দেশ

DESH 40 Naya Paise
Saturday, 20th August, 1960.

২৭ বর্ষ ॥ ৪২ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৪ ভাদ্র, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

গত ১২ই অগস্ট শান্তিনিকেতনে সাতাশী বৎসর বয়সে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী পরলোকগত হইয়াছেন।

পরিণত বয়সে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর তিরোধানে সত্য সত্যই একটি যুগের অবসান ঘটিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, পাশ্চাত্ত্য জীবনাদর্শের সহিত ভারতীয় জীবনাদর্শ মিলিত হইয়া যে একটি সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিতেছিল, রামমোহনে যাহার পূর্বসূত্র, রবীন্দ্রনাথে যাহার উপসংহার, উনিশ শতকের অধিকাংশ মহাপুরুষ ও মনীষী যাহার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন প্রায় দীর্ঘ এক শতাব্দীব্যাপী সেই যুগকে বাঙালীর ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ একটি পর্ব বলা যাইতে পারে। যে সব ব্যক্তি হাতেকলমে এই যুগ সৃষ্টিতে সাহায্য করিয়াছেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর লোকান্তর প্রয়াণে তাঁহাদের শেষ প্রতিনিধি অন্তর্হিতা হইলেন।

ইন্দিরা দেবীর পিতৃকুল, মহর্ষি পরিবার এই যুগসৃষ্টিতে যেমন সাহায্য করিয়াছে এমন বোধ করি বাংলাদেশের আর কোন একটি পরিবার করে নাই। অত্যুক্তি না করিয়াও বলা চলে যে, বাংলার এই স্পৃহনীয় যুগটি মহর্ষি ভবনের প্রাঙ্গণে জন্মলাভ করিয়াছে। সেই পরিবারের কন্যা হিসাবে স্বর্গীয়া ইন্দিরা দেবীকে এই যুগের মধ্যেমণি বলা যাইতে পারে। বাঙালীর সেই গৌরবময় যুগ [illegible] নিঃশেষ হইতে চলিল—[illegible] [illegible] যেন [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible]

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

করিতে চাহিয়াছিল? কী ছিল তাহার আকাঙ্ক্ষা? এ সব প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর সম্ভব নয়। তবে ইশারায় বলা যাইতে পারে যে, সংসারের বাস্তব এবং কল্পনা ও ধ্যানলভ্য জগতের মধ্যে একটি ভারসাম্য স্থাপন তাহার কাম্য ছিল। আর এই দুই বি-সমের মধ্যে যতদূর ভারসাম্য বা সমন্বয় সম্ভব তাহা স্থাপন করিতে সে সক্ষম হইয়াছিল। ভারসাম্যে অবস্থিত অচঞ্চল তাহার মানস সরোবরে ভাসিতেছে সাহিত্য ও শিল্পকলার শতদল। এ যুগের যাঁহারা শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি তাঁহাদের সকলের ক্ষেত্রেই এই ভারসাম্যের ভাবটি অল্পবিস্তর সার্থক হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাদের জীবন বিচিত্র কর্মে ও সাহিত্য-কৃতিতে এমন ফলবান। নিতান্ত স্বল্পায়ুর জীবনও একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। ইন্দিরা দেবীর জীবন পর্যালোচনা করিলে এই ভাবটি সহজেই প্রণিধানযোগ্য হইয়া উঠিবে। নারীসুলভ কোমলতার সঙ্গে, মনস্বিতা, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলার সঙ্গে বিচিত্র কর্ম ভারসাম্যে যুক্ত হইয়াছে; হ্রী, শ্রী ও ধী পরস্পরের সহযোগিতায় যে কল্যাণময়ী মহীয়সী মূর্তি সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে পাশ্চাত্ত্যের ও ভারতের জীবনাদর্শের সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটিয়াছে। সেইজন্যই মনস্বী পিতার সন্তান হইয়াও, মহা-প্রতিভাধর খুল্লতাতের ভ্রাতুষ্পুত্রী ও দিক্‌পাল সাহিত্যিকের পত্নী হইয়াও তিনি নিষ্প্রভ হইয়া যান নাই, ইন্দিরা দেবী অপর জ্যোতিষ্কের আলোতে [illegible] নন, তিনি [illegible] জ্যোতিষ্ক, এই জ্যোতি দৈবলব্ধ সাধনালব্ধ। দৈবলব্ধের কারণ দর্শানো সম্ভব নয়; সাধনার ব্যাখ্যা সম্ভব আর তাহা আগেই বলিয়াছি, এ সাধনা যে যুগে তিনি জন্মিয়াছিলেন সেই যুগ-সাধনার অন্তর্গত।

যুগ-সাধনার পোষকতা ছাড়াও আর একটি দাবী স্বর্গতা ইন্দিরা দেবী করিতে পারেন। রবীন্দ্র সাহিত্য ও সঙ্গীতের ব্যাখ্যাতা হিসাবে তাঁহার স্থান কাহারো নীচে নয়। ছিন্নপত্রের মতো রবীন্দ্র-নাথের অমূল্য গ্রন্থখানি তাঁহার কল্যাণেই পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাকে লিখিত এই পত্রগুলি তিনি সযত্নে রক্ষা না করিলে এই গ্রন্থের প্রকাশিত হইবার [illegible] আশা ছিল না। রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচারে, স্বরলিপিযোগে তাহার বিশুদ্ধতা রক্ষায় ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের সহিত পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত ও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা ও বর্ণনায় তাঁহার দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। শেষ জীবনে রবীন্দ্র-নাথের যে স্মৃতিকথা তিনি লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন, মৃত্যুর আগে যাহা সমাপ্ত হইয়াছে, নিঃসন্দেহে বলা যায় তাহা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত জ্ঞান বর্ধনে সাহায্য করিবে। শুধু বাঙালী মহিলা সমাজের নয়, বাঙালী মনীষী সমাজের অন্যতম সুযোগ্য প্রতিনিধি ছিলেন তিনি। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলাদেশের শিক্ষাদীক্ষার জগৎ দরিদ্রতর হইল, তবে ভরসার মধ্যে এই যে, সার্থক জীবনের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি রাখিয়া গেলেন তাহা উৎসাহের বর্তিকারূপে চিরকাল দেদীপ্যমান থাকিবে। ভগবান তাঁহার আত্মার শান্তি বিধান করুন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

প্রসঙ্গত

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল রাজ্যের বিক্ষুব্ধ জনমত উপলব্ধি করে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু এইজন্যে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি বস্তু আছে যা আমাদের সর্বপ্রকার দুঃখ-দুশ্চিন্তার ঊর্ধ্বে রাখা আবশ্যক। "নইলে আমরা ভারসাম্য ও পরিপ্রেক্ষিত হারিয়ে ফেলব।" আরও বলেছেনঃ "স্বাধীনতা দিবস কোনো একটি বিশেষ দল অথবা রাজ্যের দিন নয়। এটা মুখ্যত উৎসবের দিনও নয়, আসলে উৎসর্গের দিন।" আরও বলেছেনঃ "যখন আমাদের আসামের ট্র্যাজেডি, পাঞ্জাবের গোলযোগ, ধর্মঘট প্রভৃতির (চীনের কথা বলেন নি) সম্মুখীন হতে হচ্ছে তখন ভারতের স্বাধীনতা ও ঐক্যের মূলগত আদর্শ অন্য সময়ের চেয়েও বেশি করে আঁকড়ে ধরে থাকা আবশ্যক।"

নেহরুজী কথা খুব চমৎকার করে বলতে পারেন। এত চমৎকার যে, ভাষার আবেগ-তরঙ্গে অনেক সময় তার ভিতরকার গলদ ধরা কঠিন হয়। তাঁর এই কথা যদি সত্য হয় যে, স্বাধীনতা দিবস নগরজনপদ আলোয় সাজিয়ে, রেডিও বাজিয়ে, হৈ হৈ করে নেচে-কুঁদে বেড়াবার দিন নয়, উৎসর্গের দিন, তাহলে সর্বপ্রকার তরল আমোদ-প্রমোদ বর্জন করে, শান্ত সমাহিত এবং স্তব্ধ চিত্তে পশ্চিমবঙ্গ যেভাবে স্বাধীনতা দিবস পালন করলে তার চেয়ে যোগ্যতরভাবে স্বাধীনতা দিবস পালিত হতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গ যে পারলে তার কারণ তার চিত্ত আজ শোকভারে অবনত। নইলে তার পক্ষেও এমনভাবে পালন করা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ।

*

আত্মরতিতে মুগ্ধ হয়ে মানুষে ভুলে যায় যে, স্বাধীনতাই শেষ নয়, চরম লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় মাত্র। বিবেচনা করতে হবে গত ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে সেই লক্ষ্যে আমরা কতদূর অগ্রসর হতে পেরেছি, আমাদের সুখ-সমৃদ্ধি কত বেড়েছে, মন এবং বুদ্ধি কত উদার হয়েছে, ভারতবর্ষকে ভালোবাসার জন্যে কতখানি প্রাদেশিক সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছি। একদা লক্ষ লক্ষ নরনারী স্বাধীনতার জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করেছে, নেহরুজী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের মুখ থেকে এই কথা শুনে যে, স্বাধীনতা পরশপাথর, তার স্পর্শে লোহা সোনা হয়। তেরো বৎসর স্বাধীনতা লাভের পর ('রুথ ভ্যারেট' ছাড়া) অপর কোথাও সেই সোনার সন্ধান মিলেছে কি? স্বাধীনতা পেয়েছে চোর এবং চোরাকারবারীরা, আর একশ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ ধাপ্পাবাজ। সরকারী পরিসংখ্যানের ভিতর দিয়ে নয়, সাদা চোখে দেখা যাচ্ছে সাধারণ মানুষ, যার নাম ভারতবর্ষ, নৈতিক ও আর্থিক দুর্গতির-পিচ্ছিল পথে অতি দ্রুত নেমে যাচ্ছে। সাদা চোখের এই উপলব্ধি মায়া বলে উড়িয়ে দিলে ভুল করব। কেন আসামে একদল ভারতবর্ষীয় পশুর মতো নিহত হল এবং সেই বর্বর হত্যাকান্ড স্তোকবাক্যের জঞ্জাল দিয়ে ঢাকবার চেষ্টাই বা হচ্ছে কেন? পাঞ্জাবে কেন গোলযোগ বেধেছে? আর নিরুপায় নিরীহ সরকারী কেরানীকুল কেনই বা ধর্মঘট করতে বাধ্য হয়? নেহরুজী যে গণতন্ত্রের দোহাই পাড়েন সেটা আসলে নেহরুতন্ত্র। এবং আত্মরতির চশমা দিয়ে ভারতীয় জটিল সমস্যাগুলিকে না দেখে যদি তিনি সাদা চোখে দেখতেন তাহলে এতদিন এর সমাধান হয়ে যেত হয়তো।

*

সকল জিনিসেরই দাম দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। তার ফলে, বিশেষ করে আসন্ন পুজোর সামনে, গৃহস্থমাত্রই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। সেদিন ভারতীয় বস্ত্র ব্যবসায়ী সংঘ (সরকারী চাপেই হোক, আর বস্ত্রমূল্য সাধারণ ক্রেতার নাগালের বাইরে গেছে সেই আশঙ্কাতেই হোক) শতকরা দশ টাকা বস্ত্রমূল্য হ্রাস করার নির্দেশ দিয়েছে। শ্রীলালবাহাদুর যদিও মূল্য আরও কমাবার জন্যে বলেছেন এবং না কমালে আবশ্যকীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের হুমকি দিয়েছেন, এই হুমকির মূল্য কতখানি জানি না। কিন্তু তাঁর বক্তৃতা থেকে এই সন্দেহই দৃঢ়তর হয় যে, মূল্যবৃদ্ধি নিরোধ সম্বন্ধে সরকারের কোনো স্পষ্ট এবং বলিষ্ঠ নীতি নেই।

যে কারণেই হোক, বঙ্গীয় বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতি সম্প্রতি শতকরা আরও পাঁচ টাকা বস্ত্রমূল্য হ্রাস করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। তাঁদের মতে বস্ত্রাদি যদি পাইকারী বিক্রেতাদের মারফৎ না পাঠিয়ে সরাসরি খুচরো বিক্রেতাদের কাছে পাঠানো হয় তাহলে মূল্য (পাইকরী বিক্রেতাদের লভ্যাংশ বাবদ) শতকরা তিন টাকা কমতে পারে। আর খুচরো ব্যবসায়ীরা যদি 'ক্ষতিস্বীকার' করে আরও ২% কমান তাহলে মোট ১৫% মূল্য কমতে পারে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায়।

*

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর শ্রীমালী লোকসভায় পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, অর্থের অভাবে এবং শিক্ষার উপযুক্ত মান রক্ষার জন্যে কলেজগুলিতে ছাত্রভর্তি সীমাবদ্ধ করা প্রয়োজন। শিক্ষামন্ত্রীর উক্তির অন্তর্নিহিত সত্য অনস্বীকার্য। একে তো পাশের শতকরা হার চল্লিশের একটু এদিক-ওদিক থাকে, তার উপর তৃতীয় বিভাগেরই আধিক্য। এদের সকলকেই কলেজে পড়াশুনোর নামে অভিভাবকের অর্থ এবং নিজেদের সময় ও উদ্যমের অপব্যয় করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। ডক্টর শ্রীমালীর উক্তির এই অংশ আমরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত, সমস্যাটির এইখানেই শেষ নয়। প্রশ্ন থেকে যায়, এরা তারপরে করবে কি? স্কুল থেকে বেরিয়ে নিজের নিজের রুচি ও অনুরাগ অনুযায়ী বৃত্তি গ্রহণ করে যাতে এরা স্বচ্ছন্দে জীবিকার্জন করতে পারে, এমন কী ব্যবস্থা সরকার করেছেন? কারিগরী শিক্ষার সামান্য যে ব্যবস্থা সরকারের উদ্যোগে হয়েছে তাতে অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রেরই কোনোমতে স্থান হয়। এবং সেখান থেকে যারা বেরিয়ে আসে তাদেরও কর্মসংস্থানের কোনো গ্যারান্টি নেই। এই অবস্থায়, বিবেচনা করতে হবে, স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের নিষ্কর্মা বসে থাকা শ্রেয় না কলেজে ভর্তির সুযোগ পাওয়া বাঞ্ছনীয়? বিষয়টি দেশ এবং জাতির কল্যাণের দিক থেকে বিবেচনা করতে আমরা ডক্টর শ্রীমালীকে অনুরোধ করি।

*

আসামের হত্যাকাণ্ডের জন্যে পশ্চিমবঙ্গের বিক্ষুব্ধ জনমতের কথা ভেবে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নবতিতম জন্মোৎসবও সংক্ষিপ্ত হয়েছে। অতীব পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নেই। সমস্ত বিশ্বের রসিক চিত্তে শিল্পগুরু অমর হয়ে রয়েছেন। আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে এই দিনটি প্রতি বৎসর যথাযোগ্য উৎসবের সঙ্গে প্রতিপালিত হয়। এবারে পশ্চিমবঙ্গের চিত্ত আসামের ব্যাপারে এতই মথিত ও বিহ্বল যে, কোনো উৎসবেই তার মন সাড়া দিতে পারছে না। এইজন্যেই স্বাধীনতার উৎসবাঙ্গ পরিবর্জিত, শিল্পগুরুর জন্মতিথির উৎসবাঙ্গও। কোনোটাই শ্রদ্ধার অভাবের জন্যে নয়। শিল্পগুরুর জন্মতিথিতে তাঁর একান্ত অনুরাগী স্বদেশবাসী অসীম ভক্তির সঙ্গেই তাঁকে স্মরণ করছে এবং মনে মনে তাঁর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছে।

আসামের আবর্তনে

দরবেশ

বিদকুটে একটা স্বপ্ন প্রায়ই আমি দেখি, একশত বছর পরে ইতিহাস যেন বলছে—"ভারতবর্ষ নামে একদিন যে দেশটা ছিল, কোনও এক সময়ে ঐ দেশে বাঙ্গালী নামের একটি জাতি বসবাস করতো। তথাকথিত বাঙ্গালীদের একমাত্র সাহিত্য ছাড়া আর কিছুই আজ খুঁজে পাওয়া যায় না।"

আসামের আবর্তনে পৃথিবীর অনেক দেশেই আজ বাঙ্গালীর নামটা শুনল এবং যদিও ঘটনাটা জঙ্গলময় আসামেই ঘটল, আড়চোখে আজ অনেকেই বাঙ্গলা দেশের দিকে তাকাচ্ছে—পূর্ব-পশ্চিম দুটো বাঙ্গলার দিকেই।

১৯৪৭-এর পর আসামেই সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হল নতুন এক ধরনের নরমেধ যজ্ঞ। তুমি এই নরমেধ যজ্ঞের যে নামই দাও না কেন—বাঙ্গালীমেধ, নারীমেধ, শিশুমেধ, ভাষামেধ—এ-তত্ত্বটুকু স্বীকার করতে সংকুচিত হবে না যে, স্বাধীনতার এক যুগ পরে সারা দেশ যখন একটা পরিবর্তন চাইছে, তখন আসামে এমন একটি ঘটনা ঘটল, পৃথিবীর ইতিহাসে যার তুলনা আছে বলে ঐতিহাসিকরা গ্রহণ করবেন না। বাঙ্গালীর স্মৃতি-কোঠায় নোয়াখালি এতদিন বেঁচেছিল, মানুষের সহিষ্ণুতার উপর মস্ত বড় একটা দাবি থাকা সত্ত্বেও, আসাম আজ নোয়াখালির জায়গা নিল। এ বড় গুরুতর স্মৃতি। কিন্তু আমার কাছে একথা অনস্বীকার্য যে, আসামের বর্তমান পরিস্থিতিকে যতটা আশাহীন করে দেখা হচ্ছে, আসলে তার থেকেও ঘটনাটা আরো অভিসম্পাতময়।

অভিসম্পাতময়, কারণ, স্বাধীনতার পর ঠিক যখন আমাদের দায়িত্ববোধের 'প্রসার অনেকটা বেড়ে ওঠা উচিত ছিল, আসামের অপরিণত রাজনৈতিকদের মধ্যে তখন জেগে উঠল আঞ্চলিক ভাবপ্রবণতা, বঙ্গভাষীদের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র, ব্যাপক হত্যাকাণ্ড, মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার, গৃহে গৃহে অগ্নিসংযোগ। পৃথিবীর বর্তমান ইতিহাস যেন বলে উঠল, "একদা মহাত্মা গান্ধী নামে ভারতবর্ষে একজন মানুষ ছিলেন, তিনি কি বিশ্বাস করতেন বা করতেন না এবং তাঁর তথাকথিত ভারতীয় শিষ্যেরা আজ তাদের সীমাবদ্ধ সচেতনায়

অন্নদাশঙ্কর রায়ের

গল্প

পাঁচ টাকা

বাংলা গল্পের প্রথাসিদ্ধ ধারা হতে অন্নদাশঙ্কর প্রবর্তিত ধারাটি স্বতন্ত্র। এবং যতই দিন যাচ্ছে, ততই স্পষ্ট হচ্ছে যে, তাঁর প্রদর্শিত পথেই বাংলা ছোটগল্পের গতি। অর্থাৎ অতি-আধুনিক বাংলা গল্পের প্রবণতা তাঁর মধ্যেই সর্বপ্রথম বিধৃত হয় এবং এই ছোটগল্প আন্দোলনের অগ্রদূত তিনিই। ১৯২৯ থেকে '৫০ পর্যন্ত তিনি যত গল্প লিখেছেন, তার সমস্তই এই বইটিতে সংকলিত হয়েছে।

কন্যা ৩, **কণ্ঠস্বর** ৩, **রত্ন ও শ্রীমতী** ১ম ৩, ২য় ৩॥০ **আগুন নিয়ে খেলা** ৩, **পুতুল নিয়ে খেলা** ৩, **যার যেথা দেশ** ৫, **অজ্ঞাতবাস** ৬, **কলঙ্কবতী** ৬, **দুঃখমোচন** ৫, **মর্ত্যের স্বর্গ** ৫, **অপসরণ** ৫,

নবগোপাল দাসের **অভিযাত্রী** পাঁচ টাকা

১৯৪২ হতে '৫২ পর্যন্ত সময়টা বাংলার ইতিহাসে যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনই মর্মান্তিক। এই সময়ে দেশের পট দ্রুত পরিবর্তনশীল, সমাজ ক্রমাগত অধঃপাতী, ব্যক্তিচরিত্র সংশয় লোভ দুর্নীতি শঠতা ও যাবতীয় হীনতায় আক্রান্ত। **'অভিযাত্রী'** এই সংকটকালের মহা-মূল্যবান মানবিক দলিল। সুবোধ দাশগুপ্তের মনোহারী প্রচ্ছদ।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের **উত্তরপুরুষ** আড়াই টাকা

বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের স্বরূপ অনুধাবনে ও তার সমস্যার জটগুলি খুলে দেখাবার কৃতিত্বে নরেন্দ্রনাথের নতুন উপন্যাসটি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। **শুক্লপক্ষ** ৩, **সহৃদয়া** ৪,

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের আত্মচরিতমূলক উপন্যাস **স্মরণচিহ্ন** ৫·০০

প্রাণতোষ ঘটকের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা **রাণী বৌ** ৪·০০

রমাপদ চৌধুরীর

এই পৃথিবী পান্থনিবাস পাঁচ টাকা

রমাপদ জানেন, সত্যের আকর্ষণ দুর্বার ও অপ্রতিরোধ্য এবং আলোচ্য উপন্যাসটি একালের জীবন-সত্যেরই অকপট প্রতিরূপ। চার মাসের মধ্যে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হলো।

প্রথম প্রহর ৫, **অরণ্যআদিম** ৩,

লালবাঈ

ছয় টাকা

নবম মুদ্রণ প্রকাশিত হলো

বিমল করের **অপরাহ্ণ** তিন টাকা

এটি ধীর-লয়ে বিলম্বিত কাহিনী নয়, একটি সুখের সংসার ভেঙে পড়ার তীব্র-উত্তেজনাময় রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তকয়টিকে এতে ধরে দেওয়া হয়েছে। **দেওয়াল** ১ম ৪॥০ ২য় ৬,

সুরজিৎ দাশগুপ্তের **একই সমুদ্র** সাড়ে তিন টাকা

এর নায়ক বিশ-শতকের অভিশপ্ত-আত্মা, একালের লাঞ্ছিত-প্রবঞ্চিত তারুণ্যের মূর্ত প্রতীক। এ-বইয়ে ঢাকাঢাকি নেই, আধুনিক তারুণ্যের সমস্যাকে খোলাখুলি রূপ দেওয়া হয়েছে।

অন্যান্য বই

বনফুল-এর **উদয়-অস্ত** ৬, **অগ্নীশ্বর** ৪॥০ বিমল মিত্র-র **রাজপুতানী** ৩, রূপদর্শী-র **রঙ্গব্যঙ্গ** ৩৷৵০ সুবোধ চক্রবর্তীর **সেই উজ্জ্বল মুহূর্ত** ৩॥০ ডঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের **সাহিত্যে ছোটগল্প** ৮, **নীলদিগন্ত** ৩, গ চ নি-র **অথ সংসার চরিতম** ২॥০ দীপক চৌধুরীর **দাগ** ১ম ৫, ২য় ৪, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের **শেষ বৈঠক** ৩॥০ ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের **জেলেডিঙি** ২॥০ তারাশঙ্করের **পঞ্চপুত্তলী** ৪, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের **শুভাশুভ** ৪,

নতুন সংস্করণের বই

প্রমথনাথ বিশীর **সিন্ধুনদের প্রহরী** ৩,

নজরুল ইসলামের **প্রলয় শিখা** ২॥০ **নজরুল গীতিকা** ৩, / ৩॥০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের **অভিশপ্ত পাখি** ২য় ৪॥০

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের **ডাক্তারের হাতে দড়ি** ২॥০ **ডাক্তারের জেলখানা** ২॥০

ডি, এম, লাইব্রেরী : ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট : কলকাতা ৬

কতদূর বিশ্বাসী, সে-সব তর্ক একেবারেই ভুলে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত।"

আসামের বর্তমান পৈশাচিক তাণ্ডব-লীলার পরও আসাম নামের দেশটাকে আমি ভালবাসি। যাকে একদিন আমি আমার হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রিটুকু দিয়ে ভালবেসেছিলাম, তার বর্তমান সর্বগ্রাসী মুখব্যাদান আমায় অবশ করে আহত করেছে; অজস্র নরনারীর অসহায় কাতর ধ্বনিতে নিজেকে পঙ্গু বলে মনে করেছি, তবু আমি অসমীয়াদের প্রতি বিমুখ হতে পারিনি, কারণ আমি জানি, আর যে-কেউ এই রাষ্ট্রদ্রোহী গুণ্ডাশাহীর পরিচালক হোক না কেন, সাধারণ অসমীয় নরনারীর হাত এতে মারাত্মক রকমের কিছুই ছিল না।

আসামে অসমীয় ও বঙ্গভাষী পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে আজ চারশত বছর ধরে প্রসার লাভ করেছে। এ ছাড়া অন্য কোনও উপায় ছিল না। কংগ্রেসী রাজনীতি প্রথম থেকেই এই পরিপূরকতায় শৈথিল্য সৃষ্টি করে—এখানে স্বার্থান্ধতা ছিল।

অসমীয়দের ব্যাপক অক্ষরহীনতা, অর্থনৈতিক নিম্নমান ও হতাশার বিমুক্তকরণের আপাত-সহজ উপায় যেন কংগ্রেসী আঞ্চলিক তথাকথিত রাজনৈতিকরা দেখালেন 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলনে। যুক্তির বদলে হিংসানল জ্বলে উঠল। উচ্ছৃঙ্খল অসমীয়া নেতাদের মানসিক আবহাওয়ার এ-রকম রূপান্তর এইজন্যেই হতে পারলে, কেননা, আসামের ইতিহাসে এমন কোনও মানুষই জন্মায় নি, যিনি ওদের হারানো বিশ্বাসের পুনর্বসতি করতে সাহায্য করতে পারতেন। ওদের দৃষ্টি আসামের বাইরে গেল না, ব্রহ্মপুত্র যে বাঙলা দেশেও প্রবাহিত হয়েছে, এই তথ্যটুকুও ওদের চোখে পড়ল না; এমন কি, যে ভাষার মোহে ওরা আজ বর্তমান পাশবিকতায় নিজেদের শৃঙ্খলিত করল, সেই ভাষাকেও সুসমৃদ্ধ করে তুলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল না। ক্রমশ, কিন্তু ক্রমবর্ধমানভাবে ও'রা ওদের প্রতিবেশী বঙ্গভাষীদের দেখল রামমোহন রায়, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নেতাজীর কাছে দীক্ষা নিতে।

এতে ওদের প্রতিযোগিতা প্রবৃত্তির উদ্রেক হল না, শুধু জাগ্রত হল এক ধরনের হীনমন্যতা, যা ওদের আত্মোন্নতির পথ দেখাল না, ক্রমশ সংকীর্ণ প্রান্তিকতার পথে নিয়ে গেল, জাতীয় দায়িত্ববোধ থেকে একেবারেই বঞ্চিত করল, নিজেদের গণ্ডির মধ্যে ভারতের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নিষ্ঠুর কুঠারাঘাত করল। এতে ভারতবর্ষের মতন গোটা দেশটার কতটা ক্ষতি হল না হল, সেটা আজ জাতীয় প্রশ্ন। 'প্রশ্ন নম্বর ওয়ান'। কিন্তু ভেবে আমি অবাক না হয়ে পারিনে যে, আসামে কি সত্যিই এমন কোনও মানুষ নেই—নেতা তিনি নাই বা হলেন—যিনি অসমীয়া 'নেতাদের' এই আত্মঘাতী নীতির বিরুদ্ধে মৌলিক কিছু করবার দিকে ঝোঁক দিতে পারতেন না? যিনি জীবনের এই হীনতা ও নিষ্ঠুরতার প্রান্তিক দিকটা নেতাদের চোখের সামনে তুলে ধরতে পারতেন না? গুণ্ডামীর আবেদন এতোই সোজা যে, ও জিনিসটাতো পৃথিবীর সব মূর্খরাই অল্পবিস্তর অনুষ্ঠিত করতে পারে, এবং যে কোনও সময়ে সামান্য প্রলোভনেই। এর থেকে কি সামান্যতম ভালো পথ আসামের কোনও নেতাই খুঁজে বের করতে পারলেন না, যা থেকে অসমীয়াদের বর্তমান অর্থনৈতিক প্রশ্নের বিন্দুমাত্রও সমাধান হতে পারত?

বন্ধু, তুমি স্বীকার করবে, মহাত্মাজীর কাল্পনিক শৃঙ্গ আজ দুরারোহ। শৃঙ্গের বিসর্পিল পথে পৌঁছন সত্যিই মুশকিল। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর প্রিয়তম শিষ্যেরাও কি সেই শৃঙ্গারোহণের প্রচেষ্টা থেকে আজ বিরত নেই? এ'রাও যেন জীবনের যত কিছু সব মূল্যবান বস্তু, সে-সব থেকে আজ ক্রমশ বঞ্চিত হয়ে চলেছেন? নির্ভেজাল রাজনীতিক হয়ে বেঁচে থাকবার দিন কোনও দিনও ছিল না, আজও একেবারেই নেই। মানবতায় ও রাজনীতিতে, প্রচণ্ড রকমের বুদ্ধিমান না হয়েও একথা বলা যায়, আজ ভেদাভেদ থাকবার কথা নয়। সাধারণ মানুষ আজ জানতে চায় রাজনীতি আমাদের কোন কাজে লাগছে। ভারতীয় কংগ্রেস তার আদর্শ বারবার ভেঙেছে, রাজশক্তি অর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা, ধর্মান্ধতা, স্বার্থপরতা, ব্যক্তিগত দুর্বলতা ইত্যাদি নীচ প্রবৃত্তিগুলোর সঙ্গে সাগ্রহে করমর্দন করতে কোথাও এবং কখনও এতটুকু ইতস্তত করেছে বলে শোনা আর যায়নি। আসামের শিলহেট জেলাটিকে কিভাবে পাকিস্তানে ঠেলে দেওয়া হল, সেই পুরোনো কাসুন্দি আর ঘাটবো না। আসামের জনসংখ্যা পরিসংখ্যান এবং তার ভেল্কির কথাও তুলব না, আসাম সরকারের প্রাক্তন মুসলিম-লীগ-চাঁইরা কিভাবে ক্ষমতা অধিকার করল একথা তোলার কাজও আমার নয়, এমন কি ভারতীয় সংবিধানের দোহাই দিয়ে আসাম সম্বন্ধে যে-সব জটিল প্রশ্নগুলি তোলা হয় সে-সব কথাও নাই বা

রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

রবীন্দ্রস্মৃতি

"কোনো মহাপুরুষকে বাইরের লোকে যেভাবে দেখে বা তাঁর প্রতিভার যে পরিমাণ পরিচয় পায়, ঘরের লোকের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক সে রকম নয়। তারা বেশি কাছ থেকে দেখে বলে যেমন তার ব্যাপক বা সমগ্র ব্যক্তিত্বের অনুধাবন করতে পারে না, তেমনি অনেক ছোটখাটো ইঙ্গিত জানতে পায়, যা বাইরের লোকের অধিগম্য নয়। আত্মীয়-মাত্রেরই যে এই সৌভাগ্য ঘটে তা নয়, তবে নানা ঘটনাচক্রে আমরা বহুদিন ধরে তাঁর নিকটসান্নিধ্য এবং ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাবার সুযোগ পেয়েছিলুম। সেই ছোটখাটো পরিচয়খণ্ডগুলি একত্র করে এই স্মৃতিপটে সাজিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি।" গ্রন্থমুখ—রবীন্দ্রস্মৃতি

সূচীপত্র : সংগীতস্মৃতি, নাট্যস্মৃতি, সাহিত্যস্মৃতি, ভ্রমণস্মৃতি, পারিবারিক স্মৃতি

মূল্য ২·০০ : বোর্ড-বাঁধাই ও বহুচিত্র-শোভিত ৩·৫০ টাকা

বিশ্বভারতী

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন । কলিকাতা ৭

তুললাম। কিন্তু এই দেউলে দেশের আসাম নামক রাজ্যে আজও যে একজনও অসমীয় ভদ্রলোক এগুতে সাহস করলেন না এই বলে যে, ভাই, আমরা অন্যায় করে ফেলেছি, অন্যায় পথে চলেছি, এ পথে শুধুমাত্র আসাম রাজ্যটাই ছারখার হয়ে যাবে তা নয়, গোটা দেশটাই টুকরো টুকরো হয়ে যাবে ছোট বড় নানা অঞ্চলে—স্বাধীনতা নামের কথাটা তখন শুধু মরীচিকাতেই পরিণত হবে না, আগামীকালের ঐতিহাসিকরা লিখবেন, "অসমীয় ভাষায় কথা বলত এমন একটা আঞ্চলিক উপজাতি একদিন ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে বসবাস করত যাদের নেতারা তাদের নাকের ডগার ওপারে আর কিছু দেখতে পারত না।"

আসাম এক বিষয়ে পথপ্রদর্শক হয়ে রইল। শারীরিক শক্তিতে শিখধর্মাবলম্বীরা প্রবল। ওদের পাঞ্জাবেও ভাষাগত নানা বাগবিতণ্ডা, আইনসম্মত আন্দোলন আজ চলছে (যার কণামাত্রও আসামে চলছে না) কিন্তু তবু সেখানে আজও একজন মানুষেরও প্রাণহানি হয়নি, একজন মেয়ের উপরেও পাশবিক অত্যাচার চলেনি, একজন চাষীর ঘরের চালও পোড়েনি। শিখেরা নিশ্চয়ই অসমীয়দের শারীরিক বলকে হিংসা করে না, ওদের কোমরে সব সময় কৃপাণ থাকে, কিন্তু ও'রা ওদের ভাষাগত দাবি মানিয়ে নেবার জন্য প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে যে শান্তিপূর্ণ ব্যাপক আন্দোলন চালিয়ে চলেছেন, যে কোনও অসমীয় নেতার সেদিকে দৃষ্টিপাত হওয়া উচিত ছিল। এতে ক্ষতি কারুরেই হত না, এমন কি অসমীয় ঐ কুম্ভীরাশ্রুবর্ষণকারী নেতাদেরও না।

আযৌবন আসাম আমার কাছে, ইংরেজীতে যাকে বলে 'সেকেণ্ড হোম'। সাধারণত অসমীয়দের মতন শান্তিপ্রিয়, ভাবপ্রবণ ও সহিষ্ণু মানুষ সত্যিই ভারতবর্ষে বিরল বলেই আজও আমি মনে করি। আসামের বর্তমান অভিযান কেবলমাত্র একটা সাময়িক প্রশ্ন নয়। আসামে ক্ষমতাবানদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অন্ধ আক্রোশ ক্রমশই অক্ষমনীয়রূপে বেড়েই চলেছে। ওদের নিজেদের মধ্যেই দ্বন্দ্ব বেঁধে গিয়েছে (যেমন শুরু হয়েছে সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় নেতাদের মধ্যেও) প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে। পৃথিবীর ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার ক্ষমতা ওদের আজ নেই। অসমীয় জনসাধারণের এ-কথা কিছুতেই ভুললে চলবে না, আজ তারাই শুধু অন্ধ উন্মাদ হয়ে ওঠেনি। আসামের রাজনীতিই আজ উন্মাদ হয়ে উঠেছে। শাস্তি, প্রতিশোধ, ভয় দেখানো এ-সব সাময়িক প্রশ্ন হতে পারে কিন্তু তা আপেক্ষিক এবং অত্যন্ত ছোট প্রশ্ন।

॥ সদ্য প্রকাশিত ॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অবিস্মরণীয় উপন্যাস
মহাশ্বেতা
॥ সাড়ে পাঁচ টাকা ॥

চাঁপাডাঙার বউ (৩য় মুঃ) ২·৫০
আমার কালের কথা (৩য় মুঃ) ৪·০০

আনন্দকিশোর মুন্সীর
অন্তর্মধুর বিচিত্র উপন্যাস
রাঘব বোয়াল
॥ তিন টাকা ॥

ডাক্তারের ডায়েরী (৪র্থ মুঃ) ৪·০০

সন্তোষকুমার দে'র
নানান রঙের রসমধুর গল্প
বৈঠকী গল্প ২·৫০

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক
বীরেন্দ্রমোহন আচার্যের
আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব
॥ সাড়ে ছয় টাকা ॥

ধনঞ্জয় বৈরাগীর
সামাজিক নাটক
রুপোলী চাঁদ
(৩য় মুঃ) ২·৫০ ॥

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের
মধ্য ইয়োরোপ পায়ে হেঁটে বেড়ানোর
সচিত্র বিচিত্র ভ্রমণকাহিনী
চরণিক ৩·০০ ॥

লাফা যাত্রা ২·৫০ ॥

॥ পুনর্মুদ্রণ ॥

প্রবোধকুমার সান্যালের
যুগান্তকারী উপন্যাস
হাসুবানু (৪র্থ মুঃ) ৮·০০

মনোজ বসুর
জনপ্রিয় উপন্যাস
সবুজ চিঠি (৩য় মুঃ) ৩·০০

দেবেশ দাশের
অপূর্ব রম্যরচনা
ইয়োরোপা (৭ম মুঃ) ৩·০০
রাজসী (৩য় মুঃ) ৩·০০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবিস্মরণীয় দুটি উপন্যাস
পুতুলনাচের ইতিকথা (৭ম মুঃ) ৫·৫০ ॥
সোনার চেয়ে দামী : **বেকার** (৩য় মুঃ) ২·২৫ ॥

॥ উল্লেখযোগ্য বই ॥

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের **জর্জ বার্নার্ড শ'** ৮·৫০ ॥ **নীলকণ্ঠের এলোবেলো** ২·৫০ ॥ বুদ্ধদেব বসুর **নীলাঞ্জনের খাতা** ৪·০০ ॥ সতীনাথ ভাদুড়ীর **পত্রলেখার বাবা** ৪·০০ ॥ রমাপদ চৌধুরীর **মুক্তবন্ধ** ৩·০০ ॥ কুমারেশ ঘোষের **সাগর-নগর** ৩·৫০ ॥ সুবোধকুমার চক্রবর্তীর **মণিপদ্ম** ৪·০০ ॥ AFRICANISM—The African Personality by Dr Suniti Kumar Chatterji. Rs. 16/- ॥ সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের **দূরের মিছিল** ৪·০০ ॥ স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **মাথুর** ৪·০০ ॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের **নব সন্ন্যাস** ৭·০০ ॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের **রায় চৌধুরী** ২·২৫ ॥ সরোজকুমার রায়চৌধুরীর **মহাকাল** ৩·৫০ ॥ সন্তোষকুমার ঘোষের **মোমের পুতুল** ৪·৫০ ॥ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের **চলাচল** ৬·৫০ ॥ সুবোধ ঘোষের **একটি নমস্কারে** ৪·০০ ॥ নারায়ণ সান্যালের **অনামী** ৪·০০ ॥ বিনায়ক সান্যালের **রবিতীর্থে** ৪·০০ ॥ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের **বিষের ধোঁয়া** ৪·০০ ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের **স্বর্ণসীতা** ২·৫০ ॥ নীহাররঞ্জন গুপ্তের **অপারেশন** ৬·০০ ॥ শশিভূষণ দাশগুপ্তের **বাস ও বন্যা** ৩·০০ ॥ হুমায়ুন কবীরের **শিক্ষক ও শিক্ষার্থী** ৩·৫০ ॥ গোপাল হালদারের **আড্ডা** ২·০০ ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের **সুখদুঃখের ঢেউ** ৪·০০ ॥ বিনয় ঘোষের **বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ** ১ম খণ্ড : ৩·০০ ॥ ২য় খণ্ড : ৭·০০ ॥ ৩য় খণ্ড ১২·০০ ॥ দিলীপ মালাকারের **নেপোলিয়নের দেশে** ২·০০ ॥ কালকূটের **অমৃতকুম্ভের সন্ধানে** ৫·০০ ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **শ্রেষ্ঠ গল্প** ৫·০০ ॥ নারায়ণ চৌধুরীর **বাংলার সংস্কৃতি** ৩·০০ ॥ প্রমথনাথ বিশীর **চলন বিল** ৫·৫০ ॥ নবেন্দু ঘোষের **ডাক দিয়ে যাই** ৩·০০ ॥ পরিমল গোস্বামীর **পথে পথে** (সচিত্র) ৩·০০ ॥ বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের **দুই পৃথিবীর মাঝের দেশ** ৬·৫০ ॥ দক্ষিণারঞ্জন বসুর **বিদেশ বিভুঁই** ৬·০০ ॥

॥ **বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড**, কলিকাতা : বারো ॥

এ-কথাটিও ভুললে চলবে না, গুন্ডারাও জনসাধারণের একটা সাধারণ অংশের প্রতিনিধি মাত্র। এদের পরিবর্তনের আশা না রেখে সমাজ থেকে বাদ দিতে হবে, ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে না রাখলেও দশ বিশ বছরের জন্য এদের জেলে কিংবা অন্তরীণে রাখতে হবে। ভারতীয় সভ্যতাকে ওরা শুধু বিতাড়িতই করে তোলেনি, সমাজ ও দেশকে করে তুলেছে সম্পূর্ণরূপে বিষাক্ত। সুস্থ জীবন আজ হয়ে উঠেছে অচিন্ত্যনীয়।

বললে তুমি হয়তো ভুল বুঝবে, আসলে আমরা বাঙ্গালীরা আসামে বঙ্গভাষীদের লাঞ্ছনায় যন্ত্রণা পাইনি, যন্ত্রণার প্রতিধ্বনি মাত্র পেয়েছি। নোয়াখালির পর মহাত্মা গান্ধী যন্ত্রণা পেয়েছিলেন। রাজনীতি ছেড়ে তিনি একাই নোয়াখালি গিয়েছিলেন পায় হেঁটে—হেলিকপ্টারে বসে নয়। রাজনীতির মোহান্ধতা মহাত্মাজীকে ধরে রাখতে পারল না নয়াদিল্লিতে, কলকাতায়, শিলঙে—এমন কি স্বর্গরাজ্যের পরিকল্পনাতেও না।

আষাঢ়ের **ফসল-এ** রয়েছে

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় । পুরুষ—বৈরাগ্য ও বাসনার সংঘাত । নিতাই বসু
গল্পঃ লুইগি পিরানদেল্লো । নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । রম্যরচনা । কবিতা ।
পুস্তক সমালোচনা ঃঃ দাম ৬২ নয়া পয়সা।

কার্যালয় ঃ ৩৭, কামিনী স্কুল লেন । সালকিয়া, হাওড়া

তুমি আজ বিশ্বপ্রেমী নেহরুজীর বক্তৃতা পড়ছ, আসাম সরকারের বিজ্ঞপ্তি পড়ছ, কিন্তু এ'দের ধরাছোঁয়াতেও যিনি একেবারেই নেই সেই সামান্যমাত্র লেখক বুদ্ধদেব বসুর কথাই আমার মনে পড়ছে যিনি নোয়াখালির পর লিখলেন ঃ

"যেখানে বিফলতা নিশ্চিত, তবু আশা অন্তহীন। তিনি বেরিয়ে পড়লেন নোয়াখালির পথে, পায়ে হেঁটে, একা। গেলেন গ্রাম থেকে গ্রামে, বাড়ি থেকে বাড়িতে, কথা বললেন প্রত্যেকের সঙ্গে, অংশ নিলেন প্রত্যেকের জীবনের। বয়স তাঁর আটাত্তর। স্বজন বহুদূরে। বজ্র-কঠিন শরীর, তবু মানুষের রক্তমাংস। অমিতশান্ত স্বভাব, তবু মানুষের মন। কোথায় প'ড়ে রইল তাঁর দেশ, যেখানে বছরের পর বছর তিনি কাটিয়েছেন ভক্ত বন্ধুদের সাহচর্যে, আর কোথায় এই সিক্ত, কর্দমাক্ত, অসংস্কৃত, অবান্ধব নোয়াখালি! কোথায় তাঁর পথের শেষ জানেন না, কখনো ফিরবেন কিনা তাও জানেন না .... কিন্তু কেন? অহিংসার অগ্নিপরীক্ষা হবে ব'লে? চিরস্থায়ী আনন্দ আনবেন বলে? ও-সব কথা কিছু বলতে হয় বলেই বলা ঃ ও-সব কিছু না। আসল কথা, স্বর্গকে তিনি পেয়েছেন এতদিনে: সেই স্বর্গ নয়, যা দিয়ে রাজনৈতিক রচনা করেন জনগণের সমস্ত বঞ্চিত কামনার, ঈর্ষার, কুসংস্কারের তৃপ্তিস্থল, আর পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করতে-না-করতে যা প্রতিপন্ন হয় আরো একটি যুদ্ধের মাতৃজঠর; সেই স্বর্গ, যা ছাড়া আর স্বর্গ নেই, যা মানুষ সৃষ্টি করে একলা তার আপন মনে, সব মানুষ নয়, অনেক মানুষও নয়, কেউ-কেউ যার একটুমাত্র আভাস মাঝে-মাঝে হয়তো পায়, কিন্তু যাকে সম্পূর্ণ রচনা ক'রে সম্পূর্ণ ধারণ করতে পারেন তেমন মানুষ কমই আসেন পৃথিবীতে, খুবই কম;—আর তেমন একজনকে আজ আমরা চোখের উপর দেখছি বিদীর্ণ বিহ্বল নোয়াখালির জলে, জঙ্গলে, ধুলোয়। নম্র হও, নোয়াখালি: পৃথিবী, প্রণাম করো।'

আসামে এই নারকীয়তার পর 'ভারত-ভাগ্যবিধাতা' নেহরুজীকে আমি জিজ্ঞাসা করছি না, জিজ্ঞাসা করছি বাঙলার মনীষীদের, বাঙলার সাহিত্যিকদের ও কবিদের—তোমরাই বলো, আসামের পর কোন্ মহাপুরুষকে আমরা প্রণাম করবো?

বৈদেশিকী

চীনাদের দ্বারা ভারতের সীমা লঙ্ঘনের একটি নূতন ঘটনার সংবাদ গত সপ্তাহের শুক্রবার লোকসভায় প্রকাশিত হয়। একটি প্রশ্নের উত্তরে সরকারের তরফ থেকে জানানো হয় যে, গত ৩রা জুন ঘটনাটি ঘটে। ঐদিন ২৫ জন চীনা সৈন্যের একটি টহলদারী দল "নেফার" কামেঙ্ ডিভিসনের ভিতর ঢুকে তাকসাং বৌদ্ধমঠ পর্যন্ত চলে আসে। তাকসাং মঠটি সীমানা থেকে সাড়ে চার মাইল ভারতের ভিতরে। স্থানীয় লোকের দৃষ্টিগোচর হবার পরে চীনারা তাড়াতাড়ি সরে পড়ে। এইভাবে চীনা সৈন্যের ভারতভূমিতে বেআইনী প্রবেশকে শ্রী নেহরু অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন যে, সীমান্ত অঞ্চলে উভয় পক্ষের গতিবিধি সম্পর্কে দুই সরকারের মধ্যে যে-নিয়ম মেনে চলার কথা আছে, চীনাদের এই কাজে তা ভঙ্গ হয়েছে। এর জন্য ভারত সরকার চীন সরকারের নিকট কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই প্রতিবাদের কী উত্তর পিকিং থেকে আসে জানার জন্য অনেকেই উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকবেন। লোকসভায় প্রশ্নোত্তরের তারিখ, অর্থাৎ ১২ই আগস্ট পর্যন্ত পিকিং-এর কোনো উত্তর আসেনি ধরে নেওয়া যেতে পারে। ভারত সরকারের প্রতিবাদ কোন্ তারিখে পাঠানো হয়েছে জানি না। কিন্তু সেটা খুব সম্প্রতি হয়েছে বলে কি ধরে নেওয়া উচিত? যদি তাই হয়ে থাকে, তবে তার কারণ জিজ্ঞাস্য। ঘটনাটি ঘটেছে ৩রা জুন অর্থাৎ লোকসভার প্রশ্নোত্তরের দু মাসেরও বেশি আগে। ঘটনাটি যেখানে ঘটেছে, সেটা এমন জায়গা নয়, যেখানকার খবর সরকারের নিকট পৌঁছতে অনেকদিন লাগতে পারে। কোনো বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার পূর্বে অবশ্য খোঁজখবর নিয়ে অভিযোগের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে নেওয়া উচিত। কিন্তু তার জন্য কদিন সময় লাগতে পারে? সুতরাং প্রতিবাদ প্রেরণের পূর্বে ভারত সরকার যদি অযথা কালহরণ না করে থাকেন, তবে বুঝতে হবে যে, চীনা সরকারই উত্তর দিতে দেরি করছেন, যার কোনো সঙ্গত কারণ নেই।

৩রা জুনের ঘটনা সম্পর্কে চীনা সরকার কী উপন্যাস রচনায় ব্যাপৃত আছেন কে জানে। চীনের সঙ্গে বাদ-বিসম্বাদের এ পর্যন্ত যত ঘটনা ঘটেছে, তার কোনটার সম্পর্কেই ভারত সরকারের বিবৃতির সত্যতা চীনা সরকার মেনে নেননি। প্রতি-ক্ষেত্রেই চীনা জবাবটি একটি লকেট—বৃহত্তর চীনা দাবির হারের সঙ্গে ঝুলানো। অথবা, অন্য ধরনের তুলনা দিয়ে বলা যায় যে, চীনারা তাদের অধিকারের মহিমা এমনি বড়ো করে টেনে নিয়েছে যে, তারা যাই করুক, সেই সীমানার মধ্যে পড়বে। আমরা আশ্চর্য হব না, যদি ৩রা জুনের ঘটনা সম্পর্কে পিকিং গবর্নমেণ্ট বলেন যে, চীনা সৈন্যেরা তাকসাং মঠ পর্যন্ত এসেছিল বটে, কিন্তু

প্রকাশিত হয়েছে

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নবতম রসোত্তরণ
যোগভ্রষ্ট

গভীর জীবনবোধের
সুতীব্র জিজ্ঞাসা
আমি কে?
কে আমার পিতা??
কী আমার কুলধর্ম???
অপরূপ প্রচ্ছদ । ৫·০০

স্টিফান জাইগ
প্রিয়তমেষু

গভীর আনন্দ-বেদনায় মথিত আপন-হারা কিশোরী প্রেমের বিশ্ববিখ্যাত কাহিনী। সরস সাবলীল অনুবাদ।
রুচিস্নিগ্ধ প্রচ্ছদ । ২·০০

মন মানে না	॥	গৌরকিশোর ঘোষ	৩·৭৫
শুক্লসন্ধ্যা	॥	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	৫·০০
মুখের রেখা	॥	সন্তোষকুমার ঘোষ	৫·০০
একান্ত আপন	॥	স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪·০০
আকাশলিপি	॥	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	৪·০০
জলপায়রা (২য় সং)	॥	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৪·০০
কথাকলি (২য় সং)	॥	রমাপদ চৌধুরী	৩·০০
তৃষ্ণা (২য় সং)	॥	সমরেশ বসু	৩·০০
বধূবরণ (৩য় সং)	॥	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	৩·০০
পরমায়ু	॥	সন্তোষকুমার ঘোষ	৩·৫০
অনুবর্তন	॥	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫·০০
জনপদবধূ (২য় সং)	॥	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪·৫০
কলিতীর্থ কালিঘাট (৭ম সং)	॥	অবধূত	৪·০০
অপরূপা	॥	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	৪·০০
চীনে লণ্ঠন (২য় সং)	॥	লীলা মজুমদার	৩·২৫
আমার ফাঁসি হল (২য় সং)	॥	মনোজ বসু	৩·৫০
বনভূমি (২য় সং)	॥	বিমল কর	৩·০০
দুকূনকে ধান (অনুবাদ)	॥	শিবশঙ্কর পিল্লাই	৩·০০
মাটির মানুষ (অনুবাদ)	॥	কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী	২·৫০
আপন প্রিয় (৫ম সং)	॥	রমাপদ চৌধুরী	৩·০০
ধূপছায়া (৭ম সং)	॥	[illegible]	৪·০০
স্বন্দ্ব মধুর (৫ম সং)	॥	মুজতবা আলী ও রঞ্জন	৩·৫০

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড

আসন্ন প্রকাশ
বেনারসী ॥ বিমল মিত্র

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

তা দ্বারা সীমান্ত লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে চীন স্বীকার করে না!

কয়েকদিন পূর্বে পার্লামেণ্টে কৈলাস ও মানস যাত্রীদের প্রসঙ্গও উঠেছিল। ঐ অঞ্চলে তিব্বতী বিদ্রোহীদের দ্বারা উপদ্রুত বলে সেখানে যাত্রীদের নিরাপত্তার আশ্বাস চীন সরকার দিতে পারেন না, সেই জন্য ভারতবর্ষ থেকে যাত্রীদের যেতে মানা করে একটি সতর্কবাণী কয়েক মাস পূর্বে চীনা সরকারের তরফ থেকে আসে। তা সত্ত্বেও কিছু লোক ভারত থেকে কৈলাস ও মানস যাত্রা করে। তার মধ্যে অনেকে যাত্রা শেষ করে ফিরেও এসেছে। যারা এখনো ফেরেনি, তারাও নিরাপদে ফিরবে, এ-আশা এখনো করা যায়। এই সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে, কৈলাস মানস যাত্রীদের আসতে বারণ করে দিয়ে চীন সরকার ভারত সরকারের সঙ্গে চুক্তিভঙ্গ করেছেন কিনা এবং এর দ্বারা কোনো আন্তর্জাতিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে কিনা? শ্রী নেহরু এ সম্পর্কে চীন সরকারের কোনো দোষ দেখেন নি বা চীন সরকারকে চুক্তিভঙ্গকারী বলে মনে করেন না। দেশের কোনো অংশ যদি আভ্যন্তর কারণে বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠে তাহলে সেখানে লোকেদের আসতে *বারণ করা অযৌক্তিক নয় এবং যদিও* ১৯৫৪ সালের চুক্তি অনুসারে ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের কৈলাস ও মানসে যাবার অধিকার আছে, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তার প্রয়োগ কঠিন বা অসম্ভব হলে তার জন্য চীন সরকারকে দায়ী করা যায় না। অন্য সব দিক দিয়ে চীনের ব্যবহার যদি ভালো হত এবং তার মধ্যে যদি সন্দেহজনক কিছু না থাকত, তাহলে শ্রী নেহরুর এই কথা মেনে নিয়ে চুপ করে থাকা যেত।

বিজ্ঞপ্তি

'অভিশপ্ত চম্বল' এ সপ্তাহে প্রকাশিত হইল না, আগামী সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। —সম্পাদক

কিন্তু সারা হিমালয় অঞ্চলব্যেপে চীনের যে ভারতবিরোধী মনোভাব ও কার্যাবলী দেখা যাচ্ছে এবং যেখানে সম্ভব ভারতীয়দের দূর করে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে এবং হচ্ছে, তাতে কৈলাস ও মানস যাত্রীদের সম্পর্কে চীনা সরকারের সতর্কবাণীকে সহজ অর্থে গ্রহণ করে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। বর্তমান ঐ অশান্ত *অবস্থা সত্য হতে পারে (অবশ্য কতটা সত্য, সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা* কঠিন: সম্প্রতি তীর্থ করে যারা ফিরেছে তারা কেউ ভীতিজনক কোনো বিবরণ দিয়েছে বলে জানি না), কিন্তু এই অজুহাতের সুযোগ নিয়ে ক্রমশ ভারতীয়দের কৈলাস ও মানস অঞ্চলে যাবার অধিকার সংকুচিত করার পরিকল্পনা যে চীনা সরকারের নেই, তার কী প্রমাণ আছে? বরঞ্চ তিব্বত ও অন্যান্য ব্যাপার নিয়ে ভারতের সঙ্গে চীন সরকার যে-ব্যবহার করে আসছেন, তাতে ঐরূপ কোনো উদ্দেশ্য থাকাই সম্ভব বলে মনে হয়। "নিরাপত্তার জন্য দায়ী নই" বললেই অনেক লোক যাবে না। তা সত্ত্বেও যারা যাবে, তাদের ভালোর জন্য দু-একটা "ঘটনা" ঘটিয়ে দেওয়াও তো যেতে পারে।

যদি বলা হয় যে, এ বিষয়ে ভারত সরকারের কিছু করার বা বলার নেই, কৈলাস ও মানস যাত্রার অধিকার ভারতীয়দের থাকলেও তা প্রয়োগ করা যাবে কিনা, সেটা চীন সরকারের ইচ্ছা এবং সুবিধার উপর নির্ভর করে, তাহলে এই অধিকারের বিলোপ হতে বেশিদিন লাগবে না। ভারতীয়দের কৈলাস ও মানস যাত্রার অধিকার দুই সরকারের মধ্যে চুক্তির দ্বারা স্বীকৃত। যে-অধিকার কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তির দ্বারা স্বীকৃত, তার সংরক্ষণের জন্য কোনো আন্তর্জাতিক উপায় কেন থাকবে না, আমরা বুঝতে পারি না। কৈলাস-মানস অঞ্চলের নিরাপত্তার প্রমাণ একমাত্র চীন সরকারের উক্তির উপর নির্ভর করবে কেন?

* * *

শ্রীমতী বন্দরনায়কের গবর্নমেণ্ট কার্যারম্ভে যে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, সেটা সিংহলের ভবিষ্যতের পক্ষে আশাজনক। গত চার বছর যা হয়নি—নূতন পার্লামেণ্টের অধিবেশনের শুরুতে গবর্নর জেনারেল যে-ভাষণ দেন, তার একটি তামিল সংস্করণও সভাকক্ষে পাঠ করা হয়। এই থেকে বুঝা যায় যে, "একমাত্র সিংহলী চাই" বলে যারা সিংহলের জাতীয় জীবনকে বিষিয়ে তুলেছিল, শ্রীমতী বন্দরনায়ক সিংহলের রাজনীতিকে আর তাদের হাতে বন্দী হতে দেবেন না। কয়েকটি বড়ো সংবাদপত্র সম্বন্ধে গবর্নমেণ্ট যে-ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করেছেন, তাতেও যথেষ্ট সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়, যদিও এই ব্যাপার নিয়ে অনেক বিতর্ক উঠবে। এ বিষয়টি বারান্তরে পুনরুল্লেখের জন্য থাকল। কংগোর কথাও 'আগামী সপ্তাহের জন্য তোলা থাকল, যদিও সেখানকার ঘটনার স্রোত দুর্বার বেগে বয়ে চলেছে।

১৪।৮।৬০

"GLIMPSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ শুধু ইতিহাস নয়, ইতিহাস নিয়ে সাহিত্য। ভারতের দৃষ্টিতে বিশ্ব-ইতিহাসের বিচার। সর্ব দেশে ও সর্ব সমাজে সর্বকালের আদরণীয় গ্রন্থ। জে. এফ. হোরাবিন-অঙ্কিত ৫০ খানা মানচিত্র সহ। প্রায় ১০০০ পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ।

শ্রীজওহরলাল নেহরুর
বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ
২য় সংস্করণ ঃ ১৫·০০ টাকা

আত্ম-চরিত ॥ শ্রীজওহরলাল নেহরু ১০·০০
ভারতকথা ॥ শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারী ৮·০০
ভারতে মাউণ্টব্যাটেন ॥ অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন ৭·৫০
চার্লস চ্যাপলিন ॥ আর. জে. মিনি ৫·০০

প্রফুল্লকুমার সরকার
জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ
বাঙলার তথা ভারতের জাতীয় আন্দোলনে বিশ্বকবির কর্ম, প্রেরণা ও চিন্তার সুনিপুণ আলোচনায় অনবদ্য গ্রন্থ।
তৃতীয় সংস্করণ ঃ ২·৫০ টাকা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা—৯

লোকমাতা ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

সন্তাপমোচনে সময় অপ্রতিম চিকিৎসক, এই সদুক্তিটিকে কখনো বিশ্বাস করিনি, অন্তত করতে চাইনি। কিন্তু একথা স্বীকার করি, সময় এসে মূঢ়ের মতো সান্ত্বনা না দিক, নির্মোহ বন্ধুর মতো দুশ্চিকিৎস্য দুঃখগুলিকে স্পষ্ট ক'রে রেখে যায়, পৃথিবীতে হাঁটবার পথ স্বচ্ছ-সহজ ক'রে দেয়। এবং সেই সব দুঃখ, তারি ফলে, শোকোচ্ছ্বাসের নিরাধার দুর্দশা পেরিয়ে শোক প্রকাশের শিল্পালাপতে পরিণত হবার মতো উর্বর অথচ সংযত অবকাশ পায়। কিন্তু একের মতো এক মৃত্যু যখন ঘটছে, মনের গ্রাহকতন্ত্রীতে যখন আর সাড় নেই, তখন এলেজি-লেখকের মতো অপেক্ষা ক'রেও লাভ নেই। কবে কখন আবেগপুঞ্জ আত্মস্থ একটি স্ফটিকপাত্রে সংগৃহীত হবে, সেজন্য ব'সে থাকতে পারলাম না। অথচ বস্তুবিবেকী সংবাদদাতার সামর্থ্যও আমার নেই। দুঃখবহনের দায়িত্ব থেকে কয়েক মুহূর্ত অব্যাহতি পাবার জন্যই কলম তুলে নিলাম।

একটি ঘটনা মনে পড়ছে। ঘটনাটি আমাকে আমার মা বলেছিলেন। তাঁকে আরেকবার জিজ্ঞাসা ক'রে স্মৃতির সত্য যাচাই ক'রে নিলাম। শান্তিনিকেতন মহিলা-সমিতির উদ্যোগে এক-একদিন এক-একজন অধ্যাপক এসে ভারত-দর্শনের বিভিন্ন পর্যায়ের মর্মকথা শুনিয়ে যাচ্ছিলেন। সেদিনকার আসর বসেছিল উদয়নে। বক্তা যখন সংসারের অনিত্যতা এবং মৃত্যুর প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন, স্বভাবতই তাঁর কথকতায় কোনো জড়িমা ছিল না। এর আগের অধিকাংশ দিনই অবশ্য মৃত্যুবিষয়ক তত্ত্বকথার অবতারণা হয়েছিল, যদিও তা তেমন প্রকট ছিল না। আগের দিনগুলির সঞ্চিত প্রতিক্রিয়া অথবা

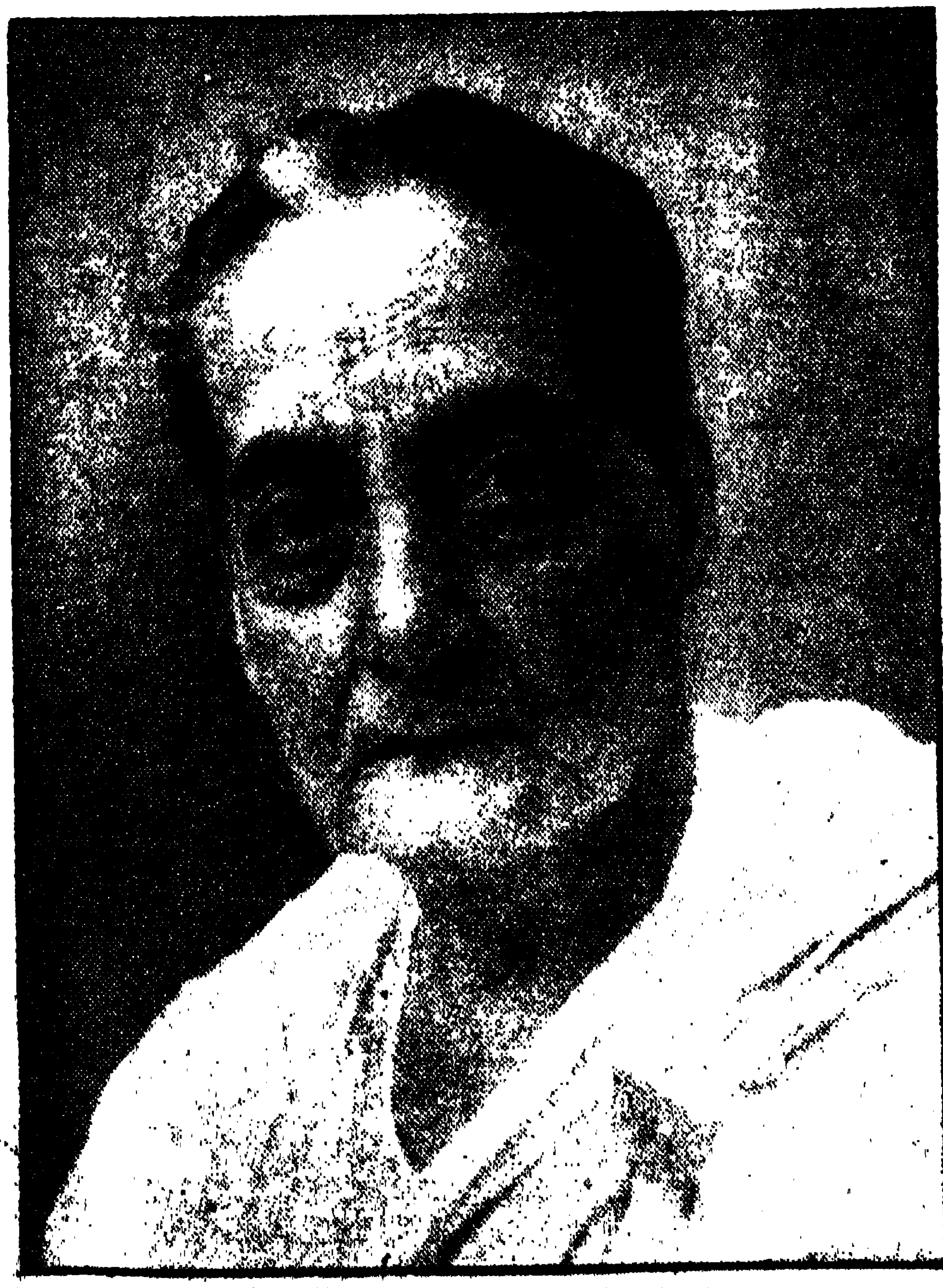

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী   ফটোঃ শ্রীপুলিন চক্রবর্তী

শারদীয়া দেশ পত্রিকা — ১৩৬৭

রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্রাবলী

●

অবনীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রসরচনা

"ওল্মানের গ্রাণ্ড টোটোলজি"

●

সুবোধ ঘোষের উপন্যাস

"না গ ল তা"

●

গল্প, প্রবন্ধ, রম্যরচনা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অন্নদাশংকর রায়, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, ধনঞ্জয় বৈরাগী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রতিভা বসু, প্রভাত দেব সরকার, প্রমথনাথ বিশী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বনফুল, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিমল কর, বিমল মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, মনোজ বসু, রমাপদ চৌধুরী, শংকর, শিবতোষ মুখোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, সতীনাথ ভাদুড়ী, সন্তোষকুমার ঘোষ, সমরেশ বসু, সরলাবালা সরকার, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সুশীল রায়, সৈয়দ মুজতবা আলী, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

সম্পূর্ণ তালিকা বারান্তরে প্রকাশিত হইবে

●

রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসুর রঙীন চিত্র ও বহু স্কেচ

●

এই সংখ্যার মূল্য—৩৲ টাকা

রেজিঃ ডাকযোগে ৩·৫৮ নয়া পয়সা

৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১

পড়েছিল। বৈঠকী আলাপ কি হিরণ্ময়ী বিশ্বশ্রমের সভানেত্রীত্ব, অন্তরঙ্গ কি বহিরঙ্গ, সর্বাঙ্গীণ ব্যক্তিত্বের গঠনশিল্পে এই সমন্বিত মহিমা বিস্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাঁকে গানের অধ্যাপিকারূপে যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা এটি, স্মারকভাবে জেনেছেন। সংগীতভবনের বিদায়ী শিক্ষার্থীদের অথবা গীতগ্রাহী কিশোর ছাত্র, যাঁদেরই তিনি বাড়িতে ডেকে শেখাতেন, তাঁরা সবাই একই সঙ্গে কাছের বীথিনি, এবং দূরত্বময়ী, সতর্ক শিক্ষয়িত্রীকে জানতে পেরেছেন। গানের প্রথম কলিটিই যে পুরোপুরি একদিনে তাঁর কাছে শিখে নেওয়া মাঝে-মাঝে কতো কঠিন হয়ে পড়তো, সে-অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। কারণ, শেখাতে গিয়ে তাঁর গল্প বলা তো আছেই, অধিকন্তু 'অনাদির মতে এখানটায় এই সুর হবে', 'শান্তিদেব এ-জায়গাটা একটু অন্য ধরনে করেন' অথবা 'শৈলজা-রঞ্জনের মতে এখানে কড়ি মধ্যম লাগবে' ইত্যাদি স্বরলিপিবিষয়ক হাজারো দুরূহ ব্যূহ সম্পর্কে তিনি শিক্ষার্থীকে অবহিত করাতেন। ফলে, এক দিনে আস্থায়ী অংশটুকু শিখে ওঠাই অনেকের কাছে রীতিমতো একটা কৃতিত্ব বলে মনে হতো।

যথেষ্ট সংকোচের সঙ্গে আবার একটি আপন কথার উল্লেখ করছি। 'নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা' গানটি শেখাতে গিয়ে একবার তিনি আশাব্যঞ্জক নানান্ ঘটনার প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ কী মনে হলো, গান থামিয়ে দিলেন। বললেন: 'কোনো বাধায় ভেঙে পোড়ো না, কারো কথায় না।' ব'লে একটু সাদা কাগজ খুঁজে আনলেন। 'তোমার নামের অক্ষরগুলি নিয়ে একটা কবিতা লিখে দিচ্ছি'—এই ব'লে আমার লিখে দিলেন:

'অলোকসামান্য তুমি হও এই ভবে
লোকের রঞ্জনে কিম্বা শোকের গঞ্জনে,
কভু যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট হোয়ো না জীবনে।'

বলা বাহুল্য, যাকে সেদিন এই আশিস জানানো হয়েছিল, সে ভাবছিল কখন বাড়ি ফিরে স্বাক্ষর-সংগ্রাহক খাতায় সেই কাগজটি এঁটে রাখবে। 'নিবিড় ঘন আঁধারে' গানটি যে তাঁর কাছে সম্পূর্ণ শেখা আমার হয়নি, সেজন্য আমার আর ক্ষোভ নেই।

গান মাত্রই স্বরলিপিধার্য। বিশেষ ক'রে রবীন্দ্র-সংগীত, যেখানে মানব-মনের যাবতীয় অনুভাবনা সূক্ষ্মায়তরূপে ধরা আছে। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী কঠোর পরিশ্রম করে স্বরলিপির মধ্যবর্তিতায় রবীন্দ্র-সংগীতের পবিত্রতা রক্ষার জন্য যা করেছেন, ক্রমশই আমাদের বিলম্বিত কৃতজ্ঞতাবোধের কাছে তা স্ফুটতর হতে থাকবে। আপাতত এবং প্রসঙ্গত, একটি তথ্যের উল্লেখ করি। 'রবীন্দ্রনাথ গানের ক্ষেত্রেও কিরকম পরকে আপন করে নিতে পেরেছেন', সেটি দেখাতে গিয়ে ইন্দিরা দেবী 'রবীন্দ্র-সংগীতের ত্রিবেণী সংগম' শীর্ষক পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। অপর সুরকারের প্রদত্ত সুরে শব্দপ্রয়োগ এবং অন্য গীতকারের শব্দে সুরযোজনার কাজটি রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন ধ'রে করেছিলেন। বিশেষত, প্রথমোক্ত পর্যায়ে তাঁর বৈচিত্র্য দেখাতে গিয়ে ২১৫টি গানের বর্ণানুক্রমিক যে 'ভাঙা গানের তালিকা' ইন্দিরা দেবীর পুস্তিকায় সন্নিবিষ্ট হয়েছে, তা অসীম-মূল্য। গানের গবেষকদের কাছে এগুলির তাৎপর্য আবিষ্কৃত হয়ে চলবে—ইন্দিরা দেবী উৎসমুখের আবিষ্ক্রিয়া উন্মোচিত করে সেই পথটি খুলে দিলেন।

'কড়ি ও কোমলের'ই 'মঙ্গলগীত' নামে কবিতাগুচ্ছ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর উদ্দেশ্যেই লিখিত। রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীকে নিয়ে যে-আশা জানিয়ে-ছিলেন, তাঁকে যে-আশীর্বাদ জ্ঞাপন করেছিলেন, পরবর্তীকালে তা আরো সত্য, আরো সার্থক হয়ে উঠেছিল:

যাত্রা করি মানবের হৃদয়ের মাঝে
প্রাণে লয়ে প্রেমের আলোক,
আয় মাগো, যাত্রা করি জগতের কাজে
তুচ্ছ করি নিজ দুঃখ-শোক।

... ...

পুণ্য জ্যোতি মুখে লয়ে পুণ্য হাসিখানি,
অন্নপূর্ণা জননী সমান,
মহাসুখে সুখ-দুঃখ কিছু নাহি মানি
কর সবে সুখ শান্তিদান।

• • •

সমুদয় মানবের সৌন্দর্যে ডুবিয়া
হও তুমি অক্ষয় সুন্দর।
ক্ষুদ্র রূপ কোথা যায় বাতাসে উবিয়া
দুই-চারি পলকের পর।
তোমার সৌন্দর্যে হোক মানব সুন্দর
প্রেমে তব বিশ্ব হোক আলো।
তোমারে হেরিয়া যেন মুগ্ধ অন্তর
মানুষে মানুষ বাসে ভালো।

মানুষ গড়ার কারিগর
৫·৫০ নঃ পঃ
দ্বিতীয় মুদ্রণ

আরও একটি বিশিষ্ট সমালোচনা (চতুরঙ্গ):
"যতদূর জানি, তিনি (লেখক মনোজ বসু) স্বয়ং একটি বিদ্যালয়ের সঙ্গে একদা শিক্ষক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ। তাঁর অভিজ্ঞতার মূল সুদূরে প্রোথিত। -শিক্ষকের জীবন তিনি সমগ্রভাবে জানেন। উপন্যাসের চরিত্র-গুলি সে কারণেই আমাদের মনে ঘৃণার পরিবর্তে সহানুভূতির সঞ্চার করে। শুধু তাই নয়। আমাদের মনকে আলোড়িত করে। আশ্চর্য হব না, যদি "মানুষ গড়ার কারিগর" আমাদের সরকারকে এ বিষয়ে বাস্তব ও সক্রিয় অর্থে অবহিত করে।......"

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড : কলিকাতা—১২

॥ অবিলম্বে প্রকাশিত হবে ॥
বারীন্দ্রনাথ দাশের
বিচিত্র ঘটনাবহুল উপন্যাস
অনেক সন্ধ্যা একটি সন্ধ্যাতারা

॥ প্রকাশিত অন্যান্য বই ॥
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের
কন্যামৃগয়া ৩-০০
শ্রেষ্ঠ গল্প—৫·০০ সাত দিন ২·৫০
অনিলকুমার ভট্টাচার্যের—উপনদী ২·০০

প্রকাশক ও বিক্রেতা:
গ্রন্থশ্রী প্রাইভেট লিমিটেড
৪৬/৫বি বালিগঞ্জ প্লেস, কলি-১৯

পরিবেশক:
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলি-১২

(সি ৭৩৫৪)

বিশ্ব বিচিত্রা

মিথ্যের দৌড়—কে কত চমৎকার মিথ্যে বলতে পারে এই নিয়ে ইওরোপ ও আমেরিকায় নিয়মিত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কিছুদিন আগে যুক্তরাষ্ট্রে উইসকনসিনের বার্লিংটন লায়ার্স ক্লাবের প্রতিযোগিতায় ১৯৬০ সালের সেরা মিথ্যুক নির্বাচন করা হয়। ক্লাবটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৯ সালে। এর অনুরাগী সভ্যদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে নিছক গল্পবাজিকে স্মরণীয় করে তোলা, উৎসাহিত করা এবং সম্মানজনক প্রতিষ্ঠা দান করা।

বছরের শ্রেষ্ঠ মিথ্যুক নির্বাচনের ভার থাকে বিচারকমণ্ডলীর উপর। সমগ্র অনুষ্ঠানটি তত্ত্বাবধান করেন ও সি হিউলেট যিনি ক্লাবটির প্রতিষ্ঠা থেকেই যুক্ত আছেন। মিঃ হিউলেটের গর্ব যে, ভাল মিথ্যে কথার তিনি একজন বিচক্ষণ বিচারক। কেউই তার এই অহঙ্কারের প্রতিবাদ করে না।

১৯৬০ সালের শ্রেষ্ঠ মিথ্যুক নির্বাচিত হয় টেক্সাসের এক যুবক। বিচারকদের সম্বোধন করে সে বলে : "ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের মনে আছে গত বছর গ্রীষ্মকালে কি নিদারুণ গরম পড়েছিল। আর আমার ক্ষেতে বাতাস এত কম ছিল যে, আমার দুটো উইণ্ডমিলকে তুলে নিয়ে বসাতে হয়েছিল তৃতীয়টি চালাবার জন্য।"

বিচারকমণ্ডলী প্রশংসায় হতবাক হয়ে যান। গল্পবাজিতে অন্যান্য প্রতিযোগিদের সে অনায়াসেই পরাজিত করে দেয়।

তত্ত্বাবধায়ক মিঃ হিউলেট স্বীকার করেন যে তার শোনা যত গল্প আছে, তার কোন একটির প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব নেই; তবে কয়েকটির কথা তিনি মনে করতে ভালবাসেন। এর একটি হচ্ছে : "এক কৃষককে নিয়ে, সে এক একর জমিতে তরমুজের চাষ করেছিল। তরমুজের তখন বাজার চাহিদা খুব। কৃষক মনে মনে ভাবলে সে খুব দ্রুত ধনী হয়ে উঠবে। কিন্তু যেভাবে চেয়েছিল তেমনটি হল না। ওর ক্ষেতের মাটি ছিল এত চমৎকার এবং এত দ্রুত দ্রাক্ষালতা বেড়ে ওঠে যে ওরা তরমুজগুলোকে জড়িয়ে মাটি ঘেঁষড়ে টেনে নিয়ে যায়।"

আর একটি গল্প হচ্ছে দক্ষিণ ডাকোটার এক নিদারুণ অনাবৃষ্টি নিয়ে। বছরের পর [illegible]

হাসি খুশির ছন্দে ভরা কিশোর মাসিক

রোশনাই

শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্যিকদের রচনায় ভরপুর হয়ে
প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হলো!

সম্পাদনায়—শ্রীরমেন দাস (সবুজসাথী)

॥ প্রতি সংখ্যা ৫০ ন. প. ॥ বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা সডাক ৬·০০ ॥

একমাত্র পরিবেশক—এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি

রোশনাই এ : ১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-বারো ॥ ফোন : ৩৪-২৩৮৬

দুখানি অনন্যসাধারণ সমালোচনা গ্রন্থ
অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তের

॥ প্রাচীন কাব্য সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন ॥

"বৌদ্ধ চর্যাপদের কাল অর্থাৎ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে ভারতচন্দ্র—রামপ্রসাদ—আজু গোসাইয়ের কাল অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় নয় শত বৎসর বাংলা কাব্যের ইতিহাসই বাংলা সাহিত্যের আদি ও মধ্যযুগের ইতিহাস। এই ইতিহাসের ধারাবাহিকতা স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন হইতে এ যুগের কৃতী গবেষকরা অনেকেই দেখাইয়াছেন, কিন্তু শ্রীক্ষেত্র গুপ্ত এই প্রথম রসবিচারের দিক দিয়া এই সকল কাব্যের সৌন্দর্য-বিশ্লেষণ ও মূল্য নির্ধারণ করিয়া সাহিত্য রসিক পাঠকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন।.....বহু আগাছা সমাকীর্ণ বিশাল বাংলা কাব্যারণ্য হইতে সুস্বাদু ফল ও সুরভি পুষ্প আহরণ ও পরিবেশন করিয়া তিনি প্রাচীন বাংলা কাব্যের প্রতি পাঠকের শ্রদ্ধা ও প্রীতির উদ্রেক করিতে পারিয়াছেন — এইখানেই তাঁহার গ্রন্থের সার্থকতা। এই বিষয়ে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের তিনি যোগ্য উত্তর সাধক।" —শনিবারের চিঠি

"শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র গুপ্ত মহাশয় অনেকখানি নতুন দৃষ্টি নিয়ে এসেছেন বলে নিঃসন্দেহে সাধুবাদের যোগ্য।.....আলোচ্য গ্রন্থটি সাহিত্যের ইতিহাস নয়। প্রাচীন কাব্যের অনেক অংশ সম্বন্ধেও তিনি ইতিপূর্বে সমালোচককুল কর্তৃক অনুচ্চারিত কয়েকটি কথা বলতে পেরেছেন।.....চর্যাগীতির উপর তাঁর আলোচনা অত্যন্ত মৌলিক ও হৃদয়গ্রাহী। প্রাচীন কাব্যগুলির নবমূল্যায়নের চেষ্টা তিনি করেছেন।" —আনন্দবাজার

"Because of his clarity of understanding he has expressed himself in so nice a way that it is a joy to be in his company..... All university students will find the book to be most useful and usable. It is an excellent reference book as well."—Amrita Bazar Patrika.

"প্রাচীন বাংলার সাহিত্য সম্পর্কে তিনি যে ক'টি প্রশ্ন তুলেছেন নিঃসন্দেহে তা প্রণিধানযোগ্য।.....লেখকের সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গীর যতো পার্থক্যই থাক না কেন, গ্রন্থখানি পাঠ করতে যেয়ে যেখানে আমাদের কৌতূহলী ও জিজ্ঞাসু মন বারবার সচকিত হ'য়ে উঠেছে, সেখানেই লেখকের মনস্বীতার পরিচয়।" —যুগান্তর

মূল্য : আট টাকা

কুমুদরঞ্জনের কাব্যবিচার

মূল্য—দু' টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা

॥ গ্রন্থ নিলয় ॥

১৭২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

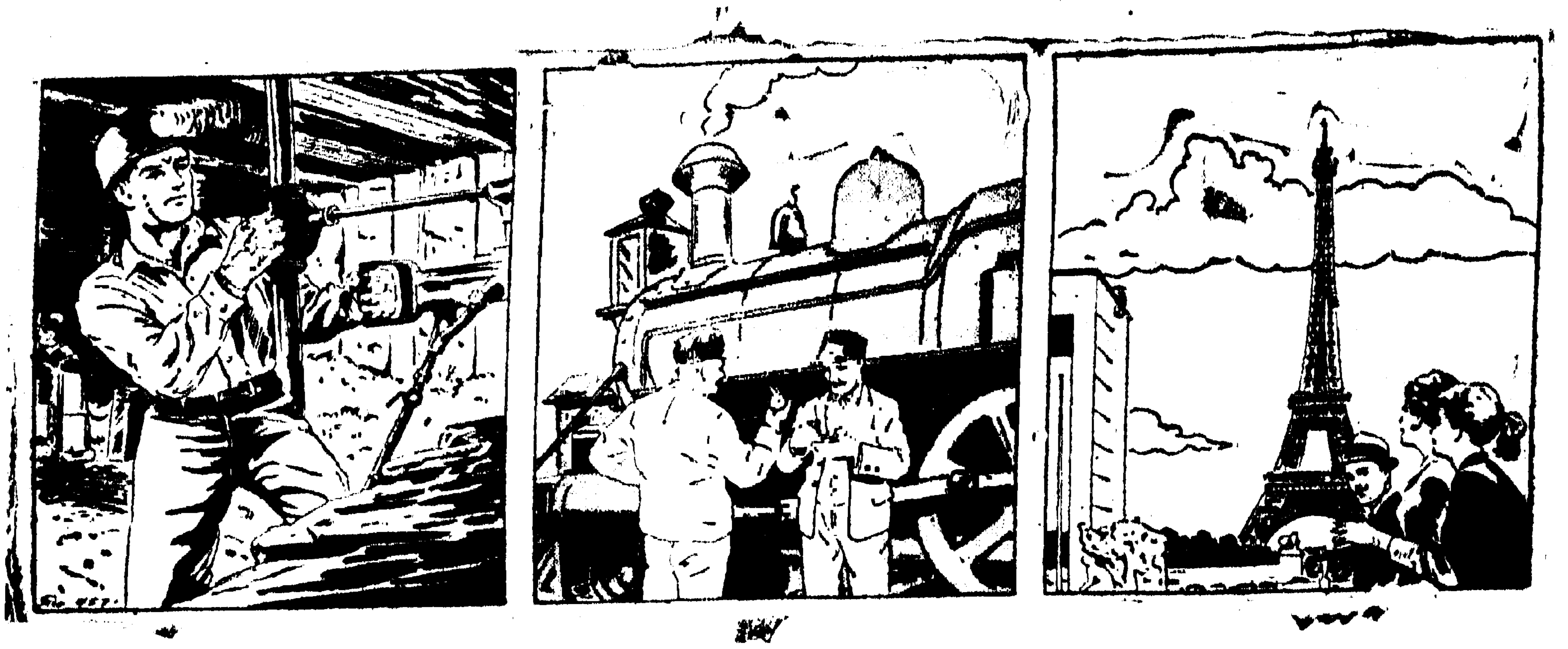

১ ২ ৩

১। নোভাস্কোসিয়ার কতকগুলি কয়লাখনি তীররেখা থেকে তিনচার মাইল অতলান্তিকের নীচে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। চারশত ফিট পুরু পাথরের একটা স্তর খনিকর্মীদের সঙ্গে তাদের মাথার ওপরের সাগরের ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছে। ২। ১৮৮৩ সালে আমেরিকার রেল কর্তৃপক্ষ ট্রেন চলাচলে চারটি পৃথক সময় প্রয়োগ করতো। এই পদ্ধতিটি ইউরোপ ও এশিয়ার রেল কর্তৃপক্ষের মনে ধরে এবং তারাও সেইভাবে সময় ঠিক করে নেয়। ৩। ১৯৫৯ সালে প্রায় বিশ লক্ষ যুক্তরাষ্ট্রবাসী বিদেশ ভ্রমণে এক হাজার একশ ষাট কোটি টাকা ব্যয় করে। একমাত্র দক্ষিণ আমেরিকা ছাড়া পৃথিবীর সব অঞ্চলে আমেরিকাবাসীর ভ্রমণ বাড়ে। দক্ষিণ আমেরিকায় ভ্রমণ কমে যায় কিউবাতে ভ্রমণ হ্রাস পাওয়াতেই

জনমানবহীন। লোকে অন্য অঞ্চলে চলে যায়। কিন্তু একরেখা এক চাষী তার পরিবার নিয়ে থেকে যায় এই ঘোষণা করে যে, অনাবৃষ্টি তাকে কাবু করতে পারবে না। গল্পবাজ বলে : "আমরা বেঁচে গেলাম, কিন্তু অবস্থার উন্নতি হবার আগে এমন শুষ্কাবস্থা দাঁড়ায় যে ছেলেমেয়েরা জল খেতে চাইলে কুয়োটাকে টেনে কাপড় নিঙড়ানোর যন্ত্রে চালিয়ে জল নিঙড়ে নিতে হতো।"

যুক্তরাষ্ট্রে গল্প মেরে বেশ অর্থোপার্জনও সম্ভব। কতকগুলি রাষ্ট্রে পুরুষ এবং মেয়েরা নগদ টাকা পুরস্কার ব্যবস্থা করে মিথ্যা বলার সম্মেলন বসায়। এদেরই সম্মেলনে পুরস্কার প্রাপ্ত নিম্নলিখিত কাহিনীটি হচ্ছে এক ইঁদুরকে নিয়ে।

ইঁদুরটা ছিল প্রকাণ্ড, বস্তুত নিজেই এক গল্পবাজ। কারুর মতে একটা দৈত্যাকার ইঁদুরও বলা চলে। সে অঞ্চলে প্রচণ্ড শীত পড়ায় সে গল্পকারের বাড়িতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ইঁদুরটি ছিল অত্যন্ত চতুর এবং ধরা পড়া প্রতিরোধ করায় খুব কৌশলী ছিল—বাড়ির লোকে যেমনই টোপ ফেলে তাকে ধরার চেষ্টা করুক না কেন।

গৃহকর্তা বলে : "আমার মাথায় একটা মতলব খেলে গেল। সেই রাতে নৈশ ভোজের পর আমাদের বৃহত্তম থার্মোমিটারটি নিয়ে তার নীচে একটুকরো পনির লাগিয়ে সেটি রান্নাঘরে রেখে এলাম। পরদিন সকালে দেখা গেল মূষিক মহাশয় ধরা পড়েছেন। রাত্রে থার্মোমিটারের পারা এত নীচে নেমে যায় যে পেরেকের মতো সেটি ইঁদুরের পিঠে বিঁধে ওকে মেঝেতে আটকে রেখে দেয়।"

এক গৃহকর্তা কর্তৃক বর্ণিত একটি ভীষণ ঝড়ের কাহিনী আছে। সে বারের গ্রীষ্মকালে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রপাত তার বাসগৃহে এসে লাগে। গম্ভীরভাবে সে বলে : ঝড়ের এত তেজ যে ঢালাই লোহার তৈরী তিন ফিট লম্বা ও দু'ফিট গভীর জলপাত্রটিকে উড়িয়ে আমাদের জেলা পার করে নিয়ে গেল। অবিশ্বাস্য শুনতে, কিন্তু ঝড় সেই জলপাত্রটিকে এত বেগে উড়িয়ে নিয়ে গেল যে আমাদের বাড়ির সামনের দিকের অঙ্গন পার হবার সময় পাঁচবার বাজ পড়লেও একবারও তার গায়ে লাগতে পারেনি।"

ঠাকুর্দার আমলের একটা ঘড়ির গল্প করে একজন। বলে, "ঘড়িটি এত পুরনো যে পেণ্ডুলামটা দোলার সময় তার ছায়া পড়ে পড়ে ঘড়ির কেসের পিঠটায় একটা গর্ত হয়ে গিয়েছে।"

পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্পের মধ্যে মাছধরা নিয়ে গল্প শোনা যায় প্রায়ই। একজন মৎস্য-শিকারী টোপ ফেলার শাশ্বত সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে বলে দাবি করে।

কিশোর সাহিত্য

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম—অশোক গুহ	— ২·০০
পান্নাদ্বীপ	— ১·০০
চিড়িয়াখানায় খোকাখুকু	— ৪·০০
নিকিতার ছেলেবেলা	— ৩·০০
আজব পাখী	— ২·২৫
সাথী	— ৩·০০
পিতা ও পুত্র	— ২·৭৫
বরফের দেশে আইভ্যাম	— ১·৭৫

পপুলার লাইব্রেরী
১৯৫/১বি, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

ডাঃ কার্তিক বসুর
টাইকোমোড়া | নানালা
অম্ল, অজীর্ণ ও ডিসপেপসিয়ায় | ব্যথা ও বেদনায়
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ—কলিকাতা ৯

বিনীতভাবে সে বলে ঃ "এমন কঠিন কিছু ব্যাপার ছিল না। বঁড়শিতে শুধু একটা মধু মাখিয়ে নেওয়া, আর জলে ফেলবার আগে খুব উঁচুতে একবার ছুঁড়ে দেওয়া। মধুর মিষ্টি গন্ধ মৌমাছিদের আকর্ষণ করে। ওরা বঁড়শিটা কামড়ে ধরে এবং মাছ বঁড়শিতে মুখ দিলে মৌমাছির হুলের কামড়ে মারা পড়ে।"

আমেরিকার এক গল্পবাজদের (লায়ার্স) ক্লাব সভ্যদের জন্য একটি চ্যাম্পিয়ানশিপ ট্রফির ব্যবস্থা রেখেছে—ট্রফিটি হচ্ছে একটি হীরকখচিত বীণা। ক্লাবের এক সভ্যা এক বছরের চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবার পূর্বে জানায় যে বীণাটি চুরি হয়ে গিয়েছে। অসতর্ক থাকায় বহু সভ্য মহিলার এই খবরটি বিশ্বাস করে। এই গল্পটির জন্য মহিলাকে একটি বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়।

বিশ্বাস করা শক্ত যে লণ্ডনের বহু শতাব্দীর পুরাতন ফুলহাম প্রাসাদে এমন এক বাসিন্দা ছিল, যে মিথ্যা বলার জন্য পুরস্কার পেয়েছিলেন। ইনি ছিলেন বিখ্যাত বিশপ পোর্টিয়াস যিনি ১৭৮৭ সালে চেস্টার থেকে লণ্ডনে বদলি হয়ে আসেন। সেকালে এক গ্রাম্য প্রমোদ ছিল "শাণ পাথরের জন্য মিথ্যে বলা"—সবচেয়ে বড়ো মিথ্যুকের প্রাপ্য ছিল একটি পরম্পরাগত শাণ পাথর পুরস্কার।

এসেক্সের ঝগেশাল নামক গ্রামে এমনি এক প্রমোদানুষ্ঠানকালে বিশপ পোর্টিয়াস সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। ধর্মযাজকের পক্ষে যা স্বাভাবিক, বিশপ পোর্টিয়াস সমবেত জনমণ্ডলীকে বেশ কড়া করে শুনিয়ে দিয়ে বলেন, "জীবনে আমি কোনদিন মিথ্যে কথা বলিনি।"

কমিটির সভ্যরা এই শুনে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলে—এবং পরে বিশপকেই শাণ পাথরটি প্রদান করলে।

সবচেয়ে বড় গল্পবাজ বলে প্রখ্যাত রুডলফ এরিক রেসপ নামক এক জার্মান, যার ব্যারন মুঞ্চসেন নামক বহুস্থান পর্যটনকারী এক বন্ধু ছিল। রেসপ তার এই বন্ধুর তথাকথিত ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন অভাবনীয়রূপে অতিরঞ্জিত করে এবং নিজের কল্পনা থেকে তাতে অনেক কিছু যোগ করে। বহু লোক তার প্রত্যেকটি কথাই বিশ্বাস করে

একটা গল্প হচ্ছে, সিংহকে শিকার করতে গিয়ে মুঞ্চসেন কিভাবে ক্ষুধার্ত সিংহের মুখোমুখি পড়ে যায়। পালিয়ে যেতে পিছন ফিরতেই ব্যারন দেখে সামনে প্রকাণ্ড এক কুমীর বিরাট হাঁ করে তাকে গিলতে আসছে। দেখেই সে সটান মাটিতে শুয়ে পড়ল। আর সিংহটা তাকে লক্ষ্য করে লাফ দিতেই গিয়ে পড়ল কুমীরের মুখে। মুঞ্চসেন সিংহটাকে হত্যা করলে তার গলা কেটে। আর কুমীরটাকে মারলে সিংহের কাটা মুণ্ডটা তার হাঁয়ের মধ্যে ঠুসে দিয়ে।

আর একবার এক শীতের রাতে ব্যারন ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে যাচ্ছিল—এত ঠাণ্ডা যে, অশ্বারোহী চালক তার শিঙাটা বাজাতে গেল কিন্তু কোন শব্দই বের হল না। সরাইখানায় পৌঁছে সে তার শিঙাটা রান্নাঘরে উনুনের ওপরে টাঙিয়ে রাখলে। কয়েক মুহূর্ত পর, ওরা তখন সকলে আগুন পোহাচ্ছিল, হঠাৎ শুনলে শিঙা থেকে স্বর বের হচ্ছে তেরেং! তেরেং! তেং! তেং আরও সুর যা শিঙাতে জমে গিয়েছিল পর পর বেজে যেতে লাগল।

এ. পির দুইটি নতুন উপন্যাস প্রকাশিত হ'ল

শক্তিশালী লেখকের
দুঃসাহসিক উপন্যাস

গুণময় মান্না প্রণীত

জুনাপুর স্টীল

এই উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে
নতুন অধ্যায়ের জন্ম
সূচনা করল।

নতুন ক'রে আলোড়ন
আনল।

জুনাপুর আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানী...ছোট ক'রে এক কথায় সবাই যাকে বলে জিস্কো। এখানের ব্লাস্ট ফার্নেসের তাপে শুধু লোহাকেই ইস্পাতে পরিণত করা হয় না, এই কারখানার আগুনের পরিদহনে বিরাট মানুষের মিছিলের আত্মা ইস্পাতের মত শপথে কঠিন হয়।
জুনাপুর স্টীল যন্ত্রসভ্যতার যন্ত্রণায় মুখরিত। এখানকার হাওয়ায় শুধু ছাটাইয়ের নোটিশ আর উপরওয়ালাদের হুমকি। অথচ এখানকার বাতাস মানুষের বেদনায় অদ্ভুত স্নিগ্ধ। জুনাপুর স্টীল তাই স্মরণীয় উপন্যাস। তার চেয়েও স্মরণীয়তম এখানকার চার পাশের মিছিল করা চরিত্ররা। যাদের বহুলাংশের জীবন জিস্কোর বাঁশির আওয়াজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যার হাত থেকে মুক্তি খুঁজেও মুক্ত হতে পারে না। তাই শুধু জুনাপুরের আকাশ মানুষের হাহাকারে ভারী হয়ে থাকে ব্লাস্ট ফার্নেসের আগুন আর ধোঁয়ার রঙ মেখে। জুনাপুর স্টীল প্রগতিশীল মানুষের জীবনের প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদকে লেখক তাঁর সৎ ভাষা আর মহৎ হৃদয়ের অনুভাবনার সংমিশ্রণে অসংখ্য মানুষের ঘাম-ঝড়ানো ইতিহাসকে লুপ্ত অন্ধকার থেকে মুক্ত করেছেন।

খালেক চৌধুরী অংকিত প্রচ্ছদে কাপড়ে বাঁধাই বায়বহুল উপন্যাস। দাম : ১০·০০

অবধূতের জনপ্রিয় উপন্যাস ॥ মিড় গমক মূর্ছনা (৫ম সং) ৪·০০

প্রকাশিত নতুন উপন্যাস

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের ॥ দেহ দেউল ৩·০০
দীপক চৌধুরীর ॥ মনের মধ্যে মন ৫·০০
মন্মথনাথ ঘোষের ॥ মধুকেরী ৩·৫০

কবিতা

শান্তিকুমার ঘোষের ॥ অন্য এক সমুদ্র ২·০০

প্রকাশ আসন্ন :

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
লাজবতী

বিমল করের
কেরানীপাড়ার কাব্য

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
রানী সংবাদ

এসোসিয়েটেড পাব্লিশার্স

॥ নতুন ঠিকানা ॥
১৬/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-১২

সত্তর বছরের অভিজ্ঞতার ফলেই এমন স্নিগ্ধ
অনুপম জনসন-এর
শিশু-প্রসাধন

শিশুদের যত্ন নেওয়ার অনন্যসাধারণ অভিজ্ঞতার
ফলেই সবরকম শিশু-প্রসাধন আপনার
কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছে — জনসন্স !

শুচিশুভ্র, স্নিগ্ধ জনসন্স বেবী পাউডার — বিশ্বের
সর্বশ্রেষ্ঠ ট্যালকম থেকে তৈরী। শিশুদের সুকুমার
ত্বকের যত্নের জন্যে আরো চাই — জনসন্স
বেবী ক্রীম, বেবী অয়েল !

জনসন এণ্ড জনসন অব ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

JWT-JJ. 347

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

৪০

স্টারে যেসব বন্ধু আসতেন দেখা করতে আমার সঙ্গে, তারা শুনলেন আমার কাছ থেকে—গোকুলবাবু আর নেই। হেমবাবুও এলেন একদিন, দুঃখ করে বললেন—অনেক আশা ছিল, কিন্তু ক্রীড চলে গেল ম্যাডানে, কর্মীরা ছিটকে পড়ল এধারে-ওধারে, গোকুলবাবুও চলে গেলেন চিরতরেই! দল ভেঙে গেল অহীনবাবু, কী করেই বা ভরসা করি ভবিষ্যতের? বলতে-বলতে একটা সংবাদ তিনি দিলেন—আমেরিকান চিত্র প্রযোজক উইলিয়াম ফক্সের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি এসেছেন, সমগ্র ভারতবর্ষ এবং দূর প্রাচ্য পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে ফিরে যাবেন! এখানে কীরকম ছবির চাহিদা, কাদের ওপর পরিবেশন ভার দেওয়া যায়, এসব সম্পর্কে রিপোর্ট দেবেন। ডুকাসরা ও'দের ছবি দেখাতেন, তাই এসেছিলেন আমাদের অফিসে। আমাদের ফটো প্লে সিণ্ডিকেটের কথা বলেছি, উনি এখন ছবিটা দেখতে চাইছেন। প্রফুল্লকে বলে তার ব্যবস্থা করতে বলবেন।

পরদিনই খবর দিলাম প্রফুল্লকে। বললাম, শীগগির মুখুজ্যে মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করো। সাহেবটির যদি ছবি ভাল লাগে, অনেক কিছুই তিনি করে দিতে পারেন, ক্ষমতা আছে করবার।

উৎসাহিত হলো প্রফুল্ল, উৎসাহিত হলাম আমরাও। প্রফুল্ল যথাসম্ভব সব ব্যবস্থা করলে। ছবিটা এক দ্বিপ্রহরে পিকচার হাউসে দেখানো হলো সাহেবকে, তারপরে চা-চক্র এবং আলোচনা। সাহেব বললেন ছবিটি ত বেশ, নতুনত্ব আছে, কিন্তু বড্ড বড়ো, ছবিকে এডিট ক'রে কেটে ছোট করা।

—কত ছোট?

বললেন—প্রায় দশ হাজার আছে ত, ওকে ছয় হাজারে আনতে হবে। এবং যতদূর বুঝলাম, অতোটাই করা যায়।

সাহেব বললেন বটে, কিন্তু, আমাদের অতো যত্নের, অতো চিন্তা-ভাবনা করে তৈরি করা ছবি, ওকে একেবারে আধাআধি কেটে দেওয়া—সে কি সহজ কাজ? অবশ্য, বাড়তি জিনিস অনেক আছে, কিন্তু তা বলে এতখানি?

সাহেবকে আমরা বললাম—আমাদের স্টুডিও দেখবেন? আপনাদের ফক্সেরই ফার্নডেল স্টুডিও-র মডেলে তৈরি করেছি। আগ্রহান্বিত হলেন সাহেব। দিন স্থির করে প্রফুল্ল আমাকে বললে—ঐ দিন ঐ সময় তৈরি থাকিস, তুলে নিয়ে যাবো।

আমি বললাম—নারে, আমার বড়ো মন কেমন করে! গিয়ে ত দেখব, চারিদিক জঙ্গলে ভরে গেছে, অগোছালো লক্ষ্মীছাড়া অবস্থা!

প্রফুল্ল বললে—তোর ভয় নেই। এখখুনি লোক লাগিয়ে সাফসুতরো করে নিচ্ছি।

শুনল না, টেনে নিয়ে গেল আমাকেও। দু তিন দিন পরে একটা ট্যাক্সী করে সাহেব, হেমবাবু, আমি আর প্রফুল্ল এই চারজন গেলাম স্টুডিওতে। দেখলাম—জঙ্গল-টঙ্গলকে সত্যিই সাফ করিয়েছে প্রফুল্ল এবং ঘরামি লাগিয়ে ঘরদোরগুলো বেশ করে মাটি দিয়ে নিকিয়ে দিয়েছে, এধার-ওধার একটু মেরামতও করে দিয়েছে।

সাহেব ত ঘুরেফিরে সব দেখে—অবাক। বললেন—এই এতে, অমন ছবি তুলেছ? লাইট-টাইট কিছু নেই?

আমরা বললাম—লাইট কোথায় পাবো? ঐ দিনের আলোতেই ছবি তুলেছি আমরা।

সাহেব রীতিমত খুশী হলেন আমাদের ওপর। আমরা ঐ ট্যাক্সিটা করেই ফিরে এসে, একটা ফটোগ্রাফারের দোকানে ফটো তুললাম

ইণ্ডিয়ান মিউজিক এণ্ড আর্ট কলেজ

(৭০/২/বি, মানিকতলা স্ট্রীট, কলি-৬।
ফোন নং ৩৫-১৭৩১। স্থাপিত—১৯৫২।
আজাদ হিন্দ বাগ (হেদুয়া)এর নিকট।)

ফাইন আর্ট, কমার্শিয়াল আর্ট, ইণ্ডিয়ান পেণ্টিং ক্লাসে ভর্তি চলিতেছে। ৩রা এবং ১০ই সেপ্টেম্বর '৬০ নূতন ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে। কণ্ঠসংগীত, যন্ত্রসংগীত ও নৃত্য বিভাগে ভর্তি চলিতেছে। বিস্তারিত বিবরণ জানিতে হইলে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৮টা পর্যন্ত অনুসন্ধান করুন।

'বলাকা'র নতুন বই!! ছোটদের
'পালা'-সিরিজের তৃতীয় নাটক
প্রশান্ত চৌধুরীর
তেপান্তর
॥ দেড় টাকা ॥

বড়দের উপন্যাস
'কপিঞ্জল' রচিত
ঢেউ
॥ তিন টাকা পঁচিশ ন. প. ॥

সম্পূর্ণ নতুন ধরণের বই
প্রবোধচন্দ্র বসুর
বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন
॥ দু টাকা পঁচিশ ন. প. ॥

॥ বলাকা প্রকাশনী ॥
৫৩, পটুয়াটোলা লেন, কলি-৯

(সি ৭●৪৫)

প্রকাশিত হইল
আশাপূর্ণা দেবীর নবতম গ্রন্থ
নব নীড় ৩॥০
নেপথ্য-নায়িকা (দ্বিতীয় মুদ্রণ যন্ত্রস্থ) পাঁচ টাকা

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
অনবদ্য গ্রন্থ
কবি ও অকবি
— তিন টাকা চার আনা —

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় লেখা
রক্তকমল
— তিন টাকা —

প্রাপ্তিস্থান : **মিত্র ও ঘোষ**, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি—১২

চারজনে মিলে। তারপরে আমি করলাম সাহেবকে নিমন্ত্রণ স্টারে এসে কর্ণার্জুন দেখবার জন্য। সাগ্রহে সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন সাহেব। হেমবাবু ও প্রফুল্ল তাঁকে নিয়ে এলেন পরবর্তী অভিনয়ের সন্ধ্যায়। অভিনয়ের পর ভিতরে এলেন সাহেব ওদের সঙ্গে। বললেন—ভালোই দেখলাম থিয়েটার। তবে তুমি কি থিয়েটার করাই স্থির করেছ?

জানি না প্রফুল্লরা সাহেবকে আমার থিয়েটার করার বিরুদ্ধে কিছু লাগিয়েছে কিনা, নইলে ও প্রশ্ন কেন হঠাৎ সাহেবের মুখে? সাহেব বললেন—থিয়েটারটা না করাই ভালো, তোমার ফিল্ম-ক্যারিয়ার নষ্ট হবে।

চলে গেল সাহেব। কথাটা দু তিনবার মনের মধ্যে তোলপাড় করে ছেড়ে দিলাম। ওদিকে সাহেবেরও চলে যাবার সময় হলো।

সুবোধ ঘোষ প্রণীত কালপুরুষের কথা
বাংলা সাহিত্যে এ গ্রন্থের জুড়ি আর নেই বললেই চলে

প্রকাশিত হ'ল
নতুন উপন্যাস
নতুন পরিবেশ

মন্মথনাথ ঘোষের
নতুন উপন্যাস
বহ মঞ্জরী
দাম ঃ ২·৫০

শক্তিপদ রাজগুরু প্রণীত
নতুন উপন্যাস
কুমারী মন
দাম ঃ ২·৫০

প্রকাশিত হ'ল

উষা দেবী সরস্বতী রচিত
নতুন উপন্যাস
কন্যা লগ্ন
একটি পুরুষের আকাঙ্ক্ষার গাঢ়তায় কটি মেয়ের আত্মনিবেদন... অথচ প্রেমের ফসল সেখানে মূল্যহীন। রমণীয় প্রচ্ছদযুক্ত।
দাম ২·৫০

আধুনিক সাহিত্য ভবন
১৬/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা ১২

সর্বজন সমাদৃত
রেনবো কালি

ঝরঝরে লেখা হয়—তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়—সাবলীল গতিতে কালি নামে

রেনবো ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিঃ ২২এ, আমেনিয়ান স্ট্রীট, কলিকাতা-১

সেই যে ফটো তুলিয়েছিলাম, তার একটি কপি দিতে গেলাম সাহেবকে। আর বললাম, আমার কপিটাতে একটা অটোগ্রাফ দিতে। সাহেব ছবিটার কার্ডবোর্ডের ওপর লিখে দিলেন—

"To Asia's Thespian par Excellence A. B. Chowdhury with sincerest wishes for continuing screen"—Joseph S. MacHenry, Nov. 1, 1923."

থিয়েটারের বিজ্ঞপ্তিতে আমি অহীন্দ্র চৌধুরী কিন্তু নাম ত অহীন্দ্রভূষণ, তাই সাহেব লিখলেন এ বি চৌধুরী।

কথাপ্রসঙ্গে সাহেবকে বললাম—যদি আমেরিকা যাই ত কাজকর্ম কিছু হতে পারে?

সাহেব উত্তর দিলেন—হতে পারে না কেন বলব? এশিয়া-আফ্রিকার বহু অভিনেতাই ত হলিউডে কাজ করেন। চাইনীজ, জাপানীজ, মালয়ান প্রভৃতি বহু লোক আছে ওখানে। তবে বেশী কাজ ত তোমাদের থাকবে না। এশিয়ার পটভূমিকায় যেসব গল্প চিত্রায়িত হয় তাতেই কাজ হতে পারে তোমাদের, অন্য যেসব সাধারণ ছবি হয় ইয়োরোপীয়ান সেটিং-এ, তাতে কেমন করে হবে? অবশ্য একটা ছবিতেই যে টাকা পাবে, তাতে দু বছর বসে খেতে পারবে বলে মনে হয়। বহু লোক ওখানে এভাবে জীবিকা অর্জন করেও থাকে।

এইখানে প্রসঙ্গত বলে রাখা কর্তব্য, মহীশূরের এলিফ্যাণ্ট বয় 'সাবু' তখনো হলিউডে যায়নি।

কিন্তু যা বলছিলাম। আমেরিকা যাবার অভিলাষস্বরূপ মাথার পোকা বহুদিনই চঞ্চল হয়েছিল, সাহেব তাতে আরও প্রেরণা জুগিয়ে গেলেন অবশ্য। তখন আমেরিকার ছবি ক্রমাগত দেখার ফলে আমেরিকা আমাদের কাছে তীর্থস্থানে পরিণত হয়ে গেছে। কতো স্বপ্ন সেদিন দেখেছি হলি-উডে যাবার! এমনকি আমি আর প্রফুল্ল দুই পাগলে মিলে পাসপোর্টের ফটো পর্যন্ত তুলিয়ে ফেলেছিলাম। ভেবেছিলাম, একটি পয়সাও না নিয়ে অতো যে আমরা আমাদের ছবিটার জন্য খাটলাম, তার পয়সা যদি কিছু উঠে আসে, তাহলে সেই পয়সা দিয়ে আমেরিকা চলে যাবো দুজনে! কিন্তু, সে আশা এখন সুদূরপরাহত। তবে, আকাঙ্ক্ষা ত মানুষের একেবারে মরে না, তাই ওটা মনের মধ্যে ঢুকেই রইল। ফটো প্লে সিণ্ডিকেটের অফিস উঠিয়ে প্রফুল্ল শেষ পর্যন্ত তার বাড়ি নিয়ে গিয়ে তুললে। আলাদা করে অফিস ভাড়া দেবার সামর্থ্য আর কই? সিণ্ডিকেটের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঢাকা। তবু, ঝাঁপ বন্ধ না করে, বাড়িতে অফিসরূপী টিমটিমে আশার আলোটুকু জ্বালিয়ে রাখতে চায় প্রফুল্ল, যদি কোনো সুবিধা হয় ভবিষ্যতে!

এর পরে, আমার আছে থিয়েটারের কাজ।

নভেম্বরের কথা। 'কর্ণার্জুন' চলছে, বুধবার 'চন্দ্রগুপ্ত'ও চলছে। এবারে ঐ বুধবারের জন্য আবার একটা বই খোলার ব্যবস্থা হলো। হরিপদ চট্টোপাধ্যায় বিরচিত জয়দেব। এবং তার পরেই ডি এল রায়ের 'পুনর্জন্ম' প্রহসনটিও হয়েছিল। নরেশবাবু পুনর্জন্মে সাজবেন যাদব, আর জয়দেবে—জয়দেব কে? না, আমি। ওঁদের প্রস্তাব শুনে ত আমি হতবাক হয়ে গেলাম! ভক্তিরসের পার্ট, ওটা কিনা শেষকালে এলো আমার ওপর? এটা কী রকম হলো? প্রবল আপত্তি করলাম আমি। প্রবোধবাবু জনান্তিকে বললেন—আপত্তি করো না হে, হলোই বা ভক্তিরস? নাট্যশিল্পী যদি সব রকম রসই না অভিনয় করতে পারে, তাহলে তার শিক্ষাটা সম্পূর্ণ হলো কোথায়? আর একট কথা। দর্শকের সামনে থেকে কখনো অন্তর্হিত হয়ো না, যত সুযোগ পাবে, যেভাবে পাবে, দর্শকের চোখের সামনে থাকবার চেষ্টা করো সব সময়। উদীয়মানদের ত খুবই উচিত প্রতিটি রাত্রে দর্শকের সম্মুখীন হয়ে থাকা।

এর ওপর আর কথা নেই। সত্যিই উদীয়মান তখন আমরা, যিনি যা ভালো উপদেশ বা পরামর্শ দেন, মেনে চলবার চেষ্টা করি। কিন্তু, নিজের মনে মনে এই চিন্তাই চলল, মাস দেড়েক যেতে না যেতে এ আবার কী নতুন পরীক্ষা! সর্ব মনঃশক্তি দিয়ে প্রস্তুত হতে লাগলাম 'জয়দেব'-এর জন্য। বিখ্যাত অভিনেতা চুনীলাল দেব তাঁর ন্যাশনাল থিয়েটারে সর্বপ্রথম 'জয়দেব' করেছিলেন ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯১২ সালে। তারপরে এই এগারো বছরে কত লোক যে জয়দেব করেছে, খ্যাতনামা আর অখ্যাতনামা, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু, আমরা ভাবব চুনীবাবুরই কথা। শহর একেবারে মাতিয়ে দিয়েছিলেন চুনীবাবু তাঁর 'জয়দেব' দিয়ে। একে জয়দেবের ঐ সব প্রাণ-মাতানো গান—ভূতনাথবাবুর দেওয়া সুর, তার ওপরে 'জয়দেব' হচ্ছে চুনীবাবুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের পরিচিতি-বাহক ভূমিকা! গল্প শুনেছি, চৈতন্যর ভূমিকা অভিনয় করবার জন্য অভিনয়ের দিন বিনোদিনী গঙ্গাস্নান করতেন, হবিষ্যান্ন-আহার করতেন, এক কথায় সর্বপ্রকার শুদ্ধাচার অবলম্বন করতেন। শুনেছি, চুনীবাবুও তদ্রূপ করতেন 'জয়দেব'এর জন্য। এই সেদিনও তাঁকে স্টারে দেখা গেছে, 'অযোধ্যার বেগম'এ মীরকাশিম যখন করেন, তখন প্লে আরম্ভ হবার ঠিক এক ঘণ্টা আগে থাকতে সাজসজ্জা ও রূপসজ্জা-ধারণ সম্পূর্ণ করে বসে আছেন উইংসের ধারে একখানা চেয়ার নিয়ে—চুপচাপ—একা একা। ভিতরে পাখা আছে, ওখানে ত নেই, মুহুর্মুহু হাত-পাখাখানা নাড়ছেন। এ ছিল নাকি তাঁর প্রতিদিনের কাজ। এমনই নিষ্ঠা! সুতরাং

আপনি কি ○ ○ ○

সাহিত্যিক? সঙ্গীত শিল্পী? চিত্রাভিনেতা?
মঞ্চাভিনেতা? ললিতকলাকার?

তাহলে আপনার যশ ও প্রতিপত্তি সংক্রান্ত
সাফল্য বিষয়ে সহায়তা করবার একমাত্র প্রতিষ্ঠান

সাহিত্য, সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক সমবায় সমিতি লিঃ

১, শিবনারায়ণ দাস লেন :: কলিকাতা—৬

পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশনা ○ বিক্রয় ব্যবস্থা ○ মুদ্রণালয় পরিচালনা ○ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রযোজনা ○ আর্ট একজিবিশন ○ নাট্য প্রযোজনা ○ সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক শিল্পীদের পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা করা আমাদের উদ্দেশ্য।

সানন্দ ঘোষণা

জাতীয় সংস্কৃতি সাপ্তাহিক পত্রিকা

রূপাঞ্জলি

প্রকাশনার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করেছি

প্রতিসংখ্যা ·৪০ নয়া পয়সা ॥ বার্ষিক চাঁদা ২০্ ॥ ষাণ্মাসিক ১১্

॥ এজেন্সীর জন্য আবেদন করুন ॥

১৯শে আগস্ট শুক্রবারের সংখ্যায় পাবেন

প্রশান্ত চৌধুরীর উপন্যাস **ডাকো নতুন নামে** ॥ ভ্যাবলাদা'র সরস লেখনীর উপাদেয় রচনা **পটুরাণীর সাথে ছবি দেখা** ॥ সমরেশ দাশগুপ্তের গল্প **নায়েকী কানাড়া** ॥ রূপাঞ্জলি ফিল্ম ক্রিটিক বোর্ড-এর সমালোচনা **কোন একদিন** ॥ শিশির সেনের লেখা **বিদেশীর চোখে বাংলার বিয়েবাড়ী** ॥ একটি বিশেষ প্রবন্ধ নাট্যলোক বিভাগে **বার্ণার্ড শ' শিল্পী না প্রচারক?** ॥ এ ছাড়া কালোচশমায়, বহু সুন্দর সিনেমা ছবি এবং মনোরম প্রচ্ছদ ॥

পরিচিত বুকস্টল ও রেলওয়ে স্টেশনে পাবেন

মিস্ রমোলা রায়,
সেক্রেটারী।

[ফোন নং ৩৪-২৪৩৭]

অমন নিষ্ঠাবানদের ঐ সব অপূর্ব ভক্তি-রসাত্মক অভিনয়, তখনো কিন্তু চুনীবাবু বেঁচে, তাঁর কাছে আমাকে সুনাম এবং কৃতিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এ এক পরীক্ষা নয় ত কী? ভগবানের স্মরণ নিয়ে প্রস্তুত হতে লাগলাম অভিনয়ের জন্য। ইত্যবসরে একটা কথা বলে নেই। শনিবার রাতে—থিয়েটার ভেঙে যাবার পর—দর্শক-দের ভবানীপুর-কালিঘাট অঞ্চলে ফিরে আসতে ভয়ানক অসুবিধা হতো। সেটা বুঝেই, স্টারের কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন, অভিনয়ান্তে একখানি করে বাস থাকবে অপেক্ষমাণ ও-অঞ্চলের দর্শকদের জন্য। কর্নওয়ালিস-কলেজ স্ট্রীট-ধর্মতলা-চৌরঙ্গী-রসা রোড হয়ে হাজরা মোড় পেরিয়ে একেবারে কালিঘাট ডিপো পর্যন্ত যাবে। হ্যাঁ, ভালো কথা, ততদিনে শহরে বেশ বাস চালু হয়ে গেছে। তার পিছনে একটা মজার ইতিহাসও বিদ্যমান। মহাত্মাজীর আন্দোলন, জালিয়ানওয়ালাবাগ ইত্যাদি একের পর এক যে-সব ঘটেছে, তার ফলে চারিদিকে মিটিং আর হরতাল খুবই হতো। ট্রাম কোম্পানীর ধর্মঘট ত লেগেই ছিল। এক সময়, সালটা ঠিক আজ মনে নেই, ট্রাম-ধর্মঘট বেশ দীর্ঘস্থায়ীই হয়েছিল। ফলে, অফিসে যাতায়াত করার কষ্ট হতে লাগল মানুষের। সেজন্য যে-সব অফিসের মাল-বওয়া-লরী ছিল, তাতে বেঞ্চি পেতে তাদের বাবুদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করলেন তাঁরা। কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থান ছিল—সেসব যায়গায় বাবুরা এসে-এসে জড়ো হতেন, আর তাঁদের উঠিয়ে নিয়ে যেতো ঐ সব লরী। মালবাহী লরী, উঁচু তার পাটাতন, ছেলেছোকরারা লাফিয়ে উঠে যাচ্ছে, কিন্তু মধ্যবয়সী যাঁরা, একটু বা মোটা হয়েছেন, ভুঁড়ি হয়ে গেছে বেশ, তাঁদেরই হতো অসুবিধা। অমন ভারী শরীর নিয়ে ওঠবার চেষ্টা করছেন, আর ওপর থেকে ২।৩ জন তাঁদের টেনে তোলবার প্রয়াস করছে, এমন কি নীচে থেকেও ঠেলছে,—সে এক দেখবার মতো দৃশ্য হতো বটে! মাল বইবার জন্য যাদের ছিল লরীর কারবার, তারা পুলিস-কমিশনারের অনুমতি নিয়ে এ এক ব্যবসাই চালু করলে। বাসের মতো টিকিট করলে তারা। লরীর ওপরে বেঞ্চি পাতা, একটা কাঠের মই থাকত, সেটা নামিয়ে দিতো যাত্রীদের ওঠা-নামার দরকার হলে। দিন-কতক পরে দেখলাম, সেগুলির আবার মাথায় একটা চারের চাঁদোয়ার মতো টানিয়ে দিয়েছে। এই করে করে প্রচুর পয়সা পিটেছে তারা তখন। এই সব দেখে পুলিস কমিশনার বাস-এর লাইসেন্স ছাড়তে লাগলেন। দেখতে দেখতে, কলকাতার রাস্তায় বিচিত্র সব নামধারী বাস-এর আমদানী হয়ে গেল। জাহাজ-স্টীমার-নৌকোর নাম থাকত দেখেছি, এর পর দেখছি—বাসের নাম। আর কী সব নামের বাহার। 'উর্বশী', 'মেনকা', "কিন্নরী", "মা" "পথের বন্ধু". "চলে এসো"। একটা বাস চলেছে, দেখি, তার নাম তার গায়ে লেখা—"আমি যাচ্ছি"। তারপরে বেরুলো লাল রঙের সব বড়ো বড়ো বাস—ওয়ালফোর্ড কোম্পানীর। এই এক কোম্পানীরই বাস ছিল অনেকগুলি। বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটের পূর্ব-দিকে—লালবাজার মোড়ে পৌঁছবার কিছু আগে—একটা ডিপো মতন ছিল, সেখানেই প্রধান আড্ডা হলো বাসগুলির। এরাই প্রথম দোতলা বাস আনলে কলকাতায়। ডবল ডেকার বাস, আজকাল যা দেখা যায়, তার মত ছাদওয়ালা নয়। বৃষ্টিতে সব ছাতা মাথায় বসে আছে দোতলায়, আর বাস চলছে। গ্রীষ্মের সময় প্রচুর হাওয়া। লোকে হাওয়া খেতেও বাসে উঠত। কালিঘাট থেকে এক বাসে শ্যামবাজারে গিয়ে, আবার ঐ বাসেই কালিঘাট ফিরে আসা, এ তখন ছিল বহু লোকের শখ। ঐ যে আমাদের থিয়েটারের বাসের কথা বললাম, ওটা চালু হলো নভেম্বরের প্রথম থেকে। বলা বাহুল্য, খুবই সুবিধা হলো লোকের। একদিন হয়েছে কী, ঠিকাদার যেন কী-এক অসু-বিধায় পড়ে, বাস না রেখে, লরী এনে রেখেছে, ঐ রকম বেঞ্চি পাতা। অসন্তুষ্ট হলো লোকে, এমন কি কাগজে লেখা-লেখিও একটু-আধটু করলে। তাঁরা বলেছেন—বাস-এর লোকেদের কাছ থেকে টিকিট কিনব না। আপনারা থিয়েটারের টিকিটের সঙ্গে বাস-ভাড়াও অমনি ধরে নেবেন, তাতে আমাদের বহু ঝঞ্ঝাট বাঁচবে।

প্যাসেঞ্জারও বেড়ে যাচ্ছে। তাই স্টারের কর্তৃপক্ষ ওয়ালফোর্ড-এর সঙ্গে ব্যবস্থা করলেন। একশ' সীটের বাস। বিজ্ঞপ্তি দিতেন—'একশ আসনের দ্বিতল বাস'। স্টার একে ত প্রমোদকর নিতেন না, তার ওপর বাস-এর ব্যবস্থা, যাঁরা বলতেন—বাস-এ ফিরব, বাস-ভাড়া সুদ্ধ টিকিট দিন,—তাঁদের তাই দেওয়া হতো। তাতে করে দর্শকরা সাধারণভাবে স্টারের প্রতি সহানুভূতিশীলই হয়ে পড়েছিলেন।

যাই হোক, ২৮শে নভেম্বর—খোলা হলো জয়দেব। পার্ট তখনো সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে আসেনি, তদুপরি কথাগুলি ভাব

সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অচলায়তন	মূল্য ১·৮০
অরূপরতন	১·৩০
চতুরঙ্গ	২·০০
চিত্রাঙ্গদা	১·৬০
ডাকঘর	১·২৫
প্রান্তিক	১·৫০
ফাল্গুনী	১·৮০
বিচিত্র প্রবন্ধ	২·০০
বৈকুণ্ঠের খাতা	১·০০
রাজা ও রানী	২·৪০
শোধবোধ	১·৩০
স্বরবিতান ৪৩	২·৭০
স্বরবিতান ৫০	৩·৩০

বিশ্বভারতী

ছেলে বুড়ো সবাই জানে
STUDENTS INK
সব চাইতে ভাল কালি
STUDENTS INK MFG. CO. CAL-23

৫ম সংস্করণ
সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের
ইস্পাত
ওরা
ভাঙবেই ৪৲
লেখকের আরেকখানি উপন্যাস
এলো
আহ্বান ৪৲
(৬ষ্ঠ সংস্করণ চলছে)
সাধারণতন্ত্রী প্রকাশালয়, ৪৪, কালী-কুমার মুখার্জি লেন, শিবপুর, হাওড়া
ও কলকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে

'এবার পুজোর সেরা বই'
স্বপনবুড়োর সফর ২॥০
আর একখানা
ছড়া-ছবিতে সোনার ভারত ৩৲
এ. কে. সরকার এণ্ড কোং
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

দিয়ে বলতে হবে খুব সচেতন আছি। অভিনয়ের দিন একটা অঘটন ঘটে গেল। সেটা বলতে গেলে আগে ভূমিকালিপির কথা বলে নেওয়া কর্তব্য। রাধাচরণ ভট্টাচার্য সাজল পরাশর, পুরাতন অভিনেত্রী হরিপ্রিয়া সাজল 'বিমলা'। রাজগুরু—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত। পদ্মাবতী—বোধ হয় কৃষ্ণভামিনী। শ্রীকৃষ্ণ—নীহারবালা। যদিও 'জয়দেব'-এ সর্বপ্রথম 'শ্রীকৃষ্ণ' যিনি করেন, সেই লীলাবতী তখন স্টারেই কাজ করছেন, কিন্তু তাকে ত আর তখন 'বালক শ্রীকৃষ্ণ' সাজানো যায় না! এইবার অঘটনের কথাটা বলি। উড়িষ্যারাজ বলে একটি পার্ট আছে, সেটি করছিল—বিজয় মুখোপাধ্যায়। একটা দৃশ্য আছে, যেখানে জয়দেব আর পরাশর শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ করে বাঙলায় চলে আসছেন, আর জয়দেবের ওপর পান্ডারা অত্যাচার করায় উড়িষ্যারাজ নিজে এসেছেন ক্ষমা চাইতে। একটা ফ্ল্যাট সিন পিছনে ফেলা রয়েছে। আমরা স্টেজের বাঁদিক থেকে বেরিয়ে মাঝামাঝি জায়গায় এসে অ্যাক্টিং শেষ করে, আবার ডানদিক দিয়ে প্রস্থান করব। সেইমত বেরিয়েছি, হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, উড়িষ্যারাজ পিছনেই পড়ে আছে, সে আর এগুচ্ছে না। বুঝলাম, বিজয়ের পার্ট মুখস্থ হয়নি, প্রম্পট্ শুনে শুনে সে পার্ট বলতে চায় আর কী! প্রম্পটার 'উড়িষ্যারাজ' বলে ধরিয়ে দিয়েছে, আর সে গড় গড় করে বলে চলেছে। আমার কথাটাও বলে দিলে, তারপরে পরাশরের কথা ছিল, তার কথাও বলে দিলে। আমরা হতভম্ব! ব্যাপার কী, আমাদের মুখ খুলতেই দেবে না, নাকি?

কিন্তু একটু পরেই বোধ হয় ওর খেয়াল হলো ব্যাপারটা। অমনি করলো কী, সোজা 'প্রভু' বলে এসে পড়ে গেল আমার পায়ের ওপরে। এবং সেই যে পড়ল, আর ওঠে না! রাধাচরণ পুরানো লোক, বোধ হয় বুঝতে পারল ব্যাপারটা। সঙ্গে সঙ্গে বানিয়ে বললে—বেলা হলো অনেক, এবার চলুন।

আমিও বানিয়ে বানিয়ে কিছু বলে গেলাম উড়িষ্যারাজকে যে আমি ক্ষমা করেছি তাঁর যে এতে কোনো দোষ নেই, এ সবই ছিল আমার সেই বানানো কথার অর্থ। কিন্তু, বিজয়ের ছিল তখন ঐ ব্যাপার, পার্ট মুখস্থ করবে না, অথচ স্টেজে নামবে! কর্ণার্জুনে—ছোট ছোট ৩।৪টা পার্ট করত সে। বেঞ্চিতে যেখানে পোশাক সাজানো থাকত, তার সন্নিহিত দেয়ালে পেরেক ঠুকে বিভিন্ন ভূমিকানুযায়ী তার মাথার পরচুলগুলি সারি সারি সাজানো থাকত। গেরুয়া, কি অন্য রঙের কাপড় একটা পরাই থাকত, তার ওপরে জামাও থাকত। একটা চাদর মাথায় দিয়ে সে স্টেজের বাইরে ঘুরছে, কখনো বুকিং-এ

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত ॥

জোড়াসাঁকোর ধারে

"এ বইয়ে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন তাঁর শিল্পীজীবনের ক্রমবিকাশের কথা। অবনীন্দ্রনাথ শুধু রেখারঙের শিল্পী নন, ভাষাশিল্পীও। বাংলা গদ্যে তাঁর একটি বিশিষ্ট আসনের অনুপেক্ষনীয় দাবি নিয়ে এসেছে—'জোড়াসাঁকোর ধারে'।" —কবিতা

মূল্য চার টাকা

ঘ রো য়া

"ঠাকুর-পরিবারের, ও তাকে কেন্দ্র করে তদানীন্তন অভিজাত ও মধ্যবিত্ত বাংলা দেশের যে রূপ 'ঘরোয়া'য় ফুটে উঠেছে তা ইতিহাসের পাতায় কিংবা অন্য কোনো বই-এ পাওয়া যাবে না, একমাত্র রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা'য় ছাড়া।" —চতুরঙ্গ

মূল্য আড়াই টাকা

বিশ্বভারতী

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন । কলিকাতা ৭

GOVERNMENT L...

গল্প-ভারতীর নূতন আকর্ষণ

আগামী সংখ্যা হইতে প্রতিমাসে প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীঅন্নদাশংকর রায় ও শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের দুখানি ধারাবাহিক উপন্যাস ছাড়াও একখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস প্রকাশিত হইবে। তৎসহ রবীন্দ্রনাথের একখানি পূর্ণপৃষ্ঠা ছবি ও রবীন্দ্র সাহিত্যের অনবদ্য আলোচনা ইহাকে বিশেষ সমৃদ্ধ করিবে।

প্রতিমাসে একটি চিত্তাকর্ষক সচিত্র সংযোজন গল্প-ভারতীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

তথ্যপূর্ণ, সুখপাঠ্য অনেক প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী, রসরচনা, বিজ্ঞান-বার্তা, খেলাধুলা, দেশ-বিদেশ, প্রবাসী বাঙ্গালী, এইতো মানুষ, আজিকার দুনিয়া, বিশ্ব-সাহিত্য ও আরও বিভিন্ন ফিচার প্রতিটি সংখ্যাকে সমুজ্জ্বল করিবে। এইরূপ বিচিত্র ও বহুমুখী আকর্ষণ কোন মাসিক পত্রিকার নাই।

আজই গল্প-ভারতীর গ্রাহক হউন ও প্রিয়জনকে উপহার দিন।

বার্ষিক চাঁদার হার সডাক ১৫্। আষাঢ় হইতে বর্ষারম্ভ যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। বার্ষিক গ্রাহকগণ কোনরূপ অতিরিক্ত মূল্য না দিয়া বিরাট পূজা-সংখ্যা ও অন্যান্য বিশেষ সংখ্যাগুলি পাইবেন।

ভারতের সর্বত্র (যেখানে আমাদের এজেন্ট নাই) এজেন্ট আবশ্যক।

গল্প-ভারতী

২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬

গ্রাম : গল্প-কথা ফোন : ৫৫—৩২৯৯

যাচ্ছে, কখনো অফিসঘরে যাচ্ছে. আর পার্ট এসে গেছে জানতে পেরেই, ঊর্ধ্বশ্বাসে গ্রীনরুমের দিকে দে ছুট। তাড়াতাড়ি গায়ের চাদরটা ফেলে দিয়ে, একটা চুল টেনে মাথায় পরে নিয়ে একেবারে স্টেজে এসে হাজির! সে পার্টটা সেরে—আবার একটু ঘুরতে বেরুলো। তারপরে আবার পার্ট আসতে আবার দৌড়ঝাঁপ! গ্রীস্মথ স্ট্যানিস্ট্রীট'-এর ওষুধের দোকানে দিনের বেলা কাজ করত, সন্ধ্যায় থিয়েটার। নানান অভিনেতা-অভিনেত্রীর নানারকম টুকি-টাকি ফরমাস সে অম্লানবদনে গ্রহণ করছে. অফিসের পর ঐ সব কিনে নিয়ে সে বাড়ি চলে যেতো, বাড়ি থেকে আসত থিয়েটারে। একদিন এই তাড়াহুড়োর মাঝে 'কর্ণার্জুন'-এর একটা সিনে সে বেরুতে পারল না, সিনটা মিস করল। তবে পাবলিক থিয়েটারের অভিনেতা. আর তার পাকা প্রম্পটার, এ দর্শককে বুঝতে দিত না যে, একটি ছোট চরিত্র দৃশ্যে প্রবেশ করল কি না! তা সেদিন ওর সিন মিস্ করার জন্য ওকে অপরেশবাবু খুব বকে-ছিলেন। আর সেই বকাবকি থেকেই আমি সেদিন বুঝতে পারলাম যে, যে কাজের জন্য ও পারিশ্রমিক পায় অর্থাৎ স্টেজে অ্যাক্টিং করা. সেটাতেই ফাঁকি দেয়, আর যেগুলি বেগার তাতেই তার মনঃসংযোগটা বেশী।

যাই হোক. 'জয়দেব' এ বিজয়ের ঐ ব্যাপারে এই শিক্ষাটা হলো যে, নিজের প্রস্তুতিই অভিনেতার সব কথা নয় সহ-শিল্পীর প্রস্তুতিও তার লক্ষ্যের বস্তু হওয়া উচিত। আর থাকা উচিত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, উপস্থিত-বুদ্ধি। রাধাচরণ তখন বানিয়ে ওভাবে না বললে, আমার কী দশা হতো!

'জয়দেব'-এর পরে ধরা হলো অযোধ্যার বেগম ৫ই ডিসেম্বর। কিন্তু 'তারা-সুন্দরী' ত অবসর-জীবন যাপন করছেন, স্টেজের সঙ্গে যুক্ত রইলেন না তাই প্রধান ভূমিকা এবার করলেন হরিপ্রিয়া। তেমনটি হলো না. আবার একেবারে 'দূরে ছাই'ও হলো না। এতে পুরানো দলই বেশী, নতুনরাও রইলাম! অপরেশচন্দ্র করলেন তার পুরানো পার্ট হাফেজ রহমৎ। এতে ওঁর অভিনয় ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হতে হলো। যেমন রোহিলাদের উত্তেজিত করছেন তিনি অর্থাৎ দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের শেষাংশটুকু—'এ পৃথিবীতে ধন, ঐশ্বর্য, যাহা কিছু পার্থিব সম্পদ হারালে আবার পাওয়া যায়, কিন্তু ইমান একবার হারালে আর ফেরে না!' এখানে 'ইমান' বলে কণ্ঠস্বর উদারা-মুদারা ছাড়িয়ে একেবারে 'তারা'য় তুলে, আবার তাকে নামিয়ে আনলেন সাবলীলভাবে, যা দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়? একে ত ভরাট গলা, তার ওপরে কণ্ঠস্বরের অদ্ভুত নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা!

নিছক চীৎকার নয়, চমৎকার সুরেলা স্বর প্রক্ষেপণ।

প্রফুল্ল সেনগুপ্ত করলে তার পুরানো পার্ট—ফৈজুল্লা। রাধাচরণেরও সেই ভূমিকা, সেই 'সোনার কমল ভাসিয়ে দিয়ে, আমি, ভাসিছি নয়ন জলে' গান। সন্তোষ দাস (ভুলো)-এরও পুরানো পার্ট—আসফ-উদ্দৌলা। তিনকড়িদা—মীরকাশিম। ব্যাস রায়—নরেশ মিত্র। আমি—সুজাউদ্দৌলা। ইন্দু—সাদৎ আলি। ছায়া—কৃষ্ণভামিনী। জিন্নৎ—নীহারবালা প্রভৃতি।

এরপর হলো আমাদের 'কর্ণার্জুন'-এর জুবিলী—৮ই ডিসেম্বর। পঞ্চাশৎ অভিনয়। বাংলা থিয়েটারের নাটকের জুবিলী উৎসব সেই প্রথম। দিনটা শনিবার, সন্ধ্যা সাতটায়। ঠিক সেই আগের বারের মতো বাড়ি সাজানো আলো আর ফুল দিয়ে, ঠিক সেই-রকম সানাইয়ের সুর বেজে চলা। এছাড়া 'চিত্রে কর্ণার্জুন' বলে একটা পুস্তিকা ছাপিয়ে দর্শকদের মধ্যে বিলি করা হচ্ছে, তাতে ব্লক করা সব কর্ণার্জুনের ছবি, তার মধ্যে একখানি কি দুখানি আবার ত্রিবর্ণে রঞ্জিত করা। আর, ছাপানো হয়েছে তাতে কর্ণার্জুনের সব গানগুলো। এখনকার আমলে যেমন শিল্পী ও কর্মীদের মধ্যে প্রাইজ দেওয়া হয়, তখন তা দেওয়া হতো না। তখন ছিল বিশিষ্ট দর্শকদের মধ্য থেকে মেডেল প্রভৃতি ডিক্লেয়ারের ব্যাপার। সেটা কেউ-কেউ পেয়েছেন ইতিমধ্যে, কিন্তু পরে সে নিয়ম বন্ধ হয়ে গেল। চল্লিশ রাত্রি চলবার পর স্থির হয়েছিল, যার যা দেবার, তা জুবিলীর দিন দিতে হবে। জুবিলীর উৎসবের বিজ্ঞপ্তি থেকেই এ উপহারের প্রসঙ্গ উধৃত করা যাক। 'অদ্য রজনীতে বাংলার সর্ব সৎকার্যের অগ্রণী ও উৎসাহ-দাতা কাশিমবাজারাধিপতি শ্রীমন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর মহোদয় আমাদের সুযোগ্য অভিনেতা শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীকে এবং গ্রন্থকারকে সুবর্ণ পদক উপহার দিবেন। এবং অন্যান্য নাট্য-শিল্পানুরাগী মহোদয়গণ কর্তৃক নিম্ন-লিখিত অভিনেতবর্গ সুবর্ণ পদক উপহার পাইবেন — শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রফুল্লকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীমতী নীহার-বালা শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী, শ্রীমতী নিভাননী।'

ইতিপূর্বে তিনকড়িদাকে একটি স্বর্ণ পদক আর নরেশবাবুকে তিনটি সোনার পদক উপহার দিয়েছিলেন নিবারণ দত্ত মশাই। আর অপরেশচন্দ্রকেও তিনি দিয়ে-ছিলেন সোনার দোয়াত কলম।

জুবিলীর দিন শিল্পী ও কর্মিবৃন্দকে মিষ্টান্ন ভোজনেও আপ্যায়িত করা হলো। গত রজনীতে হয়েছিল অন্য ব্যাপার। এক দিন ভোজও হলো গদাধর মল্লিক মশায়ের বাগানবাড়িতে। অপরেশচন্দ্র ও প্রবোধ-বাবুর বন্ধু এই গদাধর মল্লিক ছিলেন আর্ট থিয়েটারের একজন শেয়ার হোল্ডার, পরে ডিরেক্টরও হয়েছিলেন। যশোর রোডের ওপর এ'র ছিল বিস্তৃত ও সুন্দর করে সাজানো এক বাগানবাড়ি। এখানে প্রায়ই গিয়ে থাকতেন অপরেশচন্দ্র, জানকীবাবুকে সঙ্গে নিয়ে নাটক লেখবার সুবিধে হবে বলে। গদাধরবাবু ছিলেন অপরেশচন্দ্রের বিশেষ স্নেহভাজন ব্যক্তি, এ'কে তিনি তাঁর 'ইরাণের রাণী' বইখানা উৎসর্গও করে-ছিলেন। 'ইরাণের রাণী'র ব্যাপারটা একটু পরেই বলছি। ভোজের ব্যাপারে অপরেশ-চন্দ্র ও প্রবোধবাবু দুজনেই খুব উৎসাহী ছিলেন। অপরেশচন্দ্রও রাঁধতে পারতেন বহুরকম। তাঁর বাবা বিপ্রদাস মুখো-পাধ্যায়ও ভালো রাঁধতে জানতেন। তাঁর বই 'পাক প্রণালী' খুবই বিখ্যাত ছিল। ওদিকে রান্নার আয়োজন হচ্ছে, বাগানের মাঝখানে স্নিগ্ধসলিলা এক মনোরম সরোবর, তার চারদিকে আমরা শিশুর মতো ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছি, দোলনায় দোল খাচ্ছি, সে এক আনন্দের দিনই গেছে বটে! রাত্রে এলেন সব ডিরেক্টররা। খেতে খেতে ঠিক হলো, নাটক চলাকালীন প্রত্যেক দশ রাত্রিতে এক একজন ডিরেক্টরের পড়বে খাওয়াবার পালা। রাজি হলেন তাঁরা। এই অনুপাতে আরও পাঁচ রাত্রি ভোজ হয়েছিল আমাদের, ঐ 'কর্ণার্জুনের' সূত্র ধরেই অবশ্য।

তারপরে শুরু হলো অন্য কথাবার্তা। সোমবার ভোজ হলো, ঠিক হলো বুধ-বারের জন্য নতুন বই পড়বে। এবং তার কাজ বুধবার থেকেই শুরু হবে, মাঝে মঙ্গলবার, মঙ্গলবারেই সকলকে থিয়েটারে যেতে বললেন অপরেশবাবু। আমাকে বললেন—অস্কার ওয়াইল্ডের 'ডাচেস অফ পাডুয়া'কে অবলম্বন করে নতুন এক নাটক লিখেছি। ভালো পার্ট আছে আপনার।

খুশী হলাম। ভূপেনবাবুর গাড়িতেই ফিরে এলাম খুশী মনে। পরদিন গেলাম থিয়েটারে। অপরেশবাবু বসে আছেন, পার্ট সব দেওয়া হলো। আমাকে দিলেন 'দারাপ' পার্ট। বললেন—নাটকের নামকরণটা এখনো হয়নি, দুয়েক দিন পরে জানাবো নাম।

নাটকের শেষের দিকে সবটা লেখা হয়নি। বললেন—মহলা চলুক, দু এক দিনের মধ্যেই শেষ করে দিচ্ছি।

অপরেশচন্দ্র হাতব্যাগে পাণ্ডুলিপি চাবি দিয়ে রাখতেন। যতক্ষণ সার্ট হচ্ছে, ততক্ষণ পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে বিশেষ সতর্ক থাকতেন তিনি। এর কারণ থিয়েটারের বই বড্ড চুরি হয়। একটা বই কোনো থিয়েটারে মহলায় পড়েছে, অমনি লোকজন ধ'রে, গোপনে, ঘুষ দিয়ে, প্রতিপক্ষ থিয়েটারের লোক পাণ্ডুলিপি বার করে নিয়ে তাকে রাতারাতি কপি করিয়ে নিয়ে আবার তখখুনি যথাস্থানে রেখে গেছে, এরকম ঘটনার কথাও শোনা যায়। প্রমথ ভট্টাচার্যের 'ক্লিওপেট্রা' যখন মিনার্ভায় চলছিল, তখন চুনীবাবুর ন্যাশনালে 'নীলসর্পী' নাম দিয়ে ঐ একই বিষয়বস্তুর এবং ঐ একই ধরনের নাটক অভিনীত হয়েছিল, অবশ্য সে নাটক বেশী দিন চলেনি।

তারপরে বুধবার ত অভিনয় ছিল, বৃহস্পতিবার থেকে লেগে যাওয়া গেল নতুন নাটক নিয়ে। এদিকে বড়দিন এসে গেছে—পর পর ক'রাত্রি প্লে—সে'সব বজায় রেখে, তবেই না নতুন নাটকের প্রস্তুতি! তার পোশাক আছে, সেট আছে। এসবই নতুন করতে হবে, নতুন না হলে আর্ট থিয়েটার করতে চাইত না। ঠিক হয়েছিল—বড়দিনেই

সদ্য প্রকাশিত

সভা পর্ব ২·৫০

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

সমুদ্রের মতই অতলান্ত রহস্যে ভরা মানুষের মন। সেই মনসমুদ্রে প্রেম কখনও শুক্তি, কখনও রঙিন ফেনা। তার রূপ অন্তহীন, 'সভাপর্বে' সেই বিচিত্র প্রেমের সংঘাতমধুর কয়েকটি হৃদয়েরই শোভাযাত্রা। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যকীর্তি।

নতুন বই:—

প্রতিবিম্ব প্রভাত দেব সরকার ২·০০

চোখ যা দেখে মন কি তা দেখে, না চোখের দেখা মনেরই প্রতিবিম্ব? পুত্রশোকাতুরা বিনোদিনী মাতির হাত ধরে তীর্থ পরিক্রমায় যা দেখলে, তার বেদনাবিধুর কাহিনী।

——প্রকাশিত হ'লো——

সুবোধ ঘোষের নবতম গ্রন্থ

দিগঙ্গনা ৩·০০

: পরিবেশক :

ডি. হাজরা এণ্ড কোং — ১৩, সূর্য সেন ষ্ট্রীট, কলি-১২

নতুন বই খুলতে হবে। অতএব, ব্যস্ত হয়ে পড়লুম রীতিমত। কাহিনীর পরিবেশ ও কাল অনুযায়ী সেট ও পোশাক করতে হবে, আমি তার জন্য বই-টই নিয়ে এসে হাজির করলাম। এবার নতুনত্বের মধ্যে হলো এই, মধ্যে মধ্যে ঐ যে কার্টেন ফেলে নেওয়া, ওটা যথাসম্ভব পরিহার করা হল, যদিও একেবারে বাদ দেওয়া যায়নি ব্যাপারটা। অপরেশবাবু খানিকটা হিসব করেই এবার নাটক লিখলেন। আমরাও সিন সাজালাম সেইভাবে। এখন ত আমাদের হয়েছে দক্ষিণাবাবুর স্ট্রিংকনসার্টের ব্যান্ড, তাঁরা সখীদের নাচের সঙ্গে বাজালেন, অবশ্য এটাও নতুন কিছু নয়, এর আগে কোহিনুরে এ'রাই বাজিয়েছিলেন। নতুনত্ব হলো, এ'দের আবহ সংগীত বাজানো। অ্যাক্টিং-এর অ্যাকসনের সঙ্গে উপযুক্ত বাজনা বাজিয়ে পরিবেশ সৃষ্টি করা।

যাই হোক, নতুন নাটকের ভূমিকালিপি হয়ে দাঁড়ালো এই—রাজা দায়ুদসা—অপরেশচন্দ্র, দারা—আমি, পিতৃবন্ধু নাদের সা—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত, দারার গ্রাম্যবন্ধু ইয়ুসুফ—ইন্দু মুখোপাধ্যায়, কাজী—দুর্গাদাস। দিনেরাত্রে মহলা চলেছে। থিয়েটারেই থাকি বলা যায়। এই নাটকে আঙুর ক্ষেতের দৃশ্যটা দুর্গাদাস এঁকে ছিল। দেখতাম, রাত্রিবেলা, বড়ো বড়ো আলো সাজিয়ে নিয়ে, দুর্গাদাস স্টেজের একধারে একমনে বসে বসে আঙুরের ক্ষেত আঁকছে, শরীরটা তখন ওর সুস্থ ছিল না, কাজের তাগিদে বাড়ি যায় না, প্রবোধবাবুর ঘরেই থাকে।

এ নাটকের গানের সুর দিয়েছিলেন—পেয়ারা সাহেব। মেটিয়াবুরুজের মস্ত গাইয়ে, বহু রেকর্ড ছিল তাঁর। মেয়েদের মতো গলা, বিখ্যাত ওয়াজেদ আলি সা'র বংশধর। ঠুংরিতে ওস্তাদ ছিলেন। নাটকের সুরও দিয়েছিলেন ঠুংরিভাঙা। মিনার্ভায় ছিল সুবাসিনী, মিনার্ভা তখন বাইরে বাইরে ঘুরে থিয়েটার করে বেড়াচ্ছে, ও আর ঘুরতে পারছে না বলে মিনার্ভা ছেড়ে দিয়ে আমাদের স্টারে এলো। সাজলো এসে 'গুলরুখ'—চাষীর মেয়ে—আঙুর ক্ষেতের রাণী। এ'র মুখে গান ছিল। গানগুলির অমন সুর, তার ওপরে ও গাইতও ভালো, যেন মাতিয়ে দিতো। সখীদের নাচ আমাদের এত ভালো হতো না, কিন্তু নীহারবালা 'নর্তকী' সেজে রাজদরবারে একটি 'তাম্বুরীণ নৃত্য' যা প্রদর্শন করলে তা দেখবার মতো! 'রাণীরূপিণী' কৃষ্ণভামিনীকে অপরেশচন্দ্র সুন্দর তৈরি করিয়ে ছিলেন, আমি তাকে সিঁড়ি দিয়ে ভঙ্গি ভরে ওঠা আর নামা, চলা আর ফেরা, এসব দেখিয়ে দিয়েছিলাম।

মহলা ত পুরো দমে চলেছে। তার ওপরে বড়দিন এসে গেল—দিনে মহলা—রাতে প্লে। তখন নিয়ম ছিল, বড়দিনে বই খুলতেই হবে। চেষ্টা চলেওছে বড়দিনে নতুন বই দেবার। নাচের মেয়েদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ঐ স্টেজেই। হৈ-হৈ ব্যাপার। গাঁদা ফুল—দেবদারু পাতা—নিশেন—আলো—এসব দিয়ে চতুর্দিক সাজানো। বাল্বগুলিতে প্রয়োজনমতো আবার ল্যাকার দিয়ে রঙ করা হচ্ছে। সেই যে কর্ণার্জুন খোলবার সময় ল্যাকার দেওয়া হয়েছিল, তারপর আর হয়নি, বহু বাল্বের রঙই বিবর্ণ অথবা ফিকে হয়ে গেছে।

এর মধ্যে আমার মেয়ে মীরা ভূমিষ্ঠ হলো আমার শ্বশুরবাড়ি ইটালীতে—২৯শে ডিসেম্বর, শনিবারে। মা বললেন—মেয়ে হয়েছে দেখতে যাবি না?

বললাম—দাঁড়াও, অশৌচ কাটুক।

বড়দিনে ৮।১০ দিন উপরি-উপরি প্লে, দিনে নতুন বইয়ের মহলা, একে 'অশৌচ' ছাড়া আর কী বলব?

এত চেষ্টাতেও নতুন বই বড়দিনে খোলা গেল না, খোলা হলো—১লা জানুয়ারী, ১৯২৪। নাটকের নাম, অপরেশচন্দ্র অতঃপর ঘোষণা করলেন—"ইরাণের রাণী"।

(ক্রমশ)

সহজ কিস্তির সুযোগ

কোনও বাড়তি খরচ নেই..

- এই সুযোগ শুধু অল্পকালের জন্য পাবেন।
- মনে রাখবেন, প্রত্যেকটি উষা সিলিং ফ্যান ডবল্ বল-বেয়ারিং যুক্ত—সেই জন্য এই ফ্যান অনেক বেশী দীর্ঘস্থায়ী।
- নিকটতম উষা বিক্রেতার কাছে কিস্তির বিবরণ জেনে নিন।

উষা

আজই কিনুন বাজারের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফ্যান

জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড, কলিকাতা-৩১

সিটি অফিসঃ পি-১০, মিশন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা—১।

এখানে এলে সেই লোকটার সংগে দেখা হবেই। কালো মিশমিশে চেহারা। কোণের দিকের চেয়ারে বসে থাকবে। আর কুতকুতে চোখে মিটমিট করে দেখবে। অরুণ যখনই আসুক। কালো লোকটার সংগে তার দেখা হবেই হবে।

অথচ সময়টাকে বদলাতেও পারে না। সময়টা তার হাতে নয়। তাই পারে না অরুণ। কিন্তু কালো লোকটার ওই কুতকুতে চাউনিকে বরদাস্ত করা অধুনা অসহ্য ঠেকছে তার। কুন্ড থেকে সেই যে পেছু নেয় লোকটা।

ঠিক ছিল অরুণ বলবে একদিন। জয়তীর নিষেধে আর বলা হয়নি।

তুমুল তর্ক উঠেছিল বেণুবনে। "কোন অভিসার রজনীতে পায়ের দফা শেষ করেছো সুন্দরী! নূপুরের ধ্বনি এক পায়ে কেন, শুনি?" আলোচনা চলে অনেক সন্ধ্যায়। অরুণ এলে ধামা চাপা পড়ে। অরুণ আসবে। আর মিশমিশে কালো লোকটা একটু পরেই কোণের দিকের চেয়ারে বসে পড়বে। আর কুতকুত করে দেখবে অরুণকে।

তখনো আলো জ্বলে না। নীলচে আলোয় তখনো কুন্ড অখন্ড একটা আলোর সভায় পরিণত হয় না। ডুলিটা গেলে। দুলে দুলে চলে। সাত ধারায়। সিঁড়ি পার হয়ে নীচে। নেমে যায় ডুলিটা আস্তে আস্তে। তারপর। ব্রহ্মকুণ্ডের উষ্ণজলে কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে থাকে জয়তী। অনেকক্ষণ। সে অনেক সময়। অরুণ আসে। সাতধারার কবোষ্ণ জলে স্নান সারে। ব্রহ্মকুণ্ডে নেমে গল্প করে। জয়তীর সংগে। তারপরে।

এতো অনেকেই জেনেছে।

জয়তী আসে। অরুণ আসে। স্নান সারে। শীতের বাতাসকে বাঁচিয়ে গরম জামা আঁটে শরীরে। ডুলিটা চলে। আগে আগে। তারপরে পুলটার পাশে দাঁড়ায় অরুণ। মাথায় শালটা টেনে নেয় জয়তী। অরুণকে দেখে। তারপর। ডুলির সংগে তার ছোট্ট হাসিটাও মিলিয়ে যায় কখন।

এতো অনেকেই দেখেছে।

রোজ দেখেছে অরুণ। আজ কয়েক মাস ধরে জয়তীকে। কিন্তু কয়েক মাস আগে। যখন সে ছিল না। তখন দেখেছে বেণুবনের সান্ধ্যসভার সদস্যরা। দেখেছে চিত্রার্পিত, মণিকুন্তলা আর উকিল সাহেব।

বেণুবনেই উকিল সাহেবের চৌহদ্দি। এলোমেলো খাপড়ার এক একটা মানুষ-ঘর। ডুলিটা আসত। ডুলি আসে। প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মমত বেণুবনে। উকিল সাহেবের চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে আসে ডুলি। জয়তীকে নিয়ে। হেলে দুলে। শীতের তখন প্রথম প্রহর। বিপুলা আর বৈভারের গা' থামে রাত্তিরে। ঠান্ডাও পড়ে দিনের চেয়ে। জয়তী যায় রোজ স্নানে, সাতধারায়, ব্রহ্মকুণ্ডে। না; স্নানে না। পা' সারাতে।

পা'টা পড়ে গেছে জয়তীর। নামকরা হাকিম, সেরা বদ্যি সব হাল ছেড়েছে। ছাড়েনি শুধু ডাক্তার পাত্র।

'বেশ করেছেন। এরকম বহু কেস্ সেরে গেছে এখানে—. তবে নিয়ম করে চান করতে হবে।' ছাব্বিশ ইঞ্চি গলা, ছত্তিরিশ ইঞ্চি বুক কাঁপিয়ে হেসে ওঠে ডাক্তার পাত্র। সে আজ অনেকদিনের কথা।

কালো লোকটা অরুণকে দেখছিল। রণভূম হোটেলে। কোণের দিকের চেয়ারে বসে। কী যে দেখে। ভাবে অরুণ। লোকটা কে? বেয়ারাকে জিগেস করতে গিয়েও চেপে গেছে অরুণ। অকারণে লোকটাকে জাতে তুলে লাভ কি!

উকিল সাহেব বলেন অন্যকথা। হাজার কথার এক কথা। 'দুসরে পর আঁখ মা লাগানা।' কালো লোকটা কিন্তু অরুণকে পুতপুত করে দেখে।

'ডাকছে বাবু!' বেয়ারা এসে খবর দিলে অরুণকে। উঠে গেল অরুণ বাইরে। দাঁড়িয়ে আছে ওমরাই। জয়তীর অতি পুরাতন ভৃত্য।

কালো লোকটার চাউনিটি—

ডাক পড়ে প্রায়ই। ডাকে জয়তীর মা। ফেরার পথে কোন কোন দিন খবর নেয় অরুণ রাত্তিরে। উকিল সাহেবের চৌহদ্দিতে মাঝ পথে জ্বলে একটি আলো। ফেরার মুখে আলোটা নিবিয়ে দেয় অরুণ। উকিল সাহেবের অনুরোধে। তখন। কোন কোন-দিন খবর নেয় জয়তীদের। জয়তীর মা আর জয়তী। রণভূম হোটেলের পেছন দিকের বাড়িটা। ভাড়া নিয়েছে ওরা।

—এসো বাবা।

জয়তী ছিল শুয়ে। পা থেকে মাথা অবধি ঢাকা। মুখ থেকে ঢাকাটা সরিয়েই আবার স্বস্থানে ফিরিয়ে দিলে তাকে। হাসলো অরুণ।

—কেমন আছে, এ বেলা?

—বুকের ব্যাথাটা বেড়েছে আজ।

—ডাক্তার কি বললে?

—কী জানি বাবা। বুঝিনে ওসব। বললে—চান করুন। সেরে যাবে। বাবার জন্মে শুনিনি এমন কথা। জ্বরে মরছে রুগী—

হাসলো অরুণ।

—হ্যাঁ তোমায় যে জন্যে ডেকেছিলাম বাবা। অরুণ চাইলো জয়ন্তীর মা'র দিকে। জয়ন্তীর মা বললে, 'নৃসিংহ ঘোষকে চেনো?'

ভ্রূ দুটো কুঁচকে ভাবতে থাকে অরুণ। চেনা মহলে প্রাণান্ত ঘোরাঘুরি করেও নৃসিংহ ঘোষকে খুঁজে পায় না অরুণ।

—কুচকুচে কালো চেহারা। কোঁকড়ানো চুল—

সেই কালো লোকটা! কুতকুতে চোখে যে দেখে! না। চেনে না অরুণ তাকে।

—কিন্তু তোমার নাম করলে।

মিশমিশে কালো! কেমন করে দেখে? না। চেনে না অরুণ তাকে।

জয়ন্তী ঢাকাটা টেনে নেয়। চুপ করে থাকে জয়ন্তীর মা।

—সে নাকি তোমার কাছে টাকা পায়!

—টাকা! চমকে উঠেছে অরুণ।

—হ্যাঁ। আরো সব কত কী?

—কেমন?

কী জানি বাবা। বুঝিনে ওসব। সে তোমায় চেনে। তুমি চেনো না। থাকগে। তাহলে একটা—

তাহলে একটা প্রশ্ন? নৃসিংহ ঘোষ একটা গোটা প্রশ্ন হয়ে ফিরতে লাগলো অরুণের মনে।

২

'শেষকালে কিনা অরুণ মিত্র খোঁড়া মেয়েটার প্রেমে পড়লো?' বেণুবনে আজকাল মুখরোচক একটা বিষয় পাওয়া গেছে। 'রণভূমে'র মালিক কৌশিক সেন আত্মীয়ের মতই বললে কথাটা অরুণকে।

কলেজ খুলতে আর কদ্দিন?

'দেরি আছে। কেন বলুন তো?' একটু থেমে, 'যেতে বলছেন নাকি?'

হাসে কৌশিক সেন। হাসলে ভেতরটা দেখা যায়।

—বলিনি। বলতাম না। তবে—

তবে। অরুণ যদি না আসতো। অরুণ যদি বেণুবনে না থাকতো। সুমিষ্ট কণ্ঠের সুরে চমকিত না হ'ত। কোন সুকুমার বৃত্তির অভাব থাকতো যদি অরুণের।

কিংবা। ব্রহ্মকুণ্ডে এলায়িত চুলের রাশি ভেঙে ভেঙে না পড়তো জয়ন্তীর। ভিজে কাপড়ের সুঠাম বলিষ্ঠ যৌবন ডাক না দিত। তবে?

কিংবা।

ব্রহ্মকুণ্ডের স্বচ্ছজল। পা' দুটো ডুবিয়ে জয়ন্তী বসে আছে সিঁড়িতে। ওমরাই নেই কাছে। চঞ্চল হাতে ঢেউ তুলছে জয়ন্তী। একটা সিঁড়ি নেমে বসলো সে।

হয় না; এমন হয়নি কোনদিন আগে। একটা খণ্ড পাথর বেসামাল করলে তাকে। পড়ে গেল জয়ন্তী। জলে। ডুবে যাওয়ার মত জল নেই ওখানে। ওমরাই নেই কাছে। চান করায় সে রোজই।

'বিটিয়া, নাম আর একটু।' টান দেয় জয়ন্তীকে। রোজ। রোজই এমনি হয়।

সাতধারায় স্নান সেরে ফিরছিল অরুণ। সে সময়ে। একটা আওয়াজ। ছুটে এসে হাজির অরুণ। সিঁড়ি বেয়ে। তর তর করে জয়ন্তীকে তুলে ফেলেছে। স্নানার্থী কোন বিহারী পাণ্ডা। অরুণের দিকে চেয়ে দৃষ্টিটা নামিয়ে নেয় জয়ন্তী। লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে গাল। অপরাধীর মত নুয়ে পড়ছে মাটিতে।

লজ্জার কী আছে। ওমরাইকে ধমক দিলে অরুণ। দোষ তারই। অপরাধ তো করে নি কিছু জয়ন্তী। সরল দু'টো পা'। একটা অকেজো? তাই।

অরুণ কিনা শেষে খোঁড়া মেয়েটাকে

ভালবাসলে' খোঁড়া মেয়েটার যা হোক একটা হিল্লে হয়ে গেল।'

—তাই বলছিলাম। বললে কৌশিক সেন।

হাসল অরুণ।

অরুণ মিত্র হাসে। এমন অনেক কথার ঢেউ লেগেছে তার গায়। রাজগীরে আসার পর থেকেই। খোলা বই হাতে মাঝে মাঝে উদাস হয়ে কী ভাবে। ভাবার আর কী। জয়তী কিংবা কলেজ। কিংবা বই।

শীতের রাত। বাদুড়ের ডানার মত কালো রাত। পায়চারি করছে অরুণ বাইরে। বারান্দায়। থমকে দাঁড়ালো। টর্চের আলোটা ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে। এলো। অরুণ দাঁড়ালো। অরুণকে দেখে ওপরে উঠে এলো। কৌশিক সেন।

—শুনেছেন?

—কী!

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। বলেছিল কৌশিক সেন। এই খোলা লোকটার কাছে দুনিয়ার যত খবর হাজির হবে। যত ওঁচা, যত ভাল, সব। আর হাটের ন্যাড়া কৌশিক সেন। দুনিয়ার লোককে বলে বেড়াবে। বলতে তার আনন্দ। শুধু বলে। বলতে ভাল লাগে।

তাই বলছিল কৌশিক সেন। ডুবে ডুবে জল যতই খাও না বাপ। ভেবেছো শিবের বাবাও টের পায় না। পায়। এই তো! নিরঞ্জন দেখে এলো। জয়তী যখন থাকে না। যখন স্নানে যায়। তখন। প্রায়ই তখন। লোকটা আসবে আর ওদের বাড়িতে ঢুকবে। কেন? ঠিক ওই সময়টিতে কেন?

৩

পা'টা কিন্তু সবল হয়ে উঠছে না জয়তীর। সে বোঝে। চান বাদ যায় না। নিয়মিত। পরিমিত স্নান। অরুণ অনুযোগ করে ডাক্তার পাত্রের কাছে।

—কিন্তু গরম জলটাই কি সব ডাক্তার?

—তাহলে লোকে এখানে আসবে কেন বলুন মিত্রমশাই. বাড়িতেই ফুটিয়ে নিত।

—নিত। কিন্তু নেয় না। হাসলে অরুণ মিত্র।

—কী জানেন, জলের একটা মৌলিক—

—পদার্থ? সে তো যে কোন হট্ স্প্রিংয়েই আছে। কথাটা টেনে নেয় অরুণ মিত্র।

হাসে ডাক্তার। ভারী একটা হাসি। কী যেন বোকার মত বলে ফেলেছে অরুণ।—না মিত্রমশাই জলের একটা মৌলিক গুণ রয়েছে—'রেডিও অ্যাকটিভ'!

ন্যাড়া বেলতলায় একবারই আসে। তার এসেই যখন পড়েছো বাবা, তখন বেল কি আর ছেড়ে দেবে।

—এইজন্যেই বসে আছে ডাক্তার। আপনি কিস্সু বোঝেন না মাস্টার মশাই। হো হো ক'রে হেসে ওঠে কৌশিক সেন। বলে, 'কেউ চলে যাচ্ছে শুনলে স্টেশন পর্যন্ত দৌড়োয়। যদি ইনজেকশানটা দেওয়া যায় শেষমেশ।' হাসি আর থামতে চায় না কৌশিক সেনের।

এসব বোঝে না অরুণ মিত্র। আর বোঝাতেও চায় না জয়তীকে। কুণ্ডে যাবার আগে। বিকেলে বেরোয় অরুণ আর জয়তী। টমটমে। রোজই।

নৃসিংহ ঘোষ আসে। রেলপথে আলাপ হয়েছে জয়তীদের সঙ্গে। আর সেই সুবাদে স্বচ্ছন্দ জয়তীদের অন্দর মহলে আসা-যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে সে।

—কেমন আছে মেয়ে? দেখা হতেই জিগেস করে নৃসিংহ ঘোষ।

—তেমন তো কিছুই বুঝছি না বাবা। বললে জয়তীর মা।

—কিন্তু সকলেই তো বলছে—

—কী? চোখের তারায় প্রকাণ্ড একটা প্রশ্নচিহ্ন। জয়তীর মায়ের।

—পায়ে বেশ জোর পেয়েছে আজকাল জয়তী।

—তা হবে। বাইরের লোক ভাল বুঝবে বৈকি বাবা!

মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি। লোকে আকথা, কুকথা বলছে। বলুক। তারা কি জানে? যখন জয়তীকে কেউ ছিল না দেখার। এই বিদেশে? তখন কে করেছে ওর রোগের সময়? কে দেখেছে অসময়ে? অরুণের মত ছেলে হয়?

—অরুণের মত ছেলে হয় না বাবা।

—তা ঠিক। লোকটা জোচ্চোর।

কালো লোকটা টমটমের মুখের কাছে এসে দাঁড়ালো। আর ছুঁচের মত নজরটাকে সরু ক'রে দেখতে লাগল অরুণকে। দেখতে লাগল জয়তীকে। পালকের মত নরম চুলের রাশি নিয়ে পায়রার মত ভীরু একটা প্রাণ অরুণের বুকে মুখ লুকাল। কালো লোকটার ওই বিদঘুটে চাউনিকে অসহ্য

লাগছিল অরুণ মিত্রের। ওমরাই এগিয়ে এল। ডুলিটা নামালো পাশে। ডুলিটা কেঁপে উঠল। আর চলতে লাগল ডুলিটা দুলে দুলে। সিঁড়ি বেয়ে। ওপরে।

ব্রহ্মকুণ্ডের জলে বসে জয়তী আর অরুণ। জলে পা ডুবিয়ে। আর একটা ধাপ নেমে বসলো অরুণ। জয়তীর অসুস্থ পা'টা ডলে দিচ্ছে। রোজই দেয়। ভালো লাগে জয়তীর, লজ্জাও পায়।

—আশ্চর্য। লজ্জা আর গেল না। পায়ে হাত দিলেই—

—না। রোজ রোজ না।

—কেন?

উত্তর দেয় না জয়তী। আর উত্তর চায় না অরুণ। উত্তর নেই। সে জানে।

—তোমার বুঝি ভালো লাগে না? আহত গলার স্বরে চমকে ফিরে তাকায় জয়তী। হেসে নিজেই অরুণের হাতটা ধরে।

—লাগে। খুব ভাল লাগে। বোঝ না? বুঝতে পার না!

পারে। বুঝতে পারে অরুণ। যখন সে

সেবা করে। মরমে মরে যায় জয়ন্তী। নারী হৃদয়ের অনবদ্য কথাটা বোঝে অরুণ। কিন্তু এক যেখানে সম্পূর্ণ নয়, তখন। তখন সেবাও নিতে হবে তাকে।

—তুমি রাগ কর, বোঝ না। এতে কতটা আনন্দ আর কতটা দুঃখ হয়।' গভীর আবেশে চেয়ে থাকে জয়ন্তী অরুণের দিকে। তার চওড়া কাঁধের দিকে। এক মুঠো জল ছুঁড়ে মারে অরুণ। জয়ন্তীর মুখে। মিষ্টি হাসিতে কুন্ডের ব্রহ্মান্ড কেঁপে ওঠে।

৪

'বেড়াল যদি মারতেই হয় তবে পয়লা রাতেই ভাল'। তাৎপর্যটা যদি তখনই বুঝত অরুণ। না। ওটা একটা গল্প হিসেবেই শুনে এসেছে এতকাল। তবুও একটা সীমা থাকা উচিত ছিল। যাকে চিনি না, জানি না। হঠাৎ। ভাবতে আশ্চর্য লাগছে অরুণের। কেন? নৃসিংহ কে?

নৃসিংহ। নৃসিংহ ঘোষ। বাগবাজারের ঘোষ পরিবারের কনিষ্ঠতম সন্তান নৃসিংহ। যাওয়া আসার সুযোগ পেয়েছে। তাই বলে নিচ্ছে দুকথা। বলুক না। বললেই কী গায়ে ফোসকা পড়ে?

—না বলবে কেন?

—বলা যাদের স্বভাব, তার মুখে কি ধামা চাপা দেবে? বললে জয়ন্তী।

—আস্কারা পেয়ে গেছে। প্রথমেই লোকটাকে শাসন করা উচিত ছিল।'

বেণুবনের পুকুরধারে বসে ছিল ওরা। অন্ধকার নামার বাহাদুরি আছে। জানতেও পারেনি জয়ন্তী। কখন সন্ধ্যা নেমেছে। জানতে পারেনি অরুণ। কখন সন্ধ্যা হয়েছে। দুটো ন্যাড়া আলো জ্বলে উঠল দূরে। সিরসির বাতাস বইছে। শালটা টেনে নিলে জয়ন্তী।

—চল! কত দেরি হয়ে গেল দেখ তো?

—হোক। বললে অরুণ।

—অনেক দেরি হয়ে যাবে বাড়ি ফিরতে। মা ভাববেন।

—ভাববেন না। জানেন, তুমি আমার সঙ্গে আছ।

—কী এমন সাধু পুরুষ—

দুটো বাহুর সবল টানে জয়ন্তীকে কাছে টেনে নিলে অরুণ। জাপান মন্দিরের ঢাকের বাদ্যি জয়ন্তীর কানে বাজছে তখন।

কালো লোকটা কুন্ডের ধাপিতে বসে দেখছিল। দেখছিল জয়ন্তীকে। জয়ন্তীর মুখটা আর শরীরটা পায়ের মত নয়। শুধু সে কেন অনেকেই। মুখটা দেখলে আর চোখ ফেরাতে পারে না সহজে।

মিশমিশে লোকটা সিঁড়ি ধাপটায় বসে অরুণকে দেখছিল।

বাড়ি ফিরতে আজও দেরি হয়ে গেল। হবেই তো। ওই তো সময়। বেড়াতে যাওয়া, চান সারা, হবে না? হবে। কিন্তু তাই বলে এত রাত। সত্যি আজ রাত হয়ে গেল। ছি! অরুণদা যেন কী। একটুও বোঝে না। মা জানেন বলেই কি সব হয়ে গেল? লোকে বলবে কি?

—কিন্তু জান মা, আজ না, অনেকক্ষণ চান করেছি—

মা চলে গেল রান্নাঘরে। উত্তর নেই। চুপ? কি হল? আজ যেন অদ্ভুত লাগছে মাকে? ক্রাচটা নিলে জয়ন্তী। টুকটুক ক'রে রান্নাঘরে হাজির হল। বাপ মরা মেয়ে। সোহাগী। ভুলে গেল জয়ন্তীর মা সব রাগ। সব জ্বালা।

—কতদিন গলা সাধিসনি বলত?

লজ্জা পায় জয়ন্তী। মাকে জড়িয়ে ধরে।

—ঠিক বলেছ মা। কাল থেকে দেখ—

হাসে জয়ন্তীর মা। হাসে জয়ন্তী। কিন্তু জয়ন্তীর মন কী যেন একটা খুঁজে বেড়াতে লাগল। নিশ্চয় কেউ কিছু বলে থাকবে।

—কী আবার বলবে নতুন করে। আর যদি বলে। অন্যায় কিছু না। আশ্চর্য। আজ কি তবে কেউ দেখেছে? বেণুবনে। পুকুরপাড়ে। কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমে উঠছিল জয়ন্তীর।

'তুমি অরুণকে ভালবাস। কিন্তু অরুণ?' চুপ করে থাকে জয়ন্তী। লজ্জা পায়। 'লোকে বলেঃ অরুণ তোমায় দয়া করে।'

দয়া! অরুণ! অরুণ দয়া করে জয়ন্তীকে! না। অরুণ জয়ন্তীকে ভালবাসে। তোমরা কেউ জান না।

জয়ন্তী চলে এল। ক্রাচটার ঠুক্ ঠুক্ শব্দ কনকনে অন্ধকারে বৃদ্ধের কাশির মত মনে হচ্ছিল।

'তখনই বলেছিলুম।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—

'আরে, একটা ল্যাংড়া মেয়ে। তুই হলি সোনার চাঁদের টুকরো—

বেণুবন সভায় সাড়া পড়ে গেল। ঠিক যেন বুঝে উঠতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু জয়ন্তীর নিয়মিত স্নান বাদ পড়েনি কোনদিন। মেয়েটা শক্ত। ভেঙ্গে পড়েনি একটুও। সেই যে পালিয়ে গেল ছেলেটা। মুষড়ে পড়েনি একটুও।

আসল কথাটা কিন্তু কেউ জান না হে—বড় বড় চোখগুলো ফিরে তাকাল। নৃসিংহ ঘোষকে দেখতে লাগল। আর, নৃসিংহ ঘোষ হাসল। বললে, চিঠি এসেছে। আসছে। খুব শিগ্‌গির—'

আসেনি খুব শিগ্‌গির। অরুণ মিত্র কলেজ খোলার আগেই চলে গেছে। জয়ন্তী কেঁদেছিল। অরুণ প্রবোধ দিয়েছে। কিন্তু গিয়ে পর্যন্ত মাত্র একটা চিঠি। আর আজ একটা।

না। অরুণ সে ছেলেই নয়। সে জানে জয়ন্তী ভাববে।

ভুল। ভুল। জয়ন্তী ছেলেদের তুমি জান না। ক'জন ছেলে দেখেছ? ক'জনকে

দি রিলিফ
২২৬, আপার সার্কুলার রোড
এক্সরে, কফ প্রভৃতি পরীক্ষা হয়
দরিদ্র রোগীদের জন্য—মাত্র ৮্ টাকা
সময়ঃ—সকাল ৯টা থেকে ১২-৩০ ও বৈকাল ৪টা থেকে ৭টা

এই যে রবিনসন্স 'পেটেন্ট' বার্লি এসে গেছে!

দেখবেন, খোকাবাবু সবটুকু খেয়ে নেবে। রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লি গোরুর দুধের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে শিশুর কোমল পাকস্থলীতে দুধ চাপ বাঁধতে পারে না, কাজেই শিশুর পক্ষে হজম করা সহজ হয়। তাছাড়া, রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লি শিশুদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগায়, ওরা খেয়ে তৃপ্তি পায় আর এতে ওদের শরীরও গড়ে ওঠে।

এই বার্লিতে অনধিক ০.০২৮% আয়রন বি-পি ও ১.৫% ক্রিটা প্রিপঃ-এর সংমিশ্রণ আছে।

ক্যালসিয়াম ও লৌহ সংযোগে সুরক্ষিত

জান? শুধু বিশ্বাস? তাই। তুমি অন্ধ। যুক্তিহীন বিশ্বাসের খেলার পুতুল। কী আছে তোমার? ছেলেদের তুমি চেন না জয়ন্তী।

৫

হাঁটতে পারছে। পা পা ক'রে। মনে হচ্ছে শিথিল পায়ের টুকরো টুকরো রহস্য এবারে যেন ধরা পড়েছে। যেন সরল পা দুটো সোজা লাইন কেটে চলবে।

—পারছি না? ডাক্তারবাবু? ক্লাচ ছাড়াই হাঁটতে চেষ্টা করছে জয়ন্তী। পড়ে যাচ্ছে। টাল খাচ্ছে। সামলে নিচ্ছে। কোনরকমে।

—চমৎকার! তবে এক সংগে অতটা—ঠিক না। আস্তে আস্তে—

আস্তে আস্তে রোজই চেষ্টা ক'রে চলেছে জয়ন্তী। একটু হাঁটবে দুটো পায়ে কঠিন মাটির একটু স্বাদ পেতে। আনন্দে বুকটা ভরে উঠছে জয়ন্তীর। বিশ্বাস হচ্ছে তার, হাঁটতে পারবে। কয়েকবার [illegible] জয়ন্তী। সারাদিনে দু' কদম হাঁটিও। পারে না। আবার ওঠে। হাঁটার নেশায় মাতাল হয়ে উঠেছে দিনের পর দিন।

—চানটা বাদ দেবেন না কিন্তু—। বলেছিল ডাক্তার।

ডুলিটা বেরোয়। উকিল সাহেবের চৌহদ্দি থেকে। ওমরাই চলে পাশাপাশি। দোলে। আর কল্কি চালে চলে ডুলিটা। বৌদ্ধমন্দির পার হয়ে নেমে যায় ঢালু রাস্তায়। তারপর জাপান মন্দিরের পথ ছাড়িয়ে একেবারে সাতধারায়।

কালো লোকটা বসে থাকে। সিঁড়িধাপে। যেতে আর আসতে দেখা হয়। দেখতে পায় জয়ন্তী। আর কেমন যেন জড়সড় হয়ে পড়ে। ওকে দেখলেই অরুণকে মনে পড়ে বেশি করে। কেন? কেন?

মধ্যযুগের পাথুরে পাঁচিলে ছুটছে একটা ছাগল ছানা। এঁকে বেঁকে চলে গেছে পাঁচিলটা। দুনিয়া থেকে আলাদা করেছিল এই জনপদকে কোনদিন। দাওয়ায় বসে দেখছিল জয়ন্তী।

তখন ভোর। সূর্য উঠছে। পেঁজা তুলোর মত মেঘ জমে আছে। মোনা পাহাড়ে। ভাল লাগছিল জয়ন্তীর। 'তরী নিয়ে বসে আছি'—গাইছিল জয়ন্তী। গুন-গুন করে। ভোরের রাগে। ছাগল ছানা ছুটছিল। পাঁচিলের ওপরে। এঁকে বেঁকে।

পা' ভাল হলে পাহাড়ের চূড়োয় সে উঠবে একদিন।

৬

অনেক কথা শিখেছে জয়ন্তী। সে-অনেক কথা। ভরে গেছে মনটা অরুণের এক অনাস্বাদিত রোমাঞ্চে। পা'টা ভাল হলে পাহাড়ে উঠবে একদিন। একসংগে। দুজনে মিলে।

—শুধু পাহাড়ে! তুমি জান না জয়ন্তী। কোথায় যাব, আর কোথায় যাব না।

—থাক। খুব হয়েছে। কত বীরপুরুষ—

আনন্দে আটখানা হয়েছে জয়ন্তী অরুণের আসায়। ভাবতেই পারেনি সে হঠাৎ যেন ছুটে হাজির। দেখ তো কাণ্ড-খানা। ও কী আসতে বলেছে একবারো। কাজ করতে হবে না? তা মাঝে মাঝে এক আধবার আসবে বৈকি অরুণ। তার কি আসতে সাধ যায় না? তুমিই বল না জয়ন্তী। এই যে অরুণ এল। এতে সত্যি কি তোমার রাগ হয়েছে?

রাগ হয়নি। ভাল লেগেছে। এত ভাল সে-কথা বলবে কি করে জয়ন্তী। জয়ন্তী সে-কথা বলবে না। কাউকে না। অরুণকেও না।

—তুমি ভাল হয়ে গেলে অন্য একটা বাড়ি নেব। বললে অরুণ।

—কেন?

—বাঃ, নেব না?

মুচকি মুচকি হাসে জয়ন্তী। আর অদ্ভুত এক আবেশে দেখে অরুণকে।

'বলছ না?' জয়ন্তীর কাছ ঘেঁষে বসল অরুণ খাটে।

—নি—ও—

কথাটা শেষ হল না।

আজ সকালে চলে গেল অরুণ। দুদিনের ছুটিতে এসেছিল। সারাটিক্ষণ ছিল দাটিতে। শুধু রাতে! না। পাশের ঘরে শুয়েছিল অরুণ। শিগগিরি আসবে অরুণ বলে গেছে। বড্ড ফাঁকা লাগছে আজ। খটখটে রোদ। জানলা দিয়ে এক ঝলক এসে

চোখের একটু যত্ন নিন ...

মা যেমন রাঁধেন, এমনটি আর হয় না। কিন্তু অতি বড় রাঁধুনীকেও দেখতে হয় তিনি কি রাঁধছেন, নজর রাখতে হয় তাঁর কড়াইটার ওপর। শুধু ভালো জিনিস হলেই তো রান্না ভালো হয় না—রান্নাঘরের

যেন রান্নার সময় কষ্ট না হয়

আলোটিও ভালো হওয়া চাই। আপনার চোখ কি কথা কইতে পারে? যদি পারত তাহলে নিশ্চয়ই চাইত ফিলিপ্স-এর আর্জেন্টা বাতি—যার আলোয় চোখদুটি সত্যি আরাম পায়।

PHILIPS

৪০, ৬০, ৭৫, ১০০ ও ১৫০ ওয়াটস্-এ পাওয়া যায়।

ফিলিপ্স আর্জেন্টা

উজ্জ্বল আলো, চোখে লাগে না ...

TP 4433

ফিলিপস ইণ্ডিয়া লিমিটেড

পড়েছে জয়ন্তীর খাটে। রোদে পিঠ রেখে বালিশে ঠেসান দিয়ে বসল জয়ন্তী।

জানলার নীচে হাঁটাপথ দিয়ে কে যেন গেল। ওমরাই এসে বিছানাটা পরিষ্কার করে দিলে। বইটা একবার হাতে নিলে জয়ন্তী। রেখে দিলে পাশে। গানের সুরটা তখনো মিলিয়ে যায়নি।

৭

বেণুবনে একটা কথার ছায়া ঘুরতে লাগল। কেন? কি এমন শরীর খারাপ জয়ন্তীর? চানে খাওয়া বন্ধ। অরুণ ... ডাক্তারও আসছে মাঝে মাঝে।

—...কি হে?

—...।

চিন্তার কথা। কেন জয়ন্তী স্নান ছেড়েছে? জবাব দাও। তোমার প্রতিটি কাজের জবাবদিহি চাই। তা ঠিক। কিন্তু জবাব ওরা চাইবে। তুমি বলবে, কেন? বলবে। এখন তুমি একা থাক। অরুণকে নিয়মিত চিঠি লেখ না? লিখতে পার না? তার সব চিঠি যত্ন ক'রে তুলে রাখ। নষ্ট করো না। নিয়ম ক'রে উত্তর দেওয়া হয়ে ওঠে না। হাতটা চলতে চায় না। কেমন যেন লিখতে গেলে আটকে যায়। হাত সরে না।

তাই। অনুযোগ ক'রে লিখেছে অরুণ। প্রত্যাশিত চিঠির জবাব না পেলে অশান্ত হয় সে। কী বা করার আছে জয়ন্তীর? সারাটিক্ষণ শুয়ে থাকে আর ভাবে। ভাবে আর শুয়ে থাকে।

'তোমার একা একা থাকতে কষ্ট হয় না?' জিগ্যেস করেছিল অরুণ সেবারে। সে অনেকদিন হয়ে গেল। অরুণ এসেছিল। জয়ন্তী বলেছিল—হ্যাঁ।

বিষাক্ত সাপের মত। তার বিষের মত। কি একটা ঠেলে উঠতে চায় উপরে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত। একটু একটু করে উঠছে ওপরে। আর অবশ করে দিচ্ছে তার সমস্ত অস্তিত্বকে। দিনের পর দিন।

অরুণের চিঠি আসে। আর জমা হয় উত্তর নিয়ে কোনবারই ফেরে না। পর পর এক নয়, দুই নয়, অনেক। অনেক চিঠি জমে উঠেছে। বালিশের তলায়।

কাঁদে। জয়ন্তী কাঁদে। যখন সে একা থাকে। তুমি ভুল বুঝ না অরুণ। জয়ন্তী কাঁদে। তার অক্ষমতার জন্যে কাঁদে। সে কি করবে বল! তোমার চিঠি কে লিখবে বল। শুধুই কি তুমি কথার চিঠি চাও? তাহলে বল না। তা হয় না। অরুণের কোন চিঠির জবাব দেবে না জয়ন্তী।

অরুণের কোন চিঠিরই জবাব তুমি দিও না জয়ন্তী। অরুণকে তোমার ভুল বুঝতে দাও। কেন? তাই তুমি চাও।

৮

কবে যাওয়া স্থির করলেন? জিগ্যেস করলে নৃসিংহ ঘোষ।

—টাকাটা এলেই চলে যাব, বাবা। বললে জয়ন্তীর মা।

—তাই যান। কী আর করবেন বলুন? সবই বরাত। কপালে হাত ঠেকাল নৃসিংহ। বললে, 'অরুণবাবু আর আসে না?'

—অনেকদিন আসেনি। কাজে খুব ব্যস্ত থাকতে হয় তো।

—তা ঠিক। লোকটি বেশ ভাল—। তাকাল জয়ন্তীর মা একবার।

ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে নৃসিংহের। বললে, 'শুনলুম সব ডাক্তারের কাছে, কী আর করবেন বলুন, সবই বরাত!' মাথাটি নেড়ে বাইরের পথটা ধরলে নৃসিংহ।

তুমি কবে যাবে জয়ন্তী? অরুণকে জানাবে না? তাকে জানাবে না কোথায় যাবে? কোথায় গেলে সে দেখা পাবে? শুধুই কি বাড়ি থেকে টাকাটা আসার অপেক্ষায় আছ? আর কিছু নয়?

না না। আর কিছু নয়। কেন? অরুণকে তুমি ভালবাস না? কাঁদে। জয়ন্তী কাঁদে। নিজের অক্ষমতার জন্যে জয়ন্তী কাঁদে।

কিন্তু।

কিন্তু অরুণ আসছে। সব শেষের চিঠি একথা জানিয়েছে। থাকতে পারেনি অরুণ। এই অসহ্য চুপ। একে বরদাস্ত করতে পারেনি অরুণ, তাই। সে আসছে।

৯

বসন্তের বাতাসে নেশা লেগেছে। বেণুবনের বৈকালিক মজলিস জমছে। সন্ধ্যার আসর। মেতে উঠবে কিছু পরে। বসন্তের হাওয়ায় শিমুল ফুল কাঁপছে। ছোট লাইনের গাড়ি ধূসর ধোঁয়া কাঁপছে। ইঞ্জিনটা সোঁ সোঁ শব্দ তুলছে দাঁড়িয়ে। ছোট সুটকেস হাতে অরুণ নামল। সামনের মেঠো রাস্তা পার হয়ে পাকা সড়ক ধরল অরুণ।

বেণুবন সভায় কোন আলোড়ন উঠল না। অরুণ এল। পাশ দিয়ে চলে গেল। যেমন যেত আগে। কৌশিক সেন নেই। বাজারে গেছে। আবার চলল অরুণ।

উকিল সাহেবের চৌহদ্দি। ঢুকতে গেলে গেট পড়ে। লোহার শিকের গেট। ঢুকতে গিয়ে দাঁড়াল অরুণ।

কালো লোকটা!

কালো লোকটা। তার দিকে চেয়ে আছে। মিশমিশে লোকটা। কুতকুতে চোখ নিয়ে দেখছে না? পাতা খোলা চোখ। দেখছে। দেখছে অরুণকে।

গেটটা পেরিয়ে ঢুকে পড়ে অরুণ। পায়ে পায়ে হাঁটা প্রিয় পথ। জয়ন্তীর বাড়ির সামনে দাঁড়াল।

জয়ন্তী শুয়ে আছে খাটে। সেই পুরোন খাটে। খোলা বইটা বুকের ওপরে উপুড় করে রাখা। অরুণ দাঁড়াল। পাশে।

—জয়ন্তী?

—কে!

অরুণ। তোমার অরুণ জয়ন্তী। অমন ক'রে উঠলে কেন? ভয় পেলে। অপ্রত্যাশিত কোন কিছুর মুখোমুখি দাঁড়ানোর মত। চুপ। চুপ করে থাকে জয়ন্তী। শুধু চেয়ে থাকে। আর কাঁদে। চোখের কথায় কাছে আসিতে বলে।

—নিজেই এলাম। তুমি তো আর—

অরুণ! জয়ন্তী কাঁদে। নিজের অক্ষমতার জন্যে জয়ন্তী কাঁদে। নিঃশব্দ কান্নার একটা শব্দহীন স্তব্ধতা। জয়ন্তী পাশ ফিরতে চায়। পারে না। অরুণ সরে আসে কাছে। সামনে খোলা জানলা। বসন্তের বাতাস লাগছে গায়ে।

শঙ্খ মার্কাই
শ্রেষ্ঠ গেঞ্জী
যশোর কুম্ভ ইণ্ডাষ্ট্রী কোং
কলিকাতা-৯

আপনার শুভাশুভ ব্যবসা, অর্থ, পরীক্ষা, বিবাহ, মোকদ্দমা, বিবাদ বাঞ্ছিতলাভ প্রভৃতি সমস্যার নির্ভুল সমাধান জন্য জন্ম সময়, সন ও তারিখ সহ ২, টাকা পাঠাইলে জানান হইবে। ভট্টপল্লীর পুরশ্চরণসিদ্ধ অব্যর্থ ফলপ্রদ—নবগ্রহ কবচ ৭, শনি ৫, ধনদা ১১, বগলামুখী ১৮, সরস্বতী ১১, আকর্ষণী ৭।

সারাজীবনের বর্ষফল ঠিকুজী—১০, টাকা

অর্ডারের সঙ্গে নাম গোত্র জানাইবেন। জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য বিশ্বস্ততার সহিত করা হয়। পত্রে জ্ঞাত হউন।
ঠিকানা — অধ্যক্ষ ভট্টপল্লী জ্যোতিঃসঙ্ঘ
পোঃ ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা।

পরিবার-নিয়ন্ত্রণ
(জন্মনিয়ন্ত্রণে মত ও পথ)
● সচিত্র তৃতীয় সংস্করণ) ●
সর্বাধিকবিক্রিত জগৎপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সুলভ বাংলা সংস্করণ—
প্রত্যেক বিবাহিতের বাস্তব সাহায্যকারী একমাত্র শ্রেষ্ঠ পুস্তক। মূল্য ডাকব্যয় সহ ৭৮ নয়া পয়সা, M.O.তে অগ্রিম প্রেরিতব্য। বিদেশে ৩ শিলিং। এত অল্পমূল্যের পুস্তক ভিঃ পিঃ হয় না। প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য সাক্ষাৎ বেলা ১টা—৭টা। রবিবার বন্ধ। শনিবার ১—৫টা। ফোন : ৩৪-২৫৮৬

মেডিকো সাপ্লাইং কর্পোরেশন
(Family Planning Stores)
১৪৬, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯
(বৌবাজার-আমহার্স্ট স্ট্রীট জংসনের উত্তরে)

* বিশেষ দ্রষ্টব্য—উক্ত ১৪৬নং বাড়ীর একতলায় আমাদের কোন দোকান নাই। মেন্ গেট দিয়া সোজা ভিতরে ঢুকিয়া টপ্‌ফ্লোরে ছাদের উপর ১৮নং ঘরের খোঁজ করুন।

—জয়ন্তী। অরুণ সরে আসে আরো একটু কাছে।

—আমাকে একটু পাশ ফিরিয়ে দেবে—

চোখ রাখে অরুণ জয়ন্তীর চোখে। সব ঝাপ্‌সা লাগছে তার। ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে সব। সামনে খোলা জানলা। চাইল অরুণ বাইরে।

গাছের পাতায় নিঃশ্বাসের শব্দ। অন্ধকার নামছে আরো ঘন হয়ে। পাতায় আর ঘাসে, সর্বত্র। সব কিছু আড়াল করে নিচ্ছে। একটা কালো অন্ধকারে এক এক ক'রে। সব মিলিয়ে যাচ্ছে। কালো অন্ধকারের একটা শূন্য। আর সেই বিরাট শূন্যে ভাসছে একটা কুচকুচে কালো মুখ। স্থির। অজস্র তারার আলো তার খোলা চোখে। বর্শার ফলার মত তীক্ষ্ম। একদৃষ্টে চেয়ে আছে অরুণের দিকে। দেখছে। দেখছে অরুণকে। একজোড়া পাতা খোলা চোখে। বড় হচ্ছে। ক্রমশ। প্রকাণ্ড হচ্ছে। যেন একটু পরে চোখ দুটো বাইরের কালো অন্ধকারকে গ্রাস ক'রে ফেলবে।

শব্‌নম্‌

সৈয়দ মুজতবা আলী

॥ ছয় ॥

কত মাস, কত বৎসর কেটে গিয়েছে কে জানে!

বাদশা এবং আমার শ্বশুরও হার মেনেছেন।

সে নেই, এ-কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারব না। নিশ্চিহ্ন নিরুদ্দেশ হয়ে প্রত্যাবর্তন করার উদাহরণ ইতিহাসে বিরল নয়। তার চেয়ে বরঞ্চ নির্দয়তর সন্দেহই মেনে নেব—আমার প্রেমে কোনও অপরিপূর্ণতা ছিল বলেই শব্‌নম অন্তরালে বসে প্রতীক্ষা করছে, কবে আমি তাকে গ্রহণ করার জন্য উপযুক্ত হব, কবে আমার বিরহ-বেদনা-বিক্ষুব্ধ সরোবর নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত হবে সেই শব্‌নম-কমলিনীকে তার বক্ষে প্রস্ফুটিত করার জন্য।

নিশ্চয়ই আমার প্রেমে কোনও অপরিপূর্ণতা আছে।

শব্‌নমকেই একদিন সংস্কৃতে শুনিয়েছিলুম, শত্রু বেদনা দেয় মিলনে, মিত্র দেয় বিরহে—শত্রু-মিত্রে তা হলে পার্থক্য কোথায়? অথচ মিত্র যখন দূরে চলে যায়, সে তো প্রিয়জনকে বেদনা দেবার জন্য যায় না। তবে কেন হাসিমুখে তাকে বিদায় দিতে পারি নে, তবে কেন হাসিমুখে তাঁর পুনর্মিলনের জন্য প্রতীক্ষা করতে পারি নে—শব্‌নম যেরকম কান্দাহারে ম্লানমুখে, বিষন্নবদনে সন্ধ্যাদীপ জ্বালত, সে রকম না, উজ্জ্বল প্রদীপ, উজ্জ্বলতর মুখ নিয়ে।

সূফী সাহেবও তো ওই কথাই বলেছিলেন—অন্য প্রসঙ্গে। বলেছিলেন, প্রতিবার যোগাভ্যাসের পর দেহ-মন যেন প্রফুল্লতর বলে বোধ হয়, না হলে বুঝতে হবে অভ্যাসের কোনওস্থলে ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। প্রেম-যোগেও নিশ্চয়ই তা হলে একই সত্য। সে যোগ, সে মিলনের পর যখন প্রিয়-বিচ্ছেদ আসে, তখন আমার হৃদয় থেকে কাতর ক্রন্দন বেরুবে কেন? আমি কেন হাসিমুখে মুহুর্মুহু বিরহ-দিনান্তের পানে তাকাতে পারব না, সেই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে যে, সময় হলে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হবেই হবে। আমি কি মূর্খ যে দাহন-বেলায় ইন্দুলেখা কামনা করব? আমি হব সমাহিত জ্যোতিষীর ন্যায়, যে সূর্যগ্রাসের সময় বর্বরের মত সূর্য চিরতরে লোপ পেল ভয়ে বিকট অট্টরব করে উঠে না। অবলুপ্ত মধ্যাহ্ন-সূর্য তখন বিরাজ করেন তাঁর জ্ঞানাকাশে। শব্‌নম আমারই বুকের মাঝে চন্দ্রমা হয়ে নিত্য তো রাজে। শব্‌নম-শিশিরকুমারী প্রাতে যদি অন্তর্ধান হয়ে থাকে, তবে কি আজই সন্ধ্যায় পুনরায় সে আমার শুষ্কাধরে সিঞ্চিত হবে না?

আমি কেন হাসিমুখ দেখাব না? আমি কি শ্মশানের বৈরাগ্য-বিলাসী নন্দী-ভৃঙ্গী যে, দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে ত্রিভুবন শঙ্কান্বিত করব? আমার মৃত্যুঞ্জয় প্রেমের সঙ্গে হরিহরাত্মা আমিও মৃত্যুঞ্জয়—মধুমাসে আমার মিলনের লগ্ন আসবে, আমার ভালে তখন পুষ্পরেণু, বিরহ-দিগম্বর তখন প্রাতঃসূর্যরচিত রক্তাংশুকে পরিধান করবে। না, আমি এখনই, এই মুহূর্তেই বরবেশ ধারণ করব—বিরহের অস্থিমাল চিতাভস্ম আমি এই শুভলগ্নে ত্যাগ করলুম, আমার প্রতি মুহূর্তই শুভ-মুহূর্ত।

খৃষ্ট কি বলেন নি, উপবাস করতে ভণ্ডতপস্বীর মত শুষ্ক মুখ নিয়ে দেখিয়ো না। তারা চায়, লোকে জানুক, তার

এনাসিন

মাথাধরা সর্দি জ্বর ও পেশীর বেদনায়

সত্বর আরাম দেয়, কারণ এতে

চারটি ওষুধ রয়েছে

Registered User: GEOFFREY MANNERS & CO. PRIVATE LTD.

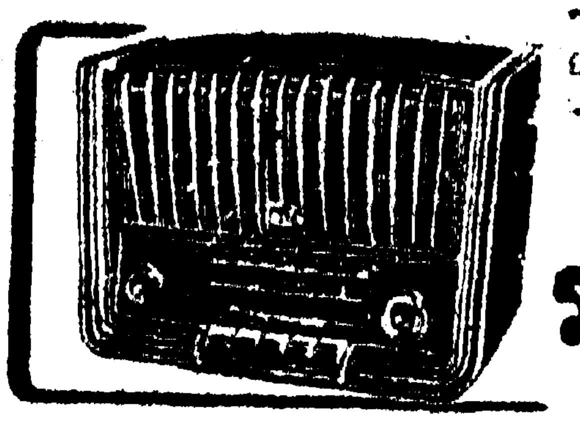
এইচ জি ই সি (সাবা) পশ্চিম জার্মানী, আর
এ রেডিও এবং সুলভ মূল্যে বিভিন্ন মডেলের
ট্রানসিস্টার রেডিও বিক্রয় ও মেরামত হয়।
মনি রেডিও প্রোডাক্টস্
১৩৭বি, ধর্ম্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

ট্রেড মার্ক বিজ্ঞপ্তি

জনসাধারন, ব্যবসায়ী এবং খরিদ্দারদের জানানো যাচ্ছে যে **প্লেটো** ট্রেড মার্কটির রেজিস্টার্ড অধিকারী আমাদের ক্লায়েন্ট **মেসার্স মাত্রে পেন এ্যাণ্ড প্লাষ্টিক ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাইভেট লি.** বোম্বাই ৪। এই অধিকার সত্ত্ব ফাউন্টেন পেন, প্রত্যেকটি পেনের অংশ, নিব এবং কালি সম্বন্ধে প্রযোজ্য। সারা ভারতবর্ষে প্লেটো ট্রেড মার্কটির সত্ত্বাধিকারী একমাত্র মেসার্স মাত্রে পেন এ্যাণ্ড প্লাষ্টিক ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাইভেট লি.—রেজিষ্ট্রেশনের জন্যেও বটে আবার দীর্ঘকাল একাদিক্রমে এই ট্রেডমার্কটি আমাদের ক্লায়েন্টের নামের সঙ্গে জড়িত বলেও বটে।

আমাদের ক্লায়েন্টরা অবগত হয়েছেন কোন কোন অসাধু ব্যবসায়ী **নকল প্লেটো পেন** এবং পেনের অংশ তৈরী করে খরিদ্দারদের **ঠকাচ্ছেন** এবং অনেকে লোক ঠকিয়ে পয়সা করার জন্যে এই সব জিনিষ বিক্রী করছেন।

PLATO
REGD.

সেইজন্যে অবগত হোন যে যাঁরা নকল প্লেটো পেন নিয়ে কারবার করছেন—আইন অনুযায়ী তাঁদের কঠোর শাস্তি হবে এবং যাঁরা এই সব অসাধু ব্যবসায়ীদের ধরিয়ে দিতে সাহায্য করবেন তাঁদের পুরস্কৃত করা হবে।

তারিখ: ১৫-৭-৬০

সারভেণ্টস্ অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটিজ বিল্ডিংস্
সরদার বল্লভভাই প্যাটেল রোড
বোম্বাই ৪

এম. পি. শিকারে
ল এ্যাণ্ড প্রফেসের পক্ষে
ট্রেড মার্ক এ্যাটর্নিজ

shilpi-m.p. 296

পুণ্যশীল। তুমি বেরুবে প্রসাধন করে, তৈলস্নিগ্ধ মস্তকে।

লোকে হাসবে, বলবে, এই যে লোকটা মজনুর মত পাগলপারা খুঁজেছে তার লায়লীকে, ঘূর্ণিবায়ু হয়ে প্রতি উটের মহ্‌মিলে প্রতি সরাইয়ে মজারে-কান্দাহারে খুঁজেছে তার শব্‌নমকে, দুদিন আগে—সে কিনা আজই হেসে খেলে বেড়াচ্ছে।

তাই হক, সেই আমার কাম্য।

শব্‌নম বলেছিল, 'তুমি আমার বিরহে অভ্যস্ত হয়ে যেয়ো না।'

অভ্যস্ত সবাই হয়, আমিও হব, তাতে আর কী সন্দেহ?

ধর্মনিষ্ঠ অথচ বিত্তশালী এক গোস্বামীকে তাঁর স্ত্রী হঠাৎ এসে একদিন কাঁদতে কাঁদতে দুঃসংবাদ দিলেন তাঁদের নায়েব বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁদের সর্বস্ব অপহরণ করেছে। কালই তাঁদের রাস্তায় বসতে হবে। গৃহিণীর মুখের দিকে একটুখানি তাকিয়ে গোস্বামী আবার পুঁথিপাঠে মন দিলেন। তিনি কেঁদে বললেন, 'ওগো, তুমি যে কিছুই ভাবছ না, আমাদের কী হবে।'

গোস্বামী পুঁথি বন্ধ করে, হেসে বললেন, 'মুগ্ধে, আজ থেকে বিশ কিংবা ত্রিশ বৎসর পরে তুমি এই নিয়ে আর কান্নাকাটি করবে না। তোমার যে অভ্যাস হতে ত্রিশ বৎসর লাগবে, আমি সেটা তিন মুহূর্তেই সেরে নিয়েছি।'

আমি ওই গোস্বামীর মত হব।

তিন লহমায় গোস্বামী অভ্যস্ত হয়ে গেলেন—এর রহস্যটা কী?

রহস্য আর-কিছুই নয়। গোস্বামী শুধু একটু স্মরণ করে নিলেন, বিত্ত যেমন হঠাৎ যায়, তেমনি তার চেয়েও হঠাৎ ফিরে আসতে পারে। আরও হয়তো অনেক তত্ত্বকথা ভেবে নিয়েছিলেন, যথা, বিত্তনাশ সর্বনাশ নয়, বিত্তাবিত্ত সবই মায়া—কিন্তু ওসবে আমার প্রয়োজন নেই। প্রথম আগত প্রথম কারণই যথেষ্ট।

তার চেয়েও বড় কথা—শব্‌নম আমার সাধারণ জনের মত বিত্ত নয়। সে কী, সে-কথা এখনও বলতে পারব না। সাধনা করে তা উপলব্ধির ধন।

স্বীকার করছি, জ্ঞানী গোস্বামীর মত তিন লহমায় আমি সে জিনিস পাইনি। সব জেনে-শুনেও আমাকে অনেক ফোঁটা চোখের জল ফেলতে হয়েছে—না-ফেলতে পেরে কষ্ট হয়েছে তারও বেশী। পাগল হতে হতে ফিরে এসেছি, সে শুধু শব্‌নমের কল্যাণে। পরীর প্রেমে মানুষ পাগল হয়। পরী মানে কল্পনার জিনিস। কিংবা বলব, প্রত্যেক রমণীর ভিতরই কিছুটা পরী লুকিয়ে থাকে। সেটাকে ভালবাসলেই সর্বনাশ। পুরুষ তখন পাগল হয়ে যায়। শব্‌নমে পরীর খাদ ছিল না।

আমি পাগল হয়ে গেলে শবনমের বদনামের অন্ত থাকতো না।

আবার বলছি তিন লহমায় আমি সে জিনিস পাইনি। ভালই হয়েছে। গোস্বামী হয়তো তিন লহমায় ত্রিশ বৎসরের পুঞ্জীভূত যন্ত্রণা এক ধাক্কায় সয়ে নেবার মত শক্তি ধরেন। আমার কি সে শক্তি আছে!

আমি সাধারণ বিরহ-বেদনার কথা বলছি না। পায়ের শব্দ শুনে সে বুঝি এসেছে ভাবা, ঘোড়ার গাড়ি বাড়ির সামনে দাঁড়াতে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বার বার নিরাশ হওয়া, কারও হাতে কোনও চিঠি দেখলেই সেটা শবনমের মনে করা, বাড়ি থেকে বেরুতে না পারা—হঠাৎ যদি সে এসে যায় সেই আশায়, আবার না-বেরুতে পেরে তার সন্ধান করতে পারছি নে বলে যন্ত্রণা ভোগ, যে আসে তার মুখেই বিষাদ দেখে হঠাৎ রেগে ওঠা এবং পরে তার জন্য নিজেকে শাস্তি দেওয়া—এসব তো সকলেরই জানা। যে জানে না, সে লোকের সঙ্গে আমার যেন কখনও দেখা না হয়। সে সুখী।

জানেমন বয়েৎ বলতে বলতে এমন একটি কান্দাহারী শব্দ ব্যবহার করলেন, যেটি ইতিপূর্বে আমি মাত্র একবার শবনমেরই মুখে শুনেছি। সঙ্গে সঙ্গে আমার সর্ব চৈতন্য যেন লোপ পেল। কে যেন আমার মাথায় ডাণ্ডশ মারলে—প্রথমটায় লাগেনি, তার পর হঠাৎ অসহ বেদনা, তারপর অতি ধীরে ধীরে সেটা কমল। ডাণ্ডশ যেন চেখে-চেখে আমার যন্ত্রণাবোধটা উপভোগ করলে। এসব তো সকলেরই হয়। এ আর নূতন করে কী-ই বা বলব?

জানেমন এখন কথা বলেন আরও কম। শবনমের কথা আমিই তুলে অনুযোগ করলাম। এখন আমার সামনে তার কথা আর কেউ তোলে না—পাছে আমার লাগে, বোঝে না, তাতে আমি ব্যথা পাই আরও বেশী—তাই আমাকেই তো তুলতে হবে তার কথা।

আমার হাত দুখানি তাঁর কোলে নিয়ে বললেন, 'বাচ্চা, শবনম আমাকে দুঃখ দেবে কেন? আর দুঃখ যদি পেতেই হয়, তবে তার হাতেই যেন পাই। যে বন্দীখানায় সোক্রাৎকে (সোক্রাতেস) জহর খেতে হয়েছিল তার রক্ষী ছিলেন তাঁরই এক শিষ্য এবং বিষপাত্র সোক্রাৎকে এগিয়ে দেওয়া ছিল তাঁরই কাজ। পাত্র অর্পণের পূর্বে তিনি কেঁদে বলেছিলেন, 'প্রভু, আমাকেই করতে হবে এই কাজ?' সোক্রাৎ পরম সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'আহা! সেই তো আনন্দ। না হলে যে ব্যক্তি আমার মৃত্যু কামনা করে, সে যখন জিঘাংসাকরে পৈশাচিক আনন্দে ক্রুর হাসি হেসে হেসে আমার দিকে বিষভাণ্ড এগিয়ে দেয়, সেটা তো সত্যই পীড়াদায়ক। এই বেদনার পেয়ালা ভরা আছে শবনমের আঁখিবারিতে—'

আমার বুকে আবার ডাণ্ডশ। সেখানে যেন বিদ্যুৎ-বিভাসে ধ্বন্যালোক হয়ে ফুটে উঠল শবনম। তার দুঃখের মুহূর্তে আমাকে একদিন বলেছিল 'কত আঁখি-পল্লব নিঙড়ে নিঙড়ে বের-করা আমার এই এক ফোঁটা আঁখিবারি।' হায় রে কিস্মৎ! দুঃখের দিনেই তুমি বদ-কিস্মতের স্মৃতিশক্তি প্রখর করে দাও!

শুনছি, জানেমন বলে যাচ্ছেন, 'সেই ভাল, সেই ভাল।' ধীরে ধীরে আকাশের দিকে দুই বাহু প্রসারিত করে অজানার উদ্দেশে বললেন, 'সেই ভাল, হে কঠোর হে নির্মম! একদিন তুমি আমার চোখের জ্যোতি কেড়ে নিয়েছিলে—আমি অনুযোগ করেছিলুম। তারপর শবনমরূপে সেটা তুমি আমায় ফেরত দিলে শতগুণে জ্যোতির্ময় করে—আমি তোমার চরণে প্রাচীন কলন্দরদের মত বার বার তোমার পদচুম্বন করিনি? আজ যদি তুমি আবার সেই জ্যোতি কেড়ে নিতে চাও তো নাও—আমি অনুযোগ করব না, ধন্যবাদও দেব না। কিন্তু এই হতভাগা পরদেশী কী করেছিল, আমায় বল, তাকে তুমি—'

দেখি তাঁর চোখ দুটি দিয়ে অল্প অল্প রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

একবার দেখেছি, একবারের কথা শুনেছি—এই তৃতীয়বার। এর পর আজ পর্যন্ত আর কখনও দেখিনি।

আমি আকুল হয়ে তাঁকে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলুম। তাঁর চোখ মুছে দিতে দিতে মনে মনে শবনমকে উদ্দেশ করে বললুম, 'তুমি, বিরহ-ব্যথায় যে আঁখিবারি ঝরে, সেটা শুকিয়ে যায়—প্রিয়-মিলনের সময় সেটা দেখানো যায় না। দেখাতে হলে সেটা বুকে করে করে বইতে হয়। তুমি যেদিন ফিরে আসবে সেদিন এই রক্তচিহ্ন দেখিয়ে তোমাকে বলব, 'জানেমন, তোমার জন্য তাঁর বুকের ভিতর কী রকম রক্তরেখায় পদ্ম-আসন প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, দেখ।'

আমি জানেমনকে চুম্বন দিতে দিতে বললুম, 'আপনি শান্ত হোন। আপনি জানেন না, আমার হৃদয় এখন শান্ত।'

আমি জানতুম, জানেমন শবনম উভয়েই—অন্তত ক্ষণেকে তার শোক ভুলে যান—ঋষি-কবিদের বাণী শুনতে পেলে। বললুম, 'আপনি সোক্রাতের যে-কথা উল্লেখ করলেন সেই বলেছেন, আমাদের কবি আব্দুর রহীম খান-ই-খানান—

"রহীমন্! তুমি বলো না লইতে
অনাদরে দেওয়া সুধা—
আদর করিয়া বিষ দিলে
কেহ মরিয়া মিটাব ক্ষুধা।
রহীমন্! হমে না সুহায় অমি
পিয়াওৎ মান বিন।
জো বিষ দেয় বোলায় মান
সহিত মরিব ভালো॥"

আমাকে আরও কাছে টেনে এনে বললেন, 'সুন্দর! সুন্দর! দাঁড়াও, আমি ফার্সীতে অনুবাদ করি;—মুখে মুখেই বললেন,

"আয় রহীমন্, না গো মরা—"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

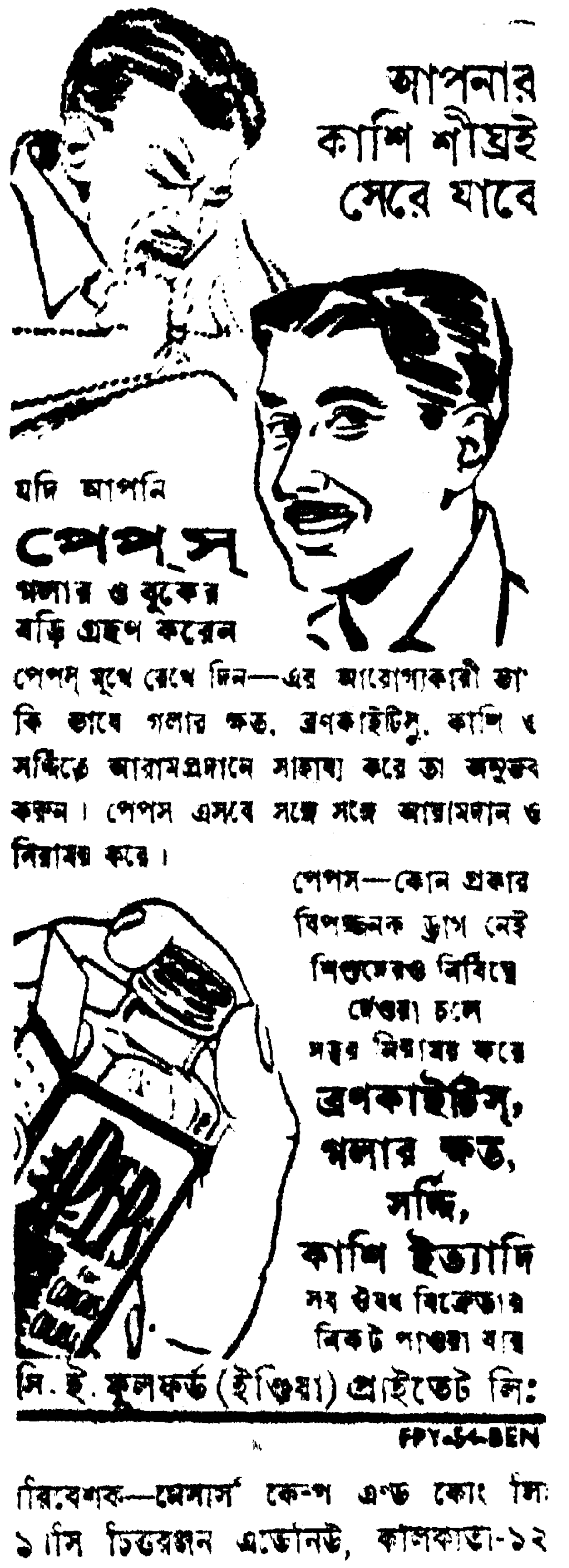

পরিবেশক—মেসার্স কেম্প এণ্ড কোং লিঃ
১।সি চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১২

চাজব্রো-পণ্ডস ইনক (সীমাবদ্ধ দায়িত্বের সঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

বিজ্ঞান বৈচিত্র

চক্রদত্ত

ছোট ছেলেমেয়েরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়। এর একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে পোলিও প্রতিরোধক ইঞ্জেকশন দেওয়া। ছোটদের ইঞ্জেকশন দেওয়া কষ্টকর। সম্প্রতি একজন সোভিয়েট ডাক্তার এক নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি বার করেছেন। ইঞ্জেকশনের বদলে এদের মিষ্টি লজেন্স খেতে দেওয়া হচ্ছে। এক মাসে চারটে মিষ্টি লজেন্স খাওয়ালে বাচ্চাদের পোলিও প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা জন্মাবে। প্রথম তিনটে গুলির প্রত্যেকটাতে আলাদা আলাদা পোলিও রোগের ভাইরাস থাকবে। আর শেষেরটিতে সমস্ত ধরনের পোলিওর ভাইরাস থাকবে। রাশিয়াতে ২ থেকে ১২ বছরের ছেলেমেয়েদের এই পোলিও প্রতিরোধক লজেন্স খাওয়ান হবে।

•

মানুষের রক্তে 'থ্রম্বিন' নামক এক ধরনের এনজাইম থাকে। থ্রম্বিন রক্তকে তাড়াতাড়ি জমে যেতে অথবা দানা বাঁধতে সাহায্য করে। বেশী বয়সে অনেকের 'স্ট্রোক' 'হেমারেজ' অথবা হার্ট অ্যাটাক ইত্যাদি অনেক ধরনের হৃদযন্ত্রের অসুখ হয় অথবা মারা পড়ে। থ্রম্বিনের দরুন রক্ত জমে যায়—যার ফলে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয় বলেই এই সব অসুখ হয়। সম্প্রতি আমেরিকার কয়েকজন বৈজ্ঞানিক এই থ্রম্বিনকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে এমন ভাবে অদলবদল করেছেন যে রক্ত জমাট না বাঁধিয়ে এটা জমাট রক্তকে তরল করতে সাহায্য করছে।

•

আজকাল বেশীর ভাগ ছেলেমেয়ের টনসিলের দরুন অনেক ধরনের উপসর্গ দেখা দেয়—যেমন হয় চোখ খারাপ না হয় কান খারাপ, না হয় বাত ইত্যাদি অনেক কিছু। অনেক ক্ষেত্রেই ডাক্তারদের কাছে ছেলেমেয়েদের অসুখ দেখাতে নিয়ে গেলেই গলা পরীক্ষা করে ডাক্তাররা টনসিল কেটে বাদ দিতে বলেন। সম্প্রতি লণ্ডনের একজন এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে, ছোটবেলা থেকে বাপ, মা একটু চেষ্টা করলেই টনসিল সংক্রান্ত অসুখ বন্ধ করতে পারেন। দেখা গেছে, যে সব বাচ্চাদের ছোটবেলায় একটু বড় টনসিল থাকে তারা নাক দিয়ে নিশ্বাসপ্রশ্বাস না নিয়ে মুখ দিয়ে নেয়। বিশেষজ্ঞ বলেন যে, যেই মা, বাবা ছেলেমেয়েদের মুখ দিয়ে নিশ্বাস নিতে দেখবেন তখনি তাদের মুখ বন্ধ করে দিয়ে নাক দিয়ে নিশ্বাস নিতে সাহায্য করবেন। বার বার করতে করতে এটা এক অভ্যাস হয়ে দাঁড়াবে। ছোট ছোট স্কুলের ছেলেমেয়েদের ঠোঁটের মধ্যে কোন পাতলা কাগজ অথবা গাছের পাতা চেপে ধরে দৌড়ন অভ্যাস করা ভাল। এতে ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারবে যে, মুখ দিয়ে কোনপ্রকার নিশ্বাস নেওয়া হচ্ছে না। মুখ দিয় নিশ্বাস না নিলে টনসিল বড় হতে পারবে না।

•

সাধারণত শীতকালেই আমরা চড়ুই-ভাতির ব্যবস্থা করি, কাজেই ঠাণ্ডা জল, অথবা ঠাণ্ডা পুডিং কিংবা ঠাণ্ডা ফল ইত্যাদির ব্যবস্থা করার বিশেষ দরকার হয় না। কিন্তু অনেক সময় প্রয়োজনবশতই গরমকালে কোথাও খাবার বয়ে নিয়ে যাওয়ার দরকার হতে পারে এবং তখন মনে হয়, ঐ সব খাবারগুলো ঠাণ্ডা হলেই যেন ভাল হয়। একটা দুটো ফ্লাস্কে করে ঠাণ্ডা পানীয় অথবা আইসক্রীম বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু ফলমূল সবকিছু ঠাণ্ডা করার উপায় খুব সহজ হয় না। ওয়েস্ট জার্মানির কোনও রেফ্রিজারেটর কোম্পানী "এসকি" নামে যে জিনিস আবিষ্কার করেছেন তাতে করে এইরকম সময়ে খুব উপকার পাওয়া যায়। "এসকি" একটি থলে মাত্র; এর মধ্যে যে-সব খাদ্যবস্তু ঠাণ্ডা রাখতে হবে সেগুলি রেখে তারপর ঠাণ্ডা করার জন্য কয়েকটি ঠাণ্ডা করার কার্টিজ ঐ থলের মধ্যে ভরে দিলে ঘণ্টাখানেক পরেই সমস্ত জিনিস-গুলি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে এবং প্রায় ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত ঐ থলিতে জিনিসগুলি ঠাণ্ডা রাখা যাবে।

•

খাঁচার মত দেখতে জিনিসটা এক নতুন ধরনের উনুন। একটা সিলিণ্ডারের ভেতর প্রপেন গ্যাস ভরে রাখা হয়। এই গ্যাস কয়লার বদলে জ্বালান হয়। বাইরে ব্যবহারের জন্য এই নতুন ধরনের উনুন খুব কার্যকারী।

নূতন ধরনের উনুন

বি য়ো গা ন্ত ক

শিবরাম চক্রবর্তী

জীবন তো ভাই অন্ধকারই।
দুঃখে সেলাম !
তারই মাঝে বারম্বারই
এলাম গেলাম।

তারই মাঝে চাঁদ উঠল,
আলোয় এলাম !
কাঁটার বনে ফুল ফুটল
গন্ধ পেলাম।

ফাটা মনে স্নেহ জুটল,
চুমু খেলাম।
মৃত্যু আসে অন্ধতারই,
দুঃখে সেলাম !

য তো দূ রে যা ও

মণীন্দ্র রায়

তোমাকে দিয়েছি ছেড়ে,
হারাবার ভয় তাই
এখন বাঁধে না পাকে পাকে।
এই ক্ষীণ জলধারা
উৎস হ'তে যায় যতো দূরে
ততো যেন পায় আপনাকে।

তোমার বুকের শব্দ, নিশ্বাসের তাপ
বৈশাখের মেঘে মেঘে এ পোড়ামাটিতে
আর বৃষ্টি ঝরাবে না জানি।
তবু কি অমল ভয় স্মায়ুর শাখায়
রক্তের আরতি জেবলে অজানা ভূগোলে
দেখাবে না স্মৃতির সন্ধানী ?

হে বন্ধু, হে প্রিয়তমা,
হাতে আমি আজ
রাখিনি কিছুই এ বিশ্বাসে—
যতো দূরে যাও তুমি, সূর্যাস্তের সে শূন্য আঁধারে
তোমার একক মূর্তি চূর্ণ চূর্ণ জ্যোতির কণায়
ছেয়ে থাকে আমারই আকাশে॥

কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

(৩৩)

সত্যিই এবার থেকে এক নতুন পথে চলতে হবে তাকে। যখন সবাই একে একে ছেড়ে গেল দীপঙ্করকে তখন তার নিশ্চয়ই একটা নতুন পথ আবিষ্কার করতে হবে। লক্ষ্মীদিরও তাকে আর প্রয়োজন নেই। সতীর প্রয়োজনও ফুরিয়ে গিয়েছে। কিরণ তাকে ত্যাগ করেছে! সকলের সব চাওয়ার সব পাওয়ার ভেতরকার চাওয়া-পাওয়ার পরিচয় সে পেয়েছে। সবাই বলছে—এই বিচ্ছেদ থেকে আমাকে উত্তীর্ণ করো। অথচ তাদেরই মতন দীপঙ্করও তো একদিন মিশতে চেয়েছিল সকলের সঙ্গে। সেই ছোটবেলাকার লক্ষ্মণ সরকার থেকে শুরু করে সকলের সঙ্গেই সে মিশতে চেয়েছে। কিন্তু এমন মেলা-মেশা তো সে চায়নি। যেখানে যার সঙ্গেই সে মিশতে চেয়েছে, সেখান থেকেই এসেছে বিচ্ছেদ। এমন মিল কি তার হয় না, যা পেতে গেলে বিচ্ছেদের মূল্য লাগে না!

মোটরটা চলে গেল!

দীপঙ্কর খানিকক্ষণ চেয়ে রইল সেই দিকে। মহিলাটির লিপস্টিক মাখা ঠোঁট। কাঁধ কাটা ব্লাউজ। একা-একা ড্রাইভারের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়েছে। ছোটবেলায় কিন্তু এরকম দেখা যেত না। আগে ঘোড়ার গাড়ির জানালা-দরজা বন্ধ করে বেরোত মেয়েরা। পুজোর সময় কালিঘাটে যারা বাজি-পোড়ানো দেখতে যেত তারা পাশের হালদারদের বাড়ির দিকের আড়াল থেকে দেখতো! এ-রকম হলো কবে থেকে। বালিগঞ্জের দিকে অনেকগুলো নতুন পাড়া হয়েছে, হয়ত সেখানকার মেয়ে। আশ্চর্য, একেই কিনা সতী বলে ভুল করেছিল দীপঙ্কর! বাঁ পাশেই প্রিয়নাথ মল্লিক রোড। কালকে এইখানেই এসেছিল দীপঙ্কর। বিরাট ম্যারাপ বাঁধা বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে কালকেই অদ্ভুত সংকল্প গ্রহণ করেছিল মনে মনে। ভালো, ভালো, বিচ্ছেদ হওয়াই ভালো: পাওয়া মানেই তো থেমে যাওয়া। দীপঙ্করকে তো এখানে থামলে চলবে না। দীপঙ্করকে যে আরো অনেক দূরে যেতে হবে, সতীর কাছ থেকে দূরে গেলেই তো তার মুক্তি!

অনেকদিন লক্ষ্মীদির সঙ্গে দেখা হয়নি। সেই বৌবাজারের সরু গলিটার মধ্যে লক্ষ্মীদির দিনগুলো কেমন করে কাটছে কে জানে! সেই দাতারবাবু, দাতারবাবুরই বা কী অবস্থা! হয়ত এতদিন বাড়িভাড়া দিতে পারেন নি বলে তাড়িয়েই দিয়েছে বাড়িওয়ালা। হয়ত দাতারবাবু ধরা পড়েছে! হয়ত লক্ষ্মীদি আবার নিরাশ্রয়। আবার কোথাও ভেসে গেছে—ভেসে তলিয়ে গেছে। সমস্ত কলকাতা শহরে এতটুকু আঁকড়ে ধরবার মত আশ্রয়ই তার আর নেই। লক্ষ্মীদি বা মেয়ে, সে কি আর ভুবনেশ্বরবাবুর কাছে এসেছে? আর ভুবনেশ্বরবাবু! ভুবনেশ্বর মিত্র! তাঁরই বা কী খবর! সতীর বিয়ের পর তিনি হয়ত সতীকে নিয়ে ফিরে যাবেন বর্মায়। এখন এই মুহূর্তে হয়ত ভুবনেশ্বরবাবু কলকাতাতেই আছেন। আর কাকাবাবু? কাকীমা?

সমস্ত বাড়িটা, বড় ফাঁকা লেগেছিল দীপঙ্করের। মা'র অসুখ, মা'কে পাখার বাতাস করতে করতে কতবার চেয়ে দেখেছিল বাড়িটার দিকে। যেন নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে বাড়িটা! এখন এতদিনের পুরোন বাড়িটার দিকে যেন চেয়ে দেখতেও ইচ্ছে করে না আর।

ঈশ্বরদাশিয়াম রো'র এ-এস্-আই, শান্তিবাবুকে দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করেছিল—আচ্ছা, শচীশবাবুকে চেনেন?

—কে শচীশবাবু?

—আমাদের বাড়িতেই ভাড়া থাকতেন, সি-আই-ডি, আমরা কাকাবাবু বলে ডাকতুম—

শান্তিবাবু বললেন—তিনি তো ছুটিতে—তিনি এস্-বি ব্রাঞ্চের লোক—আর আমরা আই-বি ব্রাঞ্চ—

—তা তিনি ছুটিতে কেন? তিনি আমাকে খুব ভালো করে জানেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই আমার সম্বন্ধে সব খবর পাবেন—

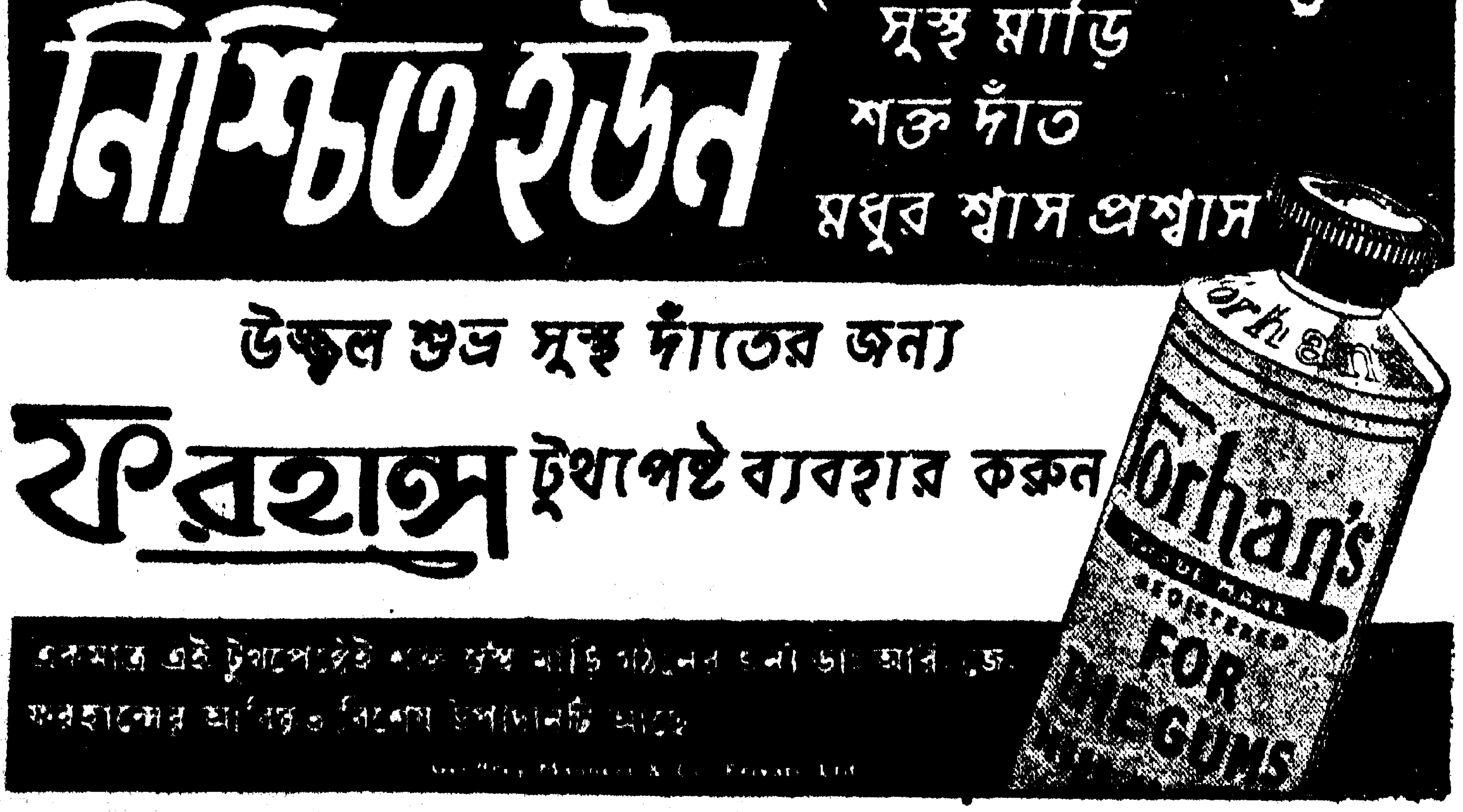

শান্তিবাবু বললেন—তিনি বোধহয় আর কলকাতায় থাকবেন না,—

—কেন থাকবেন না? তিনি তো বার্মা থেকে বদলি হয়ে এখানে এসেছিলেন।

—তা এসেছিলেন, এখন আবার শুনছি ট্রান্সফারের জন্যে দরখাস্ত করেছেন—।

তা হবে! স্বামী স্ত্রী—ছেলেমেয়ে কিছু নেই। আর লক্ষ্মীদি ছিল, লক্ষ্মীদি চলে গেল। আর ছিল সতী, তারও বিয়ে হয়ে গেল তাই। আর হয়ত কলকাতায় থাকবার ইচ্ছে নেই।

একটা ট্রাম আসছিল। দীপঙ্করের হঠাৎ মনে হলো বৌবাজারে গিয়ে একবার দেখে আসে লক্ষ্মীদিকে! হঠাৎ মনটা বড় ছটফট করে উঠলো লক্ষ্মীদির জন্যে। সতীর তবু নতুন বিয়ে হয়েছে, তার শ্বশুর শাশুড়ি আছে, স্বামী আছে, বিরাট বাড়ি-গাড়ি-টাকা সব আছে। তার কীসের ভাবনা! দুদিন বাদে সমস্ত কিছু ভুলে যাবে। ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক! ওই মেয়েটার মত ঘাড়ের চুল ছোট করে ছাঁটবে, ঠোঁটে লিপস্টিক মাখবে, একলা-একলা ড্রাইভারের সঙ্গেই হয়ত নিউ রোডের ঠিকানায় গাড়ি চালিয়ে যাবে। রাস্তার ছেলেদের দাঁড় করিয়ে ঠিকানার নির্দেশ জানতে চাইবে। হয়ত দীপঙ্করদের গায়ে গাড়ির কাদা ছিটিয়ে যাবে! হয়ত কেন, সত্যিই তাই। সকাল বেলা ঘুম থেকে ওঠার আগেই হয়ত বিছানার মাথার কাছে চা এসে যাবে। বয় বাবুর্চি খানসামারা হয়ত তটস্থ হয়ে থাকবে মিসেস ঘোষের হুকুমের ভয়ে। সতী এখন আর সতী মিত্র নয়, সতী ঘোষ! গ্রীষ্মকালে দার্জিলিং যাবে, সী-সাইডে যাবে। আর শীতের দিনে? শীতের দিনে যদি ইচ্ছে হয় তো থাকতে পারে কলকাতায়। আর কলকাতায় যদি থাকতে ইচ্ছে না-করে তো যাবে নিশ্চয়ই কোথাও। কত জায়গা আছে যাবার। ভালো না-লাগলে এক-একদিন দুজনে চলে যাবে হোটেলে। চৌরঙ্গীর হোটেলের টেরাসের ওপর বসে বসে চা খাবে। কফি খাবে। বিকেলের ছুটির আলস্য তখন সামনের ময়দানের ওপর পাখা বিস্তার করেছে। সেই টেরাসের ওপর বসে বসে দুজনে দেখবে বাইরের চলন্ত পৃথিবীকে। ট্রাম আর বাস, গতি আর বিশ্রাম, কল্পনা আর সম্ভাবনার পৃথিবী। তারপর যখন ফোর্ট উইলিয়ামের মাথার লম্বা পোস্টটার ওপর লাল আলোটা জ্বলে উঠবে, তখন নামবে দুজনে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে হোটেলের লাউঞ্জ পেরিয়ে আবার গাড়িতে গিয়ে উঠবে। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে ঘুরবে গাড়ির চাকা। তারপর প্রিন্সেপস্ ঘাট, আউটরাম ঘাট, কিম্বা যশোর রোডের নিরিবিলি, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের হাতছানি।

আর ওদিকে তখন রেলের অফিসে জাপান-ট্রাফিকের ফাইল পাতলা থেকে মোটা হচ্ছে ক্রমাগত। চেয়ারের ছারপোকাগুলোর পেট ভরে গিয়ে টইটুম্বুর। দীপঙ্কর সেন তিনটে স্পেশালের হিসেব মেলাতে গিয়ে গলদঘর্ম। জার্নাল সেকশ্যানে গাঙ্গুলীবাবু একগ্লাস চা চার ভাগ করে কে জি দাশবাবুকে তুষ্ট রাখছেন। রামলিঙ্গমবাবুর টেবিলে ফাইলের পাহাড়। স্টোরস্ সেকশ্যানে নতুন ইণ্ডেণ্ট নিয়ে তুমুল ঝগড়া চলেছে। হৃদয় চাপরাশি অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচিতে পাঁটার চপ্ বিক্রি করতে চলেছে। ধুলো, গোলমাল, ঝগড়া ছারপোকা, কাজ—সব মিলিয়ে তখন ছত্রখান করে দেবে সেই দুজনের বিকেল বেলার আলস্য।

সেখান থেকে সেই জাপান-ট্রাফিকের ফাইলের কাজ করতে করতেই দীপঙ্কর কানে শুনতে পাবে দুজনের আলগা কথার টুকরো—

—আজকে কোন্ দিকে যাবে সতী?

ভারত সরকারের

প্রাইজ বণ্ড কিনুন

নিকটবর্তী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের
অফিসে, ষ্টেট ব্যাঙ্ক, ট্রেজারী বা পোষ্ট
অফিসে বিস্তারিত বিবরণ পাবেন।

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

DA 60/287

—চলো না যশোর রোড ধরে যাই, যতদূরে চোখ যায়!

—যদি বৃষ্টি নামে?

—তা কি নামবে? তাহলে তো আরো কাছাকাছি হবো, আরো হারিয়ে যাবো আমরা!

—তোমার বুঝি হারিয়ে যেতে ভালো লাগে?

—খুব!

—কিন্তু তুমি হারিয়ে গেলে আমার যে কষ্ট হবে? আমি তখন কী করবো?

—তুমি আমায় খুঁজে বের করবে! তুমি খুঁজে পাবে বলেই তো আমি হারাবো! নইলে হারিয়ে গিয়ে লাভ কী?

তারপর হাসবে দু'জনে। সেই সন্ধ্যে বেলা, যখন দীপংকর জাপান-ট্র্যাফিকের শেষ ফিগারটা মিলিয়ে ড্রয়ার বন্ধ করে ক্লান্ত পায়ে অফিসের গেটের সামনে একেবারে রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবে, গুর্খা সেপাইটা ভারি বুট পরে লোহার গেটটা শেষবারের মত বন্ধ করে দেবে, তখন যশোর রোডের গাড়িটা সত্যিই হারিয়ে গেছে চাঁদনী রাতের তলায়। একটা ঝাঁকড়া-মাথা বিরাট আম গাছের তলায় গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে, আর কিছু দেখা যায় না। শুধু দু'জনের ভাঙা-ভাঙা হাসির শব্দ হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে অস্পষ্ট হয়ে।

ট্রামটা সামনে এসে দাঁড়াল, আবার চলেও গেল।

না থাক, আজকে লক্ষ্মীদির কাছে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। বরং কালই যাবে দীপংকর। অবশ্য মা'র শরীরটা যদি ভাল থাকে।

মা'র কথা মনে পড়তেই দীপংকর পা চালিয়ে চলতে লাগলো। কালিঘাটের বাজারের রাস্তাটা দিয়ে আর নয়। হয়ত ছিটে কি ফোঁটার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। হয়ত কালকের মত আবার টানাটানি করবে! আশ্চর্য, চন্নুনীকে এতদিন ধরে দেখে দেখেও তো এমন করে চিনতে পারেনি আগে! অনেকদিন গালাগালি দিয়েছে চন্নুনী, অকারণে গালাগালি দিয়েছে। আকাশের সঙ্গে ঝগড়া করেছে, বাতাসের সঙ্গে ঝগড়া করেছে, সংসারের স্থাবর-জঙ্গম, জড়-জীব সকলের সঙ্গে ঝগড়া করেছে সে। কিন্তু এতদিন পরে প্রথম তার ঝগড়ার কারণটা ধরতে পারলে দীপংকর। দুটি মেয়ে—লোটন লক্ষ্মী। হয়ত দেখে ফেলেছিল অঘোর-দাদু! তাই তারপরেই দূর করে দিয়েছে ছিটে-ফোঁটাকে। একেবারে সংসারের বার করে দিয়েছে!

সেই চন্নুনীর সঙ্গেই সদর দরজার সামনে দেখা হয়ে গেল।

চন্নুনী তখন বোধহয় সদর দরজা বন্ধ করতেই এসেছিল।

দীপংকর জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ গা চন্নুনী, মা এখন কেমন আছে?

চন্নুনীকে আর উত্তর দিতে হলো না। দীপংকর দেখলে সোজা সামনের দাওয়ার ওপরে মা দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে। কোনওদিকে যেন মা'র দৃষ্টি নেই। যেন নিজস্ব দুর্ভাবনায় মা থই পাচ্ছে না।

দীপংকর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—এখন কেমন আছো মা?

মা বেশি কথা বললে না। শুধু বললে—ভালো—

দীপংকর মা'র পাশে গিয়ে বসে পড়লো। বললে—এখানে তুমি বসে আছ কেন? যদি আবার শরীর খারাপ হয়? ঘরে গিয়ে শুলে ভালো হতো না? ওষুধ খেয়েছিলে তো?

মা যেন দীপংকরের কথাগুলো শুনতে পেলে না। স্থির শান্ত দৃষ্টিতে সামনের ভাঙা পাঁচিলটার দিকে চেয়ে রইল একভাবে।

দীপংকর বললে—খুব ভয় পেয়েছিলাম, জানো মা, অফিস যাবার আগে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমি ক'দিন যাইনি, এদিকে হুলুস্থুলু কাণ্ড বেধে গিয়েছে তাই নিয়ে। কেউ ফাইল খুঁজে পায় না—শেষকালে রবিনসন্ সাহেব অর্ডার দিয়ে দিলে এবার থেকে তার পাশের কামরায় বসতে হবে—

চন্নুনী একটা বাটিতে মুড়ি এনে দিলে সামনে।

মা আস্তে আস্তে বললে—কী খেয়েছিলি আজ?

দীপংকর বললে—এখুনি আসছি মা, জামা-কাপড়টা ছেড়ে, হাত-মুখ ধুয়ে আসি—

খানিক পরে ফিরে এসে মুড়ি খেতে খেতে দীপংকর বললে—আমার লেকচার শুনে রবিনসন সাহেব তো খুব খুশী! জানো মা। নৃপেনবাবুও খুব খুশী! ও'রা সবাই মুখস্ত করে এসেছিল মুখস্ত করে গেলে অবশ্য ভালোই হতো কিন্তু আমি তো আগে জানতাম না যে আজই নৃপেনবাবুর ফেয়ারওয়েল হবে—

তখনও মা'র মুখটা গম্ভীর-গম্ভীর।

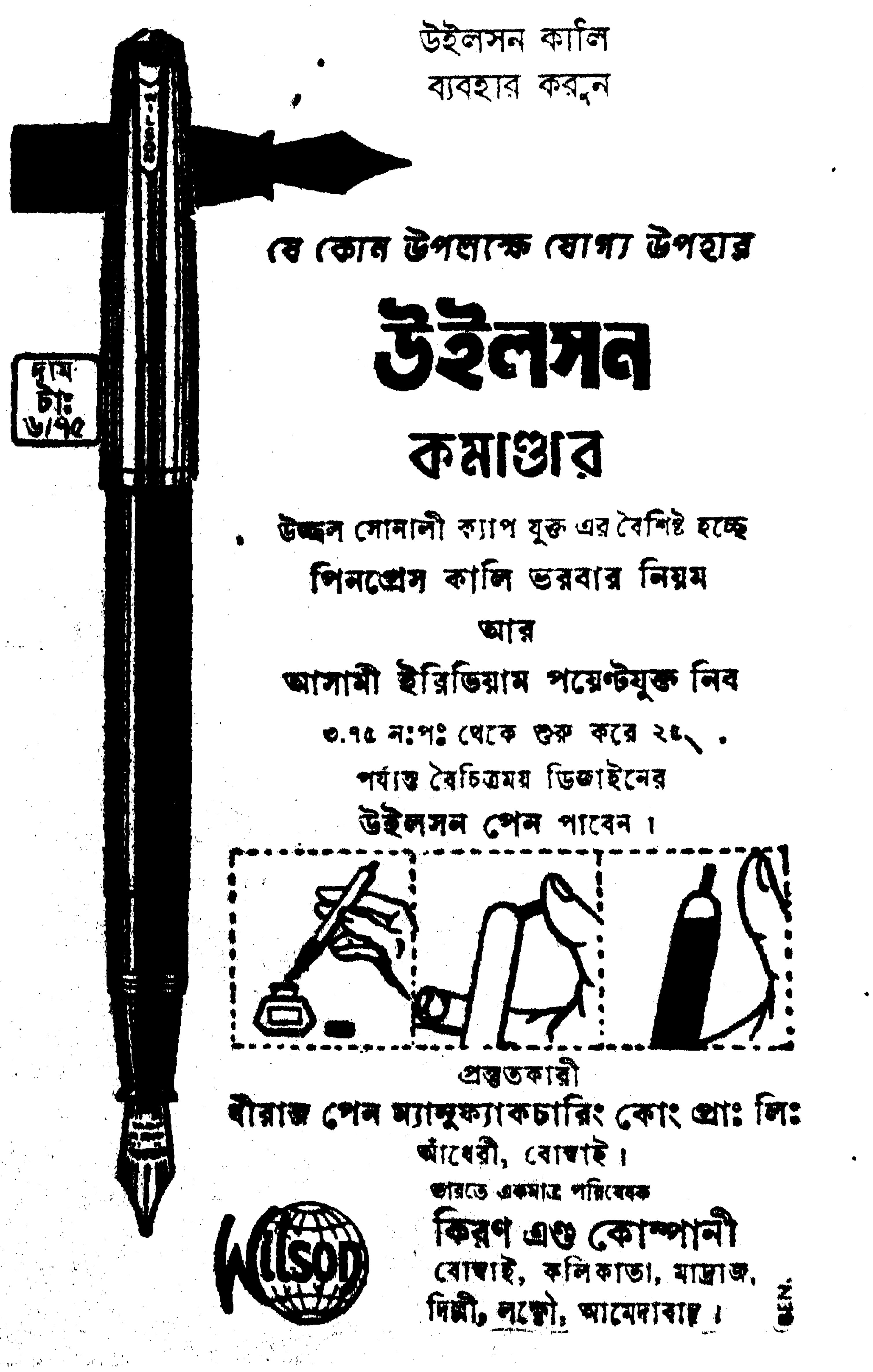

দীপংকর জিজ্ঞেস করলে আবার—পাল্লা ডাক্তারকে আর একবার ডাকবো মা! খবর দিয়ে আসবো যে এখন তুমি ভালো আছো?

মা তেমনি গম্ভীর ভাবেই বললে—না!

—কিন্তু যদি তোমার অসুখটা আবার বাড়ে! তখন কী হবে বলো তো? কাল সারাদিন খাওয়া নেই, ঘুম নেই, আর এখন কি উঠে হেঁটে বেড়ানো ভালো! চন্নুনী তো রান্না-বান্না করছেই, তুমি আবার মিছিমিছি উঠলে কেন বিছানা থেকে, বলো তো?

এতক্ষণে যেন মা মুখ ফেরালে দীপংকরের দিকে।

বললে—দীপু!

দীপংকর মা'র গলার গাম্ভীর্য দেখে ভয় পেয়ে গেল।

বললে—কী মা?

মা কিছু উত্তর দিলে না।

দীপংকর বললে—কী মা, কী হলো? ঘরে যাবে? তোমাকে ধরবো?

মা বললে—না, ঘরে যাবো না, তুই আমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর......

দীপংকর মা'র মুখের দিকে চেয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠলো। মা'র এমন মূর্তি তো দেখেনি সে কখনও।

—তুই আমার পা ছ‍ুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর, আর স্বদেশী করবি না—

দীপঙ্কর স্তম্ভিত হয়ে গেল মার কথাগুলো শুনে। হঠাৎ যেন তার বিশ্বাস হলো না। মনে হলো ভুল শুনেছে সে!

—কর তুই প্রতিজ্ঞা! আমার পা ছ‍ুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর্—!

—কিন্তু মা...

—আমি কোনও কথা শুনতে চাই না, তুই আমার পা ছ‍ুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর যে, আর জীবনে কখনও স্বদেশী করবি না।

দীপঙ্কর মা'র দিকে সোজা হয়ে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ!

তারপর বললে—কিন্তু, কখন আমি স্বদেশী করলুম? কখন তুমি স্বদেশী করতে দেখলে আমায়?

মা বললে—কিন্তু স্বদেশী না-করলে পুলিসে তোকে ধরলে কেন?

দীপঙ্কর এর কী উত্তর দেবে বুঝতে পারলে না।

মা আবার বললে—বল্, কেন তোকে পুলিস ধরে নিয়ে গিয়েছিল, বল্? তুই যদি স্বদেশী ব্যাপারে না-থাকবি তোকে কেন ধরবে তারা? তাহলে বল্, তুই কী করেছিলি?

—বিশ্বাস করো মা, আমি কিছুই করিনি! আমি ছোটবেলায় কিরণের সঙ্গে শুধু লাইব্রেরী করেছিলুম, কিন্তু যেদিন থেকে কাকাবাবু বারণ করে দিয়েছিলেন সেইদিন থেকেই লাইব্রেরীতে আর যাইনি আমি—

—তাহলে কি ওরা তোকে মিছিমিছি ধরে নিয়ে গেল বলতে চাস্?

মা'র যেন কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। মা হাঁফাচ্ছিল কথাগুলো বলতে বলতে।

দীপঙ্কর বললে—তা তুমি এখন একটু চুপ করে থাকো না মা, তোমার শরীর খারাপ, এই সময়ে, তুমি কেন ও-সব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো?

মা যেন আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

—মাথা ঘামাবো না? তোমার জন্যে ভেবে ভেবে আমার রাত্তিরে ঘুম আসে না, দিনে খেতে পারি না! আমি তোমার মা হয়ে কী অপরাধ করেছি বলো তো? কী এমন শত্রুতা ছিল তোমার সঙ্গে আমার যে তুমি আমাকে এমনি করে দগ্ধে মারবে? বলতে পারো, আমি তোমার কী সর্বনাশটা করেছি?

অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা বলতে লাগলো মা। ঝর ঝর করে দু'চোখ দিয়ে কান্না ঝরতে লাগলো! দীপঙ্কর চুপ করে কান পেতে শুনলে সব। যেন তার আর কিছু বলবার নেই, তার আর কিছু করবারও নেই—

অনেকক্ষণ পরে দীপঙ্কর বললে—মা, সব শুনলুম এবার ঘরে চলো,—

—না আমি ঘরে যাবো না, আমি মরলে কার কী এসে যায়! আমি মরে গেলেই তো তোমার নিশ্চিন্তি!

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু নিজের অসুখ হলে তুমি নিজেও তো কষ্ট পাবে!

—তুই বেরিয়ে যা আমার সামনে থেকে, বেরিয়ে যা! আমার কষ্টের কথা তোকে ভাবতে হবে না—

দীপঙ্কর হাসলো। বললে—সে তুমি যাই বলো না, তোমার কষ্ট হলে আমি ভাববোই, তুমি বারণ করলেও ভাববো!

মা আঁচল দিয়ে নিজের চোখটা মুছে নিলে। দীপঙ্কর বললে—তুমি আমার ওপর মিথ্যে রাগ করছো মা, সত্যি বলছি আমি স্বদেশী করিনি—

—স্বদেশী করিস আর না-করিস, তুই আমার পা ছ‍ুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর, জীবনে কখনও স্বদেশী করবি নে! এই পা-ছ‍ুঁয়ে বল্ আমার—ছোঁ পা—

দীপঙ্কর মা'র দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। হঠাৎ মনে হলো মা যেন তাকে দিয়ে এক ভীষণ দাসখত সই করিয়ে নিতে চায়! চিরজন্মের মত যেন আত্মসম্মানের মূল্যে তার নিজের জীবনটাকে ফিরে পেতে হবে!

—তুই যতক্ষণ না পা ছ‍ুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছিস, ততক্ষণ আমি উঠবো না, খাবোও না ঘুমোবও না! আমি মাথা খুঁড়ে মরবে এখানে!

মা'র মুখের দিকে চেয়ে সত্যিই ভয় পেয়ে গেল দীপঙ্কর! মা'র জেদ বড় ভীষণ দীপঙ্কর মা'কে চেনে।

চন্নুনী এতক্ষণ শুনছিল সব কথা। বললে —তুমি পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চাও না বাছা! মায়ের পায়ে হাত দিতেও লজ্জা—বলিহারী লজ্জার বালাই বাছা তোমার, ছিঃ—

চন্নুনীর কথায় কেউই কান দিলে না। মা যেন অচল-অটল হয়ে রইল নিজের জিদের কাছে! দীপঙ্করও সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দ্বিধায়-দ্বন্দ্বে অটল হয়ে রইল।

কিন্তু হঠাৎ মা এক তুমুল কাণ্ড করে বসলো। বলা নেই কওয়া নেই মা হঠাৎ সরে গিয়ে সামনের ইঁটের থামে মাথাটা ঠাঁই ঠাঁই করে ঠুকতে লাগলো—

দীপঙ্কর তাড়াতাড়ি ধরে ফেলেছে।

—মা, মা, এ কী করলে তুমি? এ কী করলে মা?

চন্নুনীও দৌড়ে এসেছে। কিন্তুদিও শব্দ শুনে দৌড়ে এসেছে কাছে।

মা'র কপালটা এতক্ষণে ফুলে উঠেছে।

১৯৬০-৬১ সালে আপনার ভাগ্যে কি আছে?

আপনি যদি ১৯৬০-৬১ সালে আপনার ভাগ্যে কি ঘটিবে তাহা পূর্বাহ্নে জানিতে চান, তবে একটি পোস্টকার্ডে আপনার নাম ও ঠিকানা এবং কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া পাঠাইয়া দিন। আমরা জ্যোতির্বিদ্যার প্রভাবে আপনার বার মাসের ভবিষ্যৎ লাভ-লোকসান, কি উপায়ে রোজগার হইবে, কবে চাকুরী পাইবেন, উন্নতি, স্ত্রী পুত্রের সুখ-স্বাস্থ্য, রোগ, বিদেশে ভ্রমণ, মোকদ্দমা এবং পরীক্ষায় সাফল্য, জায়গা জমি, ধন-দৌলত, লটারী ও অজ্ঞাত কারণে ধনপ্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয়ের বর্ষফল তৈয়ারী করিয়া ১৮ টাকার জন্য ভি-পি যোগে পাঠাইয়া দিব। ডাক খরচ স্বতন্ত্র। দুষ্ট গ্রহের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উপায় বলিয়া দিব। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা জ্যোতিষবিদ্যায় বিশেষ অভিজ্ঞ। মিথ্যা প্রমাণিত হইলে আমরা মূল্য ফেরৎ দিবার গ্যারান্টি দিই। পণ্ডিত দেবদত্ত শাস্ত্রী, রাজ জ্যোতিষী। (DC-3) জলন্ধর সিটি।

Pt. Dev Dutt Shastri, Raj Jyotishi, (DC-3)
Jullundur City.

দীপঙ্কর বললে—বিন্তীদি এক ঘটি জল দাও না—

মা'র মাথায় জলটা থাবড়াতে থাবড়াতে দীপঙ্করের কান্না পেতে লাগলো। একে এ ক'দিন শরীর খারাপ ছিল। এ ক'দিন দীপঙ্করের জন্যে ভেবে ভেবে ঘুম হয়নি, তার ওপর এই অত্যাচার!

মা তখনও বলছে—তুই ছাড় আমাকে দীপু, ছাড় তুই—তোর সামনেই আমি মাথা খুঁড়ে মরবো—

দীপঙ্কর বললে—এই তোমার পা ছুঁচ্ছি মা, এই পা ছুঁচ্ছি—

—তা হলে কর্ প্রতিজ্ঞা, জীবনে কখনও স্বদেশী করবি না, কর্ প্রতিজ্ঞা।

—এই প্রতিজ্ঞা করছি মা, আমি জীবনে কখনও স্বদেশী করবো না. এই তোমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলুম, এবার ওঠো, এবার ঘরে চলো তুমি—

মা তখন একটু শান্ত হয়েছে। নিজের মনেই বলতে শুরু করেছে—ওই কিরণ ছোঁড়াই আমার দীপুকে এমন খারাপ করেছে, ওই কিরণটাই যত নষ্টের গোড়া—

চন্নুনী বললে—হ্যাঁ দিদি, ঠিক বলেছ, তোমার দীপুকে ওই কিরণ ছোঁড়াই গোল্লায় দিয়েছে—আমি দেখেছি যে ছোটবেলা থেকে, দেখি সারা দুপুর, সারা বিকেল দুজনে ফিস্-ফিস্ গুজ্-গুজ্ করছে, বলি দুই বেটাছেলে মিলে এত কীসের গুজ্-গুজ্ বাছা—বেটাছেলের সঙ্গে এত পীরিত কেন গা?

—থাম তুমি চন্নুনী!

দীপঙ্কর হঠাৎ ধম্‌কে উঠলো। বললে—যত কিছু বলি না বলে তোমার বড্ড বাড় হয়েছে, না?

হঠাৎ দীপঙ্করের মুখ থেকে কথাগুলো শুনে চন্নুনীও কেমন থম্‌কে গেল। সেও যেন দীপঙ্করের কাছ থেকে এমন কথা আশা করে নি! কিন্তু দীপঙ্করের মা হঠাৎ বাধা দিলে। বললে—কেন? চন্নুনী অন্যায়টা কি বলেছে শুনি? আমিও তো দেখেছি তোকে কিরণের সঙ্গে মিশতে! মিশিস না তুই?

তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলো। বললে—চল্, চল্ তুই আমার সঙ্গে—আমি কিরণের মা'কে গিয়ে বলছি—তোমার ছেলের জন্যেই তো আমার এই সর্বনাশ, তোমার ছেলেই তো দীপুকে এমন খারাপ করে দিয়েছে—চল্ তুই, চল্ আমার সঙ্গে—এখুনি চল্—

বলে সত্যি সত্যিই মা পা বাড়াল কিরণদের বাড়ি যাবার জন্যে!

—কিন্তু মা, কী পাগলামি করছো তুমি!

—পাগলামি নয়, আমি যাবোই, আমি এখুনি গিয়ে বলে আসবো কিরণের মাকে, যত সব ছোটলোক জুটেছে পাড়ায়, তাদের সঙ্গে মিশেই এই ফল হয়েছে আমার, তাদের জন্যে আমার কপাল ভেঙেছে—

সত্যি সত্যিই মা সেই অবস্থাতেই উঠোনে নামলো। মা তখনও টলছে। দীপঙ্কর গিয়ে মা'কে ধরলে। বললে—মা কেন মিছিমিছি কিরণের মা'কে কষ্ট দেবে, কিরণ নেই বাড়িতে, সে বাড়িতে থাকে না—

—না থাক্, আমি তার মা'কে বলে আসবো!

—কিন্তু তা'র মা'র যে বড় কষ্ট, তার বাবার অসুখ, সংসার চলছে না, তুমি গিয়ে মিছিমিছি তাদের কষ্ট আরো বাড়াবে!

—তাদের কষ্ট, আর আমার কষ্টটা বুঝি তুই দেখছিস না? আমার কষ্টটা কষ্ট নয়?

বিন্তীদিও এসে মা'কে অনেক বোঝালে। বললে—দিদি, তুমি যেও না এই শরীর নিয়ে পড়ে যাবে মুখ থুবড়ে—

কিন্তু মা'র যখন যা জিদ চাপবে, তখন কারো ক্ষমতা নেই তা ভাঙায়। দীপঙ্কর মাকে ধরে ধরে চলতে লাগলো। তখন বে-ভালো করে সন্ধ্যে হয়েছে। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন দিয়ে নেপাল ভট্টাচার্যি লেনের রাস্তাটা খারাপ। মা যেন ধুঁকছে। এতদিনের উদ্বেগ, অনাহার—সব যেন মা'কে সহ্যের শেষ সীমায় এনে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। কোন কথা নেই মা'র মুখে। সরু রাস্তাটা দিয়ে যেন এক অটুট প্রতিজ্ঞা নিয়ে মা চলেছে। দীপঙ্করকে ভাল করতেই হবে। দীপঙ্করকে সমস্ত পঙ্কিলতা থেকে মুক্তি দিতেই হবে। দীপঙ্কর বড় হবে, মানুষ হবে! দীপঙ্কর অন্যায় অনিয়ম থেকে মুক্তি পাবে। সৎ মানুষ হবে, সংসারী হবে—তবেই যেন মা'র আশা পূর্ণ হবে! আশে-পাশের বাড়ি থেকে উনুনের কয়লার ধোঁয়া উঠে বাতাসে ভাসছে। মা আস্তে আস্তে সন্তর্পণে নর্দমাগুলো পেরিয়ে গেল। তারপর একেবারে কাঁচা রাস্তা। এবড়ো-খেবড়ো-অসমান।

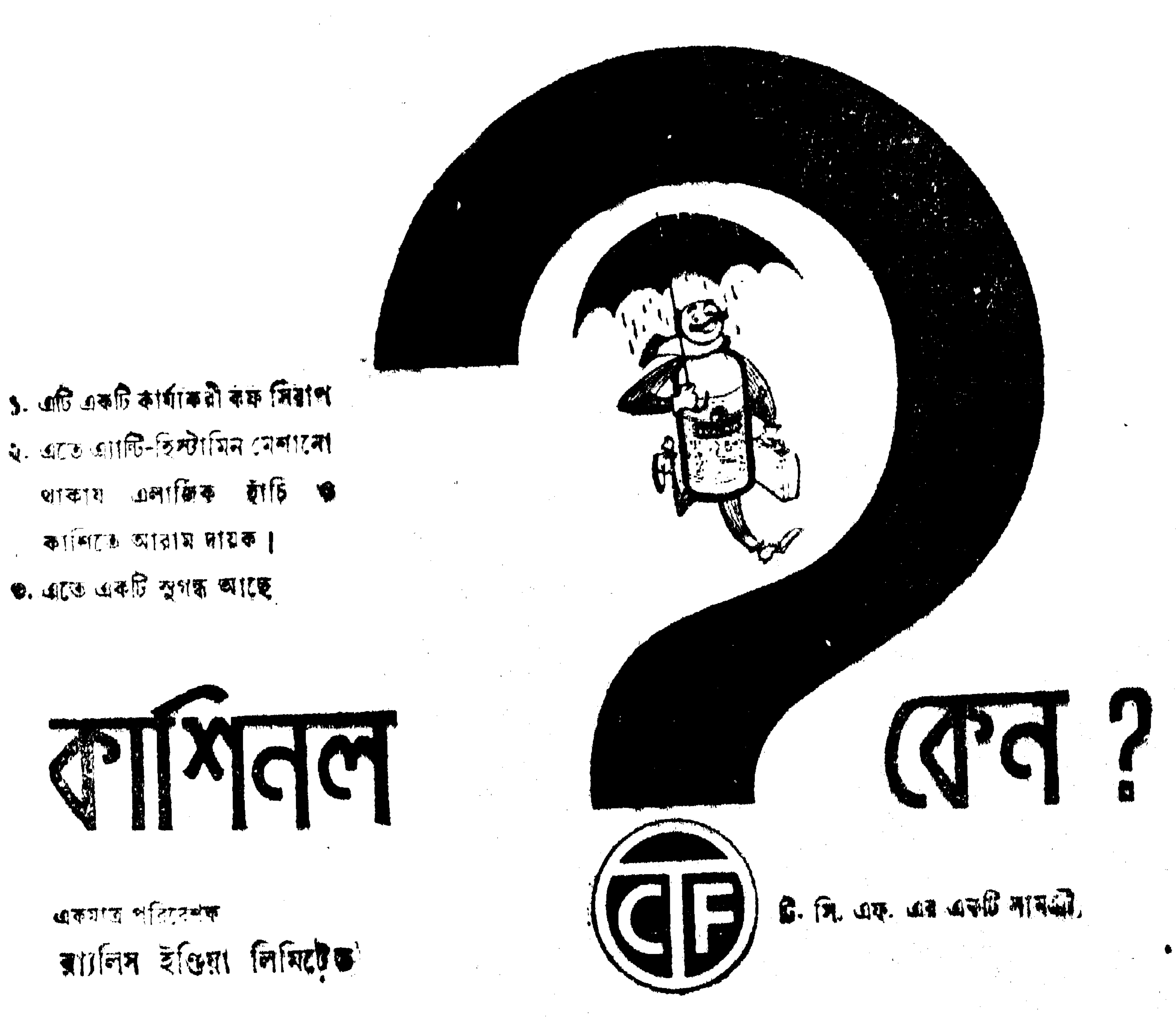

প্রতি পদে হোঁচট খাবার ভয়। একবার পড়ে গেলে আর বাঁচানো যাবে না মা'কে।

দীপংকরের তখন সব ভাবনা যেন লোপ পেয়েছে।

সেই বালিশ বুকে বুড়ো মানুষটা। তিনি কানে শুনতে পাবেন সব, কিন্তু বলতে পারবেন না কিছু। শুধু ঘড়-ঘড় করে শব্দ হবে একরকম। তখন হয়ত একটু গরম জল দিলে ঠাণ্ডা হবে। কিরণের মা হয়ত কিছু বলবে না, হয়ত মা'র কথা শুনে কাঁদবে!

কিন্তু গলিটার সামনে গিয়ে হঠাৎ একটা আর্তনাদ কানে যেতেই দীপংকর চমকে উঠলো।

মা'ও চমকে উঠেছে!

—ও কে কাঁদছে রে?

দীপংকরের যেন কী সন্দেহ হলো। বললে -কিরণের মা'র গলা মনে হচ্ছে মা!

কিরণের মা! ততক্ষণে কিরণদের বাড়ির একেবারে দরজার সামনে এসে গেছে। দরজাটা খোলা ছিল। দীপংকর উঁকি মেরে দেখলে। মা-ও দেখলে। কিরণের বাবা সেই বালিশের ওপরেই উপুড় হয়ে পড়ে আছে, মাথাটা দাওয়ার নীচে ঝুলছে। আর কিরণের মা একলা কিরণের বাবার সেই প্রাণহীন বিরাট শরীরটা দুই হাতে জড়িয়ে ধরে অসহায়ের মত চীৎকার জুড়ে দিয়েছে। সেই আর্তনাদে সমস্ত কালিঘাট যেন হঠাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো একনিমেষে! মৃত্যুর কাছাকাছি এলে সব জীবন্ত মানুষই বোধহয় ঝিমিয়ে আসে। মা'ও যেন কেমন হয়ে গেল। সেই নোংরা বিছানা-বালিশ, থুথু-দুর্গন্ধের মধ্যে মৃত্যু কেন যে আসতে সংকোচ বোধ করলে না, তা-ই একটা বিস্ময়! কত দিন কত বার মনে মনে মৃত্যু কামনা করেছে কিরণের বাবা,. বাইরে ভাষাতেই শুধু তা প্রকাশ করতে পারেনি। আজ সেই মৃত্যুই এল। কিন্তু যেন বড় মর্মান্তিক ভাবে এল। আজ কিরণ নেই, কেউ নেই। সহায়-সম্বলহীন পরিবার। ধৈর্যের সীমান্তে যেখানে জীবন-মৃত্যু একাকার হয়ে যায়, যেখানে আনন্দ-বেদনার তারতম্য-বোধ আর থাকে না, সেইখানে বুঝি পৌঁছে গিয়েছিল সেই নেপাল ভট্টাচার্য লেনের অসহায় পরিবারটি! কিন্তু মৃত্যুর কাছে বোধহয় উচ্চ-নীচ নেই, সুখী-দুঃখী নেই, অসহায়, আতুর, অনাথ কোনও বিচারই নেই। মৃত্যু বোধহয় বিচার-অবিচারের ঊর্ধ্বে। চারিদিকের সেই জঘন্য দুর্গন্ধের মধ্যে দীপংকরেরও যেন কেমন ঘেন্না করছিল। মা'কে তাড়াতাড়ি বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়েই আবার চলে এসেছে!

কিরণের মা হঠাৎ সেই অবস্থায় দীপংকরকে দেখে বেশ একটু অবাক হলো।

—আপনি সরুন মাসীমা!

—তুমি মা'কে বলে এসেছ তো বাবা?

একদিন মা'র অনুমতি ছাড়া এ-বাড়িতে আসবার অধিকার ছিল না দীপংকরের—সেকথা যেন কিরণের মা এখনও ভুলে যায়নি। ছোটবেলায় কিরণের বাবার কাছে অংক বুঝে নিয়ে গেছে দু'জনে। কতদিনের অসুখ কিরণের বাবার। কতদিন ধরে বোধহয় মৃত্যু-কামনা করেছে কিরণের বাবা, কিন্তু তখন মৃত্যু আসেনি। তখন মৃত্যু হলেই হয়ত ভালো হতো। তা হলে কিরণের বাবার এই অপমৃত্যুর সংবাদ তাকে কান দিয়ে শুনতে হতো না! তা হলে হয়ত এমন করে কিরণের মা'কে অনাথ করবার পুরোপুরি দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেত। কিন্তু আজ যখন নিঃসহায় নিঃসম্বল নিঃশেষ হয়ে এসে দারিদ্র্যের প্রান্তে এসে পৌঁছেছে তার পরিবার, তখনই সব শেষ হয়ে গেল। নিজের ভাষাহীন চোখ দিয়ে দেখে যেতে হলো কিরণ গৃহত্যাগী, স্ত্রী অনাথা! একটা কপর্দকের জন্যে প্রতিবেশীর কাছেই হাত পাততে হতো ইদানীং! সেই ... দুঃসহ দুর্দশার মূক সাক্ষী হয়ে প্রতি পলের বেঁচে থাকার চেয়ে এই মৃত্যু ঢের ভালো। শান্তি পেয়েছে কিরণের বাবা! কিরণের মা'ও বোধহয় স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলো।

সেদিন সেই সন্ধ্যাবেলাই লোক-জনের চেষ্টা করতে হয়েছিল দীপংকরকে! কাছেই শ্মশান। তবু কুষ্ঠ রোগী তো। বড় ছোঁয়াচে রোগ। 'কালিঘাট ব্যায়াম সমিতি'র দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল একবার দীপংকর। দরজায় তালা লাগানো। টেগার্ট সাহেব সেদিন নিজে এসে তালা বন্ধ করে দিয়েছে। আশে-পাশের পাড়ার লোক-জন ছেলে-ছোকরা ক'জন এসে দাঁড়াল। একটু আহা-উহু করলো। ...

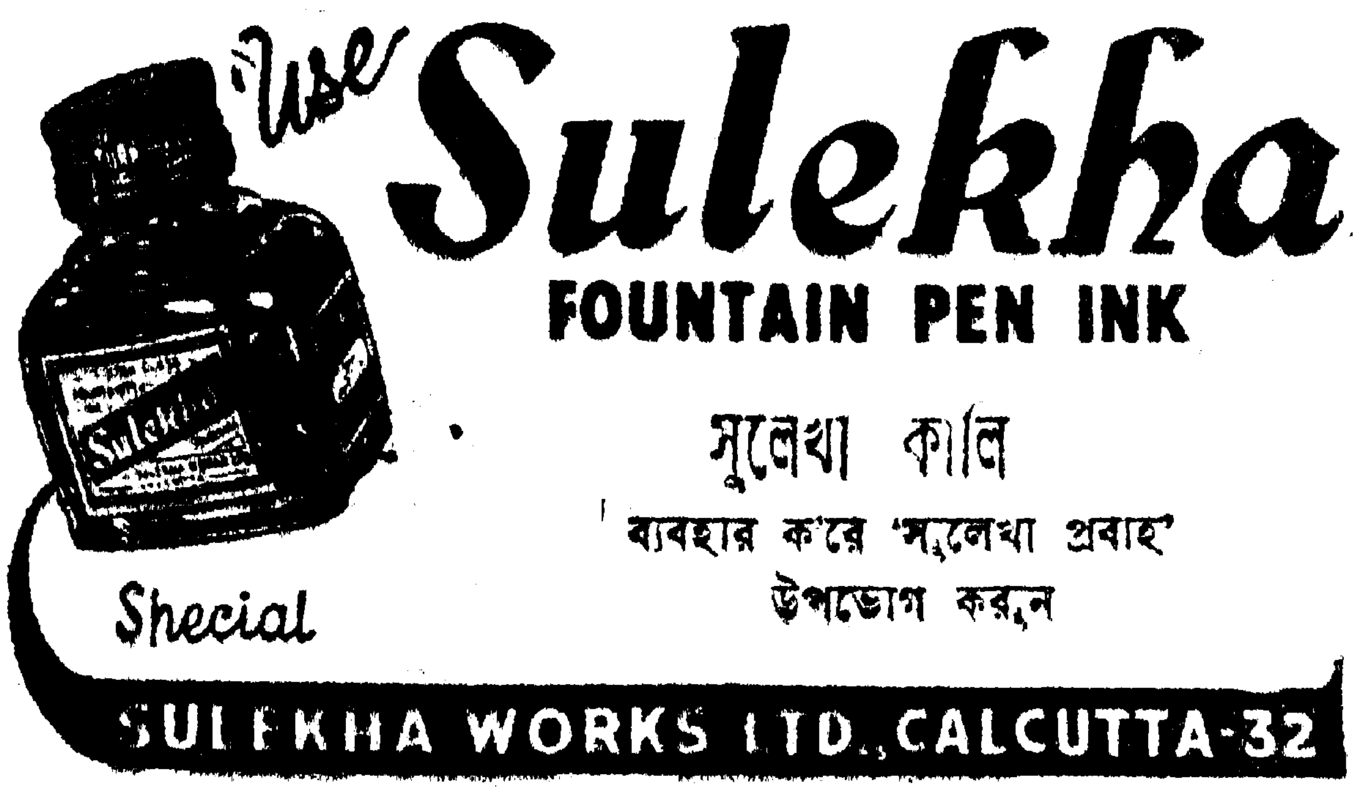

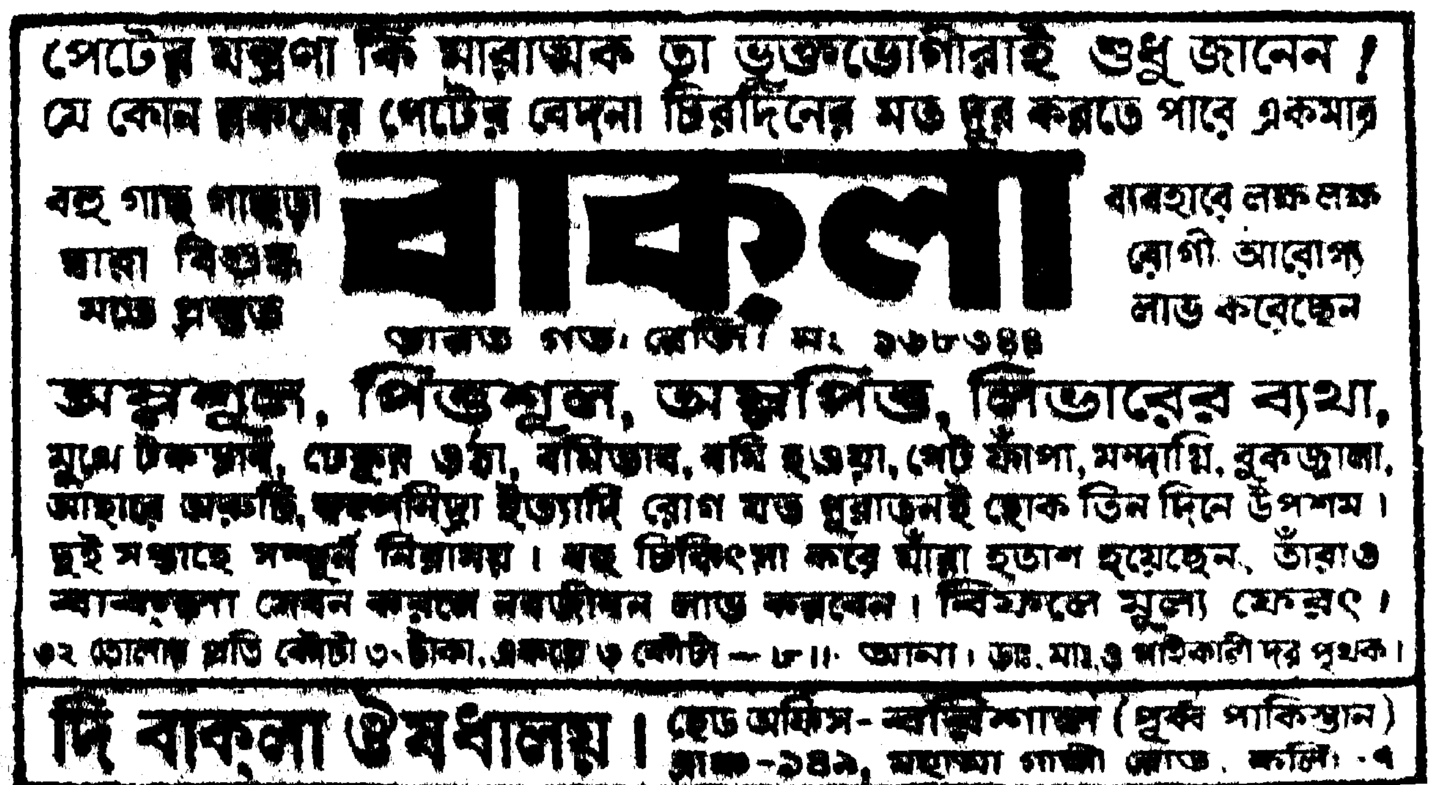

দেখাল। কিরণের জন্যে দুঃখও প্রকাশ করলে। ছেলেটা অকালে বখে গেল বলে হা-হুতাশও করলে। লেখাপড়া করলো না, বাপ-মাকেও দেখলে না। এমন ছেলে থাকলেই বা কী, আর মরে গেলেই বা কী! স্বদেশী আমরাও করি, খদ্দর পরি, বিলিতি কুমড়োটাও খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি গান্ধীর কথা মত—কিন্তু এটা কী? বাপ-মা-ই হলো আসল, বিপদের সময় তাদেরই যদি না-দেখলুম তো সে আবার করবে দেশসেবা, সে আবার ইংরেজ তাড়াতে চায় দেশ থেকে! এইটেই কি তোর দেশ-সেবা করার সময় রে বাপু?

দীপংকর ঘুরে এল আবার।

মাসীমা তখনও মৃতদেহের পাশে বসে আছে গালে হাত দিয়ে। ময়লা-বিছানার আন্ডিল। সেই নোংরা ময়লার ওপরেই মূর্তিমান মৃত্যু তার সস্তা শিকার পেয়েছে। কিন্তু মাসীমার যেন কিছুতেই আর বিকার নেই। আশে-পাশের বাড়ির দু'একজন মহিলা এসে দাঁড়িয়েছে তখন উঠোনে। মুখে-নাকে আঁচল দিয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে দল বেঁধে। তাদেরও বোধহয় আজকের দিনে পাশে এসে দাঁড়ানো একটা কর্তব্যের সামিল।

দীপংকর বললে—মাসীমা, আমি আসছি একটু পাথর-পটির দিক থেকে, বেশি দেরি হবে না—

পাথর-পটির গলির ভেতর ফটিকদের বাড়ি। ফটিকের নাম ধরে ডাকতেই তার মা বেরিয়ে এল। বুড়ী মা। তাদের অবস্থা কিরণের মত! কিন্তু ফটিকের মা বললে—কিন্তু ফটিক তো নেই বাবা?

—কখন আসবে?

—তার কি আসবার ঠিক আছে বাবা? সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত পয়সার ধান্ধাতেই ঘুরছে কেবল—

একবার চন্ডীবাবুদের বাড়িতে গেলেও হয়। রাখাল তাদেরই দলের। বাড়ি থেকে চুরি করে করে তাদের লাইব্রেরীতে বই দিয়েছিল একদিন। কিন্তু তার আগে পথে পড়ে মধুসূদনদের বাড়িটা। মধুসূদনদের বাড়ির রোয়াকের আড্ডাটা ভেঙে গিয়েছে। দুনিকাকাও আসে না, পণ্টাদাও আসে না। গরম গরম তর্কের ঝড় বয়ে যায় না আর খবরের কাগজ নিয়ে।

মধুসূদনকে ডাকতেই খানিক পরে বেরিয়ে এল। বললে—কী রে দীপু? কী খবর তোর? কবে ছাড়া পেলি?

দীপংকর বললে—কিরণের বাবা মারা গেছে, জানিস?

—সে কী রে! কখন?

—এই এক ঘণ্টা আগে, একটু শ্মশানে যেতে পারবি? কেউ নেই ওদের, জানিস্ তো—তুই, আমি আরও দুজন দরকার, ডেকে নেব 'খন আমি—

মধুসূদনের মুখ দেখে মনে হলো যেন বড় বিপদে পড়েছে। খানিক কী যেন ভেবে বললে—দ্যাখ্, যেতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আসলে কী জানিস ভাই, বড়দা ভয়ানক আপত্তি করবে, দেখেছিস তো আমাদের রোয়াকের আড্ডা পর্যন্ত তুলে দিয়েছে—যা কান্ড সব হচ্ছে পাড়ায়, কারোর সঙ্গে ভয়ে মিশতেই ভাই বারণ করে দিয়েছে বড়দা—

তারপর একটু থেমে বললে—তা যাক্‌গে, তোকে ধরেছিল কেন রে? কী করেছিলিস্ তুই?

দীপংকর তাড়াতাড়িতে সে-কথার উত্তর না দিয়ে চলতে লাগলো। বললে—সে-সব কথা বলবার সময় নেই এখন—আমি অন্য জায়গায় দেখি—

অন্য জায়গায় মানে যে কোথায় তা তখনও ঠিক ছিল না। রাখাল! রাখাল কি যাবে? বড়লোকের ছেলে, সে কী করতে শ্মশানে যাবে! তার কীসের দায় পড়েছে। তবু রাখালের বাড়ির সামনে গিয়েও একবার দাঁড়াল দীপংকর। রামধনি দরোয়ান তখনও আছে। গেটের পাশেই ছোট ঘরখানায় বসে আটা মাখছিল। দীপংকর খানিক দাঁড়াল। এদিক-ওদিক চাইতে লাগলো। অনেক বড় বাড়ি। বিরাট বাড়ি, কে কোথায় থাকে, কখন থাকে, তার হদিশ রাখা শক্ত। দীপংকর ফিরে এল আবার। এত বড় পৃথিবী, এত বিরাট কালিঘাট—অথচ সেদিন দীপংকরের মনে হয়েছিল যেন কোথাও কেউ নেই! এমন কেউ নেই যার কাছে গিয়ে সাহায্য চাইতে পারে সে।

হতাশ হয়ে আবার নেপাল ভট্টাচার্য লেনের দিকে ফিরেই আসছিল দীপংকর, হঠাৎ মনে পড়লো ছিটে-ফোঁটার কথা!

কালিঘাট বাজারের উত্তর গায়ে হিন্দু হোটেল। তারই পেছনে টিনের পাকা বাড়ি। আর কোনও উপায় না দেখে দীপংকর সেই দিকেই গেল। বেশ রাত হয়ে আসছে তখন। কিন্তু ও-পাড়া তখনও জমেনি ভালো করে। জমবে আরো অনেক রাত্রে। রাত আর একটু গভীর হলে অনেক অবাঞ্ছিত লোক ঘোরা-ফেরা করছে এদিকে-ওদিকে। সরু একটা পাঁচ ফুট চওড়া গলি। খোয়া বাঁধানো। গলির দু'পাশে একটা নয়, অনেকগুলো টিনের পাকা বাড়ি। ভেতরে হারমোনিয়ম বাজিয়ে এক-জায়গায় গান হচ্ছিল। ফেরিওয়ালারা গলির মধ্যেও কারবার করতে ঢুকেছে।

—চাই পাঁঠার ঘুগ্‌নি। গরম আলুর চপ্, পেঁয়াজি—

আরো অনেক রকম ফেরিওয়ালা। মালাই

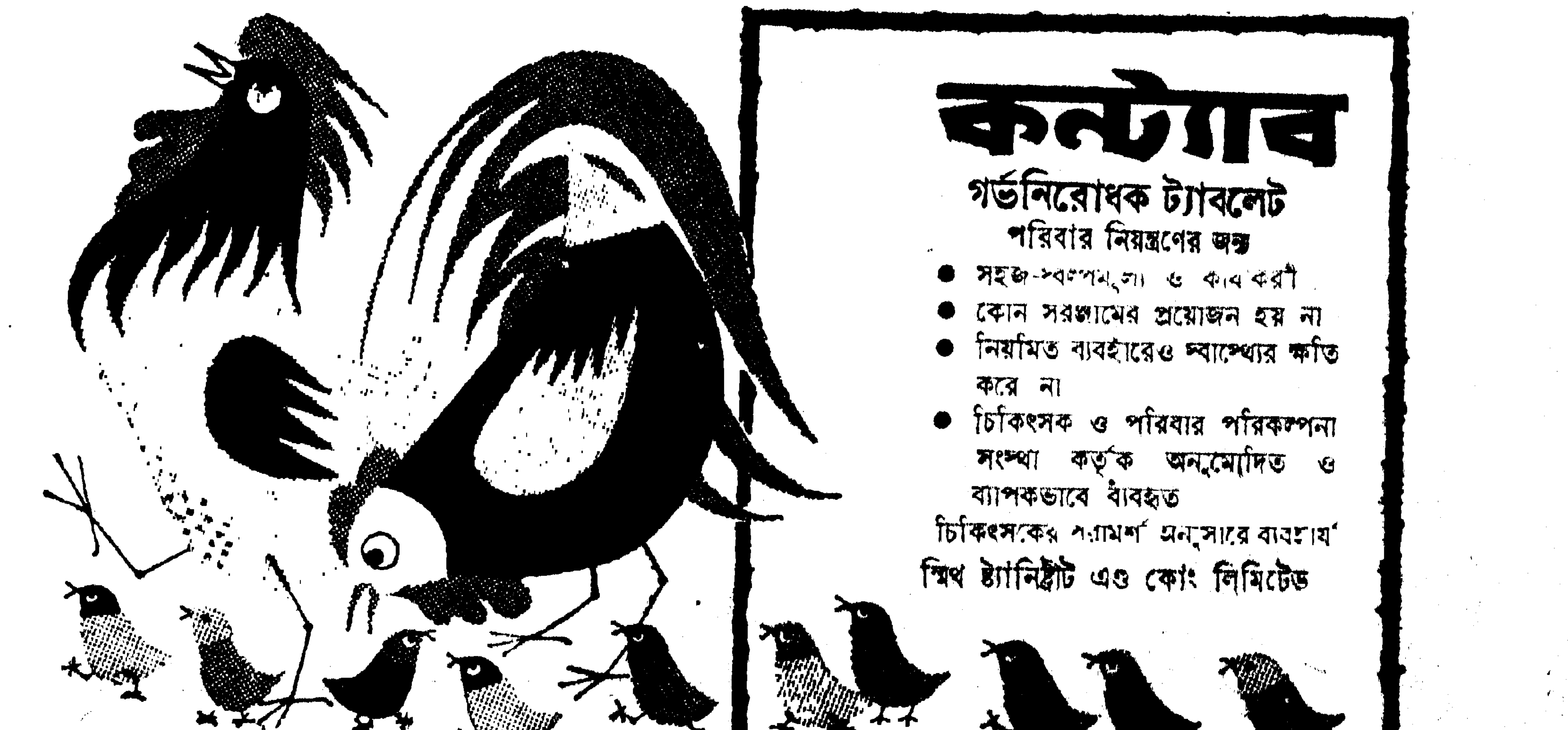

বরফ, বেলফুল। পায়ে ঘুঙুর বাজিয়ে সখী সেজে চানাচুর বিক্রি করছে একজন। দু'পাশে অনেক মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাজ-গোজ করে। হাসি-মস্করা করছে। পানের পিচ্ ফেলছে শব্দ করে। দীপংকর মাথা নিচু করে হিন্দু হোটেলের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

—ওদিকে নয় গো, ওদিকে নয়, ওটা বাঁধা ঘর!

দীপংকর পেছন ফিরে কথাটা কে-বলছে দেখতেই একপাল মেয়ে খিল্‌খিল্ করে উঠলো। হেসে গড়িয়ে পড়লো সবাই।

যেন মরিয়া হয়েই দীপংকর ডাকলে—লোটন্—

'লোটন' বলেই ডাকতে বলেছিল ফোঁটা। লোটন্‌কে দেখতে কেমন, মানুষ কেমন তাও জানতো না দীপংকর। ডাকতে একটু সংকোচও হলো। কিন্তু না-ডাকলেও উপায় নেই। ওদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে।

দীপংকর আবার বাড়িটার সদর-দরজা লক্ষ্য ক'রে ডাকলে—লোটন—

—কে গা?

একজন মেয়ে বেরিয়ে এসেছে হাসতে হাসতে। এক মুখ পান। কিন্তু দীপংকরকে দেখেই গম্ভীর হয়ে গেছে। দীপংকরও চিনতে পারলে যেন। বেশ চেনা-চেনা মুখ। অঘোরদাদুর বাড়িই দেখেছে—চন্নুনীর কাছেই দেখেছে।

—এসে গেছিস্? আয়, আয়, ভেতরে আয়—

খালি-গায়ে লুংগী-পরা ফোঁটা বেরিয়ে এসেই টানতে আরম্ভ করেছে হাত ধরে। বললে—আরে, এ যে-সে লোক নয়, বি-এ পাশ, গ্র্যাজুয়েট, রেলের অফিসার মানুষ—

দীপংকর বললে—আমি ভীষণ বিপদে পড়ে এসেছি তোমার কাছে—কিরণের বাবা মারা গেছে, শ্মশানে নিয়ে যেতে হবে, কেউ নেই, সাহায্য করবার, যার কাছে গেলাম সে-ই ফিরিয়ে দিলে, অথচ কিরণও নেই, শেষে কোনও উপায় না পেয়ে এখানে এলাম তোমার কাছে, তোমাকে সাহায্য করতেই হবে—

ফোঁটা যে ফোঁটা সে-ও মন দিয়ে শুনলে কথাগুলো। তারপর কী যেন ভাবতে লাগলো।

দীপংকর আবার বললে—খরচপত্রও কিছু দিতে হবে তোমায়, ওদের কিছু নেই—অন্তত দশটা টাকা লাগবেই—

ফোঁটা খানিক ভেবে চিন্তে বললে—দশ টাকায় হবে না,—

দীপংকর বললে—দশ টাকাও লাগবে ন হয়ত, তবে সংগে থাকা ভালো—

ফোঁটা বললে—না, আমি অনেকবার গেছি, মাল-টাল খেতে হয়, কুড়ি টাকা নেওয়াই ভালো—

তারপর লোটনের দিকে ফিরে বললে—কুড়িটা টাকা দাও তো গো, আর গামছাটা—

তারপর দীপংকরকে জিজ্ঞেস করলে—আর কে কে যাচ্ছে? আর কাউকে জোগাড় করতে পেরেছিস?

—আর কেউ নেই, শুধু আমি আর তুমি। যদি আর কাউকে জোগাড় করতে পারো তো বড় ভালো হয়—

—জোগাড় করতে পারবো না মানে? আমি বললে এ-পাড়ায় কারোর বাবার ক্ষমতা আছে 'না' বলে?—বলে বুক চিতিয়ে দাঁড়াল ফোঁটা।

সত্যিই শেষ পর্যন্ত সেদিন ফোঁটা ছিল বলে কোনও অসুবিধেই হয়নি। কোথ থেকে আরো তিন-চারজন লোক জোগাড়

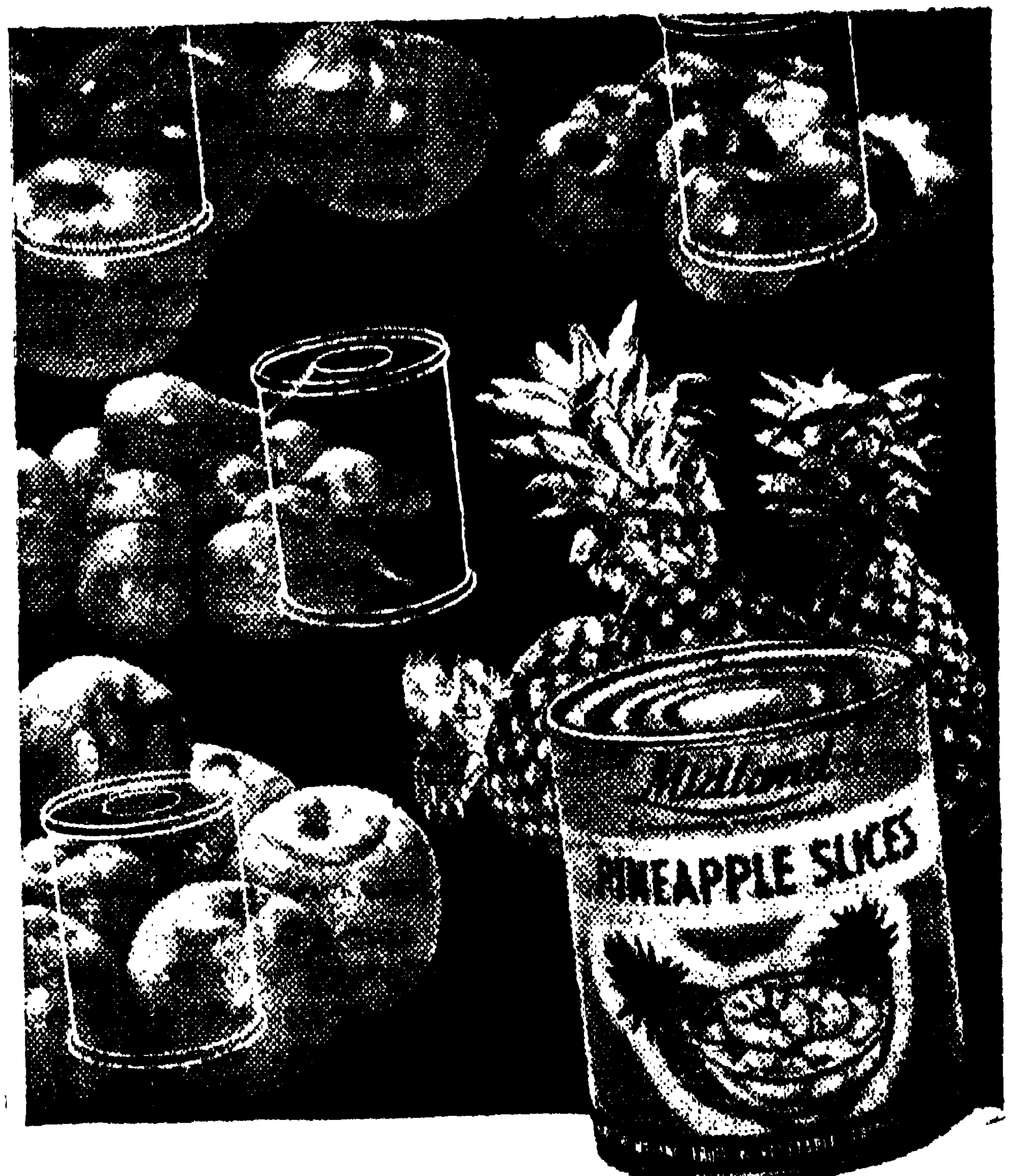

মিডল্যাণ্ড সবসময়েই পাবেন

Midland

মিডল্যাণ্ড বাছাই করা ২৭ রকমের ফল, তরকারী, জ্যাম এবং জেলী পরিবেশ করে। টিনে প্যাক করা এর চেয়ে ভাল খাবার হয় না।
এদেশে টিনে প্যাক করা খাবার তৈরীতে এরাই সবচেয়ে বড় তাই সবচেয়ে ভাল জিনিবই এরা দিয়ে থাকে সবসময়।

দেখে নিন এটা মিডল্যাণ্ড তৈরী

প্রস্তুত কারক:
দি মিডল্যাণ্ড ফ্রুট অ্যাণ্ড ভেজিটেবল প্রোডাক্টস্ (ইণ্ডিয়া) মথুরা

একমাত্র পরিবেশক:
কর্ণ প্রোডাক্টস্ কোং (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড, বোম্বাই

ভারতের এজেন্ট: প্যারী অ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

করেছিল। সবাই যেন দেবতার মতন ভক্তি করতে লাগলো ফোঁটাকে। সবাই 'দেবতা' বলে ডাকতে লাগলো ফোঁটাকে। দীপঙ্করকে কিছুই করতে হয়নি। ছিটেও ছিল সঙ্গে।

একজন বললে—দেবতা, কিছু মাল-টালের ব্যবস্থা নেই?

ক্যাওড়াতলার শ্মশানের মধ্যেও ফোঁটার রাজত্ব। ডোমরাও সসম্ভ্রমে প্রণাম করতে লাগলো ছিটে-ফোঁটাকে। দীপঙ্কর দেখে অবাক হয়ে গেল ছিটে-ফোঁটার প্রতিপত্তি। ব্রাহ্মণ-পুরুত, কাঠওয়ালা থেকে শুরু করে সাধু-সন্নিসী সবার ওপরেই সমান প্রতিপত্তি। তার এক ডাকে মুহূর্তে কার্য সমাধা হয়ে যায়। এক হাঁকে শ্মশানসুদ্ধ লোক তটস্থ হয়ে থাকে। যাকে যা হুকুম করে সে-ই এগিয়ে এসে দাঁড়ায়।

পুরুত বললে—মুখাগ্নি করবে কে?

সত্যিই তো, মুখাগ্নি করবে কে?

ফোঁটা বললে—দীপু করবে, আবার কে করবে—আমি তো পাষণ্ড একটা— বলে বিড়িটায় লম্বা টান দিলে একটা।

দীপঙ্কর তখন গঙ্গার ঘাটের ওপর অন্ধকারে চুপ করে বসে ছিল। সমস্ত মনটা তার আচ্ছন্ন হয়ে ছিল সমস্ত দিন। আর শুধু সমস্ত দিনই বা কেন? ক'দিন ধরেই একটার পর একটা ভাবনার ঝড়ে যেন একেবারে ভেঙে দিয়েছে তাকে। সেই অফিস, অফিসের চাকরি। কাকাবাবুর বাড়িতে হৈ চৈ, লক্-আপ, ছিটে-ফোঁটা, চন্নুনী, কিরণ, মা'র পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা আর তারপর এই কিরণের বাবার মৃত্যু!

গঙ্গার ঘাটের একেবারে শেষ ধাপে জলের ধার ঘেঁষে একটা লোক চুপ করে বসে আছে অনেকক্ষণ। চারদিক অন্ধকার। ছিটে-ফোঁটারা কাঠ কিনে চিতের জোগাড় করছে। মাঝে-মাঝে হরি-ধ্বনি কানে আসছে। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে শ্মশানের ভেতরটা। চোখ জ্বালা করে বেশিক্ষণ চেয়ে থাকলে। কিন্তু এখানটা নির্জন। ওপারে আলো জ্বলছে চেতলার রাস্তায়। কে একজন ওপারে গঙ্গার ধারে বসে বাঁশি বাজাচ্ছে একমনে।

হঠাৎ পাশে কে একজন এসে ডাকলে। বললে—দেবতা আপনাকে একবার ডাকছেন, দীপুবাবু—

—কেন?

—আজ্ঞে আপনিই তো মুখাগ্নি করবেন! মুখাগ্নি করতে হবে দীপঙ্করকেই।

সত্যিই তো, কেউ নেই তো ওদের। ছেলে থেকেও নেই! আশ্চর্য! এতদিন পরে বুঝি কিরণের দায়িত্ব তাকেই পালন করতে হলো! সন্তানের দায়িত্ব পালন করতে হলো। গরমে যেন মুখটা পুড়ে যাবে এত হল্কা লাগছে চোখে-মুখে।

ফোঁটা কাছে এল। বললে—যা দীপু, তোকে কিছু ভাবতে হবে না, আমরা সব করছি, তুই ঘাটে গিয়ে ঠাণ্ডায় বসগে যা—

ঘাটে আসতেই মাথাটা আবার ঠাণ্ডা হলো। রাত হচ্ছে! আটটার সময় চড়ানো হয়েছে, রাত এগারোটার আগে আর শেষ হবে না। অনেকক্ষণ এমনি চুপ করে বসে অপেক্ষা করতে হবে। ওরা ততক্ষণ খাবার খাবে আরো যা খুশি ওদের সব খাবে! টাকা-কড়ি সব কিছুর খরচা ওদের। দীপঙ্করকে কিছু ভাববার দরকার নেই।

হঠাৎ যেন টিপি টিপি পায়ে কে কাছে এসে দাঁড়াল। সেই ছেলেটা! অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যায় না। সেই বহুদিন আগে কিরণের খবর এনে দিয়েছিল। ম্যাডক্স স্কোয়ারে ভজুদার খবরও এনে দিয়েছিল! দীপঙ্কর ভূত দেখবার মত করে চমকে উঠেছে। বললে—আপনি, এখানে?

ছেলেটি বললে—আমি আপনার কাছেই এসেছি, কিরণ পাঠিয়েছে—

—কিরণ? কিরণ কোথায়? কিরণের বাবা যে আজ মারা গেলেন?

ছেলেটি আস্তে আস্তে বললে—জানি—

দীপঙ্কর যেন হঠাৎ রেগে গেল। বললে—কিন্তু আপনাদের কিরণ এত ছোট করলে কেন নিজেকে? আমার নাম-ধাম ঠিকানা, সব বলে দিলে এমন করে? জানেন, তার জন্যে আমাকেও ক'দিন লক্-আপে আটকে রেখেছিল? আজই তো ছাড়া পেলাম! নিজে ধরা পড়লো, আবার আমাকেও জড়ালে? আমি সেদিন কিরণের সঙ্গে ম্যাডক্স-স্কোয়ারে গিয়েছিলাম, তাও বলে দিয়েছে ওদের! যদি কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা না থাকে তো, কেন স্বদেশী করতে যাওয়া?

ছেলেটি কিছু বললে না। চুপ করে রইল। চারদিক দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বার করে এগিয়ে দিলে। বললে—কিরণদা আপনাকে লিখেছে—

—কিরণ, কিরণ কোথায়? ছাড়া পেয়ে গেছে?

ছেলেটি বললে—চিঠিটা পড়লেই বুঝতে পারবেন—

দীপঙ্কর তাড়াতাড়ি ভাঁজ খুলে পড়তে লাগলো।

"আমি এইমাত্র খবর পেলাম। কিন্তু ভাই আমার কিছুই করবার নেই। চারদিক থেকে জাল ফেলা হচ্ছে আমাদের ধরবার জন্যে। যদি কোনওদিন সুযোগ পাই তো তোকে সব বলবো। শয়তানদের শেষ না-করা পর্যন্ত

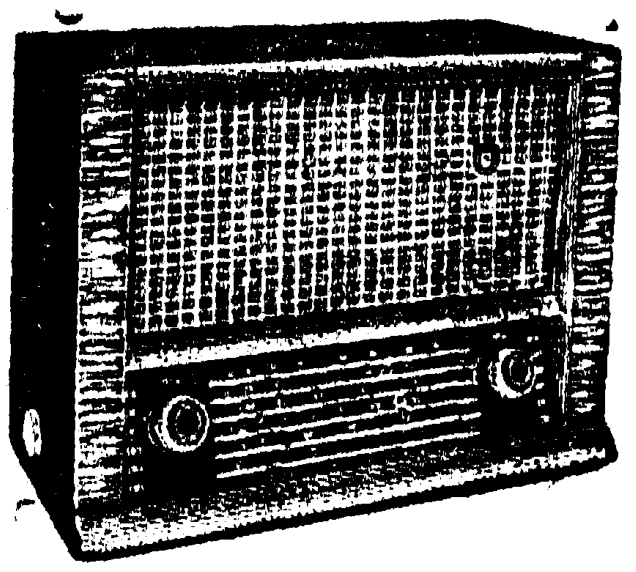

আমাদের নিকট নগদ মূল্যে অথবা সহজ কিস্তিতে অনেক রকমের রেডিও সেট পাওয়া যায়। এইচ. এম. ভি ও অন্যান্য রেডিওগ্রাম, লং-প্লেইং রেকর্ড, টেপ রেকর্ডার, "নিপ্পন" অল-ওয়েভ ট্র্যান্সিস্টার রেডিও, এমপ্লিফায়ার মাইক, ইউনিট হর্ণ, মাইক কেবল, রেডিও ও ইলেকট্রিকের বিভিন্ন প্রকারের সাজ-সরঞ্জামাদি বিক্রয়ের জন্য আমরা সর্বদা প্রচুর পরিমাণে মজুত করিয়া থাকি।

রেডিও এণ্ড ফটো স্টোর্স

৬৫, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩। ফোন: ২৪-৪৭৯৩

হোমিওপ্যাথিক

পারিবারিক চিকিৎসা

একমাত্র বঙ্গভাষায় মুদ্রণ সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার

উপক্রমণিকা অংশে "হোমিওপ্যাথির মূলতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক মতবাদ" এবং "হোমিওপ্যাথিক মতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি" প্রভৃতি বহু গবেষণাপূর্ণ তথ্য আলোচিত হইয়াছে। চিকিৎসা প্রকরণে যাবতীয় রোগের ইতিহাস, কারণতত্ত্ব, রোগনিরূপণ, ঔষধ নির্বাচন এবং চিকিৎসাপদ্ধতি সহজ ও সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। **পরিশিষ্ট অংশে** ভেষজ সম্বন্ধ তথ্য, ভেষজ-লক্ষণ-সংগ্রহ রেপার্টরী, খাদ্যের উপাদান ও খাদ্যপ্রাণ, জীবাণুতত্ত্ব বা জীবাগম রহস্য এবং মল-মূত্র-থুতু পরীক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। **বিংশ সংস্করণ।** মূল্য—৭·৫০ নঃ পঃ মাত্র।

এম, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

ইকনমিক ফার্মেসী, ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১

আমাদের আহার-নিদ্রা নেই—বাড়ি-ঘর নেই, বাবা-মা নেই। তোকে এই সঙ্গে যে-কাগজটা দিলুম সেটা পড়ে সই করে দিস্—তারপরে যা করবার আমরা করবো—"

চিঠির ওপরে বা নিচে কারোর নাম লেখা নেই। তবু কিরণের হাতের লেখা দীপঙ্করের চেনা।

দীপঙ্কর মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলে—এটা কী?

ছেলেটি বললে—পড়েই দেখুন না—

আলোর তলায় গিয়ে দীপঙ্কর কাগজটা পড়তে লাগলো—। তাতে লেখা রয়েছে—

ও' বন্দে মাতরম

"আমাদের কতবা কী? আমাদের কর্তব্য খুব পরিষ্কার। রাউন্ড টেবল কনফারেন্স সম্বন্ধে আমাদের কোনও মাথা-ব্যথা নাই। রাউন্ড টেবল কনফারেন্স সফল হউক বা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হউক তাহা জানিবার আগ্রহও আমাদের নাই, কিন্তু আমাদের প্রথম ও শেষ কথা আতঙ্ক সৃষ্টি করিতে হইবে। এই অন্যায় গভর্নমেন্ট অচল করিয়া তুলিতে হইবে, মৃত্যুদূতের মতন আত্মগোপন করিয়া থাকিতে হইবে এবং আমলাতন্ত্রের মাথায় মৃত্যু বর্ষণ করিতে হইবে। মনে রাখিও, আমাদের ভ্রাতারা জেলে এবং গ্রামে অন্তরীণে পচিতেছে। যাহারা মরিয়াছে বা উন্মাদ হইয়া গিয়াছে তাহাদের ভুলিও না। ঈশ্বর ও দেশের নামে ভাইরা আবার তোমাদের বলিতেছি বালক, বৃদ্ধ, ধনী, দরিদ্র, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ খৃস্টান সকলে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দাও, রক্ত দাও, ধন দাও। আমরা যে-স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিতেছি, তা ভারতবর্ষের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার স্বাধীনতা। সে-স্বাধীনতা কয়েকজন মুষ্টিমেয় অর্থপিশাচ বিদেশী বণিকদের কুক্ষিগত স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতা আসিলে সেদিন আমরা সবাই তাহা একযোগে ভোগ করিব। সেই দিনের সুখ-সমৃদ্ধির আদর্শ সামনে রাখিয়া আমরা আজ কুকুর-বিড়ালের মত প্রাণ দিতেছি, এবং প্রয়োজন হইলে আরো দিব। তোমাদেরও প্রাণ দিতে আহ্বান করিতেছি। ওই শোন জননীর আহ্বান ও পথ-নির্দেশ —নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

সঙ্গে আরও একটা কাগজ। তাতেও লেখা রয়েছে অনেক কিছু।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—এটা কী?

ওটাই প্রতিজ্ঞা-পত্র। ওইটেতেই আপনাকে সই করতে হবে—

দীপঙ্কর পড়তে লাগলো—"ঈশ্বর, জননী, পিতা, গুরু, নেতা ও সর্বশক্তিমানকে সাক্ষী রাখিয়া শপথ করিতেছি—(১) উদ্দেশ্য পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত চক্র ত্যাগ করিব না। স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ থাকিব না। নেতার আদেশে চক্রের কাজ বিনা প্রতিবাদে করিয়া যাইব। (২) যদি এই শপথ পালনে অক্ষম হই, তবে পিতা, মাতা, ব্রাহ্মণ ও সর্বদেশের দেশপ্রেমিকদের অভিশাপ যেন আমাকে ভস্ম করিয়া ফেলে।"......ইত্যাদি ইত্যাদি—

অনেক বড় লেখা। এক দুই করে অনেকগুলো শর্ত। অল্প আলোয় সবগুলো পড়াও যায় না।

ছেলেটি বললে—এই কাগজটাতেই সই করতে হবে—কিরণদা বলে দিয়েছে।

দীপঙ্কর কাগজটা হাতে নিয়ে ভাবলে খানিকক্ষণ। তারপর বললে—কিন্তু আমি তো এখন সই করতে পারবো না—

—তাহলে কখন করবেন?

—সে আমি কিরণকে বলবো'খন।

—কিন্তু কিরণদার সঙ্গে তো খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে না, আজকেই কিরণদা কলকাতার বাইরে চলে যাচ্ছে—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু আমি যে আর সই করতে পারি না, আমি যে আজকেই মা'র পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি, এসব আর জীবনে করবো না—

কথাগুলো বলতে গিয়ে দীপঙ্করের মাথাটা যেন লজ্জায় নুয়ে এল হঠাৎ। আর যেন মাথা তুলে তাকাবারও সাহস নেই তার। সে যেন বড় হীন প্রতিপন্ন হয়ে গেল পৃথিবীর সকলের সামনে। মনে হলো সকলে যেন তার দিকে আঙুল নির্দেশ করে ছি-ছি করে উঠলো সেই নির্জন শ্মশান ভূমির নিঃশব্দ অন্ধকারের মধ্যে।

—তাহলে ওগুলো দিন—

দীপঙ্কর কাগজগুলো দিয়ে দিলে ছেলেটির হাতে।

ছেলেটি বললে—আর কিরণদার চিঠিটা, ওটাও দিন—

কিরণের চিঠিটা নিয়ে ছেলেটি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে নিশ্চিহ্ন করে ছাইগাদার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। তারপরে আর কিছু না বলে দ্রুতপায়ে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

তখনও শ্মশানের মধ্যে বিকট হরিধ্বনির শব্দ উঠছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে ভেতরটা। বিরাট শিরীষ গাছটার মাথায় কয়েকটা শকুনি অদ্ভুত একটা কিচ্-কিচ্ শব্দ করছে মাঝে-মাঝে। রাত প্রায় দশটা বেজে গেছে। ওপারে চেতলার রাস্তায় ধান-গোলার সামনে লোক-চলাচল পাতলা হয়ে এল। যে-লোকটা এতক্ষণ বাঁশি বাজাচ্ছিল, সে-ও থেমে গেছে খানিকক্ষণ আগে।

দীপঙ্কর আবার এসে বসলো ঘাটের ওপর।

ঘাটের একেবারে শেষ-ধাপে যে-লোকটা বসেছিল, হঠাৎ যেন সে একটু নড়তে-চড়তে লাগলো। অন্ধকারে হাব-ভাব, চেহারা, পোশাক কিছুই দেখা যায় না স্পষ্ট করে। লোকটা দাঁড়িয়ে উঠে জলে পা দিলে, তারপর এগিয়ে যেতে লাগলো। তারপর আরো একটু......

দীপঙ্করের কেমন যেন সন্দেহ হলো। লোকটা কে? এখানে অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে। কী মতলব ওর?

এবার আর চুপ করে বসে থাকা গেল না। লোকটা আরো এগোচ্ছে......

দীপঙ্কর সিঁড়ি দিয়ে টপ্ টপ্ করে নামতে লাগলো।

বললে—কে ওখানে? কে আপনি?

লোকটা এবার পিছন ফিরলো। দীপঙ্করকে দেখেই লোকটা ওপরে উঠে আসতে লাগলো। তারপর আরো একটু কাছে আসতেই দীপঙ্কর চিনতে পেরেছে। দাতারবাবু!

—দাতারবাবু না? আপনি এখানে?

কোনও সন্দেহ নেই। আরো রোগা হয়ে গেছে চেহারা। ফিকে কঙ্কালসার চেহারা দাতারবাবুর। দীপঙ্করের কথার কোনও উত্তর নেই দাতারবাবুর মুখে। যেন হঠাৎ ধরা পড়ে গেছেন!

দীপঙ্কর আবার জিজ্ঞেস করলে—লক্ষ্মীদি কেমন আছে?

দাতারবাবু বললেন—ভালো—

বলেই আর কোনও কথা না বলে সোজা সিঁড়ি দিয়ে উঠে চলে যেতে লাগলেন। খুব জোরে জোরে চলতে লাগলেন। যেন দীপঙ্করকে এড়িয়ে যাবার মতলব। পাশের মাইশোর ঘাটের নির্জন অন্ধকারের মধ্যেই আত্মগোপন করতে চাইলেন।

দীপঙ্করও পেছন-পেছন ছুটলো।

—দাতারবাবু, দাতারবাবু—

দাতারবাবু ততক্ষণে অনেকদূরে চলে গেছেন। আরো জোরে জোরে পা

কে, হোড়ের
কণক
পাউডার

ধবল বা শ্বেত

শরীরের যে কোন স্থানের সাদা দাগ, একজিমা, সোরাইসিস ও অন্যান্য কঠিন চর্মরোগ, গাত্রে উচ্চবর্ণের অসাড়যুক্ত দাগ, ফুলা, আঙুলের বক্রতা ও দূষিত ক্ষত সেবনীয় ও বাহ্য দ্বারা দ্রুত নিরাময় করা হয়। আর পুনঃ প্রকাশ হয় না। সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। **হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর**, প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ফোন : ৬৭-২৩৫৯। শাখা : ৩৬, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯। (পূরবী সিনেমার পাশে)।

চালাচ্ছেন। দীপঙ্করও সরু গলিটা দিয়ে দক্ষিণেশ্বর মাইশোর ঘাটের দিকে এগিয়ে গেল।

হঠাৎ পেছন থেকে ফোঁটার গলার আওয়াজ শোনা গেল।

—কীরে দীপু, কোথায় যাচ্ছিস ওদিকে!

দীপঙ্কর কাছে এল। দেখলে ফোঁটা কাঁধে গামছা নিয়ে তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। বললে—কীরে, অন্ধকারের মধ্যে ওদিকে কোথায় যাচ্ছিলিস্? আমাদের কাজ সব ফতে! এখন নাই-কুণ্ডলীটা তোকেই গঙ্গায় ফেলতে হবে—চল্—

ফোঁটার মুখ দিয়ে তখন ভুর্-ভুর্ করে দিশী মদের বোট্কা গন্ধ বেরোচ্ছে।

দীপঙ্কর আবার শ্মশানের মধ্যে এসে ঢুকলো। তখন কলসী করে জল ঢেলে দেওয়া হচ্ছে চিতার ওপর। সব শেষ!

(ক্রমশ)

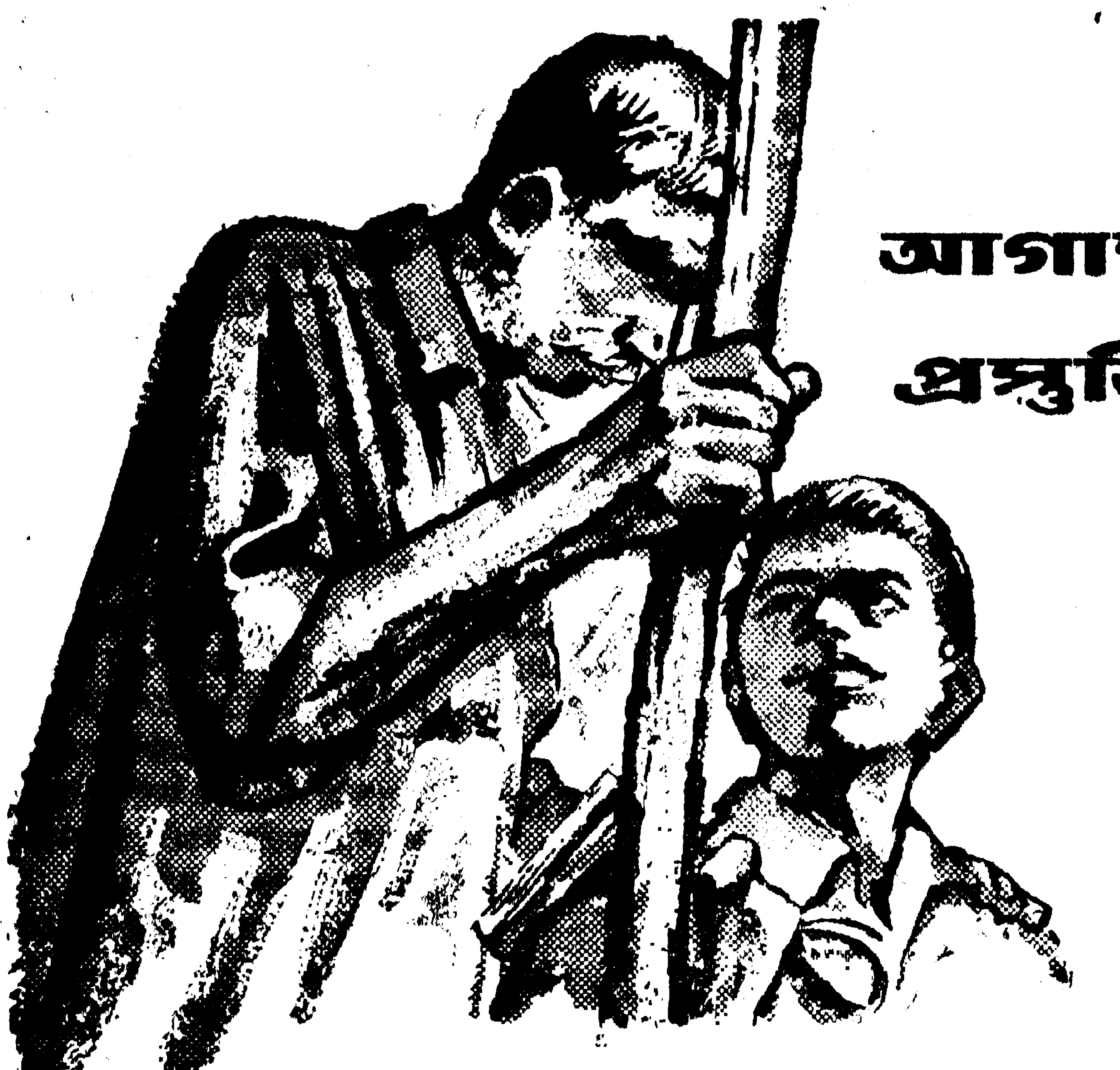

আগামীর প্রস্তুতি

খোকা আজ আর খোকা নেই। আজ সে বড় হয়েছে। দু'দিন পরে বাবার মতো ওকেও অনেক দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে সংসারের মরা-বাঁচার সংগ্রামে।........

বৃদ্ধ বাবা আজ ক্লান্ত। কপালের ভাঁজে ভাঁজে তার বার্দ্ধক্যের ছাপ। জীবনের সব অভিজ্ঞতা, সব সঞ্চয় দিয়ে খোকাকে সে বড় করে তুলেছে। তাঁর বুক ঢালা স্নেহের ছায়ায় দিনে দিনে ছোট্ট চারাটির মতো বেড়ে উঠেছে খোকা, আর জেনেছে জীবনের কঠিন সত্যকে—বেঁচে থাকার কঠিন সংগ্রাম।

এ শুধু আগামীরই প্রস্তুতি। আজকের এই মহান সংগ্রামই যে একদিন শ্রান্তিময়, ক্লান্তিময় পৃথিবীকে আনন্দ সুখের উচ্ছ্বাসে হাসি গানের উৎস করে গড়বে।

আজ সমৃদ্ধির গৌরবে আমাদের পণ্যদ্রব্য এ দেশের সমগ্র পারিবারিক পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও সুখী করে রেখেছে। তবুও আমাদের প্রচেষ্টা এগিয়ে চলেছে আগামীর পথে—সুন্দরতর জীবন মানের প্রয়োজনে মানুষের চেষ্টার সাথে সাথে চাহিদাও বেড়ে যাবে। সে দিনের সে বিরাট চাহিদা মেটাতে আমরাও সদাই প্রস্তুত রয়েছি, আমাদের নতুন মত, নতুন পথ আর নতুন পণ্য নিয়ে—

আজও আগামীতেও...দেশের সেবায় হিন্দুস্থান লিভার

PR. 4-X53 BG

টক-ঝাল

চাল ডাল চিনি বস্ত্র ইন্ধন সবকিছুরই দর ঊর্ধ্বমুখী"—একটি সংবাদের শিরোনামা।—"সদাশয় সরকার বাহাদুর

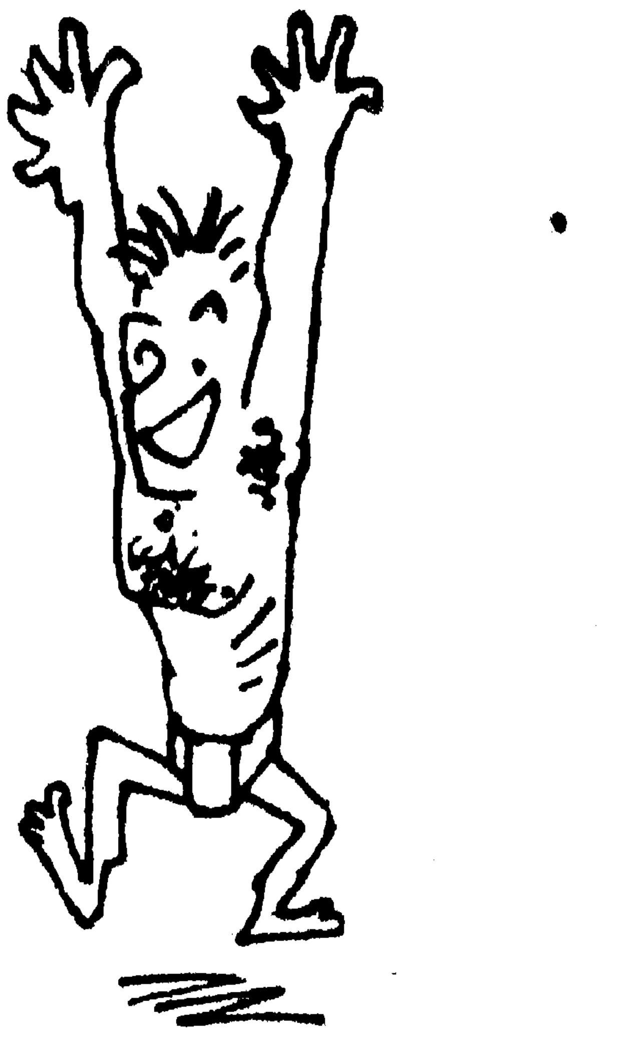

হয়ত জনসাধারণকে ঊর্ধ্ববাহু সন্ন্যাসীর ব্রতে দীক্ষিত করায় প্রয়াসী হয়েছেন"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

* * *

আসাম প্রসঙ্গে সংবাদ পরিবেশক প্রশ্ন করিতেছেন—"এখনো কি শনিব সব ঝুট হায়?" শ্যামলাল বলিল—"পাগল মেহের আলির মেহেরবাণী হলেই শুনবেন!"

* * *

ম্যাসাচুসেটের একটি বিচিত্র সংবাদে শুনিলাম, সেখানে দাঁতের রোগীদের ব্যথা হ্রাস করিবার জন্য সংগীতের সাহায্য

নেওয়া হইয়াছে এবং তাহাতে নাকি আংশিক ফললাভও হইয়াছে।—"সংগীতে দাঁতের ব্যথা সারে কিনা জানিনে কিন্তু অনেক সংগীতে মাথার ব্যথা বাড়ে, বিশ্বাস না হয় রেডিও খুলে বসে থেকে দেখবেন"—মন্তব্য করেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * *

কাশ্মীর ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী শেখ আব্দুল্লাকে ম্যাজিস্ট্রেট কতকগুলি প্রশ্ন করিলে আসামী নাকি বিরক্ত হন এবং প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করেন।—"হয়ত প্রশ্ন কঠিন ছিল কিংবা পাঠ্যতালিকার বহির্ভূত ছিল"—বলে শ্যামলাল।

* * *

বিদেশে নাকি এখন হেলি ট্যাক্সির ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই ট্যাক্সি উড়িতে পারে এবং বড় বড় দালানের ছাদে যাত্রী নামাইতে পারে।—"সুব্যবস্থা সন্দেহ নেই। কিন্তু হেলিট্যাক্সিওয়ালারা ডাকলে থামবে তো"—প্রশ্ন করে শ্যামলাল।

* * *

ক্যানাডার এক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে একদল দুর্বৃত্ত হানা দিয়া মহিলা খাজাঞ্চীর সামনে রিভলবার উঁচাইয়া ধরে। মহিলাটি তাঁর হাতের কলম রিভলবারের মুখে গুঁজিয়া দেওয়ায় তাহারা আর গুলি ছুঁড়িতে পারে না। আমাদের এক সহযাত্রী গুন গুন করিয়া গান ধরিলেন—"আপনার মান রাখিতে জননী, আপনি কলম ধর গো।"

* * *

একটি সংবাদে জানা গেল, চিকিৎসা বৃত্তিতে নাকি মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। খুড়ো বলিলেন—"নিশ্চয়ই আশার কথা। তবে এটা শেষ পর্যন্ত না "চিকিৎসা সংকট"-এর ভূমিকা হয়ে দাঁড়ায়!!"

* * *

পাকিস্তানের সঙ্গে খালের জল সংক্রান্ত বিরোধ অচিরেই মীমাংসা হইবে বলিয়া পর্যবেক্ষকদের ধারণা।—"আমরা তাহলে ধরে নিতে পারি, খালের জলে কুমীর চলাচল এখন আর নেই"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

"**দি**ন তার পড়ে কত" বিভাগে বর্ণিত ভদ্রলোক "রাগে গড়গড় করছেন—গোলমাল হলো আসামে তা বৌবাজারের, কি? আলু ফলে বেহারে, শাক ক্যানিং-এ তার দাম বাড়বে কেন? ইয়ার্কি, ইয়ার্কি পেয়েছ!" শ্যামলাল বলিল—"ইয়ার্কি নয়: এখান থেকে ছুঁড়লাম তীর, পড়ল গিয়ে কলাগাছে, হাঁটু বেয়ে রক্ত পড়ে, চোখ গেল রে বাবা—এ সম্ভব হয় বলেই আসামের গোলমালে ক্যানিং-এর শাকের দর বাড়ে"—বলে শ্যামলাল।

* * *

লোকসভায় কমিউনিস্ট পার্টির নেতা শ্রী এস এ ডাঙ্গের বিরুদ্ধে নাকি বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় আইন ভঙ্গের

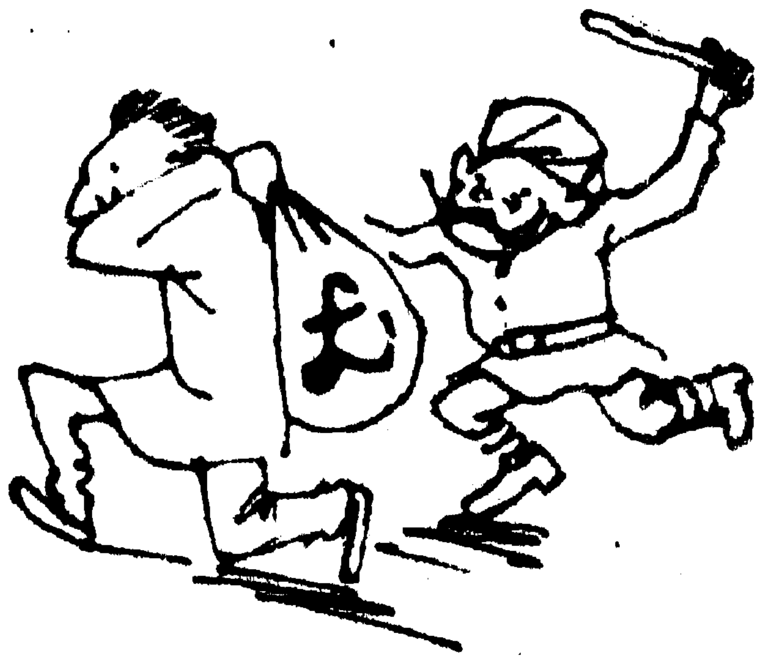

অভিযোগ আনা হইয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"ভরত নাট্যমের মুদ্রা তো এর চেয়ে অনেক উচ্চাঙ্গের ছিল!!"

* * *

পৌরসভা নাকি বিবেচনা করিতেছেন যে, পৌর তহবিলে সঞ্চিত ৫০ লক্ষ টাকা শতকরা চার টাকা হারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট ঋণস্বরূপ জমা রাখিলে কেমন হয়। পৌরসভার এই বিষয়বুদ্ধি দেখিয়া জনৈক সহযাত্রী সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন—"ছেলে নাকি বাঁচে না!!"

* * *

কলিকাতা গোয়েন্দা পুলিস সম্প্রতি এক ব্যক্তির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ১৫ পাউন্ড পরিমাণ পটাসিয়াম সায়েনাইড আটক করে। এই পরিমাণ বিষ নাকি কলিকাতার সকল লোকের প্রাণ সংহার করিতে পারে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"লোকটা মানবদরদী। খাদ্যে ও পানীয়ে তিলে তিলে যে-বিষ আমরা পান করছি এই কলকাতায়, তা থেকে চিরমুক্তির ব্যবস্থাই তিনি হয়ত করছিলেন। কিন্তু পুলিস যে এইসব মানবদরদের ধার ধারে না!!!"

কে. হোড়ের
কনক
পাউডার

জগদীশবাবুর গীতা

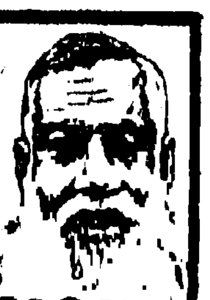

মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা অন্তঃ-রহস্য ভূমিকাসহ
অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়মূলক যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ৬·০০

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার শাস্ত্রীয় আলোচনা ৫·০০

ভারত-আত্মার বাণী ভারতের শাশ্বতবাণী বিশ্বমৈত্রীর কথা ৫·০০

শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১·৫০

কর্মবাণী ১·২৫

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী · ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

শালিমার সুপারল্যাক

সিন্থেটিক এনামেল দিয়ে

যেকোন জিনিস-ঝকঝকে-উজ্জ্বল রঙ করা যায়।

- এই সিন্থেটিক এনামেল রঙ তাড়াতাড়ি শুকোয়, শুকিয়ে শক্ত হয় ও খুব চকচকে উজ্জ্বল দেখায়।
- ঘরে বা বাইরে ব্যবহার করা যায়।
- বুরুশ দিয়ে, স্প্রে ক'রে বা এতে ডুবিয়ে লাগানো চলে।
- ৩৮ রকম রঙ, এক রঙের সঙ্গে অন্য রঙ মেশানো চলে।

TSPW 565R BEN

SHALIMAR PAINT, COLOUR & VARNISH CO., PRIVATE LTD.
Calcutta • Bombay • Madras • New Delhi • Kanpur

(ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে রপ্তানীকারী)

'তা রঙিন পরলামই বা! শিক্ষিকা বলে আমি কি ঠাকুমা?'

'না, না, এখন আর আপনি শিক্ষিকাই বা কোথায়? আপনি তো এখন ছাত্রী।'

'ছাত্রী?'

'হ্যাঁ, পাঠশালার ছাত্রী।'

'পাঠশালার? কোন পাঠশালার?

'প্রেমের পাঠশালার।'

'তার মানে প্রমোশন আর পাচ্ছি না। প্রাইমারি সেকশানেই পড়ে আছি।'

'তবে অপেক্ষা করে থাকতে পারলে কী হয় বলা যায় না।' আশ্বাসভরা চোখে তাকাল সুকান্ত।

'কিছুই বলা যায় না।' সায় দিল বিনতা। 'হ্যাঁ, জোর করে কিছু হবার নয়। রাতারাতিই আর ফুল ফোটে না।'

হাঁটছে দুজনে।

'বা, ফুল তো রাতারাতিই ফোটে।' বললে সুকান্ত। 'যদি গাছ তৈরি থাকে। বলতে পারেন গাছই রাতারাতি তৈরি হয় না। গাছ তৈরি হলে অস্থি বল্কল ফল পুষ্প ভস্ম নির্যাস সব তৈরি।'

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?' জিজ্ঞেস করল বিনতা।

'জানি না।'

ভিড় কাটিয়ে-কাটিয়ে যেতে হচ্ছে।

'আমাকে খবর দিলে আমিই তো যেতে পারতাম আপনার হোস্টেলে।' ভিড়ের ঠেলায় দূরে ছিটকে গিয়েছিল, আবার কাছে সরে এসে বিনতা বললে।

'সে তো এখনো যেতে পারেন। কিন্তু বারে বারে একই পরিবেশ ভালো লাগে না। বলুন, লাগে?'

'না, লাগে না। বেশও বদলাতে হয়, পরিবেশও বদলাতে হয়। তাতেই বিচিত্রের বাজনা। আকাশে কখনো সাদা কখনো নীল কখনো কালো। কখনো তারা কখনো বিদ্যুৎ কখনো রামধনু।'

ভিড়ের মধ্যে কি কথা জমে?

মোড়ের মাথায় ট্যাক্সি পাওয়া গেল।

উঠল দুজনে। বসল পাশাপাশি। কাটল অনেকক্ষণ নির্বোধ স্তব্ধতায়।

মনে হচ্ছে ট্যাক্সিতেও জমছে না। কী যেন কী একটা নেই। কিংবা কী যেন একটু বেশি থাকার জন্যে কেটে যাচ্ছে। ছবিতে কোথায় যেন রঙ পড়েনি, কিংবা কে জানে রঙটা বোধ হয় বেশি উচ্চস্বর।

ফাঁকায়-ফাঁকায় আলিপুর-খিদিরপুর ঘুরলে কি সুর আসবে? কিংবা হ্রদে-নদীতে? লেকে-গঙ্গায়?

'আপনি তো ছেড়ে দিয়েছিলেন, আবার এলেন কেন?' জিজ্ঞেস করল সুকান্ত।

'ছেড়ে দিয়েছিলাম মানে?'

'বা, সেই যে চলে গেলেন আমার চাকরি নেই শুনে—'

'চাকরি নেই শুনে? একদম বাজে কথা।'

'বা, ক্যাডাকোটির চলে যাননি সেদিন?'

'না গিয়ে করি কী! আপনি নিজেই বললেন, চাকরি থেকে আপনাকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। আপনি মুখ ম্লান করে বসে আছেন। কিরকম ভগ্ন রুগ্ন বিধ্বস্ত চেহারা আপনার। সেই শোকের মুহূর্তে সব কিছু বিস্বাদ লাগতে বাধ্য। তাই না ফিরে করি কী! নইলে সেদিন কত আশা করে গিয়েছিলাম আপনার কাছে—'

'জানেন আমার চাকরি আবার হয়েছে।'

'জানি।'

'কী করে জানলেন? কে বললে?'

'কে আবার বলবে! হাওয়াতে কান পেতে থাকলেই শোনা যায়। আমি আপনাতে ইনটারেস্টেড—আপনার খবরে স্বভাবতই আমার আগ্রহ।'

'তাই বুঝি আবার আমার দরজায় আপনার সদয় পদার্পণ হল।'

'মোটেই তার জন্যে নয়। আপনাকে ছাড়লাম কবে যে ফিরলাম বলছেন? তা ছাড়া আপনার বর্তমান চাকরিতে মাইনেটা তো কম।'

'তাও জানেন?'

'শুনেছি।'

'আর এ শোনেননি যে, কদিন বাদেই সিলেকশান কমিটির সামনে আমার ভাইভা-ভোসি টেস্ট হবে। সে টেস্টে যদি উতরোই তা হলে সুপিরিয়র গ্রেডটা পেয়ে যাব। শোনেননি সেটা?'

শুনিনি তো।' ঢোঁক গিলল বিনতা। 'যদি উতরোতে না পারেন?'

'তা হলে, হে বন্ধু বিদায়।'

'বন্ধু কে? আমি?'

'না, চাকরি। হে চাকরি, বিদায়।'

শুধু চাকরি-বাকরির ইনটারভিয়ুর কথা। অন্য কত কথা কত স্তব্ধতা আছে সংসারে। সেসব পাখিরা কোথায়? কোন্ দেশে উড়ে পালাল ঝাঁক বেঁধে? কোন্ দিগন্তে?

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'চলুন পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলে, গাড়িটা ছেড়ে দিয়ে হাঁটি।'

'তাই চলুন।' তা হলে যেন একটা অস্বস্তি থেকে বিনতাও রেহাই পায় এমনি চাঞ্চল্যে বলে উঠল।

কিন্তু সেই অল্প-অল্প আলো গা-ছমছম নিভৃতিতেও কোনো কথা কেউ কুড়িয়ে পেল না।

'এই সম্পর্কটাই তো মধুর।' বললে সুকান্ত।

'কোনটা? এই একসঙ্গে পা মিলিয়ে মিলিয়ে হাঁটা?'

'হ্যাঁ, এই সহচরণ।'

'তা আর বলতে। কিন্তু পথ যদি দীর্ঘ হয়? যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়েও বেশি হয়? দীর্ঘতর হয়?'

'হোক। শনৈঃ পন্থা শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পর্বত লঙ্ঘনম।'

কিন্তু পথ শেষ হবার আগেই যদি ক্লান্ত হয়ে ঢলে পড়ি আর যদি সহচর সপ্রেমে দু বাহুতে তুলে নেন?'

'তা হলে সেই তো পর্বত লঙ্ঘন। সেই তো মধুরেণ সমাপয়েৎ।'

যে যা বলতে চেয়েছিল কিছুই যেন বলতে পারল না। সুকান্ত বলতে চেয়েছিল, পথে যেতে-যেতে ভালোবাসা যদি জাগে—আর, ভালোবাসা জাগাবার জন্যেই পথ হাঁটা—তা হলে সেই জাগরমুহূর্তেই তো অর্পণ-প্রাপন। আর বিনতা চেয়েছিল বলতে, যদি পথের কোনো ক্লান্ত বিন্দুতে অর্পণ-প্রাপন ঘটে যায়, তা হলে সেই তো ভালোবাসা।

তা হলে দুটোর একটা আসুক। হয় ক্লান্তি, নয় প্রেম।

ইঁটপুরী
পেরিয়ে
চলো আসি বেড়িয়ে

'পায়ে-হাঁটা-পথ—এ-পথে আছে আনন্দ, আছে স্বাস্থ্য', বলেছেন চার্লস্ ডিকেনস্। 'আমার মতে আয়ুবৃদ্ধির এর চেয়ে প্রশস্ত পথ আর নেই। অভ্যস্ত পথচারীর সন্ধানে এমন বৃদ্ধ অনেকেই আছেন যাঁরা জরাকে জয় করেছেন পায়ে হেঁটে—উত্তর সত্তর অথবা আশী হয়েও যাঁরা যুবকের মতো তেজীয়ান।'

Bata

বাটা সু কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড

কিন্তু পারল কি একে-অন্যের কাছে বাজতে সেই ইশারায়? যেন সমস্তই স্থূল হয়ে গেল।

'চলুন কাছেই চীনে হোটেল আছে। কিছু খাই।' চলতে-চলতে বললে সুকান্ত।

বীরেশ্বর ভট্টাচার্যের
মহাভারতের গল্পগুচ্ছ
তারাপদ রাহার—
ছোটদের বেতাল পঞ্চবিংশতি
পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর
ছোটদের আরব্য উপন্যাস
এ. কে. সরকার এণ্ড কোং
কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা-১২

অবধূতের
বিস্ময়কর রচনা
শুভায় ভবতু
পাঁচ টাকা
দুরি বৌদি
চার টাকা
...সব থেকে চিত্তাকর্ষক সম্পদ অবধূতের রচনাভঙ্গির অনবদ্য স্টাইল।...তাঁর 'শুভায় ভবতু' এবং 'দুরি বৌদি' সেই পর্যায়েরই দুটি রসোত্তীর্ণ উপন্যাস। —যুগান্তর।
মিত্রালয়
১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
(সি ৬৮৬২/৪)

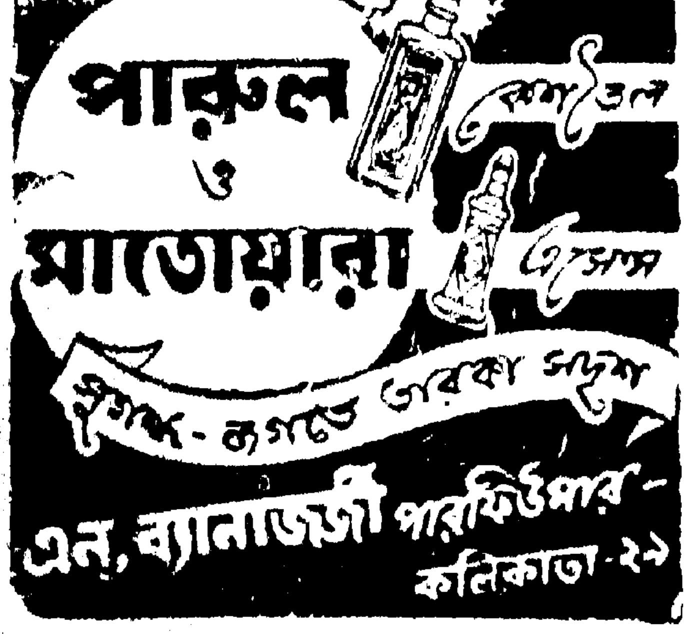

'তাই চলুন। বড্ড খিদে পেয়েছে।'

'খিদে পেয়েছে?'

'হ্যাঁ, হস্টেলে তখন খেতে দিলেন কই? টেনে বার করে নিয়ে এলেন।'

'তা এতক্ষণ বলেননি কেন? পেটে খিদে মুখে লাজ এখনো?'

'সেই তো ট্র্যাজেডি।'

খেতেও ভালো লাগল না। কী যেন মশলা বাদ পড়েছে রান্নায়। কী যেন সুগন্ধটি খোয়া গেছে। কী যেন সুরটি এসে লাগছে না খিদেতে।

সত্যিই খুব খিদে পেয়েছে বিনতার। দেখে সুকান্তর মায়া হল।

'ইচ্ছে করছে হাত দিয়ে মেখে খাই।' করুণ চোখে তাকাল বিনতা।

'একদিন আমার হোটেলে আপনাকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াব।'

'সত্যি?' খুশিভরা চোখে বিনতা তাকাল। 'খুচরোখাচরা খাওয়া নয়, পুরোপুরি খাওয়া। মানে ভাত খাওয়া। খুচ খুচ করে কেটে-গেঁথে খাওয়া নয়, হাত দিয়ে মেখে গরস পাকিয়ে খাওয়া।'

'নিশ্চয়ই। নইলে নেমন্তন্ন কী।'

'ভাজা থেকে শুরু, দইয়ে-মিষ্টিতে শেষ। দেখছেন তো আমার খিদে।'

'খাবার পরে পান না?'

'নিশ্চয়ই, মুখভরা পান। নইলে কি মশলা? দুটো সুপুরির কুচো আর কটা এলাচদানা? মুখভর্তি পান না হলে আর নেমন্তন্ন কী? আর শুনুন, নেমন্তন্ন কিন্তু রাত্রে।'

'তা আর বলতে।'

'আর, শুনুন, সন্ধের দিকে যাব আর অনেকক্ষণ থাকব।'

সুর বুঝি আবার কেটে গেল।

কিংবা সুর বুঝি এবার জোর করেই কাটিয়ে দিতে হয়। সুর কাটিয়ে দিলেই যদি সুর বাজে। তার ছিঁড়ে গেলেই যদি ঝংকার ওঠে।

বাস'এই ফিরে গেল বিনতা। সুকান্ত ট্যাক্সি নিল। ড্রাইভার বললে, কোথায়?

উত্তর দিল না। সুকান্ত সিগারেট ধরাল।

ড্রাইভার ভাবল গন্তব্যস্থান জিজ্ঞেস করাটা ঠিক হচ্ছে না। নাকবরাবরই গাড়ি চালাল।

কতক্ষণ পরে তন্দ্রার মধ্য থেকে বলে উঠল সুকান্ত, 'কোথাও যেতে হবে না। ফাঁকায়-ফাঁকায় ঘোরো খানিকক্ষণ।'

ফাঁকায় ফাঁকায় ঘুরবে তো সঙ্গের লোক কই? কত রকম মজার লোকই যে ওঠে ট্যাক্সিতে।

হোটেলে ফিরে এসে আলো নিবিয়ে বাস বিছানাতেই শুয়ে পড়ল সুকান্ত। চাকরেরও এসে কিছু বিরক্ত করবার দরকার নেই, দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। না, ভয় কী, আজকেই তো আর বিনতার নেমন্তন্ন নয়।

চারদিকে স্তূপীকৃত জঞ্জাল, বিশৃঙ্খলা—মশারিটা পর্যন্ত খাটানো নেই। ডাইং ক্লিনিং থেকে আসা আর ডাইং ক্লিনিংএ যাব-যাব সব কাপড়চোপড় বুঝি তালগোল পাকিয়ে আছে। সিগারেটের ছাই গাদা হয়ে আছে কদিন থেকে। কাগজপত্র সব এলোমেলো, ছত্রখান। চাকরটাকে ডেকে যে সব মজুত করবে যেন তার স্পৃহা নেই। দিন কেটে যাচ্ছে যাক। যখন যেটুকু দরকার তখন সেটুকু হাতের কাছে পেলেই হল। যাকে দরকার নেই, সে থাক বিস্মৃতির জঞ্জালে।

চায়ের একটা পেয়ালা-পিরিচ বুঝি মেঝের উপর নামানো ছিল, নেয়নি চাকর। আর ইঁদুর বুঝি এখন সে দুটোর উপর হামলা করেছে।

শব্দ হতেই চমকে উঠল সুকান্ত।

কেউ এল নাকি ঘরে?

একটা কী গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না? ফুলের গন্ধ কি, না, শরীরের? না কি মৃগনাভির সৌরভ? কোন এক তপ্ত ঘনিষ্ঠতার মুহূর্তে যে সৌরভ সুকান্তর পরিচিত ছিল এ যেন তাই। কেউ কি ঘরের মধ্যে নড়ছে-চড়ছে? আস্ত মানুষ, না, কি শুধু দুখানি হাত? সে হাত কি ঘরের সমস্ত আবর্জনা ক্ষিপ্র লালিত্যে দূর করে দিচ্ছে, সংশোধন করছে সমস্ত অনিয়ম? সে হাত কি আরো এগিয়ে আসছে? তার কপালের উপর বসে গলে-গলে পড়ছে?

সে হাত কি বিনতার?

স্বপ্ন দেখছিল বুঝি, ধড়মড় করে উঠে বসল সুকান্ত। ভোর হয়ে গেছে। ঘরময় বিশৃঙ্খলা তার দিকে চেয়ে হাসছে তার নৈষ্ফল্যে।

আজ বেশেবাসে কোনো বিচ্যুতি রাখতে দেবে না সুকান্ত। আজ কেতাদুরস্ত সরকারী পোশাক পরবে। আধাখেঁচড়া কিছু নয়, পুরো সাহেবী পোশাক। আজকে আপিসে তার ইনটারভিয়ু।

সিলেকশান কমিটিতে দুজন উঁচু দাঁড়ের অফিসার। আর কজন মেয়ে-কেরানীর কেসও বিবেচিত হবে বলে কাকলিকেও নেয়া হয়েছে কমিটিতে। সে অফিসরদের সাহায্য করবে। প্রাথমিক কাগজপত্র সেই দেখে রেখেছে। লালনীল পেন্সিলে রেখেছে দাগিয়ে।

বর্ণানুক্রমিক ডাকা হচ্ছে নাম। পদবীর বর্ণ।

গোড়ার দিকেই ডাক পড়ল সুকান্তর।

'ডাকো বসু সুকান্তকুমার।'

ঘরে ঢুকে সুকান্ত নমস্কার করল। তিন-জনকেই এক নমস্কার।

তা করুক। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল। যতক্ষণ না টেবিলের ওপার থেকে ইঙ্গিত হচ্ছে ততক্ষণ সে বসতে পারছে না। ভদ্র নম্র হয়ে সমীচীন ভঙ্গিতে থাকতে হচ্ছে দাঁড়িয়ে।

কাকলিই বললে, 'বসুন।'

এ কাকলির কথা নয়, এ কমিটির নির্দেশ। সুকান্ত বসল। (ক্রমশ)

পুস্তক পরিচয়

ছোট গল্প

সসেমিরা—শ র দি ন্দ, বন্দ্যোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিমিটেড। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা-৯। তিন টাকা।

শরদিন্দ, বন্দ্যোপাধ্যায় এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ রহস্য-কাহিনী লেখক। তাঁর ব্যোম-কেশের কাহিনী মধ্যে কৌতূহলরস সৃষ্টির যে আদর্শ বর্তমানে তার জুড়ি মেলা ভার। তাঁর গল্পের রহস্যঘন পরিবেশ পাঠকমনকে শেষ পর্যন্ত রহস্য-রোমাঞ্চকর নানা ভাব ও ভাবনার দোলায় আকৃষ্ট করে। 'সসেমিরা'য় মোট তিনটি গল্প আছে ঃ মণিমণ্ডন; অমৃতের মৃত্যু; শৈলরহস্য। বিশেষ করে 'অমৃতের মৃত্যু এবং শৈলরহস্যে'র রহস্য-ঘন পরিবেশ, ব্যোমকেশে সাসপেন্স, প্লট-নির্বাচন বৈশিষ্ট্য এবং আঙ্গিক শিল্প-সুষমার দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নামকরণের বৈশিষ্ট্যটিও লক্ষ্যনীয়।

২২৬।৬০

মানসী। নির্মলেন্দু ঘোষ। কল্পনা প্রেস অ্যাণ্ড পাবলিশার্স। ১৮, বাবুরাম শীল লেন, কলিকাতা—১২। দাম দুই টাকা।

বারটি ছোট গল্পের সংকলন। ভাষার দৈন্য, ভাব এবং ভাষার সমন্বয়ের অভাব এবং মননশীলতার স্বল্পতার ফলে কোন গল্পই সাহিত্য পর্যায়ভুক্ত হতে পারেনি। একমাত্র "অনুরাধা" গল্পটিতে কিছু কিছু সাহিত্যের ছাপ আছে। গল্পটি অত্যন্ত যুগোপযোগী এবং বেশ সাবলীল ভাষায় বলা হয়েছে। ছাপার ভুল আছে কয়েকটি, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট অচল। ৪৪।৬০

ইতি-উতি। শ্রী ধর্মদাস। প্রকাশক শ্রীরাইরানী মুখার্জি, ৫ নফর দাস রোড, কলিকাতা—৩৪। দাম দু টাকা।

লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সমষ্টি এই . পুস্তকটি সাহিত্য ক্ষেত্রে নবাগত লেখকের সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের পরিচয় দিলেও সাহিত্য পর্যায়ভুক্ত হতে পারেনি। বাংলা গদ্যের একটা নিজস্ব ছন্দ আছে, বৈশিষ্ট্য আছে। এ-পুস্তকে দুয়েরই একান্ত অভাব। লেখকের নিজের চিন্তাধারা প্রকাশ করার মত মনশীয়ানার স্বল্পতা, তাঁর স্টাইলের মধ্যেই সুস্পষ্ট। ক্রিয়া পদগুলিকে তিনি

সবেমাত্র প্রকাশিত হয়েছে

বাংলাসাহিত্যের রসিক পাঠক ও ছাত্রসমাজের অপরিহার্য গ্রন্থ ঃ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাসাহিত্যের অধ্যাপক

ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের

গীতি-কবি শ্রীমধুসূদন ৫-০০

'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য' ও 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' অবলম্বনে মধুসূদনের গীতি-কবি প্রতিভার তথ্যসমৃদ্ধ, সুগভীর ও সূক্ষ্ম আলোচনা।

কল্লোল প্রকাশনী,
এ-১৩৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২

রবীন্দ্র-রচনাবলী

॥ এখন সব-কয়টি খণ্ডই পাওয়া যাচ্ছে ॥

মোট ২৬ খণ্ডের মধ্যে সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত ছয়টি খণ্ডের দাম কাগজের মূল্যবৃদ্ধির হেতু স্বতন্ত্র হারে নির্ধারিত হল।

কাগজের মলাট

খণ্ড ৯ ১০ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ প্রতিটি ৯৲।
অন্যান্য খণ্ড পূর্ববৎ ৮৲।

বিশ্বভারতী

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন । কলিকাতা ৭

অপরাজেয় কথাসাহিত্যিক **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের**
সদ্যপ্রকাশিত সর্বশেষ উপন্যাস

শান্তিলতা ২৷৷০

স্বর্গত লেখকের সাহিত্য সাধনার সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি হিসাবে এই বইটি বাংলা দেশের ঘরে সমাদৃত হবে,—সেকথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

..........................আরও কয়েকটি বিখ্যাত উপন্যাস.................. ....

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঃ **হরফ** ৪৲, **মাশুল** ৩৷৷৹, **পাশাপাশি** ৩৷৷৹, **নাগপাশ** ৩৲, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঃ **আবার নদী বয়** ৩৷৹, শক্তিপদ রাজগুরুর ঃ **মেঘে ঢাকা তারা** ৪৷৷৹, **দেবাংশী** ৩৲, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের ঃ **অবরোধ** ৩৲, **বনকপোতী** ৩৷৹, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **পঙ্কজা** ৩৲, পৃথ্বীশ ভট্টাচার্যের ঃ **সোনার পুতুল** ৩৷৷৹, মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঃ **আধুনিকা** ৩৷৷৹, নীহার গুপ্তের ঃ **রক্তের টেক্কা** ৪৷৷৹, ॥ আলোচনা গ্রন্থ ॥ ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের ঃ **উপমা কালিদাসস্য** ৩৲, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ঃ **পুরানো প্রশ্ন আর নতুন পৃথিবী** ৩৲

সাহিত্য জগৎ — ২০৩/৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

স্বামী নিত্যাত্মানন্দজীর
শ্রীম-দর্শন
শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ শ্রীমর অপূর্ব কথোপকথন। ঠাকুর ও মায়ের নূতন কথা। কথামৃতের ব্যাখ্যা। বহু-প্রতীক্ষিত এই প্রকাশ। ৫·০০।
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী,
১৫, কলেজ স্কয়ার, কলিঃ১২

পদ্যের মত করে যেখানে-সেখানে বসিয়ে দিয়েছেন, যেমন—"এ সময়ে ওদের নিরাশ করে বিপদে ফেলা হবে অন্যায়।" পদ্যেরও যে একটা ছন্দ আছে এবং পদ্যের সংগে এইজন্যই যে তার তফাত, এটা না জেনেই গদ্য রচনায় হাত দেওয়া দুঃসাহসিকতার নামান্তর মাত্র। পদ্যের ছন্দে গদ্য রচনা করা সাধারণ লেখকের কর্ম নয়। বইটির দাম আরো কম হওয়া উচিত ছিল।

৪৩৫।৫৯

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ

পাশ্চাত্যের সর্বাধিক বিক্রীত (বাইবেল বাদে) দু'খানি বই। মনোবিৎ ও মনীষী ডেল কার্ণেগির মহৎ সাহিত্য-কর্ম। মানবজীবনের মহামন্ত্র, অনুপ্রেরণা ও প্রাণশক্তির অফুরন্ত উৎসধারা। বাংলায় এই প্রথম। উপন্যাসের মতোই চিত্তাকর্ষক বহু তথ্য ও কাহিনী।

প্রতিপত্তি ও বন্ধুলাভ
How to win friends & influence people.

দুশ্চিন্তাহীন নতুন জীবন
How to stop worrying & start living.

শিল্পপতি - মহাজন - ব্যবসায়ী - ছাত্র - শিক্ষক - লেখক - চাকুরীজীবী - চিকিৎসক - ব্যবহারজীবী - এমন কোন মানুষ নেই যাঁর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার প্রতি পদক্ষেপে এই বই দুখানি সাহায্য না করবে। দাম যথাক্রমে সাড়ে চার ও সাড়ে পাঁচ টাকা।

একমাত্র পরিবেশক: **পত্রিকা সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিঃ**
১২।১, লিন্ডসে স্ট্রীট, কলিঃ-১৬। শাখা: দিল্লী - বোম্বাই - মাদ্রাজ।

— সবেমাত্র প্রকাশিত হইল —
কৈশোর হইতে যৌবনকাল পর্যন্ত নারী-জীবনের এক বিচিত্র রহস্যময় অধ্যায়
সেই সর্বনাশা সন্ধিক্ষণের পটভূমিকায় লেখা চাঞ্চল্যকর উপন্যাস
স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

তৃতীয় নয়ন

দাম — ৪·৫০

— অন্যান্য উপন্যাস —

॥ প্রবোধকুমার সান্যাল ॥ প্রিয় বান্ধবী ৪৲
॥ পঞ্চানন ঘোষাল ॥ মুণ্ডহীন দেহ ৩·২৫
॥ প্রফুল্ল রায় ॥ নোনা জল মিঠে মাটি ৮·৫০
॥ সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ॥ নীলকণ্ঠী ৫৲
॥ অনুরূপা দেবী ॥ গরীবের মেয়ে ৪·৫০
॥ শক্তিপদ রাজগুরু ॥ কেউ ফেরে নাই ৭·৫০ মণিবেগম (২য় সং) ৬৲ কাজল গাঁয়ের কাহিনী ৪·৫০
॥ বনফুল ॥ পিতামহ ৬৲ নঞতৎপুরুষ ৩৲
॥ মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ স্বয়ংসিদ্ধা ৩৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

কবিতা সংকলন

পন্ত: কবিতা সংকলন—পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতির শ্রীরেবতীরঞ্জন সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা—২৬। মূল্য ২·৭৫ নঃ পঃ।

হিন্দী সাহিত্যের অন্যতম অগ্রণী কবি শ্রীসুমিত্রানন্দন পন্তের ষষ্ঠিতম জন্মদিবস উপলক্ষে উপরোক্ত পদ্যানুবাদ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। বাঙলা দেশের যে দশজন খ্যাতিমান কবি পন্তজীর ৩৭টি কবিতার অনুবাদ করেছেন তাঁদের প্রত্যেকের স্বরচিত কবিতার সংগে আমাদের বিশেষ পরিচয় আছে। তাঁদের এই পদ্যানুবাদ পাঠে মনে হল, তাঁরা যদি অনুবাদের স্বার্থে ছন্দ, অন্ত্যমিল এবং ভাবের বিন্যাস ব্যাপারে পুরোপুরি মূলানুসরণ না করতেন তাহলে তাঁদের অনুবাদ পদ্য না হয়ে কবিতায় উত্তীর্ণ হতে পারতো। পন্তজীর মূল কবিতার সংগে পরিচয় থাকায় একথা স্বীকার করছি যে, হিন্দী ভাষার দৈন্যের জন্যে তাঁর কবিতাও গতানুগতিকতার মধ্যে আবদ্ধ। তাছাড়া, তাঁর কাব্যেও সেই প্রথাগত প্রশস্তি এবং দেশাত্মবোধের নামে দেশনায়কদের প্রতি উচ্ছ্বাসবাণী রয়েছে। জীবনের গভীরতার দিকে তাঁর কাব্যের যোগ সামান্যই। এইসব কারণে মূল বাঙলা কবিতার পাশাপাশি অনূদিত তাঁর কবিতাগুলি সাধারণ পাঠককে কতখানি আনন্দ দিতে পারবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। অনুবাদকদের মধ্যে হরপ্রসাদ মিত্র, দিনেশ দাস, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্থানে স্থানে মারাত্মক রকমের বানান ভুল লক্ষ্য করা গেল। এমন কি অনুবাদক কবিদের নামও যথাযথ ছাপা হয়নি।

২৪৯।৬০

যেদিন ফুটলো বিয়ের ফুল। বিবি। এম সি সরকার এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ। ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি—১২। আড়াই টাকা।

একটি নিটোল রোমান্টিক কাহিনী পদ্যের মধ্য দিয়ে পরিবেশিত হয়েছে। নিখিলেশ রায় আর ললিতা চট্টোপাধ্যায়কে ঘিরে লেখকের কাহিনী-কাব্য গড়ে উঠেছে। বিয়ের আগে প্রেমের অভিজ্ঞতা এবং পরে বিয়ের সূচনা পদ্যের তরংগ-ভংগীতে রসময় হয়ে উঠেছে। ছদ্মনামধারী রচয়িতার বর্ণনা ও বলার ভংগী ভালই। প্রচ্ছদ মনোরম এবং বিবাহোপযোগী।

১৭৭।৬০

পদ্মা স্রোতের ভাটিয়ালি—দীনেন্দ্র সরকার। ম্যানকাইন্ড, ৫১-বি, রাসবিহারী এভিন্যু, কলকাতা—২৬। ১·৫০ নঃ পঃ।

'পদ্মা স্রোতের ভাটিয়ালি'র কবি বাংলা কাব্যের আসরে নবাগত। বর্তমান কাব্যগ্রন্থখানি সম্ভবত তাঁর প্রথম প্রয়াস। 'তারবাঁধা, পটভূমি, কাহিনী এবং সমাপ্তি' মোট এই চারটি পর্বে তিনি 'পদ্মা স্রোতের ভাটিয়ালি'র সুর বেঁধেছেন। পদ্মাপারের স্মৃতি হয়ে থাকা হাসি আনন্দ হর্ষ বিষাদময় সে সুর বর্তমান কাব্যগ্রন্থের মধ্যে এক আশ্চর্য রূপলাভ করেছে; তাঁর কাব্য পাঠে একটি সহজ কবিমন এবং আন্তরিকতা আবিষ্কার করা যায়। প্রধানত আবেগ নির্ভর হলেও দীনেন্দ্র সরকারের বর্তমান কাব্য-কাহিনীর মধ্যে যে মাটি-মায়ার টান, গ্রামীণ সংস্কৃতি ও দেশজ সংস্কৃতির প্রতি আস্থা প্রকাশিত, তা প্রশংসার্হ। আঙ্গিকে যথেষ্ট আধুনিক না হলেও, তথাকথিত দুর্বোধ্যতাকে এড়িয়ে সহজ হবার চেষ্টাতেই তাঁর সার্থকতা; তবে বিশেষ করে ছন্দ প্রসঙ্গে কবিকে আরো মনোযোগী হতে অনুরোধ জানাই।

২১৯।৬০,

উপন্যাস

সূর্যতামসী—অজয় দাশগুপ্ত। প্রকাশক—ইমপ্রেশন, ২০।১ রামচাঁদ ঘোষ লেন, কলকাতা-৬। দাম—২, টাকা।

সূর্যতামসী নতুন আঙ্গিকে লেখা একটি পারিবারিক উপন্যাস। উপন্যাসের প্রধান তিনটি চরিত্র তিন বোন—বাসনা, সুমনা, কুন্দনা। তিনজনই প্রাপ্তবয়স্কা এবং কুমারী। সকাল, দুপুর ও রাত্রির ব্যস্ততা ও অলসতায় তিন বোনের চিন্তাসূত্র সমন্বিত হয়ে গড়ে তুলেছে এই উপন্যাসের কাহিনী। বড় বোন প্রেমে ব্যর্থ হয়ে উন্মাদ, মেজো প্রেমের অস্থিরতায় বিষণ্ন, আর ছোট নতুন প্রেমের স্পর্শে গুঞ্জনমুখর। কিন্তু সব মিলিয়ে রচনাটি বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি পারিবারিক ঘটনার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। ঘুরে-ফিরে লেখক একই কেন্দ্রবিন্দুতে এসে আত্মস্থ হয়েছেন। ফলে কাহিনীর চরিত্র-কয়টি প্রারম্ভে যেখানে ছিল, শেষেও সেখানেই থেকে গেছে। হতে পারে লেখক আধুনিককালের একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের চিত্র আঁকতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এ-কাহিনী ছোটগল্প নয়, ঘটনার প্রবহমানতায় ও ব্যাপ্তিতেই উপন্যাস রূপায়িত হয়ে ওঠে, লেখকের এই সাধারণ সূত্রটিকে মনে রাখা উচিত ছিল।

রচনাভঙ্গী সুন্দর। লেখার সাবলীলতার গুণে খণ্ড খণ্ডভাবে চরিত্রগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু চিন্তাসূত্র

সেরা লেখক! সেরা বই!!

॥ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

পথের পাঁচালী ৫॥৹ দেবযান ৫, গল্প-পঞ্চাশৎ ৮॥৹ মেঘমল্লার ৩॥৹ শ্রেষ্ঠ গল্প ৫, আরণ্যক ৫, যাত্রাবদল ২।৹ কিন্নরদল ২॥৹ আদর্শ হিন্দু হোটেল ৪॥৹ ঐনাটক ২, মুখোশ ও মুখশ্রী ৩।৹ কুশলপাহাড়ী ৪॥৹ উৎকর্ণ ৪,

॥ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

উত্তরায়ণ ৫॥৹ কৈশোর স্মৃতি ৪, অভিযান ৬, কবি ৪, প্রিয় গল্প ৫, না ২॥৹ প্রতিধ্বনি ৩, বিংশশতাব্দী ২॥৹ সন্দীপন পাঠশালা ৪॥৹ স্থলপদ্ম ২৬৹ দিল্লীকা লাড্ডু ২।৹

॥ প্রবোধকুমার সান্যাল ॥

অরণ্যপথ ৩॥৹ আঁকাবাঁকা ৫, আগ্নেয়গিরি ২॥৹ উত্তরকাল ৪, জলকল্লোল ৫, তুচ্ছ ৪, দেশদেশান্তর ৩॥৹ বন্যাসঙ্গিনী ৩, বেলোয়ারী ৭, মধুচাঁদের মাস ২৬৹

॥ নীহাররঞ্জন গুপ্ত ॥

অস্তি ভাগীরথী তীরে ৭॥৹ উত্তরফাল্গুনী ৬॥৹ ঘুম নেই ৪॥৹ কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী ৬, কালোভ্রমর ৫, নীলতারা ৪॥৹ নূপুর ৩৬৹ মায়ামৃগ ২॥৹ হীরা চুনি পান্না ৪॥৹ মধুমিতা (যন্ত্রস্থ)

॥ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ॥

নবনায়িকা ৩॥৹ পঞ্চতপা ৬॥৹ সমুদ্র সফেন ৪॥৹ সাত পাকে বাঁধা ৪॥৹

॥ প্রমথনাথ বিশী ॥

কেরী সাহেবের মুন্সী ৮॥৹ নিকৃষ্ট গল্প ৫, ভূতপূর্ব স্বামী ২, মাইকেল মধুসূদন ৪, রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহ ১ম ও ২য় ৪, ৪, রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প ৪, গল্প-পঞ্চাশৎ (যন্ত্রস্থ)

॥ অবধূত ॥

মরুতীর্থ হিংলাজ ৫, উদ্ধারণপুরের ঘাট ৪॥৹ বহুব্রীহি ৪॥৹ বশীকরণ ৪॥৹ দুইতারা ২॥৹ দুর্গমপন্থা (যন্ত্রস্থ)

॥ আশাপূর্ণা দেবী ॥

অগ্নিপরীক্ষা ৩॥৹ বলয়গ্রাস ৪, নির্জন পৃথিবী ৪, ছাড়পত্র ৪॥৹ শ্রেষ্ঠ গল্প ৫, গল্প-পঞ্চাশৎ ৮,

মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা ১২

যতীশ চট্টোপাধ্যায়ের অভিনব অবদান

মৃত্যুশোক অমর প্রেমের অনবদ্য কাহিনী, অখিল মানব মনের অনুদ্ঘাটিত চিত্র; তাপিত জীবনের শান্তিদূত। মূল্য ১, ডাক ফ্রি। ভি পি হয় না।
মনীষা তীর্থ, প্রীতিনগর, নদীয়া।
(সি-৭০৯৩।১)

BUY THE BEST
HIGHLY APPRECIATED
SAMSAD ANGLO-BENGALI DICTIONARY
1672 PAGES • Rs. 12·50 n. P.
SAHITYA SAMSAD
32 A, ACHARYA PRAFULLA CH. RD. • CAL-9

প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অভিনব উপন্যাস
॥ মাটির টানে ॥
(আড়াই টাকা)
নিজে পড়বার এবং প্রিয়জনকে উপহার দেওয়ার মত বই
প্রাপ্তব্য
ডি এম লাইব্রেরী, সরোজিনী লাইব্রেরী, বরেন্দ্র লাইব্রেরী ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়সমূহে
(সি ৭০৯৭)

বিশেষ সমালোচনা-সংখ্যা
পরিচয়
॥ দাম ঃ এক টাকা পঁচিশ নঃ পঃ ॥
শ্রাবণ মাসে পরিচয় ত্রিংশতিতম বর্ষে পদার্পণ করিল। এতদুপলক্ষে একটি বিশেষ সমালোচনা-সংখ্যা প্রকাশিত হল। সম্প্রতিকালে প্রকাশিত দেশী ও বিদেশী পুস্তকের সমালোচনার মধ্য দিয়া আধুনিক সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতির পরিচয় দেওয়াই এই সংখ্যার লক্ষ্য হইবে। বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যরসিক ও সমালোচকগণ এই সংখ্যায় লিখিবেন। পরিচয়-এর সাহিত্য সমালোচনার ঐতিহ্য সুবিদিত। কাজেই এই সংখ্যাটি বিশেষ আকর্ষণীয় হইবে।
ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ

যখনই চরিত্রকে ছেড়ে অস্পষ্টতার দিকে পৌঁছেছে তখনই লেখক সংযম হারিয়েছেন।

২৩০।৬০

সাহিত্য আলোচনা

Bengali Literary Review (Autumn Reading Number 1959): Edited by Syed Ali Ashan. Published from Department of Bengali, University of Karachi, Pakistan. Rupees Two only.

করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত বাঙলা সাহিত্য, শিল্প সমালোচনাবিষয়ক ষান্মাসিক সংকলনটির বর্তমান সংখ্যাটি আমাদের হস্তগত হয়েছে। সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কয়েকটি চিন্তাশীল প্রবন্ধ আলোচ্য সংকলনটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে: তন্মধ্যে ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ (The Origin of the Bengali Language), কবীর চৌধুরী (Tradition and change in litetature of E Pakisthan), বকরুদ্দীন উমরের (The role of Tradition in the arts) এবং অধ্যাপক আসজামের (Morals and manners) রচনা উল্লেখযোগ্য। ডঃ এ রহিমের 'Society and culture of the Eighteenth century of Bengal' প্রসংগে উৎসাহী পাঠকের মনে কিছু প্রশ্ন থেকে গেলেও ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে অষ্টাদশ শতকের সমাজ ও জীবনধারার যে চিত্রটি বর্তমান প্রবন্ধে উপস্থিত, তা থেকে অনুসন্ধিৎসু পাঠক বিশেষ উপকৃত হবেন। সমুদ্রিত এই সাহিত্য সমালোচনা সংকলনটির প্রচার কামনা করি।

১৭০।৬০,

প্রাপ্তি স্বীকার

কেরল সিংহম্—কে. এম. পাণিক্কর। অনুবাদক বোম্মানা বিশ্বনাথম।

প্রতিচ্ছায়া—শ্রীমধুসূদন চক্রবর্তী।

অধ্যাপক—শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়।

বীরসিংহের সিংহ-শিশু—নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

যাদুপুরী—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

সংগীত প্রবেশিকা (পূর্বভাগ)—শ্রীকার্তিকচন্দ্র রায়।

দণ্ডকারণ্য (১ম পর্ব)—শ্রীরবীন মুখোপাধ্যায়।

একাগ্নী—বাগেশ্রী।

মালার বাঁধন—রমেশ মজুমদার।

গ্রীস-দর্শন—স্বামী নিত্যাত্মানন্দ।

স্বাক্ষর—শ্রীজিতু গুপ্ত সম্পাদিত।

তবলার কথা (১ম খণ্ড)—বাদ্যবিশারদ শ্রীসুবোধ নন্দী

যে যাই বলুক—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

ছন্দ ও অলংকার—অতীন্দ্র মজুমদার।

রাজপথ জনপথ—চাণক্য সেন।

আজব কন্যার কাহিনী—বিনয় চৌধুরী।

শহুরে মামা (শিশু-প্রহসন)—সুনির্মল বসু।

হুল্লোড়—সুনির্মল বসু।

আচ্ছা ফ্যাসাদ!—সুনির্মল বসু।

ঢেউ—কপিঞ্জল।

তেপান্তর (ছোটদের নাটক)—প্রশান্ত চৌধুরী।

একাঙ্ক সঞ্চয়ন—সম্পাদনায় ডঃ সাধনকুমার মুখার্জি ও ডঃ অজিতকুমার ঘোষ।

সাহিত্যিক—বীরু মুখোপাধ্যায়।

আড়ৎদার পঞ্চাঙ্ক নাটক
দাম—দেড় টাকা
পড়ুন, ভাবুন, অভিনয় করুন
চক্রবর্তী ব্রাদার্স,
৩৮, সুকিয়া স্ট্রীট ঃ কলিকাতা-৯
(সি-৭০৮৩)

এমনটি আর হয়নি !
শারদীয়া **কুয়াশা**
প্রকাশিত হবে ৩রা সেপ্টেম্বর
(১) তিনখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস।
(২) সাতটি বড় রহস্য-রোমাঞ্চ গল্প
(৩) একটি রোমাঞ্চকর শিকার কাহিনী
(৪) কলকাতার বুকে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী একটি গুণ্ডার রহস্যঘেরা জীবনকথা।
(৫) পাকিস্তানে বিক্রীতা আসাম-প্রবাসী বাঙালী যুবতীর মর্মন্তুদ কাহিনী।
(৬) সাতটি বিস্ময়কর নিবন্ধ
লিখবেন
প্রথম শ্রেণীর চারজন কথাশিল্পী সহ অনেক প্রতিভাবান লেখক এবং অপরাধ-বিজ্ঞানী ডাঃ পঞ্চানন ঘোষাল প্রমুখ পুলিশ ও কারা বিভাগের ঊর্ধতন অফিসারবৃন্দ।
দাম ২॥০ টাকা।
কুয়াশা
রহস্য-রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা-দুঃসাহসমূলক-রোমান্টিকধর্মী মাসিক পত্রিকা।
২০এ গোবিন্দ সেন লেন,
কলিঃ ১২।

রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

রাজপথের পাঁচালী

কলকাতার রাজপথ চোখের জলে ভেজা, হাসিতে মুখর। যদি কান পেতে শোনা যায়, তবে রাজপথের কান্না-হাসির পাঁচালী এক দিনেই শুনিয়ে যায় অনেক দিনের আর অনেক জনের কাহিনী। যদি চোখ মেলে দেখা যায়, তবে দৃষ্টিপথে খণ্ড-কালেই ধরা দেয় বিশ্বরূপ। শহরের রাজপথে এমনি ধরনের উৎকর্ণ শ্রুতি ও অনুসন্ধানী দৃষ্টির বিচিত্র সঞ্চয়ই মুভী মেকার্স-এর "কোন একদিন" ছবিটির প্রধান উপজীব্য।

ছবির নায়ক কমলেশের জীবনের কোন একটি দিনে ঘটে এমন এক ঘটনা, যার পেছনে সারি বেঁধে আসে বহু জনের বহু ঘটনার মিছিল। নায়কের অমতে তার বিয়ে ঠিক করেছেন বাবা-মা। আশীর্বাদের দিন ভোরে বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে আসে কমলেশ। বন্ধু অনিলের ট্যাক্সিটি সে চেয়ে নেয় একদিনের জন্যে। অশান্ত মনের তাড়না সে সমস্ত দিন ধরে ট্যাক্সির অশ্রান্ত বেগের মধ্য দিয়ে নিঃশেষ করতে চায়।

তার ট্যাক্সিতে এসে ওঠে বিচিত্র ধরন ও চরিত্রের সব লোক। প্রথমেই কমলেশের ট্যাক্সিতে উঠল এসে ফোঁটা-তিলক কাটা, গায়ে নামাবলী জড়ানো এক ভণ্ড বামুন। কালীঘাটে পৌঁছে কমলেশকে ভাড়া চুকিয়ে না দিয়েই সে গা ঢাকা দেয়। পথের এই প্রথম বঞ্চনা কমলেশ বুঝি মুহূর্তেই ভুলে যায় মানুষের জীবনের অনেক বড় বঞ্চনাকে প্রত্যক্ষ করে। এক স্বামী পরিত্যক্তা বঞ্চিতা জননী এসে ওঠে তার ট্যাক্সিতে। স্বামীর ঘর থেকে লুকিয়ে ছেলেকে কিছুক্ষণের জন্যে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে সে মনের সাধ মেটাবে। কিন্তু নিজের বাড়িতে এসে না ঢুকতেই তার স্বামী এসে তার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় ছেলেকে। ছেলে মাকে ট্যাক্সিতে বসে গান শুনিয়েছিল—"তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে।"

কমলেশকেও বুঝি ডাক দিয়েছে পথের দেবতা। সেই ডাকে ছুটে চলে তার ট্যাক্সি। ট্যাক্সিতে এসে ওঠে নগর-দর্শনে ভ্রাম্যমাণ দুই অবাঙালী। নগর-পরিক্রমাকালে তাদের অজ্ঞানতা ও অনভিজ্ঞতা কমলেশের হাসির খোরাক জোগায়। কিন্তু তার মুখে হাসির রেখা

বিমল রায় প্রোডাকসন্সের "পরখ" ছবির একটি আবেগময় দৃশ্যে নাজির হুসেন ও সাধনা শিবদসানি

মিলিয়ে যেতে বেশি সময় লাগে না। নিয়তির এক নিষ্ঠুর পরিহাসের সাক্ষী হয়ে সে দেখে, ছেলে বাড়ি থেকে বাবা-মাকে উচ্ছেদ করার জন্য আদালতে এসে গাড়ি চাপা পড়ে কেমন করে নিজেই উচ্ছেদ হয়ে যায় পৃথিবী থেকে। আহতকে আদালতের প্রাঙ্গণ থেকে হাসপাতালে পৌঁছিয়ে দেয় সে নিজেই। হাসপাতালে ঢুকতে না ঢুকতেই প্রাণ হারায় বাবা-মায়ের সঙ্গে জীবনের মামলায় হেরে-যাওয়া বাদী ছেলে। এর পরমুহূর্তেই হাসপাতাল থেকে নবজাত শিশুকে নিয়ে কমলেশের ট্যাক্সিতে এসে ওঠে এক তরুণ-দম্পতি। প্রথম সন্তানের আগমনে আনন্দে আত্মহারা বাবা-মায়ের রঙীন আশা ও কল্পনার টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসে কমলেশের কানে।

দিন গড়িয়ে চলে অস্তাচলের পথে। কমলেশের ট্যাক্সিও ঘুরে বেড়ায় শহরের এ-পথ থেকে ও-পথে। এমনি এক পথের

অধ্যাপক শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আলোচনা-গ্রন্থ

কবিগুরুর রক্তকরবী ৩·২৫

॥ ২য় সংস্করণ ॥

বঙ্কিম-জিজ্ঞাসা ৩·২৫

রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ২·২৫

রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতা যন্ত্রস্থ

[পুনশ্চ — শ্যামলী]

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী / শান্তি লাইব্রেরী / সিগনেট বুক শপ

সুবর্ণভারতী—৮৮/সি, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা-১৪

শেষ সংবাদ

মন্মথ রায়ের

ধর্মঘট — পথে-বিপথে — চাষীর প্রেম

আজব দেশ চারটি শ্রেষ্ঠ নাটক

জাতির জীবনবেদ—দেশের মর্মবাণী

একত্রে এক খন্ডে চার টাকা।

গুরুদাস চ্যাটার্জী এন্ড সন্স

মোড়ে কমলেশের সংগে দেখা হয় এক বিচিত্র আরোহীর। বারো বছরের কারাবাস থেকে সে সবে মুক্তি পেয়েছে। খুনের দায়ে তার জেল হয়েছিল। তার মুমূর্ষু ছেলেকে দেখতে আসেনি অর্থলোভী ডাক্তার। ছেলে মারা গেল। শোকের সংগে সংগে বাবার মনে ধরিয়ে দিয়ে গেল জ্বালা। এই জ্বালা মেটাতে গিয়ে ডাক্তারকে খুন করে সে। বারো বছর পর সে ফিরে এল নিজের ভিটেতে। তার ভিটের ওপর গড়ে উঠেছে নতুন দালান, নতুন বাড়ি। সে তার ঘর খুঁজে পেল না, খুঁজে পেল না তার মেয়েকে।

শহরের বুকে নিরুদ্দেশ ছেলেকে এমনিভাবে আকুল হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন এক বৃদ্ধ দম্পতি। ছেলে তাদের অভিমান করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। মায়ের মন্দিরে পুজো দিয়ে কমলেশের ট্যাক্সিতেই তাঁরা বাড়ি ফেরেন। মায়ের ব্যাকুল মন ভাবে কমলেশ হয়তো তার ছেলের সন্ধান পেতে পারে। তিনি ছেলের ছবি এনে দেখান কমলেশকে। কমলেশ দুঃখিনী মাকে আশ্বাস দেয়, নিরুদ্দেশ ছেলের সন্ধান পেলে সে তাকে এনে দিয়ে যাবে তাঁর কাছে।

সুন্দরের সংগে অসুন্দর কেমনভাবে মিশে থাকে মহানগরীর রাজপথে, তাও দেখল কমলেশ। সে দেখল, এমন এক ভদ্রঘরের যুবতী মেয়েকে যে লোক ঠকাতে পারে, কিন্তু আত্মসম্মানে লাগে বলে ভিক্ষা নিতে পারে না। কমলেশের ট্যাক্সিরই এক আরোহী মেয়েটিকে ডেকে তোলে গাড়িতে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেবে বলে। ট্যাক্সি না পেয়ে মেয়েটি খুব অসুবিধায় পড়েছে ভেবেছিল কমলেশের ট্যাক্সির আরোহী। ট্যাক্সিতে চড়ে একটু বাদেই মেয়েটি ভদ্রলোককে অপবাদ দিল তাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে বলে এবং একশো টাকা না দিলে সে পুলিস ডাকবে বলে ভয় দেখাল। ঝামেলা এড়াবার জন্যে কমলেশ উভয়কে নেমে যেতে বলে। এমন সময় দেখা গেল ভদ্রলোকের একটি হাত নেই। পংগুতা সে ঢেকে রেখেছে চাদরের আড়ালে। মেয়েটি মাপ চাইল তার কাছে, এবং বলল তার সংসারের দুরবস্থার কথা ও কেন তাকে এই ঘৃণ্য রোজগারের পথে নামতে হয়েছে।

এমনিভাবে জীবনের বিচিত্র মেলায় ঘুরে বেড়ায় কমলেশ তার ট্যাক্সি নিয়ে। তারই মধ্যে সে খুঁজে পেল এক উচ্ছল প্রাণের প্রবাহ। অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে গাছের তলার আশ্রয় ছেড়ে ভিজতে ভিজতে তার গাড়িতে এসে উঠল এক প্রণয়ী-যুগল। এক টাকার মধ্যে যতটুকু ট্যাক্সিতে যাওয়া যায়, ততটুকুই তারা যাবে। আবার ভিজবে বৃষ্টির জলে, গা ভাসিয়ে দেবে প্রাণের মুক্তধারায়।

সমস্ত দিনের খেলা সাংগ করে কমলেশ এবার ফিরবে ঘরে। কিন্তু তাকে নিয়ে নিয়তির খেলা বুঝি তখন শুরু। একা এক তরুণী এসে উঠতে চাইল তার ট্যাক্সিতে। শেষ পর্যন্ত রাজী হল কমলেশ তাকে ট্যাক্সিতে তুলতে। কিন্তু কোথায় যাবে মেয়েটি সে নিজেই যেন জানে না। প্রথম

প্রকাশিত হয়েছে —

সাহিত্যের খবর শ্রাবণ, '৬৫

প্রতি সংখ্যা ঃ ৫০ নঃ পঃ বার্ষিক ঃ ৬·০০ নঃ পঃ

এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ ঃ

কবি সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অন্তরঙ্গ আলোচনা

লিখেছেনঃ ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায়, অধ্যাপক শুদ্ধসত্ত্ব বসু, সুধাংশুমোহন বন্দোপাধ্যায়,ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র। অন্যান্য বিষয়ে লিখেছেনঃ ধ্যানেশ-নারায়ণ চক্রবর্তী, মুরারি ঘোষ, সুশীলকুমার ঘোষ, চারুদত্ত প্রভৃতি।

সাহিত্যের খবর ঃ ১৪, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

কি বই পড়বেন দেখুন

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দম্পতি ৩৲

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
জানি তুমি আসবে ৩৲

প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর
আমি যারে চাই
সোনার প্রতিমা
ধানদূর্বা
দানের মর্য্যাদা
পথের শেষে
তিমির রাত্রি
আশীর্বাদ
প্রত্যেকখানি তিন টাকা

শৈলজানন্দের
মধুযামিনী ৩৲
পতিব্রতা ৩৲
পতিদেবতা ২৲
প্রিয়তমা ২৲
মনের মাধুরী ২৲
বিবাহ বন্ধন ২৲
মাধবী রাতে ২৲

বঙ্কিমচন্দ্র বা শরৎচন্দ্রের লেখা নয়
এমনকি এযুগের যাযাবর, অবধূত বা বনফুলেরও নয়
তবুও আপনাকে পড়তে বলছি
উষা দেবী সরস্বতীর
ফুলশয্যার রাতে
একবার পড়লে আপনি ভুলতে পারবেন না
সুভদ্রার সেই ফুলশয্যারি রাতের কাহিনী
ভুলতে পারবেন না তার কলেজ জীবনের ট্রাজেডি
দাম ঃ ৩৲

নারায়ণ ভট্টাচার্য্য
অভিমান - ৩৲

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
ছিনিমিনি - ৩৲
নেপথ্য - ২৲

বুদ্ধদেব বসু ও প্রতিভা বসু
বসন্ত জাগ্রত দ্বারে ৩৲

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
তোমায় আমি ভালবাসি - ৩৲
শুক্লবসনা সুন্দরী - ৩৲

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
রূপের ফাঁদ - ৩৲

ক্যাটালগের জন্য চিঠি লিখুন

দেব সাহিত্য কুটীর
কলিকাতা - ৯

Pertussin
COUGH SYRUP

হুপিং এবং অন্যান্য সর্বপ্রকার কাশির জন্য পার্টুসিন ব্যবহার করুন।

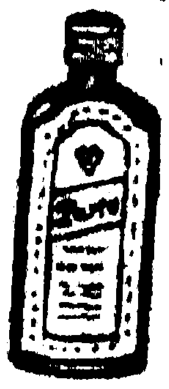

শিশু ও বয়স্কদের পক্ষে সমোপযোগী
সর্বত্র নতুন প্যাকিং-এ পাওয়া যায়
ফ্র্যাঙ্ক রস এন্ড কোং লিঃ,
কলিকাতা

FR-3

টিএএস
নস্য
সব চেয়ে ভাল

গেল লেকে, তারপর বলল শিয়ালদা স্টেশনে যাবে, আবার বলল হাওড়া স্টেশনে। শেষ পর্যন্ত হাওড়া স্টেশনই হল তার গন্তব্য। কমলেশের কেমন যেন সন্দেহ হল, মেয়েটি আত্মহত্যা করতে চায়। স্টেশনে সে মেয়েটির পিছু নিল। মেয়েটি তিরস্কার করল কমলেশকে এমনিভাবে তাকে বিরক্ত করার জন্যে। কমলেশ নাছোড়বান্দা। লোক ভিড় করে দাঁড়াল তাদের ঘিরে। শেষ পর্যন্ত থানায় যেতে হল উভয়কে। পুলিসের জেরায় ও অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়ল উভয়ের পরিচয়। মেয়েটির নাম সন্ধ্যা। মামার আদরে ও মামীর অনাদরে দিন কাটছিল তার। পর পর তিনটি বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে যাবার পর চতুর্থ সম্বন্ধের ছেলে-আশীর্বাদের দিন পাত্রের বাবা জানালেন যে, তাঁর বোনের হঠাৎ অসুখের জন্যে অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। নিজের দুর্ভাগ্য নিয়ে মামীমার গঞ্জনা সইতে না পেরে এবং মামার ভার লাঘব করার জন্যে বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয় সন্ধ্যা। কমলেশের খবর পেয়ে তার বাবা-মা থানায় এসে উপস্থিত হন। সন্ধ্যার মামা-মামীমাও ছুটে আসেন থানায়। কমলেশের বাবা বাড়িতে কন্যাপক্ষ থেকে ছেলেকে আশীর্বাদ করে যাওয়ার যে আয়োজন বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, বোনের অসুস্থতার মিথ্যে ওজুহাতে, তা-ই যেন সম্পূর্ণ হয়ে উঠল থানায়। সন্ধ্যার সঙ্গে কমলেশের বিয়ে ঠিক করেছিলেন তার বাবা। কমলেশ ও সন্ধ্যার মুখে ক্ষণিকের জন্যে ফুটে উঠল সুখের সলজ্জ আভা। তারা জানতে পারেনি, অদৃশ্য প্রজাপতি সর্বক্ষণ উড়ে উড়ে চলছিল তাদের পিছু পিছু। ঘরছাড়া তরুণ-তরুণী এই পরিণয়-বিধাতার কাছেই আত্মসমর্পণ করল।

ছবির আখ্যানভাগে যে নতুনত্বের উপাদান রয়েছে দর্শকদের কাছে তার আবেদন অনস্বীকার্য। উপরন্তু ছবিটি দর্শকের মনে সুখানুভূতি এনে দেয় এর রসমধুর বিন্যাসের গুণে। একটি চলমান ট্যাক্সির মাধ্যমে তরুণ পরিচালক-চিত্রনাট্যকার অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় ছবিতে যে গতিবেগ ও আবেগ সৃষ্টি করে তুলেছেন, তা সার্থক প্রয়োগ-নৈপুণ্যের স্বাক্ষর হয়ে থাকবে। ট্যাক্সির গতির সঙ্গে সঙ্গে ছবির বিভিন্ন রসের ছোট ছোট উপাখ্যান এক অবিচ্ছিন্ন নাটী-রসধারায় সুগ্রথিত। বিভিন্ন উপাখ্যানের উপস্থাপনেও পরিচালক প্রশংসনীয় সংযম ও রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। ছবির কয়েকটি নাট্য-মুহূর্ত আবেগমাধুর্যে আলিপ্ত। ছোট শিশুর মুখে গান ও তার দুঃখিনী মায়ের অন্তর-বেদনার মুহূর্তটি পরিচালক নাট্য-সংবেদনে স্মরণীয় করে তুলেছেন।

ফোন নং ৪৬-৫২৬
সুর ও শিল্পী
(পঞ্চম বর্ষ)
স্বনামধন্য বাংলা ও বোম্বের শিল্পীদের কথা, নামকরা রেকর্ডের, বাংলা ও হিন্দী ছবির গান, তার স্বরলিপি, গীটারের স্বরলিপি, সেতার বেহালার গৎ—সেইসাথে সিনেমার যাবতীয় খবর, ফটো, গল্প, উপন্যাস, খেলাধুলার আসর পেতে হোলে এই মাসিক পত্রিকাটি কিনুন। প্রতি সংখ্যার মূল্য: এক টাকা। এজেন্টগণ যোগাযোগ করুন: :
: কার্যালয় :
১৪৩, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড
কলিকাতা : ২৬।
(সি-৭০৫৬

কলিকাতা রেডিওতে মহালয়ায় প্রচারিত
শ্রীশ্রীচণ্ডীর বেতার-আলেখ্য
মহিষাসুরমর্দিনী
রচনা বাণীকুমার
সুরসংযোজনা পঙ্কজকুমার মল্লিক
মূল্য - ৪.৫০ নঃ পঃ
প্রকাশক - ত্রিগুণা প্রকাশনী
প্রাপ্তিস্থান : দাশগুপ্ত এণ্ড কোং
৫৪/৩, কলেজ স্ট্রীট - কলি ১২
ডি এম লাইব্রেরী, চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স, সান্যাল এণ্ড কোং ও শ্রীগুরু লাইব্রেরীতেও পাওয়া যায়।
(সি ৭১৭৭)

রঙমহল
—ফোন : ৫৫-১৬১৯—
প্রতি বৃহস্পতি ও শনি : ৬॥টায়
রবি ও ছুটির দিন : ৩টা - ৬॥টায়
শততম রজনী অতিক্রান্ত
এক পেয়ালা কফি
শ্রেষ্ঠাংশে—রবীন, হারধন, সত্য, দীপক, জহর, অজিত, বিশ্বজিৎ, পিন্টু, সমর, কেতকী, কবিতা ও তপতী ঘোষ

লিভোন
ছুলির একমাত্র ঔষধ
ছোদ, ব্রণ, মেছেতা ও বসন্তের দাগ মিলাইয়া যায়।
স্মিথ বার্ণ রিসার্চ লেবরেটরী
৬/১, হাজরা বাগান লেন, কলিকাতা-১৫

সুলভ মূল্যে

সেরা ৩টি জিনিষ

- শোন্‌পাপড়ি— ৩, সের
- পোলাও— ২, „
- মালপো— ২, „

কমলা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

প্রায় অর্ধশতাব্দীর প্রতিষ্ঠান

আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিঃ-৯

ফোন : ৩৪-১৩৭৯

রেকোকাশ্মীর

ফেস পাউডার

সানাই - সানাই - সানাই - সানাই - সানাই
সানাই - সানাই - সানাই - সানাই - সানাই

সবাই

বলেন

অপূর্ব!

উল্টোরথ-খ্যাত সম্পাদক

মনোজ দত্তের

সানাই

বেরিয়েছে ॥ দামঃ এক টাকা

নিঃশেষ হওয়ার

আগে

কিনে নিন নতুবা

নৈরাশ্য সুনিশ্চিত!

পূজা সংখ্যা

পূজা সংখ্যা

পূজা সংখ্যা

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬০!

৭৬বি, আপার সার্কুলার রোড,

কলিকাতা-৯

সানাই - সানাই - সানাই - সানাই - সানাই

বাংলার প্রথম মহিলা সংগীত পরিচালিকা বাঁশরী লাহিড়ী। "দিল্লি থেকে কলকাতা" নামক ছবিতে তিনি বর্তমানে সুরযোজনা করছেন

নায়কের মনে একটি দিনের বিভিন্ন ঘটনার প্রতিক্রিয়া মানবীয় রসের রেখায় অংকিত। নায়ককে শহরের জীবনলীলার একজন দরদী সাক্ষীরূপে উপস্থিত করার কৃতিত্ব সুন্দরভাবে অর্জন করেছেন পরিচালক। এবং নায়কের অন্তর-অনুভূতির প্রলেপ নিয়েই ছবির উপাখ্যানরাজির মর্মবাণী দর্শকের চেতনাকে নাড়া দিয়ে যায় বলেই ছবিটি মরমী হয়ে উঠেছে।

জেল-ফেরত ট্যাক্সি আরোহীর উপাখ্যানটির বিন্যাসে পরিচালক অতি-নাটকীয়তার প্রশ্রয় দিয়েছেন। এই চরিত্রের মুখে দেশের সমাজ-ব্যবস্থা ও শাসন-ব্যবস্থা নিয়ে কতকগুলি বড় বড় কথা প্রচারধর্মিতার পরিচয় দেয়। এ-সমস্ত সংলাপ উপাখ্যানের স্বচ্ছন্দ নাট্যরসকেও ক্ষুণ্ণ করে। ছবির বিভিন্ন উপাখ্যানের মধ্যে জেল-ফেরত ভদ্রলোক ও প্রতারক মেয়ের কাহিনী সহজ-কল্পিত হয়ে ওঠেনি। ছবির পথের কাহিনীগুলিতে যেমনি নতুনত্ব আছে, নায়ক-নায়িকার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার কাহিনী দুটি তেমনি মামুলী। নায়ককে শুধু একদিনের জন্যে জীবনের অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ে আগ্রহশীল শখের ট্যাক্সি ড্রাইভাররূপে উপস্থিত করলে কাহিনীর মর্যাদা ও শিল্পরস আরও বৃদ্ধি পেত।

নায়কের চরিত্রে নির্মলকুমারের প্রাণোচ্ছল ও সংবেদনশীল অভিনয় দর্শক-দের অকুণ্ঠ প্রশংসায় অভিনন্দিত হবে। বিচিত্র চরিত্র ও ঘটনার সংস্পর্শে নায়কের মনের প্রতিক্রিয়ার অভিব্যক্তি তাঁর অভিনয়ে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। চরিত্রটির মানবিক আবেদনও তিনি তাঁর অভিনয়ে নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সন্ধ্যার ভূমিকায় সুপ্রিয়া চৌধুরীর অভিনয় সুখ-দুঃখের মুহূর্তে নিরুত্তাপ। তিনি শুধু চিত্রনাট্যের দাবিই মিটিয়েছেন। নায়কের বন্ধুর চরিত্রে অনিল চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় স্বচ্ছন্দ ও প্রাণধর্মী। ট্যাক্সির বিভিন্ন আরোহীর মধ্যে স্বল্প-অবকাশে প্রশংসনীয় অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন মলিনা দেবী, শোভা সেন, গঙ্গাপদ বসু, জহর রায় ও সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্য আরোহীর ভূমিকা হরিধন মুখোপাধ্যায়, স্বপন মুখোপাধ্যায়, নবগোপাল, শীলা পাল, নমিতা সিন্‌হা, তপতী ঘোষ, শ্যাম লাহা, গুরুদাস বন্দ্যো-পাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত ও শৈলেন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সুঅভিনীত। বিশিষ্ট পার্শ্বচরিত্রে দর্শকদের প্রশংসা পাবার মতো অভিনয়-দক্ষতা দেখিয়েছেন কমল মিত্র, অসিতবরণ, শিশির বটব্যাল, রেণুকা রায়, পদ্মা দেবী ও তুলসী চক্রবর্তী। শিশু-চরিত্রে কুমার শংকরকেও ভালো লাগবে।

ছবির সংগীত-পরিচালনায় সরোজ কুমারীর কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। বিভিন্ন নাট্যমুহূর্তে তাঁর আবহ সুর-সৃষ্টি মনোরম। রবীন্দ্র-সংগীত ও শ্যামা-সংগীতের সুরপ্রয়োগ করেও তিনি আবহ-সংগীতের মাধুর্য বাড়িয়েছেন। শ্যামল মিত্র ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া ছবির দুটি গান সুখশ্রাব্য।

চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় অনবদ্য নৈপুণ্য দেখিয়েছেন যথাক্রমে অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিব ভট্টাচার্য। সুষ্ঠু সম্পাদনা ছবিটিতে প্রাণসঞ্চার করেছে। কলাকৌশল ও আঙ্গিক সজ্জার অন্যান্য বিভাগের কাজ মোটামুটি পরিচ্ছন্ন।

'আচ্ছা' নয় তবু 'সাচ্চা'

"আওয়ারা"-র পর "ছলিয়া"রূপে রাজ-কাপুরের আবির্ভাব দর্শক মহলে আবার নতুন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। সুভাষ পিকচার্স-এর "ছলিয়া"-র নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তিনি।

ছলিয়া সমাজে "আচ্ছা আদমি" বলে পরিচিত নয়। কিন্তু অন্তরে সে সাচ্চা। সাচ্চা মন নিয়ে শান্তিকে ভালোবেসে ছলিয়া হয়ে উঠল মানুষের মতো মানুষ।

আত্মহত্যার হাত থেকে শান্তিকে বাঁচিয়ে তাকে আশ্রয় দিয়েছিল ছলিয়া। আর দিয়েছিল তার মন। ছলিয়া তখনও জানতে পারেনি, শান্তি পরিত্যক্তা এবং তার একটি ছেলেও রয়েছে।

ছলিয়া আরও জানতে পারল, পাকি-স্তানে দাঙ্গায় নিরুদ্দেশ হয়ে পড়েছিল শান্তি, এবং ছিন্নমূল হয়ে পাঁচ বছর পর মিথ্যে কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে সে

এসে পৌঁছেছিল দিল্লি। কলঙ্কিনী ভেবে শান্তিকে ঘরে তুলে নেয়নি তার শ্বশুর, এবং শেষ পর্যন্ত স্বামী। ছলিয়া সব জানতে পেরে কেমনভাবে শান্তিকে তার স্বামীর হাতে, এবং ত্যজ্য ছেলেকে তার বাবার কোলে তুলে দেয়, তা নিয়েই গড়ে ওঠে কাহিনীর নাট্য-পরিণতি। ছলিয়া নিয়তির ছলনাকেই হাসিমুখে মেনে নেয়।

ছবির এই কাহিনী বহুধারায় বিস্তৃত, এবং বিস্তৃতির ধাপে ধাপে রূপ নিয়েছে অনেক চরিত্র ও ঘটনার ছড়াছড়ি। কিন্তু সব কিছু ছাড়িয়ে প্রধান হয়ে উঠেছে চিত্রনাট্যের বিবিধ প্রমোদ-উপকরণ। এগুলির মধ্যে রয়েছে প্রণয়, হাল্কা নাচ-গান, বাহুযুদ্ধের রোমাঞ্চ ও রঙ্গরস। পরিচালক মনমোহন দেশাই এই সব আমোদ-উপকরণ সাধারণ মনোরঞ্জনের দিকে লক্ষ্য রেখেই ছবিতে পরিবেশন করেছেন। কিন্তু এই আমোদ-রসের আয়োজনে ছবির কষ্টকল্পিত কাহিনী ও এর বিন্যাসের বহু অসঙ্গতি ও বৈসাদৃশ্য মোটেই ঢাকা পড়েনি। এই সব অজস্র ত্রুটি-বিচ্যুতি বিচারশীল দর্শকদের মনে অস্বস্তির কারণ ঘটায়।

তবে ছবির মুখ্য দুটি চরিত্রে রাজ-কাপুর ও নূতনের অভিনয় সর্বশ্রেণীর দর্শকদের আনন্দ দেবে। রাজ-কাপুরের অভিনয় প্রাণবন্ত, নূতনের মর্মস্পর্শী। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে ভালো অভিনয় করেছেন রেহমান, প্রাণ, শোভনা সমর্থ ও শিশু-শিল্পী রাজা।

ছবিতে পরিবেশানুগ আবহ-সংগীত ও কয়েকটি সুখশ্রাব্য গান পরিবেশন করেছেন সংগীত পরিচালক কল্যাণজী আনন্দজী।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ ও আঙ্গিক পারিপাট্য প্রশংসনীয়।

চিত্রালোচনা

বিমল রায় প্রোডাকসন্সের হিন্দী ছবি "পরখ" এ সপ্তাহের একমাত্র নতুন আকর্ষণ।

"সুজাতা"-র পর প্রযোজক-পরিচালক বিমল রায়ের এইটি প্রথম অবদান। এদিক দিয়ে এর আবেদন যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি শিল্পী সমাবেশের দিক থেকেও ছবিটি উল্লেখযোগ্য। এর ভূমিকালিপিতে নূতন ও পুরাতন প্রতিভার মেলবন্ধন চিত্র-রসিকদের নতুন প্রেরণা জোগাবে। নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বসন্ত চৌধুরী ও সাধনা শিবদাসানি। হিন্দী ছবির পটে দুজনেই নবাগত। বহুদিন আগে নিউ থিয়েটার্সের "যাত্রিক" ছবিতে আত্মপ্রকাশ করলেও হিন্দী চিত্রপ্রিয়দের কাছে বসন্ত চৌধুরী আজ অজানার পর্যায়ে গিয়ে পড়েছেন। আর ফিল্মালয়ের "লভ ইন সিমলা"-র আগে সাধনা শিবদসানির নামই কেউ শোনে নি। "পরখ" চিত্রে এই দুই তারকার শুভ সম্মিলন তাই একটি উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। এঁদের সঙ্গে আর যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন মতিলাল, লীলা চিটনিস, নাজির হুসেন, জয়ন্ত, কানাইয়ালাল অসিত সেন, রসিদ খাঁ, নিশি প্রভৃতি।

ছবির কাহিনী লিখেছেন সুরকার সলিল চৌধুরী। সুর সৃষ্টির দায়িত্ব তিনিই বহন করেছেন।

* * *

এন সি এ প্রোডাকসন্সের বহু-প্রতীক্ষিত "হাসপাতাল" পূজার আগেই মুক্তিলাভ করবে। ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের একটি জনপ্রিয় উপন্যাস অবলম্বনে ছবিটি তোলা হয়েছে তার ওপর এর মুখ্য দুটি ভূমিকায় বোম্বাই ও বাংলার দুই সেরা শিল্পীর যোগাযোগ ঘটেছে। অশোককুমার ও সুচিত্রা সেনকে একটি ছবিতে একসঙ্গে দেখবার সুযোগ এর আগে চিত্রামোদীরা পাননি। "হাসপাতাল"-এর অতিরিক্ত আকর্ষণের মূলসূত্র এইখানে।

ছবির অন্যান্য শিল্পি-সমাবেশ কম লোভনীয় নয়। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, সুশীল মজুমদার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, মাঃ তরুণ, মাঃ তিলক প্রভৃতি। ছবিটি পরিচালনা করেছেন সুশীল মজুমদার এবং এতে সুর দিয়েছেন সুরকার হেমন্তকুমারের অনুজ অমল মুখোপাধ্যায়।

* * *

গিরিশ থিয়েটার

(জাতির নাট্যগুরুর নামাঙ্কিত নাট্যশালা)
[একমাত্র স্বত্বাধিকারী—সরকার এণ্ড ব্রাদার্স প্রপার্টিস্ প্রাইভেট লিঃ]
স্থান—বিশ্বরূপা থিয়েটার (৫৫-৩২৬২)
অনাস্বাদিত রসের সুরভি সিঞ্চিত

উড়ন চৈন

প্রতি সোমবার বুধবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা ৬॥টায়

এবং রবি ও ছুটির দিন সকাল ১০॥টায়
সম্পাদনা ও নির্দেশনা—বিধায়ক ভট্টাচার্য
আঙ্গিক নির্দেশনা—তাপস সেন
শ্রেঃ—রাধামোহন ভট্টাচার্য, জ্ঞানেশ মুখার্জি, বিধায়ক ভট্টাচার্য, সুনীল ব্যানার্জি, অরুণ ব্যানার্জি, ধনেশ মুখার্জি, প্রভাত গোস্বামী, গীতা দে, জয়শ্রী সেন প্রভৃতি

মিনার্ভা থিয়েটার

ফোন ৫৫-৪৪৮৯
ভারতীয় নাট্যমঞ্চের বিস্ময়!
লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপের

অঙ্গার

সুর—রবিশঙ্কর
নাটক ও পরিচালনা—উৎপল দত্ত
উপদেষ্টা—তাপস সেন
প্রতি বৃহস্পতি ও শনি ৬॥টায়
রবি ও ছুটির দিন ৩ ও ৬॥টায়

(সি ৭১৮৯)

বিশ্বরূপা

(অভিজাত প্রগতিধর্মী নাট্যমঞ্চ)
[ফোন : ৫৫-১৪২৩, বুকিং ৫৫-৩২৬২]
বৃহস্পতি ও শনি সন্ধ্যা ৬॥টায় | রবি ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬॥টায়
২০০তম রজনীর স্মারক উৎসব
শনিবার ২০শে আগস্ট সন্ধ্যা ৬॥টায়

সেতু

একটি চিরন্তন মানব অনুভূতির কাহিনী
আলোকশিল্পী—তাপস সেন
শ্রেষ্ঠাংশে—নরেশ মিত্র, অসিতবরণ
তরুণকুমার, মমতাজ, সন্তোষ, তমাল, জয়শ্রী, সুব্রতা, ইরা, আরতি ইত্যাদি
ও
তৃপ্তি মিত্র (বহুরূপী)

বিশ্বরূপায় বহুরূপীর অভিনয়

মঙ্গলবার ২৩শে আগস্ট—সন্ধ্যা ৬॥টায়
নির্দেশনা—শম্ভু মিত্র
আলোকসম্পাত—তাপস সেন
শ্রেঃ তৃপ্তি মিত্র, শম্ভু মিত্র, অমর গাঙ্গুলী, কুমার রায় ও আরতি মৈত্র।

চিত্রজগতের বিস্ময় !!!

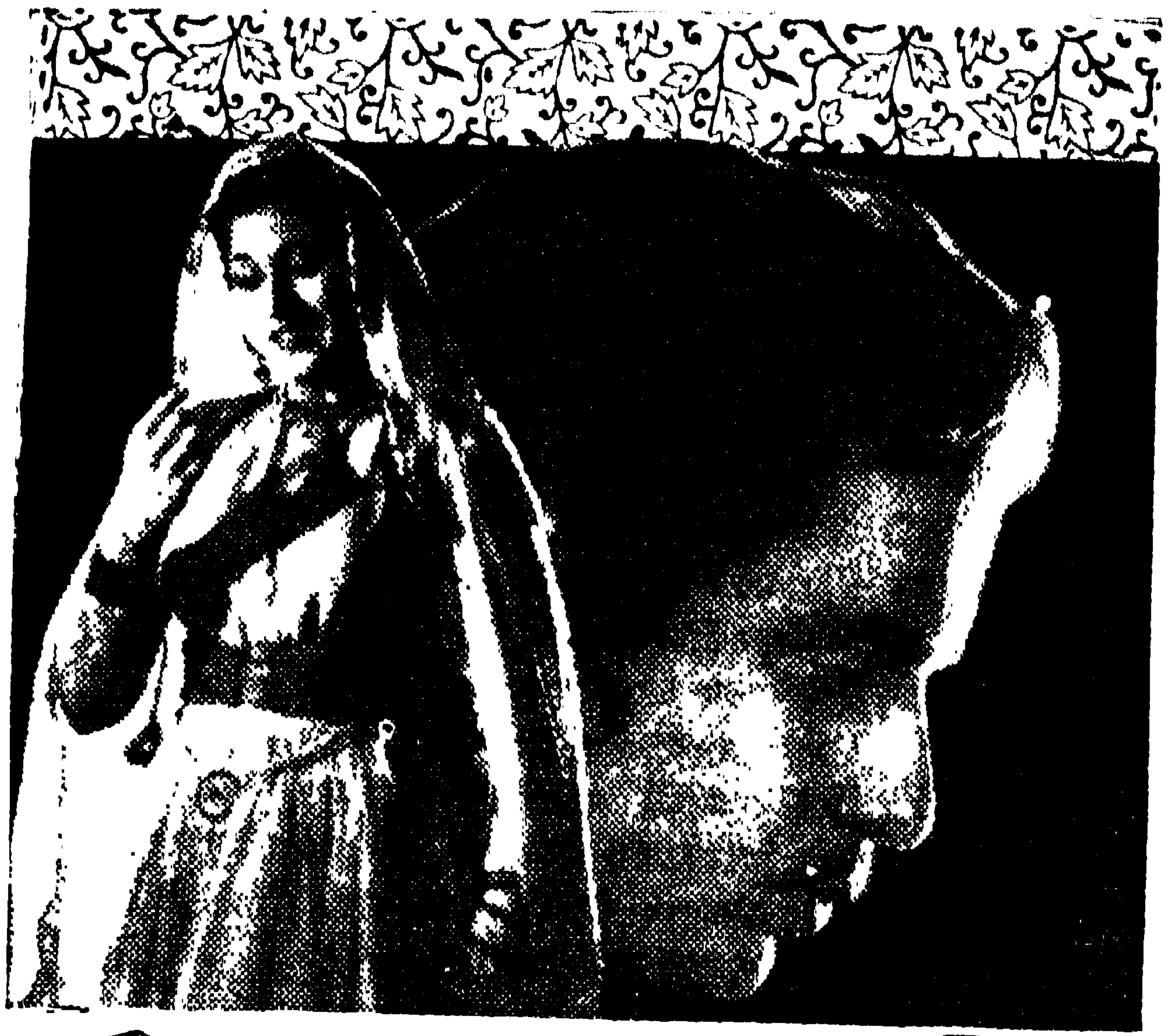

কে. আসিফ

মুঘল-আজম

সঙ্গীত নৌসাদ

সোসাইটি — হিন্দ — বসুশ্রী — বীণা

(শীততাপনিয়ন্ত্রিত) ১-১৫, ৫, ৮-৩০ (শীততাপনিয়ন্ত্রিত) ১-১৫, ৫, ৮-৩০

কৃষ্ণা — গণেশ — খান্না

(শীততাপনিয়ন্ত্রিত) ১-৩০, ৫, ৮-৩০ ১-৩০, ৫, ৮-৩০

ভবানী — অজন্তা — ন্যাশনাল — পদ্মশ্রী — অশোক — বঙ্গবাসী
২, ৫-৩০, ৮-৪৫ বেহালা খিদিরপুর যাদবপুর শালকিয়া ১-১৫, ৫, ৮-৩০

পি-সন — রিজেণ্ট — চম্পা — মৃণালিনী — বিভা — রজনী — রামকৃষ্ণ
মেটিয়াবুরুজ কাশীপুর ব্যারাকপুর ১-৩০, ৫, ৮-৩০ বেলঘরিয়া জগদ্দল নৈহাটী

শ্রীদুর্গা — জয়ন্তী — স্বপ্না বিচিত্রা — মিলনী — নিউ সিনেমা
কাঁচরাপাড়া রিষড়া চন্দননগর বর্ধমান খড়্গপুর আসানসোল

এলফিনস্টোন — বীণা — রিগ্যাল — শঙ্কর — শ্যামা — শ্রীবিষ্ণু
পাটনা পাটনা জামসেদপুর ভাগলপুর মজঃফরপুর রাঁচী

বিহার — সোসাইটি — ভারত — ক্যাপিটাল — বিজয়
ঝরিয়া দ্বারভাঙ্গা গয়া কটক মুঙ্গের

—— রেডিয়াণ্ট রিলিজ ——

এন সি এ প্রোডাকসন্সের পরবর্তী ছবি তোলা হবে বঙ্কিমচন্দ্রের "দেবী চৌধুরানী" অবলম্বনে এবং সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায়—এ-সংবাদ আমরা আগেই দিয়েছি। ছবিটি হিন্দী ও বাংলা এই দুই ভাষাতেই তোলবার সংকল্প প্রযোজক প্রেম আত্রেয়র আছে। এর উদ্যোগ-পর্ব তাই খানিকটা বিস্তারিত হবে।

ইতিমধ্যে সত্যজিৎ রায় তাঁর নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের পতাকাতলে রবীন্দ্রনাথের "পোস্ট মাস্টার" গল্পের চিত্ররূপ দিতে শুরু করেছেন। টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে বর্তমানে এর চিত্রগ্রহণ চলছে। নাম-ভূমিকায় অভিনয় করছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়। নায়িকা চরিত্রে একটি নতুন মুখের সন্ধান পাওয়া যাবে।

"পোস্ট মাস্টার" শেষ করে সত্যজিৎবাবু পর পর রবীন্দ্রনাথের 'সমাপ্তি' ও 'মণিহারা' এই দুটি গল্পেরও চিত্রাকার দেবেন। এ তিনটি ছবিকে একটি প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত করে মুক্তি দেবার বাসনা আছে তাঁর—যেমন একাধিক ইংরেজি ছবি হয়েছে।

* * *

রবীন্দ্রনাথের "কঙ্কাল" গল্পটির চিত্রস্বত্ব ক্রয় করেছেন নবগঠিত জবালা প্রোডাকসন্স। জীবন গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ছবিটি তোলা হবে। মন্মথ রায় এর চিত্রনাট্য লিখছেন।

পরিচালক জীবন গঙ্গোপাধ্যায় নিজের প্রযোজনায় শীগগিরই আর-একটি ছবির কাজে হাত দেবেন। সমরেশ বসু লিখিত "পুতুলের খেলা" অবলম্বনে ছবিটি তোলা হবে।

বাণী রায় প্রযোজিত পাঞ্চজন্য চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রথম অবদান "মীরার দুপুর"-এর কাজ ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী লিখিত কাহিনীর ভিত্তিতে এর চিত্রনাট্য লিখেছেন তরুণ পরিচালক তরুণেশ দত্ত। নির্মল-কুমার, মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, জহর রায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে।

অভিনন্দনযোগ্য প্রচেষ্টা

'ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ার' এই নামে একটি সংগীত প্রতিষ্ঠান গত এক বছর যাবৎ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকগীতি ও পল্লীনৃত্য সংগ্রহ করে তা এই শহরের রসিক সমাজে পরিবেশন করবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। সুরকার সলিল চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত 'বম্বে ইয়ুথ কয়ার'-এর এটি অনুজ প্রতিষ্ঠান। গত ৬ই আগস্ট এর এক বছর বয়স পূর্ণ হয়েছে।

পল্লী অঞ্চলে প্রচলিত নৃত্যগীত ছাড়াও বৈদিক স্তোত্র, রবীন্দ্র সংগীত ও অতুল-প্রসাদের গানও এই প্রতিষ্ঠানের প্রমোদ-সূচীর অন্তর্ভুক্ত। এই প্রমোদ-সূচীতে এ পর্যন্ত আশি দফা নাচ-গান জমা হয়েছে। তারই কিয়দংশ একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হবে। আগামী ২৮শে আগস্ট নিউ এম্পায়ারে (সকাল সাড়ে দশটায়) এই নৃত্যগীতের আসর বসবে।

ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ারের প্রতিষ্ঠাত্রী ও অন্যতম কর্মসচিব রুমা গাঙ্গুলী এই সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দান করেছেন। তাতে তিনি ইয়ুথ কয়ারের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে জানিয়েছেন যে, নিজস্ব গৃহনির্মাণ,

রঙমহল

২৩শে আগস্ট ও ৯ই সেপ্টেম্বর
সন্ধ্যা ৬।টায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পুতুলনাচের ইতিকথা

নাট্যকার—হারু রায়
সংগীত—উষা দত্ত
পরিচালনা—সলিল দত্ত

প্রবেশমূল্য—৩, ২, ২।০ ও ১,
প্রাপ্তিস্থান—১০২, বিডন স্ট্রীট
ট্রেডার্স ব্যুরো—৮২ শ্যামবাজার স্ট্রীট
ম্যাডোরিণা—চৌরঙ্গী রোড

একাঙ্ক নাটকের বলিষ্ঠ পদক্ষেপে নবনাট্য আন্দোলন জয়যুক্ত হোক
একাঙ্ক নাটকের প্রবর্তক অনন্য নাট্যকার মন্মথ রায়ের

একাঙ্কিকা	নব একাঙ্ক	ছোটদের একাঙ্কিকা
[একুশটি শ্রেষ্ঠ নাটকের সংকলন]	[দশটি অবিস্মরণীয় নাট্যগুচ্ছ]	[শিশুনাট্যের উজ্জ্বল প্রদীপ]
পাঁচ টাকা	তিন টাকা	দু' টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স । কলকাতা ঃ ছয়

মস্তিষ্ক শীতল রাখে ও সুনিদ্রার সহায়তা করে

ভৃঙ্গল শুধু যে কেশের পক্ষেই বিশেষ উপকারী তাহা নহে, ইহা মস্তিষ্ক সুস্থ ও শীতল রাখে এবং সুনিদ্রার সহায়তা করে।

ভৃঙ্গল
সুগন্ধি মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯

এন সি এ প্রোডাকসন্সের "হাসপাতাল" চিত্রের একটি দৃশ্যে সুচিত্রা সেন

লাইব্রেরী ও অডিটোরিয়াম-এর ব্যবস্থা, এবং সাধারণভাবে সম্প্রদায়ের বিস্তারের জন্যে তাঁরা একটি তহবিল স্থাপন করেছেন। আগামী অনুষ্ঠানের টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থের অর্ধাংশ এই তহবিলে যাবে, বাকী অর্ধাংশ আসামের সাম্প্রতিক হাঙ্গামায় ছিন্নমূল বাঙালীদের সাহায্যার্থে দান করা হবে। প্রতিষ্ঠানের এই সাধু সংকল্প পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্তৃক অভিনন্দিত হয়েছে বলে শ্রীমতী গাঙ্গুলী সাংবাদিকদের জানিয়েছেন। 'কয়ার'-এর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেল।

এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদের গানও পরিবেশিত হবে। অনুষ্ঠানের নৃত্যাংশ পরিচালনা করবেন রমা গাঙ্গুলী, প্রেম ধাওয়ান ও জোহরা সেহ্‌গল। 'কয়ার'-এর শিল্পীরাই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন। তাঁদের পুরোভাগে আছেন শ্যামল মিত্র ও রমা গাঙ্গুলীর নাম। "ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ার"-এর সভাপতিরূপে নির্বাচিত হয়েছেন সত্যজিৎ রায়।

মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল

আরোগ্য করিতে ২৭ বৎসর ভারত ও ইউরোপ-অভিজ্ঞ ডাঃ ডিগোর সহিত প্রতি দিন প্রাতে ও প্রতি শনিবার ও রবিবার বৈকাল ৩টা হইতে ৭টায় সাক্ষাৎ করুন। ৩বি জনক রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

(সি ৭১৯০)

এলিট

প্রত্যহ : ৩, ৬ ও রাত্রি ৯টায়

প্রণয় ও বুভুক্ষার বাস্তবধর্মী কাহিনীর বলিষ্ঠ চিত্ররূপ !

(প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য)

অনুষ্ঠান সংবাদ

আজ শনিবার (২০শে আগস্ট) বিশ্বরূপায় "সেতু" নাটকের দ্বিশততম অভিনয় উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই উৎসবে পৌরোহিত্য করবেন। এই উপলক্ষে নাট্যকার, পরিচালক শিল্পী ও কর্মীদের যথানিয়মে পুরস্কার দেওয়া হবে। অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়।

* * *

আগামীকাল (২১শে আগস্ট) অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'র সপ্তষষ্ঠিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে গীত-নৃত্য-নাট্য পরিষদ "একতারা"র উদ্যোগে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় একটি আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে কৃষ্ণচন্দ্র দে'র পরিচালনায় নৃত্যের মাধ্যমে "খণ্ডিতা" পালাকীর্তন পরিবেশিত হবে। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন।

• • •

এই দিনই (২১শে আগস্ট) ১১, লর্ড সিংহ রোডস্থিত শ্রী শিক্ষায়তন হলে সুরঙ্গমার চতুর্থ প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হবে। তদুপলক্ষে সুরঙ্গমার শিল্পিবৃন্দ কর্তৃক 'বর্ষামঙ্গল' ঋতু উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবেন শান্তিনিকেতন সংগীত ভবনের অধ্যক্ষ শৈলজারঞ্জন মজুমদার।

• • •

গত ১লা আগস্ট রঙমহলে রূপকৃৎ কর্তৃক "চরিত্রহীন" নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। সতীশের ভূমিকায় দিলীপকুমার নাগ স্মরণীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। নাটকটি পরিচালনা করেনও তিনি। অন্যান্য ভূমিকায় যাঁরা কৃতিত্বের পরিচয় দেন, তাঁদের মধ্যে হরাবত গুপ্ত, অজিত দে, সিপ্রা সাহা, শাশ্বতী রায় ও অজন্তা চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য।

বিবিধ সংবাদ

কারলভি ভেরির আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সোভিয়েট ফিল্ম "সেরিওঝা" শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে গ্রাঁ প্রি (Grand Prix) লাভ করেছে। গুণানুসারে আরো যে সব ছবি সম্মানিত হয়েছে যথাক্রমে তাদের নাম— পশ্চিম জার্মানির "রোজেজ ফর দি এটর্নি জেনারেল", রুমানিয়ার "রিভার অ্যাম্বুশ" ও সোভিয়েট ইউনিয়নের "হিরোজ অফ টুডে"। "দ্যাট নাইট ইন রোম" নামক ইতালীয় ছবিতে অভিনয় ও পরিচালনার জন্যে যথাক্রমে গিওভ্যান্না র‍্যালি ও রবার্টো রোসেলিনিকে দুটি বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় ছবি "হীরামোতী" (ইংরেজি নাম "ডাম্ব ক্রিচার্স") ও স্পেনিয়ার "ইফ আই হ্যাড এ হর্স" অনারেব্‌ল মেনশন লাভ করেছে।

• • •

কেন্দ্রীয় সরকারের বেতার ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত সংবিধান স্বীকৃত চোদ্দটি ভাষায় লিখিত লোকনাট্য রচনা প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে চিত্রসাংবাদিক সুধাংশু বক্সী লিখিত "দেশের ডাক" নাটকটি ৭৫০ টাকা পুরস্কার লাভ করেছে।

খেলার মাঠে

একলব্য

বিচিত্র অলিম্পিক। মহান রোম। বিচিত্র এবং বিপুল অলিম্পিকের আয়োজন। যুগযুগান্তের ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত, সভ্যতার প্রাচীন পাদপীঠ বিশাল রোম। সেই রোম নগরীতে সপ্তদশ অলিম্পিকের আসর—এ যেন মণি-কাঞ্চন সংযোগ। এ যেন শক্তির সঙ্গে সংস্কৃতির সমন্বয়। এ যেন বিশ্ব সভ্যতার রঙ্গমঞ্চে বিশ্ব-ক্রীড়ার মহা আসর।

সপ্তদশ অলিম্পিকের জন্য রোম আজ নতুন সাজে সজ্জিত। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের পাশে গড়ে উঠেছে বিরাট বিরাট অট্টালিকা, বৃহৎ বৃহৎ ক্রীড়াসৌধ, খেলার মাঠ, সুইমিং পুল, কুস্তির আসর—আরও কত কি! সারা বিশ্বের বাছা-বাছা মেয়ে-পুরুষ অ্যাথলেট, ক্ষিপ্রগতি সাঁতারু, সাঁতার পটিয়সী তরুণী রোমে এসে সমবেত হয়েছেন, এসেছেন নাম-ডাকের সব খেলোয়াড়, আর এসেছেন সুপটু মুষ্টিচালক, দৃঢ়চেতা মল্লযোদ্ধা, নিপুণ অসি-সঞ্চালক, শক্তিধর ভারোত্তোলক, স্থিরলক্ষ্য রাইফেলচালক এবং কলা-কুশলী জিমন্যাস্ট। জগৎজোড়া খেলার মেলায় যে-যে বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, সবাই এখন রোমে। সপ্তদশ অলিম্পিকের আসন্ন লগ্নের জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব। শক্তি ও শৌর্য, নৈপুণ্য ও কলাচাতুর্যের মহা-পরীক্ষার জন্য সবাই প্রস্তুত।

এদিকে প্রাচীন অলিম্পিকের অনুষ্ঠান-ক্ষেত্র—গ্রীসের অলিম্পিয়ায় আতসী কাচের সাহায্যে সূর্যরশ্মি থেকে প্রজ্বলিত অলিম্পিক পুতাগ্নি রোমের দিকে যাত্রা করেছে। অলিম্পিয়ার দেবী মন্দিরে দেবরাজ জিউসের আরাধনায় মগ্ন পূজারিণী আলেকা কামেলী শুচিশুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে গত ১২ই আগস্ট অলিম্পিক পুতাগ্নি প্রজ্বলিত করেন। ১২ জন সুন্দরী গ্রীক তরুণী সুসজ্জিত বেশে এবং আনুষঙ্গিক আচরণবিধির সঙ্গে মঙ্গলস্তোত্র পাঠ করতে করতে মাটির পাত্রে অগ্নিশিখা বয়ে নিয়ে আসেন। দেবতার আশীর্বাদ কামনার পর গ্রীক অ্যাথলেটেরা হাজার হাজার কৌতূহলী দর্শকদের মধ্যে দিয়ে রিলে প্রথায় অগ্নিশিখা নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। অ্যাথলেটদের হাতে হাতে বাহিত হয়ে অগ্নিশিখা প্রথম অলিম্পিকের অনুষ্ঠান-ক্ষেত্র এথেন্সের অলিম্পিক স্টেডিয়ামে পৌঁছে। সেখান থেকে জাহাজযোগে অলিম্পিক মশাল দক্ষিণ ইতালীতে নিয়ে যাওয়া হবে। আবার অ্যাথলেটদের হাতে-হাতে বাহিত হয়ে আগস্টের ২৫ তারিখে পুতাগ্নি রোমে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হবে সতের দিনব্যাপী সপ্তদশ অলিম্পিকের খেলাধুলো।

• • •

ব্যবস্থাপনা যোগদানকারী রাষ্ট্র ও প্রতিযোগীর সংখ্যা—সর্বোপরি প্রতি-দ্বন্দ্বিতার উৎকর্ষ সব দিক দিয়েই অলিম্পিক খেলাধুলোর ইতিহাসে রোম যে সব রেকর্ড ভেঙে দেবে তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। রোমে শুধু প্রতিযোগীর সংখ্যাই হবে সাত হাজারের বেশি। আর রাষ্ট্রের সংখ্যা দাঁড়িয়ে যাবে আশীর কোঠায়। যোগদানকারী রাষ্ট্র ও প্রতি-যোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হয়েছিল ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে। হেলসিঙ্কিতে যোগ দিয়েছিল ৬৯টি রাষ্ট্র আর ৫৮৬৭ জন প্রতিযোগী। সুতরাং এবার অলিম্পিক ইতিহাসে রোম সৃষ্টি করবে এক নতুন রেকর্ড। আর রেকর্ডের ইতিহাস লিখতে হবে নতুনভাবে। অ্যাথলেটিকস ও সাঁতারের সব রেকর্ডই হয়তো এখানে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

অলিম্পিক খেলার মহামেলাকে সাফল্য-মণ্ডিত করবার জন্য ইতালী সরকার এবং ইতালীর অলিম্পিক কমিটি কোন চেষ্টারই ত্রুটি করেননি। কোষাগার খুলে দিয়ে দু-হাতে অর্থ খরচ করেছেন। প্রতিযোগীদের থাকবার জায়গা অলিম্পিক ভিলেজের জন্যই খরচ হয়েছে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা। প্রতিযোগী এবং দেশ-বিদেশের ক্রীড়া-প্রতিনিধিদের সুযোগ-সুবিধার জন্য ২৫টি ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্মের তেরো হাজার কর্মী রাতদিন খেটে রোমে তৈরি করেছে এক নতুন বিমান-বন্দর। এর জন্য খরচ হয়েছে সাড়ে ষোল কোটি টাকা। এছাড়া নতুন নতুন স্টেডিয়াম, সুইমিং পুল, দোকান-পসার, রাস্তাঘাট তৈরি করতে কত টাকা যে খরচ হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই।

জ্ঞান-গরিমায়, শিক্ষায়-দীক্ষায়, শিল্প-ভাস্কর্যে রোম বিশ্বকে অনেক কিছু দান করেছে। সুতরাং রোমের অধিবাসীরা তাদের সুমহান ঐতিহ্য সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন। বিশ্বের ক্রীড়া-প্রতিনিধিদের সুখ-

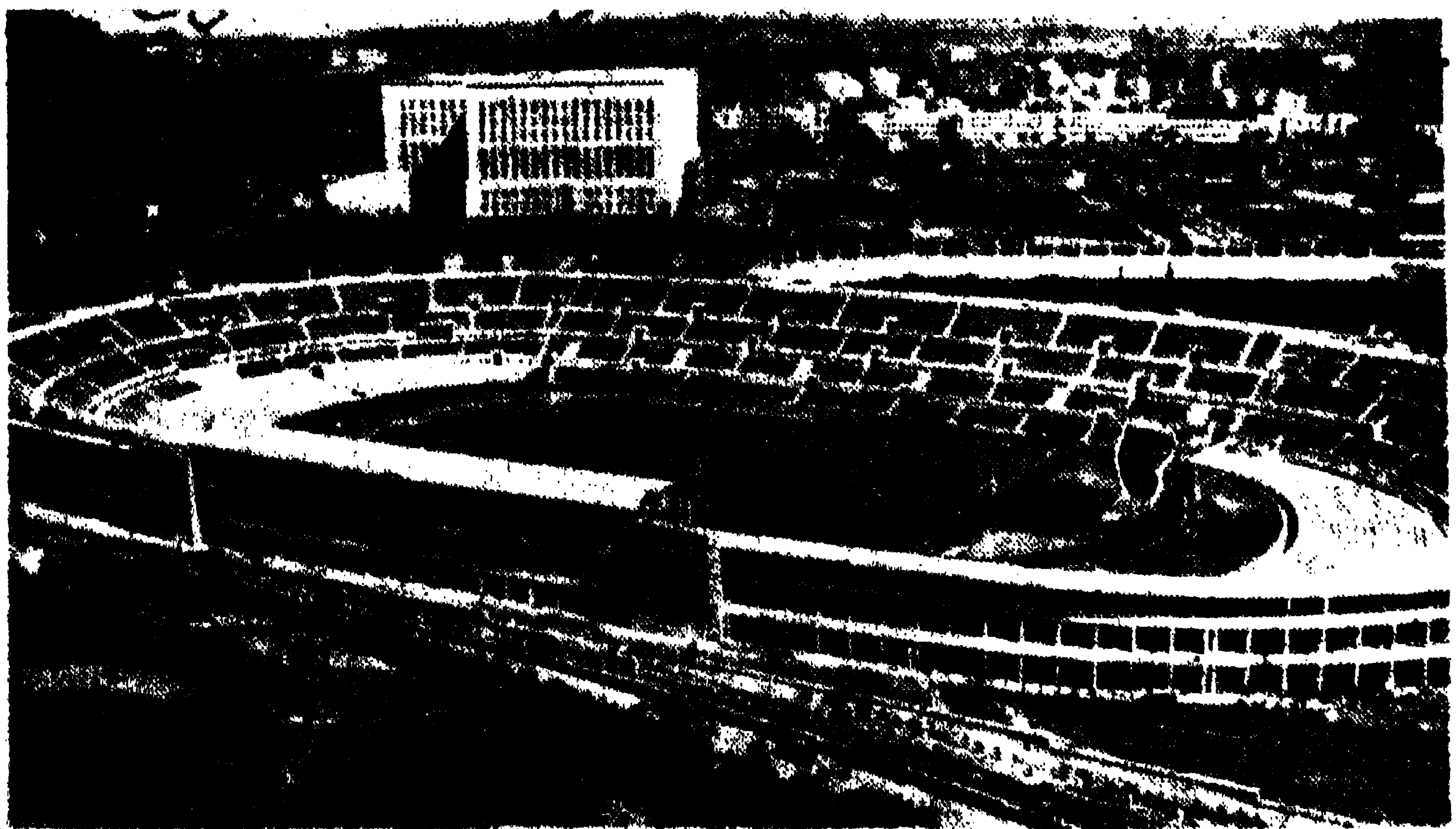

GOVE… Cooch Behar

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

৮ই আগস্ট—কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী অদ্য লোকসভায় বলেন যে, ভারতীয় বস্ত্রকল মালিক সমিতি কাপড়ের মূল্য শতকরা দশ টাকা কমাইবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, গভর্নমেণ্ট তাহাতে সন্তুষ্ট নহে। গভর্নমেণ্ট আশা করে যে, উৎপাদকরা এখনই কাপড়ের দাম আরও কমাইবেন।

৯ই আগস্ট—গত ১০ই ও ১১ই জুলাই অসমীয়া দুর্বৃত্ত দল ব্রহ্মপুত্রের তটভূমিতে কোকিলামুখে অবস্থিত স্বামী নিগমানন্দ সারস্বত মঠ ও শান্তি আশ্রমটি ভস্মীভূত করে এবং ব্রহ্মচারিগণকে প্রহার করিয়া নির্যাতিত করে। মঠ ও আশ্রমটির প্রায় ১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। প্রায় ৫০ বছর আগে স্বামী নিগমানন্দ এই আশ্রমটি নির্মাণ করেন।

সংসদে বিরোধী দলের পাঁচজন বাঙালী সদস্য আগামী ১৫ই আগস্ট তারিখে রাষ্ট্রপতি ভবনের প্রীতি-সম্মেলনে যোগদানে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া উপরাষ্ট্রপতির নিকট এক পত্র লিখিয়াছেন। উক্ত দিবসটি আসামে বাঙালীদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে 'শোক দিবস' হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত করায় তাঁহাদের পক্ষে ঐ দিবস কোন আনন্দ উৎসবে যোগদান সম্ভব হইবে না।

১০ই আগস্ট—চব্বিশ পরগণা জেলার ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার কয়েকটি থানায় ত্রাণকার্য বাবদ সরকারী অর্থ ও জিনিসপত্র লইয়া ছিনিমিনি খেলার যে গুরুতর অভিযোগ উঠিয়াছে, তাহার সহিত ঐ মহকুমার উচ্চপদস্থ কয়েকজন সরকারী অফিসারও জড়িত আছেন বলিয়া একাধিক অভিযোগ রাজ্য সরকারের নিকট পৌঁছিয়াছে।

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিল অদ্য লোকসভায় এই মর্মে ইঙ্গিত করেন যে, এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে গম প্রেরণের উপর যে নিষেধাজ্ঞা আছে খুব শীঘ্রই তাহা প্রত্যাহার করা হইবে।

১১ই আগস্ট—অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই অদ্য লোকসভায় এই তথ্য প্রকাশ করেন যে, লোকসভার কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা শ্রী এস এ ডাঙ্গের বিরুদ্ধে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় আইন ভঙ্গ করার অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করা হইতেছে।

ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগের উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বালক চুরির কাজে লিপ্ত থাকিবার সন্দেহে বালীগঞ্জ পুলিস অদ্য ৫ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে বলিয়া জানা যায়।

১২ই আগস্ট—আসামে বাঙালী বিতাড়ন যজ্ঞের নারকীয় ঘটনাবলীতে বিক্ষুব্ধ বাঙলার মর্মবেদনা উপলব্ধি করিয়াই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল স্বাধীনতা দিবসে রাষ্ট্রীয় সম্বর্ধনা বাতিল করিয়াছেন। প্রদেশ কংগ্রেস এবং অন্যান্য অনেক সংস্থাও স্বাধীনতা দিবসের উৎসব সম্পূর্ণ বর্জন করিয়াছে।

গত ৩রা জুন একটি চীনা টহলদার বাহিনী কামেং সীমান্ত ডিভিশনে ভারতীয় সীমান্ত লঙ্ঘন করায় ভারত সরকার চীন সরকারের নিকট তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। অদ্য লোকসভায় প্রশ্নোত্তরকালে প্রধানমন্ত্রী এই তথ্য প্রকাশ করেন।

বাঙলা দেশের সংস্কৃতি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা কলাশাস্ত্র পারঙ্গমা বিদগ্ধা শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী সাতাশী বছর বয়সে অদ্য অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায় শান্তিনিকেতনে শেষ-নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৩ই আগস্ট—এ আই সি সি'র সদস্যা শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী এম-পি এবং শ্রীমতী আভা মাইতি এম-পি গতকল্য পেট্রাপোলে আসাম হইতে আগত উদ্বাস্তুদের আশ্রয়শিবির পরিদর্শন করেন। আসামে বাঙালীদের উপর যে বীভৎস অত্যাচার চালান হইয়াছে, অত্যাচারিতের মুখে সেই মর্মান্তিক কাহিনী শুনিতে শুনিতে তাঁহাদের মুখে বেদনার ছায়া পড়ে।

১৪ই আগস্ট—শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ সকাল সাড়ে দশটায় বিশেষ বিমানে কোচবিহারে আসিয়া পৌঁছিলে তিন শত লোকের এক জনতা কৃষ্ণ পতাকা লইয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। জনতার ভিতর হইতে তাঁহাকে পরিবার জন্য একখানা কালো শাড়িও দেওয়া হয়। বিক্ষোভকারীরা শ্রীমতী গান্ধীকে ফিরিয়া যাইতে বলে।

এক সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, এই বৎসর ১লা অক্টোবর হইতে নির্দিষ্ট অঞ্চলসমূহে সকলপ্রকার ব্যবসায়িক আদানপ্রদানে মেট্রিক ওজন ব্যবহার বাধ্যতামূলক হইবে।

কলিকাতায় শীঘ্রই ইংরাজীতে ও বাংলায় দুইটি দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইবে। পত্রিকা দুইটির নাম যথাক্রমে 'দি পিপলস ওয়েলফেয়ার' ও 'জনকল্যাণ'। অধুনালুপ্ত ঢাকার 'ইস্টবেঙ্গল টাইমস' এর শ্রীচারুচন্দ্র গুহ এই নূতন পত্রিকা দুইটির সম্পাদক হইবেন।

প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও শ্রমমন্ত্রী সাম্প্রতিক ধর্মঘটের সময় সরকার ও কর্মচারীদের মধ্যে বিরোধীয় বিষয়ে আলাপ আলোচনার সুবিধার জন্য কোন একটি সংস্থা স্থাপনের যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা কার্যকর করা হইবে। এই সংস্থা হুইটলি সংস্থার অনুরূপ কিছু হইবে, তবে নিছক পরামর্শ প্রদান ছাড়া আরও কিছু অধিকার এই সংস্থার থাকিবে। এই অধিকার হইল কয়েকটি নির্ধারিত বিষয় বিচারের অধিকার।

বিদেশী সংবাদ

৮ই আগস্ট—কংগ্রেসের নিকট এক বিশেষ বাণীতে প্রেসিডেণ্ট আইসেন হাওয়ার বলেন—সম্প্রতি কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কম্যুনিস্টরা নূতনভাবে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। মধ্য আফ্রিকা ও কিউবার পরিস্থিতিকে তাহারা কার্যসিদ্ধির প্রয়োজনে লাগাইতে পারে।

রাষ্ট্রপুঞ্জ যদি কাতাঙ্গা প্রদেশের কঙ্গো হইতে পৃথক হইয়া যাওয়ার সমস্যার সমাধান করিতে না পারেন, তবে ঘানার পার্লিয়ামেণ্ট কঙ্গোস্থিত বেলজিয়ান সৈন্যদের বিরুদ্ধে ঘানার সৈন্যবাহিনীকে "আক্রমণাত্মক কার্যে ব্যবহারের জন্য" প্রেসিডেণ্ট কোয়ামে এনক্রুমাকে ক্ষমতা দিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

৯ই আগস্ট—১৫ বৎসর বয়স্কা মিস সুসান ড্যাডিলে ব্রিটেনের সর্বাপেক্ষা লম্বা ২৪ মাইল লেক ২৬ ঘণ্টা ১০ মিনিটে অতিক্রম করিয়া বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে। ইতিপূর্বে কোন মহিলা সাঁতারুই এই লেক অতিক্রম করিতে পারে নাই।

কাতাঙ্গার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোইসে শোম্বেকে কাতাঙ্গার প্রেসিডেণ্ট বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। কাতাঙ্গা কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের একটি প্রদেশ। কিন্তু উহা পৃথক হইয়া নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

১০ই আগস্ট—গতকল্যের সামরিক অভ্যুত্থানের পরে আজ লাওসের সঙ্গে অবশিষ্ট বিশ্বের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। বেতার এবং টেলিফোনের যোগাযোগ নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। রাজধানী হইতে বাহিরে কোন বিমান যাত্রা করে নাই এবং বাহির হইতে রাজধানীতে কোন বিমান আসে নাই।

বেলজিয়ান রেডিয়োর বিশেষ সংবাদদাতা লিওপোল্ডভিলে হইতে আজ রাত্রে সংবাদ দিয়াছেন যে, রাজধানীতে বিক্ষোভকারীদের দ্বারা শ্রীলুমুম্বা "গুরুতররূপে আহত" হইয়াছেন।

১১ই আগস্ট—গত রাত্রে ঘোষণা করা হয় যে, শুক্রবার শ্রীদাগ হ্যামারশীল্ডের ব্যক্তিগত নেতৃত্বে কঙ্গোস্থ রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর ৩০০ শত সুইডিশ সেনা কাতাঙ্গা প্রবেশ করিবে। এদিকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় যে, ঐ দিন কাতাঙ্গা হইতে সমস্ত বেলজিয়ান সৈন্য অপসারণ করা হইবে বলিয়া বেলজিয়ান শ্রীহ্যামারশিল্ডকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

১২ই আগস্ট—রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল শ্রীদাগ হ্যামারশিল্ড অদ্য বেলা ২-৪৫ মিনিটের সময় কঙ্গোর কাতাঙ্গা প্রদেশের রাজধানী এলিজাবেথভিলে আসিয়া উপনীত হন। কাতাঙ্গা প্রদেশের প্রেসিডেণ্ট শ্রীশোম্বে বিমানঘাটিতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

১৩ই আগস্ট—"সত্যসত্যই এ এক কল্পলোক!"—পঁচিশ মাইল উপর হইতে বেতারযোগে এই বাণী পাঠাইয়াছেন মার্কিন বিমান বাহিনীর মেজর রবার্ট এম হোয়াইট। গতকাল যে এক্স-১৫ বিমানটি সর্বোচ্চ শূন্যে—১৩১০০০ ফুট উঠিয়া বিশ্ব-রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে, মেজর হোয়াইট ছিলেন তাহারই পাইলট।

১৪ই আগস্ট—পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তাঁহার বেতার ভাষণে শ্রীনেহরুর পাকিস্তান আগমনের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ভারতের মনোভাবের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। তিনি বলেন, "ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শান্তি বজায় রাখার জন্য কাশ্মীর সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান আবশ্যক।"

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫. টাকা।
মফঃস্বলে : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস ৬ সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

দেশ

DESH 40 Naya Paise
Saturday, 27th August, 1960

২৭ বর্ষ ॥ ৪৩ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১১ ভাদ্র, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কয়েকদিন আগে আসামের শোচনীয় ঘটনা ও তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন। ঐ মন্তব্য একটি আবেদনের আকারে প্রচারিত হইয়াছে। মন দিয়া পড়িলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই আবেদনের প্রধান লক্ষ্য ভারত সরকারের আন্তরিকতা ও আসাম সরকারের শুভবুদ্ধি। কারণ আসামে যে ঘটনা ঘটিয়া গেল ও যাহার ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উদ্বাস্তু আগমন আরম্ভ হইয়া এখনো অব্যাহত আছে তাহার প্রতিকারার্থে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের করণীয় বিশেষ কিছুই নাই। পশ্চিমবঙ্গ প্রতিকারের ক্ষমতাহীন ভুক্তভোগী। এ এক অসহনীয় অবস্থা। উদ্বাস্তু আগমন বন্ধ করিতে পারেন, আগত উদ্বাস্তুগণকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারেন আসাম সরকার তথা ভারত সরকার, প্রথমোক্তের শুভবুদ্ধি যদি জাগ্রত হয় আর শেষোক্তের আন্তরিকতা যদি সত্য ও সক্রিয় হয়। কিন্তু যতদিন তাহা না হইতেছে ততদিন পশ্চিমবঙ্গকে গ্রহণ করিতেই হইবে নূতন উদ্বাস্তুর দল, যদিচ তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক কাঠামোর ভাঙিয়া পড়িবার বিশেষ আশঙ্কা।

"মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই সম্পর্কে কোন দ্বিমত থাকিতে পারে না যে, কিছু কালের জন্য আসামের প্রশাসন অবস্থার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। ইহাও সত্য যে, আসামের বহু জায়গায় বাঙালীদের উৎখাত করিতে এক পরিকল্পিত কার্যসূচী লওয়া হয়। যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহা আকস্মিক হইতে পারে না। ঘটনাবলী লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, ঐ সকল কার্যসূচী বহু পূর্ব হইতেই প্রস্তুত করা হয় এবং ঐ কার্যসূচী সার্থকভাবে রূপায়নের ব্যাপারে কিছু সংখ্যক দায়িত্বশীল ব্যক্তিও প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবেই হউক নিশ্চিতভাবে জড়িত ছিলেন। নতুবা এত ভয়ংকর ভাবে, এত দ্রুততায় এই হিংসাত্মক কার্যকলাপ ছড়াইয়া পড়িত না। ঐ সকল প্রস্তুতি সম্পর্কে প্রশাসন যে অবহিত ছিলেন না, ইহাও ঠিক।"

ডাঃ রায়ের এই মন্তব্যের সহিত নিতান্ত স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া প্রায় সকলেই একমত হইবেন। বস্তুত, সরেজমিনে যাঁহারা আসাম পর্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা অনুরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। স্বল্প সময়ের মধ্যে ব্যাপক ও দুর্গম অঞ্চল জুড়িয়া এহেন তাণ্ডব পূর্ব পরিকল্পনা, গোপন প্রশ্রয় ও প্রচুর অর্থবল ছাড়া সম্ভব নয়। আসাম সরকার, আসাম কংগ্রেস, আসামের যাবতীয় রাজনৈতিক দল স্ব স্ব শক্তি অনুসারে এই ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া লোকের ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। ইহারা ছাড়া আরো কোন সম্প্রদায়, স্বার্থ ও ব্যক্তি যে ইহার সহিত জড়িত নাই তাহা বলা যায় না। সেই জন্যই ব্যাপক ও নিরপেক্ষ তদন্ত অত্যাবশ্যক। ব্যাধির কারণ না জানিলে চিকিৎসা সম্ভবে না। তদন্তে কারণ প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা। সেইজন্য প্রবীণ সুচিকিৎসক ডাঃ রায় তদন্তের দাবী করিয়াছেন।

"মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুনর্বাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে যে সকল বাড়ি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, সেইগুলি অবিলম্বে নূতন করিয়া তৈরী করা দরকার। ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া দরকার এবং ভবিষ্যতে ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হওয়ার জন্য আসামের হাঙ্গামার কারণ অনুসন্ধানকল্পে একটি তদন্তের ব্যবস্থা করা দরকার।" তিনি আরও বলেন, "তিনি সংবাদপত্রের রিপোর্টে দেখিয়াছেন যে, আসামে শান্তি ফিরাইয়া আনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কয়েকটি সক্রিয় ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করিতেছেন।" এই তদন্তের দাবী আমাদের সম্পাদকীয় মন্তব্যে অনেক আগে করিয়াছি, বলিয়াছি যে আমূল ও নিরপেক্ষ তদন্ত হইলে খুব সম্ভব অনেক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। ভুলিলে চলিবে না যে, আসাম সীমান্ত রাজ্য, তাহার একদিকে লাগাও পাকিস্তান, অন্যদিকে অন্য দুইটি রাষ্ট্র।

ভাষার সমস্যাই নাকি ইহার কারণ এরূপ কথিত হইয়া থাকে। আমাদের বিশ্বাস, ইহা কারণ নয়, অজুহাত মাত্র। কেননা, যাঁহারা আসামের আভ্যন্তরীণ অবস্থার কিছু কিঞ্চিৎ খবর রাখেন তাঁহারা জানেন যে, "ভাষা আন্দোলনের" চেয়ে "বঙ্গালখেদা" আন্দোলন অনেক প্রাচীন। বৃটিশ আমলেও মাঝে মাঝে "বঙ্গালখেদা" আন্দোলন মাথা তুলিয়াছে। তারপরে ১৯৪৮ ও ১৯৫৫ সালে "বঙ্গালখেদা" আন্দোলনের যে ছোট বন্যা দেখা দিয়াছিল, এখন ১৯৬০ সালে তাহারই ভয়াবহ প্রকাশ, যাহার ফলে অল্পাধিক এক মাসের মধ্যে ত্রিশ হাজারের অধিক বাঙালী আসাম হইতে বাস্তুত্যাগ করিয়া পঃ বঙ্গে আসিতে বাধ্য হইল।

মনে হইতেছে যে, এতদিন পরে ভারত সরকার আসাম সমস্যার গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন, ডাক্তার রায়ের আবেদনে তাহার উল্লেখ আছে। শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে, একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আসামে উপস্থাপিত হইবেন। আমাদের মনে হয় ইহা যথেষ্ট নয়। আসামের যে কয়টি জেলা সবচেয়ে উপদ্রুত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটিতে একজন করিয়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়। তাঁহারা যেন কেন্দ্রীয় সরকারের "চক্ষু"। উপদ্রুত অঞ্চলে পিটুনী কর ধার্য হইলে ভবিষ্যতে এমন কাণ্ড ঘটিবার আশঙ্কা কমিবে বলিয়া মনে হয়। যদিচ আসামের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের হাত কলঙ্কিত, তবু সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব কংগ্রেস দলের। ইহা প্রাচীনতম, বৃহত্তম ও শাসনভারপ্রাপ্ত দল। তাহার কলঙ্ক সর্বভারতীয় কংগ্রেস দলের কলঙ্ক। এই কলঙ্ক মোচনার্থে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আসাম সরকারের "স্বেচ্ছায়" পদত্যাগ করা উচিত। তখন প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম হইতে পারিবে, তদন্তের পথও সুগম হইবে। আশা করি, ডাঃ রায়ের আবেদন ভারত সরকারের আন্তরিকতা ও আসাম সরকারের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করিতে সাহায্য করিবে।

প্রসঙ্গত

আসামে হত্যাকাণ্ডের ব্যাপকতা হ্রাস পেলেও অবস্থা যে এখনও শান্ত হয়নি তার প্রমাণ ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত মারপিট ও খুন-জখমে পাওয়া যাচ্ছে। আসাম যদিও ভারতবর্ষেরই একটি অংশ এবং রাষ্ট্রতন্ত্রের বিধানানুযায়ী ভারতের যে-কোন অংশের অধিবাসী অন্য যে কোনো অংশে নিরাপদে বসবাস ও জীবিকার্জনের সুযোগ পেতে পারে, তবু যে সমস্ত বাঙালী শতাধিক বর্ষ থেকে আসামেই বাস করে আসছেন এবং যাঁদের এখন আসামের অধিবাসী বলেই গণ্য করা উচিত, অসমীয়ারা তাঁদের আসামে বাস করতে দিতে অনিচ্ছুক. এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত ঘটনা থেকে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈনের নেতৃত্বে সংসদ সদস্যদের দল আসাম পরিদর্শনে গেছেন। বহু ব্যক্তি ও দল তাঁদের কাছে আসামে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে নানাপ্রকার প্রস্তাব পেশ করছেন। সেই প্রস্তাব-বৈচিত্র্যের মধ্যেও কয়েকটি বিষয়ে কিন্তু সকলেই একমতঃ (১) দাঙ্গা দমনে আসাম সরকারের অযোগ্যতা যেমন শোচনীয়ভাবে প্রমাণিত হয়েছে তাতে শাসন ব্যবস্থার প্রচুর পরিবর্তন না হলে ভবিষ্যৎ শান্তি প্রতিষ্ঠার কোনো নিশ্চয়তা নেই এবং (২) এই পৈশাচিক দাঙ্গার মূল নায়কদের শাস্তি বিধান না হলে শুধু বড় বড় নেতাদের মুখের কথায় উদ্বাস্তু বাঙালীদের মনে আসামে ফেরবার সাহস জাগবে না। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিচার বিভাগীয় তদন্তের এবং কোনো কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ব্যবস্থার কথা বলেছেন। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ দুটি প্রস্তাবই নাকি মেনে নিয়েছেন। কিন্তু তদন্ত শান্তি ফিরে আসার আগে হবে না। এবং শান্তি কবে ফিরবে, আশ্বস্ত উদ্বাস্তুরা কবে ফিরে যাবে কেউ জানে না। সুতরাং ওই দুটি প্রস্তাবের আপাতত বিশেষ গুরুত্ব নেই বলা চলে। ইতিমধ্যে বিক্ষুব্ধ বাংলায় অসন্তোষ ধূমায়িত। সমস্ত বামপন্থী দলগুলি (একত্রে অবশ্য নয়, পৃথক পৃথকভাবে) কেউ বা সত্যাগ্রহের, কেউ বা আইন অমান্যের কথা চিন্তা করছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সুবিচার লাভের আশা সকলেই ত্যাগ করেছেন। ভয় হয় যে-কোনো সময়ে আন্দোলনের আগুন জ্বলে উঠবে।

*

সকলের মনে এই প্রশ্ন আজ বড় হয়ে উঠেছে যে, স্বাধীনতা লাভের পরে এখনই কি ভারত টুকরো টুকরো হয়ে যাবে? যদি যায় (আমরা আশা করি যাবে না) সে দায়িত্ব কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপরই পড়বে। আবহমান কাল থেকে ভারতে অনেকগুলি ভাষা এবং অনেকগুলি রাজ্য বর্তমান। শুধু ভাষা নয়, সংস্কৃতি এবং আচার-ব্যবহারগত বৈচিত্র্যও রয়েছে। সেটা ভয়ের কথা নয়। কারণ এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটি গভীর ঐক্যের ফল্গুধারা প্রবাহিত। চোখে দেখা না গেলেও অন্তর দিয়ে তা অনুভব করা যায়। অনন্তকাল থেকেই এই বিরাট উপমহাদেশের মানবসমষ্টি যে একটি ভারতের জয়গান গেয়ে আসছে তা কখনই নিছক কবি-কল্পনা নয়। ভয় তখনই জাগে যখন ভাষা কিংবা সংস্কৃতি কিংবা হয়তো তুচ্ছ কোনো-কিছুকে উপলক্ষ্য করে পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ জেগে ওঠে। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সেই ঘৃণা ও বিদ্বেষের বিষবীজ তখন সরিয়ে ফেলতে হয়। মনোমালিন্য দুই সহোদরের মধ্যেও সম্ভব। জবরদস্তির সঙ্গে একই বাড়ির থামে তাদের বেঁধে রাখলে মনোমালিন্য অন্তর্হিত হবে না, বরং তার থেকে ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্ম নেবে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, কি কারণে জানি না, এই সহজ কথাটা বুঝতে চাইছেন না। বোঝেন (যেমন অন্ধ্রে এবং সংযুক্ত মহারাষ্ট্রে), কিন্তু অনেক বিদ্বেষ জমা হবার পরে, অনেক দেরিতে। ভাষাই যদি আসামের বর্বর কাণ্ডের কারণ হয় তাহলে ভাষার ভিত্তিতে আসাম ভাগ করে দেওয়া হোক।

*

বিশেষ, আসাম তো ভাগ হয়েই যাচ্ছে। পৃথক নাগারাজ্য গঠিত হতে চলেছে. কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিচালনাধীনে যদিও নয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিচালনাধীনে। এ সম্বন্ধে যাঁরা আশংকা প্রকাশ করেছেন তাঁদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে নাগাদের নিজের রাষ্ট্রতন্ত্র প্রণয়নের প্রশ্ন ওঠে না, কিছু কিছু উপধারা তৈরী হবে মাত্র। অবস্থা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত আইন ও শৃংখলা সংরক্ষিত দপ্তর হিসাবে রাজ্যপালের হাতে থাকবে। আগামী দশ বৎসর পর্যন্ত ট্যুয়েনসাং অঞ্চলের শাসনভার রাজ্যপালের হাতে ন্যস্ত থাকবে। সমস্ত নাগা উপজাতির নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে একটি সংস্থা গঠিত হবে। শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে এই সংস্থা রাজ্যপালকে পরামর্শ দেবে, কিন্তু তার দ্বারা রাজ্যপালের ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হবে না। কেউ কেউ এই নতুন রাজ্যের নাম নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন। শ্রীনেহরুও স্বীকার করেছেন, নামটা তাঁরও পছন্দ হয়নি। কিন্তু নামটা খুব মস্ত বড় ব্যাপার নয়। কেউ খোঁচা দিয়েছেন, এতে করে "বিদ্রোহীদের কাছে আত্মসমর্পণ" করা হয়েছে। বিদ্রোহ দমন করার পর বিদ্রোহীদের দাবি আংশিক পূরণ করার নাম আত্মসমর্পণ নয়। চীন-সীমান্তে অনন্তকাল অশান্তি এবং অসন্তোষ জিইয়ে রাখাই কি সমীচীন হত?

*

আমরা এই নতুন রাজ্যকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। এই নবরাজ্যের সমস্ত প্রয়াস যেন নাগা উপজাতিসমূহের এবং সেই সঙ্গে সমগ্র ভারতের কল্যাণের দিকে প্রবাহিত হয়। চীনের কামানের পাল্লার মধ্যে দাঁড়িয়ে আসামে যে বিদ্বেষবহ্নি জ্বলছে এই অঞ্চল তার থেকে মুক্ত রইল, সেও কম আশার কথা নয়। এই সঙ্গে মণিপুর এবং ত্রিপুরার দাবি গ্রাহ্য হলে আরও সুখের বিষয় হত। সেখানেও যথেষ্ট অসন্তোষ অনেকদিন থেকে চলে আসছে। কেন্দ্রীয় অব্যবস্থিতচিত্ততার ফলেই তা পিছিয়ে রইল। এই অব্যবস্থিতচিত্ততার ফল সংযুক্ত মহারাষ্ট্র ভোগ করলে। পাঞ্জাব ভোগ করছে 'পাঞ্জাবী সুবা' নিয়ে। সেখানে কয়েক সহস্র ইতিমধ্যেই কারাবরণ করেছে। ক্ষমতাসীন মানুষ তাই নিয়ে উপহাস বর্ষণ করছে। ইতিহাসের লিখন এরা পড়তে জানে না। যখন পড়তে শিখবে তখন ভাষাগত বিরোধের বটবৃক্ষ ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন এবং সুমহান ঐক্যের ইমারতে অনেকখানি ফাটল সৃষ্টি করবে, তখন অনেক বিদ্বেষ দুটি ভাষাভাষীর মধ্যে জমে উঠবে এবং অনেক অকারণ রক্তস্রোত বয়ে যাবে। তার আগে নয়। সেইটেই গভীর আশংকা ও পরম পরিতাপের বিষয়।

বিজ্ঞপ্তি

দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন-এর পাঁচ নম্বর বাড়ি, দ্বিতলের দক্ষিণের বারান্দা — ভারতীয় শিল্প সংস্কৃতির এমন পীঠস্থান আর নেই। একদা ভারতীয় শিল্পের দুই মহাসাধক গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ এই দক্ষিণের বারান্দাটিকে শিল্পের তীর্থসঙ্গমে পরিণত করেছিলেন। দুই সাধক শিল্পীর কত অসংখ্য স্মৃতি দিয়ে ঘেরা তাঁদের সেই প্রিয় দক্ষিণের বারান্দা। আজ না আছে পাঁচ নম্বর বাড়িটি, না আছে দক্ষিণের বারান্দা। ঐতিহ্য ও স্মৃতিময় সেই বাড়ির ঘরোয়া স্মৃতি-কথা লিখেছেন অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র ও সুসাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। আগামী সপ্তাহ থেকে এই স্মৃতিকথা "দক্ষিণের বারান্দা" ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক—দেশ

বৈদেশিকী

এই সপ্তাহে রাজ্যসভায় বৈদেশিক ব্যাপার আলোচনা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু চীন সরকারের ভারত-বিরোধী প্রচার ও কার্যকলাপের কথা কিছু বলেন। সেই সূত্রে তিনি ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টিরও প্রচার ও কার্যকলাপের নিন্দা করে কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ করেন। সেগুলি অনেকের কাছেই কিছু "নূতন কথা" নয়; কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর মুখ দিয়ে বেরুবার ফলে সেগুলি একটা অন্যরকমের বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে। কারণ কম্যুনিস্ট কার্যকলাপ সম্বন্ধে শ্রীনেহরু যা বলেছেন দেশের মধ্যে সেই ধরনের কার্য-কলাপের অস্তিত্ব স্বীকার করার পরে কোনো গভর্নমেন্টের পক্ষে সে সম্পর্কে কোনো সক্রিয় প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা নিশ্চয়ই কর্তব্যচ্যুতি হবে। পণ্ডিত নেহরু বলেছেন যে, ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্র স্বদেশপ্রেম এবং সত্য উভয়ই সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়ে জাতীয় স্বার্থের সর্বনাশকর অপপ্রচারে নিযুক্ত আছে। সেই অপপ্রচারের উদ্দেশ্য হচ্ছে চীন সরকারের সমর্থন, চীনারা যে ভারতের ওপর হামলা করেছে এবং তার দ্বারা যে সারা হিমালয় অঞ্চল এবং উত্তর সীমান্তের নিরাপত্তা বিপন্ন সেটা উড়িয়ে দেওয়া এবং এই আক্রমণাত্মক চীনা নীতির বিরুদ্ধে ভারতের আত্মরক্ষার সঙ্কল্প ও আয়োজনকে দুর্বল ও ব্যর্থ করা। প্রধানমন্ত্রী মহাশয় কম্যুনিস্ট পার্টির কেবল কাগজী প্রচারের কথা বলেন নি, সীমান্তের নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে ভারতীয় স্বার্থের হানিকর এবং চীনা নীতির সমর্থক প্রচার ও কার্য-কলাপের অভিযোগও তিনি কম্যুনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে করেছেন। এরূপ অভিযোগের গুরুত্ব সম্বন্ধে কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই। কারণ এটা কোনো ভালো-মন্দ মত প্রকাশের মাত্র প্রশ্ন নয়, দেশের পক্ষে এটা একটা নিছক নিরাপত্তার প্রশ্ন।

একটি বিদেশী শক্তি ভারতভূমির কতকাংশ জোর করে দখল করে বসেছে এবং আরো দাবি করছে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর সামরিক বলের সংহতি সাধন করে চলেছে, এই হল বাস্তব অবস্থা। এই অবস্থায় যদি প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে শুনা যায় যে, একটি ভারতীয় রাজনৈতিক দলের লোকেরা সেই বিপন্ন সীমান্তের নিকটবর্তী অঞ্চল-সমূহের অধিবাসীদের মধ্যে উক্ত বিদেশী শক্তির প্রতি অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করার কাজে লিপ্ত আছে তবে প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে, তাহলে সরকার এ বিষয়ে করছেন কী? পার্লামেন্টে কম্যুনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী কম্যুনিস্ট প্রভাবাধীন "পীস কাউন্সিলে"র কথাও বলেন। সম্প্রতি কলিকাতায় এই "পীস কাউন্সিলে"র ভারতীয় সংসদের যে অধিবেশন হয়েছে তাতে এবং তার সভাপতির একটি বক্তৃতায় ভারত-চীন বিবাদ সম্পর্কে যে-অদ্ভুত ভাব প্রকাশ পেয়েছে তার উল্লেখ করে শ্রীনেহরু বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কিন্তু এরূপ দেশপ্রেমহীন, জাতীয় স্বার্থ এবং দেশের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক এবং সত্যের সঙ্গে সম্পর্কবিবর্জিত প্রচার ও কাজ যারা করছে তাদের সম্বন্ধে মৌখিক নিন্দাবাদ ছাড়া আর কী কোনো কর্তব্য নেই? প্রধান-মন্ত্রী রাজ্যসভায় যা বলেছেন তার পরে এই প্রশ্ন এড়ানো যায় না।

দেশপ্রেমের দোহাই দিয়ে যা-খুশি করা বা চাওয়ার প্রলোভনকে প্রশ্রয় দেবার পক্ষপাতী আমরা নই। স্বাদেশিকতা—অর্থাৎ নিজের দেশের লোক বা গভর্নমেন্ট যাই করুক তাই সমর্থন করতে হবে, এরূপ

'নাভানা'র বই

পলাশির যুদ্ধ ॥ তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

মাত্র ন' ঘণ্টার ঘটনা হ'লেও পলাশির যুদ্ধ একটা ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ। এই সন্ধিক্ষণেই বাংলাদেশের মধ্যযুগের অবসান এবং বর্তমান যুগের অভ্যুদয়। কলকাতা শহরের গোড়াপত্তনের কথা, বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজের আঁতুড়ঘরের ইতিহাস লেখকের কথকতার বৈশিষ্ট্যে সার্থক উপন্যাসের মতো চিত্তাকর্ষক ॥ চার টাকা ॥

গড় শ্রীখণ্ড ॥ অমিয়ভূষণ মজুমদার

'গড় শ্রীখন্ড' উপন্যাসের আদ্যন্ত কাহিনীটি যেন যুগসন্ধির জীবন-জিজ্ঞাসার নির্ভুল জবাব। যন্ত্রসভ্যতা নয়, কোনো রাজনৈতিক তত্ত্বও নয়, দেশের মাটির মজ্জার উপরেই গণজীবনের শ্রী ও সমৃদ্ধি। বিশাল পট-ভূমিতে বিচিত্র প্রাণ-প্রবাহের গভীরতায় মহৎ উপন্যাস ॥ আট টাকা ॥

মীরার দুপুর ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

দেবদারুর মতো সক্ষম স্বামী এখন অসুস্থ। অচল সংসারকে চালু রাখার তাগিদে প্রসাধনের আড়ালে ক্লান্তি ও বিকৃতিকে ঢেকে নিয়ে মীরাকেই বেরুতে হচ্ছে টাকার ধান্দায়। শহরের বিচিত্র সংসর্গে শুচিতার ছিটেফোঁটা খোয়া গেলেও সভ্যসমাজ তো আর অসতী বলছে না তাকে। জীবিকার হিজিবিজি থেকেই হয়তো একদিন জীবনশিল্পের অমৃত উদ্ধার, নয়তো ঠাটঠমক বজায় রেখেও মীরা চক্রবর্তীরা শেষ পর্যন্ত শুকনো শূন্য এসেন্সের শিশি। . . . 'মীরার দুপুর' সমস্যা-পীড়িত প্রেমের প্রসঙ্গে বলিষ্ঠ আধুনিক উপন্যাস ॥ তিন টাকা ॥

চার দেয়াল ॥ সত্যপ্রিয় ঘোষ

বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন উন্মেষ—আর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট ছাত্রী বিনতা মধ্যবিত্ত জীবনের মামুলি নায়ক নায়িকা হ'য়েই চরিতার্থ হবে? যৌবনচেতনার আকস্মিকতায় সংস্কারজীর্ণ দেয়ালের উপর তাই অবরোধ-মুক্তির আর্তনাদ বেজে উঠছে ঃ না, না, না। নতুন মূল্যবোধের দৃঢ় প্রত্যয়ে কাহিনীপ্রধান উজ্জ্বল আধুনিক উপন্যাস ॥ তিন টাকা ॥

নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

মনোবৃত্তি এবং স্বদেশপ্রেম এক জিনিস নয়। নিজের দেশের লোক বা গভর্নমেণ্ট যদি আদর্শচ্যুত হয়ে অন্যায়ের পথে চলতে আরম্ভ করে তবে তার প্রতিবাদ করা দেশপ্রেমবহির্ভূত কাজ নয়। এমন কি নিজের দেশ যদি যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখনও বিনা প্রশ্নে তার সমর্থন প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের কর্তব্য, এরূপ মনে করা উচিত নয়। নিজের দেশ যদি তার স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোন ক্ষুদ্রতর বা দুর্বলতর দেশকে আক্রমণ করে তবে সে অন্যায় যুদ্ধের প্রতিবাদ করা দেশপ্রেমিকের পক্ষে নৈতিক অধিকারের বিরুদ্ধ নয়, সেটা নৈতিক কর্তব্যও বটে। বুয়োর যুদ্ধের সময়ে বৃটেনের বহুলোক বৃটিশ গভর্নমেণ্টের নীতিকে অন্যায় বলে মনে করতেন। অনেকে প্রকাশ্যে বুয়োরদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতেন। এমন কি, বৃটিশ পক্ষের কোনো হারের খবর এলে তাঁরা আনন্দ প্রকাশ করতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। আজ ভারতবর্ষ যদি স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোনো অন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত হত, যদি কোনো দুর্বল জাতির উপর আক্রমণে প্রবৃত্ত হত তাহলে আক্রান্ত বিদেশীর সমর্থনে ভারত সরকারের নীতির প্রতিবাদ করা ভারতীয় দেশপ্রেমিকের পক্ষে অন্যায় কাজ হত না, বরঞ্চ গৌরবকর কাজ হত। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ আক্রান্ত, আক্রমণকারী নয়। শুধু তাই নয়, আক্রান্ত হয়েও ভারত সরকার সেকথা অনেকদিন গোপন করে রেখেছিলেন। যখন এক খাবলা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে গেল তখনই বাকী দেহটা জানতে পারল। এখানে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি যাদের সমর্থনে কাজ করছে সেই চীনারা আক্রান্ত নয়, তারা আক্রমণকারী। তারা ক্ষুদ্র নয়, তারা পৃথিবীর বৃহত্তম জাতি, তারা দুর্বল নয়, তারা ভারতের চেয়ে বলশালী এবং বর্তমান জগতের অন্যতম বৃহৎ সামরিক শক্তি বলে পরিগণিত। সেই শক্তির দ্বারা বেপরোয়া তাদের রাজ্য বিস্তারের ক্ষুধা। তারা বলি খুঁজে বেড়াচ্ছে। সেই ক্ষুধার বলিরূপে তিব্বতীদের ভাগ্যে কী ঘটেছে তা সকলেই জানে। মানুষের ভুল হতে পারে, সব সময়ে হচ্ছে, সকলেরই হচ্ছে। কিন্তু ভারতীয় মার্কামারা এবং মার্কাহীন কম্যুনিস্টদের দ্বারা স্বদেশের বিরুদ্ধে চীনাদের পক্ষ সমর্থনের মতো এমন কুৎসিত ভুল কদাচিৎ দেখা যায়। অনেক ভুল আছে যেগুলো ভুল হয়েও কোনো দিক দিয়ে কিছু ভালো করে যায়। সেরকম হয় যেখানে ভুলের মধ্যে কিছু মহত্ত্বের স্পর্শ থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে সে বালাই নাই।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, যে-কুৎসিত জিনিস বাইরে দেখে নেহরু ক্ষুব্ধ হচ্ছেন তার ছোঁয়া থেকে গভর্নমেণ্টের ঘরের ভিতরটা সম্পূর্ণ মুক্ত আছে, একথাও কি তিনি নিশ্চিতরূপে বলতে পারেন? গোড়ার দিকে চীনাদের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে ভুল হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তারপর সেই ভুল যাতে না ভাঙে তার বহুরকম চেষ্টা কি সরকারের নিজের ঘরের ভিতরের কোনো কোনো লোকের দ্বারা হয়নি? মহত্ত্বের কথা কে কবে শোনাবে? তিব্বতীদের উপর অনুষ্ঠিত নৃশংসতা উপেক্ষা করতে বা ভুলে থাকতে যে-নরাধমরা পরামর্শ দিয়েছে তাদের কাউকে কি সরানো হয়েছে? সরানো দূরের কথা, তাদের মধ্যে একজন তো পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখ্যপদে অভিষিক্ত হতে আসছেন শুনা যাচ্ছে। মোহমুদ্গরের আবশ্যকতা ঘরে বাইরে দু জায়গায়ই আছে।

২১।৮।৬০

বাংলার শ্রেষ্ঠ চিত্র ও গল্প সাপ্তাহিক (ইংরাজী)

উইকলী নিউজ অ্যাণ্ড ভিউজ

পত্রিকার জন্য বাংলা ও বাংলার বাহিরে সর্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।
ম্যানেজার, উইকলী নিউজ অ্যাণ্ড ভিউজ,
৫২-এ বিডন রো, কলিকাতা—৬
টেলিফোন : ৫৫—৩৬৬৫

পূজা সংখ্যা প্রস্তুতির পথে। পত্রালাপ করুন।

(সি ৭৩৪৪)

ভারতবর্ষ

প্রতিষ্ঠাব্দ—১৯১৩

আশ্বিন সংখ্যা শারদীয়া সংখ্যারূপে বর্ধিত কলেবরে নামকরা লেখকগণের রচনায় ও চিত্রে সুসজ্জিত হইয়া আশ্বিনের প্রথমেই প্রকাশিত হইবে।

: শারদীয়া সংখ্যায় লিখিবেন :

—গল্প—

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
বনফুল
শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীসুবোধ ঘোষ
শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
শ্রীসন্তোষ ঘোষ
শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

—রম্য-রচনা—

শ্রীপরিমল গোস্বামী
শ্রীদেবেশ দাশ
শ্রীঅখিল নিয়োগী

—বিবিধ রচনা—

ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার
ডাঃ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ডাঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত
শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী
শ্রীদিলীপকুমার রায়
শ্রীশচীন সেনগুপ্ত
শ্রীনরেন্দ্র দেব
ডাঃ শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

নাটিকা—শ্রীমন্মথ রায়

ইহা ব্যতীত আরও বহু রচনা ও নিয়মিত বিভাগ।
প্রতি কপির মূল্য—২,

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সনস্‌
২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

আলোচনা

বাইশে শ্রাবণ

সবিনয় নিবেদন,

কিছুদিন পূর্বে 'দেশ' মারফত শ্রদ্ধেয়া নির্মলকুমারী মহলানবিশের লেখা কবিগুরুর অন্তিম মুহূর্ত ও তার পূর্বের এক বছরের তথ্যবহুল অনুলিপি "বাইশে শ্রাবণ" নামে প্রকাশিত হয়েছে। লেখিকা নিতান্ত সহজ সুরে প্রতিদিনকার খুঁটিনাটি আমাদের কাছে মেলে ধরেছেন। তিনি নিজে গুরুদেবের রোগশয্যায় সেবিকারূপে নিযুক্তা ছিলেন। তাই তখনকার খুঁটিনাটির সত্যতা সম্বন্ধে মনে কোন প্রশ্ন জাগে নি। কিন্তু গত ৭-৮-৬০ তারিখে 'যুগান্তর সাময়িকী'তে শ্রদ্ধেয় বিমলাকান্ত রায়-চৌধুরী মহাশয় লিখিত "২২শে শ্রাবণ" নামে কবিগুরুর অন্তিম মুহূর্তের যে অনুলিপি প্রকাশিত হয়েছে তাতে নির্মলকুমারী মহলানবিশের অনুলিপির হুবহু সমর্থন নেই। সেই সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয়া মহলানবিশ যদি কিছু আলোকপাত করেন তবে বাধিত হই।

বিমলাকান্তবাবু লিখেছেন, কবির অন্তিম যাত্রার পূর্বদিন তিনি যখন জোড়াসাঁকোয় রাত্রি ১০টায় পৌঁছুলেন তখন যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধেয়া নির্মলকুমারী মহলানবিশের নাম নেই। অথচ শ্রদ্ধেয়া মহলানবিশের অনুলিপিতে তিনি সেইদিন রাত্র ১২টা পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। তারপর তিনি বাড়ি চলে আসার পর প্রায় ২॥টা নাগাদ আবার তাঁকে মীরাদির ফোন পেয়ে জোড়াসাঁকো ছুটতে হয় এবং তিনি ২০ মিনিটের ভিতর সেখানে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু বিমলাকান্তবাবু লিখেছেন, রাত্রির অন্ধকার ফিকে হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এলেন লেডি রানু মুখার্জি, শ্রীযুক্তা রানী মহলানবিশ এবং শ্রীযুক্ত সুহৃদ সিংহ। সময়ের তারতম্য এখানে প্রকট হয়ে উঠেছে এবং লেডি রানু মুখার্জি ও শ্রীযুক্ত সুহৃদ সিংহের কোন উল্লেখ শ্রীযুক্তা মহলানবিশের অনুলিপিতে নেই। বিমলাকান্তবাবু আরও লিখেছেন, কবির অন্তিম যাত্রার দিন স্যার নীলরতন দরজার বাইরে থেকেই গুরুদেবকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে ফিরে যেতে যেতে আবার এসে অনেকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে গুরুদেবকে দর্শন করে চলে গেলেন। কিন্তু শ্রীযুক্তা মহলানবিশের অনুলিপিতে দেখতে পাই, ৫ই আগস্ট অর্থাৎ ২০শে শ্রাবণ বিকেলে বিধানবাবুর সাথে স্যার নীলরতন তাঁর কবি বন্ধুকে শেষ দেখা

॥ সদ্য প্রকাশিত ॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অবিস্মরণীয় উপন্যাস

মহাশ্বেতা

॥ সাড়ে পাঁচ টাকা ॥

●

সপ্তপদী (১২শ মুঃ) ২·৫০ ॥
রচনা-সংগ্রহ ১০·০০ ॥

●

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক
বীরেন্দ্রমোহন আচার্যের
শিক্ষাতাত্ত্বিক গ্রন্থ

আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব

॥ সাড়ে ছয় টাকা ॥

●

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের

জর্জ বার্নার্ড শ ৮·৫০ ॥

(তিন খণ্ড একত্রে সম্পূর্ণ জীবনী)
(বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় উচ্চপ্রশংসিত)

আনন্দকিশোর মুন্সীর
অম্লমধুর বিচিত্র উপন্যাস

রাঘব বোয়াল

॥ তিন টাকা ॥

ভেল্‌কি থেকে ভেষজ ৬·০০ ॥

●

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের
মধ্য-ইয়োরোপ পায়ে-হেঁটে বেড়ানোর
সচিত্র ভ্রমণকাহিনী

চরণিক ৩·০০ ॥

●

ধনঞ্জয় বৈরাগীর
সামাজিক নাটক

রুপোলী চাঁদ (৩য় মুঃ) ২·৫০ ॥

●

সন্তোষকুমার দের
নানান রঙের রসমধুর গল্প

বৈঠকী গল্প ২·৫০ ॥

সতীনাথ ভাদুড়ীর

জাগরী (৯ম মুঃ) ৪·০০ ॥ পত্রলেখার বাবা ৪·০০ ॥
অপরিচিতা (২য় মুঃ) ৩·০০ ॥ অচিন রাগিনী (২য় মুঃ) ৩·৫০ ॥

রমাপদ চৌধুরীর

মুক্তবন্ধ ৩·০০ ॥
পিয়াপসন্দ্ (৪র্থ মুঃ) ২·৫০ ॥

বারীন্দ্রনাথ দাশের

রাজা ও মালিনী ৩·০০ ॥
কর্ণফুলি ৩·৫০ ॥

পুনর্মুদ্রণ

প্রবোধকুমার সান্যালের উপন্যাস : হাসুবানু (৪র্থ মুঃ) ৮·০০ ॥ মনোজ বসুর উপন্যাস : সবুজ চিঠি (৬য় মুঃ) ৩·০০ ॥ দেবেশ দাশের রম্যকথা : রাজোয়ারা (৬ষ্ঠ মুঃ) ৪·০০ ॥ ইয়োরোপা (৭ম মুঃ) ৩·০০ ॥ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : পুতুলনাচের ইতিকথা (৭ম মুঃ) ৫·৫০ ॥ সোনার চেয়ে দামী : বেকার (৩য় মুঃ) ২·২৫ ॥

জরাসন্ধের

তামসী (৭ম মুঃ) ৫·৫০ ॥
[বাংলা ও হিন্দী ছায়াচিত্রে রূপায়িত হচ্ছে]

●

বিচারশালার পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস
ন্যায়দণ্ড (যন্ত্রস্থ)

লৌহকপাট ১ম খণ্ড (১২শ মুঃ) ৩·৫০
লৌহকপাট ২য় খণ্ড (১০ম মুঃ) ৩·৫০
লৌহকপাট ৩য় খণ্ড (৪র্থ মুঃ) ৫·০০

সমরেশ বসুর

গঙ্গা (৪র্থ মুঃ) ৫·৫০
(বাংলা ছায়াচিত্রে রূপায়িত হচ্ছে)
বাঘিনী (যন্ত্রস্থ)

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর

মণিপদ্ম ৪·০০
তুঙ্গভদ্রা (যন্ত্রস্থ)

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

রামমোহন (নাটক) ২·০০
বাংলা গল্প-বিচিত্রা ৪·০০

সৈয়দ মুজতবা আলীর

অবিশ্বাস্য (৮ম মুঃ) ৩·০০
চতুরঙ্গ (প্রকাশ প্রতীক্ষায়)

নারায়ণ সান্যালের

অনামী ৪·০০ ॥
বল্মীক ৪·০০ ॥

দক্ষিণারঞ্জন বসুর

বিদেশ বিভুঁই ৬·০০ ॥
মধুরেণ ২·০০ ॥

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা—১২ ॥

দেখছেন। যদিও জানি সেই সংকটময় অন্তিম মুহূর্তে অন্য কোন চিন্তা, অন্য কারো মুখ ভেসে উঠবার নয়। তবু, এই সামান্য তারতম্যই আগামী দিনের ইতিহাসে নূতন সমস্যা দেখা দিতে পারে।

ইতি—শ্রীকমল পৈত,
হাওড়া।

লেখিকার বক্তব্য

"আম্রপালী"
২০৪, বি টি রোড,
কলিকাতা—৩৫।

সবিনয় নিবেদন

২২শে শ্রাবণ বলে যে লেখাটা বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী ৭ই অগাস্টের যুগান্তরে লিখেছেন কবির অন্তিমদিনের ইতিহাস নিয়ে তার সঙ্গে আমার "২২শে শ্রাবণ" বইতে যে সব বর্ণনা আমি দিয়েছি তার কোনো কোনো জায়গায় মিল নেই বলে কমলবাবু জিজ্ঞাসা করেছেন এ বিষয়ে আমি কিছু আলোকপাত করতে পারি কি না। তা না হলে এই নিয়ে ভবিষ্যতের ইতিহাস লেখকেরা মাথা ভাঙাভাঙি শুরু করে দেবে এ আশংকা থেকে যাবে।

প্রথম বক্তব্য এই যে, আমার নিজের লেখার দায়িত্ব আমি নিতে পারি, অন্যের লেখা নিয়ে কিছু বলতে পারি না। আমার লেখা প্রধানত আমার নিজের দিনলিপি আর আমার যা মনে আছে তার সাহায্যেই লিখেছি। তাই আমার লেখা ঘটনাগুলো যে সেইভাবেই ঘটেছিল এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

যেমন, শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী যে লিখেছেন "ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে লেডী রাণু মুখার্জী, শ্রীযুক্তা রাণী মহলানবিশ ও সুসঙ্গের শ্রীযুক্ত সুহৃদ সিংহ এক সঙ্গে এসে পৌঁছলেন" একথা ঠিক নয়। আমি ভোর হওয়ার অনেকক্ষণ আগে জোড়াসাঁকোয় পৌঁছেছিলাম। তিনি নিজেই লিখেছেন অন্য জায়গায় যে রাত ২টার সময় লেডী রাণু মুখার্জী ও রাণী মহলানবিশকে ফোনে খবর দেওয়া হ'ল যে অবস্থা আরও খারাপ। আমার বইতে লিখেছি রাত বারোটার সময়ে আমার স্বামী অসুস্থ এই কারণে, মীরাদি জোর ক'রে আমাকে বরানগরে পাঠিয়েছিলেন আর আশ্বাস দিয়েছিলেন যে দরকার হলেই টেলিফোনে আমাকে খবর দেবেন। রাত বারোটার পরে যখন বরানগরে পৌঁছই তখন গাড়ি বাগানের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখি, যাতে ক'রে যে কোনো মুহূর্তে খবর পেলেই রওনা হতে পারি। সেইজনাই কাপড়চোপড় প'রে প্রস্তুত হয়েই বিছানায় শুয়েছিলাম। ড্রাইভারও সেদিন রাত্রে গাড়িতেই শোয়। রাত দুটোর কাছাকাছি কোন এক সময়ে জীবনবাবু (শ্রীযুক্ত জীবনময় রায়) বাইরে থেকে ডেকে বললেন

সুশীলকুমার বন্দোপাধ্যায়ের
অসাধারণ উপন্যাস

পুতুল নিয়ে খেলা

দেশঃ—বর্তমান সমাজের এক শ্রেণীর বিখ্যাত ব্যক্তিদের মুখোশ একেবারে খুলে দিয়েছে।

অমৃতবাজার:— Santosh who moves as warily as Iago in Shakespear's Othello.

সুশীলকুমার বন্দোপাধ্যায়ের
"তপস্যা"

হীরালাল পালধির
"রাত্রি হলো শেষ"

দুটি হৃদয়ের দুঃখ নিশার শেষ হবার কথা। শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

নব বলাকা প্রকাশনী
৪, নফরচন্দ্র লাহা লেন। কলি-৩৬

(সি-৭৩২৪।২)

কবি অবন্তীকুমার সান্যাল রচিত

॥ বাংলা সাহিত্যের বৃত্তান্ত ॥

সরল সরস ভঙ্গিতে লেখা–বিশেষভাবে প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ও সাধারণ পাঠকদের পক্ষে অপরিহার্য বই ॥

॥ এক টাকা পঁচাত্তর ন. প. ॥

কবি অতীন্দ্র মজুমদার রচিত

॥ ছন্দ ও অলঙ্কার ॥

স্বচ্ছ প্রকাশভঙ্গীতে প্রসাদ গুণ সমন্বিত ভাষায় দুরূহ বিষয়ের সরস আলোচনা ॥ প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পেশাল বাংলা ও নূতন ডিগ্রী কোর্সের জন্য অবশ্য পাঠ্য ॥

॥ দুই টাকা পঞ্চাশ ন. প ॥

॥ মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা ও সাহিত্য ॥

পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশের ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও সাহিত্যকীর্তির অনুবাদ-সহ বিশদ আলোচনা। এম এ ছাত্রছাত্রীদের অপরিহার্য।

॥ চার টাকা ॥

নয়া প্রকাশ
২০৬ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট ॥ কলিকাতা ছয়

"বঙ্গসাহিত্যে আমার কৃতিত্ব দেশের লোকে যদি স্বীকার ক'রে থাকেন, তবে আমি যেন স্বীকার করি, একদা তার দ্বার উদ্ঘাটন করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।"—রবীন্দ্রনাথ।(২৮।১১।৩৯)

রবীন্দ্রজন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত প্রবোধচন্দ্র বসু রচিত

বিদ্যাসাগরের ছাত্র-জীবন

॥ দাম : দু টাকা পঁচিশ ন. প. ॥

বলাকা প্রকাশনী
৫৩, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

(সি ৭৮৩০)

পরকীয়া

২·৭৫ নঃ পঃ

[শিলাদিত্য]

পরকীয়া রীতি করহ আরতি—চণ্ডীদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিগণ পরকীয়া প্রেমের পূজারি ছিলেন।

সমাজজীবনে পরকীয়া প্রেমের সার্থক রূপায়ণ এই উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। প্রতিমা দেবী ঐশ্বর্যের ক্রোড়ে থেকেও কি এক অব্যক্ত ব্যথায় দুঃসহ ভাবে পীড়িত। আনমনে চলেছে রূপসায়রের ঘাটে। পা পিছলে পড়ে গেল। লেখকের অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী—রচনাশৈলী মনোরম প্রেমমূলক সাহিত্যক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা।

গ্রন্থলোক :
১২।৪ চাউলপট্টী রোড, কলিকাতা-১০

মনোজ বসুর

সবুজ চিঠি

তৃতীয় সংস্করণ বেরুল ॥ ৩·০০ ॥

দেশ—একটি মধুর গৃহকোণ থেকে কাহিনী নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জীবনের এক বিশাল প্রান্তরে এসে উপস্থিত হয়েছে।

যুগান্তর—জীবনদ্বন্দ্ব নানা বিসর্পিল রেখায় ফুটে উঠেছে।

আনন্দবাজার—বিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজে যে কত বিচিত্র চরিত্রের নরনারী বিচরণ করিতেছে, তাহারই পরিচয় বর্তমান উপন্যাসে......

মানবিকতার জয়মুখর দুখানা উপন্যাসের দ্বিতীয় মুদ্রণ :

রক্তের বদলে রক্ত ২·৫০
মানুষ নামক জন্তু ৩·০০

বেঙ্গল পাবলিশার্স লিঃ : কলি-১২

"রাণী ওঠো"। সেই মুহূর্তে আমি ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে নীচে নেবে গাড়িতে চড়েছিলাম। নিষুতি রাত্রে শহরের খোলা রাস্তায় বরানগর থেকে জোড়াসাঁকো পেঁছুতে কুড়ি মিনিটের বেশী সময় লাগে না। যখন জোড়াসাঁকোতে পেঁছুই সে সময়টাকে চলতি ভাষায় মাঝ রাত্তিরই বলে। আমি যদি "দুটোর কাছাকাছি" বলি আর অন্য কেউ সেটা ২॥টা বলে তা নিয়ে তর্ক করতে চাই না কিন্তু আমার এখনো বিশ্বাস যে ২॥টার আগেই মীরাদি আমাকে ডাক দিয়েছিলেন আর আমি আন্দাজ ২॥টার কাছাকাছি সময়েই জোড়াসাঁকোতে পেঁছেছিলাম।

কবি বরাবর রাত তিনটের সময় জাগতেন আর সেই সময়েই তাঁকে পূর্বদিকে মুখ ফিরিয়ে বালিশ উঁচু করে বসিয়ে দিতে বলতেন। সেদিন তাই যখন তিনটে বাজলো বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলো এই ভেবে যে, আজ আর বলবেন না "উঠিয়ে বসিয়ে দাও।" আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে পুবদিকের রুগীর পায়ের কাছে মোড়ার উপর ব'সে কেমন করে সেই কালরাত্রির অবসানে ভোর হওয়া দেখেছিলাম। রাখিপূর্ণিমার রাত: কিন্তু আকাশে মেঘ ছিল বলে চাপা জ্যোৎস্না। বারে বারে আকাশের দিকে তাকাচ্ছি আর পরক্ষণেই রুগীর মুখের দিকে চোখ ফিরে আসছে (আর বোঝবার চেষ্টা করছি যে, বাকি রাতটুকু কাটবে কি কাটবে না।) অবশেষে আকাশে অল্প আলোর আভাস যখন দেখা দিল তখন মনে হল যাক্ আজকের রাতটাও তো কাটল।

শুধু আমি তো একলা না, আমার সঙ্গে অন্য যিনি "গুপ্তনিবাস" থেকে জোড়াসাঁকো গিয়েছিলেন শ্রীযুক্ত জীবনময় রায় এখনও বেঁচে আছেন। তাঁকেও গত বুধবার ১০ই অগাস্ট এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছি যে কখন আমরা জোড়াসাঁকোতে পেঁছেছিলাম। তিনি বললেন—"আমরা দুজনে যখন জোড়াসাঁকোতে পেঁছে গাড়ি থেকে নামলাম তখন তো একেবারে নিষুতি রাত। তোমার সঙ্গে কবির ঘরের দরজা পর্যন্ত গিয়ে বাইরে থেকেই তাঁকে দেখে সজনীদের ঘরে চলে গেলাম, তুমি ঘরের ভিতর চলে গেলে—এ তো আমার স্পষ্ট মনে আছে, ভোরের আলো তখন কোথায়?"

প্রশ্নকর্তা আর একটা প্রশ্ন করেছেন যে, রাত দশটায় শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী যখন রুগীর ঘরে গেলেন তখন তিনি আমাকে সে ঘরে দেখেন নি। অথচ আমি লিখেছি যে রাত বারটা পর্যন্ত জোড়াসাঁকোয় ছিলাম। এ কেমন করে হল? এ প্রশ্নের উত্তর খুবই সোজা। যাঁরা বাইরের লোক তাঁরা তো একবার মাত্র রুগীর ঘরে ঢুকে বাইরে থেকেই তাঁকে দেখে যাবার অনুমতি পেয়েছিলেন। বাড়ির লোকরা আর তাঁর সেবক-সেবিকারা ছাড়া আর কেউ সারাক্ষণ তাঁর কাছে থাকছিলেন না। কাজেই রাত দশটায় ঠিক যে সময়ে বিমলাকান্তবাবু কবির ঘরে ঢুকে তাঁকে দেখে এসেছিলেন আমি হয়তো সেই সময়েই কোনো কার্যগতিকে ঘরের বাইরে গিয়েছিলাম, তাই আমাকে দেখতে পাননি। আর তাছাড়া তিনি বা অন্য কেউ অল্পক্ষণের জন্য ভিতরে এসেছেন, স্বভাবতই কবিকে দেখবার জন্য তাঁদের আগ্রহ। তখন ঘরে অন্য কে কে আছেন তা লক্ষ্য না করা খু

বরণীয় লেখকের স্মরণীয় গ্রন্থসম্ভার

যোগভ্রষ্ট
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অতি অদ্ভুত এই উপন্যাসের নায়ক সুদর্শন। রুদ্রের তাণ্ডবে তার সমস্ত জীবন বিপর্যস্ত। কামের পঞ্চতিলক তার ললাটে, আসুরিক সুরায় সে অমিত শক্তিধর। মর্মবিদারী আকুল জিজ্ঞাসার সে কি উত্তাল আলোড়ন তার পৃথিবীতে! আমি কে? কে আমার পিতা?? কী আমার কুলধর্ম??? পরিপাটি প্রকাশ। ৫·০০

প্রিয়তমেষু
স্টিফান জাইগ

আত্মহারা কিশোরী প্রেমের আনন্দ-বেদনাঘন কাহিনী। বিশ্ববিখ্যাত ও অকুণ্ঠ প্রশংসিত। স্নিগ্ধ প্রচ্ছদ। ২·০০

হিরন্ময় পাত্র	॥ জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী	৪·০০
জল পড়ে পাতা নড়ে	॥ গৌরকিশোর ঘোষ	৮·০০
সুচরিতাসু	॥ প্রভাত দেবসরকার	৩·০০
প্রথম প্রণয়	॥ বিক্রমাদিত্য	৩·০০
ক্রীম	॥ অবধূত	৪·৫০
রাধা (৪র্থ সং)	॥ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	৭·০০
রূপসাগর (৩য় সং)	॥ সুবোধ ঘোষ	৪·৫০
হরিণ চিতা চিল (কবিতা)	॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র	৩·০০
মিতেমিতিন	॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	৩·০০
অন্দর মহল	॥ সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৩·০০
স্বাদু স্বাদু পদে পদে	॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	২·৭৫
গ্রীষ্মবাসর	॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	২·৭৫
পঞ্চমী মহল	॥ আশাপূর্ণা দেবী	৪·০০
সান্নিধ্য	॥ চিন্তামণি কর	৪·০০
তীরভূমি	॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪·৫০
অগ্নিসাক্ষী	॥ প্রবোধকুমার সান্যাল	৩·৫০
নীলাঞ্জনছায়া	॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩·০০

ত্রি বে ণী প্র কা শ ন
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড

আসন্ন প্রকাশ
রমণীর মন ॥ সরোজকুমার রায়চৌধুরি

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

কলিকাতা রেডিওতে মহালয়ায় প্রচারিত
'শ্রীশ্রীচণ্ডীর বেতার-আলেখ্য

মহিষাসুরমর্দিনী

রচনা — বাণীকুমার
স্বরালঙ্কার — পঙ্কজ কুমার মল্লিক
২৪খানি সংস্কৃত ও বাংলা গানের স্বরলিপিসহ
মূল্য - ৪·৫০ ন.প.
প্রকাশক • ত্রিগুণা প্রকাশনী
প্রাপ্তিস্থান : দাশগুপ্ত এণ্ড কোং
৫৪/৩, কলেজ স্ট্রীট • কলি - ১২

(সি ৭৩৭৫)

রমেশ মজুমদারের

মালার বাঁধন

প্রখ্যাত কবি, ঔপন্যাসিক ও গল্পকার রমেশবাবুর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। লেখকের উন্নত ভাবধারা, রুচি, রসবোধ ও কাহিনী বর্ণনায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় আছে। উপন্যাস কতজনই লেখে, কিন্তু জনস্বার্থে তা ক'টি লেগেছে। এমন মিষ্টি করে কাহিনী বলার জন্যই এই বইখানির প্রশংসা করছেন বহু সাহিত্যিক ও সমালোচকগণ। মূল্য—২·৫০ নঃ পঃ।

শ্রীরামকৃষ্ণ লাইব্রেরী
৬৪/২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

(সি ৭৩৫৮)

চোখে পড়ে থাকলেও মনে না রাখা বিচিত্র নয়। তিনি আমাকে দেখেননি বা দেখলেও মনে রাখেননি বলেই যে আমি তখন জোড়াসাঁকোতে ছিলাম না একথা মনে করবার কোনো সংগত কারণ নেই।

আর একটা প্রশ্ন ঐই যে, ৭ই অগাস্ট সকালে স্যার নীলরতন কবিকে দেখতে এসেছিলেন তাঁর শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য—একথা বিমলাকান্তবাবুর লেখাতে থাকলেও আমার লেখাতে নেই কেন? আমি লিখেছি যে ৫ই অগাস্ট স্যার নীলরতন তাঁর বন্ধুকে শেষ দেখা দেখে গেলেন। স্যার নীলরতন সরকার ৭ই সকালে এসেছিলেন বলে আমি কোনোদিন কারো মুখে শুনিনি। স্যার নীলরতন আমার মামাশ্বশুর! এই প্রশ্ন আসবার পরে তাঁর বড়ো মেয়ে শ্রীমতী নলিনী দেবীকে (বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রমোহন বসুর স্ত্রী) টেলিফোন করেছিলাম। তিনি বললেন যে, ("বাবা তো সেদিন আর জোড়াসাঁকোয় যাননি। আমরা সকাল সাড়ে সাতটার সময় গিয়েছিলাম, রামানন্দবাবু সেই সময় ছিলেন, কিন্তু বাবা তো ছিলেন না।" আমরা পরিবারের সকলেই জানি মেজোমামার (স্যার নীলরতনের) শরীরের তখন এমন অবস্থা নয় যে, ঐ ভীড়ের মধ্যে তিনি যেতে পারেন। তবে ৫ই অগাস্ট তিনি যে বিধানবাবুর সংগে এসেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তাছাড়া আমি তো লিখেইছি যে, আমার ভাগ্যের চক্রান্তে সেই সংকটময় দিনে আমাকে বাড়ি চলে যেতে হয়েছিল কিছুক্ষণের জন্যে। সেই সময়ের মধ্যে হয়তো কতো মানুষ এসে চলে গেছেন, তাঁদের না দেখতে পাওয়া কিছুই আশ্চর্য নয়। সেদিন ঐ শত শত লোকের মধ্যে কে এসেছে কে গিয়েছে তা দেখবার আগ্রহ আমার ছিল না। যতক্ষণ ঘরে ছিলাম দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল শুধু একখানি মুখের উপর। তার মধ্যে হয়তো ক্ষণেকের জন্য এর ওর মুখ দেখেছি। কাজেই লেডী রাণু মুখার্জী বা শ্রীযুক্ত সুহৃদ সিংহ কারো কথাই আমার মনে নেই, তাই বলে কি তাঁরা সেদিন আসেননি এই কথা ধরে নিতে হবে? তবে তাঁরা যে আমার সংগে এক সংগে পৌঁছননি এটা নিশ্চয়ই ঠিক। এমনও হতে পারে যে, রাণু মুখার্জীর সংগে অন্য কোনো মহিলাকে দেখে বিমলাকান্তবাবু রাণী মহলানবিশ ব'লে ভুল করেছিলেন।

আর একটা কথা ব'লে আমি শেষ করব। বিমলাকান্তবাবু লিখেছেন, "হঠাৎ সামনের দরজা সবেগে খুলে গেল—একজন ভদ্রলোক বারাণ্ডায় বেরিয়ে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন যে, গুরুদেবের অমৃতময় রথ ১২টা ১০ মিনিটে মরলোক ত্যাগ করেছে" ইত্যাদি। তারপর আরো দুচারটে কথার পর লিখেছেন "ঘরের মধ্যে সকলেই মহাশোকে মুহ্যমান। শ্রীযুক্তা রাণী মহলানবিশ আপন কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন শান্তভাবে" ইত্যাদি। এই কথায় মনে হতে পারে যে কবির মৃত্যুর মুহূর্তে আমি উপস্থিত থেকে যেন তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়া দেখেছিলাম। অথচ এটা আমার চিরজন্মের ক্ষোভ যে, সব সময়ে কাছে থেকেও শেষ মুহূর্তে আমি কাছে থাকতে পারিনি। প্রাণপণ চেষ্টা করে বরানগর থেকে জোড়াসাঁকোর আঙিনায় পৌঁছেও উপরে শয্যাপার্শ্বে পৌঁছতে পারলাম না। ভীড় ঠেলে বাড়ির ভিতর ঢুকে অন্য অংশের সিঁড়ি দিয়ে উঠে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ঘরে পৌঁছে শুনলাম এই মাত্র চলে গেছেন। তখন সামনের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে, ঘর লোকে লোকারণ্য। আমি কবির শয্যাপার্শ্বে গিয়ে কপালে হাত দিলাম, মাথায় হাত দিলাম, তখনও কপালটা গরম। কবি চলে যাওয়া মানে যে কী তা যেন তখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। স্তব্ধ হয়ে তাঁর বালিশের উপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইলাম। তখন সব সেবক সেবিকারই কর্তব্য সমাধা হয়ে গিয়েছে। কাজেই বিমলাকান্তবাবু যখন ঘরে ঢুকে রাণী মহলানবিশকে দেখেছিলেন তখন রাণী মহলানবিশ কোনো কর্তব্যই পালন করছিলেন না, শুধু স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়েছিলেন।

চিঠিটা বড়ো হয়ে গেল। কিন্তু সব কথার উত্তর পরিষ্কার করেই দেওয়া উচিত, এই কর্তব্যবোধে এতখানি লিখে ফেললাম।

ইতি—শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবিশ,

প্রকাশিত হল

বাংলা কথা-সাহিত্যে বিস্ময়কর সংযোজন
মৈনাক চট্টোপাধ্যায়ের

চরৈবেতি মূল্য—২·৫০ ন. প.

....'bear a pleasant surprise....That Bengali short stories have had rapid progress is well-justified by the Volume. It is really enjoyable......Amritabazar Patrika.

গল্পের গঠন ও চিন্তন দু' দিকেই নূতনত্ব সুস্পষ্ট। —যুগান্তর
বিভিন্ন রঙে আঁকা ছ'টি গল্পই বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। —লোকসেবক
গল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচনে কৃতিত্বের পরিচয় আছে। —আনন্দবাজার পত্রিকা
সুখপাঠ্য, তিনি গল্প বলবার সহজ ভঙ্গীটি আয়ত্ত করেছেন। —দেশ
আশ্চর্য ঠেকিতেছে ইহাই যে, এমন সহৃদয়, এমন মননশীল শিল্পীর পরিচয় ইতিপূর্বে আমি পাই নাই। —শনিবারের চিঠি
যে বৈশিষ্ট্য ছোটগল্পের প্রাণ, লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন হইলেও তাহা তিনি আয়ত্ত করিয়াছেন। —প্রবাসী
সহজ অন্তর্দৃষ্টির আভাস দিয়েছেন......সময়োপযোগী অনুসন্ধান আছে। —পরিচয়

ডি· এম· লাইব্রেরী
৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

(সি ৭৪০২)

প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

৫০

অবিশ্বাস্য প্রকাণ্ড টেবিল, অনেকখান চওড়া। সমুদ্রের এপার ওপার। চুপ করে প্রশ্নের প্রত্যাশায় বসে রইল আড়ষ্ট হয়ে।

বোধ হয় প্রাসঙ্গিক ফাইলটা খুঁজে পাচ্ছে না। তাই জিজ্ঞাসাবাদে দেরি হচ্ছে।

পাশের পুরুষ-অফিসর, মাদ্রাজী, ঝুঁকে পড়ে জিগ্গেস করল কাকলিকে, 'এর ফাইলটা তোমার কাছে আছে?

'আই য়্যাম নট কনসার্নড।' নির্লিপ্তের মত বললে কাকলি, 'আমার কাছে শুধু মেয়েদের ফাইল।'

ও-প্রান্তের তৃতীয় অফিসর বাঙালী। তার নথি ঘেঁটে সেও কিছু পাচ্ছে না খুঁজে।

সুতরাং আরো কতক্ষণ চুপচাপ। আর স্তব্ধতাই অতীতের চেতয়িতা। নিষ্ক্রিয় শরীরে কতক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেই পুরোনো দিনের কথা ভিড় করে কাছে আসে, হেঁটে-হেঁটে বেড়ায় চোখের সামনে।

কলিং বেল বাজল। বেয়ারা এসে দাঁড়াল। যাও ডিলিং ক্লার্ককে ডেকে আনো।

এল ডিলিং ক্লার্ক। সংশ্লিষ্ট ফাইলটা বার করল খুঁজে।

কোনো সুরাহা হল না। তবে এবার হেড অ্যাসিস্ট্যান্টকে খবর দাও।

ঠায় বসে আছে সুকান্ত। ঠায় বসে আছে কাকলি। কেউ কারু দিকে একবার ভুলেও তাকাচ্ছে না। মানুষ লক্ষ্য করে তাকানো দূরের কথা, সামনাসামনিই তাকাচ্ছে না। কাকলির চোখ তার সামনেকার খোলা ফাইলে, আর সুকান্তর চোখ দূরে জানলার ওপারে।

ভারি মজা লাগছিল সুকান্তর। ঐ দুজন পুরুষ অফিসর, বাঙালী আর মাদ্রাজী। বয়সে প্রৌঢ়, তার সম্পূর্ণ অপরিচিত। ঐ সম্ভ্রান্ত সুদৃঢ় ভদ্রমহিলাটিরও এমন ভাব যেন তার সঙ্গে তাঁর ঘুণাক্ষরেও পরিচয় নেই। সুকান্ত যেন কোন অজানা অজ্ঞাত-নামা পথের লোক। উনি যেন কোন পাহাড়ের চূড়াতে বসা অধরা, আর সুকান্ত কোন এক দীনহীন সমতলের বাসিন্দে।

কোন এক মামলার কথা শুনেছিল সুকান্ত। এক সন্ন্যাসী বহু বৎসর পরে স্বদেশে ফিরে এসে এক অভিজাতবংশীয় বিত্তবতী মহিলাকে নিজের স্ত্রী বলে দাবি করেছিল। প্রমাণ কী, তুমিই তার স্বামী? অনেক প্রমাণের মধ্যে একটি প্রমাণ যা দিয়েছিল তা সাংঘাতিক দুঃসাহসিক। বলেছিল, শরীরের প্রচ্ছন্নে এমন একটা চিহ্নের কথা বলছি যা স্বামী ছাড়া আর কারু জানবার কথা নয়। এখন সাহস থাকে তো পরীক্ষা করে দেখ। লেডি-ডাক্তার ডাকো।

যতদূর শুনেছে, পরীক্ষা করাতে রাজি হননি মহিলা। বরং প্রস্তাবের হীনতা দেখে ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ করেছিলেন। অবশ্যি পরীক্ষায় সে চিহ্ন পাওয়া গেলেও সেটা কিছু নিশ্চয়াত্মক প্রমাণ হত না। কিন্তু যাই বলো, খুব একটা ঝুঁকি নিয়েছিল

শারদীয়া দেশ পত্রিকা — ১৩৬৭

এই সংখ্যার প্রথম আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্রাবলী, শ্রীযুক্তা নির্মল-কুমারী মহলানবিশকে লেখা। এই সংখ্যার দ্বিতীয় আকর্ষণ রবীন্দ্র-জীবনের এক বিশেষ অধ্যায়ের ইতিবৃত্ত। জালিয়ানওয়ালাবাগে বৃটিশ সরকারের নির্মম অত্যাচারের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ সরকারের দেওয়া খেতাব নাইটহুড পরিত্যাগ করেছিলেন। ১৯১৯ সালে রবীন্দ্র-জীবনের সেই ঐতিহাসিক ঘটনার ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। বড়লাটকে লেখা বিখ্যাত প্রতিবাদপত্রের মূল পাণ্ডুলিপির প্রতিকৃতি, যা অদ্যাবধি অপ্রকাশিত, তা এই রচনার সঙ্গে প্রকাশিত হবে।

এই সংখ্যার তৃতীয় আকর্ষণ অবনীন্দ্রনাথের রস-রচনা 'ওল্মানের গ্রাণ্ড টোটোলজি'।

এই সংখ্যার চতুর্থ আকর্ষণ সুবোধ ঘোষের সুবৃহৎ উপন্যাস 'নাগলতা'।

এ ছাড়া এই সংখ্যায় থাকবে বাংলার প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিকদের রচনার এক সুনির্বাচিত বিপুল সম্ভার। দাম ৩, রেজিঃ ডাকে ৩·৫৮ নঃ পঃ, ৬, সুটারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা-১

সন্ন্যাসী। যদি, ধরা যাক, মহিলা রাজি হতেন, আর পরীক্ষায় সেই চিহ্ন পাওয়া না যেত? তাহলে? তাহলে ফের সন্ন্যাসীকে যেতে হত জংগলে।

টেবিলের ওপারে ঐ ভদ্রমহিলাটির সম্পর্কে তেমনি একটা কথা এখন ওঠে না? তাহলে, সবিনয়ে, মৃদুস্বরে, এমন দু-একটি চিহ্নের কথা সুকান্ত বলে দিতে পারে যা শুনলে ঐ মাদ্রাজী ও বাঙালী অফিসর যুগপৎ আঁতকে উঠবে। কী ভয়ঙ্কর কথা! আপনি কী করে জানলেন? বিজ্ঞের মত মাথা দুলিয়ে মৃদু-মৃদু হাসবে সুকান্ত। বলবে, আমি গুনতে পারি। আমি সব দেখতে পারি দর্পণের মত।

সেই পাশাপাশি দুটি ছোট কালো তিলকে সুকান্ত বোখারা আর সমরখন্দ বলত। ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, বলত কিনা। মনে হয়, সুকাতই যেন সেই দুই দেশ আবিষ্কার করেছিল। নইলে ব্যস্ত, বস্ত্রাবৃত কাকলির সময় কোথায় নিজের হৃদয়ের মধ্যে চোখ ফেলে।

কাঠ হয়ে আছে। আশ্চর্য, কেউ কি জানে একদিন ঐ কাঠে, কী মন্ত্রে হয়েছিল মঞ্জুরীরঞ্জন। শীতে-গ্রীষ্মে যত গান লেখা আছে ঐখানে, কেউ কি জানে, একমাত্র সুকান্তই জানত তার স্বরলিপি।

কেউ জানে না। ঐ বীণে কত আলাপন হয়েছে, কে সে বীণকর—একথা কোথাও আজ আর লেখা নেই।

কেউ মরে গেলে তার ভালোটাই শুধু মনে পড়ে। তেমনি কাকলি তো আজ মৃত। তাই তার কিছু কিছু ভালো যে মনে পড়বে তা আর বিচিত্র কী। এখন তো চোখ না হয় ফিরিয়ে রেখেছে কিন্তু কোনো-কোনো মুহূর্তে সেই চোখে কী আশ্চর্য আলো জ্বলেছিল—যে আলো মাটিতেও নেই, সমুদ্রেও নেই—তা কি আর মুছে যাবার? ঈশ্বর বলেছিল, আলো হোক, অমনি আলো হল। ভালোবাসারও বুঝি সেই কথা। বললে, আলো হও, অমনি, মুহূর্তে এক পিণ্ড মর্ত্য কাদা আলো হয়ে উঠল। সে-সব কথা কি কেউ আর বিশ্বাস করবে? কত ছোট চোখ কিন্তু এক সঙ্গে কতখানি দেখে ফেলে। কত ছোট বুক কিন্তু এক সঙ্গে কতখানি তুলে নেয়, চায় ধরে রাখতে। কত সুখ, কত স্বপন, কত মিথ্যে। একমাত্রই তো মিথ্যে নয়। পাথরের গায়ে সে প্রস্তরলিপি কি

চারখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস ও শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীদের বিচিত্র গল্পে-ভরা

৩০৲ তিরিশ টাকার উপযুক্ত এই সংকলন-গ্রন্থের দাম ৪৷৷৹ সাড়ে চার টাকা।

সারা সাহিত্য-জগৎকে বিস্ময়-স্তম্ভিত ক'রে প্রকাশিত হচ্ছে বড়দের অভিজাত পূজাবার্ষিক

অভিসার

এতে বড় গল্প লিখেছেন :

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, প্রবোধ সান্যাল, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিমল মিত্র, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, গজেন্দ্র মিত্র, কিরীটিকুমার ও প্রেমেন্দ্র মিত্র

চারখানি বিরাট সম্পূর্ণ উপন্যাস লিখেছেন :

১। সান্নপ্রাশ—শ্রীআশাপূর্ণা দেবী
২। সুনেত্রা—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
৩। ওগো শকুন্তলা—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
৪। দিলদরিয়া—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

এর সঙ্গে আরও আছে শংকর রচিত অতিআধুনিক সুদীর্ঘ একটি রম্য-রচনা।

দাম—চার টাকা আট আনা। ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

বিজ্ঞাপনবর্জিত উপহারোপযোগী সুচিত্রিত রঙিন মলাটে বাঁধানো এই বিরাট সংকলন-গ্রন্থখানি আগামী মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে ৫ই সেপ্টেম্বর, সোমবার।

নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাপা হচ্ছে। অগ্রিম ২৲ দু'টাকা পাঠিয়ে এখন থেকে অর্ডার 'বুক' করুন।

একমাত্র পরিবেশন কেন্দ্র—উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির, ব্লক সি, রুম ৩, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

ঝাপসা-ঝাপসা এখনো পড়া যায় এক-আধটু?

আর যায় না। মুছে গেছে, ঘুচে গেছে। সবকিছুরই শেষ হয়। ভালোবাসারও শেষ হয়।

ফাইল চলে এসেছে আফিস থেকে। প্রান্তের অফিসর দেখে মধ্যের অফিসরের দিকে এগিয়ে দিল, আর মধ্যের জন ঠেলে দিল কাকলিকে।

নোটে লেখা আছে, ক্যান্ডিডেট ইকনমিকসে এম এ, পরীক্ষা পাসের তালিকায় স্থান উঁচু, পূর্বঅভিজ্ঞতাও কিছু আছে। রেফারেন্সেসও ভালো। কাজকর্মও সন্তোষজনক। এর সম্পর্কে আপত্তি হবার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ নেই।

'তবে আর কী প্রশ্ন করবার আছে?' মধ্যের অফিসরকে বললে কাকলি।

মধ্যের ও প্রান্তের অফিসর নিজেদের মধ্যে কী একটু বলাবলি করল, পরে মধ্যের জন সুকান্তর উদ্দেশে বললে, 'ইউ মে গো।'

উঠে দাঁড়াল সুকান্ত। কথার ইঙ্গিতটা বুঝল সহজেই। তার প্রমোশন ও কনফার্মেশানটা হবে। তাহলে খুশী মনে একটা উদার নমস্কার করতে হয়।

এবার, কেউই সতর্ক ছিল না, প্রস্তুত ছিল না, হঠাৎ কাকলি ও সুকান্তর ছোট্ট একটু চোখোচোখি হয়ে গেল। কে জানে সত্যি না মিথ্যে, চোখের কোণে কাকলি বুঝি একটু হাসল। আর কে জানে সত্যি না মিথ্যে, চোখের কোণে সুকান্ত বুঝি ফোটাল একটু কৃতজ্ঞতার নম্রতা।

চোখের কাজ হচ্ছে দেখা। কিন্তু শুধু দেখেই সে তৃপ্ত নয়। সে কথা কইবে। সে হাসবে। সে ভাববে। সব শেষে সে কাঁদতে বসবে।

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল কাকলি।

নিচে, সিঁড়ির কাছেই দেখতে পেল দেবনাথকে।

বললে, 'দাদা, তোমার কিছু হল?'

'পুরোপুরি হয়নি এখনো, তবে হব-হব হচ্ছে।'

'কি চাকরি?'

'না, চাকরি আর কোথায়! সেই সোনার চাকরিটাই চলে গেল।'

'সে কি? তোমার আবার কবে চাকরি গেল?'

'সেই তোর শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে তোর কাছে হাত পাতা। মুঠোভর্তি ফিরে আসা। সে কেমন সুখের চাকরিটা ছিল বলতো?'

'এখানে বুঝি হাত পাততে সুবিধে পাও না?' ড্রয়িংরুমে চলে এল দুজনে।

'কী করে পাব? এখানে যে তোর দয়া-মায়া কম।'

'আমার কবে আবার দয়া-মায়া ছিল?'

'ছিল, যখন তুই সেই শ্বশুরবাড়িতে ছিলি তখন ছিল। তখন দূরে ছিলি, বাবা-মা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, কাউকে দেখছিস না, মনটা নরম ছিল। তখন বাবার অসুখ কি মার অসুখ বলে টাকা চাইলে বিরুক্তি করতিস না, দিয়ে দিতিস। এখন সব দেখতে পাচ্ছিস চোখের উপর, মায়া-দয়াও তাই আর দেখা যাচ্ছে না—'

'যত কম দেখা যায় ততই ভালো। বরেনবাবু কী বলছেন?'

'চাকরি করব না বলে দেওয়াতে তিনি আর চাকরি দেখছেন না। একটা বিজনেস—'

'কী বিজনেস?' বিরক্ত মুখে প্রশ্ন করল কাকলি।

'ফার্মিং। পোলট্রি—'

'সে আবার কোথায়?'

'দক্ষিণের দিকে বরেনবাবুর একটা বাগানবাড়ি আছে না? সেইখানে।'

'সেখানে কী? সেটা তো একটা বাড়ি।'

'তুই দেখিস নি বুঝি?'

'না, যাইনি এখনো। কী আর আছে ওখানে?'

'বাড়ি-পুকুর ছেড়ে দিই, আশে পাশে বিস্তর ডাঙা জমি পড়ে আছে। জমি মানেই ইমেনস পসিবিলিটি। সেই জমিতে এখন চাষবাস করি না হাঁস মুর্গি পালি তাই নিয়ে ভাবা হচ্ছে।'

'ভাবাটা তাড়াতাড়ি শেষ করে যা হোক কিছুতে হাতে-কলমে লেগে যাও।'

'ভাবাটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ করা সোজা নয়। জমিটা যদি দেখতিস।'

'বেশ একদিন দেখিয়ে নিয়ে এস।' উপরে চলে গেল কাকলি।

কতক্ষণ পরে বেল বাজল। সম্পূর্ণ ঘরোয়ায় এখনো এসে পৌঁছয়নি, এরই মধ্যে উৎপাত। কাণ্ডজ্ঞান ক্রমশই লোপ করে দিচ্ছে।

'কে?' ঝাঁঝালো মুখে জিজ্ঞেস করল কাকলি।

চাকর বললে, 'একটি মেয়েছেলে।'

'মেয়েছেলে?' আরামে নিশ্বাস ফেলল কাকলি। 'আসতে বলো।'

অফিস-পাড়ার বন্ধু চিত্রা এল ছুটতে-ছুটতে। ঘরে ঢুকেই যেমন ডুবন্ত লোকে ধরে তেমনি করে কাকলির হাত চেপে ধরল। 'বাবা, বাঁচলাম এতদিনে।'

'কেন, নির্বিঘ্নে এক মাস পেরিয়ে গেল?' হাসল কাকলি।

'বাবাঃ, কী ভয়ে-ভয়ে যে দিন কেটেছে। কেবলই মনে হয়েছে পুলিস আসছে, এই বুঝি পুলিস এল।'

'পুলিসের আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, অপর্ণা বিশ্বাসের খোঁজে বেরুবে! কে অপর্ণা বিশ্বাস? চোর নয়, ডাকাত নয়, খুনে নয়, জালিয়াত নয়, কোনো সেক্সুয়াল ক্রাইমের ভিকটিম-গার্ল নয়, গ্যাবেটর নয়, এক বিয়ের নোটিসের অবজেকটর! তাকে ধরবার জন্যে কলকাতাকে চিরুনি দিয়ে আঁচড়াবে পুলিস! তাদের জানাবেই বা কে?'

'যদি জানাত! যদি ধরত আমাকে!'

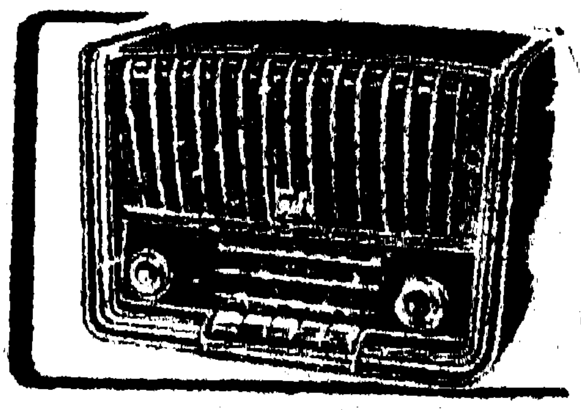

এইচ. জি. ই. সি. (কোবা) পশ্চিম জার্মানী, আর. সি. এ রেডিও এবং বিভিন্ন মডেলের ট্রানসিস্টার রেডিও বিক্রয় ও মেরামত হয়।

মনি রেডিও প্রোডাক্টস্

১৫৭বি, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

কুমারেশ

লিভার ও পেটের পীড়ায়

'স্রেফ অস্বীকার করতিস। তোর ছবি আর তুলে রাখেনি। বলতিস, আমি যাইনি, ও সই আমার নয়।'

'মিথ্যে বলতাম? পারতাম না কি সত্যি?'

'পারতেই হত। অনেক সময় মিথ্যে বলাটা মহাপুণ্য। ধর, এখন যদি ছোরা হাতে কেউ তোকে খুন করতে আসে, তুই ভয় পেয়েই খাটের নিচে লুকোস আর লোকটা যদি ঘরে ঢুকে আমাকে জিজ্ঞেস করে, এই ঘরে চিত্রা এসেছে, আমি তখন সত্যবাদী হয়ে 'হ্যাঁ' বলব? কক্‌খনো না। একটা মিথ্যে যখন একজনের প্রাণ বাঁচাচ্ছে তখন স্পষ্ট 'না' বলব, বলব আসেনি। মিথ্যেয় যদি কারু উপকার হয়, মিথ্যেই সত্যি।'

'উপকার!'

'বা, উপকার করলি নে? অবজেকশান দিয়ে মাসখানেক পিছিয়ে দিলি নে?'

'কিন্তু এখন—এখন কী হবে?'

'অবজেকশান নট প্রেসড্‌, নট পার্সুড। অবজেকশানটা বাতিল হয়ে যাবে। আর কী হবে!'

'আর কিছু নয় তো?'

'আবার কী! বিয়ের পথে সাময়িক একটা বাধা এসেছিল সরে গেল। পথ নিষ্কণ্টক হল। তখন থেকে বাড়ল আবার তাগাদার যন্ত্রণা। ও কি, উঠলি? একটু চা খাবিনে?'

'না। একেবারে যন্ত্রণা নিবারণের দিন এসে মিষ্টিমুখ করব।' সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভীতু মুখে চিত্রা বললে, 'কিন্তু যদি ভাই হাতের লেখার নমুনা নিয়ে গিয়ে ঐ সইয়ের সঙ্গে মেলায়?'

'মিলবে না। ও সই তো বাঁকা হাতে করেছিস। এখন তা নিয়ে আর ভাবনা কী! অবজেকশানই নেই তায় অপর্ণা বিশ্বাস! ঘরই নেই তার আবার উত্তর শিয়র।'

'ঘর বলে ভেঙে দে, বিয়ে বলে জুড়ে দে।' হাসতে হাসতে নেমে গেল চিত্রা।

ঘর অন্ধকার করে দিয়ে চুপচাপ শুয়ে আছে কাকলি।

জানে ঠিক আসবে আজ বরেন।

ঠিক বেজেছে ডবল বেল।

নিচের থেকে চাকর আর পাশের ঘর থেকে গায়ত্রী এসেছে।

মাকে বললে, 'বলে দাও, ভীষণ মাথা ধরেছে, শুয়ে আছে, উঠতে পাচ্ছে না।'

'সে কী?' একটু বুঝি থমকাল গায়ত্রী।

'সে কী আবার কী! সত্যি, মাথাটা ফেটে যাচ্ছে, জ্বরে আসছে কিনা কে জানে। যা বলছি তাই বলো গে।'

অগত্যা গায়ত্রী তাই বলতে গেল।

'ভীষণ স্ট্রেইন হচ্ছে, ক'দিন ওর বিশ্রাম নেওয়া দরকার।' সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল বরেন। 'এখন আর ওকে ডিস্টার্ব করব না। শুয়ে আছে থাক শুয়ে। শুধু সুসংবাদটা ওকে দিয়ে আসি।' বলে গায়ত্রীর পাশ কাটিয়ে সোজা সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল উপরে।

ঘর অন্ধকার। শুধু একটা অস্ফুট আর্ত-স্বরের টুকরোও বুঝি শোনা যাচ্ছে।

'খুব কষ্ট হচ্ছে?'

'চৌচির হয়ে ফেটে যাচ্ছে মাথা। আলো একেবারে সইতে পারছি না।'

'না, না, জ্বালব না আলো। খুব বেশি কষ্ট হলে আমি বলি কি, ডাক্তার নিয়ে আসি।'

'না, না, ডাক্তার লাগবে না। অন্ধকারে কতক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকতে পারলেই সেরে যাবে আশা করি।'

'হ্যাঁ, আমি যাই তবে। খবরটা বলে যাই। অবজেকশান রিজেকটেড হয়ে গেছে।'

'গেছে? তা তো যাবেই, সে আর বেশি কথা কী। বাজে রদ্দি অবজেকশান।'

'এখন তবে—'

শারদীয় নব কল্লোল
৩·৫০ নয়া পয়সা

বনফুল — সম্পূর্ণ উপন্যাস
আশাপূর্ণা দেবী — সম্পূর্ণ নূতন উপন্যাস
ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত — সম্পূর্ণ রহস্য উপন্যাস
সুধীরেন্দ্র সান্যাল — সম্পূর্ণ নূতন উপন্যাস
ধনঞ্জয় বৈরাগী — সম্পূর্ণ নূতন নাটক
দৃষ্টিহীন — বড় গল্প
চিত্তরঞ্জন মাইতি — সম্পূর্ণ নূতন উপন্যাস
ডাঃ নগেন দে — মনের কথা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় — উপন্যাস
প্রেমেন্দ্র নাথ মিত্র — সম্পূর্ণ গল্প
নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় —
নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস ডাঃ জিভাগো
বিশ্ব বিখ্যাত যাদুকর পি. সি. সরকারের
বড় হওয়ার সচিত্র গোপন রহস্য
কবি বিমল ঘোষের — অপূর্ব কবিতা
মায়া বসু — কবিতা
নরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী — কবিতা

জনপ্রিয় অভিনেতা উত্তমকুমারের নিজের লেখা স্মৃতি কথা
তা ছাড়া
আরো গল্প, বহু কার্টুন, রঙ্গমঞ্চ, সিনেমা, বহু সিনেমা চিত্র, অন্যান্য চিত্র পুস্তকে দেখুন
যাঁরা রেজেষ্ট্রি ... করে নেবেন তাঁরা পাঠাবেন ৪৲ টাকা যাঁরা হাতে নেবেন তাঁরা পাঠাবেন ৩৷৷০ ...।
২১০ ...

'হ্যাঁ, মার জ্যোতিষীকে ডাকাই, দিনক্ষণ ঠিক করে দিক।'

'হ্যাঁ, আর দেরি করার মানে হয় না।'

'না।' পাশ ফিরল কাকলি। সঙ্কেতে দড় হল।

নেমে গেল বরেন।

আধ ঘণ্টা-টাক পরে আবার উঠে এল চাকর।

ঘরের পর্দা সরিয়ে বললে, 'বাবু এসেছে।'

গভীর একটা তন্দ্রার ঘোরের থেকে জেগে উঠে ধমকে উঠল কাকলি, 'আবার এসেছে? সঙ্গে ডাক্তার আছে বুঝি?'

'ডাক্তার? ডাক্তার তো মনে হল না।'

'বলে দে, দেখা হবে না। দিদিমণি ঘুমিয়ে আছে।'

চাকর নিচে নামল।

আগন্তুককে বললে, 'দেখা হবে না।'

'হবে না?'

'না। বললেন ঘুমিয়ে আছেন।'

'আচ্ছা।' ধীরে ধীরে উঠে বেরিয়ে গেল সুকান্ত।

হন্তদন্ত হয়ে কাকলির ঘরে ছুটে এল গায়ত্রী। আলো জ্বালাল।

'কে, কে এসেছিল নিচে? নতুন লোক। কে ও? কে চলে গেল?'

'মা, আমি কি দেখেছি? কে?' ধড়মড় করে উঠে বসল কাকলি। 'দীপঙ্কর?'

'না, না, মনে হল, আর কেউ। আমি ক'দিন আরও দেখেছি ওকে। কিন্তু কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হল। কিন্তু ওর কী স্পর্ধা? ও কেন আসে?'

'মা, আমি তো দেখা করিনি। তাড়িয়ে দিয়েছি।' বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল কাকলি।

'ঠিক করেছিস। দৈব ঠিক করেছে। কিন্তু ওর স্পর্ধাকে বলিহারি। কী সাহসে ও আসে? কত বড় শত্রু, আবার এমুখো হয়?' জ্বলতে লাগল, কাঁপতে লাগল গায়ত্রী।

'এসেছে তো, সুকান্তকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।' টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়েছেন বনবিহারী। 'আমি ওকে গুটিকতক প্রশ্ন করব আগে। বিয়ে করাটা এত কঠিন আর বিয়ে ভাঙাটা এত সোজা। সোজা হলেই ভাঙতে হবে? কঠিনকে কঠিন সাধনায় বাঁচিয়ে রাখতে হবে না? কই, পাঠিয়ে দাও আমার কাছে। আগে আমার কথার উত্তর দিক।'

কিন্তু কোথায় কে।

নিচে নেমে এল কাকলি। সদরের কাছটাও একটু দেখল। তাকাল রাস্তার দিকে। তারপর ছাদে উঠল। তাকাল আকাশের দিকে।

কেউ কোথাও নেই।

(ক্রমশ)

আনন্দসমুজ্জ্বল দিনগুলির জন্য
শক্তি মিলে প্রস্তুত মনোরম প্রিন্টের ও চিত্তহারী বর্ণ-সুষমার মকমারি সাটিন, তাফেতা, ক্রেপ ও ব্রোকেড।

Shakti Silks পোদারের সামগ্রী

শ্রীশক্তি মিলস লিঃ, পোদার চেম্বারস, পার্শী বাজার স্ট্রীট, বোম্বাই-১

Shilpi—96.

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

৪১

তেইশ সাল এমনি করেই চলে গেল। এই তেইশ সাল আমার জীবনে স্মরণীয় বৎসর। এই সালেই আমার প্রথম অভিনীত প্রথম সিনেমার আত্মপ্রকাশ, সাধারণ রংগ-মঞ্চে এই সালেই আমার প্রথম অবতরণ, এবং এই সালেই আমার প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। যেদিনের কথা বলছি, সেদিন পয়লা জানুয়ারী—মংগলবার—'ইরাণের রাণী'র উদ্বোধন রজনী। যথাসময়ে অভিনয় শুরু হলো। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ। 'কর্ণার্জুন'-এর উদ্বোধন থেকে শুরু করে এই যে ছ' মাস গত হয়ে গেছে, এর মধ্যে স্টারের নিজস্ব এক দর্শকমণ্ডলী গঠিত হয়ে গেছে। তাঁদের উৎসাহ, এবং তার ওপরে আর্ট থিয়েটারের নতুন নাটক, সবাই একেবারে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন! অভিনয়ে মুখ্য-চরিত্রে আমরা জনা ছয়েক, আর সব খুচরো। পরদিন বুধবার। আর 'ইরাণের রাণী' বুধবারেরই বই, সেইজন্য পর-পর দু'দিন অভিনয় হলো, দ্বিতীয় দিনও অডিটোরিয়াম লোকে লোকারণ্য। অভিনয় সকলেই খুব প্রাণ দিয়ে করেছিলাম, মনে আছে। কর্ণার্জুনে যত রিহার্সাল দিয়েছি, এতে ততটা দিতে পারি নি, তবু কোনো ভয় বা সংকোচ ছিল না। 'অর্জুন'-এ গতিবিধির নিয়ন্ত্রণ ছিল, চলাফেরা একেবারে 'মাপা' ছিল, এতেও খানিকটা তাই, তবে সেবার চলাফেরার ব্যাপারটা যেভাবে মাথায় রাখতে হয়েছিল, এবার ততটা নয়। এবারে ওটা যেন অভ্যাসগত হয়ে গেছে, ও আর মনে রাখবার তেমন দরকার নেই, অথচ আপনিই সব হয়ে গেছে। এই সাবলীলতা 'দারা'র অভিনয়ে এত এসে গিয়েছিল যে, নিজেই খুশী হচ্ছিলাম নিজের কাজে; এ আত্ম-তৃপ্তি অভিনেতার পক্ষে কম কথা নয়! প্রথম দৃশ্য — ইস্পাহান — অগ্নিমন্দির-সম্মুখস্থ চত্বর, পাথরের বেদী, তার সামনে দিয়ে লোকজন যাতায়াত করছে, এই নির্বাক দৃশ্যের মধ্য দিয়ে যবনিকা উন্মোচিত হয়েছিল। দ্বিতীয় কনসার্ট, যেটা পর্দা ওঠবার সময় থেমে যাবার কথা, সেটা না থেমে তখনো বেজে চলেছে, তবে খুব মৃদু ঝংকারে! এমন সময় একদিক থেকে 'দারা' ও 'ইয়ুসুফ' রূপী আমি ও ইন্দু প্রবেশ করলাম, দুজনেই গ্রাম্যযুবক, প্রথম গ্রাম থেকে শহরে আসবার দরুণ যে সংকোচ, সেটা রয়ে গেছে, অথচ অন্তরে আছে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা, যার বশবর্তী হয়ে বেরিয়ে পড়েছি দুজনে গ্রাম থেকে শহরের দিকে। ইয়ুসুফ ক্লান্তি অনুভব করে বসে পড়ল পাথরের ওপর, এবং সেই থেকে যে অভিনয় আরম্ভ হয়ে গেল, কোথায় আর আটকায়নি তার সাবলীল স্রোতধারা, অনিবার্য সমাপ্তিতে গিয়ে ঠিক তার পরি-পূর্ণতা খুঁজে পেয়েছে!

তারপরে দেখা গেল, দারা মন্দিরের এক পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছে, অধুনা রাজার সভাসদ এবং দারার পিতৃবন্ধু নাদের সা, এসে দারাকে বলে গেলেন, এই রাজ্যের রাজাই হচ্ছে তার পিতৃহন্তা, তাকে হত্যা

ছোরা নিয়ে একাকী সেই মন্দির-প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করল, প্রতিশোধ নিতেই হবে, করতেই হবে রাজাকে হত্যা! এমন সময়, মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন এক অলোকসামান্যা রূপসী, সংগে তার লোক-জন, সখিবৃন্দ। অগ্রসর হয়ে প্রস্থানপথের দিকে যেতে-যেতে হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালেন সেই রূপসী, অতর্কিতে মিলন হল চারি চক্ষুর। এমনি করে এক অপূর্ব বিস্ময়ের সঞ্চার হলো দারার মনে। রানীর মনে কী হয়েছিল কে জানে! তাদের দু'জনের সেই মুগ্ধবিস্ময়কে মুখর করে আবহসংগীত বাজতে লাগল দ্রুত লয়ে। তারপরে, অপূর্ব ভংগিমায়, তার দিকে দৃষ্টিপাত করে চলে যাচ্ছেন সেই সুন্দরী, আর ঠিক সেই সময়ে দারার হাত থেকে তার অজ্ঞাতসারেই খসে পড়ল ছোরাখানা। অস্ফুট কণ্ঠে দারা বলে উঠলেন—কে! ইনি কে?

পার্শ্ববর্তী জনৈক নাগরিক উত্তর দিলে—ইরানের রানী।

কার্টেন পড়ে গেল।

অতঃপর, সেই সভাসদ্ নাদের সা'র গোপন ষড়যন্ত্র বলেই দারা হয়ে দাঁড়ালেন রাজার পার্শ্বচর। এবং পার্শ্বচর হয়ে ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠলেন রাজার প্রিয়পাত্র। তারপরে এলো সেই দৃশ্য, যেখানে দারা গোপনে রাজাকে হত্যা করতে যাবেন। আট-দশ ধাপের একটা উঁচু সিঁড়ি বেয়ে রাজার কক্ষে প্রবেশ করা যায়। এই কক্ষটা গভীর অন্ধকার দেখাবার জন্য—আগাগোড়া কালো রঙ্-করা। যখন কালো রঙ্ করার প্রস্তাব হলো, প্রবোধবাবু অবাক হয়ে বললেন—সিন আবার আগাগোড়া কালো রঙ্ করা হবে কী! তিনি রাজী হলেন না। তারপরে একটু ভেবে নিয়ে বললেন—আচ্ছা, ঠিক আছে। নতুন একটা সিনকে কালো রঙ করে নষ্ট না ক'রে পুরানো সিনের উল্টো পিঠে এঁকে নাও।

তাই হলো। একটা সিনের উল্টোপিঠ কালো রঙ্ করে নেওয়া হয়েছিল। সেই আগাগোড়া কালো-রঙ্-করা দৃশ্যপটের পটভূমিকা—মঞ্চে কোনো আলো নেই, শুধু ফোকাসে ধ'রে নেওয়া আছে পাত্রপাত্রীদের। ঐ যে উঁচু সিঁড়ি বললাম, সিঁড়ির ওপরে একটা চত্বর, তারপরে একটা থিলেন, সেখানে পর্দা দেওয়া, পর্দাটা নীলরঙের। তার ওপরে অঙ্কিত রয়েছে সোনালী রাজদণ্ড। পর্দার অন্তরালস্থিত কক্ষটিই হচ্ছে রাজার শয়নকক্ষ। কালো আঙরাখা পরা—সেখানেই উঁচু করে টেনে নিয়ে মুড়ি দিয়ে সন্তর্পণে একাকী মঞ্চের ওপর এসে দাঁড়ালেন দারা, ছোট্ট একটা ফোকাস্ তাঁর ওপরে এসে পড়েছে মাত্র। দেয়াল ঘেঁষে সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে এগুচ্ছেন তিনি

ছেলে বুড়ো সবাই জানে
STUDENTS INK
সব চাইতে ভাল কালি
STUDENTS INK MFG. CO. CAL-23

কে, হোড়ের
কণক
* পাউডার *

হাইড্রোসিল (একশিরা)
কোষ সংক্রান্ত যাবতীয় রোগের জন্য
ডাঃ কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ এম, বি (ক্যাল)
দি ন্যাশনাল ফার্মেসী
(স্থাপিত ১৯১৬)
৯৬—৯৭, লোয়ার চিৎপুর রোড (দোতলায়)
কলিকাতা—৭
প্রবেশপথ—হ্যারিসন রোডের উপর, জংশনের পশ্চিমে তৃতীয় ডাক্তারখানা। ফোন—৩৪-৬৫৮০। সাক্ষাৎ সকাল ৯টা হইতে রাত্রি ৮টা। রবিবারও খোলা থাকে।

মূর্ছনা—একটু করে এগুচ্ছেন—আর যেই মনে হচ্ছে 'কার যেন পদশব্দ শুনলাম'—অমনি সংগে সংগে আসছেন পিছিয়ে। সচকিত হয়ে দেখছেন চারিদিক। তারপরে যখন মনে হচ্ছে, না—কেউ না—এ মনেরই ভ্রম, তখন একটু আশ্বস্ত হয়ে আবার এগিয়ে যাচ্ছেন। ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে চত্বরে পৌঁছলেন। এইভাবে মিনিট দুই ধরে চলল সেই মূকাভিনয়। চত্বরে যখন পৌঁছেছেন, তখন ঘটল এক অভাবনীয় ঘটনা! রক্তাক্ত ছুরিকা হাতে পর্দা ঠেলে—রাজার শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন, কে? না, স্বয়ং—রানী। তাঁকে দেখামাত্রই দু'তিন ধাপ নেমে এসেছিলেন দারা। দারা এবার একটু নীচে, রানী চত্বরে। একটু থেমে দুজনেই দুজনকে দেখলেন নির্বাক বিস্ময়ে! তারপরে, সিঁড়ি বেয়ে তরতর ক'রে নেমে এলেন রানী, জানালেন, দারার জন্যই এ সর্বনাশ করেছেন তিনি, দারার প্রতি দুর্নিবার প্রেম অনুভব করার ফলেই সম্ভব হয়েছে এই অভূতপূর্ব সংঘটন! বলা যায়, রানী স্পষ্টত প্রেম-নিবেদন করলেন দারার কাছে। কিন্তু ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে গেল দারার নাসিকা, বললেন—তুমি স্বামীহন্তা!

—তোমারই জন্য।

কিন্তু সে প্রেম প্রত্যাখ্যান করলেন দারা। এবং সেই প্রত্যাখ্যাত প্রেম প্রতিহিংসার দাবানল হয়ে জ্বলে উঠল মুহূর্তেই। রানীর ইংগিতে চারিদিক থেকে বল্লম-হস্তে ছুটে এলো প্রহরীর দল। রানী জানালেন রাজা খুন হয়েছেন।

—কে খুন করেছে?

রানী দারার দিকে হাত তুলে দেখালেন—ঐ লোকটা। রানী তখন ছিলেন সিঁড়ির ওপরে, দারা নীচে, সিঁড়ির ধারে। অমনি সমস্ত উদ্যত বল্লম চারিদিক থেকে ঘিরে ধরল দারাকে। রানীর মুখে ক্রূর হাসি।

এর পরে এলো বিচারের দৃশ্য। তিন থাক গ্যালারীর মতো সাজানো, ওপরে রানী বসে আছেন, পাশে মন্ত্রীকে নিয়ে। মাঝের থাকে লাল পোশাক পরা—প্রধানতম কাজী বা বিচারক। তার পাশে অন্যান্য বিচারক। এবং নীচে, আদালতের অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ। বাঁ পাশে কাঠগড়ার মতন—তার মধ্যে কিউবের মতো একটা বসার মতো স্থান—পাশে দারার পিতৃবন্ধু সর্দার নাদের। অন্যদিকে প্রহরী ও দর্শক। এক কথায় সমস্ত দৃশ্যটিতে ওপর থেকে শুরু করে পাদপ্রদীপ পর্যন্ত, লোকে লোকারণ্য। প্রহরীরা কারাগার থেকে নিয়ে এলো দারাকে। রানী দোষারোপ করতে লাগলেন, এবং অপরাধীর কোনো কথা না শুনে তাকে এই মুহূর্তেই দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হোক, এই হলো তাঁর মনোগত অভিপ্রায়। অর্থাৎ দারাকে তিনি একেবারেই মুখ খুলতে দিতে চান না, দারা মুখ খুললেই সর্বনাশ! যদি প্রকৃত ঘটনা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। কিন্তু এ যুক্তি সমর্থন করতে পারছেন না প্রধান কাজী। তিনি বলছেন—আমাদের আইন অনুযায়ী নিকৃষ্টতম অপরাধীকেও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হয়।

রানী বললেন—কিন্তু তা' বলে,—রাজহন্তাকেও?

এইসব কথা কাটাকাটি। শেষ পর্যন্ত প্রধান কাজীর দৃঢ়তার জন্যই দারা কথা বলবার সুযোগ পেলেন। এবং দারা যখন বলবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন কাঠগড়ার মধ্যে, তখন রানীর মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে

•

বিশ্বসাহিত্যের দুখানি স্মরণীয় গ্রন্থ

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বরিস পাস্টেরনাক-এর

শেষ গ্রীষ্ম

অনুবাদ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'ডক্টর জিভাগো' ছাড়া বরিস পাস্টেরনাক একটিমাত্র উপন্যাস লিখেছিলেন, সেটি 'শেষ গ্রীষ্ম'। 'শেষ গ্রীষ্ম' রচনাটির শক্তি ও কুশলতা এর জটিলতার মধ্যে, কিন্তু গল্প ও কাহিনীর অংশ খুবই সরল ও সাবলীল। এক ক্লান্ত অবসন্ন তরুণ লেখক আধ-স্বপ্নে আধ-স্মৃতিরোমন্থনে প্রথম মহাযুদ্ধের আগের মস্কোর এক শান্ত উষ্ণ গ্রীষ্মের চিন্তায় বিভোর। স্বপ্ন দেখছে পার্থিব ও অপার্থিব ভালোবাসার — ঘৃণার চেয়ে ভালোবাসা যখন আরো সহজ ও স্বাভাবিক ছিলো—আর এই স্বপ্নের অধিকাংশ জুড়ে আছে আত্মজীবন ও ইতিহাসের উপর নৈতিক মন্তব্য। ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক উভয় দিক থেকেই 'শেষ গ্রীষ্ম' স্মরণীয় গ্রন্থ।

দাম—তিন টাকা

●

স্তেফান জেবায়াইগ-এর

গল্প-সংগ্রহ

[প্রথম খণ্ড]

অনুবাদ : দীপক চৌধুরী

মহৎ প্রতিভার চরিতকার হ'লেও সুদক্ষ কথাশিল্পীরূপেই স্তেফান জেবায়াইগ বিশ্বসাহিত্যের আসরে সর্বাধিক সমাদৃত। য়ুরোপীয় সংস্কৃতির অনাবিল প্রাণ-প্রবাহ এবং সমগ্রভাবে মানব-সত্যের অশেষ অনুসন্ধিৎসাই জেবায়াইগ-এর সৃষ্টি-কর্মকে মহিমান্বিত করেছে। হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তির সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সার্থক সমন্বয়েই তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব। শিল্পসুষমার উৎকর্ষে, চরিত্রচিত্রণের নিপুণতায় ও কাহিনীর মনোহারিত্বে স্তেফান জেবায়াইগ-এর এই গল্পসংগ্রহের প্রতিটি রচনাই চিরকালীন সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ।

দাম—পাঁচ টাকা

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২

গেছে! সেইদিকে তাকিয়ে দারা কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেলেন এক মুহূর্ত। কাজী তখন আদেশ করছেন—বলো তুমি। কোনো ভয় নেই।

দারা বলে যেতে লাগলেন—আমার পিতৃ-হন্তা ছিলেন ঐ রাজা। আমি তাঁর প্রতি-শোধ নেবার জন্য গ্রাম থেকে এসেছিলাম তাঁকে হত্যা করবার জন্য। সুযোগ মতো ঐদিন রাত্রে, তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশে আমি গোপনে প্রবেশ করেছিলাম তাঁর শয়ন-কক্ষে। একটু থামলেন দারা। মনে পড়ছে, রানীর হাতের সেই রক্তাক্ত ছোরাখানার কথা। রাজ-নামাঙ্কিত ছোরা সেখানা। দারা এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে আবার বললেন—ঐ রাজ-নামাঙ্কিত ছোরাখানা আমি কুড়িয়ে পেয়ে-ছিলাম রাজারই শয়ন-কক্ষে। পেয়ে ছোরা-খানা আমূলে বসিয়ে দিয়েছিলাম রাজার বক্ষদেশে।

বলা মাত্র, আর্তনাদ করে উঠলেন রানী। দর্শকমণ্ডলীতে দেখা গেল বিপুল উত্তেজনার আভাষ। একটা কলরব উঠল বিচার-কক্ষে। প্রধান কাজী হাতুড়ির মতো একটা দণ্ড টেবিলের ওপর ঠুকে দৃঢ় এবং উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন—চুপ করো চুপ করো!

দারা ততক্ষণে দেহটা এলিয়ে দিয়েছেন কাঠগড়ার ওপরে। কাঠগড়ার রেলিং-এর ওপরে হাত দিয়ে মাথাটা রাখলেন এলিয়ে। আবহসংগীত আরম্ভ হয়ে গেছে। তারপরে দারা দাঁড়িয়ে উত্তেজিত হয়ে দ্রুত বলে যেতে লাগলেন—আমিই দায়ুদ শার হত্যাকারী। হুজুরৎ, আমার শাস্তির ব্যবস্থা করুন। এ পৃথিবী আমার চোখে এখন অন্ধকার -কারাগার! আমায় হত্যা করুন, আমি অন্ধকারে আলো দেখি!

এ দৃশ্যের সর্বাঙ্গীণভাবে সবার অভিনয়ও হতো চমৎকার। আমার করণীয় যা কিছু ছিল, সব আমি ওজন মতোই করে যেতাম। ৫ম ও ৬ষ্ঠ অভিনয় যাবার পর একদিন হলো কী, অভিনয় করতে করতে সংলাপের শেষের দিকে পৌঁছে গেছি, বলছি, 'এ' পৃথিবী আমার চোখে' ইত্যাদি! কথাগুলো আমি উচ্ছ্বাসপূর্ণভাবে বলতাম, হাততালিও পড়ত। সেদিন ঐ কথাগুলি বলতে বলতে কী রকম একটা মনের ভাব হয়ে গেল, যেন, সম্বিৎ নেই, একটা পা আসনের ওপর, আরেকটা পা উঁচু করে রেলিং-এর ওপর রেখেছি, দুটি হাত প্রসারিত করে দিয়েছি। ফোকাস তখন আমার ওপরই থাকত। সেদিন যেন সব মিলিয়ে বিদ্যুৎ-চমকের মতো হয়ে গেল! কী বলে একে প্রকাশ করব, কীসের এ প্রেরণা? ইংরেজীতে যাকে বলে "ইলেকট্রিক কোয়ালিটি" অথবা "ইন্সপায়ার্ড মোমেণ্টস" অথবা "স্পার অব দি মোমেণ্ট" সরাচর এ জিনিস আসে না, কিন্তু যখন আসে, একেবারে ভাবোদ্বেল করে দিয়ে যায়। রুদ্ধ ভাবাবেগকে প্রকাশ করবার জন্য যে উদ্বেল অভিব্যক্তি তখন বাঁধাধরা ঝরনার মতো বেরিয়ে পড়ে। কোনো বাঁধাধরা ছকের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চায় না। পরবর্তীকালে অনেক নাটকে অভিনয় করতে করতে এরকমটা হয়ে যেতো, যা কিনা, 'আনরিহার্সড!' 'আনপ্রাকটিসড!'

তারপরে শেষ দৃশ্যের কথা। কারাগারে দারা, রানী এসেছেন কারাগারে তাঁকে বাঁচাবার জন্য। কিন্তু রানীর বহু আয়াসেও যখন দেখা গেল, দারা অনড়, তখন অকস্মাৎ বিষপান করে মৃত্যুকে বরণ করলেন রানী, বিয়োগান্ত-মর্মান্তিক সে দৃশ্য! আবহসংগীত তখন ভাবোপযোগী অদ্ভুৎ করুণ এক সুর-মায়া বিস্তার করে চলত!

দারার পক্ষে এই চারটিই ছিল মোক্ষম দৃশ্য। পিতৃবন্ধু নাদের শা যখন তাঁকে জানালেন, সে কৃষক পুত্ররূপে লালিত-পালিত হলেও কৃষকপুত্র নয়। সে এক ওমরাহের পুত্র, সে ওমরাহকে ঐ রাজা গোপনে হত্যা করেছিলেন। এবং সেই সময় শিশু দারাকে নিয়ে নাদের শা গ্রামে কৃষকদের কাছে রেখে দিয়ে এসেছিলেন। এই যে তাঁর প্রকৃত পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল দারার কাছে, সেই থেকে শুরু হলো তাঁর জীবনের নাটকীয় মুহূর্ত, যার সমাপ্তি নাটকের যবনিকা পতনে। অভিনয়টা করে গেলাম সাবলীলভাবে, ছবির মতো চলে গেল সব। অভিনয়ের সুখ্যাতিও হলো প্রচুর। "দারা ও রানীর অভিনয়", লোকে বললে, "খুব ভালো হয়েছে, এর আগে এমনটি দেখিনি!"

দায়ুদ শা-নাদের শা—এমনকি ঐ একটি দৃশ্যের কাজী—অনবদ্য অভিনয় করতেন সবাই। এমন কি 'বিস্কুট-খেকো' ভুলো বা সন্তোষ দাস সেই যে তার কথার মাত্রা হিসাবে 'বাজী রাখো' বলতো কথায়-কথায়, সেই 'বাজী রাখো' কথাটা চালু হয়ে গেল মুখে মুখে! আর জনপ্রিয় হয়েছিল এ বইয়ের ৫।৬ খানি গান। বিশেষ করে দুটি গানের সুর ত এখনো কানে বাজে! গুলরুখ-বেশিনী সুবাসিনীর গান। 'বলো তারে ভুলি কেমনে' এবং 'মিলনের গীতি গাহিব বলিয়া বেঁধেছিনু সুখে ঘর!' শেষোক্ত গানখানিতে আশোয়ারী সুর বসানো, এমন প্রাণ-ব্যাকুল-করা হতো এই গানটি যে, দর্শকরা গায়িকাকে ছাড়তে চাইত না, অন্ততঃ বার দুয়েক 'এনকোর' পড়ত।

(ক্রমশ)

প্রকাশিত হল

বিমল মিত্রের

অনুপম তিনটি বড় গল্প সংগ্রহ

বেনারসী

বাংলা কথা-সাহিত্যে বিমল মিত্র স্বনামধন্য পুরুষ। তাঁর লেখা বই বিদগ্ধ পাঠকজনের চিত্তজয় করেছে—একথা প্রমাণিত হয়েছে তাঁর বইয়ের সংস্করণের পর সংস্করণে। বেশ কিছু-দিন পরে অত্যন্ত সুনির্বাচিত তিনটি বড়গল্প নিয়ে 'বেনারসী' বেরুলো। ভাবে ভঙ্গিতে ভাষায় অপূর্ব শিল্প-সৃষ্টির নিদর্শন বিমল মিত্রের এই তিনটি গল্পে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। বেনারসী -- নায়কনায়িকা -- আর-একরকম—তিনটি ভিন্ন রঙের সার্থক রচনা যেমন জমাট তেমনি মধুর। বর্ণাঢ্য প্রচ্ছদ। ৪·৫০

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড

২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা—১২

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন!

যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র

বহু গাছ গাছড়া দ্বারা বিশুদ্ধ মতে প্রস্তুত

বাকলা

ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন

ভারত গভ। রেজিঃ নং ১৬৮৩৪৪

অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা,

মুখে টকভাব, ঢেকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দাগ্নি, বুকজ্বালা, আহারে অরুচি, স্বল্পনিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যাঁরা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও বাকলা সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিফলে মূল্য ফেরৎ।

৩২ তোলার প্রতি কৌটা ৩৲টাকা, একত্রে ৩ কৌটা — ৮৷৷৹ আনা। ডাঃ মাঃ ও পাইকারী দর পৃথক।

দি বাকলা ঔষধালয়। হেড অফিস- বরিশাল (পূর্ব্ব পাকিস্তান) ব্রাঞ্চ-১৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৭

হিমাংশুশেখর সেন এককালের নামী লেখক। বই-এর সংখ্যা তাঁর নেহাত কম নয়—প্রায় ডজন তিনেক হবে। তাঁর সাম্প্রতিক বই 'নির্জন ধূপ' প্রথম এডিশনে পাঁচশ ছাপা হয়েছিল। পাব্লিশারের ঘরে তার তিনশই গাদা হয়ে পড়ে আছে। অথচ কয়েক বছর আগেও তাঁর দুহাজারী সংস্করণ এক মাসে উড়ে গেছে। সকলেই বুঝতে পারছেন ও'র বাজার দর।

গত ভাদ্রয় তিনি আটান্ন বছরে পা দিয়েছেন। কিন্তু বাইরে থেকে দেখলে অত মনে হয় না। সামান্য মাথাধরা কি হজমের গোলমাল বাদ দিলে তাঁর শরীর বেশ ভালো। ওসব নিয়ে কোনও দুশ্চিন্তা ছিল না। ইদানীং একটা দুর্ভাবনা মাথায় ঢুকেছে। তিনি আর তেমন লিখতে পারছেন না।

সন্ধ্যাবেলা হাতে কাজ থাকে না হিমাংশুশেখরের। বন্ধু প্রিয়তোষের আড্ডায় দাবার ছক নিয়ে বসেন। প্রিয়তোষ ইঞ্জিনিয়ার। ছেলেবেলায় একসঙ্গে ইস্কুলে পড়তেন। একদিন দাবার একটা কঠিন চালের মাথায় প্রিয়তোষ বললেন: 'হিমাংশু, একটা কথা বলব। চটবে না'...

হিমাংশু চোখ তুললেন না। 'বলে ফেল।'

'তোমার ত সবটাতেই অবিশ্বাস।'

'তাতে হলোটা কি?'

'না। বলছিলাম—তোমার কুষ্টিটা কাউকে দেখালে হয়।' সামনে তাকাতে বাধ্য হলেন হিমাংশু। ভগবানই মানি না আবার জ্যোতিষী।

'আজকাল লোহালক্কড় ছেড়ে এইসবে মন দিয়েছ নাকি?'

হিমাংশুর কথায় প্রিয়তোষ একটু গম্ভীর হলেন। 'তোমার ঐ এক দোষ। সবকিছুই একটু আধটু মানতে হয় হে। এই যে লেখাটেখা হচ্ছে না, বাজার খারাপ, তুমি নিজেই তো বল। এসব কিছু না?'

এবার আর জোরে হাসতে পারলেন না হিমাংশু। অথচ হাসতে পারলে ভাল দেখাত। আস্তে বললেন, 'তবু এটা যে ভাগ্য তার প্রমাণ আছে?'

'প্রমাণে কাজ নেই। শুধু জন্মসময়টা আমাকে দিও। তাহলেই হবে।'

হিমাংশু এবার একটা চুরুট ধরালেন। যৌবনে অনেক নেশা ছিল। আজ এটা ছাড়া বিশেষ কিছু নেই। চা? তা-ও না খেয়ে থাকতে পারেন।

'কি হে চাল দাও। অত কি ভাবছো।'

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। তাড়াতাড়িতে একটা ভুলে মাৎ হয়ে গেল।

'নাও। আরেক হাত হোক।' হিমাংশুর ভাল লাগছে না। দাঁতের ফাঁকে একটা মশলার কুচি বেধেছে। এমনি অস্বস্তি।

'আজ থাক। কাল আবার হবে। রাতও হল ঢের।' উঠে পড়েছেন প্রায়। বন্ধু হাত ধরে বসালেন। 'আরে বসো বসো। সবে তো রাত নটা। ঘরে বৌ ছেলে নেই। তাড়াতাড়ি ফিরে করবে কি?'

'কি আর করব। খেয়ে-দেয়ে ঘুমোব। ঘুমোলে শুনেছি আয়ু বাড়ে।'

'থামো। লিখবে বললেও না হয় বুঝতাম। ঘুম...'

আশ্চর্য। এক বয়েসে খানকুয়েক বই লিখেছিলেন বলে কি জিরোনোরও হুকুম নেই। বাড়িতে ফিরে এলেন। বাড়ি মানে ভাড়াটে ঘর খান দুয়েক। তিনতলার ফ্ল্যাটে হাওয়া ঢের, কিন্তু মানুষ কম। হিমাংশু ও তাঁর অনুচর মকবুল। রান্না খাওয়া থেকে ভালোমন্দ সব দেখে শোনে ও।

পাঞ্জাবী হ্যাংগারে ঝোলাতে গিয়ে ঠুক করে শব্দ হলো। কলমটা মেঝেতে পড়ে গেছে। বুক পকেটে নিয়ে বেরোন পুরোন বাতিক। লুঙ্গি পরে কলঘরে ঢুকলেন। রাত্তিরে একটু গা না ধুলে ঘুম আসতে চায় না। বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে প্রিয়তোষের কথা। মাথার ওপরে কল খুলে দিয়েছেন। ঠাণ্ডা জল পিছলে নামল কপালের ওপর দিয়ে, বুকের লোমে; সুড়সুড়ি লাগল। কিন্তু সুখ পেলেন না।

লোকে তার লেখা চাইছে না। কিন্তু কি করা যায়!

শুকনো কাপড় জড়িয়ে হাঁক দিলেন—'মকবুল'। দুবার ডাকার আগেই এসে দাঁড়িয়েছে। লোকটা বড় অনুগত। টিকি দাড়ির বাছবিচার নেই হিমাংশুর। কাজেই মকবুলের রান্নার বশ হয়েছেন।

'বাবু। ভাত দিই।'

'দে। কি বাজার করলি আজ?'

বীরেশ্বর ভট্টাচার্যের
মহাভারতের গল্পগুচ্ছ
তারাপদ রাহার—
ছোটদের বেতাল পঞ্চবিংশতি
পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর
ছোটদের আরব্য উপন্যাস
এ. কে. সরকার এণ্ড কোং
কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা-১২

ডাঃ ইউ. এম. সামন্ত
বাইওকেমিক
গার্হস্থ-চিকিৎসা
দশম সং ঃ দাম—২,
গৃহ চিকিৎসার একটি সরল ও সুন্দর পুস্তক। প্রতি গৃহে রাখা কর্তব্য।
সামন্ত বাইওকেমিক ফার্মাসী
৫৮।৭ ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড
কলিকাতা—২
বাইওকেমিক ঔষধ ও পুস্তকের
— প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান —

'মুর্গি পাইনি। মাটন এনেছি।'

'বেশ করেছিস। রাঁধলি কি?' চিরুনির কাল তেল কাপড়ে মুছলেন।

'একটু স্টু বানালাম। অনেককাল হয় না। আর জলপাইয়ের টক।'

'খাশা। খাশা।' টেবিলে সাজানো খাবার। রাত্রে হাতে গড়া আটার রুটি। কোষ্ঠ সাফ রাখার সেরা ওষুধ। আটায় ক্যালোরী বেশী। রিডার্স ডাইজেস্টে পড়েছিলেন। মাংসের দিকে তাকিয়ে আঁচ করলেন, ভালোই হবে। স্টু-র অমন ফ্যাকাশে রং-ই হওয়া উচিত।

'যাক তোর বুদ্ধিশুদ্ধি খুলেছে। স্টু-টা গরমকালে খাওয়া ভালো কি বলিস?'

বোকার মত হাসল মকবুল। কুকুরের গলা দিয়ে একটা শব্দ করে মাংসের প্লেটটা এগিয়ে দিল। হিমাংশু রুটি ছিঁড়ে ঝোলে ডুবোলেন। ভেবেছিলেন মন দিয়ে খাবেন। হলো না। মজা দেখার জন্যে জন্মসময়টা প্রিয়তোষকে পাঠালেও হয়। কাল একটা পোস্টকার্ড ছেড়ে দেবেন। আচমকা একটা হাড় মাড়িতে ফুটল। 'উহু। গেছিরে।' ককিয়ে উঠলেন। মকবুল ছুটে এল। 'হাড়গুলো বেছে ফেলে দিতে পারিসনে। মেরে ফেলবি যে!' দুটো আঙুলে হাড়ের কুচিটা বার করতে চেষ্টা করলেন। আঙুল রক্তে ভিজে উঠল। ঠাণ্ডা জলে কুলকুচি করতে গিয়ে ভীষণ জ্বালা করতে লাগল। নাঃ আজ সবাই পিছনে লেগেছে।

সামান্য ব্যাপার। বিছানায় শুয়ে মনে হলো এগুলোকেই লোকে ভাগ্যের সঙ্গে জড়ায়। রোজ শহরে কত লোক গাড়ি চাপা পড়ছে, মরছে কিংবা হাত-পা ভেঙে হাস-পাতালে শাদা সিমেণ্ট জড়িয়ে পড়ে থাকছে। সবই ত অসাবধানতা। না। এসব ভাবা খারাপ। রাশিচক্র বুজরুকি। কাল সকালে উঠে নতুন উপন্যাসে হাত দিতে হবে।

ক'দিন আগে একবার বই-এর পাড়ায় গিয়েছিলেন। কিছু পাওনা আদায় করতে। উঠতি লেখকদের মন্তব্য কানে আসছিল। 'রাখ তোর হিমাংশু সেন। কবে লিখত বলে আজও বাজার জাম করবে।' আরেক-জনের ক্ষীণ গলা। 'তা হলেও পিছনটাকে ভুললে চলে।...' 'নে, নে, পিছন নিয়ে কদ্দিন চলে।'

সবটা শোনেন নি। কথার তো কোনও ট্যাক্স নেই। লেখো না বাপু দু কলম হিমাংশু সেনের মত। এসব কথা ভেবেও শান্তি পেলেন না। ওদের কথার সবটা কি মিথ্যে। ইদানীং দিনে ক'পাতা করে লিখি?

সকালবেলা। দাঁত মাজতে মাড়িতে খোঁচা লাগল। পারোক্সাইড মেশানো পেস্টে জিভ-টিভ হেজে যায়। দাঁতন শুরু করলে কেমন হয়। টাটকা ক্লোরোফিল। পেস্টে সব ভাওতা। খানিকটা সবুজ রং মেশানো, ঘাসের রসও হতে পারে। একটা করে দাঁত পড়ে যাচ্ছে। একদিন সকালে উঠে দেখবেন হয়ত শরীরের একটা দিক অবশ হয়ে গেছে। চোখে দেখতে পাচ্ছেন না, কানে ছিপি আঁটা। ভেবে ঝাঁকি লাগল। অনেকদিন আগে একবার ইলেকট্রিক সুইচে ভিজে হাত দিয়ে শক খেয়েছিলেন, অনেকটা সেইরকম।

চা খেয়ে ঘোরের মধ্যে একটা পোস্ট কার্ড লিখে ফেললেন প্রিয়তোষকে। সাল তারিখ জানা ছিল। সময়টা আন্দাজে বসালেন। শুনেছিলেন শেষ রাত্তিরে ব্যথা উঠেছিল।

ক'দিন পরে সন্ধ্যেবেলা কোথায়ও বেরোন নি। খুট খুট করে কড়া নেড়ে, মকবুল দরজা খোলার আগেই ভেজানো দরজা ঠেলে প্রিয়তোষ ঢুকল।

'এসো, এসো।'

'আসছি। কিন্তু সঙ্গে যে একজন'...

'আরে ওঁকেও নিয়ে এসো—আসুন, আসুন।' এগিয়ে গেলেন হিমাংশু। 'সঙ্কোচের কোনও কারণ নেই।'

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। 'আলাপ করিয়ে দিই। মথুরেশ ভট্চাজ। আমার বন্ধু হিমাংশু সেন।' হাত তুলে নমস্কার করতে খারাপ লাগল।

প্রিয়তোষ বললেন—'হিমাংশু, এঁর আরেকটা পরিচয় আছে। অঙ্কের ব্রিলিয়েণ্ট ছাত্র। আবার ভাল কুষ্টি বিচার করতে পারেন।'

ও, এইবার বোঝা গেল। জ্যোতিষী। অন্যেরটা ভালোই গোনে। কিন্তু নিজের বেলাই যত গোলমাল। 'আমি কিন্তু ওসব জানি না।'

'আমার বন্ধুটি ঘোর নাস্তিক। তবে একটি দেবতাকে মানে। সেটা মুদ্রাযন্ত্র।'

সকলে হেসে উঠল। প্রিয়তোষ কি যেন বলতে যাচ্ছিল। হিমাংশু ধমকে উঠলেন—'উঁহু আগে থেকে খবর দেওয়া চলবে না।'

মথুরেশ মুখ খুললেন। 'একটা কিছু মানলেই হল। ধর্ম না মানলে সায়েন্স, সায়েন্স না হলে নেচার। একটা ফোর্স। মানতেই হচ্ছে।' যেন গীতাভাষ্য। কথা বাড়িয়ে লাভ কি। ঈশ্বর আছে কি নেই এই নিয়ে ছেলেবেলায় ঢের তর্ক করেছেন। এখন ক্লান্ত লাগে। তাছাড়া, ঈশ্বর যে নেই এমন প্রমাণও সারা জীবনে জোগাড় হয় নি।

'ওভাবে হিমাংশুকে দলে টানা যাবে না। আপনি কোন ছার। আমরা আজ পনেরো বছর ধরে বোঝাচ্ছি। হিমাংশু বিয়ে কর—বয়স হয়েছে।'

'চুপ। নো কমেণ্ট।' হিমাংশু বন্ধুর দিকে চোখ পাকালেন। মথুরেশ এইবার পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বার করলেন। তেরোই 'ভাদ্র। তেরোশ...... মঙ্গলবার। ভোর রাত্তিরে না?

'তাই শুনেছি। এ ব্যাপারে পরের ওপর

নির্ভর না ক'রে উপায় নেই।' হাসলেন মথুরেশ। 'একটা ছক তৈরী করেছি। কাগজ কলম চাই।'

কাগজ নিয়ে খস্‌খস্‌ করে ঘর আঁকা হল। কাটাকুটি খেলার মত। চার কোণের ঘরগুলো শুধু ভাগ করে দিলেই হল। আস্তে আস্তে উত্তেজিত লাগছে। ওকে চলে যেতে বললেই চুকে যায়। কিন্তু কি এক টান বলতে পারছেন না।

'বলুন। কি জানতে চান?' হিমাংশু তাকালেন।

'পিছনটা একটু শুনি। মেলোনো যাক।'

'বেশ তো।' চোখ নামালেন মথুরেশ।

'ছোটবেলার একটা ঘটনা বলি'—গলায় যেন পানের কুচি বেধেছে. 'ভালবাসায় জড়িয়ে একবার খুব মানসিক অশান্তি হয়েছিল। কিছু মনে করবেন না। খানিকটা লোভ করেছিলেন আর তাই নিয়ে সামান্য দুর্নাম। বছর ষোলো-সতেরোয়. বলুন ঠিক না?'

মথুরেশের চশমার কাচে আলো পড়েছে। মনে পড়ছে না কিছু। সতেরোয়। না মনে পড়বে না।

'লুকোবেন না হিমাংশুবাবু। একটা মেয়েকে নিয়ে।' এক সেকেন্ডে মেজাজটা চড়ে গেল। ধাপ্পা, শতকরা নিরানব্বুই জনেরই ঐ বয়সে একটা কিছু হয়েই থাকে। আর কিছু হওয়া মানেই একজন নায়িকা থাকা। বিরক্ত হয়ে বললেন—'হতেও পারে। আশ্চর্য কিছু নয়।'

প্রিয়তোষ হেসে উঠলেন। 'আরে লজ্জার কি আছে। আমার গল্প তো তোমাকে বলেছি। শুনবে ফের।' হিমাংশুর হাসি পাচ্ছে না. 'গল্প আমিও কম জানি না।'

চোয়ালটা জমান সিমেণ্ট। 'কিন্তু গল্প মানেই নিজের গল্প নয়।'

'বেশ আরকেটা বলি।' 'বলহরি' দিয়ে কারা মড়া নিয়ে গেল।

'ইনিউভার্সিটির ডিগ্রীর ব্যাপারে তেমন সুবিধে হয়নি।' হিমাংশুর হাতটা নিশপিশ করছে। চালাকি করার জাগা পাওনি? হিমাংশু সেন কদ্দুর পড়েছে তা কে না জানে। গল্প সংকলনের পিছনের মলাটে লেখাই আছে সব। এবার হয়ত বাপ-মার নাম. এমন কি জন্মস্থান বলতে শুরু করবে।

'না পড়িনি, ওটা-ও তেমন কিছু খবর নয়।' ফস করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। মথুরেশ তাকালেন। 'আপনার কাছে অবশ্য সবই পুরোন, তবু বলতে হয় বিয়ে করেন নি এটাও বলতে পারি না। প্রিয়তোষ আগেই বলে বসেছেন'—

'বাবা-মার কথা কিছু বলতে পারেন?'

'আপনাকে নাবালক রেখে ও'রা স্বর্গে গেছেন।'

'ঠিক মিলল না. নাবালক বয়সে নয়। এই ধরুন বছর উনিশ কুড়িতে। হ্যাঁ মা। বাবা অনেক পরে।'

'একুশ বছরে লোক সাবালক হয়। ভুল হয়নি।' প্রিয়তোষ উকিল সেজেছেন।

'কিন্তু বললাম যে, বাবা যখন মারা যান তখন আমার বয়স আটাশ। নিশ্চয়ই সবালক হয়েছি।'

'সূক্ষ্ম গণনায় সেটাও বলা যেতে পারে। যাই হোক'...

লোকটার আশ্চর্য সহ্য শক্তি। হিমাংশু বললেন—'সময় এখন কেমন যাচ্ছে না বললেও চলবে। ভালো সময়ে লোকে ভাগ্য নিয়ে মাথা ঘামায় না, বরং বলুন কদ্দিন বাঁচবো?'

'মানে......' প্রিয়তোষের চোখ হিমাংশুর মুখে।

'হ্যাঁ, দিনখন বলতে হবে।' একটা চ্যালেঞ্জের ভাব হিমাংশুর।

'চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু সেটা কি ভালো হবে।'

'কেন? দেখি কদ্দুর আপনাদের দৌড়' —কোনও জবাব না দিয়ে মথুরেশ ছক দেখতে শুরু করেছেন। হিমাংশু যেন এইমাত্র পঞ্চাশটা সিঁড়ি লাফিয়ে এলেন, বুকের ভিতর এমন হাঁফ। গলাটা শুকোচ্ছে।

'আমার ধারণা'...গলা খাঁকারি দেওয়াটা মথুরেশের মুদ্রাদোষ।

'ওকথা বরং থাক।' প্রিয়তোষ থামাতে চাইলেন।

'কেন থাকবে।' বিশ্রী রোখ চেপে গেছে হিমাংশুর।

'বেশী দিন নেই। অষ্টমে শনিমঙ্গল। মানে'...

'মানে কি?'

ছোটগল্পের পাঠক সংখ্যা ক্রমবর্ধমান

২য় বর্ষ ২য় সংখ্যার অত্যধিক চাহিদা পূরণে অক্ষম বলে দুঃখিত। বর্তমান সংখ্যাটি সম্পূর্ণ নিঃশেষিত। শারদীয় সংখ্যা বর্ধিত কলেবরে যন্ত্রস্থ। এজেন্টরা অগ্রিম অর্ডার পাঠান। ছোটগল্প ॥ ১৯/৪, নয়নচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট। কলকাতা ৬.

সি-৭১৩৬

শ্রীজওহরলাল নেহরুর

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

"GLIMPSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ শুধু ইতিহাস নয়, ইতিহাস নিয়ে সাহিত্য। ভারতের দৃষ্টিতে বিশ্ব-ইতিহাসের বিচার। সর্ব দেশে ও সর্ব সমাজে সর্বকালের আদরণীয় গ্রন্থ। জে. এফ. হোরাবিন-অঙ্কিত ৫০ খানা মানচিত্র সহ। প্রায় ১০০০ পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ।

২য় সংস্করণ ঃ ১৫·০০ টাকা

আত্ম-চরিত	॥ শ্রীজওহরলাল নেহরু	১০·০০
ভারতকথা	॥ শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারী	৮·০০
ভারতে মাউণ্টব্যাটেন	॥ অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন	৭·৫০
চার্লস চ্যাপলিন	॥ আর. জে. মিনি	৫·০০

প্রফুল্লকুমার সরকার

জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ

বাঙলার তথা ভারতের জাতীয় আন্দোলনে বিশ্বকবির কর্ম, প্রেরণা ও চিন্তার সুনিপুণ আলোচনায় অনবদ্য গ্রন্থ।

তৃতীয় সংস্করণ ঃ ২·৫০ টাকা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন কলিকাতা—৯

টাটার কেশ তৈল

টাটার সুবাসিত নারিকেল কেশ তৈল—,
ফুলের গন্ধে ভরা
পরিশোধিত খাঁটি তেল

টাটার ক্যাস্টর হেয়ার অয়েল—চমৎকার
মিষ্টি গন্ধে ভরপুর

কেশরাশি ঘন ও সুন্দর ক'রে তুলতে হ'লে
টাটার কেশ তৈল ব্যবহার করুন!

TH. 645

টাটা-র তৈরী

'মানে—অপঘাত।' জজের মত গলা। হিমাংশু কথাটা স্পষ্ট শুনতে পেলেন। এক মুহূর্ত আগে মনে হয়নি একটা 'সেই' শব্দের এত জোর। চেয়ার থেকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে চাইল। অতি কষ্টে নিজেকে সামলালেন। একটা হাসিও ফোটালেন। 'গ্র্যান্ড। সে শুভদিন কবে?' যেন একটা লটারীর টাকা পাবেন।

'হিমাংশু ঠাট্টা রাখো।' প্রিয়তোষ উঠে দাঁড়িয়েছেন। এতদূরে যে ব্যাপারটা গড়াবে তা তিনি ভাবতেও পারেন নি।

'কিন্তু কত তারিখ, ক'টার সময়'—হেসে উড়িয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু নিজে বুঝছেন, সবটা বিশ্রী ফাঁকা ভাব।

'ঠিক তারিখ বলাটা সময়সাপেক্ষ। তবে মাস ছয়েকের মধ্যে ধরে রাখতে পারেন।'

'আচ্ছা।' লোকে খেলার শেষে যেমন তাস গুছিয়ে প্যাকেটে ভরে সেরকম মুখের ভাব হিমাংশুর।

প্রিয়তোষ আবহাওয়াটাকে হালকা করতে চাইলেন। 'আর নিন, সব কি আর মেলে। বিশেষ করে জন্ম-মৃত্যু। আপনি বরং পরে একবার মাথা ঠাণ্ডা করে'...

মথুরেশ তৎক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। জবাবটা প্রায় তৈরী ছিল। 'মাথা আমার ঠাণ্ডাই।'

মথুরেশ দরজার দিকে পা বাড়িয়েছেন। প্রিয়তোষ পেছনে, 'আজ চলি ভাই।' এছাড়া আর কি বলা যায়। 'তুমি ওসব ভেবো না হে, তোমার অমন স্বাস্থ্য'...কিছু বলা দরকার। হিমাংশু ভাবলেন। 'তুমিও যেমন, আচ্ছা ভটচাজ মশাই—একটু খোঁজখবর নেবেন। মরলে কাঁধ দেবেন তো?'

মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে গেছে। মশারি ফেলা হয় নি। টেবিলে রেডিয়াম ডায়ল টাইম-পিসটা জ্বলজ্বল করে তাকাচ্ছে। ঘড়ি মানে সময়। গলাটা শুকিয়ে এল। বিছানাটা একটা খেলার মাঠ। পাশবালিশ হারিয়ে গেছে। জ্যোতিষী কি সব জানে? গেঞ্জিটা গা থেকে খুললেন। শীতের রাত্তিরেও গরম লাগছে। বোঁটকা গন্ধ। কাচা হয় নি কদ্দিন। রাত একটা পঁয়ত্রিশ। ভোর হলে ঘড়িতে ছটা বাজে।...

সতেরো বছর বয়সের ঘটনা। হ্যাঁ মনে পড়ছে; সুন্দর পিসির মেয়ে মিনু। লতায় পাতায় সম্পর্ক। বিধবা হয়ে এসে উঠেছিলেন ওদের বাড়িতে। হিমাংশু তখন ষোলো-সতেরো। মা পনেরো-ষোল। আন্দাজ কিছুটা ভুল মথুরেশের। বাড়ন্ত গড়ন বলে একটু বেশীই মনে হত। মিনুর বয়স বছর তেরো। কিংবা একটু বেশী। সবাই বলত সুন্দর পিসী কমিয়ে বলে, বিয়ে দিতে হবে না।

মিনুর ড্যাবডেবে চোখের সামনে পায়ের লোম বার করে ঘুরতে লজ্জা করত। মিনুর ফ্রকের তলার পুরন্ত পায়ে একটাও দাগ নেই। পুকুরঘাটে একদিন আরো একটু দেখা গিয়েছিল। সাংঘাতিক।

এর কিছুদিন বাদে এক কাণ্ড বাঁধিয়ে বসলেন। পাতলা গোঁফদাড়িতে মুখ কালচে, হাতের তেলো খসখসে। গলার আওয়াজ ভাঙা কাঁসর। ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্যে তৈরী হচ্ছিলেন। বাইরের দিককার পড়ার ঘরে। তখন সন্ধ্যেবেলা। মিনু হারিকেন দিতে এসেছে। একটা আলোর গোলা যেন।

গায়ে লেপটে বসে গেছে জামার হাতা। একটা হাত হ্যারিকেন নামালো টেবিলে। আর সব গোলমাল হয়ে গেল। হাতটা নিয়ে মনে হল একতাল এঁটেল মাটি। ঠাণ্ডা ভিজেভিজে। মিনু চোখ তুলল না। ভয়ে বলল, 'ছাড়ুন, কেউ দেখে ফেলবে।'

জবাবে কি বলেছিলেন মনে নেই। ও চলে যাওয়ার পর ভয় হল যদি বাড়ির সবাইকে বলে দেয়। কী সর্বনাশ।

খেতে বসে গলার আঠায় ভাত আটকাতে লাগল। জলের গ্লাসে আলো পড়েছে! সবার চোখ এড়াতে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। সুন্দর পিসী খুন্তি নাড়ছেন। আঁচাতে গিয়ে মনে মনে বললেন, না মিনুটা লক্ষ্মী মেয়ে। কাউকে বলে নি।

রাত্তিরে লেপের মধ্যে শরীরটা আবার তেতে উঠল। গনগনে আঁচ। ভিতরে কেউ যেন উনুনে বাতাস দিচ্ছে।...মিনুর ঠোঁট দুটো অসম্ভব লাল। তরমুজ কাটলে ঐরকম দেখায়।

পাশ ফিরে শুলেন হিমাংশু। ওইটুকুকে কি অন্যায় বলা চলে? মথুরেশ তাই-ই বোধ হয় ইঙ্গিত করেছে। ছেলেবেলা কেটে গেল। তারপর। মথুরেশ কিছু জানে না, আই এ ফেল করে শহরে এলেন বাংলা দৈনিকে সাব-এডিটারী। শুধু অনুবাদ, তবু কি উত্তেজনা। জাপান সিঙ্গাপুরে, ইম্ফলে বোমা...!

আরো আগের কথা, শহরে এসে বন্ধু জুটলো। শখ করে গেলেন বার-এ। ভয়ঙ্কর সব দিনগুলো। কত টাকার সোডা-লেমনেড খেয়েছেন একবার হিসাব করে দেখলে হয়। একবার পয়সা দিয়ে প্রেম করতে যাওয়ার ঘটনা। ভালো লাগে নি। ময়লা বিছানা, ছেঁড়া তোশক। নড়বড়ে খাট। মুখে বিশ্রী গন্ধ। গা গুলোচ্ছিল। হাইজিন মেনে চলা চিরকালের বাতিক। ওরা কদ্দিন সাবান মাখে না। একটা টেন পার্সেণ্ট কার্বোলিক সাবান কিনে বাড়ি ফিরলেন। কলের তলায় রগড়ে রগড়ে চান করেও খুঁতখুঁতানি যায় নি।

এরপর আরেকটি মেয়ে। গল্প পড়ে আলাপ করতে এসেছিল। নির্জলা সাহিত্য নয়, অন্য লোভও ছিল ওর। দু' একবার গায়ে পিঠে হাত রাখেন নি এমন নয়। কিন্তু মেয়েটি আরো চেয়েছিল। সারা জীবন•

বারীন্দ্রনাথ দাশ
শাণিত-স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল এক আধুনিক সাহিত্য-শিল্পী। বীক্ষণ-বৈভব যাঁর রচনাকর্মে জীবনকে জীবিত করেছে। মানুষের অন্তর্লোকে যাঁর অনায়াস-বিচরণ এবং প্রকাশ-পারঙ্গমতা এক বৈশিষ্ট্যে উত্তীর্ণ করেছে—তাঁরই সাম্প্রতিক উপন্যাস

বারীন্দ্রনাথ দাশ

দুলারী বাঈ

......মুজরোওয়ালী। রাতের প্রথম প্রহরে যখন শহরের বুকে ঘুম নামবে, ধূসর হবে আকাশ, তখন মুজরোওয়ালী দুলারীবাঈ বিনম্র তস্‌লিম জানিয়ে গাইতে সুরু করবে—'তেরী জুল্‌ফকো মুহব্বত কো জিনজীর কহ্‌তে-এ-এ-হৈ' তারই বিচিত্র জীবনের বিস্ময়কর কাহিনী! দাম : ৪

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

আমাদের প্রকাশনীর

জনপ্রিয় ৩টি উপন্যাস

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বৈশালীর দিন

দাম : ৩৷৹

কস্তুরীমৃগ

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

দাম : ৪.

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের

তারার আঁধার

দাম : ৩৷৹

একমাত্র পরিবেশক :

ত্রিবেণী প্রকাশন

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

মফঃস্বলের অর্ডার

ক থা ক লি

১, পঞ্চানন ঘোষ লেন । কলি-৯

এক সঙ্গে থাকতে। এগোতে দেন নি। সবাইকে কি আর বিয়ে করা চলে। মেয়েটির শাপমন্যি নিজে কানে শোনেন নি। তবে বন্ধুরা বলে, ওর শাপেই তোমার আইবুড়ো দশা ঘুচল না। পরে কখনো কখনো আফসোস হয়েছে। মেয়েটি মন্দ ছিলো না।

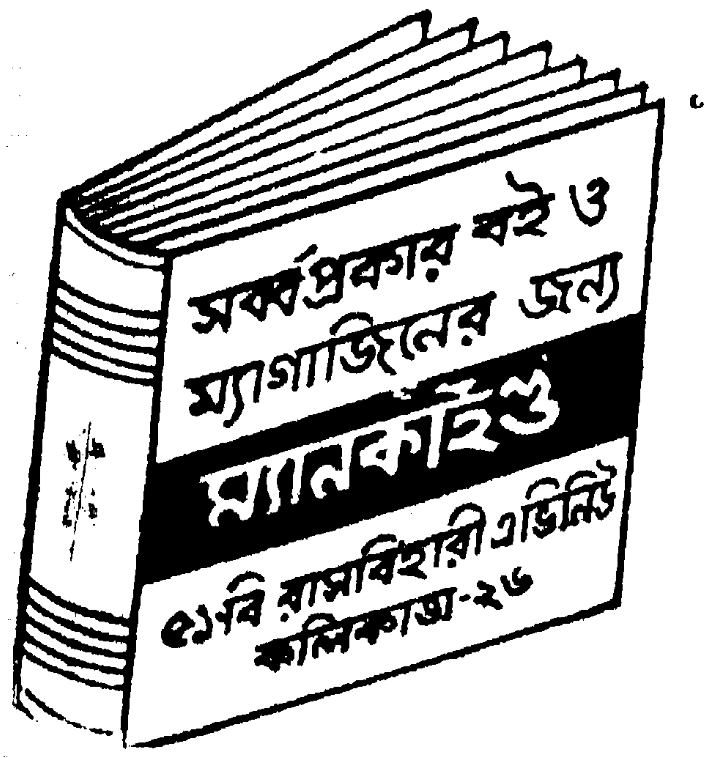

BUY THE BEST
HIGHLY APPRECIATED
SAMSAD ANGLO-BENGALI DICTIONARY
1672 PAGES • Rs 12·50 n.p.
SAHITYA SAMSAD
32-A, ACHARYA PRAFULLA CH. RD. • CAL-9

এবার পূজোর সেরা বই
স্বপনবুড়োর সফর ২৸৹
আর একখানা
ছড়া-ছবিতে সোনার ভারত ৩৷৹
এ. কে. সরকার এণ্ড কোং
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

ধবল বা শ্বেত

শরীরের যে কোন স্থানের সাদা দাগ, একজিমা, সোরাইসিস ও অন্যান্য কঠিন চর্মরোগ, গাত্রে উচ্চবর্ণের অসাড়যুক্ত দাগ, ফুলা, আঙ্গুলের বক্রতা ও দূষিত ক্ষত সেবনীয় ও বাহ্য দ্বারা দ্রুত নিরাময় করা হয়। আর পুনঃ প্রকাশ হয় না। সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ফোন: ৬৭-২৩৫৯। শাখা: ৩৬, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯। (পূরবী সিনেমার পাশে)।

...ছি, ছি এসব কি চিন্তা। দুর্ঘটনাই কপালে। না তা হতে দেবেন না। এই ছটা মাস খুব সাবধান হয়ে থাকবেন। ভিড়ে না, ট্রাম রাস্তা পার হবেন না। আস্ক মরণ দেখি। ধড়মড় করে উঠে বসলেন হিমাংশু। ঘামে সমস্ত শরীর জবজবে। কুঁজো থেকে জল গড়ালেন। খানিক খেলেন, বাকিটা চোখেমুখে, ঘাড়ে, কানের লতিতে ছিটোলেন।

আলো জেলে টেবিলের সামনে কলম নিয়ে বসলেন। পাঁচ, দশ, পনেরো মিনিট কেটে যাওয়ার পর খেয়াল হলো এক লাইনও লেখা হয় নি। গলা শুকিয়ে কাঠ। আর কোনও আশা নেই। শুধু সেকেন্ড মিনিট গুনে গুনে ওই দিনটার দিকে এগোন। এলার্ম ঘড়িটা ড্রয়ারে পুরে রাখলেন।

এক পাতাও লেখা এগোয় নি। জ্যোতিষীর কাছে না গেলে কি হতো। আফসোসে নিজের আঙুল কামড়াতে ইচ্ছে করছে।

দুপুরের খাওয়া। মুর্গীর ঠ্যাংটা ঝোলমাখানো আলুর সঙ্গে কাঁচের বাটিতে উঁচু হয়ে আছে। তাকিয়ে মনে হল, মুরগীটার মৃত্যুর জন্য কে দায়ী? আমি। তা নইলে আরো কিছুদিন খুদ খেয়ে বাঁচতে পারত ও। কিন্তু মানুষের বেলা? একি! নড়ে বসলেন হিমাংশু। ভাতে হাত দিতে দিতে ঠিক করলেন, দিন কয়েকের জন্যে বাইরে গেলে হয়। মিহিজামে এক বন্ধুর বাড়ি আছে। না, না। আজকাল তো কথায় কথায় ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। চলবে না। খাওয়া অর্ধেক সেরে উঠে পড়েছেন, মকবুল সব লক্ষ্য করছিল। হাঁ হাঁ করে ছুটে এল। 'ওকি, মাংস খেলেন না।' 'নারে, ভালো লাগছে না।'

'কম আঁচে রেঁধেছিলাম। একটু চেখে দেখলে হত না।'

'রাত্তিরে খাব। গরম করে রাখ।' মুখ ধুয়ে মনে হল, একটা জর্দা পান খেলে মন্দ হত না। দাঁত খারাপ হবার ভয়ে পান খেতেন না হিমাংশু।

'মোহিনী জর্দা দিয়ে একটা পান নিয়ে আসবি?'

'পান?' মকবুল অবাক হল। 'হ্যাঁরে। মুখটা তেতো লাগছে।'

'খান না। দিনে এক আধ খিলি পান খাওয়া তো ভাল। হজমির কাজ করে।'

'তুই-ও আবার ডাক্তারি শুরু করলি।'

পান চিবোতে চিবোতে ঝিমুনি ধরল। রাত্রে তো ভাল ঘুম আসে না। এরকম বেশীদিন হলে বাঁচা অসম্ভব। রাত্রে সব ফাঁকা। মকবুলটা ঘুমোয় বে-ওয়ারিশ লাশ।

বিকেল ছটায় ঘুম ভাঙলো। জানলা দরজা সব হাট করে খোলা। ধোঁয়ায় ঘরটা ভরে গেছে। এই সময় চারপাশের ফ্ল্যাটে উনুন ধরানো হয়। মশাও ঢুকেছে। উঠতে হলো।

এক কাপ চা চাই। গলা ভেজাতে হবে। আচ্ছা, আজ চা না খেয়ে অন্য কিছু হলে কেমন হত। কতদিন ওসব ছোঁন না। বছর তেরো-চোদ্দ হতে চলল। সেবার লিভারের ব্যথায় মর মর। ডাক্তার রসিকতা করে বলেছিল, 'হিমাংশুবাবু। একটু কমান। এরপর কেটে গেলে আর রক্ত বেরোবে না। শুধু হুইস্কি।' সব নেশা ছেড়ে দিলেন। এখন বেঁচে থাকার গ্যারাণ্টী কে দেবে। সব বোগাস। যেমন ডাক্তার তেমনি জ্যোতিষী।

না আজ খেতেই হবে। মরব তো একদিন, এমন পুতুপুতু করে বেঁচে লাভ কি। জামাকাপড় পরে ড্রয়ার থেকে খানসাতেক দশটাকার নোট পকেটে নিলেন। বারে নয় বাড়িতে। মকবুলকে সিনেমা দেখার পয়সা দিয়ে ভাগিয়ে দিলে হবে।

এদিক ওদিক তাকিয়ে ওয়াইন শপে ঢুকলেন। পুরোন দোকান। 'দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান লিকার শপ।' উনিশ শ সাতাশ সালে স্থাপিত। মালিক হরেন শা চেনা লোক। সে নেই। আরেকটি ছোকরা, কাল চোয়াড়ে চেহারা, ছুঁচলো গোঁফ। চোখে রিমলেস চশমাটা মানাচ্ছে না।

হিমাংশুকে দেখে নমস্কার করল ছোকরা। হিমাংশু অবাক হয়ে গেলেন। 'বসুন।' কথা না বলে বসলেন। 'তারপর। কি দেবো বলুন।'

মুখের দিকে তাকিয়ে গলার আওয়াজের সঙ্গে মেলাতে চেষ্টা করলেন। অবিকল একরকম, হরেন-ও এমনি করে খাতির করত। সিগারেট এগিয়ে গলা নামিয়ে বলত—'সেনবাবু। নতুন একটা স্কচ এনেছি। ফোর রোজেস। আশি পার্সেণ্ট প্রুফ। জিভে ঢেলে দেখুন মধুর মত স্বাদ।'

হিমাংশুকে চুপ করে থাকতে দেখে ছেলেটি আবার বলল, 'কি দেবো? ফরেন না দিশি?'

হিমাংশু মনে করার চেষ্টা করছেন, কি ব্র্যাণ্ড খেতেন তখন, হেনেসীর ব্র্যাণ্ডি। কনিয়াক বিস্কুট তারপর। ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট হুইস্কি।

'ইণ্ডিয়ানও খারাপ হবে না। সিমলায় ডিস্টিল—খেয়ে দেখুন।'

'ফরেন কি দাম চলছে?'

'কনিয়াক বত্রিশ, স্কচ পঞ্চান্ন।'

'গলাকাটা!' হিমাংশু বলে ফেললেন।

'কি করি স্যার। না ইমপোর্ট ডিউটি ধরছে। ব্যবসা ট্যাবসা তুলে দিতে হবে দেখছি।'

হাসলেন হিমাংশু। কত বা বয়েস। এরই মধ্যে কেমন ব্যবসাদারী বুলি রপ্ত

করে ফেলেছে। একটা কিছু কিনতে হয়।

'আচ্ছা। ক্যারেবিয়ান রাম পাওয়া যাচ্ছে?'

'পাবেন বৈকি। সাড়ে উনত্রিশ। পুরনো খদ্দের বলে। নইলে বাত্রিশে বেচি।'

'বুঝলে কি করে পুরনো'...

ছেলেটি বোতল প্যাক করতে শুরু করে দিয়েছে। 'সে আমরা মুখ দেখেই বুঝতে পারি স্যার।' অল্প হাসল। দাঁতের ভিতরটা কুমড়ো বিচির মত হলদে। পাশে আবার পানের কালচে পুরনো রক্তের মত দাগ। ছোকরা খায়।

তিনখানা দশটাকার নোট এগিয়ে দিলেন। ছেলেটি থুথু দিয়ে বারকয়েক কচলাল। হাত বাড়িয়ে দুটো সিকি ফেরত নিলেন। পাঞ্জাবির বাঁ পকেটে বোতলটা পুরলেন। রাস্তায় হাঁটতে অসুবিধে হবে। পকেটটা এত ঝুলে রয়েছে। কেউ দেখছে না ত? পকেট চেপে ধরে এগোতে লাগলেন। গলা দিয়ে একটা তালভাঙা গান বেরোতে চাইছে।

রাত সাড়ে ন'টা। খাবার টেবিলে মুরগীর ঝোল আর রুটি সাজিয়ে রেখে সিনেমায় গেছে মকবুল। নাইট শো ভাঙবে সাড়ে এগারোটায়। তার আগেই সব শেষ করা দরকার। সোডা নেই। জোয়ান বয়সের কথা মনে পড়ল। নির্জলা কে কত খেতে পারে তার প্রতিযোগিতা। হিমাংশু বেশী পারতনে না। একটুতেই নেশা ধরে যেত।

সাবধানে সিল করা ছিপি খুললেন। নাকে গন্ধ নিলেন। আঃ কী মিষ্টি। কতকাল এই জিনিস ভুলে ছিলেন। সারা ঘরে পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জের চোলাই-এর ঝাঁঝ ছড়িয়ে পড়ল। গ্লাসটা ভরে আলোর সামনে তুলে ধরলেন। এপার ওপার সব রঙিন হয়ে গেছে। বাটির ঢাকনা খুলে এক টুকরো মাংস চুষলেন। মন্দ রাঁধেনি। তবে আরেকটু ঝাল হলে জমত ভাল। এক চুমুক গলায় ঢাললেন। একটু কড়া, তা হোক। শীতকালের রাত, ঠিক মানিয়ে যাবে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে বোতল কাবার করে গর্বভরে তাকালেন খালি বোতলটার দিকে। মাংস খাওয়া হল না। পড়ে আছে। বোতলটা সরিয়ে ফেলা দরকার।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মাথাটা ভার ভার। তেমন কিছু নয়। আলোটা একটু কমে এসেছে মাত্র। সুইচটা একবার নিভিয়ে আবার জ্বালালেন। এঁকি, আরো কমে গেল যে, টেবিলের সামনে চেয়ার টেনে বসলেন। কলম হাতে ধরেছেন। কি একটা কথা লেখার চেষ্টা করলেন, আবছা, হিজিবিজি।

মিনুর নাতিটা এখন লাফিয়ে ট্রামে ওঠে। ভরা সংসার, ছেলেপুলে। একটা তেতো ঢেকুর গলায় পাক দিল। বাম করতে পারলে ভাল হত।

মা থাকলে বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিত। একবার মার সঙ্গে সে কি ঝগড়া। ক্লাস ফাইভে না সিক্সে পড়তেন। একটা ময়না পুষেছিলেন।

'দিন রাত নোংরা ছড়ায়। ছাতু কিনে আরা পারি নে। দেবো একদিন গলা টিপে।' ইস্কুল থেকে ফিরে খিদের মাথায় মেজাজ চড়ে গেল। 'খবর্দার, আমার ময়নার গায়ে হাত দেবে না'। 'ওঃ এইটুকু ছেলের মুখ কত...আমার ওপরে চোটপাট। দাঁড়া উনি আজ ফিরুন।'

বাবার আর কিছু মনে নেই। স্পষ্ট খড়মপেটার কথা। কত যে কালশিরে পড়েছিল গায়ে পিঠে। ভোরবেলা জ্বর গায়ে নিয়ে ধানখেতের পাশে গেলেন। তখনও রোদ ওঠে নি। খাঁচার দরজা খুলে দিলেন। পরে রাগ পড়লে কত খুঁজেছেন। কারো বাড়ির ময়না দেখলে চমকে উঠতেন। চেনা মুশকিল। সব পাখিকেই যে এক-রকম দেখায়।

ওকি জানলার কাছে? পাখি না! চমকে উঠলেন। ময়না, কিন্তু পাখিরা কি এতদিন বাঁচে। হয়ত বাঁচে কিংবা মরে ভূত হয়ে এসেছে। বিছানা ছেড়ে টলতে টলতে এগিয়ে এলেন জানলার কাছে। পাখিটা ওড়ে নি, কাছে যেতেই কিঁচিরমিচির কি সব বলল। আশ্চর্য, মানেও বোঝা যাচ্ছে। 'ছাদের ওপরে এস, তোমার মা-বাবা ডাকছেন।'

'কেন?'

'মিনুর সঙ্গে তোমার বিয়ে' যে।' পাখিটা উড়তে উড়তে বলল, 'চলে এস।' মিনু? ও আবার কোত্থেকে এল। বাবা-মা কবে মরে ভূত হয়ে গেছে। কিন্তু। পাখিটার মিথ্যে কথা বলে লাভ কি। ভীষণ অবাক লাগছে। মিনুর তাহলে বিয়ে হয় নি।

কোঁচাটা লুটোচ্ছে। গায়ের পাঞ্জাবি খোলা হয়নি। দেয়াল ধরে ধরে ঘর পেরোলেন। ছাদে ওঠার এজমালি সিঁড়ি। এক-একটা করে ধাপ পেরিয়ে ছাদের ঠাণ্ডা হাওয়ায়।

মা বাবা কই? মাথা ঘুরোতেই নজরে এল। চিলে কুঠুরির ওপরে গঙ্গাজলের ট্যাংক। তার পাশে একটা নারকোল গাছ। পেছনে দুটো তারা। একটু পাশেই দাঁড়িয়ে মা, বাবা। গা ঘেঁষে মিনু। কাঁটা দিল গায়ে। জামরঙের বেনারসী।

'খোকন চলে আয় বাবা। তোর বিয়েটা না দিয়ে মরব কি করে?' অদ্ভুত ব্যাপার। বুড়ো মাকে এতকাল বসিয়ে রেখেছেন। 'কিন্তু ওখানে যাই কি করে'...

'কেন ওপরের ছাদে আয়। সেখান থেকে'—

'তাইত। একথা ত মনে হয় নি।' সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। ভাঙা নড়বড়ে সিঁড়িটায় চাপলেন। হাঁফিয়ে পড়লেন, ভারি শরীর।

একেবারে উঁচু ছাদে উঠে চারিদিকে তাকালেন। কিছু নজরে এল না। শুধু নারকেল গাছের পিছনে মিনুর হাত ধরে মা। এইবার ওড়ার পালা। মা বললেন, খুব সাবধানে আসিস। নারকোল গাছে বেধে যাস নি যেন।'

হিমাংশু একটু ইতস্তত করলেন। তারপর নিজের হাত দুটোকে দুপাশে ছড়িয়ে বাজপাখি হলেন। উড়লেনও। কিন্তু হাত পা ছড়ে যেতে লাগল। নারকোল গাছটার গা বড় এবড়োখেবড়ো, ভীষণ কষ্ট হল।

অবধূতের সর্বাধুনিক উপন্যাস

দেবারিগণ

দ্বিতীয় মুদ্রণ
—সাড়ে চার টাকা—

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
সীমান্তরেখা ৩॥০
সমারোহ ২৸০

আশাপূর্ণা দেবীর
স্বপ্নশর্বরী
— তিন টাকা —

বিভূতি বন্দ্যোঃ'র
কণভঙ্গুর
— ন' সিকা —

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
মহুয়া কথা ৩॥০

প্রবোধকুমার সান্যালের
নদ ও নদী ৫, মল্লিকা ২,

গজেন্দ্র মিত্র, বিমল মিত্র, বিমল কর প্রভৃতির সম্মিলিত লেখনীর সৃষ্টি

উন্মেষ সাড়ে তিন টাকা

গুপ্ত প্রকাশিকা : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কালকাতা ১২

স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার জন্যে সুন্দর জিনিস

কাজে ভালো অথচ দাম বেশী নয় ব'লে ন্যাশনাল-একো রেডিও এবং ক্লীয়ারটোন সরঞ্জাম বিখ্যাত। আর তা-ও এত হরেক রকমের পাওয়া যায় যে আপনি মনের মতো জিনিসটি বেছে নিতে পারবেন!

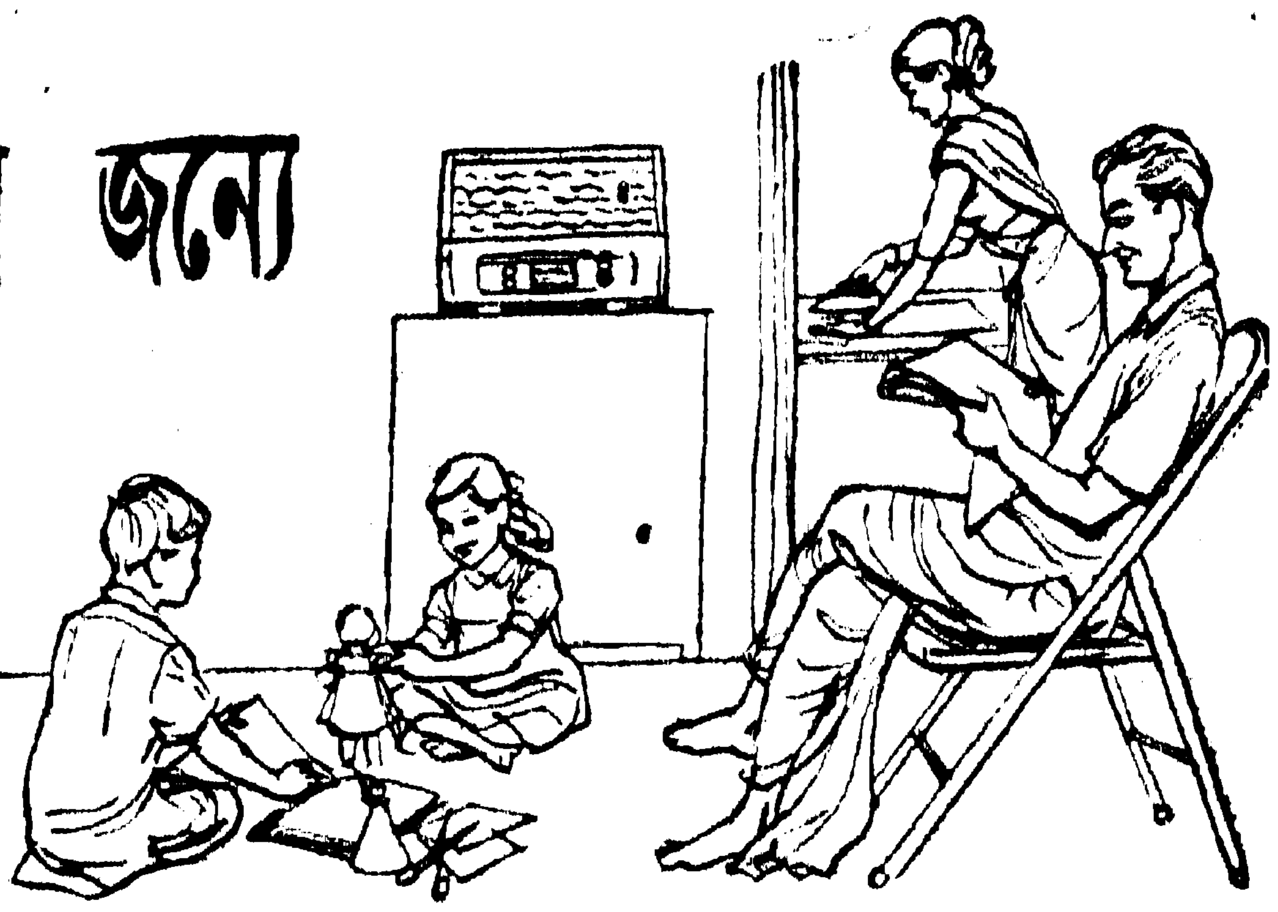

ন্যাশনাল-একো রেডিও

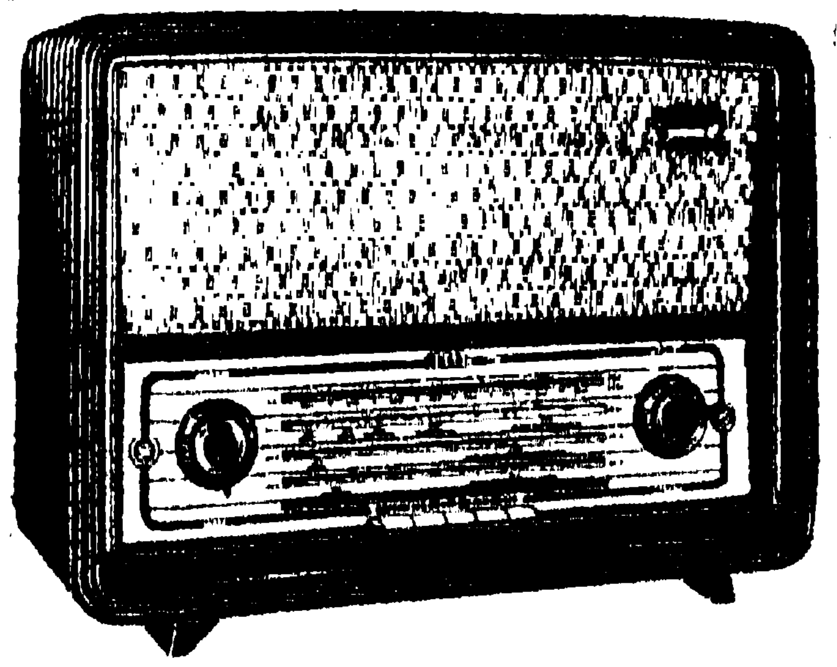

ন্যাশনাল-একো মডেল এ-৭৪৪ : ৬ নোভাল ভালব, ৯ ফাংশান, ৪ ব্যাণ্ড এসি রেডিও, মনোরম মোল্ডেড কেবিনেট, পিয়ানো-কী ব্যাণ্ড সিলেকশান, টেপ রেকর্ডারের বিশেষ ব্যবস্থা। 'মনসুনাইজ্‌ড'।

দাম ৪১৫, নীট

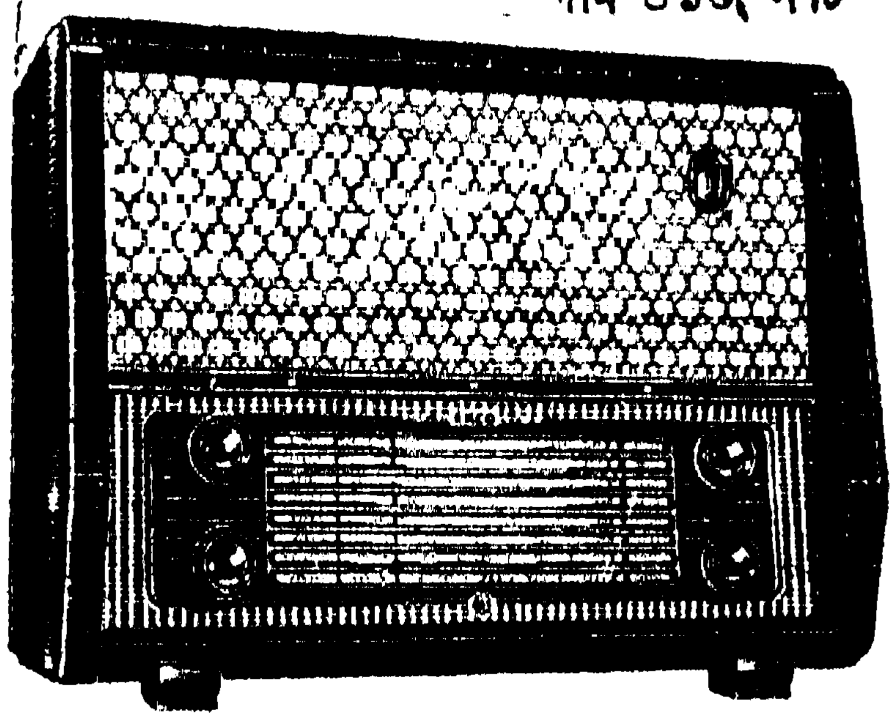

ন্যাশনাল-একো মডেল এ-৭৩১ : এসি। 'নিউ প্রমুখ' ৭ ভালভ, ৮ ব্যাণ্ড। এর শব্দগ্রহণশক্তি অসামান্য। স্বরনিয়ন্ত্রিত আর-এফ- স্টেজ সংযুক্ত, এছাড়া এক্সটেনশন স্পীকার ও গ্রামোফোন পিক্-আপের বন্দোবস্ত আছে। 'মনসুনাইজড'

দাম ৬২৫, নীট

Kleertone ক্লীয়ারটোন বাতি ও সরঞ্জাম

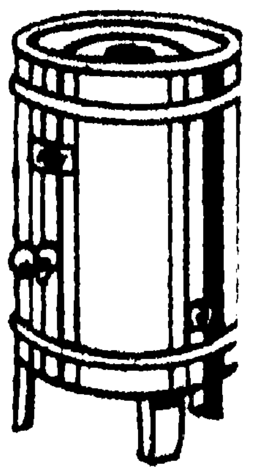

ক্লীয়ারটোন ওয়াটার বয়লার—সঙ্গে সঙ্গে গরম বা ফুটন্ত জল পাওয়া যায়। সাইজ : ৩.৫ ও ৮ গ্যালন। এসিতে চলে।

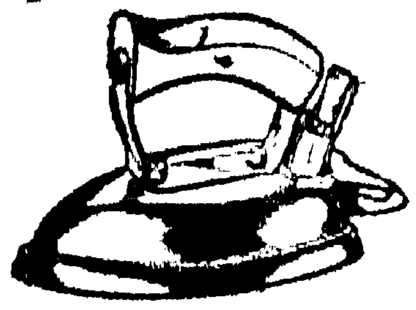

ক্লীয়ারটোন ঘরোয়া ইস্ত্রি

ওজন ৭ পাউণ্ড; ২৩০ ভোল্ট, ৪৫০ ওয়াট; এসি/ডিসি। ব্যাকালাইটের হাতল।

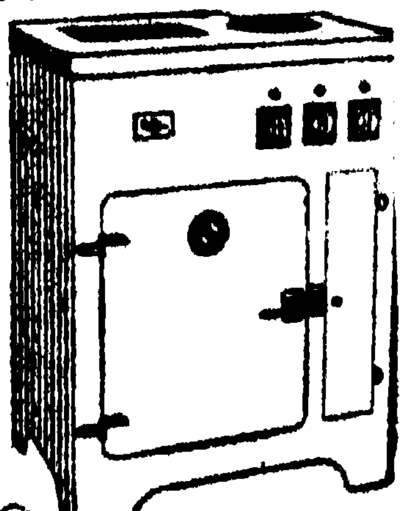

ক্লীয়ারটোন কুকিং রেঞ্জ

ছুটো হট্‌প্লেট ও উনুন আছে—প্রত্যেকের আলাদা কণ্ট্রোল। সর্বোচ্চ লোড ৫,৫০০ ওয়াট।

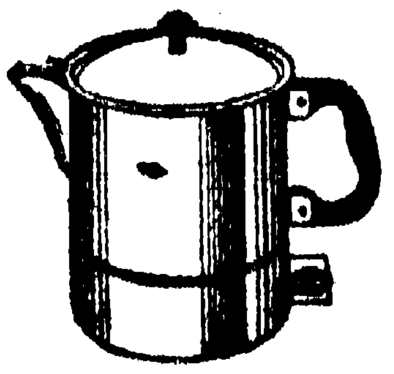

ক্লীয়ারটোন বৈদ্যুতিক কেট্‌লি

৩ পাইট জল ধরে; ক্রোমিয়ম কলাই করা। ২৩০ ভোল্ট, ৭৫০ ওয়াট। এসি/ডিসি।

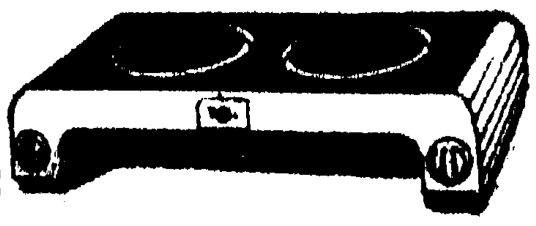

ক্লীয়ারটোন টুইন্ হট্ প্লেট

রান্নার জন্য। প্রতি প্লেটের আলাদা কণ্ট্রোল। ২৩০ ভোল্ট—এসি/ডিসি। সর্বোচ্চ লোড ৩.৫০০ ওয়াট।

ক্লীয়ারটোন ফোল্ডিং স্টীল চেয়ার ও টেবিল

নানা রঙের পাওয়া যায়। আরামের দিকে লক্ষ্য রেখে তৈরী। গদি মোড়া কিংবা গদি ছাড়া পাওয়া যায়।

GRA

জেনারেল রেডিও অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেজ প্রাইভেট লিমিটেড

৩, ম্যাডান স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ • অপেরা হাউস, বোম্বাই-৪ • ১।১৮, মাউণ্ট রোড, মাদ্রাজ-২ • ফ্রেজার রোড, পাটনা • ৩৬।৭৯, সিলভার জুবিলী পার্ক রোড, বাঙ্গালোর • যোগধিয়ান কলোনি, চাঁদনি চক, দিল্লী • রাষ্ট্রপতি রোড, সেকেন্দরাবাদ

LWTGRA 311

শবনম্

সৈয়দ মুজতবা আলী

GOVERNMENT LIBRARY

আমি বললুম, 'অদ্ভুত, সে-ও আশ্চর্য'! মনে আছে, মাসখানেক আগে সখী এসেছিল শবনমের। ওর সঙ্গে দমকা হাওয়ার মত এল শবনমের আতরের গন্ধ। কোলাপুরের না কোথা থেকে শবনম আনিয়েছিল সে এক অজানা আতর, তারই খানিকটা দিয়ে দিয়েছিল তার সখীকে—মা একদিন ওইটে মেখে এসেছিল আমার—আমাদের—না, আমাদের সকলের বাড়িতে আমাদের প্রথম বিয়ের দিনে—'

'সে কী?'

অজানতে বলে ফেলেছি। ভালই করেছি। আরও আগেই বলা উচিত ছিল।

কী আনন্দ আর পরিতৃপ্তির সঙ্গে বৃদ্ধ যোগী শুনলেন আমাদের বিয়ের কাহিনী! হাসবেন, না কাঁদবেন, কিছুই যেন ঠিক করতে পারছেন না। খানাতে দোম্বা না মুর্গীর বিরয়ানী ছিল, সেও তার শোনা চাই, তোপলের স্ত্রীধন নিয়ে আহাম্মুখির কথা ভাল করে জানা চাই। এক কথা দশবার শুনেও তাঁর মন ভরে না। আর বার বার বলেন, 'ওই তো আমার শবনম। কী যে বল, গওহর শাদ, কোথায় নূরজাহান!'

॥ সাত ॥

অনেকক্ষণ যেন ধ্যানে মগ্ন থেকে আমাকে শুধালেন, 'তুমি পেয়েছ? কী পেয়েছ?'

'সে কি আমি নিজেই ভাল করে বুঝতে পেরেছি যে, আপনাকে বুঝিয়ে বলব। এর সাধনা তো আমৃত্যু কিংবা হয়তো মৃত্যুর পরক্ষণেই বুঝব এতদিন শুধু বইয়ের মলাটখানাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছি বইটার নাম পড়েই ভেবেছি ওর বিষয়বস্তু আমার জানা হয়ে গিয়েছে, তখন দেখব, এতদিন কিছুই বুঝতে পারিনি। শবনমই আমাকে একদিন বলেছিল, সামান্য একটু আলাদা জিনিস—

"গোড়া আর শেষ, এই সৃষ্টির
জানা আছে, বল কার?
প্রাচীন এ পুঁথি, গোড়া আর শেষ
পাতা ক'টি ঝরা তার!"

হিরণ্ময় পাত্রের দিকে তাকিয়েই মুগ্ধ হৃদয়ে কেটে গিয়েছে সমস্ত জীবন—ওর ভিতরকার সত্যটি দেখতে পাইনি। বিকল-বুদ্ধি শিশুর মত এতদিন চুষেছি চুষিকাঠি—এইবারে পেলুম মাতৃস্তন্যের অনাদি অতীত প্রবহমান সুধা-ধারা। সেই যে শিশুহারা মা তার বাচ্চাকে কাঁদতে কাঁদতে খুঁজেছিল আকাশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি—চলার পথে যে ঝরে পড়েছিল তার মাতৃস্তন্যরস, তাই দিয়েই তো দেবতারা তৈরি করলেন মিলকিওয়ে—আকাশগঙ্গার ছায়াপথ।

এ জীবনেই তো পৌঁছই নি পাহাড়-চুড়োয় যেখান থেকে উপত্যকার পানে তাকিয়ে বলতে পারব, এই যে উপত্যকার কাঁটাবন খানাখন্দ, কাদা-পাথর সাপ-জোঁকে ক্ষতবিক্ষত চরণে এখানে এসে পৌঁচেছি- এই উপত্যকাই কত সুন্দর দেখায় গিরিবাসীদের কাছে, যারা কখনও উপত্যকায় নামেনি—আমি কিছুটা উপরে এসেছি মাত্র, আর এর মধ্যেই কাঁটাবনকে নর্মকুঞ্জ বলে মনে হচ্ছে, কাদা-ভরা খালকে প্রাণদায়িনী স্রোতস্বিনী বলে মনে হচ্ছে। গিরিশিখরে পৌঁছলে সমস্ত ভুবন মধুময় বলে মনে হবে, এই আশা ধরি।

জানেমন স্মিতহাস্যে বললেন, 'বুঝেছি, কিন্তু এইটুকুই পেলে কী করে?'

শারদীয় ফসল
মহালয়ার আগে প্রকাশিত হবে
দাম দেড় টাকা
এজেন্সীর জন্য যোগাযোগ করুন
৩৭ কার্তিক স্কুল লেন,
সালকিয়া—হাওড়া

গ্রীষ্ম দিনে-ও
স্নিগ্ধ সজীবতা

গ্রীষ্মের খরতাপে ক্লেদাক্ত আবহাওয়ায় আপনি যখন বিব্রত তখন আপনার একান্ত প্রয়োজন বোরোলীনের মতো মিষ্টি আর স্নিগ্ধ ফেস্ ক্রীম। ল্যানোলিন-যুক্ত বোরোলীন ত্বকের গভীরের সমস্ত মালিন্য দূর ক'রে আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য বাড়িয়ে আপনার ত্বক-কে স্নিগ্ধ ও সজীব ক'রে তুলবে।

বোরোলীন
পরম প্রসাধন

প্রস্তুতকারক:
জি, ডি, ফার্মাসিউটিকালস্ প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৩

adarts-68

কতদিন হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখনও তাঁর পরম মুখরোচক মজলিশের জলুস—আমাদের এই প্রথম বিয়ের কাহিনী।

শেষটায় শেষ প্রশ্ন শুধালেন, 'আচ্ছা, বিয়ের পর তোমাতে ওতে যখন প্রথম একলা-একলি হলে তখন সে প্রসন্ন হাসি হাসলে, না কাঁদলে?'

আমার লজ্জা পাচ্ছিল, বললুম, 'কাঁদলে।'

'জানতুম, জানতুম। আমারই স্মরণে কেঁদেছিল।' এবারে মুখে পরিতৃপ্তির উপর বিজয়-হাস্য। বললেন, 'এইটুকুনই জানতে চেয়েছিলুম। এইবারে বল, তোমার সেই আতরের কথা।'

'চেনা দিনের ভোলা গন্ধের আচমকা চড় খেয়েছিলুম, সেদিন। এর পূর্বে আমি জানতুম না, স্মৃতির অন্ধকার ঘরে সুগন্ধ আলোর চেয়েও সতেজ হয়ে মানুষকে কতখানি অভিভূত করতে পারে। আমি অনেকখানি মুহ্যমান হয়ে ওই সুবাস-বন্যায় যেন ভেসে চলে গিয়েছিলুম।

HBS-19-X52 BQ

ইরাসমিক লণ্ডনের পক্ষে, ভারতে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের তৈরী

আপনাদের মধ্যে নিশ্চয়ই প্রীতিসম্ভাষণ দান-প্রদান হয়েছিল—আমি কিছুই শুনতে পাইনি।

এইখানেই আরম্ভ।

শবনম একদিন আমায় শুধিয়েছিল, 'যখন সব সান্ত্বনার পথ বন্ধ হয়ে যায়, তখন হৃদয় হঠাৎ এক আনন্দলোকের সন্ধান পায়'—এটা আমি জানি, কি না? আমি উত্তর দেবার সুযোগ পাইনি। আমাদের যে কবির এদেশে আসার কথা ছিল, তিনি ছন্দে বলেছেন,

"দুঃখ, তব যন্ত্রণায় যে দুর্দিনে চিত্ত উঠে ভরি,
দেহে মনে চতুর্দিকে তোমার প্রহরী
রোধ করে বাহিরের সান্ত্বনার দ্বার,
সেই ক্ষণে প্রাণ আপনার
নিগূঢ় ভাণ্ডার হতে গভীর সান্ত্বনা
বাহির করিয়া আনে; অমৃতের কণা
গ'লে আসে অশ্রুজলে;
সে আনন্দ দেখা দেয় অন্তরের তলে
যে আপন পরিপূর্ণতার
আপন করিয়া লয় দুঃখবেদনার।"

সঙ্গে সঙ্গে এক অবর্ণনীয় আনন্দ-মাধুরিমা আমার সর্বদেহ মনে ব্যাপ্ত করে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে গেল, পরীক্ষা পাসের জন্য মুখস্থ-করা বিদ্যের একটা অংশ—সেটা তখন বুঝিনি, এখন সুগন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সেটা জ্বলজ্বল করে চোখের সামনে ভেসে উঠল।

রাজপুত্র দারা শীকুহ্-কৃত উপনিষদের ফার্সী অনুবাদ তো আপনি পড়েছেন, কিন্তু সব উপনিষৎ অনুবাদ করেন নি বলে বলতে পারব না বৃহদারণ্যক তাতে আছে কি না। তারই এক জায়গায় আমাদের দেশের এক দার্শনিক রাজা জনক গেছেন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে। ঋষিকে শুধালেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, মানুষের জ্যোতি কী—অর্থাৎ তার বেঁচে থাকা, তার কাজকর্ম ঘোরাফেরা করা কিসের সাহায্যে হয়—কিংজ্যোতিরয়ং-পুরুষ?"

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, "সূর্য।"

জনক শুধালেন, "সূর্য অস্ত গেলে?—অস্তমিত আদিত্যে?"

"চন্দ্রমা।"

"সূর্য চন্দ্র উভয়েই অস্ত গেলে—অস্তমিত আদিত্যে, যাজ্ঞবল্ক্য, চন্দ্রমস্যস্তমিতে কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ?"

"অগ্নি।"

"অগ্নিও যখন নির্বাপিত হয়?"

"বাক্—ধ্বনি। তাই যখন অন্ধকারে সে নিজের হাত পর্যন্ত ঠাহর করে দেখতে পায় না, তখন যেখান থেকে কোন শব্দ আসে, মানুষ সেখানে উপনীত হয়।"

এইবারে শেষ প্রশ্ন।

জনক শুধালেন, "সূর্য চন্দ্র গেছে আগুন নিবেছে নৈঃশব্দ্য বিরাজমান তখন পুরুষের জ্যোতি কী?" সংস্কৃতটি আর্য সুন্দর, পদ্য হলে বেশ কবিতা। "অস্তমিত আদিত্যে, যাজ্ঞবল্ক্য, চন্দ্রমস্যস্তমিতে, শান্তেঽগ্নৌ, শান্তায়াং বাচি, কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ।"

যাজ্ঞবল্ক্য শেষ উত্তর দিলেন, "আত্মা।"

আমাদের কবির ভাষায় 'অন্তরের অন্তরতম পরিপূর্ণ আনন্দকণা।' আরবী ফারসী উর্দুতে যাকে আমরা বলি 'রূহ্'। এ সব তো আপনি ভাল করেই জানেন।

আমার ধোঁকা লাগল অন্যখানে। যাজ্ঞবল্ক্য যখন চেনা জিনিস সূর্য থেকে আরম্ভ করে জনককে অজানা আত্মাতে নিয়ে যাচ্ছেন তখন 'অগ্নি'কে জ্যোতি বলার পর তিনি 'গন্ধ'কে মানুষের জ্যোতি বললেন না কেন? গন্ধ তো 'শব্দে'র চেয়ে অনেক বেশী দূরগামী। কোথায় রামগিরি আর কোথায় অলকা—কোথায় নাগপুর আর কোথায় কৈলাস—সেই রামগিরিশিখরে দাঁড়িয়ে বিরহী যক্ষ দক্ষিণগামী বাতাসকে আলিঙ্গন করেছিলেন, সেই বাতাকে হিমালয়ের দেবদারু গাছের গন্ধ পেয়ে ভেবেছিলেন, হয়তো এই বাতাসই তাঁর অলকাবাসী প্রিয়াঙ্গের সর্বাঙ্গ চুম্বন করে এসেছে;

"হয়ত তোমারে সে পরশ করি' আসে,
হে প্রিয়া মনে মনে ভাবিয়া তাই
সকল অঙ্গেতে সে বায়ু মাখি লয়ে
পরশ তব যেন তাহাতে পাই।"

ফার্সী এবং সংস্কৃত ছন্দে প্রচুর মিল আছে। জানেমন তাই আমাকে একাধিকবার মূল সংস্কৃতটা আবৃত্তি করতে বললেন।

ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিশলয়পুটান্ দেবদারুদ্রুমাণাং
যে তৎক্ষীরস্রুতিসুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ।
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ
পূর্বং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি।

আমি ভেবেছিলুম, এই খেই ধরে কাব্যালোচনাই চলবে, কিন্তু জানেমনই বললেন, 'গন্ধের কথা বলছিলে।'

আমি বললুম, 'জী। আর যক্ষের সুবাসানুরাগ না হয় কবিত্ব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু আমি এমন গন্ধকাতর লোক দেখেছি, যে বেহারে দক্ষিণমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে বাতাসের গন্ধ নিতে নিতে আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে বাতাসে বাংলা সাগরের নোনা গন্ধস্পর্শ। এটা কল্পনা নয়।

তা সে যা-ই হোক, ঋষি গন্ধকে জ্যোতি-

নিজে পড়বার এবং উপহার দেবার মত কয়েকখানা বই

সাহিত্যের সমস্যা—নারায়ণ চৌধুরী	৩·০০
ইয়োরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা ডাঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য	৪·০০
ভারতের মুক্তিসন্ধানী—যোগেশচন্দ্র বাগল	৫·০০
উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য—ত্রিপুরাশঙ্কর সেন	৫·০০
গ্রহ থেকে গ্রহে—স্তার্ণফেল্দ	১·৫০
স্মৃতি চিত্র—ম্যাক্সিম গর্কি	৪·০০
ছেড়ে আসা গ্রাম (২য় খণ্ড)—দক্ষিণারঞ্জন বসু	৩·৫০
গীতিমুখর ভিয়েনা—শেফালি নন্দী	২·০০

পপুলার লাইব্রেরী
১৯৫।১বি কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

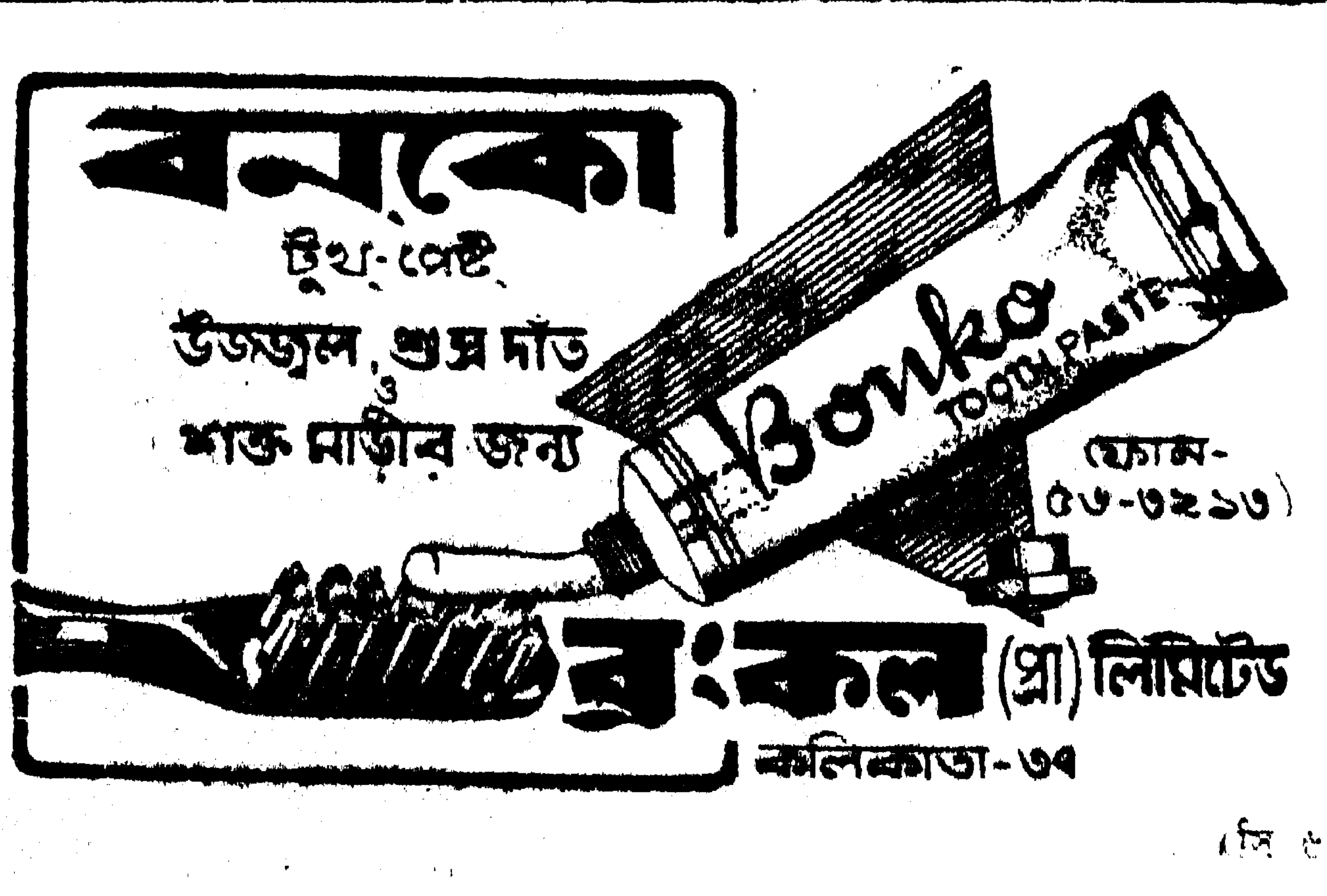

(সি ৫৮৩২)

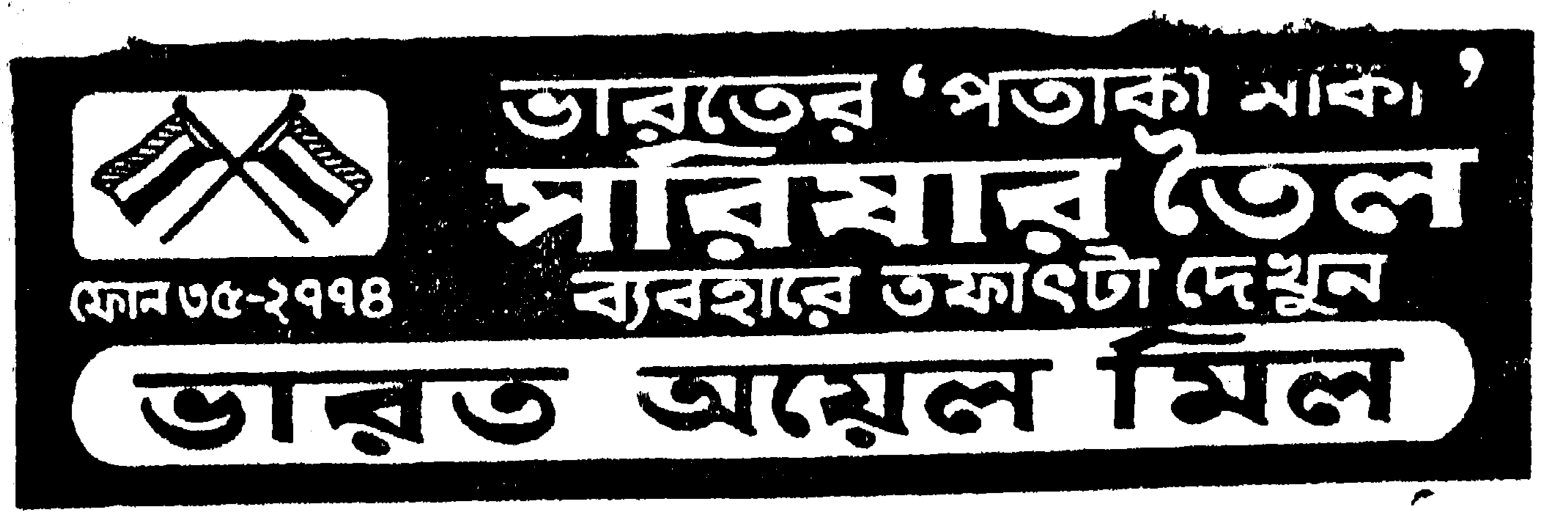

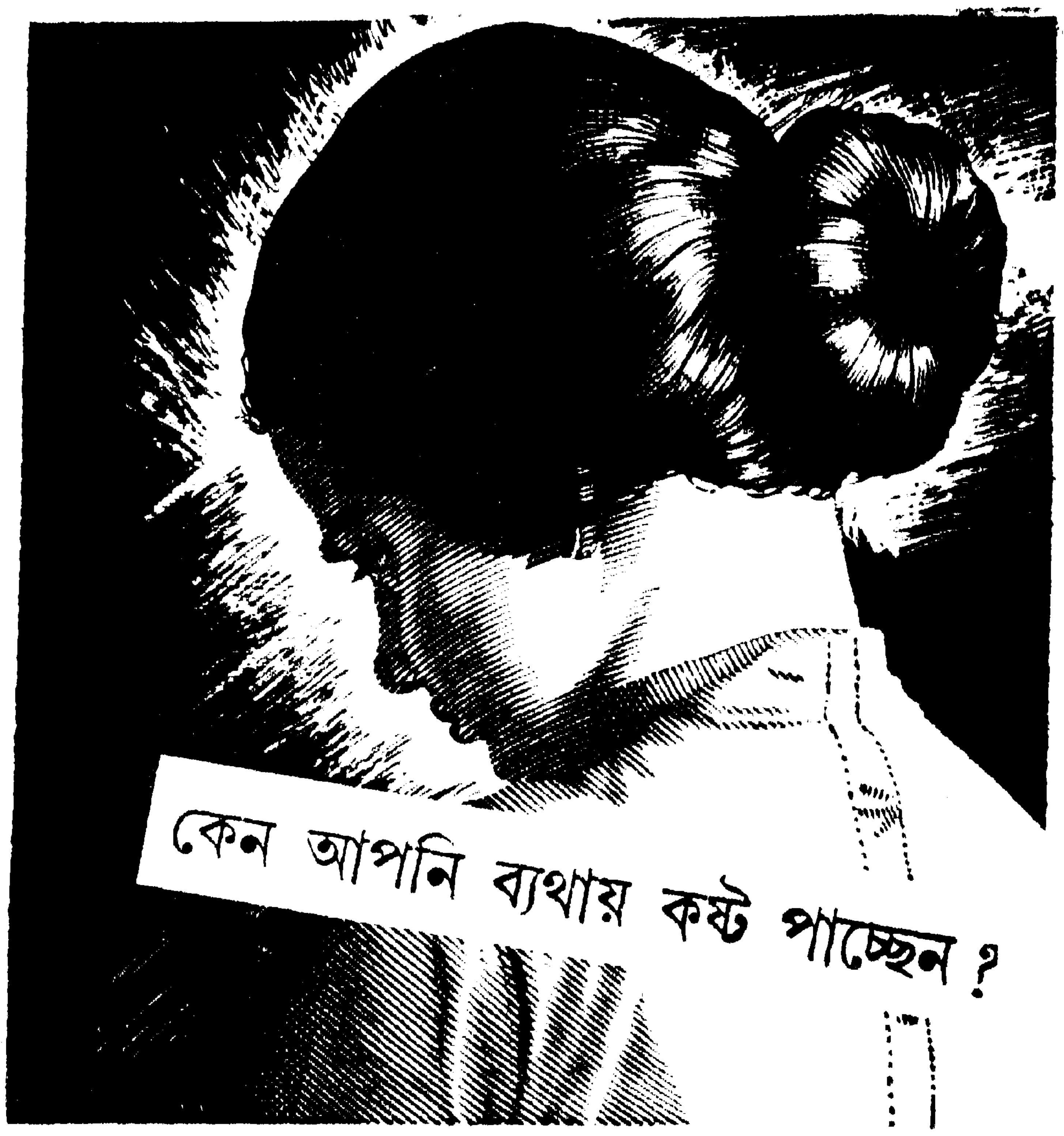

সারিডন খেলেই তো তাড়াতাড়ি ও নিরাপদে ব্যথা দূর হয়!

ব্যথাবেদনায় আর কষ্ট পেতে যাবেন না— সারিডন আপনার অস্বস্তিকর দিনগুলোয় ব্যথাবেদনার দ্রুত উপশম এনে দেবে।

সারিডন-এ অনিষ্টকর কোন কিছু নেই, এতে হার্টের কোন ক্ষতি বা হজমের কোন গোলমাল হয় না। তার ওপর বিশেষ উপাদানে তৈরি ব'লে সারিডন আশ্চর্যরকম তিনটি কাজ দেয়—এতে যন্ত্রণায় উপশম হয়, মনের স্বাচ্ছন্দ্য আসে ও শরীর ঝরঝরে লাগে।

মাথা-ধরা, গা-ব্যথা, দাঁতের যন্ত্রণা এবং সাধারণ ব্যথা বেদনায়, তাড়াতাড়ি আরাম পেতে হ'লে সারিডন খান...সারিডন নিরাপদ বেদনা-উপশমকারী।

★ সারিডন স্বাস্থ্যসম্মত মোড়কে থাকে, হাতে ধরা হয় না।
★ সারিডন একটি ট্যাবলেটের দাম মাত্র বারো নয়া পয়সা।
★ একটি সারিডন-ই প্রায় ক্ষেত্রে পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে পুরো এক মাত্রা।

একটিই যথেষ্ট
একটি ট্যাবলেট ১২ নঃ পঃ

একমাত্র পরিবেশক:
ভলটাস লিমিটেড

IWT. VT 89

রূপে বাক্যের চেয়ে ন্যূনতর মনে করেছেন, কারণ শব্দের সাহায্যে আমরা অন্ধকারে যে দিগ্‌দর্শন পেয়ে উৎপত্তিস্থলে পৌঁছতে পারি সুবাস দিয়ে অতখানি পারি নে, কিংবা হয়তো স্বীকার করেও সংক্ষেপ করেছেন—যেমন স্পর্শের কথাও বলেন নি।

কিন্তু আসল কথা এই একটুখানি সৌরভেই আমি যদি মুহ্যমান, অভিভূত হয়ে যাই তবে তার পরের সোপান এবং সেটা তো সোপান নয়, সে তো মঞ্জিল সে তো সাগরসংগম, সেই তো আত্মন—সে তো দূরে নয়, কঠিন নয়। সেই তো একমাত্র অনির্বাণ জ্যোতি, সেই তো নূর, ব্রহ্ম। সেই আলোতেই আমি অহরহ শব্‌নম্‌কে দেখতে পাব। সূর্যচন্দ্র যখন অস্তমিত, অগ্নি যখন শান্ত তখন যদি শব্‌নম নূরভিবাস দিয়ে আমাকে পাঞ্চেন্দ্রিয়াতীত করে দিতে পারে তবে আর এইটুকুতে নিরাশ হবার কিছু নেই। বিশ্বাস করা কঠিন, তখন সে জ্যোতি আমি পেলুম আমার অন্তরেই।'

আমি চুপ করলুম। জানেমন বললেন, এতে অবিশ্বাসের তো কিছুই নেই। আমি যাটুকু পেয়েছি, সেটুকু চোখের আলো হারানোর শোকে—এবং আপন অন্তর থেকেই, বহু সাধনার পর। তুমি পেয়ে গেলে অল্প বয়সেই—সে শুধু পিতৃপুরুষের আশীর্বাদের ফলে।

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'কিন্তু চিরস্থায়ী নয় আমার এ সম্পদ। মাঝে মাঝে—'

জানেমন আমাকে কাছে টেনে এনে আমার মাথা তাঁর কোলের উপর রেখে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'আমারও তাই। আমাদের বন্ধু সুফী সাহেবেরও তাই। তার পর বল। আমার শুনতে বড় ভাল লাগছে। শব্‌নম ফিরে এলে তার সামনে আবার তুমি সব বলবে।

কী আত্মপ্রত্যয়! যেন শব্‌নম এক লহমার তরে আমাদের জন্য তৃষ্ণার জল আনবার জন্য পাশের ঘরে গিয়েছে।

আস্তে আস্তে বললুম, 'আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ তাকে অরুন্ধতী তারা দেখাবার সুযোগ পাই নি বলে। এই যে আমি মজার-ই-শরীফ এলুম গেলুম,—রাত্রিবেলা একবারও আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারি নি—যে-কোনও তারা দেখতে পেলেই সব বেদনা আবার একসঙ্গে এসে আমাকে মুষড়ে ফেলবে বলে।

যে রাতে আমি প্রথম জ্যোতি পেলুম, তারই আলোকে আমি নির্ভয়ে অরুন্ধতীর দিকে তাকালুম। তিনি আমায় হাসিমুখে বললেন, "স্বর্গে আসতেই দেবতারা আমায় শুধালেন 'তুমি কোন্ পুণ্যলোকে যাবে?' তাঁরা ভেবেছিলেন, যে-স্বামীর কোপন স্বভাব পদে পদে উভয়কে লাঞ্ছিত করেছে সেই করুণাস্পদ স্বামীর কাছে আমি [illegible]

চাইব না। কিন্তু আমি তাঁরই কাছে আছি। তুমি নিজে অসম্পূর্ণতার স্মরণে নিজেকে লাঞ্ছিত করো না। শবনম আমারই মত তার বশিষ্ঠকে খুঁজে নেবে।"

সারা দিনমান কর্তব্যকার্য, নিত্য-নৈমিত্তিক সব-কিছু করে যাই প্রসন্ন মনে, দাসী যে রকম মনিববাড়ির কাজকর্ম করে যায় নিষ্ঠার সঙ্গে, কিন্তু সর্বক্ষণ মন পড়ে থাকে তার আপন কুঁড়েঘরে, আপন শিশুটিকে যেখানে সে রেখে এসেছে—তার দিকে। সন্ধ্যায় ত্বরিতগতিতে যায় সেই শিশুর পানে ধেয়ে—মাতৃস্তন্যের উচ্ছলিত-মুখ সুধারসপীড়িত ব্যাকুল বক্ষ নিয়ে—তার ওষ্ঠাধর নিপীড়নে জননীর সর্বাঙ্গে শিহরণের সঙ্গে সঙ্গে তার মুক্তি, তার আনন্দ-নির্বাণ।

আমিও দিবাবসানে ধেয়ে যাই আমাদের বাসরগৃহের নির্জন কোণে। এখানেই আমার জয়, আর এ-ঘরেই আমার সর্বস্ব লয়; তাই বহুকাল ধরে এ-ঘরের কথা ভাবতে গেলেই আমার দেহমন বিকল হয়ে যেত। এখন যাই সেই ঘরে, ওই মায়ের চেয়েও তড়িৎ-ত্বরিতবেগে।

বিশ্বকর্মা যখন তিলোত্তমা গড়তে বসেছিলেন, তখন সিংহ দিয়েছিল কটি, রম্ভা দিয়েছিল উরু, আর হরিণী যখন দিতে চাইলে তার চোখ, পদ্মকোরকও পেতে চাইলে সেই সম্মান, তখন নাকি বিশ্বকর্মা দুই বস্তুই প্রত্যাখ্যান করে, প্রভাতের শুকতারাকে দুই টুকরো করে গড়েছিলেন তিলোত্তমার দুটি চোখ। শবনম যখন কান্দাহারে ছিল—

জানেমন বললেন, 'বড় কষ্ট পেয়েছে সে তখন। অত যে কঠিন মেয়ে, সেও তখন ভেঙে পড়ার উপক্রম করেছিল। তারপর বল।'

আমি বললুম, 'আমাকে তখন বিশ্বকর্মার মত ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ খুঁজে বেড়াতে হয়নি। তাকে স্মরণ করামাত্রই আস্তে আস্তে তার সমস্ত মূর্তি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠত। রাধার ধ্যান ছিল সহজ, কারণ তাঁর কালিয়া ছিলেন কালা, চোখ বন্ধ করা মাত্রই তাঁকে দেখতে পেতেন—আমার কালা যে গোরী। কিন্তু বিশ্বকর্মার সঙ্গে আমি তুলনাস্পদ নই। কারণ তাঁর তিলোত্তমা গড়ার সময় তিনি সৃষ্টিকর, চিত্রকর। আমার চারুসর্বাঙ্গীকে গড়ার সময় আমি তুলি ফটোগ্রাফ। তবে হ্যাঁ, মূর্তি গড়ার সময় আমার সামনে বিলাতী ভাস্করের মত জীবন্ত মডেল থাকত না—খাঁটি ভারতীয় ভাস্করের মত প্রতিমালক্ষণানুযায়ী মূর্তিটি নির্মাণ করে সর্বশেষ তার সম্মিলিত পদযুগলের দুই পদনখকণার উপর ধীরে ধীরে রাখতুম আমার দুই ফোঁটা চোখের জল। এই আমার বুকের হিমিকাকণা—শবনম।

কিন্তু এবারে আর তা নয়। এবারে আমি মূর্তি গড়িনে।

এবারে সে আমার মনের মাধুরী, ধ্যানের ধারণা, আত্মনের জ্যোতি।

এবারে আমার আত্মচৈতন্য লোপ পেয়ে কেমন যেন এক সর্বকলুষমুক্ত অখণ্ড সত্তাতে আমি পরিণত হয়ে যাই। কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তা সে নয়—অথচ সর্ব-ইন্দ্রিয়ই সেখানে তন্মাত্র হয়ে আছে। কী করে বোঝাই! সঙ্গীত সমাপ্ত হওয়ার বহু বৎসর পরেও তাকে যখন স্মরণে এনে তার ধ্বনি বিশ্লেষণ করা যায়—এ যেন তারও পরের কথা। রাগিণী, তান, লয়, রস সব ভুলে গিয়ে বাকী থাকে যে মাধুর্য—সেই শুদ্ধ মাধুর্য। অথচ বাস্তব জগতে সেটা হয় ক্ষীণ—এখানে যেন জেগে ওঠে বানের পর বান—গম্ভীর, করুণ, নিস্তব্ধ জ্যোতির্ময় ভূর্ভুবঃস্বঃ।

ওই তো শবনম, ওই তো শবনম, ওই তো শবনম।

শেষ অধ্যায়

শুধু দুটি কথা আমার মনের মধ্যে সর্বক্ষণ জেগে থাকে।

একটি উপনিষদের বাণীঃ

আকাশ আনন্দপূর্ণ না রহিত যদি
জড়তার নাগপাশে দেহ মন হইত নিশ্চল।

কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ
যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

আমার প্রথম আনন্দের দিনে হঠাৎ এটি আমার মনের ভিতরে এসেছিল—বহু বৎসর অদর্শনের পর প্রিয়জন আচমকা এসে আবির্ভূত হলে যে রকম হয়। তাকে কোথায় বসাব, কী দিয়ে আদর করব কিছুই ঠিক করে উঠতে পারিনে। এই যে আকাশ-বাতাস, সে আনন্দে পরিপূর্ণ না থাকলে, কে একটিমাত্র নিশ্বাস নিতে পারত এর থেকে?

সেই রাত্রে আমি আমাদের বাসরঘরে যাই: শবনম যেদিন চলে যায়, সেদিন কেন জানি নে তার কুরান-শরীফখানা টেবিলের উপর রেখে গিয়েছিল।

প্রত্যাদেশের সন্ধানে অনেকেই কুরান খুলে যেখানে খুশি সেখানে পড়ে। আমার কোনও প্রত্যাদেশের প্রয়োজন নেই। আমি এমনি খুলেছিলুম।

'ওয়া লাওলা ফদ্‌লুল্লাহি আলাইকুম ও রহ্‌মতুহু ফী দ্দুনিয়া ওয়াল আখিরা—'

'ভূলোক দ্যুলোক যদি তাঁর দাক্ষিণ্য ও করুণায় পরিপূর্ণ না থাকত তবে—' তবে? সর্বকালের মানুষ সর্ব বিভীষিকা দেখেছে। তার নির্যাস—মানুষের অসম্পূর্ণতা তখন রুদ্রের বহ্নি (গজব) আহ্বান করে আনত, সৃষ্টি লোপ পেত।

মনে পড়ল, ছেলেবেলাকার কথা। দাদারা ইস্কুলে, আমার সে বয়স হয়নি। দুপুরবেলা মা আমাকে চওড়া লালপেড়ে ধুতি, তাঁরই হাতে-বোনা লেসের হাতা-ওলা কুর্তা, আর জরির টুপি পরিয়ে সামনে বসিয়ে কুরান পড়ত। এই জ্যোতি অনুচ্ছেদটিই মা'র বিশেষ প্রিয় ছিল—বহু বহু বিশ্বাসীর তাই। আমার স্মরণে ছিল শুধু দুটি শব্দ 'ফদল' আর 'রহমৎ'—উচ্ছ্বসিত দাক্ষিণ্য ও করুণা। তখন শব্দ দুটির অর্থ বা অন্য কোন-কিছু বুঝিনি। আজও কি সম্পূর্ণ বুঝেছি?

• • •

আরও সহজে বলি।

বয়স তখন দশ কি বারো। চটি বাঙলা বইয়ে গল্পটি পড়েছিলুম। বড় হয়ে এ গল্পটি আর কোথাও চোখে পড়েনি।

এক ইংরেজকে বন্দী করে নিয়ে যায় বেদুইন দল। দলপতি খানদানী শেখ তার মেয়ের উপর ভার দেন বন্দীকে খাওয়াবার।

ভূষাহীন প্রণয় হয় দুজনাতে। তাই শেষটায় বল্লভের বন্দীদশা আর সে সইতে পারল না। —শবনমের লায়লী তো ওই দেশেরই মেয়ে। একদিন পিতা যখন পণ্য-

যোগবাশিষ্ট রামায়ণ
সরল বাংলা অনুবাদ। মূল্য ১৩

গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা
১ম খণ্ড ৯, ২য় খণ্ড ৯

ওরিয়েণ্টাল পাবলিশিং কোং
১১ডি, আরপুলি লেন কলিকাতা-১২

রবি গুহ মজুমদারের উপন্যাস

বন হরিণীর কাব্য

মানুষ দেবতা হবে না

(সি ৭২৩৮)

বাহিনী আক্রমণ করতে বেরিয়েছেন, তখন সে খাদ্য আর তেজী আরবী ঘোড়া এনে বসন্তের দিকে তাকালে। দুজনার পালানো অসম্ভব। যদি ধরা পড়ে, তবে দুহিতা-হরণকারীকে প্রাণ দিয়ে তার শোধ দিতে হবে—ওই একটিমাত্র আশংকা ছিল বলে সে সংগ নিয়ে দয়িতের প্রাণ বিপন্ন করতে চায়নি। যাবার সময় ইংরেজ শুধু দুটি শব্দ বলে গিয়েছিল—'টম' আর 'লণ্ডন'।

এক মাস পরে দলপতির অনুচরগণ খবর আনল, ইংরেজ বন্দরে পেঁছিতে পেরে জাহাজ ধরেছে।

সরলা কুমারী চেষ্টা করেছিল তাকে ভোলবার—বহুদিন ধরে—পারেনি।

পালিয়ে গেল সমুদ্রপারে। সেখানে প্রতি জাহাজের প্রত্যেককে বলে 'টম'—'লণ্ডন', 'টম'—'লণ্ডন'।

এক কাপ্তানের দয়া হল। এ-বন্দর ও-বন্দর করে করে তাকে লণ্ডনে নামিয়ে দিল। ইতিমধ্যে মেয়েটি ওই দুটি শব্দ ছাড়া আর একবর্ণ ইংরিজি শেখেনি—সে কাউকে সংগ দিত না। ওর দিকে কেউ তাকালে কিংবা প্রশ্ন শুধালে ম্লান হাসি হেসে বলত, 'টম'—'লণ্ডন'।

সেই বিশাল লণ্ডনের জনসমুদ্র। তার মাঝখান দিয়ে চলেছে একাকিনী বেদুইন-তরুণী। মুখে শুধু 'টম'—'লণ্ডন'। কত শত টম আছে লণ্ডনে, কে জানে, কত কোণে, কিংবা অন্যত্র, কিংবা ফের বিদেশে চলে গিয়েছে আমাদের টম্।

হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে আসছে টম। চোখাচুখি হল। দুজনা ছুটে গিয়ে একে অন্যকে আলিঙ্গন করলে সেই সদর রাস্তায় বুকের উপর।

ঠিক তেমনি একদিন আসবে না শবনম? সে কি আমাকে বলে যায়নি, 'বাড়িতে থেকো। আমি ফিরব।'

* * *

॥ আমাম্ ন্ শুদ্ ॥

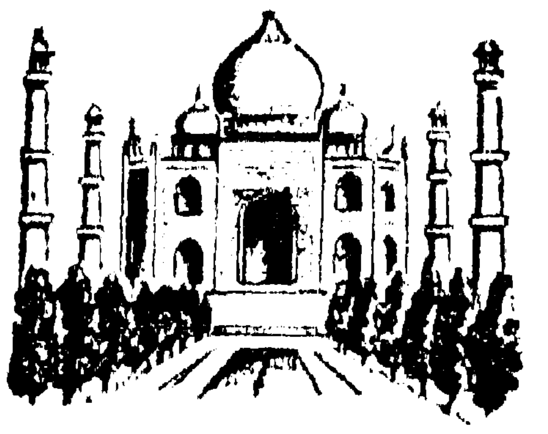

'একটি গৌরবের বস্তু যা শত-শতাব্দী ধ'রে গুপ্ত ছিল

২০০০ বছরেরও বেশি দিন ধরে অনেক সম্রাট ভারতবর্ষ জয় করেছেন, জয় করেছেন সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে, সাহসিকতায় আর উদ্ভাবনী শক্তিতে—যার ফলে গড়ে উঠেছিল মোগল সাম্রাজ্যের সুবৃহৎ দুর্গ, সমাধিমন্দির আর রাজপ্রাসাদগুলি।

সে যুগে অভিজাত জীবনের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু ছিল গন্ধসামগ্রী আর কেশতৈল। ভেষজ কেশতৈল রাজ পুরনারীদের গৌরবের বস্তু ছিল, কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে

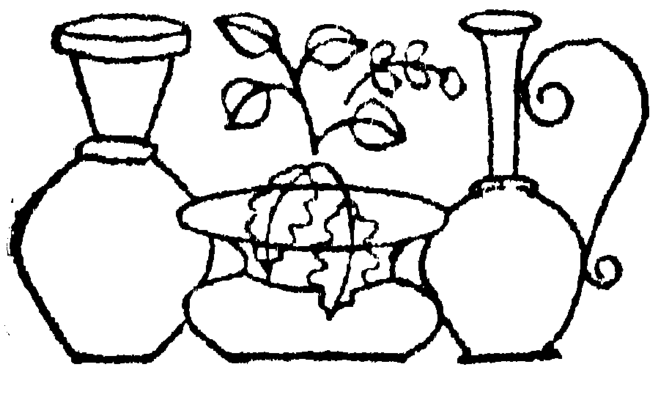

সেই ভেষজ তৈল প্রস্তুত পদ্ধতিও বিলুপ্ত হয়ে যায়। আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণায় শেষ পর্যন্ত সেই ভেষজ উপাদান সমূহের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যার ফলে মনোরম সুগন্ধযুক্ত একটি বিশুদ্ধ ভেষজ কেশতৈল তৈরী করা সম্ভব হয়েছে, আর তার নাম দেওয়া হয়েছে—কেয়ো-কার্পিন।

• মনোরম গন্ধযুক্ত কেয়ো-কার্পিন চুলের গোড়ায় স্বাভাবিকভাবে অফুরন্ত প্রাণশক্তি যোগায়।

কেয়ো-কার্পিন

ফলপ্রদ ভেষজ কেশতৈল

দে'জ মেডিকেল ষ্টোরস্ প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা • বম্বে • দিল্লী • মাদ্রাজ
পাটনা • গৌহাটি • কটক

IPB/KK/3

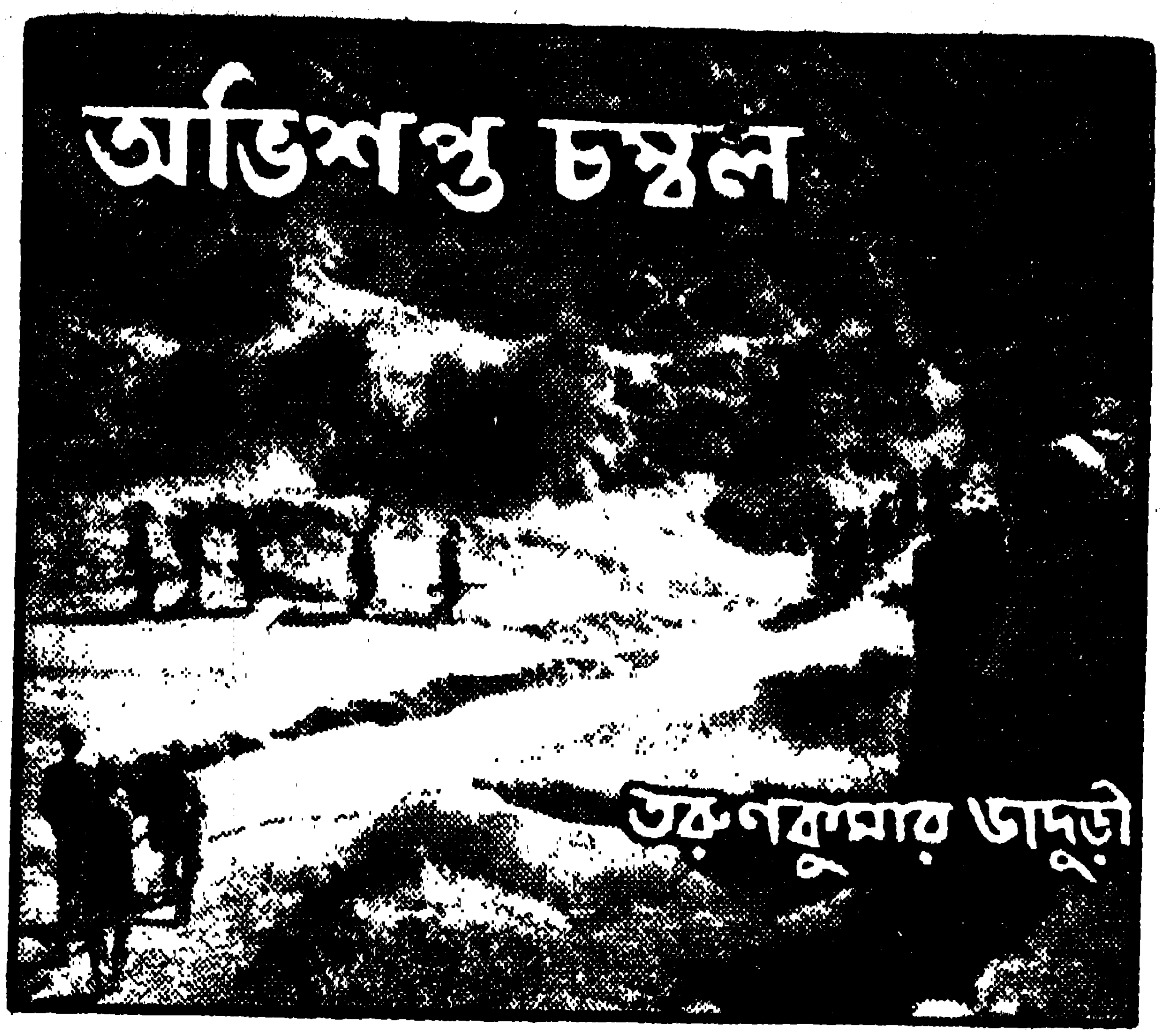

॥ আঠারো ॥

গণেশখেড়া গাঁয়ের কাছেই পোহরী। পোহরীর আদর্শ বিদ্যালয়ে আট ক্লাস পর্যন্ত পড়ে অমৃতলাল যখন হঠাৎ একদিন ঘরে বসে রইল, বাপ ভগবানলালের সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আবার যখন সে হঠাৎ স্কুল-মাস্টারী শুরু করল, ভগবানলাল ততই খুশী হল। আদর্শ জীবিকা নিতে চলেছিল তার ছেলে। কিন্তু এই সুখও একদিন উবে গেল কর্পূরের মত। অমৃতলাল মাস্টারী ছেড়ে দিয়ে আবার ঘরে ফিরে এল আর কিছুদিন পরেই সাধারণ চুরির অপরাধে ধরা পড়ল। বৃদ্ধ ভগবানলাল চোখে অন্ধকার দেখল।

জীবনের প্রথম অপরাধ অমৃতলালের সেই চুরি। আজ থেকে প্রায় ২১ বছর আগেকার কথা। দু-এক মাস জেল খেটে হয়তো সেই তার শেষ অপরাধ হত, কিন্তু অদ্ভুত বুদ্ধি অমৃতলালের, জাগীর লক্-আপ থেকে একদিন গরাদ ভেঙে পালাল আর সংগে নিয়ে গেল দুটো মাজল্-লোডিং বন্দুক। তারপরই উত্তর প্রদেশের কুখ্যাত ডাকাত গোপীর দলে অমৃতলালের খোঁজ পাওয়া গেল। গোপীর কাছে নিজের আনুগত্যের প্রমাণ দিতে গিয়ে অমৃতলাল ইটাওয়া জেলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িতে করল দুঃসাহসিক ডাকাতি।

সেদিন যখন ইন্সপেক্টর-জেনারেল রুস্তমজী সাহেব তাঁর মোস্ট-ওয়ান্টেড লিস্ট থেকে লাল পেন্সিল দিয়ে অমৃতলালের নামটা কেটে দিলেন, তাঁর মুখ দিয়ে যে কথাটা বেরিয়েছিল, তা আমার আজও মনে আছে, "দি কানিং ক্রক"। শুধু ধূর্ততা আর সাহসের উপর নির্ভর করে অমৃতলাল অবাধে চালিয়ে গিয়েছে দস্যুবৃত্তি। ইটাওয়া ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ির ডাকাতির পরেই অমৃতলাল কানপুরের এক মিল থেকে কিছু বন্দুক নিয়ে উধাও হল। কিছু দিন পরে গোপী ধরা পড়ল গোয়ালিয়রে। অমৃতলালের তখন নাম হয়েছে "বাবু দিল্লীওয়ালা"। গোপীর দলের নেতা হয়ে সে একটার পর একটা অপরাধ করে চলল বিনা বাধায়। কিন্তু বেশী দিন চালাতে পারল না অমৃতলাল— ধরা পড়ল আগ্রায় আর ১৮ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হল। আবার সে এক দুঃসাহসিক কাজ করল। কোলারস জুডিশিয়াল লক্-আপ থেকে সে পালাল। দু বছর পরে আবার ধরা পড়ল অমৃতলাল

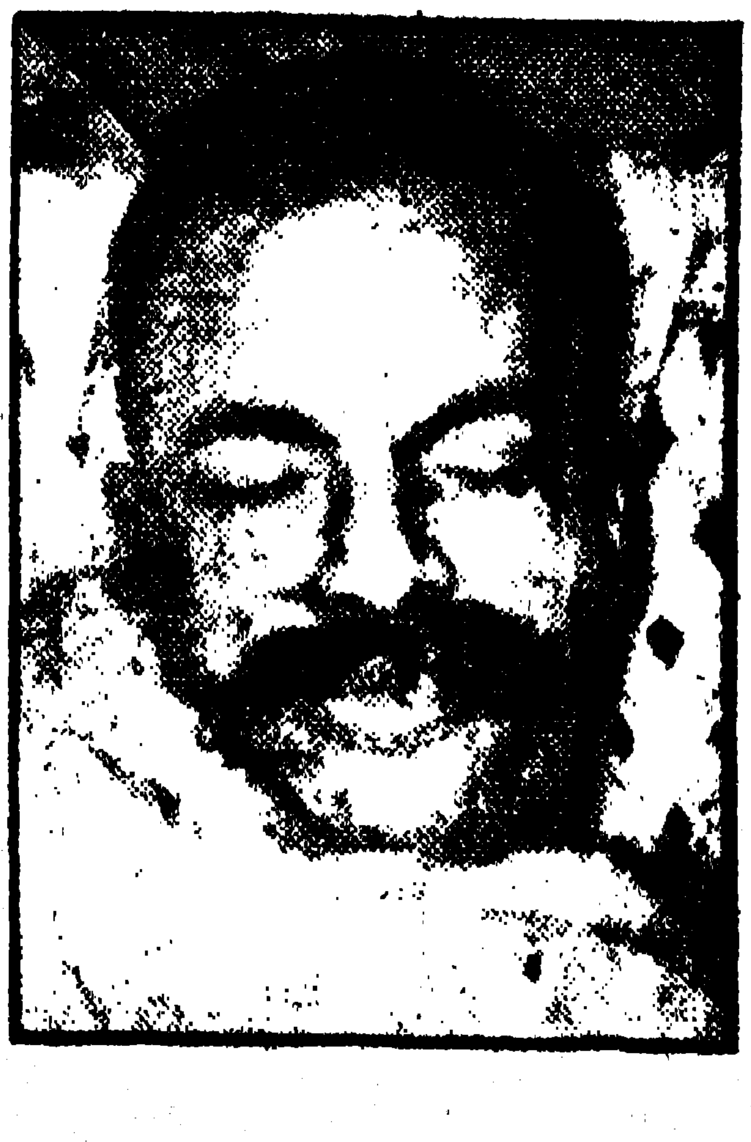

অমৃতলাল

এবারে গোয়ালিয়র শহরে। আবার পালাল অমৃতলাল গোয়ালিয়র সেন্ট্রাল জেল থেকে।

জেল থেকে পালিয়ে এসে অমৃতলাল দেখল তার দলে ভাঙন ধরেছে। তার মদ আর মেয়েমানুষের নেশা দলের কারোরই পছন্দ না। এদেরই একজন একদিন ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে গুলী মারল, কিন্তু অমৃতলালের নসীব ভালো, সে বেঁচে গেল। দলের সেই লোকটার মৃতদেহ অবশ্য পর-দিনই পাওয়া গেল মাঠের মধ্যে। সেই ঘুমন্ত অবস্থায়ই এই ঘটনার প্রায় দশ-বার বছর পরে অমৃতলালের ইহলীলা শেষ হয়েছে বদরীর হাতে। অমৃতলাল সাবধান হল, দল থেকে উত্তর প্রদেশের সব লোকদের বেছে বেছে তাড়াল।

অমৃতলালকে ধরবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছিলেন শিবপুরীর এস পি মিঃ চুনীলাল। কয়েকবার হল এনকাউন্টার। অমৃতলাল বেশ ঘা খেল, কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না। অমৃতলাল ভাবল, পথের কাঁটা চুনীলালকে সরাতে হবে। সেদিন চুনীলালের আসার কথা ছিল কোলারস পুলিস স্টেশন ইনস্পেকশনে। অমৃতলাল দেখল এই সুযোগ। হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল থানার উপর দলবল নিয়ে। চুনীলালকে কিন্তু কিছুই করতে পারল না অমৃতলাল। বরাত জোর, তিনি মোটে পাঁচ মিনিট আগে থানা ছেড়ে গিয়েছিলেন। কে যেন খবর দিয়েছিল কাছেই কোথায় বাঘ এসেছে। শিকারের নেশা কাটাতে না পেরে চুনীলাল থানার দারোগাকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন বাঘের খোঁজে। বলেছিলেন থানার ইনস্পেকশন পরে হবে। প্রায় তিন ঘণ্টা পরে যখন বাঘ মেরে ফিরে আসেন, কোলারস থানা তখন রক্ত গঙ্গায় ভাসছে। ক'জন পুলিস কনস্টেবলকে মেরে রেখে অমৃতলাল থানার সব বন্দুক আর কার্তুজ নিয়ে পালিয়েছে।

অমৃতলালের মাথার ওপর ঘোষিত হল ২০০০০ টাকার পুরস্কার।

"In the succeding years he managed to establish a reign of terror. His strategy was one of extreme cunning and each of his crimes was planned with a delibe-ration and foresight which could hve matched a military operation. Every detail was worked out. Every move of the authorities was known to him through a net work of spies and informers, that was wide spread and lucratively paid".

—পুলিসের রেকর্ডে অমৃতলালের একের পর এক অত্যাচারের কথা উঠতে লাগল।

কিছুদিন চুপচাপ অমৃতলাল। কর্তারা সব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল, অমনি অমৃতলাল আরেকটা দুঃসাহসিক ডাকাতি

করল। বিজয়া দশমী রাজপুত্তদের পুজোদিন। উমরীর রাজাসাহেবও সেদিন নিজের প্রাসাদের সব অস্ত্রশস্ত্র সাজিয়ে রেখে পুজো করছিলেন অনেক দিনের রীতি বজায় রেখে। হঠাৎ তাঁর প্রাসাদে আগমন হল এক সম্ভ্রান্ত খয়েরের ঠিকাদার সাহেবের। খয়েরের ব্যবসাদাররা ওদিকে নামী লোক আর তাঁদের প্রতিপত্তিও প্রচুর। প্রাসাদের প্রহরীরা সসম্ভ্রমে রাস্তা ছেড়ে দিলে ঠিকাদার সাহেবকে। তিনি সোজা গিয়ে উঠলেন পুজোর ঘরে, যেখানে অস্ত্র পুজোয় ব্যস্ত ছিলেন রাজাসাহেব। খয়েরের ব্যবসাদার শুধু পকেট থেকে একটা পিস্তল বের করে সবাইকে ভয় দেখিয়ে প্রত্যেকটি অস্ত্র দখল করল। একটা গুলীও ছুঁড়তে হল না। এক ফোঁটা রক্তের দাগও কোথায় পড়ল না। তারপর এক ঘণ্টা ধরে প্রাসাদ তছনছ করে ঠিকাদাররূপী অমৃতলাল ৭৫০০০্ লুট করে বিনা বাধায় উমরী ছেড়ে চলে গেল।

নতুন মধ্যপ্রদেশ তৈরি হল। এইবার সবাই ভাবল, অমৃতলালের দিন ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু কোথায়। মোরেনা জেলার পালিঘাট গাঁয়ের কাছে হঠাৎ একদিন অমৃতলাল এক বাসভর্তি বরযাত্রীর দলকে আটক করে ৪০০০০্ টাকা লুঠ করল। শুধু তাই না, বরযাত্রী দলের মধ্যে ধনী এক শেঠজীকেও ধরে নিয়ে গেল অমৃতলাল। শেঠজী ছাড়া পেলেন কিছুদিন পরে ৬০০০০্ টাকা খেসারত দিয়ে।

সারা প্রদেশে অমৃতলালের চাঞ্চল্যকর অপরাধের আলোচনা। পুলিস আর গভর্নমেণ্টকে দিনের পর দিন মন্তব্য শুনতে হয় খবরের কাগজ আর বিধান সভায়। উপ-স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নরসিং রাও দিল্লীতে ডাকলেন বড় কর্তাদের মিটিং। তৈরি হল "অপারেশন অমৃতলাল"। "অপারেশন অমৃতলাল" যোজনার কালি

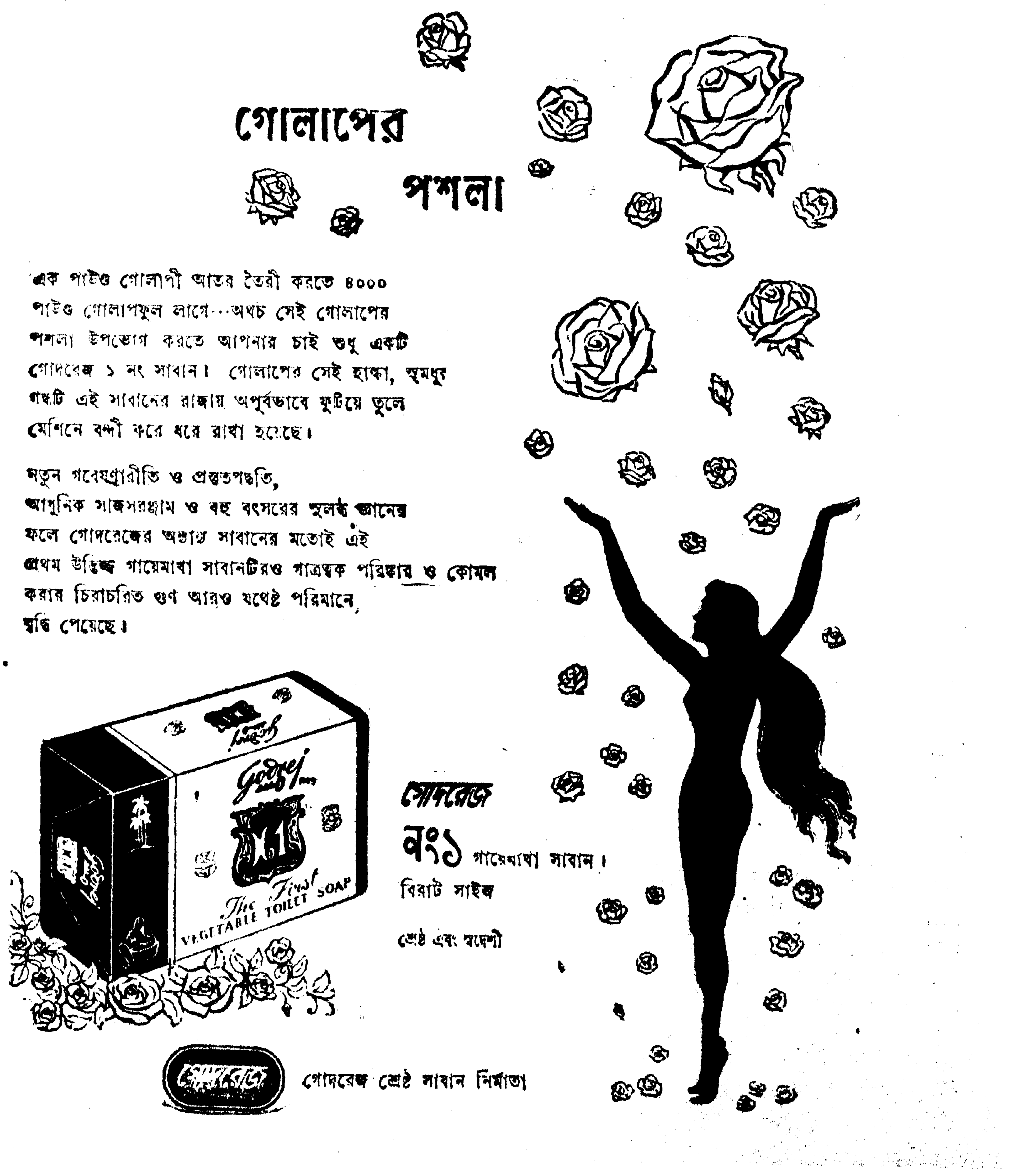

বোধহয় তখন শুকিয়েও ওঠেনি—অমৃতলাল আবার মোক্ষম ধাক্কা দিল পুলিস আর গভর্নমেন্টের "প্রেস্টিজে"। কিন্তু এর কিছুদিন আগেই অমৃতলাল হাত পাকাল ধামারের ঠাকুর সাহেবের বাড়িতে ডাকাতি করে। ঠাকুর সাহেবের বাড়িতে ছিল উৎসব সেদিন। মূর্তিমান বিভীষিকার মত কুড়িজন লোক নিয়ে অমৃতলাল উৎসবের বাতি নিবিয়ে দিয়ে অস্ত্র আর প্রচুর টাকাকড়ি নিয়ে গেল আর সঙ্গে নিয়ে গেল ঠাকুর সাহেবের দুজন আত্মীয়কে। এর কিছুদিন আগে দিনদুপুরে গোয়ালিয়রের কাছেই বম্বে-আগ্রা রোডের ওপর থেকে দুজন লোককে অমৃতলাল তুলে নিয়ে গেল।

"অপারেশন অমৃতলাল"-এর তোড়জোড় চলছে। সেদিন ছিল দোল। শিবপুরী থেকে বম্বে-আগ্রা রোডে হনুমান মন্দিরে দোল উৎসব করতে গিয়েছে একদল লোক ট্রাকে করে। দোলের উৎসব তখনও শেষ হয়নি, অমৃতলাল ঘিরে ফেলল সবাইকে। শিবপুরীর নামকরা ধনী পরিবারের ১১ জন লোককে ধরে, নিজে ট্রাক চালিয়ে তাদের নিয়ে গেল গভীর জঙ্গলে। তিনজন লোককে পরে ছেড়ে দিয়ে বাকী আটজনকে চার মাস পরে বেশ কিছু অর্থের বিনিময়ে অমৃতলাল রেহাই দেয়। অবশ্য অমৃতলাল যাদেরই যখন অপহরণ করেছে, তাদের নাকি রাজার হালেই রাখত। টাকা না পেলে অবশ্য তারা পেত স্বর্গের সুখ।

বম্বে-আগ্রা রোডের হনুমান মন্দিরের অপহরণই অমৃতলালের জীবনের শেষ বড় ক্রাইম। কিছুদিন অমৃতলাল চুপচাপ। খবর পাওয়া গেল সে নাকি ঠাকুর মাখনসিংকে ৫০০০০ টাকা ধার দিয়েছে। "A Banker among bandits" বললেন রুস্তমজী সাহেব। লন্ডন টাইমস নাম দিয়েছিল "the scholarship boy gone wrong." কেউ কেউ আবার বলত, "the elusive pimpernel."

মধ্যভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নরসিং রাও দীক্ষিত মানসিংকে মারবার বর চাইতে গিয়েছিলেন অমরনাথে। দীক্ষিতজী এবার গেলেন সুদূর নেপালে পশুপতিনাথ মন্দিরে। বর চাইলেন অমৃতলালের মৌত" (মৃত্যু)।

অমৃতলালের পতন শুরু হল। অনেক টাকা জমেছে। খরচ করতে হবে তো। ভেসে চলল অমৃতলাল মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে। একটুর জন্যে বেঁচে গেল খানাহার আর নাওলপুরার এনকাউণ্টারে। সন্দেহ করল অমৃতলাল দলের দৌলতসিং-এর ভাই মঙ্গলসিংকে। নির্মমভাবে সেই রাত্রেই গুলী করে মারল অমৃতলাল দৌলতসিংকে। জীবনে আর-একটা ভুল

মোতিরাম

করল অমৃতলাল। পরের দিন সকালে দলের লোকেরা করল তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সুলতানসিং আর দেবীশিকারী দল ছেড়ে তৈরি করল আলাদা আলাদা দল। অমৃতলালের কাছে রইল শুধু দুজন লোক। বিপদ ঘনিয়ে এল অমৃতলালের উপর। কার কাছে পাবে সাহায্য, কোথায় পাবে লোক, কে দেবে সময়ে-অসময়ে আশ্রয়। ছুটে গেল অমৃতলাল অতীতের স্মৃতিবিজড়িত পোহরী গাঁয়ে। ভগ্নীপতি মোতিরাম থাকে পোহরীতে। গাঁয়ের গণ্যমান্য ব্যক্তি মোতিরাম—কেন্দ্র পঞ্চায়েতের সরপঞ্চ। ছোটোখাটো একটা ডাকাতি কেসে ফেঁসে আছে। তখন জামিনে খালাস। সে হয়তো সাহায্য করতে পারে। আর করবে না-ই বা কেন। ডাকাতি কেসের ছজন সাক্ষীকে তো ভগ্নীপতির কথায় অমৃতলাল এক রাতেই সাবাড় করেছে। মোতিরাম রাজী হয়ে গেল এক কথায়। অমৃতলাল ভগ্নীপতির সাহায্যে আবার গড়ে তুলল দল। আশা ছিল, সুলতানসিং হয়তো আবার দলে ফিরে আসবে। সুলতানসিংকে তার দরকার। সব এনকাউণ্টারেই সুলতান সিং করত নেতৃত্ব। সব কিছু জানত সুলতানসিং, আগে পুলিসে কাজ করত তো। অমৃতলালের আপসের শর্ত নিয়ে যেদিন তার লোক সুলতানের কাছে পৌঁছল, তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। আগের দিন রাতে পুলিস শেষ করেছে সুলতান আর তার ছোট দলকে। হতাশায় বুক ভেঙে গেল অমৃতলালের। কুছ পরোয়া নেই। সব ভুলতে সে পারে, যদি সে পায় মদ আর মেয়েমানুষ। নতুন মেয়েমানুষ চায় অমৃতলাল। পয়সা খরচ করে বম্বে-কলকাতা-দিল্লী গিয়ে গতানুগতিক এক-ধাঁচে-গড়া মেয়েমানুষ আর সে চায় না। মেজাজ হয়ে উঠল খারাপ। সন্দেহ তাকে

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.-প্রণীত

ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০	বাংলার ঋষি	৩·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০	বাংলার মনীষী	১·২৫
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০	বাংলার বিদুষী	২·০০
আচার্য জগদীশ	২·০০	রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০	যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
জীবন গড়া	·৭৫	রবীন্দ্রনাথ	১·২৫

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী · ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

নারায়ণ চক্রবর্তীর
তীর্থাঞ্জলি
ভারত-ব্রহ্ম-চীনের বিস্তৃত পটভূমিকায় লেখা অনন্যসাধারণ রহস্য-উপন্যাস। ৩.০০
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২ ও অন্যান্য পুস্তকালয়ে।

রবিনসন্স
'পেটেন্ট' বার্লি
খাওয়াবার
এই ত সময়

রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লি গোরুর দুধের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে শিশুর পাকস্থলীতে দুধ শক্ত চাপ বেঁধে হজমের অসুবিধা ঘটায় না বরং তা হজম করা শিশুর পক্ষে আরো সহজ হয়। তাছাড়া, রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লি শিশুর পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগায়। রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লি শিশুরা খেয়ে তৃপ্তি পায়—এতে ওদের শরীরও গড়ে ওঠে। আপনার খোকাকে খাইয়ে দেখুন সে কেমন বেড়ে ওঠে।

এই বার্লিতে অনধিক ০.০২৮% আয়রন বি-পি ও ১.৫% ক্রিটা প্রিপঃ-এর সংমিশ্রণ আছে।

★ ক্যালসিয়াম ও লৌহ সংযোগে সুরক্ষিত

করে তুলল পাগল। দলের তুলা গড়াবয়াকে শুধু সন্দেহের বশে গুলী করল। রামপ্রসাদ আর সোমু ভয়ে পালাল দল থেকে। রামপ্রসাদ ধরা পড়ল পুলিসের হাতে আর দলের অনেক কথাই হল ফাঁস।

উ'চীবারোদ গাঁয়ে হঠাৎ খোঁজ পেল অমৃতলাল নতুন মেয়েমানুষের। শক্ত ব্যাপার কিছুই না। দলেরই এক পুরোনো লোকের স্ত্রী। কিন্তু অমৃতলালকে পালাতে হল গাঁ থেকে যখন হঠাৎ পুলিস এসে পৌঁছল গাঁয়ে। তারপর দিনই গোপালপুর থেকে বদরী এসে তার দলে ভর্তি হল। এক শর্তে রাজী অমৃতলাল তাকে দলে নিতে। যদি সে তার 'খুবসুরত' বোনকে তার কাছে এনে দেয়। বদরীর বোন তো আরো নতুন মেয়েমানুষ। দলেরই—সেই উ'চীবারোদ গাঁয়েরই সেই পুরোন লোকটা—তারই তো দ্বিতীয় স্ত্রী বদরীর বোন। তার প্রথম স্ত্রীকে পেতে গিয়ে পুলিসের ভয়ে পালাতে হয়েছে। যাক, কিন্তু দ্বিতীয় স্ত্রী, সে তো আরো নতুন মেয়েমানুষ। অমৃতলালের জিভ লকলক করতে লাগল।

"আগর আপনী বহেন কো নহী লায়া তো জান সে মার ডালুংগা"। বদরীকে ধরে অমৃতলাল ভয় দেখায়, যদি তার বোনকে সে না আনতে পারে, তাহলে শুধু তাকেই না, তার সব ভাই ক'টাকেও শেষ করে দেবে।

বদরীর গায়ে যেন আগুন লেগে গেল। ঢোক গিলতে গিয়ে মনে হল যেন একটা জ্বলন্ত কয়লার টুকরো নেমে আসছে তার গলা দিয়ে। "খুন কা ঘাঁট পিকে" (রক্তের ঢোক খেয়ে) বলেছিল, "আচ্ছা বাত হ্যায়"। কিন্তু অমৃতলালও হারবার পাত্র নয়। বুঝতে পেরেছিল বদরীটাকে চোখে চোখে রাখতে হবে। এর হাতে বন্দুক দেওয়া এখন চলবে না। ভিতরে ভিতরে জ্বলতে থাকে বদরী। অনেক মিনতি, অনেক সেবা করেছে অমৃতলালের, তবুও বন্দুক সে পায়নি। এদিকে অমৃতলাল আর ধৈর্য রাখতে পারছে না। তাগিদ দিচ্ছে বদরীকে "বহেন কো লাও, জলদী লাও"।

অবশেষে বদরী কথা দিয়েছে। আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু, করতে করতে তার কথা রাখার দিন কাছে এসে গিয়েছে। রাখী বন্ধনের পরব উদযাপন করতে অমৃতলাল গিয়েছে নিজের বোনের কাছে আর রাখী পেয়েছে অনেক পাতানো বোনদের কাছ থেকে। তারপর রাখী বেঁধে সর্বনাশ করতে বেরিয়েছে আর-একজনের বোনের—গোপালপুরের বদরীর বোনের। বদরীর বোন তখন গোপালপুরে। সারারাত হেঁটে বর্ষার মধ্যে ক্লান্ত শরীর আর দল নিয়ে অমৃতলাল বিশ্রাম নিতে থেমেছে গোপালপুর গাঁ থেকে তিন মাইল দূরে মহুয়া গাছের নিচে। গাঁ থেকে এসেছে মদ আর এসেছে আস্ত একটা পাঁঠা। আজ অমৃতলালের উৎসবের দিন। নতুন মেয়েমানুষকে পাবার লোভে অমৃতলাল সেদিন দেশী মদই খেয়ে ফেলল একগাদা। একে দেশী মদ তারপর একরাশ পাঁঠার মাংস। ঘুমে ঢুলে পড়েছে সবাই। বদরী কিন্তু কিছুই খায়নি। বলেছে, "তবিয়ত ঠিক নেহী" আজ তার বোনের বলিদান আর সে কি আনন্দে আত্মহারা হয়ে মদ আর মাংস খাবে। এতদিন সে কোনো রকমে নিজের বোনকে অমৃতলালের কামনার আগুন থেকে বাঁচিয়েছে, আজ বুঝি আর সে পারল না। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল বদরী।

ঘুম এসেছে অমৃতলালের। ঘুম এসেছে বাকী সবাইকার। শুধু ঘুম নেই বদরীর। ঘুম থেকে উঠেই অমৃতলাল বিজয় গর্বে ঢুকবে গোপালপুর গাঁয়ে আর তারপরই যাবে তার বোনের কাছে। বদরী ভাবতে পারে না। তার মাথা থেকে যেন আগুন বেরোচ্ছে। চোখ দুটো জ্বলছে ধক্ ধক্ করে। আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র। বাস তারপরই তার আদরের বোনের ওপর ঐ অর্থ-পিশাচ মাতাল, ব্যভিচারী লোকটা ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘের মত লাফিয়ে পড়বে। বদরীর মাথা ঘুরতে লাগল।

"আরে বদরী শো যা"—শুয়ে পড়তে বলে অমৃতলাল বদরীকে।

"মুঝে নীঁদ নহী আতি"—ঘুম আসছে না বদরীর। সে ঘুমবে না।

জীবনের প্রথম, শেষ আর মারাত্মক ভুল করে বসল অমৃতলাল।

জীবনে, প্রথম, শেষ আর অপূর্ব সুযোগ এল বদরীর হাতের মুঠোর মধ্যে।

"আচ্ছা ইয়ে লে রায়ফেল। প্যাহারা দেও।" এই নে রায়ফেল। তুই পাহারা দে আমাদের। অমৃতলাল ঢুলতে ঢুলতে রাইফেলটা ছুঁড়ে দিল বদরীকে।

কালো কালো ঘন জমা মেঘ মহুয়া গাছটার দিকে ছুটে আসছে। ভীষণ জোরে বৃষ্টি আসবে। মোতিরাম পাশ ফিরে শুলো। অমৃতলাল নিজের হাতটা মোতি-রামের গায়ে তুলে দিল। বদরীর হাতে রাইফেল। অমৃতলালের দামী রাইফেল। রাজা সাহেব উমরীর প্রাসাদ থেকে চুরি করে রাইফেল। মেঘটা আরো কালো হয়ে আসছে। বদরীর হাতে রাইফেল। অমৃত-লালের প্রথম, শেষ ও মারাত্মক ভুল আর বদরীর প্রথম, শেষ ও অপূর্ব সুযোগ।

সাঁই——————।

ঘন জঙ্গলের নিস্তব্ধতা চিরে রাইফেলের গম্ভীর আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হল। কখন যে ট্রিগারটা চেপেছে বদরী নিজেই জানে না।

জীবনে প্রথম আর শেষবারের মত সে চালিয়েছে গুলী।

অমৃতলাল উঠছে, আস্তে আস্তে। বদরী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। তার হাতটা যেন পাথরের হয়ে গিয়েছে। মাথার আগুনটা নিবে গিয়েছে। তারও ঘুম পাচ্ছে। অমৃতলাল ঝাপটে ধরেছে পাশে রাখা নিজের রাইফেলটা, তারপরই ধুপ করে তার বিরাট দেহটা পড়ে গেল। আর উঠল না।

বিরাট জোরে মেঘ ডেকে উঠল।

ছুটে চলে গেল বদরী গোপালপুর থানার দারোগার কাছে। ধপাস করে রাইফেলটা ফেলে দিয়ে জংগলের দিকে আংগুল দেখিয়ে বলল, "হামনে উসকো মার ডালা। অমৃতলালকো।"

ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নামল।

রুস্তমজীর মণ্টিক্রিস্টো লিস্টটার ওপর আরেকবার লাল পেনসিল চলে গেল সর সর করে। রেকর্ডে শেষ প্যারাগ্রাফ লিখে বন্ধ করে দেওয়া হল।

"Thus ended the crime career of a man who starting from thieving committed almost every serious crime known to law. In his active career of 23 years he committed hundreds of serious offences in U.P., Rajasthan and M.P. and collected an enormous sum of money. His death will relieve people of a large tract of central India from the fear of dacoity".

রুস্তমজী সাহেবের দুটো দায়িত্ব বেড়ে গেল। "খুন কা বদলা খুন" থেকে বদরীকে রক্ষা করা আর অমৃতলালের ছেলে বালোকে বাপের ঘৃণিত অপরাধ-জীবন থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া। বালোর বয়স কম। বাপের পদাংক অনুসরণ করার প্রবৃত্তি তার মনে মনে জেগেছে অনেকবার। "হি মাস্ট নট ফলো হিজ ফাদার।" আই জি সাহেব লাল পেনসিলটা ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন।

"বাট হি হ্যাজ টু মাচ মনি টু বি এ ক্রিমিনাল।" বললাম রুস্তমজী সাহেবকে।

"আই উইশ ইউ আর রাইট"—চিন্তার সুস্পষ্ট রেখা আই জীর প্রশস্ত ললাটে। অমৃতলাল তৈরী করছিল শিবপুরীর কাছে বিরাট বাড়ি। সেই বাড়ির কি হবে। বালো কি বাড়ি সম্পূর্ণ করবে? আর যদি করে তা কোথা থেকে করবে? বাপের লুকনো অজস্র টাকা দিয়ে! না সে নিজেই অর্থ উপার্জন করবে? "হি মাস্ট নট, হি মাস্ট নট"। আর বদরী? তাকে কতদিন পুলিসের পাহারায় বাঁচিয়ে রাখা যায়।

"জানো একটা কথা? অমৃতলালের কাছে শেষ সময়ে কি ছিল? তার বুক পকেটে রাখা ছিল গভর্নমেণ্টের সেই ঘোষণা-পত্র, যাতে অমৃতলালকে "জীবিত বা মৃত" ধরার জন্যে ২০০০০, টাকা পুরস্কারের কথা উল্লেখ ছিল। "ফানি, ইজন্‌ট্ ইট?"—আই জী সাহেবের লাল পেনসিলটা ঘোরাফেরা করে মণ্টিক্রিস্টো লিস্টের ওপর। একটা নামের কাছে এসে থেমে গেল পেনসিলটা—শংকর গুজর। অমৃতলালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শংকর বুঝি কিন্তু অমৃতলালের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে সে হয়তো এবার তৈরী হবে। "হাউ টু গেট হিম?"

শংকরকে পাওয়া কঠিন হল না। নসীবের অদ্ভুত চক্রান্তে কিছুদিন পরেই শংকর মারা পড়ল তার নিজের জন্মভূমি "পাওরা" গ্রামে। অনেকদিন আগে—অনেকদিন আগে শংকরের ঠাকুর্দা জানবেদ সিং আর কাকা জালিম সিংকে এই গাঁয়েরই মাঠের মধ্যে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল ডাকাতি আর নরহত্যার অভিযোগে। শংকর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিল। একদিন রাতের আঁধারে সেও মিশে গেল চম্বলের বেহড়ে।

মানসিং, সুবেদার সিং, রুপা, সুলতান, বাবু লোহারী, পুতলী, বারেলাল, গব্বর সিং, অমৃতলাল, শংকর, লাল সিং, কল্লা—অভিশপ্ত চম্বলের অভিশাপ একে একে সব মিশে গিয়েছে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে। রুস্তমজী সাহেবের মণ্টিক্রিস্টো লিস্ট ছোট হয়ে এসেছে। অভিশপ্ত চম্বলের বেহড় আর জল লাল হয়েছে এদের আর পুলিস বাহিনীর লাল রক্তে। তবু চম্বলের তৃষ্ণা এখনো মেটেনি। লাখন সিং, পানা, বাহাদুর এখনও বাকি। আর বাকি লুক্কা। মহুয়া গাঁয়ের কাছে যখন রুপা মহারাজ কমাণ্ডাণ্ট কুইনের গুলীতে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে পড়েছে, পাশে দাঁড়িয়েছিল লুক্কা—পণ্ডিত লুকমন শর্মা। রুপা পড়েছে, ছুঁড়ে ফেলেছে তার টেলিস্কোপিক রাইফেল, লুফে নিয়েছে সেই রাইফেল লুক্কা। চম্বল সাঁতরে পালিয়েছে উত্তর-প্রদেশে—সংগে গিয়েছে রুপার ভাই কানহাই। রুপা মহারাজের মৃতদেহ টেনে নিয়ে গিয়েছে অনেক দূরে, তারপর আর পারেনি। ফেলেছে দু ফোটা চোখের জল আর দীর্ঘশ্বাস। সেই দীর্ঘশ্বাস প্রতিধ্বনিত হয়েছে চম্বলের বেহড়ে বেহড়ে। আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছে সুদূর উঁদিতপুরা গাঁয়ে রুক্মিণী। তার স্বামী মানসিং-এর নামের প্রদীপ এখনও জ্বালিয়ে রেখেছে টিম টিম করে লুক্কা। দাউ ডাকতো "লুক্কে"। (ক্রমশ)

ঔপনিষদ

চিত্রিতা দেবী প্রণীত। লীলা পুরস্কারপ্রাপ্ত।
নূতন উপনিষৎ সংযোজিত
বহু প্রতীক্ষিত ২য় সংস্করণ
মূল্য—৫ টাকা
প্রাপ্তিস্থান: শ্রীশংকর পাবলিশার্স
১৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
ও অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

সর্বঋতুর সঞ্জীবনী
দই মিষ্টি
গাঙ্গুরাম গ্র্যাণ্ড সন্স
ভবানীপুর ও কালীঘাট
— কলিকাতা —
ফোন: ৪৭-২৩৭৭

র‍্যাস্‌বেরী • স্ট্রবেরী • লেবু • আনারস • কমলালেবু • চেরী

শক্ত ক'রে বসিয়ে দেয়
এবং
সুঘ্রাণে ভরিয়ে তোলে

ভারতের এজেণ্ট: প্যারী এণ্ড কোং লিঃ

অম্লান সৌন্দর্যের উপচার…

পণ্ড্স ভ্যানিশিং ক্রীম ও ফেস পাউডার

প্রথমে হালকা তুষারের মতো পণ্ড্স ভ্যানিশিং ক্রীম মাখুন… যাতে আপনার মুখত্বকের কমনীয়তা রক্ষা পায়… মুখখানি কোমল, সুন্দর ও লাবণ্যে উজ্জ্বল থাকে… ছোটখাটো কাটা ও দাগ ঢাকা পড়ে। এই ক্রীম চটচটে নয়, কিন্তু এর ওপর পাউডার ধরে চমৎকার!

তার পর মাখুন পাতলা ক'রে পণ্ড্স ফেস পাউডার যা রেশমী কোমল উজ্জ্বলতা নিয়ে আপনার মুখশ্রীর সঙ্গে মিশে থাকবে।

সব সময় উপরের এই সহজ নিয়মটি মেনে চলুন… তাহলে আপনাকে সারাক্ষণ সুন্দর দেখাবে… আপনার সৌন্দর্য মন কেড়ে নেবে!

সারা পৃথিবীর
সুন্দরী রমণীদের
মনের মতো

চীজব্রো-পণ্ডস ইন্‌ক
(সীমাবদ্ধ দায়িত্বের সঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

JWTP. 72

গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

সাধ্য ও সাধ

কয়েক বৎসর ধরে নানা অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করে আমাদের সংগীতশিল্প সম্বন্ধে একটা সাধারণ আলোচনার অবতারণা করা প্রয়োজন বলে মনে করি। অনুষ্ঠান বলতে আমরা অবশ্য খেয়াল, ঠুংরী বোঝাচ্ছি না বাংলা গান সম্বন্ধে আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য। কথিকা, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য—প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠান সারা বছর লেগেই আছে। এতে সংগীতের অনুশীলন কম হয় না। এই সব অনুষ্ঠানের সুযোগে প্রতিভাবান শিল্পীর অভ্যুদয় হবে—এটা বিদগ্ধ ব্যক্তিমাত্রেই আশা করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এত সুযোগ সত্ত্বেও সেটা ঘটছে কি না এবং যদি না ঘটে থাকে, তবে তার কারণ কি সে সম্বন্ধে আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন। সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কর্তব্য আত্মসমালোচনা। কিন্তু তথাকথিত শিল্পীদের আত্মসমালোচনা দূরের কথা সমালোচনার প্রতিই অশেষ বিরক্তি। কোন সম্প্রদায় বা প্রতিষ্ঠানের অনুগ্রহ লাভ করলে তাঁরা নিজেদের সম্পর্কে এত উঁচু ধারণা করেন যে, তখন তাঁদের মনে হয় যে, ও'রা সমালোচনার অতীত। অতি সাধারণ শিল্পী যাঁদের এখনও শেখবার অনেক আছে তাঁদেরও মনোভাব এই রকম। পরিচালক, প্রযোজক এবং শিক্ষক, শ্রেণীর মধ্যে এমন কয়েকজনকে দেখেছি যাঁরা তাঁদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনাকে স্পর্ধার সামিল বলে মনে করেন এবং এই গর্বিত মনোভাব তাঁদের শিষ্য-সম্প্রদায়ের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। এই মনোভাব যে উন্নতির পক্ষে অন্তরায় এটা বোঝানই আজকাল মুসকিল হয়ে পড়েছে।

শিল্পীদের অনেকে অভিযোগ করেন যে, আজকালকার অনেকের সমালোচনা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। ক্ষেত্রবিশেষে সেটা যে সত্যি নয় এমন কথা আমরা বলি না। কিন্তু বহু নিরপেক্ষ ব্যক্তিকেও তো নৈরাশ্যজনক মন্তব্য করতে দেখেছি এবং সেটা যে অত্যন্ত সত্য, তা আমরা বারবারই প্রত্যক্ষ করছি।

যে কোন একটি সংগীতানুষ্ঠানের কথা ধরা যাক। কণ্ঠসংগীতে ছেলেদের এবং মেয়েদের পৃথক দল থাকে। তাঁদের সম্মেলক গীতেই অনুষ্ঠান সার্থক হয়ে ওঠে। শতকরা নিরানব্বইটি ক্ষেত্রে এই সম্মেলক গানগুলি অসাফল্যে পর্যবসিত হচ্ছে। এর প্রধান কারণ পুরুষকণ্ঠের দুর্বলতা। চড়ায় উঠলেই ছেলেদের গলার আওয়াজ কুঁকড়ে সংকুচিত হয়ে আসে। মেয়েদের গলা যেখানে পৌঁছোতে অসমর্থ ছেলেদের গলা অনায়াসে সেখানে পৌঁছে গানের তরঙ্গকে উত্তুঙ্গ লীলায় হিন্দোলিত করতে সমর্থ হয় না। ফলে গানের গতি ব্যাহত হয় এবং তার প্রকৃতিরও বিকৃতি ঘটে। রবীন্দ্রনাথ এই সম্মেলকগীতের আশ্চর্য উন্নতি সাধন করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের পুরোনো দিনের সম্মেলক গান যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা স্মরণ করতে পারেন সেই সুউচ্চ এবং উদাত্ত সম্মেলক গীতিগুলি তাঁদের অন্তরকে কেমন মাতিয়ে তুলত। কলকাতায় ছায়া-প্রেক্ষাগৃহে রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানের কথা মনে পড়লে এখনো মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে কবিগুরুর উৎসাহসূচক হাতের ইঙ্গিত। কণ্ঠস্বরের ঈষৎ অবনতি প্রত্যক্ষ করলেই তিনি উৎসাহ প্রদান করছিলেন। তবু আজকাল পূর্বেকার সম্মেলক গীতির কাছাকাছিও কোন অনুষ্ঠান পৌঁছোয় না। এ নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করাতে একজন শ্লেষোক্তি করেছেন—'গাঁক্ গাঁক্ করে গান করার দিন চলে গেছে, এখন ওভাবে আর্টের অ্যাপ্রিসিয়েশন হয় না।' আর্টের উপভোগ এ'রা কিভাবে করেন জানি না, কিন্তু আর্ট সৃষ্টি হলে তবে তো তার উপভোগ। ভরা নিটোল পুরুষকণ্ঠ খাদে নামলে বা চড়লে যদি তাকে 'গাঁক গাঁক করে' গান করা বলা হয়, তাহলে পাশ্চাত্ত্য সংগীত তো চেঁচামেচি ছাড়া আর কিছুই নয়। দিলীপকুমার রায় মহাশয় 'বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম' গানটিতে যেভাবে ভরাট পূর্ণ কণ্ঠ খাদে নামিয়েছেন, সেভাবে আজকাল কজন পারেন গলা খাদে নামাতে। কৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয় এক সময় যেখানে স্বর পৌঁছে দিতে পারতেন অনায়াসে এখন কজনের কণ্ঠে সে শক্তি আছে? আসলে যে অভাব ঘটেছে তা সামর্থ্যের অভাব, অভ্যাসের অভাব। কিন্তু দুঃখ এই যে, এই অসামর্থ্যের অগৌরবে লজ্জিত না হয়ে আর্টের দোহাই পেড়ে দৈন্য ঢাকবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

একক কণ্ঠের গানও যে আশানুরূপ হয় এমন নয়। পরিবেশনের বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনেকেরই জানা নেই। প্রায়ই দেখা যায়, গলা অনাবশ্যকভাবে ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে অথবা প্রসারিত হচ্ছে। সমস্ত অংশে সমত্ব রক্ষা করতে খুব কম শিল্পীকেই দেখা যায়। গানের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই প্রাণশক্তির অভাব ঘটে। অনেক সময় মনে হয় খুব কষ্ট করে শেখা একটা গান যেন খুবই সন্তর্পণে গাওয়া হচ্ছে। পদে পদে সংশয়—এই বুঝি ভুল হল, এই বুঝি মাস্টারমশাই-এর রক্তচক্ষু সাবধান করে দেবে। এই ভয়ের ভাবটা গানে প্রতিফলিত হয়ে সংগীতকে কেমন একটা

বিশেষ আকর্ষণ

খাঁটী গরুর দুধের সাদা চিনি পাতা

● টাটকা দই

ঘরে কাটান ছানার টাটকা

● স্পঞ্জ রসগোল্লা

কমলা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

প্রায় অর্ধশতাব্দীর প্রতিষ্ঠান

আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিঃ-৯

ফোন : ৩৪-১৩৭৯

জটীল ব্যাধি ও স্ত্রী রোগ

২৫ বৎসরের অভিজ্ঞ যৌনব্যাধি বিশেষজ্ঞ ডাঃ এস পি মুখার্জি (রেজিঃ) সমাগত রোগীদিগকে গোপন ও জটিল রোগাদির রবিবার বৈকাল বাদে প্রাতে ৯—১১টা ও বৈকাল ৫—৮টা ব্যবস্থা দেন ও চিকিৎসা করেন।

শ্যামসুন্দর হোমিও ক্লিনিক (রেজিঃ)

১৪৮, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

ONE PEN FREE

EACH GTD 5 YRS — WITH EACH WATCH

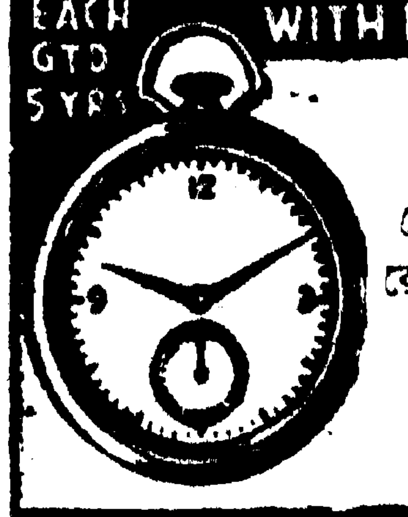

জার্মান পি ওয়াচ

প্লেন ডায়াল ৩০৲

রেডিয়াম ডায়াল ৩৫৲

রেলওয়ে টাইম কীপার

পকেট ওয়াচ ১০৲

" রেডিয়াম ১৫৲

" সুপিরিয়র ২০৲

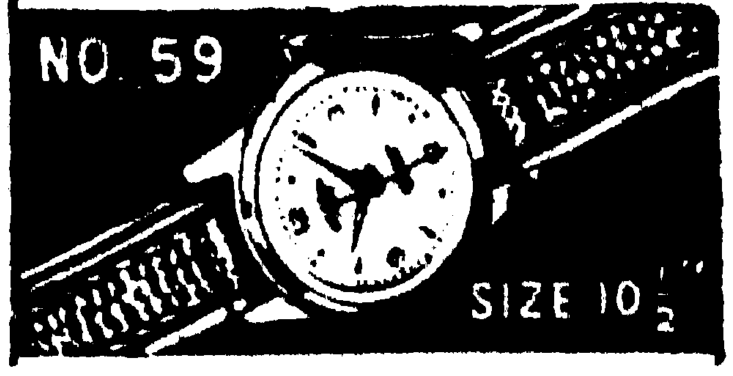

পিন লিভার রোল্ড গোল্ড - ৩৫৲

১৫ জুয়েল রোল্ড গোল্ড - ৪৫৲

১৭ জুয়েল রোল্ড গোল্ড - ৫৫৲

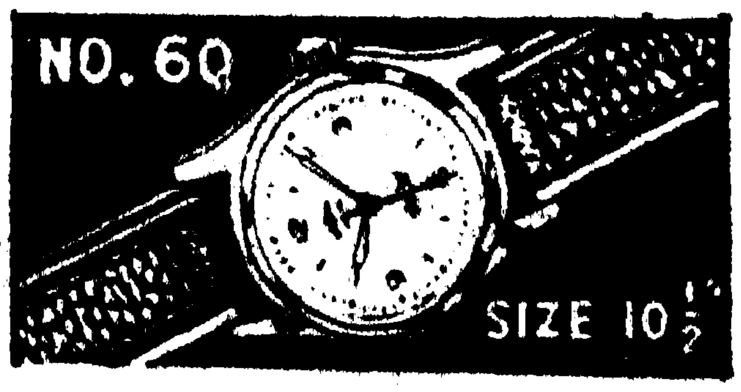

১৫ জুয়েল ওয়াটারপ্রুফ - ৫০৲

১৭ জুয়েল ওয়াটারপ্রুফ - ৫৫৲

২১ জুয়েল ওয়াটারপ্রুফ - ৬০৲

বিনামূল্যে দেয় ক্যাটালগের জন্য লিখুন

FREE INDIA WATCH Co.

PO BAG Nº 6724, CALCUTTA-7

কৃত্রিম আকৃতিতে পরিণত করে। একটা স্বাভাবিক আনন্দের ভাব নিয়ে খুব কম শিল্পীকেই গান গাইতে দেখা যায়। সংগীতের মূল বস্তু যে রস তার মধ্যে অন্তরকে ডুবিয়ে নিতে না পারলে গান হয় না। সংগীতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবার আর্ট অনেকেরই জানা নেই—যে জিনিসটা শিল্পীরা খুব পরিশ্রম করে শিখছেন তা হচ্ছে একটা সুরের বিশ্বস্ত অনুকৃতি। অনুকরণের মধ্যে নিজেকে মেলে ধরা যায় না।

আজকালকার অনুষ্ঠানের আর একটি ক্লান্তিকর দিক হচ্ছে নৃত্যপরিকল্পনার দৈন্য। ইতিমধ্যে পর পর কয়েকটি নৃত্যানুষ্ঠান দেখলেম। সবগুলিতেই ওই একই ধরন, একই ঢং, একই ভঙ্গি। প্রায় ক্ষেত্রেই মূল বিষয়বস্তুর সঙ্গে নৃত্যের মিল নেই। অনেক সময় দেখা যায় নৃত্য পরিচালকের যে জিনিসগুলি শেখা আছে, সেগুলি প্রয়োজন না হলেও প্রয়োগ করা হয়েছে, তা নইলে, তাঁর কৃতিত্ব দেখাবার সুযোগ হয় না। নৃত্যচেষ্টাতেও তেমন নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। ব্যালের অনুকরণ অনেক সময় করা হয়, কিন্তু বহু সাধনাতেও দেহের সেই নমনীয়তা আসে না। এক পায়ে ভর করে দাঁড়াতে হলে তো মহা বিপদ। পা-র কাঁপুনি দেখলে দর্শকেরও করুণা হয়। বেশভূষা নিয়েও অনেকে বিব্রত বোধ করেন। এই বুঝি ওড়না খুলে গেল—ওই বুঝি মালাটা স্থানচ্যুত হয়ে গেল; নৃত্যের দিকে একটু জোর দিতে গেলেই অংগসজ্জায় একটা বিকৃতি ঘটবে। এই সব ভয়ে এত বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় যে, নৃত্যের দিকে মন দেবারই অবসর ঘটে না। অনেক ভাড়া করা নৃত্য পরিচালক বোধ হয় অনুষ্ঠানের আখ্যান ভাগটুকুও ভাল করে জেনে নেবার চেষ্টা করেন না। ফলে তাঁদের নৃত্যপরিকল্পনায় পদে পদে অসামঞ্জস্য দেখা দেয়। নানা কায়দায় হাত ঘোরানো বা কয়েকটি বাঁধাধরা ভঙ্গিতে অংগসঞ্চালন ব্যতীত নৃত্যের মধ্যে কোন নতুন সৃষ্টির প্রয়াস কদাচিৎ দেখা যায়।

আমাদের মনে হয় যেসব ছেলেমেয়েরা নৃত্যে পারদর্শিতা লাভ করতে চায়, তারা ভারতীয় নৃত্যকলার বিবিধ বৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টাও তেমন করে না। স্কুলের বাইরে তাদের গতিবিধি নিতান্ত অল্প। কজন মিউজিয়ামে যায় নৃত্যরত মূর্তিগুলি দেখতে? কজনই বা শিল্প সম্বন্ধে অধ্যয়নে মনোযোগিতা প্রদর্শন করে। যেটুকু শেখানো হল, তার বেশি শেখবার অনুসন্ধিৎসা যদি জাগ্রত না হয়, তবে নৃত্যকলার উন্নতি হবে কেমন করে?

এই হল আমাদের শিল্পীসমাজের মোটামুটি অবস্থা। অনুষ্ঠান কোনরকমে হয়ে গেলেই হল। জাঁকজমক, আলোকপাত, বিজ্ঞাপন—এগুলিতে পরিশ্রম কম হয় না, কিন্তু মূল উপাদানের যে উন্নতি আবশ্যক, সে বিষয়ে অনেক প্রতিষ্ঠান, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক বা পরিচালকগণ সচেতন বলে মনে হয় না। এই ক' বছরের মধ্যে কাব্যসংগীতের সহযোগিতায় যেসব নৃত্যানুষ্ঠান দেখেছি, তাতে চিন্তার পরিচয় খুব অল্পই পেয়েছি। অথচ অনুষ্ঠানের প্রশংসা না হলে অনেকেরই ক্ষোভের সীমা থাকে না। অথচ সত্য, ন্যায় এবং বিবেক বলে যে তিনটি শব্দ আছে লোভনীয় প্রেস কনফারেন্সের আমন্ত্রণ সত্ত্বেও সেগুলিকে অভিধান থেকে নির্বাসিত করা যায় না। তাহলে আবার সমালোচকের কোন দিকই বজায় থাকে না যে।

এজেন্ট : মেসার্স শা বডিশি এণ্ড কোং, ১২৯, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

৩৪)

কিন্তু পরের দিন অপিস থেকে ফেরবার পথেও যেন দীপঙ্করের মন থেকে দূর করতে পারলে না ভাবনাটা! দাতারবাবু এত জায়গা থাকতে ওখানেই বা কী করতে গিয়েছিল। ওই কালীঘাটের শ্মশানের কাছে। অথচ একটা কথারও ভাল করে জবাব দিলে না। চোখগুলো কেমন জ্বলছে। যেন খানিকটা লাল। অন্ধকারে ভাল করে দেখা যায়নি অবশ্য। কিন্তু মনে হলো যেন কোথায় কী একটা গণ্ডগোল হয়েছে।

বউবাজারের সেই রাস্তাটা দিয়েই যেতে হবে।

দীপঙ্কর অপিস থেকে সকাল-সকাল বেরিয়েছিল। মিস্ মাইকেলের ঘরের ভেতরে তার বসবার জায়গা হয়েছে। নতুন চেয়ার নতুন টেবিল। নতুন একটা আলমারী। ফাইলগুলো সব একে একে হিসেব করে সেকশন থেকে আনাতে হয়েছিল। রাম-লিঙ্গমবাবু অনেক দিনের লোক। বহুদিন নিজের দেশ ছেড়েছেন। একেবারে নিখুঁত বাঙলা বলেন। বললেন—সাহেবের পাশের ঘরে কাজ করতে একটু অসুবিধে হবে আপনার—

দীপঙ্কর বলেছিল—তা চাকরি যখন করতে এসেছি, তখন আর উপায় কী?

সত্যিই উপায় ছিল না দীপঙ্করের। চাকরি করতে এলে যখন যেখানে বসতে বলবে, যখন যে-কাজ করতে বলবে, তাই-ই করতে হবে। কিন্তু সেদিনও দীপঙ্কর জানতো না যে, সেই ঘরে বসবার সুযোগ না পেলে হয়ত ঘোষাল সাহেবের নজরেও পড়বার সুযোগ আসতো না। আর অমন করে রবিনসন সাহেবেরও প্রিয়পাত্র হওয়া যেত না। রবিনসন সাহেবের মেম-সাহেবের সঙ্গেও অত ঘনিষ্ঠতা হতো না।

রবিনসন সাহেব একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—সেন, আর ইউ এ বেঙ্গলী?

রবিনসন সাহেবের এ-প্রশ্নের জবাব দিতে প্রথমে তার একটু দ্বিধা হয়েছিল। দীপঙ্কর সেন বাঙালী না তো কী!

বলেছিল—ইয়েস স্যার—হোয়াই?

রবিনসন সাহেব বলেছিল—না, মিসেস রবিনসন বলছিল তুমি বাঙালী হতেই পারো না, তুমি নিশ্চয়ই সাউথ-ইণ্ডিয়ান—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করেছিল—এ-কথা কেন মনে হলো তাঁর স্যার?

রবিনসন সাহেব হেসেছিল খুব। বলেছিল—না, তার মত, বেঙ্গলীজ কখনও ভালো হতে পারে না, অল বেঙ্গলীজ আর টেররিস্টস্—বাঙালীরা কী-রকম করে ইংরেজদের গুলী করে মারছে—দেখছো তো?

এ নিয়ে সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করাও বিপজ্জনক। এ নিয়ে কথা উঠলে অনেক কথা বলতে হয়। সাহেব বলতো—দেখ সেন, তুমি নিশ্চয় রিয়েলাইজ করবে ইংরেজরা তোমাদের ভালো করেছে, তোমাদের লক্ষ লক্ষ লোককে চাকরি দিয়েছে, রেলওয়ে করেছে, স্টীমশিপ করেছে, ফেমিন্ বন্ধ করেছে—হোয়াট নট—

—কিন্তু স্যার পভার্টি তবু ঘোচেনি কারো।

রবিনসন সাহেব একটু অবাক হতো শুনে। বলতো—কেন, কোনও পভার্টি তো নেই ইণ্ডিয়ায়, আমি তো কোনও পুওর পিপল্ দেখতে পাই না এখানে, আমি যখন চৌরঙ্গীতে যাই, ক্লাবে যাই, সব ওয়েল-ড্রেসড্ পিপল্, আমার কথা বিশ্বাস না-হয় তো মিসেস রবিনসনকে জিজ্ঞেস কর, শি ইজ অব্ দি সেম্ ওপিনিয়ন—

সাহেব ছিল সত্যিই পাগলা মানুষ। সাহেব গরীব লোক দেখতে পেত না চৌরঙ্গীতে।

সাহেব বলতো—জানো, আমার চাপরাশি দ্বিজপদ, সে এইটিন্ রুপীজ পে পায়, জানো সে একজন মানি-লেনডার—একথা তুমি আমাকে বোঝাতে পারবে না সেন, পভার্টি নেই ইণ্ডিয়ায়—কিন্তু তবু বেঙ্গলীজরা টেররিজম্ করছে! জানো, মিস্টার বার্জকে গুলী করে মেরেছে, মিস্টার পেডিকে গুলী করে মেরেছে ওরা, কী হরিবল্! ইনোসেণ্ট পিপলদের খুন করে কী লাভ! তারা তো কোনও অন্যায় করেনি!

শিশির সেনের

আনন্দ নিকেতন ৪·৫০

এ-পুস্তকে এমন অনেক সম্পদ আছে যা দেশনেতা ও জনতার পক্ষে সত্যসত্যই কল্যাণকর।—যুগান্তর

আনন্দ পাবলিশার্স ঃঃ ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ঃঃ কলিকাতা—১২

প্রকাশিত হইল
আশাপূর্ণা দেবীর নবতম গ্রন্থ

নব নীড় ৩॥০

নেপথ্য-নায়িকা (দ্বিতীয় মুদ্রণ যন্ত্রস্থ) পাঁচ টাকা

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
অনবদ্য গ্রন্থ
কবি ও অকবি
— তিন টাকা চার আনা —

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় লেখা
রক্তকমল
— তিন টাকা —

প্রাপ্তিস্থান ঃ মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি—১২

সাহেবের এ-সব কথা প্রতিবাদ করবার যোগ্য নয়। তবু সাহেব লোক ভালো। সাহেব একদিন পরিচয়ও করিয়ে দিয়েছিল মিস্টার ঘোষালের সঙ্গে। জাপান-ট্রাফিকের ব্যাপারে রবিনসন সাহেব নিয়ে গিয়েছিল তাঁর কাছে। মিস্টার ঘোষালের নিন্দে দীপঙ্কর শুনে আসছে গোড়া থেকে সবাই বলতো ঘোষাল সাহেব এক নম্বরের চশমখোর লোক। শুয়োরের বাচ্ছা বলে সবাই গালাগালি দিত। তখনও দেখেনি তাকে দীপঙ্কর।

গাঙ্গুলীবাবু বলতো—দেখবেন সেন-বাবু, বড় হয়ে গেলে আপনিও যেন ঘোষাল সাহেবের মত হয়ে যাবেন না!

কিন্তু আশ্চর্য! ঘোষাল সাহেব হেসে কথা বললেন দীপঙ্করের সঙ্গে। মিছি-মিছি লোকে নিন্দে করতো। বোধহয় বড় হলেই লোকে নিন্দে করে।

সাহেব বললে—কাম-অন্—

তারপর একেবারে সোজা মিস্টার ঘোষালের ঘরে। মিস্টার ঘোষাল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট অফিসার। হোম-বোর্ড থেকে ডাইরেক্ট অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট।

—লুক হিয়ার ঘোষাল—

কথা বলতে বলতে রবিনসন সাহেব গিয়ে ঢুকলো ভেতরে। দীপঙ্কর একটু দ্বিধা করছিল। সাহেব বললে—কাম-ইন, কাম-ইন সেন—

সাহেবের কুকুর জিমিও চলেছে পেছন-পেছন। সে-ও ঘোষাল সাহেবের ঘরে ঢুকলো।

রবিনসন সাহেব বললে—লুক হিয়ার ঘোষাল, দিস ইজ সেন আমার জাপান-ট্রাফিক ক্লার্ক, আমি একে আমার ঘরের ভেতরে এনেছি, তোমার সেকশানের মধ্যে সমস্ত মেস-আপ হয়ে আছে—একটা পেপার চাইলে খুঁজে পাওয়া যায় না। রেকর্ড সেকশান থেকে একটা চিঠি সেকশানে এসে পৌঁছতে লাগে ফোর্টিন ডেজ—ক্যান ইউ ইমাজিন?

তারপর দীপঙ্করের দিকে ফিরে সাহেব বললে—টেক ইওর সীট সেন, টেক ইওর সীট—

সাহেব না হয় পাগল। তা বলে দীপঙ্কর তো আর পাগল নয়। দীপঙ্কর তবু চেয়ারে বসলো না। মিস্টার ঘোষাল যেন কটমট করে চাইতে লাগলো দীপঙ্করের দিকে।

রবিনসন সাহেবের কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নেই। বলতে লাগলো ইউ নো ঘোষাল, হোয়াই আই হ্যাভ সিলেকটেড সেন?' কেন জানো?

ঘোষাল সাহেব জিজ্ঞেস করলেন—কেন?

রবিনসন সাহেব বললে আমি ভেবে-ছিলাম হি মাস্ট বি এ সাউথ ইণ্ডিয়ান, এখন সেন বলছে, হি ইজ এ বেঙ্গলী—তুমি জানো ঘোষাল বেঙ্গলীজ আর ডেঞ্জারাস পিপল দে আর অল টেররিস্টস্—

ঘোষাল সাহেব বললেন—জানি—

—অ্যানাদার থিং, আর দেয়ার এনি পভার্টি ইন ইণ্ডিয়া? এখানে পভার্টি আছে? তোমার কী ওপিনিয়ন, ঘোষাল? ইউ মে নো বেটার দ্যান মি! তুমি ইণ্ডিয়ান তুমি আমার চেয়ে বেশি ভালো করে বলতে পারবে! আমার এই জিমিকে যে দেখা-শোনা করে, তুমি জানো আমি তাকে কত দিই মান্থলি? টেন চিপস্—আমি তাকে মাসে দশ টাকা দিই—। না ঘোষাল আমার মনে হয় ইণ্ডিয়ায় পভার্টি নেই কোথাও—! হয়ত ছিল ব্রিটিশরা আসবার আগে এখন রেলওয়ে হয়েছে টেলিগ্রাফস টেলিফোন হয়েছে, কত লোক প্রোভাইডেড হচ্ছে—এখন পভার্টি কোথায়? আমরা রোটারি ক্লাবে এই নিয়ে ডিসকাস করেছি—

ঘোষাল সাহেব এত কথার মাথা-মুণ্ডু কিছুই এতক্ষণ বুঝতে পারছিলেন না। হঠাৎ এ-প্রসঙ্গ যে কেন উঠলো তা-ও তিনি বুঝতে পারলেন না। রবিনসন সাহেবের দিকে যখন চাইছিলেন তখন হাসি-হাসি মুখ কিন্তু দীপঙ্করের দিকে নজর পড়তেই কেমন গম্ভীর হয়ে উঠেছিলেন। কোথাকার কে-একজন সামান্য ক্লার্ক—তাকে ঘরের মধ্যে এনে এ কী অবান্তর আলোচনা!

তারপর হঠাৎ রবিনসন সাহেবের কী খেয়াল হলো। বললে—আচ্ছা ঘোষাল,

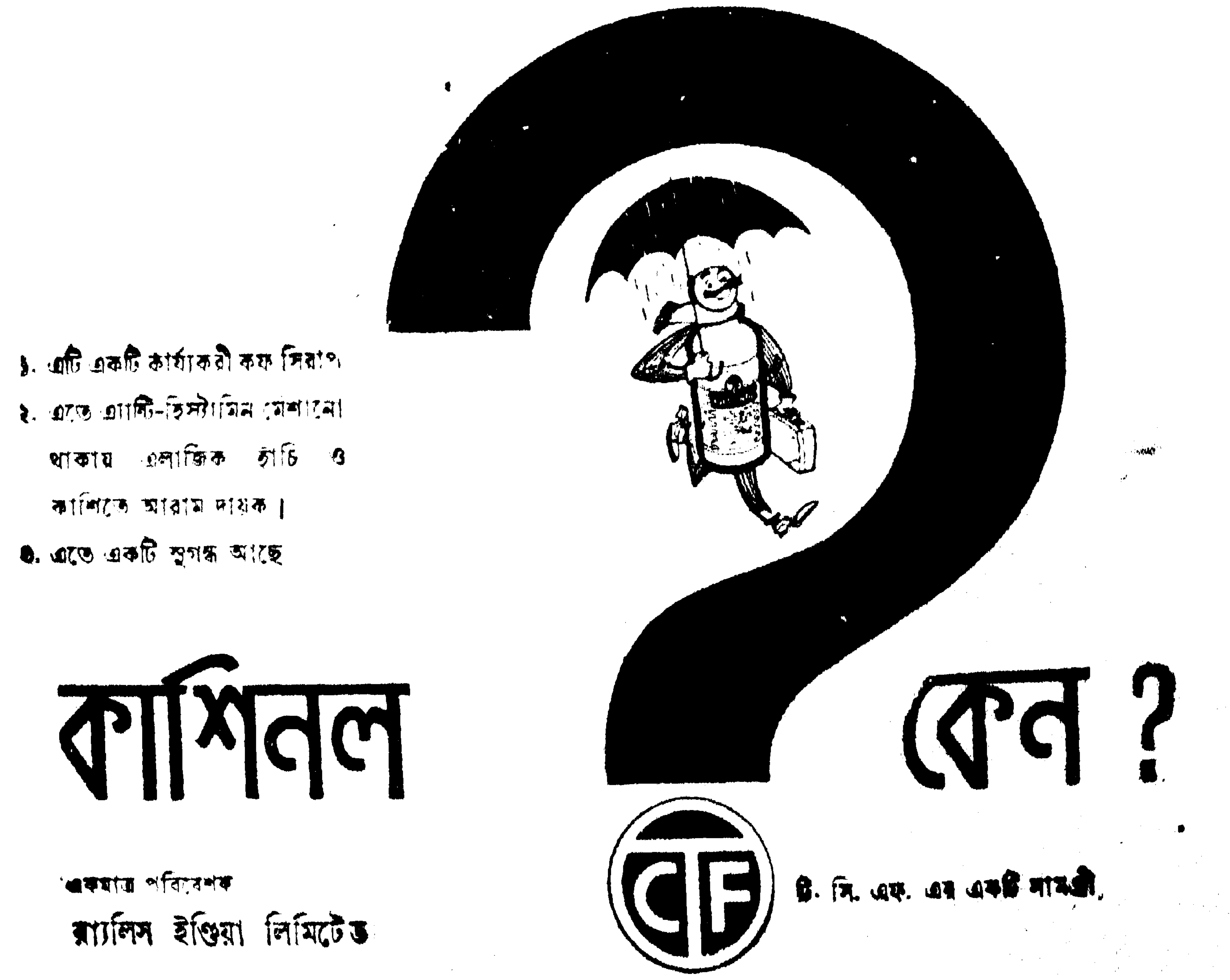

ওয়ান্‌ থিং, তুমি বেঙ্গলী না সাউথ ইণ্ডিয়ান?

ঘোষাল সাহেব যেন প্রশ্নটা শুনে একটু ঘাবড়ে গেলেন। তারপরে বললেন—আই কাম ফ্রম সাউথ ইণ্ডিয়া—

—নাউ, সী!

রবিনসন সাহেব দীপঙ্করের দিকে ফিরে বললে—এখন দেখ, ঘোষাল ইজ এ সাউথ ইণ্ডিয়ান! আমি জানি, সাউথ ইণ্ডিয়ানরা ভালো লোক।

তারপর হঠাৎ সামলে নিয়ে আবার বললে—কিন্তু, সেনও ভালো, জানো ঘোষাল, সেন যদিও বেঙ্গলী, তবু লোক ভালো, হি রাইটস্‌ এ গুড ড্রাফট—তুমি ওর কাজ দেখে স্যাটিসফায়েড্‌ হবে—

তারপর দাঁড়িয়ে উঠলো সাহেব। বললে—যাক্‌গে, যে-কথা বলতে এসেছিলাম, আমাদের রোটারি ক্লাবে এ নিয়ে ডিসকাশন হয়ে গেছে—হোয়াট ডু ইউ থিংক—আর দেয়ার পভার্টি ইন ইণ্ডিয়া? ইণ্ডিয়ায় পভার্টি আছে?

ঘোষাল সাহেব বললে—কোনও পভার্টি নেই, সবাই হ্যাপি, দে আর অল ভেরি হ্যাপি উইথ দি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট—কারো কোনও দুঃখ-কষ্ট নেই—

—নাউ সী!

রবিনসন সাহেব আবার নিজের ঘরে চলে এল। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটাও এল। দীপঙ্করও চলে এল। হঠাৎ কী নিয়ে কথা উঠতে উঠতে কী-কথা উঠে গেল, আর সাক্ষী মানতে গেল সাহেব ঘোষাল সাহেবকে। আর আশ্চর্য মিস্টার ঘোষাল! মুখের সামনে মিথ্যে কথাটা বললে। বললে—ঘোষাল সাহেব সাউথ ইণ্ডিয়ান। বললে—দেশে পভার্টি নেই। দারিদ্র্য নেই। সবাই সুখী, সবাই শান্তিতে আছে। আশ্চর্য, এর নামই কী চাকরি। এর নামই কি চাকরির উন্নতি!

গাঙ্গুলীবাবুর কাছেই শোনা ছিল মিস্টার ঘোষালের ইতিবৃত্ত।

গাঙ্গুলীবাবু বলেছিল—ঘোষাল সাহেবের ইতিহাস জানেন? কী করে চাকরি পেলে? সে অনেক দিনের কথা! কিন্তু সবাই জানে না হেড-অফিসে। কোথা থেকে হাজার কয়েক টাকা যোগাড় করে একদিন মিস্টার এন কে ঘোষাল লণ্ডন শহরে গিয়ে হাজির। উদ্দেশ্য কিছু একটা হওয়া। মাস কয়েক গেল সিগারেট খাওয়া আর মদ খাওয়া শিখতে। আর ইস্ট-এণ্ডে রাত কাটিয়ে ফুর্তি করতে! পাড়াগাঁয়ের ছেলে হঠাৎ বিলেতে গেলে যা হয়। সুট পরা, ইংরিজী বলা আর রাত্রে বাইরে কাটানোটা শিখতেই হাতের টাকা-পয়সা সব শেষ হয়ে গেল। তখন কোথায় যায়? কোথায় খায়? কী উপায়? ফেরবার জাহাজভাড়াই বা কোত্থেকে জোটে? ভিক্ষে করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই তখন। কিম্বা উপোস করে মরা। কয়েকজন ইণ্ডিয়ান ছিল তখন লণ্ডনে। তাদের কাছে হাত পাতলে ঘোষাল। কেউ দিলে না। শেষে প্রায় মারা যাবার অবস্থা। এমন সময় একটা ঘটনা ঘটে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্য ফিরে গেল ঘোষালের। তখন লণ্ডনে রেলওয়ের স্ট্রাইক চলছে। তখন ১৯২৬ সাল। সমস্ত স্টাফ স্ট্রাইক করেছে। কেউ কাজ করতে চায় না। সেই সময়ে ঘোষাল গিয়ে হাজির হলো রেল-কোম্পানীর অপিসে।

তারা জিজ্ঞেস করলে—তুমি কে?

ঘোষাল বললে—আমি মিস্টার এন কে ঘোষাল, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট—আমি এখানে ব্যারিস্টারি পড়তে এসেছিলাম, হঠাৎ ইণ্ডিয়ায় আমার বাবা মারা যাওয়ায় আমার টাকা আসা বন্ধ হয়ে গেছে—আমি এখন হেলপ-লেস্‌, আমি আপনাদের রেলওয়েতে স্ট্রাইক-পিরিয়ডে কাজ করতে চাই—

বেশ। তাই হলো। স্ট্রাইক চললো অনেকদিন ধরে। ঘোষাল কাজ করলে প্রাণ দিয়ে জান দিয়ে। তারপর স্ট্রাইক যখন শেষ হয়ে গেল, তখন আবার চাকরি খতম। ঘোষাল আবার গিয়ে দাঁড়াল রেল-কোম্পানীর অপিসে।

তারা বললে—কী চাও—

ঘোষাল বললে—ইণ্ডিয়ায় একটা রেলের চাকরি যদি দেন—আমি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট—

গাঙ্গুলীবাবু বলেছিলেন—তারা তখন একবার খুঁজেও দেখলে না, লোকটা সত্যিই গ্র্যাজুয়েট কিনা, স্ট্রাইক-পিরিয়ডে কাজ করেছে, তাইতেই খুশি হয়ে একেবারে অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার করে পাঠিয়ে দিলে এখানে—আমাদের হাড়-মাস জ্বালাবার জন্যে—

যাহোক, ঘোষাল সাহেবের ঘর থেকে চলে আসার পরই চাপরাশি এসে ডাকলে দীপঙ্করকে।

উইলসন কালি
ব্যবহার করুন

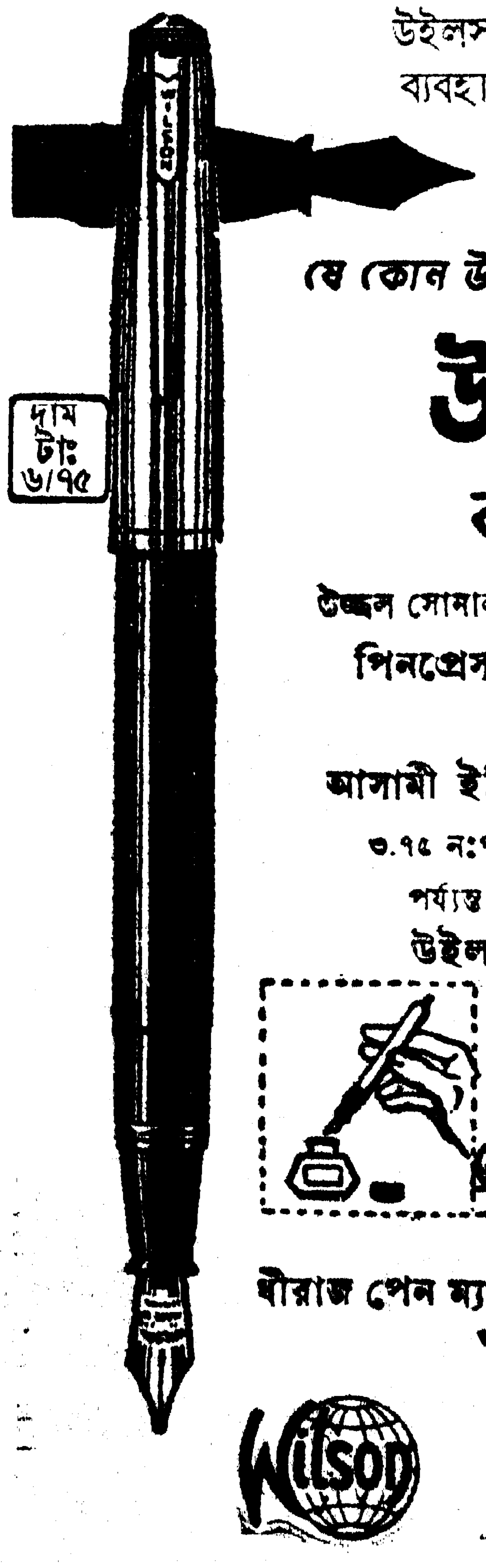

যে কোন উপলক্ষে যোগ্য উপহার,

উইলসন
কমাণ্ডার

দাম
টাঃ
৬/৭৫

উজ্জ্বল সোনালী ক্যাপ যুক্ত এর বৈশিষ্ট হচ্ছে
পিনপ্রেস কালি ভরবার নিয়ম
আর
আসামী ইরিডিয়াম পয়েণ্টযুক্ত নিব
৩.৭৫ নঃপঃ থেকে শুরু করে ২৫৲
পর্যন্ত বৈচিত্র্যময় ডিজাইনের
উইলসন পেন পাবেন।

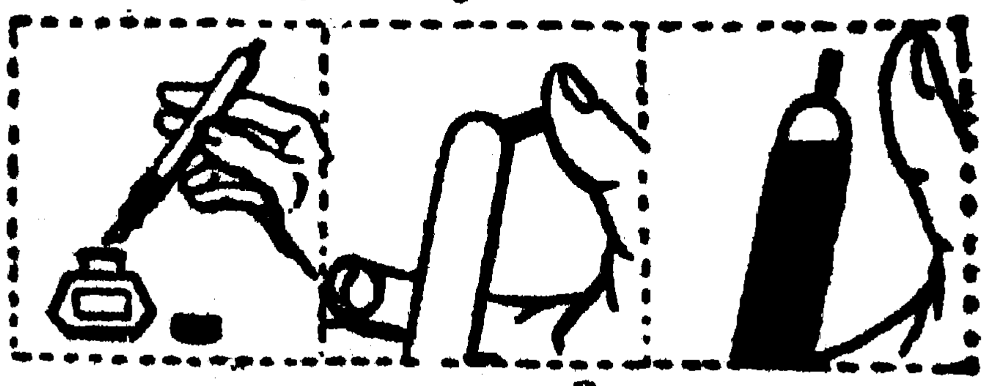

প্রস্তুতকারী
ধীরাজ পেন ম্যানুফ্যাকচারিং কোং প্রাঃ লিঃ
আন্ধেরী, বোম্বাই।
ভারতে একমাত্র পরিবেষক
কিরণ এণ্ড কোম্পানী
বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ,
দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, আমেদাবাদ।

বললে—ঘোষাল সাব সেলাম দিয়া হ্জুর—

—আমাকে ?

দীপঙ্কর একটু অবাক হয়ে গেল। এই তো এখনি ঘোষাল সাহেবের ঘর থেকে এল। এরই মধ্যে আবার কী দরকার পড়লো।

ঘোষাল সাহেবের ঘরে যেতেই চেহারা দেখে কেমন অবাক হয়ে গেল! এ যেন একেবারে অন্য মানুষ! একেবারে বদলে গেছে মুখের চেহারা!

—আপনি ক'দিন চাকরি করছেন ?

দীপঙ্কর বললে।

—রবিনসন সাহেবের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা হলো কী করে ?

সবই ইংরেজীতে প্রশ্ন। চোস্ত নির্ভুল বিলেতী ইংরিজী! খাস লণ্ডন থেকে শেখা নিশ্চয়ই। যেমন উচ্চারণ তেমনি ইনটোনেশন। দীপঙ্কর সোজা হয়ে মিস্টার ঘোষালের চোখের ওপর চোখ রেখে কথাগুলোর উত্তর দিয়েছিল সেদিন। বাইরে পোশাক-পরিচ্ছদ, পরিষ্কার করে কামানো দাড়ি, নিপাট তেড়ি, সব কিছু যেন ছদ্মবেশ বলেই মনে হচ্ছিল। কারণ ভেতরের

আধুনিক গৃহিণীদের মতে

সার্ফে কাচা কাপড় সবচেয়ে ফরসা হয়

খুব সহজে !

হাজার হাজার গৃহিণীরা আজ সার্ফ ব্যবহার করে জেনেছেন যে সার্ফের মতো এত ফরসা করে কাপড় আর কোন কিছুতেই কাচা যায় না।

সার্ফের কাপড় কাচার শক্তি অতুলনীয়। কাপড়ের ভেতরের সব ময়লা, এমনকি লুকোনো ময়লাও টেনে বের করে—তাই সার্ফে কাপড় সবচেয়ে ফরসা হয়।

আধুনিক এই কাপড় কাচার পাউডারটিতে কাচারও কোন ঝামেলা নেই। তাই সার্ফই আজকের দিনে কাপড় কাচার সবচেয়ে সহজ উপায়! ধুতি, শাড়ি, ব্লাউজ-জামা, ফ্রক, সার্ট, তোয়ালে, ঝাড়ন, বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর, এক কথায় আপনি বাড়ীর সব কাপড় চোপড়ই সার্ফে কাচুন—দেখবেন রঙ্গীন কাপড় ঝলমলে আর সাদা কাপড় ধব্‌ধবে ফরসা করে তুলতে সার্ফের জুড়ী নেই !

নীল সার্ফ দিয়ে বাড়ীতে কাচুন, কাপড় সবচেয়ে ফরসা হবে

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের তৈরী

SU. 11A-X52 BG

পাশদুটো যেন বাইরের ছদ্মবেশের আড়ালে পুরোপুরি ঢাকা পড়তে পারেনি। যেন তার দাঁত আর নখ দেখা গিয়েছিল। যে-লোকটা সাহেবকে তুষ্ট করবার জন্যে অনায়াসে নিজেকে সাউথ ইণ্ডিয়ান বলে প্রচার করতে পারে, যে-লোকটা ওপরওয়ালাকে খুশি করবার জন্যে মুখ ফুটে বলতে পারে দেশে দারিদ্র্য নেই—তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেও তার ঘৃণা হচ্ছিল সেদিন।

হঠাৎ ঘোষালের চিৎকারে গম্‌গম্ করে উঠলো কামরা—

—গেট্ আউট্, গেট্ আউট্, ক্লার্ক ক্লার্কের মতন থাকতে চেষ্টা করবেন, যান—

মিস্টার ঘোষালের সঙ্গে সেই-ই প্রথম সাক্ষাৎ। পরে জীবনে এই মিস্টার ঘোষালের সঙ্গে তাকে বহুবার সাক্ষাৎ-সংস্পর্শে আসতে হয়েছে। অদ্ভুত আশ্চর্য চরিত্র এ-মানুষটা। পরে আরেকবার মনে হয়েছিল—এত যে বদনাম তাদের, এত যে নিন্দে এ-সমস্তই বোধহয় এই রকম কয়েকজন লোকের জন্যে! ওই কে জি দাশবাবু, নৃপেনবাবু, মিস্টার ঘোষাল রামলিঙ্গমবাবু—অন্তত এদের হাত থেকেও যে মুক্তি পেয়েছে দীপঙ্কর, এর জন্যেও রবিনসন সাহেবকে কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়। পরে দীপঙ্কর অনেক বড় হয়েছিল, কিন্তু সেদিন মিস্টার রবিনসনকে না পেলে হয়ত তাকে চাকরি ছেড়ে দেবার কথাও বিবেচনা করতে হতো।

সন্ধ্যেবেলা জাপান-ট্রাফিকের ফাইলগুলো আস্তে আস্তে গুছিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে উঠলো দীপঙ্কর। বাইরে অপিসের ভেতরে তখনও কয়েকজন কাজ করছে।

মিস মাইকেলও অনেকক্ষণ হলো চলে গেছে। মিস্টার রবিনসনও চলে গেছে। আর কোনও কাজ নেই তখন। আবার এক মিনিট বসলো দীপঙ্কর চুপ করে। সারাদিন ধরে কোনও কিছু ভাববার অবসরই ছিল না। এখন যেন সব ভাবনার পাহাড়গুলো মাথায় চেপে বসলো একসঙ্গে! এখন হয়ত একটা গাড়ি ছুটেছে কলকাতার রাস্তা দিয়ে। গাড়িটা সোজা উত্তর দিক দিয়ে গিয়ে পড়লো একেবারে যশোর রোড-এ। তার-পর সেই রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে অনেক রাত হবে। অনেক সময় ছাড়িয়ে যাবে। তারপর আবার একটা গাছের ছায়ার তলায় গিয়ে দাঁড়াবে গাড়িটা। সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুটি মানুষ একাত্ম হবে সেখানে। দুটি আনন্দ মূর্তি গ্রহণ করবে একটি বিশ্বাসের স্পর্শে। একজন বলবে তার বিগত জীবনের কথা। আর একজন শুনে হাসবে। বলবে—কোথায় ছিলে তুমি, আর কোথায়ই বা ছিলাম আমি—অথচ দুজনে আজ এক হয়ে গেলাম—

একজন বলবে—কালীঘাটে যখন ছিলাম, তখন একটা বিচিত্র ব্যাপার দেখেছি—

—কী?

—বাড়ির উঠোনে একটা আমড়া গাছ ছিল, সেখানে একটা কাক দিনরাত একলা বসে থাকতো—জানো! পাশের বাড়ির একটা ছেলে ছিল তার বন্ধু! ভাত খেয়ে উঠে রোজ ভাত দিত কাকটাকে—

—কেন?

—কত মানুষের কত রকমের নেশা থাকে তো! এ-ও এক রকম নেশা!

—ছেলেটা কে?

—সে এমন কেউ না—

—তার কথা তোমার হঠাৎ মনে পড়লো যে?

—এমনি!

হঠাৎ চাপরাশিটা ঘরে ঢুকলো। বললে—সায়েব চলে গেছে হুজুর—

চাপরাশিটা ভেবেছে, এতক্ষণ বুঝি ঘোষাল সাহেবের জন্যেই বসে ছিল দীপঙ্কর। ঘোষাল সাহেবের জন্যে সে বসে থাকবে কেন! আবার দাঁড়িয়ে উঠলো দীপঙ্কর। সবাই যখন অপিস থেকে চলে যায়, তখনই যেন অপিসটা ভাল লাগে। মনে হয়, অপিসটা যেন আর অপিস নয়। যেন তখনই নিজের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে পারা যায়। যেন সে তখন নিঃশব্দে মুখর হয়ে ওঠে নিজের মধ্যে! কিন্তু আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। দীপঙ্কর ঘর থেকে বেরোতেই চাপরাশিটা দরজায় তালা-চাবি লাগিয়ে দিলে। তারপর গেটের সামনে যেতেই এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগলো মুখে। আকাশে আবার চাঁদ উঠেছে!

তারপর আবার সেই রাস্তা।

এই তো কাছেই বউবাজার! একবার ঘুরে গেলে কী এমন ক্ষতি!

কিন্তু বউবাজারের সেই গলিটার ভেতরে যেতেই দেখলে লক্ষ্মীদির ঘরে আলো জ্বলছে। খোলা জানলা দিয়ে আলো ঠিকরে এসে পড়েছে বাইরের গলিতে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়াতেই থমকে যেতে হলো। একদল চীনে পরিবার—কিচির মিচির করছে। ঘরের চেহারা একেবারে বদলে গেছে। অন্তত ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে জন কুড়ি একটা ঘরে।

কাকে কী প্রশ্ন করবে, কে উত্তর দেবে বোঝা গেল না। দাতারবাবুরা তাহলে এখান থেকে উঠে গেছে। এই ক'দিনের মধ্যেই এত পরিবর্তন হয়ে গেল। এই ক'দিন আসতে পারেনি দীপঙ্কর! সেই টাকার কথা বলতে এখানে এসেছিল। তারপর দীপঙ্কর চলে গেল থানায়।

—ইয়েস বাবু, কী চান আপনি?

ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দজী লিখিত
কয়েকখানি সৎ গ্রন্থ:

Saint Bejoykrishna Rs. 1.00
Yogiraj Kuladananda Rs. 3.50
Gospel from Sadgurusanga Rs. 2.00

নীলকণ্ঠ—
শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী
(বিস্তৃত জীবনী) যন্ত্রস্থ

ভগবান বিজয়কৃষ্ণ
(অপূর্ব নাট্যজীবনী) ৩,

পারের কড়ি— সদ্‌গুরু বিজয়কৃষ্ণ-কুলদানন্দের পত্রাবলীর মাধ্যমে
অপূর্ব সাধন সংকেত ৩·৫০
ঐ হিন্দী উত্তরাই ৪,

সদ্‌গুরু মহিমা—২ খণ্ড—
॥০ প্রত্যেকটি

যোগিরাজ কুলদানন্দ
অলৌকিক ঘটনাবলী ২·৫০

শ্রীসদগুরু সাধন সঙ্ঘ
৬০, সিমলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
টেলিফোন: ৫৫-২৮৮১

(সি ৭২৯৬)

Pertussin
COUGH SYRUP
হুপিং এবং অন্যান্য সর্বপ্রকার কাশির জন্য পার্টুসিন ব্যবহার করুন।

শিশু ও বয়স্কদের পক্ষে সমোপযোগী
সর্বত্র নতুন প্যাকিং-এ পাওয়া যায়
ফ্র্যাঙ্ক রস এণ্ড কোং লিঃ,
কলিকাতা

—দাতারবাবুর ওয়াইফ এখানে থাকতো, তারা কোথায় গেল?

তারা কিছুই বলতে পারলে না। একজন পুরুষ উঠে এল বাইরে। ভাঙা-ইংরিজীতে যা বললে তার মানে দাঁড়ায় এই যে, তারা এক মাস হলো এখানে এসেছে। আগে কারা এখানে ছিল, তা জানে না।

—আর কেউ জানে? আর কেউ বলতে পারে?

কে বলতে পারে, তার হদিস তারা বলতে পারলে না। বললে—আশে পাশে জিজ্ঞেস করে দেখ, যদি কেউ খবর রাখে!

আশে পাশে কাকেই বা চেনে দীপঙ্কর। এ-পাড়ায় আগে তো কারোর সংগেই কথা বলেনি। কারোর সংগেই আলাপ-পরিচয় নেই। বেশির ভাগই এখানকার চীন থেকে আমদানী! প্রায় চীনে পাড়াই বলা যায়। একটা ছেলে ছিল, যে লক্ষ্মীদির খাবার এনে দিত দোকান থেকে। ফাই-ফরমাস খাটতো লক্ষ্মীদির। তাকেও যদি কোনও রকমে পাওয়া যেত।

—নো বাবু, আমরা জানি না।

হতাশ হয়েই বেরিয়ে আসছিল দীপঙ্কর। মনে পড়লো সেই অপিসটার কথা। যে-অপিস থেকে প্রথম দিন লক্ষ্মীদির বাড়ির ঠিকানা পেয়েছিল।

গলির মধ্যে সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ওপরে। দাতারবাবুর অপিসটা আবার খুলেছে। ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখলে। দাতারবাবুর চেয়ারটা দেখা গেল না। দাতারবাবুর সেই বন্ধুর চেয়ারটাও দেখা গেল না।

—আচ্ছা, দাতারবাবুর অপিস এটা? মিস্টার এস এস দাতার?

দুজন লোক ভেতরে ছিল। একজন জিজ্ঞেস করলে—আপনি কে? কোথা থেকে আসছেন?

—আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, তিনি আমার বিশেষ চেনা লোক! তিনি কোথায় বলতে পারেন?

ভদ্রলোক বললে—ভেতরে গলির মধ্যে একটা হলদে রং-এর একতলা বাড়ি, সেইখানেই তাঁর ফ্যামিলি থাকে—

—সেখানে নেই, আমি এখুনি দেখে এলাম!

—কী দরকার আপনার!

দীপঙ্কর বললে—কোনও দরকার নেই, অনেক দিন দেখা হয়নি, তাই দেখা করতে এলাম, আমি এই কাছেই অপিসে চাকরি করি—

—মাফ করবেন, আমরা আর কোনও খবর বলতে পারবো না!

বলে ভদ্রলোক আবার নিজের কাজে মন দিলে। দীপঙ্কর আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল বিভ্রান্ত হয়ে। কোথায় গেল লক্ষ্মীদি, কোথায় গেল দাতারবাবু! আবার রাস্তায় এসে দাঁড়াল দীপঙ্কর। সবাই যখন তার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছে, তখন এই একটা আশ্রয়স্থলই যে ছিল তার। এই এখানে এলেই যাকিছু একটু আনন্দের খোরাক তার জন্যে মজুত ছিল। এটাও গেল। এটা সত্যিই চলে গেলে সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যাবে যে সে! আর কী আছে! আর যেন দীপঙ্করের কিছুই নেই। শুধু বাড়ি আর অপিস, অপিস আর বাড়ি।

আবার হাঁটতে আরম্ভ করলে! হাঁটার মধ্যে একটা আনন্দ আছে যেন। তখন আর নিজেকে নিঃসংগ মনে হয় না। মনে হয় সে তো চলেছে। গন্তব্যস্থানের উদ্দেশ্যে তার যাত্রা বুঝি শেষ হয়নি। আর পৃথিবীতে এত রাস্তা আছে, এত পথ আছে যে, এক-জীবনে হেঁটেও তা শেষ করা যায় না। গন্তব্যস্থান থাক আর না-ই থাক, পথ যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ গন্তব্য-স্থানও একটা আছে। আর পথের যখন শেষ নেই, তখন গন্তব্যস্থানেরও শেষ নেই। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত হেঁটে-হেঁটেই একটা জীবন অনায়াসে ফুরিয়ে দেওয়া যায়।

হাঁটতে হাঁটতে কোথায় কতদূরে এসে পড়েছিল, তারও খেয়াল ছিল না। হঠাৎ ভিড়ের আভাস পেতেই যেন সম্বিত ফিরে এল। অনেক লোকের ভিড়। অনেক চিৎকার। একেবারে হুড়মুড় করে ছুটে চলেছে সবাই। ভিড়ের স্রোত বয়ে চলেছে দীপঙ্করের দুপাশ দিয়ে।

একজনকে জিজ্ঞেস করতে খানিকটা বোঝা গেল। রবিঠাকুর লেকচার দিতে এসেছে!

গরম দুধ উপচে পড়া বন্ধ করার জন্য

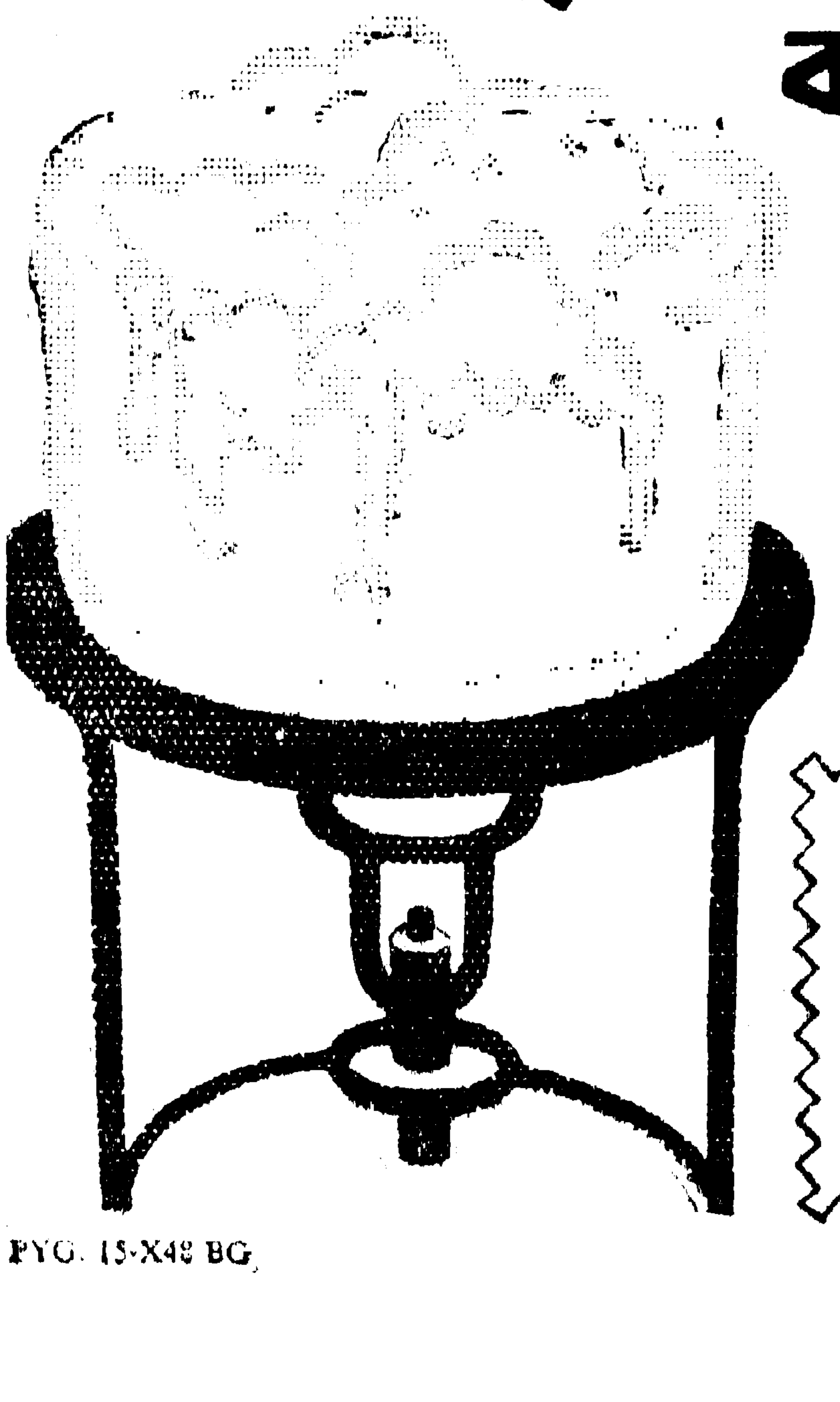

পিরামীড গ্লিসারিন

সামান্য একটু পিরামীড গ্লিসারিন দুধের কড়াইয়ের ভেতরটাতে চার কিনারায় মাখিয়ে দিন। এবারে তাতে দুধ গরম হতে দিন। লক্ষ্য করুন, দুধ কিছুতেই উপচে পড়ছে না। চুলোয় দুধ রেখে নিশ্চিন্তে আপনি অন্য কাজে মন দিতে পারেন।

এটি বিশুদ্ধ এবং উপকারী। গৃহকর্মে, ওষুধ হিসেবে, প্রসাধনে ও নানা রকম ভাবে নানা বছরই কাজে লাগে—তাই সর্বদা হাতের কাছে এক বোতল পিরামীড গ্লিসারিন রাখুন!

বিনামূল্যে পুস্তিকা! এই কুপনটি ভরে, "হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, পোষ্ট বক্স ৪০৯, বোম্বাই-১" এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

দয়াকরে আমাকে বিনামূল্যে ইংরেজী/হিন্দীতে * পিরামীড গ্লিসারিনের গৃহকর্মে ব্যবহার প্রণালী পুস্তিকা পাঠান।

আমার নাম ও ঠিকানা.................................

* যে ভাষায় চান সেটি রেখে অন্যটি কেটে দিন।

PYG. 15-X48 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর! বহুদিন আগে কালীঘাটের মন্দিরে এসেছিলেন তিনি। মা দেখিয়ে দিয়েছিল। দীপঙ্কর তখন ছোট। কিরণের সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় পৈতে বিক্রি করে বেড়ায়, আর দু-এক পয়সা হাতে পেলে বেগুনী-আলুর চপ্ কিনে খায়।

খানিক পরে ব্যাপারটা বোঝা গেল। টাউন হল-এ মিটিং-এর ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু লোকের ভিড়ে জায়গা না-হওয়ায় সবাই মনুমেণ্টের তলায় গিয়ে হাজির হচ্ছে। কী ভীষণ ভিড়! জীবনে এত ভিড় কখনও দেখেনি দীপঙ্কর। বহুদিন আগে সি আর দাশ মারা যাবার পরও এত লোক হয়নি। সমস্ত ধর্মতলাটা যেন ভর্তি হয়ে গেছে মানুষের মাথায়। দীপঙ্করও গিয়ে দাঁড়াল এক কোণে!

ক'দিন আগেই হিজলী জেলখানায় দুজন খুন হয়ে গিয়েছিল পুলিসের গুলীতে। সন্তোষ মিত্র আর তারকেশ্বর সেন। হিজলী জেলের ভেতরে তাদের গুলী করে মারা হয়েছে। যেদিন আলীপুরের সেসন জজ মিস্টার গারলিক আই সি এসকে গুলী করে খুন করা হয়েছিল, সেদিন হিজলী জেলের ভেতর তারা আলো দিয়ে সাজিয়েছিল। তারপর আর কোনও কথা নেই—গুলীর ওপর গুলী চললো জেলের ভেতর। কলকাতায় এল তাদের দুজনের মৃতদেহ—মিছিল করে নিয়ে গিয়েছিল কেওড়াতলার শ্মশানে।

দীপঙ্কর দেখতে লাগলো ভিড়ের চেহারা। মা'র পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে সে। তবু সব কানে এল। বিচ্ছিন্ন বিপর্যস্ত দীপঙ্কর দূর থেকে দেখতেই লাগলো শুধু। কিন্তু এ কোন্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর! ছোটবেলাকার সেই চেহারার সঙ্গে তো এ মেলে না।

রবীন্দ্রনাথের দুপাশে দুজন দাঁড়িয়ে। একদিকে সুভাষ বোস, আর একদিকে জে এম সেনগুপ্ত। রবীন্দ্রনাথের নাকের কাছে অক্সিজেন ধরে আছেন।

রবীন্দ্রনাথ বলতে লাগলেন—প্রথমেই বলে রাখা ভাল, আমি রাষ্ট্রনেতা নই, আমার কর্মক্ষেত্র রাষ্ট্রিক আন্দোলনের বাইরে। কর্তৃপক্ষদের কৃত কোনও অন্যায় বা ত্রুটি নিয়ে সেটাকে আমাদের রাষ্ট্রিক খাতায় জমা করতে আমি বিশেষ আনন্দ পাইনে। এই যে হিজলীর গুলী-চালনা ব্যাপারটি আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়, তার শোচনীয় কাপুরুষতা ও পশুত্ব নিয়ে যা কিছু আমার বলবার, সে কেবল অপমানিত মনুষ্যত্বের দিকে তাকিয়ে। এত বড় জনসভায় যোগ দেওয়া আমার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। মনের পক্ষে উদ্‌ভ্রান্তিজনক; কিন্তু যখন ডাক পড়ল, থাকতে পারলাম না। ডাক এল সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষক নামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতন নিষ্ঠুরতার দ্বারা চিরদিনের মত নীরব করে দিয়েছে...

প্রচুর হাততালি উঠলো। খানিকক্ষণ আর কোনও কথাই শোনা গেল না।

আবার অনেক পরে শোনা গেল—যেখানে নির্বিবেচক অপমান ও অপঘাতে পীড়িত হওয়া দেশের লোকের পক্ষে এত সহজ অথচ যেখানে যথোচিত বিচারের ও অন্যায় প্রতিকারের আশা এত বাধাগ্রস্ত, সেখানে প্রজারক্ষার দায়িত্ব যাঁদের পরে, সেই সব শাসনকর্তার এবং তাঁদেরই আত্মীয় কুটুম্বদের শ্রেয়োবুদ্ধি কলুষিত হবেই এবং সেখানে ভদ্রজাতীয় রাষ্ট্র-বিধির ভিত্তি জীর্ণ না হয়ে থাকতে পারে না।

আবার হাততালি পড়তে লাগল। কবি যেন এবার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

বলতে লাগলেন—প্রজাকে পীড়ন স্বীকার করে নিতে বাধ্য করা রাজার পক্ষে কঠিন না হতে পারে, কিন্তু বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে তখন তাকে নিরস্ত্র করতে পারে কোন্ শক্তি?

দীপঙ্কর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ শুনতে লাগল। মনে হল, এ-কথা শোনবার অধিকারও যেন তার মা হরণ করে নিয়েছে। সবটা শোনাও হল না। তাড়াতাড়ি ভিড় থেকে সরে বেরিয়ে এল দীপঙ্কর। আজ এই লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড়ের মধ্যেও দীপঙ্কর যেন অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে রইল। সে যেন অস্পৃশ্য এদের চোখে!

আবার হাঁটা। আবার তাকে হাঁটতে হবে।

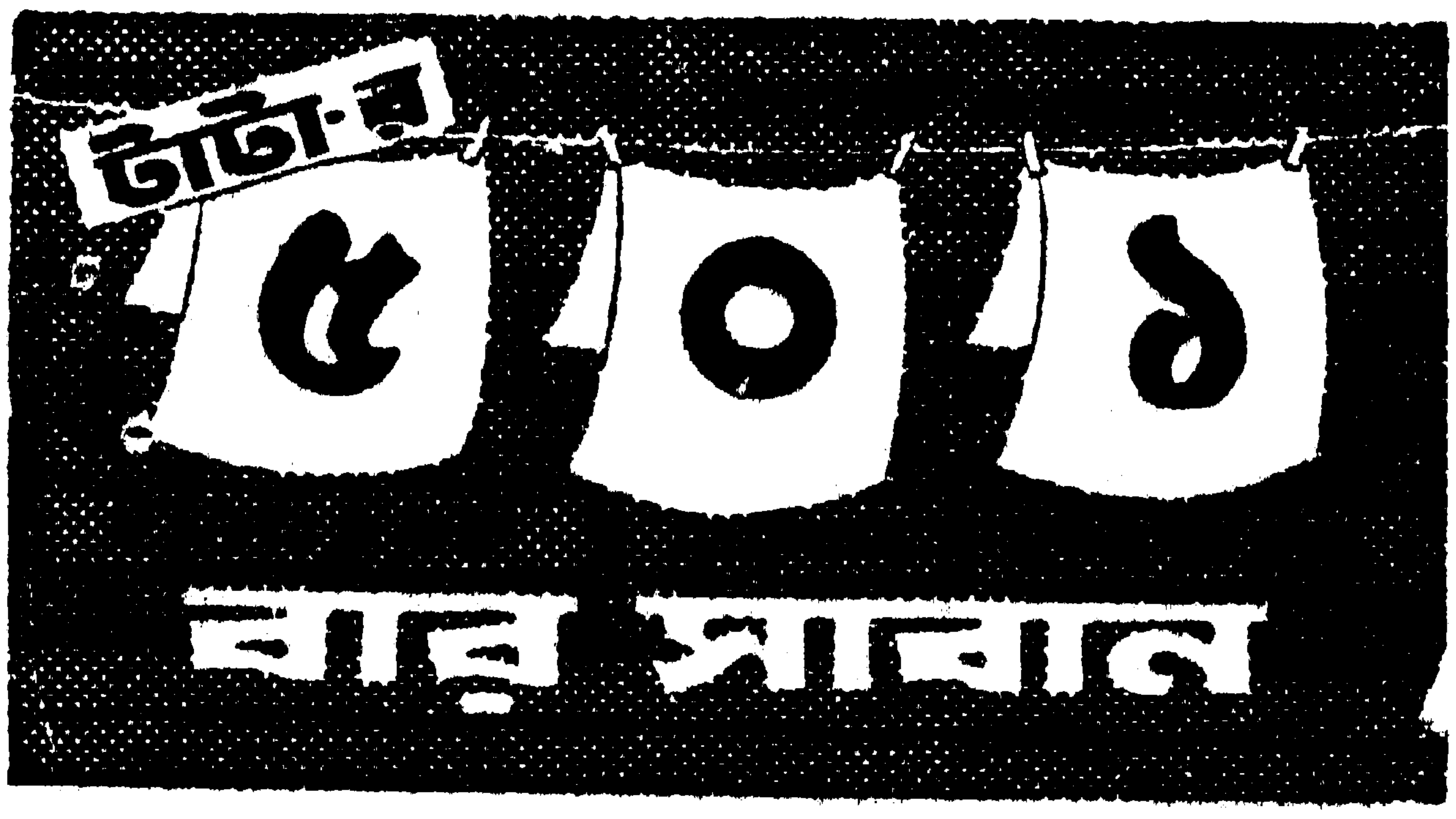

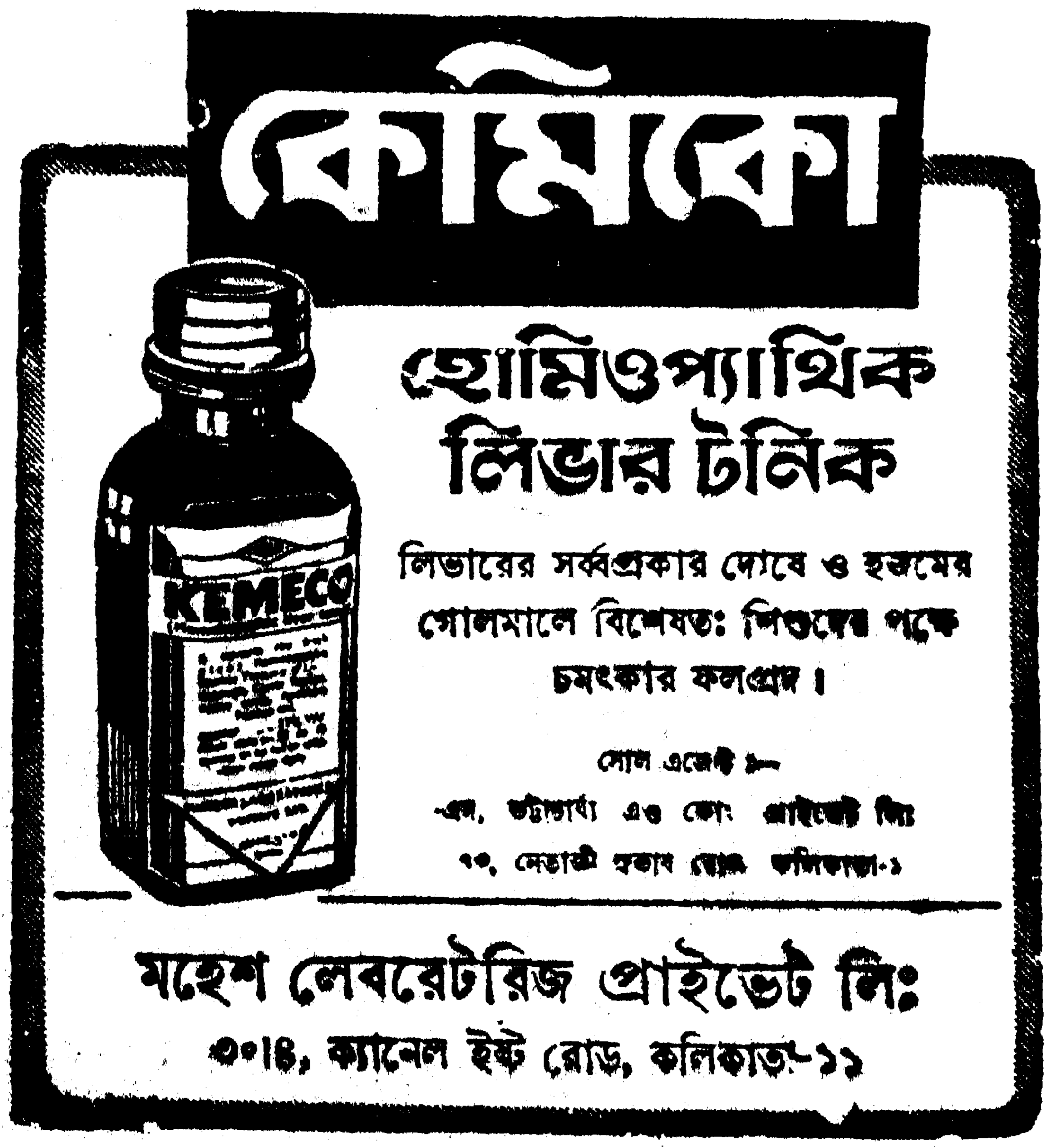

হাঁটাপথের শেষে যেন দীপঙ্কর তার গন্তব্যস্থানের নির্দেশটুকু পেয়ে যেতে পারে। পেছনে যেন এক মহাসমুদ্রের গর্জন—সেদিকে চেয়ে দেখবারও অধিকার তার আর নেই। সমস্ত পৃথিবী থেকে যেন তার নির্বাসন হয়ে গেছে কাল থেকে! সে যেন শুধু জাপান-ট্র্যাফিক-এর কাজ করবার জন্যেই জন্মেছে পৃথিবীতে। সে যেন রবিনসন সাহেব আর ঘোষাল সাহেবের খবরদারি করবার জন্যেই বেঁচে আছে। অফিসের কথাটা মনে পড়তেই যেন সমস্ত মনটা আবার বিষিয়ে উঠল।

তাড়াতাড়ি বাড়ি এসে পৌঁছতেই মা এল। আজকে মা'কে যেন অনেক ভাল দেখাচ্ছে। মা যেন সুস্থ হয়েছে আরো। তবু মা'র দিকে দীপঙ্কর সেই আগেকার দৃষ্টি নিয়ে আর যেন চাইতে পারলে না। মা যেন সেই আগেকার মা আর নেই। দীপঙ্করের কাছেও যেন মা তার ছোট হয়ে গেছে। কেন তাকে দিয়ে অমন প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলে; কেন তাকে এমন বিচ্ছিন্ন করে দিলে পৃথিবী থেকে! মা'র ওপর যেমন তার কর্তব্য আছে, সকলের ওপরেই তো আছে। এই চারপাশের পৃথিবীও তো তার আপনার জন!

মা বললে—কী রে, অমন দেখাচ্ছে কেন রে তোকে? খুব খাটুনি গেছে বুঝি অফিসে?

দীপঙ্কর শুধু বললে—না!

মা বললে—সাহেব বকেছে বুঝি তবে?

দীপঙ্করের কেমন রাগ হয়ে গেল। বললে—তুমি চুপ করো তো মা, সাহেব বকতে যাবে কেন মিছিমিছি?

মা আর কোনও কথা বললে না। দীপঙ্কর বিছানায় গিয়ে গড়িয়ে পড়ল। এ-সংসারের কোনও কাজেই লাগবে না যখন সে, তখন তার তো আর কিছুই করবার নেই। সত্যিই তার যেন কিছু করবারই নেই। এবার থেকে সে শুধু সকাল থেকে অফিসে যাবে আর বিকেল বেলা বাড়ি এসে বিছানায় শুয়ে গড়াবে! এই উনিশের একের বি'র অন্ধকার গলির সংকীর্ণ পরিধিতে সে নিঃশ্বাস গ্রহণ করবে আর নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে!

মা আবার ঘরে ঢুকলো। একটা চিঠি এগিয়ে দিয়ে বললে—এই নাও, তোমার একটা চিঠি এসেছে—

চিঠি! দীপঙ্কর তড়াক করে উঠে বসলো বিছানার ওপর। চিঠি তো তার আসে না বড় একটা! চিঠি তো তাকে কেউ লেখবার নেই!

দু'হাতে খামটার মুখ ছিঁড়ে চিঠিটা বার করে দীপঙ্কর রুদ্ধনিঃশ্বাসে পড়তে লাগলো!

লক্ষ্মীদির চিঠি। লক্ষ্মীদি লিখেছে—

দীপু,

অনেকদিন তুমি আসোনি। আমি এখনও কলকাতায় আছি। তুমি বোধহয় বৌবাজারের ঠিকানায় গিয়ে আমাকে না-পেয়ে ফিরে গেছ। আমি এখন ওপরের ঠিকানায় আছি। তুমি চাকরি করছো বলেছিলে। সেই জন্যেই আমি আর তোমায় বিরক্ত করিনি। অনেকদিন কারোরই কোনও খবর পাই না। যদি কখনও সময় করতে পারো তো আমার ওপরের ঠিকানায় একবার এসো। তোমার সঙ্গে দেখা হলে খুশী হবো!

তোমার—লক্ষ্মীদি

মা বললে—কার চিঠি রে দীপু? আপিসের?

দীপঙ্কর তখনও এক মনে চিঠিটা পড়ছে। একবার পড়া হয়ে গেছে, তখন আবার পড়ছে!

চন্নুনী ওদিক থেকে চিৎকার করে উঠলো—ও দিদি, এদিকে তোমার ডাল পুড়ে যাচ্ছে যে?

তাড়াতাড়ি মা চলে গেল। এতদিন পরে যেন মা আবার আশা পেয়েছে মনে মনে। এবার আর কোনও ভয় নেই। কোনও আশংকা নেই। দীপুকে এবার সব ছোঁয়াচ থেকে মুক্ত করতে পেরেছে মা! দীপু মা'র পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে আর কোনওদিন স্বদেশী করবে না। এবার শুধু একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে যাবে মা এখান থেকে। তার আগে বিন্তীর একটা বিয়ে দিতে পারলেই সব দায়-দায়িত্ব মিটে যায়।

পাশের বাড়িটা অন্ধকার হয়ে পড়ে আছে। অনেকদিন ভাড়াটে আসে না বলে অঘোর ভট্টাচার্যও কেমন যেন অধৈর্য হয়ে পড়েছে। বাড়ি-ভাড়ার সাইনবোর্ডটা ঝুলছে। তবু লোক আসে না। কুড়ি টাকা ভাড়া। এই বাড়ির জন্যে কুড়িটা টাকা! কুড়িটা টাকা মাসে মাসে কে গুণতে পারে! কার এত ক্ষমতা! কজন লোক আছে কলকাতায় কুড়ি টাকা বাড়ি দেবে মাসে!

যারা আসে তারা কেউ কেউ বলে—পনেরো টাকা হলে নিতে পারি, কুড়ি টাকা বড্ড বেশি মশাই।

অঘোর ভট্টাচার্য বলে—তবে পড়ে থাক,

ডাঃ কার্তিক বসুর
টাইকোসোডা | নানালা
অম্ল, অজীর্ণ ও ডিস্পেপসিয়ায় | ব্যথা ও বেদনায়
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ-কলিকাতা ৯

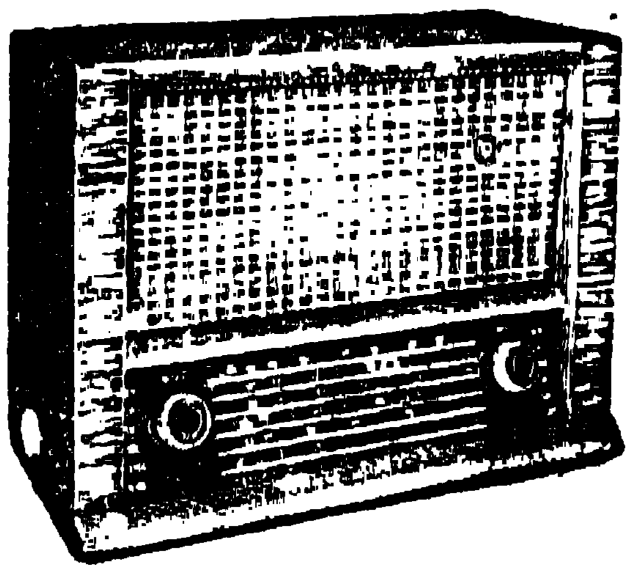
আমাদের নিকট নগদ মূল্যে অথবা সহজ কিস্তিতে অনেক রকমের রেডিও সেট পাওয়া যায়। এইচ. এম. ভি ও অন্যান্য রেডিওগ্রাম, লং-প্লেইং রেকর্ড, টেপ্ রেকর্ডার, "নিপ্পন" অল-ওয়েভ ট্র্যান্সিস্টার রেডিও, এম্প্লিফায়ার, মাইক, ইউনিট, হর্ণ, মাইক কেবল, রেডিও ও ইলেকট্রিকের বিভিন্ন প্রকারের সাজ-সরঞ্জামাদি বিক্রয়ের জন্য আমরা সর্বদা প্রচুর পরিমাণে মজুত করিয়া থাকি।
রেডিও এণ্ড ফটো স্টোর্স
৬৫, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩। ফোনঃ ২৪-৪৭৯৩

Use Sulekha
FOUNTAIN PEN INK

সুলেখা কালি
ব্যবহার ক'রে 'সুলেখা প্রবাহ' উপভোগ করুন
Special
SULEKHA WORKS LTD., CALCUTTA-32

ও মাছ নয় যে পচে গন্ধ বেরোবে হে—

দীপঙ্করের মা বলে—তা দিন্ না বাবা পনেরো টাকাতেই ভাড়া দিন্ না—

অঘোর ভট্টাচার্য রেগে যায়। বলে—কেন দেব? আমার কি টাকা সস্তা? আমার কি টাকার গাছ আছে বাড়িতে, নাড়া দেব আর ঝরে পড়বে মেয়ে,—

এ-কথায় উত্তর দেওয়া চলে না। তবু মনে হয়, বাড়িটায় লোক এলে যেন ভাল হয়। তারা বেশ ছিল। মেয়েটা আসতো মাসীমা বলে ডাকতো। বিন্তীকে দেখতে এলে নিজের গয়না দিয়ে সাজিয়ে দিত। কোথায় যে চলে গেল সে-মেয়ে। বাপ বর্মা থেকে এসে হয়ত নিয়ে গেছে।

—মা!

দীপঙ্কর এসে একেবারে রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়েছে। বললে—ভাত হয়েছে নাকি?

—কেন রে? এত সকাল-সকাল ভাত কেন রে? কোথাও যাবি?

—হ্যাঁ।

মা বললে—তা আপিস থেকে খেটে খুটে এই এলি, আবার এখুনি কোথায় যাবি? কেউ ডাকতে এসেছে বুঝি?

দীপঙ্কর বললে—না, কেউ ডাকতে আসেনি—

—কিছছু বিশ্বাস নেই। যে-সব বন্ধু জুটেছে, সময় নেই অসময় নেই ডাকলেই হলো!

দীপঙ্করের মুখ দিয়ে এর কোনও জবাব বেরোল না। বললে—তুমি ভাত দেবে তো দাও, নইলে না-খেয়েই যাবো, এসে খাবো খন্!

—কেন রে, কী এমন জরুরী রাজকার্য এসে গেল এখন, যে এখুনি না গেলে নয়! এত রাতে আবার কোথায় বেরোবি!

—তা সব কথা তোমায় বলতে হবে নাকি?

মা যেন ছেলের কথায় একটু অবাক হয়ে গেল। এমন করে তো দীপু কখনও কথা বলে না। এমন সুরে তো আগে কখনও কথা বলেনি মা'র সংগে! মা চেয়ে দেখলে ছেলের মুখের দিকে! কী একটা কথা বলতে গিয়েও যেন মা'র মুখ দিয়ে কথাটা বেরোল না। দীপুর মুখের দিকে চেয়ে মা'র হঠাৎ মনে হলো দীপু যেন এখন বড় হয়ে গেছে! এখন যেন দীপুকে আর আগেকার মত শাসন দিয়ে বেঁধে রাখা যাবে না। দীপুরও একটা নিজস্ব মত বলে জিনিস তৈরি হয়েছে। দীপু এখন সত্যিই সাবালক।

দীপু একেবারে জামা-টামা পরে তৈরী। সত্যিই যেন সে বেরোবে বলে তৈরি হয়েই এসেছে। বললে—তাহলে একেবারে ফিরে এসেই খাবো। যদি আমার ফিরতে দেরী হয় তো আমার খাবার ঢাকা দিয়ে রেখো!

মা বললে—কিন্তু এত রাত্তিরে কোথায় যাবি তুই যে ফিরতে দেরি হবে?

—সে অনেক দূরে!

—তা এত রাত্তিরে অনেক দূরে না-গেলেই নয়! আবার বুঝি সেই স্বদেশী দলে মিশছিস্?

দীপঙ্কর এবার সত্যিই একটু রেগে গেল। বললে—মা, কাল তোমার না পা ছুঁয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি স্বদেশী আর করবো না, তবু তোমার বিশ্বাস হলো না?

মা বললে—আমি তোমার ভালোর জন্যেই বলি, নইলে আমার কী? আমি আর কদিন! একদিন তোমারও ছেলে-পুলে হবে, সেদিন বুঝবে বাবা সন্তান কী জিনিস—

কথাটার দিকে কোনও কান দিলে না দীপঙ্কর। সেই লেখার কথাটা মনে পড়লো। 'উদ্দেশ্য পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত চক্র ত্যাগ করিব না। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, গৃহ, পরিবার কাহারও স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ থাকিব না। নেতার আদেশে চক্রের কাজ বিনা-প্রতিবাদে করিয়া যাইব। যদি এই শপথ পালনে অক্ষম হই, তবে পিতা, মাতা, ব্রাহ্মণ ও সর্বদেশের দেশ-প্রেমিকদের অভিশাপ যেন আমাকে ভস্ম করিয়া ফেলে।'

—দেখিস, যেন বেশি রাত করিস নি! তুই বাড়ি না-এলে আমার ঘুমই আসবে না!

এতদিন সংসারের কাছ থেকে কেবল বাধাই পেয়ে এসেছে দীপঙ্কর। প্রতি পদে পদে বাধা। কোনও কাজই স্বাধীনভাবে করতে দেয়নি মা। ছোটবেলা থেকে সুরু করে চিরকাল কেবল নিষেধ আর বারণ। নিষেধের আর বারণের বেড়াজালে ঘিরে রেখে দিয়েছে তাকে। তাই বোধহয় দীপঙ্কর শান্তি চেয়েও শান্তি পায়নি কোথাও। সংসারের কোথাও একটু আশ্রয় জোটেনি তার। অফিসে রবিনসন সাহেবের আশ্রয়ের মধ্যে এসেও মিস্টার ঘোষালের দৌরাত্ম্য তাই বোধহয় তাকে বিচলিত করেছে। তাই-ই হয়ত বাইরে কিরণের সংগে মিশে, কিরণের সাহচর্য পেয়েও কিরণকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনি। তাই বোধহয় সতী তাকে সন্দেহ করে এসেছে। তাই বোধহয় লক্ষ্মীদি এতদিন তাকে দূরে ঠেলে রেখেছে!

সত্যিই অনেক দূর। পকেট থেকে চিঠিটা বার করে আবার ঠিকানাটা দেখে নিলে দীপঙ্কর। একেবারে বালিগঞ্জের শেষ প্রান্তে। গড়িয়াহাটার মোড় পর্যন্ত ট্রাম। তারপর পায়ে হাঁটা। একেবারে সোজা দক্ষিণ দিকে হেঁটে হেঁটে চললো দীপঙ্কর। দু'একটা ছাড়া বাড়ি। একেবারে অন্য চেহারা হয়ে গেছে এ-দিকটা। একটা লেক্ হয়েছে এদিকে। গাছে গাছে ভর্তি। লম্বা-লম্বা তাল-গাছের জংগল। কয়েকটা বাড়ি উঠছে। এখনও জংগল সাফ হয়নি ভাল করে। রাস্তা দিয়ে মোষের গাড়ি চলেছে। সার সার। ক্রমে রাস্তার আলো কমে এল। কয়েকটা মুদিখানার দোকান। তারপর বাঁ দিকে জলা-জমি। জলের ওপর কচুরি-পানার ভিড়।

চলতে চলতে একেবারে গড়িয়াহাটা রেলের লেভেল-ক্রসিং-এর ওপর গিয়ে পড়লো। এখানে রেলের লাইনটা উত্তর দিক থেকে বেঁকে এসে সোজা পশ্চিম দিকে চলে গেছে। গেট্টা বন্ধ। বন্ধ লেভেলক্রসিংটার সামনে সার-সার মোষের গাড়ি দাঁড়িয়ে

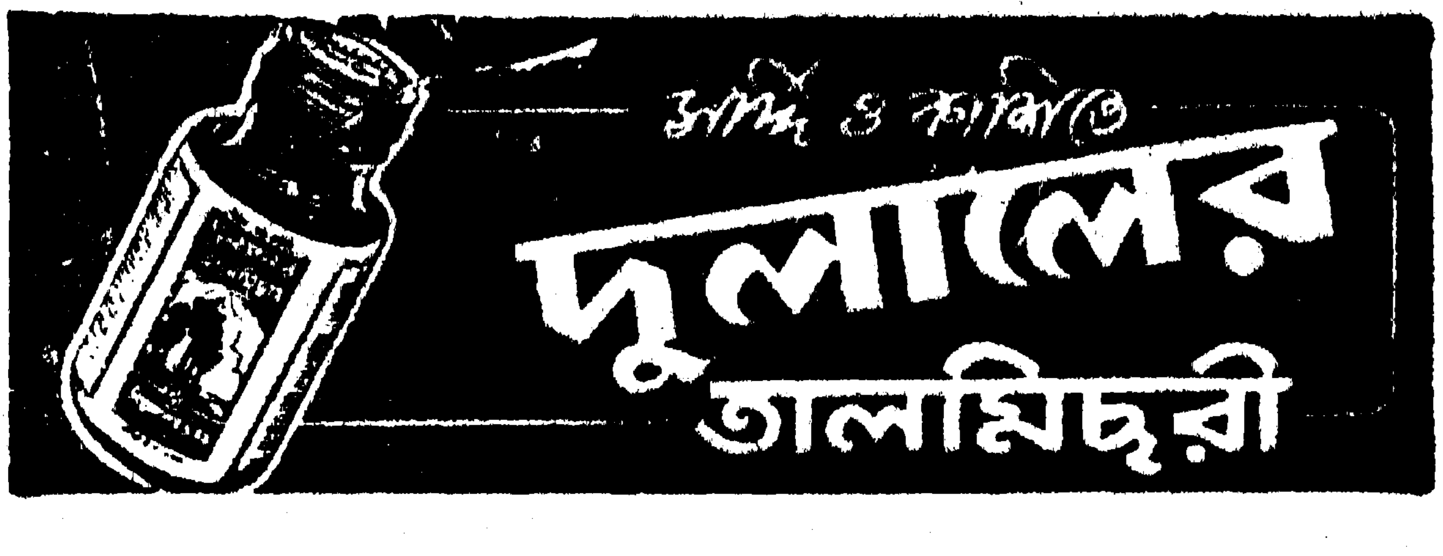

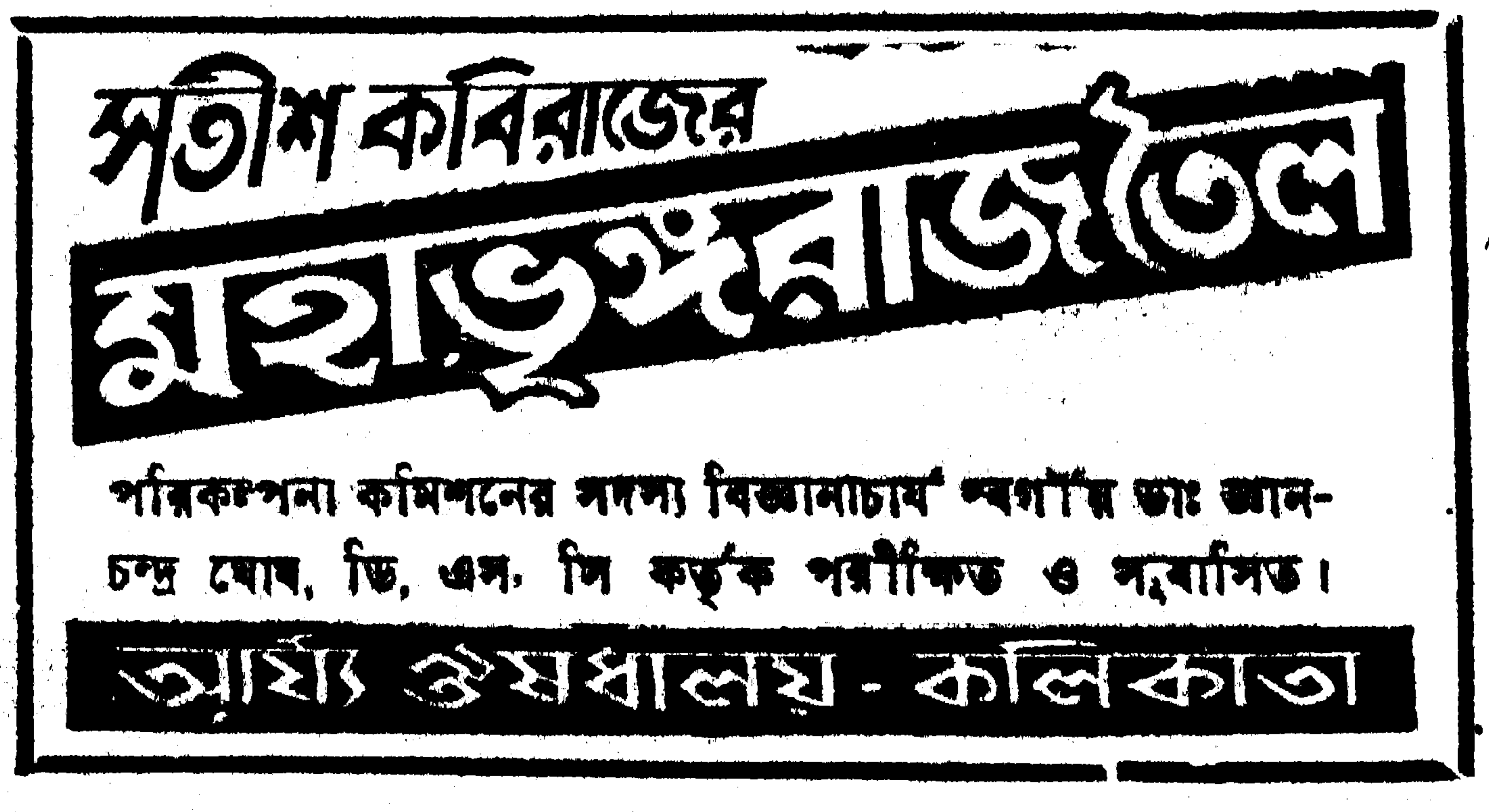

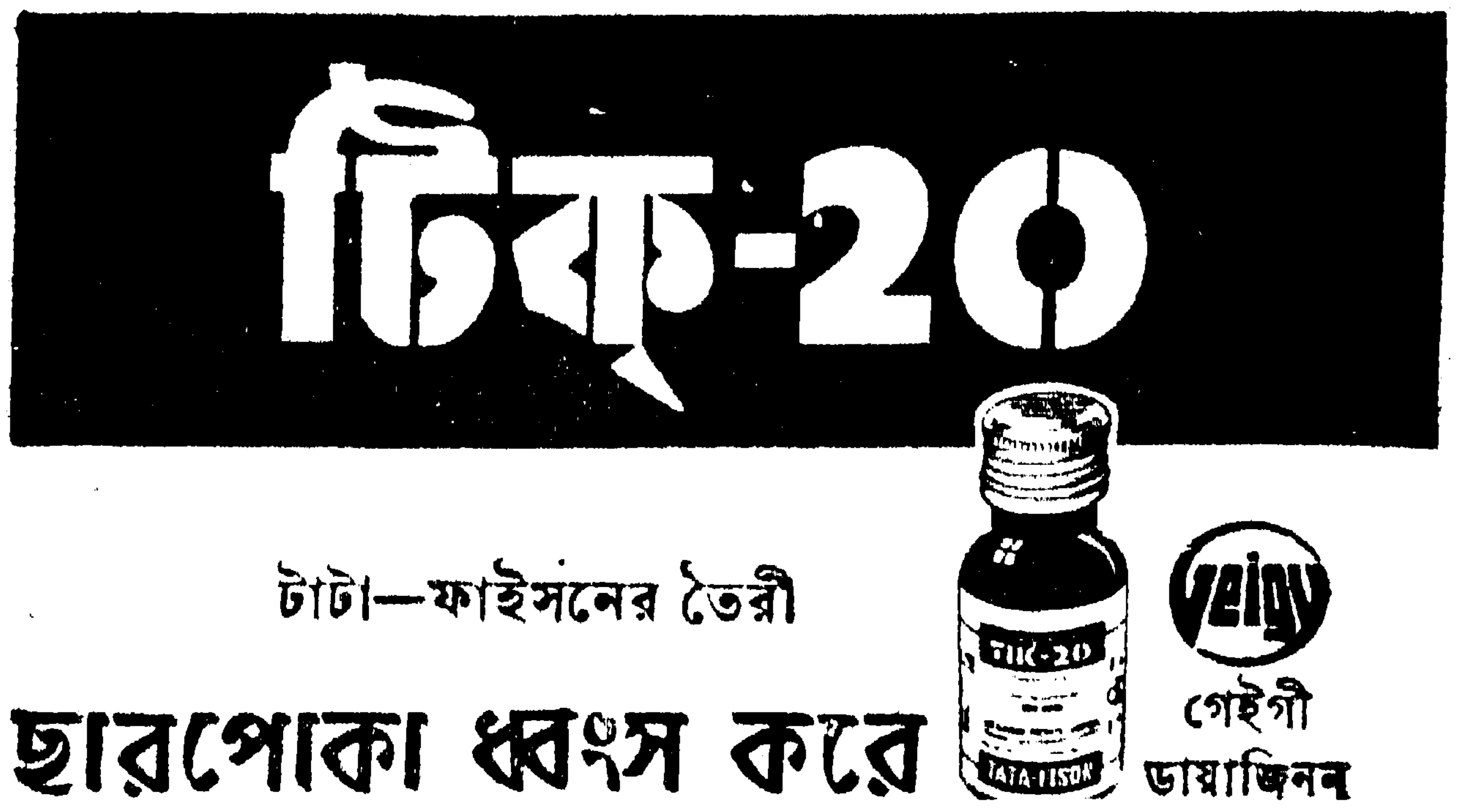

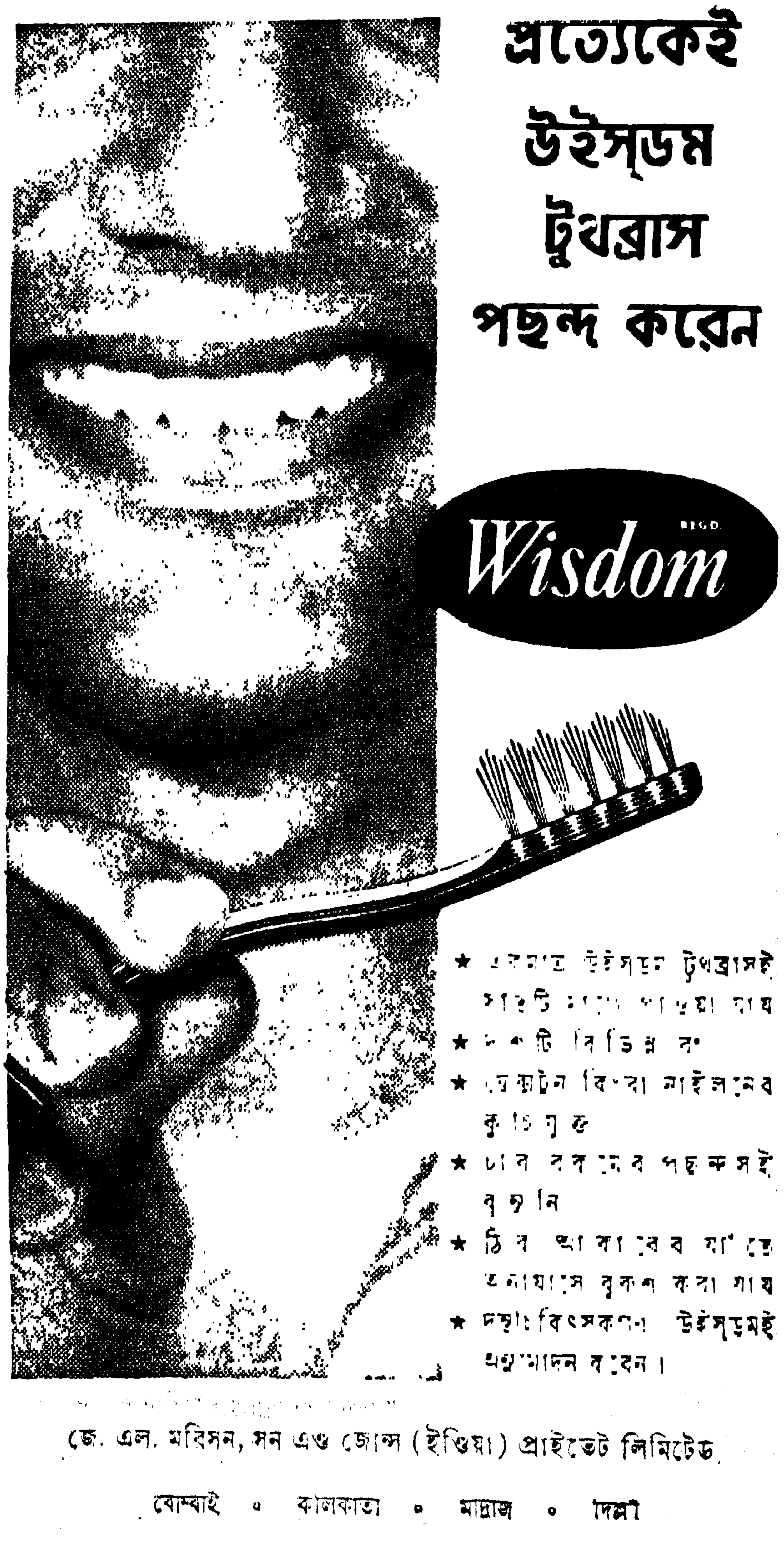

আছে। একটা লাল-আলো জ্বলছে গেটের গায়ে। পাশেই লম্বা নর্দমা। ব্যাং ডাকার শব্দ আসছে কানে। পাশেই হয়েছে একটা বুদ্ধমন্দির। মন্দিরের ভেতর থেকে পুজোর ঘণ্টার শব্দ আসছে ঢং—ঢং—

দীপঙ্কর চিনতে পারলে। ভূষণ দাঁড়িয়ে আছে। ভূষণ মালীর হাতে সবুজ হ্যাণ্ড্-সিগন্যাল ল্যাম্প্। রেলের গুমটিওয়ালা। গেটম্যান।

মাঝে-মাঝে দু'একবার ভূষণ গেছে হেড্-অফিসে! অনেকদিনের গেট-ম্যান। কোনও অ্যাক্সিডেণ্ট্ হলে সাক্ষী দিতে যায় ভূষণ। ঘোষাল সাহেবের কাছে গিয়ে দরবার করে। এদিকে বালিগঞ্জ ওয়েস্ট্ কেবিনের কেবিনম্যান করালীবাবুও চেনা লোক। আর স্টেশনমাস্টার মজুমদারবাবু আছে বালিগঞ্জ স্টেশনে।

হঠাৎ একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন হুপ্ হুপ্ করে চলে গেল। পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠলো থর থর করে। তারপর গেট্টা খুলে গেল। খুলে যেতেই গেটম্যান গেট্ খুলে দিলে।

অন্ধকারের মধ্যেই মোষের গাড়িগুলো সার-সার চলতে লাগলো। গলার ঠন-ঠন ঘণ্টা বাজছে সব।

দীপঙ্করও চলতে লাগলো। এখন ভূষণের সঙ্গে দেখা করার দরকার নেই। ভূষণ দেখলেই সেলাম করবে। রবিনসন্ সাহেবের কথা জিজ্ঞেস করবে, ঘোষাল সাহেবের কথা জিজ্ঞেস করবে। অনেক বাজে কথা বক্ বক্ করে বলবে! দীপঙ্কর গাড়িগুলোর পাশ কাটিয়ে একেবারে লাইনের ওপারে গিয়ে পড়লো। তারপর পকেট থেকে চিঠিটা আবার বার করলে। একটা আলোর তলায় ঠিকানাটা পড়ে নিয়ে আবার চিঠিটা পকেটে রেখে দিলে।

রাস্তার এক ভদ্রলোক বললে—কত নম্বর বললেন?

দীপঙ্কর বললে—তিপান্ন—

—ওই দিকে দেখুন, ওই বাড়িটা হলো পঞ্চাশ নম্বর—

এর পর আর খুঁজতে অসুবিধে হয়নি। অন্ধকারের মধ্যে একটা লম্বা তালগাছ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। তারই তলায় বাড়িটা। পাশেই একটা মাঠ।

বাড়ির দরজায় কড়া নাড়তেই লক্ষ্মীদি নিজে দরজা খুলে দিয়েছিল। অন্ধকারে প্রথমে একটু চিনতে কষ্ট হয়েছিল লক্ষ্মী-দির। এই ক'দিনের মধ্যেই যেন বড় হয়ে গিয়েছিল দীপঙ্কর। তা ছাড়া প্যাণ্ট পরা দীপঙ্করকে লক্ষ্মীদি চিনবেই বা কেমন করে?

—তোমার চিঠি এই এখুনি পেলাম লক্ষ্মীদি!

লক্ষ্মীদি বললে—আয় ভেতরে আয়—

(ক্রমশ)

সপ্তদশ অলিম্পিক

GOVERNMENT LIB… Cooch Behar

আধ্যনিক বিশ্ব অলিম্পিকের প্রবর্তক বিশ্বপ্রেমিক পিয়ের দ্য কুবার্তিন

আরবি

সারা দ্যনিয়ার য্ববশক্তি কাঁধে কাঁধ কদমে কদম মিলিয়ে সমবেত হয় মাত্র একটি উপলক্ষ্যে তার নাম অলিম্পিক গেমস্।

দ্যটি পাঁচটি মাতব্বর দেশ নয়, স্নায়্-য্দ্ধের নেতা অ্যাটম বোমার মালিক, ব্হত্তম রাষ্ট্র থেকে শ্র্ করে প্থিবীর ক্ষ্দ্রতম অবজ্ঞাত দেশ সবাই প্রতিনিধি পাঠায় এখানে। ক্টব্দ্ধি প্রৌঢ় বা জটিলব্দ্ধি ব্দ্ধের সমাগম নয় এখানে। অনবদ্য দৈহিক পট্তাসম্পন্ন খোলা মন তর্ণ-তর্ণীর সমাবেশ। রাষ্ট্রবিশারদ, মহাপন্ডিত বা বিরাট ব্যবসাদার নিয়ে যে ম্ষ্টিমেয় সমাজ, সে সমাজের লোক নয় এরা। একেবারে সাধারণ মান্ষের দল, সমাজের নিচের তলায় যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় বাস করে এরা তাদের প্রতিনিধি।

একই আদর্শে অন্প্রাণিত হয়ে পাশা-পাশি বাস করে এরা দ্'সপ্তাহ কাল। ভাষার ভেদ সত্ত্বেও একইভাবে অন্প্রাণিত হয়ে এরা একাত্ম হয়ে যায় সমবেত অন্শীলনে। তারপর তীব্র প্রতিযোগিতা চালায় একই লক্ষ্যে।

সে লক্ষ্য মহান। মান্ষ কি করে ত্বরীয়ান তুঙ্গীয়ান ও তেজীয়ান হবে তার সাধনা। এতদিন মান্ষ যত দ্রুতে ছ্টতে পেরেছে তার চেয়েও জোরে ছ্টতে হবে, যত উঁচুতে লাফিয়ে উঠতে পেরেছে ছাড়িয়ে যেতে হবে সেই সীমা তেজ ও শক্তির পরীক্ষায় সবাইকে পিছনে ফেলে।

এই সাধনা শ্ধ্ হয়েছে অনেক আগে স্বগ্হে ও স্বদেশে। চার বছর ধরে অন্শীলন চলেছে আত্মোন্নতির। প্র্বতন রেকর্ডগ্লির উদ্ধত চ্যালেঞ্জ ভাঙবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা হয়েছে। তারপর অলিম্পিকের ক্ষেত্রে এসে শপথ নিয়েছে: সমস্ত নিয়ম-কান্ন মেনে নিয়ে স্বদেশের ও খেলাধ্লার গৌরব ব্দ্ধির জন্য আমরা এখানে অংশ গ্রহণ করবো।

কত খেলা কত কসরত, সব দেহকুশলীর ঠাঁই আছে এখানে। জয়লাভের জন্য, সবার শীর্ষে ওঠবার আকাঙ্ক্ষায় প্রাণপণ করে সামান্যর জন্য বঞ্চিত হতে হয়েছে অধিকাংশ প্রতিযোগীকে। প্রস্কার আর পেয়েছে ক'জন। দেখাবার মত কৃতিত্বের স্মারক সঙ্গে নিয়ে যেতে পেরেছে মাত্র তিনজন করে মহাভাগ্যবান। তা বলে এখানে আসা ব্যর্থ হয়নি একজনেরও। সবাই গ্হজীবনে ফিরে যাবার সময় মহা-সম্পদ আহরণ করে চলেছে। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেও পরস্পর প্রীতির বন্ধনে জড়িয়েছে ওরা। কখনো ব্যক্তি-বিশেষের সঙ্গে, কখনো জাতির সঙ্গে জাতির, মান্ষের সঙ্গে মান্ষের প্রেমে হ্দয়ের ঘটংকায় প্র্ণ করে নিয়ে যাচ্ছে মহা-তীর্থ থেকে। প্রতিদিনের প্রতিক্ষণের তীব্র সংগ্রামের মধ্য যা শিক্ষালাভ করেছে চোখের সামনে সদা বিরাজমান অলিম্পিকের সেই মর্মবাণী গেঁথে নিয়ে চলেছে হ্দয়ে:

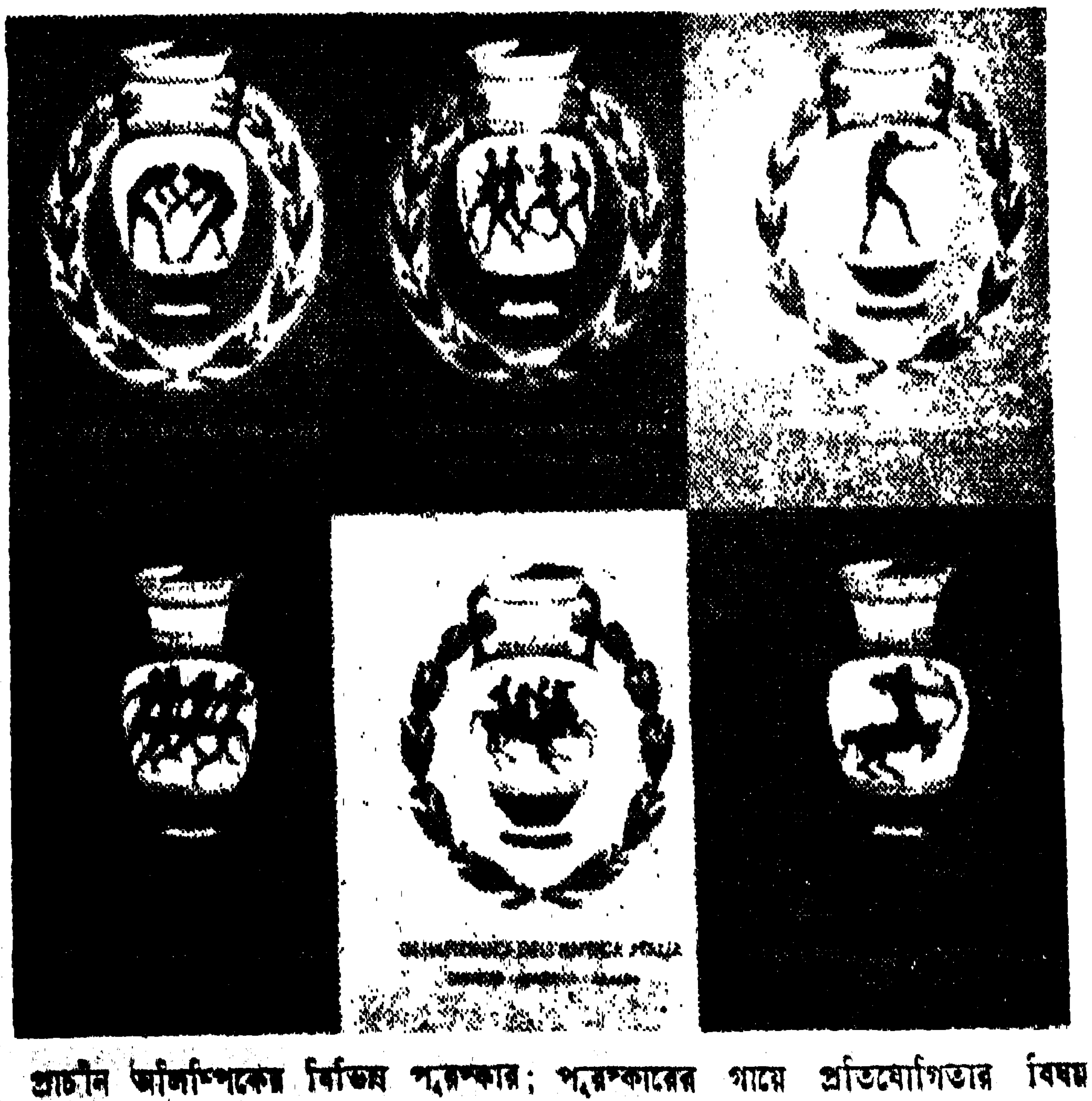

প্রাচীন অলিম্পিকের বিভিন্ন প্রস্কার; প্রস্কারের গায়ে প্রতিযোগিতার বিষয় খোদাই করা রয়েছে

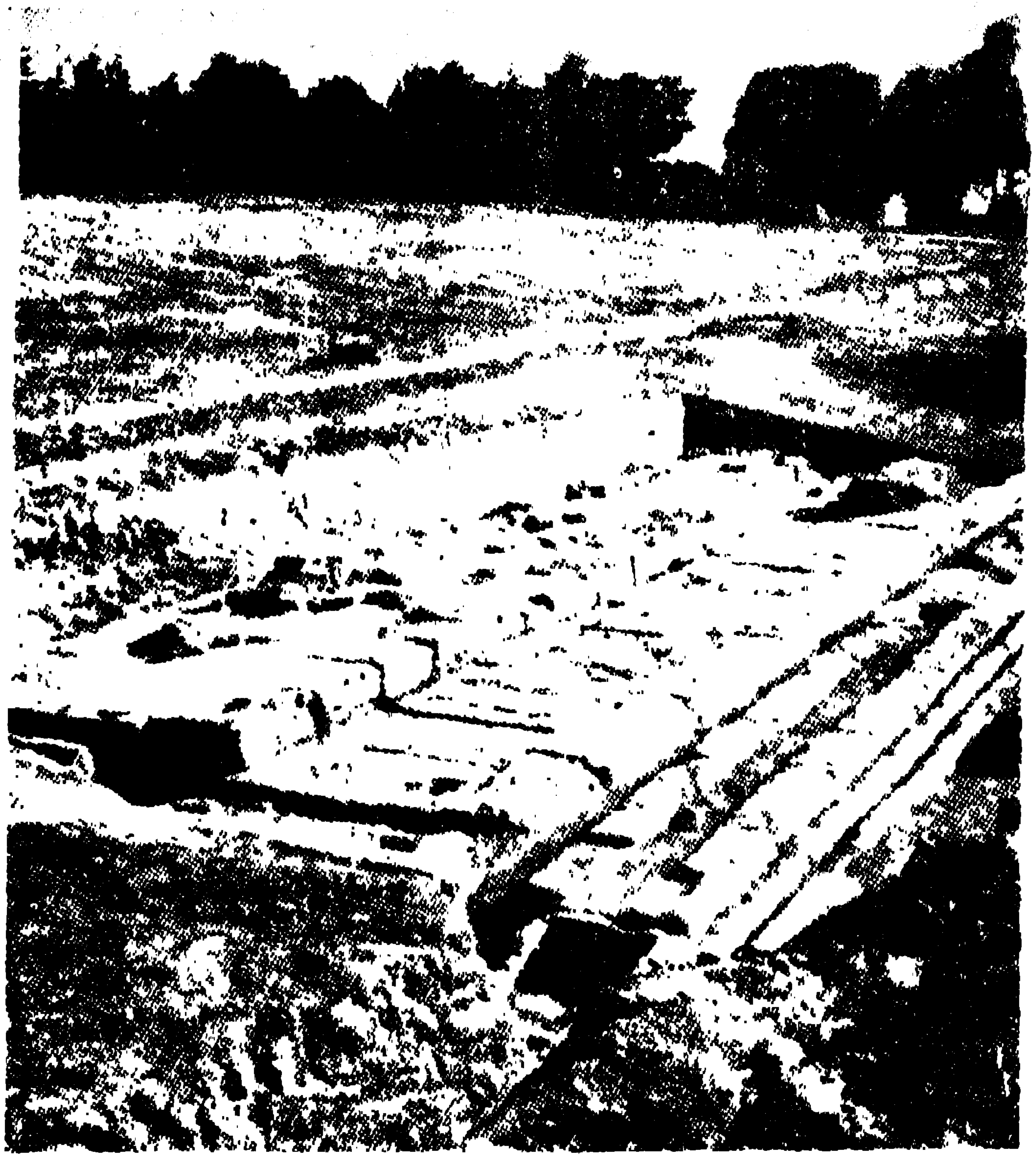

অলিম্পিয়া প্রান্তরে আড়াই হাজার বছর আগেকার ধ্বংসপ্রাপ্ত অলিম্পিক স্টেডিয়ামের শ্বেত মর্মর আসনের সারি মাটির তলা থেকে খ‍ুঁড়ে বের করা হচ্ছে। বার্লিন অলিম্পিকের প্রস্তুতি কমিটির সেক্রেটারী ডাঃ কার্ল ডায়ামের জন্মদিনে সংগৃহীত অর্থ থেকে চলছে প্রাচীন অলিম্পিকের গবেষণা

জয়লাভ নয় যথাসাধ্য সংগ্রাম করে যাওয়ার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা। কর্মেই অধিকার, ফলের লোভ ত্যাগ করতে হবে।

অলিম্পিক গেমস্‌ ও তার আদর্শ সাময়িক ফ্যাশান বা যুগধর্ম মাত্র নয়।

তিন হাজার বছর আগে সারা ইয়োরোপ যখন আদিম বর্বরতায় আচ্ছন্ন তখন সেই মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশের ক্ষুদ্র এক ভূখণ্ডে গ্রীকজাতি নিরন্তর আত্মকলহের মধ্যেই চালিয়েছিল গণতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কেমন করে প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিত্বকে অবাধ বিকাশের পথ করে দেওয়া যায়। তার সঙ্গে তারা আরও প্রয়াস পেয়েছিল দেহ, মন ও মগজ এই তিনটির সুসমঞ্জস বিকাশে মানুষ কি করে পরিপূর্ণ জীবনের অধিকারী হতে পারে।

এই গ্রীক জাতির সংস্কৃতি ও দর্শন রোমান সাম্রাজ্যের মারফত আহরণ করেই পরবর্তী ইয়োরোপীয় সভ্যতার জন্ম। কিন্তু গ্রীসের কাব্য, নাটক, দর্শন ও শিল্পরীতি সমগ্র ইয়োরোপীয় সংস্কৃতিকে অনুপ্রাণিত করলেও, সে সবের আবেদন সুধীমহলেই সীমাবদ্ধ। ইয়োরোপীয় সভ্যতার বাইরে এগুলি স্বভাবতই লাইব্রেরীর অলংকরণ।

কিন্তু প্রাচীন গ্রীকজাতির জীবনবোধ প্রকাশের প্রধান মাধ্যম ছিল যে 'অলিম্পিক গেমস্‌' তা আজও সারা দুনিয়ার জনগণকে অনুপ্রাণিত করছে।

এবার রোমে যে অলিম্পিক গেমস্‌-এর চতুর্বার্ষিকী অনুষ্ঠান বসছে বর্তমান যুগের

রোম অলিম্পিকের প্রতীক। নেকড়ে মাতার স্তন্যপানরত রোমুলাস ও রিমাসের ছবি, সঙ্গে অলিম্পিক বলয়

হিসেবে পুনঃ-প্রবর্তনের তারিখ থেকে তা সপ্তদশ হলেও আসলে সেটি ৩০৯তম অলিম্পিক অনুষ্ঠান এবং তাও যে বছর থেকে দলিল রাখা হয়েছে সেই বছর থেকে গণনায়। মাঝখানে বাদ পড়ে গেছে ১৪০২ বছর। সব হিসেব করে দেখলে জানা যায় জন্মপত্রিকা অনুযায়ী অলিম্পিকের জন্ম হয়েছিল ২৭৩৬ বছর আগে।

এর আগেও যে গ্রীসে 'অলিম্পিক গেমস্‌' অনুষ্ঠিত হয়েছে তার কিছু কিছু প্রমাণ আছে। তবে ৭৭৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দে এলিসের নাগরিক করীবাস যে বিজয়ীর মুকুট লাভ করেছিলেন তারপর থেকে ধারাবাহিক হিসেব পাওয়া গেছে। আজ আমরা প্রাচীন গ্রীক ইতিহাসের বর্ষগণনা করি খৃষ্টাব্দ প্রবর্তনের কত বছর আগে তাই দিয়ে, কিন্তু খৃষ্টের কোন খবর জানবার সুযোগই যাদের ছিল না, তাদের নিজস্ব বর্ষগণনা ছিল অলিম্পিকের চতুর্বার্ষিকী দিয়ে। প্রতি চার বছর অন্তর অলিম্পিক গেমস্‌ অনুষ্ঠিত হত, কোন কারণেই তা স্থগিত বা বাতিল হয়নি একবারের জন্যও। আর কোন্‌ সংখ্যক অলিম্পিয়াডের কত বছরে এই দিয়ে নিরূপিত হত তাদের ঘটনার কাল।

অজস্র পাহাড়ী প্রাচীর ও তীব্রস্রোত নদী-দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট স্বাধীন নগর-রাষ্ট্রের দেশ ছিল গ্রীস। গ্রীসও উত্তর-কালের বিজেতা রোমের দেওয়া নাম। নিজেদের দেশকে বলতো ওরা হেলাস। এইসব নগররাষ্ট্রের মধ্যে এতটুকু মিল ছিল না। পরস্পর ঈর্ষা ও কলহ তো ছিলই, প্রত্যক্ষ সংগ্রামও চলতো প্রায়ই।

তবু চার বছর বাদের অলিম্পিকের সময় যখন এগিয়ে আসে, দিকে দিকে ছোটে দূত, ঘোষণা করে এবার কদিনের মত অস্ত্র-শস্ত্র পরিহার কর, যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বন্দ্ব কলহ স্থগিত থাকুক কিছুদিন, অলিম্পিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হবে সবাইকে।

দক্ষিণ গ্রীসের উত্তর পশ্চিম অংশে এলিস প্রদেশে অধিষ্ঠিত অলিম্পিয়ায় ছিল এই সারা গ্রীসের চতুর্বার্ষিকী জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার স্থায়ী কেন্দ্র। একদিকে অ্যালফিয়াস ও ক্লাডিয়াস নদীর সংগম, অন্য তিন দিকে সবুজ গাছপালায় ছাওয়া হেলান দেওয়া পাহাড়। আর তারই মাঝখানে সমতল ভূমি অলিম্পিয়া, স্থান-সৌন্দর্যে দেবতাদের বিচরণের উপযুক্ত।

পশুধর্মী মানবদেহে দেবরূপ দান, জৈব আনন্দ স্ফূরণের ভিতর দিয়ে সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ লাভের মহৎ সাধনার পূত শিখা মানব হৃদয়ে সর্বপ্রথম জ্বলে ওঠে অলিম্পিয়ার ওই দেবাবিহার ক্ষেত্রে। সমতল ক্ষেত্রের উত্তরে পাইন গাছ ঘেরা তেকোণা ক্রোনিয়ান পাহাড়, আর তারই তলায়

অলিভের পবিত্র বাগান অ্যাল্টিস। এই অ্যাল্টিসে ছিল দেবরাজ জিয়ুসের মন্দির, মন্দির ঘিরে অন্যান্য বহু দেবতার সমাবেশ। সমতল ভূমিরই অপর দিকে নদীমোহানার সন্নিকটে ছিল ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে দেখা গেছে সেখানে ১৯২ মিটার দৌড়ের ট্র্যাক ঘিরে ছিল স্টেডিয়াম, তাতে ষাট হাজার লোকের বসবার ব্যবস্থা ছিল। স্টেডিয়ামের পাশেই ছিল হিপোড্রোম বা ঘোড়ায় টানা রথের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র। সে হিপোড্রোমের পরিধি এবং জাঁকজমক আজকের অনেক আমেরিকান ঘোড়দৌড়ের মাঠকেও লজ্জা দেয়।

আসলে অলিম্পিক গেমস্ ছিল দেবরাজ জিয়ুসের উৎসবের অংগ বিশেষ। প্রতিজ্ঞাভংগের শাস্তিদাতা দেবতা জিয়ুসের নামে তাঁর কাছে বলি দেওয়া মোষের রক্তাপ্লুত দেহ স্পর্শ করে শপথ নিতে হত প্রতিটি প্রতিযোগীকে।

শপথের প্রথম কথা ছিল আমি অবিমিশ্র গ্রীক রক্তের অধিকারী এবং শপথের পরেও সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে প্রমাণ করতে হত তার দাবি। কোন রকম আবরণই চলতো না অলিম্পিক প্রতিযোগীদের এবং বোধ হয় সেই জন্যই নারীর ঠাঁই ছিল না সেখানকার দর্শকাসনে পর্যন্ত।

নারীকে আসতে না দেওয়ার আরও কারণ ছিল। মধ্য নিদাঘের দ্বিতীয় পূর্ণিমার দিন যখনই এগিয়ে আসে কাতারে কাতারে লোক আসতে থাকে অলিম্পিয়ায়। প্রতিযোগীরা তো আসেই, দৌড়, রথ চালনা, কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, বর্শানিক্ষেপ, পেন্টাথলন বা পাঁচটি বিষয়ের চৌকস কসরতের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। তাছাড়া কবি আসে কাব্য নিয়ে, শিল্পী আসে তার শিল্পসম্ভার দেখাতে, বিজ্ঞানী আসে তার নতুন আবিষ্কারের কথা জানান দিতে, বেপারীরা আসে তাদের নানান্ রকম সওদা নিয়ে। নিছক দর্শক আসে কাতারে কাতারে। সারা দক্ষিণ ইয়োরোপ জুড়ে গ্রীক উপনিবেশ ছড়িয়ে আছে, ভূমধ্যসাগরের বুকের দ্বীপগুলিতে, ওপারে আফ্রিকায়, ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপময় সেতু জুড়ে, এশিয়া মাইনের সাগরকূলে সারি দিয়ে। সব জায়গা থেকে আসে গ্রীস রক্তের মানুষ। কিন্তু এত মানুষ থাকবে কোথায়? কোন ঘর বাড়ি নেই, সাময়িক ছাউনিও ওঠে না। মুক্ত আকাশেরই তলায় গাদাগাদি করে শুয়ে রাত কাটাতে হয় সবার। এর মধ্যে কি মেয়েদের আসতে দেওয়া যায়?

কঠোর আইন করে মেয়েদের আসা বন্ধ করা হয়েছিল অলিম্পিকে একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবী ডিমিটারের নারী পুরোহিত ছাড়া। যদি কাউকে দেখা যায় নিষেধ অমান্য করে এসে বসেছে, শাস্তি হবে প্রাণদণ্ড, পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে ফেলে দেওয়া হবে তাকে।

আধুনিক অলিম্পিকের স্বর্ণপদক

এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও ধরা পড়ে গেল এক নারী, দর্শকাসনে ভিড়ের মধ্যে বসে আছে। বললে শাস্তি নিশ্চয়ই নেব। কিন্তু প্রতিযোগিতার শেষে, নইলে আমার ছেলে জিততে পারবে না প্রতিযোগিতায়। মা-ই তো ছেলের সবচেয়ে বড় প্রেরণা। নিজের প্রাণ দিয়েই সে অলিম্পিকের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল মেয়েদের জন্য।

কেন এবং কি করে যে অলিম্পিক গেমস্ প্রথম শুরু হয়েছিল তার অনেক কাহিনীই আছে, তবে সে সবই উপকথা ও কিংবদন্তী। দেবরাজ জিয়ুস পৃথিবীর প্রভুত্ব পাওয়ার জন্য যখন অলিম্পিয়ার মাঠে ক্রোনসকে মল্লযুদ্ধে পরাজিত করেন, সেই থেকে অলিম্পিক

অলিম্পিকের প্রথম ম্যারাথন বিজয়ী মেষপালক এ্যাথলেট স্পিরিডন লোয়েস

গেমসের শুরু। অপর এক মত অনুযায়ী হেরাক্লিস গ্রীসের যুদ্ধরত বিভিন্ন দল ও জাতির ভিতর শান্তি আনবার জন্যই এই অনুষ্ঠান প্রবর্তন করেন। ইতিহাস আর পিণ্ডারের কাহিনী মত অলিম্পিয়ার শাসনকর্তা ওয়েনমাসের সুন্দরী কন্যা হিপোডামিয়ার তেরজন পাণিপ্রার্থী নিহত হলে পর পেলোপ যখন অভীষ্ট লাভ করে ওয়েনমাসকে হত্যা করে পেলোপের সেই জয়লাভ ও সার্থকতার স্মারক হিসেবেই অলিম্পিক প্রবর্তিত হয়। এই কাহিনী অনুসারে খৃস্টজন্মের এগারশ বছর আগে থেকে অলিম্পিক নিয়মিত চলছিল। তার পর কোন এক সময় পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহের দরুণ অলিম্পিক বন্ধ হয়ে যায়। গ্রিকদের আত্মকলহের সুযোগে গ্রীসের বাইরের শক্তিশালী জাতিগুলি দক্ষিণ গ্রীস বা পেলোপোনাসের অনেক অংশ দখল করে বসে। সেই সময় ডেলফী মন্দিরের সমাধিমগ্না পূজারিণী যুদ্ধরত ও ক্ষতবিক্ষত গ্রীসের বিভিন্ন দলের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় হিসেবে অলিম্পিক পুনঃপ্রবর্তনের দৈববাণী ঘোষণা করেন। তারই ফলে ৭৭৬ খৃস্টপূর্বাব্দে অলিম্পিক ধারার শুরু।

পাঁচদিন ধরে চলতো অনুষ্ঠান। শেষ দিনে পূর্ণবর্ম ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রচার করা হত স্থগিত যুদ্ধবিগ্রহ আবার আরম্ভ করার সময় এসে গেছে।

অলিম্পিক বিজেতার প্রাপ্য পুরস্কার ছিল অ্যানাটিস যুদ্ধ থেকে আহৃত বন্য অলিভপাতার একটি মুকুট আর একটি তালবৃন্ত। কিন্তু যে সম্মানে সে ভূষিত হত নিজ নগররাষ্ট্রে, তার সীমা পরিসীমা ছিল না। বিজয়ী সমারোহে নগর প্রবেশ করতো, তারপর নগরদেবতাকে নিবেদন করতো মুকুট। প্রতিটি সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তার ছিল বিশেষ সম্মানের আসন। তার নামে কবিতা রচিত হত এবং অ্যাল্টিসে দেবতা সমাবেশে প্রতিষ্ঠিত হত তার মূর্তি। এথেন্সের বিখ্যাত বিধানকার শোলোন অলিম্পিক বিজেতার জন্য আমরণ পেনশানের ব্যবস্থা করেছিলেন। পেনশানের ব্যবস্থা না থাকলেও কোন অসুবিধা হত না। বিজয়ীর স্বরাষ্ট্রবাসীদের গৌরবে নাগরিকসাধারণ তার সারাজীবনের দায়িত্ব বহন করতে এগিয়ে আসতো।

একদিন আত্মকলহপরায়ণ গ্রীস রোমের পদানত হল। ক্ষুদ্র শহর রোম। কিংবদন্তী মত ঈর্ষাপরায়ণ পিতৃব্যের হাতে নিহত রিহা সিলভিয়ার নবজাত যমজ সন্তান রিমাস ও রোমুলাস টাইবারের জলে ভাসতে ভাসতে এসে এক পাহাড়ের গায়ে ঠেকে। এক নেকড়েমাতা তাদের স্তন্য দান করে

উত্তর প্রদেশের সংস্কৃতির চার হাজার বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায় ভারতীয় আর্যসভ্যতার যুগে। পরাক্রান্ত মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে শিল্প ও সংস্কৃতিতে এক নতুন ধারার সুরু হ'ল। বাদশাহী আমলের জাঁকজমক ও শিল্পবোধ অমর হ'য়ে রইল মোগল স্থাপত্য, চিত্রকলা ও সঙ্গীতের মধ্যে। বিরাট কল্পনা ও সূক্ষ্মতম কারিগরীর অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে মোগল স্থাপত্যে—কালজয়ী এই সব সৃষ্টি আজও সারা পৃথিবীর বিস্ময় জাগায়।

ভারতবর্ষের যেখানেই যান, লাল পাথরের গড়া ফতেপুর সিক্রীর নিস্তব্ধতা থেকে তাজমহলের অকলঙ্ক শুভ্রতা পর্যন্ত সর্বত্রই আপনার স্মরণীয় মুহূর্তগুলোকে আরও উপভোগ্য ক'রে তুলবে উইলস-এর গোল্ড ফ্লেক সিগারেটের অতুলনীয় স্বাদগন্ধ।

গোল্ড ফ্লেকের চেয়ে

ভালো সিগারেট কোথায় পাবেন

৫০ টার দাম ৪ টাকা • ২০ টার দাম ১ টাঃ ৬০ নঃ পঃ • ১০ টার দাম ৮০ নঃ পঃ

দি ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত

ওরা বড় হয়ে ওঠে এক মেষপালকের গৃহে। লোকমুখে ওদের খবর পেয়ে ক্রুদ্ধ মাতামহ তাঁর ভাইকে হত্যা করে দৌহিত্রদের সেই রাজ্য দেন। রিমাস ও রোমুলাস নতুন নগরী পত্তন করে টাইবারকূলের সেই পাহাড়ে। ইতিমধ্যে অবশ্য রিমাসের মৃত্যু ঘটেছে।

খুনী, অপরাধী, পলাতক আসামী সবাই আশ্রয় পাবে রোমে এই ঘোষণা করে বসতি বৃদ্ধি করা হল নগরে। মেলা আহ্বান করে সেবাইন সুন্দরীদের জোর করে আটকে রেখে তাদের সংগে ঘর বাঁধতে বাধ্য করা হল।

এইভাবে গড়ে উঠল রোম। ক্রমে সমগ্র ইতালী অধিকার করে ভূমধ্যসাগরের অপর পারে অবস্থিত তদানীন্তন পাশ্চাত্যজগতের শ্রেষ্ঠশক্তি কার্থেজকেও ধ্বংস করা হল। রোমান বাহিনী ছুটলো দিকে দিকে, সিরিয়া থেকে স্পেন, মিশর থেকে বৃটেন—রোমান সাম্রাজ্যের পতাকা উড়লো, সাগর ছেঁচে বেড়াতে লাগলো রোমান নৌবহর।

সেই রোমান শক্তির পদানত হয়েও একদিক দিয়ে গ্রীস তাদের জয় করলো। গ্রীক জীবনধারা গ্রহণ করলো রোম। অলিম্পিক অনুষ্ঠান শুধু চালু রাখলো এই নয়, যে অনুষ্ঠানে গ্রীক ছাড়া আর কাকেও যোগ দিতে দেওয়া হত না, সেখানে অংশ-গ্রহণের অধিকার দিল জাতিবর্ণধর্ম-নির্বিশেষে রোমান সাম্রাজ্যের সমস্ত প্রজাকে।

তবু সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অপরিহার্য দুর্নীতি এসে ঢুকলো অলিম্পিক প্রতিযোগিতায়, ঘুষ, জুয়াখেলা, সম্রাটের বিজয়ী হবার বদ খেয়াল। তা হোক, অলিম্পিক গেমসের ক্ষুদ্র গ্রীসসত্তা বিকাশ লাভ করলো বিশ্বজনীন সত্তায়।

এরপর উত্তর ইয়োরেশিয়ার বর্বরদের আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্য গেল ভেঙে। দ্বিখণ্ডিত পূর্বসাম্রাজ্যের অন্তর্গত হল গ্রীস। রোমান সাম্রাজ্য খৃস্টধর্ম গ্রহণ করলে। তারপর একদিন সম্রাটের খৃস্টান গোঁড়ামির ফলে প্রাচীন পেগান ধর্মের সব অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হল। অলিম্পিক গেমসও বাদ পড়লো না। ৩৯৪ খৃস্টপূর্বাব্দে ২৯২তম অলিম্পিয়াডই প্রাচীন যুগের শেষ অনুষ্ঠান। তাতে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল সাম্রাজ্যের আর্মেনিয়ান রাজা ভারাস্টাড। তারপর বর্বর আক্রমণে ধ্বংস হল অলিম্পিয়া। একাধিক ভূমিকম্পে পঁচিশ ফুট মাটির নিচে চাপা পড়ে গেল। নদী দুটির ধারা পর্যন্ত গেল সরে।

চতুর্দশ শতকে সারা ইয়োরোপে গ্রীক সংস্কৃতির নবজাগরণে যে ব্যাপক সাড়া পড়ে গিয়েছিল তাতেও অলিম্পিকের বাণী জাগে নি।

অলিম্পিকে ৯টি স্বর্ণপদকের অধিকারী 'ফ্লাইং ফিন' নামে অভিহিত ফিনল্যাণ্ডের অতুলনীয় এ্যাথলেট পাভো নুরমি হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে পুতাগ্নি প্রজ্বলিত করেছেন

যে বাণী পৌঁছলো উনিশ শতকের শেষ-দিকে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সের সামরিক শিক্ষায় ব্রতী ফরাসী অভিজাত যুবক পীয়র দ্য কুবার্তিনের কানে। কিছুদিন আগে জার্মান ও ফরাসীদের পরিচালিত খননের ফলে অলিম্পিয়ার ক্রীড়াক্ষেত্র তার সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও আত্ম-প্রকাশ করেছে। সবকিছু গুঁড়ো হয়ে গেছে, কিন্তু আড়াই হাজার বছরেরও বেশী আগে ডেলফীর মহিলা পুরোহিত যে দৈববাণী জানিয়েছিলেন যুদ্ধবিধ্বস্ত গ্রীকদের, ঊনবিংশ শতকের শেষাংশের ইয়োরোপের অনুরূপ অবস্থায় সেই বাণী বাজলো কুবার্তিনের কানে। তিনি সব রাষ্ট্রের কাছে আবেদন জানালেন: ঈর্ষালেশহীন মৈত্রী-মূলক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে চলবে ভবিষ্যতের দেশে দেশে অবাধ বাণিজ্য। আপনারা আমাকে অলিম্পিক গেমস পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করুন। সারা পৃথিবী গ্রহ হবে তার এলাকা।

সাড়া মিললো। সবাই মনেপ্রাণে সাড়া দিয়েছিল তা নয়। তবু ইয়োরোপ ও আমেরিকার অনেক দেশই প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল এক সম্মেলনে। সেখানে স্থির হল, ১৮৯৬ সাল থেকে প্রতি চার বছর অন্তর বসবে বিশ্বের অপেশাদার ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। কোথায় হবে প্রথম অনুষ্ঠান তা নিয়ে মতভেদ হয় না। গ্রীসের যা প্রাপ্য সম্মান অলিম্পিক আদর্শের উদ্গাতা ধারক ও বাহক হিসেবে তা দিতেই হবে তাকে। তাছাড়া গ্রীকরা নিজেরাই দু দুটো অলিম্পিক অনুষ্ঠান করেছে গত চল্লিশ বছরে। সেখানে অবশ্য না ছিল আদর্শ, না ছিল শৃংখলা, না ছিল তার ব্যাপকতা। তবু তার মধ্যে জাতীয় মহান ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠায় যে আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছিল তা অবহেলার বস্তু নয়।

প্রাচীন অলিম্পিয়া তো ধ্বংসস্তূপে তাই প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র এথেন্সে তৈরী হল নতুন স্টেডিয়াম গ্রীক ব্যবসায়ী আভেরফের অর্থানুকূল্যে।

গ্রীকদেরই ঈর্ষায় অলিম্পিকের নবজাত শিশুর মরণসংশয় জেগেছিল। এথেন্স যখন প্রাচীন গ্রীকদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এক দেশ থেকে কতকগুলি অগ্রীক এসে জিতে চললো প্রতিযোগিতার পর প্রতি-যোগিতায়, তখন গ্রীকদের প্রবল উৎসাহ প্রচণ্ড বিদ্বেষে পরিণত হবার মত। এমন সময়ে সেদিন এক গ্রীক মেষপালক, জীবনে যে কোনদিন দৌড় প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়নি, সে বিজয়ী হল গ্রীক ইতিহাসের

অলিম্পিকের অমর এ্যাথলেট 'জেসি' ওয়েন্স

এক অমর বীরত্ব কাহিনীর স্মারক ম্যারাথন রেসে। স্বয়ং যুবরাজ তাঁর সঙ্গে দৌড়লেন স্টেডিয়ামের অংশটুকু। বিরাট জনতা পাগল হয়ে গেল। সারাদেশ এগিয়ে এল উপহার ও পুরস্কার নিয়ে। এ বলে দেব বাড়ি করে, ও বলে দেব টাকার তোড়া। অন্য অনেকে বলে রাজার হালে বসিয়ে রাখবো। এক জুতোপালিশ করিয়ে ছোকরা সেও তার সাধ্যমত পুজোর অর্ঘ্য নিয়ে এল, সারাজীবন বিনা পয়সায় তোমার জুতো পালিশ করে দেব। বিজয়ী স্পিরিডন লোয়েসের কিন্তু এত ঝামেলা ভালো লাগে না। সে ফিরে গেল তার নিরুপদ্রব মেষপালনে।

কিন্তু অলিম্পিক গেমস বেঁচে গেল। তবু আবার যখন গ্রীস আব্দার ধরলে বরাবর তাদেরই দেশে অনুষ্ঠিত হবে তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী অলিম্পিক গেমস তখন আবার সংকট দেখা দিয়েছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির আবর্তে পড়ে এবং ১৯০৬ সালে প্যান হেলেনিক গেমস এর বিরাট ব্যয়ভারে বিব্রত হয়ে শেষ পর্যন্ত গ্রীক ছেড়ে দিল তার আব্দার। কুবার্তিনের আদর্শে চার বছর অন্তর অন্তর অলিম্পিক গেমস নগর থেকে নগরে স্থানান্তরিত হয়ে বিশ্বপরিক্রমা করবে, বিকীর্ণ করবে অলিম্পিকের আলো পৃথিবীর নিভৃততম কোণে—সে ব্যবস্থা স্থায়ী হয়ে গেল।

সেই থেকে চলেছে অলিম্পিকের বিশ্ব-পরিক্রমা। এথেন্স থেকে প্যারিস, প্যারিস থেকে সেণ্ট লুই (আমেরিকা)। তারপর লণ্ডন–স্টকহোম–আণ্টোয়ার্প হয়ে আবার প্যারিস। সেখান থেকে আমস্টার্ডাম—লস এঞ্জেলস—বার্লিন—হয়ে লণ্ডনে এসেছে দ্বিতীয়বার। অবশেষে হেলসিংকি হয়ে গিয়েছে দক্ষিণ গোলার্ধে মেলবোর্নে। এবার এসে থেমেছে রোমে, রোম থেকে যাত্রা করে অলিম্পিকের সদা ভ্রাম্যমাণ রথ এশিয়া ভূখণ্ডে প্রথম পদার্পণ করবে ১৯৬৪ সালের টোকিও অনুষ্ঠানে।

এক বিষয়ে আধুনিক অলিম্পিক প্রাচীন অলিম্পিকের কাছে হার মেনেছে। প্রাচীন অলিম্পিক কোনমতেই বাদ থাকতে পারতো না, বরং অলিম্পিকের প্রয়োজনে নিজেদের খণ্ডযুদ্ধবিগ্রহই স্থগিত রাখতো। বর্তমান যুগে খণ্ডযুদ্ধের স্থান নেই। সর্ববিধ্বংসী বিশ্বব্যাপক যুদ্ধে অলিম্পিক গেমসকেই আত্মগোপন করে থাকতে হয়। তাই ১৯১৬ সালের বার্লিন অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৯৪০ সালের অনুষ্ঠান প্রথমে টোকিওতে হবার কথা ছিল। চীনের সঙ্গে যুদ্ধরত জাপান অক্ষমতা জানানোয় হেলসিঙ্কিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু ইয়োরোপ আবার জড়িয়ে পড়ে মহাযুদ্ধে। ১৯৪৪ সালে পরবর্তী অলিম্পিক অনুষ্ঠানের চিন্তাই করতে পারেনি কেউ।

যে তিনটি বাদ গেছে তা হল ষষ্ঠ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ এবং সেই হিসেবেই এবার রোমে সপ্তদশ অনুষ্ঠান।

রোমের মাধ্যমেই গ্রীক সভ্যতার সবকিছু লাভ করেছিল বর্তমান ইয়োরোপ—রোমান সাম্রাজ্য ভেঙে যার উৎপত্তি। তবু আধুনিক জগতে প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতির সবচেয়ে জনপ্রিয়, সবচেয়ে বিশ্বজনীন অবদান

উপর্যুপরি দুটি অলিম্পিকের ডেকাথলন চ্যাম্পিয়ান চৌখস অ্যাথলেট বব ম্যাথিয়াস

প্রত্যক্ষভাবে এসেছে ফরাসীদের প্রচেষ্টায়। রোম এতে কোন বিশেষ অংশ গ্রহণ করতে পারেনি। অলিম্পিক আন্দোলনের প্রথম যুগে দুর্বল ইতালী শক্তিমান প্রতিবেশীদের ভয়ে ভীত। তাই ১৯০৮ সালে চতুর্থ অলিম্পিক অনুষ্ঠানের অধিকার পেয়েও তা ছেড়ে দিতে হয়েছিল।

প্রাচীন অলিম্পিকের সঙ্গে বর্তমান অলিম্পিকের একাধারে পার্থক্য ও যোগসূত্র ম্যারাথন রেস। বিরাট পারসীক বাহিনী যখন গ্রীক আক্রমণের জন্য ম্যারাথনে এসে হাজির হয়েছিল তখন মুষ্টিমেয় এথেনীয়ান সৈন্য তাদের পরাজিত করে তাড়িয়ে দিয়েছে, গ্রীস বেঁচে গেছে সর্বনাশা বিপদ থেকে। সেই সংবাদ দৌড়ে গিয়ে এথেন্সে পৌঁছে দিয়েছিল অলিম্পিক দৌড়বীর ফিডিপাইডিস। সৈন্য সংগ্রহ ও সমবেত প্রতিরোধের আহ্বান নিয়ে এথেন্স থেকে স্পার্টা অবধি একাধিকবার দৌড়েছে সে, তারপর মারাথন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে। অবসন্ন দেহ নিয়ে ম্যারাথন থেকে এথেন্সের চব্বিশ মাইল পথ ঠিক এসেছিল সে। কিন্তু 'আমরা জিতেছি আনন্দ কর', বলেই গলগল করে মুখ দিয়ে রক্ত উঠে সে লুটিয়ে পড়লো নষ্টপ্রাণ দেহে।

ইতিহাসকার অনেকে এই কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু প্রথম অলিম্পিক সম্মেলনে কুবার্তিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু গ্রীক সংস্কৃতি-পাগল অধ্যাপক ব্রীল বললেন, ফিডিপাইডিসের অবদানমূলক মহান দৌড়ের স্মারক প্রতিযোগিতা না থাকলে গ্রীক খেলাধুলোর ঐতিহ্য পুনঃপ্রবর্তন সার্থক হতে পারে না। এক প্রাচীন গ্রীক পাত্র উপহার দেবেন বলে ঘোষণাও করলেন ওই অধ্যাপক, জীবনে যাঁর হাঁটার পরিমাণ কদম গুনে হিসেব করা যায়, ফিডিপাইডিসের দৌড়ের কাহিনী ছাড়া অন্য কোন দৌড়ের খবর সম্বন্ধে যাঁর অজ্ঞতা ও উদাসীনতা সমান।

প্রাচীন অলিম্পিকে দীর্ঘতম দৌড় ছিল আড়াই মাইল। এ যুগের প্রথম অলিম্পিক হয় ১৫০০ মিটার, এক মাইলেরও কম। তার সঙ্গে এক পুঁথিপাগল অধ্যাপকের খামখেয়ালীতে আর খবরের কাগজগুলির চটকদার সংবাদ পরিবেশনের আগ্রহে সংযুক্ত হল চব্বিশ মাইলের দৌড়। ডাক্তার সমাজ-সেবী, শারীরতত্ত্ববিদ, খেলাধুলো সংগঠক সবাই প্রতিবাদ জানালেন। প্রমাদ গুণলেন, এ কি মানুষ মারা ব্যবস্থা!

কিন্তু ম্যারাথন রেস স্থায়ী হয়ে গেল। সুবিধা বুঝে দূরত্ব সামান্য কমাতে বাড়াতে ১৯০৮ সালে লণ্ডন অলিম্পিকে ব্যবহৃত ২৬ মাইল ৩৮৫ গজকেই স্থায়ী করা হয়েছে। এই দৌড়ে ক্লান্তি ও অবসাদে মাঝ পথে ভেঙে পড়া বিজয়ের শেষ মুহূর্তে মূর্ছিত হয়ে সম্মানে বঞ্চিত হওয়ার অনেক ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু আসলে মানুষ মরেছে মাত্র একজন। অলিম্পিক প্রবর্তনের ফলে এক অবাস্তব-বিলাসী অধ্যাপকের ভাবালুতাপ্রসূত এই দৌড় আজ পৃথিবীর সর্বত্র অনুষ্ঠিত হয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে, মানুষের ক্ষমতার সীমা নেই, টানলেই বাড়ানো যায়।

এই প্রমাণই অবিসম্বাদীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বর্তমান অলিম্পিকে। বিশ বছর আগে দৌড়ের যে সময় লাফ দেওয়ার যে উচ্চতা ও দূরত্ব, বস্তু নিক্ষেপের যে দূরত্ব মানব-ক্ষমতার বাইরে বলে বিবেচিত হত, আজ তার মধ্যে অনেকগুলিই অলিম্পিক যোগদানের নূন্যতম যোগ্যতা। এবারকার নির্বাচিত ন্যূনতম যোগ্যতায় গত অলিম্পিকের অনেক বিজয়ীও বাদ পড়ে যাবে।

অলিম্পিকের পরিধি যেমন একদিকে সমগ্র পৃথিবী গ্রহ, অপরদিকে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচালিত যে কোন খেলা।

দৌড়-ঝাঁপ-নিক্ষেপ মূলত অ্যাথলেটিকসই প্রধান। কিন্তু সাঁতার, জিমন্যাস্টিকস, বক্সিং বা মুষ্টিযুদ্ধ, দু ধরনের কুস্তী, ভারোত্তলন, অসিযুদ্ধ, গুলিচালনা, অশ্বারোহণ, নানা ধরনের নৌচালনা, গুলি ছোঁড়া সবই আজ অলিম্পিকের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া, দলগত খেলাও আছে—ফুটবল, হকি, বাস্কেটবল। শীতের দেশে জনপ্রিয় বরফের উপর তার বিবিধ খেলাধুলো নিয়ে পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হয় শীতকালীন অলিম্পিক। তবে তার শুরু ১৯২৪ সালে এবং সেই থেকেই তার চতুর্বার্ষিকী সংখ্যা গণনা।

এ যুগের অলিম্পিক পুরস্কার অলিভ মুকুটের সঙ্গে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার, স্বর্ণমণ্ডিত, রৌপ্যমণ্ডিত ও ব্রোঞ্জমণ্ডিত পদক—কোনরকম অর্থমূল্যবিহীন। আজকের ব্যবসায়ী ও পেশাদারী যুগেও অলিম্পিক শখের খেলাধুলোর আসর, যেখানে কোনরকম পেশাদারীর ঠাঁই নেই। তেমনি নেই রাষ্ট্রগত জয়পরাজয়ের হিসেব যদিচ আজকের রাষ্ট্রবিভেদ সচেতন সাংবাদিকরা এই ধরনের বেসরকারী হিসেব চালু করে চলছেন, ঘোষণা করছেন দেশগত বেসরকারী চ্যাম্পিয়ান।

বর্তমান যুগের অলিম্পিক চার বছরে দুনিয়ার বৃহত্তম ও ব্যাপকতম অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠাত্রী রাষ্ট্রকে দীর্ঘদিন সর্বশক্তি সংহত করে প্রস্তুতি চালাতে হয় সারা দুনিয়ার সমাগত আট দশ হাজার তরুণ-তরুণীর প্রতি আতিথেয়তায়।

প্রথমে মার্চপাস্ট দিয়ে শুরু হয়, আগে চলে গ্রীস, তারপর বর্ণানুক্রমিকভাবে অন্যান্য দেশ। সবশেষে অনুষ্ঠাত্রী দেশের প্রতিনিধিরা। মার্চপাস্টের পর অনুষ্ঠাত্রী দেশের রাষ্ট্রপ্রধান উৎসবের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে উত্তোলিত হয় পাঁচটি মহাদেশের প্রতীক হিসেবে আলিঙ্গনবদ্ধ পাঁচ রঙের পাঁচটি বৃত্ত সমন্বিত শ্বেত অলিম্পিক পতাকা। বেজে ওঠে তুরীভেরী। হাজার হাজার পায়রা ওড়ে অলিম্পিক গেমস যে শুরু হয়েছে দুনিয়াময় সে সংবাদ বহনের প্রতীক হিসেবে।

এরপর সমবেত লক্ষ জনতার বিপুল বিহ্বল হর্ষধ্বনির মধ্যে নাটকীয়ভাবে প্রবেশ করে দেশের সবচেয়ে সম্মানিত প্রবীণ অ্যাথলেট অলিম্পিক বর্তিকা হাতে নিয়ে। ১৯৩৬ সালে জার্মানরা প্রবর্তন করেছিলেন এই ব্যবস্থার। অলিম্পিয়ার পুণ্যক্ষেত্রে সূর্যালোক থেকে জ্বালানো এই শিখা হাত থেকে হাত বদল করে, রীলে প্রথায় দৌড়িয়ে আনা হয় অনুষ্ঠানক্ষেত্রে এবং তা থেকে সেই প্রাচীন আদর্শের প্রাণশিখা সঞ্চারিত হয় স্টেডিয়ামের অগ্নিস্থলীতে। এরপর অনুষ্ঠাত্রী দেশের খেলোয়াড় দলের অধিনায়ক সকলের হয়ে শপথ গ্রহণ করেন খেলোয়াড়ী নীতি মেনে প্রতিযোগিতা করবার, স্বীয় জাতীয় পতাকা স্পর্শ করে।

একসঙ্গে চলে দৌড় ঝাঁপ নিক্ষেপণ, সব দূরত্বের দৌড়, হার্ডলস, স্টিপলচেজ, চৌকস অ্যাথলীটের প্রমাণ হিসেবে দশ ও পাঁচ বিষয়ে সংযুক্ত প্রতিযোগিতা। পুলে সাঁতার, ওয়াটার পোলো ও ডাইভিং, নানা ঘরে নানা মাঠে নানান প্রতিযোগিতা। এক পক্ষকাল মুহূর্ত অবকাশ নেই কারো। বসে অলিম্পিক গ্রাম, অলিম্পিক ডাক তার অফিস, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ।

এ যুগের অলিম্পিকের মাধুর্য ও বর্ণাঢ্যতা বৃদ্ধি হয়েছে মহিলাদের অংশ গ্রহণে এবং রেকর্ডের ব্যাপারে ও অংশ গ্রহণের ব্যাপকতায় তারা সমানে পাল্লা দিয়ে চলেছে পুরুষদের সঙ্গে।

এক একটি অলিম্পিক এক এক মহারথীর অসাধারণ বীরত্বে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। স্টকহোমে কোলেহ্‌ম্যানেন, প্যারিসে ও আমস্টার্ডামে নুর্মী, লস এঞ্জেলসে এডি-টোলান, বার্লিনে জেসিওয়েন্স, লণ্ডনে মিসেস ফ্যানি ব্ল্যাঙ্কার্স কোয়েন, হেলসিঙ্কিতে এমিল জেটোপেক, মেলবোর্নে কুটজ্‌। কে জানে কোন্‌ নতুন নক্ষত্র দেখা দেবে রোমের অঙ্গনে।

শুধু ইয়োরোপের শ্বেতাঙ্গদের নিয়ে যে বিশ্বসমাবেশ শুরু হয়েছিল, আজ সেখানে পাঁচ মহাদেশের শ্বেত পীত কালো মানুষ একাকার হয়ে গেছে। অখ্যাত নাইজেরিয়া এবং জ্যামাইকা বাদ পড়ে না সেই বিশ্বমানবতার অভিষেক মহোৎসব থেকে।

ভারতের হয়ে এককভাবে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্সের ছাত্র নর্মান প্রিচার্ড যোগ দিয়েছিলেন ১৯০০ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অলিম্পিকে, দুটি রৌপ্যপদক জিতেও এনেছিলেন। তারপর ১৯২০ সাল থেকে ভারত নিয়মিত অংশ গ্রহণ করে চলেছে। কিন্তু হকিতে ছাড়া আর বিশেষ সম্মান জয় করে আনতে পারেনি আজও। অবশ্য কুস্তিতে ১৯৫২ সালে যাদব তৃতীয় স্থান এবং মাপটাওয়ে পঞ্চম স্থান পেয়েছিলেন নিজ নিজ ওজন-বিভাগে।

হকিতে যোগ দিয়ে প্রথমবারেই যে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল ভারত আমস্টার্ডামে (১৯২৮) বিজয়ীর মুকুট অর্জন করে তা আজও অক্ষুন্ন আছে। এবারেও থাকবে এ আশা আমরা করবো। আরো আশা করবো আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অ্যাথলীট এশিয়ান ও কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়ান মিলখা সিং-এর পদক অর্জন।

অলিম্পিক গেমস চলেছে, চলবে। মানুষকে অতিমানুষের পর্যায়ে নিয়ে চলেছে। প্রেমপ্রীতির স্বর্গরাজ্যে পৌঁছে দিতে পারবে কি?

প্রকাশিত হল

প্রসূতি ও শিশু

ডাঃ চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

মাতৃত্বের প্রথম লক্ষণ, গর্ভাবস্থায় ক্রমবিকাশ ও তার নানা উপসর্গের প্রতিকার, প্রসূতির খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ও স্বাস্থ্যবিধি, প্রসব-বেদনার বিভিন্ন স্তর, সন্তান-প্রসব, স্তন্যদান, শিশুর খাদ্য-তালিকা, সন্তান পালন, শিশুকে সুস্থ ও সবল মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা ইত্যাদি অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের বিস্তৃত বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা। সুযোগ্য চিকিৎসক গভীর নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে প্রসূতির জ্ঞাতব্য সকল বিষয় আলোচনা করেছেন অত্যন্ত সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায়। যাঁরা সন্তানের জননী হয়েছেন, হতে চলেছেন বা হবেন তাঁদের সবার পক্ষেই গ্রন্থখানি অপরিহার্য। পুরু আর্টিক কাগজে ছাপা ৩৫০ পৃষ্ঠার সচিত্র সংস্করণ। দাম ছয় টাকা। ভি-পি ডাকে সাড়ে ছয় টাকা মাত্র।

প্রত্যেকটি পরিবারে একখানি সঞ্চয়-করে রাখার মতো বই

আধুনিক যৌন বিজ্ঞান

ডাঃ হ্যানা ও আব্রাহাম স্টোন

সকল দম্পতি ও যুবক-যুবতীর পক্ষে একখানি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। যৌনশাস্ত্র সংক্রান্ত অগণিত প্রসঙ্গের বিস্তারিত বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা। প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠার সচিত্র সংস্করণ। দাম ছয় টাকা। ভি-পি ডাকে সাড়ে ছয় টাকা মাত্র।

পপুলার বুক ক্লাব

৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলিকাতা—২০

ফোন : ৪৭—৪২৫৫

সারা বছরের অভিজ্ঞতার ফলেই এমন
স্নিগ্ধ অনুপম

জনসনের শিশু-প্রসাধন

শিশুদের যত্ন নেওয়ার অনুপম অভিজ্ঞতার ফলেই
তৈরী হয়েছে জনসনের সব রকম
শিশু-প্রসাধন সম্ভার।

স্নিগ্ধ ও শুভ্রনির্মল জনসন্স বেবি সোপ : সুখস্পর্শ
ও সুকোমল জনসন্স বেবী পাউডার যা পৃথিবীর
সর্বশ্রেষ্ঠ ট্যাল্ক দিয়ে তৈরী। তাছাড়া আছে
জনসন্স বেবী ক্রীম ও বেবী অয়েল যাতে ক'রে
শিশুদের কোমল ত্বকের পুরোপুরি
যত্ন নেওয়া চলে।

জনসন এণ্ড জনসন অব ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

বিজ্ঞান বৈচিত্র

চন্দ্রদত্ত

হ্রদ বলতে আমরা টলটলে জলপূর্ণ একটি জলাশয়ের কথাই ভাবি, তা সে কৃত্রিমও হতে পারে আবার স্বাভাবিকও হতে পারে; কিন্তু স্বচ্ছ কাকচক্ষু জলপূর্ণ হ্রদের কথা আমরা সহজে চিন্তা করতে পারি না। কিন্তু প্রকৃতির অমোঘ বিধানে তাও সম্ভব হয়। ত্রিনিদাদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এরকম একটি আলকাতরার হ্রদ আছে। গত সত্তর বছর ধরে এই হ্রদ থেকে অপরিশোধিত পিচ কোটি কোটি টন সংগ্রহ করা হয়েছে কিন্তু পিচের হ্রদটি আজও কাণায় কাণায় পূর্ণ আছে। এখান থেকে বছরে ১৪০০০০ থেকে ১৫০০০০ টন পর্যন্ত পিচ পাওয়া যায়। ১৫৯৫ সালে স্যার ওয়ালটার র‍্যালে প্রথম এই হ্রদটির সন্ধান পান এবং এখান থেকে কিছু আলকাতরা নিয়ে তিনি তাঁর জাহাজের ফুটোগুলো বন্ধ করেন। এরপর কয়েকজন স্পেনবাসী এই আলকাতরা বাণিজ্যিকভাবে কাজে লাগানর চেষ্টা করে বিফল হন। তারপর ১৮৫০ সালে অ্যাডমিরাল কোচরেন ত্রিনিদাদে কিছুকাল বসবাস করে এই আলকাতরা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা সম্বন্ধে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পদার্থটির কার্যকারিতা সম্বন্ধে জন-সাধারণকে বোঝাতে পারেন। এই আলকাতরার হ্রদ যে একটি সম্পদ বিশেষ একথা তিনি ভাল করেই বোঝাতে পারেন। এর আঠাশ বছর পর ইংলণ্ডের রাজা এই আলকাতরা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য একটি কোম্পানীকে অনুমতি দান করেন এবং সেই থেকে আজ পর্যন্ত ঐ কোম্পানী ঐখানে কাজ করে চলেছেন। আজকে ঐ হ্রদের চারপাশ ঘিরে একটি বেশ ছোটখাট জনপদ ব্যবসা-কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছে।

আলকাতরা হ্রদ থেকে তোলা হচ্ছে

এই কোম্পানীতে বর্তমানে প্রায় পনের শ' লোক কাজ করে। বৈজ্ঞানিকরা অনুমান করেন যে, হাজার হাজার বছর আগে কোনও আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলেই এ হ্রদের উৎপত্তি হয়। অবশ্য এটিকে হ্রদ বলে উল্লেখ করা হলেও এটির উপরের স্তরে তরল আলকাতরা নেই, বরং উপরের স্তরটি এত কঠিন যে, এর ওপর দিয়ে মানুষজন চলাচল করা ছাড়াও রীতিমত যন্ত্রপাতি রেখে নীচের স্তর থেকে পিচ ওঠানোর ব্যবস্থা হয়। এমন কী এর ওপর রেলের লাইন পেতে সংগৃহীত পিচ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাঠানোর সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। ওপর থেকে যদিও এ হ্রদের নীচের স্তরের আলোড়নের কোনও আভাস পাওয়া যায় না কিন্তু প্রতিনিয়ত নীচের স্তরে যে আলোড়ন চলতে থাকে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ কিছুটা পিচ হ্রদ থেকে উঠিয়ে নেওয়ার পর আবার যথাকালে ঐ শূন্য স্থান পূর্ণ হয়ে যায়। প্রমাণস্বরূপ আরও দেখা গেছে যে, মাঝে মাঝে হঠাৎ হ্রদের তলা থেকে কোনও রকম গ্যাস কিংবা তেল ওপর দিকে উঠে আসে।

•

প্রস্তর যুগ, লৌহ যুগ, তাম্র যুগের মত কাষ্ঠ যুগের নাম না করলেও কাঠ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটি খুব প্রয়োজনীয় জিনিস। কাঠের প্রয়োজনীয়তা আমাদের কাছে অনেক ধরনের। বাড়ি-ঘর তৈরী, আসবাবপত্তর তৈরী ছাড়াও কাঠ—মদ, কাগজ, রেয়ন, প্ল্যাসটিক, আঠা, রেজিন, লাক্ষা, ওষুধ এবং মশলা ইত্যাদির কাজে দরকার হয়। সাধারণভাবে আমরা দু' জাতের কাঠ পাই—এক হচ্ছে নরম কাঠ আর এক হচ্ছে শক্ত কাঠ। কাঠ তৈরী হয় লম্বা লম্বা সেলুলোজের আঁশের সাহায্যে। আর এগুলোকে দৃঢ় করে বেঁধে রাখে এক ধরনের স্বাভাবিক প্ল্যাসটিক দিয়ে—যাকে লিগনিন্ বলা হয়। লিগনিন অনেকগুলি ছোট ছোট মলিকুলসের দ্বারা তৈরী। যদিও বৈজ্ঞানিকরা মলিকুল সম্বন্ধে অনেক কিছু গবেষণা করে বার করতে পেরেছেন তবুও লিগনিন যে কি প্রকারে গাছের ভেতরে তৈরী হয় আজ পর্যন্ত সঠিক জানা যায় নি। তবে এটা জানা গেছে যে, লিগনিন গাছের ওপর রাসায়নিক প্রক্রিয়া প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। আজকের দিনে লিগনিনের ওষুধ এবং রং তৈরীর জন্য চাহিদা খুব বেশী। প্রায় এক শতাব্দী ধরে বৈজ্ঞানিকরা লিগনিনকে সেলুলোজ থেকে আলাদা করবার চেষ্টা করেছে। ১৮৯০ সালে পেআন নামে একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক প্রথমে সেলুলোজ এবং লিগনিন আলাদা করতে সক্ষম হন। এর পর পিটার ক্ল্যাসন নামক আর একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক লিগনিনের রাসায়নিক কাঠামোটা বার করেন। ১৯৩৯ সালে ব্রাউনস্ প্রথম লিগনিনকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা করেন।

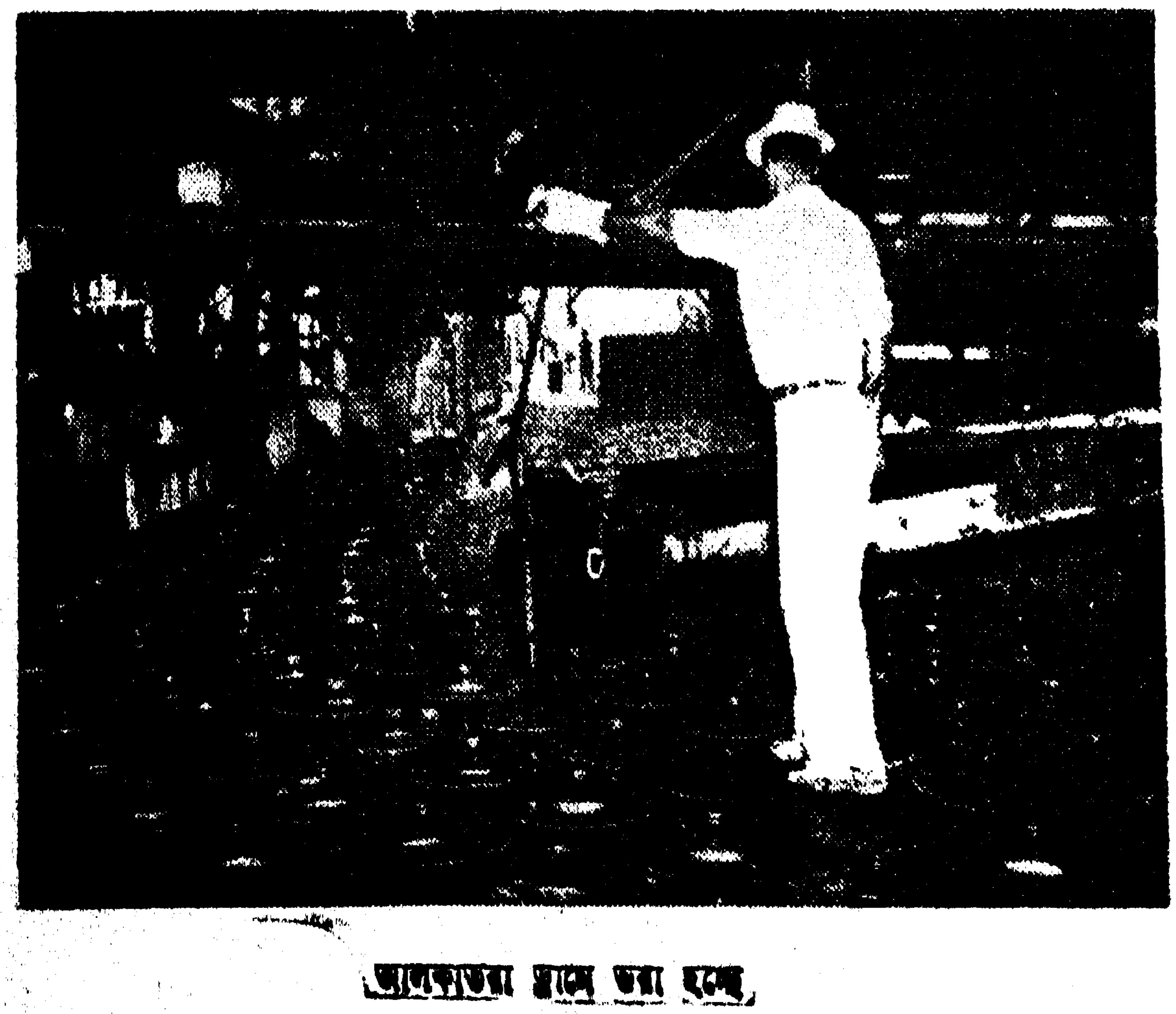

আলকাতরা ড্রামে ভরা হচ্ছে

ভবরূপ ভট্টাচার্য লিখিত অনুপম জীবনী
মহীয়সী মনীষা দেবী
যুগ দেবী ব্রহ্মময়ীর বৈচিত্র্যপূর্ণ পবিত্র জীবনের অনবদ্য আলেখ্য। মূল্য : দেড় টাকা।
মনীষা তীর্থ, প্রীতিনগর, নদীয়া।
(সি ৭০১৩/২)

ব্রাউনস্ শুধু শতকরা তিন ভাগ লিগ্নিন সংগ্রহ করতে পেরেছেন। তিনি বলেন যে, লিগনিন সংগ্রহ করা খুবই কষ্টকর—কারণ সেলুলোজ এবং লিগনিন্ এমনভাবে মিশে থাকে যে, প্রায় তাকে আলাদা করা যায় না। লিগনিন্ আলাদা করার একটা পদ্ধতি হচ্ছে যে, গাছের ভেতরের সেলুলোজটা কোন প্রকারে কমিয়ে ফেলা হয়। এটা করার জন্য গাছের ভেতর এক ধরনের ছত্রক ইন্‌জেকসন করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। কিছুদিনের মধ্যে এই ছত্রক গাছের ভেতরের সেলুলোজটা খেয়ে ফেলে কমিয়ে দেয় আর তার ফলে লিগনিন বেড়ে যায়। অবশ্য এই পদ্ধতি বাণিজ্যিক ভাবে কতটা সম্ভব সেটা ভাল করে ভেবে দেখা হবে। যদি লিগনিন কোন রকম সহজ উপায়ে সংগ্রহ করা যায় তাহলে ভারতবর্ষে যথেষ্ট পরিমাণে লিগনিন্ সংগ্রহ করা সম্ভব হবে—কারণ আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে বন সম্পদ আছে।

•

একদল রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক 'ভীইটজাস্' জাহাজে করে সমুদ্রের তলদেশের তথ্য সংগ্রহ করছেন। তাঁরা যে-সব বৈজ্ঞানিক তথ্য আজ পর্যন্ত সংগ্রহ করেছেন—তার থেকে তাঁরা ভারত সমুদ্রের অনেক কিছু নতুন তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছেন। তাঁদের চারটি স্তরের প্রাথমিক অনুসন্ধানে পূর্ব এবং পশ্চিম অংশের মধ্যে অনেক তফাৎ দেখা যাচ্ছে। আজ পর্যন্ত ভীইটজাস্ প্রায় ২০,০০০ মাইল সমুদ্রপথে চলেছে।

•

টিনজাত খাদ্যের চল আজকাল খুব বেশী। কিন্তু বলতে গেলে আজ পর্যন্ত কোন পদ্ধতির সাহায্যে এইসব সংরক্ষিত খাদ্যবস্তুর নিজস্ব স্বাদ এবং গন্ধ বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। টিন খুলে খাদ্যবস্তু খেতে গেলে তার আসল তাজা স্বাদ এবং গন্ধ পাওয়া যায় না। স্বাদ এবং গন্ধ বজায় রাখা যায় কিনা তাই নিয়ে বিভিন্ন ভাবে গবেষণা করা হচ্ছে। সম্প্রতি 'ইভান্স রিসার্চ এবং ডেভালপমেণ্ট করপোরেশন' এক নতুন পদ্ধতিতে খাদ্যবস্তুর তাজা স্বাদ এবং গন্ধ বজায় রাখতে পেরেছেন। যে বস্তুর সাহায্যে এটা সম্ভব হয়েছে সেটি একটি এন্‌জাইম। যখন খাদ্যবস্তুকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংরক্ষিত করে টিনজাত করবার জন্য তৈরী করা হয় তখন খাদ্যের ভেতরের স্বাদ এবং গন্ধ বজায় রাখার এন্‌জাইম সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। ইভান্স করপোরেশন খাদ্যবস্তুর টিনজাত করবার আগে তাজা অবস্থায় যে সমস্ত অংশ যেমন ডাঁটা, খোসা, মাংসের ছাঁট ইত্যাদি ফেলে দেওয়া হয় সেগুলো সংগ্রহ করে তার থেকে স্বাদ, গন্ধ বজায় রাখার এন্‌জাইম সংগ্রহ করে তার গুঁড়ো তৈরী করছে। সেই গুঁড়ো সংরক্ষিত খাদ্যে খাবার আগে ছিটিয়ে দিলে আবার তার তাজা অবস্থার মত গন্ধ এবং স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য এই এন্‌জাইম গুঁড়ো কিরকমভাবে এবং কখন ব্যবহার করলে সবচেয়ে ভাল হয় তা নিয়ে আরো গবেষণা হচ্ছে।

পুজোর আনন্দে ছোটদের চাই
নতুন পোশাক আর তার সঙ্গে তাদের চিরপ্রিয়
বার্ষিক-শিশুসাথী
না হ'লে ছেলেমেয়েদের মুখে হাসিই ফোটে না!
সেরা লেখা ও সেরা ছবি : সম্পাদনা—দীগিন বন্দ্যোপাধ্যায়
মহালয়ার এক সপ্তাহ আগেই বেরুবে
দাম—চার টাকা
বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ বংকিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

ট্রাম-বাসে

দেশ বড়, না নেহরু বড়"—একটি সম্পাদকীয় প্রশ্ন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"দেশ হাওয়া হয়ে গেছে। সুতরাং পাল্লায় দেশ এবং নেহরুকে এক সঙ্গে ওজন

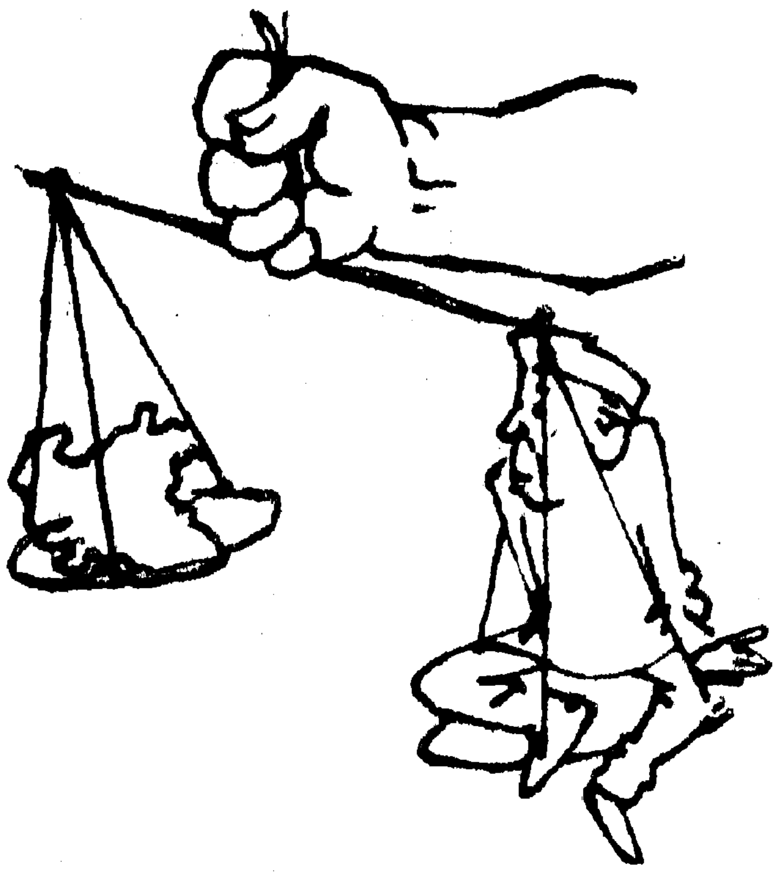

করলে দেখা যাবে দেশের দিকের পাল্লা ওপরে উঠে গেছে, আর নেহরুজী ভারি ব'লে পাল্লার এদিকটা নীচে নেমে এসেছে। কাজে কাজেই নেহরুজী বড়—Q. E. D.!!"

* * *

রাষ্ট্রপতি বলিয়াছেন এবং প্রধানমন্ত্রী মহাশয়ও নাকি বলিয়াছেন যে, কোথায় যেন অভাব রহিয়াছে।—"অভাব

নয়; কোন্‌খানে যে ভুল ছিল গো, ভুল ছিল"—মন্তব্যটা গান গাহিয়াই শোনায় শ্যামলাল।

* * *

কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন মহাশয় নাকি নেহরুজীর কাছে তাঁর আসাম সফরের রিপোর্ট পেশ করিবেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন,—"আমরা সম্প্রতি শ্রী সেন প্রমুখাৎ এইচ্‌ এম্‌ ভি-র রেকর্ড শুনেছি; গানের পর কি আর রিপোর্ট জমবে!!"

* *

সংবাদে শুনিলাম আসামের অর্থমন্ত্রী ফকরুদ্দীন সাহেবকে উর্দুতে একটি চিঠি লিখিতে দেখিয়া পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় নাকি হাসিতে হাসিতে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, অসমীয়া ভাষায় না লিখিয়া তিনি উর্দুতে চিঠি লিখিতেছেন। —"ঠিক সময় সঠিক ভাষাটি নিজের অজ্ঞাতেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে,—তারস্মরেণ বিরেতুমারেভে-র গল্প মনে করে দেখুন"—মন্তব্য করেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * *

২৪ পরগনা জেলা শিক্ষক পর্ষদের অধীনে যাঁরা কাজ করিতেছেন তাঁহারা নাকি দুই মাস পর্যন্ত বেতন পাইতেছেন না। বিশুখুড়ো বলিলেন—"গুরুদক্ষিণা কি শেষ পর্যন্ত একলব্যের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মতোই হবে?"

* * *

দার্জিলিং-এ চীনা ক্লাবের ভবনশীর্ষে নাকি কমিউনিস্ট চীনের পতাকা উড়িতে দেখা গিয়াছে।—"তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি—এই শকতি বা গায়ের জোর ছাড়া তো এর আর কোন জবাব নেই"—বলে শ্যামলাল।

* * *

সংবাদে শুনিলাম, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চলে দুগ্ধ সরবরাহ ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য রাজ্য সরকার একটি পরিকল্পনা বিবেচনা করিতেছেন।—"উত্তম পরিকল্পনা। কিন্তু আশঙ্কা হয়, এটা না শেষ পর্যন্ত রাবণ রাজার দুধের পুকুরে পরিণত হয়"—বলেন বিশুখুড়ো।

* * *

তেজস্ক্রিয়তায় যাহাতে মৃত্যু না ঘটে তাহার জন্য নাকি একপ্রকার বটিকা বাহির করা হইতেছে।—"খুবই ভালো কথা। কিন্তু উপস্থিত, তেজ-দাপটের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোন বটিকা বা অরিষ্টাদি আবিষ্কৃত হলে আরো ভালো হতো"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

সিডনীতে নাকি দীর্ঘাঙ্গীরা অভিযোগ করিয়াছেন যে, ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের কথা মোটেই ভাবেন না। তাঁদের উপযুক্ত রেডি মেড্‌ জামা পাওয়া যায় না। খাট যদি বা সংগ্রহ করা গেল, বিছানার চাদর আর সেই মাপে হয় না। সংবাদে বলা হইয়াছে—তাঁহারা নাকি অচিরেই একটি শোভাযাত্রা বাহির করিয়া তাঁহাদের দাবি

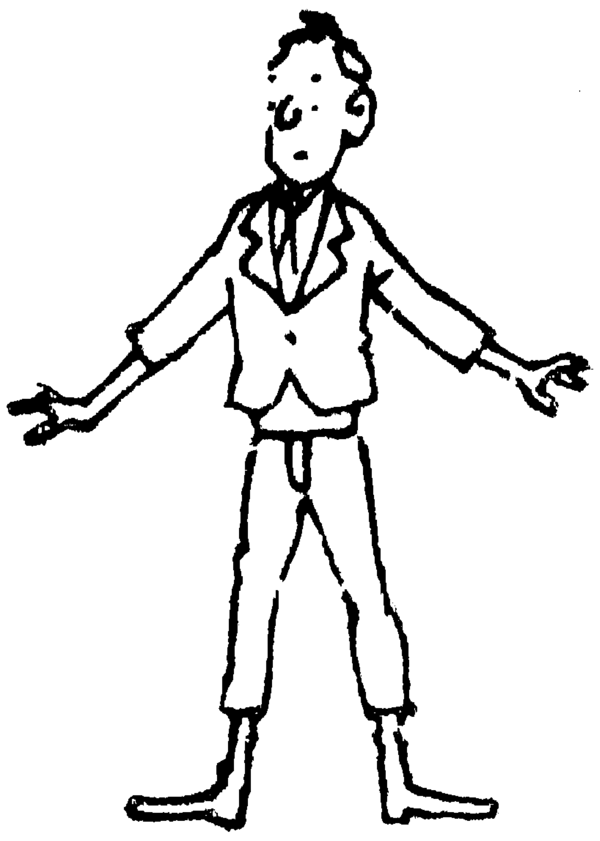

জানাইবেন।—"ব্যবসায়ীরা হয়ত একটা সুরাহা করে দেবেন। কিন্তু আমরা ভাবছি স্বামীদের কথা, ডবল বহরের স্ত্রীদের জন্য যোগ্য স্বামী বিধাতা নিশ্চয়ই গড়বেন না"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

মাটির মানুষের জন্য মৃত্তিকাস্পর্শহীন পরিকল্পনা"—একটি সংবাদ শিরোনামা। বিশুখুড়ো বলিলেন—"কিন্তু এতে দুঃখ করার কোন কারণ নেই। সোনার পাথরের বাটি যদি হয়, তাহলে মাটি ছাড়া কি আর মাটির মানুষ হবে না!"

* * *

সংবাদে শুনিয়াছিলাম যে, সঙ্গীতের প্রভাবে ধানের ফলন বৃদ্ধি পায় এবং এই লইয়া আমরা ট্রামে-বাসে আলোচনাও করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে গল্প করা হইয়াছে—কেহ যদি ধানক্ষেতের কাছে গিয়া একটি আধুনিক সঙ্গীত গাহিয়া আসে তাহা হইলে কী হইবে?—"তাহলেও ধান হবে। তবে সেটা চামরমণি না হয়ে কাকরমণি হবে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

ঢোল কোম্পানীর
দাদ ও কাউরের
অব্যর্থ মলম
বরাহনগর • কলিকাতা

পুস্তক পরিচয়

স্মৃতিকথা

অতীতের স্মৃতি (স্বামী বিরজানন্দ ও সমসাময়িক স্মৃতিকথা)—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়, হাওড়া। দাম—৫·৫০ নয়া পয়সা।

স্বামী বিরজানন্দ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্বজনশ্রদ্ধেয় ষষ্ঠ অধ্যক্ষ। বর্তমান গ্রন্থে লেখক তাঁর ধর্মজীবন গ্রহণ থেকে অন্তিম কাল পর্যন্ত দীর্ঘ ষাট বৎসরের কাহিনী বিবৃত করেছেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্গে স্বামীজী এমনি অঙ্গাঙ্গী ছিলেন যে তাঁর স্মৃতিকাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে সেই মঠ ও মিশনের কথাও অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে। কিন্তু লেখক চেষ্টা করেছেন, বইটি যেন-না নিতান্তই একটি গতানুগতিক ইতিহাস হয়ে পড়ে। অন্যদিকে বইটি স্বামীজীর ধারাবাহিক জীবনবৃত্তান্ত নয়; বিচ্ছিন্ন কতকগুলো ঘটনার স্মৃতিচিত্র মাত্র। রসরসিকতায় পরিপূর্ণ, মানবিকতার প্রতিমূর্তি বিরজানন্দ স্বামীকে এ-গ্রন্থ থেকে চিনতে কারো ভুল হবে না। বলা বাহুল্য, মহৎ জীবন যেমন সমসাময়িক ও সামাজিক মানুষের ওপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তেমনি তাঁদের জীবনকথাও পরবর্তীকালের মানুষদের মনেও তেমনি প্রভাব ছড়ায়। সেদিক থেকে বিচার করলে বলা যায়, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এ-স্মৃতিকাহিনী লিখে বাংলা দেশের পাঠকদের উপকার করেছেন। রচনাভঙ্গী সহজ সরস অথচ সাহিত্যরসে পরিপূর্ণ। সকল প্রকার পাঠককেই তৃপ্তি দেওয়ার ক্ষমতা আছে এ-গ্রন্থের।

১০২।৬০

খেলাধুলার কথা

অলিম্পিকের প্রাঙ্গণে—অমরেন্দ্রকুমার সেন। প্রোমোটার্স পাবলিশার্স, ৩০ মদন-মোহন চ্যাটার্জি লেন, কলি-৭। তিন টাকা।

সপ্তদশ বা 'রোম' অলিম্পিয়াড শুরু হতে আর দেরি নেই। অলিম্পিকের ইতিহাস সুপ্রাচীন, খৃষ্টপূর্ব ৭৭৬ সনের কাছাকাছি; তবে আধুনিক অলিম্পিক চালু হয় ১৮৯৬ সাল থেকে। এবং এই প্রসঙ্গে ফরাসী দেশের বিখ্যাত ক্রীড়ামোদী ব্যারণ দ্য কুবার্তা-র ঐকান্তিক উৎসাহ ও প্রচেষ্টা আধুনিক অলিম্পিকের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদেরা মিলিত হবেন অলিম্পিকে। নানা কারণেই রোম-অলিম্পিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং ক্রীড়ামোদী বিশ্ববাসী সাগ্রহে অলিম্পিকের ফলাফলের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকবেন।

'অলিম্পিকের প্রাঙ্গণে' গ্রন্থটিতে অলিম্পিকের আদি ও বর্তমান পর্বের ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়েছে। ক্রীড়া সম্পর্কিত (বিশেষ করে অলিম্পিকের মতো একটি বিশ্বজনীন ক্রীড়ানুষ্ঠান সম্পর্কে) বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থরচনার প্রয়াস বাংলায় খুব কমই দেখা যায়। এ বিষয়ে অমরেন্দ্রকুমার সেনের তথ্যবহুল 'অলিম্পিকের প্রাঙ্গণে'-কে বিশেষ অগ্রণী বলা যেতে পারে। ক্রীড়ামোদীগণ এবং উৎসাহী মহল বর্তমান গ্রন্থপাঠে অলিম্পিক প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি, পূর্বকথা, ফলাফল ও অলিম্পিকের বিখ্যাত রথীদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে

ভাস্কর (শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ)
প্রণীত

ভজহরি ১·৫০

এই সরস গল্পের বইখানি সম্বন্ধে স্বর্গত রাজশেখর বসু মহাশয় লিখেছিলেন—
"....অতি উত্তম হয়েছে, বিশেষ করে 'কুটীর-শিল্প', 'গণক', আর 'গলো গলো'। আমি যদি শিক্ষা বিভাগের কর্তা হতাম তবে আপনার বইটি স্কুল কলেজে অবশ্য পাঠ্য করতাম।...."

প্রাপ্তিস্থান—
দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
৫৪/৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

(সি ৭২৫৬)

বর্তমান সমাজ জীবনকে কেন্দ্র করে এক পথভ্রান্ত নারীর কাহিনী নিয়ে লেখা 'দেবপ্রিয়দেব' এক অসাধারণ উপন্যাস

"মৃগতৃষা"

পুজোর আগেই আত্মপ্রকাশ করছে।
মূল্যঃ সুলভ। ছাপাঃ ঝকঝকে।
বাঁধাইঃ মজবুত। প্রচ্ছদঃ সুন্দর।

বৈধব্য কি নারীর অপরাধ?? যৌবন বলে প্রেম বড়? সমাজ বলে কৃচ্ছ্রতা! জীবন ও যৌবন দেবতার এই রূপ প্রকাশ পেয়েছে,
কালি বন্দ্যোপাধ্যায়ের

"কেনাগোলাম"

উপন্যাসে

মূল্য ৩·৫০

নব বলাকা প্রকাশনী
৬, নফরচন্দ্র সাহা লেন। কলি-৩৬

(সি-৭৩২৪।১)

অলিম্পিক সম্বন্ধে
একমাত্র বাংলা বই

অলিম্পিকের প্রাঙ্গণে

অমরেন্দ্রকুমার সেন

এই বইখানি পড়ে রাখুন। রোম অলিম্পিকের বহু প্রশ্নের জবাব পাবেন। পৃথিবীর, ভারতীয়, এশিয়ান ও অলিম্পিক রেকর্ড সম্বলিত বহু তথ্যপূর্ণ এই বইখানি সকল ক্রীড়ামোদীর পক্ষে অপরিহার্য। স্কুল, কলেজ ও লাইব্রেরির পক্ষে সম্পদ। বহু চিত্রশোভিত। দামঃ—৩,

ফুটবল খেলা শেখার ও শেখানোর একমাত্র গাইড

ফুটবলের-কলাকৌশল

অসংখ্য ছবি ও ছকের সাহায্যে ফুটবলের কৌশলাদি সবিস্তারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আনন্দবাজার, যুগান্তর, দেশ, গড়ের মাঠ প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত। প্রায় ৭০টি ব্লক সহ, বোর্ড বাঁধাই, ডিমাই সাইজ—৩৷৷০

প্রোমোটার্স পাবলিশার্স
এ ৩৭, সি আই টি বিল্ডিং,
৩০, মদন চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৭

—— পরিবেশক ——
ত্রিবেণী প্রকাশন
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

(সি-৭৪৫০)

ডাঃ গুরুদাস পালের
আধুনিক সামাজিক উপন্যাস ৩৲
নূতন **শিবাণী** বই
যুগান্তর—'জাতি-প্রথার বিলোপ ও বিধবা বিবাহের প্রচলন'এর পটভূমিকায় গ্রাম্য পরিবেশে ......সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর ভাষায় লেখক এই উপন্যাসখানি লিখেছেন। যুক্তি-তর্কের বাঁধুনী অভিনন্দন যোগ্য ও প্রশংসনীয়। আশা করি সকলের মর্ম স্পর্শ করিবে।
পরিবেশক—ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
(সি ৭৩৭৩)

শ্রীজীবেশ মৈত্রের
বৃত্ত ও বৃত্তান্ত
দাম ২·৫০
"প্রেম জীবনে আনে ঐশ্বর্য"—লেখকের বলিষ্ঠ ভাষায় অংকিত এই বইয়ের রমলা চরিত্রের মধ্যে তার পরম নিদর্শন।
পরিবেশক ঃ
নব বিদ্যা বুক হাউস
১০/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯
(সি ৭২০৯)

বাহির হইল। বাহির হইল॥
ভারতপথিক্‌-এর
পান্নাবাঈ
ভারতপথিক্‌ নামটি পাঠকের কাছে আজ সুপরিচিত। পান্নাবাঈ তাঁর নিপুণ হাতের একমাত্র উপন্যাস। দাম ৩·৫০
অবিনাশ সাহার
বসন্ত বিদায়
বিখ্যাত উপন্যাস "প্রাণগঙ্গা"র লেখক অবিনাশ সাহা। বসন্ত বিদায় তাঁর সর্বাধুনিক উপন্যাস। দাম ৩·৫০
অবনীভূষণ ঘোষের
ভূত ভূত নয়
'সাপের কথা' লিখে ভারত সরকার থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন শ্রী ঘোষ। এখানে ভূত আছে কি নেই প্রশ্নটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে উদ্ঘাটিত। অপূর্ব মনোরম গল্প। ছোট বড় সকলেই পড়ে আনন্দ পাবেন। দাম ১·৫০
অন্যান্য বইয়ের জন্য লিখুন
ভারতী লাইব্রেরী
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা ১২
(সি ৭৪২৫)

পারবেন। খেলাধূলা সম্পর্কে যারা কৌতূহলী, অলিম্পিক সম্পর্কে এই হ্যাণ্ডবুকটি তাদের বিশেষ প্রয়োজন সাধনে সমর্থ হবে। লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল এবং অলিম্পিক তথ্য ও তত্ত্বকে একটি বিশেষ ভংগীতে পরিবেশন করবার নৈপুণ্যও লক্ষণীয়। গ্রন্থটি সচিত্র এবং প্রারম্ভে বেরী সর্বাধিকারীর একটি ভূমিকা আছে।

৩২৯।৬০

উপন্যাস

ইছি-বৌ—প্রভাত চট্টোপাধ্যায়। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ। ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা ৯। দাম ২·৫০ টাকা।

বাউরি সম্প্রদায়ের ঘর-সংসার, হাসি-কান্না, রীতি-নীতি, সুখ-দুঃখ নিয়ে, বেশ বলিষ্ঠ ভাষায় লেখা একটি উপন্যাস। নায়ক কালাচাঁদের অকৃত্রিম প্রেম উপেক্ষা করে তার ইছি-বৌ, সস্তা চটকদারীর ফাঁদে পড়ে যে ভুল করে, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে তাকে নিজের জীবন দিতে এবং স্বামীর জীবন নিতে হয়। অন্যান্য চরিত্রগুলি কিছুটা যান্ত্রিক হলেও ইছি-বৌ, তার স্বামী কালাচাঁদ এবং প্রণয়ী হরিপদ বেশ জীবন্ত।

২৮৭।৬০

ছদ্মনাম—গোপালকৃষ্ণ ভাস্কর। পূর্বাচল প্রকাশনী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। দাম ৪·৫০ টাকা।

পাশ্চাত্য রচনারীতি হাস্যকর অনুকরণে এবং কষ্টকল্পিত ঘটনাবলীর এলোমেলো সমাবেশে লেখা উপন্যাস। নায়ক অমিতাভ নবীন ব্যবসায়ী কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্বের অভাবে সে এক জুয়াড়ীর পাল্লায় পড়ে ফলে তার ব্যবসা প্রায় নষ্ট হবার উপক্রম হয়। ঘটনাচক্রে নায়ক, সুসানা নাম্নী এক রহস্যময়ী নারীর সংস্পর্শে আসে এবং তারই প্রভাবে ব্যবসা এবং ব্যক্তিত্ব দুইই কিছুটা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এটা বর্তমানের ঘটনা। অতীতে অগ্রজা স্থানীয়া এক মহিলার সংগে অবৈধ প্রণয়ের ফলে সে যে সন্তানের জন্ম দেয় সেই অতীত এবং বর্তমান ঘটনাবলীর যোগসূত্র। নায়ক তার অজ্ঞাতে সেই জারজ পুত্রের সংগেই এক জটিল মামলায় জড়িয়ে পড়ে এবং পরে সমস্ত ঘটনা জেনে মামলা প্রত্যাহার করে নেয়।

লেখক স্বেচ্ছাকৃত ভাবে নায়কের চারিদিকে যে কুয়াশার আবরণ সৃষ্টি করেছেন তা যেমন বিরক্তিকর তেমনই হাস্যকর। আজকাল কোন কোন নবীন লেখক রাতারাতি জেমস্‌ জয়েস্‌ অথবা ভার্জিনিয়া উলফ্‌ হবার চেষ্টা করছেন কিন্তু একমাত্র দুর্বোধ্যতা ছাড়া কোন ভাল জিনিস গ্রহণ করতে পারছেন

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখনীর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। পাঠক-সমাজের অতি প্রিয় এ লেখকের সৃষ্টিতে থাকে সদাই এক অভিনব কাহিনী। সুদৃশ্য প্রচ্ছদপটে বৈশিষ্ট্যের দাবী নিয়ে প্রকাশিত হোল এ লেখকের এক নবতম উপন্যাস—
যে যাই বলুক
দাম—৬৲
৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলি-৯

বাঙ্গালী ও বঙ্গসংস্কৃতিকে জানতে
একখানা প্রথম শ্রেণীর বাংলা
মাসিক **নববঙ্গ** পড়ুন
তৃতীয় বর্ষ * বার্ষিক ৩৲
২০১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭

সদ্য প্রকাশিত হল
অনাবিল কৌতুক নাট্য
সুধীর সরকার রচিত
জয় ঢাক
মূল্য ২·৫০ নঃ পঃ

শিবেন চট্টোপাধ্যায়-এর
কবিতা গ্রন্থ
চিত্রকল্প
মূল্য ২ টাকা
॥ প্রকাশক ॥
আধুনিক পাবলিশার্স
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২
(সি ৭৪২৪)

না বা চেষ্টা করছেন না। এর কারণ, প্রমথ চৌধুরীর কথায়, "রোগই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়।" ২৭৯।৬০

পরিনির্বাণ—সুবোধচন্দ্র মজুমদার। প্রকাশক—বকমারী বুক হাউস, কলিকাতা—৯। দাম—৩, টাকা।

ইংলেন্ড এবং ভারতবর্ষের পটভূমিকায় লেখা একটি অবিশ্বাস্য এবং অসম্ভব কাহিনী এ-উপন্যাসের বিষয়বস্তু। নায়কের এমন একটি চরিত্ররূপ দিতে চেয়েছেন লেখক যার কাছে পথের দাবীর সব্যসাচীকেও নিতান্ত একটি শিশু বলে মনে হয়। অন্যপক্ষে নায়িকার কার্যকলাপ সবটাই একটি অপ্রকৃতিস্থ নারীর মতো, অথচ লেখক তাকে দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন পাঠকদের কাছে। কাহিনীর নিজস্ব কোনো গতি নেই, লেখক তাঁর খেয়ালমতো ঘটনা তৈরী করে গেছেন শুধু। এমন অসার্থক একটি উপন্যাস প্রকাশ করার পক্ষে কি যুক্তি থাকতে পারে তা প্রকাশকই বলতে পারেন। ২৬৪।৬০

ছোট গল্প

মুখোমুখি—শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। পুস্তক প্রকাশক: ৮।১-বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দু' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

লেখক আলোচ্য গ্রন্থে দেখিয়েছেন যৌবন ও জীবনের বিষাদঘন মানুষগুলিকে, যারা 'আজকের এই জীবনের মুখোমুখি হচ্ছে, জীবনের মোকাবিলা করছে, জীবনের হাতে মার খাচ্ছে' সেই সব যতীন দত্ত, ইলা, শচীবিলাস, উমা ও ভূপেন ইত্যাদির ব্যথা-ব্যর্থতার কাহিনী, যারা জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে এবং বাঁচবার জন্য দু' হাত প্রসারিত করেছেও।

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সহজ আলোর সরলপথে পা বাড়াননি; তাতে ক্ষতি হয়নি; বরং গল্পের প্রচলিত রীতির সংস্কারে আঘাত দিয়ে তিনি এক নতুন পরীক্ষারীতি দেখিয়েছেন। গল্পগুলি পড়ে মনে হলো, শান্তিরঞ্জনের জীবনের মুখোমুখি হবার বিপুল অভিজ্ঞতা কোথাও ম্লান নয়। ৭।৬০

নাটক

শর্মিষ্ঠা-দেবযানী—স্বপন বুড়ো (শ্রীঅখিল নিয়োগী)। সাহিত্য চয়নিকা, ৫৯ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য ১·২৫ নঃ পঃ

বাংলা সাহিত্যে মেয়েদের অভিনয়োপযোগী নৃত্যনাট্যের সংখ্যা খুব বেশি নেই। রবীন্দ্রনাথ এই বিভাগে 'চণ্ডালিকা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'নটির পূজা', 'কাল মৃগয়া' প্রভৃতি রচনা করে সাহিত্যে নতুন পথ খুলে দিয়েছেন। স্বপনবুড়ো ভূমিকায় জানিয়েছেন, "সব পেয়েছির আসর পরিচালনা করতে গিয়ে মেয়েদের তাগিদে আমাকে কয়েকটি নৃত্য-নাট্য রচনা করতে হয়।" শর্মিষ্ঠা ও দেবযানী প্রয়োজনের তাগিদে লিখিত হলেও তিনি অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছেন। নৃত্য-নাট্য রচনার পরিকল্পনায় যে মৌলিকত্ব থাকা একান্ত আবশ্যক সে-গুণও এই নৃত্যনাট্যে বর্তমান। আখ্যানবস্তুও চমৎকার।

যে তপশ্চর্য ও আনন্দ-বেদনার ঝোঁকগুলি নৃত্যনাট্যকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে, তা উল্লেখযোগ্যভাবে "শর্মিষ্ঠা-দেবযানী"তে রয়েছে।

চঞ্চল সমীরণ মলয়া আমি—
কৌতুকে নাচি-গাই দিবস-যামী
চরণেতে ছন্দ মনে কি আনন্দ
ছুটে চলা কাজ মোর, থাকি না থামি।

নৃত্য সহযোগে এইসব গান চমৎকার ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে।

শিল্পী ধীরেন বল অঙ্কিত প্রচ্ছদ মনোরম। ২১২।৬০

বাহির হইল

যশস্বী তরুণ নাট্যকার
কিরণ মৈত্রের
বহু প্রত্যাশিত পূর্ণাঙ্গ নাটক

সংকেত ২,

বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে ও আঙ্গিকের নতুনত্বে সমুজ্জ্বল

বারোঘণ্টা ২,

শৈলেশ গুহ নিয়োগীর
ফ্লু—১, গোলপার্ক—৳০
প্রাইভেট এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ—৳০

স্নিগ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর
স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্—৳০

ছোটদের জন্য
রবিদাস সাহা রায়ের
রাজপুতের ছেলে—৷৷৵০

রাইটার্স কর্ণার
এ-৮এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—১২

বিচিত্র লেখক অবধূতের
সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প সংকলন

ব হু ব্রী হি ষষ্ঠ মুদ্রণ প্রকাশিত হইল

॥ সাড়ে চার টাকা ॥

উদ্ধারণপুরের ঘাট (১১শ মুদ্রণ) ৪৷৷
মরুতীর্থ হিংলাজ (১৯শ মুদ্রণ) ৫৲
বশীকরণ ৮ম মুদ্রণ ৪৷৷ **দুইতারা** ৪র্থ মুদ্রণ ২৷৷
দুর্গমপন্থা (বিচিত্রতম রোমাঞ্চকর ভ্রমণ-কাহিনী) =যন্ত্রস্থ=

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের **তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ** **প্রাণকুমার ৬৷৷**
১ম খণ্ড—৬৷৷০ : ২য় খণ্ড—৬৷৷০

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সূত্রধার—প্রধান সম্পাদক—বরুণ মুখোপাধ্যায়। ১১সি, মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা—২৬। প্রতি সংখ্যা—৭৫ নয়া পয়সা।

সূত্রধার নাটক সম্বন্ধীয় দ্বিমাসিক পত্রিকা। আলোচ্য সংখ্যাটিই বর্ষের প্রথম সংখ্যা। একই উদ্দেশ্যে প্রকাশিত পত্রিকা হিসেবে "সূত্রধারই বাংলাদেশের একমাত্র পত্রিকা নয়। তবু প্রকাশকদের প্রচেষ্টাকে প্রশংসা করতেই হবে। বাংলাদেশে নাট্য-আন্দোলনের ইতিহাস সুপ্রাচীন, কিন্তু নাটকের সংগে সাহিত্যের যোগাযোগ কোনো কালেই ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেনি। একটি জাতির সংস্কৃতির পক্ষে এ-ঘটনা খুব গৌরবের নয়। সুতরাং এ অভাব পূরণের দায়িত্ব যাঁরা গ্রহণ করতে সাহস পান তাঁরা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।

বর্তমান সংখ্যা সূত্রধার সব দিক থেকেই আকর্ষণীয় হয়েছে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ও শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী কয়েকটি চিন্তাপূর্ণ ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ দিয়ে সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধশালী করেছেন। তাছাড়া, শ্রীমতী লীলা মৈত্র এবং শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বিদেশী নাট্যকার ও নাটক সম্বন্ধে সুন্দর আলোচনা করেছেন। তাছাড়া, কলকাতার রঙ্গমঞ্চ ও নাটক সম্বন্ধেও বিশদ আলোচনা এখানে স্থান পেয়েছে। অঙ্গসৌষ্ঠবের দিক থেকেও বলা যায়, পরিচালকমণ্ডলী সুচিন্তান। পত্রিকাটির বহুলপ্রচার হওয়া উচিত

অন্তরঙ্গ—পরীক্ষিৎ। আর্ট এন্ড লেটার্স পাবলিশার্স। ৩৪, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ। কলিকাতা-১২। দাম দু'টাকা।

তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ বাস্তবধর্মী নাটিকা। ধনী ব্যবসায়ীর একমাত্র কন্যার সংগে মধ্যবিত্ত পরিবারের এক যুবকের প্রেম এবং পরে বিবাহ। এই নিয়ে নাটিকা বা কৌতুক নক্‌শা বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। নায়ক-নায়িকা যান্ত্রিক হলেও টাইপ চরিত্রগুলি বেশ চিত্তাকর্ষক।

২৭৬।৬০

প্রাপ্তি স্বীকার

কাল পুরুষ—(রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত কবিতা সংকলন)—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

কাব্য-চয়নিকা—দেবেন্দ্রনাথ সেন।

কাব্য-চয়নিকা—অক্ষয়কুমার বড়াল।

সন্ধ্যা রায়—শ্রীনিগূঢ়ানন্দ সরকার।

আশীর্বাদ—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

আধুনিক শিক্ষা তত্ত্ব—বীরেন্দ্রমোহন আচার্য।

চরণিক—মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

বৈঠকী গল্প—সন্তোষকুমার দে।

মুক্তবন্ধ—রমাপদ চৌধুরী।

মহাশ্বেতা—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

রুপোলী চাঁদ—ধনঞ্জয় বৈরাগী।

রাঘব বোয়াল—আনন্দকিশোর মুন্সী।

সীমান্তের সপ্তলোক—নিখিলরঞ্জন রায়।

ছুছু-ছুছু—শ্রীধীরেন বল।

বিদ্যাসাগরের ছাত্র-জীবন—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু।

একে একে এক—কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূজার নাটক
উমানাথ ভট্টাচার্যের
জল (২·৫০)
চারটি দৃশ্যের এই নাটকে অফুরন্ত হাসির অন্তরালে আছে গভীর দুঃখের অনুভূতি॥ —স্বাধীনতা
নীচের মহল (২·৫০)
ঘূর্ণী (২·২৫)
কথকতা
৩৩সি, নেপাল ভট্টাচার্য লেন, কলি-২৬
(সি ৭৪৩৫)

দার্শনিক পণ্ডিত
সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য প্রণীত
হিন্দু ধর্ম-কর্মের প্রামাণ্য বিরাট গ্রন্থ
পুরোহিত দর্পণ
সুলভ সংস্করণ—৯, রাজ সংস্করণ—১০,
দেবতা ও আরাধনা
দেবতা আছেন—কোথায় আছেন। কেমন করিয়া আরাধনা করিলে তাঁহারা আবির্ভূত হন। তাঁহাদের স্বরূপ কি এবং কি কারণে ও কি প্রকারে তাঁহারা আমাদের বশীভূত হন, তাহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও প্রত্যক্ষ দেখিবার উপায় সকল আলোচিত। মূল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র
জন্মান্তর রহস্য
আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ক প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্বন্ধে আলোচিত; জন্মান্তর ও পরলোক সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মতের সার সংকলন। সুদৃশ্য বাঁধাই মূল্য ৩৷৷০ মাত্র।
শ্রীমদ্ বাৎস্যায়ন মুনি প্রণীত
কামসূত্র ৩, মাত্র।
প্রকাশক—সত্যনারায়ণ লাইব্রেরী
৩২নং গোপীকৃষ্ণ পাল লেন, কলিকাতা

স্মৃতি কথা সুখলতা রাও
পথের আলো ও Leading Lights
(কতগুলি অসাধারণ ঘটনার সমাবেশ আছে।)
প্রাপ্তিস্থান :
পথের আলো ও Leading Lights
১। মেসার্স বৃন্দাবন ধর এন্ড সন্স প্রাঃ লিঃ
৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলিকাতা-১২
Leading Lights—
২। মেসার্স বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ
মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা-৭
৩। অশোক বুক সেণ্টার
১৬৭-এন্ রাসবিহারী এভেনিউ, কলি-১৯
(সি ৭৩০৮)

প্রকাশমাত্রই সুধীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে মননশীল নাট্যকার
দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সদ্য প্রকাশিত নাটক
জীবনস্রোত
২·৫০ নঃ পঃ
পুস্তকালয়
৬ বংকিম চাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২
(সি-৭৩৯০)

বি. কম্ পরীক্ষার্থীদের উপযোগী
অ্যাড্‌ভোকেট শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাশের
কন্ট্র্যাক্ট আইন ... ১·৫ টা.
প্রশ্নোত্তরে ভারতীয় পণ্য-বিক্রয় আইন ... ১ টা.
প্রশ্নোত্তরে ভারতীয় বাণিজ্যিক আইন ... ২·৫ টা.
শ্রীপ্রমথনাথ পালের
শরৎ-সাহিত্যে নারী (২য় সং) ৪ টা.
দত্তা-পরিচয় (২য় সং) ... ২ টা.
মানুষ শরৎচন্দ্র (২য় সং) ... ২ টা.
হিন্দু-সাহিত্যে প্রেম ... ৩ টা.
শ্রীপ্রহ্লাদ দাসের
নৃত্য শিক্ষা ... ৫ টা.
নৃত্য-বিজ্ঞান ... ২·৫ টা.
প্র ভা ত (মাসিকপত্র) কা র্যা ল য়
২সি, নবীন কুণ্ডু লেন (কলেজ রো হইতে),
কলিকাতা-৯
(সি ৭২১৭)

কে. হোড়ের
মহাভৃঙ্গরাজ

তারাশঙ্করের
'বিপাশা'

জরাসন্ধর
'পাড়ি'

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
'দিগ্বলয়'

বুদ্ধদেব বসুর
'সার্থকতা'

রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

সততার যাচাই

চিত্রপরিচালনার ক্ষেত্রে বিমল রায় প্রবীণ হলেও সৃজনীপ্রতিভায় তিনি নিত্য নবীন। তাই ছায়াছবির নতুন যুগেও তিনি যুগন্ধর চিত্রস্রষ্টারূপে অভিনন্দিত। বিমল রায় প্রোডাকশন্স-এর পতাকাতলে তৈরী "পরখ" হিন্দী ছবিটি প্রযোজক-পরিচালক শ্রী রায়ের এই অনন্য গৌরবের স্বাক্ষরই আবার নতুন করে বয়ে নিয়ে এল।

সলিল চৌধুরীর একটি অভিনব কাহিনীর চিত্ররূপ এই ছবি। এক অনুন্নত পল্লীগ্রাম এই ছবির পটভূমি।

গ্রামের পোস্টমাস্টার হঠাৎ একদিন এক বিরাট ধনীর কাছ থেকে একটি চিঠি ও সেই সঙ্গে পাঁচ লাখ টাকার একটি চেক পেলেন। গ্রামের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সেখানকার সাধু চরিত্রের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির হাতে এই টাকা তুলে দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে চিঠিতে। পোস্টমাস্টার এত বড় সমস্যার সম্মুখীন কখনও বুঝি হননি এর আগে।

গ্রামের পাঁচজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির একটি ঘরোয়া সভা ডেকে তিনি বললেন চিঠি ও চেকের কথা, তাঁর সমস্যার কথা। পাঁচ লাখ টাকার লোভ গ্রামের পাঁচ প্রধানকে এমন অস্থির করে তুলল যে, সেই সভাতে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রামের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নির্বাচন সম্ভব হল না। এঁদের মধ্যে নির্লোভ ও অচঞ্চল দেখা গেল শুধু গ্রামের আদর্শবাদী স্কুলশিক্ষক রজতকে। গণভোটের মাধ্যমে গ্রামের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নির্বাচনের প্রস্তাব করল

এস এম ফিল্ম ইউনিটের "যাত্রী" ছবির সহ-নায়িকা সবিতা।

রজত, এবং সে নিজে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করতে চাইল। এতে আর সকলেই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। কারণ, নির্বাচনে সর্বজনপ্রিয় রজতকে হারিয়ে দেওয়া সহজ কথা নয়। পোস্টমাস্টার কিন্তু বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন রজতকে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ গ্রহণ করতে। রজত রাজী হল।

রাতারাতি শান্ত গ্রাম অশান্ত হয়ে উঠল। গ্রামের লোকের ভোট আদায়ের জন্যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল ধূর্ততা ও বদান্যতার প্রতিযোগিতা।

আসন্ন নির্বাচনের এই উত্তেজনায় শান্ত মনে নিজের ছাত্রদের নিয়ে গ্রামোন্নয়নের কাজ করে চলে রজত। অবসর মুহূর্ত তার কাটে পোস্টমাস্টারের মেয়ে সীমার সান্নিধ্যে। সীমাকে রজত ভালোবাসে, সীমা রজতকে নিয়ে ভবিষ্যৎ সুখের স্বপ্ন দেখে। রজত ও সীমার প্রণয়-সম্পর্ক নিয়ে গ্রামে কুৎসা রটায় নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বীরা। একমাত্র রজতকেই সকলের ভয়, এবং সে যাতে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ায় সে চেষ্টা করেন গ্রামের জমিদার। শেষ পর্যন্ত তাই করাতে হল রজতকে। গ্রামের য়ুনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের কুচক্র থেকে পোস্টমাস্টারকে বাঁচাবার জন্যে রজত নির্বাচন থেকে নাম প্রত্যাহারের শর্তে জমিদারের কাছ থেকে টাকা ধার করে। সে টাকা অবশ্য শেষ পর্যন্ত পোস্টমাস্টারের প্রয়োজনে লাগে না। কিন্তু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার ও সীমার মধ্যে সাময়িক মান-অভিমানের পালার অবসান ঘটে।

নির্বাচনের দিনে গ্রামে দেখা দেয় দারুণ চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা। এবং তারপর শুরু হয় ভয়াবহ দাঙ্গা। এই দাঙ্গার সময়েই গ্রামবাসীদের সামনে আত্মপ্রকাশ করেন

ইণ্ডিয়ান মিউজিক এণ্ড আর্ট কলেজ

(৭০/২/বি, মানিকতলা স্ট্রীট, কলি-৬। ফোন নং ৩৫-১৭৩১। স্থাপিত—১৯৫২। আজাদ হিন্দ বাগ (হেদুয়া)-এর নিকট।)

ফাইন আর্ট, কমার্শিয়াল আর্ট, ইণ্ডিয়ান পেণ্টিং ক্লাসে ভর্তি চলিতেছে। ৩রা এবং ১০ই সেপ্টেম্বর '৬০ নূতন ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে। কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত ও নৃত্য বিভাগে ভর্তি চলিতেছে। বিস্তারিত বিবরণ জানিতে হইলে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৮টা পর্যন্ত অনুসন্ধান করুন।

প্রবীণ ও নবীন লেখকদের বাছাই রচনার সংকলন

মানস

কার্যালয় ॥ ৬৩ বহুবাজার স্ট্রীট ॥ কলিকাতা — ১২

লেখকসূচী পরবর্তী বিজ্ঞাপনে

(সি ৭৪১৬)

রঙমহল

—ফোন : ৫৫–১৬১৯—

প্রতি বৃহস্পতি ও শনি : ৬৷৷টায়

রবি ও ছুটির দিন : ৩টা - ৬৷৷টায়

শততম রজনী অতিক্রান্ত

এক পেয়ালা কফি

শ্রেষ্ঠাংশে—রবীন, হরিধন, সত্য, দীপক, জহর, অজিত, বিশ্বজিৎ, পিণ্টু, সমর, কেতকী, কবিতা ও তপতী ঘোষ

গিরিশ থিয়েটার

(জাতির নাট্যগুরুর নামাঙ্কিত নাট্যশালা)

প্রযোজনা ও উপস্থাপনা—বিশ্বরূপা থিয়েটার

স্থান—বিশ্বরূপা থিয়েটার (৫৫-৩২৬২)

অনাস্বাদিত রসের সুরভি সিঞ্চিত

উল্কা ট্রেন

প্রতি সোমবার বুধবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা ৬৷৷টায়

এবং রবি ও ছুটির দিন সকাল ১০৷৷টায়

সম্পাদনা ও নির্দেশনা—বিধায়ক ভট্টাচার্য

আঙ্গিক নির্দেশনা—তাপস সেন

শ্রেঃ—রাধামোহন ভট্টাচার্য, জ্ঞানেশ মুখার্জি, বিধায়ক ভট্টাচার্য, সুনীল ব্যানার্জি, অরুণ ব্যানার্জি, রমেশ মুখার্জি, প্রভাত গৌতম, গীতা দে, জয়শ্রী সেন প্রভৃতি

সেই বিরাট ধনী যিনি গ্রামকল্যাণে পাঁচ লাখ টাকা দান করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। গ্রামের সকলেই তাঁকে এতদিন নগণ্য ব্যক্তি বলে মনে করে এসেছে। ছদ্ম-পরিচয়ে গ্রামে থেকে তিনি দেখছিলেন লোভ ও স্বার্থপরতার নির্লজ্জ খেলা। খেলা সাঙ্গ হল। এবং সকল গ্রামবাসীদের অকুণ্ঠ ও সর্বসম্মত বিচারে তিনি শেষ পর্যন্ত কেমনভাবে গ্রামের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির হাতে পাঁচ লাখ টাকা তুলে দেন তা-নিয়েই গড়ে ওঠে নির্বাচন-পর্বের নাট্য-পরিণতি। কাহিনীর প্রণয়োপাখ্যান ও মিলনান্ত রূপে নেয় যখন রঞ্জিত ও সীমার মিলনের পথটি সহজ করে দেন তাদের উভয়ের এতদিনকার ছদ্মবেশী ধনী-শুভার্থী।

ছবির কাহিনীর মূলে সূক্ষ্ম রঙ্গ ও ব্যঙ্গ। পরিচালক বিমল রায়ের সুনিপুণ বিন্যাসের গুণে ছবির কোন অংশেই এই দুই উপাদান পরিমিতির বাঁধ ভেঙে আত্মপ্রকাশ করেনি। রঙ্গরসকে অশ্লীল ও ব্যঙ্গকে অবাস্তব রেখে কাহিনীকে রজতপটে রসমধুর ও বাণীবাহ করে তোলার এক অপূর্ব প্রয়োগ-সিদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন বিমল রায় এই ছবিটিতে। কাহিনীর অন্তর্গত প্রণয়োপাখ্যানটিও এই পরিমিতি বোধের গুণে পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। ছোট একটি গ্রামের পটভূমিতে ছবির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনেক চরিত্র ও অনেক ঘটনার ভিড় এমন এক অবিচ্ছিন্ন নাট্যরসের শাসনে নিয়ন্ত্রিত যার মধ্যে অতি-নাটকীয়তার কোন উচ্ছ্বাস নেই কিংবা ছন্দপতনের কোন গরমিল নেই। বর্তমান যুগের মানসিকতা ও চিরন্তন মানবিকতায় বাঙ্ময় এবং প্রণয়-মাধুর্য ও রঙ্গরসে উজ্জ্বল হয়েও ছবিটি শ্রেষ্ঠ শিল্পের শর্ত আশ্চর্যভাবে পূরণ করেছে।

প্রয়োগ-কর্মে পরিচালক বিমল রায় এই ছবিতে আরও যে-সব বিরল কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তার মধ্যে রয়েছে চিত্ররূপটির অনবদ্য শিল্প-শোভনতা। গ্রাম্য পটভূমিতে ছবির বহু দৃশ্যের অপার সৌন্দর্য ও লাবণ্য দর্শকের দৃষ্টি ও অনুভূতিকে মাধুর্যে ভরিয়ে তোলে। প্রণয়িনীর অন্তর-অনুরাগের প্রতীকীরূপেও পরিচালক নিসর্গ-শোভাকে নিরুচ্চারে গীতিময়তায় পরিবেশন করেছেন। গানের রূপায়ণেও পরিচালকের রসবোধ ও কল্পনাশক্তির পরিচয় সুস্পষ্ট।

ছবির ছোট-খাটো দোষ-ত্রুটিগুলি এর সামগ্রিক উৎকর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে উপেক্ষণীয়। ইংরেজী স্কুলে পড়া জমিদার-শ্যালিকার পোশাক ছবিটিতে খুবই বেমানান লাগে। গ্রামের প্রকাশ্য মঞ্চে জমিদারের পক্ষে শ্যালিকাকে নাচানোর ঘটনাটিও অস্বাভাবিক মনে হয়।

সম্মিলিত অভিনয়-সৌকর্য ছবিটির একটি বড় গুণ। পোস্টমাস্টারের মেয়ে

সীমার রূপসজ্জায় সাধনা শিবদসানির অভিনয় সুন্দর ও মর্মস্পর্শী। তাঁর অভিনয়ে নিরুচ্চার অনুরাগের অভিব্যক্তি মনকে নাড়া দেয়। বাচনভঙ্গী এবং চলা-ফেরা ও হাব-ভাবের কমনীয়তায় চরিত্রটিকে তিনি স্নিগ্ধতার প্রতিমূর্তিরূপে গড়ে তুলেছেন। আদর্শবাদী স্কুল শিক্ষক ও সীমার প্রণয়ীর চরিত্রে বসন্ত চৌধুরীর অভিনয় স্বচ্ছন্দ, সংবেদনশীল ও প্রাণবন্ত। তাঁর হিন্দী উচ্চারণও চমৎকার।

পোস্টমাস্টারের চরিত্রে নাজির হোসেন মনোজ্ঞ অভিনয়ের প্রমাণ দিয়েছেন। অভিনয়-দক্ষতার গুণে তিনি চরিত্রটির প্রতি দর্শকদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে রাখেন। ছবির একটি বিশিষ্ট চরিত্রে মতিলালের অভিনয় মনোগ্রাহী। চিত্র-নাট্যের বিশেষ কয়েকটি মুহূর্তে ও সংলাপ বলার ভঙ্গীতে তিনি দর্শকদের নিমেষেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে নেন। অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রে প্রশংসনীয় অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন কানহাইয়ালাল, জয়ন্ত, অসিত সেন, দুর্গা খোটে রশিদ খাঁন, লীলা চিটনিস ও নিশি। পার্শ্বচরিত্রে পল মহেন্দ্র, রবি পাল, মমতাজ বেগম মাস্টার আনোয়ার, মণি চ্যাটার্জি ও মেহের বানু উল্লেখযোগ্য।

কাহিনীকার সলিল চৌধুরী ছবির মরমী সংগীতাংশ পরিচালনা করেছেন। আবহ-সংগীতে এবং কয়েকটি গানের সুরারোপে তিনি প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ছবির সব কয়টি গানই সুগীত।

সামগ্রিক কলাকৌশল ও আঙ্গিক পারিপাট্যের দিক থেকে ছবিটি উঁচু মানের। আলোকচিত্রে কমল বসু, সম্পাদনায় অমিত বসু, শব্দগ্রহণে জর্জ ডি'ক্রুজ এবং শিল্প-নির্দেশে সুধেন্দু রায় বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

চিত্রালোচনা

এ সপ্তাহে দুখানি হিন্দী ছবির মুক্তি ঘোষিত হয়েছে—অনুপম চিত্রের "মিঞা বিবি রাজী" ও ডায়মণ্ড জুবিলি প্রোডাকশন্সের "রঙ্গীলা রাজা"।

"মিঞা বিবি রাজী" কৌতুকরসে সমৃদ্ধ একটি পারিবারিক চিত্র। কামিনী কদম, শ্রীকান্ত, সীমা, ডেজি ইরাণী, ডেভিড, মামুদ প্রভৃতিকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। জ্যোতি স্বরূপ ও শচীন দেব বর্মণ যথাক্রমে এর পরিচালক ও সুরকার।

"রঙ্গীলা রাজা" পুরোপুরি প্রমোদ চিত্র। দুঃসাহসিক ঘটনা, রঙ্গকৌতুক, প্রণয়, নাচগান—সবই আছে এতে। প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন মহীপাল, শশীকলা, কুমকুম, জয়ন্ত, ভগবান ও মীনু মমতাজ। ইসমাইলের পরিচালনায় ও শিবরামের সুরযোজনায় ছবিটি গৃহীত হয়েছে।

• • •

ফিল্ম করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার "রিক্তা" আজ থেকে একুশ বছর আগে বাংলা ছবির জগতে অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। অধুনা খ্যাত পরিচালক সুশীল মজুমদারের যশের সোপানও রচিত হয়েছিল এই ছবিতে। তুলসী লাহিড়ী রচিত কাহিনীর ভিত্তিতে তোলা এই ছবির মুখ্য ভূমিকায় ছায়া দেবীর অভিনয় আজও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। বিগত যুগের এই প্রসিদ্ধ ছবিটিকে আধুনিক যুগোপযোগী করে এই সপ্তাহে পুনঃপ্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন সীমা ফিল্মস্। ছবির গানগুলি নতুন করে গাইয়ে এই নবসংস্করণের আকর্ষণ বাড়ানো হয়েছে। এতে যাঁরা নতুন করে কণ্ঠদান করেছেন তাঁদের মধ্যে হেমন্তকুমার, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণা গাঙ্গুলী, সুমিত্রা দেবগুপ্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

• • •

কি বই পড়বেন দেখুন
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দম্পতি ৩্
মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
জানি তুমি আসবে ৩্
প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর
আমি যারে চাই
সোনার প্রতিমা
ধানদূর্বা
দানের মর্য্যাদা
পথের শেষে
তিমির রাত্রি
আশীর্বাদ
প্রত্যেকখানি তিন টাকা
শৈলজানন্দের
মধুযামিনী ৩্
পতিব্রতা ৩্
পতিদেবতা ২্
প্রিয়তমা ২্
মনের মাধুরী ২্
বিবাহ বন্ধন ২্
মাধবী রাতে ২্
বঙ্কিমচন্দ্র বা শরৎচন্দ্রের লেখা নয়
এমনকি এযুগের যাযাবর, অবধূত বা বনফুলেরও নয়
তবুও আপনাকে পড়তে বলছি
উষা দেবী সরস্বতীর
ফুলশয্যার রাতে
একবার পড়লে আপনি ভুলতে পারবেন না সুভদ্রার সেই ফুলশয্যার রাতের কাহিনী
ভুলতে পারবেন না তার কলেজ জীবনের ট্র্যাজেডি
দাম : ৩্
নারায়ণ ভট্টাচার্য্য
অভিমান - ৩্
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
ছিনিমিনি - ৩্
নেপথ্য - ২্
বুদ্ধদেব বসু ও প্রতিভা বসু
বসন্ত জাগ্রত দ্বারে ৩্
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
তোমায় আমি ভালবাসি - ৩্
শুক্লবসনা সুন্দরী - ৩্
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
রূপের ফাঁদ - ৩্
ক্যাটালগের জন্যে চিঠি লিখুন
দেব সাহিত্য কুটীর
কলিকাতা - ৯

এলিট

প্রত্যহ
৩, ৬ ও রাত্রি ৯টায়

এক কিশোর বালকের আর্টিস্ট হওয়ার স্বপ্নকে সার্থক রূপ দেবার দুঃসাহসী প্রচেষ্টার করুণ মধুর কাহিনী!

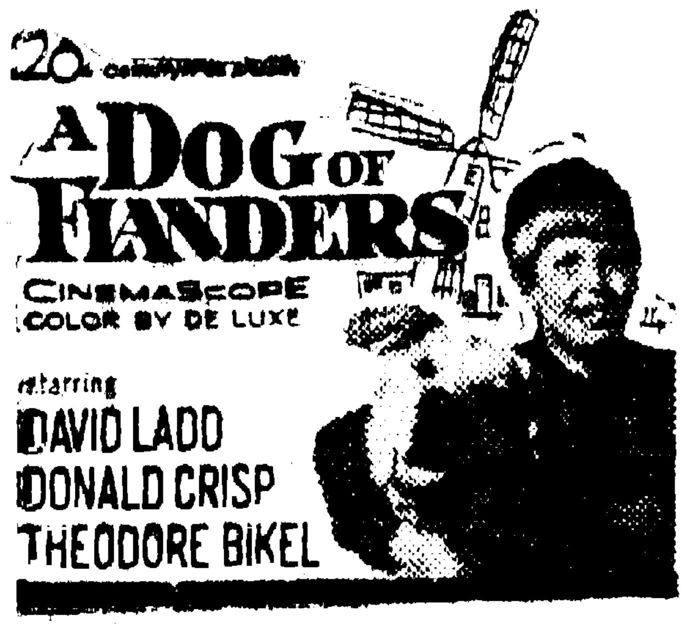

(সর্বজন দৃশ্য)

আগামী মাসে চারখানি নতুন বাংলা ছবির মুক্তি নির্ধারিত হয়েছে।

এস এম ফিল্ম ইউনিটের "যাত্রী" পূজা মরসুমের প্রথম আকর্ষণ। ছবিটি আগামী সপ্তাহে মুক্তি পাবে। ভারত দর্শনে উৎসুক পাঁচশত ট্রেনযাত্রীকে কেন্দ্র করে এর অভিনব কাহিনী। সুরশিল্পী, চিত্রশিল্পী, অধ্যাপিকা, সেবিকা, শিক্ষক, বাউল, বৈষ্ণব—নানান স্তরের মানুষের সমারোহ এর মধ্যে। পরিচালক সচ্চিদানন্দ সেন মজুমদার শিল্পী নির্বাচন করেছেন সম্পূর্ণ নতুন ধারায়। শিল্পীরা সবাই নতুন। কাহিনীর পটভূমি ও পরিবেশ একাত্ম হয়ে যাতে চরিত্রগুলির সঙ্গে মিশে যায় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন তিনি। তাই পুরোন মুখের প্রয়োজন অনুভব করেন নি।

টাইম ফিল্মসের "স্বাতীতুকু থাক" বর্তমানে সম্পাদকের টেবিলে। একাদিক্রমে ৪২ দিন স্যুটিং-এর পর ছবিটি শেষ করেছেন এর তরুণ পরিচালক-গোষ্ঠী যাত্রিক। সুচিত্রা সেন এতে দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করেছেন এবং ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা এমন মর্মস্পর্শী অভিনয় ইতিপূর্বে তিনি আর করেন নি। অসিতবরণ, বিকাশ রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস প্রভৃতিকে তাঁর বিপরীতে দেখা যাবে। এই ছবিটি সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি মুক্তি পাবে।

এপেক্স ফিল্মসের "শুন বরনারী" এবং এম জি এ প্রোডাকসন্সের "হাসপাতাল" পূজা মরশুমের অবশিষ্ট দুই আকর্ষণ। উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী প্রথম ছবিটির এবং অশোককুমার ও সুচিত্রা সেন দ্বিতীয়টির মুখ্য আকর্ষণ।

• • •

শ্রীবিষ্ণু পিকচার্সের প্রথম ছবি "অগ্নি সংস্কার"-এর চিত্রগ্রহণ অগ্রদূতের পরিচালনায় নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। বিনয় চট্টোপাধ্যায় এর কাহিনী ও চিত্রনাট্য লিখেছেন। ভূমিকালিপির পুরোভাগে আছেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, ছায়া দেবী প্রভৃতি। সুরসৃষ্টির ভার নিয়েছেন হেমন্তকুমার।

এস-কে-এল ফিল্মস্ একটি নবগঠিত প্রযোজক প্রতিষ্ঠান। সুবোধ ঘোষের "গরল অমিয় ভেল" উপন্যাস অবলম্বনে এ'দের প্রথম ছবি "শিলালিপি" তোলা হচ্ছে। সত্যজিৎ রায়ের প্রাক্তন সহকারী সুবীর হাজরা ছবিটি পরিচালনা করছেন। এর বিভিন্ন ভূমিকায় চাঁদ উসমানী, মঞ্জু দে, রুমা বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, দীপিকা দাস, অজিত চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ, তরুণকুমার প্রভৃতিকে দেখা যাবে। একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় সুপ্রসিদ্ধ

বিশ্বরূপা

(অভিজাত প্রগতিধর্মী নাট্যমঞ্চ)
[ফোন: ৫৫-১৪২৩, বুকিং ৫৫-৩২৬২]

বৃহস্পতি ও শনি সন্ধ্যা ৬॥টায় | রবি ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬॥টায়

২০০তম রজনী অতিক্রান্ত

সেতু

একটি চিরন্তন মানব অনুভূতির কাহিনী
আলোকশিল্পী—তাপস সেন
শ্রেষ্ঠাংশে—নরেশ মিত্র, অসিতবরণ
তরুণকুমার, মহরাজ, সন্তোষ, জহর,
জয়শ্রী, সুব্রতা, ইরা, আরতি ইত্যাদি
ও
তৃপ্তি মিত্র (বহুরূপী)

বিশ্বরূপায় বহুরূপীর অভিনয়

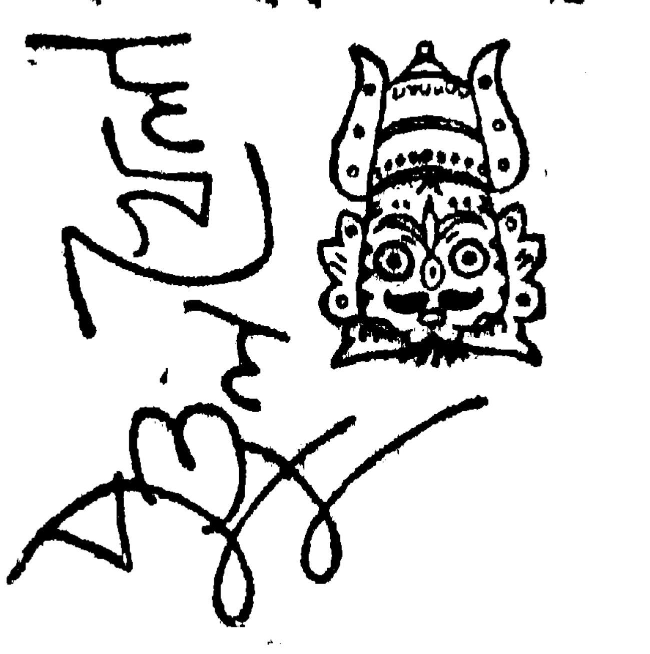

মঙ্গলবার ৩০শে আগস্ট—সন্ধ্যা ৬॥টায়
নির্দেশনা—শম্ভু মিত্র
আলোকসম্পাত—তাপস সেন
শ্রেঃ তৃপ্তি মিত্র, শম্ভু মিত্র, অমর গাঙ্গুলী,
কুমার রায় ও আরতি মৈত্র।

অভিযান

পূজা সংখ্যায়
এবার থাকবে
৪টি
উ প ন্যা স

লিখছেন:
গজেন্দ্র মিত্র, বাণী রায়,
শক্তিপদ রাজগুরু ও
মানবেন্দ্র পাল।

আরও নামকরা লেখকের লেখা থাকবে।
তা' ছাড়া থাকবে সিনেমা ও থিয়েটার
সংক্রান্ত প্রচুর লেখা ও প্রচুর ছবি।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, স্বত্বাধিকারী, 'অভিযান'
৭৬/১এ, হরি ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মনোজ দত্ত
সম্পাদিত
শারদীয়

সানাই

বেরোবে ১৫ই সেপ্টেম্বর
পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লিখেছেন
আশাপূর্ণা দেবী
ও
নীহাররঞ্জন গুপ্ত
এবং...
৪টি গল্প
লিখেছেন
প্রখ্যাত লেখকগণ
চাঞ্চল্যকর সূচী
পরবর্তী সংখ্যায়
প্রকাশিত হবে...
দাম মাত্র ২, টাকা
কার্যালয়:
৭৬বি, আপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা-৯

(সি ৭৩৪৭/২)

সাহিত্যিক ও পরিচালক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় চিত্রাবতরণ করবেন। সুধীন দাশগুপ্তের ওপর সুরযোজনার ভার ন্যস্ত করা হয়েছে।

নাট্যাভিনয়

রঙমহলের পরবর্তী নিবেদন বিমল মিত্র রচিত "সাহেব বিবি গোলাম"। এই বিখ্যাত উপন্যাসটিকে নাটকে রূপান্তরিত করেছেন শচীন সেনগুপ্ত। পূজার সময়ে নতুন নাটকটি মঞ্চস্থ করবার উদ্যোগ-আয়োজন চলছে। প্রধান ভূমিকাগুলি এইভাবে বিভাজিত হয়েছে বলে শোনা গেল: ভূতনাথ—বিশ্বজিৎ, পটেশ্বরী—জাবত্রী দেবী, জবা—সিপ্রা সাহা, ছোটবাবু—সতীশ মুখোপাধ্যায়, মেজবাবু—সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ঘড়িবাবু—জহর গাঙ্গুলী, প্রভৃতি।

* * *

সাম্প্রতিককালে রঙ-বেরঙ নাট্যগোষ্ঠী নতুন ধরনের নাটক ও তার শিল্পসম্মত প্রয়োগের জন্যে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পরেশ ধর রচিত "শুধু ছায়া" এই গোষ্ঠীর একটি বিশিষ্ট অবদান। আগামী রবিবার ৪ঠা সেপ্টেম্বর সকাল দশটায় মিনার্ভা থিয়েটারে এই নাটকটি পুনরভিনীত হবে। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করবেন সজল দত্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, জ্যোতিরিন্দ্র মিত্র, হিমানী গাঙ্গুলী, শোভা মজুমদার প্রভৃতি।

গিরিশ থিয়েটারে "ডাউন ট্রেন"

বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে গিরিশ থিয়েটারের প্রথম নাট্যোপহার "ডাউন ট্রেন" নাট্যামোদী-মহলে ইতিমধ্যেই আলোড়ন এনেছে। বাঙলা নাট্য-আন্দোলনের অতি আধুনিক পর্যায়ে গিরিশ থিয়েটারের এই নাট্য-প্রয়াস নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য তার কারণ গিরিশ থিয়েটার সপ্তাহের তিনটি দিনের মধ্যাহ্ন-সায়াহ্নে সীমাবদ্ধ পেশাদারী নাট্যাভিনয়ের প্রমোদ-কাল সপ্তাহের বাকী দিনগুলির দিবস-সন্ধ্যায় ব্যাপ্ত করে দিয়েছেন। পেশাদারী মঞ্চের জনপ্রিয়তা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এই আন্তরিক প্রচেষ্টা অবশ্যই সুধীজনের সাধুবাদ অর্জন করবে। দ্বিতীয়ত, শৌখিন মঞ্চের একটি সফল নাটককে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের পাদ-প্রদীপের আলোয় এনে গিরিশ থিয়েটার বাঙলার স্বতস্ফূর্ত নাট্য-সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করে তোলার কাজে আশ্চর্যরকম সহায়তা করেছেন। এ-কারণেও তাঁরা ধন্যবাদার্হ। তৃতীয়ত, শৌখিন নাট্যসংস্থার কয়েকজন কৃতী শিল্পী এবং চিত্রজগতের প্রখ্যাত অভিনেতা রাধামোহন ভট্টাচার্যকে পেশাদারী মঞ্চে উপস্থিত করে গিরিশ থিয়েটার সত্যিকারের অভিনয়-দক্ষতাকে অপরিচয়ের অন্ধকার থেকে জন-স্বীকৃতির আলোকে এনে প্রতিষ্ঠিত করার প্রশংসনীয় সাহস দেখিয়েছেন। গিরিশ থিয়েটারের প্রথম নাট্য-নিবেদন জন-সম্বর্ধিত হবার এটিও অন্যতম কারণ।

তরুণ নাট্যকার সলিল সেনের "ডাউন ট্রেন"-এর প্রধান পুরুষ একটি ছোট রেল-স্টেশনের মাস্টার সত্যভূষণ। সত্যনিষ্ঠ সত্যভূষণ অসদুপায়ে অর্থোপার্জনে বিশ্বাসী নয়। সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা তাকে স্বাচ্ছন্দ্য

জলসাঘর
[সিনেমা, মঞ্চ, সাহিত্য মাসিক]
সুবৃহৎ শারদীয়া সংকলন
৩০০ পাতা — দাম ২·৫০ ন.প. মাত্র
— প্রকাশিত হচ্ছে —
১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬০।

উপন্যাস
২টি
বিধায়ক ভট্টাচার্য
মণীন্দ্র চক্রবর্তী

গল্প
৭টি
দক্ষিণারঞ্জন বসু
শিবরাম চক্রবর্তী
অন্নদা মুন্সী
সুধীর সরকার
দেবাংশু মুখোঃ
অবদূত
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
এবং আরও অনেকে

প্রবন্ধ
দীগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নাটক
১টি
শ্রীমাধব রায়

বর্মা চলচ্চিত্রের অজানা, ও দুষ্প্রাপ্য ছবি
গ্রাহক ও এজেন্টরা যোগাযোগ করুন—
৪৫/এ, লকট লেন : কলিকাতা-৯
(সি-৭৪৩৮)

কে, হোড়ের
কনক
* পাউডার *

আমি কিন্তু সেকালের
রাজকুমারী নই,
একালের জনচিত্তহারিণী
চিত্রাঙ্গদা

আমার সম্বন্ধে একালের
এক জননেতা
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন :

"শিল্পের সাধনায় জয়ী হতে গেলে চাই পরিমিতি-বোধ, সত্য অনুভূতি ও ভঙ্গির সুলভ আকর্ষণ থেকে নিজেকে বাঁচাবার ক্ষমতা। জীবনের গভীরতা থেকে সৃষ্টি আসে, উপরের ফেনা থেকে নয়। সাহিত্যই হোক আর ছায়া-চিত্রই হোক জীবন-রস থেকে বঞ্চিত হলে তারা শীর্ণ ও বিবর্ণ হয়ে পড়ে। এই জন্যেই রূপ-সৃষ্টির সাধনা এতো কঠিন সাধনা।

......ছায়া-চিত্রে সূক্ষ্মতম রস-ব্যঞ্জনার ও রূপসৃষ্টির অফুরন্ত সম্ভাবনা আছে। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় ছায়া-চিত্রের আঙ্গিক নিয়ে গভীর আলোচনা চলেছে।

ফেনিল উত্তেজনা ও স্থূলরুচির বস্তু পরিবেশন-লব্ধ জনপ্রিয়তাকে পরিহার করে 'চিত্রাঙ্গদা' ফিল্মের জগতে মনন, সাধন ও রুচির প্রবর্তন করুক এই আমার আন্তরিক কামনা।"

শিল্পসাধনার নবতম প্রয়াস নিয়ে
মহালয়ায় প্রকাশিত হচ্ছে

মূল্য : আড়াই টাকা মাত্র

ডাকমাশুল স্বতন্ত্র
ভি পি পি-তে পাঠানো সম্ভব নহে।

এজেন্টরা যোগাযোগ করুন—
কার্যাধ্যক্ষ, চিত্রাঙ্গদা

৭২-১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
ফোন : ৩৪-৩৯৬২

না দিলেও বাঁচার সুখ থেকে বঞ্চিত করেনি। একমাত্র ছেলেকে অবলম্বন করে সত্যভূষণের ভবিষ্যতের সুখের স্বপ্ন দানা বেঁধে ওঠে। সহধর্মিণী অপর্ণার সোহাগে তার অভাবের সংসারে ভাবের অভাব ঘটে না কোনদিন। বিধবা মা ও বোনের প্রতিপালনের ভার সানন্দে বহন করে সে অন্তরে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে।

সত্যভূষণের এই শান্ত সুখের দিনগুলি হঠাৎ এক নিদারুণ দুর্যোগের ঝাপটায় অশান্ত ও দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। স্ত্রী অপর্ণা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে পর সত্যভূষণ চোখে অন্ধকার দেখে। অর্থাভাবে তার ছেলের পড়াও বন্ধ হবার উপক্রম। অভাব অনটনে ভগ্নস্বাস্থ্য তার স্ত্রীকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে হলে প্রচুর টাকার প্রয়োজন। অর্থের জোগাড় কিছুতেই করে উঠতে পারে না সত্যভূষণ। দুর্দিনে অন্যায় তাকে প্রলোভিত করতে চায়, কিন্তু তার আদর্শনিষ্ঠ মন তবু ন্যায়ের হাল ছাড়ে না। স্ত্রীকে জংশনের হাসপাতালে পাঠিয়েও সত্যভূষণের মনের অশান্তি কাটে না। অপর্ণাকে সুস্থ করে তুলতে হলে অনেক টাকার প্রয়োজন, তাকে কলকাতায় পাঠানো দরকার। এই ঘোর সংকটের সময় সত্যভূষণের পূর্বপরিচিত ব্যবসায়ী নরেন পাল এক রাত্রির জন্যে তার হেপাজতে স্টেশনের সিন্দুকে কয়েক হাজার টাকা গচ্ছিত রাখে। আপত্তি থাকলেও সত্যভূষণ নরেন পালের অনুরোধ এড়াতে পারে না।

তারপর কেমন করে সততার প্রতিমূর্তি এই ন্যায়নিষ্ঠ স্টেশন মাস্টার প্রতিকূল অবস্থার ঘূর্ণিপাকে নিজের ন্যায়বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে শুধু যে অপরের অর্থ আত্মসাৎ করল তাই নয়, আরো জঘন্য অপরাধও করে বসল তাই নিয়ে গড়ে উঠেছে নাটকের ভয়াবহ পরিণতি। অথচ যাদের জন্যে তার এই পাপানুষ্ঠান তাদের আর কোন প্রয়োজন রইল না এই রক্ত-কলুষিত অর্থে। প্রায় একই সঙ্গে সে তার স্ত্রী ও ছেলেকে হারাল। এত বড় ক্ষতির আঘাত সইতে পারল না সত্যভূষণ। সে পাগল হয়ে গেল।

বিধায়ক ভট্টাচার্যের সম্পাদনা ও নির্দেশনায় পরিবেশিত এই নাটকের দুর্বার গতিবেগ দর্শকদের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত আবিষ্ট করে রাখে। অথচ মাত্র একটি সেটে এবং কয়েক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে নাটকের সমস্ত ঘটনা কেন্দ্রীভূত। প্রয়োগ-নৈপুণ্যের গুণে নাট্যরস সহজেই দানা বেঁধে ওঠে দৃশ্যান্তর বা বড় রকমের কোন আঙ্গিক চমক ব্যতিরেকেই। এদিক দিয়ে "ডাউন ট্রেন" সত্যিই একটি স্মরণীয় সৃষ্টি।

নাটকীয় বিন্যাসের দিক থেকে নাটকটি সুগ্রথিত। "ফ্ল্যাশব্যাকে"র ভেতর দিয়ে নাট্যকাহিনীর উদ্ঘাটন দর্শকমনে গোড়া থেকেই 'সাসপেন্স' এর আমেজ সৃষ্টি করে। এই আমেজ আবার দর্শকের অজান্তেই নাটকীয় আবেগের স্তব্ধতায় লীন হয়ে যায়। তবে একটি নিদারুণ হত্যাকাণ্ডের মধ্যে নাট্য-পরিণতি যে ভয়ংকর রূপ নিয়েছে, তার অবতারণা না করেও একটি বিড়ম্বিত জীবনে আদর্শ-চ্যুতির ট্র্যাজেডি দেখান যেত। সত্যভূষণের অপ্রকৃতিস্থতা দেখাবার জন্যেই হয়তো কাহিনীকার এই ভয়াল হত্যাকে অপরিহার্য মনে করেছেন। কিন্তু এতে চরিত্রের স্বাভাবিকতা বিপন্ন হয়েছে। সাময়িক উত্তেজনার বশে মানুষ হয়তো অনেক অপকর্ম করে বসে, কিন্তু একজন সাধু প্রকৃতির লোক রাতারাতি স্বভাব-অপরাধীর মত তার পাপাচরণের সমস্ত প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করতে এতখানি নৃশংস হয়ে উঠতে পারে কি না তা সন্দেহাতীত নয়। উপরন্তু নায়ককে পাগল দেখাতে যে ফ্ল্যাশব্যাকের অবতারণা করা হয়েছে, তাই খানিকটা anti-climax সৃষ্টি করেছে নাটকের শেষ দৃশ্যে।

এ-সমস্ত বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও নাটকটির অনেক বৈশিষ্ট্য অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি রাখে। সংলাপের গুণে নাটকটি প্রতি-মুহূর্তেই উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। তদুপরি রয়েছে নাটকটির অপরূপ আঙ্গিক সৌষ্ঠব। একটি ছোট রেল-স্টেশনের মনোময় ও বাস্তবানুগ দৃশ্যপটে নাট্যকাহিনীর বিস্তার। যাত্রীর ভিড়ে সরব ও গাড়ির নিত্য আসা-যাওয়ায় সরগরম একটি মফঃস্বল স্টেশনের পরিপূর্ণ রূপটির সন্ধান মেলে মঞ্চে। মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাতে সমস্ত পরিবেশটি বাস্তবের মায়াকে সহজগ্রাহ্য করে তোলে। রাত্রের ঝড়ের দৃশ্যে এবং আলোছায়ার মোহরচনায় ও সামগ্রিক আঙ্গিক-নির্দেশনায় তাপস সেনের অভাবনীয় কৃতিত্ব নাটকটিকে অসাধারণ শিল্প-সৌন্দর্যে ভূষিত করে তুলেছে। সুখের কথা, আঙ্গিক মায়া নাটকটির রস-ধারাকে কোথাও গ্রাস করেনি।

প্রকাশক : বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়

প্রকাশিত হইল।

দেবেন্দ্রনাথ সেন : কাব্য-চয়নিকা

মণিমঞ্জুষা গ্রন্থাবলী

শ্রেষ্ঠ কবিদের শ্রেষ্ঠ রচনাবলী : সুলিখিত কবি ও কাব্য পরিচিতি
কবির সুন্দর আলোকচিত্র : উৎকৃষ্ট কাগজ, মুদ্রণ, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ
প্রতি বই পাঁচ টাকা

অক্ষয়কুমার বড়াল : কাব্য-চয়নিকা

পরিবেশক : শ্রীগুরু লাইব্রেরী ও ডি, এম, লাইব্রেরী, কলি-৬

অনন্য নাট্যকার মন্মথ রায়ের অবিস্মরণীয় নাট্যাবদান

জাতির জীবনবেদের মর্মবাণী
ধর্মঘট । পথে-বিপথে
চাষীর প্রেম । আজবদেশ
[বিচিত্রধর্মী চারিটি পূর্ণাঙ্গ নাটক]
একত্রে এক খণ্ডে । মূল্য চার টাকা

জীবন-যৌবনের জয়গানে পূর্ণ
সাঁওতাল বিদ্রোহ
বন্দিতা । দেবাসুর
[তিনটি আশ্চর্য পূর্ণাঙ্গ নাটক]
একত্রে এক খণ্ডে । মূল্য তিন টাকা

হাসি ও অশ্রুর সমন্বয়ে উজ্জ্বল
কোটিপতি নিরুদ্দেশ
বিদ্যুৎপর্ণা
রাজনটী । রূপকথা
[নাট্য-সাহিত্যের বিশিষ্ট সংযোজন]
একত্রে এক খণ্ডে । মূল্য তিন টাকা

ত্রিকালের প্রতিনিধিত্ব করছে
মীরকাশিম
মমতাময়ী হাসপাতাল
রঘুডাকাত
[বাংলা নাট্যের অন্ধকারে জ্বলন্ত মশাল]
একত্রে এক খণ্ডে । মূল্য তিন টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স । কলিকাতা—ছয়

বিশ্বরূপার "সেতু"-র দ্বিশততম অভিনয়োৎসবে নাটকের নায়িকা তৃপ্তি মিত্র (দক্ষিণে) প্রধান অতিথি বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পত্নীর হাত থেকে উপহার গ্রহণ করছেন।

সম্মিলিত অভিনয়-সম্পদ নাটকটিকে ইদানীংকালের একটি স্মরণীয় নাট্য-সৃষ্টির মর্যাদা দিয়েছে। প্রথমেই সত্যভূষণের ভূমিকায় যশস্বী অভিনেতা রাধামোহন ভট্টাচার্যের অত্যাশ্চর্য, সুন্দর অভিনয়ের উল্লেখ করতে হয়। সত্যভূষণের দৃঢ়তা ও আদর্শনিষ্ঠা এবং পরক্ষণেই চরিত্রটির ক্লৈব্য ও অসহায়তা তাঁর অভিনয়ে সাবলীল হয়ে উঠেছে। অপরদিকে চরিত্রটির অন্তর-বেদনা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপ তাঁর অভিব্যক্তিতে মর্মস্পর্শী হয়ে উঠে দর্শকের মনে অব্যক্ত বেদনার স্পর্শ দিয়ে যায়। অপ্রকৃতিস্থ জীবনের পুঞ্জীভূত অতীত-বেদনা তাঁর অভিনয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে, যখন তিনি দুই হাতের দশটি আঙুল ক্ষণে ক্ষণে একত্র ও আলাদা করে বার বার বিড় বিড় করে বলেন, "আমি জংশনে যাব"। শ্রীভট্টাচার্যের এই প্রথম মঞ্চাবতরণ নাট্য-রসিকদের কাছে নিঃসন্দেহে অভিনন্দিত হবে।

বিধায়ক ভট্টাচার্যের মনোগ্রাহী ও স্বচ্ছন্দ অভিনয়ের গুণে নরেন পালের চরিত্রটি চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। তাঁর অভিনয় এই নাটকের অন্যতম আকর্ষণ। স্বল্প অবকাশে সংবেদনশীল অভিনয়ে দর্শকমনে ছাপ রেখে যান গীতা দে। পয়েন্টস্‌ম্যান মথুরাপ্রসাদ ও তাঁর ঘরণীর চরিত্রে যথাক্রমে সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ও জয়শ্রী সেনের অভিনয় প্রাণধর্মী ও চরিত্রানুগ। এই দুই শিল্পীর বিহারী-হিন্দী উচ্চারণ প্রশংসনীয়। সাধু-চরিত্রে রূপান্তরিত এক ভূতপূর্ব ডাকাতের চরিত্রে জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের সু-অভিনয় চরিত্রটির বৈসাদৃশ্য অনেকাংশে বিস্মৃত করিয়ে দেয়। অন্যান্য চরিত্রে প্রশংসনীয় অভিনয়-কৃতিত্বের প্রমাণ দিয়েছেন হিরণ মৈত্র, সহদেব গঙ্গোপাধ্যায়, গোলক চট্টোপাধ্যায়, প্রহ্লাদ প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দ।

নাটকটির মঞ্চসজ্জা ও রূপসজ্জায় জন্যে প্রশংসাভাজন হবেন যথাক্রমে কবি দাশগুপ্ত ও শান্তি সেন।

"সেতু"র সাফল্য

গত ২০শে আগস্ট সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে "সেতু" নাটকটির দুইশত অভিনয়-রজনীর স্মারক উৎসব পালিত হয়। উৎসবে পৌরোহিত্য করেন ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন "যুগান্তর" সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে "সেতু"র নাট্যকার, নাট্য-পরিচালক, কাহিনীকার, শিল্পিবৃন্দ, কলাকুশলী এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্মীকে পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়।

পুরস্কার বিতরণের পর বিশ্বরূপার পক্ষ থেকে উপস্থিত অতিথিবর্গ ও দর্শকদের আন্তরিক অভিনন্দন ও স্বাগত জানান শ্রীরাসবিহারী সরকার। উৎসবের সভাপতি ও প্রধান অতিথি তাঁদের সারগর্ভ বক্তৃতায় "সেতু" নাটকটির সাফল্য ও জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করে সৃজনধর্মী বঙ্গ-সংস্কৃতির কথা উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠান শেষে "সেতু" নাটকটি অভিনীত হয়।

মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল
আরোগ্য করিতে ২৭ বৎসর ভারত ও ইউরোপ-অভিজ্ঞ ডাঃ ডিগোর সহিত প্রতি দিন প্রাতে ও প্রতি শনিবার ও রবিবার বৈকাল ৩টা হইতে ৭টায় সাক্ষাৎ করুন। ৩বি জনক রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।
(সি ৭৬৩১)

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১৫ই আগস্ট—ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ভ্রূকুটি ও কটাক্ষ উপেক্ষা করিয়াই কলিকাতা তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ আসামের নারকীয় ঘটনাবলী ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে অদ্য ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতার সর্বপ্রকার উৎসব বর্জন করিয়া বেদনাহতচিত্তে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করে।

আসামের নারকীয় ঘটনায় বিক্ষুব্ধ বাঙলার জনগণের অন্তরের বেদনা অদ্য ১৫ই আগস্ট তারিখে স্বাধীনতা দিবসের উৎসব বর্জন এবং কৃষ্ণ পতাকা উত্তোলন, কালো ব্যাজ ধারণ ও নীরব শোক-যাত্রা পরিচালনার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিক্ষোভকারীরা মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের বাসভবনের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং সেখানে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু এবং কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেনের কুশপুত্তলিকা দাহ করে।

১৩ই আগস্ট—আসামের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী এবং 'বঙ্গালখেদা' আন্দোলনের পশ্চাতে আগামী ১৯৬১ সালের লোকগণনায় আসামে বাঙালীর সংখ্যা হ্রাস করিবার এক গভীর ষড়যন্ত্র রহিয়াছে। পূর্ববঙ্গের যেসব উদ্বাস্তু তথায় গিয়া আশ্রয় লইয়াছে, তাহাদের বিতাড়ন করিলে উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইবে—এই সংকল্প লইয়াই বাঙালী উৎখাতের এক সুপরিকল্পিত চেষ্টা চলিতে থাকে।

আনন্দবাজার পত্রিকার উদ্যোগে হিমালয়ে এক অভিযান পরিচালিত হইতেছে। এই সংবাদে রাজধানীতে পর্বতারোহণানুরাগী মহলে বিশেষ আগ্রহ সঞ্চারিত হইয়াছে।

১৭ই আগস্ট—আজ লোকসভায় ন্যাশনাল কোল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশনের সর্বশেষ রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনার উপসংহারে সর্দার শরণ সিং স্বীকার করেন—দ্বিতীয় যোজনার শেষে কয়লার উৎপাদনে সাট লক্ষ টন ঘাটতি পড়িবে।

গত ১৫ই আগস্ট শিলং-এ অনুষ্ঠিত পাহাড়িয়া অধিবাসীদের এক জনসভায় পৃথক পার্বত্য রাজ্যের দাবির পুনরায় উল্লেখ করা হয়। ভাষাকে কেন্দ্র করিয়া সম্প্রতি আসামে যে দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, উক্ত সভা তাহাকে অনসমীয়াদের পরাভূত করিবার জন্য পূর্বপরিকল্পিত এক প্রবল আন্দোলন বলিয়া বর্ণনা করে।

১৮ই আগস্ট—১৫ই আগস্ট তারিখে রাত্রিতে কয়েকজনকে মারধোর ও দুইজনকে ছুরিকাহত করা হইলে পর ধুবড়ি শহরে ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছিল এবং তাহা এখনও বলবৎ রহিয়াছে। গতকল্য সূর্যাস্তের অব্যবহিত পরে কয়েকজন ছুরিকাহত হইলে পর শহরে কার্ফু জারী করা হয়। ছুরিকাঘাতে আহত শ্রীসরোজ দাশগুপ্ত হাসপাতালে ভর্তি হইবার অব্যবহিত পরেই মারা যায়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনেক কাটছাঁট করিয়া প্রস্তাবিত তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের জন্য মোট ৩৪৬ কোটি টাকার এক খসড়া পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

১৯শে আগস্ট—অদ্য লোকসভায় জনৈক কংগ্রেস সদস্য এই মর্মে এক প্রস্তাব পেশ করেন যে, সরকার সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত আয় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া আর্থিক বৈষম্য দূর করুন। যদিও সদস্যগণ সকলেই প্রস্তাবটিকে সমর্থন করেন, তবুও বিরোধীপক্ষ প্রস্তাবকারীকে তাহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে না দেওয়ায় প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হয়।

আসন্ন পূজার বাজারের প্রাক্কালে কলিকাতা মহানগরী তথা সারা বাংলায় খুচরা দোকানে যখন কাপড়ের দর ঊর্ধ্বমুখী, তখন রেলওয়ে গুদামে কাপড় জমিয়া গিয়াছে বলিয়া জানা যায়।

২০শে আগস্ট—একদিকে ফেরিওয়ালা ও কিছু সংখ্যক ছাত্র এবং অপরদিকে পুলিস—এই উভয়পক্ষে অদ্য সন্ধ্যার পর বৈঠকখানা বাজার ও শিয়ালদহের মোড়ে এক সংঘর্ষ হয় এবং উহার ফলে পুলিসের লাঠিচালনায় অন্যূন ৮জন ছাত্র আহত হইয়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়; অপরদিকে ইটপাটকেল ও সোডার বোতলের আঘাতে ২জন অফিসার সহ ১৮জন পুলিসও সামান্য আহত হয়।

অদ্য অপরাহ্নে উল্টাডাঙ্গার পুরাতন লৌহ-সেতুটি সশব্দে সহসা ধসিয়া পড়িয়া তিনজন আহত হয় এবং একজন নিখোঁজ হয়। আহত তিনজনকে আর জি কর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

২১শে আগস্ট—উড়িষ্যার রাজ্যপাল শ্রীওয়াই এন সুখঠংকর আজ এক বিবৃতিতে বলেন যে, পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যে সকল ভয়াবহ বন্যার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে, উড়িষ্যার বর্তমান বন্যা সেই জাতীয়।

প্রকাশ, অদ্য কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের সভায় শ্রীখান্দুভাই দেশাই তৃতীয় যোজনার আমলে আয়ের সুষম বণ্টনের জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবি জানান। শ্রীদেশাই নাকি প্রকারান্তরে এমন আভাসও দেন যে, তৃতীয় যোজনার আমলে দেশের ব্যাঙ্কিং শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণও বাঞ্ছনীয়।

বিদেশী সংবাদ

১৫ই আগস্ট—প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে পাকিস্তানে ত্রয়োদশ স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। পাক সরকারের নূতন রাজধানী রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রধান অনুষ্ঠান হয়। ৩১টি তোপধ্বনি দিয়া দিন আরম্ভ করা হয়।

করাচীর সংবাদে প্রকাশ—ঘড়ির চোরাচালানের অভিযোগে বিশেষ সামরিক আদালত পাঁচজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তাহাদের প্রত্যেককে তিন লক্ষ টাকা করিয়া জরিমানা করা হইয়াছে। আদালত তাহাদের নিকট প্রাপ্ত ৮৩টি ঘড়ি বাজেয়াপ্ত করার আদেশও দিয়াছেন।

গতকল্য ব্রাজাভিলে মধ্যরাত্রির সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট ফাদার ফুলবার্ট ইউলু ভূতপূর্ব ফরাসী কঙ্গোর স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন।

১৬ই আগস্ট—গতকল্য মধ্যরাত্রে সাইপ্রাস দ্বীপের স্বাধীনতা ঘোষিত হইয়াছে। সাইপ্রাস গবর্নর স্যার হিউ ফুটের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দ্বীপের ৮২ বৎসর তিন মাসব্যাপী ব্রিটিশ শাসনের অবসান হইল। ২১ বার তোপধ্বনি দ্বারা নূতন স্বাধীনতাকে স্বাগত করা হয়।

১৭ই আগস্ট—পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খান আজ কোয়েটায় সাংবাদিকদের বলেন, প্রস্তাবিত ভারত পাকিস্তান খালের জল সম্পর্কিত চুক্তি সহি করার জন্য ভারতের প্রধান-মন্ত্রী শ্রীনেহরু ১৯শে সেপ্টেম্বর নাগাদ করাচীতে আসিবেন।

মার্কিন ইউ-২ বিমানের বৈমানিক শ্রীফ্রান্সিস গ্যারী পাওয়ার্স আজ মস্কোতে তাঁহার বিচারের সময় স্বীকার করেন যে, তিনি গত ১লা মে রাশিয়ার উপর বিমানে গুপ্তচরবৃত্তি চালাইয়া-ছিলেন এবং সোভিয়েট এলাকার ১২ শত হইতে ১৩ শত মাইল অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী শ্রীপ্যাট্রিস লুমুম্বা কঙ্গো প্রজাতন্ত্রকে ছয় মাসের জন্য সামরিক আইনের অধীনে রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

১৮ই আগস্ট—কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী শ্রীপ্যাট্রিস লুমুম্বা গতকল্য রাত্রিতে বলেন যে, যদি কঙ্গো সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে সন্তোষজনক না হয় তাহা হইলে এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি কাতাঙ্গায় কঙ্গোলী সৈন্য প্রেরণ করিবেন।

১৯শে আগস্ট—অদ্য মস্কোতে এক সোভিয়েট সামরিক আদালত মার্কিন বৈমানিক শ্রীফ্রান্সিস গ্যারি পাওয়ার্সকে দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

অদ্য রাশিয়ার দ্বিতীয় মহাজাগতিক শূন্যযান উৎক্ষেপণ করা হয়। শূন্যযানে দুইটি কুকুর সহ কয়েকটি জন্তু প্রেরণ করা হইয়াছে। 'তাস' কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণে জানা যায় যে, ৪৳ টন ওজনের শূন্যযানটি পৃথিবীর দুইশত মাইল ঊর্ধ্বে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

২০শে আগস্ট—গুপ্তচরবৃত্তির জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত মার্কিন বৈমানিক ফ্রান্সিস গ্যারী পাওয়ার্সের পরিবারের লোকেরা তাঁহার দণ্ডের মেয়াদ হ্রাস করার অনুরোধ জানাইবার জন্য শ্রীখ্রুশ্চেভের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

মস্কো রেডিও হইতে অদ্য রাত্রিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মহাকাশে প্রেরিত সর্বশেষ সোভিয়েট যান দুইটি কুকুর সহ নিরাপদে ভূপৃষ্ঠে ফিরিয়া আসিয়াছে।

নূতন লাওস সরকারের নেতা প্রিন্স সৌভান্না ফুমা আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, জেনারেল ফোমীর নেতৃত্বাধীনে বিরোধী শক্তিসমূহ ভিয়েন-তিয়েনের দিকে অগ্রসর হইতেছে—উহারা রাজ-ধানীতে পৌঁছিলে অবশ্য রক্তপাত হইবে।

২১শে আগস্ট—কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী শ্রীপ্যাট্রিস লুমুম্বা বলেন যে, কঙ্গো যদি রাষ্ট্রপুঞ্জের ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট না হয়, তাহা হইলে তাঁহার দেশ কয়েকটি জাতির নিকট হইতে—শুধু আফ্রিকার জাতিগুলি নহে—সরাসরি সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করিবে।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০,, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২,, ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস ৬ সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

দেশ

DESH 40 Naya Paise
Saturday, 3rd September 1960.

২৭ বর্ষ ॥ ৪৪ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৮ ভাদ্র, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে

পশ্চিমবাংলার বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা ব্যবস্থায় নতুন কোনও গুরুতর সংকট দেখা দিয়েছে মনে করি না। তবে সাম্প্রতিক দু' একটি ঘটনায় বিদ্বজ্জন মহলে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্ত তাঁর কার্যকাল শেষ হওয়ার দু'বৎসর আগেই দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ গ্রহণ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। ওদিকে বর্ধমানের নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীসুকুমার সেন দণ্ডকারণ্য সংস্থার চেয়ারম্যানপদে নিযুক্ত হয়েছেন। একজন তাঁর কার্যকাল শেষ হওয়ার পূর্বেই বিদায় নিতে উদ্যোগী; অপরজন নতুন একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার সূচনাতেই স্থায়ী ভাবে না হোক অন্তত সাময়িকভাবে অন্যতর কর্মক্ষেত্রে প্রেরিত হচ্ছেন। কলকাতা এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিনা সে-বিষয়ে জল্পনা করা নিষ্ফল প্রায়। কিন্তু এ-প্রশ্ন স্বতই উত্থাপিত হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিচালনায় উপাচার্যের কার্যকর ভূমিকা, ক্ষমতা এবং দায়িত্ব কতখানি।

বিশ্ববিদ্যালয় মাত্রেই একটা বৃহৎ প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ত আয়তনে, আয়োজনে, শিক্ষা এবং পরীক্ষার বিবিধ বিষয় বৈচিত্র্যে এখনও সারা ভারতের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ অলংকৃত করেছেন বহু বিশ্ববিশ্রুত, প্রতিভাধর সুধীজন। তাঁরা কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনায় নেতৃত্ব করেন নি, বিদ্যাচর্চা এবং জ্ঞানের ক্ষেত্র প্রসারিত করার জন্য তাঁরা নিরন্তর নব নব পথে উদ্যোগী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সে-ঐতিহ্য এখনও অক্ষুণ্ণ আছে [illegible] না। উপাচার্য এখন বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা সংস্থার প্রধান বেতনভুক কর্মচারী। তাঁর পদমর্যাদা হ্রাস না পেলেও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার নীতি নির্ধারণে তাঁর নিজস্ব প্রভাব ও সুবিবেচনা প্রয়োগের সুযোগ বর্তমানে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

উপাচার্যের ক্ষমতা অক্ষমতা নিয়ে অসন্তোষ ও সংশয় অবশ্য প্রধান সমস্যা নয়। সমস্যা হল বিশ্ববিদ্যালয় যদি স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান হয় তবে তার দায়িত্ব কীভাবে বণ্টিত হওয়া উচিত। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর কতখানি প্রযুক্ত হওয়া সঙ্গত তা নিয়ে বিতর্ক চলেছে বহুকাল ধরেই; আর তা নিয়ে এদেশে, অন্তত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্রিটিশ আমলে গভর্নমেণ্টের বিরোধও কম হয় নি। এখন অবশ্য এধরনের বিরোধ ঘটবার সঙ্গত কারণ নেই। তবুও গভর্নমেণ্টের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতভেদ থেকে ইদানীং কখনও কখনও তিক্ত মনোমালিন্য ঘটবার আশংকা দেখা গেছে। গভর্নমেণ্টের দাক্ষিণ্যের উপর বিশ্ববিদ্যালয় অনেকখানি নির্ভর, একথা প্রতি পদে বিশ্ববিদ্যালয়কে স্মরণ করিয়ে দিলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ঘটে। অন্য দেশে, যেমন ব্রিটেনে, যেখানে রাষ্ট্রের অর্থসাহায্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পায় মঞ্জুরী কমিশন মারফত, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রাষ্ট্রের কোনরকম প্রত্যক্ষ বিরোধ ঘটে না। আমাদের দেশে সম্ভবত পুরানো আমলের জের এখনও কাটিয়ে ওঠা যায়নি, যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তারা এবং রাষ্ট্র-কর্তারা দু'পক্ষই নিজেদের অধিকার এবং ক্ষমতা সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন। গভর্নমেণ্ট দাতা এবং বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহীতা—এরকম কোনও মনোভাব প্রচ্ছন্ন থাকলে পরস্পর-সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে পারে না।

অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় ছোট বড় নানা ত্রুটিবিচ্যুতির প্রশ্ন উপেক্ষা করা যায় না। ত্রুটি বিধিনিয়মের না আদর্শের সে-কথা ধীরমস্তিষ্কে বিচার করা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় যদি আর পাঁচটা স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানের মত অদূরদর্শী দলাদলিসর্বস্ব হয়, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় নির্বিবাদ স্বাধীনতা দাবি করার কোনই অর্থ থাকে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার উপরে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব অথবা হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলীর দায়িত্বও লঘুভাবে গ্রহণ করা যায় না। পশ্চিমবাংলার শিক্ষিত বিদ্যানুরাগী মহলে অনেকের অভিযোগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটা বৃহদায়তন পরীক্ষা-প্রযোজক যন্ত্র মাত্র এবং সে যন্ত্রও আশানুরূপ সক্রিয় বা সুফলপ্রদ বলা যায় না।

বিশ্ববিদ্যালয় একটি দপ্তরমাত্র নয়, ডিগ্রী বিতরণের কারখানাও নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্থকতা বিদ্যানুরাগে, জ্ঞানানুশীলনে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কে, সিণ্ডিকেট ও সেনেটের সদস্য কারা, এসব দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্টতার মূল্য নিরূপিত হয় না। সেজন্য বর্ধমানের নতুন বিশ্ববিদ্যালয়টিকে হুবহু একটি পরীক্ষা-যন্ত্র করার সার্থকতা দেখি না। পশ্চিমবাংলার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সুষ্ঠু প্রশাসনিক তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত আইনকানুনের ভালোমন্দের প্রশ্নকেও আমরা তত গুরুত্ব দিই না। আধুনিক কালের উপযোগী উচ্চশিক্ষার আদর্শ রূপায়ণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কী পরিমাণ যত্নবান, সেইটাই প্রধান কথা। যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ এবং নীতি-বিধায়ক, তাঁরা নিজেরাই এবিষয়ে ঘোর হতাশাব্যঞ্জক অভিমত প্রকাশ করছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে এর চেয়ে মর্মান্তিক পরিহাস আর কী হতে পারে!

তারপর রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন "কর্তৃত্বের কর্তামি" তার উগ্র আকাঙ্ক্ষা যদি শিক্ষানীতিবিধায়কগণের চিত্তে, আচারে আচরণে প্রাধান্য পায়, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইনের সংস্কার করে কিম্বা উচ্চশিক্ষার মানোন্নতির জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করে কোন ফল হতে পারে না। উচ্চশিক্ষার আদর্শ বিন্যাসে এবং বাস্তব রূপায়নে বর্তমানে যে অপূর্ণতা এবং অসঙ্গতি দেখা যাচ্ছে তার কারণটা আমাদের মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকর ক্ষমতার অভাব নয়, অভাব বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনাক্ষেত্রে একান্ত চিত্তে শিক্ষাব্রতী আদর্শের অনুসরণ।

প্রসঙ্গত

নানা প্রদেশের নেতৃবৃন্দের বিরাগভাজন হয়েও বাঙ্গালী গত পনেরই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের জাতীয় উৎসবে যোগ দেয়নি। এই সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রতিবাদ নিশ্চয়ই ছিল। তার চাইতেও বেশী ছিল বোধহয় ক্ষোভ। সাধারণত আমরা ভদ্র জাতি, মারামারি কাটাকাটি তেমন একটা করিনে। কিন্তু মাঝে মাঝে হঠাৎ কোথা থেকে একটা প্রচণ্ড কালো হাওয়া উড়ে আসে আর অমনি আমরা ভুলে যাই সভ্যতার ন্যূনতম শিক্ষা। "আমরা" শব্দটা ব্যবহার করছি সর্বভারতীয় অর্থে, বাঙালী অর্থে নয়। আজকের আবেগপ্রবণ আবহাওয়ায়ও মনে রাখতে হবে, অসামীরাও ভারতীয়—বাঙালীদের ভাই। আসামীর লজ্জা বাঙালীরও লজ্জা। প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে সমগ্র জাতিকে তার যে কোনো অংশের কলঙ্কের জন্য। একদিন আসবে যেদিন কঙ্গোর দাঙ্গায় শুধু আফ্রিকা অধোবদন হবে না, গোটা মানবজাতি লজ্জিত হবে।

অন্তত কলকতায় বসে মনে হয়, আসামীরা আজো অননুতপ্ত আর বাকি ভারত উদাসীন। এ ক্ষেত্রে ক্ষোভ তো স্বাভাবিক। তবু স্বভাবের ঊর্ধ্বে উঠতে পারার প্রতিভা আছে বাঙালী জাতির। পনেরই আগস্টের উৎসব-বর্জন ছিল সেই ধরনেরই সিদ্ধান্ত। যে-স্বাধীনতার জন্যে বাঙালী প্রথম আন্দোলনের সূচনা করেছিল, যে-আন্দোলনে বাঙালী একদা নেতৃত্ব এবং সর্বদা সক্রিয় সহায়তা দিয়েছিল তারই উৎসব থেকে নিজেকে নির্বাসিত করার মধ্যে ছিল আত্মবিলোপের অন্যতর পরিচয়। কোনো কোনো সময় নিজেকে আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে হয়। থাক বাকি দেশ নিরুদ্বেগ, আসামীরা তুষ্ট হোক বাঙালীর দেহে আঁচড় দিয়ে; তবু বাঙালীর আত্মার ভার তার নিজের হাতে।

এই-আত্মার প্রকট প্রতিষ্ঠার জন্য একটি প্রস্তাব আজ নিবেদন করব বাঙালীর সামনে।

*

বাঙালীর দুর্গা পূজার আর দেরি নেই। একান্তই বাঙ্গালীর এই অকালবোধন। এমন উৎসব আর নেই বাঙালীর জীবনে। এই একটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বাঙালীর বৃহৎ পরিকর বছরে অন্তত একবার মিলিত হোতো; এক সূত্রে বাঁধা হোতো সহস্র জীবন। বাঙলার অর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে শারদীয় পূজানুষ্ঠানেরও প্রকৃতিগত পরিবর্তন হয়েছে। সেই পরিবর্তনেও প্রতিফলিত আছে বাঙালীর প্রতিভা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আমলে এবং দেশবিভাগের পূর্বে যে পারিবারিক সমারোহে সমগ্র সমাজ নিমন্ত্রিত হয়ে যোগ দিত, তা আজ প্রধানত স্মৃতির অঙ্গ। আজকের অধিকাংশ পূজা সর্বজনীন: অল্প অল্প চাঁদার সঞ্চয়ে অঞ্চলের অনুষ্ঠান। ব্যয় ও আয়োজনে সবাই প্রায় সমান শরিক। আনন্দ সবারের।

শোকের শরিকানা কেন সমাজ হবে না? যদি এ কথা সত্য হয় যে আসামের অমানুষিকতায় বাঙালী চিত্ত মথিত হয়েছে, তাহলে এ বছরের বাঙালীর দুর্গাপূজো কী করে হবে আর সব বছরের মতো?

*

দুর্গাপূজো যদি হোতো একান্তই ধর্মানুষ্ঠান, তাহলে হয়তো রাজনীতিক বা সাম্প্রদায়িক প্রসঙ্গে তার উল্লেখ অসমীচীন হোতো। কিন্তু বাঙালীর পূজো তো তেমন আংশিক আচার মাত্র নয়। "বন্দে মাতরম" গানে যে "ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী" স্থান পেয়েছে, পূজার অনুষ্ঠানে যে বাঙলার লোকসভ্যতার নানা প্রথা নিঃশব্দে লুকিয়ে আছে, পূজামণ্ডপে যে নেতাজী ও অন্যান্য নেতাদের প্রতিকৃতির প্রাচুর্য—এ-সবেরই মধ্যে আছে বাঙালীর দুর্গাপূজার মিশ্রিত চরিত্রের নিশ্চিত পরিচয়। এ শুধু ধর্ম নয়, শুধু ইস্কুল-কলেজ ছুটি নয়, শুধু লতা মঙ্গেশকরের গান নয়, শুধু কুমারটুলি বা রবীন রায়ের আর্ট নয়, শুধু পাড়ার ছেলেদের অত্যুৎসাহ নয়—আবাহন আর বিসর্জনের মধ্যেকার এই দ্রুত, সংক্ষিপ্ত কটি দিনে সব যেন একাকার হয়ে যায় আর পরিচয় মেলে বাঙালী চরিত্রের প্রায় সব কটি গুণের—অল্প দোষের। স্বতঃস্ফূর্ত উৎসবে এই তো স্বাভাবিক।

সম্প্রতি স্বভাবের বিষম ব্যত্যয় ঘটেছে আসামে, এবং বাঙালীর জীবনের ছন্দ ও সুর তাতে ব্যাহত না হয়েই পারে না। ভাবতেই পারিনে যে আর-বছরে এমনি দিনে যেমন সানাই বেজেছে এবারও তা তেমনি বাজবে। এবারও বাঙালীর উদারতা—মাঝে মাঝে যা অমিতব্যয়িতা---অন্যান্য বৎসরের মতো একই আনন্দের ধারায় প্রবাহিত হলে বুঝব বাঙালীর চিত্তে আঘাত আর আগেকার মতো দাগ কাটে না, তার বিখ্যাত স্পর্শসজাগতা আজ আর জাগ্রত নেই। বাঙালীর বিরুদ্ধে সত্য ও অসত্য অপবাদের আজ অন্ত নেই। যদি তার সঙ্গে যুক্ত হয় চিত্তের অনুকম্পাহীনতা তাহলে বাঙালী বলে গর্ব করবার বিশেষ কিছু আর থাকবে না।

*

নওগাঁয় যে যাই করুক, শিয়ালদহ স্টেশনে যত উদ্বাস্তুই জড় হোক, শরৎ তবু আসবে, আকাশ আবার হাসবে, মেঘ হবে লঘু। প্রকৃতির প্রলোভন অন্যান্য বৎসরেরই মতো হাতছানি দিয়ে ডাকবে। কিন্তু সে-ডাকে সাড়া দেবে কি বাঙালীর মন যে-মনের উপর পর্বতপ্রমাণ ক্ষোভ ও লজ্জা চেপে আছে জগদ্দল পাথরের মতো? একটি ভিখারিণী মেয়ের অশ্রু উপেক্ষা করে উৎসব করার জন্য কবি একদা তিরস্কার করেছিলেন। আজ তো সহস্র সহস্র ভাইবোন বিনাদোষে ভিখারী ও ভিখারিণীতে পরিণত।

পুরোপুরি বিনাদোষে কি?

এই প্রশ্নেরও উত্তর খুঁজতে হবে এবং শুধু অপরকে দোষ দিলে চলবে না। আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মপরিশুদ্ধির জন্য পূজা হোক, কিন্তু সে-পূজায় সরব আনন্দের স্থান নেই। আর আনন্দ স্থগিত রেখে যে-অর্থ ও শারীর শক্তি সঞ্চিত হলো তা নিয়োজিত হোক আসাম থেকে আসা আর্তের শুশ্রূষায়। এবারের পূজা হোক দুর্গার নয়, দুর্গতের। পূজার প্রার্থনা? যেন আসামের রোষ শমে এসে থামে, যেন আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ের ভেদবুদ্ধির পরিপূর্ণ বিসর্জন হয় প্রতিমানিরঞ্জনের ম্লান সন্ধ্যায়।

বৈদেশিকী

সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং কম্যুনিস্ট চীনের মধ্যে মতভেদ এবং মনকষাকষি বেড়ে চলেছে বলে কিছুদিন থেকে কাগজে নানা-রকম খবর বেরুচ্ছে। দুই সরকার প্রকাশ্যে সোজাসুজি একে অপরের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে আরম্ভ করেছেন—ব্যাপারটা এখনো এতদূর গড়ায় নি। ব্যাপারটা যে কতদূর গড়িয়েছে তাও অনুমানসাপেক্ষ। এটা ওটা নানা ঘটনা একসূত্রে বেঁধে সন্ধানী লোকেরা তা থেকে একটা ধারণা গড়ে তুলছেন। যে-ঘটনার যে-অর্থ তাঁরা করছেন সেটা সর্বত্র নির্ভুল না-ও হতে পারে। কম্যুনিস্ট দেশ-গুলির মধ্যে অথবা একই দেশের কম্যুনিস্ট কর্তাদের মধ্যে মতভেদ এবং বিবাদ উপস্থিত হলে যাঁরা খুশী হন তাঁরা ইতিপূর্বে অনেক মায়ামৃগের পশ্চাদ্ধাবন করেছেন। তবে সবক্ষেত্রেই যে ভুল হয়েছে তা-ও বলা যায় না। বর্তমানে মস্কো ও পিকিংএর মধ্যে মতভেদসূচক যে-সব ব্যাপারের খবর বেরিয়েছে সেগুলির দু-একটা ভুল অথবা অতিরঞ্জিত হতে পারে অথবা দু-একটাতে যে-অর্থ আরোপিত হচ্ছে সেটা ঠিক না হতে পারে, কিন্তু সব-গুলো নিশ্চয়ই মিথ্যা নয় এবং সবগুলো ধরলে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং চীনের বন্ধুত্ব পূর্বের মতো নিরেট নেই। তবে এ ব্যাপারে কোনো ধারণা করে নেওয়ার সময়ে আমাদের একটু সতর্ক থাকা দরকার। চীনের সম্বন্ধে ভারতের বর্তমানে যে মনোভাব তাতে চীনের সঙ্গে অন্য দেশের মতান্তরের খবর সহজে বিশ্বাস করে নেওয়ার দিকে আমাদের একটা ঝোঁক থাকা স্বাভাবিক। সেই দিক দিয়ে কিঞ্চিৎ সতর্কতা আবশ্যক। নিজেদের অনুকূলে সত্য সংবাদও একটু হাতে রেখে বিশ্বাস করলে কোনো ক্ষতি নেই। অবশ্য কথাটা শুনতে খুব ভালো নয়। কোনো এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের বন্ধুত্ব কিঞ্চিৎ শিথিল হয়েছে বলে আনন্দবোধ করার মধ্যে কিঞ্চিৎ লজ্জাবোধও থাকা উচিত কিন্ত পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় সে-অনুভব বহুর পক্ষে সহজ নয়। কিন্ত দশ বছর পূর্বেও এরূপ কল্পনা করা কঠিন হত যে, কোনো এশীয় এবং ইয়োরোপীয় জাতির মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হলে ভারতীয়দের সহানুভূতি এশীয় জাতিটির দিকে না গিয়ে ইউরোপীয়দের দিকে যাবে। এই অবস্থার সৃষ্টির জন্য কম্যুনিস্ট চীনই দায়ী। অবশ্য কম্যুনিস্টরা এশীয় ভ্রাতৃত্বের বুলি নিজেদের সুযোগ মতো কখনো কখনো আওড়ালেও কম্যুনিস্ট-বন্ধনকেই তারা সবচেয়ে বড়ো করে দেখেছে, পৃথিবীর মানুষকে কম্যুনিস্ট এবং অ-কম্যুনিস্ট এই দুজাতিতে ভাগ করে দেখেছে। কম্যুনিস্ট চীনারা

অন্নদাশঙ্কর রায়ের

গল্প পাঁচ টাকা

যতই দিন যাচ্ছে ততই স্পষ্ট হচ্ছে যে, অন্নদাশঙ্কর প্রবর্তিত ছোটগল্পের ধারাতেই আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের বিবর্তন ও পরিণতি। এই হিসেবে তিনিই প্রথম আধুনিক বাংলা গল্প-লেখক, আধুনিকদের মধ্যেও আধুনিক। ১৯২৯ থেকে ৫০ পর্যন্ত রচিত সমস্ত গল্পই এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। উপহারোপযোগী সংস্করণ।

কন্যা ৩৲ কণ্ঠস্বর ৩৲ আগুন নিয়ে খেলা ৩৲ পুতুল নিয়ে খেলা ৩৲

নবগোপাল দাসের

অভিযাত্রী পাঁচ টাকা

১৯৪২ থেকে ৫২ পর্যন্ত বাংলার জীবনে যে-সার্বিক অবক্ষয় সুরু হয় তারই ভিত্তিতে রচিত এ-উপন্যাস একটি মূল্যবান মানবিক-দলিল। এ-বই বাবদ লেখকের প্রাপ্য অর্থ রবীন্দ্র স্মৃতিভাণ্ডারে উৎসর্গিত হবে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের **উত্তরপুরুষ** আড়াই টাকা

বাংলার মধ্যবিত্ত জীবনকে নানা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে দেখতে ও দেখাতে নরেন্দ্রনাথের অবিসম্বাদিত কৃতিত্ব এই বইয়ে অভিনব ও অবিস্মরণীয় রূপ পেয়েছে। **সহৃদয়া** ৪৲ **শুক্লপক্ষ** ৩৲

সুধীরঞ্জন [illegible]পাধ্যায়ের আত্মচরিতমূলক উপন্যাস **স্মরণচিহ্ন** ৫·০০
প্রাণতোষ ঘটকের সবশ্রেষ্ঠ রচনা **রাণীবৌ** ৪·০০

রমাপদ চৌধুরীর

এই পৃথিবী পান্থনিবাস ৫·০০
কারও কারও মতে রমাপদবাবুর এই নতুন বইটিই এঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এ-বিষয়ে আপনার মত কী?

লালবাঈ ৬·০০
নবম মুদ্রণ আবার বেরল

প্রথম প্রহর ৫·০০ **অরণ্যআদিম্‌** ৩·০০

বিমল করের **অপরাহ্ণ** ৩·০০

একটি সুখের সংসার ভেঙে পড়ার তীব্র আবেগে কম্পিত উত্তেজনায় বিক্ষুব্ধ চূড়ান্ত মুহূর্তকয়টিকে ধরে দেওয়া হয়েছে 'অপরাহ্ণে'। অন্য-বই : **দেওয়াল** ১ম ৪.৫০ ২য় ৩·০০

সুরজিৎ দাশগুপ্তের **একই সমুদ্র** ৩·৫০

একালের বিভ্রান্ত উচ্ছৃংখল নীতিবোধশূন্য অভিশপ্ত তরুণ-তরুণীদের সমস্যাকে এমন অনাবৃত করে, এমন প্রচণ্ডরূপে বাংলা ভাষাতে এই প্রথম দেখানো হলো।

: অন্যান্য নতুন বই :

ডঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-এর **সাহিত্যে ছোটগল্প** ৮৲ ॥ রূপদর্শীর **রঙ্গব্যঙ্গ** ৩৫০ ॥ দীপক চৌধুরীর **দাগ** ১ম ৫৲ ২য় ৪৲ ॥ বনফুলের **উদয়-অস্ত** ৫৲ **অগ্নীশ্বর** ৪৲ ॥ সুবোধ চক্রবর্তীর **সেই উজ্জ্বল মুহূর্ত** ৩।৹ ॥ বিমল মিত্রের **রাজপুত্তানী** ৩।৹ ॥ গ. চ. মিত্র **অথ সংসারচরিতম্‌** ২॥৹ ॥ তারাশঙ্করের **পঞ্চপুত্তলী** ৪৲ ॥ অচিন্ত্যকুমারের **কল্লোল যুগ** ৬৲ ॥ ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের **জেলে ডিঙি** ২॥৹

: নতুন সংস্করণের বই :

প্রমথনাথ বিশীর

সিন্ধুনদের প্রহরী ২॥৹

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

অভিশপ্ত পুঁথি ২য় ৫৲

নজরুল ইসলামের

নজরুল গীতিকা ৩৲/৩॥৹

প্রলয়শিখা ২॥৹

ডি. এম. লাইব্রেরী : ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট : কলকাতা-৬

অ-কম্যুনিস্ট এশীয়দের চেয়ে কম্যুনিস্ট অনেশীয়দের বেশি আপন বলে জাহির করেছে। তার পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে। আমরা দেখেছি চীনা প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য অ-কম্যুনিস্ট এশীয়দের বিরুদ্ধে অভিযান "পঞ্চশীলে"র বাধা মানে নি। এখন দেখছি সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং চীনের জাতীয় স্বার্থের দ্বন্দ্ব কম্যুনিস্ট ভ্রাতৃত্বের বাধা মানছে না।

কিন্তু মজা এই যে, এই দ্বন্দ্বের ভাষা শুনে মনে হবে যে, ব্যাপারটা বুঝি নিছক কম্যুনিজ্‌মএর কোনো তাত্ত্বিক প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক। এটা কম্যুনিস্টদের মধ্যে বিবাদের একটা বিশেষত্ব। বিবাদের মূলে যে আসল স্বার্থসংঘাত সেটা তাত্ত্বিক তর্কের ধোঁয়ায় বহুদিন পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায় না। মনে হয় যেন কোনো তাত্ত্বিক প্রশ্ন নিয়ে মতের অমিলই বিবাদের মূল কারণ। কিন্তু আসলে তত্ত্বের বিবাদের মূলে রয়েছে স্বার্থের দ্বন্দ্ব। সোভিয়েট এবং চীনের মধ্যে বিবাদ "সহ-অবস্থান" বা "কো-একজিস্‌টেনস্‌"-এর তত্ত্ব নিয়ে, কিন্তু এ বিষয়ে দুএর মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য তার কারণ এই যে, উভয়ের স্বার্থ এক নয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের স্বার্থের পক্ষে সহ-অবস্থান আবশ্যক। যুদ্ধ অনিবার্য নয়, এই ধারণার বলবৃদ্ধি করা সোভিয়েট স্বার্থের অনুকূল। চীনা কম্যুনিস্ট কর্তারা মনে করেন সোভিয়েট-প্রচারিত সহ-অবস্থানের প্রস্তাব এবং যুদ্ধ অনিবার্য নয় এই ধারণা স্বীকার করে নেওয়া চীনা স্বার্থের অনুকূল নয়। কোনো প্রস্তাব নিজগুণেই সত্য বা দেশের পক্ষে মঙ্গলকর—কেবল এই মাত্র বললে কম্যুনিস্টদের কাছে কোনো প্রস্তাবের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হয় না, প্রস্তাবটি কম্যুনিস্টশাস্ত্রসম্মত কি না সেটা দেখানোই সবচেয়ে বেশি দরকার।

চীনা কম্যুনিস্ট কর্তারা বলছেন যে, সহ-অবস্থানের প্রস্তাব কম্যুনিস্ট-শাস্ত্র-বিরোধী, লেনিন বলে গেছেন যে, ক্যাপিটালিজ্‌ম্‌ এবং ইম্পিরিয়ালিজম্‌-এর সঙ্গে আবার যুদ্ধ অনিবার্য। সেই যুদ্ধ ছাড়া পৃথিবীময় সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সোভিয়েটের কর্তারা বলছেন যে, লেনিনের পরে জাগতিক অবস্থার যে পরিবর্তন হয়েছে তাতে লেনিন বেঁচে থাকলে আজ তিনি নিশ্চয়ই বলতেন না যে, যুদ্ধ অনিবার্য বা যুদ্ধ ছাড়া সারা পৃথিবীতে কম্যুনিজম্‌এর প্রতিষ্ঠা অসম্ভব; সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থায় বলা লেনিনের কোনো কথা তোতাপাখীর মতো যারা আওড়াচ্ছে তারা লেনিনিজ্‌ম্‌এর মর্মই বোঝে না, ইত্যাদি। এক সময় ছিল যখন কম্যুনিস্ট শাস্ত্রের সত্য ব্যাখ্যা করার অধিকার একমাত্র মস্কোর ছিল। কিন্তু এখন সে অধিকার একলা মস্কোর নেই। তখন মস্কোর যা স্বার্থ বিশ্ব কম্যুনিজ্‌ম-এরও সেই স্বার্থ বলে ধরে নেওয়া হত। এখন আর বিশ্ব কম্যুনিজ্‌ম-এর ব্যাখ্যা কেবল মস্কোর স্বার্থানুযায়ী হলে চলছে না। পিকিংএর স্বার্থ ভুলে থাকা চলবে না। যদি কোনো বিষয়ে মস্কো ও পিকিংএর স্বার্থ আলাদা হয় তবে সেই বিষয়ে কম্যুনিস্ট শাস্ত্র ব্যাখ্যাও দুরকম হবে। তাই হচ্ছে।

সারা পৃথিবীতে কম্যুনিজম্‌ প্রতিষ্ঠা করার আদর্শ কোনো কম্যুনিস্ট অস্বীকার করতে পারে না, কিন্তু কার্যত তার জন্য জেহাদ্‌ করার প্রশ্ন যদি উঠে, তবে সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের নীতি আর তা নয়, একথা বলা যেতে পারে। "কম্পিটিটিভ কো-এক্‌জিস্‌টেনস্‌"এর দ্বারা বাকী পৃথিবীতে কম্যুনিজম্‌ প্রতিষ্ঠিত করা যাবে, একথা মিঃ খ্রুশ্চভকে মুখে বলতেই হবে, কিন্তু সেটা তিনি বিশ্বাস করেন বলে বিশ্বাস হয় না। তবে "কম্পিটিটিভ কো-এক্‌জিস্‌টেনস্‌"এর নীতির দ্বারা সোভিয়েট ইউনিয়নের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং শক্তিবৃদ্ধি অবশ্যই সম্ভব। এই নীতির দ্বারা সোভিয়েটের প্রভাব আরো প্রসারিত হতে পারে, কিন্তু বাকী পৃথিবীর সবটাতে কম্যুনিজম্‌ কখনো আসবে না। কিন্তু পৃথিবীময় কম্যুনিজম্‌ প্রতিষ্ঠা না হলেও সোভিয়েট কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের কোনো ক্ষতি বা বিপদ নেই। অন্যপক্ষে যদি আর-একটি বিশ্বযুদ্ধ হয় এবং সে-যুদ্ধ নিউক্লিয়ার অস্ত্রের যুদ্ধই হবে—তবে হয়ত সব যাবে।

চীনের চিন্তা অন্যরূপ। তার রাজ্য-লিপ্সার এখনো নিবৃত্তি হয়নি। সোভিয়েট ও মার্কিনের মধ্যে একটা বুঝাপড়া হবার আগে চীনের কতকগুলি দাবি মেটানো চাই। যুদ্ধের ভয় সোভিয়েটের যতটা হয়েছে, চীনের ততটা হয়নি, শীঘ্র হবেও না। নিউক্লিয়ার যুদ্ধ হলে শিল্পপ্রধান সোভিয়েটের বিনষ্টির যে-সম্ভাবনা রয়েছে, চীনের ততটা নেই বলে চীনা নেতারা বিশ্বাস করেন। পৃথিবীর বৃহত্তম জন-বহুল রাষ্ট্র চীন, নিউক্লিয়ার যুদ্ধের পরেও তার অস্তিত্ব থাকবে বলে চীনারা মনে করে।

কো-এক্‌জিস্‌টেনস্‌-এর সঙ্গে সঙ্গে অনুন্নত দেশগুলিতে সাহায্যদানের যে ধরনের নীতি সোভিয়েট ইউনিয়ন গ্রহণ করেছে, সেটাও চীনের ভালো লাগার কথা নয়। নিজের ব্লকের বাইরেও নিরপেক্ষ অনুন্নত দেশগুলিতে সাহায্যদান কো-এক্‌জিস্‌টেনস্‌-এর একটা অঙ্গ বলা যায়, কারণ প্রভাব বিস্তারের পক্ষে সেটা আবশ্যক। চীনের মতে নিরপেক্ষ দেশ-গুলিকে সাহায্যদান করলে তা দ্বারা কম্যুনিজম্‌-এর বিস্তার সহজ হবে, এরূপ মনে করার কোনো কারণ নেই। সেকথা বোধহয় ঠিক। কিন্তু সোভিয়েটের উদ্দেশ্য যদি কম্যুনিজম্‌-এর আর বিস্তার না হয়ে সোভিয়েটের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রভাব বিস্তার হয়, তবে নিরপেক্ষ দেশ-গুলিকে সাহায্যদানের নীতি নিশ্চয়ই তার সহায়ক হবে। নিরপেক্ষ দেশগুলিতে সোভিয়েট সাহায্য প্রেরণ যদি বন্ধ করা যেত তবে তার একটা বড়ো অংশ চীনের দিকে প্রবাহিত হবার আশা ছিল। সুতরাং কো-এক্‌জিস্‌টেনস্‌ চীনের ভালো লাগার কথা নয়।

২৮।৮।৬০

সুনীল ভঞ্জ রচিত
কিন্তু কেন? রহস্য নাটক
২য় সংস্করণ বেরোল — ২,
প্রান্তিক পাবলিশার্স
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট : কলি-১২
(সি ৭৪৮৭/৩)

বাহির হইল :
অ-ক্র-ব'র
শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি
শকুন্তলা স্যানাটোরিআম
নতুন ধরনের উপন্যাস, কিন্তু প্রেমসর্বস্ব নয়। বিচিত্র মানুষের বিচিত্র কাহিনী।
দাম—২·৭৫
কল্লোল প্রকাশনী :
এ ১৩৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

পরিবার-নিয়ন্ত্রণ
(জন্মনিয়ন্ত্রণে মত ও পথ)
● সচিত্র তৃতীয় সংস্করণ) ●
সর্বাধিকবিক্রিত জনপ্রিয় তথ্যবহুল সংক্ষিপ্ত সুলভ বাংলা সংস্করণ—
প্রত্যেক বিবাহিতের বাস্তব সাহায্যকারী একমাত্র শ্রেষ্ঠ পুস্তক। মূল্য ডাকব্যয় সহ ৮০ নয়া পয়সা M.O.তে অগ্রিম প্রেরিতব্য। বিদেশে ৩ শিলিং। এত অল্পমূল্যের পুস্তক ভিঃ পিঃ হয় না। প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য সাক্ষাৎ বেলা ১টা—৭টা। রবিবার বন্ধ। শনিবার ১—৫টা। ফোন : ৩৪-২৫৮৬
মেডিকো সাপ্লাইং কর্পোরেশন
(Family Planning Stores)
১৪৬, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯
(বৌবাজার-আমহার্স্ট স্ট্রীট জংসনের উত্তরে)
*
* বিশেষ দ্রষ্টব্য—উক্ত ১৪৬নং বাড়ীর এক-তলায় আমাদের কোন দোকান নাই। মেন্‌ গেট দিয়া সোজা ভিতরে ঢুকিয়া টপ্‌ফ্লোরে ছাদের উপর ১৮নং ঘরের খোঁজ করুন।

আলোচনা

২২শে শ্রাবণ

সবিনয় নিবেদন,

গত সপ্তাহে 'দেশ' পত্রিকায় 'বাইশে শ্রাবণ' সম্পর্কে যে আলোচনা হয়েছে সে বিষয়ে আমি দু-চার কথা নিবেদন করতে চাই।

১৯৪১ সালের ৬ই অগাস্ট রাত্রের আর ৭ই অগাস্ট সকালবেলার কথা আমারও কিছু মনে আছে। আমি বরানগরে "গুপ্ত-নিবাসে" দোতলায় পূব দক্ষিণ দিকের ঘরে অসুস্থ হয়ে শুয়ে আছি। জোড়াসাঁকো যাওয়ার ক্ষমতা নেই। কবির অবস্থা সম্বন্ধে সব সময়েই উদ্বিগ্ন আছি। আমার স্ত্রী বেশীর ভাগ সময়ে জোড়াসাঁকোয় থাকেন। ৬ই অগাস্ট আমার বন্ধু শ্রীজীবনময় রায় আমার কাছে রয়েছেন। ৬ই অগাস্ট দুপুর রাত্রে আমার স্ত্রী যখন ফিরে এলেন, ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলুম, কী খবর? "ভালো নয়। জোড়াসাঁকো থেকে টেলিফোন পেলেই আবার ফিরে যেতে হবে।" এই অবস্থায় দুইজনেই শুয়ে রইলুম। জোড়াসাঁকো থেকে টেলিফোন আসার পরে আমার স্ত্রী জীবনের সঙ্গে জোড়াসাঁকো চলে গেলেন। তখন গভীর রাত্র। ভোর হতে তখনো অনেক দেরী।

মনের উদ্বেগে বাকি রাতটুকু আধ জাগো আধ ঘুমনো অবস্থায় কাটলো। সকালবেলা চিনি না এমন লোক তিন চার-বার টেলিফোন করলো যে, কবির অবস্থা কী রকম? আমি বললুম, আমাকে কেন টেলিফোন করছেন, আমি তো বরানগরে বিছানায় শুয়ে আছি, কিছুই জানি না। খানিক বাদে আমার স্ত্রী বরানগরে ফিরে এলেন। আমার মনে ভয় হোলো যে, তাহলে হয়তো খবর খুবই খারাপ। কিন্তু আমার স্ত্রী ব্যস্ত হয়ে বললেন যে, জোড়া-সাঁকোর টেলিফোনে তাঁকে বরানগরে তাড়াতাড়ি চলে আসতে বলা হয়েছে ব'লে তিনি চলে এসেছেন অথচ কবির অবস্থা খুবই খারাপ। এদিকে আমি তো টেলিফোনের কথা কিছুই জানি না। অন্য সকলকে জিজ্ঞাসা করেও শুনলুম বরানগর থেকে কেউই জোড়াসাঁকোয় টেলিফোন করেনি। খানিকক্ষণ পরে আমার স্ত্রী জোড়াসাঁকোয় ফিরে গেলেন।

খানিকটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও সংক্ষেপে আরো দুটো কথা লিখে রাখি। যদিও আমার শরীর খুবই খারাপ তবুও আমি জোর করে বিকালবেলা আমার গাড়ি করে কলকাতা রওনা হলাম। নিমতলা ঘাটে যাওয়ার মাঝপথে কবিকে একবার শেষ দেখা দেখেছিলাম। সেদিন জনসাধারণ যেভাবে ব্যবহার করেছিল তাই দেখে আমি নিমতলা ঘাটে না গিয়ে আমাদের কলকাতার বাড়ি ২১০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে চলে যাই। তার পরে অনেকদিন সেই বাড়িতেই থাকি বরানগরে আসিনি। মনে পড়ছে সেই সময় "বনফুল" কবির শেষ-যাত্রা সম্বন্ধে কিছু লিখেছিলেন। তার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অবিস্মরণীয় উপন্যাস

মহাশ্বেতা

॥ সাড়ে পাঁচ টাকা ॥

বিস্ফোরণ (৩য় মুঃ) ২·০০ ॥

●

নিখিলরঞ্জন রায়ের
সদ্য প্রকাশিত
ভারত-সীমান্ত ভ্রমণের সচিত্র
অন্তরঙ্গ কাহিনী

সীমান্তের সপ্তলোক

॥ তিন টাকা ॥

●

অধ্যাপক বীরেন্দ্রমোহন আচার্যের
শিক্ষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধ-গ্রন্থ

আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব ৬·৫০

●

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের
মধ্য ইয়োরোপ পায়ে-হেঁটে বেড়ানোর
সচিত্র কাহিনী

চরণিক ৩·০০ ॥

আনন্দকিশোর মুন্সীর
অম্লমধুর বিচিত্র উপন্যাস

রাঘব বোয়াল

॥ তিন টাকা ॥

ভেলকি থেকে ভেষজ ৬·০০ ॥

●

সন্তোষকুমার দের
নানান রঙের রসমধুর গল্প

বৈঠকী গল্প ২·৫০ ॥

(বিখ্যাত ব্যঙ্গশিল্পী রেবতীভূষণ-বিচিত্রিত)

●

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের
অবিস্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি

জর্জ বার্নার্ড শ ৮·৫০ ॥

[একত্রে তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ
জীবনী]

●

ধনঞ্জয় বৈরাগীর সামাজিক নাটক

রুপোলী চাঁদ (৩য় মুঃ) ২·৫০ ॥

কুমারেশ ঘোষের সাগর-নগর ৩·৫০ ॥ রূপদর্শীর কথায় কথায় ৩·০০ ॥	নীহাররঞ্জন গুপ্তের অপারেশন (২য় মুঃ) ৬·০০ ॥ বিষকুম্ভ (২য় মুঃ) ৪·০০ ॥	নীলকণ্ঠের এলেবেলে ২·৫০ ॥ চিত্র ও বিচিত্র (৪র্থ মুঃ) ৩·৫০ ॥
বুদ্ধদেব বসুর নীলাঞ্জনের খাতা ৪·০০ ॥ হঠাৎ আলোর ঝলকানি ২·৫০ ॥	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের দূরের মিছিল ৪·০০ ॥ প্রফুল্ল রায়ের সিন্ধুপারের পাখি (২য় মুঃ) ৯·০০ ॥	নারায়ণ চৌধুরীর বাংলার সংস্কৃতি ৩·০০ শশিভূষণ দাশগুপ্তের ঝ্যান ও বন্যা ৩·০০
দেবেশ দাশের রাজোয়ারা (৬ষ্ঠ মুঃ) ৪·০০ ॥ ইয়োরোপা (৭ম মুঃ) ৩·০০ ॥	হুমায়ুন কবিরের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ৩·৫০ ॥ স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাথুর (২য় সং) ৪·০০ ॥	সুবোধ ঘোষের একটি নমস্কারে ৪·০০ ॥ প্রমথনাথ বিশীর চলন বিল ৪·৫০ ॥
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চলাচল ৬·৫০	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের রায় চৌধুরী ২·২৫ ॥	রমাপদ চৌধুরীর মুক্তবন্ধ ৩·০০ ॥

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো ॥

বর্তমান শকাব্দের উল্লেখযোগ্য প্রকাশন

ব্যাঘ্রকেতন

।। সুভাষচন্দ্র বসুর কর্ম ও জীবন ।।

মূল গ্রন্থ ঃ হিউটয়-এর 'স্প্রিংগিং টাইগার'
অনুবাদ ঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়

বিদেশীর লেখা নেতাজী ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর যে অমর কাহিনী কিছুদিন পূর্বে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, বহু চিত্র ও দলিল সম্বলিত সেই ঐতিহাসিক পুস্তকের সাবলীল বাংলা অনুবাদ আপনাকে পড়তেই হবে।।

।। দাম ঃ আট টাকা ।।

এলাইড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৭ চিত্তরঞ্জন এভেন্যু, কলিকাতা ১৩

(সি ৭৪৬৮)

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

প্রখ্যাত কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের যে বই "দেশ"এ ধারাবাহিক প্রকাশ কালে বিদগ্ধ পাঠকের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছিল

তিন দিন তিন রাত্রি

"আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগী।
সকল দাগে হব দাগি।।
শুচি আসন টেনে টেনে বেড়াবনা বিধান মেনে
যে-পঙ্কে ঐ চরণ পড়ে তাহারি ছাপ বক্ষে মাগি।।"

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
প্রোজ্জ্বল উপন্যাস

যে যাই বলুক

এক বিপ্লবভ্রষ্ট যুবককে তার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে এক রাজেশ্বরী নারীর মহান প্রেমের কাহিনী। জাহাজ ভেঙে গেলেও স্থির মাস্তুলের লক্ষ্য যার ধ্রুবতারায় নিবিষ্ট এবং সমস্ত কলঙ্কের সাগর পেরিয়ে যে বন্দরে উপনীত। জীবনের গভীর প্রত্যয় আরেকবার অচিন্ত্যকুমারের লেখনীতে বলবান উচ্চারণ পেল। দাম ঃ ছয় টাকা।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা—৯

ছিল আমি নিজের চোখে যা দেখেছিলাম। প্রবাসীতে শ্রীজীবনময় রায়ও এ সম্বন্ধে তখন লিখেছিলেন।

দ্বিতীয় কথা, ২১০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে রয়েছি, একদিন টেলিফোনে অপরিচিত গলায় একজন জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার কাছে লেখা কবির চিঠি আমার কাছে আছে। আপনার আপত্তি না থাক্‌লে আমি তা প্রকাশ করতে পারি।" আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনাকে তো চিনতে পারছি না। আপনি কে? আমার চিঠি আপনি কোথায় পেলেন?" টেলিফোন বন্ধ হয়ে গেল। পরে বরানগরে আমার কাগজপত্র খোঁজ করে দেখলুম যে, আমার কাছে লেখা কবির অনেকগুলি চিঠি পাওয়া যাচ্ছে না। আমার বা আর কোনো লোকের কাছে লেখা, সে কথা তুচ্ছ। কবির লেখা সব চিঠিই অমূল্য। আমি আশা করি আমার এই হারানো চিঠিগুলি নষ্ট হবে না। আমি খুশি হবো যদি এই চিঠিগুলি ছাপানো হয়। সম্পত্তি হিসাবেও আমি চিঠিগুলি সম্বন্ধে সমস্ত দাবী ত্যাগ করছি। ইতি

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

চিত্র প্রদর্শনী

সবিনয় নিবেদন,

বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলনের উদ্যোগে কিছু-দিন আগে বোম্বাইয়ে যে গুটিকয়েক তরুণ বাঙালী শিল্পীর চিত্রকলার প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ৭ই শ্রাবণের 'দেশে' তার একটা বিবরণ দেখলাম। সংবাদদাতা শুধু সংবাদ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, 'আধুনিক' ভারতীয় চিত্রশিল্প সম্বন্ধে বিশেষ করে বাঙালী শিল্পীদের শিল্পকৃতি সম্বন্ধে গুটিকয়েক মন্তব্য করেছেন যার প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক বলে আমি বিবেচনা করি। তিনি এক জায়গায় বলেছেন, "বিশিষ্ট রসিকেরা স্বীকার করেছেন যে তাদের বাঙালী শিল্পীদের সম্বন্ধে ধারণা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। বাংলার শিল্পীরাও যে কালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নানান প্রথা প্রকরণে পরীক্ষণ নিরীক্ষণ চালিয়ে এগিয়ে চলেছেন নতুন পথ ধরে নতুন মত নিয়ে সে খবর তারা রাখতেন না এতদিন।" এই 'বিশিষ্ট রসিকরা' বাঙালী শিল্পীদের সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করেন তা আমাদের অজানা নয়। কিছুকাল আগে বোম্বাইয়ে নন্দলালের চিত্রকলার যে আংশিক প্রদর্শনী হয়েছিল Marg পত্রিকায় Fabri সাহেব তার সমালোচনা করেন এবং সে সমালোচনা আজো আমরা ভুলি নি। কাজে আজ যদি মুলকরাজ আনন্দ, লিডেন, খান্ডলওয়ালা এবং ফেরি জাতীয় 'রসিকেরা' বাঙালী শিল্পীদের শিল্পকৃতি সম্বন্ধে অন্য ধারণা পোষণ করতে শুরু করেন তাহলে এই সিদ্ধান্তই করব, বাঙালী শিল্পীরা অবনীন্দ্র-নন্দলাল প্রবর্তিত

শিল্পধারা থেকে দূরে সরে এসেছেন এবং তাঁদের উত্তরাধিকার অস্বীকার করে আত্ম-শ্লাঘা বোধ করেন। তাছাড়া উপরের উক্তি থেকে এই ধারণা হওয়াই বিচিত্র নয়—বাঙালী শিল্পীরা এতদিন কালের সংগে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যেতে পারেননি এবং নানান প্রথা-প্রকরণে পরীক্ষণ নিরীক্ষণ এতকাল বন্ধ ছিল। একা নন্দলালই এই সমস্ত উক্তির প্রতিবাদ। আজো তাঁর তুলি নিত্য নতুন শিল্প-সৃষ্টিতে ব্যপৃত।

আর এক জায়গায় তিনি উল্লেখ করেছেন "বর্তমানে সেখানে (বোম্বাইয়ে) অত্যুক্তি-মূলক চিত্রকলার মান অত্যন্ত উঁচু একথা অনস্বীকার্য সুতরাং এ ধরনের প্রতিনিধিত্ব-মূলক প্রদর্শনী করতে হলে আরও নির্মম-ভাবে নির্বাচন হওয়াই বাঞ্ছনীয়।" অত্যুক্তি-মূলক' চিত্রকলা বলতে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন বুঝলাম না। এর মানে যদি abstract, non-representative, exaggerative বা ঐ জাতীয় কিছু একটা হয় তাহলে বলব এ জাতীয় ট্রেডমার্ক দিয়ে শিল্পসৃষ্টিকে বিচার করা চলে না। 'আধুনিক' হওয়ার আগ্রহে বোম্বাই-এর শিল্পীরা (দু একজন-বাদে) নিজেদের স্বাজাত্য বিসর্জন দিয়েছেন অনেকদিনই এবং আজ যদি অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলালের প্রদেশবাসী শিল্পীরাও সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন তাহলে বুঝব ভারতীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

তাছাড়া লেখাটির মধ্যে আর একটি জিনিস বড়ো চোখে লাগল। বোম্বাই-এর পত্র-পত্রিকা 'উচ্ছ্বসিত প্রশংসা' এবং লিডেন সাহেবের পিঠ চাপড়ানো থেকে লেখক একরকম ধরেই নিয়েছেন 'অত্যুক্তিমূলক ভাবব্যঞ্জনা পদ্ধতির মাধ্যমে' বাংলার তরুণ শিল্পীরা অনেকখানি অগ্রসর হয়েছেন। উক্তিটি অবশ্য লিডেন সাহেবের (অত্যুক্তি-মূলক ভাবব্যঞ্জনা বস্তুটি কি ?) কিন্তু স্বভাবতই লেখক তাতে বেশ পুলকিত হয়েছেন। এবং শুধু তাই নয় পরামর্শ দিয়েছেন নির্বাচন আরো নির্মম অর্থাৎ আরো 'আধুনিক' হলে প্রশংসা আরো বেশী করে পাওয়া যেত। অর্থাৎ কিনা এর পর থেকে ছবি নির্বাচন করতে হবে দর্শক এবং পত্রিকা-সমালোচকদের রুচির দিকে লক্ষ্য রেখে, ছবির intrinsic merit-এর সংগে ছবি নির্বাচনের কোন সম্পর্ক থাকবে না। ভারতবর্ষে চিত্রকলা সমালোচনার মান যে কত নীচু তা যাঁরা এ বিষয়ে কিছু পড়া-শুনো করেছেন তাঁরাই জানেন। এবং এ জাতীয় 'সমালোচক' (সাহেব হলে তো কথাই নেই) এবং 'রসিকের' রুচির উপর যদি ভারতীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তাহলে ভারতীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ সত্যিই আশঙ্কাজনক।

নমস্কারান্তে ইতি—

হীরেন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা

অভিশপ্ত চম্বল

সবিনয় নিবেদন,

'অভিশপ্ত চম্বল' প্রসঙ্গে শ্রীসত্যপ্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যপ্রদেশের দস্যু-সমস্যা নিয়ে কোনও documentary film এ পর্যন্ত প্রযোজিত হয়েছে কিনা জানতে চেয়েছিলেন (দেশ, ৪ঠা আষাঢ়, ১৩৬৭)। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেও এ সম্পর্কে কম উৎসুক ছিলাম না, তাই কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার দপ্তরকে এবিষয়ে সঠিক সংবাদটি জানাতে অনুরোধ করি। সম্প্রতি তাঁরা জানিয়েছেন—তাঁদের ভাষাই উদ্ধৃত করি—

With reference to your letter dated the 20th June 1960, I am directed to say that Films Division of this ministry have not produced any documentary on the "Bandit problem in Madhya Pradesh," nor is it proposed to undertake any such film at present.

Sd/-
Under Secretary to Govt. of India
Ministry of Information &
Broadcasting

আশা করি, তথ্যটুকু শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের কৌতূহল মেটাতে সাহায্য করবে।

নমস্কারান্তে—

শ্রীঅসীম মুখোপাধ্যায়
বিভার রোড, শিলং।
৩০-৩-৬৭

প্রকাশিত হয়েছে

বেনারসী
বিমল মিত্র

বেনারসী—নায়ক নায়িকা—আর এক রকম এই তিনটি গল্প নিয়ে বেনারসী। বিমল মিত্রের অপূর্ব কথকতায় সমৃদ্ধ এই তিনটি ভিন্ন রঙের রচনা যেমন জমাট তেমনি মধুর। বর্ণাঢ্য প্রচ্ছদ। ৪·৫০

যোগভ্রষ্ট
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

যুগ যুগের যোগভ্রষ্ট আত্মা জন্মে জন্মে আকুল-ভাবে খুঁজে চলেছে তার জন্মের আদি উৎস, তার সর্বঅস্তিত্বের মূলকেন্দ্র। এ যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কথাশিল্পী এই উপন্যাসে বিংশ শতাব্দীর মোল জিজ্ঞাসাকে মূর্ত করেছেন। অভিনব প্রচ্ছদ। ৫·০০

প্রিয়তমেসু	॥ স্টেফান জাইগ	২·০০
হিরণ্ময় পাত্র	॥ জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী	৪·০০
জল পড়ে পাতা নড়ে	॥ গৌরকিশোর ঘোষ	৮·০০
সুচরিতাসু	॥ প্রভাত দেবসরকার	৩·০০
প্রথম প্রণয়	॥ বিক্রমাদিত্য	৩·০০
ক্রীম	॥ অবধূত	৪·৫০
রাধা (৪র্থ সং)	॥ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	৭·০০
রূপসাগর (৩য় সং)	॥ সুবোধ ঘোষ	৪·৫০
হরিণ চিতা চিল (কবিতা)	॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র	৩·০০
মিতোমিতিন	॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	৩·০০
অন্দর মহল	॥ সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৩·০০
স্বাদু স্বাদু পদে পদে	॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	২·৭৫
গ্রীষ্মবাসর	॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	২·৭৫
পঞ্চখী মহল	॥ আশাপূর্ণা দেবী	৪·০০
সান্নিধ্য	॥ চিন্তামণি কর	৪·০০
তীরভূমি	॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪·৫০
অগ্নিসাক্ষী	॥ প্রবোধকুমার সান্যাল	৩·৫০
নীলাঞ্জনছায়া	॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩·০০

ত্রি বে ণী প্র কা শ ন
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড

আসন্ন প্রকাশ
রমণীর মন ॥ সরোজকুমার রায়চৌধুরি

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

শারদীয়া—১৩৬৭। এতে আছে—

॥ **স্বরলিপি** ॥ সঙ্গীত ঋষি ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর অপ্রকাশিত **'স্বরোদ'**, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের দুটি **'রাগ-প্রধান'**, বড়ে গোলাম আলির **'খ্যাল'** ও **'ঠুমরী'**, এছাড়া **'সেতার'**, সুজিত নাথ ও কাজী অনিরুদ্ধের **'গীটার'** হিমাংশু বিশ্বাসের **'বাঁশী'**, আর **'বেহালা'** অনল চট্টোপাধ্যায়ের **'গীত'**, নিখিল চট্টোপাধ্যায়ের **'গজল'**, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের **'ভাব সঙ্গীত'** ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের **'শ্যামা সঙ্গীত'**, **'কীর্তন'**, অধ্যাপক নীহারবিন্দু চৌধুরীর **'অপ্রচলিত রাগ'**, **'রাগপ্রধান'** এছাড়া **'হিমাংশুর গীত'**, **'ভজন'** আর সতীনাথ, শ্যামল, উৎপলা সেনের **অপ্রকাশিত গান**।

'অনুরাধা', **'মুঘল-ই-আজম'**, **'ছলিয়া'**, **'পরখ'**, **'মধুমতী'**, **'চৌদভী-কা-চাঁদ'**, **'সখের চোর'**, **'ইন্দ্রধনু'** **'সুরের পিয়াসী'**, **'গরীবের মেয়ে'**, **'ক্ষুধা'** প্রভৃতি আরও হিন্দি ও বাংলা ছবির জনপ্রিয় গানগুলির **কণ্ঠসঙ্গীত** ও গীটারের মোট **৪৫টি স্বরলিপি**

- বাংলা দেশের প্রথম শ্রেণীর পাঁচজন সাহিত্যিকের **পাঁচটি 'গল্প'** পাঁচজন বিদগ্ধ প্রবন্ধকারের **পাঁচটি সাংগীতিক প্রবন্ধ**
- দশজন প্রথিতযশা সাহিত্যিক কবির **দশটি অপ্রকাশিত 'গান'** একাঙ্ক **নাটিকা, গীতিনাট্য,** পাঁচজন বিশিষ্ট শিল্পীর **পরিচিতি**
- তেরোটি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের **নিয়মিত বিভাগ** প্রায় ২০০জন **উচ্চাঙ্গ ও আধুনিক সংগীত শিল্পীর, সাহিত্যিকের ও নৃত্যশিল্পীর আর্ট প্লেট ছবি**

॥ মূল্য মাত্র তিন টাকা (৩·০০) ॥

॥ বাংলা ও ভারতের সর্বত্র এজেন্সীর জন্য আবেদন করুন ॥

॥ পরবর্তী বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করুন ॥

সংগীতিকা

২১, নন্দন রোড, ভবানীপুর
কলিকাতা-২৫। ফোনঃ ৪৭-৩০৮৩

তিরিশ টাকা দামের নূতন লেখা উপন্যাস ও গল্পসম্ভার মাত্র ৪৷৷০ সাড়ে চার টাকায়

সারা সাহিত্য-জগৎকে বিস্ময়-স্তম্ভিত ক'রে আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হচ্ছে বড়দের অভিজাত পূজাবার্ষিক

অভিসার

এতে বড় গল্প লিখেছেন :

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, প্রবোধ সান্যাল, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত বুদ্ধদেব বসু, বিমল মিত্র, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, গজেন্দ্র মিত্র, কিরীটিকুমার ও প্রেমেন্দ্র মিত্র

চারখানি নূতন সম্পূর্ণ উপন্যাস লিখেছেন :

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী **শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়**
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় **শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়**

এর সঙ্গে আরও আছে **শংকর** রচিত অতিআধুনিক সুদীর্ঘ একটি রম্য-রচনা!

বিজ্ঞাপনবর্জিত উপহারোপযোগী সুচিত্রিত রঙিন মলাটে বাঁধানো নূতন-লেখা সংগ্রহের এই বিরাট গ্রন্থখানি মাত্র ৪৷৷০ আট আনা, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র। নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাপা হচ্ছে। অগ্রিম ২্ দু'টাকা পাঠিয়ে এখন থেকে অর্ডার 'বুক' করুন। বিলম্বে পাওয়ার আশা অনিশ্চিত।

অগ্রিম প্রাপ্ত টাকা বাদ দিয়ে ভিঃ পিঃ চার্জ করা হবে।

একমাত্র পরিবেশন কেন্দ্র—**উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির**, ব্লক সি, রুম ৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২

অবতরণিকা

দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন-এর পাঁচ নং বাড়ি আজ আর নেই। সেই বাড়ির দক্ষিণের বারান্দা আর সেই বারান্দায় যাঁরা বসতেন তাঁরাও কেউই আজ নেই। জন্মকাল থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ঐ বাড়িতে কাটিয়েছিলেন। তাঁদের স্মৃতিতে জড়িত ছিল সেই বাড়ির প্রতিটি কোণ প্রতিটি কণা, দক্ষিণের বারান্দার প্রতিটি দিন। যাঁরা দেখেছেন সে বাড়ির জনস্রোত, যাঁরা এসেছিলেন দক্ষিণের বারান্দার ছায়াতলে তাঁদের মধ্যে বহু ব্যক্তিই আজ জীবিত। তাঁরা জানেন, তাঁরা হয় তো মনে রেখেছেন পাঁচ নং বাড়ি সংক্রান্ত অনেকানেক ঘটনা, কিছু কিছু স্মৃতি। মনে রাখবার মতো অনেক কিছুই ঘটে গেছে এই সেদিনও ঐ পাঁচ নং বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায়। বাঙলা দেশের সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থানের ইতিহাসের বহু অধ্যায়ই ঐ পাঁচ নং বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় অভিনীত হয়েছিল। তবুও সে বাড়ি রক্ষা হয়নি।

সে বাড়ি আজ নিশ্চিহ্ন। আমরা যারা জন্মেছিলাম ঐ বাড়িতে এখনও চোখ বুজলে দেখতে পাই সেই বাড়ির দেউড়ি, চওড়া কাঠের সিঁড়ি, লাইব্রেরী ঘর, দক্ষিণের বারান্দা আর নারকেল গাছ ঘেরা বাগান। আর দেখতে পাই ঐ বাড়ির জীবন স্বরূপ ছিলেন যাঁরা তাঁদের এবং তাঁদের আকর্ষণে যাঁরা যাওয়া আসা করে পাঁচ নং বাড়ির পরিবেশকে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তুলতেন তাঁদেরও।

গৃহকর্তারা বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর প্রথমে ব্যবসায়ীদের হাতে পড়ে সে বাড়ি। তারপর সরকার তা কিনে নেন জাতীয় সম্পদ হিসেবে রক্ষা করার উদ্দেশে। শেষে রক্ষা করতে না পেরে ভেঙে তার জায়গায় নতুন ইমারৎ তোলেন।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বৈঠকখানা বাড়ি। পূর্বপুরুষদের বিরাট চক মিলানো ছয় নং বাড়ি ছিল অন্দর মহল আর ঐ বৈঠকখানা বাড়ি ছিল বাহির মহল। ওখানে বাড়ির মেয়েদের প্রবেশ ছিল না। ওটি তৈরী করিয়েছিলেন দ্বারকানাথ নিজে। তাঁর দেশী বিদেশী আমন্ত্রিত অভ্যাগতদের প্রচুর আড়ম্বরে আপ্যায়ন করবার জন্যে। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর ছয় নং বাস-ভবনে বাস করতেন তাঁর বড় ছেলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আর বৈঠকখানা বাড়ি পাঁচ নং-এ থাকতেন মেজছেলে গিরীন্দ্রনাথ। গিরীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর গুণেন্দ্রনাথ এবং তার পর গগনেন্দ্র-সমরেন্দ্র-অবনীন্দ্র। দ্বারকানাথের নিজের গড়া এই পুরোনো বৈঠকখানা বাড়ি আজ আর নেই। তার ছায়াময় স্মৃতিটুকু এখনও আছে কারো কারো মনে। তাঁরা চলে গেলে তা-ও আর থাকবে না।

আমি এখানে যা লিপিবদ্ধ করলুম তা কোনোদিনই হয়তো আমার লেখার ইচ্ছে হত না যদি-না ঐ বাড়িখানাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হত। এই দুই ঘটনা কোন্ অদৃশ্য রহস্যময়

'দক্ষিণের বারান্দায় চৌকিতে বসে দাদামশায়—'

গ্রন্থিতে জড়িত তা আমি জানি না। যে বাড়িতে আমি জন্মেছিলুম, যে গণ্ডীর মধ্যে আমি বেড়ে উঠেছিলুম তার অবলুপ্তির পর তার নিঃসীম শূন্যতার ফাঁক দিয়ে দক্ষিণের বাতাসের মতো কি যেন এসে আমার চিত্তকে আপ্লুত করেছে। তাই লিখতে ইচ্ছে হয়েছে। তাই লিখেছি। এ স্মৃতিকথা-ও নয়, ইতিহাস-ও নয়। এ সেই দক্ষিণের বারান্দায় বসে বসে হালকা মেঘের দিকে তাকিয়ে দখিণ হাওয়ার পরশ পাওয়ার মত।

রবীন্দ্রনাথকে একবার স্পর্ধা করে জিজ্ঞেস করেছিলুম, মাছের ডিমের ইংরেজী কি? আমার বয়েস তখন এগারো রবীন্দ্রনাথের ষাট। গুমোট গ্রীষ্মের দুপুরে কাঁচের শার্সী বন্ধ করে তেতলার পশ্চিমের ঘরে একা বসে বসে লিখছিলেন। ডিক্সনারী থেকে সবে আয়ত্ত করেছি শব্দটা। প্রচুর সাহস নিয়ে দুপুরের নির্জনতা ভঙ্গ করে তাঁর ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করলুম—আপনি তো এত দেশ ঘুরে এসেছেন, বলুন তো মাছের ডিমের ইংরেজী কি?

—মাছের ডিমের ইংরেজী রো।

—হল না। স্পন্। আমি ডিক্সনারী দেখে এসেছি।

—ডিক্সনারী নিয়ে আমার সঙ্গে যুদ্ধ? বোস্ তাহলে। স্পন্ আর রো-র প্রভেদটা তোকে বোঝাই।

এই বলে লেখা-টেখা ছেড়ে দিব্যি আমার সঙ্গে সমবয়সী সঙ্গীর মতো আলাপ শুরু করে দিলেন।

এই যে ঘটনা, এর মধ্যে কি আছে? না আছে উপদেশ, না আছে ইতিহাস, না তথ্য। শুধু মরমী দখিন হাওয়ার পরশের মতো মনের গহ্বরে লেগে আছে এখনও। এই হচ্ছে আমার কথা। এই হল আমার লিপি।

॥ ১ ॥

"যাকে রাখো সেই রাখে।"

অমূল্য উপদেশ। এই উপদেশ আমরা ছেলেবেলায় দাদামশার কাছে পেয়েছি। তাঁর নিজের জীবনে প্রতি পদে এর প্রকাশ। কোনো জিনিস তিনি ফেলে দিতেন না। ছোট হোক, ভাঙা হোক, অনাদরের জিনিস, পুরোনো জিনিস, টুকরো টাকরা সব কিছু তাঁর কাছে আদর পেয়েছে। যত্ন করে তিনি তাদের রক্ষা করেছেন, কাজে লাগিয়েছেন। কে জানে, বড় শিল্পীরা হয় তো এমনি চোখ এমনি মন দিয়েই সব জিনিস দেখে। আমরা এ সব বুঝতোম না। কেন যে বড় আর্টিস্টের কাছে ছোটখাট খেলনার জিনিস হেলাফেলার জিনিসও আদর পায় তা-ও জানতুম না। আমরা শুধু জানতুম জোড়াসাঁকোর দক্ষিণের বারান্দায় যে চৌকিতে বসে দাদামশায় ছবি আঁকতেন তার ডান পাশে না-আলমারি না-বাক্স না-তাক গোছের একটা ব্যাপার থাকত। আমরা বলতুম দাদামশার ডেস্ক্। তার নীচের দিকটায় ছিল কয়েকটা দেরাজ, উপরের দিকটায় কতকগুলো খোপ। সেই খোপগুলির মধ্যে থাকত সব অমূল্য সম্পদ। সেখান থেকে যে কতরকমের জিনিস বেরত তার ঠিকানা নেই। আশ্চর্য লাগত। যখন যা-কিছু আমাদের দরকার হয়েছে দাদামশার কাছে গেলেই আমরা পেয়ে যেতুম।

একদিন গ্রীষ্মের বিকেলে জোড়াসাঁকোর

ট্রেড মার্ক বিজ্ঞপ্তি

জনসাধারন, ব্যবসায়ী এবং খরিদ্দারদের জানানো যাচ্ছে যে প্লেটো ট্রেড মার্কটির রেজিষ্টার্ড অধিকারী আমাদের ক্লায়েন্ট মেসার্স মাত্রে পেন এ্যাণ্ড প্লাষ্টিক ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাইভেট লি. বোম্বাই ৪। এই অধিকার সত্ত্ব ফাউণ্টেন পেন, প্রত্যেকটি পেনের অংশ, নিব এবং কালি সম্বন্ধে প্রযোজ্য। সারা ভারতবর্ষে প্লেটো ট্রেড মার্কটির সত্ত্বাধিকারী একমাত্র মেসার্স মাত্রে পেন এ্যাণ্ড প্লাষ্টিক ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাইভেট লি.—রেজিষ্ট্রেশনের জন্যেও বটে আবার দীর্ঘকাল একাদিক্রমে এই ট্রেডমার্কটি আমাদের ক্লায়েন্টের নামের সঙ্গে জড়িত বলেও বটে।

আমাদের ক্লায়েন্টরা অবগত হয়েছেন কোন কোন অসাধু ব্যবসায়ী নকল প্লেটো পেন এবং পেনের অংশ তৈরী করে খরিদ্দারদের ঠকাচ্ছেন এবং অনেকে লোক ঠকিয়ে পয়সা করার জন্যে এই সব জিনিষ বিক্রী করছেন।

PLATO

REGD.

সেইজন্যে অবগত হোন যে যাঁরা নকল প্লেটো পেন নিয়ে কারবার করছেন—আইন অনুযায়ী তাঁদের কঠোর শাস্তি হবে এবং যাঁরা এই সব অসাধু ব্যবসায়ীদের ধরিয়ে দিতে সাহায্য করবেন তাঁদের পুরস্কৃত করা হবে।

তারিখ: ১৫-৭-৬০
সারভেন্টস্ অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটিজ বিল্ডিংস
সরদার বল্লভভাই প্যাটেল রোড
বোম্বাই ৪

এম. পি. শিকারে
ল এ্যাণ্ড এ্যাডভেন্সের পক্ষে
ট্রেড মার্ক এ্যাটর্নিজ

shilpi-m.p. 296

গোল-বাগানে হেলানো বেঞ্চিতে দাদামশায় বসে আছেন। আমরা ছোটরা খেলা করছি। খেলতে খেলতে একজনের পকেট থেকে কি একটা জিনিস টপ্ করে গড়িয়ে ঘাসে পড়ে গেল।

সে তাড়াতাড়ি সেটা কুড়িয়ে পকেটে ভরছে, সেই সময় দাদামশার চোখে পড়েছে।

—দেখি, দেখি, কি ভরছিস্ পকেটে!

ছেলেটি ভয়ে ভয়ে মুঠো হাত খুলে ধরল।

লাল একটুকরো কাঁচ। ডিমের মতো। কি থেকে যেন ভাঙা।

—কোত্থেকে পেলি? এ তো দ্বারকানাথের বাতিদানের টুকরো! কি চমৎকার ভেঙেচে দেখেছিস্? যেন রক-পক্ষীর ডিম। কোথায় ছিল? আরো আছে নাকি? বের কর দিকি পকেটে আর কি আছে?

আর কিছুই নেই। ছেলেটি বল্লে, কাছারিখানার ছেঁড়া কাগজের স্তূপের মধ্যে সেটা পেয়েছে অনেক দিন হল।

বেচারার মুখ শুকিয়ে গেছে। ভাবছে এইবার বুঝি জিনিসটা বেদখল হল।

—অনেক দিন আগে পেয়েছিস? কি করিস ওটা দিয়ে?

—পকেটেই থাকে। মাঝে মাঝে নাড়ি-চাড়ি খেলি।

দাদামশার মুখে ক্রমে একটা খুসীর ভঙ্গী ফুটে ওঠে। তার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বল্লেন—নাঃ, তোর চোখ আছে দেখছি, তোর পছন্দ আছে। যা খেল্ গে।

এখনও আমি মাঝে-মাঝে ভাবি, দ্বারকানাথ ঠাকুরের বেলোয়ারি কাঁচের ঐ চমৎকার মোলায়েম টুকরোটা পাবার জন্যে দাদামশার কি মনে মনে বিষম একটা লোভ হয়নি? নিশ্চয়ই হয়েছিল। ঐ রকম আরেকখানা যদি পেতেন তাঁর ডেস্কের খুপরীর মধ্যে যত্নে তুলে রাখতেন সেই ভাঙা কাঁচের টুকরো।

আমি একবার একটা কালো রংএর পেন্সিল-কাটা ছুরী পেয়েছিলুম। বাবা দিয়েছিলেন। কাঞ্চননগরের ছুরী। নিজে হাতে নিজের ছুরীতে পেন্সিল কাটতে যে কি আনন্দ পেতুম তা আর কি বলব। উৎসাহের চোটে এটা কাটি, ওটা কাটি, হঠাৎ কি একটা কাটতে গিয়ে ছুরীর ফলাটা গেল মট্ করে ভেঙে।

চোখে অন্ধকার দেখলুম। কত আদরের কত কাজের ছুরী। তার এই দ্বিখণ্ডিত অবস্থা! জীবন বিস্বাদ হয়ে গেল। ভাবনায় পড়লুম। লোহা জোড়ার কোনো আঠা জানি না যে জুড়ব। অগত্যা দাদামশার শরণাপন্ন হতে হল।

ভাঙা ফলাটা হাতে নিয়ে বল্লুম—দাদামশায়, লোহা জুড়তে পারো?

দাদামশায় বল্লেন—তলোয়ারের খেলা তো খেলি নে। তুলির খেলা খেলি। কি হয়েছে?

ছুরীর ভগ্নাবস্থা দেখালুম।

—ওঃ এই ব্যাপার? রোস্ দেখি।

ডানদিকের একটা খোপের মধ্যে হাত

উৎসবে

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট • কলিকাতা

চিন্‌কোর নূতন বই

রবির আলো

এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে রবীন্দ্র মহাজীবনের কথা

লিখেছেন—

মনি বাগচী—মূল্য ঃ ৩৲

•

নতুন আঙ্গিকে লেখা আবিষ্কারের বিচিত্র কাহিনী

॥ ছোটদের কাড়াকাড়ি করে পড়বার মত বই ॥

পায়ে পায়ে এত দূর

লিখেছেন—

জ্যোতিভূষণ চাকী—মূল্য ঃ ২৲

প্রাপ্তিস্থান ঃ

আশোক বুক সেণ্টার

১৬৭ এন, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-১৯

॥ এই সপ্তাহে বার হবে ॥

বাংলা দেশের বিশিষ্ট লেখক-লেখিকার রচনায় সমৃদ্ধ, সেরা শিল্পীদের চিত্রে অলংকৃত ইস্পাতনগরী দুর্গাপুরের একমাত্র ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র—

'স্বগত'

'পূজা সংকলন

মূল্য—এক টাকা

আগামী সংখ্যার জন্য লেখা—ও বিজ্ঞাপন পাঠানোর ঠিকানাঃ

সম্পাদক, 'স্বগত'

দুর্গাপুর-৪ (বর্ধমান)

(সি-৭৩৮৫)

শোনা যায় যে প্রায় ১২ বছর ধরে কাজ করে ১২০০ সুদক্ষ রাজমিস্ত্রী মিলে তেরশ শতাব্দীতে বিখ্যাত কোণারক মন্দির তৈরী করেছিল।

যে কোন ভাবে বিচার করলেই বোঝা যাবে যে এরূপ বিরাট ইমারৎ তৈরীর কাজ অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এটি সহজেই অনুমেয় যে গৃহাদি নির্ম্মাণের কাজে প্রয়োজনীয় সামগ্রি এবং কর্ম্মীদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি হয়েছিল।

অতীতের ন্যায় আজও যে কোনো বিরাট পরিকল্পনার আওতায় বহু স্থায়ী শিল্পালয়ের উন্নতি হয়েছে এবং আরও বহু নতুনের উৎপত্তি হচ্ছে—যার ফলে অর্থনৈতিক উন্নতিও দিন দিন বেড়ে চলেছে। স্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকিউয়ামের পদ্ধতি

হল যে তাদের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনমত লোকবল ও দ্রব্যাদির জন্য যতদূর সম্ভব দেশীয় সাহায্যই নেবে। ১৯৫৯ সালে তাদের ভারত হতে ক্রীত দ্রব্যাদির মূল্য হয়েছিল ৩৪৬ লক্ষ টাকা, তার মধ্যে ২৮৯ লক্ষ টাকা মার্কেটিং অরগানাইজেশনের জন্যে এবং ৪২ লক্ষ টাকা রিফাইনিং অপারেশনের জন্যে। স্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকিউয়ামের মোট তিনটি অপারেশনের প্রয়োজনে পাঁচ বছরে, অর্থাৎ ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৯ পর্য্যন্ত, সবশুদ্ধ খরচ হয়েছে ১৬৫২ লক্ষ টাকা।

স্ট্যানভ্যাকের চাহিদার ফলে যে সমস্ত দ্রব্যাদির উৎপাদন আরম্ভ হয়েছে, সেগুলি হল আলকাতরা ও অন্যান্য পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদি রাখার জন্যে ড্রাম ও পিপা; গ্যাসোলিন পাম্প এবং আধুনিক ট্যাঙ্ক-ট্রাক্‌স্ এবং এয়ার ক্র্যাফট রিফিউয়েলার্‌স্।

স্ট্যানভ্যাক—*ভারতের অগ্রগতিতে অংশ গ্রহণ করেছে।*

স্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকিউয়াম অয়েল কোম্পানী সীমাবদ্ধ দায়িত্বের সহিত ইউ এস এ তে সম্মিলিত

PSSVOC-11B/60-BEN

চালিয়ে দিলেম। একটা পেট-মোটা গোল লাল কাঠের বাটি বেরল—নানারকম টুকি-টাকি জিনিসে ঠাসা। তার মধ্যে অনেকক্ষণ হাতড়ে হাতড়ে খুঁজলেম। তারপর একটা ছুরীর ফলা টেনে বার করে বল্লেন—যাকে রাখো, সেই রাখে। দাও এখন তোমার দাঁতটি আমায় দাও, আমার দাঁতটি তুমি নাও।

এই বলে আমার ভাঙা ফলাটি সেই কাঠের গোল বাটির মধ্যে টুপ্ করে ফেলে দিলেন। ইঁদুরের গর্ত যেন। আস্ত ফলাটি আমার হাতে দিয়ে বল্লেন—লাগাতে আমি পারব না। হরিনাথ জানে। হরিনাথকে ডাক। দেখে নে কেমন করে ছুরীর ফলা লাগাতে হয়।

আমি এতটা আশা করিনি। শুধু ফলা লাভ নয়, ফলা লাগাতেও শিখতে পারবো? ছুটলুম তখনই হরিনাথবাবুকে ডেকে আনতে।

হরিনাথবাবু ছিলেন দপ্তরখানার একজন সরকারবাবু। মস্ত এক মুখ কাঁচা দাড়ি নিয়ে দপ্তরখানার তক্তাপোষের উপর পাতা সাদা ফরাসের উপর তাঁর বেঁটে ডেসকটির পিছনে পা গুটিয়ে সারাদিন বসে থাকতেন। হরিনাথবাবুর ডেসকের উপরে হিসেবের খাতা আমরা খুব কমই দেখেছি। খাতা লিখতে প্রায় দেখিইনি। তাঁর ডেসকের ভিতরে যে কি থাকত তা জানবার আমাদের ছিল অদম্য কৌতূহল. কিন্তু কোনোদিন আমাদের সামনে তিনি ডেসক খুলতেন না। তবে আমরা জানতুম ঠিক দাদা-মশায়েরই মতো তাঁর ডেসক্-ও ছিল নানা রকম টুকি-টাকি দরকারি অদরকারি জিনিসের অমূল্য খনি। আমাদের বাড়িতে সরকারি করতে আসবার আগে হরিনাথবাবু বাজনার দোকানে কাজ করতেন। বেহালা এস্রাজ তিনি তৈরী করতে জানতেন। শুনেছি তিনি খুব ভালো মিস্ত্রি ছিলেন। নানারকম হাতের কাজে পোক্ত। এই সব কারণেই হরিনাথবাবুকে দাদামশায় সরকারবাবুদের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী পছন্দ করতেন। বাজনার দোকান থেকে হরিনাথবাবু সোজা ঠাকুরবাড়ির দপ্তর-খানায় কি উপায়ে প্রমোশন পেয়েছিলেন তা জানি না, তবে আমাদের ধারণা এতে দাদামশায়ের নিশ্চয় কিছু হাত ছিল।

বাজনার দোকান থেকে আসবার সময় হরিনাথবাবু সঙ্গে করে ছোটোখাটো নানা-রকম যন্ত্র এনেছিলেন। তাই দিয়ে ঠুক্-ঠাক্ সারাদিনই কিছু-না-কিছু কাজ করতেন। যার যা-কিছু ভেঙে যেত—ছোটদের খেলনা বড়দের সেলাই-এর বাক্স, দোয়াতদান, আলমারির পায়া, জানলার কাচ—অমনি হরিনাথবাবুর ডাক পড়ত। মিস্ত্রির দরকার হলে তিনিই মিস্ত্রি আনতেন। কোথায় কোন গলিতে কোন

প্রকাশিত হইল

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস

অজিত দত্ত

বর্তমান বইতে বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ দিক লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত হাস্যরসের বৈচিত্র্য বিস্তার এবং পরিণতির ধারাবাহিক বিবরণই যে ইহাতে আছে, তাহা নয়, প্রধান প্রধান হাস্যরসশিল্পীর রচনাবৈশিষ্ট্য বিশদভাবে আলোচিত হওয়ায় বইটি একটি উৎকৃষ্ট সমালোচনা-সাহিত্যে পরিণত হইয়াছে।

লেখক স্বয়ং সুপরিচিত কবি ও সাহিত্যিক। তাঁহার বিচারপদ্ধতির অভিনবত্ব এবং গভীরতা অচিরেই গ্রন্থখানিকে বাংলাসাহিত্যে অনুপম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাংলাসাহিত্য শিক্ষার্থীদেরও একটি দীর্ঘ অভাব এই বইখানি মোচন করিবে।

উৎকৃষ্ট ছাপা বাঁধাই। মূল্য ১২, টাকা মাত্র।

১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনু, কলিকাতা—১৯ ॥ জিজ্ঞাসা ॥ ৩৩, কলেজ রো কলিকাতা—৯

স্বর্ণ-সম্পুট

বিশ্বসাহিত্যের মানদণ্ডের নিরিখে বাংলা সাহিত্যের ক্রমপ্রগতি বিস্ময়কর। এই বিস্ময়কর সমৃদ্ধি সূচনায় ছোটগল্প ও কবিতা-কেন্দ্রিক হলেও আজকের বাংলা সাহিত্যের সব কটি শাখাই সাফল্যে পুষ্পিত। গল্প কবিতা থেকে শুরু করে সমালোচনা, রম্য-রচনা, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ আর রাজনৈতিক নিবন্ধ—কোন দিক থেকেই আমাদের সাহিত্য আর পিছিয়ে নেই। সম্প্রতিকালের সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের কয়েকটি সুনির্বাচিত রচনার একটি সুন্দর সংগ্রহ স্বর্ণ-সম্পুট।

আমাদের বর্ষ শুরু বৈশাখে। কিন্তু শরৎ কালকেই আমরা সাহিত্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ঋতু বলে ধরে নিয়েছি। তাই সাহিত্যের বর্ষগণনা শরৎ থেকে শুরু করতে বাধা নেই। গত শারদ ঋতু থেকে এবারের শরৎ—এক বছর কালের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টির সুরুচিপূর্ণ সুসম্পাদিত সংকলন-গ্রন্থ স্বর্ণ-সম্পুট। বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের সংকলন অভূতপূর্ব।

প্রধান সম্পাদক: সন্তোষ-কুমার ঘোষ

৩১ একডালিয়া রোড, কলকাতা ১৯ দাম দু টাকা।

(সি ৭৬৩১)

কাজের ভালো মিস্ত্রি পাওয়া যায় তাঁর জানা ছিল। ছোটোখাটো সারানোর কাজ হলে তিনি নিজেই সারিয়ে দিতেন।

বর্ষার সময় মাঠে খেলতে গিয়ে কাদার মধ্যে পা পড়ে আমার গোড়ালিতে একবার একটা কৈ-মাছের কাঁটা ফুটে গিয়েছিল। কাদার মধ্যে কাক-এ এনে ফেলেছিল বোধ হয় কাঁটাটা—দেখতে পাইনি। কাঁটাটা পা থেকে টেনে বার করতে গিয়ে দেখি বার করা যায় না। গভীর ভাবে ঢুকেছে। তা ছাড়া কাঁটার গায়ে করাতের মতো দাঁত মাংসকে এমন কামড়ে ধরেছে যে, টানলেই বিষম যন্ত্রণা। বড় ভয় পেয়ে গেলুম। ডাক্তার এলে তো ছুরী চালিয়ে গোড়ালি কেটে তবে কাঁটা বার করবে। তার থেকে ভয়ানক আর কিছু নেই। তাই খোঁড়াতে খোঁড়াতে চোখের জল মুছতে মুছতে ছুটলুম দপ্তরখানায় হরিনাথবাবুর কাছে। যদি তাঁর যন্ত্র টন্ত্র দিয়ে কিছু একটা উপায় করতে পারেন। আমার পা-টা ফরাসের উপর টেনে নিয়ে হরিনাথ বাবু চশমার মধ্যে দিয়ে একবার দেখে নিলেন। তারপর একটা সাঁড়াশির মত কি বার করে ফুস্ করে টেনে বার করে ফেল্লেন কাঁটাটা। সমস্ত যন্ত্রণার অবসান হল! একটুও লাগলো না। অদ্ভুত হাত ছিল হরিনাথবাবুর।

এ'রই কাছে দাদামশায় শিখেছিলেন কি করে 'রোলাম্' তৈরী করতে হয়। দাদামশায় বলতেন 'বজ্রপ্রলেপ'।

একদিন দুপুর বেলা আমি পাশের ঘরে মাস্টারমশার কাছে আঁক কষছি, দাদামশায় বারান্দা থেকে চেঁচিয়ে ডাকলেন—এদিকে আয়, বজ্রপ্রলেপ করা শিখিয়ে দি।

মাস্টার মশায় স্তম্ভিত।

অঙ্কের খাতা মুড়ে দক্ষিণের বারান্দায় এসে দেখলুম জল দিয়ে একটা শ্লেটের উপর দাদামশায় ময়দা মাখছেন, পাশে একটু চুণ। একটা তুলির বাক্স ভেঙে গেছে, তাই জোড়বার জন্যে বজ্রপ্রলেপ তৈরী হচ্ছে। বল্লেন—শিখে নে। কাজে লাগবে। তোর ঐ অঙ্কের চেয়ে অনেক বেশী দরকারি। খবরদার কাউকে শেখাস্ নি। হরিনাথের কাছ থেকে বিদ্যেটা আদায় করেছি। সহজে কি বলতে চায়? এই দিয়ে বাজনা জুড়তো। দেখে নে এইবার, কি করে করি।

এই বলে বজ্রপ্রলেপ করা আমায় শিখিয়ে দিলেন।

সেদিন আর অঙ্ক কষা হল না।

হরিনাথবাবু কয়েকটি যন্ত্র নিয়ে দোতলার বারান্দায় এলেন। ছোট্ট লোহার হাতুড়ি, তেকোনা উখো, সন্না, ছেনি, ইস্পাতের পেরেক।

দাদামশায় বল্লেন—দেখছিস কেমন হাতুড়িটা। অমনিটি পেলে আমি একটা কিনি।

অনেকদিন পরে দেখেছি ঠিক সেই রকম একটা হাতুড়ি দাদামশায় কোথা থেকে যোগাড় করেছেন।

আমার ভাঙা ছুরী অতি সহজেই সারানো হয়ে গেল। হরিনাথবাবুর পাকা হাত। ছুরী সারিয়ে সেটা আমার হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলনে—ভাঙা ফলাটা গেল কোথায়?

আমি কিছু বলবার আগেই দাদামশায় একটু হেসে বল্লেন—সেটা আমিই রেখে দিয়েছি।

ভাঙা ফলার উপর দুজনেরই সমান লোভ। ঐ এক বিষয়ে ঠাকুরবাড়ির দুই বাসিন্দার—একজন জমিদার, শিল্পী, অন্যজন তাঁরই সরকার, মিস্ত্রী—আশ্চর্য মিল দেখেছিলুম।

"যাকে রাখো, সেই রাখে!" (ক্রমশ

আবশ্যক

শালের জন্য আংশিক-সময়ের এজেন্ট। বিস্তৃত বিবরণ ও বিনা-মূল্যের নমুনার জন্য লিখুন—
GIRSON KNITTING WORKS, LUDHIANI. (207).

মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল

আরোগ্য করিতে ২৭ বৎসর ভারত ও ইউরোপ-অভিজ্ঞ ডাঃ ডিগোর সহিত প্রতি দিন প্রাতে ও প্রতি শনিবার ও রবিবার বৈকাল ৩টা হইতে ৭টায় সাক্ষাৎ করুন। ৩৭বি জনক রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

(সি ৭৬০৭)

আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে; রতনলাল মুন্সীর মামলায় আদালতে চারজনের নাম আত্মপ্রকাশ করেছিল প্রধান পাত্র-পাত্রী হিসাবে। আসামী রতনলাল তার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যাভিচারের কারণে গুলী মেরে হত্যা করে রঞ্জন রায়কে। রতনলালের স্ত্রীর নাম গ্লোরিয়া; রঞ্জন রায়কে যে উত্তেজিত করে এই অসামাজিক অন্যায়ে, তার নাম ডালিয়া। এই মামলাকে উপলক্ষ্য করে নীলকণ্ঠ যে লক্ষ্যে পৌঁছতে চেয়েছেন তা সাময়িক কোনও উত্তেজক ঘটনার ওপর ভিত্তি করে সেনসেশানাল কাহিনী নয়। এই উপন্যাসে সেই লক্ষ্য হচ্ছে চিরন্তন মানব জীবনের ট্র্যাজেডি। কোনও স্ত্রী তার বিবাহিত জীবনে দ্বিতীয় কোনও পুরুষকে ভালবাসতে পারে কিনা; তার দ্বিতীয় প্রেম তার প্রথম প্রেমের চেয়েও সত্য এবং সেই কারণে অদ্বিতীয় প্রেম বলে বিবেচিত হতে পারে কিনা, সেই জীবন-জিজ্ঞাসায় আলোড়িত। এই উপন্যাস কেবলমাত্র বিবাহের উপযোগী অথবা বাংলা সাহিত্যের যারা একমাত্র পাঠক, সেই পাঠিকাদের অবসর বিনোদনের উপযোগী উপাদান নয়।

প্রকাশিত হয়েছে ঃ

নীলকণ্ঠ-এর

দ্বিতীয় প্রেম

॥ দাম ঃ পাঁচ টাকা ॥

প্রকাশিত হচ্ছে

প্রফুল্ল রায়— দূরের বন্দর ৩·০০
শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্ত্তী—কী মায়া ৩·০০

—সাম্প্রতিক উল্লেখ যোগ্য প্রকাশনা—

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য—	তিমির লগন	৪·৫০	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়—	চন্দন কুঙ্কুম	২·০০
ঐ—	এতটুকু আশা	৩·০০	নীলকণ্ঠ—	একটি অশ্রু, দুটি রাত্রি ও কয়েকটি গোলাপ	৩·০০
নীহাররঞ্জন গুপ্ত—	ছায়াপথ	৪·৫০			
তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়—	পৌষলক্ষ্মী	৪·০০	ঐ—	বসন্ত কেবিন	২·৫০
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়—	ঋতুরংগ	৩·০০	শ্রীবাসব—	নাজমা বেগম (২য় সং যন্ত্রস্থ)	৫·০০

করুণা প্রকাশনী, ১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

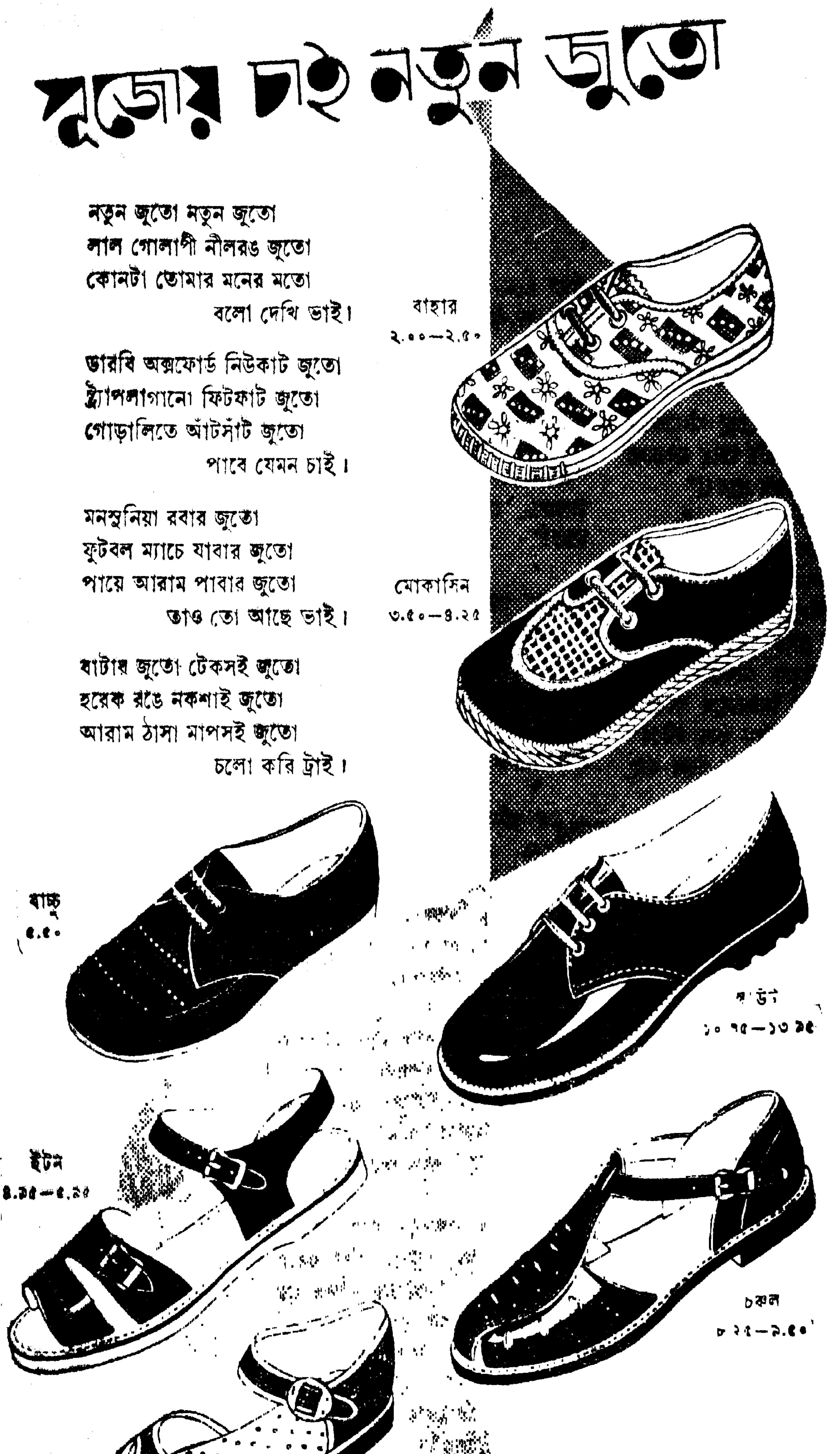
পুজোয় চাই নতুন জুতো
নতুন জুতো নতুন জুতো
লাল গোলাপী নীলরঙ জুতো
কোনটা তোমার মনের মতো
বলো দেখি ভাই।
ডারবি অক্সফোর্ড নিউকাট জুতো
স্ট্র্যাপলাগানো ফিটফাট জুতো
গোড়ালিতে আঁটসাঁট জুতো
পাবে যেমন চাই।
মনসুনিয়া রবার জুতো
ফুটবল ম্যাচে যাবার জুতো
পায়ে আরাম পাবার জুতো
তাও তো আছে ভাই।
বাটার জুতো টেকসই জুতো
হরেক রঙে নকশাই জুতো
আরাম ঠাসা মাপসই জুতো
চলো করি ট্রাই।
বাহার
২.০০—২.৫০
মোকাসিন
৩.৫০—৪.২৫
বাচ্চু
ইটন
চঞ্চল
৮.২৫—৯.৫০
চম্পা
৩.৭৫—৪.৭৫
Bata
বাটা স্যু কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড

টুকে বাকে

বাড়তি জাতীয় আয় কোথায় গেল, তাহা লইয়া নেহরুজী খুব উদ্বেগ বোধ করিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, আয় সন্ধানের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি

নিয়োগ বাঞ্ছনীয়। বিশু খুড়ো বলিলেন—"আমরা মনে করি, কমিটির চেয়ে নলচালা বা চালপড়া বেশি কাজের হবে!!"

*   *   *

কলিকাতা পৌরসভার ১৯৫৭-৫৮ সালের হিসাবপত্রে সাড়ে আট হাজার টাকার অসামঞ্জস্য রহিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। চীফ অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট নাকি মনে করেন যে, এই সাড়ে আট হাজার টাকার হিসাব খতাইয়া দেখিয়া তাহা নিয়মানুগ করিতে সাড়ে তেতাল্লিশ হাজার টাকা খরচ হইবে। —"খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি বোধ হয় একেই বলে"—বলে শ্যামলাল।

*   *   *

তৃতীয় পরিকল্পনায়, অর্থাৎ ১৯৬১-৬৬ সাল পর্যন্ত ভারতবাসী ৬৭২ কোটি ডিম খাইবেন। আশা করি,

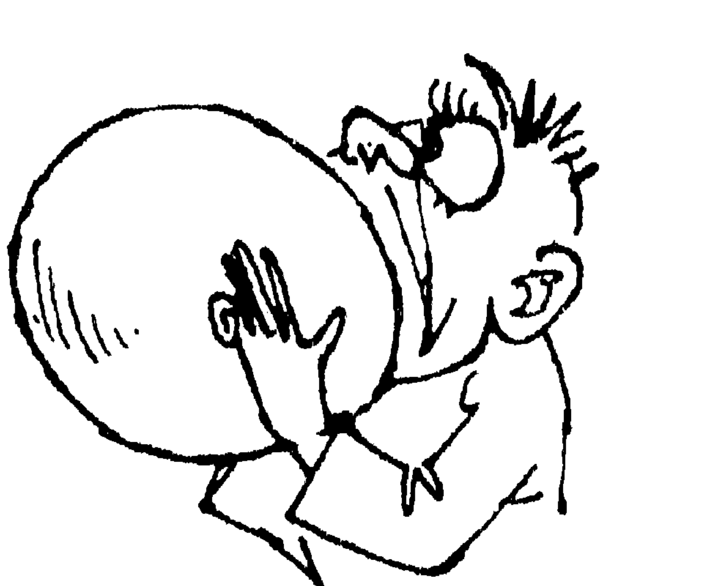

অশ্বডিম্ব নয়"—সংক্ষেপে বলেন জনৈক সহযাত্রী।

*   *   *

আনন্দবাজার পত্রিকা" বর্ষামঙ্গলের কথা লিখিয়াছেন। —"কিন্তু বর্ষায় আর আমাদের উৎসাহ নেই। ইলিশই যখন দুর্লভ, তখন বর্ষা হলে কি, আর না হলেই কি"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

*   *   *

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় নাকি সাংবাদিকদের বলিয়াছেন,—"শপথ করছি, আর কোন কিছু বলব না তোমাদের। যা বলবার, লিখে পাঠাব।" বিশু খুড়ো বলিলেন—"কিন্তু এযে উল্টো কথা হল। আমাদের শাস্ত্রে বলে—শতং বদ, মা লিখ।"

*   *   *

এক সংবাদে প্রকাশ, কলিকাতা জাদুঘরের নাকি গুরুত্ব হ্রাসের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"অসম্ভব নয়। চিড়িয়াখানার যেখানে প্রাধান্য, সেখানে জাদুঘরের হাল এই হয়!!"

*   *   *

গ্রামে গ্রামে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষাদানের একটি পরিকল্পনার কথা রাজ্য সরকার চিন্তা করিতেছেন। —"উত্তম পরিকল্পনা। শুধু দেখতে হবে, শিল্পীরা শিব গড়তে না বাঁদর গড়েন"—মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

*   *   *

রোম অলিম্পিকে যোগদানরত ভারতীয়দের পোশাক বর্তমানে হইয়াছে ফিকা নীল। আগে ছিল ঘোর নীল। —"জামার রঙ ফিকে হতে আপত্তি নেই। খেলাধূলোটা ফিকে ফিকে না হলেই হয়"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

*   *   *

সংবাদে প্রকাশ, চীন ক্রীড়াবিদরা নাকি অলিম্পিকে যোগদান করেন নাই। খুড়ো বলিলেন—"তাঁরা এখন ভারত সীমান্ত অলিম্পিকে 'খেইল' দেখাতে ব্যস্ত বলেই হয়ত রোম যেতে পারেন নি!!"

*   *   *

এক সংবাদে প্রকাশ, রাশ্যা বিজ্ঞানের সাহায্যে মেঘ হইতে বৃষ্টি ঝরাইতে সমর্থ হইয়াছে। —"আমাদের কৃতিত্ব আরো বেশি। বৃষ্টি নামাতে আমাদের বিজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। 'আয় বৃষ্টি ছেলে জাগল দেবো মেলে' বললেই কাজ হয়। তাছাড়া পানি মহারাজরা তা আছেনই"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

*   *   *

মানবেতর প্রাণীদের মধ্যে কোন্ কোন্ প্রাণি সংগীত ভালোবাসে, সেই সম্বন্ধে আনন্দবাজার রবি-বাসরীয়তে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। খুড়ো বলিলেন—"কিন্তু এসব নিশ্চয়ই আধুনিক সংগীত নয়।"

*   *   *

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই নাকি বলিয়াছেন যে, ভারতে মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা

অস্বাভাবিক ধরনের নহে। —"মোটেই না, মোটেই না। মূল্য বৃদ্ধির কথাটা কুলোকের গুজব মাত্র। গুজবে কান দিতে নেই"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

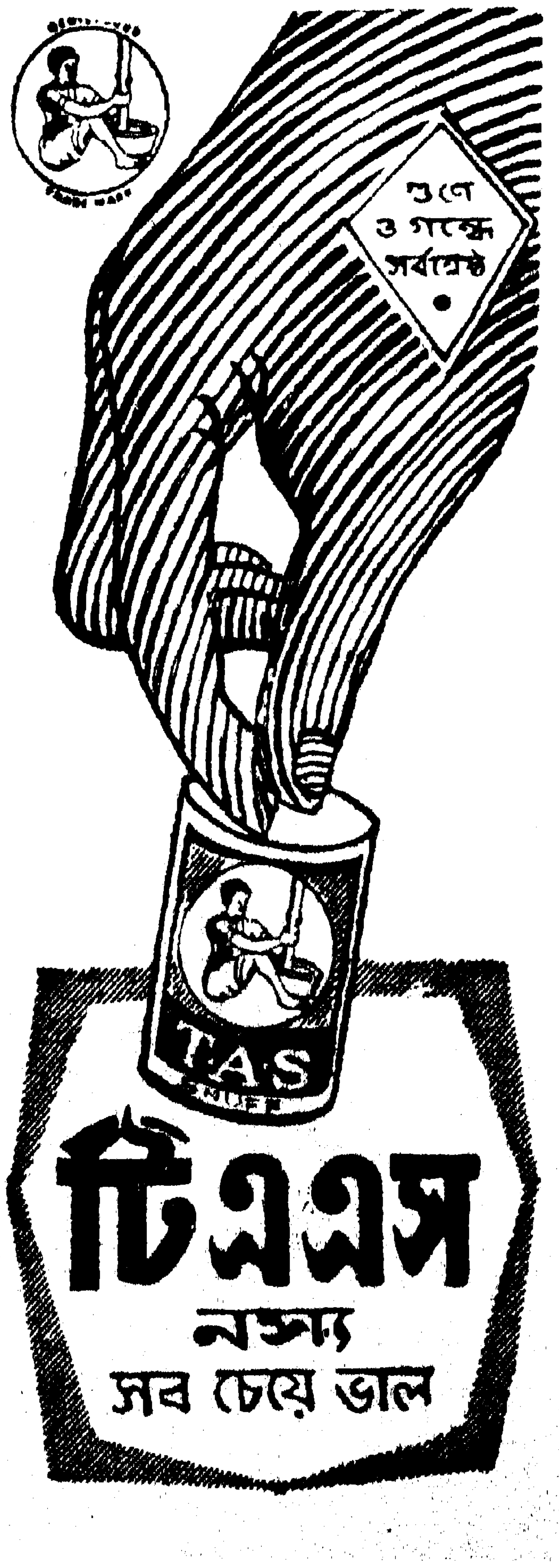

দুর্ঘটনার পর

সোমনাথ ভট্টাচার্য

আগুনটা লাগল খুবই আকস্মিকভাবে এবং অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় সমস্ত প্যাণ্ডেলটাকে পাকে পাকে পেঁচিয়ে ধরে লকলকিয়ে উঠল। মাত্র কয়েক-জন ক বালতি মাত্র জল দূর থেকে ব্যর্থভাবে আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করবারই সুযোগ পেল না। এর জন্য খুব যে একটা গোলমাল, হৈ-হট্টগোল বা সোচ্চার ত্রস্ততা জাগল—তাও না। কারণ মফস্বল শহর বাবুইহাটি তখন ভাতঘুম ঘুমাচ্ছিল। তদুপরি আগুনটাও যেমন নিমেষে হু হু করে উঠেছিল তেমনি শুকনো চট, কিছু ফাঁপা বাঁশ আর নিবস্ত্রা নিরাবরণা প্রতিমার সামান্য কিছু ডাকের সাজের শোলা ছাড়া আর কিছুই পেট ভরাবার মত পেল না। না পেয়ে রসদ সংগ্রহের আশায় ডাইনে বাঁয়ে হাত বাড়াল। ঠিক পেছনে কেনারাম সাধুখাঁর মস্ত মুদিখানা আর চালের আড়তের টিনের চালের ওপর হাত বুলিয়ে হাত টেনে নিল। সামনে বারো ফুট চওড়া রাস্তা যদু বিশ্বাস রোডের ঠিক ওধারে 'লজ্জাহর' বস্ত্রালয়ের কর্মচারীরা তখনও সবকটা টিনের ঝাঁপ বন্ধ করে উঠতে পারেনি। সেদিকে টেনে টেনে হাত বাড়িয়ে অনেক চেষ্টা করেও নাগাল পেল না। তখন রাস্তার ওপর দু-পাশে লাইট আর টেলি-ফোনের পোস্টের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা লাল সালুর ওপর 'সতীর সম্পদ' সিঁদুরের বিজ্ঞাপনটা সাক্রোশে মুখের মধ্যে পুরে হাত গুটিয়ে নিল। বিজ্ঞাপন বাঁধা দড়ির প্রান্ত দুটো ঝুলতে ঝুলতে জ্বলতে লাগল। টেলিফোনের পোস্টের গায়ের দড়িটা কি-এক অজ্ঞাত কারণে নিবে গেল। কিন্তু লাইট-পোস্টের দড়িটা শেষ পর্যন্ত জ্বলল। তারপর বাঁধন কেটে পোস্টের গা বেয়ে সর-সর করে নেমে এল।

ঘটনাটা ঘটল এইভাবে।

পুরুত মশাই বেলা এগারটার মধ্যেই শেষ করেছিলেন পুজো। ঢাকীরা ঢাক কাঁসর বাজিয়েছিল। মাইকটা বন্ধ ছিল আরতির সময়টুকুর জন্যে। কেনারাম সাধুখাঁর ন' বছরের মেয়ে লালপাড় শাড়ি পরে কোলের ভাইকে দোকান থেকে একটুকরো তালমিছরি চেয়ে নিয়ে তাই দিয়ে ভুলিয়ে বসিয়ে রেখে শাঁখ বাজিয়েছিল গাল ফুলিয়ে ফুলিয়ে। কেনারাম সাধুখাঁ গঙ্গাস্নান করে গরদ পরে খালিগায়ে এক পাশে বসে একাগ্র মনে পুজো দেখছিল। তারপর একটু প্রসাদ আর চরণামৃত মাথায় ঠেকিয়ে মুখে দিয়ে বাড়ি গেল সারাদিন উপবাসের পর খেয়ে একটু বিশ্রাম করতে। পুরুত মশাই টিনের চেয়ারের ওপর বসানো মাটির সরায় দর্শনীর পয়সাক'টা কুড়িয়ে নিয়ে এবং সবশেষে একটা নয়া পয়সা সরায় ফেলে রেখে চলে গেলেন। ঢাকীরা কেনারাম সাধুখাঁর দোকানে ঢাক-কাঁসর জিম্মা রেখে তার বাড়ি কলাপাত পেতে খেতে গেল। প্রায় আড়াই পোয়া তেল ধরে এইরকম পিদিমটা জ্বলছিল মোটা শিখায়। আর বেলা গড়াচ্ছিল। যদু বিশ্বাস রোড একটা খোলস ছাড়া সাপ হয়ে গেল। অগ্রহায়ণের দুপুরে গা এলিয়ে দিয়ে রোদ পোহাচ্ছিল। চোখ-মুখ কুঁচকে দু একজন রিকশাওয়ালা মন্থর গতিতে প্যাডল করতে করতে আর অকারণে হর্ন বাজাতে বাজাতে যাচ্ছিল ক্বচিৎ কদাচিৎ। দুটো কি তিনটে চড়ুই পাখায় করে রাস্তার ধারের ধুলো ছিটিয়ে ছিটিয়ে মেতে উঠেছিল ধুলোট উৎসবে। একটা রোগা গরু একান্ত মনে একটা চটচটে ভেলিগুড়ের বস্তার টুকরো চিবিয়ে চলছিল।

ঠিক এই সময়ে কোথা থেকে হুস্ করে এক দম্‌কা বাতাস এল। পিদিমের মোটা শিখাটা বেসামাল হয়ে পড়ল। মহাদেবের জটার ক'টা রুক্ষ চুল কেমন করে যেন চলে গেল পিদিমের শিখাটার ওপর। মহাদেবের জটার ক'টা চুল প্রথমে জ্বলল বোমার সলতের মত পিড়্‌পিড় করে। জটার এ-পাশ ও-পাশ দিয়ে একটু আধটু ধোঁয়া বেরুল। তারপরই শব্দহীন আগুনে বোমা হয়ে ফেটে উঠল। একটু ওপরে ঝুলছিল বড় বড় থালার মত চাঁদমালা।—শুকনো শোলা আগুনের আঁচ পেল কি পেল না। তারপর এলোকেশীর এলোচুলে। ডাকের সাজের গহনায়। মাথার মুকুটে। বাহারী চাঁদোয়ায়। —অবশেষে প্যাণ্ডেলের চটে এবং বাঁশে।

বেলা দ্বিপ্রহর। বাবুইহাটির প্রধান জনপথ যদু বিশ্বাস রোডের ধারে সেবায়েত কেনারাম সাধুখাঁর প্রতিষ্ঠিত কালী—ওরফে কেনাকালীর পুজামণ্ডপে এ অঘটনটা ঘটে গেল। দেখল—অনেক লোক, বেশ একটা ভিড় না-হলেও বাবুইহাটির প্রায় প্রতি পাড়ার কেউ না কেউ। তারা নিজেদের

এলাকায় সঠিক খবরটা ছড়িয়ে দেবার জন্য অস্থিরভাবে আগুনটা না-নেবা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগল।

এলোকেশীর এলোকেশ পুড়েছে। মাথায় শোলা আর রাঙতার মুকুট ডান-পাশের চোখের অর্ধেক আর গালের খানিকটা নিয়ে মাটির চটা খসে পড়েছে। সেখান থেকে পোড়া বিচুলি দেখা যাচ্ছে। ভারী বুক ঢাকা ছিল ডাকের সাজের চওড়া চওড়া গয়নায়। পুড়ে বুক উদোম হয়েছে। কোমর থেকে কাটা হাতের মালা খসে গিয়ে মাটির রং বেরিয়ে পড়েছে। রক্তাভ জিভটা যেন লকলকিয়ে বেরিয়ে পড়েছে আরও খানিকটা। নাকের বিরাট সোনালী তারের রিংটার লাল নীল পুঁতি দুটো শুধু সকৌতুকে চিকচিক করছে। মহাদেবের জটা [illegible]। মাথার সাপের ফণা ভেঙেছে।

বাঙালী ও বঙ্গসংস্কৃতিকে জানতে
একখানা প্রথম শ্রেণীর বাংলা
মাসিক **নববঙ্গ** পড়ুন
তৃতীয় বর্ষ * বার্ষিক ৩্
২০১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭

কে.হোড়ের
কনক
পাউডার

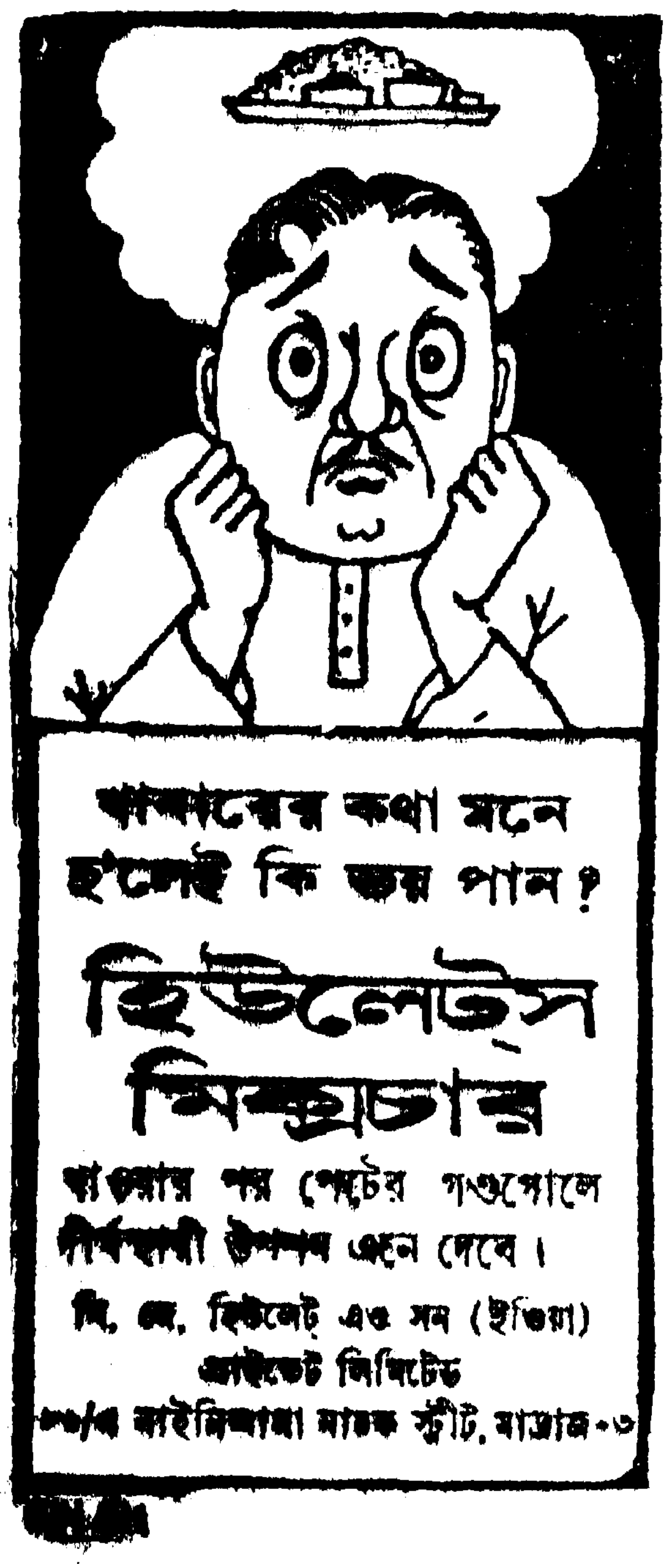

গায়ের ধপ্‌ধপে সাদা রঙ ধোঁয়ায় কালো। মূর্তিশিল্পী এবার একটু নূতনত্ব করেছিল—টার্কিশ তোয়ালে রং ছুপিয়ে চিত্র-বিচিত্র করে মহাদেবের পরনের বাঘছাল করে। আগুনে নকল বাঘছালটুকুও বাদ দেয়নি।

এতক্ষণ যারা ছটফট করছিল আগুন নেবাবার জন্য, যারা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে দৌড়াদৌড়ি করছিল এবং যারা নিরাসক্ত দর্শকের ভূমিকা নিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে-ছিল—সকলেই যেন হঠাৎ কেমন স্তব্ধ হয়ে গেল। হা হা করা পোড়া আধপোড়া বাঁশের কঙ্কালটার মধ্যে আটকে যাওয়া জোড়ায় জোড়ায় চোখের দৃষ্টি যেন হঠাৎ একটা ত্রাসে বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

—এ বছর কিছু একটা হবে।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন আস্তে আস্তে অকারণে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে কথাটা শেষ করল।

সায় দিল কে আর একজন—'কিছু একটা হবেই।'

গুঞ্জন শুরু হল এর পর থেকেই। দু-একজন করে অবশেষে কলকল করে উঠল সমস্ত ভিড়টা। ভিড়টা ভাঙল। ছড়াল। বিস্তৃত হয়ে পড়ল। ছোট ছোট দল হল এখানে-ওখানে। পরে এসে উপস্থিত হয়েছে এমন অনেকে প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে আগাগোড়া ঘটনাটা জানবার উৎসাহে এ দল থেকে ও দলে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। অত্যুৎসাহী কেউ কেউ ভিড় থেকে বেরিয়ে টিং টিং ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে সাইকেলের প্যাডল্-এ চাপ দিল। কেউ পায়ের কদম জোর করে হাটাপথই ধরল।

এক বুড়ি সভয়ে হা করে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে কেঁদে উঠল।

মেয়েদের মত পাতলা গলার একটা অল্প বয়সী ছেলে এ-সময় রসিকতা করতেও ছাড়ল না—কেনা-কালী হাড়ে কালি লাগলে এবার।

কেনারাম সাধুখাঁর বুক ভাঙা বিলাপ ভেসে এল।

ভিড়টা উচ্চকিত এবং উৎসাহী হয়ে উঠল। এতক্ষণে খবরটা ছড়িয়ে গেছে বাবুইহাটির অলিতে গলিতে। আনাচে-কানাচে। পরতে পরতে ভিড় জমছে। একটা নতুনত্বের আশায় অনেকগুলো মাথা ডিঙ্গি মেরে মেরে বিলাপের উৎসটা খোঁজার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। ভিড়ের অন্যধারের একটা অংশ ধসে গড়িয়ে পড়ল চৌ-রাস্তার একটা রাস্তার দিকে।

কেনারাম সাধুখাঁর স্বর কান্নায় ভাঙা। বিলাপ এবং সমস্ত অনুযোগ নিজের ছেলে এবং দোকানের কর্মচারীদের উদ্দেশ্যেই।

—দোকানে এতগুলো লোক তোরা—একটু সাবধান হতে পারলি না। একজনও কেউ গিয়ে খানিকক্ষণ বসতে পারলি না ঠাকুরের কাছে। মধু, তোকে এত করে বললাম যা একবার ঠাকুরতলায়। বস্‌গে খানিক। তোর দোর বন্ধ করে বউ-এর সঙ্গে ঘুমটাই বড় হল। একা মানুষ আমি কঁাদিক সামলাই। এখন আমি কি করব—।

কেনারাম সাধুখাঁর একা হেঁটে আসার ক্ষমতা ছিল না। দুই জোয়ান ছেলে কেনা-রাম সাধুখাঁকে দুদিক থেকে ধরে নিয়ে আসছিল। পেছনে কেনারাম সাধুখাঁর ন' বছরের মেয়ে ছলছল চোখে। তার পেছনে মাঝামাঝি একটা ভিড়। অনেকগুলো চোখের দৃষ্টি পড়ল কেনারাম সাধুখাঁর বড়ছেলে মধুর মুখের ওপর। মধুর মুখ লাল হল। মাথা নীচু করল।

হঠাৎ কেনারাম সাধুখাঁ রাগে ফুঁসে উঠল—তোরা আমার কেউ নোস্। সব শত্রু। সব আমার শত্রু।

কিন্তু আবার স্বর ভাঙল—ওরে অতি বড় শত্রুও যে এমন সর্বনাশ করে না। এখন আমি কি করি—।

চৌ-মাথার ওপর আসতে চতুর্দিক থেকে কেনারাম সাধুখাঁকে দেখা গেল। মোড়ের ওপর কেনারাম সাধুখাঁর দোকান। দোকানের সামনে এবং পিচ্-রাস্তার মধ্যের অপরিসর খোয়া-বাঁধানো জায়গাটুকুর ওপর কেনা-কালীর প্যান্ডেল। ভিড়ের এখানে-ওখানে ডিঙ্গি মারামারি বাড়ল।

—আমি দেখব না। দেখতে পারব না।

কেনারাম সাধুখাঁ চোখ বন্ধ করে রইল। কিন্তু চোখ খুলতেই হল। দুই জোয়ান ছেলেও আর ধরে রাখতে পারল না। কেনারাম সাধুখাঁ প্রতিমার পা আঁকড়ে ধরে পায়ের ওপর মাথা কুটতে লাগল—ভয়ংকরী—এ তোর কি লীলা মা—।

কেনারাম সাধুখাঁর মেয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল—বাবা তুমি এমন করছ কেন—আমার ভয় করছে।

মাথার বেশ খানিকটা ওপরে প্যান্ডেলের একটা বাঁশের দড়ির বাঁধন তখনও জ্বলছিল দুইয়ে ধুইয়ে। ভিড়ের ঠেলাঠেলিতে জিরাফের মত বাড়ান ঘাড়গুলোর ওপর পড়ল। যাদের ঘাড়ে পড়ল তারা ঘাড় টেনে নিয়ে অপ্রস্তুতভাবে আহত জায়গায় হাত বোলাতে লাগল। হাসির হর্‌রা উঠল অন্যদিক থেকে। মধু এতক্ষণ মনে মনে ফুঁসছিল। এবার ক্ষেপে উঠল। জনতার দিকে হাতজোড় করে বলল, "বিনা পয়সায় এতক্ষণ তো অনেক মজা দেখলেন। এবার গা-হাল্কা করুন আস্তে আস্তে।"

জবাব এল সঙ্গে সঙ্গে। "আমরা মিউনি-সিপ্যালিটির ট্যাক্স-পেয়ার দাদা। কারো ইয়ের জমিদারিতে দেইড়ে নেই—"

আর একজন বলল, "গোঁ না করে বাপের কথা শুনে যদি আর একটুখানি আগে ঘরের খিলটা খুলতেন দাদা—।"

মেয়েদের মত পাতলা গলায় দুর্বিনীত

ছেলেটা ফস্ করে বলল, "সেই মাইরি দোর খুললি তবে কেন মাইরি লোক হাসালি—।"

মাইলখানেক দূরে গ্রামের দিকে পুরুত মশাইয়ের বাড়ি। খবর পেয়ে সাইকেল রিক্‌শা করে ছুটে এলেন। এসে কাঁপতে কাঁপতে টিনের চেয়ারে বসে পড়তে পড়তে শুধু বলতে পরলেন, "মধু বাবা, রিক্‌শার ভাড়াটা দিয়ে দাও।"

মাইল দুয়েক দূরে ন্যায়তীর্থ মশাই থাকেন। তাঁর কাছ থেকে বিধান আনবার জন্যে মধুর মেজ ভাই কেতু সাইকেল করে বেরিয়ে পড়ল।

কেনারাম সাধুখাঁ এতক্ষণে অনেকখানি নির্জীব হয়ে পড়েছে। পা আঁকড়ে পড়ে আছে মড়ার মত। মাঝে মাঝে শরীরটা প্রবলভাবে নড়ে উঠছে কান্নার দমকে। গলা দিয়ে চাপতে যাওয়া চাপা শব্দ বেরিয়ে আসছে।

পুরুত মশাই টিনের চেয়ারে বসে মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। অবশ্য মুখে-চোখে ভাবটা রেখেছেন একেবারে অন্যরকম। কানটা ঠিক রেখেছেন। কে একজন একটা ঘোট পাকিয়ে তুলেছে কয়েকজনকে নিয়ে। পুরুত মশাই কান খাড়া করলেন।

"হবে না"—সেই লোকটাই নীচু গলায় বলছে, "বলতে গেলে সব খারাপ শোনায়। এ পুরুতের জন্যেই এইটি হল। জবা ফুলে কোনদিন নারায়ণ পুজো হতে দেখেছে কেউ। সেদিন স্বচক্ষে দেখলাম। এত অনাচার সহ্য হয়! তোমরা দেখো—ঐ শালার পুরুতের জন্যে এ-বছর একটা কিছু সর্বনাশ না হয়ে যায়—!"

কেতু বিধান নিয়ে এল ন্যায়তীর্থ মশায়ের কাছ থেকে। পুরুত মশাই বাঁচলেন। কেতু সাইকেল থেকে নেমে হড়বড় করে বলল, "ন্যায়তীর্থ মশাই বললেন, দগ্ধমূর্তি এখনই বিসর্জন দিতে হবে। আর সামনের পূর্ণিমায় রক্ষাকালী পুজো করতে হবে।"

পুরুত মশাই এতক্ষণে চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। বাঁচলেন। মধুকে ডেকে বললেন, "তাহলে বাবা মধু, বিসর্জনের ব্যবস্থা কর—।"

তাড়াহুড়ো করেও বিসর্জনের ব্যবস্থা করতে অগ্রহায়ণের বেলা গড়াল। বাবুই-হাটির একমাত্র পিচ্-রাস্তা যদু বিশ্বাস রোডের ধারে প্রত্যেকটা লাইট্ পোস্টে এবং অন্যসব কাঁচা রাস্তাগুলোর ধারে দুটো অন্তর একটা পোস্টের সঙ্গে ঝোলান বাল্বগুলো পীতাভ আলো বিকীরণ করতে লাগল।

বিসর্জনের মিছিলটা বেরুল প্রায় শব-যাত্রার মত। আড়ম্বরহীন নিশ্চুপভাবে। ভারী প্রতিমাটা কাঁধে নিতে যে কয়েকজন দরকার—তাদের প্রয়োজনের জন্যে আর কয়েকজন এবং ফালতু আর মাত্র দু-চারজন —গোটা এই চেহারাটা নিয়ে মিছিলটা তৈরী হল। কেনারাম সাধুখাঁ মিছিলটার সঙ্গে একটা হ্যাজাক্ কিংবা একটা কার্বাইডের আলোর ব্যবস্থাও করতে দেয়নি। মধু একটা নয় দুটো আলোর ব্যবস্থা করেছিল মিছিলটার সঙ্গে। কেনারাম সাধুখাঁ দেখে আলো দুটো আছড়ে ভেঙ্গে ফেলে আর কি—। মধুকে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠেছিল, 'অনেক ক্যারদানি দেখিয়েছ। এখন পোড়া মুখে আলো ফেলে দেশ হাসাবার দরকার নেই।'

সুতরাং আলোহীন বাদ্যহীন বিসর্জনের মিছিলটা একটা শবযাত্রার মত রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

কিন্তু দেখা গেল, খবরটা কেমন করে ছড়িয়ে গেছে। বাবুইহাটির রাস্তার ধারে ছাড়াছাড়া কিংবা ঘনবুনোট একতলা দোতলা বাড়ি কিংবা খাপরা বা টালির ঘরগুলোর বারান্দা রক সিঁড়ি দরজায় লোক দাঁড়িয়ে গেছে। ছায়ান্ধকারে জোড়ায় জোড়ায় উৎসুক চোখের্ সাদা অংশগুলো চকচক করছে।

সবাই দেখল।

বাবুইহাটির এক অল্পবয়সী মা তার তিন বছরের মেয়েকে নিয়ে দো-তলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিল। মিছিলটা যখন একেবারে বারান্দার নীচে এসে পৌঁছল তখন অল্প-বয়সী মা হঠাৎ দারুণ ভয় পেয়ে মেয়েকে দু-হাতে আঁকড়ে ধরে আঁচলের মধ্যে টেনে নিয়ে পেছন ফিরে কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বাবুইহাটির চটকলের পরম বৈষ্ণব প্রধান কারণিক মশাই হরিসভায় যাবার জন্য বাড়ি থেকে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। মিছিলটা সামনে এসে পড়াতে সবিনয়ে রাস্তা ছেড়ে একধারে সরে দাঁড়ালেন। মিছিলটা এগিয়ে গেল। কারণিক মশাই খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবলেন, তারপর ফেরবার জন্য বাড়ির পথটাই বেছে নিলেন।

বাবুইহাটির গবা-পাগলাকে কয়েকজন গিয়ে টেনে আনল পঞ্চাননতলার বট্‌গাছের অন্ধকার পেছন থেকে। একেবারে উলঙ্গ গবা একটা বড় মানকচুর পাতায় মাথা পিঠ ঢেকে তখনও গোঁ গোঁ করছে, 'আমি ভস্ম হয়ে যাচ্ছি—।'

—এ বছর একটা কিছু হবে।

কেনারাম সাধুখাঁ অঘটনটাকে ঘটনামাত্র বা নেহাত দুর্ঘটনা—ঠিক এইভাবে কিছুতেই চিন্তা করে উঠতে পারছিল না। বরং মাসাধিককাল ধরে অঘটনটাকে নিয়ে মনে মনে পর্যালোচনা করতে করতে এই সিদ্ধান্তেই প্রায় উপনীত হয়েছিল যে—এ একটা ইঙ্গিত। এ একটা দারুণ কিছু ঘটবার পূর্বাভাস।

যেদিন অঘটনটা ঘটল কেনারাম সাধুখাঁ সেদিন ভোররাত্রে যেন একটা স্বপ্নও দেখেছিল। এবং রাত্রে ঘুমের ঘোরে চিৎকার করে উঠেছিল। কিন্তু তারপর ঘুম ভেঙে

—বুকল্যাণ্ডের বই—

প্রকাশিত হোল

শঙ্করীপ্রসাদ বসুর

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি

প্রায় ছশো পৃষ্ঠার এই বিশাল গ্রন্থে বাঙালীর ভাবসাধনার আদি কবি চণ্ডীদাস এবং প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি বিদ্যাপতির কাব্যসাধনার বিস্তারিত পরিচয় মিলবে। চণ্ডীদাস সর্বাঙ্গীণভাবে আধ্যাত্মিক কবি এবং বিদ্যাপতি মধ্যযুগের ভাষাসাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় প্রেমকবি,—এই হোল লেখকের মূল বক্তব্য। এই গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্যঃ চণ্ডীদাস, বিশেষ করে বিদ্যাপতির আলঙ্কারিক চিত্রসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, যে ধরনের রসায়িত বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ বৈষ্ণব কবি তো দূরের কথা, অপর কোনো বাঙালী কবি সম্বন্ধে অদ্যাবধি করা হয়েছে কি না সন্দেহ। ভাষার চমৎকারিত্বে, চিন্তার নবত্বে, এবং বিশ্লেষণের বিচারকসুলভ নির্লিপ্ততায় এই গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজনরূপে পরিগণিত হবার দাবী রাখে। মূল্য ১২·৫০

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের

কালিদাসের কাব্যে ফুল

৫·০০

"কালিদাসের কাব্যে ফুল সম্প্রতি প্রকাশিত এমন একটি গ্রন্থ যা আপন স্বকীয়তায় বাংলা সাহিত্যের আসরে একটি বিশিষ্ট স্থানের দাবী রাখে। ভারতবর্ষের কোন ফুল মহাকবি কালিদাসের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে কেমনভাবে স্থান পেয়েছে এবং তারা মহাকবির মানসলোকের ঐশ্বর্য কেমনভাবে রূপে রসে সঞ্জীবিত করে তুলেছে, তারই একটি অনুপম সার্থক বর্ণনা পাওয়া যায় এই বইটিতে। গ্রন্থকার শুধু মহাকবির ব্যবহৃত ফুলগুলি চয়ন করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি মালার আকারে তাদের গ্রন্থিত করেছেন মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলির বাংলা অনুবাদের সাহায্যে। অনূদিত চরণগুলি সার্থক ও রসোত্তীর্ণ হয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে গ্রন্থকারের এই প্রয়াসকে এক সুপরিচ্ছন্ন নিখুঁত শিল্পকর্মের সঙ্গেই তুলনা করা চলতে পারে......।"

—যুগান্তর

গোপালদাস চৌধুরী ও প্রিয়রঞ্জন সেন সম্পাদিত

প্রবাদ-বচন ৬·০০

"সকল ভাষাতেই প্রবাদ-বচন আছে যা শুনতে ভাল, বলতে সরস। আমাদের বাংলাদেশে প্রাচীন বিখ্যাত কবিদের লেখার অংশ লোকের মুখে মুখে প্রবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে।......প্রবাদ-বচন বাংলা প্রবাদের এক বিশিষ্ট গ্রন্থ।" —আনন্দবাজার

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড

১ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬

গ্রাম—বাণীবিহার ফোন—৩৪-৪০৫৮

সত্তর বছরের অভিজ্ঞতার
ফলেই এমন স্নিগ্ধ অনুপম
—জনসন-এর
শিশু-প্রসাধন

শিশুদের যত্ন নেওয়ায় অনন্যসাধারণ অভিজ্ঞতার ফলে একমাত্র জনসনই সব রকম শিশু-প্রসাধন আপনার কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছে !

শুচিশুভ্র, স্নিগ্ধ জনসন্স বেবী সোপ, কোমল ও সুগন্ধী জনসন্স বেবী পাউডার যা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ট্যাল্কম থেকে তৈরী। শিশুদের সুকুমার ত্বকের যত্নের জন্যে আরো চাই— জনসন্স বেবী ক্রীম, বেবী অয়েল ও বেবী লোশন।

(জনসন এণ্ড জনসন অব ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড)

JWT-JJ 565

সকালে কি দেখেছিল সেটা গুছিয়ে মনে করতে পারেনি। সুতরাং স্বপ্নদর্শনের বৃত্তান্তটা ভালো করে বিশ্লেষণ করতে পারেনি। কিন্তু সত্যিই যে স্বপ্নে ভয়ংকর একটা কিছু দেখেছিল তার প্রমাণ পেয়েছিল সাদা চাদরে অগ্রহায়ণ মাসেও ঘামের হলদে দাগ দেখে আর মধুর মা'র মুখে চিৎকার করে ওঠার গল্প শুনে। কেনারাম সাধুখাঁ সচরাচর এমন স্বপ্ন দেখে না। হঠাৎ কেন দেখল? আর দেখল কেন ঘটনা ঘটে যাবার পরের রাত্রেই? এইসব উত্তরহীন প্রশ্নগুলোই কেনারাম সাধুখাঁর অকাট্য যুক্তির মত মনে হল। সুতরাং কেনারাম সাধুখাঁ স্থিরভাবে একটা কিছু ঘটনার অপেক্ষা করতে লাগল। সে আজই হোক বা কালই। এ-মাসেই হোক বা পরের মাসে।

কিন্তু কি ঘটবে? অনিবার্য ঘটনাটা কি বিভীষণ রূপ নেবে? কেনারাম সাধুখাঁকে ইদানীং এই ভাবনাটাই ভাবিয়ে তুলেছে।

দুপুরের দিকটায় বিক্রি-পত্তর কম। দু' পয়সার নুন, চার পয়সার লজেন্স, দু' আনার ইসবগুলের ভুষি—এইসব ছুটকো খদ্দের। মধু আর দোকানের পাঁচজন কর্মচারী খেতে গেছে। মধু খেয়ে ফিরে এসে দোকানে বসলে কেনারাম সাধুখাঁ বাড়ি যাবে। টাটে বসে কেনাবেচা করছে দোকানের সবচেয়ে অল্পবয়সী কর্মচারী ষষ্ঠীচরণ।

কেনারাম সাধুখাঁ গদিতে বসে অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছিল ষষ্ঠীচরণকে। কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করবার জন্যে উসখুস করছিল। ষষ্ঠীচরণের ব্যস্ত হাত খালি হল। কেনারাম সাধুখাঁ গলা পরিষ্কার করে নিল, "হ্যাঁরে ষষ্ঠী—।"

ষষ্ঠীচরণ ফিরে তাকাল, "আজ্ঞে—"

—সবাই এবার কি বলল রে? কেনারাম সাধুখাঁর স্বরে আগ্রহ ঝরে ঝরে পড়ল।

—কিসের—? ষষ্ঠীচরণের বুঝে উঠতে সামান্য দেরি হল। তারপর বলল, "ও, সকলেই পুরুতেরই দোষ দিল। বললে—।"

ষষ্ঠীচরণ ইঙ্গিতটা ঠিক ধরতে পারেনি। কেনারাম সাধুখাঁ বাধা দিয়ে বলল, "নান্... নাঃ। এই কি রকম হয়েছিল-টয়েছিল বললে পাঁচজনে।"

—ও, অন্য অন্যবারের মত সবাই একই কথা বলল। ষষ্ঠীচরণ এখানেই ছেদ দিতে চাইছিল। থেমে যেতে চাইছিল সম্ভবত।

কেনারাম সাধুখাঁ থামতে দিল না। হড়বড় করে জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, কি বললে—? কি বললে সব?"

যেন উত্তরটা ঠিক শুনতে পাবে না। কেনারাম সাধুখাঁ গদির ওপর দু-হাত এগিয়ে বসল। কেনারাম সাধুখাঁর চোখ দুটো কাচপোকার মত চকচক করছে। মুখের রেখাগুলো নানাভাবে ভেঙে চুরে সমস্ত মুখময় যেন অসংখ্য জিজ্ঞাসার চিহ্ন হয়ে ফুটে ছড়িয়ে পড়েছে।

সবাই ওই একই কথা বললে। ষষ্ঠীচরণ কথাটার খানিকটা পুনরাবৃত্তি করল। তারপর বলল, "সবাই বললে শুধু বাবুইহাটে কেন, এ-দিগরের মধ্যে কেনা-কালী এবারেও ফার্স্ট নম্বর পাবে। কি সাজ-পোশাক। কি ঘটায়—।"

ষষ্ঠীচরণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। একজন খদ্দের এসেছে। ষষ্ঠীচরণকে আর দরকারও নেই। কেনারাম সাধুখাঁ আবার রাস্তার দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। কেনারাম সাধুখাঁর দৃষ্টি প্রসন্ন, স্বচ্ছ।

বাইশ বছর আগে কেনারাম সাধুখাঁ যখন প্রথম কালী প্রতিষ্ঠা করে পুজো আরম্ভ করলে তখন নিজেই জানত না তার প্রতিষ্ঠা করা কালীর শেষে এমন একটা নাম দাঁড়িয়ে যাবে। তার নামের প্রথম অক্ষর দুটো এমনভাবে পুজোটার সঙ্গে জড়িয়ে এমন অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। অবশ্য বাবুইহাটির অসংখ্য কালীপুজোর প্রধান পুজোগুলোর প্রায় প্রত্যেকটির এইরকম একটি না একটি নাম আছে। তার কারণও সম্ভবত বাবুইহাটিতে কালীপুজোর সংখ্যাধিক্য। এবং বাবুইহাটির প্রসিদ্ধিও এতদঞ্চলের মধ্যে ওই কারণেই। আবার বাবুইহাটির সমস্ত খ্যাতির কেন্দ্র যদু বিশ্বাস রোড। যদু বিশ্বাস রোডের দু ধারেই বাবুইহাটির স্বনামখ্যাত বাঘা বাঘা পুজোগুলোর প্যাণ্ডেল। একেবারে ঘাটের ধার থেকে ধরতে গেলে প্রথম ঘাট কালী—মাঝি এসোসিয়েশনের পুজো। তারপর তারক বাঁড়ুজ্জার কালী—তারা কালী। মেছোবাজারের কালী—মেছোকালী। রক্ষাকালী নামটা অবশ্য ধর্মসঙ্গতভাবেই। তারপর

সাম্প্রতিক কালের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস

দূরের মালঞ্চ

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ৪·০০

সুনিপুণ রেখায় রেখায় বর্মা দেশের নরনারী ও নিসর্গের ছবি জীবন্ত রূপে পাঠকের মনের সামনে মেলে ধরে বঙ্গ-সাহিত্যের দিগন্তসীমা বাড়িয়ে দিয়েছেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথাসাহিত্যিক হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। সাম্প্রতিক উপন্যাস 'দূরের মালঞ্চ' তাঁর নতুন দিগন্তের সন্ধান।

মায়ামারীচ

সুনীলকুমার ঘোষ ৩·৫০

...দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় লেখক ক্ষয়িষ্ণু বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের জীবন-চিত্র বর্তমান উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। ...বিভিন্ন চরিত্রকে বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার করে তুলেছেন পাঠককে—এটা লেখকের কৃতিত্বের পরিচায়ক। —দেশ

রাতের ঢেউ

সত্যপ্রিয় ঘোষ ৩·০০

বাস্তবমুখী মানবতার ভূমিকা হিসাবে উল্লেখ্য বর্তমান উপন্যাসে লেখকের বিচক্ষণ বিশ্লেষণে যুগমানস যেভাবে চিহ্নিত এবং পারস্পরিক জিজ্ঞাসা ও উত্তরের মধ্যে প্রত্যেকটি চরিত্রের যন্ত্রণা-নিবিড় পরিক্রমা যে গভীর চিহ্ন রেখে যায়, তা বর্তমান সভ্যতার অন্তর্নিহিত অনুচ্চারিত প্রশ্নেরই অভিব্যক্তি। রুচি-স্নিগ্ধ প্রচ্ছদ।

বহু অভিনন্দিত কাব্যগ্রন্থ

যৌবনবাউল অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ৩·০০
ভালো থেকে মহৎ কবিতা চিনে নেবার জন্য অপরিহার্য। অপূর্ব প্রচ্ছদ।

হাওয়ার সংরাগ শিপ্রা ঘোষ ২·০০

সাম্প্রতিক স্বনির্বাচিত কবিতা হরপ্রসাদ মিত্র ৩·০০

অন্যান্য গল্প-উপন্যাস

সিন্ধুর স্বাদ	প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত	৭·০০
শুভক্ষণ	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৩·০০
পাহাড়ী ঢল	সমরেশ বসু	৩·০০
হেডমাস্টার	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	২·৫০
শীত-গ্রীষ্মের স্মৃতি	দিব্যেন্দু পালিত	২·০০

সুরভি প্রকাশনী : ১ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

গাঁজা-আফিমের দোকানের সামনে—গাঁজা-কালী। হকার্স কর্নারের পাশের কালী—হকার কালী। বাবুইহাটির একেবারে নাম-হীন কালী শুধুই মা-কালী বলতে সম্ভবত একটাই—বাবুইহাটির বেশ্যাপাড়ার কালী। এ-পাড়ায় ঢুকে বাবুইহাটির নামকরণ-করিয়েদের মাথার বুদ্ধিও কেমন যেন গুলিয়ে গেছে। যদিচ এ-পাড়ার পুজোর জাঁক-জমক বাবুইহাটির অনেক কালীকেই ম্লান করার মত। ক্রমে কেনাকালী নামটা ছড়িয়ে গেছে। শুনতে শুনতে কেনারাম সাধুখাঁর নামটা আস্তে আস্তে ভালই লাগতে শুরু করেছে। কেনারাম সাধুখাঁর মনে হয়েছে—এইটাই আমার কীর্তি। এই কীর্তির জন্যেই আমি মরার পরও বেঁচে থাকব। যেমন যদু বিশ্বাস কবে মরে গেছে, কিন্তু যদু বিশ্বাস রোড আছে। আমার মত সামান্য ব্যবসাদারের নামে কেউ একটি রাস্তা বা অন্য কিছুই করে দেবে না। আমি কালীপুজোই করব। এ একরকম ভালই হল। মা'কে ডাকাও হবে আবার মরার পর বেঁচে থাকাও হবে। অনেকটা রামপ্রসাদী গানের মত। গান গাওয়াও হবে আবার মা'র নাম করাও হবে। যার কেউ নেই, যে অসহায় তার ভগবান আছেন। মানুষ নিজের কীর্তির মধ্যে দিয়ে বড় হয়। মহৎ হয়। আমার কীর্তিকে বড় করতে হবে। সুতরাং নিজের ঢাক আমাকে নিজেকেই পেটাতে হবে। ঘটা-পটা সব করতে হবে। কিছু বাকী রাখলে চলবে না।

কেনারাম সাধুখাঁ জানে, ছেলেরা বোঝে না। এতটা পছন্দ করে না। পুজো হচ্ছে হোক। কিন্তু এত ঘটা কেন? অর্থাৎ এত খরচ কেন? কেনারাম সাধুখাঁ ঠিক করছে মরার আগে উইলে পুজোটার একটা ব্যবস্থা করে যাবে। এত ঘটা না করুক ছেলেরা, যাতে পুজোটা বন্ধ করতে না পারে। আর এইভাবেই কেনাকালীর পুজোর মধ্যে কেনারাম সাধুখাঁ মরার পরও বেঁচে থাকবে।

—কি হবে? কি হতে পারে!

কেনারাম সাধুখাঁ যেন পিওনের হাত থেকে টেলিগ্রামখানা নিয়ে আশঙ্কায় কাঁপা হাতে দাঁড়িয়ে।

—কি হবে? দুর্ভিক্ষ? মহামারী? রাষ্ট্রবিপ্লব?

বাবুইহাটির সবাই অঘটনটার কথা ভুলে গেছে। কিন্তু কেনারাম সাধুখাঁ যেন শাণিত উদ্যত খড়্গটা দেখতে পাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছে সমস্ত কাজের ফাঁকে ফাঁকে—অহরহই। শুধু বুঝে উঠতে পারছে না—খড়্গটা নেমে আসবে কোনদিক থেকে।

কেনারাম সাধুখাঁর কানে খবরটা এল মধুর মারফতে। ষষ্ঠীচরণ দোকানে অনুপস্থিত। গতকাল থেকে তার জ্বর। ষষ্ঠীচরণ জ্বরের ঘোরে বিকারে বিড়বিড় করে কাতরাতে কাতরাতে বারবার একটি কথাই বলছে—জ্বলে যাচ্ছে। পুড়ে যাচ্ছে। জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে সব।

কেনারাম সাধুখাঁ সব শুনে গুম হয়ে গেল।

এই প্রদেশের প্রায় ঘাড়ের ওপর সীমান্ত নিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে একটা গোলমাল প্রায় ঘোঁট পাকিয়ে উঠেছে। প্রায় প্রত্যহের সংবাদপত্রে এইটাই বর্তমানে প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের খবর।

কেনারাম সাধুখাঁ প্রায় দৃঢ়স্বরেই ঘোষণা করে, যুদ্ধটা বাঁধলই। একেবারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে দেশটা।

খবরের কাগজ দোকানে একটা আসে। কিন্তু কেনারাম সাধুখাঁর কাজের চাপে আর খবরের কাগজটা খুঁটিয়ে পড়া হয়ে ওঠে না। প্রথম পৃষ্ঠার হেডিংগুলোর ওপর কোনরকমে একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের স্তম্ভটা খুঁটিয়ে পড়ে। কিন্তু খবরটা চোখে পড়ল একটা ঠোঙ্গার গায়—।

—দেখি দেখি।

কেনারাম সাধুখাঁ মধুর হাত থেকে ঠোঙগাটা প্রায় ছিনিয়ে নিল। প্লেগ্ সন্দেহক্রমে চারজন হাসপাতালে প্রেরিত—একটু বড় হরফে শুধু হেডিংটাই আছে। বাকী খবরের সবটাই চাপা পড়েছে সিনেমার বিজ্ঞানের তলায়। কাগজটা এক বছর কি দু' বছরের পুরানো হতে পারে। খবরটা কলকাতা, কামাস্কাট্কা কি কোপেন-হেগেনের হতে পারে। কিন্তু সংক্রামক রোগের সরকারী সতর্কীকরণের বিজ্ঞাপনটা রোজই কাগজে দিচ্ছে। কেনারাম সাধুখাঁ সংশয় মুক্ত হল। যেন দেখতেই পেল—ছোট মেয়ের বই-এ পড়া সেই বাঁশীওয়ালাকে। যে বাঁশী বাজাতে বাজাতে চলেছে আগে আগে আর তার পেছনে পেছনে আসছে বন্যার মত মৃত্যুর দূতেরা। লাখে লাখে কোটিতে কোটিতে ইঁদুর। তাদের ছুঁচলো মুখে মুখে কোটিতে কোটিতে জীবাণু। আসছে প্লাবনের মত। স্রোতের মত। কেনারাম সাধুখাঁ স্বকর্ণে যেন সেই বাঁশীর সুর শুনতে পেল। যে-আসছে সে পুরুষ। তার হাতে দণ্ড। 'তিনি' আসবেন সবশেষে। সব শেষ হলে। মহাশ্মশানে তখন 'তাঁর' তাথৈ নাচ শুরু হবে।

কেনারাম সাধুখাঁ কি করবে? সতর্ক হবে? বেড়াল পুষবে? ইঁদুর মারা কল পাতবে ঘরে? র‍্যাটোকিল্ ছড়াবে? পাগল! বালির বস্তা দিয়ে কি মহাপ্লাবন রোধ করা যায়!

কাজটা জরুরী। কেনারাম সাধুখাঁকে ক'দিনের জন্য দক্ষিণে যেতে হল। দক্ষিণের খবরটা নানাভাবেই পাওয়া যাচ্ছিল। বৃষ্টির অভাবে আউশ চাষ মাঠেই মার খেয়েছে। এখন পর্যন্ত আমনেরও ভরসা পাওয়া যাচ্ছে না তেমন কিছু। শহর-গঞ্জের দিকে ভিক্ষের ঝুলি হাতে লোক বেড়েছে। দেয়ালে

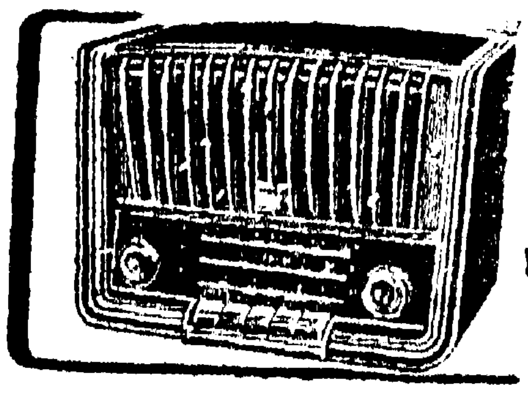
এইচ জি. ই. সি. (সাবা) পশ্চিম জার্মানী, আর

মনি রেডিও প্রোডাক্টস্
১৩৭বি, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

জনপ্রিয় মিষ্টান্ন পরিবেশক
গাঙ্গুরাম এণ্ড সন্স

৩৫—৩৩৫১
১৫১সি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

ডাঃ কার্ত্তিক বসুর
টাইকোসোড়া | নানালা
অম্ল, অজীর্ণ ও ডিস্পেপসিয়ায় | ব্যথা ও বেদনায়
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ—কলিকাতা ৯

দেয়ালে হাতে লেখা পোস্টার দেখা যাচ্ছে। ভুখা মিছিলের ছবি দেখা যাচ্ছে কাগজে।

কেনারাম সাধুখাঁ ফিরে এল। পাঁচজনের বৈঠকে প্রায় নিশ্চিন্ত স্বরে বলল, দক্ষিণ দোরটা খোলাই রয়েছে দেখে এলাম।

শরৎ এসে পড়ল। আসল বর্ষাটা যেন শুরু হল শরতের মাঝামাঝি। আকাশ ফুটো করে ধারা নামল। সাতদিন প্রায় নিরবচ্ছিন্ন বর্ষণ। কেনারাম সাধুখাঁর বাড়ির সামনের দেবদারু গাছটার মত সমস্ত দেশটা যেন উপায়হীন হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে ভিজল। কেনারাম সাধুখাঁর গঙ্গাস্নানটা প্রত্যহের অভ্যাস। কিন্তু বৃষ্টির জন্য গঙ্গাস্নানটা ক'দিন ধরেই বন্ধ। কেনারাম সাধুখাঁর নিজেরই অস্বস্তির সীমা নেই। দিনগুলো ফাঁকা ফাঁকা লাগে। শরীরটাও জুত লাগে না। তাছাড়া বাড়ি থেকে বেরুনোও হচ্ছে না। রাস্তাঘাট, নালা-নর্দমা, পুকুর-ডোবা সব একাকার। মধুই দোকান দেখাশোনা করছে। কেনারাম সাধুখাঁ আর থাকতে পারল না। পাঁচদিনের দিন মাথায় ছাতা দিয়ে গঙ্গাস্নান করতে বেরিয়ে পড়ল। গঙ্গার ঘাটে এসে কেনারাম সাধুখাঁ অবাক হয়ে গেল। ফুলে ফেঁপে এইমাত্র ক'দিনে গঙ্গার সমস্ত চেহারাটাই বদলে গেছে। লাল জল। কুটিল স্রোত। কচুরিপানার দঙ্গল চলেছে তরতর করে। এখন আর জোয়ার-ভাঁটা নেই গঙ্গায়। সবকিছু শুধু লুটপাট করে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রে। কেনারাম সাধুখাঁ তীক্ষ্ণ-চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখল। মনে করতে চেষ্টা করল অন্যান্যবারের চেয়ে ঘাটের ক'টা সিঁড়ি এবার বেশী ডুবেছে। কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। কেনারাম সাধুখাঁ খানিকটা দূরে সেই বিখ্যাত স্তম্ভটার দিকে তাকাল। নবাবী আমলে স্তম্ভটা তৈরী। স্তম্ভটা সবটা ডোবার অর্থ মুর্শিদাবাদ বন্যার কবলে। স্তম্ভটা সবটা ডুবতে এখনও ফুটখানেক বাকী।

কেনারাম সাধুখাঁ বাড়ি এসে পাঁজি খুলে দেখে প্রায় স্থির নিশ্চয় হল। ক'দিন পরেই দুর্গাপুজো। দেবীর আগমন এবার নৌকায়। কেনারাম সাধুখাঁর ঠোঁটে বাঁধা হাসিটা ঝুলে রইল, এইবার—।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হল না।

সীমান্তের গোলমালটা একেবারে মিটে গেল না। কিন্তু অন্যান্য টাট্‌কা খবরের চাপে আপাতত চাপা পড়ে রইল।

সংক্রামক রোগে মৃত্যুর হারটা পরিসংখ্যা দপ্তরে তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করতে পারল না।

খাদ্যবস্তু এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়তে বাড়তে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস ওঠে এমন জায়গায় পেঁৗছে স্থির হয়ে রইল।

প্রায় প্রতি বছরের একই ঘটনার পুনরাবৃত্তির মত বন্যাটা ক'টা জেলার নীচু অঞ্চলের ওপর দিয়ে বয়ে বয়ে গিয়েই ক্ষান্ত হল।

আর অপেক্ষা করা যুক্তিসংগত নয় মনে করে কেনারাম সাধুখাঁ এতদিনকার সাবেক স্থানীয় কুমোরকে বাদ দিয়ে কেষ্টনগরের এক পালমশাইকে চিঠি লিখতে বসল।

কেষ্টনগরের পালমশাইয়ের হাতের কাজ দেখে কেনারাম সাধুখাঁ খুশী। গতবছরের দুর্নামটুকু সুদে-আসলে পূরণ করতে কেনারাম সাধুখাঁ এবার বদ্ধপরিকর। দৈর্ঘ্যে আরও দেড় হাত উঁচু করেছে প্রতিমা। ডাকের সাজের গহনাও এবার পরিমাণে বেশী। প্রতিমা ছাড়াও আশেপাশে যে-সমস্ত পিশাচ-পিশাচী, ভূত-প্রেত, শৃগাল প্রভৃতি থাকে এবার তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছে। মেজ ছেলে কেতু ঠিক করেছে, এবার এই সমস্ত পিশাচ-শৃগাল ইত্যাদির নকল চোখের ভেতর ছোট বাল্ব জেলে আসল চোখ করে ফেলবে। আর উড়ে আসছে এইরকম ভঙ্গিতে এমন একটা গৃধিনী করবে যার পাখা দুটো ইলেকট্রিকের সাহায্যে নড়বে। কেনারাম সাধুখাঁ কেতুকে এসব করতে বাধা দেয়নি। বরং কেতু যাতে উৎসাহ বোধ করে, কথায় বার্তায় তার যে সম্মতি আছে এমন ইঙ্গিত দিয়েছে। কিছুই যেন বাদ না পড়ে। কিছু না-থাকা যেন কারো ভাল-না-লাগার কারণ হয়ে উঠতে না পারে।

দুতলায়ে দো-মেটের কাজ চলেছে। রাস্তায় লোকজনের চলাচল কম। কেনারাম সাধুখাঁ দোকানে বসে পালমশাইয়ের কাজ দেখছিল। দুটো ছোট ছেলেও অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। হাতে বই। দেখলেই বোঝা যায়, ক্লাস্ টু কি থ্রি-তে পড়ে। স্কুল পালিয়ে রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে থমকে গেছে। দেখছে। ঘাড় উঁচু করে বিস্ময়-বিহ্বল চোখে হাঁ করে দেখছে। ওদের ওই হাঁ-করে দাঁড়িয়ে থাকাটা কেনারাম সাধুখাঁর ভাল লাগল। ছেলে দুটো নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি শুরু করল। কেনারাম সাধুখাঁর হঠাৎ ভারি কৌতূহল হল। কি বলছে ছেলে দুটো? গদি থেকে নেমে আস্তে আস্তে দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। একটু শুনেই বুঝল একটা তর্কের শেষ অংশটা শুনছে।

—দেখিস জিভটা মাটিরই হবে।

—ভাগ। অত বড় মাটির জিভ কখন থাকে। ভেঙে যাবে না? দেখিস পিচবোর্ড কেটে লাল রং করে জিভ করবে। জিজ্ঞেস করে দেখ না?

কেনারাম সাধুখাঁ চোখ ছোট ছোট করে হাসি গিলল। একটুখানি নিস্তব্ধ। আবার শুরু হল। কেনারাম সাধুখাঁ কান পাতল।

—দেখিস্ পোড়াকালী এবারও ফাস্ট হবে।

কেনারাম সাধুখাঁ শুনল। সুস্পষ্টভাবেই শুনল। থমকে গেল। তারপর একটা ক্ষ্যাপা শেয়ালের মত খ্যাঁক্‌খ্যাঁক্ করতে করতে দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল, "অ্যাই ছোঁড়ারা ইস্কুল নেই সব—। পালানো হয়েছে। চল সব ধরে নিয়ে যাই হেড-মাস্টারের কাছে।"

ছেলে দুটো উধর্বশ্বাসে পালাল দু-ধারে। পালমশাই একটু অবাক হয়ে হাতের কাজ থামিয়ে ফেলেছিল। আবার মন দিল কাজে।

গভীর দুঃখ এবং হতাশার সঙ্গে কেনারাম সাধুখাঁর মনে হল, অনিবার্য অঘটনটা অনেক আগেই ঘটে গেছে। ঘটে গেছে গত বছর দুর্ঘটনার দিনটিতেই। কেনা কালীর নতুন নামকরণ সেই দিনটিতেই হয়ে গেছে। এবং অশ্বত্থের চারার শিকড়ের মত নামটা ছড়িয়ে গেছে সমস্ত অঞ্চলটা জুড়ে। বাবুইহাটির নির্মম মানুষেরা তার অবিস্মরণীয় হয়ে থাকার একমাত্র রাস্তাটাও বন্ধ করে দিয়েছে।

ডাঃ শ্রীশীতলচন্দ্র মিত্রের

সরল হোমিওপ্যাথিক গৃহ-চিকিৎসা

নূতন শিক্ষার্থী ও গৃহচিকিৎসার পক্ষে উপযুক্ত। প্রত্যেক রোগের বিবরণ ও চিকিৎসা সহজভাবে লিখিত হইয়াছে। সাধারণ স্ত্রীলোকও বুঝিতে পারিবেন। মূল্য মাত্র ৪ টাকা।

প্রকাশক—ন্যাস এণ্ড কোং
আমেরিকান হোমিওপ্যাথিক ফার্মেসী
১১২।এ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার,
কলিকাতা—৪

(বি-ও ৪৫৫০)

শঙ্খ মার্কাই
যশোর কুম্ব ইণ্ডাষ্ট্রী কোং
কলিকাতা-৯

কে. হোড়ের
কণক
পাউডার

আপনাকে লাবণ্যে উজ্জ্বল ক'রে রাখবে

পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম

আপনার স্বাভাবিক মুখশ্রী আরো সমুজ্জ্বল ক'রে তুলুন…পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম ব্যবহার ক'রে আপনার মুখখানি নির্মল, কমনীয় ও মসৃণ রাখুন। এই ক্রীম ত্বকের গভীরে প্রবেশ ক'রে সমস্ত ময়লা দূর ক'রে দেয়, ত্বকে কোন দাগ হতে দেয়না এবং ত্বক লাবণ্যোজ্জ্বল রাখে! রোজ রাত্রে পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম আপনার মুখে মাখুন — দেখবেন, কত অল্পদিনে আপনি অম্লান লাবণ্যের অধিকারিণী হয়েছেন!

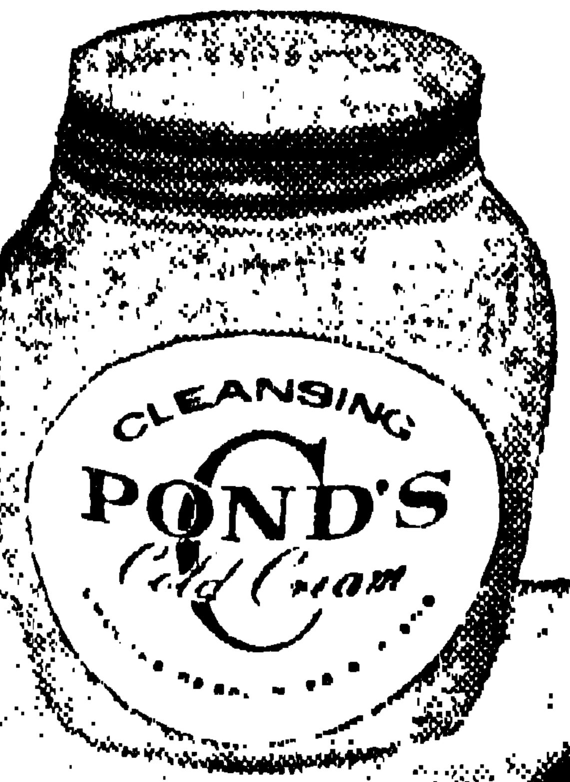

সারা পৃথিবীর সুন্দরী রমণীদের মনের মতো

চীজব্রো-পণ্ডস ইন্‌ক (সীমিত দায়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

LIBRARY Cooch Behar

৪২

মোট কথা, ভালোই হলো "ইরাণের রানী"। দু' রাত্রি অভিনয়ের পর তৃতীয় দিনটিতে ছুটি মিলল। তার মানে, বড়দিনের অভিনয় আর এই অভিনয় নিয়ে ক্রমাগত দশদিন—দিবারাত্র পরিশ্রমের পর—মিলল একটু অবসর। বড়দিনের দশদিনের অভিনয়, 'ইরানের রানী'র উদ্বোধন তার ওপরে আরও এক পরিশ্রমের ব্যাপার হয়েছিল সে সময়। নাটিকার প্রথম মুক্তির ব্যবস্থা। এ সম্বন্ধে অনেক বলার অবসর আছে, পরে বলব। যাই হোক, এই অবসরের সুযোগে ইটালীতে গিয়ে প্রথম সন্তান—নবজাতিকা ঐ কন্যাটির মুখদর্শন করে এলাম। পরের দিন ৪ঠা জানুয়ারী, অতো বড়ো অ্যাকজিবিশন হচ্ছে ইডেন গার্ডেনে—বড়দিনে যেতে পারিনি—এইদিন গেলাম। গেলাম আমরা চারজন, আমি, ইন্দু, প্রবোধবাবু আর গণদেববাবু। কোনোখানে যাতায়াত করতে গেলে এই চারজনই হলাম আমরা—সংগী। হেমেন্দ্রবাবু তখন মোটর করেছেন, সেই গাড়িতে করে আশেপাশের শহর বা শহরতলীতে রাসের মেলা দেখতে গেছি। গণদেববাবু ভবানীপুরেরই লোক—আমার থেকে তিনি বয়সে বড়ো হলেও, এমন হৃদ্যতা জন্মে গিয়েছিল যে, 'গণদেব' বলে ডাকতাম। আবার আদর করে নাম বানিয়ে নিয়ে ডাকতাম—'গাম্ভীব' বলে। তা প্রায় বারো বছরের বড়ো ছিল সে আমার থেকে। তিনকড়িদাও আমাদের থেকে বয়েসে যথেষ্ট বড়ো, আদর করে আমরা "দাদা" থেকে ডাকতাম "দদ্র" বলে। গণদেব—বয়স হলে হবে কী—শিশু স্বভাবের ছিল—ইভনিংক্লাবের কৃতী অভিনেতা—আর্ট থিয়েটারের শেয়ারহোল্ডার, 'এমারল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস ছিল'—তাদের। ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্সের, সব তখন ছাপা হতো ঐ এমারেল্ডে। গণদেব ছিল হরিদাসবাবুর ভগ্নীপতি। ওর বড়-ভাই সুরদেববাবু—আমাদের কী আদরই না করতেন! ওঁদের বাড়ি ছিল নন্দকুমার চৌধুরী সেকেন্ড লেনে, সেটা এখন হয়েছে, ডি-এল-রায় স্ট্রীট। কতো গেছি সে বাড়িতে! আমার অভিনয় খুব ভালো লাগতো তাঁদের!

যাই হোক, একজিবিশন ত ঘুরে-ঘুরে দেখে এলাম। শিশিরবাবু এই একজিবিশনেই অভিনয় করছেন—ডি-এল-রায়ের "সীতা"। খুব বড়ো একজিবিশন, আলোকমালায় চমৎকার সাজানো। দেখতে-দেখতেই এগারো সাড়ে এগারোটা বেজে গেল—সেদিন অবশ্য অভিনয় হয়েছিল কিনা জানি না—অভিনয় দেখিনি। বড়দিনের আগে থেকে প্রায় সমস্ত মাসটা পর্যন্ত ছিল এগজিবিশনটা। একজিবিশনের যে আমোদ-প্রমোদ-এর উপ-সমিতি ছিল, তাঁর কর্মকর্তারা ভাবছিলেন, যাত্রা বা থিয়েটার বা কী ধরনের প্রমোদ-সূচীর বন্দোবস্ত করা যায়। বড়দিনের সময় পাবলিক থিয়েটার নিজেদের কাজেই ব্যস্ত। অথচ, শিশিরবাবুর কোন দল তখন না থাকলেও, তাঁরা গিয়ে শিশির-বাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করলেন, অভিনয় করা যায় কিনা। বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে কিছু টাকা তুলে শিশিরবাবু একটি দল গঠন করে, অভিনয় করেছিলেন। কর্ণার্জুনের অসামান্য সাফল্যের পর—নাটমঞ্চে একটা পৌরাণিক যুগই এসে গেছে বলা চলে। সম্ভবত যুগধারার গতির দিকে লক্ষ্য করে শিশিরবাবুও পৌরাণিক বই ধরলেন তখন। এবং সেটি হচ্ছে, দ্বিজেন্দ্রলালের—সীতা। চারদিন অভিনয় করার কথা ছিল, কিন্তু উনি প্রায় দশ-বারো দিন অভিনয় করেছিলেন সবার আগ্রহাতিশয্যে, এবং করেছিলেন ঐ 'সীতা'ই। শিশিরবাবু যেমন শৌখীন দল গঠন করে একজিবিশনে অভিনয় করলেন, ঐরকম আরও অনেক শখের দল ছিল, যারা পাব্লিক থিয়েটার খোলবার জন্য মাঝে মাঝে ঝুঁকত, কিন্তু, 'মঞ্চ' নেই, স্থানাভাব, তাই আর তাদের আসরে নামা শেষপর্যন্ত হতো

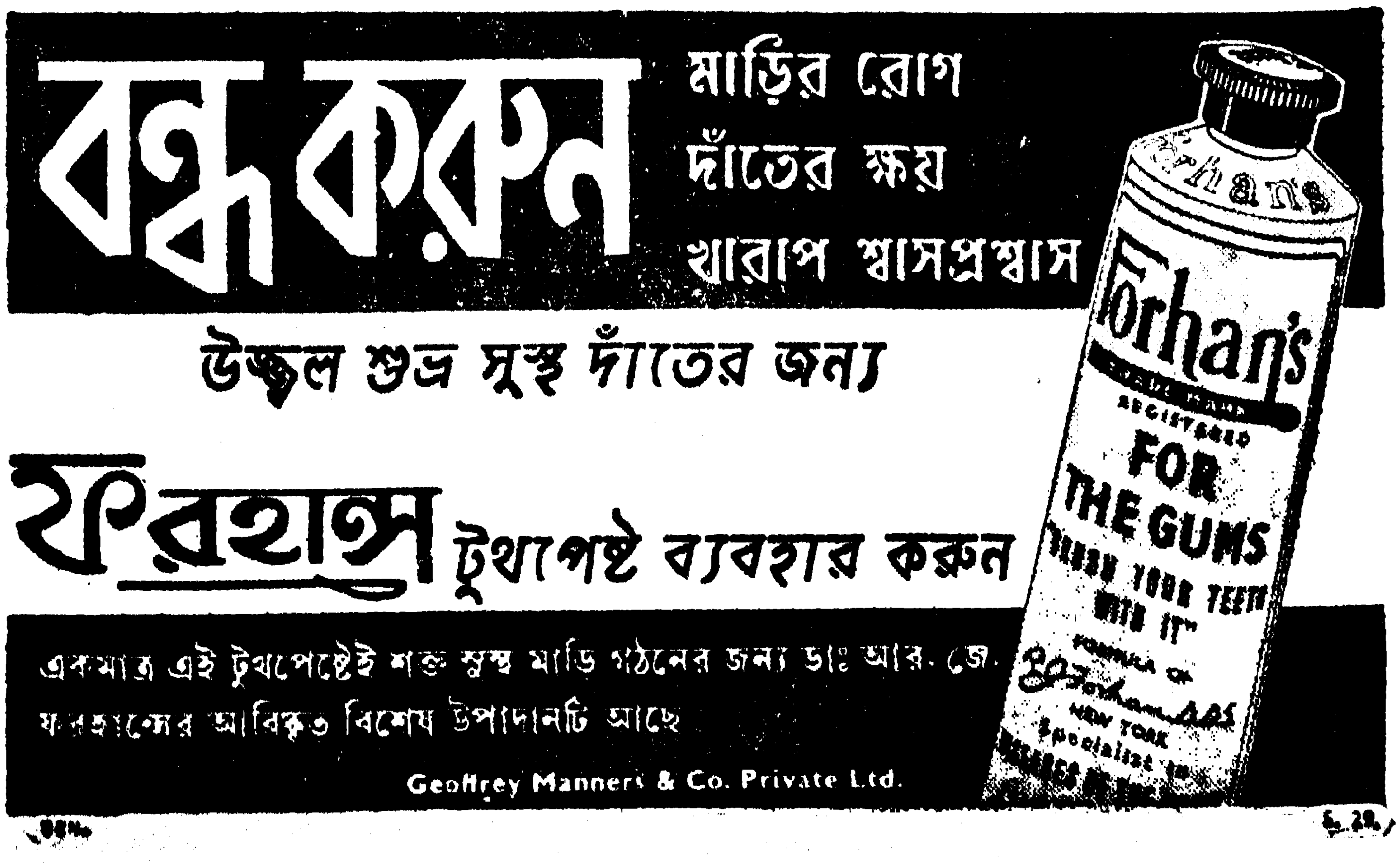

না। এইরকম একটি দল ছিল 'মডার্ন থিয়েটার্স', এ'দের কথা পরে বলব, এ'রা নবীন সেনের 'রৈবতক' করেছিলেন।

শিশিরবাবু ম্যাডানদের থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছিলেন ১৯২২-এর গোড়ার দিকে। সেই থেকে বসেছিলেন এই প্রায় পৌনে দু'বছর। এর মধ্যে প্রকাশ্য কোনো রংগালয়ে আর অভিনয় করেন নি, যদিচ আর্ট থিয়েটারে যোগদান করার ও'র কথা ছিল, এবং শুনেছি আসবার আগ্রহও ছিল প্রচুর। কেন যে শেষ পর্যন্ত এলেন না, তার কারণ জানি না, কেউ তা ব্যক্তও করেন নি আমার কাছে। তবে অনুমান করেছিলাম ব্যাপারটা। দু-পক্ষই আগ্রহশীল ছিল, কিন্তু কথা হচ্ছে, ওঁকে আনা হবে কোন 'পদ'-এ? কারণ, তিনকড়িদা বয়সে প্রবীণ, এবং প্রখ্যাত শৌখীন অভিনেতা, তিনি এখানে রয়েছেন প্রবীণ অভিনেতা হিসাবে। অপরেশবাবু রয়েছেন, ম্যানেজার। সাধারণ অভিনেতা হিসাবে উনি আসতে পারবেন না, আসা উচিত নয়। একমাত্র পদ ছিল

নাট্যাচার্যের পদ। কিন্তু সেটাও ত সম্ভব ছিল না। অপরেশবাবু রয়েছেন, তার ওপরে আরেকটা কথা এই যে, এক তাঁর শিষ্য তুলসী ছাড়া, নতুন দলের আর সব অভিনেতা এটা বিনা দ্বিধায় মেনে নেবেন কেন? এই অনুমানটা কেন যে করলাম, তার একটা কারণ আছে। এইরকম একটা ঝড় পরে উঠেছিল, সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমি ঐ অনুমানটা করতে পেরেছিলাম। কিন্তু, সেকথা বলব যথাসময়ে। আপাতত এটুকু লক্ষ্য করলাম, মিলতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু না মিলতে পেরে যে কেউ বিশেষ দুঃখিত হয়েছিল, এমন নয়। টাকা বেশী দেবার প্রশ্ন নয়, আসলে, প্রশ্নটা উঠেছিল উপযুক্ত 'পদ' বা সম্ভ্রম নিয়ে।

৫ই জানুয়ারী, শনিবার কর্ণার্জুনের ৬০ রাত্রি—ডায়মণ্ড জুবিলী উৎসবের অভিনয় হলো। সেই যে সাজানো হয়েছিল স্টার বড়দিনের সময়ে, সেই সাজসজ্জা, শুধু ফুলসজ্জাগুলি বদলে বদলে, তখনো রয়ে গেছে। 'চিত্রে কর্ণার্জুন' আবার উপহার দেওয়া হলো দর্শকদের।

ওদিকে, 'ইরাণের রানী'র সমালোচনা বেরুতে লাগল পরের সপ্তাহ অর্থাৎ ৪।৫ তারিখ থেকেই। এবং এই যে শুরু, হলো, এ চলল সেই এপ্রিল মাস পর্যন্ত। সার্ভেণ্ট, নায়ক, অমৃতবাজার, বৈকালী এবং আরও সব কাগজ প্রভৃত সুখ্যাতি করলেন। যে-সব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কখনো থিয়েটারে আসতেন না, তাঁরাও আকৃষ্ট হতে লাগলেন থিয়েটারের প্রতি। আমাদের ছবি তুলিয়ে তা ব্লক করে রাখতাম, হ্যাণ্ডবিলে ছাপা হতো। পত্র-পত্রিকাগুলি সেই সব ছবিতে আগ্রহশীল হয়ে উঠলেন, ছাপাতেও লাগলেন সেসব। থিয়েটারের সামনে নামলে, বা ট্রামে-বাসে গেলে, লোকে চেয়ে-চেয়ে দেখে, গুঞ্জন ওঠে, ফিসফাস কথা বলাবলি করে। বুঝলাম, আর বোধহয় আমি অখ্যাত নই।

এই সমস্ত সুখ্যাতির ভিতরে—আনন্দবাজারে—তারিখ হচ্ছে ১৫ই মার্চ, ১৯২৪—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—অর্থাৎ আমাদের রাখালদা—'বাঙলার রঙ্গালয়' বলে দেড় কলমের এক প্রবন্ধ লিখে নিদারুণ সমালোচনা করলেন 'ইরাণের রানী'র। অন্য কোনো-কিছু বিশেষ নয়, দৃশ্যাবলী ও পোশাক নিয়েই আক্রমণটা বেশী,, কতগুলি ঐতিহাসিক হয়েছে, কতগুলি হয়নি, এই ছিল প্রধান অভিযোগ। অথচ 'ইরাণের রানী' আমরা বিজ্ঞাপিত করেছিলাম রোমান্টিক নাটক বলে, ঐতিহাসিক নাটক বলে নয়। লক্ষ্য করা গেল, অপরেশবাবুর ওপরেই কটাক্ষটা যেন বেশী। লিখেছেন—"নাটককার অপরেশবাবুর ইচ্ছা, তিনি প্রাচীন পারস্য দেশের একটি চিত্র দেখান, কারণ "শিপিয়ে" ও "পেরো" রচিত প্রাচীন পারসিক শিল্পের ইতিহাস নামক বিখ্যাত গ্রন্থের একখানি ইংরাজী অনুবাদ দুই-চারি দিনের জন্য তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল।"

প্রসংগত, বলা প্রয়োজন, রাখালদা অপরেশবাবুকে বইখানি পড়বার জন্য দিয়েছিলেন। কিন্তু ওটা পড়েই যে নাটক লেখবার অভিলাষ হয়েছিল, এমনও বোধহয় না, এটি ছিল ডাচেস অফ প্যাডুয়া'র নাট্যরূপান্তর।

রাখালদা তারপরে লিখলেন—সুতরাং অভিনয়কালে ইরাণের রানী অর্ধপক্ক খিচুড়িতে পরিণত হইয়াছিল।

পরে আরও লিখছেন—'ফরাসী গ্রন্থকারের বইয়ের ছবি দেখিয়া আর্ট থিয়েটারের পটুয়ারা ভাল ভাল দৃশ্যপট আঁকিয়াছেন, সুন্দর সাজপোষাক তৈয়ারী হইয়াছে, নর্তকীরা ভাল নাচিয়াছে ও গাহিয়াছে, কিন্তু নাটকটা তবু কবন্ধ রহিয়া গিয়াছে, কারণ ইহাতে মুণ্ডের অভাব।' তবে অভিনয়ের সুখ্যাতি করেছেন। শেষ প্যারায় লিখছেন—"অভিনয় হিসাবে আর্ট থিয়েটার কোম্পানীর কোনো দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু নাট্যকার ও প্রডিউসারের অজীর্ণ রোগে ইরাণের রাণী বইখানির অভিনয় সর্বাংগসুন্দর হইতে পারে নাই।"

এর আবার উত্তরে, ২৮শে এপ্রিল '২৪ সালে "বৈকালী"তে "রাখালের কোদাল" বলে বড়ো প্রবন্ধ বেরুলো, তাতে নানা রকম বক্রোক্তি। আসল কথা হচ্ছে, রাখালদা "মধুজমর্দনদের" বলে একটি নাটক লিখেছিলেন, (ওর আগে তিনি 'মহীপাল' ও 'দেবী চন্দ্রগুপ্ত' নামে দুটো নাটক লিখেছিলেন বলে জানতাম) সেটি নিয়ে এসেছিলেন আর্ট থিয়েটারে। হরিদাসবাবুকে খুব শ্রদ্ধা করতেন রাখালদা, 'দাদা' বলে ডাকতেন। নাটকটি হরিদাসবাবুর কাছে আনতে উনি বললেন—ওনিয়ে আমি ত ঘাটাঘাটি করি না, অপরেশবাবুকে গিয়ে বলো।

আবার অপরেশবাবু কখনো অপর নাট্যকারদের বই ছুঁতেন না, বিশেষ করে নতুন

ECHO-4A-50 BG এরাসমিক কোং লিঃ লণ্ডনের পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত।

নাট্যকারদের। তার কারণও আছে। থিয়েটারের জন্য যাঁরা নাটক লিখতেন, তাঁরা সচরাচর অন্য লোকের লেখা নাটক স্পর্শ করতেন না, যদি চৌর্যাপবাদ আসে! তবু কলঙ্ক ছিল, কোথাও কিছু মিল দেখলেই লোকে বলবে, চুরি করেছে। এ অপবাদ শুধু ওকে কেন, স্বয়ং গিরিশচন্দ্রকেও একদিন সহ্য করতে হয়েছে বলে শুনেছি। অপরেশবাবুর খুব বন্ধু ছিলেন নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, সেইজন্য বন্ধুর একটি নাটক প্রযোজনা করেছিলেন অপরেশবাবু, এ ছাড়া, অন্য কারুর নাটক তিনি ধরেননি বললেই চলে। তিনি রাখালদার নাটক যথারীতি ছুঁলেন না, বললেন—নাটক ঠিক করেন ত ডাইরেক্টররা! ওরা ত সব আপনার বন্ধুও। ওঁদের বলুন।

রাখালদা মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। তারই প্রতিক্রিয়া, সম্ভবত ঐ চিঠি। আর তারও প্রতিক্রিয়ায় ঐ "বৈকালী"র "রাখালের কোদাল।" তাতে আরও লিখলেন—"নাটকের সমালোচনা ত খুব লিখচো, কিন্তু লোকে যে ঐ দনুজমর্দন আর মহীপালের কথা নিয়ে কানাকানি করে হাসছে! আবার প্রবন্ধের মধ্যে বিজ্ঞাপন দেওয়াও আছে। জ্যেঠা আমার সদরালা ছিলেন, বাবার নাম আমার অমুক ছিল; বলিহারী বুদ্ধি! বাহবা রাখালবাবু! কে বলে তুমি আকার সদৃশ্য প্রাজ্ঞ, কে বলে তোমার বুদ্ধি নাই?"

এইরকম বাদ-প্রতিবাদ তখনকার কাগজগুলিতে আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল না, এরকম প্রায়ই দেখা যেতো!

যাই হোক, শনি-রবিবারে 'কর্ণার্জুন' হচ্ছে, বুধবারে ইরাণের রানী। এই সময় স্টারে সিনেমা দেখানোরও ব্যবস্থা হলো। বিশেষত 'তাজমহল থিয়েটারের' 'চন্দ্রনাথ' তখন তৈরী হয়ে গেছে, 'রসা থিয়েটারে' দেখানোও হয়ে গেছে, সেই 'চন্দ্রনাথ' আবার স্টারে দেখানোর ব্যবস্থা করা হলো। বৃহস্পতি-শুক্রবার—চন্দ্রনাথ, সোম-মঙ্গল—বিলাতী ছবি, বেশীর ভাগই সিরিয়াল ছবি, পার্ট বাই পার্ট দেখানো হতো। অনাদিনাথ বসুর সঙ্গে মনমোহনের যে সম্বন্ধ ছিল, স্টারের সঙ্গেও ছিল। চন্দ্রশেখরের সেই গঙ্গাবক্ষে প্রতাপ-শৈবলিনী, সে ছবি স্টারেরও ছিল। সেই সম্বন্ধের সূত্র ধরে প্রবোধবাবুর সঙ্গে মিলে আবার স্টারে ছবি দেখাতে শুরু করলেন অনাদিবাবু। মেসিন-টেশন সব তাঁরই—ওসব ব্যাপারে লোকজনও তাঁর। লাভ লোকসানের দিকে তাঁর ঝোঁক নেই, দেশী ছবির প্রচার হোক, এটাই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। 'চন্দ্রনাথ'-এর পর 'মানভঞ্জন' দেখানো হলো। কিছুদিন যাবৎ এভাবেই চলছিল, যতদিন না কর্তৃপক্ষ আবার বৃহস্পতিবারেও নাটক দেখানো শুরু করলেন। সিনেমার বেলায়, সামনের সোফা সব ঢেকে রেখে বাকী সব ঢালাও টিকিট—আট আনা করে।

ওদিকে, অ্যাক্‌জিবিশনে অভিনয় করে শিশিরবাবু উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। তাঁর বন্ধুবান্ধব ও পৃষ্ঠপোষকদের আগ্রহাতিশয্যে তিনি একটি মঞ্চ সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। শোনা গেল, তিনি ঐ দ্বিজেন্দ্রলালেরই 'সীতা' নিয়ে আসরে নামবেন। অপরেশবাবুর কাছে বসতাম ত মাঝে মাঝে? তাঁর বন্ধুরা আসতেন, সবাই প্রবীণ ব্যক্তি, শুনতাম তাঁদের কথা। অপরেশবাবু শিশিরবাবুর কথা শুনে বললেন—পৌরাণিক বেছে নিলেন যখন শিশিরবাবু, তখন ডি এল রায়ের "সীতা" কেন? রায় মশায়ের পৌরাণিক নাটক কি দর্শকরা গ্রহণ করবেন? রায় মশাইয়ের ঐতিহাসিক নাটক বা রোমাণ্টিক নাটক (উপাখ্যান-মূলক, যেমন সোরাব-রুস্তম), সামাজিক নাটক ও প্রহসন, সবই রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে, হয়নি কেবল তাঁর সীতা, পাষাণী ও ভীষ্ম। কারণ ও'র পৌরাণিক নাটকের সুর আর কাশীরাম কৃত্তিবাসের মহাকাব্যের সুর নীতিগত তথা, পরম্পরের সঙ্গে মেলে না। আর যা মেলে না, তা এদেশের দর্শক নিতে চান না। মাইকেলের ছিল কবি-খ্যাতি এবং মেঘনাদ বধ কাব্য ছিল মহাকাব্যবিশেষ। তার কাব্য-রস রসিকের চিত্ত আকর্ষণ করে, কিন্তু নাট্য-কাহিনীতে যখন ওটা পর্যবসিত হয়েছিল, তখন সেটা পর্যন্ত লোকে তেমন নেয়নি। গিরিশবাবুই ত "মেঘনাদ বধ" নাটকাকারে গ্রথিত করে অভিনয় করেছিলেন, বেশী দিন চলেনি।

অপরেশবাবু এ-ও অভিমত প্রকাশ করেছিলেন—ঐ "সীতা" খুললে, তরুণরা যাবে, অভিনয় দেখবে, প্রবীণ ধর্মপ্রবণ নরনারী তেমন যাবেন বলে মনে হয় না।

শিশিরবাবুর তখন সবই আছে, নেই রঙ্গমঞ্চ। যে-কোনো মঞ্চ পেলেই হয়। আলফ্রেড তখন হঠাৎ পাওয়া গেল, সে কাহিনীও সময় মত বলব, তখন শিশিরবাবু ভাবলেন—আলফ্রেড ত আলফ্রেডই সই।

আলফ্রেডে বাংলা থিয়েটার জমে না। ওর পিছনেই কলাবাগান বস্তি। রাত এগারো-বারোটায় থিয়েটার ভাঙলে, মেয়ে-ছেলে নিয়ে থিয়েটার দেখতে যাওয়াও বিপদের কথা। তাছাড়া, রাহাজানি ইত্যাদি ত তখন লেগেই ছিল ও'অঞ্চলে। হিন্দী থিয়েটার অবশ্য চলত। পার্শী থিয়েটার যখন ছিল, তখন মেয়েরা যেতো না, মেয়েদের বসবার স্থান ছিল না। কোরিন্থিয়ানেও ঐ ব্যাপার, মেয়েদের বসবার জায়গা ছিল না। আলফ্রেডে ওপরে থাকত গ্যালারী। যারা ফ্যাশনেবল্ মহিলা, তারা বসত সামনের দিকে—মূল্যবান আসনে।

এহেন যে আলফ্রেড, সেখানেই শিশিরবাবু তোড়জোড় করতে লাগলেন তাঁর "নাট্য-মন্দির"-এর উদ্বোধন করতে। আমাদের তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায় স্টার ছেড়ে চলে গেল তার "বড়দার" কাছে। তুলসী গেল, কিন্তু এলেন রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও নির্মলেন্দু লাহিড়ী। সেদিন দোতলার অফিসরঘর থেকে বক্সের লবীটা পার হয়ে চলে আসছি স্টেজের দিকে, হঠাৎ লক্ষ্যে পড়ল, লবীর সোফায় বসে আছেন এক ভদ্রলোক, মাথায় টুপী। কেমন যেন চেনাচেনা লাগল। থমকে দাঁড়ালাম। তারপরে বলে উঠলাম—কে, নির্মল না?

ও বললে—হ্যাঁ।

—কী ব্যাপার? মাথায় টুপী?

—বাবা নেই। তাই—

বলে উঠলাম—এখানে?

—খাতায় নাম লেখাবো, তাই এসেছি।

—বেশ বেশ। বললাম—তা দেখা হয়েছে কর্তাদের সঙ্গে?

—খবর পাঠিয়েছি।

—বোসো তাহলে।

নিজের কাজে চলে গেলাম। রাধিকাবাবুর যাতায়াত ছিল বিখ্যাত চিত্রশিল্পী যামিনী রায়ের ওখানে। যোগেশ চৌধুরীও যেতেন, আমিও যেতাম মাঝে মাঝে। কথায় কথায় একদিন যামিনীবাবু বলেছিলেন—রাধিকাবাবু কোনো থিয়েটারে এখন নেই, তবে নেওয়া যায় না আপনাদের ওখানে?

বললাম—উনি কি যাবেন?

রাধিকাবাবু 'গজদানন্দ প্রহসন'খ্যাত ভবানীপুরের অভিজাত ব্যক্তি জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পরিবারের লোক। এ'রা চিরকেলে অভিজাত, নজরও খুব উঁচু।

রাধিকাবাবু বললেন—আপত্তি কী? থিয়েটার করব বলে যখন সিমলে পাহাড়ের বড়ো চাকরি ছেড়ে এলাম, তখন বসে থেকেই বা কী করব?

—বেশ। জানা রইল।

প্রবোধবাবুকে গিয়ে সব বললাম। উনি শুনে বললেন—আচ্ছা।

এই হলো সূত্র, যা থেকে রাধিকাবাবুর আসবার পথ সুগম হলো। কিন্তু সাজঘরের ব্যাপারে যা অনুমান করেছিলাম, তাই হলো। উনি সব ঘুরেটুরে দেখে এসে বললেন—আপনার ঘরে বসে যদি সাজি ত আপনি আপত্তি করবেন? ছেলেছোকরার দলে ঠিক যেতে চাই না।

মনে মনে হাসলাম, আমাকে উনিও মুরুব্বি ঠাউরেছেন। মুখে বললাম—সাজুন না? কোন আপত্তি নেই।

২২শে মার্চ ১৯২৪, শনিবার যে অভিনয় হলো, তাতে নির্মলেন্দু ও রাধিকানন্দ উভয়েরই 'প্রথম' রজনী 'কর্ণার্জুনে' অপরেশবাবু বহুদিনই শারীরিক অপারগতার জন্য 'পরশুরাম' ছেড়ে দিয়েছেন। 'ধৃষ্টদ্যুম্ন' ছিল মন্মথ নাগের, সে করতে শুরু করে দিয়েছিল দুটো পার্ট, পরশুরাম ও ধৃষ্টদ্যুম্ন। এবার থেকে 'পরশুরাম' করতে লাগলেন নির্মলেন্দু। রাধিকানন্দ দুঃশাসন। এই

এবার পূজায় বাংলার শিশু ও কিশোর সাহিত্যের দু'খানা নতুন সম্পদ

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
রূপকুমারের রূপকথা
দাম দুই টাকা

চিত্তরঞ্জন সুরের
জাম্পিং বনাম বাম্পিং
দাম দেড় টাকা

আনন্দের দিনে ছোটদের উপহার দেবার মত এমন সুন্দর বই বাজারে খুব কমই আছে

পরিবেশক :- রবীন্দ্র লাইব্রেরী • ১৫/২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

হোমিওপ্যাথিক
পারিবারিক চিকিৎসা

একমাত্র বঙ্গভাষায় মুদ্রণ সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার

উপক্রমণিকা অংশে "হোমিওপ্যাথির মূলতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক মতবাদ" এবং "হোমিওপ্যাথিক মতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি" প্রভৃতি বহু গবেষণাপূর্ণ তথ্য আলোচিত হইয়াছে। চিকিৎসা প্রকরণে যাবতীয় রোগের ইতিহাস, কারণতত্ত্ব, রোগনিরূপণ, ঔষধ নির্বাচন এবং চিকিৎসাপদ্ধতি সহজ ও সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। পরিশিষ্ট অংশে ভেষজ সম্বন্ধ তথ্য, ভেষজ-লক্ষণ-সংগ্রহ রেপার্টরী, খাদ্যের উপাদান ও খাদ্যপ্রাণ, জীবাণুতত্ত্ব বা জীবাণুম রহস্য এবং মল-মূত্র-থুতু পরীক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বিংশ সংস্করণ। মূল্য—৭.৫০ নঃ পঃ মাত্র।

এম, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
ইকনমিক ফার্মেসী, ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১

নতুন ভূমিকালিপির হুবহু প্রতিলিপিটা এখানে তুলে দিলামঃ—

STAR THEATRE
Direction—The Art Theatre Ltd.
Saturday the 21st March
at 7-30 p.m.
KARNARJUN
Grand 82nd & 83rd Performances
Karna—Mr. Tinkari Chakravarty
Sakuni—Mr. Naresh Ch. Mitter
Arjun—Mr. Ahindra Choudhury
Dushashan—Mr. Radhikananda Mukherjee
Parashuram—Mr. Nirmalendu Lahiri
Padma—Miss Krishnabhamini
Niyati—Miss Niharbala
Seats are reserved in advance

এর আগের দিন ছিল দোল, ২১শে মার্চ, ৮ই চৈত্র, ১৩৩০ সাল, শুক্রবার—অ্যালফ্রেডে ছিল শিশিরকুমারের 'নাট্যমন্দির'-এর প্রতিষ্ঠা-দিবস। হলো উদ্বোধন নাট্য মন্দিরের, কিন্তু 'সীতা' দিয়ে নয়, যে-নাটক দিয়ে শুভারম্ভ হলো, তার নাম—"বসন্ত-লীলা।" সীতা নিয়ে ইতিমধ্যে ঘটে গেছে এক 'পর্ব', শিশিরকুমারের "সীতা" হরণ হয়ে গেছে।

(ক্রমশ)

সর্বত্র গৃহিণীরা বলাবলি করছেন
- সার্ফে কাচলে বোঝা যায়
সাদা জামাকাপড় কতখানি ফরসা হতে পারে!

সার্ফে কাচলেই বুঝতে পারবেন যে সার্ফ জামাকাপড়কে শুধু "পরিষ্কার" করে না, ধবধবে ফরসা করে। সার্ফে কাচারও কোন ঝামেলা নেই। সহজেই সার্ফের দেদার ফেনা কাপড়ের ময়লা টেনে বার করে, কাপড় আছড়াবার কোন দরকার নেই। আর সার্ফে কাপড় যা পরিষ্কার হয় তা, না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। এর কারণ সার্ফের অদ্ভুত কাপড় কাচার শক্তি! দেখবেন সার্ফে রঙীন কাপড়ও কেমন ঝলমলে হবে! সার্ফে সবচেয়ে সহজে আর সবচেয়ে চমৎকার কাপড় কাচা যায়। ধুতি, শাড়ী, ফ্রক, জামা, তোয়ালে, ঝাড়ন এক কথায় বাড়ীর সব জামা কাপড় সার্ফে কাচুন—দেখবেন ধবধবে ফরসা করে কাচতে সার্ফের জুড়ী নেই!

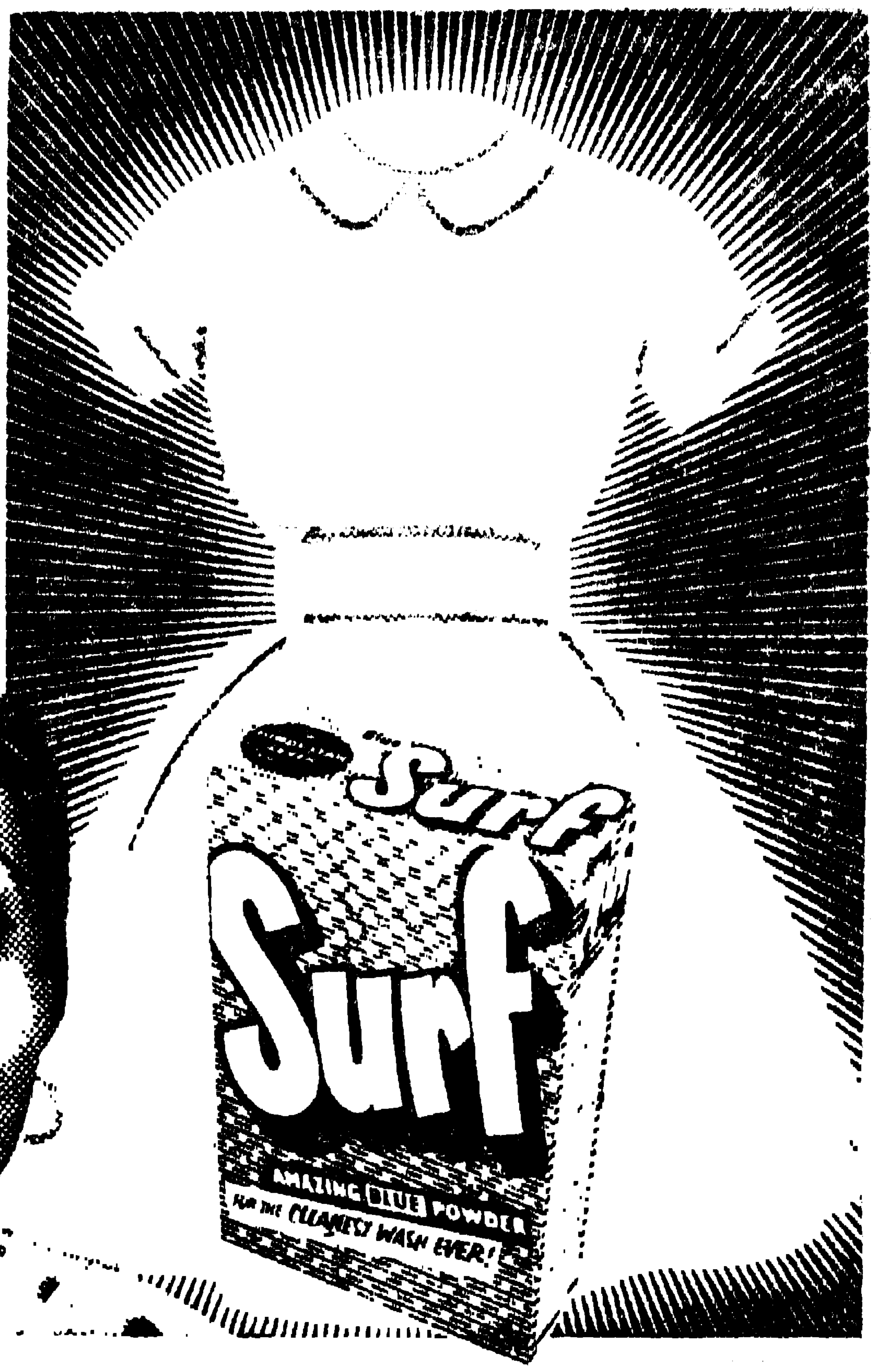

নীল সার্ফ দিয়ে বাড়ীতে কাচুন, কাপড় সবচেয়ে ফরসা হবে

SU. 12-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

বিশ্ব-বিচিত্রা

যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিন যতো ঘনিয়ে আসছে ওদেশের লোকের মধ্যে এই নিয়ে বাজি ধরার হিড়িকও বাড়ছে। নির্বাচন উপলক্ষ্য করে বাজি আমাদের দেশেও হয় তবে ওদের মতো অতোটা অদ্ভুত নয়। যেমন গতবার আইসেনহাওয়ার নির্বাচিত হলে ক্যালিফোর্নিয়ার এক বিশিষ্ট অধ্যাপক তাঁর টুপি চিবিয়ে খাবেন বলে বাজি ধরেন। আইসেনহাওয়ার নির্বাচিত হওয়ায় সেই অধ্যাপক তাঁর টুপি এসিডে ভিজিয়ে গলিয়ে নিয়ে তার ক্ষারক্ষমতা নষ্ট করে খেয়ে ফেলেন।

অবশ্য বাজিতে টাকাও যে ধরা হয় না তা নয়। ১৯২০ সালে জেমি লিভারমোর নামক নিউ ইয়র্কের শেয়ার বাজারের এক ফাটকাবাজ হার্ডিং নির্বাচিত হওয়ায় পঁচাত্তর লক্ষ টাকা বাজি জেতে। ১৯২৮ সালে আর্নল্ড রথস্টিন নামক এক কুখ্যাত জুয়াড়ী হুভার ও এল স্মিথের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হুভার জিতে যাওয়ায় প্রায় দেড় কোটি টাকা পেয়ে যেতো। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য তার যে, নির্বাচন দিবসে এক আততায়ীর গুলিতে বেচারি প্রাণ হারায়।

নির্বাচন বা অনুরূপ কোন ব্যাপারকে উপলক্ষ্য করে বাজি ধরাটা খুবই সাধারণ ঘটনা। কিন্তু জাতজুয়াড়ীরা তাস বা দাবা অথবা অন্য কোন কিছু না পেলেও বাজি ধরতে বিরত থাকে না।

কিছুকাল পূর্বে এক লেখককে কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করার পর তার জুয়ার দেনা মেটাতে এ লক্ষ (দশ হাজার) টাকার এক চেক লিখতে হয়। কারাগারে তার সঙ্গী সময় কাটাবার জন্যে এক মজার খেলার উদ্ভাবন করে। ওরা বাজি ধরতো শামুকের দৌড় নিয়ে প্রতিযোগিতা, ফড়িঙের লাফ এবং পিপীলিকার ভার বহন ক্ষমতার ওপর।

পশুপক্ষী ও পোকা মাকড়ের কোন বিশেষ ক্ষমতার ওপর বাজি ধরা বহু প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। ঝিঁঝিঁপোকা, মোরগের লড়াই, বিছের দৌড়, চিলের ওড়া নিয়ে বাজি ধরার বহু কাহিনী প্রাচীনকালের ইতিবৃত্তে পাওয়া যায়। কষ্টসহিষ্ণু রেড ইন্ডিয়ানরা বিশেষ দুর্বলচিত্ত জুয়াড়ী ছিল না। একটা অগভীর পুকুরের ধারে তারা দিনের পর দিন বসে থাকতো বাজি ধরে বৃষ্টিতে কতোটা ভর্তি হয় তাই নিয়ে। জলের পরিমাপ হতো ভাসমান জোঁক দেখে। বৃষ্টি হওয়া বা না হওয়া এবং বৃষ্টির পরিমাণ নিয়ে বাজি ধরা এদেশের ফাটকাবাজদের মধ্যে অনেককাল থেকেই চলে আসছে। কিছুদিন পূর্বে লস এঞ্জেলসের এক সাংবাদিক রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বার্ষিক বৃষ্টিপাত নিয়ে লটারি খেলার প্রস্তাব করে বলেন, এটা এক অভিনব জুয়া খেলা হবে।

বাজি ধরার মতো কোন ব্যাপার হলে জুয়াড়ীদের কাছে কোন কিছুর পবিত্রতা রক্ষিত হয় না। ১৮১৪ সালে নিজেকে "যীশুর পরিণীতা" বলে ঘোষণাকারিণী কুমারী জোয়ানা সাউথওয়ার্থ ধরাধামে দ্বিতীয় অবতারের আবির্ভাব ঘটাবে বলে প্রচার করায় ইংলণ্ডে প্রভূত সোরগোল পড়ে যায়। অবতারের আবির্ভাব সম্ভব হতে পারে কি পারে না এই নিয়ে দুজন ইংরাজের মধ্যে বাজি হয়। একজন বলে যে, সে বছর নভেম্বরের মধ্যেই জোয়ানা তার কথা রাখবে। কিন্তু কথা সে রাখতে পারেনি। বিজিত ব্যক্তি কিন্তু বাজির টাকা দিতে অরাজী হয়। ব্যাপারটি আদালত পর্যন্ত গড়াতে বিচারক বিজিতের পক্ষেই রায় দেন। রায়ে তিনি বলেন, এমন একটা কাজ বরদাস্ত করা যায় না কারণ তদ্দ্বারা দুর্নীতিপরায়ণতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

জন্ম সম্পর্কে আগে থেকেই কিছু ধারণা করা সম্ভব নয়। কিন্তু জন্মমৃত্যুর তালিকা সংকলন রীতি প্রবর্তিত হওয়ার বহু পূর্ব থেকে মৃত্যু নিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা হয়ে আসছে। এ ব্যাপার নিয়ে এক প্রামাণ্য গ্রন্থরচয়িতার মতে "যে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাস্থ্যের অবস্থা বা মৃত্যু নিয়ে বহু

শিশুর দাঁত ওঠা
সহজ করে তোলার জন্য
পিরামীড গ্লিসারিন

একটা নরম কাপড়ে আপনার আঙুল জড়িয়ে পিরামীড গ্লিসারীনে আঙুলটা একটু ডুবিয়ে নিন। তারপর আস্তে আস্তে শিশুর মাড়ীতে আঙুলটা ঘসতে থাকুন। তাড়াতাড়ি ব্যথা কমে যাবে। তা ছাড়া এর মিটি স্বাদ শিশুদের খুবই ভাল লাগবে।

এটি বিশুদ্ধ এবং উপকারী। গৃহকর্মে, ওষুধ হিসেবে, প্রসাধনে ও নানা রকম ভাবে সারা বছরই কাজে লাগে —তাই পিরামীড গ্লিসারিনের একটা বোতল সর্বদাই হাতের কাছে রাখুন।

বিনামূল্যে পুস্তিকা! এই কুপনটি ভরে, "হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড পোঃ বক্স ৪০৯, বোম্বাই-১" এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

দয়াকরে আমাকে বিনামূল্যে ইংরেজী/হিন্দীতে * পিরামিড গ্লিসারিনের গৃহকর্মে ব্যবহার প্রণালী পুস্তিকা পাঠান।

আমার নাম ও ঠিকানা.................................

* যে ভাষায় চান, সেটি রেখে অন্যটি কেটে দিন

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

PYG. 16-X48 BQ

১ ২ ৩

১। বৈজ্ঞানিকরা বলেন, সমুদ্রের নীচের জগৎ নিস্তব্ধ মোটেই নয়। মাছ এবং অন্যান্য প্রাণীরা এমন অদ্ভুত সব শব্দ করে যা হাইড্রোফোনের সাহায্যে ধরা পড়ে। ক্রোকার নামে এক ধরনের মাছ নিউম্যাটিক ড্রিল চালানোর শব্দ করে। এক শ্রেণীর চিংড়ী মাছ শব্দ করে তপ্ত খোলায় ঘি ছিটালে যেমন হয়। ২। নর্থাপ কর্পোরেশন নামক যুক্তরাষ্ট্রের এক গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, একজন স্বাভাবিক মোটরচালকই কেবল এবং গাড়ি তার করায়ত্তের মধ্যে থাকতে, আদপেই নয় অথবা অতি সামান্য উত্তেজনা অভিব্যক্ত করে (যেমন দেখা যাচ্ছে ছবির বাঁদিকে অসিলোস্কোপ দ্বারা গৃহীত রেখা)। কিন্তু সংগে যদি স্নায়বিক দুর্বল, বাক্যবাগীশ কেউ যাত্রী বিপদের কথা বলে যেতে থাকে তাহলে চালকের উত্তেজনা-রেখা কেমন দাঁড়ায় ছবির ডানদিকে তা দেখানো হয়েছে। ৩। মিনিটে-এক-ছবির উদ্ভাবক আমেরিকার এডউইন ল্যাণ্ডের আবিষ্কার থেকে জানা যায় যে, চোখে রঙ দেখা বিষয়ে নিউটন থেকে এ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ ভুল সিদ্ধান্ত পোষণ করে এসেছেন। বিভিন্ন কতকগুলি ফিল্টার ও আলোক কেন্দ্রের সহায়তায় ল্যাণ্ড দুটি শাদা-ও-কালো ফটোগ্রাফে কোন দৃশ্যের স্বাভাবিক রঙ ধরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন

লক্ষ টাকার লেনদেন হয়ে যায়। অবস্থার কোন আকস্মিক পরিবর্তন মাত্রই জুয়াড়ীদের প্রভাবিত করে তোলে।" একজন জুয়াড়ী বাজি ধরে যে, পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে পার্লামেণ্টের কোন সদস্যের মৃত্যু ঘটবে না। সেকালে আইন প্রণেতারা প্রায়ই হাওয়ায় নেচে বেড়াতো—তখন বাজি ধরা হতো তাদের মৃত্যু হতে কতদিন লাগবে তাই নিয়ে তর্কের ওপর।

একবার এক কুখ্যাত ইংরাজ জুয়াড়ি হোয়াইট নামক এক জুয়ার আড্ডায় প্রবেশ করার মুখে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। ডাক্তারকে খবর দেওয়া নিয়ে ব্যস্ত না হয়ে বাকি জুয়াড়ীরা বাজি ধরতে আরম্ভ করে দেয় লোকটি সত্যিই মারা গিয়েছে, না কেবল অচৈতন্য হয়ে রয়েছে। মারা গিয়েছে বলে বাজি যারা ধরেছিল তারা ডাক্তার ডাকায় বাধা দিতে থাকে। তৎসত্ত্বেও তারা হেরে যায় কিছুক্ষণ পর সেই জুয়াড়ী জ্ঞান ফিরে পেতে।

পাশা খেলায় ধনসম্পদ, ক্রীতদাস, রাজ্য এমন কি স্ত্রীকে বাজি ধরার নজির প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই পাওয়া যায়। মহাভারতে যুধিষ্ঠির কর্তৃক দ্রৌপদীকে বাজি ধরার কাহিনী কে না জানে! টাইবেরিয়াস, নিরো প্রভৃতির আমলে খৃষ্টধর্মীয়দের সিংহের সঙ্গে লড়াইয়ে নামিয়ে বাজি ধরা হতো। বরাবরই সিংহই খৃষ্টধর্মীয়কে হত্যা করে তাকে ভোজে লাগায়—কেউ সিংহকে ভোজন করেছে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। মানুষের জীবন নিয়ে বাজি ধরা আধুনিককালেও ঘটে, অবশ্য আগের মতো অতোটা খুনখারাপি ব্যাপার হয় না এই যা।

জুলস বেঁার নামক এক ফরাসী অভিনেতা প্যারিসের এক জুয়ার আড্ডায় তার সমুদয় সঞ্চিত অর্থই শুধু নয়, তার স্ত্রীর সিল্ক কোট এমন কি কুকুরটি পর্যন্ত বাজি রেখে হেরে যায়। অতঃপর ধীরভাবে সে বাজি ধরে তার বাকি একমাত্র সম্পদ—তার স্ত্রী। অভিনেতাটির ভাগ্য ভাল ছিল যে, স্ত্রীকে হারাতে হয়নি।

কিছুদিন আগে ভিঞ্চে মারভাসি ও রিনো ভিচিগুয়েরা নামক দুজন ইতালীয় জুয়া খেলতে বসে। ভিঞ্চে মারভাসি সর্বস্ব হেরে ফতুর হয়ে যায়। শেষ এক দান বাজি ধরে সে রিনোর জেতা সাড়ে চারশো টাকা উদ্ধারের পরিবর্তে তার স্ত্রী ক্লারাকে। রিনো রাজি হয়ে যায়। আবার ভিঞ্চের পরাজয় ঘটে। কিন্তু রিনো তার স্ত্রী ক্লারাকে দাবি করায় ভিঞ্চে তাকে আদালতে টেনে নিয়ে যায়। বিচারক অমনধারা একটা নির্মম বাজি ধরার জন্যে ওদের দুজনকেই বেত্রাঘাত দণ্ড দিয়ে বলেন, ক্লারা কোন জুয়াড়ীর খেয়ালের উপাদান হতে পারে না। ক্লারা বিচারকের মন্তব্যে বাধা দিয়ে বলে, "যে আমার দাম সাড়ে চারশো টাকার বেশী বলে গ্রাহ্য করতে পারে না যে, সে আমাকে খুব বেশী চায় বলে মনে হয় না।"

মরক্কোর পাশা এবং মহম্মদ জিয়ালেদ্দিন নামক এক ধনী তুর্কী প্যারিসে একবার জুয়া খেলতে বসেন। জিয়ালেদ্দিন এক

জগদীশবাবুর গীতা
মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা ভাষ্য-রহস্য ভূমিকাসহ
অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়মূলক যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম ৫·০০ ভারত-আত্মার বাণী ৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১·৫০ কর্মবাণী ১·২৫
প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী · ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা হেরে শেষে তাঁর সর্বাধিক প্রিয় বিংশতিবর্ষীয়া স্ত্রী, এক সার্কাশীয় সুন্দরীকে বাজি ধরে হেরে যান। প্রথমে পাশা বিনীতভাবে তাঁর দাবি খাটাতে অরাজী হন। কিন্তু মেয়েটিঃ "আমার স্বামী সর্বদাই তাঁর দেনা মিটিয়ে থাকেন" বলে জানাতে পাশা তাকে তাঁর হারেমে নিয়ে যান।

ভাঁড়ের রাজা উইলসন মিৎসনারের বাজি ধরার ছুতো ছিল অদ্ভুত যদিও জেতা বিষয়ে সে নিশ্চিত থাকতো। বাছাই করা ছেলেদের স্কুলে পড়ার সময় উইলসন বাজি ধরে যে দড়ি না টেনে সে স্কুলের ঘণ্টা বাজিয়ে দেবে। রাত্রে বাইরের লোক যাতে আসতে না পারে এবং স্কুলবোর্ডিং থেকে ছেলেদের বাইরে যাওয়া প্রতিরোধ করতে কর্তৃপক্ষ বড় বড় কুকুর ছেড়ে রাখতেন। উইলসন ঘণ্টার দড়ির আগায় মাংসের টুকরো বেঁধে দেয় যাতে সেগুলি নিতে কুকুরদের বেশ লাফ দিতে হয়। প্রায় মধ্যরাত্রে কুকুররা সেই মাংসের গন্ধ পায়, আর সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টার শব্দে সব ছেলে জেগে ওঠে। পরে উইলসন এক উত্তপ্ত কামানের গোলা কোলাপ্সের সাহায্যে শয়নাগারের বারান্দায় গড়িয়ে দেয়। বাজি ধরেছিল যে, হেড-মাস্টারই প্রথম গোলাটি ধরবে। ওর কথাই ফললো, তবে হেডমাস্টারের ফোস্কা পড়া হাতে গলা ধাক্কা খেয়ে ওকে স্কুল থেকে বিদায় নিতে হয়।

কনডাইক ও বারবারি কোস্টে উইলসনের প্রতিভা আরো শাণিত হয়। একবার আতলান্তিক সিটির বড় রাস্তা দিয়ে আর তিন জুয়াড়ীর সঙ্গে যেতে যেতে উইলসন একটা বাড়ির তিনতলার জানলায় একজোড়া পায়ের দিকে লক্ষ্য করতে বলে। সেই পদযুগল দেখে লোকটির উচ্চতা বলা নিয়ে সে বাজির প্রস্তাব করে। উইলসনের অনুমান হলো অপর তিনজনের চেয়ে অনেক কম। পায়ের মালিককে ডেকে নীচে নামাতে দেখা গেল, উইলসন যা বলেছিল তা এক ইঞ্চির চেয়েও কম ভুল। আসলে উইলসন আগে থেকেই গোপনে এক বামনকে জানলায় দাঁড় করিয়ে রেখেছিল।

আধুনিক কালের আমেরিকার জুয়াড়ী-দের মধ্যে এলভিন 'টাইটানিক' টমসন সকলকে ছাপিয়ে যায়। সমসাময়িকদের মধ্যে টাইটানিক লক্ষ রকম প্রস্তাবের উদ্ভাবক বলে পরিচিত। টাইটানিক খেলাধুলায় চৌখস এবং তার অনেক বাজি নিজেরই ব্যক্তিগত সামর্থ্য নিয়ে।

একবার শীতকালে টাইটানিক এলো-মেলোভাবে গলফ খেলতে খেলতে হঠাৎ বাজি ধরে যে, বল মেরে চারশো, এমন কি পাঁচশো গজ দূরে সে পাঠাতে পারে। সঙ্গে সঙ্গেই ওর প্রস্তাব গৃহীত হয়ে যায় এবং টাইটানিক সকলকে নিয়ে উপস্থিত হয় বরফে জমাট হয়ে যাওয়া একটি ছোট হ্রদের সামনের এক পাহাড়ের ওপরে। সেখান থেকে বল মারতে সেটা প্রায় আটশো গজ দূরে গিয়ে পৌঁছয়।

ন্যাটা গলফ খেলোয়াড় অতি দুর্লভ কিন্তু কখনো কখনো টম্সন বাঁ হাতে খেলে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখায়। এক এক সময়ে বাজি ধরে ডান হাতে খেলে ইচ্ছে করে হেরে গিয়ে কপাল খারাপ বলে রাগের ভান করে। তারপরই জানায়ঃ "ভাগ্য খারাপ তাই, নয়তো বাঁ হাতে খেলে হারিয়ে দিতে পারি।" এইভাবে বিদ্রূপ করে বাজির টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে টাইটানিক বাঁ হাতে খেলে জিতে নেয়।

একবার বেলমণ্ট রেসকোর্সে ট্রেনে করে যেতে রথস্টিন ও আরো কতকজন সহযাত্রী জুয়াড়ীর কাছ থেক টাইটানিক বহু টাকা বাজি জিতে নেয়। পথিমধ্যে কটি সাদা ঘোড়া দেখা যাবে এই নিয়ে বাজি ধরা হয় ঘোড়া পিছু আড়াইশ টাকা করে। রথস্টিনের অনুমান খুব বেশী হলেও টাইটানিক সঠিক সংখ্যা বলে বাজি জিতে নেয়। টাইটানিক এবং রথস্টিন উভয়েই সাদা ঘোড়া ভাড়া করে রেখেছিল কিন্তু টাইটানিক অপরকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। পরে টাইটানিক ঘৃণার সঙ্গে বলেঃ "কিছু বেশী পয়সা খরচ করলে রথস্টিন আরো ঘোড়া ভাড়া করে জিততে পারতো, কিন্তু ও বড় কঞ্জুস।"

টাইটানিকের অনেক বাজি ধরা তার নিজের দক্ষতার ওপরে নির্ভর করলেও খুব। ওর একটা প্রিয় খেলা হচ্ছে গাড়ির আন্দাজে বলার আইনের ওপর তার শুধু নম্বর বলা। টাইটানিক জানাবেঃ "বাজি রেখে বলতে পারি প্রথম কুড়িখানি গাড়ির মধ্যে অন্তত দুখানির শেষ দুটো সংখ্যা এক হবেই।" যারা জানে না তাদের কাছে এমন বাজি ধরাটা বোকামি মনে হবে, কিন্তু সাতবারের মধ্যে একবারও অন্তত এ বাজি লেগে যায়। কিংবা একটু ঘুরিয়ে হয়তো বললেঃ "যে কোন দুটো নম্বর বেছে নাও, আর আমি বাজি ধরছি পরবর্তী পঞ্চাশখানি গাড়ির কোনটির শেষ দুটি সংখ্যা তা হবে না।" এমন বাজিতে তিনবারের মধ্যে দুবার হয়তো সে হারবে কিন্তু একবারের জিতেই প্রচুর লাভ হয় তার।

টাইটানিক চতুর তাস খেলোয়াড়, বিশেষ করে পোকার খেলায় এবং তার সাফল্যের একটি কারণ হচ্ছে তাসের আচরণ সম্পর্কিত নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা। পোকার খেলার পর জুয়াড়ীরা তাস কাটাতে চায় এবং এটা তারা বোঝে যে, পাঁচখানি তাসে একটি জুড়ী পাওয়া সম্ভব নয়। টাইটানিকও তা জানে, কিন্তু ছয়-পাঁচ দরে বাজি ধরে এই বলে যে, দুখানি তাসে একটি জুড়ি সে পাবেই। টাইটানিক এইভাবে পাঁচ টাকায় এক টাকা করে বাজি জিতে যায়।

আর এক নামকরা জুয়াড়ী হচ্ছে জন গেটস। পেশাদার জুয়াড়ী না হলেও একটা কোন ছুতো পেলেই সে বাজি ধরে বসে। একবার এক বর্ষার দুপুরে জন গেটস ও জন ড্রেক শিকাগোগামী এক ট্রেনে চলেছিল। চলার একঘেয়েমি কাটাবার জন্যে গেটস জানালা দিয়ে গড়িয়ে পড়া বৃষ্টির ফোটার গতি নিরূপণ নিয়ে বাজি ধরার প্রস্তাব করে। ট্রেন থেকে নামার আগে পর্যন্ত গেটস এই বাজিতে দেড় লক্ষ টাকা জিতে যায়।

শিকাগোতে নেমে বাজি ধরার অন্য কিছু না পেয়ে "স্লাই লু" খেলা আরম্ভ করে। ড্রেক ও গেটস উভয়ে এক দলা করে চিনি নিয়ে বসলো এবং বাজি ধরা হলো কার চিনির দলার ওপরে প্রথম মাছি বসে তাই নিয়ে। ড্রেক সে বাজি জিতে গেল। গেটস চতুর হলেও অসৎ উপায় অবলম্বন করে না। অন্য জুয়াড়ী হলে বাজি হারছে বুঝে চিনি একটু ভিজিয়ে নিত মাছি আকর্ষণ করার জন্য।

জুয়াড়ীদের প্রকৃতি যেমন সাধারণত হয় গেটসও খুব খরুচে লোক এবং বথাশিস

প্রতিদিন পড়ার বই

সারদা-রামকৃষ্ণ

শ্রীদুর্গাপুরী দেবী রচিত

সুসাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—শ্রীরামকৃষ্ণই শুধু শ্রীসারদেশ্বরীর পরিচয় নহেন, পরন্তু শ্রীসারদেশ্বরীও শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচয়। এই দুটি পরিচ্ছন্ন-ভাবে প্রতীয়মান করা সাধারণ শক্তির কথা নহে। ইহার জন্য যে অন্তর্দৃষ্টি এবং তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন শক্তিশালিনী লেখিকা তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন।...পাঠক-চিত্তকে একান্ত আগ্রহ এবং ঔৎসুক্যের সহিত সাবলীল প্রবাহে সুরু হইতে শেষ পর্যন্ত ভাসাইয়া লইয়া যায়।

বহু চিত্রশোভিত। পঞ্চম মুদ্রণ—৫৲

গৌরীমা

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যার জীবনচরিত

যুগান্তর.—তিনি একাধারে পরিব্রাজিকা, তপস্বিনী, কর্মী এবং আচার্যা।...ঘটনার পর ঘটনা চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া রাখে। ......গৌরীমার অলোকসামান্য জীবন ইতিহাসে অমূল্য সম্পদ হইয়া থাকিবে।

তৃতীয় সংস্করণ—৩৲

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

২৬ মহারাণী হেমন্তকুমারী স্ট্রীট, কলিকাতা

(সি ৬১১৮)

দেওয়ার খ্যাতি ছিল তার। কোথাও গেলে হোটেলের পরিচারকরা ওকে সেবা করার জন্য পরস্পরে ঝগড়া করতো। ফ্লোরিডার এক হোটেলের এক পরিচারক বহু বছর গেটসকে দেখাশোনা করে যায়। একবার ডিনারে বসে গেটস দেখে এক নতুন পরিচারক এসেছে তার পরিচর্যায়। ওকে যে বরাবর পরিচর্যা করে সে রয়েছে আর এক কামরায়। গেটস তাকে ডেকে কারণ জানতে বললেঃ "ব্যাপার কি বলতো? বখশিস কি মনোমত হয় না তোমার?"

পরিচারক জানালেঃ "আজ্ঞে হ্যাঁ, বখশিস আপনি যথেষ্টই দেন। কিন্তু আর আপনি আমার খরিদ্দার নন।"

বিস্মিত গেটস প্রশ্ন করলেঃ "কেন? তার মানে?"

পরিচারক বললেঃ "আমরা পরিচারকরাও জুয়া খেলি। গত রাতে আমার কেবলই হার হতে থাকে। শেষে সব টাকা ফুরিয়ে যেতে আমি আপনাকে বাজি ধরি। সে বাজিও হেরে গিয়েছি।"

কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

৩৫

লক্ষ্মীদি আগে আগে যাচ্ছিল, দীপংকর তার পেছনে। গলিটা অন্ধকার, রাতও অনেক হয়েছে।

দীপংকর জিজ্ঞেস করলে—এখানে কবে এলে লক্ষ্মীদি?

লক্ষ্মীদি যেতে যেতে বললে—প্রায় এক মাস হলো—

তারপর একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল দুজনে। লক্ষ্মীদি যেন কী ভাবলে এক মুহূর্ত। একবার চেয়ে দেখলে দীপংকরের দিকে। একটা অস্পষ্ট আতংক যেন লক্ষ্মীদির মুখের চেহারায় ভেসে উঠলো। যেন কী বলতে গিয়েও মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে না। দীপংকর বড় কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। একেবারে লক্ষ্মীদির গা ঘেঁষে। লক্ষ্মীদি থমকে দাঁড়িয়েছে হয়ত কিছু বলবার জন্যে। কিন্তু কিছুতেই বুঝি বলতে পারছে না।

দীপংকর একবার কী বলতে গেল—লক্ষ্মীদি—

লক্ষ্মীদি বললে—চুপ, আস্তে—

দীপংকরের মনে হলো লক্ষ্মীদি যেন এক মহা সমস্যায় পড়েছে। চারিদিকে অন্ধকার। কাছাকাছি কোনও আলো নেই কোথাও। পাশেই উঠোনের ওপর একটা তালগাছ সোজা মাথা উঁচু করে আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। মাটির উঠোন। চারদিকে উঁচু পাঁচিল ঘেরা। পাঁচিলের ওপারে জলা-জায়গা থেকে বোধ হয় ব্যাং ডাকছে।

লক্ষ্মীদি গলা নিচু করে বললে—তুই এমন সময় এলি—?

দীপংকরও আস্তে আস্তে বললে—তোমার চিঠিটা যে আমি অফিস থেকে এসে তবে পেলুম। তারপর মা বললে খেয়ে বেরোতে, তাই একেবারে খেয়ে-দেয়েই বেরোলাম—

তারপর একটু থেমে বললে—তাহলে আমি না-হয় এখন যাই, পরে বেলা-বেলি আসবো আবার একদিন—

—না দাঁড়া, তোকে তো আমিই আসতে বলেছিলুম।

—তা হোক, তার জন্যে তুমি ভেবো না, আমি আর একদিন আসবো।

তারপর হঠাৎ মনে পড়লো। বললে—কালকে হঠাৎ দাতারবাবুকে দেখলুম লক্ষ্মীদি, দাতারবাবু কি এখনও লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে? আমি ডাকলুম, কোনও উত্তর দিলেন না। কী, হয়েছে কী?

লক্ষ্মীদি সে-কথার উত্তর দিলে না। দীপংকরকে বললে—এদিকে আয়—

বলে অন্য একটা গলি দিয়ে অন্যদিকে নিয়ে গেল। এদিকটাও অন্ধকার। লক্ষ্মীদি আগে আগে চলেছে। কেমন যেন সমস্ত জিনিসটা রহস্য মনে হলো দীপংকরের কাছে। কোথায় সেই বৌবাজারের চীনে-পাড়া। আবার কোথায় এই গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং। এদিকটা ঢাকুরিয়া। এত জায়গা থাকতে এখানে এল কেন? সেই লক্ষ্মীদি, কত বড়লোকের মেয়ে। কত তার টাকা-পয়সা ছিল। ভুবনেশ্বরবাবুর কত টাকা! কত বড় জায়গায় বিয়ে হতো তার। সতীর মতই কত বড়লোকের বাড়িতে বিয়ে হতো! সতীর বিয়ের দিনেও যেমন গাড়ির সার দাঁড়িয়ে গিয়েছিল প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে লক্ষ্মীদির বিয়েতেও তাই হতো। বড় বড় লোক দামী-দামী গাড়ি চড়ে আসতো। রায় বাহাদুর নলিনী মজুমদার আসতো!

লক্ষ্মীদি একটা জানালার সামনে এসে দাঁড়ালো। জানালাটা খোলা। ভেতরদিকে আঙুল দিয়ে দেখালে। বললে—ওই দ্যাখ্—

দীপংকর দেখলে। কালকে অন্ধকারে ভালো করে দেখা যায়নি। ঘরে টিম্ টিম্ করে একটা হারিকেন জ্বলছে। একটা তক্তপোষের ওপর শুয়ে রয়েছে দাতারবাবু। বড় অসহায় মুখটা। যেন অনেক যুদ্ধ করে অনেক আঘাত পাবার পর ক্লান্তিতে একটু ঘুমিয়েছে এখন। আবার যেন এখুনি জেগে উঠবে। দীপংকর অনেকক্ষণ ধরে দেখতে লাগলো। সেই সৌখীন মানুষটা। কোট প্যাণ্ট্ টাই পরে ট্যাক্সি চড়ে ভোরবেলা কালিঘাটের মন্দিরে আসতো—শুধু লক্ষ্মীদির একটা চিঠির জন্যে। সিগারেট খেত। কোথায় ভারতবর্ষের কোন্ পশ্চিম প্রান্তের কোন্ জনপদের অধিবাসী। অন্য আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভাগ্য-অন্বেষণে সমুদ্র পেরিয়ে কোন্ সুদূর দেশে গিয়ে পৌঁছিয়েছিল। সেখানে দাতারবাবু প্রতিপত্তি করেছিল, প্রতিষ্ঠা করেছিল, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যের কোন্ ষড়যন্ত্রের ফলে বুঝি লক্ষ্মীদির সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল কোন্ এক অশুভ মুহূর্তে। তখন অর্থ প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা সবকিছু নিরর্থক মনে হলো তার কাছে। একদিন লক্ষ্মীদির সঙ্গে সঙ্গে দাতারবাবুও চলে

রবিনসন্স

'পেটেণ্ট' বার্লি

খাওয়াবার

এই ত সময়

রবিনসন্স পেটেণ্ট বার্লি গোরুর দুধের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে শিশুর পাকস্থলীতে দুধ শক্ত চাপ বেঁধে হজমের অসুবিধা ঘটায় না বরং তা হজম করা শিশুর পক্ষে আরো সহজ হয়। তাছাড়া, রবিনসন্স পেটেণ্ট বার্লি শিশুর পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগায়। রবিনসন্স পেটেণ্ট বার্লি শিশুরা খেয়ে তৃপ্তি পায়—এতে ওদের শরীরও গড়ে ওঠে। আপনার খোকাকে খাইয়ে দেখুন সে কেমন বেড়ে ওঠে।

এই বার্লিতে অনধিক ০.০২৮% আয়রন বি-পি ও ১.৫% ক্রিটা প্রিপঃ-এর সংমিশ্রণ আছে।

* ক্যালসিয়াম ও লৌহ সংযোগে সুরক্ষিত

এল কলকাতায়। আর তারপর জীবনে নতুন করে যখন আবার প্রতিষ্ঠার স্বর্ণসূত্র আবিষ্কার করেছে, ঠিক সেই সময়ে কিনা এল পরিহাস। পৃথিবীর প্রথম ট্রেড-ডিপ্রেশন। আবার অর্থ গেল, প্রতিষ্ঠা গেল, প্রতিপত্তি গেল। আবার লুকিয়ে লুকিয়ে গা ঢাকা দিয়ে বেড়াতে হলো রাস্তায় রাস্তায়। দেনায় দুর্দশায় মাথার চুল পর্যন্ত বিক্রী হয়ে গেল দাতারবাবুর।

লক্ষ্মীদি সরে এল। বললে—আজকে অনেক কষ্টে ঘুম পাড়িয়েছি, মোটে ঘুম নেই চোখে—চেহারা কী হয়েছে দেখেছিস্ ?

দীপঙ্কর বললে—আমি ভেবেছিলুম তোমার সেই ছ' হাজার টাকা যোগাড় করতে পারবো, সতী রাজিও হয়েছিল, কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল—

তারপর দীপঙ্কর নিজের কথা বললে। কেমন করে কেটেছে এ ক'দিন। কেমন করে পুলিসের লক্-আপের মধ্যে থাকতে হয়েছিল। সতীর বিয়ে হবার দিন কেমন করে সে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তার শ্বশুরবাড়ি, প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে।

লক্ষ্মীদি সব মন দিয়ে শুনলে।

দীপঙ্কর বললে—তা ছাড়া, আরো অনেক সব এমন ঘটনা ঘটে গেল, যার জন্যে তোমার খবরই নিতে পারিনি। আর অফিসের কাজও রয়েছে—

লক্ষ্মীদি বললে—তোরও চেহারা অনেক বদলে গেছে—আর সেই আগেকার ছেলে-মানুষটি নেই—

দীপঙ্কর হাসলো কথাটা শুনে। ছোট-বেলাকার কথা লক্ষ্মীদির তাহলে এখনও মনে আছে। সেই চকোলেট ঘুষ দেওয়া, সেই চড় মারা, সেই চা খেতে শেখা প্রথম লক্ষ্মীদির কাছে। লক্ষ্মীদি প্রথম দীপঙ্করকে চা খাইয়েছিল একদিন। সত্যি সেইসব দিনের কথা ভাবলে দীপঙ্কর এখনও হাসে। এখনও হাসি পায় তার। এ-ঘটনার অনেকদিন পরে যখন লক্ষ্মীদির কথা মনে পড়তো তখন দীপঙ্করের আরো হাসি পেত। ছোটবেলায় গরীব ছিল বলেই দীপঙ্করের মনে হতো, যখন চাকরি হবে তার, প্রতিষ্ঠা হবে তার, তখন হয়ত কোনও দুঃখ থাকবে না আর। মনে হতো পৃথিবীর যত অর্থবান লোকই বুঝি সুখী। শুধু তারই অর্থ নেই, পরের দানের ওপর নির্ভর করতে হয় বলেই তার এত কষ্ট। কিন্তু লক্ষ্মীদি কেন তার বাবার অত ঐশ্বর্য ছেড়ে এমন করে দাতার-বাবুর সংগে দিন কাটাচ্ছে। যার আছে সে কেন ত্যাগ করে? কীসের সন্ধানে ত্যাগ করে? যখন চাকরিতে আরো উন্নতি হয়েছে দীপঙ্করের যখন সমস্ত অফিসসুদ্ধ লোক দীপঙ্করকে সম্মান দিয়ে খাতির দিয়ে অভ্যর্থনা করেছে, সেন সাহেবের এক কণা কৃপাদৃষ্টি পাবার জন্যে লালায়িত হয়েছে, তখনও দীপঙ্করের অন্তরের দারিদ্র্যের সন্ধান তারা রাখেনি। তারা দেখেছে সেন সাহেবের পদমর্যাদা, সেন সাহেবের মাইনে, সেনসাহেবের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ! কিন্তু তারা, অফিসের সেই কে-জি-দাশবাবু, সেই রামলিঙ্গমবাবু, গাঙ্গুলীবাবু, তারা কি জানতো, এক মুহূর্তের শান্তির জন্যে তাদের সেন-সাহেব তার পদ-মর্যাদা, সম্মান, অর্থ, বিত্ত, সমস্ত পদদলিত করতে পারে!

কিন্তু সে-কথা পরে হবে!

লক্ষ্মীদির জীবনেই বা কীসের অভাব ছিল! অর্থ? সে তো লক্ষ্মীদিকে কখনও আকর্ষণ করেনি! লক্ষ্মীদির রূপ ছিল, স্বাস্থ্য ছিল, গুণ ছিল, লেখা-পড়া জানা ছিল, সবই ছিল। বাপের স্নেহ, বোনের ভালবাসাও ছিল। সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎও ছিল। আর ভুবনেশ্বরবাবু, কী-ই না করতে পারতেন মেয়ের জন্যে! একদিন ভুবনেশ্বর-বাবুর মৃত্যুর পর লক্ষ্মীদিই তো তার অর্ধেক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনী হতো। ভুবনেশ্বরবাবু তো মেয়েদের মুখের দিকে চেয়েই দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন নি। ভেবেছিলেন, বড় হয়ে মেয়েরা বাবার অবিমৃষ্যকারিতায় একদিন মনে মনে অপরাধ নেবে। তখন তিনি কী বলে নিজের কাজের জবাবদিহি করবেন?

বহুদিন পরে দীপঙ্কর একদিন লক্ষ্মীদিকে জিজ্ঞেস করেছিল—এ লোভ তুমি কেমন করে ছাড়লে লক্ষ্মীদি?

তখন লক্ষ্মীদি তার দুর্দশার শেষ সীমান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। রোজ খাবার সংস্থানও জোটে না। শহরের প্রান্তের একেবারে বাইরে ভাঙা-বাড়ির তলায় ময়লা শতচ্ছিন্ন কাপড়ে লজ্জা ঢাকতে হয় লক্ষ্মীদিকে।

তবুও কখনও কাঁদতে দেখেনি, মুখ ভার করতে দেখেনি। ছেঁড়া-কাপড়টা সেলাই করে পরতো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। সে এক চরম দুর্দশার দিন গেছে লক্ষ্মীদির!

—সত্যি বলো না, কেমন করে এত ঐশ্বর্যের লোভ ছাড়তে পারলে তুমি? তোমার অনুতাপ হয় না!

লক্ষ্মীদি বলেছিল—শম্ভুকে যদি তুই ভালো করে চিনতিস, তাহলে আর এ-কথা জিজ্ঞেস করতিস্ না!

—কিন্তু দাতারবাবু তোমাকে কী দিয়েছে! শুধু অভাব আর অনটন ছাড়া আর কিছু তোমাকে দিয়েছে কোনওদিন?

লক্ষ্মীদি কথাটা শুনে হেসেছিল সেদিন। বলেছিল—তুই বাইরের লোক, তুই তো সে-কথা বলবিই। আমার বাবা দেখলেও ওই কথাই বলতো!

—কিন্তু দাতারবাবু কি সত্যিই তোমায় ভালবাসে?

—ভালো না বাসলে অত সন্দেহ করে কেন দেখতে পাস না, তোর সঙ্গে মিশি বলেও ওর সন্দেহ জানিস্—

সে-এক অসহ্য অবস্থা দাতারবাবুর তখন। লক্ষ্মীদির সে-সব দিনকার কথা ভাবলেও আতঙ্ক হয় দীপঙ্করের। লক্ষ্মীদিকে দেখেই দীপঙ্কর নিজেকে যেন নতুন করে চিনতে পেরেছিল। সমস্ত দুঃখের মধ্যে অবিচল থাকার শিক্ষা লক্ষ্মীদির কাছেই তো পেয়েছিল দীপঙ্কর। আর সতী? সমস্ত সুখের মধ্যেও অশান্তির সর্বগ্রাসী দাহনে জ্বলার যে সুখ—সে তো সতীর কাছেই জেনেছিল দীপঙ্কর।

কিন্তু সে-সব কথাও পরে হবে।

মনে আছে গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং-এর ধারের সেই লক্ষ্মীদির বাড়িতে সেদিন লক্ষ্মীদির সব ব্যাপার শুনে দীপঙ্কর কেমন নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। তখনও কিন্তু জানতে পারেনি। কেমন করে বৌবাজারের চীনে-পাড়ার বাড়িটা থেকে আবার এখানে আসতে হলো, এই জলা-জমির ভাঙা বাড়িতে। হারিকেনের টিম্‌-টিমে আলোয় দাতারবাবুর ঘুমন্ত ক্লান্ত বিভ্রান্ত চেহারাটা দেখেই দীপঙ্কর খানিকক্ষণ নির্বাক হয়ে গিয়েছিল শুধু! আগের দিন শ্মশানের বাইরে গঙ্গার ঘাটের ধারে দাতারবাবুর পরিবর্তনটা অন্ধকারে ভালো বোঝা যায়নি। কিন্তু এখন যেন বড় মর্মান্তিক লাগলো দাতারবাবুকে দেখে। কেন এমন হলো?

লক্ষ্মীদি বললে—এদিকে আয়, সব বলছি, অনেক কষ্টে ঘুম পাড়িয়েছি এই একটু আগে—

দীপঙ্কর বললে—কেন? দাতারবাবু ঘুমোয় না নাকি?

—না, ডাক্তার বলেছে, ঘুমোলেই ভাল হয়ে যাবে, যত ঘুমোবে তত ভাল। মোটে ঘুম পাড়াতে পারি না! সমস্ত দিন-রাত কেবল কী যে ভাবে। ভেবে ভেবে ওইরকম মাথা গরম হয়ে গেছে—পাগলের মতন অবস্থা। আর একটু বাড়লে একেবারে পাগল হয়ে যাবে—

—কী ভাবেন এত?

লক্ষ্মীদি বললে—ভাবে আমি আর ওকে ভালবাসি না। সেই যে ওর এক পার্টনার ছিল, যার সঙ্গে ব্যবসা করেছিল তাকে কেবল সন্দেহ করে!

—সে কী?

—হ্যাঁ, সে বেচারী অনেক কষ্টে দু' হাজার টাকা ধার করে ওর সব দেনা মিটিয়ে দিয়েছে। বৌবাজারে যত বাড়িভাড়া বাকি ছিল সব শোধ করে দিয়েছে, এখন আর বলতে গেলে কোনও দেনাই নেই আমাদের, কিন্তু এই আর এক উপসর্গ এসে জুটেছে!

দীপঙ্কর বললে—কালকে রাত্তিরে তাই আমার যেন কেমন সন্দেহ হলো দাতারবাবুকে দেখে, সেই অত রাত্তিরে শ্মশানে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসে আছেন, মনে হলো যেন জলের ভেতরে নামছেন। আমি ডাকতেই পালিয়ে গেলেন—

লক্ষ্মীদি বললে—সেইজন্যেই তো চোখে-চোখে রাখি কেবল, আত্মহত্যা করতে চায় কেবল—

—কিন্তু তুমিই বা একলা সামলাবে কী করে?

—হঠাৎ একটু চোখের আড়াল হলেই বেরিয়ে যায়। কাল যখন বাড়ি এল, তখন অনেক রাত, রাত বোধ হয় একটা! আমারও ভয় হচ্ছিল খুব কিছুতেই ঘুম আসে না! তারপরে ওই রেলের লেভেল-ক্রসিংটা, ওইটের জন্যেই বেশি ভয় করে—

—কেন?

—অনেক অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে যে ওখানে। লাইন পার হতে গিয়ে অনেকে ট্রেনের তলায় কাটা পড়েছে। মাথার তো ঠিক নেই, হয়ত কখন অন্যমনস্ক হয়ে রেল-লাইনের ওপর দিয়ে হাঁটবে, আর ওদিক দিয়ে যে ট্রেন আসছে তার হয়ত খেয়ালই থাকবে না—

দীপঙ্কর বললে—তা এত জায়গা থাকতে এখানেই বা ঘর-ভাড়া নিতে গেলে কেন লক্ষ্মীদি! আর কোথাও ঘর পেলে না?

লক্ষ্মীদি বললে—কিন্তু এত সস্তায় তো আর কোথাও বাড়ি পাওয়া যাবে না—

মাত্র একখানা ঘর। আরও একখানা ঘর আছে বটে, কিন্তু সেটাকে ঠিক একখানা ঘর বলা চলে না। শুধু দেয়াল আছে চারদিকে। এই পর্যন্ত। সেই ঘরেই লক্ষ্মীদি বসালে দীপঙ্করকে। পাশের ঘরে দাতারবাবু অঘোরে ঘুমোচ্ছে। লক্ষ্মীদি একে-একে সব বলতে লাগলো ঘটনাগুলো।

লক্ষ্মীদি বললে—এইজন্যেই তোকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম—

বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকা ও বিদগ্ধ সমালোচকদের অভিনন্দনধন্য

জাতিস্মর কথা

এই ধরণের পুস্তক বাংলা ভাষায় প্রথম। একজন বিদগ্ধ সমালোচক লিখিয়াছেন—"অজানাকে জানিবার যে যুগ আসিয়াছে, এই যুগে এই গ্রন্থ আগের দিশারী বলিয়া খ্যাত হইবে। রচনা উচ্চাঙ্গের, উপন্যাসের মত সুখপাঠ্য।"

This book, I may hope with reason, will give inspiration and help to persons interested in the matter.—The Indian Journal of Parapsychology.

মূল্য: ৪·৭৫

প্রাপ্তিস্থান-প্রকাশক:
দি ঘাটশীলা কোম্পানী
৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

ডি, এম লাইব্রেরী
৪২নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

সুলভ মূল্যে
সেরা ৩টি জিনিষ
- শোনপাপড়ি— ৩, সের
- পোলাও— ২, „
- মালপো— ২, „

কমলা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার
প্রায় অর্ধশতাব্দীর প্রতিষ্ঠান
আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিঃ-৯
ফোন: ৩৫-১৩৭৯

এখন

আপনি আপনার মনোমত স্বাস্থ্যবর্ধক টনিক ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড

ভিটামিন যুক্ত

অবস্থায় গ্রহণ করুন

বর্তমানে আপনি ভারতের জনপ্রিয় স্বাস্থ্যদায়ক টনিক ভিটামিনে সমৃদ্ধ অবস্থায় কিনতে পারবেন। ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ডের বিখ্যাত ফর্মুলা স্বাস্থ্য ও স্ফূর্তিদায়ক ভিটামিনে সমৃদ্ধ করে তোলা হয়েছে। ওয়াটারবেরীজ ভিটামিন কম্পাউণ্ড নানা দিকে দিয়ে আপনার শরীরের পক্ষে ভালো। এটি রক্ত বৃদ্ধি করে, হৃত শক্তি ও সামর্থ্য ফিরিয়ে আনে, স্নায়ুগুলীকে সবল করে পেশীসমূহকে পুষ্ট করে তোলে ও রোগ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা গড়ে তোলে। অসুস্থতার পর স্বাস্থ্য দ্রুত পুণরুদ্ধার করে।

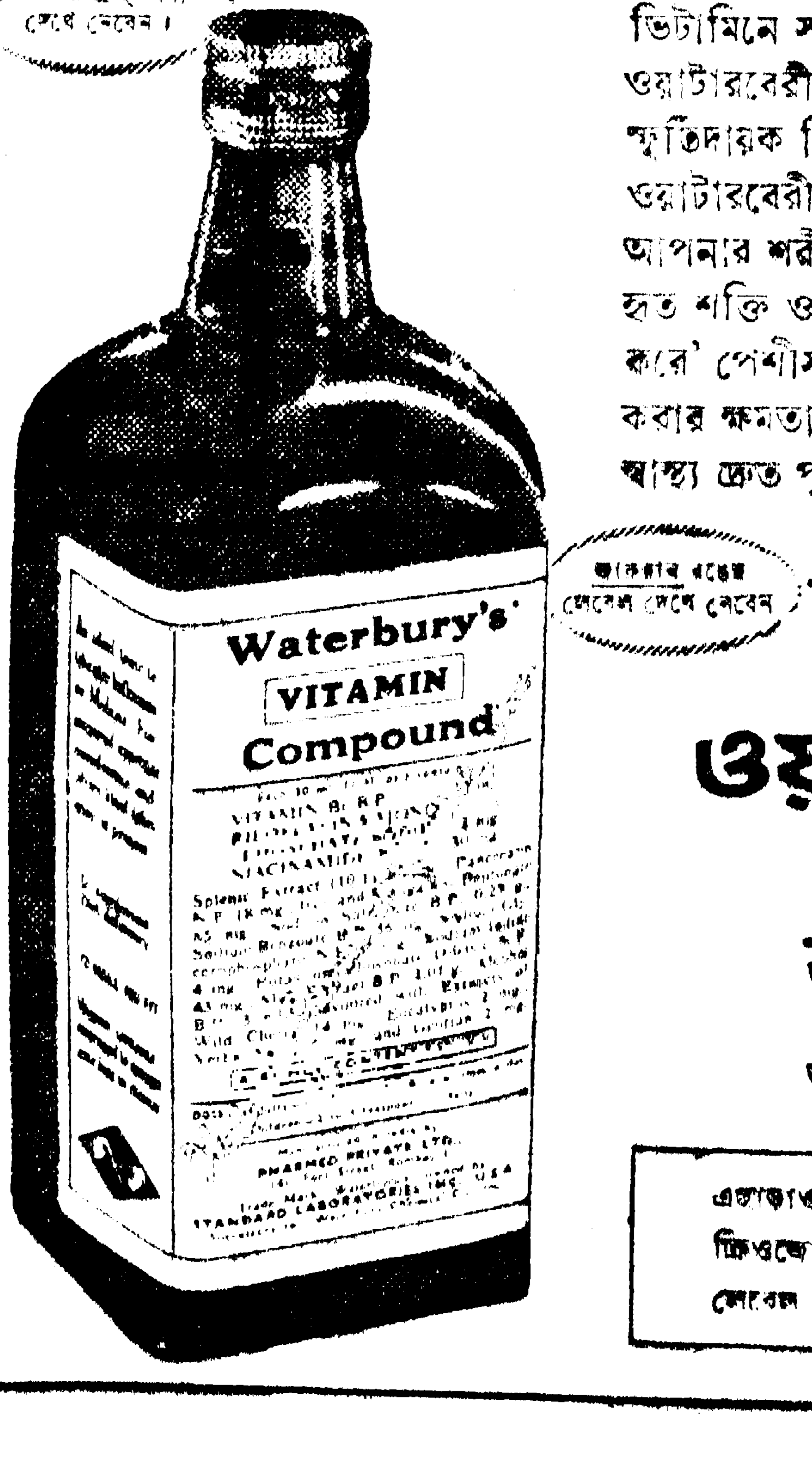

ওয়াটারবেরীজ

ভিটামিন

কম্পাউণ্ড

আপনার খাদ্যের পরিপূরক

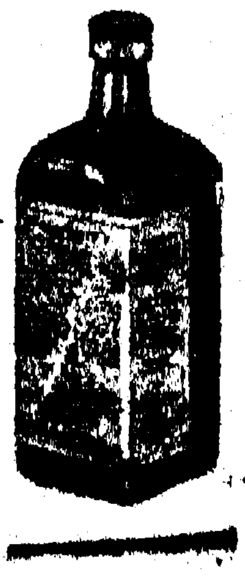

এতাছাড়া পাবেন—সর্দি-কাশির জন্য ক্রিওজোট ও গুয়াইকল সহযোগে প্রস্তুত লাল লেবেল মার্কা ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড

দীপঙ্কর বললে—আমার দ্বারা কী সাহায্য হবে তুমি বলো, তুমি যা বলবে আমি তাই-ই করতে পারি—আমি তো এখন আপিসে চাকরি করছি, আমার মাইনেও বেড়ে গেছে এই ক'দিনে।

লক্ষ্মীদি হঠাৎ বললে—এটা কী রে? তোর মণিব্যাগ—?

মণিব্যাগটা কখন প্যান্টের পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল টের পায়নি দীপঙ্কর।

দীপঙ্কর বললে—ওতে মাত্র বারো আনা পয়সা আছে—

তারপর একটু থেমে বললে—তোমার টাকার দরকার থাকে তো বলো লক্ষ্মীদি—আমি দিতে পারি টাকা—

লক্ষ্মীদি বললে—না, টাকার আমার দরকার নেই, সব দেয় অনন্ত—

—অনন্ত কে?

লক্ষ্মীদি বললে—শম্ভুর বন্ধু!—ওই যাকে এত সন্দেহ করো ও—

—কেন, সন্দেহ করো কেন?

লক্ষ্মীদি হেসে বললে—কে জানে? অনন্ত না থাকলে আজ কোথায় থাকতুম বল্ তো? অনন্ত না-থাকলে আজকে তো ওকে জেলে যেতে হতো! অনন্তকে দোষ দেওয়া সহজ, কিন্তু অনন্ত ছিল বলেই তো আজও টিকে আছি! সে-বেচারির সংসারে কেউ নেই, কার জন্যে সে করতে যাবে এত! তার কিসের দায়! আমি তার কেউ-ই না, তবু এত করে কেন?

অনন্তর কথা বলতে বলতে লক্ষ্মীদি যেন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

—প্রায় তো বৌবাজার থেকে আমাদের পথে বসবার অবস্থা হয়েছিল! জানিস, কী অবস্থা তখন আমাদের! তখন আমার হাতে একটা পয়সা নেই যে কিছু কিনে খাই। গয়নাগুলো তখন একে-একে সব বিক্রি হয়ে গেছে। বাড়িওয়ালা এসে বাড়ি-ভাড়ার তাগাদা করে, আর শুধু হাতে ফিরে যায়! কদিন আর শুধু হাতে ফিরে যাবে সে! তারপর, আমি একলা! সবাই কেমন সন্দেহ করতো! মারহাট্টি ভদ্রলোকের বাঙালী বউ, এটাই বা কী রকম! তবু ভাগ্যিস চীনে পাড়ায় ছিলুম তাই রক্ষে! আমি তো ভালো করেই জানতুম কাকাবাবু খুঁজবে আমাকে। আর একবার খবর পেলেই ধরে নিয়ে যাবে! তাই অনেক কষ্ট করেও সব মুখ বুজে সহ্য করতুম—

লক্ষ্মীদি তারপর হঠাৎ বললে—তোর খাওয়া হয়ে গেছে?

দীপঙ্কর বললে—আমি খেয়ে তবে এসেছি—এখুনি বললুম তো—

—আমার এখনও খাওয়া হয়নি। অনন্ত এলে তবে এক সঙ্গে খাবো!

—অনন্তবাবুও কি তোমার এখানে খায় নাকি?

—আমার এখানে খাবে না তো কোথায় খাবে? আমার এখানেই খায়, এখানেই শোয়! আর এখানে ছাড়া তার তো খাবার-থাকবার জায়গা নেই আর। তারও তো কেউ নেই কলকাতায়! তাছাড়া, এই বাড়ি-ভাড়া, এই এখানকার সংসার খরচ, এ-সব সে-ই তো চালাচ্ছে—! সেই জন্যেই তো শম্ভুর যত রাগ তার ওপরে—

দীপঙ্কর কথাগুলো শুনেছিল। কিছু মন্তব্য করলো না। একদিন শুধু দেখেছিল ভদ্রলোককে সেই বৌবাজারের ঘরে।

—কিন্তু লক্ষ্মীদি—

—কী বল্?

দীপঙ্কর বলবে না মনে করেও একবার জিজ্ঞেস করলে—অনন্তবাবু কী করেন?

লক্ষ্মীদি বললে—কোত্থেকে অনেক ধার-টার জোগাড় করে একলা আমাদের এই দেনা-টেনা সব শোধ করে দিয়েছে—এখন সারাদিন ওই খুচরো টুকি-টাকি উপায় করে, অর্ডার সাপ্লাই করে। শম্ভুর ছোট-বেলার বন্ধু ও—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—এখানেই এসে খাবে আজ?

—হ্যাঁ, রোজই খায়। এইটেই তো তার বাড়ি!

—তা এখুনি আসবে নাকি?

—এখনও আসতে পারে, এক ঘণ্টা দু' ঘণ্টা পরেও আসতে পারে। সে এলে এক সঙ্গে দু'জনে খাবো। নানান্ জায়গায় ঘোরাঘুরি করতে হয় কিনা? আজকাল ক্যাপিটেল্ না থাকলে ব্যবসা করা কী যে শক্ত তা জানবি কী করে তুই? অনন্ত বলে, বাজার নাকি ভীষণ খারাপ! ধারে জিনিস দেবার জন্যে লোক খোসামোদ করছে, কিন্তু কিনবে কে? কেনবার লোকই নেই!

—তাহলে আমি উঠি লক্ষ্মীদি, আমাকে তো আবার অনেক দূরে যেতে হবে!

—উঠবি কেন? এত তোর তাড়া কিসের? অনন্ত আসুক আগে, অনন্ত এলে তারপর না হয় যাস—আর কী খবর বল্, তোদের পাড়ার? মাসীমা কেমন আছে, আর সেই

তৈল জগতের শ্রেষ্ঠ অবদান
ভারতের 'পতাকা মার্কা'
ফোন ৩৫-২৭৭৪ প্যাকিং সরিষার তৈল
ভারত অয়েল মিল

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক, তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন!
যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র
বহু গাছ গাছড়া দ্বারা বিশুদ্ধ মতে প্রস্তুত
বাক্‌লা
ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন
ভারত গভঃ রেজিঃ নং ১৬৮৩৪৪
অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা,
মুখে টকভাব, ঢেকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দাগ্নি, বুকজ্বালা, আহারে অরুচি, স্বল্পনিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যাঁরা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও বাক্‌লা সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিফলে মূল্য ফেরৎ।
৩২ তোলার প্রতি কৌটা ৩৲ টাকা, একত্রে ৩ কৌটা — ৮৷৷৹ আনা। ডাঃ মাঃ ও পাইকারী দর পৃথক।
দি বাক্‌লা ঔষধালয়। হেড অফিস- বরিশাল (পূর্ব্ব পাকিস্তান)
ব্রাঞ্চ-১৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৭

ময়েটা? বিন্তী না কী নাম? তার বিয়ে হয়েছে?

অনেক কথা গড়-গড় করে জিজ্ঞেস করলে লক্ষ্মীদি। অনেক খবর নিলে। সতীর কী-রকম বিয়ে হলো, নেমন্তন্ন করেছিস কনা, শ্বশুরবাড়ি কোথায়! অনেক কথা সব!

হঠাৎ দীপঙ্কর বললে—আচ্ছা লক্ষ্মীদি—

—কী?

—ওকে তুমি এ-বাড়িতে শুতে দাও কেন?

—কাকে?

—ওই অনন্তবাবুকে! হাজার বন্ধু হলেও, এক-বাড়িতে শোয়া কি ভালো! দাতারবাবুর অসুখ, আর অসুখটা তো ওর জন্যেই। ওই অনন্তবাবুর জন্যেই! অনন্তবাবুকে তুমি অন্য বাড়িতে শুতে বলতে পারো না? এখানে খেলে দোষ নেই, কিন্তু শোওয়ার দরকারটা কী?

তারপর একটু থেমে বললে—কোথায় শোয় অনন্তবাবু? কোন্ ঘরে?

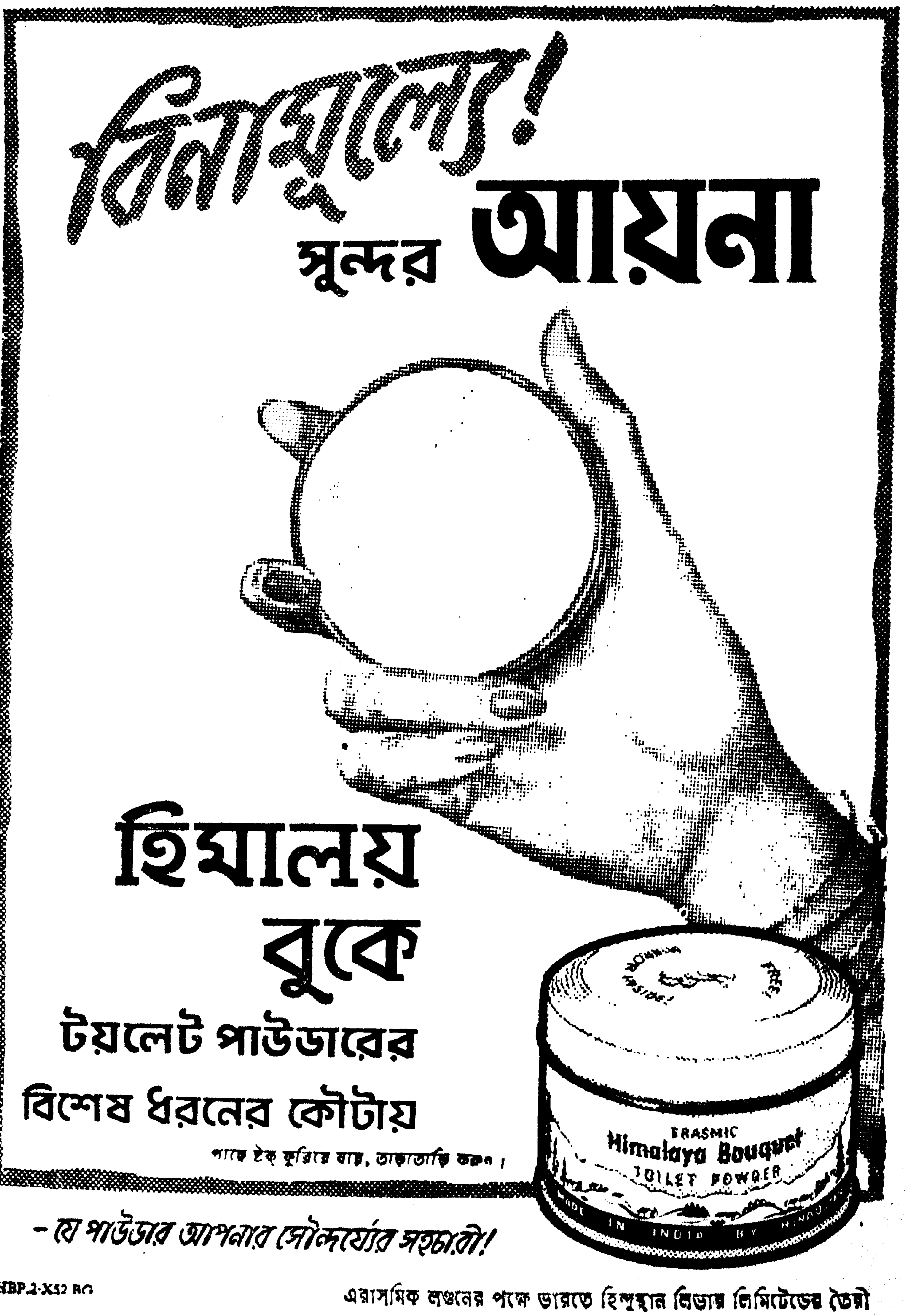

HBP.2-X52 BG

এরাসমিক লণ্ডনের পক্ষে ভারতে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের তৈরী

—এই তক্তপোষের ওপর। এটা তো অনন্তরই ঘর!

—আর তুমি? তুমি কোথায় শোও?

হঠাৎ বাইরে কড়া নাড়ার আওয়াজ হলো। লক্ষ্মীদি উঠলো। বললে—ওই অনন্ত এসেছে—

লক্ষ্মীদি দরজা খুলতে যাচ্ছিল। দীপংকর বললে—তাহলে আমিও আসি এখন, অনেক রাত হয়ে গেল—

—না বোস্, অনন্তর সঙ্গে দেখা করে যা! অনন্তর সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই তো তোকে ডেকে পাঠিয়েছি।

বলে লক্ষ্মীদি গলি দিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিতে গেল! রাত অনেক হয়েছে। আর বেশিক্ষণ দেরি করা চলে না। সেদিন দীপংকরের মনে হয়েছিল লক্ষ্মীদি যেন বড় অন্যায় করছে। শুধু অন্যায় নয়, অপব্যয় করছে নিজেকে। অথচ লক্ষ্মীদির যা বুদ্ধি, মেধা, তাতে যেন এমনভাবে এই অবজ্ঞাত জীবন যাপন করা তার পক্ষে অন্যায়। এমন করে এই অন্ধকার শহরের প্রান্তে একলা বিচ্ছিন্ন জীবন যেন লক্ষ্মীদির মানায় না। লক্ষ্মীদি এর চেয়েও কোনও বড়, কোনও মহৎ জীবনের জন্যেই যেন তৈরী হয়েছিল। যা হতে পারতো সে আলাদা কথা, কিন্তু এত দারিদ্র্যের মধ্যেও লক্ষ্মীদি যে মুখের হাসি কী করে অম্লান রাখতে পেরেছে, তাইতেই দীপংকর সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিল।

আর সেই অনন্তবাবু? অনন্ত রাও ভাবে আর শিবশম্ভু দাতার—দু'জনেই বহুদিনকার বন্ধু। পরে দীপংকর শুনেছিল—দু'জনেই এক হোটেলে থাকতো। এক সঙ্গে ব্যবসা করতো। কোম্পানীর দায়-দায়িত্ব সমস্ত ছিল দাতারবাবুর। কিন্তু শেয়ার দু'জনের সমান-সমান। অনন্ত রাওয়ের ব্যবসা খুচরো ব্যবসা। খুচরো কারবারের মালিক। অর্ডার সাপ্লাই করে অল্প মূলধন দিয়ে। হঠাৎ পাঁচশো মণ সরষের তেল সাপ্লাই করতে হবে তাতেও আছে, আবার এক টন ছোলা সাপ্লাই করতে হবে ফোর্ট উইলিয়মে তাতেও আছে। হাতে যা কাজ আসবে তাতেই রাজি। আর দাতার-বাবুর ছিল ইম্পোর্ট এক্সপোর্টের কারবার। বহুদিন আগে একদিন কলকাতাকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের বাণিজ্যের চাকা ঘুরতে আরম্ভ করেছিল। একদিন রাজপুতানা থেকে এসেছিল মারোয়াড়িরা, পাঞ্জাব থেকে এসেছিল শিখ, ইংলণ্ড থেকে এসেছিল ইংরেজরা, চায়না থেকে এসেছিল চীনেম্যান, আর হিন্দুস্তানী, বেহারী, পার্শি, ভোরা মুসলমান। সকলের জন্যে কলকাতায় রাজধানীতে নিরঙ্কুশ নিমন্ত্রণের স্থায়ী ব্যবস্থা ছিল। বাঙালীরা সরকারী চাকরি করেছে, সওদাগরী অফিসে গোলামী করেছে, হাতের লেখা ভাল করেছে, টাইপ-রাইটিং শিখেছে, স্কুল-মাস্টারি করেছে, কিন্তু বড়বাজার অঞ্চলটা রেখে দিয়েছিল ওদের জন্যে খোলা রাস্তা। সেখানেই একদিন প্রথম এসেছিল অনন্ত-রাও ভাবে। আর তারপর এসেছিল বর্মা ফেরত দাতারবাবু।

উনিশ শো তিরিশ বত্রিশ তেত্রিশের সেই বাঙলা দেশ। বাঙলা দেশে তখন আগুন নিয়ে খেলা চলেছে। মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলন, মদের দোকানে পিকেটিং, বিলিতি কাপড় বয়কট, সাইমন-কমিশন-রিপোর্ট, লর্ড আরউইনের ডোমিনিয়নের স্টেটাসের প্রস্তাব আর ওদিকে পৃথিবীজোড়া ট্রেড্-ডিপ্রেশন। তিন-রঙা কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ তখন সর্বত্র উড়ছে। রাস্তায় রাস্তায় ভলান্টিয়ারদের মিছিল, মিছিলের সঙ্গে বাড়ির মেয়েরা সেই প্রথম যোগ দিলে। বড়বাজারে মাড়োয়াড়ীরা মোটা চাঁদা দেয় কংগ্রেসকে। সেই বড়বাজারেও তখন মালের কেনা-বেচা কমে গেছে। অনেকে ফিরে গেছে যোধপুর, জয়পুর, বিকানীরে। যারা যেতে পারেনি, যাদের যাবার জায়গা নেই, তারা তখনও কেউ কেউ টিকে আছে। এই দাতারবাবু আর অনন্ত রাও ভাবের মত কয়েকজন।

অনন্তবাবু ঘরে ঢুকলো। আর তার আগে আগে লক্ষ্মীদি।

লক্ষ্মীদি ভেতরে এসে বললে—এই সেই দীপংকর, একে তো দেখেছ তুমি বৌবাজারে?

অনন্তবাবুও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ। অন্তত চেহারা দেখে তাই-ই মনে হলো দীপংকরের। দাতারবাবুর সঙ্গে একদিন দেখেছিল বৌবাজারের সেই চীনেপাড়ার বাড়িতে।

—আপনি রেলওয়েতে চাকরি করেন?

দীপংকর বললে—হাঁ—

—ছোট চাকরি না বড় চাকরি?

দীপংকর এ-কথার উত্তর দিলে না। কথাটার মধ্যে কোথায় যেন একটা অবজ্ঞার হুল লুকিয়ে ছিল। লোকটাকে সেই প্রথম দিনেই ভাল লাগেনি দীপংকরের।

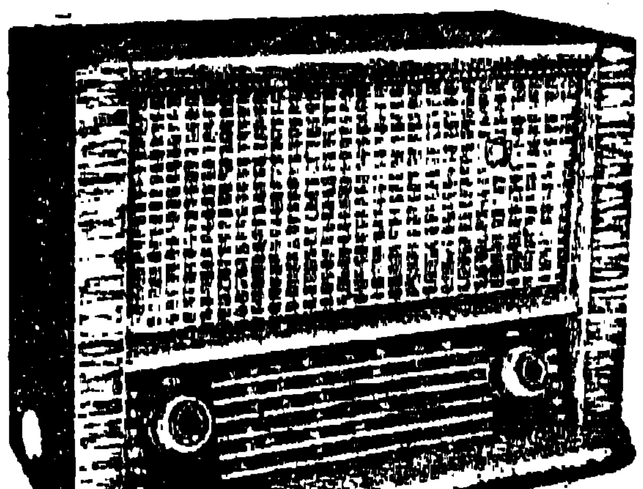

আমাদের নিকট নগদ মূল্যে অথবা সহজ কিস্তিতে অনেক রকমের রেডিও সেট্ পাওয়া যায়। এইচ, এম, ভি ও অন্যান্য রেডিওগ্রাম, লং-প্লেইং রেকর্ড, টেপ্ রেকর্ডার, "নিপ্পন্" অল-ওয়েভ্ ট্রানসিস্টার রেডিও, এম্‌প্লিফায়ার, মাইক, ইউনিট, হর্ণ, মাইক কেবল, রেডিও ও ইলেকট্রিকের বিভিন্ন প্রকারের সাজ-সরঞ্জামাদি বিক্রয়ের জন্য আমরা সর্বদা প্রচুর পরিমাণে মজুত করিয়া থাকি।

রেডিও এণ্ড ফটো স্টোর্স

৬৫, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩। ফোনঃ ২৪-৪৭৯৩

Amico's

GREEN LINIMENT

আপনি নিশ্চয় দৈহিক ব্যথায় যন্ত্রণা পাচ্ছেন- কোথায়?
কোমরে, হাঁটুতে, কিম্বা কোন সন্ধিস্থানে?
শুনে খুশী হবেন-
শারীরিক, বুক বা পিঠের পাঁজরার
বাতের ইত্যাদি যাবতীয় ব্যথায়

এ্যামিকো গ্রীন লিনীমেণ্ট

(সবুজ মালিশ)

বাস্তবিকই নির্ভরযোগ্য।

মূল্য বড় শিশি ২'৭৫ নঃ পঃ
ছোট শিশি ১'৭৫ নঃ পঃ
"মাশুল" স্বতন্ত্র

ব্যবস্থাপত্রের জন্য লিখুন—

আমিন এণ্ড ইসমাইল প্রাইভেট লিঃ

১৬ নং কলুটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১

দীপঙ্কর দাঁড়িয়ে উঠলো। বললে—আমি এবার যাই লক্ষ্মীদি?

লক্ষ্মীদি বললে—সে কি রে? যে-কাজটার জন্যে ডাকা সেইটেই তো হলো না।

দীপঙ্কর শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াল। বললে—অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে, আমি যাই, তা ছাড়া আমি আসতাম না তোমার কাছে, নেহাৎ তুমি চিঠি দিয়েছিলে বলেই এসেছিলাম আজ—

—কিন্তু আমার একটা উপকার করবি না?

—উপকার? দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল। এখন তো অনন্তবাবুই সব উপকার করছে লক্ষ্মীদির। ছ'হাজার টাকার দেনা শোধ করে দিয়েছে, বাড়ি-ভাড়া সব চুকিয়ে দিয়েছে! এখন আর কী দরকার দীপঙ্করকে!

দীপঙ্কর আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। ছোট ঘর, অনন্তবাবু নিজের জামা-টামা ছাড়বে! অত ছোট ঘরে এত লোককে ধরে না একসঙ্গে। আর তা ছাড়া লক্ষ্মীদি এই লোকটার সঙ্গে এত মেলা-মেশাই বা করে কেন? দাতারবাবুর এই অসুখ, তার কথা তো কই ভাবছে না এরা!

দীপঙ্কর বাইরে আসতে লক্ষ্মীদিও এল সঙ্গে সঙ্গে।

দীপঙ্কর পেছন ফিরে বললে—এখন, আমাকে কী জন্যে ডেকেছিলে, বলো!

লক্ষ্মীদি বললে—তুই রাগ করছিস কেন? অনন্তর কথার উত্তর দিলি না যে? কী হয়েছে তোর?

সত্যিই দীপঙ্করের আত্মসম্মানে যেন সেদিন ঘা লেগেছিল। বললে—তুমি কিছু মনে কর না লক্ষ্মীদি, আমি যেখানে যার সঙ্গেই মিশতে গেছি, যাকেই প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে গেছি, যারই উপকার করতে গেছি, সেখানেই একটা-না-একটা বাধা এসেছে—একটা গণ্ডগোল হয়েছে। এ আমার ভাগ্যেরই দোষ! নইলে আজ তো আমি তোমার সঙ্গে দেখা করবো বলেই, তোমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কাটাবো বলেই একেবারে মাকে বলে খাওয়া-দাওয়া সেরে এসেছিলাম—

—তা বোস্ না, গল্প কর না তুই! কে তোকে চলে যেতে বলেছে?

অন্ধকার গলির মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল তখন দু'জনে। বড় কাছাকাছি, বড় মুখোমুখি, বড় সামনা-সামনি। লক্ষ্মীদি একেবারে তার সামনে বুকের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল।

লক্ষ্মীদি বললে—বুঝেছি, তুই কেন চলে যাচ্ছিস! অনন্ত তোকে যদি কিছু বলেই থাকে, আমি তো আছি, আমি তোর কী করেছি? আমার ওপর তুই রাগ করছিস কেন?

দীপঙ্কর বললে—আগে বলো, ও লোকটা কে? ও-লোকটার সঙ্গে তোমার কীসের সম্পর্ক?

—হঠাৎ তুই একথা জিজ্ঞেস করছিস যে?

—না, তোমাকে বলতেই হবে, ওই অনন্তবাবুর কীসের স্বার্থ যে তোমাদের এত সাহায্য করে? এত টাকা খরচ করে কেন তোমাদের জন্যে? আর তুমিই বা ওর সঙ্গে এক বাড়িতে থাকো কেন?

লক্ষ্মীদি বললে—না রে, তুই যা ভাবছিস তা নয়! এতদিনেও তুই আমাকে চিনলি না?

দীপঙ্কর বললে—এখন বুঝতে পারছি দাতারবাবু কেন পাগল হয়েছে! তোমরাই দু'জনে মিলে দাতারবাবুকে পাগল করে তুলেছ, তুমি আর ওই তোমার অনন্তবাবু—

লক্ষ্মীদি আরো কাছে সরে এল। বললে—একটু আস্তে কথা বল, লক্ষ্মীটি—অনেক কষ্টে ওকে ঘুম পাড়িয়েছি, আবার জেগে উঠবে! তুই কিছু মনে করিসনি, শম্ভুর জন্যেই তোকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, অনন্তই তোকে ডাকতে বলেছিল—

—আমাকে? অনন্তবাবু আমাকে ডাকতে বলেছিল?

—হ্যাঁ, তুই যদি অনন্তকে একটা কাজ করে দিতে পারিস তোদের রেলে তো আমারও উপকার হয়, শম্ভুরও উপকার হয়।

দীপঙ্কর কিছু উত্তর দেবার আগেই অনন্তবাবু এসে দাঁড়াল।

অনন্তবাবু বললে—কী কথা হচ্ছে তোমাদের?

লক্ষ্মীদি বললে—এই যে দীপুকে নিয়ে যাচ্ছি, চলো—

বলে দীপঙ্করের হাত ধরে টানতে লাগলো। বললে—আয় না, একটুখানি বসে অনন্তর কথাগুলো শুনে যা না, যদি তুই কিছু করতে পারিস আমাদের জন্যে, দেখ্ না—

দীপঙ্কর অনিচ্ছে সত্ত্বেও আবার ঘরের ভেতরে গেল। লক্ষ্মীদি বসলো, অনন্তবাবু বসলো, দীপঙ্করও বসলো। অনন্তবাবু খুচরো অর্ডার সাপ্লাই করে মাঝে মাঝে রেলওয়েতে। সম্প্রতি একটা তিন হাজার টাকার কাজ ধরবার চেষ্টায় আছে। সেইটের জন্যে অনন্তবাবু চেষ্টা করছে। অনেকদিন ঘোরাঘুরি করেছে অনন্তবাবু। কাজটা

পেলে পাঁচশো টাকার মতন নেট প্রফিট্ থাকে—খরচ-খরচা বাদ দিয়ে।

দীপংকর জিজ্ঞেস করলে—কীসের কাজ? কোন্ ডিপার্টমেণ্ট?

অনন্তবাবু বললে—আপনাদের অফিসে মিস্টার এন কে ঘোষালের সঙ্গে আপনার জানাশোনা আছে?

দীপংকর স্তম্ভিত হয়ে গেল মিস্টার ঘোষালের নাম শুনে। বললে—কেন? তাঁর সঙ্গে আপনার কী দরকার?

অনন্তবাবু বললে—তিনিই তো যত গণ্ডগোল করছেন—

—কীসের গণ্ডগোল?

অনন্তবাবু বললে—অনেক টাকা চাইছে! অন্তত তিনশো টাকা চাই-ই তার, অথচ তিন শো টাকা দিলে আমার কী-ই বা থাকবে! আমি দু'শো পর্যন্ত দিতে রাজি! আপনার সঙ্গে বেশ জানাশোনা আছে?

দীপংকর বললে—অর্ডারটা স্যাংশান্ করবে কে!

অনন্তবাবু বললে—রবিনসন্ সাহেব!

সেদিন সেই অন্ধকার ঢাকুরিয়ার সেই ঘরটাতে বসে দীপংকর যেন বজ্রাহত হয়েছিল অনন্তবাবুর কথা শুনে! বাইরে থেকে যে-অফিসে প্রতিদিন সে যাচ্ছে, প্রতিদিন যে-অফিসে অ্যাটেনডেন্স-রেজিস্ট্রারে সই করে দৈনন্দিন কাজ করে চলেছে, সেখানকার ভেতরের ব্যাপার কোনওদিন তো কানে আসেনি তার। সোজাসুজি কাজ করে যায় কলমের খোঁচায়। নোট লেখে, ড্রাফ্‌ট পাঠায়, স্টেটমেণ্ট তৈরি করে, কিন্তু তার পেছনে যে এত রহস্য তা তো কখনও জানতো না দীপংকর! কোথাকার কোন্ বোর্ড থেকে টেলিগ্রাম আসে, আসে পাবলিকের কাছ থেকে। হেড্-অফিস থেকে অর্ডার গেলে তবে ডিভিশন্ থেকে সে হুকুমের তামিল হয়। বাইরে থেকে গেটে গুর্খা দারোয়ান, আর যত কিছু এস্টেব্লিশ্‌মেণ্টের আইনের কড়াকড়ি! কিন্তু এতদিন কাজ করছে দীপংকর, এ-সব তো জানা ছিল না। স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি সে। এত ফুটো সেখানে? এত ফাঁক? এত ফাঁকি?

লক্ষ্মীদি এতক্ষণ সব শুনছিল। বললে—হ্যাঁ রে দীপু, কী বলিস্ তুই? পারবি কিছু করতে? চিনিস তুই মিস্টার ঘোষালকে?

অনন্তবাবু বললে—আমি দু'শো টাকা পর্যন্ত দিতে পারি—কিন্তু তিনশো টাকা দিলে আমার কী থাকবে—সেইটে বলুন!

দীপংকর হঠাৎ বললে—তা রবিনসন্ সাহেব যখন স্যাংশন করবার মালিক, তখন মিস্টার ঘোষালের কাছে যাবার দরকার কী আপনার?

অনন্তবাবু বললে—মিস্টার ঘোষালই যে রবিনসন্ সাহেবের ডান হাত—মিস্টার ঘোষালকে যে রবিনসন্ সাহেব খুব বিশ্বাস করে—

দীপংকর বললে—আপনি রবিনসন সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিলেন কখনও?

অনন্তবাবু বললে—না, আমি একজন এন্‌লিস্টেড সাপ্লায়ার ওদের। কণ্ট্রোলার অব্ স্টোরসের অফিসে আমি নাম রেজিস্ট্রি করে নিয়েছি, তাতেও কিছু টাকা খরচ হয়েছে। নাম কি সহজে খাতায় ওঠে? নাম-ওঠানোই এক হ্যাঙ্গাম, তারপর একে খাওয়াও, ওকে খুশী করো, তাকে তোয়াজ করো! এখন বলছে মাল আমি সাপ্লাই করবো বটে কিন্তু ডি টি এস্ যদি রিজেক্ট করে তো পেমেণ্ট হবে না! আসলে এর সঙ্গে ওর সঙ্গে সব জড়ানো ব্যাপার—অর্থাৎ সবাইকে খাওয়াতে হবে। তা আমি দেখা করেছিলাম আপনাদের অফিসে—

—কার সঙ্গে?

অনন্তবাবু বললে—সে-নামটা আমি বলতে পারবো না। বলতে বারণ করে দিয়েছে ভদ্রলোক। তার হাত দিয়েই খায় মিস্টার ঘোষাল। তার নাম বললে আমার কাজটাই আটকে যেতে পারে।

দীপংকর বললে—ঠিক আছে, নাম আপনাকে বলতে হবে না। আমি আপনার কাজটা করে দেব। আপনাকে আর মিস্টার ঘোষালের কাছে যেতে হবে না। আর খাওয়াতেও হবে না কাউকে। একটা পয়সাও লাগবে না আপনার। এবার থেকে যত কাজ পাবেন আপনি, সব আমার কাছে নিয়ে যাবেন, আমি নিজে আপনাকে রবিন্‌সন্ সাহেবকে দিয়ে সব করিয়ে দেব—

লক্ষ্মীদি খুশী হলো খুব—করবি তুই দীপু? করবি ভাই?

দীপংকর বললে—আপনি কাল আমার অফিসে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবেন, আমি থাকবো।

—কোথায় বসেন আপনি?

দীপংকর বললে—ঠিক রবিনসন সাহেবের পাশের ঘরে—যেখানে সাহেবের স্টেনোগ্রাফার বসে, সেই এক ঘরেই—আমি রোজ বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত থাকি—

লক্ষ্মীদি অনন্তবাবুকে বললে—সেই তো ভালো হলো, তুমি মিস্টার ঘোষালের কাছে না গিয়ে দীপুর কাছে যেও, দীপুই তোমাকে রবিনসন সাহেবের কাছে নিয়ে যাবে—

তারপর দীপংকরের দিকে চেয়ে বললে—আগে ব্যবসা যে-রকম ছিল তেমন থাকলে কোনও অসুবিধে হতো না আমাদের। বুঝলি। আগে শম্ভু দু'হাতে লাভ করেছে। আমি তো দেখেছি, টাকা খরচ করতো দু'হাতে। আর এখন যে কী হলো, সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল হঠাৎ—

মনে আছে সেদিন লক্ষ্মীদির কথাগুলো শুনে ভারি হাসি এসেছিল দীপংকরের। লক্ষ্মীদি এই ক'মাসের মধ্যেই এমন গৃহিণী হয়ে উঠেছে, এমন সংসারী হয়ে উঠেছে যে, দেখলে বিশ্বাস করা যায় না যেন। লক্ষ্মীদির মুখের দিকে চেয়ে দেখলে দীপংকর। যেন

যতীশ চট্টোপাধ্যায়ের অভিনব অবদান

মৃত্যুশোক অমর প্রেমের অনবদ্য কাহিনী, অখিল মানব মনের অনুদ্ঘাটিত চিত্র; তাপিত জীবনের শান্তিদূত। মূল্য ১, ডাক ফ্রি। ভি পি হয় না।

মনীষা তীর্থ, প্রীতিনগর, নদীয়া।

(সি-৭০৯৩।১)

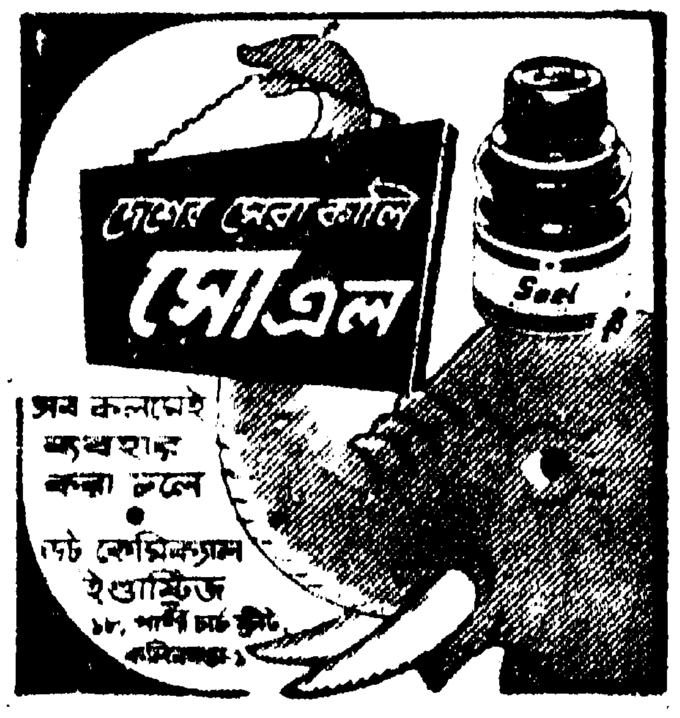

ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠ

যাঁহাদের বিশ্বাস এ রোগ আরোগ্য হয় না, তাঁহারা আমার নিকট আসিলে ১টি ছোট দাগ বিনামূল্যে আরোগ্য করিয়া দিব।

বাতরক্ত, অসাড়তা, একজিমা, শ্বেতকুষ্ঠ, বিবিধ চর্মরোগ, ছুলি মেচেতা ব্রণাদির দাগ প্রভৃতি চর্মরোগের বিশ্বস্ত চিকিৎসাকেন্দ্র।

হতাশ রোগী পরীক্ষা করুন।

২০ বৎসরের অভিজ্ঞ চর্মরোগ চিকিৎসক

পণ্ডিত এস শর্মা (সময় ৩—৮)

২৬/৮, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯

পত্র দিবার ঠিকানা পোঃ ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা

আরো ভারি হয়ে গেছে লক্ষ্মীদি এই ক'দিনের মধ্যেই। আগে যেন আরো পাতলা ছিল, আরো হাল্কা। একটা আটপৌরে ব্লাউজের ওপর আরো আটপৌরে একটা শাড়ি জড়িয়েছে গায়ে। দু'হাতে শাঁখা ছাড়া আর কোনও গয়না নেই। গোল-গোল ফরসা হাত দুটো আর আধ-খোলা গলাটা নিরাভরণ। শুধু বাইরের দিকেই নয়, ভেতরে-ভেতরেও যেন সেই লক্ষ্মীদি একেবারে আগাগোড়া বদলে গিয়েছে। আগে ঘুম থেকে ওঠার আগে বিছানার পাশে চা না দিলে ঘুমই ভাঙতো না লক্ষ্মীদির। আগে কাকিমা কলেজ থেকে আসার পর খাওয়া নিয়ে সাধাসাধি। সেই মেয়ে কোথায় পড়ে রইল, কোথায় কোন্ প্রান্তে এসে কার সংসার করছে, আশ্চর্য! সত্যিই লক্ষ্মীদি বলেছে ঠিক, কী যে হলো যেন সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল হঠাৎ!

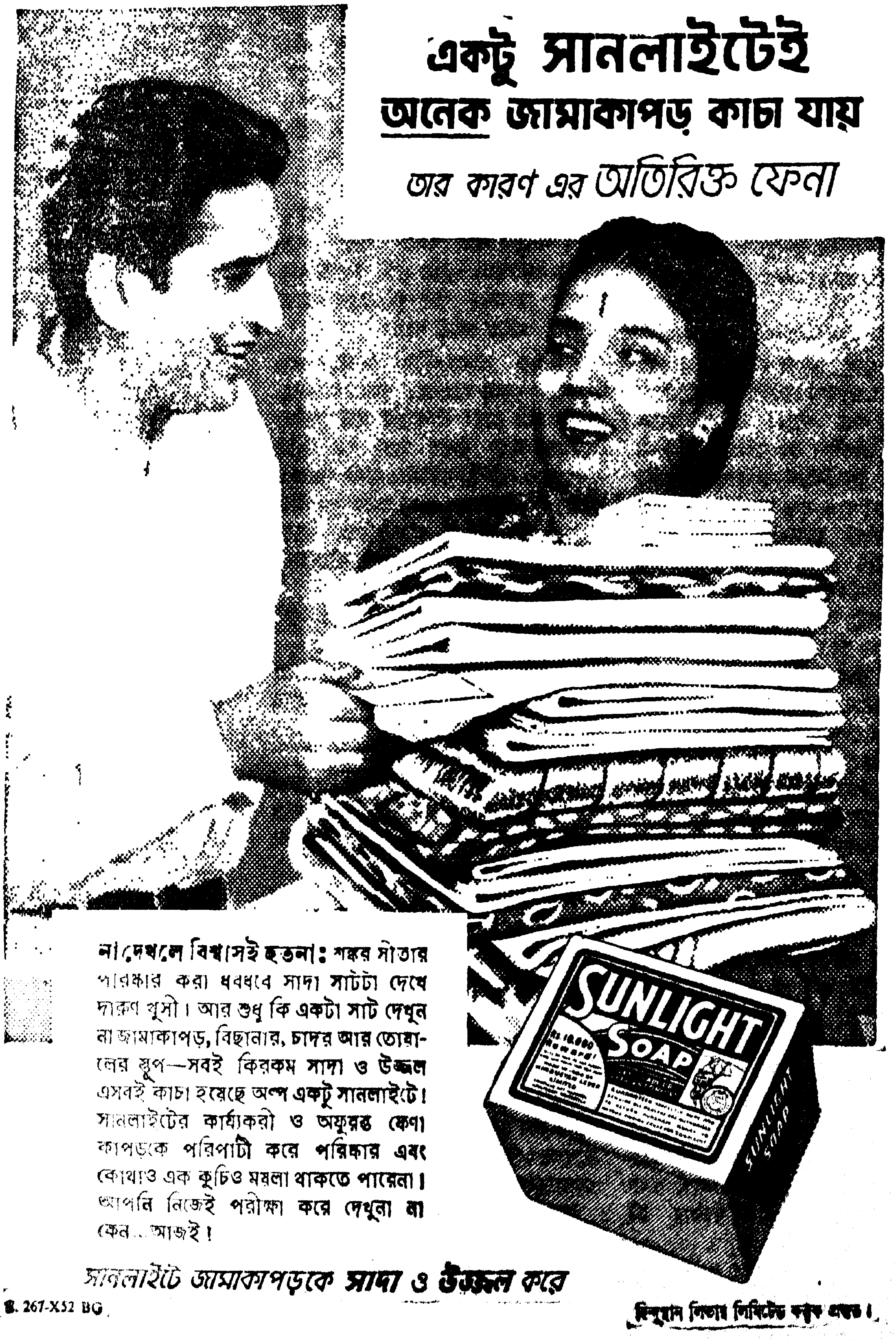

বাইরে গলির কাছে এসেও যেন দীপঙ্করের চলে যেতে ইচ্ছে করছিল না।

বললে—আমি তাহলে আসি—

লক্ষ্মীদি বললে—দাঁড়া। তুই অন্ধকারে যেতে পারবি না, আমি দরজা খুলে দিচ্ছি—

বাইরে দরজার কাছে এসে দীপঙ্কর পা বাড়িয়েও একটু থামলো। বললে—তা হলে আমি আসি লক্ষ্মীদি—

লক্ষ্মীদি বললে—আয়—

দীপঙ্কর বললে—এতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হলো, আর কিছু কথা জিজ্ঞেস করবে না? আর কারো কথা?

লক্ষ্মীদি অবাক হয়ে গেল একটু। বললে—আর কা'র কথা জিজ্ঞেস করবো, বল্?

—কারো কথাই তোমার জিজ্ঞেস করবার নেই? এতদিন ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে ছিলে, কাকাবাবু, কাকীমা, সতী,—সকলকে ভুলে গেলে একেবারে!

লক্ষ্মীদি বললে—কই, ভুলিনি তো?

—কিন্তু তাদের কথা তো একবারও জিজ্ঞেস করলে না! এমন করে তুমি সকলকে ভুলে যেতে পারলে? কিন্তু তার বদলে তুমি পেলে কী, সত্যি বলো তো? এই তোমার অবস্থা তো আজ নিজের চোখের ওপরেই দেখে গেলাম, এতে তুমি সুখী হয়েছ মনে করো! এই যে যার জন্যে তুমি সব কিছু ছেড়ে চলে এলে, তাকেও কি সুখী করতে পেরেছ তুমি? আর কোথাকার কে একজন, যার সঙ্গে তোমার কোনও সম্পর্ক নেই, সেই তারই দয়ার ওপর নির্ভর করে তোমার ভরণ-পোষণ চালাতে হচ্ছে—এটাও কি খুব গৌরবের মনে করো!

লক্ষ্মীদি কোনও কথার উত্তর দিতে পারলে না।

দীপঙ্কর বললে—সত্যি বলো তো, আবার জিজ্ঞেস করছি, ও-লোকটা তোমার কে? ওর সঙ্গে তোমার কীসের সম্পর্ক এখন! ও তোমাদের জন্যে এত করে কেন? কীসের স্বার্থে?

লক্ষ্মীদি হঠাৎ যেন নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—রাত হয়ে গেল, তোর ফিরতে দেরী হবে—তুই বাড়ি যা—

দীপঙ্কর বললে—যাবো তো আমি নিশ্চয়ই, তোমার এখানে থাকতে আসিনি, কিন্তু আমার কথার জবাব দাও—

লক্ষ্মীদি বললে—তুই জানিস না, অনন্ত না-থাকলে আমাদের এই বিপদের সময়ে কী হ'তো ভাবাই যায় না। ও অনেক করেছে, এখনও করছে। সেই জন্যেই তো বলছি ওর কাজটা তুই যদি পারিস তো করে দে—ওতে আমারই উপকার—

—তোমার উপকার হবে বলেই তো করছি, নইলে ওর সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক।

—হ্যাঁ, আমার নিজের উপকার হবে বলেই তোকে আজ চিঠি পাঠিয়েছিলুম। দেনাটা শোধ হয়ে গেলে আমি শম্ভুকে তাহলে এখান থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবো, তখন কেউ আর থাকবে না আমাদের সঙ্গে,—তখন আর কারো দয়ার ওপর নির্ভর করতে হবে না আমাকে—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করল—কিন্তু দাতারবাবুর চিকিৎসা কি করাচ্ছো?

—আমি মেয়েমানুষ, কী আর করবো বল্, ওই অনন্তই ডাক্তার দেখাচ্ছে—

—ডাক্তার কী বলছে?

—ডাক্তার আর কী বলবে, আমি তো নিজেই বুঝতে পারছি, কেবল সন্দেহ করে, সন্দেহবাতিক এসেছে ভীষণ! আমাকে সন্দেহ করে, অনন্তকে সন্দেহ করে। কেবল ওর মাথায় ঢুকেছে যে আমি বুঝি আর ওকে তেমন করে ভালবাসি না, ওর কেবল সন্দেহ আমি ওকে ছেড়ে পালিয়ে যাবো—

হঠাৎ ভেতরে যেন দাতারবাবুর গলা শোনা গেল। দুর্বোধ্য ভাষায় কী সব চীৎকার করে বলছে পাশের ঘর থেকে।

লক্ষ্মীদি চমকে উঠেছে। বললে—ওই দ্যাখ্ শম্ভুর ঘুম ভেঙে গেছে, আমি যাই—

অনন্তবাবু এসে গেল। বললে—এই দেখ শম্ভু উঠেছে,—

তারপর দীপঙ্করের দিকে চেয়ে বললে—তোমার তো রাত হয়ে গেল, অনেক দূরে তো যেতে হবে তোমাকে—

লক্ষ্মীদি বললে—তাহলে আবার আসিস, তুই দীপু—

—আসবো—

তারপর অনন্তবাবু বললে—আপনি কিন্তু যাবেন ঠিক, আমি সাহেবকে বলে সব বন্দোবস্ত করে দেব—আপনার একটা টাকাও খরচ হবে না—

বলে অন্ধকারের মধ্যে পা বাড়াল দীপঙ্কর। একেবারে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার চারিদিকে। নিচু জমি। দু'পাশে নর্দমায় কাদা জমে আছে। তাড়াতাড়ি দীপঙ্কর পা চালিয়ে চললো। এখান থেকে অনেকখানি হেঁটে যেতে হবে। তারপর সেই মোড় থেকে ট্রাম। ট্রাম এত রাত্রে হয়ত বন্ধ হয়ে গেছে। আশে পাশে কোথাও ঘড়ি নেই। রাত বোঝা

শারদীয় ফসল
মহালয়ার আগে প্রকাশিত হবে
দাম দেড় টাকা
এজেন্সির জন্য যোগাযোগ করুন
৩৭ কাশীনাথ স্কুল লেন,
সালকিয়া হাওড়া

কুমারেশ
লিভার ও পেটের পীড়ায়

টিক্-20
টাটা—ফাইসনের তৈরী
ছারপোকা ধ্বংস করে
গেইগী
ডায়াজিনন

যাবার উপায় নেই। দীপংকর লেভেল-ক্রসিংএর গেটটা পেরিয়ে ওপারে চলে গেল। যদি ট্রাম না থাকে তো সমস্ত রাস্তাটা হে'টেই যেতে হবে। তারপর কাল সকালেই আবার অফিস আছে। আবার সেই জাপান ট্র্যাফিক, আবার সেই মিস্টার ঘোষাল! কালকেই যেতে বলে দিয়েছে অনন্তবাবুকে। কী আশ্চর্য! নৃপেনবাবু তবু ভাল। তেত্রিশ টাকায় তার লোভ মিটে যায়—আর এ চায় দু'শো টাকা!

হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে চমকে উঠেছে! মনিব্যাগটা কোথায় গেল। তার পার্স!

তার ভেতরে যে পয়সা আছে। ট্রাম ভাড়া দেবে কী করে? অবশ্য বেশি পয়সা নেই। বোধহয় আনা আস্টেক হবে সব সুদ্ধ। সেই লক্ষ্মীদির ওখানেই পড়ে আছে ঠিক।

তাড়াতাড়ি আবার ফিরলো দীপংকর। এই টুকু রাস্তা যাতায়াতে আরো হয়ত মিনিট পনেরো লাগবে। তা হোক, কিন্তু মনিব্যাগটা না হলে কী করে চলবে। কাল তো আবার অফিসে যেতে হবে সকালবেলাই।

বীরেশ্বর ভট্টাচার্যের
মহাভারতের গল্পগুচ্ছ
তারাপদ রাহার
ছোটদের বেতাল পঞ্চবিংশতি
পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর
ছোটদের আরব্য উপন্যাস
এ. কে. সরকার এণ্ড কোং
কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা-১২

কে, হোড়ের
মহাভৃঙ্গরাজ

ধবল বা শ্বেত

শরীরের যে কোন স্থানের সাদা দাগ, একজিমা, সোরাইসিস ও অন্যান্য কঠিন চর্মরোগ, গাত্রে উচ্চবর্ণের অসাড়যুক্ত দাগ, ফুলা, আঙ্গুলের বক্রতা ও দূষিত ক্ষত সেবনীয় ও বাহ্য দ্বারা দ্রুত নিরাময় করা হয়। আর পুনঃ প্রকাশ হয় না। সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। **হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর**, প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট হাওড়া। **ফোন** : ৬৭-২৩৫৯। শাখা : ৩৬ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯। (পূরবী সিনেমার পাশে)।

আবার সেই গেট্টা পেরোতে হলো। গেটটা তখনও বন্ধ রয়েছে। অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে। গুড্স্ ট্রেন আসছে বোধ হয়। দোতলা গুমটি ঘরের ওপরে আলো জ্বলছে। ভূষণ মালী তখন ভেতরে। গেট বন্ধ করে ভেতরে সাউথ্ কেবিনের সংগে কথা বলছে টেলিফোনে। রাস্তা থেকেও তার গলা শোনা যায়।

—হ্যাল্লো, থ্রি-সেভেনটিন আপ? গেট্ বন্ধ করেছি হুজুর—

—না না সনাতন নই, আমি ভূষণ! ভূষণ মালী! সেকেন্ড নাইট্ ডিউটি হুজুর—

সেই ভূষণ! ভূষণের গলা শুনলেই চেনা যায়। পরে রবিন্সন্ সাহেবের সংগে যখন দীপংকর লাইন দেখতে এসেছিল, তখন ওই ভূষণই ছিল ডিউটিতে। বিনয়ের অবতার একেবারে ভূষণ! সেলাম করতে ভূষণের ক্লান্তি নেই। রবিন্সন্ সাহেব খুব ভালবাসতো ভূষণকে।

রবিন্সন্ সাহেব দীপংকরকে জিজ্ঞেস করেছিল—ইজ্ হি এ সাউথ ইন্ডিয়ান সেন?

রবিন্সন্ সাহেবের কী একটা ধারণা হয়েছিল ভালো লোক হলেই সে সাউথ্-ইন্ডিয়ান হবে। তা না হয়ে পারে না। মিসেস রবিন্সনের সংগেও তখন দীপংকরের খুব পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। সাহেবের সংগে মেম-সাহেবও লাইনে আসতো মাঝে মাঝে। যখন এই লেভেল-ক্রসিং গেট্ আরো চওড়া হলো তখন প্রায়ই আসতে হতো এখানে। কখনও সাহেবের গাড়িতে, কখনও ট্রলিতে! সাহেবের কুকুর জিমিও আসতো। সবাই নামতো গাড়ি থেকে। নেমে মাপা হতো, ইনস্পেকশন্ হতো—। সেই সময়েই ভূষণ মালী এসে সাহেবের কাছে দাঁড়াতো। আর সিগারেট মুখে মিসেস্ রবিনসনের মুখের দিকেও অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতো!

রবিন্সন্ সাহেব একদিন জিজ্ঞেস করেছিল ভূষণকে—হোয়াট্ ইজ্ ইয়োর পে গেটম্যান্?

দীপংকর বুঝিয়ে দিয়েছিল ভূষণকে। বলেছিল—সাহেব জিজ্ঞেস করছে তুমি কত মাইনে পাও?

ভূষণ বলেছিল হুজুর আঠারো রুপেয়া!

রবিন্সন্ সাহেব তাতেও খুশী হয়নি। জিজ্ঞেস করেছিল—আর ইউ স্যাটিস্ফায়েড্?

দীপংকর তর্জমা করে বুঝিয়ে দিয়েছিল—সাহেব জিজ্ঞেস করছে, তুমি ওই মাইনেতে খুশী?

ভূষণ বলেছিল—জী হুজুর, খুশী—

সাহেবও তখন উত্তর শুনে খুশী হয়েছিল। বলেছিল—সী, হি ইজ্ হ্যাপি—

কাউকে অসুখী দেখতে চাইত না রবিন্সন্ সাহেব। সাহেব চাইতো সবাই যেন সন্তুষ্ট মনে, সুস্থ চিত্তে কাজ করে। তবে ভাল করে কাজ চলবে রেলওয়ের।

চলতে চলতে দীপংকর গেট্টা পেরিয়ে আবার গিয়ে দাঁড়াল সেই তিপ্পান্ন নম্বর বাড়িটার সামনে। হয়ত লক্ষ্মীদিরা এতক্ষণে সবাই শুয়ে পড়েছে। রাত তো কম হয়নি। আবার তাদের ডেকে ঘুম ভাঙাতে হবে। নর্দমাটা ডিঙিয়ে দীপংকর সদর-দরজাটার কড়া নাড়তেই যাচ্ছিল। কিন্তু আশ্চর্য, দরজাটা শুধু ভেজানো ছিল। একটু ঠেলতেই খুলে গেল। বন্ধ করতে হয়ত ভুলে গিয়েছে।

ভেতরে তেমনি অন্ধকার। সরু গলিটার মধ্যে ঢুকতেই দীপংকরের কানে গেল দাতারবাবুর সেই চিৎকার। সেই আগেকার মতন চিৎকার করছে। তাহলে এখনও ঘুমোয়নি নিশ্চয়ই। হয়ত দাতারবাবুকে জোর করে খাওয়াচ্ছে, জোর করে খাওয়াবার চেষ্টা করছে। আহা! দীপংকরের মন থেকে আহা শব্দটা নিজের অজ্ঞাতেই বেরিয়ে এল। আশ্চর্য লক্ষ্মীদির কপাল! কত সুখ ছেড়ে এই এখানে কী কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে!

হঠাৎ গলির শেষে পৌঁছোতেই দীপংকর চমকে উঠলো।

ভেতর থেকে একটা উদ্দাম হাসির শব্দ কানে এল। এমন করে হাসছে কে? এত রাত্রে। ঘরের ভেতরে আলো জ্বলছে। দীপংকর জানালা দিয়ে ভেতরে চোখ ফেলতেই অবাক হয়ে গেল।

ঘরের মেঝের ওপর লক্ষ্মীদি আর অনন্তবাবু মুখোমুখি খেতে বসেছে। আর খেতে খেতে দুজনে কী একটা কথায় প্রাণ খুলে হাসছে। হাসির দমকে দুজনেই ফুলে ফুলে উঠছে। ভারি একটা মজার কথায় যেন হাসি আর চাপতেই পারছে না।

দীপংকর জানালা থেকে মুখটা সরিয়ে নিলে। ও-পাশ থেকে দাতারবাবুর চিৎকার তখনও চলেছে সমান তালে! সেদিকে কারো খেয়াল নেই। এরা হেসেই চলেছে! দাতারবাবুর এই চিৎকারের মধ্যেও হাসি আসছে এদের!

না, দরকার নেই। হেঁটেই বাড়ি যাবে দীপংকর। যত রাতই হোক, যত দূরই হোক। মনিব্যাগ তার দরকার নেই। বারো আনার পয়সার জন্যে ওদের হাসিতে বাধা দেবার দরকার নেই বারো আনার ক্ষতি দীপংকর সহ্য করবে। আর কালকেই তো মাইনের তারিখ। মাসের পয়লা!

রাস্তা দিয়ে চলতে তখনও যেন লক্ষ্মীদিদির হাসিটা কানে আসতে লাগলো। সেই উদ্দাম, উচ্ছল হাসি। আর দাতারবাবুর সেই বীভৎস চিৎকার। সেই চিৎকার আর পাশের ঘরেই এদের হাসি। একেবারে পাশাপাশি।

(ক্রমশ)

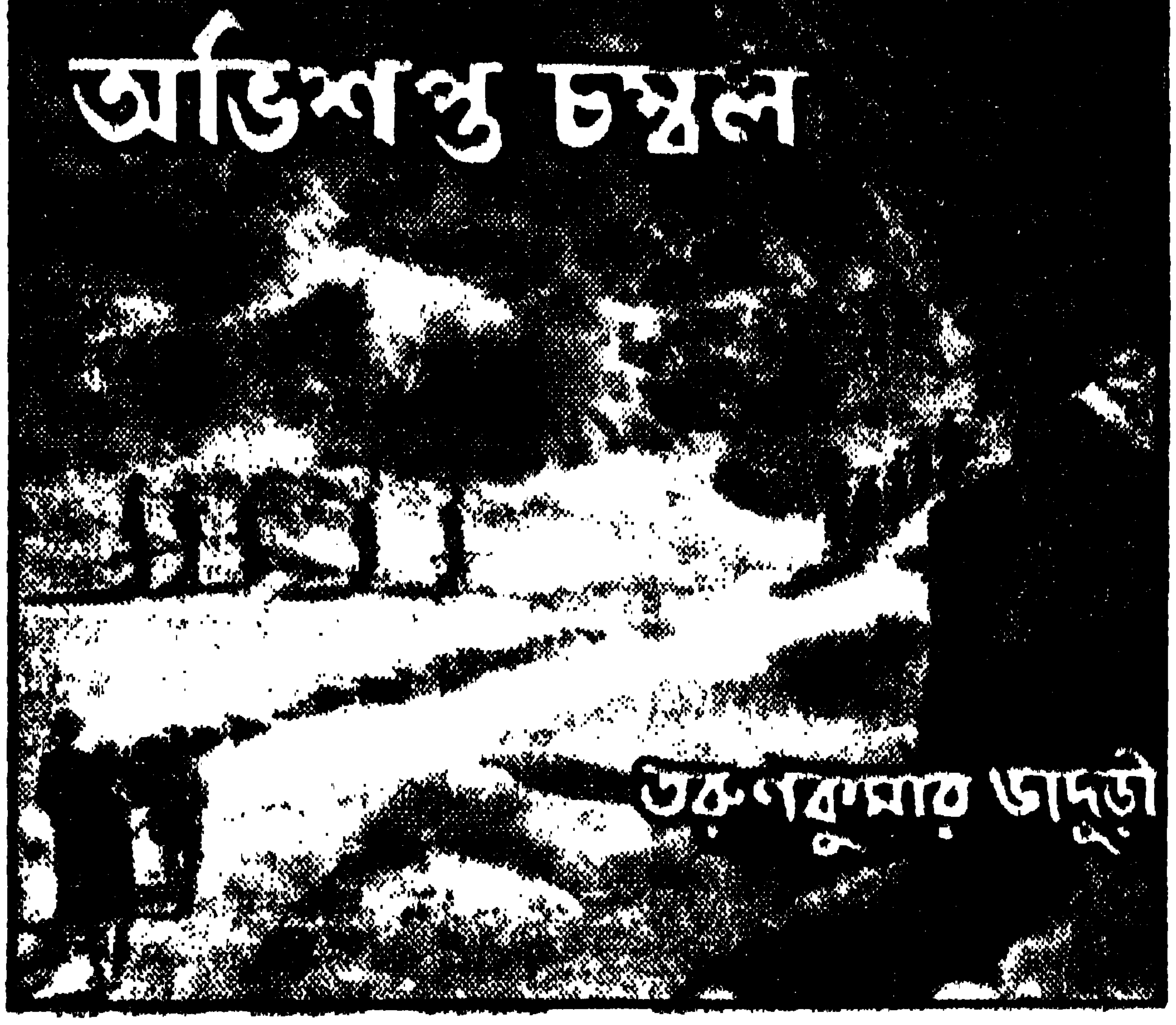

॥ উনিশ ॥

আকাশের বুকে টিম্‌টিম্‌ করে জ্বলছে শত সহস্র তারা। ওপার থেকে সিরসির করে ভেসে আসা হাওয়ায় লাগছিল শিহরণ। আধো-আলো আধো-আঁধারে দূরে থেকে অভিশপ্ত চম্বলকে দেখাচ্ছিল ঘুমন্ত একটা বিরাট অজগরের মত। বালুরাশি ভেংগে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি ছায়ামূর্তির মত। যখন দাঁড়ালাম তখন মধ্যপ্রদেশের শেষ সীমানায় এসে পেঁৗছেছি। অভিশপ্ত চম্বল বয়ে চলেছে সামনে। শান্ত, ধীর নিস্তব্ধ, অতি নিস্তব্ধ গতি তার। এ'কে-বে'কে চলে গিয়েছে অনেক দূরে, তারপরই বেহড়ের পাশে বাঁক ঘুরে হয়েছে অদৃশ্য।

উস্লেটঘাট। মধ্যপ্রদেশের সীমানা চম্বলের এপারে মধ্যপ্রদেশ ওপারে উত্তর প্রদেশ। সোজা বাঁ দিক ধরে চম্বলের সংগে সংগে চলে গেলেই মাইল পাঁচেক দূরেই শুরু রাজস্থান।

"হ্যালো ম্যান", কখন যে চুপচাপ পায়ে এসে কমাণ্ডান্ট কুইন দাঁড়িয়েছে জানতেও পারিনি। তারপর ধীরে ধীরে অনেকেই ভীড় করেছে উস্লেট ঘাটে অভিশপ্ত চম্বলের তীরে। খানিক দূরে বালির ওপর আগুন জ্বালিয়ে তার চার পাশে ভীড় করেছে আরেকটা ছোটো দল। নিস্তব্ধ রাতের বুকে আগুনের শিখা মাঝে মাঝে লক্‌লক্‌ করে উঠছিল আর কানে ভেসে আসতে লাগল—ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম, সবকো সন্মতি দে ভগবান। জয় রঘুনন্দন জয় সীতারাম জানকীবল্লভ সীতারাম। রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিত পাবন সীতারাম।" মৃদু হাততালির সংগে তাল মিলিয়েছে অভিশপ্ত চম্বল, ছলাং-ছল ছলাং-ছল। সবাই-কার দৃষ্টি ওপারে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট একটা বেহড়। হঠাৎ গুঞ্জন ধ্বনি উঠেছে এপারে। দাঁড়িয়ে উঠেছে এপারের লোকেরা। বেহড়ের বাঁকে দেখা গেল দুটো লণ্ঠনের আলো আর শোনা গেল অনেক লোকের পদধ্বনি। এপারের দুটো নৌকায় পড়ল টান আর ধীরে ধীরে চলতে লাগল ওপারে। রুস্তমজী সাহেব আর কমাণ্ডান্ট কুইন আমার দু পাশে। রাতের অন্ধকারের বুক চিরে ওপার থেকে শোনা গেল "জয় জগৎ"। শাঁখ আর ঘণ্টা ধ্বনিতে মুখরিত হল নিঝুম রাত।

শান্তিদূত আচার্য বিনোবা ভাবে প্রেমের বর্তিকা হাতে নিয়ে শান্তি অভিযানে আসছেন নরহত্যায় কলুষিত, রক্ত ও ধূলি-কণায় ভরা অভিশপ্ত চম্বলের উপত্যকায়; অভিশপ্ত চম্বলের শতাব্দীর অভিশাপ মুছে ফেলতে!—হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর, নির্মম পাষাণ-হৃদয় দস্যুদের হৃদয় পরিবর্তন করতে।

মেজর জেনারেল যদুনাথ সিং

সংগের আমেরিকান সাংবাদিক বন্ধু বলে ওঠে—দি গড দ্যাট গিভস আওয়ে ল্যান্ড, নাও কলস্‌ টু চেঞ্জ দি হার্টস অব হার্টলেস ব্যানডিটস"। হৃদয়হীন ডাকাতদের হৃদয় পরিবর্তন করতে এসেছেন ভূমিদানের দেবতা বিনোবা।

দূরে থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম বিনোবার অভ্যর্থনা। তাঁর সংগে এসেছে অগুনতি সর্বোদয় কর্মী আর এসেছেন মেজর জেনারেল যদুনাথ সিং। কাশ্মীরের ঝাংগর, রাজোরী আর নৌশেরা যুদ্ধে বীর সেনানী ভারতবর্ষের "সাধু জেনারেল"। সুখের জীবন ছেড়ে এসেছেন বিনোবার সংগে অভিশপ্ত চম্বলের বেহড়ে-বেহড়ে ডাকাতদের হৃদয় পরিবর্তনের "মিশনে"। আজ মেজর জেনারেল যদুনাথ সিং নেই। মনে পড়ছে অনেক টুকরো টুকরো ছোটো ঘটনা। বিনোবার প্রায় এক মাসের ওপর পদযাত্রায় যখন ঘুরেছি তখন সব সময়ই "সাধু জেনারেল"কে সংগে পেয়েছি। যখন পদ-যাত্রায় ক্লান্ত হয়ে জীপের খোঁজ করেছি, ৫৪-বছরের যদুনাথ সিং মুচকি হেসে দ্বিগুণ উৎসাহে "বাবার" (বিনোবা) হাতে হাত দিয়ে পা চালিয়েছেন। অনেক ঝগড়া-বিবাদ তাঁর সংগে করেছি কিন্তু তাঁর সরলতার কথা আজও মনে পড়ে। মদ-মাংস-সিগারেট তিনি জীবনে ছোঁননি। স্যানধ্রাস্ট শিক্ষিত যদু-নাথ সিংকে দেখে অবাক হয়েছি। নিজের একমাত্র শিক্ষিত মেয়েকে পাঠিয়েছিলেন বিলাতে নার্সিং পড়তে। ডাকাতদের আত্ম-সমর্পণের 'মিশনে'র তিনিই ছিলেন উদ্যোক্তা। একদিনের কথা আমার এখনও মনে আছে। জরুরী কাজে চলে গিয়েছিলেন তিনি কোথায় যেন। ফিরে এসে দেখেন বিনোবা শুয়ে পড়েছেন। তাঁকে খবরটা দেওয়া দরকার অথচ তাঁর ঘুম ভাংগাতে রাজী নন। বিনোবার ক্যাম্পের কঠিন মাটির ওপর সারা-রাত শুয়ে রইলেন। ভোর তিনটেয় যখন বিনোবা জেগে বাইরে এসেছেন দেখেন যদুনাথ সিং তাঁকে খবর জানাবার জন্যে জেগে বসে রয়েছেন।

আমাকে ডাকতেন "মিশচিভস নিউজ-হাউণ্ড" বলে। সকাল বিকেল সেই চির-পরিচিত ম্যালেশিয়ার বুশ-শার্ট, প্যান্ট আর মাথায় বিরাট টুপী পরে সাইকেলে চড়ে তাঁর প্রায়ই হঠাৎ বেহড়ে অন্তর্ধানের কথা ভুলব না। মাইলের পর মাইল ভীষণ গ্রীষ্মের রোদে তিনি ঘুরেছেন বেহড়ে-বেহড়ে, গায়ে

উসেটঘাটে চম্বল নদী পার হয়ে আচার্য বিনোবা ভাবে মধ্যপ্রদেশের সীমানায় প্রবেশ করছেন :

গাঁয়ে ডাকাতদের সঙ্গে দেখা করতে তাদের "বাবা"র শান্তির বাণী শোনাতে। তাঁর চেষ্টা যদি শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সফল না হয়ে থাকে, দোষ তাঁর না। দোষ অভিশপ্ত চম্বলের শতাব্দীর অভিশাপের আর দোষ ইতিহাসের। হাজার বছরের পুরোনো রক্তে লেখা অভিশপ্ত চম্বলের ইতিহাস। পদযাত্রার শেষে তিনি যেদিন শ্রীনগর যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছিলেন, জিজ্ঞাসা করেছিলাম "জেনারেল সাহেব, নো মোর সারেনডারস অব ব্যাণ্ডিটস? হ্যাভ ইউ সারেণ্ডারড্ অ্যাণ্ড এ্যাকসেপটেড ডিফিট?"

অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন আমার দিকে মেজর জেনারেল যদুনাথ সিং। চাঁদির তারের মত শুভ্র চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে মৃদু হেসে বললেন, "ইউ আর মিশচিভাস। আই টেল ইউ ইয়ং ম্যান আই নো নো ডিফিট। আই উইল কাম ব্যাক এগেন অ্যাণ্ড এগেন টু ক্যারী অন মাই মিশন ইফ নেসেসারী অল অ্যালোন।"

"সাধু জেনারেল" আজ আর নেই। তাঁর 'মিশন' পূর্ণ করতে তিনি আর আসবেন না। পদযাত্রার সময় তুমুল তর্ক করেছি তাঁর সঙ্গে। তিনি আমায় বোঝাতে পারেননি আর আমিও তাঁকে বোঝাতে পারিনি। তাঁর চিন্তাধারা আর আমার চিন্তাধারায় অনেক তফাত। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী আর আমার দৃষ্টি-ভঙ্গীতে পার্থক্য অনেক। অভিশপ্ত চম্বলের উপত্যকায় বিনোবার শান্তি আর হৃদয় পরিবর্তন অভিযান তাঁর মত আমার হৃদয়কে অভিভূত করেনি। সাংবাদিক বলে কিছু "সিনিসিজম" আমার আছে তা মানতে কোনো বাধা নেই কিন্তু অনেক বিষয়ে অনেকবার খটকা লেগেছে আমার। কখনও কখনও মনে হয়েছে আইন-কানুন আর সংবিধান জলাঞ্জলি দিয়ে এই যে "মিশন", তার পরিণাম কি "রুল অব দি ল"তে লোকের আস্থা ভেঙ্গে দেবে না? হয়তো ইতিহাসই আজ থেকে অনেক বছর পরে বলবে আচার্য বিনোবা আর "সাধু জেনারেলের" এই "মিশন-এর সার্থকতা কতটুকু আর ব্যর্থতাই বা কতখানি। আমি সাংবাদিক। উপদেশ, জ্ঞান বা "সারমন" দেওয়া আমার কাজ না। যেখানে যা দেখি তাই লিখি। নিজের অভিজ্ঞতার আর

'এনাসিন'

মাথাধরা সর্দি জ্বর ও পেশীর বেদনায়

সত্বর আরাম দেয়, কারণ এতে

চারটি ওষুধ রয়েছে

Registered User : GEOFFREY MANNERS & CO. PRIVATE LTD.

চাক্ষুষ প্রমাণের ওপর নির্ভর করে আমার নিজের অভিমত। তাই জেনারেল সাহেবকে বলেছিলাম হৃদয়হীন ডাকাতদের হৃদয় পরিবর্তন হবে না হবে না, হবে না। তাহলে কি করে সমাধান হবে এই ডাকাতি সমস্যার জানতে চেয়েছেন যদুনাথ সিং। কোনো সমাধান আমার কাছে নেই। কোনো উত্তরও আমার কাছে সেদিনও ছিল না, আজও নেই। উদিত পুরায় রুকিনীর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি আমি, আর মোরেনার পুতলীর মা আসগরীবাই বা তার নাতনী তান্নোর প্রশ্ন বা সমস্যার কোনো উত্তর বা সমাধান আমার কাছে নেই। অভিশপ্ত চম্বলের বেহড়ে-বেহড়ে ঘুরেছি, অনেক ঘুরেছি—একা ঘুরেছি, পুলিসের সঙ্গে ঘুরেছি, সাধারণ লোকের সঙ্গে ঘুরেছি, বিনোবা ও "সাধু জেনারেলের" সঙ্গেও ঘুরেছি, হয়তো আরো ঘুরব। বেহড়ের বাঁকে বাঁকে অনুভব করেছি হাজার বছরের পুরোনো রক্তাপ্লুত সেই ইতিহাসের অভিশাপ আর দীর্ঘশ্বাস। বেহড়ের বাঁকে যখন মোড় ঘুরেছি, আমার জীপ দাঁড়িয়ে গিয়েছে অন্য একটা বেহড়ের সামনে। প্রতিটি বেহড়ের প্রতিটি পয়েণ্টই মনে হয়েছে—"পয়েণ্ট অব নো রিটার্ন।"

উত্তেজিত হয়ে "সাধু জেনারেল" আমার সামনে হাজার হাজার বছরের পুরোনো ইতিহাস তুলে ধরেছেন। "কেন, তথাগত গোতম বুদ্ধের শান্তির বাণী শুনে কি দুর্ধর্ষ ডাকাত আঙ্গুলীমালের হৃদয় পরিবর্তন হয়নি? কেন, দস্যু রত্নাকর কি বাল্মীকি হয়ে রামায়ণ সৃষ্টি করেনি?"

আমি এ প্রশ্নেরও উত্তর দিইনি কারণ উত্তর আমার কাছে নেই। কিন্তু পাল্টা প্রশ্ন করেছিলাম "সাধু জেনারেল"কে। "যদি অভিশপ্ত চম্বলের দস্যুদের হৃদয় পরিবর্তন হয়ে থাকে তাহলে কেন লাখনসিং, পানা, বাহাদুর আত্মসমর্পণ করল না। তাহলে "বাবা"র ক্যাম্প থেকে ৪ মাইল দূরে পানা কেন দু-দুটো ডাকাতি করল। যদি সত্যি হৃদয় পরিবর্তন হয়ে থাকে তাহলে তহসীলদার সিংকে ফাঁসির সাজা থেকে বাঁচাবার জন্যে কিছু ডাকাত কেন এত আগ্রহশীল? আর আপনিও কেন চান তহসীলদারকে বাঁচাতে?"

এর উত্তর আমিও জেনারেল সাহেবের কাছ থেকে পাইনি। তিনি আর নেই তাই উত্তরও হয়তো পাবো না। কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে একমত হয়েছিলেন যে হৃদয় পরিবর্তন আর আত্মসমর্পণ দুটো আলাদা জিনিস। "বাবা" চেয়েছিলেন হৃদয় পরিবর্তন। আত্মসমর্পণ তার "বাইপ্রোডাকট"। শান্তির বাণী শুনিয়ে তিনি চেয়েছিলেন হৃদয় পরিবর্তন করতে। যদি কেউ আত্মসমর্পণ করে করুক। তারা আত্মসমর্পণ করলে তিনি তাদের সরকারের হাতে সঁপে

চম্বলের জল ভেঙে পারে উঠছেন বিনোবাজী। তাঁর পাশে টুপী মাথায় 'সাধু জেনারেল' যদুনাথ সিং

দেবেন আইনের বিচারের জন্যে—জাস্টিস টেম্পারড্ উইথ মার্সি। দয়া মেশানো বিচার। পুলিসের কাছেও তো অনেক ডাকাত আত্মসমর্পণ করেছে, তাদের সংখ্যাও তো কম না—প্রায় ২০০। তারা কি এই দয়া মেশানো বিচারের এক কণাও পেতে পারে না? জেনারেল সাহেব উত্তর দেননি। "কিন্তু পুলিসের পন্থাতেই কি এই অভিশাপ শেষ হবে?" জেনারেল সাহেব করেছেন আবার প্রশ্ন।

"না। কিন্তু আপনাদের পন্থাতেও হবে না। আপনি নিজে এই এলাকার লোকদের জানেন। আপনি নিজেই তো এই এলাকার লোক?"

আবার জেনারেল সাহেব চুপ। আমিও চুপ। তাঁর কাছে এই সমস্যার সমাধান ছিল কিনা জানি না। আমার কাছে নেই। অভিশপ্ত চম্বলের অভিশাপ যে কবে শেষ হবে আমি বলতে পারব না। বোধ হয় সময়ই এর সমাধান করবে। কালের গতি একদিন হয়তো নিজের প্রবাহে অভিশপ্ত চম্বলের অভিশাপ ধুয়ে মুছে দেবে। লাখন, পানা, বাহাদুর আর কিছু অবশিষ্ট ছোটো ছোটো দল শেষ হলেও হাজার বছরের

চম্বলের তীরে বিনোবা ভাবের প্রথম প্রার্থনা সভা

এই অভিশাপ শেষ হবে না আর "বাবা"র হৃদয় পরিবর্তন মিশনে অভিভূত হয়ে ১৫।২০ জন ডাকাত আত্মসমর্পণ করলেও এই অভিশাপ শেষ হবে না। অভিশাপ শেষ হবে সেদিন, যেদিন "খুন-কা-বদলা-খুন", যে সভ্যজগতের আওতায় পড়ে না, এই কথাটা চম্বল উপত্যকার বীর, সাহসী কিন্তু ভুলপথগামী লোকেরা বুঝবে। সেও সময়ের কথা আর কালের গতির প্রবাহের কথা।

"অলরাইট উই অ্যাগ্রি টু ডিফার"। সাধু জেনারেল আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে আমার ভিন্ন মতের প্রতি সম্মান দেখিয়ে উঠে পড়েছিলেন। অভিশপ্ত চম্বল হাতছানি দিয়েছিল তাঁকে। অভিশপ্ত চম্বল হাতছানি দিয়েছিল আমাকেও। তাই উত্তর দিয়েছিলাম, "ইয়েস জেনারেল সাহেব। উই মে বোথ লিভ টু সি হু ইজ কারেক্ট"। কার কথা সত্য হয় দেখতে আমরা দুজনেই হয়তো বেঁচে থাকব।

যেতে যেতে জেনারেল সাহেব বলেছিলেন "আবার দেখা হবে চম্বলের বেহড়ে। তিনি আবার আসবেন হৃদয় পরিবর্তন অভিযানে "ইফ নেসেসারী অল অ্যালোন।" আর আমি আমার কাজে। "কল অব দি র‍্যাভাইনস ইজ ইরেসিসটিবল।" বেহড়ের ডাক তো উপেক্ষা করা যায় না। বলেছিলেন যদুনাথ সিং।

"ফর বোথ অব আস্"। আমাদের দুজনের কাছেই।

"ইয়েস ফর বোথ অব আস।" হো হো করে হেসে উঠেছিলেন সাধু জেনারেল। গট্‌গট্ করে আমার সামনে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই চিরপরিচিত ম্যালেশিয়ার বুশ-শার্ট-প্যান্ট আর বিরাট টুপী পরে সাইকেলে চড়ে। হয়তো ফেরার আগে একবার শেষ চেষ্টা করতে গেলেন আরো কিছু ডাকাতদের হৃদয় পরিবর্তনের।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম তাঁর সেই যাওয়া। তখন কি জানতাম এই আমার শেষ দেখা। তখন কি জানতাম আমি সাইকেলে চড়া বুশ-পার্ট-প্যাণ্ট-টুপী-পরিহিত জেনারেল সাহেবের সেই সুন্দর চেহারা আর দেখতে পাব না। তখন কি জানতাম সেই-দিনকার তর্কই আমাদের শেষ তর্ক। তখন কি জানতাম আর "সাধু জেনারেল", 'মিশাচিভাস মিউজ হাউন্ড" আর ক্রমাগত সিগারেট খাওয়ার জন্যে আমায় আর 'চিমনী" বলে ডাকবেন না। সেদিন যখন তাঁর মৃত্যুর খবর পেলাম, নিজের অজান্তেই দু ফোঁটা চোখের জল পড়েছে গড়িয়ে গড়িয়ে গাল বেয়ে। তাঁর সংগে আমার মতের মিল ছিল না। আজও নেই, হয়তো কোনোদিন হবেও না কিন্তু তাঁর আন্তরিকতা আর একাগ্রচিত্ততা আমায় করেছে মুগ্ধ। তাঁর আশা, তাঁর বিশ্বাস, ইতিহাসে সত্য প্রমাণ হলে আমি খুশী হব। হেরে গিয়ে জীবনে আমি প্রথম আর শেষবার আনন্দিত হব।

"কল অব দি র‍্যাভাইন্স" হয়তো আমায় আবার ডাকবে। আমি হয়তো উপেক্ষা করতে না পেরে আবার যাবো। কিন্তু জেনারেল সাহেব তো তাঁর অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আর কথা রাখতে পারবে না। সেদিন যে তিনি সাইকেল করে আমার সামনে দিয়ে চলে গেলেন বেহড়ের মোড় ঘুরে সেইতো হল তাঁর "পয়েণ্ট অব নো রিটার্ন"। তাঁর অনুপস্থিতি অনুভব করবেন "বাবা" নিজে। মাইলের পর মাইল বেহড়ের উঁচু নীচু পথে যাঁর কাঁধে হাত দিয়ে তিনি পদযাত্রা করেছেন তাঁকে তো আর তিনি পাবেন না। হৃদয় পরিবর্তন অভিযানের তাঁর "সাধু জেনারেল", তাঁর শান্তিদূত এখন চিরশান্তিতে ঘুমুচ্ছেন। "বাবা" নিজেও রাত তিনটার সময় ঘুম থেকে উঠে কোনোদিন কাউকে হয়তো আর ক্যাম্পের বাইরে কঠিন মাটির ওপর ঘুমুতে দেখবেন না। আর তাঁকে খুঁজে পাবে না সেই সব অভিশপ্ত চম্বলের অভিশাপ দুর্ধর্ষ দস্যুরা যারা তাঁর কথায় করেছে আত্মসমর্পণ তা সে যে কোনো কারণেই হোক না কেন। কারাপ্রাচীরের কঠিন ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে শুয়ে তার কথা ভাববে লুক্কা, বিদ্যারাম, কানাহাই, বদন সিং, পাতিরাম, মোহরমানিয়া, শ্রীকিশেন কাছেরা, রামঅবতার আর লচ্ছী। লুক্কা আর কানহাই হয়তো দু ফোঁটা চোখের জলও ফেলবে।

আরেকজন ফেলবে চোখের জল জেনারেল সাহেবের জন্যে। চোখের জল ফেলতে ফেলতে সে হয়েছে অন্ধ। উদিতপুরায় মানসিংএর বৃদ্ধা স্ত্রী রুকিমনী। দুহাত তুলে আশীর্বাদ করেছে সে জেনারেল ঠাকুর যদুনাথ সিংকে। অনেক করেছে সে। অনেক। মানসিংএর দুর্ধর্ষ দলের সমস্ত ঘৃণিত অপরাধ আর তার পাপের সব প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব হয়েছে শুধু জেনারেল সাহেবের জন্যেই। তিনি না চেষ্টা করলে মানসিং আর রূপার নামের দীপশিখা নিয়ে বেঁচে ছিল যে "লুক্কা কানহাই"এর দল তা তো আত্মসমর্পণ করতো না কোনোদিন "বাবার" কাছে।

আরো একজন হয়তো নৈনী সেণ্ট্রাল জেলের এক নিভৃত সেলে বসে চোখের জল ফেলেছে। যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন সে হয়তো চোখের জল ফেলবে। ফাঁসির নিশ্চিত মৃত্যু থেকে, আপ্রাণ চেষ্টা করে তাকে বাঁচিয়েছিলেন জেনারেল সাহেব। তহসীলদার সিং-এর ফাঁসি রাষ্ট্রপতির হুকুমে পরিণত হয়েছিল আজীবন কারা-বাসে। মানসিংএর শেষ প্রদীপ তহসীলদার সিং। (ক্রমশ)

এবার পূজার সেরা বই

স্বপনবুড়োর সফর ২।।০

তার একখানা

ছড়া-ছবিতে সোনার ভারত ১।০

এ.কে.সরকার এণ্ড কোং
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

BUY THE BEST
HIGHLY APPRECIATED
SAMSAD ANGLO-BENGALI DICTIONARY
1672 PAGES • Rs. 12·50 n.p.
SAHITYA SAMSAD
32 A, ACHARYA PRAFULLA CH. RD. • CAL-9

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ

পাশ্চাত্যের সর্বাধিক বিক্রীত (বাইবেল বাদে) দুখানি বই। মনোবিৎ ও মনীষী ডেল কার্নেগির মহৎ সাহিত্য-কর্ম। মানবজীবনের মহামন্ত্র, অনুপ্রেরণা ও প্রাণশক্তির অফুরন্ত উৎসধারা। বাংলায় এই প্রথম। উপন্যাসের মতোই চিত্তাকর্ষক বহু তথ্য ও কাহিনী।

প্রতিপত্তি ও বন্ধুলাভ
How to win friends & influence people.

দুশ্চিন্তাহীন নতুন জীবন
How to stop worrying & start living.

শিল্পপতি - মহাজন ব্যবসায়ী - ছাত্র - শিক্ষক - লেখক - চাকুরীজীবী - চিকিৎসক - ব্যবহারজীবী - এমন কোন মানুষ নেই যাঁর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় প্রতি পদক্ষেপে এই বই দুখানি সাহায্য না করবে। দাম যথাক্রমে সাড়ে চার ও সাড়ে পাঁচ টাকা।

একমাত্র পরিবেশক: পত্রিকা সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিঃ
১২।১, লিণ্ডসে স্ট্রীট কলিঃ-১৬। শাখা: দিল্লী - বোম্বাই - মাদ্রাজ।

প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

৫০

এটা কী রকম হল? এটার মানে কী? এটা কি একটু বেশি হয়ে গেল না?

ইণ্টারভিউ সেরে উঠে যাবার আগে কর্তা-ব্যক্তিদের চোখের দিকে একবার তাকাতেই হয়। সেইটেই স্বাভাবিক। ডোণ্ট কেয়ারি ভাব দেখিয়ে হট করে চলে যায় না কেউ। বরং সেই শেষ চাউনিটাতে একটি মিনতি এ'কে রাখে, যেন মঞ্জুর হয় প্রার্থনা। কিংবা একটি ঔৎসুক্য জানিয়ে রাখে, কী রকম ছাপ রাখলাম না জানি। কিংবা আদৌ পারলাম কিনা রাখতে। ঐ মুখগুলি দেখে সিদ্ধান্ত করা যায় কিনা যে, আমারও কিঞ্চিৎ আশা আছে। না কি মুখগুলি নিতান্তই তোলাহাঁড়ি! নিষ্ঠুরতার নামান্তর!

সারাক্ষণ মুখ নামিয়েই বসেছিল কাকলি। প্রথম থেকে শেষ, আবার শেষ থেকে প্রথম, কী একটা ফাইলের পৃষ্ঠা ওল্টাচ্ছিল। সরাসরি ওর মুখের দিকে না তাকালেও সুকান্ত বেশ বুঝতে পারছিল ওর বৈরাগ্য, ওর বৈতৃষ্ণ্য, ওর অনীহা। নির্মম অনাশক্তি। কিন্তু এখন সুকান্তর যাবার সময়, নিঃসম্পর্ক মানুষের ভিড়ের মধ্যে তার হারিয়ে যাবার আগে, এটা কী করে বসল কাকলি? নত মুখখানি তুলল ধীরে-ধীরে, আর নিজেরও অজানতে, চোখের কোণে ছোট্ট একটি হাসির ঝিলিক ছিল।

আর সুকান্তই বা তার শেষ চাউনিটা রাখবার জন্যে ঐ তিনটে মুখের মধ্যে ঐ ছোট, নিরীহ অকেজো মুখখানিই বেছেছিল কেন? আসল কর্মকর্তা তো ঐ বাঙালী-মাদ্রাজী অফিসর দু'জন, ওরাই তো কেল্টবিস্টু, 'ডেলিভার দি গুডস' যদি কেউ করতে পারে তো ওরাই। ওদের দিকে না তাকিয়ে ও কিনা দেখতে গেল মাড়তে গেল কাকলির মুখ, যা কিনা অবস্তু, অবধ্য: অন্যমনস্ক। যা কিনা আগাগোড়া নিস্পৃহতার ইস্পাত দিয়ে মোড়া।

আশ্চর্য, ইচ্ছে করে ফেলোনি চোখ, যেন মধুকর আপনা থেকেই উড়ে গিয়ে বসল ফুলের উপর।

আশীর্বাদের মত সুন্দর মুখখানি তুলল কাকলি। ঈশ্বর যে মুখ দিয়েছিল, এ সে-মুখ নয়। এ-মুখ কাকলি নিজে সৃষ্টি করেছে। এ-মুখে রাগ নেই, ক্ষোভ নেই, জ্বালা নেই, হিংসে নেই, শুধু দুঃখের লাবণ্য দিয়ে ভরা। ঈশ্বর দুঃখের কী জানেন! তাই তাঁর সাধ্যি নেই, এসব মুখ তিনি আনেন কল্পনায়।

এ-মুখ কাকলির একার তৈরি। কে জানে হয়তো এতে সুকান্তরও কিছু হাত আছে। কিছু হয়তো কাজ করেছে ওরও রঙ-তুলি-জল।

তাকিয়েছিল তাকিয়েছিল, কিন্তু হাসল কেন? দুটি চোখ যেন দুটি নীরব প্রার্থনার নিরালা কুটির। সহসা তাতে দুটি দীপ জ্বলে উঠল কেন? কী বলতে চায় সে হাসি?

পৃথিবীতে কত তারা, কত ফুল, কত

প্রকাশিত হল

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিস্ময়কর উপন্যাস

বিকিকিনির হাট

দ্বিতীয় সংস্করণ

মন্থর-প্রবাহিনী গঙ্গার একধারে নবগঞ্জ-জামতলি দীর্ঘদিন চাপা পড়েছিল আত্মবিস্মৃতির অন্ধকারে। নামহীন, পরিচয়হীন একখণ্ড জনপদের মত্যে। অদৃষ্টের ফেরে সেই নবগঞ্জ-জামতলি একদিন উঠে এল ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। পাট-নগরীর পত্তন হল বিরাট ভূখণ্ড জুড়ে। আর সেই পাট-নগরীর পাকে পাকে জড়িয়ে পড়ল বহু মানুষের জীবন। মতিচাঁদ গাড়োয়ানের জবানিতে বিবৃত এই সুদীর্ঘ চিত্রোপন্যাসটি রচনার প্রসাদগুণে ও বর্ণাঢ্যতায় উজ্জ্বল। সাম্প্রতিক কালে এমন বলিষ্ঠ বাস্তবনিষ্ঠ উপন্যাস খুব অল্পই লেখা হয়েছে। দাম চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

এই লেখকের আরও দুটি উপন্যাস

তিন তাসের খেলা ৬·০০ ॥ **কুয়াশার রঙ** ২·৫০

নতুন সাহিত্য ভবনের তিনখানি অসাধারণ সংকলন-গ্রন্থ

১। **পঞ্চাশ বছরের প্রেমের গল্প** ॥ সুবীর রায়চৌধুরী সম্পাদিত ১২·৫০

২। **সরস গল্প** ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত ৮·৫০

৩। **হাজার বছরের প্রেমের কবিতা** ॥ অবন্তী সান্যাল সম্পাদিত ৮·০০

শারদীয় নতুন সাহিত্য

দাম দু-টাকা

শক্তিমান লেখকদের মননশীল প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও অন্যান্য চিত্তাকর্ষক রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে। শারদীয়া সংখ্যায় থাকবে সাম্প্রতিক কালের শক্তিমান কথাশিল্পী অমিয়ভূষণ মজুমদারের অসামান্য দীর্ঘ-রচনা:

হনিড্ লার্ক

এজেণ্টরা অবিলম্বে তাঁদের চাহিদা জানান:

নতুন সাহিত্য ভবন

৩নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলিকাতা-২০

ফোন: ৪৭-৪২৫৫

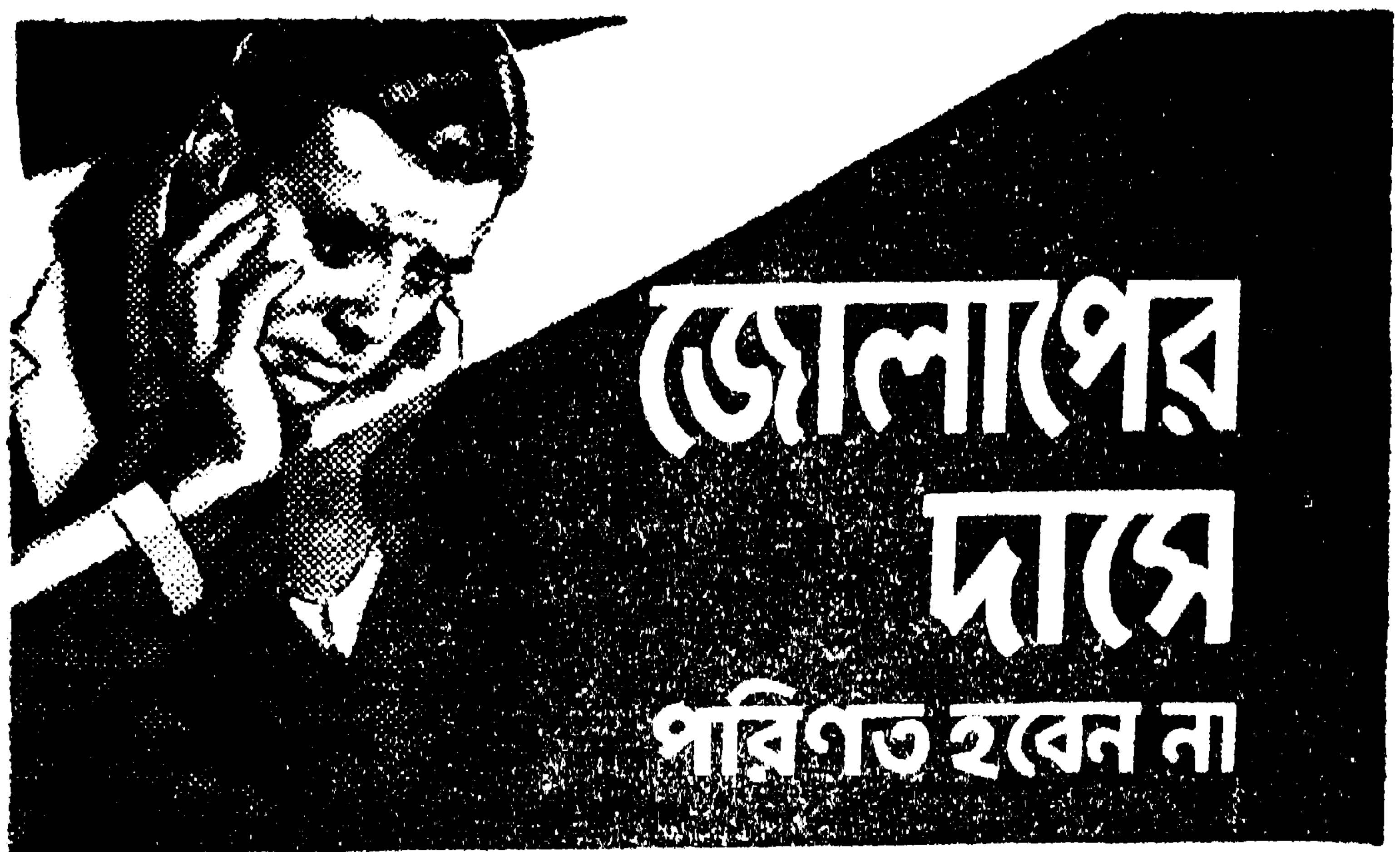

কড়া জোলাপ আপনার অন্ত্রের পেশীগুলিকে দুর্ব্বল করে, ফলে শীঘ্রই আরও **কড়া জোলাপ** না হ'লে আপনার কোষ্ঠ আর পরিষ্কার হবে না। জোলাপের **দাস** হ'য়ে পড়বেন না। অকৃত্রিম ফিলিপ্‌স মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া ব্যবহার **করুন।**

ফিলিপ্‌স এত মৃদুভাবে কাজ করে যে এমন কি শিশুদের জন্যেও ইহা **সুপারিশ করা** হয়…অথচ এত ফলপ্রদ যে প্রথমবার ব্যবহারের পরই **কোষ্ঠবদ্ধতার** হাত থেকে পূর্ণ মুক্তি পাবেন। এই কারণেই…

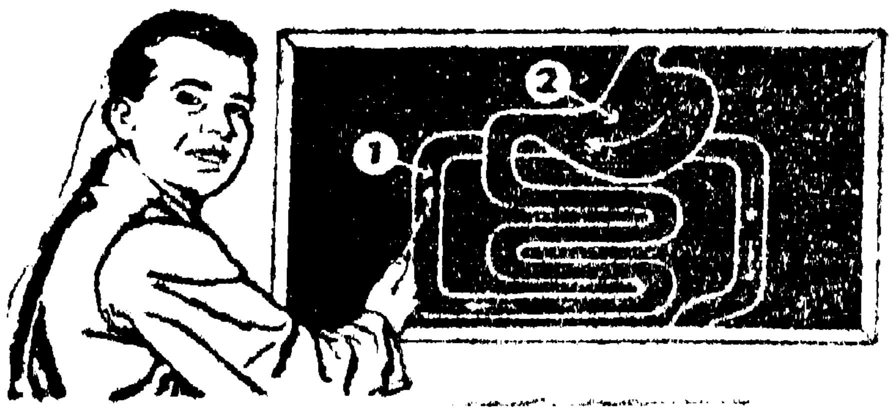

১। অন্যান্য কড়া জোলাপের মত কাজ না ক'রে ফিলিপ্‌স মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া শুকনো জমাটবাঁধা কোষ্ঠকে সিক্ত ক'রে, তারপর মৃদুভাবে পেশীগুলিকে সক্রিয় ক'রে আপনার দেহ থেকে দূষিত মল নিরাপদে ও নিশ্চিতভাবে পাস করে দেয়—অথচ শরীরে কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয় না, শরীরে খিঁচুনি ধরে না বা দুর্বলতা বোধ হয় না।

২। **শুধু একটিমাত্র গুণবিশিষ্ট** জোলাপের মত না হ'য়ে **ফিলিপ্‌স মিল্ক** অফ ম্যাগনেসিয়া কয়েক মুহূর্তের মধ্যে **আপনার পাকস্থলীকে** শান্ত ক'রে আপনার আরামের **পূর্ণতা এনে দেয়।** আপনার পরিপাক যন্ত্রকে সবল করে … পেট ভার ভার ভাব, বুক জ্বালা, পেট ফাঁপা ও অম্লজনিত বদহজম দূর করে।

আবার ভারতবর্ষে পাওয়া যাচ্ছে

নূতন নকল নিরোধক **শীলকরা** বোতলে। এই শীলকরা বোতলই ফিলিপসের বিখ্যাত বিশুদ্ধতা এবং উৎকর্ষের একমাত্র **নিশ্চয়তা।** ২, ৪ ও ১২ আউন্স বোতলে পাওয়া যায়।

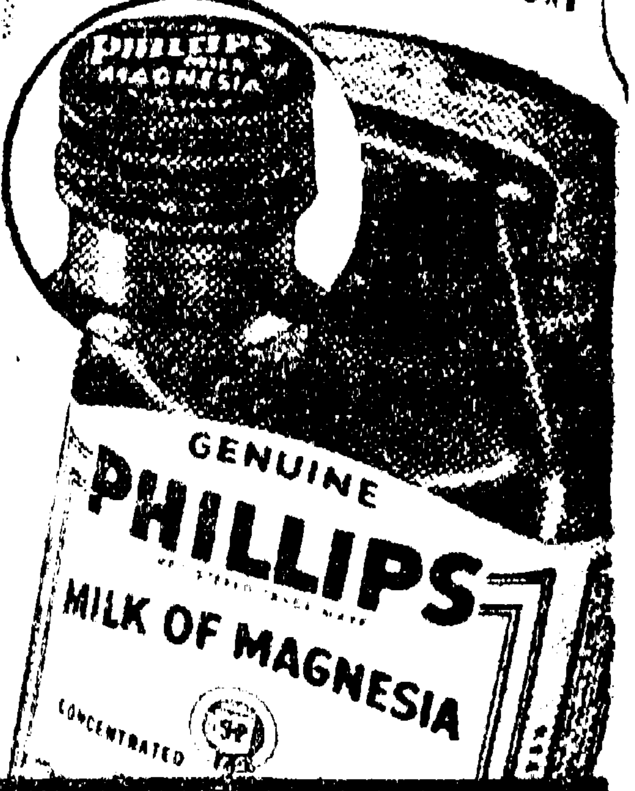

ফিলিপ্‌স

মানেই খাঁটি মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া

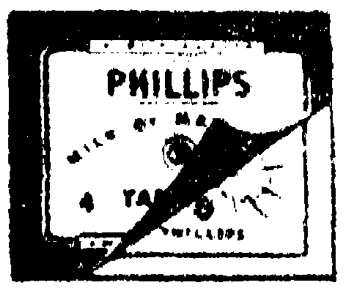

যেখানেই হোক, যখনই হোক, অম্লজনিত অজীর্ণরোগে **সঙ্গে সঙ্গে উপশম পেতে হ'লে** সর্ব্বদাই মিন্টের সুগন্ধযুক্ত সুস্বাদু ফিলিপস্‌ মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া ট্যাবলেট গ্রহণ করুন। ৪ ট্যাবলেটের হাল্কা প্যাকেটে এবং ৭৫ ও ১৫০ ট্যাবলেটের বোতলে পাওয়া যায়।

SAM/IPB

একমাত্র পরিবেশক : দে'জ মেডিকেল ষ্টোর্‌স প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ, গৌহাটী, পাটনা, কটক

আলো, কত গান, কত মণি-মুক্তো—তার উপরে আবার এই হাসির টুকরো। এটিও পৃথিবী রেখেছে জমিয়ে। হারিয়ে ফেলেনি। ধুলোয় দেয়নি ধুলো করে।

অনেকক্ষণ বসে আছেন, এবার প্রতীক্ষার শেষ হল, যন্ত্রণার শেষ হল, বাড়ি যান নিশ্চিন্ত হয়ে—এই হাসি কি শুধু তাই বলছে? এ-হাসি কি শুধু এক সমাপ্তির রেখা? শুধু এক উপশমের ইঙ্গিত? না কি, আপনার আবেদন মঞ্জুর হবে, শুধু সেই এক আশার স্ফুলিঙ্গ? মঞ্জুর হবে কী, মঞ্জুর তো হয়েছে, এই তো বোঝা গেল শেষ পর্যন্ত—তবে সেই হাসি কি তার সাফল্যে মামুলি অভ্যর্থনা? শুধু ঐটুকু? তার বেশি আর কিছু নয়?

তার অনেক অনেক বেশি। তোমার পদোন্নতি হল, এতে তোমার আনন্দকে শুধু সংবর্ধনা করা নয়—তোমার পদোন্নতি হল, এতে আমার আনন্দকেও লিপিবদ্ধ করলাম। অর্থাৎ, তোমার সুখে নিজেকেও সুখী বলে অনুভব করলাম। তোমার যে জয় হল, প্রচ্ছন্নে এটা আমারও জয়। তোমার উন্নতিতে আমার গৌরব।

এমন আশ্চর্য কথা হিসেবের খাতায় লেখে না। আমার শোকে-দুঃখে সমব্যথী হয়তো পাব, কিন্তু আমার সুখে সুখী হবার লোক কই। আমার যারা সুখে বাহ্যিক অভ্যর্থনা করতে আসে, আসলে তারা ঈর্ষী, অন্তরে তাদের দাহ। কিন্তু কাকলি এখন যে-হাসি হাসল, সেটি হৃদয়ের বিদ্যুৎ, জনালা দিয়ে নয় তৃপ্তি দিয়ে আঁকা। এমন তো কোনো কথা ছিল না। আমি সুখী হলে, আমি জয়ী হলে তার কী! পক্ষান্তরে আমি যদি পরাস্ত হই, অপমানিত হই, তাতেই বা তার কী এসে যায়!

শুনেছে, মানুষের মনের দর্পণ চোখ। হাত ভণ্ডামি করতে পারে, কিন্তু চোখ ছলনা জানে না, মনের ঠিক ছবিটি তুলে ধরে হুবহু। অন্তরের চিঠি পড়বার ভাষাই তো চোখ। মন যদি অনুপস্থিত, চোখও অনুপস্থিত। দুটি চোখই মনের আকাশের চন্দ্র-সূর্য।

যে-হাসিটি হাসল এখন কাকলি, তার কী ব্যাখ্যা হতে পারে সারাক্ষণ তারই বিচার করছে সুকান্ত। হয়তো কিছুই নয়, সুকান্তর দেখবার ভুল। কিংবা হয়তো বা ওটা পরিহাসের ছটা। কেমন পুরুষের উপর কর্তৃত্ব করছি। বিশেষত যে-পুরুষ একদিন শাসন-পীড়ন করত, করবার অন্তত যার ছাড়পত্র ছিল ভাগ্যের বিধানে সেই দুর্জন আজ কৃপাপ্রার্থী। কিংবা হয়তো বা একটু করুণার আমেজ ঐ-হাসিতে। তুমি দীন-হীনের মত দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছ, কৃপণের মত নাই-বা

দিলাম ফিরিয়ে। তোমার আকাঙ্ক্ষা অল্প, নাও এই এক মুঠো।

মন মানতে চায় না সুকান্তর। যেদিকেই তাকাক, যে কথাই ভাবুক, মনের মধ্যে সেই চকিত-স্ফুরিত হাসিটিই শুধু ভেসে ওঠে। সে হাসিটি দুই নয়নের বাইরে, আরেক নয়নের, তৃতীয় নয়নের ভাষা। যেন বলছে, আমি তোমার হিতকামী। তোমার ভালো হোক, তোমার কুশল হোক আমার এই শুধু বাসনা। তুমি ভালো থাকলেই আমার ভালো থাকা। তোমার কুশলেই আমার কুশল স্বীকার।

হিত কামনা কে করে? হিত কর্ম করা বরং সোজা, কামনা করাই কঠিন। তোমার অসুখ করেছে, কয়েকটা তোমার সেবার কাজ করে দিলাম, হিত কর্ম সম্পন্ন হল। কিন্তু তোমার ভালো হোক, তুমি শিগগির ভালো হয়ে ওঠো, সর্বান্তঃকরণে এই হিতকামনা কি করতে পার? কখখনো না, বুকটা ফেটে যাবে, যদি তুমি না নিতান্ত অন্তরের সুহৃদ হও, আত্মজন হও। তবে সুকান্ত কি কাকলির অন্তরের সুহৃদ আত্মজন? তাই যদি না হবে, তবে ঐ হাসির ব্যাখ্যা কী?

কোনোই ব্যাখ্যা নেই। অকারণে মানুষ অমনি অনেক হাসে। অকারণে মরীচিকা অমনি অনেক জল দেখায়।

পথে আর দেরি কোরো না, গুটি-গুটি ফিরে যাও ঘরে। আর পথ নেই। পথ বন্ধ।

পথ বন্ধ হবে কেন? সুহৃদের পথ বন্ধ হতে পারে, নিম্নতন কেরানীর পথ সব সময়েই খোলা আছে। ঐ ইণ্টারভিউর ফল কী হল, অফিশিয়াল চিঠি ইশু হতে দেরি হচ্ছে কেন, এ তো বৈধভাবেই সুকান্ত জানতে চাইতে পারে। সেই অজুহাতে বেরোবার সঙ্গে সুকান্তর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট, স্বার্থ মানেই টাকা, তাই তার এই ব্যাকুলতা। বিবেকের কাছে নিজেকে মোটেই তাই অপরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে না। সন্ধানটা অফিসেও করা যেত বটে কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে এতখানি যখন এসেই পড়েছে, তখন আর ঐ বাকীটুকু কী দোষ করল? তার হাতে ওজুহাত নেই এমন কথা তো কেউ বলতে পারবে না। অধস্তন হয়ে ঊর্ধ্বতনের বাড়ি গিয়ে গাফিলতির কৈফিয়ত চাওয়া এমন কী অন্যায়?

আচ্ছা ঐ হাসিটাতে কি একটি আহ্বানের সুর নেই? তা কি নিরন্তর বলছে না, আমার টাকায় সুখ নেই, খ্যাতিতে সুখ নেই শক্তিতে প্রতাপে সুখ নেই, শুধু তুমি একবার এস। সেই তুমি কে, তা কেউ বলতে পারে না। তবু তুমি এস।

সেই পরিচিত পথ। সেই সব বাড়িঘর, দোকানপাট, রিকশা-স্ট্যাণ্ড, লাইট পোস্ট —সেই লোক চলাচল। ঐ তো অদূরে কাকলিদের বাড়ি, ছাদ, সেই বন্ধুর মত কদম গাছ। আশ্চর্য, গাছটাও মানুষের মত চোখ চাইতে পারে। আর, আরো আশ্চর্য, তার চোখে সেই কাকলির হাসি। হে বন্ধু, আছ তো ভালো?

তবু দ্বিধা যায় না পা ছেড়ে।

যদি দেখে, বরেন বসে আছে। থাক না, ভালোই তো, গল্পের পরিধিটা বাড়িয়ে নিতে পারবে। অপ্রতিভ হবার আছে কী। বরং অবস্থাটা এমন হোক, বরেনই অন্য কাজের ছুতো করে বেরিয়ে যাক রাস্তায়। আর যদি বসে থাকতে চায়, শুনুক তাদের আপিসের কেচ্ছা তাদের বাজার-দরের আলোচনা।

আর যদি বরেন না থাকে! কেউ না থাকে!

হাসতে-হাসতে নামবে কী কাকলি? দু-চারটে বে-সরকারী কথা কইবে? অন্তত রাজনীতি নিয়ে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার চেহারা নিয়ে? চা দেবে খেতে? আবার একদিন আসবেন, বলবে কি যাবার সময়?

বাড়ির দিকে আরেকবার তাকাল সুকান্ত। কাকলি কোন্ ঘরে আছে? য-ঘরটায় আলো জ্বলছে, সেই ঘরে? না কি যেই ঘরটা অন্ধকার, সেই অন্ধকারে?

কিংবা কে বলবে, হয়তো বাড়িতেই নেই।

'আছে।' সুকান্তর প্রশ্নের উত্তরে চাকর বললে।

'শোনো, আমি বাড়ির গিন্নি-মাকে চাই না। চাই তাঁর বড় মেয়েকে, মিস মিত্রকে। বুঝেছ? যিনি—'

'হ্যাঁ, বুঝেছি। যিনি অফিসে কাজ করেন।' জান্তা মুখ করল চাকর।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাঁকে খবর দেবে।'

'কী নাম বলব?'

এক মুহূর্ত কী ভাবল সুকান্ত। বললে, 'না, নাম লাগবে না।'

'ইচ্ছে করলে এই স্লিপেও নাম-ঠিকানা লিখে দিতে পারেন।' চাকর কাগজ-পেন্সিল এগিয়ে ধরল।

দরকার নেই। তুমি গিয়ে শুধু বলো, 'একজন ভদ্রলোক এসেছেন।'

চাকর তাই বলতে গেল।

ব্যাডমিণ্টনের শাটল-কক-ও বোধহয় এত তাড়াতাড়ি ফেরত আসে না। চাকর ফিরে এসে বললে, 'দেখা হবে না বলে দিলেন।'

'হবে না?' কোনো মানে হয় না, তবু নিষ্প্রাণ কণ্ঠে পুনরুক্তি করল সুকান্ত।

আর, শাটল-কক নয়, ফুটবলের মতই বেরিয়ে গেল মাঠ পেরিয়ে।

খুব হয়েছে! নিজেই ধর্ম দেখছে এখন। ছি-ছি গাল বাড়িয়ে কেমন চড়টা খেলে! থোঁতা মুখ কেমন ভোঁতা হল! প্রাণও গেল ধুকোড়িও গেল। কাকলি তো গেছেই, আত্মসম্মানটাও গেল।

মন বলে বাদশা হবি, খোদা বলে মেগে খাবি।

ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাবার জন্যে উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা হল সুকান্তর। নিজেকে ভুলে যেতে, মুছে ফেলতে নিঃশেষে। নিক্ষেপ অন্য সত্তায় নিয়ে যেতে। এখান দিয়ে এখন যদি একটা মিছিল যেত ঠিক ভিড়ে যেত দলে। কিংবা রাস্তার মোড়ে জমত কোনো জটলা, ও-ও তার শ্রোতা হয়ে বসত।

একটা ভিড়-ভর্তি চলতি ট্রামে উঠে পড়ল সুকান্ত। কোথাকার ট্রাম জিগগেসও করল না। কোনোক্রমে এ অঞ্চল থেকে পালিয়ে যেতে পারলে যেন বাঁচে। হয়তো পিছন থেকে সবাই ওকে দেখছে, দেখছে বা ঘেঁষাঘেঁষি করে জানলায় দাঁড়িয়ে, কিংবা ছাদের রেলিঙ ধরে, ঝুঁকে পড়ে। দেখছে লাঠির ভয়ে কেমন লিকলিকে ন্যাজে পালিয়ে যাচ্ছে নেংটি ইঁদুর।

এদিকে কাকলিও নিজেকে বিন্দুমাত্র রেয়াত করছে না। ধিক্কারে শতধা হয়ে যাচ্ছে। সত্যিই তো, কলিং বেল তো বাজায়নি—সেই ডবল আওয়াজ! তবে কোন্ আইনে আগন্তুককে বরেন বলে সাব্যস্ত করল? খুব অহঙ্কার হয়েছে, তাই একবার নিচে নামতে পর্যন্ত পারল না। কৌতূহল পর্যন্ত হল না সে নামহীন লোকটি কে? খুব ড্রয়িংরুম করেছে, খুব খুলেছে সে সোফা-সেটির শো-রুম। খুব কার্পেট বিছিয়ে সে ধুলো ঢেকেছে। খুব রেখেছে সে চাকর কাগজ-পেন্সিল খুব বসিয়েছে সে কলিং বেল! এত বড় যে বাড়ে, তাকে ঝড় ভাঙবেই ভাঙবে। এ জন্যই বলে অতিমেঘে অনাবৃষ্টি। আশ্চর্য তুই

কাকলি, নিজেকে নিজে সে তিরস্কার করছে, তুই এত হিল্লি-দিল্লি করিস, সামান্য ক'টা সিঁড়ি ভেঙে তুই নিচে নামতে পারিস না? সাত ঘাট ঘুরে এসে তুই তোর নিজের পুকুরে ডুবে মরিস। তোর কী হয়েছিল? কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনি!

এখন ছাদে ওঠবার কোনো মানে হয়? আর সব জায়গা ফেলে সে ছাদে এসে রয়েছে? কোন্ পথ দিয়ে এল শুনি, কোন্ সিঁড়ি বেয়ে? কে জানে। তবু একা-একা ছাদেই খানিকক্ষণ পায়চারি করল কাকলি। যে আসতে জানে, সে স্মৃতির পথ দিয়েই আসতে পারে, আসতে পারে অনুভবের সিঁড়ি ভেঙে। অন্ধকারেই তার আলোকিত উপস্থিতি।

বেজায়গায় ট্রামে উঠে পড়েছে, খানিকদূর যেতেই টের পেয়ে নেমে পড়ল সুকান্ত। আচ্ছা, দেখা হবে না যে বলল, কার সঙ্গে দেখা হবে না—এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিল কাকলি? তবে ক্ষুব্ধ মুখে অমনি চটপট উঠে আসার কোনো মানে হয়? সে তো কথায় বা লেখায় মোটেই এমন জানান দেয়নি যে সুকান্তই এসেছিল। তবে কাকলির প্রত্যাখ্যানের অন্য অর্থ, নির্দোষ অর্থও তো হতে পারে। আশ্চর্য, সে নিজে প্রত্যক্ষরূপে সত্যাসত্য নিরূপণ করল না কেন? বেশ তো, কাকলি এসে দাঁড়াত সামনে, সামনে না হলে অন্তত সিঁড়ির রেলিঙ ধরে, বলত, না, হবে না দেখা, আমি বাজে লোকের সঙ্গে দেখা করি না। কেন যাচাই করে দেখল না স্বচক্ষে, রূঢ় ভাষাটা শুনল না স্বকর্ণে। সে তো আর পকেটে করে পুরনো দিনের কঙ্কাল নিয়ে আসেনি, সে নতুন সম্পর্কের, অফিস-সম্পর্কের ছাড়পত্র নিয়ে এসেছে। তবে অত পালাই পালাই কেন? বসে থেকে এপার-ওপার কেন দেখে গেল না? কথায়-লেখায় জানান দেয়নি, একবার গলা ছেড়ে সেই 'কলি' বলে ডেকে উঠতে কী হয়েছিল? দেখত সে-ডাক কী প্রতিধ্বনি নিয়ে আসে! গেট-আউট, ক্লিয়ার-আউট বলায় কিনা।

খুব কেরদানি দেখিয়েছ। নিজেকেই নিজে টিটকারি দিল সুকান্ত। এখন হোটেলের ছেলে হোটেলে ফিরে যাও।

হ্যাঁ, হোটেলে যেতে দোষ কী। ইন্টারভিউর সময়ে ঠিকানাটা তো চোখে পড়েছিল কাকলির। আর চোখে পড়ামাত্রই কোনো-কোনো ঠিকানা কারু কারু মনে যদি গাঁথা হয়ে যায়, তবে আর কী করা যাবে? হোটেলে মানুষ তো কত কাজেই যেতে পারে, শুধু লোক খোঁজবার জন্যেই যা হবে কেন? ঘর খালি আছে কিনা, কী রকম রেট—এই অনুসন্ধান তো খুবই সাধারণ। অত কথায় কাজ কী। হোটেল

রবীন্দ্র-রচনাবলী

॥ এখন সব-কয়টি খণ্ডই পাওয়া যাচ্ছে ॥

মোট ২৬ খণ্ডের মধ্যে সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত ছয়টি খণ্ডের দাম কাগজের মূল্যবৃদ্ধির হেতু স্বতন্ত্র হারে নির্ধারিত হল।

কাগজের মলাট

খণ্ড ৯ ১০ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ প্রতিটি ৯৲।
অন্যান্য খণ্ড পূর্ববৎ ৮৲।

বিশ্বভারতী

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন । কলিকাতা ৭

শ্রেষ্ঠ শারদ সংখ্যা ঃ "ঋতায়ন"

সর্বদিকে শ্রেষ্ঠ এবং জনপ্রিয় লেখকদের এমন সমাহার দুর্লভ!!

—ঃ গল্প ও রস-রচনা ঃ—

॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র
॥ সমরেশ বসু
॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

পরিমল গোস্বামী, দীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যশোদাজীবন ভট্টাচার্য, বিষ্ণু ভৌমিক, জ্যোতির্ময় ঘোষ, অজয় দাশগুপ্ত

মহালয়ার আগেই বেরোবে। পাঠক ও এজেন্টরা অগ্রিম অর্ডার দিন। উচ্চ কমিশন।

প্রবন্ধ ঃ—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ অরুণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, পল্লব সেনগুপ্ত।

কবিতা ঃ—হরপ্রসাদ মিত্র, নীরেন চক্রবর্তী, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, বীরেন রক্ষিত, আশীস সান্যাল, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক,

প্রাপ্তিস্থান ঃ—আগামী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্। ৫৯ পটুয়াটোলা লেন; কলিকাতা—৯
ফোন—৩৪-৫২১৩।

(সি ৭৫১২)

সদ্য প্রকাশিত সর্বশেষ উপন্যাস

অপরাজেয় কথা-সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শান্তিলতা ২॥০

'শান্তিলতা' স্বর্গত লেখকের প্রতিভার ও সাহিত্য সাধনার সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি হিসাবে বাংলা দেশের ঘরে ঘরে সমাদৃত হবে, উপহারের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে,—সেকথা নিঃসন্দেহে বলা চলে!

..........................পুজোয় প্রিয়জনকে উপহার দিন..........................

প্রেমেন্দ্র মিত্রের নতুন উপন্যাস ॥ আবার নদী বয় ৩৷৹
শক্তিপদ রাজগুরুর চলচ্চিত্রে যুগান্তকারী উপন্যাস ॥
মেঘে ঢাকা তারা ৪॥৹, দেবাংশী ৩৲
নীহার গুপ্তের বিখ্যাত রহস্যোপন্যাস ॥ রঙের টেক্কা ৪॥৹

সাহিত্য জগৎ—২০৩/৪, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

উপহার দেবার মত
সদ্য প্রকাশিত কয়েকটি বই

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
রহস্য কাহিনী
নিশিরাতের কান্না
কিরীটি রায়ের নতুন অ্যাডভেঞ্চার
দাম : ২·৭৫

অজিতকুমার রায়চৌধুরীর
অকাল প্রেম
একখানি নিটোল প্রেমের উপন্যাস
দাম : ৩·০০

সুনীল ঘোষের
বিখ্যাত উপন্যাস
স্বর্ণমৃগয়া
আনন্দবাজার বলেন : "এ যুগের অন্যতম ট্র্যাজেডীকে লেখক আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। স্বর্ণমৃগয়া নিঃসন্দেহে সম্প্রতিকালে প্রকাশিত একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হিসাবে পরিগণিত হবে।" নূতন সংস্করণ। দাম : ৬·৫০।
জলতরঙ্গ—৭·০০; অনাদৃষ্ট—৬·০০

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নির্বাসিতের আত্মকথা
"পুরাতন তবু চিরনূতন একখানি বই।" —আনন্দবাজার।
"এ রকম বই পৃথিবীর সব সাহিত্যেই, বাঙলা সাহিত্যে তো বটেই—বিরল।" —সৈয়দ মুজতবা আলি।

সৌখিন সম্প্রদায়ের অভিনয়-উপযোগী নাটক
নীহাররঞ্জন গুপ্তের
রাত্রি শেষ ২·০০
চৌধুরী বাড়ি ২·০০

: পূজার আগেই বেরুচ্ছে :
বনচাঁড়ালের কড়চা—গোপাল হালদার
দুই সমতল—কার্তিক ভট্টাচার্য
উল্কা (৪র্থ সং)—নীহাররঞ্জন গুপ্ত
ব্যাকুল বসন্ত (২য়)—সুনীল ঘোষ

ন্যাশনাল পাবলিশার্স
২০৬, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিঃ ৬
(সি ৭৬১০)

যখন, তখন অনায়াসে সেখানে থাওয়া চলে, বাইরের লোক নিষিদ্ধ নয় নিশ্চয়ই। অত যাচাই কিসের? সোজাসুজি সুকান্তর খোঁজ করলেই বা কী দোষ! শত হলেও প্রমোশন পাবার পর ও তো এখন তার 'কলিগ', সমান-সমান, অফিস-এটিকেটেই তো রিটার্ন-ভিজিট দেয়া চলে। আকস্মিক যখন এসেছিল, তখন নিশ্চয়ই কোনো জরুরী ঠেকা ছিল, অন্তত সেটুকু জেনে নেওয়াও তো ভদ্রতা।

যাক খুব কর্মদক্ষতা দেখিয়েছ। নিজেকেই নিজে গঞ্জনা দিচ্ছে কাকলি। দশ হাত কাপড়েও কাছা দিতে শেখনি, তুমি খুব বুদ্ধিমতী। লোকটা কে খোঁজ না নিয়েই চলে যেতে বললে। পাখিটা খাঁচায় এসেছিল, দরজা বন্ধ করলে না, উড়ে পালাল। এখন বলছ, বন থেকে তাকে খুঁজে আনবে। বলি, চাকরিতে তোমার প্রমোশন হয় না?

ক্রিং-ক্রিং, ডবল বেল বাজল।

ওই, কে জানে কে, নিজের চোখে দেখিগে। এমনও হতে পারে, আবার এসেছে, চাকরের অপেক্ষা না করে নিজেই বেল টিপেছে। আর, কিছু না জেনেই, সাধারণভাবেই দুটো আওয়াজ করেছে।

শব্দ শোনামাত্রই ছুটে নেমে এসেছে কাকলি।

না, আর কেউ নয়, বরেন বসে।

খুব ত্বরান্বিত হয়ে এসেছে, আর খুব আনন্দিত মুখ, কাকলিকে দেখে উথলে উঠল বরেন, 'এখন পথ নিষ্কণ্টক। অবজেকশান বাতিল হয়ে গেছে। এবার দিনটা ঠিক করে ফেল।'

মুহূর্তে নিবে কালো হয়ে গেল কাকলি। দুর্বলের মত শ্রান্ত ভঙ্গিতে বসল। বললে, 'আমি বলছিলাম কী—'

'কী বলছিলে?'

'বলছিলাম, আমার শরীরটা খুব খারাপ যাচ্ছে, কয়েকদিন ছুটি নিয়ে চেঞ্জে যাব ভাবছি। তাই বলছিলাম, আর কিছুদিন অপেক্ষা করলে হত না?'

বরেন এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল। একটু বুঝি বা কী চিন্তা করল। নিচের ঠোঁটটা একটু কামড়াল দাঁত দিয়ে। বললে, 'বা, অপেক্ষা করা যাবে না কেন? কিন্তু এ নোটিসটা তা হলে ল্যাপস করে।'

'তা করুক না।' মুহূর্তের জন্যে আবার উজ্জ্বল হল কাকলি। 'পরে আবার নোটিস দেব।'

'আবার যে তার তিন মাসের মাথা অসুস্থ হয়ে পড়বে না তার ঠিক কী' পাশের ঘর থেকে গায়ত্রী এসে বললে গম্ভীর মুখে। 'তোমার এমন কিছুই এখ অসুখ করেনি। একটু বুকে কাঁপা বা মাথাধরা—সে একটা কিছু অসুখই নয়।'

মিনতি-ভরা চোখে মা'র দিকে তাকাল কাকলি।

গায়ত্রী বললে, 'ছুটি নিতে চাস, নে। সেটা বিয়ের ছুটি।'

'আমিও ছুটি নেব।' বললে বরেন, 'তারপর হনিমুনে যেখানে বলো সেখানে ঘুরতে যাব। দেশ বলো দেশে, বিদেশে বলো বিদেশে।'

'সেইটেই তো চমৎকার চেঞ্জ হবে।' সায় দিল গায়ত্রী।

কথা কয় না কাকলি তবু।

সমস্ত ব্যাপারটা নিমেষের মধ্যে আয়ত্ত করে নিল বরেন। নিয়ে এল নখদর্পণে। বুঝল, যে কোনো কারণেই হোক, কাকলির মধ্যে অনিচ্ছা জেগেছে। সে অনিচ্ছাকে বাড়তে দেওয়া হবে না, সবল হাতে উপড়ে ফেলতে হবে—আর সম্ভব হলে, আজই, এক্ষুনি। এমন একটা কিছু করতে হবে, যাতে ওর মধ্যে আর দ্বিধা না থাকে, আড়ষ্টতা না থাকে। যাতে অকুণ্ঠ আগ্রহে ও-ই বিয়েতে অগ্রণী হয়, ওর নিজের স্বার্থে, নিজের মঙ্গলে। বিয়েটাকে আবশ্যিক করে তুলতে হবে। ওর জীবনে এঁকে দিতে হবে বলিষ্ঠ স্বাক্ষর। দাগ করে দিতে হবে দলিল।

এইখানে একটু সতর্ক হল বরেন। বললে, 'শরীর যদি ভালো না থাকে, শুভ কাজ পিছিয়ে দিতেই হবে। তার আর কথা কী। শরীরমাদ্যং—'

'একজন স্পেশালিস্ট তা হলে দেখাও।' গায়ত্রী বললে।

'তা হবে'খন। ব্যস্ত কী।' বরেন কাকলির দিকে তাকাল। বললে, 'চলো বেরিয়ে আসা যাক। দেবনাথের ফার্মের জায়গাটা দেখবে চলো।'

'হ্যাঁ, চলুন,' মুখে আর সরলতায় ঝলমল করে উঠল কাকলি। 'ও-জায়গাটা আমার দেখা হয়নি।'

'তা হলে চট করে তৈরি হয়ে এস।'

যেতে-যেতে পিছন ফিরল কাকলি। হাসিমুখে বললে, 'আর ঐটেই বুঝি আপনার বাগানবাড়ি?'

উদাসীনের মত মুখ করে বরেন বললে, 'হ্যাঁ, আছে একটা চালাঘর।' (ক্রমশ)

দেবপ্রিয় দে'র
"মৃগতৃষা"
মূল্য ২·৫০
ফুলের মত নিষ্পাপ এক নারীর ব্যর্থ জীবনের মর্মান্তিক পরিণতি নিয়ে লেখা উপন্যাস। মহালয়ার আগেই আত্মপ্রকাশ করছে।
নব বলাকা প্রকাশনী
৪ নফরচন্দ্র লাহা লেন, কলি-৩৬
(সি ৭৪৯২)

পুস্তক পরিচয়

সরস গল্প সংকলন

সরস গল্প—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত। প্রকাশক—নতুন সাহিত্য ভবন, ৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলিকাতা—২০। দাম ৮·৫০ নয়া পয়সা।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য নানা দিক থেকেই অত্যন্ত সমৃদ্ধ, কিন্তু সরস গল্পের বড় অভাব। এমন নয় যে, বাংলা দেশের পাঠকরা হাসতে ভুলে গেছে। কিংবা এ-ও নয় যে, তাঁরা লেখকদের কাছ থেকে হাসির গল্প চান না। তবু দেখা যাচ্ছে, আজকের দিনের লেখকরা এত বেশী গম্ভীর, এমন কি, প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুঃখবাদীও। অথচ এমন অবস্থা ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে কদাপি ঘটেনি। মধ্যযুগের সাহিত্যের উল্লেখ করার দরকার নেই, কারণ তখনও কথাসাহিত্যের জন্মই হয়নি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী থেকে রবীন্দ্রনাথ এবং তদকালীন এমন কোনো খ্যাতিমান লেখকের নাম করা প্রায় অসম্ভব, যিনি কিছু-না-কিছু সরস গল্প রচনা করেননি। সে-তুলনায় আধুনিক কালের লেখকরা যে এদিকে অনেক কম নজর দিচ্ছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার প্রমাণ আলোচ্য গ্রন্থের সূচীপত্রের ওপর একবার চোখ বুলোলেই পাওয়া যাবে। বিষণ্ণতাই জীবনের সব নয়, হাসিও জীবন ও আনন্দের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। সুতরাং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সরস গল্পের সংকলন উপহার দিয়ে পাঠকদের উপকারই করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর দীর্ঘ ভূমিকাটি লেখকদেরও প্রণিধানযোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে স্বয়ং সম্পাদক পর্যন্ত ছত্রিশ জনের রচনা এখানে সংকলিত করা হয়েছে। যদিও বাংলা ছোট গল্প লেখকের সংখ্যার তুলনায় এ-সংখ্যা প্রায় নগণ্য, তথাপি বলতে বাধা নেই, সম্পাদনা প্রায় নিখুঁত। অবনীন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতি কিন্তু লক্ষণীয়। তাঁদের রচনাবলী থেকে কি সম্পাদক দু'টি গল্পও এ-গ্রন্থে স্থান দেবার মতো খুঁজে পাননি? সাম্প্রতিকদের মধ্যে রূপদর্শীর অনুপস্থিতিও যুক্তিসংগত নয়। তবু সম্পাদককে এইজন্য ধন্যবাদ দিতে চাই যে, সংকলনের ব্যাপারে তিনি কোনো গোঁড়া মতামতের আশ্রয় নেননি, এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণযোগ্য রচনাকেই বেছে নিয়েছেন। এ-কাজ যে কত পরিশ্রমসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ, তা একটু চিন্তা করলে যে-কোনো পাঠকই বুঝতে পারবেন। প্রত্যেক রচনাকারের একটিমাত্র লেখাকে এখানে স্থান দেওয়া হয়েছে, অথচ এমন অনেক লেখক আছেন, যাঁরা প্রচুর ভালো ছোট গল্প লিখেছেন। সুতরাং কোনো পাঠক হয়তো তাঁর প্রিয় লেখকেরও সবচেয়ে পছন্দের গল্পটি না দেখে ক্ষুন্ন হতে

সুধীন্দ্র মজুমদার প্রণীত

ত্রি ভু জ

মৌমাছিপুঞ্জের মতো ভিড় ক'রে আসা অজস্র চরিত্র, সুখ ও অসুখের উদ্বেজনায় যারা মহাযুদ্ধে আতল অন্ধকারের ছায়াচ্ছন্নতায় বিচিত্র; নির্জনে 'মীনিং অব হ্যাপিনেস'-এর সূচিমুখে রক্তক্ষরিত হলেই কি সুখের মর্মার্থ অর্জিত হবে? সময় জট পাকিয়ে গেছে, দেশ কাল ইতিহাস অন্ধ কালা! বাংলা-সাহিত্যে এ-রকম উপন্যাস আর লেখা হয় নি। ৪·৫০।

*

১৭২।৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা ২৯

......নি উ স্ক্রি প্ট প্র কা শি ত পু স্ত ক......

এ ১৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ১২

*

এই উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর জীবন-চেতনায় বাঁচবার শপথকে সত্যানুগ অনিবার্যে উত্তীর্ণ করিয়ে নতুন ক'রে রমেশচন্দ্র সেন তাঁর সেই প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার অনিবার প্রাখর্যকে প্রমাণিত করেছেন। যেমন তা প্রমাণিত হয়েছিল তাঁর শতাব্দী কুরপালা এবং কাজলে। এই উপন্যাসের জন্য তিনি বাংলা-সাহিত্যপাঠকের কাছে অকপট সাধুবাদে অভিনন্দিত হবেন। ৩·৫০।

অ প রা জে য়

রমেশচন্দ্র সেন প্রণীত

অধ্যাপক শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা-গ্রন্থ

বঙ্কিম জিজ্ঞাসা

ধর্মচেতনা, জীবনচেতনা, শিল্পচেতনা, সমাজচেতনা, উত্তরসূরী রবীন্দ্রনাথ—পাঁচটি অধ্যায়ে বঙ্কিম-প্রতিভার নূতন মূল্যায়ণ। উপন্যাস-শিল্পের সংজ্ঞাবিচারে বঙ্কিম-রীতির অভিনবত্ব প্রকাশ, স্বপ্নতত্ত্বের মনোবিজ্ঞানসম্মত আলোচনা এবং বিশেষ-ভাবে 'চন্দ্রশেখর' চরিত্রের আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য ॥ মূল্য ৩·২৫ ॥

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী * শান্তি লাইব্রেরী

॥ নবভারতী : ৮৮/সি, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা-১৪ ॥

পারেন; কিন্তু সে-অবস্থায় সম্পাদককে দায়ী করা সংগত হবে না। পাঠককে খুশী করতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ নেই। ছবিগুলোর জন্যে শিল্পী অহিভূষণও ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। ১৭৪।৬০

সাহিত্য আলোচনা

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য : ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৬ : মূল্য দশ টাকা।

"ঊনবিংশ শতকের বাঙালীর এই নব-জাগরণ শুধু মাত্র একটি নবসাহিত্য রচনার উদ্যম লইয়া নহে; এই নব-জাগরণের একটি গভীর এবং ব্যাপক রূপ আছে; সেই গভীরতা এবং ব্যাপকতার উৎস হইতেই এই যুগের সাহিত্য প্রচেষ্টা উৎসারিত। রাষ্ট্রজীবন, সমাজ-জীবন, ধর্ম-সংস্কৃতি, শিক্ষা-সভ্যতা সর্বক্ষেত্রে আসিয়াছিল প্রবল আঘাত; এই আঘাত জাতিকে বিপর্যস্ত বা বিমূঢ় করিতে পারে নাই আত্মরক্ষার সহজাত বৃত্তিতে জাতিকে আত্মশক্তি ও আত্মচৈতন্যে উদ্বুদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করিয়াছিল।" বক্ষ্যমান গ্রন্থটির ভূমিকা-রচনায় এই মন্তব্যটি লিপিবদ্ধ করেছেন ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

আমাদের জাতীয় ভাবধারা ও সাহিত্যের ক্রমবিবর্তনের ক্ষেত্রে ঊনবিংশ শতক একটি বিশেষ চিহ্নিত যুগ সন্দেহ নেই। এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্যারীচাঁদ-মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক-সত্তার উন্মেষ এবং জাতীয় চিন্তাধারার এক বিশিষ্ট রূপায়ণ। কিন্তু এই পরিণতির উৎসকে অনুসন্ধান করতে গিয়ে লেখক ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের চিন্তাধারা ও মানস-বিক্ষোভের রেখাঙ্কনকে স্থান দিয়েছেন তাঁর এই গ্রন্থে। তাঁরই ভাষায়, "বাঙালীর চিত্ত-সংকটের সেই স্বরূপ অনুসন্ধানের চেষ্টা করিয়াছি।" প্রায় পাঁচশো পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটিতে লেখক যে-যে বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে তাঁর আলোচনার ভিত্তি স্থাপনা করেছেন তার মধ্যে আছে ১৮০০—১৮১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সমকালীন বাঙালীর মানস ও বাঙলা সাহিত্যের অনুশীলনের কথা। তারপর আছে রামমোহন ও বাংলার নব-জাগৃতির কথা। পরবর্তী প্রসঙ্গে আছে মূলত ঈশ্বর গুপ্ত ও তাঁর প্রভাব এবং সাহিত্য-বিবর্তনের আলোচনা। তৎপরবর্তী-কালে—ভাবোন্মত্তার অবসানে জাতির আত্মস্থ হবার কাল। বিদ্যাসাগর ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অবদান। এমন কি, সম-কালীন নাট্যসাহিত্য সম্পর্কেও তাঁর আলোচনা বাদ যায়নি। ১৮০০ থেকে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সাহিত্য-চর্চাকে কেন্দ্র করে বাঙালীর জাতীয় জীবনে যে ভাব-বিবর্তনের স্রোত বয়ে গেছে, তারই রেখাঙ্কন করবার প্রয়াস পেয়েছেন লেখক।

আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, বিষয়টি অভূতপূর্ব আলোচনা নয়। গ্রন্থকারের প্রভূত পরিশ্রমের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েও বলছি, এ বিষয়ে নানান নিবন্ধ ইতস্তত সাময়িকপত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি, কোনো-কোনো পূর্বলিখিত গ্রন্থও ঐ সমস্ত আলোচনার স্মৃতি বহন করছে। কিন্তু যেটা গ্রন্থকারের মৌলিকত্ব নির্ণয় করে, সে হচ্ছে তাঁর দৃষ্টিকোণ। প্রতিটি অধ্যায়ের মধ্যে যেসব তথ্যের সন্নিবেশ এবং উল্লেখ আছে, তা এ ধরনের নিবন্ধ গ্রন্থে

প্রকাশক : বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়

প্রকাশিত হইল।

দেবেন্দ্রনাথ সেন : কাব্য-চয়নিকা

মণিমঞ্জুষা গ্রন্থাবলী

শ্রেষ্ঠ কবিদের শ্রেষ্ঠ রচনাবলী : সুলিখিত কবি ও কাব্য-পরিচিতি
কবির সুন্দর আলোকচিত্র : উৎকৃষ্ট কাগজ, মুদ্রণ, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ
প্রতি বই পাঁচ টাকা

অক্ষয়কুমার বড়াল : কাব্য-চয়নিকা

পরিবেশক : শ্রীগুরু লাইব্রেরী ও ডি, এম, লাইব্রেরী, কলি-৬

বাঙলা সাহিত্য প্রকাশনায় যুগান্তকারী সংযোজন

প্রেমেন্দ্র মিত্র
পরিকল্পিত

বঙ্গ সাহিত্য সম্ভার

অধ্যাপক প্রতিভাকান্ত মৈত্র
সম্পাদিত

প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলাদেশে নূতন জীবনবোধ জাগ্রত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর সামগ্রিক সমাজ-বিপ্লবের ইতিহাস জানতে পারা যায় তৎকালে রচিত বাঙলা গ্রন্থাদি পাঠ করে। কিন্তু যে-সব গ্রন্থ সে ইতিহাসের উপকরণ বহন করছে সেগুলি আজ বাঙালী পাঠকের কাছে নিতান্ত দুর্লভ। অতীতের গর্ভ থেকে প্রায়-অবলুপ্ত অমূল্য গ্রন্থরাজির পুনরুদ্ধার ও সাধারণের পক্ষে সহজলভ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হচ্ছে 'বঙ্গসাহিত্য সম্ভার'।

প্রথম খণ্ডে আছে : মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের **'রাজাবলি'** (বাঙলা ভাষায় লিখিত প্রথম ইতিহাস ১৮০৩) : ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **'নববাবুবিলাস'** (বাঙলা উপন্যাসের অংকুর—১৮২৩) : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের **'সমাজবিষয়ক কবিতা'** (বাঙলা খণ্ড কবিতায় প্রথম সমকালের ছায়া—১৮৩১-৫৬) : রামনারায়ণ তর্করত্নের **'কুলীন কুলসর্বস্ব'** (প্রথম সামাজিক নাটক—১৮৫৪) : ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের **'অঙ্গুরীয় বিনিময়'** (প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস—১৮৫৪)।

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। দাম (বিশেষ বাঁধাই) ৬৲

বারীন্দ্রনাথ দাশ রচিত
নিশীথ নিঝুম ৩৲
বাঙলা ভাষায় সম্পূর্ণ নূতন ভঙ্গি ও পরিপ্রেক্ষিতে রচিত উপন্যাস

শিক্ষাবিদ রচিত
ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ১৲
চীফ ইন্সপেক্টর সোশাল এডুকেশন নিখিলরঞ্জন রায়ের ভূমিকাসহ

দি বুক ক্লাব প্রাইভেট লিমিটেড
৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা ৭

(সি-৩৫০৮)

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী-র
অনন্যসাধারণ গল্পগ্রন্থ
পতঙ্গ
দেশ বলেনঃ 'রাক্ষসী' গল্পের চমক, 'প্রতিনিধির' পরিবেশ রচনা ও গূঢ়ব্যঞ্জনা স্মরণযোগ্য। গ্রন্থের শেষ গল্প 'পতঙ্গ' নিঃসন্দেহে একটি বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা।
গল্পগুলি অবশ্যই আপনাকে আনন্দ দেবে। দাম—২.৫০
কল্লোল প্রকাশনী :
এ ১৩৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

পথের পাঁচালীর
অমর কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকখানি অবিস্মরণীয় সাহিত্যসৃষ্টি
নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব ৩৷৷০
অশনি সংকেত ৪৷৷০
অনুসন্ধান ... ... ৩৲
উর্মিমুখর ২৸০
ছায়াছবি ... ... ৩৲
বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন
মফঃস্বলের সকল অর্ডার সযত্নে সরবরাহ করা হয়
বিভূতি প্রকাশন
২২এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২
(সি-৭৫৬৫)

নাটক সম্বন্ধীয় একমাত্র প্রগতিশীল দ্বিমাসিক
সূত্রধার
এ সংখ্যায় লিখছেনঃ নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ডাঃ সাধন ভট্টাচার্য, ডাঃ অরুণ মুখোপাধ্যায়, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, গুরনেক সিং, নীরদ নাথ। এছাড়া নিয়মিত বিভাগে রয়েছেঃ নাট্যমঞ্চ পরিক্রমা, নাট্য সংস্থা ও নাট্যকার পরিচিতি, নাট্যান্দোলনের বিবিধ সংবাদ ও বেতারনাট্যের আলোচনা। মূল্য ৭৫ নঃ পঃ।
সর্বত্র গ্রাহক ও এজেন্ট চাই।
১০এ, অশ্বিনী দত্ত রোড। কলিকাতা-২৯
(সি ৭৪৬২)

থাকাই স্বাভাবিক, কিন্তু সে-সবকে কেন্দ্র করে তাঁর যে বিশ্লেষণ লক্ষ্য করলাম, তার প্রতি রসিক চিত্ত আকর্ষিত না হয়ে পারে না। বিশেষ করে তাঁর ভাব-দ্বন্দ্ব পর্যায়ের আলোচনা অতি মনোজ্ঞ এবং অভিনবত্বেরও সূচনা করেছে। সমকালীন সাংস্কৃতিক পটভূমিকার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে নানাবিধ সম-সাময়িক আন্দোলনের যে পরিচিতি দিয়েছেন লেখক, তার মধ্যে দিয়ে তাঁর নিজস্ব উপলব্ধির বস্তুও ধরা পড়ে। ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধীয় আলোচনাও সারগর্ভ, কিন্তু মদনমোহন তর্কালংকার এবং অক্ষয়কুমার দত্তকে নিয়ে তাঁর যে বিচার-বিশ্লেষণ লক্ষ্য করলাম, তাতে তাঁকে সাধুবাদ না দিয়ে পারি না বিশেষ করে 'অক্ষয়কুমার দত্ত ও বুদ্ধিবাদের জয়ঘোষণা' শীর্ষক পরিচ্ছেদটির জন্য। বিদ্যাসাগর ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও তাঁর আলোচনা মূল্যবান, কিন্তু 'সমকালীন নাট্যসাহিত্য' পরিচ্ছেদটি যতোটা 'তথ্যসম্বলিত' রচনা হয়েছে, ততটা মর্মগ্রাহী হয়নি বলে আমার ধারণা। অবশ্য এ কোনো বৃহৎ ত্রুটি নয়, প্রধানত যে-বিষয়বস্তুকে উপজীব্য করে লেখকের চিন্তা-উৎসারণ ঘটেছে বক্ষ্যমান গ্রন্থে, তা বহু-আলোচিত হলেও নূতন এক আস্বাদের দাবি রাখে, এবং লেখক যে চিন্তাধারার স্বাক্ষর রেখেছেন এ-বইয়েতে, তার সঙ্গে বহু পাঠকই একাত্মবোধ করবেন বলে মনে হয়। এক কথায় লেখকের শ্রম ও বিচার সার্থক।

১৬৫।৫৯,

ছোট গল্প

ইস্টকুটুম—লীলা মজুমদার। ত্রিবেণী প্রকাশন। ২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা—১২। তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

এখনকার শক্তিমান লেখিকাদের মধ্যে লীলা মজুমদারের নাম একবাক্যে উচ্চারিত হবার যোগ্য। তাঁর লেখা ভালো লাগে এইজন্যে যে, তাঁর ভাবনা-কল্পনার চলাফেরার রাস্তাটি একেবারে নতুন। ঝকঝকে তকতকে। সেখানকার গাছপালা, রঙ, আকাশ-মাটি সব সজীব। দুঃখকে এক ঝলক খুশির খোলা হাওয়ায়—নৈরাশ্যকে হাসির হাল্কা আলোয় লাঘব করবার দুর্লভ লাবণ্যময় গুণ আছে বলেই শিশুদের প্রিয়-লেখিকা লীলা মজুমদার। বর্তমান বই 'ইস্টকুটুম'-এর গল্পগুলি পড়ে স্বতই এ-প্রত্যয় জন্মাল,—শুধু কিশোর-হৃদয় নয়, বয়স্ক পাঠকের চিত্তকেও যাদুস্পর্শে তিনি রসাল করে তুলতে জানেন। তাঁর গল্প-কথনের ভঙ্গি বৈঠকী। বেশ আড্ডা-জমানো শরিফ মেজাজ। এ-বইয়ের চার-ছ পাতার এক-একটি

বাংলায়
আগাথা ক্রিষ্টি
রহস্যকাহিনীর রচয়িতা হিসাবে আগাথা ক্রিস্টি বিশ্ববিদিত। প্রাচুর্যের সঙ্গে বৈচিত্র্যের সমন্বয় তাঁর অতুলনীয় রচনার বৈশিষ্ট্য। ক্রিস্টির বিপুল গ্রন্থরাজি থেকে কয়েকটি সুনির্বাচিত কাহিনীর অনুবাদ প্রকাশের আয়োজন হয়েছে।
প্রথম আসন্ন প্রকাশ
দশ পুতুল
ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

বাংলা নাট্য সাহিত্যে এই প্রথম
একাঙ্কি সঙ্কলন
এতে আছে। রবীন্দ্রনাথ, শচীন সেনগুপ্ত, তুলসী লাহিড়ী, তারাশঙ্কর, মন্মথ রায়, বনফুল, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, নন্দগোপাল, পরিমল গোস্বামী, বিধায়ক, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অখিল নিয়োগী, সুনীল দত্ত, গিরিশংকর, সোমেন নন্দী, শীতাংশু মৈত্র, কিরণ মৈত্র, রমেন লাহিড়ীর কুড়িটি শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের নাটকের অভূতপূর্ব সংকলন।
একাঙ্ক নাটকের তত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্পাদকদ্বয় ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য ও ডঃ অজিতকুমার ঘোষের দুটি মূল্যবান আলোচনায় সমৃদ্ধ।
মূল্য—আট টাকা
বীরু মুখোপাধ্যায়ের নতুন পূর্ণাঙ্গ নাটকঃ সাহিত্যিক ২, উমানাথ ভট্টাচার্যের মঞ্চসফল নাটকঃ শেষ সংবাদ ২.৫০, সুনীল দত্তের মর্মস্পর্শী পূর্ণাঙ্গ নাটকঃ অভিশপ্ত ক্ষুধা ১.৭৫
জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ছোট ছোট গল্প নিঃশেষে পাঠ করে মনে হল, বড়ো বড়ো মুক্তোর একগাছি সুন্দর মালা স্মৃতির-দেরাজে যাকে সযত্নে তুলে রেখে দেওয়া যায়।

আনন্দ-ফূর্তি, উৎসবের জরি-আলো, বাঞ্ছিত হৈ-চৈ, মজা-আমোদ, পুরনো অথচ সুগন্ধী নানারঙা কাহিনী, নতুন নতুন আজগুবি কথাবার্তা, হাসি-ঠাট্টা-মস্করা—এ-সবের যেন ভোজ লেগে গেছে উপস্থিত গল্পগুলিতে। যে-সব চরিত্র গল্পগুলির জানলায়-দরজায় উঁকি দিয়েছে, তাদের সকলের সঙ্গে ভাব জমাতে ইচ্ছে যায়, লোভ সংবরণ করা যায় না। চরিত্রগুলি তাক লাগায়। গল্পের কাগজের শিকলে মন সারাক্ষণ বাঁধা থাকে। বটুমামা, পেল্লু, পিসেমশাই, নেশা, মন্দাকিনীর প্রেম-কাহিনী—এরা সব আদর্শ গল্প। এ-সব গল্পে যে-সব সুন্দরীর আচমকা সাক্ষাৎ মিলেছে, তাদের রূপ বর্ণনায় লেখিকা যে কারিকুরি করেছেন, তা তাঁর নিজস্ব। কাঁচপোকার মত জ্বলজ্বল-করা তারার মত ঝিকমিক-করা রূপ, ম্যাগনোলিয়া ফুলের মত রঙ, ভোমরার মত চোখ, পদ্মের মত হাত-পা তাদের। এই চিত্রকরী রূপ-বর্ণনাকে তারিফ না করে উপায় নেই। কোন কোন গল্পে ভয়-মেশানো রাত্রি আর অলৌকিক ঘটনাও ছমছমিয়ে উঠেছে। হীরে-চুনি-পান্না-বসানো জড়োয়া কাজ-করা ভাষায় গল্পগুলি পড়ে বাংলা গল্পের একটি নতুন চেহারার সম্মুখীন হওয়া গেল। লেখিকা 'ইস্টকুটুমে'—এ-কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন, ছোটদের লেখায় জাদুকর হলেও তিনি বড়দের লেখায় সমানই নিপুণ কারিগর।

বইয়ের প্রচ্ছদপট শোভন। ২৬।৬০

রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

রবীন্দ্রস্মৃতি

"কোনো মহাপুরুষকে বাইরের লোকে যেভাবে দেখে বা তাঁর প্রতিভার যে পরিমাণ পরিচয় পায়, ঘরের লোকের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক সে রকম নয়। তারা বেশি কাছ থেকে দেখে বলে যেমন তাঁর ব্যাপক বা সমগ্র ব্যক্তিত্বের অনুধাবন করতে পারে না, তেমনি অনেক ছোটখাটো ইঙ্গিত জানতে পায়, যা বাইরের লোকের অধিগম্য নয়। আত্মীয়মাত্রেরই যে এই সৌভাগ্য ঘটে তা নয়, তবে নানা ঘটনাচক্রে আমরা বহুদিন ধরে তাঁর নিকটসান্নিধ্য এবং ঘনিষ্ঠপরিচয় পাবার সুযোগ পেয়েছিলুম। সেই ছোটখাটো পরিচয়-খণ্ডগুলি একত্র করে এই স্মৃতিপটে সাজিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি।"

গ্রন্থমুখ : রবীন্দ্রস্মৃতি

সূচী ॥ সংগীতস্মৃতি, নাট্যস্মৃতি, সাহিত্যস্মৃতি, ভ্রমণস্মৃতি, পারিবারিক স্মৃতি

মূল্য ২.০০ : বোর্ড-বাঁধাই ও বহুচিত্র-শোভিত ৩.৫০ টাকা

লেখিকার অন্যান্য গ্রন্থ

নারীর উক্তি

এই গ্রন্থে, সাহিত্যে সমাজে বা ব্যক্তিগত ব্যবহারে শালীনতার প্রয়োজন কতটা তার খোলাখুলি আলোচনা আছে। তা ছাড়া, 'বর্তমান স্ত্রী শিক্ষা-বিচার' 'সম্বন্ধ' 'আদর্শ' 'পার্সেল-বিল' 'বঙ্গনারী—কঃ পন্থা, কি ছিল, কি হল, কি হতে চলিল' ইত্যাদি প্রবন্ধে লেখিকার সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ সহজ ও সরস অভিমত গ্রন্থটিকে সুখপাঠ্য করেছে।

মূল্য ২.৫০ টাকা

বাংলার স্ত্রী-আচার

পশ্চিম উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের বিবাহ-পূর্ব বিবাহ-কালীন ও বিবাহ-উত্তর স্ত্রী-আচারসমূহের বিবরণ। গ্রন্থশেষে বিবাহের গান সন্নিবিষ্ট।

মূল্য ১.৩০ টাকা

রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম

রবীন্দ্রনাথ গানের ক্ষেত্রেও কি রকম পরকে আপন করে নিতে পেরেছেন, চলিত কথায় যাকে গান-ভাঙা বলা হয়—তার পরিধি কত বিস্তৃত এবং তাতেও কি রকম অপরূপ কারিগরি দেখিয়েছেন, দৃষ্টান্ত-সহ তার আলোচনা। প্রত্যেক সংগীত-রসিকের অবশ্যপাঠ্য বই।

মূল্য ০.৮০ নয়া পয়সা

বিশ্বভারতী

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন । কলিকাতা ৭

প্রাপ্তি সংবাদ

বসন্ত বনের হরিণী—বিধায়ক ভট্টাচার্য।

যোগ-বিয়োগ—আশাপূর্ণা দেবী।

স্মরণের আবরণে—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

কংকাল—জিতু গুপ্ত।

গ্রন্থ বার্তা—শীলভদ্র।

ফুলের ডালি—পরিতোষকুমার চন্দ্র।

নাম যার পারাবত—সমীর চৌধুরী।

উনপঞ্চাশিকা—ডাঃ প্রভুরাম চট্টোপাধ্যায়।

পুতুলের কান্না—বীরেন্দ্রকুমার রায়।

অনেক আকাশ—সৈয়দ আলী আহসান।

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা ও সাহিত্য—অতীন্দ্র মজুমদার।

অভিশপ্ত অশ্রু—সুনীল দত্ত।

মনের মত গল্প—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

বাংলার লোক-শ্রুতি—ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য।

মর্মবাণী—শ্রীবলেন্দ্রনাথ কুণ্ডু।

স্বপ্নাঞ্জলি—চার্লস ডিকেন্স আণ্ড্রুজ। অনুবাদক নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

মহিষাদলের অর্জিনী—বাণীকুমার।

আমি এক সদাগর—সুধাংশু গুপ্ত।

A Common script system—N. D. Agarwala.

রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

সত্যজিৎ সকাশে

(বিশেষ প্রতিনিধি)

ছুটির দিনের অবসর-মুহূর্তে গুণীর সান্নিধ্যে যে কত মূল্যবান ও রমণীয় হয়ে উঠতে পারে তা-ই অনুভব করলাম গত রবিবার সন্ধ্যায় সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে দেখা করতে গিয়ে। শ্রীরায়ের বসবার ঘরে ঢুকেই দেখি তিনি তন্ময় হয়ে

সত্যজিৎ রায়ের এই ছবিটি তুলেছেন অলক মিত্র

বিঠোফেন-এর রেকর্ড শুনছেন। ঘরে একাই ছিলেন তিনি। বিঠোফেন-এর সুরে ডুবে থাকা তাঁর পক্ষে শুধু অবসরবিনোদনই নয়, অনেকটা বুঝি তাঁর শিল্প-সাধনারও অঙ্গ। শ্রীরায়ের এই সুর-তন্ময়তার পরিচয় মেলে তাঁর ছবির অনুপম আবহ-সুররচনায়। তাঁর রসানুভূতি সংগীত-পরিচালককেও বুঝি অভূতপূর্ব সুরসৃষ্টির প্রেরণা জোগায়।

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর নির্মীয়মান ছবি সম্বন্ধে এবং বর্তমান বাংলা চিত্রশিল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে অনেক কথাই হল সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের তিনটি গল্প নিয়ে—('পোস্টমাস্টার', 'সমাপ্তি' ও 'মণিহারা')—তিনি বর্তমানে যে ছবিটি তুলছেন সেই প্রসঙ্গেই প্রথম কথা তুললাম। তিনি বললেন, ছবিটির নাম রেখেছি 'গল্পগুচ্ছ'। তিনি আরও বললেন, দশ দিনেই 'পোস্টমাস্টার'-এর শুটিং শেষ করেছি'। ছবিটি দৈর্ঘ্যে চার হাজার ফুটের কাছাকাছি হয়েছে। 'পোস্টমাস্টার'-এর নায়কের ভূমিকায় রূপদান করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়। রতনের চরিত্রে নেওয়া হয়েছে একজন নতুন মেয়েকে। এই নতুন শিল্পীর নাম ও ছবি এখনই খবরের কাগজে ছাপতে বারণ করেছেন তিনি। সে স্কুলে পড়ে এবং খবরের কাগজে ও সাময়িক পত্র-পত্রিকায় ওকে নিয়ে পাবলিসিটি বেরোতে থাকলে পড়াশুনোর দিক দিয়ে মেয়েটির ক্ষতি হবে বলে তিনি আশংকা করেন।

রবীন্দ্রনাথের তিনটি গল্পের নায়িকাই হবেন সত্যজিৎ রায়ের নতুন আবিষ্কার। 'সমাপ্তির' নায়করূপে তিনি নির্বাচিত করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে। 'গল্পগুচ্ছ' ছবি শুরু হবে 'পোস্টমাস্টার' দিয়ে, এর পর থাকবে 'মণিহারা' এবং তারপর 'সমাপ্তি'। তিনটি গল্প নিয়ে 'গল্পগুচ্ছ' ১৪ হাজার ফুটের কাছাকাছি হবে বলে তিনি জানালেন।

চাণক্য সেন-এর
নতুন অবিস্মরণীয় উপন্যাস

রাজপথ জনপথ

দাম ঃ ৬·৫০ ন. প.

লেখক কর্তৃক প্রাপ্ত পত্রাবলীর একটি ঃ

কালীতলা, হুগলী
১০-২-৬০

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

'রাজপথ জনপথ'-এর আমি একজন ভক্ত পাঠক।...যে দুটি কারণে আপনার বিচিত্র রচনা পড়ে মুগ্ধ হয়েছি তা সবিনয়ে নিবেদন করছি। বাংলা সাহিত্যের ভৌগোলিক সীমানা ইতিমধ্যে বিস্তৃত হয়েছে অনেকখানি। শুধু বাংলাদেশই নয়, বহির্বাংলার অনেক অংশই আজ আমাদের সাহিত্যের অন্তর্গত। শুধু মাত্র অভিনবত্বের জন্যেই আমরা, বেদে, নাগা, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, এমন কি দূরে আন্দামানের অধিবাসীদের কাছে বাংলা সাহিত্যের জমি বেচেছি। আজ সুদূর আফ্রিকাকে আপনি আমাদের সামনে এনে দিয়েছেন। পিটার কাবাকু নিপীড়িত আফ্রিকার মূর্ত প্রতীক। রাজপথ জনপথ বাংলা সাহিত্যের আঞ্চলিকতা পরিহার করে আন্তর্জাতিকতায় উত্তরণের প্রথম পথ।

দ্বিতীয় কারণটি আরও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করি। কবিগুরুর জন্ম-শতবার্ষিকীর আয়োজন চলেছে দেশে-বিদেশে। শুধু আড়ম্বর অনুষ্ঠানেই কি তা সম্পূর্ণ হবে? 'এসো যুগান্তরের কবি' তিনি যাঁকে ডাক দিয়ে গেছেন, আফ্রিকার নবজাগরণের দিনে সে কই? আপনি তার খানিকটা অন্ততঃ পালন করেছেন। 'আফ্রিকা' কবিতার এক অপূর্ব গদ্যবাণীরূপ রচনার জন্য আপনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

'রাজপথ জনপথ' অনন্যশ্রেণীর রচনা। তাই কোন পূর্বনির্দিষ্ট মানদণ্ডে তার বিচার হবে না।

(স্বাঃ) বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

আমাদের অন্যান্য বই ঃ **করুণা কোরোনা** । **স্টিফান জাইগ** । ৬·০০ ॥ **রেজর্স এজ** । **সমারসেট মম্‌** । ৬·০০ ॥ **ডোরিয়ান গ্রের ছবি** । **অসকার ওয়াইল্‌ড** । ৪·৫০ ॥ **অভিশপ্ত উপত্যকা** । **কোনান ডয়েল** । ৪·০০ ॥ **প্রিয়াল লতা** । **সঞ্জয় ভট্টাচার্য** । ২·৫০ ॥ **বধূ অমিতা** । **হীরেন্দ্রনাথ দত্ত** । ২·০০ ॥ **জলকন্যার মন** । **শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়** । ৩·০০ ॥ **তিমিরাভিসার** । **শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়** । ৫·০০ ॥ **বালির প্রাসাদ** । **পুলকেশ দে সরকার** । ৪·০০ ॥ **দুই সখী** । **বিনয় চৌধুরী** । ২·০০ ॥ **ধন্বন্তরির দিনলিপি** । **ধন্বন্তরি** । ২·০০ ॥

নবভারতী ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ঃ ঃ কলিকাতা—১২

(সি-৭৫৭৪)

ওস্তাদ মসীদ্ খাঁর কৃতী ছাত্র শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু প্রণীত অপূর্ব গ্রন্থ

তবলা শিক্ষা ও সংস্কৃতি ৫৲

দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ ৫৭/সি, কলেজ স্ট্রীট, কলি—১২

শারদীয়া গল্প-ভারতী

বাংলা সাহিত্যে এক নূতন যুগের সৃষ্টি করিয়াছে।

এবারের শারদীয়া সংখ্যা অন্যান্য বৎসরের গৌরবকেও ম্লান করিবে। সর্বদলের শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকার এরূপ সমন্বয়, এরূপ মণিকাঞ্চনযোগ পূর্বে কখনও সম্ভব হয় নাই।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ উপন্যাসিকত্রয়ের তিনটি সম্পূর্ণ উপন্যাস।

● তিনটি বড়গল্প।

● ত্রিশটি গাঝার ও ছোটগল্প।

● সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকারের একটি সম্পূর্ণ নাটিকা।

রম্য-রচনা, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ ও একটি অপূর্ব সচিত্র সংযোজন।

ইহার বিশেষ বিশেষ আকর্ষণ।

গল্পভারতী পূজা সংখ্যার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা শুধু একটি উৎসবঋতুর সামগ্রী নয়। প্রত্যেক সুধীজনই সানন্দে স্বীকার করিয়াছেন যে, ইহা বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির চিরস্থায়ী নিদর্শন।

প্রায় ৪৩০ পৃষ্ঠার এই বিরাট শারদীয়া সংখ্যা বহু দিনের পরিকল্পনাপ্রসূত ও প্রায় ৫০ জন খ্যাতনামা সাহিত্যরথীর সমবেত সক্রিয় প্রচেষ্টার ফল।

সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য মূল্য পূর্ববৎ মাত্র ৪৲। সডাক ৪.৭৫ নঃ পঃ।

ভিঃ পিঃ-তে বই পাঠানো হয় না।

এজেন্টগণ সত্বর কাহার কত কপি প্রয়োজন জানান।

বার্ষিক চাঁদা সডাক ১৫৲। বার্ষিক গ্রাহকগণ কোন অতিরিক্ত মূল্য না দিয়াই পূজায় এই বিরাট সংখ্যা ও অন্যান্য বিশেষ সংখ্যাগুলি পাইবেন।

গল্প-ভারতী

২৭১বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ — ফোন : ৫৫-৩২৯৪

॥ ইষ্টলাইটের বই ॥

উল্টোডাঙ্গার জঙ্গলে নবাব তনয় নবাব সন্ধি করলেন ইংরেজের সঙ্গে। সন্ধির নাম আলিনগরের সন্ধি। সেই সন্ধি হলো ভারতীয় রাজনীতির সন্ধিক্ষণ। যব চার্নক যে সংসার পত্তন করেছিল, ক্লাইভ সেখানে পত্তন করেছিল সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ, আড়াই শ' বছর পরে মানুষ কেমন করে সেখানে জোয়ারের স্রোতে উঠল আর নামল তারই রম্য-কাহিনী। যাদের কথা ভুলে গেছি তাদের কথা স্মরণ করবার মতো স্মরণীয় গ্রন্থ।

দাম ২.৫০

বেদুইন । এই শহরে

: আমাদের আরও কয়েকখানি স্মরণীয় গ্রন্থ :

আশাপূর্ণা দেবী	। শশিবাবুর সংসার	... ৪.০০
বিমল মিত্র	। প্রথম পুরুষ	... ৩.০০
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	। নীল সিন্ধু	... ৩.২৫
নীহাররঞ্জন গুপ্ত	। বহ্নিশিখা	... ৬.৫০
"	। পিয়া মুখ চন্দা	... ৪.৫০
"	। বিয়ের আগে ও পরে	... ৫.০০

স্মরণীয় সংকলন

পরিমল গোস্বামী সম্পাদিত	। বাঙ্ময় বাঙ্ময়ী	... ৭.৫০

ইস্টলাইট বুক হাউস

২০, স্ট্র্যান্ড রোড । কলিকাতা ১

আগামী বছরের মে মাসে ছবিটি মুক্তিলাভ করবে।

'পোস্টমাস্টার'-এর কাজ শেষ হয়েছে। এবার তিনি হাত দেবেন রবীন্দ্রনাথ নিয়ে তাঁর প্রামাণিক চিত্রের কাজে। ছবিটির চিত্রনাট্য তৈরী হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও মানসিকতার কোন বিশেষ দিকের ওপর ছবিতে প্রাধান্য থাকবে কিনা জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, 'রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মের ভেতর দিয়ে একটি যুগের মানসিকতা কেমনভাবে বিকশিত হয়ে উঠল তাই রূপ নেবে ছবিটিতে'। প্রসংগত তিনি বললেন, "শুধু তাঁর কবি-মানস নিয়ে প্রামাণিক ছবি তৈরী করলে সাধারণ দর্শকদের কাছে তা সহজগ্রাহ্য না হওয়াই স্বাভাবিক।" তাঁর ছবিতে রবীন্দ্র-আবির্ভাবের পূর্ববর্তী যুগ-মানসের অপ্রচ্ছন্ন পরিচয় থাকবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্ম ও সাধনার ভেতর দিয়ে নবজাগ্রত ভারতের আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব কী-ভাবে গ্রহণ করলেন, বিশ্বজনীনতার একনিষ্ঠ পুরোহিতরূপে আপন ভূমিকা তিনি কী-ভাবে সার্থক করে তুললেন, বিশ্বমানবের কাছে অনাগত কালের উদ্দেশ্যে কী বাণী তিনি রেখে গেলেন—তাই হবে শ্রীরায়ের এই প্রামাণিকচিত্রের প্রধান উপজীব্য। "রবীন্দ্রনাথের "সভ্যতার সংকট"-এর ভাববাণী বিশেষভাবে রূপায়িত হবে আমার ছবিতে," সত্যজিৎবাবু বল্লেন। "সভ্যতার সংকট"-এর অন্তর্নিহিত বাণীর প্রকৃষ্ট রূপ ও এর ঐতিহাসিক পটভূমি গড়ে তোলার জন্যে শ্রীরায় "মন্তাজে"র ভেতর দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দৃশ্যাবলী ছবিতে পরিবেশন করবেন স্থির করেছেন। যুদ্ধের "স্টক শট"-এর ব্যবস্থার জন্যে তিনি কিছুকালের মধ্যেই একবার বিদেশে যাবেন বলে জানালেন।

গ্রামোফোন রেকর্ড ও টেপ-রেকর্ডে গৃহীত রবীন্দ্রনাথের একাধিক আবৃত্তি এই প্রামাণিক চিত্রটিতে সংযোজিত হবে। তা-বাদে একক ও সমবেত কণ্ঠে রবীন্দ্র-সংগীতও থাকবে ছবিটিতে। কিছুকাল আগে সত্যজিৎ রায় যখন শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন, তখন তিনি সদ্যপরলোকগতা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর নিজের গাওয়া রবীন্দ্র-সংগীত টেপ-রেকর্ডে তুলে এনেছেন। তিনি বললেন, "ইন্দিরা দেবীর নিজের গাওয়া গান ছবিতে ব্যবহার করার সুযোগ হয়তো হবে না। কিন্তু আমার কাছে তা এক বিশেষ সম্পদ হয়ে রইল।"

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তাঁর নির্মীয়মান প্রামাণিক ছবিটি দৈর্ঘ্যে পাঁচ হাজারের কাছাকাছি হবে। এই দৈর্ঘ্যের মধ্যে তিনি রবীন্দ্র-জীবন নিয়ে তাঁর ধ্যান ও কল্পনাকে রূপ দিতে পারবেন কিনা জিজ্ঞেস করাতে তিনি বললেন, "দৈর্ঘ্য আরেকটু বেশী হলে ভালোই হতো। তবু এর মধ্যে যতটুকু সম্ভব

এস এম ফিল্ম ইউনিটের "যাত্রী" ছবির এই দৃশ্যটি তোলা হয় কন্যাকুমারীতে। বীণা ও সেন এ ছবির দুই প্রধান চরিত্র।

চেষ্টা করছি নিজের 'আইডিয়া'কে রূপ দিতে।"

অনেক কথার পর জিজ্ঞেস করলাম "দেবী চৌধুরাণী"র কথা। তিনি বললেন, "বঙ্কিমচন্দ্রের এই ক্লাসিকটি নিয়ে আমার ছবি করবার ইচ্ছে অনেকদিনের। বাইরে থেকে "দেবী চৌধুরাণীর" চিত্ররূপে পরিচালনার প্রস্তাব যখন এল তখন আমি সানন্দেই তা গ্রহণ করলাম"। দেবী চৌধুরাণীর ভূমিকার জন্যে সত্যজিৎ রায় এখনও কোন শিল্পী নির্বাচন করেন নি। "তবে এ-ভূমিকায় যিনি অভিনয় করবেন তাঁকে খাটতে হবে খুব। আউটডোরেই তাঁকে থাকতে হবে বেশীর ভাগ সময়," তিনি বললেন।

"মহাভারতে"র কথা তাঁকে জিজ্ঞেস করতে ভুলিনি। কিছুকাল আগে সংবাদ রটেছিল তিনি মহাভারতের কুরুক্ষেত্র-পর্বের চিত্ররূপ দেবেন। এবং খুব ব্যয়বহুল ছবি হবে এটি। এ-ছবির ব্যাপারে তিনি বর্তমানে বিশেষ কিছু ভাবছেন না বলেই জানালেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বললেন, "রামায়ণের কাহিনী সাধারণ দর্শকরা যতটা আগ্রহের সঙ্গে নেন, মহাভারতের আখ্যান নিয়ে তাদের ততটা যেন আগ্রহ নেই।" কারণ হিসাবে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বললেন, "মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ—বিশেষত কুরুক্ষেত্র-পর্বে—ধর্মগুরু, কর্মবীর, নেতা ও রাজনীতিজ্ঞ। তাঁর জীবনের এই অধ্যায়ে দর্শকরা ভক্তি-রসের সন্ধান কম পান বলেই হয়তো মহাভারতের কাহিনী নিয়ে তোলা ছবি বক্স-অফিসে ততটা সফল হয়নি।" বক্স-অফিসে সাফল্যের সম্ভাবনা কম বলেই যে মহাভারতের কাহিনী নিয়ে সত্যজিৎ রায় ছবি তৈরীর সংকল্প সাময়িক ত্যাগ করেছেন তা-নয়। তিনি পরে বললেন, "শিক্ষিত দর্শকরা মহাভারতের কাহিনীর চিত্ররূপ খুবই উৎসাহের সঙ্গে নেবেন। বিদেশীরাও এ-ছবিতে ভারতের আধ্যাত্মিকতার মর্মরূপটি দেখতে পাবেন"। তবু অনেক দিক ভেবে এই ছবির কাজে আপাতত হাত দেওয়ার সংকল্প তিনি স্থগিত রেখেছেন।

সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সুযোগ যাঁদের হয়নি তাঁদের জানিয়ে রাখি, এই বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী ও চিত্রপরিচালক ব্যক্তিগত জীবনে সুরসিক, সদালাপী ও বন্ধুবৎসল। বিশ্বজোড়া সম্মানের অধিকারী হয়েও তিনি নিরহংকার, কাউকে তিনি সহজে নিরাশ করেন না। সারাদিন শ্যুটিং-এর পর ক্লান্ত হয়ে তিনি ফিরেছেন। তারপর এতক্ষণ আমার সঙ্গে আলাপের পর যখন জনৈক প্রেস ফটোগ্রাফার এসে নানাভাবে তাঁর ছবি তুলে নিতে চাইলেন তখন তিনি তাঁর ক্লান্তি প্রকাশ করেছেন, কিন্তু বিরক্তি প্রকাশ করেন নি। তিনি শুধু

জয়ঢাক কৌতুক নাট্যগুচ্ছ
দাম--আড়াই টাকা
রচনা—সুধীর সরকার
প্রান্তিক পাবলিশার্স
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট : কলি-১২
(সি ৭৪৮৭/২)

জানেন কি!
কলকাতায় সাধারণ রঙ্গালয় ৫টী
ষ্টার | বিশ্বরূপা | মিনার্ভা | রংমহল
ও
গিরিশ থিয়েটার
যেখানে নিয়মিত ভাবে
সোমবার · বুধবার
শুক্রবার ৬॥ টায়
রবিবার ও ছুটীর দিন
সকাল ১০॥টায়
... নাটক অভিনয় হচ্ছে
নাটক সলিল সেন | পরিচালনা • বিধায়ক ভট্টাচার্য্য
আলোক নির্দেশনা • তাপস সেন
চরিত্রে ...
রাধামোহন • জ্ঞানেশ • বিধায়ক • সুনীল
অরুণ • রমেশ • প্রভাত • গীতা জয়শ্রী প্রভৃতি

জিগীষা
শারদ সংখ্যা
দুইটি সম্পূর্ণ উপন্যাস
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
বিধায়ক ভট্টাচার্য
— এ ছাড়া —
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, নারায়ণ গঙ্গোঃ, সুধীরেন্দ্র সান্যাল, হরিনারায়ণ চট্টোঃ, নীলকণ্ঠ, শিবরাম চক্রবর্তী, জীবনানন্দ ঘোষ, সুনীল ধর, পুলক বন্দ্যোঃ, বঙ্কিম চট্টোঃ, কালীকিঙ্কর দাস, রমেন চৌধুরী, শ্যামল ঘোষাল ইত্যাদি
শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্রের
(সরস আলোচনা)
দাম : ২·৫০ ন. প.
১৩৫এ, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট
কলিকাতা—৭
ফোন: ৩৪—৫৫১১
(সি-৭৫৬৬)

গন্ধর্ব নব নাট্যান্দোলনের একমাত্র ত্রৈমাসিক মুখপত্র
২য় বর্ষ বর্ষশেষ সংখ্যা (·৫০ নঃ পঃ) প্রায় নিঃশেষিত। একাধিক নাটক ও বহু মূল্যবান আলোচনা নিয়ে তৃতীয় বর্ষ ১ম সংখ্যা বেরোবে মহালয়ায়। দামঃ ১·০০ টাকা।
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য সডাকঃ ৪·০০ ॥ মফঃস্বলে এজেণ্ট চাই।
গন্ধর্ব ॥ ১৩৩/১এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড । কলিঃ ৬
(সি ৭৪৬৫)

পূজোর নাটক নির্বাচনের আগে আর একবার ভেবে দেখবেন——
সস্তা হাততালি যদি পেতে চান, অথচ দর্শকদের মনে গভীর আলোড়ন যদি সৃষ্টি করতে চান — অভিনয় করুন—
পরীক্ষিতের
অন্তরঙ্গ ২৲
১৪টি পুরুষ চরিত্র ও একটি মাত্র নারী চরিত্র।
আর্ট য়্যান্ড লেটার্স পাবলিশার্স, জবাকুসুম হাউস,
৩৪, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১২

শিশির সেন শিশির সেন
১। আনন্দনিকেতন ৪·৫০
অপরাজেয় জীবনসত্যের নির্ভীক মূল্যায়নে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ
'আপনার বইটিতে সদভাবনা ও ভদ্রতা যথেষ্ট মাত্রায় আছে। হয়ত এ যুগে তাই অপরাধ বলে গণ্য হবে।'
ডক্টর শিশিরকুমার ঘোষ, অধ্যাপক বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন
২। একটি ফুল দুটি নায়ক ৩·০০
'ভাবনা ব্যক্তির জন্যে, সত্যের জন্যে, রূপের জন্যে, রসের জন্যে, উক্তির জন্যে, উক্তির অর্থের জন্যে, জীবনের তাৎপর্যের জন্যে।'
বোরিস পোস্টারনায়ক
এ-গ্রন্থ দুটি নিজে পড়ুন প্রিয়জনকে উপহার দিন
আনন্দ পাবলিশার্স ঃঃ ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ঃঃ কলিকাতা-১২

মানস
লেখকসূচী শারদ সংকলন
কবিতা ॥
বিষ্ণু দে
মণীন্দ্র রায়
বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
দক্ষিণারঞ্জন বসু
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়
সিদ্ধেশ্বর সেন
প্রমোদ মুখোপাধ্যায়
জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়
শ্যামসুন্দর দে
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
রাম বসু প্রভৃতি
প্রবন্ধ ॥
অরুণ মিত্র
প্রিয়তোষ মৈত্রেয়
গোপিকানাথ রায়চৌধুরী
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
পঙ্কজ দত্ত
সুনীল মিত্র
প্রভৃতি
গল্প ॥
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়
অমিয়ভূষণ মজুমদার
বরেণ গঙ্গোপাধ্যায়
দেবেশ রায়
কল্যাণশ্রী চক্রবর্তী
সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়
শুভ্রাংশু ভট্টাচার্য
অজয় গুপ্ত
প্রভৃতি
মানস কার্যালয়
৬৪, বহুবাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা ১২
(সি ৭৫৬২)

বললেন, "আমরা তো ফিল্ম স্টার নই। এমনিতে আমাদের চেহারা ছেপে কী হবে। শুটিং-এর কাজের সময় আমাদের ছবি নেওয়ার তবু একটা মানে থাকতে পারে"। বললেন ঠিকই, কিন্তু সহাস্যে ফটোগ্রাফারের সব আব্দারই তিনি মেনে নিলেন।

এবার বলি তাঁর বিনয়ের কথা। রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে" উপন্যাসটির চিত্ররূপ তিনি একবার দিতে চেয়েছিলেন। সে-প্রসঙ্গ তুললাম। কথায় কথায় তিনি বললেন, "অনেক আগে "ঘরে-বাইরে"-এর চিত্রনাট্য তৈরী করেছিলাম। "পথের পাঁচালী" করবারও আগে তৈরী করেছিলাম চিত্রনাট্যটি। চিত্রনাট্যটি আজকের দিনে হলে চলত না। খুবই কাঁচা হয়েছিল।" মুগ্ধ হলাম তাঁর বিনয় দেখে।

রবীন্দ্রনাথ ও শিশু রঙমহল

কবিগুরু শিশুদের সম্বন্ধে বলেছেন—তাদের আনন্দের উৎস অফুরন্ত। সজীব সচেতন মন নিয়ে তারা পৃথিবীকে আপন করে নেয়। মধ্যদিনে আকাশছোঁয়া ঘুড়ির শন্‌শন্‌ আওয়াজের মধ্যে একটি নিঃসঙ্গ বালক সুদূরের হাতছানি অনুভব করে। বাড়ির সীমানায় যে নারকেল গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে আদিমযুগের অভিযাত্রী দলের বন্দী হয়ে, তারা যেন জানিয়ে দেয় তারা চিরকাল ধরে মানুষের কত আপন।

ছোট একটি গল্পের মধ্যে গুরুদেব শিশুমনের কল্পনা বিকাশ দেখিয়েছেন। কবি বললেন, একটি শিশু তাঁকে ধরেছে গল্প শোনাতেই হবে। তিনি ধরলেন বাঘের গল্প। গায়ের কালো কালো ডোরা বাঘের আর ভাল লাগে না। তাই বাঘ তাঁর চাকরের কাছে সাবান চাইলো, সাবান মেখেই কালো ডোরাগুলি তুলে ফেলবে। শিশু হেসেই অস্থির। শিশুমনের আনন্দ কল্পনার প্রসারে—সে যেন বাঘটাকে সাবান মাখতে দেখতে পাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন কোথায় শিশুমনের সরল দৃষ্টি আর বড়দের জটিল মনের তফাত।

এই শিশুমনের সরল দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ শিশু রংমহলের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কবিগুরু শিশু রঙমহলের ক্রমবিকাশ দেখলে নিশ্চয়ই প্রীত হতেন। তাঁর বাঘের গল্পের বিশ্লেষণ থেকেই বোঝা যায় কেন শিশু রঙমহলের "জিজো", "হলদে ঝুঁটি মোরগ" আরও অনেক গল্প শিশুমন জয় করেছে।

রবীন্দ্রনাথ বিশেষ করে ছোটদের জন্য তাঁর লেখার ঝুলিতে বেশী কিছু নাটিকা রেখে যান নি—"শারদোৎসব" ছাড়া। তবে শিশুমনের গতি সম্বন্ধে তাঁর ভাণ্ডার পূর্ণ। তাঁর মতে শৈশবের প্রয়োজনীয় জীবনীশক্তির সবটুকু রস তাদের যোগাতে হবে, নইলে তাদের তৃষ্ণা অতৃপ্ত থেকে

যাবে। তিনি বলেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষণ-পদ্ধতিতে এই রস পরিবেশনের ব্যবস্থা নেই। কেননা আধুনিক শিক্ষা যান্ত্রিক নিয়মে চলে।

পথ বেঁধে দেওয়া শিক্ষণ-রীতির বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তাঁর মনের আদিম দিকটা ছিল অতি সচেতন। সে মন ছিল রং, ছন্দ, জীবন, গতির পূজারী। তাঁর মতে শহুরে শিক্ষার মধ্যে এই বাস্তব রূপের প্রকাশ নেই। স্কুলের ছেলেমেয়েরা যেন ছাপমারা বাজারের কেনাবেচার জিনিস।

গুরুদেবের সান্নিধ্যে তাঁর বিদ্যায়তনের শিক্ষার্থীরা স্বভাবত কাব্যের প্রেরণা পেয়েছে পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে। আকাশের রং ফেরার সাথে সাথে তাদেরও মনের রং বদলেছে। তাই বোধ হয় উত্তর যুগের হতভাগ্য শহরের ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত আরও অনেক কাব্যরস সঞ্চয় করার তাগিদ তাঁর কাছে আসে নি। এ ছাড়া বাঘের গল্পের ছোট্ট মেয়ের মনের খোরাকও তো যোগাতে হবে! তাদেরও গুরুদেবের মত রং, ছন্দ ও গতির স্পৃহা প্রবল। সন্দেহ নেই যে তিনি ওপার থেকে শিশু রঙমহলকে তাদের এই মহৎ প্রচেষ্টায় আশীর্বাদ করছেন। তারা যে ছন্দে গানে রংএর বান ছুটিয়ে শিশুমনকে দোলা দিয়েছে, তা একঘেয়ে পাঠসর্বস্ব শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে প্রাণ আনবে।

এর দৃষ্টান্ত শিশু রঙমহলের বর্তমান কর্মপদ্ধতিতে। আগামী ডিসেম্বর মাসে শিশু রঙমহল রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদনের যে বিরাট আয়োজন করেছে তা দেখবার জন্যে গত সপ্তাহে আমরা আমন্ত্রিত হয়েছিলুম। স্টেজের যে মডেলটি সেদিন সাংবাদিকদের সম্মুখে দেখান হল তা থেকেই পরিকল্পনার বিরাটত্ব বোঝা যাবে। এই স্টেজে একসাথে ২০০টি শিশু-শিল্পী নৃত্য ও অভিনয় করতে পারবে। নানাপ্রকার দৃশ্যপট ও সাজসজ্জার পরিকল্পনায় একটা অভিনবত্ব রয়েছে যা সাধারণত দেখা যায় না। সি এল টি-র ২০০টি নিজস্ব সভ্য শ্রীবালকৃষ্ণ মেননের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা গ্রহণ করছে। একটি ব্যালে গ্রুপের শিক্ষাপদ্ধতি কি রকম হতে পারে তারও একটা ধারণা সাংবাদিক-দের হল। সংগীতাংশ পরিচালনায় রয়েছেন শ্রীদেবব্রত বিশ্বাস ও শ্রীমতী কমলা বসু। দৃশ্যপট পরিকল্পনা কার্যকরী করছেন শ্রীসুরেন চক্রবর্তী। শ্রীমতী অঞ্জলি সেন-গুপ্তের নেতৃত্বে বিচিত্র সুন্দর পোশাক তৈয়ারী হচ্ছে। শ্রীপ্রিয়লাল চৌধুরী আবহ-সঙ্গীত পরিচালনা করবেন। সমগ্র অনু-ষ্ঠানটি পরিচালনা করবেন শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায় নিজে। কলিকাতার সেরা কণ্ঠ-শিল্পিগণ সংগীত সহযোগিতায় থাকবেন। কবিগুরুর আড়াই হাজার গান থেকে বিশেষ কটি গান চয়ন করে একটি অপূর্ব গীতি-গাথা রচনা করা হয়েছে।

আগামী সি এল টি ফেস্টিভালে এই বিশেষ অনুষ্ঠান সাত দিন দেখান হবার পর দিল্লীতে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ও বাংলা দেশের কয়েকটি জেলায় শিশু-রংমহল এক মাস সফর করবে। দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নিঃসন্দেহে এবারকার ফেস্টিভালের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকবে।

ইন্দ্রানী প্রোডাকসন্সের 'হাসে শুধু হাসি নয়"-এর নায়িকা রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিত্রালোচনা

সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ছবি এস এম ফিল্ম ইউনিটের "যাত্রী"। এইটি এই সপ্তাহের নতুন বাংলা আকর্ষণ।

পনেরো হাজার মাইল জুড়ে ভারত পরি-ক্রমা করে জীবন-সন্ধানী পরিচালক সচ্চিদানন্দ সেন মজুমদার ছবির পর্দায় যে গল্পটিকে রূপ দিয়েছেন তা তাঁর স্বরচিত। গল্পের চরিত্রের মানসিক বিন্যাস অনুযায়ী তাদের স্ব স্ব অন্তরঙ্গ দৃষ্টিতে যা ধরা পড়েছে তাই হলো চিত্রাংশ। পরিবেশানুগ

॥ বই আর বই ॥

শিশু-ভারতী

(বাংলায় বুক অব নলেজ)
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত — সম্পাদিত
নানা বিষয় ও চিত্র-সম্পদে অনুপম
দশ খণ্ডে পূর্ণ। মূল্য : ১০০·০০
বিষয়সূচীর খণ্ড ২·০০

॥ছোটদের ক'খানা নতুন বই ॥

বিদ্রোহী বালক - - - - ২·২৫
রূপকথার দেশে - - - - ২·৫০
যাদুপুরী - - - - ৩·২৫
রুশদেশের উপকথা - - ২·২৫
বীরসিংহের সিংহশিশু - - ২·৫০
শুধু হাসি ভেবোনা - - ১·৫০
জগদানন্দের বিজ্ঞান-সিরিজ (১৫ বই)

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস
২২/১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা -৬

বিশ্বরূপা
(অভিজাত প্রগতিধর্মী নাট্যমঞ্চ)
[ফোন : ৫৫–১৪২৩, বুকিং ৫৫–৩২৬২]
বৃহস্পতি ও শনি রবি ও ছুটির দিন
সন্ধ্যা ৬॥টায় ৩টা ও ৬॥টায়
২১১ হইতে ২১৮ অভিনয়

সেতু

একটি চিরন্তন মানব অনুভূতির কাহিনী
আলোকশিল্পী—তাপস সেন
শ্রেষ্ঠাংশে—নরেশ মিত্র, অসিতবরণ
তরুণকুমার, মমতাজ, সন্তোষ, তমাল,
জয়শ্রী, সুব্রতা, ইরা, আরতি ইত্যাদি
ও
তৃপ্তি মিত্র (বহুরূপী)

রঙমহল
—ফোন : ৫৫–১৬১৯—
প্রতি বৃহস্পতি ও শনি : ৬॥টায়
রবি ও ছুটির দিন : ৩টা · ৬॥টায়
শততম রজনী অতিক্রান্ত

এক পেয়ালা কফি

শ্রেষ্ঠাংশে—রবীন, হরিধন, সত্য, দীপক, জহর, অজিত, বিশ্বজিৎ, পিকু, সমর, কেতকী, কবিতা ও তপতী ঘোষ

বিশ্বরূপায় বহুরূপীর অভিনয়

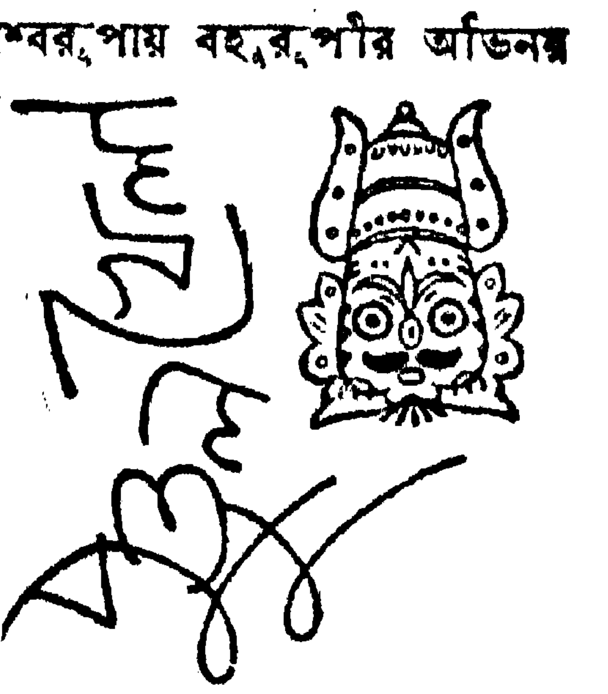

মঙ্গলবার, ৬ই সেপ্টেম্বর—সন্ধ্যা ৬॥টায়
নির্দেশনা—শম্ভু মিত্র
আলোকসম্পাত—তাপস সেন
শ্রেঃ তৃপ্তি মিত্র, শম্ভু মিত্র, অমর গাঙ্গুলী,

মনোজ বসুর বই

আঙ্কল টমস ক্যাবিন ও নীলদর্পণের সঙ্গে
উপমিত মহৎ উপন্যাসের দ্বিতীয় মুদ্রণঃ
মানুষ গড়ার কারিগর ৫·৫০

মানবিকতার জয়মুখর শাশ্বত দুই
উপন্যাসের দ্বিতীয় মুদ্রণঃ
রক্তের বদলে রক্ত ২·৫০
মানুষ নামক জন্তু ৩·০০

রাজনীতিক মানুষ নয়, সামান্য সাধারণের
প্রীতিসিঞ্চিত ভ্রমণকথার দ্বিতীয় মুদ্রণঃ
নতুন ইয়োরোপ, নতুন মানুষ ৫·০০
সোবিয়েতের দেশে দেশে ৬·০০

বেঙ্গল পাবলিশার্স লিঃ : কলি-১২

রঙমহল

সেপ্টেম্বর ● শুক্রবার ● ৬-১৫ মিঃ
[নাটক আরম্ভ ৬॥ ও শেষ ৯॥]
ছদ্মবেশী প্রযোজিত

পুতুলনাচের ইতিকথা

নবনাট্যান্দোলনের অনুরাগী
জনসাধারণের সুবিধার্থে
টিকিটের মূল্য হ্রাস

৩, ২, ১, ৭৫ নঃ পঃ ও ৫০ নঃ পঃ
প্রাপ্তিস্থানঃ ১০২, বিডন স্ট্রীট ও
থেডার্স ব্যুরো, ১২ ভূপেন বসু এভিনু।

ষ্টার থিয়েটার

[শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত] ফোনঃ ৫৫-১১৩২

শ্রেয়সী

আজকের সমাজ-সমস্যার সম্মুখীন হয়ে
যে নাটক কথা বলছে—
কাহিনীঃ **সুবোধ ঘোষ**
নাটক ও পরিচালনাঃ দেবনারায়ণ গুপ্ত
দৃশ্য ও আলোকঃ **অনিল বসু**
প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ৬॥টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটীর দিন ৩টা ও ৬॥টায়
রূপায়ণেঃ ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, সাবিত্রী চট্টোঃ, বসন্ত চৌধুরী, অজিত বন্দ্যোঃ, অপর্ণা দেবী, অনুপকুমার, লিলি চক্রঃ, শ্যাম লাহা, শীলা পাল, তুলসী চক্রঃ, পঞ্চানন, বেলারাণী, প্রেমাংশু বোস ও ভানু বন্দ্যোঃ

ধ্বনি ও সুর-সংযোজনায় এক অপরূপ জীবনকাব্য প্রতিফলিত হয়েছে এই চিত্রাংশে।

শিল্পীরা সবাই নতুন। পরিচালক যাঁদের মধ্যে কাহিনীর চরিত্রের মানসিক ঐক্য খুঁজে পেয়েছেন তাঁদেরই শিল্পী হিসাবে মনোনীত করেছেন। আবহসঙ্গীত রচনা করেছেন সুধীন দাশগুপ্ত। কণ্ঠসঙ্গীত পরিচালনা করেছেন অতুল চট্টোপাধ্যায়।

এ সপ্তাহের দ্বিতীয় নতুন ছবি "শ্রবণ-কুমার"। এটি হিন্দীতে তোলা। নলিনী চোংকর, অনন্তকুমার, অচলা সচদেব, সুন্দর, কাক্কু প্রভৃতিকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। শারদ দেশাই ছবিটি পরিচালনা করেছেন, সুর যোজনার দায়িত্ব বহন করেছেন শিবরাম।

● ● ●

জরাসন্ধের "তামসী" অবলম্বনে হিমালয় পিকচার্সের প্রথম ছবি "বিষকন্যা" তোলা হচ্ছে। শ্রীজয়দ্রথ ছদ্মনামে প্রযোজক পাঁচু বসাক স্বয়ং ছবিটি পরিচালনা করছেন। এক নারী কয়েদীকে ঘিরে ছবির কাহিনী। এই চরিত্রে অভিনয় করছেন সুপ্রিয়া চৌধুরী। অন্যান্য প্রধান ভূমিকায় আছেন নির্মলকুমার, ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, পদ্মা দেবী, তপতী ঘোষ প্রভৃতি। কতকগুলি নতুন মুখও দেখা যাবে এ ছবিতে। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে এর চিত্র-গ্রহণ চলছে। প্রায় অর্ধাংশ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে।

আলোছায়া প্রোডাকশন্সের "সপ্তপদী" সমাপ্তপ্রায়। বহুদিন পরে উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেনের একত্র সমাবেশ ছবিটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে। বিদেশিনী রিনা ব্রাউনের চরিত্রে সুচিত্রা সেন তাঁর প্রতিভার নূতন স্বাক্ষর রাখবেন বলে প্রকাশ। এই ছবির আর একটি বিশেষত্ব নায়িকার মুখে ইংরেজি গান। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন হেমন্তকুমার। উত্তমকুমার ও অজয় কর যথাক্রমে এই ছবির প্রযোজক ও পরিচালক।

● ● ●

শ্রীদিলীপ চিত্রমের প্রথম নিবেদন "যে প্রেম নীরবে কাঁদে"-র শুভ মহরত গত ২১শে আগস্ট ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে সম্পন্ন হয়েছে। আশাপূর্ণা দেবীর একটি কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন চণ্ডী নাগ। উদয়রাজ সিং ও জগন্নাথ দাশ এর যুগ্ম-প্রযোজক।

পুরাতনের পুনরাবির্ভাব

আজ থেকে দুই দশকেরও অধিককাল আগে, বাঙলা ছবির সবাক যুগের আদি-পর্বে সুশীল মজুমদার পরিচালিত "রিক্তা" ছবিটি খুবই জনসমাদর লাভ করেছিল। মাতৃত্বের বেদনা, দাম্পত্যজীবনের সংঘাত ও প্রথম যৌবনের প্রণয়কে ঘিরে তুলসী লাহিড়ী রচিত এই ছবির কাহিনীতে যে নাট্যরস দানা বেঁধে উঠেছে এ-কালের দর্শকদের কাছেও তার আবেদন অনস্বীকার্য। "রিক্তা"র এই কাহিনীগত সার্বজনীন আবেদনই ছবিটিকে নবসংস্করণে দর্শকদের কাছে নতুন করে উপস্থিত করার প্রেরণা জুগিয়েছে বীণা চিত্রম্-কে।

চলচ্চিত্রের ভাষা ও আঙ্গিকে, প্রয়োগ-কর্মে ও অভিনয়-শৈলীতে বর্তমানে বাঙলা

মিনার্ভা থিয়েটারে
রঙ-মহল কর্তৃক অনন্য নাট্যসৃষ্টি
শুধু ছায়া
রচনা : পরেশ ধর
নির্দেশনা : মনীন্দ্র মজুমদার
আবহ সংগীত : জগন্নাথ ধর
ভূমিকায় : সলিল দত্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, শোভা মজুমদার, জ্যোতিরিন্দ্র মিত্র, চিত্ত রায়, বন্ধুদেব মুখার্জী, শিবপ্রসাদ মুখার্জী, দুলাল ব্যানার্জী, হিমানী গাঙ্গুলী।
রবিবার ৪ঠা সেপ্টেম্বর সকাল দশটায়
টিকিট : ৩, ২, ১, ● মিনার্ভায় পাওয়া যাচ্ছে
(সি ৭৬৩৪)

মিনার্ভা থিয়েটার
ফোন : ৫৫-৪৪৮৯
লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের
অঙ্গার
সুর—রবিশংকর
পরিচালনা—**উৎপল দত্ত**
লোকসংগীত—**নির্মল চৌধুরী**
উপদেষ্টা—**তাপস সেন**
প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ৬॥টায়
রবিবার ও ছুটির দিন ৩ ও ৬॥টায়
(সি ৭৫৬৩)

"শ্রীশ্রীচণ্ডীর বেতার-আলেখ্য
কলিকাতা বেতারে মহালয়ার অনুষ্ঠিত
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে

মহিষাসুরমর্দিনী
রচনা স্বরালঙ্কার
বাণীকুমার পঙ্কজকুমার মল্লিক
২৪খানি সংস্কৃত ও বাংলা গানের স্বরলিপিসহ
মূল্য - ৪·৫০ ন.প.
প্রকাশক - ত্রিগুণা প্রকাশনী
প্রাপ্তিস্থান : দাশগুপ্ত এণ্ড কোং
৫৪/৩, কলেজ স্ট্রীট · কলি ১২
(সি ৭৫৬১)

ছবি যে শিল্প-কৌলিন্য অর্জন করেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বাঙ্গীন শিল্প-মূল্যের বিচারে "রিক্তা"কে হয়তো অনেকাংশে রিক্ত মনে হতে পারে। তবে বাঙলা সবাক চিত্রের প্রথম যুগের একটি সফল ও আন্তরিক শিল্প-প্রয়াস হিসাবে এ-যুগের চিত্ররসিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করবার দাবি এ ছবির অবশ্যাই আছে।

"রিক্তা"র একটি বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে আধুনিক দর্শকদের কাছে। বিগত দিনের অনেক জনপ্রিয় শিল্পীদের তাঁরা দেখতে পাবেন এ-ছবিতে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আর ইহজগতে নেই, কেউ শিল্পী-জীবন থেকে অবসর নিয়েছেন, আবার কোন কোন শিল্পী আজও রজতপটে দর্শকদের আনন্দ দিয়ে চলেছেন। যাঁরা মৃত তাঁদের বেদনাজড়িত স্মৃতি ও তাঁদের সফল শিল্পী-জীবনের সাক্ষ্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে ছবিটি। যাঁরা জীবিত তাঁদের অভিনয়-জীবনের সার্থক ক্রমবিকাশের স্বাক্ষর মেলে এই ছবিতে। এ-কালের চিত্রামোদীদের কাছে "রিক্তা"র অনেক শিল্পীর অভিনয়ই মঞ্চানুগ মনে হবে। চলচ্চিত্রের অভিনয় দিনে দিনে, বহু সাধনায় আজকের দিনে যথাযথ রূপ নিয়েছে বাঙলা ছবিতে। কিন্তু ভেবে অবাক হতে হয়, বিশ বছরেরও আগে "রিক্তা"য় আজকের দিনের মতোই সুষ্ঠু চলচ্চিত্রের অভিনয়ের পরিচয় দিয়েছেন ছবির মুখ্য নারীচরিত্রে ছায়া দেবী ও এক কুচক্রী ব্যবসায়ীর ভূমিকায় তুলসী লাহিড়ী। আধুনিকা প্রণয়িনীর ভূমিকায় রমলাকে আজকের দিনের দর্শকদেরও ভালো লাগবে। ছবিটির অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে রয়েছেন অহীন্দ্র চৌধুরী, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেববালা, সুশীল মজুমদার, সন্তোষ সিংহ, মোহন ঘোষাল, রাজলক্ষ্মী, কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্য মুখোপাধ্যায়।

বাণী চিত্রম নিবেদিত "রিক্তা"র নব-সংস্করণে ছবির আদি সুরকার ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের অনুপম সুরসৃষ্টি অনেকাংশে বর্জিত হয়েছে। হীরেন ঘোষের সংগীত পরিচালনায় আধুনিক শিল্পীদের কণ্ঠে "রিক্তা"র জনপ্রিয় গানগুলি ছবিতে সংযোজিত হয়েছে। নতুনভাবে গৃহীত আধুনিক শিল্পীদের গানগুলি ছবির আকর্ষণ খুব যে বাড়িয়েছে এ-কথা বলা চলে না, তবে গানগুলি সুশ্রাব্য এবং ছবির বিভিন্ন দৃশ্যে ও পাত্র-পাত্রীদের মুখে সুপ্রযুক্ত। গান কটি গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণা গঙ্গোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, সুমিতা দেবগুপ্ত এবং আরও কয়েকজন শিল্পী। শচীন দেববর্মণের কণ্ঠে ছবির একটি ভাটিয়ালি গান মাধুর্যের আবেশ আনে মনে।

নাট্যাভিনয়

রূপকারের নাট্যোৎসব

'কোটি গীর্জার অগুনতি ঘণ্টাধ্বনি মানুষের প্রাণে যে হিল্লোল তুলতে পারে না, একটি নাটক তা পারে—' একথা বলেছিলেন বিখ্যাত নাট্যকার ইউজিন ও'নীল। নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী প্রতিষ্ঠিত 'রূপকার' নাট্যসংস্থা তাঁদের জীবনবোধের প্রত্যয় প্রকাশের ভাষা হিসাবে তাই নাটককে বেছে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, আন্তরিক প্রেরণা ও নিষ্ঠা নিয়ে যে দু-চারটি গোষ্ঠী সার্থক নাটক অভিনয়ে এগিয়ে এসেছেন; দীর্ঘকালের সাধনা, প্রত্যয়, একাগ্রতায় তাই 'রূপকার' গোষ্ঠী সে দলের অন্যতম হবার মর্যাদা পেয়েছেন। ১৯৫৫ সাল থেকে এঁদের যাত্রা শুরু, আজ ১৯৬০। এই পাঁচ বৎসরে রূপকার মঞ্চস্থ করেছেন বিভিন্ন বক্তব্যের নাটক, ঘুরে এসেছেন দূর দেশ—মেদিনীপুর, জামশেদপুর, চন্দননগর। নব-নাট্য আন্দোলনের পুরোভাগে যে কটি দল এসে দাঁড়িয়েছে, 'রূপকার' তাঁদের মধ্যেই একজন।

গত ২২শে আগস্ট থেকে ২৫শে আগস্ট পর্যন্ত তিন দিন ধরে 'রূপকারের' নাট্যোৎসব হয়ে গেল মিনার্ভা মঞ্চে। প্রথম দিন অভিনীত হল সুকুমার রায়ের 'চলচিত্তচঞ্চরী' ও তুলসী লাহিড়ীর

এইচ-এম-ভি গ্রামোফোন রেকর্ড এবং চার-গতিযুক্ত রেকর্ড প্লেয়ার ট্রানসিস্টার লোকাল ও অলওয়েভ রেডিও এবং বিভিন্ন প্রকারের রেডিও ও গেরড্ রেকর্ডচেঞ্জার সহ রেডিও-গ্রাম। জাইস আইকন ও আগফা ক্যামেরা কোডাক ও অন্যান্য ফিলিম, কাগজ কেমি-ক্যাল, ফ্লাস বালব, বাইনাকুলার ও টেপ-রেকর্ডার বিক্রয়ের জন্য মজুত আছে। কিস্তিতেও দেওয়া হয়।—নান্ এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ৯এ, ডালহৌসি স্কোয়ার ইস্ট, কলিকাতা-১। (বি-ও ৩৩১২)

১ লালবাজার স্ট্রীট, কলি-১, ৯৭/৫৬, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলি-১২ ফোন ২২-৭৫৮৫

রিক্তা
পরিচালনা : সুশীল মজুমদার
সুরশিল্পী : ভীষ্মদেব চ্যাটার্জি ও হরেন ঘোষ
গানে : হেমন্ত, সন্ধ্যা, শচীনদেব, কৃষ্ণচন্দ্র

ভারতের সেরা ছবি : চলিতেছে : রূপবাণী অরুণা ভারতী ২-৩০, ৫-৪৫, ও ৯টা

'লৌহমন্দ', দ্বিতীয় দিনে রসরাজ অমৃতলাল বসুর 'ব্যাপিকা বিদায়' এবং তৃতীয় দিনে তুলসী লাহিড়ীর 'ভিত্তি'। ভিন্নধর্মী এই চারটি নাটক অভিনয় করে রূপকার গোষ্ঠী এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন। অভিনয় কলার এমন সুষ্ঠু প্রকাশ শৌখিন দলের মধ্যে বিরল।

রূপকার নাট্যোৎসবের চারটি নাটকই পরিচালনা করেছেন সবিতাব্রত দত্ত। তরুণ পরিচালক হিসাবে তাঁর শিল্পরুচি, নাট্যরস সৃষ্টির জ্ঞান, শিল্পবোধ এবং সংযম অসাধারণ দক্ষতার পরিচায়ক। তাঁর পরিচালনায় রূপকারের প্রতিটি শিল্পী প্রশংসাধন্য অভিনয় করেছেন এবং দলগত অভিনয়নৈপুণ্যে প্রতিটি নাটক সার্থকতার রূপ পেয়েছে।

তিন দিনের উৎসবে চারটি নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় প্রাণবন্ত অভিনয় করেছেন: ভবরূপ ভট্টাচার্য, সবিতাব্রত দত্ত, মধুসূদন দত্ত, প্রদ্যোৎ চট্টোপাধ্যায়, সুদর্শন বসু, রথীন বোস, গোবিন্দ লাহিড়ী, সন্তোষ দত্ত, মৃণালকান্তি শীল, হরিনারায়ণ চক্রবর্তী, মৃণাল ঘোষ, বাণী দাশগুপ্তা, গীতা দত্ত, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, কল্যাণী দাশগুপ্তা, অনিমা রায়, তিলোত্তমা ভট্টাচার্য, সুকুমার রায় চৌধুরী, শক্তিপদ দত্ত, দুলাল মুখোপাধ্যায়, মুক্তি গোস্বামী, শুভব্রত দত্ত এবং আরও অনেকে। এ ছাড়া মঞ্চসজ্জায় চিত্ত ঘোষ, আলোকসম্পাতে—তাপস সেন, রূপসজ্জায়—মুন্সী আবদুল বারি এবং অমূল্য দেবের আবহ সংগীত প্রশংসার যোগ্য।

অনুষ্ঠান সংবাদ

হাওড়া বহুমুখী ক্লাবের সভোরা গত সপ্তাহে বাটরা অনাথবন্ধু সমিতি হলে বটুলাল ঘোষ রচিত ও পরিচালিত "দ্বিধা" নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। বিভিন্ন ভূমিকায় সেজন আঢ্য, অরুণ সান্যাল, সুনীল সিংহ, আশা বসু, দীপা হালদার প্রভৃতির অভিনয়ে ও সংগীতে পরেশ চট্টোপাধ্যায় প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দেন

প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংস্থা রূপাঙ্কনের উদ্যোগে আগামী ৬ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ছটায় মিনার্ভা থিয়েটারে নিখিল মুখোপাধ্যায় রচিত "উত্তর নাই" এবং ইন্দ্রনাথ উপাধ্যায় রচিত "এইতো-সামনে" এই দুটি একাঙ্ক নাটকের অভিনয় আয়োজন হয়েছে।

হাওড়া যুব সভার উদ্যোগে আগামী ১১ই থেকে ১৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হাওড়া টাউন হলে আট দিনব্যাপী একটি নাটক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম পাঁচদিন পনেরোটি নাট্য সংস্থা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবেন। ১৬ই সৌমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী "অভিনয়কলা" সম্পর্কে আলোচনা করবেন এবং হাওড়া যুব সভা কর্তৃক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের "ঊনপঞ্চাশ নম্বর মেস" অভিনীত হবে। ১৭ই সাধনকুমার ভট্টাচার্য ও অজিতকুমার ঘোষ "বাংলা একাঙ্ক নাটক" সম্বন্ধে আলোচনা করবেন এবং হাওড়া এমেচার্স কর্তৃক অমৃতলালের "ব্যাপিকা বিদায়" অভিনীত হবে। ১৮ই "শিশিরকুমার ও রঙ্গমঞ্চ" সম্বন্ধে আলোচনা করবেন উমাশঙ্কর ঘোষ ও রমেন লাহিড়ী এবং একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ। সব-শেষে শ্রীনাট্যম কর্তৃক জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের "দায়ে পড়ে দার গ্রহ" প্রহসনটি অভিনীত হবে।

কাব্যে সাহিত্যে শিল্পে ভাস্কর্যে নৃত্যে সংগীতে ধর্ম ও দর্শনে যাঁরা ভারতকে অমর করে রেখে গেছেন তাঁদের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে...

তীর্থক্ষেত্র বিদীর্ণ করে চলেছে ভারত দর্শন স্পেশাল আলোক সন্ধানী পাঁচ শত যাত্রী বুকে নিয়ে। রাত গড়িয়ে যায় গাড়ির চাকার নীচে। নিত্য নতুন প্রভাতে নতুন দেশের সংবাদ আসে। হৈ হৈ করে সবাই বেরিয়ে পড়ে—পথে পথে মেলা বসে...হাসে কাঁদে...অতীতকে সাক্ষী রেখে নিজেকে নতুন করে জানে। এই নতুন করে জানার মাঝে প্রেম-বিরহে প্রীতি ভালবাসা গড়ে ওঠে এক চলমান সুখী পরিবার। এক পৃথিবী এক পরিবারের সার্থক সূচনা হয়।...

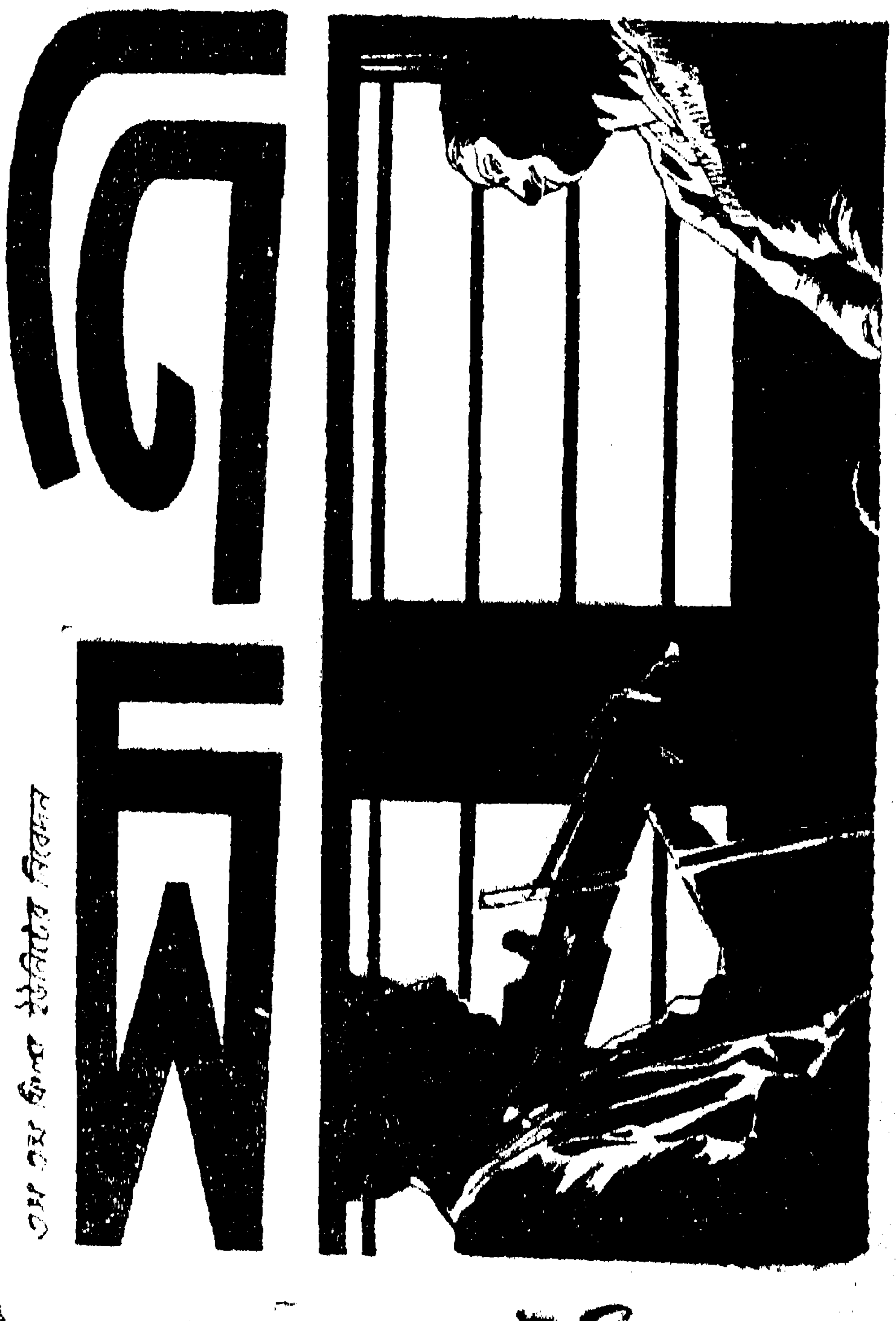

রচনা ও পরিচালনা:
সচ্চিদানন্দ সেন মজুমদার
প্রযোজনা: নিরঞ্জন সেন
সংগীত-আবহ:
সুধীন দাশগুপ্ত
কণ্ঠ: অনল চট্টোপাধ্যায়
নৃত্য: মারুথাপ্পা পিল্লাই
ভারত নাট্যম: কুমারী সরোজা
চিত্রশিল্পী: নলিন দোয়ারা
শব্দযন্ত্রী: নৃপেন পাল
সুজিত সরকার
সম্পাদনা: মধু ব্যানার্জি
প্রধান চরিত্রে:
বীণা, সবিতা, মঞ্জুলা, মাধবী, কমলিনী, অরুণ সেন, সমীর, তপনবাবু, মন্মথবাবু, সুশীল, গোপাল, বীরু, অমর, স্যানী ও পাঁচ শত যাত্রী
চিত্র পরিচালনা: রমেন চৌধুরী

আজ
শুভমুক্তি

শ্রী • প্রাচী • ইন্দিরা

শ্যামশ্রী • নেত্র • জয়শ্রী
সুচিত্রা • অলকা

খেলার মাঠে

LIBRARY Cooch Behar

একনজরে

গত ২৫শে আগস্ট থেকে প্রাচীন সভ্যতার পাদপীঠ মহানগরী রোমে সপ্তদশ অলিম্পিকের ১৮ দিনব্যাপী খেলাধুলো আরম্ভ হয়েছে। বিশ্বের ৮৫টি রাষ্ট্রের প্রথম সারির প্রতিযোগীদের নানা রকমের খেলাধুলোয় রোমের অলিম্পিক আসর এখন জমজমাট। সেখান থেকে প্রতিনিয়তই নানা রকমের খবর এসে পৌঁছচ্ছে। খেলার খবর আসছে, আয়োজনের খবর আসছে, আসছে রেকর্ড ভাঙাগড়ার নতুন নতুন খবর। পৃথিবীর সেরা সেরা প্রতিযোগীদের শৌর্য, বীর্য ও বীরপনার কাহিনী শুনবার জন্য সারা বিশ্ব কান খাড়া করে আগ্রহ-ভরা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে। ১৮ দিন ধরে প্রায় ৮ হাজার প্রতিযোগীর খেলাধুলো, দৌড়-ঝাঁপ, সাঁতার, কুস্তি প্রভৃতি ১৮ রকমের প্রতিযোগিতা শেষ হবার পর অলিম্পিকের উপর যবনিকা পড়বে আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর। আশা করি, প্রাচীন অলিম্পিকের পুণ্যভূমি অলিম্পিয়ার ভগ্ন দেবমন্দির থেকে আনীত দীপশিখা নির্বাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রীড়াবিদদের মন থেকে ধুয়ে মুছে যাবে অমঙ্গল ও সংকীর্ণতার কালো ছায়া। প্রশান্ত উদার দৃষ্টি নিয়ে আট হাজার প্রতিযোগী আর হাজার হাজার দর্শক ঘরে ফিরে যাবে। শান্তি ফিরে আসবে যুদ্ধভীত অশান্ত বিশ্বে, শান্তি আসবে অভাবের উগ্র তাড়নায়, নিগৃহীত দুনিয়ার ঘরে ঘরে।

এইটাই অলিম্পিক অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যই আধুনিক অলিম্পিকের প্রবর্তন করে গেছেন মানবপ্রেমিক ব্যারন পিয়ের দ্য কুবার্তিন। তাই আধুনিক অলিম্পিকের আদর্শ হচ্ছে—"অলিম্পিকে জয়লাভই বড় কথা নয়, অংশ গ্রহণই বড় কথা; জীবনে জয়ের চেয়ে বড় সংগ্রাম; পরাজিত করার চেয়ে প্রতিপক্ষের সঙ্গে সমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা মূল লক্ষ্য।"

এই লক্ষ্যে এখনো হয়তো আমরা পুরোপুরি পৌঁছতে পারিনি। অলিম্পিকের মাধ্যমে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নও হয়তো পুরোপুরি সার্থক হয়নি। তবুও অলিম্পিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মাত্র ৬৪ বছরের প্রচেষ্টায় বিশ্ব যতখানি এগিয়ে গেছে, অন্য কোন আন্দোলনই শান্তির পথে বিশ্বকে এতখানি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি।

এবার অলিম্পিকেরই ছোট্ট একটা উপমা। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীকে এক পতাকার তলে মিলিত করবার জন্য বিশ্বের রাজনৈতিক নেতারা কত চেষ্টাই না করেছেন। কত বৈঠক বসেছে, কত আলাপ-আলোচনা হয়েছে, সাম্মিট কনফারেন্সে আবিষ্কার হয়েছে কত সূত্র। কিন্তু কোন শক্তি পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীকে এক পতাকা তলে মিলিত করতে পারেনি। রাষ্ট্রনেতাদের মুখে চুনকালি দিয়ে আজ রোমের অলিম্পিক আসরে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী এক হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। জার্মানী থেকে দুদিকের দুটি বাঁকা পথ ধরে তারা মিলিত হয়েছে রোমের অলিম্পিক অঙ্গনে। যেখানে পূর্ব-পশ্চিমের প্রশ্ন নেই। সেখানে তারা একটি জার্মান দল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এ-মিলন কতখানি ফলপ্রসূ হবে, জানি না। তবে রোম অঙ্গনে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর মিলনের যে প্রথম সেতু বাঁধা হয়েছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অলিম্পিক আদর্শের রূপায়ণে এবারকার অলিম্পিকে এইটাই সবচেয়ে বড় ঘটনা।

মানবপ্রেমিক মহামতি ব্যারন দ্য কুবার্তিন প্রাচীন অলিম্পিক থেকেই আধুনিক অলিম্পিকের আদর্শ নিরূপণ করে গেছেন। খৃষ্ট-জন্মের ৭৭৬ বছর আগে যুদ্ধের লেলিহান অগ্নিশিখা যখন সমস্ত গ্রীসকে গ্রাস করে ফেলেছিল। অত্যাচার, উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনায় যখন গ্রীকদের জীবনযাপন করা হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ, কথিত আছে, তখন শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় হিসাবে 'ডেলফির' দেবমন্দির থেকে দৈববাণীতে ঘোষিত হয়েছিল অলিম্পিক খেলাধুলো প্রবর্তনের আদেশ। অলিম্পিক খেলাধুলোর জ্যোতির্ময় রূপের মধ্যেই গ্রীস শান্তির সন্ধান পেয়েছিল। খেলাধুলোর মধ্য দিয়েই শান্তি ফিরে এসেছিল শতধা বিভক্ত, যুদ্ধোন্মাদ গ্রীস-এ। গ্রীসের আলফিয়াস ও ক্লডিয়াস নদীর সঙ্গম-স্থলে তিন দিকে পাহাড়-ঘেরা উন্মুক্ত প্রান্তর অলিম্পিয়ায় যখন অলিম্পিক খেলাধুলোর আসর বসত, তখন তার আয়োজনে এমন বিশ্ব-ব্যাপকতা না থাকলেও অলিম্পিক ছিল গ্রীকদের জাতীয় জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। গ্রীকরা

৪০ কোটি নরনারীর আশা-ভরসা—রোম অলিম্পিকে ভারতের দৌড়বীর মিলখা সিং

খেলাকে স্থান দিয়েছিল জীবনের সর্বাঙ্গ-সুন্দর উপাদান হিসাবে। এর মধ্যে ছিল পূজা-অর্চনা, এর মধ্যে ছিল দেহ-চর্চা ও বীরপনা, ছিল কাব্য, ছিল শিল্প, ছিল সংগীত। চতুর্বার্ষিক অলিম্পিক অনুষ্ঠান ছিল সুন্দরের পূজারী গ্রীকদের জাতীয় মহোৎসব। অলিম্পিক অঙ্গনে আবরণহীন মানবদেহের সুন্দর সুঠাম ছবি গ্রীক শিল্পীকে জোগাতো শিল্পপ্রেরণা, কবিকে কাব্যের ব্যঞ্জনা। আধুনিক অলিম্পিক থেকেও শিল্প ও সংস্কৃতিকে বাদ দেওয়া হয়নি। পূজো-অর্চনা বাদ গেলেও প্রাচীন অলিম্পিকের পুণ্যভূমি থেকে পূত অনল এনে সেই অগ্নি সাক্ষী রেখে খেলাধূলো ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার রেওয়াজ চালু হয়েছে। আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের মূলমন্ত্র। দেহের বর্ণ আর জাতিধর্মনির্বিশেষে সবারই অলিম্পিকে সমান অধিকার। এক পতাকার তলে সবাই ভাই-ভাই। এই আদর্শের জনাই অলিম্পিক আন্দোলন দিন-দিন জোরদার হয়ে উঠছে। ১৮৯৬ সালে এথেন্সে আধুনিক অলিম্পিকের প্রথম অনুষ্ঠানে, যেখানে যোগ দিয়েছিল মাত্র তেরটি রাষ্ট্র আর ২৮৫ জন প্রতিযোগী, আজ অলিম্পিকের সপ্তদশ অনুষ্ঠানে সেখানে যোগ দিয়েছে ৮৫টি রাষ্ট্র আর প্রায় আট হাজার প্রতিযোগী।

এক দিক দিয়ে অলিম্পিক বিশ্বের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান। কারণ রাজনৈতিক সম্মেলনই হক, যুব উৎসবই হক কিংবা কোন প্রদর্শনীই হক, এমন প্রতিনিধি-মূলক এবং এমন সু-আয়োজিত আর কোন অনুষ্ঠান আছে, যাকে অলিম্পিকের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে? অলিম্পিকের আয়োজন, অলিম্পিকের দর্শক সমাগম, অলিম্পিকের প্রতিনিধিত্ব সবই বিরাট এবং ব্যাপক। বিশ্বের যুব-শক্তির চতুর্বার্ষিক এই মহাসম্মেলন বিশ্বকে শান্তির পথে পরিচালিত করতে পারে—সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

এই আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখেই অলিম্পিকের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে একসঙ্গে গ্রথিত পাঁচটি বলয় বা বৃত্ত। পাঁচটি মহাদেশের প্রতীক হিসাবে পাঁচটি বলয় গ্রহণ করা হয়েছে। একসঙ্গে গ্রথিত করার উদ্দেশ্য, পাঁচটি মহাদেশ যেন একসঙ্গে মিলেমিশে থাকে।

খেলাধূলোর দিক দিয়েও অলিম্পিকের লক্ষ্য মহান। তিনটি কথা দিয়ে একে প্রকাশ করা হয়েছে। 'সিটিয়াস', 'আলটিয়াস', 'ফর্টিয়াস'। কথা তিনটির অনুবাদ করলে দাঁড়ায় তুরীয়ান, তুঙ্গীয়ান, তেজীয়ান। অর্থাৎ আরও দ্রুত আর উচ্চে আরও শক্তির সঙ্গে। যতটুকু জোরে ছুটেছ, তার চেয়েও জোরে ছুটতে হবে। যতটুকু উঁচুতে উঠেছ, তার চেয়েও উঁচুতে উঠতে হবে। যতখানি শক্তির পরিচয় দিয়েছ, তার চেয়েও শক্তির পরিচয় দিতে হবে। রক্ত মাংসে গড়া মানুষের শক্তি যে কোথায় পৌঁছুতে পারে; অধ্যবসায়, অনুশীলন ও সাধনায় মানুষ কতখানি সাফল্য অর্জন করতে পারে, তারই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রঙ্গভূমি চতুর্বার্ষিক অলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গন। প্রতিটি অলিম্পিকেই আমরা দেখতে পাই, মানুষের শক্তি-সামর্থ্য একধাপ এগিয়ে গেছে। লণ্ডন অলিম্পিকে প্রতিযোগীদের অর্জিত গৌরব ম্লান হয়ে গেছে, হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে হেলসিঙ্কিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে মেলবোর্ন। এবার মেলবোর্নের মহিমা ম্লান করছে রোম। রোমে ইতিমধ্যেই বহু বিষয়ে নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাকী সমস্ত বিষয়েও রেকর্ড হবে ভূরি ভূরি। 'দেশের' পরবর্তী সংখ্যা থেকে ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে। এখন অলিম্পিক খেলাধূলায় ভারতের অংশ গ্রহণ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক।

• • •

ভারত কবে থেকে অলিম্পিকে অংশ গ্রহণ করছে এ সম্পর্কে কিছুটা মতদ্বৈধতা আছে। ১৯০০ সালে জি এম প্রীচার্ড নামে একজন শ্বেতাঙ্গ ভারতীয় হিসাবে প্যারীর দ্বিতীয় অলিম্পিকে অংশ গ্রহণ করে ২০০ মিটার হার্ডলস ও ২০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করেন। প্রীচার্ড ভারতীয় বলেই নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন। অলিম্পিকের নথিপত্রেও প্রীচার্ডকে ভারতীয় বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রীচার্ড কিভাবে অলিম্পিকে যোগ দিয়েছিলেন এবং কে-ই বা তাঁকে অলিম্পিকে পাঠিয়েছিল তার রহস্য অজ্ঞাত রয়ে গেছে। তবে প্রীচার্ড যে কলকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং পরে আই এফ এ-র সম্পাদক হয়েছিলেন এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। যাই হক, প্রীচার্ডের অলিম্পিকে অংশ গ্রহণ সম্বন্ধে ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের নথিপত্রে কোন উল্লেখ না থাকায়—এ সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্বও আরোপ করা হয়নি। সরকারীভাবে ভারতের অলিম্পিকে যোগদান শুরু হয়েছে ১৯২০ সালের সপ্তম অলিম্পিক থেকে। এণ্টোয়ার্প অলিম্পিকে যোগদানকারী ২৯টি রাষ্ট্রের ২৬০৬ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ২ জন অ্যাথলেটবিশিষ্ট ভারতীয় দল ছিল অন্যতম প্রতিযোগী রাষ্ট্র।

তারপর প্রতিবারই ভারতের অ্যাথলেটরা অলিম্পিকে অংশ গ্রহণ করে আসছেন। ১৯২৮ সালে আমস্টার্ডাম অলিম্পিক থেকে আরম্ভ হয়েছে হকি দলের অংশ গ্রহণ। ভারত অলিম্পিকে ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের লণ্ডন অলিম্পিক থেকে। কিন্তু একমাত্র হকিতে প্রতি অলিম্পিকের স্বর্ণ-পদক আর মল্লযুদ্ধে মল্লবীর যাদবের কৃতিত্বে একটি ব্রোঞ্জ পদক পাওয়া ছাড়া ভারত এ পর্যন্ত আর কোন অলিম্পিক পদক লাভ করতে পারেনি।

হকিতে অবশ্য ভারত বিশ্বের অজেয় যোদ্ধা। উপর্যুপরি ছয়টি অলিম্পিকে প্রাধান্যের পর্যাপ্ত প্রমাণ দিয়ে ভারত বিজয়ীর মুকুট লাভ করেছে। বিশ্বের খেলা-ধূলোর ইতিহাসে একাদিক্রমে ত্রিশ বত্রিশ বছর ধরে একটি খেলায় এমন প্রাধান্য বজায় রাখার দ্বিতীয় নজির নেই। যদিও ভারতের হকি খেলায় এখন আর আগের জলুস নেই, নেই সেই হিরন্ময়দ্যুতি। তবুও হকিতে ভারত আজও বিশ্বশ্রেষ্ঠ। আশা করি, রোমেও তার বিশ্ব-শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকবে।

ভারতের শ্বেতাঙ্গ অ্যাথলেট প্রীচার্ডের কথা বাদ দিলে আজও আমরা অ্যাথলেটিকসে কোন পদক লাভ করতে পারিনি। লণ্ডন অলিম্পিকে হপ স্টেপ ও জাম্পের একটি পদক আমাদের হাতছানি দিয়েও দূরে সরে গেছে। আমাদের হপ স্টেপ ও জাম্পের প্রতিযোগী এইচ রেবেলো ফাইনালে উঠেও মাংসপেশীতে টান ধরায় লাফ দিতে পারেননি। রেবেলোর যে রেকর্ড ছিল এবং অলিম্পিকের প্রাথমিক রাউণ্ডে তিনি যে নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন, তাতে অ্যাথলেটিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা রেবেলো অনায়াসেই একটি অলিম্পিক পদক লাভ করতে পারতেন।

ফার্স্ট প্রাইজ
সুনীল ভঞ্জ রচিত
কৌতুক নাটিকা
এক দৃশ্যে অভিনয়োপযোগী—১৷৹
প্রান্তিক পাবলিশার্স
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট ঃ কলি-১২
(সি ৭৪৮৭/১)

দিশারী
সলিল সেনের বাস্তবধর্মী সামাজিক নাটক। দাম ২·০০
প্রবেশ নিষেধ
চলচ্চিত্রে রূপায়িত মিহির সেনের অভিনব নাটক। দাম ২·৫০
ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা-১২

অলিম্পিকে আমরা কোন সাফল্য অর্জন করতে না পারলেও অলিম্পিকে যোগদানের পর থেকে অ্যাথলেটিকস মানের আমরা প্রভূত উন্নতি করেছি—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমরা কদম কদম এগিয়ে চলেছি, কিন্তু বিশ্ব এগিয়ে চলেছে জোর কদমে। তাই অ্যাথলেটিকসের পদক আজও আমাদের হাতের বাইরে। কিন্তু এবার অন্তত একজন প্রতিযোগীকে কেন্দ্র করে অ্যাথলেটিকসে আমাদের একটি পদক লাভের সম্ভাবনা দেখা গিয়েছে। এটি স্বর্ণ-পদক হওয়াও অসম্ভব নয়। এই প্রতিযোগী হচ্ছেন ভারতের মধ্য পাল্লার দৌড়বীর মিলখা সিং। যদিও মিলখার সমগোত্রীয় মধ্যপাল্লার দৌড়বীর বিশ্বে আরও কয়েকজন আছেন, তবুও মিলখার দৌড়ের মান এখন উর্ধ্বমুখী। বিশেষ করে, রোম যাবার পর তিনি আরও উন্নতি করেছেন। এটা খুবই শুভ লক্ষণ। তাই আমরা আশা করছি—মিলখা সিংয়ের কৃতিত্বে ভারত এবার অলিম্পিক থেকে অ্যাথলেটিকসের প্রথম পদক লাভ করবে।

ভারতের অন্য কোন অ্যাথলেট সম্বন্ধে কোন সাফল্য আশা করা যায় না। তবু ম্যারাথন দৌড়ের প্রতিযোগী লাল চাঁদ, যিনি দেরাদুনের অলিম্পিক অ্যাথলেটিক ক্যাম্পের নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় ২ ঘণ্টা ২৫ মিনিট ১১ সেকেণ্ডে ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ (ম্যারাথনের দূরত্ব) দৌড়েছিলেন। তাঁর সাফল্য সম্পর্কে ক্ষীণ আশা আছে। ২০ কিলোমিটার ও ৫০ কিলোমিটার ভ্রমণের প্রতিযোগী জোরা সিং সম্বন্ধেও কিছুটা আশা করতে পারতাম যদি তাঁর হাঁটার পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ না হত।

অলিম্পিকে ভারতের ফুটবল খেলা সম্পর্কে ইতিপূর্বেই দেশের পাতায় আলোচনা করা হয়েছে। ফুটবল সম্পর্কে আমরা যতখানি আশা করেছিলাম ভারতের ফুটবল টীম তার চেয়ে অনেক ভাল খেলেছে। এই মন্তব্য লেখার সময় পর্যন্ত ভারত গ্রুপ লীগের দুটি খেলায় অংশ গ্রহণ করেছে। শক্তিশালী হাঙ্গেরীর সঙ্গে সমানে সমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রথম খেলায় ভারত হেরেছে ২—১ গোলে, ফ্রান্সের সঙ্গে দ্বিতীয় খেলা ১—১ গোলে অমীমাংসিত থেকে গেছে। আমাদের পক্ষে এটা আশাতীত ভাল ফলাফল।

হকি, ফুটবল ও অ্যাথলেট দল ছাড়া রোম অলিম্পিকে ভারত থেকে আর যোগ দিয়েছেন ৪ জন মল্লবীর, একজন ভারোত্তোলক, একজন করে পিস্তল ও রাইফেল চালক। এঁদের কারো সম্পর্কেই আমি আশাবাদী নই।

রোম অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধি

হকি—গোল—এস লক্ষ্মণ (সার্ভিসেস) ও সি দেশমুথু (মহীশূর); ব্যাক—পৃথ্বীপাল সিং (পাঞ্জাব), শান্তারাম (সার্ভিসেস), জে এল শর্মা (ইউ পি) ও বালকিষেণ সিং (রেলওয়ে); হাফব্যাক—জে এণ্টিক (রেলওয়ে), মহেন্দ্রলাল (রেলওয়ে), চরণজিৎ সিং (পাঞ্জাব), জি এস সাবন্ত (মহারাষ্ট্র) ও এল ক্লডিয়াস (বাঙলা) অধিনায়ক; ফরোয়ার্ড—উধম সিং (পাঞ্জাব), কে অরোরা (বোম্বাই), ডি জে পিটার (সার্ভিসেস), হরিপাল (সার্ভিসেস), জগিন্দর সিং (রেলওয়ে) আর এস ভোলা (সার্ভিসেস), আর্মান ব্যাপ্টিস্ট (রেলওয়ে), বি পাটেল (মহারাষ্ট্র), জে ম্যাস্কারিনাস (বোম্বাই) ও যশোবন্ত সিং (সার্ভিসেস)।

ফুটবল—গোল—আর থঙ্গরাজ (সার্ভিসেস) ও এস এস নারায়ণ (বোম্বাই); ব্যাক— চন্দ্রশেখর (বোম্বাই), এস এ লতিফ (বোম্বাই) ও অরুণ ঘোষ (বাঙলা); স্টপার —জার্নেল সিং (বাঙলা) ও ইউসুফ খাঁ (অন্ধ্র); হাফব্যাক—এফ এ ফ্রাঙ্কো (বোম্বাই), এম কেম্পিয়া (বাঙলা), রামবাহাদুর (বাঙলা), এস এস হাকিম (অন্ধ্র); ফরোয়ার্ড—প্রদীপ ব্যানার্জি (বাঙলা) অধিনায়ক; চুনী গোস্বামী (বাঙলা), জে এল কানন (বাঙলা), টি বলরাম (বাঙলা), এস এস সুন্দররাজ (মাদ্রাজ), এম দেবদাস (বোম্বাই) ও এস এইচ এইচ হামিদ (অন্ধ্র)।

অ্যাথলেটিকস—(পুরুষ)—মিলখা সিং (সার্ভিসেস, অধিনায়ক) ২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড়, টি আর যোশী (দিল্লী) ১০০ মিটার দৌড়, জগমোহন সিং (পাঞ্জাব) ১১০ মিটার হার্ডলস, গুরুবচন সিং (দিল্লী), হাইজাম্প ও ডেকাথলন, বি ভি সত্যনারায়ণন (মাদ্রাজ), লং-জাম্প তিরসা সিং (সার্ভিসেস), লালচাঁদ (সার্ভিসেস) ম্যারাথন, জগমল সিং, জোরা সিং (সার্ভিসেস), ২০ ও ৫০ কিলোমিটার ভ্রমণ, অজিত সিং (সার্ভিসেস), ২০ কিলোমিটার ভ্রমণ ও বাঁজিৎ ভাটিয়া (দিল্লী) ৫,০০০ মিটার দৌড়।

কুস্তি—শ্যামসুন্দর (পাঞ্জাব) ফেদার ওয়েট, জ্ঞানপ্রকাশ (দিল্লী) লাইট ওয়েট, উদয়চাঁদ (সার্ভিসেস) ওয়েল্টার ওয়েট, মাধো সিং (সার্ভিসেস) লাইট হেভী ওয়েট।

ভারোত্তোলন—লক্ষ্মীকান্ত দাশ (রেলওয়ে) ফেদার ওয়েট।

পিস্তল ও রাইফেল ছোড়া—বিকানীরের মহারাজা কার্নী সিং (রাজস্থান), ক্লে পিজিয়ন; পি এস চীমা (সার্ভিসেস) পিস্তল।

জনপ্রিয় নাট্যকার কিরণ মৈত্রের নাট্যসৃষ্টি

চোরা-বালি ২৲
পত্রিকায় উচ্চপ্রশংসিত। মধ্যবিত্তের জীবন আলেখ্য — তিন অঙ্কের পূর্ণাঙ্গ নাটক।

এক অঙ্কে শেষ ২·২৫
বহুবার প্রশংসিত পুরস্কারপ্রাপ্ত ৪টি একাঙ্ক। ২টি স্ত্রী-চরিত্র বর্জিত।

যা হচ্ছে তাই ২৲
তীব্রতম শ্লেষ ও হাসির দুটি নাটক। ১টি স্ত্রী বর্জিত। অপরটিতে ১টি নারী চরিত্র।

বিমল রায়ের
অসমাপ্ত ১৲
গিরীশ নাট্য প্রতিযোগিতায় ও বেতারে অভিনীত একাঙ্ক নাটক।

সিটি বুক এজেন্সী ঃ ৫৫, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিঃ—৯

বিভুপ্রসাদ বসুর

মুখর মৌন

কাব্যগ্রন্থের সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার অভিমত উদ্ধৃতির সঙ্গে আমাদেরও আশা এই ঃ রসিক পাঠকসমাজ এই কাব্যগ্রন্থপাঠে উল্লসিত হবেন ॥ ২·০০ ॥

দেশ ঃ ...কবি আশাবাদী। পরিবেশের নৈরাশ্যবাদিতার মধ্যেও তিনি সমন্বয় সাধনে সচেষ্ট।...
অমৃতবাজার He has more closeness to the inner world than the outer.
আনন্দবাজার ঃ ...ভাব ও রূপ উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর স্বকীয়তা সুস্পষ্ট।...
যুগান্তর ঃ ...নিখুঁত ছন্দে বাঁধা, কোথাও দুরূহতার কালোছায়া নেই, সহজ গতিবান এই কবিতাগুলি বেশ ভাল লাগল।...
হিন্দুস্থান ....appeal directly to the heart and thus satisfy....

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী / শান্তি লাইব্রেরী

॥ **সুবর্ণভারতী** — ৮৮/সি, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা-১৪ ॥

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২২শে আগস্ট—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ লোকসভায় ঘোষণা করেন যে, দেশের পরিকল্পিত উন্নয়নের ফলে যে অতিরিক্ত আয় হইয়াছে, সেই অতিরিক্ত আয় ঠিক কোথায় গিয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয়।

কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের জন্য বিদেশ হইতে আনীত বহু লক্ষ টাকার বৈদ্যুতিক বাতিস্তম্ভ সম্পর্কিত দুর্নীতি ও জালিয়াতির এক অভিযোগের তদন্তের সূত্রে পুলিস অদ্য একযোগে কলিকাতাস্থ দুইটি প্রতিষ্ঠানের অফিস এবং বোম্বাইয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানের একটি হেড-অফিসে হানা দেয়। কলিকাতার উপরোক্ত দুইস্থান হইতে বেশ কিছু আপত্তিজনক কাগজপত্র পাওয়া যায় বলিয়া প্রকাশ।

২৩শে আগস্ট—বেকার সমস্যার সমাধান, মূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা ও বাড়তি জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন—মৌলিক এই তিনটি উদ্দেশ্য সাধনেই ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়াছে। এবং ইহার জন্য দায়ী প্রশাসনিক অপদার্থতা। আজ লোকসভায় তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়া সম্পর্কে পুনরায় বিতর্ক শুরু হইলে বিরোধীদলের সদস্যরা এই বলিয়া সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। তাঁহারা বলেন, এই কারণেই উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে জনসাধারণ নির্বিকার।

২৪শে আগস্ট—নদীয়া জেলার ধুবুলিয়া শিবিরে আশ্রয় গ্রহণকারী আসাম প্রত্যাগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে গত শনি হইতে মঙ্গল এই চারি দিনে মোট ২৭ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে। তাহাদের প্রায় সকলেই শিশু এবং একরূপ কঠিন আন্ত্রিক রোগই তাহাদের অধিকাংশের মৃত্যুর কারণ বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে।

অদ্য বিকালে দমদম বিমান ঘাটিতে আসামের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহার মধ্যে এক বৈঠকে শ্রীচালিহা আসামের ঘটনাবলীতে ডাঃ রায়ের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়া এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে যে, আসামে সকল দলের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মাথা চাড়া দিয়া উঠায় নানা বিষয়ে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে।

উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে অভূতপূর্ব বিধ্বংসী বন্যার" ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র এখনও অজ্ঞাত তবে প্রাথমিক সরকারী হিসাবেই বন্যার তাণ্ডবে ১৫ লক্ষাধিক লোক ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

২৫শে আগস্ট—ভাষা সংক্রান্ত দাঙ্গার ফলে উদ্ভূত আসামের পরিস্থিতি সম্পর্কে আজ নয়াদিল্লিতে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক আরম্ভ হয়। আসামে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন এবং মানসিক পরিবর্তনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে বৈঠকে আলোচনা হয়।

অদ্য লোকসভায় তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া সম্পর্কে বিতর্ককালে অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য জনসাধারণকে অধিকতর ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, পরিকল্পনার জন্য কর বাবদ অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পরোক্ষ করের উপরই অধিক নির্ভর করিতে হইবে।

২৬শে আগস্ট—অদ্য লোকসভায় বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া অনুমোদিত হয়। স্বতন্ত্র পার্টির নেতা শ্রী এন জি রঙ্গ কর্তৃক উত্থাপিত একটি বিকল্প প্রস্তাব ২২১—৯ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া যায়। বিকল্প প্রস্তাবে তৃতীয় যোজনার খসড়াটি "অবাস্তব এবং বিভ্রান্তিকর" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল।

আসামে বাঙ্গালীদের উপর যে অমানুষিক নির্যাতন হইয়াছে সে সম্পর্কে আলোচনার জন্য আগামী সপ্তাহেই যে পশ্চিমবঙ্গ বিধান মণ্ডলীর জরুরী অধিবেশন আহ্বান করা হইবে তাহা একরূপ নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

২৭শে আগস্ট—আজ আমদানী উপদেষ্টা পরিষদে বক্তৃতা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ভারতের মজুত স্টার্লিং-এর পরিমাণ অত্যন্ত হ্রাস পাওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য ব্যাপক আমদানি হ্রাসের সম্ভাবনা আছে বলিয়া ইঙ্গিত করেন।

২৮শে আগস্ট—ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্যের আরও সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ প্রসঙ্গে বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী বলেন, শীঘ্রই ৭০টি পণ্যের উপর হইতে রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

২২শে আগস্ট—কঙ্গোলী প্রধানমন্ত্রী শ্রীলুমুম্বার তীব্র আলোচনা সত্ত্বেও নিরাপত্তা পরিষদ আজ কঙ্গোতে রাষ্ট্রপুঞ্জ সেক্রেটারী জেনারেল শ্রীহ্যামারশেল্ডের কার্যকলাপের প্রতি বিপুল সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

অদ্য রাত্রে সোভিয়েট সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'তাস' এই মর্মে এক সংবাদ প্রকাশ করেন যে, পশ্চিম জার্মানীস্থ মার্কিন গোয়েন্দা সার্জেণ্ট ভ্লাডিমির শেলোবোদা রাশিয়াতে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছেন। অদ্য রাত্রে 'ইজভেস্তিয়ায়' প্রকাশিত এক বিবৃতিতে শ্রীশেলোবোদা পশ্চিম জার্মানীতে মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের কার্যকলাপের বিবরণ দিয়াছেন।

২৩শে আগস্ট—কাতাঙ্গা সরকার আজ বলেন যে, মালী ফেডারেশনের সৈন্যরা দৃশ্যত "অফিসারদের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া যায় এবং অ্যালবার্ট ভিল অঞ্চলে গতকাল ও আজ যে মারাত্মক ঘটনা ঘটে তাহাতে দুইজন কঙ্গোলী মারা যায়।" মালী সৈন্যরা তাহাদের আফ্রিকান ও ইউরোপীয় অফিসারদের আদেশ অমান্য করে। শহরের ইউরোপীয়রা সামরিক শিবিরে আশ্রয় লয়।

কঙ্গোলী সৈন্যরা গতকল্য কাশাই প্রদেশে বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে হাঙ্গামা দমনের কার্যে রওয়ানা হইয়া গিয়াছে—এই কাশাই প্রদেশ কিছুদিন আগে কঙ্গো হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করিয়াছিল।

২৪শে আগস্ট—আজ জনমানবশূন্য উত্তর উপকূলবর্তী মান্নারের নিকট হইতে সিংহলী সৈন্যরা ১৮ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করিয়াছে। ঐগুলি দক্ষিণ ভারত হইতে বে-আইনীভাবে আগত ৩৬ জন বহিরাগতের অন্যতম বলিয়া মনে হয়।

গত রাত্রে নিরাপত্তা পরিষদ ৮টি নূতন আফ্রিকান রাষ্ট্রকে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করার অনুকূলে মত প্রকাশ করেন। ঐ রাষ্ট্রগুলি হইতেছে দাহোমে, নাইজার, উত্তর ভোল্টা, আইভরিকোস্ট, ছাদ রিপাবলিক, কঙ্গো, গাবন এবং সেণ্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক।

২৫শে আগস্ট—প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান ইতিহাস প্রসিদ্ধ রোম নগরীতে অদ্য সপ্তদশ অলিম্পিক খেলা-ধূলার উদ্বোধন অনুষ্ঠান মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। অলিম্পিকের প্রচলিত বিধি অনুযায়ী ইতালীর প্রেসিডেণ্ট সিনোর গিয়াভানি গ্রণ্ডি যোগদানকারী ৮৫টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের স্বাগত জানাইয়া ১৮ দিন ব্যাপী অলিম্পিক খেলা-ধূলার উদ্বোধন করিয়াছেন।

একজন সিনিয়র বেলজিয়ান অফিসার আজ এলিজাবেথভিলে বলেন যে, কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী শ্রীলুমুম্বার প্রায় এক হাজার সেনা কাতাঙ্গার উত্তরে কঙ্গো হইতে বিচ্ছিন্ন প্রেসিডেণ্ট অ্যালার্ট কলোনিজর খনি রাষ্ট্র অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

২৬শে আগস্ট—মার্কিন বৃটিশ ও অন্যান্য পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের গোয়েন্দা বিভাগ একখানি পত্রের সন্ধানে রত আছেন। এই পত্রে সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টি চীনের সঙ্গে তাহাদের মতগত বিরোধ সম্পর্কে বিশ্বের অন্যান্য কম্যুনিস্ট পার্টিকে জানাইয়াছেন।

কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী শ্রীপ্যাট্রিস লুমুম্বা আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, প্রত্যেকটি বেলজিয়ানকে কঙ্গো ত্যাগ করিতে হইবে এবং তাহারা চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপুঞ্জকেও কঙ্গো ছাড়িতে হইবে। শ্রীলুমুম্বা বলেন, 'বেলজিয়ানের কর্তৃত্বের স্থানে অন্যের—রাষ্ট্রপুঞ্জের কর্তৃত্ব স্থাপিত হউক—আমরা চাই না।

২৭শে আগস্ট—ওয়াকিবহাল মহলে শুনা যায় যে, চীনের কম্যুনিস্ট নেতারা চীনের সরকারী অফিসারদের সম্প্রতি এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, চীনের সংবাদপত্রাদিতে যে সমস্ত বিবরণ প্রকাশিত হয় তাহার সবই যেন সঠিক চিন্তাধারা হিসাবে গ্রহণ না করা হয়।

২৮শে আগস্ট—আজ রাত্রিতে জনসংখ্যা সম্পর্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের যে বর্ষপঞ্জী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ, বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় ২৯০ কোটি। প্রতি বৎসর পৃথিবীতে ৪ কোটি ৮০ লক্ষ হিসাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস ৬ সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

দেশ

DESH 40 Naya Paise
Saturday, 10th September 1960

২৭ বর্ষ ॥ ৪৫ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২৫ ভাদ্র, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

ভারত পুনরাবিষ্কার

সঙ্কটসময়ে দেশনায়ক হৃদয়দৌর্বল্যে পীড়িত, গভীর সংশয়াচ্ছন্ন, তাঁর কণ্ঠে একান্ত অসহায় কাতরোক্তি। স্বাধীন, সুখী ও ঐক্যবদ্ধ আত্মসংহত ভারতবর্ষের ভবিষ্য স্বপন ভেঙে যাচ্ছে, চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে: রাষ্ট্রনায়ক নেহরুর সাধ্য নেই অমিতবীর্যে এই সমূহ বিনষ্টির প্রতিরোধে। প্রধানমন্ত্রী নেহরুর মুখ থেকেই শোনা গেল এই অদ্ভুত, হতাশাচ্ছন্ন স্বীকারোক্তি। দেশের পক্ষে এর চাইতে বিপত্তিসূচক আর কিছু!

লোকসভায় আসাম ঘটনাবলী প্রসঙ্গে বিতর্কের সমাপ্তিপর্বে প্রধানমন্ত্রী নেহরু ভারতবর্ষের এক ভয়াবহ কঙ্কাল-চিত্র বর্ণনা করেছেন। এ কী শ্রীনেহরুর দুঃস্বপ্ন জাত, ব্যর্থতা ও হতাশার প্রতিচ্ছবি? নাকি সত্যিই ভারতবর্ষের অন্তর্বিরোধের যথাযথ রূপ প্রতিবিম্বিত হয়েছে শ্রীনেহরু বর্ণিত এই কঙ্কাল চিত্রে? প্রধানমন্ত্রী অনুভব করেছেন, ভারতীয় জনপ্রতিনিধিমণ্ডলীর অধিবেশন কক্ষের অভ্যন্তরে এবং বাইরেও আসমুদ্র হিমাচল এই বিরাট ভারতভূমির সর্বত্র চলেছে প্রেতের ভৈরবনৃত্য; অতীতের, দূরতম অতীতের কবরেলিকা থেকে উঠে এসেছে সব অশরীরী ছায়ামূর্তি। রাষ্ট্রনায়ক নেহরু, ইতিহাসদর্শী নেহরু, প্রগতির অনিবার্যতায় বিশ্বাসী নেহরু, ভারতবর্ষ পুনরাবিষ্কারের এই যে নতুন সূত্র যোজনা করেছেন তার যথার্থতা সুধিজন সাবধানে মোহমুক্ত চিত্তে বিচার করবেন আশা করি। রাষ্ট্রনায়ক নেহরুকেও জিজ্ঞাসা করি, আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই "পিছু-টান", সংস্কারান্ধতার পুনরুজ্জীবন কেন, কী করে সম্ভব হল সাম্প্রতিক কালে?

বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে এককালে আমাদের অভিযোগ ছিল, তাঁরাই নিজেদের স্বার্থে ভারতবর্ষে অনৈক্য এবং বিরোধের বীজ বপন করেছেন। জাতীয় জাগৃতির প্রত্যেকটি পর্বে, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ, গোখেল, তিলক, শ্রীঅরবিন্দ থেকে গান্ধীজী, নেতাজী এবং স্বয়ং শ্রীনেহরু পর্যন্ত সবাই একবাক্যে প্রচার করেছেন, ভারত-ইতিহাসের মর্মবাণী হল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। সকলেই আশ্বাস দিয়েছেন পরবশতার অভিশাপ-মুক্ত-স্বাধীন ভারতবর্ষের জনজীবনে বিরোধ বিদ্বেষের, সংকীর্ণ স্বাতন্ত্র্য এবং গোষ্ঠীপরতন্ত্রতার চিহ্নমাত্র থাকবে না। কিন্তু এখন কী দেখি? স্বাধীন ভারতবর্ষের তের বৎসর অতিক্রান্ত হতে না হতে ভারতীয় জনজীবনের স্তরে স্তরে বিরোধ সংঘাতের প্রবল আক্ষেপে ভারতীয় ঐক্যের সংকল্প দলিত, মথিত, বিপর্যস্তপ্রায়।

"এক জাতি, এক প্রাণ, একতা"র সংকল্প মন্ত্ররূপে উৎসবে, অনুষ্ঠানে উচ্চারিত। কিন্তু ভারতীয় জনগণের বাস্তবজীবনে, প্রাত্যহিক কর্মে ও মননে অবহেলিত। রাষ্ট্রনায়ক নেহরু বলছেন, এর জন্য দায়ী দল নয়, নেতা নয়, রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থায় অদূরদর্শিতা অথবা ব্যর্থতাও নয়, দায়ী বহু সম্প্রদায়, ভাষা, জাতি, উপজাতি, গোষ্ঠী-অধ্যুষিত ভারতবর্ষের ঐতিহ্য। শ্রীনেহরু স্বয়ং এককালে এই ঐতিহ্যের মধ্যে ভারতীয় ঐক্যের স্বর্ণসূত্র আবিষ্কার করেছিলেন: ক্লান্ত, দ্বিধাগ্রস্ত, রাষ্ট্র পরিচালনায় অভিশপ্ত রাষ্ট্রনায়ক নেহরুই আজ আবার সেই ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে ঐক্য-বিধ্বংসী প্রেতনৃত্য আবিষ্কার করে শিহরিত, পরাভূত।

শ্রীনেহরুর হতাশাচ্ছন্ন এই নতুন ভারত দর্শনের সূত্র যাই বলুক সঙ্কটকালে রাষ্ট্রনায়কের দুর্বলতাকে নির্বিবাদে মেনে নিতে পারা যায় না। ইতিহাস মানুষই ভাঙে গড়ে। দেশনায়কের যথার্থ ভূমিকা হল দেশবাসীকে নতুন ইতিহাস রচনার আদর্শে প্রয়াসে পরিচালনায়, রাষ্ট্রনায়কের কীর্তির সহস্র প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও জাতীয় জীবনে সেই নব ইতিহাস সংকলনে দ্বিধামুক্ত দৃঢ় রাষ্ট্রনীতি প্রয়োগ-কৌশলে। ভারতবর্ষ আজ যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন তারও প্রতিবিধান সম্ভব যদি রাষ্ট্র পরিচালকরা দৃঢ়চিত্ত দূরদর্শী হন।

এককালে য়ুরোপে সার্ব, ক্রোট, মাসিডোনীয় প্রভৃতি নানা খণ্ডজাতি উপজাতিদের উগ্র স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা গোটা বল্কান অঞ্চলের রাজনৈতিক সংহতি ও শান্তি বিপর্যস্ত করেছিল; সেখানেও মনে হয়েছিল সংস্কারান্ধ গোষ্ঠীবিকার-গ্রস্ত প্রেতনৃত্যের হাত থেকে নিষ্কৃতির উপায় নেই। সেই বল্কানেও যখন বিবিধ কলহপরায়ণ খণ্ডজাতি গোষ্ঠীকে একসূত্রে গ্রথিত করা সম্ভব হয়েছে তখন ভারতবর্ষে ঐক্য বিধ্বংসী প্রেতনৃত্য অনিবার্য বিবেচনা করার কোনও ইতিহাস-সম্মত যৌক্তিকতা নেই।

রাষ্ট্র পরিচালনায় দুর্বলচিত্ততা এবং ব্যর্থতার যথার্থ গুরুত্ব প্রধানমন্ত্রী নেহরু স্বীকার করতে প্রস্তুত নন, সম্ভবত সেজন্যই তিনি ভারত দর্শনে বিভীষিকাগ্রস্ত নতুন সূত্র আবিষ্কারের আগ্রহী। সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে যদি সত্যই ভূতের উৎপাত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে তবে তার জন্য দায়ী দল, নেতা এবং শাসকমণ্ডলী। ঐক্য-বিধ্বংসী ভূতকে প্রশ্রয় দিয়েছেন কারা? কারা ভারত রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও যথাসময়ে যথাস্থানে ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করতে সাহসী হননি? আসামে প্রেতনৃত্যের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে প্রধানমন্ত্রী আজ ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কিত। শঙ্কা অমূলক নয়, কিন্তু এই প্রেতনৃত্য প্রতিরোধ করার উপায় ছিল না, ভবিষ্যতেও নেই, প্রধানমন্ত্রীর এই যুক্তি মারাত্মক বিভ্রান্তি-পূর্ণ। শ্রীনেহরু মেনে নিয়েছেন, রাজনৈতিক ... বিকারগ্রস্ত উন্মাদনার কোনও প্রতিকার নেই, কারণ তাঁর নব ভারত দর্শনে এই উন্মাদনার উৎস নাকি ভারতীয় ঐতিহ্যের মর্মমূলে, জনচিত্তের সর্বস্তরে ওতপ্রোত। এ যদি সত্য হয় তাহলে নতুন করে বিচার করতে হবে স্বাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাস, বিচার করতে হবে জনচিত্তের উপর জাতীয় নেতাদের ভাবোন্মাদ প্রভাবের ... সে-বিচারে ভারতীয় ঐক্য-বিধ্বংসী ... প্রধান অভিযুক্তের ভূমিকা রাষ্ট্রনায়ক নেহরুর।

প্রসঙ্গত

রবীন্দ্র-শতবার্ষিক অনুষ্ঠানের আর মাত্র সাত মাস বাকী। বিশ্বের সর্বত্রই তার আয়োজন শুরু হয়েছে, তার সংবাদও আমরা পাচ্ছি। লণ্ডনে দেশব্যাপী উৎসবের আয়োজন করছেন 'ঠাকুর উৎসব কমিটি'- যার সভাপতি হয়েছেন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন এবং উপ-সভাপতি ভারতের লণ্ডনস্থ হাই-কমিশনার শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। রুশ দেশে জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সোভিয়েট ভারতীয় ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মিলিত প্রচেষ্টায় কবির জীবন ও কর্মসাধনা সম্পর্কে একখানি বৃহৎ স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন করেছেন; তাছাড়া, সোভিয়েট ইউনিয়নে ব্যাপকভাবে এই শত-বার্ষিকী উৎসব পালনের পরিকল্পনাও প্রস্তুত হয়েছে। মার্কিন দেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রে রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উৎসবের আয়োজন শুরু হয়ে গিয়েছে। কিছুকাল আগে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর বিবৃতি থেকে আমরা তার পরিচয় পেয়েছি। জাপানও পিছিয়ে নেই। সে-দেশের ঠাকুর শতবার্ষিকী কমিটির পক্ষ থেকে জাপানী ভাষায় একটি সুদৃশ্য পাক্ষিক বুলেটিন ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হচ্ছে। দেশবাসীকে এই উৎসবে উদ্বোধিত করার জন্য রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী কর্মধারার সচিত্র পরিচয় এই পত্রিকায় নিয়মিতই প্রকাশিত হচ্ছে। এমন কি, ভারতের প্রতিটি রাজ্যে প্রস্তুতিপর্ব পূর্ণোদ্যমে চলেছে। বোম্বাই রাজ্য সম্মিলিতভাবে শতবার্ষিকীর সপ্তাহব্যাপী উৎসবের আয়োজন করেছেন, বিশ্বের বিশটি দেশের প্রতিনিধি এই উৎসবে যোগদান করবে। কিন্তু বাংলাই শুধু ঘুমিয়ে রয়। যে-বাংলা দেশকে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের দরবারে সম্মানের আসনে বসিয়েছেন, যে-বাঙালীর মূক মুখে রবীন্দ্রনাথ ভাষা দিয়েছেন, কণ্ঠে দিয়েছেন গান, প্রাণে দিয়েছেন আনন্দ, যে আত্মবিস্মৃত জাতিকে আপন গৌরবে গরীয়ান করেছেন এবং যে-দেশকে উদ্দেশ করে কবি বলেছেন—আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি, সেই বাংলা দেশে সরকারী উদ্যোগে শত-বার্ষিকী অনুষ্ঠানের কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী অদ্যাবধি আমরা পেলাম না।

*

পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে শতবার্ষিকী কমিটি গঠিত হয়েছে, কমিটির সদস্যদের গালভরা নাম সংবাদপত্রে প্রকাশিতও হয়েছিল। সরকারী আমলা-তন্ত্রের আমীর ওমরাহরা এই কমিটিতে আছেন, আর আছেন কিছু কোটিপতি ব্যবসায়ী। এই কমিটির সদস্যদের নাম প্রচারের দ্বারা মুখ্যমন্ত্রী হয়তো দেশ-বাসীকে এই ভরসাই দিতে চেয়েছিলেন যে, এ'রা কেউ সন্ন্যাসী নন, সুতরাং গাজন নষ্ট হবার আশংকা নেই। কিন্তু কমিটি আজ পর্যন্ত যখন দেশবাসীর কাছে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা উপস্থাপিত করলেন না তখন আশংকা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। কমিটির ঝুলির মধ্যে কি পরিকল্পনা আছে জানবার উপায় নেই। তাঁরা হয়তো ভেবে রেখেছেন, যাদুকরের মত শেষ মুহূর্তে ঝুলির ভিতর থেকে আমগাছের চারা বার করে তাতে আম ফলাবেন, হ্যাট থেকে বেরবে র‍্যাবিট, আর বিস্মিত দেশবাসী তালি বাজাবে। সরকারী উদ্যোগে কিছু কিছু পরিকল্পনা যে ঝুলি থেকে একেবারে বেরোয় নি তা নয়। রবীন্দ্র-সরোবর, রবীন্দ্র-স্টেডিয়াম, জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের পৈত্রিক বাসভবনে রবীন্দ্র-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি চিরাচরিত শহরে শোভাবর্ধনকারী পরিকল্পনা কিছু কার্যত হয়েছে, কিছু হবে বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। রবীন্দ্রনাথ শহরের কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন বাঙালীর কবি। সমগ্র বাংলা দেশের প্রাণের স্বতস্ফূর্ত সহযোগে যে উৎসব প্রতিপালিত হওয়া উচিত তার পরিকল্পনা বা প্রস্তুতির কোনো পরিচয় আজও আমরা পেলাম না কেন?

বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণে এ-সপ্তাহে 'প্রথম কদম ফুল' প্রকাশিত হল না। আগামী সপ্তাহ থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হবে।

—সম্পাদক

*

সম্প্রতি গ্রামে গ্রামে এই বার্তা রটিত হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার পল্লীবাসী-দের মধ্যে রবীন্দ্র-সংগীত শিক্ষাদানের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। রাজ্যের প্রত্যেকটি উন্নয়ন ব্লকে একজন করে রবীন্দ্র-সংগীত শিক্ষক নিযুক্ত করা হবে এবং এই উদ্দেশ্যে দু'শ জন সংগীত-শিক্ষক সংগ্রহ করা হবে। উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে রবীন্দ্রকীর্তির বিরাট সরোবর থেকে মাত্র এক গণ্ডূষ করুণাবারি ছাড়া কি পল্লীবাসীদের আর কিছু প্রাপ্য নেই? রবীন্দ্র-সাহিত্য গ্রাম বাংলার প্রতি ঘরে পৌঁছে দেবার জন্য যে সুলভ সংস্করণের প্রস্তাব আমরা একাধিকবার জানিয়েছিলাম সে-বিষয়ে রাজ্য সরকার কতদূর অগ্রসর হয়েছেন দেশবাসী সেই ঘোষণারই আজ প্রত্যাশী।

*

রবীন্দ্র সাহিত্যের সুলভ সংস্করণের কথাই যখন উঠল তখন রাজ্য সরকারের কাছে আরেকটি প্রস্তাব সবিনয়ে নিবেদন করি। শোনা যায় শতবার্ষিকী উপলক্ষে রাজ্য সরকার রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলীর একটি সুলভ সংস্করণ ৭৫৲ টাকায় প্রকাশ করবেন বলে স্থির করেছেন। নিম্নমধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালীকে যেখানে ভাত-কাপড়ের সমাধান করতে হিমসিম খেতে হয় সেখানে ৭৫ টাকায় রচনাবলী কেনা তাদের কাছে স্বপ্নের অতীত। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ যে-পদ্ধতিতে রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশ করেছেন সে পদ্ধতি সম্পূর্ণ বর্জন করে এমন ভাবে রচনাবলী প্রকাশ করা উচিত যে পাঠক তার প্রয়োজন রুচি ও প্রবণতা অনু-সারে রচনাবলীর খণ্ড বিশেষ ক্রয় করতে পারে। যে-পাঠক রবীন্দ্রনাথের কাব্য পাঠে আগ্রহী, নাটক বা উপন্যাস পাঠে নয় তাকে কেন অধিক অর্থ ব্যয় করে নাটক উপন্যাস কিনতে বাধ্য করা হবে। এই কারণে আমাদের প্রস্তাব—রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন শ্রেণীর রচনা বিভিন্ন খণ্ডে একত্রিত প্রকাশ করা হোক। কবিতা, উপন্যাস, ছোট-গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, গান ইত্যাদি ভিন্ন-ভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত হলে পাঠকরা নিজেদের সামর্থ্যের মধ্যে প্রিয় সাহিত্য-সামগ্রী কিনতে পারেন। আশা করি, রবীন্দ্রনাথের বিরাট পত্রসাহিত্যও এই সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এ-পদ্ধতির আরেকটি উপকারিতা আছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই, গবেষণা আরো গভীর ও বিস্তৃত হবে। সাহিত্যের যে-ছাত্র রবীন্দ্র কাব্য নিয়ে গবেষণা করতে ইচ্ছুক তাকে বাধ্য হয়ে বিশ্বভারতী গ্রন্থণ-বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ২১৪৲ টাকা দামের ছাব্বিশটি খণ্ড চতুর্দিকে ছড়িয়ে নিয়ে বসতে হয়, কেননা ছাব্বিশটি খণ্ডেই রবীন্দ্র কাব্যকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আমাদের নিবেদন, রবীন্দ্র-রচনাবলীর সুলভ সংস্করণ প্রকাশকালে আমাদের এই প্রস্তাব সহৃদয়তার সঙ্গে যেন বিবেচনা করে দেখেন।

বৈদেশিকী

ইউনাইটেড নেশন্‌স-এর জেনারেল অ্যাসেমব্লীর আসন্ন অধিবেশনে সোভিয়েট প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব তিনি নিজে করবেন বলে শ্রীক্রুশ্চফ ঘোষণা করেছেন। সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিক জগতে বিষম হৈচৈ পড়ে গেছে। সোভিয়েটের বড়কর্তা যদি নিজে যান, তাহলে অন্য দেশের বড়কর্তারা কী করবেন, তাই নিয়ে জল্পনা কল্পনার প্রবল স্রোত বইতে আরম্ভ করেছে। অধিবেশন আরম্ভ হতে বেশি দেরি নেই। সুতরাং ধীরেসুস্থে ভেবেচিন্তে চাল চালবার সময় নেই। যা স্থির করার তাড়াতাড়ি স্থির করতে হবে। তবে শ্রীক্রুশ্চফ এইরকম একটা কাণ্ড করে বসতে পারেন, এ সম্ভাবনাটা পূর্বে কারো মনে আসেনি তা নয়। কূটনীতির ওস্তাদদের দিয়ে মার্কিন সরকার নিশ্চয়ই এই প্রশ্ন নিয়ে অনেক গবেষণা করিয়েছেন। কারণ এই সময়ে, এই ইলেকশনের বছরে শ্রীক্রুশ্চফের আমেরিকায় আগমন আমেরিকা আদৌ পছন্দ করবে না। কিন্তু মুশকিল এই যে, ইউনাইটেড নেশন্‌স-এর অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য শ্রীক্রুশ্চফ আসছেন, তাঁকে বাধা দেবার উপায় নেই। আমেরিকায় যখন ইউনাইটেড নেশন্‌স-এর হেড অফিস স্থাপিত হয়, তখন কি আমেরিকা আজকের পরিস্থিতির সম্ভাব্যতা কল্পনা করতে পেরেছিলেন? আমেরিকায় ইউনাইটেড নেশন্‌সের অফিস বসানো আমেরিকার আগ্রহ এবং ইচ্ছাতেই হয়েছিল। ইউনাইটেড নেশন্‌স মার্কিন প্রভাবাধীন হয়েই বরাবর থাকবে, এইটাই ছিল আমেরিকার আশা এবং 'ইউনো'র উপর মার্কিন প্রভাব সুরক্ষিত করার সহায়ক হবে বলেই ইউনোর হেড অফিস মার্কিন ভূমিতে স্থাপিত হয়। তাছাড়া ইউনোর খরচপত্র জোগানোর দায়িত্বেরও সবচেয়ে বড়ো অংশ আমেরিকা নেয়। সুতরাং তার পরিবর্তে ইউনোর বাড়িঘরদোর তৈরির কণ্ট্রাক্টরিরও একটা বড়ো অংশ মার্কিন ব্যবসায়ীরা যাতে পায়, তার জন্যও ইউনোর হেড অফিস নিউইয়র্কে স্থাপন করার দিকে আমেরিকার একটি অনিবার্য ঝোঁক ছিল। ইউনোর হেড অফিস নিউইয়র্কে থাকাতে মার্কিন সরকারের রাজনৈতিক এবং অন্যবিধ সুবিধা এখনো যথেষ্ট আছে। তবে ফুলের সঙ্গে দু চারটে কাঁটাও আছে এবং ফুলের গন্ধ উপভোগ করার সঙ্গে সেগুলোর খোঁচাও আমেরিকাকে সহ্য করতে হয়। ইউনোতে বিভিন্ন দেশ থেকে যেসব প্রতিনিধি যান, তাঁদের মধ্যে কারো কারো আগমন মার্কিন সরকার আদৌ পছন্দ করেন না। তারা আমেরিকায় না এলেই মার্কিন সরকার খুশী হতেন, কিন্তু তাঁদের ঠেকাবার উপায় নেই। নিউইয়র্কে ইউনোর দপ্তরে বিভিন্ন দেশের লোক যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের সম্বন্ধে মার্কিন সরকারের মতামত দেবার অবশ্য অনেকটা অধিকার আছে। আমেরিকার বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করছে বা করতে পারে, এরূপ সন্দেহ কারো উপর হলে তাকে সরিয়ে দেবার জন্য বলার অধিকার মার্কিন সরকারের আছে।

'নাভানা'র বই

প্রবন্ধ ও বিবিধ রচনা

সব-পেয়েছির দেশে ॥ বুদ্ধদেব বসু	২·৫০
আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয় ॥ দীপ্তি ত্রিপাঠী	৭·৫০
পলাশির যুদ্ধ ॥ তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়	৪·০০
রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেম ॥ মলয়া গঙ্গোপাধ্যায়	৩·০০
রক্তের অক্ষরে ॥ কমলা দাশগুপ্ত	৩·৫০
সময়টা কেমন যাবে ॥ জ্যোতি বাচস্পতি	৩·০০

গল্পসংগ্রহ ও উপন্যাস

প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প	৫·০০
এক অঙ্গে এত রূপ ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৩·০০
সমুদ্র-হৃদয় (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু	৪·০০
ফরিয়াদ (উপন্যাস) ॥ দীপক চৌধুরী	৪·০০
চিররূপা ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ	৩·০০
গড় শ্রীখণ্ড (উপন্যাস) ॥ অমিয়ভূষণ মজুমদার	৮·০০
মেঘের পরে মেঘ (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু	৩·৭৫
মীরার দুপুর (উপন্যাস) ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	৩·০০
তিন তরঙ্গ (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু	৪·০০
বসন্তপঞ্চম ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র	২·৫০
বিবাহিতা স্ত্রী (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু	৩·৫০
চার দেয়াল (উপন্যাস) ॥ সত্যপ্রিয় ঘোষ	৩·০০
মাধবীর জন্য ॥ প্রতিভা বসু	২·৫০
বধূপত্নী ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	২·৫০
মনের ময়ূর (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু	৩·০০

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা
(পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ)
সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ

নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

কিন্তু সে নিয়মতো কোনো দেশের রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের বেলায় খাটে না। শ্রীক্রুশ্চফের ব্যাপারটাতো আরো অন্যরকম। শ্রীক্রুশ্চফের পর্যায়ের কোনো নেতার পক্ষে আমন্ত্রিত না হয়ে বিদেশে যাওয়ার কথাই উঠে না। কিন্তু তাঁর দেশের প্রতিনিধি হয়ে ইউনাইটেড নেশনস্-এর অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য নিউইয়র্কে যাওয়া শ্রীক্রুশ্চফের পক্ষে আইনবিরুদ্ধ নয়। কারণ তিনি তো আমেরিকায় যাচ্ছেন না। যাচ্ছেন ইউনাইটেড নেশনস্এ যদিও ইউনাইটেড নেশনস্-এর অফিসের অবস্থান আমেরিকার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে। আমেরিকার অনিচ্ছা এবং অসম্মতি সত্ত্বেও ইউনাইটেড নেশনস্সের অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য শ্রীক্রুশ্চফের নিউইয়র্কে আসা আমেরিকা ঠেকাতে পারবে না। এই জন্যই মার্কিন সরকারের রাগ বেশি হয়েছে। এই সময়ে শ্রীক্রুশ্চফের নিউইয়র্কে আসা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইলেকশনে অর্থাৎ মার্কিন রাষ্ট্রের আভ্যন্তর ব্যাপার সোভিয়েটের হস্তক্ষেপ বলে বিবেচিত হবে, এরূপ বলা হচ্ছে। কারণ এটা ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, শ্রীক্রুশ্চফ ইউনোর অধিবেশনে এসে এমনসব কথা বলবেন, যাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইলেকশনকে প্রভাবান্বিত করার ইচ্ছা প্রতিফলিত হবে।

কিন্তু এটা মুখ্য কথা নয়। শ্রীক্রুশ্চফের আসার কথায় আরো অনেক শক্ত সমস্যা পশ্চিমা শক্তিদের সামনে উঠেছে, যেগুলোর সমাধান করা সহজ নয়। যদি শ্রীক্রুশ্চফ ইউনাইটেড নেশনস্-এর অধিবেশনে উপস্থিত হন, তাহলে শ্রীআইসেনহাওয়ারের উপস্থিত হওয়াও যেমন মুশকিল, অনুপস্থিত থাকাও তেমনি মুশকিল হবে। শ্রীক্রুশ্চফ বলেছিলেন যে, শ্রীআইসেনহাওয়ার এবং শ্রীম্যাকমিলানের সঙ্গে দেখা হলে তিনি খুশী হবেন, কিন্তু গত মে মাসে প্যারিসে এবং তারপরেও অনেকবার শ্রীক্রুশ্চফ শ্রীআইসেনহাওয়ার সম্বন্ধে যেসব উক্তি করেছেন, তারপরে মার্কিন প্রেসিডেন্টের পক্ষে শ্রীক্রুশ্চফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করা সহজ নয়। অথচ সরে থাকাও মুশকিল। গুপ্তচরের কাজে নিযুক্ত 'ইউ-টু' বিমানের ব্যাপার নিয়ে ইউনোতে আলোচনার নোটিশ সোভিয়েট গবর্নমেণ্ট দিয়ে রেখেছিল। পূর্বে থেকে যদি দুই পক্ষের মধ্যে একটা মিটমাটের কথা শুরু না হয়, তবে ইউনোতে 'ইউ-টু'র ব্যাপার নিয়ে শ্রীক্রুশ্চফ একটা মহা তোলপাড় উপস্থিত করবেন সন্দেহ নেই। শ্রীক্রুশ্চফ আসাতে অনেক দেশেরই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বের মান উঁচু করার দিকে ঝোঁক হবে। সব কম্যুনিস্ট দেশগুলি থেকে পয়লা নম্বর নেতা স্ব স্ব প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করতে আসবেন বলে মনে হয়। নিরপেক্ষ দেশগুলির উপরেও এর প্রভাব নিশ্চয়ই কিছুটা পড়বে।

তাছাড়া মনে যাই থাক, শ্রীক্রুশ্চফ নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে খুব জোর বলবেন, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। এই সময়ে পশ্চিমা শক্তিরা সরে থাকলে তাদের মনোভাব সম্বন্ধে একটা খারাপ ধারণা নিশ্চয়ই জন্মাবে। পৃথিবীর সর্বত্র অথবা প্রায় সর্বত্র, কারণ চীন সম্বন্ধে নাকি সন্দেহের কারণ আছে—মানুষ নিউক্লিয়ার যুদ্ধের ভয়ে ভীত। মানুষ নিরস্ত্রীকরণ চায়। এই অবস্থায় শ্রীক্রুশ্চফের সঙ্গে কথাবার্তা বলার অনিচ্ছা প্রকাশ যারা করবেন, তাঁদের বদনাম হবে। নিরপেক্ষ দেশগুলির সহানুভূতি সে স্থলে শ্রীক্রুশ্চফের দিকে যেতে পারে।

শ্রীক্রুশ্চফের নিউইয়র্কে যাবার সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বৃটিশ ও মার্কিন সরকারের মধ্যে মন্ত্রবিনিময় আরম্ভ হয়ে গেছে বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীম্যাকমিলান ইউনাইটেড নেশনস্-এর অধিবেশনে পশ্চিমা বড় কর্তাদের উপস্থিত হওয়ার পক্ষে বলছেন বলে মনে হয়। তবে শ্রীক্রুশ্চফের ঘোষণার পরেও ফরাসী সরকারী মহল থেকে বলা হয়েছে যে প্রেসিডেন্ট দ্য গল যাবেন না। এটাই ফ্রান্সের শেষ কথা কিনা ঠিক বলা যায় না। মার্কিন এবং বৃটিশ প্রধানগণের উপস্থিত হবার সিদ্ধান্ত হলে নিরপেক্ষ দেশগুলির প্রধান নেতারাও যাবার জন্য তাগিদ অনুভব করতে পারেন। মিঃ ক্রুশ্চফের একটা পুরানো প্ল্যানও ছিল, অনেককে নিয়ে শীর্ষ সম্মেলন করার। বর্তমান কৌশলের দ্বারা সোভিয়েট গবর্নমেণ্ট সেই প্ল্যান কার্যে পরিণত করার চেষ্টায় আছেন, এমনও পশ্চিমা শক্তিদের মনে হতে পারে। তবে আর একটা কারণ আছে, যাতে পশ্চিমা বড় কর্তাদের পক্ষে সরে থাকা বিপজ্জনক হবে। আফ্রিকার অনেকগুলি সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ এবার ইউনোর সদস্য হচ্ছে। তাদের মধ্যে অনেকেরই প্রধান নেতা হয়ত এই অধিবেশনে আসছেন। তাঁরা সব শ্রীক্রুশ্চফের পাল্লায় পড়ে যেতে পারেন। এ আশঙ্কাও আমেরিকার পক্ষে তুচ্ছ নয়।

৪।৯।৬০

শ্রীমাধব রায়ের জীবনধর্মী তিনাঙ্ক নাটক।
যুগান্তর বলেন: নাটকটি হৃদয়প্রধান এবং তাই এর অন্তর্নিহিত ভাবধারাটি চিন্তাশীলদের নিকট সমাদর পাবে।
নতুন খবর বলেন: সার্থক বাংলা নাটক না পাওয়ার অভাবে যাদের অবিমিশ্র আক্ষেপের বিরাম নেই, সহযাত্রীর নাট্যকার তাঁদের অভিনন্দনযোগ্যই নন—নাট্যমোদীদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার পাত্র।
সহযাত্রী
দাম দুই টাকা
শ্রীগুরু লাইব্রেরী,
২০৬, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
(সি ৭৮১৩)

এবারে পূজায় ছোটদের দুটি অপূর্ব বই
ছড়া-সঞ্চয়ন — প্রাচীন ও আধুনিক ছড়ার অভিনব সঙ্কলন
শ্যামলা-দীঘির ঈশান কোণে — মিষ্টি ছন্দে মনোরম কাহিনী পাতায় পাতায় রঙীন ছবি
প্রতিটি আড়াই টাকা
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ কলিকাতা-৯

শিশির সেন **শিশির সেন**

১। আনন্দনিকেতন ৪·৫০
অপরাজেয় জীবনসত্যের নির্ভীক মূল্যায়নে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।
'আপনার বইটিতে সদভাবনা ও ভদ্রতা যথেষ্ট মাত্রায় আছে। হয়ত এ যুগে তাই অপরাধ বলে গণ্য হবে।'
ডক্টর শিশিরকুমার ঘোষ, অধ্যাপক বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

২। একটি ফুল দুটি নায়ক ৩·০০
'ভাবনা ব্যক্তির জন্যে, সত্যের জন্যে, রূপের জন্যে, রসের জন্যে, উক্তির জন্যে, উক্তির অর্থের জন্যে, জীবনের তাৎপর্যের জন্যে।'
—বোরিস পাস্তেরনাক
এ-গ্রন্থ দুটি নিজে পড়ুন প্রিয়জনকে উপহার দিন
আনন্দ পাবলিশার্স : ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলিকাতা-১২

আলোচনা

'বাইশে শ্রাবণ'

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়, ১১ই ভাদ্র, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দের 'দেশ' পত্রিকায় "২২শে শ্রাবণ" শীর্ষক আলোচনায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কমল পৈত মহাশয়ের চিঠি এবং শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা নির্মলকুমারী মহলানবিশ মহাশয়ার বক্তব্য পড়লাম। শ্রীযুক্তা মহলানবিশ আমার শ্রদ্ধেয়া এবং নমস্যা, সুতরাং তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদ করবার ধৃষ্টতা আমার নেই, তবুও আমার লেখা '২২শে শ্রাবণের' ঘটনা সম্বন্ধে দু-একটি কথা জিজ্ঞেস না করেও পারছি না।

দু'খানি চিঠিতেই কয়েকটি প্রশ্ন সম্বন্ধে মতভেদ হয়েছে—

(১) আমি রাত্রি দশটার সময় জোড়াসাঁকো পৌঁছে যাঁদের উপস্থিত থাকতে দেখেছি, তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্তা নির্মলকুমারী দেবীর নাম নেই।

(২) শ্রীযুক্তা মহলানবিশ রাত্রি আড়াইটা নাগাদ ফোন পেয়ে কুড়ি মিনিটের মধ্যেই জোড়াসাঁকোয় পৌঁছলেন, অথচ আমি লিখেছি, "রাত্রির অন্ধকার ফিকে হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এলেন লেডী রানু মুখার্জি, শ্রীযুক্তা রানী মহলানবিশ এবং সুসঙ্গের শ্রীযুক্ত সুহৃদ সিংহ।

(৩) গুরুদেবের মহাযাত্রার দিন "স্যার নীলরতন দরজার বাইরে থেকেই গুরুদেবকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ক'রে ফিরে যেতে যেতে আবার এসে অনেকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে গুরুদেবকে দর্শন ক'রে চলে গেলেন", অথচ শ্রীযুক্তা মহলানবিশের অনুলিপিতে আছে যে, ৫ই আগস্ট, অর্থাৎ ২০শে শ্রাবণ বিকেলে বিধানবাবুর সঙ্গে স্যার নীলরতন তাঁর কবি বন্ধুকে শেষ দেখা দেখছেন।

এই তিনটি সমস্যারই উত্তর দিচ্ছি—

(১) আমি রাত্রি দশটার সময় জোড়াসাঁকো পৌঁছে সোজা বিচিত্রা-ভবনের দোতলার দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ঘরেই গিয়েছিলাম (আজ যেখানে শ্রদ্ধেয় পুলিনবাবুর অফিস) এবং সকাল বেলার আগে ও-ঘর থেকে বেরুইনি, সুতরাং গুরুদেবের ঘরেও আমি যাইনি এবং ঐ ঘরে কে কে আছেন, সে সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ বা চেষ্টা করবার দরকার হয়নি, কারণ আমি যে-ঘরে ছিলাম, সেই ঘরের জানলা থেকেই খুব ভালভাবে গুরুদেবের দর্শন পাচ্ছিলাম।

অন্তিম সেবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে ব'লে লিখেছি, তাঁদের নাম আমি জিজ্ঞেস ক'রেই পেয়েছি—কারণ ২২শে শ্রাবণের

● সদ্য প্রকাশিত ●

আনন্দকিশোর মুন্সীর
রাঘব বোয়াল
॥ তিন টাকা ॥

নিখিলরঞ্জন রায়ের
ভারত সীমান্তসমূহে ভ্রমণের সচিত্র কাহিনী
সীমান্তের সপ্তলোক
॥ তিন টাকা ॥

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের
জর্জ বার্নাড শ ৮·৫০ ॥
[চিন্তানায়কের উপন্যাসোপম জীবনকথা]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
মহাশ্বেতা
॥ সাড়ে পাঁচ টাকা ॥

ধনঞ্জয় বৈরাগীর
আশ্চর্য নাটক
রুপোলী চাঁদ (৩য় মুঃ) ২·৫০ ॥

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের
মধ্য ইয়োরোপে পায়ে-হেঁটে বেড়ানোর কাহিনী
চরণিক ৩·০০ ॥

সন্তোষকুমার দে'র
বৈঠকী গল্প ২·৫০ ॥
[শ্রেষ্ঠ বাংলাশিল্পী রেবতীভূষণ চিত্রিত]

জরাসন্ধের
বিচারশালার পটভূমিকায় নবতম গ্রন্থ
ন্যায়দণ্ড
শিগগিরই প্রকাশিত হচ্ছে।

অধ্যাপক বীরেন্দ্রমোহন আচার্যের
শিক্ষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধ-গ্রন্থ
আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব ৬·৫০

● নানা ধরনের উল্লেখযোগ্য বই ●

বনফুলের
দ্বৈরথ (৬ষ্ঠ মুঃ) ৩·০০ ॥
স্বপ্নসম্ভব ৩·০০ ॥

বিক্রমাদিত্যের
দেশে দেশে (২য় মুঃ) ৩·০০ ॥
ফতেনগরের লড়াই ২·৫০ ॥

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
রায়চৌধুরী ২·২৫ ॥
কয়লাকুঠীর দেশে ৩·৫০ ॥

কালকূটের
অমৃতকুম্ভের সন্ধানে (৭ম মুঃ) ৫·০০ ॥

শিবনাথ শাস্ত্রীর
ইংলণ্ডের ডায়েরী ৪·০০ ॥

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
মাথুর (২য় মুঃ) ৪·০০ ॥

নারায়ণ সান্যালের
বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প (২য় মুঃ) ৩·৫০ ॥

অমরেন্দ্র ঘোষের
ঠিকানা বদল ৫·০০ ॥

প্রবোধকুমার সান্যালের
শ্যামলীর স্বপ্ন (৬ষ্ঠ মুঃ) ৪·০০ ॥
নওরংগী ৩·০০ ॥

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
উত্তরায়ণ (৩য় মুঃ) ৪·০০ ॥
বাসর ৩·০০ ॥

গোপাল হালদারের
একদা (৬ষ্ঠ মুঃ) ৪·০০ ॥
অন্যদিন (৩য় মুঃ) ৪·৫০ ॥

রঞ্জনের
বইয়ের বদলে (২য় মুঃ) ২·৫০ ॥

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর
মণিপদ্ম ৪·০০ ॥

নবেন্দু ঘোষের
ডাক দিয়ে যাই (৬ষ্ঠ মুঃ) ৩·০০ ॥

দেবজ্যোতি বর্মণের
আধুনিক ইয়োরোপ ৩·২৫ ॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
শ্রেষ্ঠ গল্প (৩য় মুঃ) ৫·০০ ॥

সতীনাথ ভাদুড়ীর
পত্রলেখার বাবা ৪·০০ ॥
গণনায়ক (২য় মুঃ) ২·৫০ ॥

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর
কৃশানু (৬ষ্ঠ মুঃ) ৬·০০ ॥
মহাকাল (২য় মুঃ) ৩·৫০ ॥

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের
দিকশূল (৩য় মুঃ) ৪·৫০ ॥
বিগত দিন ৩·৫০ ॥

মৌলানা খাফি খানের
যন্দুন্টং ২·৫০ ॥

সত্তু বাদির
সত্তু বাদার গল্প ২·৫০ ॥

দিলীপ মালাকারের
নেপোলিয়নের দেশে ২·০০ ॥

অমলেন্দু দাশগুপ্তের
বক্সা ক্যাম্প (২য় মুঃ) ৩·৫০ ॥

অশোক মিত্রের
ভারতের চিত্রকলা ১৫·০০ ॥

AFRICANISM : The African Personality Rs 16/-
Dr. Sunitikumar Chatterji

অতুল চক্রবর্তীর
গৃহ ও প্রাঙ্গণ ৩·০০ ॥

সীতা দেবীর
মাটির বাসা (২য় মুঃ) ৩·৫০ ॥

সাধনকুমার ভট্টাচার্যের
এরিস্টটলের পোয়েটিকস ও সাহিত্যতত্ত্ব ৬·৫০ ॥

আর্যকুমার সেনের
লীলাসঙ্গিনী ৪·০০ ॥

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর
জাপানী বন্দীশিবিরে ২·৫০ ॥

বিনয় ঘোষের
বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ
১ম খণ্ড ৩·০০ ২য় খণ্ড ৭·০০ ৩য় খণ্ড ১২·০০

রণজিৎকুমার সেনের
দ্বৈত সংগীত ৪·০০ ॥

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শ্রেষ্ঠ গল্প (৩য় মুঃ) ৫·০০ ॥

সরলাবালা সরকারের
বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ (সচিত্র) ৪·৫০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ঃ বারো ॥

আগেও যখন গুরুদেবকে অসুস্থ অবস্থায় দর্শন করবার সৌভাগ্য হয়েছে, তখনও যাঁরা সেবা করছিলেন, তাঁদের দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার দরকার হয়নি। তাই যিনি আমাকে নামগুলি দিয়েছিলেন, তাঁরই হয়ত ভুল হয়েছিল শ্রীযুক্তা রানী দেবীর নাম না বলা। নামগুলি কার কাছ থেকে সংগ্রহ ক'রেছিলাম, সেকথা আমার দিন-লিপিতে লেখা ছিল না।

(২) আমার সামনেই রাত্রি আড়াইটের সময় শ্রীযুক্তা রানী দেবীর কাছে ফোন করা হ'ল। তিনি কখন জোড়াসাঁকো পেঁৗছলেন, সেটা জানবার আগ্রহ হয়নি—হবার কথাও নয়। ভোর বেলা যখন তিনি আমাদের ঘরের কাছাকাছি ও-বাড়ির বারান্দায় এলেন, তখনই তাঁকে আমি প্রথম দেখতে পাই এবং মনে ক'রেছি তিনি তখনই এলেন। এটা আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি।

"ভোরের আলোর সংগে সংগে লেডী রানু মুখার্জি, শ্রীযুক্তা রানী মহলানবিশ ও সুসংগের শ্রীযুক্ত সুহৃদ সিংহ এক-সংগে এসে পেঁৗছলেন"—একথা আমার লেখায় নেই। আমার লেখা একটু আগেই উদ্ধৃত করেছি। "একসংগে এসে পেঁৗছলেন", এই কথাটা আমার লেখাও নয় এবং এর জন্যেও খানিকটা সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। ভোর বেলা প্রথমেই যাঁরা আমার নজরে পড়েছেন, তাঁদেরই দু-একজনের কথা লিখেছি মাত্র, তার মধ্যেও ভুলক্রমে ডাঃ ডি এন মৈত্রের নাম বাদ পড়ে গেছে, তিনি রাত্রি একটার সময়ে আমাদের ঘরে এসেছিলেন।

(৩) সার নীলরতনকে আমি নিজে দেখেছি বলেই আমার স্পষ্ট মনে আছে, এমনকি, তাঁর পরিধানে সাদা প্যান্ট, সাদা কোট এবং ফিকে নীল রং-এর শার্ট ছিল—এই ছবি আমার চোখের সামনে এখনও ভাসছে। তিনি চলে যাবার সংগে সংগেই শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় এলেন। শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা নলিনী দেবী সকাল সাতটার সময় জোড়াসাঁকোয় গিয়েছেন এবং আশা করি, ওখানেই ছিলেন, কিন্তু সার নীলরতনকে আমি অনেক বেলায় (বোধহয় সাড়ে দশটা বা এগারটার সময়) দেখি সুতরাং শ্রীযুক্তা নলিনী দেবী তাঁর পিতার উপস্থিতি না-ও লক্ষ্য ক'রে থাকতে পারেন, তাছাড়া সার নীলরতন ঘরের ভেতরে ঢোকেননি, বারান্দায় দরজার কাছেই ছিলেন। আমার পক্ষেও অবিকল সার নীলরতনের মত অন্য কাউকে দেখে ভুল ক'রবার সম্ভাবনা যে নেই, তা আমি বলতে পারি না, তবে সে সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ।

শ্রীযুক্তা রানী মহলানবিশের চিঠিতে আরও দু-একটি কথা সম্বন্ধে লিখছি—লেডী মুখার্জির সংগে অন্য কোনো ভদ্র-মহিলাকে একসংগে আসতে দেখিনি এবং ঐ ভদ্রমহিলাকে দেখে শ্রীযুক্তা রানী মহলানবিশ ব'লে ভুল করবার কোন সম্ভাবনাও আমার ছিল না, কারণ শ্রীযুক্তা রানী মহলানবিশকে বহুবার দেখবার এবং কথা বলবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

গুরুদেবের মহাযাত্রার মুহূর্তে আমাদের অলক্ষ্যেই এসেছে, কারণ সামনের দরজা প্রায় ২২ মিনিট আগে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছিল। দরজা খোলা হয়েছে মহাযাত্রার সংগে সংগেই বলে মনে হয়। তারও বোধ হয় পাঁচ-সাত মিনিট পরে আমি ঘরে ঢুকেছি এবং শ্রীযুক্তা রানী দেবীকে গুরুদেবের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত দিতে দেখেছি—তাই দেখে আমার মনে যে ভাব এসেছিল, সেকথাই আমার প্রবন্ধে লিখেছি—"আপন কর্তব্য পালন ক'রে যাচ্ছেন শান্তভাবে ইত্যাদি"। শ্রীযুক্তা মহলানবিশকে আমি ভোর বেলা দেখি এবং মহাযাত্রার পর দেখি, সুতরাং তিনি যে ইতিমধ্যে জোড়াসাঁকোয় উপস্থিত ছিলেন না, একথা আমার জানা ছিল না। সকাল বেলা যখন গুরুদেবের ঘরে যাই, তখন ঘরভর্তি লোক, সুতরাং ওখানে কে ছিলেন, অথবা কে ছিলেন না, সে বিষয়ে লক্ষ্য করবার মানসিক অবস্থা তখন ছিল না, দরকারও ছিল না।

শেষ বক্তব্য এই যে, আমার লেখাটা একটা শ্রদ্ধানিবেদন—গুরুদেবের মহাযাত্রার দিন উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য অনেকের সংগে আমারও হয়েছিল এবং যাঁরা তখন শিশু অথবা যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, তাঁদের কাছে সেদিনকার একটি সামান্য বর্ণনা দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না আমার লেখার। এত বড় যুগান্তকারী ঘটনার বর্ণনায় দু-একটি ছোট খাটো এবং নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপারে যদি সামান্য এদিক-ওদিক হ'য়েও থাকে, তবে সেটা নিয়ে, ঐতিহাসিক মূল্যের কোনো তারতম্য হবে ব'লে আমার ধারণা নেই। ইতি—

বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী, কলিকাতা।

আধুনিক কবিতা

শারদ সংকলন : দাম এক টাকা

কবিতা, অনুবাদ কবিতা ও প্রবন্ধে :
হরপ্রসাদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন বসু, সুশীল রায়, গোপাল ভৌমিক, কৃষ্ণ ধর, সন্তোষ-কুমার অধিকারী, প্রসিতকুমার, মৃত্যুঞ্জয় মাইতি, শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, বরেন্দ্র মল্লিক, চিত্তরঞ্জন মাইতি, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, আলোক সরকার, অনল চৌধুরী, নচিকেতা ভরদ্বাজ, প্রসেনজিৎ সিংহ, পূর্ণেন্দুনাথ মুখোপাধ্যায়, সামসুল হক, শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, রেবা দত্ত, তুষার চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লকুমার দত্ত, দীনেশ মুখোপাধ্যায়, বিজনকুমার ঘোষ, দেবব্রত দত্ত প্রভৃতি।

আধুনিক কবিতা প্রকাশনীর

প্রথম কাব্য গ্রন্থ :
বর্তমান বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল

মৃত্যুঞ্জয় মাইতির

গ্রাম নদী বন

১.২৫ ন. প.

সিটি অফিস ও প্রাপ্তিস্থান 'বিদিশা'
এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২
কার্যালয় : গোপাল কলোনী, কলি-৩২

(সি ৭৬৭৭)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ২৮শে ভাদ্র ১৩০১

লেখক বিভূতিভূষণের মনটাই যেন উদাস পল্লীকথকের। বাঙলার পল্লীকে বিভূতিভূষণ ভক্তের মতো ভালবাসতেন। তাঁর রচনায় প্রকৃতি সচেতন, ফুল, পাখি গাছপালা এক একটি সজীব চরিত্র, প্রকৃতিমরমীর রসবোধ সমভাবে মিশ্রিত। আমের মঞ্জরী, ঘেঁটুফুল, কলমীলতা এর প্রতিদিন দেখা মানুষটি, তাঁর কথকতার গুণে যেন আমার নিজস্ব।

বিভূতি প্রকাশন

এ-২২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—১২

আজ থেকে এক পক্ষকাল আমাদের প্রকাশিত বিভূতিভূষণের সকল বই টাকা প্রতি দু' আনা কম দামে বিক্রয় করা হবে।

(সি ৭৭৩৭)

গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

সংগীত সম্পর্কে আমাদের আলোচনাগুলি সাময়িক অনুষ্ঠানাদিকে আশ্রয় করে চলেছে এবং সংগীতের সাময়িক মূল্য ছাড়া একটা চিরন্তন মূল্য আছে এ সম্বন্ধে চিন্তার প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করি কি না সন্দেহ। যে সব গান কালকে অতিক্রম করে তাদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছে তা অল্প-সংখ্যক গায়ক গায়িকার কণ্ঠে আজও শুনতে পাওয়া যায় কিন্তু তাদের ধরে রাখবার ব্যবস্থা না করলে একটা আর্ট হারিয়ে যাবে এবং সে ক্ষতি যে কত বড় ক্ষতি তা আমরা ধারণা করতে পারি না। সংগীত আজ পর্যন্ত এত অবহেলিত যে তার ঐতিহ্যের বিলুপ্তিও আমাদের মনে রেখাপাত করে না।

পুরাতন গানের রেফারেন্স হিসাবে আমরা যতগুলি সংকলগ্রন্থের উপর নির্ভর করি তার একটিও বর্তমান কালে ছাপা হয় নি। সংগীত রাগকল্পদ্রুম, বাঙ্গালীর গান, প্রীতিগীতি, সংগীতসার সংগ্রহ প্রভৃতি বহুগ্রন্থ আছে যার প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি তা অভিজ্ঞ লোকমাত্রেই জানেন অথচ এ সব গ্রন্থ আজকাল দুষ্প্রাপ্য। কতদিকে দেশের টাকা কতভাবে খরচ হচ্ছে কিন্তু এই সব গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হবার মত টাকা নেই। পুরাতন সুরকারগণের প্রচেষ্টার ইতিহাস আমরা জানি না। অনেক রচয়িতার নামও হয়ত জানা নেই। রাধামোহন সেন নামক একজন গীতকার, গীতবিশারদ এবং পণ্ডিতব্যক্তি ছিলেন যাঁর সম্বন্ধে কোন খবরই আমরা রাখি না। অথচ তাঁর লেখা "সংগীততরঙ্গ" সংগীতের কতদিকে আলোকপাত করছে। তাঁর গান থেকে নিধুবাবু প্রেরণা পেয়েছিলেন। এই "সংগীততরঙ্গ" গ্রন্থটি আলোচনাসহ আবার ছাপা হওয়া উচিত কিন্তু সে দায়িত্ব আজ পর্যন্ত কেউ গ্রহণ করলেন না।

এক সময় যখন এই সব সংগীত সংগ্রহ করবার আগ্রহ লোকের ছিল তখন অধিকাংশ শিল্পীর রাগসংগীত সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁরা সুরে তালে চমৎকার গান গাইতে পারতেন। তাঁদের চাল হয়ত সাদা-মাটা ছিল, কিছুটা স্থূলে কবিত্বে তাঁরা সন্তুষ্ট থাকতেন কিন্তু কৃত্রিমতা তাঁদের মধ্যে ছিল না। আমাদের দেশে কাঙাল সন্ন্যাসীরা দাশুরায়, নীলকণ্ঠ, রামপ্রসাদের গান গাইতেন; দুর্গাপুজোয় আগমনী, কালীপুজোয় শ্যামাসংগীত শোনা যেত, যাত্রা থিয়েটারের গানেও রাগ-সংগীতের নিয়ম মেনে চলা হত। শ্রোতারা বা পাঠকেরা এই সব সরল এবং অকৃত্রিম সংগীত উপভোগ করতেন।

কালের পরিবর্তন হল। পরিবর্তন সব কিছুরই হয় কিন্তু একটা ধারাবাহিকতা সব কিছুতেই থাকে, অন্তত থাকা উচিত। বাংলাগানের বেলায় এই ধারাবাহিকতাটা অক্ষুণ্ণ থাকে নি। সেকালের গাইয়েরা যে সব শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন তাদের ঠিক মূল্যায়ন পদ্ধতিতে শেখান নি। অর্থাৎ, এমনভাবে গান শেখান নি যাতে শিক্ষার্থী-দের মধ্যে গানের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণের আগ্রহ জাগে। তাঁরা সুরের দিকটা দেখাতেন তাল সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। গান সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলতেন না। ভাল গান ভাল লাগবে—এ আর বেশি কথা কি। শিষ্যেরা হিন্দী গান শিখতেন তার সঙ্গে

প্রকাশিত হয়েছে

রমণীর মন

সরোজকুমার রায় চৌধুরী

কম কথায় যে কত বেশী বলা যায়, 'রমণীর মন' তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ছোট্ট একটি ঘটনা, সামান্য একটা কথা, দু এক টুকরো ভেসে-আসা স্মৃতি—এই নিয়ে কী উজ্জ্বল চিত্রাঙ্কন, কী অসামান্য মুন্সীয়ানা! প্রত্যেকটি গল্প আপন সৌকর্যে মনে গভীর রেখাপাত করে। নিঃসন্দেহে প্রবীণ সাহিত্যিকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প সংগ্রহ। স্নিগ্ধ প্রচ্ছদ। দাম : ৩·৫০ ॥

সদ্য প্রকাশিত

যোগভ্রষ্ট
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
৫·০০

বেনারসী
বিমল মিত্র
৪·৫০

নূতন মুদ্রণ

কলিতীর্থ কালিঘাট (৮ম সং)
অবধূত । ৪·০০

পলাশের নেশা (৪র্থ সং)
সুবোধ ঘোষ । ৩·০০

প্রিয়তমেষু	॥	স্টেফান জাইগ	২·০০
শুক্লসন্ধ্যা	॥	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	৫·০০
মুখের রেখা	॥	সন্তোষকুমার ঘোষ	৫·০০
আকাশলিপি	॥	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	৪·০০
জলপায়রা (২য় সং)	॥	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৪·০০
তৃষ্ণা (২য় সং)	॥	সমরেশ বসু	৩·০০
বধূবরণ (৩য় সং)	॥	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	৩·০০
পরমায়ু	॥	সন্তোষকুমার ঘোষ	৩·৫০
অনুবর্তন	॥	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫·০০
জনপদবধূ (২য় সং)	॥	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪·৫০
অপরূপা	॥	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	৪·০০
চীনে লণ্ঠন (২য় সং)	॥	লীলা মজুমদার	৩·২৫
আমার ফাঁসি হল (২য় সং)	॥	মনোজ বসু	৩·৫০
বনভূমি (২য় সং)	॥	বিমল কর	৩·০০
দুকুনকে ধান (অনুবাদ)	॥	শিবশঙ্কর পিল্লাই	৩·০০
মাটির মানুষ (অনুবাদ)	॥	কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী	২·৫০
আপন প্রিয় (৫ম সং)	॥	রমাপদ চৌধুরী	৩·০০
ধূপছায়া (৭ম সং)	॥	সৈয়দ মুজতবা আলী	৪·০০
দ্বন্দ্ব মধুর (৫ম সং)	॥	মুজতবা আলী ও রঞ্জন	৩·৫০

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বাঙালী জীবনের যুগ-সন্ধিক্ষণে
মহালয়ার বেতারানুষ্ঠান
মাতৃমন্ত্রে দীক্ষার জন্য এখনি পড়ুন
মহিষাসুরমর্দিনী
রচনা স্বরারোপ
বাণীকুমার পঙ্কজকুমার মল্লিক
২৪খানি সংস্কৃত ও বাংলা গানের স্বরলিপিসহ
মূল্য—৪·৫০ ন.প.
প্রকাশক: ত্রিগুণা প্রকাশনী
প্রাপ্তিস্থান: দাশগুপ্ত এণ্ড কোং
৫৪/৩, কলেজ স্ট্রীট • কলি-১২
(সি ৭৬৬৯)

মিশিয়ে মিশিয়ে কিছু বাংলা গানও সঞ্চয় করে রাখতেন। এইভাবে আরও একটা যুগ কেটে গেল। প্রকৃত অধ্যাপনার অভাবে বহু বাংলা গানের সুর বিলুপ্ত হল। বর্তমানে পুরাতন বাংলা গান নিয়ে নাড়াচাড়া করেন এমন ব্যক্তির সংখ্যা খুব বেশি নয়। অবশ্য বেতারে যাঁরা তথাকথিত পুরাতনী গান করেন তাঁদের কথা ধরছি না, কারণ সে আগ্রহকে আদৌ নিষ্ঠাবান আগ্রহ বলা যায় কি না সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। কোথাও কিছু জানা নেই হুট্ করে চাহিদা মেটাতে গিয়ে একটা পুরাতন বাংলা গান আয়ত্ত করা কঠিন ব্যাপার। ফাঁকিটা তাই সহজেই ধরা পড়ে। কিন্তু এঁদের ছেড়ে দিলেও কিছু আগ্রহসম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তি পুরাতন বাংলা গানের ধারা সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়েছেন। সঙ্গীতের মূল্যায়নের প্রতি তাঁদের বিশেষ আগ্রহ। অসুবিধাটা বোধ করেন তাঁরাই সব চেয়ে বেশি।

আগেকার সঙ্কলন গ্রন্থগুলিতে অনেক গান লিপিবদ্ধ করা আছে। কিন্তু পাঠান্তর সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা নেই। কিছু কিছু যে নেই তা নয়। যেমন, "নিধুবাবুর গীতাবলী" গ্রন্থে নিধুবাবুর প্রকৃত রচনাগুলি বেছে নেবার চেষ্টা হয়েছিল; "প্রীতি-গীতি"তেও এইরকম প্রয়াসের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। "বাঙ্গালীর গান" এ বহু সুরকারের জীবনী দেওয়া আছে। কিন্তু এ যুগের মত এরকম গবেষণার দৃষ্টি সে যুগে ছিল না তাই যাচাই-এর মধ্যেও অনেক ভুল চুক থেকে গেছে।

সুর সম্পর্কেও গোলমাল খুবই বেশি। গানের মাথায় এমন সব সুর দেওয়া আছে যার সঙ্গে প্রচলিত সুরের সম্পর্ক নেই। অনেক ক্ষেত্রেই সুরের উল্লেখে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় নি। এই কারণে অনেক প্রাচীন গায়ক এই সব সুরের উল্লেখ নিয়ে বিদ্রূপ করেন। অনেক সুরের ধরণ পাল্টে গেছে। সেকালের বাংলা টোড়ীর সঙ্গে বর্তমান ভৈরবীর তফাৎ নেই। আজকের মুলতানের সঙ্গে আগেকার মুলতানের কিছুমাত্র মিল নেই। সে মুলতান ভীমপলশ্রীরই নামান্তর। এ ছাড়া বহু কূট-রাগের উল্লেখ আছে যার পরিচয় আমরা জানি না। নিধুবাবুর একটা গান আছে "কমলবদনীলো চঞ্চল মৃগবৎ এত অধৈর্য কেন"—এর সুর দেওয়া আছে শ্যামপুরবী। অথচ বহুকাল থেকে এই গানটি ভৈরবীতে চলে আসছে। কি করে যে এই পরিবর্তন হয়েছে তা বলা শক্ত। প্রবীণ গায়কদের মতে আগেকার খাতাপত্র থেকে নকল করবার সময় অনেক ক্ষেত্রেই নাকি ত্রুটিবশত একটা গানের সুর আর একটা গানের মাথায় উঠেছে। তা ছাড়া "শ্যামপুরবী" সুরও নেহাৎ অপ্রচলিত। এইরকম নিধুবাবুর আর একটি অতি বিখ্যাত গান—"নানান দেশের নানান ভাষা"—এর সুর দেওয়া আছে—"কামোদ খাম্বাজ" অথচ আমরা যা শুনেছি তাতে কামোদের তেমন পরিচয় পাই নি। শ্রীধর কথকের বিখ্যাত গান "তবে প্রেমে কি সুখ হত" খাম্বাজে অনেকে গান কিন্তু পিলুতেও এই গানটি প্রচলিত আছে। এ সুরটিও খুবই মিষ্টি। আবার কোন কোন গান যথাযথ প্রাচীন সুরেই গীত হয়ে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ শ্রীধর কথকের একটি গানের উল্লেখ করতে পারি—"বল দেখি বিধুমুখী আমারে কি আছে মনে"—এর সুর বাহার-বাগেশ্রী। আমরা এটি যেভাবে গাইতে শুনেছি তাতেও বাহার এবং বাগেশ্রী দুটো রাগেরই অপূর্ব মিলন ঘটেছে। এই ধরণের চমৎকার গান বড় একটা শোনা যায় না।

এই সব পুরাতন গানগুলির নতুন করে সঙ্কলন এ যুগে বিশেষ আবশ্যক হয়ে পড়েছে। যে সব সুর পাওয়া যায় তার স্বরলিপি করাও নিতান্ত প্রয়োজন। গান এবং সুরগুলির সঙ্কলন কার্য সমাধা হলে বোঝা যাবে এর মূল্য কতখানি। এ যুগে শৌখিন ব্যক্তি দুর্লভ এই কারণে শৌখিন প্রচেষ্টা এ সব দিকে হচ্ছে না। তবে ইউনিভার্সিটির শিক্ষায় সঙ্গীতকে স্বীকার করা হয়েছে। এই শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটলে এই সব গানের আবশ্যকতা উপলব্ধি হবে কেননা শিক্ষা দিতে গেলেই একটা ধারাবাহিক রীতি অবলম্বন করতে হয়। আশা আছে পাঠ্যের চাহিদা থেকেই হয়ত ভবিষ্যতে এই সব গানের কিছু সংগ্রহ প্রকাশিত হবে। এ যুগে পাঠ্য না হলে কোন বিষয়ের আলোচনা হয় না—এটা যেমন দুঃখের বিষয় তেমনি ভরসার কথাও বটে। দুঃখের বিষয় বলছি এই কারণে যে পাঠ্য বিষয় হলেই যে বিদ্যা হয় তা একান্তভাবেই মুখস্থ বিদ্যা। আর ভরসার কথা বল্লুম এই জন্য যে তবু যেভাবেই হোক কিছু আলোচনা তো হবে। তাতেও লাভ কম নয়।

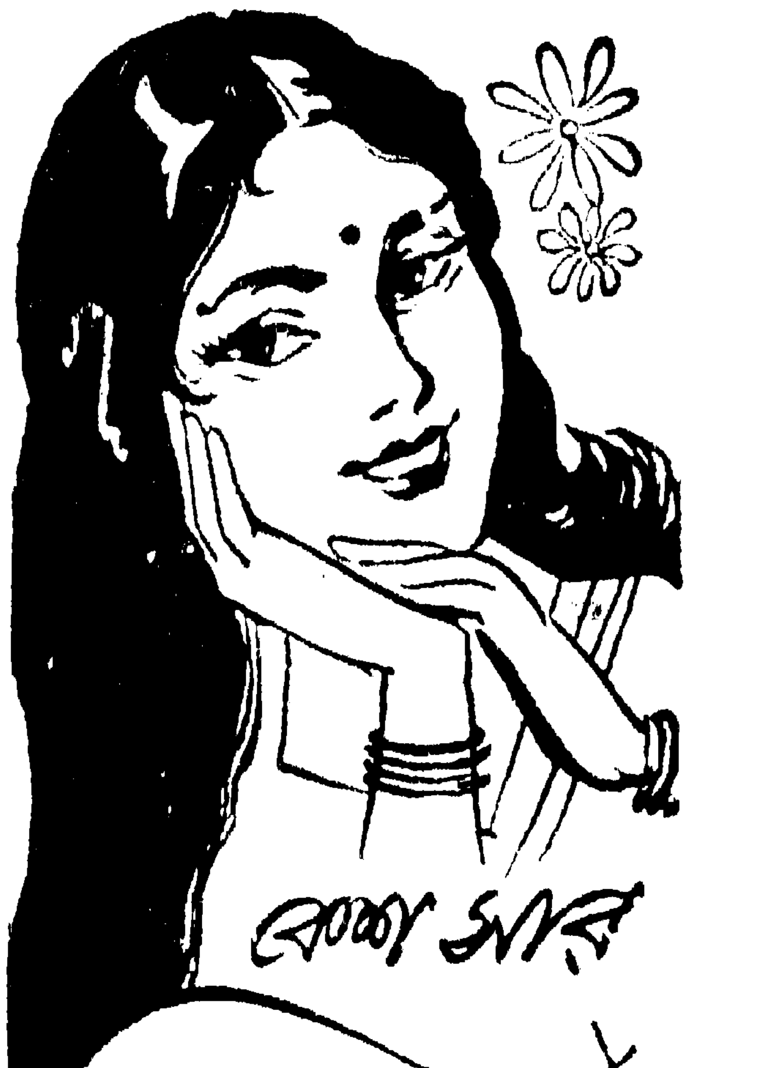
কেশ্য সার
আর্ণিকল
আর্ণিকা কেশ তৈল
আর্ণিকা, ভৃঙ্গরাজ, পাই-লোকারপাশ প্রভৃতি ভেষজ সহযোগে প্রস্তুত। অকাল পক্কতা ও পতন নিবারক এবং কেশ বর্দ্ধক।
★
মহেশ ল্যাবরেটরিজ প্রাইভেট লিঃ
৩০/৪, ক্যানেল ইষ্ট রোড, কলিকাতা-১১

সোল এজেণ্টঃ
এম, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ,
৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

কে, হোড়ের
কনক
পাউডার

মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল
আরোগ্য করিতে ২৭ বৎসর ভারত ও ইউরোপ-অভিজ্ঞ ডাঃ ডি.গোর সহিত প্রতি দিন প্রাতে ও প্রতি শনিবার ও রবিবার বৈকাল ৩টা হইতে ৭টায় সাক্ষাৎ করুন।
৩বি জনক রোড, বালীগঞ্জ কলিকাতা।
(সি ৭৮০৩)

দক্ষিণের বারান্দা

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ২ ॥

রাঁচীতে এসেছেন দাদামশায় হাওয়া বদল করতে। আমরা সবাই গেছি। ভোরবেলা প্রায় সকলের আগে উঠে দাদামশায় বেড়াতে বেরতেন। হাতে একটি লাঠি। বাড়ির বাইরে গেলেই, যেখানেই থাকুন না কেন, দাদামশার হাতে লাঠি থাকত। লাঠির একটা সংগ্রহ ছিল দাদামশার। লাঠি খুব ভালবাসতেন। চেরী কাঠের একটা ভারি সুন্দর লাঠি ছিল। বেতের লাঠি, বাঁশের লাঠি ভালো ভালো বিলিতি লাঠি, রুপো বাঁধানো, পিতল বাঁধানো, সরু, মোটা, সোজা, বাঁকা, কত-রকম লাঠিই যে ছিল। রাঁচীতে যেটা নিয়ে বেড়াতেন তার নীচে লাগানো ছিল লম্বা ছুঁচোলো একটা লোহার নাল। এই নিয়ে তিনি রাঁচীর পাহাড়ে পাথর খুঁচিয়ে বেড়াতেন।

আমি যেদিন ভোরে উঠতুম সেদিন দাদামশার সঙ্গে পাথর খুঁজতে যেতে পেতুম। সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। কোন মাঠে কি রকম পাথর পাওয়া যাবে সেটা যদিও দাদামশার মোটামুটি জানা ছিল, কিন্তু প্রায়ই চেনা জায়গা থেকে অজানা পাথর বেরিয়ে পড়ত। দাদামশার মুখে পাথরের কথা শুনতে শুনতে মনে হত পাথরেরা আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। জীবন্ত তারা সব। এ-ধারে ও-ধারে, এ-খাঁজে ও-খাঁজে সব গা-ঢাকা দিচ্ছে, তাদের খুঁজে বার করাই আমাদের খেলা। এই খেলায় দেখতুম দাদামশার অদ্ভুত চোখ। চলতে চলতে হঠাৎ খোঁচা দিতেন ধুলো-বালির মধ্যে, মাটির চাংড়ায়। ঠিকরে বেরিয়ে পড়ত চমৎকার আকৃতির নুড়ি। ঘাসের মধ্যে হয়তো চুলের মত ফাঁক, তার মধ্যে দিয়ে কি একটু দেখা যাচ্ছে। দাদামশার চোখে ঠিক পড়েছে—তাকে টেনে বার করবেনই।

আমিও পাথর খুঁজতুম। আমার চোখে পড়ত চকচকে অভ্রখণ্ড। দাদামশায় সেগুলো ছুঁতেনই না। বলতেন ওগুলো কিছু নয়। তোর এখনও চোখ হয়নি। হীরে খোঁজ, হীরে খোঁজ। খুঁজতে হয় তো হীরে! অভ্রভর নিয়ে কি করবি? হীরে মাটির উপর পড়ে চকচক করে না, হীরে লুকিয়ে থাকে মাটির তলায়—খুঁড়ে বার করতে হয়।

দাদামশার সঙ্গে আমিও হীরের স্বপ্ন দেখতুম।

নানারকম পাথর সংগ্রহ করে দাদামশায় বাড়ি ফিরতেন। বাড়ি এসেই সেগুলি জলে ধুয়ে ফেলতেন। জলে ধুলে তাদের জলুস বেরুত। কতরকম আশ্চর্য রঙিন অজানা পাথর বার হত। তার মধ্যে থাকত কিছু কাচের মতো স্বচ্ছ স্ফটিক। হীরের কাছাকাছি হলেও আসল হীরে কোনোদিন বেরত না। এরই মধ্যে দু-একটা বড় গোছের পাথর বেছে নিয়ে দাদামশায় হঠাৎ রহস্যমাখা স্বরে বলে উঠতেন—এটার ভিতরে হীরে আছে বলে মনে হচ্ছে। এটাকে ভাঙতে হবে।

আমার মনে বিদ্যুতের শিহরণ খেলে যেত।

—হাতুড়ি আন।

আমারই হাতে হাতুড়ি দিয়ে বলতেন—দে, যা দে, ঐ জায়গাটায় আস্তে আস্তে।

সুন্দর পাথরটাকে ভেঙে ফেলতে আমার হাত উঠত না।

দাদামশায় উৎসাহ দিতেন—চালা হাতুড়ি। ফস্ করে হীরে বেরিয়ে পড়তে পারে, বলা যায় না।

আমি অতি সাবধানে হাতুড়ি চালাতুম। দাদামশায় শেষে থাকতে না-পেরে নিজেই ঘা দিতেন। পাথর টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ত। কিন্তু হীরে বার হত না।

বড় হয়ে অনেককে আমি গাছের পাতা ফুল, ঝিনুক, পাখির পালক, প্রজাপতি সংগ্রহ করতে দেখেছি। কিন্তু পাথর সংগ্রহ করতে কাউকে দেখিনি।

কলকাতার বাইরে গেলেই দাদামশায় পাথর কুড়োতে বেরতেন। দেওঘরে দেখেছি, রাঁচীতে তো দেখেইছি, দার্জিলিংএ দেখেছি, কার্সিয়ংএ দেখেছি, শান্তিনিকেতনেও দেখেছি। এ এক অপূর্ব খেলা। হীরে খোঁজার নাম করে কত রকমের কত আশ্চর্য

বিহার সাহিত্য ভবনের
নতুন বই

রঞ্জনা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
বাংলা সাহিত্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন ॥

কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস। মূলতঃ মনস্তত্ত্বমূলক। এই উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্রই বলিষ্ঠ, জীবন্ত ও আশ্চর্য সংযমের প্রতীক। লিপিকুশলতা ও মননশীল চরিত্র চিত্রণে নারায়ণবাবু সিদ্ধহস্ত।

এই উপন্যাসটিতেও তাঁর পূর্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ আছে।

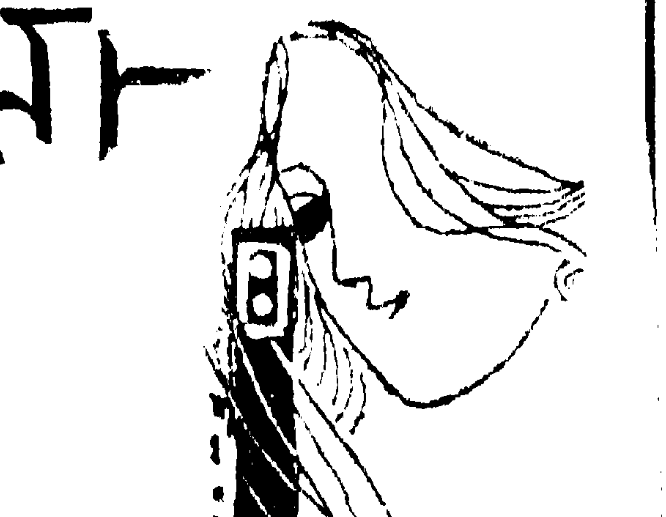

দাম—তিন টাকা

বিহার সাহিত্য ভবন প্রাঃ লিঃ, ৩৭এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

(সি ৭৬৯০)

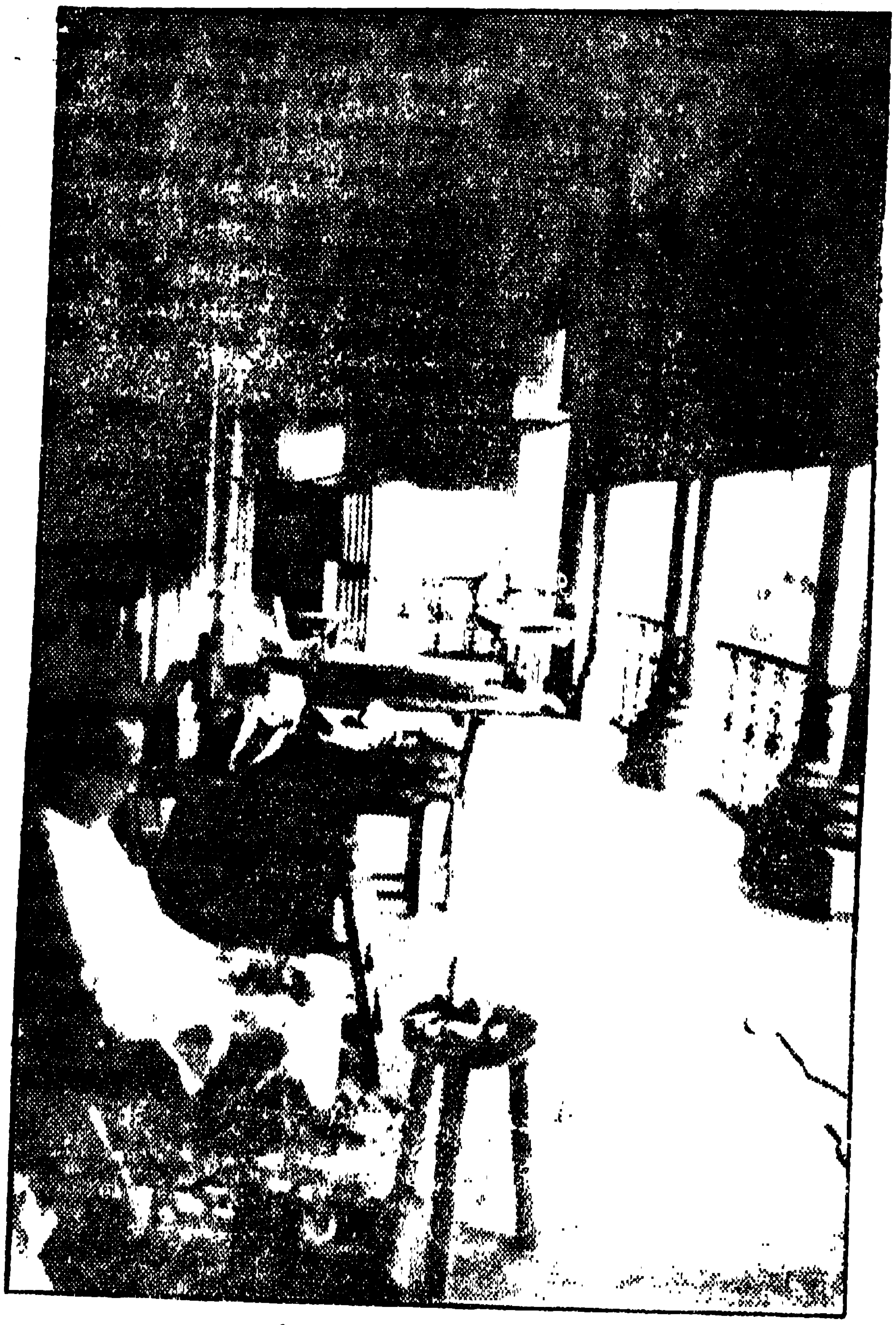

দক্ষিণের বারান্দায় অবনীন্দ্রনাথ

পাথর যোগাড় করেছিলেন তার ঠিক নেই। কলকাতায় ফিরে এসে পাথরগুলি দেখাতেন সবাইকে। বড়দাদামশায়, মেজদাদামশায়ও পরম বিস্ময়ে সেগুলি দেখতেন আর তারিফ করতেন।

দাদামশায়ের একটি মজার পাথর ছিল। দেখতে অবিকল এক টুকরো পাঁউরুটির মত। অনেককে সেই পাথর দিয়ে ঠকানো হয়েছে। প্লেটে করে হঠাৎ সামনে ধরে দিলে কেউ টের পেত না। হাতে করে তুলে মুখে দিতে গেলে ওজনে বুঝে ফেলত পাথর। তখন যা হাসির ধুম। কিছু কিছু পাথর দাদামশায় পালিশ করিয়ে নিতেন। পালিশ করালে শক্ত রুক্ষ পাথরগুলি মসৃণ হয়ে যেত। সেইগুলিই ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয়। যেমন ছিল তাদের রং, তেমনই সূক্ষ্ম স্বচ্ছ রেখাবিন্যাস, তেমনি ঠাণ্ডা স্পর্শ। আমার নিজের মনে হত হীরক-খণ্ডের চেয়ে সেগুলি অনেক বেশী দামী।

দাদামশায় তবু কিন্তু হীরেই খুঁজতেন। হীরে না-পেলে তাঁর মন উঠবে না। এই ভাবে হীরে খুঁজতে খুঁজতে তিনি একবার একটি অতি আশ্চর্য পাথর পেয়ে গিয়েছিলেন সম্পূর্ণ অভাবিত এক স্থান থেকে। সেই কথা এবার বলি।

দেওঘর কি রাঁচী ঠিক মনে নেই, সেখান থেকে কলকাতায় বাড়ি ফিরে এসে দাদামশায় একদিন সকালে তাঁর সংগৃহীত পাথরগুলি একে-একে পরীক্ষা করতে শুরু করলেন। পাথরগুলি স্তূপীকৃত করে রাখা হয়েছে লম্বা একটা কাঠের টেবিলের উপর। আমরা সবাই জড় হয়েছি। দক্ষিণের বারান্দা। দাদামশায় তাঁর শক্ত কাঠের চেয়ারে পা গুটিয়ে বসেছেন। পরনে লুঙি। ডানপাশে জার্মান সিলভার-এর মস্ত এক গামলায় এক গামলা জল। একটা তেপায়া টুলের উপর সেটা বসানো। একটা করে পাথর তুলছেন আর সেই জলে ডুবিয়ে নিচ্ছেন। বাঁ দিকের চেয়ারে মেজদাদামশায় বসে বই পড়ছেন। ডানদিকের চেয়ারে বড়দাদামশায় বসে আঁকছেন ছবি। আমরা দাদামশায়ের হাত থেকে মেজদাদার হাতে নিয়ে যাচ্ছি একবার পাথর, আর একবার বড়দাদার হাতে।

—এটাকে সন্ধ্যা বেলায় কুড়িয়েছিলাম, সর্ষে-ডোবার মতো রং ছিল। সকালে দেখি একেবারে সাদা!

—দেখি, দেখি। সন্ধেবেলায় তাহলে আর একবার দেখতে হবে।

—এটাকে পাথর বলে মনেই হয় না। যেন মখমলের টুকরো।

—হ্যাঁ, একটা পুতুল বানালে হয়। মনে হবে মখমলের কাপড় পরে আছে।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, আলো ফেলে, হাত বুলিয়ে, যত প্রকারে সম্ভব শিলাখণ্ডের রস-গ্রহণ করা হচ্ছে। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি। আমরা জানি যে আজ কতকগুলি পাথর ভাঙা হবে—তার ভিতরে কি আছে কেউ জানে না। হয়তো হীরে-ও বেরতে পারে। আমাদের প্রধান আকর্ষণ, প্রধান ঔৎসুক্য সেইখানেই।

গোল নুড়িগুলি একপাশে সরিয়ে রাখা হল। স্বচ্ছ কোয়ার্টজ-গুলিকে ঠেলে দিয়ে দাদামশায় বল্লেন—এগুলো হীরে নয়, অথচ হীরের মত দেখতে। বড্ড ঠকায়।

তারপর গোটা দুই এবড়ো-খেবড়ো গোলমত পাথর নিয়ে বল্লেন—এগুলোকে ছেনি দিয়ে সাবধানে ভাঙতে হবে। কি বেরোয় দেখা যাক।

একটা পাথর আমার হাতে তুলে দিয়ে বল্লেন—দেখছিস্ কত হালকা! ভিতরটা ফাঁপা। এরই মধ্যে সারি-সারি হীরে বসানো থাকে।

এবার পূজায় বাংলার শিশু ও কিশোর সাহিত্যের দু'খানা নতুন সম্পদ

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
রূপকুমারের রূপকথা
দাম দুই টাকা

চিত্তরঞ্জন সুরের
জাম্পিং বনাম বাম্পিং
দাম দেড় টাকা

আনন্দের দিনে ছোটদের উপহার দেবার
মত এমন সুন্দর বই বাজারে খুব কমই আছে

পরিবেশক :- রবীন্দ্র লাইব্রেরী • ১৫/২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

হাতুড়ি আর ছেনিটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্লেন—ভাঙ তুই!

আমার তখন বুক দুর-দুর করতে আরম্ভ করেছে। কি করে খুলব আমি এ কপাট? সরে গিয়ে বল্লুম—আমি পারব না।

তখন দাদামশায় নিজেই কোলে একটা ঝাড়ন তাল পাকিয়ে রেখে তার উপর পাথরটাকে বসিয়ে ছেনি চালাতে শুরু করলেন। আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখতে লাগলুম। বড়দাদামশায় চীনে কালি দিয়ে কালোয় সাদায় যে ছবি আঁকছিলেন তা বন্ধ করলেন। মেজদাদামশায় তাঁর বই।

ছেনি ঠুকতে ঠুকতে হঠাৎ পাথরের গায়ে ফাটল ধরল। আমরা ঝুঁকে পড়লুম। তারপর ফুস্ করে যেন একটা জোড় খুলে গেল।

আমরা পরম বিস্ময়ে দেখলুম—পাথরের ভিতরটা সত্যি ফাঁপা আর তার গায়ে পরতে-পরতে সাজানো অপূর্ব নীলাভ স্বচ্ছ মিছরির দানার মতো সব দানা!

চেঁচিয়ে উঠলুম—হীরে!

সেই মুহূর্তে আমাদের স্থির বিশ্বাস হয়েছিল আমাদের চোখের সামনে এতদিনের সাধনার ধন এক হীরকের খনি জলজ্বল করছে।

দাদামশায় খানিক চুপ করে রইলেন, তারপর বল্লেন—এগুলো আসল হীরে নয়। একে বলে পাহাড়ের দাঁত।

হায়, হায় এই যদি আসল হীরে না হয়, তবে আসল হীরে কি? আমাদের মনের তখন যা অবস্থা।

দাদামশায় তৎক্ষণে আর একটা সেইরকম পাথর নিয়ে ভাঙতে শুরু করে দিয়েছেন। এটা আগেরটার চেয়ে শক্ত। দমাদ্দম ঘা পড়ছে কিন্তু কিছুতেই ভাঙতে চাইছে না। তারপর হঠাৎ এক সময় চার টুকরো হয়ে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল পাথরটা। একটি টুকরো ছিটকে গিয়ে পড়ল বারান্দার রেলিং-এর ধারে।

—ওরে দেখ্ দেখ্। হীরে পালালো, হীরে পালালো।—দাদামশায় চেঁচিয়ে উঠলেন। আমরা হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পাথরের টুকরোটাকে কুড়োলুম।

এ পাথরটারও ভিতরে ফাঁপা আর তার গায়ে গায়ে মিছরির দানার মত সারি সারি দানা। জোরে ঘা লাগার ফলে কয়েকটা দানা ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছিল। মেঝে থেকে দানাগুলি আমরা কুড়োলুম। দাদামশায় খুঁত খুঁত করতে লাগলেন—ভালো করে দেখ্, হীরে-টিরে খসে পড়ল কি না।

শীঘ্রই বেরুবে। সুকৃতি রায়চৌধুরীর

তপোময় তুষারতীর্থ

অভিনব আঙ্গিকে কেদারবদরী ভ্রমণপথের গান। ১২টি চিত্রশোভিত। ভূমিকা লিখেছেন শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। মূল্য—৪।।০। দি বুক হাউস, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

(সি ৭৬৩৬)

কে, হোড়ের
কণক
* পাউডার *

বিদ্যোদয়ের বই

অলিম্পিকের বছরে প্রকাশিত হচ্ছে

অলিম্পিকের ইতিকথা — শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত

শতাধিক আর্ট-প্লেট ও ঈষদূন সাত শত পৃষ্ঠা সম্বলিত, সুপ্রাচীন আদিকাল থেকে অত্যাধুনিক যুগ পর্যন্ত অলিম্পিকের তথ্যসমৃদ্ধ পূর্ণাঙ্গ ইতিকথা। এই মহাগ্রন্থখানি সুদীর্ঘ সাত বৎসরের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল। এ সময়ের মধ্যে লেখক আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি ও বিভিন্ন দেশের অলিম্পিক কমিটি; অটো মায়ার, কার্ল ডায়েম প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত অলিম্পিক-বিশেষজ্ঞগণ; এমিল জেটোপেক, বব ম্যাথিয়াস প্রমুখ অলিম্পিকখ্যাত বহু ক্রীড়াবিদ প্রভৃতির সাহায্য, পরামর্শ ও উপদেশ এবং অলিম্পিক সম্বন্ধে অজস্র গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা থেকে তথ্য আহরণ করেছেন। কেবল তাই নয়, ইতিমধ্যে লেখক তাঁদের নিকট গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ মুদ্রণের সাথে সাথে পাঠিয়েছেন। তারা গ্রন্থখানি লেখায় এই তরুণ ক্রীড়া-বিশেষজ্ঞের অদম্য নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। প্রখ্যাত অলিম্পিক ও ক্রীড়া-বিশেষজ্ঞ পঙ্কজ গুপ্ত বলেছেন,

"..This book will go a long way in keeping aflame the Olympic movement in the heart of every sportsman and lover of games and sports. I wonder how a young man of Sri Shantiranjan Sen Gupta's age could write single-handed a voluminous book like **Olympiker Itikatha** packed with facts, figures and records...."

গ্রন্থখানির অন্যতম আকর্ষণ বিশ্ববিখ্যাত অলিম্পিক-বিশেষজ্ঞ ও ক্রীড়াবিদগণের অটোগ্রাফের যথাযথ প্রতিলিপি-মুদ্রণ। এ জাতীয় গ্রন্থ আজ পর্যন্ত পৃথিবীর আর কোন ভাষায় প্রকাশিত হয়নি। মূল্য ঃ ২২·৫০ ॥

চিত্রদর্শন — কানাই সামন্ত

এই বিরাট গ্রন্থখানি সম্পর্কে **যুগান্তর সম্পাদকীয়তে** যে সুদীর্ঘ আলোচনা বেরিয়েছিল, তার থেকে দু-একটি জায়গা উদ্ধৃত হল, "......তাহার (লেখকের) বিষয়-সমাবেশ ও আলোচনার সামগ্রিকতা, প্রামাণিকতা এবং প্রাঞ্জল লিপিকুশলতা কাহারো নজর এড়াইবে না। ...ঈষদূন অর্ধ-শত পূর্ণ-পৃষ্ঠা এক-রঙা ও বহু-রঙা ছবি বইটিকে এমন এক অমূল্য চিত্রশালার রূপ দিয়াছে, যাহার পাশে দাঁড় করাইবার মতো দ্বিতীয় কোন বাংলা বইয়ের কথা অতি পড়ুয়ারও সহসা মনে পড়িবে না। ভারতীয় চিত্রকলার রূপ-দর্শনের এবং আধুনিক শিল্প-শৈলীর অগ্রযাত্রায় বাংলার দান কী ও কতটা, তাহার পথ-নির্দেশক হিসাবে এই সুন্দর বইটিকে আমরা সাদর স্বাগত জানাইতেছি।" মূল্য ॥ ২৫·০০ ॥

মানব-বিকাশের ধারা — প্রফুল্ল চক্রবর্তী

সুলেখক **নন্দগোপাল সেনগুপ্ত** যুগান্তরে বলেছেন, "...নৃ-প্রত্ন-সমাজতত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ বই বোধহয় এই প্রথম এবং প্রথম বলেই প্রাথমিক স্তরের রচনা এটি নয়। যথেষ্ট অন্তর্দৃষ্টি, পাণ্ডিত্য ও বিচারশক্তির সঞ্চয় নিয়ে লেখক কলম ধরেছেন এবং দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট আকর-গ্রন্থগুলি অনুশীলনের সঙ্গেই তাঁর নিজস্ব কিছু পর্যবেক্ষণও আছে, যা আলোচনায় প্রাণ সঞ্চার করেছে।...From Savagery To Civilization, How Life Came Into Being, How Man Conquered Nature প্রভৃতি ইংরেজী বইয়ের মাধ্যমে যাঁরা বিষয়টির সঙ্গে পরিচিতি অর্জন করেছেন, তাঁদের পক্ষে নূতন কথা এতে ঢের আছে। ফ্রেজার ডিলথাই ম্যালিনোস্কী মরগ্যানের পড়ুয়ারাও অনুপকৃত হবেন না বইটি পড়লে।..." মূল্য ঃ ১২·০০ ॥

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯

শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনায় সমৃদ্ধ ও অপূর্ব চিত্র-সজ্জায় সুশোভিত হয়ে
মহালয়ার আগে প্রকাশিত হবে শারদীয়া সংখ্যা
জলসা
দাম তিন টাকা
উপন্যাস লিখছেন
সুবোধ ঘোষ
রমাপদ চৌধুরী
সমরেশ বসু
গল্প ও অন্যান্য রচনা
বনফুল মুজতবা আলী
শংকর সাগরময় ঘোষ
শচীন ভৌমিক প্রভৃতি

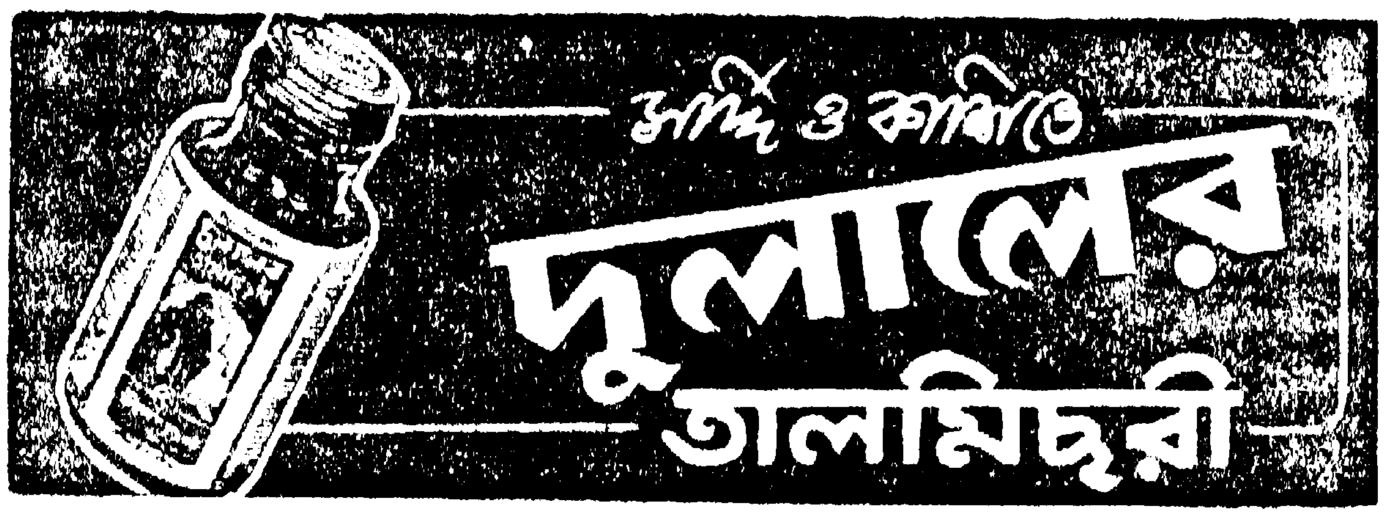

প্রস্তুতকারক— দুলাল চন্দ্র ভড়

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন!
যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দুর করতে পারে একমাত্র
বাকলা
বহু গাছগাছড়া দ্বারা বিশুদ্ধ মতে প্রস্তুত
ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন
ভারত গভঃ রেজিঃ নং ১৬৮৩৪৪
অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা,
মুখে টকভাব, ঢেকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দাগ্নি, বুকজ্বালা, আহারে অরুচি, স্বল্পনিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ন নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যাঁরা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও বাকলা সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিফলে মূল্য ফেরৎ।
৩২ তোলার প্রতি কৌটা ৩৲ টাকা, একত্রে ৩ কৌটা — ৮৷৷৹ আনা। ডাঃ, মাঃ, ও পাইকারী দর পৃথক।
দি বাকলা ঔষধালয়। হেড অফিস- বরিশাল (পূর্ব্ব পাকিস্তান)

হীরে না পেয়ে দাদামশায় মন খারাপ হয়ে গেল। নিজে উঠে একবার খুঁজে দেখলেন কোথাও কিছু পড়ে-টড়ে আছে কি না। তারপর পাথরগুলোকে গুছিয়ে তুলে রেখে দিলেন।

পরদিন ভোরে উঠে দাদামশায় বাগানে বেড়াচ্ছিলেন। জোড়াসাঁকো বাড়ির বাগান হলে হবে কি, রাঁচীর অভ্যেস তখনও যায়নি। বাগানেই পাথর খুঁজছেন। বার বার ঘুরে ঘুরে আসছেন বারান্দার নীচের সেই জায়গাটায়—যদি কালকের পাথরের টুকরো দু-একটা পান। হীরেও তো থাকতে পারে! আমার একটি মাসতুতো বোন—ছোট একটি খুকী—বারান্দার নীচের ঠিক সেই জায়গাতেই সিঁড়ির ধারে ঘুরঘুর করছিল। দাদামশায় দেখতে পেলেন সে মাটি থেকে কি একটা চকচকে জিনিস তুলে একবার দেখেই টপ্ করে মুখে পুরেল।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে দাদামশায় বললেন—দেখি কি খেলি, মাটি থেকে কুড়িয়ে!

মেয়েটি মুখ হাঁ করতে দেখা গেল ছোট্ট একটি কাঁচের টুকরোর মতো কি যেন।

—বের কর শিগ্‌গীর!

মুখ থেকে জিনিসটা বেরতে দেখেন—এতটুকু তেঁতুল বীচির মতো অদ্ভুত একটি পাথর। বাদামী তার রং। আলোর দিকে ধরলে স্বচ্ছ দেখায়। আর সব চেয়ে অবাক কাণ্ড, তার ঠিক মাঝখানে একটি মৌমাছি জমে পাথর হয়ে রয়েছে।

—নিশ্চয় ব্যাগ থেকে খসে পড়েছে। কাল থেকে কেবলই মনে হচ্ছে কথাটা! এই বলতে বলতে সেটিকে হাতের মুঠোয় করে উপরের বারান্দায় উঠে এলেন। তারপর আমাদের সবাইকে ডেকে দেখালেন। প্রস্তরীভূত সেই নিখুঁত পতঙ্গ কোথা থেকে এ জোড়াসাঁকোর বাগানে এল তা কেউ বলতে পারলে না। আমরা ছোটরা চমৎকৃত হলুম।

দাদামশায়-ই আনা পাথরের টুকরো থেকে জিনিসটা ভেঙে পড়েছিল না আর কোথাও থেকে এসেছিল—এ রহস্যের সমাধান কোনোদিন হয়নি।

দাদামশায় সেই অপূর্ব পাথরটি বাঁধিয়ে আংটি করিয়েছিলেন। প্রায়ই পরতেন। অনেকেই তাঁর হাতে সে আংটি দেখেছেন। সে আংটি আজও সযত্নে রক্ষিত আছে বড়মামার কাছে।

দাদামশায় বলতেন—হীরে পাওয়া আমার ভাগ্যে আর হল না। কিন্তু এ যা পেলুম, তা-ও বড় কম নয়।

আর বলতেন—

যেখানে দেখিবে ছাই,
উড়াইয়া দেখ ভাই,
পেলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন!

(ক্রমশঃ)

সুরেশ অধিকারী

তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা খবরের কাগজ কিনেই গাড়িতে উঠলাম। ট্রেন ছাড়তে কাগজটা মেলে বসলাম। শিরোনামা কয়েকটাতে সবে চোখ বুলিয়েছি, পাশ থেকে অনুরোধ এল 'মাঝের পাতাটা দয়া করে একটু দেবেন দাদা।'

এ নতুন নয়। ট্রেনে কাগজ ছড়িয়ে বসলে এ রকম অনুরোধ অনবরতই আসে। রাগ হয়, কিন্তু না দিয়ে পারা যায় না। এখনও রাগ হল, তা বলে না বলতে পারলাম না। মাঝ থেকে একটা পাতা দিতেই হল।

'ধন্যবাদ।' বললেন ভদ্রলোক। না বললেও ক্ষতি ছিল না।

তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। ট্রেনের শব্দ, যাত্রীদের হল্লা।

'ম্যাচিস হবে, দাদা?'

কাগজ থেকে মুখ সরিয়ে তাকালাম ভদ্রলোকের দিকে। দেখবার কিছু নেই চেহারাতে। দেশলাইটা দিলাম। কালো রং ভদ্রলোকের, গাঁট্টাগোট্টা।

'এ বছর শীতটা বেশ পড়েছে, না?'

'হ্যাঁ'।

'গরমটাও আসছে বছর খুব পড়বে, কি বলেন?'

বলতেই হবে কিছু। না বলাটা অভদ্রতা। বললাম, 'তাই মনে হচ্ছে।' এরপর আর কোন কথা বলতে পারেন, তাই ভাবলাম। ভাবনাকে ভড়কে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আমার নাম সুরেশ অধিকারী।'

নাম শুনে বললাম, 'বেশ, বেশ।'

'আপনার নামটা জানতে পারি কি?'

'নিশ্চই।' বললাম নাম।

একটা স্টেশন এল। চা ডাকলাম। এক কাপ কিনলাম।

'এখানের শুনেছি নাকি চমৎকার চা। খাব নাকি এক কাপ? এরপর আর এক কাপ না এনে উপায় কি। কয়েকটা চুমুক দিলেন সুরেশ অধিকারী। 'বেড়ে করেছে, কি বলেন?'

'হুঁ'।

তারপর পানের ডিবেটা বার করতে, হাত বাড়ালেন আবার। 'দেবেন নাকি একটু দাদা?'

দিলাম। চিবোলেন কিছুক্ষণ।

সিগারেটের প্যাকেটটা বার করলাম। পানের সঙ্গে সিগারেট জমবে ভালো।

'কি সিগারেট দাদা?'

সুরেশ অধিকারীকে সিগারেটও দিতে হল। সিগারেট টেনে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লেন তিনি।

'ট্রেনে একেবারে স্পীড নেই। দেখেছেন?'

'হুঁ'।

'ওয়ার এবার লাগবে বোধ হয়। কি বলেন?'

'হুঁ'।

বালিশটা পেছনে ঠেলে গড়াবার চেষ্টা করলাম একটু।

'আপনার একটা এক্সট্রা বালিস আছে দেখছি।'

আবার সুরেশ অধিকারীকে দিতে হল।

BUY THE BEST
HIGHLY APPRECIATED
SAMSAD ANGLO-BENGALI DICTIONARY
1672 PAGES • Rs. 10·50 n.P.
SAHITYA SAMSAD
32 A, ACHARYA PRAFULLA CH. RD. • CAL-9

শারদীয়া
সচিত্র ভারত
প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও কার্টুনিস্টদের শ্রেষ্ঠতম অবদানে শোভিত হয়ে মহালয়ার পূর্বে বের হচ্ছে।
মূল্য প্রতি সংখ্যা—১·৭৫ নঃ পঃ
•
এজেণ্টগণ অবিলম্বে অর্ডার পেশ না করলে চাহিদা মেটান সম্ভব হবে না।
•
—কার্যালয়—
৮৬নং ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩
(সি ৭৬৮৩)

গন্ধর্ব
৭ম সংখ্যা
মহালয়ায় প্রকাশিত হচ্ছে
নাট্য আন্দোলনের একমাত্র ত্রৈমাসিক মুখপত্র। একাধিক নাটক ও বহু মূল্যবান প্রবন্ধ পত্রস্থ হবে।
মূল্য: এক টাকা।
স্থানীয় পরিবেশক : পারিজাত ব্রাদার্স
গন্ধর্ব ॥ ১৩৩/১এ, আচার্য প্রফুল্ল রোড/৬
(সি ৭৬৯৭)

একটু গড়াবার পর নড়ে উঠলেন তিনি।

'আপনি তেমন সিগারেট খোর নন মনে হচ্ছে।'

'না, তা নয়। এই মাঝে মাঝে।' বললাম।

'আমার কিন্তু ঘণ্টায় ঘণ্টায় না হলে চলে না। বড় বদ অভ্যেস।'

বিরক্ত হয়ে আরও একটা সিগারেট ছাড়তে হল।

খিদে পেয়েছে। খাবারের হাঁড়িটা বার করলাম।

'খাবার বার করলেন?'

আমি যেন বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিলাম। দোষ কপালের গড়ায়, কোথায় গিয়ে ঠেকে। ভাগ দিতে হল।

খাওয়া শেষ হল। আমার খাবার খেয়ে আরামের 'আঃ' করলেন তিনি, অথচ 'আঃ' করা উচিত ছিল আমার। নিজের খাবার খেয়ে আমি আরামের 'আঃ'-ও পেলাম না।

'আপনার প্যাকেটটা ফুরোলো নাকি?'

এক রকম হাত বাড়িয়ে বালিশের পাশ থেকেই কুড়িয়ে নিলেন প্যাকেটটা। একটা সিগারেট নিজে ঠোঁটে চাপলেন, আর একটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

আমার পয়সায় কেনা সিগারেট। আর আমাকেই বিলোচ্ছেন সুরেশ অধিকারী। নিলাম।

খাওয়ার পর শোবার পালা। লোকে খেয়ে পেলে শুতে চায়। আগে আমার বালিশটা চেয়ে নিয়েছিলেন, অতএব তিনি দিব্যি শুয়ে পড়লেন। এবং শোবার কিছু পরেই ঘুমিয়ে পড়ে নির্ভাবনায় নাক ডাকতে লাগলেন। গড়াবার জায়গা আমার নেই। যেটুকু ছিল তা সুরেশ অধিকারী দখল করেছেন বিনা দ্বিধায় এবং আপাতত আরামে নাক ডাকছেন। সুতরাং অর্ধ শয়নে রইলাম আমি। বসে বসে দেখতে লাগলাম সুরেশ অধিকারীকেই। যতই দেখছি, ততই অবাক লাগছে। এবং তিনি আমায় সাংঘাতিকভাবে আপন করছেন।

বই নিয়ে বসলাম একটা। সময় কাটাবার জন্যে।

ঘণ্টা দুয়েক পরে ঘুম ভাঙল ভদ্রলোকের। হাই তুললেন গোটা কয়েক। চোখ রগড়ালেন বার কয়েক। বললেন, 'বেশ ঘুম হল।' তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কি বই ওটা?'

দিতে হল।

'বেশ বই তো। এই সব ডিটেকটিভ বই-ই তো ট্রেন জার্নিতে ভাল লাগে।'

তারপরেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে ডিটেকটিভ বইতে মজলেন।

এই অকূল পাথারে শেষ সম্বল ছিল বইটা। সর্বভুক ক্ষুধার তাও রেহাই পেল না।

এমন সহযাত্রী সঙ্গে করে যাত্রা, আর মহাপ্রস্থানের যাত্রা একই কথা। আর কিছুক্ষণ ওঁকে সঙ্গে থাকতে দিলে যে সর্বস্বান্ত হতে হবে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

তাই রেহাই পাবার জন্যে জিজ্ঞেস করলাম, 'কতদূরে যাচ্ছেন আপনি, তা তো জানা হল না।'

'বলিনি বুঝি?' তাকালেন তিনি। তারপর বললেন কোথায় নামবেন।

গন্তব্য স্থানের নাম শুনে আশ্বস্ত হলাম। আমার অনেক আগেই তিনি নামবেন। এবং তাঁর নামার স্টেশন আসতে আর বেশী দেরি নেই। তবু তাঁর যাত্রাপথ মন্দ দূর নয়। তাই জিজ্ঞেস করলাম, 'এতদূর যাচ্ছেন, সঙ্গে কিছুই নেননি?'

'কি হবে।' মৃদু হাসলেন তিনি। 'ট্রেন জার্নিতে লটবহর যত বাড়াবেন, ততই ঝঞ্ঝাট বাড়বে। কি বলেন?'

'তা বটে।' বললাম। 'কিন্তু তা বলে একেবারেই কিছু নয়?'

'কি দরকার।' আবার হাসলেন। 'কেউ না কেউ বেশী জিনিস সঙ্গে আনেনই। ট্রেনে তো আজ চড়ছি না মশাই, ট্রেনে চড়ে চড়ে পায়ে চড়া পড়ে গেল।'

'তা বটে।' আবার বললাম। এবার আর ঘাড় নাড়বার চেষ্টা করলাম না, ঘাড় আপনা থেকেই নড়ে গেল।

তবু সাহস ভরে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেউ যদি তার বাড়তি জিনিস আপনাকে ব্যবহার করতে না দেয়?'

আবার হাসলেন তিনি। 'কেন দেবে না? কিছু সঙ্গে নেই দেখে সকলেই দেয়। আর না দিলে—'

'না দিলে কি?'

'কেড়ে নিতে কতক্ষণ।' বললেন তিনি নির্বিকার ভাবে।

সাংঘাতিক লোক। চেহারায় জলুস না থাক, জোর দিব্যি আছে। পালোয়ানের মত শরীর। কাড়তে তো পারেই, মারতেও পারে সচ্ছন্দে। অতি সাংঘাতিক লোক যে সুরেশ অধিকারী তাতে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই, বরং যতই সময় যাচ্ছে, নিঃসন্দেহ হচ্ছি। একবার ভাবলাম, পরের স্টেশনে অন্য কামরায় পালাই। সাহস হল না। তাতে সন্দেহই বাড়বে সুরেশ অধিকারীর এবং কে জানে হঠাৎ হয়ত সংহার মূর্তিই ধারণ করবেন। তার চেয়ে আর কয়েক ঘণ্টাই তো। কোন রকমে কাটিয়ে দেয়া যাবে।

পরের স্টেশনে কানের কাছে চায়ের ডাক।

'হোক না একটু।'

ডাকলাম। খাওয়ালাম। যাকগে। আর কটা স্টেশনই বা। আর কত সর্বস্বান্ত করবেই বা সুরেশ অধিকারী।

'পানের ডিবেটা দিন।' যেন ডিবের অধিকারী তিনিই, আমি নেহাত রক্ষক। এক

সংগে গোটা তিনেক পান পুরলেন মুখে। যাবার আগে যত লুঠতে পারেন।

'সিগারেটের প্যাকেটটা কই?'

এগিয়ে দিলাম। একটা ধরালেন। একটা পকেটে পুরলেন। হেসে বললেন, 'আপনি ত প্রায় নন-স্মোকার, আমি হেভী খাই, বাড়ি গিয়ে আরামে টানা যাবে, কি বলেন?'

কি আর বলব? একটু বাদেই নামবেন। যত হাতড়াতে পারেন। হাতড়ে নিন। এত করেছি, আর কিছুক্ষণ না হয় সহ্য করলাম।

এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লেন এর পর।

'ট্রেনে বহু লোকের সংগে আলাপ হয়েছে, কিন্তু সত্যি বলছি, আপনার মত এমন অমায়িক লোক খুব কম দেখেছি।' তিনি বললেন।

নিজের প্রশংসায় জীবনে এই প্রথম লজ্জা পেলাম না। তবু হাসলাম। না হেসে উপায় নেই! আর তা ছাড়া পরের স্টেশনেই যখন তিনি নেমে যাচ্ছেন, শেষবারের মত না হয় একটু লজ্জার হাসি হাসলামই।

পরের স্টেশনে সত্যিসত্যিই নামলেন সুরেশ অধিকারী। সংগে লটবহরের যখন লেশমাত্র নেই, নামবার তাড়াহুড়োও নেই সুতরাং।

ভরসা করতে পারি না পুরোপুরি, তাই জানলায় মাথা গলিয়ে দেখলাম। না সত্যি সত্যিই চলে যাচ্ছেন তিনি।

ট্রেনে উঠে এই প্রথম আরামের নিশ্বাস ফেললাম। সুরেশ অধিকারী নেই, অতএব অনন্ত শান্তি বইকি। আরামের নিশ্বাস গোটা কয়েক ফেলেছি, এমন সময় হঠাৎ প্লাটফর্মে জানলার সামনে—

হ্যাঁ সুরেশ অধিকারীই। আঁতকে উঠলাম। এতক্ষণ ভদ্রলোক সংগে থাকতে এমন ভয় তো একবারও পাইনি, জীবনেও কখনো এমন ভয় পেয়েছি কিনা সন্দেহ। হঠাৎ কি ভদ্রলোক মত বদলেছেন? তিনি কি শেষ পর্যন্ত আমার সংগে যাবেন? কিম্বা ভয়ংকর এই ভদ্রলোকের ভয়াবহ কিছু মতলব আছে?

'খানিক গিয়েই মনে পড়ল'—বললেন সুরেশ অধিকারী, 'পকেটে হাত ঢুকিয়েই দেখি হাতে ঠেকল। যত ছোটো তুচ্ছ জিনিসই হক, সুরেশ অধিকারীকে কেউ বদনাম দিতে পারবে না কোনদিন। তাই দৌড়তে দৌড়তে এসেছি মশাই! ভাগ্যিস ট্রেন ছেড়ে দেয়নি।'

সত্যিই হাঁপাচ্ছিলেন ভদ্রলোক। জিজ্ঞেস করলাম 'কিসের কথা বলছেন?'

'আপনার দেশলাইটা ভুলে পকেটে ফেলেছিলাম।'

আমার দেশলাই-ই বটে। ফেরত দেবার জন্যে ছুটতে ছুটতে এসেছেন। কার সাধ্য বদনাম করে সুরেশ অধিকারীর?

ট্রেন ছেড়ে গেলে আমার বিশেষ ক্ষতি হত না। ভুলেই গিয়েছিলাম দেশলাইটার কথা। দেশলাই তো রোজ কত ভাবে কত হারায়। আর মনে থাকলেও, সাংঘাতিক সহযাত্রী সুরেশ অধিকারীর হাত থেকে রেহাই পাবার আনন্দে দেশলাই কেন সুটকেসটাও ভদ্রলোকের সংগে চলে গেলে সহ্য করে থাকতাম। কিন্তু ট্রেন ছেড়ে চলে গেলে কি সুরেশ অধিকারীর আপসোসের অন্ত থাকতো?

যষ্টি-মধু

ভঙ্গ বঙ্গের রঙ্গ ব্যঙ্গের মাসিক পত্রিকা

সম্পাদনা ঃ **কুমারেশ ঘোষ**

বহু রঙ্গ-রচনায় ও ব্যঙ্গচিত্রে সুশোভিত পূজা সংখ্যা বার হচ্ছে। ২·০০

৪৫এ, গড়পার রোড, কলিকাতা-৯

চিন্‌কোর নূতন বই

রবির আলো

এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে রবীন্দ্র মহাজীবনের কথা

মূল্য ঃ ৩৲

লিখেছেন—
মণি বাগচী

•

নতুন আঙ্গিকে লেখা আবিষ্কারের বিচিত্র কাহিনী

॥ ছোটদের কাড়াকাড়ি করে পড়বার মত বই ॥

পায়ে পায়ে এত দূর

মূল্য ঃ ২৲

লিখেছেন—
জ্যোতিভূষণ চাকী

প্রাপ্তিস্থান ঃ

অশোক বুক সেণ্টার

১৬৭ এন, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-১৯

—বুকল্যাণ্ডের বই—

প্রকাশিত হোল

শঙ্করীপ্রসাদ বসুর

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি

প্রায় ছশো পৃষ্ঠার এই বিশাল গ্রন্থে বাঙালীর ভাবসাধনার আদি কবি চণ্ডীদাস এবং প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি বিদ্যাপতির কাব্যসাধনার বিস্তারিত পরিচয় মিলবে। চণ্ডীদাস সর্বাংশগতভাবে আধ্যাত্মিক কবি এবং বিদ্যাপতি মধ্যযুগের ভারতসাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় প্রেমকবি,—এই হোল লেখকের মূল বক্তব্য। এই গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ঃ চণ্ডীদাস, বিশেষ করে বিদ্যাপতির আলংকারিক চিত্রসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, যে ধরনের রসাশ্রিত বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ বৈষ্ণব কবি তো দূরের কথা, অপর কোনো বাঙালী কবি সম্বন্ধে অদ্যাবধি করা হয়েছে কি না সন্দেহ। ভাষার চমৎকারিত্বে, চিন্তার নবত্বে, এবং বিশ্লেষণের বিচারকসুলভ নির্লিপ্ততায় এই গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজনরূপে পরিগণিত হবার দাবী রাখে। মূল্য ১২·৫০

সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের

কালিদাসের কাব্যে ফুল

৫·০০

"কালিদাসের কাব্যে ফুল সম্প্রতি প্রকাশিত এমন একটি গ্রন্থ যা আপন স্বকীয়তায় বাংলা সাহিত্যের আসরে একটি বিশিষ্ট স্থানের দাবী রাখে। ভারতবর্ষের কোন ফুল মহাকবি কালিদাসের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে কেমনভাবে স্থান পেয়েছে এবং তারা মহাকবির মানসলোকের ঐশ্বর্য কেমনভাবে রূপে রসে সঞ্জীবিত করে তুলেছে, তারই একটি অনুপম সার্থক বর্ণনা পাওয়া যায় এই গ্রন্থটিতে। গ্রন্থকার শুধু মহাকবির কাব্য থেকে ফুলগুলি চয়ন করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি মালার আকারে তাদের গ্রথিত করেছেন মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলির বাংলা অনুবাদের সাহায্যে। অনূদিত চরণগুলি সার্থক ও রসোত্তীর্ণ হয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে গ্রন্থকারের এই প্রয়াসকে এক সুপরিকল্পিত নিখুঁত শিল্পকর্মের সঙ্গেই তুলনা করা চলতে পারে......।"

—যুগান্তর

গোপালদাস চৌধুরী ও প্রিয়রঞ্জন সেন সম্পাদিত

প্রবাদ-বচন ৬·০০

"সকল ভাষাতেই প্রবাদ-বচন আছে যা শুনতে ভাল, বলতে সরস। আমাদের বাংলাদেশে প্রাচীন বিখ্যাত কবিদের লেখার অংশ লোকের মুখে মুখে প্রবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে।......প্রবাদ-বচন বাংলা প্রবাদের এক বিশিষ্ট গ্রন্থ।" —আনন্দবাজার

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড

১ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬

গ্রাম—বাণীবিহার ফোন—৩৪-৫০৩৮

অম্লান সৌন্দর্যের উপচার...

পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম ও ফেস পাউডার

প্রথমে হালকা তুষারের মতো পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম মাখুন...যাতে আপনার মুখত্বকের কমনীয়তা রক্ষা পায়...মুখখানি কোমল, সুন্দর ও লাবণ্যে উজ্জ্বল থাকে...ছোটখাটো কাটা ও দাগ ঢাকা পড়ে। এই ক্রীম চটচটে নয়, কিন্তু এর ওপর পাউডার ধরে চমৎকার!

তার পর মাখুন পাতলা ক'রে পণ্ডস ফেস পাউডার যা রেশমী কোমল উজ্জ্বলতা নিয়ে আপনার মুখশ্রীর সঙ্গে মিশে থাকবে।

সব সময় উপরের এই সহজ নিয়মটি মেনে চলুন...তাহলে আপনাকে সারাক্ষণ সুন্দর দেখাবে...আপনার সৌন্দর্য মন কেড়ে নেবে!

সারা পৃথিবীর
সুন্দরী রমণীদের
মনের মতো

চীজব্রো-পণ্ডস ইনক
(সীমাবদ্ধ দায়িত্বের সঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

JWTP. 72

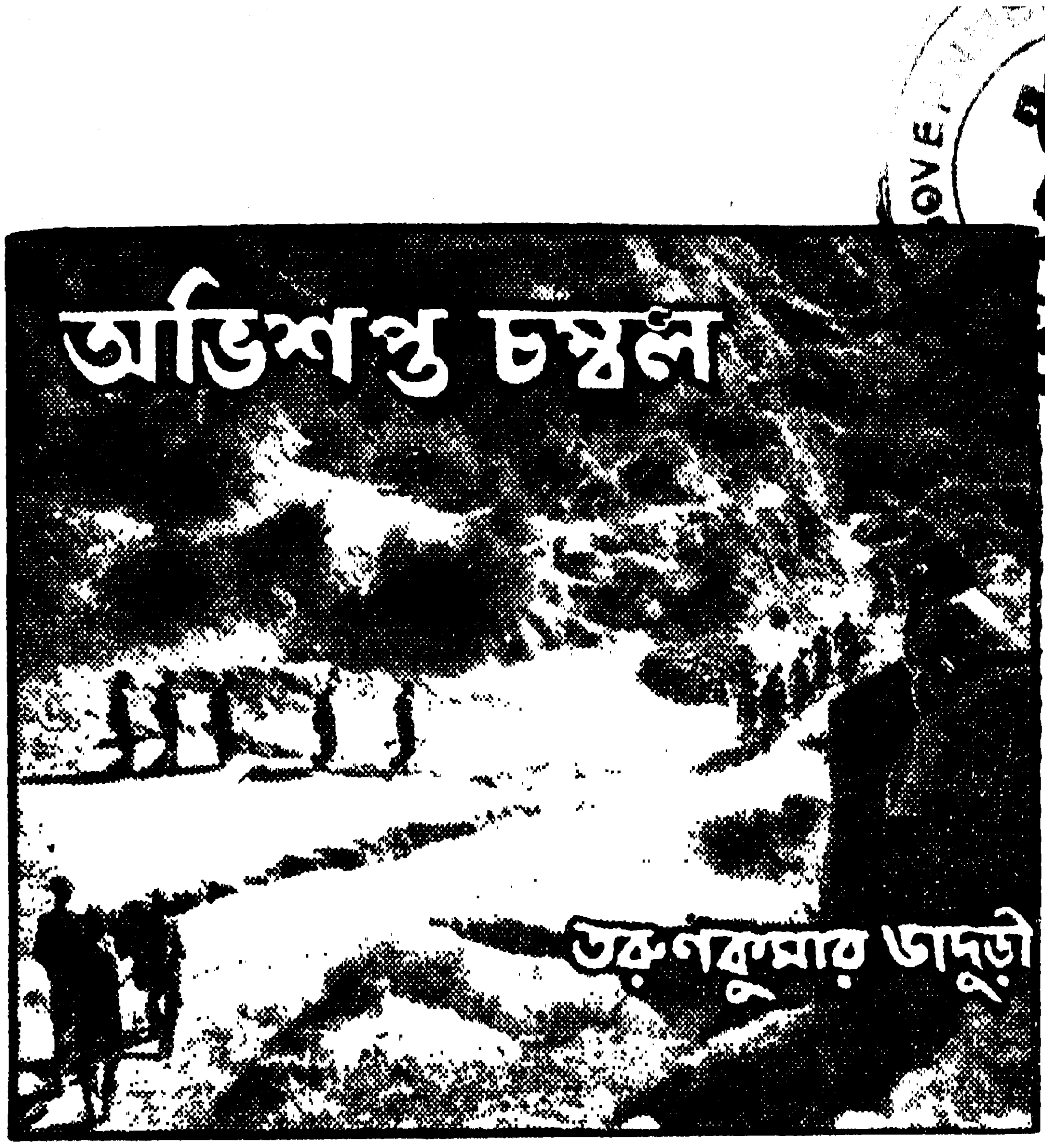

কুড়ি

নৈনীর কঠিন কারাপ্রাচীরের অন্ধকার 'সেলে' বসে তহসীলদার সিং জীবনের শেষ ক'টা দিন গুনছিল। 'দাউ' মানসিং-এর চোখের মণি, দুলারা বেটা তহসীলদার সিং। আর ক'টা দিনই বা বাকী? আজ নয় কাল, ফাঁসী হয়ে যাবে আর সঙ্গে সঙ্গে মানসিং-এর নাম মুছে যাবে অভিশপ্ত চম্বলের বুক থেকে। থাকবে শুধু তার অতৃপ্ত আত্মার দীর্ঘশ্বাস আর রুক্মিণীর চোখের জল। একদিন রুক্মিণীর চোখের জলও শুকিয়ে পাথর হয়ে যাবে আর মানসিং-এর স্মৃতি রয়ে যাবে চম্বলের অভিশাপ হয়ে। আজ থেকে অনেক বছর পরে, অনেক বছর পরে, অভিশপ্ত, সর্বনাশা চম্বল যখন ভাঙনের গান গাইতে গাইতে আরো অনেক "বেহড়" তৈরী করবে, তারাও বলবে চম্বলের সেই অভিশাপ মানসিং-এর কথা, শোনা যাবে শত শত সেই ক্ষুধিত, অতৃপ্ত, পাষাণ "বেহড়ে"র দীর্ঘশ্বাস। কান পেতে শুনলে সেই দীর্ঘশ্বাসেও শোনা যাবে সেই অভিশাপের রক্তমাখা কাহিনী। বৃদ্ধা রুক্মিণী উদিতপুরা গাঁয়ে বাড়ির সামনের কুয়োটার কাছে এসে দাঁড়াবে আর দূরে, অনেক দূরে দৃষ্টি দিয়ে দেখবে। আগেও দেখতো, এখনও দেখে, পরেও হয়তো দেখবে। হয়তো কোনোদিন তার "দুলারা বেটা" তহসীলদার ফিরে আসবে। 'দাউ' মানসিং-এর ঘরে শেষ প্রদীপ জ্বলছে টিমটিম করে নৈনীর কঠিন কারাপ্রাচীরের অন্ধকার 'সেলে'। একদিন ভোরে হয়তো দপ্ করে নিবে যাবে আর তারপর—"উসকে বাদ্—উসকে বাদ্ ক্যায়া সব খতম্"। কিন্তু এমনি করেই কি সব খতম্ হয়ে যাবে? গলার রুদ্রাক্ষের মালা ঘোরাতে ঘোরাতে তহসীলদার ভাবে। ভাবতে ভাবতেই একদিন অন্ধকার 'সেল' থেকে চিঠি লিখল আচার্য বিনোবা ভাবেকে। "বাবা" তখন সুদূরে কাশ্মীরে। "বাবা"র সঙ্গে মরবার আগে দেখা করতে চায় তহসীলদার। "বাবা" নিজে যদি আসতে না পারেন তাহলে তাঁর কাছ থেকে কেউ যদি আসে, তহসীলদার তার বুকের বোঝা হাল্‌কা করে কিছু বলতে চায়। তারপরে সব ঘটনা দ্রুত ঘটেছে আর "বাবা" এসেছেন অভিশপ্ত চম্বলের অভিশাপ মুছে দিতে, "বাগী"দের হৃদয় পরিবর্তন করতে।

আগ্রার সর্বোদয় নেতা ডাঃ ললিত গেলেন নৈনী কারাগৃহে তহসীলদার সিং-এর সঙ্গে [illegible]থা [illegible]। লাঠিতে ভর দিয়ে তহসীলদার [illegible] এসে ডাঃ ললিতকে জড়িয়ে [illegible]। সব কিছু শুনতে রাজী আছে [illegible]লদার কিন্তু সে সহ্য করতে পারে না তাকে যদি কেউ "ডাকু"—ডাকাত বলে। "হমে খুনী কহো, কাতিল কহো, হত্যারা কহো, পর হমে ডাকু মত কহো"—বলে ওঠে তহসীলদার সিং। অনুতপ্ত তহসীলদার

বাংলায়

আগাথা ক্রিষ্টি

রহস্যকাহিনীর রচয়িতা হিসাবে আগাথা ক্রিস্টি বিশ্ববিদিত। প্রাচুর্যের সঙ্গে বৈচিত্র্যের সমন্বয় তাঁর অতুলনীয় রচনার বৈশিষ্ট্য। ক্রিস্টির বিপুল গ্রন্থরাজি থেকে কয়েকটি সুনির্বাচিত কাহিনীর অনুবাদ প্রকাশের আয়োজন হয়েছে।

প্রথম আসন্ন প্রকাশ

দশ পুতুল

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

মনোজ বসুর সর্বকালের উপন্যাস

মানুষ গড়ার কারিগর

দ্বিতীয় মুদ্রণ
৫·৫০ নঃ পঃ

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত (শনিবারের চিঠি):

উপন্যাসের ফলশ্রুতিতে নিজেদের চেতনার ঘনীভবনের মধ্যে একটা বিস্তীর্ণ বিষণ্ণতা দেখিতে পাই—যে বিষণ্ণতা ব্যক্তিমনের পরিধিকে অতিক্রম করিয়া আস্তে আস্তে জাতীয় জীবনের দিগ্‌বলয়ে ছড়াইয়া পড়ে।......চিত্তবদ্ধ আদর্শনিষ্ঠারই ইহা একটি চিত্তে সমর্পিত ক্রন্দন। সে ক্রন্দন যে ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রাঙ্কনে নিপুণ রূপায়ণ লাভ করিয়াছে, স্রষ্টা হিসাবে এইখানেই লেখকের কৃতিত্বের দাবি।

মানবিকতার জয়মুখর শাশ্বত দুই উপন্যাসের দ্বিতীয় মুদ্রণ:
রক্তের বদলে রক্ত ২·৫০
মানুষ নামক জন্তু ৩·০০

রাজনীতিক নয়, সামান্য সাধারণের প্রীতিসিঞ্চিত ভ্রমণকথার দ্বিতীয় মুদ্রণ:
নতুন ইয়োরোপ, নতুন মানুষ ৫·০০
সোবিয়েতের দেশে দেশে ৬·০০

বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রা) লিমিটেড : কলিকাতা বারো

—ছোটদের পড়াবার মত বই—

ভানুমতীর বাঘ ...	... শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র	২·০০
হ্যামেলিনের বাঁশিওলা	... ,, বুদ্ধদেব বসু	২·০০
ভালো ভালো গল্প	... ,, শিবরাম চক্রবর্তী	২·০০
ডাকাতের হাতে ...	... ,, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	২·০০
আহ্লাদে আটখানা	... (সংকলন গ্রন্থ)	৩·০০
নোটন নোটন (ছড়ার বই)	... ,, বিশ্বনাথ দে	১·০০

শ্রীপ্রকাশ ভবন,

এ-৬৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিঃ ১২

(সি-৭৩৫৪)

আজ প্রকাশিত হলো

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

সর্বাধুনিক উপন্যাস

অন্তরাল

দাম—৩·০০ ন. প.

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

নূতন নাটক

বহ্নিশিখা

২·৫০ ন. প.

আশাপূর্ণা দেবীর

অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

উন্মোচন

পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ

৪·০০

সরস্বতী গ্রন্থালয় ॥ ১৪৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ॥ কলি—৬

বিদ্যাসাগরের হাসির গল্প ১-৭৫

বিদ্যাসাগর মশায়কে দৃঢ়চরিত্রের মানুষ এবং দয়ার সাগর বলেই সকলেই জানেন। কিন্তু তিনি যে অত্যন্ত পরিহাসপ্রিয় ও একজন ভাল হাসির গল্প বলিয়ে ছিলেন, তা হয়তো অনেকেই জানেন না। বিদ্যাসাগর মশায়ের সেই সব পরিহাস-রসিকতা ও হাসির গল্পগুলি নিয়েই এই গ্রন্থ।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারক জীবনের গল্প ২-৫০

বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত নির্ভীক, ন্যায়নিষ্ঠ, নিরপেক্ষ, কর্তব্যপরায়ণ ও দুঁদে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। মনীষী ভুদেব মুখোপাধ্যায় তাই বঙ্কিমচন্দ্রকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট চাকরির সর্বশেষ রত্ন বলে গেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধুপুত্র তারকনাথ বিশ্বাসও লিখেছেন—লোকে তাঁর নামে ভয় পেত। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরিতে এরূপ লোকেরই প্রয়োজন।

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সেই সুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট জীবনের বহু অজ্ঞাত, রোমাঞ্চকর ও মজার কাহিনী নিয়েই এই গ্রন্থটি রচিত।

সাহিত্য সদন

এ ১২৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ঃ কলি-১২

(সি ৭৮০৮)

সব ভুলে যেতে চায়। "দাউ"-এর জন্যে যারা "বাগী" হয়েছে তাদের সে মিনতি জানাতে চায়। কেউ যেন তাদের গিয়ে বলে তার কথা। তাদের যেন বলে, "দাউ"-এর ঘরের শেষ প্রদীপ তহসীলদার চায় তারা যেন "হাজির" হয়ে যায়। তারা যেন বাবার পায়ে আত্মসমর্পণ করে। "ইসকে বাদ্ তহসীলদার কো অগর ফাঁসী লগ যায়ে তো উসসে অচ্ছী মৌত তহসীলদার কে লিয়ে দুসরী নহী হো সকতী।" 'এর পরে যদি ফাঁসী হয়ে যায়, তার চেয়ে ভালো মৃত্যু তহসীলদার আশা করতে পারে না।'

শান্তির বাণী নিয়ে হৃদয় পরিবর্তনের অভিযানে তাই এলেন বিনোবা। উসেট ঘাটের তীরে আধো-আলো-আধো-আঁধারে সেদিন শোনালেন তাঁর প্রথম বাণী। "ম্যায় ডাকুক্ষেত্র নহী, সাধুক্ষেত্র সে আয়া হুঁ। ইয়ে লোগ ডাকু নহী, ইয়ে সব বাগী হ্যায়। ম্যয় ভী বাগী হুঁ। আরে ডাকু কহাঁ নহী হ্যায়। সব জগা ডাকু হ্যায়। দিল্লিমে ভী ডাকু হ্যায়।" আমি তো দস্যু-অধ্যুষিত এলাকায় আসিনি, আমি এসেছি সাধুদের পুণ্যভূমিতে। এরা তো ডাকাত নয়, এরা "বাগী" (বিদ্রোহী)। আমিও "বাগী"। আর ডাকাত কোথায় নেই। সব জায়গাতেই তো ডাকাত আছে। দিল্লিতেও তো ডাকাত আছে।" দুনিয়ায় ভাল বা মন্দ কেউ নেই। সব মানুষের মধ্যেই রয়েছে "সুমতি" আর "কুমতি"। হৃদয় পরিবর্তন করে, প্রেমের অমৃত বাণী শুনিয়ে "কুমতি" সরিয়ে দিলেই থাকবে শুধু 'সুমতি", তখন সব মানুষই সাধু।

"বাবা" এসেছেন উত্তর-প্রদেশ থেকে চম্বল পার করে। সঙ্গে এসেছে সব "শান্তি" সৈনিকরা। সুদূর কেরালা থেকে এসেছেন পাদ্রী মিশনারী ফাদার গ্রিফিৎস আর ব্রাদার স্টিফেন হৃদয়-পরিবর্তনের এই যাদু দেখতে। আরো এসেছে অনেকে। আর এসেছে উত্তর-প্রদেশে "বাবা"র হৃদয়-পরিবর্তনের প্রথম জ্বলন্ত উদাহরণ ডাকাত রামঅবতার। রূপা মহারাজের দলের সভ্য ছিল রামঅবতার। উত্তর-প্রদেশের ফতেহাবাদে "বাবা"র সান্ধ্য প্রার্থনাসভায় আত্মসমর্পণ করলো রামঅবতার। ঐতিহাসিক ফতেহাবাদে—এইখানেই আউরংগজেব তাঁর ভ্রাতা দারাকে পরাজিত করেন—বিংশ শতাব্দীর নতুন ইতিহাস লেখা হলো, রামঅবতারের আত্মসমর্পণে। "কুমতি"র ওপর রামঅবতারের "সুমতি"র জয় হলো। দুদিন পরেই রামঅবতার কিন্তু হয়ে গেল নেতা। উসেটঘাটে সেদিন যখন রামঅবতারকে দেখলাম, রামঅবতার খদ্দরের পাজামা, পাঞ্জাবি আর টুপি পরে "বাবা"র পদযাত্রীদের মধ্যে রীতিমত একজন হোমরা-চোমরা কর্তা হয়ে পড়েছে।

কিন্তু শুধু রামঅবতারই এলো আত্মসমর্পণ করতে "বাবা"র কাছে উত্তর-প্রদেশে। অনেক চেষ্টা, অনেক পরিশ্রম করলেন সাধু জেনারেল যদুনাথ সিং কিন্তু হৃদয় পরিবর্তনের বাণী শুনে আর কেউ এগিয়ে এলো না। কিছুদিন আগেই হয়েছিলো ভয়ংকর এনকাউণ্টার। রূপা মহারাজের দলের নেতা লুক্কা। রূপা মহারাজের দল মানেই মানসিং-এর দল। চম্বলের সবচেয়ে পুরোনো দল। দল ভাঙতে শুরু হয়েছিলো রূপা মহারাজের মৃত্যুর পরই। কোনোরকমে জোড়াতালি দিয়ে রেখেছিলো লুক্কা। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ হয়েছিল এনকাউণ্টার। বাছা বাছা তিনজন লোক মরল। তাদের মধ্যে ছিল দলের দুর্ধর্ষ রামনাথ—মেওয়ালালের ভাই রামনাথ। হাতের আঙুলে গুলী লেগে যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে লুক্কার সঙ্গে পালাতে পেরেছিল মটরা আর বাকী লোকেরা।

লুক্কার কাছে এই সময় পেঁছে দেওয়া হল নৈনী কারাগারের অন্ধকার "সেলে" ফাঁসীর অপেক্ষারত তহসীলদারের কথা। সাধু জেনারেল যদুনাথ সিং-এর শুরু হল সাইকেলে চড়ে দুর্গম বেহড়ের মধ্যে অবিরাম যাত্রা। "বাবা"র শান্তিদূতেরা (Emissary) ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে "বাগী"দের হৃদয়-পরিবর্তনের বাণী শোনাতে। লুক্কার জীবনে এলো ভীষণ সংকট। সে ভাবতেই পারে না, পনেরো কুড়ি বছরের দস্যু-জীবনের ওপর কি করে সে হঠাৎ যবনিকা টেনে দেবে। আত্মসমর্পণ তো না হয় করল, তারপর? তারপর তো নির্ঘাৎ ফাঁসি। এর চেয়ে তো ঢের ভালো পুলিসের হাতে গুলী খেয়ে মরা। কিন্তু আরেকটা চিন্তাও মনের মধ্যে আনাগোনা করে। "দাউ"-এর ঘরের শেষ প্রদীপ তহসীলদার সিং তো এই চেয়েছে। কিন্তু লুক্কা কি করে ভুলতে পারে "দাউ"র মৃত্যুর কথা। কি করে ভুলতে পারে ডুনভান-কাপুরার সেই ভীষণ সংঘর্ষের কথা, যখন আহত তহসীলদারকে ফেলে সবাইকে পালাতে হয়েছিল। আর রূপা মহারাজ? তার মৃত্যু তো ধোকা? এসবের বদলা তো নেওয়া হয়নি? "খুন কা বদলা খুন" যে এখনও বাকী? সব কিছু অসমাপ্ত রেখে কি করে সে "হাজির হবে?" কি মুখ নিয়ে দলের বাকী সবাইকে বলবে এ কথা। কিন্তু তহসীলদারের কথাও তো ফেলা যায় না, আর কতদিনই বা এইভাবে পালিয়ে বাঁচা যায়? প্রতিপত্তি, অর্থ, অস্ত্র-শস্ত্র সবই তো

রি. কম্ পরীক্ষার্থীদের উপযোগী
য়্যাডভোকেট শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাশের

কনট্র্যাক্ট আইন	...	১·৫ টা.
প্রশ্নোত্তরে ভারতীয় পণ্যবিক্রয় আইন	... ...	১ টা
প্রশ্নোত্তরে ভারতীয় বাণিজ্যিক আইন	... ...	২·৫ টা

শ্রীপ্রমথনাথ পালের

শরৎ-সাহিত্যে নারী (২য় সং)		৪ টা
নৃত্য-পরিচয় (২য় সং)	...	২ টা
মানুষ শরৎচন্দ্র (২য় সং)	...	২ টা
হিন্দু-সাহিত্যে প্রেম	...	৩ টা

শ্রীপ্রহ্লাদ দাসের

নৃত্য শিক্ষা	... ...	৫ টা
নৃত্য-বিজ্ঞান	... ...	২·৫ টা

প্র ভা ত (মা সি ক প ত্র) কা র্যা ল য়
২সি, নবীন কুণ্ডু লেন (কলেজ রো হইতে)
কলিকাতা-৯

(সি-৭২১৭)

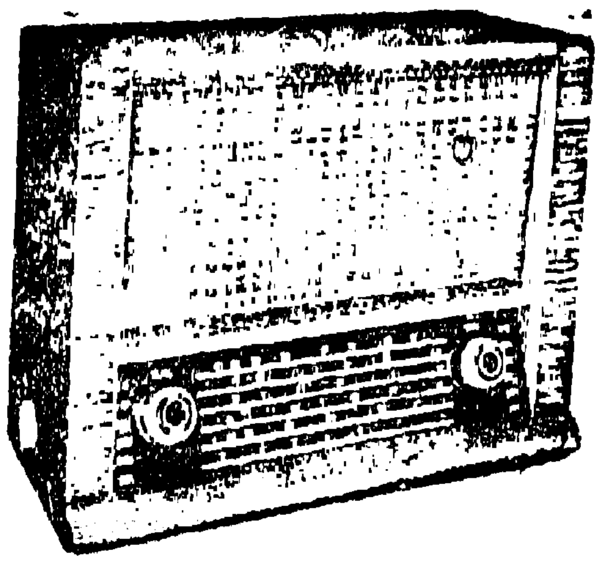

আমাদের নিকট নগদ মূল্যে অথবা সহজ কিস্তিতে অনেক রকমের রেডিও সেট্ পাওয়া যায়। এইচ, এম, ভি ও অন্যান্য রেডিওগ্রাম, লং-প্লেইং রেকর্ড, টেপ্ রেকর্ডার, "নিপ্পন্" অল-ওয়েভ্ ট্র্যান্সিসটার রেডিও, এমপ্লিফায়ার, মাইক, ইউনিট, হর্ণ, মাইক কেবল, রেডিও ও ইলেকট্রিকের বিভিন্ন প্রকারের সাজ-সরঞ্জামাদি বিক্রয়ের জন্য আমরা সর্বদা প্রচুর পরিমাণে মজুত করিয়া থাকি।

রেডিও এণ্ড ফটো স্টোর্স
৬৫, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩। ফোনঃ ২৪-৪৭৯৩

মোহিনী পূজার জন্য
ধূপকাঠি
বিশেষ কোয়ালিটি ২ ঘন্টা ধরিয়া জ্বলে
মোহিনী এজেন্সী - পারফিউমার্স বোম্বাই-৩
এজেন্ট :- পারেখ ট্রেডিং কোং, ৪৪-৪৫ এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

আর মিত্রের
ময়ূর মার্কা
তিল তৈল

বিশুদ্ধ ও সুপরিষ্কৃত
তিল তৈল
হইতে প্রস্তুত
যাবতীয় শিরঃরোগে
অদ্বিতীয়

অর্দ্ধ শতাব্দীর সুনামের
উপর প্রতিষ্ঠিত

ফুরিয়ে আসছে। তা যতদিন রূপা মহারাজের টেলিস্কোপিক রাইফেল—"দূরবীন-ওয়ালী বন্দুক" হাতে আছে তার কে কি করতে পারে! কিন্তু উদিতপুরায় "মাজী" যে তহসীলদারের জন্যে রোজ কাঁদে? সেও নাকি চায় লুক্কা সবাইকে নিয়ে "বাবা"র চরণে আত্মসমর্পণ করে। সবকিছু ঠেলে ফেলতে পারে লুক্কা কিন্তু "দাউ"-এর স্ত্রী রুক্মিণীর কথা তো ফেলতে পারে না। সে যে সবাইকার "মাজী" (মা)। ভীষণ ধর্ম-সংকট লুক্কার সামনে। আর রূপার ভাই কানহাই, সে তো সবকিছু ছেড়ে দিয়েছে লুক্কার হাতে। লুক্কা মহারাজ যা বলবে তাই হবে। "দাউ"-এর প্রিয়পাত্র ছিল রূপা। জেলে কথা দিয়েছিল "দাউ" রূপার বাবা ছাবরামকে। কথা রেখেছিল "দাউ" কিন্তু "কসম্" পুরো করবার আগেই সব শেষ হয়ে গেল। আর রূপা মহারাজ, তার প্রিয়পাত্র ছিল লুক্কা। শুধু তো তাই না, "দাউ"-এর দুই হাত ছিল রূপা আর লুক্কা। আদর করে "দাউ" ডাকতো রূপে আর লুক্কে।

বিনোবার হৃদয়-পরিবর্তন অভিযান কিছুদিন আলোড়ন তুলেছিল সারা দেশে। ইন্সপেক্টর জেনারেল রুস্তমজী সাহেব হঠাৎ একদিন দীর্ঘ বক্তব্য দিয়ে বিনোবার মিশনের তীব্র সমালোচনা করলেন। কাগজে-কাগজে শুরু হয়ে গেল তর্ক-বিতর্ক। আজ হয়তো এই তর্কের শেষ জবাব দেওয়ার বা অভিমত জাহির করবার সময় আসেনি। ইতিহাসই হয়তো এর জবাব দেবে। এক মাস "বিনোবা"র সঙ্গে পদযাত্রা করেছি অভিশপ্ত চম্বল উপত্যকায়। অনেক সময় মনে হয়েছে হয়তো জিনিসটা ঠিক হচ্ছে না। কেউ যদি আজও আমায় জিজ্ঞাসা করে, আমি নিজে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে এই হৃদয়-পরিবর্তনে বিশ্বাস করি কিনা আর আমি কি সত্যিই ভাবি যে দুর্ধর্ষ ডাকাতদের হৃদয় পরিবর্তন হয়েছে, আমি নিঃসংকোচে বলব, হৃদয়-পরিবর্তন হয়নি-হয়নি-হয়নি। যাদের কাছে মানুষের জীবনের মূল্য কিছুই না, যাদের জীবনের মন্ত্র হল "খুন কা বদলা খুন" তাদের হৃদয়-পরিবর্তন হবে না—হবে না—হবে না। যেমন বিনোবার শান্তি-মিশনের অনেক জিনিসই আমার ভাল লাগেনি, তেমনি পুলিসের দৃষ্টিভঙ্গীও আমার অনেক সময় ভাল লাগেনি। পুলিসের অনেক বড়-কর্তারাও স্বীকার করেন যে, অভিশপ্ত চম্বলের অভিশাপ শুধু পুলিস অভিযানেই শেষ হবে না। কিসে হবে তাহলে? এর উত্তর আমার কাছে নেই। কালের গতির স্রোতেই একদিন হয়তো মিটে যাবে, ধুয়ে যাবে, মুছে যাবে এই শতাব্দীর অভিশাপ।

(ক্রমশ)

শরিক

সুনীলকুমার নন্দী

কোন ভোর থেকে মুক্তো তোলার কতো কৌশলী ডুবুরির ভিড়।
কলকোলাহল।
গর্বিত জলকন্যার হাসি। উল্লাস। ঢেউ।
প্রতিকূলতার মলমলে রাঙা রোদ্দুরে নেয়ে
ভ্রূকুটিকারিণী কন্যার কানে গান বেঁধে বেঁধে কী হলো কী হলো ?

বাউল হৃদয়, তোমাকে শূন্য করবে এবার জলকন্যার আহ্লাদী ঢঙ্—
শ্রাবণের ঝরা বৃষ্টির মতো বেহিসেবী হাতে এলে তো ছড়িয়ে
প্রীতি ও প্রেমের সঞ্চয়ে ভরা মুঠো মুঠো গান।
এ-দেওয়ার দাম পাবে না পাবে না।
নিজের মনকে শত সাবধানী কুয়াশায় মুড়ে
চোখ ভরে নামা উদাসীন ছায়া ভেঙে বারবার
রক্ত নাচানো রহস্যময় নিবিড় ইশারা দিয়ে ছুটে যায়
মায়ার হরিণ।

অদ্ভুত এক মোহিনী আশার আলোছায়া পথে ছুটে ছুটে আরে
কোন অজান্তে সকাল গড়ায় দুপুরে এবং দুপুর—মিশলো সন্ধ্যার স্রোতে।
তবু সে তো ওই সেই দূরে সেই দূরে রয়ে গেলো—
গানের শরিক হলো না। হৃদয়, কিছুতেই ধরা দেবে না।

সব ফাঁকি, সব মিথ্যে মিথ্যে, শুধু হাহাকার—

বেদনাবিদ্ধ করুণ-মধুর সুরে সুরে তবু বেঁধেছি যে-গান
তাকেও ছিনিয়ে নিয়ে যায় বুঝি চাপা সন্ধ্যার কালো কুন্তল।
সারা মন ছেয়ে ঝড়ো হাওয়া বয়। চোখ ছিঁড়ে নামে ক্লান্তির ঘুম।

গভীর রাত্রি। ঘুম ভেঙে যায়। ফিকে তন্দ্রায় মনে হয় যেন
হলুদ চাঁদের আগুনে পুড়ছে জলকন্যার কোমল শরীর।
কোথা গেলো সব কুশলী প্রেমিক? নেই, কেউ নেই এই অবেলায়—
ঈশ্বর, একী অপার করুণা মৃত্যুচিতায় শরিক হলাম।

উতলা হৃদয়, এবার তৃপ্ত !

জলকন্যার জ্বলন্ত বুকে দেহ ঢেলে দিতে
বালুসেজ ছেড়ে ক্ষিপ্র ব্যাকুল উৎসাহে উঠি ফালি ফালি করে অবশ তন্দ্রা।
ভেঙে যায় ভুল।
না না না হৃদয়, ও কিছুই নয়। পূর্ণ হবে না অলীক ইচ্ছা।
এখানেও তার চলেছে দেখো না ছলনার খেলা—
জ্যোৎস্নার সাথে মেতেছে রূপসী নতুনতর এ-মায়াবী রঙ্গে !

টুকে-বাকে

আসামের অর্থমন্ত্রী ফকরুদ্দিন সাহেব নাকি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে দুর্গাপূজা যাহাতে খুব ধূমধামের সহিত সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য

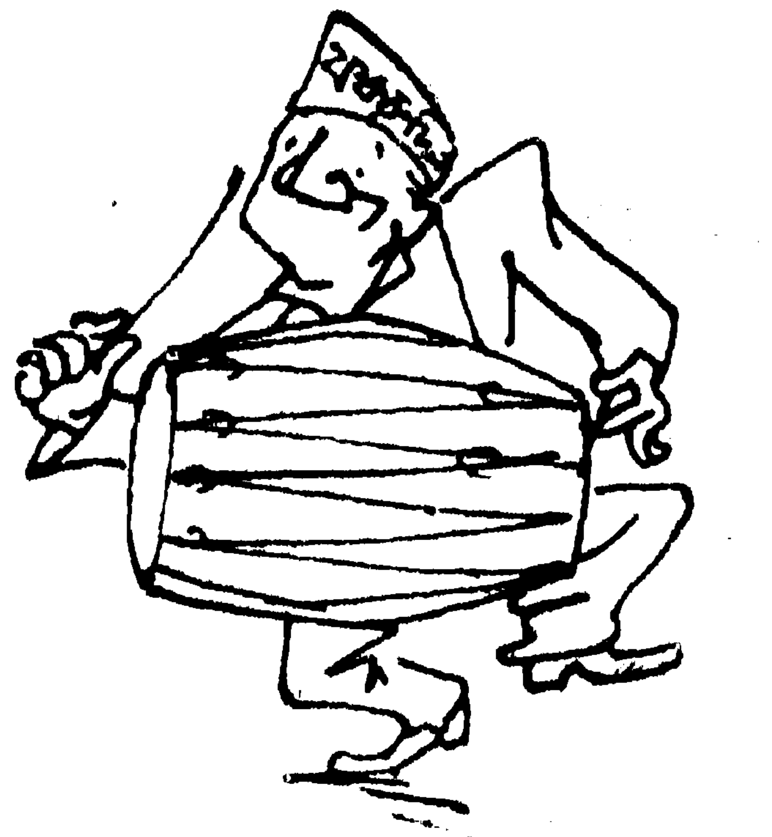

সরকার উৎসাহ দান করিতেছেন। খুড়ো বলিলেন—"ধূমধাম আর এমন কী হবে; ধূম আগেই দেখেছি, ধামও গেছে!!"

* * *

পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে তেল পাওয়ার আশা নাই—একটি সংবাদ শিরোনামা। —"সমস্ত তেল পদযুগল

মর্দনে নিঃশোষিত হয়ে গেছে কিনা তা অবশ্য সংবাদে বলা হয়নি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

মহানগরীর দক্ষিণাঞ্চলে আর-একটি পৌরসভা স্থাপনের জন্য সরকার উদ্যোগী হইয়াছেন। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর!!"

* * *

কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় জনৈক কমিউনিস্ট কাউন্সিলার একটি রাস্তার বর্তমান নাম পরিবর্তন করিয়া কোন এক ব্যবসায়ীর নামে রাস্তাটির নামকরণের প্রস্তাব করেন। এই সময় অন্য এক কাউন্সিলার প্রশ্ন করেন—"কম্যুনিজম্ কোন্ পথে।" আমাদের জনৈক সহযাত্রী সংবাদটি শুনিয়া গান ধরিলেন—"পথ আমারে শুধায় লোকে, পথ কি আমার পড়ে চোখে।"

* * *

রাজ্যের কৃষি-মন্ত্রিগণ নাকি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, খাদ্য প্রশাসনকে আরো দক্ষ করিয়া তুলিতে হইবে। শ্যামলাল বলিল—"কিন্তু কপাল লেখে কে? দক্ষ হলেই তো হয় না;—পূর্বে ছিল লক্ষপতি, তুমি যার কন্যা সতী, তার কেন মা এ দুর্গতি, ছাগমুণ্ড তার স্কন্ধে গেল, জেনেছি মা তারা তুমি অদৃষ্টের অনুকূল"—শ্যামলালও গান গাহিয়াই তার মন্তব্য শেষ করে।

* * *

এক সংবাদে শুনিলাম, সোবিয়েত বিজ্ঞানীরা নাকি কৃত্রিম উপায়ে ধারা বৃষ্টিপাতে সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। —"এই সঙ্গে যদি তারা কৃত্রিম উপায়ে সমুদ্র থেকে ইলিশ মাছ তুলে এনে নদী-নালা, খাল-বিল ভরে দিতে পারতেন, তাহলে আমরা অর্থের বদলে কৃত্রিম বৃষ্টির সাহায্যই চেয়ে নিতাম"—বলেন বিশু খুড়ো।

* * *

লণ্ডনের এক খবরে জানা গেল, সেখানে একঝাঁক বুনো হাঁস নাকি একটি আক্রমণ-উদ্যত ঈগল পাখিকে মারিয়া ফেলিয়াছে। —"আমরা ছোটবেলা শিখেছিলাম—ইঁদুরছানা ভয়ে মরে, ঈগল পাখি পাছে ধরে—কিন্তু ঈগলের এ্যালেম তো দেখা গেল"—বলেন আমাদের এক সহযাত্রী।

* * *

নেহরুজী নাকি একবার বলিয়াছিলেন —কলিকাতায় আর দেখবার কি আছে, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আর তেরতলা সেক্রেটারিয়েট বাড়ি ছাড়া। —"অথচ এই কলকাতার চিড়িয়াখানা দেখে এক অজ্ঞাতনামা কবি একদিন উচ্ছ্বসিত হয়ে গেয়ে উঠেছিলেন—উল্লুকের কী আমদানি, মহারানী, ধইন্য তোমার জমিদারী"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

আসামে নারী ও শিশুদের উপর পাশবিক নির্যাতনের কথা কেহ নেহরুজীকে বলেন নাই—এই কথা বলিয়াছেন প্রধান মন্ত্রী, লোকসভার অধিবেশনে।

—"কিন্তু কে আর কি বলবেন। যাঁরা প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাঁরা হয়ত এই কথাই ধরে নিয়েছেন যে, সীজারের স্ত্রীর সম্বন্ধে সন্দেহের কোন প্রশ্নই ওঠে না"—মন্তব্য করিলেন বিশু খুড়ো।

* * *

একটি সংবাদে শুনিলাম, অলিম্পিক ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে এবারে আমেরিকার পতাকা বহন করিয়াছেন একজন "কালা আদমী।" —"এ সম্বন্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার ঘোটরা কী বলেছেন, সে সংবাদ এখনো পাওয়া যায়নি"—মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

* * *

নিউ ইয়র্কের সংবাদে জানা গেল, সেখানে কমলালেবু হইতে মোটরের তেল আবিষ্কার করা হইয়াছে। —"এ সংবাদে আমাদের কৌতূহল নেই। সাম্প্রতিক দুর্মূল্যতায় কমলালেবু আমাদের কাছে এখন প্রায় ইতিহাসের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। লেবু নয়, লেবুর রস শুধু এখনো উপভোগ করি সেই অজ্ঞাতনামা ছেলেটির পাঠ নুংস্বর ভঙ্গিতে—পৃথিবীটা ক, পৃথিবীটা ক, মলাসে মলাসে, বু-র মতো"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

বিজ্ঞান বৈচিত্র

চক্রদত্ত

ডারউইন ১৮৩১ এবং ১৮৩৬ সালে 'বিগিল' জাহাজে করে এ্যাটল্যান্টিক মহাসমুদ্রের কয়েকটি দ্বীপ, দক্ষিণ আমেরিকার সমুদ্রোপকূলে এবং এর আশেপাশের দ্বীপ এবং পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণ করে সেখানকার মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত বই "অরিজিন অব স্পেসিজ" লেখেন। বর্তমানে একদল বৈজ্ঞানিক ডারউইন যে-পথে ভ্রমণ করেছিলেন, সেই পথ ধরে সেই সমস্ত জায়গা থেকে ডারউইনের সংগৃহীত তথ্যগুলির মত তথ্য নতুন করে সংগ্রহ করে, নতুন করে গবেষণা করে দেখতে চান। ডাঃ জুলিয়ন হাক্সলে এবং ডারউইনের নিকটতম আত্মীয়া লেডী নোরাবার্লো এই বৈজ্ঞানিক দলের অভিনেতৃত্ব করবেন। এই দলে স্ত্রী-পুরুষ মিলে প্রায় বিশ জন আছেন।

*

আজকের দিনে বেশীর ভাগ যন্ত্রপাতিই বিদ্যুৎ-চালিত, ফলে চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সব সময় সম্ভব হয় না। সেজন্য আজকাল নানারকম শক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগান হয়। বিশেষত জল-বিদ্যুৎ এখন সর্বত্রই পরিচিত। এখন আগ্নেয়গিরি থেকে শক্তি সংগ্রহ করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপায় উদ্ভাবন করা হচ্ছে। ইটালীর লার্ডারেল্লোই এই রকম আগ্নেয়গিরিস্থ শক্তির দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদনের সর্বপ্রথম কেন্দ্র—স্থানীয় আগ্নেয়গিরি থেকে বাষ্প এবং মাঝে মাঝে তার সঙ্গে গরম জল বার হয়। এই জল ও বাষ্প ঘণ্টায় ২০০০০০ থেকে ৩০০০০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত বার হচ্ছে এবং প্রতি সেকেণ্ডে ৫০০ মিটার ওপরে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। আজকের দিনে এই আগ্নেয়গিরি-চালিত বৈদ্যুতিক কেন্দ্র থেকে ২০০০০০ কিলোওয়াট শক্তি উৎপন্ন করা যাচ্ছে। ফলে সমগ্র ইটালীর বিদ্যুতের চাহিদার শতকরা দশ ভাগ এখান থেকে তৈরী হয়। বৈজ্ঞানিকগণ যন্ত্রের সাহায্যে এই আগ্নেয়গিরি গহবরের ১২০০ মিটার নীচের তাপ পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, এখানে ৩৩০° সেণ্টিগ্রেড আছে, এর পর

জোলাপের দাসে পরিণত হবেন না

কড়া জোলাপ আপনার অন্ত্রের পেশীগুলিকে দুর্ব্বল করে, ফলে শীঘ্রই, আরও কড়া জোলাপ না হ'লে আপনার কোষ্ঠ আর পরিষ্কার হবে না। জোলাপের দাস হ'য়ে পড়বেন না। অকৃত্রিম ফিলিপ্‌স মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া ব্যবহার করুন।

ফিলিপ্‌স এত মৃদুভাবে কাজ করে যে এমন কি শিশুদের জন্যেও ইহা সুপারিশ করা হয়…অথচ এত ফলপ্রদ যে প্রথমবার ব্যবহারের পরই কোষ্ঠবদ্ধতার হাত থেকে পূর্ণ মুক্তি পাবেন। এই কারণেই…

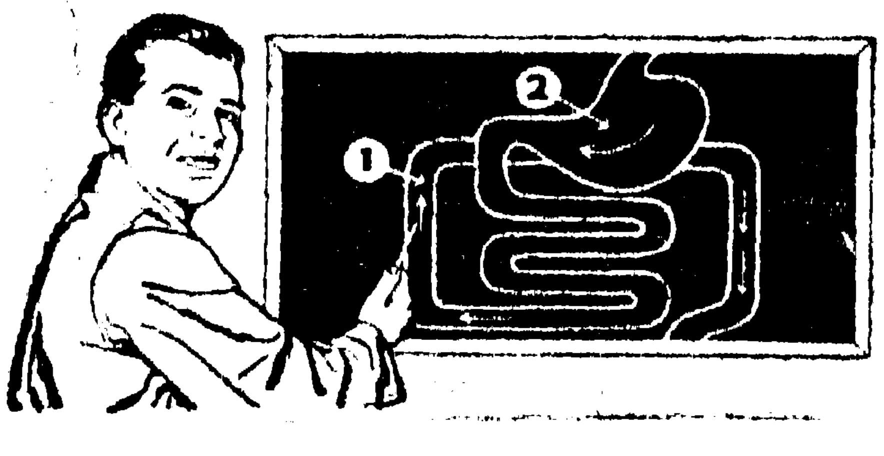

আবার ভারতবর্ষে পাওয়া যাচ্ছে

নূতন নকল নিরোধক শীলকরা বোতলে। এই শীলকরা বোতলই ফিলিপসের বিখ্যাত বিশুদ্ধতা এবং উচ্চমানের একমাত্র নিশ্চয়তা। ২, ৪ ও ১২ আউন্স বোতলে পাওয়া যায়।

১। অন্যান্য কড়া জোলাপের মত কাজ না ক'রে, ফিলিপ্‌স মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া শুকনো জমাটবাঁধা কোষ্ঠকে সিক্ত করে, তারপর মৃদুভাবে পেশীগুলিকে সক্রিয় ক'রে আপনার দেহ থেকে দূষিত মল নিরাপদে ও নিশ্চিন্তভাবে বা'র করে দেয়—অথচ শরীরে কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয় না, শরীরে খিঁচুনি ধরে না বা দুর্বলতা বোধ হয় না।

২। শুধু একটিমাত্র গুণবিশিষ্ট জোলাপের মত না হ'য়ে ফিলিপ্‌স মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আপনার পাকস্থলীকে শান্ত ক'রে আপনার আরামের পূর্ণতা এনে দেয়। আপনার পরিপাক যন্ত্রকে সবল করে… পেট ভার ভার ভাব, বুক জ্বালা, পেট ফাঁপা ও অম্লজনিত বদহজম দূর করে।

ফিলিপ্‌স

মার্কেই খাঁটি মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া

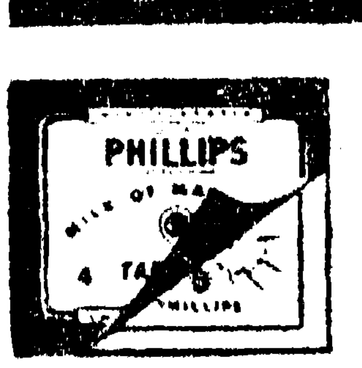

যেখানেই হোক, যখনই হোক, অম্লজনিত অজীর্ণরোগে সঙ্গে সঙ্গে উপশম পেতে হ'লে সর্বদাই মিন্টের সুগন্ধযুক্ত সুস্বাদু ফিলিপ্‌স মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া ট্যাবলেট গ্রহণ করুন। ৪ ট্যাবলেটের সস্তা প্যাকেটে এবং ৭৫ ও ১৫০ ট্যাবলেটের বোতলে পাওয়া যায়।

একমাত্র পরিবেশক : দে'জ মেডিকেল ষ্টোরস প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ, গোহাটী, পাটনা, কটক

পিরএনহা: আক্রমণ করবার পূর্ব মুহূর্তে

আর তাঁরা অবশ্য নীচে যেতে পারেননি। এইভাবে আগ্নেয়গিরি থেকে ব্যাপকভাবে বিদ্যুত সংগ্রহ করা সম্ভব কিনা, সে সম্বন্ধে জাপান, নিউজিল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড ও আলাস্কায় পরীক্ষা করা হচ্ছে।

আইজত নগরের 'ইণ্ডিয়ান ভেটেরিনারী রিসার্চ ইনস্টিটিউট' হর্স সিকনেস নামে এক রকম ঘোড়াদের রোগের ওষুধ হিসাবে একটি নতুন রকম টীকা আবিষ্কার করেছেন। গত এপ্রিল মাসে রাজস্থান, মহারাষ্ট্র প্রদেশ, খান্দেশ ও চণ্ডীগড় প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে 'হর্স সিকনেস' রোগে প্রায় ৪০০ ঘোড়ার মৃত্যু ঘটে। এর আগে ভারতবর্ষে ঘোড়াদের এরকম রোগ হতে দেখা যায়নি। সাধারণত এ-রোগ আফ্রিকার ঘোড়াদের মধ্যেই হয়। সেই-জন্য এ রোগের নাম 'আফ্রিকান হর্স সিকনেস।' ভারত গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে ঘোড়াদের মধ্যে এ রোগের প্রকোপ দেখে বিদেশ থেকে রোগের প্রতিষেধক টীকা সংগ্রহ করে সাময়িকভাবে রোগ বন্ধ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভেটেরিনারী রিসার্চ ইনস্টিটিউটে গবেষণার কাজও আরম্ভ হয়ে যায়। আইজত নগরের এই প্রতিষ্ঠান ইঁদুরের মস্তিষ্ক থেকে প্রতিষেধক টীকা প্রস্তুত করতে থাকেন। প্রথমে ইঁদুরটিকে ঐ রোগাক্রান্ত করে নিয়ে তাকে ঠাণ্ডায় জমিয়ে ফেলে তারপর মস্তিষ্কটুকু বার করে নিয়ে ঘোড়াদের রোগের ওষুধ তৈরী হয়। একটি ইঁদুরের মস্তিষ্ক থেকে প্রায় দশ ডোজ ওষুধ তৈরী হয়।

●

হাঙর মাছ জলের ভেতর সুযোগ পেলেই মানুষকে আক্রমণ করে। অনেক ক্ষেত্রে এরা কামড়ে মাংস তুলে নেওয়া, হাত কিম্বা পা কেটে নেওয়া ছাড়াও মানুষের মৃত্যু ঘটায়। অবশ্য হাঙররা অনেক বড় এবং খুব তাড়াতাড়ি জলের ভেতর চলাফেরা করতে পারে বলে সহজেই মানুষদের কাবু করতে পারে। দক্ষিণ আমেরিকায় এক জাতের মাছ আছে, যাদের 'পিরএনহা' বলা হয়। এই মাছ সাধারণত লম্বায় ৬ ইঞ্চি। পিরএনহা ঠিক হাঙরের মতই সুযোগ পেলে যে-কোন প্রাণীকে আক্রমণ করে। যখন এদের কাছাকাছি কোন রকম আক্রমণ করবার মত প্রাণী থাকে না—তখন একটি মাছ আর-একটি মাছকে আক্রমণ করে। কয়েকটা মাছ একসঙ্গে আক্রমণ করে যে-কোন লোককে মেরে ফেলতে পারে। জলের ভেতর লোহার পাত ফেলে দিয়ে দেখা গেছে যে, এই মাছ কামড়ে পাত বেঁকিয়ে ফেলেছে এবং পাতের ওপর কামড়ের দাগ পড়েছে।

*

আণবিক পরীক্ষার সময় কতটা সাবধান হওয়া দরকার তার একটা উদাহরণ এখানে দেওয়া হচ্ছে। কোন আণবিক গবেষণাগারে এক আউন্স প্লুটোনিয়াম-এর ১/৫০ ভাগ অসাবধানতা বশত বিস্ফোরণ হয়। এর ফলে এটি ওখানকার হাওয়ার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সাবধানতা অবলম্বনের জন্য যে সমস্ত লোকেরা এই বিস্ফোরণের চার একরের মধ্যে উপস্থিত ছিল তাদের সবার কাপড় জামা ল্যাবরেটরীতে জমা দিতে বলা হয়। ঐ সমস্ত লোকদের প্রস্রাব পরীক্ষা করে দেখা হয় যে, ওদের নিশ্বাস নেবার সময় অথবা অন্য কোনপ্রকারে শরীরের ভেতর প্লুটোনিয়াম প্রবেশ করে নি। আশেপাশের বাড়ি ঘর দোর ভাল করে পরিষ্কার করা হয়। মাঠের সমস্ত ঘাসের চাপড়া তুলে ফেলে অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে মাটির নিচে চাপা দেওয়া হয়। ল্যাবরেটরীর আশেপাশের রাস্তা থেকে পিচ তুলে ফেলে আবার নতুন করে পিচ দেওয়া হয়। বাড়ি ঘর দোর আবার নতুন করে রং করা হয়। এই সমস্ত করবার জন্য প্রায় ৩৫০,০০০ ডলার খরচ পড়ে।

শারদ সোমপ্রকাশ

৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা। ২০০ পৃষ্ঠা, এণ্টিকে ছাপা।

প্রবন্ধ : বিনয় ঘোষ, অরবিন্দ পোদ্দার, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল নিয়োগী, কালিদাস দত্ত, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

গল্প স্কেচ : নরেন্দ্রনাথ মিত্র, মিহির আচার্য, বিষ্ণু চক্রবর্তী, দেবকুমার ঘোষ, [illegible] দত্ত, যতীন্দ্রমোহন রায়, অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়।

কবিতা : বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুশীল গুপ্ত, মণীন্দ্র রায়, হরপ্রসাদ মিত্র, রামেন্দু দেশমুখ, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, অমিয় ভট্টাচার্য, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, কৃষ্ণ ধর, শচীন দত্ত, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, অমলেন্দু দত্ত, বিশ্বনাথন্ প্রমুখ॥

দাম : ১.২৫ নঃ পঃ ● সম্পাদক—সুশীল ভট্টাচার্য

॥ দক্ষিণী, বারুইপুর, ২৪ পরগণা : প্রচ্ছদ : চারু খান

বঙ্গ ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা

GOVERNMENT LIBRARY

সুনির্মল দত্ত

রাজনৈতিক মানচিত্র যে সর্বদা সাংস্কৃতিক মানচিত্র অনুসরণ করে না—এই কথা আজকের দিনে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠিত হওয়ার পরেও যেমন বলা চলে, বাঙলার পূর্ব ইতিহাসও তার সাক্ষ্য দেবে।

পাকিস্তান-পূর্ব বাঙালীর কাছে বৃহত্তর বঙ্গের দাবি ছিল অন্যতম জাতীয় দাবি। "বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন, এক হউক..." এই স্বপ্ন ছিল একদিন বাঙালীর জাতীয় ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের উদ্দীপক শক্তি। এই এক করার সাধনা যে আমাদের ব্যর্থ হয়েছে আজ তা দুঃখের হলেও স্বীকার করতে হবে। অবশ্য বাঙলার রাজনৈতিক মানচিত্র ভেঙে দুটুকরো হলেও দুই বাঙলার ভাষা ও ভাবের আত্মিক বন্ধন ছিন্ন হয়েছে, একথা স্বীকার করার মত চরম দুঃসময় এখনও উপস্থিত হয়নি এবং কোন কালেই হবে না বলে বিশ্বাস রাখি।

ইংরেজ আমলে বাঙলার নিজস্ব যে জেলাগুলিকে ছিনিয়ে নিয়ে সংলগ্ন প্রদেশ-গুলোতে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল বিভাগপূর্ব বাঙলার সেই চিত্রটি হয়ত ম্লান হয়নি আজও। তারই একটি বিচ্ছিন্ন জেলা শ্রীহট্টের কথা আজ এই প্রবন্ধের বক্তব্য-বিষয়। "বাম হাতে যার কমলার ফুল"—কবিকল্পনার এই কমলা ফুলের দেশই ছিল বাঙলার এককালীন পূর্বপ্রান্তিক জেলা শ্রীভূমি শ্রীহট্ট। আধুনিক বাঙালীর একাংশের মধ্যে একটি অমূলক ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, শ্রীহট্ট চিরকালই ছিল আসামে। নিজ জাতি ও জাতীয় ঐতিহ্যের অসম্পূর্ণ পরিচয় অথবা এই সম্পর্কে চরম অজ্ঞতা থেকেই এই অতি বড় ভুলের জন্ম; সম্ভবত ইংরেজ প্রবর্তিত শাসন ও শিক্ষা-ব্যবস্থাই এর প্রত্যক্ষ কারণ হবে। শ্রীহট্টের সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যে বঙ্গ সংস্কৃতিরই ঐতিহ্যবাহী সে বিষয়ে কিছু বলা আমার আজকের প্রতিপাদ্য নয় এই প্রবন্ধে তার অবকাশও নেই। আমি শুধু এখানে শ্রীহট্ট জেলা কেন এবং কিভাবে বাঙলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসামভুক্ত হয়েছিল তারই পটভূমিকাটি ঐতিহ্যের প্রাচীন ধারা অনুসরণ করে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙএর (বা য়ুয়ান চোয়াং) শ্রীহট্ট আগমন সুবিদিত। হিউয়েন সাঙএর ভারত বিবরণীতে (হিউয়েন সাঙএর ভারত ভ্রমণ-কাল—৬২৯ হতে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দ—১৬ বৎসর) দেখি বাঙলাদেশের বিশেষত নিম্ন-বঙ্গের অনেকাংশে তখনও সাগরের চিহ্ন ছিল। তিনি সমতট রাজ্যের মধ্য দিয়ে এসে ছিলেন শ্রীহট্টে। পূর্ববঙ্গই ছিল এই সমতট। হিউয়েন সাঙ লিখছেন, 'সমতট থেকে উত্তর পূর্ব দিকে সাগরের তীরভূমি বরাবর এগিয়ে, পাহাড় ও উপত্যকা ডিঙিয়ে আমরা শিলিচটল দেশে পৌঁছলাম।

"going from this (Sama-tata) north east along the borders of the sea across mountains and valleys, we come to the country of Shi-li-t' sa-ta-lo" (S Beal's Life of Heuen Tsiang—p. 138)

এই শিলিচটল দেশই শ্রীহট্ট। এখান থেকেই হিউয়েন সাঙ ... ভাস্করবর্মার রাজ্য কামরূপে।

"The first place is Shi-li-cha-ta-lo —which was situated in near the great sea to the north east of Sama-tata" (S. Julien's Heuen Tsiang—iii 82)

আজকে বাঙলাদেশ বলতে আমরা যা ভাবি হিউয়েন সাঙএর সমকালীন বাঙলা সেরূপ ছিল না। কতগুলো খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল সেকালের বাঙলা। পৃথক জনবসতির কিংবা কতগুলো বিশিষ্ট কোমের (ট্রাইব) নাম থেকেই রাষ্ট্রীয় বিভাগগুলোর উৎপত্তি হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়,—যেমন,—রাঢ় বা সুহ্ম (দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ), পুণ্ড্র (বা বরেন্দ্র-উত্তরবঙ্গ), গৌড় (উত্তর-পশ্চিমবঙ্গ), বঙ্গ (মধ্য-পূর্ববঙ্গ), সমতট (নিম্ন-পূর্ববঙ্গ) ইত্যাদি। হিউয়েন-সাঙএর বর্ণনানুযায়ী মনে হয় সমতটের অবস্থিতি ছিল কামরূপের ২৫০ মাইল দক্ষিণে। পরবর্তী যুগের সপ্তগ্রাম বন্দর, নবদ্বীপ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানগুলির উল্লেখ তাঁর পরিক্রমায় না থাকায় মনে হয় যে, দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের অনেকাংশে তখনও

বিস্তৃত জনাবাস গড়ে ওঠেনি। নিম্ন ও পূর্ববঙ্গেরও কোন কোন অংশ যে তখনও ছিল জলময় অথবা জলা কিংবা নিম্নভূমি তারও ইঙ্গিত হিউয়েন সাঙএর বিবরণে পাওয়া যাচ্ছে। সমতটের উত্তর-পূর্বে শিলিচটল দেশে পৌঁছতে হিউয়েন্ সাঙ সাগরের দেখা পেয়েছেন। সাগর এখানে এলো কোথা থেকে! কৈলাসচন্দ্র সিংহের 'ত্রিপুরার ইতিহাস'এ এই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "শ্রীহট্ট জিলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, ময়মনসিংহের পূর্বাংশ এবং ত্রিপুরা জিলার উত্তর-পশ্চিমাংশের ভূপ্রকৃতি দর্শনে বোধ হয়, এই স্থানে পূর্বে একটি বৃহৎ হ্রদ ছিল। ব্রহ্মপুত্র নদে প্রবাহিত কর্দম দ্বারা ঢাকা, ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরার সন্ধিস্থল সমতলক্ষেত্রে পরিণত হইলে, এই হ্রদ বিশেষরূপে মানবমণ্ডলীর দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল। এই জন্যই দ্বাদশ শতাব্দী পূর্বে হিউয়েন্ সাঙ শিলহট্ট রাজ্যটি সমুদ্র-তীরবর্তী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বরবক্র প্রভৃতি নদীসমূহ এই হ্রদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। নদীপ্রবাহে আনীত কর্দমরাশি দ্বারা এই হ্রদ ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইয়া অসংখ্য বিল সৃষ্ট হইয়াছে। এই

বিপদের হাত থেকে শহরকে বাঁচিয়ে দিল

১৯৫৯ সালের ১লা অক্টোবর যখন জামশেদপুরে প্রচণ্ড ঝড় ও বৃষ্টি হচ্ছিল, টাটা স্টীল কর্মীদের ছোট একটি দল জামশেদপুর নগরীকে একটা বড় রকম বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্যে তাড়াতাড়ি সুবর্ণরেখার ধারে একটি জলাধারের কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'ন।

জলাধার ও নদীর মাঝখানের বাঁধের ধারে ঝড়ে ভেসে-আসা একটা কাঠের ভেলা আটকে গিয়েছিল... যে কোন মুহূর্তে জলের স্রোতে প্রচণ্ড গতিতে ভেসে গিয়ে, নদীর ওপরের পুলের গা দিয়ে জলের যে মেন পাইপ শহরের দিকে গেছে সেটাকে ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিত।

বিপদ যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন ২৭ বছর বয়সের সামসুদ্দিন খাঁ সেই ঘূর্ণায়মান জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সাঁতার কেটে ভেলার কাছে পৌঁছে সে কোনো রকমে সেটাকে টেনে সরিয়ে দিলো। তার সহকর্মীরা তাকে বীরের মত অভিনন্দন জানালো, আর, টাটা স্টীল একজন প্রাক্তন-কর্মীর এই সাহসী ছেলেটিকে নগদ ৫০০্ পুরস্কার ও একটি স্থায়ী চাকরি দিলেন।

কর্তব্যের জন্যে জীবন বিপন্ন করার মহৎ দৃষ্টান্ত জামশেদপুরে সামসুদ্দিনের মত বীর কর্মীরা স্থাপন করেছেন। এখানে শিল্প শুধু জীবিকা উপার্জনের পথই নয়—জীবনেরই একটি অঙ্গ।

জামশেদপুর
ইস্পাত নগরী

TTN 4086

The Tata Iron and Steel Company Limited

সকল বিলের কান্দি বা উচ্চস্থানস্থিত গ্রামগর্নলি অদ্যাপি বর্ষাকালে সমর্দ্রমধ্যস্থিত দ্বীপ বলিয়া বোধ হয়। আনর্মানিক শ্রীহট্ট জিলার প্রায় চতুর্থাংশ বিল ও নিম্নভূমি; ইহার সহিত ময়মনসিংহ জিলার পূর্বপ্রান্তস্থিত নিম্নভূমি ও ত্রিপর্রা জিলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তস্থিত নিম্নভূমি সংযুক্ত করিলে বোধ হয় উল্লেখিত হ্রদের পরিমাণ ফল দর্ই সহস্র বর্গমাইল হইতেও অধিক ছিল।" হিউয়েন্ সাঙ হ্রদের এই বিরাটত্ব দেখেই একে সাগর বলে বর্ণনা করেছেন। প্রাচীনকালে এই হ্রদ যে সাগরের ধারণা জন্মাত তার উল্লেখ রয়েছে অন্যত্রও। ভাটেরার তাম্রলিপিতে (আনর্মানিক দশম শতক) দক্ষিণ শ্রীহট্টের প্রাচীন একটি রাজ্যের সীমানির্দেশ করতে 'সাগর পশ্চিমে' কথাটি লেখা আছে। আইন-ই-আকবরিতেও মৈমনসিং-ত্রিপর্রা-শ্রীহট্টের সীমান্ত-সংগমের নিম্নভূমিকে 'ভাটীদেশ' বলা হয়েছে। এছাড়া শ্রীহট্টের হাইলহাওর, সর্নিগয়াজর্রী, কাপাপাশা প্রভৃতি প্রকাণ্ড হ্রদ বা বিলগর্নলি বর্ষার সময় প্রায় সাগরের রূপ নেয়। এই বিলগর্নলোকে তাই বলা হতো সাগর বা সায়র যা থেকে শ্রীহট্টে 'হাওর' কথাটি এসেছে।

শ্রীহট্টের প্রাচীন একটি নাম ছিল শিলিচটল কিংবা শিহলিচট্টলো—এ তথ্য আমরা পাচ্ছি হিউয়েন সাঙএর বিবরণে। কালক্রমে এই নামই শিলিচট্ এবং মর্সলমান আমলে শিলহাট্ বা শিলহট্ট হয়ে দাঁড়ায়। সর্রমা নদীর তীরে শ্রীহট্ট বা সিলেট শহর প্রাচীন কাল থেকেই বাণিজ্যকেন্দ্র এবং সমৃদ্ধ বন্দর বলে প্রসিদ্ধি লাভ করে। প্রচুর পণ্যের লেনদেন, কেনাবেচা চলত এখানকার বন্দর-বাজারে বা হাটে। অনেকের মতে এই হাট বা হট্টের লক্ষ্মীশ্রী ("শ্রীহট্ট লক্ষ্মীর হাট আনন্দের ধাম......" ইত্যাদি, কবি প্যারিচরণ দাশ) থেকেই শ্রীহট্ট নামের উৎপত্তি। হিন্দর্র পর্রাণ অনর্যায়ী কিন্তু এই জেলা সতীর বামজঙ্ঘা বা মহালক্ষ্মীর পদাঙ্কিত 'শ্রীক্ষেত্র' বলেও আখ্যাত হয়েছে। এই শ্রীক্ষেত্রই শ্রীহট্ট হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। দর্'তিনশ বছর কিংবা তারও আগের বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থে শ্রীহট্ট এবং শিলিচট দর্টি নামই আছে। আধর্নিক যর্গে অর্থাৎ ইংরেজ আমলে এই নামই হয় সিলেট।

বরবক্র (বরাক), মনর্, সর্রমা, ক্ষমা (খোয়াই) প্রভৃতি নদীর স্রোতধারায় বিধৌত শ্রীহট্ট পৌরাণিক যর্গ থেকেই হিন্দর্র তীর্থভূমি বলে সম্মানিত হয়ে আসছে। এই নদীগর্নলি পর্ণ্যসলিলা বলে প্রাচীনকাল থেকে পর্জিত। মনর্নদী সম্পর্কে পৌরাণিক কিংবদন্তী আছে যে, মনর্ এই নদীতীরে শিবপর্জা করেছিলেন:

পর্রা কৃতযর্গে রাজন্ মনর্না পর্জিতঃ শিবঃ
তত্রৈব বিরলে স্থানে মনর্নাম নদীতটে।
—সংস্কৃত রাজমালা।

পর্রাণ হতে শর্রর্ করে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম-দিগ্বিজয়ের যর্গযর্গান্তের কাহিনী কিংবদন্তীর স্মৃতিজড়িত স্থানগর্নলি ছড়িয়ে আছে তীর্থময় শ্রীহট্টে। ভারতের চৌষট্টিটি (মতান্তরে একান্ন বা বাহান্নটি) তান্ত্রিক মহাপীঠের মধ্যে দর্'টি বামজঙ্ঘা মহাপীঠ জয়ন্তীয়ার বাউরভাগ (বাম+উরর্+ভাগ=বাউরভাগ) পরগণায় 'ফালাজোরের কালীবাড়ী' নামে কথিত। গ্রীবাপীঠ শ্রীহট্ট শহরের মাইল দেড়েক দক্ষিণে গোটাটিকরের জৈনপর্রে অবস্থিত।

শ্রীহট্টে পড়িল গ্রীবা মহালক্ষ্মী দেবী।
সর্বানন্দ ভৈরব বৈভব যাহা সেবি।
—অন্নদামঙ্গল—ভারতচন্দ্র রায় গর্ণাকর।

তাছাড়া খোয়াই নদীতীরে সায়েস্তাগঞ্জের নিকট 'ভুবনেশ্বর মহাদেব' (এখানে দেবীর নখটি অঙ্গর্রীয়ক পড়েছিল বলে এ ভুবনেশ্বর নবরত্ন উপপীঠ নামেও খ্যাত) এবং উত্তর শ্রীহট্টের বালাগঞ্জ (সতীর বালা পড়েছিল বলে এই নাম হয়) প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। অনেকের মতে উপরোক্ত এই জয়ন্তীয়াই ছিল মহাভারতে বর্ণিত নারী-রাজ্য। কথিত আছে এই রাজ্যের অধীশ্বরী প্রমীলা অর্জর্নের অশ্ব বেঁধে রেখেছিলেন। অর্জর্ন প্রমীলাকে বিয়ে করে যর্ধিষ্ঠিরের যজ্ঞের অশ্ব মর্ক্ত করেন। সে যাই হোক, পৌরাণিক এই সব উক্তি ও আখ্যায়িকার ঐতিহাসিক দিকটা তাৎপর্যপর্ণ। পর্রাণের ইতিকথাটর্কু ছেঁটে ফেললে যা পাওয়া যায়, তাতে শ্রীহট্টভূমির প্রাচীনত্বই স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং আরও প্রমাণ করে যে, স্মরণাতীত যর্গ থেকেই এখানে বিস্তৃত জনবসতি ছিল, যার জন্য রামায়ণ-মহাভারতীয় মহাকাব্যের যর্গেও শ্রীহট্ট দূরপ্রান্তের ভারতীয়দের অজানা বা অগম্য ছিল না।

শ্রীহট্টের উত্তর-পশ্চিমে ভারতের পূর্বপ্রান্তে বিস্তৃত ছিল যে বিখ্যাত প্রাচীন রাজ্য, তারই নাম প্রাগজ্যোতিষপর্র বা কামরূপ। প্রাচীন প্রাগজ্যোতিষ বলতে অধর্না আসামের কামরূপ ছাড়াও আরও অনেক বিস্তৃত অঞ্চল বোঝাত। বরেন্দ্রভূমির (উত্তর-পূর্ববাংলার) এক বিশাল জনপদ নিয়ে গঠিত ছিল প্রাগজ্যোতিষ।

ঢোল কোম্পানীর
দাদ ও কাউরের
অব্যর্থ মলম
বরানগর • কলিকাতা

সর্বপ্রকার বই ও ম্যাগাজিনের জন্য
ম্যানকাইণ্ড
৫১বি রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৬

বীরেশ্বর ভট্টাচার্যের
এবার পূজায় সেরা বই!
মহাভারতের গল্পগুচ্ছ

স্বপনবুড়োর সফর

পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর
ছোটদের আরব্য উপন্যাস

তারাপদ রাহার
ছোটদের বেতাল পঞ্চবিংশতি

এ. কে. সরকার এণ্ড কোং
কলেজ স্কোয়ার • কলিকাতা-১২

যদি আপনি
পেপস্
গলার ও বুকের
বড়ি গ্রহণ করেন
পেপস্ মুখে রেখে চুষবেন। এর আরোগ্যকারী ভাপ গলা ব্যথা, বীজাণু সর্দি কাশী কি ভাবে দূর করে তা লক্ষ করুন। পেপস্ সঙ্গে সঙ্গে আরামদান করে ও জীবাণু ধ্বংস করে।

কোন প্রকার
বিপজ্জনক ড্রাগ নেই
শিশুদেরও নির্বিঘ্নে
দেওয়া চলে
সত্বর বিরাময় করে
ব্রণকাইটিস্,
গলার ক্ষত,
সর্দি,
কাশি ইত্যাদি
সব ঔষধ বিক্রেতার
নিকট পাওয়া যায়
সি. ই. ফুলফর্ড (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ
FPY-55-BEN

পরিবেশক—মেসার্স ফেল্প এণ্ড কোং লিঃ
১২সি চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১২

তাম্রলিপি ইত্যাদির সাক্ষ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রাগজ্যোতিষের রাজধানী বিভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত ছিল। কামরূপের পালবংশীয় দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধের রাজা ধর্মপালের (গৌড়েশ্বর ধর্মপাল নন) সময়ে এই রাজ্যের রাজধানী 'দুর্জয়া' (বর্তমান গৌহাটী) থেকে স্থানান্তরিত হয় এবং ধর্মপালের তাম্রশাসনে তখনই প্রথম প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজধানী হিসেবে 'কামরূপনগর' নামটির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই কামরূপ পরে কামতা নামে অভিহিত হয়। 'আসাম বুরঞ্জীতে' 'কমতা' নামটি আছে। কালিকাপুরাণ অনুযায়ী কেউ কেউ বলেন, কামাখ্যাদেবীর অপর নাম 'কামদা' হ'তে কামতা হয়েছে। আবার কালিকাপুরাণেই আছে 'ভগবতীর অপর এক নাম কামরূপা'। এই কামতা-নগর ছিল রংপুর জেলার সীমানায় কোচবিহার রাজ্যের মধ্যে। কোচবিহার রাজধানীর ১৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এর ভগ্নাবশেষ আজও দেখা যায়। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে রংপুর জেলার ডিমলার নিকট একটি প্রাচীন নগরের চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়। এই স্থানেই কামরূপের কোন একজন রাজা 'ধর্মপাল নগরের' পত্তন করেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। ডাঃ বুকানন হ্যামিল্টন এই সম্বন্ধে লিখেছেন,—

"Dharma Pal's city about two miles from a bend in the Tista, a little below Dimla (in Rangpur District) are the remains of a fortified city said to have been built by Raja Dharma Pal, the first king of the Pal dynasty in Kamrup."

হ্যামিল্টনের বর্ণিত 'ধর্মপাল নগর' করতোয়া নদীর পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল বলে অনুমিত হয়। নরক-ভগদত্তের আমল থেকে এমন কি মুসলমান আক্রমণের সময় (ত্রয়োদশ-পঞ্চদশ শতক) পর্যন্ত করতোয়া ছিল কামরূপের স্থায়ী পশ্চিম সীমারেখা। এডোয়ার্ড গেইট তাঁর 'হিস্টোরী অব আসাম' গ্রন্থে এই কথাই বলেছেন (পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের 'কামরূপ শাসনাবলী'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। এই করতোয়া বা কলোতু নদী পেরিয়েই হিউয়েন সাঙ ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে ভাস্করবর্মার রাজ্য কামরূপে প্রবেশ করেন। জাতিতত্ত্বারিধী গ্রন্থে (২৬০ পৃঃ) মৈমনসিং ও শ্রীহট্টকে প্রাগজ্যোতিষ রাজ্য-ভুক্ত বলা হয়েছে। মনীষী রমেশচন্দ্র দত্তও বলেছেন যে, প্রাচীন কামরূপের সীমানা শ্রীহট্ট ও মৈমনসিংএর কিছুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হিউয়েন সাঙএর ভারত বিবরণীর ইংরেজ ভাষ্যকার বিলও তাই বলেছেন—

(Buddist Records of the Eastern countries — footnote — Vol. II p. 195).

কামাখ্যাতন্ত্র এবং যোগিনীতন্ত্রে (আঃ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক) শ্রীহট্ট ও কামরূপের যে সীমা নির্দেশ করা আছে তাতেও দেখি শ্রীহট্ট কামরূপের মধ্যবর্তী দেশ।

পূর্বে স্বর্ণ নদীশৈব দক্ষিণে চন্দ্রশেখরঃ।
লৌহিত্য পশ্চিমে ভাগে উত্তরেচ নীলাচলঃ।
এতন্মধ্যে মহাদেবি শ্রীহট্ট নাম্মো নামতঃ।
—যোগিনীতন্ত্র।

আজও শ্রীহট্টে জনশ্রুতি আছে যে, প্রাগ-জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত ছিলেন এই দেশেরও রাজা। ভগদত্ত রাজার বাড়ি বলে আজও স্থানীয় লোকেরা লাউড পাহাড়ের একটি উঁচু জায়গা দেখিয়ে থাকে। এছাড়া শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ড পরগণার নিধনপুরে ভাস্করবর্মার যে তাম্রশাসনখানি পাওয়া

গেছে তা থেকে বরেন্দ্রভূমির মধ্য দিয়ে শ্রীহট্টে মৈথিলীয় ব্রাহ্মণদের আগমনের কথা জানা যায়। এই সব কারণে অনুমান করা হয় যে, শ্রীহট্ট ছিল প্রাচীন প্রাগজ্যোতিষের রাজ্যপাশে বাঁধা। অবশ্য এই অনুমানের স্বপক্ষে কোন সন্দেহাতীত প্রমাণ-নিদর্শন নেই। সুপণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন, "তখন (অর্থাৎ ভাস্কর বর্মণের রাজত্বকালে) শ্রীহট্ট একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়েন চোয়াং যিনি ভাস্করবর্মার সময়েই কামরূপেও আসিয়াছিলেন;—সমতট পরিভ্রমণ সময়ে যে ছয়টি রাজ্যের নাম শুনিয়াছিলেন তাহার প্রথমটির নাম ছিল—'শিহলিচটলো', ইহা সমতটের সংলগ্ন পূর্বোত্তর দিকে অবস্থিত ছিল, ইহাই শ্রীহট্ট। যে যোগিনীতন্ত্রে কামরূপের সীমা নির্দেশ দেখিয়া তন্মধ্যে শ্রীহট্টের অবস্থান নিরূপিত হইয়া থাকে তাহাতেই কামরূপের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীহট্টের পৃথক নির্দেশ রহিয়াছে।

এ স্থানয়া পূর্বে মার্গে চ কামরূপম্
বিজানিহি
শ্রীহট্টমপি পূর্বে চ...।

—যোগিনীতন্ত্র দ্বিতীয়ার্ধ প্রথম পটল।

অপিচ যোগিনীতন্ত্রে বিশ্বসিংহের নাম আছে—ইনি ষোড়শ শতাব্দীর লোক; ঐ সময় তো শ্রীহট্ট মুসলমানদের অধিকারভুক্তই ছিল। ফলত যোগিনীতন্ত্রের সীমা কোনও রাষ্ট্রীয় সীমানা (political boundary) নহে, ইহা মনুসংহিতোক্ত আর্যাবর্ত, ব্রহ্মাবর্ত ইত্যাদির নাম একটা পৌরাণিক ভূবিভাগের নির্দেশক মাত্র।" (কামরূপ শাসনাবলী পৃঃ—৪-৫)। যাই হোক, প্রাচীন পুঁথিপত্রের সাক্ষ্য এবং কিংবদন্তীর সূত্র থেকে মনে হয়, সপ্তম শতক, অর্থাৎ ভাস্করবর্মার রাজত্বকাল পর্যন্ত কামরূপের সঙ্গে শ্রীহট্টের নিকট-অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক ছিল, হয়ত বা কোন বিস্মৃত যুগে শ্রীহট্ট ছিল এই কামরূপেরই একসূত্রে গাঁথা, প্রতিবেশী মিত্ররাজ্য।

বাংলার পূর্বাঞ্চলে একটি প্রাচীন রাজ্যের নাম ছিল হরিকেল। নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস'এ (পৃঃ ১৩৯—৪০ দ্রঃ) বলা হয়েছে, "...সাক্ষ্যপ্রমাণ হইতে মনে হয়, হরিকেল সপ্তম অষ্টম শতক হইতে দশম-একাদশ শতক পর্যন্ত বঙ্গ এবং সমতটের সংলগ্ন কিন্তু স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল।" সমসাময়িক পুঁথিপত্রে এই রাজ্যের সভ্য-সংস্কৃতির পরিচয় মেলে। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংগৃহীত রুদ্রাক্ষ মাহাত্ম্য এবং রূপচিন্তামণিকোষ (পঞ্চদশ শতক) দুটি পান্ডুলিপিতে শ্রীহট্ট এবং হরিকেল দেশকে এক এবং সমার্থক বলা হয়েছে। রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী (নবম-দশক শতক) গ্রন্থে হরিকেল দেশের মেয়েদের খুব প্রশংসা করা হয়েছে এবং রাঢ় ও কামরূপের মেয়েদের চেয়ে গুণসম্পন্না বলা হয়েছে এবং তারা যে পূর্বদেশবাসিনী, তারও ইঙ্গিত রয়েছে। ডাকার্নব গ্রন্থে বলা হয়েছে, হরিকেল চৌষট্টিটি তান্ত্রিক পীঠের একটি। উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীহট্টও তান্ত্রিক পীঠভূমি। চৌষট্টি পীঠের মধ্যে এ-জেলায় রয়েছে দুটি মহাপীঠস্থান—একথা আগে বলা হয়েছে। উপরোক্ত পুঁথিপত্রের উল্লেখ থেকে তাই ইতিহাসবিদরা সিদ্ধান্ত করেন যে, শ্রীহট্টই ছিল এই প্রাচীন হরিকেল। সেযুগের একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ জনপদ বলে হরিকেলের খ্যাতি অনেকদূর, এমন কি, গুজরাট পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। দ্বাদশ শতাব্দীর গুজরাটী কোষকার হেমচন্দ্র তাঁর অভিধান-চিন্তামণিতে এই জনপদের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে হরিকেল বলতে সম্ভবত সমগ্র শ্রীহট্ট জেলা বোঝায়নি। মধ্যযুগে, মোটামুটি সপ্তম হতে একাদশ শতকের যুগে হরিকেলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব জানা যায়। হরিকেল রাজ্যের অস্তিত্ব যুগান্তব্যাপী যদি স্থায়ী হতো এবং সমগ্র শ্রীহট্টে ব্যাপ্তিলাভ করতো, তবে শ্রীহট্টের ইতিহাসে নানাভাবে এবং বহুল উল্লেখ নিশ্চয়ই পাওয়া যেতো। অতীতে, তাই মনে হয়, শ্রীহট্টের কোন খণ্ডাংশই এই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কারণ শ্রীহট্ট তো তখন গৌড়, জয়ন্তীয়া ও লাউড়—এই তিনটি প্রধান খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। শ্রীহট্টের পশ্চিমাংশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল লাউড় রাজ্য। মৈমনসিং জেলার কিছুদূরে পর্যন্ত প্রসারিত ছিল এই রাজ্যের সীমানা। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এই লাউড় রাজ্যের সভ্যতা-সংস্কৃতি এক সময় ব্যাপ্তিলাভ করেছিল সমগ্র পূর্ববঙ্গাঞ্চলে। সপ্তম হতে একাদশ শতক অবধি স্বতন্ত্র রাজ্য হিসেবে হরিকেলের অস্তিত্বের যুগে লাউড় এই রাজ্যের একীভূত ছিল বলে অনুমান করা বোধ হয় অনৈতিহাসিক হবে না। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের চন্দ্রদ্বীপ অধিকারের পর থেকেই হরিকেল বঙ্গের অংশ বলে গণ্য হয়। চন্দ্রদ্বীপ, অর্থাৎ শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, মৈমনসিং—পূর্ববঙ্গের এই জেলাগুলির অংশবিশেষ নিয়েই যে হরিকেলি জনপদ বিস্তৃত ছিল, পুঁথিপত্রের ইঙ্গিত থেকে এটাই সমর্থিত হয়।

শ্রীহট্টের সমুন্নত সভ্যতার একটি

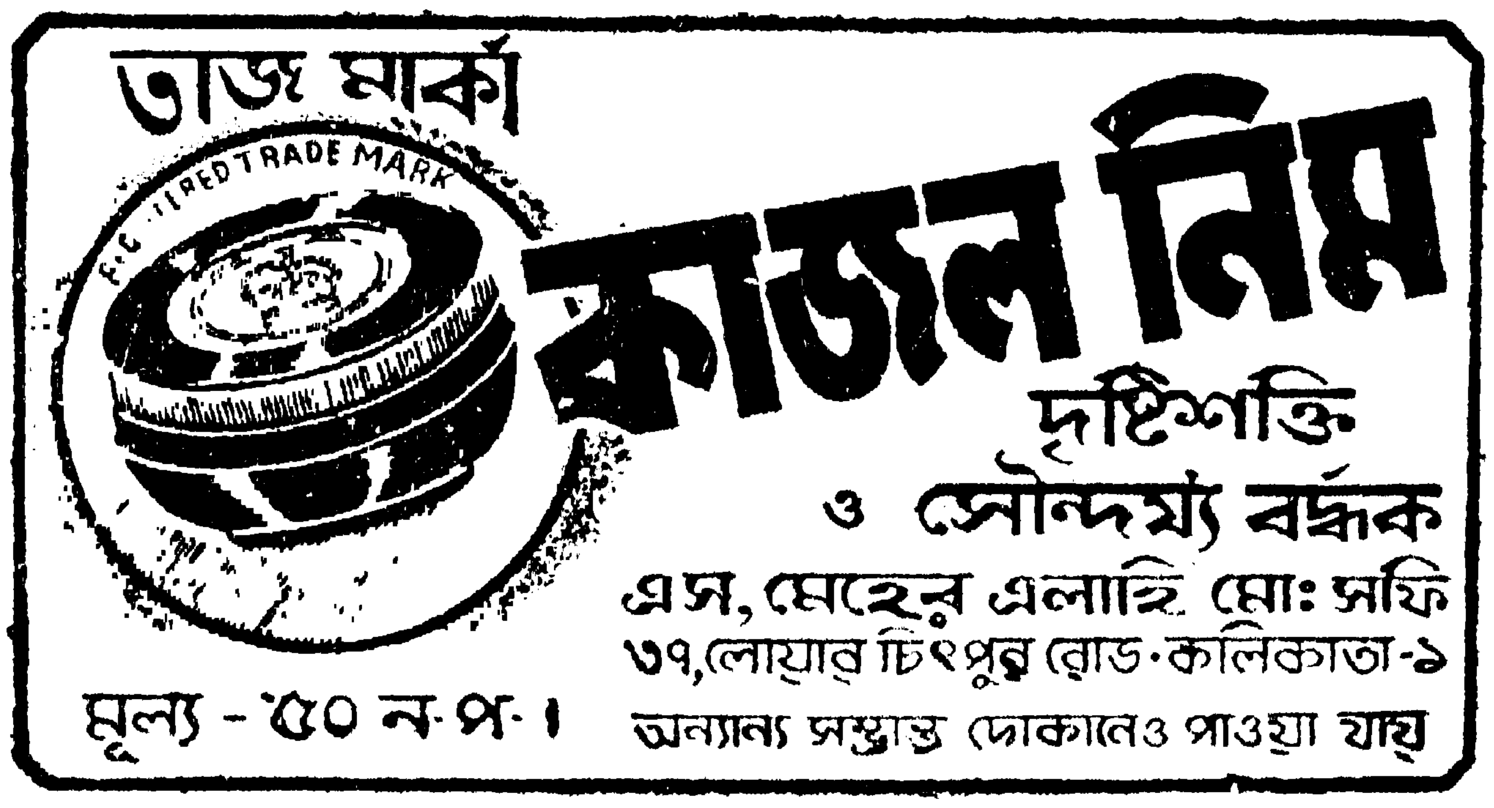

ঐতিহাসিক নিদর্শন 'ভাটেরার তাম্র-ফলক'। প্রায় একশ বছর আগে দক্ষিণ শ্রীহট্টের ভট্টভাটক বা ভাটেরার 'হোমের টীলা' নামক স্থানের মাটির নিচে এক মর্মর-মন্দিরের ভিত্তি ও দু'খানা তাম্রফলক পাওয়া যায়। তাম্রফলক দুটিতে চন্দ্র-বংশীয় এক প্রাচীন রাজবংশের উল্লেখ ও প্রশস্তি বর্ণিত হয়েছে। এই তাম্রলিপির বিবরণ থেকে আমরা শ্রীহট্টের এই অঞ্চলে একটি অতি প্রাচীন সভ্য ও সমৃদ্ধ জনপদের খবর পাই। সংস্কৃতে লিখিত ফলকের দেবনাগরী লিপি, 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস'-এর লেখক নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর লিপির অনুরূপ। কারণ কোন কোন অক্ষর বঙ্গাক্ষরের আদি-রূপ বলে মনে হয়। বাংলার এই পূর্বপ্রান্তে শ্রীহট্ট-ত্রিপুরা-মৈমনসিং অঞ্চলে যে জনসমৃদ্ধ বহুশতাব্দীর উন্নত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল, তা বিবিধ পুঁথিপত্রের উল্লেখ, অগণিত মূর্তি ও মৃৎপাত্র এবং লিপি ইত্যাদির সাক্ষ্য থেকে

মানুষ ও তার বিশ্বাস

মানুষের সব চেষ্টা, সব সাধনা বাসনার পেছনে রয়েছে
তার এক অনন্ত বিশ্বাস—যে বিশ্বাস তাকে বার বার জুগিয়েছে
প্রেরণা, দিয়েছে তাকে দুর্জ্জয় কর্ম্মের শক্তি; পাথরের
কঠিন বুক চিরে মানুষ এঁকেছে পথ, শান্ত জলের নিরব
ধারায় সে জাগিয়েছে বিদ্যুতের প্রাণস্পন্দন।...

এক জাগ্রত বিশ্বাস—যে বিশ্বাস সংসারে এনেছে সুখের
আনন্দ, মানুষকে দিয়েছে আরও বৃহত্তর কর্ম্মের সুযোগ, জীবনকে
করেছে অর্থমর্ম্মে সত্যাতে প্রতিষ্ঠিত।

আজ সমৃদ্ধির গৌরবে আমাদের পণ্যদ্রব্য এ দেশের
সমগ্র পারিবারিক পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন সুস্থ ও সুখী করে
রেখেছে। তবুও আমাদের প্রচেষ্টা এগিয়ে চলেছে
আগামীর পথে—সুন্দরতর জীবন মানের প্রয়োজনে মানুষের
চেষ্টার সাথে সাথে চাহিদাও বেড়ে যাবে। সে দিনের সে
বিরাট চাহিদা মেটাতে আমরাও সদাই প্রস্তুত রয়েছি আমাদের
নতুন মত, নতুন পথ আর নতুন পণ্য নিয়ে।

আজও আগামীতেও দশের সেবায় হিন্দুস্থান লিভার

PR. 6-X52 BG

নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। 'বাঙালীর ইতিহাসে' (পৃঃ ১২৮) তাই বলা হয়েছে, "শ্রীহট্ট জেলার পঞ্চখণ্ড অঞ্চলে প্রাপ্ত নিধনপুর তাম্রপাট্টালী (সপ্তম শতক) ভাটেরায় প্রাপ্ত গোবিন্দকেশবের পাট্টালী (একাদশ শতক), বন্দরবাজারে প্রাপ্ত লোকনাথের মূর্তি (দশম-একাদশ) এবং ত্রিপুরা জেলায় প্রাপ্ত লোকনাথের পাট্টালী (অষ্টম শতক), এবং তৎপরবর্তী অগণিত লিপি ও মূর্তি, ফরিদপুরে প্রাপ্ত ধর্মাদিত্য-গোপচন্দ্র ইত্যাদি পাট্টালী (ষষ্ঠ-সপ্তম শতক), ঢাকা জেলায় প্রাপ্ত অসংখ্য মূর্তি ও লিপি এই সব ভূখণ্ডে প্রাচীন-কাল হইতেই বহুদিনস্থিত সমৃদ্ধ সভ্যতা এবং জনাবাসের দ্যোতক। এই সব ভূখণ্ডের পুরাতন গঠন এবং ইহাদের অবলম্বন করিয়াই প্রাচীন বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতি পূর্বাঞ্চলে বিস্তার লাভ করিয়াছিল।"

শ্রীহট্টের প্রাচীন রাজ্যগুলির মধ্যে গৌড় ছিল অন্যতম। গৌড়ের সর্বশেষ হিন্দুরাজা গৌড়গোবিন্দ বিখ্যাত মুসলমান পীর শাহজালালের কাছে পরাজিত হবার পর গৌড় এবং প্রায় সমগ্র শ্রীহট্ট জেলা মুসলমান শাসনাধিকারে আসে। আসাম সরকারের প্রকাশিত ইতিহাস (B.C. Allen's Assam District Gazetters — Vol. II (Sylhet) এবং হাণ্টারের Statistical Accounts of Assam প্রভৃতির উল্লেখ অনুযায়ী শাহজালালের শ্রীহট্ট বিজয়ের ঘটনাকাল ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে। ফিরুজ শাহ্ তুঘলক তখন দিল্লীর সম্রাট। শাহজালালের সঙ্গে ৩৬০ জন আউলিয়া বা অনুচর এদেশে এসেছিলেন। শ্রীহট্টকে তাই বলা হতো তিনশ ষাট আউলিয়ার দেশ। হাণ্টার বলেন, ".... after the death of Shah Jalal the district was included in the kingdom of Bengal and put in charge of a Nabab." সমসাময়িক ঘটনাবলী থেকে মনে হয়, শাহজালালের সময় সমগ্র জেলার কোন কেন্দ্রীয় শাসন কায়েম হয়নি। আনুমানিক ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত শাহজালালই বর্তমান সিলেট শহরকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শাসন পরিচালনা করেছিলেন। তারপর বাংলার নবাবের পরোক্ষ প্রভাবাধীন হলেও তখনও শাহজালালের অনুগামী দরগার প্রধান কর্মাধ্যক্ষরাই সম্ভবত ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নিজেদের ক্ষুদ্র সেনা-বাহিনীর সাহায্যে সিলেট শহরসহ এই অঞ্চল শাসন করতেন। শাহজালালের পরে তাঁর সেনাপতি সিকান্দার গাজী এবং তারপর হায়দর গাজী হন শ্রীহট্টের শাসনকর্তা। শ্রীহট্টে তখনও ছোট-বড় অনেকগুলো স্বাধীন, অর্ধ-স্বাধীন বা সামন্ত রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। বাংলার নবাব সৈয়দ হুসেন শাহের সময়েই (১৪৯৬—১৫২০) শ্রীহট্ট কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে আসে এবং বাংলার রাজনীতিক মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়।

হিন্দু-মুসলমান সভ্যতার দুটি ধারা এসে মিলিত হয়েছে শ্রীহট্টের সংস্কৃতি-সঙ্গমে। দরবেশ শাহজালাল ও শ্রীচৈতন্যের স্মৃতি জড়ানো এ-জেলা ছিল উভয়েরই পুণ্যভূমি। হিউয়েন সাঙ, ইবন বতুতা (চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধ) প্রভৃতি বিদেশী পর্যটকরা শ্রীহট্ট দর্শন না করে তাঁদের ভারত পরিক্রমা সমাপ্ত হলো মনে করেননি। শাহজালালের স্থাপিত সিলেট শহরের দরগা হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মিলিত পূজো পেয়ে এসেছে। শ্রীহট্টে যে অতি প্রাচীনকালেই আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তারলাভ করেছিল, তা আজ সর্বজনস্বীকৃত—তার প্রমাণ রয়েছে ত্রিপুরার রাজা অনাদিবর্মা এবং রাজা ধর্মধর কর্তৃক যথাক্রমে ৬৪১ খৃষ্টাব্দে ভানুগাছ পরগণায় মঙ্গলপুর গ্রামে এবং দ্বাদশ শতকে কৈলাড়গড়ে বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে। সপ্তম শতকেই যে শ্রীহট্টে মৈথিল স্মৃতি প্রচলিত হয়, তার সাক্ষ্য দিচ্ছে নিধনপুর তাম্রলিপি। শ্রীহট্টের শাস্ত্রীয় ও সামাজিক ধ্যান-ধারণা, আচার-অনুষ্ঠানে মৈথিল বাচস্পতি মিশ্রের স্মৃতি বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে। সুতরাং শ্রীহট্টে একদিকে যেমন সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা ছিল, অন্য দিকে তেমনি শাহ-জালালের সময় থেকে আরবী-ফার্সীর প্রভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে শ্রীহট্টের কথ্যভাষায় একদিকে এসেছে শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য, অন্যদিকে উর্দুর প্রাচুর্য। এই মিলিত ঐতিহ্য শ্রীহটীয় সংস্কৃতিকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

গ্রীষ্ম দিনে-ও
স্নিগ্ধ সজীবতা

গ্রীষ্মের খরতাপে ক্লেদাক্ত আবহাওয়ায় আপনি যখন বিব্রত তখন আপনার একান্ত প্রয়োজন বোরোলীনের মতো মিষ্টি আর স্নিগ্ধ ফেস্ ক্রীম। ল্যানোলিন-যুক্ত বোরোলীন ত্বকের গভীরের সমস্ত মালিন্য দূর ক'রে আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য বাড়িয়ে আপনার ত্বক-কে স্নিগ্ধ ও সজীব ক'রে তুলবে।

বোরোলীন
পরম প্রসাধন

প্রস্তুতকারক:
জি. ডি. ফার্মাসিউটিক্যালস্ প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৩

আইন-ই-আকবরি, রিয়াজ-উস-সালাতিন (১৭৮৮ খৃঃ) প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীহট্টকে বঙ্গদেশের অন্তর্গত বলা হয়েছে। আইন-ই-আকবরিতে উল্লেখ আছে যে, আকবরের সময় শ্রীহট্ট সহ সুবা বাংলা ২৪টি সরকার (জেলা) এবং ৭৮৭টি মহল নিয়ে গঠিত ছিল। পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের পর বাংলার সাথে শ্রীহট্টও ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা ছিল ঢাকা বিভাগের মধ্যে। এই সময়েই ইংরেজ সরকার আসামকে চীফ কমিশনারের অধীন একটি পৃথক প্রদেশরূপে গঠন করার সিদ্ধান্ত করে। শ্রীহট্টের অধিবাসীদের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও এই জেলাকে আসাম প্রদেশে সংযুক্ত করা হয়। অচ্যুতচরণ চৌধুরীর 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' থেকে প্রসঙ্গটি উদ্ধৃত করছিঃ

"প্রাচীনকালাবধি শ্রীহট্ট বঙ্গের অঙ্গরূপে ঢাকা বিভাগের কমিশনারের অধীন ছিল; ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আসাম প্রদেশে

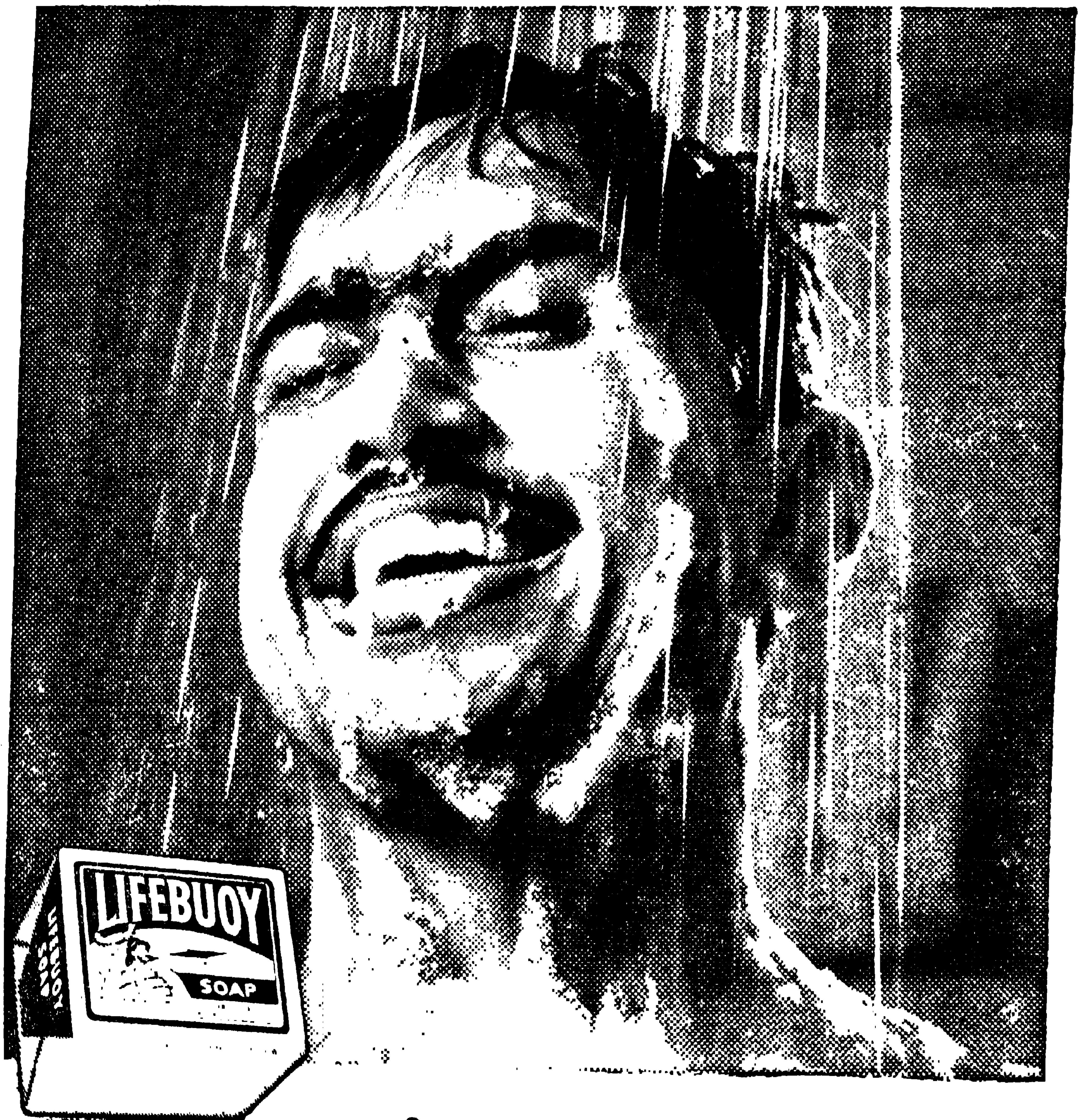

লাইফবয় যেখানে
স্বাস্থ্যও সেখানে!

সত্যিই, লাইফবয় মেখে স্নান করতে কি আরাম! শরীরটা তাজা আর ঝরঝরে রাখতে লাইফবয় সাবানের তুলনা নেই। ঘরে বাইরে ধূলো ময়লা লাগবেই লাগবে। লাইফবয় সাবানের চমৎকার ফেনা ধূলো ময়লা রোগ বীজাণু ধুয়ে দেয় ও স্বাস্থ্যকে রক্ষা করে। পরিবারের সবার স্বাস্থ্যের যত্ন লাইফবয়ে।

L. 20-252 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

পৃথক চিফ্ কমিশনার নিয়োগ করার বিষয় স্থির হইলে দেখা গেল যে, আসামের আয় নিতান্ত অল্প প্রযুক্ত চিফ্ কমিশনারীর ব্যয়সংকুলান হইবে না, এইজন্য আয়-বহুল শ্রীহট্ট জিলাকেও আসাম প্রদেশভুক্ত করা হয়। ঐ সময় লর্ড নর্থব্রুক ভারতের গভর্নর জেনারেল. তিনি শ্রীহট্টে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীহট্টবাসী আইনবর্জিত আসামের অধীনে যাইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিল, তাহারা আপনাদের অসুবিধা ও দুঃখ-কাহিনী বর্ণন করিয়া লর্ড বাহাদুরের নিকট এক আবেদন করিয়াছিল. লর্ড নর্থব্রুক যদিও তাহাদের সঙ্গত প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নাই. তথাপি তিনি প্রতিশ্রুত হন যে. শ্রীহট্টের বিধি-ব্যবস্থা পূর্ববৎ অব্যাহত থাকিবে। রাজস্ব সংগ্রহ ও ভূমি বন্দোবস্তে বাঙ্গলার সর্বত্র যে নীতি প্রচলিত. শ্রীহট্টে কদাপি তাহার ব্যভিচার ঘটিবে না. শ্রীহট্টে আসামের শাসন প্রণালী অনুসৃত হইবে না।

'ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী শ্রীহট্টবাসীবর্গের আবেদনের প্রত্যুত্তরে শ্রীহট্টের কালেক্টর সাহেবকে এই চিঠি লিখেন ঃ

Fort William
The 5th September, 1874

Sir,

1. His Excellency the Governor General in council directs me to acknowledge through the Government of Bengal, receipt of the memorial signed by certain inhabitant of the District of Sylhet against the transfer of that district to Assam. The memorial begins by an allusion to the Bill which has since passed into Law, for the transfer of certain powers from the Bengal Govt. to the Government of India and the impression of the memorialists seems to be that this law will effect some material change in the system under which they have been hitherto administered.

2. In reply I am to explain for the information of the memorialists that this law has only given formal completion to a decision which has been passed after long and careful consideration. It was recommended by to late Lieunt. Governor Sir George Campbell and it has been sanctioned by the Secretary of State after due regard to all the considerations set forth in the memorial under acknowledgement. But neither the transfer of the district nor the passing of an act which formally withdraws the district from the jurisdiction of certain authorities in Bengal will make any substantial change in the mode of administering Sylhet. There will 'certainly be no change' whatever in the system of law and judicial procedure under which inhabitants of Sylhet have hitherto lived nor in the principles which apply throughout Bengal to the settlement and collection of land revenue.

3. His Excellency the Governor-General in council regrets therefore that he cannot accede to the prayer of memorialists, and I am to request that his honour the Lieutt. : Governor may be pleased to cause this reply to be communicated to them."

(শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—পূর্বাংশ ২ ভাগ ৫ম খণ্ড—পৃঃ ৫৮-৫৯)

শ্রীহট্ট জেলাকে বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আসামে কেন জুড়ে দেওয়া হয়েছিল, এই চিঠি তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। চিঠিটি বিদেশী সরকারের জবরদস্তি নীতির একটি অদ্ভুত নিদর্শন। শ্রীহট্টের অধিবাসীদের বিভ্রান্ত করার জন্যে এ ছিল এক বিরাট ধাপ্পা। চিঠিটির অন্তর্লীন কূট-নৈতিক চালাকিটি সুকৌশলে চেপে যাওয়া হয়েছে। আইনটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, 'formal completion to a decision' এবং 'there will certainly be no change' এই বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। ইংরেজ সরকারের আসল উদ্দেশ্য ছিল, বৃহত্তর বাংলার জাতীয় সংহতিকে বিধ্বস্ত ও বিক্ষিপ্ত করে দেওয়া। বাংলাদেশকে আয়ত্তাধীনে রাখা ইংরেজের কাছে ছিল এক বিরাট সমস্যা। বাঙালীর দেশাত্মবোধ ও জাগ্রত জাতীয়তাবোধ সারা ভারতকে নেতৃত্ব দিচ্ছিল স্বাধীনতার সংগ্রামে, উদ্বুদ্ধ করছিল জাতীয় আদর্শে। বাংলাদেশের এই বর্ধিষ্ণু জাতীয় চেতনার জন্যেই ইংরেজ ভীত হয়ে উঠেছিল। বাঙালীর এই ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে ভেঙে দু-টুকরো করতে ইংরেজ তাই আবার ১৯০৫ সালে ঢাকা শহরকে রাজধানী করে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে এক স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর শ্রীহট্ট এই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু সারা বাংলা জুড়ে বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামী বিক্ষোভ লর্ড কার্জনের 'settled fact'কে un-settled করে দিলে ভাঙা বাংলা আবার জোড়া লাগে। শ্রীহট্ট ও কাছাড় কিন্তু তবু আসামভুক্তই থেকে যায়। শাসনতান্ত্রিক সুবিধের জন্য শ্রীহট্ট জেলাকে আসামে জুড়ে দেওয়ার যুক্তি ইংরেজ দিয়েছিল। কিন্তু তারা অস্বীকার করেছিল, বাংলার সাথে শ্রীহট্টের চিরকালের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক একাত্মতা, জন ও জাতিগত সমতা, সমাজ ও সংস্কৃতির সহমর্মিতা, ভাষা ও ভাবের বন্ধন। রাজ্য শাসনের যে দোহাই তারা দিয়েছিল সে যে একান্তই বিদেশী শাসকের স্বার্থে, আমাদের জাতীয় স্বার্থে নয়, এতো সুস্পষ্ট। বাংলাদেশ থেকে শ্রীহট্ট জেলার নির্বাসিত হওয়ার এবং আসামভুক্তির এই হলো সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বিদেশী বণিকের চক্রান্তে বাংলার রাজনৈতিক মানচিত্র থেকে শ্রীহট্টের নির্বাসন হয়েছিল সত্যি, কিন্তু সাংস্কৃতিক মানচিত্রের সঙ্গে তার আঙ্গিক বন্ধন কোনদিনই ছিন্ন হয়নি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বাণীতে এ-কথাই অমর হয়ে থাকবে ঃ

মমতাবিহীন কালস্রোতে
বাঙলার রাষ্ট্রসীমা হতে
নির্বাসিতা তুমি
সুন্দরী শ্রীভূমি।
ভারতী আপন পুণ্য হাতে
বাঙালীর হৃদয়ের সাথে
বাণীমাল্য দিয়া
বাঁধে তব হিয়া।
সে বাঁধনে চিরদিন তরে তব কাছে
বাঙলার আশীর্বাদ গাঁথা হয়ে আছে।

নারায়ণ চক্রবর্তীর
তীর্থাঞ্জলি
ভারত - ব্রহ্ম - চীনের বিস্তৃত পটভূমিকায় লেখা অনন্যসাধারণ রহস্য-উপন্যাস। ৩.০০
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২ ও অন্যান্য পুস্তকালয়।

ঔপনিষদ
চিত্রিতা দেবী প্রণীত (লীলা পুরস্কারপ্রাপ্ত)
নূতন উপনিষৎ সংযোজিত
বহু প্রতীক্ষিত ২য় সংস্করণ
মূল্য—৫, টাকা
প্রাপ্তিস্থান ঃ শ্রীশঙ্কর পাবলিশার্স
১৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
ও অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

বিশেষ আকর্ষণ
খাটী গরুর দুধের সাদা চিনি পাতা
● টাটকা দই
ঘরে কাটান ছানার টাটকা
● স্পঞ্জ রসগোল্লা
কমলা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার
প্রায় অর্ধশতাব্দীর প্রতিষ্ঠান
আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিঃ-৯
ফোন ঃ ৩৪—১৩৭৯

বনস্পতি রঙ করার কি দরকার?

কেউ কেউ বলেন যে বনস্পতি রঙ করা উচিত, যাতে ঘিয়ে ভেজাল হিসেবে বনস্পতি ব্যবহার করলে সহজেই তা ধরা যায়।

কিন্তু খাবার জিনিসে মেশাবার মত এমন কোন রঙ নেই যা বনস্পতিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। অবশ্য বনস্পতিতে ৫ শতাংশ তিলের তেল থাকায় ঘিয়ের মধ্যে ৫ শতাংশ বনস্পতি ভেজাল দিলেও একটি সাধারণ রাসায়নিক পরীক্ষায় সহজেই তা ধরা পড়ে।

বনস্পতি ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তার জন্যে

একথা সত্য যে, ঘি ব্যবহারকারীদের স্বার্থরক্ষার জন্যে বনস্পতি রঙ করার প্রস্তাব করা হচ্ছে, কিন্তু যে-রঙ মেশানো হবে তা যাতে লক্ষ লক্ষ বনস্পতি ব্যবহারকারীর স্বাস্থ্যের অনিষ্ট না করে, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়াও একান্ত প্রয়োজন। যে রঙই মেশানো হোক, তা ১৯৫১ সালে ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত "ঘি অ্যাডালটারেশন কমিটির" মৌলিক শর্তাবলী অনুযায়ী হওয়া চাই। তার প্রধান প্রধান শর্তগুলি হল :

১। "রঙটি বনস্পতিতে সহজেই মিশে যাওয়া দরকার।

২। "বনস্পতিতে মেশানোর পর বনস্পতির যে রঙ হবে তা দেখতে মনোরম হওয়া চাই।

৩। "রঙটি পাকা হবে এবং রাসায়নিক বা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় যেন সহজে পৃথক করা না যায়।

৪। "উত্তাপে যেন রঙের পরিবর্তন না হয় এবং রান্নার তাপেও (প্রায় ২০০° সেঃ) নষ্ট না হয়।

৫। "দীর্ঘদিন ব্যবহারেও রঙের দরুণ যেন বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া না জন্মায় কিংবা অনিষ্ট না হয়।"

খাবার জিনিসে সাধারণতঃ যে সব রঙ ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে কোন রঙই এই সমস্ত শর্ত পূর্ণ করে না। সেগুলি হয় বনস্পতিতে মেশেনা অথবা সহজেই বনস্পতি থেকে পৃথক করা যায়। পাকা সিন্থেটিক রঙে বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় কিংবা ক্যান্সার রোগ জন্মায়। সুতরাং বনস্পতিতে মেশাবার উপযুক্ত রঙ এখনো পাওয়া যায়নি।

জগতের বৈজ্ঞানিকদের দৃঢ় অভিমত এই যে, খাদ্য কিংবা পানীয় জিনিসে রঙ মেশানো উচিত নয়। কারণ, বহু বছর নির্দোষ ব'লে ব্যবহৃত অনেক রঙ পরে ক্যান্সার রোগের সৃষ্টি করে ব'লে প্রমাণ পাওয়া গেছে। সব উন্নত দেশেই খাদ্য ও পানীয়ে মেশাবার উপযুক্ত রঙের সংখ্যা ক্রমে কমিয়ে আনা হচ্ছে।

ঘিয়ে ভেজালের সমস্যা

যতদিন ঘিয়ে ভেজাল দেবার জন্যে কাঁচা বা পরিশোধিত তেল, জান্তব চর্বি ইত্যাদি জিনিষ সহজেই পাওয়া যাবে ততদিন কেবল বনস্পতি রঙ ক'রে ঘিয়ে ভেজাল বন্ধ করবার আশা বৃথা।

ঘিয়ে ভেজালের সমস্যা এদেশে খাদ্যে ভেজাল দেবার বিরাট সমস্যার একটা অংশ মাত্র। ১৯৫৪ সালের "খাদ্য ভেজাল নিরোধ আইন" এবং তার অন্তর্গত নিয়মাবলী খাদ্যে ভেজাল নিবারণের উদ্দেশ্যে রচিত। এই আইন যত কড়াভাবে প্রয়োগ করা হবে ততই খাদ্যে ভেজাল নিবারণের চেষ্টা সার্থক হবে। তাছাড়া, বনস্পতির মত ঘি-ও কেবলমাত্র সীলমোহর করা টিনে বিক্রি করা হলে এই চেষ্টা আরো সফল হবে।

বনস্পতি ব্যবহারকারীদের প্রতি আশ্বাস

বনস্পতি প্রস্তুতকারীদের কাছে এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে ঘিয়ে ভেজাল দিয়ে বনস্পতির অপব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথা তাঁরা জোর দিয়ে বলতে চান যে বনস্পতি সম্বন্ধে কোন পরিবর্তন করা হলে বনস্পতি ব্যবহারকারীদের হিতের দিকে লক্ষ্য রেখেই যেন তা করা হয়।

বনস্পতি প্রস্তুতকারীরা বনস্পতি ব্যবহারকারীদের এই আশ্বাস দিচ্ছেন যে বিশুদ্ধতা ও পুষ্টিকারিতার সর্বোচ্চ মান অনুসারেই বরাবর বনস্পতি তৈরী করা হবে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন :

দি বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া

ইণ্ডিয়া হাউস, ফোর্ট স্ট্রীট, বোম্বাই-১

TYMA 940

কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

(৩৬)

লক্ষ্মীদির জীবনটা কেমন যেন জটিল মনে হয়েছিল সেদিন। মনে হয়েছিল—বোধহয় সব মানুষেরই এমনি হয়। দীপংকরও তো কবার সহজ করতে চেয়েছে জীবনকে। সোজা, সরল, সহজ জীবনই তো দীপংকর চেয়েছিল। একটা ঋজু রেখার মত নির্ঝঞ্ঝাট জীবন। হয়ত সবাই তাই-ই চায়। জীবনকে সহজ করার জন্যেই আয়োজন করে অনেক কিছুর, শেষে আয়োজনটাই ভারি হয়ে ওঠে, আয়োজনটাই জঞ্জাল হয়ে শেষে পীড়া দেয় জীবনকে। যেদিন লক্-আপ্ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, সেই দিনই তো দীপংকর সংকল্প করেছিল—এই শেষ। সেই প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বিয়ে-বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে দীপংকর তো সেই প্রতিজ্ঞাই করেছিল। বলেছিল—ভালোই হয়েছে, সব বন্ধন ছিন্ন করে সে মুক্তি পেল। সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে সে পরিত্রাণ পেল। মা'র পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেও তো সে সেই সংকল্পের পুনরাবৃত্তি করেছিল। তারপর আর কোনও সংসর্গ তো সে চায়নি। চাকরি করবে আর উনিশের একের বি ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে এসে সে অজ্ঞাতবাস করবে, এই-ই তো সে ভেবেছিল। কোনও আয়োজনই তো তার ছিল না। কোনও আকর্ষণই তো তার ছিল না আর। ভেবেছিল সব নিঃশেষ হয়ে গেল তার জীবন থেকে। কিরণের বাবার নশ্বর দেহটা যেমন করে শ্মশানে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, তেমনি করেই দীপংকরের জীবন থেকেও সব আকর্ষণ তো নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা হলে আবার কেন এত আয়োজন স্তূপীকৃত হলো তার জীবনে, কেন এত জঞ্জাল তার জীবনে বড়ো হলো, কেন এমন করে আবার লক্ষ্মীদিও জড়িয়ে পড়লো তার জীবনে। কেন সতীও আবার তাকে এমন করে মূল ধরে আকর্ষণ করলে।

মনে আছে মিস মাইকেল বলতো—মিস্টার সেন, ইউ আর ভেরি শাই—তুমি এত লাজুক কেন?

মিস মাইকেলের সঙ্গে বেশি দিনের পরিচয় নয়। কিন্তু কিছুদিন পাশাপাশি বসতে বসতেই যেন পুরোপুরি চি. ফেলেছিল দীপংকরকে। মিস মাইকেল বাড়ি থেকে টিফিন আনতো। একটা চ্যাপ্টা কৌটোর মধ্যে কয়েকটা মোটা-মোটা জেলি-মাখানো স্যাণ্ডউইচ। তারপর ইলেকট্রিক কেট্‌লিতে একটু চা করে নিত।

প্রথম দিন দীপংকরকেও চা খেতে বলেছিল মিস মাইকেল।

দীপংকর বলেছিল—না আমি চা খাই না মিস মাইকেল—

মেমসাহেব যেন আকাশ থেকে পড়েছিল দীপংকরের কথাটা শুনে। বলেছিল—সে কি, তুমি চা খাও না? কখনও চা খাওনি?

দীপংকর বলেছিল—না, আমি কখনও চা খাইনি—

কিন্তু কথাটা বলেই মনে পড়ে গিয়েছিল হঠাৎ। চা তো একবার সে খেয়েছিল। সেই ছোটবেলায়। সেই লক্ষ্মীদির কাছে—তাদের লাইব্রেরীর চাঁদা চাইতে গিয়ে একবার চা খেয়েছিল। কিন্তু খুব ভালো লেগেছিল চা খেতে।

মিস মাইকেলের সঙ্গে শেষের দিকে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল। সব রকম গল্প হতো।

মিস মাইকেল বলতো—দ্যাট্‌স ভেরি গুড্ সেন, চা না-খাওয়া খুব ভালো—

—কেন? ও-কথা বলছো কেন?

মিস মাইকেল হেসে বলেছিল—ইউ উইল গেট প্লেজার ইন কিসিং—চুমু খেয়ে সুখ পাবে খুব—

কথাটা শুনে দীপংকরের কান দুটো খানিকক্ষণের জন্যে গরম হয়ে উঠেছিল। প্রথম দিন যে কী লজ্জা হয়েছিল দীপংকরের। আগে কখনও দীপংকর কোনও মহিলার সঙ্গে এক ঘরে এতক্ষণ একসঙ্গে কাটায়নি। মেমসাহেবের বয়েস হয়েছিল—তবু অনেকক্ষণ মিস মাইকেলের দিকে তাকাতেই পারেনি দীপংকর।

সেই দিনই মেমসাহেব বলেছিল—তুমি খুব লাজুক দেখছি তো—

দীপংকর একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি বিয়ে করোনি কেন মিস মাইকেল?

বিয়ে! ভারি কঠিন প্রশ্ন করেছে, ভেবেছিল দীপংকর। মেমসাহেব টাইপিং থামিয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে ছিল দীপংকরের দিকে।

দীপংকর জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি তো সুন্দরী, তাহলে বিয়ে করলে না কেন?

মেমসাহেব হেসেছিল খুব। বলেছিল—খুব, খুব সুন্দরী ছিলাম আমি, ইন মাই ইয়ং ডেজ্—তখন যদি তুমি আমায় দেখতে—

—তা হলে? তা হলে বিয়ে করোনি কেন?

ভবরূপ ভট্টাচার্য লিখিত অনুপম জীবনী

মহীয়সী মনীষা দেবী

যুগ দেবী প্রজ্ঞাময়ীর সৌভাগ্যপূর্ণ পবিত্র জীবনের অনবদ্য আলেখ্য। মূল্য: দেড় টাকা।

মনীষা তীর্থ, প্রীতিনগর, নদীয়া।

(সি ৭০৯৩/২)

জটীল ব্যাধি ও স্ত্রী রোগ

২৫ বৎসরের অভিজ্ঞ যৌনব্যাধি বিশেষজ্ঞ **ডাঃ এস পি মুখার্জ্জি** (রেজিঃ) সমাগত রোগীদিগকে গোপন ও জটিল রোগাদির রবিবার বৈকাল বাদে প্রাতে ৯—১১টা ও বৈকাল ৫—৮টা ব্যবস্থা দেন ও চিকিৎসা করেন।

শ্যামসুন্দর হোমিও ক্লিনিক (রেজিঃ)

১৪৮, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা—১

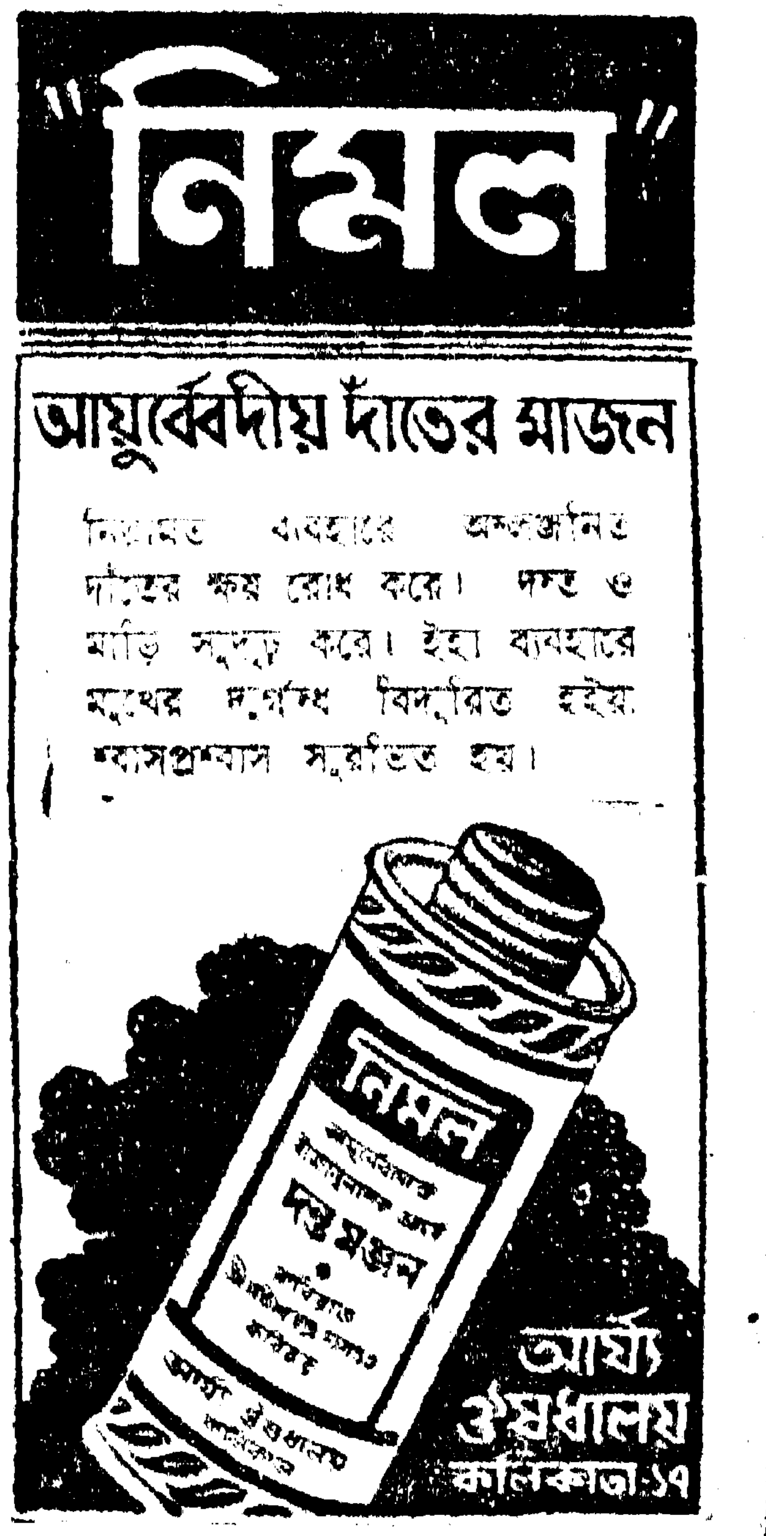

মেমসাহেব বলেছিল—সুন্দরী ছিলুম বলেই তো বিয়ে করিনি—

—সে কি! সুন্দরী হলে বিয়ে করবার দরকার নেই—?

মেমসাহেব বললে—সে তুমি বুঝবে না সেন, তুমি ছেলেমানুষ!

—জানো—

তারপর মেমসাহেব টাইপ-রাইটার থামিয়ে বলেছিল—তুমি ভিভিয়ান লে'র নাম শুনেছ? দি গ্রেট হলিউড ফিল্ম স্টার? এখন আমেরিকাতে খুব ফেমাস স্টার, সে আর আমি একসঙ্গে এইখানে কাজ করেছি

—তুমি হয়ত বললে বিশ্বাস করবে না—তার সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল—

দীপঙ্কর চুপ করে ছিল দেখে মিস মাইকেল বললে—তোমাকে আমি তার চিঠি এনে দেখাবো, তা হলে তো বিশ্বাস হবে?

মিস মাইকেল ভেবেছিল দীপঙ্কর বুঝি তার কথা বিশ্বাস করছে না।

মেমসাহেব বলেছিল—তুমি এখানে যাকে জিজ্ঞেস করবে, সে-ই বলতে পারবে সেন। আমরা দুজনে একসঙ্গে এক-বাড়িতে থাকতুম, এক ঘরে শুতুম, একসঙ্গে অফিসে আসতুম—

—তা তুমি তার সঙ্গে হলিউডে চলে গেলে না কেন?

মিস মাইকেল অফিসে আসতো কাঁটায়-কাঁটায় নিয়ম করে নিখুঁত পরিপাটি পোশাক-পরিচ্ছদ। কোথাও এতটুকু খুঁত ছিল না। অফিসে এসেই মেশিনটা খুলে নোট-খাতাটা বার করে বসতো। তারপর পেন্সিলটা ছুরি দিয়ে কেটে কেটে শিসটা ছুঁচোলো করে নিত। তারপর যতক্ষণ না রবিনসন সাহেব ডাকতো, ততক্ষণ গল্প করতো সেন-এর সঙ্গে। তিনবার চা করতো, বার বার ব্যাগ থেকে আয়না বার করে মুখ দেখতো, ঠোঁটে লিপস্টিক বুলিয়ে নিতো, ভ্রূটা এঁকে নিত। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের মুখখানা দেখতো বার বার। যতদিন অফিসে ছিল, ততদিন সময় পেলেই নিজের গল্প বলেছে। জীবনের কোনও গল্পই বলতে বাকী রাখেনি। দীপঙ্করের ওপর কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল মেমসাহেবের।

মিস মাইকেল একদিন বলেছিল—আমার খুব হেটরেড ছিল বাঙালীদের ওপর, জানো সেন—আমি বেঙ্গলীদের খুব হেট্ করতাম—কিন্তু—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করতো—কেন?

—আই ডোণ্ট নো, এই অফিসে আমি কারো সঙ্গে কথা বলি না, তুমি দেখেছ তো—আমি বাবুদের সঙ্গে একটাও কথা বলি না—আই হেট্ দেম, ফ্রম মাই হার্ট—আমি মন থেকে তাদের হেট করি, কিন্তু—

—কিন্তু, কী?

—কিন্তু, তোমাকে দেখবার পর থেকে আমি মাইণ্ড চেঞ্জ করেছি, আই হ্যাভ চেঞ্জড্ মাই মাইণ্ড—

দীপঙ্কর হেসে ফেললে। বললে—কেন?

—বিকজ ইউ আর রিয়্যালি গুড—তুমি সত্যিই ভালো। তোমার ভালো হোক্ এই আমি চাই—তোমার জীবনে উন্নতি হলে আমার চেয়ে কেউ খুশী হবে না—মনে রেখো—

আশ্চর্য! সংসারে হয়ত এমনি করেই এক-একজনকে অকারণে ভালো লাগে। আবার অকারণে খারাপও লাগে। সংসারে

ভাল-লাগা আর খারাপ-লাগার মধ্যে ফাঁকটা বোধহয় খুবই সামান্য। সেইজন্যেই বোধহয় একজনের ভাল-লাগার সঙ্গে আর একজনের খারাপ লাগার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাকে মিস্ মাইকেলের ভালো লাগার পেছনেও তাই সেদিন কোনও কারণ খুঁজে পায়নি দীপঙ্কর. দীপঙ্কর বলেছিল—তুমি নিজে ভালো. তাই আমাকেও তোমার ভালো লাগে মিস্ মাইকেল—

—নো নো সেন. নেভার! তুমি জানো না সেন আমি কী জঘন্য মেয়ে!

হঠাৎ মিস মাইকেলের প্রতিবাদ করবার ভঙ্গী দেখে দীপঙ্কর অবাক হয়ে গিয়েছিল।

—আমি তোমাকে আজ বলছি সেন, জীবনে এমন ক্রাইম নেই যা আমি করিনি! আমি যে সারা-জীবন কত ক্রাইম্ করেছি. তা তুমি কল্পনা করতে পারবে না সেন! লর্ড জেসাসের কাছে যে আমি কত অপরাধী!

বলে হঠাৎ মাথাটা নিচু করে ফেলতো। দীপঙ্কর বুঝতে পারতো মিস্ মাইকেল কাঁদছে। ব্যাগ থেকে সিল্কের রুমালটা বার করে চোখটা আলতো করে মুছে নিত। তারপর অনেকক্ষণ আর কথা পর্যন্ত বলতে পারতো না। অবাক কাণ্ড!

দীপঙ্করও আশ্চর্য হয়ে যেত মেম-সাহেবের কাণ্ড কারখানা দেখে! কত মানুষ, কত বিচিত্র মানুষ যে আছে পৃথিবীতে, তাই দেখেই অবাক হয়ে যেত দীপঙ্কর। কোথাকার কে এক মেম-সাহেব, এও তো এই কলকাতা-শহরের মানুষ। এও তো এই কলকাতার হাওয়াতেই দীপঙ্করের মত বড় হয়েছে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করেছে, একই কলকাতার বুকের ওপর মিস্ মাইকেলও তো দীপঙ্করের মত বেড়ে উঠেছে। এরও তো একদিন বাবা ছিল. মা ছিল. বন্ধু-বান্ধব ছিল, এও তো দীপঙ্করের মত স্কুলে পড়েছে! কিন্তু এই পাউডার আর লিপস্টিক আর বব্‌ড-চুলের আড়ালে আসল মানুষটাকে কে দেখতে পেয়েছে এমন করে? বাইরে থেকে দেখলে কে ভাববে এই মেম-সাহেবও আবার কাঁদে! বাইরের এই চেহারা দেখে কে ভাবতে পারবে যে এরও দুঃখ আছে. কষ্ট আছে অশান্তি আছে!

প্রথম দিকে গাঙ্গুলীবাবু বলেছিল—খুব সাবধান সেনবাবু, মেম-সাহেবের সঙ্গে এক-ঘরে বসছেন. একটু বুঝে শুনে চলবেন—বলা তো যায় না!

—কেন? দীপঙ্কর সত্যিই বড় ভাবনায় পড়েছিল কথাটা শুনে।

সারাটা জীবন লোকের কাছে অনাদর আর অবহেলা পেতে অভ্যস্ত দীপঙ্কর। সারা জীবন মার কাছ থেকে শুনে এসেছে সে মানুষ নয়, সে অপদার্থ। শুনে এসেছে তার জন্যেই মা'র এত কষ্ট। সে মানুষ হলে মা একটু শান্তি পেত, একটু আরাম পেত। ছোটবেলায় লক্ষ্মণ সরকার তাকে মেরেছে, লক্ষ্মীদিও তাকে মেরেছে। সতী তাকে তাচ্ছিল্য করে এসেছে! গাঙ্গুলীবাবুর কথায় দীপঙ্কর তাই ভয় পায়নি তেমন। কষ্ট করতেই জন্মেছে দীপঙ্কর। না-হয় কষ্টই ভোগ করবে আরো। কী আর করতে পারে সে। চাকরি তো সে ছাড়তে পারবে না—

গাঙ্গুলীবাবু বলেছিল—বড় দাম্ভিক প্রকৃতির মানুষ। ইণ্ডিয়ানদের বড্ড ঘেন্না করে—আমাদের মানুষ বলেই মনে করে না মশাই। আমাদের যেন গরু-ভেড়া মনে করে, ও. এমন করে হাঁটে—

কিন্তু আশ্চর্য! মিস মাইকেলের ভেতরেও যে একটা সহজ মানুষ লুকিয়ে আছে, সে-কথা বোধহয় অফিসের মধ্যে একা দীপঙ্করই জানতে পেরেছিল। কিন্তু মিস মাইকেল বলেছিল—তুমি একদিন আমার ফ্ল্যাটে চলো সেন—

—আমি?

—কবে যাবে বলো?

দীপঙ্কর যেন বিশ্বাস করতে পারেনি। এতখানি আগ্রহ মিস মাইকেলের, হঠাৎ যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছেও হয় না।

—আজ যাবে?

দীপঙ্কর বলেছিল—না-না, আজ আমার জামা-কাপড় বড় ময়লা—

—তাতে কী! আমার ফ্ল্যাটে কেউ নেই। আমি শুধু একলা থাকি। আর কেউ নেই আমার সংসারে। সংসারে আমি একেবারে এলোন্ সেন, একেবারে এলোন্—!

তারপর একটু থেমে বলেছিল—ভিভিয়ান্ যে-খাটে শুতো. সেটা তোমার দেখাবো, চলো, যে-টেব্‌লে বসে ড্রেস করতো, সেই টেবলটাও দেখাবো, সমস্ত আমি রেখে দিয়েছি. একটাও নষ্ট করিনি! আমার অ্যালবামটাও তোমায় দেখাবো, দেখবে ভিভিয়ানের চেয়েও আমি কত সুন্দরী ছিলাম, কত বিউটিফুল ছিলাম—আমার নিজের লাভ লেটার্স আছে ফাইভ হান্ড্রেড্ থার্টি থ্রি, পাঁচশো তেত্রিশটা লাভ লেটার্স আছে আমার জানো.—আর ভিভিয়ানের ছিল ওন্‌লি থ্রি হান্ড্রেড্—মাত্র তিনশো— উড্ ইউ বিলিভ্—?

দীপঙ্করের দিকে খানিকক্ষণ পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মিস মাইকেল।

তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—অথচ দেখ, সেই ভিভিয়ান এখন আমেরিকার দি গ্রেট ফেমাস ফিল্ম স্টার, আর আমি? আমি এই রেলওয়েতে রট্ করছি—আর এখন তো......

বলতে বলতে মিস মাইকেলের বুকটা যেন ফাঁকা হয়ে যেত। মিস মাইকেলের দুঃখটা বুঝতে চেষ্টা করতো দীপঙ্কর, কষ্টটা অনুভব করতে চাইতো। কিন্তু তবু যেন পুরোপুরি বুঝতে পারতো না! পাঁচশো তেত্রিশ আর তিনশো লাভ লেটার্সের তফাৎটাও বুঝতে পারতো না। দীপঙ্করকে তো কেউ-ই লাভ-লেটার্স লেখেনি, তাতে এত দুঃখ কেন মিস মাইকেলের।

বাইরে কে যেন ডাকলে। চাপরাশি এসে ডাকলে দীপঙ্করকে।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কে?

এই যে
রবিনসন্স
'পেটেন্ট' বার্লি
এসে গেছে!

দেখবেন, খোকাবাবু সবটুকু খেয়ে নেবে। রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লি গোরুর দুধের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে শিশুর কোমল পাকস্থলীতে দুধ চাপ বাঁধতে পারে না, কাজেই শিশুর পক্ষে হজম করা সহজ হয়। তাছাড়া, রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লি শিশুদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগায়, ওরা খেয়ে তৃপ্তি পায় আর এতে ওদের শরীরও গড়ে ওঠে।

এই বার্লিতে অনধিক ০.০২৮% আয়রন বি-পি ও ১.৫% ক্রিটা প্রিপঃ-এর সংমিশ্রণ আছে।

ক্যালসিয়াম ও লৌহ সংযোগে সুরক্ষিত

বেতার জগৎ

শারদীয় বিশেষ সংখ্যা ॥ ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৬০ ॥

এবারকার বিশেষ আকর্ষণ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ঃ উপন্যাস। বিমল মিত্র ঃ উপন্যাস।
মন্মথ রায় ঃ রূপক নাট্য।

'আমার শিল্প সাধনা' : যামিনী রায়। সঙ্গে শিল্পীর একটি বহুবর্ণ চিত্র 'সবুজ মেয়ে'।

তাছাড়া

মহিষাসুরমর্দিনী শ্রীশ্রীদুর্গার বহুবর্ণ প্রচ্ছদ চিত্র ঃ দীপেন বসু ও একটি বহুবর্ণ প্রাচীন চিত্র 'মহেশ্বর পরিবার'।

ছোটগল্প ॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়; হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়; সমরেশ বসু; আশাপূর্ণা দেবী; বাণী রায়; নীহাররঞ্জন গুপ্ত; আশুতোষ মুখোপাধ্যায়; শিবরাম চক্রবর্তী ও অন্যান্য ॥

দুইটি বিশেষ রচনা লিখেছেন ঃ প্রমথনাথ বিশী ও সৈয়দ মুজতবা আলি।

কবিতাবলী ॥ কালিদাস রায়; রাধারাণী দেবী; উমা দেবী; সুধীন্দ্রনাথ দত্ত; প্রেমেন্দ্র মিত্র; বিষ্ণু দে; বুদ্ধদেব বসু; হরপ্রসাদ মিত্র; বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়; অনিল ভট্টাচার্য; কৃষ্ণ ধর ও অন্যান্য। এবং গান ও স্বরলিপি।

বিশেষ রচনাবলী

ভারতীয় হোন, দুঃসাহসী হোন ঃ জেনারেল কে. এম. কারিয়াপ্পা। **কয়েকটি দেশের বেতার-প্রচার পদ্ধতি ঃ ব্রিটেন - পাকিস্তান - দক্ষিণ আফ্রিকা - কানাডা - নিউজিল্যান্ড - মালয়** (সংগৃহীত)। **ভারত কথা ঃ** ডক্টর কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। **এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যে সরকারী শিল্প সংস্থার পরিচালনা ঃ** এম আয়ুব (পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশনের অধিকর্তা)। **বর্ণের অনুভূতি ঃ** অধ্যাপক সি. ভি. রামণ। **একজন সৈনিকের অভিজ্ঞতা ঃ** লেঃ জেঃ জে. এন. চৌধুরী। **কাক-চরিত** (পক্ষীতত্ত্ব) ঃ এম. কৃষ্ণান্। **উপহার দ্রব্যের শুল্ক ঃ** ডি. পি. আনন্দ (কেন্দ্রীয় রেভিনু্য বোর্ডের সদস্য)। **বাংলা চলচ্চিত্রে আর্টের দিক ঃ** সত্যজিৎ রায়। **ইয়েতির সন্ধানে জাপানী অভিযাত্রী দল** (অভিযাত্রী দলের নেতা ডাঃ টি. ওগাওয়া'র সঙ্গে বেতার সাক্ষাৎকারের বিবরণ)। **নাগা সংস্কৃতি ও অরণ্যচারী বাঘ** (সংগৃহীত)। **হাতী শিকার** (সচিত্র)ঃ নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। **দিবং উপত্যকার আদিবাসী ঃ** কে. ব্যানার্জি, (পলিটিক্যাল অফিসার দিবং ভ্যালী)। **নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ঃ** জে. সি. মাথুর, আকাশবাণীর ডিরেক্টর জেনারেল। **জাগ্রত আফ্রিকা ঃ** ডক্টর অংশুকুমার দত্ত। **সাপ** (সর্পতত্ত্ব)ঃ পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়। **অপরাধ তত্ত্বের একটি নূতন দিক ঃ** ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল। **সুরসুন্দরী** (সচিত্র) অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। **বই-এর বাজারে ক্রেতা ঃ** ভবানী মুখোপাধ্যায়। **পক্ষী নিরীক্ষণ ঃ** জাফর ফতে আলি। **হরিণ শিকার ঃ** রামু। **পূর্ব ইউরোপ পরিদর্শন ঃ** ইলা পালচৌধুরী।

ছোটদের জন্য লিখেছেন

নরেন্দ্র দেব। সুখলতা রাও। মণীন্দ্র দত্ত। শৈল চক্রবর্তী (কার্টুন ফিল্ম তৈরী)। দিবোন্দু পালিত।

বেতার নাট্য-শিল্পীবৃন্দের ও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে বহু পূর্ণপৃষ্ঠা চিত্রাবলী

মূল্য ঃ ২·০০ টাকা (ডাকে ২·৫০ টাকা)।

বার্ষিক গ্রাহকগণ শারদীয় বেতারজগৎ রেজিস্টার্ড ডাকে পেতে চাইলে অনতিবিলম্বে নগদ, মনি অর্ডারে অথবা পোস্টাল অর্ডারে অতিরিক্ত ৫০ নয়া পয়সা বেতারজগৎ আপিসে (পাকিস্তানে 'স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স লিঃ, ৩।১০, লিয়াকৎ অ্যাভিনু্য, ঢাকা'—এই ঠিকানায় আট আনা) পাঠাবেন।

বেতারজগৎ বিশেষ সংখ্যার কপির জন্য আপনার সংবাদপত্র বিক্রেতাকে বলুন, অথবা, ইডেন গার্ডেনস্-এ বেতারজগৎ আপিসে অগ্রিম মূল্য জমা দিন।

—একঠো বাবু!

বোধহয় অনন্ত এসেছে। সেই অনন্ত রাও ভাবে। দাতারবাবুর বন্ধু। লোকটাকে ভালো লাগেনি কাল। সত্যিই কীসের আর টান! লক্ষ্মীদির জন্যে অতো টান ভালো নয় অনন্তবাবুর! তবু যা হোক, উপকার তো হবে লক্ষ্মীদির! লক্ষ্মীদির এই অভাবের সময় অনন্তবাবুকে উপকার করলে লক্ষ্মীদিরও তো উপরকার হবে। রবিনসন সাহেবকে গিয়ে যদি বলে দীপংকর সাহেব কথাটা এড়াতে পারবে না।

বাইরে গিয়ে দেখলে—না। অনন্তবাবু নয়, অন্য একজন ভদ্রলোক।

—কী চাই আপনার? কে আপনি?

ভদ্রলোক বললে—মিস্টার সেনকে চাই—

—আমিই তো মিস্টার সেন। আসল নামটা কী? পুরো নাম?

—হরিপদ সেন!

দূর। কোথাকার কে হরিপদ সেন। তাকে খুঁজতে এসেছে এখানে।

দীপংকর বললে—সে রেটস্ অফিসে, সিঁড়ি দিয় তিনতলায় চলে যান—

ভদ্রলোক চলে গেল। কী আপদ সব। যে-সে এসে ডাকে। চাপরাশিকে বললে—ও তো আমাকে নয়, রেটস্ অফিসের হরিপদ সেনকে খুঁজছিল—

তারপর বললে—দেখ, একজন আমাকে খুঁজতে আসবে আজকে ভদ্রলোক বাঙালী নয়, মারাঠী—নাম অনন্ত রাও ভাবে—সে ভদ্রলোক এলে আমায় ডেকে দিবি, বুঝলি, খুব জরুরী কাজ, তার জন্যে আমি অপেক্ষা করছি—

রবিনসন সাহেব লাঞ্চ খেতে যায় ঠিক একটার সময়। আসে দুটোর পরে। অনন্তবাবু যদি আগে আসে তো ভাল, আর তা নয় তো দুটোর পরে। একটা থেকে দুটোর মধ্যে এলে মিছিমিছি বসিয়ে রেখে দিতে হবে। অকারণে অনেক গল্প করতে হবে। অনন্তবাবুর সংগে গল্প করে লাভটা কী! অফিসে যতক্ষণ হৈ-চৈ-হল্লা চলে, তখন ভালো লাগে না দীপংকরের। তবু মিস মাইকেলের ঘরের ভেতরটা বেশ নিরিবিলি। কোনও শব্দ আসে না কানে। কাজ করতে করতে অনেক কিছু ভাবা যায়। অনেক কথা ভাবার আছে দীপংকরের। ভাবনার কি শেষ আছে! দীপংকর ভাবতো জীবন তো আরম্ভ হলো। তারপর? তারপর কী? তারপর কোথায় গিয়ে পৌঁছবে সে? এই অফিস, এই রবিনসন সাহেব, এই মিস্টার ঘোষাল, এই মিস মাইকেল! আজ না-হয় এখানে এসে পৌঁছিয়েছে। সেই ধর্মদাস ট্রাস্ট মডেল স্কুল থেকে একদিন যাত্রা শুরু হয়েছিল। তারপর কিরণ, লক্ষ্মণ সরকার, প্রাণমথবাবু, রোহিণীবাবু, কাকাবাবু, কাকীমা, লক্ষ্মীদি, সতী, সবাইকে অতিক্রম করে এতদিন পরে না-হয় এখানে এল। কিন্তু তারপর? তারপর কী? এই এখানে এসেই আটকে যাবে নাকি সে? এখানে এসেই থেমে যাবে?

হঠাৎ গাংগুলীবাবু এল ঘরের মধ্যে। দীপংকরের পাশে একটা চেয়ার নিয়ে বসে পড়লো।

বললে—এক মিনিটের জন্যে একটু বিরক্ত করতে এলাম সেনবাবু—

—না, না, বিরক্ত কী, বলুন—

হাতে শালপাতা মোড়া একটা জিনিস এগিয়ে দিলে দীপংকরের দিকে। বললে—এইটে দিতে এলুম—প্রসাদ, মায়ের প্রসাদ—খান—

দীপংকর ঠোঙাটা খুলে দেখলে। একটা শালপাতার ওপর একটু সিঁদুর লাগানো। দু-চারটে গাঁদা ফুলের পাপড়ি আর একটা চিনির ডেলার সন্দেশ।

—এ কীসের প্রসাদ?

গাংগুলীবাবু বললে—মা-কালীর প্রসাদ, সকাল বেলা পুজো দিয়ে এসেছিলাম কিনা, ভাবলাম আপনাকে একটু প্রসাদ দেব, তাই অফিসে এনেছিলাম—

—তা হঠাৎ পুজো দিলেন কেন?

—আমার স্ত্রীর আজ পাঁচ বছর ধরে অসুখ চলছিল, সেটা ভালো হয়ে গেছে, তাই।

পাঁচ বছর ধরে অসুখ? কী অসুখ? আপনি বলেন নি তো?

গাংগুলীবাবু একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন—আপনাকে তো কোনও কথাই বলিনি! আপনি আর আমার কতটুকু জানেন! আমার স্ত্রী আজ পাঁচ বছর ধরে পাগল হয়ে গিয়েছিল!

পাগল! দীপংকর চমকে উঠলো! দাতারবাবুরও তো মাথাটা গোলমাল হয়ে গিয়েছে! গাংগুলীবাবু এতদিন কথাটা বলেনি, নইলে জেনে নিলেই হতো! লক্ষ্মীদিকেও বলা যেত তাহলে! লক্ষ্মীদি এতদিন ধরে কষ্ট পাচ্ছে। দাতারবাবু ভালো হয়ে গেলে আর অনন্তবাবুর কাছে সাহায্য নিতে হয় না। লক্ষ্মীদি বেঁচে যায় তাহলে!

—কেন পাগল হয়েছিলেন আপনার স্ত্রী?

—সে অনেক কথা। আপনাকে তো বলেছিলাম, একদিন বলবো সব! সময় হলেই বলবো একদিন, এখন উঠি!

বলে গাংগুলীবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে যাবার উপক্রম করলে।

দীপংকর হাতটা ধরে টানলে। বললে—না-না, আপনি এখনি বলুন, আমার এখন হাতে কাজ নেই—আপনি বসুন—বলুন ব্যাপারটা—

গাংগুলীবাবু বাইরে চলে এল। দীপংকরও সংগে সংগে চলে এল।

দীপঙ্কর বললে—বলুন, কী হয়েছিল কী?

গাঙ্গুলীবাবুর মুখটা কেমন যেন শুকিয়ে এল। বললে—এখানে ঠিক বলা যাবে না—বরং আর একদিন বলবো—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু আমাকে যে আজ শুনতেই হবে—আমারও এক আত্মীয় সম্প্রতি পাগল হবার মত হয়েছে কিনা—

—কে?

—আমার একজন দিদির স্বামী!

গাঙ্গুলীবাবু চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে—আজ পাঁচ বছরে যে কী কষ্টেই ছিলাম সেনবাবু, কী বলবো—পাঁচটা বছর আমার রাতে ঘুম ছিল না, দিনে শান্তি ছিল না। আমি ভগবান মানতাম না, তবু ভগবানকে দিনরাত ডেকেছি। বলেছি—আমার কষ্ট দূর করো ঠাকুর, আমি আর সহ্য করতে পারি না এ-কষ্ট! আপনাদের সঙ্গে কথা বলেছি, অফিসের কাজ করেছি, বাইরে হেসেছি, কথা বলেছি, কিন্তু মনের মধ্যে কেবল অশান্তির আগুন জ্বলেছে—

দীপঙ্কর বললে—চলুন, কোথাও গিয়ে বসি, বসে বসে শুনি—

—কোথায় আর যাবেন! এ অনেক বড় গল্প, অনেক সময় লাগবে—

—তবু চলুন—

দীপঙ্কর চাপরাশিকে বলে গেল যদি কেউ খোঁজ করতে আসে যেন বসিয়ে রাখে তাকে। গাঙ্গুলীবাবুও কে জি দাশবাবুকে বলে এসেছিল।

কী বিচিত্র মানুষ আর কী বিচিত্র মানুষের জীবন। কোথায় মিস মাইকেল, তারও একটা সমস্যা আছে। সে-সমস্যার কথা বলতে বলতে মেমসাহেব কেঁদে ফেলে। আবার এই গাঙ্গুলীবাবু। এরও কত বিচিত্র এক সমস্যা। এরও মুখ-চোখ কান্নায় ভারি হয়ে আসে কথা বলতে বলতে।

সত্যিই, এদের তুলনায় তো দপীঙ্করই সুখী। দীপঙ্করের তো কোনও সমস্যাই নেই বলতে গেলে। শুধু লক্ষ্মীদির সমস্যাটাই এখন একটা পাথরের মত বুকের ওপর ভারি হয়ে চেপে বসেছে। লক্ষ্মীদি সুখী হলেই দপীঙ্করের কোনও সমস্যা থাকে না। দাতারবাবুর অসুখ ভাল হয়ে গেলেই সব সমস্যা মিটে যায় লক্ষ্মীদির। দীপঙ্করও নিশ্চিন্ত হয়।

মনে আছে গাঙ্গুলীবাবুকে নিয়ে দীপঙ্কর সামনের পার্কটাতে গিয়ে বসেছিল। চারিদিকে অফিস। অফিস আর অফিসের কেরানী। সমস্ত অঞ্চলটা যেন গম্ গম্ করছে অফিসের গন্ধে। সেই আবহাওয়া থেকে বেরিয়ে দীপঙ্কর একেবারে খোলা আকাশের তলায় গিয়ে বসলো।

গাঙ্গুলীবাবু বললে—আপনি ঠিক বুঝবেন না আমার কথাগুলো সেনবাবু, যে ভুক্তভোগী, সে-ই শুধু বুঝতে পারে—

দীপঙ্কর বললে—আপনি বলুন আমি ঠিক বুঝবো—

দীপঙ্কর জানতো সংসারে যে ভুক্তভোগী, সে-ই কেবল দুঃখের কথা বুঝতে পারে। দীপঙ্কর কি ভুক্তভোগী নয়? দীপঙ্কর কি মানুষ দেখেনি? দীপঙ্করও কি জানতো না যে মানুষের বাইরের চেহারা দিয়ে তাকে বিচার করার মত ভুল আর নেই! দীপঙ্কর কি দেখেনি ছিটে-ফোঁটাকে, দেখেনি বিন্তিদিকে, দেখেনি প্রাণমথবাবুকে, দেখেনি কিরণ, ফটিক, রাখাল, নির্মল পালিত, লক্ষ্মণ সরকারকে।

দীপঙ্কর বললে—আমিও অনেক লোক অনেক রকম মানুষ দেখেছি গাঙ্গুলীবাবু

এজেন্ট ঃ মেসার্স শা বাভিশি এণ্ড কোং, ১২৯, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

আসলে আমি জিজ্ঞেস করছি অন্য কারণে—জিজ্ঞেস করছি আমার এক দিদির জন্যে—

—দিদি? কী-রকম দিদি? আপন?

—না, আপন দিদি নয়। এমন কি, দূর-সম্পর্কেরও দিদি নয়। বলতে গেলে কেউ-ই নয়। তবু খুব আপন। তার কথা আমি খুব ভাবি—প্রায়ই ভাবি। পৃথিবীতে দুজনের কথা কেবল ভাবি আমি, তাদের মধ্যে এই দিদিই একজন—

গাঙ্গুলীবাবু বললে—আমারও আপনার মত কেউ ছিল না সেনবাবু, বেশ ছিলাম, বাবা-মা ছিল, তাঁরা মারা যাবার পর লেখা-পড়া করতাম, আর শেষকালে এই রেলের অফিসে চাকরি পেয়ে গেলাম—একটা বোন ছিল বিয়ে দিতে, তা তারও বিয়ে দিয়ে-ছিলাম টাটানগরে—

—তারপর?

—তারপর একদিন বিয়ে হয়ে গেল হঠাৎ। হঠাৎ মানে আমি তার জন্যে ঠিক তৈরি ছিলাম না মশাই। মস্ত বড়ঘরের মেয়ে। আপনি বর্ধমানের ভট্টাচার্যিদের নাম শুনেছেন? তাঁরা ওখানকার বনেদী ঘর। বহু পুরুষের বাস ওদের ওখানে। মানে ইচ্ছে করলে ওরা কলকাতাতেই একশো-খানা বাড়ি তৈরি করতে পারতো—এত পয়সা। অনেক মেয়ে বাড়িতে—মানে আমার অনেক শালী। একেবারে পর পর সব মেয়ে জন্মেছে ভাইদের। কিন্তু মেয়েদের বিয়ে হয়েছে সব বড় বড় জায়গায়। কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনীয়ার, কেউ উকিল, ব্যারিস্টার, কেউ আবার ব্যবসাদার। একমাত্র আমিই হলাম জামাইদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। আমারই একমাত্র খারাপ অবস্থা। আমিই একমাত্র কেরানী!

মশাই, সেই গোড়া থেকেই আমার স্ত্রীর কেমন লজ্জা করতো আমার জন্যে। কেবল আমাকে বলতো—তোমার বড় চাকরি হয় না? আরো বড় চাকরি? আমার সেজ-জামাইবাবুর মত?

তা আমি আর কী উত্তর দেব এর, বলুন? আমি ভাবতাম বুঝি হাসি-ঠাট্টা করছে আমার সঙ্গে।

কিন্তু একদিন হঠাৎ বলা-নেই, কওয়া-নেই আমার বউ বাড়ি থেকে চলে গেল। একলা চলে গেল মশাই। আমি অফিস থেকে বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখি, বউ বাড়ি নেই—। কী হলো? হলো কী, এমন তো হয় না। খোঁজাখুঁজি করলুম অনেক। অনেক জায়গায় গেলুম। আমার তো আর কেউ নেই কলকাতায় যে সেখানে যাবে? পাশের বাড়িতে খোঁজ নিলুম—সেখানেও নেই। শেষে কী সন্দেহ হলো, গেলুম বর্ধমানে, আমার শ্বশুরবাড়িতে। যা ভেবেছি, ঠিক তাই! গিয়ে দেখি বউ গেছে বাপের বাড়িতে—

আমার শ্বশুর-শাশুড়ি, তাঁরা সেকেলে লোক। বললেন—একলা-একলা থাকে, তাই ওই রকম হয়েছে, আর কিছুদিন সবুর করো বাবা, সব ঠিক হয়ে যাবে—

আমার তখন বাড়িতে কেউ নেই, বুঝলেন না। স্ত্রীকে ছেড়ে থাকতে পারবো কেন?

শ্বশুরমশাইকে বললাম—যদি আমার ওখানে পাঠিয়ে দেন তো আমার বড় ভাল হয়, বড় কষ্ট হচ্ছে আমার খাওয়া-দাওয়ার—

শাশুড়ি বললেন—তাহলে পটলকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তাকে যদি বোঝাতে পারো তো দেখ—

সারিডন খেলেই তো খুব তাড়াতাড়ি ও
নিরাপদে যন্ত্রণা দূর হয়

মাথাবেদনায় আর কষ্ট পেতে যাবেন কেন—সারিডন খেয়ে তাড়াতাড়ি ও নিরাপদে ব্যথার উপশম করুন।

সারিডন-এ অনিষ্টকর কোন কিছু নেই, এতে হার্টের কোন ক্ষতি বা হজমের কোন গোলমাল হয় না। তার ওপর বিশেষ উপাদানে তৈরি ব'লে সারিডন আশ্চর্যরকম তিনটি কাজ দেয়—এতে যন্ত্রণার উপশম হয়, মনের স্বাচ্ছন্দ্য আসে ও শরীর ঝরঝরে লাগে।

মাথা-ধরা, গা-ব্যথা, দাঁতের যন্ত্রণা এবং সাধারণ ব্যথা-বেদনায়, তাড়াতাড়ি আরাম পেতে হ'লে সারিডন খান... সারিডন নিরাপদ বেদনা-উপশমকারী।

একটিই যথেষ্ট
একটি ট্যাবলেট ১২ নঃ পঃ

★ সারিডন স্বাস্থ্যসম্মত মোড়কে থাকে, হাতে ধরা হয় না।
★ সারিডন একটি ট্যাবলেটের দাম মাত্র বারো নয়া পয়সা।
★ একটি সারিডন-ই প্রায় ক্ষেত্রে পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে পুরো এক মাত্রা।

একমাত্র পরিবেশক:
ভলটাস লিমিটেড

IWTVT 87

আমার স্ত্রীর ডাক নাম পটল। তা যাকগে, বউ ঘরে এল।

বললাম—তুমি হঠাৎ যে না-বলে কয়ে চলে এলে, আমায় কী ভাবনায় ফেলেছিলে বলো তো—

বউ বললে—আমি আর যাবো না কলকাতায়, আমার বড় লজ্জা করে।

আমি বললাম—লজ্জা কীসের? আমার কাছে থাকবে তাতে লজ্জা কী?

তখন থেকেই মাথাটা একটু-একটু খারাপ হচ্ছে, আমরা বুঝতে পারিনি আর কি। বউ সে-কথার উত্তরে বললে—তুমি যে মাইনে কম পাও, তাই আমার লজ্জা করে—

বললাম—মাইনে কম-বেশি পাওয়া কি আমার হাতে?

তা বললে কি জানেন? বললে—সেজ-জামাইবাবু, না-জামাইবাবু, ওরা তো বেশি মাইনে পায়—তুমি ওদের মত মাইনে পাও না কেন?

তা আমি এর কী জবাব দেব বলুন!

দীপঙ্কর মন দিয়ে শুনছিল গল্প।

বললে—তারপর?

গাঙ্গুলীবাবু বললে—আপনি তো বিয়ে করেন নি। কিন্তু বিয়ে যদি কখনও করেন তো বড়লোকের মেয়েকে কখখনো বিয়ে করবেন না মশাই, এই আপনাকে আমি বলে রাখলুম! আমার নিজের কখনও একটা অসুখ করেনি মশাই, কখনও আমার নিজের জন্যে ডাক্তার ডাকতে হয়নি একটা। আমার ওই চা-খাওয়া ছাড়া আর কোনও নেশাই নেই জীবনে, কিন্তু এখন ভাবি, বিয়ে না করলে আমি কত সুখেই থাকতে পারতুম! আরাম করে চাকরি করতুম, আর সিনেমা-থিয়েটার দেখে বেড়াতুম—

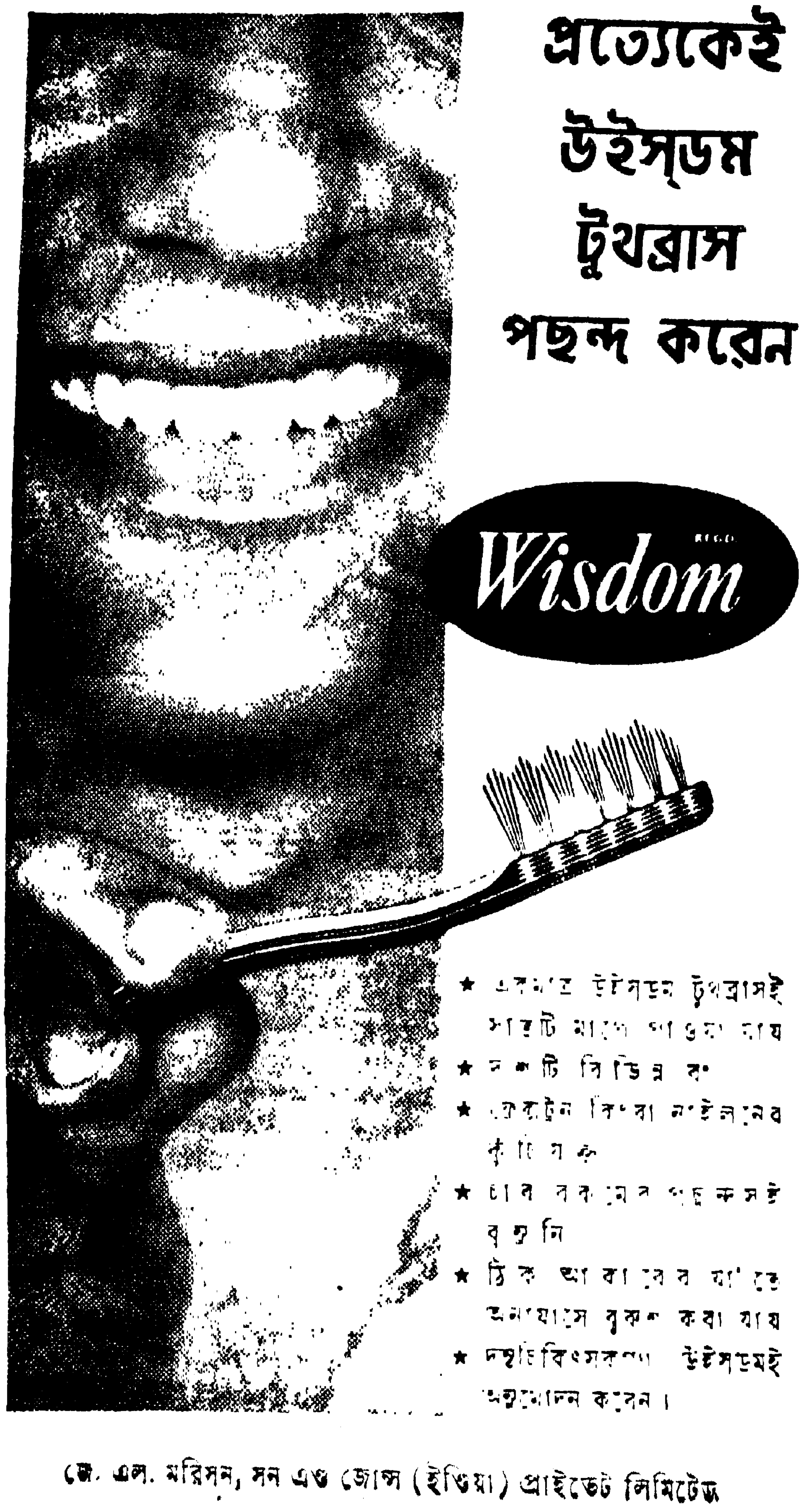

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—তা আপনার প্রমোশন হয়ই বা না কেন গাঙ্গুলীবাবু? এত বছর চাকরি করছেন আপনি?

গাঙ্গুলীবাবু বললে—আপনিও ওই কথা বলছেন? প্রমোশন হবে কী করে সেনবাবু? আপনার কথা আলাদা, আপনি ঢুকলেন জেনারেল সেকশনে, তারপর কী করতে গিয়ে কী হয়ে গেল, রবিনসন সাহেব আপনাকে বসিয়ে দিলে নিজের ঘরে, আর আমাদের তো তা নয়, চিরকাল ওই এক চেয়ারে, এক ঘরের মধ্যে পচতে হবে—

দীপঙ্কর বললে—তা তারপর?

—তারপর বুঝিয়ে সুঝিয়ে সেবার তো নিয়ে এলাম বউকে বাড়িতে। শাশুড়ি অনেক বুঝিয়ে-টুঝিয়ে মেয়েকে পাঠালে! আমি বউ-এর মন ভোলাবার জন্যে অফিসের কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে দেড় হাজার টাকা লোন নিলুম। বউ-এর দামী শাড়ি কিনে দিলাম, ভালো ভালো গয়না গড়িয়ে দিলাম। সিনেমায় নিয়ে গেলাম, থিয়েটারে নিয়ে গেলাম। মহা খুশী বউ। ভাবলাম বুঝি সেরে গেল। সেইবারেই প্রথম বড় মেয়ে হলো আমার। তারপর একটা ছেলে।

কিন্তু পরের মাস থেকে হাতে মাইনে পেতে লাগলাম কম। আর কুলোতে পারি না, আর চলে না সংসার। বউকেও বলতে পারি না তখন। শেষে একদিন আর চাপা রইল না। একেবারে খোলাখুলি গালাগালি দিতে লাগলো আমাকে।

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল। বললে—গালাগালি?

—হ্যাঁ সেনবাবু, অফিসে কাউকেই এ-সব কথা বলিনি, কেউ জানে না। আজ আপনাকেই প্রথম বললাম। তখন আর কি একেবারে উন্মাদ অবস্থা। সে শাড়ি-শায়ারও ঠিক থাকে না। চিৎকার করে গালাগালি—

—কাকে গালাগালি দিতেন?

—আমাকে সেনবাবু, আবার কাকে। আমি মাইনে কম পাই, আমি বউকে শাড়ি-গয়না কিনে দিতে পারি না, আমি ইতর, আমি ছোটলোক—শেষকালে কানে আঙুল দিতে হতো। পাড়ার লোক পর্যন্ত সে-চিৎকারে তিষ্ঠোতে পারতো না—এমন চিৎকার। ছেলেমেয়েরা হাউ-মাউ করে কে'দে উঠতো মায়ের কাণ্ড দেখে—

গাংগুলীবাবুর গল্প শুনতে শুনতে দীপংকর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। কী সাংঘাতিক অবস্থা গাংগুলীবাবুর। অথচ বাইরে থেকে তো কিছুই বোঝা যায় না, কিছু বোঝবারই উপায় নেই। দিনের পর দিন জার্নাল সেকশনে এসেছে নিয়ম করে। নিয়ম করে কে জি দাশবাবুকে চা দিয়েছে, হেসেছে, রসিকতা করেছে। নৃপেনবাবুর ফেয়ারওয়েলের সময় সবই তো করেছে গাংগুলীবাবু, কিছু তো বোঝা যায়নি বাইরে থেকে।

পার্কের ভেতরে আস্তে আস্তে ভিড় বাড়ছে। এতক্ষণে বোধহয় রবিনসন সাহেবের লাঞ্চ খেয়ে ফেরবার সময় হলো।

দীপংকর জিজ্ঞেস করলে—তারপর?

গাংগুলীবাবু বললে—তারপর ডাক্তার দেখাতে লাগলুম। শ্বশুর-শাশুড়ি তাঁরাও এলেন। আমার তো টাকা ছিল না। তাঁদেরই জ্বালা, আমার মত জামাই করে তাঁদেরই পস্তাতে হচ্ছে। ভেবেছিলেন জামাই-এর রেলের চাকরি, উন্নতি হলে প্রচুর উন্নতি হবে, একেবারে মাথায় উঠে যাবে জামাই, আবার যদি তা না-ও হয়, তো মেয়ের খাওয়া-পরার কষ্ট হবে না জীবনে—কিন্তু তাঁরা তো জানতেন না যে, আমি জার্নাল সেকশনের এ-বি গ্রেডের ক্লার্ক, জার্নাল সেকশনে একবার নাম লেখালে সেখান থেকে আর মুক্তি নেই।

—যাক, তারপর? কিসে ভালো হলো?

গাংগুলীবাবু কী একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বাধা পড়লো। দ্বিজপদ দৌড়তে দৌড়তে একেবারে পার্কের মধ্যে এসে পড়েছে।

—হুজুর, রবিনসন সাহেব!

—ডেকেছে? এরই মধ্যে এসে গেল সাহেব?

দীপংকর উঠে পড়লো। সাহেব আজকে সকাল-সকাল এসে পড়েছে দেখছি। তাড়াতাড়ি জুতোটা পায়ে গলিয়ে দৌড়লো। গাংগুলীবাবু সঙ্গে সঙ্গে চললো। দীপংকর বললে—শেষটা শোনা হলো না গাংগুলীবাবু, ছুটির পরে শুনবো কিন্তু—

গাংগুলীবাবু বললে—এখন মশাই আর কোনও গণ্ডগোল নেই, ধন্বন্তরি ওষুধ একেবারে, তাই তো সকালবেলা উঠেই কালীঘাটে গিয়ে পাজো দিয়ে এলুম—

—তা কী ওষুধে সারলো?

—আরো কত রকম কী করেছি, তার কি ঠিক আছে। পাগলা কালীর বালাও পরিয়েছিলাম, তাতেও কিছু হয়নি। শেষে শ্বশুরমশাই অনেক টাকা খরচ করে কলকাতার বড় বড় ডাক্তার দেখালেন, তাতেও কোনও ফল হয়নি—শেষে—

—শেষে?

তখন একেবারে রবিনসন সাহেবের ঘরের সামনে এসে গেছে দুজনে।

—শেষে হরকালী কবিরাজের মধ্যম-নারায়ণ-তেল আছে এক রকম, তাই মাখিয়ে মাখিয়ে ভালো হলো। এখন আবার নরম্যাল, সব স্বাভাবিক—

দীপংকর জিজ্ঞেস করলে—তেলটা কোথায় পাওয়া যায়? কত দাম? আমাকে এক বোতল কিনে দিতে পারেন?

—অফিসের পরে দেখা হবে তো, তখন বলবো'খন আপনাকে, আমাকে ডাকবেন!

সাহেবের ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই দীপংকর দেখলে রবিনসন সাহেবের মুখে হাসি। দীপংকর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেও যেন সাহেবের চেতনা হলো না। তেমনি দীপংকরের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলো। একরকম দুর্বোধ্য অব্যক্ত হাসি।

হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠলো সাহেব। নড়ে বসলো।

বললে—আমি তোমাকে ডেকে পাঠিয়ে-ছিলাম, না?

দীপংকর বললে—ইয়েস স্যার—

—কী জন্যে বলো তো? হোয়াই?

রবিনসন সাহেবের এই রকমই অদ্ভুত কাণ্ড! কী বলতে ডেকেছিলে ভুলে গেছে।

দীপংকর জিজ্ঞেস করলে—আপান-ট্রাফিকের পিরিঅডিক্যাল স্টেটমেণ্ট স্যার?

—নো, নো, নট্ দ্যাট্—

বলে সাহেব ভাবতে লাগলো মাথায় টোকা দিতে দিতে। দীপংকর দাঁড়িয়েই আছে। হঠাৎ জিমির দিকে নজর পড়তেই সাহেব বললে—জানো সেন, জিমি ইজ্ য়্যান ইনটেলিজেণ্ট্ ডগ্, জিমির খুব বুদ্ধি! আজকে কী করেছে জানো—?

দীপংকর দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলো।

সাহেব বললে—আজকে মিসেস্ ঘুম থেকে উঠতে দেরি করেছে, আর্লি মর্ণিং ছ'টার সময় ওঠে রোজ মিসেস—এদিকে জিমির ঠিক খেয়াল আছে, উড্ ইউ বিলিভ্, জিমি মিসেসের ঘরের দরজায় গিয়ে নক্ করছে—ধাক্কা দিচ্ছে—

জিমির বুদ্ধি দেখে যে দীপংকরও অবাক হয়ে গেছে তা বোঝাবার জন্য দীপংকর জিমির দিকে চেয়ে একটু হাসলো। জিমি বোধহয় বুঝতে পারলে যে, তাকে নিয়েই কথা হচ্ছে। মুখটা দীপংকরের দিকে তুলে ল্যাজটা একটু নেড়ে দিলে।

সাহেব বললে—ভেরি ইনটেলিজেণ্ট্, বুঝলে সেন, ইভ্‌ন্ মোর ইনটেলিজেণ্ট্ দ্যান্ দীজ্ অফিস-ক্লার্কস—

সাহেব গড়-গড় করে জিমির আরো গুণ-পনার কথা সবিস্তারে বলতে লাগলো। কবে একদিন ছোট্ট একটুকু বাচ্চা বয়েসে এসে-ছিল বাড়িতে, তারপর ঘরের ছেলের মত হয়ে গেছে সাহেবের। সাহেব আর মেম-সাহেব সারাদিন জিমি-জিমি করেই অস্থির। একদিন শরীর খারাপ হলে, এক-দিন জিমির অরুচি হলে, সি-এম-ও থেকে

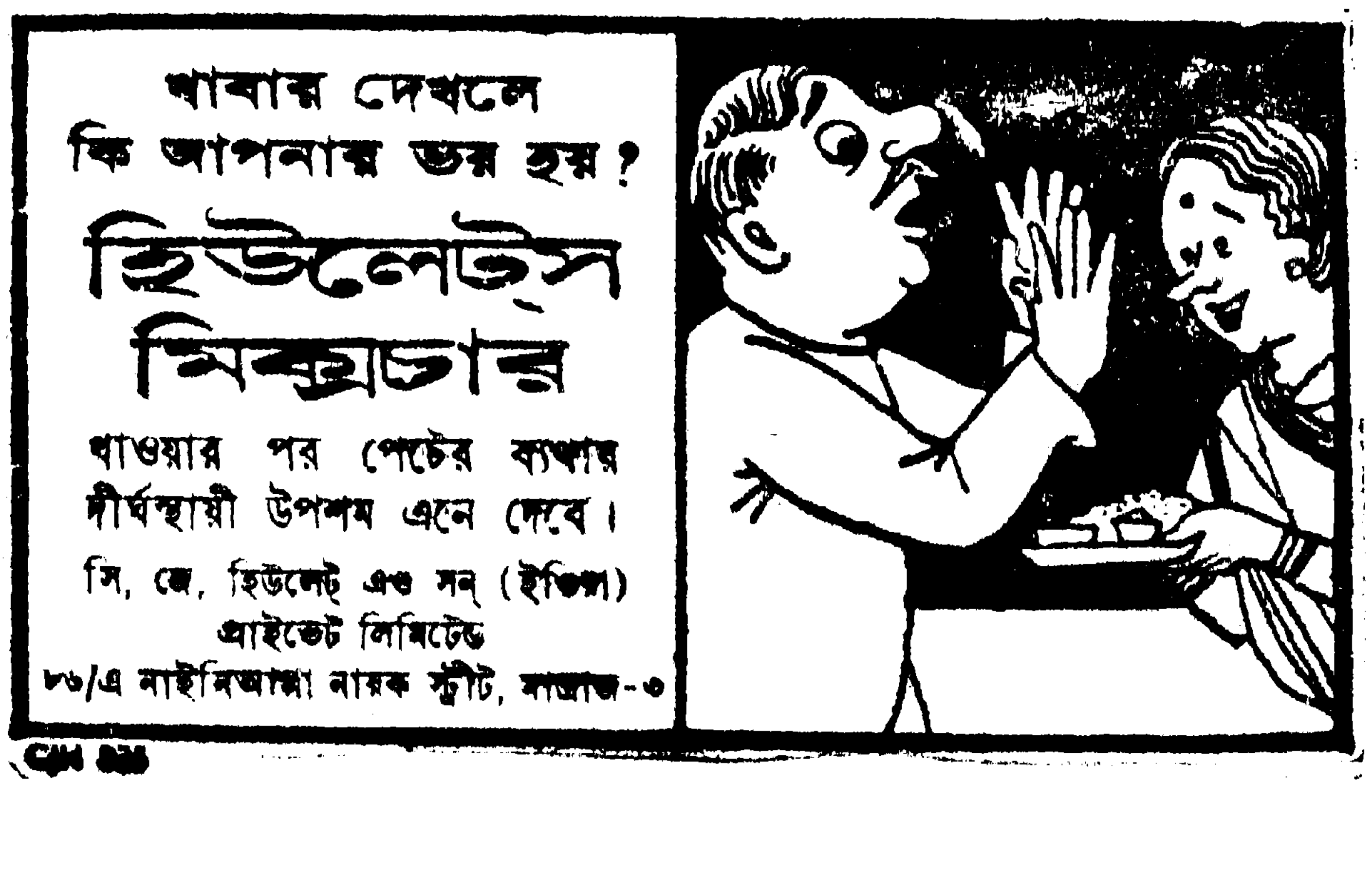

হসপিটালের কম্পাউণ্ডার পর্যন্ত তটস্থ হয়ে ওঠে। জিমির জন্যে কোথায় মাংস, কোথায় সোপ্, কোথায় বিস্কিট্ সব দিকে নজর দিতে হয় মেমসাহেবকে। জিমি হট্ ওয়াটার খাবে না জানো, জিমির রেফ্রিজারেটেড্ ওয়াটার চাই। স্টু খাবে, বেকন্ খাবে, হ্যাম, পরিজ সব খাবে। কিন্তু রাইস্ মুখে দেবে না—এমন ডগ্ দেখেছ তুমি সেন?

দীপঙ্কর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনেছিল সব। এই জন্যেই সাহেব তাকে ডেকেছিল নাকি! এই জিমির কথা শোনাতেই ডেকে পাঠিয়েছিল সাহেব চাপরাশি দিয়ে। আশ্চর্য খেয়ালী সাহেব! পরে অনেকবার রবিনসন সাহেবের কথা মনে পড়ায় দীপঙ্করের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়েছে! হোক ইউরোপীয়ন, হোক ফরেনার, হোক ব্রিটিশ, কিন্তু অমন লোক যে হয় না। ভালো লোক কি নেই ব্রিটিশারদের মধ্যে? আছে বৈ কি! রবিনসন সাহেবই তো তার প্রমাণ! অতখানি বিশ্বাস, অতখানি ভালবাসা আর ক'জনের কাছেই বা পেয়েছে দীপঙ্কর! প্রাণমথবাবু—তা প্রাণমথবাবু তো তার উপকার করেছেন। চ্যারিটি করেছেন। গরীবদের ওপর তার কর্তব্যবোধ থেকে তিনি সাহায্য করেছেন দীপঙ্করকে! কিন্তু রবিনসন সাহেব তো তা নয়। রবিনসন সাহেব তো স্ট্যাণ্ডিয়ার পভার্টি দেখতে পাননি। সাহেব পভার্টি টলারেট করবেন না। জিমির ক্লিনারকে টেন চিপ্স্ দিতো সাহেব। পৃথিবীতে গরীব কেন থাকবে! সে যত ছোট কাজই করুক, হি মাস্ট্ বি ফেড্। তাকে খেতে দেওয়া চাই। কুকুরের সেবা করছে বলে সে কি কম খাবে নাকি? তারও কি বাঁচবার অধিকার নেই! দৈত্যকুলে হঠাৎ যেন এক প্রহ্লাদ এসে জুটে গিয়েছিল। যেন পেডি, বার্জ, টেগার্ট, সিমসনদের দলের ভেতরে হঠাৎ একজন ডেভিড হেয়ার ভুল করে ঢুকে পড়েছিল। আর আসবি তো আর একেবারে এই জায়গায়—এই রেলের অফিসে!

তারপর হঠাৎ যেন সাহেবের আসল কথাটা মনে পড়ে গেছে।

বললে—হ্যাঁ, যে-কথা বলতে তোমাকে ডেকেছিলুম—তুমি অফিসে কী কাজ করো?

প্রশ্নটা শুনে প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিল দীপংকর। বললে—আমি ক্লার্ক স্যার, জাপান-ট্র্যাফিকের কাজ করি—

—আই সী, তা আর ইউ এ গ্র্যাজুয়েট?

—ইয়েস্ স্যার।

সাহেব খানিকক্ষণ কী যেন ভাবলে। তারপর বললে—তা তুমি সেফ-ওয়ার্কিং এগজামিনেশনটা দাও না কেন? সেফ-ওয়ার্কিং আর ইয়ার্ড!

দীপংকর বললে—আপনি যদি পারমিশন দেন তো দিয়ে দিতে পারি—

—ইয়েস, ডু ইট্, আমি ডি-টি-আই নিচ্ছি, ইউ মে সি এ ক্যাণ্ডিডেট—

কথাটা বলেই জিমির দিকে চাইলে সাহেব আবার। বললে—জানো, হোয়াট য়্যান ইন্‌টেলিজেণ্ট ডগ্, আমি ওকেই ডি-টি-আই করে দিতুম—বাট্ আনফরচুনেটলি জিমি ইজ্ এ ডগ—দো হি ইজ্ মোর ইনটেলিজেণ্ট দ্যান্ দোজ্ অফিস-ক্লার্কস—

কী কথা বলতে বলতে কী কথা বলে ফেললে সাহেব।

দীপংকর বললে—আমি পরীক্ষা দেব স্যার—

—হ্যাঁ, দাও—আই উইল্ হেল্‌প্ ইউ—

বলে সাহেব নিজের কাজে মন দিতে যাচ্ছিল। দীপংকরও চলে আসছিল ঘর থেকে। হঠাৎ কথাটা মনে পড়লো। বললে—স্যার একটা অনুরোধ আছে আপনার কাছে—

বলো?

দীপংকর বললে—আমার এক আত্মীয়ের ভীষণ বিপদ হয়েছে স্যার, তার হাসব্যাণ্ড্ হঠাৎ পাগল হয়ে গেছে, তার জন্যে আমি একটা ফেবার চাই আপনার কাছে। তিনি রেলওয়ের এনলিস্টেড্ কনট্র্যাকটার, তার একটা কাজ যদি আপনি করে দেন, মাত্র তিন-হাজার টাকার কাজ—

সাহেব জিজ্ঞেস করলে—কী কাজ?

দীপংকর যতটুকু জানে সমস্তই বললে। বড় বড় কনট্র্যাকটার অবশ্য অনেক আছে লিস্টে, কিন্তু ইনি তাদের মত নন্। ছোট-ছোট অর্ডার সাপ্লাই-এর কাজ করেন। অত্যন্ত দুরবস্থা এঁদের। বেঙ্গলী নয়। মহারাষ্ট্রীয়ান্। ট্রেড্-ডিপ্রেশনের জন্যে অফিস উঠে গেছে এঁদের। একটা সামান্য ছোট বাড়ি ভাড়া করে কলকাতার বাইরে—ঢাকুরিয়ায় থাকে। গড়িয়াহাটা লেভেল-ক্রসিং-এর কাছে। আমার নিজের দিদি নেই—কিন্তু এ আমার নিজের দিদির চেয়েও নিজের। ছোটবেলা থেকে এক বাড়িতে—এক সঙ্গে পাশাপাশি বাস করেছি। এর কষ্ট-আমার নিজেরই কষ্ট। এর দুঃখ আমার নিজেরই দুঃখ। আমি নিজে গিয়ে এদের দুঃখ-কষ্ট দেখে এসেছি। আমার যদি ক্ষমতা থাকতো তো এদের আমি টাকা দিয়ে সাহায্য করতাম। ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কথা বলে গেল দীপংকর। সাহেবের দয়া উদ্রেক করবার জন্যে যা কিছু বলা দরকার সব বললে।

সাহেব-জিজ্ঞেস করলে—এরা টেণ্ডার পাঠিয়েছে?

দীপংকর বললে—সে-সব আমি জানি না—ভদ্রলোক আজকেই আসবেন,—

সাহেব বললে—অল্ রাইট্, আমার কাছে তাকে নিয়ে এসো, আই শ্যাল্ সী টু ইট্!

দীপংকর আরো একটু করুণ করে বলতে যাচ্ছিল ব্যাপারটা—

সাহেব বললে—আর বলতে হবে না সেন, আই উইল্ ডু ইট্ ফর ইউ—

দীপংকর সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়ে বাইরে চলে এল। বাইরে এসেই একবার দেখলে চারিদিকে। অনন্তবাবু হয়ত এসে অপেক্ষা করছে। ওদিকের করিডোর থেকে এদিকের করিডোরটা একবার ঘুরে দেখে নিলে। কোথাও অনন্তবাবুকে দেখা গেল না। এত দেরি করছে কেন আসতে। তারই তো কাজ। দীপংকরের কী! গরজটা তো তারই। কাজটা পেলে অনন্তবাবুরই উপকার। লক্ষ্মীদিরই উপকার। তারই পাঁচশো টাকা অন্তত প্রফিট থাকবে। কাউকে ঘুষ দিতে হবে না। রবিনসন সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেই শুধু ফর্মের ওপর সই করে দেবে। তাহলেই হয়ে যাবে। আর কারোর কিছু বলবার থাকবে না।

আবার নিজের ঘরের কাছে এসে চাপরাশিকে একবার জিজ্ঞেস করলে।

—হ্যাঁ রে, কেউ খুঁজতে আসেনি আমাকে?

—না, হুজুর।

দীপংকর বললে—যদি কেউ এসে আমাকে খোঁজ করে, আমাকে ডেকে দিবি বুঝলি? মনে থাকবে তো?

—থাকবে হুজুর।

—হ্যাঁ, ভুলিসনি যেন, খুব জরুরী!

আশ্চর্য বটে! এত করে আসতে বলে এল দীপংকর, আর কি না এল না। সত্যি, কী আক্কেল লোকটার। দীপংকর তো তাদের জন্যেই অত করে বলে এসেছিল। নইলে তার কীসের স্বার্থ! লক্ষ্মীদির জন্যেই দীপংকর নিজে রবিনসন সাহেবের কাছে অনুরোধটা করেছে। আর এত করে বলেও অনন্তবাবু ঠিক সময়ে আসতে পর্যন্ত পারলো না।

আবার ভেতরে গিয়ে ঢুকলো দীপংকর, মিস মাইকেলকে লম্বা নোট দিয়েছে সাহেব। সেইটেই একমনে টাইপ করছে। দীপংকর নিজের ফাইলগুলো আবার নামালো। আবার স্টেটমেণ্ট করতে হবে। স্টেটমেণ্ট পাঠাবার তারিখ এসে গেল আবার। কাজ করতে করতে দীপংকর আবার বাইরে এল। না, এখনও অনন্তবাবুর দেখা নেই।

চাপরাশিকে আবার জিজ্ঞেস করলে—কী রে, কেউ আসেনি?

—না হুজুর।

আশ্চর্য! লক্ষ্মীদিরই বা কী রকম দায়িত্ব-জ্ঞান! লক্ষ্মীদির ব্যাপারটাই যেন দুর্বোধ্য। অনন্তবাবুর সঙ্গে অত মাখা-মাখিই বা কেন! হ্যাঁ, উপকার করছে ভদ্রলোক, সেইজন্যেই যা একটু কৃতজ্ঞতা। কিন্তু সেই কৃতজ্ঞতাটুকুর জন্যে অত ঘনিষ্ঠতার দরকার কী! অত হাসাহাসি, অত গায়ে গড়িয়ে পড়ার দরকার কী! অথচ পাশের ঘরে দাতারবাবু তখন চীৎকার করছে—উন্মাদের চিৎকার।

হঠাৎ নজরে পড়লো এতক্ষণে অনন্তবাবু আসছে। বাইরের গেট দিয়ে সোজা ভেতরে আসছে তার দিকে। পোশাকটা বদলিয়েছে। একটু ফিট্‌ফাট। ফরসা জামা-কাপড়। দীপংকর হেসে এগিয়ে গেল অনন্তবাবুর দিকে। শেষ পর্যন্ত যে অনন্তবাবু এসেছে এই-ই যথেষ্ট! তা না হলে এত তোড়-জোড় এত রবিনসন সাহেবকে ধরা সব মাটি হতো!

অনন্তবাবু! আপনি এত দেরি করে এলেন, আমি অনেকক্ষণ ধরে এখানে অপেক্ষা করে আছি—

অনন্তবাবু হন হন করে আসছিল সোজা। তারপর দীপংকরের পাশ দিয়ে ডান দিকে ঘুরে গেল। যেন দীপংকরকে দেখতেই পেলে না!

দীপংকর ডাকলে—অনন্তবাবু,—এই যে আমি—

অনন্তবাবু পেছন ফিরে চাইলে একবার

সর্বঋতুর সঞ্জীবনী
দই মিষ্টি
গাঙ্গুরাম গ্র্যাণ্ড সন্স
ভবানীপুর ও কালীঘাট — কলিকাতা —
ফোন: ৪৭-২৩৭৭

দীপঙ্করের দিকে। অনেক কষ্টে যেন চিনতে পারলে। বললে—ও, আপনি, আমি আসছি—

বলে আর দাঁড়ালো না, একেবারে হন হন করে মিস্টার ঘোষালের ঘরে ঢুকে পড়লো। আর চাপরাশিটাও তেমনি। অনন্তবাবুকে দেখেই একটা সেলাম করলে, তারপর দরজাটা খুলে ফাঁক করে দিলে।

এক নিমেষে যেন একটা ম্যাজিক হয়ে গেল দীপঙ্করের চোখের সামনে। সেই অনন্তবাবুই তো, না সে ভুল করেছে? না সে অন্য লোককে অনন্তবাবু বলে ভুল করেছে। আশ্চর্য তো! চিনতেই পারলে না দীপঙ্করকে! অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগলো দীপঙ্কর। এ কী রকম হলো। যার জন্যে সে এত চেষ্টা করলে, সে-ই তাকে চিনতে পারলে না! মিস্টার ঘোষালকে এত ভাল করে চিনেও সেখানে তার কাছেই গেল!

সেদিন দীপঙ্কর তার চাকরি-জীবনের প্রথম দিনে সত্যিই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। নিঃস্বার্থ উপকার যে করতে চায়, তার কাছে লোকে না এসে কেন যায় স্বার্থপর অশুভ-বুদ্ধি লোকের কাছে! যেখানে সহজে কার্য-সিদ্ধি হয়, সেখানে যাবার প্রবৃত্তি কেন

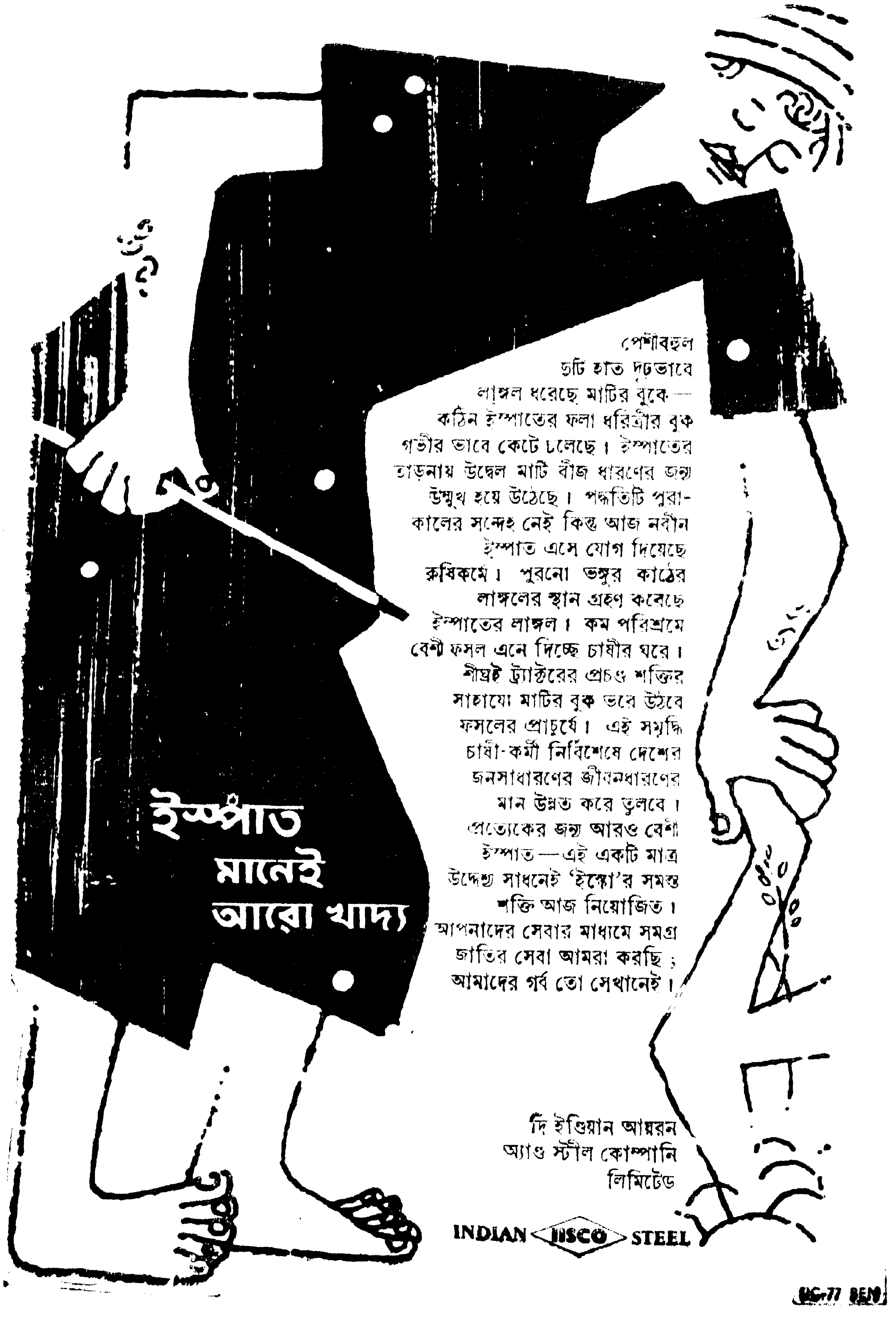

মানুষের হয় না! দীপঙ্করের কোনও স্বার্থ ছিল না বলেই কি অনন্তবাবু মিস্টার ঘোষালের ঘরে গিয়ে ঢুকলো—যেখানে ঘুষ দিতে হবে, যেখানে অন্যায়ের সঙ্গে বোঝা-পড়া করতে হবে, সেখানে?

সেইখানেই আরো অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইল দীপঙ্কর। কাল সেই রাত্রের পর এমন কী ঘটনা ঘটে গেল, যার জন্যে আজ অনন্ত-বাবুর এই বিপরীত আচরণ। দীপঙ্করের সমস্ত অন্তরটা বেদনায় টন টন করে উঠলো। বেদনাটা অনন্তবাবুর এই বিপরীত ব্যবহারের জন্যে ততটা নয়, যতটা আত্ম-গ্লানিতে। ছোটবেলা থেকে অনেক মানুষের অনেক ব্যবহারের সঙ্গে তার মুখোমুখি ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, অনেক দুর্বোধ্য আচরণের ব্যাখ্যাও মিলেছে, কিন্তু এ কী হলো! এমন তো হবার কথা নয়। মনে হলো দীপঙ্করের সততা, দীপঙ্করের নিষ্ঠা, দীপঙ্করের ভালবাসার যেন চরমতম অপমান করলে অনন্তবাবু!

দ্বিজপদ এসে ডাললে—হুজুর, সাব সেলাম দিয়া—

দীপঙ্কর চাপরাশিকে বললে—একটু দেখিস তো, ওই বাবু ঘোষাল সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে যায় কিনা—

রবিনসন সাহেবের ঘরে বেশিক্ষণ সময় লাগেনি। একটা দুটো প্রশ্নের উত্তর দিয়েই তাড়াতাড়ি আবার বেরিয়ে এসেছে। এসেই চাপরাশিটাকে জিজ্ঞেস করলে—বাবু বেরিয়েছে?

—না হুজুর।

দীপঙ্কর দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। অনন্ত-বাবুর সঙ্গে দেখা করতেই হবে আজ। অন্তত লক্ষ্মীদির জন্যেও দেখা করতে হবে। তাহলে কেন তাকে চিঠি দিয়ে ডাকিয়ে পাঠিয়েছিল লক্ষ্মীদি! কেন তাকে অপমান করা এমন করে? রবিনসন সাহেব যখন জিজ্ঞেস করবে—কই, তোমার রিলেটিভ এল না? তখন কী উত্তর দেবে দীপঙ্কর?

হঠাৎ মিস্টার ঘোষালের দরজাটা খুলে যেতেই দীপঙ্কর তৈরি হয়ে নিলে।

কিন্তু অনন্তবাবুর সঙ্গে মিস্টার ঘোষালও বেরোল বাইরে। দু'জনের যেন খুব ভাব। গল্প করতে করতে দু'জনে বেরিয়ে সামনের গেটের দিকে গেল। মিস্টার ঘোষালের গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল সামনে। দু'জনেই গিয়ে উঠলো তাতে। দীপঙ্কর ডাকতে যাচ্ছিল অনন্ত-বাবুকে। কিন্তু তার আগেই গাড়িটা ছেড়ে দিয়েছে।

দীপঙ্কর খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। তারপর আস্তে আস্তে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে পড়লো।

মিস মাইকেলের তখন হাত খালি। এক কাপ চা করে খাচ্ছে।

বললে—কী হলো সেন? তোমাকে এত ওরিড্ দেখাচ্ছে কেন? হোয়াট হ্যাপেনড্?

দীপঙ্কর মুখটা আড়াল করে বললে—না কিছু হয়নি—

মেমসাহেব বললে—আজ যাবে সেন?

—কোথায়?

দীপঙ্করের কোনও কথা মনে ছিল না। তার মাথাটার ভেতর সব যেন গোলমাল হয়ে গিয়েছে।

মেমসাহেব বললে—আমার ফ্ল্যাটে। আমার অ্যালবামটা দেখাবো তোমায় চলো। অনেক কালেকশন্ আছে আমার ভিভিয়ানের ছবিও দেখাবো, সে যে খাটে শুয়ে থাকতো, সেটা দেখাবো, সে যে ড্রেসিং টেবলে বসে ড্রেস করতো সেটা দেখাবো—চলো—

তারপর হঠাৎ দীপঙ্করের মুখের দিকে চেয়ে মেমসাহেব বললে—কী ভাবছো? এনিথিং রং উইথ্ ইউ?

দীপঙ্কর তখনও ভাবছিল—এ কেমন করে হলো। এ কেমন করে সম্ভব হলো। এমন ব্যবহার কেন করলে অনন্তবাবু! লক্ষ্মীদি আর অনন্তবাবু যে খেতে বসে এত হেসে গড়িয়ে পড়েছে, তার জন্যে তো কিছু বলেনি দীপঙ্কর। দীপঙ্কর যে সে-সব দেখতে পেয়েছে, তাও তো কেউ জানে না। সে তো চুপি চুপি দেখে আবার চুপি চুপি বেরিয়ে এসেছে। লক্ষ্মীদিও জানতে পারেনি, অনন্তবাবুও জানতে পারেনি। তার মনিব্যাগটা সেখানেই পড়ে ছিল তবু পাছে তারা জানতে পারে, পাছে তাদের আনন্দের ব্যাঘাত হয়, তাই সেটা না-নিয়েই সে তো ফিরে এসেছে। সেই অত রাত্রে অত দূর থেকে ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন পর্যন্ত হেঁটেই চলে এসেছে।

হঠাৎ গাঙ্গুলীবাবু ঘরে ঢুকলো।

বললে—সেনবাবু, যাবেন নাকি?

—কোথায়?

—সে কি, এর মধ্যেই ভুলে গেলেন? সেই কবিরাজী তেল কিনবেন না? মধ্যম-নারায়ণ তেল? সেই পাগলের ওষুধটা!

দীপঙ্করের ঘেন্না হলো কথাটা ভাবতে। বললে—না গাঙ্গুলীবাবু, ও তেল আমার দরকার নেই—

—সে কি, এর মধ্যেই ভুলে গেলেন? আপনার? তেলটা ভাল, আমি তো বলছি, যত দিনের পাগলই হোক, একটু মাখালেই সেরে যেত। একেবারে অব্যর্থ ওষুধ, দামটাও বেশি নয়—

দীপঙ্কর বললে—না গাঙ্গুলীবাবু, আমার দরকার নেই, আমি আর কারোর ভালোর জন্যে মাথা ঘামাবো না—যাদের আমি নিজের লোক মনে করে উপকার করবার চেষ্টা করি, তারাই আমাকে পর ভাবে, আপনি যান আজকে, আমার দেরি হবে যেতে—

গাঙ্গুলীবাবু কী ভেবে শেষ পর্যন্ত চলে গেল। সত্যিই তো, কেন সে ভাবতে যাবে! লক্ষ্মীদির তো কোনও দুঃখ নেই। তার তো হাসতে বাধে না। দাতারবাবু পাগলই হোক আর যাই হোক, তাতে লক্ষ্মীদির তো ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। লক্ষ্মীদি তো অনন্তবাবুর সঙ্গে সুখেই আছে!

খানিক পরে মিস্ মাইকেল বললে—চলো সেন—

দীপঙ্কর সে কথার উত্তর না দিয়ে বললে—জানো মিস্ মাইকেল, আমি যেখানেই মিশতে গিয়েছি, যার সঙ্গেই ভাব করতে গেছি, সেখানেই আমাকে বহু বাধা পেতে হয়েছে। আমি স্বার্থ চাইনি, অর্থ চাইনি, শুধু চেয়েছিলাম মিশতে, শুধু চেয়েছিলাম ভালবাসতে—কিন্তু সব জায়গা থেকেই আঘাত পেয়েছি কেবল—কেন এমন হয় বলতে পারো? কেন সংসারের মানুষরা ভালো হয় না? কেন সৎ হয় না, কেন ভাল-বাসতে জানে না কেউ, বলতে পারো?

মেমসাহেব খানিকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইল দীপঙ্করের দিকে। হঠাৎ দীপঙ্করের ভাবান্তর দেখে কেমন আশ্চর্য হয়ে গেল। এতদিন একসঙ্গে কাজ করছে, কিন্তু এর আগে এমন করে তো কথা বলেনি সেন!

বললে—চলো। কেন মানুষ ভাল হয় না আমি তোমায় বলবো, আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে দেব—

মিস মাইকেল তাড়াতাড়ি কাগজপত্র সব গুছিয়ে রাখলে। মেশিনটা বন্ধ করে চাবি দিয়ে দিলে চাপরাশি। চায়ের সাজ-সরঞ্জাম সব গুছিয়ে রেখে আলমারিতে চাবি লাগিয়ে দিলে। রবিনসন সাহেব চলে গেছে।

সব ঠিক করে বেরোতে যাবার বন্দোবস্ত করছে, এমন সময় হঠাৎ কাছাকাছি কোথাও দুম দুম করে কয়েকবার বিকট আওয়াজ হলো। বন্দুক কিম্বা রিভলবারের শব্দ। অনেক লোকের চিৎকারের শব্দ কানে এল। কাছাকাছি যেন কোথাও গণ্ডগোল শুরু হলো। মিস মাইকেল আর্তনাদ করে উঠেছে।

—সেন, স্টপ্, স্টপ্—ফায়ারিং—ফায়ারিং হচ্ছে, স্টপ্—

তাড়াতাড়ি দীপঙ্কর আবার ঘরের ভেতর ঢুকলো। মেমসাহেব বললে—ক্লোজ দি ডোর—ক্লোজ ইট—কুইক—

অনেকক্ষণ ধরে যেন অনেক গোলমাল চলতে লাগলো কাছাকাছি। দরজা বন্ধ ঘরের

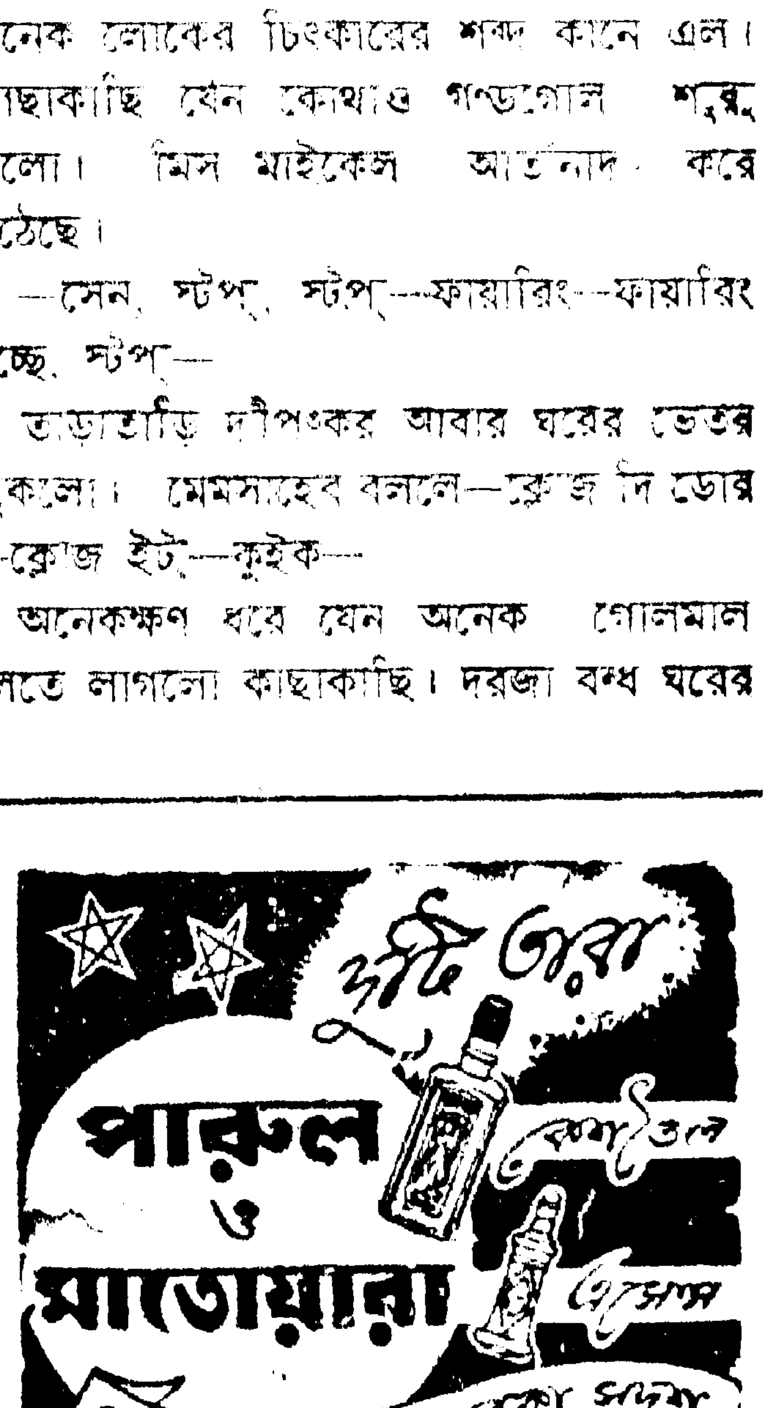

ভেতর মিস্ মাইকেল আর দীপঙ্কর ঘন হয়ে বসলো। মিস মাইকেল দীপঙ্করের হাত দুটো ধরে রাখলে জোর করে। বললে—বাইরে যেও না, এখানে থাকো—ফায়ারিং হচ্ছে—

হঠাৎ গাঙ্গুলীবাবু আবার দৌড়ে ফিরে এসেছে। তখনও হাঁফাচ্ছে। বললে—সর্বনাশ হয়েছে সেনবাবু, রাইটার্স বিল্ডিং-এ গুলী চলছে—

—কেন?

গাঙ্গুলীবাবু বললে—সমস্ত লোকজন যে-যেদিকে পারছে পালাচ্ছে—পুলিসে পুলিসে ছেয়ে গেছে একেবারে, আমি দৌড়তে দৌড়তে আবার চলে এসেছি—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে, কিছু শুনলেন?

গাঙ্গুলীবাবু বললে—কর্ণেল সিমমনকে স্বদেশীরা খুন করেছে—জেলখানার আই-জি। সাহেব অফিসের ভেতরে বসে ছিল, হঠাৎ স্বদেশীরা ঢুকে একেবারে বুকের ওপর গুলী করেছে— (ক্রমশ)

সর্বত্র গৃহিণীরা বলাবলি করছেন

- সার্ফে কাচলে বোঝা যায়

সাদা জামাকাপড়

কতখানি ফরসা হতে পারে!

সার্ফে কাচলেই বুঝতে পারবেন যে সার্ফ জামাকাপড়কে শুধু "পরিষ্কার" করে না, ধবধবে ফরসা করে। সার্ফে কাচারও কোন ঝামেলা নেই। সহজেই সার্ফের দেদার ফেনা কাপড়ের ময়লা টেনে বার করে, কাপড় আছড়াবার কোন দরকার নেই। আর সার্ফে কাপড় যা পরিষ্কার হয় তা, না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। এর কারণ সার্ফের অদ্ভুত কাপড় কাচার শক্তি! দেখবেন সার্ফে রঙীন কাপড়ও কেমন ঝলমলে হবে! সার্ফে সবচেয়ে সহজে আর সবচেয়ে চমৎকার কাপড় কাচা যায়। ধুতি, শাড়ী, ফ্রক, জামা, তোয়ালে, ঝাড়ন এক কথায় বাড়ীর সব জামা কাপড় সার্ফে কাচুন—দেখবেন ধবধবে ফরসা করে কাচতে সার্ফের জুড়ী নেই!

নীল সার্ফ দিয়ে বাড়ীতে কাচুন, কাপড় সবচেয়ে ফরসা হবে

SU. 12-452 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

৪৩

এগজিবিশনের সাফল্যের পর শিশির-বাবুদের একটা ধারণা জন্মালো যে, 'সীতা' নিয়ে পাবলিক থিয়েটার খুললে জমবে। 'সীতা' করে দল সংগঠন করা তাঁর হয়ে গেছে, কিন্তু মঞ্চ কই? কলকাতার এই স্বল্পসংখ্যক থিয়েটারগুলির মধ্যে একটি দল গৃহহারা হয়ে সারা বাঙলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনোমোহন যদিও তখন খুব ক্ষীণ, তবু তাদের মঞ্চ রয়েছে বলে কোনক্রমে চলছে। আর এক মুমূর্ষু দল, বেংগল থিয়েট্রিক্যাল কোং, কর্নওয়ালিস ছেড়ে আলফ্রেডে গেছেন। যে দু-তিনদিন কর্নওয়ালিসে থিয়েটার করেছিলেন ম্যাডান কোম্পানী, সে দু-তিনদিনই বা সিনেমা বন্ধ থাকে কেন? যেখানে সিনেমাতে লাভ থাকছে, অথচ থিয়েটার তেমন জমছে না! এইভাবে টাকার ক্ষতির কথা ভেবে থিয়েটারটাকে ওঁরা নিয়ে এসেছিলেন অ্যালফ্রেডে। এখানে এসে ওঁরা ধরলেন "সতীলীলা"। এটি হিন্দী সতী অনসূয়া নাটক অবলম্বনে গঠিত বাঙলা নাটক, রচনা ডাঃ হরনাথ বসুর, যাঁর লেখা "বেহুলা" নাটক অমরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টারে অভিনয় করেছিলেন। 'সতী অনসূয়া' করাতে ওঁদের সুবিধা হয়েছিল এই যে, পার্শী থিয়েটারের যাবতীয় সিন-টিন ওরা ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। বহু অর্থব্যয়ে প্রস্তুত ঐসব সিন, সবগুলিই আবার 'ম্যাজিক সিন।' 'সতীলীলা' আমি দেখেছিলাম। অত্রি ঋষির পত্নী অনসূয়ার সতীত্বের মহিমাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এর কাহিনী। সংগে আবার অন্য এক সতীর কাহিনীও জুড়ে আছে। ইনি তাঁর কুষ্ঠরোগগ্রস্ত স্বামীকে পিঠে করে—ঝোলায় বসিয়ে—বারবনিতার গৃহে নিয়ে গিছলেন। কিন্তু যখন ওভাবে তিনি স্বামীকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর স্বামীর পা অনবধানবশত মাণ্ডব্য ঋষির গায়ে লেগে গিয়েছিল। রাত্রে, অন্ধকারে ঠিক করতে পারেনি সতী। ঋষি ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন—সূর্যোদয়ের সংগে সংগেই তোমার স্বামীর প্রাণ বেরিয়ে যাবে।

তার উত্তরে, সতী নারীও দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন—আমি যদি যথার্থ সতী হই, তাহলে বলছি, সূর্য আর উঠবে না।

ফলে, প্রকৃতির রাজ্যে এলো এক বিশৃঙ্খলা—অনিয়ম। সতীর কথা ত আর মিথ্যা হতে পারে না, তাই সূর্যও উঠতে পারছেন না। আর, সূর্য না উঠলে সব-কিছুই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। অতএব, দেবতারা চঞ্চল হয়ে উঠলেন স্বর্গে। তাঁরা এলেন একযোগে সতীর কাছে। অনুরোধ করতে লাগলেন—তোমার বাক্য ফিরিয়ে নাও, নইলে সৃষ্টি যে রসাতলে যাবে!

সতী বললেন—কী করে ফিরিয়ে নেই বাক্য? স্বামীর প্রাণ চলে যাবে!

তখন মাণ্ডব্য ঋষি বললেন—শাপ প্রত্যাহার করছি।

সতীও বললেন—তাহলে, সূর্যদেব উঠতে পারেন।

পরক্ষণেই—সূর্যোদয় হলো—সপ্তাশ্ব রথে সূর্যদেব উঠে এলেন, সতী নারী ও তাঁর স্বামী দিব্যদেহে সূর্যের রথে করে ধীরে ধীরে উঠে গেলেন ওপরে—দিব্যধামে।

এই 'ট্রান্সফরমেশন সিনটা' ছিল দেখবার মতো। সতী নারী সাজতেন—নীরদাসুন্দরী। তাঁর কুষ্ঠরোগগ্রস্ত স্বামী সাজতেন—সত্যেন্দ্রনাথ দে। অত্রিমুনি যিনি সাজতেন, তাঁর নাম—নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, পুরাতন কালের মিনার্ভার অভিনেতা, ইনিই ছিলেন 'সাজাহান'-এর ওরিজিন্যাল যশোবন্ত সিংহ।

এতো গেল এক সতীর কথা, কাহিনীর নায়িকা যে সতী, তিনি হচ্ছেন অনসূয়া। এঁর সতীত্বের মহিমা এমনভাবে দিকে দিকে প্রচারিত হলো যে, ইন্দ্র প্রভৃতি পঞ্চ-দেবতা একদিন পরিব্রাজক ব্রাহ্মণের বেশে পরীক্ষা করতে এলেন তাঁকে। যখন এলেন, তখন মুনি ছিলেন না। সতী অনসূয়ার কাছে এসে তাঁরা প্রার্থনা করলেন—আশ্রয়। তাঁরা বললেন—আমরা পথশ্রমে শ্রান্ত ও ক্ষুধিত।

অনসূয়া সাদরে গ্রহণ করলেন তাঁদের। অতিথি সংকারে উদ্যত হলেন। প্রার্থনা করলেন—অন্ন গ্রহণ করবার জন্যে। কিন্তু দেবতারা তা চাইলেন না। অনসূয়া তখন বললেন—সেবা যদি না গ্রহণ করেন ত আমাকে ত বটেই, আমার স্বামীকেও পাপ স্পর্শ করবে। একান্ত অনুরোধ, অন্ন আপনাদের গ্রহণ করতেই হবে।

ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পালের
পরিবার পরিকল্পনা বা
জন্ম-নিয়ন্ত্রণ
কার্যকরী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জন্য
বিবাহিত নর-নারীর অবশ্য পাঠ্য,
বহু চিত্র-সম্বলিত। মূল্য ১·৫০ মাত্র
বাসন্তী লাইব্রেরী
২২/১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

এইচ-এম-ভি গ্রামোফোন রেকর্ড এবং চার-গতিযুক্ত রেকর্ড প্লেয়ার ট্রানসিস্টার লোকাল, ও অলওয়েভ রেডিও এবং বিভিন্ন প্রকারের রেডিও ও গেরভ্ রেকর্ডচেঞ্জার সহ রেডিও-গ্রাম। জাইস আইকন ও আগফা ক্যামেরা কোডাক ও অন্যান্য ফিল্ম, কাগজ কেমি-ক্যাল, ফ্লাস বাল্ব, বাইনাকুলার ও টেপ-রেকর্ডার বিক্রয়ের জন্য মজুত আছে। কিস্তিতেও দেওয়া হয়।—নান্ এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ৯এ, ডালহৌসি স্কোয়ার ইস্ট, কলিকাতা-১। (বি-ও ৩৩১২)

সংগীত দ্বিমাসিক
রম্যবীণা
আগামী সপ্তাহে প্রকাশ্য
চতুর্থ সংখ্যায় থাকবে
● প্রথিতযশা সংগীতসাধক দিলীপ-কুমার রায়ের তথ্যবহুল প্রবন্ধ : টপ্পা ও ভাবভক্তি; ও. সি. গাঙ্গুলী বিরচিত সংগীতের বর্তমান পরিস্থিতি-বিষয়ক একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ; হিমাংশু দত্তের সুর-প্রতিভার এক অভিনব মূল্যায়ন অশোকরঞ্জন সিংহের গবেষণামূলক 'সুধাকর-স্মরণী' শীর্ষক প্রবন্ধে; গানের ভাবরস সম্বন্ধে লিখেছেন অধ্যাপক ডাঃ হরপ্রসাদ মিত্র। এছাড়া অন্যান্য প্রবন্ধ, স্বরলিপি ও বিভিন্ন বিভাগ ●
॥ সম্পাদক ॥ : মূল্য :
ভাস্কর মিত্র ৭৫ নঃ পঃ
২৬/৪ ব্রড স্ট্রীট, কলিকাতা—১৯
(সি-৭৭৩৯)

ডাঃ কার্ত্তিক বসুর
টাইকোসোডা | নানালা
অম্ল, অজীর্ণ ও ডিসপেপসিয়ায় | ব্যথা ও বেদনায়
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ-কলিকাতা ৯

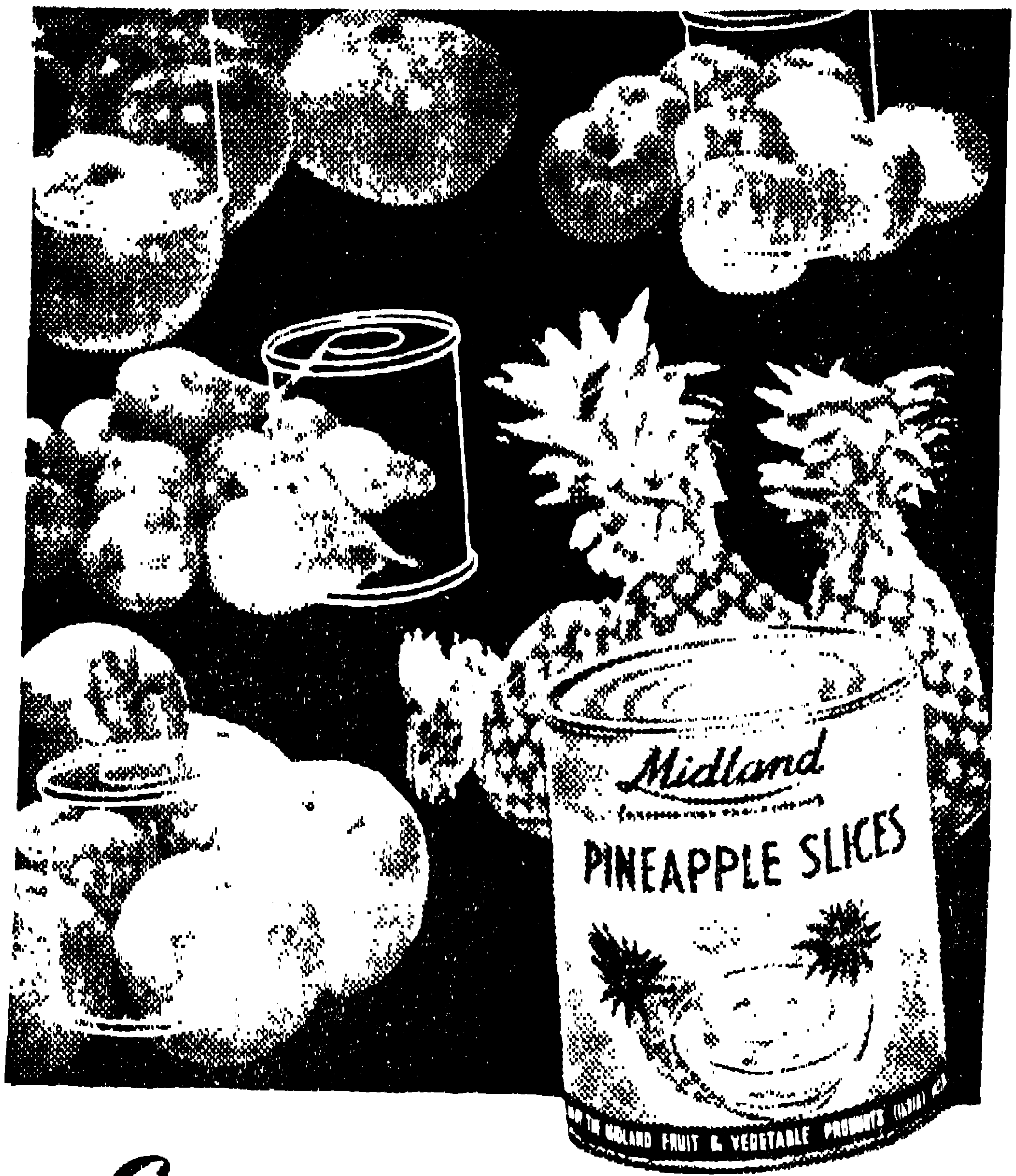

মিডল্যাণ্ড সবসময়েই পাবেন

Midland

মিডল্যাণ্ড বাছাই করা ২৭ রকমের ফল, তরকারী, জ্যাম এবং জেলী পরিবেশন করে। টিনে প্যাক করা এর চেয়ে ভাল খাবার হয় না।
এদেশে টিনে প্যাক করা খাবার তৈরীতে এরাই সবচেয়ে বড় তাই সবচেয়ে ভাল জিনিষই এরা নিয়ে থাকে সবসময়।

দেখে নিন এটা মিডল্যাণ্ড তৈরী

প্রস্তুত কারক:
দি মিডল্যাণ্ড ফ্রুট অ্যাণ্ড ভেজিটেবল প্রোডাক্টস (ইণ্ডিয়া) মথুরা

একমাত্র পরিবেশক:
কর্ণ প্রোডাক্টস্ কোং (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড, বোম্বাই

ভারতের এজেন্ট: প্যারী অ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

তাঁরা বললেন—পারি, কিন্তু এক শর্তে।

—বলুন। সকল শর্তেই সম্মত আছি।

তাঁরা প্রস্তাব করলেন—ভোজনার্থে যখন আসন গ্রহণ করবো, তখন তোমাকে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে আমাদের অন্ন পরিবেশন করতে হবে।

চমকে উঠলেন অনসূয়া। কিন্তু তবু তিনি বললেন—তাই হবে।

তারপর, পাদ্যার্ঘ্য গ্রহণ করে ব্রাহ্মণবেশী দেবতাবৃন্দ আসনে বসলেন অন্ন গ্রহণ করবার জন্য। অনসূয়া বললেন—আমি অন্ন পরিবেশন করছি, কিন্তু আমার নগ্নরূপ যাতে আপনারা দেখতে না পান, সেজন্য দুগ্ধপোষ্য শিশু হয়ে যান। সতীর বাক্য মিথ্যা হবার নয়। বলামাত্রই দেবতারা যার-যার আসনে অবিলম্বে হয়ে গেলেন দুগ্ধপোষ্য শিশু। আর শিশু যখন হয়ে গেলেন, তখন অন্ন গ্রহণ করার সামর্থ্যও তাঁদের রইল না। ফলস্বরূপ, অনসূয়াকেও আর বাস পরিত্যাগ করতে হলো না, দেখা গেল, তিনি পঞ্চ শিশুকে একে একে তুলে দোলনার ওপরে শুইয়ে দিলেন।

এই পরিবর্তন-দৃশ্যটি, পরিব্রাজক ব্রাহ্মণ থেকে দুগ্ধপোষ্য শিশুতে পরিণত হওয়া এটা হতো একেবারে ইন্দ্রজালের মতো। তখন প্রেক্ষাগৃহে বসে বুঝতে পারিনি, এর অন্তর্নিহিত কৌশলটা কী! পরে, এ ধরনের দৃশ্য দেখিয়েছিলেন পটলবাবু মিনার্ভাতে। পরবর্তীকালে যখন আমিও 'আত্মদর্শন'-এ অভিনয় করেছিলাম, সেই সময় এর কায়দাটা দেখে নিয়েছিলাম, যথাসময়ে তা বর্ণনা করা যাবে। এতে 'অনসূয়া'র ভূমিকায় যিনি নামতেন, তাঁর নাম—শ্রীমতী মালিনী। নাটক নগণ্য হলেও, অভিনয় ভালো হতো, বিশেষ করে কয়েকজনের অভিনয় তো অতি-চমৎকার! অনসূয়া-চরিত্রের মর্যাদা বা গাম্ভীর্য, পুরো মাত্রায় বজায় রাখতেন শ্রীমতী মালিনী। আরেকটি নতুন অভিনেত্রীও চোখে পড়বার মতো অভিনয় করলে। অল্পবয়সী মেয়েটি, ছিপছিপে গড়ন, অভিনয় করেছিল একটি চটুল ভূমিকায়। সুন্দর মানিয়েছিল তাকে, তার ওপরে নাচে-গানে, লঘু সংলাপে রীতিমত চিত্তাকর্ষকও হয়েছিল ভূমিকাটি। এ'র নাম শ্রীমতী প্রভা, উত্তরকালে যিনি প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীরূপে প্রখ্যাতা হয়েছিলেন বাঙলার রঙ্গমঞ্চে। কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় 'বণিক' সাজতেন, হাস্যরসাত্মক একটি ভূমিকা, তারই তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী সাজতেন প্রভা। মনে হচ্ছিল যেন মাণিক-জোড়। অভিনয়ের ব্যাপারে আর সবাইকে মামুলী ধরনের মনে হয়েছিল, তার মধ্য থেকে দু' ধরনের দুই ভূমিকায় ঐ মালিনী আর প্রভা যে চমক দিয়েছিল, তা

ভোলবার নয়। অথচ, নাট্যবস্তু তেমন জোরালো না থাকায়, 'সতী লীলা' নাটক চলল না। তারপরে, যতদূর মনে পড়ে, ধরেছিলেন তাঁরা ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক—'বিদূরথ'। তারিখটা ঠিক মনে নেই, সম্ভবত এটিই ছিল ম্যাডানের বেঙ্গল থিয়েটারের শেষ বই। নাম ভূমিকায় ছিলেন—নির্মলেন্দু লাহিড়ী। বইটা দেখিনি, এবং প্লে সম্বন্ধে তেমন কিছু শুনিওনি। তখন ও'দের থিয়েটারের এমন অবস্থা যে, এ'দের সংবাদ কেউ বিশেষ রাখত না, সাপ্তাহিক যে প্লাকার্ড-পোস্টার পড়ার কথা, তা-ও নিয়মিত পড়ত না। নতুন বই খোলবার সময় এ বিষয়ে একটু চাড় দেখা যেতো, তারপরে সব যেতো মিইয়ে। এমনি করে করে কখন যে ও-থিয়েটার একদিন মিলিয়ে গেল, শেষ হয়ে গেল, জানতেও পারলাম না। লক্ষ্য রেখেছিলেন শিশিরবাবু, ও'দের থিয়েটার উঠে যেতেই, উনি গিয়ে তাড়াতাড়ি নিয়ে নিলেন অ্যালফ্রেড মঞ্চ। শুনলাম, নামকরণ করাও হয়ে গেছে। নাম হলো—নাট্যমন্দির। এইবার প্রয়োজন নাটক। 'সীতা' ত করাই আছে, এখন শুভদিন দেখে তাকে মঞ্চস্থ করলেই হয়। ওদিকে 'সীতা' নিয়ে ব্যাপার হয়েছে এই যে, এগজিবিশনে উনি যে চার দিনের বেশী অভিনয় করেছিলেন, সেটা দ্বিজেন্দ্রলাল-পুত্র দিলীপকুমারকে উনি জানান নি। ভেবেছিলেন, 'ও নিয়ে ভাবতে হবে না, যখন আমরা অভিনয় করব, তখন যথাস্থানে জানিয়ে অনুমতি নিলেই হবে।' কিন্তু সেটিই হলো ভুল।' এবারে 'সীতা'র রাইট-এর ব্যাপারে সচেষ্ট হতে গিয়ে শুনলেন, 'সীতা' বেহাত হয়ে গেছে। এ-ও শুনলেন, ওটি আর্ট থিয়েটার সংগ্রহ করেছেন অভিনয় করবার জন্য।

প্রায় মাথায় হাত দিয়ে পড়বার মতো অবস্থা। থিয়েটার নিয়ে নেওয়া গেছে, তার নিয়মিত ভাড়া গুণে যেতে হবে, সামনের দোলের দিনে নতুন নাটক দিয়ে 'নাট্য-মন্দির'-এর উদ্বোধন হবে, স্থির হয়ে গেছে। এখন উপায়? বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে পরামর্শ করে শেষ পর্যন্ত ঐ দোলের দিনেই নাট্য-মন্দিরের উদ্বোধনের ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু ঠিক কোনো নাটক দিয়ে নয়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়-সঙ্কলিত কতগুলি গানের সঙ্কলনকে নাট্যাকারে গ্রথিত করে, নাম দিলেন—বসন্তলীলা। অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে ওতে সুর সংযোজনা করেছিলেন। কৃষ্ণবাবুর নিজের মুখে গাওয়া কতগুলি গানও এতে ছিল, তার মধ্যে দু-একখানা গান বেশ জনপ্রিয়ও হয়েছিল। 'বসন্তলীলা'র অন্যতম আকর্ষণও ছিলেন কৃষ্ণবাবু। বলা কর্তব্য, এই 'বসন্তলীলা'র মাধ্যমেই বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে তাঁর প্রথম আবির্ভাব। নৃপেন্দ্রনাথ বসু মশাই ছিলেন বেঙ্গল থিয়েটারে, তিনিও এসে যোগদান করলেন ও'র দলে। তিনিই দিলেন 'নাচ' বসন্তলীলায়। নেপথ্য সঙ্গীতের জন্য এসেছিলেন গুরুদাসবাবু বলে এক সঙ্গীতজ্ঞ ভদ্রলোক, বিলাতী সুর-টুর তাঁর খুব আয়ত্তে ছিল। যাই হোক, যথা-বিজ্ঞাপিত দিবসে ত উদ্বোধন হলো 'নাট্য-মন্দির'-এর। ও'রা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন 'সম্পূর্ণ নূতন ধরনের গীতিনাট্য' বলে, যার আবার কাগজে প্রতিবাদ জানালেন কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। ২৯শে মার্চ, ১৯২৪ তারিখের হিন্দুস্থানে তিনি যা লিখেছিলেন, তার মোটামুটি তাৎপর্য হলো এই যে, 'বসন্তলীলা', 'নূতন ধরনের' গীতিনাট্য, এটা বলা ভুল। 'কামিনীকুঞ্জ', 'মনচোরা' প্রভৃতি এই ধরনের বই এর আগে অভিনীত হয়ে গেছে। পঞ্চাশ বছর আগে উনিই 'কামিনীকুঞ্জ'-এ শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'বসন্তলীলা' চলল না। ও'রা তখন পুরনো বই 'আলমগীর' প্রভৃতি মঞ্চস্থ করতে লাগলেন। লোকপরম্পরায় শুনলাম, 'সীতা' করবরাই তোড়জোড় করছেন শিশিরবাবু, নতুন কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' আর্ট থিয়েটার নিয়েছে একথা যখন শুনলাম, তখন আমার বিস্ময়ের অবধি ছিল না। ভাবছিলাম, আর্ট থিয়েটার ও-বই কেন করবে? ও-বইটি সম্পর্কে অপরেশবাবুর যে কী মত, আমি তা জানতাম। অপরেশবাবুর বন্ধু যাঁরা আসতেন, সবাই তাঁরা প্রবীণ এবং রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন, যেমন—বউ-বাজারের শ্রীশ মতিলাল মশাই, বন্ধু কবিরাজ সতীশচন্দ্র শর্মা (বিখ্যাত 'শ্বাশারী' ওষুধের আবিষ্কর্তা যিনি। আমরা বলতাম—'শ্বাশারী-দাদা'), পুলিন-বিহারী মিত্র (যিনি স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ শিষ্য, এবং নিজেও ছিলেন ভালো গাইয়ে, অনেক গান রেকর্ড করিয়েছিলেন)—শ্রদ্ধেয় সবারই মতামত শুনতে পেতাম বসে বসে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা'র অভিনয় সম্বন্ধে এ'দের কারুরই মত অনুকূল ছিল না। তবে আর্ট থিয়েটার ঝপ্ করে 'সীতা' নিলো কেন অভিনয় করবার জন্য? কথাটা এক সময় প্রবোধ-বাবুর কাছে গিয়ে পাড়লাম। উনি শুনে বললেন—ঠিকই শুনেছ, 'সীতা' করব আমরা। নির্মলেন্দু 'রাম' করবে।

এইবার যেন অন্ধকারে একটু আলো দেখা গেল। মনে হলো, এটা হওয়া সম্ভব। নির্মলেন্দু যখন আমাদের স্টারে এলো তখন 'কর্ণার্জুন' ও 'ইরানের রানী' ছাড়া নতুন বই নেই, যোগ্য ভূমিকা নিয়ে ও নামবে কোন্ বইয়ে? 'কর্ণার্জুনে' কোনো ভূমিকা নিতে প্রথমটায় সে অস্বীকারই

বাংলা নাট্যসাহিত্যে এই প্রথম

একাঙ্ক সঞ্চয়ন

রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ
শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের ২০টি শ্রেষ্ঠ কৃতির
অভূতপূর্ব সংকলন
একাঙ্কনাটিকার তত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্পাদকদ্বয় ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য ও ডঃ অজিতকুমার ঘোষের দুইটি মূল্যবান আলোচনায় সমৃদ্ধ। দাম ৮·০০

বীরু মুখোপাধ্যায়ের নতুন নাটক
সাহিত্যিক—২·০০
উমানাথ ভট্টাচার্যের মঞ্চ-সফল
শেষ সংবাদ—২·৫০ (যন্ত্রস্থ)
সুনীল দত্তর মর্মস্পর্শী পূর্ণাঙ্গ নাটক
অভিশপ্ত ক্ষুধা—১·৭৫

বিজন ভট্টাচার্যের **গোত্রান্তর** ২·৫০। বিধায়ক ভট্টাচার্যের **কান্নাহাসির পালা** ২·৫০। জোছন দস্তিদারের **দুই মহল** (২য় সং) ২·৫০। বীরু মুখোপাধ্যায়ের **সংক্রান্তি** (২য় সং) ২·৫০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের **বারো ভূত** ১·৫০। সুনীল দত্তের **হবুরাজার দেশে** ১·৭৫; **অংকুর** (২য় সং) ১·৫০

ছোটদের বাইশজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের
বাছাই-করা নাট্য-সঙ্কলন
ছোটদের রঙমহল ৩·৫০

লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার—তুলসী লাহিড়ী ২·০০। **নাটক নয়**—কিরণ মৈত্র ১·২৫। **একাঙ্ক সপ্তক**—দিগিন বন্দ্যোঃ ৩·০০। **অপরাজিত**—রমেন লাহিড়ী ১·৭৫। **অপরাধী**—দীপঙ্কর সরকার ০·৬২। **জিজ্ঞাসা**—শান্তি মুখোঃ ২·২৫। **জয়ের পথে**—সঞ্জীব সরকার ১·৫০। **ঊষার আলো**—অন্নদা বাগচী ১·৫০। সুনীল দত্তের **হরিপদ মাস্টার** (২য় সং) ২·০০, **জতুগৃহ** ১·৫০, **ত্রিনয়ন** ১·০০, **লুঠতরাজ** ০·৫০

জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিঃ-১

করেছিল, কর্ণার্জুন—ও-বই ত অনেকদিন ধরে চলেছে, ওতে আর আমি কী করব? আমায় নতুন কিছু দিন। এই নির্মলেন্দু আর শিশিরকুমার হচ্ছেন মামাতো-পিসতুতো ভাই। ভাবলাম, এ-যোগসূত্র থেকে এ অবস্থার উদ্ভব হতে পারে।

আমার এই অনুমান আরও দৃঢ় হয়েছিল, যখন নির্মলেন্দু আর্ট থিয়েটার ছাড়বার পর এক বিবৃতি দিয়েছিলেন এখানে 'সীতা' অভিনয় না হবার জন্য। 'সীতা' ছিল নির্মলেন্দুর অতিপ্রিয় বই। 'রাম'-এর ভূমিকাটি করবার জন্য ওঁর মধ্যে তীব্র বাসনাও আমি লক্ষ্য করেছিলাম। আর্ট থিয়েটারের সাপ্তাহিক অভিনয়পুঞ্জের দিনগুলি যখন বেড়ে গিয়েছিল, সেই সব দিনে মাঝে-মাঝে নির্বাচিত নৃত্যগীত প্রদর্শন করাই তখন রেওয়াজ ছিল, নির্বাচিত দৃশ্যের অভিনয় ব্যাপারটা—নতুন। 'সীতা' থেকে নির্বাচিত দৃশ্য অভিনয় হতো, তাতে 'রাম' সাজতো নির্মলেন্দু। এবং এ-ঘটনার বহু পরে, যখন ছায়াচিত্রের জগতে প্রথম এল টকীর আবির্ভাব, ম্যাডান তখন ছোট-ছোট নির্বাচিত দৃশ্য তুলতেন, তার মধ্যে একটি ছিল 'সীতা'র নির্বাচিত দৃশ্য, তাতেও—রাম—নির্মলেন্দু। এসব ঘটনাপরম্পরা লক্ষ্য করে আজ মনে হয়, হয়ত সেদিনের সেই অনুমানই সত্য হবে, নির্মলেন্দুর জন্য 'সীতা' নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কারুর মত না হওয়ায়, 'সীতার' অভিনয়টা আর হলো না।

ওদিকে, মার্চ মাস শেষ হয়ে এলো। মার্চের শেষ থেকেই স্টারে সিনেমা দেখানো শুরু হয়, যার কথা আগেই বলেছি। শনি-রবি-বুধবারে—নাটক। আর বাকী চারটি দিন—সিনেমা।

পড়ল এপ্রিল মাস। কর্ণার্জুনে আশী রাত পেরিয়ে গেছে, আরও চলবে। 'ইরানের রাণী'রও বেশ বিক্রি, তাতে করে আরও দু-তিন মাস চলবে আশা করা যায়। বুধবারের বইয়ের পক্ষে—বেশ আশাজনক অবস্থাই বটে! প্রসংগত বলি, আশী রাত্রি 'কর্ণার্জুন' অভিনীত হবার পরও ইংলিশম্যানে সমালোচনা বেরিয়েছিল। ১লা এপ্রিল ইংলিশম্যান যা লিখেছিলেন, তার মধ্যে সুখ্যাতির অংশটা বাদ দিলে বিরুদ্ধ মত যা ছিল, তা হচ্ছে এই যে, অনেক অনেক অভিনেতার মেক-আপ মাঝে-মাঝে 'রি-টাচ্' করা দরকার, ঘামে রঙ উঠে যায়। এবং অনেকের পোশাকে মাঝে-মাঝে আরও পরিবর্তন করা দরকার। পদ্মাবতীর বাবা যিনি সেজেছিলেন, যদিও তিনি রাজা, তাঁর পোশাকটা ছিল ময়লা—পাট-ভাঙাও নয়। প্রতিহারীর মতো, কী দু-একজন প্রতিহারীর থেকেও নিকৃষ্ট।

কথাটা একেবারে অগ্রাহ্য করবার মতো নয়। অখ্যাতনামা অভিনেতা বলে যত্ন করে ইস্ত্রী করে দেয়নি, যা দিতো ওরা বড়োদের, এই রকমই ছিল দস্তুর। খ্যাতনামাদের জন্য যত্ন আর আতিশয্যের অন্ত নেই, আর অন্যদের বেলায় অবহেলার অবধি ছিল না বেশ-সজ্জাকরদের। আর রঙ সম্বন্ধে ইংলিশম্যান যে ত্রুটি ধরেছেন, তা-ও যথার্থ। আমরা নতুনরা রঙ-করার ব্যাপারে যতটা যত্নশীল ছিলাম, সত্যি কথা বলতে কী, পুরনোরা ততটা ছিল না। আমরা মুখের সঙ্গে সঙ্গে হাত-

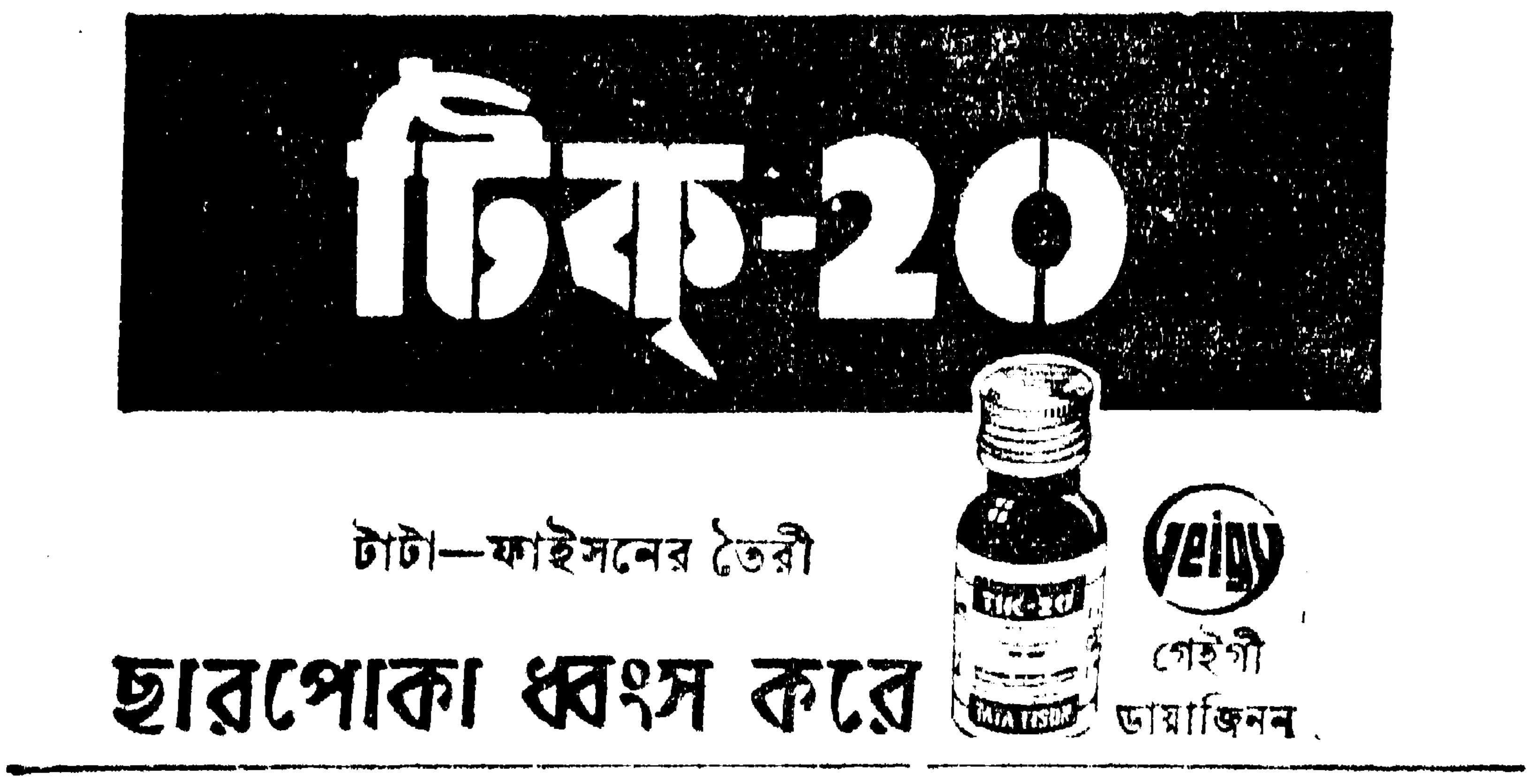

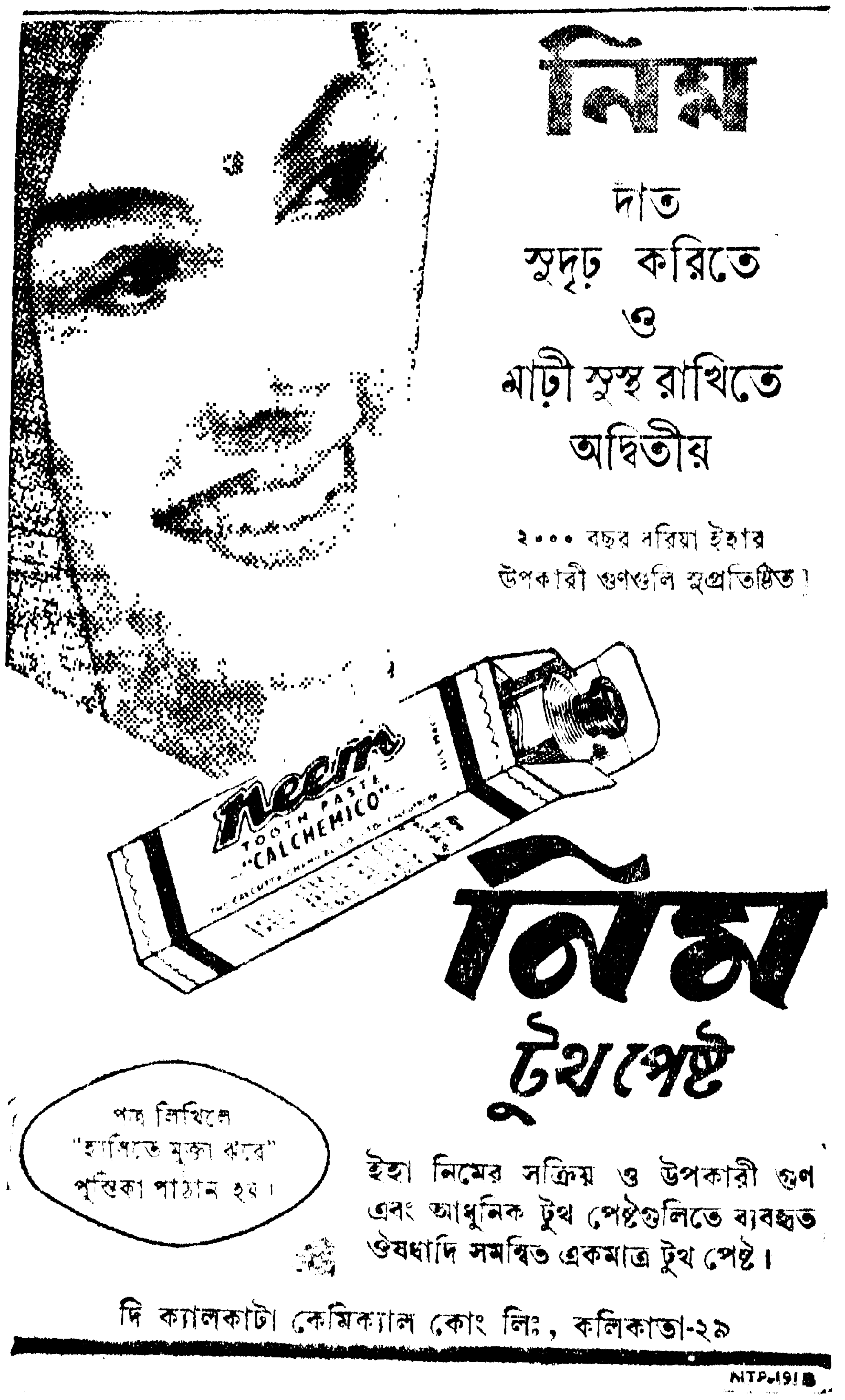

পা-ও রঙ করতাম। পুরনোরা কেউ কেউ ফাঁকি দিতেন, তাঁদের অভ্যাসও ছিল না পায়ে রঙ দেবার। পায়জামা প'রে অভিনয় করবার রেওয়াজ ছিল পূর্বে, তাই মোজা পরতেই হত সংগে। পা রঙ-করার প্রশনও তখন ছিল না, অতএব সেটাই অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল আর কী! আমাদের ডিরেক্টর ভূপেনবাবু আবার স্টেজ-বক্সে বসে বসে তীক্ষ্দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন, কে পায়ে রঙ করেনি, কে করেছে। কোনো ত্রুটি হলেই ছুটে আসতেন সাজঘরে। রঙ হয়নি কেন?

অমনি তারা পায়ে তাড়াতাড়ি রঙ করে নিতো। এইভাবে রীতিমত ভীতিপ্রদ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ভূপেনবাবু। ইংলিশম্যানের সমালোচক যেদিন দেখতে এসেছিলেন সেদিন হয়ত ভূপেনবাবু আসেননি থিয়েটারে, নইলে, এ-ত্রুটি করবে কেন?

গুডফ্রাইডের দিন—১৮ই এপ্রিল, ১৯২৪ —কর্তৃপক্ষ বিশেষ প্রোগ্রাম দিলেন— 'মুক্তির ডাক', বড়দিনের সময় একদিন যার অভিনয় হয়ে গিয়েছিল। 'মুক্তির ডাক' পুরো নাটক নয়, নাটিকা। এক অঙ্কের নাটিকা—একটি দৃশ্য। অভিনয় ভালো হয়েছিল, লোকে নিয়েওছিল তখন, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, কার সংগে জুড়ে দেওয়া যায় একে? 'কর্ণার্জুন' বা 'ইরানের রানী'র সংগে জুড়ে দেওয়া যায় না। তাই বড়দিনের পর আর হয়নি এ-নাটিকাটি। গুড ফ্রাইডে প্রভৃতি উৎসবের দিনে বহু বাঙালীও আসতেন থিয়েটারের ভিড় করে। তাই গুড-ফ্রাইডের দিন 'মুক্তির ডাক'-এর সংগে দেওয়া হলো অমৃতলাল বসুর 'বিবাহ-বিভ্রাট।' এবং মধ্যখানে সুবিখ্যাত নর্তকী ও বাইজী গহরজানের নৃত্যগীত। গহরজান তখন ঐসব জলসায়—বয়স হয়ে যাওয়ার ফলে—আর উঠে দাঁড়াতেন না বা নাচতেন না। বসে বসেই গাইতেন তিনি, তাঁর দুপাশে দুটি অল্পবয়সী মেয়ে থাকত, তারাই উঠে-উঠে নাচত বা গাইত। এই গহরের সংগে আমাদের সেই হেম মুখোপাধ্যায়ের খুব জানাশোনা ছিল। গহর হেমবাবুকে 'দাদা' বলতেন, আমাকে বলতেন—'ভাইয়া'। ও'র সংগে আমার আলাপ হবার একটা কারণও ঘটেছিল। উনি আমাদের 'সোল অফ এ স্লেভ' ছবিটা দেখেছিলেন এবং দেখে এত উৎসাহিত হয়েছিলেন যে, আমাদের স্টুডিও দেখতে এসেছিলেন উনি এবং ও'র একটি আগ্রহও ছিল ফিল্মে অভিনয় করবার। ও'রই সারেংগীবাদক ছিলেন ওস্তাদ গৌরী-শঙ্কর মিশ্র মশাই। মাঝে-মাঝে স্টারে আসতেন ইনি। ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে ছিল গহরজানের বাড়ি। দোতলায়—বড়ো হলঘরে —নবাব-বেগমদের মতো দরবার করে বসতেন—আতরদান—পিকদান এসব নিয়ে। আর তাঁর আশেপাশে থাকত—যারা শিখতে আসত—সেই সব মেয়ে। গহরের গান শুনতে ঐ দরবারে আসতেন বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। সেযুগের জগৎবিখ্যাত নর্তকী ছিলেন গহরজান— এমন রাজা-মহারাজা তখন ছিলেন না, যাঁরা তাঁর নাম না জানতেন। বিলেতে গিয়ে পর্যন্ত নাচ দেখিয়ে এসেছিলেন। উচ্চমেজাজের মহিলা, সবিশেষ ধনবতী। ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের বাড়িখানা ছাড়া চিৎপুর রোডের ওপর ছিল দু-তিনখানা বাড়ি, বহু টাকা ভাড়া পেতেন সেসব থেকে। তাছাড়া হায়দরাবাদেও তাঁর বাড়ি ছিল। তাঁর স্বামী ছিলেন মিস্টার আব্বাস। তাঁকে কিছু সম্পত্তি দিয়ে, বাকী সম্পত্তি দান করে গিয়েছিলেন গহরজান।

অতএব, এহেন গহরজানের প্রোগ্রাম, সেদিন স্টারে ছিল বিশেষ আকর্ষণের বিষয়। তার সংগে হবে 'মুক্তির ডাক' অভিনয়। এই 'মুক্তির ডাক'-এর এক ইতিহাস আছে। বড়দিনের কিছু আগে—এক অভিনয়ের দিনই হবে সেটা—হরিদাস-বাবু আমাকে ডেকে বললেন—একখানি নতুন নাটক পড়বেন?

আগ্রহান্বিত হলাম। বললাম—নতুন নাটকের খোঁজে ত সব সময়ই থাকি, যদি ভালো লাগে, যদি অভিনয় করা যায়।

হরিদাসবাবু বললেন—এটি নাটক নয়, নাটিকা বলতে পারেন।

জগদীশবাবুর গীতা
মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা অন্তঃ-রহস্য ভূমিকাসহ
অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়মূলক যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম ৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী
ভারতের শাশ্বতবাণী বিশ্বমৈত্রীর কথা ৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১·৫০
কর্মবাণী ১·২৫
প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী · ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.-প্রণীত
ব্যায়ামে বাঙালী ২·০০
বাংলার ঋষি ৩·০০
বীরত্বে বাঙালী ১·৫০
বাংলার মনীষী ১·২৫
বিজ্ঞানে বাঙালী ৪·০০
বাংলার বিদুষী ২·০০
আচার্য জগদীশ ১·০০
রাজর্ষি রামমোহন ১·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ১·৫০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ ১·৫০
জীবন গড়া ·৭৫
রবীন্দ্রনাথ ১·২৫
প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী · ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

কুমারেশ
লিভার ও পেটের পীড়ায়

কেমন সুন্দর
ঘন চুল
—এঁরা নিশ্চয়ই
ব্যবহার করেন ...
টাটার
কেশ তৈল
টাটার সুবাসিত নারিকেল কেশ তৈল—
ফুলের গন্ধে ভরা
পরিশোধিত খাঁটি তেল
টাটার ক্যাস্টর হেয়ার অয়েল—চমৎকার
মিষ্টি গন্ধে ভরপুর
কেশরাশি ঘন ও সুন্দর ক'রে তুলতে হ'লে
টাটার কেশ তৈল ব্যবহার করুন।
Perfumed
HAIR OIL
COCONUT
JASMINE
Perfumed
HAIR OIL
CASTOR
THE TATA OIL MILLS
TTH 424
টাটা-র তৈরী

—তা হোক।

হরিদাসবাবু আমার হাতে দিলেন কাগজে গোল করে মোড়া—সুতো দিয়ে বাঁধা—একটি প্যাকেট। বললেন—পড়ে দেখে বলবেন—কেমন লাগল?

এক অঙ্কের বই। কতক্ষণ আর লাগল পড়তে? পরদিনই ওটা ওঁকে ফেরত দিয়ে বললাম—পড়েছি। বড়ো ভালো লেগেছে।

প্রথম প্রশ্নই তিনি করলেন—কী ভালো লাগল?

বললাম—সম্পূর্ণ নতুন ধরনের জিনিস। এক অঙ্ক, একটি দৃশ্য। এ এক নতুন ব্যাপার। আমাদের দেশে ইতিপূর্বে এক অঙ্কের গম্ভীর ভাবের নাটক হয়নি, যা হতো—সব হাল্কা রসের—প্রহসন-জাতীয়। তা-ও আবার দুটি-তিনটি গর্ভাঙ্ক বা অন্তর্দৃশ্য থাকত। এক দৃশ্যের নাটক এই প্রথম দেখলাম।

হরিদাসবাবু বললেন—আর কী লক্ষ্য করলেন?

বললাম—সংলাপের নতুনত্ব। লেখার ঢংটাই দেখছি আলাদা। এরকম ডায়লগ আমাদের দেশে ছিল না আগে, আইডিয়ারও তফাৎ আছে।

—কী রকম আইডিয়া?

যেন জেরা করতে আরম্ভ করেছেন হরিদাসবাবু। বললাম—প্রাচীনপন্থীদের কাছে ভালো লাগা মুশকিল।

—কেন?

বললাম—এ হচ্ছে মা ও মেয়ে নিয়ে একটি উপাখ্যান, যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে নায়ক। দোষনীয় না হলেও, আমাদের সমাজ-ধারার নীতিবিরুদ্ধ, যদিও নাট্যকার বৌদ্ধ সমাজকে বেছে নিয়েছেন—বুদ্ধের জীবিত কালের ঘটনা এটি। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও, লোকে কেমন নেবে, জানি না।

—সেকথা অবশ্য আলাদা।

বললাম—আরেকটি নতুন জিনিস দেখলাম। নায়িকা হচ্ছেন নগরীর বিখ্যাত নর্তকী, নটী। তাঁর রূপমুগ্ধ রাজা বিম্বিসার যখন তাঁর সতীত্বের প্রতি কটাক্ষপাত করে হাসলেন, বললেন—তোমার সতীত্ব! তখন, নটী (অম্বা) বললেন—হ্যাঁ, আমার সতীত্ব। চমকে উঠো না রাজা। সতীত্ব শুধু দেহের ধর্ম নয়—আত্মার একনিষ্ঠতাই তার প্রকৃত প্রাণ।

—এখন এই যে কথাবার্তা, এসবে প্রবীণেরা সায় দেবেন কী? তবে নবীনেরা দেবেন।

হরিদাসবাবু একটু ভেবে নিয়ে বললেন—পারবেন কথাগুলি যথাযথ রেখে অভিনয় করতে? ভার নিতে পারবেন ঐ নাটকের?

—কেন নয়?

উনি বললেন—তাহলে লাগিয়ে দিন বড়দিনের সময়।

তখন এতো কাজ, সে-সব কাজ বজায় রেখেও হয়ে উঠবে কি এর মধ্যে? হরিদাসবাবু শুনলেন না, প্রবোধবাবুকে সব কথা বলে, বইখানা আমার হাতে দিয়ে চলে গেলেন। প্রবোধবাবু বললেন—যা দরকার শোনো, সিন-টিন, জিনিসপত্র, সবেরই ব্যবস্থা করে দেবো।

আবার পড়লাম বইটা। একবার কেন, বার দুয়েক পড়লাম। মাত্র চারটি মুখ্য চরিত্র, আর একটি ছোট চরিত্র। হরিদাস-বাবুকে গিয়ে বললাম ভূমিকালিপির কথা। ওঁর ইচ্ছা ছিল, 'বিম্বিসার' আমি করি। কিন্তু ভরসা পেলাম না এতো কাজের চাপের জন্য, সামনে 'দারা' রয়েছে দাঁড়িয়ে 'ইরানের রানী'র। বললাম—ভূমিকা থেকে আমাকে বাদ দিন। আর সবই আমি করে দেবো।

অতএব, 'বিম্বিসার' করলেন প্রফুল্ল সেনগুপ্ত। দৃশ্যটি সুন্দর সাজানো হয়েছিল—সুদৃশ্য এবং দ্বিতল। শ্রেণী-বদ্ধ সোপান চলে গেছে দ্বিতলের অলিন্দে। নীচে, উদ্যানের অংশ। উদ্যানের দিকে—বাতায়ন। 'ইরানের রানী'তে যেমন আবহ-সঙ্গীত ছিল, এতে ব্যবস্থা করলাম অনুরূপ আবহসঙ্গীতের। প্রফুল্ল ছাড়া আর যারা ছিল, তারা হচ্ছে—সুন্দরম—তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়। অম্বা—কৃষ্ণভামিনী। সুন্দরমের স্ত্রী এবং অম্বার কন্যা—পদ্মা—নীহারবালা। অপরেশবাবুর কথা আগে বলেছি, নতুন নাট্যকারদের বই তিনি ছুঁতেন না। তাই উনি এ-বই ধরলেন না, এবং সেই সঙ্গেই বোধহয় এর দায়িত্ব এসে পড়েছিল আমার ওপরে। নাট্যকার তখন নতুন এবং অখ্যাত। ঢাকায় আইন অধ্যয়ন করছেন তিনি। তাঁর নাটিকাটি পড়ে ভালো লেগে যায় তাঁর শিক্ষক সাহিত্যিক ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের। তিনি পড়ে, হরিদাসবাবুকে পাঠিয়ে দিয়ে-ছিলেন পড়বার জন্য। সেই থেকে এই নাটকীয় ঘটনার উদ্ভব। হরিদাসবাবু নাট্যকারকে চিঠি লিখেছিলেন—নাট্যকার এসে অভিনয় দেখেছিলেন কিনা মনে নেই, তবে তখন তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি। নাট্যকারের নাম—মন্মথ রায়, এম-এ, আজকের যিনি প্রখ্যাতনামা নাট্যকার। বলা কর্তব্য, বড়দিনের সেই অভিনয়ে নাটকখানির সৌভাগ্য, সুখ্যাতি পেয়ে গেল। হরিদাসবাবু নিজে ছিলেন তীক্ষ্ম সমালোচক, তাঁর সুখ্যাতি ত অর্জন করলেই, প্রমথ চৌধুরী, কাজী নজরুল—এঁদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করল 'মুক্তির ডাক' নাটক। কাগজে-কাগজেও বেরুলো—অজস্র সুখ্যাতি। কিন্তু নাটকখানির দুর্ভাগ্য হলো এই যে, কার সঙ্গে একে জোড়া যায়, এটা ভেবে কোনো কুল-কিনারা পাওয়া গেল না। এতদিন পরে, সুযোগ পেয়ে একে আবার 'পুনরুদ্ধার' করা গেল। এই পুনরভিনয়ের সময় তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল না, কিন্তু তাঁর অভিনীত 'সুন্দরম'-এর ভূমিকাটি যে কে করেছিল, ঠিক মনে নেই। সম্ভবত ইন্দুই করেছিল ঐদিন—ঐ ভূমিকা। কিন্তু তারপর? কীভাবে, কার সঙ্গে ওকে জোড়া যায়। তাই এ-অভিনয়ের পরও ওটা ধামাচাপা পড়ে গিয়েছিল।

'বিবাহ-বিভ্রাট'—যেটি 'মুক্তির ডাক' ও গহরের জলসার সঙ্গে অভিনয় হয়েছিল, সেটি একটি প্রহসন—১৮৮৪ সালের লেখা—পুরনো বই। কিন্তু পুরনো হলেও বড়ো সজীব। ভূমিকালিপি ছিল তাঃ—কর্তা গোপীনাথ—তিনকড়ি। মিঃ সিমহা—রাধিকানন্দ। গোপীনাথের পুত্র নন্দলাল—ইন্দু মুখোপাধ্যায়। গৌরীকান্ত কারফর্মা—বিস্কুট-খেকো ভুলো—সন্তোষ দাস। মিসেস কারফর্মা—নীহারবালা। ঝি—কৃষ্ণভামিনী। (ক্রমশ)

জন্মনিয়ন্ত্রণে পুস্তক, পরামর্শ ও ব্যবস্থা
প্রত্যহ বেলা ১—৭টা। রবিবার বাদ।
একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
মেডিকো সাপ্লাই, টপ ফ্লোর
১৬৬, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা—৯
ফোন: ৩৫-২৫৮৬

আবশ্যক
শালের জন্য আংশিক-সময়ের এজেন্ট। বিস্তৃত বিবরণ ও বিনা-মূল্যের নমুনার জন্য লিখুন—GIRSON KNITTING WORKS, LUDHIANI. (207).

কে, হোড়ের
মহাভৃঙ্গরাজ

ধবল বা শ্বেত
শরীরের যে কোন স্থানের সাদা দাগ, একজিমা, সোরাইসিস ও অন্যান্য কঠিন চর্মরোগ, গাত্রে উচ্চবর্ণের অসাড়যুক্ত দাগ, ফুলা, আঙুলের বক্রতা ও দূষিত ক্ষত সেবনীয় ও বাহ্য দ্বারা দ্রুত নিরাময় করা হয়। আর পুনঃ প্রকাশ হয় না। সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ফোন: ৬৭-২৩৫৯। শাখা: ৩৬, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯। (পূরবী সিনেমার পাশে)।

এখন

আপনি আপনার
মনোমত স্বাস্থ্যবর্ধক টনিক
ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড

ভিটামিন যুক্ত

অবস্থায় গ্রহণ করুন

জাফরান রঙের পিলফার প্রুফ ক্যাপ দেখে নেবেন।

বর্তমানে আপনি ভারতের জনপ্রিয় স্বাস্থ্যদায়ক টনিক ভিটামিনে সমৃদ্ধ অবস্থায় কিনতে পারবেন। ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ডের বিখ্যাত ফর্মুলা স্বাস্থ্য ও স্ফূর্তিদায়ক ভিটামিনে সমৃদ্ধ করে তোলা হয়েছে। ওয়াটারবেরীজ ভিটামিন কম্পাউণ্ড নানা দিকে দিয়ে আপনার শরীরের পক্ষে ভালো। এটি রক্ত বৃদ্ধি করে, হৃত শক্তি ও সামর্থ্য ফিরিয়ে আনে, স্নায়ুগুলীকে সবল করে' পেশীসমূহকে পুষ্ট করে তোলে ও রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা গড়ে তোলে। অসুস্থতার পর স্বাস্থ্য দ্রুত পুণরুদ্ধার করে।

জাফরান রঙের লেবেল দেখে নেবেন

ওয়াটারবেরীজ
ভিটামিন
কম্পাউণ্ড

আপনার খাদ্যের পরিপুরক

এছাড়াও পাবেন—সর্দি-কাশির জন্য ক্রিওজোট ও গুয়াইকল সহযোগে প্রস্তুত লাল লেবেল মার্কা ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড

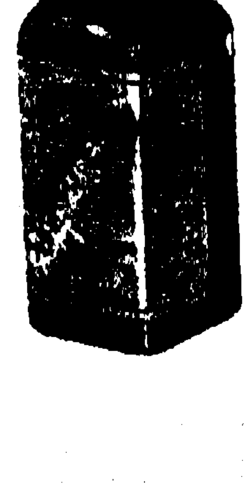

পুস্তক পরিচয়

ইতিহাস

বাঙ্গলার ইতিহাস—শ্রীগদাধর কোলে। প্রাপ্তিস্থানঃ ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—তিন টাকা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধে এবং আরো নানা নিবন্ধেই বলেছেন যে, বৌদ্ধ-প্রভাবে দেশে যে সমাজ-বিপ্লব দেখা দিয়েছিল, তার ফলে একমাত্র ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ব্যতীত আর সব সম্প্রদায়ই একাকার হয়ে গিয়েছিল। কোলে মহাশয় এই মতকেই তাঁর গ্রন্থের অন্যতম মূল তত্ত্বরূপে গ্রহণ করেছেন। তবে তাঁর সিদ্ধান্ত রবীন্দ্রনাথের অভিমতের থেকে কিছু পরিমাণে পৃথক। গ্রন্থখানিতে সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাসের দ্বারা লেখক বিভিন্ন সমাজের গতিপ্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতামত ক্ষেত্রবিশেষে মৌলিক। কোনো কোনো স্থলে মতান্তর ঘটতে পারে। যেমন, কোলে মহাশয় বিবিধ যুক্তি দেখিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, "কায়স্থগণও ব্রাহ্মণ হইতে আগত জাতি।"

বৌদ্ধ যুগের উপবীতত্যাগী ব্রাহ্মণেরাই বৈদ্য এবং কায়স্থ—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যে সকল ক্ষত্রিয় উপবীত ত্যাগ করেছিল, তারা নবশাখ নামে অভিহিত এই সিদ্ধান্তের ওপর কোলে মহাশয়ের গ্রন্থখানি রচিত। তাঁর মতে, বর্তমান মাহিষ্য কৈবর্তরা বাংলার প্রাচীন ক্ষত্রিয় রাজগণের বংশধর। বাংলার ক্ষত্রিয়রা এক-দিকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ও উপবীত ত্যাগ করার ফলে শূদ্র বলে গণ্য হয়েছে; অপর-দিকে কৃষির উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করার ফলে সম্পূর্ণরূপে কৃষক সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে। বলা বাহুল্য, তাঁর এই মতামত সর্বগ্রাহ্য নয়।

একালে কীভাবে ইতিহাস লিখিত হওয়া উচিত, এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন মতামত শুনতে পাওয়া যায়। তবে এ বিষয়ে অধিকাংশই একমত যে, যে-ইতিহাস সম-সাময়িক এবং ভবিষ্যৎ জীবনকে গঠন এবং সমৃদ্ধ করে, সেই রকম ইতিহাস লিখিত হওয়া উচিত। কোলে মহাশয়ের গ্রন্থ এক দিক দিয়ে এই সাহায্য করে যে, প্রকৃতপক্ষে সামাজিক ভেদাভেদ গর্হিত ব্যাপার। কেননা, যাঁদের নিম্নশ্রেণীর অন্তর্গত ভেবে ভেদাভেদ সৃষ্টি করি, তারা কেউ অনার্যসম্ভূত নয়। আজকের যা ভেদাভেদ দৃষ্ট হয়, তা যুগ-বিপর্যয়ের ফলে ঘটেছে। আবার কোলে মহাশয়ের গ্রন্থটি পাঠ করে কোনো সম্প্রদায় যদি ঐতিহাসিক সূত্র লাভ করে জাতিগত লড়াই শুরু করে, তাহলে 'বাঙ্গলার ইতিহাসের' মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে। কেননা, ঐ লড়াই এযুগে অচল। আশা করি, পাঠকরা যথাযথভাবে গ্রন্থটিকে গ্রহণ করবেন। **২২।৬০**

শারদ-সংখ্যায় তিনটি সম্পূর্ণ উপন্যাস

এক যে ছিল রাজা

দীপক চৌধুরী

নাট-ঘর

লীলা মজুমদার

এলিজাবেথ ও গদাধর

শঙ্কর

ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস

জব চাণকের বিবি

কলিকাতা স্রষ্টা জব চাণকের প্রেমময় জীবন আলেখ্য। ॥ পাঁচ টাকা ॥

অর্চনা পাবলিশার্স

৮বি, রমানাথ সাধু লেন, কলিকাতা—৭

ফোন : ৩৯—১২২৫

(সি ৭৫৬৯)

এবারের শারদীয়া

জাগরী

পূর্ব ঐতিহ্য আরও উজ্জ্বল করবে।

JAGARI : Calcutta-3

(সি ৭৬১২)

দিশারী শরৎ-জয়ন্তী কমিটি সংকলিত

শরৎ-স্মরণী—২৲

শরৎচন্দ্রের জীবনকথা ও সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে খ্যাতনামা সাহিত্যশিল্পীদের আলোচনা

দিশারী প্রকাশনী

১১এ, এসপ্ল্যানেড ইস্ট; কুটীর শিল্প বিপণি, কলিকাতা—১ ও ৫২, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

(সি ৭২৭৫)

রমেশ মজুমদারের

মালার বাঁধন

প্রখ্যাত কবি, ঔপন্যাসিক ও গল্পকার রমেশবাবুর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। লেখকের উন্নত ভাবধারা, রুচি, রসবোধ ও কাহিনী বর্ণনায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় আছে। উপন্যাস কতজনই লেখে, কিন্তু জনস্বার্থে তা কাটি লেগেছে। এমন মিষ্টি করে কাহিনী বলার জন্যই এই বইখানির প্রশংসা করছেন বহু সাহিত্যিক ও সমালোচকগণ। মূল্য—২.৫০ নঃ পঃ।

শ্রীতারাপদ সরকারের

ছোটদের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

সচিত্র চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক

মূল্য : এক টাকা মাত্র

শ্রীরামকৃষ্ণ লাইব্রেরী,

৬৪/২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট : কলিকাতা—৬

(সি ৭৭৬১)

আশাপূর্ণা দেবীর অনবদ্য উপন্যাস
কনকদীপ মূল্য—২
নীহাররঞ্জন গুপ্তের রহস্য-ঘন উপন্যাস
ইস্কাবনের সাহেব হরতনের বিবি মূল্য—৪·৫০
(২য় মুদ্রণ যন্ত্রস্থ)
ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের ত্রিশঙ্কু মূল্য ঃ ৩
রাইটার্স সিণ্ডিকেট
৮৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
(সি-৭৭৬৩।২)

ডঃ মুলক রাজ আনন্দ-এর
একটি রাজার কাহিনী ৭-৫০
[Private life of an Indian Prince]
রমাঁ রোলাঁর
বিমুগ্ধ আত্মা
[দুই বোন ॥ সুন্দরের পিয়াসী ॥ মা ও ছেলে]
দাম ঃ বোর্ড ১৫ ও কাগজের মলাট ১৩
পাবেল লুকেনিৎস্কীর
নিশো ৭-৫০
[উপজাতি জীবনের উপর সুবৃহৎ উপন্যাস]
র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

কথাকলির বই - - - - সবার প্রিয় বই
॥ নতুন বই ॥
শচীন ভৌমিকের
সায়াহ্ন যুথিকা
সুনির্বাচনে ভাষার কারুকার্যে রসোত্তীর্ণ। চারবঙা অপূর্ব প্রচ্ছদ। দাম মাত্র তিন টাকা।
সায়াহ্ন যুথিকা শচীন ভৌমিকের নতুন গল্প গ্রন্থ। সুদূর বর্মা মুলুক থেকে বোম্বাই পর্যন্ত গল্পের পটভূমি বিস্তৃত। প্রতিটি গল্প আঙ্গিকের সৌন্দর্যে ঘটনার লেখকের ছবি ও পরিচিতি সংযোজিত।
॥ পূর্ববর্তী প্রকাশ ॥
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
খাল পোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর
॥ দাম ২·০০ ॥
স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
র ঙ্গ রা গ
॥ দাম ৩·০০ ॥
॥ আগামী প্রকাশ ॥
সঞ্জয় ভট্টাচার্যের
মৌ চা ক
॥ দাম ৫·০০ ॥
মনোতোষ সরকারের
এক আকাশে এক রঙ
॥ দাম ৩·০০ ॥
কথাকলি
এ বারো, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-বারো

নাটক

অমৃত অতীত—শ্রীমন্মথ রায়। পরিবেশক ঃ ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য এক টাকা মাত্র।

নাট্যকার ভূমিকায় জানিয়েছেন, "শতবর্ষ-ব্যাপী অরাজকতায় অতিষ্ঠ হইয়া গৌড়বঙ্গের প্রজাপুঞ্জ অষ্টম শতাব্দীতে গোপাল দেবকে পরিত্রাতা মনে করিয়া তাঁহাকে গৌড়বঙ্গের রাজা নির্বাচন করে—ঐতিহাসিক এই ভিত্তিতে নাটকটি পরিকল্পিত হইয়াছে। অবশ্য একমাত্র গোপাল দেব ভিন্ন অন্য চরিত্রগুলি আমার কল্পনাপ্রসূত।"

'অমৃত অতীত' দৃশ্যহীন মাত্র দুই অঙ্কের নাটক। দ্বিতীয়াঙ্কে সময়ক্ষেপক অন্ধকারের প্রয়োজন হয়েছে একবার মাত্র।

মক্ষিরানীকে গোপালের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছে কৃতান্তক। অন্যায়ের চূড়ামণি কৃতান্তক ভালবেসেছে একমাত্র মক্ষিরানীকেই। চোরদ্ধর্ণিক চোর ধরার জন্য নিযুক্ত থাকলেও দেশে চৌর্যবৃত্তি দূর হয়ে যাক—তা সে চায় না। কেননা, চোর ধরার জন্যেই তার চাকরি। আবার চোর থাকলে উপরি আয় থাকে। উদাত্ত হচ্ছেন দেশনেতা। নেতাগিরিই তার ব্যবসায়। মহামাত্য হচ্ছে কৃতান্তকের তোষামোদকারী। এরা সকলেই ভেবেছে, এদের রাজা হবে কৃতান্তক। কিন্তু কৃতান্তক রাজা হতে চায় না। রাজা হলে সারা দেশটাই হবে তার, তখন লুণ্ঠন বা চৌর্যবৃত্তি করা তার সাজবে না।

রাজা গোবর্ধন গোপাল কর্তৃক পদচ্যুত হয়। গোবর্ধন স্বীকার করে যে, মৎস্যন্যায় শেষে তাকেও গ্রাস করে ফেলেছিল। তাই তার এমন দুরবস্থা। কৃতান্তক ও গোপাল দেবের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে নাটকটি শেষ হয়ে এসেছে। মক্ষিরানীর অন্তর্দ্বন্দ্ব এই অংশে তীব্র নাটকীয়তার সৃষ্টি করেছে। নাটকটি কাল-পরিমাণ সংক্ষিপ্ত হলেও, বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে তার যোগসূত্র যথাযথ ঘটেছে। ক্ষুদ্র-পরিসর এই নাটকটি অভিনয়-সাফল্য লাভ করবে, একথা সহজেই বলা যায়। ৭৫।৬০

রূপোলী চাঁদ—ধনঞ্জয় বৈরাগী। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড; ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২·৫০ নয়াপয়সা।

বাস্তববাদী নাট্যকারদের মধ্যে বর্তমানে স্থান অধিকার করেছেন। তাঁর নাটকাবলী ধনঞ্জয় বৈরাগী নিঃসন্দেহে একটি বিশিষ্ট যে নাট্যরসিকদের প্রিয় হতে পেরেছে তার প্রমাণ আলোচ্য নাটকখানির তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রণ। নাটকীয় সংঘাত ও

তাকে পরিপুষ্ট করে তোলায় ঘনীভূত উদ্বেগ সৃষ্টিতে "রুপোলী চাঁদ" ইদানীংকার একটি উল্লেখযোগ্য নাট্যরচনা। বেশ স্বচ্ছন্দ গতিশীল এর সংলাপ। তাছাড়া নৈরাশ্যোদ্ভবা বাস্তব জীবনের যে রূপ সাধারণত এখনকার বাস্তবধর্মী নাটকগুলিতে দেখা যায়, আলোচ্য নাটকখানি তা থেকে স্বতন্ত্র। অপরিসীম দুঃখ দুর্দশার মধ্যেও মানুষ যে অমানুষ হয়ে যায় না—তার মধ্যেও উদার মনুষ্যত্বের মহত্ত্ব থাকে—সেটা এর নায়ক সতুর চরিত্রের সাহায্যে ব্যক্ত করা হয়েছে এমনভাবে যা আদর্শবাদীদেরও মনকে অভিভূত করবে। ৩৬০।৬০

কালরাত্রি—শ্রী ডি মোদক। প্রকাশক শ্রীঅরুণকুমার মোদক, ২৭-২, তারক চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৫। মূল্য ষাট নয়া পয়সা।

আইরিশ নাট্যকার জে এ ফারগুসেন-এর ক্যাম্পবেল অব কিলমোর-এর ছায়াবলম্বনে রচিত আলোচ্য পুস্তিকা একখানি একাঙ্কিকা। বৈপ্লবিক আন্দোলনে গুপ্ত সমিতির সভ্য এক দরিদ্র বিধবা রমণীর একমাত্র পুত্র প্রণব এবং পালিত পুত্র সমরের গতিবিধি অস্বাভাবিক না হইলেও বৈপ্লবিক ভাবধারার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইহাদিগকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিসের আগমন এবং উপরোক্ত বিধবা রমণীর সঙ্গে পুলিসের ব্যবহারে অতিনাটকীয়তার ছোঁয়াচ বর্তমান। স্বাধীন দেশের তরুণ মনে ইহা কতদূর প্রভাব বিস্তার করিবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। ২০৮।৬০

উপন্যাস

চা মাটি মানুষ (২য় পর্ব)—বীরেশ্বর বসু। কথামালা প্রকাশনী, ১৮এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২। দাম ৫·৫০।

চা মাটি মানুষের দ্বিতীয় পর্ব সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এ পর্বেও উপন্যাসের নায়ক ভাওনাথ জীবনে বহুবিধ ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত হইয়া সত্যের সন্ধানে নিয়ত ব্যাপৃত। সৎ, অসৎ, দুষ্কৃতকারী প্রভৃতি হরেকরকম মানুষ ভাওনাথের চতুষ্পার্শ্বে—ইহার মধ্য হইতে লেখক তাঁহার চিন্তাধারার প্রভাবে নায়ক ভাওনাথের জীবনের পরিচয় দিয়াছেন।

চা-জগতের কথা অনেকেরই অজ্ঞাত। সুতরাং এই অজ্ঞাত সমাজের দুরূহ জীবন যাপন পদ্ধতি আমাদের কাছে নিঃসন্দেহে নূতন। বীরেশ্বর বসু এই সমাজের চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। কিঞ্চিৎ ভাবালুতার স্পর্শ থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থটি একপ্রকার।

২৩৩।৩০

অনুবাদ-গ্রন্থ

গ্র্যান্ড হোটেল—ভিকি বাউম। অনুবাদকঃ গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। গ্রন্থভবন, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭। মূল্য ছয় টাকা।

অনূদিত এই উপন্যাসটির দ্বিতীয় মুদ্রণই এর জনপ্রিয়তার প্রমাণ। বার্লিনের প্রসিদ্ধ গ্র্যান্ড হোটেল। কে আসে আর কে যায়—তার খবর কেই-বা রাখে। কিন্তু তার মধ্যে ডাঃ ওটেনশ্লাগ, রোগগ্রস্ত কেরানী ক্রিংগেলাইন বিখ্যাত নাচওয়ালী গ্রুসিন্স্কায়া, ব্যবসায়ী হের প্রাইজিং আর জোয়াড়ে

সুধীন্দ্র মজুমদার প্রণীত

ত্রি ভু জ

একজন যুবক প্রেমে-অপ্রেমে মহাযুদ্ধে হারিয়ে গিয়েছিল। একজন একদা-প্রখ্যাত কবি সোনা রূপো মদ গণিকা ভালোবেসেছিল। একজন নারী ভালোবাসাকে অপরিম্লান নিরাময়ের মতো দেখেছিল ব'লে অন্ধকারকে ভয় পেয়েছিল; যাকে চেয়েছিল ব'লে ভেবেছিল তার শয্যাসঙ্গিনী হয়ে, যাকে চেয়েছিল ব'লে হারিয়েছিল তার স্মৃতির ক্ষতে রক্ত চুঁইয়ে পড়তে দেখে সে নির্জনে 'মর্নিং অব হ্যাপিনেস' লিখে যাচ্ছিল। এ-ছাড়াও আছে মৌমাছিপুঞ্জের মতো ভিড় ক'রে আসা অজস্র চরিত্র, সুখ ও অসুখের উদ্বেজনায় যারা মহাযুদ্ধের অতল অন্ধকারের ছায়াচ্ছন্নতায় বিচিত্র; সময় জট পাকিয়ে গেছে, দেশ কাল ইতিহাস অন্ধ কালো। অথচ ভোর-ভোর সমুদ্রে নৌকো ভেসে পড়েছে! কেউ যাবে, কোথায় যাবে? বাংলা সাহিত্যে এ-রকম উপন্যাস আর লেখা হয় নি॥ ৪·৫০॥

*

১৭২/৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা ২৯

---নিউস্ক্রিপ্ট প্রকাশিত পুস্তক---

এ ১৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ১২

*

রমেশচন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যের সেই কতিপয় সাহিত্যিকদের অন্যতম, যাঁরা নিরেট বাস্তব ঘটনা-প্রতিঘটনাকে অবাস্তব ভাবাপ্লুততায় দেখেন না; বয়সে এবং মননে প্রাজ্ঞ ব'লেই আবেগের মাত্রাতিরিক্ত অর্বাচীনতা যাঁদের সিক্ত করে না। এই উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর জীবন-চেতনায় বাঁচবার শপথকে সত্যানুগ অনিবার্যে উত্তীর্ণ করিয়ে নতুন ক'রে তিনি তাঁর সেই প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাকে প্রমাণিত করেছেন। ইতিপূর্বে যেমন তা প্রমাণিত হয়েছিল তাঁর শতাব্দী, কুরপালা ও কাজলে॥ ৩·৫০॥

অপরাজেয়

রমেশচন্দ্র সেন প্রণীত

গেঝেয়ার্ন—একের পর এক এসে গড়ে তুলেছে এই উপন্যাসের কায়া। গেঝেয়ার্নের প্রয়োজন হল গ্রুসিনস্কায়ার মুক্তার মালাটা। নিজের জীবন বিপন্ন করে হানা দিল গ্রুসিনস্কায়ার ঘরে। কিন্তু নিয়তির এমনি খেলা যে, সেদিন রাত্রি এগারোটার সময় ফিরে এলেন গ্রুসিনস্কায়া। ধরা পড়লেন গেঝেয়ার্ন। কিন্তু প্রতিদানে পেলো তার কাছ থেকে অমর প্রেম। এদিকে প্রাইজিং সামান্য টাইপিস্ট ফ্লামশেনের প্রেমে পড়লো। একদিন রাত্রিকালে গেঝেয়ার্ন চুরি করতে আসে প্রাইজিং-এর ঘরে। প্রাইজিং এক মুষ্ট্যাঘাতে তাকে মেরে ফেলে। প্রাইজিং-এর জেল হল। কেরানী ক্রিঙেলাইন লাভ করলো রূপসী ফ্লামশেনকে। ফ্লামশেন বর্বরতার মধ্যে লাভ করলো জীবনের সৃষ্টির প্রথম আনন্দ।

এই কাহিনীর মধ্যে সর্বজনীন আবেদন থাকলেও, এদেশীয় 'ধাতে' তা কতোখানি সহ্য করতে পারবে, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। অবশ্য অনুবাদের মধ্যে কোনো রকম জটিলতা নেই। উপন্যাসে বর্ণিত বিদেশীয় উচ্চ এবং নিম্নশ্রেণীর সমাজ-ভেদ চিন্তা যেমন সুস্পষ্ট, তেমনি তার ভাবধারা রূপটিকেও মূল ঔপন্যাসিক যথাযথ অংকন করেছেন। ৬৬।৬০,

কিশোর-সাহিত্য

অমর বাণী—মৌমাছি (শ্রীবিমল ঘোষ)। সরস্বতী লাইব্রেরী, ৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯। মূল্য ১৲ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটি আমাদের দেশের মনীষী ও মহাত্মাদের কতকগুলি বাছাই করা 'অমর বাণী'র সংকলন। কিশোরদের পাঠ্যপুস্তকে আজ এরূপ উপদেশপূর্ণ অমর বাণীর মত কোন জিনিস দেখিতে পাওয়া যায় না। শিক্ষক এবং অভিভাবকদের কেহ কেহ অবশ্য এরূপ অমর বাণীর সঙ্গে এক সময়ে অল্পবিস্তর পরিচিত ছিলেন। কিন্তু আজ অনেকেই তাহা ভুলিতে বসিয়াছেন। গ্রন্থকার বহু আয়াস স্বীকার করিয়া বিভিন্ন খণ্ডে অমর বাণীর সংকলনে প্রয়াসী হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দ অনুভব করিতেছি।

এই 'অমর বাণী' শুধু তরুণ তরুণীদের নয়—বয়স্কদেরও পথের নির্দেশ দেয়, নিজের বিবেকবুদ্ধি ও আচার ব্যবহার সুসংযত করিতে সাহায্য করে। এই বাণীগুলি খুব সহজবোধ্য না হইলেও বারবার আবৃত্তি করিলে এবং অন্যের সাহায্যে ইহার মর্মার্থ বুঝিয়া লইলে চিরদিন ইহা তাহাদের মনে গাঁথা হইয়া থাকিবে এবং সারাজীবন তাহাদিগকে ঠিক পথে চলিবার প্রেরণা যোগাইবে।

পুস্তকখানিতে কয়েকজন মনীষীর প্রতিকৃতি এবং পরিশিষ্টে 'অমর বাণী' রচয়িতাগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রন্থটির সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে। এরূপ সংকলনের পথপ্রদর্শক হিসাবে গ্রন্থকার অভিনন্দন যোগ্য।

ছাপা বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট মনোজ্ঞ।

২৪২।৬০

প্রাপ্তি স্বীকার

আর এক জীবন—ইলা দেবী।
পল্টন ছাউনি—অমিয় হালদার।
কত গান তো হোলো পাওয়া—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।
প্রিয়তমেষু—স্টিফেন জাইগ অনুবাদক শান্তিরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়।
বেনারসী—বিমল মিত্র।
রমণীর মন—সরোজকুমার রায়চৌধুরী
যোগভ্রষ্ট—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়।
হিরন্ময় পাত্র—হরবৌকুমার চক্রবর্তী।
দিবাজীবন—গীতি-কথা-ভ্রমর।
আকর্ষণ—শচী মুখোপাধ্যায়।

বের হ'ল ! বের হ'ল ! বের হ'ল
পুজোর আনন্দে ছোটদের চির আদরের প্রিয় সঙ্গী
বার্ষিক-শিশুসাথী
সেরা লেখা ও সেরা ছবি : সম্পাদনা—দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়
আজই সংগ্রহ কর—না হলে পরে পস্তাতে হবে
দাম—চার টাকা
বৃন্দাবন ধর এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

পুজা সংখ্যা
সিনেমা জগৎ
দাম তিন টাকা
মনঞ্জর বৈরাগীর সম্পূর্ণ রহস্য উপন্যাস 'আমি সমীতা'
প্রকাশিত হবে
১৫ই সেপ্টেম্বর

কে সি কে পরিচালিত এই ছবিতে সুর-যোজনা করেছেন নির্মলকুমার।

শ্যামা, অভি ভট্টাচার্য ও প্রাণ অভিনীত "ট্রাংক কল"-এর অন্যতম আকর্ষণ সংগীত পরিচালক রবি-র সুরসৃষ্টি। বলরাজ মেহতা ছবিটি পরিচালনা করেছেন।

* * *

আগামী সপ্তাহের প্রধান আকর্ষণ শ্রী এন সি এ প্রোডাকশন্সের "হসপিটাল" এবং ফিল্মস ডিভিশন কৃত "ভারতের নৃত্যরাজি"।

প্রথমোক্ত ছবিটি "হাসপাতাল" নামে পূর্বে প্রচারিত হলেও ঐ নামে অন্য একটি ফিল্ম নির্মাণরত থাকায় প্রযোজক প্রতিষ্ঠান ইংরেজী নামটিই বেছে নিয়েছেন দর্শকসাধারণের মনে যাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয় সেইজন্যে। "হসপিটাল" গত সপ্তাহে সেন্সর বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে আগামী সপ্তাহে মুক্তির প্রতীক্ষা করছে।

"ভারতের নৃত্যরাজি" বা "Dances of India" ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোকনৃত্যের একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের বিবরণী চিত্র। রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশ, গুজরাত, কাশ্মীর, মহারাষ্ট্র, নেপাল, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, কেরালা, মণিপুর প্রমুখ তেরোটি বিভিন্ন অঞ্চলের পঁয়ত্রিশ রকমের লোকনৃত্যের পরিচয় মিলবে এই প্রামাণিক ছবিটিতে। ভি শান্তারাম ছবিটির প্রযোজক এবং সমস্ত ছবিটি আগাগোড়া ইস্টম্যান- কলারে গৃহীত।

* * *

কেমিরা ফিল্মসের প্রথম নিবেদন "শহরের ইতিকথা" আগামী পুজো উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জীবনধারার সংঘাতে নাগরিক জীবনে যে নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাকে উপজীব্য করে এর কাহিনী লিখেছেন বিনয় চট্টোপাধ্যায়। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের দুটি চরিত্রে উত্তমকুমার ও মালা সিংহ এই ছবিতে চিত্রামোদীদের অভিবাদন জানাবেন। তাঁদের সংগে অন্যান্য ভূমিকায় চিত্রাবতরণ করেছেন পাহাড়ী সান্যাল, জীবেন বসু, কাজরী গুহ, বাণী হাজরা, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, জহর রায় ও ছায়া দেবী। দক্ষিণ ভারতের দুজন নামকরা নৃত্যশিল্পী—লীলা ও মাধুরী—তিনটি বিভিন্ন নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেছেন। ছবিটি পরিচালনা করেছেন বিশু দাশগুপ্ত।

* * *

গত সপ্তাহে শ্রীদিলীপ চিত্রমের "যে প্রেম নীরবে কাঁদে"র মহরত প্রসংগে লেখা হয়েছিল—"আন্নাপূর্ণা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন চণ্ডী নাগ।"

পূজায় পড়বার মতো এবং উপহার দেবার মতো তিনখানি বই

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকাসমৃদ্ধ। বাংলা সাহিত্যের বিশেষ মূল্যবান যোজনা। ৫·০০ ॥

প্রতিভা বসুর প্রেমের গল্প

লেখিকার নিজের পছন্দকরা অপূর্ব গল্পসমষ্টি। ৪·০০ ॥

সজনীকান্ত দাসের স্বনির্বাচিত গল্প

চব্বিশটি বিখ্যাত গল্প। অনেকগুলিই ইতিপূর্বে কোন গ্রন্থে ছাপা হয়নি। বাংলা সাহিত্যের নির্দেশ-ফলক। ৫·০০ ॥

একমাত্র পরিবেশক : পত্রিকা সিণ্ডিকেট, ১২/১, লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলি ১৬

"একাংক নাটিকার ক্ষেত্রে
তিনি তো আজও সম্রাট।" —দেশ

মন্মথ রায়ের একাংক নাটক

একাঙ্কিকা

[একুশটি শ্রেষ্ঠ একাংক সংকলন] ৫.০০

নব একাংক

[দশটি অভিনব একাঙ্কিকা] ৩.০০

ছোটদের একাঙ্কিকা

[শিশু নাট্যমোদের দুর্লভ বই] ২.০০

মরা হাতী লাখ টাকা

[শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ কর্তৃক অভিনীত।
নব সংস্করণ] ১.২৫

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। কলিকাতা-৬

বিশ্বরূপা

(শীততাপ প্রগতিধর্মী নাট্যমঞ্চ)

[ফোন : ৫৫-১৪২৩, বুকিং ৫৫-৩২৬২]

বৃহস্পতি ও শনি সন্ধ্যা ৬॥টায় | রবি ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬॥টায়

প্রযোজনানৈপুণ্যে ও অভিনয়মাধুর্যে অতুলনীয়

সেতু

২১৫ হইতে ২২২ অভিনয়

একটি চিরন্তন মানব অনুভূতির কাহিনী

নাটক **বিধায়ক** | আলোকসম্পাত **তাপস সেন**

শ্রেষ্ঠাংশে—নরেশ মিত্র, অসিতবরণ
তরুণকুমার, মমতাজ, সন্তোষ, তমাল,
জয়শ্রী, সুব্রতা, হীরা, আরতি ইত্যাদি
ও
তৃপ্তি মিত্র (বহুরূপী)

বিশ্বরূপায় বহুরূপীর অভিনয়

স্বর্গত তুলসী লাহিড়ী রচিত

ছেঁড়া তার

মঙ্গলবার ১৩ সেপ্টেম্বর ৬॥টায়
নির্দেশনা—শম্ভু মিত্র
আলোকসম্পাত—তাপস সেন

শ্রেঃ তৃপ্তি মিত্র, শম্ভু মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, অমর গাঙ্গুলী, কুমার রায়, শোভেন মজুমদার ও আরতি মৈত্র।

এই সম্পর্কে শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশার্থে পাঠিয়েছেন :

"সংবাদটি আমাকে যারপরনাই বিস্মিত করেছে। কারণ এ সম্পর্কে আমি বিন্দুবিসর্গও অবগত নই। শ্রীচণ্ডী নাগ অথবা দৃশ্যে প্রযোজক কারও সংগেই কোনদিন আমার পরিচয় মাত্র নেই। তাছাড়া—"যে প্রেম নীরবে কাঁদে"র মত রুচিহীন নামসম্বলিত কোন উপন্যাস বা গল্প আমি কখনো লিখেছি বলেও আমার জানা নেই। কাজেই বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই।

"আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে কিভাবে আমার রচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবির আয়োজন হতে পারে, এটা আমার বুদ্ধির অগম্য।

"আমি আপনাদের এই বহুল প্রচারিত পত্রিকার মাধ্যমেই উক্ত শ্রী নাগ মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি, তিনি যেন এ সম্পর্কে শীঘ্রই একটু আলোকপাত করে আমাকে বাধিত করেন।"

ভারত-দর্শন

পরিচিত পরিবেশের গণ্ডি থেকে নতুন পটভূমির দিকে যাত্রা শুরু করেছে অতি-আধুনিককালের বাংলা ছবি। এস এম ফিল্ম ইউনিট-এর "যাত্রী" বাংলা ছবির এই নবীন যাত্রারই এক সার্থক উত্তরণরূপে উপস্থিত হয়েছে।

বিশাল ও বিচিত্র ভারতভূমি এই ছবির পটভূমি। "ভারত-দর্শন স্পেশাল ট্রেনে" ভারত-পরিক্রমায় বেরিয়েছে এক ভ্রাম্যমান মানব-গোষ্ঠী। তাদের ঘিরেই ছবিটির আখ্যানভাগ রচিত।

ট্রেনের চাকার গতির সংগে সংগে গড়ে ওঠে পাঁচশো যাত্রীর একটি চলমান সমাজ। তাদের মধ্যে রয়েছে অরুণ সেন ও অধ্যাপিকা বীণা, ইতিহাসের অধ্যাপক বিপিনবাবু ও ছোট্ট ছেলে স্যানি, পল্লী-বাংলার প্রাণ-প্রতীক বৈষ্ণবী নতুনদি আর-এক বঞ্চিতা নারী, যিনি জীবনভোর খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাঁর গৃহত্যাগী স্বামীকে, কমার্সিয়াল আর্টিস্ট সমীর আর "ভারত-দর্শন" ট্রেনের সেবিকা সবিতা এবং আরও অনেক যাত্রী।

অরুণ সেনের বেহালার তারে ধুলো জমে রয়েছে। জীবনের হারানো সুর খুঁজতে বেরিয়েছে সে। এক নিরুদ্দেশ বেদনার প্রতিমূর্তি এই আপনভোলা যুবক। অধ্যাপিকা বীণাও চায় অনেক দেখা ও অনেক জানার মধ্যে নিজের জীবনের সব দুঃখ ভুলে থাকতে। কিন্তু সব কিছু আড়াল করে তার সামনে এসে দাঁড়ায় সেই বঞ্চিত ব্যথাহত প্রেমিকের স্মৃতি, যে তাকে না পেয়ে আত্মহত্যার ভেতর দিয়েই প্রেমের আহুতিকে সম্পূর্ণ করে তুলেছে।

থিয়েটার ইউনিট-এর

২১শে সেপ্টেম্বর, সন্ধ্যা ৭টা

চারদেয়াল

মিনার্ভা থিয়েটার

পরিচালনা : শেখর চট্টোপাধ্যায়
আলোক : তাপস সেন

(সি ৭৫৮১)

ষ্টার থিয়েটার

[শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত] ফোন: ৫৫-১১৩৯

শ্রেয়সী

আজকের সমাজ-সমস্যার সম্মুখীন হয়ে
যে নাটক কথা বলছে—
কাহিনী : সুবোধ ঘোষ
নাটক ও পরিচালনা : দেবনারায়ণ গুপ্ত
দৃশ্য ও আলোক : অনিল বসু
প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ৬॥টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটীর দিন ৩টা ও ৬॥টায়
রূপায়ণে : ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, সাবিত্রী চট্টোঃ, বসন্ত চৌধুরী, অজিত বন্দ্যোঃ, অপর্ণা দেবী, অনুপকুমার, লিলি চক্রঃ, শ্যাম লাহা, লীলা পাল, তুলসী চক্রঃ, পঞ্চানন, বেলারাণী, প্রেমাংশু বোস ও ভানু বন্দ্যোঃ

রেকোকাশ্মীর
ফেস পাউডার

জানেন কি !

কলিকাতায় সাধারণ রঙ্গালয় ৫টি

ষ্টার-বিশ্বরূপা-মিনার্ভা-রঙমহল

ও

গিরিশ থিয়েটার

প্রযোজনা ও উপস্থাপনা—বিশ্বরূপা থিয়েটার

স্থান : বিশ্বরূপা থিয়েটার (৫৫-৩২৬২)

যেখানে নিয়মিতভাবে

সোম, বুধ ও শুক্রবার ৬॥টায়
এবং রবিবার ও ছুটির দিন সকাল ১০॥টায়

ডাউন ট্রেন

......নাটক অভিনয় হচ্ছে

সম্পাদনা ও নির্দেশনা—বিধায়ক ভট্টাচার্য

আঙ্গিক নির্দেশনা—তাপস সেন

শ্রেঃ—রাধামোহন ভট্টাচার্য, জ্ঞানেশ মুখার্জি, বিধায়ক ভট্টাচার্য, সুনীল ব্যানার্জি, গীতা দে, জয়শ্রী সেন প্রভৃতি

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

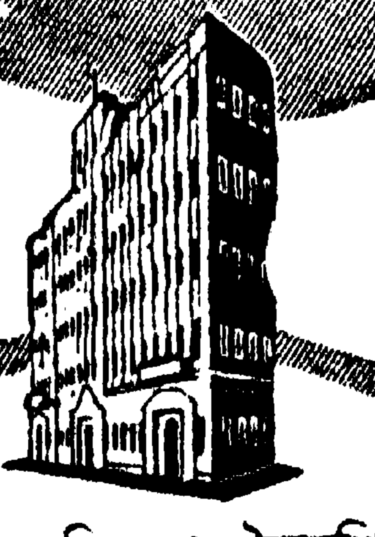

★ আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

★ আকর্ষণীয় হারে ক্যাস সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

★ স্পেশাল সেভিংস ডিপোজিট একাউণ্টে বার্ষিক ২½% হারে সুদ দেওয়া হয়।

হেড অফিস

৪ ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১

শেষ পর্যন্ত বীণার অন্তরের ব্যথা একদিন মিশে যায় অরুণের বড় বেদনার সঙ্গে। অরুণের গভীরতর জীবন-বেদনার মধ্যেই সে খুঁজে পায় শান্তি, আর বীণার হৃদয়তন্ত্রীতে বেজে ওঠে অরুণের জীবনের হারিয়ে যাওয়া সুর। দুটি জীবনের বেদনা এক হয়ে মিশে গিয়ে নতুন মাধুর্যের সুরটিকে জাগিয়ে তোলে।

অন্য দিকে সবিতার প্রেরণায় কমার্শিয়াল আর্টিস্ট সমীর অনুভব করে জীবিকার চেয়ে জীবন বড়, প্রয়োজনের চেয়ে প্রেম। আর বিপিনবাবু বাঙ্ময় পাষাণগাত্র ছুঁয়ে ছুঁয়ে প্রণাম জানিয়ে যান ভারতের ইতিহাসকে, সঙ্গীদের শুনিয়ে যান ভারত-আত্মার মর্মপরিচয়। অতীতকে সাক্ষী রেখে বর্তমানকে সার্থক ও সুন্দর করে গড়ে তোলে যাত্রিদল। পথের সঞ্চয়ে জীবনের ঝুলি পূর্ণ করে ফিরে আসে তারা নিজেদের ঘরে।

পটভূমির বৈচিত্র্য ও বিশালতা এই ছবির প্রধান সম্পদ। একটি স্পেশাল ট্রেনের গতিপথ ধরে ভারতের বহু পুণ্যতীর্থ ও দেবালয়, অগণিত শিল্পকীর্তি ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানের সঙ্গে দর্শকদের সাক্ষাৎ-পরিচয়ের এক দুর্লভ সুযোগ এনে দিয়েছে ছবিটি। ছবিতে মনোরম দৃশ্য-বিন্যাস ও নেপথ্য-ভাষণের ভেতর দিয়ে ভারতের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক পীঠস্থানগুলির উপস্থাপন পরিচালক সচ্চিদানন্দ সেন-মজুমদারের প্রশংসনীয় প্রয়োগ-নৈপুণ্য ও শিল্পরুচির পরিচয় দেয়। যে মন্দির বা ভাস্কর্য অনেকেরই অনেকবার দেখা, তাই যেন নতুন রূপ ও প্রাণ নিয়ে ছবিতে উপস্থিত। ভারতের বিভিন্ন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান ও তীর্থভূমির দৃশ্যের সঙ্গে সেই সব জায়গার সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক মর্মপরিচয়টি পরিচালক নেপথ্য ও প্রকাশ্য কণ্ঠ-সঙ্গীতের মাধ্যমে অপূর্বভাবে পরিবেশন করেছেন। ভারতের প্রামাণিক রূপ বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে তাঁর ছবিতে।

ছবিতে যে প্রণয়োপাখ্যান রূপ নিয়েছে, তার রস ভারত-পরিক্রমার পথের বিস্ময় ও অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে উঠতে পারেনি। ভারতভূমির অনন্ত রূপ ও ভাবের মধ্যে ব্যক্তি-জীবনের সুখ-দুঃখের অনুভূতি যেন সহজেই তুচ্ছ হয়ে পড়েছে। এবং ছবিতে প্রণয়োপাখ্যানটি সুষ্ঠু নাট্য-প্রস্তুতি ও পরিণতির ভেতর দিয়ে উপস্থাপিত হয়নি বলে তা দর্শকমনকে নাড়া দেয় না। প্রেমোপাখ্যানের প্রধান দুটি পুরুষ চরিত্রকে খুবই কৃত্রিম বলে মনে হয়। তদুপরি প্রণয়-আখ্যানের প্রধান চরিত্রগুলির সংলাপও জীবনবোধবর্জিত ও শূন্য ভাবালুতায় আচ্ছন্ন। এই কারণেও তাদের

আকুলতা ও বেদনা আশা ও অভীপ্সা

বাঙালী ও বঙ্গসংস্কৃতিকে জানতে
একখানা প্রথম শ্রেণীর বাংলা
মাসিক **নববঙ্গ** পড়ুন
তৃতীয় বর্ষ ※ বার্ষিক ৩্
২০৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭

পূজায় প্রিয়জনকে উপহার দিবার
শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

জাতিস্মর-কথা

বাংলা-সাহিত্যে এ গ্রন্থের আর জুড়ি নেই। বিশিষ্ট সংবাদপত্র ও পত্রিকা, বিদগ্ধ সমালোচকগণ কর্তৃক অভিনন্দিত। জীবনের গতিছন্দে ছেদ নেই, বিরতি নেই, শাশ্বত পথিকের চলার বিরাম নেই—এই মহাসত্য জাতিস্মর-গণ কর্তৃক বিবৃত। মূল্য ৪·৭৫।

প্রকাশক— দি ঘাটশীলা কোম্পানী,
৩, ম্যাঙ্গো লেন,
কলিকাতা

প্রাপ্তিস্থান—দাশগুপ্ত এণ্ড কোং,
৫৪/৩, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

চক্রবর্তী চাটার্জি এণ্ড কোং,
১৫, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা-১২

ডি. এম. লাইব্রেরী,
৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

শারদ সংখ্যার আরও বিশেষ আকর্ষণঃ

কালীচরণ ঘোষ-এর
— অমৃতস্য পুত্রা —
ফাঁসীর পূর্বে লিখিত শহীদ দীনেশ গুপ্তের আটখানি চিঠিসহ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অধ্যায়

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়-এর
— অনেক দিনের অনেক কথা —
পুরোনো দিনের স্মৃতি

অভাব কবি অভিরাম দাস-এর
— অভিরাম দাসের পাঁচালী —

শ্রীজীবেশ মৈত্রের

বৃত্ত ও বৃত্তান্ত

দাম : ২·৫০

"প্রেম জীবনে আনে ঐশ্বর্য"—লেখকের বলিষ্ঠ ভাষায় অঙ্কিত এই বইয়ের রমলা চরিত্রের মধ্যে তার পরম নিদর্শন।

পরিবেশক :

নব বিদ্যা বুক হাউস

১০/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯

(সি ৭৬৫৩)

জিগীষা

— শারদ সংখ্যা —

তিনটি সম্পূর্ণ উপন্যাস

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বিধায়ক ভট্টাচার্য

রণজিৎ শিকদার

— এ ছাড়া —

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য চৌধুরী, ডাঃ বিশ্বাস, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র সান্যাল, হরি-নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, নীলকণ্ঠ, শিবরাম চক্রবর্তী, হাস্যানন্দ ঘোষ, সুনীল ধর, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক চট্টোপাধ্যায়, কার্তিকের দাস, রমেন চৌধুরী, শ্যামল সেন, ধনঞ্জয় বৈরাগী, দিলীপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তাপস সেন, সৌমেন্দ্র নন্দী ইত্যাদি।

শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্রের

(সরস আলোচনা)

জ্যোতিষীর গণনায় উত্তমকুমার-এর শিল্পী-জীবন

— গীতিচিত্র —

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, পান্নালাল বসু (কাওয়াল), সন্ধ্যা মুখার্জী, সুলতা চৌধুরী, মাধুরী মুখোপাধ্যায়।

শীঘ্রই বাহির হইতেছে

দাম : ২·৫০ ন. প.

১৩৫এ, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট, কলিকাতা—৭

ফোন : ৩৪-৫৫১১

কলিকাতার সোল এজেন্ট :

: মূলচাঁদ এ্যাণ্ড কোং

(সি ৭৭৭৭)

দর্শকমনে রেখাপাত করে না। ফলে ছবিটিতে প্রামাণিকতার সংগে প্রাণাবেগের এবং ভারত-দর্শনের সংগে আত্মদর্শনের রসায়নটিও রসের উত্তাপে সঞ্জীবিত হয়ে উঠতে পারেনি।

অভিনয়াংশের দুর্বলতা ছবিটিকে আরও নিষ্প্রাণ করে তুলেছে। বীণা ও সবিতার রূপসজ্জায় যথাক্রমে মুক্তি ও বেবির অভিনয় স্বচ্ছন্দ। অরুণের চরিত্রে পার্থ-সারথির অভিনয় আড়ষ্ট ও প্রাণহীন। অন্যান্য চরিত্রে গীতা, বিপিন, ঋষীন, নবীন, মন্মথ, বিমল, গোপাল ও শিশু-শিল্পী সমীরের অভিনয় চিত্রনাট্যের দাবি মিটিয়েছে।

সংগীত-পরিচালনায় (আবহে) সুধীন দাশগুপ্ত প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন দৃশ্যের নেপথ্য-সুর-ঝংকার মনকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। অনন্ত চট্টোপাধ্যায়ও কণ্ঠ-সংগীত পরি-চালনায় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।

মঞ্জু গুপ্তের গাওয়া অতুলপ্রসাদের "কত গান তো হোল গাওয়া" গানটি ছবিটির এক বিশেষ সম্পদ। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে "ও আমার দেশের মাটি" সুখশ্রাব্য।

ছবিটির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ ও আংগিক সৌষ্ঠব ভূয়সী প্রশংসার দাবি রাখে। ছবির বিভিন্ন দৃশ্যে "মন্তাজ"-এর ব্যবহার উঁচু শিল্পমানের পরিচায়ক। "মন্তাজ"-এর ভেতর দিয়ে একটি নৃত্যাংশের পরিবেশন ছবিটির একটি চমকপ্রদ শিল্পবৈশিষ্ট্য। আলোক-চিত্র ও সম্পাদনায় যথাক্রমে নলিন দোয়ারা ও মধু বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। শব্দগ্রহণে নৃপেন পাল ও সুজিত সরকার এবং আবহ-সংগীত গ্রহণে সত্যেন চট্টোপাধ্যায়ের কাজ সন্তোষজনক।

ছবি তৈরী'র ছবি

ভারতের সর্বাধিক ব্যয়বহুল ছবি "মুঘলে-আজম"-এর নির্মাণ-পর্ব নিয়ে চিত্রামোদীদের কৌতূহলের অন্ত নেই। দর্শকদের এই কৌতূহল মেটাবার উদ্দেশ্যে "মুঘলে-আজম"-এর নির্মাতারা ছবিটির প্রস্তুতি-কার্যের বিশদ তথ্য ও ইতিহাস সম্বলিত দুই হাজার ফুটের একটি স্বল্প-দৈর্ঘ্যের চিত্র তৈরী করেছেন। কেমনভাবে "মুঘলে-আজম"-এর অভূতপূর্ব জাঁকজমক ও আড়ম্বরের আয়োজন সম্পূর্ণ হল এবং কী অপরিসীম পরিশ্রম ও গবেষণার ভেতর দিয়ে ভারতের এই মহার্ঘতম চিত্রটি তিলে তিলে রূপ নিয়েছে তা-ই দেখানো হয়েছে দুই রীলের এই প্রামাণিক ছবিতে। কোন বড় ছবির প্রস্তুতি-পর্ব নিয়ে প্রামাণিক ছবি বিদেশে তৈরী হয়েছে। কিন্তু এ-দেশে

দেবপ্রিয় দে'র

"মৃগতৃষ্ণা"

মূল্য : ২·৫০

আগামী সপ্তাহেই প্রকাশিত হচ্ছে। সকল সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যাবে।

নব বলাকা প্রকাশনী

৪ নফরচন্দ্র লাহা লেন, কলিকাতা—৩৬

(সি ৭৬৬৯)

৫ম সংস্করণ

সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের

ইস্পাত ওরা ভাঙবেই ৪৲

লেখকের আরেকখানি উপন্যাস

এলো আহ্বান ৪৲

(৬ষ্ঠ সংস্করণ চলছে)

সাধারণতন্ত্রী প্রকাশালয়, ৪৪, কালী-কুমার মুখার্জি লেন, শিবপুর, হাওড়া ও কলকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে

উত্তর ভারতের একমাত্র সাহিত্যপত্রিকা

বাংলা ও হিন্দীর বিশিষ্ট লেখকের রচনায় সমৃদ্ধ

ইন্দ্রপ্রস্থ

মূল্য ১৲ টাকা

শারদ সংকলন

১৫ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হবে।

কার্যালয় : বি-২/৪১, হাউজ খাস, নয়াদিল্লী—১৬

(সি ৭৬৯৫)

ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ার।

এ-ধরনের প্রচেষ্টা এই প্রথম। "মুগলে-আজম"-নির্মাণের এই প্রামাণিক চিত্রটি অচিরেই সারা ভারতে মুক্তিলাভ করবে।

ইয়ুথ কয়ার-এর মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

গত সপ্তাহে নিউ এম্পায়ারে ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ার ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসংগীত ও লোকনৃত্যের একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। কয়ার-এর শিল্পিবৃন্দ কর্তৃক বৈদিক স্তোত্রগীতির পর অনুষ্ঠান শুরু হয়।

সংগীতাংশে রুমা গাঙ্গুলীর গাওয়া অতুলপ্রসাদের গান, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া গোয়া অঞ্চলের একটি লোকসংগীত এবং শ্যামল মিত্রের কণ্ঠে হিন্দী লোক-সংগীত উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে।

নৃত্যাংশে রুমা গাঙ্গুলী, দীপিকা দাস, অসিত চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জুলিকা দাস, গোপা ঘোষাল, নমিতা ঘোষাল ও কৃষ্ণা মজুমদার তাঁদের চিত্তাকর্ষক নৃত্যভঙ্গীতে দর্শকদের আনন্দ দেন। কয়ার-এর অর্ধশতাধিক শিল্পীর অংশগ্রহণে সমগ্র অনুষ্ঠানটি এক বিরল রসের আয়োজনরূপে রসিকজনের কাছে উপস্থিত হয়। ভারতের আঞ্চলিক লোকসংগীত ও লোকনৃত্য পরিবেশনের এই অভিনব শিল্প-প্রয়াসের জন্যে ইয়ুথ কয়ার সুধিজনের কাছে ধন্যবাদার্হ হবেন।

কয়ার-এর শিল্পিবৃন্দ কর্তৃক ভারতের জাতীয় সংগীত গাওয়ার পর অনুষ্ঠান শেষ হয়। জাতীয় সংগীতটি সর্বাংশে প্রচলিত সুরে গাওয়া হয়নি। জাতীয় সংগীত নিয়ে কয়ার-এর সুরকারের এই ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা বাঞ্ছনীয় নয়। উপরন্তু সুরের পরিবর্তন গানটিকে মোটেই শ্রুতিমধুর করতে পারেনি।

অনুষ্ঠানে সংগীত-পরিচালক হিসাবে ছিলেন সলিল চৌধুরী, অরুণ বসু ও শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়। নির্মলকুমারের ধারাবাহিক ভাষণ সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

সংগীত-শিল্পীর সম্মান

গত ২১শে আগস্ট কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে গীত-নৃত্য-নাট্য পরিষদ একতারা কর্তৃক তাঁদের প্রধান অধ্যক্ষ অন্ধগায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে'র সপ্তষষ্ঠিতম জয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নাট্যকার শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। বেদগানের পর কর্মাধ্যক্ষ শ্রীঅজয় হোম জন্মদিবস উপলক্ষে সংস্কৃতে কয়েকটি মন্ত্রপাঠের পর একটি রূপোর থালায় কৃষ্ণচন্দ্রকে ধুতি-চাদর সহ চন্দন মালা ও অর্ঘ প্রদান করা হয়। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে বলেন, যে কৃষ্ণচন্দ্র বাঙলা ও বাঙলার বাহিরে সংগীতে প্লাবন এনেছিলেন তাঁহার জয়ন্তী অনেক পূর্বেই করা উচিত ছিল। তাঁহার ছাত্রছাত্রীরা

শারদ সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

পরশুরামের

গল্প

জামাই ষষ্ঠী

(অসমাপ্ত)

যাযাবরের

প্রবন্ধ

তির্যক অক্ষি

রূপকার প্রযোজিত

সুকুমার রায়ের

চলচ্চিত্তচঞ্চরী

এবং

রসরাজ অমৃতলাল বসুর

ব্যাপিকা-বিদায়

পরিচালনা

সবিতাব্রত দত্ত

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট হল

২০শে সেপ্টেম্বর ● সন্ধ্যা ৬টায়

টিকিট:—২৲, ১৲ ও ৫০ নঃ পঃ

কার্যালয়—৫৩, বকুলবাগান রোড, কলি-২৫

(সি ৭৬৮২)

ঋষি দাসের

সোভিয়েত দেশের ইতিহাস

[আদিম যুগ থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত]

"এতদিন পরে বাঙ্গালা সাহিত্যে সোভিয়েট রাশিয়ার একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস...প্রকাশিত হইল।...বাংলা সাহিত্যের পক্ষে এই গ্রন্থ একটি মূল্যবান ও স্মরণীয় সংযোজন।"

—সম্পাদকীয়, যুগান্তর

মূল্য : ১২.৫০ ন. প.

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের

হাসির গল্প

[শ্রেষ্ঠ হাসির গল্পের সংকলন]

"নিছক মধুর হাস্যরস। হাসি বলতে যাঁরা অট্টহাসিকেই বোঝেন, তাঁরাও এই সংকলন থেকে একেবারে নিরাশ হবেন না বলেই মনে হয়। প্রত্যেকটি গল্পই বৈশিষ্ট্যে ও বৈচিত্র্যে ভরা।..." —দৈনিক বসুমতী

মূল্য : ৫৲ টাকা

পরিব্রাজকের

রতিবিলাপ

"চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সমকালীন পটভূমিতে নিবদ্ধ উপন্যাস। কল্পনায় নিপুণতা আছে, লিখনভঙ্গী সরস।" —দৈনিক বসুমতী

বড় সাহেব

"ঘাতপ্রতিঘাতের সঙ্গে লেখক বড়সাহেব সোমনাথ চক্রবর্তীর জীবন-কাহিনী ও চরিত্রটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এই উপন্যাসখানির মধ্যে...অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।"

—দৈনিক বসুমতী

ক্যালকাটা পাবলিশার্স

১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯

(সি ৭৭৩১)

নিজেই যে অনন্ত এই কলম্ব' এগিয়ে এসেছেন এজন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার শ্রদ্ধা জানিয়ে কৃষ্ণচন্দ্রকে মালা প্রদান করেন এবং বলেন, ইনি যে কেবল ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি, গজল, ভজন, কীর্তন, রাগসংগীত ইত্যাদি জানেন তা নয় রবীন্দ্র-সংগীতেও তাঁহার কিছু কম দক্ষতা নেই। স্বয়ং গুরুদেব তাঁহার "বিসর্জন" নাটকে কৃষ্ণচন্দ্রকে গান শিখিয়েছিলেন। শিশিরকুমারের "সীতা" ও "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকে কৃষ্ণচন্দ্রের গান আজও তাঁহার কানে লেগে আছে।

কৃষ্ণচন্দ্র প্রত্যুত্তরে বলেন, আজ 'একতারা'র ছাত্রছাত্রীদের এই ভালোবাসা ও প্রীতি নিদর্শনের দিনে আমার সবাগ্রে মনে পড়ছে শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর কথা। রবীন্দ্র শতবার্ষিক জন্মোৎসবের ঠিক আগে তাঁর পরলোকগমনে ক্ষতি অনেক হল। সাহিত্য শিল্পজগতে যেমন তাঁকে হারালেন, তেমনি অপরিমেয় ক্ষতি হল রবীন্দ্র-সংগীতের।

সবশেষে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে কৃষ্ণচন্দ্রের পরিচালনায় 'খণ্ডিতা' পালাকীর্তন নৃত্যের মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়। বাঙলার প্রায় লুপ্ত সম্পদ কীর্তনে নৃত্যের প্রয়োগ 'একতারা'র এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এভাবে নৃত্যের মাধ্যমে পরিবেশন করাতে কীর্তনের একঘেয়েমি দূর করতে তাঁরা সক্ষম হয়েছেন এবং দর্শকগণও চক্ষুকর্ণের তৃপ্তিলাভ করেছেন।

শিশিরকুমার স্মরণে

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের স্মরণে সর্বপ্রথম ও একমাত্র অনুষ্ঠিত জেলা-ব্যাপী যে "শিশির-স্মৃতি-নাট্য-প্রতিযোগিতা" বিগত জুন মাসে মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরে হয় তাহাতে অংশ গ্রহণকারী তেরোটি বিভিন্ন নাট্য-সংস্থার মধ্যে খড়্গপুরের "মশাল" নাট্য-সংস্থা অমর গঙ্গোপাধ্যায় রচিত নাটক "জীবন-যৌবন" অভিনয় করিয়া মেদিনীপুর জেলার শ্রেষ্ঠ নাট্য-সংস্থারূপে গণ্য হয়। গত ১২ই আগস্ট প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন প্রখ্যাত নট শ্রীছবি বিশ্বাস। বিজয়ী দল হিসাবে প্রথম পুরস্কার ছাড়াও "মশাল" আরও দুইটি বিভাগে দলগত অভিনয় এবং মঞ্চসজ্জা বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়া পুরস্কৃত হন। ঐদিন নাট্যাচার্যের এক আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন প্রসঙ্গে শ্রীছবি বিশ্বাস মহাশয় একটি সংক্ষিপ্ত ও মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন।

সদ্য প্রকাশিত C. F. Andrews-এর What I owe to Christ-এর
আবিস্মরণীয় অনুবাদ

ঋণাঞ্জলি মূল্য—৪·৫০

অনুবাদক নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

শরিমল গোস্বামীর মেরুপথের যাত্রীদল মূল্য ১·৫০

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের নতুন পৃথিবীর নতুন মানুষ মূল্য : ১·৭৫

রাইটার্স সিণ্ডিকেট

৮৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

(সি ৭৭৫৩।১)

শারদীয়া সংখ্যা

উল্টোরথ

সোমবার, ১২ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হচ্ছে

সুবৃহৎ শারদীয়া সংকলন

——এতে লিখেছেন——

বিধায়ক ভট্টাচার্য — দক্ষিণারঞ্জন বসু
শিবরাম চক্রবর্তী — দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমাধব রায় — জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
অন্নদা মুন্সী — ছবি বিশ্বাস
সুধীর সরকার
মণীন্দ্র চক্রবর্তী, অবধূত
এবং আরও বহু প্রখ্যাত লেখক

- নর্গিস দত্তের বহু দুষ্প্রাপ্য ও অজানা কাহিনী
- বহু রঙীন ছবি—পাকিস্থান, বোম্বাই, কলিকাতা ও
- বর্মা। এ ছাড়া নিয়মিত বিভাগ।
- আপনাদের চিঠির উত্তর দিচ্ছেন—সিনেমাসং

—গ্রাহক ও এজেন্টরা যোগাযোগ করুন—

৩৫০ পাতা · ২·৫০ ন.প. মাত্র

৯৫/এ, ক্লাইভ লেন : কলিকাতা-১

(সি ৭৮২১)

রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পঞ্চাঙ্ক নাটক

আড়ৎদার পড়ুন, ভাবুন, অভিনয় করুন

চক্রবর্তী ব্রাদার্স :—দেড় টাকা

৩৮, সুকিয়া স্ট্রীট : কলিকাতা—৯

(সি ৭৬৬৩)

ফ্রেণ্ডস বুক ক্লাবের উপহার
বাংলা ফোটোগ্রাফে নব সংযোজন
চিত্ত ভট্টাচার্যের

ফুলদানী ও শেষ হাস্নুহানা ২·০০

*

রণজিৎ ভট্টাচার্যের

যমুনা বহে উজান ২·০০

জিগীষা,
১৩৫এ মুক্তারামবাবু স্ট্রীট, কলিকাতা—৭

(সি ৭৭৭৬)

প্রকাশিত হল......

ষ্টার থিয়েটারে সাফল্যের সহিত অভিনীত দেবনারায়ণ গুপ্ত কর্তৃক নাটকে রূপান্তরিত সুবোধ ঘোষের অনন্যসাধারণ নাটক।

দাম ২·০০

শ্রেয়সী

সলিল সেনের বাস্তবধর্মী অভিনব সামাজিক নাটক। দাম ২·০০

দিশারী

চলচ্চিত্রে রূপায়িত মিহির সেনের সাফল্যমণ্ডিত অভিনব নাটক।

দাম ২·৫০

প্রবেশ নিষেধ

ক্যালকাটা পাবলিশার্স,

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা—১২

অঙ্গার

অঙ্গার

অঙ্গার

অঙ্গার

অঙ্গার

অঙ্গার

মিনার্ভা থিয়েটারে

(সি ৭৭৮৯)

খেলার মাঠ

রামের সপ্তদশ অলিম্পিকের ১৮ দিন-ধী খেলাধূলো প্রায় শেষ হবার মুখে। ব অলিম্পিকের বিরাট খেলাধূলোর লোচনা করা সময় সাপেক্ষ। তাহিকের দু' তিনটি সংখ্যায় সম্ভব । তাই অ্যাথলেটিকসের ট্র্যাক ও ফিল্ড ভণ্ট, মহিলাদের অ্যাথলেটিকস, হকি, টবল প্রভৃতি বিষয়ের পর্যালোচনা ায়ক্রমে 'দেশের' পাতায় প্রকাশ করা ব। অলিম্পিকের সাঁতার ও ডাইভিং তমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। এ সপ্তাহে ধু জলক্রীড়া নিয়েই পর্যালোচনা করছি। অলিম্পিকের ষোলো সতেরো রকমের লাধূলোর মধ্যে জলক্রীড়ার আকর্ষণ নাতম। জলক্রীড়ার মধ্যে আছে পুরুষ ও হিলাদের সাঁতার, পুরুষ ও মহিলাদের াইবোর্ড ও স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং আর য়াটারপোলো খেলা।

সাঁতারে বিশ্বের অগ্রগণ্য দেশগুলির মধ্যে মার্কিন আমেরিকা সর্বাগ্রগণ্য। তারপরই হাঙ্গেরী, জার্মানী, জাপান ও গ্রেট ব্রিটেনের নাম করতে হয়। কিন্তু গতবারের অলিম্পিকে অস্ট্রেলিয়ার পুরুষ ও মহিলা সাঁতারুরা ১৩টি স্বর্ণ পদকের মধ্যে ৮টি স্বর্ণ পদক লাভ করে সাঁতার ক্ষেত্রে তাদের প্রাধান্যের পর্যাপ্ত প্রমাণ দেয়। আমেরিকা পায় মাত্র ২টি স্বর্ণ পদক। অবশ্য ডাইভিংয়ের তিনটি পদক নিয়ে আমেরিকা মোট ৫টি স্বর্ণ পদক ঘরে তোলে।

কিন্তু এবার রোম অলিম্পিকের সাঁতারে আমেরিকার পুরুষ ও মহিলা সাঁতারুরা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে ১৫টি স্বর্ণ পদকের মধ্যে ৯টি স্বর্ণ পদক লাভ করেছে। এ ছাড়া পুরুষদের ডাইভিংয়ের ২টি স্বর্ণ পদকও তাদের দখলে। অস্ট্রেলিয়া পেয়েছে ৫টি স্বর্ণ পদক। এখন সাঁতারের মান সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক।

গতিবেগ, সহনশীলতা, শক্তি ও নৈপুণ্যে পৃথিবীর মানুষ কতখানি এগিয়ে গেল তার প্রমাণ দেবার উপযুক্ত স্থান ৪ বছরের ব্যবধানে এক একটি অলিম্পিক অনুষ্ঠান। সাঁতার ক্ষেত্রে বিশ্ব কতখানি এগিয়ে গেছে এবার রোম অলিম্পিকে তার ভালই প্রমাণ পাওয়া গেছে।

পুরুষ ও মেয়েদের সাঁতারের ১৫টি বিষয়ের মধ্যে একমাত্র পুরুষদের ২০০ মিটার বুক সাঁতার ছাড়া আর সমস্ত বিষয়েই নতুন অলিম্পিক রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর নতুন বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৭টি বিষয়ে। অধিকাংশ বিষয়েই একাধিক প্রতিযোগী নতুন রেকর্ড করেছেন। কোন কোন বিষয়ে ৬ জন এমন কি ৭ জন প্রতি-যোগীও নতুন রেকর্ডের অধিকারী হয়েছেন। পুরুষদের ২০০ মিটার বুক সাঁতারে নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত না হবার কারণ মেলবোর্ণ অলিম্পিক পর্যন্ত বুকের মুখে জলের নীচ দিয়ে সাঁতার কাটা আইনসিদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন সে নিয়ম তুলে দেওয়া হয়েছে।

একলব্য

ব্যক্তিগতভাবে এবার সবচেয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন আমেরিকার ষোড়শী সাঁতারু প্যাটরিসী ক্রিস ভন সালজা। তিনি পেয়েছেন তিনটি স্বর্ণ পদক। দু'টি রিলে রেসে দু'টি আর ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে একটি। এর পর নাম করতে হয় আমেরিকার তরুণ সাঁতারু মাইক ট্রয়-এর। ট্রয় ৪×২০০ মিটার রিলেতে স্বর্ণপদক ছাড়া ২০০ মিটার বাটারফ্লাই রেসের স্বর্ণ পদকও লাভ করেছেন।

অস্ট্রেলিয়ার সাঁতারুদের মধ্যে মারে রোজ, যিনি মেলবোর্ণ অলিম্পিকে তিনটি স্বর্ণ পদক পেয়েছিলেন তিনি এবারও ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে বিজয়ী হয়েছেন। সম কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন গতবার ১০০ মিটার পিঠ সাঁতারের বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার ডেভিড থিলে। অস্ট্রেলিয়ার সাঁতার-সম্রাজ্ঞী ডন ফ্রেজারও সমকৃতিত্বের অধিকারিণী। মেলবোর্ণের বিজয়িনী ফ্রেজারের কাছ থেকে ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইলের স্বর্ণ পদক এবারও কেউ ছিনিয়ে নিতে পারেনি। স্বল্প পাল্লার সাঁতারে ১০০ মিটারে ফ্রেজারই একমাত্র মেয়ে সাঁতারু যিনি পর পর দু'টি অলিম্পিকে বিজয়িনীর সম্মান অর্জন করলেন। পুরুষদের মধ্যেও মাত্র একজন সাঁতারু দু'টি অলিম্পিকে ১০০ মিটারের স্বর্ণ পদক পেয়েছেন। তিনি হচ্ছেন পরবর্তী জীবনে ছায়াচিত্রের 'টার্জন' হিসাবে খ্যাত আমেরিকার সাঁতার সম্রাট জনি উইসমুলার।

বিশ্ব রেকর্ড ও অলিম্পিক রেকর্ড সমেত নীচে সাঁতারের প্রতিটি বিষয়ের ফলাফলের সংগে যে মন্তব্য দেওয়া হল তা থেকেই রোম অলিম্পিকের সাঁতার প্রতিযোগিতার আভাস পাওয়া যাবে।

পুরুষদের বিষয়

১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল

বিশ্ব রেকর্ড—জে ডেভিট (অস্ট্রেলিয়া)—৫৪·৬ সেঃ।

প্রাক্তন অলিম্পিক রেকর্ড—জে হেনরিকস (অস্ট্রেলিয়া)—৫৫·৪ সেঃ।

১ম—জে ডেভিট (অস্ট্রেলিয়া)—৫৫·২ সেঃ (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড)

২য়—এল লারসন (ইউ এস এ)—৫৫·২ সেঃ।

৩য়—এম ডস স্যন্টস (ব্রেজিল)—৫৫·৪ সেঃ।

(জে ডেভিট মেলবোর্ণ অলিম্পিকে ৫৫·৮ সেকেণ্ডে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। আমেরিকার জেফ ফেরেল ৫৪·৮ সেকেণ্ডে ১০০ মিটার অতিক্রম করলেও রোম অলিম্পিকের আগে 'এপেণ্ডি-সাইটিসের' জন্য তার দেহে অস্ত্রোপচার করা হয়। ফলে তিনি ১০০ মিটারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। আমেরিকার ১৯ বছর বয়স্ক সাঁতারু ল্যান্স লারসেন আর ডেভিট একই সময়ে ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল অতিক্রম করেন। লারসেন প্রথম হয়েছেন বলে অলিম্পিকে প্রতিবাদও করা হয়। কিন্তু ভোটে আমেরিকা হেরে যায়, ডেভিট লাভ করেন স্বর্ণ পদক)

৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল

বিশ্ব রেকর্ড—জন কনরাডস অস্ট্রেলিয়া —৪ মিঃ ১৫·৯ সেঃ।

প্রাক্তন অলিম্পিক রেকর্ড—মারে রোজ (অস্ট্রেলিয়া)—৪ মিঃ ২৭·৩ সেঃ।

১ম—মারে রোজ (অস্ট্রেলিয়া)—৪ মিঃ ১৮·৩ সেঃ (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড)

২য়—টি ইয়ামানাকা (জাপান)—৪ মিঃ ২১·৪ সেঃ।

৩য়—জন কনরাডস (অস্ট্রেলিয়া)—৪ মিঃ ২১·৮ সেঃ।

(এই বিষয়ে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী জন কনরাডসের তৃতীয় স্থান লাভ উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। প্রথম স্থানাধিকারী মারে রোজ এবং দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ইয়ামানাকা মেলবোর্ণেও যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। এই বিষয়ে প্রথম ৭ জন আগের অলিম্পিক রেকর্ড ম্লান করে দিয়েছেন)

১৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইল

বিশ্ব রেকর্ড—জন কনরাডস (অস্ট্রেলিয়া) ১৭ মিঃ ১১ সেঃ।

প্রাক্তন অলিম্পিক রেকর্ড—জর্জ ব্রীন (ইউ এস এ) ১৭ মিঃ ৫২·৯ সেঃ।

১ম—জন কনরাডস (অস্ট্রেলিয়া) ১৭ মিঃ ১৯·৬ সেঃ (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড)

২য়—মারে রোজ (অস্ট্রেলিয়া) ১৭ মিঃ ২১·৭ সেঃ।

৩য়—জর্জ ব্রীন (ইউ এস এ) ১৭ মিঃ ৩০·৬ সেঃ।

(১৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে আগের অলিম্পিক রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়েছেন প্রথম ৬ জন সাঁতারু। এবার প্রোপা

পদকের অধিকারী মারে রোজ মেলবোর্ণে স্বর্ণ পদক পেয়েছিলেন আর তৃতীয় স্থানাধিকারী জর্জ ব্রীন মেলবোর্ণে হিটে অলিম্পিক রেকর্ড করেছিলেন।

১০০ মিটার পিঠ সাঁতার

বিশ্ব রেকর্ড—জে মংকটন (অস্ট্রেলিয়া)—১ মিঃ ১·৫ সেঃ।

প্রাক্তন অলিম্পিক রেকর্ড—ডি থিলে (অস্ট্রেলিয়া)—১ মিঃ ২·২ সেঃ।

১ম—ডি থিলে (অস্ট্রেলিয়া)—১ মিঃ ১·৯ সেঃ (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড)

২য়—এফ ম্যাকিনে (ইউ এস এ) ১ মিঃ ২·১ সেঃ।

৩য়—আর বেনেট (ইউ এস এ)—১ মিঃ ২·৩ সেঃ।

(১০০ মিটার পিঠ সাঁতারে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী জে মংকটনের সপ্তম স্থান অধিকার উল্লেখ করবার মত ঘটনা। থিলে গতবারও স্বর্ণ পদক পেয়েছিলেন, রৌপ্য পদকের অধিকারী ম্যাকিনে গতবার পেয়েছিলেন রোঞ্জ পদক)

২০০ মিটার বুক সাঁতার

বিশ্ব রেকর্ড—টি গ্যাথারকোল (অস্ট্রেলিয়া)—২ মিঃ ৩৬·৫ সেঃ।

অলিম্পিক রেকর্ড—*এম ফুরুকাওয়া (জাপান) ২ মিঃ ৩৪·৭ সেঃ।

১ম—ডব্লিউ মুলিকেন (ইউ এস এ)—২ মিঃ ৩৭·৪ সেঃ

২য়—ওয়াই ওসাকী (জাপান)—২ মিঃ ৩৮ সেঃ

৩য়—ডব্লিউ মেনসোনিভিস (হল্যান্ড)—২ মিঃ ৩৯·৭ সেঃ

(* জলের নীচ দিয়ে সাঁতার কাটা যখন আইনসিদ্ধ ছিল তখনকার রেকর্ড। বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী গ্যাথারকোল মেলবোর্ণে চতুর্থ স্থান দখল করেছিলেন)

২০০ মিটার বাটারফ্লাই

প্রাক্তন বিশ্ব রেকর্ড—মাইক ট্রয় (ইউ এস এ) ২ মিঃ ১৩·২ সেঃ; **প্রাক্তন অলিম্পিক রেকর্ড**—ডব্লিউ জর্জিক (ইউ এস এ) ২ মিঃ ১৮·৬ সেঃ

পজ্ঞার নাটক

উমানাথ ভট্টাচার্যের

জল (২·৫০)

একটা অশ্রুসজল পরিহাসের ক্ষীণ আবরণের তলায় নাটকটিতে মাঝে মাঝে ঢেউ খেলেছে অতল গাম্ভীর্যের॥

যুগান্তর॥

নীচের মহল (২·৫০)

ঘূর্ণী (২·২৫)

কথকতা

৩৩সি, নেপাল ভট্টাচার্য লেন, কলি—২৬

(সি ৭৬১৬)

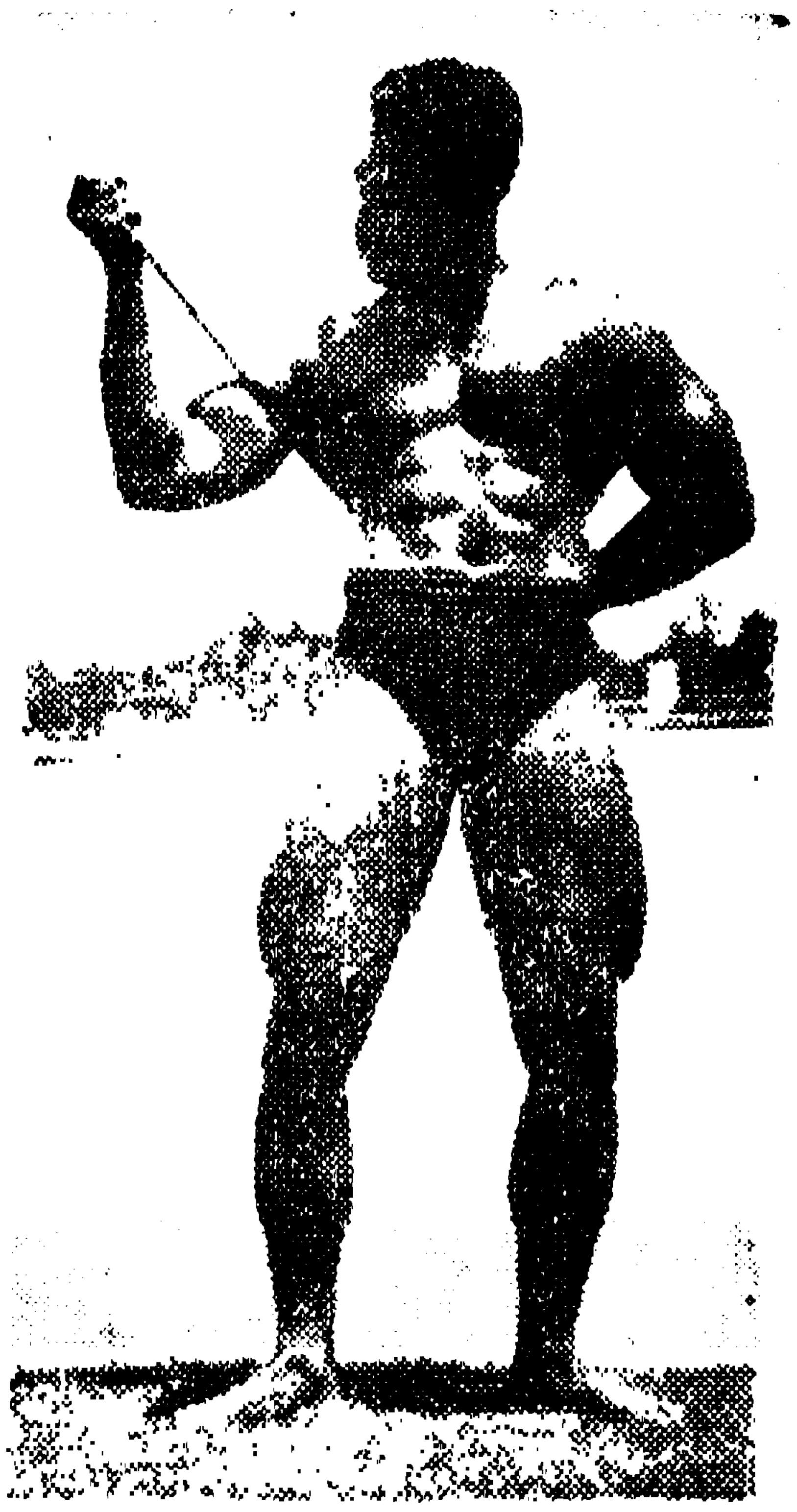

পাঁচবার ভারতশ্রী উপাধিধারী ভারতের শ্রেষ্ঠ দেহশ্রী কমল ভাণ্ডারী বিশ্বশ্রী প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য ১২ই সেপ্টেম্বর বিমানযোগে লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করছেন

১ম—মাইক ট্রয় (ইউ এস এ) ২ মিঃ ১৮·৮ সেঃ (নতুন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড)

২য়—এন হেজ (অস্ট্রেলিয়া) ২ মিঃ ১৯·৬ সেঃ

৩য়—ডি গিলেনডার্স (ইউ এস এ) ২ মিঃ ১৫·৩ সেঃ

(এই বিষয়ে মাইক ট্রয় নতুন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড করা ছাড়া প্রথম ৫ জন আগের অলিম্পিক রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন)

৪×২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল রিলে

প্রাক্তন বিশ্ব রেকর্ড—অস্ট্রেলিয়া—৮ মিঃ ১৬·৬ সেঃ

প্রাক্তন অলিম্পিক রেকর্ড—জাপান—৮ মিঃ ১৭·১ সেঃ

১ম—ইউ এস এ (নতুন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড)—৮ মিঃ ১০·২ সেঃ (দলে ছিলেন—জি হ্যারিসন, আর ব্লাক, এম ট্রয় ও জি ফ্যারেল)

২য়—জাপান—৮ মিঃ ১৩·২ সেঃ

৩য়—অস্ট্রেলিয়া—৮ মিঃ ১৩·৮ সেঃ

(আমেরিকা গতবার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল। তিনটি দেশই আগের বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে)

৪×১০০ মিটার মেডলে রিলে

প্রাক্তন বিশ্ব রেকর্ড—ইউ এস এ—৪ মিঃ ৮·২ সেঃ

১ম—ইউ এস এ—৪ মিঃ ৫·৪ সেঃ (নতুন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড) দলে ছিলেন—এফ ম্যাকিনে, পি হেট, এল লারসন ও জি ফ্যারেল।

২য়—অস্ট্রেলিয়া—৪ মিঃ ১২ সেঃ

৩য়—জাপান—৪ মিঃ ১২·২ সেঃ

(বুক সাঁতার, পিঠ সাঁতার, বাটারফ্লাই স্ট্রোক ও ফ্রি স্টাইলের ৪×১০০ মিটার মেডলে রিলে এবারকার অলিম্পিকের নতুন বিষয়)

ডাইভিং—হাইবোর্ড

১ম—আর ওয়েবস্টার (ইউ এস এ)—১৬৫·৫৬ পয়েণ্ট

২য়—জি টোবিয়ান (ইউ এস এ)—১৬৫·২৫ পয়েণ্ট।

৩য়—বি ফেলপস (গ্রেট ব্রিটেন)—১৫৭ ১৩ পয়েণ্ট।

ডাইভিং—স্প্রিং বোর্ড

১ম—গ্যারী টোবিয়ান (ইউ এস এ)—১৭০·০০ পয়েণ্ট

২য়—স্যাম হল (ইউ এস এ)—১৬৭·০৮ পয়েণ্ট

৩য়—জুয়ান বোটেলা (মেক্সিকো)—১৬২·৩০ পয়েণ্ট

(হাই বোর্ড ডাইভিংএ দ্বিতীয় এবং স্প্রিং বোর্ডে প্রথম স্থানাধিকারী গ্যারী টোবিয়ান গতবার হাইবোর্ডেও দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিলেন। ১৯২০ সাল থেকে হাই বোর্ড ও স্প্রিং বোর্ড ডাইভিংয়ে আমেরিকা স্বর্ণ পদক পেয়ে আসছে, শুধু গতবার মেলবোর্ণে মেক্সিকোর ডাইভার জে ক্যাপিল্লা হাই বোর্ডে স্বর্ণ পদক পেয়েছিলেন)

মহিলাদের সাঁতার

১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল

বিশ্ব রেকর্ড—ডন ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া)—৬০·২ সেঃ

প্রাক্তন অলিম্পিক রেকর্ড—ডন ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া)—৬২ সেঃ

১ম—ডন ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া)—৬১·২ সেঃ (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড)

২য়—ক্রিস ভন সালজা (ইউ এস এ)—৬২·৮ সেঃ

৩য়—এন স্টুয়ার্ড (গ্রেট ব্রিটেন)—৬৩·১ সেঃ

(১১০ গজের হিসাব ধরলে ফ্রেজার এর আগে এক মিনিটেরও কম সময়ে ১০০ মিটার সাঁতার কেটেছেন বলা যায়। অনেকে আশা করেছিল অলিম্পিকে তিনি এক মিনিটের বাধা অতিক্রম করবেন, কিন্তু পারেননি। তবে পর পর দুটি অলিম্পিকে স্বর্ণ পদক পেয়ে এক স্মরণীয় কীর্তির অধিকারিণী হয়েছেন)

৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল

বিশ্ব রেকর্ড—ক্রিস ভন সালজা—৪ মিঃ ৪৪·৫ সেঃ

ত্তন অলিম্পিক রেকর্ড—লোরেন ক্র্যাপ ট্রেলিয়া)—৪ মিঃ ৫৪·৬ সেঃ

ম—ক্রিস ভন সালজা (ইউ এস এ)—ঃ ৫০·৬ সেঃ (নতুন অলিম্পিক র্ড)

য়—জে সিভারকুইস্ট (সুইডেন)—৪ মিঃ ৯ সেঃ

য়—সি ল্যাগারবার্গ (হল্যাণ্ড)—৪ মিঃ ৯ সেঃ

আমেরিকার ষোড়শী সাঁতার পটিয়সী ভন সালজার স্বর্ণ পদক লাভ আশানু-ফলাফল, চমৎকার সাঁতারের স্টাইল ভন জার)

১০০ মিটার পিঠ সাঁতার

বশ্ব রেকর্ড—এল বার্ক (ইউ এস এ) মঃ ৯·২ সেঃ

প্রাক্তন অলিম্পিক রেকর্ড—জুডি গ্রীন-(ব্রিটেন) ১ মিঃ ১২·৯ সেঃ।

১ম—এল বার্ক (ইউ এস এ) ১ মিঃ ৯·৩ : (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড)

২য়—এন স্টুয়ার্ট (ব্রিটেন) ১ মিঃ ১০·৮ :

৩য়—এস তানাকা (জাপান) ১ মিঃ ১১·৪ ঃ

(এই বিষয়ে তিনজনই আগের অলিম্পিক কর্ড ভেঙে দিয়েছেন। অলিম্পিকের য়েকদিন আগে লীন বার্ক বিশ্ব রেকর্ড তিষ্ঠা করেছেন)

২০০ মিটার বুক সাঁতার

প্রাক্তন বিশ্ব রেকর্ড—ডব্লিউ উরসেলম্যান পশ্চিম জার্মানী) ২ মিঃ ৫০·২ সেঃ

প্রাক্তন অলিম্পিক রেকর্ড—ইউ হাপে পশ্চিম জার্মানী) ২ মিঃ ৫৩·১ সেঃ

১ম—অ্যানিটা লন্সব্রাউ (গ্রেট ব্রিটেন) ২ মঃ ৪৯·৫ সেঃ (নতুন বিশ্ব ও অলিম্পিক রকর্ড)

২য়—ডব্লিউ উরসেলম্যান (জার্মানী)—২ মঃ ৫০ সেঃ

৩য়—বি গোয়েবল (জার্মানী)—২ মিঃ ৫৩·৬ সেঃ

(অ্যানিটা লন্সব্রাউ ও উরসেলম্যান দুজন আগের বিশ্ব রেকর্ড ভেঙে দিলেও উরসেলম্যানের পরাজয় কিছুটা অপ্রত্যাশিত)

১০০ মিটার বাটারফ্লাই

বিশ্ব রেকর্ড—এন র‍্যামে (ইউ এস এ) ১ মিঃ ৯·১ সেঃ

প্রাক্তন অলিম্পিক রেকর্ড—এস ম্যান (ইউ এস এ)—১ মিঃ ১১ সেঃ

১ম—সি স্কুলার (ইউ এস এ)—১ মিঃ ৯·৫ সেঃ

২য়—এম হিমসস্কার্ক (হল্যাণ্ড)—১ মিঃ ১০·৪ সেঃ

৩য়—জে এণ্ড্রু (অস্ট্রেলিয়া)—১ মিঃ ১২·২ সেঃ

(বিশ্বের ক্রমপর্যায়ে স্কুলারের স্থান ছিল তৃতীয়)

৪×১০০ মিটার রিলে

প্রাক্তন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড—অস্ট্রেলিয়া ৪ মিঃ ১৭·১ সেঃ

১ম—ইউ এস এ (স্পিলেন, নাটালী, সি উড ও সালজা) ৪ মিঃ ৮·৯*সেঃ (নতুন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড)

২য়—অস্ট্রেলিয়া, ৪ মিঃ ১১·৩ সেঃ

৩য়—জার্মানী, ৪ মিঃ ১৯·৭ সেঃ

(বিশ্ব সাঁতারে অগ্রগণ্য দু'টি দেশই নতুন বিশ্ব রেকর্ড করেছে। আমেরিকা গতবার দ্বিতীয় ও অস্ট্রেলিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেছিল)

৪×১০০ মিটার মেডলে রিলে

প্রাক্তন বিশ্ব রেকর্ড—ইউ এস এ ৪ মিঃ ৪৪·৬ সেঃ

প্রাক্তন অলিম্পিক রেকর্ড—হল্যাণ্ড ৪ মিঃ ৪৭· সেঃ

১ম—ইউ এস এ (এল বার্ক, পি ওয়ার্নার, সি স্কুলার ও ক্রিশ ডন সালজা) ৪ মিঃ ৪১·১ সেঃ (নতুন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড)

২য়—অস্ট্রেলিয়া ৪ মিঃ ৪৫·৯ সেঃ;

৩য়—জার্মানী ৪ মিঃ ৪৭·৬ সেঃ;

ডাইভিং—হাইবোর্ড

১ম—ইনগ্রিড ক্র্যামার (জার্মানী)—৯১·২৮ পয়েণ্ট

২য়—পাউলা পোপ (ইউ এস এ)—৮৮·৯৪ পয়েণ্ট

৩য়—নিনেল ক্রুৎসোভা (রাশিয়া)—৮৬·৯৯ পয়েণ্ট

ডাইভিং—স্প্রিং বোর্ড

১ম—ইনগ্রিড ক্র্যামার (জার্মানী)—১৫৬·৮১ পয়েণ্ট

২য়—পাউলা পোপ (ইউ এস এ)—১৪০·৮১ পয়েণ্ট

৩য়—এলিজাবেথ ফেরিস (গ্রেট ব্রিটেন)—১৩০·০৯ পয়েণ্ট

(১৯২৪ সাল থেকে আমেরিকা কোনবার হাইবোর্ড ডাইভিংয়ের স্বর্ণপদক হারায়নি আর স্প্রিং বোর্ডের স্বর্ণ পদক অলিম্পিক ইতিহাসেই আমেরিকা ছাড়া আর কোনো দেশে যায়নি। এবার জার্মানীর ইনগ্রিড ক্র্যামার দু'টি ডাইভিংয়েই স্বর্ণ পদক পেয়েছেন। নিনেল ক্রুৎসোভা হাইবোর্ডে তৃতীয় স্থান লাভ করায় সোভিয়েট রাশিয়া সাঁতারে মাত্র একটি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে, অবশ্য ওয়াটারপোলো খেলাতেও রাশিয়া পেয়েছে একটি রৌপ্য পদক)

ওয়াটারপোলো খেলা

লীগ প্রথায় খেলায় ইতালী ৫ পয়েণ্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে, রাশিয়া ৩ পয়েণ্ট পেয়ে রৌপ্য পদক এবং গতবারের চ্যাম্পিয়ান হাঙ্গেরী ২ পয়েণ্ট পেয়ে ব্রোঞ্জ পদকের অধিকারী হয়েছে।

অলিম্পিক সম্বন্ধে

বাংলায় প্রামাণ্য বই

অলিম্পিকের প্রাঙ্গণে

অমরেন্দ্রকুমার সেন

এই বই সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত

● "The book contains a graphic history, recent origin and growth of the Olympic Games Supplemented by records. The details gathered are quite enormous and frankly speaking, one does not normally know as much as is incorporated in the book with extreme care. The book is enriched with numerous art plates. The cover is neat and well designed."
—HINDUSTHAN STANDARD

● "শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রকুমার সেন সযত্ন চেষ্টায় এই গ্রন্থটিকে তথ্যবহুল ও সরস করে তুলেছেন। তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

অলিম্পিকের প্রাচীন ইতিহাস, আধুনিক অলিম্পিকের সূত্রপাত এবং ১৯০০ সনের প্যারিস অলিম্পিক থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত প্রত্যেক অলিম্পিকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও জয়-পরাজয়ের তথ্য এই গ্রন্থে যুক্ত। তা ছাড়া রয়েছে ভারতীয় অলিম্পিক ও অলিম্পিকরথীদের কথা। বহু খেলোয়াড়ের ছবি এর অন্যতম আকর্ষণ। সুন্দর সুমুদ্রিত এই গ্রন্থটি অকুণ্ঠ প্রশংসাযোগ্য। খালেদ চৌধুরী অংকিত প্রচ্ছদ অনিন্দ্য।" —আনন্দবাজার পত্রিকা

● "'অলিম্পিকের প্রাঙ্গণে' গ্রন্থটিতে অলিম্পিকের আদি ও বর্তমান পর্বের ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়েছে। ক্রীড়ামোদিগণ এবং উৎসাহী মহল বর্তমান গ্রন্থ পাঠে অলিম্পিক প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পূর্বকথা, ফলাফল ও অলিম্পিকের বিখ্যাত রথীদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন। খেলাধুলা সম্পর্কে যাঁরা কৌতূহলী অলিম্পিক সম্পর্কে এই হ্যাণ্ডবুকটি তাঁদের বিশেষ প্রয়োজন সাধনে সমর্থ হবে।"
—দেশ

ডিমাই সাইজ — ৩·০০

প্রোমোটার্স পাবলিশার্স

এ ৩৭, সি, আই, টি বিল্ডিং

৩০, মদন চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৭

: প্রাপ্তিস্থান :

ত্রিবেণী প্রকাশন : কলিকাতা—১২

ডি. এম. লাইব্রেরী : কলিকাতা—৬

(সি ৭৮৩২)

দেশী সংবাদ

২৯শে আগস্ট—গত ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী হইতে ১৯৬০ সালের মার্চ মাসের মধ্যে কাকদ্বীপ অঞ্চলে খুন ও অগ্নিদাহের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সংসদ সদস্য শ্রীকংসারি হালদারের যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। অপর আসামী যোগেন্দ্র ... সন্দেহের অবকাশে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

আসামের ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিসের বিরুদ্ধে আসাম ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক প্রচারিত 'গোহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিস' নামক এক প্রচারপত্রে এবং অনুরূপ অন্যান্য বেনামী প্রচারপত্রে যে-সকল অভিযোগ করা হইয়াছে, আসাম সরকারের এক প্রেসনোটে সেগুলির প্রতিবাদ করিয়া বলা হইয়াছে যে, অভিযোগগুলি সম্পূর্ণ বিকৃত ও তাহা মিথ্যা।

উড়িষ্যার সাম্প্রতিক বন্যায় ২০ লক্ষ ৭৫ হাজার নরনারী বিপন্ন এবং ৯টি জেলার ৫০০০ বর্গমাইল এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া ভুবনেশ্বরে প্রচারিত এক প্রেসনোটে এই তথ্য পরিবেশন করা হয়।

৩০শে আগস্ট—আসাম সম্পর্কে সংসদীয় প্রতিনিধি দলের রিপোর্টটি আজ লোকসভা ও রাজ্যসভায় পেশ করা হয়। রিপোর্টে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আসামে রাষ্ট্রপতির শাসনের কোন প্রয়োজন নাই, সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারপতিকে সভাপতি করিয়া তদন্ত কমিশন গঠনও নিষ্প্রয়োজন। প্রতিনিধি দলের পি এস পি ও কম্যুনিস্ট সদস্যদ্বয় অবশ্য তদন্ত কমিশন গঠনের ব্যাপারে ভিন্নমত প্রকাশ করিয়া নোট দিয়াছেন।

৩০শে আগস্ট—আজ লোকসভায় পররাষ্ট্র বিভাগের বিতর্কের উত্তরদান করিয়া প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, কংগোতে অবিলম্বে চারিশত শয্যা বিশিষ্ট একটি হাসপাতাল স্থাপনে ভারত স্বীকৃত হইয়াছে এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থাও করা হইতেছে।

অদ্য উড়িষ্যার সেচ ও বিদ্যুৎমন্ত্রী শ্রীরাধানাথ রথ কলিকাতায় সাংবাদিকগণের সহিত বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে আলাপ আলোচনাকালে বলেন, উড়িষ্যার বিধ্বংসী বন্যায় ক্ষতির পরিমাণ ৬০ কোটি হইতে ৮০ কোটি টাকার মধ্যে দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

১লা সেপ্টেম্বর—আসাম সম্পর্কে তিন দিনব্যাপী বিতর্কের উত্তরদান করিয়া শ্রীনেহরু আজ লোকসভায় বলেন যে, আসাম সম্পর্কে উচ্চ পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি মানা হইবে না। কারণ, যে সমস্ত ক্ষত সারানোর প্রয়োজন ... সৃষ্টি করিবে, শান্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে বাধা আনিবে। তিনি আরও বলেন, এক সময়ে আসামে রাষ্ট্রপতির শাসনের কথা তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় দফায় ... রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম হইলে ... পুনর্বাসনের পথে ভীষণ বাধা পাইবে ... তাহা হইলে তাহাদের ... পরিবারবর্গের আজ তাহাদের ... পারিবে না।

১লা সেপ্টেম্বর—আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ... অধিবেশনে ... দাবি উপেক্ষিত হইলে জনগণের বিক্ষোভ কঠিনতর আকারে দেখা দিবার পূর্বাভাস সূচিত হয়। এইদিন সকালে সভায় আসাম সম্পর্কে বিতর্ককালে আসামের নিপীড়িত বাংলাভাষীদের মধ্যে আস্থা ও নিরাপত্তাবোধ পুনরুদ্ধারের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্তের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সৈন্য সমাবেশের তত্ত্বাবধানে এই রাজ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা অবলম্বনের সর্বসম্মত দাবি সোচ্চারকণ্ঠে ঘোষণা করা হয়।

২রা সেপ্টেম্বর—লোকসভায় আসামের পরিস্থিতি এবং ৩০শে আগস্ট তারিখে এই সভায় উপস্থাপিত সংসদীয় প্রতিনিধি দলের রিপোর্ট বিচার বিবেচনার পর এই মর্মে সুপারিশ করিয়াছেন যে, জুলাই মাসে আসাম রাজ্যে অনুষ্ঠিত হাঙ্গামার কারণ অনুসন্ধানের এবং ভবিষ্যতে যাহাতে অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়, তাহার উপায় নির্ধারণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে উপযুক্ত সময়ে বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সরকারের নীতি পুনর্ঘোষণা করিয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন, দোষীদের সাজা দেওয়ার জন্য সরকার আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিচার বিভাগীয় দ্রুত তদন্ত চাহেন। কিন্তু হাঙ্গামার মূল কারণ সম্পর্কে ব্যাপক তদন্তের প্রশ্নটি ইহার সহিত জড়িত নয়। কেননা, উত্তেজনাপূর্ণ বর্তমান পরিস্থিতিতে তাহা সম্ভব নয়।

আজ লোকসভায় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী ডঃ বি ভি কেশকার বলেন যে, ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির পরিচালনাধীন সংবাদপত্রের সংখ্যা দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়াছেন। এই দলের ৭টি দৈনিক, ৮।৯টিরও বেশী সাপ্তাহিক এবং কয়েকটি মাসিক পত্রিকা আছে।

৪ঠা সেপ্টেম্বর—দিল্লির কূটনৈতিক মহলে জানা যায় যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর আসন্ন পাকিস্তান সফরকালে কাশ্মীর সহ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অমীমাংসিত সমস্ত বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা হইবে। কূটনৈতিক মহল মনে করেন, প্রধানমন্ত্রী নেহরু হয়ত শেষ পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি সীমারেখা বরাবর কাশ্মীরকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রস্তাবই মানিয়া লইবেন। তবে সেই ক্ষেত্রে ভারতের গণ-সমর্থন লাভ করা খুবই কঠিন হইবে।

বিদেশী সংবাদ

২৯শে আগস্ট—মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন সূত্র হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, পররাষ্ট্র দপ্তরে অবস্থিত জর্ডানের প্রধানমন্ত্রীর অফিসে বোমা নিক্ষেপ করা হয়। ইহার ফলে জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী শ্রীহাজ্জা মাজালিসহ আরও ৯ জন মারা যান এবং ৫০ জন আহত হন।

গতকল্য কাসাই-কাতাঙ্গা সীমান্তে কাতাঙ্গা ও কেন্দ্রীয় কঙ্গো সরকারের সৈন্যদলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। উভয় পক্ষের সংঘর্ষ এই প্রথম। বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, কোন পক্ষেই কেহ হতাহত হয় নাই।

৩০শে আগস্ট—গতকাল ডাকার (সেনেগাল) হইতে প্রায় এক মাইল দূরবর্তী সমুদ্রগর্ভে এয়ার ফ্রান্সের একখানা সুপার কনস্টেলেশন বিমান ভাঙিয়া পড়ায় উহার ৬৩ জন আরোহীই নিহত হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করা হয়।

রিপাবলিকে পরিণত হইবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পরেও দক্ষিণ আফ্রিকা কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে বলিয়া আজ ন্যাশনাল পার্টির বিশেষ সম্মেলনে এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। দঃ আফ্রিকা রিপাবলিককে পরিণত হইবে কিনা, সে সম্পর্কে ৪ঠা অক্টোবর গণভোট গৃহীত হইবে।

৩১শে আগস্ট—প্রধানমন্ত্রী শ্রীযোসেফ এলিয়া লুঙ্গা আজ এলিজাবেথভিলে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, শ্রীপ্যাট্রিস লুমুম্বার কেন্দ্রীয় কঙ্গো সরকারের সৈন্যগণকে দক্ষিণ কাসাই হীরক সাধারণতন্ত্রের রাজধানী বাকাওয়াঙ্গা হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে।

১লা সেপ্টেম্বর—শ্রীনিকিতা ক্রুশ্চেভ রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদের আসন্ন বৈঠকে রুশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করিবেন। আজ রুশ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'তাস' এই মর্মে সংবাদ ঘোষণা করিয়াছে।

নেপাল আজ ভারতের সহিত কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে। এই সকল চুক্তি অনুসারে ভারত নেপালের পাঁচটি উন্নয়নমূলক কাজের জন্য উহাকে ১ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা দিবে।

২রা সেপ্টেম্বর—ফ্রান্স আগামী ২রা মার্চের মধ্যে মরক্কোস্থ ঘাটিসমূহ ত্যাগ করিয়া আসিবে বলিয়া আজ ঘোষণা করা হইয়াছে। ১৯৫৬ সালে স্বাধীনতা লাভের পূর্বে মরক্কোতে ৮০ হাজার ফরাসী সেনা ছিল। বর্তমানে সেখানে মাত্র ২৩ হাজার সৈন্য রহিয়াছে এবং উহাদের অধিকাংশই বৈমানিক।

৩রা সেপ্টেম্বর—কিউবা গতকল্য কম্যুনিস্ট চীনকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক সামরিক চুক্তি হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

নিউজিল্যাণ্ডের ওয়েস্টপোর্ট নামক স্থানে ১৮৮৬ সালে একটি গ্যাসের কারখানা খোলা হইয়াছিল। তখন এক হাজার কিউবিক ফুট গ্যাসের দাম ছিল দশ টাকা। সেখানে আজও ঐ দামেই এই পরিমাণ গ্যাস পাওয়া যায়।

৪ঠা সেপ্টেম্বর—কাতাঙ্গা সেনাবাহিনীর জনৈক মুখপাত্র অদ্য একথা স্বীকার করেন যে, কাসাই প্রদেশে প্রেসিডেণ্ট কালোনজীর মুক্তি ফৌজে ইউরোপীয়রা রহিয়াছেন।

সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'তাস' জানাইতেছেন, অধিকাংশ বিজ্ঞানীর ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত করিয়া রুশ বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পৃথিবীর অন্তস্তলে নির্ভেজাল লোহ রহিয়াছে—লোহজ ধাতু বা ধাতব বালুকণা সেখানে নাই। ১৮০০ মাইল নীচে পৃথিবীর অন্তস্তলে তাপমাত্রা ৪ হাজার হইতে ৬ হাজার ডিগ্রি (সেণ্টিগ্রেড) নহে, সেখানে তাপ হইতেছে প্রায় ১২ হাজার ডিগ্রি।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস ৬ সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮০। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

দেশ

DESH 40 Naya Paise
Saturday, 17th September, 1960

২৭ বর্ষ ॥ ৪৬ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১ আশ্বিন, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

উৎসবের দিন আসন্ন। আকাশে বাতাসে ঋতুবদলের, শারদ প্রসন্নতার ইশারা। প্রকৃতির সঙ্গে রাজনীতির যোগাযোগ প্রত্যক্ষ নয়—অনেক দুঃখের মধ্যে এই একটুখানি সান্ত্বনা। প্রকৃতিও কখনও কখনও প্লাবনে পীড়নে রুদ্রাণী মূর্তিতে দেখা দেন বটে, কিন্তু আবার তাঁরই সুনিপুণ সৃজনধারণ-কৌশলে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি অনায়াসে ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়। প্রকৃতির বিরূপতায় বিদ্বেষের বিষ নেই; রাজনীতির জটিল কুটিল দ্বন্দ্ববিরোধ জনজীবনে যে যন্ত্রণা সৃষ্টি করে তার ফল দীর্ঘস্থায়ী, তার অশুভ পরিণাম সহজে নিবারণ করা যায় না। আসন্ন উৎসব-ঋতুতেও তাই বাঙালীর পক্ষে ভুলবার উপায় নেই, তার জীবনের পটভূমি নানা প্রতিকূল রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাতে বিপর্যস্ত।

উৎসবের আনন্দ-আয়োজনের চিরাচরিত ধারা বাঙালীর ঘরে ঘরে যথাসাধ্য অনুসৃত হবে; দুর্গত বাঙালী দুর্গতিহারিণীর বন্দনায় আত্মনিয়োগ করবে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই উৎসবে আড়ম্বর বাহুল্য বর্জনের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন সুদ্ধ আসামের বাংলাভাষীদের প্রতি সমবেদনা প্রদর্শনের জন্য নয়। আসামের মর্মান্তিক ঘটনাবলীর ফলে বাঙালী মাত্রেই বেদনাভারাক্রান্ত, উদ্বিগ্ন, চিন্তাক্লিষ্ট। কিন্তু কেবল আমাদের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী কেন, গত বারো তেরো বৎসরে পশ্চিম বাংলার জনজীবন একাদিক্রমে নানা ভাবে বিড়ম্বিত, বিপন্ন হয়েছে। বাঙালী-মানসে এই সমূহ সংকটের গুরুত্ব এবং গভীরতা পুরোপুরি যথার্থভাবে প্রতিফলিত হতে পেরেছে কি না সন্দেহ।

উৎসবের সংকল্প

অভাব অভিযোগের সীমা নেই, অসন্তোষ প্রতিনিয়ত সোচ্চার, রাজনৈতিক কলহ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যতদূর মনে হয় সারা ভারতবর্ষে পশ্চিম বাংলার জুড়ি নেই। অথচ বাঙালী সমাজের সংকট মোচনের জন্য যে সমূহ উদ্যোগ দরকার সে-সম্বন্ধে বাংলার চিন্তাজীবীরা, জন-নায়কেরা অবহিত নন। উৎসব-অনুষ্ঠানে যে সাম্প্রতিককালে কোলাহল এবং আড়ম্বরের ঘটা বৃদ্ধি পেয়েছে সম্ভবত তার একটি কারণ বাংলার রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলির প্রবল ভঙ্গি-সর্বস্বতা।

দেশ, জাতি এবং সমাজের সংকট ও সমস্যা নিয়ে ভাবোচ্ছ্বাস সহজ, কল্পনা-বিলাসের আকর্ষণও লোভনীয়। এর পর আছে বাঙালীর সংস্কৃতি সচেতনতার প্রভাব। উৎসব অনুষ্ঠানে এই সবকটি প্রবণতার সমাবেশ ঘটে। এককালে আধুনিক বাঙালীর জীবনসাধনার মূলমন্ত্র ছিল শক্তি ও সংহতি। ইদানীং শক্তি ও সংহতির স্থান নিয়েছে সাংস্কৃতিক প্রয়াসের নামধারী কতকগুলি চোখ-ধাঁধানো ভঙ্গি এবং ভাববিকার। সংস্কৃতির সার্থক অনুশীলনে আপত্তি থাকতে পারে না। আপত্তি কোলাহল-মুখরতায় এবং তথাকথিত সাংস্কৃতিক ভঙ্গিমার ক্লান্তিকর বিকৃত পুনরাবৃত্তিতে।

বাঙালী মধ্যবিত্ত মানসের সবচেয়ে শংকাজনক অবক্ষয়ের লক্ষণ সংস্কৃতির সঙ্গে পৌরুষের চূড়ান্ত বিচ্ছেদ। জীবন-সংগ্রামে নিরুৎসাহ পশ্চাৎপদ বাঙালী শুদ্ধ সাংস্কৃতিক রোমাঞ্চে সান্ত্বনার আশ্রয় সন্ধান করছে—এ-অভিযোগ উঠেছে এবং এর সমুচিত প্রতিকার প্রয়োজন।

উৎসব অনুষ্ঠানে আড়ম্বর বাহুল্যের আরও একটা দিক আছে যা আধুনিক সমাজমানসের অশুভ লক্ষণ। বিলিতি সমাজদর্শনের বিচারে আমাদের কালের সামাজিকসত্তা নানাভাবে বিচ্ছিন্ন, বিশ্লিষ্ট; অসংখ্য স্বতন্ত্র সতত-চঞ্চল পরমাণু মিলিয়ে এর প্রতিরূপ। কিন্তু এই পরমাণুগুলির মধ্যে মিলটা কম; "সকলের তরে প্রত্যেকে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"—এই ছাড়ার টুকরো সমাজে অচলপ্রায়।

এইচ জি ওয়েলসের ভবিষ্যদর্শনে এ-ধরনের "য়্যাটমিক সোসাইটি" তথা "পারমাণবিক সমাজে" নাকি এমন সময় আসবে যখন একজন লোক জলে ডুবে প্রাণ হারাচ্ছে দেখলেও আর পাঁচজন তাকে বাঁচানোর জন্য বিন্দুমাত্র ব্যস্ত হবে না। মানবসমাজের এই ভয়াবহ ভবিষ্যৎ কল্পনা সত্য না হলেই স্বস্তি। কিন্তু এও মিথ্যা নয় যে, আমাদের চোখের সামনে বহু লোকের জান্তব দুর্গতি মোচনে আমরা প্রায়ই সচেষ্ট নই। অথচ অতিথি-পরিচর্যা, দরিদ্র-নারায়ণ সেবা এক সময়ে আমাদের সমাজে সকলেই পবিত্র ধর্মাচরণ বলে গ্রহণ করেছিল। এখন তার ব্যতিক্রম ঘটছে, যার ফলে উৎসব অনুষ্ঠানে সর্বাধিক প্রাধান্য পাচ্ছে বাহ্যিক আড়ম্বর এবং সাংস্কৃতিক আমোদ-প্রমোদ। সর্বজনীন পূজার আনন্দ সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে বণ্টিত হোক; অসংখ্য দুর্গত, দুঃস্থ এবং ভাগ্য-তাড়িত ব্যক্তিদের দুঃখ লাঘবের জন্য উৎসব উপলক্ষে কল্যাণমূলক প্রচেষ্টার সংকল্প অগ্রাধিকার লাভ করুক, এটা আশা করা নিশ্চয়ই অনুচিত হবে না।

প্রসঙ্গত

কোনো বৃহৎ ব্যক্তিত্বের সংগে পরিচয় যদি যুক্ত থাকে তাহলে সেটি অনেকে সৌভাগ্য বলেই মনে করেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই সৌভাগ্যটাই দুর্ভাগ্য রূপেও দেখা দেয়। যে-মানুষের নিজেরই একটা যোগ্যতা আছে, এবং সেই যোগ্যতার জন্যেই যার স্বনামধন্য হবার কথা—অনেক ক্ষেত্রে বৃহৎ ব্যক্তিত্বের প্রবল দীপ্তিতে সেই যোগ্যতার খানিকটা আচ্ছন্ন হয়ে যায়, আমরা তাকে স্পষ্ট রূপে দেখতে পাইনে। তার প্রাপ্য মর্যাদা দিতে আমরা ভুলে যাই।

ফিরোজ গান্ধীর ক্ষেত্রে এই কথাটি বেশি করে খাটে। তিনি প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর জামাতা, তিনি ইন্দিরা গান্ধীর স্বামী। তাঁর এই পরিচয়েই তাঁকে আমরা জেনেছি। এবং সেই জন্যেই তাঁর নিজের পরিচয়টি—তাঁর নিজস্ব পরিচয়টি—নেবার আগ্রহ তেমন ভাবে আমাদের জাগেনি।

কিন্তু দেশের জন্যে ও দশের জন্যে তিনি যে কাজ করেছেন, তার হিসাব যদি আমরা ভালো করে খতিয়ে দেখি, তাহলে স্পষ্টই বুঝতে পারা যাবে যে, বৃহৎ ব্যক্তিত্বের সংগে তাঁর পরিচয় যদি যুক্ত না থাকত, তাহলে তাঁর নিজের কর্মগুণেই তিনি স্বনামধন্য হতে পারতেন, তাঁর মূল্য বিচারে আমাদের এমন ভুল তা হলে হত না।

*

১৯১২ সালের ১২ সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁর জন্ম। ১৯৬০ সালের ৮ সেপ্টেম্বর দিল্লির হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। অপরিণত বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটল। তাঁর মৃত্যুতে দেশের ও দশের যে ক্ষতি হল তা পূরণ হতে সম্ভবত দেরি হবে।

এলাহাবাদে ফিরোজ গান্ধীর ছাত্রজীবন আরম্ভ। এখানে তিনি যখন কলেজের ছাত্র সেই সময়েই জাতীয় চেতনার দীক্ষা তিনি লাভ করেন। এবং জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করে তিনি বিলাতে যান এবং লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস্-এ ভর্তি হন। সেখানেই নেহরু-পরিবারের সংগে তাঁর পরিচয় হয়। ১৯৪২ সালে তিনি জহরলাল নেহরুর একমাত্র সন্তান ইন্দিরাকে বিবাহ করেন।

সংবাদপত্রের সংগে ফিরোজ গান্ধীর যোগ খুব ঘনিষ্ঠ। লখনউ-এ ন্যাশনাল হেরাল্ড্ পত্রিকার তিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। তারপর দিল্লির ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস্ পত্রিকার ম্যানেজিং ডিরেক্টার হন। সংবাদপত্রের সংগে তাঁর এই ঘনিষ্ঠতা ছিল বলেই তিনি সাংবাদিকতার স্বাধীনতা বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। এবং আইনসভার সংবাদাদি পরিবেশন ব্যাপারে সংবাদপত্রকে যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে—তার মূলে ছিলেন ফিরোজ গান্ধী।

১৯৫০ সাল থেকে তিনি লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন, মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি সদস্য ছিলেন।

*

মার্জিতরুচি ও পরিচ্ছন্ন এই পুরুষটি ছিলেন স্বল্পভাষী। কখনো তিনি সকলের

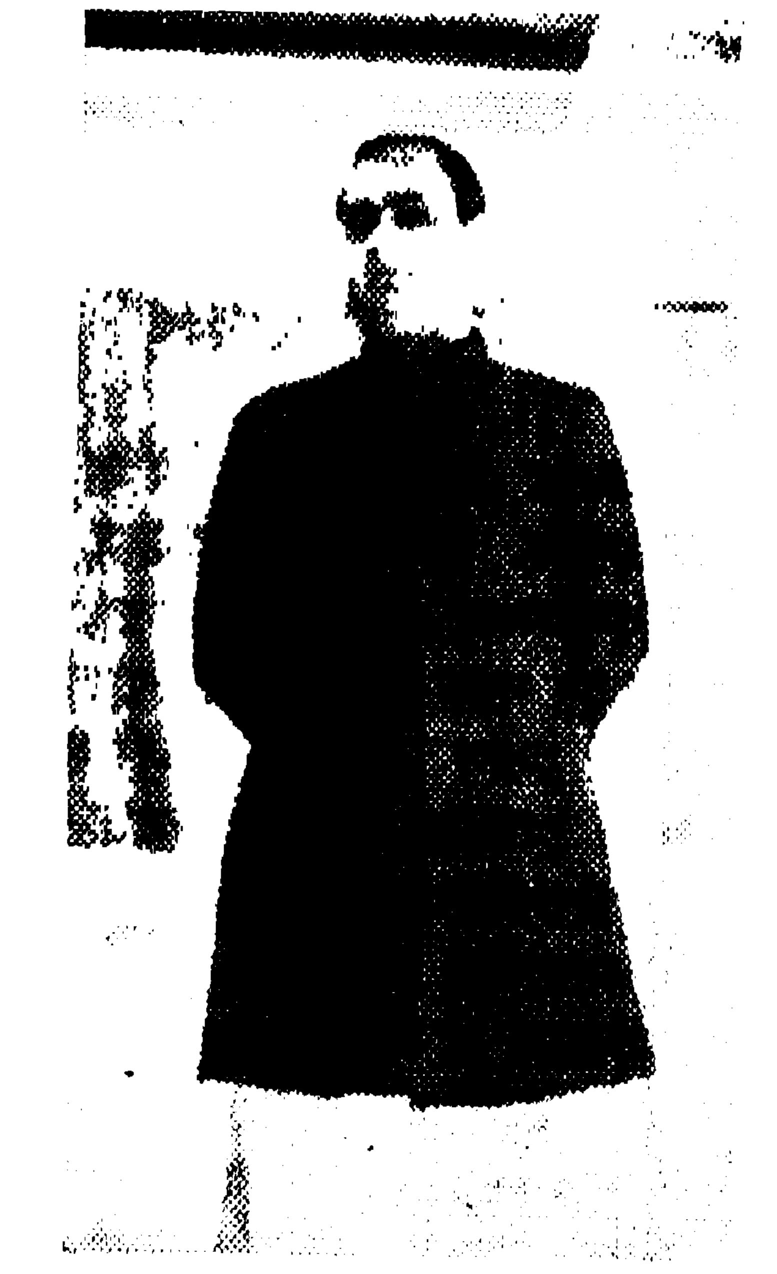

ফিরোজ গান্ধী (১৯১২—১৯৬০)

সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রকাশ করবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন না। এই জন্যেই তাঁকে নেপথ্যচারী আখ্যা দেওয়া যায়। নিজেকে প্রকাশ করা বা প্রচার করার আকাঙ্ক্ষা যদি তাঁর থাকত তাহলে সে ইচ্ছা পূরণের জন্যে তাঁকে বিশেষ ক্লেশ হয়তো করতে হত না। প্রধানমন্ত্রীর তিনি জামাতা, তিনি উদ্যোগী হলে হয়তো নিজেকে একজন প্রধান পুরুষ বলে জাহির করতে পারতেন।

কিন্তু রুচি তাঁর ছিল। অন্যের আলোয় নিজেকে আলোকিত করতে তিনি তাই কুণ্ঠিত ছিলেন। তার পরিবর্তে নিজস্ব দীপ্তিতেই তিনি ক্রমশ জ্যোতিষ্মান হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে সে জ্যোতি নিভে গেল।

দশ বৎসরকাল তিনি লোকসভার সদস্য। কিন্তু বছর পাঁচেক তিনি সভায় বিশেষ কথা বলেননি। নীরব শ্রোতা হিসাবেই তিনি উপস্থিত থাকতেন। সম্ভবত, এই সময় তিনি নিজেকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করে তুলছিলেন। অবশেষে, ১৯৫৫ সালে, ফিরোজ গান্ধী উঠে দাঁড়ালেন সভায়, তিনি বক্তৃতা দিলেন। সভাস্থ সকলের এবং দেশের অন্যান্য সকলের, দৃষ্টি পড়ল এই মহাভারত সভাপর্বে বিকর্ণোপম তেজস্বী নবীন বাগ্মীর উপর। দেশের কাছে এ-যেন এক নবীন আবিষ্কার। দেশবাসী জানতে পেল—তাদের হয়ে স্পষ্ট কথা বলার জন্যে এসে গিয়েছেন একজন স্পষ্টভাষী। ফিরোজ গান্ধীর এই স্পষ্টভাষিতার জন্যে তিনি ছিলেন অনেকের প্রিয়, তেমনি অনেকের অপ্রিয়ও তিনি ছিলেন। তাঁকে ভালোবাসত বহুলোক, তাঁকে ভয় করত অনেকে। সকলের ভালোবাসা-লাভের লোভে তিনি কখনো কারও মন রক্ষা করে কথা বলেননি, অনেক সময় প্রধান-মন্ত্রীরও না।

*

১৯৫৫ সাল থেকেই আমরা তাঁকে স্পষ্ট-ভাবে দেখতে পেয়েছি। এই সময় লোক-সভায় তাঁর বক্তৃতার ফলেই একটি বৃহৎ বিষয় উদ্ঘাটিত হয়, এবং তার ফলেই দেশের একটি প্রধান ব্যবসায় সংস্থা সংক্রান্ত তদন্ত কমিটি গঠিত হয়।

কিন্তু ফিরোজ গান্ধীর সবচেয়ে বড় কাজ সম্ভবত লাইফ-ইন্সিয়োরেন্স কর্পো-রেশনের সংগে মুন্দ্রার লেনদেন বিষয়কে কেন্দ্র করে তদন্তের উদ্বোধন। ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি এই ব্যাপারে লোকসভায় যে বৃত্তান্ত দাখিল করেন তার ফলে চারিদিক আন্দোলিত হয়ে ওঠে, এবং এর দ্বারা অনেকের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী টি টি কৃষ্ণমাচারীর প্রস্থান এই উদ্ঘাটনেরই পরিণতি।

এই জন্য তিনি ভালোবাসা পেয়েছেন অনেকের এইজন্য তাঁকে ভয়ও করত অনেকে। কখনো কোথাও কোনো অন্যায় তাঁর চোখে পড়লে, তিনি তার উচ্ছেদ না করা পর্যন্ত নিরস্ত হতেন না। এ-জন্যে তাঁকে পরিশ্রম করতে হয়েছে অক্লান্ত ভাবে, যাবতীয় তথ্য আহরণ করেছেন নিপুণ যত্নে। এই জন্যেই লোকসভার সকলের দৃষ্টি ছিল তাঁর উপর। বক্তৃতা দেওয়ার জন্য যখন উঠে দাঁড়াতেন ফিরোজ গান্ধী, দলমত নির্বিশেষে সমস্ত সদস্য উৎকর্ণ হয়ে, শুনতেন সেই বক্তৃতা। কেউ ভয়ে, কেউ কৌতূহল নিয়ে।

*

লোকসভার এই নবীন সত্যব্রতীর অকাল মৃত্যুতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী আজ শোকাভিভূত। এই ক্ষতি তাঁর ও তাঁর একমাত্র কন্যা ইন্দিরার ব্যক্তিগত ক্ষতি নয়, এই ক্ষতি ভারতবাসীর ক্ষতি। তাই আজ প্রত্যেক ভারতবাসী প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর কন্যার এই শোকে গভীর সমবেদনা নিবেদন করছে।

বৈদেশিকী

সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মিঃ খ্রুশ্চভ ইউনাইটেড নেশনস্‌-এর জেনারেল অ্যামসব্লীর অধিবেশন স্বয়ং উপস্থিত হচ্ছেন। মিঃ খ্রুশ্চেভের এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার ফলে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক জগতে যে-আলোড়ন সৃষ্টি হয়, বিশেষভাবে মার্কিন সরকার যে-উভয় সংকটে পড়েন, তার কিঞ্চিৎ আলোচনা গত সপ্তাহের "বৈদেশিকীতে" ছিল। ইতিমধ্যে আরো যে-সব খবর বেরিয়েছে তাতে ব্যাপারটার কৌতুক এবং কুতূহল উৎপাদনের শক্তি আরো প্রকাশ পেয়েছে। দেখা যাচ্ছে যাতে বহুসংখ্যক দেশের প্রধান নেতা ইউনোর অধিবেশনে উপস্থিত হন তার জন্য মিঃ খ্রুশ্চেভ নিজে অনেক চিঠি পাঠিয়েছেন। কম্যুনিস্ট ব্লকের প্রধান নেতারা তো আসছেনই, সে সংবাদ পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। পশ্চিমা ব্লকের অন্তর্গত দেশগুলির প্রধানমন্ত্রীরা কেউ আসবেন কিনা সেটা মার্কিন প্রেসিডেণ্ট কী স্থির করেন তার উপর অনেকটা নির্ভর করে। "নিরপেক্ষ" দেশগুলি কী করে সেইটাই হবে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর চালের সাফল্যের একটা বড়ো মাপকাঠি। সেদিক দিয়ে সোভিয়েটের সুবিধা হচ্ছে বলে মনে হয়। প্রধানমন্ত্রী উ নু বর্মার প্রতিনিধি দলের নেতারূপে যাচ্ছেন বলে ঘোষিত হয়েছে। ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক থেকে প্রেসিডেণ্ট নাসের স্বয়ং যাচ্ছেন। যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেণ্ট মার্শাল টিটো যাচ্ছেন বলেও সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এ-সংবাদও জানা গেছে যে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে যাবার জন্য অনুরোধ করে মিঃ খ্রুশ্চভ চিঠি লিখেছিলেন। শ্রী নেহরু কী করবেন তা এখনো জানা যায়নি। বোধহয় এখনো নিশ্চিত কিছু স্থিরও হয়নি। তবে তাঁর উপস্থিতির দ্বারা যদি নিরস্ত্রীকরণ অথবা কোনো অন্য বৃহৎ আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানের সহায়তা হয় তবে তিনি যেখানে দরকার সেখানেই উপস্থিত হবার জন্য প্রস্তুত আছেন, একথা শ্রী নেহরুর পক্ষ থেকে পূর্বেও কোনো কোনো সময়ে বলা হয়েছে, সম্ভবত এবারও তাই বলা হয়েছে। কোনো পক্ষের হলে প্রপাগাণ্ডার সুবিধা হয় তার জন্য শ্রী নেহরু যাবেন না, যদি আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের সত্যিই সহায়তা হয় তাহলেই তিনি যেতে পারেন। অর্থাৎ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার এবং মিঃ খ্রুশ্চভের যদি পরস্পরের সন্নিকট হবার সম্ভাবনা থাকে, এবং এমন একটি পরিস্থিতি বা আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় যাতে শ্রী নেহরুর উপস্থিতি সার্থক কর্মের আনুকূল্য করতে পারে তাহলেই শ্রী নেহরুর যাওয়ার অর্থ হয়।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের

গল্প ১৯২৯-৫০ পাঁচ টাকা

১৯২৯ হতে '৫০ পর্যন্ত লেখক যত গল্প লিখেছেন, সবই এতে সংকলিত হয়েছে। বাংলা ছোটগল্পের প্রথাসিদ্ধ ধারা হতে তাঁর ধারাটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং এই স্বাতন্ত্র্যের পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ বিকাশের সাক্ষ্য হলো এই গল্পসংকলন।

কন্যা ৩, **আগুন নিয়ে খেলা** ৩, **পুতুল নিয়ে খেলা** ৩, **যার যেথা দেশ** ৫, **অজ্ঞাতবাস** ৬, **কলঙ্কবতী** ৬, **দুঃখমোচন** ৫, **মর্তের স্বর্গ** ৫, **অপসরণ** ৫,

---

নবগোপাল দাসের **অভিযাত্রী** ৫·০০

১৯৪২ হতে '৫২ পর্যন্ত সময়টা বাংলার ইতিহাসে অভিনব ও গুরুত্বপূর্ণ। তারই পটভূমিতে রচিত এ-উপন্যাস একটি মূল্যবান মানবিক দলিল।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের **উত্তরপুরুষ** ২·৫০

বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ আজ যেসব নতুন নতুন সমস্যায় উপদ্রুত হচ্ছে তেমনই এক সমস্যার ভিত্তিতে 'উত্তরপুরুষ' মানবচরিত্রের নব-মূল্যায়ন। **সহৃদয়া** ৪, **শুক্লপক্ষ** ৩,

---

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের আত্মচরিতমূলক উপন্যাস **স্মরণচিহ্ন** ৫·০০

প্রাণতোষ ঘটকের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা **রানীবৌ** ৪·০০

রমাপদ চৌধুরীর

এই পৃথিবী পান্থনিবাস ৫·০০

অনেকের মতে রমাপদ-র সাম্প্রতিকতম উপন্যাসটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এবিষয়ে আপনার কী মত? দ্বিতীয় মুদ্রণ বেরিয়েছে।

লালবাঈ

নবম মুদ্রণ বেরল

ছয় টাকা

অরণ্য আদিম ৩·০০ **প্রথম প্রহর** ৫·০০

বিমল করের **অপরাহ্ন** ৩·০০

চারটি চরিত্রের আত্মকথনে মানব-অস্তিত্বের নিগূঢ় রহস্যের গ্রন্থি খোলা হয়েছে, এ-উন্মোচন যেমন স্বাগ্রয়ী তেমনই রোমাঞ্চকর। **দেওয়াল** ৪৷৷০/৬,

---

সুরজিৎ দাশগুপ্তের **একই সমুদ্র** ৩·৫০

একালের তরুণ-তরুণীদের যন্ত্রণা, বিক্ষোভ ও সমস্যাকে দুঃসাহসী নবীন লেখক অনাবৃত করে উপস্থাপন করেছেন। এ-উপন্যাস আধুনিক তারুণ্যের মর্মকথা।

অন্যান্য বই ঃ—বনফুলের **উদয়-অস্ত** ৬, **অগ্নীশ্বর** ৪৷৷০ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের **অভিজ্ঞান** ৬, **শশীনাথ** ৫, গ. চ. নি.র **অথ সংসারচরিতম** ২৷৷০ সুবোধ চক্রবর্তীর **সেই উজ্জ্বল মুহূর্ত** ৩৷৷০ বিমল মিত্রের **রাজপুতানী** ৩৷৷০ রূপদর্শীর **রঙ্গব্যঙ্গ** ৩৷৷০ দীপক চৌধুরীর **দাগ** ১ম খণ্ড ৫, ২য় ৪, প্রমথনাথ বিশীর **সিন্ধুনদের প্রহরী** ৩, **কপং কৃষ্ণা** ২৷৷০ দীনেন্দ্রকুমার রায়ের **ডাক্তারের জেলখানা** ২৷৷০ **ডাক্তারের হাতে দড়ি** ২৷৷০ নীহার গুপ্তের **অভিশপ্ত পুঁথি** ১ম ৪, ২য় ৪৷৷০ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের **শুভাশুভ** ৪, অচিন্ত্যকুমারের **কল্লোল যুগ** ৬, তারাশঙ্করের **পঞ্চপুত্তলী** ৪, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের **জেলোডাঙ্গা** ২৷৷০

ডি. এম. লাইব্রেরী ঃ ৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট ঃ কলকাতা ৬

তবে মিঃ খ্রুশ্চভ এই যুক্তি দিতে পারেন যে প্রধান প্রধান নিরপেক্ষ দেশের মুখ্য নেতারা যদি উপস্থিত হন তবে তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার এবং অন্য পাশ্চমা নেতারা এগিয়ে আসতে পারেন এবং তখন প্রধানদের মধ্যে আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বনিরসনের আলোচনা করো পক্ষেই সহজে এড়ানো সম্ভব হবে না। কিন্তু পশ্চিমা শক্তিদের বিরুদ্ধে কোনো সোভিয়েট প্যাঁচের সংগে ভারত যুক্ত আছে, যাতে এরূপ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে এমন কিছু থেকেও শ্রী নেহরু সাবধান থাকতে চান। আবার সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কোনো রকম অসৌজন্য দেখানো হয় তাও শ্রী নেহরুর অভিপ্রেত হতে পারে না। কেবল সোভিয়েট, মার্কিন, বৃটেন এবং ফ্রান্সকে নিয়ে শীর্ষ সম্মেলন করা মিঃ খ্রুশ্চভের কোনো দিনই খুব মনঃপূত নয়। শীর্ষ সম্মেলনের পরিধি আরো খানিকটা বৃহত্তর করার চেষ্টা মিঃ খ্রুশ্চভ কয়েকবার করেছেন। সে চেষ্টার প্রতি শ্রী নেহরুর সহানুভূতি স্বাভাবিক, কিন্তু জেনারেল অ্যাসেমব্লীর আঙিনায় ৮২।৮৩ জনের শীর্ষ সম্মেলনে কোনো কাজ হতে পারে বলে শ্রী নেহরু নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন না। জেনারেল অ্যাসেমব্লীতে সকলের মিলতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু দুই পক্ষের আসল কর্তাদের মধ্যে কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি বুঝাপড়া না হয়ে থাকলে মেলা বাড়িয়ে বিশেষ কিছু লাভ হবার সম্ভাবনা নেই।

এখন পর্যন্ত যা দেখা যাচ্ছে তাতে ইউনাইটেড় নেশনস্ এর সভায় প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার ও মিঃ খ্রুশ্চভের সাক্ষাৎ হবার সম্ভাবনা নেই। এবং এবিষয়ে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলান প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের পদাংক অনুসরণই করবেন। প্রেসিডেণ্ট দ্যগলের কোনো-দিনই যাবার ইচ্ছা ছিল না। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার এবং মিঃ ম্যাকমিলানের সিদ্ধান্ত অন্যরূপ হলে তাঁর পক্ষে একটু অসুবিধা হত। সে অসুবিধা তাঁর এখন হবে না। আমেরিকার প্লান হচ্ছে এই যে, প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার মিঃ খ্রুশ্চভের সংগে সাক্ষাৎ এড়াবেন বটে কিন্তু তিনিও জেনারেল অ্যাসেমব্লীতে উপস্থিত হবেন। জেনারেল অ্যাসেমব্লীর অধিবেশন অনেকদিন ধরে চলার কথা, মিঃ খ্রুশ্চভ কয়েকদিনের বেশি নিশ্চয়ই নিউইয়র্কে বসে থাকবেন না। মিঃ খ্রুশ্চভ যখন থাকবেন না তখন প্রেসিডেণ্ট আইসেন-হাওয়ার উপস্থিত হতে পারেন। কিন্তু এতে মুশকিল হচ্ছে এই যে, অন্য দেশের, বিশেষ করে নিরপেক্ষ দেশগুলির, প্রধান মন্ত্রী যাঁরা আসবেন তাঁরা কি মিঃ খ্রুশ্চভের দ্বারা আপ্যায়িত হবার পরে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের দ্বারা আপ্যায়িত হবার জন্য নিউইয়র্কে বসে থাকবেন? অথবা মিঃ খ্রুশ্চভ ছাড়া অন্য সব প্রধানমন্ত্রীদের এই উপলক্ষে মার্কিন রাষ্ট্র ভ্রমণের জন্য ঢালা নিমন্ত্রণ জানানো হবে?

মিঃ খ্রুশ্চভের গতিবিধি সম্পর্কে কী রকম ব্যবস্থা মার্কিন সরকারের মনঃপূত হবে সেটা মার্কিন সরকার সোভিয়েট কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছেন। মার্কিন সরকারের বক্তব্য এই যে, জেনারেল অ্যাসেমব্লীর অধিবেশনের জন্য মিঃ খ্রুশ্চভ যতদিন নিউইয়র্কে থাকবেন ততদিন ইউনাইটেড নেশন্-এর হেড কোয়ার্টাসের যত কাছাকাছি সম্ভব তাঁর থাকবার ব্যবস্থা যেন করা হয় (এবং ম্যানহাট্টান আইল্যাণ্ডে, নিউইয়র্কের যে-অঞ্চলে উনো'র হেড়-কোয়াটার্স অবস্থিত) বাইরে যেন তিনি না যান। মার্কিন সরকার বলেছেন যে, মিঃ খ্রুশ্চভের নিরাপত্তার জন্যই এই অনুরোধ করা হয়েছে। কারণ, মিঃ খ্রুশ্চভের মার্কিন বিরোধী সাম্প্রতিক উক্তিসমূহ, সোভিয়েট কর্তৃক অন্যায়ভাবে মার্কিন বিমানের ধ্বংসসাধন ইত্যাদি কারণে মিঃ খ্রুশ্চভের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দায়িত্বটা একটু কঠিনতর হয়েছে।

এর পাল্টা জবাব মিঃ খ্রুশ্চভের দিক থেকে কী আসবে বলা যায় না। মিঃ খ্রুশ্চভের কিউবা ভ্রমণের আয়োজনের কথা কিছুদিন থেকে শুনা যাচ্ছিল। মেক্সিকো থেকেও নাকি তাঁর নিমন্ত্রণ আছে। তিনি নিউইয়র্কের ম্যানহাট্টান আইল্যাণ্ডেই সাময়িকভাবে হেড্ কোয়াটারস করে সেখান থেকে একবার কিউবা ঘুরে এলেন, একবার মেক্সিকো ঘুরে এলেন, তারপর দক্ষিণ আমেরিকার কোনো দেশ থেকে নিমন্ত্রণ আসে কিনা দেখতে লাগলেন—মিঃ খ্রুশ্চভ যদি এই রকম করতে থাকেন তাহলে তাঁকে গণ্ডিবদ্ধ করে রাখার ব্যবস্থা প্রচুর হাস্যরস সৃষ্টি করতে পারে। জেনারেল অ্যাসেমব্লীর অধিবেশন উপলক্ষে যদি দুই পক্ষ মিলে প্রভূত পরিমাণ এই রকম হাসাহাসির খোরাকও জুগিয়ে যেতে পারেন তাহলেও আন্তর্জাতিক "টেনসনের" উপশম হতে পারে। দুঃখের বিষয় সব-কিছু হাসি দিয়ে ঢাকা যায় না—যেমন তিব্বতের বেদনা। তিব্বতের কথা জেনারেল অ্যাসমব্লীতে আবার তোলার চেষ্টা হবে। অতীতে ভারত সরকারের প্রতিনিধি এই ব্যাপারে "নিরপেক্ষর" ভূমিকা নিয়ে এই দেশের মাথায় যে-লজ্জা ও কলংকের বোঝা চাপিয়েছেন সে বোঝা কি নামানো হবে না?

১১-৯-৬০

পরীক্ষিতের অনূদিত

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ হস্তরেখাবিদ কিরোর
হাতের ভাষা (২য় সং) ৪·২৫

হাতের গোপন কথা (৩য় সং) ২·৫০
হাতের গোপন কথা
Secrets of the hands-এর অনুবাদ

ডন ব্র্যাডম্যানের
ক্রিকেট খেলার অ, আ, ক, খ
How to play cricket-এর অনুবাদ
ক্রিকেট শিক্ষার্থীদের সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক

পরীক্ষিতের প্রথম নাটক
অন্তরঙ্গ ২

"নায়ক ও নায়িকারা যান্ত্রিক হলেও type চরিত্রগুলি বেশ চিত্তাকর্ষক" —দেশ

আর্ট অ্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স
জবাকুসুম হাউস
৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা - ১২

লাইম লাইট

(ইংরাজীতে চলচ্চিত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বাৎসরিক সংকলন)

সম্পাদনাঃ কমল গোয়েংকা
মৃগাঙ্কশেখর রায়

যাঁরা লিখেছেন ঃ

বুদ্ধদেব বসু।
রাধামোহন ভট্টাচার্য।
অজিত গঙ্গোপাধ্যায়।
মৃণাল সেন।
বিমল ভৌমিক।
সুধাংশু ভট্টাচার্য।
সুশান্ত বসু।
প্রদীপ্ত সেন।
সিদ্ধার্থ দাশগুপ্ত।

এবং
অন্যান্য আরও অনেকে।

সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে বাহির হইবে।

এজেণ্টগণ নিচের ঠিকানায় লিখুন ঃ
"লাইম্ লাইট"
১২/২এ, রিজেণ্ট এস্টেট, কলিকাতা-৪০

বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের মৎস্যচাষ বিভাগের ডাঃ জোয়াকিথ রাডারের সাহায্যে মাছ ধরবার এক নতুন উপায় বার করেছেন। তিনি যে জালের সাহায্যে মাছ ধরা হবে তাতে রাডার যুক্ত একটি যন্ত্র লাগাচ্ছেন। এই যন্ত্রটি কোথায় মাছ পাওয়া যাবে তার একটা হদিস দেবে—আর সেই সংগে জালের সাহায্যে মাছ ধরা হবে। রাডার যুক্ত যন্ত্র মাছের মরসুম চলে গেলেও মাছ ধরতে সাহায্য করবে। সম্প্রতি ইংলিশ চ্যানেলে রাডার যুক্ত জাল হেরিং মাছ ধরার সময় চলে যাওয়ার পরও প্রায় ১০০ টন মাছ বার দিনে ধরেছে।

*

বেশীর ভাগ বড় বড় শহরের আশে-পাশেই কলকারখানা গড়ে ওঠে—যার ফলে শহরের লোকেরা কয়লা এবং ধোঁয়ার জন্য খুব অসুবিধা বোধ করেন। কিন্তু কলওয়ালারাও কলের ছাই, চিমনির ভুসো ইত্যাদি নিয়ে অসুবিধা বোধ করেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তারা বড় বড় গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে এগুলো জমা করতে থাকেন। কিন্তু যখন এই সব গর্ত ভরে যায় তখন সেগুলো নিয়ে কি করা যায় তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। জার্মানীর হার্থবুরগ শহরে এই সব ছাই ভুসো দিয়ে এক নতুন ধরনের বাড়ি তৈরীর মশলা প্রস্তুত করা হচ্ছে। একে পোরাস ক্রংকীট (porous concrete) বলা হচ্ছে। ইটের মত এগুলো তৈরী করা হচ্ছে। দেখা গেছে যে হার্থবুরগের যে কোন বিদ্যুৎশক্তি-উৎপাদন-কেন্দ্রে একদিনে যতটা ছাই পাওয়া যায় তাতে ছোট পরিবারের থাকার মত ১০টা বাড়ির তৈরীর জন্য পোরাস ক্রংকীট ইট তৈরী করা যায়। এই নতুন ধরনের বাড়ির তৈরীর উপাদনের চাহিদা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। জার্মানীর বিভিন্ন শহর ছাড়াও দেশ-বিদেশ থেকে এর চাহিদা হচ্ছে।

*

আমেরিকার নৌবহর গবেষণাগার থেকে তেল এবং গ্যাসের থেকে যে সমস্ত আগুন জ্বলে তা সহজে নেবানোর জন্য এক নতুন ধরনের গুঁড়ো বার করেছেন। এটা হচ্ছে পটাশিয়াম বাইকার্বোনেটের গুঁড়ো—অবশ্য

রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ রবীন্দ্র-সাহিত্য ॥

খৃষ্ট

রবীন্দ্রনাথ খৃষ্ট-জীবন ও বাণীর যে ব্যাখ্যা বিভিন্ন সময়ে (১৯১০-১৯৩৬) করেছেন এই গ্রন্থে সেগুলি একত্র সংকলিত হয়েছে। সমাহৃত অধিকাংশ রচনা ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নি। অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল অংকিত খৃষ্ট-চিত্রে ভূষিত। মূল্য ২·৫০ টাকা।

ভারতপথিক রামমোহন রায়

বিভিন্ন বৎসরে (১২৯১-১৩৪৭) রামমোহনের স্মরণ-সভায়, রামমোহন শতবার্ষিকীতে, ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক উৎসবে, মাঘোৎসবে রবীন্দ্রনাথ রামমোহন সম্বন্ধে যে-প্রবন্ধ পাঠ করেছেন, অভিভাষণ দিয়েছেন, ও অন্য সূত্রেও রামমোহন সম্বন্ধে যা বলেছেন, এই গ্রন্থের নূতন সংস্করণে তা যথাসাধ্য সংকলন করবার চেষ্টা করা হয়েছে। পূর্ব সংস্করণের পর এই নূতন সংস্করণে, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত অনেকগুলি রচনা সংগৃহীত হয়েছে। মূল্য ৩·০০, বোর্ড বাঁধাই ৪·০০ টাকা।

॥ পত্রধারা ॥

চিঠিপত্র

সপ্তম খণ্ড

কাদম্বিনী দত্ত ও শ্রীমতী নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত পত্রগুচ্ছ।

মূল্য কাগজের মলাট ৩·০০, বোর্ড বাঁধাই ৪·৩০ টাকা

॥ শোভন সংস্করণ ॥

জীবনস্মৃতি

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্রাবলী-বিভূষিত শোভন সংস্করণ

এই সংস্করণে সুবিস্তৃত গ্রন্থপরিচয়ও আছে

মূল্য বোর্ড বাঁধাই ১২·০০ টাকা

মুগা ও চামড়া বাঁধাই ২০·০০ টাকা

রক্তকরবী

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অংকিত চিত্রাবলীতে শোভিত

আর্ট পেপারে মুদ্রিত, বোর্ড বাঁধাই মূল্য ৪·৩০ টাকা

সাধারণ সংস্করণ মূল্য ২·৩০ টাকা

রক্তকরবীর ইংরেজি অনুবাদ Red Oleanders প্রকাশিত হলে বিলাতে সাময়িক পত্রে যে-সকল আলোচনা প্রকাশিত হয় সে সম্বন্ধে Manchester Guardian পত্রে কবির দীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশিত হয়। বর্তমান সংস্করণের গ্রন্থপরিচয়ে সেই প্রবন্ধটি (Red Oleanders : Author's Interpretation) সংযোজিত হল। রক্তকরবী সম্বন্ধে বিভিন্ন সূত্রে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য ব্যাখ্যান এবং মন্তব্য এই গ্রন্থে মুদ্রিত আছে।

বিশ্বভারতী

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

এর নতুন নামকরণ হয়েছে 'পাপ'ল কে পাউডার'। এই গুঁড়োর মত এত তাড়াতাড়ি আর কোন জিনিস এই ধরনের আগুন নেবাতে পারে না। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে একটা বিধ্বস্ত বিমানের

নতুন ধরনের ভাঁজ করা স্কুটার

আগুন পাপ'ল কে পাউডার ১১ সেকেন্ডের মধ্যে নিভিয়ে ফেলেছে। এই পাউডারের খরচও খুব কম এবং এর মধ্যে কোন বিষাক্ত দ্রব্যও নেই। আশা করা যাচ্ছে যে 'ফায়ার একস্টিংগুইসারে' এই পাউডার ব্যবহার করা যাবে।

*

সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে নৌবহর বা সাবমেরিন যাওয়ার সময় পেট্রল ফুরিয়ে গেলে আবার উপকূল থেকে পেট্রল আনা বিশেষ সময় সাপেক্ষ এবং যুদ্ধকালীন অল্প সময়ের মূল্যও খুব বেশী। আমেরিকাতে এজন্য সমুদ্রের তলায় পেট্রল ট্যাঙ্ক রাখার পরিকল্পনা চলছে। মেক্সিকো উপসাগরের নীচে এই পেট্রল-ভান্ডারটি স্থাপন করার চেষ্টা চলছে। এর জন্য মেক্সিকো উপসাগরের ৫২ ফিট নীচে ৭০ ফুট লম্বা ও ২২ ফুট চওড়া একটি রবারের পেট্রলাধার রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই আধারটিতে একসঙ্গে ৫০ হাজার গ্যালন পেট্রল ধরবে। এই রবারের আধারটি জলের স্রোতে ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় এটা ইস্পাতের ফ্রেমে আটকে রাখা হবে।

*

আজকাল "স্কুটার" নামক যানটি প্রায়

স্কুটারের ভাঁজ খুলে ফেলা হচ্ছে।

সাইকেলের মতই ব্যবহার করা হয় তবে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যেতে হলে সাইকেলের মত অত সহজে নেওয়া যায় না। অথচ মানুষের শখের অন্ত নেই, মনে হয় কোনওখানে গেলে নিজের স্কুটারটি সঙ্গে নিতে পারলে বেড়িয়ে আরাম পাওয়া যায়। নতুন ধরনের ভাঁজা স্কুটারটি মানুষের এই শখ সহজে পূরণ করতে পারবে। স্কুটারটি ভেঁজে একটি ছোট ব্যাগে ভরে অনায়াসে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে চলে যাওয়া যায়। সবশুদ্ধ এটির ওজন মাত্র ৫১ পাউন্ড। স্কুটারটি ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল গতিতে চলে আর এক গ্যালন পেট্রলে একশত মাইল যেতে পারে এবং এর যে ট্যাঙ্কটি আছে তাতে এক সঙ্গে এক গ্যালন পেট্রলই ধরে।

পুজায় উপহার দেবার
মত একখানি নতুন বই
অসীম বর্ধনের লেখা
অবাঞ্ছিত শিশু
দাম—৪৲
শিশুসমস্যা ও তার সমাধানের
অপূর্ব মনোবৈজ্ঞানিক সংব্যাখ্যান
এডুকেশানাল এণ্টারপ্রাইজার্স
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯
(সি ৭৯৬৪)

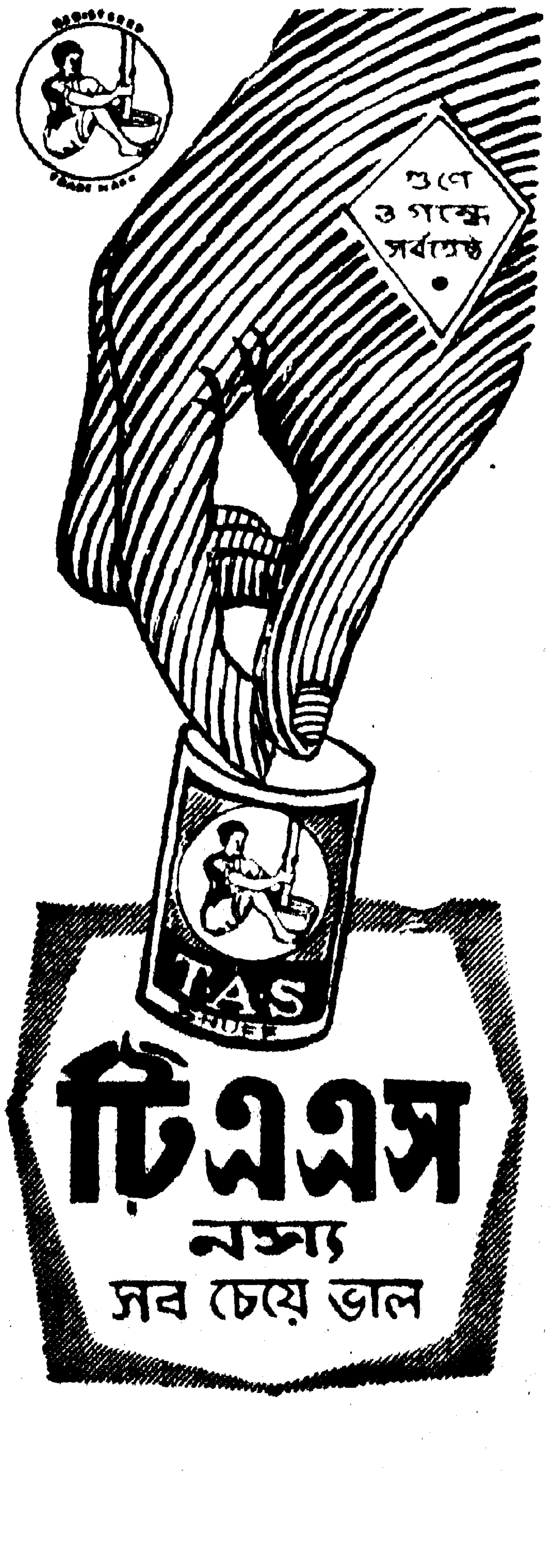

মহালয়ার পূর্বে প্রকাশিত হচ্ছে
নীহাররঞ্জন গুপ্তের
রহস্য উপন্যাস
মদনভস্ম
লেখকের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস
পোড়ামাটি ভাঙ্গাঘর
আট টাকা
আর, এন, চ্যাটার্জী এণ্ড কোং
২৩, নির্মলচন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

চিত্র প্রদর্শনী

গত সপ্তাহে কলকাতার আলিয়াঁস ফ্রাঁসেস-এর তত্ত্বাবধানে শ্রীমতী সন্তোষ-কুমারী রোহৎগীর চিত্রকলার একটি প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল ২৪ নং পার্ক ম্যানসনস—এ। আলিয়াঁস ফ্রাঁসেস-এর দপ্তরে কোনও ভারতীয় চিত্রকলার প্রদর্শনী এর আগে দেখিনি। সম্ভবত এইটিই প্রথম।

শ্রীমতী রোহৎগী কলকাতার রসিক মহলে পরিচিতা। দিলীপ দাশগুপ্ত পরিচালিত 'স্টুডিও'-র প্রায় প্রত্যেক প্রদর্শনীতে এবং গত বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের চিত্রকলা প্রদর্শনীতে এ'র রচনা আমরা দেখেছি। কয়েক বছর আগে আর্টিস্ট্রী হাউস-এ এ'র একক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়।

১৯৫৬ সালে ইনি সরকারী চারু ও কারুকলা বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিছুকাল পরে 'স্টুডিও'-র সভ্যা হন। বর্তমানে ইনি রূপভেদ এবং বর্নিকাভঙ্গ পরীক্ষণ নিরীক্ষণ করছেন।

১৯৫৮ সালে শ্রীমতী রোহৎগী দিল্লীতে একক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। সেই বছরেই অস্ট্রেলিয়ায় নিউ সাউথ ওয়েলস আর্ট গ্যালারীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় শিল্পীদের প্রতিকৃতি অঙ্কন প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করে ইনি বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন। এ ছাড়া আরও কয়েকটি প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করে স্বর্ণ পদক এবং পুরস্কার লাভ করেছেন।

আলোচ্য প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত ছবির মধ্যে কিছু আমার আগেই দেখা এবং কিছু ছবি প্রথম দেখলাম। আঁকার স্টাইলে বিশেষ পরিবর্তন না ঘটলেও ক্রাফটসম্যানশিপ-এ ইনি অনেক উন্নতি করেছেন। ঝকমকে রঙের দিকে এ'র বিশেষ ঝোঁক নেই। আলো আঁধারের বৈসাদৃশ্য প্রকাশিত হয়েছে এ'র ছবিতে অত্যন্ত মৃদু ভাবে কারণ কোথাও গাঢ় রঙের প্রয়োগ নেই। তৈল চিত্রগুলির মধ্যে নরনারীর প্রতিকৃতিই বেশী দেখা গেল। এ'র রেখা সব সময়েই কম্পমান কিংবা ভাঙ্গা। তুলির টানটোনও অমার্জিত। আকৃতি দেখলে বোঝা যায় কিন্তু অস্পষ্ট। প্রতিকৃতিও ভাসা ভাসা। আঙ্গিকে ফরাসী ইমপ্রেস-

—প্রকাশিত হয়েছে—

সৈয়দ মুজতবা আলীর
নূতন দিগ্বিজয়
মর্মে মর্মে দোল দেওয়া প্রণয়-মধুর
উপন্যাস

শবনম্

'শবনম্' মানে ভোরের শিশির। এই কাহিনীর নায়িকার নাম শবনম্। ভোরের শিশিরের মতোই স্নিগ্ধ তার রূপ, ভোরের শিশিরের মতোই সে পূতপবিত্র। এমনি এক অপরূপা নায়িকাকে নিয়ে বাংলার সর্বজনপ্রিয় কথাশিল্পী সৈয়দ মুজতবা আলী একটি অতুলনীয় প্রেম-উপন্যাস রচনা করেছেন। হাজারো বিচিত্র বিষয় নিয়ে রম্য-রচনা লিখে যিনি পাঠক-সাধারণকে হাজারো রহস্যের সন্ধান দিয়েছেন, এবারে তিনি নরনারীর হৃদয় রহস্যের সোনার কাঠির খবর শোনাবেন তাঁদের। দাম : ৫৲ টাকা

বিশ্ববিদিত
আগাথা ক্রিস্টির
অন্যতম শ্রেষ্ঠ রহস্যোপন্যাস
পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ পাঠক প্রশংসিত
বাংলায় এই প্রথম

দশ পুতুল

অনুবাদ
অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আশ্চর্য এই 'দশ পুতুল'! আশ্চর্য একাধিক অর্থে। জটিল নিবিড় রহস্যময় এর প্লটের বুনন। নিপুণ কারুশিল্পের পরিচয় এর পরিবেশ ও আবহ রচনায়। স্বচ্ছন্দ গতিশীল এর কাহিনী। রুদ্ধ-শ্বাসে এই কাহিনী পরিণাম প্রত্যাশী হয়ে থাকতে হয়। বিশ্বখ্যাত এই কাহিনীর বিস্ময়কর এই অনুবাদের দৌতো শ্রেষ্ঠতম রহস্যোপন্যাসের সঙ্গে বাঙালী পাঠক পরিচিত হবার সুযোগ পাবেন। অভিনব প্রচ্ছদ। দাম ৩·৫০ ॥

অন্যান্য বিশেষ সাম্প্রতিক প্রকাশ

যোগভ্রষ্ট	॥ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	৫·০০
বেনারসী	॥ বিমল মিত্র	৪·৫০
রমণীর মন	॥ সরোজকুমার রায়চৌধুরী	৩·৫০
প্রিয়তমেষু	॥ স্টেফান জাইগ	২·০০
হিরন্ময় পাত্র	॥ জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী	৩·৫০
জল পড়ে পাতা নড়ে	॥ গৌরকিশোর ঘোষ	৮·০০
সুচরিতাসু	॥ প্রভাত দেবসরকার	৩·০০
প্রথম প্রণয়	॥ বিক্রমাদিত্য	৩·০০
ক্রীম	॥ অবধূত	৪·৫০

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

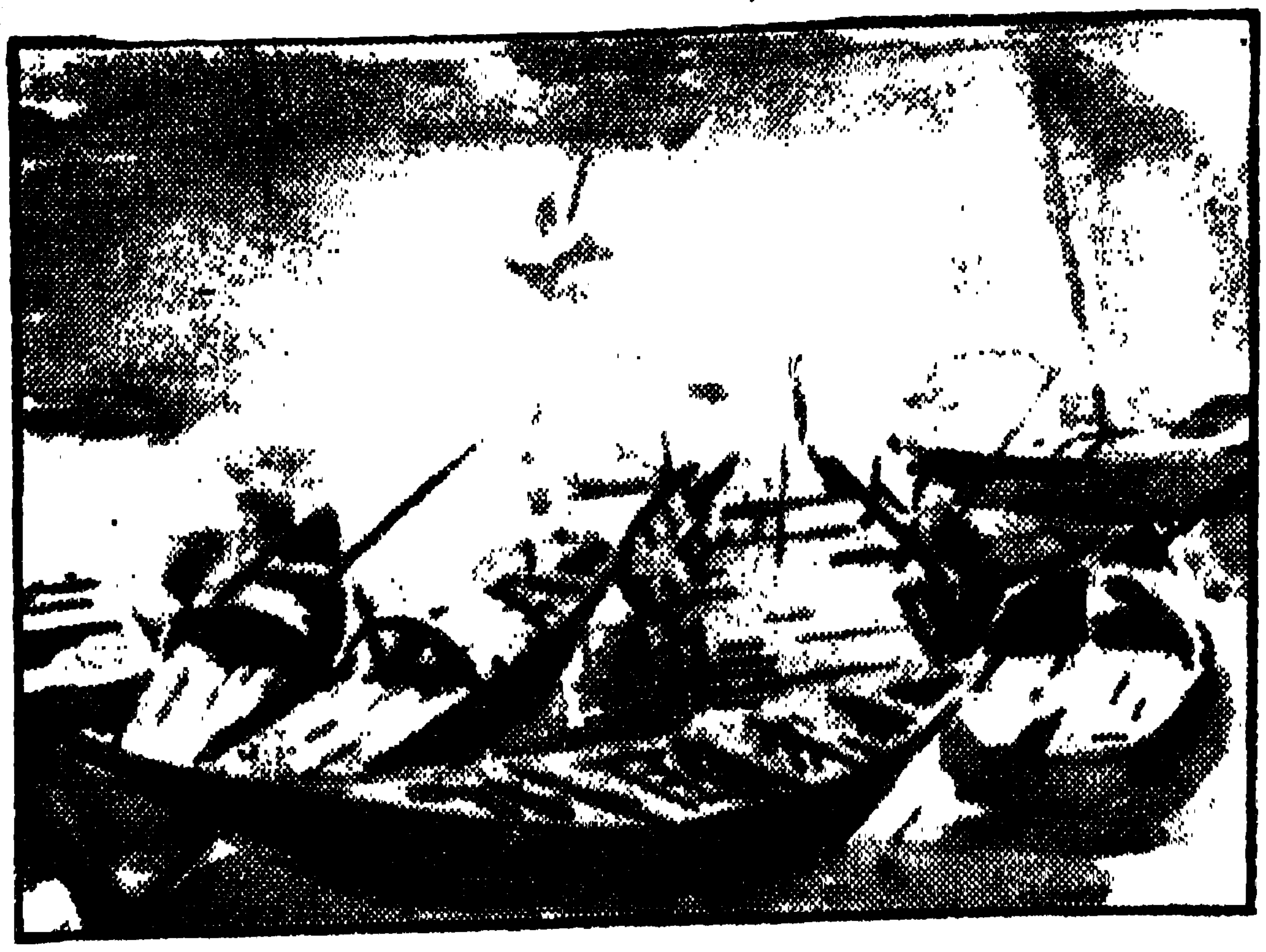

হ্গলী নদীতে নৌকা ...সন্তোষকুমারী রোহৎগী

নিজম-এর ভাগ বেশ স্পষ্ট তবে প্রত্যেক টানটোনই মিশ্রিত বর্ণের হওয়ার ফলে সে ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পায়নি। ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি শ্রীমতী রোহৎগীর প্যাস্টেলের কাজেই মুন্সিয়ানা প্রকাশ পায় সবচেয়ে বেশী। জল রঙের ক্রিয়াকৌশলেও এ'র দখল প্রশংসনীয়।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রচনা—'অ্যাট পহেলগাঁও', 'বয় ইন জনীস', রেস্তোরা, 'দি গার্ল উইথ এ হ্যাট', 'বোটস অন দি হুগলী', 'আমীরা কাদাল (শ্রীনগর)' এবং 'সানলিট কর্নার (শ্রীনগর)'

শ্রীমতী রোহৎগী অত্যন্ত অল্প বয়সেই যথেষ্ট যশের অধিকারিনী হয়েছেন। ভবিষ্যতে ইনি আরও যশের অধিকারিনী হবেন বলেই আমরা বিশ্বাস করি।

যাই হোক, আলিয়াঁস ফ্রাঁসেস-এর এই আয়োজন একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ। ভারতীয়দের সঙ্গে সৌহার্দ্য দৃঢ়তর করবার উদ্দেশ্যে পরিচালিত বিদেশী দপ্তরগুলির মধ্যে এক ইন্ডো জার্মান ফ্রেন্ডশিপ-এর দপ্তর ছাড়া এর আগে তরুণ ভারতীয় শিল্পীদের উৎসাহ দান করবার জন্য তাদের চিত্রকলার প্রদর্শনীর আয়োজন করতে আর কোনও দপ্তরকে দেখিনি। এই কারণে কলকাতার শিল্পী এবং শিল্প রসিক সমাজের কাছে এ'রা অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। তবে আলিয়াঁস ফ্রাসেসের দপ্তরটি ঠিক চিত্রকলা প্রদর্শনীর উপযুক্ত স্থান বলে মনে হল না। হলের অভ্যন্তরীন সাজসরঞ্জামে ছবির প্রাধান্য কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয় এবং আলোর ব্যবস্থাও ভাল নয়।

কানাই বসুর সুখ্যাত নাটক

গৃহ প্রবেশ ২৲

অভিনয়ে অতুলনীয়। (স্ত্রী ভূমিকা মাত্র দুটি) পাঠে অপূর্ব। সর্বত্র প্রশংসিত। সব সম্ভ্রান্ত দোকানে অথবা "বই-জয়ন্তী" ৯৩/১, সার্পেন্টাইন লেন, কলিকাতা-১৪। (সি ৭৮৮০)

তিন দিন তিন রাত্রি

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

শুধু তিনটি দিন। প্রবহমান কালস্রোতে তুচ্ছ তিনটি উপলখণ্ডের বেশী যাদের মর্যাদা নেই, কিন্তু তিনটি মাত্র দিবারাত্রির দর্পণে যদি এ-কালের এক বৃহৎ সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বেদনা-ব্যর্থতা, বিজয় আর পরাভবকে প্রত্যক্ষ করা যায় তাহলে তিন দিনের খণ্ডিত ক্ষণকালকে চিরকালের মর্যাদা না দিয়ে পারা যায়না। তিন দিন তিন রাত্রি-তে নরেন্দ্রনাথ মিত্র সেই দুঃসাধ্য সাধন করেছেন। অগ্রণী কথাশিল্পীর পরিণত মানসের আশ্চর্য ফসল তিন দিন তিন রাত্রি। বইটি সম্বন্ধে এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে "দেশ" পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশ কালেই বিদগ্ধ পাঠকের সানন্দ অভিনন্দনে ধন্য হয়েছে। দাম পাঁচ টাকা মাত্র।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা — ৯

পরিচয়

শারদীয় সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ ঃ

অবিস্মরণীয় ভ্রমণকাহিনী

ইংরেজের শোন দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে বিপজ্জনক গোপন পথে ১৯২০ সালে একদল ভারতীয় বিপ্লবী গিয়েছিলেন নবজাত সোভিয়েত ইউনিয়নে। ইতিহাসের সেই এক বিস্মৃত ও রোমাঞ্চকর অধ্যায়ের বিবরণ লিখেছেন তাঁদেরই অন্যতম সহকর্মী ঃ **মুজফ্ফর আহ্মদ**

"ভারত ও সংস্কৃত" সম্পর্কে মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন ঃ **ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়**

আরো লিখেছেন ঃ

প্রবন্ধ ॥ অন্নদাশংকর রায়, অশোক রুদ্র, চিন্মোহন সেহানবিশ, জে বি এস হলডেন, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বিমল ভৌমিক, রবীন্দ্র মজুমদার, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণকুমার সান্যাল, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হেমাংগ বিশ্বাস

গল্প ॥ অমল দাশগুপ্ত, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রদ্যোৎ গুহ, মতি নন্দী, সত্য গুপ্ত

কবিতা ॥ অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, গোলাম কুদ্দুস, চিত্ত ঘোষ, তারাপদ রায়, তরুণ সান্যাল, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, বিষ্ণু দে, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মংগলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, রাম বসু, শংখ ঘোষ, সিদ্ধেশ্বর সেন, সুনীল গংগোপাধ্যায়, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও আরও অনেকে

ছবি ॥ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ॥ খালেদ চৌধুরী, প্রকাশ কর্মকার, পৃথ্বীশ গংগোপাধ্যায়, সুধীর মৈত্র, সুবোধ দাশগুপ্ত

দাম ঃ আড়াই টাকা

প্রাপ্তিস্থান ঃ

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

GOV ENT LIBRARY

প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

৫১

'চলুন।' ঝুলন্ত আঁচলটাকে শান্ত করতে করতে এগিয়ে এল কাকলি।

দ্রুত চোখে আনুপূর্বিক দেখল একবার বরেন। অবাধ, মুক্ত, অনর্গল। একতাল নির্ভর আর দুর্বলতা। কোথাও বন্ধন নেই, গ্রন্থি নেই, কোথাও নিশ্চয়ই লুকোনো বাঘনখ।

'চলো।' এক লাফে উঠে পড়ল বরেন।

গায়ত্রী চলে গেল ভিতরে।

কাকলি আগে উঠল গাড়িতে। বরেন তার পাশে বসেই ফের নেমে পড়ল। বললে, 'মাকে একটা কথা বলে আসি।'

প্রায় ছুটে ঢুকল অন্তঃপুরে। কাকে কী বললে কে জানে, আবার অমনি চলে এল বাইরে। গাড়িতে উঠেই, প্রয়োজনের অতিরিক্ত জোরে শব্দ করে, দরজা বন্ধ করলে। আর, কোনোদিন যা করে না, তক্ষুনি—তক্ষুনি সিগারেট ধরাল।

'কী বলতে গেলেন?' চোখে নির্মল কৌতূহল, জিজ্ঞেস করল কাকলি।

'কিছু নয়।' এক মুখ ধোঁয়ার মধ্যে থেকে বললে বরেন।

ধরনটা ভালো লাগল না। মার সঙ্গে কী এমন কথা থাকতে পারে যার মধ্যে কাকলি নেই। তবু, ঘাঁটিয়ে দরকার নেই, চুপ করে রইল। বিয়েটা পিছিয়ে দিতে চাইছে, ওকথা বলাতে বরেন সাংঘাতিক বিরক্ত হয়েছে। তাকে আরো খোঁচা মারা উচিত হবে না। বরং তার বিরক্তির উপর একটি প্রশান্তির প্রলেপ দেওয়াই বোধহয় বাঞ্ছনীয়। একটু কথা, একটু ভঙ্গি, একটু বা প্রশ্রয়।

কিন্তু এমন তো কোনোদিন হয় না। এতক্ষণ এই চুপ করে থাকা। চুপ করে বসে নিজের মনে সিগারেট টানা। কতক্ষণ ধরে কাকলির এক পাশে ফেলে রাখা হাতখানি তুলে না ধরা। যেন, শুধু প্রতিবেশিতা নয়, সমস্ত অস্তিত্বকেই উড়িয়ে দেওয়া।

কী যেন ভাবছে। একটা নিরবয়ব চিন্তার পাথরে সঙ্কল্পের ক্ষুরকে শান দিচ্ছে ধীরে ধীরে।

কথা তাহলে কিছু কাকলিকেই বলতে হয়। সন্ধে হয়ে গেল, এখন কি কিছু ভালো করে দেখা যাবে—এমনি ধরনের মামুলী কিছু। কিংবা কতক্ষণের পথ? লেভেল-ক্রসিং পড়ে নাকি? জায়গাটা কি বড় রাস্তার ধারেই, না কি গাঁয়ের মধ্যে?

কতক্ষণ চলবে এমনি একটানা? এই নিঃশব্দতার জলস্রোত?

ড্রাইভারকে একটা রেস্টোরর‍্যাণ্টের নাম করল বরেন।

'ওখানে কী?' কাকলি চমকে উঠল।

'ওখানে খাওয়া। ওখানে কিছু খেয়ে নেব দুজনে।' বরেনের গলায় কেমন যেন প্রভুত্বের সুর।

কী হল বরেনের? আগে হলে একটি বা মিনতির সুর রাখত। বলত, চলো না কোথাও দুজনে খাই গে। কিংবা অনুমতি চাইত, যাবে অমুক রেস্টোর‍্যাণ্টে? খাবে কিছু? আজ যেন ওর নিজের ইচ্ছেই স্বপ্রধান। কাকলির সম্মতির কোনো প্রয়োজন ...এ যেন ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

... কাকলি প্রতিবাদ করে উঠল। 'না, ... আমি কিছু খাব না। আমার একটুও খিদে নেই।'

...অনুগ্রহের মত হাসল বরেন। 'তোমার খিদে নেই বলে জগৎসংসারে আর কারুরই

শীঘ্রই বেরুবে। সুকান্ত রায়চৌধুরীর

তপোময় তুষারতীর্থ

অভিনব আঙ্গিকে 'কেদারবদরী ভ্রমণপথের গান। ১২টি চিত্রশোভিত। ভূমিকা লিখেছেন শ্রীহেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষ। মূল্য—৪৷৷৹। দি বুক হাউস, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

(সি ৭৮২২)

বিনয় চৌধুরীর

নতুন উপন্যাস

আজব কন্যার কাহিনী

তিন টাকা

এডুকেশন্যাল বুক সোসাইটি

৬২ যদুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

(সি ৭৮৭১)

উৎসবে

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট • কলিকাতা

খিদে থাকবে না এতটা ভাবা ঠিক হবে না। তোমাদের বাড়িতে যে গিয়েছিলাম, জিজ্ঞেস করেছিলে? দিয়েছিলে খেতে?'

'ওমা, ছি ছি, সত্যি, বলেন নি কেন?' আত্মধিক্কারের সুর তুলল কাকলি। 'আপনার খিদে পেয়েছে জানলে মা ককখনো আপনাকে ছেড়ে দিতেন না।'

'মাকে টানো কেন? তুমি হলে কী করতে? কী করতে সত্যি-সত্যি?'

'আমি হলেও ছাড়তাম না। ককখনো। পেট ভরে খাইয়ে দিতাম।' সরলতার ছবি হয়ে কাকলি বললে।

'ককখনো না। তোমার যা স্বভাব, তুমি শুধু বসিয়ে রাখতে। টালমাটাল করতে।'

'আপনি তখন বাইরে বেরুবার এমন এক রব তুললেন—'

'না তুলে উপায় কী। দেখলাম, বসে থেকে চেয়ে-চিন্তে পাওয়া যাবে না। নিজের বাহুর জোরে ভাঁড়ার লুট করে ছিনিয়ে নিতে হবে। যারা লুটেরা, যারা ডাকাত, তারাই রব তোলে, জানান দেয়—'

আপনার নিরাপত্তা আপনার হাতে —এবং আমাদের

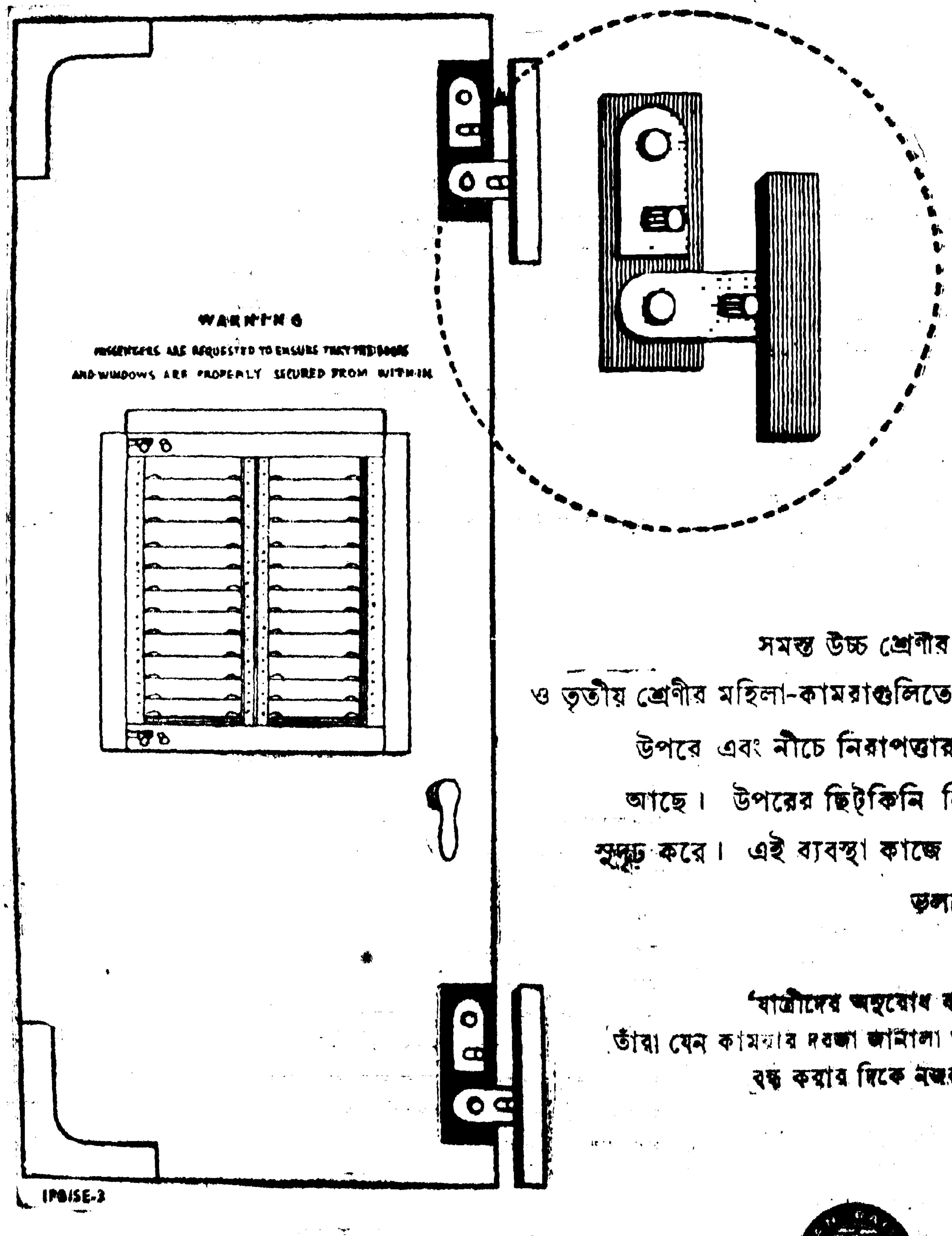

IPBISE-3

সমস্ত উচ্চ শ্রেণীর কামরা ও তৃতীয় শ্রেণীর মহিলা-কামরাগুলিতে দরজায় উপরে এবং নীচে নিরাপত্তার ব্যবস্থা আছে। উপরের ছিটকিনি নিরাপত্তা সুদৃঢ় করে। এই ব্যবস্থা কাজে লাগাতে ভুলবেন না।

"যাত্রীদের অনুরোধ করা যাচ্ছে তাঁরা যেন কামরার দরজা জানালা ভালভাবে বন্ধ করার দিকে নজর রাখেন"

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

গহনে একটা ইঙ্গিত রেখেছে এ বেশ বুঝতে পারছে কাকলি, তবু সংকীর্ণ অর্থে উদরের দিকে একেবারেই দৃষ্টি নেই এ নাও হতে পারে। কে জানে সত্যিই হয়তো খিদে পেয়েছে বরেনের। আর আত্মীয়-পরিচিতের খিদের কথা শুনলে কোন মেয়ে না কোমল হয়।

'বেশ, যেতে চান, চলুন।' কাকলি বললে। 'আপনি কিন্তু একা-একা খাবেন। আমি বসে বসে দেখব।'

'জগৎসংসারে তেমন যদি কোনো ব্যবস্থা থাকে, তবে তাই হবে।' বরেন বললে উদাসীনের মত।

রেস্টোর‍্যান্টে ঢুকে সবিস্তার অর্ডার দিল বরেন। আর, সবই দুজনের মত।

'এ কী, রাত্রের খাওয়াই সেরে নিচ্ছেন নাকি?'

'না, আরম্ভ করছি।' বরেন তাকাল কাকলির দিকে। 'আমার খিদে কি এতটুকু? আমার বাসনা কি শুধু বাসনে ধরবার?'

তবু কাকলি এগোয় না।

বরেন বললে, 'উপস্থিত খাদ্যকে অশ্রদ্ধা করতে নেই।'

'খাদ্যের মূল্য শুধু খিদের প্রেরণায়।' কাকলি বললে, 'খিদে না থাকলে সুখাদ্যও বিষ হয়ে ওঠে।'

'বলা যায় না। কখন আবার খেতে-খেতে খিদে পায়। অভ্যেস থেকে অনুরাগ আসে। তখন আগে যা মনে হয়েছিল বিষ তাই অমৃত মনে হয়।'

একটু বুঝি বা হাত লাগাতে হয় কাকলিকে। খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়। তা না হলে তাড়াতাড়ি করবে না বরেন। বসে বসে সুতোটাকে শুধু লম্বা করবে। রাত করে ফেলবে। ফিরতে দেরি করিয়ে দেবে কাকলির।

'নিন, আমিও খাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, কী যেন বলেছে—ফর টুমরো উই ডাই।'

'টুমরো? হাতে খানিকটা সময় রেখেছে বুদ্ধিমান।' হাসল কাকলি। 'মৃত্যুর কথাই যখন ভাবছে তখন আগামীকাল কেন, হোয়াই নট টু নাইট, দি নেক্সট মোমেণ্ট?'

কাকলির মুখের এতগুলো শব্দের মধ্যে থেকে 'টু-নাইট' কথাটা লুফে নিল বরেন। দীপ্ত, কণ্ঠে বলল, 'টু-নাইট? আজকের রাত কি মরণের রাত? আজকের রাত বরেনের রাত।' বলে হেসে উঠল শব্দ করে।

তবু ভড়কাল না কাকলি। বললে, "তার আগে বরণের রাত আসা উচিত।'

'ও কিছু নয়। কোনো ব্যবধান নেই দুই রাতে। ওরা একই রাত একাত্ম বরেনের মধ্যেই বরণ আছে লুকিয়ে। আর এ-কারটা একত্র হবার এ-কার।' ফেলে

ছাড়িয়ে উঠে পড়ল বরেন। উচ্ছল হাতে বিল চুকোল।

পথে নেমে কাকলি বললে, 'এখন তো দিব্যি রাত হয়ে গেছে। অন্ধকারে কী দেখব!'

'দেখা কি আর পায়ে হেঁটে ঘুরে-ঘুরে দেখা? একটা আইডিয়া নেওয়া। চলো। ওঠো।' তাড়া দিল বরেন।

'আরেক দিন গেলে হয় না?' করুণ মুখ করল কাকলি।

'আবার আরেক দিন?' প্রায় তিরস্কারের

দিশারী শরৎ-জয়ন্তী কমিটি সংকলিত

শরৎ-স্মরণী—২৲

শরৎচন্দ্রের জীবনকথা ও সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে খ্যাতনামা সাহিত্যশিল্পীদের আলোচনা

দিশারী প্রকাশনী

১১এ, এস্‌প্ল্যানেড ইস্ট; কুটীর শিল্প বিপণি, কলিকাতা—১ ও ৫২, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা—৬ (সি ৭৭৭৫)

শান্তিলতা......
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভার সর্বশেষ চূড়ান্ত স্বাক্ষর! 'শান্তিলতা' ঘরে ঘরে সংগ্রহ করুন,—পড়ে, পড়িয়ে ও উপহার দিয়ে স্বর্গত লেখকের প্রতি শ্রদ্ধা দেখান!

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শান্তিলতা ২৷৷০
সর্বশেষ উপন্যাস

'অ্যাকাডেমী-পুরস্কার' ও 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' প্রাপ্ত লেখক
প্রেমেন্দ্র মিত্রের নতুন উপন্যাস
আবার নদী বয় ৩৷০

গৈরিক রুক্ষতা আর ঘন সবুজে মেশা ভিন্ন পরিবেশ—ভিন্ন মানুষ আর তারই বলিষ্ঠ কামনার সুষ্ঠু পরিণতিময় একটি সার্থক উপন্যাস
দেবাংশী ৩৲

শক্তিপদ রাজগুরুর
অবিস্মরণীয় উপন্যাস
দেবাংশী ৩৲
মেঘে ঢাকা তারা ৪৷৷০
(চলচ্চিত্র জগতে যুগান্তকারী উপন্যাস)

সাহিত্য জগৎ—২০৩/৪, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

বাংলার ভাইবোনকে শারদীয়া পূজায় উপহার দিবার শ্রেষ্ঠ জীবনী গ্রন্থ
একখানি দেবীচরিত

—ভগিনী নিবেদিতা—

— প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা প্রণীত —

'ভারতবর্ষের সৌভাগ্য যে নিবেদিতাকে পরমাত্মীয়রূপে হৃদয়ের কাছে পাইয়াছিল, ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য যে নিবেদিতা যখন ইহজগতে ছিলেন তখন তাঁহাকে আপনার বলিয়া হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারে নাই।' তাঁহাকে চিনিবার সময় স্বাধীন ভারতে আজও কী আসে নাই? দেশকে কী তবে আমরা ভালবাসি নাই? 'জাতীয়তা', 'স্বদেশী', 'কুটীরশিল্প' প্রভৃতি শব্দের রচয়িত্রীকে কী আমরা এত শীঘ্র ভুলিব? যিনি আমাদের মাতৃভূমি ও মাতৃজাতির জন্য গুরুর আদেশে দধীচির মত তিলে তিলে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন,—যাঁহার বিদ্যুৎসারিত জ্ঞান, প্রেম ও কর্মময় মহাজীবনের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, যাহা কিছু মহত্তম তাহাই প্রতিদান আকাঙ্ক্ষাবিহীন ভালবাসায় নীরবে উৎসর্গ করিয়াছেন—তাঁহার কথা বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে জানাইবার সময় আসিয়াছে—সেই 'ভগিনী নিবেদিতার' একখানি প্রামাণিক জীবনী লিখিয়াছেন শ্রীসারদামঠের প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা। মূল্য—৭.৫০

— প্রাপ্তিস্থান —
রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বিদ্যালয়, বাগবাজার
উদ্বোধন কার্যালয় এবং অন্যান্য পুস্তকালয়

মত্ত করে বললে, বরেন। 'আজকের ডিম কালকের মুরগির চেয়ে বেশি দামী। তাছাড়া তুমি তো মাঠ-ঘাট দেখছ না দেখছ আমার চালাঘর। দেখবে চলো পছন্দ হয় কিনা।'

ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে এটা ভাবতেও ভালো লাগছে না কাকলির। আর বাড়ি যেতে হলেও তো এই বরেনের গাড়িতেই যেতে হবে। মিছিমিছি তবে এখুনি পেছুই কেন?

'চলুন।' দৃঢ় ভঙ্গি করেই কাকলি উঠল গাড়িতে।

হাতে জ্বলন্ত সিগারেট বরেন বললে, 'চেঞ্জে যেতে চাইছিলে না?'

'হ্যাঁ, একটু চেঞ্জ একরকম মন্দ হত না। বহুদিন এক জায়গায়, এক ভাবে আছি—'

'চেঞ্জে একাই যেতে?'

'কেন, আপনি যেতেন? বা, তাহলে তো ভালোই হত। আমার খরচ বেঁচে যেত।' এখন বলতে আর কী দোষ, বললে কাকলি।

'সত্যি বলছ?'

'বা, এখুনি চলুন না বাড়ি। পরামর্শ করে জায়গা, যাবার তারিখ, থাকবার হোটেল না ঘর—যা হয় সব ঠিক করে ফেলি।' চতুর চোখে হাসল কাকলি।

'তা এখন আমরা যেখানে যাচ্ছি, সেই দুজনেই যাচ্ছি। সেই চেঞ্জই হচ্ছে। জায়গাটার আর কিছু না থাক দুটো স্বাস্থ্যকর সম্পদ আছে—এক নির্জনতা আরেক অন্ধকার।'

'অন্ধকার?' গা কেমন ছমছম করে উঠল কাকলির।

'অন্ধকার মানে দোকান-বাজার লোকালয় নেই ধারে কাছে। বাস-ট্রাক-মোটর যায় অনেক দূর দিয়ে। তাই শব্দটব্দও বিশেষ শোনা যায় না। চেঞ্জের পক্ষে আইডিয়াল জায়গা। মাঝরাতের কাছাকাছি একটা ট্রেন যায় বটে পাশ দিয়ে, যদি জেগে থাকো, এঞ্জিনের সিটিটা বাঁশির মতই মিষ্টি লাগবে। তবে, মাঠের মধ্যে ঘুম এমন গভীর হবে যে সিটিটা শুনতেই পাবে না। আর শেষ রাতের দিকে হঠাৎ যদি ঘুম ভেঙে যায় তখন মনে মনোরম একটি দ্বিধা জাগবে ট্রেনটা আমাকে না জানিয়েই চলে গেল নাকি, নাকি এখনো যায়নি। আর সেই দ্বিধার মধ্যেই আবার ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু ভোরবেলা?' জরে, আনন্দে বরেন শিশুর মত হয়ে গিয়েছে। 'ভোরবেলা মানে সূর্য ওঠবার অনেক আগে থেকেই গাছ-ভর্তি শুনতে পাবে পাখিদের পাখা-ঝাপটানি, তারপরেই ডাক—মনে হবে এ যেন শব্দ নয়, এ রঙ ফুটছে, নীল, সবুজ, হলদে—'

'রাতে মাঝে মাঝে থাকেন বুঝি ওখানে?' কাকলির নিজের স্বর নিজেরই কানে মৃদু শোনাল।

'কোনোদিন থাকিনি এ পর্যন্ত। তবে থাকলে ওরকমই মনে হবে অনুমান করতে পারছি। সুতরাং বুঝতেই পারছ, চেঞ্জের পক্ষে খুব ভালো জায়গা। তোমার শরীরটা খারাপ যাচ্ছে বলছিলে না?' ঠিক নাগালেই না পেয়ে কাকলির কোলের থেকে একটা হাত কুড়িয়ে নিল বরেন। 'কেন, কী হয়েছে, কিসে খারাপ বুঝছ?'

কাকলি নিজেই টের পেল তার যে-হাতে গোড়ায় প্রবোধের ভঙ্গি ছিল এখন সে-হাতে অলক্ষ্যে একটা প্রতিরোধের ভঙ্গি ফুটেছে। বললে, 'কোথায় কোন স্নায়ুতে সূক্ষ্ম ছন্দ পতন চলেছে বোঝে কার সাধ্য? আর তারই জন্যে সমস্ত শরীর মন্থর, বিষণ্ণ।'

'ও কিছু নয়, একটা মানসিক অস্বাস্থ্য।' কাকলির কাষ্ঠ-রুষ্ট হাতটা নিজের কোলের কাছে টেনে নিল বরেন। 'দু-চার দিন অমনি

যুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্য পৃথিবীর পট-ভূমিকায় এক আশ্চর্য সাহিত্য-সৃষ্টি। দূরের মানুষকে কাছে আনার — সকল মানুষের আনন্দ বেদনার এক অনবদ্য-আলেখ্য

সৌরীন সেনের **অন্য কোনখানে** মূল্য: ৫·৫০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের **অজ্ঞাতবাস** মূল্য: ৫৲

রাইটার্স সিণ্ডিকেট

৮৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

(সি ৭৭৬৩/৪)

এবারের সর্বশ্রেষ্ঠ শারদীয় সংকলন

॥ ৮ম বর্ষ ॥

রূপাঞ্জলি

মূল্য—২.৫০

কলিকাতায় প্রকাশিত হয়েছে ॥

জগদীশবাবুর গীতা

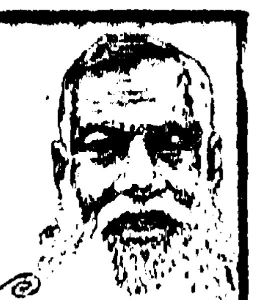

মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা অন্তঃরহস্য ভূমিকাসহ অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়মূলক যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ৬·০০

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম — শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার শাস্ত্রীয় আলোচনা ৬·০০

ভারত-আত্মার বাণী — ভারতের শাশ্বতবাণী বিশ্বমৈত্রীর কথা ৬·০০

শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১·৫০

কর্মবাণী ১·২৫

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী · ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম.এ.-প্রণীত

ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০	বাংলার ঋষি	৩·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০	বাংলার মনীষী	১·২৫
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০	বাংলার বিদুষী	২·০০
আচার্য জগদীশ	২·০০	রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০	যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
জীবন গড়া	৭৫	রবীন্দ্রনাথ	১·২৫

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী · ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

নিরিবিলিতে থাকতে পারলেই শরীর ভালো হয়ে যাবে। ঝরঝরে হয়ে যাবে।'

'চলুন দেখে আসি।' একটা কিরে আমার পথ রাখতে চাইল কাকলি।

যতটা দূরে ভেবে ঝাপসা-ঝাপসা ভয় পেয়েছিল কাকলি তেমন কিছু দুর্গম নয়। শহর পেরিয়ে খানিকটা শহরতলি, আর শহরতলিতে খানিকটা এগিয়ে গিয়েই হঠাৎ বাঁয়ে বাঁক নিয়ে ফাঁকা গলি পথে ঢুকে এক মাঠ অন্ধকারের মধ্যে ছোট একটা ঘর।

হর্ন—হেড লাইটে জানান দিতেই পাশের চালা থেকে মালী বেরিয়ে দরজার তালা খুলে দিল। ইলেকট্রিক কনেকশান আছে। আলো জ্বালাল বরেন। কাকলির উদ্দেশে বললে, এস।

মেঝে-দেয়াল পাকা, বাংলো ধাঁচের ছোট ঘর, চাল টালি না অ্যাসবেসটোস কে জানে, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই তাক লেগে গেল কাকলির। সামনে একফালি একটা বারান্দা, বেত-বাঁশের তৈরি হালকা কটা বসবার চেয়ার, তা পেরিয়ে ভিতরে ঘরে প্রকাণ্ড খাটপাতা, তাতে ঢালাও বিছানা করা। নেটের মশারির কোণটুকু থেকে শুরু করে বালিশের অড়ের কুঁচিটুকু পর্যন্ত নিখুঁত। এক স্তূপ বালিশ—মাথায়, বুকে, পায়ে, পাশে, পিঠে, যখন যেরকম দরকার, এলাহি ব্যবস্থা। দুধের ফেনার মত সাদার শতদল।

কাকলির ভারি লোভ হল বিছানা দেখে। ইচ্ছে করল হাত পা ছড়িয়ে হতাকার হয়ে শুয়ে পড়ে। হাত-পা ছুড়ে বালিশের জঞ্জাল দূর করে দিয়ে বিছানাটাকে নির্ঝঞ্ঝাট করে নিয়ে ঘুমোয়। কত দিন এমনি দিল-দরিয়া দরাজ বিছানায় শোয়নি, উত্তরমেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত ভ্রমণ করতে করতে ঘুমোয়নি নিশ্চিন্ত হয়ে। না, তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল একবার কাকলি, না, বেড-সুইচ নেই তাহলে তো আরো নির্বাধ আরো উদাত্ত। কী আশ্চর্য, কোনো একাকী মেয়েরই যেন এত বড় বিছানা হয়ে গেছে জীবনে। কৃশ শরীরটাকে কৃশ একটা শয্যার পরিমিতিতে আটকে রেখেছে চিরদিন। এত বড় এক বিছানা রাখাই একটা সম্পদকে বিস্তৃত করে রাখা। অতখানি শূন্যতা আবদ্ধ করে রাখবার মত কার অত দুঃসাহস।

নিজের মনেই হাসল কাকলি। এ বাড়ি ঘর তার নয়। বিছানাটা তার নয়। তা কিছুই হুকুম করবার নেই। তার পাত্র আছে পালন করবার। অনুগত থাকবার।

কিন্তু কী মজা হত যদি বরেন বলে যে না থাকত দাঁড়িয়ে। এই অন্ধকার জ নিঃশব্দতা আর এই অচেনা বিছানা তার এ একবার হত। তবে দেখ, থেকে আজন্মকাটের কী অঘোর ঘুমোত আজ কাকলি।

'এই দেখ এখানে খাবার ঘর।' বরেন গর্বের ভঙ্গিতে দেখাতে লাগল। 'আর এই বাথরুম।'

টবে-ড্রামে জল টলমল করছে, তোয়ালে সাবান আনকোরা, আরো অনেক সব টুকিটাকি। যদি ঘুমুতে যাবার আগে স্নান করবার রেওয়াজ থাকে, পা ডুবিয়ে স্নিগ্ধ হতে পারো।

বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়াল বরেন। হাত দিয়ে একটা ঘের দিল শূন্যে। বললে, 'এই সমস্ত জমিটাই এ বাড়ির লপ্ত। মানে আমার জমি। মানে, হাসল বরেন, 'মালতীর জমি।'

'এই চালাঘরটা?'

'এটাও আমারই মধ্যে। ওখানে মালী থাকে। বাড়ি-জমির তদারক করে। কী

যশস্বী অধ্যাপক ও কথাশিল্পী

শ্রীযুক্ত অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়ের

সম্পূর্ণ নূতন ধরণের লেখা হাসির গল্প

অধ্যাপক

'অন্ধকারাচ্ছন্ন এই রাত্রি-যুগে সূর্যের আশা যাঁরা আজও হারান নি, সেই সব আদর্শবাদী অধ্যাপক, সমাজকর্মী এবং ছাত্রবন্ধুদের করকমলে গল্পগুলি উৎসর্গীকৃত হয়েছে। 'গল্পগুলি হাসির গল্পই বটে, কিন্তু লিখতে লিখতে আমি কেঁদেছি, কাঁদতে কাঁদতে নিজেকেই উপহাস করেছি মর্মান্তে'

—লিখেছেন লেখক।

॥ মূল্যবান কাগজে ছাপা, তিমাই বই ॥

॥ অনেকগুলি কার্টুন ছবি । ৩·০০ ॥

দি স্টুডেন্টস বুক হাউস, ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিঃ-১২

শান্তি লাইব্রেরী, ১০-বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়'র

নূতনতম উপন্যাস

উত্তর সাগরের তীরে

আটলান্টিকের পটভূমিকায় রচিত এক অসাধারণ কাহিনী বিধৃত হয়েছে এ উপন্যাসে।

মূল্য—চার টাকা

আজ প্রকাশিত হল :

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

সর্বাধুনিক উপন্যাস

অন্তরাল

মূল্য—তিন টাকা

নবভারতী প্রকাশন — ১৪৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

এক্সপার্ট দেখেছ, কেমন সুন্দর ঝকঝকে তকতকে করে রেখেছে।'

'নাম কী?' কী জানি কী, মনে হল কাকলির, নামটা জেনে রাখা ভালো।

'নাম জানি না। মালী বলেই ডাকি।' বরেন তাকাল বাইরে। 'চালাটা ছোট। তাই পরিবার আনতে পারেনি। আর সবচেয়ে অসুবিধে, গারাজ করতে পারিনি এখনো যার থেকে সম্পত্তিটা কিনি তার গারাজ ছিল না। তাই এই বিপদ—'

'মালীর পরিবার থাকলে বেশ হত, গল্প করা যেত।'

কথাটা বরেন কানেও নিল না। বললে, 'তাই সর্বাগ্রে একটা গারাজ করতে হবে। ভাবছি তোমাকে এবার একটা নতুন মোটর কিনে দেব।'

'আমাকে?' হাসল কাকলি। 'আর সেই গাড়ি আমি চালাব?'

'চালালে ক্ষতি কী!'

'এক নাগাড়ে পথে চাপা দিতে দিতে এগোব, বলছেন, ক্ষতি কী!'

'কিছু লোক তো চাপা পড়ে মরবেই।'

'মরবেই?'

'হ্যাঁ, এখন তো শুধু দুই কারণে মানুষের মৃত্যু হবে। এক গাড়িচাপা পড়ে, দুই থ্রম্বসিস হয়ে। ডাক্তারদের পসার শেষ। কেউ আর তাদের ডাকবার সময়ই দেবে না। পড়বে আর মরবে।'

বেশ হাওয়া আসছে। এই হাওয়াটুকুর মতই লঘু সুরটুকু বজায় থাকে কথাবার্তায় এই সর্বক্ষণ এখন চাইছে কাকলি। কিন্তু তা বুঝি হবার নয়।

আবার ঘরের মধ্যে চলে এল বরেন।

বললে, 'দেখছ চারদিকে কেমন অন্ধকার।'

'হ্যাঁ, সাংঘাতিক। চেঁচালে কেউ শুনতে পাবে এমন মনে হয় না।'

'আর কী রকম নিঝুম। টুঁ শব্দটি কোথাও নেই।' বরেন বললে তন্ময় হয়ে, 'কলকাতার ঘড়িতে এখন আটটা, কিন্তু এখানে এখন নিশুতি রাত।'

'সত্যি মনে হচ্ছে যেন কোন সুন্দর বিদেশে এসেছি।'

ঘরে ফ্যান ঘুরছে, তবু হঠাৎ, দুই টানে টেনিস শার্টটা গা থেকে খুলে ফেলল বরেন। অবশেষ গেঞ্জিটাও খুলে ফেলা যায় কিনা ভাবতে ভাবতে বললে, 'একী, দাঁড়িয়ে আছ কেন? বোসো। না কি বারান্দায় বসবে?'

ঘরের মধ্যে বিছানারই অদূরে কতকগুলি চেয়ার পাতা আছে, তারই একটা বেছে নিয়ে বসল বরেন। হাত দিয়ে তুলে কাকলিরই কাছে দিল একটা এগিয়ে।

কাকলি বসল না। বললে, 'সবই তো সুন্দর দেখা হল। এবার চলুন ফিরে যাই।'

বরেন বললে, 'আজকে আর ফিরে যাওয়া নেই। আজকের রাতটা আমরা এখানে কাটাব।'

'আমরা?'

'হ্যাঁ, আমি আর তুমি।'

'সে কী?'

'এতে আর অবাক হবার কী আছে?'

'মা, বাড়িতে ভাববে না?'

'না। তোমার মাকে বলে এসেছি।'

'মাকে কখন বললেন?'

'ঐ যে গাড়িতে উঠতে যাবার আগে ভিতরে গেলাম—'

'মিথ্যে কথা।' কাকলি রুখে উঠল। 'কোনো মাকে বলা যায়, আপনার মেয়েকে নিয়ে বাইরে রাত কাটাতে চললুম? অসম্ভব।'

'তা হলে কী বলা যায়?' সিগারেট ধরাল বরেন।

'বড় জোর বলা যায়, আমাদের ফিরতে একটু দেরি হতে পারে, আপনারা ভাববেন না।'

'বেশ তো, তাহলে ঐটুকুই বলেছি। তা এখনো দেরি তো কিছু হয়নি।' হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল বরেন। সুতরাং অনায়াসে আরো কতক্ষণ বসে যেতে পারি। চাইকি, এক চমক ঘুমিয়েও নিতে পারি দুজনে।'

'আপনি ঘুমোন। আমি বসে আছি চেয়ারে।' কাকলি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

নিজের চেয়ারটা কাকলির মুখোমুখি ঘুরিয়ে নিল বরেন। বললে, 'খুব ইচ্ছে ছিল বিয়ের প্রথম রাতটা দুজনে এখানে কাটাব।'

'তা কাটাবেন।'

'ম্যারেজ অফিসরের সামনে পাকা দলিল সই করে দুজনে সটান চলে আসব এখানে।

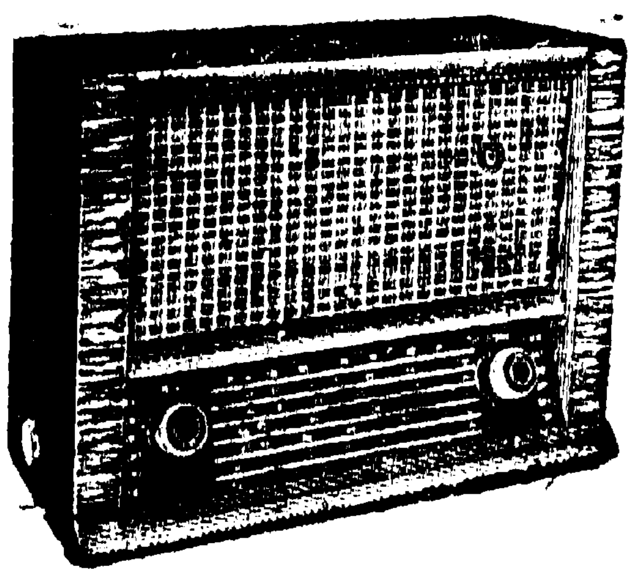

আমাদের নিকট নগদ মূল্যে অথবা সহজ কিস্তিতে অনেক রকমের রেডিও সেট্ পাওয়া যায়। এইচ, এম, ভি ও অন্যান্য রেডিওগ্রাম, লং-প্লেইং রেকর্ড, টেপ্ রেকর্ডার, "নিপ্পন্" অল-ওয়েভ্ ট্র্যান্সিস্টার রেডিও, এমপ্লিফায়ার, মাইক, ইউনিট, হর্ণ, মাইক কেবল, রেডিও ও ইলেক্ট্রিকের বিভিন্ন প্রকারের সাজ-সরঞ্জামাদি বিক্রয়ের জন্য আমরা সর্বদা প্রচুর পরিমাণে মজুত করিয়া থাকি।

রেডিও এণ্ড ফটো স্টোর্স

৬৫, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩। ফোনঃ ২৪-৪৭৯৩

যেদিন খুশি, সন্ধেসন্ধি। খাওয়া-দাওয়া আগেভাগে সেরে নেব হোটেলে। ঠিক আজকের মতো। তারপর ঘরে ঢুকে সেই যে দরজায় খিল দেব—' বরেন উঠে দরজায় খিল দিল।

ছটফট করে উঠল কাকলি। আর্তমুখে বললে, 'বা, সেই রাতটা আগে আসুক।'

বরেন ফের চেয়ারে এসে বসল। 'সেই রাতটাই তো এসেছে।'

'আজকে কি আমাদের বিয়ের রাত? আমাদের বিয়ে কি হয়েছে বলতে চান?'

'বিয়ের আর বাকি কি। নোটিস দেওয়া হয়ে গিয়েছে। কী একটা অবজেকশান পড়েছিল তাও গিয়েছে বাতিল হয়ে। এখন শুধু একদিন—তাও যত শিগগির সম্ভব—নোটিসের মান রাখতে হলে তার তিন মাসের মধ্যে—আর সে হিসেবে আজ থেকে দিন পনেরো কুড়ি মোটে আছে—ম্যারেজ অফিসারের কাছে গিয়ে সাক্ষী রেখে ডিক্লেরেশান ফর্মটা সই করে দিয়ে আসা। আর ঢং করে মন্ত্র উচ্চারণ করা—আশ্চর্য, সেখানেও মন্ত্র—আমার বলা, তোমাকে নিচ্ছি আমি আমার বৈধ স্ত্রীরূপে আর তোমার বলা তুমি নিচ্ছ আমাকে বৈধ স্বামীরূপে—ব্যস্, তাহলেই পূর্ণ স্বরাজ—'

ডুবন্ত লোকের কুটো ধরার মত বললে কাকলি, 'তাতো এখনো বাকি।'

'সে কাল পরশু তরশু—ঐ বাকি মেয়াদের মধ্যে—যে কোনোদিন হতে পারে। তারিখ পেরিয়ে যায়, ব্যাক-ডেট করে নেয়া যায় ঘুষ দিয়ে। নিতান্ত একটা কাগুজে ব্যাপার। আসল দুটো হার্ডল—নোটিস আর তার অবজেকশান—তা নির্বিঘ্নে পার হয়ে গিয়েছে—'

'যেটুকু তখনো বাকি আছে, ঐ সই আর মন্ত্র, যাকে আপনি কাগুজে ব্যাপার বলেছেন—যা না হলে বিয়েটা সম্পূর্ণ হবে না—সেটুকু আগে হয়ে যাক। কাকলিরই কানে দুর্বল ছলনার মত শোনাল বুঝি কথাটা।

'সেটুকু আর আগে হবে না। আমি জানি তুমি গড়িমসি করবে। পাশ কাটিয়ে পালিয়ে যেতে চাইবে। সে আর হতে দিতে আমি প্রস্তুত নই। বরং আমি জানি যদি এ-রাত তোমার সঙ্গে এখানে কাটিয়ে যেতে পারি তা হলেই তোমার ঐ সইয়ে আর মন্ত্রে চাড় আসবে। তখনই তুমি দলিলে ঢাকতে চাইবে নিজেকে।' বরেন উঠে দাঁড়াল, উদ্ধত ও নিষ্ঠুর। 'আর যদি অল্প রাতেই বাড়ি ফিরতে চাও তাতেও আমার আপত্তি নেই।' বলে বরেন সহসা সুইচ অফ করে অন্ধকার করে দিল।

অন্ধকারে প্রথম প্রতিক্রিয়া একটা ক্ষীণ আর্তনাদ বেরুতে চাইল কাকলির থেকে। কিন্তু কাকলি সেটাকে হাসিতে বদলিয়ে দিল। বরেনের পরবর্তী পদক্ষেপের জন্যে প্রতীক্ষা না করেই হেসে উঠল। বললে, 'ও কী, অন্ধকার করছেন কেন? যা আনন্দের তা কি চোখ দিয়ে একটুও দেখবার নয়?'

বরেনের পরবর্তী পদক্ষেপে দ্বিধা এল।

কাকলি বললে, 'আলো জ্বালান। আপনার সঙ্গে আমার আরো অনেক কথা আছে।'

বরেন সুইচটা অন করল।

(ক্রমশ)

শ্রীমতীর অভিসার

প্রিয়নাথ বসু

জীবন-সন্ধানের নতুনতর দিগন্ত উদ্ঘাটনে বিশিষ্ট। "মানবজীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা-আনন্দ বিস্ময় প্রভৃতি অবলম্বন করেই অধিকাংশ গল্পের আখ্যানভাগ গড়ে উঠেছে। লেখকের ভাষা চিত্তাকর্ষক, বর্ণনাভংগী নিপুণ ও ঋজু। গল্পগুলি তাই এককথায় সুখপাঠ্য সন্দেহ নেই।" —দেশ। দাম ২·৫০

ডি· এম· লাইব্রেরী,

৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

(সি ৭৭৪৭)

বৃহৎ আকারের

গোদরেজ নং১

প্রথম উদ্ভিজ তৈলজাত স্নানের সাবান — এবং এখনও সর্বশ্রেষ্ঠ সাবানের অন্যতম।

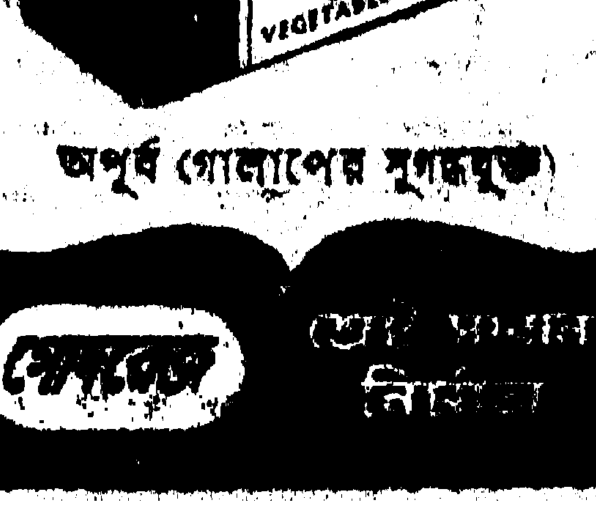

অপূর্ব গোলাপের সুগন্ধযুক্ত

গোদরেজ শ্রেষ্ঠ সাবান নির্মাতা

আবশ্যক

শালের জন্য আংশিক-সময়ের এজেন্ট। বিস্তৃত বিবরণ ও বিনা-মূল্যের নমুনার জন্য লিখুন—

GIRSON KNITTING WORKS, LUDHIANA. (207).

রবিনসন্স 'পেটেন্ট' বার্লি

খাওয়াবার এই ত সময়

রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লি গোরুর দুধের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে শিশুর পাকস্থলীতে দুধ শক্ত ডাপ বেঁধে হজমের অসুবিধা ঘটায় না বরং তা হজম করা শিশুর পক্ষে আরো সহজ হয়। তাছাড়া, রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লি শিশুর পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগায়। রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লি শিশুরা খেয়ে তৃপ্তি পায়—এতে ওদের শরীরও গড়ে ওঠে। আপনার খোকাকে খাইয়ে দেখুন সে কেমন বেড়ে ওঠে।

এই বার্লিতে অনধিক ০.০২৮% আয়রন বি-পি ও ১.৫% ক্রিটা প্রিপঃ-এর সংমিশ্রণ আছে।

ক্যালসিয়াম ও লৌহ সংযোগে সুরক্ষিত

আপনি বিচক্ষণ ব্যক্তি, কিন্তু সন্তানের পিতা হিসাবে আপনি আরও বেশী বিচক্ষণ। আপনি চাইছেন—আজকের তৈরী নতুন জামা সামনের বছরও যাতে আপনার ছেলে বয়স বাড়লেও গায়ে দিতে পারে। ওর ভবিষ্যতের দিকে আপনার সজাগ দৃষ্টি আছে।

শরীর বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার মনও পরিণত হতে থাকবে। তাই, তার বৃহত্তর ভবিষ্যতের জন্যে আগে থেকেই আপনাকে চিন্তা করতে হবে। সব চাইতে ভাল শিক্ষার বন্দোবস্তই তার জন্যে প্রয়োজন—সম্ভব হলে তাকে উচ্চতর শিক্ষার উদ্দেশ্যে কয়েক বছরের জন্যে বিদেশেও পাঠাতে হ'তে পারে। কিন্তু তাতে মোটা টাকার দরকার।

আজকের এই বিচক্ষণতা আপনার অটুট থাকুক। দরকারের সময় প্রয়োজনীয় অর্থ যাতে পান, তার জন্যে পাকা ব্যবস্থা এখনই ক'রে রাখুন। এর সব চাইতে সহজ ও নিশ্চিত উপায় হ'ল জীবন বীমা। একটি শিক্ষা-পলিসি নিয়ে সামান্য সঞ্চয় শুরু করুন, আপনার সন্তানের জন্যে সব চাইতে ভাল শিক্ষা ও তার ভবিষ্যৎ কর্মজীবন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবেন।

আরো একটু বড় করুন

জীবন বীমার কোন বিকল্প নেই

ASP/LIC-89 BEN

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

৪৪

অমৃতলাল বসুর "বিবাহ-বিভ্রাট"—লোকের ধারণা ছিল নিতান্তই একখানি প্রহসন-বিশেষ। আগেকার অভিনয় অবশ্য দেখিনি, তবে গল্প শুনেছি অনেক। তারপর থেকে যতবার অভিনয় হয়েছে, প্রহসনরূপেই হয়েছে, হালকাভাবে। আর্ট থিয়েটারে কিন্তু ঠিক তা হয়নি। এখানে ভালো-ভালো অভিনেত্রী দিয়ে ভালোভাবে অভিনয় করানোর চেষ্টা হয়। আসলে বইখানা প্রহসন হলেও এর মধ্যে একটা বিয়োগান্তের সুর আছে। 'এল-এ' পাশ (আজকের আই এ বা আই এস-সি) ছেলেকে কেন্দ্র করে ছেলের বাপের যে 'বরপণে'র অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা তারই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ওপরে গড়ে উঠেছে এই নাটক। মূল ঘটনাস্রোত চলেছে সামাজিক পরিবেশের উপর ব্যঙ্গোক্তি পরিবেশন করে, কিন্তু শেষ দৃশ্যে এসে এক করুণ পরিণতিতে পেঁছেছে এই নাটক। নাটকের এই বিয়োগান্ত সুরটিকে ধরেই নাটক প্রযোজনার নীতি নির্ধারিত হয়েছিল আর্ট থিয়েটারে। এবং এই প্রয়াসটা ছিল বলেই হরিদাসবাবু কৃষ্ণভামিনীর মতো অভিনেত্রীকে 'ঝি'-এর ভূমিকায় নামিয়েছিলেন। কৃষ্ণভামিনী তখন বড়ো-বড়ো ভূমিকায় কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করে, বিশেষ করে 'ইরাণের রাণী'তে তার খুবই নাম হয়েছে। এই অবস্থায় হরিদাসবাবু যখন তাকে ডেকে বললেন—কেষ্ট, তুমি ঝি-এর পাঠটা করো।

তখন সে রীতিমত অবাকই হয়ে গিয়েছিল। কৃষ্ণভামিনীর অভিনয়-কৃতিত্বে হরিদাসবাবু মুগ্ধ ছিলেন, খুবই স্নেহ করতেন তাকে। আমাদের রাখালদা বা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে সে 'বাবা' বলতো, সেই হিসেবে, যেহেতু রাখালদা হরিদাসবাবুকে অগ্রজের মতো শ্রদ্ধা করতেন, সেইহেতু হরিদাসবাবুকে কৃষ্ণভামিনী ডাকত 'জেঠামশাই' বলে। ভক্তিও করত খুব। গুরুর মতো মান্য করত। এবং হরিদাসবাবুর খুব প্রভাবও ছিল ওর ওপর, এটা দেখেছি। বললেন—তুমি 'ঝি' করো, ঘটকের পার্ট নরেশবাবু করছেন। ফলে, সব কটি ভূমিকা আমাদের প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা-অভিনেত্রী দিয়েই করানো হবে। যদিও উত্তরে কৃষ্ণভামিনী নীরব ছিল, তথাপি তার মনের কথা বুঝতে কষ্ট হয়নি হরিদাসবাবুর। একটু হেসে বলেছিলেন, ঝি-এর পার্টটা 'ছোটখাট' পার্ট নয়, এ পার্ট কে করেছিল জানো? ক্ষেত্রমণি। যার তুল্য চরিত্রাভিনেত্রী এযাবৎ হয়নি। কথা প্রসঙ্গে অপরেশবাবু বললেন—ক্ষেত্রমণি কতো বড়ো অভিনেত্রী জানিস? 'ঝি'-এর পার্টটা এমন চমৎকার করেছিল যে, সুখ্যাতি আর লোকের মুখে ধরে না! তবে একটা গল্প শোন্। সুপ্রসিদ্ধ জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে যখন অভিনন্দনা-লাভ করবার জন্য বড়লাট লর্ড ডাফরিন ও লেডী ডাফরিন এসেছিলেন, তখন আমোদপ্রমোদের নানাবিধ সুচীর মধ্যে 'বিবাহ-বিভ্রাট' অভিনয়ও ছিল। তদানীন্তন স্টার থিয়েটার অভিনীত 'বিবাহ-বিভ্রাট!' মিঃ সিন্‌হা সেজেছিলেন নাট্যকার স্বয়ং অর্থাৎ নাট্যাচার্য রসরাজ অমৃতলাল বসু। মিসেস কারফর্মা—বিনোদিনী। ঝি ক্ষেত্রমণি। ক্ষেত্রমণির সেই 'ঝি' দেখে তাঁরা বলেছিলেন—এমন শক্তিময়ী অভিনেত্রী আজকের দিনে বিলাতের থিয়েটারেও কম দেখা যায়।'

বস্তুত, লেডী ডাফরিন ভারতবর্ষ থেকে চলে যাবার পর তাঁর স্বদেশে বসে যে

গিরীন্দ্রশেখর বসু প্রণীত

ভগবদ্‌গীতা

মনস্বী লেখকের গবেষণা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গীতার অভিনব সংস্করণ। বিশিষ্ট প্রণালীতে রচিত সাধারণ পাঠকদের উপযুক্ত সরল ব্যাখ্যা ও আনুষঙ্গিক নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিশদ আলোচনা এই গীতায় আছে। গীতার অসংখ্য সংস্করণের মধ্যে এই গীতা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। এই বিরাট গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় লেখকের স্বতন্ত্র চিন্তাধারা প্রকাশ পাইয়াছে।

মূল্য ৯·৫০

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

॥ প্রকাশিত হইয়াছে ॥

ছোটদের হাতে চিনুকোর শারদ উপহার

শরতের আনন্দ যদি ছোটদের মুখে-চোখে প্রত্যক্ষ করতে চান তাদের হাতে তুলে দিন

মরসুমী

দাম ঃ ৩

সম্পাদনা করেছেন ঃ জ্যোতিভূষণ চাকী

এতে লিখেছেন ঃ কবিশেখর কালিদাস রায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, স্বপন বুড়ো, সুখলতা রাও, পুণ্যলতা চক্রবর্তী, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, বিমলচন্দ্র ঘোষ, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতকৃষ্ণ বসু, আশা দেবী, ধীরেন্দ্রলাল ধর, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, কুমারেশ ঘোষ, শৈল চক্রবর্তী, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, ডাঃ ননীগোপাল মজুমদার, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, রমেন দাস (সবুজসাথী), অজয়েন্দু মুখোপাধ্যায়, মুরারিমোহন সেন, সমীন ঘোড়, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, তুষার চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু চক্রবর্তী, রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, পীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায়, অমরনাথ ঘোষ, নীলরতন মুখোপাধ্যায়, অরুণ সেন, প্রীতিভূষণ চাকী।

প্রাপ্তিস্থান ঃ অশোক বুক সেণ্টার
১৬৭এন, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-১৯

LIBRARY Cooch Behar

আত্মকথা লিখেছিলেন ('আওয়ার ভাইসেরিয়্যাল লাইফ ইন্ ইণ্ডিয়া'), তাতে তিনি এই অভিনয়ের কথা লিখেছিলেন এবং ঝি-এর কথা উল্লেখ করেছিলেন। এইসব সুখ্যাতির গল্প-সল্প তখন থিয়েটার মহলে খুব প্রচলিত ছিল। সে-সব শুনেই সম্ভবত শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় উক্ত পুস্তকখানি সংগ্রহ ক'রে, তা' থেকে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জনুয়ারী-সোমবার-তারিখের যে দিনলিপি আছে, সেটি উদ্ধৃত করেছেন, তাঁর "ইণ্ডিয়ান স্টেজ"-তৃতীয় খণ্ডে। যাঁরা আগ্রহশীল, তাঁরা তা আনুপূর্বিক প'ড়ে দেখতে পারেন।

যাইহোক, এইসব কথাবার্তা শুনে কৃষ্ণভামিনী রাজী হয়েছিলেন অবশেষে উক্ত 'ঝি'-এর পার্ট করতে। অভিনয় চমৎকারই হলো তার। তবে, অমৃতলালের যুগে সেই যে অভিনয় করে গেছে, এবং তার যে বর্ণনা তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গেলে, সেই অনুপাত অনুযায়ী হলো না এ অভিনয়। অবশ্য, একা রাধিকাবাবু মিঃ সিন্‌হার ভূমিকায় একেবারে মাত করে দিলেন। তাঁর সেই পুরো ফিরিঙ্গী কায়দায় চলাফেরা করা,—তাঁর সেই ফিরিঙ্গিসুলভ চালচলন, সুন্দর হয়েছিল। দশমাস বিলেতে থেকে বাঙলা ভুলে যাওয়া,—চরিত্রটিও অদ্ভুত!

—কতদিন বিলেতে ছিলেন?

—যাওয়া-আসা নিয়ে দশমাস।

ফিরিঙ্গি কায়দায় ইংরেজী উচ্চারণের ধরনে হিন্দী বা বাংলা বলার সে কী কায়দা, তাঁর সেই বলার ঢংটি আজও মনে পড়ে, 'স'কে 'ভ'এর মতো উচ্চারণ করে বলতেন। আমাদের 'বিবাহ-বিভ্রাট'-এর সব থেকে বড়ো আকর্ষণই হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন—রাধিকাবাবু। পরে, যখন রাধিকাবাবু স্টার ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তখন নরেশবাবুও করেছিলেন এই পার্ট।

যাইহোক, 'বিবাহ-বিভ্রাট'-এর তবু একটা হিল্লে হলো, সাধারণ নাটকগুলির সঙ্গে অভিনয় হতে লাগল মাঝে মাঝে। কিন্তু 'মুক্তির ডাক?' এক অঙ্কের একটি দৃশ্যের গুরুগম্ভীর নাটিকা—লোকে তখনো দেখতে ঠিক অভ্যস্ত হয়নি। যদিও একাঙ্ক নাটিকা পাশ্চাত্ত্যের সকল দেশেই ইতিমধ্যে হয়েছে, তাঁদের বিখ্যাত লেখক যাঁরা, তাঁরা প্রায় সবাই অল্পবিস্তর একাঙ্ক নাটক লিখে গেছেন। শেখভ, অন্দ্রেয়েভ, মেতারলিংক্ থেকে শুরু করে স্ট্রীণ্ডবার্গ, অস্কার-ওয়াইল্ড, সুডারম্যান,—এ'রা সকলেই একাঙ্ক নাটক বা একাঙ্কিকা (শব্দটি মন্মথ রায় দ্বারা প্রবর্তিত) লিখে গেছেন। পেশাদারী মঞ্চে সেগুলি অভিনীত হয়নি, হয়েছে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে। ১৯১৯ সালে ইংরাজী ড্রামার ক্ষেত্রে এলো এক বিবর্তন। জিওফ্রে হুইটওয়ার্থ করলেন 'বৃটিশ ড্রামা লীগ' বা সুপরিচিত নাম—"বি-ডি-এস"-এর প্রবর্তনা, যাঁদের কাজ ছিল, দেশের সমস্ত শখের নাট্য সম্প্রদায়গুলিকে একীভূত এবং কেন্দ্রীভূত করা। এই কার্যেরই ফলশ্রুতি-স্বরূপ ১৯২০ সালে ইংল্যাণ্ডে সর্বপ্রথম আরম্ভ হলো একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা। এর দেখাদেখি স্কট্‌ল্যাণ্ডে হলো "এস্-সি-ডি-এ" বা স্কটিশ কমিউনিটি ড্রামা অ্যাসোসিয়েশন। এইসব

সর্বত্র
নির্ভরযোগ্য!
'murphy 0299'
(ড্রাই ব্যাটারী)
৪ ভাল্ব - অল-ওয়েভ - ৩ ব্যাণ্ড
১৮৫, টাকা *
murphy
গৃহের আনন্দ বর্ধন করে!
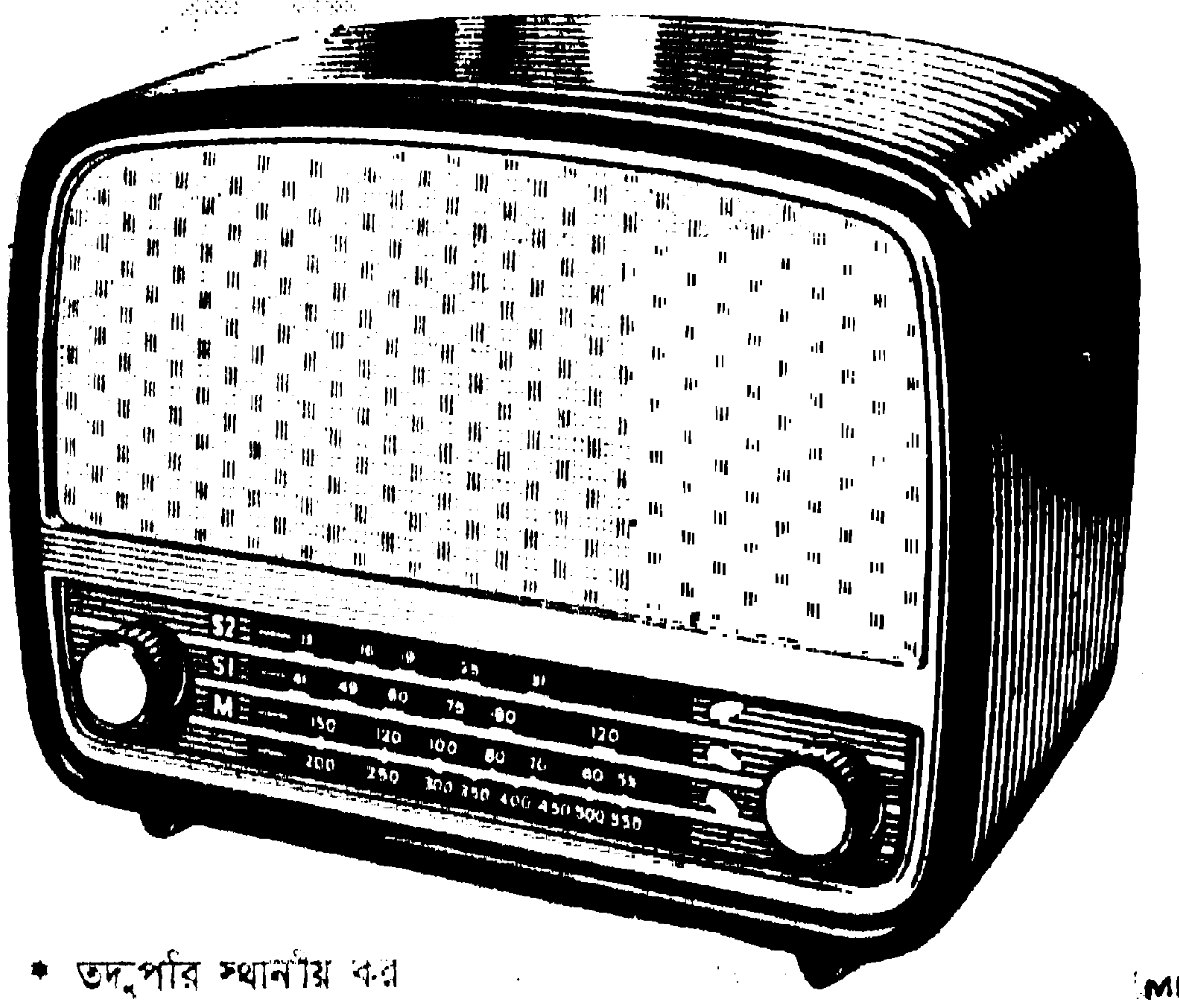
* তদুপরি স্থানীয় কর
MR.104

murphy radio
পূর্ব ভারতের একমাত্র পরিবেশক
দেবসনস্ প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা * পাটনা
অনুমোদিত ডিলার্স
ইস্টার্ণ ট্রেডিং কোং,
২, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা—১। ফোন : ২২-৩৯৩৮
রেডিও হাউস,
ভীমতলা চক, মেদিনীপুর।

শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা

॥ ১৩৬৭ ॥

খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের রচনাসমৃদ্ধ অতুলনীয় শারদ-সংকলন

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুবৃহৎ উপন্যাস

মনোজ বসুর উপন্যাস

সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও সমরেশ বসুর
তিনটি সুদীর্ঘ গল্প

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, আশাপূর্ণা দেবী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, প্রবোধকুমার সান্যাল, বনফুল, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, বিমল কর, 'শঙ্কর', শিবরাম চক্রবর্তী, সরলাবালা সরকার, সতীনাথ ভাদুড়ী, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, সন্তোষকুমার ঘোষ, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সুশীল রায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির ছোট গল্প

● রম্যরচনা ও প্রবন্ধরাজি ●

ড্রাগনের দাঁত • • • • • • • অন্নদাশঙ্কর রায়
ভারতীয় ভাস্কর্যে প্রকৃতি-পুরুষ • • অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
অসবর্ণ বিবাহ • • • • • • • • কালিদাস রায়
বাংলা ছবি • • • • • • • • • তপন সিংহ
বৈদিক যুগের বেশভূষা ও প্রসাধন-রুচি • নৃপেন্দ্র গোস্বামী
দেবী দুর্গার আবির্ভাব • • • • • বঙ্কিমচন্দ্র সেন
দ্বিতীয় হৃদয়ের জন্য • • • • শিবতোষ মুখোপাধ্যায়
বাবুদের সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ • • • • • • • শ্রীপান্থ
টলস্টয়ের অন্তিমপর্ব • • • • • • সরোজ আচার্য
জাতীয় মহোদ্যান • • • • • সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়
বিশ্বকোষের গোড়ার কথা • • • হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

আধুনিক কবিতাগুচ্ছ

আনন্দ-মেলা

● বহুবর্ণ চিত্র ● অসংখ্য রেখাচিত্র ● মনোরম ফটোগ্রাফ ●

মূল্য : সাড়ে তিন টাকা

আন্দোলনের সময় থেকেই জনসাধারণ একাঙ্ক গুরুগম্ভীর নাটিকা দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেল। যেটা ওদের হলো ১৯২০ সালে, সেটি আমাদের হলো ১৯২৩ সালের বড়দিনের সময়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মাত্র তিনটি বছরের ব্যবধান, যা বৃটিশ নাটিকা করল, তা আমরা করলাম মাত্র তিনটি বছর পরে। এ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয় কী? এর পর থেকে বিলেতে খুবই একাংক নাটক বেরুতে লাগল। আমার কাছে সে-সব কিছু আছে। বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক 'গোলাঞ্জ'-এর একটি সংকলন বেরিয়েছিল ১৯৩৪ সালে, যাতে ছিল পঞ্চাশখানি বাছাইকরা একাংক নাটক, সবই বিখ্যাত লেখকদের রচনা। তার মধ্যে একটি নাটিকা পড়ে বড়ো আগ্রহান্বিত বোধ করলাম। নাটিকাটির নাম 'দি জাজমেণ্ট্ অব ইন্দ্র' ('ইন্দ্রের ন্যায়বিচার বলতে পারি)। লিখেছেন কে? না, ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়। বিদেশী লেখকদের মধ্যে হঠাৎ এক ভারতীয়, বিশেষ করে বাঙালী লেখকের নাম পেয়ে মনটা একেবারে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল! উদগ্র কৌতূহলও হয়েছিল ধনগোপাল সম্বন্ধে! কে এই ধনগোপাল? শুনলাম কিছুদিন ইনি বসবাস করেছিলেন আমেরিকায়। সেখানে গিরীশচন্দ্রের বিল্বমঙ্গল নাটকের ইংরাজী তর্জমা করে 'চিন্তামণি' নাম দিয়ে প্রকাশও করেছিলেন। 'নিউ ইয়র্ক' পাবলিক লাইব্রেরীতে যে নাটকের তালিকা আছে, তাতে এই গ্রন্থখানিও স্থান পেয়েছে। ধনগোপাল, শুনেছিলাম, সে যুগের এক বাঙালী বিপ্লবী। সে যুগের বিপ্লবীদের যা ভাগ্য ছিল, এঁকেও তা ভোগ করতে হয়েছে। বিদেশে যেতে হয়েছে, কপর্দকহীন অবস্থায় আমেরিকায় গিয়ে এইসব বই লিখে কিছুদিন ধ'রে অর্থ উপার্জন করে দৈনন্দিন জীবন চালাতে হয়েছে ধনগোপালকে। কিন্তু, ক্রমে ক্রমে ঘটল অবস্থা বিপর্যয়। অর্থ নেই—তদুপরি অসুস্থ দেহ—উপার্জনের ক্ষমতাও ক্রমশঃ হ্রাস পেয়ে গেল। শুনতে পাই, আর কোনো দিকে কোনো আশার অরুণোদয় দেখতে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে আত্মহত্যা করতে হয়েছিল। একথা যদি সত্যি হয় ত, এই লজ্জা ও গ্লানি রাখবার স্থান আমাদের কোথায়? সেদিন দেশের মুখ বিদেশে তিনি যেভাবে রেখেছিলেন, তাতে করে এ'দেশবাসী যে-কেউ তাঁর কৃতিত্বে গর্ববোধ করবেন। ধনগোপালবাবুর মতো লোক দরকার আজকের দিনে, যিনি তাঁর মতো আমাদের যেসব নাটকের রত্নরাজি আছে, সেগুলি যথোপযুক্তভাবে তর্জমা করে বাইরে বিভিন্ন দেশে প্রচার' করবেন। এবং সংগে সংগে বিভিন্ন দেশের নাটকও করবেন আমাদের ভাষায় অনূদিত। এইভাবে ইংরেজী ত বটেই, অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষাও বটে,—চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের নাটক পর্যন্ত আমাদের ভাষায় অনূদিত হওয়া চাই। ধনগোপালবাবু যখন ইহলোক থেকে বিদায় গ্রহণ করেন, তখন আমরা পরাধীন ছিলুম। নিজের জীবন দিয়ে তিনি সম্ভবতঃ পরাধীনতারই মূল্য দিয়ে গেছেন। কিন্তু আজকের ধনগোপালদের সম্বন্ধে সে ভুল হলে চলবে না। যেভাবে শেষ পর্যন্ত না খেতে পেয়ে ধনগোপাল চলে গেছেন, সেভাবে যেন আর কাউকে না যেতে হয়।

কিন্তু, যাইহোক, পূর্বেকার সূত্রে আবার ফিরে যাই। ১৯২৩ সালে বড়দিনের সময় দুদিন আর গুড্ফ্রাইডেতে একদিন—এই যে 'মুক্তির ডাক' হয়ে গেল, সেই হলো শেষ, অর্থাৎ বন্ধ হয়ে গেল 'মুক্তির ডাক',

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অপূর্ব সৃষ্টি
ক্ষণভঙ্গুর ২৷

প্রবোধকুমার সান্যাল
নদ ও নদী ৫৲
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
মহুয়া কথা ৩৷৷৹
একাদশ সাহিত্যিকের রচনা
উন্মেষ ৩৷৷৹
আশাপূর্ণা দেবী
স্বপ্নশর্বরী ৩৲

অবধূত বিরচিত
সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস
দেবারিগণ ৪৷৷
দ্বিতীয় সংস্করণ

গুপ্ত প্রকাশিকা, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

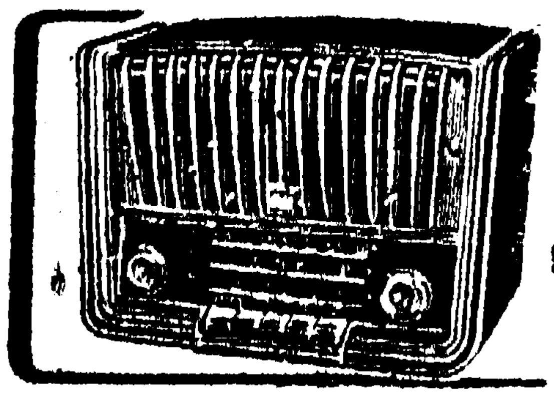

এইচ জি. ই. সি. (সাবা) পশ্চিম জার্মানী, আর,
এ রেডিও এবং সুলভ মূল্যে বিভিন্ন মডেলের
মনি রেডিও প্রোডাক্টস,
১৫৭বি, ধর্ম্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

ভারতের 'পতাকা মার্কা'
সরিষার তৈল
ব্যবহারে তফাৎটা দেখুন
ফোন ৩৫-২৭৭৪
ভারত অয়েল মিল

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন!
যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দুর করতে পারে একমাত্র
বহু প্রকৃত গাছড়া দ্বারা বিশুদ্ধ মতে প্রস্তুত
বাক্‌লা
ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন
ভারত গভঃ রেজিঃ নং ১৬৮৩৪৪
অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা,
মুখে টকভাব, ঢেকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দাগ্নি, বুকজ্বালা, আহারে অরুচি, স্বল্পনিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যাঁরা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও বাক্‌লা সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। নিষ্ফলে মূল্য ফেরৎ।
৩২ তোলার প্রতি কৌটা ৩৲ টাকা, একত্রে ৩ কৌটা—৮৷৷৹ আনা। ডাঃ, মাঃ ও পাইকারী দর পৃথক।
দি বাক্‌লা ঔষধালয়। হেড অফিস- বরিশাল (পূর্ব্ব পাকিস্তান)
ব্রাঞ্চ—১৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ -৭

যদিও প্রমথ চৌধুরী-নরেশ সেনগুপ্ত-নজরুল প্রভৃতি বহু রসিকচিত্তকে আকর্ষণ করতে পেরেছিল এই নাটক।

ওদিকে কিন্তু 'কর্ণার্জুন' স্টারের বিজয়-বৈজয়ন্তী হয়ে চলেছে। প্রতিবার পুরনো দল যে হুল ফোটাতেন মাঝে মাঝে, তা' এতদিনে একটু বুঝি কমে এসেছে! যদিও আঘাত করতে তখনো কেউ কম না! ৯১।৯২ অভিনয়ের সময় পর্যন্ত রঙ্গ-পত্রিকা 'অবতার' বক্রোক্তি এবং টিকা-টিপ্পনী কেটে বসল 'কর্ণার্জুন' সম্বন্ধে। 'আর্টের বাহার'—নামে নিবন্ধের নামকরণ করে লিখলেন—"নূতন দলে আর্টের বাহার দিন দিন খুলিতেছে। তাহাদের কর্ণকে মার্কিনের লোক এবং অর্জুনকে আর্জেনটাইনের অধিবাসী বলিয়া মনে হ'ল। ইহা কি আর্টের কম বাহাদুরী? কী বলেন? তবে অহীন্দ্র চৌধুরী বাবাজীবনকে দেখিয়া বড়ই দুঃখ হইল। তিনি আর্টের দলের মধ্যে আশাপ্রদ বটে, কিন্তু বেচারী কোণঠাসা হইয়া আছেন। তিনকড়িবাবুর অভিনয় তাঁহার কাছে কিছুই নয়। কিন্তু তিনকড়িবাবু ভূতপূর্ব যাত্রাদলের আসরের বিখ্যাত অভিনেতা, তাই তাঁহার স্থান উচ্চ আর অহীন্দ্রবাবুর নীচে। নতুবা অহীন্দ্রবাবু ও তিনকড়িবাবু দুইয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। শুনিতেছি সীতা হরণের পরই, সীতা লজ্জায় একেবারে পাতালে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি আর জনসমাজে মুখ দেখাইবেন না। (৪ঠা বৈশাখ ১৩৩১) 'সীতা'র উল্লেখ সম্ভবত এই জন্য যে, 'সীতা' আর স্টার থিয়েটারে অভিনীত হবে না, 'অবতার' এ সংবাদটি সংগ্রহ করেছেন।

যাইহোক, তারপর, ১লা মে—১৯২৪ সালে—সুবিখ্যাতা অভিনেত্রী কুসুমকুমারী এলেন স্টারে। স্থির হলো, বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' অভিনীত হবে। শনি-রবি-বুধ ও বই চলছে, বৃহস্পতিবার চলবে—মৃণালিনী। এবং যেহেতু থিয়েটারের দিন বাড়িয়ে দেওয়া হলো, সেই হেতু সিনেমা দেখানোও গেল বন্ধ হয়ে। দেখতে-দেখতে 'মৃণালিনী'র মহলার তোড়জোড় আরম্ভ হয়ে গেল। এখানকার বায়োস্কোপ বন্ধ গেলেও, আমি বায়োস্কোপ দেখতাম, সিরীয়াল ছবিই খুব দেখতাম। এই বায়োস্কোপের ব্যাপার নিয়ে অনাদিবাবু ও স্টারে অসতেন, বায়োস্কোপ বন্ধ হয়ে যাবার পরও আসতেন তাঁর ঘোড়ার গাড়িটি করে, প্রবোধবাবুর কাছে। সেই একুশ সালে প্রথম আলাপ হয়েছিল ওঁর সঙ্গে, এখন সেই আলাপ পরিণত হয়েছে রীতিমত ঘনিষ্ঠতায়। ওদিকে চন্দ্রনাথ করবার পর 'তাজমহল ফিল্মস' আর কোনো কাজ করতে পারছে না, নানান কারণে সে কোম্পানী ওঠে যাবার মতো হয়েছে,

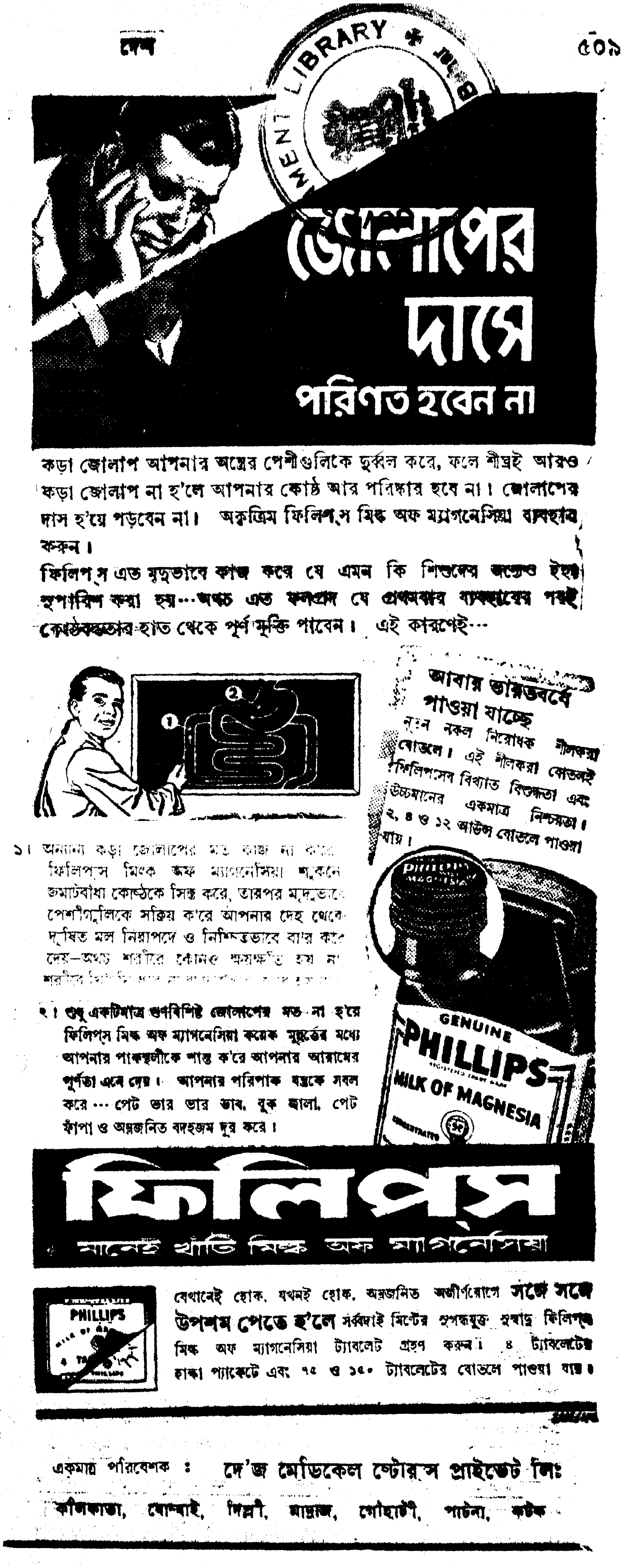

স্টার নিলেন না 'তাজমহল' এবং যা হয়, 'তাজমহল' উঠে গেল। এই তাজমহলের স্টুডিওর যন্ত্রপাতি কেনবার জন্য আগ্রহশীল ছিলেন অনাদিবাবু, সেই সূত্রে নরেশবাবুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন অনাদিবাবু। অনাদিবাবুর নিজের কারখানা ছিল বাগবাজারে—রাজবল্লভ পাড়ায়—সেখান থেকে টুরিং কোম্পানী বেরিয়ে যেতো ছবি দেখাতে দূর দূর দেশে। কারখানা ছিল বলেই অনাদিবাবু ইতিমধ্যে 'রত্নাকর' ছবি তুলেছেন, 'ডাবুর কেলেঙ্কারী' বলে একটি প্রহসন ততদিনে তুলেছেন, কি, তুলছেন। তাজমহলের ঐ সব যন্ত্রপাতি যদি উনি পান ত, ও'র কাজের আরও সুবিধা হবে। এটা তার একটা খেয়ালও ছিল বলা যায়। বায়োস্কোপ সংক্রান্ত যাবতীয় যন্ত্রপাতি, যেখানে যা পেতেন, কিনে নিতেন। এবং তার কারখানায় সেগুলিকে পুনর্যোজনা করে নতুনের মতো গড়ে অনেক কাজ চালিয়ে নিতেন। কিন্তু 'তাজমহল'-এর অন্যতম কর্ণধার আমাদের 'কাকু' অর্থাৎ বি কে ঘোষ—আবার জে-এফ-ম্যাডানের মধ্যম পুত্র ফ্রামজী ম্যাডানের সহপাঠী ছিল সেণ্ট্ জেভিয়ার্স কলেজে। সেই পরিচিতির ফলেই বোধহয় 'ম্যাডানদের সঙ্গে কথা কয়ে যন্ত্রপাতি সব ম্যাডানদের দিয়ে দিলে আমাদের 'কাকু' অর্থাৎ বি-কে-ঘোষ। ওদিকে, আমি কিন্তু ততদিনে ফিল্মের ব্যাপারে আবার একটু জড়িয়ে পড়েছি। 'ইরাণের রাণী'র সুখ্যাতি শুনে ম্যাডানরা দেখতে এসেছিলেন থিয়েটার। নিজেরা দেখে, তারপর পাঠিয়েছিলেন প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মশাইকে। তিনি বসে বসে একদিন অভিনয় দেখলেন, এবং অভিনয়-শেষে দেখা করলেন চুপিচুপি আমার সঙ্গে। জানা গেল, 'ইরাণের রাণী' ছবি হিসাবে তুলতে ও'রা আগ্রহশীল। আমার দিক থেকে আপত্তির কী থাকতে পারে? সম্পূর্ণ সম্মতিই ছিল। শুধু ছিলই নয়, ছবি তোলার প্রাথমিক কাজে আমি একটু জড়িয়েই পড়ে ছিলাম বলা যায়। এদিকে এই ব্যস্ততা, অন্যদিকে, ৮ই যে 'মৃণালিনী'র অভিনয় হলো স্টারে। দুর্গাদাস এতেও অভিনয় করেনি, শুধু সিন এ'কেছিল। তিনকড়িদা করলেন পশুপতি। নির্মলেন্দু—হেমচন্দ্র। মৃণালিনী—নীহারবালা। গিরিজায়া—সুবাসিনী। মনোরমা—কুসুমকুমারী।

অভিনয়ের প্রভূত সুখ্যাতি ও অখ্যাতি দুই-ই হলো। ফরোয়ার্ড লিখ'লেন—'A thing of beauty is joy for ever. Bankimchandra can never be old with the literate public of Bengal.'

বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পর্কে 'ফরোয়াড''-এর উক্তি অতি সত্য। শুধু রঙ্গমঞ্চের আদি যুগ থেকে নয়, আমাদের যুগেও যে বঙ্কিমের কী বিপুল প্রভাব ছিল, তা' পরবর্তী অবকাশে বলা যাবে।

এই সময়কার আরেকটি উল্লেখযোগ্য

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের
নতুন উপন্যাস
এই প্রেম
উপন্যাসটিতে কবিতার মত প্রচ্ছন্ন আছে প্রেম সম্পর্কে কিছু গভীর কথা। আছে একটি অবিবাহিতা অথচ অন্তঃসত্ত্বা মেয়ের সমস্যা-ছোঁয়া করুণ-মধুর কাহিনী। এবং সে-কাহিনী 'আনন্দবাজার'-এর মতে—'জমাট।' 'যুগান্তর' বলেন,—'ভোলানাথ-বাবুর ভাষা ঝরঝরে। বিশেষ করে তাঁর বর্ণনাভঙ্গী বলিষ্ঠ। প্রত্যেকটি চরিত্র নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।' দাম—৪্।
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬।
(সি ৭৬৮৭)

আশাপূর্ণা দেবীর
অনন্যসাধারণ উপন্যাস
নেপথ্য নায়িকা (২য় মুদ্রণ) ৫্
নবনীড় (নবতম গ্রন্থ) ৩৷৷
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
কবি ও অকবি ৩৷৷
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
রক্তকমল ৩্
প্রাপ্তিস্থান : মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

পঞ্চম মুদ্রণ প্রকাশিত হল
ধনঞ্জয় বৈরাগীর বলিষ্ঠ বাস্তবধর্মী উপন্যাস
এক মুঠো আকাশ
রূঢ় বাস্তব কিন্তু মর্বিড নয়; দুঃসাহসিক কিন্তু দুঃশীল নয়, দুরন্ত কিন্তু দুরন্বয় নয়—এই উপন্যাসের রচয়িতা বাংলা কথা-সাহিত্যে এক নতুন দিগন্ত উদ্ঘাটিত করেছেন। এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্য। ৫.০০ ৷৷
অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের একাঙ্ক সংকলন নতুন তারা ৩.২৫ ৷৷ অহীন্দ্র চৌধুরীর ভূমিকা সম্বলিত ছ'টি পুরস্কারপ্রাপ্ত একাঙ্কিকা একাঙ্ক নাটক সংকলন ৩.০০ ৷৷ ধনঞ্জয় বৈরাগীর দু'খানি নাটক এক পেয়ালা কফি ২.৫০; এক মুঠো আকাশ ২.০০; উপন্যাস মধুরাই (৩য় মুদ্রণ) ২.৫০ ৷৷
একমাত্র পরিবেশক : পত্রিকা সিণ্ডিকেট, ১২।১, লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলিঃ-১৬।

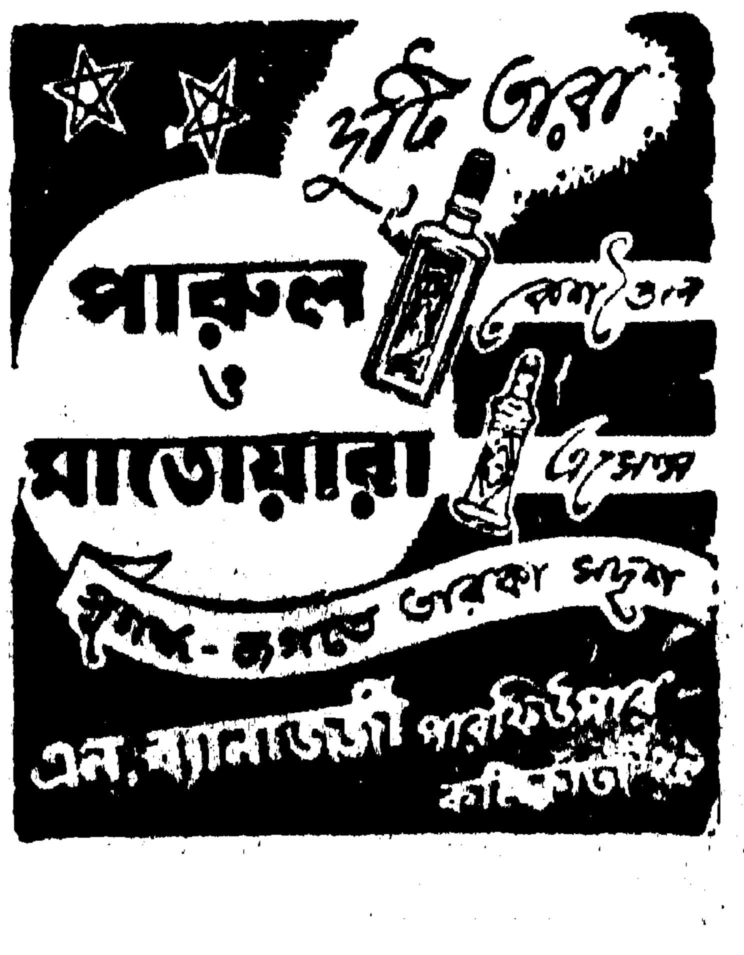

ঘটনা, মনমোহন থিয়েটার উঠে গেল। এই উঠে যাবার পিছনে নানান কারণ আছে। আর্ট থিয়েটারে প্রতিষ্ঠিত হবার আগে থাকতেই, একটা ব্যাপার দেখা গিয়েছিল, সেটা এই যে, বাঙলা দেশে যতগুলি থিয়েটারের কাগজ ছিল, সেইসব সাপ্তাহিক,—তার অধিকাংশই ছিল মনমোহনের ওপর বিরক্ত। দানীবাবু যখন নামেন, তখনই একটু সাড়া পাওয়া যায়, নইলে 'মনমোহন'-এর আসর দীপ্তিমান হয়ে ওঠে না তাছাড়া, দানীবাবুর সঙ্গে ওখানে যেসব পুরাতন শিল্পীরা ছিলেন, চুনীবাবু, ক্ষেত্রবাবু, হীরালালবাবু,—এ'দের কাছ থেকে বহু আশা ছিল দর্শকদের যে, নতুন আরও কিছু পাবো, তা' আর হলো না। তার ওপর গিয়ে গোপনে 'কর্ণার্জুন'-এর জনপ্রিয়তার ঢেউ। 'কর্ণার্জুন' খুলেছিল ৩০শে জুন ১৯২৩ সালে—ও'রা সেই দেখে, তাড়াতাড়ি করে ১৮ই আগস্ট খুললেন 'আলেকজাণ্ডার' বলে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি নাটক। কিন্তু 'আলেকজাণ্ডার'-রূপী স্থবির দানীবাবুকে দর্শক নেবে কেন? 'আলেকজাণ্ডার' হবেন প্রদীপ্ত তরুণ, সেখানে দানীবাবু, বৃদ্ধ-স্থবির, মানাবে কেন ও'কে? তারপরে নাটকখানিও তত সুবিধার ছিল না। আছে কতগুলি চমকপ্রদ 'সিচুয়েশন' মাত্র, কিন্তু তা-ও কে যে কখন কোথায় ঢুকছে, তার কোনো ধারাবাহিকতা নেই, পারম্পর্য'ও নেই। তবে একটা ভাব অবশ্য ছিল নাটকে, সেটি—স্বাদেশিকতা। সে যুগের তক্ষশীলা ও পুরু—স্বদেশিকতার আবেগ প্রকাশের সুযোগও ছিল। তাতেও মুশকিল হয়েছিল এই যে, বহু স্থানে 'সেন্সর' কেটে দিয়েছিল। যেগুলি কাটা, বইতে সে-সব স্থানে শূন্য লাইনের ওপর তারকাচিহ্নিত করা আছে। তাতে, পুরো সংলাপগুলি যে কী তা-ও সঠিক নির্ধারণ করা যায় না। বইখানিও তেমন জমে উঠল না। তখন পুরানো নাটকের পুনরাভিনয় করে চালাতে লাগলেন ও'রা। তারপর, চব্বিশ সালের দোসরা ফেব্রুয়ারী 'ললিতাদিত্য' খুললেন, তা-ও তেমন চলল না। মনমোহনবাবু ত বহু দিন থেকেই তুলে দেবো-দেবো করছিলেন তাই, মনমোহনবাবু যখন এই সময় গেলেন বেড়াতে দার্জিলিং, ভাদুড়ী মশাই একেবারে নিজেই চলে গেলেন সেখানে। তারপর যে-সব ঘটনা ঘটেছিল তা আগেই লিখেছি। শিশিরবাবু ফিরে এলেন বিজয়ী হয়ে। দানীবাবু হতবাক। তাঁকে জিজ্ঞাসা না করেই 'মনমোহন' তুলে দিলেন মনমোহনবাবু। ওদিকে শিশিরবাবুর তখনো বই তৈরী হতে দেরী। তাঁর 'সীতা' তখন লেখানো হচ্ছে যোগেশদাকে দিয়ে। সেইজন্য, শিশিরবাবু 'মনমোহন' নিয়ে, মঞ্চ কিছুদিনের জন্য ছেড়ে দিলেন 'মিনার্ভা'কে অভিনয় করবার জন্য। 'মিনার্ভা' কিছুদিন আবার এখানেই করতে লাগলেন অভিনয়।

তারপর আমাদের 'কর্ণার্জুন'-এর শততম রজনীর কথা। এ' আমার নট জীবনের এক বিরাট 'স্মারক-চিহ্ন' বলা যেতে পারে।

(ক্রমশঃ)

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী-র
চমক-লাগানো গল্পসংকলন
পতঙ্গ
দেশ বলেন : 'রাক্ষসী' গল্পের চমক, 'প্রতিনিধি'র পরিবেশ রচনা ও গল্প-ব্যঞ্জনা স্মরণযোগ্য। গ্রন্থের শেষ গল্প 'পতঙ্গ' নিঃসন্দেহে একটি বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা। আপনি কি বলেন?
দাম—২·৫০
কল্লোল প্রকাশনী : এ১৩৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২

কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রে
মহালয়া অনুষ্ঠান উপভোগ করতে
প্রতি বাঙালীর অবশ্য পাঠ্য
মহিষাসুরমর্দিনী
রচনা বাণীকুমার — সুরসংযোজনা পঙ্কজ কুমার মল্লিক
২৪খানি সংস্কৃত ও বাংলা গানের স্বরলিপিসহ
মূল্য ৪·৫০ ন.প.
প্রকাশক - ত্রিগুণা প্রকাশনী
প্রাপ্তিস্থান : দাশগুপ্ত এণ্ড কোং
৫৪/৩, কলেজ স্ট্রীট • কলি-১২
(সি ৭৭৯১)

কথাসাহিত্য-সম্রাট
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদারের
ঠাকুরদার ঝুলি ৪৲
ঠাকুমা'র ঝুলি ৪৲
দাদামশায়ের থলে ৪৲
সুখলতা রাওর
গল্প আর গল্প ৪৲
সোনার ময়ূর ২৷৷
গজেন্দ্রকুমার মিত্র সম্পাদিত
শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকগণের রচনা-সঞ্চয়ন
ঐতিহাসিক গল্প-সঞ্চয়ন ৩৲
বিমল ঘোষ (মৌমাছি)-এর
মায়ের বাঁশী ৪৷৷
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
পৃথিবীর ইতিহাস ৪৲
বিদেশী গল্প-সঞ্চয়ন ১ম ২৷৷০ ২য় ২৷৷০
দেশ বিদেশের ধর্ম ১৷০
দেশ বিদেশের লেখাপড়া ৸০
*
কৃষ্ণদয়াল বসুর ছড়ার বই
রুনু ঝুনু ১৷০
॥ নতুন বই ॥
তুলসীদাস সিংহের
সেকালের খোস গল্প অজস্র রঙীন ছবি ২৷৷
মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা—১২

প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ নাকি বলিয়াছেন যে, খালের জলের মীমাংসা হইয়া গেলেই কাশ্মীর সমস্যার সমাধানও সরল

হইবে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"কাজে কাজেই; জলের পর জলখাবার"!!

* * *

পয়লা সেপ্টেম্বর লোকসভার যে অধিবেশন হল তাহাতে নেহেরুজী সাফ জবাবে বলিয়াছেন আসামের ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় তদন্ত হইবে না; আসামীরা গোসা হইবে বলিয়া রাষ্ট্রপতির শাসনও চালু করা হইবে না।—"আমরা গোসা করিনি। নির্বিকার চিত্তেই সব মেনে নিয়েছি, যেমন মেনে নিয়েছে ঐ পয়লা সেপ্টেম্বরের প্রাইজ বন্ডের খেলাকে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

সংবাদে প্রকাশ কলিকাতা কর্পোরেশনের অফিস হইতে নাগরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র উধাও

হইয়াছে।—স্বার্থলেশশূন্য হয়ে কাজ করাইতো কাজের মতো কাজ"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

শিলচর মেডিকেল কলেজ নামে মাত্র। কলেজের ক্লাস নাকি হইতেছে গৌহাটিতে। সংবাদদাতা অবাক হইয়া বলিতেছেন—যাহা শিলচর, তাহাই

ট্রামে-বাসে

গৌহাটি। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"অবাক হবার কিছু নেই। ন্যায়শাস্ত্রে তো স্পষ্টই বলা আছে—যাহা বাহান্ন, তাহা তেষট্টি"!

* * *

রেলমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম নাকি ঘোষণা করিয়াছেন যে অদূর ভবিষ্যতে ট্রেনে যাত্রীদের ভিড় কমিবার সম্ভাবনা নাই। খুড়ো বলিলেন—"যে হারে টিকিটহীন ভ্রমণ বাড়ছে তাতে আমাদেরও তাই মনে হয়, এমন মওকা কে ছাড়ে, ভিড় হবে তো কাজে কাজেই"।

* * *

দিল্লিতে শুনিলাম সর্দার প্যাটেলের একটি মর্মর মূর্তি স্থাপিত হইবে। পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর মূর্তি সম্বন্ধেও প্রস্তাব করা হয় এবং ইহার পর প্রস্তাব করা হয় রবীন্দ্রনাথের"ও" মর্মর মূর্তি স্থাপনের। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"উত্তম প্রস্তাব। তবে রবীন্দ্রনাথের"ও" প্রস্তাব শুনে আশঙ্কিত হচ্ছি। এই "ও" অর্থাৎ রেসের ভাষায় যাকে বলে "অলসো রেন্"—তার কিন্তু কোন দাম নেই"!!

* * *

কলিকাতায় গাছপালার আয়ুষ্কাল নাকি ক্রমেই হ্রাস হইতেছে।—"কিন্তু এতে আর ভাবনার কী আছে, পথেঘাটে সঙ্গীতের জলসার ব্যবস্থা করা হোক, গাছপালা লিক্‌লিকিয়ে বাড়বে, মজবুতও হবে। উদ্ভিদের ওপর সংগীতের প্রভাবের কথা কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই পড়েছেন"—বলে শ্যামলাল।

* * *

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু নাকি বলিয়াছেন যে, বাঁধের সাহায্যে বন্যা প্রতিরোধ সম্ভব নয়। খুড়ো বলিলেন—" আর একটু দৃষ্টি খুললেই নেহরুজী দেখতে পাবেন যে জনমতের জলতরঙ্গও বাঁধ দিয়ে রোধ করা যায় না"।

* * *

রোম অলিম্পিকে আমেরিকার সাঁতারুরা জল ক্রীড়ায় সাফল্য অর্জন করিয়াছেন।—"তবু ভালো যে শূন্যে মহাকাশের খেলায় ফেল মেরে তাঁরা অন্ততঃ জলে এসে দাঁড়িয়েছেন"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

বাংলার চাকুরিক্ষেত্রে অবাঙালীর সুপরিকল্পিত অনুপ্রবেশ—একটি সংবাদের শিরোনামা। শ্যামলাল বলিল—

"পুরানো গানটি আবার হয়ত নূতন করে গাইতে হবে—নিজবাসভূমে পরবাসী হলে"।

* * *

নিখিল ভারত কংগ্রেস সম্মেলনের নারী বিভাগের ভারপ্রাপ্তা শ্রীমতী মুকুল মুখার্জি বলিয়াছেন যে জাতীয় নীতিতে নিজেদের উপযুক্ত স্থান করিয়া লইতে নারীদিগকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে।—"তা হবে বৈ কি। লেডীস সীট্ ছোড় দিজিয়ে বললেই তো আর এক্ষেত্রে কেউ স্থান করে দেবে না"—মতব্য করেন বিশুখুড়ো।

কে, হোড়ের
কণক
* পাউডার *

এইচ-এম-ভি গ্রামোফোন রেকর্ড এবং চার-গতিযুক্ত রেকর্ড প্লেয়ার। ট্রানসিস্টার লোকাল ও অলওয়েভ রেডিও এবং বিভিন্ন প্রকারের রেডিও ও গ্যারড রেকর্ডচেঞ্জার সহ রেডিও-গ্রাম। জাইস আইকন ও আগফা ক্যামেরা কোডাক ও অন্যান্য ফিলিম, কাগজ কেমিক্যাল, ফ্লাস বালব, বাইনাকুলার ও টেপ-রেকর্ডার বিক্রয়ের জন্য মজুত আছে। কিস্তিতে দেওয়া হয়।

নান্ এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড,
৯এ, ডালহৌসি স্কোয়ার ইস্ট, কলিকাতা-১

(বি-ও ৩৩১২)

দিয়ে বেরিয়ে আসবে সৃজিত দ্রব্যের আসল রূপ। এটা দাদামশায় বরাবরই আমরা দেখেছি।

একটা পাথর পকেটে নিয়ে ঘুরছেন ক'দিন। টুক্-টাক্ ঠুক্-ঠাক্ চলেছে তার উপর। পাথরটা শক্ত। ছেনির ঘায়ে সহজে ভাঙতে চায় না। তাহলেও তার মধ্যে থেকে একটা আকৃতি বেরিয়ে আসছে। পকেটে পকেটেই থাকে পাথরটা। বসেন যখন সামনে রেখে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেন। দেখা হয়ে গেলে আবার পোরেন পকেটে। গেছেন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্টস্-এর বাড়িতে। আমরা বলতুম, 'সোসাইটি'। সোসাইটিতে তখন উড়িষ্যার কারিগর গিরিধারী আর তার ছেলে শ্রীধর পাথরের কাজ করে। দুজনেই ওস্তাদ ভাস্কর। অনেক ভালো ভালো পাথরের মূর্তি গড়েছে। শ্রীধরকে ডেকে দাদামশায় বললেন—দেখ তো শ্রীধর এই

॥ ৩ ॥

আরো হীরে খোঁজার গল্প আছে। এবারে আর পাহাড়ে মাঠে নদীর কিনারায় বা ভাঙা খোয়াইএর মধ্যে নয়। একেবারে খোদ কলকাতায়—জোড়াসাঁকোতেই।

বহু বছর দাদামশায় কলকাতার বাইরে যান নি। হীরের সন্ধান করবেন কোথা থেকে? ফল-ওয়ালা লাঠির ফলায় মর্চে পড়ে গেছে। কিন্তু হীরের স্বপ্ন তখনও দেখেন। পুরোনো পাথরগুলি নাড়া চাড়া করেন, জলে ধুয়ে ধুয়ে দেখেন। পাথরে ছেনি চালান। আগে ছেনি চালাতেন পাথরটাকে ভেঙে দেখবার জন্যে, ভিতরে কি আছে। আজকাল আর ভালো পাথর-গুলিকে ভেঙে নষ্ট করতে চান না। ঠুক্ ঠুক করে ছেনি চালান আর পাথরের মধ্যে থেকে আশ্চর্য সমস্ত মূর্তি বেরিয়ে আসে। এত সহজে এত কম ঠোকাঠুকি করে মূর্তি-গুলিকে পাথরের মধ্যে থেকে বার করে নিয়ে আসেন যে অবাক লাগে।

অনেকের ধারণা দাদামশায় শেষ বয়সে টুকরো-টুকরো, নুড়ি-পাথর, কাঠি-কুটি, ডাল-পালা সাজিয়ে 'কুটুম কাটাম' বানাতে শুরু করেছিলেন। শুরু কিন্তু তিনি শেষ বয়সে করেন নি, করেছিলেন বহু আগে। এই যে পাথরগুলিকে কাটতেন সাজাতেন — সবই কুটুম কাটাম। দাদামশায় বলতেন এরা আমার সব কুটুম। সঙ্গে নিয়ে বসতেন, সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন, সাজিয়ে রাখতেন, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতেন। কুটুম-কাটামের প্রধান ধর্ম, ডালই হোক, শিকড়ই হোক, পাথরই হোক বা ঢেলাই হোক, তার থেকে কুঁদে কিছু বার করা চলবে না। শুধু যেখানে যা অবান্তর আছে, তাকে কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে। ন্যূনতম ভাঙ-চোরের মধ্যে

কুটুম কাটাম নিয়ে দক্ষিণের বারান্দায় অবনীন্দ্রনাথ

পাথরটা। শ্রীধর পাথরটা নেড়ে দেখলে একটা মূর্তি প্রায় বেরিয়ে এসেছে। চোখে তার বিস্ময়। এত শক্ত পাথর নিয়ে শ্রীধর বা গিরিধারী কাজই করে না।

দাদামশায় বললেন—এই যে দেখছ একটুখানি, এটাকে উড়িয়ে দিতে পারো শ্রীধর? বলে একটা জায়গা দেখিয়ে দিলেন।

শ্রীধর পাথরটা নিয়ে যায় দেখে দাদামশায় বললেন—শোনো, শোনো, শুধু এইটুকু। বেশী নয়। ছেনি দিয়ে টুক্ করে উড়িয়ে দাও। দেখো যেন আবার 'ফিনিশ' করতে যেও না।

পাথরটা হাতে নিয়ে নখ দিয়ে দেখিয়ে দিলেন জায়গাটা। শ্রীধর চলল পাথর নিয়ে ঘরের কোণে, যেখানে তার যন্ত্র-টন্ত্র থাকে, সেই দিকে।

কিছু দূরে গেছে, দাদামশায় আবার তাকে ডাকলেন।

—দেখো যেন ফিনিশ-টিনিশ করতে যেও না। শুধু উড়িয়ে দেবে ঐটুকু। শ্রীধর থমকে দাঁড়িয়েছিল, আবার এগুলো।

দাদামশায় এবার উঠে পড়লেন। বললেন—থাক্ শ্রীধর। তুমি আবার ফিনিশ করে বসবে। দাও বরং আমাকে। বলে পাথরখানা শ্রীধরের হাত থেকে নিয়ে আবার পকেটে পুরলেন।

অমন যে উড়িষ্যার দক্ষ ভাস্কর, তার হাতেও পাথর দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন না। কুটুম-কাটামের কাজ বড় সহজ ছিল না।

দিদিমা একবার কেমন করে হাত ফস্কে সাদা রংএর একখানা পাথরের রেকাবি ভেঙে ফেললেন। পুরনো দিনের দামী রেকাবি, আজকাল সেরকম পাওয়াই যায় না। দিদিমার মনে ভারি দুঃখ। কিন্তু দাদামশার ফুর্তি দেখে কে।

বললেন—নিয়ে আয় টুকরোগুলো। ধুয়ে ফেল্ দেখি।

পাথর পেলেই জলে ধোওয়া চাই। জলে ধুলে ভিজে অবস্থায় পাথরের রং তো খুলতোই, তাছাড়া পাথরের রেখাগুলিও স্পষ্ট হয়ে উঠত।

দাদামশায় একটা টুকরো বেছে নিয়ে বললেন—দেখছিস্ কি চমৎকার ছবি রয়েচে। ওকে আটকাবে কে? ভেঙে বেরিয়ে এল।

আমাদের চোখে ছবি-টবি কিছু পড়ল না। কিন্তু দাদামশায় তখনই কাজে লেগে গেলেন। আর, কি আশ্চর্য, দু-একটা ছেনির আঁচড় পড়তেই আমরা দেখলুম একটি সুন্দর গড়নের মেয়ের আকৃতি বেরিয়ে আসছে। একদিন কি দুদিন লেগেছিল কাজটা শেষ করতে। যখন ছেনির শেষ ঘা পড়ল, তখন আর সেটা রেকাবির ভাঙা টুকরো নেই। তখন সেটা হয়ে গেছে ছবি। পাথরে কাটা মনোহর এক মূর্তি।

দিদিমাকে দেখিয়ে বললেন—এই নাও, তোমার ভাঙা পাথর। নতুনের চেয়েও দাম বেড়ে গেল।

এই ঘটনার পর এ-কোণ ও-কোণ থেকে এ-তাক ও-কুলুঙ্গী থেকে সকলে ভাঙা পাথর-বাটি খুঁজে বার করতে থাকল আর দাদামশার কাছে এনে হাজির করতে লাগল। ভাঙা বাটি গেলাস রেকাবি থেকে দাদামশায় সে সময় অনেকগুলি ভালো ভালো চিত্র কুঁদে বার করেছিলেন।

এই রকম যখন পুরোদমে পাথর কাটা চলেছে, সেই সময় হঠাৎ আমরা খবর পেলুম, কত্তাবাবা (রবীন্দ্রনাথ) তাঁর দল নিয়ে আসছেন জোড়াসাঁকোতে। বর্ষামঙ্গল হবে-হবে শুনে আসছিলুম, সেই বর্ষাকালের আরম্ভ থেকে। এদিকে বর্ষা তো প্রায় খতম। কত্তাবাবা এসে পৌঁছতেই শুনলুম, এবার হবে 'শেষ বর্ষণ'। বর্ষার মেঘের গান-ও রইল, শরৎ-লক্ষ্মীও রইলেন, শিউলি ফুলও বাদ পড়বে না।

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ক'দিন ধরে খুব রিহার্সাল চলল। শান্তিনিকেতন থেকে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা ছাড়াও আমাদের বাড়ির অনেকে যোগ দিলেন। অভিনয়ের তোড়জোড় শুরু হলে যেমন হয়, এ-বাড়ি ও-বাড়ি সরগরম হয়ে উঠল। তিন দাদামশায় প্রায় সব সময়ই ও-বাড়িতে গিয়ে বসে থাকতে লাগলেন, রিহার্সাল দেখতে লাগলেন, পরামর্শ দিতে থাকলেন। কত লোক আসা-যাওয়া করত সে সময় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। হাট বসে যেত। বড় কম লোক হত না রিহার্সাল শোনবার। সে কি যে-সে রিহার্সাল? কত্তাবাবা নিজে চালাচ্ছেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। সত্যি কথা বলতে কি, আসল জলসার চেয়ে রিহার্সালটাই উপভোগ্য হত বেশী।

যাই হোক, শেষে 'শেষ বর্ষণ' হল—একদিন, দুদিন, তিনদিন। হল জোড়াসাঁকোর ছ-নম্বর বাড়ির উঠোনে। লোকে লোকারণ্য হল। জম্‌জমাট হয়ে উঠল জোড়াসাঁকোর গলি, জোড়াসাঁকোর বারান্দা, জোড়াসাঁকোর উঠোন আর আমাদের মন, প্রাণ, অন্তর। তারপর যেদিন শেষ জলসা দেখে আমরা ঘরে ফিরে সবে মন-খারাপ করতে শুরু করেছি, সেই সময় হঠাৎ শোনা গেল, আরো একদিন শেষ বর্ষণ হবে। বেলজিয়ামের রাজা-রানী

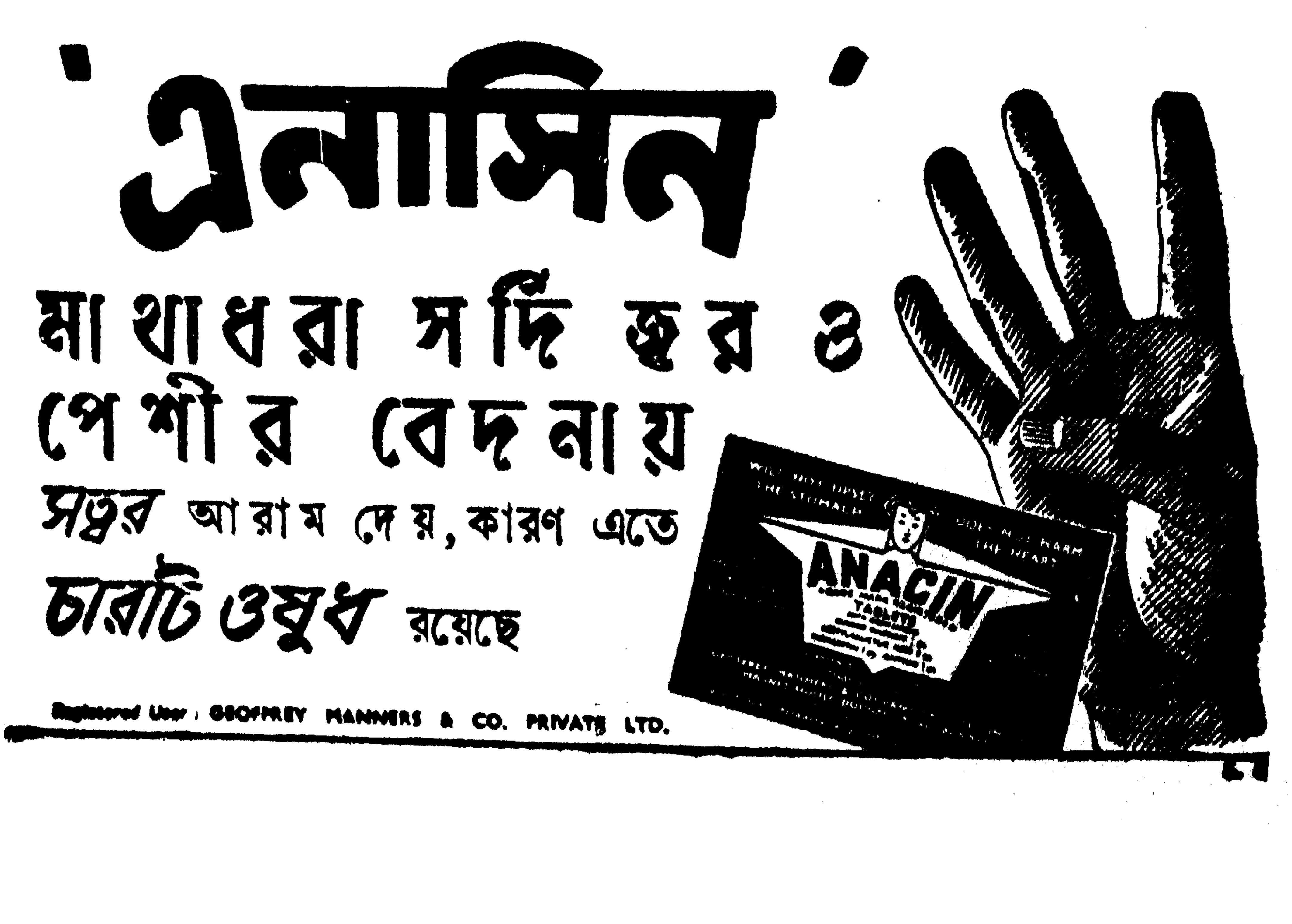

কলকাতায় এসেছেন—তাঁদের দেখানো হবে। আবার মন চাঙ্গা হয়ে উঠল আমাদের' রাজা-রানীকে শেষ বর্ষণ দেখাবার তোড়-জোড় শুরু হল নতুন করে। শোনা গেল, কিছু টাকার আশা আছে শান্তিনিকেতনের জন্যে।

রাজা-রানী বলে কথা, স্বয়ং লাট-বাহাদুরের অতিথি। তাঁদের বসবার জন্যে ভারি ভারি মখমলের গদি-দেওয়া আরাম-কেদারা এল। চওড়া চওড়া ধাপের উপর সাজানো হল। দেখতে হল যেন 'রয়েল বক্‌স'।

তারপর সন্ধের সময় রঙ্গাভিনয়ের আগে রাজা-রানী এলেন তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে। সেদিন-ও উঠোন-ভর্তি দর্শক—অভিনয় খুব জমেছে। কিন্তু দাদামশায় ভিতরে ঢোকেন নি। আগেই দেখে নিয়েছেন যা দেখার। স্কেচ করেছেন। ছবি আঁকাও হয়ে গেছে খানকতক। আর আসল কথা, রাজা-রাজড়া, নাম-জানা হোমরা-চোমরা লোকের ভিড়ে দাদামশায় ঘেঁষতেন না কখনও।

উঠোনের বাইরে গাড়ির ভিড়, লোকজনের ভিড়। উপরের বারান্দা থেকে দাদামশায় দেখেন সেই ভিড়ের মধ্য মোটর-বাইক-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক গোরা সার্জেণ্ট। বেলজিয়ামের রাজ-পরিবারকে লাট-সাহেবের বাড়ি থেকে পথ দেখিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে সে। রাজা-রানী তাঁদের পারিষদ নিয়ে ভিতরে ঢুকে সোফায় বসে বেশ তোফা গান শুনছেন, আর যে-বেচারা তাঁদের হাট-মাঠ পেরিয়ে সঙ্গে করে নিয় এল, তার দিকে কেউ ফিরেও তাকাল না, এটা দাদামশায় একেবারেই পছন্দ হল না।

তিনি বারান্দা থেকে নিচে নামলেন। নেবে সার্জেণ্টের কাছে গিয়ে বললেন—সায়েব, সবাই গেল, তুমি যাবে না?

সায়েব ভারি বিব্রত হয়ে পড়ল। গান শোনবার ইচ্ছে খুব, কিন্তু হাজার হোক চাকর তো? রাজা-রানীর সামনে দিয়ে আসরে গিয়ে বসে কি করে? রাজা যদি দেখতে পান, কি ভাববেন?

দাদামশায় বললেন—এই কথা? কোনো ভাবনা নেই। রাজা যেদিকে মুখ করে বসেছেন, তার পিছনে তোমায় বসিয়ে দেব—রাজা বা রানী কেউ টেরই পাবে না।

এই বলে তাকে নিয়ে গিয়ে উঠোনের অন্ধকার খিড়কি দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দিলেন।

সায়েবকে বসিয়ে দিয়ে এসে তবে নিশ্চিন্ত।

শেষ বর্ষণের গান সাঙ্গ হয়ে যাবার পর দাদামশায় কত্তাবাবাকে বলেছিলেন—রবি-কা, পুলিসের সার্জেণ্ট পর্যন্ত তোমায় শেষ বর্ষণের সার্টিফিকেট দিয়ে গেছে।

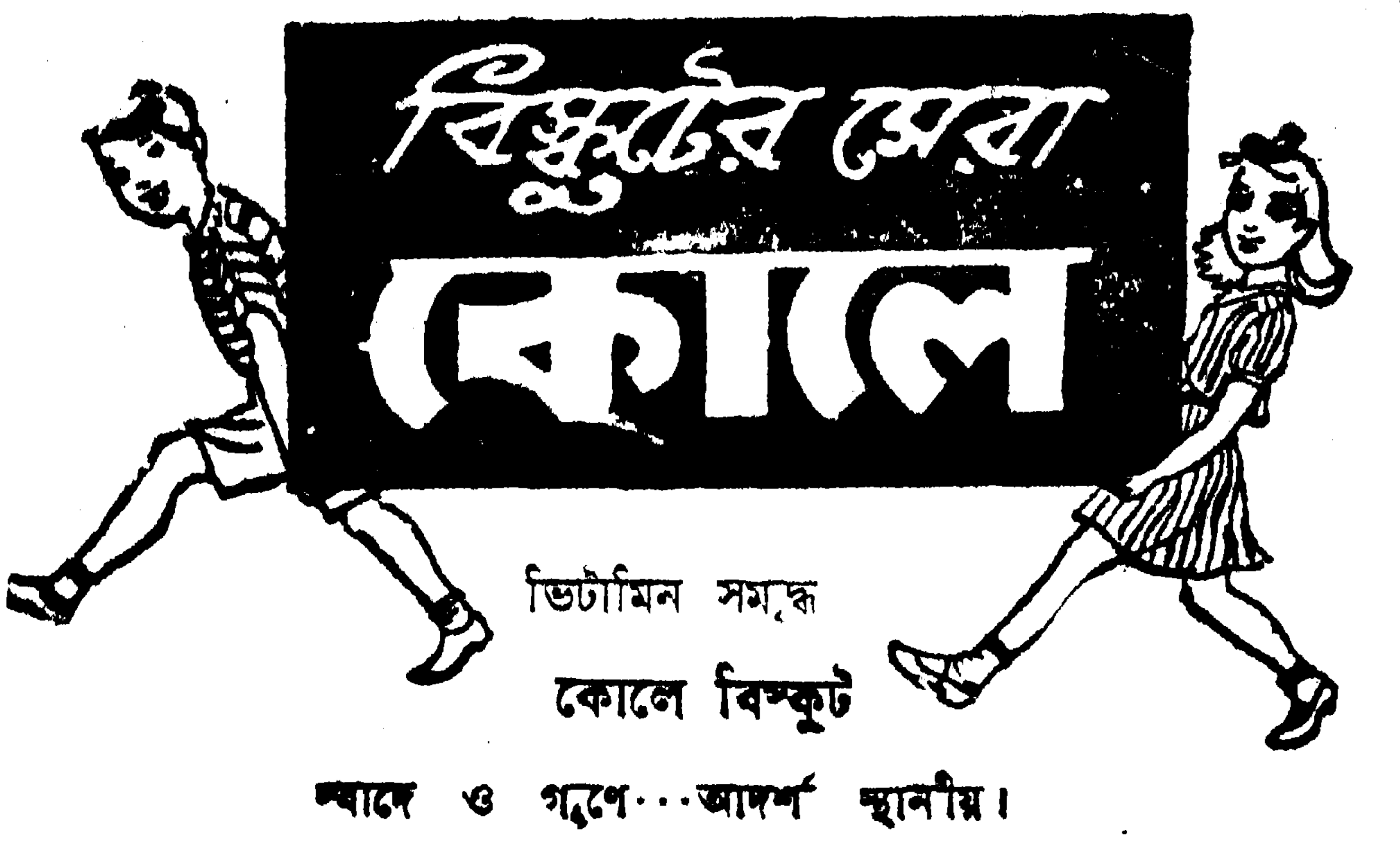

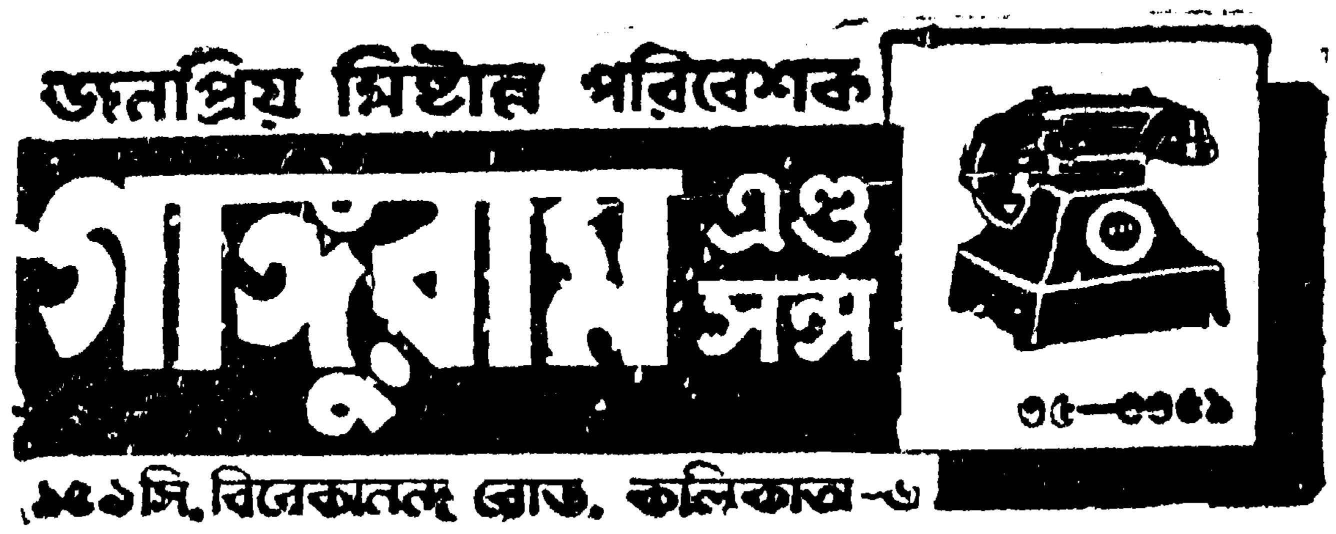

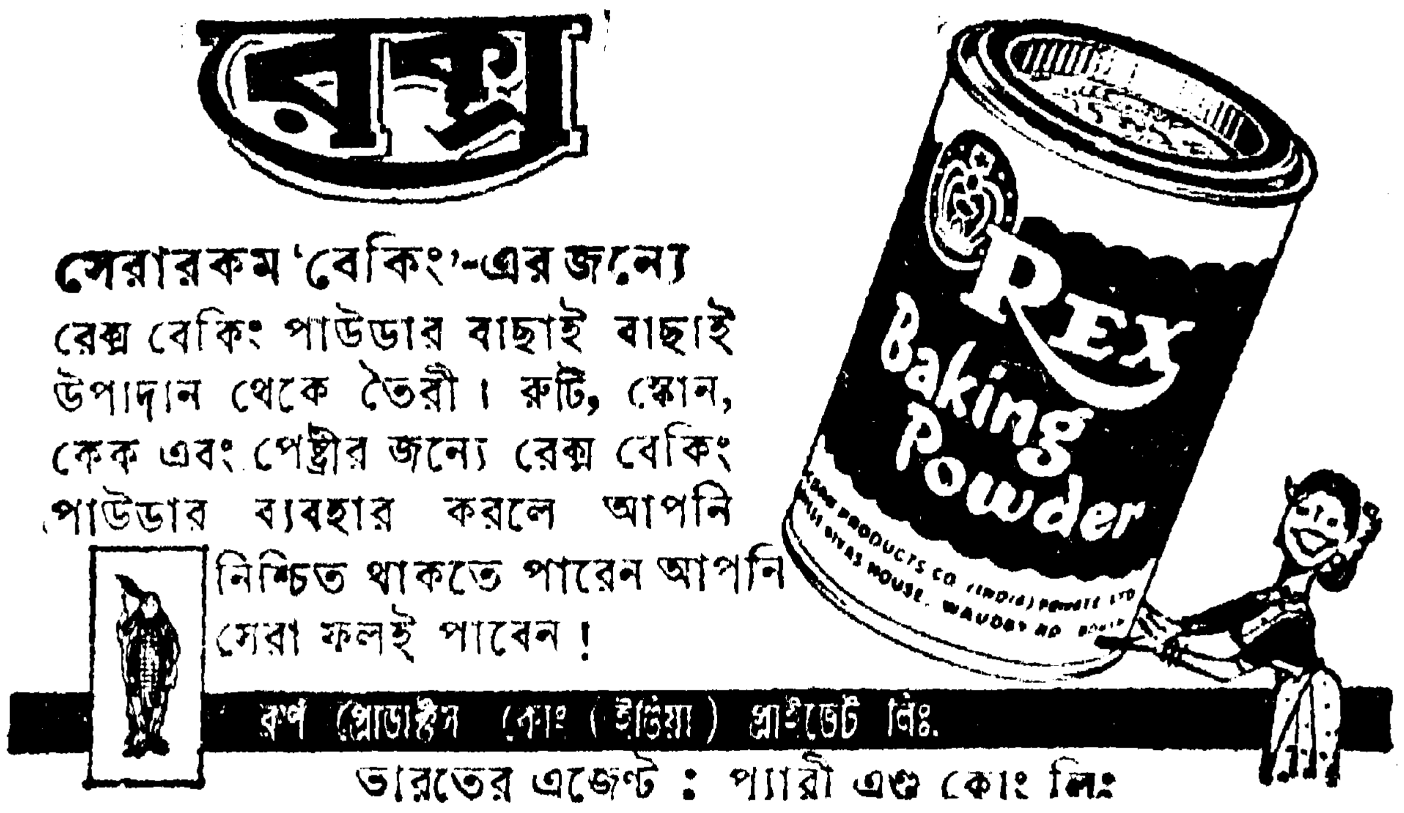

শ[illegible]নে [illegible] মুখে হাসি আর ধরেনি।

যাই হোক, [illegible] তো হয়ে চুকলো। পরদিন দাদামশায় ভোরে উঠেছেন। আমাদের ডেকে বললেন—চল্ একবার ও-বাড়ির উঠোনটা ঘুরে আসি।

দাদামশার সঙ্গে ঘুরতে যাবার ডাক পেলেই আমরা আনন্দে ছুটে যেতুম। চললুম সকলে। কেন যাচ্ছি জানি না—ও-বাড়ির খালি উঠোনে সারি-সারি চেয়ার কোচ বেঞ্চ পড়েছে, এক-দিকটা ঘিরে স্টেজ বাঁধা হয়েছে—তার মধ্যে ঘুরে বেড়াতেই তো কত মজা—হয়তো সেইজন্যেই যাচ্ছি—কে জানে? অভিনয়-পর্বের সময় ও-বাড়ির উঠোনে একবার স্টেজ বাঁধা হয়ে গেলে ঐ জায়গাটা আমাদের পক্ষে বিষম আকর্ষণীয় হয়ে দাঁড়াত। চিরদিনের নেহাত অকেজো সাধারণ উঠোনটা হঠাৎ কিসের ছোঁয়ায় এক রহস্যময় লোভনীয় জগত হয়ে পড়ত। দাদামশায় উঠোনে ঢুকেই সোজা চললেন মখমলের কোচ-গুলোর দিকে, যেখানে কাল রাতে রাজা-রানী আর তাঁদের সাঙ্গপাঙ্গরা জাঁকিয়ে বসেছিলেন।

বললেন—খোঁজ ভাল করে। হীরে-টীরে পাওয়া যায় কি না দেখ্।

রাজা-রাজড়ার ব্যাপার। অপেরা থিয়েটার দেখতে এসেছে—নিশ্চয় গায়ে-গলায় হীরে-জহরত দুলিয়ে এসেছে। এর থেকে কি দু-একখানা ছিটকে পড়বে না?

—খোঁজ ভাল করে। উল্টে-পাল্টে দেখ্। হীরে কি সহজে চোখে পড়ে রে—

হীরক-সন্ধানী সারা জীবন জহরতের সেরা জহরত কোহিনুর হীরে খুঁজে বেরিয়েছেন। হীরের কথা তিনি কি ভুলতে পারেন?

আমরা ভারি উত্তেজিত হয়ে উঠলুম। সত্যিই তো। রাজা-রানীর পক্ষে মুঠো মুঠো হীরে ছড়িয়ে চলে যাওয়াও কিছুই নয়। খুঁজতে লেগে গেলুম আমরা আঁতি পাঁতি করে।

নিজেই খুঁজতে লেগে গেলেন দাদামশায় আমাদের সঙ্গে। বললেন—আরে কোচ-এর নিচে অত খুঁজচিস্ কি? গদিগুলোর ফাঁকে হাত ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে দেখ্। হীরে পড়লে ঐখানেই পড়বে।

বললেন—তোদের হাতগুলো সরু আছে—দে চালিয়ে গদির ভিতর।

আমরা মহা উৎসাহে সেদিন হীরে খুঁজেছিলুম। মনে মনে প্রাণপণে এক-খানি ছোট্ট হীরে চেয়েছিলুম—সাম্রাজ্ঞীর রত্নচূড় থেকে খসে-পড়া এতটুকু একটি হীরে! হায়, কেন যে পেলুম না!

যদি সত্যি পেয়ে যেতুম সেদিন—আঃ, কি ভালই না লাগত।

(ক্রমশ)

বিশ্ব-বিচিত্রা

ব্যাভেরিয়ার রাজধানী মিউনিক বিবিধ কারণে বহু লোকের অত্যন্ত প্রিয়। অতীত ও বর্তমানের স্থাপত্য শিল্পের চমৎকার সব নিদর্শন ভর্তি সারা শহরটি। এর বিবিধ সংগ্রহশালাগুলি অসাধারণ বৃহৎ। এখানকার অধিবাসীদের জীবনধারা অদ্ভুত মনোরম। স্থানটির ভৌগোলিক অবস্থান এমনি যে, ব্যাভেরিয়ার নয়নবিমোহন হ্রদ এবং পর্বতগুলিতে সহজেই যাওয়া যায়।

মিউনিকের একটি বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে "স্থানীয়" হাস্যরসিকদের প্রভূতভাবে সম্মানিত করার ওদের রীতি। এদের মধ্যে একজন, যার খ্যাতি, বরো বছর আগে তার মৃত্যু পর্যন্ত সারা ব্যাভেরিয়ায়, এমন কি শিশুদের কাছে পর্যন্ত পেঁাছেছিল তার নাম হচ্ছে কার্ল ভ্যালেন্টিন। আজও জনপ্রিয় তার গান ও নক্শাগুলির রস এত গভীর যা দার্শনিকতা ঘেঁষে যায় অথচ হাস্যোচ্ছলতায় পরিপূর্ণ।

মাস কতক আগে আইসার গেট দুর্গের (১৩৩৭ সালে শহর রক্ষার জন্য নির্মিত) দক্ষিণ দিকের অট্টালিকায় ভ্যালেন্টিনের নামে একটি মিউজিয়াম জনসাধারণের জন্য উদ্বোধিত হয়েছে। এই মিউজিয়ামের সংগঠনকারীরা এই সাব্যস্ত করেন যে, এতে কার্ল ভ্যালেন্টিনের ব্যবহৃত ও তার ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সামগ্রীই শুধু নয়, সেই সঙ্গে এমন বস্তু রাখতে হবে যা তার রসিকতার নমুনাও ব্যক্ত করতে পারবে। এই অনবদ্য এবং বিস্ময়ে স্তম্ভিত হবার মতো সংগ্রহগুলির তালিকা প্রণীত হয়েছে তিনটি ভাষায়—ব্যাভেরীয় ভাষায় যা জার্মানদের বোধগম্য নয়, জার্মান ও ইংরাজীতে।

মিউজিয়ামটির ভিতরে প্রবেশ করার পূর্বেই দর্শক ভ্যালেন্টিনের বিবিধ মহিমান্বিত রসিকতার মুখে পড়ে যায়: প্রবেশমূল্য ধার্য হয়েছে ৫১ ফেনিগ, এবং দর্শককে, মোটামুটি ৫০ ফেনিগ না রেখে এক ফেনিগ কেন বেশী করে ধরা হয়েছে তার একটা যুক্তি ঢুঁড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়। প্রবেশদ্বারে লাগানো ব্রোঞ্জের হাতলটা বেশ বড় আকারের একটা সিংহের মুখ এবং তার নীচেই ঝোলানো রূঢ় ভাষায় এক বিজ্ঞপ্তি: "খাবার দিও না।" দরজার ঠিক পিছনেই রয়েছে ভিসুভিয়াসের একটি মডেল—অগ্ন্যুদ্গার হতে যাচ্ছে এমন একটা ভাব এবং তার নীচে বিজ্ঞপ্তি: "ধূমপান নিষেধ।"

ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠাটা বেশ কষ্টকর। ওপরে উঠতে এক স্থানে দেয়াল থেকে এক জোড়া বুট জুতো আর একটা বীয়ারের পিপে ঝোলানোর ভূতড়ে ব্যাপার দেখে দর্শক বিস্মিত হয়। এটির ব্যাখ্যা হচ্ছে মধ্য যুগে অতি উৎসাহী এক স্থপতি নিজেকে দেয়ালে গেঁথে উপরোক্ত সামগ্রী-গুলি বাইরে প্রসারিত করে রাখে। একটা কুলুঙ্গীতে রয়েছে "শুষ্ক সূর্যরশ্মি" এবং আরো এগিয়ে দেখা যায় ব্যাভেরীয় আল্পস পর্বতের একখানি তৈলচিত্র এই ত্রুটিটি

কার্ল ভ্যালেন্টিনের এই অস্থিচর্মসার প্রতিমূর্তিটি তার নামযুক্ত ভাঁড়ামীর মিউজিয়ামে দর্শকদের স্বাগত জানায়

মানিয়ে নিতে যে, "এখানে ভুল করে একটি জানালা বুজিয়ে ফেলা হয়েছে।"

"প্রকৃতির ভ্রম" দেখানো হয়েছে পাখীর খাঁচায় দাঁড়ের ওপর এমন একটি কচ্ছপ

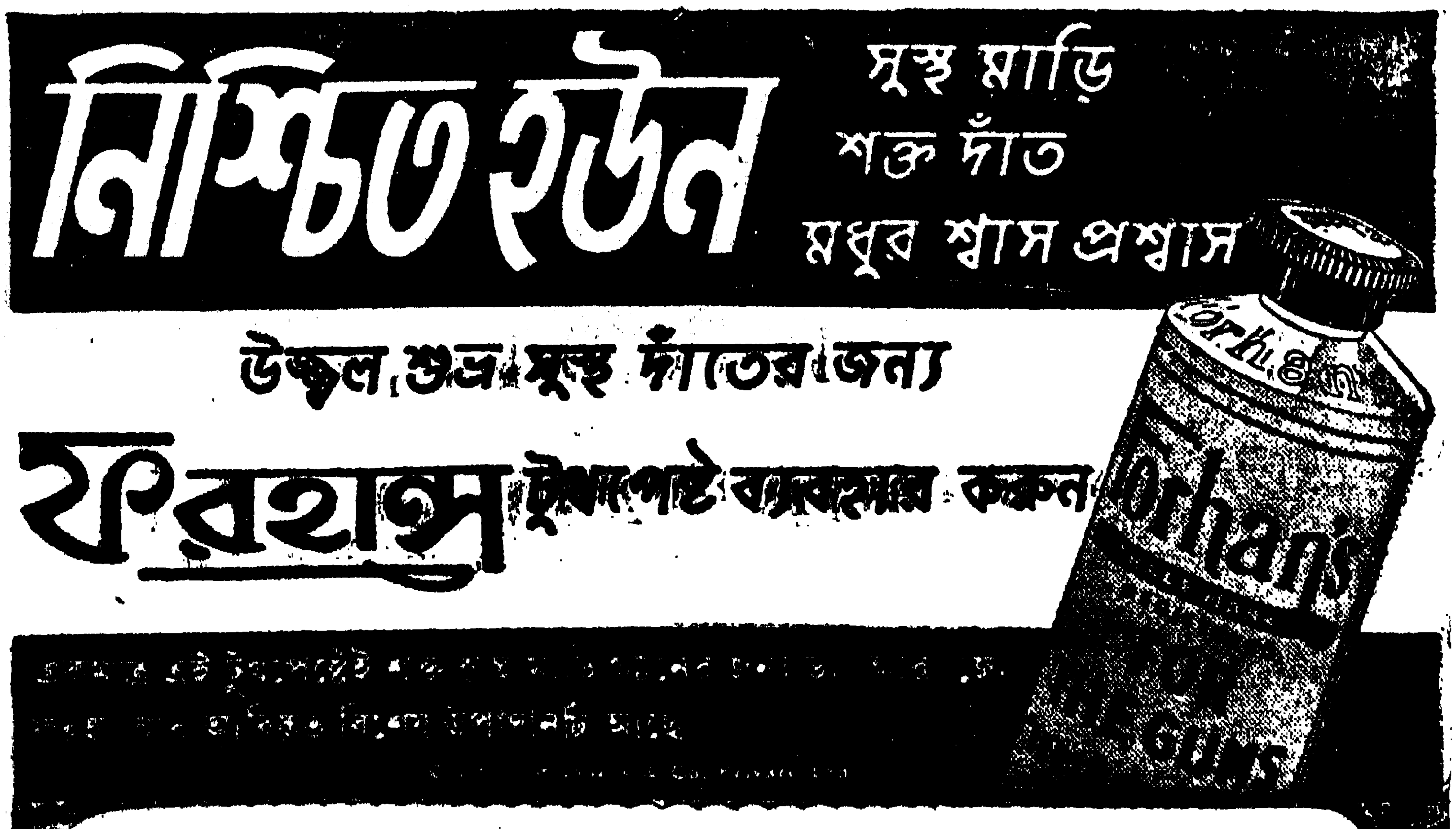

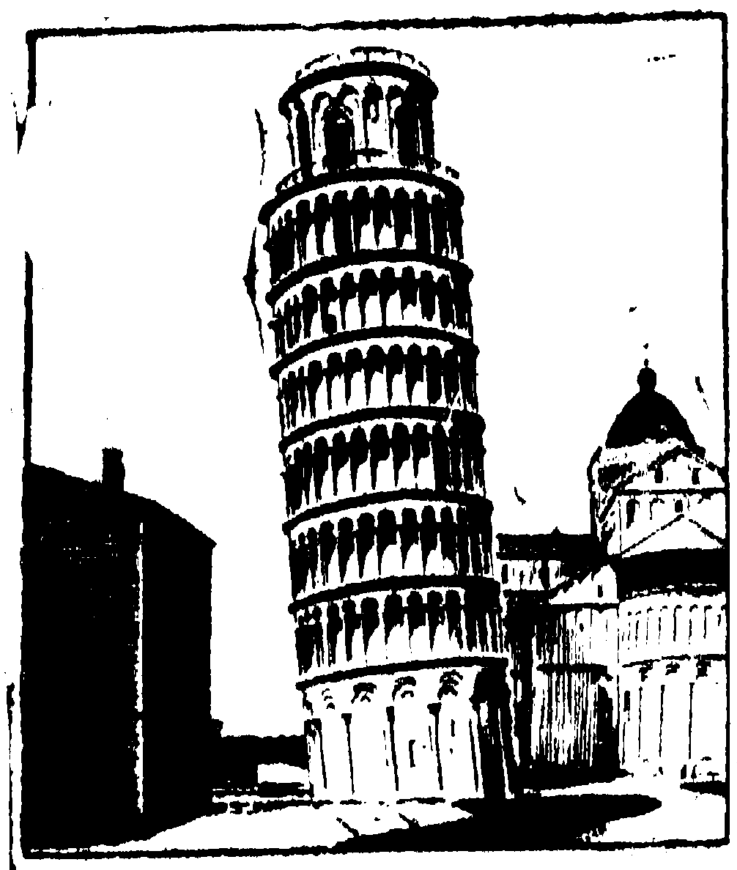

১

২

৩

১। পিসার হেলানো মন্দিরটি সোজা করে দাঁড় করাবার কোন কার্যকরী উপায় কেউ বলে দিতে পারলে প্রচুর টাকা তো সে পাবেই এবং পিসার সম্মানিত নাগরিক বলে পরিগণিত হবে। ১১৭৪ সালে তৈরী ১৭৯ ফিট উঁচু এই মন্দিরটি পনের ফিট হেলে রয়েছে। এই অবস্থাটা দূর করতে বহু প্রস্তাব হয়েছে। সবচেয়ে মনোমত হয়েছে আর্জেন্টিনার স্কুলের মেয়ে লিলা বিয়াণ্ডির প্রস্তাবটি। লিলা জানিয়েছে যতক্ষণ না সোজা হয় অপরদিক থেকে মাটি সরিয়ে যাওয়া। ২। "ঘোড়ার মতো ঘাম হচ্ছে" বলতে মানুষ যাই বোঝাতে চায় না কেন এটা বোধহয় তার ধারণায় নেই কথাটি কতটা সত্যি। বিশেষজ্ঞরা সবচেয়ে দ্রুত ঘেমে ওঠে এমন পশুদের পরীক্ষা করে দেখেছেন যে ঘোড়াই জিতে যায় দুটি ব্যাপারে: সবচেয়ে বেশী ঘামে এবং সবচেয়ে দ্রুত ঘেমে ওঠে। বৈজ্ঞানিকদের ধারণা মানুষের চেয়েও ঘোড়ার ঘামবার ক্ষমতা বেশী। ৩। যুক্তরাষ্ট্রের ডন ই ম্রারেবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তার দৃষ্টি হারায়। মনমরা না হয়ে সে তার অসুবিধে দূরীকরণে বদ্ধপরিকর হয়। কলেজে ভর্তি হয়ে সে বিদ্যার্জন করে, বিয়ে করে এবং পরিবার প্রতিপালনে রত হয়। ব্রেল রীতিতে তৈরী রুলার ইত্যাদির সহযোগিতায় সে প্ল্যান তৈরী করে এবং জমি কিনে নিজের হাতে বাড়ি তৈরী আরম্ভ করে দেয়। এক বছরের মধ্যেই বাড়িটি সম্পূর্ণ হয় এবং এখন অন্ধ ম্রারেবার তার স্ত্রী ও দুটি সন্তান নিয়ে সেখানে বাস করছে।

সুলভ মূল্যে
সেরা ৩টি জিনিষ
● শোনপাপরি—৩, সের
● পোলাও— ২, "
● মালপো— ২, "
কমলা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার
প্রায় অর্ধশতাব্দীর প্রতিষ্ঠান
আমহার্স্ট স্ট্রীট কলিকাতা
ফোন: ৩৪-১৩৭৭

আপনার শুভাশুভ ব্যবসা, অর্থ, পরীক্ষা, বিবাহ, মোকদ্দমা, বিবাদ বাঞ্ছিতলাভ প্রভৃতি সমস্যার নির্ভুল সমাধান জন্য জন্ম সময়, সন ও তারিখ সহ ২, টাকা পাঠাইলে জানান হইবে। ভট্টপল্লীর পুরশ্চরণসিদ্ধ অব্যর্থ ফলপ্রদ—নবগ্রহ কবচ ৭,, শনি ৫,, ধনদা ১১,, বগলামুখী ১৮,, সরস্বতী ১১,, আকর্ষণী ৭,।

সারাজীবনের বর্ষফল ঠিকুজী—১০, টাকা

অর্ডারের সঙ্গে নাম গোত্র জানাইবেন।
জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য বিশ্বস্ততার সহিত করা হয়। পত্রে জ্ঞাত হউন।
ঠিকানা — অধ্যক্ষ ভট্টপল্লী জ্যোতিঃসঙ্ঘ
পোঃ ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা।

বসিয়ে রেখে যার পক্ষে ছোট্ট ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা দুঃসাধ্য। নোঙরা জল ভর্তি একটা চাটুতে রয়েছে "এক চমৎকার তুষার-মানবের দেহাবশেষ।" তারই কাছে একটি বিজ্ঞপ্তি: "মিউনিকের অধিবাসী শীতের জন্য প্রস্তুত হও! শীতকালের দাঁতখোঁটা কাঠি একমাত্র এইখানেই পাবে।" একটা বোতলে লেবেল দেওয়া "বার্লিনের হাওয়া"—বার্লিনের আবহাওয়া বলপ্রদায়ক গুণের জন্য প্রখ্যাত।

যারা জার্মান নয় তাদের কাছে ব্যাখ্যা না করে দিলে দুর্বোধ্য এমন বহু সামগ্রীর মধ্যে ঐ বোতলটি একটি। ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি বহুপরিচিত ছড়ার আরম্ভতে আছে—'মেরী বসেছিল পাথরের ওপর"। এই নিয়েই ভ্যালেন্টিন মিউজিয়াম একটি রসিকতা করেছে প্রকাণ্ড একটা পাথরের গায়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে: "এই পাথরের ওপরেই মেরী বসেছিল।"

একটা দরজার গায়ে সহজে আকৃষ্ট হবার মতো একটি বিজ্ঞপ্তি রয়েছে "কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য।" দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলেই সামনে পড়ে বিরাট এক ফাঁকা দেওয়াল, কেবল অতি ছোট অক্ষরে এক জায়গায় লেখা "আপনি কি দীর্ঘনাসা নন?" এতে হতাশ হয়ে পড়লে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই যেন রয়েছে দুটি সামগ্রী—"ইভের ডুমুরপাতা" যেটা সে পরেছিল সতের বছর বয়সে, আর একটা যা সে পরেছিল যখন তার বয়স হয় তিপ্পান্ন। এই সব দেখার পর দর্শক বেশ মেদবহুল চেহারা গোঁফওয়ালা এক ব্যাভেরীয়ানের প্রতিমূর্তি দেখে দৃষ্টি চরিতার্থ করতে পারেন। এই ব্যক্তিটি হচ্ছেন "হের এম্মেনজেন্ডার"—টবে স্নান করার আবিষ্কর্তা।

গূঢ় রসিকতার এই সব সামগ্রীর মাঝে ইতস্তত টাঙানো রয়েছে কার্ল ভ্যালেন্টিনের মঞ্চে ও পর্দায় অভিনীত নানা চরিত্রের ছবি। ওর নাটকাবলীর মঞ্চসজ্জা রয়েছে; পুরণো সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন রয়েছে যা আধুনিক পাঠকদের চোখে অদ্ভুত লাগবে; অনুষ্ঠান-সূচী এবং আরো বহুপ্রকার স্মারক রয়েছে যা ঐ লোকটিকে অতো জনপ্রিয় হতে সাহায্য করেছিল। মিউজিয়ামটির পরিকল্পনা এবং যাবতীয় সামগ্রী সংগ্রহ করেন হের হান্স কোনিগ। নিজে তিনি একজন চিত্রশিল্পী এবং শিল্পীদের এক পেশাদারী সংস্থার চেয়ারম্যান। তাঁরই চেষ্টায় অর্থ সংগৃহীত হয় এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত আইসার গেট দুর্গটি পুনর্গঠিত হয় এই মিউজিয়ামটির জন্যে।

*

যুক্তরাষ্ট্রে ছোটদের জন্যে এক নতুন ধরনের লাইব্রেরীর প্রচলন বেড়ে চলেছে। বইয়ের বদলে এই সব লাইব্রেরীতে থাকে

পোষবার উপযোগী বিবিধ জন্তু-জানোয়ার পাখী এমন কি সাপ পর্যন্তও।

এই অভিনব লাইব্রেরীর উদ্ভাবক পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স্ক জীবতত্ত্ববিদ জন ম্যিপলী ফোরবেস। ছোটদের জীবজন্তুর প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য একটি জাতীয় সংস্থা ফোরবেসকে এ ব্যাপারে সর্বতোভাবে সহায়তা দান করছে। সাত বছর আগে ফোরবেস ক্যালিফোর্নিয়ার সাক্রামেণ্টোতে প্রথম লাইব্রেরীর উদ্বোধন করেন এটা অনুভব করে যে, ছোটরা মিউজিয়ামে মরা জীবজন্তুর চেয়ে জীবন্ত প্রাণীর প্রতি বেশী আকৃষ্ট হবে।

গ্রন্থাগারে বই নেবার যেমন নিয়ম এসব লাইব্রেরীরও ঠিক সেইভাবেই পরিচালিত। প্রথমে নাম রেজেস্ট্রি করাতে হয় তবে সভ্যের বয়স অন্তত সাত বছরের হওয়া চাই। নাম লেখাবার পর সারি সারি খাঁচায় রক্ষিত তার পছন্দমতো যে কোন একটি জীবকে সে বাড়ি নিয়ে যেতে পারে।

অধিকাংশ লাইব্রেরীতে থাকে শ্বেত মূষিক, খরগোস, গিনিপিগ, কচ্ছপ, বিড়াল, নানারকমের পাখী, সজারু—এমন কি কুমীর, সাপ এবং শৃগালও।

এর মধ্যে কোন একটি পছন্দ হলে বালক বা বালিকাকে একটি ফর্মের প্রশ্নমালার মধ্যে দিয়ে জানিয়ে দিতে হবে সে যেটিকে পছন্দ করেছে সেটির কিভাবে যত্ন নিতে হয় তা সে জানে। তারপর সেই জীবটিকে খাঁচায় নিয়ে সে চলে যায়। এর জন্য কোন মূল্য দিতে হয় না এবং সে এক সপ্তাহ সেই জীবটিকে তার কাছে রাখতে পারে। তার বেশী সময় তার রাখবার ইচ্ছে হলে সেক্ষেত্রে প্রতি অতিরিক্ত দিন পিছু তাকে ৫৫ নয়া পয়সা করে দিতে হবে।

ফোরবেস বলেন সাধারণত এক সপ্তাহের বেশী রাখতে দেওয়া হয় না, কারণ বেশী আদর আর বেশী খাওয়ার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কোন জন্তু ফিরৎ এলে তাকে তিন সপ্তাহ আলাদা করে রেখে দেওয়া হয়, আবার তাকে অন্য কারুর কাছে পাঠানোর উপযোগী কিনা দেখবার জন্য। ফোরবেস বলেন, "ছোটরা ওদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে বলে নয়,—তার কারণ ওরা একটু বেশী আদর করে বলে।"

অভিভাবকদের লিখিত অনুমতি ছাড়া ছোটদের কোন সরীসৃপ নিতে দেওয়া হয় না। শিক্ষক এবং সমাজসেবী যারা হাসপাতালে ছোটদের ওয়ার্ডে পোষা জীবজন্তু দেখাতে নিয়ে যায় কেবলমাত্র সেইসব প্রাপ্তবয়স্কদেরই এই লাইব্রেরী ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হয়। এর ব্যতিক্রমও মাঝে মাঝে ঘটে। একবার এক যাজককে একটি ছাগল নিয়ে যেতে দেওয়া হয়েছিল ধর্মপ্রচারের সুবিধে হবে বলে।

প্রত্যেকটি জন্তুকে হিউমেন সোসাইটির পশু চিকিৎসকদের দিয়ে সুস্থ ও পোষ মানার উপযোগী কিনা পরীক্ষা করানো হয়। রুগ্নগুলিকে আলাদা করে রাখা হয়।

শতকরা নব্বুইটি ক্ষেত্রে জন্তুদের খাঁচা ছাড়াই নিয়ে যেতে দেওয়া হয়। তবে সজারুদের ক্ষেত্রে তা দেওয়া হয় না। স্বভাবত ওরা বেশ শান্ত থাকলেও বিরক্ত করলে ওরা লেজের ঝাপটায় শর ফুটিয়ে যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতের সৃষ্টি করে দিতে পারে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের এই সব লাইব্রেরীর সভ্য হতে উৎসাহিত করেন এবং তাঁরা এটিকে একটি বিশেষ জনসেবা বলে গণ্য করেন। এক মা এইভাবে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন: "আমাদের ন'বছরের মেয়েটি যে কি জন্তু পছন্দ করবে আমরা বুঝতে পারতুম না। শেষে ওকে এক লাইব্রেরীতে নিয়ে যেতে দেখা গেল ওর সবচেয়ে পছন্দ ভোঁদড়। ওকে একটা কিনে দিতে সেটিকে নিয়ে বেশ খুশী হয়ে আছে।"

লাইব্রেরীগুলি ঘুরে ঘুরে দেখা গিয়েছে যে, শেলফে রাখা প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে চাহিদা হচ্ছে গর্ভবতী ইঁদুরের। ফোরবেস বলেন, "ছোটরা কিভাবে বাচ্চা প্রসব হয় দেখতে খুব উৎসুক হয়। অধিকাংশ বাপ-মা এটা অনুমোদন করেন এই কারণে যে, এইভাবে অত্যন্ত সহজে প্রকৃতির কতক নিয়মের বিদ্‌ঘুটে প্রশ্নগুলির উত্তর ওরা নিজেরাই জানতে পারে।"

কতকগুলি জনহিতকর সাহায্য তহবিল এবং প্রাইভেট সাহায্য তহবিলের অর্থে লাইব্রেরীর খরচ চলে এবং মাঝে মাঝে সাধারণের কাছ থেকেও লাইব্রেরী চালানোর চাঁদা পাওয়া যায়। কেউ আর্থিক সাহায্য পাঠায়, কেউবা দিয়ে যায় খাঁচা। বহু লোক জীবজন্তুও উপহার দেয়। কতক জীবজন্তু শিকার করে ধরে আনা হয়, কতক পাওয়া

পরিবার-নিয়ন্ত্রণ
(জন্মনিয়ন্ত্রণে মত ও পথ)
● সচিত্র তৃতীয় সংস্করণ) ●
সর্বাধিকবিক্রিত জনপ্রিয় তথ্যবহুল
সংক্ষিপ্ত সুলভ বাংলা সংস্করণ—
প্রত্যেক বিবাহিতের বাস্তব সাহায্যকারী একমাত্র শ্রেষ্ঠ পুস্তক। মূল্য ডাকব্যয় সহ ৮০ নয়া পয়সা M.O.তে অগ্রিম প্রেরিতব্য। বিদেশে ৩ শিলিং। এত অল্পমূল্যের পুস্তক ভিঃ পিঃ হয় না। প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য সাক্ষাৎ বেলা ১টা—৭টা। রবিবার বন্ধ। শনিবার ১—৫টা। ফোন : ৩৪-২৫৮৬

মেডিকো সাপ্লাইং কর্পোরেশন
(Family Planning Stores)
১৪৬, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯
(বৌবাজার-আমহার্স্ট স্ট্রীট জংসনের উত্তরে)
*
* বিশেষ দ্রষ্টব্য—উক্ত ১৪৬নং বাড়ীর একতলায় আমাদের কোন দোকান নাই। মেন্ গেট দিয়া সোজা ভিতরে ঢুকিয়া টপ্‌ফ্লোরে ছাদের উপর ১৮নং ঘরের খোঁজ করুন।

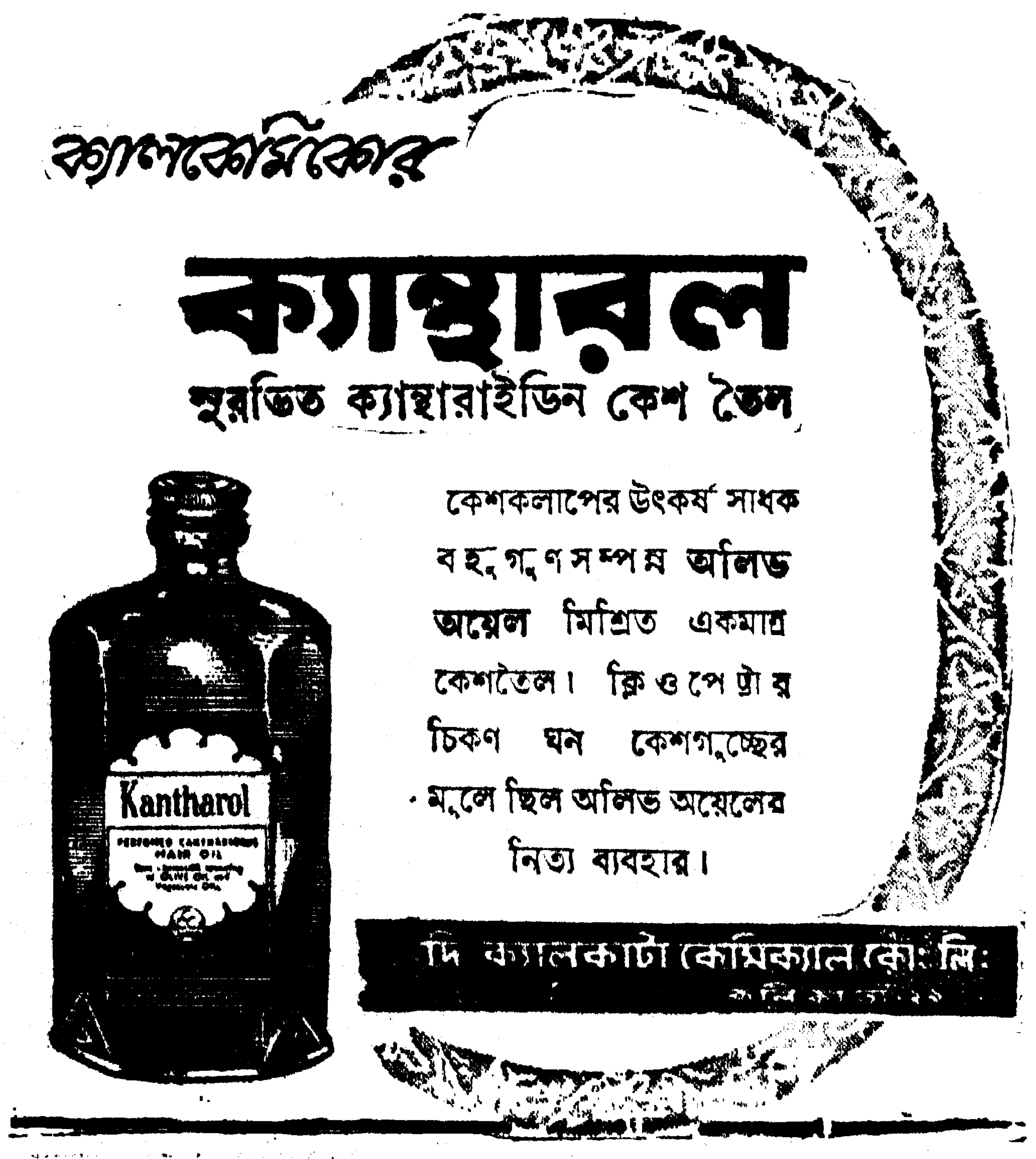

যায় ছোটরা যেগুলির ওপর আকর্ষণ হারিয়েছে, আর বহু সংখ্যায় পাওয়া যায় বাড়ির পোষা কোন জন্তু শাবক প্রসব করলে।

"এই সব লাইব্রেরী" ফোরবেস বলেন, "বেশ ভালভাবেই জনসাধারণের নজরে পড়েছে। আমার মনে হয় এদের দ্বারা প্রভূত উপকার সাধিত হয়. এমন কি ছোটদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা হ্রাস করে দিতেও সক্ষম হয়েছে।"

এর একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ ফোরবেস কনেক্টিকাটের স্ট্যামফোর্ডে ছেলেদের একটি ক্লাবের কথা বলেন। একদিন সেখানে গিয়ে দেখেন বদমায়েস ছেলেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে তার গাড়িতে একটা দুর্গন্ধ-ছড়ানো বোমা রেখে দেবার তালে। কিন্তু ফোরবেস তাঁর গাড়ির ভিতর থেকে কতকগুলি জীবন্ত জন্তু বের করতেই ছেলেগুলির চালচলন একেবারে বদলে যায়। তারপর থেকে আর তারা দুর্গন্ধ-ছড়ানো বোমা রাখার চেষ্টা করেনি।

॥ একুশ ॥

প্রথম যখন বিনোবা শান্তি-মিশনে এলেন, হই-চই হল সারা দেশে। বড় বড় নেতা মন্ত্রীরা বিনোবাকে পাঠালেন তাঁদের শুভেচ্ছা। পুলিসের হোমরা-চোমরা অফিসাররা জানালেন বিনোবাকে অভ্যর্থনা আর অভিনন্দন। মধ্যপ্রদেশের এক বড় পুলিস অফিসার তো এই পর্যন্ত বলে বসলেন যে, তিনি অনেক বছর আগেই সরকারকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, যদি বিনোবাকে চম্বল উপত্যকায় "ডাকু"দের শান্তির বাণী শোনাতে আনা যায় সমস্যার সমাধান হয়তো হবে। নিজের চোখেই দেখলাম অনেক। দেখলাম আত্মসমর্পণ করা "বাগী"দের সঙ্গে হাত ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছেন সব হোমর-চোমরা পুলিস অফিসাররা। ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে ফটো তোলাচ্ছেন তাঁরা ডাকাতদের সঙ্গে। হঠাৎ যেন ভোজ-বাজীর মত সবাইকার হৃদয়-পরিবর্তন হয়ে গেল। সব "ভাই, ভাই" হয়ে গেল। পুলিসের জীপে করে ডাকাতরা সব ঘুরে বেড়াল, আরো কত কি সব কাণ্ড। ভালো লাগেনি, ভালো লাগেনি আমার এসব। আবার বিনোবার সাঙ্গপাঙ্গরাও যা সব করল, তাও ভালো লাগেনি আমার। ডাকাতরা সব হয়ে পড়ল নেতা। প্রার্থনা সভায় বসে রামধুন গাইলে। হাজার হাজার লোকের কৌতূহল মেটাবার জন্যে ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে জনতাকে তাঁরা 'দর্শন' দিলেন। কেউ কেউ আবার ছোটো-খাটো বক্তৃতাও ঝাড়লেন। বিনোবার সঙ্গে তারাও পদযাত্রা করলেন কয়েকদিন কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে। ফুলের মালা পরে শহরে বড় বড় রাস্তায় ঘুরে বেড়াল আর যেদিন শেষ পর্যন্ত তাদের পুলিসের হাতে সঁপে দেওয়া হল, বিনোবার আশ্রমের মেয়েরা তাদের 'ডাকু' ভাইদের কপালে টিকা লাগিয়ে, মিষ্টি খাইয়ে, হাতে রাখী বেঁধে দিল। ডাকাতরা বোনেদের আশীর্বাদ করল টাকা দিয়ে। পুলিসের জীপে উঠে মালা পরে ডাকাতরা 'মহাত্মা গান্ধীকী জয়', 'ভারতমাতা কি জয়', 'সন্ত বিনোবা কি জয়' বলতে বলতে জেলে গেল। জেলে বসল 'বাবা'র প্রার্থনা সভা। ডাকাতদের দাবি হল, হাতকড়া পরানো চলবে না, তারা জেলের বাইরে শোবে, আরো কত কি? ডাকাতদের কোর্টে বিনা পয়সায় ডিফেণ্ড করার জন্যে এলেন উকিলরা। চাঁদা ওঠানো হল, আরো কত কি হল। ডাকাতদের আত্মীয়দের সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে এলেন অনেকে আর মৃত ডাকাতদের পরিবারের লোকের জন্যে আশ্রম তৈরী করার কথা হল। মৃত, জীবিত বড় বড় ডাকাতদের বাড়ি বাড়ি গেলেন বিনোবা আর তাঁর সাথীরা। কিন্তু কেউ একটা কথাও তাদের বিষয়ে বললে না —যারা ডাকাতদের অত্যাচারে আজ জর্জরিত, যাদের নিঃশেষ করেছে ডাকাতরা। যাদের বাপ, ভাই, স্বামীকে গুলী করে উড়িয়ে দিয়েছে ডাকাতরা। সেই সব মা যার ছেলে, সেই সব বোন যার ভাই, সেই সব স্ত্রী যার স্বামী, সেই সব ছেলেমেয়ে যাদের বাপ ডাকাতদের হাতে প্রাণ দিয়েছে, তাদের কথা কেউ ভাবলে না, তাদের জন্যে আশ্রম খোলার কথা তো কেউ চিন্তাও করল না। আর অগুনতি সেই সব পুলিসের লোক, যারা প্রাণ দিয়েছে, তাদের নাম কারুর মুখেও শুনলাম না। কে জানে, কে খবর রাখে, আজ গোবিন্দ-বাহাদুর থাপার বিধবা স্ত্রী আর সেই ফুটফুটে ফুলের মতো মেয়েটার। কোথায় তারা, কেমন আছে—বেঁচে আছে কিনা, কেউ জানে?

রাম অবতার

পুলিসের দাম্ভিকতা আর হামবড়াই ভাব যেমন ভালো লাগেনি, তেমনি আবার শান্তি মিশনের শান্তিদূতদের ডাকাতদের 'হিরো' তৈরী করার চেষ্টা 'লায়নাইজ' (Lionise) করাও আমার ভালো লাগেনি। পুলিস জানে, শুধু তাদের দ্বারা ডাকাতি-সমস্যার শেষ হবে না, কিন্তু ২০।২১ জন ডাকাত যে 'বাবা'র কাছে আত্মসমর্পণ করল, তা-ও তাদের অনেকের পছন্দ হয়নি। অনেক পুলিস অফিসার ঈর্ষায় জ্বলে মরছেন, এ-ও আমি জানি। কিন্তু এ-ও সত্যি যে, ক্রমাগত দিনের পর দিন বিনোবা, রোদ-বর্ষা-শীত উপেক্ষা করে যেসব পুলিসের লোকদের, যারা বছরের পর বছর নিজের প্রাণ হাতে করে ডাকাত-দের অত্যাচার থেকে অভিশপ্ত চম্বল উপত্যকাকে বাঁচাতে চেষ্টা করছে, করেছে ও করবে কটুবাক্য শুনিয়েছেন, তাদের হেয় করেছেন। অহিংসার পূজারী বিনোবা, তাঁর কাছে পুলিসের মূল্য হয়তো কম, কিন্তু বিনোবার কল্পিত সর্বোদয় সমাজ থেকে আজ আমরা অনেক দূরে। যেমন বিনোবার আন্তরিকতায় আমার কোনো সন্দেহ নেই, তেমনিই ডাকাতি-অধ্যুসিত অভিশপ্ত চম্বল এলাকায় মোতায়েন পুলিস ফৌজের আন্তরিকতায়ও আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

কিন্তু হঠাৎ এই ২০।২১ জন দুর্ধর্ষ ডাকাত আত্মসমর্পণ করল কেন? এর উত্তর দিতে গেলে আরেকটা দেশব্যাপী বিতর্ক উঠবে। অন্য ডাকাতদের সম্বন্ধে বলতে

সুস্বাদু এই রান্না পরখ করুন

তরকারীর ঝোল

৩টা বড় আলু, ১টা মুলা, এক মুঠো ফ্রেঞ্চবীন, ১ টেবল চামচ রেপ্ত সালাড অয়েল, ৫ বা ৬টি কারী পাতা, পাতলা করে কাটা একটা পেয়াজ, এক কফি কাপ সবুজ মটরশুটী, লবণ, ১ টেবল চামচ রান্নার গুড়ো মসলা, ১ চা চামচ ব্রাউন ও পলসন পেটেণ্ট কর্ণফ্লাওয়ার আধ কাপ দুধের সহিত মিশ্রিত।

তরকারী পরিষ্কার করুন। কেটে মটর শুটির সহিত ডেকচীতে ঢালুন। দেড় কাপ জল ঢালুন। রান্নার গুড়ো মসলা ও কারী পাতা মেশান। স্বাদ অনুযায়ী লবণ মেশান। কিছুক্ষণ সিদ্ধ করুন। আরেকটা ডেকচিতে রেপ্ত সালাড তেলে কাটা পেয়াজ ভাজুন, ব্রাউন হওয়া পর্যান্ত। সিদ্ধ তরকারী এতে মেশান, দুধ ইত্যাদি দিয়ে তাড়াতাড়ি মেশান। ঢাকা দিয়ে ১০ মিনিট সিদ্ধ করুন। চাপাটির সহিত খেতে দিন।

ইংরাজী, হিন্দী, গুজরাটি, টামিল অথবা মালায়ালাম ভাষায় (যে ভাষায় চান সেটি রেখে বাকী কেটে দিন) চমৎকার পাক-প্রণালী বইটি বিনামূল্যে পেতে হলে এই কুপনটি ভর্ত্তি করুন।

এই সঙ্গে ১৫ নঃ পঃ ডাকটিকিট পাঠালাম
মিঃ / মিসেস্ / মিস ....
....
....
ঠিকানা..............
....
ডিপার্টমেণ্ট DSH 20

কর্ণ প্রোডাক্টস্ কোং
(ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড,
পোষ্ট বক্স নং ৯৯৪ বম্বে—১

ব্রাউন এণ্ড পোলসন্ কর্ণফ্লাওয়ার পেটেণ্ট করা। বিশুদ্ধতার এই পরীক্ষা করুন!

এক গ্লাস সিদ্ধ করা ঠাণ্ডা জলে দুই টেবিল চামচ ব্রাউন এণ্ড পোলসন্ পেটেণ্ট কর্ণফ্লাওয়ার মেশান। ২৪ ঘণ্টা পরেও এটা গন্ধবিহীন, ময়লাবিহীন ও ক্ষতিকর জীবাণুহীন থাকবে। বি এণ্ড পি গুণসম্পন্ন অন্যান্য দ্রব্যগুলি: রেইমলি, কাষ্টার্ড পাউডার, সুগন্ধিত কর্ণফ্লাওয়ার, বিভিন্ন কাষ্টার্ড পাউডার।

কর্ণ প্রোডাক্টস কোং (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ

ভারতের এজেন্টঃ—প্যারী এণ্ড কোং লিমিটেড

পারবো না, কারণ তাদের আত্মসমর্পণ করা না করাতে লাভ-লোকসান বেশী নেই—তারা অনেকেই যাকে বলে 'ছুট্-ভাইয়া' ব 'স্মল ফ্রাই'। কিন্তু লুক্কা আর তার দল যে আত্মসমর্পণ করল, তার দাম আছে বইকি। কিন্তু কেন করল লুক্কা আত্মসমর্পণ? বিনোবা আর তাঁর সাথীরা বার বার অস্বীকার করেছেন, তাঁরা ডাকাতদের কোনো প্রতিশ্রুতি বা আশ্বাস দেননি। কিন্তু এই কথা অস্বীকার করা বৃথা যে, লুক্কার দলকে বলা হয়েছিল—যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তাহলে তহশীলদারসিংকে ফাঁসি থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করা হবে। যথেষ্ট এই প্রতিশ্রুতি। লুক্কা, কানহাই, এদের কাছে এই প্রতিশ্রুতির অনেক দাম। তাদের আত্মসমর্পণে যদি 'দাউ'-এর ঘরের শেষ প্রদীপ তহশীলদারের প্রাণ বাঁচে তাহলে তারা তা করতে কোনো দ্বিধাই করবে না। শুধু তাই না, তাদের প্রাণ দিয়েও যদি তহশীলদারের প্রাণ বাঁচানো যায়, তারা হাসতে হাসতে প্রাণ দিতেও পারতো. আর তাদের হাসতে হাসতে প্রাণ দেবার বদলে তহশীলদার বেঁচে গিয়ে যদি উদিতপুরায় 'মাজী'র মুখে হাসি ফোটাতে পারে, তাহলে তারা তা করতে কখনই পেছপা হত না। 'মাজী' আজ কত বছর হাসেনি। 'দাউ' মানসিং-এর নামে তারা সব কিছু করতে পারে। এর নাম হৃদয় পরিবর্তন নয়, এর নাম আনুগত্য। আর সেই আনুগত্যের জন্যে চরম মূল্য দেবার জন্যে এদের প্রস্তুতি। এই তো অভিশপ্ত চম্বলের কাহিনী। যুগ যুগ ধরে এই তো হয়ে আসছে। সভ্য সমাজের আওতায় হয়তো এই রকম বীরত্বের কোনো দাম নেই, কিন্তু তাদের কাছে এই হল বীরত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বিশ্বাস করতে মন চায় না। অনেক সময় আমারও কষ্ট হয়েছে বিশ্বাস করতে. কিন্তু না করে উপায় নেই। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই তো হয়ে আসছে। এই তো অভিশপ্ত চম্বলের ভাঙনের গান। বেহড়ের প্রতিটি দীর্ঘশ্বাসে এই কাহিনীই তো শোনা যাবে—প্রাণ-দেওয়া, প্রাণ-নেওয়ার রক্তাপ্লুত কাহিনী।

তহশীলদারের ফাঁসি হবে না। 'দাউ মানসিং-এর ঘরের শেষ প্রদীপ টিম টিম করে জ্বলবে নৈনী কারাপ্রাচীরের অন্ধকার 'সেলে।' তার ফাঁসি মকুব হয়ে গিয়েছে রাষ্ট্রপতির হুকুমে। নিজেদের জীবন তুলে দিয়েছে—লুক্কা, কানহাই, আরো অনেকে অনির্দিষ্টের হাতে। তাদের বিচার হবে। সভ্য সমাজের কানুনে যদি তাদের জীবন যায় যাবে। তহশীলদারের জীবন যদি বাঁচে, যদি 'মাজী'র মুখে হাসি ফোটে, এর চেয়ে ভালো ঋণ পরিশোধের চেষ্টা আর কি হতে পারে।

'দাউ'-এর ঋণ তো প্রাণ দিয়েও শোধ করা যায় না?

ঐতিহাসিক, নেতা, দার্শনিক বা নীতিবিদ্—এর কোনটাই আমি নই। আমার নেশা ও পেশা সাংবাদিকতা। জ্ঞান দেওয়া আমার কাজও না কর্তব্যও না। নিজের চোখের সামনে যা ঘটে যায়, তা তুলে ধরি। নিজের যা অভিজ্ঞতা হয়, তাই লিখি। কে ভালো বা কে মন্দ বিচার করার ক্ষমতা আমার নেই আর গুণও হয়তো নেই। বিনোবা মিশন নিয়ে অনেক প্রশ্ন অনেকে আমায় করেছে, আজও করছে। উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কঠিন হয়েছে। যা আমার সামনে ঘটেছে আর সেই সব ঘটনা আমার মনে যেসব চিন্তা এনেছে, তাই আমি তুলে ধরেছি।

"ভাই তরুণ," কলকাতা থেকে বৌদির কুপিত চিঠি এল, "এদিকে ডাকাতের দল যে সাধু হয়ে গেল। এমন দুর্ধর্ষ নৃশংসতা, ভালমানুষের মত ল্যাজ গুটিয়ে নুয়ে পড়ল? অহিংসার বাহাদুরী আছে।... ধত্ত ডোবালো কিন্তু ডাকাতদের সাধু হওয়াটা। তুমি তো খুনীকে দিব্যি হিরো'র আসনে তুলে দিয়েছ—ভালো লাগছিল—সহ্য হচ্ছিল—সাধু হওয়াটা কেমন যেন মিনমিনে..."।

বৌদিকে কি জবাব দিয়েছিলাম, ঠিক মনে নেই, কিন্তু এই ভয়ই আমি করেছিলাম। আমি কাউকেই 'হিরো', 'ভিলেন' কিছুই করিনি। আমি শুধু দুর্ধর্ষ দস্যুদের, অভিশপ্ত চম্বলের সেই সব অভিশাপদের জীবনের অনেক না-জানা ছোট-বড় দিকটা তুলে ধরেছি। তারাও যে মানুষ, তাদেরও যে দোষ-গুণ, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ আছে—আমি তাই বলতে চেয়েছি, আর বলতে চেয়েছি, অভিশপ্ত চম্বলের সেই অভিশপ্ত রক্তমাখা ইতিহাসের কথা। "ক্রাইম ডাজ নট পে" বা "ইজ দেয়ার ক্রাইম ইন দি ব্লাড?" এই সব বড় বড় সমস্যার সমাধান বা কারণ অনুসন্ধান আমি করিনি। রক্তে-মাংসে-গড়া অভিশপ্ত চম্বলের অভিশাপ এই সব দস্যুদের চরিত্রই শুধু তুলে ধরেছি বাস্তবভাবে। যদি মানসিং বা রূপা বা লাখনসিং-এর জন্যে কেউ দুফোঁটা জল আমার লেখা পড়ে ফেলে বা অন্য কেউ তাদের প্রতি ঘৃণার আর ধিক্কারে থুথু ফেলে, আমার বলার কিছুই থাকবে না।

চম্বল পার করে উসেটঘাটে এলেন 'বাবা'। আমার পাশে ছায়ামূর্তির মতো দাঁড়িয়ে কমাণ্ডাণ্ট কুইন। আরো খানিকটা দূরে মুস্তফাজী সাহেব। কুইনের দৃষ্টিটা যেন কেমন নিষ্প্রভ, জ্যোতিহীন। মুস্তফাজী সাহেবকে মনে হচ্ছে যেন একটা

চম্বলের বেহড়ে 'বাবা'র পদযাত্রা

স্ট্যাচু। তাঁর সেই মণ্টিক্রিস্টো লিস্টটার কথা ভাবছেন বোধহয়। তাদের মধ্যে কেউ কি আসবে 'হাজির' হতে!

"কাম অন ম্যান্"—কনুইয়ে টান দেয় কুইন। 'বাবা'র পদযাত্রা শুরু হয়েছে। অনেক দূর যেতে হবে, অনেক দূরে। 'বাবা' চলেছেন, সঙ্গে সাধু, জেনারেল আরও অনেকে। রাম অবতারও আছে। আমরাও রয়েছি।

গাঁয়ের পর গাঁ ঘুরেছি বাবার সঙ্গে। উসেটঘাট, উসেটঘাট থেকে রাচেড়, তারপর অম্বাহ, পোরসা, নাগরা, কানহেরা কাড়োরা, সুরপুরা, ভিণ্ড, নয়াপুরা, পাণ্ডরী আরো অনেক গ্রামে। দিনের পর দিন গিয়েছে আর মনে হয়েছে, এই বুঝি এল সব আত্মসমর্পণ করতে। সকাল বেলা যাত্রা শুরু হয়েছে আশা আর উৎসাহ নিয়ে। সাধু জেনারেল ক্রমাগত সাইকেল নিয়ে ঘুরেছেন বেহড়ে বেহড়ে। সন্ধে বেলায় আবার নিরুৎসাহ, কই কিছুই তো হল না।

কে যেন কানে কানে সেদিন উসেটঘাটে ফিসফিস করে বলেছিল, 'বাবা' এপার দিয়ে এলেন পিনহাট থেকে উসেটঘাটে আর সেই রাতেই প্রায় বোধহয় সেই সময়েই 'ঠাকুর সাহেব' ডাকাতি করে চম্বল পার হয়ে চলে গিয়েছে উত্তর প্রদেশের দিকে। আবার বাবার ক্যাম্প থেকে ক' মাইল দূরেই পানা করল দু-দুটো ডাকাতি।

কেন পাণ্ডরীর সোনাচিড়ইয়াই বলেছিল, তার ভাই 'হাজির' হতে কখনও আসবে না। সে কখনই আসবে না। যদি আসে তার 'লাশ' আসবে। আর ঠাকুর সাহেবই নাকি কাকে যেন বলেছিল, 'আত্মসমর্পণ করলেই আজ নয় কাল

হোমিওপ্যাথিক

পারিবারিক চিকিৎসা

একমাত্র বঙ্গভাষায় মুদ্রণ সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার

উপক্রমণিকা অংশে "হোমিওপ্যাথির মূলতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক মতবাদ" এবং "হোমিওপ্যাথিক মতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি" প্রভৃতি বহু গবেষণাপূর্ণ তথ্য আলোচিত হইয়াছে। চিকিৎসা প্রকরণে যাবতীয় রোগের ইতিহাস, কারণতত্ত্ব, রোগনিরূপণ, ঔষধ নির্বাচন এবং চিকিৎসাপদ্ধতি সহজ ও সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। পরিশিষ্ট অংশে ভেষজ সম্বন্ধ তথ্য, ভেষজ-লক্ষণ-সংগ্রহ রেপার্টরী, খাদ্যের উপাদান ও খাদ্যপ্রাণ, জীবাণুতত্ত্ব বা জীবাগম রহস্য এবং মল-মূত্র-থুতু পরীক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বিংশ সংস্করণ। মূল্য—৭·৫০ নঃ পঃ মাত্র।

এম, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
ইকনমিক ফার্মেসী, ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১

ফাঁসি হবেই। না করলে আরো দু-দশ বছর তো বেঁচে থাকবো।'

"কিংবা পুলিসের গুলীতে কাঙ্গ মারা পড়তেও তো পারো?" সেই কে যেন জিজ্ঞাসা করেছিল।

"হো সক্তা হ্যায়।"

"ফির খতরা ক্যা মোল লেতে হো? তাহলে এই বিপদ কেন জেনে শুনে মাথায় নিয়ে ঘুরছ?

ঠাকুর সাহেব নাকি জবাব দিয়েছিল, "খতরা তো হামারী জিন্দেগী হ্যায়।" বিপদই তো আমার জীবন।

ঠাকুর সাহেব আসেনি আত্মসমর্পণ করতে। পানা আসেনি, বাহাদুরাও আসেনি, অরো অনেকে আসেনি। হঠাৎ মাঝ রাতে মূর্তিমান বিভীষিকার মত কানহেরা গাঁয়ে এসেছিল লুক্কা, কানহাই আর তাদের দলের কিছু লোকে। মেওয়ারাম আসেনি। তার ভাই রামনাথের মৃত্যুর বদলা তার নেওয়া হয়নি। তাকে বোঝাতে পারেনি লুক্কা। (ক্রমশ)

আপনার রূপ লাবন্য আপনারই হাতে!

মুখশ্রীকে অকারণ রোদে—ধূলোয় কালো বা নষ্ট হতে দেন কেন? চেহারার লাবণ্যতা রক্ষার ভার হিমালয় বুকে স্নোর ওপরই ছেড়ে দিন—তারপর দেখুন চেহারার চমক। একটু খানি হিমালয় বুকে স্নো ঘষে দেখুন, হারানো কান্তি ধীরে ধীরে আবার কেমন ফিরে আসছে! ক্লান্ত শুষ্ক ত্বক সজীব হয়ে উঠছে! হিমালয় বুকে স্নো আপনার মুখে কখনও ব্রণ বা দাগ পড়তে দেবে না। নিজের চেহারায় দেখুন···লাবণ্যতা এনে ধরেছে···

হিমালয় বুকে স্নো!

HBS.18-X52BG

ইয়াসমিক লণ্ডনের পক্ষে, ভারতে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের তৈরী

ব্রজবুলি

রূপদর্শী

জুজুৎসু জানা না থাকলে খবর্দার গণ্ডার মারতে যাসনি। রিস্‌ক্‌ আছে।

কথাটা বলেই ব্রজদা সুনীতের দিকে চাইলেন।

সুনীল বলল, ভাল লোককেই কথাটা বললেন বটে ব্রজদা। সুনীতবাবু নিজে হাতে কখনও একটা ছারপোকা মেরেছেন কি না জিজ্ঞেস করুন তো।

ছারপোকা! সুনীত তাড়াতাড়ি বলে উঠল, বাঃ, কি যে বলেন, ছারপোকা মারা কি এমন শক্ত।

শক্ত বৈ কি? জুজুৎসু জানলে গণ্ডারকে হয়ত কাবু করা যায়, ছারপোকা ঘায়েল করা যায় না। এ আমার নিজের চোখে দেখা কি না। আমার যিনি ওস্তাদ—জাপানের চ্যাম্পিয়ন জুজুৎসু বীর—

ব্রজদা থামলেন। চোখ বুজে আলতো-ভাবে নিজের নাক কান মলে গুরুকে স্মরণ করে নিলেন।

মিঃ গুরুমারা গুঁতোগাতা একবার কলকাতায় এসেছিলেন। জুজুৎসুর খেলা দেখাতে। বড়লাটের আমন্ত্রণে। আমি তখন পটলডাঙ্গার মেস-ডি-শান্তিনিকেতনে একখানা সিঙ্গল সীটেড্‌ রুমে থাকি। ওস্তাদের ইচ্ছে আমার কাছেই কদিন থাকেন। কি আর করি, গেস্ট রুম থেকে একখানা ভালো দেখে তক্তপোশ এনে আমার পাশেই পেতে দিলাম। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর খানিকক্ষণ গল্প গুজব করে শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ এক চীৎকারে আমার ঘুম ভেঙে গেল। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দেখি অন্ধকারে প্রচণ্ড একটা হুটোপুটি চলেছে। ব্যাপারটা কি? তাড়াতাড়ি লাইট জেলে দিলাম। ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। মিঃ গুরুমারা গুঁতোগাতা গোটা কয়েক জুজুৎসুর গুঁতোয় তক্তপোশটার বারটা বাজিয়ে দিয়েছেন।

একটু অবাক হয়েই বললাম, ব্যাপার কি?

মিঃ গুরুমারা গুঁতোগাতা বললেন, শতোশতো সুঁচখোঁচা দাগা।

ওস্তাদ জাপানী হলেও একটু বাঙ্গাল কছমের জাপানী। কিয়োটোর কুট্টি। তাই মানেটা বুঝতে একটু দেরি হল। একটু হেসে বললাম, ওস্তাদ, ভয় পেয়ো না, ওগুলো সূঁচের খোঁচা নয়। এদেশে একরকম খুদে খুদে ডোমেস্টিক জানোয়ার আছে। আমরা বলি, ছারপোকা। হার্মলেস্‌। শুয়ে পড়ো।

ওস্তাদ আমার কথায় বিশেষ ভরসা পেলেন না। আলোর কাছে এগিয়ে গিয়ে সারা গা দেখতে লাগলেন।

আর বলতে লাগলেন, গাটাগোটা ফুটো।

তা মিছে বলেন নি, বুঝলি। আমিও দেখলাম ছারপোকার কামড়ে ওস্তাদের গোটা গাটাই প্রায় ফুটো হয়ে গেছে।

ব্রজদা দম নেবার জন্যে একটু থামতেই সুনীত বলে উঠল, বাঃ, জাপানী ভাষার সঙ্গে আমাদের ভাষার ত বেশ একটা মিল আছে!

ব্রজদা বললেন, হবে না কেন, ওরিয়েণ্টাল কাণ্ট্রি যে। আমরাও প্রাচ্য, জাপানীরাও প্রাচ্য। অরিজিন ত সেই বেদ। ইংরেজ এসেই ত ভেদ সৃষ্টি করে দিল কি না। নইলে আদিতে শ্যাম, কম্বোজ, বোরোবুদুর, যবদ্বীপ, বালি, সিংহল, জাপান, ইস্তক, আমেরিকা, এ-সবই ত বৃহত্তর বঙ্গের অংশ ছিল। আমাদের ছিল। বাংলার সমৃদ্ধি, বাংলার সংস্কৃতি এককালে কোন তুঙ্গে উঠেছিল একবার চেয়ে দ্যাখ। আর সেই বাংলার আজ কি দুরবস্থা। এখন যে চান্স পাচ্ছে, সেই একখানা লাথি ঝেড়ে চলে যাচ্ছে।

ব্রজদা ফোঁস করে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন, ডিফেক্টটা কি হয়েছে জানিস, পেঁচক আর তেমন করে ডাকছে না।

পেঁচক! মানে?

পেঁচা। বাংলা কি ভুলে গেলি? আউল।

সকলে সমস্বরে বলে উঠল, পেঁচা ডাকছে না, তা হয়েছে কি?

যা হবার তাই হচ্ছে। আবার কি হবে।

ব্রজদা চটে উঠলেন।

বললেন, প্রহরে প্রহরে পেঁচক 'বাঙ্গালী জাগো' বলে আর ডেকে উঠছে না। কাজেই বাঙ্গালী ঘুমুচ্ছে। একেই বাঙ্গালীর ছেলের একটু লেটে ওঠা অব্যেস, তার উপর জাগনে-ওলা নেই। আসল গুবলেট তো সেইখানেই। বুঝলি নে। নইলে জাগ্রত বাঙ্গালীর গায়ে হাত তুলবে এমন সাহস ভূভারতে কোন ব্রাদারের আছে!

যাকগে যাক, যা বলছিলাম তাই বলি।

ব্রজদা প্রসঙ্গে ফিরে এলেন।

রূপকার প্রযোজিত

সুকুমার রায়ের

চলচিত্তচঞ্চরী

এবং

রসরাজ অমৃতলাল বসুর

ব্যাপিকা-বিদায়

পরিচালনা

সবিতাব্রত দত্ত

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট্‌ হল

২০শে সেপ্টেম্বর • সন্ধ্যা ৬টায়

টিকিটঃ—২,, ১, ও ৫০ নঃ পঃ

কার্যালয়—৫৩, বকুলবাগান রোড, কলিকাতা—২৫

(সি ৮০১৬)

সারারাত ধরে মিঃ গুরুমারা ছারপোকা মারার চেষ্টা করলেন। হ্যাঁ, দেখলাম বটে, জাপানী অধ্যবসায় কাকে বলে! এক এক-খান করে কাঠ তক্তপোশ থেকে তিনি খুলে ফেললেন। কিন্তু কোথায় ছারপোকা। একটারও টিকি দেখা গেল না। আবার একটু একটু করে তক্তপোশটি জুড়ে আলো নিবিয়ে যাহাতক শোয়া অমনি আবার "শতো শতো সুচিখোঁচা।" সারারাত এইভাবে লড়াই চলল। তোশক বালিশ ছিঁড়ে, তক্তপোশের কাঠগুলো ভেঙে, ঘরটাকে লণ্ডভণ্ড করে ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে ওস্তাদ আমার হাওয়া দিলেন। এ দেশ ত্যাগই করে গেলেন। তাই বলছিলাম, বাঘ, ভালুক, হাতি, হিপো মারার চাইতে ছারপোকা মারা শক্ত। অন্তত আমার কাছে।

সুনীত বলল, আর গণ্ডার? গণ্ডা মারেননি ব্রজদা?

সুনীল দাবড়ে উঠল, কাকে কি কোশ্চেন করতে হয় মশাই এখনও পর্যন্ত তাই শিখলেন না। ব্রজদা কি এক আধটা গণ্ডার মেরেছেন? গণ্ডার হিসেব জিজ্ঞেস করুন।

ব্রজদা সস্নেহে বললেন, চিরটা কাল তোর একই রকম কাটল সুনীল। আজও তোর

পাক ধরল না।- সেই ডাঙ্গাই থেকে গেলি। গণ্ডার কি বাঙালী যে গণ্ডায় গণ্ডায় মারা পড়বে? আর তা ছাড়া এখানে কোথায় তুই গণ্ডায় গণ্ডায় গণ্ডার পাবি যে মারবি? মারা তো দূরেস্থান, যে কটা বাঙালী গণ্ডার আছে রিজার্ভ ফরেস্টে, সে কটা বাঁচিয়ে রাখাই এখন দারুণ সমস্যা।

ব্রজদা নড়ে চড়ে বসলেন।

বললেন, মাঝখানে তো আমাদের বনমন্ত্রীর নাওয়া খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কি, না গণ্ডারদের ছেলেপুলে হচ্ছে না। কত ডাক্তার কবিরাজ এল। অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, বাইওকেমিক, আয়ুর্বেদী, য়ুনানি, ভেটিনারি, কত কি করা হল। কোন ফল হল না। বনমন্ত্রী সাহেব-ডাক্তার আনালেন। বড় বড় সব গাইনোলজিস্ট। যাদের হাতে পড়লে বাঁজা বউও কার্তিকের মা হয়। কিন্তু ওনারাও এখেনে ফেল মেরে গেলেন। গণ্ডারণীরা লজ্জায় ওনাদের সামনে বেরুলই না যে। সরকারের এক কাঁড়ি টাকা গজব হয়ে গেল। কর্পোরেশনের কাউন্সিলাররা রেট পেয়ারদের স্বার্থে চারদিন ধরে স্পেশাল মিটিং ডেকে গলাবাজি করে, অবশেষে বিধানসভায় "অবিলম্বে গণ্ডারের বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাব" পাঠিয়ে দিলেন। বিধানসভায় লেফটিস্ট গ্রুপ সরকারকে তুলো ধুনে দিলে। লোকসভায় প্রশ্ন উঠল। কম্যুনিস্ট দল বললে, কংগ্রেসী কুশাসনের প্রতিবাদে গণ্ডারদের এই ঐতিহাসিক সত্যাগ্রহ, ইংগ-মার্কিন চক্রান্তের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামী আত্মত্যাগ, গণ্ডার সমাজকে আজ শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তের প্রগতিশীল আন্দোলনের মধ্যে এনে ফেলেছে। বিশ্বের প্রগতিশীল সমাজ আজ দাবি করছে, সরকার হয় গণ্ডারদের বংশবৃদ্ধি ঘটান, নইলে গদি ছেড়ে দিন। পি-এস-পি বললে, ভারত আক্রমণে উদ্যত চীনের বিরুদ্ধে ভারত সরকার আজ পর্যন্ত কোন সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন না করায় গণ্ডারদের মধ্যে আতংক দেখা দিয়েছে। তাঁরা ভাবছে, যে দেশে নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কেই অনাস্থা রয়েছে, সে দেশে আর বাচ্চা পেড়ে কি হবে? গণ্ডারদের এই মনোভাবে সামগ্রিকভাবে নেহরু সরকারের চীন-নীতি এবং বিশেষভাবে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর প্রতি গভীর অনাস্থা প্রকাশিত হয়েছে। জনসংঘ এবং হিন্দুমহাসভার মতে এটা প্রাণী সমাজের উপর অনাস্থার জন্ম নিয়ন্ত্রণের অনুকূলে সরকারী প্রচারকার্যের এফেক্ট। ভারত সরকার জবাবে বললেন, এটা রাজ্য সরকারের জুরিসডিকশন। লোকসভায় প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি নাকচ হয়ে গেল। রাজ্যের বনমন্ত্রী সাংবাদিক বৈঠকে জানালেন, আমি হলপ করে বলতে পারি, গণ্ডারদের ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য কোন নির্দেশ আমার দপ্তর থেকে দেওয়া হয়নি। গণ্ডারদের ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর কোন ব্যবস্থাও করা হয়নি। এখন গণ্ডাররা যদি তা সত্ত্বেও বংশবৃদ্ধি না করে, তার আমি কি করতে পারি? সরকারের যেটুকু করার তা করেছেন। এই খাতে অনেক টাকা খরচ করা হয়েছে। আর গণ্ডারের বাচ্চা না হওয়ার জন্য কে দায়ী, গণ্ডার না গণ্ডারণী, সেটা তদন্তের জন্য একটা একস্‌পার্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। এক সদস্য বিশিষ্ট কমিটি। বিখ্যাত শিকারী শ্রীব্রজরাজ কারফরমা হচ্ছেন সেই কমিটির চেয়ারম্যান।

ব্রজদা থামলেন। একটু দম নিলেন।

বললেন, অ্যাইসা রিপোর্ট দিয়েছিলাম না একখানা, কি বলব, একটু ব্যাকিং পেলে ঐতেই নোবেল প্রাইজটা পেয়ে যেতুম। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি থেকে শুরু করে মানবজাতির ধ্বংসে এসে দি এণ্ড করেছিলুম। সেই রিপোর্ট'টার সামারি করেই তো এইচ জি ওয়েলস "আউট-লাইন অব্ দি হিস্ট্রী অব দি ওয়ার্লড" বইখানা বের করে দিলে।

সুনীত ফস করে বলে ফেলল, সে কী, ওটা ত অনেক আগের বই! তখন ত আমাদের স্বাধীন গভর্নমেণ্টই হয়নি।

ব্রজদা বললেন, ঐটেই ত বৃটিশদের বাহাদুরি। ওরা যেটা করে, আগে আগে করে। তা সে টুর্কালিফাইং-ই হোক, কি সাম্রাজ্যবিস্তারই হোক। জাতটা বড় হয়েছে কি অমনি অমনি।

সুনীল তাড়াতাড়ি বলে উঠল, তারপর গণ্ডারদের কি হল?

ঝড়াঝড় বাচ্চা হল। হবে না! ব্রজদা বললেন, কেমন মোক্ষম জিনিস রেকমেণ্ড করেছিলাম।

সুনীতের ইদানীং এসব বিষয়ে একটু বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে। মুখটি একটু নীচু করে জিজ্ঞেস করলে, জিনিসটা কি দাদা?

ব্রজদা বললেন, একটা স্বপনাদ্য তাবিজ। প্রসূতির গলায় কালো কার দিয়ে শনিমঙ্গলবারে ঝুলিয়ে দিলে একেবারে অব্যর্থ ফল। এক পয়সা খরচা নেই, শুধু ঐ তাবিজটার যা কস্ট্। ওনলি পাঁচ সিকে।

তা তাবিজটা, সুনীত বলল, গণ্ডারণীদের গলায় ঝুলিয়ে দিলেন কি করে?

কেন? ব্রজদা বললেন, জুজুৎসু শিখেছিলাম তাহলে কি করতে?

হলে হবে কি, ব্রজদা হতাশ গলায় বললেন, দেশে ত দিশি গুণীর কদর নেই। এই কাজটা যদি কোন সাহেব এসে করত ত দেখতিস। দেশে তার স্ট্যাচু তোয়ের হয়ে যেত। জিম করবেটের নামে তোরা ন্যাশন্যাল পার্ক করে দিলি, (করেছিস বেশ করেছিস, ও ত আমারই সাগরেদ। শিষ্যের ভাল দেখলে গুরুর আনন্দই হয়) তার যে গুরু, যে তাকে হাতে ধরে শিকার শেখালে, সে গেল ভেসে! কেন? না, সে যে বাঙালী। আজ বাঙালীর বিরুদ্ধে যদি হোল ওয়ার্ল্ডে

.....বাঙালীর ইতিহাস বাঙালী নিজেই জানে না। আপনি কি জানেন, অন্নদাশংকর রায়কে বাংলা শিখিয়েছেন কে? দেশবন্ধুকে কলকাতার মেয়র, শ্রী নেহরুকে ভারতের প্রাইম মিনিস্টার, গান্ধীজীকে মহাত্মা করল কে? সত্যেন বোসকে আইনস্টাইনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল কে?—ব্রজরাজ কারফরমা। সেই মহান শ্রীব্রজরাজ কারফরমাকে জানবার একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ

রূপদর্শীর

সচিত্র রম্যরচনা

ব্র জ বু লি

দাম ৩৲ টাকা

সুকবি **সুভাষ মুখোপাধ্যায়** বাংলা সাহিত্যে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁর গদ্য রচনা সাহিত্যক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর সংযোজন। কবি-মনের স্পর্শের সঙ্গে এমন সারল্য ও স্নিগ্ধতা-জড়ানো লেখা সত্যিই দুর্লভ। শিল্পী চিত্তপ্রসাদের প্রচ্ছদপট ও অঙ্গসজ্জা এবং খালেদ চৌধুরীর প্রচ্ছদলিপি দ্বারা অলংকৃত এঁর সর্বাধুনিক গদ্যরচনা:

যখন যেখানে

দাম ২.৭৫ নঃ পঃ

ডাঃ আনন্দকিশোর মুন্সীর

পরম লগনে

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় লেখকের এই রচনা একটি কৌতুকময় হাস্যমধুর উপন্যাস। এই গ্রন্থেরই কাহিনী "রায় বাহাদুর" নামে চিত্রে রূপায়িত হচ্ছে।

দাম ৪.৫০ নঃ পঃ

বর্তিক

পুস্তক প্রকাশক

১৩।২। এফ্ প্রিন্স
গোলাম মহঃ রোড
কলিকাতা - ২৬

এই কন্‌স্পিরেসি না হত ত দেখতিস, পজিশন কাকে বলে তা তোদের ব্রজদা জগৎবাসীকে দেখিয়ে ছাড়ত। পজিশন পাচ্ছে না বলে ত বাঙালী আজ স্থায়ীভাবে অপজিশনে চলে যাচ্ছে।

জিজ্ঞেস করলাম, জিম করবেটকে চিনলেন কি করে?

ব্রজদা আমার মুখের পানে অগ্নি দৃষ্টি হানলেন।

বললেন, সেটা করবেটকেই জিজ্ঞেস কর।

সুনীল বললে, তিনি ত গত হয়েছেন। তাঁকে এখন পাই কোথায়?

ব্রজদা বললেন, তবে কিছুকাল অপেক্ষাই কর। এত অধৈর্য হচ্ছ কেন? এটুকু জেনে রাখতে পার, যে-ছোকরা এয়ার গান ছাড়া কিছু চালাতে পারত না, তাকে আমি হাতে ধরে ·৩৪৫ বোরের ম্যাঞ্চেস্টার রিপিটার ছোঁড়া শিখিয়েছি।

সেবার জিমু বললে, ওস্তাদ বাঘ মারা ত শেখালে, মারলামও অনেক, এখন ওতে

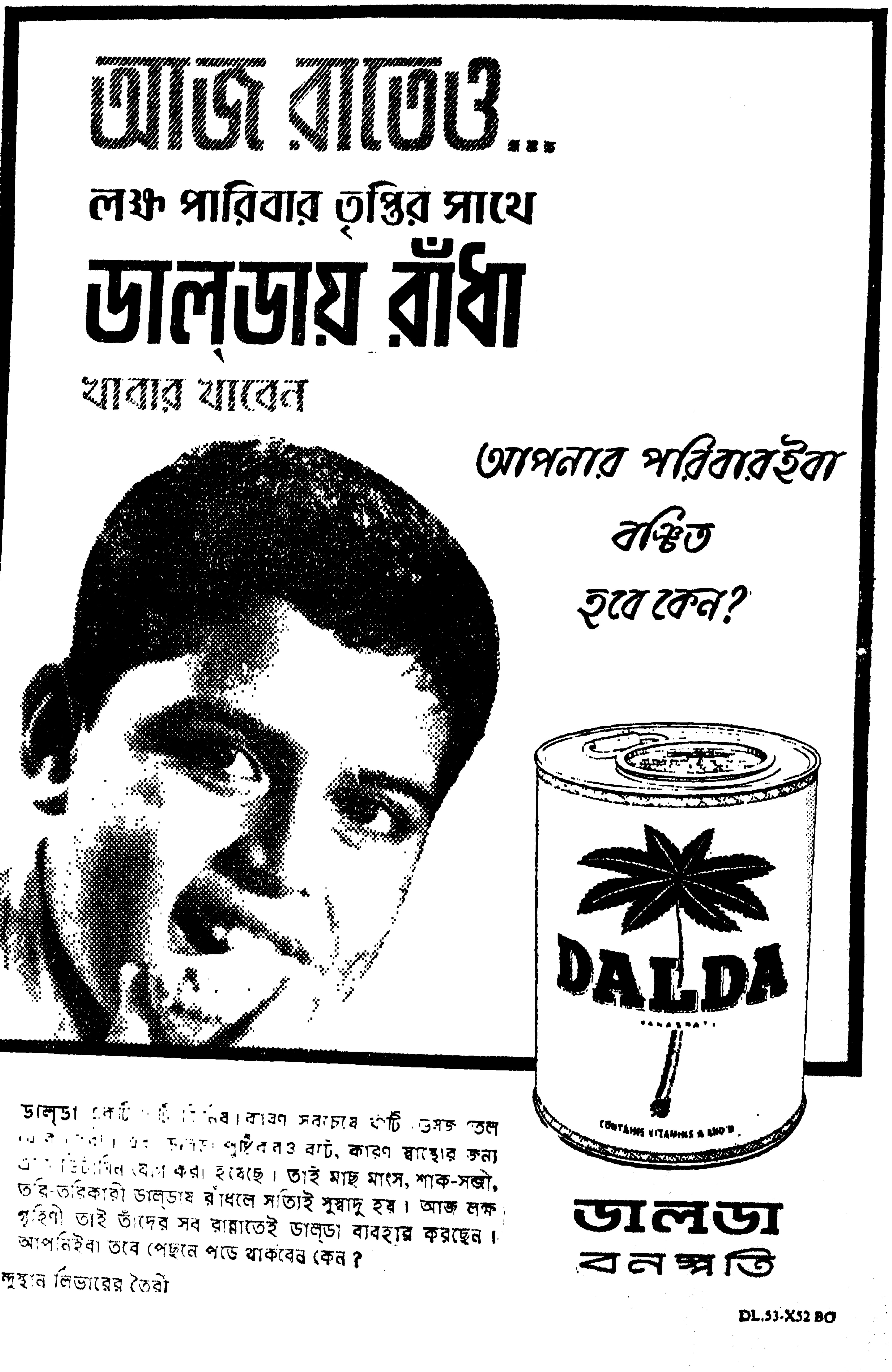

অনুরচি ধরে গেছে। এবারে হাতি মারার কৌশলটা শিখিয়ে দাও।

হেসে বললাম, জিমনু, এখনও তেমন বাঘের পাল্লায় পড়নি। মেরেছ ত গাড়োয়ালের পাহাড়ি বাঘ। কতকগুলো ইল্লিটারেট ম্যাস্। পড়তে বাংলার বাঘের পাল্লায়, ঠেলা বুঝতে। একবার এক বাংলার বাঘকে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার করে দেওয়া হয়েছিল, তার ঠ্যালায় অস্থির। বৃটিশ গভর্নমেণ্টের বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর থেকে বৃটিশরা ভুলেও কখনও বাঘেদের আর ভাইস-চ্যান্সেলার করেনি। তাই বলছি বাঘেদের অত তুচ্ছ ভেব না। অবিশ্যি হাতি মারা শিখতে চাও শিখিয়ে দেব।

কদিন পরেই খবর পাওয়া গেল আসামের জঙ্গলে একটা বুনো হাতি খুব অত্যাচার শুরু করেছে। খেত খামার নষ্ট করে দিচ্ছে। বাড়িঘর তচনচ করছে। মানুষ মারছে। জিমিকে নিয়ে চললাম। ওকে বললাম, হাতি মারতে হয় এক গুলীতে। মিস্ করেছ কি গেছ। আর হাতির ভালনারেব্ল্ জায়গা হচ্ছে মাথায়। শুঁড়টা যেখানে শেষ হয়ে কপালটা শুরু হয়েছে, জাস্ট অন দ্যাট স্পট। হ্যাঁ, হাতি যেন কক্ষনো তোমার গায়ের গন্ধ টের না পায়। খুব সাবধান। বাতাসের বিপরীতে কক্ষনো থাকবে না। সব সময় এই পজিশনে থাকবেঃ আগে বাতাস, মধ্যে হাতি, শেষে তুমি। আমি হাতির কপালে একটা মার্কা করে দেব আর তুমি সেই মার্কায় চাঁদমারি করবে।

দিন তিনেক হেঁটে মিকির পাহাড়ের এক জায়গায় গিয়ে বুঝলাম, এসে গেছি। কিন্তু বিপদ হল এই যে, হাওয়ার গতির মাথা-মুণ্ডু, টের পাওয়া যাচ্ছিল না। কখনও এদিক দিয়ে বইছে একটু পরেই সেদিক দিয়ে। আচ্ছা ঝামেলা। বুদ্ধিটা উস্কে নেবার জন্য পকেট থেকে নস্যির কৌটা বের করে এক টিপ নস্যি নিয়েছি কি, সামনের কবরি কলার ঝাড়ের আড়াল থেকে প্রচণ্ড এক হ্যাঁচ্ছো শোনা গেল। যেন বড় বড় গোটা চারেক হাউট্জার কামান একসঙ্গে কেউ দ্যাওড় করে দিলে। এক ফুৎকারে গোটা আষ্টেক কলার ঝাড় সবেগে উপড়ে গিয়ে জঙ্গল সাফ হয়ে গেল। আর অমনি দেখলুম দু হাত দূরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে যমদূত সদৃশ বিরাট এক টাস্কার। চুপিসাড়ে কলা-গাছ খেয়ে যাচ্ছিল। আমার এক্সট্রা র নস্যির কিছুটা হয়ত বাতাসে উড়ে ওর শুঁড়ের ফুটোয় ঢুকে গেছে। আর তাইতেই এই বিপর্যয়। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে সেই অপ্রস্তুত দাঁতালের শুঁড়টা বাঁ হাতে চেপে ধরে এক হ্যাঁচকা টানে, মাথাটা নুইয়ে আনলাম, তারপর ডান হাত দিয়ে পকেট থেকে লাল টুকটুকে একটা টিপ বের করে থুথু দিয়ে ঝটিতি তার কপালে সেঁটে দিলাম। বললাম, জিমনু, ফায়ার। কিন্তু কোথায় জিমনু? দেখলাম, বেচারা তখনও পজিশন নিতে পারেনি। ইতস্তত করছে। আমি তৎক্ষণাৎ শুঁড় ধরে টেনে হাতির মুখটা জিমুর দিকে ঘুরিয়ে দিলাম। সত্যি, ছোকরার টিপটা প্রশংসা করার মতই। ঐ এক গুলীতেই মিকির পাহাড়ের সাক্ষাৎ শমনটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আর উঠল না।

ব্রজদা চুপ করে গেলেন।

আপনাকে কোন জানোয়ার কখনও বিপদে ফেলেনি ব্রজদা?

ফেলেনি আবার! ব্রজদা নড়েচড়ে বসলেন। একবার একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগারই আমাকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিল। এ তোদের ব্রজদার উপর দিয়ে যায়। ব্রজদার দাদাই তাকে বলতে পারিস।

বলেন কি! সুনীল ব্রজদার কথায় এমন প্রচণ্ড রকম অবাক হল যে ওর টাকে তক্ষুনি তক্ষুনি ভুরভুর করে চুল গজিয়ে গেল। ফ্যালফ্যাল করে ব্রজদার মুখপানে সে শুধু চেয়ে রইল।

সুনীত সাহস করে বলে ফেলল, এ ত তাহলে জবর টাইগার।

ব্রজদা বললেন, হ্যাঁ। উওম্যান ইটার।

শুধু ধোপানী ধরে খেত। তাও সবটুকু খেত না। শুধু হাত দুখানা খেয়ে ফেলত।

সে কী, কেন?

ব্রজদা বললেন, অম্বলের ব্যামো ছিল বোধ হয়। ধোপানীরা ত সোডা দিয়ে কাপড় কাচে। হাতে নিরন্তর সোডা বা ক্ষার লেগে থাকে। তাই খেয়ে হয়ত টেম্পরারি একটা রিলিফ পেত। ওরা অকারণে ত কারোর ক্ষতি করে না। ভাল ভাল শিকারীর বই পড়ে দেখিস, জানতে পারবি।

এই বাঘটা আমাকে খুব ধোঁকা দিয়েছে। খুব ভুগিয়েছে। ওটাকে মারবার জন্য আমি ইণ্ডিয়া, বার্মা, সিলান ঘুরে বেড়িয়েছি। ধোপাদের এমন একটা আড়ত ভারতে নেই, যেখানে আমি যাইনি। কিন্তু বৃথা। যেখানেই যাই সেইখানেই দেখি হাহাকার। শয়তানটা স্বাভাবিক বুদ্ধি বশে এটা বুঝেছিল ধোপা-দের চাইতে ধোপানীদের কাবু করা সহজ। জানিনে চণ্ডীদাস পড়েছিল কি না। সাত বচ্ছরে সে দু হাজার পাঁচ শ পঞ্চান্নটা ধোপানীকে ঘায়েল করেছিল।

ওর ধোপানী মারার রহস্যটা আমার কাছে যখন পরিষ্কার হয়ে গেল, তখন আমি এক-দিন ঢাকুরের এক ডোবায় ধোপানীর ছদ্ম-বেশে কাপড় কাচতে শুরু করলাম। বাঘটাকে ক্রমাগত ফলো করতে করতে শেষ পর্যন্ত এখানে এসে পেঁচেছি। লোডেড্ রাইফেলটা বাঁ হাতের কাছে একটা কাপড়ের পুটুলির নিচে লুকিয়ে রাখলাম। আমি জানি, বাঘ আজ এখানে আসবে। পায়ের তাজা ছাপ ডোবার পাড়ে দেখে বুঝলাম, রাত্তিরে এসে ও জায়গাটা সার্ভে করে গেছে।

পরিবারের সকলের পক্ষেই ভালো

বীজাণুনাশক নিমতেল থেকে তৈরী, সুগন্ধি মার্গো সোপ কোমলতম ত্বকের পক্ষেও আদর্শ সাবান। মার্গো সোপের প্রচুর নরম ফেনা রোমকূপের গভীরে প্রবেশ ক'রে ত্বকের সবরকম মালিন্য দূর করে। প্রস্তুতির প্রত্যেক ধাপেই উৎকর্ষের জন্য বিশেষভাবে পরীক্ষিত এই সাবান ব্যবহারে আপনি সারাদিন অনেক বেশী পরিষ্কার ও প্রফুল্ল থাকবেন।

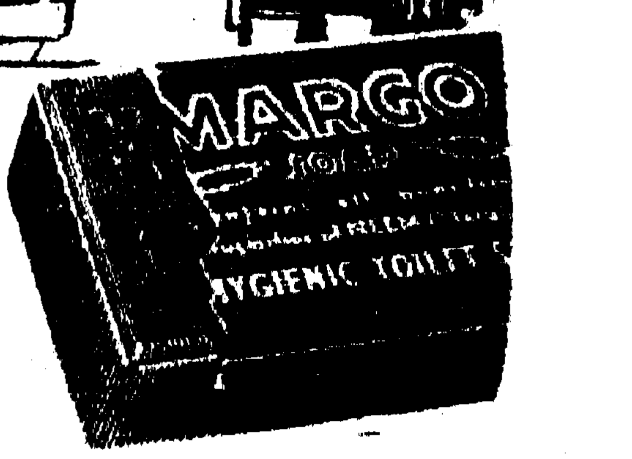

মার্গো সোপ

পরিবারের সকলেরই প্রিয় সাবান

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড, কলিকাতা-২৯

ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে কাপড় কেচে চলেছি। কান দুটো খাড়া। দুপুর বেলা রোদ্দুর চড়চড় করছে। অনেকক্ষণ সেই পচা জলে দাঁড়িয়ে থাকায় পা চুলকুচ্ছে। মুখ বুজে সব সহ্য করছি। আজ এস্পার কি ওস্পার। হঠাৎ পিছনে জলে সামান্য একটা শব্দ হল। চট করে চেয়ে দেখলাম, কিছুই নেই। যেই আবার সামনে ফিরেছি, অমনি দেখি বাঘ। একেবারে আমার পাটের উপর থাবা গেড়ে বসে জিভ দিয়ে সুক্ সুক্ করে ঠোঁট চাটছে। চট করে রাইফেলটার দিকে হাত বাড়ালাম। কিন্তু কোথায় রাইফেল? ঠাহর করে চেয়ে দেখি বাঘ সেটাকে কোন্ ফাঁকে নিয়ে ল্যাজে খেলাচ্ছে। উপায়ান্তর না দেখে আমি তৎক্ষণাৎ চোখ বুজে ফেললাম।

ব্রজদা গম্ভীরভাবে উঠে দাঁড়ালেন।

ম্লান হেসে ব্রজদা বললেন, এর পরেও কি আর তারপর থাকে? তারপর বাঘটা আমাকে খেয়ে ফেলল।

যাঃ! সুনীত প্রতিবাদ করল। কি যে বলেন? এই ত দিব্যি বেঁচে রয়েছেন।

লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্রজদা ব্যথা-ভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন, দ্যাখ, তোদের ব্রজদা যে-চোখে একদিন বাঙ্গালীর ছেলে বিজয় সিংহকে লঙ্কা জয় করতে দেখেছে আজ সেই চোখেই তাকে দেখতে হচ্ছে, বাঙ্গালীর ছেলে চারদিক থেকে মার খেয়ে পালিয়ে এসে নেড়িকুত্তার মত কেঁউ কেঁউ করছে। একে কি তোরা বাঁচা বলিস?

আহারের পর দিনে দু'বার..

সব ঋতুতে স্বাস্থ্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়

দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দ্দি, কাসি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।

সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য, ৩৬, গোয়ালপাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

(সি ৭৯২৭)

কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

(৩৭)

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কারা মেরেছে জানেন? শুনলেন কিছু?

গাঙ্গুলীবাবু বললে—অত শোনবার সময় হলো না, গুলীর আওয়াজ পেয়েই আমি তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসেছি মশাই—

অবশ্য পরের দিনই খবরের কাগজে বেরিয়েছিল। দীপঙ্কর তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথাও কিরণের নামটা দেখতে পেলে না। কিরণ ধরা পড়বার ছেলে অবশ্য নয়। তবু দীপঙ্কর যেন আশ্বস্ত হলো। সেদিন সমস্ত ডালহৌসী স্কোয়ারটাই যেন একটা আগুনের কুণ্ড হয়ে উঠেছিল। চারিদিকে পুলিস, চারিদিকে পুলিস-সার্জেণ্ট, চারিদিকে ঘেরাও করে ফেলেছিল সবাইকে। বহু নির্দোষী লোককেও লালবাজারের থানায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল। মিস মাইকেলের মুখটা ভয়ে একেবারে লাল হয়ে উঠেছিল। বয়েস কম নয় মেমসাহেবের। লিপস্টিক রুজ আর পাউডারের আড়ালে বয়েসটা ঢেকে রাখতো। বললে—আমি কী করে বাড়ি যাবো সেন?

দীপঙ্কর বললে—একটু থামুক, আমি তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবো—

সমস্ত ডালহৌসী স্কোয়ারটায় তখন সে কী উত্তেজনা। কখন স্বদেশীরা ঢুকেছিল ভেতরে, কেউ জানে না। পাকা নিখুঁত সাহেবী পোশাক-পরা তিনজন ছেলে ঢুকেছে রাইটার্স বিল্ডিং-এর ভেতরে। সবাই ভেবেছে, হয় খাঁটি সাহেব নয়তো অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। সিমসন সাহেব তখন ভারি ব্যস্ত—সামনে সেকশ্যানের বড়বাবু ফাইল দেখাতে নিয়ে এসেছে। হঠাৎ ঘরের দরজাটা খুলে যেতেই সাহেব বলে উঠেছে

—হুজ দ্যাট? কে?

সিমসন সাহেবের ঘরে অনুমতি না নিয়ে ঢোকা অপরাধ!

—হু আর ইউ?

কিন্তু কথাটা পুরো বলতেও পারলে না সাহেব। তার আগেই একটা গুলী এসে মুখে লাগলো। আর লেখা হলো না সাহেবের। হাত থেকে কলমটা খসে পড়লো।

বাইরে হোম সেক্রেটারী আলবিয়ন সাহেবের ঘর। আলবিয়ন মারে।

সেখানে গিয়ে একজন জিজ্ঞেস করলে—মারে সার টেব্‌ল্ পর হ্যায়?

উত্তরের জন্যে আর অপেক্ষা করেনি কেউ। ঘরের কাচে গুলী ছুঁড়তেই ঘরের দরজা ভেঙে গেল। আওয়াজ পেয়েই পুলিসের ইন্‌স্‌পেক্‌টর জেনারেল ক্রেগ্ সাহেব দৌড়ে এসে গুলী ছুঁড়েছে। অ্যাসিস্টেণ্ট ইনস্পেক্টার জেনারেল জোন্‌স সাহেবও তৎক্ষণে বেরিয়ে এসে গুলী ছুঁড়েছে। কিন্তু কারোর গুলীই ঠিক লোকের গায়ে লাগলো না। তারা তৎক্ষণে পাসপোর্ট অফিসের দিকে গেছে। সেখানে রিভলবারে গুলী ভর্তি করে নিয়ে বেরিয়ে আসছিল। জুডিসিয়াল সেক্রেটারী মিস্টার নেলসনের ঘরটা পাশেই। নেলসন সাহেব ঘর থেকে উঁকি মারতেই তার গায়ে একটা গুলী এসে লাগলো। একটা বিকট আর্তনাদ উঠলো মিস্টার নেলসনের মুখ দিয়ে।

পাশেই ছিল প্রেন্টিস্ সাহেবের ঘর। দৌড়তে দৌড়তে নেলসন সাহেব সেই ঘরে এসে ঢুকলো।

বাইরে রাইটার্স বিল্ডিং-এর কোরিডারে তখন গুলী ছোঁড়া-ছুঁড়ি চলেছে। জোন্‌স্ নেলসন সাহেবের বডিগার্ড গুলী ছুঁড়ছে স্বদেশীদের লক্ষ্য করে—ওরাও ছুঁড়ছে।

তেতলায় এডুকেশন সেক্রেটারী স্টেপলটন্ সাহেবের ঘর। স্টেপলটন্ সাহেব খবর পেয়েই লালবাজারে টেগার্ট সাহেবকে টেলিফোন করে দিলে।

বহু পত্র-পত্রিকার অভিনন্দন-ধন্য **নলিনীকান্ত সরকার** লিখিত জীবনী-গ্রন্থ

দাদাঠাকুর মূল্য—৫

আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর "Men I have seen"এর সার্থক অনুবাদ

মহান্ পুরুষদের সান্নিধ্যে মূল্য—৩·৫০

রাইটার্স সিণ্ডিকেট

৮৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

(সি-৭৭৬৩।৩)

রূপমঞ্জরী

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

নগর জীবনের ইতিবৃত্ত নয়, কোন উপনগরের উপাখ্যানও নয়, রূপমঞ্জরী নিতান্তই কয়েকটি গ্রাম্য মানুষের কাহিনী। কিন্তু গ্রামের মানুষ বলে কি তারা সবাই সরল আর সহজ মানুষ? তা নয়। বরং সামাজিক আর অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়ায় রূপ-মঞ্জরীর প্রায় সব কটি চরিত্রই এক একটি জটিল মানসিকতার প্রতিভূ। স্বপ্রতিষ্ঠ লেখকের সম্পূর্ণ নতুন ধরনের, নতুন স্বাদের উপন্যাস। দাম ২·৫০

দাঁড়ের ময়না	পূর্ণেন্দু পত্রী	উপন্যাস	৩·৫০
সাম্পিক	রমেশচন্দ্র সেন	উপন্যাস	৩·৫০
সন্ধ্যা-সকাল	শান্তিরঞ্জন বন্দ্যো	উপন্যাস	৪·৫০
রাহুর প্রেম	এমিলী ব্রণ্টী	উপন্যাস	৪·৫০
উর্বশী (২য় সং)	নারায়ণ গঙ্গো	গল্প	২·৫০
একটি সুরের কান্না	ভারতপ্রেম্	কাহিনী	২·৫০
পূর্বক্ষণ	ননী ভৌমিক	গল্প সংগ্রহ	২·০০
পরবাসী	বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত	কবিতা	২·০০

সাহিত্য ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা-১২

লালবাজার থেকে এসে হাজির হলো শুধু টেগার্ট নয়। গর্ডন সাহেব, বার্ট সাহেব, সবাই। লালবাজারের সমস্ত পুলিস এসে তখন রাইটার্স বিল্ডিং ঘিরে ফেলেছে। অফিসপাড়ার যত লোক মজা দেখতে এসেছিল, সবাইকে অ্যারেস্ট করে নিয়েছে পুলিস।

বার্ট সাহেব তখন সিমসন সাহেবের ঘরে ঢুকলো।

দেখলে—চেয়ারে বসে আছে একজন হেলান দিয়ে।

আর দুজন টেবলের নিচে বসে আছে।

খবর পেয়ে হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়লো টেগার্ট সাহেব। যে ছেলেটা চেয়ারে বসে ছিল, তাকে তখন ধরা অবান্তর। সে বোধহয় খানিক আগেই বিষ খেয়েছে। মাথাটা ঝুলছে তখনও কাত হয়ে।

টেগার্ট সাহেব টেবিলের নিচে রিভলবার বাগিয়ে ধরে চিৎকার করে উঠলো—হ্যান্ডস আপ্—

হাত তোলবার ক্ষমতাই তখন আর তাদের নেই। দুজনেই রিভলবার দিয়ে আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছিল—কিন্তু তখন তাদের গুলী ফুরিয়ে গিয়েছে। দুজনেই তখন ধুঁকছে।

টেগার্ট সাহেব জিজ্ঞেস করলে—কী নাম তোমার?

—দীনেশ গুপ্ত!

—আর তোমার?

—বিনয় বসু।

এই বিনয় বসুকে ধরিয়ে দেবার জন্যেই পুলিস এতদিন দশ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। একেই এতদিন খুঁজে বেড়াচ্ছিল পুলিস!

ততক্ষণে রাইটার্স বিল্ডিং-এর বাইরে পুলিস লাঠি নিয়ে তাড়া করেছে সবাইকে—ভাগো, ভাগো, শালা লোগ্—

কুকুর-বেড়ালের মত তাড়া করে এল পুলিস। তারপর হাসপাতালে বিনয় বসু মারা গেল। আর তারপর কিছুদিন পরে দীনেশ গুপ্তেরও ফাঁসি হয়ে গেল একদিন।

কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন তখন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। তিনি শোক-সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেন। তিনি বললেন—

"We have read instances in history, where the perpetratore of acts like these in one generation having been punished for them, have been acclaimed as martyrs by the next generation. Therefore let us pay our respect to the courage and devotion shown by this young man in the pursuit of his ideal".

তা মেমসাহেব সেদিন খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। থর থর করে কাঁপছিল। দীপঙ্কর যখন অফিস থেকে বেরোল, তখন সমস্ত জায়গাটাই বেশ ফাঁকা হয়ে গেছে।

পুলিসে ছেয়ে গেছে জায়গাটা। অফিসেও যারা দেরি করে কাজ করে, তারা মাইনের দিন বলে সকাল-সকাল চলে গিয়েছে। দীপংকরের নিজের একবার মনে হলো হয়ত কিরণও এর পিছনে আছে। হয়ত শেষ পর্যন্ত তাকেও ধরবে পুলিস। এবার ধরলে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না কিরণকে। এবার নিশ্চয়ই ফাঁসি হয়ে যাবে তার! সেই অফিসের ঘরের মধ্যে বসেও দীপংকরের নিজেকে আবার বড় ছোট মনে হয়েছিল। কিরণের তুলনায় অনেক ছোট! কিরণের মা, কিরণের বিধবা মা'র কছে খবরটা যাবে। এই সেদিন কিরণের বাবা গেছে, এবার কিরণ গেলে মাসীমা আর হয়ত বাঁচবে না। আবার হয়ত দীপংকরকেই শ্মশানে নিয়ে যেতে হবে মাসীমাকে!

মেমসাহেব বললে—আমার বড় ভয় করছে সেন—

গাংগুলীবাবু আগেই চলে গিয়েছিল। গাংগুলীবাবুর স্ত্রী পাঁচ বছর পরে সেরে উঠেছে। বেশি দেরি করে গাংগুলীবাবু বাড়ি যেতে চায় না। ছেলেমেয়ে, স্ত্রী নিয়ে এতদিন পরে সুখের সংসার করতে চায় গাংগুলীবাবু। মাইনে কম পায়, তাতে কী ক্ষতি! সত্যিই তো, সুখটাই বড়। শান্তিটাই বড়।

দীপংকর বললে—চলো, আমি তোমার বাড়ি পৌঁছে দেব মিস মাইকেল—

কোথায়, কোন্ দিকে মিস মাইকেলের বাড়ি, তা জানতো না দীপংকর। মিস মাইকেলই অনেক কষ্টে একটা ট্যাক্সি জোগাড় করে উঠলো। দীপংকর সামনের সীটে বসতে যাচ্ছিল। মেমসাহেব বললে—ওকি, ভেতরে বোস, আমার পাশে—

ট্যাক্সি চলার পর মিস মাইকেল আবার বললে—আমার এখনও ভয় করছে সেন—

—কেন, ভয় করবার কী আছে? আমি তো আছি।

মিস মাইকেল বললে—সব ইউরোপীয়ানদের এই রকম করে খুন করলে, কী হবে শেষকালে?

দীপংকর বললে—তা তুমি তো ইউরোপীয়ান নও, তুমি তো ইণ্ডিয়ান, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান—তোমার ভয় কী?

কিন্তু সে-কথা কি আর তখন কেউ শুনবে। সেদিন যখন আসবে, তখন ইণ্ডিয়ানরা সবাইকেই খুন করবে। স্বরাজ এলে ইউরোপীয়ান, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, কেউ-ই তখন রেহাই পাবে না। কিরণও একদিন সেই কথাই বলেছিল।

মিস মাইকেল বললে—ভিক্টোরিয়া বেশ আরামে আছে সেন—সে ছিল অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, এখন হয়ে গেল য়্যুরোপীয়ান—

ট্যাক্সির ভেতরে বসে দীপংকর বাইরের রাস্তার দিকে চেয়ে দেখছিল। সব যেন ফাঁকা হয়ে গেছে এদিকটা। এই অফিস-পাড়াটা। চৌরঙ্গীতে তখনও লোক-জন

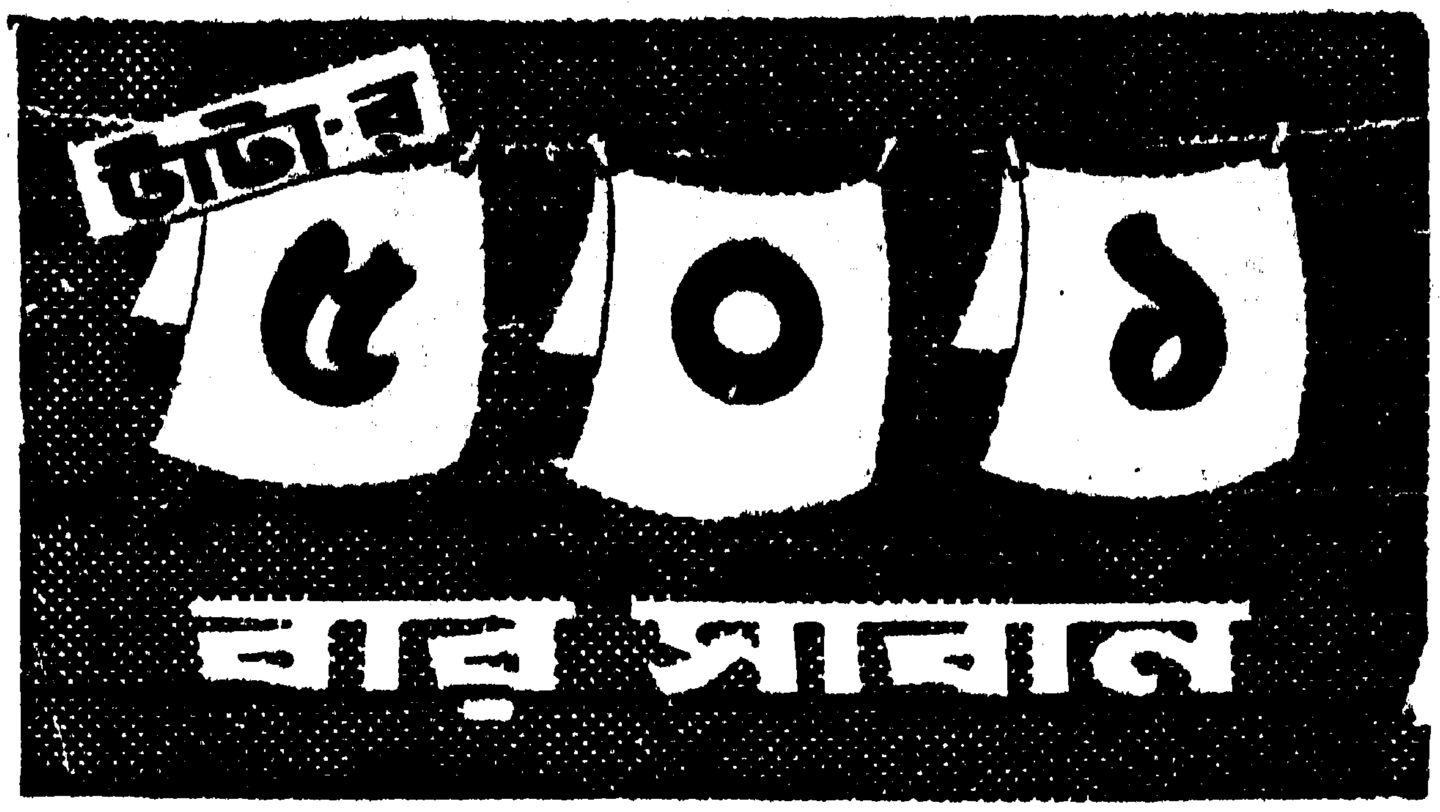

শালিমার
সুপারল্যাক

- এই সিন্থেটিক এনামেল রঙ তাড়াতাড়ি শুকোয়, শুকিয়ে শক্ত হয় ও খুব চকচকে উজ্জ্বল দেখায়।
- ঘরে বা বাইরে ব্যবহার করা যায়।
- বুরুশ দিয়ে, স্প্রে ক'রে বা এতে ডুবিয়ে লাগানো চলে।
- ৩৮ রকম রঙ, এক রঙের সঙ্গে অন্য রঙ মেশানো চলে।

JWTSPW 549 BEN

SHALIMAR PAINT, COLOUR & VARNISH CO., PRIVATE LTD.
Calcutta - Bombay - Madras - New Delhi - Kanpur
(ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে স্বত্বাধিকারী)

রয়েছে। জায়গায়-জায়গায় জটলা হচ্ছে। পুলিস দেখলেই দল ভেঙে সরে যাচ্ছে। লক্ষ্মীদির কথাও মনে পড়লো। এত করে দেখা করতে বলে আসার পরও অনন্তবাবু দেখা করলে না। ভালোই হয়েছে! তার কীসের গরজ! লক্ষ্মীদির সুবিধে হোক, অসুবিধে হোক, তার কিছু দেখবার দরকার নেই। শুধু লক্ষ্মীদি নয়, কারোরই সুবিধে-অসুবিধে দেখবার গরজ আর তার নেই।

মিস মাইকেল হঠাৎ বললে—কী ভাবছো সেন?

দীপঙ্কর বললে—কই, কিছু ভাবছি না তো!

—খুব আনমাইণ্ডফুল দেখছি যে তোমাকে?

দীপঙ্কর বললে—অন্য কথা ভাবছিলাম মিস মাইকেল—

—তুমি এত ভাবো কেন? সব সময়েই দেখেছি তুমি ভাবো!

দীপঙ্কর বললে—না, দেখ, আজ মিস্টার

সর্বত্র গৃহিণীরা বলাবলি করছেন

- সার্ফে কাচলে বোঝা যায়

সাদা জামাকাপড়

কতখানি ফরসা হতে পারে!

সার্ফে কাচলেই বুঝতে পারবেন যে সার্ফ জামাকাপড়কে শুধু "পরিষ্কার" করে না, ধপধবে ফরসা করে। সার্ফে কাচারও কোন ঝামেলা নেই। সহজেই সার্ফের দেদার ফেনা কাপড়ের ময়লা টেনে বার করে, কাপড় আছড়াবার কোন দরকার নেই। আর সার্ফে কাপড় যা পরিষ্কার হয় তা, না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। এর কারণ সার্ফের অদ্ভুত কাপড় কাচার শক্তি! দেখবেন সার্ফে রঙীন কাপড়ও কেমন ঝলমলে হবে! সার্ফে সবচেয়ে সহজে আর সবচেয়ে চমৎকার কাপড় কাচা যায়। ধুতি, শাড়ী, ফ্রক, জামা, তোয়ালে, ঝাড়ন-এক কথায় বাড়ীর সব জামা কাপড় সার্ফে কাচুন—দেখবেন ধবধবে ফরসা করে কাচতে সার্ফের জুড়ী নেই!

নীল সার্ফ দিয়ে বাড়ীতে কাচুন, কাপড় সবচেয়ে ফরসা হবে

SU. 12-X52 BG

হিন্দুস্থান-লিভারের তৈরী

রবিনসনকে বলে একটা কাজের কথা বলে-ছিলাম। সাহেবও রাজি ছিল। আমার এক রিলেটিভের জন্যে। তাকে বলেছিলুম আমার কাছে আসতে—কোনও ঘুষ দিতে হবে না, আমি তার কাজ করে দেব—

হঠাৎ ট্যাক্সিটা এসে একটা গলির মধ্যে থামলো।

মিস মাইকেল নেমে পড়লো। বললে—এখানেই আমার বাড়ি—

দীপঙ্কর বললে—তা হলে এবার আমি আসি মিস মাইকেল—

মিস মাইকেল হঠাৎ দীপঙ্করের হাতটা ধরে ফেললে—না-না, সে কি, আমার ফ্ল্যাটে এসো, একটুখানির জন্য আসতেই হবে—বেশিক্ষণ তোমায় আটকাবো না, আমার ঘরে কেউ নেই, আমি এলোন—

শেষ পর্যন্ত জোর করেই টেনে নিয়ে গেল মেমসাহেব। কেন যে তাকে তার ঘরে নিয়ে যাবার এত আকর্ষণ, কেন কে জানে! এ-ও কলকাতার আর একটা অংগ। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন থেকে ছোটবেলায় অনেক জায়গায় বেড়াতে বেরিয়েছে দীপঙ্কর, কিন্তু এমন জায়গায় কখনও আসেনি। ছোট ছোট দোকান চারদিকে। মাংসের দোকান, চায়ের দোকান, দরজির দোকান। চারদিকেই ভিড়। এত ভিড় যেন কালীঘাটেও নেই। শহরের একেবারে কেন্দ্রেও যে এমন পাড়া আছে, তা আগে জানতো না দীপঙ্কর। ছোট ছোট অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মেয়ে, খড়ম পায়ে দিয়ে মগে করে দোকান থেকে চা কিনে নিয়ে যাচ্ছে। দোকানগুলো সবই মুসলমানদের। লুঙ্গি পরে বেচা-কেনা করছে। মেমসাহেবদের সংগে খুব ভাব। মেমসাহেবরা একলাই দোকানে গিয়ে সওদা করছে। গম্ গম্ করছে সমস্ত পাড়াটা। এই যে একটু আগেই রাইটার্স বিল্ডিংএ এত বড় কাণ্ড হয়ে গেল, এখানে যেন তার কোনও আভাসই নেই। সহজ স্বাভাবিক জীবন এখানে। শিস্ দিতে দিতে কেল্লা থেকে টমিরা ঘুরছে। হাতে ছোট ছোট ছড়ি। লাল-লাল মুখ। খাঁকি পোশাক। বিরাট বিরাট আস্ত গরুর মাংস টাঙানো রয়েছে দোকানের সামনে। রাত্রি বেলাও মাছি এসে বসছে মাংসের গায়ে। টমিগুলো কিছু কিনছে না, কিন্তু খুব চেনা-লোকের মত রাস্তার চারদিকে দেখতে দেখতে চলেছে।

দীপঙ্কর বললে—আমি আর ভেতরে যাবো না আজ, অন্য দিন বরং যাবো—

—কেন? কী হলো তোমার বলো তো?

দীপঙ্কর বললে—মনটা সারাদিন খুব খারাপ হয়ে আছে আজ—

কেন? খারাপ কেন? এস, পাঁচ মিনিটের জন্যে এসো ভেতরে—

কাঠের সিঁড়ি। পুরনো বাড়ি। দেয়ালে খড়ি দিয়ে নানারকম ছবি আঁকা। এ-বাড়ির বাসিন্দারাই এঁকে রেখেছে। মস্ত বড় একটা মুখ সিগারেট খাচ্ছে। দুটো মুখ পরস্পরকে চুমু খাচ্ছে। এমনি নানারকমের ছবি সব।

মেমসাহেব সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললে—কেন, মন খারাপ কেন তোমার সেন? বস্ কিছু বলেছে?

—না-না, অফিসের কোনও কিছু ব্যাপারই নয়!

—তা হলে?

মেমসাহেব একটু কটাক্ষ করলো দীপঙ্করের দিকে। বললে—এনি লাভ-অ্যাফেয়ার? কোনও ভালোবাসার ব্যাপার?

—না-না, ভালোবাসা-টাসা আমার নেই মেমসাহেব! আমিও তোমার মত এলোন—

মেমসাহেব চাবি দিয়ে দরজার তালাটা খুললে। ঘরের জানলা-দরজা সব বন্ধ ছিল। একটা যেন কেমন ভিজে গন্ধ ঘরের ভেতর। জানলা খুলে দিতেই বাইরের হাওয়া একটু ঢুকলো ভেতরে। দীপঙ্কর ঘরের ভেতরে গিয়ে একটা চেয়ারে বসলো।

মেমসাহেব বললে—আমি আগে অফিসের কোনও লোককে ঘরে আনিনি জানো, তুমিই প্রথম এলে—

তারপর একটু থেমে বললে—দাঁড়াও তোমার জন্যে চা করি, বেশি দেরি হবে না—

দীপঙ্কর বললে—আমি তো চা খাই না তুমি জানো—

॥ প্রকাশিত হ'ল ॥

বারীন্দ্রনাথ দাশের

একটি অশ্রুতপূর্ব কাহিনী

অনেক সন্ধ্যা, একটি সন্ধ্যাতারা

মূল্য : চার টাকা

প্রকাশক ও বিক্রেতাঃ
গ্রন্থশ্রী প্রাইভেট লিমিটেড
৪৬।৫বি, বালিগঞ্জ প্লেস, কলি-১৯

পরিবেশক ঃ
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলি-১২

(সি ৭৮১৬)

ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত

সাধারণ মানুষের একটি রূপ আছে, যে রূপটিকে বলা যায় বিশ্বজনীন। দেশ ভেদে, সময় ভেদে তার বিশেষ তারতম্য নেই। কিন্তু এছাড়াও মানুষের একটি জাতিগত-রূপ আছে, যা দেশ-কাল ভেদে আপন ঐতিহ্য অনুযায়ী গড়ে ওঠে এবং যা মানুষের বিশ্বজনীন রূপ থেকে খানিকটা স্বতন্ত্রও বটে। জাতীয় জীবনদর্শন ও ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করলে বিষয়টি আরও পরিস্ফুট হয়। ভারতীয় দর্শন, ধর্ম ও সাহিত্যে 'শক্তি-সাধনা' একটি বিশিষ্ট আসনে প্রতিষ্ঠিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর দাশগুপ্ত এই গ্রন্থটিতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শক্তি-সাধনার ও শাক্ত সাহিত্যের তথ্য-সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক আলোচনা করে এদেশের ঐতিহ্যের এই দিকটা রূপায়িত করেছেন; শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে শাক্তধর্মের আধ্যাত্মিক রূপটিও তুলে ধরেছেন। বিদগ্ধ ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকমণ্ডলীর কাছে বইটি অপরিহার্য। দাম পনর টাকা।

সাহিত্য সংসদ। ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা—৯

—তা হলে কী খাবে তুমি?

—কিছু খাবো না আমি, শুধু তোমার অ্যালবামটা দেখেই চলে যাবো, আমার মা ভাববে বেশি দেরি হলে!

—তা হলে একটু পুডিং খাও—

বলে মেমসাহেব পর্দার আড়ালে গিয়ে কী করতে লাগলো। খুট-খাট শব্দ! মাঝে-মাঝে টুং-টাং শব্দ হচ্ছে। তারপর স্টোভ জ্বালার শব্দ হলো। ছোট্ট একটুখানি ঘর। কিন্তু পর্দা, আলো, পুরনো ফার্নিচারের বাহুল্যে ঘরটা ভরে আছে। দেয়ালে অনেকগুলো ছবি। দেয়াল ভর্তি ছবি। অনেক পুরুষ অনেক মেয়ের ছবি। কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন ছেলে আর একজন মেয়ে। কোথাও দুটি মেয়ে দুজনকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে। ঘরের সিলিং থেকে ঝুলছে রঙিন কাগজের ফানুস।

হঠাৎ পর্দার ভেতর থেকে মেমসাহেব বেরিয়ে এল। হাতে এক কাপ চা আর দুটো ডিশে পুডিং—

মেমসাহেব দীপঙ্করের দিকে চেয়ে বললে—আবার ভাবছো নাকি সেন?

দীপঙ্কর ধরা পড়ে গিয়ে হাসলো। বললে—না ভাবছি না, আর ভাববো না—

তারপর হঠাৎ মিস মাইকেলকে যেন বড় ভালো লোক বলে মনে হলো। কেন তাকে মেমসাহেব ডেকে আনলে, এত লোক থাকতে? কই, কেউ তো দীপঙ্করকে এত আগ্রহ করে ডাকে না। শুধু কি নিজের কথা বলবার জন্যে!

মেমসাহেব বললে—ভাবলে লাইফের কুল-কিনারা পাবে না সেন, তার চেয়ে খাও—

দীপঙ্কর বললে—তুমি নিজেই রান্না করো নাকি?

—নিজে রান্না করবো না তো কে করবে? কুক্? আমার একলার লাইফ, কুক রেখে কী হবে! আর আমি মাইনে কী পাই, তা তো তুমি জানো! আগে যখন ভিভিয়ান ছিল, তখন একদিন ভিভিয়ান রাঁধতো, একদিন আমি রাঁধতুম—

হঠাৎ বাইরে দোতলার ওপর কোথায় যেন খুব নাচ-গান আরম্ভ হলো। মাথার ওপর দুম দুম করে নাচছে কারা?

দীপঙ্কর বললে—কে নাচছে?

—ও কেউ না, ভাড়াটেদের বাড়ির মেয়েরা!

খাবার পর মেমসাহেব অনেকগুলো অ্যালবাম বার করলে। বেশ চামড়ায় বাঁধানো অ্যালবাম। দীপঙ্কর ছবিগুলো দেখতে লাগলো। মিস মাইকেলের কত রকম ভঙ্গির ছবি সব। জোড়ায় জোড়ায় ছবি। বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে বিভিন্ন ভঙ্গি। কোথাও মিস মাইকেল গাউন পরেছে। কোথাও প্রায় সমস্ত শরীরটাই দেখা যায় শুধু হয়ত কোমরে একটুখানি কাপড়ের টুকরো লেগে আছে। দীপঙ্কর দেখতে দেখতে একবার চোখ নামিয়ে নিলে। কান মুখ কপাল সব যেন তার ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগলো। এসব ছবি কেন তাকে দেখাচ্ছে মেমসাহেব? ওপরে নাচের সঙ্গে গানও চলছে মনে হলো। দীপঙ্করের মনে হলো এখনি উঠে যায় সে! এ-সব ছবি তাকে দেখানো কী দরকার।

—কেমন সেন? হাউ ডু ইউ লাইক ইট? তোমার পছন্দ হয়?

কী আশ্চর্য! এরা কী! এদের একটু লজ্জাও নেই! একটু দ্বিধা-সংকোচ কিছুই নেই!

—আচ্ছা সেন, আমার ফিগার ভাল না ভিভিয়ানের? সত্যি বলো তো!

দীপঙ্কর এতক্ষণে মুখ তুললে।

বললে—এসব আমাকে দেখাচ্ছ কেন মেমসাহেব? আমি তোমাদের ফিগারের কী বুঝি?

মেমসাহেব হেসে উঠলো। বললে, তুমি কখনও মেয়েদের সঙ্গে মেশোনি? তোমার কোনও লেডী-লাভ নেই?

মনে আছে, সেদিন মিস মাইকেলের ঘরে বসে দীপঙ্কর যেন অন্য এক জগতে চলে গিয়েছিল। যে-মিস মাইকেল অফিসে স্টেনোগ্রাফার, সে যেন এই মেয়ে নয়। মিস মাইকেল মানুষের এই পৃথিবীতে এসে যেন হেরে গিয়েছিল! কবে যাত্রা শুরু করেছিল একদিন আর সকলের সঙ্গে। যৌবন ছিল সেদিন। তার জন্যে দলে দলে ইয়ং ম্যানরা এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতো। মটর-বাইক নিয়ে আসতো। সন্ধ্যেবেলা হলেই ভিড় করতো তারা নিচেয়। শিস দিত নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

মেমসাহেব বললে—আমার তখন তোমার মত বয়েস, জানো সেন—

—সেই জন্যেই কি তুমি আমাকে এখানে ডেকে নিয়ে এসেছ?

মেমসাহেব হাসলো। বললে—না, ডেকেছি, কারণ তুমি তবু বুঝতে পারবে—তারপর যখন তুমি বড় হয়ে যাবে, তোমার বয়েস বেড়ে যাবে, তখন তো আর বুঝতে পারবে না—

মেমসাহেবের ওপর আর ঘৃণা হলো না দীপঙ্করের। মেমসাহেবের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। সত্যিই দেখলে মায়া হয়। এখন আর কেউ আসে না। এখন আর সেই আগেকার মত নিচে মটর বাইক নিয়ে এসে কেউ শিস দিয়ে ডাকে না তাকে। এখন যারা আসে, তাদের লক্ষ্য অন্য জায়গায়।

মেমসাহেবের গলাটা করুণ হয়ে উঠলো বড়। বললে—এখন আর কেউ আসে না সেন—অবশ্য আসে এক-একজন মাঝে-মাঝে—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কারা?

মেমসাহেব সে-কথার উত্তর দিলে না। বললে—আগে যারা আসতো, তারা আমার জন্যেই আসতো আর ভিভিয়ানের ফিগার তো দেখেছো. ভিভিয়ানের সেই জন্যে হিংসে ছিল আমার ওপর—। আমি নিজে ভিভিয়ানকে কত ফ্রেন্ড জুটিয়ে দিয়েছি। ভিভিয়ানের জন্যে আমি কতদিন খারাপ করে সেজেছি—

তারপর হঠাৎ মেমসাহেব আলমারি খুলে একটা প্যাকেট বার করলে।

বললে—এই দেখ—

বেশ যত্ন করে সিল্কের ফিতে দিয়ে বাঁধা প্যাকেট। দামী জিনিসের মত তুলে রেখে দিয়েছে মেমসাহেব। প্যাকেটটা বার করতেই ভুর্ ভুর্ করে সেন্টের গন্ধে ভরে গেল ঘরটা। আস্তে আস্তে মিস মাইকেল

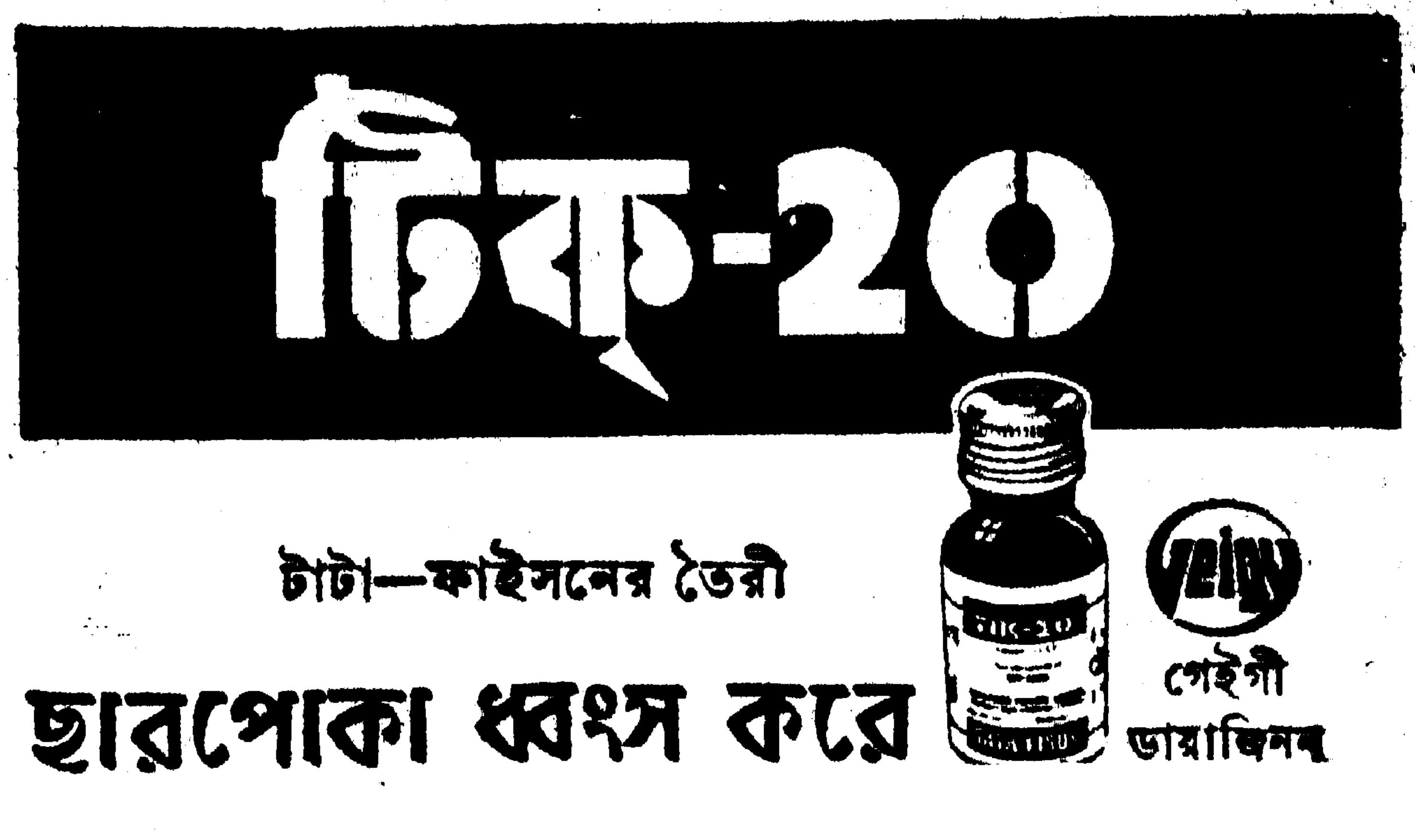

প্যাকেটটা খুললে। নানা রং-এর চিঠি। কত রকম বিচিত্র কাগজ। কত বিচিত্র ছবি আঁকা। কেউ লিখেছে 'মাই লাভ', কেউ লিখেছে 'ডিয়ারেস্ট', কেউ লিখেছে 'মাই সুইটি'—কত যে বিচিত্র সম্বোধন!

মেমসাহেব বললে—এই চিঠিগুলো সব মাঝে-মাঝে খুলে পড়ি, জানো সেন, রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়ি—পড়তে পড়তে আমার পুরনো কথাগুলো সব মনে পড়ে যায় — তখন যেন আবার পুরোন দিনে ফিরে যাই আমি—

মেমসাহেবের চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো। এ-ও একরকম মানুষ তো! কলকাতা শহরে কত লোকের কত রকম সমস্যা—কিন্তু এ-সমস্যার কথা সত্যিই দীপঙ্কর জানতো না। পাঁচশো তেত্রিশটা চিঠি। চিঠি যারা লিখেছিল, তারা কোথায় চলে গেছে, কেউ জানে না হয়ত! এরাই একদিন এই ফ্ল্যাট-বাড়ির তলায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে শিস দিয়েছে। কেউ কেউ হয়ত আবার মিস মাইকেলকে মটর-বাইকের

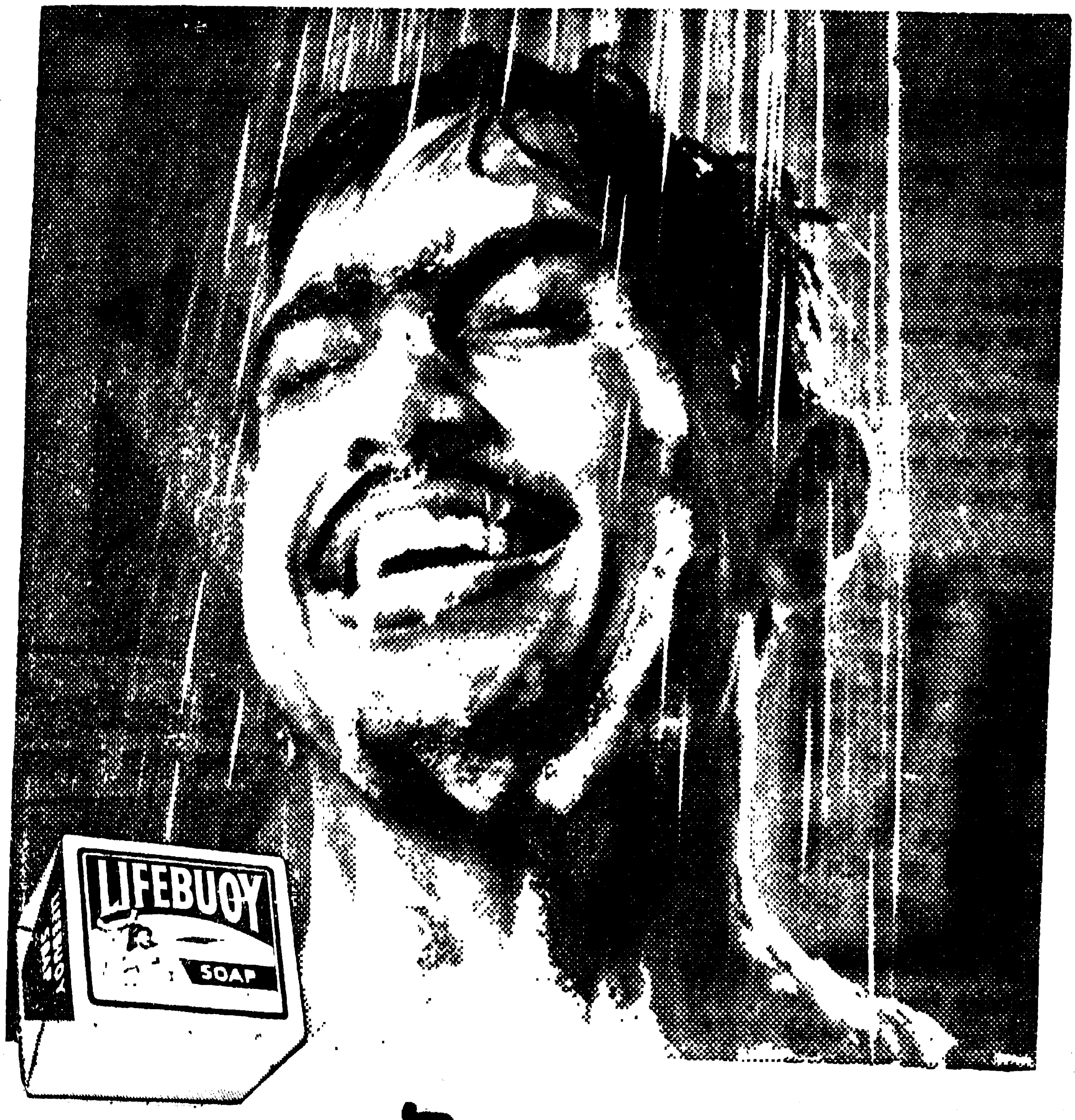

লাইফবয় যেখানে
স্বাস্থ্যও সেখানে!

সত্যিই, লাইফবয় মেখে স্নান করতে কি আরাম! শরীরটা তাজা আর ঝরঝরে রাখতে লাইফবয় সাবানের তুলনা নেই। ঘরে বাইরে ধুলো ময়লা লাগবেই লাগবে। লাইফবয় সাবানের চমৎকার ফেনা ধুলো ময়লা রোগ বীজাণু ধুয়ে দেয় ও স্বাস্থ্যকে রক্ষা করে। পরিবারের সবার স্বাস্থ্যের যত্ন লাইফবয়ে।

L. 20-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

পেছনে নিয়ে ঘুরিয়েছে। হোটেলে খাইয়েছে। নেচেছে। তারপর হয়ত অনেক রাত্রে আবার এইখানে পৌঁছে দিয়ে গেছে। তখন হয়ত মিস মাইকেল নেশায় টলছে!

—এরা সব কোথায় গেল মিস মাইকেল?

মিস মাইকেল বললে—কখন যে সবাই কোন্ দিকে ছিটকে ছড়িয়ে গেল, তার হিসেব রাখবারও সময় পাইনি সেন. মাঝে-মাঝে এক-একজনের সঙ্গে দেখা হয়। সেদিন আর্থারের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল হঠাৎ হগ মার্কেটে সঙ্গে তার মিসেস রয়েছে, বেবীরা রয়েছে, আমি চিনতে পারলুম, কিন্তু আর্থার আমাকে চিনতেও পারলে না—অথচ—

—অথচ?

মিস মাইকেল বলতে লাগলো—অথচ ওই আর্থারের কত চিঠি আছে এর মধ্যে, ওই আর্থার আর আমি একবার ওর ফ্ল্যাটে সেভেনটি-টু আওয়ার্স একসঙ্গে কাটিয়েছি, একসঙ্গে খেয়েছি, একসঙ্গে জেগেছি, একসঙ্গে ঘুমিয়েছি, একসঙ্গে ড্রিংক করেছি—

—তুমিও ড্রিংক করো নাকি মিস মাইকেল?

—ড্রিংক?

মিস মাইকেল খিল খিল করে হেসে উঠলো। —ড্রিংক করবো না? ড্রিংক না করলে কবে সুইসাইড করতুম সেন, আমি রোজ ড্রিংক করি, এই দেখ—

হঠাৎ উঠে গিয়ে মিস মাইকেল তার কাবার্ডটা খুলে একটা বোতল বার করলে। দীপঙ্করের দিকে চেয়ে বললে—তুমি খাবে?

—না-না—দীপঙ্কর জোরে জোরে হাত নাড়লে।

আর-একটু হলেই মুশকিলে পড়েছিল দীপঙ্কর। হয়ত পীড়াপীড়ি করতো খুব।

তবু মেমসাহেব বললে—খাও না, একটু-খানি খাও—দেখবে এ-খেলে তুমি তোমার সব ওরিজ ভুলে যাবে, সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে থাকতে পারবে—খাও না—

অদ্ভুত লাগলো দীপঙ্করের। হেসে বললে—না, না— আমার কোনও ওরিজ নেই। মেমসাহেব—আমার কোনও সমস্যাই নেই। যাদের নিয়ে আমার ভাবনা ছিল, তারা সবাই কোথায় চলে গেছে, সবাই ভুলে গেছে আমাকে—আমি আবার একলা হয়ে গেছি—

মেমসাহেব বললে — আমারই কি আগে কোনও ভাবনা ছিল না? কোনও ভাবনা ছিল না! আমি আর ভিভিয়ান দিন-রাত ফুর্তি করেছি, দিনরাত ড্রিংক করেছি তখন—তখন কি ভিভিয়ান জানতো যে, সে হবে ফিল্ম-স্টার, আর আমি রেলওয়ে অফিসে চিরকাল রট করবো—!

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—ভিভিয়ান তোমাকে এখনও চিঠি লেখে?

মেমসাহেব বললে—না সেন, এখন সে আমার কথা ভুলেই গেছে, এখন সে রেলওয়ের কথা ভুলেই গেছে—অথচ আমার জন্যেই সে আজ এত ফেমাস হতে পারলো। আমি আমার ফ্রেন্ডের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলুম বলেই সে আজ ফিল্ম স্টার—

দীপঙ্কর মাথা নিচু করে দু-একখানা চিঠি আবার পড়তে লাগলো। কত ভালবাসার কথা রয়েছে চিঠিগুলোতে সব। কী আগ্রহ সকলের মিস্ মাইকেলের জন্যে! কত চুমু পাঠিয়ে দিয়েছে, কত প্রেম-নিবেদন। পড়তে পড়তে দীপঙ্করের সত্যিই হাসি পেতে লাগলো। ভালবাসা বুঝি একেই বলে। কাছাকাছি থাকা, তবু দুবেলা চিঠি লেখা। চিঠি না পেলে মন খারাপ হয়ে যাওয়া। আর সেই চিঠিগুলো সিল্কের ফিতে জড়িয়ে যত্ন করে তুলে রাখা।

দোতলার ওপরে নাচ-গান তখনও চলছে।

দীপঙ্কর বললে—এবার উঠি মিস মাইকেল, তোমার অনেক দেরি করে দিলাম—

ভাস্কর

(শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ) প্রণীত

সরস গল্প ও প্রবন্ধ : লেখা ৩.০০
সরস গল্পের বই : শতভী ১.৫০
কণিকা ১.৫০
মজলিস ১.৫০
ভজহরি ১.৫০
উপন্যাস : পূর্ণিমা ৩.৫০
নাটক : কলের গরু ২.০০
জীবনী : বাংলার একটি বিস্মৃত রত্ন ১.০০
কবিতা : ভাগীরথী ১.৫০
ভাষা-বিষয়ক :
German Word Book for Beginners 1.50
French Word Book for Beginners 1.00

প্রাপ্তিস্থান :
দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
৫৪/৩ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

(সি ৭৭৪৯)

ধবল বা শ্বেত

শরীরের যে কোন স্থানের সাদা দাগ, একজিমা, সোরাইসিস ও অন্যান্য কঠিন চর্মরোগ, গাত্রে উচ্চবর্ণের অসাড়যুক্ত দাগ, ফুলা, আঙ্গুলের বক্রতা ও দূষিত ক্ষত সেবনীয় ও বাহ্য দ্বারা দ্রুত নিরাময় করা হয়। আর পুনঃ প্রকাশ হয় না। সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ফোন : ৬৭-২৩৫৯। শাখা : ৩৬, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯। (পূরবী সিনেমার পাশে)।

অভিযান
পূজা সংখ্যা
এবার থাকবে
৪টি উপন্যাস
লিখবেন:
গজেন মিত্র, বাণী রায়, শক্তিপদ রাজগুরু ও মানবেন্দ্র পাল
তা' ছাড়া থাকবে
সিনেমা ও থিয়েটার সংক্রান্ত প্রচুর লেখা ও প্রচুর ছবি।
মূল্য—২

যষ্টি-মধু
ভঙ্গ বঙ্গের রঙ্গ ব্যঙ্গের মাসিক পত্রিকা
সম্পাদনা : কুমারেশ ঘোষ
বহু রঙ্গ-রচনায় ও ব্যঙ্গচিত্রে সুশোভিত পূজা সংখ্যা বার হচ্ছে। ২.০০
৪৫এ, গড়পার রোড, কলিকাতা-৯

'পূজায় প্রিয়জনকে উপহার দিবার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ
জাতিস্মর-কথা
বাংলা-সাহিত্যে এ গ্রন্থের আর জুড়ি নেই। বিশিষ্ট সংবাদপত্র ও পত্রিকা, বিদগ্ধ সমালোচকগণ কর্তৃক অভিনন্দিত। জীবনের গতিছন্দে ছেদ নেই বিরতি নেই, শাশ্বত পথিকের চলার বিরাম নেই—এই মহাসত্য জাতিস্মর-গণ কর্তৃক বিবৃত। মূল্য ৪.৭৫।
প্রকাশক — দি ছাটশীলা কোম্পানী, ৩, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা
প্রাপ্তিস্থান—দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, ৫৪/৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
চক্রবর্তী চাটার্জি এণ্ড কোং, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২
ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

—না, আর একটু বোস।

বলে মিস মাইকেল চিঠিগুলো একে-একে আবার বেঁধে ফেললে ভাল করে। তারপর সেগুলো আলমারির ভেতরে তুলে রাখলে। আশ্চর্য, চিঠিগুলো, অত যত্ন করে রেখে দিয়ে কী লাভ হবে মিস মাই-কেলের! ওগুলো এখন আর কী কাজে আসবে!

মেমসাব?

বাইরের দরজায় একটু আস্তে টোকা পড়লো। শুনেই মিস মাইকেল উঠলো। বললে—কে? কোন্ হ্যায়?

দরজাটা খুলতেই একটা লুঙ্গি-পরা ছেলে এগিয়ে এল। বললে—মেমসাব—একঠো সাব আয়া—

মিস মাইকেলের মুখখানা যেন কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বললে—তুম্ যাও রহিম—যাও তুম—

রহিম তবু যায় না। দাঁড়িয়ে রইল মেম-সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে। বললে—সাহেব এসেছে মেমসাহেব, খুব বড় আদমি, খুব বড় গাড়ি নিয়ে এসেছে—বিলিতি সাহেব।

মেমসাহেব বললে—তুই আর কোথাও নিয়ে যা সাহেবকে, আমার সময় নেই এখন—

তবু রহিম ছাড়ে না। বলে—সব মিসিবাবার ঘরে আদমী আছে মেমসাব, আজ কেউ খালি নেই—

—বেরো এখান থেকে, গেট আউট—

মিস মাইকেল হঠাৎ যেন রেগে আগুন হয়ে গেল। বললে—বলছি আমার সময় নেই, তবু কথা বলছে, বেরিয়ে যা—

এবার রহিমের মুখের ওপরেই দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলে মিস মাইকেল। তারপর আস্তে আস্তে এসে আবার চেয়ারটায় বসলো। দীপংকর দেখলে মেমসাহেবের মুখটা কেমন হয়ে গেছে যেন! হঠাৎ যেন কেউ অপমান করেছে মিস মাইকেলকে। খানিকক্ষণ কোনও কথাই বলতে পারলো না মেমসাহেব।

দীপংকর বললে—আমি তা হলে উঠি মিস মাইকেল—

মিস মাইকেল চোখ তুলে চাইতে পারলে না দীপংকরের দিকে। দুই হাত দিয়ে হঠাৎ নিজের মুখখানা ঢেকে ফেললে। তারপর খানিকক্ষণের জন্যে আর মুখই তুলতে পারলো না উঁচু করে।

বড় মুশকিলে পড়লো দীপংকর। লজ্জাটা যেন মিস মাইকেলের নয়, দীপংকরের। হঠাৎ মেমসাহেবকে না-বলেও যাওয়া যায় না। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল দীপংকর। মিস মাইকেলের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলো।

—মিস মাইকেল—

মেমসাহেব এতক্ষণে মুখ তুললো। এরই মধ্যে চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল হয়ে গেছে। ফুলে উঠেছে। অনেক ভিজে-ভিজে রয়েছে চোখের পাতাগুলো।

—মিস মাইকেল, এবার আমি উঠি?

মিস মাইকেলও দাঁড়িয়ে উঠলো। বললে—তুমি যা দেখলে, তা ভুলে যেও সেন, ফরগেট ইট, প্লিজ—

বলতে বলতে মেমসাহেব আবার মুখ নিচু করে ফেললে। মুখ নিচু করেই বললে—আমাকে ভুল বুঝো না সেন, প্লিজ ভুল বুঝো না—চিরকাল আমি এমন ছিলুম না, এর জন্যে আর কেউ দায়ী নয়, কেউ দায়ী নয়, কেউ দায়ী নয়—দায়ী শুধু ভিক্টোরিয়ান, ভিক্টোরিয়া আমাকে পাগল করে দিয়েছে সেন দি ম্যান বিহাইন্ড মাই লাইফ—

বলতে বলতে আর সামলাতে পারলে

এবার পূজায় ছোটদের দুটি অপূর্ব বই

ছড়া-সঞ্চয়ন
প্রাচীন ও আধুনিক
ছড়ার অভিনব সঙ্কলন

শ্যামলা-দীঘির ঈশান কোণে
মিষ্টি ছন্দে মনোরম কাহিনী
পাতায় পাতায় রঙীন ছবি

= প্রতিটি আড়াই টাকা =

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ কলিকাতা-৯

এবারের সর্বশ্রেষ্ঠ শারদীয় সংকলন

= ১০৪ পৃষ্ঠা =

শারদীয়া
রূপাঞ্জলি

মূল্য—২.৫০

॥ প্রত্যেক রেলওয়ে হুইলার বুকস্টলেই পাবেন ॥

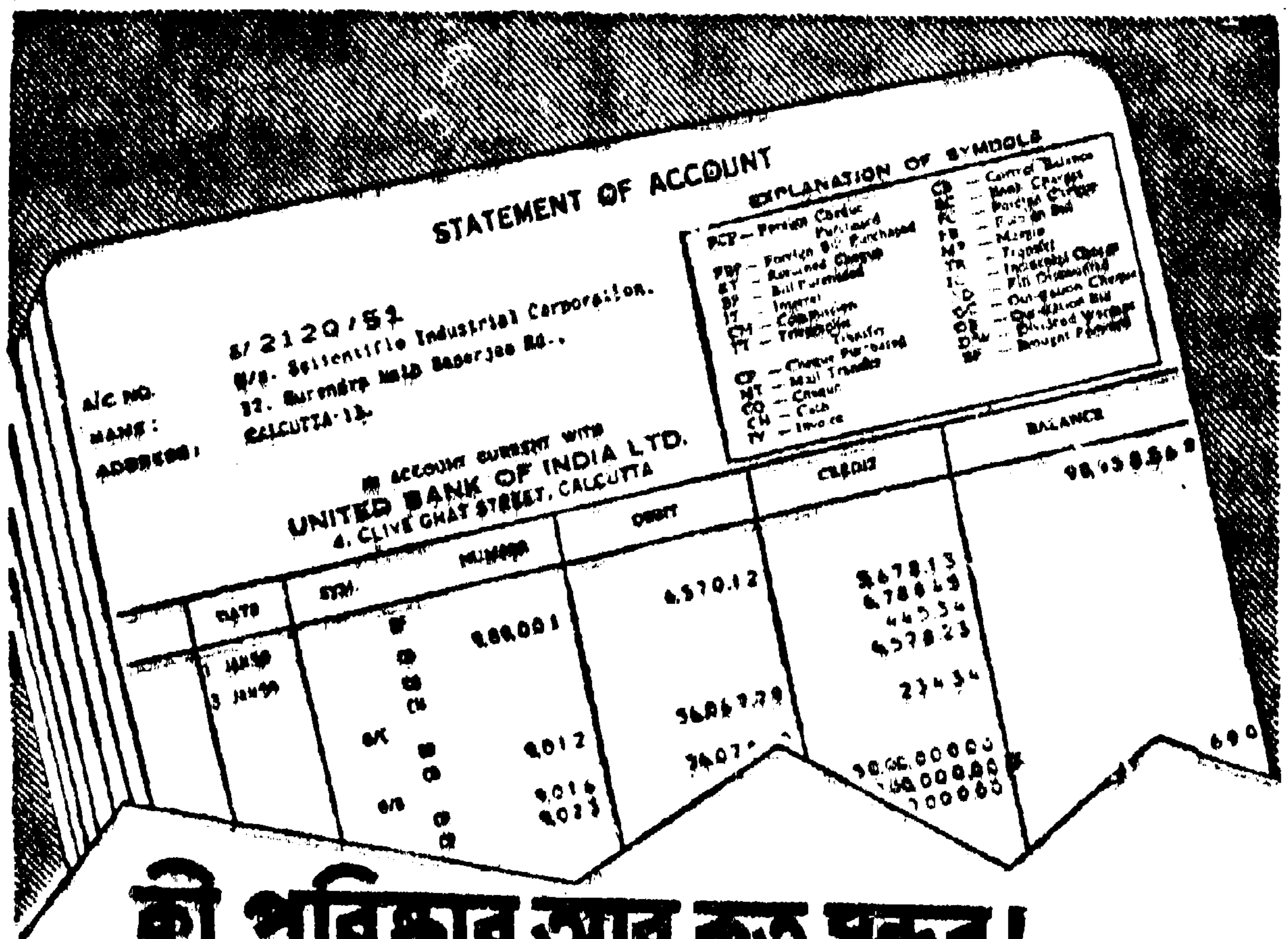

কী পরিষ্কার আর কত সুন্দর!

ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের হেড অফিস, আর আরও কয়েকটি ব্রাঞ্চ এমনি সুন্দর হিসাব-স্টেটমেন্ট অব একাউন্ট পাঠায়, একেবারে ছাপার মত পরিষ্কার ছিমছাম। বুঝতে কষ্ট নেই, গুছিয়ে রাখতেও সুবিধে। মেশিনে ছাপা হয় এগুলো। ব্যাঙ্কের অন্যান্য ব্রাঞ্চও ক্রমশঃ এমনি ছাপা স্টেটমেন্ট পাঠাবে। ব্যাঙ্কের কাজে শ্রমলাঘবকর মেশিন চালু করতে
ইউনাইটেড ব্যাঙ্কই অগ্রগামী।

সেবার প্রতীক

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ
হেড অফিস: ৪, ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা-১

স মিস মাইকেল। একেবারে দীপংকরের সামনেই চোখে রুমাল চাপা দিলে।

তারপর বোধহয় হঠাৎ আবার সম্বিত ফিরে এল। চোখ মুখ মুছে বললে—অলরাইট, তুমি আজ আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছ বলে ধন্যবাদ—কালকে আবার অফিসে দেখা হবে—

দীপংকরের কিছু বলবার ছিল না। বলতে পারলেও না। সমস্ত ঘটনাটা যেন একটা স্বপ্নের মত ঘটে গেল। হয়ত এ-পাড়ার জীবনে এ-ঘটনা নিত্য-নৈমিত্তিক। এখানে এমন ঘটনা রোজকার। তবু সব দেখে যেন নির্বাক হয়ে গিয়েছিল দীপংকর। যে-মেমসাহেবকে রোজ অফিসে দেখে, এ যেন সে-মেমসাহেব নয়। কবেকার কোন্ বন্ধুর ভাগ্যের উদ্‌ভ্রান্ত মেমসাহেব যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে। একজন যশের শিখরে উঠে গেছে অদৃশ্য এক ভাগ্যের দৌলতে, আর অন্য একজন এখানেই পড়ে আছে তার ভাঙা অদৃষ্টের সমস্ত হাহাকার নিয়ে। এও কি কম ট্র্যাজেডি! তবু দীপংকর এখানে আজ এসেছিল বলেই তো এমন করে জীবনের আর-একটা দিক দেখতে পেলে! সেই কালীঘাট বাজারের পেছনে ছিটে-ফোঁটার যে-জীবন, এখানে এই কলকাতা শহরের একেবারে কেন্দ্রেও যেন সেই জীবনেরই পুনরাবৃত্তি দেখে গেল দীপংকর। অথচ সেই কালীঘাটের বাজারের জগতে যারা নিঃশব্দে বিচরণ করে তারা মানুষের চোখে ঘৃণ্য বলে ঘোষিত হয়। আর এখানে, এই সভ্য জগতে যারা আসে তারা সম্ভ্রান্ত, তারা চিহ্নিত। তফাৎ শুধু এইটুকুই যে সেখানে যৌবনের বাজি খেলা চলে গোপনে, আর এখানে সানন্দে সগৌরবে, উচ্চ ঘোষণা করে! নির্লজ্জ, সদম্ভ এখানকার যৌবনের কারবার!

কিন্তু তখনও হয়ত দীপংকরের দেখবার সামান্য কিছু বাকি ছিল।

বাইরের দরজার কড়াটা আবার নড়ে উঠলো। বেশ সচকিত শব্দ এবার। বেশ উচ্চারিত!

আবার বোধহয় বাইরে এসেছে। অনুনয়, বিনয়ে আবার হয়ত মিস্ মাইকেলকে রাজি করাতে এসেছে।

—কে? কোন হ্যায়?

চীনে পাড়াতে লক্ষ্মীদিকেও একদিন এমনি করে আগন্তুক সামলাতে হয়েছে। মিস্ মাইকেলের ঘরে দাঁড়িয়ে সেই দিনকার কথাগুলো মনে পড়লো দীপংকরের।

মিস্ মাইকেল বললে—একটু দাঁড়াও সেন। দেখি কে ডাকছে—

দরজাটা খুলতেই দীপংকর যেন সামনে ভূত দেখলে।

মিস্টার ঘোষাল!

পেছনেও যেন আর একজন কে রয়েছে। অন্ধকারে ভাল করে দেখা গেল না তার মুখটা।

দীপংকরকে দেখেই মিস্টার ঘোষাল এগিয়ে এল। বললে—হ্যালো, আমি তোমাকে চিনি মনে হচ্ছে—

দীপংকর দাঁড়িয়ে উঠে বললে—আমি দীপংকর সেন, জাপান-ট্র্যাফিক ক্লার্ক—

—হোয়াট্ ব্রট্ ইউ হিয়ার? তুমি এখানে কী করতে?

দীপংকরকে এর উত্তর দিতে হলো না। মিস মাইকেলই বুঝিয়ে দিলে। রাইটার্স বিল্ডিংএ গল্পীচালানোর জন্য মেমসাহেব নিজেই সেনকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। সেন আসতে রাজি হয়নি। বলতে গেলে মেমসাহেবের পীড়াপীড়িতেই সেন এখানে এসেছে স্যার!

—আই সী!

বোধহয় বেশি সময় ছিল না মিস্টার ঘোষালের হাতে। ভারি ব্যস্ত-সমস্ত ভাব। যেন একটু আগেই কোথা থেকে ঘুরে এসেছে। সারা মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে। মিস্ মাইকেলকে হঠাৎ বাইরে ডেকে নিয়ে গেল মিস্টার ঘোষাল। দীপংকর একলা বসে রইল ঘরে। বাইরে নিচু গলায় কী যেন সব কথা হতে লাগলো ওদের।

দীপংকর চুপ করে বসে বসে ঘামতে লাগলো!

এখানে কেন এল মিস্টার ঘোষাল! এত জায়গা থাকতে এই মিস্ মাইকেলের বাড়িতে! যে লোক অফিসে এত গম্ভীর হয়ে কথা বলে, সেই এখন হেসে কথা বললে দীপংকরের সঙ্গে! কী অদ্ভুত লোক! কী আশ্চর্য চরিত্র!

হঠাৎ মিস্ মাইকেল আবার ঘরে ঢুকেছে।

দীপংকর জিজ্ঞেস করলে—মিস্টার ঘোষাল চলে গেছে?

—হ্যাঁ

—এখানে কেন এসেছিল, তোমার কাছে?

মেমসাহেব হাসলো। বললে—ও এসেছিল গার্লস্ খুঁজতে—

দীপংকর স্তম্ভিত হয়ে গেল। বললে—সে কি? গার্লস্?

—এখানে, ওপরে নিচে সব ঘরে গার্লস্ পাওয়া যায় কিনা! আজকে কোথাও কিছু পাচ্ছিল না, তাই আমি জোগাড় করে দিয়ে এলাম। মিস্টার ঘোষাল যে ব্যাচিলর—বিয়ে করেনি, এই কাছেই 'প্যালেস্ কোর্টে' থাকে!

কিছুক্ষণ দীপংকরের মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না!

তারপর উঠলো। বললে—আমি আসি তাহলে মিস মাইকেল—

—অলরাইট, কালকে আবার দেখা হবে!

তিন চার তলা উঁচু বাড়ি। মিস্ মাইকেলের ঘর থেকে বেরিয়েই সিঁড়ি। কম পাওয়ারের বাতি জ্বলছে। ওঠবার সময় নজরে পড়েনি দীপংকরের। মিস্ মাইকেলের সঙ্গেই চলে এসেছিল। বাইরে বেরিয়েই কেমন ভয় করতে লাগলো। বিরাট চওড়া কাঠের সিঁড়ি। ওপরে নিচে একটা মানুষ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু সর্বত্র যেন অনেক লোকের ভিড়ের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। সব ঘরের ভেতর থেকে গান বাজনা নাচের শব্দ হচ্ছে। ছোট ছোট সুরের টুকরো, মেয়েলি গলার চিৎকার। কেমন একটা অচেনা গন্ধে সমস্ত জায়গাটা জম-জমাট। একতলার সিঁড়ির পাশের একটা ঘরের পর্দাটা একটু ফাঁক করা ছিল। ভেতরে নজর যেতেই দেখলে একদল য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে। ঝলমল্ করছে, কিলবিল করছে। সিল্ক আর সেণ্টের ছড়াছড়ি। এ কোথায় তাকে নিয়ে এসেছে মিস্ মাইকেল।

হঠাৎ পেছনে দুম্ দুম্ করে অনেক-গুলো পায়ের শব্দ হলো। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে যেন কয়েকজন নামছে। দীপংকর সরে গিয়ে দাঁড়াল একটা কোণে।

আর তারপরেই একদল লোক সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে একেবারে রাস্তায় গিয়ে পড়লো। দু'জন মেয়ে আর দু'জন...

কিন্তু দীপংকর আর একবার ভালো করে চেয়ে দেখলে। মিস্টার ঘোষাল আর অনন্তবাবু! অনন্ত রাও ভাবে! দু'জনেই দুটো অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ের হাত ধরে হাসতে হাসতে চলেছে!

রাস্তায় একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। দীপংকর চিনতে পারলে। মিস্টার ঘোষালের গাড়ি। চারজনেই গাড়ির ভেতরে গিয়ে বসলো। তারপর একটা যান্ত্রিক আর্তনাদ করে গাড়িটা ছেড়ে দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে দীপংকরের চোখে মুখে এসে ছিটকে পড়লো পেট্রলের ধোঁয়া আর চারজনের অশ্লীল হাসি!

এ কোন্ জগতে এসে পড়েছে দীপংকর! এরা কোথাকার জীব! সেই কিরণের সঙ্গে দেখা কলকাতায় সঙ্গে এ তো মিলছে না! এ তো অন্য জগৎ। এখানকার স্বরাজ তো তারা চায়নি। ওই যারা বোমা রিভলভার

চিত্রাঙ্গদা

উপন্যাস

চিত্রাঙ্গদা • রতি সংহার

চিত্রাঙ্গদা ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত

চিত্রাঙ্গদা • বেলা যায়

চিত্রাঙ্গদা শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রাঙ্গদা • আজ রাজা কাল ফকির

চিত্রাঙ্গদা স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

গল্প

চিত্রাঙ্গদা গজেন্দ্রকুমার মিত্র

চিত্রাঙ্গদা হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

চিত্রাঙ্গদা মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

বিধায়ক ভট্টাচার্য

চিত্রাঙ্গদা

নাটক

মন্মথ রায়

চিত্রাঙ্গদা

বিচিত্র রচনা

চিত্রাঙ্গদা সত্যজিৎ রায়

চিত্রাঙ্গদা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

চিত্রাঙ্গদা শৌভিক

চিত্রাঙ্গদা মঞ্জু দে

নারীর রূপ ও রুচি

চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা অনুরাধা দেবী

• এজেন্টগণ যোগাযোগ করুন •

৭২-১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ফোন: ৩৪-৩৯৬২

নিয়ে টেগার্ট সাহেবকে খুন করবার চেষ্টা করছে, যারা রাইটার্স বিল্ডিং-এ ঢুকে কর্ণেল সিম্‌সনকে গুলী করলে, যাদের সদ্‌গতির জন্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত মনুমেন্টের তলায় এসে লেকচার দিলেন, তাদের সঙ্গে এদের যোগসূত্র কী? এদের মুক্তির জন্যেই কি ক্ষুদিরামের ফাঁসি হলো! এদের জন্যে ভেবে-ভেবেই কি সি আর দাশ জীবন দিলেন নাকি! এদেরই জন্যে গোপীনাথ সাহা, সূর্য সেন, ভগৎ সিং, যতীন দাস আত্মত্যাগ করলে? হঠাৎ সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দীপঙ্করের মনে হলো এখনই কিরণের সঙ্গে দেখা হলে যেন ভাল হতো! কিরণকে বুঝিয়ে দিত—তুই যাদের জন্যে এত কষ্ট করছিস্ কিরণ, তারা অনন্ত রাও ভাবে—। স্বরাজ হলে ওদেরই সুবিধে হবে। ওরাই মাথায় চড়ে বসবে তখন, দেখিস্!

মাইনের টাকাটা জামার বুক-পকেটে রয়েছে।

সেই, জন-বহুল রাস্তাটার ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে দীপঙ্কর আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো। কালীঘাটের বাজারের যে-সমাজ, সেখানকার অধঃপতনকে তবু যেন ক্ষমা করা যায়। সেখানে অজ্ঞতাকে মূলধন করে তারা জীবনের ফাটকা বাজারে জুয়া খেলতে নেমেছে। হোক তারা পাপী। সে তবু অজ্ঞানতার পাপ। যেদিন কিরণের চাওয়া স্বরাজ আসবে, সেদিন তা তারা কাড়াকাড়ি করে সামনের সারিতে দাঁড়াবার প্রতিযোগিতায় নামবে না। কিন্তু এই সমাজ? এরাই তো সেদিন ক্ষুদিরামের ফাঁসির পরাকাষ্ঠার প্রশংসা করে লেকচার দেবে! এরাই তো সেদিন দেশ-সেবকের প্রাপ্য ফুলের মালাটা আগে ভাগে এসে গলায় পরবে!

একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিল। দীপঙ্কর ট্যাক্সিটাকে ডেকে উঠে পড়লো।

ট্যাক্সিওয়ালা জিজ্ঞেস করলে—কাঁহা যাব?

ট্যাক্সিওয়ালা ভেবেছিল হয়ত পার্ক স্ট্রীট, কিংবা ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, কিংবা ওই রকম কোনও রাস্তার নাম করবে বাঙালী সাহেব। কিন্তু দীপঙ্কর বললে—কালীঘাট—

হু হু করে চলতে লাগালো ট্যাক্সিটা। ছোট বেলায় এক-একদিন কিরণ আর দীপঙ্কর দূরে থেকে এ-পাড়াটার দিকে চেয়ে দেখেছিল। সেদিন ভারি আপসোস হয়েছিল মনে মনে। ভেবেছিল এদের মধ্যেই বুঝি মানুষের সব সমস্যার সমাধানগুলো লুকিয়ে আছে। মানুষ সুস্থ মনে স্বাভাবিক হলে যা হয়, তা বুঝি এই। বড় বড় বাড়ি, ভাল ভাল পর্দা, ভাল ভাল খাবার, বিলাস, ঐশ্বর্য—এ-ই বুঝি মানুষের কামনার শেষ ধাপ! এখানে পৌঁছতে পারলেই বুঝি আর কিছু চাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। চৌরঙ্গীর ওপর দিয়ে যেতে যেতে দীপঙ্কর আবার বাড়িগুলোর দিকে চেয়ে দেখলো। মিস মাইকেলের ঘরের পর্দার মত পর্দা ঝুলছে এখানকার জানলায়। মিস্ মাইকেলের ঘরের মত বাতি ঝুলছে এখানকার সিলিং-এ। হয়ত এ-বাড়িগুলোর ভেতরেও এ-বাড়ির মেয়েরা মিস মাইকেলের মত সিল্কের ফিতে দিয়ে লাভ-লেটার্সগুলো বেঁধে যত্ন করে তুলে রাখে। এরাও বোধহয় মিস মাইকেলের মত মুখে রুমাল চাপা দিয়ে নিঃশব্দে কাঁদে। বাইরে থেকেই শুধু চেনা যায় না!

চলতে চলতে ট্যাক্সিটা হাজরা রোড দিয়ে মন্দিরের দিকে ঢুকছিল—

দীপঙ্কর লাফিয়ে উঠলো। বললে—কালীঘাট নয় সর্দারজী গড়িয়াহাট চলো, গড়িয়াহাট লেবেল-ক্রসিং—

ট্যাক্সি ড্রাইভারটা একটু অবাক হলো হয়ত। হয়ত ভাবলে বাঙালী সাহেব অপ্রকৃতিস্থ। তা ভাবুক। এখনি লক্ষ্মীদির কাছে গিয়ে একবার দেখা করা ভাল। লক্ষ্মীদিকে তার অনন্তবাবুর কাণ্ডটা বুঝিয়ে বলা দরকার। অন্তত লক্ষ্মীদি বুঝতে পারুক কার ওপর নির্ভর করে আছে লক্ষ্মীদি। কী রকম চরিত্রের লোক সেই অনন্তবাবু! কী জঘন্য চরিত্রের লোক!

লেভেল ক্রসিং-এর গেটটা খোলাই ছিল। এখন আর কোনও ট্রেন নেই বোধহয়। ট্যাক্সিটা লাইনের ওপর উঠতেই দীপঙ্কর অন্ধকারে চিনতে পেরেছে। দীপঙ্কর চিৎকার করে উঠলো—রোখো রোখো—

ক্রসিং পেরিয়ে ওপরে গিয়ে ট্যাক্সিটা ব্রেক কষে থেমে গেল।

দীপঙ্কর তাড়াতাড়ি ভাড়াটা চুকিয়ে দিয়েই দৌড়ে কাছে এল। বললে—লক্ষ্মীদি, তুমি এখানে?

লক্ষ্মীদি লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল একা। মুখটা শুকনো। চুল বাঁধেনি আজ। টিপ্ পরেনি।

—তুমি একলা এখানে কী করছো লক্ষ্মীদি?

লক্ষ্মীদিও দীপঙ্করের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেছে। বললে—তুই যে হঠাৎ? তোর মনিব্যাগটা নিতে।

—না, সেজন্যে নয়, অন্য একটা কথা ছিল তোমার সঙ্গে। তা তুমি এখানে কেন এখন? এই রাত্তির বেলায়?

লক্ষ্মীদি বললে—শম্ভু হঠাৎ কোথায় বেরিয়ে গেছে—জানিস, বড় ভাবনায় পড়েছি—কখন যে বেরিয়ে গেল টেরই পাইনি, তাই খুঁজতে বেরিয়েছি—

(ক্রমশ)

ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত নবীনচন্দ্র সেনের

॥ রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস ॥

প্রকাশিত হয়েছে ॥ দাম ঃ আট টাকা ॥

॥ নবীনচন্দ্রের "ত্রয়ী কাব্যের" একত্র মুদ্রণ বিস্তৃত ভূমিকাসহ প্রকাশিত হলো। এক শ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকায় নবীনচন্দ্রের জীবনী, যাবতীয় গ্রন্থের আলোচনা, মহাকাব্যের লক্ষণ ও ইতিহাস, য়ুরোপীয় রেনেসাঁস ও উনিশ শতকী বাংলার নবজাগরণ, নবীনচন্দ্রের সঙ্গে এই নবজাগরণের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে সুবিস্তৃত আলোচনা এই ভূমিকাটিকে গবেষণার মূল্য দিয়েছে ॥

গ্রাম ঃ বাণীবিহার

ফোন ঃ ৩৪-৪০৫৮

বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিঃ

১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬

—ছোটদের পড়াবার মত বই—

জাদুমতীর বাঘ	শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র		২.০০
হ্যামেলিনের বাঁশিওলা ...	„ বুদ্ধদেব বসু		২.০০
ভালো ভালো গল্প ...	„ শিবরাম চক্রবর্তী		২.০০
ডাকাতের হাতে	„ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত		২.০০
আহ্লাদে আটখানা ...	(সংকলন-গ্রন্থ)		৩.০০
নোটন নোটন (ছড়ার বই) ...	„ বিশ্বনাথ দে		১.০০

শ্রীপ্রকাশ ভবন,

এ-৬৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিঃ ১২

(সি-৭৩৫৪)

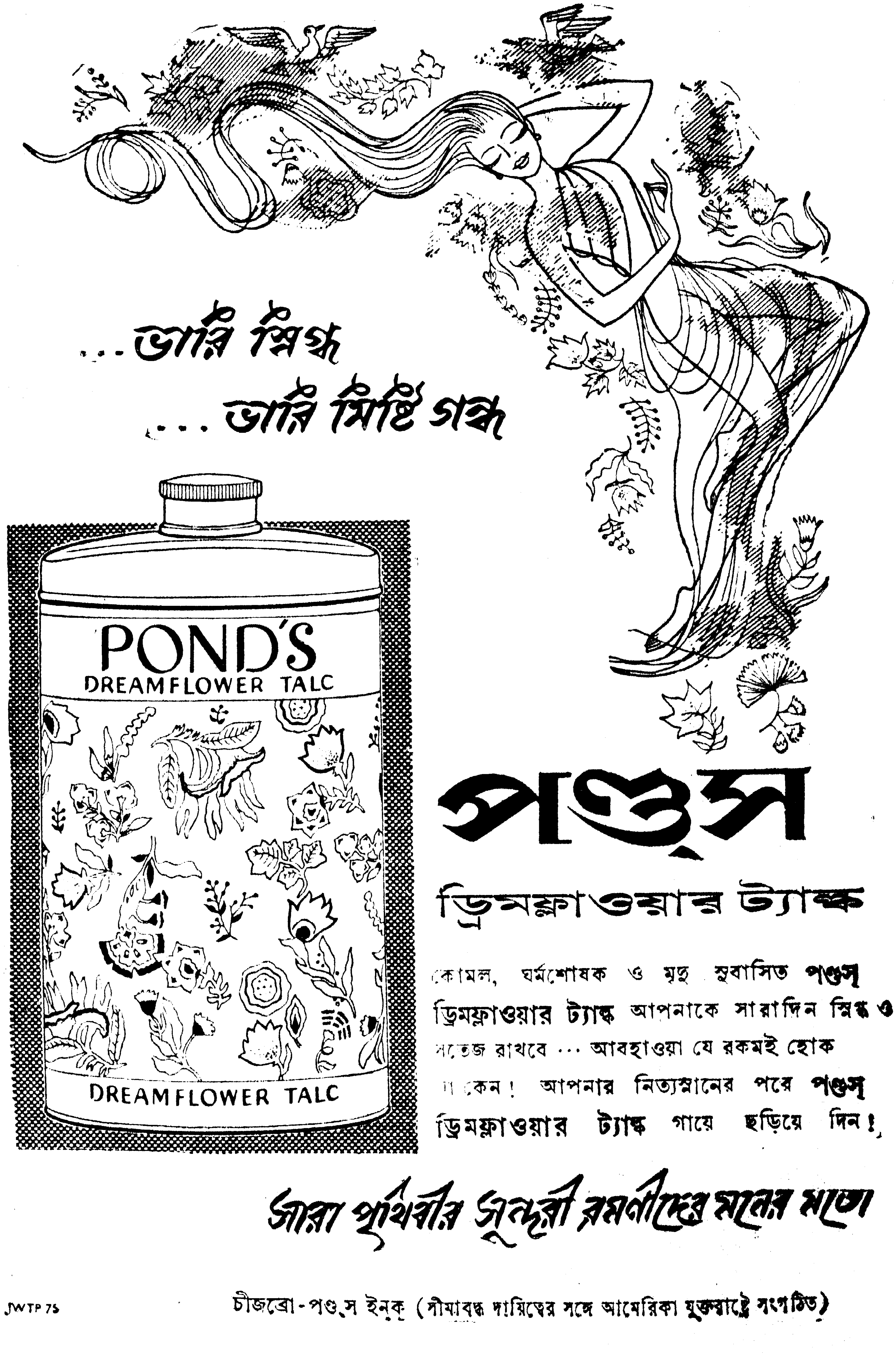
...ভারি স্নিগ্ধ
...ভারি মিষ্টি গন্ধ
POND'S
DREAMFLOWER TALC
DREAMFLOWER TALC
পণ্ডস
ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যাল্ক
কোমল, ঘর্মশোষক ও মৃদু সুবাসিত পণ্ডস্ ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যাল্ক আপনাকে সারাদিন স্নিগ্ধ ও সতেজ রাখবে ... আবহাওয়া যে রকমই হোক না কেন! আপনার নিত্যস্নানের পরে পণ্ডস্ ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যাল্ক গায়ে ছড়িয়ে দিন!
সারা পৃথিবীর সুন্দরী রমণীদের মনের মতো
JWTP 75
চীজব্রো-পণ্ডস ইনক্ (সীমাবদ্ধ দায়িত্বের সঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

পুস্তক পরিচয়

প্রাচীন সাহিত্য

প্রবাদবচন—শ্রীগোপালদাস চৌধুরী ও শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন। বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিঃ, ১ শঙ্কর ঘোষ লেন। কলি-৬। ছয় টাকা।

ভাষার বিশিষ্টরূপ হিসাবে বঙ্গভাষা নিঃসন্দেহে তার প্রবাদ প্রবচন বা লোক-শ্রুতির জন্য গৌরববোধ করতে পারে এবং এ বিষয়ে ইতোপূর্বে একাধিক সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তন্মধ্যে ডক্টর সুশীল দে'র 'বাংলা প্রবাদ' প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য গ্রন্থটিতে বাংলা ভাষার মোটামুটি প্রচলিত উল্লেখযোগ্য প্রবাদবচনগুলি একত্রে সংকলিত হয়েছে এবং উৎসাহী ছাত্র, পাঠকের পক্ষে সংকলনটি সহায়ক হবে। গ্রন্থটিতে কয়েকটি ক্ষেত্রে স্বল্প ব্যবধানের মধ্যে একই প্রবাদবচনের পুনরাবৃত্তি দেখা গেল। পরিশেষে একটি কথা ঃ অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যে প্রবাদবচন প্রকাশই যদি উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তাহলে সাধারণ পাঠকের দিক থেকে গ্রন্থটির মূল্য কিছু বেশী হয়ে পড়েনি? ৩১৩।৬০

জীবনী সাহিত্য

গান্ধীজী—শ্রীঅনাথনাথ বসু। প্রকাশক—ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—১·৫০ ও ২·০০ টাকা।

ছোটদের উপযুক্ত করে লেখা গান্ধীজীর জীবন-কাহিনী। তাঁর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। ছোটদের জন্য লেখা বলেই লেখক জটিল রাজনীতির আবর্তের মধ্যে পাঠকদের নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেননি। ফলে সমগ্র গ্রন্থটি সহজপাঠ্য হয়েছে। তার জন্য অবশ্য লেখকের ভাষাও অনেকটা দায়ী। কঠিন ভাষা হলে এ-গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যই ব্যাহত হতো। সর্বশেষে গান্ধীজীর জীবনের বড় বড় ঘটনাগুলির সন-তারিখ দিয়ে লেখক ভালো করেছেন। ৯১।৬০

বীরসিংহের সিংহ শিশু—শ্রীনয়নচাঁদ মুখোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২।১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলি—৬। দু' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগরের জীবনকথা ছোটদের জন্য সহজ সুন্দরভাবে লেখা হয়েছে। একথা একান্ত সত্য যে, মহাপুরুষগণের চরিত্রধারা বজ্রের চেয়ে যেমন কঠিন, তেমনি আবার কুসুমাপেক্ষাও কোমল। মানুষ ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য সদাজাগ্রত ছিল। স্বর্গত রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, ঈশ্বরচন্দ্র কথা বলতেন কম, কিন্তু কাজ করতেন বেশী। এ বিষয়ে সাধারণ বাঙালীর সাথে ঈশ্বরচন্দ্রের আকাশপাতাল তফাত। সেই অসাধারণ মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি পূর্ণাংগ সুন্দর পরিচয় বর্তমান গ্রন্থের

সপ্তধারা

দেবদত্ত

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (যুগান্তর) বলেন,—

...গল্পগুলি সমস্তই আধুনিক সমাজ ও ভদ্রঘরের ছেলেমেয়ের জীবন নিয়ে লেখা... এগুলির মধ্যে 'ঝড়' নামে গল্পটিই সবচেয়ে ভালো।...অন্যান্য গল্পও সরস এবং স্বচ্ছন্দ। ...গ্রন্থটি এককথায় সুখপাঠ্য এবং উপভোগ্য।

(সি ৭৬৯৬)

অ — ক্রু — ব-র

॥ অভিনব উপন্যাস ॥

শকুন্তলা স্যানাটোরিআম

ভারতের একটি হিল-স্টেশন অথবা শৈল-বিশ্রাম। তার বুকে বিশ্রাম করছে একটি লম্বা-চওড়া স্যানাটোরিআম, যার অতিথিদের কারো মন সাধারণ বাঁধা সড়ক বেয়ে চলে না। এই অসাধারণত্বই তাঁদের এখানকার আতিথ্যের কারণ।

এই সব অতিপরিচিত অতিথিদের বিচিত্র জীবনের বিচিত্র কাহিনী অননুকরণীয় ভঙ্গিতে বলেছেন লেখক। যে সব উপন্যাস পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যায় না **'শকুন্তলা স্যানাটোরিআম'** তেমনি একটি গ্রন্থ।

মূল্য—২·৭৫

কল্লোল প্রকাশনী ঃ এ ১৩৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

নবতম ও বৃহত্তম উপন্যাস

উপকণ্ঠে ৯৲

'কলকাতার কাছেই' উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের নিয়ে লেখা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ উপন্যাস। নরেন ও শরতের পরিণতি!

গজেনবাবুর অন্যান্য বইয়ের নূতন মুদ্রণ

মনে ছিল আশা ৪৲ নারী ও নিয়তি ২॥
জন্মেছি এই দেশে ৪॥ স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্ ৩৲
ভাড়াটে বাড়ী ৩৲ ছুটি ২৲ প্রেরণা ৩৲
আব্‌ছায়া ২৷৵ কমা ও সেমিকোলন ২৷৵
শ্রেষ্ঠগল্প ৫৲ সাবালক ২৷৵ কোলাহল ৩৲
গল্প-পঞ্চাশৎ ৮॥

মিত্র ও ঘোষ ঃ কলিকাতা — ১২

লেখক ছোটদের উপযোগী করে প্রদান করেছেন। লেখকের বলবার ভংগীটি সুন্দর এবং সর্বশ্রেণীর পাঠক বর্তমান গ্রন্থপাঠে উপকৃত হবেন। কয়েকটি সুন্দর

বাঙালী ও বংগসংস্কৃতিকে জানতে
একখানা প্রথম শ্রেণীর বাংলা
মাসিক **নববঙ্গ** পড়ুন
তৃতীয় বর্ষ * বার্ষিক ৩৲
২০১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭

পাঠকদের বহু প্রতীক্ষার অবসান
দেবপ্রিয় দে'র
"মৃগতৃষ্ণা"
বের হলো।
সকল সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।
মূল্য : ২·৫০ বাঁধাই : মজবুত
নব বলাকা প্রকাশনী,
৪, নফরচন্দ্র সাহা লেন, কলিকাতা—৩৬
(সি ৭৬২৯/১)

BUY THE BEST
HIGHLY APPRECIATED
SAMSAD ANGLO-BENGALI DICTIONARY
1672 PAGES • Rs. 12·50 n.P.
SAHITYA SAMSAD
32 A, ACHARYA PRAFULLA CH. RD. • CAL-9

আলোকচিত্র গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

৩০৪।৬০

গল্প সংকলন

রাণীবৌ—প্রাণতোষ ঘটক। ডি এম লাইব্রেরী। ৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। চার টাকা।

রানীবৌ প্রকৃতপক্ষে একটি বড় গল্প—যদিও গল্পটিকে পল্লবিত করে উপন্যাসের শরীর আরোপ করতে চেষ্টা করেছেন লেখক। বন্যার পটভূমি-কল্লোলে একটি সুন্দরী নারীকে ঘিরে কয়েকজন পুরুষের কলগুঞ্জন। রানীবৌ এই নারী। নিষ্ঠুর বন্যা তার স্বামী কালীচরণকে কেড়ে নিয়েছে। কালীচরণের বন্ধু চৌধুরী, লক্ষ্মণ সামন্ত, জোসেফ। এই কয়জন পুরুষ রানীবৌয়ের, তার ছেলেমেয়ের তদারকির ভার নিয়েছে। এই তিনটি পুরুষের অনুরাগ বর্ণিত হয়েছে রানীবৌকে কেন্দ্র করে। সমাজের নিচু-তলার চরিত্র এরা। চুরি ডাকাতি, স্বামী-হারা স্ত্রীর সংগে প্রেম, কিছুই আটকায় না এদের স্বভাবে। জোসেফ রেলওয়ে ওয়াগন থেকে চাল চুরি করতে চেষ্টা করে। পুলিসের গুলীর মুখে পড়ে জখম হয়। প্রকাণ্ড চালের আড়ৎ থেকে সামন্ত আর চৌধুরীও চালের বস্তা লোপাট করে। উদ্দেশ্য রানীবৌয়ের মন ভেজানো। রানী-বৌয়ের সন্তানেরা ভাত খেয়ে বাঁচবে।

রানীবৌ নামক গোটা গল্পে যে সমাজ, স্ত্রী ও পুরুষ চরিত্রের ছবি পাওয়া গেল—ঠিক সে সমাজ, সে চরিত্রের সংগে আমরা পরিচিত নই। অথচ জানি, গ্রাম-বাংলার আনাচে কানাচে এরকম চরিত্র, জীবন, সমাজ আত্মছায় টি'কে আছে। রানীবৌয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়, চরিত্রগুলির দুর্বার দুঃসাহসিকতা আমাদের পাঠক-গোষ্ঠীর অভ্যস্থ চোখে খানিকটা অন্তরায় সৃষ্টি করলেও—একথা স্বীকার করা ভালো, এ-বই স্বাদের নতুনত্ব বহন করছে। বইটিতে 'পিত্তোশ মিছা', 'বিশাখা যেওনা' নামে আরো দুটি গল্প আছে। লেখকের নিজস্ব টেকনিকে এ দুটি গল্পও রসোত্তীর্ণ।

১৯৬।৬০

উপন্যাস

ফুলশয্যার রাতে—ঊষাদেবী সরস্বতী, এম-এ। প্রকাশক—দেব সাহিত্য কুটীর, ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯। দাম—তিন টাকা।

সুরঞ্জনকে ভালোবেসেছিলো সুভদ্রা, কিন্তু বিয়ের রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করেও তাকে সে বিয়ে করতে পারেনি। অথচ তার জন্য দায়ী সুরঞ্জনের কাকা। দীর্ঘ-কাল পরে সুভদ্রার মেয়ে প্রেমে পড়লো সেই সুরঞ্জনেরই ছেলে প্রশান্তর সংগে। সুরঞ্জনের প্রতি আক্রোশবশত তাদের মিলনে বাধা দিলো সুভদ্রা। ফলে আত্মহত্যা করলো বিশাখা। নিতান্তই সাজানো একটি গতানুগতিক গল্প, কাহিনী-বর্ণনাতেও কোনো নতুনত্ব নেই। তার ওপর, মূল কাহিনীর প্রবাহকে ব্যাহত করে লেখিকা অনাবশ্যকভাবে বহু অবান্তর

প্রকাশিত হলো :—
সুবোধকুমার চক্রবর্তী-র
অধুনাতম ভ্রমণ বৃত্তান্ত—
কী মায়া ৩·০০

সুবিশাল দেশ ভারতবর্ষকে জানবার জন্য শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী আজ দেশ-দেশান্তর পরিক্রমায় ও নিভৃত সাধনায় নিমগ্ন। তাঁর বলিষ্ঠ ভারতদর্শন 'রম্যানি বীক্ষ' নামে পর্বে পর্বে প্রকাশিত হচ্ছে এবং আপন স্বাতন্ত্র্যে এবং বৈদগ্ধে ও সর্বাঙ্গীণ মৌলিকতায় বর্তমান পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করেছে। ভ্রমণ সাহিত্যে লেখক আজ অনন্য। ...বর্তমান গ্রন্থের পটভূমিকা ভারতের বাইরে বিস্তৃত হয়েছে। পশ্চিমের সীমানা অতিক্রম করে বেলুচিস্থান ও মিশর। হিমালয় পেরিয়ে তিব্বত. সেতুবন্ধ পারে সমুদ্র বিধৌত সিংহল। এই সমস্ত দেশের মাটি আর মানুষ, তাদের হাসি, অশ্রু, ও হৃদয়াবেগ স্বপ্নের মত প্রতিবিম্বিত হয়েছে 'কী মায়া'য়। মাটির যেমন মায়া আছে মানুষেরও তেমনই। লেখকের সন্ধানী দৃষ্টিতে ঘরের বাইরের মানুষের অন্তরঙ্গ পরিচয় কাহিনী। বাংলা সাহিত্যে নতুনতম আস্বাদে সমৃদ্ধতর হলো।

করুণা প্রকাশনী, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিঃ ১২

প্রকাশিত হয়েছে :
নীলকণ্ঠ-এর
দ্বিতীয় প্রেম ৫·০০
নীলকণ্ঠের এই নতুন উপন্যাস ২৫ বছর আগের এক মামলাকে কেন্দ্র করে। রতন-লালের ইংরেজী স্ত্রী গ্লোরিয়ার সঙ্গে ব্যাভিচারের সন্দেহে রতনলাল গুলী মেরে হত্যা করে রঞ্জন রায়কে। এই প্রশ্নের মীমাংসা—আজও হয়নি যে গ্লোরিয়ার স্বামী রতন লাল Guilty না Not Guilty?

প্রকাশিত হলো :—
প্রফুল্ল রায়-এর
দূরের বন্দর ৩·০০
শ্রীবাসব-এর
নাজমা বেগম ৫·০০
২য় সংস্করণ

কথার অবতারণা করেছেন যেখানে-সেখানে। ছাপা-বাঁধাই সুন্দর, প্রচ্ছদপটের ছবি থেকে মনে হয়, কেবলমাত্র বিয়েতে উপহার দেওয়ার জন্যই বইটি প্রকাশ করা হয়েছে। ২৬৬।৬০

এর পূরবী ওর বিভাস—শ্রীমন্ত সওদাগর। মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। তিন টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি শ্রীমন্ত সওদাগরের একখানি নতুন উপন্যাস। প্রধান ভূমিকায় সঙ্গীতশিল্পী বিভাস এবং তারই প্রণয় সঙ্গিনী পূরবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। করুণ-মধুর প্রেমোপাখ্যান হিসাবে গ্রন্থখানি পাঠকমহলে হয়ত সমাদর লাভ করিতে পারিবে। গ্রন্থের ভাষা গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত আবেগ-বহুল হইলেও কাহিনীর সঙ্গে বেখাপ্পা মনে হয় না। কাজেই কোনরকমেই পাঠকের ধৈর্যচ্যুতির সম্ভাবনা নাই।

১৫৯।৬০

মালার বাঁধন—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার। শ্রীরামকৃষ্ণ লাইব্রেরী, ৬৪।২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম ২·৫০ টাকা।

এক অপরিণামদর্শী কিশোরের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং ব্যর্থতার কাহিনী নিয়ে লেখা উপন্যাস। মধ্যবিত্ত, গ্রাম্য, কিশোর অসিত উচ্চশিক্ষার জন্য শহরে আসে তার পিতৃ-বন্ধুর আশ্রয়ে এবং সেখানে পিতৃ-বন্ধুর কন্যা শেলীর অতি শিষ্ট আচরণকে প্রেম বলে মনে করে। কিছুদিন পরে সে কিন্তু নিজের ভুল বুঝতে পারে যখন সে শেলীকে নির্লজ্জভাবে প্রেম-পত্রের মাধ্যমে প্রেম নিবেদন করে। শেলীর কাছ থেকে চরম প্রত্যাখ্যান পেয়ে সে ফিরে আসে তার বাল্য-সহচরী এবং কৈশোরের প্রিয়া উত্তরার কাছে, যদিও ইতিমধ্যে আকস্মিক দুর্ঘটনায় উত্তরার একটি চক্ষু নষ্ট হয়ে গেছে।

পঞ্চাশ বছর আগে এ উপন্যাস একশ্রেণীর পাঠকের সমাদর লাভ করতে পারত কিন্তু বর্তমান যুগে সস্তা ভাবপ্রবণতা এবং মেয়েলী নাকে কান্না পাঠকদের বিরক্তই করবে। তাছাড়া, প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর এক কিশোরের বিয়ে নিয়ে এত মাথাঘামান পঞ্চাশ বছর আগের অভিভাবকদের পক্ষেই সম্ভব ছিল। গল্প বলার মত ভাষার জোর নেই, কাহিনী অতি মামুলী এবং মাঝে মাঝে ন্যাক্কারজনক অসুস্থ মনের সাক্ষ্য দেয়। আশ্চর্যের কথা এই যে, ভাষার দৈন্য, গল্পের একঘেয়েমী, রুচির একান্ত অভাব এবং সাহিত্য নামের একান্ত অযোগ্য একটি পুস্তক বর্তমানকালের প্রকাশকের অনুমোদন লাভ করল কিভাবে?

৩৩৪।৬০

কিশোর-সাহিত্য

চির নতুন গল্প—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। টিচার্স বুক সাপ্লাই, ৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম ১·৫০ নঃ পঃ।

সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত লেখকের আলোচ্য পুস্তকখানি ছোটদের জন্য লিখিত মোট ১৭টি গল্পের সমষ্টি। প্রত্যেকটি গল্পই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল; ভাষা ঝরঝরে, ফলে প্রত্যেকটি গল্প অত্যন্ত সুখপাঠ্য হইয়াছে। অবসর সময়ে ছোটদের চিত্তবিনোদনের পক্ষে আলোচ্য পুস্তকটি নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

২৫৩।৬০

এক যে ছিল রাজা—সুজিতকুমার নাগ। পম্পা পাবলিসিটি, ৭১।১।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

শিশুপাঠ্য এই পুস্তিকাটি গল্প,

ওয়ান ইণ্ডিয়া সোসাইটি
মোবাইল লাইব্রেরী
কলকাতার যে কোন স্থানে পাঠকদের রুচিসম্মত পত্র ও পুস্তক ধার দেওয়া হয়। লিখুন—
Post Box No. 10427, Cal.-26.
(সি ৭৭৮৫)

ফার্স্ট প্রাইজ সুনীল ভঞ্জ রচিত কৌতুক নাটিকা
এক দৃশ্যে অভিনয়োপযোগী—১॥০
প্রান্তিক পাবলিশার্স
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট : কলিকাতা—১২
(সি ৭৯৩৮)

মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল
আরোগ্য করিতে ২৭ বৎসর ভারত ও ইউরোপ-অভিজ্ঞ ডাঃ ডিগোর সহিত প্রতি দিন প্রাতে ও প্রতি শনিবার ও রবিবার বৈকাল ৩টা হইতে ৭টায় সাক্ষাৎ করুন। ৩বি জনক রোড, বালীগঞ্জ কলিকাতা।
(৮০২৪)

"GLIMPSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ শুধু ইতিহাস নয়, ইতিহাস নিয়ে সাহিত্য। ভারতের দৃষ্টিতে বিশ্ব-ইতিহাসের বিচার। সর্ব দেশে ও সর্ব সমাজে সর্বকালের আদরণীয় গ্রন্থ। জে. এফ. হোরাবিন-অঙ্কিত ৫০ খানা মানচিত্র সহ। প্রায় ১০০০ পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ।

শ্রীজওহরলাল নেহরুর
বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ
২য় সংস্করণ : ১৫·০০ টাকা

আত্মচরিত ॥ শ্রীজওহরলাল নেহরু ১০·০০
ভারতকথা ॥ শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারী ৮·০০
ভারতে মাউণ্টব্যাটেন ॥ অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন ৭·৫০
চার্লস চ্যাপলিন ॥ আর. জে. মিনি ৫·০০

প্রফুল্লকুমার সরকার
জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ
বাঙলার তথা ভারতের জাতীয় আন্দোলনে বিশ্বকবির কর্ম, প্রেরণা ও চিন্তার সুনিপুণ আলোচনায় অনবদ্য গ্রন্থ।
তৃতীয় সংস্করণ : ২·৫০ টাকা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন কলিকাতা—৯

ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস
জব চার্ণকের বিবি
কলিকাতা স্রষ্টা জব চার্ণকের প্রেমময় জীবন আলেখ্য। ॥ পাঁচ টাকা ॥
অর্চনা পাবলিশার্স
৮বি, রমানাথ সাধু লেন, কলিকাতা—৭
ফোন : ৩৪-১২২৫
(সি ৬৭৬৭)

কে.হোড়ের
কণক
* পাউডার *

কবিতা ও ছড়ার সংকলন। যোগীন্দ্রনাথ বসু ও সুজিতকুমার নাগের গল্প, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুখলতা রাও, প্রেমেন্দ্র মিত্র, স্বপন বুড়ো প্রভৃতির কবিতা ও ছড়ায় সমৃদ্ধ আলোচ্য পুস্তিকাখানি ভুতপ্রেতি বালকবালিকার পক্ষে নিঃসন্দেহে সুখপাঠ্য।

১৯৪।৬০

ভুতু-ভুতু—লেখা ও ছবি ধীরেন বল। চণ্ডীচরণ দাস এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৫০ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। মূল্য ১·২৫ নয়াপয়সা।

ছোটদের উপযোগী সচিত্র রচনায় ধীরেন বল যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। আলোচ্য বইখানি কুকুর, বিড়াল, হাঁস, মোরগ প্রভৃতিকে সত্য মানুষসুলভ চরিত্রে রূপায়িত করে একটা মিষ্টি গল্পের মধ্যে দিয়ে ছোট ছেলেমেয়েদের তন্ময়তা, নিয়মানুবর্তিতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বিষয়ে শিক্ষা দেবার সুন্দর একটি প্রচেষ্টা বেশ সহজ ভাষায় লেখা। ছবি এবং ছাপার দিক থেকে যথেষ্ট আকর্ষণীয়।

৩৫৪।৬০

তেপান্তর—শ্রীপ্রশান্ত চৌধুরী। বলাকা প্রকাশনী; ৫৩, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা—৯। দাম—১·৫০ টাকা।

শিশু বা কিশোরদের অভিনয় উপযোগী একটি অনবদ্য শিশু নাটিকা। বাংলা সাহিত্যে শিশুসাহিত্যের, বিশেষ করে শিশুদের অভিনয় করার মত নাটকের অভাব আছে। বর্তমান নাটকটি সেই অভাব পূরণের সহায়তা করবে। নাটকের নায়ক খোকা এক বই-পাগল কিশোর। জেগে সে বই পড়ে, আর ঘুমিয়ে বইয়ের রাজ্যে বিচরণ করে। স্বপ্নে সে নিজেকে নিয়ে যায় অচিন দেশের রাজকন্যার রাজ্যে, যেখানে দৈত্যপুরীর মধ্যে রাজকন্যা বন্দী হয়ে আছে। খোকার স্বপ্নরাজ্যের চরিত্রগুলি সত্যই অতীব চিত্তাকর্ষক। এগুলি খোকার ইতিপূর্বে পড়া চরিত্র। ছোটদের বই হলেও এই গ্রন্থ শিশুদের ও বড়দেরও সমান আনন্দ দেবে। এক কথায় নাটিকাটি ছোটদের একটি ছুটির দিনে অভিনয় করার পক্ষে চমৎকার।

৩৪৬।৬০

নিশাচরের
শ্বাসরুদ্ধকারী নূতন রহস্যোপন্যাস
সুলতার বিয়ে ৪৲
ভিয়েনা নার্সিং হোম (৩য় মুদ্রণ) ৪৲
আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস
কল্যাণী ৩৲
প্রমথনাথ বিশীর
অমনোনীত গল্প ৩৲
প্রাপ্তিস্থান : মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি ১২

প ট ভূ মি
॥ সম্পাদক ॥
শঙ্কর মিত্র : দেবব্রত বসু
রবীন্দ্র পরিপুষ্ট বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট পরিমণ্ডলে পটভূমি সংহত সত্তার এক নব দিগন্ত। সে দিগন্তে বিম্বিত হবে বর্তমানের পূর্ণাবয়ব, অতীতের মৃন্ময় কৌলীন্যের চিন্ময় সৌরভ আর ভবিষ্যতের সর্ব সম্ভাব্য প্রতিশ্রুতি। অর্থাৎ এক কথায় পটভূমি ত্রিকালজ্ঞ মানসিকতার এক পরিশীলিত প্রতিজ্ঞা।
: এ সংখ্যায় লিখেছেন :
যশোদাজীবন ভট্টাচার্য, দুর্গাদাস সরকার, মদন দাস, বীরেন্দ্র সরকার, অর্চনা গোস্বামী, মলয় ভট্টাচার্য, অজিত দে, গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজল সরকার, নিরেন্দু হাজরা, সমর দত্ত, নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।
॥ মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিতব্য ॥
: ঠিকানা :
কর্মসচিব
ভবানী মুখোপাধ্যায়
১৩ [illegible] লেন, হাওড়া
প্রকাশক
চিত্ত চক্রবর্তী
৩১নং হেমচন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা—৩০
(সি ৭১৪৭)

প্রাপ্তি সংবাদ

ঘরের মানুষ মারা—নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংগীত পারিজাত—শচীন্দ্রনাথ মিত্র।

মন্ত্র ও মন্ত্রান্ত—জীবেশ মৈত্র।

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—১ম খণ্ড—শ্রীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

গীতি কবি শ্রীমধুসূদন—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য।

প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান—রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

উপনিষদ প্রসঙ্গ—শ্রীঅরবিন্দ।

মনের দিগন্ত—রবিদাস সাহা রায়।

ভক্তমালের ভক্ত-চরিত—(১ম খণ্ড)—স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী।

মেখলা—গৌর দাস।

নতুন ডাক—নিখিল সুর।

দেশ বিদেশের শিক্ষা—শ্রীজ্ঞানান্বেষী।

তাও-তে-চিং (লাও ৎসে কথিত জীবনবাদ) —অনুবাদক অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিজ্ঞানের বিচিত্র জগৎ (১ম ভাগ)—ওয়ারেন নক্স, জর্জ স্টোন, মরিস মিইস্টার, ডেভিস নোয়েল। বাংলা রূপান্তর সুবোধ সেনগুপ্ত।

রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

উৎসব অন্তে

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ১৯৬০ সাল ভারতবর্ষের পক্ষে একান্তই দুর্বৎসর। যেমন খেলাধুলোয়, তেমনি ছায়া-ছবির ব্যাপারেও। ইউরোপের বিশিষ্ট চলচ্চিত্র উৎসবগুলিতে যথানিয়ম সরকারী মনোনীত ছবি প্রেরিত হলেও, এ বছর কোন ভারতীয় চিত্র আন্তর্জাতিক পুরস্কারের পশরা ঘরে নিয়ে আসতে পারে নি। ব্যাপারটি পরিতাপকর সন্দেহ নেই।

আমরা ভাল ছবি তৈরি করতে পারছি না বলে প্রতিযোগিতায় হেরে যাচ্ছি—শুধু এই-টুকু বল্লেই কিন্তু সবটুকু বলা হবে না। পাইকারি হারে ভারতীয় চলচ্চিত্রের এই পরাজয়ের পিছনে এমন কতকগুলি অতিরিক্ত কারণ রয়েছে সেগুলি দূর করতে না পারলে বর্তমান অবস্থার অবসান ঘটবে বলে মনে হয় না।

এ বছরে কান, বার্লিন, কারলভি ভেরি ও ভেনিস এই চার জায়গায় অনুষ্ঠিত ইউরোপের চারটি প্রধান চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতবর্ষ থেকে যথাক্রমে পাঠান হয়েছিল "সুজাতা" (হিন্দি), "পুবেরুণ" (অসমিয়া), "হীরামোতী" (হিন্দি) ও "ক্ষুধিত পাষাণ" (বাংলা)। এই চারখানি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি ছাড়াও প্রত্যেক উৎসবে একটি বা দুটি করে প্রামাণ্য চিত্রও প্রেরিত হয়েছিল। কারুর ভাগ্যেই কিন্তু পুরস্কারের শিকা ছেঁড়ে নি।

"সুজাতা"-র প্রযোজক-পরিচালক বিমল রায় কান থেকে ফিরে এসে প্রকাশ্যে অভিযোগ করেছিলেন এই বলে যে প্রতিযোগিতায় ভারতীয় ছবির ব্যর্থতার অন্যতম কারণ সরকারী অব্যবস্থা এবং অসহযোগিতা। তার ফলে ভারতীয় ছবিকে একান্ত প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় এবং তা কাটিয়ে নিজের যোগ্য মর্যাদা আদায় করে নেওয়া প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। উদাহরণ স্বরূপ শ্রীরায় কানে "সুজাতা"-র প্রদর্শন ব্যবস্থার উল্লেখ করেছিলেন। এমন অসময়ে ছবিটি প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয় যখন এগারো জন বিচারকের মধ্যে মাত্র তিনজন হাজির হয়েছিলেন, এবং চিত্র-সমালোচকদের অনেকেই অনুপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য দেশের গভর্নমেণ্ট তাঁদের দেশের ছবির ব্যাপক প্রচারের জন্যে চিত্র নির্মাতাদের যে পরিমাণে বিদেশী মুদ্রা সরবরাহ করে থাকেন সেরকম কোন সহযোগিতা তিনি ভারত সরকারের কাছ থেকে পান নি বলে আরো অভিযোগ করেন।

শ্রী এন সি এ প্রোডাকসন্সের "হসপিট্যাল" চিত্রের একটি আনন্দোজ্জ্বল দৃশ্যে সুচিত্রা সেন ও অশোককুমার।

এই প্রসঙ্গে শ্রীরায় মন্তব্য করেন যে ভারত সরকার যদি বিদেশের চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের জন্য নির্বাচিত ছবির প্রযোজককে সব রকমে সাহায্য করতে অপারগ হন তাহলে কোন আন্তর্জাতিক উৎসবেই ভারতীয় ছবি পাঠান উচিত নয়।

"পুবেরুন"-এর পরিচালক প্রভাত মুখোপাধ্যায় বার্লিন উৎসব থেকে ফিরে আরো তীব্র ভাষায় সরকারী অব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন। বার্লিন উৎসবের তরফ থেকে ভারতবর্ষকে জানুয়ারির গোড়াতে আমন্ত্রণ জানান হলেও বার্লিনস্থ ভারতীয় দূতাবাস থেকে সে আমন্ত্রণ দিল্লিতে পৌঁছতে সময় লাগল একমাস। তারপর কোন্ ছবি বার্লিনে পাঠান হবে তা স্থির করতে আরো চারমাস কেটে গেল। "পুবেরুণ"-এর প্রযোজক

ছোটদের নাটক?
বাংলা তথা ভারতে শিশুরঙ্গমহলের এক অপূর্ব সৃষ্টি। সমর চট্টোপাধ্যায়ের সাতটি ছড়া ও নাটিকার অপূর্ব সংকলন সি.এল.টি'র [illegible] একটি কানন [illegible]

অবনপটুয়া ২·৫০ মিঠুয়া ১·০০
ঝিঙো ·৭৫ সাত ভাই চম্পা ২·৫০
যাদুকরের দেশে—
একটি থালের পাতা— | যন্ত্রস্থ
সর্বত্র এজেন্ট আবশ্যক

শিশুরঙ্গমহল প্রকাশনী
২ তিলক রোড, কলিকাতা ২৯
ফোন : ৪৬—১২০০

মন্মথ রায়ের অবিস্মরণীয় নাট্যাবদান

জাতির জীবনবেদের মর্মবাণী
ধর্মঘট । পথে-বিপথে
চাষীর প্রেম । আজবদেশ
[বিচিত্রধর্মী চারিটি পূর্ণাঙ্গ নাটক]
একত্রে এক খণ্ডে । মূল্য চার টাকা

জীবন-যৌবনের জয়গানে পূর্ণ
সাঁওতাল বিদ্রোহ
বন্দিতা । দেবাসুর
[তিনটি আশ্চর্য পূর্ণাঙ্গ নাটক]
একত্রে এক খণ্ডে । মূল্য তিন টাকা

হাসি ও অশ্রুর সমন্বয়ে উজ্জ্বল
কোটিপতি নিরুদ্দেশ
বিদ্যুৎপর্ণা
রাজনটী । রূপকথা
[নাট্য-সাহিত্যের বিশিষ্ট সংযোজন]
একত্রে এক খণ্ডে । মূল্য তিন টাকা

ত্রিকালের প্রতিনিধিত্ব করছে
মীরকাশিম
মমতাময়ী হাসপাতাল
রঘুডাকাত
[বাংলা নাট্যের অন্ধকারে জ্বলন্ত মশাল]
একত্রে এক খণ্ডে । মূল্য তিন টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স । কলিকাতা—ছয়

বার্লিনে ছবি পাঠাবার লিখিত সরকারী নির্দেশ পেলেন ৩০শে মে ১৯৬০—অর্থাৎ ফেস্টিভ্যাল কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত শেষ তারিখ উত্তীর্ণ হয়ে যাবার এক সপ্তাহ পরে!

কিন্তু শুধু ছবি পাঠালেই তো হবে না। বিদেশী দর্শকদের উপযোগী করে সেটি কাটছাঁট করা দরকার। জার্মান ভাষায় সাব-টাইটল বা পরিচয়লিপি সংযোজনাও একটি অবশ্য করণীয় কর্তব্য। তার জন্যে প্রথমেই প্রয়োজন জার্মান ভাষায় সাব-টাইটল লেখান। এবং যেহেতু এখানে জার্মান-জানা শিল্পীর একান্ত অভাব, সাব-টাইটলগুলি যাতে নির্ভুলভাবে লেখা হয় তার জন্যে উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা দরকার। অর্থাৎ প্রত্যেকটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। অথচ যাঁরা কোন ছবি বার্লিনে পাঠান হবে তাই স্থির করতে চারমাস সময় নিয়েছেন, তাঁরা "পুবেরুন"-এর প্রযোজককে অবশ্য করণীয় কাজগুলির জন্যে চারদিন সময় দিতেও নারাজ।

ফল যা হবার তাই হল। অর্থাৎ তাড়াহুড়ো করে জোড়াতালি দিয়ে কাজ সারবার ফলে ছবিটি ফেস্টিভ্যালে কোন আলোড়ন তুলতে পারল না। উপরন্তু সরকারী অবিবেচনায় প্রযোজকের অনেকগুলি টাকা নষ্ট হল।

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী ডাঃ বি ভি কেশকারকে লিখিত একটি পত্রে "পুবেরুণ" ছবির পরিচালক প্রভাত মুখোপাধ্যায় এই ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকার অবহিত হওয়া প্রয়োজন। কোথায় ছবিটি পাঠান হচ্ছে, সেখানকার ছবি বিচারের মানদণ্ড কি—এ সমস্ত কিছুই বিচার না করে যেখানে-সেখানে যে-কোন ছবি পাঠাবার ফল আমরা হাতে-হাতেই পাচ্ছি। সুতরাং এ ব্যাপারেও কর্তৃপক্ষ স্থানীয়দের সজাগ হবার সময় এসেছে।

চিত্রালোচনা

শ্রী এন সি এ প্রোডাকসন্সের বহু-বিঘোষিত "হসপিটাল" চিত্রের মুক্তি এই সপ্তাহে। প্রেম ও মর্যাদাবোধের দোটানা এক আত্মপ্রতিষ্ঠ নারীর জীবনে যে বিপর্যয় আনে তাকে উপজীব্য করে ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মূল উপন্যাস ইতিমধ্যেই পাঠকসমাজের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে। খ্যাতিমান পরিচালক সুশীল মজুমদারের নির্দেশনায় এই বহু-পঠিত কাহিনীর চিত্ররূপ নতুন করে রসিক চিত্তে আলোড়ন তুলবে। এ ছবির অন্যতম আকর্ষণ নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অশোক-

মিনার্ভা থিয়েটারে

অঙ্গার

সুর—রবিশঙ্কর
পরিচালনা—উৎপল দত্ত
লোকসংগীত—
নির্মল চৌধুরী
উপদেষ্টা—তাপস সেন

• প্রতি বৃহস্পতি ও শনি ৬॥ •
• রবি ও ছুটির দিন ৩ ও ৬॥ •

(সি ৭৯৫১)

স্টার থিয়েটার

[শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। ফোনঃ ৫৫-১১৩৯

শ্রেয়সী

আজকের সমাজ-সমস্যার সম্মুখীন হয়ে
যে নাটক কথা বলছে—
কাহিনীঃ সুবোধ ঘোষ
নাটক ও পরিচালনাঃ দেবনারায়ণ গুপ্ত
দৃশ্য ও আলোকঃ অনিল বসু
প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ৬॥টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটীর দিন ৩টা ও ৬॥টায়
রূপায়ণেঃ ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, সাবিত্রী চট্টোঃ, বসন্ত চৌধুরী, অজিত বন্দ্যোঃ, অপর্ণা দেবী, অনুপকুমার, লিলি চক্রঃ, শ্যাম লাহা, লীলা পাল, তুলসী চক্রঃ, পঞ্চানন, বেলারাণী, প্রেমাংশু বোস ও ভানু বন্দ্যোঃ

কুমার ও সুচিত্রা সেনের একত্রে চিত্রাবতরণ। তাঁদের সঙ্গে যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, সুশীল মজুমদার, কমল মিত্র, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, মাস্টার তিলক, দীপা চক্রবর্তী, কেতকী দত্ত, রেখা মল্লিক প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সংগীত পরিচালনা করেছেন অমল মুখোপাধ্যায়।

এই সপ্তাহে আরো যে দুটি ছবি মুক্তি-লাভ করছে তাদের একটি ফিল্মস ডিভিসন কৃত ভারতীয় লোকনৃত্যের পূর্ণাঙ্গ প্রামাণ্য চিত্র "ড্যান্সেস অফ ইণ্ডিয়া"। এর প্রযোজক যশস্বী প্রয়োগশিল্পী ভি শান্তারাম। সারা ভারতবর্ষের পঁয়ত্রিশটি বিভিন্ন ধাঁজের নৃত্যগীত এর মধ্যে পরিবেশিত হয়েছে। ছবিটি আগাগোড়া রঙীন।

অন্যটি ফিল্মিস্তানের বেশ কিছুদিন আগে তোলা ঐতিহাসিক চিত্র "বাবর"। আজ্‌রা, জাগীরদার, মোহন ও রণধীরকে নিয়ে এর প্রধান ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। হেমেন গুপ্ত ও রোশন যথাক্রমে এর পরিচালক ও সুরকার।

• • •

অনেকগুলি নতুন ছবির প্রস্তুতিপর্ব চলছে।

"হেড মাস্টার"-এর পর অগ্রগামীর নতুন ছবি তোলা হবে তারাশঙ্করের 'কান্না" অবলম্বনে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "নব বোধন" গল্পটি চিত্রাকারে রূপান্তরিত করবেন "কিছুক্ষণ" খ্যাত পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়।

সুকুমার দাশগুপ্তের পরিচালনায় এস এম প্রোডাকসন্সের পরবর্তী ছবির বিষয়-বস্তু নেওয়া হবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের "নদীর নামটি অঞ্জনা" থেকে।

রাজকুমার পিকচার্স নামে একটি নব-গঠিত প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রনাথের "দেনা-পাওনা" ও "অপরিচিতা" এই দুটি ছোট গল্পের চিত্রস্বত্ব ক্রয় করেছেন। কবি-গুরুর জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবে এই প্রতিষ্ঠানের চিত্রাঞ্জলি হিসাবে উপস্থাপিত করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এর নির্মাতারা। পরিচালনা ও সুরযোজনায় থাকবেন যথাক্রমে প্রভাত মুখোপাধ্যায় ও রাইচাঁদ বড়াল। প্রযোজক বীরেন শীল স্বয়ং এর চিত্র গ্রহণ করবেন।

সব কটি ছবিরই প্রাথমিক কার্যাদি সুরু হয়ে গেছে। কয়েকটির চিত্র গ্রহণ পূজার অব্যবহিত পরেই আরম্ভ হবে।

• • •

এইচ পি প্রোডাকসন্সের "মৌমাছি"-র শুভ মহরৎ গত সপ্তাহে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে সম্পন্ন হয়েছে। দিলীপ চৌধুরী এর কাহিনীকার। ছবিটি পরি-

থিয়েটার সেন্টার

একাঙ্ক নাটক
প্রতিযোগিতা

যোগদানের শেষ দিন—
২০শে সেপ্টেম্বর
প্রবেশমূল্য—২০, টাকা
৩১এ, চক্রবেড়িয়া রোড,
কলিকাতা—২৫

রঙমহল

শুভমুক্তি

রবিবার
১৮ই সেপ্টেম্বর
সন্ধ্যা ঃ ৬॥টায়

বিমল মিত্রের
সাহেব বিবি গোলাম
নাট্যরূপ - শচীন সেনগুপ্ত

॥ পরিচালনা ঃ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ॥
॥ সুরসৃষ্টি ঃ অনিল বাগচী ॥
॥ নৃত্য-পরিচালনা ঃ অতীনলাল (এ) ॥
॥ মঞ্চসজ্জা ঃ অমলেন্দু সেন ॥
॥ আলোকসম্পাত ঃ অনিল সাহা ॥
॥ শব্দপ্রেক্ষণে ঃ প্রভাত হাজরা ॥

— রূপায়ণে —
নীতীশ মুখোঃ, রবীন মজুমদার, হরিধন, সত্য বন্দ্যোঃ, জহর রায়, বিশ্বজিৎ, অজিত, নবদ্বীপ, নির্মল, কেতকী দত্ত, কবিতা রায়, শুক্লা দাস, সিপ্রা সাহা, মমতা বন্দ্যোঃ, শ্যামলী, অনিলা, দীপিকা দাস ও সিপ্রা মিত্র।

ডঃ কার্ত্তিক বসুর
টাইকোসোডা | নানালা
অম্ল, অজীর্ণ ও ডিসপেপসিয়ায় | ব্যথা ও বেদনায়
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ-কলিকাতা ৭

১৬ই সেপ্টেম্বর
স্বপ্ন
হবে
সত্যি

হসপিটাল
প্রদর্শনীর পরিবর্তিত সময়–
২, ৫-৩০, ৮-৪৫
মিনার ঃঃ বিজলী ঃঃ ছবিঘর
এবং সহরতলীর আরো ১৫টি চিত্রগৃহে

চালনা করবেন পিনাকী মুখোপাধ্যায় প্রণতি ভট্টাচার্য, অভি ভট্টাচার্য, রবী মজুমদার, জহর রায়, জীবেন বসু, তুলসী চক্রবর্তী, বম্বের অসীমকুমার ও অসিত সেন এর বিভিন্ন ভূমিকায় দেখা দেবেন সুদর্শনা নামে একটি নবাগতা অভিনেত্রীও এই ছবিতে আত্মপ্রকাশ করবেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুর যোজনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

জ্যোতিরূপা ছায়াচিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রথম নিবেদন "সাক্ষী"র চিত্র গ্রহণ স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটির স্টুডিওতে সুরু হয়েছে। অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় এর চিত্রনাট্য লিখেছেন এবং তাঁরই তত্ত্বাবধানে ছবিটি পরিচালনা করছেন দেবব্রত দাশগুপ্ত। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন মঞ্জু দে, নির্মল কুমার, অসিতবরণ, জহর রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

• • •

নির্মীয়মান ছবিগুলির মধ্যে ফিল্ম এণ্টারটেনার-এর প্রথম ছবি "হিসাব নিকাশ"-এর কাজ রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। স্বরচিত চিত্রনাট্যের ভিত্তিতে অমল দত্ত ছবিটি পরিচালনা করছেন। নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন অনিল চট্টোপাধ্যায় ও নবাগতা অর্পিতা দেবী। অন্যান্য বিশিষ্ট ভূমিকায় আছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীর কুমার, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ, চন্দ্রাবতী, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

মহামায়া চিত্রমের "ভাঙন" ছবির কাজও মোহন বিশ্বাসের পরিচালনায় অগ্রসর হচ্ছে। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, অসিতবরণ, আশীষ কুমার, প্রণতি দেবী, নমিতা সিংহ, পদ্মা দেবী প্রভৃতিকে এর বিভিন্ন ভূমিকায় দেখা যাবে।

নাট্যাভিনয়

ষ্টারে "শ্রেয়সী"

সুবোধ ঘোষের "শ্রেয়সী" উপন্যাসে আজকের উদ্‌ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের বিশেষ মানস ভঙ্গিটি এক নিবিষ্ট অনুভবের ভেতর দিয়ে উদ্ঘাটিত। এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারের গৃহকোণ থেকে এই উপন্যাসের কাহিনী নানা ঘাত-প্রতিঘাত, বিচিত্র চরিত্রচিত্রণ, মধুর প্রণয় ও নিদারুণ চিত্তদাহের ভেতর দিয়ে জীবনের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে এসে উপনীত হয়েছে। এই কাহিনীর গতি ও পরিণতিতে প্রেম ও

প্রেম'র সম্বন্ধে ক্লিষ্ট আধুনিক সমাজ-জিজ্ঞাসার এক বলিষ্ঠ উত্তর উচ্চারিত।

এই মননশীল ও মরমী উপন্যাসের ভিত্তিতেই রচিত স্টার রংগমঞ্চের বর্তমান আকর্ষণ "প্রেয়সী"। দেবনারায়ণ গুপ্ত কর্তৃক নাট্যরূপান্তরিত ও পরিচালিত স্টারের এই নতুন নাট্যোপহার নাট্যামোদীদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন পাবার দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

উপন্যাসের মূল কাহিনীর আংশিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে নাট্যকার এই নাটকে যে নাট্যোপাখ্যান পরিবেশন করেছেন তার উদ্ভবস্থল কলকাতার অদূরবর্তী এক ক্ষয়িষ্ণু রাজবাড়ি। এক নির্মম অভিশাপ যেন আঁকড়ে ধরে রয়েছে রাজবাড়িটিকে। আর এই অভিশাপের বিড়ম্বনা নিয়ে বেঁচে রয়েছেন রাজবাড়ির বর্তমান প্রভু প'য়ষট্টি বছর বয়সের বৃদ্ধ কমল বিশ্বাস। মিথ্যা গল্প ফেঁদে আর ফাঁকি দিয়ে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তিনি সংসার চালিয়েছেন, এবং সেই সংগে নিজের একমাত্র ছেলে অতীনকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলেছেন।

কমল বিশ্বাসকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করতে পারে না তার ছেলে। অতীন চাকুরি পাবার পর তার জীবনটাই একদিন কমল বিশ্বাসের কঠোর স্বার্থপর দাবির সম্মুখে অসহায় হয়ে পড়ে। এক বড়লোকের ভাগ্নিকে বিয়ে করে ঘরে টাকা ও অলংকার এনে ছোট বোন বাসনার বিয়ের খরচ যোগাড় করে দিতে হবে তাকে। কমল বিশ্বাস ছেলেকে একথাও জানিয়ে দেন যে বিয়ের পর ইচ্ছে করলে সে নতুন বউকে ত্যাগ'ও করতে পারে। কমল বিশ্বাসের এই চক্রান্তে বাধা দিতে পারেননি তাঁর স্ত্রী সুধাময়ী। ঠাকুরদালানের বারান্দায় বসে সুধাময়ী কমল বিশ্বাসের সব ফন্দিই অতীতে যেমনিভাবে মেনে নিয়েছেন তেমনিভাবেই সায় দিলেন তার এই নির্দয় চক্রান্তে।

কেতকী নতুন বউ হয়ে এল ভাংগা রাজ-বাড়িতে, আর বাসনা চলে গেল বড়লোক স্বামীর ঘরে। লেখাপড়া জানা মেয়ে কেতকী স্বামীর মন পায়নি একদিনেরও জন্যে। কেতকী চলে গেলে অতীন রক্ষা পায়। কিন্তু শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে যেতে রাজী নয় কেতকী। বাড়ি থেকে বউকে চলে যেতে বললে রাজবাড়ির আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে। তাই কমল বিশ্বাস পুত্র-বধূকে চলে যাবার কথা বলতে পারেননি এবং মনের দিক থেকেও তা চাননি। কেতকীর বড়লোক মামা'র কাছে কমল বিশ্বাসের সব ফাঁকি যখন ফাঁস হয়ে গেল, তখন তিনি কুচক্রী শ্বশুরের আশ্রয় থেকে ভাগ্নিকে নিয়ে যাবার জন্যে বার বারই এসে ফিরে গিয়েছেন। কেতকী স্বামীর অবজ্ঞা সত্বেও শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে যেতে রাজী হয়নি।

কেতকী'র এই অনমনীয় দৃঢ়তা এক বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেয় অতীনের জীবনে। কাজরীকে ভালোবাসে অতীন। তাকে নিয়ে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখে সে। কাজরী শিল্পী—ছবি এঁকে নাম করেছে। সে অর্থ ও বৈভবের স্বপ্ন দেখে না, সে চায় একজন সুন্দর মানুষ নিয়ে একটি সুন্দর ঘর।

বিশ্বরূপা

(অভিজাত প্রগতিশীল নাট্যমঞ্চ)

[ফোন : ৫৫-১৪২৩ বুকিং ৫৫-৩২৬২]

বৃহস্পতি ও শনি সন্ধ্যা ৬॥টায় | রবি ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬॥টায়

প্রয়োগনৈপুণ্যে ও অভিনয়মাধুর্যে অতুলনীয়

সেতু

২১৯ হইতে ২২৬ অভিনয়

একটি চিরন্তন মানব অনুভূতির কাহিনী

নাটক বিধায়ক ভট্টাচার্য | আলোকসম্পাত তাপস সেন

শ্রেষ্ঠাংশে—নরেশ মিত্র, অসিতবরণ তরুণকুমার, মমতাজ, সন্তোষ, তমাল, জয়শ্রী, সুব্রতা, ইরা, আরতি প্রভৃতি

ও

তৃপ্তি মিত্র (বহুরূপী)

জানেন কি!

কলিকাতায় সাধারণ রঙ্গালয় ৫টি

স্টার-বিশ্বরূপা-মিনার্ভা-রঙমহল

ও

গিরিশ থিয়েটার

প্রযোজনা ও উপস্থাপনা—বিশ্বরূপা থিয়েটার

স্থান : বিশ্বরূপা থিয়েটার (৫৫-৩২৬২)

যেখানে নিয়মিতভাবে

সোম, বুধ ও শুক্রবার ৬॥টায় এবং রবিবার ও ছুটির দিন সকাল ১০॥টায়

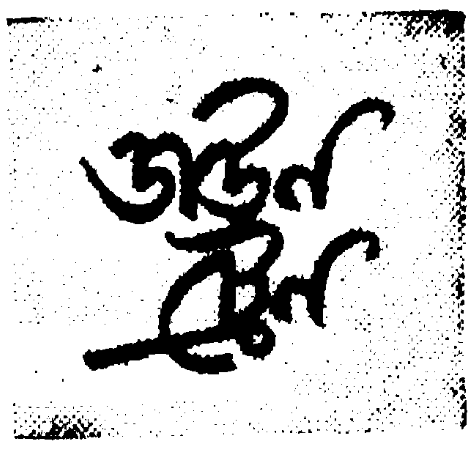

......নাটক অভিনয় হচ্ছে

সম্পাদনা ও নির্দেশনা—বিধায়ক ভট্টাচার্য

আঙ্গিক নির্দেশনা—তাপস সেন

শ্রেঃ—রাধামোহন ভট্টাচার্য, জ্ঞানেশ মুখার্জি, বিধায়ক ভট্টাচার্য, সুনীল ব্যানার্জি, গীতা দে, জয়শ্রী সেন প্রভৃতি

মহালয়ার আগেই প্রকাশ হচ্ছে

শারদীয়া

বাণীরূপা

লিখেছেন—মন্মথ রায়, পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য, শিবরাম চক্রবর্তী, কুমারেশ ঘোষ, কিরণ মৈত্র ও আরও অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিকবৃন্দ.

*

বিশেষ আকর্ষণ

তরুণকুমারের লেখা

'আমার চোখে দাদা'

এ ছাড়া মিণ্টু দাশগুপ্তের কৌতুক নক্সা, রেবতীভূষণের কার্টুন, অসংখ্য রঙ্গীন ছবি, জীবনী, গান ও বিভাগীয় রচনা থাকছে। দাম—৯, টাকা মাত্র।

১৫৪, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

ফোন—২৪-১৪৫৫

(লি ৭৯২৬)

থিয়েটার ইউনিট-এর
২১শে সেপ্টেম্বর, সন্ধ্যা ৭টা
চারদেয়াল
মিনার্ভা থিয়েটার
পরিচালনা : শেখর চট্টোপাধ্যায়
আলোক : তাপস সেন
মিনার্ভায় টিকিট পাওয়া যাচ্ছে

কাজরী তার মনের মানুষকে খুঁজে পেয়েছিল অতীনের মধ্যে।

অতীন ও কাজরীর মিলনের পথে একমাত্র বাধা হয়ে দাঁড়ায় কেতকী। কেতকীকে অতীন তার জীবন থেকে সরিয়ে দিতে চায়। একদিনের জন্যে বাড়ি এসে সে কেতকীকে বাধ্য করে বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন-পত্রে সই করতে। যে আপন হয়ে তার জীবনে এল না তাকে ধরে রাখতে চায় না কেতকী। সে সই করে দিল বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন-পত্রে। কিন্তু বিচ্ছেদের আগেই যে এক বড় বন্ধনে সে কেতকীকে বেঁধে চলে গিয়েছিল সে সংবাদ রাখেনি অতীন। যাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করতে পারেনি তার নারীত্বের উপর মুহূর্তের ভুলে অধিকার চেয়েছিল অতীন। কেতকী জানত এর নির্মম পরিণতি। সে হবে একদিন জননী, যেদিন কারোর জায়া বলে থাকবে না তার পরিচয়। তার কোলে এল ছেলে। স্বামী পরিত্যাক্তা রমণীর এই মাতৃত্ব—যে স্বামীর কাছে কোনদিন স্ত্রীর অধিকার পায়নি বলেই সকলে জানে—ক্ষমার চোখে দেখল না সমাজ। মিথ্যা কলঙ্কের অমানিশায় আলোর অপেক্ষায় দিন কাটায় কেতকী।

এদিকে কাজরীকে নিয়ে নতুন ঘর বেঁধেছে অতীন। মধু মিলনের ঘোর কাটতেই অতীন বুঝতে পারে, যে প্রেয়সীকে একদিন সে হৃদয়-মন অর্পণ করেছিল আধুনিক উদ্‌ভ্রান্ত সমাজের অনেক পাপ ইতিমধ্যেই তার মনে বাসা বেঁধেছে। সে হয়ে উঠেছে একাধিক পুরুষের মক্ষিরাণী। অতীন আরও বুঝতে পারে, কাজরী স্বামী চায় না, চায় পুরুষ। জননী হয়ে যৌবনের অকাল-মৃত্যু সে ডেকে আনতে চায় না। তার গর্ভে কোনদিনই যাতে সন্তান আসতে না পারে সেই ব্যবস্থা করে নিয়েছে স্বামীর অমতে তার এক ডাক্তার বন্ধুর সাহায্যে। এই নিদারুণ আঘাতের পর কাজরীকে নিয়ে অতীনের মোহভঙ্গ ঘটতে বিলম্ব হয় না। অতীনের সব সাধ-আহ্লাদকে নিয়ত যেন বিদ্রূপ করে চলে কাজরী। তারপর একদিন নিজের ভ্রান্ত-পথে চলার পুরো স্বাধীনতা আদায় করে নেবার জন্যে মিথ্যে অজুহাতে আদালতে অতীনের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন জানায় কাজরী। প্রেমের বাঁধনে যাকে বাঁধতে পারল না, তাকে ধরে রাখার জন্যে আইনের আশ্রয় নেয় না অতীন।

জীবনের এই নিদারুণ বঞ্চনা ও বিড়ম্বনার দিনে অতীনের মনে পড়ে কেতকীর কথা। প্রেয়সীর আসন যাকে সে দিতে পারেনি, প্রেয়সীর অধিকারে সে তারই পরিত্যক্ত কর্তব্য ও দায়িত্বের ভার তুলে নিয়েছে নিজের হাতে। আত্মাহুতির ভেতর দিয়ে সে নীরবে প্রতিপালন ও সেবা করে চলেছে বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ীকে, এবং সব দুঃখ ভুলে রয়েছে সন্তানের মুখের দিকে চেয়ে। এই মহিয়সী উপেক্ষিতাই অতীনের ব্যর্থ ও বিড়ম্বিত জীবনের একমাত্র শান্তির আশ্রয় হয়ে উঠল। প্রেয়সীর পাপে তার যে জীবন শূন্য হয়ে পড়েছিল, প্রেয়সীর পুণ্যে সে তাকে পূর্ণ করে তুলতে চাইল। অতীন অনুতাপের আগুনে নিজেকে শুদ্ধ করে ধরা দিল কেতকীর কাছে ও দু'হাতে কোলে তুলে নিল নিজের ছেলেকে। কেতকীর দু' চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল জয় ও আনন্দের অশ্রু।

নাট্যকার-নাট্যপরিচালক "প্রেয়সী" উপন্যাসের মূল সুর ও বক্তব্য অবিকৃত রেখে এর একটি রসোত্তীর্ণ নাট্যরূপ পরিবেশনের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। উপন্যাসের সব মর্মবাণী নানা ঘটনারাজী ও চরিত্রের মধ্যে

বিবিধ ভারতীর
নিবেদন
ইন্দ্রধনু
১৯৬০ সালের
১২ই সেপ্টেম্বর থেকে
বেলা ১১টা থেকে ১২টা
কথাচিত্রের গান, আকাশবাণীর লঘুসংগীত,
লোকগীতি, যন্ত্রসংগীত, ছোটগল্প, কাহিনী
ও অন্যান্য অনুষ্ঠান
(২৫·৩৬ এবং ২৫·১০ মীটারে)
DA 60|363

বিচ্ছুরিত, তা নাটকে মূল কাহিনীর আংশিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ভেতর দিয়ে বাঙময় হয়ে উঠতে বাধা পায়নি। নাট্যকার মূল কাহিনী অনুসরণ না করে নাটকটিতে অতীন ও কেতকীর জীবনের যে মিলনান্ত নাট্যপরিণতি দেখিয়েছেন তার মধ্যে নাট্যোপাখ্যানের আবেগ ও বক্তব্যের একটি সার্থক ও সুষ্ঠু সমন্বয় গড়ে উঠেছে। উপন্যাসের চরিত্রাঙ্কনে সুকুমার হৃদয়বৃত্তি ও সূক্ষ্ম মনোবীক্ষণের দীপ্তি ছড়িয়ে রয়েছে তারও বিচ্ছুরণ দেখতে পাওয়া যায় নাটকটিতে। নাটকে প্রধান চরিত্রগুলিকে মনোময় ও বাস্তব করে উপস্থিত করার এক বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন নাট্যকার। নাটকের মূল নারী চরিত্রটিকে যে সংযম ও ব্যক্তিত্বের ভেতর দিয়ে এবং যেভাবে বেদনা ও মহত্বের প্রতিমূর্তিরূপে উপস্থাপিত করেছেন নাট্যকার-নাট্যপরিচালক তা প্রশংসনীয় প্রয়োগ-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। নাট্যকার কাজরীর পিতা ও সহোদরের দুটি বিশ্বাস-যোগ্য ও সুন্দর চরিত্র অংকনের জন্যেও প্রশংসা দাবি করতে পারেন। এ-বাদে নাটকে কয়েকটি আবেগপূর্ণ নাট্যমুহূর্তের জন্যেও নাট্যকার-নাট্যপরিচালক দর্শকদের সাধুবাদ অর্জন করবেন।

তবে সামগ্রিকভাবে নাটকটি আরও সুসংবদ্ধ হলে দর্শকের মন নিবিড়তরভাবে আবেগ-আপ্লুত হয়ে উঠতে পারত। অতীন ও কাজরীর প্রণয় নিয়ে নাটকে আরও বেশী মাধুর্যরস বিস্তারের অবকাশ ছিল। অতীন ও কমল বিশ্বাসের চরিত্র উপস্থাপনে পিতা-পুত্রের সম্পর্কের অন্ত-র্নিহিত নাট্যদ্বন্দ্ব আরও গভীর ও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠতে পারত নাটকটিতে। নাটকে মূল কাহিনীর অনুসরণে নির্মলের চরিত্রটি বিন্যস্ত হয়নি বলে নাটকে তার সংক্ষিপ্ত ভূমিকা অনাবশ্যক মনে হয়েছে।

সম্মিলিত অভিনয়-সৌকর্য নাটকটির একটি বিশেষ সম্পদ। কেতকীর চরিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের হৃদয়স্পর্শী ও

জয়শ্রী পিকচার্সের "অজানা কাহিনী"-র নায়িকা সুপ্রিয়া চৌধুরী।

সংবেদনশীল অভিনয় নাটকটিকে এক বিশেষ রসমাধুর্যে মণ্ডিত করে তুলেছে। বাংলার নাট্যমঞ্চে তার ওই অভিনয় স্মরণীয় হয়ে থাকবে। নায়ক অতীনের চরিত্রটিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন বসন্ত চৌধুরী। এই সুদর্শন অভিনেতা চরিত্রটির অন্তর-বেদনা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রণয়-মুহূর্তেও তার অভিনয় মরমী। কাজরীর রূপসজ্জায় লিলি চক্রবর্তীর অভিনয় স্বচ্ছন্দ ও চরিত্রানুগ। কমল বিশ্বাস ও তার স্ত্রী সুধাময়ীর ভূমিকায় যথাক্রমে কমল মিত্র ও অপর্ণা দেবী মনোজ্ঞ ও মর্মস্পর্শী অভিনয়ের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কাজরীর পিতার চরিত্রে ছবি বিশ্বাসের অভিনয় সাবলীল। তার টেনিস-পাগল ছেলের ভূমিকায় অনুপকুমারের প্রাণোচ্ছল অভিনয় দর্শকদের আনন্দ দেয়। এক মদ্যপের চরিত্রাভিনয়ে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অভিনয়-দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। অন্যান্য ভূমিকায় প্রশংসনীয় অভিনয়-নৈপুণ্যের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন পঞ্চানন ভট্টাচার্য, তুলসী চক্রবর্তী, প্রেমাংশু বসু, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও শীলা পাল। কয়েকটি পার্শ্ব চরিত্রে উল্লেখযোগ্য শ্যাম

আমরা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি
আমাদের তৃতীয় বই দেবপ্রিয় দে'র
"মৃগতৃষ্ণা"
সুকলেবরে আত্মপ্রকাশ করেছে।
অবিলম্বেই সংগ্রহ করুন।
মূল্য : ২·৫০ ছাপা : ঝকঝকে।
নব বলাকা প্রকাশনী,
৪, নফরচন্দ্র সাহা লেন, কলিকাতা—৩৬
(সি ৭৬২৯/২)

কে. হাডের
মহাভৃঙ্গরাজ

শ্রেষ্ঠ চিরুণী
শঙ্খ মার্কা

মহালয়ে প্রকাশিত হচ্ছে
শারদীয়া '৬৭
নতুন খবর
॥ দাম : দু' টাকা ॥
এই সংখ্যায় আছে
কুমারেশ ঘোষের
॥ সম্পূর্ণ উপন্যাস ॥
এই ধূলি এও সত্য
•
দেবনারায়ণ গুপ্তের
॥ পূর্ণাঙ্গ নাটক ॥
দাবী
•
মন্মথ রায়ের
॥ নক্সা-নাট্য ॥
কুকুর-বেড়াল
•
অনন্ত চট্টোপাধ্যায়ের
॥ সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য ॥
কবিয়াল
•
ছোট গল্প - রসরচনা - প্রবন্ধ এবং চলচ্চিত্র ও মঞ্চ সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ আলোচনা
লিপিবদ্ধ করেছেন—
দিলীপ মিত্র, প্রশান্ত চৌধুরী, বি, বিশ্বনাথম, রমাপতি বসু, রাধারমণ মুখোঃ, ক্ষীরোদ চট্টোঃ
•
গোপাল ভৌমিক, এন, কে, জি মনুজেন্দ্র ভঞ্জ, পংকজ দত্ত, সন্তোষ-কুমার দে, জ্যোতির্ময় বসু রায়, পরিতোষ দে, কল্পতরু সেনগুপ্ত, সেবাব্রত গুপ্ত, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, মানু গোস্বামী
॥ নতুন খবর কার্যালয় ॥
১৬।১৭, কলেজ স্ট্রীট, কলিঃ-১২

হীরালাল পালধির লেখা মিষ্টিমধুর গল্প
"রাত্রি হলো শেষ"
শীঘ্র প্রকাশিত হবে।

নব বলাকা প্রকাশনী,
৪, নফরচন্দ্র সাহা লেন, কলিকাতা—৩৬
(সি ৭৬২৯/৩)

লাহা, শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলারানী, শৈলবালা, প্রিয়া চট্টোপাধ্যায়, ভারতী ও করুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুখেন দাস ও লিলি চক্রবর্তীর কণ্ঠে নাটকের দুটি গান সুশ্রাব্য। দৃশ্যসজ্জা ও আলোক-সম্পাতে অনিল বসু প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

রঙমহলের নতুন আকর্ষণ

আগামী রবিবার (১৮ই সেপ্টেম্বর) রঙমহলে "সাহেব বিবি গোলাম"-এর উদ্বোধন অভিনয় হবে। সেকালের কলকাতার এক অবিস্মরণীয় চিত্র এঁকেছেন বিমল মিত্র তাঁর "সাহেব বিবি গোলাম" উপন্যাসে। তার নাট্যরূপ দিয়েছেন প্রখ্যাত নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত। নাটকটি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

পটেশ্বরীর ভূমিকায় ভারতী দেবীর পরিবর্তে শেষ পর্যন্ত শিপ্রা মিত্র নির্বাচিত হয়েছেন। অন্যান্য ভূমিকা এইভাবে বণ্টন করা হয়েছেঃ ছোটবাবু—নীতীশ মুখোপাধ্যায়, ননীলাল—রবীন মজুমদার, ঘড়িবাবু—সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূতনাথ—বিশ্বজিৎ, বিধু সরকার—জহর রায়, ভৈরব—হরিধন মুখোপাধ্যায়, ব্রজদুলাল—ঠাকুরদাস মিত্র, বংশী—অজিত চট্টোপাধ্যায়, মেজবাবু—নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়, মতি—নবদ্বীপ হালদার, চুনিদাসী—কেতকী দত্ত, বড়গিন্নি—মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, জবা—সিপ্রা সাহা, হাসিনী—দীপিকা দাশ, তিনকড়ি—শুক্লা দাস, বাইজী—শ্যামলী মুখোপাধ্যায় ও অনিলা।

সংগীত পরিচালনা করছেন অনিল বাগচী। শিল্প নির্দেশ ও আলোক নিয়ন্ত্রণের ভার যথাক্রমে অমলেন্দু সেন ও অনিল সাহার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

অনুষ্ঠান সংবাদ

আগামী রবিবার (১৮ই সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাতটায় আশুতোষ কলেজ হলে দক্ষিণীর বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই উৎসবে ভাষণ দেবেন ও স্নাতকদের যোগ্যতাপত্র বিতরণ করবেন। এই উপলক্ষে সুনীলকুমার রায়ের পরিচালনায় রবীন্দ্র-সংগীতের একটি বিশেষ আসরের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আসামের সাম্প্রতিক হাংগামায় বিপন্ন উদ্বাস্তুদের সাহায্যকল্পে আগামী রবিবার (১৮ই সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টায় মহাজাতি সদনে একটি আকর্ষণীয় সংগীতোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এই উৎসবের উদ্বোধন করবেন এবং কলিকাতার নগরপাল শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন। যে সব শিল্পী এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তাঁদের মধ্যে আছেন সুনন্দা পট্টনায়ক, অরুণা ঘোষ, ওস্তাদ দবীর খাঁ ও সম্প্রদায়, এবং মহম্মদ ইমরৎ খাঁ। কুমারী শ্রীলেখা ও কুমারী রূপা কথক নৃত্য প্রদর্শন করবেন।

কেরলীয় নৃত্যকলা কেন্দ্রমের উদ্যোগে ক্যাথিড্রাল রোডস্থিত ফাইন আর্টস একাডেমির ভবনে ১৭ই থেকে ১৯শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী একটি কথাকলি সেমিনার বা কথাকলি নৃত্য সম্পর্কীয় এক আলোচনা-চক্রের আয়োজন করা হয়েছে।

আপনি কথাকলি নাচ দেখেছেন ?

কথাকলি নাচের মত টম নারিকেল তৈল নারিকেলবীথির দেশ কেরালার বিশিষ্ট সম্পদ।

বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরিস্রুত এবং টিনে ও প্লাস্টিকের কৌটায় ভর্তি টম নারিকেল তৈল বিশুদ্ধতা ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য গ্যারাণ্টিযুক্ত।

½ পাঃ, ১ পাঃ ও ২ পাঃ ভ্যাকুয়ামযুক্ত টিনে সর্বত্র পাওয়া যায়।

ভাসু ব্রাদার্স
২৬, আমড়াতলা লেন, কলিকাতা—১
Aiyars

খেলার মাঠে

একলব্য

প্রাচীন সভ্যতার পাদপীঠ, শাশ্বত নগরী রোমে সপ্তদশ অলিম্পিকের উপর যবনিকা পড়েছে। ৮৫টি দেশের যুবক যুবতী নিজেদের শৌর্য বীর্য আর ক্রীড়াশৈলী দিয়ে অলিম্পিক ইতিহাসের পাতায় রোমকে আর এক গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে যে যার দেশে ফিরে গেছে। সঙ্গে নিয়ে গেছে সপ্তদশ অলিম্পিকের মধুর স্মৃতি,

তিনটি স্বর্ণ, দুইটি রৌপ্য ও একটি ব্রোঞ্জ পদকের অধিকারিণী রাশিয়ার জিমন্যাস্ট মিস লারিশা ল্যাটিনিনা

আর অলিম্পিকের ক্রীড়াঙ্গন থেকে পাওয়া অতুলনীয় গৌরব, যা বিশ্বের খেলাধুলার ইতিহাসে তাদের গৌরবদীপ্ত খেলোয়াড় জীবনের পরিচয় পতাকা হিসাবে চিরদিন চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ৪ বছর পরে ১৯৬৪ সালে আবার অলিম্পিকের আসর বসবে নবীন জাপানের নন্দন শহর টোকিওতে। আবার বিশ্বের সমস্ত পতাকা এসে মিশবে অলিম্পিক পতাকার সঙ্গে। খেলাধুলায় কোন্ দেশ কতখানি এগিয়ে গেল আবার তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

অলিম্পিকে কোন্ ব্যক্তি কতখানি পারদর্শিতা দেখালেন, আর কোন রাষ্ট্রের কত বেশী প্রতিযোগী সাফল্য অর্জন করলেন তা জানবার কৌতূহল স্বাভাবিক। যদিও রাষ্ট্রের ভিত্তিতে নৈপুণ্যের হিসাব অলিম্পিকের আদর্শ বিরোধী তবু যেখানে শক্তির পরীক্ষা, নৈপুণ্যের বিচার, সাধনার সিদ্ধিই মুখ্য পরীক্ষার বিষয় সেখানে সাফল্যের খতিয়ান ব্যক্তি ও রাষ্ট্রভিত্তিক না হয়ে পারে না। তাছাড়া অলিম্পিকের জয়লাভ ব্যক্তিগতভাবে কোন প্রতিযোগীকে যেমন বিশ্ব প্রধানের সম্মান দিয়ে তাকে বিশ্ববরেণ্য করে তোলে তেমন প্রতিযোগীর সঙ্গে সঙ্গে তার দেশেরও পরিচয় পাওয়া যায়। বিজয়ী বিজয়মঞ্চে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ওড়ে তার দেশের জাতীয় পতাকা, বাজে দেশের জাতীয় সংগীত।

মেলবোর্ণ অলিম্পিকের মত এবার রোম অলিম্পিকেও সবচেয়ে বেশীবার উড়েছে সোভিয়েট রাশিয়ার জাতীয় পতাকা। অলিম্পিকে প্রথম স্থানাধিকারীর জন্য সোনার মেডেল, দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর জন্য রূপোর মেডেল এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীর জন্য ব্রোঞ্জের মেডেল দেবার বিধান আছে। ১৯৫৬ সালে মেলবোর্ণ অলিম্পিকে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিনিধিরা কি সোনার মেডেল, কি রূপোর মেডেল, কি ব্রোঞ্জের মেডেল, সব মেডেলই বেশী পেয়ে সর্বসাকুল্যে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী আমেরিকার চেয়ে ২৪টি মেডেল বেশী পেয়েছিল। অর্থাৎ আমেরিকা পেয়েছিল ৩২টি সোনার, ২৫টি রূপোর, ১৭টি ব্রোঞ্জের মোট ৭৪টি মেডেল। আর রাশিয়া পেয়েছিল ৩৭টি সোনার, ২৯টি রূপোর, ৩২টি ব্রোঞ্জের—মোট ৯৮টি মেডেল। বিশ্বের খেলাধুলার অগ্রগণ্য দুটি দেশ আমেরিকা ও রাশিয়ার প্রাধান্যের লড়াইয়ে রাশিয়া এবারও ৩২টি মেডেল বেশী পেয়েছে। মেডেলের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানাধিকারী আমেরিকা পেয়েছে ৭১টি আর রাশিয়া পেয়েছে ১০৩টি মেডেল। ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে সর্বপ্রথম অংশ গ্রহণ করে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিযোগীরা অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছিলেন। হেলসিঙ্কিতে রাশিয়া পেয়েছিল শীর্ষস্থান অধিকারী আমেরিকার চেয়ে মাত্র ৭টি মেডেল কম। কিন্তু হেলসিঙ্কির সাফল্যই

তিনটি স্বর্ণ ও একটি রৌপ্য পদকের অধিকারিণী আমেরিকার ষোড়শী সাঁতারু ক্রিস ভন সালজা

ছিল আমেরিকার প্রতি সোভিয়েট রাশিয়ার সতর্কবাণী।

যাই হোক, এবার অ্যাথলেটিকস আমেরিকা ও রাশিয়া, সাঁতারে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া, সাইকেল চালনায় ইতালী, জিমন্যাস্টিকসে রাশিয়া ও জাপান, ফুটবল খেলায় যুগোশ্লাভিয়া, হকিতে পাকিস্তান প্রাধান্যের পরিচয় দিয়েছে।

উপর্যুপরি ছয়টি অলিম্পিকের বিজয়ী ভারতকে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের কাছে তার বিশ্ব হকির শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব খোয়াতে হয়েছে। নতুন পাকিস্তান হয়েছে অলিম্পিক হকির নতুন চ্যাম্পিয়ন। ভারতের এ বিপর্যয় খুব অপ্রত্যাশিত ছিল না। হকি খেলায় আমরা পিছু হটতে আরম্ভ করেছি এ সত্য অনেদিন আগেই উপলব্ধি করা গিয়েছিল। স্বীকার করতে বাধা নেই মেলবোর্ণ ফাইন্যালে অনেকটা সৌভাগ্যের জোরেই আমরা পাকিস্তানকে পরাজিত করেছিলাম। তারপর এশিয়ান গেমে পাকিস্তানের কাছেই আমরা চ্যাম্পিয়নশিপের গৌরব হারিয়েছি, আজ হারিয়েছি অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নের বিশ্ব-জয়ীর সম্মান। হকি ফুটবল, অ্যাথলেটিক স্পোর্টস এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে ক্রমে ক্রমে আলোচনা করা যাবে। আজ কয়েক-জন প্রতিযোগীর ব্যক্তিগত কৃতিত্বের কথা আলোচনা করে লেখা শেষ করছি।

অ্যাথলেটিকসে তিনটি স্বর্ণ পদকের অধি-কারিণী আমেরিকার দৌড় পটিয়সী মিস উলমা রুডলফ

রোম অলিম্পিকে পুরুষ ও মেয়ে প্রতি-যোগীদের মধ্যে মেডেল লাভের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন দুইজন জিমন্যাস্ট। রাশিয়ার মেয়ে মিস ল্যারিশা ল্যাটিনিনা আর জাপানের ছেলে তাকাশি ওনো। এরা পেয়েছেন ৬টি করে মেডেল। দু'জনেরই সোনার মেডেলের সংখ্যা তিনটি করে। এর পর নাম করতে হয় আমেরিকার সাঁতার পটিয়সী ক্রিসভন সালজা ও দৌড় পটিয়সী উলমা রুডলফের। এ'দের দুজনেরই দখলে আছে তিনটি করে স্বর্ণ পদক। ক্রিস ভন সালজা আবার চতুর্থ পদক হিসাবে একটি রৌপ্য পদকও পেয়েছেন। এ ছাড়া ১৩ জন প্রতিযোগী দুটি করে স্বর্ণ পদকের অধিকারী হয়েছেন। এদের একটা তালিকাও এই সঙ্গে প্রকাশ করা হল:—

যাঁরা বেশী পদক পেয়েছেন

রোম অলিম্পিকে পুরুষ ও মেয়ে প্রতি-যোগীদের মধ্যে যারা দুইটি বা তার বেশী পদক পেয়েছেন তাদের তালিকা।

পদকের তালিকা

(১) মিস ল্যারিশা ল্যাটিনিনা (রাশিয়া) জিমন্যাস্ট ৩টি স্বর্ণ, ২টি রৌপ্য ও ১টি ব্রোঞ্জ পদক।

নীহাররঞ্জন গুপ্তর
টাটকা আনকোরা বই

মধুমিতা ৫৲

নীলতারা (২য় মুদ্রণ যন্ত্রস্থ) ৪॥ উত্তরফাল্গুনী ৬॥
অস্ত ভাগীরথী তীরে ৭॥ নূপুর ৩৲
হীরা চুনি পান্না ৪॥ কালোভ্রমর (একত্রে) ৫৲
কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী ৬॥ মায়ামৃগ (নাটক) ২॥
নিশিপদ্ম ৪॥ ঘুম নেই ৪॥

মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা — ১২

উপহার!
'বাথগেটের'
দেড়শত বৎসরের বিখ্যাত
ক্যাষ্টর অয়েল
খরিদ করিয়া

লোভনীয় পূজোপহার লাভ করুন
(১০০টি উপহার ১০৲ হইতে ৫০০৲ পর্যন্ত)
★ ১ম উপহার— ১টি নূতন রেডিও ৫০০৲ (all wave all transistor)
★ ২য় উপহার— ১টি নূতন সাইকেল ২৫০৲
★ ৩য় উপহার— ১টি নূতন সেলাই কল ১৭৫৲
এবং আরও ৯৭ টি মূল্যবান উপহার—

আপনি এখনই আপনার নিকটস্থ ষ্টোর বা ফার্মেসী হইতে 'GIFT COUPON INSIDE' লেবেলযুক্ত বাথগেটের ক্যাষ্টর অয়েল (৪ আং শিশি) খরিদ করিয়া 'লাকীকুপনের' এক বা ততোধিক উপহার পাইতে পারেন।

অনুসন্ধান করুন:—

মেসার্স বাথগেট এণ্ড কোং লিঃ
১৭-১৯, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১
ফোন : : ২৩-১৪৩৪

মেসার্স পুরী এণ্ড কোং
সোল ডিষ্ট্রিবিউটার, কলিকাতা ও সুবার্বস
৫৬, চৌরঙ্গী, কলিকাতা-১৬
ফোন : : ৪৪-৪১৬০

ফিক্সড ও স্প্রিং বোর্ড ডাইভিংয়ের বিজয়িনী জার্মানীর স্কুল ছাত্রী ইনগ্রিড ক্র্যামার

(২) তাকাশি ওনো (জাপান) জিমন্যাস্ট ৩টি স্বর্ণ, ১টি রৌপ্য ও ২টি ব্রোঞ্জ পদক।

(৩) ক্রিস ভন সালজা (আমেরিকা) তারু ৩টি স্বর্ণ ও ১টি রৌপ্য পদক।

(৪) মিস উইলমা রুডলফ (আমেরিকা) অ্যাথলীট—৩টি স্বর্ণপদক।

(৫) গ্লেন ডেভিস (আমেরিকা) অ্যাথ-লীট—২টি স্বর্ণপদক।

(৬) ওটি ডেভিস (আমেরিকা) অ্যাথলীট ২টি স্বর্ণপদক।

(৭) আর্মিন হ্যারি (জার্মানী) অ্যাথলীট ২টি স্বর্ণপদক।

(৮) সান্তে গিয়াগেলী (ইতালী) সাইক্লিস্ট—২টি স্বর্ণপদক।

(৯) মাইক ট্রয় (আমেরিকা) সাঁতারু—২টি স্বর্ণপদক।

(১০) ক্যারিল সুলোর (আমেরিকা) তারু—২টি স্বর্ণপদক।

(১১) মিস লীন বার্ক (আমেরিকা) তারু—২টি স্বর্ণপদক।

(১২) মিস ইনগ্রিদ ক্রামার (জার্মানী) ডাইভিং—২টি স্বর্ণপদক।

(১৩) ফেরেন্স নেমেথ (হাঙ্গেরী) পেন্টাথলন—২টি স্বর্ণপদক।

(১৪) লরেন্স মর্গ্যান (অস্ট্রেলিয়া) অশ্বচালনা—২টি স্বর্ণপদক।

(১৫) রুডলফ কারপাটি (হাঙ্গেরী) অসিচালনা—২টি স্বর্ণপদক।

(১৬) জি ডেলফিনো (ইতালী) অসি-চালনা—২টি স্বর্ণপদক।

(১৭) ভ্লাডিমির জোয়ানোভিচ্ (রাশিয়া) —২টি স্বর্ণপদক।

ফাইনাল তালিকা

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
রাশিয়া	৪৩	২৯	৩১
আমেরিকা	৩৪	২১	১৬
ইতালী	১৩	১০	১৩
জার্মানী	১২	১৯	১১
অস্ট্রেলিয়া	৮	৮	৬
তুরস্ক	৭	২	০
হাঙ্গেরী	৬	৮	৭
জাপান	৪	৭	৭
পোল্যান্ড	৪	৬	১১
চেকোস্লোভাকিয়া	৩	২	৩
রুমানিয়া	৩	১	৬
ব্রিটেন	২	৬	১২
ডেনমার্ক	২	৩	১
নিউজিল্যান্ড	২	০	১
বুলগেরিয়া	১	৩	৩
সুইডেন	১	২	৩
ফিনল্যান্ড	১	১	৩
অস্ট্রিয়া	১	১	০
যুগোশ্লাভিয়া	১	১	০
পাকিস্তান	১	০	১
ইথিওপিয়া	১	০	০
গ্রীস	১	০	০
নরওয়ে	১	০	০
সুইজারল্যান্ড	০	৩	৩
ফ্রান্স	০	২	২
ইরাণ	০	১	৩
হল্যান্ড	০	১	২
দক্ষিণ আফ্রিকা	০	১	২
আর্জেণ্টিনা	০	১	১
ইউনাইটেড আরব	০	১	১
ক্যানাডা	০	১	০
ঘানা	০	১	০
ভারত	০	১	০
মরক্কো	০	১	০
পর্তুগ্যাল	০	১	০
সিংগাপুর	০	১	০
ব্রেজিল	০	০	২
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	০	০	২
ইরাক	০	০	১
মেক্সিকো	০	০	১
স্পেন	০	০	১
ভেনেজুলা	০	০	১

দু'টি স্বর্ণ পদকের অধিকারী বিশ্বের ক্ষিপ্রতম দৌড়বীর জার্মানীর আরমিন হ্যারি

সাঁতারে দুইটি স্বর্ণ পদকের অধিকারী আমেরিকার মাইক ট্রয়

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

৫ই সেপ্টেম্বর—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের অধিবেশনে আসাম সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের দাবিসমূহের ব্যাপারে প্রথমাবধি কেন্দ্রীয় সরকার তথা প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী পন্থের দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।

অদ্য সুপ্রীম কোর্টের কনস্টিটিউশন বেঞ্চ এই মর্মে রায় দান করিয়াছেন যে, সুপ্রীম কোর্টে মামলা বিচারাধীন থাকাকালে সংবিধানের ১৬১নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বোম্বাইয়ের (বর্তমানে মহারাষ্ট্র) রাজ্যপালের কম্যাণ্ডার নানাবতীর উপর প্রদত্ত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ স্থগিত রাখার ক্ষমতা নাই।

৬ই সেপ্টেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু শ্রীনিকিতা ক্রুশ্চেফকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য তাঁহার এখনই কোন সংকল্প নাই এবং রাষ্ট্রপুঞ্জে তাঁহার যোগদান ঘটনাবলীর গুরুত্বের উপর নির্ভর করিবে।

অংগচ্ছেদ, উদ্বাস্তু আর বেকারীর চাপে বিপর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গে বাঙলার সন্তানগণ চাকুরির ব্যাপারে ক্রমেই কোণঠাসা হইয়া পড়িতেছেন। সম্প্রতি এক সরকারী নমুনা তদন্তে প্রকাশ পাইয়াছে যে, নিজের রাজ্যেই বাঙালী চাকুরিয়ার দল সংখ্যালঘু। রাজ্যের বিভিন্ন বে-সরকারী সংস্থার প্রায় নয় লক্ষ কর্মীর মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা শতকরা মাত্র ৪১ ভাগ।

৭ই সেপ্টেম্বর— আজ রাজ্যসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত পন্থ আসামের ঘটনাবলী সম্পর্কে সংসদীয় প্রতিনিধি দলের রিপোর্ট বিবেচনার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, আসামের ঘটনাবলী সমগ্র দেশে গভীর দুঃখ ও উদ্বেগ সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি বলেন, একদিক দিয়া আসাম মোটেই একটিমাত্র ভাষার রাজ্য নয়।

অদ্য নয়াদিল্লিতে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি বুখারেস্ট ইস্তাহার সম্পর্কে যেরূপ দ্ব্যর্থবোধক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় কমিটি মোটের উপর আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ক্রুশ্চেফ অনুসৃত পন্থাটিই সমর্থন করেন।

আজ সকালে আসানসোল হইতে ৫০ মাইল দূরে এক কয়লার খনিতে প্রচণ্ড দাংগা হয়। ওই হাংগামায় ৪ জন নিহত এবং ৩০ জন আহত হইয়াছে। তার মধ্যে ২০ জনের অবস্থা আশংকাজনক বলিয়া প্রকাশ। খনিটি সালামপুর থানার অন্তর্গত। নিহতদের দুইজন ঐ খনির দরোয়ান এবং অপর দুইজন শ্রমিক।

৮ই সেপ্টেম্বর—জনৈক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী বলেন যে, নির্মীয়মাণ দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার নির্মাণকার্যে নিযুক্ত বিভিন্ন ঠিকাদারী সংস্থায় প্রায় বিশ হাজার কর্মচারীর মধ্যে শতকরা দশজনও বাঙালী কর্মী নাই। কর্মীদের বেশীর ভাগই বোম্বাই, পাঞ্জাব ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হইতে আগত।

গতকল্য সকাল ৭-৪৫ মিনিটে সংসদ সদস্য শ্রীফিরোজ গান্ধী উইলিংডন নার্সিংহোমে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৮ বৎসর হইয়াছিল।

৯ই সেপ্টেম্বর—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সর্বশেষ বার্ষিক রিপোর্ট হইতে জানা যায়, ১৯৬০ সালের ৩০শে জুন যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই বৎসর ভারতে সাধারণ মূল্যস্তর বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী আজ লোকসভায় বলেন যে, বস্ত্রমূল্য হ্রাসের ব্যাপারে গবর্নমেণ্ট ইণ্ডিয়ান কটন মিলস ফেডারেশনকে যতদূর অগ্রসর হইতে বলিয়াছিলেন, ফেডারেশন ততদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয় নাই। বোম্বাইর এক সংবাদে প্রকাশ যে, ইণ্ডিয়ান কটনমিলস ফেডারেশন উহার অন্তর্ভুক্ত সকল সমিতিকে ১০ই সেপ্টেম্বর হইতে সুতার কাপড় ও সুতার বাণ্ডিলের উপর মূল্যের ছাপ মারিয়া দিবার নির্দেশ দিয়াছেন

১০ই সেপ্টেম্বর—আসাম রাজ্যের সরকারী ভাষার প্রশ্ন সম্পর্কে পৃথকভাবে এবং সমবেতভাবে ঘরোয়া আলোচনার জন্য আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর গৌহাটিতে আসামের বিভিন্ন ভাষার প্রতিনিধিরা মিলিত হইবেন।

অদ্য ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে পশ্চিমবংগ পুনর্গঠন সংযুক্ত পরিষদ ও স্বতন্ত্র পার্টির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সভায় আসামের হাংগামা সম্পর্কে সভাপতি শ্রীনির্মলচন্দ্র চ্যাটার্জি বলেন, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতির নেতৃত্বে উপযুক্ত বিচারবিভাগীয় তদন্তের ঘোষণার জন্য আমরা প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু ও ভারত সরকারকে ছয় সপ্তাহ সময় দিয়েছি।

১১ই সেপ্টেম্বর—ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিশেষত কালিম্পং এবং কলিকাতায় 'চীনা গুপ্তচর চক্রের অবস্থান সম্পর্কে যে অভিযোগ উঠিয়াছে, তৎসম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ ব্যাপক তদন্ত শুরু করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার কাজ কিভাবে চলিতেছে তাহা পর্যালোচনার জন্য আজ নয়াদিল্লিতে পশ্চিমবংগ, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রীদের এক বৈঠকে বসতি স্থাপনকারীদের জমির স্বত্বাধিকার দান নীতিগতভাবে স্বীকৃত হয়।

বিদেশী সংবাদ

৫ই সেপ্টেম্বর—কংগোর রাষ্ট্রপতি শ্রীযোসেফ কাসাভুবু আজ রাত্রিতে এক বেতার ভাষণে বলেন যে, কংগোর প্রধানমন্ত্রী শ্রীপ্যাট্রিস লুমুম্বাকে অপসারিত করিয়া তাঁহার স্থলে তিনি সেনেটের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযোসেফ ইলেওকে নিযুক্ত করিয়াছেন। শ্রীকাসাভুবু উক্ত বেতার ভাষণে আরও বলেন যে, কংগোর শাসনভার গ্রহণ করিবার জন্য তিনি রাষ্ট্রপুঞ্জকে আহ্বান জানাইয়াছেন।

৬ই সেপ্টেম্বর—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার গোপন বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত দুইজন আমেরিকান সাংকেতিক ভাষা বিশেষজ্ঞ গত জুন মাসে নিখোঁজ হন। অদ্য তাঁহারা মস্কোতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, তাঁহারা রাশিয়ার হইয়া কাজ করিবেন।

শ্রীপ্যাট্রিস লুমুম্বাকে প্রধানমন্ত্রিত্ব হইতে পদচ্যুত করার জন্য প্রেসিডেণ্ট কাসাভুবুর চেষ্টা কার্যত ব্যর্থ হইলে আইন ও শৃংখলা রক্ষার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্তৃপক্ষ আজ অতি দ্রুত লিওপোল্ডভিল বেতার কেন্দ্র বন্ধ করিয়া দেন এবং বিমান চলাচলের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ করেন।

৭ই সেপ্টেম্বর—"আফ্রিকায় রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন কংগোতে যে এক তরফা কার্যকলাপ চালাইয়া যাইতেছে" তাহা বন্ধ করার জন্য প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার আজ সোভিয়েট সরকারকে অনুরোধ জানান।

শ্রীপ্যাট্রিস লুমুম্বা আজ আফ্রিকার স্বাধীন দেশগুলির নিকট অবিলম্বে সামরিক সাহায্য চাহিয়াছেন।

৮ই সেপ্টেম্বর—করাচীর একটি প্রধান কলেজের অধ্যক্ষ ছাত্রীদের নাইলন পোশাক ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। কারণ দেখান হইয়াছে যে, এই সব পোশাকে খুব বেশী গা দেখা যায় এবং ছাত্রদের চিত্ত-বিক্ষেপ ঘটায়।

কংগোর প্রধানমন্ত্রী শ্রীপ্যাট্রিস লুমুম্বা আজ কংগোর অবস্থা সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের একটি বৈঠক আহ্বান করিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন।

৯ই সেপ্টেম্বর—গত বুধবার কংগোর সৈন্য-বাহিনীর উদ্দেশে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় শ্রীপ্যাট্রিস লুমুম্বা ঘোষণা করেন যে, তিনি কংগোর রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল শ্রীদাগ হ্যামারশিল্ড প্রস্তাব করেন যে, কংগো সংকট সম্পর্কে আলোচনার জন্য অদ্য রাত্রে নিরাপত্তা পরিষদের এক জরুরী বৈঠক করা প্রয়োজন।

১০ই সেপ্টেম্বর—কংগোর সংকটে বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাইতেছে—রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল শ্রীহ্যামারশীল্ড গত রাত্রে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে এই মর্মে এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীনিকিতা ক্রুশ্চেফকে নিউইয়র্কে অবস্থানকালে রাষ্ট্রপুঞ্জের যথাসম্ভব কাছাকাছি বসবাস করিতে এবং ম্যানহাটার্ন দ্বীপের সীমানার বাহিরে চলাফেরা না করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

১১ই সেপ্টেম্বর—একদল সশস্ত্র কংগোলী সৈন্য লইয়া প্রধানমন্ত্রী প্যাট্রিস লুমুম্বা আজ আকস্মিকভাবে লিওপোল্ডভিল বেতারকেন্দ্র দখল করিতে গিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর ঘানা দলের অধিনায়ক একজন বৃটিশ অফিসার কর্তৃক বাধা পান। উক্ত অফিসার বলেন, "আপনি আর অগ্রসর হইলে আমি গুলী করিব।"

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—২০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক ৫ টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২ ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস ৬ সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২০—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

দেশ

DESH 40 Naya Paise
Saturday, 24th September, 1960

২৭ বর্ষ ॥ ৪৭ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১ আশ্বিন, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

GOVERNMENT LIBRARY

সম্প্রীতির প্রসার

প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্প্রীতির সম্পর্কটাই স্বাভাবিক। তার ব্যতিক্রম কখনও কখনও ঘটে। কিন্তু বিরোধকে অনিবার্য ভবিতব্য বলে চিরদিনের মত মেনে নিতে কোন পক্ষেরই মন চায় না। ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান কেবল ভৌগোলিক হিসাবে পরস্পরের প্রতিবেশী নয়; জন্মসূত্রে এই দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের পরস্পর সম্বন্ধ নিবিড়, অবিচ্ছেদ্য। ভারত ও পাকিস্তানের পৃথক পৃথক স্বাধীন সত্তা সমসাময়িক কালের ইতিহাসে একই পরিমণ্ডলে পরিবর্ধিত ও বর্ধমান। দুই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, প্রশাসনিক পদ্ধতি ও প্রকরণে কতখানি মিল এবং কতখানি অমিল তার চুলচেরা বিচারে প্রয়োজন নেই। প্রতিবেশীদের মধ্যে সম্প্রীতির গোড়ার কথা, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সহনশীলতা। ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের মধ্যে সেই পরস্পর শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা অনুশীলনের ক্ষেত্র ধীরে ধীরে প্রস্তুত হচ্ছে মনে হয়। দুই দেশের পক্ষেই এ বড় আনন্দের বিষয়।

অতীতে কী ঘটেছে, কী ঘটা উচিত ছিল কিম্বা ঘটা উচিত হয় নি তা নিয়ে বাদানুবাদ বৃথা। প্রধানমন্ত্রী নেহরুর পাকিস্তান সফর এবং প্রেসিডেন্ট আয়ুবের সঙ্গে আলাপ আলোচনা একটা বৃহৎ সম্ভাবনার সূচনা করেছে। একে সুলক্ষণ মনে করি। ইতিহাস আবহমানকাল বৎসরের পর বৎসর পুরানো বাদ বিসম্বাদের জের টেনে চলবেই, এমন কোন অমোঘ বিধান নেই। গত তের বৎসর স্বাধীন ভারত অথবা স্বাধীন পাকিস্তান কারোই ইতিহাস থেমে থাকে নি; উত্থানেপতনে, পরিবর্তনে, শঙ্কায়, আশা নিরাশায় দুই দেশের জনমানস নানা ভাবে আলোড়িত হয়েছে, দুই দেশেই রাজনৈতিক দৃশ্যপটের অল্প-বিস্তর পরিবর্তন ঘটেছে। সম্প্রতি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পূর্ণ সম্প্রীতি স্থাপনের সুযোগও প্রশস্ত হয়েছে বলা যায়। প্রেসিডেন্ট আয়ুবের শাসনকালে ভারতের প্রতি পাকিস্তানের মনোভাব অনেকটা সৌহার্দপূর্ণ হয়েছে দেখে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এখন আরও আশান্বিত বোধ করা স্বাভাবিক। ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের ইতিহাসে পরস্পর বিশ্বাস ও বোঝাপড়ার নতুন পরিচ্ছেদ রচনার উদ্যোগ প্রকৃতই শুরু হতে পারলে আনন্দের কথা।

দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যে সমস্ত সমস্যা এখনও অমীমাংসিত রয়েছে সেগুলির সবিস্তার বর্ণনা এবং আলোচনায় আপাতত প্রয়োজন নেই। সমস্যাগুলি গুরুতর সন্দেহ নেই এবং সন্দেহ নেই এগুলির সন্তোষজনক মীমাংসার জন্য দুই রাষ্ট্রের নেতাগণ এবং জনসাধারণ আগ্রহী। মীমাংসা কীভাবে সম্ভব তা নির্ধারণের দায়িত্ব ভারত ও পাকিস্তানের রাষ্ট্র নেতাদের। আমাদের বক্তব্য, কোন কোন সমস্যার মীমাংসা বিলম্বিত হলেও দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সম্প্রীতির সম্পর্ক ছিন্ন অথবা ক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণ নেই। মতভেদ মাত্রেই বিরোধের সূচনা কিম্বা পরস্পর শত্রুতা ঘোষণা অনিবার্য করে না। এ-সম্পর্কে কয়েক বৎসর পূর্বের অভিজ্ঞতা স্মরণীয়; কখনও কখনও ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মনোমালিন্য অবস্থাচক্রে এতই তীব্র হয়েছিল যে অনেকে এই দুই রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কিত বোধ করেছিলেন। কিন্তু তবুও ব্যাপক ক্ষেত্রে বৃহদাকারে কোনও সংঘর্ষ দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের শান্তিনাশ করে নি, উত্তেজনা ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়েছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে মত বিরোধ থাকলেই প্রচণ্ড বৈরিতা এবং সংঘর্ষ অবধারিত নয়। উত্তেজনা প্রশমন ও পরিহারের এই তাৎপর্য ভারত এবং পাকিস্তান কোন দেশের অধিবাসীবৃন্দই উপেক্ষা করতে পারে না।

পরস্পর মনোভাবের সুস্থতা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের উপর দুই রাষ্ট্রের সম্প্রীতি ও শান্তি প্রধানত নির্ভর করে। সে জন্য ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধের যে-সমস্ত বিষয় এখনও নিষ্পত্তি বাকী রইল সেগুলির অবিলম্বে চূড়ান্ত মীমাংসার উপর বর্তমানে সর্বাধিক গুরুত্ব না দিলেও চলে। ভারত ও পাকিস্তান, এই দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা থাকা কারো পক্ষেই কল্যাণকর নয়; এই বিশ্বাস দুই দেশের অধিবাসীদের মনে ক্রমে ক্রমে যত দৃঢ়মূল হবে বিরোধ-মীমাংসার পথও ততই প্রশস্ত হতে থাকবে। ভারতবর্ষের মনোভাব এ-বিষয়ে প্রথমাবধি পরিষ্কার। বিরোধ মীমাংসার জন্য অনেক ক্ষেত্রে ভারতকেই বেশী ঝুঁকি নিতে হয়েছে। ও দিকে প্রেসিডেন্ট আয়ুবের নেতৃত্বাধীনে পাকিস্তান নানারকম ভাগ্যান্বেষী রাজনীতি ব্যবসায়ীদের দায়িত্বহীন হঠকারিতা ও বিদ্বেষ-বিষ-সৃষ্টিকারী প্ররোচনার প্রভাবমুক্ত হতে পেরেছে। ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপনের সুযোগ এখন তাই পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী নির্বিঘ্ন মনে করা যায়।

রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে রাজনৈতিক ও বৈষয়িক বোঝাপড়া অবশ্য দুই দেশের মধ্যে মিলন বন্ধনের একমাত্র সূত্র নয়। কিন্তু এও না মেনে উপায় নেই যে, রাজনৈতিক অথবা বৈষয়িক বিরোধ প্রবল থাকলে অন্যান্তর ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক, সামাজিক আদান-প্রদান ও বন্ধুত্ব দুঃসাধ্য হয়। সুখের বিষয় ভারত-পাকিস্তানের রাজনৈতিক মনোমালিন্য কখনও কখনও তীব্র হওয়া সত্ত্বেও দুই দেশের জনসাধারণের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ কখনও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়নি। চরম দুর্যোগের অন্ধকারে যে সময় দুই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক আকাশ সমাচ্ছন্ন ছিল তখনও শুভবুদ্ধি ও সৌভ্রাত্রের মানবিক চেতনা ভারত ও পাকিস্তানের জনমানসের কোন কোন স্তরে আশা ও বিশ্বাসের আলোক জ্বালিয়ে রাখতে পেরেছে। এর জন্য সাধুবাদ প্রাপ্য ভারত ও পাকিস্তানের পরস্পর প্রতিবেশী সুলভ বন্ধুত্বকামী জনসাধারণের। নেহেরু-আয়ুব সাক্ষাৎকারের ভবিষ্যৎ পরিণাম ভারত ও পাকিস্তানের জনসাধারণের এই আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্তির অনুকূল হোক এই আশা যতদূর সম্ভব বর্তমানে অযৌক্তিক নয়।

প্রসঙ্গত

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা রবীন্দ্র রচনাবলীর সুলভ সংস্করণ প্রকাশ সম্পর্কে এই বিভাগেই কিছুদিন আগে আলোচনা করেছিলাম। আনন্দের বিষয়, আমাদের আবেদনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনৈক মুখপাত্র মুখ খুলেছেন। সাংবাদিক-দের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন যে আগামী পঁচিশে বৈশাখের মধ্যেই রবীন্দ্র-রচনাবলীর সুলভ সংস্করণ পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের উদ্যোগে প্রকাশিত হবে এবং পঁচাত্তর টাকার মধ্যেই রবীন্দ্র-রচনা-বলী পাওয়া যাবে। শুভ সংবাদ সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন শ্রেণীর রচনাকে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে একত্রিত প্রকাশের যে আবেদন জানিয়েছিলাম সে-বিষয়ে সরকারী মুখপাত্র নীরব থেকে গিয়েছেন। কী পদ্ধতিতে রবীন্দ্র-রচনা-বলীর সুলভ শতবার্ষিকী সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে তা জানার আগ্রহ ও প্রয়োজন জনসাধারণের থাকা স্বাভাবিক। ড্রয়িং রুমের শোভা বর্ধনের জন্য বহু মূল্যবান আসবাবের পাশে এক সেট রচনাবলী অনেক ধনীর গৃহেই স্থান পাবে। তাঁদের জন্য আমাদের মাথাব্যথা নেই, তাঁদের জন্য বিশ্বভারতী শোভন সংস্করণই আছে। আমাদের আবেদন হচ্ছে সেইসব লোকজনদের জন্য যাঁরা নিরবধি রবীন্দ্র সাহিত্য থেকে সুধা পান করেন জীবনকে সার্থকরূপে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনে, যেমন নিরবধি আলো বাতাস গ্রহণ করে মানুষ বাঁচে। তাঁদের কাছে এই পঁচাত্তর টাকার 'সুলভ সংস্করণ' কি সত্যিই সুলভ? আজকের দিনে মধ্যবিত্ত বাঙালীর ক্রয় ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর সামগ্রিক পরিচয় লাভের জন্য যারা সর্বাধিক আগ্রহশীল তারাই চিরকাল সীমিত ক্রয়ক্ষমতার জন্য সমগ্র রচনাবলী সংগ্রহের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকে গিয়েছে। সুতরাং 'শত-বার্ষিকী সংস্করণ' সংগ্রহের জন্য একসঙ্গে পঁচাত্তর টাকা দেবার ক্ষমতা যেখানে জনসাধারণের অধিকাংশেরই নেই, সেখানে কিস্তিতে টাকা জমা দিয়ে সমগ্র রচনাবলী সংগ্রহের সুবিধা পশ্চিমবঙ্গ সরকার করবেন বলেই আমাদের ধারণা।

*

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখপাত্র আরও জানিয়েছেন যে অসাধু পুস্তক ব্যবসায়ী-দের হাতে পড়ে রচনাবলী যাতে কালো বাজারে বিক্রী না হতে পারে তজ্জন্য রচনাবলী প্রকাশের [illegible]ক' বিজ্ঞপ্তি দিয়ে শ্রোতাদের [illegible]সীর যোগ স্থাপন করবেন। অতি উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু সরকারী তত্ত্বাবধানে পুস্তক বিক্রয়ের কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। পুত্র-কন্যার জন্য পাঠ্য বই 'কিশলয়' ক্রয়েচ্ছু অভিভাবকদের গ্রীষ্মের প্রখর রোদে কলেজ স্ট্রীটের রাস্তায় লম্বা লাইন দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি অসহায় ভাবে। প্রত্যেকেরই সময়ের মূল্য আছে, অনিশ্চিত সময় অপেক্ষারও সীমা আছে। অধৈর্য হয় অবশেষে বারো

> পুজো উপলক্ষে দেশ পত্রিকা কার্যালয় এক সপ্তাহ বন্ধ থাকবে। পরবর্তী (৪৮) সংখ্যা প্রকাশিত হবে আগামী ৮ অক্টোবর।
>
> সম্পাদক

আনার 'কিশলয়' পাঁচসিকা দিয়ে ফুটপাথের কালো বাজার থেকে কিনে নিতে হয়। সরকারী তত্ত্বাবধানে গ্রন্থ বিক্রয়ের নমুনা যখন এই, তখন রবীন্দ্র-রচনাবলীকেও ফুটপাথের কালোবাজারে গড়াগড়ি খেতে দেখলে বিস্মিত হবার কিছু নেই। সরকারী জনৈক মুখপাত্র অবশ্য রচনাবলী সংগ্রহেচ্ছু ক্রেতাদের ভরসা দিয়েছেন নাম রেজেস্ট্রি ক'রে বই বিক্রী করা হবে। নাম রেজেস্ট্রী করলেই যে রচনাবলী নিশ্চিত পাওয়া যাবে সে-ভরসা কি সরকার জন-সাধারণকে দিতে পারবেন? সরকারী লাল-ফিতার রক্তচক্ষু সর্বদাই জন-সাধারণকে আতঙ্কে রাখে। আতঙ্ক এই জন্যে যে, সরকারী তত্ত্বাবধানে এবং নিয়ন্ত্রণে অনেক সামগ্রীই জনসাধারণের কাছে দেখা দিয়েই কর্পূরের মত উবে গিয়েছে—পরে সেই সামগ্রীই জমা হয়েছে কালো-বাজারীর কবলে। অনেক অভিজ্ঞতার পর এই ধারণাই হয়ে ওঠা অসম্ভব নয় যে, রবীন্দ্র রচনা-বলীও হয়ত সেই একই পথে উধাও হয়ে যাবে।

•

এ ক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় সরকারী তত্ত্বাবধানে সরাসরি বই বিক্রীর সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজেদের হাতে না রেখে জনসাধা-রণের আস্থাবান পুস্তক ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে বিক্রীর ব্যবস্থা হলে ক্রেতাদের পক্ষে সহজে এবং সত্বর রচনাবলী সংগ্রহের সুযোগ ঘটবে। সাধু পুস্তক ব্যবসায়ী একাধিক আছে এবং তাঁদের সুনাম ও প্রতিষ্ঠা সর্বজনবিদিত। এছাড়া বিশ্ব-ভারতীর বইয়ের দোকান ত আছেই। ক্রেতাদের কাছে তৎপরতার সঙ্গে বই পৌঁছে দেওয়াই এদের ব্যবসা এবং তার জন্য স্বতন্ত্র সংগঠন ও নৈপুণ্য তাদের আছে। সরকারের শুধু দেখা কর্তব্য তৎপরতার সঙ্গে বইয়ের দোকানের চাহিদা যেন মেটাতে পারা যায়, আর 'কিশয়ল'-এর মত রচনাবলীকে ফুট-পাথে যেন ঠেলে ফেলে দেওয়া না হয়।

*

আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল পল্লীবাসী-দের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় শতবার্ষিকী উৎসব পালনের কি প্রস্তুতি চলছে তা দেশ-বাসীকে জানানো। কোনো পরিকল্পনাই যদি এখন থেকে তাদের কাছে তুলে না ধরা হয় তাহলে সরস্বতীর বরপুত্রের পুজো হবে সরস্বতী পুজোর মতই মাইক্রোফোন-লাউড স্পীকার বিড়ম্বিত অর্থহীন উল্লাসের মধ্যে।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব পালনের অসীম আগ্রহ নিয়ে দেশবাসী অপেক্ষা করছে, শুধু প্রয়োজন কী ভাবে উৎসব অনুষ্ঠিত হলে উৎসবপাত্রের যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হবে সেই প্রস্তুতি-পর্বটি জানিয়ে দেওয়া। দেশবাসী আজ সেই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা জানাবার জন্য শতবার্ষিকী কমিটির দুয়ারে বার বার করাঘাত করে ব্যর্থ হয়েছে। সরকারী মুখপাত্র মাঝে-মাঝে পাত্রের ঢাকনা খুলে এক-একটি ভানুমতীর খেলা ঘোষণা করেছেন, তাতেই চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেছে। কলকাতা শহরে রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত বড় বড় ইমারৎ, প্রদর্শনী গৃহ, সরোবর, স্টেডিয়াম মূর্তি আর সড়ক নির্মাণের ঘোষণায় আমরা পুলকিত নই। ১৩৬৮ সালের পঁচিশে বৈশাখ থেকে যে রবীন্দ্র শতবর্ষ শুরু হবে সেই বর্ষটি কি ভাবে দেশব্যাপী উৎসবে পরিণত করা যায় সেই ঘোষণাই আমরা শতবার্ষিকী কমিটির কাছে জানতে চাই।

বৈঠকী

কংগোর সংকট দিনের পর দিন যে রকম দুর্বোধ্য, প্যাঁচালো এবং ভয়াবহ হয়ে উঠ্‌ছে তাতে এই লেখা যখন ছাপা হয়ে বেরুবে, তখন সেখানকার অবস্থা কী রকম হয়ে দাঁড়াবে তা আন্দাজ করাও কঠিন। এখনই যে কী অবস্থা হয়েছে তাও বুঝা মুশকিল। কটংগার সংবাদ, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধের খবর চাপা পড়ে গিয়ে এখন কেন্দ্রীয় সরকারের ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার খবরই মুখ্য হয়ে উঠেছে। প্রেসিডেন্ট কাসাভুবু এবং প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বা পরস্পরকে বরখাস্ত করে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তাতে কারোই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি, কেবল গৃহ-যুদ্ধ ও রক্তপাত আরম্ভ হয়। কংগো সেনা-বাহিনীও বিভক্ত হয়ে যায়। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে লুমুম্বা-বিরোধী দলের নেতা কর্নেল মোচমোবুটু শেষ পর্যন্ত "সিভিল" কর্তৃত্বের সাময়িক অবসান হল বলে সামরিক কর্তৃত্ব ঘোষণা করেন, কিন্তু তাতে বাস্তব পরি-স্থিতির যে বিশেষ কোনো পরিবর্তন বা শৃংখলা প্রতিষ্ঠার কোনো লক্ষণ ছিল তা নয়। মিঃ লুমুম্বার আমন্ত্রণে সোভিয়েট রাশিয়া অনেকগুলি এরোপ্লেন এবং অনেক টেকনি-সিয়ান পাঠিয়েছেন, তাঁদের আগমনে অবস্থার জটিলতা আরো বাড়ল। মিঃ লুমুম্বা ইউ-এন বাহিনী ও মিঃ হ্যামারশিয়েল্‌ড্‌এর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করে ইউ-এন বাহিনীকে কংগো ছেড়ে যেতে বলতে লাগলেন। সোভিয়েট সরকারও মিঃ হ্যামার-শিয়েল্ডকে পাশ্চাত্ত্য ঔপনিবেশিক স্বার্থের দালাল বলে গাল পাড়তে লাগলেন। এদিকে কংগোতে বিবদমান দলগুলির কর্তাদের পরস্পরের হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব থেকে ইউ-এন বাহিনীকে রেহাই যে দেওয়া হচ্ছে তাও নয়। মিঃ কাসাভুবুর অনুচরগণ এবং কর্নেল মোবুটুর সৈন্যদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মিঃ লুমুম্বাকে ইউ-এন বাহিনীর শরণ নিতে হয়েছে। এই প্রবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত যা খবর প্রকাশিত হয়েছে তাতে মিঃ লুমুম্বা কী অবস্থায় আছেন (অথবা আদৌ আছেন কিনা, কারণ মিঃ লুমুম্বা নিহত হয়েছেন বলেও একটা খবর রটেছিল) তা বুঝা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে মিঃ কাসাভুবুও ইউ-এন বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। ইউ-এন বাহিনী মিঃ লুমুম্বার বিরুদ্ধে তাঁর পক্ষ নিচ্ছে না কেন, এই বোধ হয় মিঃ কাসাভুবুর [illegible]! ইউ-এন বাহিনীতে যে বিভিন্ন গবর্নমেন্টের

সদ্য প্রকাশিত

সমরেশ বসুর
সর্বোত্তম উপনাস

বাঘিনী

॥ সাত টাকা ॥
আর এক অপরিচিত জীবনের বিচিত্র কাহিনী

জরাসন্ধের
মহোত্তম উপন্যাস

ন্যায়দণ্ড

॥ সাড়ে ছ' টাকা ॥
বিচারশালার পটভূমিকায় আশ্চর্য সৃষ্টি

সৈয়দ মুজতবা আলীর
নবতম রম্যরচনা

চতুরঙ্গ

॥ সাড়ে চার টাকা ॥
পঞ্চতন্ত্র ও ময়ূরকণ্ঠীর নবীনতম সহযাত্রী চতুরঙ্গ। স্থাপত্য প্রসঙ্গে ষোলখানা হাফটোন ছবি বইখানাকে রম্যতর করেছে।

প্রবোধকুমার সান্যালের
দেবতাত্মা হিমালয়
(১ম খণ্ড)
দশম মুদ্রণ প্রকাশিত হল ৯·০০

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর
তুঙ্গভদ্রা ৪·০০
ইতিহাসের পটভূমিকায় নতুন উপন্যাস

বরিস পাস্তেরনাকের
নোবেল-প্রাইজ-পাওয়া উপন্যাস

ডাক্তার জিভাগো

১২·৫০
সম্পাদনা : বুদ্ধদেব বসু
[বই দুটি রূপা এণ্ড কোং এর সহযোগিতায়]

বারট্রাণ্ড রাসেলের
প্রবন্ধ গ্রন্থ

সুখের সন্ধানে

৫·০০
[The Conquest Of Happiness]
অনুবাদ : পরিমল গোস্বামী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
মহাশ্বেতা ৫·৫০
[প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত প্রায়]

আনন্দকিশোর মুন্সীর
রাঘব বোয়াল ৩·০০
[অম্লমধুর উপন্যাস]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
অসিধারা (৩য় মুঃ) ৩·৫০

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের
জর্জ বার্নাড শ ৮·৫০

নিখিলরঞ্জন রায়ের
সীমান্তের সপ্তলোক ৩·০০

ধনঞ্জয় বৈরাগীর নাটক
রুপোলী চাঁদ (৩য় মুঃ) ২·৫০

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের
চরণিক ৩·০০

নীলকণ্ঠের কথামৃত
এলেবেলে ২·৫০

সন্তোষকুমার দে-র
বৈঠকী গল্প ২·৫০

সতীনাথ ভাদুড়ীর
পত্রলেখার বাবা ৪·০০

● এ সপ্তাহে প্রকাশিত হল ●
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর
আয়ুবের সঙ্গে ২·০০
পাকিস্তানের সামরিক ডিক্টেটর : হর্তাকর্তাবিধাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপের চমকপ্রদ কাহিনী

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো

সৈন্য গেছে তাঁদের মধ্যেও ইউ-এন বাহিনীর ভূমিকা সম্বন্ধে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে একটা খবর বেরিয়েছিল যে, ঘানা এবং সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের সরকার নাকি ইউ-এন বাহিনী থেকে তাঁদের সৈন্যদের সরিয়ে নিয়ে আসবেন বলে হুমকি দিয়েছেন। এখন পর্যন্ত অবশ্য ঘানা বা সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের সৈন্যেরা কংগো থেকে চলে আসার জন্য কোনো হুকুম পায়নি। ওদিকে মিঃ কাসাভুবুর সমর্থক কর্নেল মোবুটুর সৈন্যেরা সোভিয়েট ও চেক্ রাষ্ট্রদূতদের কংগো পরিত্যাগ করে যেতে বাধ্য করেছে এবং মিঃ লুমুম্বার আমন্ত্রণে যে-সব সোভিয়েট এরোপ্লেন এবং টেকনিশিয়ান এসেছিল তারাও বোধহয় চলে যেতে বাধ্য হবে। শ্রীরাজেশ্বর দয়াল যিনি মিঃ হ্যামারশীল্ডের পক্ষে বিশেষ ইউ-এন প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়ে কংগোতে গেছেন, তিনি মিঃ কাসাভুবু এবং মিঃ লুমুম্বার মধ্যে আপোষ ঘটানোর চেষ্টা করছেন বলে সংবাদে প্রকাশ। টিউনিসিয়া এবং মরোক্কোর রাষ্ট্রদূতগণ এবং পরে তাঁদের সঙ্গে ঘানা ও সংযুক্ত আরবরাষ্ট্রের রাজদূতগণও নাকি মিঃ কাসাভুবু এবং মিঃ লুমুম্বার মধ্যে আপোষ ঘটানোর চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কংগোতে শান্তি ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার কোনো লক্ষণই এখনও পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। যে ইউ-এন শান্তিরক্ষার জন্য এলো তার ভূমিকা নিয়েই এখন পূর্ব পশ্চিমা বিপদ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। গত সিকিউরিটি কাউন্সিলের অধিবেশনে সিংহল ও টিউনিসিয়ার প্রতিনিধিরা যে প্রস্তাব আনেন সেটা ভোটাধিক্যে পাস হবার পরে সোভিয়েট সরকার তার বিরুদ্ধে "ভিটো" প্রয়োগ করেছেন। এই প্রস্তাবের মর্ম ছিল এই যে, ইতিপূর্বে কংগো সম্বন্ধে সিকিউরিটি কাউন্সিল যে-সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন সেগুলি বহাল থাকবে, ইউ-এন-এর তরফ থেকে যে-শান্তিরক্ষার কাজ নেওয়া হয়েছে সেটা চালিয়ে যাওয়া হবে এবং কোনো শক্তি ইউ-এনকে পাশ কাটিয়ে কোনো রকম সামরিক বা অন্যবিধ সাহায্য দিয়ে কংগোতে একলা কিছু করবে না। এই প্রস্তাব "ভিটো" করেই সোভিয়েট প্রতিনিধি কংগোর "রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা বিপন্ন" হওয়ার বিষয়টি আলোচনার জন্য জেনারেল অ্যাসেমব্লীর কর্মসূচীভুক্ত করতে সেক্রেটারী জেনারেলকে বলেন। কিন্তু মার্কিন প্রতিনিধি জেনারেল অ্যাসেমব্লীর নির্ধারিত "রেগুলার" অধিবেশনের জন্য অপেক্ষা না করে অবিলম্বে কংগোর বিষয় আলোচনার জন্য জেনারেল অ্যাসেমব্লীর বিশেষ অধিবেশন ডাকতে বলেন। এই প্রবন্ধ যখন লেখা হচ্ছে তখন জেনারেল অ্যাসেমব্লীর সেই বিশেষ অধিবেশন চলছে। জেনারেল অ্যাসেমব্লীর "রেগুলার" অধিবেশন দুদিন বাদেই আরম্ভ হচ্ছে, তাতে মিঃ ক্রুশ্চফ এবং আরো অনেক কম্যুনিস্ট মহারথী এবং অকম্যুনিস্ট বড় নেতাও অনেকে আসছেন। বিশেষ অধিবেশনে তাঁদের অনেকে উপস্থিত থাকতে পারবেন না। মার্কিন প্রতিনিধির এই চালে সোভিয়েট প্রতিনিধি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। কংগোর যেরূপ অবস্থা তাতে অবশ্য একদিনও বিলম্ব না করার পক্ষে যুক্তি আছে। তবে মার্কিন সরকারের সততা সম্বন্ধে সন্দেহ উদ্রেক করার জন্য সোভিয়েট গবর্নমেন্টও নানা কথা তুলবেন। আফ্রিকার অনেক নূতন রাষ্ট্র এবার ইউ-এন সদস্যশ্রেণীভুক্ত হবে, কংগো সম্বন্ধীয় আলোচনায় তাঁদের যোগদানের সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। যাঁরা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন তাঁদের মনের উপর সোভিয়েট যুক্তির কিছুটা প্রভাব হয়ত পড়বে। যে অকম্যুনিস্ট হোমরা-চোমরারা জেনারেল অ্যাসেমব্লীতে যোগ দিতে আসছেন কিন্তু এখনও এসে পৌঁছতে পারেননি তাঁদেরও কারো কারো মনে একটু লাগতে পারে। কিন্তু আসল প্রশ্ন হল, কংগো বাঁচবে কিনা, অখণ্ড স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে বাঁচবে কিনা? না, তার দশা কোরিয়ার মতো হতে চলেছে? তবে কোরিয়াতে ইউ-এন-এর নামে যে-বাহিনী গিয়েছিল তার সঙ্গে কংগোতে প্রেরিত ইউ-এন বাহিনীর কোনো তুলনা হয় না। কংগোর যা অবস্থা তাতে যেখান থেকে খুশি সামরিক বা বে-সামরিক সাহায্য নিতে পারব—সার্বভৌমত্যের এই অধিকারের উপর অত্যধিক জোর না দিলে একক ইউ-এন-এর উপর নির্ভর করাই তার পক্ষে শ্রেয় হবে। ইউ-এন-এর মারফৎ ঔপনিবেশিক স্বার্থ আবার জড় গেড়ে বসবে এরকম আশংকা বর্তমান সময়ে অমূলক বলে মনে হয়। আসল ভয়ের ব্যাপার হল কংগোনীজদের আভ্যন্তর অনৈক্য, শনির প্রবেশ, তা সে পূর্ব থেকেই হোক বা পশ্চিম থেকেই হোক, সেই অনৈক্যের রন্ধ্রপথেই সম্ভব।

* * *

ভারতের প্রধানমন্ত্রীও জেনারেল অ্যাসেমব্লীর অধিবেশনে যাচ্ছেন। দিল্লিতে কয়েকদিন পূর্বে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের মিটিংএ শ্রী নেহরু তাঁর নিউইয়র্কে যাবার সম্ভাবনার কথা প্রথম প্রকাশ্যে বলেন। তাঁর কথা থেকে তখন কিন্তু মনে হয়েছিল যে, তাঁর যাওয়া ভবিষ্যৎ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করছে। অর্থাৎ দুই পক্ষের শীর্ষস্থানীয়দের একত্রিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিলেই শ্রী নেহরু যাবেন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার, মিঃ ম্যাকমিলান, জেনারেল দ্যগল প্রভৃতি পশ্চিমা বড়োকর্তারা কেউ উপস্থিত না হলেও শ্রী নেহরু যাচ্ছেন। তাতে মনে হয় যে যাবার সিদ্ধান্তটা আগেই করা হয়ে গিয়েছিল। শ্রীনেহরু যাওয়াতে আপাতদৃষ্টিতে শ্রীক্রুশ্চেভের মান বাড়বে কিন্তু শ্রী নেহরু যাচ্ছেন বলে পশ্চিমা শক্তিরা ক্ষুণ্ণ হবে—এরূপ মনে করাও হয়ত ঠিক হবে না। হয়ত শ্রী নেহরুর যাওয়াটা প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এবং মিঃ ম্যাকমিলানও চাচ্ছেন। শ্রী নেহরু উপস্থিত থাকলে মিঃ খ্রুশ্চেভের পক্ষে "নিরপেক্ষ" দেশগুলিকে নিয়ে খেলা করা তত সহজ হবে না, ওয়াশিংটন-লণ্ডন এরূপও ভাবতে পারেন। তাছাড়া সকলেই যে শ্রী খ্রুশ্চেভের ডাকে বা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য যাচ্ছেন তা নয়। মার্শাল টিটোর উপস্থিতি শ্রী খ্রুশ্চেভের আনন্দবর্ধনের কারণ হবে এরূপ মনে করার নিশ্চয়ই কোনো কারণ নেই।

* * *

নিউইয়র্কে যাবার আগে পণ্ডিত নেহরু পশ্চিম পাকিস্তান ঘুরে আসবেন। খালের জল সম্পর্কিত চুক্তি সই হচ্ছে। এই চুক্তিকে ভারতের তরফ থেকে একটি সওগাত বলা যায়। সওগাত দিতে আপত্তি নেই কিন্তু মুশকিল এই যে, একদল লোক মনে করছে যে কৌশল জানলে ভারত সরকারের কাছ থেকে ষোল আনার উপর আঠারো আনা আদায় করা যায়।

১৮।৯।৬০

এবার পূজায় ছোটদের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ
শিবরাম চক্রবর্তীর
পঞ্চরঙ্গ ১.৫০
ছেলেদের আরও দুটি বইঃ—রসময় যার নাম ১.৫০, মধু চক্রান্ত ১.৫০
পূজায় সুবোধ ঘোষের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ঃ
দিগঙ্গনা ৩.০০
ডি. হাজরা এণ্ড কোং, ১৩ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিঃ ১২

আলোচনা

দক্ষিণের বারান্দা

মহাশয়,

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জোড়া সাঁকোর ধারে' ও পরে ৪৫ সংখ্যা দেশে শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দক্ষিণের বারান্দা' পড়তে গিয়ে দাদামশায়ের হঠাৎ পাওয়া মূল্যবান পাথরের টুকরোটি কোথা থেকে এসেছিল সে রহস্যের সমাধান অবনীন্দ্রনাথের কথ্য ভাষায় পাওয়া গেল। তিনি শ্রুতিধরী শ্রীমতি রাণী চন্দকে বলছেন, "আর একটি লোক এল একদিন, জব্বলপুরে পাওয়া যায় নানা রকম পাথর, বহু পুরানো পোকামাকড় গাছপালা পাথর হয়ে গেছে, সেই সব নিয়ে। ভারি সুন্দর সুন্দর পাথর সব। তার মধ্যে একটি ছিল ঠিক গোল নয়, বাদামের মত গড়নটি দেখতে, রঙটি অতি চমৎকার। পছন্দ হল, কিন্তু দাম বেশি চাইলে বলে রাখলুম না; লোকটি তার সব পাথর দেখিয়ে খানিকবাদে চলে গেল। বসে আছি বারান্দায় চুপচাপ। সমরদার ছোট নাতনীটি এসে সেখানে খেলা করতে লাগল। দেখছি সে খেলা করছে আর অনবরত মুখ নাড়ছে। বললুম, 'দেখি তোর মুখে কি?' সে সামনে এসে হাঁ করে জিব মেলে ধরলে। দেখি জিবের উপরে সেই পাথরটি। বললুম, 'কোথায় পেলি তুই এই পাথর। দে শিগগির বের করে। গিলে ফেললে কি কান্ড হবে।' এখন, সেই লোকটি যাবার সময় সব জিনিস তুলেছে, ভুলে সেই পাথরটিই ফেলে গেছে। সমরদা'র নাতনী সেটি পেয়ে লজেঞ্জুস ভেবে মুখে পুরে বসে আছে। তাড়াতাড়ি তার মুখ থেকে পাথরটি নিয়ে পকেটে পুরলুম। পরদিনই সেটি আমার আংটিতে বসিয়ে একেবারে আঙুলে পরে বসলুম। সুন্দর পাথরটি, তার গায়ে একটি মৌমাছি দুটি ডানা মেলে বসে আছে, পাথর হয়ে গিয়েছিল।

মেয়েরা ছুটে এল দেখতে, বললুম, 'ওরে দেখ, তাজমহল কোথায় লাগে এর কাছে। তাজমহল? যে মরেছিল সে তো ধুলো হয়ে গেছে কবে। আর প্রকৃতি এই মৌমাছিটিকে কি করে রেখেছে যে, আজও ঠিক তেমনিই আছে। রঙও বদলায়নি একটু। কবে কোন লক্ষ লক্ষ বছর আগে বসন্ত এসেছিল এ ধরার বুকে, মৌমাছি ডানা দুটি মেলে খাচ্ছিল ফুলের মধু আকণ্ঠ পুরে, যে রসে ডুবেছিল, সেই রসের কবরে আজও আছে সে তেমনি মগ্ন হয়ে।' তাঁর কথা শুনতে শুনতে মরা গাঙে বান ডেকে উঠল। তাই তাঁর গুটিকতক কথা বেশি বলা হয়ে গেল। শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় 'দক্ষিণের বারান্দা' লিখতে গিয়ে বলেছেন, 'এ স্মৃতি কথাও নয়, ইতিহাস নয়। এই যে ঘটনা, শুধু মরমী দখিন হাওয়ার পরশের মতো মনের গহ্বরে লেগে আছে এখনও।' সেই জন্য মূল্যবান পাথরের আবিষ্কারের উপর নিজের ও শ্রোতার মন আবিষ্ট না করে দরদী ভাষায় মনের কথাকে সরল সুষমায় ব্যক্ত করেছেন। উভয়ের লেখাই চিত্তাকর্ষক হয়েছে বলেই পাথরের সামান্যতম অনুসন্ধানটি নাড়া দিয়েছে, সেইটি সবিনয়ে প্রকাশ করলুম। ইতি

বিনীত

ধ্রুবপান্ডা

ট্রেনিং কলেজ, হুগলী।

দুর্গাপুজা ও উৎসব বর্জন

সবিনয় নিবেদন,

১৮ই ভাদ্রের 'দেশে' সম্পাদকীয় মন্তব্যে আপনি যে প্রস্তাব করেছেন তা খুবই সময়োপযোগী হয়েছে। আসামে শোচনীয় কাণ্ডের ফলে আমরা সবাই অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছি এবং এই অন্যায়ের উপযুক্ত প্রতিবাদ করেছি। তাই আমরা স্বাধীনতা দিবসের উৎসব বর্জন করতে দ্বিধাবোধ করি নি। এইবারে আমাদের এই সংকল্প নিতে হবে যে, আমরা দুর্গাপুজো করব, কিন্তু আনন্দের সঙ্গে উৎসব করে নয়; মাকে শান্তচিত্তে আবাহন করে তাঁর কাছে শক্তির প্রার্থনা করব। এই বৎসরের পুজোতে আনন্দের স্থান থাকতে পারে না, হৈ হুল্লোড় ও উৎসবের কথা ভাবতে পারা যায় না,—যখন শেয়ালদা স্টেশনে ও উত্তরবঙ্গের মাটিতে চল্লিশ হাজার বাঙ্গালী নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে আছেন, তাদের বর্তমান শূন্য, ভবিষ্যত নেই। তাছাড়া আমরা উড়িষ্যার কথা ভুলতে পারি না, যেখানে আরও পঞ্চাশ হাজার নরনারী গৃহহীন হয়েছেন। তাদের সবাই বাঙ্গালী না হতে পারেন, কিন্তু দুর্গতের জাতি বিচার আমরা নিশ্চয় করব না! এই সব দুর্গতদের মুখে হাসি ফোটানোই হোক আমাদের এই বৎসরের উৎসব।

একদিন বাঙ্গালী নেতৃবৃন্দ তরুণ-তরুণীদের দেশমাতৃকার আরাধনায় ডাক দিয়েছিলেন: যে আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙ্গালী মাতৃপুজো সার্থক করে তুলেছিল। তার

পূজোর জন্যে
উৎকৃষ্ট শ্রেণীর জুতো
ও
বিভিন্ন চামড়ার জিনিস

কিনতে হ'লে এই সরকারী বিক্রয় কেন্দ্রগুলিতে আসুন

(১) কোচবিহার
(২) কালিম্পং
(৩) হাওড়া ময়দান, ১৮এ, জি, টি, রোড (সাউথ), হাওড়া

বেবী সু	৪৲ ও তদূর্ধ্ব,
পুরুষদের সু	১০৲ ও তদূর্ধ্ব,
চপ্পল	৪·৫০ ন. প. ও তদূর্ধ্ব,
মেয়েদের জুতো	৫৲ ও তদূর্ধ্ব

এই সমস্ত জিনিস
* সুন্দর
* সস্তা
* টেঁকসই

প শ্চি ম ব ঙ্গ স র কা র ক র্তৃ ক প্র চা রি ত

জন্য বাঙ্গালী অনেক দুঃখ স্বীকার করেছে, বাঙ্গালীর উপর দিয়ে বহু ঝড় গেছে। আজকে বাঙ্গালী চুপ করে বসে থাকবে কেন? কি কর্তব্য তার, কোনো নেতা বলে না দিলে, বাঙ্গালীর কি কিছুই করার থাকবে না—প্রতিবাদ করা ছাড়া। আজকে নেতা আমাদের নেই। না থাকুক: শ্রেয় কি, করণীয় কি সে সম্বন্ধে দ্বিধা থাকা উচিত নয়। গত শতাব্দীতে ও এই শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গালী নেতারা সমাজ পুনর্গঠনের স্বপ্ন নিয়ে শক্তির বন্দনা করেছিলেন। সেই স্বপ্ন তাঁরা সফল করে যেতে পারেন নি। এই বৎসরের মাতৃপূজার মধ্য দিয়ে আমরা সেই ভার নিতে পারি না কি? কেন্দ্র কিম্বা প্রাদেশিক সরকারের দিকে তাকিয়ে বসে থাকা নয়, অন্য রাজ্য আমাদের প্রতি কি অন্যায় করছে তার চুলচেরা বিচার নয়,—আমাদের আরব্ধ কার্য আমরাই সফল করব এই সংকল্প গ্রহণ করে কাজ শুরু করা হোক আজকে দুর্গাপূজার সঙ্গে সঙ্গে। এই হোক আমাদের উৎসব, কর্মের উৎসব। অন্য কোনো উৎসবের প্রয়োজন আছে কি?

শিলাদিত্য ঘোষ। সিন্দ্রী।

(সি-৮২৩৮)

বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ক্ষুদে ব্যাটারীর খাপ হচ্ছে ·৩ ইঞ্চি ব্যাস আর ·১২৫ ইঞ্চি উঁচু। খাপ অনেকটা একটা এস্পিরিন ট্যাবলেটের মত। এই ব্যাটারী পারার সাহায্যে তৈরী। বধির লোকদের কানে শোনবার যন্ত্রের সংগে

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ক্ষুদে ব্যাটারী।

এই ধরনের ব্যাটারীর দরকার হয়। এছাড়াও পকেটে রেডিও, টেপ রেকর্ডার এবং মহাশূন্যে রকেটের বিভিন্ন যন্ত্রপাতির জন্য এই ব্যাটারীর খুব দরকার হয়।

■

২১ মাইল লম্বা ইংলিস চ্যানেলের ওপর ব্রিজ তৈরি করার কথা চিন্তা করা হচ্ছে। এই ব্রিজ একদিকে ডোভার ইংলণ্ডে আর একদিকে ক্যালে ফ্রান্সের সংগে যোগ করবে। আমেরিকান, ব্রিটিশ এবং ফ্রেঞ্চ তিনটি কোম্পানী এই ব্রিজ তৈরীর প্ল্যান ঠিক করেছেন। ব্রিজ সবসুদ্ধ চওড়া হবে ১১০ ফিট। এর ওপর দিয়ে এক সংগে ট্রেন, মোটর, মোটর সাইকেল এবং সাইকেল যাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। দুটো রেললাইন ছাড়া মোটর চলবার জন্য ৫টা লেন থাকবে। মোটর সাইকেল এবং সাইকেল চলার লেনগুলি আলাদা থাকবে। ব্রিজটির তলা দিয়ে সব প্রকার জাহাজ চলাচল করতে পারবে। এমন কি কুইন মেরীর মত উঁচু জাহাজও তলা দিয়ে যেতে পারবে। ব্রিজটির এক একটি স্প্যান ৭৪০ ফিট করে লম্বা হবে—শুধু দুটো স্প্যান লম্বায় ১১৫ ফিট করে হবে। যার তলা দিয়ে বেশীর ভাগ বড় বড় জাহাজ চলাচল করবে। সমস্ত

নতুন বই বেরল

সুবোধ ঘোষের
অসামান্য রম্য সাহিত্য রচনা

কালপুরুষের কথা ৩·০০

॥ পূর্ণেন্দু পত্রী অংকিত মূল্যবান প্রচ্ছদে সমৃদ্ধ ॥

নতুন উপন্যাস

বহুমঞ্জরী

সমথনাথ ঘোষের নতুন পটভূমিতে নতুন উপন্যাস। দাম ২·৫০

আধুনিক সাহিত্য ভবন ॥ ১৬/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ১২

তিন দিন তিন রাত্রি

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

শুধু তিনটি দিন। প্রবহমান কালস্রোতে তুচ্ছ তিনটি উপলখণ্ডের বেশী যাদের মর্যাদা নেই, কিন্তু তিনটি মাত্র দিবারাত্রির দর্পণে যদি এ-কালের এক বৃহৎ সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বেদনা-ব্যর্থতা, বিজয় আর পরাভবকে প্রত্যক্ষ করা যায় তাহলে তিন দিনের খণ্ডিত ক্ষণকালকে চিরকালের মর্যাদা না দিয়ে পারা যায় না। তিন দিন তিন রাত্রি-তে নরেন্দ্রনাথ মিত্র সেই দুঃসাধ্য সাধন করেছেন। অগ্রণী কথাশিল্পীর পরিণত মানসের আশ্চর্য ফসল তিন দিন তিন রাত্রি। বইটি সম্বন্ধে এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশ কালেই বিদগ্ধ পাঠকের সানন্দ অভিনন্দনে ধন্য হয়েছে। দাম পাঁচ টাকা মাত্র।

সাম্প্রতিক কথা-সাহিত্যে একঘেয়েমীর অভিযোগ বিদগ্ধ পাঠকের। লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এ অপবাদ দূর করলেন তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের কাহিনীতে

যে যাই বলুক

এক মহিয়সী নারীর আশ্চর্য প্রেম-কাহিনী ফুটে উঠেছে অচিন্ত্যকুমারের সার্থক লেখনীতে। দাম ছয় টাকা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা — ৯

ব্রিজটি তৈরীর খরচা প্রায় ৫৬০ কোটি ডলার পড়বে—আর ব্রিজটা শেষ করতে প্রায় ৫ বছর লাগবে।

*

ফিলাডেলফিয়ার জেফারসন মেডিক্যাল কলেজের কয়েকজন তত্ত্বানুসন্ধানী পেশী-সমূহের মধ্যে এক নতুন ধরনের রাসায়নিকের সন্ধান পেয়েছেন, যেটি ক্যানসার এবং ডায়াবেটিসের পক্ষে খুবই উপকারী। এরা অনুসন্ধান করে বার করেছেন—যে সব প্রাণীরা ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছে তাদের যদি ব্যায়াম করাতে করাতে পেশী সমূহকে ক্লান্ত করে ফেলা যায়, তাহলে তাদের রোগের উপশম হতে থাকে এমন কি অনেক ক্ষেত্রে ক্যানসারের টিউমার সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়।—কিন্তু যাদের কোন রকম ব্যায়াম করান হয় না তাদের কোন উপকার হয় না। এই অনুসন্ধানের ফলাফল লক্ষ্য করে তত্ত্বানুসন্ধানীরা ধারণা করলেন যে পেশী যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন নিশ্চয় পেশীসমূহের মধ্যে থেকে কোন প্রকার উপকারী রসায়ন তৈরী হয়। এটাকে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য এরা ইঁদুরের কিছুটা পেশী কেটে নিয়ে নুনের জলে ডুবিয়ে রেখে যন্ত্রের সাহায্যে সেই পেশী উত্তেজিত করে ক্লান্ত করে ফেলা হল। এর পর যে তরল পদার্থের মধ্যে এই পেশী ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল সেই তরল পদার্থ ক্যানসার রোগাক্রান্ত ইঁদুরকে ইন্‌জেকশন্ করা হল—ফলে দেখা গেল যে ক্যানসারের বৃদ্ধি বন্ধ হয়েছে। অন্য জায়গায় আগের ইঁদুরের থেকে নেওয়া পেশী নুনের জলে ডুবিয়ে রেখে তাকে উত্তেজিত না করে রাখা হল। আর এই তরল পদার্থও ক্যানসার ওয়ালা ইঁদুরের ওপর ইন্‌জেকশন্ করা হল—কিন্তু কোন উপকারই এতে পাওয়া গেল না। ক্যানসারের বৃদ্ধি এতে কমলো না। এই সময় চিকাগোর একজন বৈজ্ঞানিক এই ধরনের ক্লান্ত পেশীসমূহের থেকে কি ধরনের রাসায়নিক বস্তু পাওয়া যায় তা পরীক্ষা করে দেখতে গিয়ে এক নতুন ধরনের ইন্‌সুলিন এর থেকে পান। এই নতুন ইন্‌সুলিন সম্বন্ধে প্রায় কিছুই এখনও জানা যায় নি। তবে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে এই ইন্‌সুলিন অথবা এই জাতীয় কোন রসায়নিক, যেটা পেশীসমূহ ক্লান্ত হয়ে পড়ার সময় তৈরী হয়, ক্যান্‌সারের ওপর কাজ করে।

*

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই নতুন ধরনের ফাইবার গ্লাসের তৈরী বাড়ি অনেকেই পছন্দ করছেন। তার প্রধান কারণ চারজন লোক দ্বারা এটা এক ঘণ্টার মধ্যে যে কোন জায়গায় তৈরী করা যায়। আবার

নতুন ফাইবার গ্লাসের বাড়ি

প্রয়োজন হলে ১০ মিনিটের মধ্যে এটাকে খুলে ফেলা যায়। লম্বায় বাড়িটা ৫০ ফিট। প্রয়োজন মত এতে মানুষের বসবাসের সব কিছুই লাগান যায়।

*

কর্নেল্ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বৈজ্ঞানিকদের মতে মৌমাছিদের নিজস্ব ভাষা আছে। অবশ্য এই ভাষা শুধু মৌমাছিরাই বুঝতে পারে। এই ভাষা মানুষের কাছে অজ্ঞাত। তবে এদের ভাষা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকরা কিছুটা ধারণা করতে পেরেছেন। যেমন এদের দ্রুত পাখা নাড়ান এবং বিভিন্ন দিকে নাড়ানর সাহায্যে কোন দিকে এবং ফুলের কোন অংশ থেকে মধু সংগ্রহ করতে হবে সেটা বোঝাতে সাহায্য করে। স্ত্রী মৌমাছি এই খবর সংগ্রহ করে এনে কর্মী মৌমাছিদের জানায়। যদি স্ত্রী মৌমাছি ওপর দিকে উড়তে আরম্ভ করে তাহলে বুঝতে হবে চাক যে দিকে সেই দিকে খাবার আছে। যদি নীচের দিকে ওড়ে তাহলে ধরতে হবে যে খাবার চাকের উল্টোদিকে আছে।

তরুণ গল্পকারদের একমাত্র ত্রৈমাসিক মুখপত্র

ছোটগল্পের শারদীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

[illegible] গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত প্রচ্ছদপট। শোভন মুদ্রণ।

দাম বার আনা ।। সডাক ১৲ টাকা।

পরিবেশক [illegible]—কলেজ স্ট্রীট। কার্যালয়—২৯।৪, নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রীট, কলকাতা ৬

(সি ৭৯০৪)

শারদীয় উৎসবে বিপুল আয়োজন

STANDARD PRODUCTS

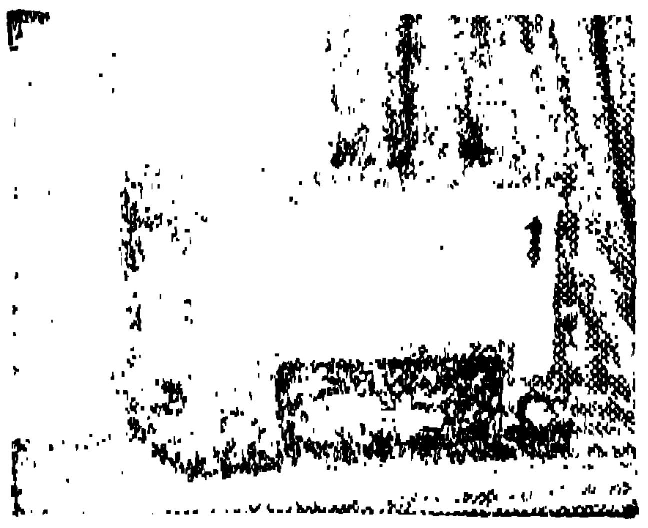

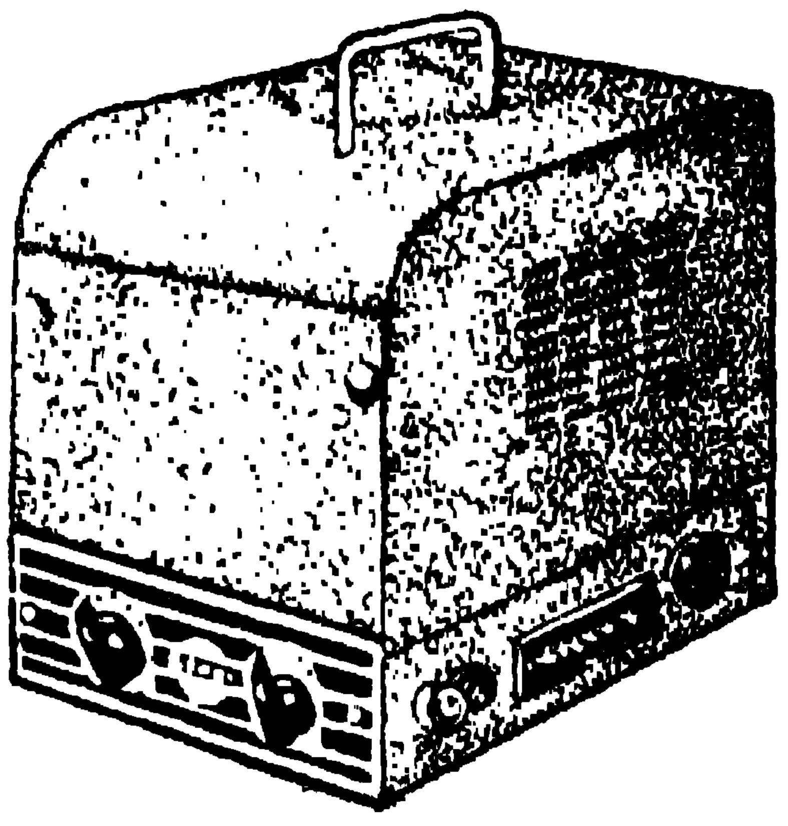

অল ওয়েভ ব্যাটারী রেডিও
মডেল—5SB
অল ওয়েভ AC/DC এবং
AC রেডিও
মডেল 5SA এবং 5SU

(I) মডেল RS/8—10 (10W)
AC/6V স্পিচ এ্যামপ্লিফায়ার
(II) মডেল S/18 (18W)
AC/6V স্পিচ এ্যামপ্লিফায়ার
(III) মডেল S-25
AC/6V স্পিচ এ্যামপ্লিফায়ার
(IV) ড্রাই ব্যাটারী এ্যাম্প্লিফায়ার
মডেল DB2A

ব্যাটারী চার্জার ও ভেরিএবল ট্রান্সফর্মার

—প্রস্তুতকারক—

ষ্ট্যাণ্ডার্ড রেডিও এ্যাণ্ড উইণ্ডিং হাউস প্রাঃ লিঃ

১, [illegible] স্ট্রীট (গণেশ এভেনিউর উপর) কলিকাতা-১৩

ফোন ঃ ২৪-৪২৫৭

কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

(৩৮)

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু এই এখন তাকে কোথায় খুঁজে পাবে?

লক্ষ্মীদি বললে—তা জানি না, কিন্তু মানুষটা কোথায় গেল তাই ভাবছি। শেষে কিছু ঠিক করতে না পেরে বেরিয়ে পড়লাম—

দীপঙ্কর বললে—চলো চলো, কী আশ্চর্য, এই সময়ে একলা-একলা এই রকম করে বেরোতে আছে! আমি যদি এখন না আসতুম—

লক্ষ্মীদির দৃষ্টিটা যেন চঞ্চল। সেই অন্ধকার লেভেল-ক্রসিংএর গেটের ওপর দাঁড়িয়ে লক্ষ্মীদিকে যেন বড় অসহায় দেখাচ্ছিল। সত্যিই তো, দীপঙ্কর যদি এই সময়ে না-আসতো লক্ষ্মীদি হয়ত একলাই বেরিয়ে যেত এমনি করে!

দীপঙ্কর দাঁড়িয়ে পড়লো। বললে—কোথায় যাবে তুমি?

লক্ষ্মীদি বললে—চল না, ওই দিকটা দেখে আসি একটু, কত দূরে আর যেতে পারে, এই হয়ত ওইদিকে একটুখানি দূরে গেছে—আয় না, তুইও আয় না আমার সঙ্গে, তুই সঙ্গে থাকলে তবু একটু করে খুঁজতে পারবো—

—কিন্তু কতক্ষণ বেরিয়েছে?

লক্ষ্মীদি বললে—এই তো আমি রান্না করছিলুম, অতটা খেয়াল ছিল না আমার. হঠাৎ নজরে পড়লো দেখি দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে গেছি—তারপর যা ভেবেছি তাই, দেখি ঘর ফাঁকা—

লক্ষ্মীদির সঙ্গে দীপঙ্করকেও চলতে হলো। খানিকটা এগিয়েই বুদ্ধ-মন্দির। সরু সরু গলি রাস্তা। দুপাশে পোড়ো জমি আর আগাছা। তারপরেই লেক। মাঝে-মাঝে এক-একটা গ্যাসের আলো জ্বলছে। তাও অনেক দূর-দূর। এ অন্ধকারে তেমন স্পষ্ট কিছুই দেখা যায় না। কোথায় অনেক দূরে একটা লোক অস্পষ্ট ছায়ার মত নড়ছে, দূর থেকে তাকে চেনাই মুশকিল। সেদিন তো কালীঘাটের শ্মশানেই গিয়ে হাজির হয়েছিল। আজও যদি সেখানে যায়? অত দূরে চলে গেলে কি আর খুঁজে পাওয়া যাবে! পাগল মানুষ, তার তো কোনও খেয়ালের ঠিক-ঠিকানা নেই। যেখানে খুশি যাবে। হয়ত পুলিসেও ধরতে পারে।

দীপঙ্কর বললে—তোমারই তো অন্যায়, তুমি একটু দেখতে পারো না?

লক্ষ্মীদি কিছু বললে না। শুধু আগে আগে চলতে লাগলো একটা অনির্দিষ্ট ছায়ার অনুসরণ করে। দীপঙ্করও পেছন-পেছন চলছিল। সারাদিন অফিসের কাজ নিয়ে কেটেছে, তারপর মিস মাইকেলের সঙ্গে তার বাড়িতে গিয়েছিল। সেখান থেকে সোজা বাড়িতে যাওয়ারই তো তার কথা। তা হলে কেন হঠাৎ এখানে চলে এল দীপঙ্কর! কী দরকার ছিল তার এখানে আসার।

—ওই যে, ওই বোধহয় শম্ভু!

লক্ষ্মীদি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল একলাই। সমস্ত লেকটা জনহীন। দীপঙ্করের ভয় করতে লাগলো। এত রাত্রে লক্ষ্মীদির মত মেয়েকে নিয়ে এখানে ঘোরাফেরা কি উচিত। এখানে কত কী কাণ্ড হয়, শুনেছে দীপঙ্কর। রাত গভীর হলেই নানারকম বদ লোক এসে জোটে এখানে।

দীপঙ্কর তাড়াতাড়ি লক্ষ্মীদির পাশে এগিয়ে গেল। দূরে একটা গ্যাসের নিচে

"জ্যাক্ জিল্ দুইজন,
হাত ধ'রে ভাই বোন
জল নিতে পাহাড়েতে চড়লো
জ্যাক্ পড়ে উল্টে
জিল্ তাকে তুলতে
গড় গড় গড়িয়ে যে পড়লো।"
ঘরে ঘরে মুখে মুখে মিষ্টি সুরে
আবৃত্তি ক'রছে শিশুরা—
শ্রীসুকমল দাশগুপ্তের
বিলিতি ছড়া
দাম—১·২৫ সর্বত্র পাওয়া যায়
"জিজ্ঞাসা"য়
জিজ্ঞেস করুন।
১৩৩এ রাসবিহারী এভেনিউ
কলিকাতা ২৯
(সি ৭৭৫৩)

BUY THE BEST
HIGHLY APPRECIATED
SAMSAD ANGLO-BENGALI DICTIONARY
1672 PAGES • Rs. 12·50 n.P.
SAHITYA SAMSAD
32-A, ACHARYA PRAFULLA CH. RD. • CAL-9

জটীল ব্যাধি ও স্ত্রী রোগ
২৫ বৎসরের অভিজ্ঞ যৌনব্যাধি বিশেষজ্ঞ ডাঃ এস পি মুখার্জি (রেজিঃ) সমাগত রোগীদিগকে গোপন ও জটিল রোগাদির রবিবার বৈকাল বাদে প্রাতে ৯—১১টা ও বৈকাল ৫—৮টা ব্যবস্থা দেন ও চিকিৎসা করেন।
শ্যামসুন্দর হোমিও ক্লিনিক (রেজিঃ)
১৪৮, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা—১

দিয়ে যেন দাতারবাবু আস্তে আস্তে এলোমেলোভাবে চলেছে। লক্ষ্মীদির মুখে কথা নেই। হন্ হন্ করে এগিয়ে চলেছে।

কিন্তু সামনে গিয়েই ভুলটা ধরা পড়লো। একজন হিন্দুস্থানী খাওয়া-দাওয়ার পর বেড়াতে বেরিয়েছেন।

দীপংকর বললে—দেখলে তো? এ রকম করে কি তাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব?

লক্ষ্মীদিও সত্যিই, হতাশ হয়ে গিয়েছিল। কোনও কথা বললে না।

দীপংকর বললে—চলো, ফেরো, এমনভাবে খুঁজলে পাবে না, বরং থানায় একটা খবর দেওয়া ভালো—

শেষে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দীপংকর লক্ষ্মীদিকে ফিরিয়ে নিয়ে এল।

চারিদিকে বেশ অন্ধকার। আশে-পাশের নর্দমায় তখন ঝিঁ-ঝিঁ পোকা ডাকছে। লক্ষ্মীদি তখনও অন্যমনস্ক ছিল। লেক পেরিয়ে সোজা বুদ্ধ মন্দিরের পাশ দিয়ে রাস্তা।

লক্ষ্মীদি বললে—জানিস দীপু, আজ বুঝতে পারি, আমার জন্যেই শম্ভুর এই অবস্থা—আমি না থাকলে হয়ত ওর এ-অসুখটা হতো না—

দীপংকর বললে—কিন্তু ও-লোকটাকে তুমি কেন তোমার কাছে থাকতে দাও লক্ষ্মীদি—? ও-লোকটা কেন তোমাদের কাছে থাকে? জানো, ও লোকটা ভাল নয়?

লক্ষ্মীদি এতক্ষণে মুখ তুললো। বললে—কেন?

দীপংকর বললে—তুমি কিছু মনে কোর না, কালকে তুমি চিঠি লিখেছিলে বলেই এসেছিলুম, তুমি বলেছিলে বলেই আমি অনন্তবাবুকে আজকে অফিসে যেতে বলেছিলুম—

—তা যায়নি তোর কাছে?

দীপংকর বললে—গিয়েছিল।

লক্ষ্মীদি জিজ্ঞেস করলে—কাজটা পেয়েছে তো?

দীপংকর বললে—তা জানি না। হয়ত পেয়েছে, হয়ত পায়নি। কিন্তু মাঝখান থেকে আমি রবিনসন্ সাহেবের কাছে লজ্জায় পড়লুম। তোমার কথা ভেবেই আমি সাহেবকে বলে রেখেছিলুম। সাহেবও রাজি ছিল, কিন্তু দেখি অনন্তবাবু অফিসে গিয়ে সোজা মিস্টার ঘোষালের ঘরে ঢুকে গেল—

—সে কি রে?

দীপংকর বললে—বললে তুমি হয়ত বিশ্বাস করবে না। না-দেখলে আমিও বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু আশ্চর্য, আমি ডাকলুম অনন্তবাবুকে। আমি নিজের কাজ ফেলে সমস্ত দিন বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম অনন্তবাবুর জন্যে, অথচ যেন চিনতেই পারলে না, অথচ আমায় নিজেরই যেন গরজ, যেন আমার নিজেরই কাজ—

লক্ষ্মীদি বললে—তা অনন্ত তোকে দেখে কী বললে?

—আমি ডাকলুম, আমাকে দেখলে অনন্তবাবু, তবু যেন চিনতেই পারলে না। সোজা মিস্টার ঘোষালের ঘরে ঢুকে গেল। অথচ সাহেবকে আমি বলে রেখেছিলুম। রবিনসন সাহেব আমাকে কথা দিয়েছিল, একটা পয়সা লাগতো না আমার কাছে গেলে—

লক্ষ্মীদি বললে—যাক গে, তুই কিছু মনে করিসনি, নিশ্চয় মিস্টার ঘোষাল কম টাকা নিতে রাজি হয়েছে!

দীপংকর বললে—কিন্তু হলোই বা কম টাকা, কেন ঘুষ দিতে যাবে? জানো, আমার নিজের চাকরি হয়েছে তেত্রিশ টাকা ঘুষ দিয়ে! সে-কথা আমি এখনও ভুলতে পারি না—

লক্ষ্মীদি বললে—সংসারে তোর মত লোক তো সবাই নয়, এ দুনিয়াটাই মন্দ, এই মন্দর রাজ্যে মন্দ না-হলে লোকে বাঁচবে কী করে? কী করে টিঁকে থাকবে মানুষ?

তারপর দীপংকরের পিঠে হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলো লক্ষ্মীদি।

বললে—সবাইকে নিজের মতন ভাবিসনি তুই, এ-সংসারে ভালোও আছে, মন্দও আছে—মন্দই বেশি, সবাইকে নিয়েই যখন ঘর করতে হবে, তখন মন-খারাপ করলে চলে?

চলতে চলতে লেভেল-ক্রসিংটার কাছে এসে পড়েছিল।

দীপংকর বললে—মন খারাপের কথা বলছো, তোমার ব্যাপার দেখেও তো আমার মন খারাপ হয়।

—আমার ব্যাপার? আমি আবার কি করলুম?

দীপংকর বললে—তুমি ভাবো তো, কতখানি অন্যায় করছো তুমি দাতারবাবুর ওপর?

লক্ষ্মীদি বুঝতে পারলে না কথাটা। হাঁ করে চেয়ে রইল দীপংকরের দিকে।

দীপংকর বললে—দোষ কি তোমার একটা? তোমার হাজার দোষ! তুমি সতীকে কষ্ট দিয়েছ, তুমি তোমার বাবাকে কষ্ট দিয়েছ, তুমি দাতারবাবুকেও কষ্ট দিচ্ছ—

লক্ষ্মীদি হাসতে লাগলো।

দীপংকর বললে—হেসো না, হাসতে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। যখন ছোট ছিলাম তখন বুঝতে পারতুম না। তখন ভাবতুম সবাই বুঝি তোমাকেই কষ্ট দেয়, সবাই বুঝি তোমার ওপরেই অত্যাচার করছে, পীড়ন করছে—। সেদিন তোমার কষ্টের জন্যেই আমার কষ্ট হয়েছে। সকলের

কাছে তোমার কন্টর কথা বলেছি, এখন দেখছি আমারই ভুল—

—কেন, ভুল কেন?

—ভুল নয়? ও-লোকটা তোমার কে? ওর জন্যেই তো দাতারবাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ওর সংগে তোমার এত কিসের সম্পর্ক? কেন ওর টাকা নিয়ে তুমি সংসার চালাও?

লক্ষ্মীদি আবার হাসলো। বললে—এই জন্যে তোর এত রাগ?

—আমার কেন রাগ হতে যাবে লক্ষ্মীদি! রাগ আমার হয় না, আমার দুঃখ হয় তোমার জন্যে। তুমি তোমার বাবার টাকা, সুখ আরাম সব ত্যাগ করে এলে কি এই জন্যে? এই অনন্তবাবুর সংগে এক ঘরে থাকবার জন্যে? জানো, অনন্তবাবু কী জঘন্য চরিত্রের লোক?

লক্ষ্মীদি বললে—তুই সত্যিই রেগে গেছিস দেখছি, চুপ কর তুই—

দীপংকর বললে—চুপ করবো না, তোমাকে আমি সব কথা বলে তবে যাবো, আর এই কথা বলতেই এসেছি এত রাত্রে—নইলে আমি তো বাড়িতেই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কথাগুলো তোমাকে বলতে এলাম—ভাবলাম, তুমি হয়ত জানো না, তোমাকে সাবধান করে দেওয়া দরকার—

লক্ষ্মীদি বললে—বল, তুই কী বলবি?

দীপংকর বললে—জানো, অনন্তবাবু মদ খায়?

লক্ষ্মীদি হেসে উঠলো শব্দ করে। বললে—খায় তো খায়, তাতে কী?

দীপংকর স্তম্ভিত হয়ে গেল লক্ষ্মীদির কথা শুনে। দীপংকর ভেবেছিল কথাটা বলে লক্ষ্মীদিকে চমকে দেবে! অথচ লক্ষ্মীদি এত সহজ ভাবে নিল কথাটা!

লক্ষ্মীদি বললে—মদ তো খাবার জিনিস, খাবে না?

—তুমি বলছো কি?

লক্ষ্মীদি বললে—তোর বয়েস বাড়লে কী হবে দীপু, তুই দেখছি এখনও সেই ছেলেমানুষ আছিস! তুই হাসালি আমাকে, অনন্ত মদ খায় তুই জানতিস না? মদ তো শম্ভুও খায়। আর তাছাড়া মদ খেলেই লোক খারাপ হয়ে গেল একেবারে?

দীপংকরের মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না। লক্ষ্মীদির মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ হাঁ করে। লক্ষ্মীদি বলছে কী! সেই লক্ষ্মীদি এখন কোথায় এসে নেমেছে! এত অধঃপতন হয়েছে লক্ষ্মীদির!

লক্ষ্মীদি বললে—অনন্ত মদ খায়, এই কথাটা বলতেই তুই এত রাত্তিরে কণ্ট করে আমার কাছে এলি? কেন, তুই বুঝি নিজে মদ খাস না?

দীপংকর বললে—আমি মদ খাবো?

—কেন, খেলে কী হয়েছে? তোর এখনও এই সব গোঁড়ামি রয়েছে? তুই কি এখনও মানুষ হলি না দীপু? আর কবে হবি?

বলে লক্ষ্মীদি সেই রাস্তার ওপরেই বেদম হাসতে লাগলো।

দীপংকর চুপ করে রইল। কোনও কথা বলবার মত প্রবৃত্তিও হলো না তার।

লেভেল-ক্রসিংটার ওপর এসে লক্ষ্মীদি বললে—অনেক রাত হলো, তুই এবার বাড়ি যা, তোর মা হয়ত ভাবছে—

দীপংকর বললে—মা তো ভাবছেই, কিন্তু দাতারবাবু যদি আজ রাত্রে আর না ফেরে?

লক্ষ্মীদি বললে—আগেও কয়েকদিন শম্ভু বেরিয়ে গেছে, কিন্তু আবার ফিরে এসেছে ফিরে আসবেখন, তুই যা—

দীপংকর বললে—চলো, তোমাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি—

লক্ষ্মীদি বললে—আমি নিজেই বাড়ি ফিরে যেতে পারবো—তোর ভয় নেই—

দীপংকর বললে—ভয় তোমার জন্যে নয় লক্ষ্মীদি, ভয় আমার নিজের জন্যেই।

—কেন?

দীপংকর বললে—আজ অনন্তবাবুকে এমন জায়গায় দেখলুম, আর এমনভাবে দেখলুম, সে-কথা বললে তুমিও অনন্তবাবুকে বাড়ি থেকে দূর করে দেবে, জানো, এর পরে আর কোনও ভদ্রলোকের বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া উচিত নয় অনন্তবাবুকে—

লক্ষ্মীদি জিজ্ঞেস করলে—কোথায়?

দীপংকর বললে—সে এক জঘন্য জায়গায়! অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পাড়ায়—মিস্টার ঘোষালের সংগে—সংগে দেখলাম, দুটো মেয়ে রয়েছে আবার, আমি ওদের দেখে লুকিয়ে পড়লাম—

—অনন্ত কী করতে গিয়েছিল সেখানে?

—তা কী করে জানবো। তবে সেখানে যে-জন্যে সবাই যায়, সেই জন্যেই গিয়েছিল। ছি, ব্যাপারটা দেখবার পর থেকে আমার ঘেন্না হয়ে গেল অনন্তবাবুর ওপর। আর তাই বলতেই তোমার কাছে এলাম!

লক্ষ্মীদি চুপ করে রইল।

দীপংকর বলতে লাগলো—সেই জন্যেই তোমাকে বলতে এলাম, তোমার টাকার দরকার থাকে তুমি আমাকে বলো, আমি তোমাকে মাসে মাসে সংসার খরচের সব টাকা দেব, কিন্তু অনন্তবাবুকে বাড়ি থেকে দূর করে দাও, ও-সব লোককে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়াও উচিত নয়—

লক্ষ্মীদি এবারও কোনও জবাব দিলে না।

দীপংকর আবার বলতে লাগলো—তুমি হয়ত ভাবছো আমি অনন্তবাবুর বিরুদ্ধে এত বলছিই বা কেন? তাতে আমার কী স্বার্থ? কিন্তু আমার স্বার্থ তোমার আর দাতারবাবুর জন্যে—

সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গল্পগুচ্ছ ৩	৪·০০
গল্পগুচ্ছ পাঠ্য	১·৪০
চোখের বালি	৪·০০
চৈতালি	১·৩০
ছিন্নপত্র	৪·০০
মানসী	৩·৩০
মালিনী	১·০০
শেষরক্ষা	১·৫০
স্বরবিতান ১৬	৫·৫০
হাস্য কৌতুক	১·৬০

॥ অজিতকুমার চক্রবর্তী ॥

রবীন্দ্রনাথ	২·০০

বিশ্বভারতী

মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল

আরোগ্য করিতে ২৭ বৎসর ভারত ও ইউরোপ-অভিজ্ঞ ডাঃ ডিগোর সহিত প্রতি দিন প্রাতে ও প্রতি শনিবার ও রবিবার বৈকাল ৩টা হইতে ৭টায় সাক্ষাৎ করুন। ৩বি জনক রোড, বালীগঞ্জ কলিকাতা।

(সি ৮১১৫)

বহু অভিনয়ধন্য পাঁচটি শ্রেষ্ঠ নাটক

থানা থেকে আসছি—
অজিত গঙ্গোপাধ্যায় ২, টাকা

নচিকেতা— ঐ ২, টাকা

অংশীদার—গঙ্গাপদ বসু (যন্ত্রস্থ) ২

ফকিরের পাথর ও নাট্যগুচ্ছ—
মন্মথ রায়
(একাঙ্কের জলসা) ২·৫০ নঃ পঃ

অমৃত-অতীত—মন্মথ রায় ১, টাকা

বিভূতিভূষণ গুপ্তের একটি সার্থক গল্পগুচ্ছ
ফুলডোরে— ২·২৫ নঃ পঃ

বিনয় সেনগুপ্ত রচিত একটি উপন্যাস
সোয়েদান— ২, টাকা

—প্রকাশনে ও পরিবেশনে—
অটো-প্রিণ্ট এণ্ড পাবলিসিটি হাউস
৪৯ বসদেওপাড়া রোড, কলিকাতা-৬
ফোন—৩৫-২৯৫৯

লক্ষ্মীদি বললে—কিন্তু আমাকে তো সংসার চালাতে হবে—

দীপঙ্কর বললে—তোমার সংসার আমি চালাবো।

লক্ষ্মীদি বললে—দূর, শুধু তো সংসার চালানো নয়, শম্ভুর চিকিৎসাও আছে, শম্ভুকে ডাক্তার দেখানোর খরচও তো আছে—

দীপঙ্কর বললে—কত টাকা তোমার দরকার বলো? তুমি বলো তোমার কত টাকা দরকার মাসে মাসে?

লক্ষ্মীদি বললে—তা ছাড়া আমি তোর টাকাই বা নেব কেন? তোর মা-ই বা কী ভাববে?

দীপঙ্কর বললে—অফিসের মাইনেটা আমি মা'কে দেব, তার বাইরে সকালে সন্ধ্যের না হয় আমি টিউশ্যানি করবো তোমার জন্যে!

লক্ষ্মীদি বললে—না সে হয় না—

—কেন হয় না? টাকার জন্যেই যদি তোমার অনন্তবাবুকে এত দরকার, তাহলে আমিই তোমাকে টাকা দিচ্ছি, তোমার সব খরচ আমি দেব, এমন কি দাতারবাবুর চিকিৎসার খরচও আমি দেব! আর তাছাড়া এমন একটা ওষুধ আছে যেটা মাখালে এখনি দাতারবাবু ভাল হয়ে যায়—জানো—

—কী ওষুধ?

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু আমি ওষুধ দিলে সে ওষুধ তো মাখাবে না তোমরা! অনন্তবাবু যে-রকম লোক সে তো চাইবেই যে দাতারবাবুর অসুখটা না-সারুক—

—কী ওষুধ তাই-ই বল্ না?

দীপঙ্কর বললে—আমাদের অফিসের এক ভদ্রলোকের স্ত্রীর পাঁচ বছর ধরে মাথা-খারাপ ছিল, শেষে এই ওষুধটা মাখিয়ে ভাল হয়ে গিয়েছে—। শুধু ওষুধ কেন, তোমাদের খাওয়া-পরা, তোমাদের বাড়ি ভাড়া, তোমাদের যাবতীয় খরচ সব আমি দিতে পারি, তার জন্যে তুমি কিছু ভেবো না! আর তা'ছাড়া আমি শীঘ্রি একটা বড় প্রমোশন পেয়ে যাচ্ছি—রবিনসন সাহেব আমাকে ডি-টি-আই করে দিচ্ছে—

চলতে চলতে আরো অনেক দূর চলে এসেছিল দুজনে।

দীপঙ্কর বললে—আর বাড়ির কথা বলছো, আমাদের অঘোর দাদুর বাড়িটা তো এখনও খালি পড়ে রয়েছে, সেই যেদিন থেকে কাকাবাবু কাকীমা চলে গেছে, তারপর থেকে আর কোনও ভাড়াটে আসেনি—সেই বাড়িতে গিয়েই তো তুমি উঠতে পারো—

—সে তো অনেক ভাড়া?

—ভাড়ার কথা তুমি ভাবছো কেন? ভাড়া তো দেব আমি! আর আমি বললে ও-বাড়ির ভাড়া অঘোরদাদু পনেরো টাকাও করে দিতে পারে—অঘোরদাদু আমাকে খুব ভালবাসে—! আর অঘোরদাদু যদি নাও থাকে তো ছিটে-ফোঁটাও আমি ভাড়া নিলে কিছু বলবে না। যত খারাপ ভাবো ওদের আসলে তত খারাপ নয় ওরা—

লক্ষ্মীদি বললে—কিন্তু তুই-ই বা কেন অত করতে যাবি আমাদের জন্যে?

দীপঙ্কর বললে—সে-সব কথা তোমার ভাববার দরকার কী? তোমার টাকা পেলেই তো হলো?

লক্ষ্মীদিও যেন রাজি হলো দীপঙ্করের কথায়। কেমন যেন ভাবতে লাগলো কথাটা। সত্যিই তো ওখানে থাকলে দীপঙ্করের কাছে হবে, দীপঙ্কর সব সময়ে দেখতে পারবে। দাতারবাবু চিকিৎসা করতে সুবিধে হবে।

দীপঙ্কর বললে—তোমাদের কিছু করতেই হবে না, আমি আছি, আমার মা রয়েছে, বিন্তিদি আছে, আর ওটা তোমাদের পুরোন পাড়া, ওই পাড়াতে তুমি এতদিন কাটিয়েছ, তোমার কোনও অসুবিধেই হবে না, তুমি চলো লক্ষ্মীদি। এখানে একলা তুমি থাকতে পারবে না! আমি তো তোমাকে সেদিনই সেই বৌবাজারেই বলেছিলুম চলে আসতে—

—আর অনন্ত?

লক্ষ্মীদি যেন অনন্তবাবুর নামটা উচ্চারণ করতেও ভয় পাচ্ছিল। বললে—ওকে কী বলবো?

দীপঙ্কর বললে—তুমি ওকে এত ভয় করো?

লক্ষ্মীদি বললে—ভয় নয়, কিন্তু এতদিন আমাদের দেখাশোনা করলে, আমাদের এত টাকা দিয়ে উপকার করলে। এখন তাকে কী বলবো?

দীপঙ্কর বললে—বলবে, এতদিন তুমি আমাদের অনেক উপকার করেছ, এর জন্যে তোমার ওপর আমরা কৃতজ্ঞ—। আর তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না!

লক্ষ্মীদি বললে—কিন্তু তুই তো জানিস না, ওর উপকার জীবনে ভোলবার মত নয়। ও না-থাকলে আমরা উপোষ করে মরে যেতাম—। আমাদের বিপদের সময়ে ও যা করেছে, কোনও মানুষ তা করে না—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু উপকার যা কিছু করেছে, সে তো ওর নিজেরই স্বার্থে!

—কেন? স্বার্থ কিসের?

লক্ষ্মীদি মুখ তুলে চাইল দীপঙ্করের দিকে।

দীপঙ্কর বললে—তুমি জানো না, কীসের স্বার্থ?

—না জানি না!

দীপঙ্কর বললে—নিজের মনকে এমন করে তুমি চাপা দিতে চেষ্টা কোর না। ওকেই বলে মনকে চোখ ঠারা। কিন্তু যাদের চোখ আছে তাদের তুমি কী বলে বোঝাবে? কী বলে জবাবদিহি করবে?

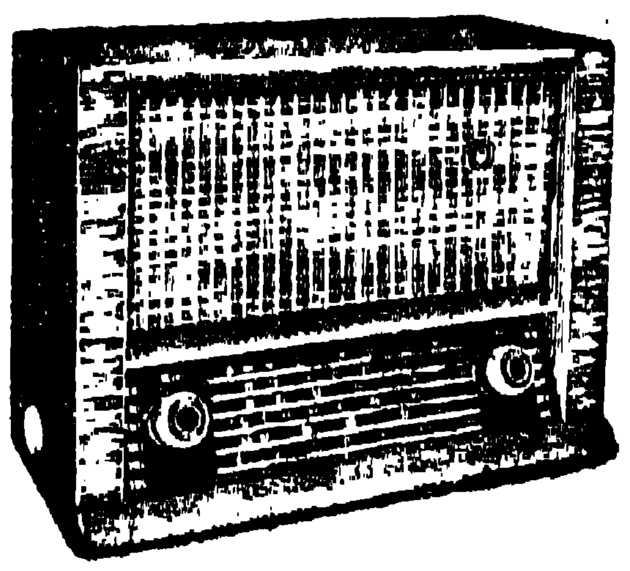

আমাদের নিকট নগদ মূল্যে অথবা সহজ কিস্তিতে অনেক রকমের রেডিও সেট্ পাওয়া যায়। এইচ. এম. ভি ও অন্যান্য রেডিওগ্রাম, লং-প্লেইং রেকর্ড, টেপ্ রেকর্ডার, "নিপ্পন" অল-ওয়েভ্ ট্রান্সিস্টার রেডিও, এম্প্লিফায়ার, মাইক, ইউনিট, হর্ণ, মাইক কেবল, রেডিও ও ইলেক্ট্রিকের বিভিন্ন প্রকারের সাজ-সরঞ্জামাদি বিক্রয়ের জন্য আমরা সর্বদা প্রচুর পরিমাণে মজুত করিয়া থাকি।

রেডিও এণ্ড ফটো স্টোর্স
৬৫, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩। ফোনঃ ২৪-৪৭৯৩

সুশ্রী দেখতে এবং থাকতে হলে!

ইন্টারফ্রান্ টুথ পেষ্ট

ঝকঝকে দাঁত ও সুস্থ মাড়ীর জন্যে

ইন্টারফ্রান ফেস ক্রীম
স্নিগ্ধ পরিচ্ছন্ন ও লাবণ্যবর্দ্ধক।
ইন্টারফ্রান ট্যাল্কম পাউডার
মধুর-সুবাসিত ও স্বাচ্ছন্দ্যকারী।

ইন্টারন্যাশনাল ফ্রানচাইসেজ প্রাঃ লিঃ, বোম্বাই ১

লক্ষ্মীদি বললে—কীসের জবাবদিহি?

লক্ষ্মীদি তখনও যেন বুঝেও বুঝতে চাইছে না।

দীপঙ্কর বললে—তুমি জান না, কেন তোমাদের জন্যে অনন্তবাবু এত করে? কীসের লোভে? কীসের লোভে অনন্তবাবুর এত দরদ তোমাদের ওপর? তোমার কাছে কি কিছুই পায় না অনন্তবাবু? দাতারবাবুর পাগল হওয়ার পেছনে কি অনন্তবাবুর কোনও হাত নেই? দাতারবাবু যে ব্যবসা করতে গিয়ে এমন করে লোকসান খেয়ে গেল, এর পেছনেও কি অনন্তবাবুর কোনও কারসাজি নেই বলতে চাও?

লক্ষ্মীদি চুপ করে চলতে লাগলো।

দীপঙ্কর বললে—তোমাকে দেখতে সুন্দর, তোমার রূপ আছে, আয়নাতে কি সেটাও তুমি দেখতে পাও না? অনন্তবাবু আর কতটুকু দিয়েছে তোমাকে? কতটুকু উপকার করেছে? তোমার রূপের জন্যে এর চেয়েও বেশি উপকার করবার লোকের অভাব নেই কলকাতা শহরে, এটা তুমি বিশ্বাস করো?

লক্ষ্মীদি হঠাৎ মুখ টিপে হেসে ফেললে। দীপঙ্করের দিকে চেয়ে দেখলে একবার।

বললে—হ্যাঁরে, তোরও বুঝি সেই জন্যে আমার উপকার করার এত আগ্রহ?

দীপঙ্কর বললে—আমার কথা আলাদা—

লক্ষ্মীদি বললে—কেন, আলাদা কেন? তুইও তো পুরুষ মানুষ!

খানিকক্ষণ দীপঙ্করের মুখে আর কোনও কথা বেরোল না। দীপঙ্কর লক্ষ্মীদির পাশ থেকে একটু সরে এল।

লক্ষ্মীদি হঠাৎ দীপঙ্করের হাতটা ধরে ফেললে।

বললে—লজ্জা করছিস কেন? বল্ না—

দীপঙ্কর হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু লক্ষ্মীদি খুব শক্ত করে হাতটা ধরে ফেলেছে।

লক্ষ্মীদি বলতে লাগলো—আমার কাছ থেকে তুই হাজার চেষ্টা করলেও পালাতে পারবি না,—আয়, বাড়ির ভেতরে আয়—

বাড়ির কাছে গিয়ে লক্ষ্মীদি দরজার তালাটা খুলে ভেতরে ঢুকলো। দীপঙ্করও ঢুকলো।

অন্ধকার ঘরে ঢুকে আলো জেনলে লক্ষ্মীদি বললে—বোস, বোস এখানে—

দীপঙ্কর বসলো। বসে বললে—অনেক দেরি হয়ে গেল, বাড়ি যাই আমি—

লক্ষ্মীদিও হঠাৎ একেবারে গা ঘেঁষে পাশে বসলো। বললে—কেন, তোর বাড়ি যাবার এত তাড়া কেন? এখন তো কেউ নেই এখানে? শম্ভুও নেই, অনন্তও নেই—

দীপঙ্কর একটু সরে বসতে চেষ্টা করলে। কিন্তু লক্ষ্মীদি তার হাতটা জোরে ধরে রেখেছে।

দীপঙ্কর বললে—ছি—

লক্ষ্মীদি দীপঙ্করের চোখে চোখ রেখে হাসতে লাগলো।

দীপঙ্কর বললে—তুমি মানুষ না কী, লক্ষ্মীদি—ছি—

লক্ষ্মীদি হাসতে হাসতে বললে—মানুষ হলে আজ আমার এই দশা হয়, তুই বুঝতে পারিস না? মানুষ হলে আজ অনন্তর পয়সায় পেট চালাই? মানুষ হলে আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে শম্ভুর সঙ্গে পালিয়ে আসি? মানুষ হলে এই অন্ধকারে একলা-একলা রাস্তায় বেরোই? তুই তো আমার চেয়ে ছোট, মানুষ হলে তোকে ঘরে টেনে নিয়ে এসে তোর গা ঘেঁষে গল্প করি? তুই কি আমাকে এখনও মানুষ মনে করিস?

কথাগুলো বলে লক্ষ্মীদি হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

দীপঙ্কর একদৃষ্টে লক্ষ্মীদির দিকে চেয়ে দেখতে লাগলো। সেই লক্ষ্মীদি আজ কোথায় নেমেছে। এ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে।

দীপঙ্কর বললে—তুমি দেখছি জ্ঞান-পাপী লক্ষ্মীদি—

লক্ষ্মীদি বললে—আমি আজ জ্ঞানও বুঝি না, পাপও বুঝি না, বেঁচে থাকবার জন্যে কী করা উচিত সেইটেই শুধু বুঝি—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু এ-রকম করলে আর কতদিন বাঁচবে? তুমিও যে পাগল হয়ে যাবে দাতারবাবুর মত!

লক্ষ্মীদি বললে—পাগল হয়ে গেলে তো বেঁচে যাই! সুখ-দুঃখ কোনও জ্ঞানই থাকে না—শম্ভু তো তাই বেঁচে গেছে! আমার অন্য ভয় করে—

—কী ভয়?

লক্ষ্মীদি বললে—এক এক সময় ওই রেল-লাইনটার কাছে গিয়ে দাঁড়াই, যখন ট্রেনগুলো আসে, যখন পায়ের তলার মাটি থর থর করে কাঁপতে থাকে, মনে হয় ঝাঁপিয়ে পড়ি সামনে, মনে হয় সব আপদ চুকে যাক—

দীপঙ্কর বললে—দেখছি তোমারও মাথা-খারাপ হতে বাকি নেই আর—

লক্ষ্মীদি বললে—লেভেল ক্রসিংএর যে গেটম্যানটা আছে, সে মাঝে মাঝে আমাকে ওখানে একলা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে যায়—

—কে? ভূষণ?

—নাম জানি না। সে লোকটা অনেক দিন আমাকে দেখেছে। কী ভাবে কে জানে! তোর মত সেও হয়ত ভাবে আমার মাথা খারাপ হয়েছে!

দীপঙ্কর বললে—তাহলে এক কাজ করো লক্ষ্মীদি। তোমার বাবার ঠিকানাটা আমায় দাও—আমি চিঠি লিখে জানিয়ে দেব তাঁকে! নিজের বাবার কাছে ক্ষমা চাইতে লজ্জা নেই—

লক্ষ্মীদি গম্ভীর হয়ে গেল। বললে—না!

দীপঙ্কর বললে—তুমি ঠিকানা দাও আর না-দাও, আমি তোমার বাবাকে চিঠি লিখে দেবই—

লক্ষ্মীদি বললে—আমি সব ছাড়তে পারি দীপু, কিন্তু আমার অহঙ্কার আমি ছাড়তে পারি না, অহঙ্কার ছাড়লে আমি বাঁচবো কী দিয়ে বল্? অহঙ্কার সম্বল করেই যে বাড়ির বাইরে বেরিয়েছি আমি, যেদিন সেটাও থাকবে না, সেদিন কিছুই যে আর নিজের বলে থাকবে না রে আমার—

—কিন্তু কীসের এত অহঙ্কার তোমার শুনি? রূপের?

লক্ষ্মীদি বললে—অহঙ্কারের কি মানে আছে রে? অহঙ্কারের কি উপলক্ষ আছে? অহঙ্কার যার আছে, তার কাছে আর সব যে তুচ্ছ—

—কিন্তু জীবনের চেয়ে কি অহঙ্কারটাই তোমার কাছে বড় হলো লক্ষ্মীদি?

লক্ষ্মীদি বললে—যারা বেঁচে আছে, তারাই তো জীবনকে আঁকড়ে ধরে। কিন্তু আমি তো বেঁচে নেই—আমি তো আর বাঁচতে চাই না—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু যেদিন দাতার-বাবুকে আমার হাত দিয়ে চিঠি পাঠাতে, যেদিন দাতারবাবুর অসুখের খবর শুনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে, সেদিন তো বাঁচতেই চেয়েছিলে?

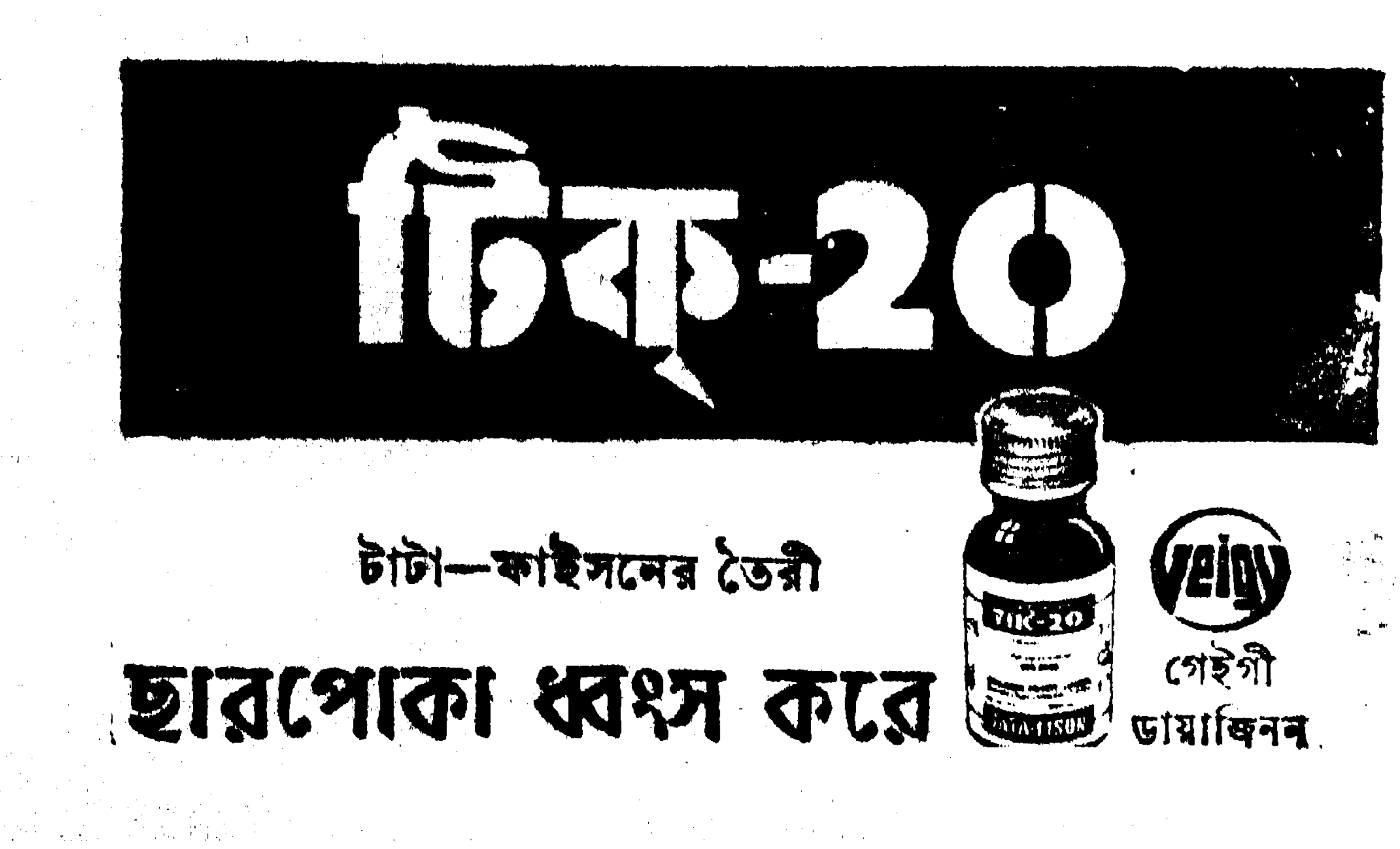

লক্ষ্মীদি বললে—মানুষ তো অনেক কিছুই চায়! কিন্তু কে চাওয়ার মত করে চাইতে পারে?

—কিন্তু চাওয়ার মত করে চাইতে কে তোমায় বারণ করেছিল? কে তোমায় বাধা দিয়েছিল?

লক্ষ্মীদি বললে—ওই যে বললুম, আমার অহংকার!

দীপংকর বললে—তাহলে এতই যদি বোঝ তুমি তো কেন আজ অনন্তবাবুকে এমন করে সহ্য করো? দূর করে দিতে পারো না ও-লোকটাকে? তার সঙ্গে হাসাহাসি করো, হেসে গড়িয়ে পড়ো তার সামনে, এটাও কি ভাল?

—কখন আমি হাসাহাসি করেছি? কখন হেসে গড়িয়ে পড়েছি বল?

দীপংকর বললে—তুমি ভাবছো আমি দেখিনি? আমি নিজের চোখে দেখে তবে বলছি, কাল রাত্রে মনিব্যাগটা ফেরত নিতে এসে দেখি ও-ঘরে দাতারবাবু পাগল অবস্থায় চীৎকার করছে, আর এ ঘরে তুমি আর অনন্তবাবু দু'জনে খেতে খেতে হেসে গড়িয়ে পড়ছো। দাতারবাবুর দিকে তোমাদের ভ্রুক্ষেপই নেই। একেও যদি তুমি

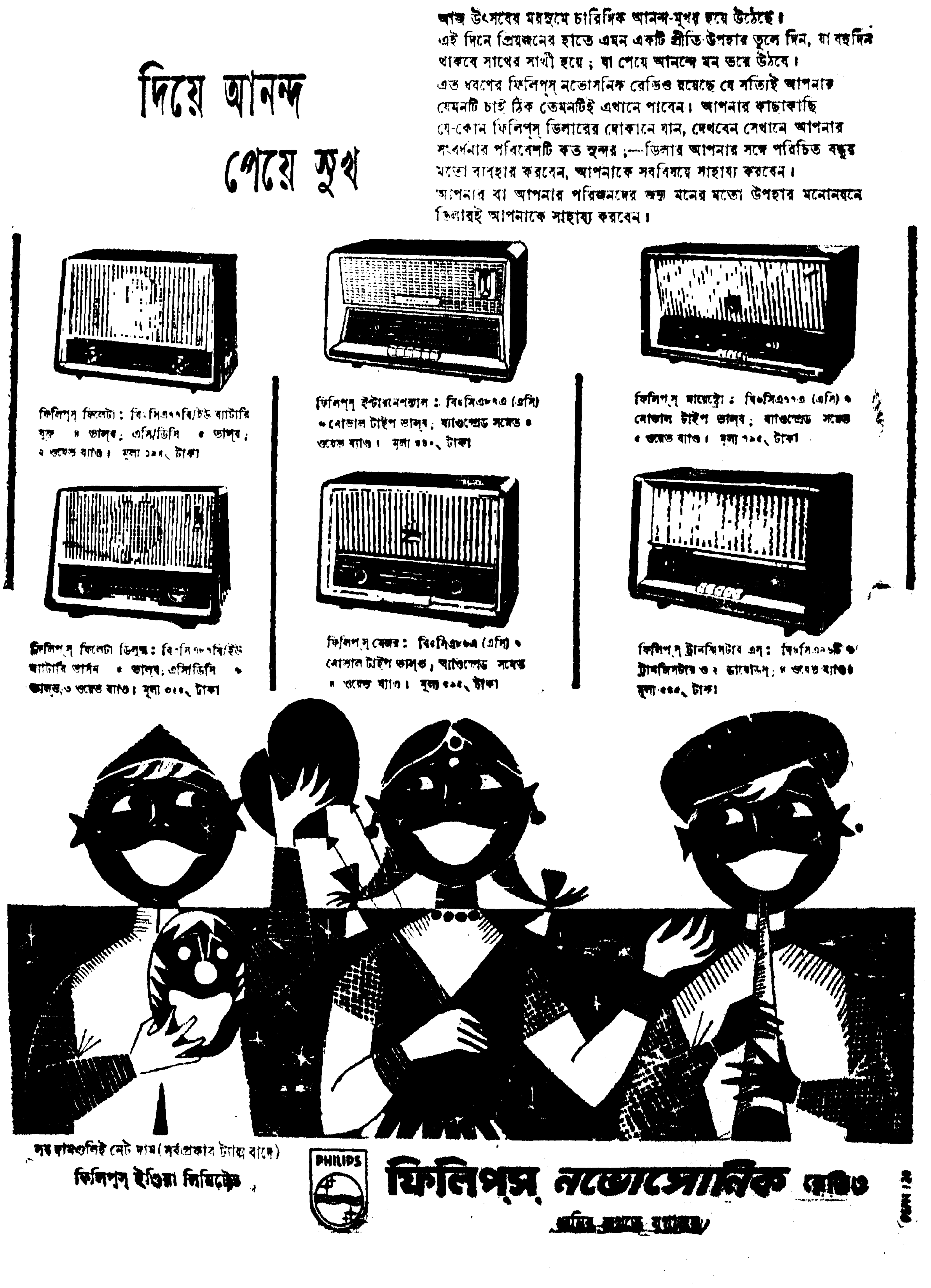

অহংকার বলো তো অহংকারের মানেই আমি জানি না বলতে হবে—

লক্ষ্মীদি এ-কথার কোনও উত্তর দিলে না।

দীপংকর বলতে লাগলো—আমি তোমার কাছে কীসের জন্যে আসি জানি না, হয় তো তোমাকে ভালবাসি বলেই আসি, কিন্তু তুমি আপত্তি করো আর যাই করো, এ আমি কিছুতেই সহ্য করবো না। তোমার ভালোর জন্যেই আমি সহ্য করবো না—। আমি যদি অনন্তবাবুর এখানে আসা বন্ধ না করতে পারি তো তোমার বাবাকেই আমি চিঠি লিখে সব জানিয়ে দেব।

লক্ষ্মীদি তখন যেন একটু নরম হয়ে এল।

বললে—বেশ তুই যা বলবি, আমি তাই-ই করবো—বল্ কী করতে হবে?

দীপংকর বললে—তুমি ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে আমাদের বাড়িতে উঠে চলো, বাড়িটা এখনও খালি পড়ে আছে—

—ভাড়া?

দীপংকর বললে—ভাড়ার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না, সে আমি বুঝবো—! তা ছাড়া তোমাকে কিছুই ভাবতে হবে না। দাতারবাবুর চিকিৎসা আমিই করবো, তার সমস্ত খরচা আমি দেব—

—এত টাকা খরচ করবি তুই আমাদের জন্যে?

দীপংকর বললে—করবো! টাকা না থাকলে আমি ধার করবো অফিসের ব্যাংক থেকে!

লক্ষ্মীদি বললে—কত দিন খরচ করবি? শেষে তো তোরও সংসার হবে, বউ হবে, ছেলে-মেয়ে হবে—তখন?

—ততদিনে দাতারবাবু ভাল হয়ে উঠবে!

—যদি না হয়?

হঠাৎ বাইরে কড়া নড়ে উঠলো।

দীপংকর বললে—ওই বোধ হয় দাতারবাবু এসেছে—

লক্ষ্মীদি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই অনন্তবাবু এল ভেতরে। লক্ষ্মীদিও আগে আগে এল।

অনন্তবাবুকে দেখে দীপংকর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। লক্ষ্মীদির দিকে চেয়ে বললে—আমি উঠি তাহলে লক্ষ্মীদি—

লক্ষ্মীদি বললে—যাবি?

—হ্যাঁ যাই।

বলে চোখ ফেরাতেই দেখলে অনন্তবাবু তার দিকেই চেয়ে আছে। অনন্তবাবুর চোখে-মুখে যেন একটা কর্কশ ঔদ্ধত্য। যেন কেমন রূঢ় দৃষ্টি দিয়ে দেখছে তার দিকে। দীপংকর সে-দৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল। হঠাৎ লক্ষ্মীদি কথা বলে মুশকিল করে দিলে—

লক্ষ্মীদি অনন্তবাবুকে জিজ্ঞেস করলে—কাজটার কী হলো অনন্ত?

অনন্তবাবু গম্ভীর হয়ে বললে—হয়েছে—

—তুমি নাকি দীপুর কাছে যাওনি? ও তোমার জন্যে সমস্তক্ষণ বসে ছিল, রবিনসন সাহেবকেও বলে রেখেছিল। তা কত টাকা নেবে মিস্টার ঘোষাল?

অনন্তবাবু বললে—সে সব তোমার শুনে দরকার কি? সে নিক না-নিক, তোমার শুনে লাভ কী?

দীপংকরের কানে কথাটার খোঁচা এসে লাগলো বড় তীক্ষ্ণ হয়ে। যেন কথাটার লক্ষ্য লক্ষ্মীদি নয়, দীপংকর।

দীপংকর ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—কিন্তু আপনিই বলেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আমি তাই রবিনসন্ সাহেবকে বলেও রেখেছিলাম।

অনন্তবাবু এ-কথার উত্তর না-দিয়ে লক্ষ্মীদিকে বললে—এ কতক্ষণ এসেছে?

লক্ষ্মীদি বললে— অনেকক্ষণ, শম্ভু বেরিয়ে গেছে হঠাৎ, তাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম, দীপু তখন আসছিল এখানে, পথে দেখা হয়ে গেল।

অনন্তবাবু বললে—এতক্ষণ কি সেই সব কথাই হচ্ছিল?

লক্ষ্মীদি হাসতে হাসতে বললে—দীপুর সঙ্গে আমার যে-কথা বরাবর হয়, সেই সব কথাই হচ্ছিল, কেন, তুমি অত রাগ করছো কেন?

অনন্তবাবু যেন ধমকে উঠলো লক্ষ্মীদিকে। বললে—ওর সঙ্গে তোমার এত কীসের কথা?

এতক্ষণ দীপংকর সামনে এগিয়ে এল। অনন্তবাবুর সামনে আসতেই একটা মদের গন্ধ এল নাকে। মনে হলো অনন্তবাবু যেন এখন প্রকৃতিস্থ নয়। কিন্তু তবু অনন্তবাবুর ঔদ্ধত্যটুকু যেন আর বরদাস্ত করা যায় না। বিশেষ করে লক্ষ্মীদির সঙ্গে এমন করে কথা বলবার সাহস কোথায় পেলে অনন্তবাবু!

অনন্তবাবু বললে—ওকে বারণ করতে পারো না এখানে আসতে?

লক্ষ্মীদি যে লক্ষ্মীদি, সে-ও যেন অবাক হয়ে গেল। বললে—তুমি কাকে কী বলছো?

অনন্তবাবু বললে—হ্যাঁ ঠিকই বলছি, ও একটা রেলওয়ে ক্লার্ক, ও কেন আসে এখানে? কীসের লোভে? ও কী চায়?

লক্ষ্মীদি বললে—তুমি ভুল করছো, ও আমার ভাই-এর মত যে, ছোট থেকে ওকে দেখে আসছি আমি—

—সেই জন্যে একলা একলা নিরিবিলিতে বসে তার সঙ্গে এত রাত পর্যন্ত গল্প করতে হবে?

লক্ষ্মীদি বললে—কেন, গল্প করলে দোষ কী?

দীপংকর এতক্ষণে কথা বললে। বললে—চুপ করো লক্ষ্মীদি, অনন্তবাবু মদ খেয়েছে, এখন মাথার ঠিক নেই ওঁর।

—কী?

অনন্তবাবু চোখ বড় বড় করে চাইলে দীপংকরের দিকে।

দীপংকর বললে—এখন আপনার মাথার ঠিক নেই, আপনি বেশি মাত্রায় মদ খেয়েছেন, নইলে আপনাকে বুঝিয়ে বলতাম —আপনিও বুঝতে পারতেন—আপনি শুয়ে পড়ুন তাড়াতাড়ি, নইলে পড়ে যাবেন।

অনন্তবাবু রুখে এল দীপংকরের দিকে। বললে—কাকে কী বলতে হয় জানেন না আপনি?

দীপংকর বললে—মাতালের কাছে আমি ভদ্রতা শিখতে রাজি নই!

অনন্তবাবু বললে—করেন তো একটা ক্লার্কের চাকরি, মিস্টার ঘোষাল আমাকে সব বলেছে, তার এত আবার তেজ কেন?

দীপংকর বললে—ক্লার্ক আমি নিশ্চয়ই, কিন্তু আপনার মত অভদ্র নই—

লক্ষ্মীদি বললে—কেন তুমি ওকে অমন করে বলছো?

অনন্তবাবু লক্ষ্মীদির হাতটা সরিয়ে দিয়ে বললে—তোমার ভাইকে আজকে এমন জায়গায় দেখেছি, তারপরেও ওর লজ্জা নেই!

লক্ষ্মীদি বললে—কী বলছো তুমি অনন্ত? কাকে দেখেছো? কোথায়? আর ওর কাছেই বা তুমি গেলে না কেন আজ?

অনন্তবাবু বললে—কেন যাবো? ঘুষ দিয়ে যখন কাজ আদায় করবো জুতো মেরে কাজ নেব। অত খোসামোদের ধার ধারবো কেন?

দীপংকর বললে—আমি তো আপনাকে খোসামোদ করতে বলিনি—

বেরিয়েছে

অভ্যুদয়

সপ্তম বর্ষ শারদ সংকলন

॥ লেখকসূচী ॥

অন্নদাশংকর রায়, হরপ্রসাদ মিত্র, ভবানী মুখোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র ঘোষ, সুশীল রায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, মুরারি ঘোষ, সুধীর করণ, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক দুর্গাদাস সরকার, হরেন ঘোষ প্রভৃতি

সম্পাদক : নির্মল বসু

দাম পঞ্চাশ নয়া পয়সা

৯বি, কার্তিক বসু লেন, কলিকাতা-৬

(সি ৭৯৮০

—বিনা ঘুষে কাজ নেওয়া মানেই তো খোসামোদ? কেন খোসামোদ করবো? মিস্টার ঘোষালকে ঘুষ দেব, সে আমার পা চাটবে, পোষা কুকুরের মত আমার পা চাটবে—

বলে নিজের একটা পা উ'চু করে বাড়িয়ে দিলে দীপঙ্করের দিকে।

—তাতে পেটও ভরবে, মানও বাঁচবে!

দীপঙ্কর বললে—সেটা আপনি আগে বুঝলে সাহেবের কাছে আমার মুখটা নষ্ট হতো না!

অনন্তবাবু মুখ বে'কিয়ে বললে—আপনার কি সোনা-বাঁধানো মুখ, যে ক্ষয়ে গেলে লোকসান হবে? করেন তো ক্লার্কের চাকরি—

দীপঙ্করের সমস্ত শরীর যেন রি-রি করে উঠলো। তবু অনেক কষ্টে সামলে নিলে।

বললে—লক্ষ্মীদি, তুমি ওঁকে একটু থামতে বলো, নইলে সহ্যের সীমা পেরিয়ে যাচ্ছেন—

লক্ষ্মীদি দীপঙ্করের সামনে এসে তার হাত দুটো ধরলে। বললে—তুই যা এখন দীপু—ওর কথায় কান দিসনি—

অনন্তবাবু বললে—হ্যাঁ, বেশি কথা বললে অপমান করে বসবো তখন—চলে যেতে বলো—

লক্ষ্মীদি ঠেলতে ঠেলতে দীপঙ্করকে একেবারে গলির ভেতরে নিয়ে এল। ওদের দরজার সামনে এসে দরজাটা খুলে দিলে লক্ষ্মীদি। বললে—তুইও রেগে গেছিস্ আজ—যা তুই—

দীপঙ্কর বললে—আমার রাগটাই দেখলে তুমি?

লক্ষ্মীদি বললে—ও তো ওই রকমই—ওর কথা ছেড়ে দে—

দীপঙ্কর বললে—আমার জন্যে তো নয়, কিন্তু এই লোকের সঙ্গেই তুমি ঘর করছো, এই লোকের সঙ্গেই তো তোমার খাওয়া-পরার সম্পর্ক, এই লোককে সন্তুষ্ট করেই তো তোমাকে চলতে হচ্ছে—! তাই তোমার কথা ভেবেই আমার কষ্ট হচ্ছে—

লক্ষ্মীদি বললে—আমার কথা ছেড়ে দে, আমি তো আর বে'চে নেই, সেই জন্যে আমার ও সব গায়ে লাগে না—

—কিন্তু, আমাদের ওখানে তোমার যাওয়ার কী হবে?

লক্ষ্মীদি বললে—আমি তো বলেছি, যাবো—

—তাহলে আমি বাড়িটা ভাড়া নিয়ে নি? শেষকালে তুমি আপত্তি করবে না তো?

লক্ষ্মীদি বললে—না!

হঠাৎ অনন্তবাবুর গলা শোনা গেল পেছনে। বললে—ফিস্ ফিস্ কী প্রেমালাপ হচ্ছে দু'জনে?

বলতে বলতে একেবারে কাছে এসে গেল অনন্তবাবু।

লক্ষ্মীদি বললে—তা তুমি আবার এলে কেন?

অনন্তবাবু হঠাৎ লক্ষ্মীদিকে জড়িয়ে ধরে মুখের কাছে মুখ এনে বললে—ওর সঙ্গে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তুমি প্রেমালাপ করবে আর আমি বুঝি......

কথাটা আর শেষ হলো না। লোকটার স্পর্ধা দেখে দীপঙ্করের মাথায় যেন খুন চেপে গেল।

বললে—স্কাউন্ড্রেল—

বলে অনন্তবাবুর মুখটা লক্ষ্য করে প্রচণ্ড এক ঘুঁষি মারল। ঘুঁষিটা অনন্ত-বাবুর মুখের ওপর গিয়ে যেন ফেটে চৌচির হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে টলে পড়ে গেল মাটিতে। আর ছট্‌ফট্ করতে করতে লাগলো যন্ত্রণায়!

মুহূর্তের মধ্যে কী যে ঘটে গেল, দীপঙ্করেরও খেয়াল ছিল না।

লক্ষ্মীদিও প্রথমটায় বুঝতে পারেনি। তারপর অনন্তবাবুর ওই অবস্থা দেখে মাটিতে বসে পড়ে অনন্তবাবুর মুখের কাছে মুখ নামিয়ে ডাকতে লাগলো—অনন্ত—অনন্ত—

অনন্তবাবু তখন যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করছে। তার তখন সাড়া দেবার ক্ষমতা-টুকুও বোধ হয় আর নেই।

লক্ষ্মীদি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো।

বললে—তুই অনন্তকে মারলি?

দীপঙ্কর লক্ষ্মীদির হঠাৎ এই প্রশ্নে চমকে উঠলো।

বললে—তুমি বলছো কি লক্ষ্মীদি, ও একটা স্কাউন্ড্রেল—ওকে মেরে ফেলিনি এই-ই ওর ভাগ্য! যে তোমার সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করতে পারে, তাকে তুমি স্কাউন্ড্রেল ছাড়া আর কী বলবে—?

—থাম তুই।

লক্ষ্মীদি একেবার গর্জন করে উঠেছে। লক্ষ্মীদির চেহারা দেখে দীপঙ্কর ভয় পেয়ে গেল।

—তোর এত বড় আস্পর্ধা? তুই ওকে মারলি কী বলে? আমার সঙ্গে যেমন ব্যবহারই করে থাক্ সে আমি বুঝবো, তুই কে?

বলেই তখনি আবার মাটিতে বসে পড়ে অনন্তবাবুর মাথাটা ধরে আদর করতে লাগলো। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ব্যাকুল হয়ে ডাকতে লাগলো—অনন্ত—অনন্ত—

অনন্তবাবু বোধ হয় তখন অজ্ঞান অচৈতন্য। অন্ধকারে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না মুখটা। লক্ষ্মীদি বার বার ডাকতে লাগলো—অনন্ত—অনন্ত—

তারপর সাড়া না পেয়ে আবার উঠে দাঁড়াল লক্ষ্মীদি।

বললে—বল্ কেন তুই মারলি ওকে? তুই ওকে মারবার কে? আমাকে যদি অপমান করে থাকে সে আমি বুঝবো, তুই কেন মারিস?

একটু থেমে আবার বললে—তোর বড় বাড় হয়েছে, না? হেসে কথা বলি বলে তুই একেবারে মাথায় উঠে বসবি? বেরো বেরিয়ে যা এখান থেকে—তোকে আর আসতে হবে না আমার এখানে, বেরিয়ে যা—বেরো—

লক্ষ্মীদি দীপঙ্করক ঠেলে একেবারে দরজার বাইরে বার করে দিল। তারপর দড়াম্ করে সদর দরজাটায় খিল্ লাগিয়ে দিয়েছে। দীপঙ্কর সেই দরজার বাইরের অন্ধকারের মধ্যে খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শুধু। তারপর আস্তে আস্তে অন্ধকার রাস্তা দিয়ে চলতে আরম্ভ করলো। দীপঙ্করের মনে হলো এতদিনের সব বিশ্বাস এতদিনের সব আকর্ষণের মূল ধরে যেন লক্ষ্মীদি টান দিল। যেন সব সম্পর্কের সূত্র নিশ্চিহ্ন করে দীপঙ্করকে একেবারে নিরাশ্রয় করে রাস্তায় ছেড়ে দিলে।

রাত্রের শেষ নির্জন ট্রামটা যখন ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের মোড়টা পেরিয়ে গেল, তখনও দীপঙ্কর সেই কথাটাই ভাবছে তারপর হাজরা রোডের মোড়ে আসতেই চলন্ত ট্রাম থেকে নেমে পড়লো। এই তো কাছেই প্রিয়নাথ মল্লিক রোড। সতীর শ্বশুর বাড়ি। সতীর কাছে তার বাবার ঠিকানাটা নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

হাঁটতে হাঁটতে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের ভেতরে ঢুকে একেবারে সতীদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল দীপঙ্কর। বিরাট তেতলা বাড়ি। সামনের গেটে দারোয়ান বসে পাহারা দিচ্ছে।

দীপঙ্কর বাড়িটার গেটের দিকে এগিয়ে গেল। এর মধ্যেই সতী নিশ্চয়ই ঘুমোয়নি। এত সকাল-সকাল। ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে নিশ্চয় জেগে আছে এখন। নিশ্চয়ই জেগে আছে। (ক্রমশ)

শ্রীমতী বীণাপাণি মিত্র প্রণীত

রন্ধন সঙ্কেত

একাধারে দেশী ও বিলাতী রন্ধন, মিষ্টান্ন, আচার প্রভৃতি রন্ধনের গৃহ্য প্রকরণ ও আবশ্যকমত ছবি সহ একমাত্র পুস্তক

(সর্বত্র প্রশংসিত)

উৎকৃষ্ট কাগজ ও বাঁধাই ৩৩৪ পৃষ্ঠা

মূল্য ছয় টাকা

প্রকাশক—শ্রীশরৎকুমার মিত্র, ৮৫নং গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা ৫

(সি ৪০৬৭)

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

৪৫

তারিখটা মনে আছে—২৪শে মে, ১৯২৪। কর্ণার্জুনের শততম রজনী। যেমন জুবিলীতে সাজানো হয়েছিল, তেমনি সাজানো হলো সব, তেমনি 'চিত্রে কর্ণার্জুন' বিলি করা হলো। অধিকন্তুর মধ্যে হয়েছিল এই যে, ঠিক অভিনয়ের আগে একটি সভা হয়েছিল, সভাপতিত্ব করেছিলেন—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। তাঁর ভাষণ, যা কাগজে বেরিয়েছিল, তার কিছুটা উদ্ধৃত করি,—'শ্রীযুত বাবু অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'কর্ণার্জুন' নাটক পড়িয়া ও তাঁহার অভিনয় দেখিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। মহাভারতে কর্ণের চরিত্র সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল, অপরেশবাবু তাহাকে আরও উজ্জ্বল করিয়াছেন। অভিনয়ে কর্ণের চরিত্র দেখিয়া না মুগ্ধ হইয়াছেন, এমন লোকই বিরল। তাই কর্ণার্জুন উপরি-উপরি একশত রাত্রি অভিনয় হইয়াও আজো পুরানো হয় নাই। নাটকখানিতে গ্রন্থকার প্রায়ই মহাভারতের অনুসরণ করিয়াছেন, কেবল শকুনির চরিত্রটি বদলাইয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে নাটকখানি আরও খুলিয়াছে। শকুনি যে কুরুবংশের শনি, সেটা সকলেই জানিত। কিন্তু শকুনি যে সত্যসত্যই প্রতিহিংসা লইবার জন্যই কুরুকুলে বাস করিয়াছিল, এটা অপরেশবাবুর নিজস্ব।'

সেদিনকার সভায় উপস্থিত ছিলেন—নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু, রায় জলধর সেন বাহাদুর, নাটোরের মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ রায় (ইনি এ'র বক্তৃতায় অপরেশচন্দ্রকে 'নাট্যবিনোদ' উপাধি প্রদান করেন) ললিতমোহন গুপ্ত ও অন্যান্য সুধিবৃন্দ। এর পরে, রবিবার ১০১ রাত্রি অভিনয় হয়ে যাওয়ার পর, সোমবার স্টার মঞ্চে একটি প্রীতি ভোজ ও সান্ধ্য সম্মেলন আহূত হয়েছিল। সেখানে সাংবাদিক, সাহিত্যিক, অন্যান্য থিয়েটারের শিল্পী, ডাঃ নরেন বসু প্রভৃতি ডাক্তারবাবুরা, বিশিষ্ট কবিরাজ, বহু জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশ হয়েছিল, বলা যায় প্রেক্ষাগৃহ ভরে গিয়েছিল। এবং এই সম্মেলনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ওস্তাদ পিয়ারা সাহেবের গান। প্রসঙ্গত বলে রাখি, সম্প্রতি এক ভদ্রলোক আমাকে ফোনে জানিয়েছেন, ইতিপূর্বে আমি যে লিখেছিলাম, পিয়ারা সাহেব নবাব পরিবারের লোক, সেটা সত্যি নয়। ইনি মেটিয়াবুরুজেই থাকতেন এবং বাল্যকালে বেশ বাবুয়ানী ছিল বলেই আমার অনুরূপ ধারণা হয়েছিল আর কী। শুনলাম, পিয়ারা সাহেব আজও বেঁচে আছেন, এবং ঐ অঞ্চলের কোনো এক সিনেমা-গৃহের ম্যানেজাররূপে কাজ করছেন। ইনি ছিলেন বিশেষরূপে কাওয়ালী গানের ওস্তাদ। সেদিন উনি ছাড়া আরও সব গাইয়ে ছিলেন উপস্থিত। গানের পর যেমন চা ও পানটান দেওয়া হয়, তেমনি দেওয়া হবে বলে মনে করেছিলেন অভ্যাগতবৃন্দ। তাই যখন 'দয়া করে আপনারা একটু ওপরে আসুন' বলে আহ্বান জানানো হলো, তখন তাঁরা একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিলেন। তখনো টেবিলে খাওয়ার রেওয়াজ হয়নি, তাই পাতা পেড়ে একেবারে যাকে বলে যজ্ঞি-বাড়ির আয়োজন, তারই ব্যবস্থা হয়েছিল থিয়েটারে। আসল কথা, কর্তৃপক্ষ আয়োজনে কোনও কার্পণ্য করেননি শততম রজনী উৎসব বলে। এর আগে বাংলা দেশে কোনো নাটকের একাদিক্রমে চলবার রেকর্ড হিসাবে শততম রজনী অতিক্রান্ত হয়নি, একাদিক্রমে পঞ্চাশ রাত্রিই হয়নি। এদিক থেকে দেখতে গেলে এ তো এক ইতিহাসেরই সৃষ্টি হয়েছে বলা যায়। তার সাফল্যের জন্য কর্তৃপক্ষের মনে উৎসাহ আসা স্বাভাবিক, আনন্দও হওয়া স্বাভাবিক।

ওদিকে প্রতি বুধবারে ত 'ইরানের রানী' চলেছে, বৃহস্পতিবারের বই 'মৃণালিনী'ও শেষ হয়ে এলো, এবং শেষ পর্যন্ত ২৩শে জুলাই রাত আটটায় খোলা হলো বৃহস্পতিবারের নাটক হিসাবে 'কপালকুণ্ডলা।' ভূমিকালিপি ছিল—চাটুজ্যে—অপরেশচন্দ্র। নবকুমার—তিনকড়ি চক্রবর্তী অধিকারী—অহীন্দ্র চৌধুরী। কাপালিক—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত। মতিবিবি—কুসুমকুমারী। পেশমন—সুবাসিনী। কপালকুণ্ডলা—নীহারবালা। শ্যামা—নিভাননী। মেহের-উন্নিসা—পান্নারাণী। এই পান্নারাণীও ছিল এক সুগায়িকা, ভবানীপুরের অধিবাসিনী, ভবানী থিয়েটারে অভিনয় করতো এবং গান করতো, পরে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যোগদান করে।

এই ঘটনার কিছুদিন আগে রাধিকানন্দবাবু স্টার ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি নিজে একলা থিয়েটার করবেন বলে চেষ্টা করছিলেন তখন, এবং তার একটা সম্ভাবনাও হয়েছিল। শহরের বিখ্যাত ধনী কীর্তিচন্দ্র দাঁ-মশাই তাঁকে অর্থসাহায্য দিয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করবেন, এই রকম ব্যবস্থা হয়েছিল।

আমাদের ত হলো ওদিকে 'কপালকুণ্ডলা'। এর একটা ইতিহাসও আছে। এ'বই বহুদিন থেকেই মঞ্চে অভিনীত হয়ে আসছে, বলা চলে, সাধারণ রঙ্গমঞ্চ-প্রতিষ্ঠার সেই আদিকাল থেকেই। কিন্তু যখন আবার নতুন করে ক্লাসিক থিয়েটারে 'কপালকুণ্ডলা' খোলবার ব্যবস্থা হলো গিরিশচন্দ্রের করা নাট্যরূপ, সেই সময় তারাসুন্দরী ও কুসুমকুমারী দুজনেই রয়েছেন ক্লাসিকে। গিরিশচন্দ্র ব'সে নিজের হাতে সবাইকে পার্ট দিলেন, সবাই নিয়মমাফিক তাঁকে প্রণাম করে পার্ট হাতে নিয়ে সরে যাচ্ছে। কুসুমকে উনি দিলেন—কপালকুণ্ডলা। আর তারাসুন্দরীকে দিলেন—মতিবিবি। কুসুমকে পার্ট দেবার পরই তিনি বুঝতে পারলেন, কুসুম একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছেন ভিতরে-ভিতরে, যদিও মুখে কিছু বলছেন না। সে-ভাবটা টের পেয়েই গিরিশচন্দ্র বললেন—তোর করার ইচ্ছে 'মতিবিবি', না?

কুসুম চুপ করে আছেন। গিরিশচন্দ্র বললেন—দেখ, বিনোদিনী যখন ন্যাশনালে 'কপালকুণ্ডলা' করে, তখন তাকে পার্ট দেওয়ার সময় তার কথায় বা হাবে-ভাবে একটুও ক্ষুণ্ণ ভাব প্রকাশ পায়নি। বরং তার ঐকান্তিকতায় মতিবিবির থেকেও সজীব হয়ে উঠেছিল 'কপালকুণ্ডলা'। আসল কথা, পার্ট কিছু নয়রে, যে করবে, তার শক্তির ওপর নির্ভর ক'রে যে-কোনো পার্টই সজীব হয়ে উঠতে পারে।

কুসুম ঈষৎ মুখভার করে বললে—আমি কি তাই বলেছি বাবা?

কিন্তু কুসুমের মন থেকে তখনো ক্ষুণ্ণভাব দূর হয়নি দেখে গিরিশচন্দ্র একটু হেসে বলেছিলেন—আচ্ছা' আমি একদিন

কে, হোড়ের
কণক
পাউডার

ছোট ছোট পার্ট করে তোদের দেখাবো'খন।

তা তিনি করেছিলেন দু-তিন রাত্রি ধরে একসঙ্গে পাঁচ-পাঁচটা পার্ট। অধিকারী, চটিরক্ষক, মাতাল মুটে ও প্রতিবেশী।

কথাটা হয়েছিল বহু পূর্বে, আমার এটা শোনা কথা। কিন্তু তখন ওটা প্রযুক্ত হলো আমার ওপর। ভূমিকাগুলিকে প্রবল করবার জন্য অপরেশচন্দ্র নিজে নিলেন ছোট পার্ট—চাটুজ্যে, আর আমায় দিলেন —অধিকারী। এটাও খুব ছোট পার্ট, মাত্র এক সিনের। আমি বলেছিলাম—আমি ত ছুটিছাটা পাই না তেমন। থাক না, না-ই বা রইল আমার পার্ট।

অপরেশচন্দ্র তখন মৃদু হেসে আমাকে বলেছিলেন গিরিশচন্দ্রের ঐ গল্পটা। এর ওপর আর কোনো কথা নেই। আসলে পার্ট ছোট বলেই আমার পছন্দ হয়নি। কিন্তু রিহার্সাল দিতে দিতে মনে হলো, পার্ট ছোট হলেও—ভালো পার্ট। পার্টটা করতে করতে ঋষি কন্বের কথা মনে হলো। সেই শকুন্তলা। আজীবন যাকে লালন-পালন করলেন, তাকে বড়ো করে যখন শ্বশুরবাড়িতে পাঠাচ্ছেন, তখন মনটা তাঁর কেঁদে উঠল। তিনি বললেন—গৃহী না হয়েও আমার মনটা যখন এমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, তখন গৃহী হলে না-জানি কতো বেদনা পায় মানুষ!

কন্বের মতো অধিকারীও গৃহহারা—মায়ের সেবক তিনি। শিশু বয়স থেকেই তাঁর আঙিনায় দৌড়-ঝাঁপ দিয়ে যে খেলা করেছে, তার প্রতি মমতা আসা স্বাভাবিক। সেই শিশু আজ বড়ো হয়েছে। পালিয়ে এসেছে সে নবকুমারকে নিয়ে। উনি নবকুমারকে লুকিয়ে রাখলেন, লুকিয়ে ওদের বিবাহ দিলেন, কিন্তু বললেন—ওখানে তোমাদের থাকা হবে না। কাপালিক খুঁজতে খুঁজতে ঠিক এখানে এসে পড়বে। বলে, ওদের মেদিনীপুরের দিকে চলে যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি। ব্যবস্থা ত করলেন, কিন্তু বিদায় দিতে মন সরে কই? গৃহীর মতো কেঁদে ফেললে চলবে না, চোখে জল আসবে না, কিন্তু মায়া-মমতা-স্নেহ-র প্রকাশ দেখাতেই হবে। তাছাড়া, অধিকারীর সংলাপগুলি ছিল বড়ো ভালো, সেই সংলাপ ও ভাবাভিব্যক্তিকে সম্বল করে চরিত্রটিকে যথাযথরূপে ফুটিয়ে তুলতে হবে। সেলুকাস করেছিলাম, সে-ও প্রৌঢ় এবং এ-ও প্রৌঢ়, কিন্তু এ হচ্ছে সামাজিক। তখন যুবকের ভূমিকাই করতাম সাধারণত, তাই দর্শকদের মধ্যেও একটা আগ্রহ সঞ্চারিত হলো আমাকে প্রৌঢ়রূপে দেখে। অর্থাৎ, যাকে দেখেছি আমরা —অর্জুন, কুমারসেন, দারা সাজতে—সে সাজছে অধিকারী? দর্শকদের মনের ভাব অনেকটা এই রকম হয়েছিল, আর কী! সার্ভেণ্ট লিখলে—

Mr. Aparesh Ch. Mukherjee as "Chatterjee"—a typical Kulin Brahmin of the past was unique. Mr. Ahindra Chowdhury as "Adhikary" was marvellous."

দৃশ্যপটের মধ্যে বালিয়াড়ির দৃশ্যটি হয়েছিল সব থেকে সুন্দর। শিশির পত্রিকা লিখেছিল—"বিশেষত বালিয়াড়ির দৃশ্যটি আমাদের বড়ই স্বাভাবিক বোধ হইয়াছে। শুধু আমাদের কেন, যাঁহারা সমুদ্রের তীরবর্তী কণ্টক-লতাবৃত বালিয়াড়ি দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই আমাদের মতের সমর্থন করিতে হইবে।"

অভিনয়-সম্পর্কে 'শিশির' লিখেছিল—"কাপালিকের অভিনয় করিয়াছিলেন প্রফুল্লবাবু। নবকুমারকে লতার দ্বারা বন্ধন, দাঁড়কাকের কা-কা-এর মত অমঙ্গলপূর্ণ 'আয়-আয়' ডাক সত্যই দর্শকের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। এই জাতীয় ভূমিকায় ইহা অপেক্ষা কৃতিত্বের কথা আর কি থাকিতে পারে? চাটুজ্যের ভূমিকায় অপরেশচন্দ্র যে হাস্যরসের স্রোত বহাইয়া ছিলেন, তাহাতে অনেকের পেটে যে খিল ধরিয়াছিল—সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। চরম হইল যখন থুথু ও গামছা দিয়া চটি জুতাটি মুছিয়া, সেই গামছাটি দ্বারা আবার গাত্র মার্জনাপূর্বক সেটাকে মস্তকে স্থাপন করিলেন।"

বালিয়াড়ীর দৃশ্যে মঞ্চমায়া দেখবার মতো হতো। দৃশ্যের পিছনটা—অন্ধকার। বালি আঁকা র‍্যাকগুলি স্টেজের ওপর পাতা রয়েছে, তার ওপর দিয়ে চলাফেরা করা যায়। র‍্যাকের ওপর আমাদের মালী রোজ এসে বালিয়াড়ীর ওপর যে ধরনের লতাগুল্ম বা গাছ হয়, সেইরকম ধরনের গাছ এনে পুঁতে দিতো, গাছগুলি তাতে সজীব দেখাতো। তার সামনে স্টেজের মাঝামাঝি জায়গায় বসে থাকতেন কাপালিক। মাথার ওপরকার ঝারি থেকে নীল আলো এসে মঞ্চময় বিচ্ছুরিত হয়ে আছে। তার থেকে একটু দূরে জ্বলছে লাল আলো। সেই লাল আলোটা কাঁপছে আর ওর জটাজুটের ওপর এসে পড়েছে তার আভা, সত্যিই বড়ো ভীষণ দেখাতো—পরিবেশ আর কাপালিক। মঞ্চের মধ্যখানে যে গর্ত ছিল, যেখান থেকে লিফ্‌টের মতো কোনো বস্তু বা মানুষকে নিয়ে নেমে যাবার ব্যবস্থা ছিল, যাকে বলে, 'স্টেজ-ট্র্যাপ'—সেখানকার কাঠটা খুলে নিয়ে, সেস্থানে লোহার পাতলা জাল দিয়ে তৈরী একটা বাক্স বসানো আছে। বাক্সটা এমন যে, আগাগোড়া জাল, কিন্তু তার ঘেঁষে ঘেঁষে সরু কাঠ দিয়ে জালগুলি আটকানো। তারই গায়ে গায়ে হলদে-লাল সব সিল্কের টুকরো পর-পর কেটে বসানো রয়েছে। সিল্কের টুকরোগুলি এমনভাবে মোটা থেকে সরু করে কাটা, যেন অগ্নিশিখা বলে ভ্রম হয়। ভিতরের জালের সঙ্গেও সংলগ্ন ছিল সিল্কের কাটা বড়ো বড়ো টুকরো,—লকলকে অগ্নিশিখার মতো; লাল-হলদে আর ঈষৎ নীল,—এগুলি থাকত জালের সঙ্গে বাঁধা। বাক্সের ঠিক নীচে, একটা টুলের ওপরে, একটা টেবিল-ফ্যান থাকতো শোয়ানো, ওপরের দিকে মুখটা উঁচু করা। সেটা চালানো মাত্রই অগ্নিশিখারূপে সিল্কের ছোট বড়ো টুকরোগুলি আগুনের জিভের মতো লকলক করে উঠে ওপরের দিকে উড়ে উড়ে কাঁপতে থাকত! এরই ফলে ঘটত ঐ অগ্নিকুণ্ডের বিভ্রম। তার পাশেই থাকত বাক্স-করা একটা লালচে আলো। সেটা থেকে সেই আলো এসে পড়ত ঐ শিখা পার হয়ে ওঁর মুখের ওপরে, ফলে, আলোটা ওঁর মুখে পড়ে কাঁপছে মনে হতো। সপ্তগ্রামের বাড়ি বা বাড়ির সদর ইত্যাদি ভালোই হতো, কিন্তু ঐ বালিয়াড়ীর দৃশ্যের কোনো তুলনাই হয় না! আর, অভিনয়ের দিক থেকে বিশেষ করে মতিবিবি যে দৃশ্যে নবকুমারকে প্রত্যাখ্যান করছেন, সেখানে কুসুম ও তিনকড়িদা, উভয়ের অভিনয় হতো অনিন্দ্যসুন্দর! তারাসুন্দরীর 'মতিবিবি' আমি দেখিনি, কিন্তু গল্প যা শুনেছি, তা থেকে অনুমান করতে পারি, কী অপূর্ব হতো সেই অভিনয়। কুসুমেরও খারাপ হতো না।

বঙ্কিমের বইয়ের যেন মার ছিল না। থিয়েটারের পুরাতন যুগে, মধ্যযুগে, আমাদের যুগে, যখনই বঙ্কিমচন্দ্রের বই অভিনীত হয়েছে তখনই একটা সাড়া পড়ে গেছে। আমাদের 'কপালকুণ্ডলা'ও কম আলোড়ন তোলেনি। ওঁর কতো বই যে আমরা অভিনয় করেছি, তা ইয়ত্তা নেই। প্রায় সব বই-ই বলতে গেলে। দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলা, রাজসিংহ, কৃষ্ণকান্তের উইল, দেবী চৌধুরানী, চন্দ্রশেখর, আনন্দমঠ থেকে শুরু করে মায় 'রজনী' পর্যন্ত। সে যুগে ওঁর বইয়ের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, অমৃতলাল বসু, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, এই এঁরা। আমাদের সময়েও নাট্যরূপ দিয়েছেন—শচীন

ডাঃ কার্ত্তিক বসুর
টাইকোসোডা | নানালা
অম্ল, অজীর্ণ ও ডিস্‌পেপসিয়ায় | ব্যথা ও বেদনায়
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ কলিকাতা ৯

সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র ভদ্র, মহেন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি নাট্যকাররা। কাজেই, দেখা যাচ্ছে, দীর্ঘকাল ব্যাপী বঙ্কিমচন্দ্র মাতিয়ে রেখেছেন বাংলার মঞ্চ। এতকালব্যাপী কোনো নাট্যকার নাকি প্রভাব বিস্তার করতে পাবে নি। বঙ্কিমের বই-ই এমন, যুগের রুচি অনুযায়ী ওকে নাট্যরূপান্তরিত করা যায়। ভবিষ্যতেও যদি কেউ নতুন করে ওঁর বইগুলির নাট্যরূপ দেন, তাতেও আবার নতুন করে চলবে ওঁর বই, আমার এই ধারণা। এমন গল্পের বাঁধুনি, এমন রোমান্টিক ধরণ, এমন মনোমুগ্ধকর পরিবেশ,—এ আর পাওয়া যাবে না। বাংলাদেশের উপন্যাসের নাট্যরূপ হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের বইগুলিই ক্লাসিকের দাবি করতে পারে। ১৯৫০ পর্যন্ত যে-সব নাটক অভিনীত হয়েছে, সেগুলিকে বিচারের মধ্যে টেনে এনে প্রশ্ন করতে পারি, আর কোনো নাটক এ দাবি করতে পারে কী? আমার ত মনে হয়, অমন যে জনপ্রিয় নাটক—গিরিশের প্রফুল্ল আর দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান এ-ও অতোটা পারে না। ১৮৭৩ থেকে ১৯৫০ প্রায় আশী বছর ধরে বঙ্কিমচন্দ্র মাতিয়ে রেখেছেন রঙ্গমঞ্চ। এই আশী বছরে যার ব্যাপ্তি, সে সব নাটকই ত ক্লাসিক! বঙ্কিমকে আমরা বাংলার স্যার ওয়াল্টার স্কট বলে খুব সম্মান দেখিয়েছি, কিন্তু, তাঁর ভাবের গভীরতা, এবং লেখার স্টাইল এমন যে, বিলিতী সাহিত্যে গভীর জ্ঞান আমার না থাকা সত্ত্বেও বলতে পারি, যে সব বিদেশী রোমান্টিক উপন্যাসকার ওদেশে আছেন, ইংরেজ ও ফরাসী, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মান তাঁদের সমান ত নয়ই, বরং ঊর্ধ্বে।

কিন্তু, কী কথায় কী কথা এসে পড়ছে! আমাদের স্টারের পরবর্তী ঘটনা হলো, দানীবাবুর স্টারে আগমন। কেমন করে ঘটল, সেটা বলি। 'মনমোহন' উঠে যাবার পর বসে আছেন দানীবাবু। ওঁর সমধর্মী—যাঁরা ওঁর অন্তরঙ্গ—তাঁরা ওকে জপাচ্ছেন, —নিজেই থিয়েটার খুলুন না মশাই?

দানীবাবুর টাকাও আছে। তাই প্রায় প্রলুব্ধ হয়ে পড়েছিলেন আর কী! রীতিমত ভাবছিলেন—তা' করলে মন্দ হয় না?

কোন কাগজেও যেন টিপ্পনী করে,—শিশিরবাবু চেষ্টা করছেন দানীবাবুকে তাঁর মঞ্চে নেবার জন্য।

এমত অবস্থায় একদিন দেখি, অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এসে বসে আছেন স্টারে। গিরীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর অবিনাশবাবু ঐ পরিবারের মধ্যেই বসবাস করতে থাকেন, দানীবাবুর বিশেষ হিতৈষী বন্ধু হয়ে পড়েছিলেন তিনি। মনমোহনে বসে নাটক পড়া শুনতেন, দানীবাবুকে দেখাশোনাও করতেন। এহেন অবিনাশবাবুকে স্টারের অফিসে এসে বসে থাকতে দেখে, কেমন যেন মনে হলো। অপরেশচন্দ্র আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও করিয়ে দিলেন।

কানাঘুষোয় শুনলাম, দানীবাবু শিশিরবাবুর ওখানে যাবেন না, এখানেই আসছেন।

একটা অভিনয় দিনে, আমাদের যে ড্রেসার ছিল কুঞ্জ, সে এসে বললে—ম্যানেজারবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করবেন এখানে এসে।

চমকে উঠলাম। বললাম—সে কী রে! এখানে কেন? আমি ডেকে পাঠালেই ত যেতাম।

কুঞ্জ বললে—আমায় বললেন, ওনার আশেপাশে যখন কেউ থাকবে না, তখন আমাকে ডেকে আনিস।

বললাম—দাঁড়া, সিন থেকে ঘুরে আসি, তারপরে সব বলিস।

কুঞ্জ বাল্যকাল থেকেই ড্রেসারগিরি করছে, ওর মামাও ড্রেসার ছিল। জাতিতে ওরা ব্রাহ্মণ। কুঞ্জই দেখত আমাদের পোশাক-টোশাক। কত বকুনিই যে খেয়েছে, তবু আমাদের সঙ্গ ছাড়ত না। একদিন কী কারণে যেন রেগে গিয়ে তেড়ে গিয়েছিলাম ওর দিকে, বলেছিলাম—আজ মারবই তোকে।

তা' ও করেছিল কী, ভয়ে আমার সাজঘরের সঙ্গে যে ফিট্ করা তক্তপোষটি ছিল একেবারে তার তলায় সেঁধিয়ে গেল। আমি নীচু হয়ে ওর পা ধরে হিড়হিড় করে টেনে ওকে বার করেছি, আর ও প্রাণপণে তক্তপোশের পায়া জড়িয়ে ধরে আছে। আমাদের ঘরের একটু উঁচুতে ছিল গরাদবিহীন জানালা। বলছিলাম—তোকে ঐ জানালা দিয়ে গলিয়ে ফেলে দেবো। আর সেই শুনে, ভয়ে ও কাঁপছে!

ড্রেসার যারা ছিল, তাদের গুণের কথা কখনো ভুলতে পারি না। বিশেষ করে, এই কুঞ্জ। মাত্র পোশাক পরিয়েই কর্তব্য সমাধা সে করত না। কীসে আমরা খুশী থাকব, কীসে আমাদের মেজাজ ভালো থাকবে, এই ছিল তার চিন্তা। একদিন হয়ত বললাম, —এই কুঞ্জ, সরবত আনিয়ে দে, বড় তেষ্টা পেয়েছে।

তা বলতো—না স্যার, সরবত খাবেন না, গলা ধরে যাবে।

সেই কুঞ্জ, সেদিন যখন সিন থেকে ঘরে এলাম, আমাকে দেখে হাঁক দিয়ে বেয়ারা কাশীকে ডাকলো। বললে—এই কাশী, ম্যানেজার মশাইয়ের গড়গড়াটা এখানে এনে দে?

কৌতূহল হলো। বন্ধু যে একেবারে গড়গড়া নিয়ে আমার ঘরে বসছেন, ব্যাপারটা কী?

এলেন অপরেশচন্দ্র একটু পরেই। দুটো একটা মামুলী কথা বলবার পরই, বলে উঠলেন আসল কথাটা,—দানীবাবু আসছেন শুনেছেন বোধহয়?

—হ্যাঁ, কানাঘুষো শুনেছি, স্পষ্ট কিছু জানি না।

—ঠিকই শুনেছেন। আসছেন। তিনি এলে পুরানো পুরানো বইগুলো আমরা অভিনয় করতে পারি, কী বলেন? তার আসা এখানে মঙ্গলজনক নয়?

—নিশ্চয়ই!—বলে উঠলাম—অতো বড়ো অভিনেতা আসবেন, কতো শক্তি বেড়ে যাবে আমাদের। কিছুদিনের মধ্যেই শিশিরবাবু থিয়েটার খুলছেন শুনেছি, এ অবস্থায় ওঁকে পেলে আমাদের ত খুবই ভালো হবে!

অপরেশচন্দ্র বললেন—ওখানে উনি ছিলেন মান্যপদে, ম্যানেজার। এখানে আমি ম্যানেজার—হিসাবে রয়েছি, তাই ওকে ত আর এখানে ম্যানেজার করা যায় না, তাই ওঁকে আমরা আনছি, নাট্যাচার্য হিসাবে। শেখাবেন না কিছুই, ওসব ঝঞ্ঝাটে উনি যান না, তবে, একটা পদ ত দরকার। আপনার আপত্তি নেই ত?

—সে কী!—আমি বললাম—আপত্তি কেন হবে! শেখান না উনি? ওঁর অভিনয় দেখে-দেখে কতো জিনিস শিখছি দূরে থেকে, এখন ওঁকে কাছে পেলে, ত, আরও কতো শিখতে পারব! আমার আপত্তি থাকতে পারে, এটা ভাবলেন কী করে?

অপরেশচন্দ্র এইবার হেসে ফেললেন, বললেন—সেইরকমই শুনেছি।

—কে বললে!

—থাক, না-ই বা শুনলেন।

চলে গেলেন অপরেশচন্দ্র। গেলাম প্রবোধবাবুর কাছে। বললাম গিয়ে সব।—বললাম —অপরেশবাবু ও কথা জিজ্ঞাসা করলেন কেন? অর্থ কী?

প্রবোধদা বললেন—কথা উঠেছে বলে, দানীবাবুকে আনায় তোমার নাকি মস্ত আপত্তি।

—সে কী! কে বলেছে!

উনি বললেন—কে বলতে পারে বলে তোমার মনে হয়?

—বুঝতে পারছি না। নিশ্চয়ই আমার কোনো অন্তরঙ্গ লোক।

—হ্যাঁ, খুব পাকা মাথা।

হেসে ফেললাম। নামটা অবশ্য পেটে এলেও মুখে বলতে পারলাম না। ঘটনাটা তখন দাঁড়িয়েছিল, যেন, আমরা নতুনরা একটা দল বেঁধেছি। দুর্গা, ইন্দু, এরা সব নাকি আমার কথায় ওঠে বসে। অতএব, এরা বিগড়ে গেলে ক্ষতি হতে পারে।

যাক, এভাবে যে ব্যাপারটা মিটে গেল, এতেই শান্তি পেলাম আমি।

কে. হোড়ের
মহাভৃঙ্গরাজ

এরপরে, দানীবাবু একদিন বেড়াতে এলেন স্টারে। অপরেশবাবু বললেন—এসে, দেখা করবেন।

—নিশ্চয়ই যাব। আমি বললাম—আপনি পরিচয় করিয়ে দেবেন।

মনে মনে বললাম—সর্বনাশ, ওসব কথা দানীবাবুর কানেও গেছে নাকি!

স্টেজের উত্তর দিকে, সেখানে সিনটিন রাখা হতো, সেখানে একটা ঘর ছিল। বাইরে, আস্তাবলের ধার দিয়ে এলে সেই ঘরে সোজাসুজি আসতে পারা যায়। ওখানে, একটা দরজা ছিল বাইরের দিকে যাবার। দানীবাবুর সঙ্গে লোকজন দেখা করতে আসবে, সেইসব ভেবেই ও ঘরখানা সংস্কৃত করে দেওয়া হলো দানীবাবুকে।

এলেন উনি। অপরেশবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন। দানীবাবুর কথা বলার একটা বিশেষ ভঙ্গী ছিল। সেই ভঙ্গীতে বললেন—নাম শুনেছি। অবিনাশবাবু বলছিলেন। বেশ বেশ। আপনি ভালো অভিনয় করেন।

—জানি না। যথাসাধ্য করি আর কী!

তারপরে, ক্রমশ ও'র সঙ্গে আমার বেশ আলাপই হয়ে গিয়েছিল বলা চলে। দুজনে বসে কতো গল্পই না করেছি। উনি তামাক খেয়ে নলটা দিতেন আমার দিকে বাড়িয়ে, বলতেন—খান।

না এলে, না তামাক খেলে, দুঃখ করতেন। আর, গল্প হতো অবিনাশবাবুর সঙ্গে, দানীবাবুরই ঘরে বসে। পুরোনো দিনের কতো গল্পই যে শুনেছি তার ইয়ত্তা নেই।

দানীবাবুর স্টারে আসার ব্যাপার নিয়ে যখন প্ল্যাকার্ড পড়লো, তখন ছাপার ব্যাপারে একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল। ও'র নামের সঙ্গে ছাপা হয়ে গিয়েছিল ইংরাজীতে—"The great Tragedienne !"

শব্দটা ফরাসী, স্ত্রীলিঙ্গ। এই নিয়ে হাসাহাসি, সারা শহরময় একটা চাঞ্চল্য আর কৌতুকের বন্যাই বয়ে গিয়েছিল!

এখন, উনি এলেন, কী অভিনয় হবে? না, প্রথমেই, চন্দ্রগুপ্ত, বৃহস্পতিবারের নাটক হিসাবে। আমাদের এটা আগেই করা ছিল, তবু মহলা দেবার জন্য প্রস্তুত হলাম। হরিদাসবাবুর ছিল 'কিওরিউ' সংগ্রহ করার ঝোঁক। কোথায় কোন এক সাহেবের কাছ থেকে সংগ্রহ করে এনেছিলেন, পায়ের—হাতের-বুকের-বর্ম.—প্লেটের। গ্রীক্ হেল্মেট্ও সংগ্রহ করেছেন, লাল পশম দিয়ে ছাঁটা। আমাকে দেখিয়ে একগাল হেসে বললেন—কীরকম? সেনাপতি সুন্দর মানাবে।

সেল্যুকাস সাজছি। চুল পরতাম না, নিজের চুলই সাদা করে নিতাম। হেলমেট্টা পরতে গিয়ে দেখি, মাথায় লাগছে। প্যাড করে নিলাম। দানীবাবু আমাকে বললেন—ওখানে যখন 'আলেকজান্ডার' করেছি, ওরা তখন একজোড়া গ্রীক জুতো তৈরী করিয়ে দিয়েছিল। সেটা নিয়ে এসে আপনাকে দেবো, পরে দেখবেন।

উৎসাহিত হয়ে বললাম—দেখি ত, আপনার জুতো আমার পায়ে মাপসই হয় কি না?

হলো। তবু বললাম—না হয় না হবে, একটু লাগলেও ক্ষতি নেই। আপনি আনবেন।

আনলেন সেই স্যাণ্ডেলের মতো গ্রীক্ জুতো। ভালো হলো আমার পোশাক-আশাক। মেক-আপও হলো নতুন। এক ভদ্রলোক তখন বিলেত থেকে মেক আপ শিখে এসে, আমার ওদিকে ঝোঁক আছে শুনে, আলাপ করে গিয়েছিলেন আমার সঙ্গে। তিনি বললেন—আমি আপনার মেক আপ করে দেবো। প্রৌঢ়, গ্রীক্।

—পারবেন?

—দেখুন না ট্রাই করে?

বললাম—বৃহস্পতিবার প্লে, আপনি বুধবারে আসুন। 'ইরাণের রাণী' আছে সেদিন। শো শেষ করে মেক-আপের রিহার্স্যাল দিয়ে নেবো। নইলে, বৃহস্পতি-বার প্লের আগে যখন মেক-আপ করে দেবেন, সে মেক-আপ যদি পছন্দ না হয়? তখন ত তুলে ফেলবারও অবকাশ থাকবে না।

অবশ্য, মেক-আপ খুব ভালোই হয়েছিল। আমি তখন সেল্যুকাসে মোটা ভুরু ও 'হুইস্কার' নিতাম। সিন্ধুনদ তটের দৃশ্যটি দেখতে খুব সুন্দর হলো। সেকেন্দার স্তব্ধ হয়ে দেখছেন পর্যন্ত। আমি দাঁড়িয়ে আছি, আমার পাশে আমার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে হেলেন। তখন ওটা সেট্সিন ছিল। তাঁবুর সামনে বারান্দা মতো করা। ডিভান বসানো। দূরে-দূরে ঘুরছে সব বডিগার্ড।

দানীবাবু 'চাণক্য'রূপে অভিনয় করলেন, যাকে বলে, প্রাণপণ. চোখে ভালো দেখতেন না তখন। বলতেন—আমাকে ঐ ফোকাস্ টোকাস্ আলো-ফালো বেশী দিস না রে, চোখে সইতে পারব না।

কিন্তু, স্টেজে যখন নামলেন, তখন অন্য মানুষ। আলোও পড়ছে চোখে মুখে, কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। চলাফেরা চমৎকার, পদক্ষেপ একেবারে—মাপা। বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তি, স্টেজে একবারে সাবলীল অভিনয় করে চলেছেন। অথচ, 'একজিট' নিয়ে উইংসের বাইরে এলে, আর চোখে দেখতে পাচ্ছেন না, ও'কে তখন ধরতে হতো গিয়ে।

আমি-নীহার-ইন্দু হচ্ছি গ্রীক, ও আমাদের বহু রিহার্স্যালে দেওয়া জিনিস। তবু, প্রাণ দিয়ে অভিনয় করার চেষ্টা করে চলেছি। চন্দ্রগুপ্ত সেজেছিল—দুর্গাদাস। নন্দ এবার করলে দানীবাবুরই ভাগ্নে—দুর্গাপ্রসন্ন বসু। ছায়া—সুবাসিনী। হেলেন—নীহারবালা। মুরা—নিভাননী। কাত্যায়ন—নরেশবাবু। আরেকজন ননীবাবু ছিলেন আমাদের মধ্যে, তাঁর নামছিল—গাইয়ে ননী-বাবু। তিনি সাজলেন—ভিক্ষুক। তিনকড়িদা এবারকার 'চন্দ্রগুপ্ত'-এ কোনো পার্ট করলেন না। আমাদের এবারকার 'চন্দ্রগুপ্ত' এর প্রথম রজনীর তারিখ হলো—২৪শে জুলাই ১৯২৪।

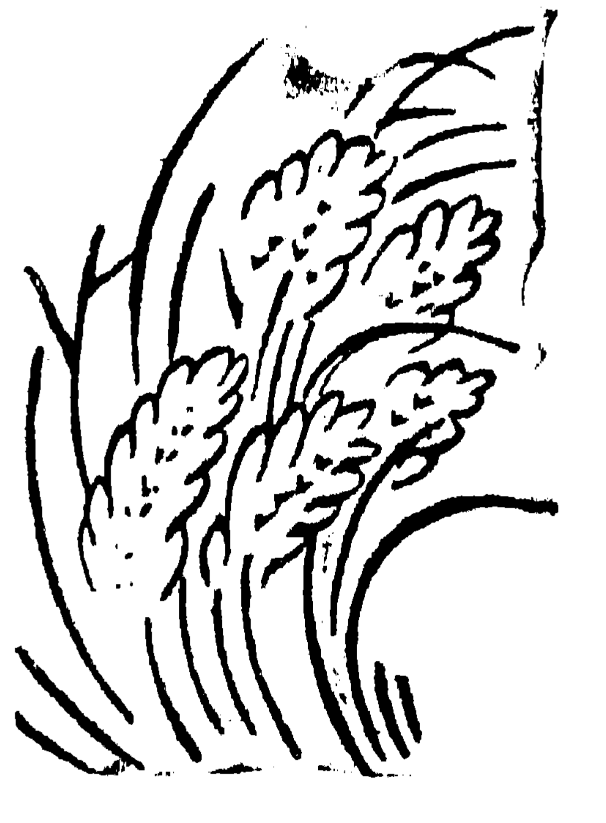

GOVERNMEN

বৃষ্টিভেজা তারা

গোবিন্দ চক্রবর্তী

তারারা জ্বলছে, তারারা গলছে
তারারা চলছে আর
রকমারি রোশনাই।
তারাদের মত তোমারো চলার
লঘু ধ্বনিটুকু পাই—
যখনি গভীর নিবিড় অন্ধকার।

এ ভীরু মাটির বড় বেশী হাহাকার—
সামান্য শ্বাস রোল তোলে ঝটিকার।
তারারা গহন শঙ্কাহরণ
জাগে তবু অবিরল।
তুমি যেন তারই শুভ্র হৃদয়তল—
ছায়ালেশ নেই কোথাও তিলেক যার।

তারারা জ্বলছে, তারারা বলছে :
তারারা তিমির নয়।
বরং তিমিরে হীরকের বিস্ময়
তারাই; হারাই যে শাওন মেঘে-
তিমিরই সে মেঘ হয়।

মেঘে যে ঘেরাও, তারও পানে চাও;
আরো খরকরোজ্জ্বল।
সিক্ত তারার রূপসী উপমা
স্নিগ্ধ জলকমল

আহা তুমি তাই, তুমি যেন তাই
হে আমার, হে আমার।

আলো অন্ধকার আলো

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

আলো অন্ধকার আলো চোখের গভীর কাছে অন্তহীন দোলে;
আমাদের ভালোবাসা ওই ক্লান্ত পাখিটির মত
সমস্ত নিসর্গ মুছে একদিন উড়ে যাবে বিস্মৃতির কোলে,
বয়সী রেখার দুঃখ শরীরের সব স্বর্গে সাজাবে সময়।

কে তুমি আমাকে আজো বিপুল ধ্বংসের দিকে অবিরাম টানো
কে তুমি বাউল যেন হেঁটে গেলে গান হবে ভোরের আকাশ;
আমি কানা মুখে স্থির তাকাতে পারিনা—কেউ জানো
আনন্দিত দুঃখ কিংবা দীপ্তিহীন সুখ কাকে বলে ?

আলো অন্ধকার আলো আমার চোখের কাছে অন্তহীন দোলে॥

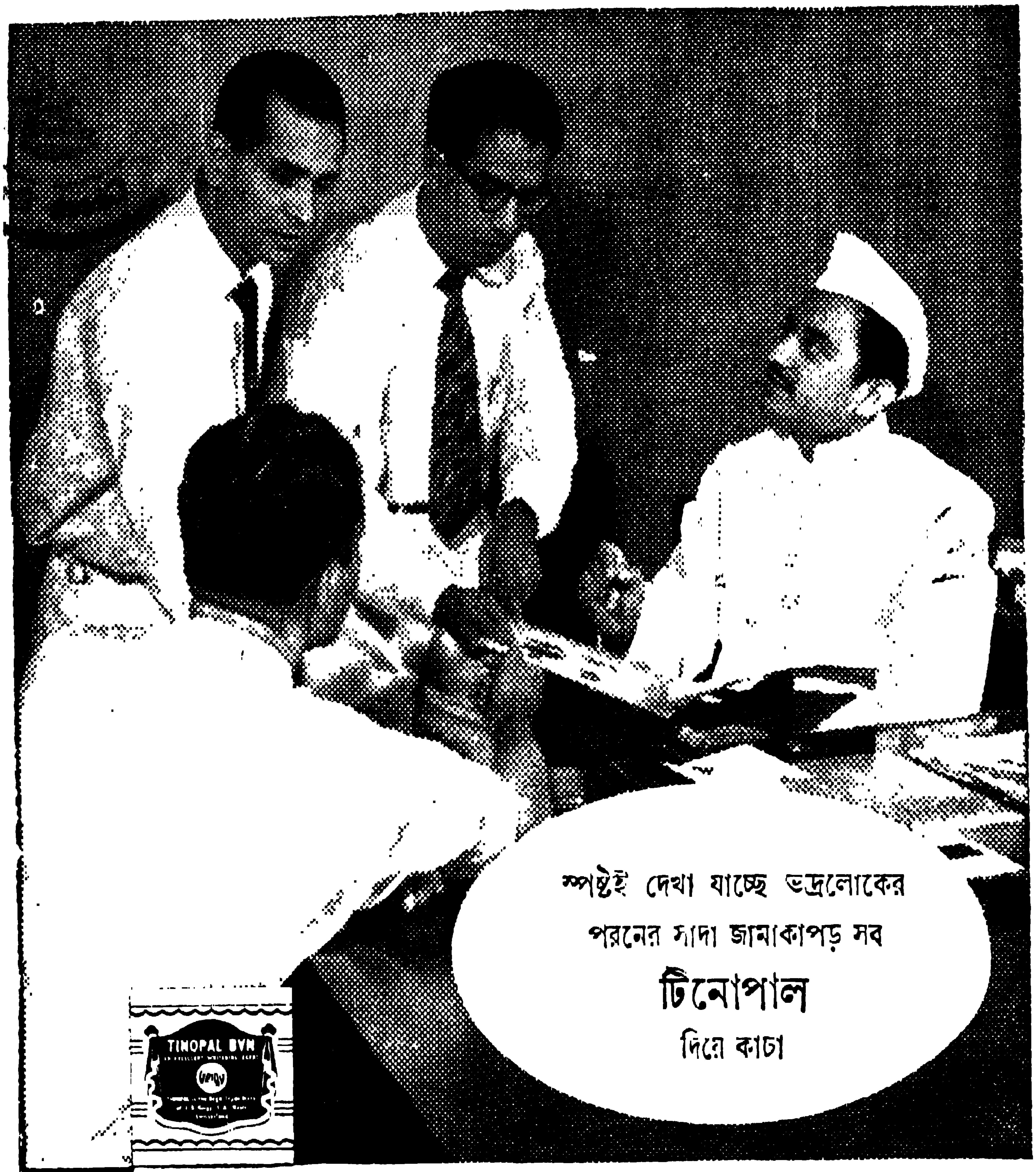

টিনোপাল

এদের রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক—জে.আর. গায়গী, এস. এ., বাল, সুইজারল্যাণ্ড

সামান্য একটু টিনোপাল ব্যবহার-করলে সাদা জামাকাপড সবচেয়ে বেশী সাদা হয়ে ওঠে।

প্রস্তুতকারক: সুহৃদ গায়গী প্রাইভেট লিমিটেড, ওয়াডী ওয়াডী, বরোদা

একমাত্র পরিবেশক: সুহৃদ গায়গী ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড, পো: বক্স নং ৯৬৫, বোম্বাই ১

SISTA'S-SG-102-BEN

ষ্টকিষ্টস্ঃ হিন্ডাইজ প্রাইভেট লিমিটেড, পি-১১, নিউ হাওড়া ব্রীজ এপ্রোচ রোড, কলিকাতা—৭

বিশ্ব-বিচিত্রা

অনেকেরই হয়তো জানা নেই যে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মধ্যে কুড়ি কোটি লোক ন্যাটা এবং এদের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। ন্যাটা লোকেদের জন্যে তাই ওদের সুবিধে মতো নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হচ্ছে।

বছর কতক আগে ইওরোপের একটি বৃহৎ ব্যাংক তাদের ন্যাটা পৃষ্ঠপোষকদের জন্যে বিশেষভাবে চেক ছাপায়। চেক বইয়ে রেখে দেবার যে অংশ সেটা ছাপানো হয় ডান দিকে। ন্যাটা লোকের জন্য এই ব্যাংক বিশেষ ব্যবস্থা করায় তাদের দেখাদেখি বহু প্রতিষ্ঠান নতুন ধরণের সামগ্রী উৎপাদনে ব্রতী হয়। ইওরোপের নানা স্থানে এখন ন্যাটাদের জন্য বিশেষভাবে তৈরী মাছ ধরার ছিপের রিল পাওয়া যায়। গল্ফ খেলার ছড়ি, বন্দুক, ফাউন্টেন পেন, কাস্তে, কাঁচি, বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি, স্যাক্সোফোন এবং আরো বহু প্রকার সামগ্রী এমন বিশেষভাবে তৈরী পাওয়া যায় যা ন্যাটা হাতে ব্যবহার করার সুবিধে হয়। এমন কি দাঁতের ন্যাটা ডাক্তারের পক্ষে স্বচ্ছন্দে ব্যবহারের উপযোগী বিশেষভাবে তৈরী সরঞ্জামও পাওয়া যায়।

ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে ন্যাটাদের দীর্ঘ তালিকা প্রণয়ন করা যায়। মিসরের ফারোয়াদের অনেকেই ছিল ন্যাটা এবং প্রাচীন রোমের সম্রাটদের মধ্যেও অনেকে তাই ছিলেন। অন্যান্য খ্যাতনামাদের মধ্যে ন্যাটা ছিলেন বাইবেল প্রসিদ্ধ বেঞ্জামিন, আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট, ইংলণ্ডের ষষ্ঠ জর্জ, শিল্পী মাইকেলএঞ্জেলো, রাফায়েল এবং অদ্বিতীয় মনীষী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি।

দা ভিঞ্চির হাতের লেখা ন্যাটা বলে অদ্ভুত ছিল—মনোবিজ্ঞানীরা যাকে "আয়নায় লেখা" বলে অভিহীত করেন। হিসেব নিয়ে দেখা গিয়েছে যে প্রতি আড়াই হাজার ন্যাটা লোকের মধ্যে একজনের হাতের লেখা হয় "আয়নায় লেখা" যেটা দেখতে হয় সোজা-ভাবে লিখে তার ওপর ব্লটিং পেপার দিয়ে কালি শুষিয়ে নিলে যেমন দেখায়। কাগজে উল্টো দেখায় এবং পড়তে হয় ডান দিক থেকে বাঁ দিকে। দা ভিঞ্চির যাবতীয় গ্রন্থ আয়নার সাহায্যে পড়তে হয়।

মহামনীষী দা ভিঞ্চির মতো অনেক ক্ষেত্রে ন্যাটারা স্বাভাবিক লোকের চেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখায়। ক্রীড়া ক্ষেত্রে ন্যাটা লোকের সংগে টেনিস খেলতে যে কি রকম বেগ পেতে হয় ভুক্তভোগীরা তা ভাল করে জানেন। ন্যাটা হওয়ার জন্যে আবার অনেক কিছু থেকে বঞ্চিতও হতে হয়। যেমন শর্ট-হ্যান্ড লেখার যে পদ্ধতি তা ন্যাটা লোকের পক্ষে আয়ত্ব করা সম্ভব নয়। কম্পটোমিটারও তারা ব্যবহার করতে পারে না। বেহালা বাজানোও কোনক্রমেই সম্ভব হতে পারে না তাদের পক্ষে।

সংগীতের ক্ষেত্রে ন্যাটাদের সুবিধের জন্য বিখ্যাত সংগীতবিদ মরিস র‍্যাভেল তার একটি প্রভুত খ্যাতিপ্রাপ্ত সংগীত ন্যাটাদের জন্য বিশেষভাবে রচনা করেন ন্যাটারা যতটা কৃতিত্ব দেখাতে পারে সে জন্যে নয়, ন্যাটা হওয়ার দুর্ভোগ যাদের তাদের জন্য কিছু করার উদ্দেশ্যে। অস্ট্রিয়ার খ্যাতনামা পিয়ানোবাদক পল উইটজেনস্টিন প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধে তার ডান হাতটি খোয়ান। ন্যাটাদের জন্য বিশেষভাবে রচিত স্বরলিপি যোগাড় করে পঁচিশ বৎসর তিনি পৃথিবীর প্রধান কনসার্ট হলগুলিতে এক হাতে বাজিয়ে কৃতিত্ব দেখান।

অস্ট্রিয়ার আর এক পিয়ানোবাদক, কাউন্ট গেৎসা জিকীর বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর শিকার করতে গিয়ে ডান হাতটি খুইয়ে বসেন।

(১)

(২)

(৩)

১। যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞরা লক্ষ্য করে দেখেছেন মোটরের অনেকগুলি পার্টস একেবারে একই রকম দেখতে হওয়ায় সংযোজনকালে বেছে ঠিক করে নিতে কর্মীদের অনেক সময় চলে যায়। ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক এর প্রতিকারের যে উপায় উদ্ভাবন করেছেন তা গৃহীত হলে মোটর গাড়ির ইঞ্জিন ও তার বিভিন্ন পার্টসগুলি অতঃপর বর্ণময় হয়ে উপস্থিত হবে। তার প্রস্তাব হচ্ছে দ্রুত চিনে নেবার সুবিধের জন্য পার্টসগুলিকে বিভিন্ন রঙে রাঙিয়ে আলাদা করে নেওয়া। ২। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বাস্থ্য গবেষণাগারের রাসায়নিকরা বাজার চলতি চিনির চেয়ে তিনশতগুণ মিষ্টি এক অসাধারণ কার্বো-হাইড্রেট নিয়ে পরীক্ষা করছেন। এই বস্তুটি হচ্ছে স্টিভিওসাইড যা প্যারাগোয়েতে উৎপাদিত এক প্রকার ক্ষুদ্র গুল্ম থেকে পাওয়া যায়। স্থানীয় অধিবাসীরা এর পাতা শুকিয়ে গুঁড়ো করে বহু শতাব্দী ধরে চায়ের মিষ্টি হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। ৩। গবেষকরা বলেন দীর্ঘকাল খোলা গায়ে সূর্যরশ্মি থেকে আল্ট্রাভায়োলেট-রে নিতে থাকলে আগুনে পোড়ার মতোই ত্বকের অবস্থা হয়। ত্বকে রঞ্জক পদার্থ থাকে যা সূর্যের আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মিকে পরিস্রুত করে কিন্তু দীর্ঘকাল রোদে থাকলে রঞ্জক পদার্থের সংরক্ষণ ক্ষমতা হ্রাস পায় ফলে ত্বক ঝলসে যায়। শ্যামা শাদীদের চেয়ে টুকটুকে ফর্সা মেয়েদের ত্বক বেশী দ্রুত ঝলসে যায়। নিগ্রোদের চেয়ে ককেশিয়ানদের ত্বক সহজে ঝলসে যায়।

এক হাতে বাজানোর দক্ষতায় তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ ফ্রাঙ্ক লিষ্‌সের সঙ্গে ব্যবস্থা করে চারিটি কনসার্টে পিয়ানো বাজিয়ে নাম করেন।

ন্যাটা মেয়েদের কিন্তু পুরুষদের চেয়ে বেশী অসুবিধা ভোগ করতে হয়। বুনন কাজে যা কিছু নির্দেশ থাকে ডানহাতের উপযোগী এবং কোন ন্যাটা মেয়ে বুনতে গেলে তাকে নির্দেশ উলটো করে নিতে হবে। ক্যান ওপনার, কর্কস্ক্রু সেসব নিয়েও ওদের বড়ো ঝামেলায় পড়তে হয়।

এই ধরণের নানা অসুবিধের সম্মুখীন হয়ে আমেরিকার একদল ন্যাটা তাদের অধিকার রক্ষা করার জন্য একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করে এবং তাদের সভ্যদের বাঁ হাতে শপথ গ্রহণাদি কাজ মঞ্জুর করাবার আন্দোলন তোলে। ওদের দুটি বিশেষ পরিকল্পনা ছিলঃ (১) পোশাক নির্মাতাদের চাপ দেওয়া যাতে তারা বোতামের ঘর উলটো দিকে বসায়; এবং (২) নিউ ইয়র্কের ভূগর্ভস্থ রেলের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা যাতে তারা টার্নস্টাইলে মুদ্রা নিক্ষেপের গর্তটি উলটো দিকে বসান।

এই সংঘকে কতকগুলি দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সম্মুখীন হতে হয়। বহু শতাব্দী ধরে সমাজ ন্যাটাদের তাচ্ছিল্য করে আসছে। একটা প্রাচীন অযৌক্তিক অতিকথায় বাম বলতে "ভুল" এবং দক্ষিণ বলতে "ঠিক" বলে ধরে নেওয়া চলে আসছে। ভাষাতেও এর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। "ন্যাটা তারিফ" বলতে কি বোঝায় সেটা কারুর অজানা নয় এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে "বামপন্থী" বলতে বোঝায় বিরুদ্ধবাদী বা কম্যুনিস্ট।

সমগ্র ইতিহাসে পৃথিবীর যাবতীয় ভাষা এবং প্রায় সকল দেশের দৃষ্টিতে দক্ষিণ হস্ত হচ্ছে ক্ষমতা, উচ্চতর ধাপ, সদ্‌গুণ, পুরুষত্ব এবং জীবনের প্রতীক, আর বাম বলতে বোঝায় দুর্বলতা, নিম্নস্তর, অশুভ, মেয়েলিপনা এবং মৃত্যু।

সুদীর্ঘ কাল ধরে সমাজের এই ধারণা সত্ত্বেও মানবজাতির এক শ্রেণীর লোক কেন তাহলে বাঁ হাত ব্যবহারে অটল হয়ে আছে? এ পর্যন্ত মানুষ কেন ন্যাটা হয় তার কোন স্থির সিদ্ধান্তে পেশছানো সম্ভব হয়নি। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে ন্যাটামি চোখের তারার বা চুলের রঙের মতো উত্তরাধিকার সূত্রে ঘটে। কিন্তু এ ধারণার কোন জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায় না। ন্যাটা বাপমায়ের সন্তান ন্যাটা হওয়ার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া গেলেও তার কারণ মুখ্যত মনস্তাত্ত্বিক এবং উত্তরাধিকারসূত্রের চেয়ে অনুকরণ প্রবৃত্তিই বেশী কার্যকরি।

আর একটি মত হচ্ছে ন্যাটা হওয়ার পিছনে রয়েছে মস্তিষ্কের প্রভাব। এরা বলেন মস্তিষ্কের একটা দিক বেশী প্রভাবশালী হয়ে অপরদিকটাকে চালিত করে। এক চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ যেমন বলেছেনঃ "আমরা ন্যাটা কারণ আমরা দক্ষিণ-মস্তিষ্ক-বিশিষ্ট বলে।" এই মতবাদের ত্রুটি হচ্ছে এই যে গবেষকরা আবিষ্কার করেছেন যে মস্তিষ্কের দুদিকের পরিমাপে এমন কিছু পার্থক্য থাকে না।

সাম্প্রতিক মত হচ্ছে কোন লোকের পার্শ্বিকতা নির্ধারিত হয় বাপমা ও শিক্ষকদের সচেতন বিশ্বাস এবং কালের রীতি মেনে চলার প্রয়োজন দ্বারা। যুদ্ধ ব্যাপারের একটা রীতির দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। মানুষ ডান হাতে অসি চালাতে শেখে যাতে বাঁ হাতে ঢালটা ধরে হৃৎপিণ্ডের ওপর আঘাত বাঁচাতে পারে। যোদ্ধাদের মধ্যে ডান হাতই প্রাধান্য পেতে থাকে এবং তাদের নবজাত পুত্র সন্তানরাও সেই মতো তৈরী হয়ে ওঠে।

অধিকাংশ শিশু কিন্তু প্রথম বছরে কোন কিছু ধরতে সেটা যে হাতের নাগালের মধ্যে থাকে সেই হাতটাই ব্যবহার করে। এইটে লক্ষ্য করে বহু বাপমা শিশুদের ডান হাতটা বেশী ব্যবহার করায় উৎসাহ দেয়। ফলে অধিকাংশ মানুষই দুহাত সমভাবে ব্যবহারের ক্ষমতা নিয়ে জন্মেও বড়দের সন্তোষবিধান করতে বাঁহাতের ব্যবহারে বিরত হয়।

ফরাসী বৈজ্ঞানিক ডাঃ যোশেফ লে কোঁতে স্বভাবত ন্যাটা কিনা নির্ধারণের একটি সহজ পরীক্ষার উদ্ভাবন করেন। তিনি দেখেন যে কোন লোকের দৃষ্টি বাঁদিক ঘেঁষা হলে সে ব্যক্তি নিশ্চিত বাঁ হাত ও বাহু ব্যবহারে প্রবৃত্ত হবে। এটা বোঝবার জন্য তিনি নিম্নলিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেনঃ

দুটি চোখ খোলা অবস্থায় কোন একটি বস্তুর ঠিক মাঝখানে আপনার তর্জনীটি লক্ষ্য করান। বাঁ চোখ বন্ধ করুন। আঙুল যদি সরে যায় বা ওঠানাবা করে তাহলে আপনি ন্যাটা।

কার্যত লে কোঁতের উদ্ভাবনের সূত্র হচ্ছে যুদ্ধে ন্যাটা সৈনাদের রাইফেলের তাক করা দেখে। স্বভাবত ন্যাটা কিনা নির্ধারণ করার আর দুটি উপায় হচ্ছেঃ

(১) ঝট করে দুহাতের পাঞ্জা জড়িয়ে ধরুন। বাঁ হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ যদি ওপরে থাকে আপনি ন্যাটা।

(২) বসা অবস্থায় পায়ের ওপর পা দিন। ওপরের পা যদি বাঁ পা হয় তাহলে খুবই সম্ভব আপনি সব ব্যাপারেই ন্যাটা।

ন্যাটা শুধু মানুষই হয় না। জীবতত্ত্ববিদরা দেখেছেন ন্যাটা চিংড়ী, ন্যাটা বোয়াল মাছ এবং ন্যাটা আবর্ত বিশিষ্ট শম্বুক। অধিকাংশ লতাই ডানদিক ঘেঁষে ওঠে এবং পাক খায়, কিন্তু অনেক লতা আছে যেগুলি ওঠে এবং পাক খায় বাঁ দিক ঘেঁষে। এ পর্যন্ত কোন উদ্ভিদ বা জীব বৈজ্ঞানিক একটা দিক আরেক দিকের ওপর কেন প্রাধান্য খাটায় তার কারণ বলতে পারেন নি।

ডাঃ ইরা এস ওয়াইল আদিম মানুষের জীবন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে বিস্ময়কর তথ্য উদ্ঘাটনে সক্ষম হয়েছেন। পুরাকালীন হস্ত দ্বারা ব্যবহৃত যন্ত্রাদি এবং অঙ্কন পরীক্ষা করে ডাঃ ওয়াইল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে অধিকাংশ লোক ছিল ন্যাটা। ব্রোঞ্জ যুগে অর্থাৎ চার হাজার বছর আগে ন্যাটা এবং স্বাভাবিক লোকের সংখ্যা সমান-সমান দাঁড়ায়।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা কিছুদিন আগে পর্যন্তও লোককে এই কথা বোঝাতে চাইতেন যে ন্যাটা সন্তানকে বাপ মা যদি ডান হাত ব্যবহারে উৎসাহিত করে তোলে তাহলে সে সন্তানের আবেগ রুদ্ধ হয় এবং মানসিক উন্নতি ব্যাহত হয়। অধিকন্তু, বহু বিশেষজ্ঞ এই মত প্রকাশ করতেন যে বাম থেকে দক্ষিণে পরিবর্তন বাক্যোচ্চারণে ত্রুটি ঘটায় —বিশেষত তোতলা করে তোলে।

এই অভিমতের পিছনে আজো তেমন বৈজ্ঞানিক সত্য পাওয়া যায়নি। বাঁ হাত থেকে ডান হাতে পরিবর্তন কোন গুরুতর প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে না। এখনকার বিশ্বাস হচ্ছে যে কোন শিশুকে বাঁ হাত থেকে ডান হাত ব্যবহারে প্রবৃত্ত করে তুললে সে তোতলা হয় না। বস্তুত ডান হাত ব্যবহার যারা করে তাদের মধ্যে তোতলা যতো, ন্যাটাদের মধ্যে তোতলার সংখ্যা তার চেয়ে বেশী নয়।

—

যুগচিত্র—শরৎসংখ্যা

মার্কেণ্টাইল বিল্ডিংস, কলিকাতা—১

বেণু চক্রবর্তীর বিস্ময়কর দুর্ধর্ষ উপন্যাস এই সংখ্যার বিশিষ্ট আকর্ষণ।

(সি ৮১০৭)

ডাঃ ইউ. এম. সামন্ত

বাইওকেমিক

গার্হস্থ-চিকিৎসা

দশম সং ঃ দাম—২,

গৃহ চিকিৎসার একটি সরল ও সুন্দর পুস্তক। প্রতি গৃহে রাখা কর্তব্য।

সামন্ত বাইওকেমিক ফার্মাসী

৩৮।৭ ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড কলিকাতা—২

বাইওকেমিক ঔষধ ও পুস্তকের — প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান —

বাইশ

আবার নাগরা এসেছি। কমান্ডান্ট কুইনের সঙ্গে আবার বসেছি অতি পরিচিত সেই নিম গাছটার ছায়ায়। আমার সামনে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ রঘুবীর সিং আর তার জামাই ভীকম সিং। রঘুবীর সিং, আবার কর গুনে গুনে সব নামগুলো শুনিয়েছে আমায়। তিলক সিং, মথুরে সিং, জবরসিং আরো অনেক। ভীকম সিং আবার শার্টের হাতটা কনুই পর্যন্ত উঠিয়ে দেখিয়েছে গুলীর দাগ। কুইনের আর্দালি মাঝে মাঝে দিয়ে গিয়েছে কোল্ড ড্রিংক। কিন্তু নাগরার হাওয়ায় সেদিন ছিল কিছু-একটা-ঘটনার সংকেত। ভোর বেলায় ছোটো নাগরা গাঁ জেগে উঠেছিল উৎসবের আনন্দে। ছোটো ছোটো নিশান ঝুলেছে চারদিকে. আমের পাতা দিয়ে তৈরী হয়েছে অনেক তোরণ। শাঁখ, ঘন্টা বেজেছে ঘরে ঘরে।

লাখন সিং-এর গাঁ নাগরাতে এসেছিলেন বিনোবা ভাবে। সেই রাস্তা দিয়ে পোরসা থেকে এঁকে বেঁকে "বেহড়ের" মধ্যে দিয়ে। বৃদ্ধ রতনলাল জানে সেই রাস্তা, এখন যেমন হয়েছে সেই রকম, না আগে যে রকম ছিল সেই রকম যখন সেখান দিয়ে উট চুরি করে নিয়ে যেতো পোরসা থেকে নাগরা, আর নাগরা থেক চম্বল পার করে বেহড়ের মধ্যে দিয়ে ওপারে উত্তর প্রদেশে। এখনকার আঁকা-বাঁকা রাস্তা অনেকেই জানে। আমি জানি, কুইন জানে, আরো অনেকেই জানে। ঠাকুর লাখন সিংও জানে। সেই রাস্তা দিয়েই এসেছেন "বাবা"। "বাবার" ক্যাম্পে হতাশার ছায়া। "সাধু" জেনারেল দমে আছেন উসেই ঘাট থেকে রাছেড়, রাছেড় থেকে আম্বাৎ, আম্বাৎ থেকে পোরসা আর পোরসা থেকে নাগরা। কৈ, কেউ তো এলো না আত্মসমর্পণ করতে! তবে কি সব চেষ্টা, সব পরিশ্রম বৃথা হবে। ম্যালেশিয়ার বুশশার্ট, প্যান্ট আর মাথায় মস্ত বড় টুপি পরে সাইকেলে চড়ে বেহড়ের মধ্যে আবার অদৃশ্য হয়ে গেলেন যদুনাথ সিং।

কুইনের তাঁবুর ভিতরে লাঞ্চে সেদিন ভিড় হয়েছিল অনেক সাংবাদিকের। হেঁটে হেঁটে "বাবার" সঙ্গে পদযাত্রা করতে করতে শ্রান্ত ক্লান্ত সব সাংবাদিকরা আতিথ্য স্বীকার করেছে কমান্ডাট কুইনের। কাঁটা-- ছুরির টুং-টাং মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতা ভংগ করেছে আর কুইনের হো হো করে হাসি আর সাদর অনুরোধ "কাম অন ম্যান হাভ ওয়ান মোর চিকেন পিস" দূর করেছে সব শ্রান্তি।

আজ লিখতে গিয়ে মনে পড়ে যাচ্ছে সেদিনকার দুপুর বেলার সব কথা। লাঞ্চ সেরে নিজের তাঁবুতে গিয়ে সবে গা ঢেলেছি

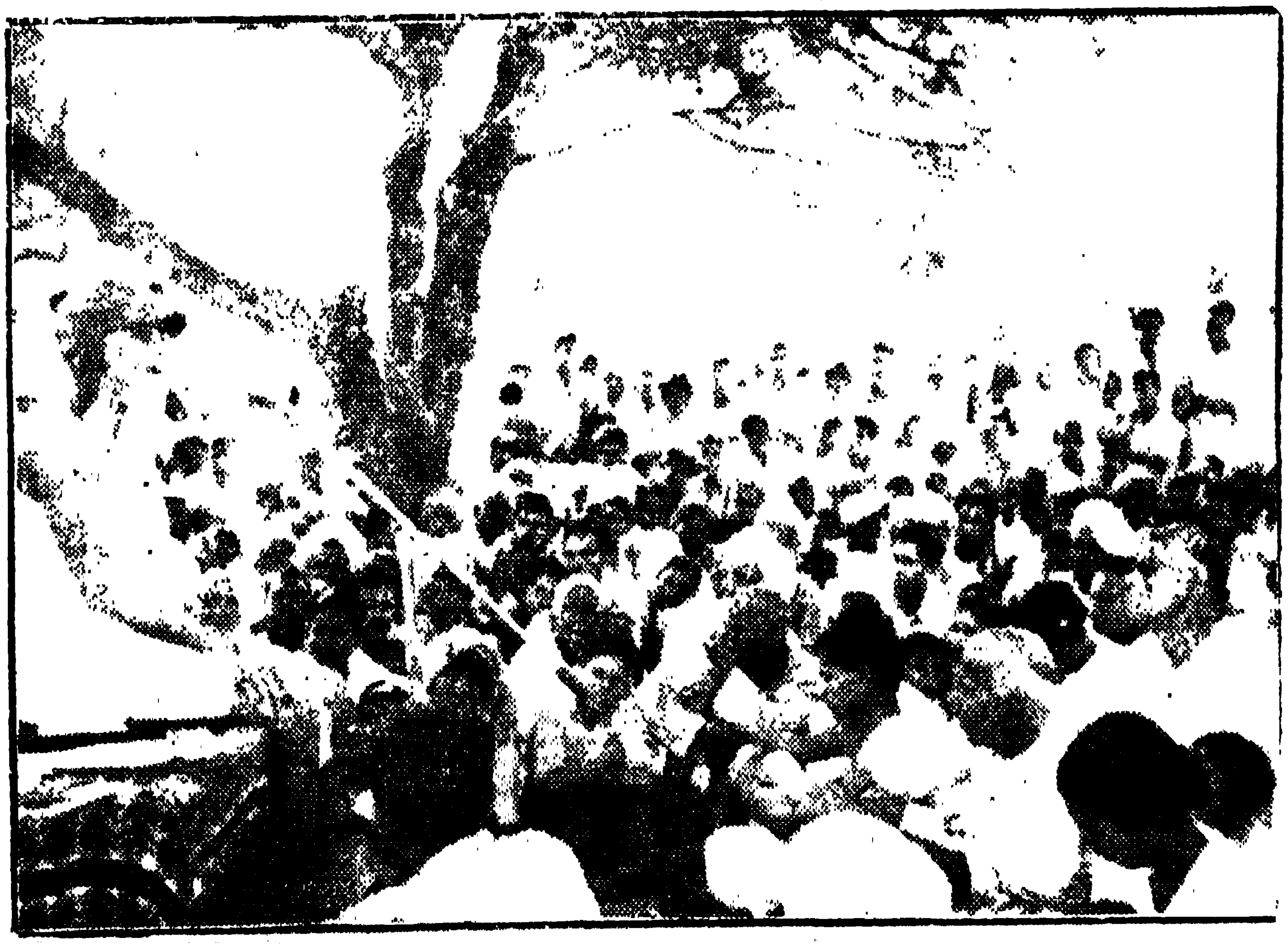

বিনোবাজীর প্রার্থনা সভা

এমন সময় আস্তে আস্তে ধীর পদক্ষেপে এসে দাঁড়িয়েছে কুইন। হ্যাঁচকা টান মেরে বিছানা থেকে উঠিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলেছে 'কাম অন ম্যান'। চুপচাপ উঠে কুইনের সঙ্গে গিয়েছি। ফোর্থ ব্যাটালিয়নের হেড কোয়ার্টারে ঢুকে আরেকটা তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়েছে কুইন। তাঁবুর পর্দা তুলে ধরে ভিতরে বসা তিনজন লোককে দেখিয়ে বলেছে 'হ্যাভ এ লুক'।

"বাট হু আর দে।" কারা এরা?

হো হো করে হেসে উঠেছে কুইন। চুপচাপ আবার তিনজন লোককে তাঁবুর ভিতর থেকে বের করে নিয়ে বসিয়েছে সেই নিম গাছটার নীচে। কুইনের চোখে মুখে হাসি। কিছু জিজ্ঞাসা করলেই বলে "আস্ক দেম" এদেরই জিজ্ঞাসা করো। ধৈর্যের বাঁধ প্রায় ভেঙ্গে এসেছে। চিৎকার করেই বলেছি নিজে "কাম অন ম্যান, লেট আস হ্যাভ ইট"। আবার হেসে ধীরে সিগারেট ধরিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে কুইন যখন জবাব দিয়েছে, চেয়ার ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছি। ছুটে গিয়েছি তাঁবুর দিকে টাইপরাইটার আনতে। পেছনে শুনতে পেয়েছি কুইনের প্রাণখোলা মন-মাতানো হাসি।

মোহরমানিয়া, পাতিরাম আর শ্রীকিষেণ—মধ্যপ্রদেশের অভিশপ্ত চম্বলের তিন দুর্ধর্ষ ডাকাত। এসেছে চম্বল সাঁতরে, বেহড় পার করে লাখন সিং-এর গাঁ নাগরায় "বাবা"র কাছে আত্মসমর্পণ করতে। পাতিরামের হাতে বন্দুক।

"বোলো ম্যান সাহবকো সব বোলো"—হুকুম দেয় কুইন মোহরমানিয়া, পাতিরাম আর শ্রীকিষেণকে আমায় সব বলতে। তারপর দু'ঘণ্টা ধরে বসে কথা বলেছি এদের সঙ্গে। মোহরমানিয়া বলেছে কল্লার মৃত্যুর কথা। কি করে শুধু কল্লা ছাড়া তারা সবাই অন্ধকারে পালাতে পেরেছিল। "সাব গোলী, গোলী, গোলী, দনাদ্দন, দনাদ্দন। কুছ নহী দেখা। খালি গোলী। সব হাম ভাগা"। কল্লা মরেছে। পুতলীর কল্লা। তারপর দল গিয়েছে ভেঙ্গে আর মোহরমানিয়া এসেছে আত্মসমর্পণ করতে। সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে নির্বিকার ভাবে শ্রীকিষেণ বলেছে রূপার দলের কথা। খুব কম দিনই ছিল রূপার দলে। পালিয়ে এসেছে দল ছেড়ে।

এবার পাতিরামের পালা। বন্দুকটায় হাত বোলাতে বোলাতে বলেছে লুক্কার কথা। রূপার মৃত্যুর পরে সেও পালিয়েছে দল ছেড়ে। ক'টা খুন করেছে জীবনে? মনে নেই। "কিসকো ইয়াদ সাহাব"। খুন করতে কেমন লাগতো। কে জানে। "ক্যা মালুম। ব্যাস, খুন কিয়া ইতনা মালুম"।

সন্ধ্যেবেলায় প্রার্থনা সভায় হাজার হাজার লোকের সামনে পাতিরাম, শ্রীকিষেণ আর মোহরমানিয়া আত্মসমর্পণ করল 'বাবা'র কাছে। 'বাবা' জড়িয়ে ধরলেন এদের বুকের মধ্যে। সাধু জেনারেল পাশে এসে টিপ্পনী কাটলেন "ওয়েল ওয়েল"।

ভোর বেলায় আবার শুরু করেছি বিনোবার সঙ্গে পদযাত্রা। সঙ্গে চলেছে রামঅবতার, মোহরমানিয়া, পাতিরাম আর শ্রীকিষেণ। দশ মাইল হেঁটে পৌঁছেছি কানহেরা গাঁয়ে। 'বাবা'র পদযাত্রা যখন চলেছে মাঝের উদুতগড় গাঁয়ে আশী বছরের বৃদ্ধ পঞ্চম সিং দাঁড়িয়েছে জোড় হাত করে 'বাবা'র দর্শন করতে। অভিশপ্ত চম্বল উপত্যকায় প্রাচীন অভিশাপ পঞ্চম সিং। যখন 'দাউ' মান সিং-এর নামও কেউ শোনেনি

এজেন্ট ঃ মেসার্স শা বাডিশি এণ্ড কোং, ১২৯, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

বিনোবাজীর প্রার্থনা সভায় 'বাগী'র দল। বাঁ-পাশে তাকিয়ে লুক্কা, তার পাশেই হাঁটুর উপর হাত রেখে মটরে

তখন দস্যু পঞ্চম সিং-এর আতঙ্কে কেঁপেছে সারা উপত্যকা। গোয়ালিয়রের মধ্যেরাও সিন্ধিয়ার কাছে পঞ্চম সিং একদিন প্রাণ-ভিক্ষার বদলে আত্মসমর্পণ করেছিল। পঞ্চম সিং আজ বৃদ্ধ, চোখে দেখতে পায় না। ময়লা, ছেঁড়া কাপড় পরে দাঁড়িয়েছিল গাঁয়ের এক কোণে। পঞ্চমসিংকে আজ দুবেলা দুমুঠো অন্নের জন্যে চিন্তা করতে হয়।

পঞ্চম সিং অতি দুঃখের মধ্যে হেসে উঠল। হঠাৎ হাসি কেন? চারজন ডাকাত দেখে পঞ্চম সিং হেসে উঠেছে। বলল, এরা আবার ডাকাত নাকি? সব ছিঁচকে, কাপুরুষ। সব বেটা ইঁদুর। পঞ্চম সিং-এর কাছে এইসব ডাকাতদের কোনো দাম নেই। নিজের হারানো দিনের দস্যুবৃত্তির সংগে তুলনা করে আজকের ডাকাতদের। পঞ্চম সিং-এর সময় না ছিল এত বন্দুক, না ছিল এত গোলাগুলি। নিজের বুকের ওপর হাত চাপড়ে বলল, "সাহেব, আমাদের সময় লাগত হিম্মত, কলিজা আর গায়ের জোর"। বেশী-ক্ষণ দাঁড়াতে পারিনি পঞ্চম সিং-এর কাছে, চলে যেতে হয়েছিল কানহেরা গাঁয়ে। কানহেরা থেকেই আমার চলে যেতে হয়েছিল অনেক দূরে জওরেরা আর খিরোনী গাঁয়ের কাছেই একটা জায়গায়। সেখান থেকে ফিরেছি অনেক রাতে। 'বাঘী' জেনারেল অনেক চেষ্টা করেছিলেন যাতে আমি না যেতে পারি। কিন্তু তাঁর আর পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে সেদিন আমি যা দেখে-ছিলাম আমার সাংবাদিক জীবনে তা এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা, এক বিস্ময়কর অনুভব। গুছিয়ে বলা যায় না সে অনুভব। হঠাৎ কানে এসেছিল সংবাদটা আর হঠাৎই জায়গাটার নামটা শুনতে পেয়েছিলাম। এক মুহূর্ত দেরী করিনি। পড়ি কি মরি করে জীপ নিয়ে ছুটে গিয়েছিলাম।

রূপা মহারাজের টেলিস্কোপিক রাইফেল ক্ষিপ্রগতিতে চেপে ধরেছিল লুক্কা আর কানহাই, রাইফেল তুলে ধরেছিল তাক করে। আমার এই অযাচিত হঠাৎ আবির্ভাব তাদের করেছিল বিস্মিত আর ক্রুদ্ধ। কিন্তু বেশী সময় আমার লাগেনি এদের বোঝাতে। লুক্কা মহারাজ জিজ্ঞাসা করেছে বারবার কি করে আমি এই জায়গার খোঁজ পেয়েছি আর বারবার আমি লুক্কাকে বলেছি—এ ছাড়া তার বাকী যে-কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি রাজী আছি। হার মেনেছে মহারাজ। আর জিজ্ঞাসা করেনি। আমিও বেশী প্রশ্ন করিনি। করলেও উত্তর হয়তো পেতাম না।

সন্ধ্যে বেলা কিন্তু নিজে হাতে করে আমাকে খাবার আনিয়ে দিয়েছে। তারপর রাতে যখন শুয়েছি তখন আমার এক পাশে কানহাই আর এক পাশে লুক্কা মহারাজ। ঘুম আসেনি সে রাতে। বেহড়ের সেই নিস্তব্ধ ভয়াবহ রূপ আমায় করেছে বিচলিত আর চম্বলের জলের ওপর থেকে ভেসে আসা বাতাস মনে জাগিয়েছে অনেক অজানা ভয়। ক্রমাগত একটার পর একটা সিগারেট খেয়েছি আর আমার জ্বলন্ত সিগারেটের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকেছে লুক্কা মহারাজ।

"কুঁ সাহাব, ডর লাগতা হ্যায়?" ভয় লাগছে কিনা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসে মহারাজ।

"নহী, ডরকি ক্যায়া বাত হ্যায়"—ভয় লাগলেও কাঁপা গলায় উত্তর দিয়েছি কৃত্রিম সাহস দেখিয়ে।

রাতের আঁধারে তারপর এসে দাঁড়িয়েছে

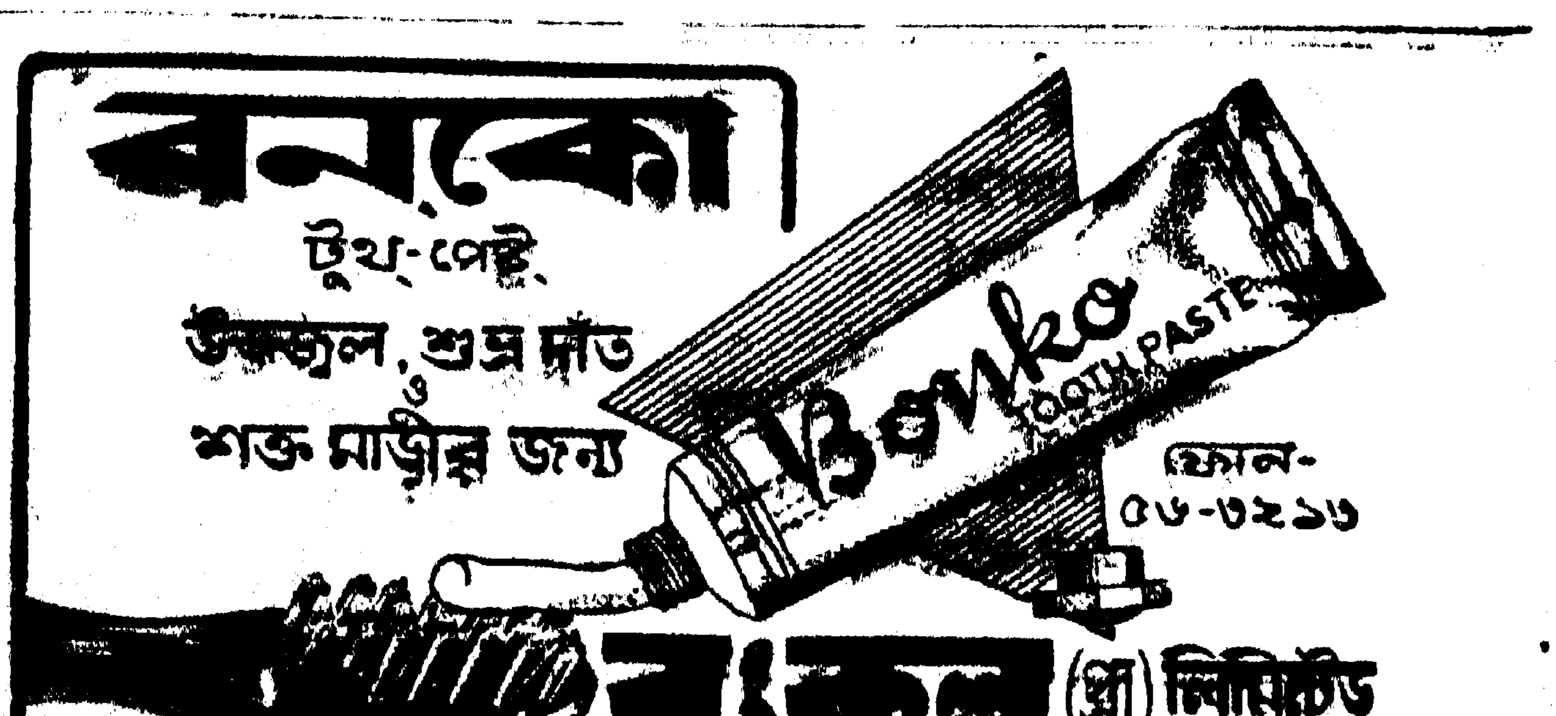

(সি ৭৭০৪)

কয়েকটা জীপ। চিৎকার করে উঠেছেন আমায় দেখে সাধু জেনারেল—"ইউ, ইউ থিফ্"। জীপ ক'টা রওনা হবার আগেই তাড়াতাড়ি উধর্বশ্বাসে জীপ চালিয়েছি আর পেঁৗছেছি আবার কানহেরা গাঁয়ে। রাত তখন তিনটে। বসেছিলাম কানহেরা গাঁয়ের পাঠশালার সামনেই একটা কুয়োর ওপর। অন্ধকারের বুক চিরে ভেসে এসেছে দূরে থেকে একটা কুকুরের আর্তনাদ আর গাছের ওপর থেকে কর্কশ স্বরে ডেকে উঠেছে একটা ময়ূর। দুটো জীপ এসে দাঁড়িয়েছে পাঠশালার সামনে আর তার থেকে নেমেছে বারোটা ছায়ামূর্তি। দেখেই চিনতে পেরেছিলাম। ধীরে ধীরে ছায়ামূর্তিগুলো চলল পাঠশালার দিকে—লুক্কা, কানহাই, ভূপসিং, মটরে, বিদ্যারাম, তেজাসিং, ভগবালা, দুর্জনা, জংগে মালহা, রামসানহাই, দরল্লা আর সাধু জেনারেল। পাঠশালার বারান্দায় লণ্ঠনের স্তিমিত আলোয় বসে আছেন 'বাবা'। ধীরে ধীরে 'বাবা'র সামনে হাতজোড় করে বসল সবাই। সাধু জেনারেল দড়াম করে আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলেন। দরজায় কান লাগিয়ে শুনতে লাগলাম আর মাঝে মাঝে ভাঙ্গা দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে দেখছিলাম মাঝরাতের সেই নাটকীয় দৃশ্য।

"বাবা, ইয়ে হ্যাঁয় লুক্কা—পণ্ডিত লুকমন শর্মা। আউর ইয়ে হ্যায় ইনকী দূরবীনওয়ালী বন্দুক"—সাধু জেনারেলের গলা। লুক্কা মহারাজ এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল বাবাকে। লণ্ঠনের আলোতে লুক্কাকে দেখাচ্ছে অদ্ভুত। ফর্সা রং হয়েছে লাল টকটকে আর নীল চোখ দুটো জ্বলছে নীল কাঁচের মত।

"আউর ইয়ে হ্যাঁয় কানহাই, রুপাকে ভাই"—আবার সাধু জেনারেল। এবার কানহাই এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল বাবাকে। সাধু জেনারেলের ধাক্কা খেয়ে এরপর সরে আসতে হয়েছে দরজার কাছ থেকে, আর বেশী কিছু দেখতে পাইনি। প্রায় ঘণ্টাখানিক পরে সবাই বেরিয়ে এসেছে আর লুক্ক আমায় দেখে এগিয়ে এসেছে। "কেয়া লিখোগে সাহাব হামারে বারেমে"—জিজ্ঞাসা করেছে কি লিখব তাকে নিয়ে।

"আচ্ছা তোমাদের কাছে যে টি এম সি আর প্রচুর হ্যাণ্ড গ্রিনেড ছিল সে সব গেল কোথায় ?"

"বেচ দিয়া"—বিক্রী করে দিয়েছি—অম্লান বদনে বলে লুক্কা।

"কিসকো" ? কাকে ? —এবার লুক্কা শুধু হাসল। কোনো উত্তর নেই আর আশাও করিনি। আমার আরেকটা প্রশ্নের উত্তর লুক্কা দেয়নি। জিজ্ঞাসা করেছিলাম মেওয়ারাম কেন আত্মসমর্পণ করল না। চুপচাপ ছিল মহারাজ। কিন্তু আমি জানি মেওয়ারাম ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে আত্মসমর্পণের কথা। রাগ করে চলে গিয়েছে দল ছেড়ে। তার ভাই রামনাথের মৃত্যুর বদলা তার এখনও যে নেওয়া হয়নি।

আর মটরে। তার হাতে তখনও গুলীলাগা ক্ষত। যে এনকাউণ্টারে রামনাথ মরে সেখান থেকেই গুলী লেগে পালিয়েছিল মট্‌রে কাতরাতে কাতরাতে। বুঝতে পারে না এ কিরকম লড়াই—যখন সে হাত তুলে দাঁড়িয়েছিল কেন পুলিস তার হাত লক্ষ্য করে গুলী করল। যুদ্ধে তো হাত তুলে দাঁড়ালেই "সারেণ্ডার" হয়ে যায়। গুলী লেগে সে পালিয়েছিল আর বেহড়ের মধ্যে এসে লুক্কা মহারাজ তাকে দিয়েছে টিটেনাস ইনজেকশন আর করেছে ব্যাণ্ডেজ।

আশেপাশের গাঁ আর শহর ভেঙে পড়েছে ছোট্টো কানহেরা গ্রামে। হাজার হাজার লোক দেখতে এসেছে 'বাগী'দের। সেই ভিড়ের মধ্যে এসেছে লচ্ছী আর তার সাথী প্রভু ডাকাত। চুপচাপ তারাও আত্মসমর্পণ করেছে 'বাবা'র কাছে। ধূর্ত, নিষ্ঠুর লচ্ছী। বম্বে-দিল্লী-কলকাতা করে বেরিয়েছে। টাকা ফুরিয়েছে আবার করেছে অপরাধ। বম্বেতে খবরের কাগজে 'বাবা'র শান্তির বাণী শুনে এসেছে আত্মসমর্পণ করতে।

(ক্রমশ)

সর্বঋতুর সঞ্জীবনী
দই মিষ্টি
গাঙ্গুরাম গ্র্যাণ্ড সন্স্
ভবানীপুর ও কালীঘাট — কলিকাতা —
ফোন: ৪৭-২৩৭৭

সর্দ্দি ও কাশিতে
দুলালের তালমিছরী
প্রস্তুতকারক— দুলাল চন্দ্র ভড়

গ্রীষ্ম দিনে-ও
স্নিগ্ধ সজীবতা
গ্রীষ্মের খরতাপে ক্লেদাক্ত আবহাওয়ায় আপনি যখন বিব্রত তখন আপনার একান্ত প্রয়োজন বোরোলীনের মতো মিষ্টি আর স্নিগ্ধ ফেস্ ক্রীম। ল্যানোলিনযুক্ত বোরোলীন ত্বকের গভীরের সমস্ত মালিন্য দূর ক'রে আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য বাড়িয়ে আপনার ত্বক-কে স্নিগ্ধ ও সজীব ক'রে তুলবে।
বোরোলীন
পরম প্রসাধন
প্রস্তুতকারক :
জি. ডি. ফার্মাসিউটিক্যালস্ প্রাইভেট লিমিটেড,
কলিকাতা-৬

GOVERNMENT LIBRARY

দক্ষিণের বারান্দা

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৪ ॥

জোড়াসাঁকো বাড়ির বাগানকে আমরা ছেলেবেলায় যে-রূপে দেখেছি আমাদের কাছে তা ছিল অদ্ভুত ভাবে আকর্ষনীয়। আমাদের জন্মাবার অনেকদিন, আগে শুনেছিলুম, ঐ বাগান ছিল যাকে বলে 'সাজানো বাগান।' সাজানো বাগান কাকে বলে তার পরিচয় আমরা প্রচুর পেতুম যখন কোনো ধনী আত্মীয়ের বাড়িতে নিমন্ত্রণে যেতুম। সুরকী-পেটা, কাঁকর-ফেলা রাস্তা—দুধারে তার হেলানো-ইঁটের পাড়। ছাঁটাই-করা দূর্বাঘাসে ঢাকা সবুজ জমির মাঝখানকে বিদ্ধ করে গোল ফুলের কেয়ারি। সুসমতল ভূমির উপর জ্যামিতিক রেখা আর বৃত্তের কণ্টকর বন্ধন। ভাগ্যিস্ জোড়াসাঁকোর বাগান ঐ রকম ছিল না।

ইঁট, কাঠ, লোহা সিমেন্ট গাঁথা অতি-ব্যস্ত কলকাতা শহরের মাঝখানে আমাদের যে বাগান তা ছিল একেবারে ছুটির জগত। এক সময় শুনেছি জোড়াসাঁকোর বাগানে অনেক মালী খাটত। আমরা যখন দেখেছি তখন জোড়াসাঁকো বাড়ির মালীর বহর কমতে কমতে দু-টিতে ঠেকেছে। তার মধ্যে একজনের নাম ভাগবত—আমরা বলতুম, সর্দার মালী। এককালে সর্দার-ই ছিল সে। তার তাঁবেদারি করত যারা তাদের সর্দার ছিল। এখন সর্দারের নীচে শুধু একজন—তার নাম ছিল যোগী। তবু আমরা ভাগবত মালিকে সর্দার মালী বলেই ডাকতুম। মাত্র এই দু-জন মালীর তদারকে আমাদের বাগান সেলুনে-ছাঁটা মাথার মতো দেখাত না বটে, এখানে ওখানে গাছগুলো যথেচ্ছ বাড়ার, অবাধ স্বাধীনতা পেত বটে আর দূর্বার পাশে মুথা আর উলু ঘাস অব্যাহত আনন্দে গজিয়ে উঠত, কিন্তু আমাদের কাছে সেইটেই ছিল পরম বিস্ময়।

আমাদের ছিল একটা 'গোল-বাগান'। গোল তার আকৃতি, তাকে ঘিরে টালি-বাঁধানো একটি রাস্তা। গোল-বাগানের মাঝটিতে ফুলের কেয়ারির বদলে ছিল একটি ফোয়ারা—দেখতে ঠিক একটি প্রকান্ড ঝিনুকের মতো। দাদামশায় ঐরকম করে তৈরী করিয়েছিলেন। ফোয়ারা সব সময় জলে ভরা থাকত—আমরা তার ধারে গিয়ে বসতুম, আর তার মাঝখানে দ্বীপের উপর যে-দুখানা চীনে-মাটির বাড়ি থাকত, জলের ধারে নুয়ে-পড়া পাতার আড়ালে তাদের রূপকথার রাজপুরী বলে মনে হত।

আমাদের বাগানে তো কোনো পুকুর ছিল না। ঐ ফোয়ারা-ভরা টলটলে জলেই তার আশা মিটত। বর্ষার সময় বৃষ্টি নামলে দৌড় দিতুম আমরা গোল-বাগানের দিকে। গোল-বাগানে ঢোকবার মুখে টালি-বাঁধানো রাস্তার উপর ছিল একটা মাধবী আর চামেলি লতার মাচা। সেই ফুলের মাচার আচ্ছাদনের তলায় গিয়ে আমরা দাঁড়াতুম আর দেখতুম ঝম্‌ঝম্ করে ফোয়ারার জলের উপর বৃষ্টির চাবুক পড়ছে। ব্যাঙেরা ডিম পাড়ত ফোয়ারার মধ্যে। ব্যাঙাচিরা ল্যাজ কিল্‌বিল্ করে ছুটোছুটি করত জলের মধ্যে আর দেখতে দেখতে আমাদের চোখের সামনে ফোয়ারার জলের প্রসার একটু একটু করে বেড়ে যেত। মনে হত ভিন্‌দেশী এক হ্রদের জলে অচিন দু-খানা রাজ-প্রাসাদের ছায়া পড়েছে।

দক্ষিণের বারান্দার নীচে ছিল দোলনার বাগান। বাগানের একপাশে ছিল প্রকান্ড একটা আম গাছ; অন্যপাশে ছিল ডালিম গাছ আর কাঠালি চাঁপার ঝোপ। তারই ধার দিয়ে ছিল কুন্দ-ফুলের বেড়া এবং বাগানের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয়

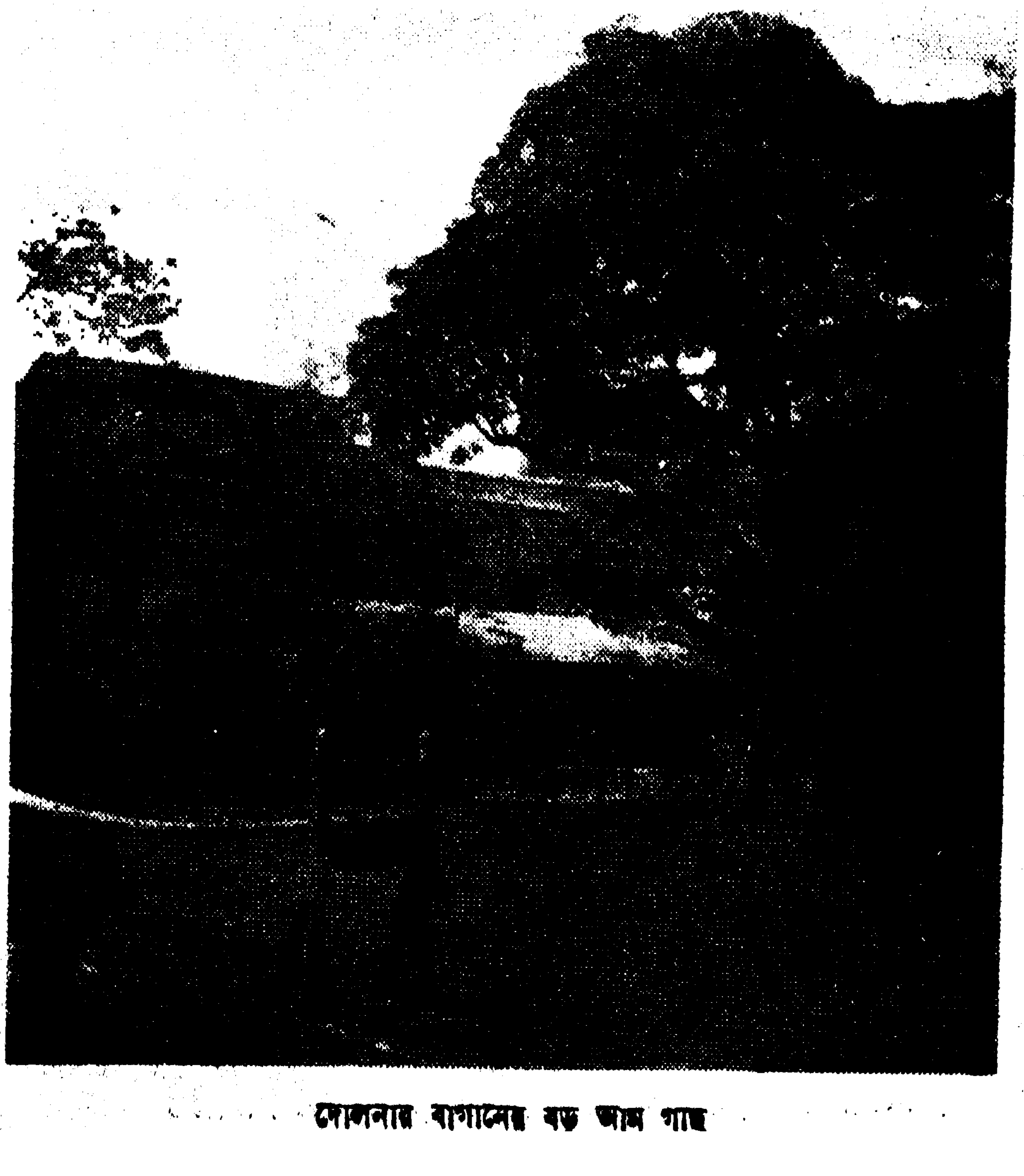

দোলনার বাগানের বড় আম গাছ

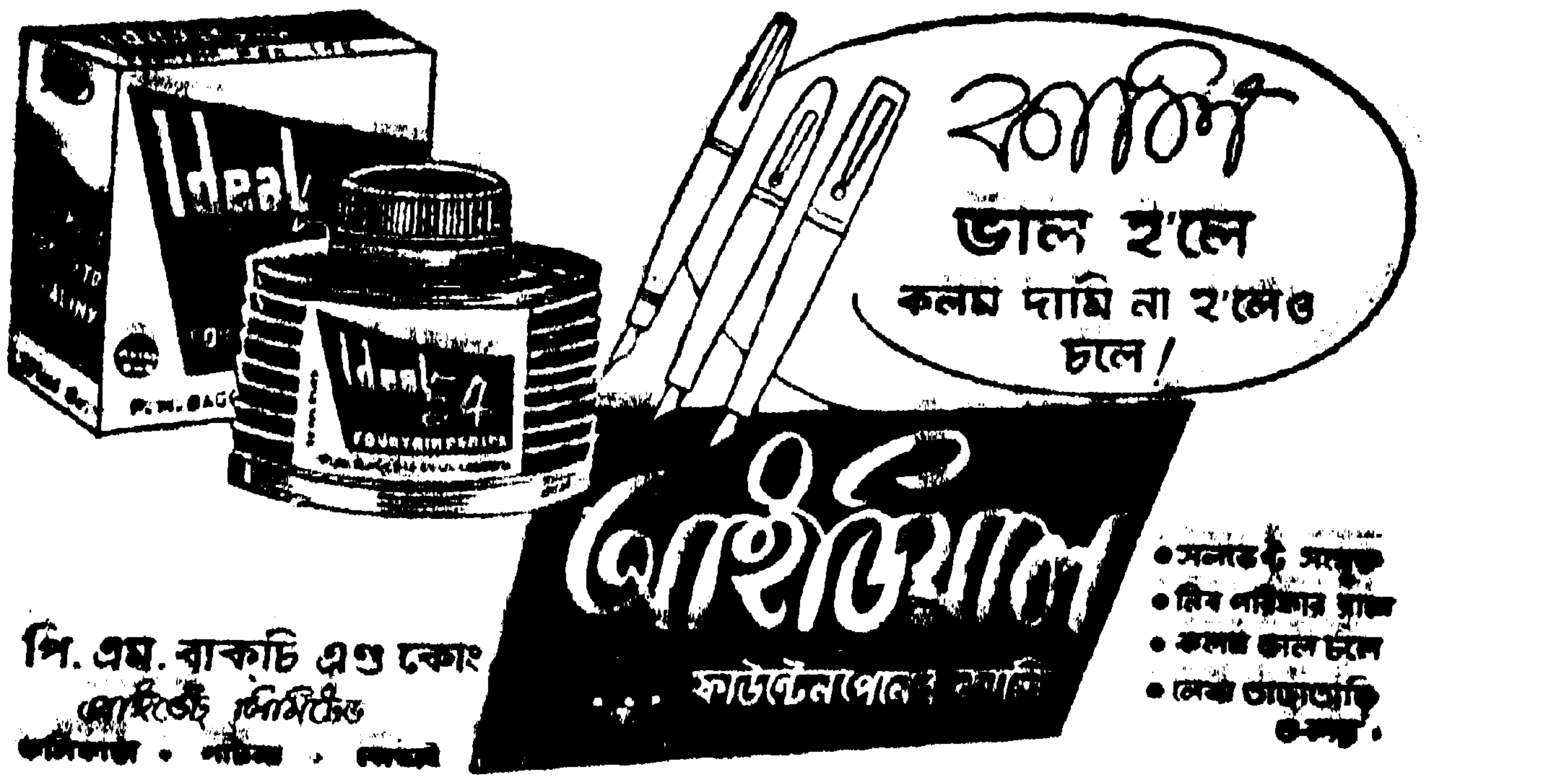

বস্তুটি ছিল এই বেড়ার ধারে। সেটি ছিল একটি দোলনা, যার নামে দোলনার বাগানের নামকরণ। দোলনা বলতে সাধারণত যা বোঝায় তা নয়। ত্রিশ হাত লম্বা এক হাত চওড়া একখানি কাঠের তক্তা মাটি থেকে আড়াই হাত উপরে দুই প্রান্তে দুটি আলনার উপর বসানো। বাগানের একদিক থেকে আর একদিক পর্যন্ত টানা এই দোলনা। আশ্চর্য স্প্রীং ছিল ঐ কাঠ-খানার। পনের কুড়িজন ছেলেমেয়ে একসঙ্গে বসে দুলেছি, কোনোদিন ভাঙেনি, একটু মচকায়নি পর্যন্ত। দোলনার ঠিক কেন্দ্রের কাছে একজন কি দু-জন দাঁড়িয়ে থাকত তারা হাঁটু মুড়ে মুড়ে দোলাতে শুরু করত দোলনাটা। হাওয়ার মধ্যে উঠত পড়ত সমস্ত কাঠটা ঢেউএর মতো। সেই সঙ্গে সারি বেঁধে বসে থাকত যারা তারাও মনে করত ঢেউএর উপর আছাড়ি পিছাড়ি খাচ্ছে।

অত বড় দোলনা, তাতে কি আর শুধু দোলা হত? কত সময় আমরা দল বেঁধে বসে গল্প করেছি, সাপ খেলা দেখেছি, বাঁশবাজী দেখেছি, বাঁদর-নাচ দেখেছি, বহুরূপীর নাচ কহবতীর নাচ দেখেছি, চাঁদের আলোয় বসে গান গেয়েছি তারপর শান্তিনিকেতনের স্কুলের ছেলেরা যখন শারদোৎসব অভিনয় করবার জন্যে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এসে থেকেছে তখন তাদের নিয়ে ঐ দোলনার উপর কত হৈ হৈ করেছি।

গোলবাগানের পূবে ছিল বড়বাগান। সব বাগানের চেয়ে বড় বলে তার নাম ছিল বড় বাগান। ঐ ছিল আমাদের খেলার মাঠ, ঘাসের বিছানা, আমাদের ছুটির দেশ। বড় বাগানের দক্ষিণে ছিল একসারি নারকেল গাছ আর একটি দেবদারু গাছ। দেবদারুর পাশেই ছিল ঝাঁকড়া এক বকুল গাছ যার তলাটা সব সময় অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে হয়ে থাকত—সন্ধ্যেবেলা যেখানে একলা যেতে আমাদের গা ছম্‌ছম্ করত।

বাগানে বড়-গাছের মধ্যে আর ছিল শিশু গাছ, কৃষ্ণচূড়া গাছ। কাঁঠাল সীতামালতী, মহানিম, আরেকেরিয়া ঝাউ। ছোট গাছের মধ্যে ছিল পেয়ারা, বাতাবি লেবু, চাঁপা ব্রাউনিয়া, গন্ধরাজ, স্থলপদ্ম, করবী, বাবলা, জবা, করমচা, তমাল, আমড়া, বেল, কাঠ-মল্লিকা, রঙ্গন আর ছিল কোকো-গাছ যা হয়তো কোনো বাগানেই নেই। আর ছিল কয়েকটা বাঁশের মাচা যার উপর চড়ানো থাকতো চামেলি, ইউবেরিয়া, কাঠালি চাঁপা, নবমল্লিকা আর নীলমণি লতা। সর্দার ও যোগী মালীর যত্নে অযত্নে লালিত হত এই সমস্ত বৃক্ষ-লতাদি।

এই বাগানে এক সময় আমরা জন্মাবার আগেই এক আমগাছ লাগিয়েছিলেন দাদা-মশায়রা—এটা সেই দোলনার বাগানের বড় আমগাছ নয়। বড়-আমগাছ ছিল বহুদিনের

পুরোনো গাছ, তার আম ছিল বিষম টক। দাদামশাইদের এই আমগাছটা শুনে আসছিলুম হিমসাগর, কিন্তু তখনও ফলেনি।

বড়দাদামশায় বলতেন—দেখিস্ খেয়ে যখন ফল হবে। বাগানের আম হিমসাগর। তোদের মেজদাদামশায় লাগিয়েছেন।

—ও মেজদাদামশায় কবে ফল হবে তোমার গাছে?

—হবে, হবে গাছ বড় হোক!

আমরা ধৈর্য ধরে থাকতুম।

প্রতি বছরই আম গাছ উঁচু হত। বাড়তে বাড়তে বাবুর্চিখানার মাথা ছাড়িয়ে গেল। বাবুর্চিখানার ছাদে উঠে আমের পাতা ছিঁড়ে আমের ডাল ভেঙে আমরা তার গন্ধ শুঁকতুম আর ভাবতুম কবে ডাল ভরে ফল আসবে। একবার মুকুল ধরল কিছু কিছু, কিন্তু ফল এলোনা। অবশেষে এক বছর শীতকালে সেই হিমসাগর—হিমের সাগর বোলে ভরে গেল। বড়দাদামশায় যোগী মালীকে ডেকে হুকুম দিলেন—গাছে যত ফল হবে সব বাঁচানো চাই। প্রথম বারের ফল একটিও যেন নষ্ট না হয়। কী বোল-ই সেবার ধরেছিল টক-আমের গাছে হিমসাগর আমের গাছে দুইয়েতেই তারপর এল মাঘের কুয়াশা। আমের মুকুল এসেছিল যেমন প্রাচুর্য নিয়ে ঝরেও পড়ল তেমনি। তারপর ক্রমে চৈত্রমাসে আমের গুটি ধরল। বড়দাদামশায় ভোরবেলা উঠে বাগানে নামতেন আর যোগীমালীকে সঙ্গে করে ঘাড় উঁচু করে দেখতেন কোন ডালে কটা গুটি ধরেছে। তারপর বৈশাখের খর-রৌদ্রে আমের গুটি ঝরতে আরম্ভ করল। তার উপর এল কাল-বৈশাখী। এক-একটা ঝড়ের ঝাপটা আসত আর দক্ষিণের বারান্দা থেকে আমরা দেখতুম গাছের ডালগুলি মাথা ঝাঁকিয়ে আমের গুটিগুলি ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে। এইভাবে কমতে কমতে সমস্ত আম পড়ে গেল, রইল শুধু একটি।

বৈশাখী ঝড় তখন থেমে গেছে। ঐ একটি আমকে রক্ষা করবার জন্যে বাড়ির আমরা সবাই উঠে পড়ে লেগেছি। বড়দাদামশায়, মেজদাদামশায়, দাদামশায় মাঝে মাঝে বাগানে নেমে এসে দেখে যান আম। দক্ষিণের বারান্দা থেকে দাদামশায়রা দেখবার চেষ্টা করেন। পাতার আড়ালে লুকোচুরি করে আম। দেখতে না পেলে হাঁক দিয়ে ওঠেন—ও রে, দেখ্ তো, আমটা গেছে বুঝি! যোগী মালীর চোখে ঘুম নেই। আমগাছটা ছিল আবার বাগানের প্রান্তে মদন চাটুজ্যে লেনের গায়ে। পাছে সেই গলি থেকে কেউ আম চুরি করে নিয়ে পালায় আমাদের সব সময় ভয়।

কিন্তু শিবরাত্রির সলতে সেই আম শেষ অবধি রক্ষা পেল। আম পেকে এল। হিমসাগর আম—পাকলে আবার রং ধরে না, সবুজ থাকতেই নামাতে হবে। যোগী মালী গাছে উঠে-উঠে দেখে আসতে লাগল আমের অবস্থা কেমন।

তারপর একদিন গ্রীষ্মের সকালে যখন তিন দাদামশায় দক্ষিণের বারান্দায় বসে আছেন, বড়দাদামশায় আর দাদামশায় ছবি আঁকছেন আর মেজদাদামশায় পড়ছেন বই, সেই সময় যোগী মালী একটি থালায় করে আমটি নিয়ে বারান্দায় ঢুকল।

বড়দাদামশায় বললেন—দেখি। হাতে তুলে নিয়ে একবার শুঁকে বল্লেন—হুঁ বেশ পেকেছে। ধুয়ে নিয়ে আয় তো। অবন, চাকবে নাকি?

দাদামশায় বললেন—তুমি আগে দেখ। সমর-দাকে দিও, তারপর দিও আমায়।

মেজদাদামশায় ঘাড় ফিরিয়ে চশমার ফাঁক দিয়ে একবার দেখলেন।

তারপর থালার উপর একটি চক্‌চকে ছুরি আর সদ্যধোওয়া আমটি নিয়ে যোগী আবার বারান্দায় ঢুকলো।

কত দিনের কত বছরের কত আশার আম। বড়দাদামশায় তুলি রেখে ছুরি তুলে নিলেন। তারপর আমটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একপাশ থেকে ছোট একটি চাক্‌লা কাটলেন। কেটে নিয়ে মুখে দিয়ে বললেন—বাঃ কি চমৎকার। দাও সমরকে দাও।

যোগী থালা হাতে মেজদাদামশার কাছে উপস্থিত হল। মেজদাদামশায় আর এক চাক্‌লা সাবধানে কেটে নিয়ে মুখে ফেলে একবার বড়দাদামশায়েরা দিকে তাকিয়ে বললেন—বেড়ে খেতে তো। অবন তুমি নাও এবার।

দাদামশায় দেখলেন বেশীর ভাগ আমটাই তাঁর জন্যে রাখা হয়েছে। যে ছবিটা

নারায়ণ চক্রবর্তীর

তীর্থাঞ্জলি

ভারত - ব্রহ্ম - চীনের বিস্তৃত পটভূমিকায় লেখা অনন্যসাধারণ রহস্য-উপন্যাস। ৩.০০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২ ও অন্যান্য পুস্তকালয়।

ঔপনিষদ

চিত্রিতা দেবী প্রণীত (লীলা পুরস্কারপ্রাপ্ত)

নূতন উপনিষৎ সংযোজিত

বহু প্রতীক্ষিত ২য় সংস্করণ

মূল্য—৫, টাকা

প্রাপ্তিস্থান ঃ শ্রীশঙ্কর পাবলিশার্স

১৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ও অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

সর্বক্ষণ প্রফুল্লতার জন্য

মধুর সুগন্ধযুক্ত, মোলায়ম ট্যাল্কম পাউডার এবং অন্য টয়লেট পাউডারে নেই, ত্বকের দাগ এবং ঘামের দুর্গন্ধ উৎপাদক জীবাণু বিনাশকারী জি-১১* যুক্ত... তবুও গোদরেজ টয়লেট পাউডারের দাম বেশী নয়।

অতি সত্বর ঘামাচি, চুলকানি স্থায়ীভাবে দূর করে...তাই শিশুদের বিশেষ উপযোগী।

টয়লেট পাউডার।

দুর্গন্ধ নিবারক ত্বকের পরিচর্যা করে সুগন্ধযুক্ত আনন্দদায়ক।

সর্বাপেক্ষা সুফল পেতে হ'লে সিন্থল দিয়ে স্নানের পর ব্যবহার করুন।

(* পেটেন্ট হেক্‌সাক্লোরোফিন্)

গোদরেজ সর্ব শ্রেষ্ঠ সাবান ও অন্যান্য প্রসাধন সামগ্রীর নির্মাতা

আঁকাছিলেন তাকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে পাশে যে গামলায় ছবি আঁকার জল থাকতো তাইতে হাত ডুবিয়ে নিয়ে থালা সুদ্ধ আম কোলে টেনে নিলেন। বললেন—ছুরি নিয়ে যা।

তারপর আঙুলে করে খোসা ছাড়িয়ে আমে একটা কামড় দিয়েই—আরে থূঃ থূঃ! এ যে এক বিষ!

একবার বড়দাদামশায়ের দিকে তাকান, একবার মেজদাদামশায়ের দিকে। তারপর তিন ভাই-এ হো হো হাসি।

হাসির শব্দ শুনে আমরা ছুটে এসে দেখি আধ-খাওয়া আম মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। যোগী মালী হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে! দাদামশায়দের চোখে কিন্তু কৌতুকের আলো উপ্‌চে পড়ছে, হিমসাগর আম চিরতরে টকে যাওয়া সত্ত্বেও।

(ক্রমশ)

সর্বত্র গৃহিণীরা বলাবলি করছেন

- সার্ফে কাচলে বোঝা যায়

সাদা জামাকাপড়

কতখানি ফরসা হতে পারে!

সার্ফে কাচলেই বুঝতে পারবেন যে সার্ফ জামাকাপড়কে শুধু "পরিষ্কার" করে না, ধবধবে ফরসা করে। সার্ফে কাচারও কোন ঝামেলা নেই। সহজেই সার্ফের দেদার ফেনা কাপড়ের ময়লা টেনে বার করে, কাপড় আছড়াবার কোন দরকার নেই। আর সার্ফে কাপড় যা পরিষ্কার হয় তা, না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। এর কারণ সার্ফের অদ্ভুত কাপড় কাচার শক্তি! দেখবেন সার্ফে রঙীন কাপড়ও কেমন ঝলমলে হবে! সার্ফে সবচেয়ে সহজে আর সবচেয়ে চমৎকার কাপড় কাচা যায়। ধুতি, শাড়ী, ফ্রক, জামা, তোয়ালে, ঝাড়ন এক কথায় বাড়ীর সব জামা কাপড় সার্ফে কাচুন—দেখবেন ধবধবে ফরসা করে কাচতে সার্ফের জুড়ী নেই।

নীল সার্ফ দিয়ে বাড়ীতে কাচুন, কাপড় সবচেয়ে ফরসা হবে

W. 13-X52 BG.

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

আমাদের সংগীতে বীণার জন্য সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বীণার তুল্য মনোহর এবং মধুর বাদ্য আর পরিকল্পিত হয়নি। কতরকমের বীণা যে ছিল আর কত বিচিত্র যে তাদের নাম তা যাঁরা সংস্কৃত সংগীতসাহিত্য এবং সাধারণ সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত তাঁরাই জানেন। বীণা সম্বন্ধে নানারকম মতবাদ প্রচলিত আছে। অনেকে বলেন হার্প থেকেই বীণার উৎপত্তি এবং বীণাজাতীয় বাদ্যের পরিকল্পনাই হয়েছে হার্প থেকে। এই হার্প নাকি আমাদের দেশে এসেছে মিশর, গ্রীস এবং রোম থেকে। অনেকে এটা স্বীকার করেন না, তাঁদের মতে মানব-সভ্যতার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক দেশের লোকেরা তাদের মনের মত করে এইসব যন্ত্রাদির পরিকল্পনা করেছে। সব জিনিসই যে ধার করা হতে হবে এমন কোন কথা নেই। এ তর্ক বিতর্কের মধ্যে যেতে চাই না। তবে, হার্পের প্রচলন যে ভারতবর্ষে ছিল এমন কি বাংলাদেশেও হার্পের পরিচয় অজ্ঞাত ছিল না তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। হার্পকেও ভারতবর্ষে বীণা বলেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। অনেক বীণার বর্ণনা আছে যা হার্প ছাড়া কিছুই নয়।

বীণা সম্বন্ধে আলোচনায় একটি কথা পরিষ্কারভাবে বলা উচিত। সেটা হচ্ছে এই যে বীণা বলতে কয়েক শতাব্দী ধরে আমরা যে একপ্রকার বিশেষ তারের যন্ত্র বুঝি পূর্বে সেরকম ধারণা ছিল না। বীণা বলতে আগে যে কোন তারের যন্ত্র বোঝাতো অর্থাৎ বাউলের একতারা থেকে সেতার, সরোদ, সারেঙ্গি—এ সবই বীণা-গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে। বিবিধ বীণার মধ্যে কয়েকটি বীণার বিশেষ গুরুত্ব ছিল। যুগে যুগে বীণার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্ব অরোপের মধ্যেও পরিবর্তন লক্ষিত হয়। বাস্তবিক কত পরিবর্তনই তো ঘটছে। মুসলমানদের হাতেও বীণার শ্রীবৃদ্ধি কম হয়নি। সেতার এযুগের একটি প্রধান বীণা। এটি খুব সম্ভবত আমাদের প্রাচীন ত্রিতন্ত্রী বীণার বর্তমান রূপ। আইন-ই-আকবরি অনুসারে মোগল যুগে এই বীণাকে "যন্ত্র" বলা হত। কল্লিনাথও এইরকম বলে গেছেন। তবে আকবরের আমলে ত্রিতন্ত্রী পঞ্চতন্ত্রীতে পরিবর্তিত হয়েছে। শেহতার থেকে সেতার শব্দটা প্রচলিত হয়েছে বিশ্বাস

বীণাবাদিনী সরস্বতী
(আশুতোষ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত)

করবার যথেষ্ট কারণ আছে। "শরোদ" বীণাটি তার নামেই পরিচিত কেন না ফার্সীতে "শরোদ" শব্দের অর্থই সংগীত। কেউ কেউ স্বরেদবীণা বা শারদবীণা বলেন; কিন্তু এর সমর্থনে যা বল হয় তা অনেক ক্ষেত্রেই কষ্টকল্পনা। "দিলরুবা" ও এইরকম একটি মনোহর নাম। দিল কেড়ে নেয়—এই অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এই-ভাবে বীণাকে ভারতবর্ষে হিন্দু, মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই নানাভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন।

বীণার নানা প্রকারভেদ থাকলেও তার একটা সাধারণ আকৃতি বা বিশেষত্ব ছিল। এই নির্দিষ্ট রূপ থেকে বীণার আসল আকৃতি কিরকম ছিল সেটি ধারণা করা যায়। এই সহজ অনাড়ম্বর প্রাচীন বীণাকে বলা হত একতন্ত্রিকা এবং নির্দিষ্ট মানের বীণা বলে এই যন্ত্রটিই সরস্বতীর হস্তে অর্পণ করা হয়েছে। বীণার মূল পরিচয় বহনকারী এই একতন্ত্রী কলকাতার যাদুঘরে রক্ষিত অনেক সরস্বতীর মূর্তিতে দেখতে পাওয়া যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে রক্ষিত দশম শতাব্দীর বীণা-বাদিনী সরস্বতী মূর্তিতে যে বীণাটি রয়েছে সেটি পরীক্ষার দিক দিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট। এই বীণার শাস্ত্রোক্ত বিবরণটি বর্ণনা করার প্রয়োজনীয়তা এ যুগেও যথেষ্ট রয়েছে কেননা বীণা সম্বন্ধে আলোচনা আজও কম হয় না এবং বাংলা দেশে আসল বীণার ব্যবহার প্রায় নেই বলে বীণার মূল পরিকল্পনা সম্বন্ধে পরিচয়ও স্পষ্ট নয়। এই কারণেই আমাদের প্রধান বাদ্যযন্ত্রের প্রাচীন কাঠামো সম্বন্ধে একটা বর্ণনা দেওয়া গেল।

বীণার বর্ণনায় প্রথমেই মাপনির্ণয়সূচক শব্দগুলির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। মাপের ইউনিট হল "অঙ্গুল"। বুড়ো আঙুলের পর্বদৈর্ঘ্য

কেমিকো

হোমিওপ্যাথিক লিভার টনিক

লিভারের সর্ব্বপ্রকার দোষে ও হজমের গোলমালে বিশেষতঃ শিশুদের পক্ষে চমৎকার ফলপ্রদ।

সোল এজেন্ট :—
এন. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

মহেশ লেবরেটরিজ প্রাইভেট লিঃ
৩০।৪, ক্যানেল ইষ্ট রোড, কলিকাতা-১১

সুস্বাদু এই রান্না পরখ করুন

তরকারীর ঝোল

৬টা বড় আলু, ৩টা মুলা, এক মুঠো ফ্রেঞ্চবীন, ১ টেবিল চামচ রেঞ্জ সালাড অয়েল, ৩ বা ৪টি কারী পাতা, পাতলা করে কাটা একটা পেঁয়াজ, এক কাপ সবুজ মটরশুটি, লবণ, ১ টেবিল চামচ রান্নার গুঁড়ো মসলা, ১ চা চামচ ব্রাউন ও পলসন পেটেন্ট কর্ণফ্লাওয়ার আধ কাপ দুধের সঙ্গে মিশিত।

ইংরাজী, হিন্দী, গুজরাটি, তামিল অথবা মালায়ালাম ভাষায় (যে ভাষায় চান সেটি রেখে বাকী কেটে দিন) চমৎকার পাক-প্রণালী বইটি বিনামূল্যে পেতে হলে এই কুপনটি ছাড়ি করুন।

এই সঙ্গে ১০ নং পয়সার ডাকটিকিট পাঠালাম
মিঃ / মিসেস / মিস..............
....
....
ঠিকানা..............
....
ডিপার্টমেন্ট DSH 23
কর্ণ প্রোডাক্টস্ কোং (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড, পোষ্ট বক্স নং ৯৯৪ বম্বে—১

তরকারী পরিষ্কার করুন। কেটে মটর শুটির সহিত ডেকচীতে ঢালুন। দেড় কাপ জল ঢালুন। রান্নার গুঁড়ো মসলা ও কারী পাতা মেশান। স্বাদ অনুযায়ী লবণ মেশান। কিছুক্ষণ সিদ্ধ করুন। আরেকটা ডেকচিতে রেঞ্জ সালাড তেলে কাটা পেঁয়াজ ভাজুন, ব্রাউন হওয়া পর্যন্ত। সিদ্ধ তরকারী এতে মেশান, দুধ ইত্যাদি দিয়ে তাড়াতাড়ি মেশান। ঢাকা দিয়ে ১০ মিনিট সিদ্ধ করুন। চাপাটির সহিত খেতে দিন।

ব্রাউন এণ্ড পোলসন কর্ণফ্লাওয়ার পেটেন্ট করা। বিশুদ্ধতার এই পরীক্ষা করুন!

এক গ্লাস সিদ্ধ করা ঠাণ্ডা জলে দুই টেবিল চামচ ব্রাউন এণ্ড পোলসন পেটেন্ট কর্ণফ্লাওয়ার মেশান। ২৪ ঘণ্টা পরেও এটা গন্ধবিহীন, ময়লাবিহীন ও ক্ষতিকর জীবাণুহীন থাকবে। বি এণ্ড পি গুণসম্পন্ন অন্যান্য দ্রব্যগুলি: রেইসলি, কাস্টার্ড পাউডার, সুগন্ধিত কর্ণফ্লাওয়ার, বিভিন্ন কাস্টার্ড পাউডার।

[illegible] (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ

৩৭.২৭ এ.জি. —প্যারী এণ্ড কোং লিমিটেড

হচ্ছে এক অংগুল। পর্ব মানে গাঁঠ। বুড়ো আংগুলে দুটি গাঁঠ—একটি গোড়ায় অপরটি মাঝে। এই দুই গ্রন্থির মাঝখানটুকুতে যে দৈর্ঘ তাকেই বলে পর্ব বা পাব। এই মাপটি এক ইঞ্চির কিছু কম। এইরকম বারটি আঙুলে এক বিতস্তি হয় এবং দুই বিতস্তিতে হয় এক হস্ত। ব্যাপারটি এইরকম—

অংগুল—এক পর্ব
বিতস্তি—১২ অংগুল
হস্ত—২ বিতস্তি

প্রথমে বীণার দণ্ডের কথা বলা যাক। এই দণ্ড তৈরি হবে খদির কাষ্ঠ দিয়ে। এর পরিধি হওয়া উচিত এক বিতস্তি অর্থাৎ বারো অংগুল। বলা বাহুল্য বীণাদণ্ডের কাঠ সরল, গ্রন্থিহীন, অক্ষত, মসৃণ, সুগোল, এবং বর্তুলাকার হওয়া আবশ্যক। দণ্ডের দৈর্ঘ নির্দিষ্ট করা হয়েছে তিন হস্ত অর্থাৎ বাহাত্তর অংগুল—প্রায় ছ ফুটের কাছাকাছি। দণ্ডের ভিতরটা হবে ফাঁপা। এর ওপরে আর নিচে যে রন্ধ্র থাকবে তার পরিমাণ হবে দেড় অংগুল। এই দণ্ডের একেবারে ওপর থেকে সপ্তদশ অংগুল নিচে দণ্ডের পিছন দিকে দুটি গর্ত থাকবে। এই গর্ত দুটির সাহায্যে একটি লাউকে দণ্ডের সংগে যোজনা করতে হবে। এই লাউটিকে বলা হয় তুম্ব। একতন্ত্রীর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র একটি তুম্ব দণ্ডের ঊর্ধ দিকে যুক্ত হয়।

[illegible] আকৃতি সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে লাউটি দাঁড় করালে যতটা উঁচু হয় সেটি ছয় অংগুল পরিমাণ হলেই চলবে। তুম্বের মুখটি হবে দ্বাদশ অংগুল পরিমাণ এবং এই পরিমাণ স্থান থেকে লাউ-এর মুখটি কেটে নিতে হবে। লাউ-এর নিচে নাভিস্থানে অর্থাৎ ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় ফুটো থাকবে। এই ফুটোর বাইরে একটি নারিকেল খোলের তিন অংগুল পরিমাণ চাকতি থাকবে। একে বলে কর্পর। এই চাকতিতেও একটা ফুটো থাকবে। দণ্ডের পিছনে দুটি গর্তের কথা আগেই বলা হয়েছে। তাহলে তুম্বের একদিকে রইল নারিকেল কর্পর অপরদিকে মূল বীণাদণ্ড। তুম্বটি বাঁধা হবে একটি শক্ত সুতো দিয়ে। সুতোটি সোজা কর্পর, তুম্বনাভি ভেদ করে দণ্ডের সংগে যুক্ত হচ্ছে কেননা প্রত্যেকটিতেই যথাস্থানে একটি করে বিবর রাখা হয়েছে। একটি কীলক দিয়ে সুতোটিকে আঁট করবার ব্যবস্থা করা হত। অনেক ক্ষেত্রে তুম্বের ভিতর দিয়েই একটি কীলক প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হত। আবার অনেক ক্ষেত্রে তুম্বকে অক্ষত রেখে অন্যভাবে দণ্ডের সংগে তুম্বটিকে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করা হত।

এ হল দণ্ডের ওপরের বর্ণনা। দণ্ডের নিচে অপর যে অংগটি যোজনা করা হয় তাকে বলে ককুভ। এই অংগটি খদিরের সার বা অন্য কাঠ দিয়ে নির্মিত হতে পারে। এটি দৈর্ঘে আট অংগুল এবং চওড়ায় তিন অংগুল। এর দুটি পাশ ঢালু এবং ঢালু

অংশ দুটি চওড়ায় এক অঙ্গুলেরও অধিক। মাঝখানটা কচ্ছপের পিঠের মত উন্নত। এই পিঠে একটি গর্ত থাকবে। এই গর্তটিতে শঙ্কু দ্বারা (অর্থাৎ গোঁজ দিয়ে) পত্রিকা সংযুক্ত থাকে। গোঁজটি গর্তের মাপে বসান হয়। গোঁজের গায়ে একটি রন্ধ্র থাকে। এই রন্ধ্রের সংগে পত্রিকাটি বাঁধা বা সংযুক্ত থাকে।

পত্রিকাটি তৈরি হয় কাঁসা মেশানো লোহা দিয়ে। এটি চওড়ায় দুই অঙ্গুল এবং দৈর্ঘ্যে চার অঙ্গুল। এটিও কূর্মপৃষ্ঠবৎ উন্নত কিন্তু মধ্যভাগ কিছুটা নামানো কেননা এই পত্রিকাটির ওপর দিয়েই বীণার তন্ত্রী লম্বিত হবে।

সমগ্র ককুভটি একটি দণ্ডের ওপর অবস্থিত থাকে। এই দণ্ডটিও লম্বা এবং চওড়ায় ককুভেরই সমান; অর্থাৎ লম্বায় আট অঙ্গুল আর আড়ে তিন অঙ্গুল। দণ্ডের উল্টো দিকটি মসৃণ, গোল এবং কূর্মপৃষ্ঠের মত উন্নত। এই দণ্ডটিকে বীণার মূল দণ্ডের সংগে লাগাবার জন্য এর সংগে আর একটি দণ্ড যোজনা করা হয়েছে যেটি বীণা-দণ্ডের মূল রন্ধ্রে (অর্থাৎ স্থূলত্বের পরিমাণে প্রায় দেড় অঙ্গুল) প্রবিষ্ট হতে পারে। এই দণ্ডের সাহায্যে পত্রিকাসমেত ককুভটিকে বীণার অধোভাগে মূল দণ্ডের সংগে সংযুক্ত করা হয়।

এ হল বীণার আসল চেহারা। এইবার বীণার তুম্বের ঊর্ধ্বভাগে দণ্ডের সংগে একটি সূত্র বেষ্টন করতে হবে। এটি গোলাকারে বেষ্টন করতে হবে বলে এই বেষ্টনকে বলা হয়েছে নাগপাশ। সূত্রটি মোটা, মসৃণ এবং দৃঢ় হওয়া উচিত। এই সূত্রটি দোরকসূত্র নামে খ্যাত। তুম্ব থেকে এই দোরকসূত্র বন্ধন পর্যন্ত স্থানকে বলা হয় দোরকদেশ।

এই নাগপাশের সংগে বীণার যে তন্ত্রীটি বাজানো হয় তার একটি প্রান্ত দৃঢ়ভাবে বন্ধ থাকে। এই স্নায়ুময়ী তন্ত্রীটিও দৃঢ় এবং ঘন। তন্ত্রীটিকে আকর্ষণ করে পত্রিকার ওপর দিয়ে নিয়ে আসতে হবে এবং ককুভকে সংবেষ্টন করে অপর প্রান্তটি দৃঢ়ভাবে বেঁধে দিলেই তন্ত্রীবন্ধন কার্য সমাপ্ত হবে। পত্রিকা এবং তন্ত্রীর মাঝখানে যব পরিমাণ একটি পাতলা বাঁশের ছিলে প্রবেশ করান আবশ্যক। এটি জোয়ারির কাজ করবে। একে বলে জীবা।

নাগপাশ রয়েছে তুম্বের ওপরে। তুম্বের তিন অঙ্গুল নীচে দণ্ডের ওপর একটি পাকা বেত সংবেষ্টন করতে হবে। এই বেতটি পরিমাণে কনিষ্ঠ অঙ্গুলের মত, আর সুগোল, মসৃণ হওয়া চাই। এইটিই হচ্ছে মন্দ্রস্বরস্থান অর্থাৎ খাদের শেষ পর্যন্ত। নাগপাশ থেকে তন্ত্রীটি এই বেত্রবেষ্টনের ওপর দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। একতন্ত্রিকার আর কোন পর্দা সংযুক্ত হত না।

বীণার দোরিকাদেশ অর্থাৎ উচ্চ ভাগটি বামস্কন্ধে থাকবে। ককুভদেশ থাকবে দক্ষিণ চরণের পাশে। সারণা বা বাজাবার সময় বামহাতের তর্জনী এবং মধ্যমার অগ্রভাগ তন্ত্রীতে নিপীড়িত হতে থাকবে। অনামিকা, কনিষ্ঠা—এই দুটি আঙুল মোড়া থাকবে দণ্ডের নিচে। দক্ষিণ হস্তের আঙুল দিয়ে বীণার তারে আঘাত করতে হবে। আঘাত-স্থানটি হবে জীবাসংলগ্ন তন্ত্রীস্থান থেকে এক বিতস্তি ঊর্ধ্বে। আরও ওপরে বাজান যায় কিন্তু দক্ষিণ হস্তের আঘাত যেন বক্ষস্থলের ঊর্ধ্বে না যায়। দণ্ডের যে অংশটুকু বাদনের জন্য ব্যবহৃত হয় সেই অংশটুকুকে বলা হয় কম্বিকা।

এইটিই হল একতন্ত্রিকা বীণার সাধারণ লক্ষণ। এবীণা বেণুদণ্ডে প্রস্তুত হত এমন উল্লেখও আছে।

শাস্ত্রের এই বর্ণনার সংগে যেসব বিশেষজ্ঞ পরিচিত তাঁদের কেউ কেউ এইভাবে বীণা নির্মাণও করেছেন আশা করি। তাঁদের প্রস্তুত বীণার পরিচয় পেলে আমরা বিশেষ আনন্দিত হব। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হবে আমাদের মিউজিয়মগুলিতে এইভাবে যদি বীণা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ করে রাখা যায়।

বীণা নামটিও মনোরম। "বী" শব্দের অর্থ গতি এবং "ণ" অক্ষরে "নির্ণয়" বোঝায়। যে যন্ত্রে সুরের গতি নির্ণয় করা হয় তাকে বলা হয় বীণা। একজন অভিধানকার বলছেন—এই যন্ত্রে স্বর জন্মগ্রহণ করে অথবা স্বরকে চেনা যায় বলেই এর নাম বীণা (বেতি জয়েতে স্বরঃ অস্যাম্ ।)।

প্রাচীন ভারতে যেসব বীণা খ্যাত ছিল তাদের মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে—রাবণ, অম্বিকা, বাণ, কাশ্যপ, স্বয়ম্ভু, ভৌল্লি, মনোরমা, গণনাথা, কৌমারী, আণিবাণি, অধিকচিত্রিকা, নটনাগরিকা, কুম্ভিকা, মল্লারি, ঘোষবতী, তন্ত্রীসাগর, অম্বুজ, নকুল, চিত্রা, বিপঞ্চী, মত্তকোকিলা, পিণাকী, কিন্নরী, বল্লকী, হস্তিকা পরিবাদিনী, শততন্ত্রী, জয়া, জ্যেষ্ঠা, আলাপিনী, নিঃশঙ্ক, সারঙ্গী, কূর্মী, উদুম্বরী, সরস্বতী (ব্রাহ্মিকা) গান্ধর্বী, সংবাদিনী, বিশোকা, ঈশ্বরী, মহতী, মহাবীণা, ধনুসারেকা, ত্রিসরা, স্বরমণ্ডল, রুদ্র, কপিলাসিকা, মধুস্যান্দী, ঘোষ ইত্যাদি। এদের অধিকাংশেরই স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না, বিবিধ গ্রন্থে নামগুলি রয়ে গেছে। এই তালিকার সংগে গত কয়েক শতাব্দীর বিবিধ তারের যন্ত্রের নাম যোগ করলে দেখা যাবে ভারতের তারযন্ত্রের ব্যবহার কত প্রসার লাভ করেছিল। বোধহয় পৃথিবীর আর কোন দেশে এমন হয়নি।

ছেলে বুড়ো সবাই জানে
STUDENTS INK
সব চাইতে ভাল কালি
STUDENTS INK MFG. CO. CAL-23

Pertussin
COUGH SYRUP
হুপিং এবং অন্যান্য সর্বপ্রকার কাশির জন্য পার্টুসিন ব্যবহার করুন।
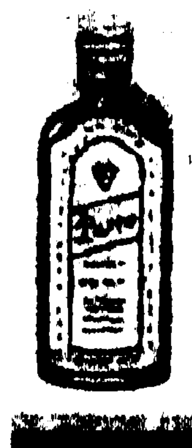
শিশু ও বয়স্কদের পক্ষে সমোপযোগী
সর্বত্র নতুন প্যাকিং-এ পাওয়া যায়
ক্র্যাঙ্ক রস এণ্ড কোং লিঃ,
কলিকাতা

সতীশ কবিরাজের
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল
পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য বিজ্ঞানাচার্য স্বর্গীয় ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ডি. এস. সি কর্তৃক পরীক্ষিত ও সুবাসিত।
আর্য্য ঔষধালয় - কলিকাতা

হাবু আর বাবু

বাবু : "ব্যাপার কি হে ?"

হাবু : "আরে ভাই, বড় বাবুকে ধরেছিলাম ইন্‌ক্রিমেণ্টের জন্যে, উলটে ঘর থেকে বার করে দিলে! কেন কিছুই বুঝতে পারছি না। দস্তুরমত খেটে কাজ করি—আর কাজে আমার গলতিও নেই"

বাবু : ওঠো ভায়া, ওঠো। হাল ছেড়োনা। তোমার পোশাক দেখেই হয়তো বড়বাবুর মেজাজ বিগড়েছে..."

হাবু : "আমার পোশাক—কি বলছো হে ? এর পেছনে যে আমি মোটা টাকা খরচ করি।"

বাবু : "তুমি হয়তো কাপড় ঠিকমত বেছে কিনতে পারোনা। তোমাকে আমি বিনীর স্যুটের কাপড় কিনতে বলি। বিনীর কাপড়ে উৎকর্ষের একটা মান বজায় থাকে। শাদা চোখে ধরা যায়না এমন কোন খুঁত যাতে থেকে না যায় তার জন্যে তৈরীর প্রতিটি ধাপে সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য রাখা হয়। এজন্যই বিনীর স্যুটের কাপড় দেখতে চমৎকার আর টেকেও দীর্ঘদিন।"

বিনী — বস্ত্রশিল্পে একটি গৌরবোজ্জ্বল নাম

BINNY — **a great name in textiles**

প্রতি বছর বিনী আন্দাজ ৯ কোটি গজ কাপড় তৈরী করে।
বিনীর তৈরী নানান রকম কাপড়ের মধ্যে আছে :

শার্টিং - খাকি ড্রিল - শাদা ও রঙীন ড্রিল - অ্যান্টিক্রীজ স্যুটিং
তসর - ইউনিফর্ম ফেব্রিক - তোয়ালে - সিল্কের শাড়ি - র‍্যাগ ইত্যাদি

মনে রাখবেন, বিনীর অনুমোদিত স্টকিস্টের দোকানে এই সাইন বোর্ড দেখতে পাবেন এবং সেখান থেকে আপনার প্রয়োজন মত বিনীর কাপড় আমাদের নিয়ন্ত্রিত দরে কিনতে পাবেন।

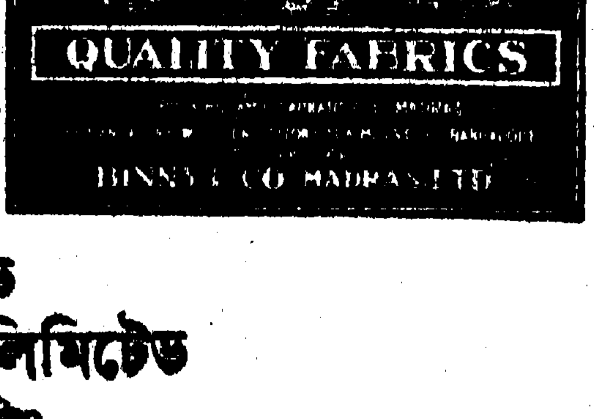

দি বাকিংহাম অ্যাণ্ড কর্ণাটিক কোম্পানী লিমিটেড
দি বাঙ্গালোর উলেন, কটন অ্যাণ্ড সিল্ক মিলস কোম্পানী লিমিটেড
ম্যানেজিং এজেণ্টস্ : **বিনী অ্যাণ্ড কোং (মাদ্রাজ) লিঃ**

JWTBY 846

ঠিক এই কয়েকটা মুহূর্তের জন্যেই যেন সারাবাড়িটা নিস্তব্ধ হয়ে আছে। সব ঘরেই আলো জ্বলছে। মানুষ আছে সব ঘরে। মাঝের ঘরটায় বড় মেয়ে সুচিরা আর স্ত্রী শিবানী। একটু আগেই ফিস্ফিস্ করে কি যেন বলাবলি করছিল। তারপরই চুপ। আর ...হ্যাঁ, নিশ্চয় পাশের ঘরে পড়া থামিয়ে খাতায় পেনসিল ছুঁইয়ে কান পেতে আছে। হয়ত সব শুনছে রুমা।

বাইরের ঘর থেকে মেজ ছেলে সুকোমলের চুরুটের একটা উগ্রগন্ধ নাকে এসে লাগল ওর। তবুও নিস্তব্ধতাটুকু ভাঙতে পারল না মুরলীধর। পেনশন পাওয়া, কেরানী মুরলীধর চক্রবর্তী।

শুধু এই সময়টুকু নয়, সারাদিনেরই সঙ্গী এই কোনার ছোট্ট ঘরখানা। বেশ লাগে এখানে একা একা থাকতে। কেমন যেন নিরিবিলি। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হলেই আলো জ্বালায়। আবার নিবিয়ে দিয়ে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে থাকে। বড় একটা কেউ আসে না এ ঘরে। মাঝে মাঝে এসে দাঁড়ায় ছোট ছেলে দশ বছরের বাবলু। আর আসে বাড়ির একরাশ মানুষের কলধ্বনি।

কিন্তু আজই কেমন যেন অবাক লাগছিল হঠাৎ এমন নীরবতা লক্ষ্য করে। ভাবছিল হয়ত বা চেয়ারটা টানার শব্দে এই নীরবতাটুকু ভেঙে যাবে। কিন্তু তাও হল না। অনেকক্ষণ পর নিজের অজ্ঞাতেই যেন একটা স্বর বেরিয়ে এল। খুব মৃদু স্বর 'বাবলু'

সঙ্গে সঙ্গে থানার পেটা ঘড়িতে ন'টা বাজল। স্ত্রীর কণ্ঠস্বর কানে এল। 'রান্না হয়ে গেছে। দিচ্ছি এক্ষুনি।'

শিবানীর পায়ের শব্দে সঙ্গে রুমার চেয়ার টানার শব্দ। তার সঙ্গে সুকোমলের কাশির শব্দে সারা বাড়িটা যেন সচকিত হয়ে উঠল।

সুচিরা ডাকল রুমাকে 'কাল তোর কলেজ ছুটি রুমা?'

রুমা আস্তে আস্তে পা ফেলে এগিয়ে গেল ওদিকে—কাল তো আমাদের 'ফাউণ্ডার্স বার্থ ডে'

'বড়দার বাড়ি যাবি?' বোধনার কাঠিটা একপাশে সরিয়ে রাখল সুচিরা। একটু আশংকা প্রকাশ করল রুমা, মা'কে জিজ্ঞেস করেছে?'

সে আমি বলব'খন, খুব স্পষ্ট একটা কণ্ঠস্বর কানে এল মুরলীধরের। একবার বাবার প্রসঙ্গটা তুলল না ওরা।

একটু পর খেতে ডাকল শিবানী। পাশে বাবলুকে না দেখতে পেয়ে ছোট্ট একটা প্রশ্ন তুলল ও—'মাছের ঝোল হয়নি এখনো?

—'হয়েছে'।

—তবে বাবলুকে দিলে না আমার সঙ্গে—উস্খুস করতে লাগলো আবার। শিবানী ওর ভাতের মধ্যে ডাল দিতে দিতে জবাব দিল আগের মতই—। শরীরটা ভাল নয় ওর। জ্বরের মত হয়েছে তাই আর ভাত দিলুম না আজকে, একটু থেমে স্বামীর দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলো ও—। পাউরুটি আর ঝোল খেয়ে ঘুমিয়েছে। কোন জবাব দিল না মুরলীধর। ঠিক অন্যদিনের মত স্বস্তির সঙ্গে যেন খেতে পারল না সেদিন।

আবার সেই অন্ধকার ঘরটার মধ্যে এসে আশ্রয় নিতে হল। ইতিমধ্যে বোধ হয় বিছানাটাও শিবানী পেতে রেখে গিয়েছিল। মাঝে একবার জলের গ্লাস রাখতে ঘরে ঢুকল। ঠিক তখন খুব মৃদু স্বরে ডাকল মুরলীধর—'শোন'

শিবানী কাছে গিয়ে দাঁড়াল—'কিছু বলবে আমাকে?

কি যেন ভাবল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর খুব থেমে থেমে প্রশ্ন করল মুরলীধর—

—আচ্ছা দীনেনকে ত অনেকদিন দেখি না!

'দীনেন! ও হ্যাঁ কি জানি! শরীর টরির খারাপ বোধ হয়, কিংবা......' খানিকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন জবাব দিল শিবানী। আর স্বামীর অস্থিরতাও লক্ষ্য করল। —'তা তোমরা কেউ একটা খোঁজ খবরও নাওনি।'

—দেখি বলব'খন সুকোমলকে। সংক্ষেপে জবাব দিয়ে স্বামীকে এড়িয়ে যেতে চাইল শিবানী। কিন্তু না শুনেও পারল না।

—অমনি আমার নাম করে বলে দাও যেন একবার আসতে বলে দেয় ওকে।

—'আচ্ছা বলে দোব'খন', ছোট একটা জবাব দিয়ে বেরিয়ে গেল শিবানী।

বালিশটা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল মুরলীধর। তাড়াতাড়ি ঘুমও আসে না, মাঝে মাঝে পাশ ফিরে শোয়। অন্ধকার ঘরে একা একা ভাবে মনটা একটু খুঁত-খুঁত করে বাবলুটার জন্যে। আবার জ্বর হল ছেলেটার। প্রত্যেক মাসেই ত ভুগছে। বড্ড রোগা হয়ে পড়েছে। কদিন ধরেই লক্ষ্য করছে মুরলীধর। ওর দুরন্তপনার জন্যেই রোগাক্লিষ্ট মুখখানা সব সময় খুশীতে ভরে থাকে। কিন্তু........ নিছক একটা চিন্তায় মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে

ওঠে মুরলীধরের. বাবলু কি দাদাদের মত স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারবে? সমস্ত মুখখানায় যেন মায়া মাখানো। আর বাপ হয়ে শুধু ওর জন্যেই যেন কর্তব্য পালন করতে পারলো না মুরলীধর। নিজের মনেই ভাবে আর একটা অস্বস্তির বুকে নিজেকে সমর্পণ করে রাখে। মুক্তি পেতে চায় কিন্তু পায় না। অনেকক্ষণ পর নিঃশ্বাসটুকু নিস্তব্ধ ঘরে শব্দ করে ওঠে। তারপর কানে আসে ছেলে মেয়ে স্ত্রীর যুক্তিতর্কের শব্দ।

এক একবার অধৈর্য হয়ে উঠে বসে বিছানায়। আবার কি ভেবে শুয়ে পড়ে। নাঃ আর সে গম্ভীর্যতা নাই ওর। যুক্তি-তর্ক করার মত ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে মুরলীধর। এখন শুধু প্রত্যাশা করে নিঃসঙ্গ জীবন। নিজেরই অবাক লাগে। মাত্র দুটো বছর পেনশন নিয়েছে মুরলীধর। বাঁধাধরা জীবন থেকে ছুটি পেয়েছে। কিন্তু এখনই বা কি তার ব্যতিক্রম! এও আর এক বাঁধাধরা জীবন। আটকা পড়ে গেছে এখানে। এ বিশ্রাম যেন শুধু ওর চৌত্রিশ বছরের জমে থাকা ক্লান্তিকেই মনে করিয়ে দিচ্ছে বার বার। ক্রমশ পঙ্গু হয়ে পড়ছে ওর চেতনা। মাঝে মাঝে ব্যগ্র হয়ে ফিরে পেতে চেয়েছে চৌত্রিশ বছরের সেই ব্যস্ততা। কিন্ত.........ব্যস্ত হয়েছে শুধু মন। সেই চৌত্রিশ বছরের প্রতিটি মুহূর্তকে মনে করে হর্ষিত পেয়েছে মুরলীধর। একটা মানুষের হুবহু একটা ছবি স্পষ্ট ভেসে উঠেছে ওর চোখের ওপর। কেরানী জীবনের মনে রাখার মত একটা দিন।

সেইদিনই প্রথম অফিসের চেয়ারে পেঁছিতে দশ মিনিট লেট হয়েছিল। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে আড়চোখে আশপাশে তাকাবার সময় কানে এল ওর।

'আজ কিন্তু আপনার লেট মুরলীবাবু'

'কি করি বলুন! ট্রামের জন্যেই.........'

'না না, সেকথা বলিনি। আপনি বলেন কি না আপনার লেট হয় না। তাই......'

দুজনকে ডিঙিয়ে লেজারের ওপর ব্লটিং চাপতে চাপতে অল্প একটু হাসল চিন্ময়। এ ডিপার্টমেণ্টের সবচেয়ে কমবয়সী ক্লার্ক।

'আমাকে যে বড্ড সেদিন বলেছিলেন। বৌএর আবদার শুনতে গিয়ে ট্রেন ফেল করেছি।'

ওর কথায় হাসল মুরলীধর।

'আমার লেট, কিন্তু......মানে জানু ত কলকাতায় ট্রামের অবস্থা কি রকম। একবার বন্ধ হল ত ব্যস.........তারও ওপর আবার বেলগাছিয়ার ট্রাম।'

'অনেক ভাল আপনার ট্রাম কোম্পানী।' শচীন মিত্রের গলায় ওদের মৃদু আলোচনা চাপা পড়ে গেল। 'রেল কোম্পানীর দৌলতে বুঝলেন, এখনও পর্যন্ত মনে বাবা তারকনাথের কৃপায় কোনদিন বিনা লেটে হাওড়া স্টেশন পেঁছিতে হয়নি— হুঃ আপনার ট্রাম কোম্পানী!' ইতিমধ্যে ডিপার্টমেণ্টাল ইনচার্জের জুতোর শব্দ সারি বাঁধা মানুষগুলো আবার মোটা মোটা খাতা আর ফাইলের মধ্যে ডুবে যায়।

টিফিন করতে নিচে নেমে আবার চিন্ময়ের মুখোমুখি বসে মুরলীধর।

চায়ে চুমুক দিয়ে ছোট্ট একটা প্রশ্ন করে চিন্ময়, 'অফিস থেকে বাড়ী ফেরেন কখন মুরলী দা'

শুকনো পরোটা শেষ করে জবাব দেয়— 'এই প্রায় ন'টা।'

—আপনার ছেলেমেয়ে নেই

'—হ্যাঁ, তিন ছেলে দুই মেয়ে। বড়

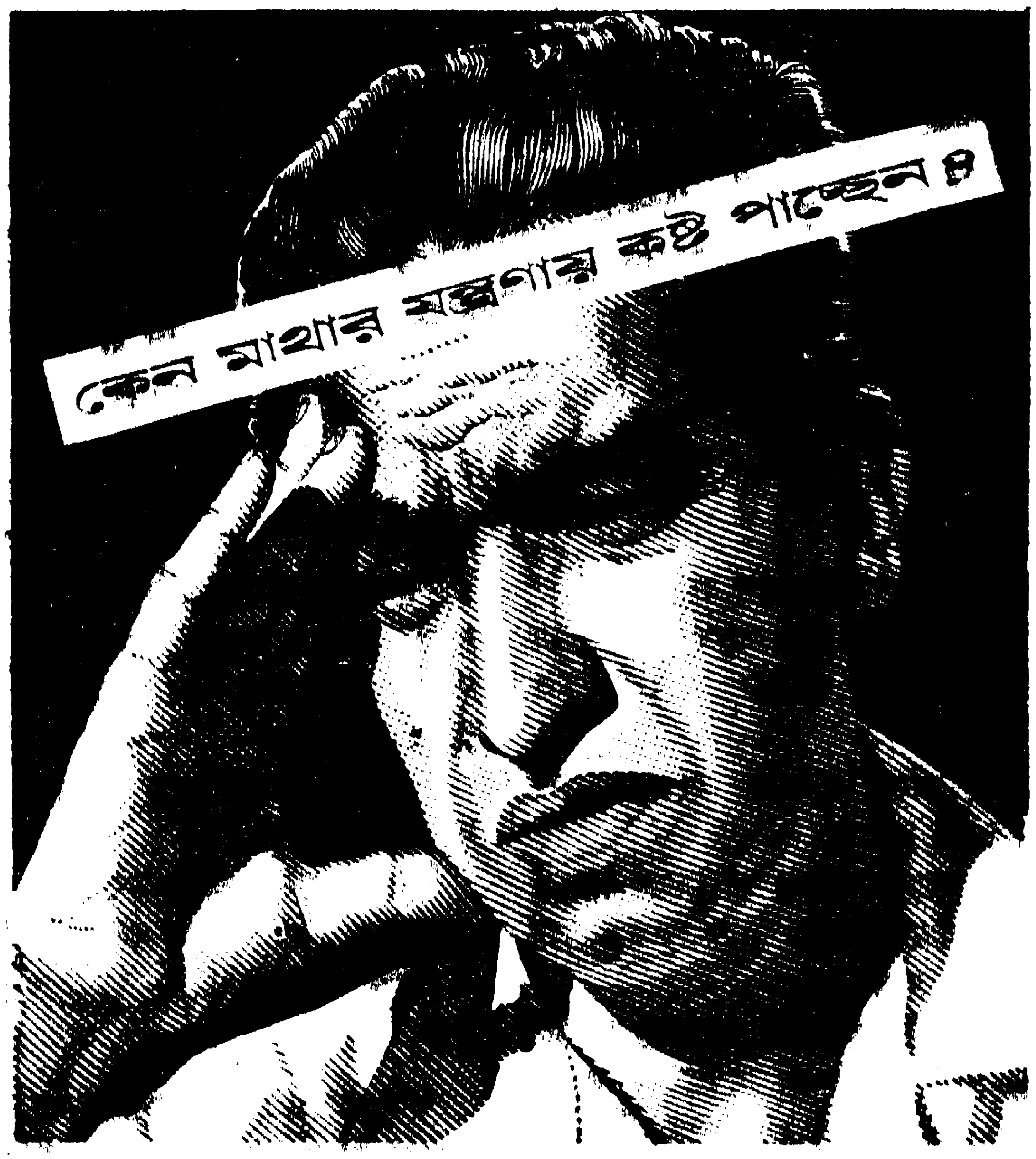

— সারিডন খেলেই তো খুব তাড়াতাড়ি ও নিরাপদে যন্ত্রণা দূর হয়!

মাথার যন্ত্রণায় আর কষ্ট পেতে যাবেন কেন—সারিডন খেয়ে সত্বর ও নিরাপদে যন্ত্রণা ও ব্যথার উপশম করুন।

সারিডন-এ অনিষ্টকর কোন কিছু নেই, এতে হার্টের কোন ক্ষতি বা হজমের কোন গোলমাল হয় না। তার ওপর বিশেষ উপাদানে তৈরি ব'লে সারিডন আশ্চর্যরকম তিনটি কাজ দেয়—এতে যন্ত্রণার উপশম হয়, মনের স্বাচ্ছন্দ্য আসে ও শরীর ঝরঝরে লাগে।

মাথা-ধরা, গা-ব্যথা, দাঁতের যন্ত্রণা এবং সাধারণ ব্যথা-বেদনায়, তাড়াতাড়ি আরাম পেতে হ'লে সারিডন খান...সারিডন নিরাপদ বেদনা-উপশমকারী।

একটিই যথেষ্ট

একটি ট্যাবলেট ১২ নঃ পঃ

- ★ সারিডন স্বাস্থ্যসম্মত মোড়কে থাকে, হাতে ধরা হয় না।
- ★ সারিডন একটি ট্যাবলেটের দাম বারো নয়া পয়সা।
- ★ একটি সারিডন-ই প্রায় ক্ষেত্রে পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে পুরো এক মাত্রা।

WTVT 90

একমাত্র পরিবেশক : ভলটাস লিমিটেড

ছেলে তোমার চেয়ে হয়ত বছরখানেক বড় হবে। আর মেজ ছেলের বয়সও প্রায় তেইশ।' নিজেও একটু আগ্রহ প্রকাশ করে মুরলীধর। চিন্ময় কি যেন ভাবে। কোঁচকান ভ্রূ নিয়ে তাকায়।

'এই বয়সে আপনি অফিসের পর পার্ট-টাইম চাকরি তারপর আবার বাজার করে বাড়ি ফিরবেন রাতে.........'

প্রথমটা একটু অস্বস্তি প্রকাশ করল মুরলীধর। তারপর জোর করে হাসি টেনে বলল, 'আমি নিজেই ওদের চাকরি করতে দিই নি। অবশ্য বড় ছেলে বি-এসসি পাশ করার পর থেকেই চাকরির চেষ্টা করছে। একটা কেমিস্টের চাকরিও পেয়ে যাবে খুব শিগ্গিরই।' একটু থেমে আবার বোঝাতে চেষ্টা করল ও—'আর এমন কিই বা বয়েস হয়েছে বল না এই ত দেখছ।' সহজে ধরতে পারবে না মুরলী চক্রবর্তী পঞ্চাশের ঘর পার হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে টিফিন আওয়ার শেষ হয়ে যেতেই আবার যে যার নিজের চেয়ারে ফিরে যায়।

ছুটির পর আবার দু'ঘণ্টা পার্ট টাইম চাকরির কথা ভাবতে সত্যিই কেমন যেন ক্লান্তি আসে মুরলীধরের। তারপর আবার বাজার করা। স্ত্রীর দু-একটা ফাই-ফরমাশও আছে ওর সঙ্গে। শিয়ালদায় নেমে কাঁচা আনাজের বাজারে যাবে আধ ঘণ্টার মত। দু গজ জামার ছিট কিনতে নামতে হবে শ্যামবাজারে। তারপর বাড়ি। যার নাম রাত ন'টা। আর এছাড়া করবেই বা কি। তাই সব সুদ্ধ দু'শ টাকাতেও কুলিয়ে উঠতে পারে না শিবানী। সুনির্মলেরও চাকরিটা যদি.........। তারপর সুরুচিরা, সুকোমল রুমার পড়ার খরচ আছে। তবু পুরোনো ডাক্তারই রয়ে পাঁচিশ টাকার ওপর দিয়েই হয়ে যাচ্ছে। এক বাবলু ছাড়া আর কেউই দুধ ছুঁতে পায় না। কিন্তু তাতেও দুঃখ নাই মুরলীধরের। ও জানে এই সারাদিনের মজুরী দু'শ টাকা নয়। আরও কিছু। সুনির্মল, সুকোমল, সুরুচিরা, রুমা, বাবলুরা। এরা ওর জীবনের গর্বের বস্তু হয়ে উঠবে একদিন। আর যাই হোক কেরানী মুরলীধর এ পরিচয়টাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে।

আবার মাঝে মাঝে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে একটু ক্ষুণ্ণ হয় মুরলীধর। না, এর চেয়ে অবিবাহিত জীবনটাই যেন বেশ ছিল। একটা আনন্দ পেয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে সেদিনের বাইশ বছরের ছেলে সদ্য কেরানী মুরলীধর আর তার পাশে অল্প লাজুক একটা মেয়ে শিবানী। তখন এতটুকু দায়িত্বের বোঝা যেন বেড়াতে হয়নি ওকে। বাবার হেফাজতেই ছেড়ে দিয়েছিল সব। কিন্তু যে মুহূর্তে পরিপূর্ণ জীবনের কথা ভেবেছে, সেদিন থেকেই যেন নিঃশব্দে একটার পর একটা দায়িত্বের বোঝা এসে দেহ-মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। অথচ............বিশ্রী একটা অস্বস্তি নিয়ে পাশ ফিরে শোয় আবার। হঠাৎ আলোটা জ্বলে উঠতেই চমকে উঠল—'কে ঘরে?'

—'আমি'—শিবানীর স্পষ্ট কণ্ঠস্বর কানে এল মুরলীধরের। মশারির গায়ে উঁকি দিলো। 'তুমি এখনও ঘুমোওনি?'

—'ঘুম আসছে না'। অল্প একটু থেমে আবার প্রশ্ন করল—কটা বাজে এখন?

'—এগারটা বেজে গেছে ত'—টিনের কৌটো গুলো তাকের ওপর গুছিয়ে রাখতে রাখতে জবাব দিল শিবানী। 'সারাদিন ঘরের মধ্যে থাকবে। বিকেলের দিকে যদি একটু......'

'তোমাদের সব খাওয়াদাওয়া মিটে গেছে?' নিজের আবেগেই আগের মত প্রশ্ন করল মুরলীধর।

—'আমাদের ত কখন হয়ে গেছে। সবাই-ই ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষণে।'

'—তা তুমি এত রাত্তির অবধি জেগে আছ। আবার ত কাল সকালে পাঁচটায় না বাজতেই উঠতে হবে। তার ওপর তোমার অম্বলের অসুখটাও.........' অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন কি জোরে থেমে গেল।

খানিকক্ষণ চুপ করেই রইল শিবানী। তারপর বেশ বিরক্ত হয়েই বলল যেন ও, তোমার সংসার সংসার ত আর আমারও পেনশন হয়নি।

একটু যেন ভয় পেল মুরলীধর। একটু পর শিবানী আলোটা নিবিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। দূরে দাঁড়িয়ে বলল ওকে লক্ষ্য করেই—'ঘুমিয়ে পড়, অনেক রাত্তির অবধি জেগে থেক না। আবার ত সকালে রান্নার রাখাটা—'

শিবানী চলে যাবার পর অনেকক্ষণ ধরেই এপাশ ওপাশ করল ও। তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। বেশ নিঃসাড়েই ঘুমিয়েছিল সেদিন। অন্যদিন টব থেকে চায়ে নিতে ঘরে ঢুকলেই পায়ের শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। কিন্তু সেদিন একটু অবাক হল শিবানী।

বেশ খানিকক্ষণ পর রুমা এসে ঘুম ভাঙাল বাবার। তাড়াতাড়ি উঠে বসল চৌকির ওপর। ইস্ জানলার গায়ে রোদ্দুরের ঝাঁক এসে গেছে আজ। চায়ের কাপটা সামনে রাখল রুমা—'তুমি কিসের স্বপ্ন দেখছিলে বাবা?'

মুখ ধুয়ে এসে মেয়ের হাত থেকে কাপটা নিল। কিসের স্বপ্ন? 'নিশ্চয় তুমি স্বপ্ন দেখছিলে নইলে এত বেলা অবধি ঘুমোও না তুমি।' ওর কথাটা ভাবতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ল সত্যিই ত কিসের যেন একটা স্বপ্ন দেখছিল ও। অথচ......না কিছুতেই আর মনে করতে পারল না

এই যে
রবিনসন্স
পেটেন্ট বার্লি
এসে গেছে!
দেখবেন, খোকাবাবু সবটুকু খেয়ে নেবে। রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লি গোরুর দুধের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে শিশুর কোমল পাকস্থলীতে দুধ চাপ বাঁধতে পারে না, কাজেই শিশুর পক্ষে হজম করা সহজ হয়। তাছাড়া, রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লি শিশুদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগায়, ওরা খেয়ে তৃপ্তি পায় আর এতে ওদের শরীরও গড়ে ওঠে।
এই বার্লিতে অনধিক ০.০২৮% আয়রন বি-পি ও ১.৫% ক্রিটা প্রিপঃ-এর সংমিশ্রণ আছে।

ক্যালসিয়াম ও লৌহ সংযোগে সুরক্ষিত

ঢোল কোম্পানীর
দাদ ও কাউরের
অব্যর্থ মলম
বরানগর • কলিকাতা

অন্তত সুকোমল আর রুমার বিয়েটা হয়ে গেলেও বাইরে কোথাও গিয়ে কিছু সময় কাটিয়ে আসতে পারত হয়ত। কলকাতার বাতাসেই ত এই একটানা বত্রিশ বছর নিশ্বাস ফেলেছে। মাঝে মাঝে ভয় হয়। শেষ নিঃশ্বাসটুকুও কি এই যন্ত্রণায় ক্ষুব্ধ কলকাতাই......না, না, আর আড়ালে থাকবে না ও। এই অন্ধকূপ ছেড়ে বেরুতেই হবে। আজই স্পষ্ট করে জানতে হবে ওকে। সত্যিই কেন এমন করে বেঁধে রেখেছে ওরা। মুরলীধরকে কি আজও প্রয়োজন আছে ওদের। বাকীটুকুও জানতে চাইবে ও।

যেটুকু জানে তাও বড় কম নয়। তবুও সব নয়। আজ ছ-মাস ধরেই বেড়ে চলেছে। যে দীনেন একটা বেলাও এ বাড়ির মায়া কাটাতে পারেনি.........ঠিক বাড়ির মায়া নয়, রুমার শূন্যতাকে পূর্ণ করবার এক অদ্ভুত আনন্দে মেতে থাকত, সেই দীনেনকেই একদিন ওই অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নেমে যেতে দেখল মুরলীধর। অবাক লেগেছিল সেদিন। কিন্তু অস্থিরতাকে চাপা দিয়েছে তখনকার মত। মাঝে মাঝে মুরলীধরেরও রাগ হত দীনেনের ওপর। সামান্য ওইটুকু ক্ষমতা নিয়ে নিজের

অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে না রেখে ও নিছক একটা বিলাসিতাকে আঁকড়িয়ে রয়েছে কেন?

একদিন স্পষ্ট করে জানতে চাইল মুরলীধর 'তুমি কি কর দীনেন?'

হঠাৎ নিজেকে অন্বেষণ করল দীনেন। 'এবার ইণ্টার মিডিয়েট দিয়েছি।'

'না না, তা নয় চাকরি-টাকরি কিছু কর না?' যেন জেরা করল মুরলীধর। প্রথমটা একটু ইতস্তত করতে লাগল, তারপর কোন রকমে থেমে থেমে বলল, 'একটা পারিফিউমারী ফার্মের সেলসম্যানের কাজ করি। আর সকালে টিউশনি করি।''

মাইনে পাও কত সবসুদ্ধ?

দেড়শ টাকার মত।

সেদিনকার মত ছাড়া পেল দীনেন। ওর সংকোচের ভাব দেখে আর কোন প্রশ্ন করেনি মুরলীধর। বাকীটুকু আপনিই কানে এল। বছর দুয়েক আগে নেহাৎই অস্বচ্ছলতার জন্যেই লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে চাকুরিতে ঢুকতে হয়েছিল। আশা ছিল প্রাইভেটেই পড়াশোনাটা চালিয়ে যাবে ও। কিন্তু সে সুযোগ আর স্বচ্ছলতা বদলে দায়িত্ব আর দৈন্যতাই আঁকড়িয়ে ধরল ওকে। ছ'টা লোকের গোটা সংসারের দায়িত্ব প্রায় সমস্তই ওর ওপর এসে গেছে তখন। ঠিক যে কেউ জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে তাও নয়। অথচ......। তারপর সেই ছ-বছর আশা বুকে করে বাঁচতে চেয়েছে। তার জন্যে কিছুই বাদ দেয়নি ও। কাপড়ের কলে নাইট ডিউটির সংগে দিনের বেলায় পার্ট টাইম কম্পোজিটারের কাজ কিংবা ক্যানভ্যাসারী। কিছু না হলেও সেলসম্যানশিপের সংগে নিচু ক্লাসের টুাশন। শেষ দু বছরও এমনি করেই কলেজের ক্লাস করেছে। অদ্ভুত লাগে দীনেনকে। তবুও মনে হয় যেন সব সময় মুখখানা ভরে পরিতৃপ্তির চিহ্ন আঁকা রয়েছে। এতটুকু ক্লান্তি নেই ওর। আর সকলের মত মুরলীধরও ওর ওপর নির্ভর করে চলেছে। প্রিয় হয়ে উঠেছে দীনেন। অনায়াসে একটার পর একটা দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে দীনেনের ওপর। শিবানীর কথা বলার ভংগী শুনে মনে হয়েছে সত্যিই যেন দীনেন ওকে সেই অধিকার দিয়েছে। কিন্তু ......এই ছ মাসের মধ্যে একটা দিনের জন্যেও চোখে পড়ল না দীনেনকে। এ বাড়ির কারুর এতটুকু কৌতূহলও নেই। ওর নামটা যেন সবাই মুছে দিচ্ছে, সবাই। সবচেয়ে আশ্চর্য মনে হয় রুমার নীরবতা। অথচ...... না, না এসব কিছুতেই সহ্য করবে না আর। মুরলীধরেরও অধিকার আছে স্পষ্ট করে জানবার। এ বাড়ির লোকের চলাফেরার মধ্যে এত সংকোচ, এত আড়ষ্টতা কেন?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ও। অজানতেই কণ্ঠস্বর থেকে একটা গম্ভীর স্বর বেরিয়ে এল 'বাবলু, কে আছে.....'

সমস্ত বাড়িটা যেন এক মুহূর্তে সচকিত হয়ে উঠল। পাশের ঘর থেকে ছুটে এল শিবানী, ভয়ে আর বিস্ময়ে দরজায় কানপেতে রইল সুচিরা।

স্বামীর দিকে এগিয়ে গেল শিবানী। 'কি হয়েছে! হঠাৎ চিৎকার করে উঠলে কেন?'

—'চিৎকার...নাঃ কই!' নিজেই যেন কেমন বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল মুরলীধর।

'এইত বাবলুকে ডাকলে। শরীর-টরির খারাপ হয়নি ত!' কপালের ওপর হাত রাখল শিবানী, 'কই কিছুই ত বুঝতে পারছি না ...সন্ধ্যেবেলা অন্ধকারে বসে থাকবে। কত-দিন ধরে বললুম না হয় কোথাও ঘুরে এসো একটু।'

বেশ খানিকক্ষণ চুপ করেই রইল

আপনি কথাকলি নাচ দেখেছেন?

কথাকলি নাচের মত টম নারিকেল তৈল নারিকেলবীথির দেশ কেরালার বিশিষ্ট সম্পদ।

বজ্ঞানসম্মতভাবে পরিশ্রুত এবং টিনে ও প্লাস্টিকের কৌটায় ভর্তি টম নারিকেল তৈল বিশুদ্ধতা ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য গ্যারাণ্টিযুক্ত।

½ পাঃ, ১ পাঃ ও ২ পাঃ ভ্যাকুয়ামযুক্ত টিনে সর্বত্র পাওয়া যায়।

ভাস্ ব্রাদার্স
২৬, আমড়াতলা লেন, কলিকাতা—১

Aiyars

মুরলীধর। কি যেন ভাবল। তারপর চোখ তুলে তাকাল স্ত্রীর দিকে—'রুমা কোথায় গেছে?'

কলেজ থেকে ফেরেনি এখনও, সংক্ষেপে জবাব দিল শিবানী। হঠাৎ সোজা হয়ে বসল ও, 'আচ্ছা দীনেনকে ত অনেকদিন দেখি না। তোমরা কি কেউ......'

একটু যেন অস্বস্তি বোধ করল শিবানী, "সে ত আজ ছ মাস এ বাড়ি মাড়ায় না তা তোমার কি আজ......'

'মনে আমার অনেকদিনই হয়েছে কিন্তু ......' গলার স্বরটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল, 'আমি ব্যাপারটা ঠিক স্পষ্ট করে বুঝে উঠতে পারছি না। একদিন তুমিই রুমার......'

—'এখনও আমার অমত নাই—' বেশ রুষ্ট মনে হোল শিবানীকে।

'আমিও সেই কথাই জিজ্ঞেস করছিলাম। তার নামটা পর্যন্ত শুনতে পাই না কারুর মুখে। তা এখন অনিচ্ছাটা কি রুমার না তোমার?'

'দু-জনেরই। দীনেনের ইচ্ছে এখন চার বছর ধরে ঐ দেড়শ টাকার চাকরিই করবে। কেরানীর চাকরিও করবে না অথচ চার বছর বাদে যে কি করবে তাও বোঝা শক্ত।'

'রুমার আপত্তি কোনখানে?' খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইল ও। ভ্রূ কোঁচকাল শিবানী। 'রুমার কেন, আমারও আপত্তি আছে। যার কোন স্থিরতা নাই তার সংগে মেয়ের বিয়ে দিতে পারব না আমি।'

অনেকক্ষণ চুপ করেই রইল মুরলীধর। আর শিবানীও যেন একটু সাহস পেল। 'রুমার মনোমতই একটি ছেলে পেয়েছি।'

হঠাৎ চোখ তুলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল মুরলীধর। শিবানী একটু উৎসাহ বোধ করল। 'বাইরের কলেজে প্রফেসারী পেয়েছে। বেশ সুন্দর ছেলে। ভাবছি সুকোমল আর রুমার একদিনেই বিয়ের তারিখ ঠিক করব।'

সব শোনার পরও চুপ করেই রইল মুরলীধর। বেশ কিছুক্ষণ পর শব্দ করে নিশ্বাস ফেলল ও। প্রায় অসহায়ের মতই শোনাল ওর কণ্ঠস্বর। 'দেখো আমার আর কোলকাতায় থাকতে ভাল লাগছে না।'

'তা এখন কোথায়ই বা যাবে?'

'বেশী দূর না হোক অন্তত কাছাকাছি কোথাও যেতে পারলে যেন...' বলতে বলতে চেয়ারের হাতলের ওপর ঝুঁকে পড়ল। নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে গেল শিবানী। প্রায় অসহায়ের মতই একভাবে বসে রইল মুরলীধর। একটু পর রুমাও ফিরল। চটির শব্দ শুনেই আন্দাজ করল ও। ওঘরে ঢোকার সংগে সংগেই একটা গুনগুন শব্দ ভেসে এল ওর কানে। খুব মৃদু হলেও প্রসংগটা রুমারই, সেটা বুঝতেও দেরি হল না।

আরও রাত হল। সুকোমল আসার সংগে সংগে সমস্ত বাড়িটা কলধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল। বেশ অদ্ভুত মনে হয় মুরলীধরের। সবাই কেমন একটা গাম্ভীর্য নিয়ে চলাফেরা করে ওরা। এ বাড়িতে আরও একটা মানুষ আছে যেন কারুর মনেই হয় না। কিংবা মনে হলেও এড়িয়ে যেতে চায়। এড়িয়ে যেতে চায় মুরলীধরের কাছে, ওদের নকল আভিজাত্য মূল্য পায় না বলেই। সুকোমলকে সামনা সামনি দেখেনি আজ প্রায় এক বছর হবে। সুচিরা, রুমা ওরাও কেমন যেন দূরে দূরেই রয়েছে। অথচ সুনির্মল সময় পেলেই আসে। ওকে দেখলেই মনে হয় যেন সেই আঠারো বছরের তারুণ্য অটুট আছে। মুরলীধরের সামনে এতটুকু বিষন্নতা কিংবা সংকোচ রাখে না ও। মনেই হয় সুনির্মলও এ বাড়িরই একজন। মাঝে মাঝে ওর চেহারাটা মনে পড়লে একটা ক্ষীণ যন্ত্রণায় সমস্ত মন গুমরে কেঁদে ওঠে।

আজ যেন আরও বেশী ব্যাকুল হয়ে পড়ল। ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মুরলীধর। পেরেকে টাঙানো জামাটা গায়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

হঠাৎ এত রাত্রে ওকে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে দেখে কাছে এল শিবানী। যেন বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল ও। এই রাত সাড়ে আটটার সময় কোথায় যাবে?

কোন জবাব দিল না মুরলীধর।

ব্যস্ত হয়ে ছুটে এল সুচিরা, রুমা, সুকোমল। কিন্তু মুরলীধর সেদিকে লক্ষ্য না করে সোজা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। শিবানী ওর সংগে দুটো সিঁড়ি নেমে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

খোলা দরজা দিয়ে রাস্তায় নামতেই সারা শরীরটা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছে। আঃ এমন সুন্দর স্বস্তির আস্বাদ যেন এই প্রথম অনুভব করল মুরলীধর।

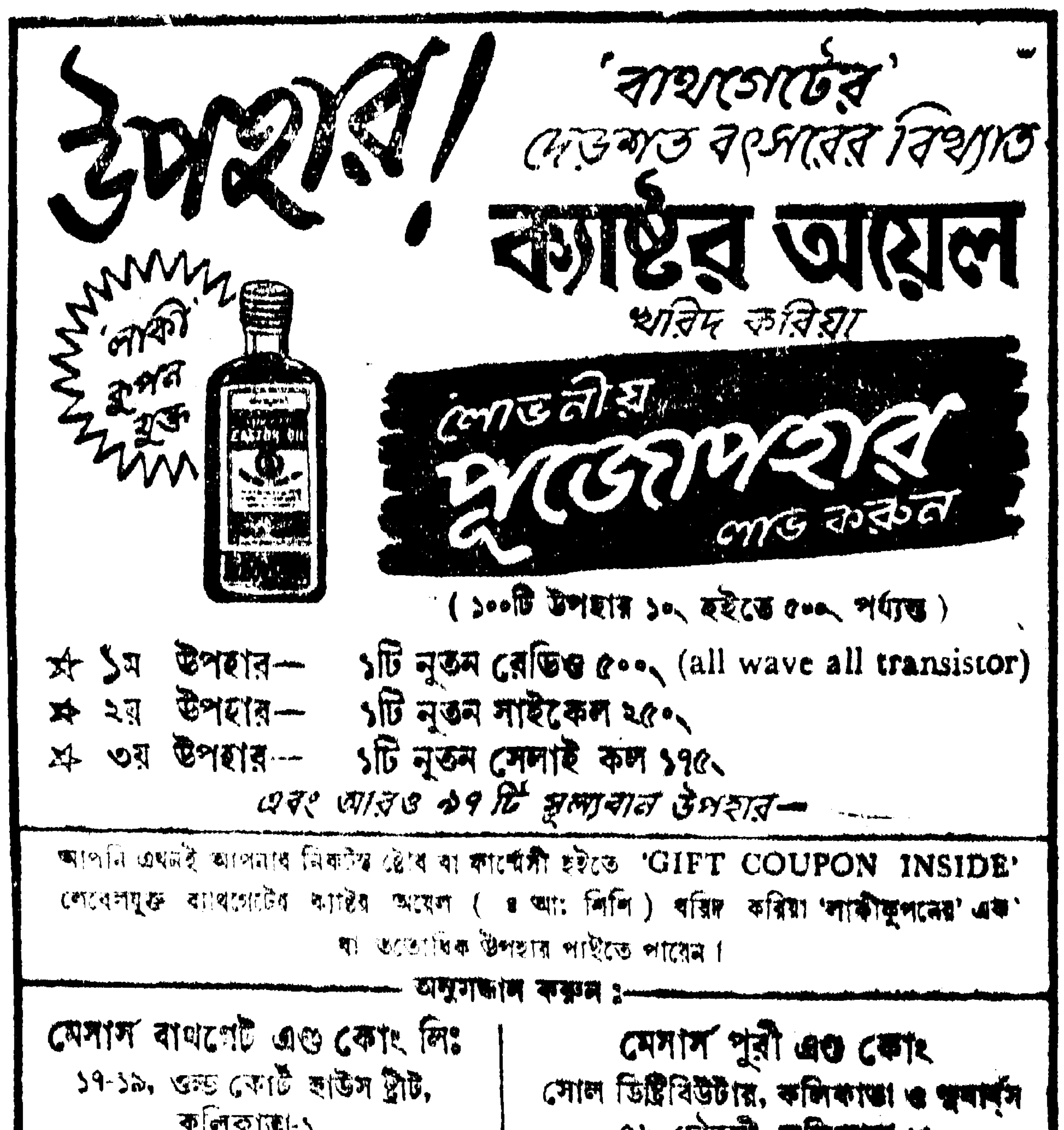

ভাষা কোন্দল[illegible] দু[illegible]

[Government Library, Cooch Behar stamp]

স্বরাজ মিত্র

এক

হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ যখন আঞ্চলিক ভাষাগুলোকে জবরদস্তি রোলার চালিয়ে দুমড়ে ফেলতে চাইছে, ঠিক সেই ক্ষণে আমাদের উচিত প্রতিবেশী ভাষার আচরণ সম্পর্কেও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল থাকা। এক রাষ্ট্রের পক্ষে রাজনৈতিক গোয়েন্দাগিরিতে অতি হীনতা থাকলেও এটা ছদ্মবেশী চলতি রেওয়াজ। কিন্তু সাংস্কৃতিক জগতে গোয়েন্দাগিরি চলে না। সেখানে অপ্রকাশ্য নেই কিছুই। ভালো হোক মন্দ হোক অগনিতের গোচরে আসছেই। তবু প্রয়োজন তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টির, যাতে প্রতিবেশীর আচরণ সংশয়াকীর্ণ কিনা কিম্বা ভাষার প্রশস্ত অঞ্চল উপদ্রুত কিনা না জানলে, আমি অন্তত মনে করি সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে।

প্রতিবেশ - নিরপেক্ষতা সার্বভৌমিক সাংস্কৃতিক অখণ্ডতাকে খণ্ডিত না করলেও প্রতিবেশ-নির্লিপ্ততা বাঞ্ছনীয় নয়। নয় এই কারণে, অনেকে যারা মনে করেন ভাষার সীমানা চৌকিদারি করার দরকার নেই, তারা নিতাত অজ্ঞাতসারে কিছু হারিয়ে ফেলেন, সেটা অনেকটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহ বিষ-ফলের মতন। বিবাদ যা নিয়েই হোক না কেনো, অবশ্যম্ভাবী পরিণাম নিতান্ত দুঃখদায়ক নিশ্চয়ই। অথচ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, কি আজকের স্নায়ুযুদ্ধ প্রায় সবই অমীমাংসিত বিরোধের স্বার্থপ্রাণ প্রণোদিত। আর, বিশেষত, ভাষার প্রেক্ষাপটে কলহের অতি সূক্ষ্ম নাদও গভীরতর চিন্তার প্রশ্ন।

সম্প্রতি তাই দেখলাম আমাদের প্রাত্যান্তিক প্রদেশে "অসমীয়া ভাষাত বঙলুয়া শব্দের" অবাধ প্রবেশ নিয়ে কোন এক বিখ্যাত সাপ্তাহিকের মাধ্যমে জোর তর্কাতর্কি হয়ে গেল। জনৈক নামজাদা অসমীয়া লেখক ভাষার বিশুদ্ধতা ও স্বাতন্ত্র্যের দোহাই দিয়ে সংরক্ষণশীলতার মনোভাব প্রকাশ করাতে একাধিক আক্রমণ তথা কড়া সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। কেউ কেউ আবার উল্টো মতবাদও প্রকাশ করেছেন।

বিজাতীয় শব্দের অবাধ বিচরণ অথবা নির্বিঘ্ন বিস্তার কদাপি কোন গোঁড়া ভাষাপ্রেমীর কাছে নির্দ্বন্দ্ব সমর্থন পায়নি। অন্যপক্ষে প্রগতিবাদীরা অনেকক্ষেত্রে কেবল নিঃসংশয় স্বীকৃতি দিয়ে ক্ষান্ত হননি একান্ত সমাদর করে নিজের সাহিত্যিক আসরে স্থান দিয়েছেন। এতে শব্দের সংকরী গোষ্ঠী বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু ভাব প্রকাশের নয়া সম্ভার শব্দ-ভাণ্ডারে অপ্রত্যাশিত প্রাচুর্য এনেছে, উপরন্তু এককের আগমনে অন্য ভাষার শব্দ উজ্জীবিত হয়েছে, অর্থঘটিত ব্যাপারে সূক্ষ্ম প্রকাশনায় এনেছে নয়া উদ্দীপনা। এটা মোট সাকুল্য-লাভের কথা।

অসমীয়া ও বাংলা ভাষার বিরোধ নতুন নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে কলহ বহু দিনকার। বাংলা-ওড়িয়া কিম্বা বাংলা-অসমীয়ার ভাষার সম্পর্ক নিয়ে ভাষাতাত্ত্বিকরা প্রচুর গবেষণা করেছেন। এবং তাঁরা যে সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন তা ইতিহাস স্বীকৃত।

একটা জাতির ভাষার উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও উৎকর্ষ কোন পথ ধরে চলেছে, সেটা এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নয়। কিন্তু এর অংগাংগী যে সম্পর্ক বিদ্যমান সেটা মোটেও অবহেলিত নয়।

ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে, বহিরাগত আদিম আর্যভাষা ভারতবর্ষে প্রভূত বিস্তার লাভ করে ভাষার পরিবর্তন-ধর্ম অনুসারে নানা কারণে রূপান্তরিত হয়েছে। আর্যভাষা-গোষ্ঠী (Indo-Irarnim or Aryan) প্রথমে আদি ভারতীয় আর্য (Old Indo-Aryan)—যে যুগটাকে বৈদিক বলা হয়, সেই যুগ অতিক্রম করে মধ্যভারতীয় আর্য অবস্থায় "প্রাকৃত" ভাষার রূপ নিল। এই প্রাকৃতও অবশেষে ভেঙে চুরে শৌরসেনী মাগধী দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি প্রাদেশিক প্রাকৃতের জন্ম দিল। আধুনিক আর্যভাষার পূর্বে কিছুকাল চলল অপভ্রংশ: অবশেষে এল বাংলা ওড়িয়া, হিন্দী পাঞ্জাবী ইত্যাদি।

"GLIMPSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ শুধু ইতিহাস নয়, ইতিহাস নিয়ে সাহিত্য। ভারতের দৃষ্টিতে বিশ্ব-ইতিহাসের বিচার। সর্ব দেশে ও সর্ব সমাজে সর্বকালের আদরণীয় গ্রন্থ। জে. এফ. হোরাবিন-অঙ্কিত ৫০ খানা মানচিত্র সহ। প্রায় ১০০০ পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ।

শ্রীজওহরলাল নেহরুর

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

২য় সংস্করণ : ১৫·০০ টাকা

আত্মচরিত ॥ শ্রীজওহরলাল নেহরু ১০·০০

ভারতকথা ॥ শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারী ৮·০০

ভারতে মাউণ্টব্যাটেন ॥ অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন ৭·৫০

চার্লস চ্যাপলিন ॥ আর· জে· মিনি ৫·০০

প্রফুল্লকুমার সরকার

জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ

বাঙলায় তথা ভারতের জাতীয় আন্দোলনে বিশ্বকবির কর্ম, প্রেরণা ও চিন্তার সুনিপুণ আলোচনায় অনবদ্য গ্রন্থ।

তৃতীয় সংস্করণ : ২·৫০ টাকা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন কলিকাতা—৯

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন!
যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র
বহু গাছড়া দ্বারা বিশুদ্ধ মতে প্রস্তুত
বাক্‌লা
ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন
ভারত গভঃ রেজিঃ নং ১৬৮৩৪৪
অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা,
মুখে টক ভাব, ঢেকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দাগ্নি, বুকজ্বালা, আহারে অরুচি, স্বল্পনিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ন নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যাঁরা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও বাক্‌লা সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিফলে মূল্য ফেরৎ।
৩২ তোলার প্রতি কৌটা ৩্ টাকা, একত্রে ৩ কৌটা — ৮৷৷ আনা। ডাঃ, মাঃ, ও পাইকারী দর পৃথক।
দি বাক্‌লা ঔষধালয়। হেড অফিস- বরিশাল (পূর্ব্ব পাকিস্তান)
ব্রাঞ্চ—১৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৭

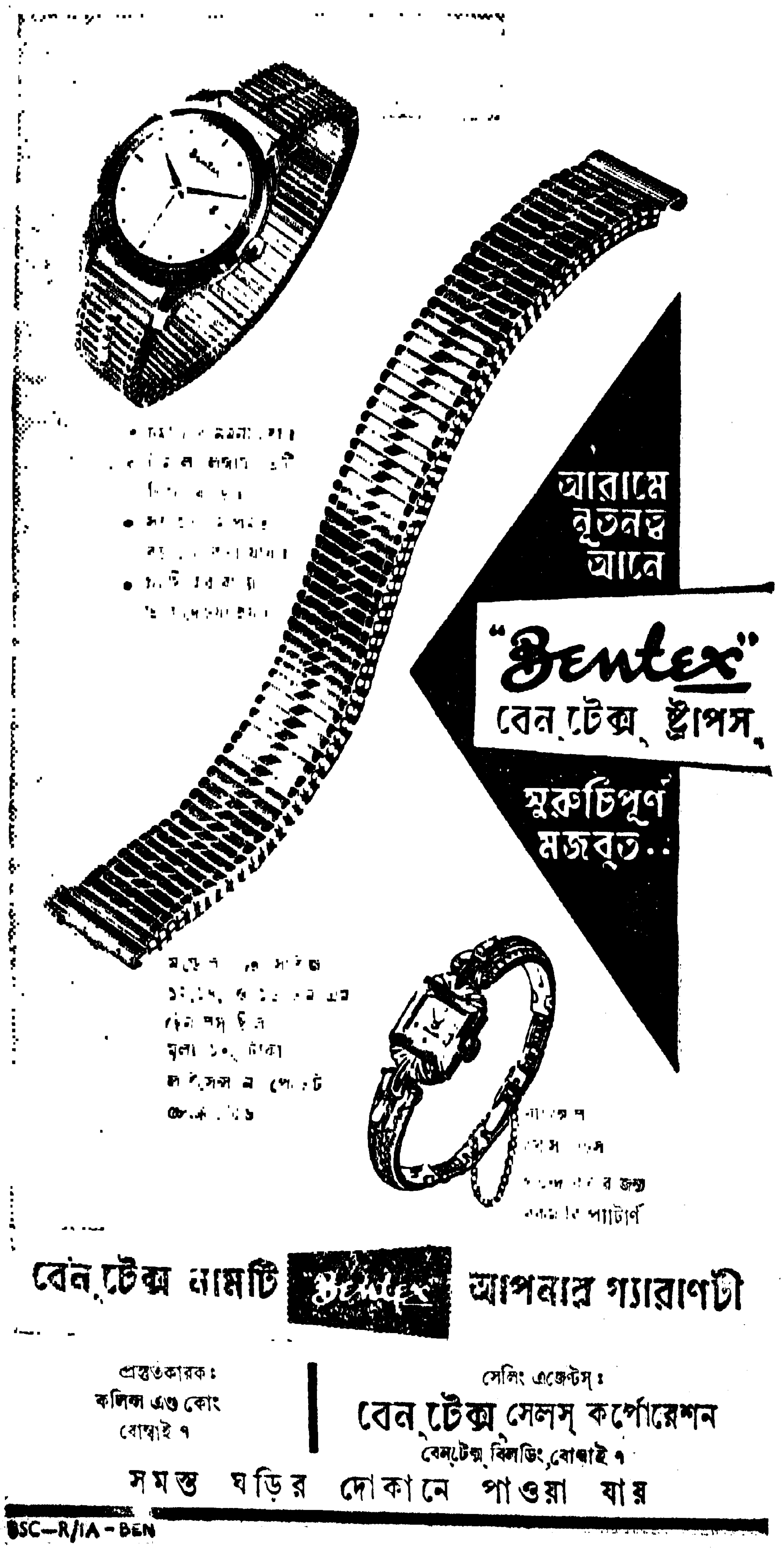

রবীন্দ্রনাথ তাঁর "বাংলা ভাষা পরিচয়ের" ভূমিকায় লিখেছেন: "শৌরসেনী ছিল পাশ্চাত্ত্য হিন্দির মূলে, মাগধী অথবা প্রাচ্য ছিল প্রাচ্য হিন্দির আদিতে। আর ছিল ওড্রী, উড়িয়া, গৌড়ী, বাংলা। আসামীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু অনতিপ্রাচীন যুগে আসামীতে গদ্য ভাষার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, এত বাংলায় পাইনে। সেই সব দৃষ্টান্তে যে ভাষার পরিচয় পাই তার সঙ্গে বাংলার প্রভেদ নেই বললেই হয়।"

এই মতটাকে সমর্থন করে যাচ্ছেন শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনও। যদিও প্রসঙ্গ ভিন্ন, তিনি বলেছেন: "বাঙ্গলা দেশে যেমন আসামেও তেমনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ব্রজবুলি ভাষায় কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদরচনার প্রথা প্রবর্তিত হয়। সেই সময়ে অসমীয়া ভাষা বাঙ্গালা ভাষা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়ায় নাই। সে সময়ে উত্তর পূর্ববঙ্গে যে উপভাষা প্রচলিত ছিল, অর্থা গোষ্ঠীভাষার মূলোদ্ভূত একমেবম্ তাহাই ছিল আসাম অঞ্চলেরও ভাষা। সুতরাং এই হিসাবে প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্য বাঙ্গালা সাহিত্যের বাহিরে পড়ে না। ("বাংলা সাহিত্যের কথা")

প্রথমতঃ আর্যীকরণের প্রভাব, দ্বিতীয়ঃ অর্থ গোষ্ঠীভাষার মূলোদ্ভূত একমেবম্ অন্তঃপ্রবাহ এবং তৃতীয়ত বৃহত্তর বঙ্গ-ছত্রতলে যে মানুষ আর যে ভাষা ক্রমবর্দ্ধমান হচ্ছিল, তার সঙ্গে বাংলা ভাষার অমিল ছিল না বললেই হয়। এমন কি পরবর্তীকালে লিপিমালারও কিঞ্চিৎ যে-পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, পূর্বে তাও ছিল না। "Origin of the Bengali Script-র লেখক সেকথা প্রমাণ করেছেন বহু সাক্ষীসাবুদ সহ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক দীনেশ সেনও তাঁর "বৃহৎ বঙ্গে" গবেষণালব্ধ অতি মূল্যবান মন্তব্য রেখে গেছেন:

"এই দেশে ("মগধ, প্রাগজ্যোতিষপুর, অঙ্গ, বঙ্গ পৌণ্ড্র প্রভৃতি স্থান বৃহৎ বঙ্গের অন্তর্গত, তাহাদের ভৌগোলিক সংস্থান সর্বজনসম্মত......"). শুধু ঘন ঘন রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন হয় নাই, ইহার ভাষাও মূলতঃ অর্ধমাগধী এবং এক লক্ষণাক্রান্ত—তথাপি সেই ভাষার উপর প্রাদেশিকত্বের ছাপ মারিয়া ভিন্ন ভিন্ন অংশকে তফাত করা হইয়াছে। ত্রিপুরা, মণিপুর প্রাগজ্যোতিষপুর প্রভৃতি প্রদেশে বহুকাল বাঙ্গলায় দলিলপত্র, এমন কি তাম্রশাসন পর্যন্ত লিখিত হইয়াছে। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর উড়িয়া-সাহিত্যের ভাষার সহিত বর্তমান বাঙ্গলা ভাষার সে সান্নিধ্য, তাহা ত্রিপুরা ময়মনসিং, চট্টগ্রাম প্রভৃতি দেশের কথিত ভাষার সহিত আধুনিক কালের লিখিত বাঙ্গালার

অপেক্ষা নূতন নহে। গঙ্গা বংশের রাজত্ব-কালে বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে উড়িয়া ভাষার সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। সম্প্রতি, —একশত বৎসরও হয় নাই, আসামী ভাষাকে বাঙ্গালা হইতে পৃথক করা হইয়াছে, তৎপূর্বে বাঙ্গালাই আসামের রাজ দরবারে ও বিদ্যালয়গুলিতে প্রচলিত ছিল। কয়েকজন মিশনারী আসামের নিম্ন-শ্রেণীর কথিত ভাষায় কতকগুলি পুস্তক লিখিয়াছিলেন, ও তদুপযোগী অক্ষর (যথা পেট কাটা 'ৰ') তৈরী করিয়াছিলেন-- তারপর যখন তাহারা দেখিতে পাইলেন, আসামের ভদ্র সাহিত্য অন্যরূপ, তাহা বাঙ্গালা, তাহাতে ওরূপ নিম্নশ্রেণীর ভাষা চলিবে না, তখন তাঁহারা সেই নিম্নশ্রেণীর কথিত ভাষা তদ্দেশে চালাইতে বদ্ধপরিকর হইলেন—তাঁহাদের সামান্য ক্ষতিপূরণের ব্যাপদেশে আসামের কথিত ভাষার পরিবর্তন হইয়া গেল।"

এই নিম্নশ্রেণীর কথিত ভাষা ("vulgar and uncouth dialect" অর্থাৎ অভদ্র আরু জধলা দোয়ান আরু বঙলাতকৈ হীন") নিয়ে আপত্তিকর প্রশ্ন উঠতে পারে। ডঃ সূর্যকুমার ভুঞার মতে আসামের কথা ভাষা হল একশ কুড়িটির মতন। এরা সবাই অস্ট্রিক ভোটচীন দ্রাবিড় ও আর্যভাষার শাখা অথচ প্রত্যেকে নিজের অস্তিত্ব নিয়ে জীবন্ত। বাংলায় মতই অসমীয়াও মাগধী প্রাকৃতের অপভ্রংশ থেকে উৎপত্তি, আর অসমীয়া সাহিত্য বলতে ঐ ভাষার লিখিত সাহিত্যকেই বোঝাবে।

"অসমীয়া সাহিত্যের চানেকী"তে (সম্পাদনা : হেমচন্দ্র গোস্বামী; প্রকাশনা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) একটা যুগ-বিভাগ ছিল অসমীয়া সাহিত্যের:—

এক। সপ্তম থেকে নবম শতাব্দী পর্যন্ত গীতযুগ : ডাকের বচন, ছড়া, কন্যাবার-মাহী, বিহুগান প্রভৃতি অলিখিত নিদর্শন প্রথম যুগের।

দুই। মন্ত্র আর জ্ঞানতার যুগে লিখিত সাহিত্যের জন্ম— ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত

তিন। প্রাকবৈষ্ণবী যুগ বা অনুবাদ সাহিত্যের কাল—(পঞ্চদশ শতাব্দী? ১২০০—১৪৫০??)।

চার। নবজাগৃতির যুগ বা বৈষ্ণবী যুগ:— শঙ্করদেবের আবির্ভাব (১৪৪৯-১৫৬৯)।

পাঁচ। বিস্মৃতির যুগ।

ছয়। ১৮২৬ খৃঃ থেকে আধুনিক যুগ।

বাংলা সাহিত্যেরও তেমনি যুগ-বিভাগ করেছেন ভাষাচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

এক। প্রাচীন বা আদি যুগ (মুসলমান-

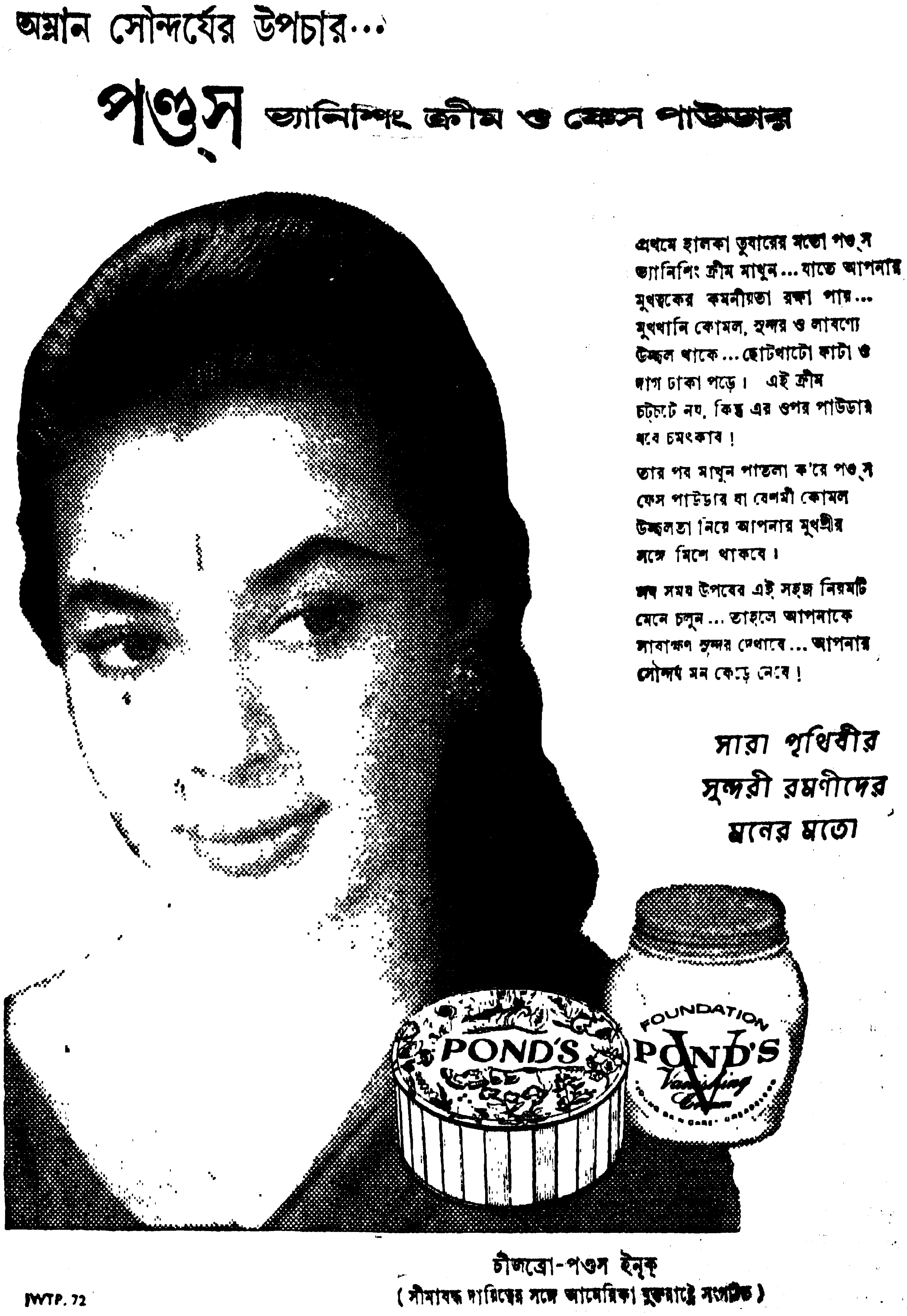
অম্লান সৌন্দর্যের উপচার…
পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম ও ফেস পাউডার
প্রথমে হালকা তুষারের মতো পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম মাখুন…যাতে আপনার মুখত্বকের কমনীয়তা রক্ষা পায়…মুখখানি কোমল, সুন্দর ও লাবণ্যে উজ্জ্বল থাকে…ছোটখাটো কাটা ও দাগ ঢাকা পড়ে। এই ক্রীম চটচটে নয়, কিন্তু এর ওপর পাউডার ধরে চমৎকার!
তার পর মাখুন পাতলা ক'রে পণ্ড্‌স ফেস পাউডার যা রেশমী কোমল উজ্জ্বলতা নিয়ে আপনার মুখশ্রীর সঙ্গে মিশে থাকবে।
সব সময় উপরের এই সহজ নিয়মটি মেনে চলুন… তাহলে আপনাকে সারাক্ষণ সুন্দর দেখাবে… আপনার সৌন্দর্য মন কেড়ে নেবে!
সারা পৃথিবীর
সুন্দরী রমণীদের
মনের মতো
POND'S
FOUNDATION
POND'S
Vanishing Cream
চীজব্রো-পণ্ডস ইনক
(সীমাবদ্ধ দায়িত্বের সঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)
JWTP. 72

পূর্ব)—১২০০ খৃঃ পর্যন্ত—বাংলা সাহিত্যের আরম্ভ—ভাষা কতকটা অসম্পূর্ণ ধরনের।

দুই। মধ্যযুগ—(১২০০ হতে ১৮০০ পর্যন্ত) ঃ

(ক) যুগান্তর কাল (তুর্কী বিজয়ের যুগ)—বাংলা ভাষার বর্তমান সাধু ভাষার রূপ নেওয়া। এই সময়ের সাহিত্য বা নিদর্শন বিশেষ নেই।

(খ) আদি মধ্যযুগ (প্র-চৈতন্য বা চৈতন্যপূর্ব) (১৩০০ থেকে ১৫০০ পর্যন্ত)—বাংলা সাহিত্যের পত্তন; নানা বিষয়ে সাহিত্য-সৃষ্টির আরম্ভণী।

(গ) অন্ত মধ্য-যুগ (১৫০০ থেকে ১৮০০ পর্যন্ত)ঃ

(১) চৈতন্য যুগ বা বৈষ্ণব সাহিত্য প্রধান যুগ—(১৫০০-১৭০০—বৈষ্ণব সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ। বাংলা সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি যুগ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক।

(২) অষ্টাদশ শতক (নবাবী আমল) ১৭০০—১৮০০।

তিন। নবীন বা আধুনিক বা ইংরেজী যুগ—১৮০০ হতে—

এই যুগ বিভাগ দু'টোকে সামনে রেখে এটা ভুললে চলবে না যে, পঞ্চদশ শতকের আগে অসমীয়া সাহিত্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা কেউ স্বীকার করেননি। উক্ত শতাব্দীর আগে পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ ও আসামে একই উপভাষা চালিত হয়েছিল, তারপর অসমীয়া ভাষা ভিন্ন ধারায় বইতে শুরু করে বাংলা ভাষার অধীনতা অস্বীকার করে।

উনবিংশ শতাব্দীতে প্রথম বাস্তবিক বিরোধ দেখা দিল। শিক্ষার মাধ্যম কি হবে এই নিয়ে চলল নানা বাদানুবাদ। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে আসাম রাজ্য পুরোপুরি বৃটিশ সিংহের মুঠোতে আসে। দশ বছর বাদে আসামের আদালত ও ইস্কুলসমূহে বাংলার প্রচলন শুরু হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে পর্যন্ত অন্তত পনেরো বছর অসমীয়া ভাষা আদালত প্রভৃতিতে চলছিল। তারও পূর্বে ফার্সিকে হটিয়ে ইংরেজী জবরদখল করেছিল। তারপর প্রচুর আন্দোলনের পর ১৮৭২ সালে ক্যাম্বেল সাহেবের হুকুমত নামানুসারে শিক্ষা ও আদালতের ভাষা হল অসমীয়া।

গত শতাব্দীর মোঝামাঝি শিক্ষার বিষয় নিয়ে যখন অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল, সেই সময় শিবসাগর ব্যাপিস্ট মিশন প্রেস থেকে বেনামা একটি পুস্তিকা প্রকাশ পেল—A few Remarks on the Assamese Language এই নামে। মিঃ ই এ গেট সাহেব তাঁর Report on the Progress of the Historical Research in Assam-এ এ-বিষয়ে উল্লেখ করলেন ঃ

"For some years after the annexation of Assam Valley the old schools or tols for teaching of Sanskrit were maintained. Subsequently, the tols were replaced by modern Vernacular Schools, in which Bengalee, which had already been declared to be the language of the courts, was made the mdium of instruction, the theory being that Assamese was only a dialct of Bengalee and had no literature of own. This view was eagerly refuted by the natives of the country and in 1855 a well written indication of the chains of Assamese to rank as a separate language was published under the title 'A' Few

রামায়ন
কৃত্তিবাস বিরচিত

কৃত্তিবাস রচিত রঘুবংশ কীর্তিকথা রস-সর্জনায় অপূর্ব। বাঙালীর অতি প্রিয় এই চিরায়ত কাব্য, ও ধর্মগ্রন্থটিকে সুন্দর চিত্রাবলী ও মনোরম পরিসাজে যুগরুচিসম্মত একটি অনিন্দ্য প্রকাশন করা হইয়াছে। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সারগর্ভ ভূমিকা সংযোজিত। প্রকাশন পারিপাট্যে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত। [দাম ঃ ৯,]

স্মরণীয় অনুষ্ঠানে অনুপম উপহাররূপে পূর্ণাঙ্গ রামায়ণের
এই অভিজাত সংস্করণটি সপ্রশংস রুচির পরিচয়।
সংগ্রহে ও উপহারে রুচির পরিচয় এই রামায়ণ।
পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন।

সাহিত্য সংসদ ।ঃঃ ৩২৩ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯
॥ অন্যান্য পুস্তকালয়েও পাইবেন ॥

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.-প্রণীত

ব্যায়ামে বাঙালী	২.০০	বাংলার ঋষি	৩.০০
বীরত্বে বাঙালী	১.৫০	বাংলার মনীষী	১.২৫
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪.০০	বাংলার বিদুষী	২.০০
আচার্য জগদীশ	২.০০	রাজর্ষি রামমোহন	১.৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১.৫০	যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১.৫০
জীবন গড়া	.৭৫	রবীন্দ্রনাথ	১.২৫

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী • ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

জগদীশবাবুর গীতা

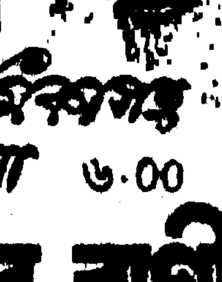

মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা অন্তর-রহস্য ভূমিকাসহ
অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়মূলক যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ৬.০০

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম — শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার সুষ্ঠু আলোচনা ৩.০০
ভারত-আত্মার বাণী — ভারতের শাশ্বতী সংস্কৃতির কথা ৩.০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১.৫০
কর্মবাণী ১.২৫

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী • ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

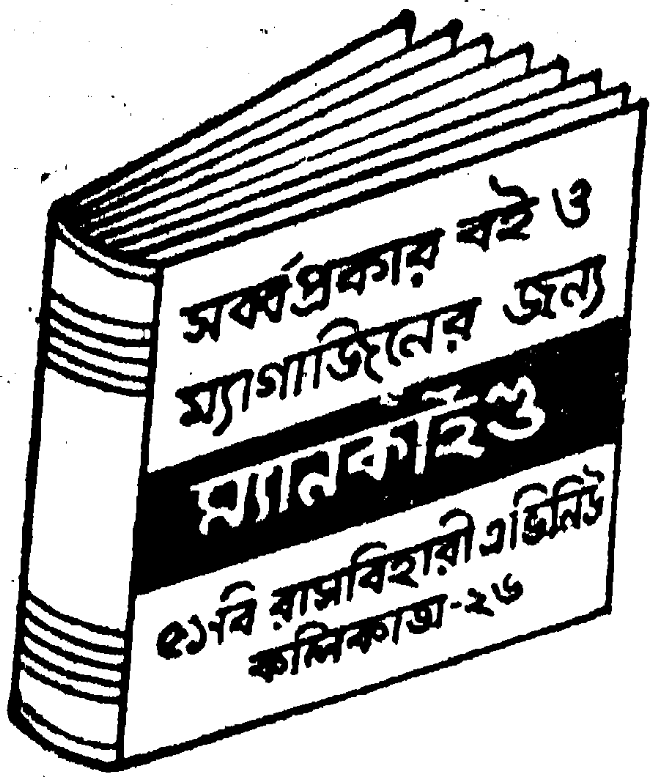

বিশেষ আকর্ষণ
খাটী গরুর দুধের সাদা চিনি পাতা
● টাটকা দই
ঘরে কাটান ছানার টাটকা
● স্পঞ্জ রসগোল্লা
কমলা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার
প্রায় অর্ধশতাব্দীর প্রতিষ্ঠান
আমহার্স্ট ষ্ট্রীট, কলিঃ-৯
ফোন : ৩৪-১৩৭৯

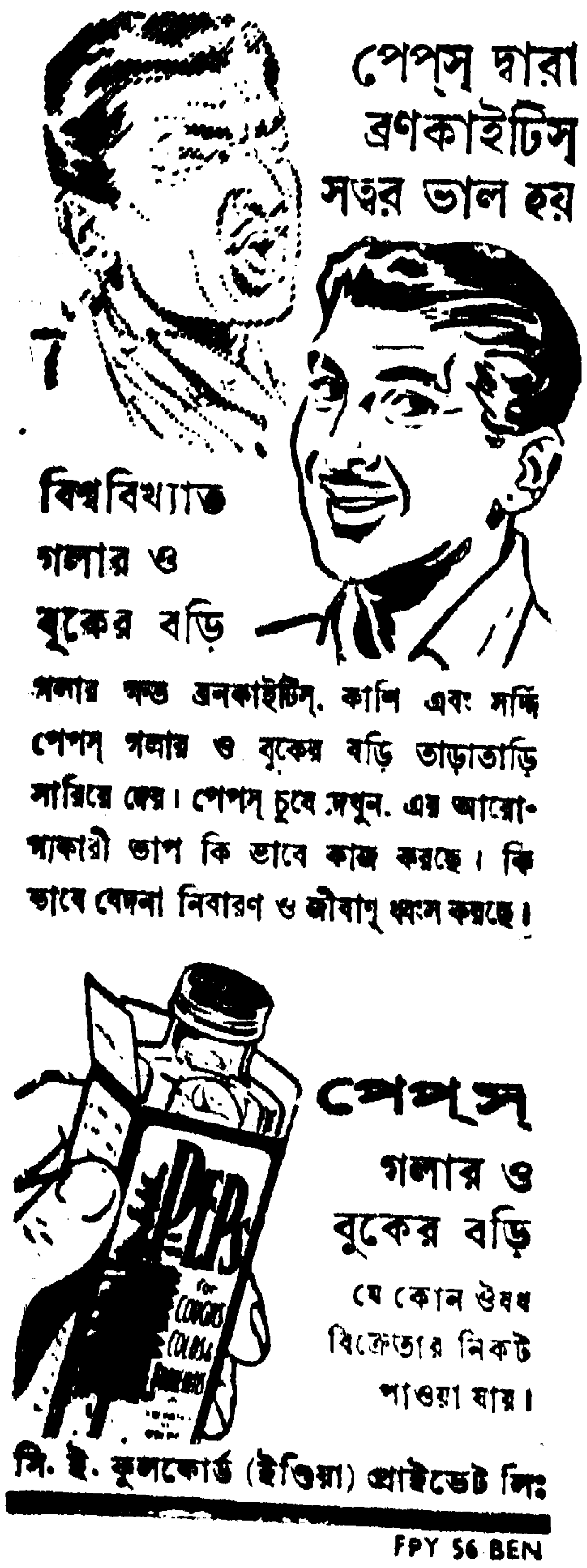

পরিবেশক—অসার্স কোম্প এণ্ড কোং লিঃ
১২সি চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১২

Remarks on the Assamese Language' at the Baptist Mission Press, Sibsagar......The writer goes to controverse the idea that Assamese had no literature and shows that prior to the beginning of the present century the Assamese Literature was more extensive than Bengalee."

অসমীয়া ভাষার আধুনিক অস্তিত্বের পিতৃস্বরূপ আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন (১৮৩০—১৮৫৯) এই পুস্তিকার লেখক এটা পরে প্রকাশ পায়। এই কিতাবে অসমীয়া কেবল দোয়ান (Jargon) বা অপভাষা এবং শিক্ষার অনুপযুক্ত একথা অস্বীকার করা হয়। লেখক এই দাবিও জানান, ১৮০০ খৃষ্টাব্দে অসমীয়া ভাষা বাংলার চেয়েও বহুগুণে প্রবলতর ছিল। চারশো বছর আগে, রাম সরস্বতী এবং শ্রীশঙ্করদেব কৃত্তিবাস—কাশীদাসেরও আগে, রামায়ণ মহাভারত অসমীয়াতে অনুবাদ করেন। সেই সময় আরো অন্যান্য লেখক অসমীয়া গদ্য ও পদ্যে শ্রীমৎ ভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবত গীতা লেখেন। কেবল ধর্ম বেজালি বুরঞ্জী সংস্কৃত থেকে অনূদিত হচ্ছিল তাই নয়, ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অসমীয়া মৌলিক ইতিহাসও লেখা হচ্ছিল। ঢেকিয়াল ফুকন তাঁর গ্রন্থে বহু অনূদিত এবং মৌলিক অসমীয়া পুঁথির ফিরিস্তি দেন।

মোদ্দা কথা, অসমীয়া যে একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বা সুকীয়া ভাষা এই নিয়ে সেদিনকার আসাম-নেতৃবৃন্দ উঠে পড়ে লেগেছিলেন এবং গুণাভিরাম বড়ুয়া, হেমচন্দ্র বড়ুয়া প্রভৃতিদের অসীম প্রচেষ্টায় আর এণ্ডার্সন সাহেবের উনিশ শতকের শেষাশেষি এশিয়াটিক জার্নালের প্রবন্ধ প্রমাণিত করার চেষ্টা করল যে, অসমীয়া আদতেই আলাদা ভাষা, এর সংগে বাঙলার কোন সম্পর্ক নেই।

দুই

বিরোধের মূলসূত্র আবিষ্কার করতে হলে ভাষাচার্যদের দ্বারস্থ হতে হয়। অথচ ভারতবর্ষের কোন প্রাদেশিক সাহিত্যের ইতিহাস আজ পর্যন্ত সুনিরূপিত হয়নি। কোন্‌টা কার নির্ণয়ের প্রশ্নেই যতো ঝামেলা। অথচ প্রতিবেশীর সাহিত্যচর্চা করতে গেলেই ভয় হয়, এই বুঝি গোল বাধলো। বৌদ্ধগান ও দোহা উড়িষ্যার না বাঙলার? চর্যাপদের প্রযুক্ত শব্দগুলো বাঙলা না উড়িষ্যা ভাষার? গোপাল উড়ে, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কোন্ প্রদেশবাসী? তেমনি ডাকের বচন (এই ডাকের বচনকেই বর্তমান অসমীয়া ভাষার আদিম ভাষা বলা হয়ে থাকে). চাঁদ-বেহুলার উপাখ্যান, অনন্ত কন্দলী নিয়েও বাঙলার সংগে অসমীয়ার ঝগড়া চলছে।

খনাকে নিয়ে অসমীয়া সাহিত্য দাবীদার হয়নি, কিন্তু ডাকের বচনের আদত হিস্যা ছাড়তে এ সাহিত্য নিতান্তই গররাজী। অলিখিত যুগের ডাকের বচন জনজিহ্বায় এতো ছড়িয়েছিল যে, বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা সহ সুদূর নেপাল পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এই বচনগুলোর রচনাকাল নিয়ে মতদ্বৈধ আছে, অসমীয়া সাহিত্যের চানেকী সরল মনে একে শঙ্করী যুগের পূর্বে রচিত বলে অনুমান করছেন। এবং কোন কোন লেখক আসামের "লোহি ডাঙ্গরা" (বর্তমান নাথ লোহু) কুমোর ডাকের জন্মস্থান বলে দাবি করেছেন। কিন্তু বাঙলার ডাক গোপ।

দীনেশ সেন মনে করেন, "চলতি কথা" অর্থে ডাকের বচন ব্যবহৃত হতে পারে। "ভাব ও ভাষা দৃষ্টে বোধ হয় ৮০০—১২০০ খৃঃ অব্দের মধ্যে এই সকল বচন রচিত হইয়াছিল। যুগে যুগে ভাষার সংস্কার হওয়াতে সেগুলি বর্তমান সহজাকারে পরিণত হইয়াছে। উহারা এক জাতির সম্পত্তি: হয়তো প্রাচীনকালে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিই অজ্ঞাতসারে উহাদের রচনার সাহায্য করিয়াছে। কোন ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা এ সমস্ত রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।"

ডাকের বচনগুলো সংস্কৃতে রচিত হয়নি এ প্রমাণ আছে। কিন্তু এগুলো খাঁটি অসমীয়া বা বাঙলা ভাষার অন্তর্গত এ মনে করা ভুল। বরং দীনেশবাবুর মতো "প্রাকৃত গোছের" ভাষায় রচিত এটা ভাবাই ঠিক হবে। পরাগলী মহাভারতের মতো ডাক ও খনার বচনের ভাষা কোন কোন স্থানে এতো জটিল আর দুর্বোধ্য যে, এর অর্থ বার করা মুশকিল। কিন্তু স্বল্পবরত উভয় ভাষার সংগে যে সাদৃশ্য বিদ্যমান তাও লক্ষ্য করবার মতো।

প্রাচীন বাঙলা বৌদ্ধগণ (চর্যা-গান বা চর্যা-পদ) যেটা বাঙগালীর নিজস্ব বলে দাবি করা হয়ে থাকে, (১৯১৭ সালে নেপাল থেকে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিয়ে এলেন "চর্যা-চর্যাবিনিশ্চয়"—বাঙলার পণ্ডিতেরা প্রমাণ করলেন এটা বাঙলার) সেখানেও প্রাচীন অসমীয়া দাবী ত্যাগ করেনি।

"The 'Buddha-doles' or songs constitute another department of ancient Assamese literature: these compositions were done by popular preachers of the Buddhistic religion, the linguistic pecularities of which connect them with the old Assamese linguistic forms." (The Red River and the Blue Hill by Hem Barua).

কামরূপী ও মৈথিলীর মিশ্র উপভাষায় সে সব [illegible] বলে উক্ত লেখক মনে করছেন।

পরাগল খাঁর অনুরোধে যে সাহিত্য-

রচিত হল তার নাম পরাগলী মহাভারত, কবীন্দ্র সঞ্জয় রচিত এই মহাভারতকে "পদ মহাভারত" বলে অসমীয়া সাহিত্য দাবী করেন। তেমনি বিশিষ্ট ধর্মপ্রচারক অনন্ত কন্দলীকে নিয়ে যথেষ্ট কোন্দল হয়েছে। তাঁর রচিত "অনন্ত রামায়ণ"ই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন এই রামায়ণ কৃত্তিবাসের আগে রচিত হয়েছিল বলে দাবী করেছিলেন। দীনেশ সেন ও ঢেকিয়াল ফুকন উভয়েই রাম সরস্বতীর অপর নাম অনন্ত কন্দলী বলে ভুল ধারণা করে আসছিলেন। সম্প্রতি জানা গেছে, এরা পৃথক ব্যক্তি। অনন্ত রামায়ণ ছাড়া কন্দলী কুমার হরণ, মহীরাবণ বধ, জন্মরহস্য কথাসূত্র প্রভৃতি লিখেছেন, আর রাম সরস্বতীর কাব্যগুলো হল ভীমচরিত, লক্ষ্মীচরিত, কুলাচলবধ ইত্যাদি ইত্যাদি। শেষোক্ত জন শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের আদেশে মহাভারতেরও কিছু অনুবাদ করেন।

অনন্ত কন্দলী সম্পর্কে দীনেশবাবুর মন্তব্যঃ "চট্টগ্রামের কবি পরমেশ্বরকে আমরা যেরূপে আত্মসাৎ করিয়াছি—অনন্তকেও সেইভাবে দাবী করিব। তিনি যে ভাষায় বহি লিখিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গদেশের পূর্ব সীমান্তের ভাষা, তিনি আসামবাসী কিন্তু বঙ্গভাষাভাষী, অর্থাৎ তাঁহার সময়ে আসাম-প্রচলিত লিখিত ভাষার সঙ্গে তৎকালীন বঙ্গীয় কবিদের ভাষার তেমন কোন পার্থক্য নাই।"

বাঙলা এবং অসমীয়া উভয় ভাষাই 'আপাতদৃষ্টিতে সমধর্মী ও এক গোত্রজ বলে নৈকট্য চোখে পড়ে। প্রাচীন সাহিত্য থেকেই ধরা যাক।

		শব্দ	অসমীয়া
বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণ		গোহারি	গোহারি
" "	:	তিতা	তিতা
সঞ্জয়কৃত মহাভারত	:	কোনি	কিয় কেলে
কৃত্তিবাসী রামায়ণ	:	ভোক	ভোগ
" "	:	লোহ	লোহ
অনন্ত রামায়ণ	:	তাইক	তাইক
" "	:	বুঢ়া	বুঢ়া

তারপর প্রাকৃত বা অপভ্রংশ থেকে শব্দের রূপান্তরও লক্ষণীয় :

শব্দ	প্রাকৃত	অপভ্রংশ	অসমীয়া	বাংলা
হৃদয়	হিঅঅ	—	হিয়া	হিয়া
স্নেহ	সেনহ	—	চেনেহ	স্নেহ
হস্ত	হত্থ	—	হাত	হাত
কর্ম	কম্ম	কাম	কাম	কাম
সপ্ত	সত্ত	সাত	সাত	সাত

ভাষার মূল হলো শব্দ। তৎসম, তদ্ভব, দেশী এবং বিদেশী প্রধানত এই চার শ্রেণীর শব্দ নিয়েই বাঙলা ও অসমীয়া ভাষা গড়ে উঠেছে। অতএব শব্দ-সাদৃশ্য যেমন অনাশ্চর্য নয়, অর্থঘটিত মিল থাকাটাও অপ্রত্যাশিত নয়। তবে ভাষা-বিজ্ঞানের রীতি হল দুই ভাষার শব্দসমূহের তুলনামূলক আলোচনা করার সময় কেবল লিখিত রূপটাই ধর্তব্য নয়, তার প্রকৃত উচ্চারণ প্রণালীও লক্ষ্য করা উচিত। অতি সাদৃশ্য যেমনঃ

তৎসম	অর্ধতৎসম
ভক্তি	ভকতি
মর্ম	মরম
রত্ন	রতন
যত্ন	যতন

তদ্ভব বা প্রাকৃতজ শব্দ যেমনঃ নাক, গরু, তুমি ও তিনি ইত্যাদি। দেশী শব্দের মধ্যে কদলী, লাড়ু, তামোল বা তাম্বুল ও হাড়ী ইত্যাদি। বিদেশীঃ চাহিদা (হিন্দী), নবাব (ফার্সী), গীর্জা (পর্তুগীজ), গুদাম (মালয়), চিনি বা চেনি (চীন) সাবান বা চাবোন (ফ্রান্স) এবং স্টেশন (ইংরেজী)

অতএব এক গোত্র ও সমধর্মিতার নৈকট্য ভাষার বিরোধকে ঘনিয়ে আনতে সহায়তা করেছে এটা ঠিক। অনেক সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিকেও দেখা গেছে যারা কেবলমাত্র মাতৃভাষার প্রতি অতি-আনুগত্যবশতঃ বহু বিদেশী শব্দকে, প্রতিবেশী অবশ্যই আছে, আত্মীয়ের চেয়ে বেশী ভেবে থাকেন। আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন সমালোচকেরা যে এ ব্যাপারে একেবারে উদাসীন তাও বলা যায় না। কেননা, তাঁরা আবার দিব্যি 'জাত গেলো' বলে অনুপ্রবিষ্ট শব্দকে অপাংক্তেয় করার চেষ্টায় ব্রতী। এবং মাসতুতো বোন হয়ে সংস্কৃত-মাসির ঘাড়ে বেবাক দোষ চাপিয়ে একপ্রকারের পাশ কাটানোর প্রচেষ্টাও মাঝে মাঝে দেখা যায়।

পাশাপাশি একাধিক ভাষা যখন সহ অবস্থানের পর্যায়ে থাকে, তখন সেটা একেবারে সম্পর্কহীন হয়ে থাকতে পারে না। নানা কারণে, বিশেষত রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক কি ধর্মীয় সূত্রে একটা ভাষার উপর অন্যটা কমবেশী প্রভাব বিস্তার করেই এবং এটাই হল অতি স্বাভাবিক নিয়ম। ধারে হোক, প্রয়োজনে হোক যে কোন শব্দ যদি ভাষাকে সমৃদ্ধ করার ক্ষমতা রাখে, তাকে স্বাগত জানানো প্রথম কথা। বাঙলা শব্দ 'রসগোল্লা' খেয়ে যদি অসমীয়া ভাষা কেলেঙ্কারি না করেন, বাঙলা ভাষারও উচিত অসমীয়া শব্দ "তামোল" চিবিয়ে "খং" না করা!

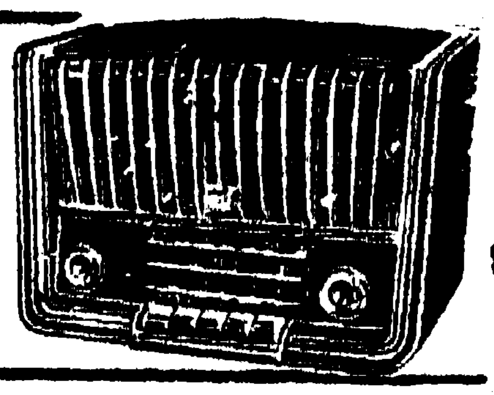

এইচ জি. ই. সি. (সাবা) পশ্চিম জার্মানী, আর এ রেডিও এবং সুলভ মূল্যে বিভিন্ন মডেলের ট্রানসিস্টার রেডিও বিক্রয় ও মেরামত হয়।

মনি রেডিও প্রোডাক্টস্‌
১৫৭বি, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত

সাধারণ মানুষের একটি রূপ আছে, যে রূপটিকে বলা যায় বিশ্বজনীন। দেশ ভেদে, সময় ভেদে তার বিশেষ তারতম্য নেই। কিন্তু এছাড়াও মানুষের একটি জাতিগত-রূপ আছে, যা দেশ-কাল ভেদে আপন ঐতিহ্য অনুযায়ী গড়ে ওঠে এবং যা মানুষের বিশ্বজনীন রূপ থেকে খানিকটা স্বতন্ত্রও বটে। জাতীয় জীবনদর্শন ও ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করলে বিষয়টি আরও পরিস্ফুট হয়। ভারতীয় দর্শন, ধর্ম ও সাহিত্যে 'শক্তি-সাধনা' একটি বিশিষ্ট আসনে প্রতিষ্ঠিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর দাশগুপ্ত এই গ্রন্থটিতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শক্তি-সাধনার ও শাক্ত সাহিত্যের তথ্য-সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক আলোচনা করে এদেশের ঐতিহ্যের এই দিকটা রূপায়িত করেছেন; শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে শাক্তধর্মের আধ্যাত্মিক রূপটিও তুলে ধরেছেন। বিদগ্ধ ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকমণ্ডলীর কাছে বইটি অপরিহার্য। দাম পনর টাকা।

সাহিত্য সংসদ । ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা—৯

ব্রিটানিয়া
থিন অ্যারারুট
আজকাল ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট বিস্কুট (তা ছাড়া ব্রিটানিয়ার অন্য সমস্ত বিস্কুটও) স্বাদে, গন্ধে ও গুণে আরো ভালো, আরো চমৎকার, কেমনা ব্রিটানিয়া বিস্কুট এখন অভূতপূর্ব টার্বো-রেডিয়্যান্ট প্ল্যান্টে তৈরী হয়—বিস্কুট তৈরীর এ ধরণের প্ল্যান্ট সারা ভারতে দ্বিতীয়টি নেই। এই প্ল্যান্টে আরো নিখুঁতভাবে পুরোপুরি সেঁকা হয় ব'লে ব্রিটানিয়া বিস্কুট মাত্রেই আশ্চর্য কুড়মুড়ে, স্বাদে-গন্ধে অপূর্ব এবং বিশেষ ক'রে পুষ্টিতে ভরপুর থাকে।
খেতে চমৎকার...
আর পুষ্টিতে ভরপুর
BRITANNIA
THIN ARROWROOT
Better Biscuits
BRITANNIA
THIN ARROWROOT
ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট বিস্কুটই বাজারে উৎকৃষ্ট। পুষ্টিকর, স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো, অথচ এত সহজে হজম হয় যে ডাক্তাররা পুষ্টিদায়ক হালকা খাবার হিসেবে সব সময়ই এই বিস্কুট খেতে বলেন। আপনার বাড়ীর জন্যে চাই স্বাদে, গন্ধে ও উপকারিতায় সবচেয়ে উৎকৃষ্ট বিস্কুট ব্রিটানিয়া।
ব্রিটানিয়া
বিস্কুট
IS 1011
দি ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানী লিমিটেড

প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(৫২)

‘কী কথা?’ এক পা এগুলো বরেন।

‘শুনুন। বসুন শান্ত হয়ে।’ চেষ্টা করে ক্ষীণরেখায় হাসল কাকলি।

‘বেশ। বসলাম।’ চেয়ারটা বরং আরো কাছে টেনে নিয়ে বরেন বসল।

‘অস্থির হবেন না।’ যেন শোকার্তকে সারহীন সান্ত্বনা দিচ্ছে কাকলির নিজের কানেই এমনি বাজে শোনাল।

‘না, না, আমি খুব স্থির।’

‘স্থির?’

‘হ্যাঁ, সংকল্পে স্থির। আমার প্রাপ্য— আমি আজ কিছুতেই ছেড়ে দেব না।’

‘প্রাপ্য?’ রুক্ষ হবার মত সাহস নেই, করুণ রেখায় আবার হাসল কাকলি।

‘একশোবার প্রাপ্য। আদালত তাই সাব্যস্ত করে দিয়েছে।’

‘বা, আদালত আবার কী সাব্যস্ত করল?’ কাকলি অবাক হবার ভাব করল। যতটা সাধ্য দীর্ঘ করা যাক কথাবার্তা। যদি দীর্ঘ করলে ইতিমধ্যে কিছু প্রতিবন্ধক জুটে যায়।

‘ন্যাকামো করো না।’ ধমকে উঠল বরেন। ‘আদালত বলে দিয়েছে তুমি আমার। ন্যায়ে না হোক অন্তত অন্যায়ে। সুতরাং—’

‘আদালত কি ওভাবে কিছু বলেছে?’ চোখের দৃষ্টিটাকেও একটু দীর্ঘ করল কাকলি।

‘ভাব যাই হোক, বলে দিয়েছে তুমি আমার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত।’ বরেন চেয়ারে হেলান দিতে চাইল, পারল না। ‘ও কথার শুধু একটা মাত্রই মানে। সুতরাং—’

কাকলি এবার চোখেও হাসল। বললে, ‘মোটেই নয়। ব্যভিচার কথাটার একাধিক মানে। যে কোনো অন্যথাচরণই ব্যভিচার।’

‘রাখো।’ আবার ধমকে উঠল বরেন। ‘কথাটা বাঙলা নয়, কথাটা ইংরিজি। অ্যাডালটারি। ও কথাটার একটিমাত্রই মানে। সেই লিভিং ইন অ্যাডালটারি। সুতরাং আমার সঙ্গে রাত কাটালে তোমাকে এমন কিছু দোষগ্রস্ত দেখাবে না। তুমি যদি আদালতেও যাও, আদালত বলবে, বা, এতে আবার নালিশ কী, এ তো জানা কথা। এ তো ঠিকই হয়েছে, এ রকমই তো হবে, হওয়া উচিত।’

‘আদালত তার নিজের বুদ্ধিতে কী বলবে তাই মেনে নিতে হবে?’ কাকলি আবার একটু গম্ভীর হবার চেষ্টা করল।

‘নিশ্চয় নিতে হবে। আদালত যে ডিভোর্সের ডিক্রি দিয়েছে তা মেনে নাওনি?’ মুখিয়ে উঠল বরেন। ‘তা যদি নিয়ে থাকো তবে যে সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সেই ডিক্রি, তাকেও মানতে হবে।’ চেয়ারটা আরো একটু কাছে, পাশে, টেনে এনে বরেন কাকলির একটা হাত মুঠো করে চেপে ধরল। ‘সুতরাং ওঠো, চলো—’

‘আদালতের বিচারে কি ভুল হয় না?’ হাসি-হাসি মুখ করল বটে কাকলি, কিন্তু কান্না-কান্না শোনাল।

‘না, কী করে হবে! সেই আদালতের বিচার তোমার নিজের স্বীকৃতিতে। তা তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন? সুতরাং এস।’ হাত ধরে টানল বরেন। ‘আর তোমার এখন ফিরে যাবার পথ নেই।’

‘তার মানে বলতে চান আদালতের মান রাখতে এখন প্রাণ দেব?’

‘শুধু প্রাণটুকুই দেবে না, আর বাকি সমস্ত কিছু দেবে।’

‘কিন্তু,’ হাতটা ধীরে ছাড়িয়ে নিল কাকলি, ‘আদালতের বিচার যাই হোক, আপনার বিচারে ভুল থাকে কেন?’

‘ভুল?’

‘হ্যাঁ, ভুল বৈকি। আদালতের মামলায় আমার না হয় সম্মতি ছিল কিন্তু আপনার এ বর্তমান মামলায় আমার বিন্দুমাত্র সম্মতি নেই।’ একটু বা কঠোর শোনাল কাকলিকে। ‘সুতরাং সে ক্ষেত্রে—’

‘তোমার সম্মতি-অসম্মতি অবান্তর।’ উঠে দাঁড়াল বরেন, কাকলির কাঁধের উপর দৃপ্ত হাত রাখল, বললে, ‘ওঠো। নইলে জোর করে, কোলে করে তুলে নিয়ে যাব।’

মূর্তি দেখে ভয় পেল কাকলি। বন্যতায় বিশাল দেখাচ্ছে বরেনকে। উদগ্র, উদ্ধত। অপ্রতিবার্য। খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে-পড়া ক্ষুধার্ত শ্বাপদের মত। হয়তো বা বঞ্চিত বলে আহত বলে বেশি ক্রুদ্ধ।

এবার পূজায় ছোটদের দুটি অপূর্ব বই

ছড়া-সঞ্চয়ন

প্রাচীন ও আধুনিক ছড়ার অভিনব সঙ্কলন

শ্যামলা-দীঘির ঈশান কোণে

মিষ্টি ছন্দে মনোরম কাহিনী

পাতায় পাতায় রঙীন ছবি

= প্রতিটি আড়াই টাকা =

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ কলিকাতা-৯

ভারতের চিরায়ত সাহিত্য

কালিদাসের

শকুন্তলা

স্বচ্ছন্দ আধুনিক গদ্যে সরল ভাষান্তরণ

বহু দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান চিত্রে শোভিত।

দাম— ৫.৭৫

শূদ্রকের

মৃচ্ছকটিক

শেকসপীয়রের লেখা নয় কিন্তু পৃথিবীর প্রথম শেকসপীয়রীয় নাটক।

দাম—৪.৫০

অনুবাদক—শত্রুজিৎ দাশগুপ্ত (সভূর্বাদ)

চিরায়ত সাহিত্য

১৬এস, ডোভার লেন, কলিকাতা।

কিন্তু এখন কার্কাল কী করবে? কী করতে পারে?

কাঁদবে? যেমন করে নিপীড়িতারা কাঁদে? না কি পায়ে পড়ে মিনতি করবে? যেমন করে অসহায়ারা ভিক্ষে চায়?

ভাবতেও সমস্ত শরীর রি-রি করে উঠল কার্কালির।

নইলে কি চোঁচাবে? চেঁচিয়ে লোক ডাকবে? কে কোথায় আছো আমাকে বাঁচাও, এই বলে রব তুলবে? নয়তো, চোর, চোর, ডাকাত, ডাকাত—এমনি একটা ঢালা চিৎকার?

এ আরো লজ্জাকর।

তা ছাড়া মিনতিতে ভিজবে বা কান্নায় গলবে বরেনের এই এখন চেহারাই নয়। বরং ঐ বিগলিত ভঙ্গিতে তার সুবিধে-সুযোগ আরো বেড়ে যাবে। আর চেঁচিয়েই আশু কোনো ফল হবে এমন মনে হয় না। গলার পর্দা কত উঁচুতে তুলতে পারবে? স্টেজে রিহার্সেল দেওয়া থাকলে বরং সহজ ছিল। আর স্বর উচ্চ গ্রামে তুলতে পারলেও বা শুনছে কে? যারা আশে-পাশে আছে, মালী বা ড্রাইভার, তাদের কানে যদি আওয়াজ ঢোকেও, শুনেও শুনবে না। তা ছাড়া এখন বুঝি জোরে হাওয়া দিয়েছে বাইরে। ঝোড়ো হাওয়া। বৃষ্টি-বৃষ্টি আকাশ। কে কার আর্তনাদ শোনবার জন্যে কান পেতে আছে?

নখে-দাঁতে লড়তে পারে অবশ্যি। তা না হয় লড়ল। কিন্তু যে রকম ভয়ানক দেখতে হয়েছে বরেনকে, শারীরিক শক্তিতে ওর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে এমন ভরসা হয় না। শেষ পর্যন্ত নিরস্ত তো করতে পারবেই না, মাঝখানে নিজে জখম হবে প্রকাশ্যে মুখে-গালে রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন বয়ে বেড়াবে—সে আরেক কলঙ্ক, দ্বিগুণ কলঙ্ক। হাতাহাতি ঝটাপটি শুরু হলে শেষ পর্যন্ত মরীয়া হয়ে উঠবে বরেন, আর যেমন দুর্বার তার মূর্তি, কোনো কিছুতেই সে পেছপা হবে না। যে মুহূর্তে সে সন্দেহ করেছে কার্কালর সরে পড়ার মতলব সে মুহূর্তে সে হঠকারিতার তুঙ্গে এসে উঠেছে। চাই কি, গলা টিপে মেরেও ফেলতে পারে বোধহয়। অতদূর না যাক, মারাত্মক আঘাত করতে কসুর করবে না।

তবে উপায় কী?

এখানে এসেছে বলে অনুতাপ হচ্ছে কার্কালর। ঘটনা এমন একটা বিসদৃশ চেহারা নেবে আঁচ করতে পারেনি। বাধা সরে যাওয়া সত্ত্বেও বিয়ে পিছিয়ে দিতে চাইছে এতে খুব বেশি ক্ষুণ্ণ না হয় তারই জন্যে বরেনকে প্রশস্ত সঙ্গ দেবার খাতিরে ফার্ম দেখতে রাজি হয়েছিল। ভাবেনি আজই, এক্ষুনি এক্ষুনি এমনি উদ্দাম হয়ে উঠবে। এমনি একটা বিপন্ময় মুহূর্তে না আসে তারই জন্যে সজাগ থাকতে-থাকতে কখন একটু হঠাৎ শিথিল হয়ে পড়েছিল, আর তারই জন্যে এই লাঞ্ছনা।

এখন করে কী কার্কাল?

চারদিকে আর্ত চোখে তাকাল নিঃস্বের মত। কোনো পথ নেই, উপায় নেই। রাজিই বোধহয় হতে হয় শেষ পর্যন্ত।

'শেষকালে গায়ের জোর দেখাবেন?' করুণ চোখে তাকাল কার্কাল।

'হ্যাঁ, তাই তো দেখাব। গায়ের জোর ছাড়া আমার আর কী আছে! এখন তো একমাত্র গায়ের জোরেই আমি পুরুষ তোমার কাছে।'

'কিন্তু গায়ের জোর কি সম্ভ্রান্ত?'

'সম্ভ্রান্ত হবার মত ভ্রান্ত আর আমি নই। গায়ে যে এখনো গেঞ্জিটা আছে এই যথেষ্ট। এক টানে এটাও এখন খুলে ফেলব। শোনো,' কাঁধ ছেড়ে দিয়ে বরেন দাঁড়াল মুখোমুখি। 'যে য়্যাডালটারার সে আবার সম্ভ্রান্ত কবে?'

'ডিক্রি হয়ে যাবার পর আর য়্যাডালটারি কোথায়?' কার্কাল আবার হাসিমুখ করল। 'বিয়েই যেখানে নাকচ হয়ে গেল সেখানে আর য়্যাডালটারির অবকাশ নেই। সেখানে য়্যাডালটারিও নাকচ হয়ে গেল। সুতরাং—'

'তোমার ও সব সূক্ষ্ম তর্কে আমি আর বিভ্রান্ত হতে রাজি নই। নাও, ওঠো।' বরেন আরো ঘেঁষে এল। 'য়্যাডালটারির কেস আর না থাক, বিয়ের কেসটা তো আছে। তুমি নিজের হাতে নোটিশে সই করে দিয়েছ। কি, সেটা তোমার সম্মতি-দলিল নয়? বর্তমান মামলায় তোমার সম্মতি নেই, তোমার একথা আর খাটে না।'

'বা, বিয়েতে মত তো আমার আছেই। তাই বলে বিয়েটা ঘটবার আগেই—'

'রাখো।' হুমকে উঠল বরেন। 'তোমার আর কোনো ছলনাতে আমি ভুলছি না। আমার জাতও যাবে পেটও ভরবে না, এ অসম্ভব। বদনাম কিনব অথচ বিয়ে দিয়ে ঢাকতে পারব না, দুই ইনিংসেই আমি গোল্লা খাব—এ সহ্যের বাইরে। সুতরাং—' বরেন বাহু ধরল কার্কালর।

'প্লিজ—' মিনতি মাখানো সজল চোখে কার্কাল।

'ও সব পুরোনো হয়ে গিয়েছে।' জোরে কার্কালকে আকর্ষণ করল বরেন। 'রাত বেশি করে লাভ নেই। ওঠো, চলো।'

'কোথায় যাব?' উঠে পড়ল কার্কাল।

'ঘুমুতে চলো।'

কার্কাল ফের বসল চেয়ারে। গম্ভীর হয়ে দৃঢ়স্বরে বললে, 'এ হয় না।'

'একশো বার হয়।' বরেন এবার দুই বাহু ধরে সবলে কার্কালকে দাঁড় করিয়ে দিল।

'আমি যেখানে 'না' বলছি আপনি সেখানে পাশবিক জোর দেখাবেন?'

'পাশবিক জোর আছেই তো দেখাবার জন্যে?'

'তা হলে আপনি আমাকে ভালোবাসেননি একটুও?'

'যেন তুমিই আমাকে বেসেছ! শোনো,' বরেন আরো নিবিড়ে আকর্ষণ করতে চাইল কার্কালকে। 'তোমার সকল সুবিধে একে-একে আদায় করে নিয়ে তুমি সরে পড়বে, আর আমি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকব এ ভালোবাসায় আর বিশ্বাস নেই।'

'তবে এখন কিসে বিশ্বাস?'

'এখন বিশ্বাস শুধু পৌরুষে। পাশবিকতায়।' বরেন কার্কালকে আলিঙ্গন করে ধরল।

চোখে অন্ধকার দেখল কার্কাল। অনুভব করল শরীরে এমন শক্তি নেই যে দুর্ধর্ষ বরেনকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে মাটিতে। গলায় এক তন্তু আওয়াজ আনতে পারে।

উপায় নেই। রাজিই হতে হয় শেষ পর্যন্ত।

'বাব্বাঃ, তুমি কী জবরদস্ত! কিছুতেই ছেড়ে দেবে না।' লোলকটাক্ষে তাকাল কার্কাল। 'সাধ্য কী তোমার কাছে হার না মানি। সব না দিয়ে দিই তোমাকে।'

সম্ভাষণের মদিরতায় অভিভূত হয়ে গেল বরেন। গদগদস্বরে বললে, 'তবে—'

'যাও, শোও গে,' স্থির নিষ্কম্পস্বরে বললে কার্কাল, 'আমি ওখান থেকে একটু ঘুরে আসছি।'

'কোনখান থেকে?'

'আহাহা—বাথরুম থেকে।'

বরেন ছেড়ে দিল আলিঙ্গন। আর

ধবল বা শ্বেত

শরীরের যে কোন স্থানের সাদা দাগ একজিমা, সোরাইসিস ও অন্যান্য কঠিন চর্মরোগ, গাত্রে উচ্চবর্ণের অসাড়যুক্ত দাগ ফুলা, আঙ্গুলের বক্রতা ও দূষিত ক্ষত সেবনীয় ও বাহ্য দ্বারা দ্রুত নিরাময় করা হয়। আর পুনঃ প্রকাশ হয় না। সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট হাওড়া। ফোন : ৬৭-২৩৫৯। শাখা : ৩৬ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯। (পূরবী সিনেমার পাশে)।

কে, হোড়ের
কনক
পাউডার

তক্ষুনি ত্বরিত পায়ে কাকলি ঢুকে পড়ল বাথরুমে। দরজায় ছিটকিনি দিল।

গভীর করে নিশ্বাস ফেলল আরামের। আর তাকে পায় কে! দরজার ওপার থেকে শত ধাক্কা দিলেও কিছুতেই খুলবে না কাকলি। একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত করবে না। যাতে বরেনের সন্দেহ হয় কাকলি ভয়ানক কিছু করেছে, হয়তো বা আত্মহত্যা করেছে। দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকতে বেশ তাকে ভাবতে হবে, জড়ো করতে হবে লোকজন, হয়তো বা খবর দিতে হবে পুলিসে। আর পুলিসের সামনে, লোকজনের সামনে দরজা ভাঙা হলে তার আর ভয় কী!

সমাধান আরো সহজ মনে হল। কাকলি দেখল বাইরের দিকে বাথরুমের আর একটা দরজা আছে। ঐ দরজা দিয়েই বোধহয় মেথর আসে পরিষ্কার করতে।

ঐ দরজা খুলেই পালাবে কাকলি।

ড্রাইভারকে বললে তাকে বড় রাস্তায় পৌঁছে দেবে না? কিংবা বাস-টার্মিনাস? কিংবা যতক্ষণ না নাগাল পায় একটা ট্যাক্সির?

কী বললে একা কাকলিকে নিয়ে ড্রাইভার গাড়ি চালাতে রাজি হবে তাও বুঝি একটু ভাবা দরকার।

সে পরে হবে। আসল হচ্ছে বেরিয়ে পড়া।

যদি ড্রাইভার রাজি নাও হয়, পায়ে হেঁটে, ছুটেই, এগোবে কাকলি। অন্ধকারেই পথ করে নেবে।

বাইরে নিশ্চয়ই বরেন আর তাকে তাড়া করবে না। আর যদি পিছু নেয়ও, পারবে না আয়ত্তে আনতে। হামলায় মাততে, হাত ধরে টানাটানি করতে। আর যদি বাড়ি পর্যন্ত চলে আসে, সে অন্য ভূমিকায়, অন্য পরিবেশে। অন্তত ভদ্রলোকের জামা-কাপড়ে।

টুক করে বাইরের দরজাটা খুলে বেরিয়ে পড়ল কাকলি। অন্ধকার, তবু যেন গাড়ির মধ্যেই ঘুমুচ্ছে ড্রাইভার।।

'এই। শোনো।' কাকলি যতদূর সম্ভব আতঙ্ক মন্থর করল কণ্ঠস্বর।

চটকা ভেঙে উঠে পড়ল ড্রাইভার।

'কাছাকাছি কোথাও একটা ডাক্তারখানা আছে?' দরজা খুলে তাড়াতাড়ি নিজেই ভিতরে ঢুকে পড়ল কাকলি। 'শিগগির। বাবুর একটা হার্ট-অ্যাটাক হয়েছে। বিছানায় খানিকক্ষণের জন্যে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি। ডাক্তারখানা পেলেই ডাক্তারের হদিস পাওয়া যাবে নিশ্চয়। শিগগির।'

আচ্ছন্নের মধ্য থেকে কী বুঝল ড্রাইভার, গাড়িতে স্টার্ট দিল।

হর্নও বুঝি দিতে হল কয়েকবার।

সন্দেহ কি, ধড়মড় করে উঠে পড়েছে বরেন। আর, যতই গাড়িটাকে দূরে নিয়ে যাওয়া ততই বরেনকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা, এ সহজ সত্য ভুলে গিয়ে নিরন্তর ভয়ে শিউরে উঠছে কাকলি, এই বুঝি বরেন তার পিছু নিল। ধরে ফেলল! পথ আটকাল সামনে দাঁড়িয়ে।

'ঐ ট্যাক্সিটা আসছে, ওটাকে আটকাও।' চেঁচিয়ে উঠল কাকলি।

ট্যাক্সিটা দাঁড়াল।

গাড়ি ছেড়ে দিল কাকলি। ড্রাইভারকে বললে, 'আমি এই ট্যাক্সি করেই ডাক্তার আনতে যাচ্ছি। তুমি ফিরে যাও গাড়ি নিয়ে। দেখ গিয়ে বাবুকে। এ সময় বাবুর কাছে একজনের থাকা দরকার।'

গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা মানেই একটা পাপের বিবর থেকে বেরিয়ে আসা। সমস্ত গা থেকে মালিন্যের শেষ পঙ্কটুকু মুছে ফেলা।

কিন্তু গাড়িটা ছেড়ে দেওয়া বুঝি বুদ্ধিমানের কাজ হল না। গাড়িটা পেয়েই বরং বরেন দ্রুততর অনুসরণের সুযোগ পাবে। পথে ধরতে না পায় একেবারে কাকলিদের বাড়ির দরজায় গিয়ে হাজির হবে, হাজির হবে বাঘের প্রশ্রয়ের খাসমহলে। কে জানে, কোথায় না জানি আছে শর্টকার্ট, রাস্তাঘাট সম্বন্ধে বরেন তার চেয়ে অনেক বেশি রপ্ত, ট্যাক্সির আগেই গিয়ে হাজির হবে। ট্যাক্সিকে সে তাদের পাড়া, খুব হলে তাদের রাস্তার নাম শুধু বলতে পারে। আর, ট্যাক্সিদের যা স্বভাব, যতদূর সাধ্য পথটাকে দীর্ঘ করতে চাইবে, মুখ দিয়ে না খেয়ে নাক দিয়ে খাবে। তাই বাড়িতে যাবার আগে আর কোথাও যাওয়া যায় না? যাতে মার কাছে নালিশ করতে গিয়ে বরেন দেখে বাড়িতেও কাকলি ফেরেনি।

সেই ভালো। একটা অভিভাবকত্বের অধীনে আশ্রয় নিতে পারলে কাকলি আরো নিশ্চিন্ত নিরাপত্তায় চলে আসে। তখন লড়বার ভূমিকা আর তার হাতে থাকে না। যার হাতে যায়, তার সামান্য সান্নিধ্যই তখন বোধহয় বিরাট দুর্গের কাজ করে।

ট্যাক্সিওয়ালাকে সুকান্তর হোটেলের ঠিকানা বললে কাকলি।

হাতঘড়িতে সময়টা এবার দেখে নিল। না, এমন কী রাত হয়েছে!

দোতলায় চলে এল কাকলি।

ঐ সুকান্তর ঘর। দরজা খোলা। পর্দা ঝুলছে। আলো জ্বলছে ভিতরে।

পর্দার কাছে কী এক আধেক-দেখা-না-দেখা ছায়া দুলে-দুলে উঠল।

'আসুন।' তপ্ত অন্তরঙ্গতায় ডেকে উঠল সুকান্ত।

দরজা আর পর্দার মাঝখানে যে ফাঁক হয়ে আছে তারই কাছে ছায়া বুঝি ঘন হয়ে এল।

'আশ্চর্য আমি তারিখটা একদম ভুলে গেছি। সত্যি, আজই কি আপনার সেই নেমন্তন্নের দিন।' তক্তপোশে বসে ছিল, উঠে দাঁড়াল সুকান্ত। 'তা হোক, যখন আসবেন তখনই নিমন্ত্রণ।'

কী বুঝল কে জানে, ছায়া ঘরের মধ্যে শরীরিনী হয়ে উঠল।

'একি, আপনি?' স্তম্ভীভূত হয়ে গেল সুকান্ত।

'হ্যাঁ, এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম একবার রিটার্ন-ভিজিটটা দিয়ে আসি।' কাকলি স্বচ্ছন্দমুখে বললে, 'আপনি কারু অপেক্ষা করছেন বোধ হয়। আচ্ছা আসি। নমস্কার।' (ক্রমশ)

আবশ্যক

শালের জন্য আংশিক-সময়ের এজেন্ট। বিস্তৃত বিবরণ ও বিনা-মূল্যের নমুনার জন্য লিখুন—
GIRSON KNITTING WORKS,
LUDHIANA. (207).

ধবল-শ্বেত কুষ্ঠ

বহুদিন পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম, দিনরাত চর্চা ও অনুসন্ধানের পর কবিরাজ শ্রীরঘুস্বরূপ, বি এ উহা সমূলে বিনাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইংরাজীতে লিখিবেন।

আয়ুর্বেবদীক কেমিক্যাল
রিসার্চ লেবরেটরিজ ফতেপুরী, দিল্লী-৬

ট্রাম-বাসে

বত্রিশ বছরের জয়ের রেকর্ডের পর ভারত পাকিস্তানের কাছে এই প্রথম হকিতে পরাজয় বরণ করিয়াছে ইহাতে অনেকেই দুঃখিত হইয়াছেন। ভবিষ্যতের জন্য অনেকে অনেক সতর্কবাণী উচ্চারণ

করিয়াছে।—"কিন্তু আমরা শুধু গেয়ে চলেছি—প্রিয় তোমার হাতে যে-হার মানি সেই তো মোর জয়"—বিষণ্ণমুখে মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

রেডিওতে অলিম্পিক হকির ফলাফল ঘোষণার পর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নাগরিকরা নাকি পথে বাহির হইয়া আনন্দে নৃত্য করিয়াছেন। —"নৃত্যটা যে কথক শ্রেণীর হয়নি তা তো জানা কথা। তবে সেটা জারি, না খেমটা মার্কা হয়েছে সেটাই শুধু জানা গেলনা" —বলে শ্যামলাল।

সংবাদে শুনিলাম রুশ তরুণীরা জিমনাস্টিকে নিরংকুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। —"ঘরকন্নাটা অংকুশহীন হলেই রুশ বেঁচে যাবে" মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

সামুদ্রিক মৎস্য শিকারের জন্য সরকার নাকি একটি বোর্ড গঠনের কথা চিন্তা করিতেছেন। —"কিন্তু বোর্ডের চেয়ে ভালো চার তৈরিতে মন দিলে ভালো হতো না কি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

মৎস্য সংকটের সূত্র ধরিয়া কলিকাতার একটি কাগজ প্রশ্ন করিয়াছেন—(১) ৫ খানি ট্রলারের কি হইল, (২) কত টাকা প্রতি মাসে বা প্রতি বৎসরে জলে ঢালা হইতেছে, (৩) কাকদ্বীপের বরফ ঘরের কি হইল, (৪) কল্যাণীর মৎস্য গবেষণাগারের গবেষণার ফল কি, (৫) পোনাবিক্রয় ব্যবস্থার কি হইল, (৬) জাল ও নৌকা সরবরাহের খবর কি? বিশুখুড়ো বলিলেন —"প্রশ্ন এত দীর্ঘ ও কঠিন হয় বলেইতো পরীক্ষার হলে যত গোলমাল!!"

অতঃপর করমর্দন-প্রথা বন্ধ করিবার জন্য মার্কিন মুল্লুকে আন্দোলন চলিতেছে। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী

বলিলেন—"করমর্দন বন্ধ হলে ক্ষতি নেই। পাণিপীড়ন বন্ধ না হলেই হয়!!"

লবণহ্রদের পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নের জন্য রাজ্যসরকার নাকি একটি পর্ষদ গঠন করিবেন। —"ফলাফলটা হয়ত এক চিমটি লবণ দিয়েই গ্রহণ করতে হবে" —বলেন জনৈক সহযাত্রী।

একটি বৈদেশিক দম্পতির খবর। তাঁদের বিবাহ হইয়াছে ষাট বছর। কিন্তু তারা নাকি আজ পর্যন্ত পরস্পরের সঙ্গে একটি কথাও বলেন নাই। —"তাঁদের মধ্যে যে-কেউ একজন অতঃপর কথা না বলেও গান গেয়ে দেখতে পারেন —চোখে চোখে কথা কও, মুখে কেন বলনা"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

সংবাদে পড়িলাম—জনসংখ্যার দিক হইতেও কলিকাতাকে ছোট করিয়া দেখাইবার টেকনিক কার্যকরী হইয়াছে। "এই যদি সত্যিকারের ঘটনা হয়ে থাকে, তবে এর পর থেকে মা ষষ্ঠীর চাল-কলার বরাদ্দ হ্রাস করে দিতে হবে বৈকি"। —বলে শ্যামলাল।

সর্বশেষে মুঘল সম্রাট বাহাদুর শা'র প্রপৌত্র কলিকাতাতে বসবাস করিতেছেন। শুনিলাম কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহার জন্য মাসিক আড়াই শত টাকা বৃত্তি ধার্য করিয়াছেন। —"তিনি নিশ্চয় বলেছেন—সম্রাট মহানুভব"—বলেন এক সহযাত্রী।

সংবাদে প্রকাশ কলিকাতা কর্পোরেশনের কাগজপত্রে এখনও রাজমুকুট বা ক্রাউন প্রতীক বর্তমান রহিয়াছে। খুড়ো বলিলেন—"মাঝে মাঝে অভিযোগ শোনা যায় কর্পোরেশন দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় নথিপত্র উধাও হয়ে গেছে। সত্য হলে বলব, তারও একটা মানে হয়: কিন্তু ক্রাউন উধাও করে দিয়ে কে কবে বড়লোক হয়েছে!!"

জনৈক পত্রপ্রেরকের মারফত শুনিলাম —ফ্রান্স যদি সাহায্য করে তবে ভারত পৃথিবীর অন্যতম মদ্যউৎপাদনকারী দেশ

বলিয়া গণ্য হইবে। পান বর্জনের কথা স্মরণ করিয়াই বোধহয় জনৈক সহযাত্রী জড়িত কণ্ঠে গান ধরিলেন—বিদায় বেলা কেন আন ফুলডোর!!!"

পুস্তক পরিচয়

কবিতা

হরিণ চিতা চিল—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ত্রিবেণী প্রকাশন, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম তিন টাকা।

বিন্দুতেও কখনো কখনো সিন্ধুর স্বাদ পাওয়া যায়, কবিতায় সর্বদাই। কারণ কবিতাই হচ্ছে জীবনের এমন একটি ঘনীভূত রসায়ন যে তার সূক্ষ্মতম দর্পণে ত্রিকালের আদিঅন্তহীন মহাকাশও নখায়ত্ত হয়ে ঘনিয়ে আসে। কবি সৌন্দর্য জগতের সত্যসন্ধী, তিনি সৌন্দর্যের সত্যস্বরূপ হৃদয়পটে প্রতিফলিত করেন। কিন্তু যেহেতু আমরা বস্তুজগতের নির্ভুল দৃশ্য তখনই দেখি যখন আমাদের অক্ষিস্ফটিকে বস্তুর বিপরীত ছায়াপাত ঘটে, এবং অন্ধকারের তারতম্য দিয়েই আলোকের সন্ধান পেয়ে থাকি, সেহেতু কবির সৌন্দর্য-দর্শন কখনোই অবিমিশ্র নয়। তা যদি হতো তাহলে নবরসের আবগাঢ়তা কবিতার মধ্যে স্থান পেত না। জীবন যেমন একটি সম্পন্ন বৈপরীত্যের সমাহার, শিল্পের অনুকার্যও তেমনি, তার রূপরসালংকৃতি ঘটে নানা বিরোধী রস-রেখার জৈব-সংঘাতে। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবি চেতনাকে বোঝাতে গিয়ে এই কথারম্ভের প্রয়োজন ছিল।

বাংলা কবিতার আধুনিক যুগের অন্যতম প্রতিভূ প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় এই জীবন-সন্ধান-সংঘাতের ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। তাঁর এই জীবনমুখিনতা, বস্তুতান্ত্রিকতা কিন্তু রোমান্টিক কবিসত্তা বিরোধী নয়। চিন্ময় এবং মৃন্ময় দুটি অনুরাগই তাঁর অন্তরে লালিত হয়েছে একটিই গূঢ় কারণে। জীবন তাঁর কাছে শুধুই জীবিকা-জনন-জপের ত্রিস্রোতা প্রবাহ নয়, 'জড়ে জড়র ভাব ফের জড়ত্ব প্রাপ্তি' নয়, একটি রাজসূয়-সম্মেলক তপস্যার সিদ্ধিই তার ফলশ্রুতি। তপস্যায় দ্বিজ হবার আকাঙ্ক্ষাই তাঁকে এই পৃথিবীর নাড়ীতে নাড়ীতে জড়িয়েছে, কবি মাত্রেই কাল-পুরুষ, প্রেমেন্দ্র মিত্র স্বকাল পুরুষ। তাঁর ইতিহাস চেতনা, ভৌগোলিক চেতনা নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। আমাদের বক্তব্য, জীবনানন্দের সঙ্গে ইতিহাস চৈতন্যের ক্ষেত্রে তাঁর বিসাদৃশ্যের মূলগত কারণ এই একটিই, তিনি স্বকালপুরুষ। মানব সভ্যতার আনুষঙ্গিকতার মধ্যে, দাম্পিত এবং স্পন্দিত জীবন-চর্যার মধ্যে তিনি আত্মিক বিকাশকেই খুঁজে বেড়িয়েছেন। সমকালীন পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর মানবেতিহাসের সওয়াল জবাব তাঁর কবিতার মধ্যেই স্ফুরিত হয়েছে, হৃদয়কেন্দ্রিক সংবেদনশীলতার সঙ্গে তথ্যগত সাংবাদিকতা একটি আশ্চর্য সেতু রচনা করেছে। এই সেতুই তাঁর কাব্যচেতনার প্রতীক। যন্ত্রণা হচ্ছে জনন-চিহ্ন, জীবনের ক্ষেত্রে যেমন, শিল্পের ক্ষেত্রেও অথৈবচ। এই শরবিদ্ধ অনুভব মিত্রকবির অন্তরে-বাহিরে রোমাঞ্চিত। যুগের ট্র্যাজেডি, মানুষের নিয়তি-দাসত্ব মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ।

ছক পাতা খেলা চলেছে খেলতে খেলতে
হুকুম কোথায় চালের বাইরে হেলতে!
ইতিহাসও সেই একই মুখস্থ
সুরে আওড়ানো নামতা।
রাজার, প্রজার, নিজের খরচে
যে যেমন দেয় নামতা।
[ছক]

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন হয়ে পড়ে যে প্রেমেন্দ্র মিত্র সার্থক নাগরিক কবি। তাঁর পরবর্তী কালের সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে এই বিশেষণে চিহ্নিত করা যায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর অগ্রজ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সধর্মা। শহর কলকাতা স্পষ্ট অক্ষরে তাঁর কাব্য সমষ্টিকে অভিভূত করে না রাখলেও পরোক্ষ লক্ষণে তাঁর প্রায় প্রতিটি কবিতায়ই ছড়িয়ে আছে। তাঁর অনুভাবন-অনুধাবনের মধ্যে, চিন্তায় এবং চৈতন্যে, রঙরেখার তির্যক ব্যবহার, যুক্তি-বাদিতায়, মৌলবক্তব্যে তাঁর কবিতা নিঃসন্দেহে নাগরিক।

সবই জানলার দেখা।
তাই দিয়ে সব চাওয়া-পাওয়া,—

* সদ্য প্রকাশিত *

নজরুল চরিত-মানস ॥ **ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত**

কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও রচনাসম্ভারের ওপর ব্যাপক আলোচনা এ পর্যন্ত বড় একটা হয়নি। চিন্তাশীল পর্যালোচক ডক্টর গুপ্ত কবির বিচিত্র জীবন ও বহুমুখী প্রতিভার ওপর বিস্তৃত আলোকপাত করেছেন। তাঁর এ পর্যালোচনায় কোন রকম ভাবালুতা নেই। সুতীক্ষ্ম যুক্তি, বিদগ্ধ মননশীলতা ও বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহই এখানে বর্তমান।

মূল্য : আট টাকা

• বিশেষ আকর্ষণ •

ইলিয়া এরেনবুর্গের ১৯·৫০ নঃ পঃ দামের উপন্যাস "ঝড়" কনশেসনে মাত্র ১০৲ ও দোকানীকে ৮৲ টাকায় দেওয়া হচ্ছে। এর মেয়াদ অনিবার্যভাবে ৩০।৯।৬০ পর্যন্ত। মাশুল ২৲। সিকি টাকা অগ্রিম ব্যতীত, ভি পি করা হবে না।

অন্যান্য বই

সন্‌জীদা খাতুনের "কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত" (৫৲) ॥ কাজী নজরুল ইস্‌লামের "ব্যথার দান" (৩·৫০) "মধুমালা" (২৲) ॥ বেগম শামসুন নাহারের "নজরুলকে যেমন দেখেছি" (২·৫০) ॥ অবিনাশ সাহার "প্রাণগঙ্গা" (৬৲) "বসন্ত বিদায়" (৩·৫০) "পূবের আকাশ" (২·৫০) "তরঙ্গ" (২৲) "নবীন যাত্রী" (·৬২) "ঢাকাই গল্প" (২৲) ॥ মুসাফিরের "লীলা লিপি" (২৲) ॥ আবুল মনসুর আহমদের "সত্যমিথ্যা" (৫৲) ॥ শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ ও পরেশ সাহার "কথাশিল্পী" (৫৲) ॥ প্রাণতোষ ঘটকের "মুঠো মুঠো কুয়াশা" (২·৫০) ॥ আবুল কালাম শামসুদ্দীনের "শাহেরবানু" (২·৫০) ॥ গোর্কির "তিন পুরুষ" (৭·২৫) ॥ এমিল জোলার "সম্ভাবনার পথে" (৮৲) ॥ আর্থার ক্লেগের "নয়া চীন নয়া দুনিয়া" (·৭৫) ॥ সরলানন্দ সেনের "মাও সে তুং" (২৲) ॥ ইভান তুর্গেনিভের "অনাবাদী জমি" (৪৲) ॥ অবনীভূষণ ঘোষের "সাপের কথা" (১·২৫) "ভূত ভূত নয়" (১·৫০) ॥ ভারত পুত্রম্'এর "পান্নাবাঈ" (৩·৫০) ॥ অধ্যাপক নরুল মোমেনের "বহুরূপী" (২·৫০) ॥ রণজিৎকুমার সেনের "বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য" (৪৲) ॥

ভারতী লাইব্রেরী ॥ ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

(সি ৪১৬৮)

জীবিকা, জনন, জপ।
জানলার ধারে দিন গোনা।
আরো যদি বাতায়ন থাকে.
খোঁজা বুঝি পণ্ডশ্রম
এক জানলারই মাপে গড়া চোখ
কান ও চেতনা।
[ট্রেনের জানলা]

মনস্তত্ত্ব এবং হৃদয়তত্ত্বকে এক আশ্চর্য পটুপাকে জীবন যাপনের রহস্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন কবি। নিসর্গকে এনেছেন জৈবলীলার পটভূমিকায়, এবং জীবনের আন্তরিকতাকে এক আধ্যাত্মিক সঞ্চারণীতে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন। শিল্পীকে নিষেধের ভূমিকায় প্রক্ষেপ করে তিনি শিল্পের মূলকথা আত্মজিজ্ঞাসার যে প্রাপ্তি চিহ্নিত করলেন তা বিস্ময়কর।

আয়ু শুধু মেঘ-শোভা নয়
নয় শুভ্র সন্তোষের ভাবা।
এখানে দাহ ও ক্ষত
দিয়ে নিয়ে তবে কোনদিন
সত্তার নির্যাস মেলে
শল্যবিদ্ধ শোকর শিখায়।
তাই ত শিকারী ফেরো
নিজেরই হৃদয় খুঁজে খুঁজে।
[শিকার]

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় দুর্বোধ্যতা নেই. তার দুটি কারণ ভাষায় ভাবনায় তিনি স্বচ্ছ। কূটচিন্তাকেও তিনি কটাক্ষে প্রকাশ করতে পারেন, এটিকেই শিল্পের যাদুবিদ্যা বলে। শব্দের পৌনঃপৌনিক ঘর্ষণজাত কারুকার্য এবং উপমান্তরে চমক সঞ্চারের বজ্রক্রীড়া ছাড়াও তাঁর কবিতার ভাষায় দিবকণ্ঠ ঝংকার শুনতে পাওয়া যায়। বস্তু থেকে বস্তুর অতীতে উত্তীর্ণ হবার বিস্ময়কর গতিশক্তি তাঁর কবিতার অন্যতম চরিত্র লক্ষণ। প্রায় নিরীশ্বর হয়েও আলোচ্য কবির মনে আশা এবং বিশ্বাস, আত্মবিচার ও আত্মবিকীরণ প্রায় মিস্টিক কবি-পর্যায়ে পড়ে।

পৃথিবী ত দুরাশার চেয়ে ঢের বড়
তবুও নির্মল নয় বুঝি।
বলাকায় বিচ্ছিন্ন পাখিও
আকাশের কান্না হয়ে গলে
তাই কোন তীরে ঝরে পড়ে।
[অনাবিষ্কৃত]

প্রথমা-সম্রাট-ফেরারী ফৌজের পর 'সাগর থেকে ফেরাতে কবির চিন্তায় এবং প্রকাশে নবতর যোজনা লক্ষ্য করেছি, বর্তমান গ্রন্থ তার কবিতায় এবং নামকরণে আমাদের চমৎকৃত করেছে। একটি স্বর্গমর্ত্য পাতালের প্রাণলক্ষণাকে প্রতীক করে, জনন-হনন জপের আলেখ্য সত্তার মুগ্ধ করেছে। মাত্রাবৃত্ত-স্বরবৃত্তের মিত্র-ব্যবহার, উপমার স্বতঃসিদ্ধতা প্রশংসনীয়। তর্জমা নাম দিয়ে কয়েকটি লঘু চালের মৌলিক সূক্ষ্ম কবিতা এই সংকলনের অভিনবত্ব বৃদ্ধি করেছে। প্রচ্ছদ, মুদ্রণ, গ্রন্থন সুন্দর। ১৩৯।৬০

বছরের শ্রেষ্ঠ শারদীয় সংকলন

সপ্তর্ষি

শারদীয় — ১৩৬৭ সন

বিশেষ আকর্ষণ: এ কালের শক্তিমান কথাশিল্পী "শক্তিপদ রাজগুরুর" আসামের পটভূমিকায় লেখা একটি সুবৃহৎ উপন্যাস

"অপমৃত্যু"

স্বনামধন্য সাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসোপম বড়গল্প:—

"অভূতপূর্ব"

গল্প:—প্রেমেন্দ্র মিত্র, বনফুল, সুবোধ ঘোষ, ভবানী মুখোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য, মিহির আচার্য, অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীর করণ, কণাদ গুপ্ত ও খগেন দত্ত।

কবিতা:—মনীশ ঘটক, বিষ্ণু দে, দিনেশ দাস, গোপাল ভৌমিক, অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়, অমিয় ভট্টাচার্য, রাখাল চক্রবর্তী এবং আরো অনেকে।

রম্যরচনা:—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত।

প্রবন্ধ:—অন্নদাশংকর রায়, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র এবং দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সিনেমা:—পঙ্কজ দত্ত।

প্রচ্ছদ:—নরেন সরকার।

গোপাল ঘোষ, কালীকিংকর ঘোষ দস্তিদার, মাখন দত্তগুপ্ত, অর্ধেন্দুশেখর দত্ত অনিতা রায় চৌধুরীর আঁকা কয়েকটি স্কেচ ও পেন্টিং।

বহুবর্ণের দুটি দুষ্প্রাপ্য রাজপুত-চিত্র ও দ্বিবর্ণের একটি দুর্গার চিত্র।

আপনার প্রিয় চিত্রতারকাদের ছবি।

উৎকৃষ্ট কাগজে মনোটাইপে ছাপা প্রায় তিন শতাধিক পৃষ্ঠার এই সংখ্যাটির মূল্য—দুটাকা। সডাক: ২·৬২ ন. প.।

কলিকাতা দপ্তর: ৬২ গণেশ এভেনিউ, কলি—১২

চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি পাঠাবার একমাত্র ঠিকানা—

সম্পাদকীয় দপ্তর: এন. কিউ ১০।২ বাটানগর—২৪ পরগণা

(সি ৮১০৪)

উপন্যাস

মনের মানুষ—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা—৯। মূল্য—তিন টাকা।

শৈলজানন্দ যখন বাংলা সাহিত্যের আসরে যোগ দিয়েছিলেন, তখন বিদ্রোহবাদ একটি যুগধর্ম ছিল। তারি মধ্যে শৈলজানন্দ নিজের একটি পথ পেয়েছিলেন। সেই পথটি মানুষকে ভালোবাসার পথ। বিশেষত, অবজ্ঞাত মানুষকে। অতঃপর তাঁর রচনারীতি ও বিষয়দিগন্ত বিচিত্রতর হয়েছে, উজ্জ্বলতর হয়েছে—সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই মানবপ্রীতির অন্তঃশীলা নদীটি এখনো সমান প্রবাহিত।

'মনের মানুষ' গ্রন্থের বিষয়ও তাই। গোড়াতেই লেখক স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিয়েছেন: 'ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় দুরধিগম্য হিমগিরির অভ্যন্তরভাগে দুর্ভেদ্য বনানী বেষ্টিত জনমানবহীন রেল স্টেশনে স্বজনবান্ধবহীন অবস্থায় সমাজ-সংসার থেকে চিরনির্বাসিত, যাঁরা—জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে পরহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদেরই নিয়ে আমার এই কাহিনী।

আশ্চর্য একটি সহানুভূতির প্রসাদগুণে এই কাহিনী-সংগ্রহে ফুটে উঠেছে। মূলে চরিত্রগুলির পাশাপাশি রামধনি, দুলারির মতো আপাত-অনুজ্জ্বল চরিত্রও এসে

দাঁড়িয়েছে, তারপর পাঠকচিত্তে কখন অনিবার্য একটি শিখা জ্বালিয়ে ধরেছে। এমন-কি কয়েকটি শিশু চরিত্র। আশা-হতাশায় ঘেরা মানবসংসারের যে মহল সাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত হবার আগে অনেকে রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক বেড়া পার হয়ে আসে, এখানে বিনাদ্বিধায় তা সম্মানিত হয়েছে। বিশ্বহৃদয় বিশ্ব প্রশ্নের চেয়েও এখানে বড়ো হয়ে উঠেছে। আর তার আধার ট্র্যাজেডি। এই ট্র্যাজেডিকে শৈলজানন্দ কোথাও বিকৃত করেননি, একটি সানন্দ সুন্দর জীবন-রসের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। পূর্ণেন্দু পত্রীর আঁকা প্রচ্ছদপট বিশেষ প্রশংসার্হ। (৫৭৩৫৯)

প্রতিচ্ছায়া—শ্রীমধুসূদন চক্রবর্তী। দাশগুপ্ত এন্ড কোং (প্রি) লিঃ; ৫৪।৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। ৩.৫০ টাকা।

যুদ্ধক্ষেত্রে অশিষ্ট আচরণের জন্য এক সৈনিকের মৃত্যুদণ্ড হয়। দণ্ডিত সৈনিকের বন্ধু তার এক পুত্রের সঙ্গে বন্ধু-কন্যার বিবাহ দিয়ে নিজ কর্তব্য পালন করে, কিন্তু বিবাহ সুখের হয় না, কারণ স্বামী দেবল সংসারের প্রতি অনাসক্ত। স্ত্রী অপর্ণা তখন দেবর শ্যামলকে বেছে নেয় তার অবৈধ সঙ্গী হিসেবে কিন্তু শ্যামলের বিবাহে সে সম্বন্ধ ছিন্ন করে। স্বামীর মৃত্যুর পর কিভাবে অপর্ণা একমাত্র কন্যাকে নিয়ে, বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকে তারই কাহিনী নিয়ে এই উপন্যাস।

কাহিনীর মধ্যে একটা একঘেয়েমী না থাকলে উপন্যাসটি সুখপাঠ্য হতে পারত। লেখক বহু চরিত্র সৃষ্টি করেছেন অহেতুক এবং সেজন্য কোন চরিত্রের ওপরই ন্যায় বিচার করতে পারেন নি। ভাষার সাবলীলতা লেখকের ভবিষ্যতকে আশাপ্রদ করলেও মৌলিকতার অভাব এবং চিন্তাদৈন্য সম্বন্ধে লেখকের স্বপক্ষে কিছুই বলার নেই।

পুস্তকটির বাঁধাই অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক, যদিও মলাট চাকচিক্যপূর্ণ। প্রথমেই ৯ পৃষ্ঠা থেকে আরম্ভ, তার পরেই চতুর্থ অধ্যায়। প্রথমদিকের পৃষ্ঠা এবং অধ্যায়গুলি পরে খুঁজে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে কয়েকটি পৃষ্ঠার কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। ৩০২।৬০

গ্রামীণ অর্থনীতি

কৃষি ও সমবায়—নিরঞ্জন হালদার। রেনেসাঁস পাবলিশার্স, ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা—১২। সাড়ে তিন টাকা।

সমবায় চাষ সম্বন্ধে নতুন কিছু চিন্তার খোরাক জোগাবে বর্তমান গ্রন্থটি। বর্তমান গ্রন্থে লেখক শ্রীযুত নিরঞ্জন হালদার ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতিতে সমবায়ের স্থান থেকে আলোচনা শুরু করে সমবায় চাষ পর্যন্ত সমবায়ের বিভিন্ন পর্যায়ের সম্যক বিবরণ দিয়েছেন। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করে সমবায় চাষের ভবিষ্যৎ—বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিক্রিয়া এবং জন-জীবনে এর প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কে লেখক তাঁর বলিষ্ঠ মত প্রকাশ করেছেন। বইটি প্রত্যেক সমবায় কর্মীর তথা উৎসাহী পাঠকের কাছে এক নতুন জিজ্ঞাসা তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, লেখক সমবায় কৃষি সম্বন্ধে নিজে কি অভিমত পোষণ

বাঙ্গালী ও বঙ্গসংস্কৃতিকে জানতে
একখানা প্রথম শ্রেণীর বাংলা
মাসিক **নববঙ্গ** পড়ুন
তৃতীয় বর্ষ * বার্ষিক ৩,
২০১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭

সমীরকুমার গুপ্তের গোধূলিমদির কাব্যগ্রন্থ
শিশিরবিন্দু ১,
Poems rich in thought. Content as well as in expression. Like sunlit dew drops of the morning they reflect the varying colours of the playful Infinite.
Modern Review
প্রকাশিতব্য কাব্যগ্রন্থ : **ঝিনি সুতোর মালা**
প্রাঃ মোমেণ্টস্ মনুমেণ্ট,
৩৯ এইচ সুরেন সরকার রোড, কলিকাতা-১০
(সি ৮০৩৬)

দিশারী শরৎ-জয়ন্তী কমিটি সংকলিত
শরৎ-স্মরণী—২,
শরৎচন্দ্রের জীবনকথা ও সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে
খ্যাতনামা সাহিত্যশিল্পীদের আলোচনা
দিশারী প্রকাশনী
১১এ, এস্প্ল্যানেড ইস্ট; কুটীর শিল্প বিপণি, কলিকাতা—১ ও ৫২, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা—৬
(সি ৭৭৭৫)

দ্বাদশ শারদীয়া
আসর পত্রিকা
অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের পূর্ণ উপন্যাস "স্বর্ণশিখা"। কাজী আবদুল ওদুদের "তারাশঙ্কর", এবং বহু খ্যাতনামা কবি, সাহিত্যিকের রচনা ও চিত্রে সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশ হয়েছে। এজেণ্টগণ আজই অর্ডার বুক করুন। দাম মাত্র ১, ২৫ নঃ পঃ।
২/১/এ, নারায়ণ সুর স্ট্রীট,
কলিকাতা—৫
(সি ৮১০১)

ভ্রমণসাহিত্যে বিচিত্রার সংযোজন
বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের
ভারততীর্থ ২.০০
মৈত্রেয়ী দেবীর
মহাসোভিয়েট ৩.৫০
সমারসেট মমের
আবরণ ৫.০০
Painted Veilএর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ
বিচিত্রা।
বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

—বাহির হইল—
......শুধু কি এই? ব্রজদাই রবীন্দ্রনাথকে নোবেল প্রাইজ পাইয়ে দিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্রকে কপালকুণ্ডলা লেখবার ফ্যাক্ট জোগাড় করে দিয়েছেন, মাইকেলকে প্রাইভেট পড়িয়েছেন, বিদ্যাসাগরকে বিধবা বিবাহ আন্দোলনে সাহায্য করেছেন, রামমোহনকে বিলাত যাবার টিকিট কিনে দিয়েছেন, জব চার্নককে—আচ্ছা, জব চার্নকের কথা আজ থাক, একদিনে এত হজম করতে পারবেন কিনা আমার সন্দেহ আছে। ক্রমশঃ সবই জানতে পারবেন :
বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাস্যরসাত্মক কথাশিল্পী
রূপদর্শীর
ব্র জ বু লি
দাম : ৩.৫০ নঃ পঃ
আরও দুখানি উল্লেখযোগ্য বই
যখন যেখানে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ২.৭৫
পরম লগনে ডাঃ আনন্দকিশোর মুন্সী ৪.৫০
: প্রাপ্তিস্থান :
গ্রন্থভারত ৪১।ব রাসবিহারী এভেনিউ
কথাশিল্প ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

বর্তিক
১।৩২। এফ প্রিন্স গোলাম মহঃ রোড
কলিকাতা - ২৬
(সি ৮২৩৩)

সংগীত দ্বিমাসিক
১-ম বর্ষ **রম্যবীণা** ৪-র্থ সংখ্যা
॥ প্রকাশিত হয়েছে ॥
লিখেছেন : দিলীপকুমার রায়, অর্ধেন্দু-কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোকরঞ্জন সিংহ, দেবাশিস দাশগুপ্ত প্রভৃতি
সম্পাদক ভাস্কর মিত্র
মূল্য ৭৫ ন. প.
২৬/৪ রড স্ট্রীট, কলিকাতা—১৯

পূজোয় উপহার দেবার মত একখানি নতুন বই
অসীম বর্ধনের লেখা
অবাঞ্ছিত শিশু
দাম—৪৲
শিশুসমস্যা ও তার সমাধানের অপূর্ব মনোবৈজ্ঞানিক সংবাখ্যান
এডুকেশানাল এণ্টারপ্রাইজার্স
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯

করেন? এ বিষয়ে তিনি কোন নির্দিষ্ট পথ নির্দেশ করতে পারেননি। তিনি যদি বলতে চান, জমি-মালিকের সমিতি তাকে উপদেশ—বীজ-সার জলসেচের সুবিধা দেবে, তবে এটা বোধহয় নতুন কিছু বলা হল না—১৯৪০ সালের বঙ্গীয় সমবায় আইনানুযায়ী গঠিত ঋণদান সমিতি-গুলির উপবিধিতে কিংবা নতুন সেবা-সমিতিগুলি (service co-op) ঠিক এই উদ্দেশ্যে সংগঠিত হলেও বাস্তবে কেবলমাত্র কৃষকদের ঋণ সরবরাহ করা ছাড়া তারা অন্য কোন কাজ করে বলে জানা নেই। এর কারণ সম্পর্কে বলা যায়, সাধারণ গ্রামবাসীর সমবায় সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং যার ফলে সমবায় আজও একদল স্বার্থপুষ্ট দলের স্বার্থ সংগঠনরূপেই রয়েছে এবং ঐ সকল কারণে আজও পল্লী-বাংলার উন্নতির জন্য সমবায় তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি—এ বিষয়ে সত্যকারের সমবায় কর্মীদের সচেতন করতে পারলে গ্রন্থটির উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সার্থক হতে পারতো। ১২৫।৬০

রম্যরচনা

দেখা অদেখা—পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২। তিন টাকা।

বাংলা সাহিত্যের রম্যরচনা বিভাগে 'দেখা অদেখা' একটি নতুন সংযোজন। সাহিত্যের আসরে গ্রন্থকার পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আবির্ভাব সম্প্রতি ঘটলেও লঘু রচনার ক্ষেত্রে তিনি যে বিশেষ প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছেন বর্তমান গ্রন্থপাঠে সে কথা সহজেই বলা যেতে পারে।

রম্যরচনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে প্রকাশভঙ্গীর যে বৈচিত্র্য সাহিত্য-পাঠককে সর্বাগ্রে আকৃষ্ট করে, 'দেখা অদেখা'য় লেখক সে বিষয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে তাঁর 'একটু হাসুন, খোশমোদ, বিড়াল, এতটুকু বাসা, গৃহভৃত্য সমাচার, মিছিলনগরী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য; উক্ত বিষয়গুলির মধ্যে যে বিষয়বৈচিত্র্য ও হাস্যরস ছড়িয়ে রয়েছে তা শুধুমাত্র নির্জলা হাস্যরসেই পরিসমাপ্তি-লাভ করেনি বরং এক সূক্ষ্ম ও পরি-শীলিত শিল্পবোধ এবং অন্যতর আবেদনে হৃদয় ছাড়িয়ে মস্তিষ্ককে স্পর্শ করায় বক্তব্যের গভীরতা বেড়েছে। তবে কলেজে প্রাসঙ্গিক লঘু রচনা বা পুজোর চাঁদা ডেলিপ্যাসেঞ্জার, প্রভৃতির মধ্যে বৈচিত্র্য থাকলেও সংবাদপত্রীয় অত্যধিক সুগন্ধই সেই সকল রচনার স্বাদকে ক্ষুণ্ণ করেছে। তবু বলা যেতে পারে এই তরুণ লেখকের মধ্যে সম্ভাবনার আলোক বর্তমান—তিনি তাঁর রচনার মধ্যে একটি বিচিত্র-রসলোক সৃষ্টি করেছেন। ছাপা পরিচ্ছন্ন, কিন্তু কয়েকটি মুদ্রণপ্রমাদ চোখকে বিশেষ পীড়িত করে। ১৯০।৬০

ধর্ম

গীতা-ধ্যান (৩য় খণ্ড)—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। ৩, অন্নদা নিয়োগী লেন, বাগবাজার, কলিকাতা—৩। মূল্য—২৲।

ভাষ্যসমন্বিত ধর্মগ্রন্থটিতে অষ্টাদশ অধ্যায় গীতার সপ্তম, অষ্টম, নবম এবং দশম অধ্যায় আলোচিত হয়েছে। গীতার ছয় অধ্যায় পর্যন্ত আলোচনা অর্জুন-কেন্দ্রিক। সপ্তম অধ্যায় ঈশ্বরকেন্দ্রিক। গীতার প্রথম দিকে—ক্ষত্রিয় তুমি, যুদ্ধ তোমার কর্তব্য—এইরূপ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কথা অনেকবার আছে। কিন্তু গীতার বক্তা ক্রমে চলেছেন আত্মতত্ত্ব—ব্রহ্মতত্ত্বের দিকে। ভূমিকায় গ্রন্থকারের বক্তব্য পাঠে বিজ্ঞান-অনিসন্ধিৎসুদের মত-পার্থক্য থাকলেও গীতার শ্লোকের ভাষ্য ধর্মজিজ্ঞাসুদের ভালো লাগবে, মনে হয়। ২৪৬।৬০

প্রাপ্তি স্বীকার

অকাল প্রেম—অজিতকুমার রায়চৌধুরী।
কস্তুরী-মৃগ—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।
তরু বিহংগ—শক্তিপদ রাজগুরু।
সংখ্যা বিজ্ঞানের অ-আ-ক-খ—বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
মনের আকাশ—সঞ্জয়।

বিশ্ববিখ্যাত মনোবিৎ ও মনীষী ডেল কার্নেগি
রচনা করেছেন এমন দুখানি বই, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মরূপে যা লক্ষ লক্ষ পাঠকের জীবনে আশা আনন্দ অনুপ্রেরণা আর সার্থকতা এনেছে। উপন্যাসের রস, আত্মজীবনীর আবেদন আর জীবনদর্শনের দীপ্তিতে সমৃদ্ধ। বাংলায় এই প্রথম
প্রতিপত্তি ও বন্ধুলাভ
How to win friends & influence people.
দুশ্চিন্তাহীন নতুন জীবন
How to stop worrying & start living.
শিল্পপতি - মহাজন - ব্যবসায়ী - ছাত্র - শিক্ষক - লেখক - চাকুরীজীবী - চিকিৎসক - ব্যবহারজীবী - এমন কোন মানুষ নেই যাঁর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার প্রতি পদক্ষেপে এই বই দুখানি সাহায্য না করবে। দাম যথাক্রমে সাড়ে চার ও সাড়ে পাঁচ টাকা।
একমাত্র পরিবেশক: পত্রিকা সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিঃ
১২।১ লিণ্ডসে স্ট্রীট কলিঃ-১৬। শাখা: দিল্লী - বোম্বাই - মাদ্রাজ।

NT LIBRARY

গত সপ্তাহে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর সম্প্রতিকালের আঁকা ৫০টি ছবির একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস। প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয় ক্যাথিড্রাল রোডে অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস-এর নিজ ভবনে।

শিল্পাচার্যের বয়স বর্তমানে প্রায় ৮০; কিছুকাল যাবৎ তাঁর শরীরও ভাল যাচ্ছে না। কিন্তু এই বার্ধক্য এবং অসুস্থতার মধ্যেও শিল্পীর তুলি পূর্ণোদ্যমে কাজ করে চলেছে। গত আড়াই বছরে নন্দলাল ছবি এঁকেছেন প্রায় ৮/৯শর মত। এর মধ্যে থেকে বেছে মাত্র ৮০টি ছবি টাঙিয়ে এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। এবং প্রদর্শনীটি চলেও মাত্র এক সপ্তাহের জন্যে।

নন্দলালের নামে শিল্পামোদীরা ছুটে গিয়েছেন প্রদর্শনীর খবর পেয়েই. কিন্তু যে ছবি দেখবার আশা নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা, সে ছবি দেখতে পাননি। এখানে দেখা গেছে নন্দলালের শিল্পধারার নতুন একটি অংগ। একবার অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'ওরা হিন্দু পুরাণকথার দিকে চলে গেল, আমি মোগলেই টিঁকে রইলুম। ওরা নিল অজন্তার দিক, আমি রইলুম পারশিয়ানে।' কিন্তু এখানে কোথায় সেই পুরাণকথা আর কোথায় সেই অজন্তা। এ যেন ৭।৮ বছরের একটি শিশু তার সরল মন নিয়ে সরল ভংগীতে প্রকাশ করেছে অদ্ভুত সব কল্পনা। পরিণতির শেষ রেখা স্পর্শ করে নন্দলাল যেন আবার শৈশবের সারল্যে ফিরে এসেছেন। একটা প্রবাদ আছে, বৃদ্ধ হলে নাকি মানুষ দ্বিতীয়বার শৈশব ফিরে পায়। নন্দলালের এই ছবির মালা দেখে মনে হয় প্রবাদটি সত্যি। সব ছবিতেই রেখা আছে আবার ওয়াশও আছে। আকারগুলি শিশুদের আঁকার মতই আড়ষ্ট এবং বিচিত্র। এসব ছবির বিন্যাসেও শিশুর মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করে 'চাঁদের আলোয় পাঁচটি পাখি', 'পৃথ্বী-রাজ ও বরাহ', 'নয়টি পাতি হাঁস', 'গাছের তলায় হায়না', এবং 'তিনটি ঘোড়া'র—এই কয়টি রচনায় ধরা দিয়েছে অনাবিল শিশু মন ও সারল্য। এ সব ছবি দেখে অনেকেই হয়ত মনে করবেন—যে কেউই এ ছবি আঁকতে পারে। কিন্তু যে লোক শিশু নয় তার পক্ষে শিশুর মত ছবি আঁকা যে কত শক্ত কাজ তা কেবল শিল্পীরাই বুঝবেন। আজ ইউরোপে বড় বড় শিল্পীরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন সব ভুলে গিয়ে আবার শিশু-দের রচনার বৈলক্ষণ্য এবং শিশুদের সারল্য ফিরে পেতে। শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, সংস্কার এসবের ফলে মানুষের মন যখন পরিণত হয়ে ওঠে তখন তার পক্ষে শিশুর মত অনাবিল দৃষ্টি দিয়ে জগৎকে দেখা যে কত কঠিন কাজ তা অনুমান করা কিছুমাত্র শক্ত নয়। বিদগ্ধ শিল্পীদের মতে এই পরিশ্রান্ত এবং অতি চতুর জগতে নির্মল শিল্পকে পেতে হলে জীবনকে নতুন করে শিশুর দৃষ্টি দিয়ে দেখার আবশ্যক। সম্ভবত নন্দলালও এ সত্য অনুভব করছেন, তাই তিনি তাঁর দীর্ঘ শিল্পী জীবনে যে বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন তা ভোলবার চেষ্টা করছেন।

নন্দলাল সৃষ্টি করার আনন্দেই সৃষ্টি করেছেন এসব ছবি। এই আনন্দ থেকে রচনাগুলির সৃষ্টি হওয়ায় দর্শককেও আনন্দ দেয়। এই কারণেই ছবিগুলি নিঃসন্দেহে রসোত্তীর্ণ।

এখানে আমরা নন্দলালের স্বাভাবিক ছান্দসিকী রচনাও কিছু দেখতে পেলাম। আগেকার মতই এ রচনাগুলিতে প্রাণছন্দের আদিম রেখা থেকে প্রসূত হয়ে অন্যান্য রেখার ভংগীতে চিত্রের পটভূমি বোপে একেকটি সর্বাংগীণ ছন্দের সৃষ্টি হয়েছে। ছন্দ ভেঙ্গে ভেঙ্গে অলংকারেরও সৃষ্টি করেছেন। এই অলংকরণের গুণে ছন্দেরই সর্বশেষ ঝংকার যেন এখানে সেখানে বাজছে।

যাই হোক অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস-এর একক প্রদর্শনীর জন্য নির্দিষ্ট কক্ষটির উন্মোচন হল পথিকৃৎ শিল্পাচার্য নন্দলালের চিত্র প্রদর্শনী দিয়ে। এটা সত্যিই শুভ লক্ষণ। কক্ষটির আয়তন একটু ছোট হলেও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া বেশ প্রীতিকর।

শৈল শহর — নন্দলাল বসু

রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

ছবির দৈর্ঘ্য

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের অজুহাতে ভারতীয় ফিল্মের দৈর্ঘ্য সংক্ষিপ্ততর করবার উপদেশ দিয়েছেন। সাধারণত যত ফুট ছবি আমরা চিত্রগৃহে দেখি, তা তুলতে তার প্রায় তিনগুণ পরিমাণ কাঁচা ফিল্ম দরকার লাগে। এই হিসাবে ছবির দৈর্ঘ্য কমালে মোট কাঁচা ফিল্মের চাহিদা সেই অনুপাতেই কমবে। ফলে বিদেশ থেকে কাঁচা ফিল্ম আমদানি করার ব্যাপারে যে বিদেশী মুদ্রা ব্যয় হয়ে যায় তার একটা মোটা অংশ এর দ্বারা বাঁচবে। মন্ত্রী মহোদয়ের প্রস্তাবের পিছনে সম্ভবত এইটেই প্রধান যুক্তি।

শ্রী শাস্ত্রী দু' ঘণ্টার মধ্যে যাতে ছবি শেষ হয়, সেদিকে নজর রাখতে বলেছেন। ছবির দৈর্ঘ্য এগারো হাজার ফুটের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে পারলে দু' ঘণ্টার মধ্যে তার প্রদর্শন সম্ভব। অধিকাংশ বাংলা ছবি সাধারণভাবে এই নিয়ম মেনে চলে কোন মন্ত্রীর সুপারিশের অপেক্ষা না করেই। শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর বর্তমান প্রস্তাবে তাই এখানকার প্রযোজকরা বিশেষ বিচলিত হবেন না।

বিচলিত হয়েছেন দক্ষিণ ভারতের চিত্রনির্মাতারা। তার কারণও আছে। নৃত্য-গীত দক্ষিণ ভারতীয় ছবির অপরিহার্য অঙ্গ, কারণ ও-অঞ্চলের চিত্রামোদীদের এটাই প্রধান চাহিদা। ফলে ওখানকার ছবির গড়পড়তা দৈর্ঘ্য আঠারো হাজার ফুটের কম নয়। তাই নাচ-গানের সংখ্যা কমিয়ে ছবিকে এগারো হাজার ফুটের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা দক্ষিণ ভারতীয় প্রযোজকের কাছে কম সমস্যার কথা নয়।

ফিল্ম ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ার বর্তমান সভাপতি শ্রী বি নাগি রেড্ডী এক বিবৃতিতে শ্রী শাস্ত্রীর প্রস্তাবের তীব্র

কেমিরা ফিল্মসের "শহরের ইতিকথা"র নায়িকা মালা সিংহ

প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি এই বলে অভিযোগ করেছেন যে, সরকারী তহবিলে টাকার ঘাটতি হলেই ফিল্ম শিল্পকে নিয়ে টানাটানি করবার বাতিক কর্তৃপক্ষকে পেয়ে বসে। কাঁচা ফিল্মের জন্যে ভারত সম্পূর্ণভাবে বিদেশের ওপর নির্ভরশীল জেনেও একান্ত প্রয়োজনীয় এই বস্তুটির আমদানি খেয়াল-খুশিমত নিয়ন্ত্রিত করলে সমগ্র ফিল্ম ব্যবসায়ের যে কতদূর ক্ষতি হতে পারে, সে সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ যথোচিত সচেতন নন। শ্রী রেড্ডীর মতে, জনসাধারণের রুচি রাতারাতি পাল্টানো সম্ভব নয়। যারা আঠারো হাজার ফুটের ছবি দেখতে অভ্যস্ত, তদের কাছে এগারো হাজার ফুটের ছবি পরিবেশন করলে ফল কি দাঁড়াবে, তা সহজেই অনুমেয়।

শ্রী রেড্ডী হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় ফিল্ম ভারতের বাহিরে যে পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে, কাঁচা ফিল্ম বাবদ তার সম্পূর্ণ চাহিদা সেই টাকায় মেটানো সম্ভব। এ অবস্থায় দৈর্ঘ্য কমাবার সরকারী নির্দেশ শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়, তার পিছনে কোন সঙ্গত যুক্তিও নেই।

বোম্বাইয়ের চিত্রনির্মাতারা সবাই ছবির দৈর্ঘ্য বাড়াবার পক্ষপাতী না হলেও হিন্দী ছবির দর্শকদের চাহিদা খানিকটা দক্ষিণ ভারতীয়দের মতই। তাই তাঁরাও শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর সুপারিশ সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতে পারছেন না।

আমাদের মতে, যতদিন না ভারতবর্ষ কাঁচা ফিল্ম উৎপাদনের ব্যাপারে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হতে পারবে, ততদিন প্রত্যেক প্রযোজকেরই উচিত অনাবশ্যকভাবে ছবিকে দীর্ঘায়িত না করা। তাই বিশেষ ধরনের ছবির জন্যে দৈর্ঘ্যের ব্যতিক্রম অনুমোদন-যোগ্য হলেও, সাধারণভাবে এ ব্যাপারে বাংলার পদাঙ্ক অনুসরণ করলে চিত্র-শিল্পের লাভ বই ক্ষতি হবে না।

চিত্রালোচনা

পুজো সপ্তাহের আকর্ষণ সাতখানি নতুন ছবি—তিনখানি বাংলা ও চারখানি হিন্দী। শিল্পী সমাবেশ ও আখ্যানভাগের দিক দিয়ে ছবিগুলি চিত্রামোদীদের বৈচিত্র্যের সন্ধান দেবে আশা করা যায়।

টাইম ফিল্মসের "স্মৃতিটুকু থাক" নব গঠিত পরিচালক মণ্ডলী যাত্রিক-এর দ্বিতীয় অবদান। সুচিত্রা সেন এর নায়িকা। তার চেয়েও যেটা বড় কথা—তিনি এতে দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, যা আগে আর কখনও করেন নি। অসিতবরণ, বিকাশ রায়, ছবি বিশ্বাস, অনিল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিকে তাঁর বিপরীতে দেখা যাবে। রবীন চট্টোপাধ্যায় এই ছবিতে সুরযোজনা করেছেন।

কেমিরা ফিল্মসের "শহরের উপকথা"-র সুরকারও রবীন চট্টোপাধ্যায়। শিল্পীদের

এস-কে-এস ফিল্মসের প্রথম চিত্র "শিলালিপি"-র একটি দৃশ্যে (ডান দিক থেকে সবিতাব্রত দত্ত, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপিকা দাস, আশীষতরু ও অজিত মুখোপাধ্যায়।

পুরোভাগে রয়েছেন উত্তমকুমার, মালা সিংহ, পাহাড়ী সান্যাল, জীবেন বসু, ছায়া দেবী, বাণী হাজরা, কাজরী গুহ ও তরুণকুমার। বিনয় চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন বিশু দাশগুপ্ত।

জয়শ্রী পিকচার্সের "অজানা কাহিনী" এ সপ্তাহের তৃতীয় বাংলা ছবি। সুনীলবরণ পরিচালিত এই ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় সুপ্রিয়া চৌধুরী, অসিতবরণ, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, রবীন মজুমদার, তরুণ-কুমার, নমিতা সিংহ, তুলসী চক্রবর্তী প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। অপরেশ লাহিড়ীর সুরসৃষ্টি ছবির আকর্ষণ বাড়িয়েছে।

নতুন হিন্দী ছবিগুলির মধ্যে সব চেয়ে আকর্ষণীয় শিল্পী সমাবেশ ঘটেছে অশোক-কুমার অভিনীত ও প্রযোজিত অশোক পিকচার্সের "কল্পনা"-তে। অশোক-কুমারের বিপরীতে দক্ষিণ ভারতের সুপ্রসিদ্ধা নর্তকী-ভগিনীদ্বয় পদ্মিনী ও রাগিণী প্রধান দুটি নারী-চরিত্রে অভিনয় করেছেন। রাখন এবং ও পি নায়ার যথাক্রমে এই ছবির পরিচালক ও সুরকার।

আই এস জোহরের প্রযোজনা ও পরি-চালনায় তোলা "বেওকুফ" হিন্দী ছবির অনুরাগীদের মনে নতুন আনন্দের আমেজ আনবে। এর প্রধান ভূমিকাগুলির রূপ দিয়েছেন কিশোরকুমার, মালা সিংহ, প্রাণ ও আই এস জোহর নিজে। এ ছবির কাহিনীকারও জোহর। শচীনদেব বর্মণ সংগীত পরিচালকের দায়িত্ব বহন করেছেন।

রাওয়াল ফিল্মসের "কলেজ গার্ল"-এর নাম ভূমিকায় আছেন বৈজয়ন্তীমালা। ভূমিকালিপিতে আরো যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে শাম্মী কাপুর, ওম্ প্রকাশ, রাজ মেহরা, পূর্ণিমা, তাবাসাম, রণধীর, অচলা সচদেব প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এর গল্প ও গান লিখেছেন রাজেন্দ্রকৃষ্ণ। তাতে সুর দিয়েছেন শংকর ও জয়কিষণ। পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছেন টি প্রকাশ রাও।

বি ডি প্রোডাকশন্সের "মায়া মচ্ছেন্দ্র" পৌরাণিক ছবির অনুরাগীদের আনন্দ বর্ধন করবে। পুরুষ বর্জিত এক প্রমীলা রাজ্যে এক মহাযোগীর আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে এর চমকপ্রদ কাহিনী। দক্ষ বিভ্রমকারী ক্যামেরার কৌশল ছবিটিকে অনন্যতা দিয়েছে। ক্যামেরার যাদুকর বাবুভাই মিস্ত্রী ছবিটি পরিচালনা করেছেন।

* * *

আশীষ মুখোপাধ্যায় "রবীন্দ্রনাথ", "মুর্শিদাবাদ", "শাস্ত্রীয় সংগীত" ইত্যাদি কয়েকটি সুন্দর প্রামাণ্য চিত্র চিত্রামোদীদের চিত্তপর্বে উপহার দিয়েছেন। এবার তিনি পূর্ণাঙ্গ নাট্যচিত্র নির্মাণে হাত দিয়েছেন। এই বিভাগে তাঁর প্রথম ছবির কাজ গত সোমবার ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। সেদিন ওস্তাদ আমীর খাঁর সংগীত পরিচালনায় ছবির কয়েকটি গান বাণীবদ্ধ করা হয়। আশীষ মুখোপাধ্যায় স্বয়ং প্রযোজনা ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ছবি-টির অধিকাংশই হবে বহির্দৃশ্য। মাত্র চারটি সেট স্টুডিওতে তোলা হবে। শিল্পীরা প্রায় সবাই নতুন। এখনও ছবির নামকরণ হয় নি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "নব বোধন" অবলম্বনে পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় যে ছবি তুলবেন বলে গত সপ্তাহে খবর

অনুপম আঙ্গিকে লেখা সুকৃতি রায়চৌধুরীর
তপোময় তুষারতীর্থ
১২টি চিত্রশোভিত সাবলীল ভাষায় 'কেদার-বদরী ভ্রমণ কথা'। পাঠে মনে হবে হিমতীর্থে পৌঁচেছেন। দাম ৪.৫০। ভূমিকা লিখেছেন শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।
দি বুক হাউস, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলি-১২
(সি ৮০২৮)

গিরিশ থিয়েটার
কলিকাতার ৫ম নাট্যশালা
প্রযোজনা ও উপস্থাপনা—বিশ্বরূপা থিয়েটার
স্থান : বিশ্বরূপা থিয়েটার (৫৫-৩২৬২)
সোম, বুধ ও শুক্রবার ৬৷৷টায় এবং রবিবার ও ছুটির দিন সকাল ১০৷৷টায়
সম্পাদনা ও নির্দেশনা—বিধায়ক ভট্টাচার্য
আঙ্গিক নির্দেশনা—তাপস সেন
শ্রেঃ—রাধামোহন ভট্টাচার্য, জ্ঞানেশ মুখার্জি, বিধায়ক ভট্টাচার্য, সুনীল ব্যানার্জি, গীতা দে জয়শ্রী সেন প্রভৃতি

রঙমহল
— ফোন : ৫৫-১৬১৯ —
প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার : ৬৷৷টায়
রবি ও ছুটির দিন : ৩টা - ৬৷৷টায়
বিমল মিত্রের যুগান্তকারী কাহিনী
সাহেব বিবি গোলাম
নাট্যরূপ : শচীন সেনগুপ্ত
পরিচালনা : বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র
সুরসৃষ্টি : অনিল বাগচী
শ্রেষ্ঠাংশে—নীতীশ, রবীন, হরিধন, সত্য, জহর, বিশ্বজিৎ, নবদ্বীপ, অজিত, ঠাকুরদাস, নির্মল, মিণ্টু, সমর, কার্তিক, সুনীত, শিপ্রা সাহা, কেতকী দত্ত, কবিতা রায়, শুক্লা দাস, মমতা বন্দ্যোঃ, অনিলা দেবী, শ্যামলী মুখোঃ, দীপিকা দাস ও শিপ্রা মিত্র।

প্রবাসিকা পিকচার্সের ভক্তিমূলক চিত্র "লক্ষ্মীনারায়ণ"-এর দুটি বিশিষ্ট ভূমিকায় ব্রততী মুখোপাধ্যায় ও অনুভা গুপ্তা।

বেরিয়েছিল তার শুভ মহরৎ গত মঙ্গলবার দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিমল রায় প্রোডাকশন্সের প্রাক্তন ক্যামেরাম্যান মন্টু বসু ছবিটির প্রযোজক এবং আলোকচিত্রের পরিচালনা তিনিই করবেন। স্বাগতা পিকচার্সের পতাকাতলে ছবিটি তোলা হবে—বাংলা ও হিন্দী দুটি ভাষাতেই। কলকাতা ও বোম্বাইয়ের বহু নামকরা শিল্পী ছবির ভূমিকালিপিতে থাকবেন।

শুক্রবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর, সুশীল মজুমদার প্রোডাকশনের নতুন ছবি "কঠিন মায়া"-র মহরৎ নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও-তে হবার কথা। গজেন্দ্রকুমার মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করবেন সুশীল মজুমদার। শ্রেষ্ঠাংশে সন্ধ্যা রায় ও বিশ্বজিৎকে দেখা যাবে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুর সৃষ্টি করবার ভার নিয়েছেন।

• • •

শ্রীদিলীপ চিত্রমের প্রথম ছবি "যে প্রেম নীরবে কাঁদে"-র লেখিকা আশালতা দেবী—ছবিটির পরিচালক চণ্ডী নাগ আমাদের এই কথা জানিয়েছেন। লেখিকা হিসাবে আশাপূর্ণা দেবীর নামোল্লেখ লিপিকারের প্রমাদবশত ঘটে থাকবে। এ ব্যাপারে প্রযোজক প্রতিষ্ঠানের যে কোন দুরভিসন্ধি নেই তার প্রমাণ স্বরূপ শ্রীনাগ উল্লেখ করেছেন যে ভুলটি কেবলমাত্র "দেশে"-র সংবাদে ঘটেছে, অন্যান্য কাগজে আশালতা দেবীর নামই ছাপা হয়েছে। আশা করি এর পর এ নিয়ে আর বাগবিতণ্ডার প্রয়োজন থাকবে না।

অপরিণীতার মাতৃত্ব

অজ্ঞাত পিতৃপরিচয় যে নবজাতককে অবৈধ বলে চিহ্নিত করে দিয়েছে, মাতৃত্বের পবিত্র অধিকার কী তাকে কোনদিনই মর্যাদার আসন দিতে পারে না? আজকের সমাজে এমনি ধরনের অবাঞ্ছিত শিশু আর অপরিণীতা জননীর সমস্যা দিনে দিনে গুরুতর হয়ে দেখা দিচ্ছে। সুশীল মজুমদার পরিচালিত শ্রীএন সি এ প্রোডাকশন্স-এর "হসপিটাল" ছবিটির প্রণয়-মধুর নাট্যকাহিনীতে এই জটিল সামাজিক সমস্যার একটি সুষ্ঠু ও মানবিক সমাধানের ইঙ্গিত মেলে।

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত'র যে কাহিনীর ভিত্তিতে ছবিটি তৈরী তার নায়ক-নায়িকা শৈবাল ও শর্বরী। অবিবাহিত এই যুবক-যুবতী একই হাসপাতালের ডাক্তার এবং উভয়েই পরস্পরের প্রতি প্রণয়াসক্ত। বড়-লোকের একমাত্র ছেলে শৈবাল প্রণয়িনীকে নববধূরূপে ঘরে বরণ করে আনতে উদগ্রীব। কিন্তু শর্বরীর কাছে প্রণয় যত মধুর, পরিণয় ততই কঠিন। পঙ্গু পিতা ও ছোট ভাই-বোনদের প্রতিপালনের গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে তার ওপর। তাই শর্বরী প্রেমাস্পদকে তাদের সুখমিলনের দিনটির অপেক্ষায় থাকবার জন্যেই শুধু অনুরোধ জানায়।

শৈবাল-শর্বরীর প্রেম অম্লান, কিন্তু অপরিণামদর্শী। একদিন তাদের নির্জন-মিলনের শেষ অঙ্কে দেখা দেয় এক দুর্ঘটনা। মোটর বিকল হয়ে পড়ায় এক রাত্রির মত তারা আশ্রয় নেয় শহর থেকে অনেক দূরে এক পান্থশালায়। একটি রাত্রির উন্মাদনা দুজনকার জীবনেই অভিশাপ হয়ে দেখা দেয়। কিছুকাল পরে শর্বরী জানতে পারে যে, সে সন্তান-সম্ভবা।

শৈবালকে শর্বরী আশু বিবাহ-বন্ধনের প্রয়োজনীয়তার কথা জানায়। কিন্তু শৈবালের কাছে তখন সত্যের চাইতে বড় হয়ে দেখা দেয় সংস্কার, মানবতার চাইতে মর্যাদা। শর্বরীকে বিবাহ করতে তার আপত্তি নেই, কিন্তু তার মাতৃত্বকে স্বীকার করতে তার মধ্যে দেখা দেয় দ্বিধা, আত্ম-মর্যাদা বাঁচাবার অপপ্রয়াস। জায়া ও জননীর মহৎ অধিকারই চেয়েছিল শর্বরী শৈবালের কাছে। কিন্তু শৈবালের দ্বিধাগ্রস্ত মনের সব যুক্তি অপমানের মত এসে বাজে শর্বরীর বুকে। প্রচণ্ড অভিমানে শর্বরী শৈবালকে জানায় যে, সে তার বিপন্নতার সুযোগ নিতে আসেনি। একাই সে তার মাতৃত্বকে সার্থক ও সুন্দর করে তুলবে। অনাগত শিশুকে জননীর পরিচয়েই সমাজের কাছে বরণীয় করে তুলবে।

মাতৃত্বের মধ্যে যে কোন অবমাননা নেই মনে-প্রাণে তা বিশ্বাস করে শর্বরী। হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডাঃ চৌধুরীর কথাও তার কানে বাজে—বিজ্ঞান সৃষ্টি করে, ধ্বংস করে না। মায়ের জীবন বিপন্ন হলেই অনাগত শিশুর বিনাশে হাত বাড়ায় বিজ্ঞানী—তার আগে নয়। ওই বিশ্বাস ও আদর্শ সম্বল করে পুরুষের গড়া সংস্কারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে চায় শর্বরী। সে যে জননী এই পরিচয় দিয়েই শর্বরী তার সন্তানকে সকল কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচাবে। এই

শারদীয়া
আনন্দোৎসবে—

আত্মীয়তা ও মিত্রতা স্মরণীয় রাখায় সহায়তা করে :
ন্যায্যমূল্যে আমাদের রকমারী আধুনিক
ডিজাইনের সিল্কের সাড়ী ও তাঁতের ধুতি সাড়ী।

রামগোপাল গোরামল
৪৮নং মনোহর দাস স্ট্রীট (সোনাপটি), দোতালা, কলিকাতা-৭
ফোন নং ৩৩-৩৫৭৪

তার অটল সংকল্প। সন্তানের পিতৃপরিচয় সে জানাবে না কাউকে—এই তার পণ।

অনাগত শিশুর পিতৃপরিচয় শর্বরী তার পণ্গু বাবাকেও জানাতে রাজী হয় না। কলঙ্কিত মাতৃত্ব নিয়ে শর্বরী যাতে বাড়িতে না থাকে সে ইচ্ছাই প্রকাশ করলেন তার বাবা। শর্বরী বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে একা—জয় করে জেনে নিতে চায় সে তার অদৃষ্টকে।

শর্বরী তার দুশ্চর জীবনচর্যায় মমতা ও মানবতার স্পর্শ পেল একাধিক দরদী ও মহৎ প্রাণের কাছ থেকে। শর্বরীর জীবনে আলো ছড়িয়ে এল একদিন তার সন্তান। জননীর অপার বাৎসল্য ও অনাত্মীয়ের উদার স্নেহের ভেতর দিয়ে বড় হতে লাগল শিশু। এবং সেই সঙ্গে একটি নির্মম সত্য যেন বার বার বিদ্রূপ করে যেতে লাগল শর্বরীর সকল সংকল্প ও সাধনাকে। পিতৃপরিচয়হীন শিশু জননীর অঙ্কে থেকেও যে অনাথ এবং সমাজের কাছে অনাদৃত—বাস্তবের এই মমতাহীন নির্দেশ পেল শর্বরী। তখন সে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত, বাঁচার আশাও বুঝি সে ছেড়ে দিয়েছে।

শৈবালের সব সংবাদই রাখত শর্বরী। শৈবাল বিদেশ থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চ ডিগ্রী নিয়ে ফিরে এসেছে এবং সারাজীবন অকৃতদার থেকে কলকাতায় আর্তের সেবায় নিজের নার্সিং হোম খুলেছে—এই সব সংবাদই জানে শর্বরী। জানে না শুধু তার অন্তরের খবর। শর্বরী স্বেচ্ছায় অজ্ঞাতবাস

জয়শ্রী পিকচার্সের "অজানা কাহিনী"র নায়িকা সুপ্রিয়া চৌধুরী

গ্রহণের পর কী গভীর উদ্বেগ ও অনুশোচনা নিয়ে শৈবাল তাকে খুঁজে বেড়িয়েছে, অপরাধবোধের কী দুঃসহ জ্বালা সে এতকাল নীরবে সয়ে এসেছে, প্রেমের কী নিদারুণ ব্যর্থতায় আজ সে অবসন্ন—তার কোন সংবাদই রাখে না শর্বরী। শর্বরী তখন বোম্বাইতে তার কর্মস্থলে, মৃত্যুপথযাত্রী। শৈবালকে দিয়ে তার দেহে অস্ত্রোপচারের জন্যে শর্বরী তার চিকিৎসককে অনুরোধ করল। দুরন্ত অভিমানে যাকে একদিন ছেড়ে চলে এসেছিল তাকে ফিরে পাওয়ার জন্যেই শুধু নয়, তার অবর্তমানে নিরপরাধ শিশুটি যাতে এই বৃহৎ সংসারে অনাথ ও অনাকাঙ্ক্ষিত না হয়ে পড়ে সে কারণেই শর্বরী শৈবালের কাছে যাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়ল।

শৈবাল-শর্বরীর ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ প্রণয়ের সুখ-পরিণতি ঘটল কলকাতায়। মরণের মুখে যাকে একদিন ফেলে চলে গিয়েছিল শৈবাল, তাকে পরম সম্মানে ও প্রেমে আবার ঘরে তুলে আনল সে। সেই সঙ্গে কোলে তুলে নিল তার ছেলেকে—তাদের অপরাজিত প্রেমের চিরবাঞ্ছিত-ধনকে।

পরিচালক সুশীল মজুমদার ছবির প্রণয়োপাখ্যানটিকে শুধু রসমধুর করেই রজতপটে পরিবেশন করেননি, একটি স্থিত-নিষ্ঠ বক্তব্যে বাণীবাহও করে তুলেছেন। আধুনিক সমাজে অবিবাহিত মাতৃত্বের যে সমস্যা দিনের পর দিন উৎকট হয়ে দেখা দিচ্ছে, তার একটি কল্যাণস্নিগ্ধ সমাধানের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ রয়েছে ছবিটিতে। অসংযত প্রণয় কিংবা প্রবৃত্তির লালসা সমাজ-জীবনে যে অনর্থ ডেকে আনে—গর্ভপাত, অনাকাঙ্ক্ষিত শিশুর প্রাণনাশ,

কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

"কেনাগোলাম"

এমন মনোহর কাহিনী ও এমন বলিষ্ঠ লেখা শরৎচন্দ্রের পর বাংলা সাহিত্যেও বিরল। মূল্য : ৩·৫০

সর্বত্র পাওয়া যায়।

নব বলাকা প্রকাশনী,

৪, নফরচন্দ্র লাহা লেন, কলিকাতা—৩৬

(সি ৭৬২৯/৪)

শারদীয়া

নির্মলেন্দু

পড়ুন ও অপরকে পড়ান

১০০ খানা ফিল্ম অভিনেতা-অভিনেত্রীর ছবি, জওহরলাল আবেদীনের স্কেচ আছে। বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ আছে।

প্রতি বুক স্টলেই পাবেন

মাত্র দেড় টাকা

নির্মলেন্দু

১৮নং বাবুরাম শীল লেন

কলিকাতা-১২

(সি ৮২২৯)

বিশিষ্ট রচনা ও চিত্রসম্ভারে

বিশেষ দীপাবলী সংখ্যা

চিত্রভারতী

সম্পাদনা : দীপক চৌধুরী

ছ' বছরের প্রতিষ্ঠিত হিন্দী চিত্রভারতীর রূপান্তরিত বাংলা সংস্করণ

হিন্দী চিত্রজগতের চিত্র ও সংবাদ

বম্বে থেকে পরিবেষণ করবেন

বিভাস সোম

৫, সুখলাল জহুরী লেন,

কলিকাতা-৭

আগামী সংখ্যায় বিস্তৃত বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করুন

(সি-৮১৩৯)

টাইম ফিল্মসের "স্মৃতিটুকু থাক" চিত্রের একটি আবেগময় দৃশ্যে সুচিত্রা সেন ও এক শিশু শিল্পী

অনাথের সংখ্যাবৃদ্ধি, অবিবাহিত জননীর আত্মহত্যা অথবা সমাজ-লাঞ্ছিত হয়ে ব্যভিচারের পথে আত্মবিলোপ প্রভৃতির মধ্যে যা প্রকাশ পেয়ে থাকে—তার প্রতিকার যে শুভবুদ্ধি ও শুদ্ধ মানবিকতার মধ্যেই খুঁজে নিতে হবে এই বক্তব্যই স্পষ্ট উচ্চারিত হয়ে উঠেছে ছবির নাট্যকাহিনীতে। পরিচালক তাঁর বক্তব্যের জন্যে যে কষ্ট-কল্পিত প্রচারধর্মিতার আশ্রয় নেননি সেজন্যে তিনি রসিকজনের সাধুবাদ পাবেন। চিন্তাশীল দর্শকরাও এ-ছবিকে অভিনন্দন জানাবেন।

প্রয়োগ-কর্মে শ্রী মজুমদার এই ছবিতে তাঁর পরিচালক-জীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন বললে ভুল হবে না। নায়ক-নায়িকার জীবনে এক দুরতিক্রম্য সমস্যার উদ্ভব পর্যন্ত ছবির প্রতিটি মুহূর্ত ও প্রতিটি দৃশ্য দর্শকের দৃষ্টি ও শ্রুতিকে আবিষ্ট করে রাখে। নায়ক-নায়িকার পারস্পরিক সম্বন্ধের এই আবেগনিবিড় বিন্যাসে পরিচালকের গভীর রসবোধ ও ও পরিমিতি জ্ঞানের পরিচয় মেলে। উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলে প্রণয়ী-যুগলের নির্জন মিলন, পরস্পরের প্রতি প্রেম-নিবেদন ও মান-অভিমানের পালা একদিকে যেমন মাধুর্যের রসে সিঞ্চিত অপরদিকে তেমনি শালীনতা-বোধে সমুজ্জ্বল।

নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদের পর ছবির কাহিনী নানা শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃতি লাভ করেছে, নায়িকার সান্নিধ্যে এসেছে একাধিক চরিত্র, জড়ো হয়ে উঠেছে অনেক ঘটনা। ফলে ছবির গতি কিছুটা শিথিল হয়ে পড়েছে। ছবির এই অংশে অপ্রয়োজনীয় ঘটনা ও চরিত্র ভিড় করে এসেছে। এই সব ঘটনা ও চরিত্রের নাট্য-ভূমিকা তর্কাতীত নয়। কয়লা-খনির এক মদাপ উচ্ছৃংখল মালিকের চরিত্রটি খুবই অবাঞ্ছিত ও অপ্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে।

ছোট-খাটো এই সব বৈশাদৃশ্য ও অসংগতি সত্ত্বেও ছবির সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে পরিচালকের সূক্ষ্ম রসানুভূতির ছাপ। কাহিনীর নাট্যপরিণতি নিয়ে দর্শকের কৌতূহল জাগিয়ে রাখতে তিনি প্রশংসনীয়-ভাবে সক্ষম হয়েছেন। স্বল্প সংলাপের মাধ্যমে নাট্যমুহূর্ত রচনা ও প্রতিটি সামান্য ঘটনাকেও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্যে যথোচিত নাট্য-প্রস্তুতি ও বাস্তব কার্য কারণের অবতারণা সৃষ্টির ক্ষেত্রে পরিচালক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এই সাফল্যের মূলে জ্যোতির্ময় রায়ের সুরচিত চিত্রনাট্য অনেকাংশে সহায়তা করেছে।

ছবিটির বিভিন্ন বহির্দৃশ্য ও অন্তর্দৃশ্য রচনায়ও পরিচালক উন্নত শিল্পরুচির পরিচয় দিয়েছেন। আঙ্গিক শিল্পসৌষ্ঠবের দিক দিয়ে ছবিটি উল্লেখযোগ্য। ছবির সামগ্রিক আঙ্গিক পারিপাট্যের মধ্যে হাসপাতাল ও নার্সিং হোম-এর দৃশ্য সেট দুটি উচ্চ প্রশংসার দাবী রাখে।

ছবির নায়িকার ভূমিকায় সুচিত্রা সেনের অপূর্ব অভিনয় দর্শকদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। শ্রীমতী সেনের অভিনয়ে মধুর প্রণয়, দুঃসহ অন্তর-জ্বালা, রুদ্ধ অভিমান ও গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের অভিব্যক্তি এমন মনোময় রূপ নিয়েছে আমাদের চিত্রপটে যার তুলনা বিরল। নায়ক শৈবালের চরিত্রে শক্তিমান অভিনেতা অশোককুমার দর্শকদের মুগ্ধ করে রাখেন তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্যে। চরিত্রটির মর্মলোকে সহজে, স্বাচ্ছন্দে প্রবেশ করে এর সংঘাত ও সংশয়, আশা ও নিরাশা অনবদ্য দক্ষতায় তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। নায়কের চরিত্রে এই প্রবীণ অভিনেতা যৌবনোচিত প্রাণশক্তি আরোপ করেছেন বিস্ময়কররূপে।

নায়ক-নায়িকার পরেই ছবিতে মনোগ্রাহী অভিনয়ের জন্যে দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পাবেন পরিচালক সুশীল মজুমদার। হাসপাতালের অধ্যক্ষের চরিত্রে তিনি একটি সবল ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে সক্ষম হয়েছেন। অন্য এক প্রবীণ চিকিৎসকের ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যালের অভিনয়ও মনোজ্ঞ। জনৈক প্যাথোলজিস্ট-এর চরিত্রে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৌতুকাভিনয় দর্শকদের আনন্দ দেয়। কৌতুকের সংগে সংগে একটি চরিত্ররূপও তিনি এঁকেছেন তাঁর অভিনয়ে। নায়কের পিতা ও এক বিজ্ঞান-সাধকের চরিত্রে যথাক্রমে কমল মিত্র ও ছবি বিশ্বাসের অভিনয় যথাযথ। নায়ক-নায়িকার ছোট ছেলের ভূমিকায় শ্রীমান তরুণকে দর্শকের ভাল লাগবে। নায়িকার পিতা ও কয়লা-খনির মালিকের রূপসজ্জায় যথাক্রমে দিলীপ চৌধুরী ও ধীরেন চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় মনে রেখাপাত করে না। অন্যান্য কয়েকটি ছোট চরিত্রে মিহির ভট্টাচার্য, তিলক, রেখা মল্লিক, কেতকী দত্ত, অঞ্জনা নাগ ও দীপা চক্রবর্তীর অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

ছবির সংগীত পরিচালনায় অমল মুখোপাধ্যায় গীতা দত্তের কণ্ঠে "এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায়" গানটির সুরারোপে প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সংগীত, এবং গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার কর্তৃক

মিনার্ভা থিয়েটার

ফোন : ৫৫-৪৪৮৯

বঙ্গরঙ্গমঞ্চে অভূতপূর্ব

লিট্‌ল্‌ থিয়েটার গ্রুপের

সুর—
রবিশংকর

পরিচালনা—
উৎপল দত্ত

লোকসংগীত—
নির্মল চৌধুরী

উপদেষ্টা—
তাপস সেন

২৪শে শনিবার ৬॥
২৫শে রবিবার ৩ ও ৬॥
২৭শে (মহাসপ্তমী) ৩ ও ৬॥
২৮শে (মহাষ্টমী) ৩ ও ৬॥
২৯শে (মহানবমী) ৩ ও ৬॥
১লা অক্টোবর ৬॥
২রা অক্টোবর ৩ ও ৬॥
৪ঠা অক্টোবর ৩ ও ৬॥
৫ই অক্টোবর ৩ ও ৬॥

(সি ৪১২৯)

সুরচিত এই গানটি জনসমাদর পাবে সহজেই। ছবির আবহ-সংগীত পরিবেশানুগ।

অনিল গুপ্তর আশ্চর্য সুন্দর আলোক-চিত্র ছবিটির শিল্পসম্পদ বাড়িয়েছে। ক্যামেরা ছবিতে আলো-আঁধারের যে মায়া-জাল সৃষ্টি করে তুলেছে তা নয়নাভিরাম। বিশেষ দৃশ্যের "মুড" ফুটিয়ে তোলায়ও শ্রী গুপ্ত চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নায়িকার মুখাবয়বের দৃশ্যগ্রহণ সুন্দর। কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজে প্রশংসা অর্জন করবেন অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদনা) ও বাণী দত্ত (শব্দগ্রহণ)। সংগীতগ্রহণে মিনু কাটারাক-এর কৃতিত্বও উল্লেখযোগ্য।

ফিল্মস ডিভিশন-এর ছবি

ফিল্মস ডিভিশন নিবেদিত ভারতের আঞ্চলিক লোকনৃত্যের পূর্ণাঙ্গ প্রামাণিক ছবি "ধরতি কি ঝংকার" গত সপ্তাহে প্রিয়া চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হয়।

প্রখ্যাত প্রয়োগশিল্পী ভি শান্তারাম প্রযোজিত এবং এ ভাস্কর রাও পরিচালিত এই ছবিতে ভারতীয় লোকনৃত্যের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ও লোক-সংস্কৃতির একটি সম্যক পরিচয় ফুটে উঠেছে। ইস্টম্যান রঙ-য়ে গৃহীত ছবির নৃত্য দৃশ্যগুলিতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী ও উপজাতীয়দের জীবনযাত্রা, সমাজ-ব্যবস্থা, দৈনন্দিন আচার-নিষ্ঠা ও বেশভূষার একটি মনোময় প্রামাণিক রূপের সন্ধান মেলে। সেদিক দিয়ে ছবিটি আমোদ-বিতরণের লক্ষ্য পূর্ণ করেও একটি বিশিষ্ট সার্থকতা অর্জন করেছে। ছবির বহির্দৃশ্যাবলীতে ভারতের বিভিন্ন জায়গার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সুন্দরভাবে পরিস্ফুট। লোক-নৃত্যের ঐতিহ্যপুষ্ট, অনাড়ম্বর ও প্রাণময় ছন্দের সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের সংগীতের রসধারাও ছবিটিতে পরিবেশিত। ছবিটির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ এবং চিত্রনাট্য অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি রাখে।

"ধরতি কি ঝংকার"-এর সঙ্গে ফিল্মস ডিভিশন-এর "রাধা-কৃষ্ণ" কলাচিত্রটিও দেখানো হয়। পটে আঁকা ছবির মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা ও তাঁর অলৌকিক অন্যান্য লীলা এই পরম রমণীয় ছবিটির উপজীব্য। দেশ-বিদেশে অভিনন্দিত এই অল্প দৈর্ঘ্যের ছবিটি ফিল্মস ডিভিশনের শিল্প-নিষ্ঠার একটি অপূর্ব স্মারক।

নাট্যাভিনয়

অনুষ্ঠান সংবাদ

আগামী রবিবার (২৫শে সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাতটায় ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের প্রান্তিক শাখা ডাঃ ডি এন গাঙ্গুলির নাটক 'মরু ঝঞ্ঝা''-র একটি প্রাক্-প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন দক্ষিণ কলিকাতার বয়েজ স্কাউট হলে। জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও তাপস সেন যথাক্রমে পরিচালনা ও আলোক সম্পাতের ভার গ্রহণ করেছেন।

মোহন রাকেশ রচিত "আষাঢ় কা এক দিন" নামক হিন্দী নাটক গত বছরে সংগীত নাটক আকাদমী কর্তৃক হিন্দী ভাষার শ্রেষ্ঠ নাটক হিসাবে পুরস্কৃত হয়। গত রবিবার ঐ নাটকটি নিউ এম্পায়ারে সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন অনামিকা সম্প্রদায়। কবি কালিদাসের জীবনকে কেন্দ্র করে নাটকের আখ্যানভাগ সম্প্রসারিত। অভিনয়ে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রতিভা আগরওয়ালা, সুনীতা রেলিন, অঞ্জু দেব, সরোজ খান্না, নির্মলা, বি পি তেওয়ারী, শ্যাম জালান প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত দুজনই নাটকটির প্রযোজনা করেন। আগামী ২৮শে সেপ্টেম্বর অনামিকার সভ্যদের জন্যে নাটকটি নিউ এম্পায়ারে পুনরভিনীত হবে।

গত মহালয়ার দিন (২০শে সেপ্টেম্বর) প্রাচ্য বাণী মন্দিরের সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে অধ্যাপক যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী রচিত সংস্কৃত নাটক "আনন্দ রাধম্" মহাসমারোহে মহাজাতি সদনে অভিনীত হয়। শ্রীশ্রীরাধার পুণ্য জীবনাবলম্বনে নাটকটি সরল সংস্কৃতে রচিত। প্রাচ্যবাণী মন্দিরের সদস্য ও সদস্যাগণ এর অভিনয়ে প্রশংসনীয় পার-দর্শিতা প্রকাশ করেন। সংগীতাংশে পংকজকুমার মল্লিক, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীকেদার ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু দাস বাউল প্রমুখ শিল্পীদের যোগদানে অভিনয় অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়।

গত সোমবার (১৯শে সেপ্টেম্বর) বেলুড়স্থ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের ছাত্রবৃন্দ শারদোৎসব উপলক্ষে বিদ্যা-মন্দিরের ব্যায়ামাগারে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সংগীত ও হাস্য-কৌতুকের পর মন্মথ রায়ের একাঙ্ক নাটক "মরা হাতি লাখ টাকা" সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়।

সম্প্রতি মঙ্গোলিয়া ও সোভিয়েত রাশিয়াতে যে ভারতীয় সাংস্কৃতিক দলটি নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন তার অন্যতম সদস্যা হিসাবে কুমারী অনুরাধা গুহ কথক নৃত্য প্রদর্শন করে ঐ সব দেশের অভিনন্দন লাভ করেছিলেন। দেশে ফিরে তিনি নতুন করে সম্বর্ধনা লাভ করছেন ভারতবর্ষের দিকে দিকে। তাঁর সাম্প্রতিক সফর-সূচী দেখলেই এই তরুণী শিল্পীর জনপ্রিয়তার আঁচ পাওয়া যাবে। ১৬ই সেপ্টেম্বর

সপ্তধারা

দেবদত্ত

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (যুগান্তর) বলেন,—

...গল্পগুলি সমস্তই আধুনিক সমাজ ও ভদ্রঘরের ছেলেমেয়ের জীবন নিয়ে লেখা... এগুলির মধ্যে 'ঝড়' নামে গল্পটিই সবচেয়ে ভালো।...অন্যান্য গল্পও সরস এবং স্বচ্ছন্দ। ...গ্রন্থটি এককথায় সুখপাঠ্য এবং উপভোগ্য।

(সি ৭৬৯৬)

বিশ্বরূপা

(অভিজাত প্রগতিধর্মী নাট্যমঞ্চ)

[ফোন : ৫৫-১৪২৩, বুকিং ১১-৩২৬২]

বৃহস্পতি ও শনি সন্ধ্যা ৬॥টায় | রবি ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬॥টায়

মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী ও মহানবমী প্রতিদিন ৩ ও ৬॥টায়

সেতু ২২৫ হইতে ২৩৮ অভিনয়

- অবিসম্বাদিতরূপে চলমান কালের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক।
- বর্তমান মঞ্চ জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্রের (বহুরূপী) বিস্ময়কর অভিনয়-সুষমামণ্ডিত।
- নরেশ মিত্র ও অসিতবরণের অভিনয়-দীপ্ত।
- তরুণকুমার, মমতাজ, সন্তোষ, তমাল, তারক, জয়নারায়ণ, দীপক, জয়শ্রী, সুব্রতা, আরতি প্রভৃতির অভিনয়োজ্জ্বল।
- মনকে দোলা দেয়.........ভরিয়ে দেয়

ষ্টার থিয়েটার

[শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। ফোনঃ ৫৫-১১৩৯

শ্রেয়সী

আজকের ... সমস্যার সম্মুখীন হয়ে যে নাটক কথা বলছে—

কাহিনীঃ সুবোধ ঘোষ

নাটক ও পরিচালনাঃ দেবনারায়ণ গুপ্ত

দৃশ্য ও আলোকঃ অনিল বসু

প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ৬॥টায়

প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬॥টায়

রূপায়ণেঃ ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, সাবিত্রী চট্টোঃ, বসন্ত চৌধুরী, অজিত বন্দ্যোঃ, অপর্ণা দেবী, অনুপকুমার, জিতেন চক্রঃ, শ্যাম লাহা, লীলা পাল, তুলসী চক্রঃ, পঞ্চানন, বেলারাণী, প্রেমাংশু বোস ও ভানু বন্দ্যোঃ

ভাটপাড়ার গ্রীষ্টাইড ব্যাটারির কারখানায় অনুষ্ঠিত বিচিত্রানুষ্ঠান, ১৭ই সেপ্টেম্বর পাটনার সুর-সংগমের অনুষ্ঠান, ১৯শে সেপ্টেম্বর নিউ দিল্লির কালীবাড়ীতে এবং ২১শে সেপ্টেম্বর অমৃতসরে পাঞ্জাব মিউজিক ক্লাবের অধিবেশনে কথক নৃত্য প্রদর্শন করতে তিনি আহূত হয়েছিলেন।

বিমল মিত্রের বহু পঠিত উপন্যাস "সাহেব বিবি গোলামে"র একটি সার্থক নাট্যরূপ দিয়েছেন বৈদ্যনাথ ঘোষ। গত ১৬ই আগস্ট এই নাটকটি মঞ্চস্থ করেন কলিকাতা আর্মড পুলিস। এর নিখুঁত টীম-ওয়ার্ক পেশাদারী মঞ্চের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিভিন্ন ভূমিকায় শেফালী দে (পটেশ্বরী) উমাদাস মৈত্র (ছোটবাবু), বিমল ঘটক (মেজবাবু), নরেন মজুমদার (ঘড়িবাবু), অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় (বংশী), প্রশান্ত বসু (ননীলাল), নিত্য দত্ত (মারোয়াড়ী), মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (মেজ-গিন্নী), গোপাল চট্টোপাধ্যায় (ভূতনাথ), প্রদীপ সান্যাল (পায়রাবাবু) অত্যন্ত সুন্দর অভিনয় করেন। নাটকটি পরিচালনা করেন নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ওল্ড ক্লাব)।

বৃটেনের চলচ্চিত্র শিল্প

চলচ্চিত্রের রূপ যেমন ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে তেমনই পরিবর্তিত হয়ে এসেছে তার নির্মাণ পদ্ধতি—চলচ্চিত্রের মান বৃদ্ধিই তার উদ্দেশ্য। এই রূপ এবং পদ্ধতি পরিবর্তনের কাজে ব্রিটেন বরাবর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে আসে। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে, চলচ্চিত্র শিল্পের আদি যুগেও, ব্রিটেন এই শিল্পের উন্নতির জন্য আগ্রহ দেখায়।

আজ এই প্রমোদশিল্প এক বিরাট ব্যবসায়িক শিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে—প্রমোদ ব্যবস্থা আরও নানারকমের থাকলেও এই শিল্পের জনপ্রিয়তা কিছুমাত্র হ্রাস পায় নি। বিদেশেও ব্রিটিশ চলচ্চিত্রের সুনাম আছে। ব্রিটেনে আজ চিত্রগৃহের সংখ্যা হল ৪,০০০ এবং তাতে প্রতি বৎসর প্রায় ১,০০০,০০০,০০০ দর্শকের সমাগম হয়।

চলচ্চিত্র শিল্পে প্রতি বৎসর প্রচুর মূলধন বিনিয়োজিত হচ্ছে, কিন্তু ব্যবসায়ের দিক দিয়ে এতে যে ঝুঁকি রয়ে গিয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। অবশ্য গভর্নমেণ্ট শিল্পের বিভিন্ন দিকের সমস্যা মেটাবার জন্য এবং শিল্পে প্রাণ সঞ্চারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকেন।

বর্তমানে পার্লামেণ্টে চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব আলোচনার অপেক্ষায় আছে। এই ধরনের একটি প্রস্তাব হল ব্রিটিশ সিনেমাগুলিতে প্রদর্শনের জন্য ব্রিটেনে নির্মিত চলচ্চিত্রসমূহের 'কোটা' বা বরাদ্দ পুনরায় স্থির করার প্রস্তাব।

এ সম্পর্কে আগেও কিছু কিছু কাজ হয়েছে। জননিরাপত্তার স্বার্থে সিনেমা-গুলিকে লাইসেন্স প্রদান সম্পর্কে পার্লা-মেণ্ট কতকগুলি নিয়ম বেঁধে দেয়। কোন্ ছবি কেবল বয়স্কদের উপযোগী বা কোন্ ছবি আদৌ প্রদর্শনের উপযোগী নয় তা স্থির করার জন্য আছে চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড।

ব্রিটেনে চলচ্চিত্র উৎপাদন ও বণ্টন সম্পর্কে যে দুটি প্রতিষ্ঠান প্রধানত দায়ী তারা হল র‍্যাংক অর্গানাইজেশন ও এসো-সিয়েটেড ব্রিটিশ পিকচার কর্পোরেশন। তৃতীয় প্রতিষ্ঠান হল ব্রিটিশ লায়ন, এই প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়েছে ব্রিটেনে নির্মিত চলচ্চিত্রসমূহের বণ্টন ও স্বতন্ত্র চলচ্চিত্র প্রযোজকদের জন্য স্টুডিও ইত্যাদি সংগ্রহ সম্পর্কে সাহায্যের জন্য। ব্রিটিশ লায়ন কতকগুলি আমেরিকান চিত্রের বণ্টন ব্যবস্থাও এই সংগে করে থাকে।

প্রধান প্রধান প্রদর্শকরা—এ'রা হলেন চিত্রগৃহের প্রকৃত মালিক, ডিস্ট্রিবিউটর নন; ডিস্ট্রিবিউটরের কাজ হল চলচ্চিত্র ভাড়া দেওয়া এবং প্রয়োজনমত প্রযোজকদের অর্থ দিয়ে উৎপাদনকার্যে সাহায্য করা—বড় বড় শহরেই চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে থাকেন। অবশ্য র‍্যাংক অর্গানাইজেশনের মত কতকগুলি সংগঠনের কাজ হল উৎপাদন বণ্টন ও সেই সংগে প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা করা।

ছোট ছোট শহরে এবং গ্রামগুলিতে চিত্রগৃহের মালিক হন একজন বা একাধিক লোকের একটি দল। এ'দের হাতে একাধিক সিনেমা পরিচালনার দায়িত্বও থাকে। চলচ্চিত্রগুলি সাধারণত প্রথম মুক্তিলাভ করে লণ্ডনের সিনেমাগুলিতে; তারপর তা প্রেরিত হয় অন্যান্য শহরে। দেশের বর্তমান আইন অনুযায়ী ছোট বড় প্রত্যেক সিনেমাকে ব্রিটেনে নির্মিত চলচ্চিত্রসমূহের শতকরা অন্ততঃ ৩০ ভাগ চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হয়। এই ব্যবস্থাকেই 'কোটা' বা বরাদ্দ বলা হয়।

গত দু বৎসরে ব্রিটেনে যে সমস্ত কাহিনী চিত্র রেজিস্ট্রিকৃত হয় তার মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ব্রিটেনে নির্মিত হয়। এই সংখ্যা নিশ্চয় কম নয়। প্রতি বৎসর ব্রিটেনের বিভিন্ন স্টুডিও থেকে শতাধিক কাহিনী চিত্র মুক্তিলাভ করছে, এই সংখ্যা সম্প্রতি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে জানা যায়।

'কোটা' বা বরাদ্দ নির্দিষ্ট করা ছাড়াও রাষ্ট্র চলচ্চিত্র শিল্পের আর্থিক উন্নতির জন্য নানাভাবে সাহায্য করে থাকে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, রাষ্ট্র প্রত্যেক টিকিটের ওপর যে আমোদ কর আদায় করে থাকে তা সম্প্রতি লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে।

তিন বৎসর পূর্বে পার্লামেণ্ট শিল্পের আর্থিক উন্নয়ন সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন করে—এই আইনাধীনে প্রথম গঠিত হয় ব্রিটিশ ফিল্ম ফাণ্ড এজেন্সী—এজেন্সীর কাজ হল টিকিটের মূল্যের ভিত্তিতে সামান্য কিছু অর্থ দর্শকসাধারণের কাছ থেকে আদায় করা। এই অর্থ গিয়ে জমা হচ্ছে এজেন্সীর তহবিলে। এই তহবিল ব্রিটিশ চলচ্চিত্র প্রযোজকদের এবং চিলড্রেনস ফিল্ম ফাউণ্ডেশন লিমিটেডকে প্রয়োজনমত অর্থসাহায্য করছে।

এই আইন রচিত হওয়ায় ন্যাশনাল ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পায়; কর্পোরেশনের কাজ হল অর্থসাহায্য করা নয়, প্রযোজকদের প্রয়োজন মত একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে অর্থ ধার দেওয়া।

এই সমস্ত ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ প্রযোজকদের অধিকতর সংখ্যায় চলচ্চিত্র নির্মাণের সুযোগ দিয়েছে। অবশ্য এইভাবে যে অর্থ তারা লাভ করছে তা যথেষ্ট হয়নি। স্টুডিও এবং কারিগরের চাহিদাও তাদের রয়েছে।

ব্রিটেনে সবশুদ্ধ ১০টি বড় এবং মাঝারি রকমের স্টুডিও রয়েছে যেখানে কাহিনী এবং দলিল চিত্র নির্মাণের কাজ চলতে পারে। কতকগুলি স্টুডিও প্রধান প্রধান চলচ্চিত্র গ্রুপের সংগে সংশ্লিষ্ট, বাকিগুলি ব্যক্তিবিশেষের মালিকানাধীন। এই ব্যক্তিগত মালিকানাধীন স্টুডিওগুলিই অন্য যে কেউ বাইরে থেকে এসে ভাড়া করতে পারে। এ ছাড়া কতকগুলি ছোট ছোট স্টুডিও ব্রিটেনে আছে যারা দলিল চিত্র নির্মাণের কাজে কিছু কিছু সুনাম অর্জন করেছে।

*

ভেনিস ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কমিটি এক তারবার্তায় কালকাটা ফিল্মসের "বাইশে শ্রাবণ"-এর পরিচালক মৃণাল সেনকে জানিয়েছেন যে তাঁর ছবিটি ফেস্টি-ভ্যাল-এর "ইনফরমেশন সেকশন"-এ গৃহীত হয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক ভিত্তিতে ছবিটি ফেস্টিভ্যাল-এ প্রদর্শিত না হলেও "ইনফরমেশন সেকশন"-এ গৃহীত হওয়ায় ছবিটি "ক্রিটিকস্ এওয়ার্ড"-এর জন্যে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হবে। গত বছর ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত "বাড়ী থেকে পালিয়ে"-ও এই বিভাগে প্রদর্শিত হয়েছিল।

এলিট —প্রত্যহ—
৩, ৬ ও রাত্রি ৯টায়
উন্মত্ত নদীর বিশাল জলধারার মত ক্যামবেলের জীবনে এসেছিল উদ্দাম প্রেমের দুরন্ত জোয়ার ....সে চেয়েছিল অপরিচিত যুবকের বাহুবন্ধনে নিজেকে লুকাতে।

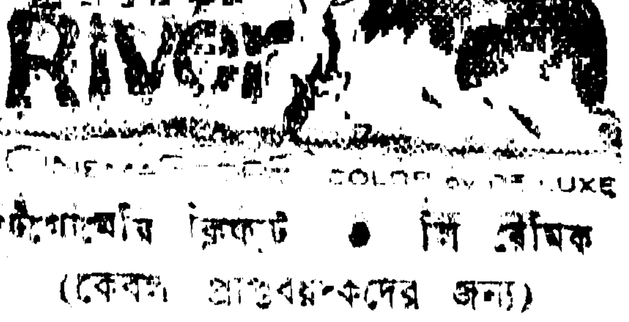

মণ্টগোমারি ক্লিফট • লি রেমিক
(কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য)

খেলার মাঠে

একলব্য

অলিম্পিক—পুরুষদের ট্র্যাক ইভেণ্ট

রোম অলিম্পিকে পুরুষদের অ্যাথলেটিকসের ২৪টি বিষয়ের মধ্যে পাঁচটি বিষয়ে নতুন বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর নতুন অলিম্পিক রেকর্ড হয়েছে ১৮টি বিষয়ে। এ ছাড়া ৪×১০০ মিটার রিলে রেসে জার্মানীর দৌড়বীরেরা আগের বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড স্পর্শ করে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছেন। শুধু পাঁচ হাজার মিটার দৌড়, ১১০ ও ৪০০ মিটার হার্ডল রেস ও ২০ কিলোমিটার ভ্রমণ প্রতিযোগিতায় নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মাত্র দুজন প্রতিযোগী—আমেরিকার লী ক্যালহাউন ও গ্লেন ডেভিস এবারও হার্ডলসের স্বর্ণপদক লাভ করে পর পর দুটি অলিম্পিকে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছেন।

অ্যাথলেটিকসে বিজয়ীর ২৪টি স্বর্ণপদক গিয়েছে মাত্র ৯টি দেশে। আমেরিকা পেয়েছে ৯টি, সোভিয়েট রাশিয়া ৫টি। জার্মানী, নিউজিল্যাণ্ড ও পোল্যাণ্ড ২টি করে আর ইতালী, অস্ট্রেলিয়া, গ্রেট ব্রিটেন ও ইথিওপিয়া পেয়েছে একটি করে স্বর্ণ পদক।

পুরুষদের অ্যাথলেটিকসের ২৪টি বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা গিয়েছে ৪০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায়, যাতে অন্যতম প্রতিযোগী ছিলেন ভারতের মিলখা সিং। মিলখা সিং তাঁর নিজের মান অনুযায়ী অনেক ভাল ফল করেও কোন স্থান লাভ করতে পারেননি।

এ সপ্তাহে পুরুষদের ট্র্যাক ইভেণ্টের কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে শুধু আলোচনা করা হল। পরের সপ্তাহে ফিল্ড ইভেণ্ট সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

১০০ মিটার দৌড়

বিশ্ব রেকর্ড—আর্মিন হ্যারী (জার্মানী) ও এইচ জেরোম (ক্যানাডা) ১০ সেকেণ্ডঃ

প্রাক্তন অলিম্পিক রেকর্ড—এডি টোলান, জেসি ওয়েন্স, হ্যারিসন ডিলার্ড, ববি মরো ও ইরা মার্চিসন (ইউ এস এ), ১০·৩ সেকেণ্ড।

১ম—আর্মিন হ্যারী (জার্মানী) ১০·২ সেঃ (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড)

২য়—ডেভ সাইম (ইউ এস এ) ১০·২ সেঃ।

৩য়—পি র‍্যাডফোর্ড (গ্রেট ব্রিটেন) ১০·৩ সেঃ।

অ্যাথলেটিকসের নানা বিষয়ের মধ্যে ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতার বিজয়ীর সম্মান অনন্য। ১০০ মিটার দৌড়ের বিজয়ীকে ইংরাজীতে বলা হয় 'ফাস্টেস্ট ম্যান অব দি ওয়ার্ল্ড'—অর্থাৎ পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষিপ্রতম মানব। বিগত ১৩টি অলিম্পিকের ১০টি অলিম্পিকেই আমেরিকার দৌড়বীরেরা ১০০ মিটারে বিজয়ীর স্বর্ণ পদক পেয়েছেন। বাকী তিনটি অলিম্পিকের স্বর্ণ-পদক গিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা, গ্রেট ব্রিটেন ও ক্যানাডার ঘরে। জার্মানীর দৌড়বীর আর্মিন হ্যারী এবার নতুন অলিম্পিক রেকর্ড সৃষ্টি করে ১০০ মিটারে বিজয়ী হওয়ায় জার্মানী এবার সর্বপ্রথম এই বিষয়ের স্বর্ণ পদক লাভ করেছে। আর্মিন হ্যারী অলিম্পিকের কিছুদিন আগে ১০০ মিটারে নতুন বিশ্ব রেকর্ডের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবু বিশ্বের অ্যাথলেটিক বিশারদদের ধারণা ছিল এবারও ১০০ মিটারের স্বর্ণ পদক যাবে আমেরিকার ঘরে। গতবার আমেরিকার দৌড়বীর ববি মরো যেমন ১০০ ও ২০০ মিটারে বিজয়ী হয়েছিলেন এবারও তেমন রে নর্টন দুই বিষয়েই মরোর পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন। কিন্তু রে নর্টন পেয়েছেন পঞ্চম স্থান। আর্মিন হ্যারীর

১০০ মিটার দৌড়ের বিজয়ী। বিশ্বের ক্ষিপ্রতম মানব আর্মিন হ্যারী

২০০ মিটার দৌড়ের বিজয়ী এল বেরুটি

প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ক্যানাডার এইচ জেরোম। জেরোমও হ্যারীর সমপর্যায়ের দৌড়বীর এবং হ্যারীর মতই অলিম্পিকের কিছুদিন আগে ১০ সেকেণ্ডে নতুন বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী হয়েছেন। কিন্তু রোমে সেমি-ফাইন্যাল দৌড়বার সময় জেরোমের মাংসপেশীতে 'টান' ধরায় জেরোম দৌড়তে পারেন না। আর্মিন হ্যারী ১০০ মিটারের হিটেই নতুন অলিম্পিক রেকর্ড করেছিলেন। ফাইন্যালেও তিনি নতুন রেকর্ড করে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেন।

২০০ মিটার দৌড়

বিশ্ব রেকর্ড—ডি সাইম (ইউ এস এ) ২০ সেঃ (স্ট্রেট ট্র্যাক) এস জনসন ও রে নর্টন (ইউ এস এ) ২০·৫ সেঃ (টার্ণ ট্র্যাক)।

প্রাক্তন অলিম্পিক রেকর্ড—বব্ মরো (ইউ এস এ) ২০·৬ সেঃ।

১ম—এল বেরুটি (ইতালী) ২০·৫ সেঃ (বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড)।

২য়—এল কার্ণে (ইউ এস এ) ২০·৬ সেকেণ্ড।

৩য়—এ সিয়ে (ফ্রান্স) ২০·৭ সেঃ।

১০০ মিটার দৌড়ের মত ২০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতাকেও আমেরিকার দৌড়-

বীরদের পরাজয় উল্লেখ করবার মত ঘটনা। কারণ ২০০ মিটারে আমেরিকার প্রাধান্য আরও বেশী। আগের ১৩টি অলিম্পিকের মধ্যে ১১টি অলিম্পিকেই ২০০ মিটারের স্বর্ণ পদক গিয়েছে আমেরিকার ঘরে। দু'বার গিয়েছে ক্যানাডায়।

এবার ইতালীর দৌড়বীর এল, বেরুটির ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান লাভ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ফলাফল। কারণ পৃথিবীতে ২০০ মিটার দৌড়ের নাম করা ১২।১৪ জন প্রতিযোগীর মধ্যে বেরুটির স্থান ছিল চার পাঁচ জনের পরে। বেরুটি কোনদিনই ২০·৭ সেকেণ্ডের কম সময়ে ২০০ মিটার অতিক্রম করতে পারেননি। অথচ নিজের দেশে অলিম্পিক প্রতিযোগিতার সময় তিনি ২০·৫ সেকেণ্ডে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড করে ২০০ মিটারের স্বর্ণপদক লাভ করলেন! এখানে বলা প্রয়োজন বেরুটি শুধু নতুন অলিম্পিক রেকর্ডই করেননি। টার্ণিং ট্র্যাকের বিশ্ব রেকর্ডকেও স্পর্শ করেছেন।

৪০০ **মিটার দৌড়**

প্রাক্তন বিশ্ব রেকর্ড—লাউ জোন্স (ইউ এস এ) ৪৫·২ সেঃ।

প্রাক্তন অলিম্পিক রেকর্ড—ভি রডেন ও এইচ ম্যাকিনলে (জামাইকা) ৪৫·৯ সেঃ:

১ম—ওটিস ডেভিস (ইউ এস এ) ৪৪·৯ সেঃ (**নতুন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড**)।

২য়—কার্ল কফম্যান (জার্মানী) ৪৪·৯ সেঃ।

৩য়—ম্যালকম স্পেন্স (দক্ষিণ আফ্রিকা) ৪৫·৫ সেঃ

৪র্থ—মিলখা সিং (ভারত) ৪৫·৬ সেঃ

৪০০ মিটার দৌড়ে যেমন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা গিয়েছে রোম অলিম্পিকের অন্য কোন প্রতিযোগিতায় বোধ করি এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায়নি। প্রথম স্থানাধিকারী আমেরিকার ওটি ডেভিস এবং দ্বিতীয় স্থানাধিকারী জার্মানীর কার্ল কফম্যান দুজনেই নতুন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড করেছেন। তাছাড়া তৃতীয় স্থানাধিকারী দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যালকম স্পেন্স এবং চতুর্থ স্থানাধিকারী ভারতের মিলখা সিংও আগের অলিম্পিক রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়েছেন। স্বল্প ও মধ্য পাল্লার দৌড়ে ১ সেকেণ্ড উন্নতি করতে যেখানে বিশ্বের কীর্তিমান অ্যাথলেটদের বছরের পর বছর কেটে যায়, সেখানে আগের বিশ্ব রেকর্ড থেকে ·৩ সেকেণ্ড উন্নতি করা অতুলনীয় কীর্তির আওতায় পড়ে।

৪০০ মিটারে ভারতের দৌড়বীর মিলখা সিং কিছু একটা করতে পারবেন এমন ধারণা আমাদের বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। কারণ রোমে যেয়ে মিলখা তার দৌড়ের

ভারতের শ্রেষ্ঠ দৌড়বীর মিলখা সিং

প্রভূত উন্নতি করেছিলেন। ৪০০ মিটারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় এজন্য ২০০ মিটারের প্রতিযোগিতাও তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু বিশ্বের খ্যাতনামা দৌড়বীরদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি আশানুরূপ সম্মান লাভ করতে পারেননি।

১৫০০ মিটার দৌড়ের বিজয়ী
হার্ব ইলিয়ট

৪০০ মিটারে তাকে চতুর্থ স্থান লাভ করে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

কিন্তু এজন্য মিলখার উপর কোন অভিযোগ নেই। কারণ আমরা তার ক্ষমতার যতটুকু পরিচয় পেয়েছিলাম রোমে তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন। মিলখা সিং ভারতে কোনদিন ৪৬ সেকেণ্ডের কম সময়ে ৪০০ মিটার দৌড়তে পারেননি। কিন্তু রোমের ফাইন্যালে তার ৪০০ মিটারের সময় হয়েছে ৪৫·৬ সেকেণ্ড। অর্থাৎ আগের অলিম্পিক রেকর্ডের চেয়েও ·৩ সেকেণ্ড কম।

৮০০ **মিটার দৌড়**

বিশ্ব রেকর্ড—রজার ময়েন্স (বেলজিয়াম) ১ মিঃ ৪৫·৭ সেঃ

প্রাক্তন অলিম্পিক রেকর্ড—টম কোর্টনী (ইউ এস এ) ১ মিঃ ৪৭·৭ সেঃ

১ম—পি স্নেল (নিউজিল্যাণ্ড) ১ মিঃ ৪৬·৩ (**নতুন অলিম্পিক রেকর্ড**)

২য়—রজার ময়েন্স (বেলজিয়াম) ১ মিঃ ৪৬·৫ সেঃ

৩য়—জর্জ কার (জামাইকা) ১ মিঃ ৪৭·১ সেঃ

৮০০ মিটার দৌড়ে নিউজিল্যাণ্ডের পি স্নেলের প্রথমস্থান লাভ রীতিমত অপ্রত্যাশিত ফলাফল। ৮০০ মিটারের নামকরা দৌড়বীরদের মধ্যে কোনদিন স্নেলের নাম শোনা যায়নি।

১৫০০ **মিটার দৌড়**

প্রাক্তন বিশ্ব রেকর্ড—হার্ব ইলিয়ট (অস্ট্রেলিয়া) ৩ মিঃ ৩৬ সেঃ

প্রাক্তন অলিম্পিক রেকর্ড—রণ ডিলানী (আয়ারল্যাণ্ড) ৩ মিঃ ৪১·২ সেঃ

১ম—হার্ব ইলিয়ট (অস্ট্রেলিয়া) ৩ মিঃ ৩৫·৬ সেঃ (নতুন বিশ্ব ও অলিম্পিক **রেকর্ড**)

২য়—মিচেল যাজী (ফ্রান্স) ৩ মিঃ ৩৮·৪ সেঃ:

৩য়—আই রাজাভোল্গি (হাঙ্গেরী) ৩ মিঃ ৩৯·২ সেঃ

১৫০০ মিটার দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী অস্ট্রেলিয়ার 'কান্তিহীন ক্যাঙ্গারু' হার্ব ইলিয়টের স্বর্ণপদক লাভ সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত ফলাফল। ইলিয়ট শুধু প্রথম স্থানই লাভ করেননি নতুন বিশ্ব এবং অলিম্পিক রেকর্ডও সৃষ্টি করেছেন।

৫০০০ **মিটার দৌড়**

বিশ্ব রেকর্ড—ভি কুটস (রাশিয়া) ১৩ মিঃ ৩৫ সেঃ।

অলিম্পিক রেকর্ড—ভি কুটস (রাশিয়া ১৩ মিঃ ৩৯·৬ সেঃ।

১ম—মারে হলবার্গ (নিউজিল্যাণ্ড ১৩ মিঃ ৪৩·৪ সেঃ।

২য়—এইচ গ্রোডটস্কি (জার্মানী) ১৩ মিঃ ৪৪·৬ সেঃ।

১০০০০ মিটার দৌড়ের বিজয়ী বলটনিকভ

৩য়—কে জিমনী (পোল্যাণ্ড) ১৩ মিঃ ৪৬·৮ সেঃ।

[স্বল্প ও দীর্ঘ পাল্লার ৮ রকমের দৌড়ের মধ্যে একমাত্র পাঁচ হাজার মিটারে কোন নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়নি।]

১০,০০০ মিটার দৌড়

বিশ্ব রেকর্ড—ভি কুটস (রাশিয়া) ২৮ মিঃ ৩০·৪ সেঃ।

প্রাক্তন অলিম্পিক রেকর্ড—ভি কুটস (রাশিয়া) ২৮ মিঃ ৪৫·৬ সেঃ।

১ম—পি বলটনিকভ (রাশিয়া) ২৮ মিঃ ৩২·২ সেঃ (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড)।

২য়—এ ই গ্রোডটস্কি (জার্মানী) ২৮ মিঃ ৩৭ সেঃ।

৩য়—ডেভ পাওয়ার (অস্ট্রেলিয়া) ২৮ মিঃ ৩৮·২ সেঃ।

[গতবার মেলবোর্ন অলিম্পিকে পাঁচ হাজার ও দশ হাজার মিটার দৌড়ের দু'টি স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন রাশিয়ার দৌড়বীর ভ্লাদিমির কুটস। কুটসের উত্তরসাধক বলটনিকভ এবার নতুন অলিম্পিক রেকর্ড করে দশ হাজারে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছেন।]

৪×১০০ মিটার রিলে

বিশ্ব রেকর্ড—ইউ এস এ ৩৯·৫ সেঃ

অলিম্পিক রেকর্ড—ইউ এস এ ৩৯·৫ সেঃ

১ম—জার্মানী ৩৯·৫ সেঃ (বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ডের সম সময়)

২য়—রাশিয়া ৪০·১ সেঃ

৩য়—গ্রেট ব্রিটেন ৪০·২ সেঃ

(৪×১০০ মিটার রিলে দৌড় আরম্ভ হয়েছে ১৯১২ সালের স্টকহোম অলিম্পিক থেকে। এই বছর গ্রেট ব্রিটেন বিজয়ীর স্বর্ণ পদক পায়। তারপর থেকে প্রতি অলিম্পিকে আমেরিকা বিজয়ী হয়ে আসছে। এবার জার্মানী সর্বপ্রথম রিলের স্বর্ণ পদক পেয়েছে অলিম্পিক ও বিশ্ব রেকর্ডের সময়কে স্পর্শ করে।)

৪×৪০০ মিটার রিলে

প্রাক্তন বিশ্ব রেকর্ড—জামাইকা ৩ মিঃ ৩·৯ সেঃ

প্রাক্তন অলিম্পিক রেকর্ড—জ্যামাইকা ৩মিঃ ৩·৯ সেঃ

১ম—ইউ এস এ (জে আর্মান, ই ইয়ং, জি ডেভিস ও ও ডেভিস) ৩ মিঃ ২·২ সেঃ (নতুন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড)

২য়—জার্মানী, ৩ মিঃ ২·৭ সেঃ;

৩য়—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ৩ মিঃ ৪·৯ সেঃ,

(৪×৪০০ মিটার রিলে আরম্ভ হয়েছে ১৯০৮ সালে লণ্ডন অলিম্পিক থেকে। ১০ বারের অলিম্পিকে আমেরিকা স্বর্ণপদক পেয়েছে ৭ বার। এবার নিয়ে ৮ বার আমেরিকা—১৬০০ মিটার রিলে দৌড়ের স্বর্ণ পদক ঘরে তুলল।)

৩০০০ মিটার স্টিপল চেজ

বিশ্ব রেকর্ড—জেড ক্রিজিসকোয়ায়াক (পোল্যাণ্ড) ৮ মিঃ ৩১·৪ সেঃ।

প্রাক্তন অলিম্পিক রেকর্ড—ক্রিস ব্র্যাশার (ব্রিটেন) ৮ মিঃ ৪১·২ সেঃ।

১ম—জেড ক্রিজিসকোয়ায়াক (পোল্যাণ্ড) ৮ মিঃ ৩৪·২ সেঃ (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড)।

২য়—এন সকোলভ (রাশিয়া) ৮ মিঃ ৩৬·৪ সেঃ।

৩য়—এস রিজিশ্চিন (রাশিয়া) ৮ মিঃ ৪২·২ সেঃ।

[পোল্যাণ্ডের জেড ক্রিজিসকোয়ায়াকই ছিলেন ৩০০০ মিটার স্টিপল চেজে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী। সুতরাং নতুন অলিম্পিক সময়ে তাঁর প্রথম স্থানলাভ প্রত্যাশিত ফলাফল।]

১১০ মিটার হার্ডলস

বিশ্ব রেকর্ড—মার্টিন লাউয়ার (জার্মানী) ১৩·২ সেঃ।

অলিম্পিক রেকর্ড—লী ক্যালহাউন ও জে ডেভিস (ইউ এস এ) ১৩·৫ সেঃ।

১ম—লী ক্যালহাউন (ইউ এস এ) ১৩·৮ সেঃ।

২য়—ডব্লিউ মে (ইউ এস এ) ১৩·৮ সেঃ।

৩য়—এইচ জোনস (ইউ এস এ) ১৪ সেঃ।

[১১০ মিটার হার্ডল রেসে গতবারের অলিম্পিক বিজয়ী লী ক্যালহাউনের এবারও স্বর্ণপদক লাভের ঘটনা বিশেষভাবেই উল্লেখ করবার মত। আবার এই বিষয়ে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী মার্টিন লাউয়ারের চতুর্থ স্থানলাভও কম উল্লেখযোগ্য নয়। মোট তেরটি অলিম্পিকের মধ্যে মাত্র একবার ছাড়া বাকী ১২ বারই আমেরিকার প্রতিনিধি এই বিষয়ে বিজয়ীর স্বর্ণপদক পেয়ে এসেছেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে ক্যালহাউন নতুন অলিম্পিক রেকর্ড করতে পারেননি ও তাঁর মেলবোর্নের অলিম্পিক রেকর্ডই বহাল আছে।]

৪০০ মিটার হার্ডল রেসে উপর্যুপরি দু'বারের বিজয়ী গ্লেন ডেভিস

৪০০ মিটার হার্ডলস

বিশ্ব রেকর্ড—গ্লেন ডেভিস (ইউ এস এ) ৪৯·২ সেঃ।

অলিম্পিক রেকর্ড—এ ডি সাদার্ন ও গ্লেন ডেভিস (ইউ এস এ) ৫০·১ সেঃ।

১ম—গ্লেন ডেভিস (ইউ এস এ);

২য়—ক্লিফটন কুশম্যান (ইউ এস এ);

৩য়—রিচার্ড হাওয়ার্ড (ইউ এস এ)।

[১১০ মিটার হার্ডল রেসের মত ৪০০ মিটার হার্ডল রেসেও গতবারের বিজয়ী গ্লেন ডেভিস এবারও বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছেন এবং এই বিষয়ে ডেভিসই প্রথম অ্যাথলেট, পর পর দু'টি অলিম্পিকের স্বর্ণপদক যাঁর অধিকারে। ১১০ মিটার ও ৪০০ মিটার হার্ডলসে আমেরিকার প্রতিযোগীরাই ছয়টি পদক নিয়ে গেছেন। অবশ্য হার্ডলসে আমেরিকার প্রাধান্য চিরদিনই সুস্পষ্ট। গ্রেট ব্রিটেনের লর্ড বার্গলে ও আয়ারল্যাণ্ডের টিসডল ছাড়া অন্য কোন দেশের কোন প্রতিযোগী কোনবার ৪০০ মিটার হার্ডল রেসে বিজয়ী হতে পারেননি। অলিম্পিকে ৪০০ মিটার হার্ডল রেস অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ১৯০০ সালের প্যারী অলিম্পিক থেকে।]

স্মারকের দ্বিতীয় পদক্ষেপ ঃ
শারদীয়া সংখ্যা
লিখছেন ঃ তারাশঙ্কর, ডঃ অজিত ঘোষ, ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ, ক্ষেত্র গুপ্ত, জাহ্নবী চক্রবর্তী, বিমলচন্দ্র ঘোষ, রাম বসু, শক্তি চট্টো
ডঃ ধীরেন গাঙ্গুলী, উত্তমকুমার এবং উদীয়মান আরও অনেকে।
ঃ মূল্য মাত্র এক টাকা ঃ
সম্পাদক সুখেন্দু মল্লিক
কার্যালয় ঃ ৩, বালক দত্ত লেন, কলি ৭
(সি ৭৯৭৭)

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১২ই সেপ্টেম্বর—আজ সকালে বালী থানার অন্তর্গত গিরিশ ঘোষ রোডে দিনদুপুরে এক দুঃসাহসিক সশস্ত্র ডাকাতিতে দুর্বৃত্তগণ নগদে ২৪ হাজার টাকা লইয়া অপেক্ষমান ট্যাক্সিতে করিয়া চম্পট দেয়। পুলিস তাজা কার্তুজ ভর্তি একটি রিভলবারসহ এক ব্যক্তিকে হাতে-নাতে ধরিয়া ফেলে। ট্যাক্সি চালককেও পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে, কিন্তু লুণ্ঠিত অর্থের কোন হদিস পাওয়া যায় নাই।

অদ্য কলিকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে এক সভায় আসামের বিশিষ্ট খণ্ডজাতি নেতা এবং লোকসভার সদস্য শ্রীহুভার হাইনিউতা দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, খণ্ডজাতীয় জনগণ অসমীয়াকে আসামের রাজ্যভাষা হিসাবে মানিয়া লইবেন না।

রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরে খোঁজ লইয়া জানা যায় যে, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বিভাগীয় সার্ভিসের অধীন অন্যূন ২২২টি পদ শূন্য আছে। সুশিক্ষার প্রয়োজনে অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিয়া রাজ্য সরকারের ১৯৫৬-৫৭ সালে প্রদত্ত আদেশবলে ঐ পদগুলির অধিকাংশ সৃষ্ট হয় বলিয়া প্রকাশ।

১৩ই সেপ্টেম্বর—ভারতের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হয়—এইরূপ কয়েকটি অপরাধের সাজা দেওয়ার জন্য ভারত সরকার সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে ফৌজদারী আইন সংশোধনের জন্য একটি বিল উত্থাপন করিবেন। প্রস্তাবিত বিল অনুযায়ী কোন ব্যক্তি যদি দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতা বা সীমান্ত সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশের সাহায্যে ভারতের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করে। তবে তাহার দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা জরিমানা অথবা কারাদণ্ড ও জরিমানা দুই-ই হইবে।

১৪ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনযোগ্য জমি নাই—এই কথাই কয়েক বৎসর যাবত রাজ্য সরকার ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু রাজ্য সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরের সহিত ঘনিষ্ঠ কোন এক মহলের সংবাদে ঐ ব্যাপারে সম্পূর্ণ পৃথক এক চিত্র উদ্ঘাটিত হয়।

শেয়ারের বাজারে ফাটকাবাজীর মনোভাব বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

১৫ই সেপ্টেম্বর—আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা অদ্য কলিকাতায় এক সাক্ষাৎকারে বলেন, সমগ্র ভারতের স্বার্থেই সীমান্ত রাজ্য আসামের অখণ্ডত্ব বজায় রাখা দরকার; শুধু তাহাই নহে, 'যথেষ্ট আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দিয়া' ত্রিপুরা, মণিপুর, নেফা ও আসাম সহ একটি দৃঢ় সংবদ্ধ সংযুক্ত প্রশাসনের প্রয়োজনীয়তাও এই মুহূর্তে বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে।

জানা গিয়াছে যে, কংগ্রেস, পি এস পি এবং কম্যুনিস্ট এই তিনটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল আসামে সাম্প্রতিক হাঙ্গামাকালে নিজ নিজ দলের লোকেদের আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করার কথা বিবেচনা করিতেছেন।

১৬ই সেপ্টেম্বর—আসন্ন আদমসুমারী লইয়া সরকারী মহলে সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই ঐ কাজের জন্য ৫০ হাজার গণনাকারীর এক বিরাট বাহিনী তৈরী হইতেছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু অদ্য মহীশূর কংগ্রেস পরিষদ দলের একটি রুদ্ধদ্বার-কক্ষ বৈঠকে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে দল ও উপদলগুলির মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে তাহাতে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন।

১৭ই সেপ্টেম্বর নির্ভরযোগ্যসূত্রে জানিতে পারা গিয়াছে যে, নয়াদিল্লিস্থ কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তর হইতে দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থার চীফ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে বদলী করা হইয়াছে।

পঁচাত্তর টাকার মধ্যেই সমগ্র রবীন্দ্র রচনাবলী পাওয়া যাইবে এবং আগামী বৈশাখের পূর্বেই এই সুলভ শতবার্ষিকী সংস্করণ প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

১৮ই সেপ্টেম্বর—আজ নয়াদিল্লিতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদের পঞ্চদশ অধিবেশনে যোগদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রীনেহরু আগামী ২৯শে সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লি হইতে বিমানযোগে যাত্রা করিয়া পরের দিন নিউইয়র্কে উপনীত হইবেন।

বিদেশী সংবাদ

১২ই সেপ্টেম্বর—মার্কিন ভাইস প্রেসিডেণ্ট শ্রীরিচার্ড নিক্সন বলেন, সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চেফ যদি আণবিক বোমার পরীক্ষা বন্ধ রাখার চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করিতে চাহেন, তবে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন।

প্রকাশ, প্রেসিডেণ্ট কাসাভুবু গতকাল শ্রীলুমুম্বাকে গ্রেপ্তার করার জন্য পরোয়ানা জারী করিয়াছেন। শ্রীলুমুম্বাকে নাকি একটি ঢাকা গাড়িতে পলায়ন করিতে দেখা গিয়াছে।

১৩ই সেপ্টেম্বর—স্যার এডমণ্ড হিলারীর বহু উদ্দেশ্যমূলক অভিযান অদ্য সুদৃশ্য শহর ভাদগাঁও (কাঠমাণ্ডুর নিকটে) হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অভিযানের একটি উদ্দেশ্য তুষার মানব ধরা। অভিযানের প্রথম পর্যায়ে পৌঁছিতে ১৫ দিন লাগিবে। এখন হইতে আগামী দুই মাসকাল ধরিয়া তুষারমানব ধরিবার চেষ্টা চলিবে।

কঙ্গোলী সংসদ আজ রাত্রে প্রধানমন্ত্রী শ্রীলুমুম্বাকে পূর্ণ ক্ষমতা দান করিয়াছে। সংসদের উভয় সভার যুক্ত অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীলুমুম্বাকে তাঁহার সমর্থকরা হর্ষধ্বনি দ্বারা সম্বর্ধিত করেন। বিরোধীপক্ষের প্রায় কোন সদস্যই অধিবেশনে যোগদান করেন নাই।

১৪ই সেপ্টেম্বর—কঙ্গোর প্রেসিডেণ্ট কাসাভুবু ও প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বা রাষ্ট্রপুঞ্জে দুই দল প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা লইয়া নিরাপত্তা পরিষদে আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে জোর বিতর্ক বাধিয়া ওঠে। কেননা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করেন কাসাভুবুর প্রতিনিধি দলকে, রাশিয়া লুমুম্বার।

ডেইলী এক্সপ্রেস পত্রিকা সংবাদের সূত্র প্রকাশ না করিয়া আজ এই সংবাদ ঘোষণা করিয়াছেন যে, কতিপয় সোভিয়েট মহাকাশ বিজ্ঞানীকে রকেটযোগে মহাকাশে ৩০ মাইল ঊর্ধ্বে প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং তাঁহারা নিরাপদে ও সুস্থ শরীরে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

১৫ই সেপ্টেম্বর—সিংহলের অর্থমন্ত্রী শ্রীফেলিকস ডায়াস বন্দরনায়ক তিন মাসের অধিক সময়ের ভিসা লইয়া যে সকল বিদেশী সিংহলে বসবাস করিবে তাহাদের উপর বার্ষিক চারশত টাকা হারে কর ধার্যের প্রস্তাব করিয়াছেন।

মিঃ প্যাট্রিস লুমুম্বা আজ এইরূপ দাবি করেন যে, সৈন্যদল তাঁহাকে অপসারিত করিবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তিনি এখনও কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী পদেই অধিষ্ঠিত আছেন। এক বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, কঙ্গোলী সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কর্নেল যোসেফ মোবুটুকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

১৬ই সেপ্টেম্বর—কঙ্গো সম্পর্কে মার্কিন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সোভিয়েট ভিটোর আশঙ্কা রহিয়াছে। রাশিয়া যদি সত্যসত্যই ভেটো ক্ষমতার প্রয়োগ করে তবে কি সংঘাত অন্তে সাধারণ পরিষদের এক জরুরী অধিবেশন আহ্বান করা হইবে?—এই প্রশ্নের জবাবে রাষ্ট্রপুঞ্জের কূটনৈতিক মহল দ্বিধাবিভক্ত।

কঙ্গোলী সামরিক পুলিস আজ শ্রীপ্যাট্রিস লুমুম্বার ২০ জন পার্শ্বচরকে তাঁহার সরকারী বাসভবন হইতে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়। শ্রীলুমুম্বা এখনও তাঁহার বাসভবনেই আছেন। মনে হয় তিনি স্বগৃহে অন্তরীণ।

১৭ই সেপ্টেম্বর—আগামী সপ্তাহে রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিবেশনে যোগদানের জন্য শ্রীক্রুশ্চেফ প্রমুখ যে নেতৃবৃন্দ আসিতেছেন তাঁহাদের নিরাপত্তার জন্য পুরা দুই ডিভিশন সংখ্যায় প্রায় ৮ হাজার পুলিস নিয়োগ করা হইয়াছে।

সোভিয়েট ও চেক রাষ্ট্রদূতদ্বয়কে কঙ্গো ত্যাগ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইলে উভয় দেশের রাষ্ট্রদূতদ্বয় এবং দূতাবাসের সমস্ত কর্মচারী লিওপোল্ডভিল বিমানঘাটিতে গমন করেন। কঙ্গোর সৈন্যরা উহাদের পশ্চাদনুসরণ করেন।

১৮ই সেপ্টেম্বর—মার্কিন এবং সোভিয়েট প্রতিনিধিদ্বয়ের মধ্যে বাগবিতণ্ডা ও সেক্রেটারী জেনারেল শ্রীহ্যামারশিল্ডের পদত্যাগের প্রচ্ছন্ন হুমকীর পর কঙ্গো সংকট আলোচনার জন্য আহূত নিরাপত্তা পরিষদের জরুরী বৈঠক অদ্য অপরাহ্ন পর্যন্ত স্থগিত থাকে।

ওয়াশিংটনের খবরে প্রকাশ, রাষ্ট্রদপ্তরের জনৈক মুখপাত্র অদ্য বলেন যে, রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য কম্যুনিস্ট প্রতিনিধিদল এখানে উপস্থিত হইলে তাহাদের আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া চলাফেরা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষান্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষান্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮০। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

দেশ

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

DESH 40 Naya Paise
Saturday, 8th October, 1960.

২৭ বর্ষ ॥ ৪৮ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২২ আশ্বিন, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

শারদ উৎসব সমারোহের দীপ্তিতে আকাশ বাতাস, আবেশে মনপ্রাণ এখনও সমাচ্ছন্ন। কোথায় দূরে, বহুদূরে পৃথিবীর আর এক গোলার্ধে নিউইয়র্কের একপ্রান্তে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা নিয়ে, সত্যি বলতে কী, আমরা অনেকেই খুব ভাবিত হইনি। কিন্তু না ভেবে উপায় কী ? পৃথিবী একাত্ম না হলেও এযুগে একাকার। রাষ্ট্রপুঞ্জের সঙ্গে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই বটে, কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতির আবহাওয়ায় দুর্যোগের লক্ষণ প্রবল হলে তার ঝাপটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও সইতে হয়। রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং রাষ্ট্রনেতারা আমাদের কাছে সুদূর গগনবিহারী; তা বলে তাঁদের আকর্ষণ-বিকর্ষণের প্রভাবটা কম নয় আমাদের উপর।

ঘরের পাশে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারীর আবির্ভাবে আমরা উদ্বিগ্ন হই, কতকটা আত্মরক্ষার সহজাত প্রেরণায়, আর কতকটা মানবীয় সহানুভূতি বশে। সেই আপদ্ধর্ম এবং মানবীয় সহানুভূতির ক্ষেত্র আমাদের কালে বিস্তৃত হয়েছে আরও বহুদূরে। কবি গোল্ড-স্মিথই বোধ হয় প্রায় দুই শতাব্দী পূর্বে সখেদে বলেছিলেন, ইংলণ্ডে বসে যদি কোনও মন্ত্রকৌশলের সাহায্যে সুদূর এশিয়া মহাদেশের কয়েক লক্ষ মানুষকে এক নিমেষে মেরে ফেলা যায়, তাহলে ইংলণ্ডের একজন লোকও সামান্য মাত্র দুঃখ অনুভব করবে না। গোল্ড-স্মিথের এই মন্তব্যের অর্থ এ-নয় যে, ইংরেজরা হৃদয়হীন; প্রকৃত তাৎপর্য হল দূরে দৃষ্টির অগোচরে স্বজাতিগোষ্ঠী-বহির্ভূত অসংখ্য লোকের প্রাণহানি বা দুর্গতি ঘটলে মানুষ সাধারণ বিচলিত বোধ করে না। কিন্তু আমাদের কালটা অন্যরকম; এ-কালে ঘরের ও বাইরের,

রাষ্ট্রপুঞ্জের ভাবনা

স্থান ও কালের ব্যবধান এবং দূরত্ব বিলুপ্তপ্রায়। পরমাণু বোমা এবং রকেট অস্ত্রের কৃপায় সমূহ বিনষ্টির পাকা হিসেবে দূরের মানুষ, কাছের মানুষ, শাদা মানুষ, বাদামী এবং কালো মানুষ, ভালো এবং মন্দ মানুষ সবাই এক পথের পথিক। কাজেই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনা সকলেরই; আর সেই মহাভাবনার ভাবব্যঞ্জনার প্রধান প্রযোজনাকেন্দ্র রাষ্ট্রপুঞ্জ।

পৃথিবীর আটানব্বইটি সদস্য-দেশ গঠিত রাষ্ট্রপুঞ্জের পঞ্চদশ সাধারণ অধিবেশনে এবার রাজসূয় যজ্ঞের মত যে-কাণ্ড চলেছে, সেটি নিতান্ত আনুষ্ঠানিক ব্যাপার নয়। অনেকের মনে সশঙ্ক প্রশ্ন, রাজসূয় যজ্ঞটা শেষ পর্যন্ত দক্ষযজ্ঞ না হয়। সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী ক্রুশ্চফ স্বয়ং রাষ্ট্রপুঞ্জে উপস্থিত হয়ে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট আইসেন-হাওয়ারকে বাক্‌যুদ্ধে আহ্বান করা থেকে এ-পর্যন্ত বহু নাটকীয় উত্তেজনা-পূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন এবারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; তার একটি কারণ কঙ্গোয় শান্তিস্থাপন ব্যাপারে রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী-জেনারেল শ্রী হ্যামারশীল্ডের আচরণ সম্পর্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যদের মধ্যে মারাত্মক মতভেদ। এর মূলও আসলে মার্কিন-সোভিয়েট মনোমালিন্য। অনেকের আশঙ্কা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইএর উত্তেজনা কোনমতে প্রশমিত না হলে রাষ্ট্রপুঞ্জের সংকটমোচন অসম্ভব।

রাষ্ট্রপুঞ্জের সংকট কথাটা কিছু পরিমাণে বিভ্রান্তিকর। আগেই বলা হয়েছে পৃথিবী আজ একাকার, কিন্তু একাত্ম নয়। রাষ্ট্রপুঞ্জের একান্তভাবে কোনও নিজস্ব সর্বজনীন সত্তা নেই; নামে ইউনাইটেড নেশনস্, প্রকৃতপক্ষে "বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ির" মত আটানব্বইটি সদস্য-রাষ্ট্র নানা রকম রাজনৈতিক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সামরিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত। কাজেই রাষ্ট্রপুঞ্জের সংকটের সূত্রটা তার নিজস্ব চরিত্রে এবং আচরণে নয়। সংকটের মূল সূত্র দুই মহাশক্তিধর মার্কিন এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রগোষ্ঠীর পরস্পর বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা এর বাইরে রয়েছে এশিয়া-আফ্রিকার কতকগুলি রাষ্ট্র, যারা প্রত্যক্ষভাবে মার্কিন কিম্বা সোভিয়েট রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করেনি। এই গোষ্ঠীবহির্ভূত রাষ্ট্র-গুলির তরফ থেকেই শ্রী নেহরু প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় পঞ্চনেতা প্রস্তাব করেন, মার্কিন-সোভিয়েট মনোমালিন্য দূর করার চেষ্টায় অবিলম্বে আইসেনহাওয়ার-ক্রুশ্চফ বৈঠক প্রয়োজন। প্রস্তাবের উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নেই; কিন্তু পৃথিবীর ভবিষ্যতের পক্ষে এ-ও এক মারাত্মক পরিহাস যে, মার্কিন এবং সোভিয়েট মহানায়কদের সুমতি প্রার্থনা ছাড়া রাষ্ট্রপুঞ্জের বাকী ছিয়ানব্বইজন সদস্যের গতি নেই এবং কাজেই পারমাণবিক বিনাশের মহাভয় থেকে পৃথিবীর নিষ্কৃতি নেই।

লর্ড রাসেল এবং অন্যান্য মনীষীরা মিথ্যা বলেননি, এ যুগের "পাওয়ার-ড্রিভন্, টেরর্-ড্রিভন্"—ক্ষমতা-চালিত, সন্ত্রাস-তাড়িত পৃথিবীকে সমূহ বিনাশ থেকে রক্ষা করার উপযুক্ত শুভবুদ্ধি-চালিত উদ্যোগ রাষ্ট্রপ্রধানদের ধারণা এবং সাধ্যের অতীত। রাষ্ট্রপুঞ্জের সাময়িক সংকটমোচন কোন কূটনৈতিক ফরমুলা-প্রয়োগে সম্ভব যদিও বা হয়, "ক্ষমতা-চালিত, সন্ত্রাস-তাড়িত" পৃথিবীর ভবিষ্যৎ বিপদমুক্ত হওয়ার আশা দেখি না।

প্রসঙ্গত

দেশ পত্রিকার পাঠক লেখক ও অনুগ্রাহীদের আমরা বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাই। আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে পুরোপুরি সাড়া দেবার মতন মানসিক অবস্থা এবার বঙ্গবাসীর ছিল না। তবু বারো মাসে তের পার্বণের এই বাংলা দেশের সেরা এবং বৃহত্তম পার্বণ দুর্গোৎসবের বোধন থেকে বিসর্জনের প্রতিটি অনুষ্ঠানই সযত্নে ভক্তিভরে পালিত হয়েছে। প্রকৃতির বিরূপতা হয়ত কিছুটা বাধা হয়েছিল—কিন্তু সে-বাধা ঠেলে উৎসবের সানাই না হোক ঠাকুর দালানের ঢাকের বাজনা প্রত্যুষের ঘুম ভাঙিয়েছে, মণ্ডপে শিশুদের কাকলি বুঝি কাকের ডাকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শুরু হয়েছে, আর যথারীতি প্রতিমা দর্শনার্থীদের আনাগোনায় পথে পথে ভিড় বেড়েছে, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলে মণ্ডপের উজ্জ্বল আলোয় সান্ধ্যারতির দৃশ্যটি বিমুগ্ধচিত্তে অবলোকন করেছে পুরুষ ও নারী। এ-দৃশ্য নতুন কিছু নয়, পুরোনো। পুরোনো বলেই যেন আরও স্মৃতিময়, আরও হৃদয়গ্রাহী। কলকাতাবাসীরা হয়ত প্রতিটি পুরাতনের মধ্যে এবার একটি নতুন জিনিসও লক্ষ্য করেছেন। সর্বজনীন পুজো-মণ্ডপের সেই অবশ্যতম ব্যবস্থাটি এবারে ছিল না (অন্তত বেশির ভাগ ক্ষেত্রে)। কদর্য ও অশোভন মাইকের গলা খুলে দেওয়া হয় নি। যুব সমাজের একাংশ মাইকের কারিকুরি ছেড়ে দুর্গত নিঃস্ব জনের জন্যে চাঁদার বাক্স হাতে মণ্ডপে মণ্ডপে দাঁড়িয়েছিল সন্ধ্যায়। মনে হয়েছে, এই সমগ্র উৎসবের মধ্যেও আমাদের আচরণে একটি প্রচ্ছন্ন বেদনা ছিল। বলা বাহুল্য, এই বেদনা দুর্গোৎসবকে সুন্দর ও গাম্ভীর্যময় করেছে। আর আমরা বিষাদের পটভূমিকায় এই সংযত সভ্য আচরণে অন্তত একটিবার তাদের কথা মনে করতে পেরেছি যাদের এত বড় উৎসবে যোগ দেবার কোনো উপায়ই ছিল না।

•

গল্প শুনেছি, একদা প্রোষিতভর্তৃকারা শহরবাসী স্বামীকে পুজোর আগে একটি পুজোর বাজারের ফর্দ পাঠাতেন, তাতে সংসারের আর পাঁচটা চাহিদার সঙ্গে অন্যতম একটি চাহিদা থাকত, আলতার শিশি ও এক পাতা টিপে সিঁদুর। পরে এই ফর্দে নাকি সিঁদুরের তলায় আরও একটি নতুন চাহিদা যোগ হয়েছিল, 'একখানি পূজা সংখ্যা পত্রিকা'। ইদানীং শুনি একটিতে কুলোয় না, একাধিক প্রয়োজন হয়। দোষ গৃহিণীদেরও নয়, গৃহস্বামীরও না। এখন যেখানে শতাধিক শারদীয় পত্রিকা সেখানে একে সুখ নেই, তৃপ্তি নেই।...শতাধিক কথাটা নিতান্ত বাহুল্যবশে ব্যবহার করা হয়েছে এমন মনে করা ভুল। বস্তুত, পুজোর মুখে—মহালয়ার আগে পরে রাস্তার বইয়ের দোকানের দিকে তাকালে অনভ্যস্ত চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠবে, অভ্যস্ত চোখও কিছুক্ষণের মতন অপলক হয়ে থাকবে। অজস্র রঙ, নানা কারুকর্ম শোভিত প্রচ্ছদ, চিত্রবিচিত্র পোস্টার। হবে না কেন! 'বাংলা সাহিত্যের ছোট বড় সকল ব্যাপারীই শারদ উৎসবের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে একটি শারদীয়া পত্রিকা প্রকাশ করে থাকেন। এ নিতান্ত বাণিজ্য নয়, কিছুটা যেন ঐতিহ্যও হয়ে দাঁড়িয়েছে। উৎসাহের বিভিন্ন আয়োজনে জোগান দিতে সবাই যখন তৎপর—তখন সাহিত্য কর্মশালার কারিকররাই বা বাদ যাবে কেন! অথচ ব্যাপারটি খুব সহজসাধ্য নয়, পলকে হবার না। একটি শারদীয় সংখ্যা প্রকাশের আয়োজন আর দুর্গা প্রতিমা গড়ার আয়োজনের শুরু বোধ হয় এক সঙ্গে—যখন বর্ষার মেঘ আকাশ ঘোর করে থাকে, শরৎ দূরান্তে। তারপর নিত্য অল্পে অল্পে অনেক ধৈর্যে, প্রচুর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দীর্ঘ দু আড়াই মাসের পর সযত্নে প্রকাশ পায় একটি পত্রিকার অর্ঘ্য। এই অর্ঘ্যের কতটুকু সাহিত্য, কি মূল্য, তার বিচার অন্যত্র, কিন্তু নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের মূল্য দিতে কার্পণ্য করা অনুচিত। মনের ভোজে যোগান দেওয়ায় কোন কারিকর জিতল, তার প্রশ্ন আসে না, মুনিদের মতের গরমিলও থাকতে পারে, কিন্তু সব যোগানদারকেই অন্তত আমাদের প্রসন্নচিত্তে ধন্যবাদ জানানো উচিত।

•

গত ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর একনবতিতম জন্মজয়ন্তী পালিত হয়েছে। অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের সংখ্যাই বেশি। মটরের ধুলো উড়িয়ে হয়ত কোথাও কোথাও মন্ত্রী উপমন্ত্রীদের আসা যাওয়া ঘটেছে, কোথাও বা কংগ্রেসী কুলীনদের চিরাচরিত বাকবাহুল্য দেখা গিয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষুদ্রাকার জনমণ্ডলীতে নিতান্ত নগণ্যজনের উপস্থিতিও লক্ষ্য করেছি। গান্ধীজীর স্মৃতি বিজড়িত অনুষ্ঠানগুলির দুটি স্পষ্ট ভাগ আছে, একটি সরকারী, অন্যটি বেসরকারী। বলা বাহুল্য বেসরকারী অনুষ্ঠানের প্রতিই আমাদের মমত্ব এবং শ্রদ্ধা অধিক। এই ধরনের একটি নিতান্ত ঘরোয়া সভায় সেদিন অতি নগণ্য এক বক্তার একটি উক্তি শুনেছি। গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মামুলি রীতি ছেড়ে বক্তা বলেছিলেন, অধিকাংশ ভারতবাসীর ধারণা গান্ধীজী তাদের স্বাধীনতা অর্জন করে দিয়েছেন। এবং এই স্বাধীনতা রক্ষা করার দায়িত্ব তিনি দিয়ে গেছেন আমাদের। কিন্তু গান্ধীজী ভারতবাসীকে আরও কিছু মহামূল্য সম্পদ দিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন সে-কথা আমরা বিস্মৃত হতে চলেছি। উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁর কাছে থেকে আমাদের প্রাপ্য ঐশ্বর্যের কোনোটিই স্থূল অথবা প্রত্যহের অভাব মোচনের সামগ্রী নয়, পরন্তু প্রত্যেকটি সম্পদই পরিপূর্ণভাবে মানবিক মৌল গুণের চর্চা। তাঁর রেখে যাওয়া দিয়ে যাওয়া ঐশ্বর্যের মধ্যে আমাদের জন্য আছে সাহস, সত্য ও প্রেম। রাজনীতির ধূলিঝঞ্ঝায় এই তিনটি গুণের কোনোটিই আজ আর গান্ধীজীর পরম দান বলে বিবেচিত হয় না। আমরা যদি প্রমাদে না মেতে এই পরম কয়েকটি মানবিক মৌল গুণের প্রতি আগ্রহশীল হই—হয়ত প্রকৃত গান্ধীজীকে অনুভব করতে পারব।

আলোচনা

অভিশপ্ত চম্বল

॥ ১ ॥

মহাশয়,

দেশ পত্রিকায় বর্তমানে প্রকাশিত উপরোক্ত প্রবন্ধের জন্য লেখক ও আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

কিন্তু একটা ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারছি না। দেশের ২৭ বর্ষ ৩২ সংখ্যায় ৫৩৬ পৃষ্ঠায় প্রথম কলমের সপ্তম লাইনে লেখক পুতলী বাঈ-এর নিজস্ব বলা কথার কিছু অংশ লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি লিখেছেন——'আমাকে এবার থামতে হল। পুতলীর মুখ থেকেই এবার শোনা যাক—'। তারপর কোটেশনে পুতলীর কথা উদ্ধৃত করেছেন—"সুলতান দাঁড়িয়েছিলো ছোট একটা টিলার উপর......"

ঐ পৃষ্ঠারই ৪২ লাইনে লেখক আবার লিখেছেন—'পুতলী আমায় বলছিলো তার কথা।'

উপরের অংশটুকু পড়লে বেশ বুঝতে পারা যায় যে লেখকের সঙ্গে পুতলী বাঈ-এর এক সাক্ষাৎকার ঘটেছিলো। অথচ আজও পর্যন্ত ঐ সাক্ষাৎকারের কোন বিবরণীই লেখক আমাদের দেননি। ঠাকুর সাহেবের বোন সোনচিঁড়িয়ার সাক্ষাৎকারের মতই আশা করা যায় ঐ সাক্ষাৎকার উপভোগ্য।

লেখককে এখানে তাই আমি অনুরোধ জানাচ্ছি যে তিনি যেন ঐ সাক্ষাৎকারের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করে পাঠকদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেন। ইতি—

শ্রীঅনিমেষচন্দ্র চক্রবর্তী, বিহার।

॥ ২ ॥

সবিনয় নিবেদন,

দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত শ্রীতরুণকুমার ভাদুড়ীর 'অভিশপ্ত চম্বল' খুবই আগ্রহসহকারে পড়ছি, এই ব্যাপারে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

২৭শে আগস্টের 'দেশে' লেখক 'অভিশপ্ত চম্বলের' (আঠারো) শেষাংশে লিখেছেন যে চম্বল উপত্যকার দুর্ধর্ষ ডাকাতদের মধ্যে এখনও কয়েকজন বাকি আছে ধরা পড়তে। তাঁর কথাতেই বলি—"লাখন সিং, পানা, বাহাদুর এখনও বাকি, আর বাকি লুক্কা।... রুপা পড়েছে, ছুঁড়ে ফেলেছে তার টেলিস্কোপিক রাইফেল, লুফে নিয়েছে সেই রাইফেল লুক্কা, চম্বল সাঁতরে পালিয়েছে উত্তর প্রদেশে—সঙ্গে গিয়েছে রুপার ভাই কানহাই।"

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

ভস্মপুতুল ৫·০০

নারায়ণবাবুর এই নতুন উপন্যাস বর্তমান বাংলার সমাজচিত্র হিসেবে অনন্য তো বটেই কিন্তু এ-বইয়ের আসল তাৎপর্য এক মহৎ-ধ্যানকে মূর্ত করে তোলার মধ্যে, ইতিহাসের দিক-নির্দেশে। সম্প্রতিকালের সামগ্রিক অবক্ষয়ের পটে এ-বই এক শুদ্ধ ভবিষ্যতের স্বপ্ন। সবে বেরল। অন্যান্য বই ঃ

সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী ২৷৷৹ **সাহিত্যে ছোটগল্প** ৮৲ **নীল দিগন্ত** ৩৲

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের

পরম পিপাসা ৩·৫০

বাংলাসাহিত্যে মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য হার্দ্য-উপলব্ধির এমন একটি আবহাওয়া ও পরিমণ্ডল গড়ে নিয়েছেন, যেটি তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব। সমৃদ্ধ-কল্পনায় এবং প্রবল হৃদয়াবেগে তাঁর সাম্প্রতিকতম উপন্যাস 'পরম পিপাসা' সাহিত্যে স্থায়ী-স্বীকৃতির দাবি নিয়ে এসেছে। প্রতিভাময়ী লেখিকার শ্রেষ্ঠ বই। সবে বেরল।

প্রকাশের অপেক্ষায়

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সর্বশেষ উপন্যাস **মাটির পথ** ৬·৫০

গদাধরচন্দ্র নিয়োগীর ভ্রমণকাহিনী **পথ আমায় ডাকে** ৪·০০

ডঃ সুরেশ চক্রবর্তীর বিখ্যাত গ্রন্থ **সঙ্গীত প্রবেশ** ৩য় ভাগ ৩·৫০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন মুদ্রণ **মাটি** ২·৫০

অন্যান্য নতুন বই

অন্নদাশঙ্কর রায়ের **গল্প** ৫·০০

যাঁর প্রতিটি গল্পই অনন্য তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলন করতে হলে তাঁর সমস্ত গল্পই একত্রীকরণ করতে হয়। বাংলাসাহিত্যের সবচেয়ে সংযমী ও স্বল্পলিপি লেখকের এই গল্পগ্রন্থে ১৯২৯ থেকে '৫০ পর্যন্ত লেখা সমস্ত গল্পই সংকলিত হয়েছে। উপহার উপযোগী সংস্করণ।

নবগোপাল দাসের **অভিযাত্রী** ৫·০০

১৯৪২ থেকে '৫২ পর্যন্ত সময়কালটা বাংলার ইতিহাসে গভীর সংকটের যুগ। তারই পটে 'অভিযাত্রী' এক মূল্যবান মানবিক দলিল।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের **উত্তরপুরুষ** ২·৫০

"এই কাহিনীতে এমন একটা দরদী মনের স্পর্শ আছে, যা পাঠককে সহজেই অভিভূত করে।......চরিত্রগুলি অদ্ভুত সজীব।"—আনন্দবাজার।

অন্যান্য বই ঃ **সহৃদয়া** ৪৲ **শুক্লপক্ষ** ৩৲

রমাপদ চৌধুরীর

এই পৃথিবী পান্থনিবাস ৫·০০ — কারো কারো মতে এইটেই রমাপদর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

লালবাঈ ৬·০০ — নবম মুদ্রণ

প্রথম প্রহর ৫·০০ **অরণ্যআদিম** ৩·০০

বিমল করের **অপরাহ্ণ** ৩·০০

একটি সুখের সংসার ভেঙে যাবার বিক্ষুব্ধ চূড়ান্ত মুহূর্তগুলির রুদ্ধশ্বাস কাহিনী।

অন্য বই ঃ দেওয়াল ১ম ভাগ ৪৷৷৹, ২য় ভাগ ৬৲

সুরজিৎ দাশগুপ্তের **একই সমুদ্র** ৩·৫০

একালের তারুণ্যের সমস্যাকে নবীন লেখক যে রকম পুঙ্খানুপুঙ্খ খোলাখুলিভাবে তুলে ধরেছেন তা সত্যই দুঃসাহসিক। এর নায়ক বিশ শতকের ট্রাজেডি।

ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের

জেলেডিঙি (নাটক) ২·৫০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

অভিসারিকা ৩·৫০

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

স্মরণচিহ্ন ৫·০০

প্রাণতোষ ঘটকের

রানীবৌ ৪·০০

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের **ডাক্তারের জেলখানা** ২·৫০

ডি· এম· লাইব্রেরী ঃ ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা—৬

লেখকের এই বিবরণ পড়ে স্বভাবতই মনে হবে—লক্কা আর কানহাই এখনো ধরা পড়েনি এবং এখনো তারা অবাধে দস্যুবৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ গত ২০শে তারিখের স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার এক খবরে প্রকাশ যে গত ১৯শে মে চম্বল উপত্যকার এগারোজন নামকরা ডাকাত কানহেরা গ্রামে আচার্য বিনোবা ভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই এগারো জনের মধ্যে লক্কা ও কানহাই দুজনই ছিল। কাজেই এরা এখনো বাকি থাকে কি করে? এরা কি তবে আবার বেহড়ে ফিরে গিয়েছে?

এই সম্পর্কে লেখক শ্রীভাদুড়ীর কাছ থেকে দেশ মারফত সঠিক বিবরণ কি (বিশেষ করে লক্কা ও কানহাই সম্বন্ধে) তা জানতে পারলে বাধিত হব। ইতি—

শ্রীশক্তিব্রত সরকার, কলিকাতা।

লেখকের উত্তর

॥ ১ ॥

শ্রীঅনিমেষ চক্রবর্তী যে প্রশ্ন তুলেছেন তার জবাব দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন। সাংবাদিক জীবনে অনেক কিছুই করতে বা জানতে হয়। তার সবটুকু তো সব সময় বলা যায় না। কোনো সাংবাদিকই বিশ্বাস-ভঙ্গ করে না। আমি অত্যন্ত দুঃখিত—নানা কারণে পুতলীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ বিস্তারিতভাবে দিতে পারিনি। তবে যতটুকু বলা দরকার বা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো আমি বলেছি।

॥ ২ ॥

শ্রীশক্তিব্রত সরকার একটু ধৈর্য রাখলেই বুঝতে পারতেন আমি কি বলতে চাই। "দেশ"-এর পরবর্তী সংখ্যাগুলো থেকেই লক্কা সম্বন্ধে সব কিছু জানা যায়। লক্কার আত্মসমর্পণের পরিচ্ছেদের অবতারণা হিসেবেই ঐ কথাগুলো লিখেছিলাম। তাছাড়া আমি তো সব ঘটনা তারিখ ধরে ধরে লিখিনি। লক্কা এখন জেলে।

তরুণ ভাদুড়ী
ভূপাল।

আধুনিক কবিতায় প্রকৃতি

সাবিনয় নিবেদন,

'শারদীয়া দেশ' পত্রিকায় শ্রীবুদ্ধদেব বসুর 'আধুনিক কবিতায় প্রকৃতি' প্রবন্ধটি চিন্তাপূর্ণ ও খুবই প্রণিধানযোগ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর কয়েকটি উক্তি সম্পর্কে মনে সংশয় জাগে। "তিনটি বিখ্যাত কবিতা পাশাপাশি উপস্থিত করে প্রকৃতি ও মানুষের সম্বন্ধ নিরূপণের চেষ্টা করবো"—বলে তিনি প্রথম যে কবিতাটি উপস্থাপিত করেছেন—কীটসের 'ওড টু এ নাইটিংগেল'—সেটি আদৌ এই সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত কি না, সে কবিতাটিতে এই সম্বন্ধে দূরতম আভাসমাত্র আছে কি না সন্দেহ। বুদ্ধদেববাবু বলছেন, এই কবিতাটিতে "কাব্যকলা ও পাখির গান এক ব'লে ধরে নিতে হবে, নয়তো কবিতাটি অর্থহীন ভাবোচ্ছ্বাসে পরিণত হয়।" 'ভাবোচ্ছ্বাস' থাকার ফলে কোনো কবিতা 'অর্থহীন' হয়ে যেতে পারে, কবি বুদ্ধদেব বসুর মুখে একথা শুনে বিস্মিত হচ্ছি। আমার তো মনে হয় কীটসের কবিতাটি প্রধানত ভাবোচ্ছ্বাসই, এবং সেই হিসেবেই অর্থপূর্ণ, অন্য কোনো গূঢ় অর্থের ভার এ-কবিতার সইবে না। এই বস্তু জগৎ ও বাস্তব জীবন—যেখানে যা কিছু মধুর ও সুন্দর পদ্মপত্রে জলের মতোই ক্ষণস্থায়ী, যেখানে যৌবন অচিরেই জরায় পরিণত হয়, এমন কি তার পূর্বেই মৃত্যুর করালগ্রাসে পতিত হয়,—এই জীবন সম্বন্ধে কবির অপরিসীম ক্লান্তি, এক আদর্শ কল্পজগৎ যেখানে জরা নেই মৃত্যু নেই ক্লান্তি নেই, পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ও আনন্দ যেখানে অচঞ্চল মহিমায় নিত্য বিরাজিত, সৌন্দর্যের নন্দন-ভূমি যে অমৃত-আলয়ের আভাস কবি পান ক্ষণে ক্ষণে, সেই অমর্ত্যলোকে প্রয়াণের জন্য এক তীব্র আকুলতা, সেই লোকে ক্ষণিক অবস্থিতির অনির্বচনীয় পুলক বিহ্বলতা, এবং সেই অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার পর আবার এই স্থূল বাস্তব জগতে প্রত্যাবর্তনের বেদনা—এই কয়টি ভাব ওই কবিতার মূলে; 'প্রকৃতি ও মানুষের সম্বন্ধে'র ক্ষীণতম ইঙ্গিতও কোথাও আছে বলে মনে হয় না।

এই কবিতার ষষ্ঠ স্তবকের প্রথম কয়টি পংক্তি অপেক্ষাকৃত দুর্বোধ্য এবং তার অর্থ সম্পর্কে মতবিরোধ হতে পারে, কিন্তু বুদ্ধদেববাবু যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা খুবই অদ্ভুত ঠেকে। তিনি বলছেন: "কীটস যাকে অমর বলে ভাবছেন, এবং জীববংশের তুলনায় যার অমরতা আমরা মেনে নিতে আপত্তি করবো না তা ঐ কবিতাতেই পূর্বোল্লিখিত 'poesy', পাখির গান এখানে শিল্পকলারই নামান্তর।" ন্যূনপক্ষে বলতে হয় নিজ প্রয়োজনের তাগিদে বুদ্ধদেববাবু এই অর্থ আরোপ করতে চাইছেন, এই আশ্চর্য গীতি-কবিতাটিকে রূপক বানাতে চাইছেন। এ-ব্যাখ্যা অদ্ভুত ঠেকে কারণ, প্রথমত 'poesy' কথাটি চতুর্থ স্তবকে স্পষ্টতই 'কাব্যকলা' বা 'শিল্পকলা' অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, হয়েছে কবি-কল্পনা—poetic imagination-অর্থে,—যার অদৃশ্য পাখায় ভর দিয়ে কবি এই দুঃখময় কাছের জগৎটা থেকে পাড়ি দিতে চান সেই অমর্ত্যলোকে নাইটিংগেল যে-জগতের অধিবাসী, যার ডানায় ভর দিয়ে "পরীর দেশের বন্ধ দুয়ার

"GLIMPSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ
শুধু ইতিহাস নয়, ইতিহাস নিয়ে সাহিত্য। ভারতের দৃষ্টিতে বিশ্ব-ইতিহাসের বিচার। সর্ব দেশে ও সর্ব সমাজে সর্বকালের আদরণীয় গ্রন্থ। জে. এফ. হোরাবিন-অঙ্কিত ৫০ খানা মানচিত্র সহ। প্রায় ১০০০ পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ।

শ্রীজওহরলাল নেহরুর
বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ
২য় সংস্করণ ঃ ১৫·০০ টাকা

আত্মচরিত	॥ শ্রীজওহরলাল নেহরু	১০·০০
ভারতকথা	॥ শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারী	৮·০০
ভারতে মাউণ্টব্যাটেন	॥ অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন	৭·৫০
চার্লস চ্যাপলিন	॥ আর. জে. মিনি	৫·০০

প্রফুল্লকুমার সরকার
জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ
বাঙলার তথা ভারতের জাতীয় আন্দোলনে বিশ্বকবির কর্ম, প্রেরণা ও চিন্তার সুনিপুণ আলোচনায় অনবদ্য গ্রন্থ।
তৃতীয় সংস্করণ ঃ ২·৫০ টাকা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা—৯

দিই হানা মনে মনে"। চতুর্থ স্তবকে যাকে বলছেন 'poesy' শেষ স্তবকে সে-ই 'fancy', যে-ছলনাময়ী ("deceiving elf") শুধু ক্ষণিকের জন্য কুহক সৃষ্টি করে, যে রঙ্গময়ী মোহিনী মায়ায় ভুলিয়ে নিয়ে যায় সংসারের তীর হতে, আমাদের বাস্তব পরিবেশ থেকে তুলে নিয়ে যায় লোকান্তরে শুধু মুহূর্তের জন্য। 'Poesy'কে এখানে 'শিল্পকলা', 'মনীষার মিনার' মনে করা সংগত নয়। দ্বিতীয়ত পাখির গানকে এখানে বুদ্ধদেববাবুর অর্থে 'poesy' বা শিল্পকলার নামান্তর মনে করাও সংগত মনে হয় না। কবি যাকে অমর বলে ভাবছেন তা নাইটিংগেলই, বা তার গানই, অন্তত তার সংগে সম্পর্কলেশ-হীন কোনো 'কলা' নয়। অভিভূত তন্ময় সেই মুহূর্তে কবির কাছে নাইটিংগেল পাখি হয়ে উঠেছে সৌন্দর্যের নন্দনভূমি সেই অমর্ত্যলোকের (যা কবির ধ্যানের ধন) অধিবাসী, তারই প্রতিভূ, প্রতীক; সে যেন এই মরজগতের কেউ নয়, সে সেই জগতের যেখানে মৃত্যু নেই জরা নেই; তার গানের অমৃতধারা বয়ে চলেছে যুগ হতে যুগান্তরে, উদ্‌বেল করেছে রাজার হৃদয় ও চাষীর হৃদয়, প্রবাসিনীর হৃদয় মথিত করে তুলেছে চোখের জলের জোয়ার, যুগে যুগে নর-নারীর "হৃদয়-বাতায়নে ঝরোখা সব" দিয়েছে খুলে "ফেনায়িত সুনীল শূন্যতায়, উজাড় পরীস্থানে"। যুক্তির দিক দিয়ে এই ব্যাখ্যা হয়তো ঠিক টেঁকে না বলে বুদ্ধদেব-বাবু একে হাস্যকর বলেছেন; এই প্রবন্ধের গোড়ার দিকে তাঁর নিজের কথাই তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিই: "সম্পূর্ণ যুক্তিসহ কবিতা হয়তো শর্শবিষাণেরই নামান্তর; অন্ততপক্ষে এ-কথা আমরা সকলেই জানি যে এই ধরনের 'ভ্রান্তির' উপরেই জগতের বহু কবিতা প্রতিষ্ঠিত।"

এই প্রবন্ধে কীটসের আরেকটি কবিতা সম্পর্কে বুদ্ধদেববাবুর উক্তি সমানই বিস্ময়কর। তিনি বলছেন: "পরবর্তী 'গ্রীশিয়ান আর্ন' কবিতায় একটি শিল্প-কর্মকে বিষয়রূপে বরণ করে কীটস নিজেই এই ভুল সংশোধন করেছিলেন।" এক কবিতার 'ভুল' অন্য কবিতায় সংশোধন করা যায়, কোনো সার্থক কবি সে রকম দুষ্কর্ম করেন, কোনোরকম "ভুল সংশোধন" কোনো সার্থক কবিতার মুখ্য বা গৌণ, স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য হতে পারে,—কাব্য-সমালোচনায় এর চেয়ে অদ্ভুত, আশ্চর্য উক্তি আর কি হতে পারে?

আধুনিক কবিতার প্রকৃতির প্রতি কবি-দের যে-মনোভাব প্রতিফলিত এবং এইদিক দিয়ে রোমান্টিক কবিদের সংগে তাঁদের যে প্রভেদ বুদ্ধদেববাবু নির্দেশ করেছেন তা হয়তো যথার্থ, কিন্তু রোমান্টিকদের প্রকৃতি-প্রেম, এবং সাধারণভাবে তাঁদের কাব্য নিকৃষ্ট, —এই ধরনের একটা ইঙ্গিত তাঁর লেখায় রয়েছে মনে হয়, কাজেই এই প্রসংগে দুয়েক কথা বলতে চাই। রুশো, ওয়র্ডস্বার্থের মতো রোমান্টিকদের "হার্দ্যগুণের অফুরন্ত ভাণ্ডার" প্রকৃতি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অলীক,

সদ্য প্রকাশিত

সমরেশ বসুর
মহোত্তম উপন্যাস
বাঘিনী
।। সাত টাকা ।।

জরাসন্ধের
নবতম উপন্যাস
ন্যায়দণ্ড
।। সাড়ে ছয় টাকা ।।
বিচারশালার পটভূমিকায় মর্মস্পর্শী কাহিনী

আর এক আশ্চর্য জগৎ ও জীবনের প্রতিচ্ছবি
সৈয়দ মুজতবা আলীর
অপরূপ রম্যরচনা
চতুরঙ্গ
অন্তরঙ্গ আলোচনায় ও তীক্ষ্ণদৃষ্টিপাতে
প্রোজ্জ্বল নবতম গ্রন্থ

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর
নবতম উপন্যাস
তুঙ্গভদ্রা
।। চার টাকা ।।
ঐতিহাসিক পটভূমিকায় অনন্যসাধারণ কাহিনী

বরিস পাস্তেরনাকের
বহু বিতর্কিত চাঞ্চল্যকর উপন্যাস
ডাক্তার জিভাগো
।। সাড়ে বারো টাকা ।।
মূল উপন্যাসের একটি অক্ষরও বর্জিত হয়নি।
কবিতার অনুবাদ ও সম্পাদনা:
বুদ্ধদেব বসু

বারট্রাণ্ড রাসেলের
প্রবন্ধ গ্রন্থ
সুখের সন্ধানে
[The Conquest Of Happiness]
।। পাঁচ টাকা ।।
সংসার-জীবনে সুখলাভের পথ সন্ধান ও ইঙ্গিত দিয়েছেন একালের শ্রেষ্ঠ মনীষী
অনুবাদ:
পরিমল গোস্বামী

● প্রকাশ প্রতীক্ষায় ●

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর
আয়ুবের সঙ্গে

ডক্টর নবগোপাল দাসের
এক অধ্যায়

দেবেশ দাশের
পশ্চিমের জানালা

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
উপনগর

● সাম্প্রতিক প্রকাশনা ●

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
মহাশ্বেতা ৫·৫০
[তিন মাসে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত]

আনন্দকিশোর মুন্সীর
রাঘব বোয়াল ৩·০০
[সুখ্যাত লেখকের নবতম অম্লমধুর উপন্যাস]

ধনঞ্জয় বৈরাগীর নাটক
রুপোলী চাঁদ (৩য় সং) ২·৫০

নিখিলরঞ্জন রায়ের
সীমান্তের সপ্তলোক ৩·০০

নীলকণ্ঠের কথামৃত
এলোমেলো ২·৫০

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের
জর্জ বার্নার্ড শ ১২·৫০
[চিন্তানায়কের উপন্যাসোপম জীবনী]

সন্তোষকুমার দে'র
বৈঠকী গল্প ২·৫০
[শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গশিল্পী রেবতীভূষণ চিত্রিত]

সতীনাথ ভাদুড়ীর
পত্র লেখার বাবা ৪·০০

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের
চর্ণক ৩·০০

কুমারেশ ঘোষের
সাগর-নগর ৩·৫০

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা: বারো

তিন দিন তিন রাত্রি

বিশ্রুতনামা কথাসাহিত্যিক **নরেন্দ্রনাথ মিত্রের** এ উপন্যাস নিঃসন্দেহে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা।

দাম—**পাঁচ টাকা**

যে যাই বলুক

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের এ উপন্যাসে আছে এক মহান প্রেমের কাহিনী।

দাম—**ছয় টাকা**

শতকিয়া

সুবোধ ঘোষ

সুবোধ ঘোষের লেখার মৌলিকত্ব সর্বজনবিদিত। ঘর বাঁধার যে কামনা কিষাণী মুরলীর চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল, তা কি শুধুই দুঃস্বপ্ন? জটিল মনস্তত্ত্বের আশ্চর্য সমাধান শতকিয়ার বিষয়বস্তু। দাম—আট টাকা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

রূপসী রাত্রি : পাঁচ টাকা ॥ **প্রচ্ছদপট** : তিন টাকা পঞ্চাশ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তিন শূন্য : তিন টাকা পঞ্চাশ ॥ **প্রেমের গল্প** : চার টাকা

ভারত প্রেম কথা ॥ সুবোধ ঘোষ ॥ ছয় টাকা

প্রেমের গল্প ॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥ চার টাকা

গল্প সংগ্রহ ॥ সরলাবালা সরকার ॥ পাঁচ টাকা

বহু যুগের ওপার হতে ॥ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ দুই টাকা

চিন্ময় বঙ্গ ॥ আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন ॥ চার টাকা

বিবেকানন্দ চরিত ॥ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ পাঁচ টাকা

ছেলেদের বিবেকানন্দ ॥ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ এক টাকা পঁচিশ

রবীন্দ্র মানসের উৎস সন্ধানে ॥ শচীন্দ্রনাথ অধিকারী ॥ তিন টাকা পঞ্চাশ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড
৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা—৯

অনুমোদিত পরিবেশক:
ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাঃ লিমিটেড
২নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট । কলিকাতা

এবং প্রকৃতির 'সৌন্দর্য' "একান্তভাবে মানুষেরই হৃদয়াশ্রিত"—একথা ঠিকই। মানুষের উপলব্ধির বাইরে পদার্থ আছে রূপ নেই, শূন্যে শূন্যে শক্তির কম্পন আছে, নেই আলো, মানুষেরই "চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চুনি উঠল রাঙা হয়ে", কিন্তু সংগে সংগে একথাও ঠিক যে সুন্দরকে আমরা অনুভব করি আপন চেতনস্বরূপে নয়, আপনার বাইরে। সূর্যাস্তবেলায় মেঘে মেঘে রঙের খেলা, বা জ্যোৎস্নারাত্রির সৌন্দর্য দুচারজন মিস্টিক হয়তো অনুভব করেন আপন অন্তরেরই সৌন্দর্য বলে, কিন্তু বাকি সবাই এ সমস্তকে প্রকৃতির সৌন্দর্য বলেই অনুভব করেন, এবং আমাদের 'প্রকৃতি'র ধারণা এই নিয়েই, 'প্রকৃতি'কে আমরা যে শুধু পদার্থের সমষ্টি বলে জানি তা নয়, রূপ বলেই জানি, আলো, রঙ, সুর বলেই জানি, শক্তির কম্পন বলে নয়। বিজ্ঞান এবং কোনো কোনো দার্শনিক মত যাই বলুন, এ-ই আমাদের অভিজ্ঞতার সত্য, এবং জড়ের সংগে চেতনার যত বিরোধই থাক, এই প্রকৃতির সংগে একটা কোথাও আমাদের গভীর একাত্মতা নিশ্চয়ই আছে, যেজন্য এই আধুনিক যুগেও, 'ভূমিকম্পের ধ্বংসকারী শক্তি'কে প্রকৃতির শক্তি এবং 'কলেরার বীজাণু'কে প্রকৃতির চর হিসেবে জানা সত্ত্বেও আমাদের হৃদয় নেচে ওঠে যখন ওয়র্ডস্বার্থে পড়ি : "The sunshine is a glorious birth", এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে মন। প্রকৃতির মধ্যে যা রমনীয় যা মহান, যা অসীমের আভাস বহন করে, রোমাণ্টিকদের দৃষ্টি সেইদিকে নিবদ্ধ বলে তাঁরা প্রকৃতিকে নিয়ে অত্যন্ত বেশি উচ্ছ্বসিত. প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে তাঁরা শ্রান্ত হননি, প্রকৃতির মধ্যে তাঁরা এক বিরাট সত্তার স্পন্দন অনুভব করেছেন, তাকে মানবসত্তার পরিপন্থী নয়, বন্ধু হিসেবে অনুভব করেছেন এবং তার বিরাটত্ব, মহত্বের কাছে নত হয়ে তাকে উপাসনা করেছেন। রোমাণ্টিকদের সব মত ও উপদেশ আজকের দিনে গ্রহণীয় না হলেও এ-কথা আজকের দিনের সত্য এবং আশা করি চিরকালেরই সত্য থাকবে যে প্রকৃতির মধ্যে যেমন কিছু আছে যা ভয়ঙ্কর, ভীষণ, যা মানবহিতের প্রতি উদাসীন এমন কি নিষ্ঠুর, তেমনি অনেক-কিছু আছে যা সুন্দর, বিরাট, মহিমান্বিত, যা আমাদের হৃদয়কে মুগ্ধ করে, দোলা দেয়, যা শুধু আমাদের চোখের, মনের ক্ষণিক তৃপ্তিকর নয়, যা আমাদের জীবনকে, এই পৃথিবীতে আমাদের অস্তিত্বকেই মহৎ মূল্য দান করে। 'প্রকৃতি'র যথার্থ স্বরূপ কী তা বিজ্ঞানের, মানুষের জ্ঞানসাধনার বিষয়, সেখানে পদার্থের, শক্তির তরঙ্গের বীক্ষা, কিন্তু প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের অনুভবের এই সত্য,

প্রকৃতির সংগে মানুষের বিরোধের নয়, একাত্মতার সত্য—তা যদি দুর্ভাগ্যক্রমে আজকের দিনে কবিতার বিষয় না হয়, এক সময় যে ছিল এবং কয়েকজন শক্তিমান কবির হাতে যে এই সত্যের সার্থক ও মহৎ প্রকাশ সম্ভব হয়েছে, সেইটাই সুখের, গৌরবের বিষয় এবং সেইসব কবিদের প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞতাই থাকবে। অবশ্যই, কবিতা এক সত্যকে নিয়েই চিরকাল আঁকড়ে থাকবে এমন কথা বলি না, প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের, জড়ের বিরুদ্ধে মনের অভিযান—এ সত্য নিয়েও সার্থক কবিতা লেখা হয়েছে এবং হবে, কিন্তু এক সত্য আরেক সত্যকে নাকচ বা হেয় করতে পারে না; তাছাড়া, আধুনিক হোক বা প্রাচীন হোক, কবিতার মূল্যায়ন করতে হবে কাব্যিক উৎকর্ষের দিক দিয়েই, তত্ত্বের দিক দিয়ে নয়। ইতি—
মোহিতকুমার মজুমদার, দার্জিলিং।

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

মহাশয়,

শ্রদ্ধেয় শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী লিখিত সুখ-পাঠ্য আত্মস্মৃতি সম্পর্কে দু'একটি কথা নিবেদন করবার আছে।

১৭ই সেপ্টেম্বরের 'দেশে' ৪৪ সংখ্যক পরিচ্ছেদে চৌধুরী মহাশয় স্বর্গত বিপ্লবী ও সাহিত্যিক ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কথা বিবৃত করেছেন। ধনগোপালের শেষ জীবন প্রসংগে অহীন্দ্রবাবু লিখেছেন, "...কিন্তু ক্রমে ক্রমে ঘটল অবস্থা বিপর্যয়। অর্থ নেই—তদুপরি অসুস্থ দেহ—উপার্জনের ক্ষমতাও ক্রমশ হ্রাস পেয়ে গেল। শুনতে পাই, আর কোন দিকে কোন আশার অরুণোদয় না দেখতে পেয়ে শেষপর্যন্ত তাঁকে আত্মহত্যা করতে হয়েছিল।"

ধনগোপাল বাবুর আত্মহত্যার কারণ আর্থিক দুরবস্থা নয়। মৃত্যুর বহু পূর্বেই তাঁর আর্থিক অসাচ্ছল্য দূর হয়েছিল। সাহিত্যিক ও সুবক্তারূপে তিনি আমেরিকায় প্রভূত প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। সে সময় তিনি একবার কলকাতাতেও আসেন কিছু-দিনের জন্যে। তখন বেলুড় মঠে অবস্থান করে অনেকের সংগে সাক্ষাৎও করেন। আমেরিকায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকরূপে তিনি যথেষ্ট উপার্জন করতেন। জনৈকা আমেরিকান মহিলাকে তিনি বিবাহ করেন এবং তাঁদের একটি পুত্র হয়। পুত্রের নামও ধন মুখোপাধ্যায় (বর্তমানে প্যান আমেরিকান এয়ারওয়েজ-এর অফিসার)। ধনগোপালের আত্মহত্যার কারণ, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ট্রাজেডী! বিপ্লবী জীবনের দুঃখকষ্ট নয়।—

২৪শে সেপ্টেম্বরের 'দেশে' ৪৫ সংখ্যক পরিচ্ছেদে অহীন্দ্রবাবু লিখেছেন, "শুনলাম পিয়ারা সাহেব আজো বেঁচে আছেন এবং ঐ অঞ্চলের কোন এক সিনেমা গৃহের ম্যানে-জাররূপে কাজ করছেন।"......একথাও সত্য নয়।

পিয়ারা সাহেবের মৃত্যু হয়েছে ১৯৫৭ খৃঃ। মেটিয়াবুরুজের P. Son (পিয়ারা এন্ড সন্) সিনেমাগৃহের তিনি ম্যানেজার ছিলেন না। তিনি ছিলেন তার স্বত্বাধিকারী। অলমিতি। বিনীত—

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়,
কলিকাতা।

চারখানি অনন্যসাধারণ প্রকাশন

যোগভ্রষ্ট
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
৫·০০

শব্নম
সৈয়দ মুজতবা আলী
৫·০০

বেনারসী
বিমল মিত্র
৪·৫০

দশ পুতুল
আগাথা ক্রিষ্টি
৩·৫০

অন্যান্য বই

অবধূত
কলিতীর্থ কালিঘাট (৮ম সং) ৪·০০
ক্রীম ৪·৫০

রমাপদ চৌধুরী
দুটি চোখ দুটি মন (২য় সং) ৪·৫০
কথাকলি (২য় সং) ৩·০০
আপন প্রিয় (৫ম সং) ৩·০০

সুবোধ ঘোষ
পলাশের নেশা (৪র্থ সং) ৩·০০
রূপসাগর (৩য় সং) ৪·৫০

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
জনপদবধূ (৩য় সং) ৪·৫০
তীরভূমি ৪·৫০
নীলাঞ্জনছায়া ৩·০০

গৌরকিশোর ঘোষ
জল পড়ে পাতা নড়ে ৮·০০
মন মানে না ৩·৭৫

লীলা মজুমদার
চীনে লণ্ঠন (২য় সং) ৩·২৫
ইষ্টকুটুম ৩·৫০

সন্তোষকুমার ঘোষ
পরমায়ু ৩·৫০
মুখের রেখা ৫·০০

সরোজকুমার রায় চৌধুরী
শুক্রসন্ধ্যা (২য় সং) ৫·০০
রমণীর মন ৩·৫০

প্রবোধকুমার সান্যাল
অগ্নিসাক্ষী (২য় সং) ৩·৫০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
গ্রীষ্ম বাসর ২·৭৫

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী
হিরণ্ময় পাত্র ৪·৫০

বিমল কর
বনভূমি (২য় সং) ৩·০০

ত্রি বে ণী প্র কা শ ন প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

কে. হোড়ের মহাভৃঙ্গরাজ

আমরা বিজ্ঞানী

পঙ্কজ রায়

আমরা নতুন যুগের বিজ্ঞানী :
মস্তিষ্ক সর্বস্ব আমাদের মস্তক।
আমরা চিন্তাবিদ—
অতীতের শূন্যতা আমরা ভরে তুলি
ফরমুলা, ফিজিক্স আর ফলিত রসায়নের গবেষণা দিয়ে।

আমাদের কথাই হোলো আইন;
আমরা যা বলি তাই সার কথা—
আমাদের ২৩ নম্বর প্ল্যানই শুধু আমাদের কাছে গ্রাহ্য,
আর সবই তুচ্ছ, গন্ধহীন চামেলীর মত।
আমাদের সত্যে কোন খুঁত নেই—
বহু ক্লেশে আমরা জড়ো করি
দুনিয়ার আজগুবি প্রেসক্রিপসন—
যা বোঝে শুধু আমাদের নন্দী ভৃঙ্গীর দল
এদিকে দুনিয়া গলে গলে পড়ে সুদূর সীমারেখায়।

এটা নতুন যুগ—
এটা মরণের যুগ—
শিল্প, চিন্তার স্বাধীনতা,
সঙ্গীত, সাহিত্য—সবেরই হোলো অপমৃত্যু।

আমাদের মনে কোন দুর্বলতা নেই—
আমরা কাজ ও চিন্তা করি যুগপৎ।

শুভ্র, স্বচ্ছ, অভেদ্য দেওয়ালের মধ্যে
আমরা সমাহিত—
চারিদিকে বাষ্প ও অ্যাসিডের গন্ধ—
অসংখ্য বর্ণমালার খেলা,
কখনো বা কৃত্রিম চাঁদ ব্যঙ্গ করছে
মাঝরাতে দুঃস্বপ্নের মতো।

আমরাই জনতা—
তাদের জীবন আমাদের মুঠোর মধ্যে।
রুদ্রের রোষ আমাদের নেই—
কিন্তু রুদ্রের ক্ষমতা?
হাঁ, ঘুমন্ত মানুষকে আলোর ঝলকে
চমকে দিয়ে সৃষ্টি বিনষ্ট করতে পারি
তাই যদি হয় আমাদের অভিপ্রায়।

আত্মীয়

তারাপদ রায়

ঘটে বুঝি সবই ঘটে, একই জন্মে সবই সত্যি হয়;
স্বপ্নে যা দেখেছি আর যা দেখিনি সব মিশে আছে,
সব নক্ষত্রের আলো একই রাত্রে পৌঁছাবে না কাছে,
তবু আরো রাত্রি থাকে, গাঢ় নীল অনন্ত সময়।

দুদিকেই জানলা খোলা, যে প্রান্তে থাকো না দেখা হবে,
একপ্রান্তে পত্রাবলী, কুসুমিত মুগ্ধ বনস্পতি,
অন্য প্রান্ত শূন্য পথে তটিনীর তীরে বসুমতী—
একদিকে যৌবন খোলা, অন্য দিক গিয়েছে শৈশবে।

কোন দিকে যাবে তুমি, যে পথেই আসা যাওয়া করো
দেখা হবে, বারবার দেখা হবে, শৈশবে যৌবনে
কিংবা ম্লান প্রৌঢ়তায়, বার্ধক্যের আকাঙ্ক্ষিত বনে
সেই পুষ্প, পত্ররাজি, সেই নদী আরো খরতর।

কেউ বনবাসে যাবে, আর কেউ সুদূর প্রবাসে,
কেউ থাকবে কাছাকাছি সংসারের নিকট আত্মীয়
একই বৃত্তে ঘোরা ফেরা, এক জন্মে সকলেই প্রিয়
কুসুম, কুসুম গন্ধ আবর্তিত প্লাবিত বাতাসে।

প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(৫৩)

'শুনুন! শুনুন! চলে যাচ্ছেন কেন?' ডাক দিল সুকান্ত।

প্রস্থান-উদ্যত ভঙ্গিটাকে নিবৃত্ত করে স্বস্থানে নিয়ে এল কাকলি।

'যখন দয়া করে এসেছেন, তখন একটু বসে যান।' দিব্যি চোখের উপর চোখ রেখে বলতে পারছে সুকান্ত। 'শুধু দাঁড়িয়ে গেলে রিটার্ন-ভিজিট হয় না। অফিসিয়াল ডিকোরাম-এর বইটা আপনি পড়ে দেখবেন।'

'ভিতরে এসে একটু বসে যেতে হয় বুঝি?' কাকলি দিব্যি চোখের পাতা পারল নাচাতে।

'নিশ্চয়। আপনি যদি এসে দেখতেন আমি বাড়ি নেই, আমার ঘর বন্ধ, তা হলেও আপনার রিটার্ন-ভিজিটটা ভ্যালিড হত না। আপনার শুধু আসাটাই সাফিসিয়েণ্ট নয়। চিরকুট বা একটা কার্ড রেখে গেলেও নয়।'

'তাহলে আপনি বলতে চান, রিটার্ন-ভিজিটটা ভ্যালিড করতে হলে আমাকে আপনার ঘরে ঢুকে খানিকক্ষণ বসে যেতে হবে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু শূন্য ঘরে স্ট্যাচুর মত বসে থাকলে হবে না। ঘরওয়ালার সঙ্গে একটু গল্পও করে যেতে হবে।'

'তাই নাকি?' কাকলি ঘরে ঢুকে ভালো করে দেখতে লাগল কোথায় বসে। যেদিকে তাকায় সেই দিকেই স্তূপাকার এলোমেলো। একরাশ কাপড়, ধোয়া আর আধোয়া, কাঠের চেয়ারটাকে প্রায় ঢেকে রেখেছে, প্রথমটা হদিস পায়নি। পরে ঠাহর করতে পেরে নিজেই উদ্যোগী হয়ে কাপড়ের জঞ্জালটাকে বিছানার উপর নামিয়ে রাখল। 'যদি কিছু মনে না করেন, চেয়ারটাকে মুক্ত করি।'

নয়তো বিছানাটাও আছে। চেয়ারে না কুলোলে বিছানায় বসেও গল্প করা যায়। প্রায় বলতে যাচ্ছিল সুকান্ত। কিন্তু অফিস-কলিগ্ ভদ্রমহিলাকে এ ভাবে বলাটা মোটেই সঙ্গত হবে না। তাই দ্রুত সামলে নিল।

চেয়ারে বসে কাকলি বললে, 'কিন্তু গল্প —কী গল্প করব?'

'দুই অফিস-কলিগ্ কী আর গল্প করতে পারে বলুন। তাদের তো শুধু এক গল্প।' হাসল সুকান্ত। বিছানায় পা তুলে বসল।

'এক গল্প?'

'হ্যাঁ। শুধু শপ-টক। মানে অফিস নিয়ে আলোচনা। অফিসের চিট-চ্যাট, সাদা বাঙলায়, কেচ্ছা। কিন্তু অপনার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। দর্শন, সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য, যা আপনার খুশি, গল্প করতে পারেন। দেখছেনই তো, আমি তো আর আপনি নই।'

'আমি নন মানে?' কাকলির চোখের দৃষ্টি ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

মানে, আমি চাকর দিয়ে অতিথিকে তাড়িয়ে দিই না বাড়ি থেকে।' সুকান্ত মেঝের দিকে তাকাল। 'তাকে অভ্যর্থনা করে ভিতরে এনে বসাই।'

'দেখুন ছি ছি, সেদিন ভারি ভুল হয়েছিল, অন্যায় হয়েছিল।' অনুশোচনায় উদ্বেগ হয়ে উঠল কাকলি। 'আমি মোটেই বুঝতে পারিনি।'

'কী বুঝতে পারেননি?'

'যে, আপনি এসেছেন।'

'বুঝতে পেলে কী করতেন?' দৃষ্টিটাকে তুলে সুকান্ত একফালি জ্যোৎস্নার মত কাকলির গায়ের উপর রাখল।

'বুঝতে পেলে নিচে নামতুম, দেখতুম—'

'দেখেননি বলে যাহোক চাকরকে দিয়ে পরোক্ষে তাড়িয়ে ছিলেন, দেখতে পেয়ে প্রত্যক্ষে তাড়াতেন।' চোখের দৃষ্টিটাকে নির্লিপ্ত করে কাকলির মুখের উপর রাখল সুকান্ত।

'মোটেই নয়। অফিস-কলিগকে কি কেউ তাড়ায়? শুনেছেন কোথাও?' হাসতে চেয়েও হাসল না কাকলি। 'কিন্তু আপনিই বা কেমন! এসেছেন যখন, নামধামটা তো বলতে হয়। নইলে ভিতরের লোক কেমন করে বুঝবে?'

'ভিতরে কোথায়, আপনি তো উপরে ছিলেন। তাই ভিতরের লোক না বলে উপরের লোক বলুন।'

'ও একই কথা। স্লিপ ছিল, পেন্সিল ছিল, তাতেও তো লিখে দিতে পারতেন।'

'পার্পাস অফ ভিজিটটাও লিখতে হয়, না?'

'সে তো অফিসের স্লিপে। বাড়ির স্লিপে ওটা না হয় ব্ল্যাংক রাখতেন।' নড়ে-চড়ে উঠল কাকলি। 'পুরো নাম না লিখে শুধু ইনিশিয়্যালস লিখলেও নিশ্চিন্ত হতে পারতাম।'

'আরো সংক্ষেপে, একজন ভদ্রলোক এসেছেন দেখা করতে, শুধু এটুকু বললে হত না?'

'কী করে হবে? জীবনে অবাঞ্ছিত ভদ্রলোকও তো আসে ধূমকেতুর মত।'

'যা বলেছেন!' উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল সুকান্ত। 'আমার জীবনেও যেমন এসেছে এক অবাঞ্ছিতা।'

'অবাঞ্ছিতা?' ভাসা-ভাসা সরল-দীঘল চোখে তাকাল কাকলি। 'যার জন্যে আপনি অপেক্ষা করছিলেন? যার এখানে নেমন্তন্ন?'

'আর বলেন কেন!' আহতের মত মুখ করল সুকান্ত। 'জীবনে এসেছে বললাম না? বলা উচিত কপালে জুটেছে।'

'কিন্তু যার জন্যে আপনার অপেক্ষা, যাকে আপনার নেমন্তন্ন, সে কি কখনো অবাঞ্ছিতা হতে পারে?'

'সেইই তো ট্র্যাজেডি। শুনুন তা হলে অবস্থাটা—' আসলে আরো দৃঢ় হল সুকান্ত।

'একজন অফিস-কলিগকে বলবেন আপনার প্রাইভেট কথা? সেটা কি ঠিক হবে?'

'কেন বলা যায় না কলিগকে?' অসহায় মুখ করল সুকান্ত। 'যদি কলিগ ছাড়া সম্প্রতি আর কেউ তার না থাকে?'

'তা হলে বোধহয় বলা যায়।' কাকলিও খাটি হল চেয়ার। 'আগে তবে বলুন ভদ্রমহিলাটি কে?'

সিলিঙের দিকে তাকাল সুকান্ত। তাকে কি আপনি চিনতে পারবেন? ধরুন একজন শিক্ষিকা। বেশ কথাটা এই শিক্ষিকা—তাই না?'

'হ্যাঁ, আগে যে শিক্ষয়িত্রী চলত তার চেয়ে ভালো।'

'তারও আগে যা চলত সেটা ভয়াবহ।'

অবাক হবার মত মুখ করল কাকলি। 'সেটা কী?'

'মিসট্রেস। কখনো-কখনো বা হেড-মিসট্রেস। শিক্ষিকা শব্দটা সম্ভ্রান্ততা এনেছে। বলা যায় অর্থের পুনর্বাসন ঘটিয়েছে। তেমনিধারা নার্স কথাটার জন্যেও একটা কুলীন প্রতিশব্দ দরকার। কেউ যদি শোনে, ঘরে নার্স এসেছে, তাহলে কেউ রুগীর খোঁজ করবে না, উলটে ঐ আসাটারই একটা রুগ্ন মানে করে বসবে।'

'নার্সটার্স জানি না, কিন্তু যে শিক্ষিকার কথা বলছেন, অনুমান করছি, সে তো আগে—আগে আরো এসেছে আপনার হোটেলে, আর নিশ্চয়ই তা আপনারই নিমন্ত্রণে।'

'ঐ দেখুন, ঐ আরেকটা শব্দ—হোটেলে আসা। তেমনিধারা বাগানবাড়িতে যাওয়া, কিংবা ডাকবাংলোয় ডাকা। বাঙলা ভাষায় ঐ কথাগুলোর প্রক্ষালন দরকার। যদি কোনো মহিলা হোটেলে আসেন, কিংবা কোনো মহিলাকে বাগানবাড়ি নিয়ে যাই কিংবা ডাকবাংলোয় ডেকে আনি, বাঙলা করে বললেই লোকে তার হেয় অর্থ করবে। কী, বলুন করবে না?'

'করবে।' যতদূর সাধ্য মৃদু করে বললে কাকলি।

'যেমন আপনি এখন করছেন। যেহেতু শিক্ষিকাটি আমার ঘরে এসেছেন সেই হেতু দুয়ে-দুয়ে চার ছাড়া কিছু হবার নয় ভাবছেন। কিতু তার এই আসাটা যে উৎপাত হতে পারে, নিমন্ত্রণটাই যে নিপীড়ন, তা ধারণাই করতে পারলেন না।'

'কিন্তু কেন, উৎপাত কেন?'

'শিক্ষিকাটির বিশ্বাস যে তাঁর সঙ্গে মেলামেশাটা দীর্ঘ হয়ে উঠলেই একদিন তিনিও আমার স্ত্রী হয়ে উঠবেন। বলুন, তা কি হয়?'

'কেন হয় না? খুব হয়।'

'আপনি কিছু জানেন না। শুধু মেলা-মেশাতেই কি ভালোবাসা জাগে? আর ভালোবাসা না জাগলে বিয়ে কী।' দিব্যি চোখে চোখ রাখল সুকান্ত। 'বলুন, ঠিক নয়?'

'বললেনই তো, আমি কিছু জানি না।' কাকলি চোখ নামাল।

'আপনার জীবনে তেমন কিছু হয়নি বোধহয় অভিজ্ঞতা। সকলের জীবনে হয় না। যেমন সকলের গলায় গান আসে না। সকলের চিত্তে জন্মায় না রসবোধ। যার আসে তার মহাভাগ্য।'

'আপনার এসেছিল?'

'হ্যাঁ, একদিন এসেছিল কিন্তু সেকথা থাক। শিক্ষিকার কথাটাই বলি।'

'বলুন।'

'শিক্ষিকার ধারণা যেন গাধা পিটিয়েই ঘোড়া করা যায়। জোর করেই আনা যায় সুর, লেখা যায় কবিতা। বিস্বাদ থেকেই আসা যায় আশ্চর্যে। সূর্যের তাপে ফুল ফোটে, কিন্তু যেহেতু সূর্য নেই সেহেতু আগুনের দাহেই ফুটবে। তা কখনো হয়! বলুন না, আপনিই বলুন না। গায়ের জোরে চাষ করতে পারি, কিন্তু বৃষ্টি আনতে পারি গায়ের জোরে? আর বৃষ্টিই যদি না ঝরল, ফসল কোথায়? কী, আপনার মত কী?'

খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল কাকলি। বললে, 'আমি কী বুঝি! আমার কতটুকু জীবন; কী বা হয়েছে আমার জীবনে!'

'কথায় বলে, রাস্তা ধরে শুরু হেঁটে যাও, এগিয়ে যাও, ঠিক মিলবে সরাইখানা। শিক্ষিকার বোধহয় তাইতেই বিশ্বাস। কিন্তু রাস্তা যে সব সময়ে সরাইয়ে গিয়েই শেষ হয় না, কখনো কখনো শূন্য প্রান্তরে এসে মেশে, তা তার জানা নেই।'

'কিন্তু নদী ধরে চললে, কোনো ভুল নেই, ঠিক সমুদ্রে এসে পড়া যায়।' কাকলি বললে।

একটু বুঝি চঞ্চল হল সুকান্ত। বললে, 'আচ্ছা, আপনাকে যদি একটু চা এনে দি, খাবেন?'

হাসল কাকলি। 'এটা অফিসিয়্যাল কোডে পড়ে তো?'

'এক কলিগ আরেক কলিগকে চা খাওয়াবে এতে বারণ তো কিছু দেখি না।'

হাতের ঘড়ি দেখল কাকলি। 'সময়ের বারণ।' আবার দেখল চারদিকের ছন্নছাড়া চেহারা। 'স্থানের বারণ। তাছাড়া রিটার্ন-ভিজিটের মেয়াদ বুঝি পেরিয়ে গেছে এতক্ষণে। এবার তবে উঠি।'

'উঠবেন কী! বৃষ্টি নেমেছে।'

'সত্যিই তো।' জানলার বাইরে থেকে চোখ ঘরের মধ্যে আনতেই সুকান্তর চোখের

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন!
যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র
বহু গুল্ম গাছড়া দ্বারা বিশুদ্ধ মতে প্রস্তুত
বাকলা
ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন
ভারত গভঃ রেজিঃ নং ১৬৮৩৪৪
অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা,
মুখে টকভাব, ঢেকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দাগ্নি, বুকজ্বালা,
আহারে অরুচি, স্বল্পনিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম।
দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যাঁরা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও
আমাদের দাওয়াই সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। নিষ্ফলে মূল্য ফেরৎ।
৩২ তোলার প্রতি কৌটা ৩৲ টাকা, একত্রে ৩ কৌটা — ৮৷৷ আলাদা। ডাঃ, মাঃ ও প্যাকিং খরচ পৃথক।
দি বাকলা ঔষধালয়। হেড অফিস- বরিশাল (পূর্ব্ব পাকিস্তান)
ব্রাঞ্চ-১৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৭

উপর এসে পড়ল। সামনে মিল কাকলি। বললে, 'কিন্তু আপনার কী! আপনার তো মজা। পৌষ মাস। দিব্যি নিজের জায়গায়, নিজের ঘরে আছেন। আর আমি! আমি কতদূর যাব বলুন তো?'

'আপনাকে তবে একটা ট্যাক্সি ডেকে দি।' তক্তপোশ থেকে নেমে পড়ল সুকান্ত।

'তাই দিন। সো কাইন্ড অফ ইউ।'

'হ্যাঁ, রাত বাড়বে বই কমবে না। আর আপনার অভিভাবকেরা ভাববেন।'

'অভিভাবক দেখি এক দঙ্গল করে দিলেন।' স্বচ্ছমুখে হাসল কাকলি।

'আপনার মা বাবা আছেন নিশ্চয়ই। তদতিরিক্ত আরো একজন কোন না আছেন! মেয়েদের সব সময়েই এক দঙ্গল অভিভাবক। নিরভিভাবক যদি কাউকে বলতে চান তো আমি। কেউ নেই আমার জন্যে ভাবে।'

'আপনার কথা জানি না। কিন্তু তদতিরিক্ত লোকের কথা যা আপনি বললেন সেটাও অতিরিক্ত বললেন।'

'মানে, বানিয়ে বললাম?'

'বানিয়ে ঠিক না হোক, বাড়িয়ে বললেন।'

'সে কী, তার সঙ্গে আপনার বিয়ে হচ্ছে না?' মুহূর্তে তপ্ত হয়ে উঠল সুকান্ত। সহকর্মীর নৈর্ব্যক্তিক সীমা সহসা অতিক্রম করে ফেলল।

'কী করে হয় বলুন। ঐ যে সুন্দর করে বললেন কথাটা ঐটেই সত্যি কথা।' হাসতে শুরু করে শেষে গম্ভীর হল কাকলি।

'যা, আমি আবার কী বললুম।'

'ঐ যে বললেন, শুধু মেলামেশাতেই কি ভালোবাসা হয়? আর ভালোবাসা যদি না জাগে কিসের বিয়ে কিসের বাজনা! গায়ের জোরে চাষই করা যায় বৃষ্টি ঝরানো যায় না। আর বর্ষণ না হলে সব নিষ্ফল।'

চাকর অনেকক্ষণ গেছে ট্যাক্সি আনতে, কিন্তু ফেরবার নাম নেই।

সুকান্ত দুশ্চিন্তায় ফেলল। বললে, 'বৃষ্টির মধ্যে ট্যাক্সি পাওয়া মুশকিল। তারপর কোন রাস্তায় জল দাঁড়িয়েছে, ট্যাক্সি পেলেও আসে কি না ঠিক কী। ট্র্যাম অচল, বাস দুরারোহ।'

'তা হলে কী হবে?' ভয়পাওয়া পাখির মত তাকাল কাকলি।

'রিক্সা করে যেতে হবে।'

'আমি একা-একা কী করে যাব রিক্সাতে! কতটা পথ তার খেয়াল আছে?'

'কী করে থকবে! তা ছাড়া দুই কলিগ এক রিক্সা চড়েছে এমন কোনো প্রিসিডেণ্ট নেই। বিশেষত দুজনের মধ্যে একজন যখন অনাত্মীয় মহিলা।'

'বিপদে নিয়ম নেই।' করুণ করে বললে কাকলি।

'কিন্তু স্ত্রীলোকে সব সময়েই নিয়ম। স্ত্রীলোক মহাবিপদ।'

'তা হলে পায়ে হেঁটে চলুন।' ব্যস্ত হয়ে উঠল কাকলি। 'ছাতাফাতা যোগাড় করুন হোটেল থেকে।'

'তা করছি। কিন্তু আমি যাব কেন?'

'বা, আমাকে একা ছেড়ে দেবেন? একজন অফিস-কলিগের নিরাপত্তা দেখবেন না?'

যখন বলছেন, বেশ, ততটুকু না হয় দেখব।'

'হ্যাঁ, বলুন, আমার কী অপরাধ। আপনার কাছে রিটার্ন-ভিজিট দিতে এসেই তো আমার এই দশা। আপনার তো উচিত অমাকে এই পরিবেশে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া।'

'কোড়ে যদি থাকে তবে দেব পৌঁছে। কী, মাথায় ছাতা ধরে?' হাসল সুকান্ত।

আরো হাসল যখন দেখলে এত সব ভয় জল্পনাকে ধূলিসাৎ করে চাকর ট্যাক্সি নিয়ে হাজির হয়েছে।

এগিয়ে দিতে নামল সুকান্ত। দোরগোড়া পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়াই শিষ্টাচার।

কিন্তু ড্রাইভারের চেহারা দেখে পাংশু হয়ে গেল কাকলি। একা ড্রাইভার নয়, তার পাশে বসা সঙ্গী। দুইই দুর্ধর্ষ।

'আপনিও চলুন।' আকুল অস্ফুটে মিনতি করল কাকলি।

রবিনসন্স
'পেটেণ্ট' বার্লি*
খাওয়াবার
এই ত সময়

রবিনসন্স পেটেণ্ট বার্লি গোরুর দুধের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে শিশুর পাকস্থলীতে দুধ শক্ত চাপ বেঁধে হজমের অসুবিধা ঘটায় না বরং তা হজম করা শিশুর পক্ষে আরো সহজ হয়। তাছাড়া, রবিনসন্স পেটেণ্ট বার্লি শিশুর পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগায়। রবিনসন্স পেটেণ্ট বার্লি শিশুরা খেয়ে তৃপ্তি পায়—এতে ওদের শরীরও গড়ে ওঠে। আপনার খোকাকে খাইয়ে দেখুন সে কেমন বেড়ে ওঠে।

এই বার্লিতে অনধিক ০.০২৮% আয়রন বি-পি ও ১.৫% ক্রিটা প্রিপঃ-এর সংমিশ্রণ আছে।

RPT 1375

* ক্যালসিয়াম ও লৌহ সংযোগে সুরক্ষিত

কোড-ফোড আর দেখতে লাগল না সুকান্ত। 'চলুন।'

ম্যানেজারকে বললে, ঘর খালি রইল। দেখবেন।

ওদিকে গাড়ি ফিরে আসবার আগেই বরেন সব টের পেয়েছে, বুঝে নিয়েছে। যত রাগ গিয়ে পড়েছিল ড্রাইভারের উপর। কিন্তু ড্রাইভার ফিরে এলে তাকে আর বকল না। তম্বি করল না। ড্রাইভারের চেয়ে সে যে বেশি বোকা তর্ক উঠলে সে কথাটাই তো স্পষ্টীকৃত হবে।

বরেনের উচিত ছিল বাথরুমের বাইরের দরজাটা বাইরে থেকে তালা দিয়ে বন্ধ করে রাখা। আর ভিতরের দরজাটার ছিটকিনি উড়িয়ে দেওয়া। যেমন গারাজ হয়নি, এগুলোতেও তেমনি ত্রুটি থেকে গেছে। এতেই যজ্ঞ পণ্ড হত না নিশ্চয়।

চোর পালাবার পর বুদ্ধি বাড়িয়ে লাভ নেই।

কিন্তু কতদূরে পালাবে? কত বার?

ড্রাইভার ফিরে এসে যে গল্প বললে তা বরেন কোনো অংশে খণ্ডন করলে না। সব মেনে নিল। প্রতারিত হয়েছে এ প্রচারিত করে গৌরব কোথায়!

'আমি এখন অনেক ভালো আছি। ডাক্তার লাগবে না। চলো বাড়ি চলো।' বরেন উঠল গাড়িতে।

রাস্তায় নেমে খানিক ঘোরাঘুরির শেষে নির্দেশ দিলে কাকলিদের বাড়ি যেতে।

'খুকি কোথায়? কাকলি?' বরেনকে একা নামতে দেখে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করল গায়ত্রী।

'সে কি! এখনো ফেরেনি বাড়ি?' বলে বরেন ছোট্ট একটি কাহিনী ফাঁদল। দুজনে একসঙ্গে ফিরছিল—সে প্রায় ঘণ্টা-খানেক আগে—কাকলি গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ল। বললে, অফিসের কোন এক বন্ধুর বাড়ি যাবে, কী এক জরুরি দরকার আছে। আরো বললে, বরেন যেন প্রতীক্ষা না করে, সে একাই ফিরতে পারবে। দায়িত্বজ্ঞান আছে বলে বরেন খোঁজ নিতে এসেছে সে ঠিকমত ফিরল কিনা।

'তুমি সে বন্ধুর বাড়িটা চেন?' গায়ত্রী অধীর হয়ে উঠল।

'দরকার হলে বার করা যাবে নিশ্চয়ই। কে জানে সেখান হতে হয়তো আর কোথাও গেছে। ভাববেন না, এসে পড়বে এক্ষুনি।' আশ্বস্ত করল বরেন।

কী বিচিত্র রাত, ট্যাক্সিতে কতদূর আসতেই দেখা গেল, আর বৃষ্টি নেই, শুকনো খটখট করছে পথঘাট।

'বাঃ' উচ্ছল কণ্ঠে বলে উঠল কাকলি, 'বৃষ্টির পথে খানিকটা এগিয়ে আসবার পরেই আবার শুকনো।'

'আবার কে জানে শুকনো পথে খানিকটা এগিয়ে গিয়েই আবার জল।' হাসল সুকান্ত।

'তেমন দুজন একসঙ্গে থাকলে ঘোর বর্ষাই খরা।' কাকলি বললে।

'আবার ঘোর খরাই বর্ষা।' বললে সুকান্ত। 'কিন্তু এ কি ঠিক কলিগের মত কথা হচ্ছে?'

'হচ্ছে না বুঝি? না যদি হয় তা হলে চুপ করে থাকুন।'

চুপ করল দুজনে।

'তেমন দুজন হলে স্তব্ধতাও কথা।' সুকান্ত টিপ্পনী ঝাড়ল।

'আবার কথাও স্তব্ধতা।' সায় দিল কাকলি।

'সুতরাং কথা বলুন।'

'সুতরাং চুপ করে থাকুন।'

'ও একই কথা।' একসঙ্গে বলে উঠল দুজনে।

বাড়ির কাছাকাছি ট্যাক্সিটা আসতেই কাকলি বললে, 'তুমিও চলো।'

'হ্যাঁ যাব বৈ কি। তোমাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসব।'

'কি, অভিভাবকের মত?'

'না। অফিস-কলিগের মত।'

ট্যাক্সি ভাড়াটা সুকান্তই দিল। এটা কি অফিস-কলিগের মত হল? তাকাল কাকলি। একরকম একটা হল। হাসল সুকান্ত।

বরেন আর গায়ত্রী একসঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল বারান্দায়। কিন্তু ট্যাক্সি থেকে কাকলি এ কার সঙ্গে নামল? কে তাকে দিয়ে গেল বাড়িতে?

'এই আমার মা।' অফিস-কলিগকে যেমন আলাপ করিয়ে দেয় তেমনি ভঙ্গিতে বললে কাকলি।

কোড়ে নমস্কারের কথাই বলেছে, সুকান্ত একেবারে পায়ে লুটিয়ে প্রণাম করতে গেল।

কী সর্বনাশ! আঁতকে উঠে কয়েক পা পিছিয়ে যেতে দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খেল গায়ত্রী!

'আর ইনি বরেন্দ্রবাবু—'

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই কেটে পড়ল বরেন। এমন ভাব যেন সে থানায় গেল পুলিসে 'খবর দিতে।

'আর উপরে বাবা আছেন—'

'হ্যাঁ, আছি, আছি। মরিনি এখনো।' উপর থেকে বনবিহারী আনন্দধ্বনি করে উঠলেন। 'দেখবার জন্যে বেঁচে আছি। আমার বাড়ি, আমি বলছি, উঠে এস উপরে।'

'আরেক দিন আসব। সবার সঙ্গে আলাপ করে যাব। আজ অনেক রাত হয়েছে। আজ চলি।'

ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়েছে। পায়ে হেঁটেই চলল সুকান্ত। (ক্রমশ)

নন্দাঘুন্টি

গৌরকিশোর ঘোষ

(এক)

বহু বাঙগালী এর আগে হিমালয় ভ্রমণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা লেখক, তাঁরা আপন অভিজ্ঞতা অক্ষরের পর অক্ষরে মুখর করে রেখেছেন। তাঁদের কথা আমরা জানি। আবার এমন বহু লোকের কথাই আমরা জানিনে, হিমালয় প্রবল আকর্ষণে যাঁদেরকে ঘরছাড়া করেছে।

বাঙগালীর ছেলে একশ বছর আগে দুর্গম হিমালয়ের শরীর ডিঙিয়ে লাসা পৌঁছে অসাধ্য সাধনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। 'শরৎচন্দ্র দাশের কৃতিত্বই তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। অনেক বাঙগালী সার্ভেয়ার হিমালয়ের অগম্য সব স্থান জরীপ করেছেন, তীর্থযাত্রীর পিপীলিকা মিছিলের প্রবহমানতা যুগ-যুগ ধরে বজায় রয়েছে।

বাঙগালীর কাছে হিমালয় নতুন নয়। তবে নন্দাঘুণ্টি অভিযানের নতুনত্ব কি? (নূতনত্ব না বলে বৈশিষ্ট্য বলাই বরং ভাল।) কিছু আছে কি?

অভিযাত্রী দলের নেতা সুকুমার রায়

হ্যাঁ, এই অভিযানের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, পর্বত অভিযান বা মাউণ্টেনীয়ারিং এক্সপীডিশনের আধুনিক যে সংজ্ঞা, তদনুসারে এটা বাঙলার প্রথম অভিযাত্রী দল। এর আগে এখানকার সুসংগঠিত কোন দল হিমালয় অভিযানে যাননি। সেই হিসেবে এই দলটি বাঙলার পর্বতাভিযানের ইতিহাসে 'পথিকৃতের স্থান লাভ করবে।

দ্বিতীয়ত, সারা ভারতে, এই প্রথম সম্পূর্ণ বে-সরকারী স্তরে হিমালয় অভিযানের উদ্যোগ হল। এ বিষয়েও বাঙলা দেশই আবার নেতৃত্ব গ্রহণ করল।

তৃতীয়ত, বাঙগালীর সংগঠন শক্তির একটা প্রমাণ পাওয়া গেল। সর্বস্তরে এবং সুপরিকল্পিত নিটোল সংগঠনই এযুগের পর্বতাভিযানের প্রাণ।

চতুর্থত, পর্বতাভিযানের মত বিপুল ব্যয় ও পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপারে বাঙগালী এখনও অকুতোভয়ে হাত দিতে পারে, এটারও প্রমাণ পাওয়া গেল।

শেরপাদের দলপতি আঙ্‌ শেরিং

অভিযাত্রী-দলের আন্দাজি একটা হিসাবে জানা গেল, প্রায় চাঁল্লশ হাজার টাকা এই অভিযানে ব্যয়িত হবে। এই টাকার সবটাই উঠে এসেছে মুখ্যত কয়েকটি বাঙগালী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায়। আনন্দ-বাজার পত্রিকা আর্থিক দায়িত্বের প্রধান বোঝাটি কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এছাড়া অন্তত আরও ত্রিশটি প্রতিষ্ঠান নানা সম্ভার দিয়ে সাহায্য করেছেন। (দশে মিলে কাজ করা বাঙগালীর ধাতে নেই, প্রবাদ বাক্যের মত এই অপবাদ যে মিথ্যে হতে পারে, এই ব্যাপারে তা দেখা গেল।)

এই অভিযান (ফলাফল যাই হোক না কেন), বাঙলার তরুণ প্রাণে দুঃসাধ্য কাজে হাত দেবার, অসাধ্য সাধনে ব্রতী হবার প্রেরণা যে জাগাবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ আমার নেই। আমরা শরীরী সুখে থাকতে এত অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, সাধ করে ভতের কিল

অভিযাত্রী দলের সঙ্গে প্রেরিত আনন্দবাজার পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার ও বর্তমান প্রবন্ধ-লেখক গৌরকিশোর ঘোষ

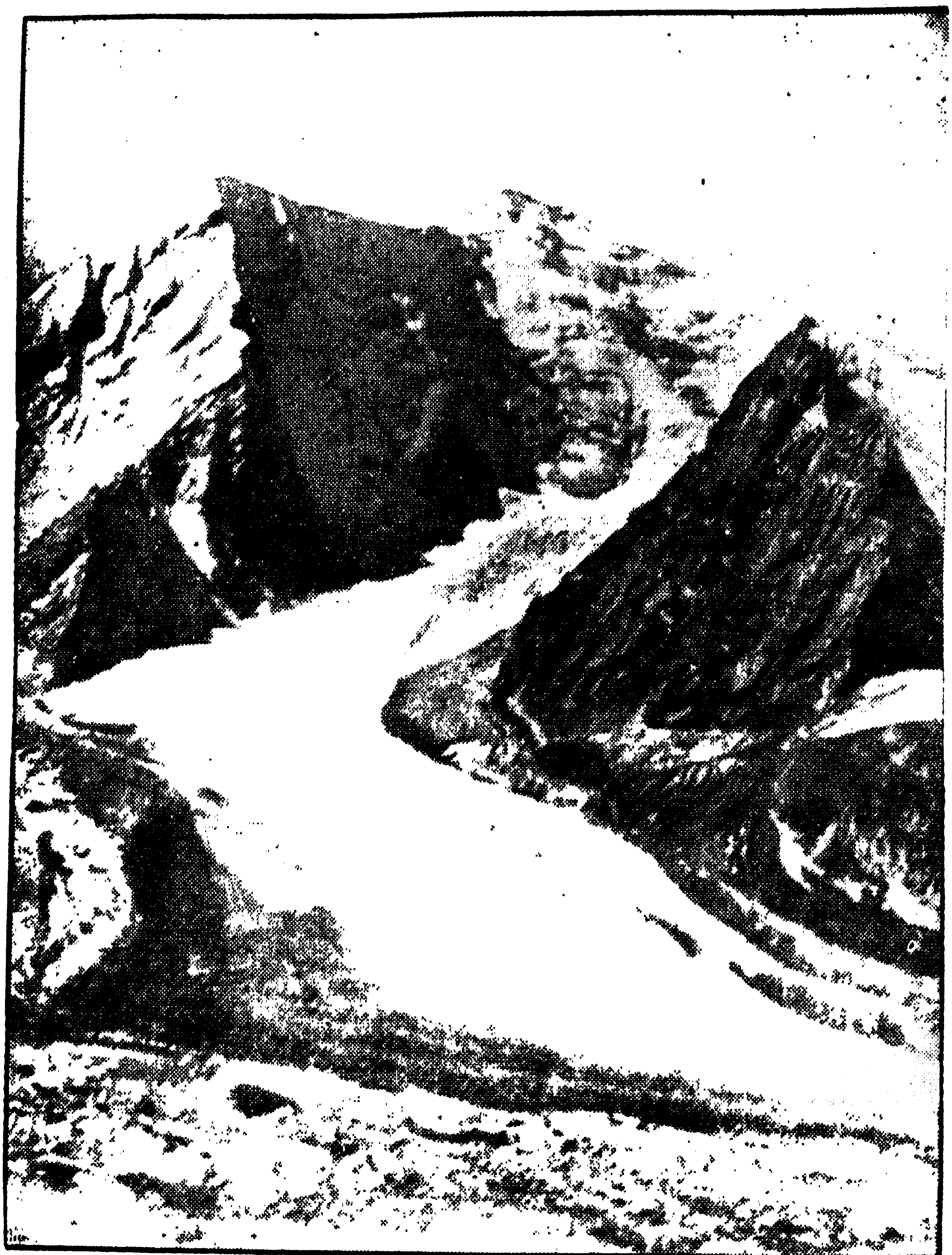

নন্দাঘুণ্টি পর্বতের চূড়া, মাঝখানে দিয়ে নেমে এসেছে হিমবাহ

খাবার ইচ্ছাটা বিসর্জন দিয়ে বসে আছি। আমাদের রক্তে অ্যাডভেঞ্চারের যে আহ্বান স্তিমিত হয়ে আসছিল, কলকাতা হিমালয়ান ইনস্টিটিউটের এই সদস্যরা তা যদি জাগিয়ে তুলতে পারেন, আমার মনে হয়, তাহলেই মূল উদ্দেশ্যের অনেকটাই সফল হবে।

অভিযাত্রীরা যে-কাজে হাত দিয়েছেন, তা রীতিমত দুরূহ। নন্দাঘুণ্টি শিখরের উচ্চতা ২০৭০০ ফুট। আজ, পর পর দুবার, এভারেস্ট বিজয় এবং হিমালয়ের অন্য সব মহারথীদের পতনের পর, সাধারণ মানুষের মনে উচ্চতা সম্পর্কে সম্ভ্রমবোধ কমে এসেছে। তাই এখন ২০ হাজার ফুটের কথা শুনলেই অনেকে এমনভাবে নাক সিঁটকান, যেন এটা দোতলার ছাতে ওঠার মত ব্যাপার।

কিন্তু এটা জেনে রাখা বোধহয় ভাল, হিমালয়ের আবহাওয়ার ভয়াবহতা আগেও যেমন হিংস্র, নিষ্ঠুর, ক্ষমাহীন ছিল, এখনও তাই আছে, একটুও কমেনি। একটা নির্দিষ্ট উচ্চতার উপরে উঠে যাবার পর মানবদেহে যেসব ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে থাকে, তার প্রকৃতিও অপরিবর্তিতই আছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা বিজয়ী (১৯৫৫) অভিযাত্রী দলের সঙ্গে যে ডাক্তার গিয়েছিলেন, তিনি তাঁর রিপোর্টে বলেছেন, হিমালয়ের খুব উঁচুতে উঠতে গেলে, অক্সিজেনের স্বল্পতা অনুভব করা যায়। বায়ুর আর্দ্রতা কমে যায়। মানুষ খুব হাঁপাতে থাকে। প্রচুর ঘাম হয়। শরীরে জলের ভাগ কমে আসে। ক্ষিধে কমে যায়। খাবার কথা মনে হলেই বমি আসে। প্রস্রাব কমে যায়। ১৬ হাজার ফুট থেকেই এসব লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। এর উপর আছে শীত। অক্টোবরের

মাঝামাঝি থেকেই প্রচণ্ড শীত পড়ে যাবে। তখন তুষার-ক্ষত হবার ভয় আছে।

আরেকটা কথাও জেনে রাখা উচিত। এই অভিযাত্রী দলটি প্রয়োজনীয় কিছু কিছু জিনিস এখনও পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পারেনি। তাপমান যন্ত্র এদের নেই, ব্যারোমিটার নেই। শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র নেই। আরও অনেক কিছু নেই। যেসব জিনিস সংগ্রহ করতে পেরেছে, তার কোনটাই অব্যবহৃত নয়। এর আগে নানা অভিযানে যেসব জিনিস ব্যবহৃত হয়েছে, অভিযাত্রীরা তাই সংগ্রহ করে এনেছে।

আর সেজন্য কারও মনে অভিযোগ নেই। অসাধারণ মনোবল এবং পরিশ্রম করার ক্ষমতা আমি এদের মধ্যে দেখেছি। এদের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কেও এরা সদা-সচেতন। হিমালয় যদি মুখ তুলে চায়, এদের শরীর যদি শেষ পর্যন্ত সুস্থ থাকে, তবে শিখর-শীর্ষে ওঠা এদের পক্ষে সম্ভব হবে।

(দুই)

অভিযাত্রিকদের সহযাত্রী হবার প্রস্তাব আকস্মিকভাবেই আমার কাছে এল। কিন্তু আমি একটুও অবাক হইনি। জানতাম এমনটাই হবে। এ যেন আমার পাওনা। মনে পড়ছে, ১৩ই আগস্ট রাত প্রায় ১২টার সময় দুজন সহকর্মীর সংগে বাড়ি ফিরছিলাম। অফিসের কাজ চুকিয়ে ক্লান্ত শরীরটা জীপ গাড়িতে এলিয়ে দিয়েছি। গভীর নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে মুখর নগরীতে। ঢুলছি বসে বসে। অকস্মাৎ একটা কথা কানে এল। হিমালয় অভিযান... বাঙালীর ছেলে...অশোকবাবু এক কথায় রাজী...আনন্দবাজার থেকে রিপোর্টার ফটোগ্রাফার যাবে। সহকর্মীরা সামনের সীটে বসে আলোচনা করছেন। আমার তন্দ্রা তৎক্ষণাৎ ছুটে গেল। হঠাৎ কেমন যেন ঝাঁকানি খেলাম। রক্তে একটা চনমনে আস্বাদ জেগে উঠল।

একদিন শুনলাম, নন্দাঘুণ্টিতে অভিযান যাচ্ছে। কলকাতা হিমালয়ান ক্লাবের সদস্যরা এই কাজে এগিয়ে এসেছেন। আর আমি আর প্রবীণ ফটোগ্রাফার শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সিংহ অভিযাত্রিকদের সহযাত্রী হচ্ছি। এ'রা পাহাড়ে চড়বেন আর আমরা খবর পাঠাব, ছবি পাঠাব। একসংগে যাওয়া, একসংগে খাওয়া, একসংগে থাকা। তফাৎ শুধু এক জায়গায়। সারাদিন পথশ্রমের পর অভিযাত্রিকরা বিশ্রাম নেবেন। আর আমাদের বসতে হবে ডেসপ্যাচ লিখতে, ছবি বাছতে। রানারের হাতে ডাকের প্যাকেট সঁপে দেবার পর স্বস্তি।

একদিন অভিযানের নেতা শ্রীসুকুমার রায়ের সঙ্গে দেখা হল। আলাপ হল অভিযাত্রিকদের সংগে।

অভিযাত্রী দলের নেতার হাতে শ্রীঅশোক-কুমার সরকার জাতীয় পতাকা তুলে দিচ্ছেন

কজন যাচ্ছেন?

আমরা ছয়জন, শেরপা সাতজন। সংগে থাকবে পর্বতারোহণের উপযোগী সরঞ্জাম, খাদ্যবস্তু, দুটো ভেড়া আর দুজন সাংবাদিক। আর কি চাই?

না। কিছু না। আর বাকিই বা থাকল কি?

এ-এক আশ্চর্য দল। সকলের বয়েসই ত্রিশের নিচে। সবাই অবিবাহিত। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। নেতা কর্পোরেশন স্কুলের শিক্ষক। সদস্যের কেউ-বা কেরানী, কেউ দোকানী, কেউ-বা দোকানে খাতা লেখে।* চেহারাতেও সাধারণ বাঙালী। অসাধারণ শুধু চিন্তায়, কর্মেও।

এ'দের দলে দুজন পৃথিবী বিখ্যাত শেরপা আছেন। আঙ শেরিং আর আজীবা। ১৯৪৩ সালে নাংগা পর্বতে যে ভয়াবহ দুর্ঘটনা হয়, তাতে উচ্চতর শিবির থেকে একমাত্র আঙ শেরিং-ই প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছিলেন। আর সবাইকে (চারজন জার্মান সাহেব আর ছয়জন শেরপাকে সেবার প্রাণ দিতে হয়েছিল)। ১৯৫০ সালে ফরাসী অভিযাত্রীদের অন্নপূর্ণা পর্বতে অভিযানের সংগে শেরপা আজবীরা নাম ছড়িয়ে পড়ে। ২৫ হাজার ফুট উঁচু থেকে (যেখানে একটা চশমাকেও বিরাট বোঝা বলে মনে হয়) দলের পর্যুদস্ত নেতাকে কাঁধে করে নামিয়ে এনেছিলেন।

এ'দের পেয়ে নন্দাঘুণ্টি অভিযাত্রী দলটি যে শক্তিশালী হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

(তিন)

কুমায়ুন-হিমালয়ের সাম্রাজ্ঞী নন্দাদেবী (২৫৬৪৫ ফুট)। মাথায় তুষারমুকুট পরে উন্নতশিরে স্বমহিমায় বিরাজমান, আর তার চারদিকে সদা-জাগ্রত প্রহরারত অনেক

---

* শ্রীনিমাই বসু কেরানী। কাজ করেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদে। শ্রীধ্রুবরঞ্জন মজুমদার এক মোটর পার্টসের দোকানে খাতা লেখেন। শ্রীবিশ্ব-দেব বিশ্বাস কাজ করেন বোতল তৈরির কারখানায়। শ্রীদিলীপ ব্যানার্জীর দোকান আছে বড়বাজারে। ডঃ অরুণ কর চিত্তরঞ্জন সেবা সদনের হাউস সার্জন। (অভিযাত্রিকেরা অবিবাহিত, কিন্তু সংগে নিচ্ছেন এক গাইনোকলজিস্টকে। পছন্দ আছে!)

হাই-অল্টিচিউড তাঁবু পরীক্ষা করা হচ্ছে

সংগৃহীত মালপত্রের একাংশ

কিঙ্কর-কিঙ্করী। দক্ষিণদ্বার যারা রক্ষা করছে, তাদের মধ্যে রয়েছে মাইকতোলি (২২৩২০), মৃগথুনি (২২৪৯০), ত্রিশূল (২৩৩৬০) আর নন্দাঘুণ্টি (২০৭০০)। উচ্চতায় অন্যান্য পাহাড় থেকে কিছুটা নীচু হলেও নন্দাঘুণ্টির প্রতিরোধ অসাধারণ। সে-কথা সার এডমন্ড হিলারী স্বীকার করেছেন। এরিক শিপটন বলেছেন, এই পর্বতে আরোহণ রীতিমত কষ্টসাধ্য।

অতীতে তিনটি মাত্র অভিযান এই পাহাড়ে হয়েছিল। তার মধ্যে ১৯৪৭ সনে একটি সুইস দল এই পর্বত-চূড়ায় আরোহণ করেছিলেন। এই অভিযানের বিবরণ দিতে গিয়ে আন্দ্রে রচ্ বলেছেনঃ "শীঘ্রই চড়াই শেষ হয়ে এল এবং অবশেষে, দুপুরবেলায়, আমরা যেখানে পৌঁছলাম, আমাদের ধারণা সেইটিই শিখরদেশ। কিছু দেখা যাচ্ছিল না। আমরা আরো উপরে উঠতেও পারতাম না।" রচ্ সাহেব স্পষ্ট করে বলেননি যে, তাঁরা শিখরে উঠেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে, শিখরে পৌঁছেছেন। কিন্তু যেহেতু কেউ রচ এর "ধারণা"কে চ্যালেঞ্জ করেননি, সেই হেতুই নন্দাঘুণ্টির শিখরে ওরা উঠেছিলেন, এই কথাটা মেনেই নেওয়া হয়। রচ্ যেখানে লিখেছেন......

And finally, at midday, we reached what we thought must be the summit for, although visibility was practically nil...."

সেখানে মিঃ কেনেথ ম্যাসন তাঁর বইয়ে (আবোড্ অব স্নো) লিখেছেন, "রচ্ ডিটার্ট," গ্র্যাডেন, সাটার আর তেনজিং ১১ই জুলাই শিখরে পৌঁছেছিলেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, রচ্-এর কাছে যেটা ছিল 'ধারণা', ম্যাসনের হাতে সেইটাই হল 'ইতিহাস'।

১৯৪৪ সনে সর্বপ্রথম এই নন্দাঘুণ্টি শিখরে অভিযান হয়। এই অভিযাত্রী দলে ছিলেন মিঃ বেসিল গুডফেলো, জন গুজার্ড, ইনেস ট্রেমলেট। এ'দের সঙ্গে শেরপা ছিলেন দুজন—পাসাং দাওয়া শেরপা আর নুরী। অক্টোবরের মাঝামাঝি এই দলটা রানীক্ষেত থেকে যাত্রা করে নন্দাঘুণ্টির পাদদেশে যাত্রা করেন। এই অভিযান দক্ষিণ দিক থেকে পরিচালিত হয়েছিল। রানীক্ষেত থেকে সুতোল গ্রাম পর্যন্ত আসতে এই দলের পাঁচ দিন সময় লেগেছিল। সুতোল থেকে ১৫০০০ ফুট উঁচুতে মূল শিবিরে পৌঁছতে লেগেছিল তিন দিন। মূল শিবিরে তিন দিন থেকে এ'রা ধীরে-সুস্থে ফিরে এসেছিলেন। আবহাওয়া খুব খারাপ ছিল। নন্দাগিনী উপত্যকার উপরে প্রতিদিন বেলা প্রায় একটার সময় মেঘ জমত। ১৪০০০ ফুট থেকে ১৮০০০ ফুট পর্যন্ত মেঘের কম্বলে ঢাকা থাকত। কখনও কখনও দু-এক পসলা অল্পস্বল্প বৃষ্টিও হয়েছে। আর একবার হয়েছে মুষলধারায়। পাহাড়ের উপরে তুষারপাত বিশেষ হয়নি।

১৯৪৪ সনের অভিযাত্রিকরা খুব বেশী-দূর অগ্রসর হতে পারেননি। তাঁদের দৌড় ছিল রণ্টি হিমবাহ পর্যন্ত। ১৯৪৫ সনে পি এল উড আবার অভিযান করলেন নন্দাঘুণ্টিতে। এ'দের দলে ছিলেন আর এইচ স্যামস আর উড সাহেবের ভাই জেরেমি। আর ছিল তিনজন অভিজ্ঞ স্থানীয় লোক। এ'রাও রানীক্ষেত থেকে নন্দাঘুণ্টির দক্ষিণ দিক থেকে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। রানীক্ষেত থেকে ২৫শে সেপ্টেম্বর এ'রা যাত্রা করেছিলেন। প্রথমে লরিতে গড়ুড় পর্যন্ত, রানীক্ষেত থেকে সাত মাইল, তারপর পাঁচ দিনের পথ হেঁটে সুতোল, ৫০ মাইল। তারপর ঘন জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে একদিন বৃথাই নষ্ট করেছিলেন। এদিকে প্রচুর বাঁশবন। মাঝে মাঝে বাঁশ কেটে রাস্তা বের করতে হয়েছিল। ৩রা অক্টোবর ও'রা প্রায় ১২০০০ ফুট উঠতে পেরেছিলেন। অক্টোবরের এই সময়টা হিমালয়ের এই দিকটাতে বর্ষা কেটে যাবার কথা, কিন্তু তখনও পর্যন্ত আবহাওয়ার মতিগতি অস্থির ছিল। একদিন মুষলধারে বৃষ্টিও হয়ে গেল। যাহোক, শেষ পর্যন্ত ও'রা ১৪০০০ ফুট উপরে মূল শিবির এবং ১৫০০০ ফুট উপরে এক নম্বর শিবির স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এ'দের দু নম্বর শিবিরটা ১৭০০০ ফুট উঁচু 'কলে'র ৩০০ ফুট নীচুতে। নরম তুষার আর চোখ-ধাঁধানো সূর্যের আলো ও'দের খুব কাবু করে ফেলেছিল।

আরও একটু এগোতেই ও'রা প্রচণ্ড বাধা পেলেন ৮০০ ফুট খাড়াই একটা

উঁচু চড়াইতে। সেই সুদীর্ঘ 'কল'টাতে ওঁরা ৩য়, ৪র্থ এবং ৫ম শিবির স্থাপন করেছিলেন। ৯ই অক্টোবর সকালে উড আর তাঁর ভাই জেরেমি দুজনে নন্দাঘুণ্টি শিখরে উঠবার একটা চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু গুরুতর পরিশ্রমে এবং হিংস্র আবহাওয়ার আক্রমণে কাতর হয়ে ওঁদের ফিরে আসতে হয়।

১৯৪৭ সনে একটা সুইস দল ওই একই পথে নন্দাঘুণ্টিতে অভিযান করে (এই দলের উল্লেখ আগেই করেছি)। এই দলে রচ্ এবং ডিটার্ট ৭ই সেপ্টেম্বর সুতোল থেকে যাত্রা করেন। সঙ্গে তিনজন শেরপা—আঙ্ তেনজিং (এভারেস্ট বিজয়ী নন), আঙ্ নরবু আর পেনুরি। এরা দক্ষিণ দিকের পথ ধরে অনেকখানি ওঠবার পর পূর্ব দিকে আর-একটা পথ ধরে এগোতে থাকে। কারণ সোজা দক্ষিণে আর বেশীদূর এগোতে পারা যেত না। ওঁরা দেখলেন দক্ষিণ গিরিশিরা থেকে পূর্বের গিরিশিরায় আরোহণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ, ওই গিরিশিরাটি একটু একটু করে নেমে এসে হুকুম-গালা কলে (১৮০০০ ফুট) মিশে গেছে। যে লম্বা গিরিশিরাটা হুকুম-গালার সঙ্গে পূর্ব-প্রান্তের গিরিশিরাটিকে যুক্ত করেছে, তার কিছুটা তুষারে ঢাকা, কিছুটা পাথরে। ওঁরা এই পথ ধরেই এগিয়ে গেলেন। ১৮০০০ ফুটের কাছাকাছি এসে খুব খাড়া একটা চড়াই পেলেন। আবহাওয়ার যথেষ্ট অবনতি ঘটল। মেঘ জমতে লাগল, জমল কুয়াশা। বৃষ্টিও হয়েছিল। যাহোক, শেষ রাত্তিরের দিকে ওঁরা শিবির থেকে বেরিয়ে নন্দাঘুণ্টি শিখরের দিকে অগ্রসর হলেন। পরদিন সকাল নটা পর্যন্ত কঠিন পরিশ্রম করে ওঁরা একটু একটু করে এগোবার পথ তৈরি করতে পারলেন। কিছুক্ষণ পর থেকেই তুষারবর্ষণ শুরু হল। ঘন কুয়াশা ওঁদের ঘিরে ধরল। আঙ্ তেনজিং আগে আগে উঠছিল। পলকের জন্য একবার কুয়াশা সরে গেল। ওঁরা দেখতে পেলেন নন্দাঘুণ্টির চূড়া ওঁদের প্রায় নাগালের মধ্যে এসে গেছে। প্রবল উৎসাহে ওঁরা একটু একটু উঠতে আরম্ভ করলেন। মেঘ আর কুয়াশা আবার ঢেকে দিল। ঘোর অন্ধকার হয়ে এল। ধুঁকতে ধুঁকতে খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠতে উঠতে ওঁরা যেখানে এসে পৌঁছলেন, ওঁদের ধারণা হল সেখানটাই নন্দাঘুণ্টি পর্বতের চূড়া। মনে হল যেন আর ওঠার কোন জায়গা নেই। তারপর ধীরে ধীরে নামতে শুরু করলেন। তারপর বহুকষ্টে এক সময় মূল শিবিরে পৌঁছে গেলেন।

এই হল নন্দাঘুণ্টি অভিযানের অতীতের ইতিহাস। একটা জিনিস লক্ষ্যণীয়, তিনটি অভিযাত্রী দলই নন্দাঘুণ্টির দক্ষিণ দিক থেকে অভিযান চালিয়েছিল। শ্রীসুকুমার রায়ের নেতৃত্বে এখন যে দলটি গত ২৫ সেপ্টেম্বর কলকাতা থেকে যাত্রা করেছে সেটি এই চিরাচরিত পথ পরিত্যাগ করে নতুন একটা পথ বেছে নিয়েছে। এই বাঙালী অভিযাত্রী দলটি এই প্রথম উত্তর দিকের পথ ধরে নন্দাঘুণ্টিতে অভিযান চালাবে।* এই অঞ্চলটি এখনও পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত। এই অভিযাত্রী দলকে দুটি কাজ সম্পন্ন করতে হবেঃ এক, এই অগম্য অঞ্চলের ভিতর দিয়ে নন্দাঘুণ্টির শিখরে ওঠবার মত একটা ভাল পথ আবিষ্কার করা, এবং দুই, শিখরে ওঠার চেষ্টা করা। এটা মনে রাখতে হবে ১৯৪৭ সনে যে সুইস দলটি নন্দাঘুণ্টি শিখরে উঠেছে বলে দাবি করে, তাঁদের একটা সুবিধে ছিল এই যে, ১৯৪৪ এবং ১৯৪৫ সনের অভিযাত্রিকেরা এদিকের পথটি আবিষ্কার করে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই বাঙালী অভিযাত্রীদের নন্দাঘুণ্টির পথ আবিষ্কার এবং শিখরে আরোহণ একসঙ্গে দুটো কাজই এবং অল্প সময়ের মধ্যে করতে হবে। দুটো কাজই দুরূহ। এই দুটো কাজ হাশিল করে সাফল্যকে এঁরা যদি করায়ত্ত করতে পারেন, তা হলে অভিযাত্রিক মাত্রেই এঁদের কৃতিত্বে গর্ব বোধ করবেন।

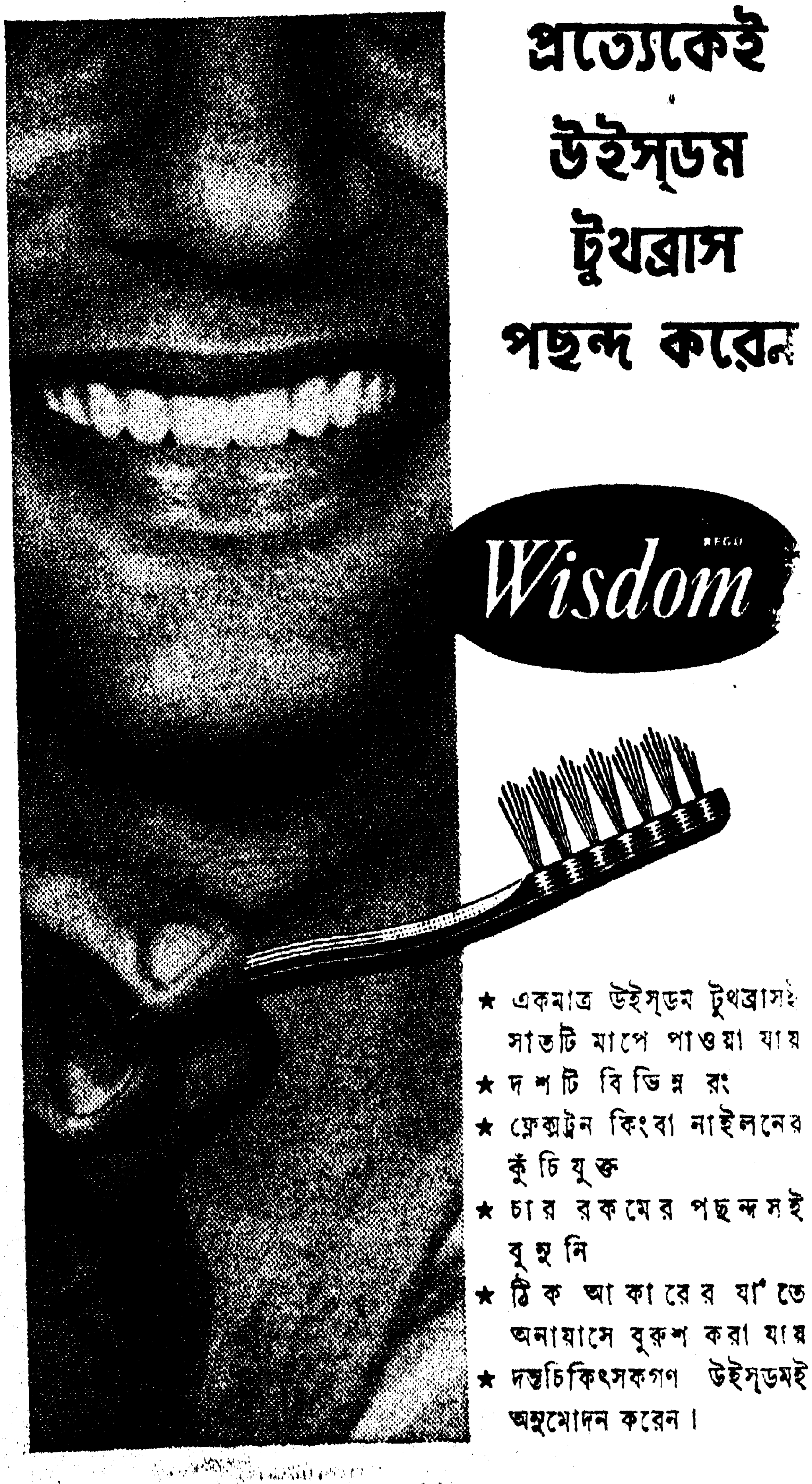

প্রত্যেকেই উইস্‌ডম টুথব্রাস পছন্দ করেন

★ একমাত্র উইস্‌ডম টুথব্রাসই সাতটি মাপে পাওয়া যায়
★ দশটি বিভিন্ন রং
★ ফ্রেক্সট্রন কিংবা নাইলনের কুঁচিযুক্ত
★ চার রকমের পছন্দসই বুরুনি
★ ঠিক আকারের যাঁতে অনায়াসে বুরুশ করা যায়
★ দন্তচিকিৎসকগণ উইস্‌ডমই অনুমোদন করেন।

জে. এল. মরিসন, সন এণ্ড জোন্স (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড
বোম্বাই • কলিকাতা • মাদ্রাজ • দিল্লী

কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

(৩৯)

সতী যদি তাকে না-চিনতে পারে। অনেকদিন পরে এসেছে দীপংকর। অনেক বড় ঘরে বিয়ে হয়েছে। বাড়ির সামনে লোহার রেলিং দেওয়া গেট। ইঁট-বাঁধানো রাস্তা ভেতরে। বাড়ির সামনে দাঁড়ালে সোজা ভেতরের গ্যারাজটা নজরে পড়ে। গেটের দু মাথার ওপর ইলেকট্রিকের ডুম-বাতি জ্বলছে।

দীপংকর অনেকক্ষণ সেইখানে এধার-ওধার পায়চারি করতে লাগলো।

ঠিক এই সময়ে বাড়ি ঢোকবার মুখে যদি সতী তাকে দেখতে পায় তো ভাল হয়। তাহলে আর ডাকতে হয় না। একটা চিঠি বা একটা স্লিপে দীপংকরের নাম লিখে ভেতরে পাঠালেও চলে। কিন্তু স্লিপ্ পেয়ে যদি সতী দেখা না করে। যদি উত্তর না দেয়। যদি বলে—এখন সময় নেই। দরোয়ান হয়ত ফিরে এসে বলবে—এখন মোলাকাত্ হবে না!

দীপংকরের মনে হলো সে বড় মর্মান্তিক! কেউ চিনতে না পারলে মনে বড় কষ্ট হয়।

কিন্তু লক্ষ্মীদির বাবার ঠিকানাটাও যে তার দরকার! লক্ষ্মীদির ব্যাপারটা তাঁকে আর না জানালে যে চলবে না। তাঁকে জানালেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। লক্ষ্মীদি কোথা থেকে কোথায় নেমেছে, অনন্তবাবুর পাল্লায় পড়ে কত নিচে নেমে এসেছে! শেষকালে কোথায় কত গভীরে যে নামবে তা-ও বলা যায় না। লক্ষ্মীদির সেই আগেকার রূপ, সেই আগেকার চাল-চলন, কথা বলা, সমস্ত যেন বদলে গেছে। লক্ষ্মীদির কথা ভাবতে ভাবতে বড় দুঃখ হয়েছে দীপংকরের। ট্রামে বসে সমস্তক্ষণ কেবল লক্ষ্মীদির কথাই ভেবেছে। লক্ষ্মীদিকে উদ্ধার করার আর কী উপায় খোলা আছে! ফাঁকা ট্রামের মধ্যে কেবল দীপংকরই একলা। একলা-একলাই কথাগুলো ভেবেছে শুধু। দীপংকরকে লক্ষ্মীদি তাড়িয়ে দিয়েছে বলে নয়, লক্ষ্মীদির অধঃপতনের জন্যেই দীপংকরের মনে আঘাত লেগেছে। এমন করে চোখের সামনে লক্ষ্মীদি নষ্ট হয়ে যাবে! হয়ত তারপর যখন একদিন সমস্ত জলুস চলে যাবে লক্ষ্মীদির, তখন ওই অনন্তবাবুকে নিয়ে পথে দাঁড়াতে হবে! তখন আর কেউ সাহায্য করবার থাকবে না। তখন হয়ত ওই গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং-এর ওপরই ট্রেনের চাকার তলায় আত্মহত্যা করতে হবে লক্ষ্মীদিকে!

—এখানে কাকে চাই আপনার?

দীপংকর হঠাৎ সামনে চেয়ে দেখলে। এক ভদ্রলোক সামনের রোয়াকের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন তারই দিকে চেয়ে।

—কাকে খুঁজছেন?

দীপংকর বললে—খুঁজতে এসেছিলাম এই পাশের বাড়িতে—

—ঘোষেদের বাড়ি?

দীপংকর বললে—হ্যাঁ, সনাতন ঘোষ।

তারপর একটু থেমে বললে—কিন্তু এত রাত্তিরে কি ওঁরা জেগে আছেন?

ভদ্রলোক বললেন—জেগে আছেন নিশ্চয়ই। আলো তো জ্বলছে ভেতরে—ডাকুন না, ওই সামনে দরোয়ান বসে আছে, ওকে বলুন, ও ডেকে দেবে—

দীপংকর বললে—এতক্ষণ তো সেই কথাই ভাবছি—এখন কি ডাকা ঠিক হবে? বরং কাল দেখা করাই ভালো—

দীপংকর আস্তে আস্তে গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় এল! না, আজ থাক। এত রাত্রে বাড়ির বউ-এর সংগে দেখা করতে যাওয়াই তো অন্যায়। দরোয়ানের কাছেও নিজের পরিচয় দিতে হবে। দরোয়ান হয়ত তাকে সনাতনবাবুর কাছেই নিয়ে যাবে! সনাতনবাবুর কাছে গিয়ে নিজের পরিচয়ও দিতে হবে। সনাতনবাবু কী-রকম লোক কে জানে! তাঁর স্ত্রীর সংগে এত রাত্রে কীসের দরকারে দেখা করতে এসেছে তা-ও বলতে হবে। তারপর নানান্ জেরার পরও যে সতীর সংগে দেখা করতে অনুমতি পাওয়া যাবে, তারও কোনও ঠিক নেই! যদি তিনি জিজ্ঞেস করেন—দীপংকর কে, তাঁর স্ত্রীর সংগে কোন্ সূত্রে পরিচয়? তখন? তখন কী জবাব দেবে সে? পাশা-পাশি বাড়িতে থাকার সম্পর্কটাই একমাত্র সূত্র! আর কোনও সূত্রই তো নেই সতীর সংগে।

দরকার নেই!

দীপংকর আস্তে আস্তে আবার ঈশ্বর গাংগুলী লেনের দিকে হাঁটতে লাগলো। মস্ত বড় বাড়ি। সতীর শ্বশুরবাড়িটা! ভেতরে অনেকখানি জায়গা। অনেক চাকর-বাকর। অনেক গাড়ি, অনেক অর্থের চিহ্ন বাড়িটার সর্বাংগে! সমস্ত পাড়াটার মধ্যে সব বাড়িগুলোর চেয়ে বড়। সকলকে ছাড়িয়ে সকলের ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে আপন আভিজাত্য নিয়ে।

হঠাৎ মনে হলো সতী হয়ত কলকাতায় নেই। হয়ত বর্মায় চলে গেছে বাবার কাছে। বিয়ের পর একবার তো বাবার কাছে যায় মেয়েরা। হয়ত সেখানেই গেছে। সেখানেই আছে। সতী যে-রকম বাবাকে ভালবাসে, বাবাকে ছেড়ে এতদিন থাকতে পারবে কেন? কলকাতায় থাকলে একদিন কি আর আসতো না ঈশ্বর গাংগুলী লেনের দিকে। সেই পুলিসে ধরে নিয়ে যাবার পর আর তো দেখা হয়নি দীপংকরের সংগে! মেয়েরা কি এত শিগ্গির সব ভুলে যায়! এত শিগ্গির সব ভুলে যেতে পারে। কিরণ তো ঠিকই বলেছিল সেদিন—ওদের জন্যে তুই এত ভাবিস দীপু, ওদের বিয়ে হয়ে যাবার পর দেখবি সবাই ভুলে যাবে তোকে!

সত্যি, সেই লক্ষ্মীদিই আজ তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে। যে

উপনিষদ

চিত্রিতা দেবী প্রণীত (লীলা পুরস্কারপ্রাপ্ত)

নূতন উপনিষৎ সংযোজিত

বহু প্রতীক্ষিত ২য় সংস্করণ

মূল্য—৫. টাকা

প্রাপ্তিস্থানঃ শ্রীশঙ্কর পাবলিশার্স

১৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ও অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

অম্লান সৌন্দর্যের উপচার...

পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম ও ফেস পাউডার

প্রথমে হালকা তুষারের মতো পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম মাখুন... যাতে আপনার মুখত্বকের কমনীয়তা রক্ষা পায়... মুখখানি কোমল, সুন্দর ও লাবণ্যে উজ্জ্বল থাকে... ছোটখাটো কাটা ও দাগ ঢাকা পড়ে। এই ক্রীম চটচটে নয়, কিন্তু এর ওপর পাউডার ধরে চমৎকার!

তার পর মাখুন পাতলা ক'রে পণ্ডস ফেস পাউডার যা রেশমী কোমল উজ্জ্বলতা নিয়ে আপনার মুখশ্রীর সঙ্গে মিশে থাকবে।

সব সময় উপরের এই সহজ নিয়মটি মেনে চলুন... তাহলে আপনাকে সারাক্ষণ সুন্দর দেখাবে... আপনার সৌন্দর্য মন কেড়ে নেবে!

সারা পৃথিবীর
সুন্দরী রমণীদের
মনের মতো

চীজব্রো-পণ্ডস ইন্‌ক্
(সীমাবদ্ধ দায়িত্বের সঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

JWTP. 72

লক্ষ্মীদিকে এত ভালবাসতো দীপংকর। সেই লক্ষ্মীদি! আর সতী! এখন সেই সতীর শ্বশুরবাড়ির সামনেই দীপংকরকে প্রার্থীর মতন ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়!

হঠাৎ দীপংকরের আবার মনে হলো—সে বড় একলা! তার কেউ নেই। তার লক্ষ্মীদি নেই, লক্ষ্মীদির সংগে তার যেটুকু সম্পর্ক ছিল, তাও তো লক্ষ্মীদি শেষ করে দিলে। সতীও নেই। কিরণও নেই। সকলের সবাই আছে, তারই শুধু কেউ নেই। এই শহর, এই কালীঘাটের সমস্ত লোকের সব কিছু আছে, দীপংকরই শুধু নিঃসংগ, দীপংকরই শুধু একলা। দীপংকরেরই যেন কোনও কাজ নেই সংসারে। আজ এর কাছে, কাল ওর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। ছিটেরও একটা নিজস্ব পৃথিবী আছে। ফোঁটারও আছে তার নিজস্ব জগৎ। সেখানকার জগতে ছিটে-ফোঁটা সম্রাট হয়ে আছে, দেবতা হয়ে আছে। তারাও সুখী! গাংগুলীবাবুর স্ত্রীও ভাল হয়ে গেছে। সে-ও সুখী। মেমসাহেবও তার ছবির অ্যালবাম আর প্রেমপত্র নিয়ে নিজস্ব জগতে বাস করছে। কিরণ? কিরণের কি কাজের অভাব আছে? কোথায় পৃথিবীর কোন্ কোণে নিজের কাজ করে চলেছে সে। শুধু দীপংকরই আজ পথে পথে নিঃসংগ হয়ে ঘুরছে।

কালিঘাটের বাজারের দিকটা দিয়ে না গিয়ে দীপংকর সোজা পথ ধরলো। গলি দিয়ে ঢুকে সোজা ঈশ্বর গাংগুলী লেনে পড়া যাবে। অন্ধকার গলিগুলো সব। সরু। দু'পাশের ঘেঁষা-ঘেঁষি বাড়িগুলোর ভেতরে গাদাগাদি হয়ে বাস করছে কত পরিবার। কোনও কোনও জানালায় তখনও আলো জ্বলছে। কোনও কোনও বাড়ি তখন অন্ধকার। ঘুমিয়ে পড়েছে ভেতরের মানুষরা। সকলের কাজ আছে, সকলের ঘুম আছে—শুধু দীপংকর যেন এই সংসারে প্রহর গুনতে এসেছে! মা হয়ত এতক্ষণ ভাবছে খুব। হয়ত না-খেয়ে বসে আছে দীপংকরের জন্যে! তার দীপু আজকে মাইনে পেয়েছে। মাইনে পেয়ে এত দেরি করা উচিত হয়নি। মাইনের দিনটায় দীপংকর বরাবর সকাল-সকাল বাড়ি ফিরে মা'র হাতে টাকাটা তুলে দেয়। মা টাকাগুলো গুনে নিয়ে মাথায় ঠেকায়। তারপর তার কাঠের বাক্সটার মধ্যে তুলে রাখে।

দীপংকর পা চালিয়ে চললো। মা'র কথাটা মনে পড়তেই পায়ের গতি যেন বেড়ে গেল।

নেপাল ভট্টাচার্যি স্ট্রীটের কাছেই নেপাল ভট্টাচার্যি লেন। কিরণদের বাড়িটার দিকে চাইতেই মনে হলো যেন বড় অন্ধকার। হয়ত কিরণের মা ঘুমিয়ে পড়েছে। কিরণের বাবা মারা যাবার পর আর যাওয়া হয়নি।

কী যে হলো। হঠাৎ নেপাল ভট্টাচার্যি লেনের ভেতরে ঢুকলো দীপংকর! কিরণ-দের বাড়ির সামনে গিয়ে দরজার কড়া নাড়তে লাগলো।

—মাসীমা!

আর একবার কড়া নাড়তে হলো। বেশি জোরে কড়া নাড়তে যেন সাহস হলো না দীপংকরের। অন্ধকারের মধ্যেই চারদিকে চেয়ে দেখলে একবার। কিরণদের বাড়ির আশে-পাশে সি-আই-ডি'রা এখনও ঘোরা-ফেরা করে। কোথায় থাকে কিরণ, কেউ জানে না। সারা বাঙলা দেশে, সারা কলকাতায় যেন আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে।

দীপংকর চারদিকে আর একবার চেয়ে দেখলে। কেউ কোথায় নেই। কিরণের বাবা মারা যাবার পর থেকে 'সি-আই-ডি'রা

আপনি কথাকলি নাচ দেখেছেন ?

কথাকলি নাচের মত টম নারিকেল তৈল নারিকেলবীথির দেশ কেরালার বিশিষ্ট সম্পদ।

বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরিশ্রুত এবং টিনে ও প্লাস্টিকের কৌটায় ভর্তি টম নারিকেল তৈল বিশুদ্ধতা ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য গ্যারান্টিযুক্ত।

½ পাঃ, ১ পাঃ ও ২ পাঃ ভ্যাকুয়ামযুক্ত টিনে সর্বত্র পাওয়া যায়।

ভাসু ব্রাদার্স
২৬, আমড়াতলা লেন, কলিকাতা—১

আরো বেশি করে চম লাগিয়েছে এখানে।

দীপঙ্কর চলে আসবে ভাবছিল। দরকার নেই। এই অন্ধকারে এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে তাকেও হয়ত অকারণ হয়রানি করবে তারা।

কিন্তু হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল।

অন্ধকারের মধ্যেই কিরণের মা'র চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

দীপঙ্কর বললে—আমি দীপু, মাসীমা—

—এসো বাবা, এসো।

দীপঙ্কর বললে — কেমন আছেন মাসীমা?

—তুমি ভেতরে এসো, বলছি!

অন্ধকার উঠোন। উঠোনের এক কোণে একটা কুমড়োশাকের মাচা। দাওয়ার ওপর যেখানটায় কিরণের বাবা বুকে বালিশ নিয়ে বসে থাকতো, সেখানটায় গিয়েই যেন দীপঙ্করের বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। মনে হলো কিরণের বাবা নেই বটে, কিন্তু সমস্ত বাড়িটার মধ্যে যেন তার অশরীরী ছায়া যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেন মুক্তি পেয়েছে এ-কথাটা বলতে এসেছে, কিন্তু বলতে পারছে না মুখ ফুটে।

—আমি আসতে পারিনি মাসীমা অফিসের নানান্ কাজে—আপনার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?

মাসীমা বললে—অসুবিধে হলেই বা কী করছি বলো বাবা! আমার মরণ হলেই বাঁচি—

মাসীমা দাঁড়িয়ে ছিল পাশে।

দীপঙ্কর বললে—অমন কথা বলছেন কেন মাসীমা,—

—কেন বলবো না বাবা, আমার কে আছে বলো, কার মুখ চেয়ে বাঁচবো?

—কেন? কিরণ তো রয়েছে! কিরণের মত ছেলে থাকতে আপনি এ-কথা বলছেন কেন মাসীমা। কিরণ তো আর চিরকাল এমনি করে বাড়ি ছেড়ে থাকবে না—

মাসীমা কিছু উত্তর দিলে না।

দীপঙ্কর পকেটে হাত দিয়ে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করলে। বললে—আপনি এই টাকাটা রাখুন মাসীমা, আজকে আমি মাইনে পেয়েছি, মাসে মাসে আমি পাঁচ টাকা করে দেব আপনাকে—

কিরণের মা টাকাটা নিলে হাতে করে। বললে—তোমার মাকে জিজ্ঞেস করেছ তো বাবা?

দীপঙ্কর বললে—এ আমার নিজের টাকা মাসীমা, আমি নিজে উপায় করেছি—

—তা হোক, তবু তোমার মাথার ওপরে মা তো আছে।

দপঙ্কর বললে—এখন আমি বড় হয়েছি, এখনও কি সব কাজ মা'কে জিজ্ঞেস করে করতে বলেন মাসীমা?

কিরণের মা সে-কথার উত্তর দিলে না। বলতে লাগলো—না বাবা ও-কথা বলো না। ছেলে যে কত কষ্ট করে মানুষ করতে হয় তা যারা মা হয়েছে তারাই জানে। সেই ছেলে বড় হয়ে মা'কে না দেখলে মা'র মনে যে কী কষ্ট হয়, তা অন্য লোকে কী করে বুঝবে! আর কাকেই বা বোঝাবো?

বলে মাসীমা আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে লাগলো।

দীপঙ্কর বললে—কিরণের মত ছেলে কি সব মা পায় মাসীমা? আপনি তো সৌভাগ্যবতী মাসীমা!

মাসীমা বললে—আমার মরণ হওয়াই ভাল বাবা, উপযুক্ত ছেলে থাকতে যাকে পরের কাছে হাত পাততে হয় তার মরণ হওয়াই ভাল—

—ছি মাসীমা, অমন কথা বলবেন না, ওতে কিরণের অমঙ্গল হবে!

মাসীমা আঁচলে চোখ মুছতে লাগলো আবার। দীপঙ্কর বললে—আজ আপনি কাঁদছেন মাসীমা, কিন্তু যখন স্বরাজ হবে তখন দেখবেন এই ছেলের জন্যেই আপনার গর্বে বুক ফুলে উঠবে আবার। স্বরাজ হলে তখন কিরণদেরই কত খাতির হবে দেখবেন। আজকের এই সুভাষ বোস, এই জে এম সেনগুপ্ত, বিধান রায় এরাই তখন তো দেশের লাটসাহেব হবে—

মাসীমা বললে—তা হয়ত হবে, কে জানে বাবা, কিন্তু গরীব-দুঃখীদের কষ্ট চিরকালই থাকবে—দেখো—

দীপঙ্কর বললে—না মাসীমা, আপনি জানেন না, এখন যারা স্বদেশী করছে, এখন যারা জেল খাটছে, দেখবেন তখন তাদের কত খাতির করবে। এই জে এম সেনগুপ্ত কি বিধান রায় যদি লাটসাহেব হয় তো দেখবেন আপনাদের কোনও দুঃখ থাকবে না তখন, কিরণদেরই খাতির তখন সকলের আগে—

মাসীমা সে-কালের মানুষ। কী বুঝলো মাসীমা কে জানে! হয়ত বিশ্বাস করলে, কিম্বা হয়ত বিশ্বাস করলে না। বিশ্বাস না-হবারই কথা। কে-ই বা তখন বিশ্বাস করতো! বিপিন পাল, যিনি 'স্বরাজ' কথাটা প্রথম প্রচলন করলেন—তিনিই কি বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন পুরোপুরি! আর কুমিল্লা জেলার বড় ইস্কুলের হেড্ মাস্টার শরৎকুমার বসু? তাঁর স্কুলের দুটি ছেলে একদিন লিফ্লেট বিলি করছিল। হেড্ মাস্টার তাদের নাম ধাম ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে জানিয়ে দিলেন। তারপর একদিন তিনি রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়েছেন, এমন সময় কে তাঁকে পিস্তলের গুলীতে মেরে ফেললে! আর সেই ময়মনসিং-এর ডি এস্ পি যতীন্দ্রমোহন ঘোষ? বাইরের ঘরে বসে নিজের ছোট ছেলেকে আদর করছেন, এমন সময় কোথা থেকে পাঁচটা ছেলে ঘরে ঢুকে পড়লো। ঢুকে পড়েই তাঁর বুকের ওপর গুলী। গুলীর পর গুলী! তারপর রংপুরে পুলিসের ডি আই জি রায়সাহেব নন্দকুমার বসু। স্বদেশী ছেলেদের ধরতে তাঁর ভারি উৎসাহ। হঠাৎ একদিন চারটে ছেলে তাঁর বাড়িতে ঢুকে পরে তাঁকে গুলী ছুঁ মারলো। শুধু কি তাই? একটার প একটা। সাব-ইনস্পেক্টর মধুসূদন ভট্টাচা মেডিক্যাল কলেজের সামনে দিয়ে চলেছে রাস্তায় অনেক ভিড়। হঠাৎ গুলী আওয়াজ। মধুসূদন ভট্টাচার্য রাস্ত ওপরেই ঢলে পড়লো। আর এর সুরেপ কি আজকে? সেই একদিন বড়লা লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে সার হার রিজনী বক্তৃতা দিলেন—

'বর্তমানে আমাদের এক ভীষণ ষড়য মুখোমুখি হতে হয়েছে। দেশের গভর্ন উচ্ছেদ করে ব্রিটিশ-শাসন অচল ক

মানুষ গড়ার কারিগর

দ্বিতীয় মুদ্রণ
৫·৫০ নঃ পঃ

বিশ্ববিশ্রুত দুইখানা ক্লাসিক বইয়ের সঙ্গে তুলনাঃ

'শিক্ষক' মাসিক-পত্রিকার সম্পাদকীয়—একদা নিগ্রো ক্রীতদাসদের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা ও নীচতার বিবরণ জনসমাজে প্রকাশ করিয়া **Uncle Tom's Cabin**-এর স্বনামধন্যা রচয়িত্রী নিগ্রোজাতির অশেষ উপকার সাধন করিয়াছিলেন। আমরা আশা করি, এই পুস্তকের রচয়িতা ভূতপূর্ব শিক্ষক মনোজ বসুও তাঁহার এক কালের সহকর্মীদের শোচনীয় অবস্থার প্রতি দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ইহার অবসান ত্বরান্বিত করিতে সমর্থ হইবেন...(অধ্যাপক মহীতোষ রায় চৌধুরী)

আনন্দবাজার পত্রিকা—বইখানিকে শিক্ষকদর্পণ বলা যেতে পারে—নীলদর্পণ যেমন নীলকর ও নীলের উৎপাদকদের দর্পণ...(কবিশেখর কালিদাস রায়)

বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রা) লিমিটেড ঃ কলিকাতা-১২

জন্য দেশব্যাপী যুদ্ধ চালানোই এদের উদ্দেশ্য। এদের সংঘশক্তি যেমন কার্যকরী, তেমনি ব্যাপক। সংখ্যায়ও এরা অনেক। নেতারা গোপনে কাজ করে, আর শিষ্যরা অন্ধভাবে তাদের অনুসরণ করে। রাজনৈতিক মার্ডার এদের আন্দোলনের উপায়। মার্টসিনির পথই এদের পথ। এরা দুবার সার এন্ড্রু ফ্রেজারের ট্রেন উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। একবার সকলের সামনে তাকে গুলী করবার চেষ্টাও করেছে। মিস্টার কিংসফোর্ডকে খুন করবার চেষ্টা করেছে দু'বার। তাকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া বোমার ঘায়ে দু'জন ইংরেজ মহিলা প্রাণ হারিয়েছে। ইনস্পেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জি, আলিপুরের পাবলিক প্রসিকিউটর আশুতোষ বিশ্বাস, সার উইলিয়ম কার্জন-উইলি, মিস্টার জ্যাকসন, আর এই সেদিন ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট শামসুল আলম্ এই ক'জনকে বেপরোয়াভাবে খুন করা হয়েছে। তিনজন ইনফরমারের মধ্যে দু'জনকে গুলী করে মেরেছে। আর একজনকে ধরতে না-পেরে তার ভাইকে তার মা আর বোনের চোখের সামনে খুন করেছে এরা। ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট অ্যালেনকেও এরা রেহাই দেয়নি। ভাইসরয়কে লক্ষ্য করে দুটো পিক্রিক্ এসিড্ বোমা ছোঁড়া হয়েছিল—কিন্তু বোমা ফাটেনি বলে তিনি কোনও-রকমে বেঁচে গেছেন। এই সব ঘটনা কয়েকটা খবরের কাগজের প্রচারের ফল। বিদ্রোহের জমি তারাই তৈরী করে দিয়েছে।'

কত দিনকার আগেকার সব ঘটনা। যখন কিরণের সঙ্গে দিনরাত মিশতো, তখনকার দিনের কথা সব। কিরণ বলতো সব গল্পগুলো। আজ সেই কিরণদের বাড়িতে কিরণের বিধবা মাকে দেখে সেই কথাগুলোই মনে পড়তে লাগলো।

দীপঙ্কর বললে—আপনি কেবল নিজের কথাই ভাবছেন মাসীমা, কিন্তু ভাবুন তো সুভাষ বোসের কথা—

মাসীমা বললেন—তাঁদের কথা ছেড়ে দাও বাবা, স্বরাজ হলে যদি কিছু হয় তো তাঁদেরই হবে, তাঁরাই বড় বড় চাকরি পাবে, তখন আমার গরীব ছেলের কথা কে আর ভাববে বলো?

—ভাববে মাসীমা ভাববে। আমি বলছি ভাববে। তখন এই দিশী-লোকরাই তো রাজ্য চালাবে, দিশী লোকেরা তো আর সাহেবদের মত এমন নেমকহারামি করবে না—

- কে জানে বাবা! আমার যা কপাল, তাতে কিছুই বিশ্বাস করতে ভরসা হয় না যে!

খানিক পরেই দীপঙ্কর উঠলো। মাসীমা বললে—তোমার মা হয়ত ভাবছে, তুমি মিছিমিছি এখানে দেরি করলে এতক্ষণ!

দীপঙ্কর বললে—আমি আসবো মাসীমা মাঝে মাঝে—আপনি দরকার হলেই আমাকে ডেকে পাঠাবেন—

মাসীমা বললে—দরকার তো হয়ই মাঝে মাঝে,—

—কিন্তু আমাকে ডাকেন না কেন? টাকার দরকার হলে আমাকে বলবেন, লজ্জা করবেন না যেন!

—টাকার কথা নয় বাবা! কত রকম যে লোক আসে, কত সব কথা জিজ্ঞেস করে! কিরণ বাড়িতে আসে কি না, কিরণ কোনও চিঠি দেয় কি না—এই সব। আমার বড় ভয় করে বাবা—

তারপর হঠাৎ থেমে বললে—আজকে আবার আর এক কান্ড হয়েছে—এই দেখাচ্ছি তোমাকে—

বলে কিরণের মা ঘরের ভেতর থেকে একটা প্যাকেট নিয়ে এল। দীপঙ্করের হাতে দিয়ে বললে—এই দেখ, একজন লোক এসে আজ আবার এইটে রেখে গেছে, বলেছে কিরণ এলে তাকে দিতে—

প্যাকেটের দড়িটা খুলে দীপঙ্কর দেখলে। কয়েকটা বই। মোটা-মোটা ইংরিজী বই সব। বোমা বারুদ গুলী তৈরি করবার বই। একখানা বই—অরবিন্দর 'ভবানী মন্দির'। আর একখানা—বারীন ঘোষের 'মুক্তি কোন্ পথে'। সঙ্গে একগাদা ছাপানো কাগজ—হ্যান্ডবিল্। নিচে লেখা রয়েছে 'স্বাধীন ভারত সিরিজ'।

দীপঙ্কর হ্যারিকেনের আলোর কাছে এসে হ্যান্ডবিলটা পড়তে লাগলো।

"জার আমাদের বলে থাকেন—ঈশ্বরই আমাকে রাশিয়ার সম্রাট করে পাঠিয়েছেন। তোমরা আমার সিংহাসনকে ঈশ্বরের সিংহাসন মনে করে প্রণাম করবে। আমাকে বিরক্ত করতে তোমরা আমার কাছে এসো না। আমি সব সময়েই তোমাদের কথা ভাবি।

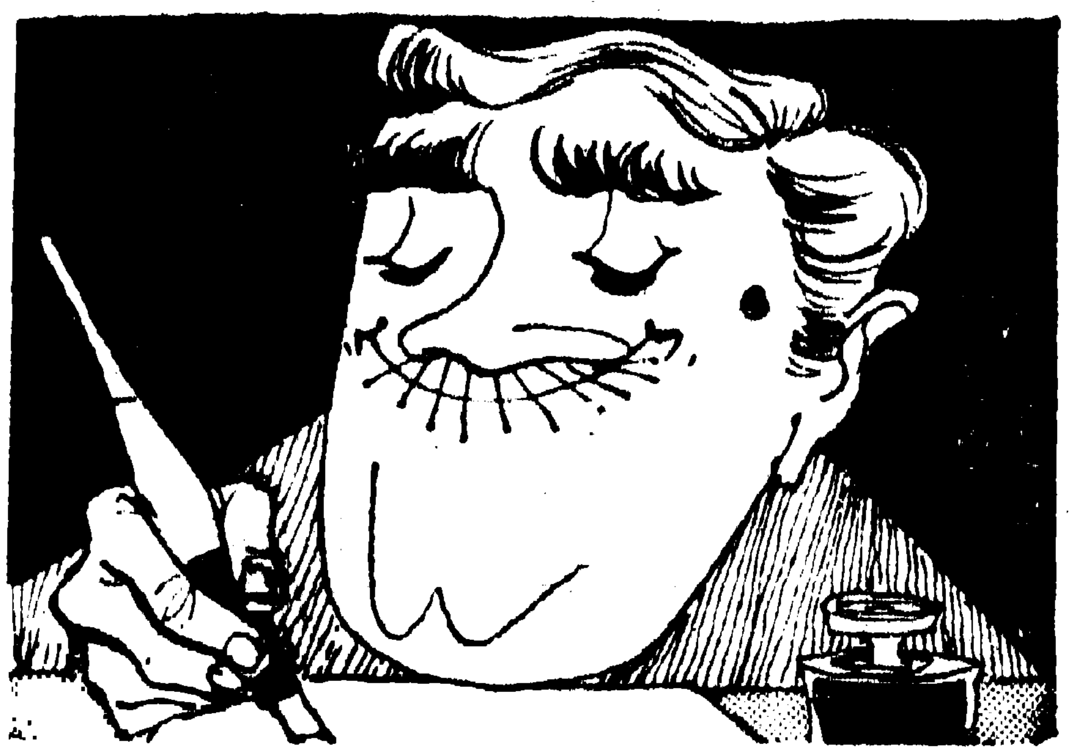

চোখের ক্ষতি ক'রে নয় ...

লিখিয়ে হোন আর না-ই হোন, রাত্তিরেও হয়তো আপনাকে কলম ধরতে হয়। আর, কম আলোয় লিখতে যাওয়া মানেই চোখের অপূরণীয় ক্ষতি করা। তাই ফিলিপস্ আর্জেন্টা বাল্‌ব লাগিয়ে নিন।

স্বচ্ছন্দ আরামে কলম চালান

আর্জেন্টার উজ্জ্বল অথচ আরামদায়ক আলোতে স্বচ্ছন্দে লিখে যেতে পারবেন—চোখের ক্ষতি হবে না। আপনি নিজেই বলবেন, ফিলিপস্ আর্জেন্টার আলোয় কলম চালাতে কত আরাম!

PHILIPS

৪০, ৬০, ৭৫, ১০০ ও ১৫০ ওয়াট্‌স-এর পাওয়া যায়

ফিলিপস্ আর্জেন্টা

উজ্জ্বল আলো, চোখে লাগে না

ফিলিপস্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

আমার কোনও পরামর্শের দরকার নেই—কারণ ঈশ্বর আমাকে পূর্ণ জ্ঞান দিয়েছেন। আমি তোমাদের মধ্যে রয়েছি, এতেই তোমাদের গর্ববোধ করা উচিত—এবং আমার ইচ্ছাকেই আইন বলে মেনে নেওয়া উচিত।"

আমরা জারের এই কথা বিশ্বাস করেছি। তিনি যা বলেছেন তাই-ই মেনে নিয়েছি। কিন্তু তার ফল কী হয়েছে? অফিসের ফাইলের পাহাড় গরীবদের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিচ্ছে। সরকারী কর্মচারীরা সামনে মন্ত্রীদের আর সেক্রেটারিদের পায়ের ধুলো নেয়, আর পেছনে নির্বিকারভাবে চুরি করে। চুরির প্রাধান্য এত বেড়েছে যে, যে যতবড় চোর সে তত বড় সম্মানিত লোক। অফিসে চাকরি-প্রার্থীদের যোগ্যতা বিচারের কোনও বালাই নেই। আস্তাবলের সহিস হয়েছে প্রেস-সেন্সর। সম্রাটের চাটুকার এক অপদার্থ হয়েছে আড্মিরাল। আর আমরা রাশিয়ানরা কী করছি? আমরা পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছি। বুকফাটা কান্নায় চাষী তার জমাবন্দির আদায়ের টাকা দাখিল করছে। যার সম্পত্তি আছে, সে তা বন্ধক দিচ্ছে। লোকে সরকারী কর্মচারীদের ঘুষের দাবি মেটাচ্ছে বাধ্য হয়ে। সম্রাটের প্রমোদ ভ্রমণের জন্যে লাখ লাখ টাকা নষ্ট হতে দেখছি কিন্তু তার পরেই নিশ্চিন্তে তাস খেলছি, সিনেমার স্টার কিম্বা গানের আসরের গায়িকাদের সুরের সমালোচনা করছি, শয়তানদের সামনে মাথা নিচু করছি আর যে-সব কাজের নিন্দেয় পঞ্চমুখ হচ্ছি সেই কাজই নিজেরা করবার জন্যে কাড়াকাড়ি শুরু করে দিয়েছি। এরই মধ্যে যখন কেউ মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, দেশের জন্যে সংগ্রাম করতে আরম্ভ করে, আমরা বলি—লোকটা কী আহাম্মক!

এত সবের মধ্যেও আমাদের একটা সান্ত্বনা ছিল যে বিশ্বের দরবারে রাশিয়া শক্তিশালী দেশ বলে পরিগণিত। ইংরেজরা যখন ফ্রান্সের ষড়যন্ত্রকারী সম্রাট এবং বিশ্বাসঘাতক অস্ট্রিয়ার সাহায্যে পশ্চিম ইওরোপকে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিল তখনও আমরা হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। বলেছি—জার আমাদের দেশ রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন—আমাদের পরোয়া কিসের? নির্ভীক চিত্তে আমরা যুদ্ধে গিয়েছি। কিন্তু রাশিয়ার দর্প চূর্ণ করে আমাদের সে-যুদ্ধে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। হাজারে হাজারে আমরা প্রাণ দিয়েছি।

হে জার, রাশিয়ার লোক তোমাকে পূর্ণ ক্ষমতা দিয়েছিল, পৃথিবীতে ঈশ্বর বলে তোমাকে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু, তুমি কী করেছ? সত্যকে তুমি খুন করেছ। রাশিয়া জাগো, মঙ্গল খাঁ'র উত্তরাধিকারীদের দাসত্ব বহুদিন করেছ। আজ অত্যাচারী শাসকের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াও। জাতির এই দুর্দশার জন্যে তার কাছে কৈফিয়ত দাবি কর। দৃঢ়কণ্ঠে শুনিয়ে দাও সম্রাটের সিংহাসন ঈশ্বরের সিংহাসন নয়। আমরা চিরকাল দাসের জীবন যাপন করবো, তা ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয়—ইতি—

নিহিলিস্ট পার্টি—রাশিয়া।"

পড়তে পড়তে দীপংকর অনেকক্ষণ ভাবতে লাগলো। খানিক পরে বললে—এ-সব আপনাকে কে দিয়ে গেল? তাকে আপনি চেনেন?

মাসীমা বললে—না বাবা, আমি চিনি না, কখনও দেখিনি তাকে। তারা বললে কিরণ এলে তাকে দিতে!

দীপংকর বললে—আমাকে দেখিয়েছেন, ভালো করেছেন মাসীমা—এ সি-আই-ডি'দের কাজ—একটা দেশলাই আছে?

না কখনই নয়!

কিন্তু তাহলেও এক মাথা ভর্তি পাকা চুল মানুষকে লোকের কাছে 'অপ্রিয়' করে আর তার জীবনে ব্যর্থতা এনে দিয়ে তাকে অতিষ্ঠ করে তোলে।

কিন্তু আজকের পৃথিবীতে যেখানে বিজ্ঞান বহু বিস্ময়কর পরিবর্তন এনেছে সেখানে পাকা চুলের জন্যে কারুর উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়, কারণ 'লোমা' একটি আদর্শ কেশ তৈল ও কালো কেশ-রঞ্জক যা নিরাপদে ও খুব দ্রুত আপনার চুলের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনে। লোমার সুমিষ্ট গন্ধ লক্ষ লক্ষ লোকে ভালবাসে, সেইজন্যেই এটি অন্যান্য আরো কালো কেশ রঞ্জকের পাশাপাশিই চলছে।

লোমা

মেখে চুল আঁচড়ান
আপনার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্যে

একমাত্র এজেন্ট: এম.এম. খাম্বাটওয়ালা
আমেদাবাদ-১, ইণ্ডিয়া
এজেন্ট: সি. নরোত্তম এ্যাণ্ড কোং
বোম্বাই-২

এজেন্ট : মেসার্স শা বাডিলাল এণ্ড কোং, ১২৯, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

মাসীমা ঘর থেকে একটা দেশলাই এনে দিলে। বললে—কী করবে বাবা দেশলাই দিয়ে?

—পর্নড়িয়ে ফেলবো। কিরণকে বিপদে ফেলবার জন্যেই এই কাণ্ড করেছে ওরা—

বলে ফস্ করে আগন্ন জ্বালিয়ে দিলে সমস্ত কাগজগন্লোতে। কিরণদের সেই উঠোনের মধ্যে সমস্ত বই কাগজ-পত্র দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠলো। মা'র কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে দীপঙ্কর—স্বদেশী করবে না জীবনে। তব্ন যেন কিরণকে বাঁচাতে গিয়ে এট্নকু করলে কোনও অপরাধ নেই। অন্ধকার উঠোনের মধ্যে আগন্নের শিখা-গন্লো লক্ লক্ করে উঠছে। দীপঙ্কর চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। তারপর এক সময়ে আগন্নটা নিভে এল। কাগজগন্লো গন্-গনে লাল হতে হতে ক্রমে কুচকুচে কালো হয়ে গেল। তারপর শন্ধন ধোঁয়া।

দীপঙ্করের হঠাৎ মনে হলো বাইরে যেন কার পায়ের শব্দ হলো।

—কে?

চম্কে উঠেছে দীপঙ্কর। কে ওখানে?

তাড়াতাড়ি উঠোনের দরজাটা খনলে বাইরে এসে কাউকে দেখা গেল না কোথাও। এধার-ওধার সব দিকে দেখলে দীপঙ্কর। তারপর বললে—মাসীমা, আপনি দরজা বন্ধ করে দিন, সাবধানে থাকবেন, আমি যাচ্ছি।

মাসীমা বললে—কে বাবা! কাকে দেখলে!

দীপঙ্কর বললে—না, ও কেউ না। আমি যাচ্ছি—

মাসীমা দরজা বন্ধ করে দিলে। আশ্চর্য, কিরণ বাড়ি আসে না, তব্ন তারও পেছনে ঘোরাঘন্রি করছে পন্লিসের লোক। তাকে জড়িয়ে ফেলবার জন্যে নিষিদ্ধ কাগজ-পত্র রেখে গেছে। রায় বাহাদন্র নলিনী মজন্ম-দারের লোক এখনও তার পেছনে ঘন্রে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু ঈশ্বর গাঙ্গন্লী লেনের কাছে আসতেই একটা শোরগোল কানে এল দীপঙ্করের। ঠিক যেন তাদের বাড়ির ভেতর থেকেই আসছে। এখন এত রাত্রে কী হলো আবার! তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বাড়ির সামনে আসতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ছিটে!

ছিটের সঙ্গে একেবারে মন্খোমন্খি দেখা হয়ে গেল।

ছিটে ভেতর থেকে দৌড়তে দৌড়তে আসছিল। সামনে দীপঙ্করকে দেখেই থমকে গেল।

বললে—এই যে দীপন্, শালা শন্য়ার-কা-বাচ্চার কাণ্ডটা দেখেছিস্?

ছিটের মন্র্তির দিকে চেয়ে দীপঙ্কর ভয় পেয়ে গেল। ঘেমে নেয়ে উঠেছে। দর দর করে ঘাম ঝরছে সারা শরীরে। হাতে একটা লাঠি। চুলগন্লো এলোমেলো। যেন মারমন্খো হয়ে কোথাও যাচ্ছে। কার সঙ্গে মারামারি লাগিয়েছে এখন?

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে?

ছিটে বললে—আমি ভালোমান্নষ আছি তো আছি, আমি চাকর হয়ে তোমার পা চাটবো, কিন্তু রাগলে আমি কারোর নই! শালা শন্য়ার-কি-বাচ্চা, হারামজাদ্-কি-ভেড়ন্য়া, আমার মেয়েমান্নষের গায়ে হাত তোলা? আমার গায়ে হাত তুললে আমি কিচ্ছন্ বলবো না, কিন্তু আমার মেয়েমান্নষের গায়ে হাত? এত বড় আস্পর্দা শালার। শালা জানে না আমি কে?

দীপঙ্কর কিছন্ই বন্ঝতে পারছিল না তখনও। বললে—কী হয়েছে বলো না? হয়েছে কী?

ভেতর থেকে হঠাৎ আর্তনাদ উঠলো। মেয়েমান্নষের গলার আওয়াজ। যেন ভীষণ ঝগড়া চলছে ভেতরে। যেন কে কাকে মেরেছে। অনেক মেয়েমান্নষের গলার আওয়াজ একসঙ্গে কানে এল। বাড়িতে এত মেয়েমান্নষ কোথা থেকে ঢনকে পড়লো!

ছিটে আর দাঁড়াল না। লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে পাগলের মতন আবার বাড়ির ভেতরে ঢনকে পড়লো।

—তোর বাবার খাই আমি শালা? তোর বাবার পরি? শালা আমার মেয়েমান্নষের ইজ্জত নষ্ট করবি তুই? বেরিয়ে আয়, বেরিয়ে আয় শালা, দেখি তোর ক'টা মন্ণ্ডন!

দীপঙ্করও সঙ্গে সঙ্গে ঢনকে পড়লো। চন্ন্নীর ঘরের সামনে আরো দন'জন মেয়ে-মান্নষ! তারাও চিৎকার করছে গলা ছেড়ে। এরা কারা! এরাই কি লক্ষ্মী আর লোটন! বেশ সাজা-গোজা চেহারা। একজনকে তো সেদিন দেখেছিল কালিঘাট বাজারের পেছনের বস্তিতে! লোটন।

ছিটেকে দেখে ফোঁটা বেরিয়ে এল। তারও হাতে একটা চ্যালা কাঠ! বলছে—আয় চলে আয়, বাপের ব্যাটা হোস্ তো সামনা-সামনি লড়ে যাবি—চলে আয়—

ছিটে—বলা নেই কওয়া নেই—হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লো ফোঁটার ওপর। আর একট্ন হলেই একটা রক্তারক্তি কাণ্ড বাধতো। কিন্তু দীপঙ্কর দৌড়ে সামনে গিয়ে দন'জনের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। বললে—করছো কী তোমরা, মারামারি করবে নাকি?

কিন্তু কথা শেষ হবার আগেই ফোঁটার চ্যালা-কাঠটা সোজা একেবারে দীপঙ্করের মাথার ওপর এসে পড়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণায় দীপঙ্করের মাথাটা যেন ফেটে চৌচির হয়ে গেল। মনে হলো যেন অনেক-গন্লো মান্নষের আর্ত চিৎকার কানে এল। আর তারপর সে-আওয়াজও যেন আর শোনা গেল না। যেন মা দৌড়ে কাছে এল। যেন অঘোরদাদন্র গলাও শোনা গেল একট্ন। মন্খপোড়া বলে যেন কাকে গালাগালি দিচ্ছে। তারপর.....

(ক্রমশঃ)

Gov... Cooch Behar

পায়ে পায়ে

দেবেশ রায়

তখন রাত্রি শেষ হয়নি। আমি দরজা খুলে বাইরে এলাম। সারারাত ঘুমিয়ে থাকার পর হঠাৎ চোখ খুলে তাকানোর জন্য আমার আচ্ছন্ন, অস্পষ্ট ও ঘোলাটে দৃষ্টির মতোই বাইরের গাছ-গাছালি, পাহাড়-আকাশ। এদের কোনোটিকেই দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু, আমার জন্মের পর থেকে এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল এই দৃশ্যগুলোই আমি দেখেছি, এরাই আমার চোখের সম্মুখের একমাত্র দৃশ্য, তাই আমি বুঝতে পারছিলাম কোন্‌টা আকাশ, পাহাড় বা গাছ। কিন্তু দূরের দৃশ্য আমার কাছে এদের একটা জটলা বলে মনে হচ্ছিল। আমি জানি, শুনেছি, ঐ-সব পাহাড়ে ঝরনা আছে—দেখতে পাচ্ছিলাম না।

কেমন ভয়-ভয় করছিল। তখনো দিন শুরু হয়নি। আমার ঘরের দরজা যে-অর্ধেক খুলে বেরিয়ে এসেছিলাম, ততোটুকুই খোলা। দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতর তাকালাম—ঘরের ভেতর আলো যায়নি, ছায়ার মতো আমার মশারি দেখা যাচ্ছে, অসহায়ের মতো ঝুলছে। ঘরের ভেতর যেন কেউ আছে। কিংবা এই বারান্দায়। অথবা সম্মুখে, আমার দৃষ্টির সীমার ভেতরেই, তাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না, অথবা সে আমাকে দেখা দিচ্ছে না। অথবা এ হয়তো আমার মনের ভুল, মনের অভ্যাস, যেহেতু আমি এ-অবধি আমাকে এমন কোনো অবস্থায় দেখিনি, যখন চারপাশে মানুষ নেই। আমার মনে হচ্ছিল মানুষ আছে, আমি তাদের দেখতে পাচ্ছি না।

শরতকালের মেঘের মতো, শিরিষ-ফুলের মতো, খুব পাতলা একটা চাদর, আমাকে জড়িয়ে, খুলে, চলে গেল। খুলে যাওয়ার পর আমার মনে হলো, কিছুই আমাকে জড়িয়ে ধরেনি। চোখের কোণায় আঙুল ছোঁয়ালাম, ভেজা, স্বপ্নে কাঁদার পর জেগে, চোখের জল অনুভব করে যেমন বোঝা যায় কাঁদছিলাম, তেমনি বুঝলাম, কেউ আমাকে কাঁদিয়ে গেল। নূপুরের শব্দ পেলাম—শব্দ নয়, প্রতিধ্বনি—মিলিয়ে যাবার পরে আমার বোধে এলো। একটা কুকুর বীভৎসভাবে একটানা ডাকলো। একটা বাতাস এসে আমাকে ধাক্কা দিয়ে পেছনের দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে গেল। যদি হাওয়াটা জানতো, আমি ভাবলাম, আমার দরজাটা আধ খোলা, তবে ঘরের ভেতর যেতে পারতো, মশারির পর্দাগুলোকে খাঁচায় বন্দী পাখির মতো সাপটে দিত, আমার সারারাতের শয্যাকে আলুথালু করে দিত।

ঠিক বিকেল বেলা নদীতে, মাঝ-নদীতে, ভাটিয়ালি সুরটা গুন্ গুন্ করার আগে, ঠিক আগে, মাঝির বুক থেকে গলা পর্যন্ত যেমন বৈরাগী আকাঙ্ক্ষায় ভরে যায়, তেমনি কোনো আকাঙ্ক্ষা সুর হয়ে আমার কানে এসে বাজলো। আমার ঠিক পেছনের ঘরে মা ঘুমুচ্ছে—মায়ের নিশ্বাসের ধ্বনি। মা যদি জানতো, আমি বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি এবং আর ঘরে যাবো না, বাইরে এসে আমার চোখের সামনে তার আঁচল মেলে ধরতো, যাতে আমি বাইরের কিছু দেখতে না পাই (মা বহু-ধাবনে বিবর্ণ নীল আঁচল মেলে ধরতো, 'এই তো আকাশ'; মা বহু-ক্ষরিত শুষ্ক স্তন দেখিয়ে বলতো—'এই তো অমৃত'; মা আঁচল-মেলে-ধরা-হেতু পাখির ডানাসদৃশ দুই বিস্তারিত হাত দেখিয়ে বলতো—'এই তো আশ্রয়')। সে বলেছিল—'তাতে কিছু হয় না।' সে বললো—'তাতে কিছু হয় না।'

আমি তারা মনে করেছিলাম, ধ্রুবতারা—সব তারাকেই আমি ধ্রুবতারা বলে জানি, ধ্রুবতারা আমি চিনি না—পরে বুঝলাম, সম্মুখের বহুদূরের কোনো পাহাড়ের মাথার আলো। আরো বুঝলাম, আমি দু-একটা মেঘকেও পাহাড় বলে ভেবে ফেলেছি। দু-একটা পাহাড়ের মাথা দেখা যাচ্ছিল না, মেঘে ভরা। আমি এতোক্ষণ পাহাড়ের মাথায় যাবো ভেবে মেঘের মাথায় যাবার কথা ভাবছিলাম।

মায়ের নিশ্বাসের শব্দ শুনে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। সেই নিশ্বাস আমি যেন দেখতে পাচ্ছিলাম। এখানে, সব সময়ই

ধোঁয়ার মতো নিশ্বাস বেরোয়। নিশ্বাস দেখা যায়। মায়ের নিশ্বাসের শব্দ যেন আমার চোখের সম্মুখে, মা জাগ্রত থাকলে যে-পর্দা টাঙাতেন, সেই পর্দা রচনা করছিল। আমি মনে-প্রাণে চাইছিলাম পর্দাটা অন্ধকারের মতো নিরেট হোক, শক্ত হোক, ঘন হোক, যাতে আমি কিছুই দেখতে না পাই। 'তা হয় না'—সে বলেছিল। 'তা হয় না'—সে বললো।

মায়ের নিশ্বাসের শব্দ শুনে আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল, ভীষণ, ভাটিয়ালি সুর বিকেলে শুনলে যেমন কষ্ট হয়। আমি নদীর মাঝে, মা তীরে; নাকি মা নদীর মাঝে, আমি তীরে। নাকি, মা আর আমি দুজনেই নদীর মাঝে। ভিন্ন তরীতে।

আমি একদিকে তাকিয়ে ছিলাম, এক-দৃষ্টিতে। কিছু দেখছিলাম না হঠাৎ দেখলাম, আমার চোখের সামনে নীল—নীল—নীল; আকাশকে সমুদ্রের জলে ধুয়ে, আরো একটু পাতলা করে, যেন কেউ চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে—মেলে দিচ্ছে, যেন চারদিকের সব—পাড়, মেঘ, মাটি, গাছ, আকাশ হয়ে যাবে, এক্ষুনি। কে এমন করলো? তাকে নমস্কার করলাম। মা বলেছিলেন—'ঈশ্বর, আকাশ, মাটি, বাতাস, সূর্য, মানুষ, গাছ, পাহাড় সব, সব সৃষ্টি করেছেন।' আমি বলেছিলাম 'মা, আমি ঈশ্বর হবো।' সেই নীল আবার ঘন হয়ে গেল—মাঝরাতের ঘুমের মতো। 'হাঁ, এসো, এসো, তুমি ঈশ্বর হবে'—সে বললো।

সেই এক কি দু মুহূর্তের জন্য আমি মায়ের কথা, আমার কথা সব ভুলে গিয়েছি, নাকি কেউ ভুলিয়ে দিল। আর ঠিক সেই একটি কি দুটি বিস্মৃত মুহূর্তের মাপে সমস্ত শক্তি সংহত করে শয়তানের নিশ্বাসের মতো এক হাওয়া এসে সমস্ত কিছু ওলোট পালোট করে দিল, আমার ঘরের আধ-খোলা দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল, মায়ের নিশ্বাসের শব্দ উড়ে গেল কোথায়, কোন্ পাতাল থেকে আলোর মতো গতিতে কুয়াশা উঠে এলো, দেয়াল রচলো আমাকে ঘিরে, আমি শুধু নিজেকে দেখতে গেলাম, শুধু নিজেকে। আর আমার সম্মুখে বহুদূরে, বহুদূরে, দিগন্ত ছাড়িয়ে, সমুদ্রের ওপারের চাইতেও দূরে, সেই নীল আকাশ তখন আবার স্বপ্নের মতো পাতলা হয়ে যাচ্ছিল। কুয়াশার দেয়াল তখন দুদিকে, আমার ডাইনে-বাঁয়ে, আর দীর্ঘ হয়ে—হয়ে—হয়ে সেই সুড়ঙ্গের মতো দেয়াল শেষে হয়েছে যেখানে, সেখানে সেই আকাশ। এক সীমায় আমি, আর-এক সীমায় সে, সেই আকাশ। শয়তানের নিশ্বাসের মতন দমকা, ঝোড়ো ঠান্ডা হাওয়া সব কিছু তছনছ করে দিল, আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে বেঁধে একটা হ্যাঁচকা টানে বারান্দা থেকে পথে এনে ফেললো, আর ক্রুদ্ধ জানোয়ারের মতো গুঁতোতে গুঁতোতে আমাকে ঠেলে নিয়ে চললো। আমি আছড়ে পড়লাম পথে, আমার মাথা ঠোঁট করতল কেটে গেল, কিন্তু যতোবার আমি পড়ে যাই, আমাকে আবার অদৃশ্য পায়ে দাঁড়াতে হয়, আর এতো ছেঁড়া-খোঁড়া সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো গর্জন-মুখর বাতাসের মধ্যেও, সব ঢেকে-দেয়া কুয়াশার মধ্যেও সেই বহুদূরবর্তী নীল আকাশ স্থির। আমার মায়ের গলার ফুলের মালার মতো সে আকাশ, রূপকথার সেই মালা, যার মাঝখানে একটি নীলকমল, ঈশ্বরের সৃষ্টি, কিন্তু ঐ নীলকমল যেন দুলছে শয়তানের বুকে। 'মা।' মা নেই। 'মা।' মা নেই। আর যতোবার 'মা' বলে ডাকি, সেই ক্রুদ্ধ জানোয়ার গোঁ-গোঁ শব্দে আমাকে প্রচণ্ড আঘাত দেয়, আমি মুখ থুবড়ে পড়ি আর কেঁদে আকাশ ফাটিয়ে দিতে চাই—'আমি ঈশ্বর হবো না', সে বলে, 'তা হয় না।'

'তুমি কি ঈশ্বরের পিতা?'

'না, তুমি, তুমি-ই ঈশ্বর।'

'আমি ঈশ্বর হবো না।'

আবার আঘাত। 'মা।' আবার আঘাত। 'মা।' আবার আঘাত। মা বলে ডেকে যে-প্রশ্নটা আমি করতে যাচ্ছিলাম, ততোক্ষণ তা আমার গলার কাছে এসে গেছে। 'মা।' আবার আঘাত। মনে হলো আমার মেরুদণ্ড বুঝি ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। আবার দাঁড়ালাম, মা বলে ডাকার সময় হলো না, তার আগেই প্রশ্নটি আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে—'ঈশ্বরের সৃষ্টি নীলকমল শয়তানের গলায়?' আমি জানতাম না শয়তান কে। কিন্তু আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, আমাকে আমার ঘুম থেকে উঠিয়ে, ক্ষতবিক্ষত করে আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে সুখ থেকে, স্বস্তি থেকে—সে শয়তান না হয়ে যায় না।

আমার প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই কে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিল। থরথর করে আমার পা কাঁপছে, থরথর করে আমার নিশ্বাস কাঁপছে। ঘুম থেকে জেগে বাইরে আসবার পর থেকে আমার আশেপাশে তার অস্তিত্ব অনুভব করছিলাম—সে বিশাল, গাঢ়, নিবিড় ও পুঞ্জীভূত। সে-ই আমাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল—আমার গায়ে অনুভূত বাতাস থেকে বুঝলাম। আমি তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না, স্পষ্ট বোঝা গেল সে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে, সম্মুখে চলা শুরু করলো। তার দুই হাত দুই দিকে বিস্তৃত, পাহাড়ের মতো সে উঁচু, পাঁজা পাঁজা মেঘের মতো তার পিঠের দুদিকের মাস, কালো নদীর ঢেউয়ের মতো তার পেছন, শালগাছের মতো তার দুই উরু, ধিকি-ধিকি আগুনের পথে তার পায়ের বাটির মাংস ধিকধিক করছে গতির বেগে। আর তার কটিদেশ যেন বাঁশী মুগ্ধ সাপের কোমর, হেলে-দোলে, ভাঙে না; তার পিঠের দু-তাল মাংসের মাঝখানে মেরুদণ্ডের গভীর কৃশ খাল, গাঁয়ের বুক-কাটা খালের মতো ছলছলে। আমি তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু উন্মাদ ঝড় আর কুয়াশার মাঝখানে আমার সম্মুখবর্তী শূন্যতা ভরে সে দাঁড়িয়েছিল—এ-আমি শূন্যতার আকার দেখে বুঝলাম। আমার মনে সেই পাহাড়ের মতো উঁচু মানুষটার পেছনে দাঁড়িয়ে আবেগ এলো। সে যেন এই আবেগের অপেক্ষাতেই ছিল। আমার মনে আবেগ আসতেই সে ঝুঁটি-ধরে বাতাসকে থামিয়ে দিল, তারপর বিশাল-বিশাল পায়ে সে দুহাতে কুয়াশা সরিয়ে, আগাছা সরিয়ে, চলে গেল। মাটি কাঁপছিল তার পায়ের ভারে। তবু আমি জানতাম সে হাসতো, সতীর মৃতদেহ কাঁধে প্রলয় নাচনকালে শিবের হাসির মতো। আর আমি জানতাম, সিংহদ্বারের মতো তার দুই বুকের মাঝখানে নীলকমলের মালা, সে-মালা দোলাতে দোলাতে, দুহাতে কুয়াশা সরাতে-সরাতে সে চলে গেল বহুদূরবর্তী সেই

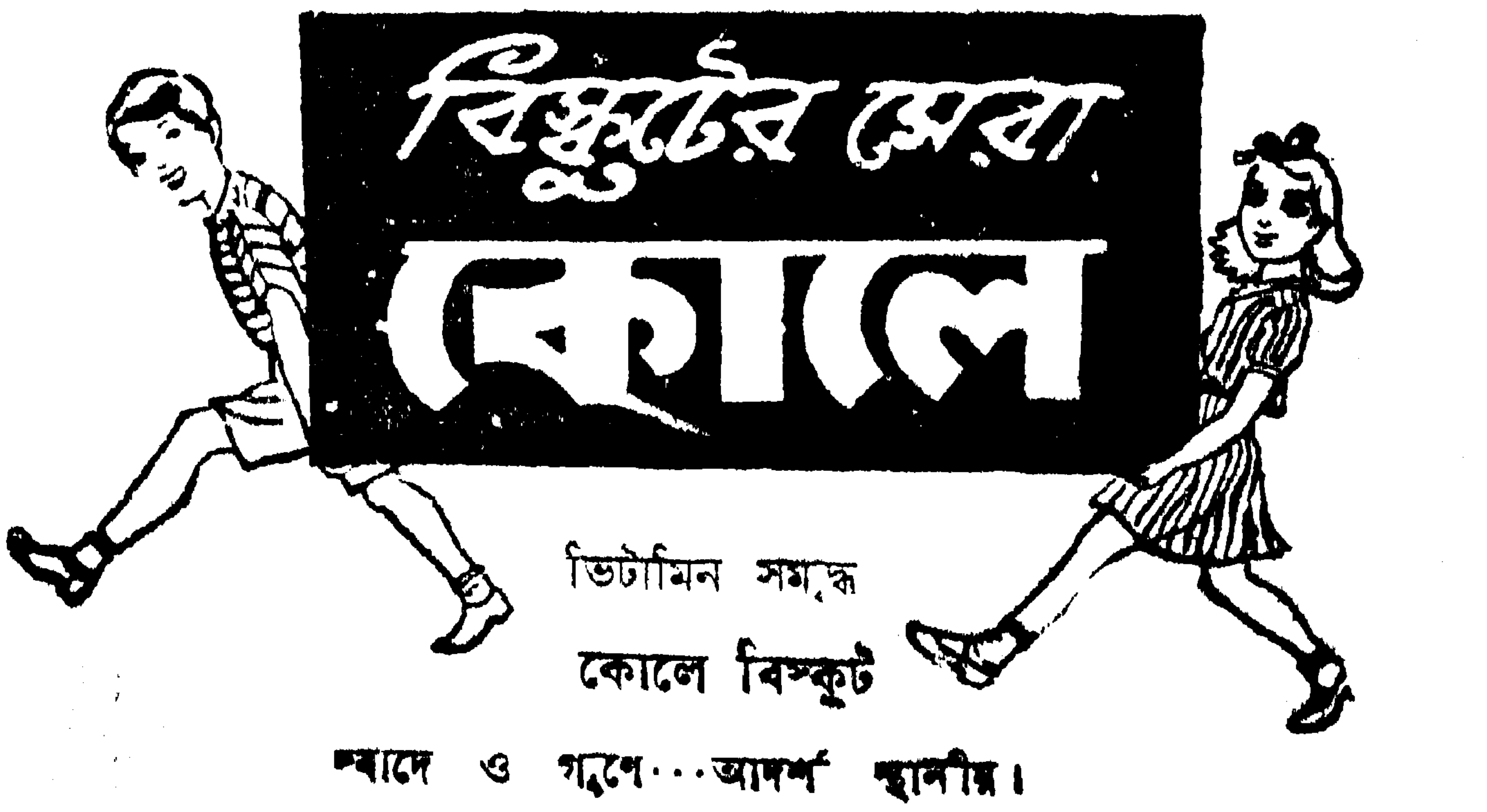

স্বাদে ও গুণে···আদর্শ স্থানীয়।

আকাশের দিকে। আমি বলে উঠলাম—'এই কি শয়তান?'

'এ তো তুমি।'

'আমি শয়তান হবো না।'

'এ তো তোমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধ-প্রপিতামহ, প্রবৃদ্ধ-প্রপিতামহ—ও তুমি।'

'আমি শয়তান হবো না।'

'এ স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে এনেছিল, ভালোবাসার মৃত্যুতে ডমরু বাজিয়ে নেচেছিল—ত্রি-লোকে পা ফেলে। এ তো তুমি।'

'আমি যে নাচ জানি না।'

'তুমি জানবে।'

চেয়ে দেখি, ঝকঝক করছে চারদিক। এই ক-টি মুহূর্তের মধ্যে সে, (শয়তান? আমি?), পরিষ্কার করে দিয়েছে আকাশ—মাটি। আমি দু' পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে।

'আমি কোন্ পথে যাবো?'

'দেখছ তো তোমার সামনে দুটো পথ, যেটাতে তোমার খুশি।'

'এই পথটা বাঁধানো, একটু-একটু করে ওপরে উঠেছে, যদি আস্তে আস্তে হাঁটি, তবে তো আমার ক্লান্তি আসবে না, আমি স্বচ্ছন্দে পৌঁছুতে পারবো।'

'কোথায়?'

'যেখানে এ-পথ গেছে!'

'কোথায় গেছে তা তুমি জানো?'

'না।'

'তবে তোমাকে যেতে-ই হবে কে বলেছে?'

'এখন তো আর আমার না-গিয়ে উপায় নেই। সেই শয়তান (নাকি আমি-ই?) ভেতর থেকে আমাকে ধাক্কা দিচ্ছে।'

'এই বাঁধানো পথে যাত্রী এতো কম কেন? আর এই যে পথটা চলে গেছে সোজা, খাড়া পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে, ধাপের পর ধাপ, সিঁড়ির পর সিঁড়ি—এ-পথে এতো ভিড় কেন?'

'এই বাঁধানো ঝকঝকে পথটা হচ্ছে গলিপথ, আর এই ধাপের পর ধাপ খাড়াই পথটা রাজপথ। এই বাঁধানো ঝকঝকে গলিপথে যদি তুমি যেতে চাও, তবে এই যে পাহাড়টার বাঁদিকে দিয়ে একটি গুহা আছে, সেই গুহায় একটি ডাইনি আছে—তার কতো বয়স, কেউ জানে না, দেখতে যেন বুড়ো বটগাছের মতো—সেখানে গিয়ে তোমার আত্মাটা তাকে দিতে হবে; আর কোনোদিন ফেরত পাবে না। সেই আত্মা নিয়ে মন্ত্র পড়ে ডাইনি এক সুন্দর রথ বানাবে। সেই রথে চড়ে তুমি স্বচ্ছন্দে এই গলিপথ দিয়ে গিয়ে সেখানে পৌঁছতে পারবে—পৌঁছনো-না-পৌঁছনো অবশ্য সমান, তোমার তো আত্মা থাকবে না, পৌঁছনো-না-পৌঁছনোর কোনো অর্থও তোমার কাছে থাকবে না। এই ঝকঝকে গলিপথ দিয়ে চলতেই তোমার আনন্দ—অবিশ্যি তোমার তো আত্মা থাকবে না, তাই আনন্দটাও তুমি বুঝবে না, তুমি চলবে এই পর্যন্ত, চলবে, থামবে না, কেননা, থামার জন্য ইচ্ছা দরকার, এবং তোমার তো আত্মা থাকবে না, তাই ইচ্ছে করতে পারবে না।'

'আমার রথের দরকার নেই, আমি হেঁটে এই গলিপথে যাবো।'

'হেঁটে এই পথে যেতে পারবে না। তোমার আত্মার মূল্যে এমন এক রথ ডাইনি তোমাকে দেবে, যা শুধু চলে, চলে, চলে, প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলে, তারপর এক সময় পুড়ে ছাই হয়ে মিলিয়ে যায়। তোমার বাবা আর মার কি অসুখ—তুমি জানো না?'

'না।'

'না-খেয়ে-খেয়ে অসুখ হয়েছে। এই যে দেখছ পাহাড়, এ-পাহাড়ের গুহায় যাত্রীদের জন্য শস্য সঞ্চয় করে রাখা হয়। এই পাহাড়ের মাথায় তোমরা এক কৃষি-ক্ষেত্রে পৌঁছবে, সেখানে সবাই চাষ করে, সেই ধান এই গুহায় সঞ্চয় করে রাখা হয়, যাত্রীদের জন্যে। তোমার বাবার বাবা যে-শস্য জমা করে গেছেন, সেই শস্যে তোমার বাবার খিদে মিটেছে। তোমাদের পিতৃ-পুরুষ যে-শস্য উৎপাদন করেছে, তা দিয়ে তোমাদের আহার চলবে। যেই ডাইনির কাছে আত্মা বেচবে, রথের ঘোড়া দুটোকে খাওয়াবার জন্য সে আমাদের শস্যভাণ্ডার থেকে খাবার চুরি করে—তাই রাজপথের যাত্রীদের খাবার কম পড়ে। তাদের না-খেয়ে-খেয়ে অসুখ করে। রথে চড়ে যারা যায়, তারা কোথাও পৌঁছয় না, চলে-চলে শেষে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যারা হেঁটে যায়, তারা সেই চাষের ক্ষেতে পৌঁছয়, কিন্তু না-খেয়ে তারা জীর্ণ হয়ে যায়। যেদিন এই রথ আবিষ্কার হলো, তখন কথা ছিল, আমরা সবাই ঐ রথে চড়ে যাবো কিন্তু কয়েকজন লোক কোত্থেকে এই ডাইনিটাকে এনে বসিয়ে দিল।'

'আমি যাবো না।'

'না-গিয়ে তোমার উপায় নেই। ঝরনা কি না-চলে থাকতে পারে?'

'আমার আত্মাকে বেচলে তো আমার মাকে পাবো না?'

'না।'

'বন্ধুকে?'

'কেমন করে? অত বেগে ছুটে-চলা রথের ওপর বসে কথা বলা যায়?'

'একা-একা যেতে হবে?'

'হ্যাঁ।'

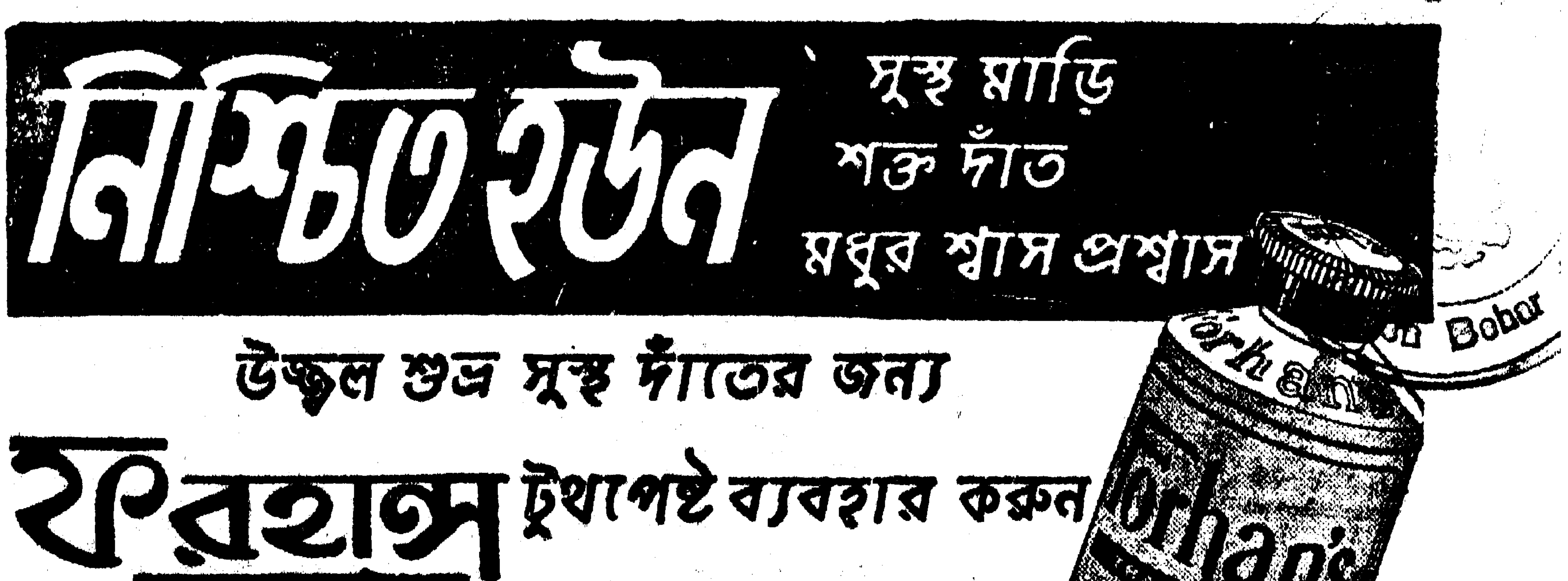

'আর কোথাও পৌঁছতে পারবো না।'

'মা।'

—আমার পা দুটো খাড়াই পথের সিঁড়িতে পা দিল, দু-চার পা যেতেই আমার পা হারিয়ে গেল, নিজের পা আমি চিনতে পারলাম না, বুঝতেও না, এতো ভিড়, এতো ভিড়।

অথচ তাদের চোখে-মুখে কোথাও দুঃখ নেই, ভয় নেই। আমি বুঝতে পারলাম না, এতো উঁচু পথ, এতো দূরে যেতে হবে, পথের শেষে নিশ্চিত অসুখ, তবু সবাই এমন নিশ্চিন্ত কেন? তবে আমি-ই বা কেন সেই দুঃখের কথা ভাবছি? তবে সবাই ভাবছে, অথচ সে দুঃখকে কেউ মূল্য দিচ্ছে না। আমরা যেন কোনো মেলায় চলেছি।

সিঁড়ির পর সিঁড়ি।

সিঁড়ির পর সিঁড়ি।

ধাপের পর ধাপ।

ধাপের পর ধাপ।

কিন্তু সোজা উঠে যায়নি। কয়েক ধাপ পর পরই বেঁকে গেছে। আমরা একসঙ্গে সমস্ত পথটা দেখতে পাচ্ছিলাম না, এক-একটা বাঁক দেখে মনে হচ্ছিল এখানেই বুঝি পথের শেষ। ফলে, পথের শেষ দেখতে পাওয়ার আনন্দে আমাদের ক্লান্তি আসছিল না। কিন্তু বারবারই সেই শেষ বেঁকে-বেঁকে, আড়ালে-আড়ালে, দূরে-দূরে সরে সরে যাচ্ছিল। এই অপসৃয়মান চলনাময় গন্তব্য শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে এক রসিকতার বিষয় হয়ে উঠলো। আমাদের ডান পাশে খাড়াই পাহাড়, কোথাও কোথাও রুক্ষ কর্কশ বিশাল পাথর বেরিয়ে আছে, কোথাও ঘন গাছপালা পথের পাশেই, কোথাও পাথরের গায়ে শ্যাওলার থকথকে সবুজ, কোথাও ঝরনা যেন আমাদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে, কোথাও বিরাট বড় গাছের মাথা থেকে আমার মাথায় দু-এক বিন্দু জল ঝরঝর ঝরে পড়ে। আমাদের মধ্যে গল্প করার বিষয়ই পাহাড়, গাছ, আকাশ, ঝরনা—এই সব। আমাদের মধ্যে একজন, ঝরনা দেখলেই আমরা তার দিকে তাকিয়ে হাসা শুরু করি। আর ঝরনা দেখলেই সে কেমন একটু লজ্জা পেত। আর একজন, সে যদি লাল ফুল পেল, আর রক্ষা নাই। আর একজন মাঝে-মাঝেই পাতা দিয়ে মুকুট বানিয়ে মাথায় পরে।

আমি ভুলেই গিয়েছি, কবে আমি পথে বেরিয়েছি। তবে প্রতিদিন সকালে-বিকালে কিছু সময়ের জন্য আমাদের স্থির বিষণ্ণ, অচঞ্চল হতে হয়। সকালে আমাদের চোখের সামনে, আমাদের চোখের বাইরের কোন্ এক পাহাড়ের আড়ালের কোন্ এক গুহা থেকে নবজাত সূর্য ওঠেন। তাঁর দেহ থেকে নবজন্মের রক্ত মুছে যাচ্ছে। স্নিগ্ধ, সামান্য-রক্তিম, সেই সূর্য নীল আকাশে জ্বলজ্বল করেন। সেই নীল আকাশের রঙ: যেন আকাশকে সমুদ্রের জলে ধুয়ে নেয়া হয়েছে। আমরা ঘুম থেকে জেগে উঠে সেই সূর্যের দিকে তাকাই, আমরা পরম বাসনায় পূর্ণ হয়ে যাই। এই সূর্যই কি যাত্রারম্ভের সকালের সেই নীলকমল? আমরা কি সূর্যের দিকেই যাচ্ছি। আমরা পরস্পরের দিকে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে চাই। আর মনে হয়, কখনো বা আমরা সূর্য হতে চাই, কখনো বা সূর্যের সেই অজ্ঞাত যাত্রা। সারাটা দিন ধরে কতোখানি পথ পেরুতে হবে, আর সারা দিনের শেষে আমরা কিরকম ক্লান্ত হয়ে পড়বো—সে-সব কোনো কথাই আমাদের কানে আসে না। মনে পড়ে—সেই কোন্ এক সকালে পথে বেরিয়েছি। মনে পড়ে, এক ঘন-কুয়াশার অনন্ত সুড়ঙ্গের এক সীমায় আমি, আর-এক সীমায় নীলকমল।

এতোদিনে আমরা দেখেছি, আমাদের সবাইয়েরই জীবন একরকম। আমি নেই, সবাই আমরা।

বিকাল বেলা দেখি, আমরা অস্তাচল-চূড়াবলম্বী সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছি। লোহিত আলোয় সমস্ত আকাশ ছেয়ে গেছে। আর সেই লোহিত আলো ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের বেশে-বাসে, আমরা সবাই যেন বৈরাগী হয়ে যাই। ঠিক তার পূর্ব-মুহূর্তে আমরা সবাই ক্লান্ত হয়ে লুটিয়ে পড়তে থাকি। কিন্তু সূর্যের সেই অস্ত-গমন আমাদের যেন এক ধরনের প্রশান্ত-বিশ্বাসে উজ্জীবীত করে। সারাদিন আমাদের পথ-চলার কালে আমরা কখনো সূর্য-র দিকে পেছন ফিরি না। এমনভাবে পথটা গেছে যে সকালে-দুপুরে-বিকালে সূর্য নিয়ত আমাদের সম্মুখে। সকালে, পাহাড়ের চূড়ায়, গাছের পাতায়, আমাদের চোখে-মুখে সূর্য-র আলো পড়ে। বিকালে পাহাড়ের চূড়া থেকে গাছের পাতা থেকে, আমাদের চোখ-মুখ থেকে সে আলো সরে যায়। নদীতীরের মতো নির্জনতায় আমরা ঢলে পড়ি। আর সেই বিকালে, নদী যেখানে তীরকে ছুঁয়েছে সেই রেখায় রেখায়, মনে-মনে আমরা খুঁজি সারাদিন যে পাখি আকাশে উড়েছে, তারই একটি খসে-পড়া পালক। যেন সেই পালকের স্পর্শে আমা-দের নিদ্রা আসবে। আর শান্তি।

আমরা কতোপথ এগিয়েছি, কতো উঁচুতে উঠেছি, কিছু-ই বুঝতে পারি না। কারণ, এ-পথ এমনভাবে বেঁকে গেছে যে কোনো-সময়েই পেরনো পথ দেখা যায় না। কখনো-কখনো আমাদের মনে হয়, আমরা কি একই জায়গায় ঘুরছি। তা মনে হওয়া সত্ত্বেও হাঁটা ও সিঁড়ি ভাঙা ছাড়া আমাদের কী-ই বা করার আছে?

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পার-ছিলাম, আমাদের চেহারা কী-রকম হয়েছে। সারাদিন পাহাড় ধরে ধরে উঠতে হয় ওপরে, তাই, লাঙলধরা হাতে-র মতো কড়া পড়েছে আমাদের হাতে। আর সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে আমাদের পা হয়েছে কামারের বাহুর মতন। আর জেলে-র চোখের মতো আমা-দের চোখ কিছুটা বা ভেজা, কিছুটা বা জালে নিবন্ধ, কিছুটা বা নদীর পাড়ে উদাস।

মারামারি কাটাকাটি-ও যে হয় নি তা নয়। ঠিক মাঝবেলায় সবার নিশ্বাস গরম, সবার মুখের লালা ভারি,—পা ধরে আসে।

আর্ণিকল
আর্ণিকা কেশ তৈল

আর্ণিকা,
ভৃঙ্গরাজ, পাই-
লোকারপাশ প্রভৃতি
ভেষজ সহযোগে প্রস্তুত।
অকাল পক্কতা ও পতন
নিবারক এবং কেশ বর্দ্ধক।

★

মহেশ
ল্যাবরেটরিজ
প্রাইভেট লিঃ
৩০/৪, ক্যানেল ইষ্ট
রোড, কলিকাতা-১১

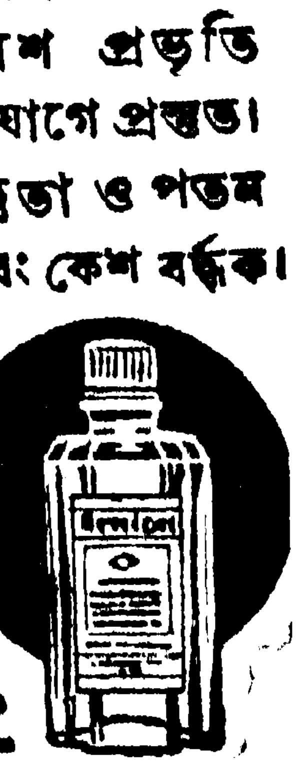

সোল এজেণ্ট:

এম, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং
প্রাইভেট লিঃ,
৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

তখন একজনের শরীরের সংগে আর একজনের শরীরের ঘষা লাগলে জ্বলে যায়। আর ঘষা লাগলেই দ্বজনের মধ্যে একটা ধাক্কাধাক্কি হয়ে যায়। আবার এমন-ও হয়, কোনো হেতু না-থাকা সত্ত্বে-ও আমরা কুৎসিত, অশ্লীল, গালি-গালাজ করি, কেউ কারো কথা শ্বনি না। বলার সময় মুখের ভেতর জিভটা যে-নাড়াচাড়া করি, আর দাঁতগুলো যে কিড়মিড় করে, তাতেই কেমন এক ধরনের আনন্দ হয়।

আমাদের মধ্যে দ্বঃখ এসে বাসা বেঁধেছে। খিদে পায় প্রচণ্ড। খেতে পাই সামান্য। এ-নিয়ে প্রতিবাদ ওঠে আমাদের মনে। কিন্তু আমরা জানি পথের শেষে একটা জায়গায় আমরা পৌছ্ববো যেখানে আমরা চাষ করবো। তাই খিদে নিয়ে আমরা কিছ্ব বলি না। কালে-কালে খিদেটা আমাদের অভ্যাস হয়ে যায়।

অনেকদিন পর্যন্ত সকালে-বিকালে নীল-আকাশ দেখে মায়ের কথা মনে পড়তো। আমার মা-কে আবার আমি কবে পাবো? একদিন মায়ের কথা ভুলে গেলাম। কিন্তু মায়ের কথার চাইতে-ও জরুরি একটা কথা আমার মাঝে মাঝে মনে পড়ে। আর যখন-ই দ্বঃখ হয়, আমি, আমরা স্বর্যের দিকে চাই, তারপর কোনো পাহাড়ের চুড়োয়, যেন ওখান থেকে আমাদের দ্বঃখের নিবৃত্তি আসবে। পথের আশে-পাশে যে নানা লতা-পাতা-ফুল, তা দিয়ে বিকেলের সেই আশ্চর্য স্বর্যের সম্মুখে বসে, সেই গভীর নীল আকাশের তলায় বসে, আমরা মালা গাঁথি, আর সেই মালা আমাদের পাশে রেখে ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমের মাঝখানে সেই মালার সৌরভ আমাদের মনে গভীর এক ব্যথা জাগায়। মন্দ-বাতাসে আমলকি পাতায় কাঁপন দ্ব' একবিন্দ্ব শিশির ঝরে পড়ার মতন, কোনো চোখের পাতা মনের কোন্ গহনে কাঁদে, আর, চোখের জল পড়ে। দ্বঃখ পারাবারে এক-একবিন্দ্ব চোখের জলে জোয়ারের কলরোল ওঠে। অসম্পূর্ণ চাঁদ থাকে চোখের সামনে। আমাদের দলের বৈরাগী (কে সে চিনি না, আমি-ই নাকি!) গান গায়—

হাতের কাছে শঙ্খ ছিল
দিলেম তাতে ফ্বঁ
মনের কাছে ছিল যে এক
দ্বঃখের সিন্ধ্ব
তাতে লাগলো জোয়ার
লক্ষ্মী, রে, তুই আয় রে ভেঙে—

ব্বঝতে পারি না, এরপর 'ঢেউয়ের পাহাড় নাকি 'চড়াই পাহাড়।' দ্বটোর একটাও আমার পছন্দ নয়। 'লক্ষ্মী' কথাটা শোনার সংগে সংগেই আমার মনে আসে ধানখেতের ছবি। গানটা মেলাতে পারি না। সম্পূর্ণ চাঁদের দিকে তাকিয়ে আমি শেষ কলিটার শেষ কথাটি—লক্ষ্মী, ধান আর মন মিশিয়ে—

ভাবি। পাই না। পাতার ফাঁক দিয়ে আচ্ছন্ন জ্যোৎস্না কিছ্ব ছায়া-সহ ছড়িয়ে থাকে—আমরা ভাবনার চারপাশে দ্বঃখের মতন।

একদিন দ্বপ্বরে একজন আমাদের দল ছেড়ে বেরিয়ে যায়। কে যেন বললো—"ও লক্ষ্মী পেয়ে গেছে!"

একদিন বিকেলে সর্ব-আভরণ-শ্বন্য, অকিঞ্চন,—এক-কলা শশীর মতো শিঙা, অন্ধ্বৃত শিঙার মতো বিবশ চোখ, অন্বন্মীলিত চোখের মতো কুণ্ডলিত-ফণা সাপ, সাপের ফণার মতো মাথার জটা যার —সেই শ্মশানচর অথচ অন্য-স্বপ্নে অন্যমনা শিবের মতো আকাশের তলায় লোহিত বরণ স্বর্যের দিকে মুখ করে আমরা থেমে পড়লাম। যেন, আকাশ-ছেয়ে, পাহাড়-ছেয়ে, মাটি-ছেয়ে, নদী বইছে। নদীর পাড় এতো-ক্ষণ গোষ্ঠ ছিল। গো-ক্ষ্বর-ধ্বলিতে দিগন্তে মিলনের সংগীত। আর, আমি একা। মাথা-মোড়া ঘাসের ওপর আমি একা। আজ একা আমি। আমার সম্মুখে, নিচে, নদী মাটি ছ্বঁয়েছে। নিমেষ-পাতের কালে চোখের ওপরের পাতা নিচের পাঁপড়ির সংগে মেলে-কি-মেলে-না যেমন, তেমনি, নদীর জল মাটির কাছে আসে-কি-আসে-না। আজ একা আমি সেই পাড়ে-পাড়ে, চুলের মতো কালো জলের নিচে সোনারঙের বালির মতো অস্পষ্ট অনির্দেশ্য কোনো পাখির পালক খ্বঁজছি। শেষ-বাঁধন-ছিঁড়ে গোলাপের ফ্বটে-ওঠার মতো ফ্বটে-ওঠা কোনো ঠোঁটে সেই পাখির পালক ছোঁয়ালেই যেন কথা বলে উঠবে।

আর স্ফুটনোন্মুখ কনকচাঁপার পাপড়ির ভেতরে সৌরভ যেমন বেরিয়ে আসার জন্য মৃগনাভি হরিণীর মতো ছ্বটে বেড়ায়—তেমনি আমার মন। মনে হয়, আমি যেন মা হবো। আমাকে জন্ম দেবার পূর্বে মায়ের ব্বঝি এমনি যন্ত্রণা হয়েছে। মায়ের গর্ভের অন্ধকারে আমি যেমন পথ খ্বঁজে বেড়াচ্ছিলাম—আমার মন তেমনি পথ খ্বঁজে বেড়াচ্ছে বেরিয়ে আসার জন্য—আমি এবার মা হবো।

বিকেলের নদীর পরপারের মতো তরংগ-কল্প নীল-বন্ধ্বরতায়, হাওয়ায় হিল্লোলিত ধানখেতের মতো বন্ধ্বরতায়, বীচি-ভংগ-মুখর নদীর ওপর নৌকোর মতো বন্ধ্বরতায় কে আমারই দিকে আসছে। অস্তগামী স্বর্যের সোনার আলোর মতো, পাকা-ধানের মতো, এক শাড়ি তার পরনে। বৈরাগীর গাওয়া লক্ষ্মী এলেন! কি ভেঙে? ঢেউয়ের পাহাড়! চড়াই পাহাড়! নাকি ধানের ঢেউ! কিছ্ব-ই তো ভাঙে নি।

সে এসে আমার সামনে দাঁড়ালো। তার দ্ব-চোখের নির্নিমেষ দৃষ্টি আমার ওপরে। তার ঠোঁটে সামান্য হাসির ভংগি। আমি ভয় পেলাম। পিছ্ব হঠতে গিয়ে দেখি, আমার পা সরছে না। তবে কি পাহাড়ের শ্বর্তে সেই ডাইনি আমার মনোহরণ করলো? কিন্তু সে তো অনেকদিনের কথা! আমি এখন ইচ্ছা করতে পারছি না। আমার মন, আমার মন গেল কোথায়? মন, মন।

যে-ক্ষণে আমার এ-কথা মনে হলো,

স্বলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.-প্রণীত
ব্যায়ামে বাঙালী ২·০০ বাংলার ঋষি ৩·০০
বীরত্বে বাঙালী ১·৫০ বাংলার মনীষী ১·২৫
বিজ্ঞানে বাঙালী ৪·০০ বাংলার বিদুষী ২·০০
আচার্য জগদীশ ২·০০ রাজর্ষি রামমোহন ১·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ১·৫০ যুগাচার্য বিবেকানন্দ ১·৫০
জীবন গড়া ·৭৫ রবীন্দ্রনাথ ১·২৫
প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী · ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

জগদীশবাবুর গীতা
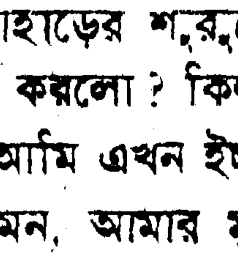
মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা তত্ত্ব-রহস্য ভূমিকাসহ অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়মূলক যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম ৫·০০
শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার যুক্তিপূর্ণ আলোচনা
ভারত-আত্মার বাণী ৫·০০
ভারতের শাশ্বতবাণী বিশ্বমৈত্রীর কথা
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১·৫০
কর্মবাণী ১·২৫
প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী · ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

মন-কে ডাকলাম, সে যেন এই মুহূর্তেরই অপেক্ষায় ছিল, আমার দু' হাত তার দুই অঙ্গুলিতে ভরে নিল। আর তখনই আমি দেখলাম, তার চোখের পাতা সেই পালক, যা আমি খুঁজছি। আমারই সেই ঠোঁট যা ঐ পালকের স্পর্শে বাঙ্ময় হবে। আমার দু' হাত, তার দু' হাতে ভরে, অস্তমিত সূর্য-কর-দীপিত গোধূলির রক্ত-গুণ্ঠনের দিকে চাইলাম, বেদনায় আমার মন ভরে গেল। যে-মুহূর্তে আমার মন বেদনায় ভরে গেল, সে-মুহূর্তে তার দু-চোখ টলটল করে উঠলো।

সারাদিন ধরে আমি তৃষিত, তুমি মেটাবে? মেটাবো। সারা পথ ধরে আমি ক্লান্ত, তুমি মেটাবে? মেটাবো।

"তুমি কে?"

"মন"

"তুমি এখানে এলে কি করে?"

"আমার মা আমাকে পাহাড়ের শুরুতে বলেছিলেন—একসময় আমার মনকে আমি পাবো। আমার সঙ্গে যারা ছিল তারা কেউবা পেয়ে গেছে, কেউবা এখনো পায় নি। আমি আজ পেয়ে গেলাম। তুমি আমার মন।"

"তুমি আমার?"

মন"

"আমি আর আমার সংগীদের পাবো না?"

"এখন থেকে আমরা দুজন দুজনার সংগী।—পরে, যেখানে আমাদের পৌঁছনোর কথা সেখানে আবার আমরা এক হবো।"

"মন, তোমার খিদে পায় নি?"

"ভীষণ, আমাদের খাদ্যে বহু ঘাটতি, কেন জানো?"

"জানি। না, না, তুমি আমায় ভোলাতে এসেছ, তুমি সেই ডাইনির দূতী। আমি পথ চলবো একা, নইলে আমার মা-কে পাবো না।" আমি হাত ছাড়িয়ে নিই। সে হেসে উঠলো জলকল্লোলের মতো—"আমাকে সংগে না নিলে তুমি আর এক পা-ও যেতে পারবে না, আমি যে তোমার মন। এই পথে একলা চলা বারণ। কেন জানো? এই পথের শেষে যখন তুমি পৌঁছবে তখন পথের শুরুতে একজনকে তোমার-আমার জায়গা নেবার জন্য পাঠাতে হবে। তুমি আর আমি সেই সর্বোত্তম শিল্প রচনা করবো—এমন একটি মানুষ, যে নিশ্বাস নেয় বুক ভরে দৃশ্য দেখে চোখ ভরে, আঃ আর একটি গোটা মানুষ। আস্ত মানুষ! জানো মন, জানো? তার বুকের পেশী হবে মেঘের মতো মেঘের মতো, তার হাতের কব্জি হবে হাতুড়ির মতো, হাতুড়ির মতো। মন, তার বুকের নিচে ফুসফুস, হৃৎপিন্ড। তার সারা শরীর ব্যেপে টগবগে রক্ত ছুটে ছুটে বেড়াবে, তার হৃৎপিন্ড মুগুরের মতো নাচবে। মন, মন, একটা গোটা মানুষ, একটা আস্ত মানুষ রচনা করতে তুমি পেছ-পা হচ্ছো?"

"তবে তুমি শয়তানের দূতী নও?"

"শয়তান কে? শয়তানের গলায় অমন নীলকমলের মালা দোলে গো? ঐ যে-মানুষটা আকাশ থেকে আগুন লুটে এনেছে মাটি খুঁড়ে ধান উঠিয়েছে, তাকে ঐ ডাইনি মিথ্যে নাম দিয়েছে, শয়তান। শয়তান তো তারা, যারা মন বেচেছে ডাইনির কাছে। আমরা মানুষ। আমরা মানুষ তৈরি করবো। তখন আমরা ঈশ্বর-ঈশ্বরী হবো। মন, তুমি যে তোমার মা-কে বলেছিলে, তুমি ঈশ্বর হবে। এসো, ঈশ্বর হও।"

সে তার হাত বাড়িয়ে দিল, আমার হাত ধরলো না। আমার সমস্ত প্রাণ কেঁদে উঠলো—তোমার হাতখানি বাড়িয়ে ধরো, আমার হাতে দাও, তাকে ধরবো, তাকে পরাণে রাখবো। আমি তার প্রসারিত পাণি গ্রহণ করলাম।

আমরা দুজন শুধু পথ হাঁটছি, শুধু সিঁড়ি ভাঙছি। দিনের হিসেব আমরা রাখি না, রাতের হিসেব আমরা করি না। সকালে বিকালে সেই নীল-কমলটা আমাদের চোখের সামনে দোলে। আমি ঈশ্বর হয়েছি—মন ঈশ্বরী। আমরা মানুষ সৃষ্টি করেছি—যে বুক ভরে নিশ্বাস নেয়, চোখ ভরে স্বপ্ন দেখে, আর আমরা যখন পথের শেষে পৌঁছবো সে দু পা ভরে পথ হাঁটবে।

আমাদের ভীষণ খিদে পায়। তাই জোর পাই না। মনের চুল রুক্ষ। তার মুখের হাসি বাদে আর সব লুকিয়ে গেছে। নিজেকে দেখতে পাই না। মনের চাউনি দেখে মনে হয় আমি সুন্দর। আমার চাউনি দেখেও মনের কি তাই মনে হয়?

একদিন বিকেলে আমাদের দুজনের সামনে যখন সূর্য অস্ত যাচ্ছেন আর সোনা-বরণ আলো ছড়িয়ে পড়ছে, আকাশটার গা থেকে, পায়ের তলার ঘাস থেকে সেই সোনার আলো নেমে উঠে ছড়িয়ে চারদিকে যেন পুজোর ভোরের আকাশ করে তুলেছিল। আমি মনের দিকে চেয়ে দেখি সে আমার দিকেই চেয়ে। তার চোখের মণিতে দেখি অনেক মানুষের ভিড়। চমকে চারপাশে চেয়ে দেখি, চারপাশ থেকে সবাই চমকে তেমনি করেই চাইছে। দেখি, সেই কবে, ভোরে, আমরা, যারা যাত্রা শুরু করেছিলাম—তারা সবাই এক জায়গায় সমবেত হয়েছি। কোন্ কোন্ পথ দিয়ে কেউ জানি না। জানি, আমরা যা ছিলাম, তারা দ্বিগুন হয়ে মিলেছি। জানি, আরো বহুগুণ মানুষ আমরা সৃষ্টি করেছি। তারাও শিগ্‌গিরই এই পথের গোড়া থেকে রওনা হবে।

প্রচন্ড শীত দূর করবার জন্য পরাণ খুড়ো শুকনো পাতা-কাঠ দিয়ে আগুনে জ্বালালো। তারপর সেই আগুনের চারপাশে আমরা হাত ধরাধরি করে নাচতে লাগলাম। আগুনের শিখা এক এক দমকা হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে উঠছে, আর আমাদের সবাইয়ের শরীরের ওপর দিয়ে আলো সরে যাচ্ছে, ফিরে আসছে। খিদে ও শীত। মনের দিকে তাকিয়ে দেখি তার মাথার রুক্ষ চুল আগুনের শিখার মতো কাঁপছে। ঢাক বাজছে গুরু গুরু ধ্বনিতে, কাঁসর বাজছে, আর বুড়ো এক কবি নতুন নতুন গান বেঁধে গাইছে। সে-গান তৈরি হচ্ছিল, অথচ প্রত্যেকটি গানই আমাদের জানা। শেষ রাতে সেই আগুনের চারপাশে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে দেখি লাল আলোর সমস্ত আকাশ ছেয়ে গেছে আর সারারাত ধরে আকাশটাতে আগুন লাগিয়ে যেন আমাদের আগুনের কুন্ডটা ছাই হয়ে পড়ে আছে। সূর্য দেখা দিলেন। এতোদিনে মনে হলো সূর্য যেন আমাদের পরাণ খুড়ো। আকাশের লাল রঙটার চারপাশে আবার আমরা হাতে হাত বেঁধে নাচবো।

দূরে তাকিয়ে দেখি এক অদ্ভুত সুন্দর লম্বা বাড়ি। কাচের জানলা, তাতে রোদ পড়ে ঝকঝক করছে। খড়ের চাল, তাতে তখনো শিশির শুকোয় নি। বাড়িটা দেখতে যেন দুর্গা প্রতিমার মন্দির।

"ও-বাড়িটা কার?"

"ও-বাড়িতেই তো আমাদের সবার থাকবার কথা, চলো চলো চলো।"

আমার ক্ষুধা ও ক্লান্তি ভুলে গেলাম। আর, সেই প্রথম ভোরে যা-হয়েছিল, তাই হলো আবার। আমার পা দুটোকে চিনতে পারছি না। সবাই আমরা মেলায় চলেছি। আমাদের মুখে সেই হাসি, মেলার কলরোল কানে এলে যাত্রী যেমন হাসে।

মাঝে মাঝে আমাদের সবার মাঝখানে পরাণ-খুড়োর শাদা দাড়ি ভেসে উঠছিল। কে যেন তাকে শুধলো "যেদিন আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম, তোমাকে তো দেখি নি, তুমি কোত্থেকে এলে?"

"আমি কারো সংগেই রওনা হই নি। তোমাদের সংগে কাল বিকেলে যেখানে আমার দেখা হয়েছে ওখানেই আমার ঘর। তোমাদের পথ দেখিয়ে আজ দুপুরের আগেই এই পাহাড়ের শেষে তোমাদের পৌঁছে দিয়ে নেমে যাবো, তোমরা যাদের সৃষ্টি করেছ তাদের জন্য বসে থাকবো।"

পাশে তাকিয়ে দেখি, মন নেই। ও মন, তুমি কোথায়? এই তো আমি। তাকিয়ে দেখি সে আর-একজন।

"তুমি-ও মন নাকি?"

"আমরা সবাই মন।"

"আমার মন কোথায়?"

"এই তো আমি এখানে"—আমার মন এসে হা হা বাতাসে ওড়া চুলের মতো ছড়িয়ে হেসে আমার হাত ধরলো—"এতো ভয় পাও কেন, চলো-চলো।" আমাদের একের কথার জবাব দেয় আর-একজন, এক-জনের হাসিতে আর একজন হেসে ফেলে।

ঠিক দুপুরে আমরা সবাই থমকে দাঁড়ালাম। আর পরাণ-খুড়ো আমাদের দিকে হেসে উঠলো—"চলো চলো দাঁড়িয়ে পড়লে যে সব!"

"সে বাড়ি কোথায়? এ যে মাঠ!"

"এসো-এসো, জোর-পায়ে এসো, বলছি।"

পরাণ-খুড়োর চারপাশে আমরা জটলা করে চলেছি। মনকে একহাতে আমার বুকের

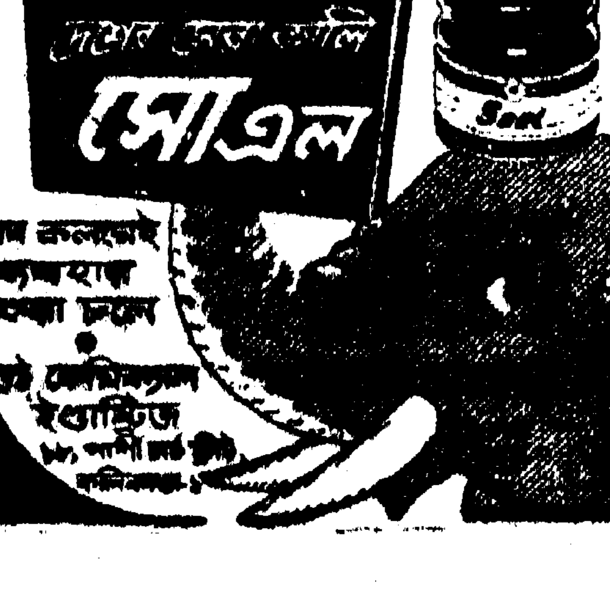

সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছি। তাকে এখনই যেন আমার সবচেয়ে বেশি দরকার।

"কথা ছিল" সমুদ্রের মতো পুরোনো গলায় পরাণ-খুড়ো বলতে লাগলো, "ওই বাড়িতে তোমাদের বাবা-মা-স্ত্রী নিয়ে ঘর-সংসার করবে। তোমাদের বাবা-মা-রাও সেই উদ্দেশ্যেই ঘর থেকে বেরিয়েছিল। কিন্তু এতো যে পাহাড় পেরুলে তোমাদের খিদে পায় নি?"

"প্রচণ্ড"

"তোমাদের বুক ক্লান্তিতে ভেঙে যায় নি?"

"যাচ্ছে।"

"কেন এমন হলো?

"সেই পাহাড়তলীর ডাইনী আমাদের খাবার চুরি করে রথীদের দিয়েছে।"

ততোক্ষণে আমরা সবাই এই ধানখেতের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছি। পাকা ধান আমাদের গায়ে লেগে যাচ্ছে। মনের ধানি রঙের শাড়ি সেই ধানের সঙ্গে মিশে গেছে। আমাদের সঙ্গে ঘর্ষণে যাতে একটি ধানও না পড়ে, এমনি সতর্ক হয়ে আমরা হাঁটছি।

"যেদিন থেকে ঐ চোরা-রাস্তা, ঝকঝকে রাস্তা, রথের রাস্তা তৈরি হয়েছে, সেদিন থেকে যাত্রীদের খাবারে টান পড়েছে। তাই পাহাড় পেরিয়ে, এতো লম্বা পথ অতিক্রম করে এসে আর গৃহপ্রবেশ করা হয় না। এই ধানখেত পেরিয়ে সেখানে যেতে হয়, যেখানে তোমাদের বাবা ও মা লাঙল দিয়ে নতুন মাটি ঘষে, ধানের চারা বুনছে। সেদিন থেকে ঐ চোরা-পথে রথে চড়ে যাত্রী আসা শুরু হয়েছে, সেদিন থেকে তোমাদের পূর্বপুরুষ তোমরা যে-পথে এলে সেই সিঁড়িভাঙা রাজপথ দিয়ে এসে এখানে লাঙল হাতে ঐ চোরা পথটাকেই চষতে লেগেছে। এমনি ভাবে যেদিন সারাটা পথ চষা হয়ে যাবে—ধানখেত হয়ে যাবে, সেদিন আর ঐ রথ-পথ থাকবে না, আর সেদিনই ঐ মন্দিরের মতো বাড়িটা গৃহ হবে।"

আমরা এমন জায়গায় এসে পৌঁছুলাম যেখানে কালো কালো মাটি উপুরে আছে। আরো এগিয়ে আমরা এক জায়গায় দাঁড়ালাম। সম্মুখে সেই ঝকঝকে পিচ-ঢালা পথ, যা-র অপর সীমা আমরা দেখেছিলাম যাত্রার শুরুতে।

আমাদের মা-বাবা লাঙল চালাচ্ছে সেই পথের ওপর। আর বহু চাপে, বহু কষ্টের পর একটুখানি পথ হয়তো ভাঙছে।

আমাদের দেখা মাত্র তাদের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন এলো। ভাঙা গলায় তারা গান গেয়ে উঠলো। বাঁ হাতে লাঙল ধরে ডান হাতে তারা আমাদের ডাকতো লাগলো। আরা সব দুঃখ-কষ্ট-হতাশা ভুলে তাদের দিকে ছুটে গেলাম।

মাথার ওপর দুপুরের রোদ ঝকঝক করছে। আমাদের ছায়া কালো মাটিতে মিশে গেছে। আমরা যেন সবটুকুই মন দিয়ে তৈরি।

বাবা-মা'র সামনে মন আর আমি গিয়ে দাঁড়ালাম। তাকিয়ে দেখি, সমস্ত মাঠ জুড়ে মা-বাবাদের সামনে মন আর মন। আমরা সবাই মন।

আমার বাবা কেশে উঠলেন। তাঁর পাঁজর ঠাঁ-ঠাঁ করে কেঁপে উঠলো, পেট ঢুকে গেল ভেতরে, গলাটা যেন ছিঁড়ে যাবে, চোখদুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। অবশেষে এক-মুখ রক্ত ফেললেন আমাদের মাঝখানে, ঠিক মাঝখানে, কালো মাটির ওপর। হাঁফাতে-হাঁফাতে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

"এই যেখানে রক্ত পড়লো—এখান থেকে তোমার লাঙল চালানো শুরু"—বাবা লাঙলের ফলাটা বাড়িয়ে দিলেন—বাবার হাতের ওপর আমি হাত রাখলাম—

"এই যেখানে রক্ত পড়লো—এখান থেকে তোমার বীজ বোনা শুরু"—মা একগুচ্ছ ধানের চারা এগিয়ে ধরলেন, মন মায়ের হাত জড়িয়ে ধানের চারা জড়ালো।

"কোনো এক মুহূর্তের জন্যও লাঙল হাতছাড়া করবে না।"

"কোনো এক মুহূর্তের জন্যও ধানের চারা হাতছাড়া করবে না।"

"যতোদিন না তোমাদের সন্তান এসে তোমাদের সামনে দাঁড়ায়।"

—তারপর তাঁরা চলে গেলেন সেই কাঁচের বাড়ির দিকে,—ওটা এখন আশ্রয়, ওখানে তাঁরা অপেক্ষা করবেন ততোদিন, যতোদিন সমস্ত পথটা চষে ফেলা না-হয়। আমি আর মন, লাঙল আর ধানের চারা হাতে তাঁদের প্রস্থানের দিকে চেয়ে রইলাম।

আমি লাঙল চালাতে-চালাতে ভেঙে পড়ি। বড় শক্ত পথ, ভাঙে না। আমার উপবাসী বাহুতে শক্তি নেই, পা টলে যায়, মাথা ঘুরে পড়ে যাই।

মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখি কেউ একজন হয়তো একটুখানি পথ ভেঙেছে। আমি আবার দাঁড়াই। সমস্ত জোর প্রয়োগ করে রাস্তার ওপর লাঙল ঠেলি।

এক কলরব শুনতে পেলাম। আসছে-আসছে। আর এক প্রচণ্ড শব্দ। হঠাৎ দেখি আমার সমস্ত দৃষ্টি ঝলমলিয়ে পথ বেয়ে এক রথ উঠে আসছে। তার এতো প্রচণ্ড গতি যে চাকার ঘূর্ণন দেখা যায় না, মুহূর্তের মধ্যে রথ আমার সামনে এসে পড়লো, আমাকে গুঁড়িয়ে নিয়ে যাবে। মন-কে দেখতে পেলাম না, আমি মূর্ছাহত-প্রায় হলাম।

খিল্‌ খিল্‌ হাসিতে আমার মূর্ছা ভেঙে গেল। দেখি হাসিতে খান্‌খান্‌ হয়ে যাচ্ছে মন। তাকিয়ে দেখি রথটা পুড়ে ছাই হয়ে পড়ে আছে সামনে। আমি মনের দিকে চাইলাম। মন বললে, "ও রথ তো থামতে পারে না—আমাদের নিজে হাতে চষা মাটির স্পর্শ পাওয়া মাত্রই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এসো, থেমো না, তুমি মাটি না চষলে আমি বুনবো কি করে?"

আমি দু'হাতে বজ্রের মতো শক্তি নিয়ে, পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে লাঙল ধরলাম, আর, আকাশের মতো বেঁকে মন ধানের চারা বোনে। মাঝে-মাঝে সে ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে চায়—চাইবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমরা দু-জনাই দাঁড়াই, মন আমার কপালের ঘাম মুছিয়ে দেয়, আমি মনের উড়ন্ত চুল বিন্যস্ত করি।

তখন বিকেল আসন্ন। সূর্য প্রায় অস্তাচল শিখরে। সেই আশ্চর্য হরিৎ আলো প্রায় ছড়াবো-ছড়াবো। আমি দাঁড়ালাম। মন দাঁড়ালো। মন আমার চোখে-চোখ রেখে দু পা এগুলো। তার চোখ যেন কী শুনতে পেয়েছে। সেই প্রথম-বিকেলে মন আমার বুকের কাছে এসে দাঁড়ালো। আমি লাঙলটা শুদ্ধু তাকে আবিষ্ট করলাম, মন ধানের চারা শুদ্ধু তার হাত আমার গলায় মালা করে দিল। তারপর চষা-মাটির ফাঁকে-ফাঁকে বিকেলের আলোর মতো স্বরে মন বলল, "শুনতে পাচ্ছ?"

"কি?"

"তার পায়ের শব্দ"

"কার?"

"যাকে তুমি আর আমি সৃষ্টি করেছি সেই আস্ত-গোটা মানুষটার; সে দব্‌দবিয়ে মাটি কাঁপিয়ে আসছে গো,—আমরা ঈশ্বর-ঈশ্বরী, সে-ও ঈশ্বর হবে,—আমাদের বানানো সেই মানুষটা ঈশ্বর হবে, ঈশ্বর হবে, ঈশ্বর হবে!"

মনের হৃৎপিণ্ডের ধ্বনি আমার পাঁজরায় বাজছিল। সে হৃৎ-ধ্বনি পদধ্বনির মতো আমার কানে এসে বাজলো। আমি উদ্‌গ্রীব মনের ব্যাকুল নয়নের দিকে চাইলাম। আমাদের মাথা ছাপিয়ে লাঙলের ফলা আর ধানের চারা—আমাদের মানুষটার জন্য!

বিকেল তখন গাঢ়। বিকেলের ছায়ায় আমাদের দু'জনকে পাহাড়ের মতো লাগছিল, বিরাট, সংহত, দৃঢ়, প্রচণ্ড। মন আমার নত নয়নে চষা মাটির ছায়া দেখলো, আমি মনের উন্নত নয়নে নীলকমল আকাশের ছায়া দেখলাম।

আমাদের মাথা ছাপিয়ে লাঙলের ফলা আর ধানের চারা—আমাদের মানুষটার জন্য।

কে. হোড়ের
কণক
পাউডার

॥ তেইশ ॥

ভোরবেলা আবার শুরু হয়েছে 'বাবা'র পদযাত্রা। সে দৃশ্য আমি ভুলব না। পুলিসের গাড়িতে চলেছে 'বাগী'রা, কাঁধে বন্দুক আর বুকে ঝোলানো গুলীর বেল্ট। হাজার হাজার লোক জয়ধ্বনি করতে করতে চলেছে তাদের পিছনে। "হিরো"র মত রাস্তায় রাস্তায় ডাকাতদের হয়েছে অভ্যর্থনা। সে দৃশ্য দেখলে ফিল্মস্টারদেরও রীতিমত ঈর্ষা হত। সেই উত্তেজিত হাজার হাজার জনতার সংগে 'বাবা' চলেছেন আগে আগে। এসে পেঁাছেছেন কাড়োরা গাঁয়ে সেখানেও অপূর্ব দৃশ্য। রাস্তার মোড় থেকে গাঁ পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য। আমপাতা দিয়ে সাজানো তোরণের মধ্যে দিয়ে গাঁয়ে ঢুকেছেন 'বাবা' আর তাঁর পিছনে এসেছে—'বাগী'দের দল।

কাঁধে বন্দুক নিয়ে একের পর এক সবাই ঢুকছে গাঁয়ের মধ্যে, দু-পাশে জনতার ভিড়। ভিড়ের মধ্যে জীপ থেকে বেরিয়ে এলেন পুলিস অফিসার। ডি আই জি কোলহী আর কম্যাণ্ডাণ্ট কুইন সবার আগে। বাগীদের সংগে করমর্দন করছেন তাঁরা। কোলহী সাহেব হাত বাড়িয়ে দে' আর বলেন, "সাবাস্ সাবাস্ আচ্ছা হুয়া, আচ্ছা হুয়া।" তারপরই হঠাৎ ঘটনাটা হয়ে গেল। প্রথমে কেউ বুঝতেও পারে নি। সবাইকার সংগে হয়ে গিয়েছে করমর্দন। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এল কমাণ্ডাট কুইন লুক্কার সংগে হাত মেলাতে। এক লহমার জন্যে লুক্কা থেমে গেল। তার নীল চোখ দিয়ে যেন হঠাৎ আগুনের ফুল্কি ছুটে বার হল। ঝট্ করে হাতটা সরিয়ে নিল। কুইনের মুখের সব সময়ের হাসি মিলিয়ে গেল এক নিমেষে। "হঠ্ যাও হামারে সামনেসে" লুক্কা চিৎকার করে গালাগালি দেয় কুইনকে। সহ্য করতে পারছে না সে কুইনকে। সে ভুলতে পারেনি তার রূপা মহারাজকে মরতে হয়েছিল কুইন সাহেবের হাতে। কি করে সে ভুলতে পারবে সেই ঘটনা আর সেই কথা। ভুলে গিয়ে কি করে সে হঠাৎ হৃদয় পরিবর্তন করে কুইন সাহেবের সংগে হাত মেলাবে অসম্ভব। লুক্কার পেছনেই ভুপসিং হঠাৎ বন্দুকটা চেপে ধরল। মুহূর্তের মধ্যে বিষিয়ে উঠল সমস্ত আবহাওয়াটা। একটা চাপা উত্তেজনা, একটা অজানার অশুভ আতংক ছেয়ে গেল সারা কাড়োরা গাঁয়ে। কে যেন হঠাৎ টেনে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল কুইনকে।

সারাদিন কাড়োরা গাঁয়ে সেদিন সকাল বেলার ঘটনার কালো ছায়া সবাইকে করেছে চিন্তিত। মাঝে মাঝে কে বা কারা যেন খুঁজে খুঁজে পুলিস ক্যাম্পের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেছে বারবার কে কুইন সাহেব, কোথায় সে। তারা তাকে দেখতে চায়। বড় কর্তারা কুইন সম্বন্ধে উদ্বিগ্নে কাটিয়েছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। যদি কিছু হয়। যদি লুক্কা বা আর কেউ হঠাৎ কুইনকে......? সাধু জেনারেল বলেছিলেন 'বাগীরা' শুধু আত্ম-সমর্পণই করেনি তারা তাদের হৃদয়ও সঁপে দিয়েছে বাবার চরণে—দে হ্যাভ সারেনডারড দেয়ার হার্টস্ টু'। কিন্তু তাহলে এসব কি?

এই ঘটনার পর সরকারী মহলে হয়েছে অনেক জল্পনা কল্পনা। 'বাবা' কে আর সাধু জেনারেলকে বুঝিয়ে অনেক করে রাজী করানো হয়েছে যাতে 'বাগী'রা তাদের অস্ত্র-শস্ত্র তুলে দেয় কর্তৃপক্ষের হাতে। আবার দেখা দিয়েছে একটা থমথমে ভাব। সেই কয়েক ঘণ্টা মনে হয়েছে—কয়েক যুগ। অস্ত্র-শস্ত্র ছেড়ে দিতে কেউই রাজী না। অনেক কষ্টে তাদের রাজী করালেন সাধু জেনারেল। ঠিক হল সন্ধ্যা বেলা হবে 'আর্মস্ সারেণ্ডার'। ছোটো একটা তাঁবুর মধ্যে বসলেন ভিণ্ড জেলার কলেক্টর, গোয়ালিয়রের কমিশনার, পুলিস সুপার পাহুজা আরো অনেকে। একে একে 'বাগী'রা এল আর তাদের বন্দুক আর কার্তুজ রেখে গেল। সব চেয়ে শেষে এল লুক্কা। রূপা মহারাজের টেলিস্কোপিক রাইফেল তার হাতে। একবার করে দেখে রাইফেলটার দিকে আর তার ওপর

১৯৬০-৬১ সালে আপনার ভাগ্যে কি আছে?

আপনি যদি ১৯৬০-৬১ সালে আপনার ভাগ্যে কি ঘটিবে তাহা পূর্বাহ্ণে জানিতে চান, তবে একটি পোষ্টকার্ডে আপনার নাম ও ঠিকানা এবং কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া পাঠাইয়া দিন। আমরা জ্যোতিষবিদ্যার প্রভাবে আপনার বার মাসের ভবিষ্যৎ লাভ-লোকসান, কি উপায়ে রোজগার হইবে, কবে চাকুরী পাইবেন, উন্নতি, স্ত্রী পুত্রের সুখ-স্বাস্থ্য, রোগ, বিদেশে ভ্রমণ, মোকদ্দমা এবং পরীক্ষায় সাফল্য, জায়গা জমি, ধন-দৌলত, লটারী ও অজ্ঞাত কারণে ধনপ্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয়ের বর্ষফল তৈয়ারী করিয়া ১০ টাকার জন্য ভি-পি যোগে পাঠাইয়া দিব। ডাক খরচ স্বতন্ত্র। দুষ্ট গ্রহের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উপায় বলিয়া দিব। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা জ্যোতিষবিদ্যায় কিরূপ অভিজ্ঞ। মিথ্যা প্রমাণিত হইলে আমরা মূল্য ফেরৎ দিবার গ্যারাণ্টি দিই। **পণ্ডিত দেবদত্ত শাস্ত্রী, রাজ জ্যোতিষী।** (DC-3) জলন্ধর সিটি।

Pt. Dev Dutt Shastri, Raj Jyotishi, (DC-3)
Jullundur City.

হাত বুলায় লুক্কা। পাঁচ মিনিট কেটে গেল। লুক্কা আবেগে চেপে ধরে রাইফেলটা শেষ-বারের মত। তাঁবুর মধ্যে আবার সেই গুমোট ভাব। মুখটা একপাশে ঘুরিয়ে হঠাৎ একটা ঝাকুনি দিয়ে লুক্কা রাইফেলটা তুলে দিল কালেক্টর সাহেবের হাতে। ছুটে বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে।

বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলাম "কুঁ্য মহারাজ ?"

লুক্কার নীল কাচের মত চোখ বেয়ে টস্ টস্ করে জল গড়িয়ে পড়ল। আমার কথার উত্তর না দিয়ে চলে গেল খানিকদূরে এগিয়ে। খানিক পরে আবার ফিরে এল। তাঁবুর কাছে এসে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে রইল রাইফেলটার দিকে। আবার চলে গেল আবার ফিরে এল। যখন পুলিসের গাড়ি করে সব রাইফেল আর প্রায় ৯০০ রাউন্ড কার্তুজ চলে গেল, মহা-রাজ একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল গাড়িটার দিকে।

আর কিছু তো নেই মহারাজের কাছে। হ্যাঁ আছে। থলী থেকে বের করে দিল লুক্কা

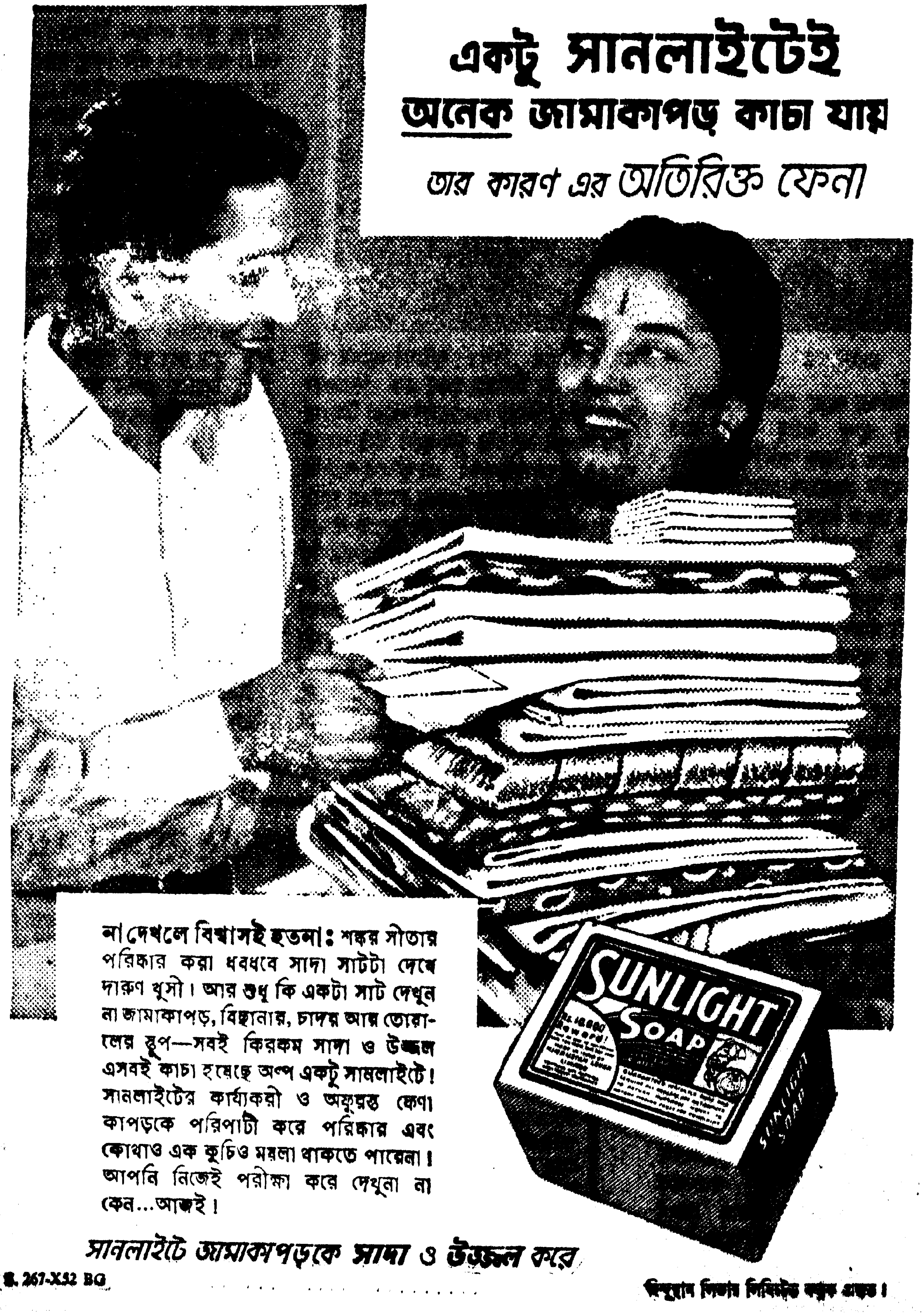

একটা হ্যাণ্ড গ্রিনেড। কুইন তখনও কাড়োরা গ্রামে। এক ঘণ্টা পরে আরেকটা হ্যাণ্ড গ্রিনেড নিয়ে এল লুক্কা। বলল, সকালে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। রাতে আবার একটা হ্যাণ্ড গ্রিনেড নিয়ে এলো—বলল আর কিছু নেই আমার কাছে।

সে রাতে কাড়োরা গ্রামে দুজন ঘুমোতে পারেনি। আমি আর লুক্কা মহারাজ। নাগরা ফিরে গিয়ে কমাণ্ডাট কুইনও বোধহয় ঘুমুতে পারেনি। যখন 'বাবা'র ক্যাম্পে সব গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন আমি ঘুরে বেড়িয়েছি ক্যাম্পের আশেপাশে। গাছের নীচে বসে সিগারেট নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে চিন্তার অনেক এলোমেলো জট ছাড়াবার চেষ্টা করেছিলাম। ছায়ামূর্তির মত একটা তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো লুক্কা। চুপচাপ এসে থামল গাছটার কাছে।

"কু্য মহারাজ নীঁদ নহী আতী?"—জিজ্ঞাসা করি লুক্কাকে।

ভরা গলায় জবাব দিয়েছিল মহারাজ "নহী"। অদ্ভুত এই শান্ত পরিবেশে তার ঘুম আসছে না। হঠাৎ কি যেন সব হয়ে গেল। বছরের পর বছর, রাতের পর রাত সে পালিয়েছে। অজানা ভয় আর আশংকা সব সময় তাকে করেছে বিচলিত আর আজ অনেক বছর পরে এই শান্ত পরিবেশে জীবনে প্রায় প্রথমবার শান্তিতে ঘুমোবার অবসর পেয়ে তার ঘুম হচ্ছে না। আর কি হচ্ছে? লুক্কার হাতের মুঠো বন্ধ হচ্ছে না। কেন? হাতের রাইফেলটা যে নেই। এই ১৫।২০ বছর প্রতি মুহূর্তে মুঠোর মধ্যে চেপে রেখেছে রাইফেল আর আজ সেই মুঠো হঠাৎ খালি হয়ে গিয়েছে। তাই তার মুঠো বন্ধ হচ্ছে না। কেমন যেন একটা অদ্ভুত অনুভূতি। পুলিসের ভয়ে পালাতে হচ্ছে না। ফেলে আসা

বিনোবাজীর সঙ্গে 'বাগী' সমস্যা সম্পর্কে আলোচনারত ডাঃ কাটজু

রক্তমাখা দিনগুলো যেন কেমন বহু যুগের পুরোনো ইতিহাসের মত মনে পড়ছে। রূপা মহারাজ, 'দাউ' মানসিং, সুবেদার সিং, তহশীলদার সিং সবাইকার কথা যেন আজ মনে পড়ছে।

হঠাৎ বলে ওঠে লুক্কা—"আজ আর আমি কি? আমার হাতে আজ রাইফেল নেই। আজ ছোট্টো একটা শিশু যদি এসে আমার লাথি মারে আমি কি করতে পারি? কি আমার শক্তি। মনে হচ্ছে আমার কলিজাটা কে যেন ছিঁড়ে নিয়ে গিয়েছে। আমি তো আজ একটা "জিন্দা লাশ"।" আমি বেশী কথা বলিনি। চুপচাপ অন্ধকারে বসে মহারাজের কথা শুনেছি। সিগারেটের আভায় লুক্কার নীল চোখদুটো জ্বলছিল নীল কাঁচের মত।

তারপরের ঘটনাগুলো ঘটেছে সাধারণভাবে। ইতিহাসে বা সাংবাদিকতায় তাদের কোনো দাম নেই। 'বাবা'র পদযাত্রা চলেছে—গাঁয়ের পর গাঁ। সঙ্গে চলেছে সব বাগীরা। সুরেপুরায় এসেছে আরো তিনজন। করম সিং বদন সিং আর রামদয়াল। মেওয়ারামের দল ছেড়ে চলে এসেছে এরা। গাঁয়ের পর গাঁয়ে হাজার হাজার লোক এসেছে এদের দেখতে। 'বাবা'র অনেক প্রার্থনা সভা ভেঙ্গে গিয়েছে জনতার ডাকাত দেখবার কৌতূহলে। আর টুকরো টুকরো ছোটোখাটো ঘটনা ঘটেছে। একদিনের কথা আমার মনে পড়ে। সেই

'এনাসিন'
মাথাধরা সর্দি জ্বর ও
পেশীর বেদনায়
সত্বর আরাম দেয়, কারণ এতে
চারটি ওষুধ রয়েছে

Registered User: GEOFFREY MANNERS & CO. PRIVATE LTD.

গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে সেই ছোটো হাসা-রস মন্দ লাগে নি। লক্কা আর কানহাই তখন হয়ে উঠেছে বিরাট 'হিরো'। তাদের চাহিদা সবচেয়ে বেশী। প্রেস ফটোগ্রাফার আর রিপোর্টাররা ঘুরছে তাদের পেছনে পেছনে সারা সময়। কানহাই-এর ফটো তুলতে গেলেই সে বলত 'দাঁড়াও'। তারপর নিজের গোঁফ জোড়াতে তা দিয়ে, চুমরী দিয়ে পাকিয়ে ঠিক অ্যাংগেলে রেখে বলতো "হাঁ অব লেও"। এক পুলিস ফটোগ্রাফারের নাম দিয়েছিল কানহাই জনীওয়াকার। হেসে আর বাঁচি না আমরা।

সেদিন লক্কাকে বাগে পেয়ে তাকে ঘিরে ধরলো কয়েকজন রিপোর্টার। যে গুরু-গম্ভীরভাবে লক্কা সেদিন রিপোর্টারদের 'ম্যানেজ' করল, অনেক হোমরা চোমরা নেতাও তা বোধহয় পারবেন না। বিরক্ত হয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠল মহারাজ। "তোমরা বড় বিরক্ত করছ আমায়। তোমাদের জ্বালায় আমি অস্থির। একবার এ আসে তো একবার ও আসে। ভাল লাগে না কেবল এক কথা বলতে। আমার হাতে সময় বেশী নেই। তার চেয়ে এক কাজ করো। সবাই এক-সংগে এসো। যার যা জিজ্ঞাসা করবার জিজ্ঞাসা করে নিয়ে লিখে নাও। বারবার ভালো লাগে না।"

রিপোর্টাররা তো থ।

হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়তেই লক্কা বলে উঠল, "তোমাকে তো সব বলেছি। তুমিই বলে দাওনা এদের। তুমি কি লিখেছ —দেখিয়ে দাওনা এদের। সব ল্যাটা চুকে যায়।"

কি করে মহারাজকে বলি এক খবরের কাগজের সংগে আরেক কাগজের কি গলা-কাটা প্রতিযোগিতা। চুপচাপ পালিয়ে এসে-ছিলাম ভিড় থেকে। সেই প্রেস-কনফারেন্সের পরিণতির জন্যে অপেক্ষা করিনি। শুধু এইটুকু জানি গোমড়া মুখ করে হোমরা-চোমরা রিপোর্টাররা সব ফিরে এসেছিলেন।

কয়েকদিন বাদেই সভ্যজগতে বাগীদের ক্ষণস্থায়ী স্বাধীনতা হয়েছে শেষ আর তাদের সঁপে দেওয়া হয়েছে কর্তৃপক্ষের হাতে। বেহড়ের স্বাধীনতাও এর সংগে সংগে হয়েছে শেষ। আবার হয়েছিল সেই চাপা উত্তেজনা, একটা অজানা, অশুভ আতঙ্ক আর থমথমে আবহাওয়া। ভিণ্ড শহরের লোকেরা বোধহয় কখন সেরকম দৃশ্য দেখেওনি, দেখবেও না। যেমন 'হিরো'র অভ্যর্থনা বাগীরা পেয়েছিল তেমনি আবার তাদের হল 'হিরো'র মত বিদায়—হিরো'স সেণ্ড অফ্। আবার হাজার হাজার লোকের ভিড় হয়েছিল বিনোবার প্রার্থনা সভায়। সভার এক কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে পুলিসের ব্ল্যাক-মারিয়া। 'বাবা'র আশীর্বাদ নিয়ে এরা চলল জেলে। আশ্রমের মেয়েরা পরিয়ে দিল কপালে রক্তচন্দন, হাতে বেঁধে দিল রাখী। লক্কা রাখীর বদলে দিল টাকা। 'বাবা'র চরণে প্রণামী দিল অনেকে টাকা। বিদ্যারাম শুরু করল রামধুন "রঘুপতি রাঘব রাজা-রাম"। এককালে পুলিসে কাজ করত বিদ্যা-রাম। রাইফেল চুরির অপরাধে দু'বছর জেল হয়েছিল। জেল থেকে বেরিয়ে হয়েছিল 'বাগী'। সুমধুর কণ্ঠে গাইল বিদ্যারাম আর করতালি দিয়ে জনতা তার সংগে গেয়ে উঠল রঘুপতি রাঘব রাজারাম। ছাদের উপর দাঁড়িয়ে কৌতূহলী জনতার কৌতূহল নিবৃত্ত করল ডাকাতরা, তারপর জয়মাল্য পরে চলে গেল জেলে। পুলিসের গাড়ির পিছনে পিছনে অনেকদূর পর্যন্ত দৌড়েছে জনতা আর ডাকাতদের সংগে গলা ছেড়ে চেঁচিয়েছে "ভারত মাতা কি জয়" "মহাত্মা গান্ধী কি জয়।"

পরদিন 'বাবা' ভিণ্ড ছেড়ে চলে গেলেন পাণ্ডরীর দিকে। জনতার ভিড় কমে এল আর কমে এল কদিনের উৎসাহ, উত্তেজনা আর উদ্দীপনা। যাবার আগে গেলেন ভিণ্ড জেলে। জেলের প্রাংগণে আবার হল প্রার্থনা সভা। বিদ্যারাম আবার ধরল রামধুন। লক্কা বাবাকে অনুরোধ জানাল—সে শুধু একবার নেহরুজীর সংগে দেখা করতে চায়। 'বাবা' বললেন তিনি পণ্ডিতজীকে বলে দেখবেন।

আরেকটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে। জেলে যাবার আগে ডাকাতদের সংগে তাদের আত্মীয় স্বজনদের কয়েক মুহূর্তের মিলন। দূরে থেকে দাঁড়িয়ে দেখেছি সেই অদ্ভুত দৃশ্য। কান্নার রোলে সেদিন 'বাবা'র ক্যাম্প ভরে উঠেছিল। কারুর মা, কারুর ভাই, কারুর স্ত্রী-পুত্র। কারো চোখে জল, কেউ চিৎকার করে কাঁদছে আর কেউবা আনন্দের আতিশয্যে ছুটোছুটি করছে। সে দৃশ্য ভোলা যায় না, ভুলবার কথা নয়।

কিন্তু আরেকদিনের কথা তো বলা হল না। আমার প্রতিজ্ঞা আমি রাখতে পারিনি। বলেছিলাম কোনোদিন যাব না সেই গাঁয়ে। কিন্তু আমায় আবার যেতে হয়েছিল সেই গাঁয়ে। জানতাম সেখানে গেলেই আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সে প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে ছিল না, আজও নেই। কিন্তু তবুও আমায় যেতে হয়েছিল উদিতপুরায় আবার।

বাড়ির দরজায় হাত রেখে ঝাপসা চোখে দাঁড়িয়েছিল রুক্মিণী। 'বাবা' আসছেন তার গাঁয়ে আর আসছে তার স্বামীর আদরের লক্কা। আরো বৃদ্ধা হয়েছে রুক্মিণী। চোখের দৃষ্টি আরও ক্ষীণ হয়েছে।

"আও বেটা। বড়োদিন বাদ আয়ে"—ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেলেছিল রুক্মিণী যখন "মাজী" বলে ডেকে তার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। (ক্রমশ)

তৈল জগতের শ্রেষ্ঠ অবদান
ভারতের 'পতাকা মার্কা'
ফোন৩৫-২৭৭৪ প্যাকিং সরিষার তৈল
ভারত অয়েল মিল

Amico's
GREEN LINIMENT

আপনি নিশ্চয় দৈহিক ব্যথায় যন্ত্রণা পাচ্ছেন- কোথায়?
কোমরে, হাঁটুতে, কিম্বা কোন সন্ধিস্থানে?
শুনে খুশী হবেন-
শারীরিক, বুক বা পিঠের পাঁজরায়
বাতের ইত্যাদি যাবতীয় ব্যথায়
এ্যামিকো গ্রীন লিনীমেণ্ট
(সবুজ মালিশ)
বাস্তবিকই নির্ভরযোগ্য।
মূল্য বড় শিশি ২'৭৫ নঃ পঃ
ছোট শিশি ১'৭৫ নঃ পঃ
"মাশুল" স্বতন্ত্র
ব্যবস্থাপত্রের জন্য লিখুন—
আমিন এণ্ড ইসমাইল প্রাইভেট লিঃ
৬০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

॥ ৫ ॥

গোলবাগান আর বড়বাগানের মাঝে টালির ছাদ দেওয়া একখানা চালাঘর ছিল, তার চার পাশ ছিল খোলা, কোনোদিকে কোনো দেয়াল ছিল না। সেই ঘরের মেঝেয় ছিল তিনখানা লোহার বেঞ্চি আর একখানা লোহার টেবিল। টেবিলের গোল মাথাটায় ছিল চীনে রাশিচক্রের ডিজাইন জাফ্রি করে কাটা। ঘরের একদিকে ছিল এক বুগেন-ভেলিয়া লতা আর অন্যদিকে এক নাম-না-জানা বিদেশী লতাগুচ্ছ। বহুদিনের পুরনো দুটো গাছ। এদের মোটা মোটা ডালপালা জড়িয়ে জড়িয়ে কালো কালো দড়াদড়ির মতো ছাদে উঠে সমস্ত ছাদটাকে ঢেকে ফেলেছিল। তারই ঘন-পাতার সবুজ ঘেরা-টোপে সারা বছর সাজানো থাকত এই চালা-ঘরের ছাদ। আর সেই পাতা আর ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে পাখির দল নিশ্চিন্তে বাসা বাঁধত। মৌমাছিরা করত চাক। এই বিদেশী লতাটা বিরাট আকৃতি ধারণ করেছিল। তার ঘন পাতার আড়ালে বুগেন ভেলিয়ার ফুল ফুটতে পেত না। তার নিজের ডালে ডালে প্রায় বারোমাসই ফুটত অজস্র ছোট ছোট সাদা ফুল। আর এই সাদা ফুলের মধ্যে মাছি আটকা পড়ত পালে পালে। কি যে সে লতার নাম তা যোগী মালীও জানত না, সর্দার মালীও নয়। এই ছিল আমাদের 'সামার হাউস', আমাদের আশ্রয়, আমাদের নীড়। বাগানে খেলছি, হঠাৎ বৃষ্টি এসে গেছে, ছুটতুম সামার হাউসে মাথা বাঁচাতে। বর্ষার সময় অক্লান্ত বৃষ্টিতে বাড়িতে বসে আর ভালো লাগছে না, ছুটলুম গাছে ঢাকা সেই ঘরে। লোহার বেঞ্চির উপর বসে সামার হাউসের চারিপাশে ঘেরা বাগানের ঘাসের উপর বৃষ্টির খেলা দেখতে দেখতে মন খুশী হয়ে উঠত। গ্রীষ্মের প্রখর দুপুরেও সেখানকার শীতল আশ্রয়ে কত সময় পালিয়ে আসতুম আর শুনতুম গাছে-ঢাকা ছাদ থেকে ভেসে আসা ঘুঘুর অক্লান্ত ডাক।

এই সামার হাউসের একটা অংশ ছিল জাল দিয়ে ঘেরা। ঘেরা অংশের মেঝে ফুঁড়ে বসানো ছিল ডাল-পালাওয়ালা একটা গাছের শুকনো গুঁড়ি। এটি এককালে ছিল দাদামশার পাখির খাঁচা। দাদামশায় পালে পালে পখি কিনে এনে এই খাঁচার মধ্যে ভরতেন। তারা জল খেয়ে, দানা খেয়ে, গাছের ডালে বসে ক'টা দিন কাটাতো, তারপর দাদামশায় আস্তে আস্তে তাদের ছাড়তে আরম্ভ করতেন। দাদামশার বিশ্বাস ছিল, এইভাবে ছেড়ে দিলে তারা জোড়াসাঁকোর বাগানের পরিসীমার মধ্যেই থেকে যাবে। শহরের মধ্যে বনের পাখি যাবে কোথায়? শহরের মধ্যে জোড়াসাঁকোর বাগান ছিল পাখিদের একটা 'ওয়েসিস্'—কাজেই সেখানেই তাদের থাকতে হবে। পালাতে গেলেও ঘুরে ফিরে আবার ফিরে আসতে হবে। বেশ কিছুদিন পাখিগুলো থেকেও যেত। গোলবাগানের ফোয়ারায় ডানা ঝট-পট্ করে স্নান করত। সিসু গাছে বসে শিস্ দিত। পোকা-মাকড় ধরে খেত। ক্বচিৎ কখনও দানাও খেয়ে যেত। তারপর ধীরে ধীরে তাদের দল কমতে থাকত। জোড়া-সাঁকোর ওয়েসিস্ ছেড়ে বুনো-পাখির দল কোন বনে যে উড়ে পালাতো তার খবর কেউ

গোলবাগানের একাংশ

পেত না। তারপর সব পাখি একে-একে চলে গেলে দাদামশায় আবার এক ঝাঁক পাখি কিনে আনতেন। আবার ঐ খাঁচার মধ্যে তাদের দিনকতক আশ্বস্ত করে রেখে বাগানে ছাড়া হতে থাকত। বাগানের মধ্যে তাদের ভুলিয়ে রাখার জন্যে ডালে-ডালে বাসা বেঁধে দেওয়া হত। ঝোপ ঝাড় কুঞ্জবন বানিয়ে তাদের নিরালা নির্ভয় জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করা হত। ঘর বাঁধুক, বাচ্চা পাড়ুক, সংসার পেতে বসুক—এই ছিল দাদামশার মনের ইচ্ছে। মায়ায় পড়ে পাখিরা রয়ে যেত কিছুদিন জোড়াসাঁকোর ঐ বাগানে। তারপর কবে আবার বনের দুর্বার ডাক এসে পৌঁছত। একদিন দেখা যেত বনের পাখিরা সব বাগান ছেড়ে পালিয়েছে।

দাদামশার এ খেলা আমরা অবশ্য দেখিনি। দাদামশার মুখেই শুনেছিলুম এর গল্প। খেলার চিহ্ন সামার হাউসের লাগাও সেই জালের খাঁচাটা দেখেছি।

একদিন শীতকালের দুপুর। শীত বেশ পড়েছে। রোদে পা দিয়ে বসে থাকতে ভালো লাগে। আমরা ক'টি ছেলে সামার হাউসে বসে শীতের রোদ পোয়াচ্ছি, দক্ষিণ দিক থেকে হিজল গাছের মাথার উপর দিয়ে মিঠে রোদ এসে পড়েছে পাথরের মেঝেতে। এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়ল গোল-বাগানের ফোয়ারায় চীনে বাড়ির উপর এক আশ্চর্য পাখি। এক সাদা রংএর বুলবুলি। বুলবুলি চিরকেলে কালো। সাদা রংএর বুলবুলি একেবারে অবিশ্বাস্য। দেখেও প্রত্যয় হয় না। আমরা ঠিক করলুম ওটাকে ধরতে হবে। আর স্থির হয়ে বসে থাকা অসম্ভব হল। আমাদের চঞ্চলতা আর ছুট্‌ফটানি দেখেই বোধহয় একটা তীক্ষ্ন ডাক দিয়ে বুলবুলিটা উড়ে গিয়ে বসল সিসু গাছে।

আমি ছুটলুম দোতলার বারান্দায় দাদামশাকে খবর দিতে—বাগানে একটা সাদা বুলবুলি এসেছে।

দাদামশায় শুনে মহা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। ছবি আঁকা টাকা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বল্লেন—বলিস্ কি রে! কই দেখি। ঠিক দেখেছিস্ তো?

আমি বল্লুম—ঠিক দেখেছি। সিসু গাছে গিয়ে বসেছে।

দোতলার বারান্দার পুব দিকে প্রকাণ্ড সিসু গাছ। তার মোটা গুঁড়ি দু'ভাগে ভাগ হয়ে দুই বাহুর মতো আকাশে উঠেছে। এই দুই বাহুর মাঝখানে একসময় ডালপালা ছিল। এক জাপানী উদ্যান-শিল্পী একদিন দোতলার লাইব্রেরী-ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে দাদামশাদের দেখালে যে ঐ ফালতু ডালগুলো কেটে বাদ দিলে সিসুগায়ের দুই বাহুর ঠিক মাঝখান দিয়ে প্রভাতের সূর্যোদয় এবং সন্ধ্যার পূর্ণ চন্দ্রোদয় দুই-ই ছবির মতো দেখা যাবে। ডাল কেটে ফেলা হল। আমরা জন্মে অবধি সিসুগাছকে ঐ রূপেই দেখেছি। সোনার থালার মত কত চন্দ্রোদয় দেখেছি তার মধ্যে দিয়ে তার ঠিক নেই।

সিসুগাছের চূড়োর ঝুঁটি মাথায়, ঘাড় উঁচু করে দৃপ্ত ভঙ্গিতে রাজপুত্রের মতো সাদা বুলবুলি বসে আছে দেখা গেল।

দাদামশায় দেখে বললেন—সত্যিই তো! এ পার্শিয়ার বুবুল—শা-বুলবুল!

ফোয়ারার ধারে নেমেছিল শুনে বল্লেন—আবার আসবে। তোরা গোল করিস্‌নে। খাঁচা পাত। চল্ সামার হাউসে গিয়ে লুকোই সবাই।

দাদামশার ছবি আঁকা ঘুচে গেল। একটা বাঁশের খাঁচা যোগাড় হল। খানিকটা ছাতু আর কলা। দাদামশায় বল্লেন—খাঁচার মধ্যে খানিকটা লাল রংএর ঘুড়ির কাগজ ঝুলিয়ে দে—রং দেখে আসবে। তা-ও হল। তারপর

সবাই মিলে আমরা সামার হাউসে লুকিয়ে বসে রইলুম। বাড়িতে অনেক ছেলে মেয়ে, অনেক লোক। সকলের কাছে খবর গেল বাগানে সাদা বুলবুল এসেছে, ধরার চেষ্টা হচ্ছে, কেউ যেন গোলযোগ করে তাড়িয়ে না দেয়।

সমস্ত বাড়ি যখন চুপচাপ হয়ে গেল, সাদা বুলবুলি আবার এল ফোয়ারার ধারে, এবারে তার সংগে এল এক কালো বুলবুলি।

দাদামশায় বল্লেন—দেখছিস্ কেমন সেথো জোগাড় করে এনেছে! খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর দুটো পাখিই উড়ে এসে খাঁচার উপর বসল।

দাদামশায় বল্লেন—খাঁচা চিনেছে। এ ধরা না পড়ে যায় না!

আমাদের তখন ভয়ানক উত্তেজনা। নিঃশ্বাস বন্ধ করে সব পড়ে আছি, কিন্তু বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটছে।

কলা আর ছাতুর লোভে অবশেষে সাদা বুলবুলিটা খাঁচায় ঢুকল। কালোটা বাইরেই রইল।

এখন কি করা যায়? দাদামশায় আমাকে পাঠালেন—যা শিগগির গিয়ে দরজা বন্ধ করে দে।

আমি হামাগুড়ি দিয়ে দৌড়ে গেলুম। কিন্তু কাজটা কি অতই সহজ? পার্শিয়ার শা-বুলবুল। আমি পৌঁছবার আগেই বুলবুলি খোলা দরজা গলে উড়ে পালাল।

—যাঃ পালাল! খাঁচার দরজায় সুতো বেঁধে রাখতে ভুলে গেচিস্ তোরা! —বলে দাদামশায় উঠলেন।

বুলবুলিটা কোথায় যে পালিয়ে গেল, সেদিনের মতো তাকে আর দেখতে পেলুম না।

পাখি ধরার আশা ত্যাগ করে আমরা ঘরে ফিরলুম। দাদামশায় কিন্তু একটুও স্ফূর্তির অভাব নেই। বললেন—শহরের মাঝে কি-বাগান বানিয়েচি দেখছিস্—পার্শিয়া থেকে শা-বুলবুল উড়ে আসচে!

পরদিন সকাল বেলা দাদামশায় বারান্দায় বসে ছবি আঁকতে আঁকতে হঠাৎ লাফিয়ে উঠেছেন। কানে এসেছে তীক্ষ্ণ এক বুলবুলির ডাক—পীক্ পীক্রু! হাঁকাহাঁকি শুরু করেছেন—মোহনলাল, মোহনলাল! শিগগির আয়! এ শা-বুলবুলের ডাক না হয়ে যায় না! দেখ্ কোথায় বসলো!

আমি পড়ার বই ফেলে ছুটে বারান্দায় চলে এলুম। তারপর দুজনে মিলে এ-গাছ খুঁজি, ও-গাছ খুঁজি, শেষে চোখে পড়ল, দেবদারু গাছের পাতার ফাঁকে সাদা একটি ফোঁটা!

নিঃশব্দে আবার খাঁচা পাতা হল গোল-বাগানের ফোয়ারার ধারে। দাদামশায় নেমে এলেন সামার হাউসে। বল্লেন—ফোয়ারার ধারে ওকে আসতেই হবে জল খেতে, দেখ্ না। এবারে খাঁচার দরজায় সুতো বেঁধে আমরা তৈরী হয়ে রইলুম। ধৈর্য ধরে, অপেক্ষা করার পর সাদা-কালো দুটো বুলবুলিই এল আমার খাঁচার উপরে। তারপর খানিকক্ষণ নিঃশব্দে অপেক্ষা করার পর হল কি, সাদার বদলে কালোটা ঢুকল খাঁচার মধ্যে।

—দে সুতো টেনে।

সুতো টানতেই কালো বুলবুলি ধরা পড়ে গেল। দরজা পড়ার শব্দে শা-বুলবুলি পালাল উড়ে।

তখন দাদামশায় কালোটাকে আর-একটা বাঁশের খাঁচায় বন্দী করে অন্য খাঁচাটার দরজা খুলে রেখে দিলেন। বললেন—এইবার ওর সেথোর টানে সাদাটাকে আসতেই হবে।

কিন্তু সেই যে সে গেল, সাদা-বুলবুলি আর ফিরল না। তারপর হঠাৎ আর একদিন এসে হাজির। সংগে নতুন একটা কালো-বুলবুলি, নতুন সেথো।

আমাদের নাওয়া-খাওয়া ঘুচে গেল। সারাদিন কেবল সাদা বুলবুলির পিছনে। অপেক্ষা করছি তো অপেক্ষাই করছি। কোথায় যে মাঝে মাঝে লুকিয়ে পড়ত বুলবুলিটা, তার কোনো চিহ্ন পাওয়া যেত না। তারপর হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ ডাক শোনা যেত। ডাক শুনেই চেনা যেত শা-বুলবুলির ডাক। খাঁচার দরজা খুলে বসে থাকতুম আমরা। শীতকালের সারা দুপুর সামার হাউসেই কেটে যেত। দাদামশায় আমাদের সংগে। কিন্তু সাদা বুলবুলি ধরা দিত না।

বুলবুলিটা যেন সারা বাগানকে যাদু করে রেখেছিল। গাছে গাছে বুলবুলি ডাকত। তাদের ডাকে খাঁচায় ধরা বুলবুলি সাড়া দিয়ে উঠত। তার মাঝে হঠাৎ শোনা যেত শা-বুলবুলির উচ্চ ডাক—পীক্ পীক্ পীক্রু! সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার সাদা বুলবুলিটা যখন আসত একটা-না-একটা কালো বুলবুলিকে সংগে নিয়ে

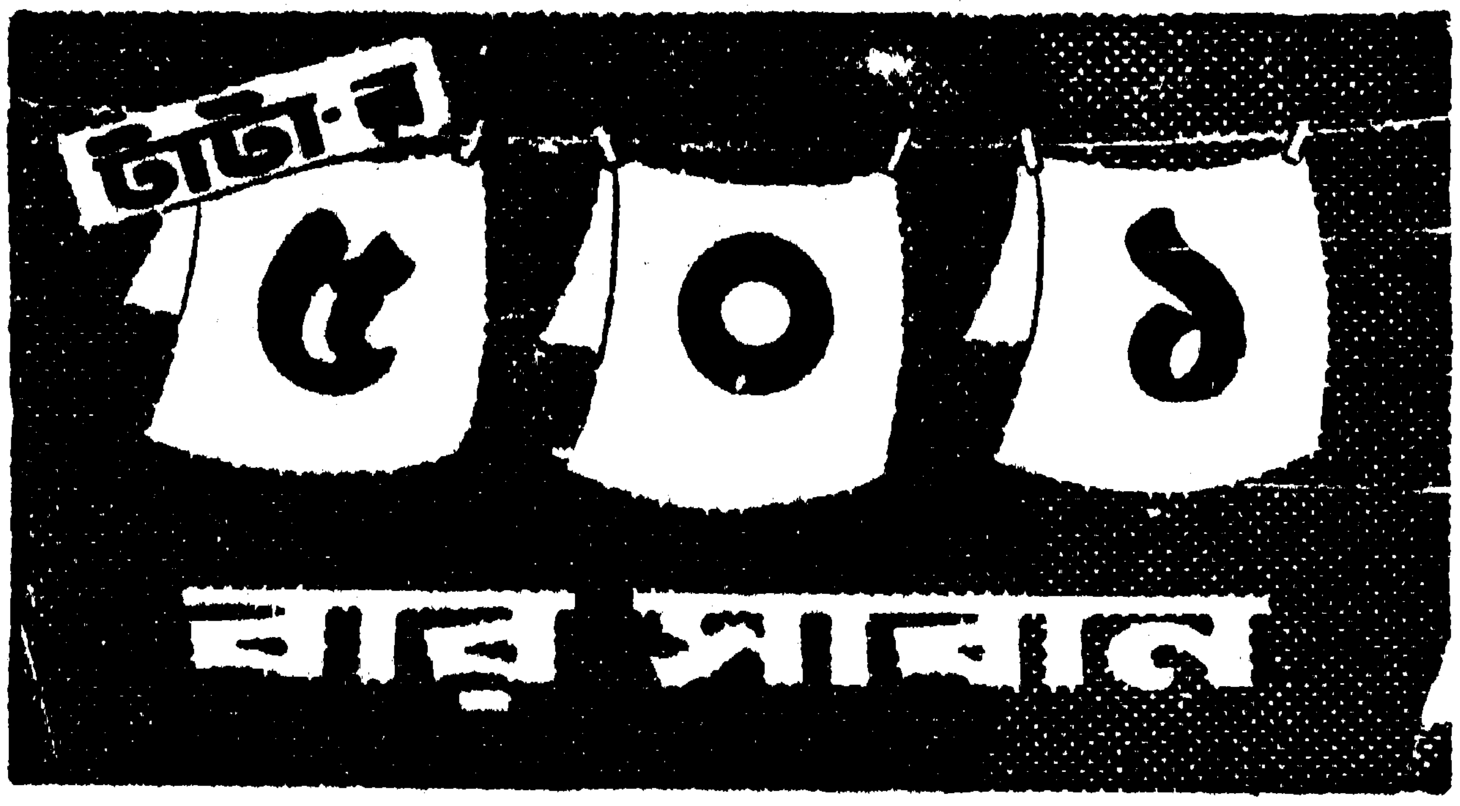

গ্রীষ্ম দিনে-ও
স্নিগ্ধ সজীবতা

গ্রীষ্মের খরতাপে ক্লেদাক্ত আবহাওয়ায় আপনি যখন বিব্রত তখন আপনার একান্ত প্রয়োজন বোরোলীনের মতো মিষ্টি আর স্নিগ্ধ ফেস্ ক্রীম। ল্যানোলিন-যুক্ত বোরোলীন ত্বকের গভীরের সমস্ত মালিন্য দূর ক'রে আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য বাড়িয়ে আপনার ত্বক-কে স্নিগ্ধ ও সজীব ক'রে তুলবে।

বোরোলীন
পরম প্রসাধন

প্রস্তুতকারক:
জি. ডি. ফার্মাসিউটিক্যালস্ প্রাইভেট লিমিটেড,
কলিকাতা-৩

adarts-60

চলে আসত ফোয়ারার ধারে। নিজে কখনো কখনো খাঁচার উপরে এসে বসত। হয়তো খাঁচার বুলবুলিটার সঙ্গে কথা-ও কইত। কিন্তু ভিতরে ঢুকত না। ভিতরে ঐ একবারই ঢুকেছিল।

কালো বুলবুলিগুলো বোকার মত ভিতরে ঢুকে যেত আর ধরা পড়ত। একবার ধরা পড়ে গেলে শা-বুলবুলি তার সেথোর দিকে আর ফিরেও তাকাত না। উড়ে যেত নতুন সঙ্গীর খোঁজে।

সেবারে একটার পর একটা এমনি করে অনেকগুলো কালো বুলবুলি আমরা ধরেছিলুম। সাদা বুলবুলিকে পারিনি।

দাদামশায় বলতেন—এ বড় ভয়ানক পাখি! পাখি সেজে পারশিয়া থেকে কে এল, কে জানে?

তারপর একদিন বসন্তকালের আরম্ভে শা-বুলবুলি কোথায় যে চলে গেল, আর ফিরে এল না। জোড়াসাঁকোর বাগান ছেড়ে হয়তো পারস্যের কোন ঝরনা-ধোওয়া সবুজ বাগিচায়!

সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি সামার হাউসে হাজিরা দেওয়ার পালা-ও আমাদের চুকল। (ক্রমশ)

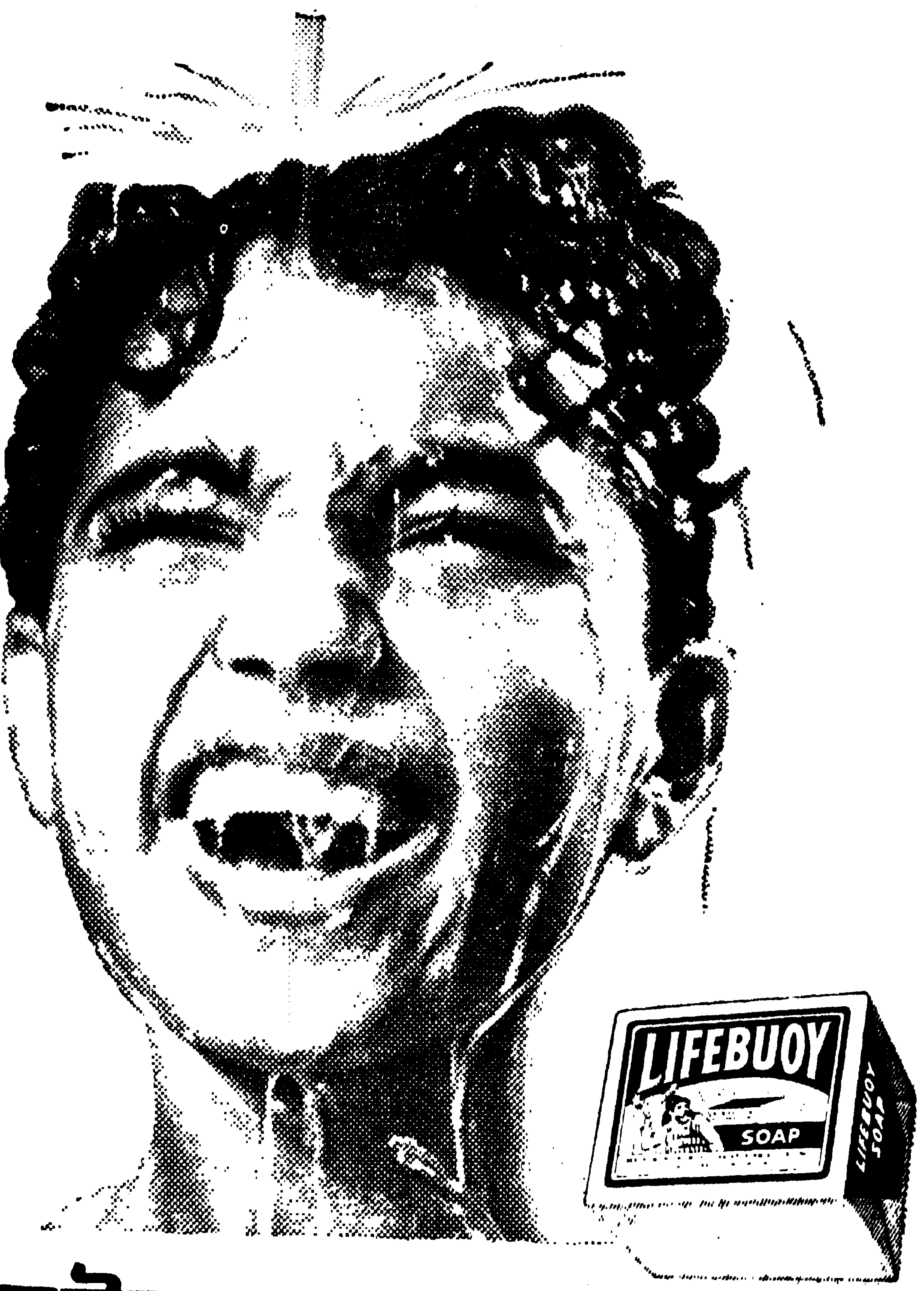

লাইফবয় যেখানে
স্বাস্থ্যও সেখানে!

আঃ! লাইফবয়ে স্নান করে কি আরাম! আর স্নানের পর শরীরটা কত ঝরঝরে লাগে! ঘরে বাইরে ধুলো ময়লা কার না লাগে—লাইফবয়ের কার্যকারী ফেনা সব ধুলো ময়লা রোগ বীজাণু ধুয়ে দেয় ও স্বাস্থ্য রক্ষা করে। আজ থেকে আপনার পরিবারের সকলেই লাইফবয়ে স্নান করুন।

L. 16-X52 BG

॥ কঙ্গো

GOVERNMENT LIBRARY

তরুণবিকাশ লাহিড়ী

বিশ্বের দুঃসাহসী অভিযাত্রীদের মধ্যে একটি বিশেষ নাম, হেনরি মর্টন স্ট্যানলি। তিনি মধ্য-আফ্রিকার গহন অরণ্যের গোপন রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন, একটি ছায়াস্নিগ্ধ বিশাল দেশ কঙ্গোর সাথে বিশ্ববাসীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এক বিপদসংকুল অভিযানের নেতা হিসাবে যে মর্যাদা তাঁর প্রাপ্য, স্ট্যানলির উদ্দেশ্য স্মরণ করলে সেই গৌরবের অনেকখানিই ম্লান হয়ে যায়। বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড ১৮৭৮ সালে স্ট্যানলিকে কঙ্গোতে পাঠান। কঙ্গো উপত্যকার ঐশ্বর্য অনুসন্ধান ও বেলজিয়ান ঘাঁটি স্থাপনের জন্য কয়েকটি সুবিধাজনক স্থান নির্বাচনই ছিল স্ট্যানলির কঙ্গো অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ করেই লিওপোল্ডের সৈন্যরা কঙ্গোয় প্রবেশ করেছে। ক্রমে নয় লক্ষ বর্গমাইল এলাকাযুক্ত এক সুবিশাল দেশ ইউরোপের অতি ক্ষুদ্র রাজ্য বেলজিয়ামের অধিকারে এসেছে। অবশ্য সরাসরি যুদ্ধ-বিগ্রহের দ্বারা বেলজিয়ামকে কঙ্গো দখল করতে হয়নি, মধ্য-আফ্রিকায় বেলজিয়ামের অনুপ্রবেশের মূলে সামরিক কার্যকলাপ অপেক্ষা কূটকৌশলের অবদানই অধিক।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আফ্রিকার ওপর বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির দৃষ্টি পড়ে। এর পূর্ব পর্যন্ত ভারত ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জই তাদের প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল। আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক প্রভুত্ব বিস্তারের ইতিহাস পর্যালোচনা করে ইসাইয়া বোম্যান বলেছেন, ‘অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ না হতেই এশিয়ার রাজ্যগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে যাওয়ায় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির পক্ষে অর্থনৈতিক শোষণের জন্য একটি নূতন দেশ আবিষ্কার করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আফ্রিকা এই দিক দিয়ে অতুলনীয়। এর আয়তন বিরাট, ঐশ্বর্য বিপুল। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় প্রচুর কাঁচা মালের সন্ধান এই মহাদেশে পাওয়া গেল। শোষণের একটি বিরাট নূতন ক্ষেত্র আবিষ্কার হওয়ায় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি আফ্রিকার বিভিন্ন অংশে নিজ নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর হল।’ অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেও কতকগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ক্ষতচিহ্নের মত আফ্রিকার বুকের ওপর পর্তুগাল, বৃটেন, ফ্রান্স ও হল্যান্ডের কয়েকটি ক্ষুদ্র উপনিবেশ ছিল। তবে সেই উপনিবেশগুলি প্রধানত ক্রীতদাস সংগ্রহের বন্দর হিসাবেই ব্যবহৃত হত, উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে মূল ভূখণ্ড দখল করার বিশেষ কোনও চেষ্টা ইউরোপীয় শক্তিরা করেনি।

বেলজিয়াম একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা পায় ১৮৩০ সালে। এত দেরিতে স্বাধীনতা পাওয়ার ফলে এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারে এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি কোনও অংশ গ্রহণ করতে পারেনি। বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড উচ্চাভিলাষী ছিলেন। এশিয়ায় ঠাঁই না পেয়ে, নব-আবিষ্কৃত মহাদেশ আফ্রিকায় ঐশ্বর্য আহরণ করে বেলজিয়ামকে একটি বৃহৎ শক্তিতে পরিণত করতে উদ্যোগী হলেন। স্ট্যানলির সাহায্যে তিনি দ্রুত কঙ্গোর কয়েকটি স্থানে বেলজিয়ান ঘাঁটি স্থাপন করলেন। ইউরোপের অন্যান্য শক্তিরা বেলজিয়ামের এই কার্যকলাপে কোনও আপত্তি করল না, দুর্গম অরণ্যের গোপন বিভবের কথা ত তাদের জানা ছিল না। বরং আফ্রিকায় নিজ নিজ এলাকার সীমানা নির্ধারণের জন্য ১৮৮৪-৮৫ সালে বার্লিনে যে ঔপনেবেশিক রাষ্ট্রগুলির সম্মেলন হয়, তাতে বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ডকেই সর্বসম্মতিক্রমে কঙ্গোর অধিপতি বলে ঘোষণা করা হয়। এর পর বিশ বছর ধরে এই শক্তিমান নৃপতি কঙ্গোকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে ব্যবহার করে এসেছেন, যথেচ্ছ শোষণ করেছেন। ১৯০৮ সালে বেলজিয়ান পার্লামেণ্ট কঙ্গোর শাসন-ভার গ্রহণ করে।

ছয়টি প্রদেশ নিয়ে কঙ্গো একটি বৃহৎ দেশ। প্রথম মহাযুদ্ধের পর এর আয়তন আরও বেড়েছে। কঙ্গোর পূর্ব প্রান্ত সংলগ্ন জার্মান-অধিকৃত রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি অঞ্চলটি রাষ্ট্রসংঘের ব্যবস্থা অনুযায়ী বেলজিয়ান কঙ্গোর শাসনাধীন হয়েছে। বনজ, কৃষিজ আর খনিজ, এই তিন রকম সম্পদেই কঙ্গো পৃথিবীর মধ্যে এক ঐশ্বর্যশালী দেশ। কঙ্গোর দক্ষিণের দুইটি প্রদেশ, কাটাঙ্গা ও কাসাই, সর্বাপেক্ষা বেশী সমৃদ্ধ। কাটাঙ্গায় শুধু যে বিপুল পরিমাণ তাম্র সঞ্চিত রয়েছে তাই নয়, এখানে স্বর্ণ, টিন, কোবাল্ট প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আণবিক যুগের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মহার্ঘ্য বস্তু ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামও রয়েছে কাটাঙ্গায়। পশ্চিম পার্শ্ববর্তী কাসাই প্রদেশটিও কম সম্পদশালী নয়। কাসাই নদীর বালু থেকে জগতের সবচেয়ে বেশী পরিমাণ হীরক আহরণ করা হয়। দক্ষিণে যেমন খনিজ সম্পদ, উত্তরে তেমনি

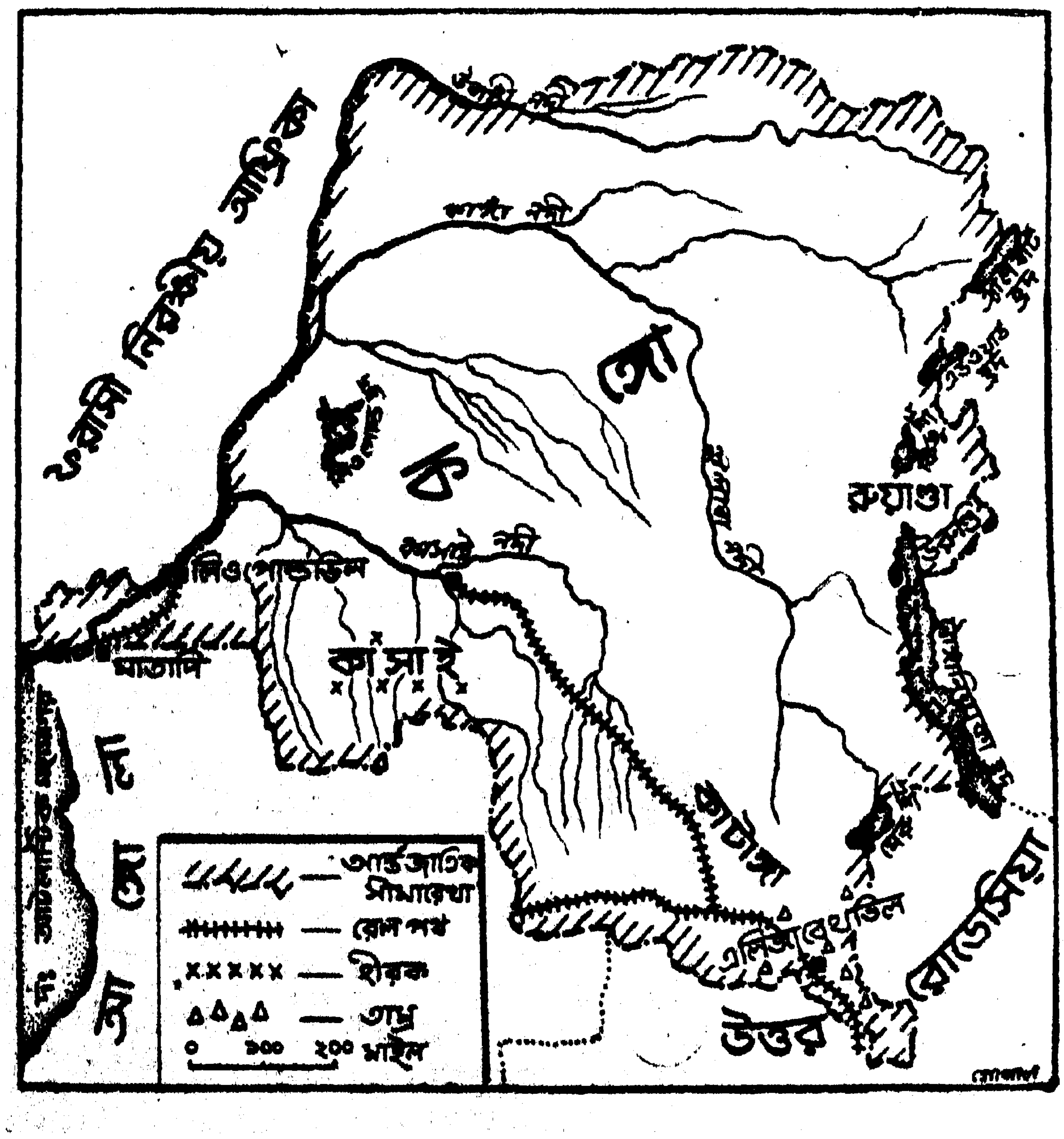

বনজ ও কৃষিজ সম্পদের প্রাচুর্য। উত্তরের বনাঞ্চল হতে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ উদ্ভিদ তৈল, রবার, কফি, কোকো, সিংকোনা প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি হয়।

ভৌগোলিক দিক দিয়ে বিচার করলে কঙ্গোর অখণ্ডতা রক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন। এই দুর্গম দেশটিতে এখনও যথোপযুক্ত রেলপথের বিস্তার হয়নি, যোগাযোগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নদী-পথের উপর নির্ভর করতে হয়। দেশের মধ্যস্থল দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে কঙ্গো নদী, উত্তর হতে বহু শাখা প্রশাখাযুক্ত উবাঙ্গী আর দক্ষিণ হতে কাসাই লুলাবা, লুফিয়া প্রভৃতি নদী এসে যোগ দিয়েছে প্রধান নদী কঙ্গোর সংগে। উপনদীগুলির যোগদানে পুষ্ট কঙ্গো রাজধানী লিওপোল্ডভিলের পাশ দিয়ে মাতাদি-বন্দরের মোহানায় আটলাণ্টিক মহাসগরের সংগে মিলিত হয়েছে। মাতাদি কঙ্গোর একমাত্র সমুদ্র-বন্দর, লিওপোল্ডভিল থেকে মাতাদি পর্যন্ত কঙ্গো নাব্য নয়, এই পথটুকুর জন্য রেলপথের সহায়তা গ্রহণ করতে হয়। নতুবা বৃষ্টিবহুল কঙ্গোয় নদীপথই বাণিজ্যের সর্ব-প্রধান সহায়ক। অরণ্য-সঙ্কুল দেশে কঙ্গো ও তার উপনদীগুলিই সর্বাপেক্ষা সহজ ও সুলভ বাণিজ্য পথ। বেলজিয়ান সরকার একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা, 'উনাত্রার' মাধ্যমে সমস্ত নদীপথগুলি নিয়ন্ত্রণ করতেন। তারা জানতেন, এই কাজে একাধিক প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব থাকলে সরবরাহ ব্যবস্থায় জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। আজ যদি আভ্যন্তরীণ কলহের দরুণ কোন একটি উপনদী ভিন্ন শাসনের অধীন হয় তবে সেই নদীর পর্যাংক বহির্জগৎ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, তার অর্থনৈতিক বনিয়াদ বিপর্যস্ত হবে। বিমানের সাহায্যে আপৎকালীন অবস্থায় হয়ত কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু আকাশ-পথে বাণিজ্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল, সেই ব্যবস্থা কখনই বেশীদিন চলতে পারে না। একথা কঙ্গোর সম্বন্ধে আরও প্রযোজ্য, কারণ, কঙ্গোর পণ্যদ্রব্যের অধিকাংশই গুরুভার—খনিজ বা বনজ দ্রব্য।

কেবলমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা অটুট রাখার জন্যই নয়, আরও একটি অর্থনৈতিক কারণে কঙ্গোর অখণ্ডতা প্রয়োজন। আয়তন অনুপাতে কঙ্গোর লোকসংখ্যা অত্যন্ত কম, মোট জনসংখ্যা মাত্র এক কোটি বাইশ লক্ষের মত। প্রতি বর্গমাইলে দশজনেরও কম লোক বাস করে। একমাত্র ব্যতিক্রম রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি। এই ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যা প্রায় একশ চল্লিশ জন। এই কারণে সবল দেহ ওয়াহুতু ও ওয়াতুসি সম্প্রদায়ের বাসভূমি রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডিকে কঙ্গোর 'শ্রমিকের আড়ত' বলা হয়। ওয়াহেতুরা কাজ না করলে কাটাংগার তামার খনিগুলি অচল হয়ে পড়বে, আবার কাটাংগায় রুজি রোজ-গারের পথ বন্ধ হলে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত রুয়াণ্ডায় ভীষণ অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেবে। এইসব কারণে, নদীপথের বিন্যাসে, জনবসতির আঞ্চলিক তারতম্যের বিচারে, বিচিত্র প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ দেশের বিভিন্ন অংশে যেভাবে বণ্টন করা আছে সেই বিবেচনায় কঙ্গোর অখণ্ডতা বজায় রাখা প্রয়োজন। নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্যই প্রদেশগুলির একটি কেন্দ্রীয় শাসনের আনুগত্য স্বীকার করা উচিত। অন্যথায় কঙ্গোর স্বয়ংসম্পূর্ণতা নষ্ট হবে, খণ্ড রাজ্যগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অর্থ-নৈতিক কাঠামো বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।

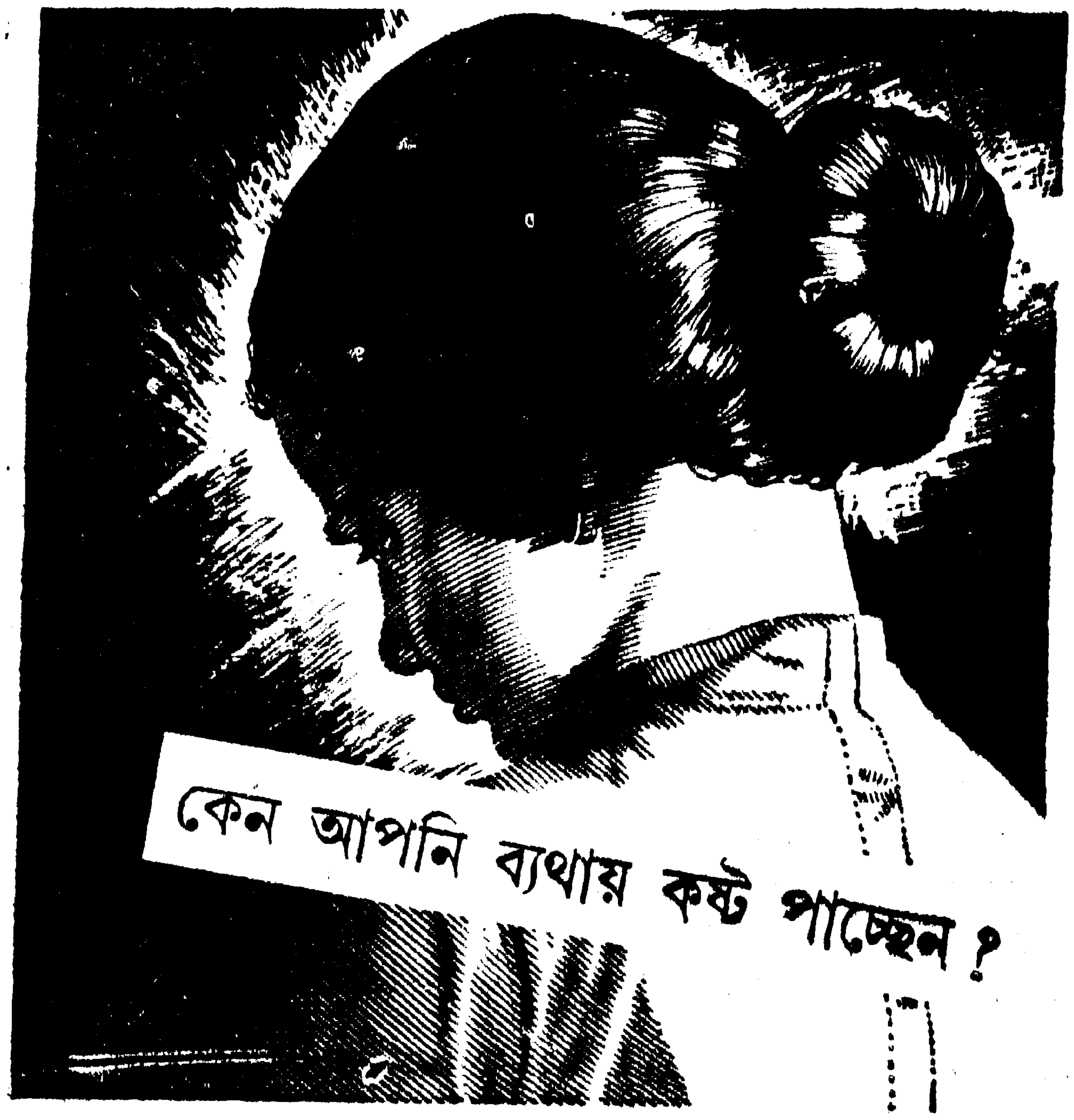

সারিডন খেলেই তো তাড়াতাড়ি ও নিরাপদে ব্যথা দূর হয়!

ব্যথাবেদনায় আর কষ্ট পেতে যাবেন না— সারিডন আপনার অস্বস্তিকর দিনগুলোয় ব্যথাবেদনার দ্রুত উপশম এনে দেবে।

সারিডন-এ অনিষ্টকর কোন কিছু নেই, এতে হার্টের কোন ক্ষতি বা হজমের কোন গোলমাল হয় না। তার ওপর বিশেষ উপাদানে তৈরি ব'লে সারিডন আশ্চর্যরকম তিনটি কাজ দেয়—এতে যন্ত্রণার উপশম হয়, মনের স্বাচ্ছন্দ্য আসে ও শরীর ঝরঝরে লাগে।

মাথা-ধরা, গা-ব্যথা, দাঁতের যন্ত্রণা এবং সাধারণ ব্যথা বেদনায়, তাড়াতাড়ি আরাম পেতে হ'লে সারিডন খান... সারিডন নিরাপদ বেদনা-উপশমকারী।

★ সারিডন স্বাস্থ্যসম্মত মোড়কে থাকে, হাতে ধরা হয় না।
★ সারিডন একটি ট্যাবলেটের দাম মাত্র বারো নয়া পয়সা।
★ একটি সারিডন-ই প্রায় ক্ষেত্রে পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে পুরো এক মাত্রা।

একটিই যথেষ্ট
একটি ট্যাবলেট ১২ নঃ পঃ

একমাত্র পরিবেশক:
ভলটাস লিমিটেড

JWT. VT

একমাত্র কাটাঙ্গার পৃথগম হবার পক্ষে কিছুটা সুবিধা রয়েছে। এই সমৃদ্ধ প্রদেশটি রোডেশিয়ার মাধ্যমে বহির্জগতের সংগে যোগসূত্রটি কোনক্রমে বজায় রাখতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, কাটাঙ্গা রোডেশিয়ার মালভূমিরই অংশবিশেষ। অর্থনীতির দিক দিয়েও রোডেশিয়ার সাথে তার নিবিড় যোগ আছে। রোডেশিয়ার কয়লা কাটাঙ্গার খনিগুলির পক্ষে অপরিহার্য। তবে মালভূমির ঢাল উত্তরাভিমুখী হওয়ায়, কাটাঙ্গার প্রায় সব নদীগুলিই যোগ দিয়েছে কঙ্গোর সাথে। কেন্দ্রস্থল দিয়ে প্রবাহিত এই বিপুলা নদীটির বাহু-বন্ধনে দূরবর্তী প্রদেশটিও বাঁধা পড়েছে। কাটাঙ্গার এই সুবিধা আছে বলে, রোডেশিয়া বা কঙ্গো যে কোনও একটি রাজ্যের সাথে যুক্ত হবার সুযোগ থাকার দরুণ, এই খনিজ-পদার্থ-সমৃদ্ধ প্রদেশটিকে কঙ্গোর 'ভরকেন্দ্র' বলা হয়। লক্ষ্য করবার বিষয়, এই 'ভরকেন্দ্র' হতেই সাম্প্রতিক গোলযোগের সূত্রপাত হয়েছে।

বর্তমান অশান্তির মূলকারণ কি শুধু আভ্যন্তরীণ কলহ, অন্তর্দ্বন্দ্ব? অথবা এর পিছনে কোনও বৃহৎ স্বার্থ বা শক্তি-গোষ্ঠীর যোগ রয়েছে? থাকলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। রাজা লিওপোল্ড 'Concession System' প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী যে সংস্থা বা ফার্ম একটি বিশেষ কাজের ভার গ্রহণ করেছে সেই প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সংগ্রহের জন্য বিস্তৃত এলাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, যে-কোম্পানী মাতাদি থেকে লিওপোল্ড-ভিল পর্যন্ত রেলপথটি তৈরী করেছিল, সেই কোম্পানীকে বুসিরা পর্যন্ত বিশলক্ষ একর জমি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই বিস্তৃত অঞ্চল 'বাস-রুক' নামে খ্যাত এবং আজও সেই কোম্পানীর অধীনে রয়েছে। এ ছাড়া পাঁচটি জেলা মিশিয়ে প্রায় আঠারো লক্ষ একর জমি রয়েছে বিখ্যাত সাবান-প্রস্তুতকারক কোম্পানী 'লেভার-ব্রাদার্সের' অধীনে। এইরূপ মালিকানার উদাহরণ আরও বহু দেওয়া যায়। প্রায় সব রবার, কফি, কোকোর বাগান, কাটাঙ্গার প্রয় সমস্ত খনিগুলি রয়েছে বিদেশী কোম্পানীর হাতে। এটা অস্বাভাবিক নয় যে এইসব 'ইউরোপীয় কোম্পানীগুলি, কঙ্গোর প্রকৃত স্বাধীনতায় অস্বস্তি বোধ করবে—এমন ধরনের শাসন-কাঠামো এরা চাইবে যার অধীনে এদের স্বার্থ বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হয়।

কায়েমী স্বার্থ ছাড়া, বৃহৎ শক্তিরও কঙ্গোর ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়ার কারণ আছে। সুয়েজ খালের ওপর কর্তৃত্ব হারাবার পর হতে একটি বিকল্প পথের সন্ধান চলছে। এই দিক দিয়ে কঙ্গোর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কঙ্গোর মধ্য দিয়ে নদীপথে ও রেলপথে গিনি উপসাগর থেকে ভারত-মহাসাগরের তীরবর্তী বন্দর দার এস সালামে পৌঁছবার একটি সহজ পথ আছে। লিউইস এম অলেকজান্ডার এই পথটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, যুদ্ধের সময় দূর-প্রাচ্যে সামরিক সরবরাহ পৌঁছে দেবার জন্য এটাই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পথ। এর ওপর রয়েছে কাটাঙ্গার ইউরেনিয়াম সম্পদ—যে কোন বৃহৎ শক্তিরই এই সম্পদের প্রতি আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। কাটাঙ্গায় বহু বেলজিয়ান বাস করে। বর্তমন পরিস্থিতিতে এতগুলি ইউ-রোপীয়ের একত্র অবস্থিতি কঙ্গোর পক্ষে খুব নিরাপদ নয়।

কঙ্গোর অবস্থাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাকিন্ডারের ব্যাখ্যা অনুযায়ী যে শক্তি মহাদেশের কেন্দ্রস্থল অধিকার করে থাকে সেই শক্তি সমগ্র মহাদেশের রাজ-নৈতিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। ম্যাকিন্ডারের কথা আজ বর্ণে বর্ণে প্রমাণিত হয়েছে। সরকার সুগঠিত ও শক্তিশালী হলে কেন্দ্রস্থিত দেশ ?? কত প্রভাবশালী হতে পারে তার প্রমাণ সোবিয়েৎ রাশিয়া। সুতরাং কঙ্গোর শাসন-ব্যবস্থার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারলে সমগ্র আফ্রিকার রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। বলা বাহুল্য, এই ধরনের সুযোগ লাভ করা বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীর অনভিপ্রেত হতে পারে না।

একথা অবশ্য সত্য, বর্তমান অশান্তির জন্য কঙ্গোর অধিবাসীরা কম দায়ী নন। ইন্ধন যোগালেই জ্বলে উঠতে হবে, দলগত ও ব্যক্তিগত স্বার্থের কাছে দেশের স্বার্থকে বলি দিতে হবে এ ধরনের মনোবৃত্তি কোনক্রমেই সমর্থন করা যায় না। জাতি বিচারে কঙ্গোর অধিবাসীরা প্রধানত বান্টু নিগ্রো, কিন্তু এদের মধ্যে বহু দল উপদল আছে, কেন্দ্রাভিগ শক্তি অপেক্ষা কেন্দ্রাতিগ শক্তিই বেশী প্রবল। তবে দল ও উপ-দলগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে বেলজিয়াম সরকারের বিভেদ-নীতির ফলে। বেলজিয়ামের অনুপ্রবেশের পূর্বে কঙ্গোয় গুটিকয়েক সুসংবদ্ধ দল ছিল, তারা মোটামুটিভাবে এক রাজার আনুগত্য মেনে চলত। বেলজিয়াম সরকার কঙ্গোকে

ডাঃ কার্ত্তিক বসুর
টাইকোসোডা | নানালা
অম্ল, অজীর্ণ ও ডিস্পেপসিয়ায় | ব্যথা ও বেদনায়
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ-কলিকাতা ৯

জনপ্রিয় মিষ্টান্ন পরিবেশক
গাঙ্গুরাম এণ্ড সন্স
৩৫—৩৩৩১
১৬৯সি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

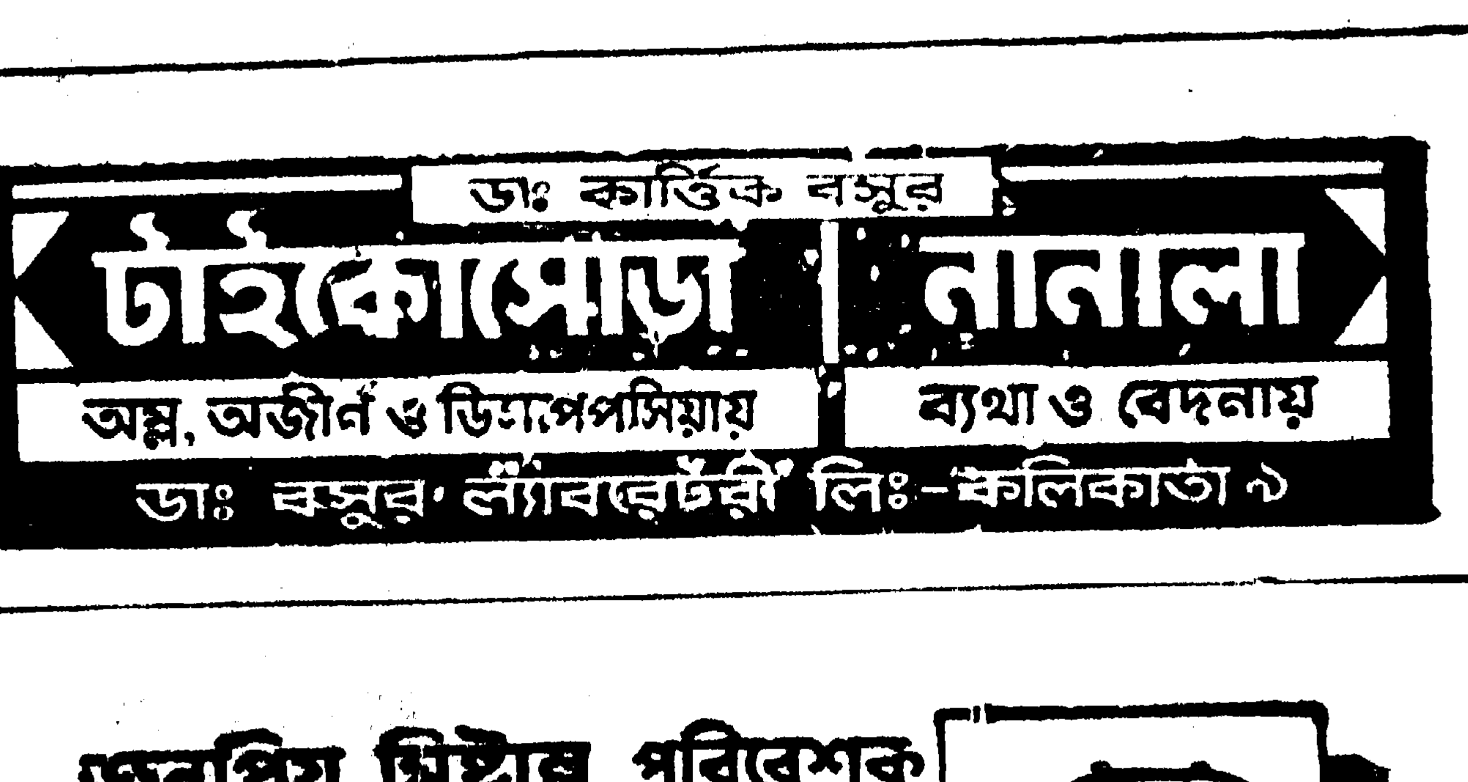

এমনভাবে বিভাগ করলেন যার ফলে দল-গুলির নিজস্ব সংহতি নষ্ট হয়ে গেল, এক অংশ অপর অংশ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, নূতন নূতন উপদলীয় স্বার্থের সৃষ্টি হ'ল।

সাম্প্রতিক ঘটনাবলী থেকে মনে হয়, দলগত বিরোধে জাতি দুর্বল হলে সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্যেরই যে শুধু সহায়তা করা হবে, এ-সত্য আজও কঙ্গোবাসীরা উপলব্ধি করতে পারেননি, মনে হয়, কঙ্গোর অসংখ্য জলপ্রপাত এখনও কিছুকাল শুধু ভূমিক্ষয় করতেই নিযুক্ত থাকবে, বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত শক্তিসমূহকে একত্রিত করতে পারলে, অপচয় নিবারণ করে তার রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম হলে সমগ্র দেশ যে কি উজ্জ্বল, আলোকিত হতে পারে, সে সম্বন্ধে সম্যক ধারণা আজও কঙ্গোবাসীর হয়নি। যেদিন হবে, এই বনাঞ্চলে আবৃত, প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দেশটি সেদিন বিশ্বের দরবারে অসামান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

সর্বত্র গৃহিণীরা বলাবলি করছেন

- সার্ফে কাচলে বোঝা যায়

সাদা জামাকাপড় কতখানি ফরসা হতে পারে!

সার্ফে কাচলেই বুঝতে পারবেন যে সার্ফ জামাকাপড়কে শুধু "পরিষ্কার" করে না, ধবধবে ফরসা করে। সার্ফে কাচারও কোন ঝামেলা নেই। সহজেই সার্ফের দেদার ফেনা কাপড়ের ময়লা টেনে বার করে, কাপড় আছড়াবার কোন দরকার নেই। আর সার্ফে কাপড় যা পরিষ্কার হয় তা, না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। এর কারণ সার্ফের অদ্ভুত কাপড় কাচার শক্তি! দেখবেন সার্ফে রঙীন কাপড়ও কেমন ঝলমলে হবে! সার্ফে সবচেয়ে সহজে আর সবচেয়ে চমৎকার কাপড় কাচা যায়। ধুতি, শাড়ী, ফ্রক, জামা, তোয়ালে, ঝাড়ন এক কথায় বাড়ীর সব জামা কাপড় সার্ফে কাচুন—দেখবেন ধবধবে ফরসা করে কাচতে সার্ফের জুড়ী নেই!

সার্ফ দিয়ে বাড়ীতে কাচুন, কাপড় সবচেয়ে ফরসা হবে

SU. 12-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

বিশ্ব বিচিত্রা

মাস কয়েক আগে ইস্রায়েল কর্তৃক প্রাক্তন নাৎসী এডলফ আইকম্যান যুদ্ধাপরাধী বলে গ্রেপ্তার হতে লণ্ডনের এক নিভৃত স্থানে অবস্থিত এক লাইব্রেরীর সেলফে সাজানো "আইকম্যান এ" নামের ফাইলে নতুন কিছু লেখা হয়ে যায়। সেই সেলফেরই আরো খানিকটা দূরে আর একটি ফাইলে রয়েছে হিটলারের দক্ষিণহস্তস্বরূপ মার্টিন বোরম্যান সম্পর্কিত তথ্য, ১৯৪৫ সালের বসন্তকালে মিত্রশক্তি বার্লিন দখল করার সময় যে অন্তর্হিত হয়। এরও নামের পাশে "গ্রেপ্তার হয়েছে" লিখতে পারলেই এই লাইব্রেরীর কর্মীরা খুশী হত।

আইকম্যান-বোরম্যান সম্পর্কিত এই দলিলগুচ্ছ ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে হিটলারের এক শত্রু, প্রাচ্যভাষা ও ইতিহাসের পণ্ডিত ডাঃ এলফ্রেড ওয়াইনার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ওয়াইনার লাইব্রেরী কর্তৃক সংগৃহিত বহু সহস্র দলিলেরই অংশ। লণ্ডনের ডেভন-শায়ার স্ট্রীটে অবস্থিত এই লাইব্রেরীতে রয়েছে নানা ঐতিহাসিক অপরাধ সংক্রান্ত পঞ্চাশ হাজার গ্রন্থ, বহু সহস্র সাময়িক পত্রিকা এবং সংবাদপত্র ও পত্র-পত্রিকার কাটিং। বিভিন্ন বিভাগে ছাপানো কার্ডে এই ধরণের লেখা পাওয়া যায়, যেমন, "রাজনীতিক নির্যাতন," "প্রতিরোধ সংগ্রাম", "নাৎসী দখলে ইওরোপ", "বন্দীশিবির", "যুদ্ধপরাধী ও তাদের বিচার" ইত্যাদি।

উনিশটি ভাষায় মুদ্রিত হিটলারের "মাই স্ট্রাগল" এবং গোয়েবলস, রোশেনবার্গ এবং অন্যান্য নাৎসী নেতাদের রচিত গ্রন্থাবলীর সঙ্গে এখানে রয়েছে হিটলারের কুনজরে যারা পড়েছিল তাদের নামের তালিকা সমন্বিত একটি গ্রন্থ। ১৯৩৭ সালে জার্মানীতে প্রকাশিত আর একখানি গ্রন্থ রয়েছে যাতে হিটলারের 'ঝটিকা বাহিনী'র সভ্যদের বিবরণ সমন্বিত তালিকা পাওয়া যায়।

ব্রেইল পদ্ধতিতে লেখা একখানি গ্রন্থ দেখে বোঝা যায় নাৎসীরা তাদের বিষাক্ত প্রচারকার্যে কতটা ব্যাপক ক্ষেত্র দখল করে-ছিল। এ ছাড়া রয়েছে বহু ছবির বই যেগুলি ছোট ছেলেমেয়েদের মনকে কিভাবে বিকৃত করে তোলা হতো তার সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে।

ওয়াইনার লাইব্রেরী হচ্ছে একটি অত্যন্ত সক্রিয় প্রতিষ্ঠান যার মহাফেজখানা যারা নির্যাতিত হয়েছে এবং যারা তাদের প্রতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চায় এমন লোকের প্রভূত সহায়ক হয়। জার্মানীর আরোল-সেনে অবস্থিত আন্তর্জাতিক সন্ধানী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সতত যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। লাইব্রেরীর রেকর্ডগুলি নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের সন্ধানে সূত্র সরবরাহে প্রায়ই কাজে লাগে।

নাৎসীরা শক্তিশালী হয়ে উঠতে, জার্মানীর বহু লোকের অনুরূপ, ডাঃ ওয়াইনার ইওরোপের বিপদের সম্ভাবনা আগেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। হিটলার ও তার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ব্যক্তিরা বিশ্বযুদ্ধের পরিকল্পনা করছিল। ডাঃ ওয়াইনার নিজেই তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্রতী হন।

তিনি বলেন, "আমার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ইহুদীদেরই সাহায্য করা নয়, যাদের বড়ো নষ্টের মূলে বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। আমার লক্ষ্য ছিল আরো বিস্তৃত। আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গণতন্ত্রগুলিতে যারা জনমত গঠন করে সর্বশক্তি নিয়োগ করে এই ভয়াবহ বিপদটি তাদের উপলব্ধি করানো। ইহুদী-বিরোধীতা ছিল সূত্রপাত মাত্র,—নাৎসীরা যে পথে চলতে চায় তার একটি ধাপ মাত্র।"

এমন একটা কাজ জার্মানীতে থেকে নিরাপদে সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না। তাই ডাঃ ওয়াইনার সীমান্ত পার হয়ে হল্যাণ্ডে চলে যান। সেখানে আমস্টারডামের পার্ক হোটেলের এক কামরা নিয়ে জার্মানীর নতুন শাসকদের সম্পর্কে তথ্যাদি, বই, প্রচার-

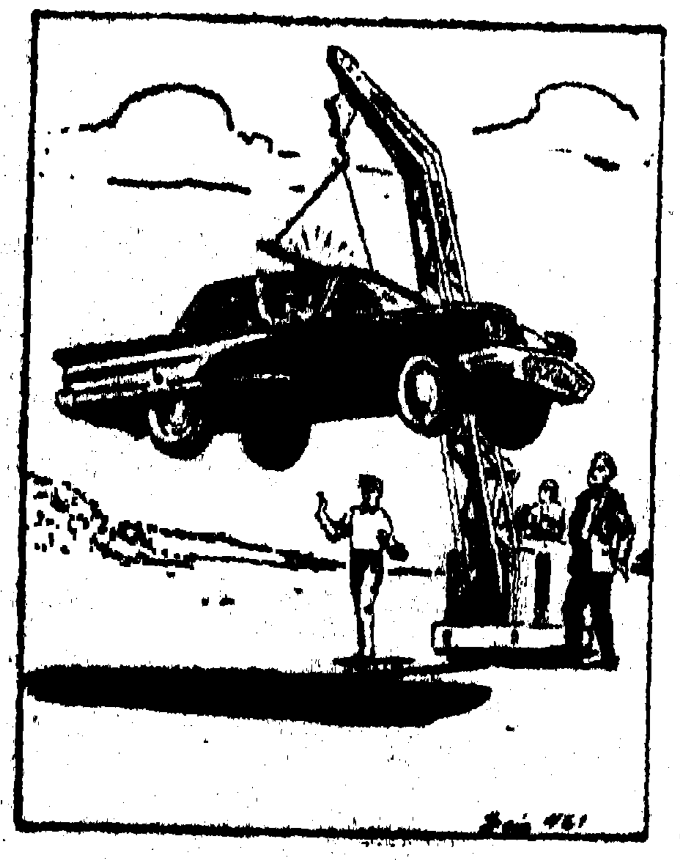

(১)

(২)

(৩)

১। কতকগুলি নতুন আসঞ্জক পদার্থ এত শক্তিশালী যে এক বর্গ ইঞ্চি জোড়তে সাত হাজার পাউণ্ড ভার টেনে রাখতে পারে, যা সবচেয়ে টিকসই পদার্থকেও জোড়ের মুখ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি তাদের তৈরী এক ফোঁটা আঠার জোরে চারজন যাত্রীসমেত একখানি মোটর গাড়িকে একটি লোহার থামের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখতে সমর্থ হয়। ২। বিশেষজ্ঞরা বলেন যে কোন উদ্ভিদের চেয়ে ঘাস বিস্তৃততর ক্ষেত্রে জন্মায়। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই ঘাস জন্মে। ঘাসজাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে বৃহত্তম হচ্ছে বাঁশ যা এত ঘনভাবে জন্মায় যে তাতে বিশাল বনের সৃষ্টি হয়। ৩। বিশেষজ্ঞদের মতে মানুষ ঘুমায় মুখ্যত দেহকে বিশ্রাম দেবার জন্য নয়। তারা ঘুমায় প্রধানত মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দিতে, বিশেষ করে মস্তিষ্কের ধূসর বাহ্যাংশ। উচ্চতর মানসিক শক্তিসমূহ—কথা বলার, মনে করে রাখার, ভেবে দেখার, যুক্তি প্রয়োগ করার, কল্পনা করার ইত্যাদির সক্ষমতা—মস্তিষ্কের এই অংশেই অবস্থিত

পুস্তিকা, সংবাদপত্রের বিবরণ সংগ্রহ করতে থাকেন। চোরাগোপ্তাভাবে সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের মারফৎ এবং প্রভূত বিপদ ঘাড়ে নিয়ে জার্মানী থেকে পলাতক রিফিউজিদের দ্বারা উপাদানগুলি সংগৃহীত হতে থাকে। নাৎসী নেতারা কি বলছে এবং কি করছে তার বিস্তারিত বিবরণ সংকলিত করে স্বাধীন বিশ্বের কূটনীতিক, সাংবাদিক এবং জন-প্রতিষ্ঠানসমূহে পাঠানো হতে থাকে।

১৯৩৯ সালের মধ্যেই দশ হাজার গ্রন্থ এবং অন্যান্য বহু দলিল সংগৃহীত হয়ে যায়। আর তখন সেগুলি হোটেলের একখানি কামরায় রাখা সম্ভব না হওয়ায় অন্য একটা বাড়ি নেওয়া হয় এবং সহকারিও নিযুক্ত করা হয়। এদের মধ্যে একজন ছিলেন প্যারীস থেকে আগত জার্মান সাংবাদিক ডাঃ কার্ট জিয়েলেনৎজিগার। পরে তিনি ডাঃ ওয়াইনারের প্রধান ডেপুটি নিযুক্ত হন। শেষে যখন স্পষ্টই দেখা গেল যে হিটলার সত্যিই যুদ্ধ চায় তখন বিপদ বুঝে যাবতীয় সংগ্রহ লন্ডনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ডাঃ জিয়েলেনৎজিগার আমস্টারডামেই থেকে যান এবং বিবেকহীনভাবে, সাধারণ মানবিক শোভনতা বিসর্জন দিয়ে যারা শাসন কার্য ও নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিল তাদের সম্পর্কে জার্মানী ও অধিকৃত দেশসমূহ থেকে উপাদান সংগ্রহে রত থাকেন। এই উদ্যমের জন্য তাকে শেষ পর্যন্ত জীবন বিসর্জন দিতে হয়। ১৯৪০ সালে জার্মানরা হল্যান্ড অধিকার করতে ডাঃ জিয়েলেনৎজিগার গ্রেপ্তার হন এবং যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত বন্দীশিবিরে আটক থেকে রোগ, শোক, বুভুক্ষা ও নির্যাতনে দেহত্যাগ করেন।

কিন্তু ডাঃ ওয়াইনার যে কাজ আরম্ভ করেছিলেন তা অব্যাহতই থাকে। ইওরোপের এক এক করে দেশগুলি যতো নাৎসী কবলিত হতে থাকে উপাদান সংগ্রহের কাজও ততোই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। লাইব্রেরীকে সে সময় তার উপাদান সংগ্রহ করতে নিরপেক্ষ দেশসমূহের ওপর নির্ভর করতে হয়। ১৯৪২ সালের মধ্যে সংগ্রহের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে সুইটজারল্যান্ড, সুইডেন ও স্পেন। নাৎসী জাল যতো বিস্তৃত হতে থাকে তার পরিচালকদের বিরুদ্ধে তথ্য সংগ্রহ করায় ডাঃ ওয়াইনারের জিদও ততোই বাড়তে থাকে। যুদ্ধ চলতে থাকার সময় মিত্র রাজ্যসমূহের গবর্নমেন্ট, সাংবাদিক ও বেতারবক্তাদের কাছে এই লাইব্রেরিটি খুবই কাজে লেগেছিল।

পনের বছর হলো যুদ্ধ থেমে গেলেও ওয়াইনার সংগ্রহ অবিরত বেড়েই চলেছে এবং সমসাময়িক করে রাখা হচ্ছে। প্রাক্তন ন্যাশনাল সোশ্যালিজমের অনুরাগীদের কার্য-কলাপের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখা হচ্ছে, আর সেই সঙ্গে জার্মানীর রাজনীতিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি ঝোঁকও। কোন নাৎসী মনোভাবের পুনরুজ্জীবন কোথাও দেখলেই সে সম্পর্কে বিবরণ প্রকাশ করা হয়।

ডাঃ ওয়াইনারের বয়স এখন পঁচাত্তর। তাঁর স্ত্রী মারা গিয়েছেন বন্দীশিবিরে খাদ্যাভাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের শয়তানির জন্য মানবিকতার ওপর তাঁর বিশ্বাস টলাতে পারেনি। শান্তভাবেই তিনি বলেন "আমাদের ভুললে চলবে না যে বহু সহস্র জার্মান হিটলারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল। অনেকে ছিল অতি সাধারণ, নিরহংকারী ব্যক্তি যারা মনেপ্রাণে যেটা পাশবিক এবং নীতির দিক থেকে ভুল বুঝেছে নির্ভয়ে তার বিরুদ্ধে তারা দাঁড়িয়েছে। তারা প্রতিবাদ জানিয়েছে—এবং মৃত্যুবরণ করেছে।"

এই ওয়াইনার লাইব্রেরিটিই হচ্ছে তাদের স্মৃতিসৌধ। স্বাধীন মানুষকে এটাও ভয়ানকভাবে মনে করিয়ে দেবে যে কি কাণ্ডই না হতে পারতো।

•

এটনা পর্বতের সাম্প্রতিক অগ্ন্যুদ্গীরণ নিকটবর্তী সিসিলীয় গ্রামগুলিকে শঙ্কিত করে তুললেও বিশেষজ্ঞদের অভিমত হচ্ছে নীচের ধাপের গ্রামগুলির ভয়ের কোন কারণ নেই। প্রচণ্ড অগ্ন্যুদ্গীরণ হলেও তাতে কোন মৃত্যু ঘটেনি। খৃষ্টপূর্ব ৪৭৫ থেকে এ পর্যন্ত যে দুশ'ষাট বার বিস্ফোরণ ঘটেছে এটি সেইরকমই একটি ঘটনা।

সবচেয়ে সাংঘাতিক হয়েছিল ১৬৬৯ সালে যাতে বারো মাইল দূরবর্তী কাটিনা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। ১৯২৮ সালে পাহাড়ের ঢালু জায়গায় অবস্থিত একটি গ্রাম ধ্বংস হয়।

ভিসুভিয়াসও আবার মাথাচাড়া দেবার লক্ষণ দেখাচ্ছে। ভিসুভিয়াস অবজার্ভেটারির আবহাওয়াবিদ অধ্যাপক এডওয়ার্ড ভিট্রোৎস্কী বলেন, সম্ভবত এ বছর শেষ হবার আগেই একটা বড় রকমের বিস্ফোরণ ঘটবে। দীর্ঘকাল ভিসুভিয়াস শান্ত আছে। অতীতের অভিজ্ঞতা বলে এটা অতি দুর্লক্ষণ। আগ্নেয়গিরিটি বর্তমানে চৌদ্দ থেকে ষোল বছরের বিস্ফোরণ চক্রে রয়েছে এবং শেষ যে বিস্ফোরণ হয়েছে তারপর এটা এখন ষোল বছর চলছে।"

ভিসুভিয়াস পর্বত দুটি শিখর দেশে চার হাজার ফিট পর্যন্ত উঁচু। বর্তমানে নির্বাপিত নীচের অগ্ন্যুদ্গম মুখটির ধারে নতুন ফাটল দেখা দিয়েছে। এই মুখটি থেকেই নির্গত গলিত লাভা স্রোতে '৭৯ সালে পম্পিয়াই নগরী আচ্ছাদিত হয়ে যায়।

•

সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষকরা আতঙ্কের সঙ্গে তিনশ ফিট গভীর গিরিমুখের নীচে গন্ধকে ভারি বাতাস লক্ষ্য করেছেন। একেবারে নীচে তারা গলিত লাভার চাপা গর্জনও শুনেছেন।

ভিসুভিয়াসের বিস্ফোরণ দেখেছেন, এমন একজন পরিব্রাজক লিখেছেন, "ধ্যান-মগ্ন বিরাট এক দৈত্যের মত ভিসুভিয়াস ইতালীর রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের নীচে শুয়ে আছে। এর ভয়াবহ কার্যকলাপ বন্ধ করতে পারে, মানুষের এমন শক্তি নেই এবং এর ছায়ায় যারা বাস করে, তাদের নিরাপত্তা বলতে কিছু নেই।"

১৯০৬ সালের ৬ই এপ্রিল সকাল আটটায় যে বিস্ফোরণ হয় তার এক বর্ণনা উদ্ধৃত করে দেওয়া গেল:

"বিরাট এক বাষ্পকুণ্ডলীর নীচে বিপুলায়তন একটা বয়লার যেন গুম্ গুম্ করে স্পন্দিত হচ্ছে; শিখরদেশে ছাই আর লাভার সংঘর্ষে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। দুদিন প্রভূত পরিমাণে লাভা প্রবাহিত হবার পর ভিসুভিয়াসের কণ্ঠ পরিষ্কার হয়েছে মনে হল। তারপরেই আরম্ভ হলো গ্যাস ও ছাইয়ের প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। দেখতে দেখতে সেটা সাত-আট মাইল উঁচু বিরাট এক ফুলকপির আকার নিলে।"

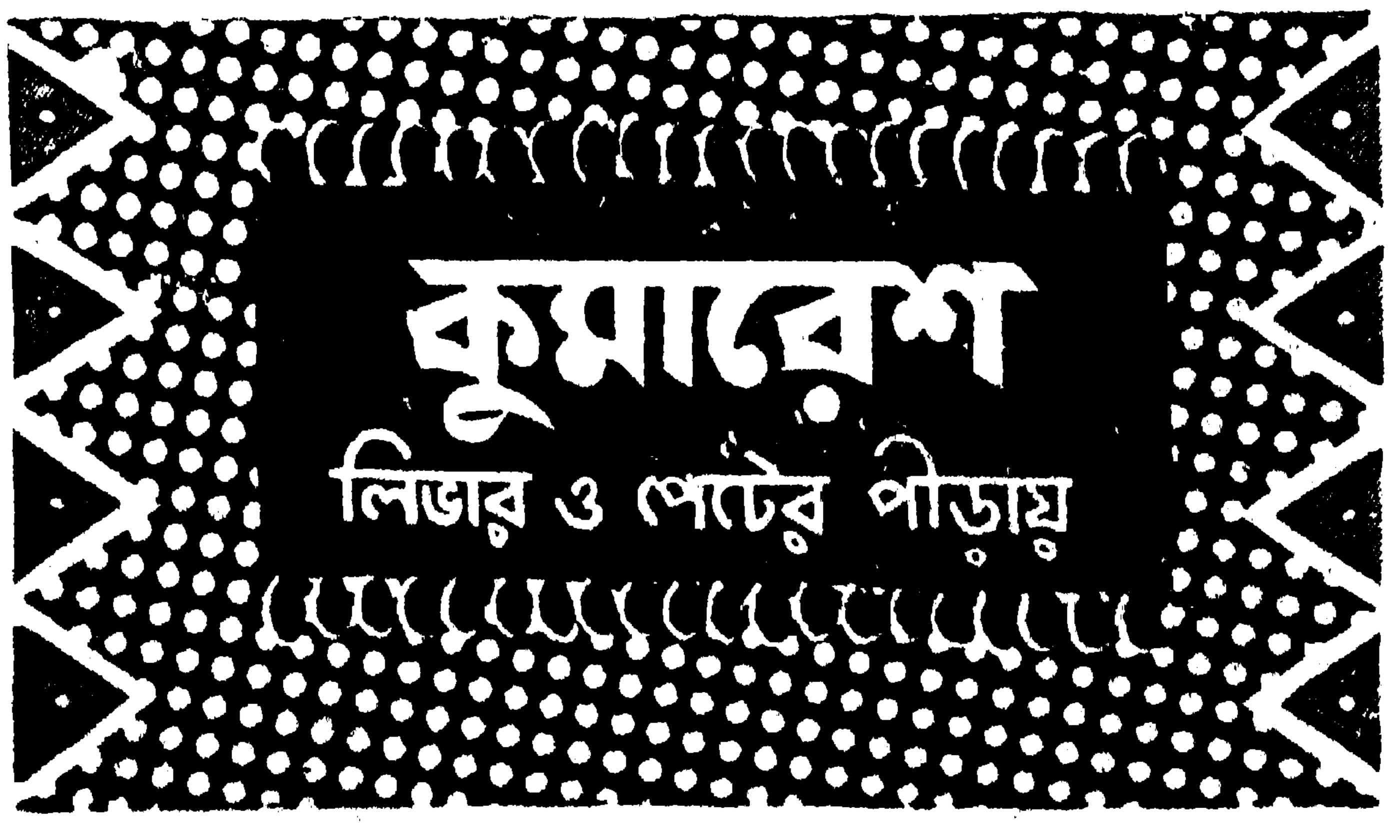

গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

মনে পড়ছে একজন বক্তা আকাশবাণীর কথিকায় বলছিলেন—বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং। অর্থাৎ রসাত্মক বাক্যই হল কাব্য। বক্তব্য তাঁর বুঝতে কষ্ট হয়নি কিন্তু তাঁর উচ্চারণ এবং কণ্ঠের মধ্যে রসের আভাসও ছিল না। তা ছাড়া কণ্ঠস্বরের যে কর্কশতা সাধারণ কথাবার্তায় হয়ত ধরা পড়ত না আকাশবাণীর যান্ত্রিক মাধ্যমে সেটিও বিষাক্ত লতার গায়ে কাঁটার মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কথিকাটি পাণ্ডিত্যের প্রচুর উপাদান বহন করা সত্ত্বেও মনে রেখাপাত করতে পারল না। আসল কথা হচ্ছে কাব্যের মত আকাশবাণী থেকেও আমরা রসাত্মক বাক্য (তথা রসাত্মক কণ্ঠ) শুনতে চাই। তা নইলে সব আয়োজনই ব্যর্থ।

আকাশবাণীর সাধারণ সমালোচনা সঙ্গীতাংশকেই অধিকার করে হয়ে থাকে এবং বেতার কর্তৃপক্ষ এদিকেই বিশেষ মনোযোগ দেন। আর সব চেয়ে কম মনোযোগ দেওয়া হয় কথিকা, বক্তৃতা এই সব অনুষ্ঠানের প্রতি কেননা এদিকে শ্রোতার ভিড় অপেক্ষাকৃত কম অথচ বক্তাদের ভিড় অপেক্ষাকৃত বেশী। হয়তো না দিলে নেহাৎ খারাপ দেখায় বলেই "টক্" জাতীয় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়ে থাকে নইলে আদৌ হত কি না সন্দেহ। তাও প্রচার জাতীয় বক্তৃতার পর সাহিত্যধর্মী বা আর্টধর্মী কথিকা খুব অল্পই প্রচারিত হয়ে থাকে। শুনেছি বি বি সি এ-বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী। তাঁদের চেষ্টায় এবং উপদেশে ভাল ভাল বক্তা তৈরি হয়েছেন, দেশ জোড়া তাঁদের নাম। ভাল করে কথা বলতে পারাটা যে মস্তবড় একটা আর্ট এবং আলাপ করবার কৌশলও যে শিখতে হয় সেটা আমাদের দেশের বক্তাদের মধ্যে অনেকের ধারণাতেই আসে না এবং একান্ত উদাসীন বেতার কর্তৃপক্ষের অপর সব বিষয়ের মত এবিষয়েও চিন্তার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

বেতার কর্তৃপক্ষের ধারণা এই রকম যে সাধারণ আলোচনায় যে-কোন বক্তাই যথেষ্ট, তাঁর কণ্ঠস্বর বাচনভঙ্গি নিয়ে বিচার বিবেচনা করবার দরকার নেই। সঙ্গীতালেখ্য বা বিশেষ অনুষ্ঠানেই তাঁরা কণ্ঠস্বর এবং বক্তার স্টাইলের দিকে নজর দেবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ফলে প্রতিদিনের অনুষ্ঠানসূচিতে যে সব আলাপের অনুষ্ঠান থাকে সেগুলি প্রায়ই নীরস শুষ্ক এবং ক্লান্তিকর ঠেকে। অনেক সময় বিশেষ অনুষ্ঠানেও তাঁরা এমন কোনো খ্যাতনামা ব্যক্তিকে আহ্বান করেন যাঁদের কণ্ঠস্বর, রচনা বা পাঠনভঙ্গি মোটেই চিত্তাকর্ষক নয়। সেই সব অনুষ্ঠান বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও তৃপ্তিদায়ক হয়ে ওঠে না। অতএব কথিকা প্রচারের ব্যাপারে আরও অনেক বেশী মনোযোগ না দিলে এই অনুষ্ঠানগুলির কোন সার্থকতা থাকবে না।

কোনো বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লেখা আর বেতারে বলার মধ্যে অনেক তফাৎ। এই জিনিসটা বেতার বক্তাদের যেমন বুঝিয়ে দেওয়া উচিত তেমনি বেতার কর্তৃপক্ষেরও বোঝা উচিত। কেবল কনট্রাক্ট পাঠানো আর দশদিন আগে সেটা পাবার নির্দেশ দিলেই কর্তব্য সমাপন করা হয় না। এ বিষয়ে বেতার কতৃপক্ষের কিছু অসুবিধা থাকলেও কর্তব্যের খাতিরে সব বাধাই তাঁদের কাটিয়ে ওঠা দরকার। কোনও সম্ভ্রান্ত অধ্যাপকে মুখের ওপর একথা বলা শক্ত যে তাঁর গলাটা প্রচারের উপযুক্ত নয় বা তাঁর উচ্চারণ অশুদ্ধ, শুধু তাই নয় গ্রাম্যতা-দোষযুক্ত; কিন্তু সত্যের খাতিরে একথাটা তাঁকে জানান আবশ্যক এবং তার লেখাটা অপর কোন সুকণ্ঠ ব্যক্তিকে দিয়ে পড়াবার ব্যবস্থা করাটাই বোধ হয় উপযুক্ত ব্যবস্থা। কোন কোন ভাল গল্প লেখকের গল্প পড়ার দোষে চিত্তাকর্ষক হয় না। কবিতার বেলাতেও একই কথা—কবিমাত্রেই সুকণ্ঠ নন। কথা হচ্ছে, যেখানে অক্ষমতা বিধিদত্ত, সেখানে অপরের কণ্ঠে যদি তাঁদের লেখা পড়া হয়, তাহলে আপত্তি ওঠা উচিত নয়। সঙ্গীতশিল্পীদের বেলায় তাঁদের কণ্ঠস্বরের অযোগ্যতা স্পষ্টই জানিয়ে দেওয়া হয়; তাহলে বক্তাদের বেলায় তার ব্যতিক্রম হবে কেন?

বেতার বক্তাদের মধ্যে অনেকে আছেন, যাঁরা কিভাবে কথা বললে ভাল হয়, সেটা ভেবে দেখেন না। কেউ হয়ত শ্রোতাদের ঠিক ছাত্রের মত মনে করে একটা ক্লাশ লেকচার দিয়ে যান, কেউ একটা 'ডেসক্রিপটিভ্ ক্যাটালগ' গোছের কথিকা রচনা করেন, আবার কেউ এমনই বাগাড়ম্বর করেন যে, আসল রহস্যই খুঁজে পাওয়া শক্ত হয়ে পড়ে; কারুর কারুর আবার অভ্যাস আছে মনুমেণ্টের তলার বক্তৃতার ঢঙে কথা বলা। এছাড়া নানারকম কূট বিষয় আছে, যাকে অনেক রেডিও-বক্তা আরও কূট এবং জটিল করে

টিক্-20

টাটা—ফাইসনের তৈরী

ছারপোকা ধ্বংস করে

গেইগী ডায়াজিনন

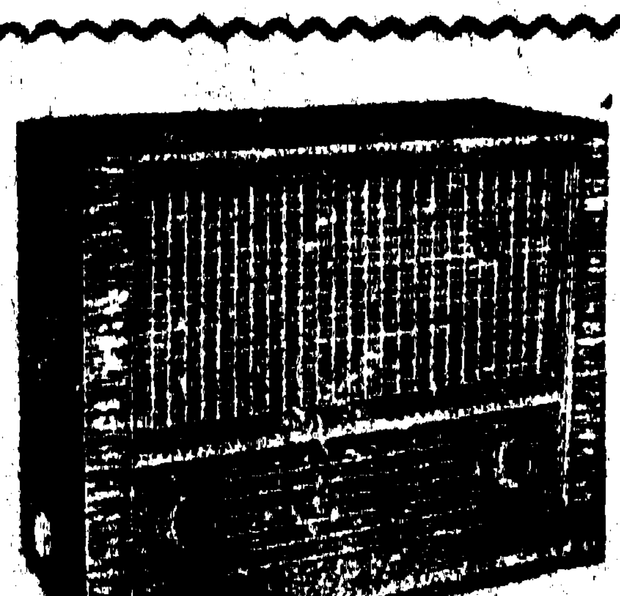

আমাদের নিকট নগদ মূল্যে অথবা সহজ কিস্তিতে অনেক রকমের রেডিও সেট পাওয়া যায়। এইচ, এম, ভি ও অন্যান্য রেডিওগ্রাম, লং-প্লেইং রেকর্ড টেপ রেকর্ডার, "নিপ্পন" অল-ওয়েভ ট্র্যানজিস্টার রেডিও, এমপ্লিফায়ার, মাইক, ইউনিট, হর্ণ, মাইক কেবল, রেডিও ও ইলেকট্রিকের বিভিন্ন প্রকারের সাজ-সরঞ্জামাদি বিক্রয়ের জন্য আমরা সর্বদা প্রচুর পরিমাণে মজুত করিয়া থাকি।

রেডিও এণ্ড ফটো স্টোর্স

৬৫, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩। ফোন: ২৪-৪৭৯৩

তোলেন। একজন রেডিও-বক্তা প্রাচীন নাটক সম্পর্কে বলতে গিয়ে সমগ্র নাট্য-শাস্ত্রের প্রতিটি অধ্যায়ের একটা সিনপ্সিস দাখিল করলেন পনের মিনিট ধরে। অপর একজন নিরীশ্বরবাদ সম্বন্ধে এমন উল্টো ব্যাখ্যা শুরু করলেন যে, বিশেষজ্ঞ শ্রোতা ছাড়া কেউ তাঁর বক্তৃতার একটি কণাও বুঝে উঠতে পারলেন না। এই রকম ব্যাপার হামেশাই হচ্ছে। আর এক শ্রেণীর আছেন, যাঁরা সরকারি কর্মচারী: সাধারণ নয়, উচ্চপদস্থ, এমন কি সম্ভ্রান্ত পর্যায়ে পড়েন অনেকে—তা না হলে আবার ওদিকটা রক্ষা করা যায় না। এঁরা নানারকম উপদেশ দিয়ে থাকেন এবং টেকনিকাল বিষয়ের আলোচনাও করেন। অনেক সময় তাঁদের আলোচনা ঠিক আপিসের রুটিন নোটের মত মনে হয়। কেউ হয়তো একটা রিপোর্টের খানিকটা তর্জমা করলেন, কেউ-বা কৃষি বা স্বাস্থ্য-দপ্তরের একটা বুলেটিনের হুবহু বাংলা করিয়ে পড়ে দিলেন। তা-ও সে বাংলা সম্বন্ধে অধিক আলোচন না করাই ভাল। যে-কোন একটা বিষয়কে চিত্তাকর্ষক করে মনোরম ভাষায় প্রকাশ করতে আমাদের রেডিও-বক্তাদের অনেকেই কত অক্ষম, তা এই বেতারে প্রচারিত কথিকাগুলি থেকে যথেষ্ট প্রমাণিত হয়। বি বি সি'র বক্তৃতাগুলি শুনলে বোঝা যায়—কূট বিষয়কে সুন্দর এবং সহজে প্রকাশ করবার ক্ষমতা ওঁদের দেশের বক্তাদের কত বেশি এবং প্রচার সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা কত স্পষ্ট। আমাদের দেশে দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় বলতে গেলে—দিনের মত বিষয় হয়, রাতের মত অন্ধকার আর জলের মত বিষয় হয় ইঁটের মত শক্ত।

বেতার কর্তৃপক্ষের নিজেদের ব্যবস্থাতেও ত্রুটি কম নয়। নাটক, খবর—এই সব ব্যাপারগুলি ধরুন। দিল্লীর কয়েকজন ভদ্রমহিলা খবর বলে থাকেন। তাঁদের পড়বার ভঙ্গী এত অস্পষ্ট যে, অনেক সময় তা বোঝাই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। কাজ-সারার তাড়া তাঁদের এত যে, শ্রোতাদের কর্ণপীড়াটা তাঁরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না। কলকাতায় নাট্যানুষ্ঠানে অনেক সময় দেখি, অভিনেতারা পার্ট বলতে গিয়ে আটকে যান। অনেকেই কোনরকম প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না। কেউ কেউ কেবলমাত্র রিডিং পড়ে যান—অর্থাৎ আগে একবার পাঠ্য অংশটুকু তাঁদের পড়ে দেখা হয়নি। ভাল রকম পড়া না থাকলে পাঙ্চুয়েশনের কোন বালাই থাকে না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে ঠিক জায়গায় জোর দেওয়া হয় না বা বাক্যের ইঙ্গিত ঠিক বোঝা যায় না।

এই সব ত্রুটিগুলিকে আর বাড়তে দেওয়া সংগত নয়। যাঁরা বক্তা তাঁরা যদি না বোঝেন, তাহলে তাঁদের বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে, রেডিওতে আমরা সভা-সমিতির বক্তৃতা, ইস্কুল-কলেজের লেকচার, দপ্তরের রিপোর্ট—এসবের কিছুই চাই না; আমরা চাই, ঘরোয়া কথাবার্তার ঢঙে সাধারণ আলাপ, কিন্তু সে-আলাপে থাকবে কথা বলবার আর্ট। প্রত্যেক সম্পাদকের যেমন একটা কর্তব্য আছে, তেমনি বেতার কর্তৃপক্ষেরও এ বিষয়ে একটা কর্তব্য আছে। এক হিসাবে তাঁরাও তো সম্পাদনার কাজই করছেন। অতএব বেতার-ভাষণের স্বরূপ কী, সে সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট নির্দেশ তাঁদের কাছ থেকে আসা দরকার। আমরা একথা বলছি না যে, বক্তাদের লেখার ওপরে তাঁরা কলম চালাবেন বা সম্মানিত বক্তাদের শাসন করবেন, কিন্তু বেতারে প্রচারের জন্য লেখা কী রকম হওয়া চাই বা বলবার ধরন কী রকম হলে ভাল শোনাবে, সে সম্বন্ধে উপযুক্ত নির্দেশ দিতে হবে বৈকি। আশা করি, বক্তারা এটি বেতার কর্তৃপক্ষের ঔদ্ধত্য বলে বিবেচনা করবেন না, তাঁরাও এ বিষয়ে সহযোগিতা করবেন। আমাদের মনে হয়, এদিকে মনোযোগ দিলে ভবিষ্যতে বেতার-ভাষণ বা কথা বেতারানুষ্ঠানগুলি সার্থক এবং সুশ্রাব্য হয়ে উঠবে।

চিত্র প্রদর্শনী

কমল চৌধুরী আমাদের কাছে সুপরিচিত। ইনি গভর্নমেণ্ট কলেজ অব আর্ট অ্যাণ্ড ক্র্যাফট-এর একজন কৃতী ছাত্র। এঁর চিত্রকলা আমরা নানা প্রদর্শনীতে দেখেছি। ১৯৫৫ সালে এঁর প্রথম একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়। ১৯৫৫ সালেই ইনি আফ্রিকার উগাণ্ডা সরকারের শিক্ষা বিভাগে চাকুরি গ্রহণ করে সেখানে চলে যান। ইনি এখনও উগাণ্ডার মবেল শহরের একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। উগাণ্ডায় শ্রী চৌধুরী বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। মবেল-এর মাউণ্ট এলগন হোটেলে একটি মস্ত বড় মুরাল রচনা করেছেন এবং ১৯৫৮ সালে কাম্পালায় ইম্পিরিয়াল হোটেলে এঁর একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। সম্ভবত ওদেশে কোনও ভারতবাসীর চিত্রকলা প্রদর্শনী এইটিই সর্বপ্রথম। এর পর বৃটিশ কাউন্সিলের ব্যবস্থায় ইনি লণ্ডনে যান, সেখানে কমনওয়েলথ ইনস্টিটিউট-এ একক প্রদর্শনী করতে। লণ্ডনের রসিক মহলে এবং সংবাদপত্রে ইনি যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছেন। শ্রী চৌধুরী উগাণ্ডার বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে সেখানকার নৈসর্গিক দৃশ্য, গ্রাম, মানুষ, জীবজন্তু প্রভৃতির ছবি এঁকেছেন। সেই সব রচনাই এখানে প্রদর্শিত হয়। চিত্রগুলি সত্যিই উপভোগ্য। বর্ণবহুল আফ্রিকার রূপ ইনি ক্যানভাস-এ তুলেছেন অত্যন্ত উজ্জ্বল বর্ণের সাহায্যে। সবুজ বর্ণের প্রয়োগটাই বেশী। ইনি 'আধুনিক'পন্থী নন, তাই এঁর ব্যক্তিগত ভাল-লাগা না-লাগার ওপর অতিরঞ্জন বা অনুরঞ্জন করে কোনও নব্যতন্ত্রের অবতারণা করেননি। আবার ক্যামেরায় তোলা ছবির মত কল্পনাশূন্য মানসিক অবস্থা নিয়েও চিত্রগুলির রচনা করেননি। ছবিগুলির মধ্যে প্রাণ আছে, তাই রচনাগুলি আকর্ষণীয়।

আমরা দেখেছি এখানকার বহু শিল্পী বিদেশে যান এবং বিদেশ থেকে ফিরে আসেন সেখানকার দৃষ্টিভঙ্গী এবং ক্রিয়া-কৌশল আয়ত্ত করে। ভারতবর্ষে এসে তাঁরা যেসব রচনা করেন, তাতেও বেশীর ভাগ সময় প্রকাশ পায় বিদেশীর দৃষ্টি-ভঙ্গী। এক বিখ্যাত শিল্পীর কথা **Everything is worth knowing: learn the art and lay it aside** কিন্তু ইউরোপ-ফেরতা বেশীর ভাগ শিল্পী, যা তাঁরা সেখানে গিয়ে শেখেন, তা আর সরিয়ে রাখতে পারেন না। কমল চৌধুরীর চিত্রকলায় কিন্তু পাশ্চাত্ত্য প্রভাবও পড়েনি। আবার আফ্রিকার চিত্রকলারও প্রভাব পড়েনি। ইউরোপের বহু 'আধুনিক' চিত্রকলায় আমরা লক্ষ্য করি, আফ্রিকার আদিম শিল্পের অত্যন্ত প্রবল প্রভাব। কিন্তু কমলবাবু খাস আফ্রিকায় অবস্থান করেও 'তথাকথিত' আধুনিকতা এখনও আয়ত্ত করেননি। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, যদি শিল্পী আফ্রিকার প্রিমিটিভ আর্ট কিছুটা চর্চা করেন, তা হলে এঁর রচনাগুলি আরও জোরালো হয়ে উঠবে। আমি আফ্রিকার আর্টের পুনরাবৃত্তি করতে বলছি না; 'learn it; and lay it aside'। অবচেতন মনের মধ্যে যা প্রভাব থেকে যাবে, তা থেকেই সৃষ্টি হবে প্রকৃত রসরচনা।

যাই হোক, এঁর রচনা যেগুলি আমাদের বিশেষভাবে আনন্দ দিয়েছে, তা হল—'বুগিসুর দৃশ্য, নুগোমা, গুহাভিমুখ, বাস কণ্ডাক্টর, খেলোয়াড় এবং সিংহ শিকারীর দল।'

আমরা কমলবাবুর ১৯৫৫ সালের একক প্রদর্শনী দেখবার পর এই 'দেশ' পত্রিকায় আশা প্রকাশ করেছিলাম আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে শিল্পী আমাদের কিছু অভিনব জিনিস দেখাবেন। কমলবাবুর এ রচনাগুলি আমাদের চোখে অভিনব সে বিষয় কোনই সন্দেহ নেই। সুতরাং কমলবাবু আমাদের কাছে অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। কমল চৌধুরী কেবল চিত্র চর্চাই করছেন না, সিনেমাটোগ্রাফিও কিছু কিছু চর্চা করছেন। এই প্রদর্শনী উদ্বোধনের দিন শিল্পী আফ্রিকার বন্যপশুদের ওপর তাঁর তোলা একটি ফিল্মও সমবেত আমন্ত্রিতদের প্রদর্শন করেন। কমলবাবু চিত্রশিল্পী কাজেই কম্পোজিশন সম্বন্ধে তাঁকে কিছু চিন্তা করতে হয়নি। ছবির বিষয়বস্তুও অভিনব। কিছু কিছু এডিট করলে ফিল্মটি সর্বাঙ্গ সুন্দর একটি ডকুমেণ্টারী ছবি হতে পারে। ফিল্ম তোলার দিকে এঁর ঝোঁক গেছে অসম্ভব রকম লক্ষ্য করলাম। অপেশাদার হয়েই ইনি যে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন অনেক পেশাদার ক্যামেরা ম্যানেরও এ ক্ষমতা থাকে না। ছবিটিতে আমরা দেখতে পেলাম রোমহর্ষক সব দৃশ্য। পশুরাজ সিংহ এবং তার সিংহিনী-দের, হিংস্র কুমির, ভয়াবহ গণ্ডার, হিপ্পোপটেমাস, হাতী প্রভৃতি। উপজাতি-দের নাচ, গান, উৎসব এসব ত দেখা গেল। রঙীন হওয়ায় এবং আফ্রিকার আবহ সঙ্গীত থাকায় ছবিটি যথার্থই উপভোগ্য হয়েছে। কমলবাবু ভবিষ্যতে নামকরা ক্যামেরম্যান হিসাবেও পরিগণিত হবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। ইনি ছুটিতে কলকাতায় এসেছেন অল্প দিনের মধ্যেই উগাণ্ডায় ফিরে যাবেন।

শিল্পী কমল চৌধুরী অঙ্কিত একটি চিত্র

মা আসিয়াছিলেন, মা চলিয়া গেলেন। পূজা তাঁর যেমনই হোক, পূজা শেষের একটি দিনের জন্য আমরা সারা বছর প্রতীক্ষায় থাকি। আমাদের সর্বাত্মক অসাফল্যের গ্লানি এই একটি বিশেষ দিন ধুইয়া মুছিয়া দিয়া যায়। এই আমাদের একমাত্র সিদ্ধিলাভের দিন। দিনটি হইল বিজয়া। "সিদ্ধি"লাভের একমাত্র উল্লাসে আমরা গালাগালি ছাড়িয়া গলাগলি করি। সুতরাং আমরা সবাইকে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাইতেছি। মাকে পুনরাগমনায় চ বলিয়া বিদায় দিয়াছি। বলিয়াছি সপ্তমী অষ্টমী নবমীতে মা আসিলেও বিজয়ার দিনটিকে মাটি করিও না। আমরা যেন বলিতে পারি—যা দেবী সর্বভূতেষু "সিদ্ধি"রূপেন সংস্থিতা!!

• • •

কংগ্রেসের "জিজ্ঞার গ্রুপ" অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করিবার উপায় হইল শিক্ষা। বিশু খুড়ো সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন—"কিন্তু সেটা উপযুক্ত শিক্ষা হওয়া চাই। কাঁচকলা হলে আদায়-কাঁচকলায় থাকবেই!!"

• • •

পঞ্জিকাকার জানাইয়াছেন, এবারে দেবীর দোলায় গমন। ফলং—দোলায়াং মড়কং ভবেৎ। —"কিন্তু তাতে আমরা

ভীত নই, মন্বন্তরে মরিনি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি"—শ্যামলাল সিদ্ধির ধকল কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই।

• • •

লোকসভার সদস্য শ্রী হুন্ডার বলিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের উচিত খাসি-জেন্তিয়ার পান ক্রয় করা। —"তাঁরা যদি ডাক দিয়ে বলেন—একখান কথা কও-বা-না কও পান খাইয়া যাও—তাহলে সাড়া দেবার মতো রোমান্টিক মন পশ্চিমবঙ্গ নিশ্চয়ই পারেন"—বলন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

ট্রাম-বাসে

মানব-কল্যাণে কৃতত্বপূর্ণ কর্মের জন্য পুরস্কার দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন কেন্দ্রীয় সরকার। বলা হইয়াছে —গুরুতর বিপদেও যে-ব্যক্তি নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া সাহসের সহিত কাজ করিয়া যায়, তাহাকে প্রথম পুরস্কার

দেওয়া হইবে। খুড়ো বলিলেন—"স্বাস্থ্য-ভঙ্গের আশঙ্কা থাকলেও কচু-ঘেচু সংযোগে কাঁকর মিশ্রিত চাল খাই, হাইড্রেণ্টের জলো দুধ খাই, সাপের চর্বি মেশানো ঘি খাই (ঋণ করেই খাই); জীবন বিপন্ন করে ভিড়ে ভিড়াক্কার ট্রাম-বাস-ট্রেনে দশটা-পাঁচটা করি; ছেলে একদিন নির্ঘাৎ বেকার হয়ে রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করবে জেনেও তার শিক্ষার পিছনে টাকা ঢালি; পণের টাকা (আধুনিক নাম দান-সামগ্রী) দিতে হবে জেনেও মেয়েকে চুটিয়ে নাচ শেখাই এবং এই সব গুরুতর বিপদের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়েও গান গাই—নিশিদিন ভরসা রাখিস। সুতরাং প্রথম পুরস্কার সরকার কাকে দেবেন, তাই ভাবি!!"

• • •

অলিম্পিকের শেষ সংবাদে শুনিলাম, ভারতের পাঁচটি মল্লবীরের সংগে ম্যানেজার ও কর্মকর্তা ছিলেন সাতজন। —"মাল্পে সুধমান্তি—ভারতেরই বাণী; বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি জন্মেছিল এই ভারতের মহা-কাঁকুড়ের সাগর তীরে"—মন্তব্য করেন অন্য এক সহযাত্রী।

• • •

"ইলিশ গেল কোথায়" শীর্ষক প্রবন্ধ পড়িলাম। —"কিন্তু এর জবাব আমাদের তো দূরের কথা, মৎস্য বিভাগও দিতে পারবেন না। একমাত্র উপায় 'হারাণ-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ' কলামে ইলিসের নামে বিজ্ঞাপন ছাপা—ফিরিয়া আইস। কাঁচা-লঙ্কা তেল সর্ষেবাটা শিকেয় তুলে

গিন্নিরা শয্যাশায়ী"—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

লিভার সুস্থ রাখিতে দক্ষিণ ভারতীয় ইড্‌লির নাকি জুড়ি নাই। এই সম্বন্ধে গবেষণার জন্য আমেরিকাতে ইড্‌লি রপ্তানি করা হইয়াছে। আমাদের এক সহযাত্রী বলিলেন—"স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের সীমাবদ্ধ। তবু ভাবছি বৈদেশিক গবেষণাগারে কিছু ভেরেণ্ডা-ভাজা পাঠালে কেমন হয়!!"

• • •

এক সংবাদে শুনিলাম, কলিকাতা ময়দানে প্রচুর বৃক্ষ রোপণ করা হইবে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"তৃতীয় যোজনায় আমাদের পকেটে আর টাকা থাকবে না বলেই তার সংগে সংগতি রাখতে গড়ের মাঠকেই আর ফাঁকা রাখা হবে না। জুতসই প্রবাদটাই মাঠে মারা গেল।"

আবশ্যক

শালের জন্য আংশিক-সময়ের এজেন্ট। বিস্তৃত বিবরণ ও বিনা-মূল্যের নমুনার জন্য লিখুন—
GIRSON KNITTING WORKS, LUDHIANA. (207).

নারায়ণ চক্রবর্তীর

তীর্থাঞ্জলি

ভারত-ব্রহ্ম-চীনের বিস্তৃত পটভূমিকায় লেখা অনন্যসাধারণ রহস্য-উপন্যাস। ৩.০০
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২ ও অন্যান্য পুস্তকালয়।

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

৪৬

'চন্দ্রগুপ্ত' ত হয়ে গেল চব্বিশে জুলাই। বৃহস্পতিবারের অভিনয় হিসাবে ঐ যে 'কপালকুণ্ডলা' হচ্ছিল, তার শেষ অভিনয় রজনী হয়ে গিয়েছিল গত সপ্তাহের বৃহস্পতিবারে—সতেরোই। সেই অভিনয়-তালিকার মধ্যে যুক্ত ছিল 'বিবাহ-বিভ্রাট'-ও। এই 'বিবাহ-বিভ্রাট'-এ 'মিঃ সিং'-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন নরেশবাবু। রাধিকাবাবু স্টার ছেড়ে দিয়ে তাঁর নতুন 'মডার্ন থিয়েটার'-এর উদ্বোধন-ব্যবস্থা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তা' সেদিনকার ঐ অভিনয়ে এমন আশাতিরিক্ত দর্শক-সমারোহ হলো যে, কর্তৃপক্ষ শুক্রবার দিন, অর্থাৎ পঁচিশে জুলাই তারিখে "কেবল আর এক রাত্রির জন্য"—দিলেন—'কপালকুণ্ডলা' এবং বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সেদিনও হলো অভূতপূর্ব জন-সমাগম। ফলে, 'কপালকুণ্ডলা' চলতে লাগল প্রতি শুক্রবারে।

অভিনয়ের সময় ও দিন-সম্পর্কে কিছু বলব বলে আগে লিখেছিলাম, পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে। সেটা এই অবকাশে সংক্ষেপে বলে রাখি। বহু পূর্বে, সেই যখন প্রথম পেশাদারী অভিনয়ের প্রবর্তনা হয়েছিল, তখন অভিনয় হতো শনিবার-শনিবার মাত্র, রাত্রি ন'টায় আরম্ভ হয়ে শেষ হতো বারোটা নাগাদ। এক কথায়, তিন ঘণ্টা অভিনয়-কালের নাটক ছিল সেগুলি। এবং শনিবার ছাড়া আর কোনোদিন অভিনয় হতো না তখন। সপ্তাহের মধ্যে অভিনয়ের জন্য শনিবার দিনটি যে বেছে নেওয়া হয়েছিল, তার কারণ ছিল। অবশ্য, সেযুগে শনিবারটা ছিল বাবুদের যাকে বলে—"মেল-ডে।" কেরানীবাবুদের "মেল-ডে'র মতোই আর কী! কেরানীবাবুদের "মেল-ডে" ছিল বৃহস্পতিবার। সেদিন তাদের নিঃশ্বাস ফেলবার সময় ছিল না, কেউ ফিরছেন অফিস থেকে আট-টায়, কেউ ন'টায়। কারণ, বৃহস্পতিবার ছিল বিলেতের মেল যাবার দিন। হাওড়া থেকে মেল ছাড়বে রাত্রে, লেট-ফী দিয়ে হলেও বিলেতের চিঠি যাবে সেদিন। তা' বাবুদের মেল-ডে শনিবার—কেন? না, সকাল-সকাল সেদিন অফিসের ছুটি, পরের দিন রবিবার পুরো ছুটি। এই ছুটির অবকাশে 'মেল-ডে' করবেন বাবুরা। শনিবার চলে যাবেন বাগানে, রবিবার দিন সেখান থেকে হয় রাত্রে, নয়ত সোমবার সকালে ফিরবেন। জমিদার, বড়-বড় অ্যাটর্নী, উকিল, ব্যবসাদার,—এ'দেরই মধ্য থেকে দেখা দিতো সব 'বাবু'র দল! ও'দের কাছে শনিবার ছিল একটা আমোদের দিন। ওদিন থিয়েটার দেওয়ায় অসুবিধা হতো কেরানীকুলের। আজকের দিনের মতো তখন ডেলী প্যাসেঞ্জারীর সুযোগ ছিল না সেদিন, তাঁরা বাড়ী যেতেন 'উইক্-এন্ড-এ' বড়বাজারে বাজার সেরে—আমের সময় আম—কপির সময় কপি—ওইসব পু'ট্‌লী বে'ধে, কেউ-কেউ শেয়ালদা'র দিকে কেউ-কেউ হাওড়ার দিকে ছুট্ দিতেন। শনিবার দিন জামাইয়ের দলও আবার 'ফ্রী' নেই। জামাইয়ের দল আসে অপেক্ষাকৃত নতুন জামাই যারা, তারা আর কী! দিব্যি ফিট্-ফাট্ হয়ে—'বাবু' সেজে—হাতে 'কোঁচা' ধ'রে শ্বশুরবাড়ী চলেছেন শনিবারে, রবিবারে থাকবেন, সোমবার সকালে ফিরবেন অফিস করতে। অতএব, দেখা যাচ্ছে, সাধারণত সেই সব বাবুরাই তখনকার দিনে আসতেন থিয়েটারে, যাঁদের বাগান নেই অথবা বাগান বাড়িতে পার্টি দেবার তেমন সামর্থ্য নেই, এবং অন্যান্য ব্যয়বহুল আমোদপ্রমোদও নির্বাহ করতে পারতেন না। অবশ্য মাঝে মাঝে দু'চারজন বড়োলোকও যে থিয়েটারে না আসতেন এমন নয়। কিন্তু মধ্যবিত্ত কেরানীকুল একেবারে বঞ্চিত হতেন বলা যেতে পারে। ও'রা সপ্তাহ-শেষে দেশে না গিয়ে নিশ্চয়ই বসে থাকবেন না থিয়েটার দেখার জন্য? তাই, ক্রমশ ও'দের জন্য বুধবার রাত্রি ন'টায় অভিনয়ের দিন স্থির হয়েছিল। কিন্তু, এর কিছুদিন পরে, যখন গোপীচাঁদ শেঠী (কে'ইয়া) ন্যাশনাল থিয়েটারের সাব-লীজ গ্রহণ করেছিলেন, তা' সে হবে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিককার কথা, তখন তাঁর ম্যানেজার এবং অধ্যক্ষ ছিলেন অবিনাশচন্দ্র কর বলে এক ভদ্রলোক। এই অবিনাশবাবুর আমলে শনি-বুধ ত অভিনয় হতোই, তদুপরি হঠাৎ একদিন রবিবার—রবিবারও 'শো' আরম্ভ হয়ে গেল। এই 'হঠাৎ' হওয়ার পিছনে ছিল মাত্র একটা খেয়াল। তখন ও'র ন্যাশনালে গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-রচিত "কামিনীকুঞ্জ" গীতি-নাট্যটি বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল, খেয়ালের বশে বা শখ করে অবিনাশবাবু একদিন

BUY THE BEST
HIGHLY APPRECIATED
SAMSAD ANGLO-BENGALI DICTIONARY
1672 PAGES • Rs. 12·50 n.P.
SAHITYA SAMSAD
32-A, ACHARYA PRAFULLA CH. RD. • CAL-9

ধবল বা শ্বেত

শরীরের যে কোন স্থানের সাদা দাগ, একজিমা, সোরাইসিস ও অন্যান্য কঠিন চর্মরোগ, গাত্রে উচ্চবর্ণের অসাড়যুক্ত দাগ, ফুলা, আঙুলের বক্রতা ও দূষিত ক্ষত সেবনীয় ও বাহ্য দ্বারা দ্রুত নিরাময় করা হয়। আর পুনঃ প্রকাশ হয় না। সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ফোন ঃ ৬৭-২০৫৯। শাখা ঃ ৩৬, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯। (পূরবী সিনেমার পাশে)।

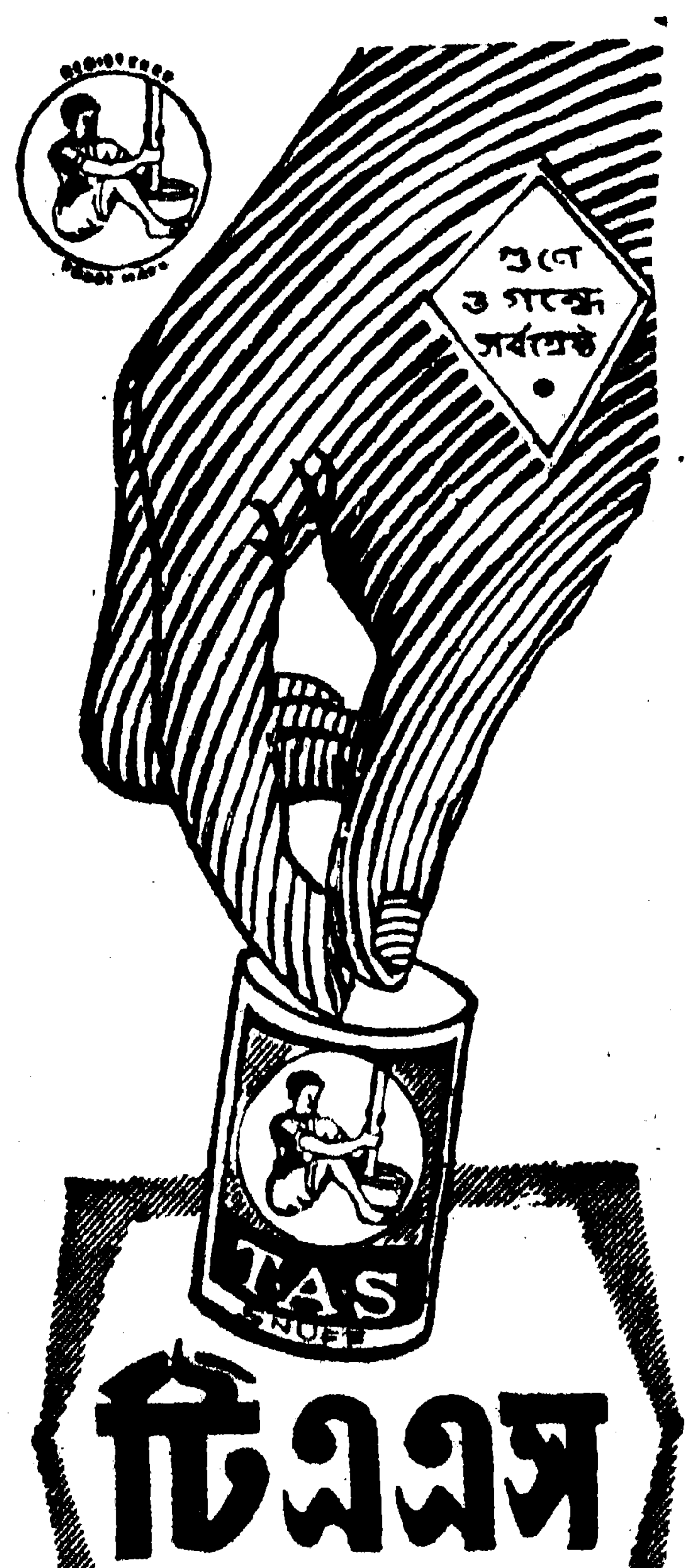

টিএএস
নস্য
সব চেয়ে ভাল

রবিবারে দুপুরবেলা—দুটোর সময়—'কামিনীকুঞ্জ' অভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন, দেখা গেল, খুব বিক্রি হলো। সেই থেকে চালু হলো রবিবারে অভিনয়। কিন্তু সেটা দুপুরে বা ম্যাটিনী আর রইল না, দাঁড়ালো গিয়ে রবিবার সান্ধ্য অভিনয়ে। আমাদেরও অল্প বয়সে—থিয়েটারের বিজ্ঞাপন হাতে এলে লক্ষ্য করে দেখেছি, লেখা থাকত,—"সাণ্ডেআাট্ ক্যাণ্ডল্-লাইট!"

এই 'ক্যাণ্ডেল-লাইট' শীতকালে হতো ছ'টায়, গ্রীষ্মকালে বদলে গিয়ে হতো—সাতটায়।

তারপরে, নাটকের দৈর্ঘ্য যখন একটু-একটু করে বড়ো হ'তে আরম্ভ করল, তখন ত 'উইক্‌ডেজ'-এর অভিনয় নেমে এলো নটা থেকে আট-টায়। বিশেষ করে যখন থেকে আবার কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান আইন জারী করলেন, রাত একটার পর অভিনয় করলে জরিমানা হবে।

এরপরে, আমাদের সময় ত ম্যাটিনী ইত্যাদি রীতিমত চালু হয়ে গেছে। রাত্রিবেলা

যদি কেউ বিনা টিকিটে ভ্রমণ করে

তাতে আপনার কি এসে যায়?

এসে যায় বৈ কি! আপনার মতো যাঁরা সৎ ও ন্যায়পরায়ণ তাঁদের প্রত্যেকেরই এতে এসে যায়। যারা বিনা টিকিটে ভ্রমণ করে, তারা রেলের কামরায় আপনারই জায়গা বেদখল করে। আর টিকিট না কেটে যে টাকা তারা ফাঁকি দেয়, তা দিয়ে অতিরিক্ত আরও অনেক সুবিধা নিশ্চয়ই আপনার জন্য করা যেত।

আপনার পয়সায় এই আনন্দ-ভ্রমণ ছেলে ছোকরারা হঠাৎ খেয়ালের বশে মাঝে মাঝে করে বটে, কিন্তু নিয়মিতভাবে বিনা টিকিটে যারা ভ্রমণ করে তারা যে পাকা চোর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আপনার নির্লিপ্ততায় এই দুষ্কৃতকারিরাই পরোক্ষে উৎসাহ পায়। পুলিশ বা টিকিট-পরীক্ষকের কাজ করতে কেউ আপনাকে বলবে না, কিন্তু টিকিট-পরীক্ষক যখন কোন বিনা টিকিটের যাত্রীকে ধরেন, তখন সেই টিকিট-পরীক্ষক কি অন্ততঃপক্ষে আপনার সাহায্য বা নৈতিক সমর্থনও প্রত্যাশা করতে পারেন না?

বিনা টিকিটে ভ্রমণ
বন্ধ করতে
সাহায্য করুন

পূর্ব রেলওয়ে

আট-টা বা নটায় অভিনয় করবার অনেক কারণ ছিল। প্রথম, দর্শকদের খাওয়া-দাওয়া ক'রে বেরিয়ে থিয়েটারে আসতে আসতে যে সময়টা লাগবে, তাতে করে অভিনয়ের সময় নটা, নিদেন পক্ষে আটটার কম করলে চলে না। এবং বাবুরা, যাঁরা ছিলেন থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক, তাঁদের থিয়েটারে আসা ত ছিল উৎসব-বিশেষ! তখন আলো জ্বলেনি অথচ, থিয়েটার দেখতে যাওয়া, কিম্বা সন্ধ্যার সময় থিয়েটার দেখা, এসব ত রেওয়াজই ছিল না। দিব্যি রাত হবে- থিয়েটার বাড়ি আলোয়-আলোয় ঝলমল করবে—একেবারে ইন্দ্রপুরী হয়ে উঠবে—উৎসবক্ষেত্রে পরিণত হবে, তবেই না উৎসাহ হবে থিয়েটারে আসবার! থিয়েটারে আসা হবে, এ-খবরটা যেই বাড়ির মধ্যে ঘোষণা হয়ে গেল, অমনি পড়ে গেল সাজসজ্জার ধুম। যেন, উৎসব। এই মনোবৃত্তিটা ছিল কিন্তু সেই আদিকাল থেকেই। অভিনয়টা ছিল উৎসব-বিশেষ। উৎসবের প্রাণ নিয়েই দর্শকেরা আসতেন থিয়েটারে। এবং আদিযুগে কেন, মিশরযুগে, গ্রীকযুগে, এমন কি উনবিংশ শতক—ইয়োরোপে, আমেরিকায় এবং আমাদের দেশেও, ঐ উৎসবের মন নিয়ে সবাই আসতো অভিনয় দেখতে। সেইজন্যই প্রয়োজন হতো, এত আলোকমালার, এতো সাজবেশের! অবশ্য তখন ও হয়ে দাঁড়িয়েছে সব বাবুলোকের কাণ্ড, তাই তাদের হৈ-হুল্লোড় করবার সুবিধার জন্যও রাত্রের অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়ে থাকবে। অবশ্য একেবারেই অস্বীকার করতে পারি না, আমাদের সময়েও কিছু-কিছু দেখেছি এই 'বাবু' সম্প্রদায়ের রকম-সকম। 'বাবু' সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রবন্ধ লিখে গেছেন, তার থেকে একটু উদ্ধৃতি দিলেই ব্যাপারটা বোধগম্য হবে। তিনি লিখছেন—"যাঁহার বুদ্ধি বাল্যে পুস্তক মধ্যে, যৌবনে বোতল মধ্যে, বার্ধক্যে গৃহিণীর অঞ্চলে, তিনিই বাবু। যাঁহার ইষ্টদেবতা ইংরাজ গুরু, ব্রাহ্মধর্মবেত্তা বেদ দেশী সম্বাদপত্র এবং তীর্থ 'ন্যাশনাল থিয়েটার', তিনিই বাবু।"

বঙ্কিম মাত্র ন্যাশনাল থিয়েটারের কথা উল্লেখ করে গেছেন, কিন্তু তারপরে যতো থিয়েটার ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে তার প্রায় সবগুলিই 'বাবু-অধ্যুষিত' বলা যায়।

ইতিহাস ছেড়ে এবারে ফিরে আসি আমাদের কথায়। আমাদের সময় ত দেখতে-দেখতে সপ্তাহে পাঁচদিন থিয়েটার হয়ে দাঁড়ালো দেখা যাচ্ছে। আরম্ভ করেছিলাম শনিবারে—কর্ণার্জুন দিয়ে, এখন হয়ে দাঁড়ালো সোম-মঙ্গল বাদ দিয়ে বাকী পাঁচদিনই থিয়েটার। অভিনয়ে—'চন্দ্রগুপ্ত'তে দানীবাবু এসে 'চাণক্য' করছেন, শুনি, শহরময় যেন একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। চারিদিকেই আলোচনা, কেমন করবেন দানী-বাবু 'চাণক্য' এই বৃদ্ধ বয়সে, নতুন দলের সঙ্গে? কেমন মেলে তাঁর অভিনয়? কেমন করে খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন তিনি?

অভিনয়-সম্পর্কে সমালোচনাও যা বেরুতে লাগল, তা' দেখা গেল মূলত দানীবাবুকে কেন্দ্র করেই। যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধবাদী, তাঁরা ত কলম ধরতে ছাড়লেন না। বিশেষ করে 'নাচঘর' তাকে রীতিমত আক্রমণই করেছিলেন বলা চলে। অবশ্য 'নাচঘর'-এর মন্তব্যের বিরুদ্ধেও আবার লেখালেখিও হতে লাগল প্রচুর।

এ' গেছে একদিন, অন্যদিকে তাঁর সুখ্যাতিও হতে লাগল খুব। দোসরা আগস্ট 'শিশির' লিখলেন—"আমরা দানীবাবুর চাণক্য অভিনয় মিনার্ভায়, পরে মনোমোহনে বহুবার দেখিয়াছি। মিনার্ভায় অভিনয় প্রাণবন্ত ছিল, কিন্তু ইদানীং মনোমোহনে তাঁহার অভিনয় নিষ্প্রাণ বলিয়া মনে হইত। কারণও যথেষ্ট ছিল। অভিনয় কখনও সহ-অভিনেতার সাহায্য ভিন্ন ফুটিতে পারে না। মনোমোহনে দানীবাবুর অভিনয় এই সহ-অভিনেতার যোগ্যতার অভাবেই প্রতিপদে প্রত্যাহত হইত। এখানে স্টারে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। নূতন দলের অভিনেতারা সকলেই যোগ্য, তাঁহারা অভিনয় সজীব করিবার প্রাণপাত চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেখিলাম, নূতন দলের সহিত খাপ খাওয়া—ইহার জন্য দানীবাবু অভিনয়ে অনেক নূতনত্বের

—প্রকাশিত হল—
শেফালি নন্দীর লেখা
সিষ্টার মিস মিত্র ২·৭৫
—— লেখিকার অন্যান্য বই ——
সজানীর চোখে পশ্চিম—২·৭৫ পান্না দ্বীপ—১·০০
সাগরে হাওরে—৩·৫০ গীতিমুখর ভিয়েনা—২·০০
পপুলার লাইব্রেরী
১৯৫/১বি, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

॥ ট্যাক্সির মিটার উঠছে : নীলকণ্ঠ ॥ প্রকাশিত হলো ॥

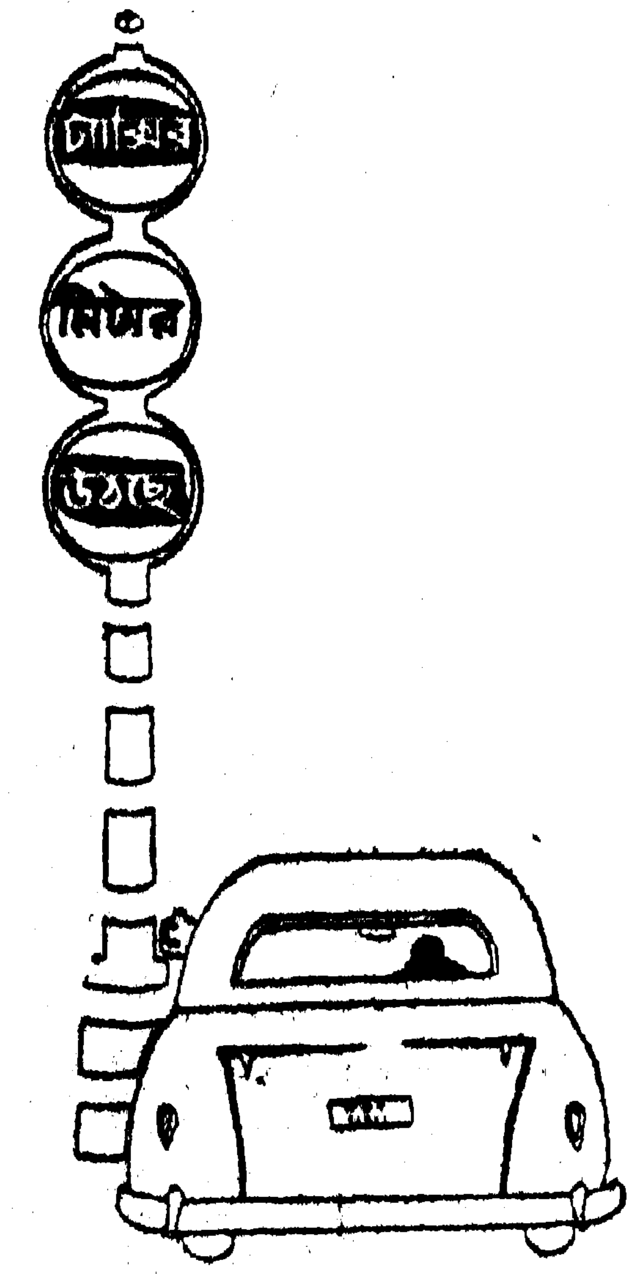

॥ দাম : চার টাকা ॥

নীলকণ্ঠের এই নতুন উপন্যাস সম্পূর্ণ নতুন বিষয় নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থিত। ট্যাক্সির অন্ধকারে যে সব ঘটনা অথবা দুর্ঘটনা ঘটে তারই প্রথম দুঃসাহসিক উপস্থিতি এই গ্রন্থে। ট্যাক্সির চালক অর্জুন সিংকে কেন্দ্র করে যত চরিত্রের ভীড় তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্বর্ণদেব সরকার। সুদূর সিঙ্গাপুর থেকে কলকাতায় আসে যেদিন,—সেদিন রাতেই গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল থেকে বেরিয়ে আর ফিরে আসে না। যার ঠিকানায় যায় তার নাম যজ্ঞেশ্বর রায়। স্বর্ণদেব নিহত না নিরুদ্দিষ্ট বলতে পারে না কেউ। এই রহস্য, গোয়েন্দা-গল্পের রস এবং জীবনের রঙ একসঙ্গে এক আধারে বাঙলা সাহিত্যের আদিকাল থেকে এ পর্যন্ত ইতিহাসে এই প্রথম।

প্রকাশিত হলো—
: শৈলজানন্দের :
"নতুন করে পাওয়া"
দাম : চার টাকা

দি নিউ
বুক এম্পোরিয়ম

: শ্রীবাসবের :
"দূর কিনারে"
দাম : পাঁচ টাকা

॥ ২২-১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট : কলিকাতা ছয় ॥

৭০২ Bohar

আপনাকে লাবণ্যে উজ্জ্বল ক'রে রাখবে

পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম

আপনার স্বাভাবিক মুখশ্রী আরো সমুজ্জল ক'রে তুলুন…পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম
ব্যবহার ক'রে আপনার মুখখানি নির্মল, কমনীয় ও মসৃণ রাখুন। এই ক্রীম
ত্বকের গভীরে প্রবেশ ক'রে সমস্ত ময়লা দূর ক'রে দেয়,
ত্বকে কোন দাগ হতে দেয়না এবং ত্বক লাবণ্যোজ্জল রাখে!
রোজ রাত্রে পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম আপনার মুখে মাখুন—দেখবেন, কত অল্পদিনে
আপনি অম্লান লাবণ্যের অধিকারিণী হয়েছেন!

সারা পৃথিবীর সুন্দরী রমনীদের মনের মতো

চীজব্রো-পণ্ড্‌স ইন্‌ক (সীমিত দায়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

সন্নিবেশ করিয়াছেন।...সেই চেষ্টা সর্বথা এবং সর্বতোভাবে সফলতালাভ করিয়াছিল সেলুকসের অভিনয়ে। এমন সুন্দর সজ্জা-সৌষ্ঠব, এমন মনোজ্ঞ অভিব্যক্তি অধুনা বহু কমই দেখিয়াছি। অহীন্দ্রবাবুর সেলুকসের তুলনা নাই।"

শুধু 'শিশির' কেন, বহু কাগজই তখন প্রশংসা করেছিলেন। পত্রযোগেও বহু ব্যক্তিবিশেষ প্রশংসা করে গেছেন। নাচঘরের সমালোচনায় 'চন্দ্রগুপ্ত'-এর সমালোচনা হয়নি, হয়েছিল মূলত দানীবাবুর সমালোচনা। 'বৈকালী'তে তারই প্রত্যুত্তরে শৈলেশনাথ বিশী বলে একজন লিখলেন ৬ই আগস্ট:—'দানীবাবু কোথাও অস্বাভাবিক বা বিকৃত মুখভঙ্গী করেন নাই। অভিনয়ের সময় প্রত্যেক ভাব তিনি মুখচোখ ও সর্বাঙ্গ দিয়ে অভিনয় করেছেন।"

বিশী তারপরে লিখেছিলেন—'চাণক্যের' পরেই সেলুকাসের ভূমিকায় অহীন্দ্রবাবুর সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয়ের কথা মনে হয়। তিনি চেহারায় পুরা গ্রীক সাজিয়াছিলেন ও তাঁহার প্রত্যেকটি অভিনয়ই তাঁহার পদ-মর্যাদা, অপরিসীম বাৎসল্য, বীরত্ব ও শৌর্যের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বাংলার রঙ্গমঞ্চে সত্য-সত্যই একজন ক্ষমতাশালী অভিনেতা হইয়া উঠিয়াছেন।"

ঐ সময় থেকে, লক্ষ্য করেছিলাম, লোকে আর আমাকে উদীয়মান ইত্যাদি না বলে পাংক্তেয় করে নিচ্ছেন।

'বৈকালী'তে এক ভদ্রলোক—প্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত এম-এ লিখছেন—

"গত ১৬ই শ্রাবণ প্রকাশিত ১১শ সংখ্যা 'নাচঘর'-এ দানীবাবুর চাণক্যের ভূমিকা অভিনয়ের যে সমালোচনা বেরিয়েছে, তা পড়ে সমজদার লোকমাত্রেই ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। 'নাচঘর'-এর সম্পাদকদ্বয় উচ্চশিক্ষিত, সাহিত্যিক এবং উচ্চশিক্ষিত সমাজেই মেলা-মেশা করেন। সুতরাং তাঁদের কাছে থেকে উচ্চ অঙ্গের সমালোচনাই আশা করা গিয়েছিল। কিন্ত সে বিষয়ে সকলেই হতাশ হয়েছেন।...দানীবাবুর চাণক্যের ভূমিকায় অভিনয় একেবারে অপূর্ব। হয়ত তিনি স্থান বিশেষে 'তোমাকে'র উপর ঝোঁক না দিয়ে "হত্যা করব"র উপর ঝোঁক দিয়েছেন কিম্বা মোটেই ঝোঁক দেননি, কিন্তু তাতে কি যায় আসে? উপযুক্ত 'ঝোঁক' দিয়ে পার্ট বলাটাই অভিনয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। চাণক্যের সে সজীব মূর্তি, সেই নিষ্ঠুর, দাম্ভিক, প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্রাহ্মণের যে সুস্পষ্ট ছবি দানীবাবুর অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে, তা যে একবার দেখেছে সে আর জীবনে কখনো ভুলতে পারবে না। এ রকম অপূর্ব অভিনয় বাংলাদেশে এক দানীবাবুর দ্বারাই সম্ভব।......তবে একটা জিনিস দেখে বড়ো সুখী হয়েছি, "নাচঘর" অহীন্দ্রবাবুর সেলুকাসের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন।......এমন সর্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে খুব কমই দেখা যায়। অহীন্দ্রবাবু অর্জুনের ভূমিকায় যখন প্রথম প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন, তখনই সকলে বুঝেছিলেন যে ইনি একজন অসাধারণ অভিনেতা। তাঁর সেলুকাসের ভূমিকার অভিনয় দেখে সে বিষয়ে সমজদার দর্শকের মনে আর কোন সন্দেহ নেই। সেলুকাসের চরিত্রকে এমনভাবে সজীব সরস করে তুলতে আর কোনো অভিনেতা পারতেন কিনা সন্দেহ। অহীন্দ্রবাবুর সেলুকাসের ভূমিকা দেখতে দেখতে আমাদের মনে হচ্ছিল, প্রথম শ্রেণীর অভিনয় বাংলা রঙ্গমঞ্চে শুধু দানীবাবু—শিশিরবাবুরই একচেটে নয়। অহীন্দ্রবাবুর সম্বন্ধে বিশেষ বলবার কথা এই যে,—বাংলাদেশের অভিনয়ের মধ্যে তিনি একটি নতুন সুর এনেছেন। তিনি পুরানো ধাঁচের অভিনেতা নন, শিশিরবাবুর ধরনও তাঁর ভিতরে নেই; তাঁর ধরনটি সম্পূর্ণ অভিনব।" এসব ত গেল পত্র ও পত্রিকার অভিমত। দানীবাবুর 'চাণক্য' সম্পর্কে আমার নিজেরও কিছু পর্যালোচনা করবার আছে।

(ক্রমশঃ)

একটি মুহূর্ত
মনসা চট্টোপাধ্যায়ের
নতুন উপন্যাস
দাম—দুই টাকা
গ্রন্থ ভবন
১৭, সুভাষ পল্লী, বনহুগলী,
কলিকাতা-৩৫
(সি ৮২৩০)

পরিবার-নিয়ন্ত্রণ
(জন্মনিয়ন্ত্রণে মত ও পথ)
সচিত্র সুলভ তৃতীয় সংস্করণ।
প্রত্যেক বিবাহিতের বাস্তব সাহায্যকারী অবশ্যপাঠ্য। মূল্য সডাক ·৮০ নয়া পয়সা অগ্রিম M. O.-তে প্রেরিতব্য। পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় জন্য সাক্ষাৎ বেলা ১—৭টা।
মেডিকো সাপ্লাইং কর্পোরেশন
FAMILY PLANNING STORES.
রুম নং ১৮, টপ্ ফ্লোর
১৪৬, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা—৯
ফোন: ৩৪-২৫৮৬

বিজয়ার
সাদর সম্ভাষণ
আত্মীয়তা ও মিত্রতা স্মরণীয় রাখায় সহায়তা করে
ন্যায্যমূল্যে আমাদের রকমারী আধুনিক
ডিজাইনের সিল্কের সাড়ী ও তাঁতের ধুতি সাড়ী।
রামগোপাল গোরামল
৪৮নং মনোহর দাস স্ট্রীট (সোনাপটি), দোতালা, কলিকাতা-৭
ফোন নং ৩৩-৩৫৯৪

সদ্য প্রকাশিত
নীহাররঞ্জন গুপ্তের
রহস্য উপন্যাস
মদন ভস্ম
তিন টাকা
পোড়ামাটী ভাঙ্গাঘর
আট টাকা
আর এন চ্যাটার্জি এণ্ড কোং
২৩, নির্মলচন্দ্র স্ট্রীট, কলিঃ—১২

প্রচুর ফেনায় চুলের ময়লা কাটিয়ে দেয়

টাটা-র

শ্যাম্পু

আপনার চুল চকচকে, পরিষ্কার
ও কোমল রাখে...
অবাধ্য চুল বশে আনে।

টাটার উৎপাদন

পুস্তক পরিচয়

উপন্যাস

মহাশ্বেতা—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম— ৫·৫০ নয়া পয়সা।

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করবার অধিকার কেন দেওয়া হবে না, বিধাতাকে এ-প্রশ্ন করেছিলো মহাভারতের চিত্রাঙ্গদা। সে-প্রশ্ন আজো করছে বাংলা দেশের মেয়েরা। পুরুষ এবং নারীর সমানাধিকারের কথা এখন প্রায় পুরনো হয়ে গেলেও, সে-অধিকার আমাদের দেশের মেয়েরা বড় সহজে আদায় করতে পারছে না। কত রকম সামাজিক চাপের ফলে সে বাইরে আসতে বাধ্য হচ্ছে তারা ভাগ্য জয় করতে তার খবর কে রাখে। সব সময় যে ভাগ্যজয়ের চিরন্তন প্রশ্নটিই তাদের বিচলিত করছে তা নয়, সমাজের রক্ষণশীলতা এবং অর্থনৈতিক অধোগতিই অনেকাংশে এ-পরিণতির জন্য দায়ী। নতুবা ভাগ্যজয়ের প্রেরণাই যদি তাদের গৃহের অর্গল মুক্ত করতে বাধ্য করতো, তাহলে দুঃখ ছিলো না। হয়তো সমগ্র জাতটাই উপকৃত হতো তাতে। কিন্তু তবু ঘরের অর্গল খুলছে, যে কারণেই খুলুক, তাতেও লাভ কম নয়। নীরাও তেমনি বাইরে ছুটে এসেছে, নিজের বিশ্বাসে শক্ত হয়ে পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়েছে, নিজেই যে নিজের অভিমানকে জয়যুক্ত করে মহৎ হয়েছে তা নয়, দেশের মেয়েদের চোখে আপন মহত্ত্বেও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মহাশ্বেতা উপন্যাস নীরার জয়যাত্রার কাহিনী।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন কোনো উপন্যাস আজ তার পাঠকের কাছে পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। তবু বলা ভালো, মহাশ্বেতা তারাশঙ্করের পক্ষেও একটি নতুন সৃষ্টি। একেবারে নতুন দিনের নতুন মানুষগুলির দিকেও তিনি একেবারে নতুন দৃষ্টিতেই তাকিয়েছেন। শুধু সামাজিক নয়, তার চেয়ে গণ্ডিবদ্ধ একটি পারিবারিক সংঘাত ও বিদ্বেষ যে কেমন করে তিলে-তিলে মানুষের প্রাণকে হত্যা করে তা তিনি দেখেছেন, কিন্তু সে অন্ধকারের একটি ছোট্ট জ্যোতির্ময় স্ফুলিঙ্গকে আবিষ্কার করতে তাঁর ভুল হয়নি। নীরা সেই অন্ধকারকে দু'হাতে সরিয়ে এসে দাঁড়াতে পেরেছে, তাতেই তার জীবনের সার্থকতা নয়। অনেক দুঃখরজনীর শেষে সে জীবনের পরম মহিমাটিকে স্পর্শ করতে পেরেছে, এইখানেই তার জয়। অথচ আশ্চর্য এত বড় ঘটনাকে বিবৃত করতে লেখক অনেক ঘটনাকে স্রোতের মতো বাঁহয়ে দেননি। একটা জীবনকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলবার জন্য অজস্র অবিশ্বাস্য চরিত্রেরও আমদানী করেননি। জ্যেঠামশাই থেকে বিনোদা আর হেনা থেকে প্রতিমা—প্রত্যেকটি চরিত্রই অবধারিত এবং সত্য। একদিকের এই তিতিক্ষা অন্যদিকে বিনোদাকেও পৌঁছে দিয়েছে জীবনের দুঃখনিশির শেষে এক প্রদোষ উষালোকে—সেখানে মোটামুটি দাঁড়িয়ে নীরার সঙ্গে তাঁর প্রশান্ত মিলন সম্ভব।

যে ঘূর্ণাবর্ত নীরার জীবনকে পথে-বিপথে ঘুরিয়ে নিয়ে চলেছে তা মোটেই অস্বাভাবিক নয়, তবু লেখক বারবার বলছেন, তার জীবন একটা নাটক ছাড়া আর কি! অর্থাৎ তিনি প্রকারান্তরে সাহিত্যের একটি মূল প্রশ্নের জবাবেই বলতে চেয়েছেন, নাটক বস্তুত জীবন বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। বর্ণনায় ব্যাপ্তির প্রয়োজন ছিলো, তাই সোজাসুজি নাটক না লিখে তাঁকে উপন্যাসই রচনা করতে হয়েছে। তবু পাঠক এ-উপন্যাসে একেবারে একটি নতুন আঙ্গিকের সন্ধান পেয়ে বিস্মিত হবেন। মানতে বাধ্য হবেন, প্রৌঢ় সাহিত্যিক তারাশংকর আজও নিঃশেষিত হননি, শুধু তাই নয়, এখনও নতুনতর এবং সার্থক সৃষ্টিও তাঁর দ্বারা সম্ভব। ৩৫৯।৬০

শারদ-সাহিত্য

সুর ও শিল্পী—সম্পাদক শ্রীআশীষ-কুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঅরুণ রায় চৌধুরী। ১৪৩, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা ২৬। মূল্য তিন টাকা।

নাম দেখে পত্রিকাখানি কেবলমাত্র সংগীত ও সংগীতশিল্পী সম্পর্কিত বলে ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। প্রধানত সংগীত সম্পর্কিত প্রবন্ধ এবং জনপ্রিয় গায়ক-গায়িকার কতকগুলি গানের স্বরলিপি এতে স্থান পেলেও চলচ্চিত্র ও নাট্যালয় সম্পর্কিত সংবাদ ও ছবি এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্র-পত্রিকার গল্প স্থান পেয়েছে এতে।

গণবার্তা—সম্পাদক—বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ৩৭, রিপন স্ট্রীট, কলিকাতা—১৬। মূল্য তিন টাকা।

সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি ও অর্থনীতি-বিষয়ক প্রবন্ধ এবং তৎসহ গল্প, কবিতা ও নাটিকার সমন্বয়ে প্রকাশিত হয়েছে আলোচ্য শারদীয়া সংখ্যাখানি। বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে আছেন—সর্বশ্রী ত্রিদিব চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, পুলকেশ দে সরকার, সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সলিল সেন, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, প্রেমেন্দ্র মিত্র,

বাঙালী ও বঙ্গসংস্কৃতিকে জানতে
একখানা প্রথম শ্রেণীর বাংলা
মাসিক **নববঙ্গ** পড়ুন
তৃতীয় বর্ষ * বার্ষিক ৩,
২০১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭

অনুপম আঙ্গিকে লেখা সুকৃতি রায়চৌধুরীর
তপোময় তুষারতীর্থ
১২টি চিত্রশোভিত সাবলীল ভাষায় 'কেদার-বদরী ভ্রমণ কথা। পাঠে মনে হবে হিমতীর্থে পৌঁছেছেন। দাম ৪·৫০। ভূমিকা লিখেছেন শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।
দি বুক হাউস, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলি-১২
(সি ৮০২৮)

রত্নময়ী 'শ্রীমনীষা দেবীর উপন্যাসোপম জীবনী অবলম্বনে লেখা যতীশ চট্টোপাধ্যায়ের
মৃত্যুশোক সাধারণ—১, বোর্ড বাঁধাই—১৷৹
অখিল মানব মনের প্রিয়জন মৃত্যু বেদনার মর্ম-স্পর্শী আলেখ্য। ইণ্ডিয়ান বুক ডিস্ট্রিবিউটিং কোং, ৬৫/২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ—৯
(সি ৮১২০)

ডাঃ শ্রীশীতলচন্দ্র মিত্রের
সরল হোমিওপ্যাথিক গৃহ-চিকিৎসা
নূতন শিক্ষার্থী ও গৃহচিকিৎসার পক্ষে উপযুক্ত। প্রত্যেক রোগের বিবরণ ও চিকিৎসা সহজভাবে লিখিত হইয়াছে। সাধারণ স্ত্রীলোকও বুঝিতে পারিবেন। মূল্য মাত্র ৪, টাকা।
প্রকাশক—ন্যাস এণ্ড কোং
আমেরিকান হোমিওপ্যাথিক ফার্মেসী
১১২।এ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা—৪
(বি-ও ৪৫৬৬)

বিনয় চৌধুরীর
নতুন উপন্যাস
আজব কন্যার কাহিনী
তিন টাকা
এডুকেশন্যাল বুক সোসাইটি
৬২ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
(সি ৭৪৭১)

চিত্র ভারতী

দীপাবলী সংখ্যায় থাকছেঃ

সন্তোষকুমার ঘোষ, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল দাশগুপ্ত, মিহির সেন, শৈলজানন্দ ও বিশিষ্ট কয়েকজন লেখকের গল্প * ইন্দ্রনাথের লেখা সচিত্র রম্যরচনা 'পাছে ভুলে যাই' * আনন্দ মুখোপাধ্যায়ের গীতিনাট্য 'বারো মাস তেরো পার্বণ' * হরিপদ চক্রবর্তীর সচিত্র শিকার কাহিনী 'তিতির পেছনে হিমসিম' * নয়জন নবীন কবির নয়টি প্রেমের কবিতা * মঞ্চ-শিল্প সম্পর্কে তাপস সেনের সুচিন্তিত প্রবন্ধ * হলিউডের বিখ্যাত দুটি ছবির চিত্রনাট্য থেকে অনুবাদ * বাংলা চলচ্চিত্রের প্রথম যুগ সম্বন্ধে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা

আর

জনপ্রিয় শিল্পীদের আর্ট পেপারে ছাপা অসংখ্য ছবি।

*

আটটি নিয়মিত বিভাগে লিখবেন—ধ্যানব্রত হালদার, বিজন দত্ত, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর সেন ও অশোক ঘোষাল

*

বম্বের চিত্রজগতের কথা এবং চিঠির জবাব দেবেন বিভাস সোম।

*

এ সংখ্যার একটি বিশেষ আকর্ষণ চিত্রতারকাদের স্বাক্ষরিত ফটোগ্রাফের জন্য কুপন

*

দিল্লী থেকে নিয়মিতভাবে লিখবেন ও আলোকচিত্র দেবেন হীরেন চৌধুরী

*

দিল্লীতে যোগাযোগের ঠিকানাঃ
14A/6, W.E.A.,
Karolbag, New Delhi-5.
Phone : 52721

*

বোম্বাই প্রতিনিধির ঠিকানা ঃ
Beevash Shome,
Kinchin, Flat 5
Fourteenth Rd.,
Khar, Bombay-52
Phone : 71131

*

অফিস :
৩, সুখলাল জহুরী লেন,
কলিকাতা-৭
ফোন ঃ ৩৩-৩৩১৮

দুই শতাধিক পৃষ্ঠার এই বিশেষ সংখ্যার মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

এজেন্সীর জন্য আবেদন করুন

অন্নদাশঙ্কর রায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, কৃষ্ণ ধর, মানস রায় চৌধুরী, ধীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত প্রভৃতি।

আবাহন — সম্পাদক — শ্রীসুধীন্দ্রকুমার পালিত। ২৬।২, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা—৯। মূল্য ১·৫০ নয়া পয়সা।

ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'আবাহন'-এর বর্তমান বছরের আলোচ্য শারদীয়া সংখ্যাখানি বিশিষ্ট লেখকদের রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ। লেখকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রচনার জন্য নাম করা যায় প্রবন্ধ বিভাগে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ ও চিত্তরঞ্জন দেব, গল্প রচনায় নরেন্দ্রনাথ মিত্র, রমেশচন্দ্র সেন, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য এবং কবিতা রচনায় হরপ্রসাদ মিত্র, খোন্দকার নূরুল ইসলাম প্রভৃতি।

অঙ্গনা—সম্পাদিকা প্রতিভা রায়। ৩৫, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। মূল্য ১·৫০ নয়া পয়সা।

মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত 'অঙ্গনা' সাময়িক পত্রিকা হিসেবে সুপরিচিত। আলোচ্য শারদীয়া সংখ্যাখানি বিশিষ্ট লেখিকাদের রচনাসম্ভারে একটি সুসম্পাদিত প্রকাশন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ইলারাণী বসু, ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী, অরুণা মুখোপাধ্যায়, লীনা দত্ত ও চিত্রা সেনের প্রবন্ধ, হাসিরাশী দেবী, বাসন্তী বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুষ্পদল ভট্টাচার্যের গল্প এবং স্নেহলতা নাথ, উমা দেবী প্রভৃতির কবিতা।

রবিবারের লাঠি—সম্পাদিকা নন্দিতা গঙ্গোপাধ্যায়। ৭ ডি, গোপাল ব্যানার্জী লেন, কলিকাতা—২৬। মূল্য ২·০০।

বলাই দেবশর্মা, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেজাউল করীম, চিত্তরঞ্জন দেব প্রভৃতির প্রবন্ধ এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্য, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী দেবী, গোবিন্দ চক্রবর্তী, অরুণ ভট্টাচার্য প্রভৃতির কবিতাই আলোচ্য শারদীয়া সংখ্যাখানির যা কিছু আকর্ষণ। কয়েকটি গল্পও অবশ্য আছে, কিন্তু তেমন রসোত্তীর্ণ নয়। কলেবরের তুলনায় মূল্য যথেষ্ট বেশী।

জয়শ্রী—সম্পাদিকা লীলা রায়। ৪৭-এ, রাসবিহারী এভিনু্য, কলিকাতা—২৬। মূল্য ২·০০।

সুপ্রতিষ্ঠিত মাসিক পত্রিকাখানির আলোচ্য শারদীয়া সংখ্যা অন্যান্য বছরের মতোই রচনার দিক থেকে সমৃদ্ধ। প্রবন্ধ রচনায় আছেন হরপ্রসাদ মিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ সেন, সরোজেন্দ্রনাথ রায়, অতীন্দ্রনাথ বসু, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভূষণ দাশগুপ্ত ও যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী। রসিক পাঠকের কাছে সন্তোষকুমার ঘোষের 'পার্সোনাল এসে' জাতীয় রচনাটি ভাল লাগবে। নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সুশীল রায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু প্রভৃতির গল্প এবং নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, দীনেশ দাস, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত প্রভৃতির কবিতা সংখ্যাখানির মর্যাদা বাড়িয়েছে।

সাত সমুদ্দুর—সম্পাদিকা ইন্দিরা দেবী। ৪০, চিত্তরঞ্জন এভিনু্য, কলিকাতা—১২। মূল্য ২·৫০ নয়া পয়সা।

ছোটদের উপযোগী লেখায় যারা খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদের অনেকেরই রচনা সম্ভারে সমৃদ্ধ এই আলোচ্য পূজা সংকলনখানি। ছোটরা পড়ে খুশী হবে এমন সচিত্র গল্প ও কবিতা সুদৃশ্যভাবে পরিবেশনের জন্য সম্পাদিকা প্রশংসা অর্জন করবেন। ছোটদের রচনা-ক্ষমতাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত ছোট ছেলেমেয়েদের কতকগুলি রচনা এই সংখ্যাখানির একটি বৈশিষ্ট্য। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

রোশনাই—সম্পাদক রমেন দাস। এশিয়া পাবলিসিং কোম্পানী, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২। মূল্য ১·০০।

পূজো সংকলনরূপে গত বছর প্রথম প্রকাশিত হবার পর 'রোশনাই' গত ছ'মাস ছোটদের মাসিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হচ্ছে। আলোচ্য শারদীয়া সংখ্যাখানির লেখকদের তালিকায় আছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, নরেন্দ্র দেব, নজরুল ইসলাম, স্বপনবুড়ো, ধীরেন বল, কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রমুখ সুখ্যাত সাহিত্যিকবৃন্দ।

সৃজনী—পশ্চিমবঙ্গ শিল্পাধিকার কর্মী সংসদ। ১, হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা—১। মূল্য ১·০০।

পশ্চিমবঙ্গ শিল্পাধিকার কর্মী সংসদের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত আলোচ্য শারদীয় সংকলনটি প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে আঙ্গিক সৌষ্ঠবের দিক থেকে। আগাগোড়া আর্ট পেপারে সুন্দরভাবে মুদ্রিতই শুধু নয়, রচনাবলীর দিক থেকেও পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন শিল্প সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলীও সংকলনটির বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের একখানি অপ্রকাশিত পত্র, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শিল্পে খদ্দরের স্থান' প্রবন্ধ ছাড়া শিল্পসম্পর্কিত ও পশ্চিম বাঙলার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাবিষয়ক সচিত্র প্রবন্ধাবলী অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় পরিবেশন করে। এছাড়া গল্প ও কবিতাও সংকলনটিতে স্থান পেয়েছে।

জাগৃহি—সম্পাদক জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। জাগৃতি সংঘ, কাটজুনগর, যাদবপুর। মূল্য ১·০০।

জাগৃতি সংঘের মুখপত্র 'জাগৃহির' আলোচ্য শারদীয়া সংখ্যাখানি রচনা ও আঙ্গিকের দিক থেকে একটি প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা। সরোজ আচার্য, অধ্যক্ষ শৈলজারঞ্জন মজুমদার, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার মিত্র, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়,

শ্রীনিরপেক্ষ প্রভৃতির প্রবন্ধ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির গল্প, প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত 'স্মৃতি চিত্রন' এবং মণীন্দ্র রায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট কবিদের রচনা সংখ্যাখানিকে মর্যাদাসম্পন্ন করে তুলেছে।

নির্মলেন্দু—সম্পাদক নির্মলেন্দু ঘোষ। ১৮, বাবুরাম শীল লেন, কলিকাতা—১২। মূল্য ১·৫০ নয়া পয়সা।

সম্পাদকের নিজের নামেই পত্রিকার নামকরণ থেকে আত্মপ্রচারের যে আভাস পাওয়া যায় আলোচ্য সংখ্যাগুলির রচনা, ছবি ইত্যাদির মধ্যে তা অতি নির্লজ্জভাবে স্পষ্ট। নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নবেন্দু ঘোষ, আশাপূর্ণা দেবী, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, শিবরাম চক্রবর্তী প্রভৃতি গল্প এবং অন্যান্য কজনের প্রবন্ধ ও কবিতা থাকলেও তার সংগে যেমন সম্পাদক নিজের ও সহঃ-সম্পাদিকার রচনা চালিয়ে দিয়েছেন, তেমনি বিভিন্ন ছবির দৃশ্যের সংগে নিজের পরিবারের, আত্মীয়-পরিজনের ও পৃষ্ঠপোষকদের ছবি ছাপিয়ে সংখ্যাখানিকে প্রায় একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার করে তুলেছেন।

হিমাদ্রি—সম্পাদক প্রমথনাথ ভট্টাচার্য। ১৬, গণেশচন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা—১২। মূল্য ১·৫০ নয়া পয়সা।

প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতার সমন্বয়ে আলোচ্য শারদীয়া সংখ্যাখানি পূর্ববর্তী বছরের ধারাই অনুসরণ করেছে। এ বছরকার উল্লেখযোগ্য রচনাবলীর মধ্যে আছে—রাণীচন্দের "গুরুদেবের আশেপাশে" প্রবন্ধ, সুবোধ ঘোষ, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন বসু, গৌরীশংকর ভট্টাচার্যের গল্প এবং কাজী নজরুল ইসলাম, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, দিলীপকুমার রায় ও জগদানন্দ বাজপেয়ীর কবিতা। এছাড়া অন্যান্য বছরের মতো মহাপুরুষদের চিত্রাবলী।

সংগ সাথী—সম্পাদক শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সেন। ৪৫।এ, মতি শীল স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা প'চিশ নয়া পয়সা।

গল্প, কবিতা এবং প্রবন্ধের সমাবেশে এই শারদীয়া সংখ্যাখানি বেশ উপভোগ্য হইয়াছে। প্রখ্যাত সাহিত্যিকগণের মধ্যে শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ও নরেন্দ্র দেবের রচনা ইহাতে স্থানলাভ করিয়াছে।

মা ন ব—সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি শ্রীকমলারঞ্জন তলাপাত্র। মূল্য প'চাত্তর নয়া পয়সা।

শারদীয়া সংখ্যা 'মানবে' আছে বিভিন্ন লেখকের ৬টি গল্প, ৬টি প্রবন্ধ এবং ২২টি কবিতা। প্রবন্ধগুলি সুচিন্তিত। গল্পগুলি নিতান্ত ছোটখাট। কবিতা চলনসই।

উ ন্মে ষ—সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি কান্তি গুপ্ত। 'উন্মেষ' সাহিত্য আসর, সি, আই, টি বিল্ডিংস, কলিকাতা—১০ হইতে প্রকাশিত। মূল্য প'চাত্তর নয়া পয়সা।

এই শারদীয়া সংখ্যাখানির রচনা—প্রবন্ধ, গল্প, রম্য-নক্সা, কবিতা ও কিশোর মহল এই কয়ভাগে বিভক্ত। লেখকগণের মধ্যে নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, পরিমল গোস্বামী, কৃষণচন্দর, তারাপদ রাহা, বিমলচন্দ্র ঘোষ এবং রামেন্দ্র দেশমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ই ন্দ্র প্র স্থ—সম্পাদকমণ্ডলী—আ দি ত্য সেন, অমল সরকার, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশান্ত লাহিড়ী। নয়াদিল্লি হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

এই মাসিকপত্রের ভাদ্র-আশ্বিন দুই সংখ্যা মিলিয়া শারদীয়া সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, অনুবাদ, সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া খেলাধুলা, পুস্তক পরিচয় প্রভৃতি অনেক কিছুই ইহাতে স্থানলাভ করিয়াছে। লেখকগণের মধ্যে চাণক্য সেন এবং নরেন্দ্র দেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ফলন—সম্পাদক—যামিনীকান্ত মাইতি। ১৫৯, রামদুলাল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৩১ নয়া পয়সা।

শারদীয়া সংখ্যা 'ফলনে' আছে কয়েকটি কবিতা, প্রায় সমসংখ্যক গল্প এবং একটি ভ্রমণ কাহিনী।

গন্ধর্ব—সম্পাদক নৃপেন্দ্র সাহা। ১৩৩/১এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা—৬ হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

নব নাট্য আন্দোলনের একমাত্র ত্রিমাসিক মুখপত্র গন্ধর্বের ইহা শরৎ সংখ্যা। কয়েকটি পূর্ণাংগ নাটক এবং নাটক সম্পর্কে কিছু প্রবন্ধ আলোচ্য সংখ্যার আকর্ষণ। লেখকগণের মধ্যে পবিত্র গংগোপাধ্যায়, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং খালেদ চৌধুরীর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

স্বস্তিকা—শ্রীসনৎকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ২৭।১বি, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি বাগচি ও অন্যান্যের প্রবন্ধ, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির গল্প, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের উপন্যাস, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতা, কিছু অনুবাদ সাহিত্য ও অন্যান্য রচনাসম্ভার আলোচ্য শারদীয়া সংখ্যাখানির বিশেষ আকর্ষণ। প্রচ্ছদ পরিকল্পনা প্রশংসার্হ।

"আশা হতাশায় ঘেরা মানব সংসারের যে মহল সাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত হবার আগে অনেক রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক বেড়া পার হয়ে আসে, এখানে বিনা দ্বিধায় তা সম্মানিত হয়েছে"—মানবদরদী কথাশিল্পী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মনের মানুষ সম্বন্ধে 'দেশ'এর অভিমত।

মনের মানুষ

মানবপ্রীতির বিচিত্র আখ্যান। দাম তিন টাকা

লিপিকার বই

দুস্তর মরু
দরবেশ ॥ তিন টাকা

বিদূষক
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
দুই টাকা পঞ্চাশ

সাহিত্যের সত্য
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
দুই টাকা পঞ্চাশ

আসন্ন প্রকাশ

সারারাত
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ
লিমিটেড। কলিকাতা-৯

ঘরে বাইরে—সম্পাদিকা কনক মুখোপাধ্যায়। ১০৮।২, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ হইতে প্রকাশিত। দাম দেড় টাকা।

আলোচ্য শারদীয়া সংখ্যাখানি বহু প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, কৌতুক নাটিকা, সূচীশিল্প, আলপনা স্কেচ, কার্টুন ও একখানি রহস্যোপন্যাসে সমৃদ্ধ। প্রবন্ধে—জ্যোতির্ময়ী দেবী, নীলিমা ঘোষ, ডাঃ রেণুকা রায়; কবিতায়—শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী, উমা দেবী; গল্পে—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী, হাসিরাশি দেবী, ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ির নাম উল্লেখযোগ্য। পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রচ্ছদপট সুন্দর।

বঙ্গবাসী কলেজ পত্রিকা—৬০শ সংখ্যা ১৩৬৬-৬৭। সম্পাদনা করুণাসিন্ধু দে।

অন্যান্য বছরের মত বর্তমান বছরের 'বঙ্গবাসী কলেজ পত্রিকাটি' ছাত্র ও অধ্যাপকগণের বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দী রচনাসম্ভারে আত্মপ্রকাশ করেছে। সুচিন্তিত কয়েকটি প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, আলোচনা ও একটি একাঙ্কিকা বর্তমান সংখ্যার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে। আলোচ্য সংখ্যাটি একাধারে সুসম্পাদিত ও সুসজ্জিত।

ত্রিপুরা—সম্পাদক বীরেশ চক্রবর্তী। আগরতলা, ত্রিপুরা কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

বেশ কয়েকটি কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও রসরচনা এই শারদীয়া সংখ্যাখানির বিশেষ আকর্ষণ। প্রচ্ছদ ফটো প্রশংসার যোগ্য।

নিরীক্ষা—সম্পাদক অরুণ গাঙ্গুলী। ২৬, চৌরঙ্গী রোড হইতে প্রকাশিত। মূল্যে ৫০ নঃ পঃ।

পাক্ষিক পত্রিকা নিরীক্ষার শারদীয়া সংখ্যা রাজনীতি, প্রবন্ধ, সাহিত্য এবং কবিতার সমাবেশে বেশ উপভোগ্য হইয়াছে।

শিক্ষক—সম্পাদক শ্রীমহীতোষ রায় চৌধুরী। ৬১, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা—১৯—শিক্ষক কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কবিশেখর কালিদাস রায়, শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য প্রভৃতি প্রখ্যাত লেখকের প্রবন্ধ আলোচ্য শারদীয়া সংখ্যার বৈশিষ্ট্য।

নববঙ্গ—সম্পাদক—শ্রী প্রতুলপতি লাহিড়ী। ২০১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৫০ নঃ পঃ।

কয়েকটি ছোট গল্প, কবিতা এবং প্রবন্ধে সমৃদ্ধ এই পূজা সংখ্যায় শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধ "আদর্শ-ভ্রষ্ট বাঙ্গালী" উল্লেখযোগ্য।

পল্লী-ডাক—সম্পাদক—ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীরামপুর। মূল্য এক টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।

শহরতলির এই বাংলা সাপ্তাহিকের শারদীয়া সংখ্যায় ২০টি কবিতা, ১১টি প্রবন্ধ, ছোট-বড় ৮টি গল্প এবং কিছু রসরচনা স্থানলাভ করিয়াছে। লেখকগণের মধ্যে ডাঃ হরপ্রসাদ মিত্র এবং সৌরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রচ্ছদ পরিকল্পনা মনোরম।

গন্ধবণিক—সম্পাদক শ্রীনারায়ণচন্দ্র কুণ্ডু। শ্রীহারাধন দত্ত। ৬৭।১।১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

কিছু গল্প, কয়েকটি প্রবন্ধ এবং কিছু কবিতায় আলোচ্য শারদীয়া সংখ্যাখানি সমৃদ্ধ। প্রচ্ছদ ফটো মন্দ নহে।

শ্রীচরণেষু—সম্পাদক শ্রীননীগোপাল দত্ত। ৪বি, রাজা কালীকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

আলোচ্য শারদীয়া সংখ্যার কবিতায় কুমুদরঞ্জন মল্লিক, স্বপনবুড়ো, শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু, গল্পে—অমরেন্দ্রকুমার সেন এবং গোপাল ভৌমিকের নাম উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য আকর্ষণের মধ্যে শ্রীসুকমল দাশগুপ্তের নাটক এবং খেলাধুলার আসর ও ধাঁধাঁর নাম করা যাইতে পারে।

ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট মনোজ্ঞ।

শুভবন্তু—সম্পাদক শ্রীপ্রমোদকুমার সেন। শুভবন্তু কার্যালয়, ৬৩ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৩, টাকা।

শুভবন্তু পূজাবার্ষিকী একটি সংকলন গ্রন্থ। এতে শ্রীঅরবিন্দের একটি সম্পূর্ণ কাব্যনাটক 'বাসবদত্তা', শ্রীমা লিখিত একটি নাটক 'উত্তম রহস্য', ও স্বপন ভট্টাচার্য লিখিত একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস 'চালচিত্র' স্থান পেয়েছে। এছাড়া পশুপতি ভট্টাচার্য ও অমলেশ ভট্টাচার্যের গল্প, শ্রীমা ও নিশিকান্তর কবিতা আছে। সংকলনটি সুখপাঠ্য হয়েছে।

প্রাপ্তি স্বীকার

ছোটদের এব্রাহাম লিংকন—মে ম্যাকনীয়ার অনুবাদক কুনাল কুমার।

একটি মুহূর্ত—মনসা চট্টোপাধ্যায়।

ডাকাতের হাতে—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

তপোময় তুষার তীর্থ—সুকৃতি রায় চৌধুরী।

দিব্য জীবন বার্তা (২য় খণ্ড ১ম ভাগ)—শ্রীঅরবিন্দ। অনুবাদ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু।

পূর্ণযোগ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু।

মিঠে কড়া—দীপঙ্কর।

সামাজিক নিরাপত্তা বীমা—অনুবাদক মৃত্যুঞ্জয় নন্দী।

স্বপ্ন বাসর—জনার্দন চক্রবর্তী।

হামেলিনের বাঁশিওয়ালা—বুদ্ধদেব বসু।

জুনাপুরী স্টীল—গুণময় মান্না।

জন্ম-রাশি ও লগ্ন-বিচার—শ্রীহরিদাস জ্যোতিষার্ণব।

করকোষ্ঠী-বিচার—শ্রীহরিদাস জ্যোতিষার্ণব।

পায়ে পায়ে এত দূর—জ্যোতিভূষণ চাকী।

হিমালয়ে ঘুমের দেশ—হরেন ঘোষ।

বালুবেলা—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য।

মরুসূর্য—জ্যোতিভূষণ চাকী সম্পাদিত।

ডাক্তার জিভাগো—সম্পাদনা বুদ্ধদেব বসু।

তুঙ্গভদ্রা—শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী।

ন্যায়দণ্ড—জরাসন্ধ।

বাঘিনী—সমরেশ বসু।

সুখের সন্ধানে—বারট্রান্ড রাসেল অনুবাদক পরিমল গোস্বামী।

শ্রী শ্রী নিতাই চরিতামৃত—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাশগুপ্ত।

West Bengal College and University Teachers' Conference Souvenir 3bth Session—1960.—Dr. Sukumar Mitra.

Facts About Germany.

Temples of South India.

ছেলে বুড়ো সবাই জানে
STUDENTS INK
সব চাইতে ভাল কালি
STUDENTS INK MFG. CO. CAL-23

ছোটদের নাটক?
[illegible]
...করুন।

অবনপটুয়া ২.৫০ মিঠুয়া ১.০০
ঝিঙ্গো .৭৫ সাত ভাই চম্পা ২.৫০
যাদুকরের দেশে—
একটি ঘাসের পাতা— | যন্ত্রস্থ
সর্বত্র এজেন্ট আবশ্যক
শিশুরংমহল প্রকাশনী
২ তিলক রোড, কলিকাতা—২৯
ফোন : ৪৬—১২০০

রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

আধুনিক রূপকথা

ছায়াছবির গল্প যেন এক ধরনের আধুনিক রূপকথা। এতে বাস্তবের ব্যাকরণ অনেকাংশে বর্জিত হলেও এর গতি পরিণতি এক বিশেষ লক্ষ্যের দিকে নিবদ্ধ। এই লক্ষ্য হল দর্শকের চিত্তবিনোদন। দর্শক-মনোরঞ্জনের এই আদি সর্ত পালন করেও অলস কল্পনায় রঞ্জিত একটি মামুলী কাহিনীর চিত্ররূপ প্রয়োগ-নৈপুণ্যের গুণে কত মরমী হয়ে উঠতে পারে সে-প্রমাণই পাওয়া গেল যাত্রিক পরিচালিত টাইম ফিল্মস-এর "স্মৃতিটুকু থাক" ছবিটিতে।

উৎপলা ও শোভনা—এই দুই যমজ সহোদরাকে কেন্দ্র করে ছবির আখ্যানভাগ রচিত। একই দিনে দেহরূপের অবিকল সাদৃশ্য নিয়ে তারা পৃথিবীর বুকে চোখ মেলেছিল। কিন্তু নিয়তির অভিন্ন বিধান রূপ নেয়নি তাদের জীবনে। জন্মের অল্পকাল পরেই পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে দুই সহোদরা।

উৎপলা কলকাতা শহরের এক ধনী গৃহে প্রাচুর্য ও বিলাসের মধ্যে লালিত-পালিত হয়ে একদিন যৌবনে পদার্পণ করে। দু'হাত ভরে সে কুড়িয়ে নেয় ভাগ্যের অকৃপণ দাক্ষিণ্য। আর শোভনা সুদূর গ্রামে নিজের দরিদ্র সংসারে নীরবে সয়ে চলে শুধু দুর্ভাগ্যের দুঃসহ জ্বালা। উৎপলার জীবন মধুময় হয়ে ওঠে প্রণয়ে, আর শোভনার অন্তরের প্রথম অনুরাগকে বিদ্রূপ করে যায় উদাসীন নিয়তি। কিন্তু উভয়ের জীবনে দোলা দিয়ে যায় একই পুরুষ' তাদের জীবনের সাধ-আহ্লাদ ও অন্তর-ব্যথার সে নিমিত্ত মাত্র, নায়ক নয়।

তারপর শোভনার বঞ্চনা ও বিড়ম্বনার পালা একদিন কেমন করে শেষ হয় এবং তার জীবনে সকল কাঁটা ধন্য করে প্রেম ও সৌভাগ্যের শতদল কীভাবে ফুটে ওঠে, তা'র ভেতর দিয়েই ছবির নাট্যকাহিনী এক চরম পরিণতির দিকে এগিয়ে আসে। উৎপলার জীবনের সকল সুখ, স্বপ্ন ও সাধ তখন ভাগ্যের এক নির্মম ছলনায় অন্তর্হিত। এক নিদারুণ ট্রেন দুর্ঘটনায় সে তার স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলে। স্মৃতি একদিন সে ফিরে পেল। কিন্তু সে শুধু অতীতের সুখস্মৃতিটুকু অন্তরের গভীরে আজীবন সঞ্চয় করে রাখার জন্যে। সহোদরা শোভনার জীবনকে পূর্ণ করে তুলতে গিয়ে এক পরম আত্মত্যাগের সন্তোষে সে মিশিয়ে দিল সকল সুখের কামনা।

তরুণ চিত্রপরিচালকগোষ্ঠী যাত্রিক ছবির কাহিনী-বিন্যাসে প্রয়োগ-কর্মের যে দক্ষতা, রসবোধ ও পরিমিত জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসংশয়ে তাঁদের কৃতী চিত্র-স্রষ্টা হিসাবে স্বতন্ত্র-চিহ্নিত করে রাখবে। চিত্রকাহিনীর মৌলিক দুর্বলতা, অসংগতি

আলোছায়া প্রোডাকসন্সের আগামী চিত্র "সপ্তপদী"-র একটি আবেগময় দৃশ্যে সুচিত্রা সেন ও ছায়া দেবী।

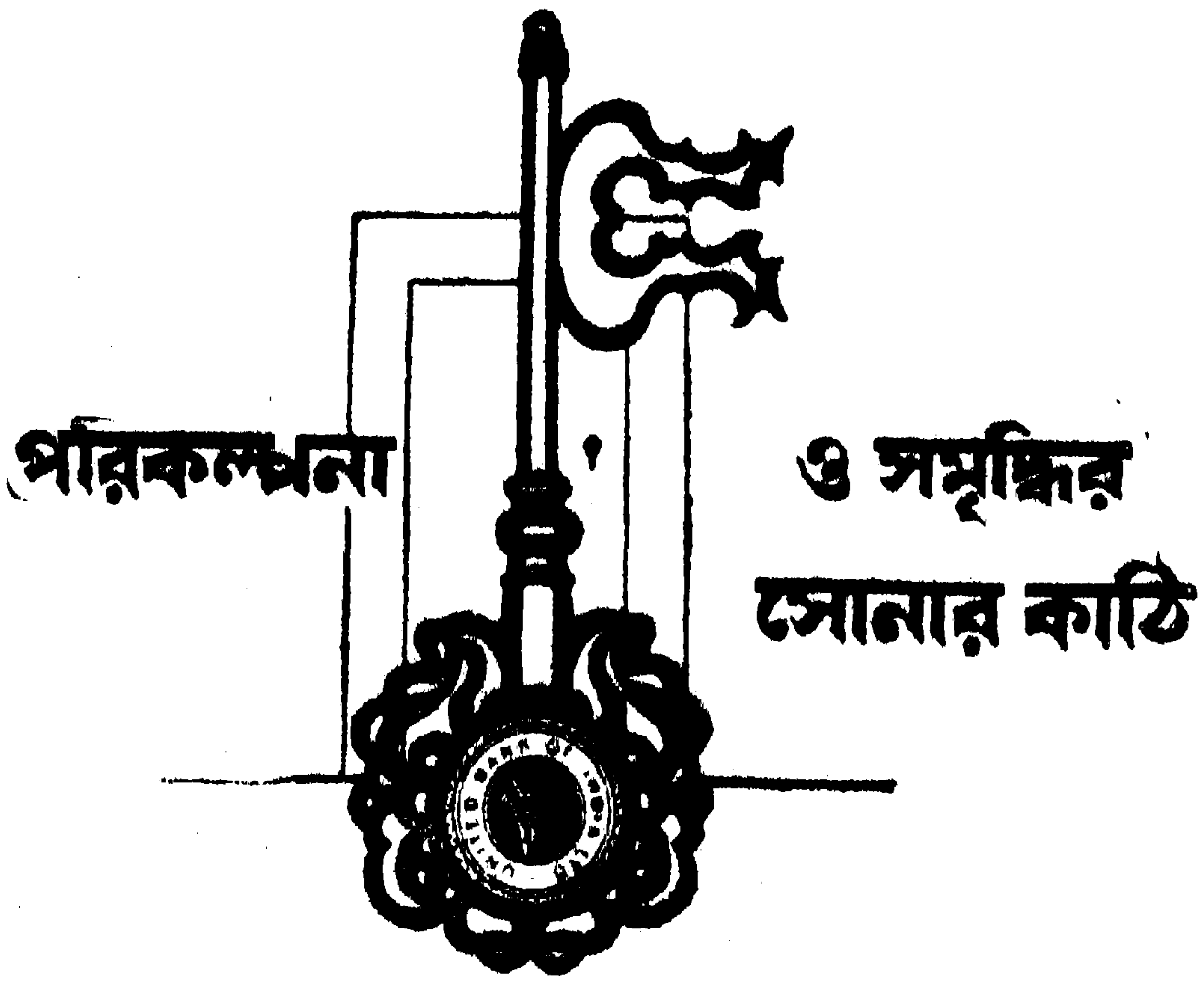

ব্যক্তির কল্যাণ ও জাতীয় সমৃদ্ধি পরস্পর সংশ্লিষ্ট। এই কল্যাণ বা সমৃদ্ধি-সাধন একমাত্র পরিকল্পনানুযায়ী প্রযত্নের দ্বারাই স্বল্পকালে সম্ভবপর। এবং পরিকল্পনার সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে জাতীয় তথা ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের উপর।

সুসংগঠিত ব্যাঙ্কের মারফত সঞ্চয় যেমন ব্যক্তিগত দুশ্চিন্তা দূর করে, তেমনি জাতীয় পরিকল্পনারও রসদ যোগায়।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস : ৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

ভারতের সর্বত্র ব্রাঞ্চ অফিস এবং পৃথিবীর যাবতীয় প্রধান প্রধান বানিজ্য কেন্দ্রে করেসপণ্ডেন্ট মারফত

আপনার ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যভার গ্রহণে প্রস্তুত

ও বৈসাদৃশ্য তাঁরা তাঁদের নিপুণ বিন্যাসের গুণে সহজেই ঢেকে দিয়েছেন। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে চিত্রনাট্যের গতি এমন এক সহজ সাবলিল ছন্দে বাঁধা, এবং এর প্রতিটি নাট্যমুহূর্ত এমন সুচিন্তিত ও সুপ্রযুক্ত যে ছবিটি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শকের চেতনাকে নিবিষ্ট করে রাখে। ছবির প্রতি ঘটনা এর পরমুহূর্তের পরিণতি এবং প্রতি মুহূর্ত তার আসন্ন প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনায় দর্শকের কৌতূহলকে স্তিমিত হতে দেয় না।

ব্যঞ্জনার বিচ্ছুরণে চলচ্চিত্রের ভাষাকে বাঙময় করে তোলার ক্ষেত্রেও পরিচালক-গোষ্ঠী ছবির বিভিন্ন ক্ষণে অনিন্দ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বিয়ের মন্ত্র শুনে উৎপলার মনে প্রিয়মিলনের কামনা দুর্বার হয়ে ওঠার মুহূর্তটি পরিচালকদের রসজ্ঞানের পরিচয় দেয়। ছবির তেমনি একটি মধুর দৃশ্য দুই যমজ বোনের মাঝখানে শোভনার শিশুপুত্রের প্রসন্ন প্রতিক্রিয়ার মুহূর্তটি। এ-বাদেও ছবির সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে বেদনা ও আনন্দের রসে সিঞ্চিত পরম উপভোগ্য অনেক আবেগ মুহূর্ত। এবং পরিচালকবৃন্দ সাধুবাদার্হ হবেন এই কারণে যে আবেগের মুহূর্তগুলি অতি-নাটকীয়তার উচ্ছ্বাসে আচ্ছন্ন নয়। সমগ্র ছবিটিতে রূপ নিয়েছে যে শিল্পশোভনতা তার জন্যেও তরুণ রূপকারেরা দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করবেন। ছবির সংলাপ সাহিত্যরসমণ্ডিত হয়েও কৃত্রিম নয় এবং তা' অন্তরের অনুভূতিকে ফুটিয়ে তোলে একান্ত সাফল্যের সঙ্গে।

ছবির কাহিনীতে যে গোঁজামিল ও গলদ রয়েছে—যেগুলির মধ্যে উৎপলার স্মৃতিশক্তি বিলোপের উপাখ্যান ও তার অজ্ঞাতবাসের প্রয়োজনে একাধিক কষ্ট কল্পনার অবতারণা এবং শোভনাকে সকলেরই উৎপলা বলে ভুল

করার ঘটনা বিশেষভাবে দর্শকের যুক্তি-বোধকে পীড়া দেয়—সেগুলি যান্ত্রিক-এর মতো রসজ্ঞ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চিত্র-পরিচালকগোষ্ঠী কী-করে সহজে মেনে নিলেন তা ভাবতে অবাক লাগে। ছবির দ্বৈত ভূমিকায় এক বিশেষ শিল্পীর কথা ভেবেই এর কাহিনী রচিত এমন মনে করাও হয়তো দর্শকের পক্ষে অন্যায় হবে না। ছবিতে সহোদরার দ্বৈত ভূমিকা প্রধান হলেও এর অতিরিক্ত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার দিকে চিত্রনাট্যকার ও পরিচালকদের সতর্ক দৃষ্টি লক্ষণীয়। ফলে একাধিক সুন্দর চরিত্র ছবিতে স্বাভাবিক বিকাশ লাভ করতে পারেনি। শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টির পথে এ-ধরনের ফরমাশী কাহিনী-কল্পনা এক দুরতিক্রম্য অন্তরায়।

কিন্তু এই অন্তরায় সহোদরার দ্বৈত ভূমিকায় সুচিত্রা সেনের অত্যাশ্চর্য অভিনয়ে অনেকখানি অতিক্রান্ত। তাঁর অবিস্মরণীয় অভিনয়ে উৎপলা ও শোভনার অন্তরের বেদনা ও সংঘাত এক অপূর্ব জীবনবোধের রেখায় অঙ্কিত। দুটি ভিন্নমুখী জীবনের দুই অন্তর-রূপ তাঁর অভিনয়ে পরিপূর্ণ-ভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। অস্ফুট ও উচ্ছল প্রণয়ের অপরূপ অভিব্যক্তিতে তাঁর অভিনয় মধুর। শুধু অভিনয়ের গুণে কোন ছবির মাধুর্যরস এত অপর্যাপ্ত ও নাট্য আবেদন এত গভীর হয়ে উঠতে এর আগে আর খুব বেশী দেখা যায়নি। এই ছবিতে সুচিত্রা সেনের অভিনয় দর্শকদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কয়েকটি দৃশ্যে সুচিত্রা সেনের উপস্থিতিও ভুলিয়ে দেন যে শক্তিমান নট তিনি শোভনার অগ্রজ বেশী অনিল চট্টো-পাধ্যায়। একটি ছোট চরিত্রের রূপায়ণে তিনি যে প্রাণোচ্ছল ও সংবেদনশীল অভিনয়ের পরিচয় দিয়েছেন তা এই তরুণ শিল্পীকে খ্যাতির উচ্চশিখরে তুলে ধরবে। দুই সহোদরার প্রণয়ীর চরিত্রে অসিতবরণের অভিনয় স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। এক হৃদয়-বান চিকিৎসকের চরিত্রে চিত্রাবতরণ করেছেন বিকাশ রায়। ছবিতে অভিনয়-দক্ষতা দেখাবার অবকাশ তাঁর কম, তবুও চরিত্রটিকে ভাল লাগে। উৎপলার পালক পিতা-মাতার চরিত্রে যথাক্রমে ছবি বিশ্বাস ও পদ্মা দেবী দুটি সুন্দর চরিত্র সৃষ্টির কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। যমজ সহোদরার গর্ভধারিণীর চরিত্রে অপর্ণা দেবীর অভিনয় মর্মস্পর্শী। শ্রীমান ইন্দ্রজিৎ শোভনার শিশু পুত্রের ভূমিকায় দর্শক মনে মায়ার সৃষ্টি করে।

সংগীত পরিচালনায় রবীন চট্টোপাধ্যায় তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। ছবির বিশেষ মুহূর্তের আবহ-সংগীত নাট্যরসানুগ। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ছবির দুটি গান ও নির্মলেন্দু চৌধুরীর গাওয়া একটি

লোকসংগীত সুন্দর সুরারোপিত ও সুগীত। কিন্তু গানগুলি সুপ্রযুক্ত নয়।

অনিল গুপ্তর আলোকচিত্র পরিচালনায় ছবিটি এক বিশেষ শিল্পসৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। দুলাল দত্তের সম্পাদনা এবং সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও দেবেশ ঘোষের শব্দগ্রহণ প্রশংসনীয়। ছবির সামগ্রিক অংগসৌষ্ঠবও যথাযথ পরিচ্ছন্ন।

বোম্বাই ধাঁচে বাংলা ছবি

হাল্কা আমোদ বিতরণই যে-সব ছবির লক্ষ্য, কেমিরা ফিল্মস-এর "শহরের ইতিকথা" সেই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

বিনয় চট্টোপাধ্যায় রচিত এ-ছবির কাহিনীর নায়িকা এক বাগদত্তা গ্রাম্য-বালিকা। নির্দিষ্ট পাত্র বিলেত থেকে উন্মার্গ আধুনিকতার নেশা নিয়ে একদিন ফিরে আসে। গ্রাম্যদুহিতাকে জীবন-সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করতে সে নারাজ। নায়িকার বাবা বাঞ্ছিত পাত্রের সংগে মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে আসেন।

নায়িকার বাবার এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যে এগিয়ে আসে বিত্তশালী এক যুবক জমিদার, যার এক মহালের বিশ্বস্ত পুরাতন কর্মচারী কন্যাদায়গ্রস্ত এই বৃদ্ধ। জমিদারের পণ—নায়িকাকে এমন আধুনিকা করে গড়ে তুলবে সে, যাতে বিলেত-ফেরত পাত্র একদিন যেচে এসে তার পাণিগ্রহণের প্রার্থনা জানাতে দ্বিধা করবে না। হলও তাই। কিন্তু নায়িকা তখন যুবক জমিদারের প্রতি প্রণয়াসক্ত। সাময়িক বিরহ-যাতনা ও মান-অভিমানের পালা সাংগ হবার পর তার প্রণয় কীভাবে সার্থক হয়ে ওঠে তা নিয়েই চিত্রনাট্যের পরিসমাপ্তি ঘটে।

কাহিনীকার হিসাবে বিনয় চট্টোপাধ্যায় এ ছবিতে বিশেষ কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। গ্রাম্য পরিবেশে এবং আধুনিকতার পাঠ নেবার কালে নায়িকার প্রাণোচ্ছলতা ও অনভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে পরিচালক বিশু দাশগুপ্ত অংশত উপভোগ্য আমোদরস সঞ্চারে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু বক্স-অফিসের দাবির সংগে আপোস করবার আগ্রহে তিনি বহু ক্ষেত্রে সুস্থ রুচি ও শালীনতা রক্ষা করে চলতে পারেননি। উগ্র আধুনিকতা ও উন্নাসিকতা দেখাবার জন্যে হোটেল ও ক্লাবে 'বল' নাচের বাহুল্য রীতি-মত পীড়াদায়ক।

ছবিটিকে সামগ্রিকভাবে রসমধুর করে তোলার পথে অনতিক্রম্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ছবির অবাস্তব ও কষ্টকল্পিত কাহিনী এবং এর দুর্বল চিত্রনাট্য। কাহিনীর উদ্দেশ্য দুর্নিরীক্ষ্য এবং আবেদন আবেগস্পর্শ-রহিত; এর প্রণয়োপাখ্যান মাধুর্যরসবর্জিত, মুখ্য চরিত্রগুলি অপরিণত এবং ঘটনারাজি ইতস্তত

জোলাপের দাসে পরিণত হবেন না

কড়া জোলাপ আপনার অন্ত্রের পেশীগুলিকে দুর্ব্বল করে, ফলে শীঘ্রই আরও কড়া জোলাপ না হ'লে আপনার কোষ্ঠ আর পরিষ্কার হবে না। জোলাপের দাস হ'য়ে পড়বেন না। অকৃত্রিম ফিলিপ্‌স মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া ব্যবহার করুন।

ফিলিপ্‌স এত মৃদুভাবে কাজ করে যে এমন কি শিশুদের জন্যেও ইহা সুপারিশ করা হয়…অথচ এত ফলপ্রদ যে প্রথমবার ব্যবহারের পরই কোষ্ঠবদ্ধতার হাত থেকে পূর্ণ মুক্তি পাবেন।

আবার ভারতবর্ষে পাওয়া যাচ্ছে

নূতন নকল নিরোধক শীলকরা বোতলে। এই শীলকরা বোতলই ফিলিপ্‌সের বিখ্যাত বিশুদ্ধতা এবং উচ্চমানের একমাত্র নিশ্চয়তা। ২, ৪ ও ১২ আউন্স বোতলে পাওয়া যায়।

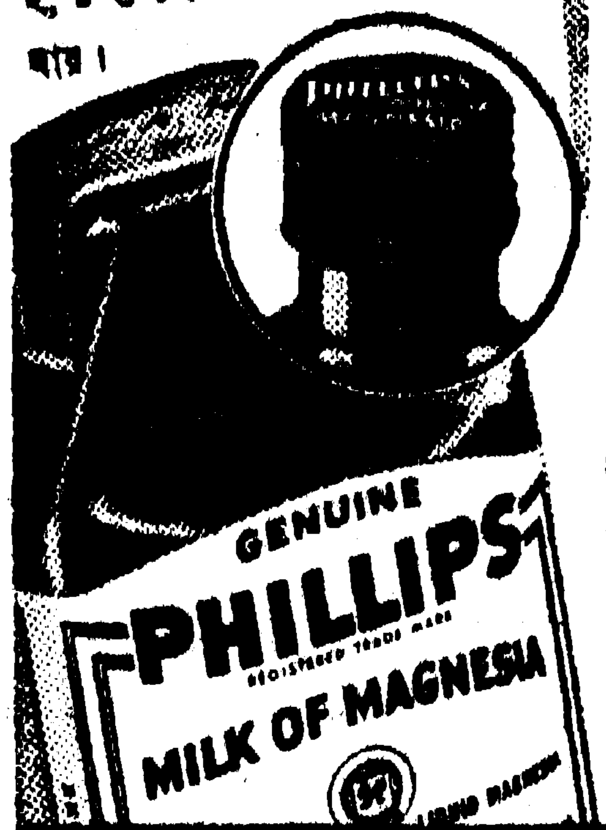

এই কারণেই…

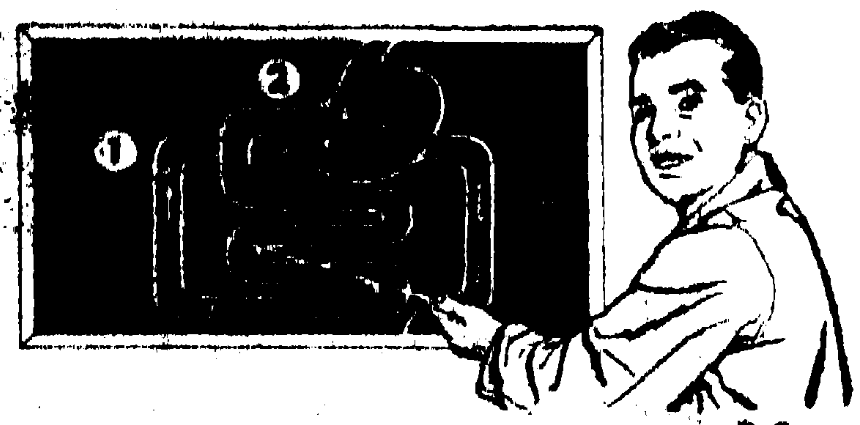

১। অন্যান্য কড়া জোলাপের মত কাজ না ক'রে, ফিলিপস মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া শুকনো জমাটবাঁধা কোষ্ঠকে সিক্ত করে, তারপর মৃদুভাবে পেশীগুলিকে সক্রিয় ক'রে আপনার দেহ থেকে দূষিত মল নিরাপদে ও নিশ্চিতভাবে বা'র করে দেয়—অথচ শরীরে কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়না, শরীরে খিঁচুনি ধরে না বা দুর্ব্বলতা বোধ হয় না।

২। শুধু একটিমাত্র গুণবিশিষ্ট জোলাপের মত না হ'য়ে ফিলিপ্‌স মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আপনার পাকস্থলীকে শান্ত ক'রে আপনার আরামের পূর্ণতা এনে দেয়। আপনার পরিপাক যন্ত্রকে সবল করে … পেট ভার ভার ভাব, বুক জ্বালা, পেট ফাঁপা ও অম্লজনিত বদহজম দূর করে।

ফিলিপ্‌স

মার্কেট থাটি মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া

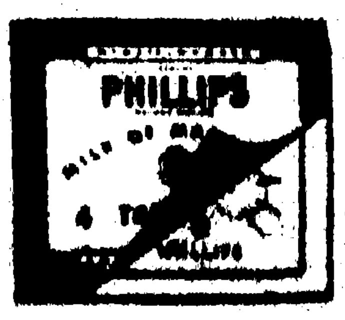

যেখানেই হোক, যখনই হোক, অম্লজনিত অজীর্ণরোগে সঙ্গে সঙ্গে উপশম পেতে হ'লে সর্ব্বদাই মিন্টের সুগন্ধযুক্ত সুস্বাদু ফিলিপস মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া ট্যাবলেট গ্রহণ করুন। ৪ ট্যাবলেটের হাল্কা প্যাকেটে এবং ৭৫ ও ১৫০ ট্যাবলেটের বোতলে পাওয়া যায়।

একমাত্র পরিবেশক 2-AF/1PB

দে'জ মেডিকেল ষ্টোরস্‌ প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা • বম্বে • দিল্লী • মাদ্রাজ • পাটনা • গৌহাটি • কটক

বীক্ষণ্ত। কাহিনীর অনেক নিন্দনীয় কষ্টকল্পনার মধ্যে প্রধান হল নায়িকার পিতার পক্ষে তার বিবাহযোগ্যা কন্যাকে আধুনিকতার তালিম পাবার জন্যে অবিবাহিত যুবক জমিদারের বাড়িতে রেখে আসা—যেখানে নবনিযুক্ত যুবতী গভর্নেস ব্যতীত কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি অথবা জমিদার পরিবারভুক্ত অন্য কারুর সাক্ষাত মেলে না। অল্প কিছুদিন পরেই গভর্নেসও কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে যায়। বাড়িতে থাকে শুধু অবিবাহিত দুই যুবক-যুবতী। এই ধরনের ঘটনা একমাত্র সিনেমাতেই সম্ভব!

যেমন অসার নায়কের চরিত্র, তেমনি বৈচিত্র্যহীন উত্তমকুমারের অভিনয়। এই শক্তিমান শিল্পীর নিজস্ব অভিনয়-প্রতিভা প্রকাশের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে একান্ত কষ্টকল্পিত নায়ক-চরিত্র। সে তুলনায় নায়িকার রূপসজ্জায় মালা সিংহের অভিনয় প্রাণবন্ত। চরিত্রটির চাপল্য ও গাম্ভীর্যের অভিব্যক্তিতে শ্রীমতী সিংহ তাঁর অভিনয়-দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন।

কামিনীকদম—ডি. অভদূতের
'লাখোঁ কি কাহানী' ছবিতে

সোনার মেয়ের হরিণ চোখে
রূপের নাচন দেখে, শিউলী শাখে কোকিল
ডাক, মনমাতানো সুরে···নাচিয়ে হৃদয়
বনের ময়ূর নাচছে অনেক দূরে!
লাস্যময়ী চিত্রতারকা কামিনী কদমের চোখে মুখে
আজ ময়ূর-নাচের চঞ্চলতা, রূপের মহিমায়
উদ্ভাসিত আজ এ নারী হৃদয়। 'কোনই বা হবেনা,
লাক্সের কোমল পরশ যে আমি প্রতিদিনই
পেয়েছি'—কামিনীকদম জানান তাঁর রূপ
লাবণ্যের গোপন রহস্যটি।

LUX
TOILET SOAP

আপনিও ব্যবহার করুন
চিত্রতারকার বিশুদ্ধ, শুভ্র,
সৌন্দর্য্য সাবান

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

LTS. 73-X52 BG

নিউ থিয়েটার্স-সরকার প্রোডাকসন্সের যৌথ প্রচেষ্টা "নতুন ফসল"-এর একটি হর্ষোজ্জ্বল দৃশ্যে অনুপকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী।

নায়িকার জন্যে পূর্ব নির্দিষ্ট পাত্রের উন্নাসিক ও উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রটি জীবেন বসুর অভিনয়ে বাস্তবানুগ হয়ে উঠেছে, যদিও বয়সের দিক দিয়ে তাঁকে অত্যন্ত বেমানান দেখিয়েছে। নায়িকার পিতার চরিত্রটি পাহাড়ী সান্যালের সংবেদনশীল অভিনয়ে মনে রেখাপাত করে। নায়কের এক বন্ধুর চরিত্রে তরুণকুমারের অভিনয় সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে চিত্রাবতরণ করেছেন ছায়া দেবী, কাজরী গুহ ও বাণী হাজরা। হোটেলে সংগীত পরিবেশনে জহর রায়ের উপস্থিতি দর্শকদের আনন্দ দেয়।

সংগীত পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায় চারখানি গানের সুরারোপে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। গান ক'টি সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও শ্যামল মিত্র'র কণ্ঠদানে সুখশ্রাব্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রয়োগের ত্রুটিতে গান-গুলি দর্শকের মনে আবেশ সৃষ্টি করার সুযোগ পায় না। আবহ-সংগীত পরিবেশানুগ।

দেওজী ভাই-এর আলোকচিত্র গ্রহণে আরও উন্নতির অবকাশ ছিল। কলাকৌশল ও আঙ্গিক সৌষ্ঠবের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সন্তোষজনক।

দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পীদ্বয় মাধুরী ও লীলার একটি যুগ্ম নৃত্য এক কথায় নাক্কারজনক। দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যের এমনিধারা বিকৃত রূপায়ণ সচরাচর চোখে পড়ে না।

চিত্রালোচনা

এ সপ্তাহে মাত্র দুখানি হিন্দী ছবি মুক্তি পাচ্ছে—পুষ্প পিকচার্সের "নঙ্গী-মা" ও জুবিলী পিকচার্সের "হনিমুন"।

উগ্র আধুনিকতার পরিপ্রেক্ষিতে একটি পারিবারিক কাহিনী রূপ পেয়েছে "নঙ্গী-মা"তে। বলরাজ সাহানী, শ্যামা ও ডেজি ইরাণী এর প্রধান তিনটি শিল্পী। সন্তোষীর পরিচালনায় ও রবির সুর-যোজনায় ছবিটি গৃহীত হয়েছে।

"হনিমুন" নামানুযায়ী একটি হাল্কা-রসের ছবি। লেখরাজ ভকরি একাধারে এর লেখক, প্রযোজক ও পরিচালক। সঈদা খান, মনোজ, বিজয়া চৌধুরী, জীবন, ললিতা পাওয়ার, সবিতা চট্টোপাধ্যায় এবং পরলোকগত শিল্পীদ্বয় রাধাকিষণ ও কুলদীপ কাউরকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। সুরসৃষ্টি করেছেন সলিল চৌধুরী।

হাইড্রোসিল (একশিরা)

কোষসংক্রান্ত যাবতীয় রোগের জন্য

ডাঃ কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, এম বি (ক্যাল)

দি ন্যাশনাল ফার্মেসী

(স্থাপিত ১৯১৬)

৯৬-৯৭, লোয়ার চিৎপুর রোড (দোতলায়)

কলিকাতা-৭

প্রবেশ পথ — হ্যারিসন রোডের উপর, জংশনের পশ্চিমে তৃতীয় ডাক্তারখানা। ফোন ঃ ৩৩-৬৫৮০। সাক্ষাৎ সকাল ৯টা হইতে রাত্রি ৮টা। রবিবারও খোলা থাকে।

(সি-৮২৮৬)

বিশ্বরূপা

(অভিজাত প্রগতিধর্মী নাট্যমঞ্চ)

[ফোন ঃ ৫৫-১৪২৩, বুকিং ৫৫-৩২৬২]

বৃহস্পতি ও শনি সন্ধ্যা ৬॥টায় | রবি ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬॥টায়

প্রয়োগনৈপুণ্যে, অভিনয়মাধুর্যে অতুলনীয়

সেতু

২৪৩ হইতে ২৫৪ অভিনয়

একটি চিরন্তন মানব অনুভূতির কাহিনী

নাটক—বিধায়ক ভট্টাচার্য

আলোকসম্পাত—তাপস সেন

শ্রেঃ নরেশ মিত্র - অসিতবরণ

তরুণকুমার, মমতাজ, সন্তোষ, তমাল, জয়শ্রী, সুব্রতা, ইরা, আরতি প্রভৃতি

ও

তৃপ্তি মিত্র (বহুরূপী)

বিশ্বরূপায় বহুরূপীর অভিনয়

রবীন্দ্রনাথের

রক্তকরবী

১১ই অক্টোবর, মঙ্গলবার—সন্ধ্যা ৬॥টায়

নির্দেশনা—শম্ভু মিত্র

আলোক—তাপস সেন

ভূমিকায়—তৃপ্তি মিত্র, শম্ভু মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, অমর গাঙ্গুলী, কুমার রায়, শোভেন মজুমদার, আরতি মৈত্র ও শান্তি দাস

জটীল ব্যাধি ও স্ত্রী রোগ

২৫ বৎসরের অভিজ্ঞ যৌনব্যাধি বিশেষজ্ঞ ডাঃ এস পি মুখার্জি (রেজিঃ) সমাগত রোগী-দিগকে গোপন ও জটিল রোগাদির রবিবার বৈকাল বাদে প্রাতে ৯—১১টা ও বৈকাল ৫—৮টা ব্যবস্থা দেন ও চিকিৎসা করেন।

শ্যামসুন্দর হোমিও ক্লিনিক (রেজিঃ)

১৪৮, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

ডেল কোম্পানীর

দাদু ও কাউরের

অপূর্ব সম্পদ

বরানগর • কলিকাতা

আই এফ এ শীল্ডের রাণার্স—ইণ্ডিয়ান নেভি ফুটবল দল

আই এফ এ শীল্ড কলকাতার বাইরের ক্লাবের করায়ত্ব হবে। অবশ্য আই এফ এ শীল্ড একবার বাংগলার বাইরে না গেছে, এমন নয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত জয়ের মাধ্যমে বাইরের কোন ক্লাব আই এফ এ শীল্ড কলকাতা থেকে নিয়ে যেতে পারেনি। ১৯৫৩ সালে বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান কালচার লীগ ও ইস্টবেংগল ক্লাবের মধ্যে তিন দিন ফাইন্যাল খেলা অমীমাংসিত থাকবার পর ঘটনাচক্রে ইণ্ডিয়ান কালচার লীগকে আই এফ এ শীল্ড দেওয়া হয় হাইকোর্টে একটা আপোস মীমাংসার ফলে। বাইরের আর কোন টীম আই এফ এ শীল্ড নিতে পারেনি, শুধু তাই নয়—ইণ্ডিয়ান কালচার লীগ ও হায়দরাবাদ স্পোর্টিং ছাড়া আর কোন বাইরের টীম শীল্ডের ফাইন্যালেও উঠতে পারেনি। মহীশূরের কাছে মহমেডান স্পোর্টিং এবং ইণ্ডিয়ান নেভির কাছে ইস্টবেংগল একই দিনে বেশী গোলের ব্যবধানে হার স্বীকার করায় মোহনবাগানের সাফল্য সম্পর্কে যথেষ্টই সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল। মোহনবাগান অবশ্য বাইরের দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মহীশূরকে সেমি ফাইন্যালে ও ইণ্ডিয়ান নেভিকে ফাইন্যালে হারিয়ে দিয়ে শীল্ড বিজয়ী হয়েছে।

ইস্টবেংগল ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের দু'তিনজন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়ের পায়ে চোট থাকায় তারা খেলতে না পারলেও চতুর্থ রাউণ্ডে ইণ্ডিয়ান নেভির কাছে ইস্টবেংগলের এবং মহীশূরের কাছে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ৩—০ ও ৩—১ গোলে হার স্বীকার রীতিমত অপ্রত্যাশিত। ইণ্ডিয়ান নেভি বা মহীশূরে কোন দলই নামডাকের খেলোয়াড়ে পূর্ণ ছিল না। তবে তাদের খেলা দেখে বুঝতে কষ্ট হয়নি যে তাদের খেলার পেছনে অনুশীলন আছে, অধ্যবসায় আছে, আন্তরিকতা ও শিক্ষা আছে। এই লেখার শেষদিকে আই এফ এ শীল্ডের সমস্ত খেলার ফলাফল খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে এক ফাইন্যালে মোহনবাগানের কাছে একটি গোল খাওয়া ছাড়া নেভি দল কোন গোল খায়নি। এটা তাদের রক্ষণভাগের দৃঢ়তারই পরিচয়।

কলকাতার দলগুলির মধ্যে মোহনবাগানের পরই ভাল খেলেছে—রাজস্থান ক্লাব। নামডাকের খেলোয়াড় না নিয়েও রাজস্থান গ্রীয়ার ক্লাবকে ৫—১ গোলে, আন্দামানের সেণ্ট্রাল স্পোর্টস ক্লাবকে ৭—১ গোলে, ভবানীপুর ক্লাবকে ৪—০ গোলে ও ইস্টার্ন রেলকে ১—০ গোলে পরাজিত করে সেমি ফাইন্যালে ওঠে। সেমি ফাইন্যালের চ্যারিটি খেলায় অতিরিক্ত সময়ের শেষ মুহূর্তে তারা নেভির কাছে একটি গোল খেয়ে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নেয়। এ ফলাফলও আবার খেলার ধারার সংগতিসূচক নয়। ভাল খেলেই রাজস্থান হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

৩৪টি দল নিয়ে এবার আই এফ এ শীল্ড খেলার তালিকা গঠন করা হয়। এর মধ্যে বাংগলার বাইরের দলের সংখ্যা ছিল ৮। অবশ্য পাটনা ও কটক দল শেষ পর্যন্ত খেলতে আসেনি। যারা এসেছিল তাদের মধ্যে নেভি ও মহীশূর দলের খেলাই দর্শকদের যা কিছু আনন্দ দিয়েছে।

সামগ্রিকভাবে খতিয়ে দেখতে গেলে বলতে হয় উন্নত কলানৈপুণ্য এবং তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিক দিয়ে আই এফ এ শীল্ডের কোন খেলাই এবার দর্শকদের আনন্দ দিতে পারেনি। লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের নিষ্পত্তি হবার পর অনেকদিন বাদে শীল্ডের খেলা আরম্ভ হওয়ায় খেলাও তেমন জমেনি। ইস্টবেংগল ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের অপ্রত্যাশিত পরাজয়ে আই এফ এর কিছু আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। তবে শুধু শীল্ডেই পাঁচটি 'চ্যারিটি' খেলার ব্যবস্থা করে আই এফ এ অনেকটা পুষিয়ে নিয়েছেন। শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগান ক্লাবকেই খেলতে হয়েছে চারটি 'চ্যারিটি' ম্যাচ।

নীচে শীল্ডের সমস্ত খেলার ফলাফল দেওয়া হল।

প্রথম রাউণ্ড

জর্জ টেলিগ্রাফ (৬) : ক্যালকাটা (২)
এরিয়ান (৬) : বনবিহারী ডি এ এ (০)
বালী প্রতিভা (২) : পুলিস (১)
হাওড়া ডি এস এ (২) : বি এন আর (১)
ভবানীপুর ক্লাব (১) : বাটা এস সি (০)
রাজস্থান (৫) : গ্রীয়ার (১)
হাওড়া ইউনিয়ন (২) : ডালহৌসী (১)
ইণ্টারন্যাশনাল (২) : খিদিরপুর (০)
উয়াড়ী (২) : পোর্ট কমিশনার্স (০)

দ্বিতীয় রাউণ্ড

জর্জ টেলিগ্রাফ (২) : বার্নপুর ইউনাইটেড (০)
ত্রিপুরা স্পোর্টস (১) : এরিয়ান (০)
বালী প্রতিভা (ওঃ ওঃ) : পাটনা এ এ (স্ক্র্যাচ)
হাওড়া ডি এস এ (২) : ২৪ পরগণা ডি এস এ (১)
ভবানীপুর ক্লাব (ওঃ ওঃ) : কটক কম্বাইণ্ড (স্ক্র্যাচ)
রাজস্থান (৭) : সেণ্ট্রাল স্পোর্টস—আন্দামান (১)
হাওড়া ইউনিয়ন (০) (০) (৩) : স্পোর্টিং ইউনিয়ন (০) (০) (২)
ইণ্টারন্যাশনাল (২) : পাঞ্জাব ডি এফ এ (১)
উয়াড়ী (৫) : দিল্লি একাদশ (২)

তৃতীয় রাউণ্ড

মহমেডান স্পোর্টিং (৩) : জর্জ টেলিগ্রাফ (০)
মহীশূর এফ এ (১) (৪) : ত্রিপুরা স্পোর্টস (১) (১)
টাটা স্পোর্টস (২) (৩) : বালী প্রতিভা (২) (১)
মোহনবাগান (৪) : হাওড়া ডি এস এ (০)
রাজস্থান (৪) : ভবানীপুর (০)
ইস্টার্ন রেল (১) : হাওড়া ইউনিয়ন (০)
ইণ্ডিয়ান নেভি (০) (১) : ইণ্টারন্যাশনাল (০) (০)
ইস্টবেংগল (১) (৫) : উয়াড়ী (১) (০)

চতুর্থ রাউণ্ড

মহীশূর এফ এ (৩) : মহমেডান স্পোর্টিং (১)
মোহনবাগান (২) : টাটা স্পোর্টস (০)
রাজস্থান (১) : ইস্টার্ন রেল (০)
ইণ্ডিয়ান নেভি (৩) : ইস্টবেংগল (০)

সেমি ফাইন্যাল

মোহনবাগান (০) (৩) : মহীশূর এফ এ (০) (১)
ইণ্ডিয়ান নেভি (১) : রাজস্থান (০)

ফাইন্যাল

মোহনবাগান (১) : ইণ্ডিয়ান নেভি (০)

অলিম্পিক অ্যাথলেটিকস

অলিম্পিক অ্যাথলেটিকসের পুরুষদের কতগুলি বিষয়ের ফলাফল 'দেশের' পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে। ফলাফলের সংগে মন্তব্য সমেত আরও কতগুলির ফলাফল এ সপ্তাহে প্রকাশ করা

হল। 'দেশের' পাতায় ধারাবাহিকভাবে সমস্ত ফলাফলই প্রকাশ করা হবে।

২০ কিলোমিটার ভ্রমণ

বিশ্ব রেকর্ড—জি প্যানিকিন (রাশিয়া) ১ ঘঃ ২৭ মিঃ ২৮·৬ সেঃ।

অলিম্পিক রেকর্ড—এল স্পিরিন (রাশিয়া) ১ ঘঃ ৩১ মিঃ ২৭·৪ সেঃ।

১ম—গোলুবিচি (রাশিয়া) ১ ঘঃ ৩৪ মিঃ ৭·২ সেঃ।

২য়—এন ফ্রিম্যান (অস্ট্রেলিয়া) ১ ঘঃ ৩৪ মিঃ ১৬·৪ সেঃ।

৩য়—এস ভিকার্স (ব্রিটেন) ১ ঘঃ ৩৪ মিঃ ৫৬·৪ সেঃ।

[২০ কিলোমিটার ভ্রমণ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে গতবার মেলবোর্ন অলিম্পিক থেকে। রাশিয়ার প্রতিনিধি গোলুবিচি স্বর্ণপদক লাভ করলেও গতবারের অলিম্পিক রেকর্ড ম্লান করতে পারেননি।]

অ্যাথলেটিকস—পুরুষ

৫০ কিলোমিটার ভ্রমণ

বিশ্ব রেকর্ড—এস লাভান্তভ (রাশিয়া) ৪ ঘঃ ১৬ মিঃ ৮·৬ সেঃ।

প্রাক্তন অলিম্পিক রেকর্ড—জি দোর-দোনী (ইতালী) ৪ ঘঃ ২৮ মিঃ ৭·৮ সেঃ।

১ম—ডি টমসন (ব্রিটেন) ৪ ঘঃ ২৫ মিঃ ৩০ সেঃ (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড)।

২য়—জে ল্যুংগ্রেন (সুইডেন) ৪ ঘঃ ২৫ মিঃ ৪৭ সেঃ।

৩য়—এ পামিচ (ইতালী) ৪ ঘঃ ২৭ মিঃ ৫৫·৪ সেঃ।

[গ্রেট ব্রিটেনের প্রতিনিধি ডি টমসন ৫০ কিলোমিটার ভ্রমণে প্রথম স্থান অধিকার করায় গ্রেট ব্রিটেন অ্যাথলেটিকসে মাত্র একটি স্বর্ণপদক পেয়েছে। এই বিষয়ে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী লাভান্তভ কোন স্থান দখল করতে পারেননি। ৫০ কিলোমিটার, অর্থাৎ ৩১ মাইল ১২০ গজ ভ্রমণ অ্যাথলেটিকসের সবচেয়ে দূরপাল্লার প্রতিযোগিতা।]

হাই জাম্প

বিশ্ব রেকর্ড—জন টমাস (ইউ এস এ) ৭ ফুট ৩½ ইঞ্চি।

প্রাক্তন অলিম্পিক রেকর্ড—চার্লি ডুমাস (ইউ এস এ) ৬ ফুট ১১½ ইঃ।

১ম—আর স্যাভলাকাড্জে (রাশিয়া) ৭ ফুঃ ১ ইঃ (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড)।

২য়—ভি ব্রুমেল (রাশিয়া) ৭ ফুঃ ১ ইঃ।

৩য়—জন টমাস (ইউ এস এ) ৭ ফুঃ ০½ ইঃ।

[আমেরিকার ১৯ বছরের নিগ্রো অ্যাথলেট জন টমাসের হাই জাম্পে তৃতীয় স্থান লাভ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ফলাফল। অলিম্পিকের মাত্র মাসখানেক আগে এক সপ্তাহে যিনি তিনবার ৭ ফুট ২ ইঞ্চি, ৭ ফুট ২½ ইঞ্চি ও ৭ ফুট ৩½ ইঞ্চি লাফিয়ে নতুন বিশ্ব রেকর্ডের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, স্বর্ণপদক লাভে তাঁর ব্যর্থতা রীতিমত বিস্ময়কর—বোধ করি রোম অলিম্পিকের সবচেয়ে **বিস্ময়কর ফলাফল।** সোভিয়েট রাশিয়ার আর স্যাভলাকাড্জে কোনদিন ৭ ফুটের বাধা অতিক্রম করতে পারেন নি, ব্রুমেলের কোনদিন হাই জাম্পের চ্যালেঞ্জার হিসাবে নাম শোনা যায়নি। কিন্তু স্যাভলাকাড্জে পেলেন অলিম্পিকের স্বর্ণপদক আর ব্রুমেল পেলেন রৌপ্য পদক!]

ভাগ্যহীন জন টমাস

লং জাম্প

বিশ্ব রেকর্ড—জেসি ওয়েন্স (ইউ এস এ) ২৬ ফুঃ ৮¼ ইঃ।

প্রাক্তন অলিম্পিক রেকর্ড—জেসি ওয়েন্স (ইউ এস এ) ২৬ ফুঃ ৫¼ ইঃ।

১ম—আর বোস্টন (ইউ এস এ) ২৬ ফুঃ ৭¾ ইঃ (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড)।

২য়—আই রবার্টসন (ইউ এস এ) ২৬ ফুঃ ৭¼ ইঃ।

৩য়—আই টার-ওভানোসিয়ান (রাশিয়া) ২৬ ফুঃ ৪½ ইঃ।

[অলিম্পিকের কয়েক সপ্তাহ আগে রাল্ফ বস্টন জেসি ওয়েন্সের বিশ্ব রেকর্ড ভেঙ্গে দিলেও সে রেকর্ড অনুমোদন করা হয়নি। আশা করা গিয়েছিল, একুশ বছরের নিগ্রো অ্যাথলেট বস্টন ওয়েন্সের বহুকালের পুরনো বিশ্ব রেকর্ড ভেঙ্গে দেবেন কিন্তু পারেননি, তবে ওয়েন্সের অলিম্পিক রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছেন।]

হপ স্টেপ ও জাম্প

প্রাক্তন বিশ্ব রেকর্ড—ও ফাইওডোসেভ (রাশিয়া) ৫৪ ফুঃ ৯½ ইঃ।

প্রাক্তন অলিম্পিক রেকর্ড—এডিমির ডা সিলভা (ব্রেজিল) ৫৩ ফুঃ ৭½ ইঃ।

১ম—জোসেফ স্মিড (পোল্যাণ্ড) ৫৫ ফুঃ ১¾ ইঃ (**নতুন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড**)।

২য়—ভি গোরায়েভ (রাশিয়া) ৫৪ ফুঃ ৬½ ইঃ।

৩য়—ভি ক্রেয়ার (রাশিয়া) ৫৩ ফুঃ ১০¾ ইঃ।

[হপ স্টেপ ও জাম্পে পোল্যাণ্ডের জোসেফ স্মিডের স্বর্ণপদক লাভ সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত ফলাফল। অলিম্পিকের কিছুদিন আগে স্মিড ৫৫ ফুট ১০½ ইঞ্চি পর্যন্ত লাফিয়েছিলেন, কিন্তু তা বিশ্ব রেকর্ডের অনুমোদন পায়নি। তবে স্মিড নতুন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড করেই প্রথম স্থান লাভ করেছেন।]

পোল ভল্ট

বিশ্ব রেকর্ড—ডন ব্রাগ (ইউ এস এ) ১৫ ফুঃ ৯¼ ইঃ।

প্রাক্তন অলিম্পিক রেকর্ড—আর রিচার্ডস (ইউ এস এ) ১৪ ফুঃ ১১½ ইঃ।

১ম—ডন ব্রাগ (ইউ এস এ) ১৫ ফুঃ ৫ ইঃ (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড)।

২য়—আর মরিস (ইউ এস এ) ১৫ ফুঃ ১ ইঃ।

৩য়—ই ল্যাণ্ডস্টর্ম (ফিনল্যাণ্ড) ১৪ ফুঃ ১১ ইঃ।

[অলিম্পিক অ্যাথলেটিকসে পোল ভল্টই একমাত্র বিষয় যার স্বর্ণপদক কোনদিন আমেরিকার হাতছাড়া হয়নি। অলিম্পিকের পর ছায়াচিত্রে 'টার্জনের' ভূমিকায় অভিনয়ের অভিলাষী আমেরিকার ডন ব্রাগ অতি সহজেই নতুন অলিম্পিক রেকর্ড করে পোল ভল্টে বিজয়ী হয়েছেন।]

দেশী সংবাদ

২৭শে সেপ্টেম্বর—অদ্য আম্বালার অতিরিক্ত দায়রা জজ সর্দার প্রীতম সিং পাতারের আদালতে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু ও অন্যান্য শীর্ষ-স্থানীয় ভারতীয় নেতাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হইলে রাজসাক্ষী জার্নাইল সিং ১৯৫৭ সালের মে মাসে লাহোরে আসামী রণবীর সিং সেগানের সঙ্গে এবং পাকিস্তান মুসলিম লীগ নেতা খান আবদুল কাইয়ুম খানের সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয় বর্ণনা করে।

কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর জল বণ্টন সম্পর্কে অনুষ্ঠিত আন্তঃরাজ্য সম্মেলনে কোনরূপ মীমাংসা হয় নাই বলিয়া জানা গিয়াছে। রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে এই দুইটি নদীর জল বণ্টনের প্রশ্নটি জটিল হইয়া উঠে।

২৮শে সেপ্টেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরুর পরামর্শ অনুযায়ী আচার্য বিনোবাভাবে আগামী-কাল ইন্দোর হইতে পনেরশত মাইল দূরবর্তী আসামের দিকে পদব্রজে রওয়ানা হইবেন।

পাঞ্জাবের রাজ্যপাল এক অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া আগামী ২রা অক্টোবর হইতে দ্বিভাষী পাঞ্জাবের হিন্দী এলেকায় দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী এবং পাঞ্জাবী এলাকায় গুরুমুখী অক্ষরে পাঞ্জাবী সরকারী ভাষা হিসাবে প্রবর্তন করিয়াছেন।

২৯শে সেপ্টেম্বর—সরকারী সূত্রে গত রাত্রিতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, ব্রাহ্মণী নদীর বন্যায় দুবোনিয়ায় ১৫৮২ ফুট দীর্ঘ নবনির্মিত বাঁধটি একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। আগস্ট মাসের ন্যায় পুরাতন বাঁধটি জলস্রোতে নিশ্চিহ্ন হইলে নূতন করিয়া উহা নির্মাণ করা হয়।

দার্জিলিং-এ উচ্চপদস্থ তিব্বতী অফিসারদের হত্যা ও দলিলপত্র বিনষ্ট করার জন্য ১১ জনেরও বেশী গুপ্তচর দার্জিলিং-এ প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া নির্ভরযোগ্যসূত্রে জানা গিয়াছে। কতকগুলি তিব্বতী এই দলের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে বলিয়া সন্দেহ করা হয়।

৩০শে সেপ্টেম্বর—শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষে চারদিন ধরিয়া পূজা ও উৎসব শেষে অদ্য কলিকাতায় দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জন অনুষ্ঠিত হয়। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার দরুণ এই বৎসর নিরঞ্জন উৎসবে উৎসাহ-উদ্দীপনায় কিছুটা ভাটা পড়ে। আকাশের অনিশ্চিত অবস্থার জন্য নিরঞ্জন দর্শনার্থীদের ভিড় ও অন্যান্য বারের তুলনায় কম হয়।

১লা অক্টোবর—বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, আসামের রাজ্যভাষা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের প্রয়াসে রাজ্য সরকার ও বিভিন্ন-ভাষা-গোষ্ঠীকে পরিচালনা করিবার জন্য আসাম সরকার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দ-বল্লভ পন্থকে আগামী ৪ঠা ও ৫ই অক্টোবর শিলংয়ে আসিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন।

চীন যাহাতে তিব্বতের উপর আক্রমণ পরিত্যাগ করে, তজ্জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুরোধ করিয়া দলাই লামা রাষ্ট্রপুঞ্জের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণী, বৈতরণী ও শালন্দী নদীর বন্যায় উড়িষ্যার কটক ও বালেশ্বর জেলার ৪৫০ বর্গ-মাইল এলাকায় অবস্থিত ৫২৫টি গ্রাম জলমগ্ন হইয়াছে এবং উহার ফলে প্রায় ৩ লক্ষ নরনারী বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

২রা অক্টোবর—তিব্বতী উদ্বাস্তুগণ হাজার হাজার মেষ ও চমরী গরুসহ তিব্বত ত্যাগ করিয়া উত্তর সিকিমের চেলোমু মালভূমিতে বসবাস করিতেছে। এই সংবাদ সরকারী মহল হইতে সমর্থিত হইয়াছে।

কোন নিয়োগকর্তা যদি তাহার কর্মচারীর প্রাপ্য প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের সমস্ত টাকা মিটাইয়া না দেন, তবে সেক্ষেত্রে কর্মচারী অথবা তাঁহার ওয়ারিশকে সাহায্য করিবার জন্য ভারত সরকার কর্মচারী প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড পরিকল্পনা অনুসারে ২০ লক্ষ টাকার একটি বিশেষ তহবিল গঠন করিয়াছেন বলিয়া এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

২৭শে সেপ্টেম্বর—কঙ্গোর প্রেসিডেণ্ট শ্রীযোসেফ কাসাভুবু সামরিক বাহিনী কর্তৃক প্রস্তাবিত গোল-টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠানে সম্মত হইয়াছেন। উহাতে দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ স্থির করিবার জন্য সকলমতের রাজনৈতিক নেতাদের আহ্বান জানানো হইবে। পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শ্রীপ্যাট্রিক লুমুম্বাও বাদ পড়িবেন না।

অদ্য অস্ট্রিয়ার সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে জানা যায় যে, গতরাত্রে মস্কো বিমানঘাটির নিকট একটি অস্ট্রিয়ান ভাইকাউণ্ট বিমান ভাঙিয়া পড়ে। এই দুর্ঘটনায় ৩০ জন যাত্রী নিহত হইয়াছে। তন্মধ্যে দুইজন ভারতীয়ও আছেন।

২৮শে সেপ্টেম্বর—বেলজিয়ান নিউজ এজেন্সীর সংবাদে প্রকাশ, রাষ্ট্রপুঞ্জ হেড কোয়ার্টার্স হইতে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, কাতাঙ্গা প্রদেশের মালেম্বা এনকুলু এলাকা হইতে সমস্ত ইথিওপিয়ার সেনা ও ইউ-রোপীয় নাগরিককে অপসারণ করিতে হইবে।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমঞ্জুর কাদির আজ এক বিবৃতিতে বলেন যে, কিছুসংখ্যক সশস্ত্র আফগান লস্কর গোপনে পাক এলাকায় ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু পাকিস্তানী মোমন্দ খণ্ডজাতির লোকজন তাহাদিগকে হঠাইয়া দিয়াছে।

২৯শে সেপ্টেম্বর—কঙ্গোর প্রেসিডেণ্ট শ্রীযোসেফ কাসাভুবু আজ বলেন—প্রধান সেনা-পতি কর্নেল যোসেফ মোবুটু বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ যন্ত্রবিদদের লইয়া যে পরিষদ গঠন করিয়াছেন, তাহাকেই কঙ্গোর প্রকৃত অস্থায়ী সরকার হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীহ্যারল্ড ম্যাকমিলান আজ রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদে ৬ হাজার শব্দ সম্বলিত এক বক্তৃতা করিয়া সোভিয়েট আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রীহ্যামারশিল্ডকে সমর্থন করেন এবং উপনিবেশবাদের উপর শ্রীক্রুশ্চেফ যে আক্রমণ করিয়াছেন, তাহাকে 'সেকেলে স্লোগান' বলিয়া অগ্রাহ্য করেন। নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি বিশেষজ্ঞগণকে লইয়া একটি নূতন কমিটি গঠনের দাবি করেন।

৩০শে সেপ্টেম্বর—প্রেসিডেণ্ট আইসেন-হাওয়ার ও শ্রীক্রুশ্চেফের মধ্যে সাক্ষাৎকার ঘটাইবার জন্য বিশ্বের পাঁচটি নিরপেক্ষ দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতা—শ্রী নেহরু, মার্শাল টিটো, প্রেসিডেণ্ট সুকর্ন, প্রেসিডেণ্ট নাসের ও ডাঃ এনক্রুমা আজ এক ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালান।

১লা অক্টোবর—আফ্রিকার সর্বাপেক্ষা জনবহুল দেশ নাইজেরিয়া অদ্য মধ্যরাত্রে স্বাধীন দেশে পরিণত হয়। ঐ সময় লাগসে ঘোড়দৌড়ের মাঠে এক অনুষ্ঠানে ইউনিয়ন জ্যাক নামাইয়া উহার স্থলে নাইজেরিয়ার নূতন সবুজ ও শ্বেত পতাকা উড্ডীন করা হয়।

রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদে অদ্য শ্রীনিকিতা ক্রুশ্চেফ যখন স্পেনের জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার তীব্র ভাষণ দিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে হঠাৎ বক্তৃতার মাঝখানে সংযত হইতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

২রা অক্টোবর—প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার, শ্রীহ্যারল্ড ম্যাকমিলান ও অস্ট্রেলীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীরবার্ট মেঞ্জিস আজ যুক্তভাবে এই মর্মে আশা প্রকাশ করেন যে, রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে, বিশেষ করিয়া নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা সম্পর্কে প্রকৃত সাফল্য অর্জন করিতে সক্ষম হইবে।

কঙ্গোর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ সম্পর্কে যে গোল-টেবিল বৈঠকের প্রস্তাব উঠিয়াছে, দেশের মোট ছয়টি প্রদেশের মধ্যে তিনটি তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

দেশ

DESH 40 Naya Paise
Saturday, 15th October, 1960

২৭ বর্ষ ॥ ৪৯ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২৯ আশ্বিন ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

রাষ্ট্র, রাজ্য ও ভাষা

আসামের সরকারী ভাষা কী হবে তা নিয়ে বিরোধটা নতুন মোড় নিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত পন্থ বলছেন, সব পক্ষকেই খুশী করা যায়, যাহোক এমন একটা সমাধানের ব্যবস্থা করা গেছে। সত্যি বলতে কী, সব পক্ষ দূরের কথা, আসামের রাজ্যভাষা সম্পর্কে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত কোন পক্ষকেই খুশী করতে পেরেছে মনে হয় না। অসমীয়ারা অসন্তুষ্ট, প্রবল প্রতিবাদ-মুখর; কারণ তাদের ধনুক-ভাঙ্গা পণ, একমাত্র অসমীয়া ভাষাই সরকারী স্বীকৃতির অধিকারী। বিভিন্ন খণ্ড-জাতীয় অধিবাসীরা অসমীয়া ভাষার সরকারী প্রাধান্য মেনে নিতে রাজী নয় এবং যদিও আসামের সরকারী ভাষা সংক্রান্ত প্রস্তাবে অনসমীয়াদের তুষ্টির চেষ্টায় ইংরেজীকে (পরে ইংরেজীর স্থলে হিন্দীকে) অসমীয়া ভাষার পাশে রাখা হয়েছে, তাতে বিরোধ এবং সংশয় বিন্দুমাত্র কমেনি। না কমাই স্বাভাবিক। কারণ সরকারী ভাষা অসমীয়ার পাশে ইংরেজীকে (পরবর্তী-কালে হিন্দীকে) বসানো নিতান্তই অসমীয়া-হিন্দী "আঁতাতের" একটা কৌশল। ইংরেজী হল বর্তমানে সর্বভারতীয় রাষ্ট্রভাষা; তাকে লিখিত-পঠিতভাবে আসামের বিকল্প রাজ্যভাষা হিসেবে ঘোষণা করার কোনই অর্থ হয় না। যে-ভাষার সরকারী অধিকার সারা দেশে বিস্তৃত এবং স্বীকৃত, তাকে আলাদাভাবে একটি অঙ্গরাজ্যের বিকল্প সরকারী ভাষা বলে ঘোষণা করা রাজনৈতিক জ্যামিতির নিয়ম অনুসারে একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। যে-ভাষা সমগ্র দেশে সরকারীভাবে প্রযুক্ত, তাকে কোন একটি অঙ্গরাজ্যে চালু করার জন্য বিশেষ বিধানের দরকার হয় না।

কাজেই প্রশ্ন হল, ইংরেজীকে বিশেষভাবে আসামের একটি সরকারী ভাষা ঘোষণা করার উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য প্রথমত কতকটা ছেলেভুলানো-প্রায়; এর দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার এবং আসাম রাজ্য সরকার অনসমীয়াভাষীদের আশ্বাস দিতে চাইছেন যে, অসমীয়া ভাষার একচ্ছত্র প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করবার কিছুমাত্র মতলব নেই তাঁদের; ইংরেজী ত রইলই, তবে হিন্দী যখন ইংরেজীকে স্থানচ্যুত করবে, তখন অবশ্য "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা"র মত হিন্দীই হবে অনসমীয়াভাষীদের শেষ আশ্রয়। অর্থাৎ অসমীয়া+ইংরেজী (বিকল্প হিন্দী) ফরমুলার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ; প্রথমটি হল, অসমীয়াকে রাজ্যভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা ব্যাপারে অনসমীয়াভাষীদের আপত্তি খণ্ডনের কৌশল (কারণ ইংরেজী ত রইল); দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, হিন্দীর প্রাধান্য বিস্তার। ভারতবর্ষের কোন অহিন্দীভাষী অঞ্চলেই হিন্দীকে সর্বভারতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করবার আগ্রহ নেই। আসামের ভাষা-সংকট সমাধানে কেবল রাষ্ট্রভাষা নয়, একেবারে রাজ্যভাষারূপে ফাঁকতালে হিন্দীর অনুপ্রবেশের বন্দোবস্ত করতে পারলে হিন্দীওয়ালাদের ডবল লাভ।

আসামের ভাষাবিরোধ সমাধানের সরকারী ফরমুলাটা যে অস্বাভাবিক, অবাস্তব এবং সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়, এটা এখন স্পষ্ট প্রতীয়মান। অসমীয়া ভাষার স্বচ্ছন্দ প্রসারের জন্য অসমীয়াভাষীদের আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু অসমীয়া আসাম রাজ্যের একমাত্র ভাষা নয়, এমন কী ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে যে সূত্র রচিত হয়েছিল, সেই সূত্র অনুসারেও অসমীয়া আসামের সরকারী ভাষা গণ্য হতে পারে না। আসামের অন্যতম আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে বাংলাও সরকারী ভাষার মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য, এই অভিমত পক্ষপাতদুষ্ট নয়। তার প্রমাণ, ভারতীয় সংবিধান। সংবিধানের ৩৪৭ অনুচ্ছেদের স্পষ্ট নির্দেশ, কোনও রাজ্যের জনসমষ্টির উল্লেখযোগ্য অংশ দাবি করলে রাষ্ট্রপতি ওই রাজ্যে অতিরিক্ত একটি সরকারী ভাষা প্রবর্তনের আদেশ দিতে পারেন। হিন্দীকে অনসমীয়াভাষীদের উপর চাপানোর ব্যবস্থা প্রশস্ত না করে পণ্ডিত পন্থ অনায়াসে সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী আসামের ভাষাসংকটের সন্তোষজনক সমাধান করতে পারতেন। সরকারী ভাষা হিসাবে একমাত্র অসমীয়া ভাষার দাবিই গ্রাহ্য, অনসমীয়াভাষীদের ভাগ্যে কপট "সান্ত্বনা-পুরস্কার" ইংরেজী (বিকল্পে হিন্দী)—এই ব্যবস্থার আপাত-চাতুর্য যতই চমৎকার হোক, এ দ্বারা বাস্তব বিরোধ মীমাংসিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না।

সরকারী ভাষা নির্ধারণ নিয়ে আসামে যে দীর্ঘস্থায়ী বিরোধের ক্ষেত্র রচিত হল তার সঙ্গে সারা ভারতের রাষ্ট্রিক ঐক্যের ভবিষ্যৎ জড়িত। আসামের বাংলাভাষীরা কেবল নয়, নানা ভিন্ন ভিন্ন ভাষী খণ্ড উপজাতিগুলিও অসমীয়া প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রবল প্রতিবাদী। আসাম বহুভাষী রাজ্য হিসাবে এর বিভিন্ন ভাষা-গোষ্ঠীর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকার যদি দৃঢ়ভাবে উদ্যোগী হতেন, তাহলে পরিস্থিতি এখনকার মত অনিশ্চিত শঙ্কাকুল হতে পারত না। শঙ্কার সূত্র আপাতত আসাম; কিন্তু বহুভাষী, বহুজাতি, উপজাতি এবং সম্প্রদায়ের সমবায়ে গঠিত প্রজাতন্ত্রী ভারতের ঐক্যও নানা রকম পরস্পরবিরোধী দাবির ঘাত-প্রতিঘাতে বিধ্বস্ত হওয়া অসম্ভব নয়। সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে প্রত্যেকের বিচারে প্রত্যেকের নিজের দাবিটাই একমাত্র ন্যায়সঙ্গত দাবি মনে হতে পারে। কিন্তু দাবিমাত্রই যদি পরস্পর সম্পর্কে সর্বাধিক প্রাধান্য চায় এবং সে-প্রাধান্য অন্যের উপরে চাপানোর জন্য যে-কোনও উপায় অবলম্বিত হয়, তাহলে এই বিরাট দেশের জনসমষ্টি "এক জাতি, এক প্রাণ, একতা"র আদর্শে মিলিত হবে কী করে? প্রথম থেকেই অঙ্গরাজ্য গঠনে ভাষাভিত্তিক স্বাতন্ত্র্যের নীতিকে অতিমাত্রায় প্রশ্রয় দেওয়ার ফলটা যে সর্বভারতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার অনুকূল হয়নি, তা ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে। যাকে বলে, "কাউন্সেল অব্ পারফেকসন" অর্থাৎ সর্বাঙ্গসুন্দর সমাধানের হদিস দিয়ে এখন হয়ত বিশেষ সুফল পাওয়ার আশা নেই। তবুও সুস্থবুদ্ধিসম্পন্নদের মনে রাখা ভালো, সারা ভারতের রাষ্ট্রভিত্তিক ঐক্যের বনিয়াদ পাকা না হলে ভাষাভিত্তিক স্বাতন্ত্র্যের ধাক্কা সামলানো খুবই কঠিন হবে।

প্রসঙ্গত

সম্প্রতি ভারতের কয়েকটি রাজ্যে কংগ্রেস-কর্মীদের মধ্যে আত্মকলহের যে নগ্নরূপ প্রকট হয়ে উঠেছে তাতে সংকিত হবার যথেষ্ট কারণ দেখা দিয়েছে। ১৯৬১ সালে দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন শুরু হবে। সেই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেস সংগঠনকে শক্তিশালীরূপে পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে কংগ্রেস নেতারা উদ্যোগী হয়েছেন—যার ফলে কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে যে আত্মকলহ এতকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে শুধু বুড়বুড়ি কাটছিল আজ তা ভুস করে ভেসে উঠেছে—চাপা দিয়ে রাখা আর সম্ভব হয়ে উঠল না। অন্ধকারের অন্তরাল থেকে দিনের আলোয় যখন এই বিরোধ স্পষ্ট হয়ে উঠল তখন দেখা গেল কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দুই দলের মধ্যে যাঁরা পার্লামেন্টারী রাজনীতি করে এসেছেন, আর যাঁরা সাধারণ কংগ্রেস কর্মী, এই দুই দলের ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতাই কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে পর্বতপ্রমাণ প্রাচীর তুলে বিরোধের সৃষ্টি করেছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বিভিন্ন রাজ্যের প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিগুলির উপর এই দুই দলের ক্ষমতা বিস্তারের প্রতিযোগিতা এত প্রবল হয়ে উঠল কেন? এ প্রশ্নের একটি মাত্র সরল ব্যাখ্যা হচ্ছে নির্বাচনের বৈতরণী পার হতে হলে সর্বাগ্রে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি নামক নৌকোগুলিকে হাত করা চাই। কিন্তু বিগত চার বছর ধরে এই নৌকাগুলিকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়ার ফলে পাটাতনে আর খোলে যে ফাটল ধরেছিল তা জোড়া লাগাবার বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সে-চিড় যে জোড় লাগেনি তা আসন্ন নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রকট হয়ে উঠল। নৌকোর খোলের জল ছাঁকতে গিয়ে দেখা গেল নৌকোর তলার কাঠে পচন ধরে ক্ষয়ে গেছে, নতুন করে ঢেলে না সাজলে বুঝি বৈতরণী আর পার হওয়া যায় না।

ঢেলে সাজতে গিয়েই যত গন্ডগোল। উত্তর প্রদেশে কী দেখলাম? কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের বিরোধী কংগ্রেস-কর্মীদলের নেতা চন্দ্রভাণ গুপ্ত সম্পূর্ণানন্দকে পরাজিত করে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। এই ঘটনার পর অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সঞ্জীবিয়া উঠে পড়ে লেগেছেন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নেতা শ্রীনরোত্তম রেড্ডীর সম্মান কী ভাবে রক্ষা করা যায়। তাঁরও সভাপতির আসন বুঝি হাত-ছাড়া হয়ে যায়। সেখানকার সংগ্রামী কংগ্রেসকর্মীদল সংহতি রক্ষার নামে সংহার মূর্তি নিয়ে দেখা দিয়েছেন।

ওদিকে মৈশুরাধিপতি জাত্তি মহাশয়ের মুখ্যমন্ত্রীত্ব বুঝি যায়-যায়। প্রাদেশিক কংগ্রেসের কেষ্ট-বিষ্টুরা বিধান পরিষদের কয়েকজন সদস্যকে ভাঙিয়ে এনে জোর আন্দোলন চালিয়েছেন মিঃ জাত্তিকে মুখ্যমন্ত্রীত্ব থেকে বিতাড়নের জন্য। উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত মহাতাবও খুব স্বস্তিতে নেই। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উপর তাঁর প্রভাব অতীতের নানা ঘটনায় আজ স্তিমিত হয়ে এসেছে। উড়িষ্যায় কংগ্রেস-গণতন্ত্র পরিষদ মৈত্রীর বিরোধিতা আজ যাঁরা করছেন তাঁদের আসল উদ্দেশ্য কংগ্রেস সংগঠনে প্রাধান্য বিস্তার করা।

*

প্রত্যেক রাজ্যের কংগ্রেস সংগঠনে দুটি দল স্পষ্ট রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। একদল আছেন কংগ্রেস সংগঠনকে অবলম্বন করে, অপর দল লোকসভা ও বিধানসভাকে অবলম্বন করে। এই দুই দলের সংঘর্ষ আজ ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কোথাও কম, কোথাও বেশী। এ-সংঘর্ষ আজকের নয়, বহুকাল ধরেই ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে আজ সম্মুখ সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। একদল মন্ত্রীত্বপ্রয়াসী, অপর দল সেবাব্রতী। দুই দলের আদর্শগত মত-বিরোধ আজ কংগ্রেস সংগঠনের মূলে আঘাত করেছে। এ-মতবিরোধ আজকের নয়, স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে থেকেই এ-বিরোধ দেখা দিয়েছিল এবং স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরেই কংগ্রেস সংগঠন ভেঙ্গে ফেলবার কথা গান্ধীজী জানিয়ে ছিলেন এই আশঙ্কা করেই। তিনি বুঝেছিলেন যে, কংগ্রেস যদি মন্ত্রিত্ব গ্রহণের দিকে যায় তাহলে জনসেবা ও জনসংযোগের আদর্শ থেকে সে বিচ্যুত হবে। সেদিন গান্ধীজীর কথায় কংগ্রেস হাই-কমান্ড কর্ণপাত করেননি, তাঁরা ভেবেছিলেন তাঁদের নেতৃত্বের জোরেই এ-বিরোধ তাঁরা মিটিয়ে ফেলতে পারবেন। আজ কি দেখছি। বিরোধ মেটাতে তাঁরা শুধু ব্যর্থই হননি, বিরোধের ইন্ধন জুগিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে একের প্রতি আরের অবিশ্বাস আর ঘৃণাই তাঁরা বাড়িয়ে তুলেছেন যার মর্মান্তিক পরিণাম আসন্ন। যে-সব কংগ্রেসকর্মী আইনসভা আর মন্ত্রীত্ব নিয়ে আছেন তাঁদের বিরুদ্ধে বহুকাল ধরে বহু অভিযোগ হাই-কমান্ডের কাছে উপস্থাপিত হয়েছে, যার অধিকাংশেরই কোন অনুসন্ধান হয়নি, প্রতিকার দূরের কথা। তাছাড়া কংগ্রেস মন্ত্রীদের উপর প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ক্ষমতা কতখানি ও কতদূর প্রযুক্ত হতে পারে সে-সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া নেই। তার ফলে অধিকাংশ রাজ্যেই দেখা যাচ্ছে মন্ত্রীত্বাধীকারী সদস্যরাই কংগ্রেস কমিটির উপর প্রাধান্য বিস্তার করছেন। সুতরাং আইনসভার অন্তর্ভুক্ত কংগ্রেসকর্মী ও আইনসভার বাইরের কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে মতানৈক্য বহুকাল ধরেই ধূমায়িত হয়ে এসেছে। উত্তর প্রদেশের দৃষ্টান্ত থেকে এইটিই প্রমাণিত হল যে নীরবে ও ধৈর্যের সংগে সমবেতভাবে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ সংগঠনের কাজে অধিক সময় নিয়োগ করেছিল বলেই বিরোধীদল আজ সেখানে জয় লাভ করেছে এবং ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দল তাঁদের একচেটিয়া ক্ষমতাটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন বলে আজ তাঁদের পরাজয় বরণ করতে হল।

*

কিন্তু উত্তর প্রদেশের এই কেলেঙ্কারী থেকে আমরা কী শিক্ষা পাচ্ছি। কংগ্রেস দীর্ঘকাল ধরে ভারতের রাজনীতিতে প্রাধান্য লাভ করে এসেছে। আগামী নির্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেস সংগঠনের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও ভাঙ্গনের ঘটনা একটার পর একটা যে-ভাবে ঘটে চলেছে তাতে শঙ্কিত না হয়ে পারা যায় না। উত্তর প্রদেশের ঘটনাই কংগ্রেস হাই-কমান্ডের সম্মানের মূলে কুঠারাঘাত করেছে। তার ফলে অন্যান্য রাজ্যের কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে এমন একটা ধারণা দেখা দিতে পারে যে সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির আস্থা ক্রমেই হারাচ্ছে। এ থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, প্রাদেশিক নেতৃত্বের সঙ্গে সর্বভারতীয় নেতৃত্বের বিরোধ আজ দেখা দিয়েছে, পূর্বে যা ছিল না। আসামের ঘটনাই একথার সমর্থন জানাচ্ছে। আসামে 'বাঙ্গাল খেদা' আন্দোলনের সময় প্রদেশ কংগ্রেস কর্মীদের এক সভায় প্রধানমন্ত্রীকে নাজেহাল হতে হয়েছিল, যার জন্য সভায় বক্তৃতা না দিয়েই তাঁকে সভাস্থল ত্যাগ করে চলে আসতে হয়। প্রদেশ কংগ্রেসের উপর সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রভাবের এই অবনতি কি কারণে ঘটল তার অনুসন্ধান ও প্রতিকারের সময় আজ এসেছে। সাধারণ নির্বাচন আসন্ন। অহমিকা ত্যাগ করে রাজ্য ও কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন কংগ্রেস নেতাদের আত্মজিজ্ঞাসার সময় এসেছে। পরস্পরের প্রতি দোষারোপ না করে আইনসভার ভিতরের ও আইনসভার বাহিরের কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে সংহতি ও সমঝোতা এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে দলের মধ্যে বিরোধ অনিবার্য না হয়ে ওঠে। আসন্ন নির্বাচনের প্রাক্কালে সকল কংগ্রেসকর্মীর কাছে এইটিই আমাদের নিবেদন।

বৈদেশিকী

ইউনাইটেড নেশনস্এর জেনারেল এ্যাসেমব্লীর অধিবেশনে যোগ দিতে যে কুড়িকয়েক রাষ্ট্রপ্রধান নিউইয়র্কে গিয়েছিলেন তাঁরা সব একে একে স্বদেশে ফিরে গেছেন বা যাচ্ছেন। যিনি এই সমারোহ ঘটিয়েছিলেন সেই মিঃ ক্রুশ্চফেরও নিউ-ইয়র্ক বাসের সমাপ্তি এই প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্বেই ঘটবে যদি তিনি আবার হঠাৎ একটা কিছু নূতন খেলা দেখাতে মনস্থ না করে থাকেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রীও তার আগেই ভারতে পেঁাছে যাচ্ছেন। এর পরেও আরো অনেকদিন ধরে জেনারেল এ্যাসেমব্লীর অধিবেশন চলবে কিন্তু তাতে প্রধানমন্ত্রী-স্থানীয় বড়ো কেউ একটা উপস্থিত থাকবেন না। প্রধানমন্ত্রীদের জটলার দ্বারা পৃথিবীর যে বিশেষ কিছু উপকার হয়েছে তার প্রমাণ নেই। সকলেই বক্তৃতা করেছেন এবং যাঁর যাঁর বক্তৃতা তাঁর তাঁর দেশের খবরের কাগজে বড়ো করে ছাপা হয়েছে যাতে প্রত্যেক দেশেরই সাধারণ পাঠকের মনে এই ধারণা জন্মায় যে তাদের কর্তার কথার মতো সার-গর্ভ কথা আর কেউ বলেনি। আসলে যে লক্ষ লক্ষ কথা তারে বেতারে প্রচারিত হয়েছে তার অধিকাংশই ছেঁদো কথা, সেগুলি অনুচ্চারিত থাকলে পৃথিবীর কোন ক্ষতি হত না।

তিন সপ্তাহ ধরে ইউনোর নাট্যমঞ্চে বা প্রধানমন্ত্রীর হাটে যে বকাবকির পালা হয়ে গেল তার ফলাফলের বিচার এখন কিছু-কাল চলতে থাকবে। মোটের উপর অবস্থার বিশেষকিছু পরিবর্তন হয়নি বলে মনে হয়। কিছু হয়নি বলে যে পৃথিবীর সংঘর্ষ হঠাৎ আরো বেড়ে গেল এরূপ আশঙ্কা করারও কারণ নেই। পূব-পশ্চিম দ্বন্দ্বেও যে কোনো পক্ষের মোটের উপর বিশেষ লাভ বা ক্ষতি হয়েছে তা বলা যায় না। নিরপেক্ষ রাষ্ট্রদের মধ্যে বা ইউনোর নূতন সদস্যদের মধ্যে কোনো পক্ষেরই নূতন প্রতিপত্তিলাভের প্রমাণ নেই। কংগোর সম্পর্কে এবং ইউনোর সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ হ্যামারশিয়েল্ড্-এর বিরুদ্ধে সোভিয়েট প্রচেষ্টা সফল হয়নি। তাতে মিঃ ক্রুশ্চফের খানিকটা মর্যাদা হানি হয়েছে সন্দেহ নেই। তাতে নিরপেক্ষ এবং নূতন স্বাধীনহওয়া রাষ্ট্র-গুলি বৃহৎশক্তিদের বগলদাবা হতে কিরূপ অনিচ্ছুক সেটাও প্রমাণিত হয়েছে। একদিক দিয়ে নিরপেক্ষ এবং নূতন স্বাধীনহওয়া দেশগুলিই এখন ইউনোর সত্তা এবং মর্যাদা রক্ষার জন্য সব চেয়ে বেশি প্রয়াসী, অবশ্য সেটা তাদের স্বার্থও বটে। কংগো এবং মিঃ হ্যামার্শিয়েল্ড্এর ব্যাপারে যেমন সোভিয়েট পক্ষের কিছুটা মর্যাদা হানি ঘটেছে তেমনি নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে পাশ্চিমারা নিরপেক্ষদৃষ্টিতে কিছুটা খাটো হয়েছে। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এবং মিঃ ক্রুশ্চফের মধ্যে ব্যক্তিগত সংযোগের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন জানিয়ে পঞ্চ-

—— সদ্য প্রকাশিত ——

সমরেশ বসুর মহোত্তম উপন্যাস

বাঘিনী

॥ সাত টাকা ॥

আর এক আশ্চর্য জগৎ ও জীবনের প্রতিচ্ছবি

বি টি রোডের ধারে (৩য় মুঃ) ২·৫০ ॥
শ্রীমতী কাফে (২য় মুঃ) ৬·০০ ॥
গঙ্গা (৫ম মুঃ) ৫·৫০ ॥

বাংলা ছায়াচিত্রে রূপায়িত হচ্ছে।

জরাসন্ধের নবতম উপন্যাস

॥ সাড়ে ছয় টাকা ॥

ন্যায়দণ্ড

বিচারশালার পটভূমিকায় মর্মস্পর্শী কাহিনী

লৌহকপাট ১ম খণ্ড (১৩শ মুঃ) ৪·০০ ॥
লৌহকপাট ২য় খণ্ড (১০ম মুঃ) ৩·৫০ ॥
লৌহকপাট ৩য় খণ্ড (৫ম মুঃ) ৫·০০ ॥
তামসী (৭ম মুঃ) ৫·৫০ ॥

বাংলা ও হিন্দী ছায়াচিত্রে রূপায়িত হচ্ছে।

সৈয়দ মুজতবা আলীর
অপরূপ রম্যরচনা

চতুরঙ্গ

॥ সাড়ে চার টাকা ॥

জলে ডাঙ্গায় (৮ম মুঃ) ৩·৫০ ॥

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর
নবতম উপন্যাস

তুঙ্গভদ্রা

॥ চার টাকা ॥

মণিপদ্ম - ৪·০০ ॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মহাশ্বেতা (২য় মুদ্রণ) ৫·৫০ ॥

সপ্তপদী (১৩শ মুঃ) ২·৫০ ॥
[বাংলা ছায়াচিত্রে রূপায়িত হচ্ছে]
ধাত্রী দেবতা (৮ম মুঃ) ৬·০০ ॥
আমার কালের কথা (৩য় মুঃ) ৩·৫০ ॥

সতীনাথ ভাদুড়ীর

পত্রলেখার বাবা ৪·০০ ॥
জাগরী (৯ম মুঃ) ৪·০০ ॥

অচিন রাগিণী (২য় মুঃ) ৩·৫০ ॥
সংকট (২য় মুঃ) ৩·৫০ ॥
অপরিচিতা (২য় মুঃ) ৩·০০ ॥

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের

জর্জ বার্নাড শ ৮·৫০ ॥
শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কের উপন্যাসোপম জীবনী

অগ্নিরথের সারথি ৪·০০ ॥
একাকিনী নায়িকা ২·৫০ ॥
অখণ্ড জগৎ (অনুবাদ) ৩·০০ ॥

আনন্দকিশোর মুন্সীর

রাঘব বোয়াল ৩·০০ ॥

ডাক্তারের ডায়েরী (৩য় সং) ৪·০০ ॥

নীলকণ্ঠের নবতম কথামৃত

এলেবেলে ২·৫০ ॥

চিত্র-বিচিত্র (৪র্থ মুঃ) ৩·৫০ ॥
অদ্য ও প্রত্যহ (২য় মুঃ) ৫·০০ ॥

বরিস পাস্তেরনাকের
বহু বিতর্কিত চাঞ্চল্যকর উপন্যাস

ডাক্তার জিভাগো

॥ সাড়ে বারো টাকা ॥
কবিতার অনুবাদ ও সম্পাদনা :
বুদ্ধদেব বসু

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের প্রবন্ধ-গ্রন্থ

সুখের সন্ধানে

[The Conquest Of Happiness]

॥ পাঁচ টাকা ॥

অনুবাদ : **পরিমল গোস্বামী**

● শেষ বই দুটি রূপা অ্যাণ্ড কম্পানির সহযোগিতায় প্রকাশিত ●

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো

নিরপেক্ষ শক্তিরা যে প্রস্তাব করেন সেই প্রস্তাবের এবং তৎসম্পর্কিত সংশোধনী প্রস্তাবগুলির আলোচনায় পশ্চিমা বৃহৎ-শক্তিদের যে-মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তাতে নিরপেক্ষদের বিচারে পশ্চিমাদের কিছুটা নৈতিক ক্ষতি হয়েছে বলা যায় এবং সোভি-য়েট সোভিয়েট পক্ষের লাভ।

তবে পঞ্চনিরপেক্ষ শক্তির প্রস্তাবটি যে আমাদের সর্বাংশে ভালো লেগেছে তা নয়। বৃহৎশক্তিদের মধ্যে মিত্রতা পৃথিবীর পক্ষে আবশ্যক হতে পারে কিন্তু সেই মিত্রতা সৃষ্টির জন্য নিরপেক্ষদের এই ধরনের চেষ্টা কাম্য এবং ফলপ্রসূ হতে পারে কি না সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। আমেরিকা ও সোভিয়েট যদি 'কোল্ড ওয়ারের' উপশম চায় তবে তাদের মিটমাটের পথ খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে না। তখন মধ্যবর্তী হিসাবে নিরপেক্ষদের ভূমিকা আপনা থেকেই সৃষ্টি হবে, বৃহৎশক্তিরাই সৃষ্টি করবে। কোরিয়ার যুদ্ধ ভারত সরকারের বা অন্য কোনো নিরপেক্ষ শক্তির চেষ্টায় থামেনি, দুই পক্ষ যুদ্ধ থামাতে চেয়েছিল, আসলে যুদ্ধ থেমেই গিয়েছিল, কিন্তু যুদ্ধ-বিরতি বিধিবদ্ধভাবে সুনিশ্চিত করার জন্য কতকগুলি প্রশ্নের নিষ্পত্তি আবশ্যক ছিল যা কোনো নিরপেক্ষ মধ্যবর্তিতার দ্বারাই সম্ভব। সেই জন্যই ভারত সরকারের তখন মধ্যবর্তী ভূমিকা গ্রহণের সুযোগ হয়েছিল।

অবশ্য নিরপেক্ষ মতের চাপের মূল্য নেই তা নয়। কিন্তু সেটা অবস্থা, সময় এবং নিরপেক্ষদের ভালোমন্দ করার শক্তির উপর নির্ভর করে। বর্তমান ক্ষেত্রে আমেরিকা ও সোভিয়েটের মধ্যে আপসের মনোভাব-মূলক যোগাযোগ নিশ্চয়ই কাম্য, কিন্তু প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এবং মিঃ ক্রুশ্চফের মধ্যে যা ঘটে গেছে এবং নির্বাচন ইত্যাদির দরুণ আমেরিকার যে-আভ্যন্তর পরিস্থিতি বর্তমান রয়েছে তাতে এই দুজনের মধ্যে ব্যক্তিগত মিলনের আবেদন করে কী ফল আশা করা যায় তা বুঝা কঠিন। সাধারণভাবে এরূপ ব্যক্তিগত মিলনের সম্ভাবনা নেই বলেই বোধ হয় এই আবেদন করা হয়েছিল। অবস্থার গুরুত্ব প্রকাশের জন্য অর্থাৎ এই ভাব প্রকাশ করার জন্য যে পৃথিবী এতই গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হয়েছে যে, এখন আর অন্য কোনো কথা না ভেবে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এবং মিঃ ক্রুশ্চফের মধ্যে আবার ব্যক্তিগত সংযোগ স্থাপন আবশ্যক, পূর্বে তাঁদের মধ্যে যা ঘটেছে সে সব ভুলে গিয়ে। পঞ্চ-নিরপেক্ষশক্তির এই যুক্তিতে কোনো ফল হয়নি। এরূপ যুক্তির ভিত্তিতে কোনো প্রস্তাব করা আদৌ সমীচীন হয়েছে কি না সে-বিষয়েও সন্দেহ আছে। একথা ঠিক যে, সোভিয়েট এবং আমেরিকার মধ্যে আপসের ভাব দেখা না দিলে পৃথিবীর বহু স্থানে গোলযোগ এবং অশান্তির সম্ভাবনা থাকবে এবং গোলযোগ হতেও থাকবে। সোভিয়েট বা আমেরিকা না চাইলে বিশ্বযুদ্ধ ঘটবে না কিন্তু দুয়ের মধ্যে আপসের ভাব না হলে নানা স্থানে অশান্তি লেগে থাকবে এবং সে অশান্তির ফলভোগ করতে হবে বেশির ভাগ নিরপেক্ষদেরই কারণ যারা নিরপেক্ষ থাকতে চায় তাদের জায়গাতেই অশান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে বা হবে। কিন্তু এই অবস্থার পরি-বর্তনের জন্য কেবল বৃহৎশক্তিদের নিকট আবেদন নিবেদন করেও যে কোনো লাভ নেই সেটা বুঝবার সময় কি এখনো হয়নি?

*

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান কাশ্মীরের কথা তুলে সম্প্রতি যা বলেছেন তাতে অনেকের আশ্চর্য বোধ হবে। অনেকদিন পরে—এবং খালের জল সম্পর্কিত চুক্তি স্বাক্ষরের কালি শুকোতে না শুকোতে—আবার পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষের মুখ থেকে কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনার কথা শুনো গেল। বিষয়টি ভবিষ্যতে আলোচনার জন্য রইল।

আর একটি বিষয় যা ভবিষ্যতে আলো-

*

চনার জন্য থাকল—ফরাসী সরকারের সংগে যুদ্ধরত স্বাধীনতাকামী আলজেরিয়ানদের প্রতি ফরাসী লেখক, দার্শনিক, শিল্পীদের সহানুভূতি জ্ঞাপনের মনোহর ঘটনা।

৯।১০।৬০

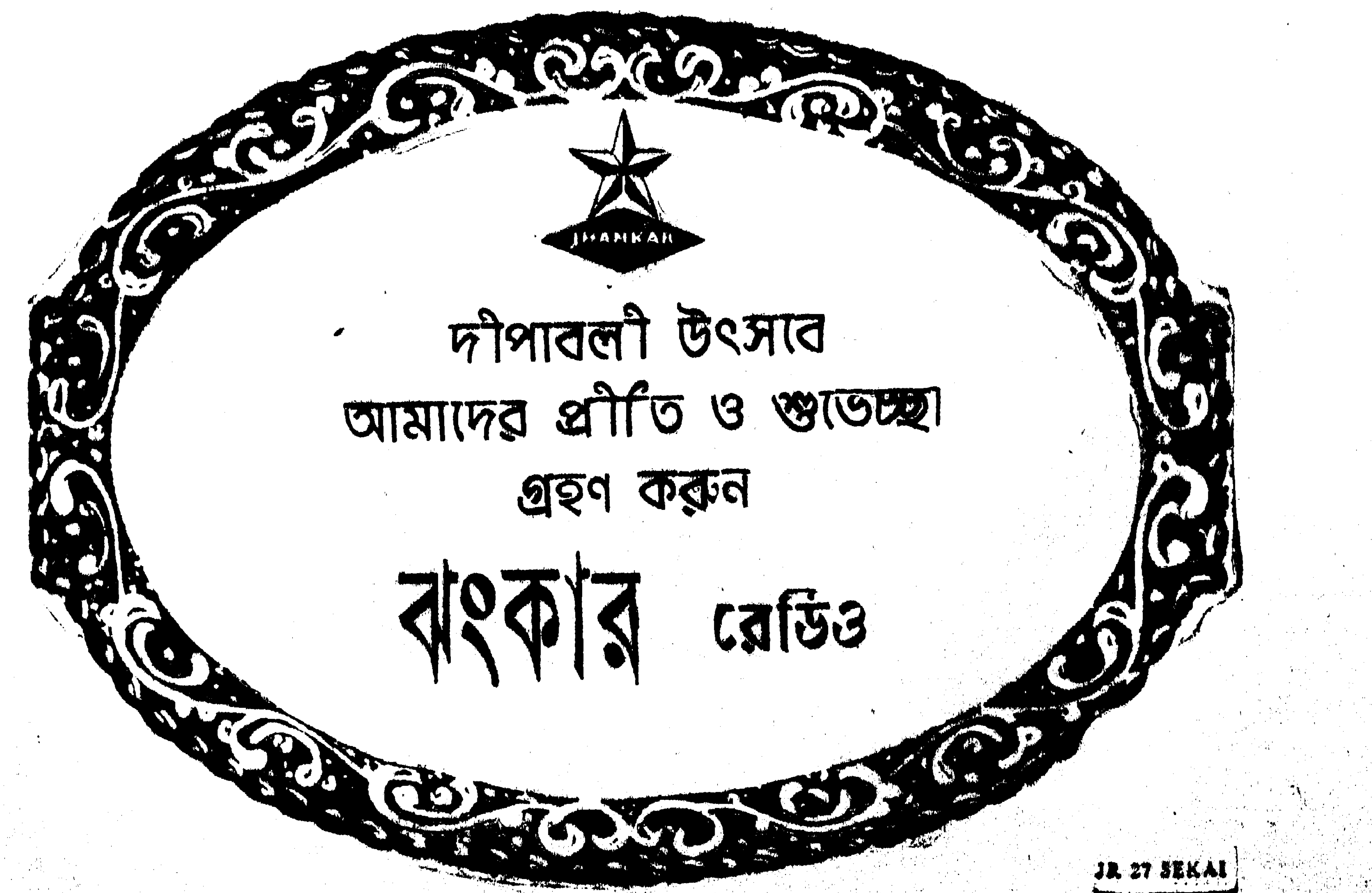

আলোচনা

ভাষা কোন্দলী দুই

মহাশয়,

'দেশে'র ৪৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত স্বরাজ মিত্রের "ভাষা কোন্দলী দুই" প্রবন্ধটি পড়লাম। এই প্রসঙ্গে পূর্ব ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠীর ক্রমবিকাশ কিভাবে হয়েছিল এবং এই ক্রমবিকাশে বাংলার ভূমিকা কতখানি সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে চাই।

সকলেই জানেন, কোন একটি ভাষা রাতারাতি ভুঁই ফুঁড়ে ওঠে না, এক বছর, একশ বছরেও কিছু হয় না, হাজার হাজার বছর ধরে লোকের মুখের কথা রূপ বদলাতে বদলাতে একটি অবিচ্ছিন্ন সংহতি লাভ করে। নতুন ভাষার সৃষ্টি হয় ওই থেকে। এই হিসাবে বাংলা ভাষার জন্ম হাজার বছর আগে। আবার বাংলার সহিত আরো কয়েকটি পূর্বভারতীয় ভাষার (আধুনিক ওড়িয়া ও অসমীয়া) জন্মসূত্র রয়েছে। আর্যরা যখন ভারতবর্ষে আসেনি তখন ভারতবর্ষ কতগুলি অনার্য গোষ্ঠীর (জাতি নয়) দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। তাদের ভিতর স্থানগত ঐক্য বিশেষ লক্ষ্যে পড়ে না, সুতরাং তাদের ভাষার ভিতর যথেষ্ট বিচ্ছিন্নতা ছিল এটা মনে করা খুবই স্বাভাবিক, তবে আঞ্চলিকতার প্রভাব কোন ভাষার পক্ষে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়, এই বিধিতে বিভিন্ন অনার্যগোষ্ঠীর ভাষার ভিতর অনেক অমিল সত্ত্বেও কিছু কিছু মিল ছিল। আর্যরা ভারতবর্ষে আসার পর অনার্যদের সঙ্গে তাদের সংগ্রাম বাধে এবং সমগ্র উত্তর ভারত থেকে হটে গিয়ে অনার্যরা দক্ষিণ ও পূর্বভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে, ফলে উত্তর ভারতে আর্যদের ভাষা বৈদিক সংস্কৃতের প্রচলন হয়। তারপর ভাষাগত ক্রমবিকাশের ফলে বৈদিক সংস্কৃত লৌকিক সংস্কৃতে এবং তার থেকে প্রাকৃত ও মাগধী প্রাকৃতে রূপান্তরিত হয়। এই মাগধী প্রাকৃতই পূর্বভারতের আধুনিক ভাষাগোষ্ঠীর জননী বলা চলে।

এইখানে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, সমগ্র পূর্বভারত কতগুলি অনার্যগোষ্ঠীর দ্বারা দীর্ঘকাল অধ্যুষিত ছিল, অর্থাৎ যখন পূর্বভারতে মাগধী প্রাকৃত রূপ বদলাতে লাগল তখন তার ভিতর স্থানবিশেষে অনার্যগোষ্ঠীর ভাষার অনুপ্রবেশ সহজ হয়ে উঠল, এই থেকে তিনটি প্রধান ভাষার সৃষ্টিঃ বাংলা, ওড়িয়া ও অসমীয়া। এই তিনটি ভাষার ব্যাকরণ মূলত একইরকম, শব্দ এবং ধাতু ত আছেই—তা সত্ত্বেও সামান্য যেটুকু প্রভেদ লক্ষিত হয়, তা কেবল অনার্য ও বৈদেশিক (মঙ্গোল মঙ্গোলয়েড ও ভোট-চীনা শ্রেণীয়) ভাষার প্রভাবের ফলে। যেমন বর্তমানের যে অসমীয়া ভাষা বাংলা থেকে একটু সরে গেছে তা মঙ্গোল গোষ্ঠীর ভাষার অনুপ্রবেশের ফলে। এই থেকে বোঝা যায় যে, পূর্বভারতের প্রধান তিনটি ভাষার জন্ম প্রায় একইকালে; তবে সামান্য যে একটু কালগত প্রভেদ চোখে পড়ে তা জাতিগত

অসামান্য প্রকাশন

সৈয়দ মুজতবা আলী
শবনম
৫·০০

বিমল মিত্র
বেনারসী
৪·৩০

আগাথা ক্রিস্টি
দশ পুতুল
৩·৫০

সরোজকুমার রায়চৌধুরী
রমণীর মন
৩·৫০

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী
হিরণ্ময় পাত্র
৪·০০

অন্যান্য বই

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
যোগভ্রষ্ট ৫·০০
রাধা (৪র্থ সং) ৭·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র
জলপায়রা (২য় সং) ৪·০০
হরিণ চিতা চিল (কবিতা) ৩·০০

গজেন্দ্রকুমার মিত্র
আকাশশিল্পি (২য় সং) ৪·০০

প্রবোধকুমার সান্যাল
অগ্নিসাক্ষী (২য় সং) ৩·০০

প্রভাত দেব সরকার
সুচরিতাসু ৩·০০

বিক্রমাদিত্য
প্রথম প্রণয় ৩·০০

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
অন্দর মহল ৩·০০

বিমল কর
বনভূমি (২য় সং) ৩·০০

সুবোধ ঘোষ
পলাশের নেশা (৪র্থ সং) ৩·০০
রূপসাগর (৩য় সং) ৪·৫০

অবধূত
কলিতীর্থ কালিঘাট (৮ম সং) ৪·০০
ক্রীম ৪·৫০

রমাপদ চৌধুরী
আপন প্রিয় (৫ম সং) ৩·০০
কথাকলি (২য় সং) ৩·০০
দুটি চোখ দুটি মন (২য় সং) ৪·৫০

সরোজকুমার রায়চৌধুরী
শুক্লসন্ধ্যা ৫·০০

গৌরকিশোর ঘোষ
জল পড়ে পাতা নড়ে ৮·০০
মন মানে না ৩·৭৫

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রসারণশীলতার জন্য। আসামে আর্য সংস্কৃতির প্রবেশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক-কালে, কেননা আসাম ভারতের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত। সিন্ধুনদ এবং তার অববাহিকা অঞ্চলকে আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির আদিম পীঠভূমি ধরলে পূর্ব-ভারত পর্যন্ত এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ—বলতে গেলে নদী যেভাবে আস্তে আস্তে নিম্নভূমির দিকে বয়ে যায়, ভারতীয় আর্য সংস্কৃতিও তেমনি ধীরে ধীরে পূর্বদিকে প্রবহমান এবং এই সূবাদে সুন্দর একটি gradation লক্ষ্যে পড়ে। সুতরাং আধুনিক অসমীয়া ভাষা যে অপেক্ষাকৃত বয়োকনিষ্ঠ তা অস্বীকার করা কেবল গায়ের জোরেই সম্ভব।

সাম্প্রতিক আসামে যে ব্যাপক হারে হামলা হয়ে গেল, তার আভ্যন্তরীণ কারণ হিসাবে ভাষার ভূমিকা অনেকখানি। কিন্তু মুখের কথায় অসমীয়া যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠিত ভাষা তা জাহির করলে কি

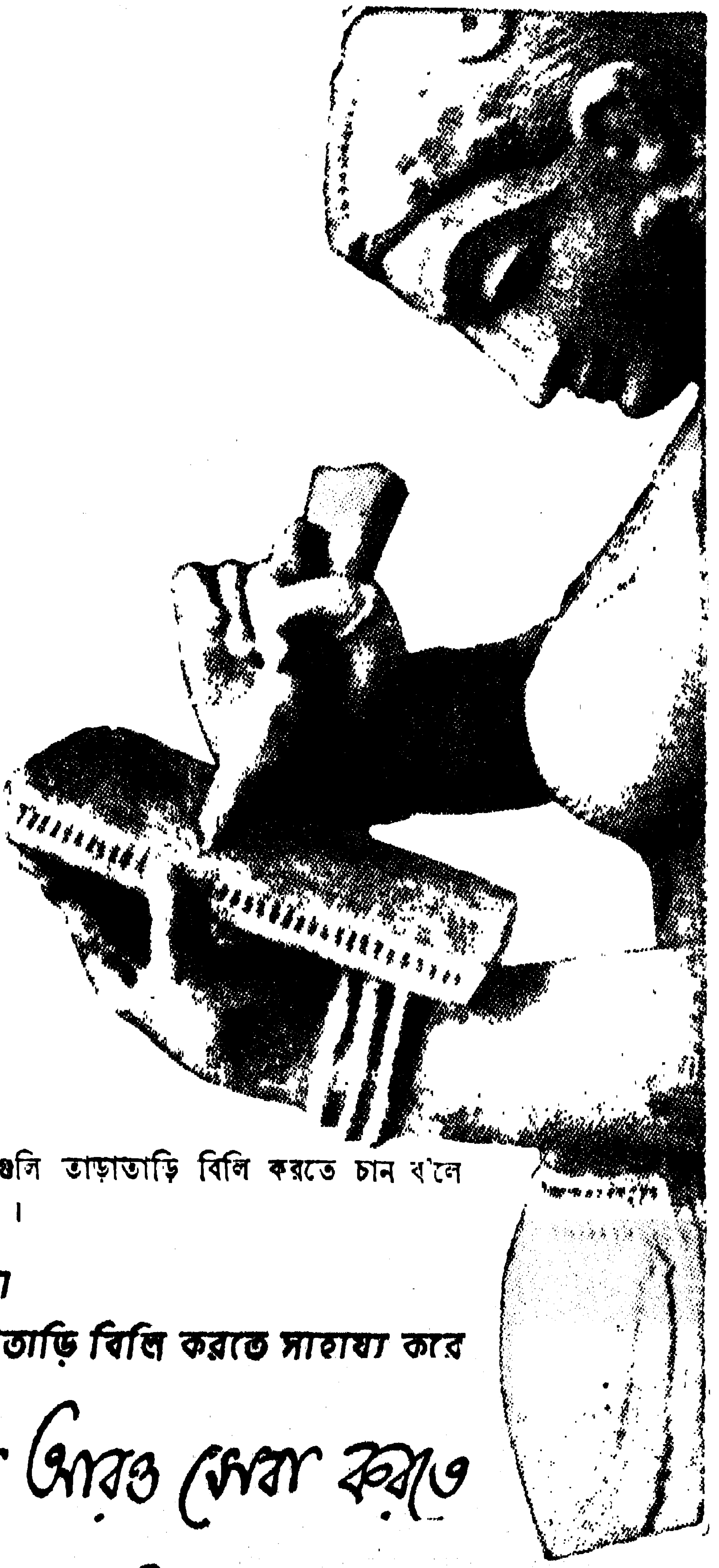

গোপনীয়...

আপনারা যে সব চিঠিপত্র লেখেন, সেগুলি অত্যন্ত গোপনীয় তাতে সন্দেহ নেই — কিন্তু আপনাদের লেখা চিঠির একটা অংশ সম্পর্কে ডাকপিয়ন উদাসীন থাকতে পারেন না। সেটি হ'ল ঠিকানার অংশ। তিনি চিঠিগুলি তাড়াতাড়ি বিলি করতে চান ব'লে এই অংশটায় তাঁর প্রয়োজন থাকে।

সম্পূর্ণ এবং পরিষ্কার ঠিকানা চিঠিপত্র তাড়াতাড়ি বিলি করতে সাহায্য করে

আপনাদের আরও সেবা করতে আমাদের সাহায্য করুন

ডাক ও তার বিভাগ

DA 60/398 (Bengali)

হাওড়া বার্ত্তা
৩৭৪, জি টি রোড, সালকিয়া,
হাওড়া
হাওড়াবার্তার কবিতা সঙ্কলনের জন্য কবিতা প্রয়োজন। —কর্মাধ্যক্ষ
(সি-৮৩৮৬)

মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল
আরোগ্য করিতে ২৭ বৎসর ভারত ও ইউরোপ অভিজ্ঞ ডাক্তার ডিগোর সহিত প্রতিদিন প্রাতে ও প্রতি শনিবার, রবিবার বৈকাল ৩টা হইতে ৭টায় সাক্ষাৎ করুন। ৩বি, জনক রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা-২৯। (সি ৮৩৯১)

কেশহোড়ের
মহাভৃঙ্গরাজ

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ
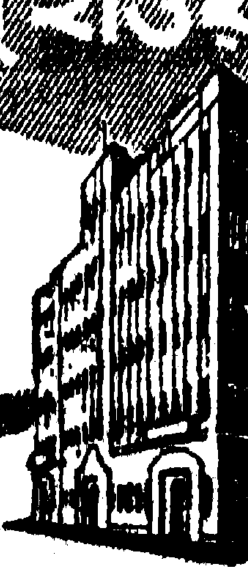
সম্প্রতি ব্যাঙ্কের তিনটি শাখা অফিস খোলা হয়েছে
১। পাইকপাড়া
২। এণ্টালি
(দুইটিই কলিকাতায়)
এবং
৩। ঝাউটুনিতে
(বিহার)
হেড অফিস
৪ ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা ১

আর না-করলে কি। যেমন—আগেই বলেছি —পাহাড় হতে ঝরনা ঝরতে ঝরতে নদী ও উপনদীতে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়, স্থানভেদে বিভিন্ন নামে নামিত হয়, ভাষার ব্যাপারটাও কতকটা সেইরূপ। কোন একটি ভাষা প্রতিবেশী ভাষা হতে একেবারে পৃথক হতে পারে না। বাংলা ও অসমীয়া একই ভাষার সামান্য এদিক ওদিক। সেই কথায় আসছি। তার আগে একটি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে নিই। আধুনিক দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা ভিন্ন গোষ্ঠীর ভাষা। বিন্ধ্যপর্বত মাঝখানে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের মত দণ্ডায়মান বলে আর্যরা দক্ষিণ ভারতে তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটাতে সমর্থ হয়নি। সেইজন্য দক্ষিণ ভারতে অনার্য গোষ্ঠীর ভাষা আজো স্বতন্ত্র ভাষা হিসাবে বলবৎ আছে, তবে সেই অনার্য গোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষাগুলির ভিতর উত্তর ভারতের ভাষার মত যথেষ্ট মিল আছে, শব্দ এবং ব্যাকরণ উভয় দিক দিয়ে। এবং ভারতবর্ষের এখানে ওখানে যে ক'টি প্রাচীন অনার্য জাতি খণ্ড বিখণ্ড-ভাবে আপনাদের স্বাতন্ত্র্য বাঁচিয়ে বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে আজো টিকে আছে, তাদের ভাষার সহিত দক্ষিণ ভারতের প্রতিষ্ঠিত দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাগুলির মিল বেশ। ভাষার এই মিল-অমিল তত্ত্বটা, আশা করি, যাঁরা ভাষার ইতিহাসের দু' পাতা পড়েছেন তাঁরা ভাল করেই বুঝতে পারবেন। এইবার প্রসঙ্গে ফিরে যাচ্ছি। নবাবী আমলে বাঙলা বিহার উড়িষ্যা একত্রে ছিল; তখন আইন আদালতের ভাষা হিসাবে যদিও ফার্সীর একচেটে অধিকার, তবু লৌকিক কথ্য ভাষা হিসাবে এই তিনটি ভাষার সেতু হিসাবে বাংলার স্থান ছিল সবার উপরে। আধুনিক শ্রীহট্ট তখন বাঙলার অন্তর্গত ছিল, সুতরাং সেকালের শ্রীহট্টে যে বাংলাই চলতি ছিল একথা বালকেও বুঝতে পারবে। আর স্থানগত প্রভাবের কথা ধরলে শ্রীহট্টের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে খাঁটি বাংলা যে চলতি ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। নবাবী আমলের আগেও পালযুগে বাংলার এইরূপ অধিনায়কত্ব স্পষ্টই চোখে পড়ে। অধিকন্তু সেকালে শুধু শ্রীহট্ট ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা নয়, সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা জুড়ে বাংলার চল ছিল। কেননা, ব্রহ্মপুত্রের নাব্যতা আসামে বাঙালীদের গতায়াত সহজ করে তুলেছিল, ফলে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় বাঙলার সংস্কৃতি অতিশয় প্রকট। এর সোজা মানে যা দাঁড়ায় তা ধরলে বলতে হয় যে, সেকালের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাংলা খুব চলতি ছিল। আর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা বাদ দিলে যে আসাম থাকে তার নাম পার্বত্য আসাম। এই অঞ্চল জুড়ে ছিল বিভিন্ন পার্বত্য জাতি উপজাতি, তারা প্রায়ই অভারতীয় মঙ্গোল গোষ্ঠীর। দীর্ঘকাল এই ভারতীয় অভারতীয়ের একত্র সংশ্রবের

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
মনের মানুষ
— তিন টাকা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
বহু যুগের ওপার হতে
— দু টাকা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
তিন শূন্য
— তিন টাকা পঞ্চাশ

সুবোধ ঘোষ
ভারত প্রেমকথা
— ছয় টাকা

সরলাবালা সরকার
গল্পসংগ্রহ
— পাঁচ টাকা

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন
চিন্ময় বঙ্গ
— চার টাকা

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
বিবেকানন্দ চরিত
— পাঁচ টাকা

ছেলেদের বিবেকানন্দ
— এক টাকা পঁচিশ

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী
রবীন্দ্র মানসের উৎস সন্ধানে
— তিন টাকা পঞ্চাশ

লিপিকার বই
দুস্তর মরু
দরবেশ ॥ তিন টাকা

বিদূষক
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
দুই টাকা পঞ্চাশ

সাহিত্যের সত্য
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
দুই টাকা পঞ্চাশ

আনন্দ পাবলিশার্স
প্রাঃ লিমিটেড। কলিকাতা-৯

ফলে উভয় গোষ্ঠীর ভাষা পরস্পরকে প্রভাবিত করে ফেলল, তবে এইখানে পার্বত্য গোষ্ঠীর উপর বাংলার প্রভাব অধিকতর বলবান। এইজন্য বলতে হয় যে, আধুনিক অসমীয়া বলে যে একটি স্বতন্ত্র ভাষার প্রতিষ্ঠা তা ছদ্মবেশী বাংলা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এইখানে আরো একটি কথা বলি। হাজার বছর আগের বাংলা ভাষার যে নমুনা পাওয়া গেছে চর্যার পদগুলিতে তা অনেকে অসমীয়া বলে দাবি করেছেন। এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য এই যে, হাজার বছর আগে যদি অসমীয়া ভাষায় সাহিত্য রচিত হয়ে থাকে, তাহলে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে গেল, অথচ অসমীয়া ভাষায় কোন পুঁথি লেখা হল না কেন? আরো লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, চর্যার যে পদগুলি অসমীয়া বলে দাবি করা হয়েছে সেগুলি পাওয়া গেছে নেপাল-এর রাজ-পুঁথি সংগ্রহশালায়। যদি ধরা যায় যে, ঐ পুঁথিখানি লিখিত হয়েছিল ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে, তাহলে স্বতই একটি প্রশ্ন জাগে—ঐ সময় নেপালের সহিত আসামের কোনরূপ যোগসূত্র ছিল কি? যদি না থাকে তাহলে আসামে লিখিত পুঁথি নেপাল রাজ-সংগ্রহশালায় যাবে কি করে? জানা গেছে যে, বৌদ্ধ শ্রমণদের অত্যাচারে হিন্দু পণ্ডিতগণ তাঁদের রচিত পুঁথি পত্তর নিয়ে তিব্বত ও নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আমরা যদি বলি, ঐসব পুঁথিপত্তরের ভিতর চর্যাপদখানি কোনরকমে পাচার হয়ে গেছল তাহলে তা কি খুব অযৌক্তিক হবে? আর ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতকে আসামের অধিবাসী যারা ছিল তার প্রায় সকলেই অভারতীয় মঙ্গোল ও ভোটচীনা গোষ্ঠীর লোক। অভারতীয়ের লেখা পুঁথি কি করে যে গোঁড়া ভারতীয় হিন্দুরাজার সংগ্রহশালায় স্থান পাবে তাও ত বোঝা যায় না। সুতরাং চর্যাপদগুলি যে অসমীয়া ভাষায় লিখিত নয় তা জোর দিয়ে বলা যায়।

কবে থেকে অসমীয়া ভাষা বাংলা হতে বিশ্লিষ্ট হতে শুরু করেছিল তার সঠিক কোন সময় নির্দেশ সম্ভব নয়। তবে ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতকে আসামে যে ভাষার চল ছিল তা যে বর্তমান অসমীয়ার ধার কাছ দিয়েও যায় না তা খুব বোঝা যায়। অনেকের মনে থাকতে পারে যে, আসামের বিখ্যাত কবি শঙ্করদেব পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি এই সময়ে ব্রজবুলি ভাষায় অনেকগুলি বৈষ্ণব পদ লেখেন। বাঙলায়ও ঠিক এই সময়ে ব্রজবুলিতে বৈষ্ণব পদরচনার হিড়িক পড়ে যায়। সুতরাং একথা বেশ হলপ করেই বলা যায় যে, শঙ্করদেব বাঙালী পদকর্তাগণের অনুকরণেই ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেন। কিন্তু আসাম ও বাঙলায় ঐ সময়ে যদি দুইটি পৃথক ভাষার চল থাকে তাহলে তিনি এই বৈষ্ণব পদ রচনার প্রেরণা পেলেন কিরূপে? সরাসরি মিথিলা হতে কি? তা কখনোই সম্ভব নয়। আসলে সেকালে আসাম এবং বাঙলায় একই ধরনের লৌকিক কথ্যভাষার রেওয়াজ ছিল। এই কথ্যভাষার যোগসূত্রে বৈষ্ণব ভাবধারাটি বাঙলা হতে আসামে চলে যায়। আসামে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি ভাষা প্রচলিত থাকলে এমনটি হত না।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, আসাম হতে বিহার পর্যন্ত বিস্তীর্ণ একটি ভূভাগ জুড়ে যে ভাষাটি বর্তমানে প্রচলিত আছে তাকে সকলেই বাংলা বলে স্বীকার করেন। কিন্তু এই বাংলার মৌখিক কিম্বা লৌকিক রূপটি সর্বত্র একরকম নয়। চট্টগ্রাম অঞ্চলে যে ভাষা তা রাঢ় অঞ্চলের ভাষার সহিত কোনক্রমেই মিলে না, আবার ময়মনসিংহ এলাকার ভাষা না চট্টগ্রাম না রাঢ় কোন স্থানের ভাষার সহিত বন্ধুত্ব করতে পারেনি। তা সত্ত্বেও চট্টগ্রাম ময়মনসিংহ কিংবা রাঢ় অঞ্চলের লৌকিক ভাষা খাঁটি বাংলা। এই মাপকাঠিতে যদি অসমীয়াকে বাংলার একটি লৌকিক রূপ বলি, তাহলে কি খুবই অযৌক্তিক হবে?

সুধাংশু তুঙ্গ, মেদিনীপুর

অঞ্জলী প্রকাশনীর নূতন বই প্রকাশিত হইল

সুদূরের পিয়াসী

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত)

কল্লোল যুগে যিনি শুধু সিন্ধুপারের কথা লিখেছেন আর আমাদের কালে যাঁরা ভারতের বাইরে ও ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক পটভূমিকায় বিচিত্র নায়ক নায়িকার সঙ্গে পাঠক সাধারণকে পরিচিত হবার সুযোগ দিয়েছেন এ গ্রন্থ হল তাঁদের কয়েকজনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলন।

।। যাঁরা লিখেছেন ।।

সৈয়দ মুজতবা আলী, অন্নদাশংকর রায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, সুবোধ ঘোষ, বিমল মিত্র, নরেন্দ্র মিত্র, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শেখর সেন, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল কর ও রমাপদ চৌধুরী। —পাঁচ টাকা

পরিবেশক:—

নব গ্রন্থ কুটীর—৫৪/৫এ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

(সি ৮৩৪৬)

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন!
যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দুর করতে পারে একমাত্র

বাকলা

বহু গাছড়া দ্বারা বিশুদ্ধ মতে প্রস্তুত

ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন

ভারত গভঃ রেজিঃ নং ১৬৮৩৪৪

অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা,
মুখে টক ভাব, ঢেকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দাগ্নি, বুকজ্বালা, আহারে অরুচি, স্বল্পনিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যাঁরা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও বাকলা সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিফলে মূল্য ফেরৎ।
৩২ তোলার প্রতি কৌটা ৩৲ টাকা, একত্রে ৩ কৌটা — ৮৷৷৹ আনা। ডাঃ, মাঃ ও পাইকারী দর পৃথক।

বাকলা ঔষধালয়। হেড অফিস-বরিশাল (পূর্ব পাকিস্তান) ব্রাঞ্চ-১৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৭

গানের আসর

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের কাগজে শার্ঙ্গদেব-এর "গানের আসর" নামক রচনায় বীণা বাদ্য যন্ত্রের আলোচনা খুব আগ্রহ সহকারে অধ্যয়ন করিলাম। বীণা যন্ত্রটির চল দক্ষিণ ভারতে খুব অধিক, প্রায় প্রতি ব্রাহ্মণ ঘরের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। শার্ঙ্গদেব রচনার শেষ দিকে সকল বীণার নামের একটি তালিকা দিয়েছেন। যদ্যপি সর্বশেষে "ইত্যাদি" দিয়া কার্য শেষ করিয়াছেন তবু একটি অত্যন্ত সাধারণ বীণার নাম বাদ গিয়াছে। তাহা "নারদ-বীণা"। বঙ্গদেশের নারদের ধারণা জপের মালা হস্তে রক্তকেশী বৃদ্ধ নারদ যিনি কেবল থাকিয়া থাকিয়া হরিনাম করেন। দক্ষিণের ধারণা অন্য রূপ। যুবক নারদ, চূড়াকেশী, মাথায় বালা জড়ানো, বালকও বলিতে পারেন। কিন্তু বৃদ্ধ? কদাপি নয়। নারদের হাতে মঞ্জিরা আর গলায় ঝোলানো বীণা। সে বীণা একটি শূন্য গর্ভ কাষ্ঠ দন্ড যার দুই ধারে বিলম্বিত দুইটি কদু-খোল। বলা প্রয়োজন আমি নিজে দক্ষিণবাসী হইয়াও নারদ বীণা শুধু থিয়েটার ও সিনেমাতেই দেখিয়াছি। উহা কাহাকেও বাজাইতে দেখি নাই।

সুব্রহ্মনিয়াম, মাদ্রাজ

প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

৫৪

কাকলির পিছু-পিছু গায়ত্রী প্রায় ছুটতে-ছুটতে উপরে উঠে এল।

'এ সবের মানে কী?' প্রায় চড়াও হল মেয়ের উপর।

কাকলি একেবারেই তর্কের ভঙ্গি নিল না। শরৎকালের সরল প্রভাতের মত হেসে ফেলল। বললে, 'মানে আমিই কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।'

কিন্তু না বুঝিয়ে ছাড়বে না গায়ত্রী। বললে, 'ওটাকে আবার কোত্থেকে জোটালি?'

'কোনটাকে?' কাকলি খিলখিল করে হেসে উঠল।

'ঐ কান্তটাকে।' রাগে তোতলাতে লাগল গায়ত্রী।

'যদি শুধু কান্ত বলো, মানেটা অন্য-রকম দাঁড়ায়।' পরম শান্তির স্বরে কথা বলছে কাকলি। 'তাহলে আর জোটানোর প্রশ্ন ওঠে না। কেননা যে কান্ত, যে স্বামী, সে আগে থেকেই জুটে রয়েছে। তবে যদি সুকান্তকে মীন করো—'

'হ্যাঁ, ঐ সুকান্ত, ঐ জুতোকান্তকেই মীন করছি।'

বুকের মধ্যে ঘা খেল কাকলি। মুখের হাসিটুকু উড়ে গেল এক ফুঁয়ে। কোনো কথা কইল না।

কিন্তু ছাড়বার পাত্রী নয় গায়ত্রী। বললে, 'ঐ সুকান্তকে জোটালি কোত্থেকে?'

'সেই তো আশ্চর্য।' কাকলি কথা বলল।

'ওর বাড়ি গিয়েছিলি?' কথা তো নয় যেন চাবুক মারছে গায়ত্রী।

'ও তো বাড়িতে থাকে না।'

'কোথায় থাকে?'

'হোটেলে থাকে।'

'হোটেলে? হোটেলে থাকে? সেই হোটেলে গিয়েছিলি তুই?'

'বা, হোটেলে যেতে বাধা কী! সর্ব-সাধারণের প্রতিষ্ঠান। কত লোকে যাচ্ছে।'

'হোটেলে যেতে ওর সঙ্গে দেখা হল, না, ওর সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই গিয়েছিলি হোটেলে?' ঝানু উকিলের মত জেরা করছে গায়ত্রী।

'হোটেলে যেতেই কি অমনি-অমনি কারু সঙ্গে দেখা হয়?' মৃদু মৃদু হাসল কাকলি। 'কারু সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই যায় হোটেলে।'

'ওর সঙ্গে তোর দেখা করতে যাবার ঠেকা কী?'

'না, ঠেকা কী। একটা শিষ্টাচার।'

'শিষ্টাচার?'

'মানে অফিশিয়াল এটিকেট। ও তো আমার সহকর্মী, আমরা এক অফিসে কাজ করি। তারই জন্যে—'

'তারই জন্যে কী?' গায়ত্রী আবার হুমকে উঠল।

'তারই জন্যেই ও সেদিন এসেছিল এ বাড়ি। সেই যে সেদিন, মনে নেই?' কাকলি মনে করিয়ে দিতে চাইল।

'কিন্তু, কেন, কেন আসে?'

'সেও বোধহয় শিষ্টাচার।' বেশেবাসে কাকলি এতক্ষণে অনেক আটপৌরে হয়ে গিয়েছে, এখন সাবান-তোয়ালের দিকে হাত বাড়াল।

'অফিসের শিষ্টাচার তো বাড়িতে কেন?'

'সে কথার উত্তর আমি দিই কী করে?' তাকের থেকে সোপকেসটা কুড়িয়ে নিল কাকলি। 'সে কথার উত্তর সুকান্ত দিতে পারে।'

'সুকান্ত দিতে পারে?' মেয়ের মুখে সুকান্ত-নামটাই যেন গায়ত্রীর অসহ্য লাগছে।

'হয়তো ও-ও পারবে না। কেউই দিতে পারে না সে-উত্তর।' ব্যস্ত হতে চাইল কাকলি।

'কিন্তু সেদিন তুই তো ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিলি বাড়ি থেকে।'

'সেটা যে সত্যি তাকে নয় সেটা তাকে বুঝিয়ে দিতে গিয়েছিলাম।' কাকলি বাথ-রুমের দিকে ধাওয়া করল।

'তার মানে বরেনের সঙ্গে তোর বিয়েটা হবে না?' গায়ত্রী বাধা দিতে চাইল।

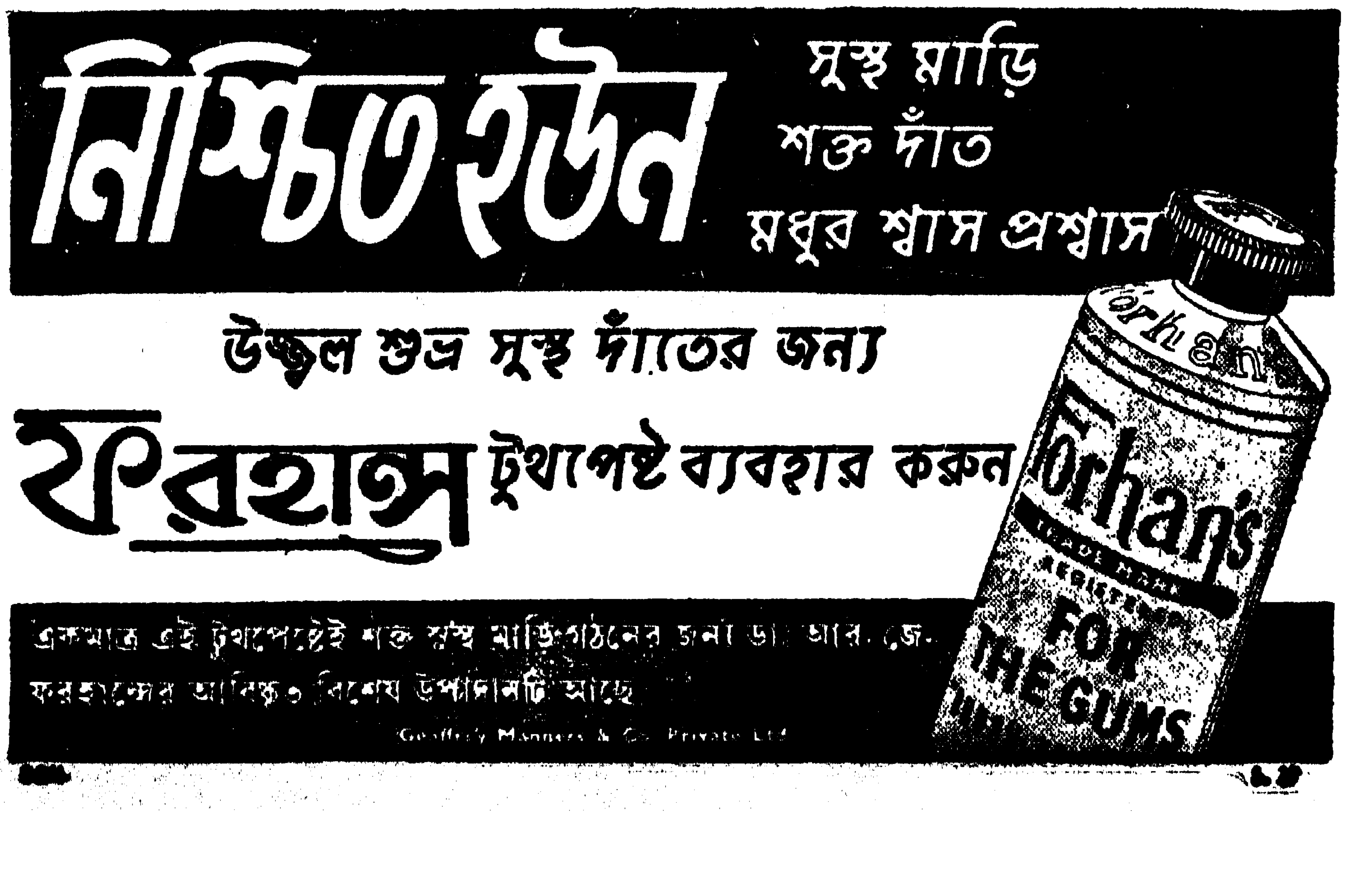

দি রিলিফ
২২৬, আপার সার্কুলার রোড
এক্সরে, কফ প্রভৃতি পরীক্ষা হয়
দরিদ্র রোগীদের জন্য—মাত্র ৮৲ টাকা
সময়ঃ—সকাল ৯টা থেকে ১২-৩০ ও
বিকাল ৫টা থেকে ৭টা

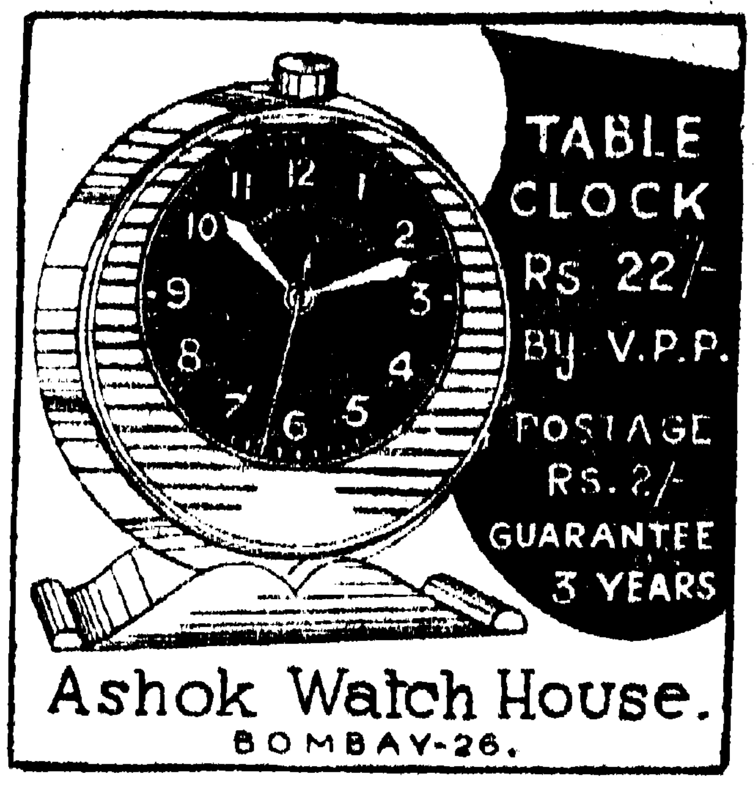

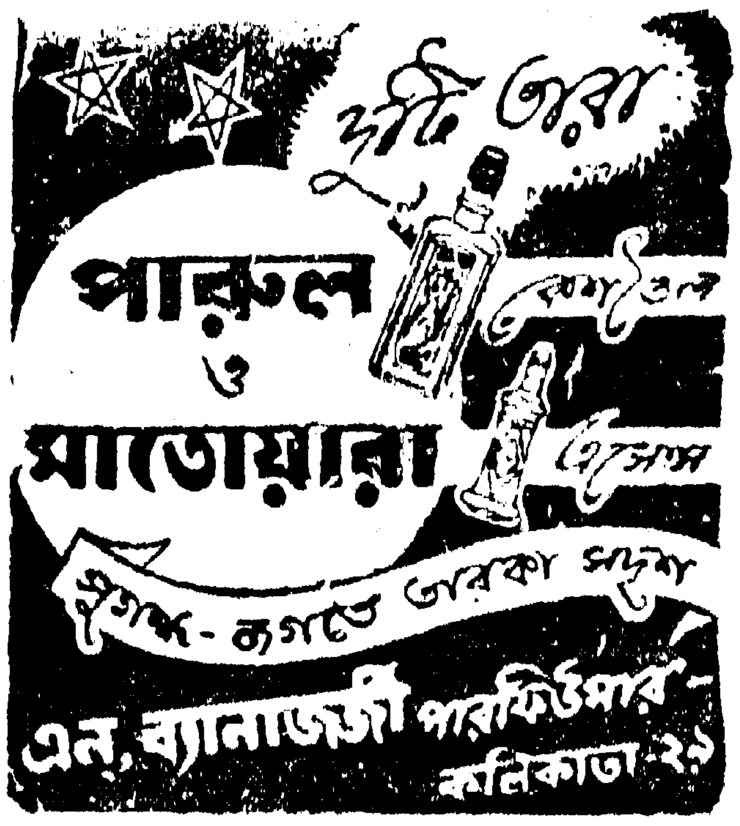

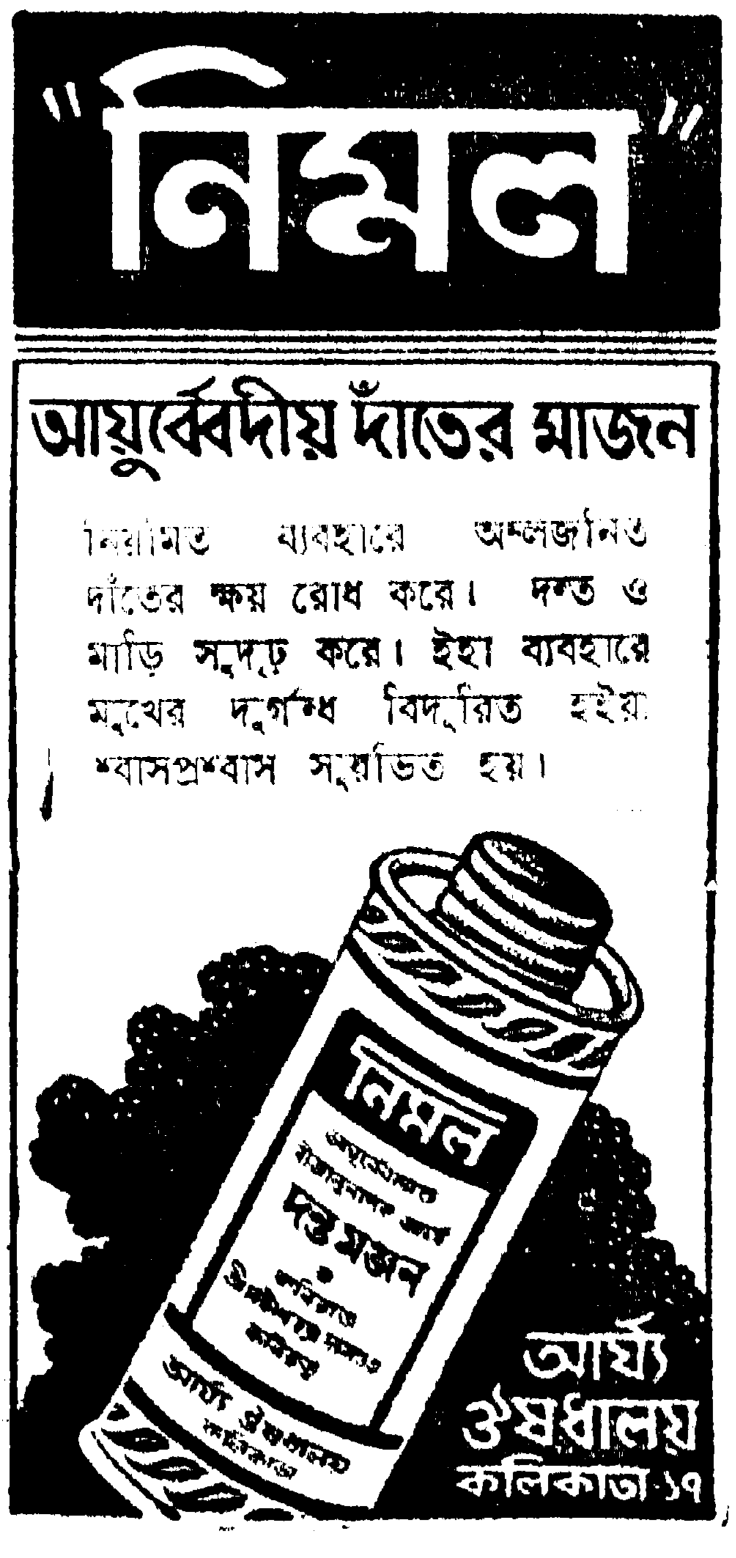

নিজের থেকেই থামল কাকলি। 'বা, তার মানে কি তাই দাঁড়ায়? এর সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক কী?'

'সম্পর্ক নেই তো বরেনকে অমনি একা-একা চলে যেতে দিলি কেন?'

'কেউ চলে যেতে চাইলে তাকে আমি ঠেকাই কী করে?'

'ঐ আগন্তুকটার সঙ্গে অহেতুক তোকে দেখলে না গিয়ে সে করে কী?'

'বা, আমি আমার অফিসের সহকর্মীর সঙ্গে সামান্য মিশতে পারব না?' পিছনে তাকাল কাকলি। 'আমার সঙ্গে আমার কোনো সহকর্মীকে একত্র দেখলেই উনি চটে যাবেন এ তো ভীষণ কথা। এ তো তা হলে সূত্রপাতেই বজ্রপাত।'

'তার মানে তুই ঐ সুকান্তর কাছেই ফিরে যাবি? যে তোর অত বড় শত্রু, যে তোকে অত বড় অপমান করল—'

'বা, একজনের ভিজিট ফিরিয়ে দেবার মানে সেই ভিজিটরের কাছে ফিরে যাওয়া?' নিজেই একটু ফিরল কাকলি। 'এত সোজা? এত সস্তা?'

তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করল কাকলি। উঃ, চারদিকে কী অগাধ, অবাধ নিশ্চিন্ততা! উন্মুক্ত শান্তি! সর্বাঙ্গে জল ঢালতে লাগল অঝোরে। জয়ের জল, মুক্তির জল, শক্তির জল। শুধু ক্লান্তি প্রক্ষালন করছে না, রুক্ষকে সুস্থ করছে, তপ্ত করছে, আকাঙ্ক্ষায় আনছে নির্মল তীক্ষ্ণতা। যে জল অতলের দিকে টানে, ঢেলে দিয়ে সঁপে দিয়ে আপনাকে ফিরিয়ে দিয়ে যায় সাথে, এ যেন সেই জল, সেই প্রবল প্রাণের প্রতিনিধি।

অগত্যা গায়ত্রী বনবিহারীর কাছে গেল।

'ব্যাপারটা যে ঘোরালো হয়ে উঠল—' মুখ চোখ গলা এক সঙ্গে ভার করে বললে গায়ত্রী।

এতটুকু চঞ্চল হলেন না বনবিহারী। যেমনি শুয়েছিলেন তেমনি শুয়ে রইলেন। শুধু শুধোলেন, 'কী হল?'

'বরেন চলে গেল।'

'কেন?'

'কী অন্যায়, ঘোরতর অন্যায়।' বিছানার পাশে বসল গায়ত্রী। 'কাকলি আবার সেই পশুটাকে জুটিয়ে এনেছে।'

'পশু? পশু আবার কে?'

'ঐ যে— কী না জানি নাম—সুকান্ত। সুকান্ত-পশু।'

'বলো কী? এনেছে না এসেছে?' একটা ঝড়ে-পড়া গাছ যেন তার আপন মহিমায়, বিস্তীর্ণ তার শাখা প্রশাখায় উঠে বসল। 'এমন গোলমেলে হয়ে যায় জিনিসটা—আনা না আসা ঠিক বোঝা যায় না। তুমিই ডেকে আনলে না আমিই এলাম নিজের থেকে—এদুটোকে আর আলাদা করা যায় না। কিন্তু সুকান্তকে তুমি পশু বলছ কোন হিসেবে? ও তো সুকান্ত-পশু নয়, ও তো সুকান্ত বসু।'

'ওটাকে সেদিন তাড়িয়ে দিয়েছিল কাকলি—' ঘৃণায় বললে গায়ত্রী।

'তাড়িয়ে দিয়েছিল তো আবার ধরল কেন? তার মানেই তো যায় না তাড়িয়ে দেওয়া। জীবনে একটা কিছু আছে যার জড় ফেলা যায় না উপড়ে।'

'ছিছি কী লজ্জা, কী ঘেন্না—'

'কে কাকে তাড়ায়! সুকান্ত তাড়াল কাকলিকে, কাকলি তাড়াল সুকান্তকে। কিন্তু কেউ ওরা ভালোবাসাকে তাড়াতে পারল? শত কাটা ছেঁড়া করেও পারল মূল তুলে ফেলতে? পারল না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে পারল না।'

'আর মানে তুমি চাও কাকলি আবার ঐ অপদার্থের সঙ্গে গিয়ে মিলবে?'

হাসলেন বনবিহারী। 'আমার চাওয়ায় কী হবে? কথা হচ্ছে কাকলি চায় কিনা। যদি কাকলি চায় তাহলে আর অপদার্থতা কোথায়? তাহলে কাকলির চাওয়ার ছোঁয়ায় লোহাও সোনা, চিরন্তন সোনা।'

'এ অসম্ভব।' দৃঢ় হল গায়ত্রী। 'যে কোর্টে গিয়ে স্ত্রীর নামে জঘন্য বদনাম দিয়ে বিয়ে বিচ্ছেদ করে নেয় তাকে সেই স্ত্রী, যদি তার বিন্দুমাত্র আত্মসম্মান থাকে, কখনোই ফের মালা দেয় না, না, ককখনো না—'

'কিন্তু যদি ভালোবাসা না মরে, যদি ভালোবাসা থেকে যায়, তাহলে কিসের বদনাম, কিসের বিচ্ছেদ? অপমানের জ্বালা খেসারতে পূরণ হয় না, পূরণ হয় ভালোবাসায়। রক্ত কি জলে যায়? যায় না। যন্ত্রণা লেগে থাকে। যন্ত্রণাও ভালোবাসাই ধুয়ে নেয়। আমিও একদিন বিমুখ ছিলুম ওদের উপর, যখন ওদের বিয়ে হয়নি—' বনবিহারী আবার বিছানায় ঢলে পড়লেন, 'কিন্তু শত বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও ওদের ভালোবাসা যখন বিয়েতে বিকশিত হল তখন মনে মনে সংবর্ধনা করেছি ওদের,—আর প্রার্থনা করেছি, যত দুঃখ পাক, ওদের সংযোগ যেন স্থায়ী হয়, ওদের সংসার যেন সুখের হয়—'

'কই আর হল!' বললে গায়ত্রী, 'বিচ্ছেদ করাতে আদালত বসাল।'

'হ্যাঁ, কিন্তু শেষ পরিচ্ছেদ এখনো বাকি। বোঝো সেই শক্তি যে আইন মানে না, দেশ-কাল মানে না, রাজসম্পদকে তুচ্ছ করে। সবচেয়ে বড় কথা, বিচ্ছিন্নকে যুক্ত করে দেয়।'

'তুমি যাই বলো,' উঠে পড়ল গায়ত্রী, 'যে বিয়ে একবার ভাঙা হয়েছে তা আর জোড়া যাবে না।'

'ভাঙাকে কে জুড়তে চাচ্ছে? এ পুরোনোকে নতুন করে চেনা, নতুন করে পাওয়া। যেমন শেষ অঙ্কে দুষ্মন্তর শকুন্তলাকে। নতুন চোখে নতুন মধুচন্দ্রিকা।'

'ও একই কথা। এ আমি ঘটতে দেবো না। কিছুতেই না।'

'ঘটতে দেবে না—কী করবে?'

'সুকান্তকে ঠেকাব। আর যে করে পারি কাকলির নিজের হাতে সইকরা বিয়ের নোটিসের মান রাখবো।'

'তার মানে, তুমি বলতে চাও রক্তের দস্তখতের চেয়ে কালির দস্তখতের দাম বেশি হবে?'

'নিশ্চয় বেশি হবে। ওদের রক্ত কতক্ষণ? দুদিন পরে আবার যে কান্না সেই কান্না। সেই ঝগড়া, সেই মারামারি সেই সন্দেহপনা।'

'আর বরেনের বেলায় তার আশঙ্কা নেই?'

'না, নেই। বরেন ঢের বেশি সম্ভ্রান্ত।'

'আর তুমি—তুমি সম্যক ভ্রান্ত।'

'দেখা যাক কে হারে কে জেতে—' রাগ ফলিয়ে চলে গেল গায়ত্রী।

'সবটাই গায়ের জোর?' নিজের মনে বলে উঠলেন বনবিহারী। 'গায়ের জোরের উপরে প্রাণের জোর কি জয়ী হবে না?'

কাকলিকে ডেকে পাঠালেন। একটু যদি গোপন পরামর্শ করা যেত তার সঙ্গে।

খবর এল, ঘর অন্ধকার করে দিয়ে ঘুমুচ্ছে কাকলি।

আহা, ঘুমুক। বিশ্রাম করুক। কত ক্লান্ত না জানি, মগ্ন হোক, স্নিগ্ধ হোক।

ঘুমুচ্ছে তো কত, চোখ বুজে ইচ্ছে করে একটা আগুনের ছবি আঁকছে কাকলি। বা, স্বপ্ন দেখছে। অন্ধকারে কোথায় যেন আগুন লেগেছে, লাল হয়ে উঠেছে আকাশ। আগুন নয়, হয়তো বা সমুদ্রে স্নান করে সূর্য উঠছে। কিংবা কে জানে রুক্ষ প্রান্তরে হঠাৎ কোথাও বা গুচ্ছ-গুচ্ছ পলাশের সমারোহ। টকটকে লাল। আরো অনেকক্ষণ একাগ্র চোখে মনোযোগ করে দেখতে লাগল কাকলি। না, আগুন নয়, সূর্য নয়, পুষ্পস্তবক নয়, কী লজ্জা, সুকান্তর সামারকুল গেঞ্জিটা তার প্রথম সিঁথির সিঁদুরে মাখামাখি হয়ে গেছে।

আর, কী তোমার কীর্তি, জনে জনে সবাইকে বলে দেব, এই অভিযোগের সঙ্গে, আহা, কী তুমি সুন্দর, আনন্দময়, এ কথা কি বলা যায় আর কাউকে, এই আশীর্বাদ ভরা দুটি মদির-লাজুক চোখ সর্বক্ষণ অন্ধকারে জ্বলতে দেখছে সুকান্ত।

ঘুম ভাঙবার পর সুকান্তর মনে হল এমন রাতও ঘুমে ফুরিয়ে দিতে হয়!

আর কাকলির মনে হল, ছিছি, কত বেলা হয়ে গিয়েছে, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে আবার অফিসে বেরুতে হবে। হ্যাঁ, বেরুতে হবে অফিসে। অফিসে না বেরুলে তার সঙ্গে আবার একটু দেখা হবার সম্ভাবনা কোথায়, ওজুহাত কোথায়?

সকাল হতে বনবিহারী কতক্ষণ ধরে চেষ্টা করছেন, কিছুতেই কাছে পাচ্ছেন না। কাকলিকে। সব সময়ে গায়ত্রী তাকে ঘিরে

জোলাপের দাসে পরিণত হবেন না

কড়া জোলাপ আপনার অন্ত্রের পেশীগুলিকে দুর্বল করে, ফলে শীঘ্রই আরও কড়া জোলাপ না হ'লে আপনার কোষ্ঠ আর পরিষ্কার হবে না। জোলাপের দাস হ'য়ে পড়বেন না। অকৃত্রিম ফিলিপ্স মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া ব্যবহার করুন।

ফিলিপ্স এত মৃদুভাবে কাজ করে যে এমন কি শিশুদের জন্যেও ইহা সুপারিশ করা হয়···অথচ এত ফলপ্রদ যে প্রথমবার ব্যবহারের পরই কোষ্ঠবদ্ধতার হাত থেকে পূর্ণ মুক্তি পাবেন।

আবার ভারতবর্ষে পাওয়া যাচ্ছে

নূতন নকল নিরোধক শীলকরা বোতলে। এই শীলকরা বোতলই ফিলিপ্সের বিখ্যাত বিশুদ্ধতা এবং উচ্চমানের একমাত্র নিশ্চয়তা। ২, ৪ ও ১২ আউন্স বোতলে পাওয়া যায়।

এই কারণেই···

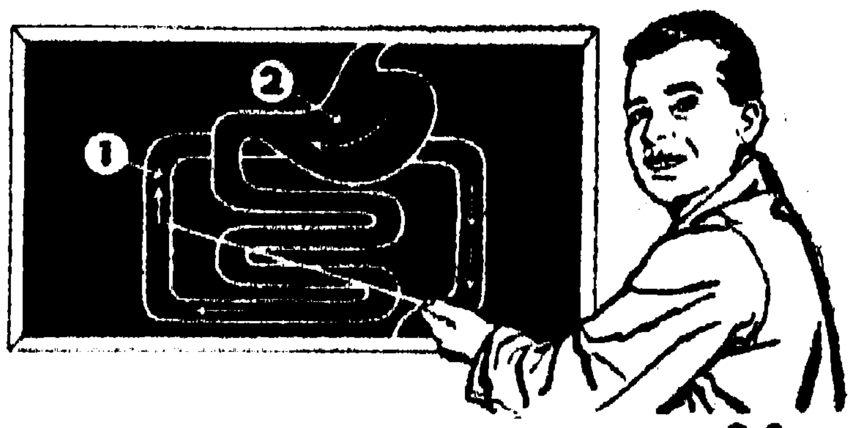

১। অন্যান্য কড়া জোলাপের মত কাজ না ক'রে, ফিলিপ্স মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া শুকনো জমাটবাঁধা কোষ্ঠকে সিক্ত করে, তারপর মৃদুভাবে পেশীগুলিকে সক্রিয় ক'রে আপনার দেহ থেকে দূষিত মল নিরাপদে ও নিশ্চিন্তভাবে বা'র করে দেয়—অথচ শরীরে কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়না, শরীরে খিঁচুনি ধরে না বা দুর্বলতা বোধ হয় না।

২। শুধু একটিমাত্র গুণবিশিষ্ট জোলাপের মত না হ'য়ে ফিলিপ্স মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আপনার পাকস্থলীকে শান্ত ক'রে আপনার আরামের পূর্ণতা এনে দেয়। আপনার পরিপাক যন্ত্রকে সবল করে··· পেট ভার ভার ভাব, বুক জ্বালা, পেট ফাঁপা ও অম্লজনিত বদহজম দূর করে।

ফিলিপ্স

মানেই খাঁটি মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া

যেখানেই হোক, যখনই হোক, অম্লজনিত অজীর্ণরোগে সঙ্গে সঙ্গে উপশম পেতে হ'লে সর্বদাই মিন্টের সুগন্ধযুক্ত সুস্বাদু ফিলিপস মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া ট্যাবলেট গ্রহণ করুন। ৪ ট্যাবলেটের হাল্কা প্যাকেটে এবং ৭৫ ও ১৫০ ট্যাবলেটের বোতলে পাওয়া যায়।

একমাত্র পরিবেশক

2-AF/1PE

দে'জ মেডিকেল ষ্টোরস্ প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা • বম্বে • দিল্লী • মাদ্রাজ • পাটনা • গৌহাটি • কটক

রয়েছে, রয়েছে আড়াল করে। আর যখন গায়ত্রী কাছে নেই তখন কাকলিকেও ধারে পারে খ‍ুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

আর এমনি কাউকে দিয়ে ডাকাতে গেলে এমন হৈ-চৈ তুলছে যে গায়ত্রী নিজেই চলে আসছে তামিল করতে। আর মেয়েরও এমন একটা ভাব নেই যে বাবার কাছে গিয়ে নিরি-বিলি একটু বসি, বন্ধুর মত নিভৃতে দুটো কথা কই। কেবল অফিস আর অফিস, কেবল ছুটিহীন ছোটাছুটি।

না, একটা জরুরি কথা তাকে বলতে হয় গোপনে। আজই, এখুনি। দেরি হয়ে গেলে বিপদ হতে পারে।

ছটফট করতে লাগলেন বনবিহারী।

খেয়ে দেয়ে উপরে উঠছে কাকলি, অফিসের সাজ ধরবে এবার, বারান্দাতে এসেছে, বনবিহারীর সংগে তার চোখোচোখি হল। বনবিহারী ছোট্ট হাত-ছানি দিয়ে তাকে ডাকলেন।

দ্রুত চলে এল কাকলি।

'তোর মা কোথায়?'

কামিনীকদম—ভি. অভদূতের 'লাখোঁমে কি কাহানী' ছবিতে

সোনার মেয়ের হরিণ চোখে রূপের নাচন দেখে, শিউলী শাখে কোকিল ডাকে, মনমাতানো সুরে—নাচিয়ে হৃদয় বনের ময়ূর নাচছে অনেক দূরে! লাস্যময়ী চিত্রতারকা কামিনী কদমের চোখে মুখে আজ ময়ূর-নাচের চঞ্চলতা, রূপের মহিমায় উদ্ভাসিত আজ এ নারী হৃদয়। 'কোনই বা হবেনা, লাক্সের কোমল পরশ যে আমি প্রতিদিনই পেয়েছি'—কামিনীকদম জানান তাঁর রূপ, লাবণ্যের গোপন রহস্যটি।

LUX
TOILET SOAP

আপনিও ব্যবহার করুন
চিত্রতারকার বিশুদ্ধ, শুভ্র, সৌন্দর্য্য সাবান

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

LTS. 71-X52 B

নিচে।'

'শোন, কাছে আয়। তোকে আমার ছোট্ট একটি উপদেশ আছে।' বনবিহারী কাকলিকে আরো একটু কাছে টেনে নিলেন। 'তুই তো আবার উপদেশ শুনিস না।'

'বা, সে কী কথা? কে বললে শুনি না?'

'হ্যাঁ, উপদেশ না বলে বলতে পারি পরামর্শ। এক বয়োবৃদ্ধ অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ।'

'বা বলো না—'

'শোন, অফিসে একা-একা যাবি না, কাউকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবি। আর ফেরবার সময়—'

'অফিসে তো আমি বাসে-ট্রামে যাই। বাসে-ট্রামে তো গাদা-গাদা লোক।'

'কিন্তু স্টপ পর্যন্ত যেতে কিংবা স্টপ থেকে বাড়ি পর্যন্ত আসতে বেশ খানিকটা হাঁটা পথ। একা-একা হাঁটবিনে রাস্তায়।'

'কেন, কী হবে?'

'কিছু হবে না। তবু, আমার অনুরোধ, একটা লোক সঙ্গে রাখবি। বললে অফিস থেকে পাবি না একজন আর্দালি?'

'কেন, লোক দিয়ে কী হবে? আমাকে কেউ কিডন্যাপ করে নিয়ে যাবে?' কাকলি রুখে দাঁড়াল। 'আমি কি ছেলেমানুষ?'

'ঐ নাও। মেয়ের আবার তক্ষুনি লেগে গেল। আমি বলছি, সাবধান থাকা ভালো।' কটাক্ষগর্ভ চোখে তাকালেন বনবিহারী। 'সাবধানের মার নেই।'

'না, আমি খুব সাবধান আছি।' কথাটাকে উড়িয়ে দিয়ে চলে গেল কাকলি।

অফিসের সাজগোজ সেরে নিচে নামছে কাকলি একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। একা ট্যাক্সি চড়াও হয়তো ঠিক হবে না। কে জানে কার তাঁবেদার হয়তো ট্যাক্সিওয়ালা। কিন্তু ট্যাক্সিটা কি খালি আছে? অফিস টাইমে খালি ট্যাক্সি পাওয়া হাতে স্বর্গ পাওয়ার চেয়েও বড় সান্ত্বনা। কিন্তু না, লোক আছে। কে যেন নামছে ট্যাক্সি থেকে।

'এ কি, আপনি?' বিস্ময়ে চোখ বিস্ফারিত করে কাকলি বললে।

অফিসের পোশাকে, আনন্দে, ঝলমল করতে লাগল সুকান্ত। বললে, 'উঃ, কী ভাগ্যি, ধরতে পেরেছি আপনাকে। আমি ভাবছিলাম বেরিয়ে গেছেন বুঝি। না, পেরেছি ধরতে। চলুন, যাবেন না অফিস?'

'বা, যাব বৈ কি। যাব বলেই তো তৈরি হয়ে বেরুচ্ছিলাম—'

'হ্যাঁ, আমি যখন যাচ্ছি, ভাবলাম আপনাকেও নিয়ে যাই। একই যখন পথ, আর একই যখন গন্তব্য। ভাবলাম আপনার আর একা-একা যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না।'

'দাঁড়ান, বলে আসি।' কী করবে কী বলবে যেন দিশে পাচ্ছে না কাকলি।

'কাকে আবার বলবেন?' সুকান্ত থ হয়ে রইল।

'বাবাকে বলে আসি। দাঁড়ান। প্লিজ। এক মিনিট।' ঊর্ধ্বশ্বাসে উপরে ছুট দিল কাকলি।

বনবিহারীর কাছে গিয়ে বললে হাঁপাতে-হাঁপাতে, 'উনি নিজেই একেবারে ট্যাক্সি নিয়ে এসেছেন—'

'উনি—কে উনি?' ব্যাকুল চোখ মেলে তাকালেন বনবিহারী।

অফিসের আর্দালি—কাকলির ইচ্ছে হল তাই বলে আনন্দে আবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। কিন্তু না, নামটা ঘোষণা করতেই বোধ হয় বেশি সুখ পাবে এই মুহূর্তে। তাই দ্রুত, দীপ্ত স্বরে বললে, 'সুকান্ত—সুকান্তবাবু। উনি আর আমি এক অফিসেই কাজ করি কিনা—'

'বা, সুকান্ত এসেছে? নিজে থেকে নিয়ে যেতে এসেছে? তাহলে আর ভাবনা কী! তাহলে আর ভয় কিসের?' লাঠিতে ভর দিয়ে বনবিহারী উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন। 'আমি একটু দেখি দৃশ্যটা। যদিও মনে মনে আমার জানা, তবু একবার দেখি চোখ মেলে। পৃথিবীর কত দৃশ্য দেখিনি, দেখব না, শুধু এটা দেখি—'

কখন আবার ত্বরিত পায়ে নির্ঝরের মত নেমে গিয়েছে কাকলি, আর গোলমাল শুনে যদিও গায়ত্রী বেরিয়ে এসেছে, তাঁকে ব্যাপারটা আনুপূর্বিক বুঝতে না দিয়েই, ট্যাক্সিতে সুকান্তর পাশে উঠে বসেছে। দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে স্টার্ট পাওয়া গাড়ির ভরপুর আনন্দে বলে উঠেছে, 'চলুন।'

গাড়িটা কতদূর যেতেই সুকান্ত বললে, 'আজ অফিস না গেলে কেমন হয়?'

'খুব ভালো হয়। এই গাড়িতে করে একটানা—'দিব্যি সায় দিল কাকলি।

'পাগল!' কাকলির চোখের উপর চোখ ফেলল সুকান্ত। 'অফিস কামাই করলে কি চলে?'

'সর্বনাশ।' হেসে উঠে সায় দিল কাকলি। 'সবার উপরে অফিস সত্য তাহার উপরে নাই।'

(ক্রমশঃ)

টিক্-20

টাটা—ফাইসনের তৈরী
ছারপোকা ধ্বংস করে
Geigy
গেইগী
ডায়াজিনন

ডাঃ কার্তিক বসুর
টাইকোসোডা | নানালা
অম্ল, অজীর্ণ ও ডিস্‌পেপসিয়ায় | ব্যথা ও বেদনায়
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ-কলিকাতা ৯

আমাদের নিকট নগদ মূল্যে অথবা সহজ কিস্তিতে অনেক রকমের রেডিও সেট্ পাওয়া যায়। এইচ, এম, ভি ও অন্যান্য রেডিওগ্রাম, লং-প্লেইং রেকর্ড টেপ্ রেকর্ডার, "নিপ্পন" অল-ওয়েভ্ ট্র্যান্সিস্টার রেডিও, এ্যাম্পলিফায়ার, মাইক, ইউনিট, হর্ণ, মাইক কেবল, রেডিও ও ইলেক্‌ট্রিকের বিভিন্ন প্রকারের সাজ-সরঞ্জামাদি বিক্রয়ের জন্য আমরা সর্বদা প্রচুর পরিমাণে মজুত করিয়া থাকি।

রেডিও এন্ড ফটো ষ্টোর্স
৬৫, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩। ফোনঃ ২৪-৪৭৯৩

for
an
early
morning
clean
'refreshing'
feeling
BINACA top
BINACA
top
the newest toothpaste by CIBA

পূবে ঝড় : ১৩৬৭

দিনেশ দাস

আকাশের নীলমুখ কালো ক'রে আচমকা পূবের ঝড়।
গাছপালা কাঁপে থরথর :
পাখিদের অন্তিম চীৎকারে
কেঁপে ওঠে নির্মেঘ উপত্যকা। ব্রহ্মপুত্রে জেগেছে প্রলয়।
খণ্ড খণ্ড হয়ে যায় অখণ্ড সময়।

বাংলা, তোমার চোখে কত জল আছে বলো বলো!
এখানে জীবন শুধু করুণ জলের ধারা পড়ে নীল বঙ্গোপসাগরে,
এখানে জীবন ছেঁড়া পালকের মত শুধু বাতাসেতে ওড়ে :
প্রেতেরা কবর ছেড়ে হানা দেয় গৃহস্থের ঘরে :
আমাদের প্রাণ যেন প্রেত হ'য়ে ঘোরে ফেরে বিষণ্ণ ছায়ায়
হৃদয়ের শূন্যমঞ্চে সংবাদপত্রেরা শুধু পালাগান গায়।

মানুষেরও থাবা আছে, নির্মম নখরে
সে-থাবা রক্তের ডেলা নিয়ে খেলা করে।
অবাক্ বিস্ময়ে ভয়ে আমার মনের তালা বন্ধ হ'লো—
একটি তো চাবিকাঠি অন্ধকার কোথায় লুকোলো!
আতঙ্ক অবাধে নাচে মাংসাশী লোমশ বুনো ভাল্লুকের মত—
সময়ের দাঁড় ফেলে কে তাকে কেমন ক'রে বাঁধবে বলতো?

কোজাগরী

গোবিন্দ চক্রবর্তী

রাজর্ষি প্রতীকমাত্র

প্রচ্ছদে উৎকীর্ণ যার মিথিলানগরী
ভোগৈশ্বর্যে শোভা অতুলন;
শ্রদ্ধায় স্মরণ যদি করি
এখনো সে বর্ণময় বর্ণাঢ্য চিত্রণ—
আরেক নোতুন দীপ্তি
পায় বুঝি, পেতে পারে এই কোজাগরী।

রাজর্ষি প্রতীক মাত্র।

বসুন্ধরা চিরদিনই শ্রমস্বয়ংবরা।
অধীশ্বর, রাজ্যেশ্বরও হ'য়ে
জনক নামের এক সুন্দর শপথ
বুঝি সেই তেজোদৃপ্ত, পূত মেহনত;
যার শুভ্র ভবিষ্যৎ—সীতা
চারুলেখা লক্ষ্মী অনিন্দিতা।

সেই লক্ষ্মী প্রাণমূল্যে
হ'য়েছিল যেহেতু কষণ-

তাই দশজিহ্বা মেলে লোভ দশানন,
শূন্যগর্ভ দম্ভের হুংকার!
এবং যা মানুষের দৃঢ় অঙ্গীকার
দানবলুপ্তির সংগ্রাম—
ধনুকে টঙ্কার দেন
তাই না শ্রীরাম?

সে প্রতীক নয় বুঝি আর।
পাহাড়টলানো অন্য তরঙ্গবিস্তার :
যখন ধরণী চায় বহু স্বেদশ্রম,
কী-যে এই বিমূঢ় বিভ্রম
ছায়াগ্রাস কি মহানগরী,
শুধু এক অপরূপা জ্যোৎস্নাবিভাবরী—
তাই হ'ল অবশেষে মুগ্ধা কোজাগরী।

শিলীভূত রাম নিশ্চেতন :

ছিন্নমুণ্ডে প্রাণ পায় আবার রাবণ :

অন্ধকার গহন-ক্রন্দন :

লক্ষ্মীর সুদূর নির্বাসন।

বিজ্ঞান বৈচিত্র

চক্রদত্ত

রাস্তা ঘাটে আমরা টেলিফোন বুথ দেখতে অভ্যস্থ। তবে এই সব বুথ সাধারণত কাঠের তৈরী। সম্প্রতি এক নতুন ধরনের বুথ চালু হচ্ছে। এই বুথ

নতুন ধরনের টেলিফোন বুথ

প্লাসটিকের তৈরী। আর এটা খুব সহজেই যেখানে দরকার সেখানে বসান যায়।

●

বর্তমান যুগকে প্ল্যাসটিকের যুগ বলা যায়। আমাদের জীবনযাত্রার সব কিছুর মধ্যেই প্ল্যাসটিক একটা স্থান করে নিয়েছে। আমরা অনেকেই বোধ হয় প্ল্যাসটিকের প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যবহার যে কত ধরনের হয় তা জানি না। এখানে এর দুটো উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। একটি হচ্ছে উচ্চ-তাপ সহ্য করবার ক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে পাতলা প্ল্যাসটিকের চাদর ৬০০০ ডিগ্রী ফ্রানহাইট তাপ সহ্য করতে পারে। এই ধরনের প্লাসটিকের নাম দেওয়া হয়েছে ডাইনো থারমো ডি ৬৫'। এর মধ্যে ফসপেট এবং বোরনের উপদান মিশিয়ে এই জাতের প্লাসটিক তৈরী করা হয়েছে। এই নতুন ধরনের প্লাসটিক 'মিজিল' এবং আকাশে যে সব রকেট ছোঁড়া হচ্ছে তাদের কাজে লাগানো হচ্ছে। দেখা গেছে যে এগুলো ছাড়বার সময় যে পরিমাণে তাপের সঞ্চয় হয় তা অন্য কোন প্রকার পদার্থের সহ্য করবার মত ক্ষমতা থাকে না—শুধু ডাইনো থারমো ডি ৬৫ সহ্য করতে পারে। আর একটি পরীক্ষায় দেখা গেছে যে প্ল্যাসটিক কংক্রীটের তৈরী বড় বড় রাস্তা সারাবার জন্য খুব কার্যকরী।

সম্প্রতি সাধারণ প্ল্যাসটিকের সংগে রেজিন মিশিয়ে যে বস্তু তৈরী হচ্ছে তা দিয়ে কংক্রীটের গাথুনিকে আরও শক্ত করা যাবে। কংক্রীটের ফাঁকে ফাঁকে এই "ইপক্সি" রেসিন ভরে দিলে গাঁথুনি বেশ শক্ত হবে।

*

"জন হপকিনস"ইউনিভার্সিটির ডাঃ জন স্ট্রং ১৯৫৯ সালে বেলুনযোগে শূন্য পথে ভূপৃষ্ঠ থেকে পনের মাইল ঊর্ধ্বে উঠে আবহাওয়া তথ্য সংগ্রহ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, "ভেনাসে" জীবনের অস্তিত্ব আছে। এর আগে অন্যান্য যে সব বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাতে তারা সঠিকভাবে কিছুই বলতে পারেননি। ডাঃ জন স্ট্রং ভেনাসের চতুর্দিকস্থ জলীয় বাষ্পের ওপর ভিত্তি করেই তার তথ্য সংগ্রহ করেন এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তিনি বলেন যে, ভেনাসের চতুর্দিকে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, ঐ গ্রহে যথেষ্ট পরিমাণ জল আছে এবং আবহাওয়ায় প্রচুর পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড বর্তমান। তার মতে ভেনাসের আবহাওয়াস্থ জলীয় বাষ্পের পরিমাণ পৃথিবীর আবহাওয়াস্থ জলীয় বাষ্পের চেয়ে চার গুণ বেশী এবং আরও লক্ষ্য করে দেখেছেন, ভেনাসের আশপাশের আকাশের মেঘে পৃথিবীর চারপাশের আকাশের মেঘের চেয়ে জলীয় বাষ্প বেশী থাকে।

*

লিউকিমিয়া রোগটি যে ঠিক কী করে এবং কোথা থেকে হয় সে সম্বন্ধে ডাক্তাররা আজ অবধি সঠিক কিছু বলতে পারেন না। তবে সম্প্রতি "হেকটোন ইনস্টিটিউট ফর মেডিক্যাল রিসার্চ"এর ডাঃ স্টিভেন ঘোষণা করেন যে লিউকিমিয়া একরকম বীজাণু-ঘটিত রোগ। কয়েকজন কয়েদী তার পরীক্ষার জন্য নিজেদের দেহদান করায় তিনি তাদের ওপর পরীক্ষা করে এ সম্বন্ধে ভাল রকম তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছেন। এইরোগে যে রোগী মারা গেছেন তাদের মস্তিষ্ক থেকে "সিরাম" নিয়ে সুস্থ কয়েদীদের দেহে ইনজেকশন করার পরে তাদের দেহে "এন্টিবডি" সৃষ্টি হয়। তারপর তাদের দেহ থেকে 'সিরাম' নিয়ে ইঁদুরের দেহে ইনজেকশন করা হয়। সাধারণ ইঁদুর এই রোগে বেশী আক্রান্ত হয় বলে ইঁদুরের দেহেই ইনজেকশন করা হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দেখা গেল ইঁদুরদের দেহেও "এন্টিবডি" তৈরী হয়েছে। যদিও ডাঃ ষ্টিভেন লিউকিমিয়া রোগের ভাইরাস যে কীজাতের সে সম্বন্ধে কিছু সঠিক বলতে পারেননি। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে যে এ রোগের চিকিৎসার টীকা তৈরী করা সম্ভব হবে তা তিনি নিশ্চিত করেই বলতে পারেন।

*

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ সবচেয়ে বেশী বুদ্ধি বিবেচনার অধিকারী বলেই মনে করি। দেখা গেছে যে, পরপয়েস নামক যে জীব সমুদ্রে বাস করে তাদের মস্তিষ্ক মানুষের মস্তিষ্কের চেয়ে পরিমাণে বেশী। বৈজ্ঞানিকদের মতে মানুষ ও সিম্পাঞ্জির পরেই পরপয়েসই সবচেয়ে বেশী চালাক চতুর জীব। অনেক সময় দেখা গেছে যে, বুদ্ধিতে তারা শিম্পাঞ্জিকেও হার মানিয়েছে। একজন সাধারণ মানুষের মস্তিষ্কের পরিমাণ ১৩০০ গ্রাম অর্থাৎ তিন পাউন্ডের কিছু কম, সে তুলনায় একটি ছোট ধরনের পরপয়সের মস্তিষ্কের পরিমাণ ১৪০০ গ্রাম। পরপয়েসের স্বর-যন্ত্রটি খুব জটিল এবং মনে হয় যে, চেষ্টা করলে এদের কথা শেখান যায়। দেখা গেছে যে,. একটি পোষা পরপয়েস একটি মেয়ের হাসি শুনে তৎক্ষণাৎ তার হাসি নকল করে হাসতে আরম্ভ করে। প্রাণীতত্ত্ববিদরা বলেন যে, যদিও পরপয়েস সম্বন্ধে তারা খুব বেশী গবেষণা করে উঠতে পারেননি, কিন্তু তারা ভাল করেই জানেন যে, এদের মানুষকে অনুকরণ করার ক্ষমতা অথবা কোনও কিছু শেখার ক্ষমতা খুব বেশী এবং পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, এদের বুদ্ধিও খুব প্রখর। এছাড়া মাঝে মাঝে এদের আবেগ-প্রবণ হতেও দেখা যায়।

কে. হোড়ের
কনক
* পাউডার *

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

RARY
Cooch Behar

৪৭

দানীবাবু-অভিনীত "চন্দ্রগুপ্ত"কে কেন্দ্র ক'রে বাইরে এই যে এ-পক্ষে ও'পক্ষে তুমুল আলোচনা, তা' শুধু নাট্যকলার উৎকর্ষ-সাধনের জন্য নয়। বেশ বুঝতে পারা গেল, এর মধ্যে তিনটি দল হয়ে গেছে। একদল দাঁড়িয়েছেন দানীবাবুর পথে, আরেক দল রীতিমত বিরক্ত ও উত্যক্ত বোধ করছেন এই লক্ষ্য করে যে, অহেতুক এরকম ঈর্ষা-প্রণোদিত আক্রমণ কেন? আরেক দল, দল-হিসাবে অবশ্য বিশেষ পুষ্ট তাকে বলা চলে না, 'নাচঘর' পত্রিকা ও আর দু'একজন মাত্র,—এ'রা দানীবাবুকে 'স্থবির,' 'আর পারেন না তেমন কিছু করতে' বলে আখ্যা-ব্যাখ্যা ইত্যাদি ক'রে চলেছেন। পক্ষে যাঁরা, তাঁরা বলতেন, প্রতিযোগিতার তেমন অভাব ছিল বলেই হালে কিছুকাল তাঁর অভিনয়ে দীপ্তি তেমন দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু আর্ট-থিয়েটার-পরিচালিত 'স্টারে' এসে পার্শ্ব অভিনেতাদের পাশে দাঁড়িয়ে আবার তিনি সজীব হয়ে উঠেছেন, জাড্য জয় করেছেন, ইত্যাদি।

দানীবাবুর অভিনয় আমি আগেও দেখেছি। এবং মুগ্ধ বিস্ময়েই দেখেছি। আজ অতি নিকট থেকে দেখবার সুযোগ পেলাম। যে উইংগস থেকে বেরুতেন, তাঁর পিছনে পিছনে সেখানে গিয়ে দাঁড়াতাম দেখার জন্য। এক-দুই রাত্রি নয়, কয়েক রাত্রিই গিয়ে দাঁড়িয়েছি। বয়স হয়ে যাবার দরুণ—ও'র যৌবনের অভিনয়ের সঙ্গে আজকের অভিনয়ে কিছু পার্থক্য অবশ্যই লক্ষ্য করা যাচ্ছে, কিন্তু সে পার্থক্যও খুব প্রকট হয়ে উঠছে না এই কারণে যে, যখন উনি ২৪ সালে আর্ট থিয়েটারে অভিনয় করতে এলেন, তখন ও'র বয়স,—ছাপ্পান্ন বছর। একজন অভিনেতা ষাটের কম বৃদ্ধ হন না। অতএব এ পার্থক্যটুকু ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। ও'র কণ্ঠ তেমনি রয়েছে মেঘমেদুর। বলা যায়, মেঘ গর্জনের মতো। যেখানে-যেখানে কণ্ঠ উচ্চে নিয়ে যাবার প্রয়োজন হতো, সেখানে অনায়াসে আজও নিয়ে যাচ্ছেন কণ্ঠস্বর। যেমন বিখ্যাত অভিসম্পাতের দৃশ্যে যখন বলছেন, —ভগবতী বসুন্ধরে, দ্বিধা হও! তখন এমন বাজ-ডাকার মতো স্বর-প্রক্ষেপণ করতেন যে, আমরা পর্যন্ত কেঁপে উঠতাম।

বাচালকে যে-দৃশ্যে জিজ্ঞাসা করছেন,—নন্দের পরিবারবর্গ কোথায়?

বাচাল তখন সত্য গোপন করে বললে—মলয় পর্বতে।

উনি বলে উঠলেন—মিথ্যা কথা!

এই 'মিথ্যা কথা',—এমনভাবে বলে উঠতেন যে, তাতে আর বাচালকে ভয় পেয়ে যাবার 'অভিনয়' করতে হতো না, আপনিই ভীতকণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করে ফেলত সে,—মিথ্যা কথা।

কোমল-কঠোরে মিশ্রিত তাঁর কণ্ঠস্বর যেন শরতের মেঘের মতো নিকটে-দূরে গর্জন ক'রে বেড়াতো। কণ্ঠস্বর কখনো মিলিয়ে যাচ্ছে, কখনো নিকটে আসছে, কণ্ঠস্বরের সে এক অদ্ভুত লীলা বলা যেতে পারে।

ভালো কণ্ঠধারী ছিলেন শুনেছি অমৃতলাল মিত্র, মহেন্দ্রলাল বসু এ'রা। তাঁদের কণ্ঠ নিজে শুনিনি, তুলনা করতে পারব না, কিন্তু দানীবাবুর কণ্ঠস্বরের লীলা বৈচিত্র্যই শুধু লক্ষ করবার নয়, তাঁর স্বাভাবিক স্বর-প্রক্ষেপণের মধ্যে অসাধারণ গাম্ভীর্য এবং অসাধারণ মাধুর্য, দুইয়ের সংমিশ্রণ লক্ষণীয়। যাকে বলে গম্ভীরে মধুর। তাই বোধ হয় সে কণ্ঠ এমন মুগ্ধ করবার ক্ষমতা রাখত। যখনকার কথা বলছি, কণ্ঠস্বরের সেই গুণ তখনো বিদ্যমান রয়েছে। ছিল শুধু উচ্চারণের ঈষৎ ত্রুটি। ছেলেবেলা থেকেই ভয়ানক আদুরে ছিলেন—মা মরা ছেলে—পিসীদের আদরের মধ্যে থেকে—একটু আদুরে কথা বলার ধরন গ'ড়ে উঠেছিল শৈশবে। বাল্যেও সেটা ছিল, যৌবনে উঠেছিল প্রকট হয়ে। তারপর ক্রমে ক্রমে সাধনার দ্বারা সে দোষটা দূর করবার প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও, একেবারে নির্দোষ হয়নি।

অভিনেতারূপে দানীবাবুর আরেকটি সম্পদ ছিল, সেটি হচ্ছে তাঁর গতিভঙ্গি। যদিও ইদানীং তাঁর চোখে একটু দোষ দেখা দিয়েছিল, কিন্তু আশ্চর্য ক্ষমতা, স্টেজের প্রখর আলোতেও তাঁর চলাফেরায় কোনো ত্রুটি হতো না! দৃপ্ত ছিল তাঁর গতিভঙ্গি,

শ্রীজওহরলাল নেহরুর

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

বিশ্ব-বিশ্রুত "GLIMPSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। এ শুধু সন-তারিখ-সমন্বিত ইতিহাস নয়—ইতিহাস নিয়ে সরস সাহিত্য। গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পটভূমিকায় গৃহীত মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন যুগের চিত্রাবলী নিয়ে লিখিত একখানা শাশ্বত গ্রন্থ। জে. এফ. হোরাবিন-অংকিত ৫০খানা মানচিত্র সহ। প্রায় হাজার পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ।

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৫·০০ টাকা

শ্রীজওহরলাল নেহরুর
আত্ম-চরিত ১০·০০ টাকা

শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারীর
ভারতকথা ৮·০০ টাকা

প্রফুল্লকুমার সরকারের
জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ২·৫০ টাকা

অনাগত (উপন্যাস) ২·০০ টাকা

ভ্রষ্টলগ্ন (উপন্যাস) ২·৫০ টাকা

অ্যালান ক্যাম্বেল জনসনের
ভারতে মাউণ্টব্যাটেন ৭·৫০ টাকা

আর জে মিনির
চার্লস চ্যাপলিন ৫·০০ টাকা

শ্রীসরলাবালা সরকারের
অর্ঘ্য (কবিতা-সঞ্চয়ন ৩·০০ টাকা

ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর
আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে ২·৫০ টাকা

ত্রৈলোক্য মহারাজের
গীতায় স্বরাজ ৩·০০ টাকা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ । ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

সজীব ছিল চলাফেরার ভঙ্গিমা,—কোথাও কোনো জড়তা নেই, সাবলীল, সচ্ছন্দ।

অবাক হতাম বিশেষ করে তার একটি দৃশ্যের অভিনয় দেখে। 'চাণক্য'-বেশী দানীবাবু নন্দকে অভিসম্পাত দিয়ে মঞ্চ থেকে প্রস্থান করছেন। "সেইদিন দেখবে আবার এই ব্রাহ্মণের তপস্যার শক্তি' থেকে শুরু ক'রে আরও পাঁচ ক্রম স্বর তুলে শেষ কথাটি বলে যাচ্ছেন—'ব্রাহ্মণের দুর্জয় প্রতাপ' ইত্যাদি। এখানে যখন তিনি প্রস্থান করছেন, তখন দেখবার জিনিস এই ছিল যে, তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রস্থান করতেন না। পৈতেটা হাতে করে যখন অভিশাপ দিচ্ছেন, সারা শরীরটা তখন তাঁর থরথরে করে কাঁপত! এবং এই কাঁপতে কাঁপতেই সারা দেহটা পিছু হটতে থাকত। পিছু হটতে হটতে কেমন করে যে হঠাৎ উইংগস-এর ভিতরে ঢুকে পড়তেন, ঠিক ধরতে পারতাম না। এই দৃশ্যে, সে যুগে, যখন প্রথম ও'র 'চাণক্য' দেখেছিলাম, প্রচুর হাততালি পড়ত এবং তখন ওটা ধরব কী, আবেগে ভাসিয়ে দিতেন একেবারে! এইবার উইংগসের পাশে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখলাম, এবং অভিনয়ের ক্ষমতার স্বরূপটা যে কী, তা' বুঝবার অবকাশ পেলাম, এবং পেয়ে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। আজও সেইভাবে কাঁপতে কাঁপতে পিছু হটে বেরিয়ে এলেন। সত্যিই কাঁপছে সারা শরীর। ধীরে ধীরে পা টানছেন, কাঁপুনিটা সমানে বজায় রেখে অবশ্য। এবং ঐ পা-টানাটা চোখে দেখা যায় না, এমনি সাবলীল। অনেক সময় টেবিল অ্যালার্ম ঘড়িটা অ্যালার্ম বাজাবার সময় আপনিই কেমন কাঁপতে কাঁপতে ঈষৎ সরে যায় ভাইব্রেশনের দরুণ, সে যেন ঠিক তাই ছিল। ভাইব্রেশনের দরুণ দেহটা যেন আপনিই সরে সরে যাচ্ছে!

অভিনয়-কৌশলের এ'এক অত্যাশ্চার্য ব্যাপার। কী ক'রে হয়? নিজেও অভ্যাস করতে শুরু করেছিলাম গোপনে। করতে গিয়ে দেখি একটা পা টানতে আরেকটা যায় না, কিম্বা কাঁপুনিটাই মাঝপথে থেমে যায়। তাঁর এই কৌশলটা যখন পর্যবেক্ষণ করি, তখন ১৯২৪ সাল। আর দেখেছিলাম এই সেদিন, ১৯৫৯ সালে, একজন ফরাসী "Mime" (যারা নির্বাক অভিনয় করেন) এসেছিলেন এদেশে। তিনি এক সঙ্গে তিনজন লোকের ভূমিকা অভিনয় করেন। যেমন আরেকজনকে দেখেছিলাম এ' বছরেই অর্থাৎ ১৯৬০ সালে—তাঁর নাম বললে অনেকে বুঝতে পারবেন—অনেকে দেখেছেনও তাঁর অভিনয়-চাতুর্য—মার্সেল মার্সো—নিউ এম্পায়ারে শো দিয়েছিলেন। ইনি প্রখ্যাত ব্যক্তি। কিন্তু প্রথমজন যাঁর কথা বললাম, তিনি ততটা খ্যাতনামা নন। আমাদের অনুরোধ আমাদের সংগীত-নাটক অ্যাকাডেমীর স্টেজে একদিন দেখিয়েছিলেন তাঁর অভিনয়-ক্ষমতার নিদর্শন। অনেক কিছু দেখালেন, তার মধ্যে একটা জিনিস বড়ো ভালো লেগেছিল, সে হচ্ছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দৌড়নো। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে দৌড়নোর ভঙ্গী করছেন, অথচ এগুচ্ছেন না। একটা পা পিছন দিকে টেনে গতিরোধ করছেন। এক কথায় অগ্রগতির তালটাকে রোধ করছেন।

ও'র এই কৌশলটা দেখতে দেখতে আমার মনে পড়ে গেল দানীবাবুর সেই পা-টানার কথা। ছাত্রদের বললাম—ভালো করে দেখে নাও।

ও'র ফিল্ম রেখে গেলনে, সে ফিল্মও দেখলাম আমরা।

তারপরে, এ'বছরের জুলাই মাসে, এলেন জগৎবিখ্যাত "Mine"—ইনিও ফরাসী—মার্সেল মার্সো। ইনি ফ্রান্স থেকে অস্ট্রেলিয়া যাবার পথে দিল্লী ও কলকাতায় দুদিন শো করে গেলেন। এখানে সব ব্যবস্থা করে-ছিলেন 'অ্যালায়াস ফ্রাসে।' আমাকেও ডেকেছিলেন তাঁরা, আমাদের অ্যাকাডেমীর ছাত্ররাও গিয়েছিল। খুব নামকরা লোক, কাগজে-কাগজে ও'র কথা পড়েছি। ও'কে অ্যাকাডেমীতে আনবার ইচ্ছা হলো। কিন্তু বিনা পয়সায় আসবেন কী? ছাত্ররাই গেল। এবং আশ্চর্য, উনি রাজী হয়ে গেলেন। অ্যাকাডেমীর স্টেজেই শো হবে। দিনস্থির হলো ১৬ই জুলাই—অপরাহ্নে। কিন্তু আসাম দিবসের জন্য ওদিন হরতাল হয়ে যাওয়ায় বারণ করেছিলাম যে, না হবে না। ভদ্রলোক যেন বিপদে পড়লেন। কখন হবে? সকালে?

—না। ওদিন কোনো সময়েই নয়।

অথচ তিনিও আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। তাঁর যাবার সময় স্থির ছিল যে! পরদিন সকালেই প্লেনে চলে গেলেন অস্ট্রেলিয়া। এবং অস্ট্রেলিয়া থেকে এ' পথে আর ফিরছেন না, প্রশান্ত মহাসাগর দিয়ে আমেরিকা চলে যাবেন। কিন্তু রওনা হবার আগে, ও'র অভিনয়ের দু'রীল ষোলো মিলিমিটার ফিল্ম রেখে গেলেন, তার মধ্যে একটি রীল ছিল রঙ-করা ছবি-সম্বলিত। আগস্টের বারো তারিখে আমাদের প্রেক্ষা-গৃহে বসে বসে আমরা তা' দেখলাম। ও'রও ঐ রকম কৌশল আছে। এবং আরও নানারকম আছে।

আজ পুরানো কথা বলতে গিয়ে এই কথাই ভাবছি, দানীবাবু সে যুগে ওটা কী করে অভ্যাস করেছিলেন!

যাই হোক, অভিনয়ে আগের থেকে কিছু পার্থক্য লক্ষিতে হলেও তুলনায় একটুও ম্লান হয়নি দানীবাবুর অভিনয়। স্টারের আমলের আগেকার কথা বলছি। অভিনয়টি তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিমুখ হয়ে তাঁকে ততটা 'অ্যাকটিভ' করতে পারেনি, উদ্দীপনা ততটা ছিল না, আর কিছুটা হয়ত আয়েসী হয়ে গিয়েছিলেন। ক্য

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.-প্রণীত

ব্যায়ামে বাঙালী ২.০০ | বাংলার ঋষি ৩.০০
বীরত্বে বাঙালী ১.৫০ | বাংলার মনীষী ১.২৫
বিজ্ঞানে বাঙালী ৪.০০ | বাংলার বিদুষী ২.০০
আচার্য জগদীশ ২.০০ | রাজর্ষি রামমোহন ১.৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ১.৫০ | যুগাচার্য বিবেকানন্দ ১.৫০
জীবন গড়া .৭৫ | রবীন্দ্রনাথ ১.২৫

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী • ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

জগদীশবাবুর গীতা

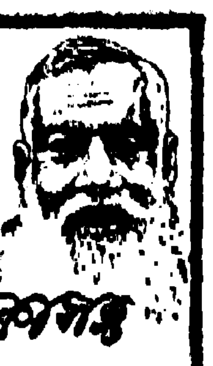

মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা অনু-রহস্য ভূমিকাসহ
অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়মূলক যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ৬.০০

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম ৫.০০ | ভারত-আত্মার বাণী ৬.০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১.৫০ | কর্মবাণী ১.২৫

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী • ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

তাঁর ত অভাব কিছু ছিল না। কাজেই কোনো জিনিসের জন্য কোনো চেষ্টা তিনি করতেন না। 'এণ্টারপ্রাইজ' যাকে বলে, তা' তাঁর ছিল না। দ্বিতীয়ত, একটু আহিফেন সেবন করতেন। এখনো বহু-লোক করেন, কিন্তু তখনকার দিনে একটু বয়স হলেই প্রৌঢ়-প্রৌঢ়াদের মধ্যে অনেকেরই ওটা অভ্যাসে পরিণত হতো। বাঙালীর সব থেকে বহুল-অর্জিত ব্যাধি হচ্ছে পেটের গোলমাল। সেই পেটের গোলমালের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বাঙালীকে সকাল-সন্ধ্যা তরিবৎ করতে হয়। কখনো মিছরির সরবত, কখনো মাছের ঝোলের সঙ্গে নেবুর রস, আর ডাব। বাঙলা দেশে যত ডাব হয়, তার অধিকাংশই কাঁচা খেয়ে ফেলা হয়, ঝুনো নারকেল আমদানী করতে হয় অন্য প্রদেশ থেকে।

যাই হোক, যা বলছিলাম। আহিফেন সেবন করলে একটু ঝিমুতে হয়। ঘন দুধ চাই তখন, মিষ্টি চাই। তারপরে তাকিয়া আর গড়গড়া হয়ে পড়ে নিত্যসংগী। এসবের জন্য দানীবাবু আয়েসী বা আরামী হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু স্টারে এসে এক কথায় ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিলেন সে সব। ফলে এখানে এসে অভিনয় করবার পর তাঁর পূর্ব অভিনীত চরিত্রগুলি আবার তাঁর সেই আগেকার যুগের অভিনয়ের মতো সজীব হয়ে উঠেছিল। এই সময়ও খুব হাততালি পড়ত দেখেছি স্টারে। কিন্তু 'নাচঘর' ছিল এই হাততালির বিরুদ্ধে। তখন নাচঘর দু'তিন মাস হলো সবে প্রকাশিত হচ্ছে। তাঁরা হাততালির বিরুদ্ধে অনেক কথাই লিখলেন। এবং বিশেষ করে এক জায়গায় লিখলেন 'হাততালি-ভক্তদের আমরা নিম্নশ্রেণীর লোক ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারব না।'

ফল হলো মারাত্মক। বহু কাগজে এর প্রতিবাদের ঝড় উঠল। 'জাগরণ' প্রভৃতি পত্রিকা এর বহু প্রতিবাদ করলেন। ৩১শে জুলাই 'জাগরণ' 'রঙ্গমঞ্চ' শীর্ষক নিবন্ধে লিখলেন—"সহযোগী নাচঘর হাততালি বর্জন প্রসঙ্গে কয়েকটি এমন রূঢ় কথার অবতারণা করিয়াছেন, যাহার ভাষা চমকপ্রদ হইলেও অত্যন্ত তিক্ত এবং ভদ্রতালেশ পরিশূন্য।"

নাচঘরের কেন এ' উদ্যম বলতে পারি না। অবশ্য অভিনয় চলবার সময় হাততালি পড়লে অভিনেতাদের অনেক সময় ক্ষতি হয়, ভাব কেটে যায়। কিন্তু দৃশ্য-সমাপ্তিতে হাততালি পড়লে ক্ষতি কী? দেশাচার, ওর বিরুদ্ধে লড়াই করে লাভ নেই। অনেকে বলেন—ভাদুড়ী মশাই হাততালির পক্ষপাতী নন। এমনও শুনেছি যে, লোকে বলেছে, অভিনয়কালীন হাততালি পড়লে তিনি বিরক্ত হতেন। তিনি নাকি বলতেন—"আমার থিয়েটারে হাততালি নিষিদ্ধ। ওতে অভিনয়ের ব্যাঘাত হয়।"

কিন্তু আমি যতদিন তাঁর থিয়েটারে তাঁর সঙ্গে অভিনয় করেছি, ততদিন তাঁকে একথা বলতে শুনিনি। দর্শক হাততালি দিয়েছে, দর্শকদের তিনি কিছু বলেনওনি। অভিনয়-কালীন হাততালি আমরাও যে পছন্দ করি, এমন নয়, কিন্তু সে নিয়ে দর্শকদের সঙ্গে যুদ্ধ করেও ত কোনো ফল নেই! তবে কথা এই যে, তিনি সম্ভবত তখন হাততালি দেবার রেওয়াজটা তুলে দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কারণ তার কিছুদিন পরেই খুলছে তাঁর থিয়েটার।

শিশিরবাবুর "সীতা" অভিনয়ের কথা এবার বলতে পারি। 'সীতা' বলেই প্রথম বিজ্ঞাপিত হয়েছিল, নাট্যকারের নাম প্রথম-প্রথম প্ল্যাকার্ডে থাকতো না। 'সীতা'র প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার অ্যালফ্রেডে 'মডার্ন থিয়েটার'-এর পোস্টার পড়ল। কিন্তু মডার্ন থিয়েটারের বিপদ হলো এই যে, ৩১শে জুলাই বই খুলবে, কিন্তু হঠাৎ ও'দের অর্থ-প্রদায়ী পৃষ্ঠপোষক কীর্তিচন্দ্র দাঁ মারা গেলেন। সুতরাং রাধিকাবাবু স্বাভাবিকভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হলেন বলতে হবে। কিন্তু তাতেও ও'রা নিরুদ্যম হননি। ওরা অভিনয় করবেন নবীন সেনের 'রৈবতক'-এর নাট্যরূপ। তারিখ বদলে হলো ২৪শে আগস্ট। কিন্তু বই খোলবার আগেই শোনা গেল, মতান্তরের দরুণ রাধিকাবাবু ছেড়ে দিয়েছেন মডার্ন থিয়েটার। সঙ্গে চিত্রশিল্পী যামিনী রায় এবং আরও যে দু' একজনকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিলেন রাধিকাবাবু, তাদের নিয়ে আবার চলে এসেছেন। যামিনীবাবু অবশ্য গিয়েছিলেন দৃশ্যপট পরিকল্পনার জন্য। তখন মডার্ন থিয়েটার চালাবার ভার নিলেন 'আনন্দ পরিষদ'-এর সভ্যরা। ওদিকে শিরিবাবুর 'সীতা' খুলে গেল ৬ই আগস্ট বুধবার ১৯২৪ সালে—পুরাতন মনো-মোহন মঞ্চে 'নাট্যমন্দির' নাম নিয়ে। ভূমিকালিপি হলো—রাম—শিশিরবাবু। লক্ষ্মণ—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী। ভরত—তারা-কুমার ভাদুড়ী। শত্রুঘ্ন—তুলসী বন্দ্যো-পাধ্যায়। বশিষ্ট—ললিতমোহন লাহিড়ী। বাল্মীকি—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। শম্বুক—যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। লব—জীবনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। কুশ—ননীগোপাল সান্যাল। ননীবাবু ছিলেন বিখ্যাত সিনেমাটোগ্রাফার। প্রথমে ছিলেন ম্যাডানে, তারপরে—তাজ-মহলে, তারপরে—ইণ্ডিয়া কিনেমা আর্টস—অরোরাতে—কালী ফিল্মসে— দীর্ঘবয়স পর্যন্ত ফটোগ্রাফারের কাজ করেছিলেন। ইনি শিশিরবাবুর থিয়েটারে আসেন আলোকসম্পাতের জন্য,—তাও চাকরী নয়, শখ করে। শখ ছিল তখন অভিনয়েরও। তাই নিলেন কুশের পার্ট। কিন্তু তখন সুবিধা করতে পারলেন না, একরাত্রি করেই ছেড়ে দিলেন। দ্বিতীয় রাত্রি থেকে 'কুশ' করতে লাগলেন—রবীন্দ্রমোহন রায়। দুর্মুখ—অমিতাভ বসু। বৈতালিক—কৃষ্ণচন্দ্র দে। ব্রাহ্মণ—নৃপেশনাথ রায়। কৌশল্যা—পান্নারানী। সীতা—প্রভা। ঊর্মিলা—ঊষারানী। তুঙ্গভদ্রা — নীরদাসুন্দরী। আত্রেয়ী—নিরুপমা।

(ক্রমশ)

নূতন নাটক
এক অঙ্কে শেষ
২·২৫

কিরণ মৈত্রের
৪টি নাটক এতে আছে
বুদবুদ
ভাগ্যে লেখা
কোথায় গেল
অন্ধ-কারায়

সিটি বুক এজেন্সী
৫৫, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯

বাঙালী ও বঙ্গসংস্কৃতিকে জানতে
একখানা প্রথম শ্রেণীর বাংলা
মাসিক নববঙ্গ পড়ুন
তৃতীয় বর্ষ * বার্ষিক ৩,
২০১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭

BUY THE BEST
HIGHLY APPRECIATED
SAMSAD ANGLO-BENGALI DICTIONARY
1672 PAGES • Rs. 12·50 n.P.
SAHITYA SAMSAD
32 A, ACHARYA PRAFULLA CH. RD. • CAL-9

ধবল বা শ্বেত
শরীরের যে কোন স্থানের সাদা দাগ, একজিমা, সোরাইসিস ও অন্যান্য কঠিন চর্মরোগ, গায়ে উচ্চবর্ণের অসাড়যুক্ত দাগ, ফুলা আঙ্গুলের বক্রতা ও দূষিত ক্ষত সেবনীয় ও বাহ্য দ্বারা দ্রুত নিরাময় করা হয়। আর পুনঃ প্রকাশ হয় না। সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ফোন : ৬৭-২৩৫৯। শাখা : ৩৬ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯। (পূরবী সিনেমার পাশে)।

কেমন সুন্দর
ঘন চুল
—এঁরা নিশ্চয়ই
ব্যবহার করেন ...
টাটার
কেশ তৈল
টাটার সুবাসিত নারিকেল কেশ তৈল—
ফুলের গন্ধে ভরা
পরিশোধিত খাঁটি তেল
টাটার ক্যাস্টর হেয়ার অয়েল—চমৎকার
মিষ্টি গন্ধে ভরপুর
কেশরাশি ঘন ও সুন্দর ক'রে তুলতে হ'লে
টাটার কেশ তৈল ব্যবহার করুন !
TH. 645
টাটা-র তৈরী

GOVERNMENT LIBRARY Cooch Behar

মেট্রিক পদ্ধতি

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

অংকের মাস্টারমশাইএর ফরমাশ দেওয়া নামতা মুখস্ত করার স্মৃতিটা অনেকের কাছেই একটা ভয়াবহ স্মৃতি। এক, দুই বা তিনের ঘর ছাড়ালেই নামতাটা ক্রমশই দুরূহ ব্যাপারই হ'য়ে দাঁড়ায়—তখন নামতা আবিষ্কারকের উদ্দেশ্যে নানান্ অভিসম্পাত বাণী বর্ষণ করতেও অনেকে দ্বিধা বোধ করেন না। কিন্তু এক, দুই তিন ছাড়িয়ে যখন দশ ঘরের নামতা আসে তখন যেন একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যায়। মুখস্ত করার কোন প্রয়োজন নেই—ডানদিকে শূন্য বসালেই কার্যোদ্ধার হয়। সাত উনিশং বা নয়ষোলং কত বলতে বললে হয়ত বা অনেকেই কলম কামড়াবেন—কিন্তু তিনদশং বা তেত্রিশদশং কত বলতে বললে কেউ আটকাবেন না। দশ দিয়ে ভাগের বেলাতেও তাই। দশদিয়ে গুণ ভাগ করার কোন ঝামেলা নেই, আর মেট্রিক পরিমাপ পদ্ধতিতে দশ দিয়ে গুণভাগ ব্যবহার করা হয় বলেই পৃথিবীর সব দেশেই আজ মেট্রিক পদ্ধতি সমাদৃত। এতে হিসেব নামক বিভীষিকাময় জিনিসটা অনেক সহজ হয়ে আসে।

মেট্রিক পদ্ধতির মাপজোখ আমাদের দেশে এখন চালু হয়েছে—আগামী কয়েক বছরের মধ্যে পুরোনো মাপজোখের মাপকাঠি বাতিল করে দেওয়া হবে।

হিসেবের নিকেসের বা মাপজোখে এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি প্রথম উদ্ভাবিত হয় ফরাসী দেশে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্তও ইউরোপের নানান স্থানে নানান ধরনের ওজন বা দৈর্ঘ্য মাপার স্কেল প্রচলিত ছিল—যেমন আমাদের দেশে এখনও কোন কোন স্থানে আশীতোলায় সেরের পরিবর্তে ষাট তোলা সের বা একশ কুড়ি তোলায় সের ধরা হয়। কবিরাজেরা আবার চৌষট্টি তোলায় সের ধরে থাকেন। সে রকম সে সময়ে ইউরোপে 'এক ফুট' বলতে প্রায় দু'শ রকম মাপ বোঝাতো—পাউণ্ড ছিল কয়েক শ' রকম। তাই ব্যবসায়ী বা জনসাধারণের অবর্ণনীয় অসুবিধেয় পড়তে হ'ত। এক জায়গার হুকুমে আর এক জায়গায় কাজ করতে গেলেই বাধত বিপত্তি। এ ধরনের অসুবিধে দূর করার জন্য তখনকার ইউরোপের একদল চিন্তাশীল ব্যক্তি চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু তখনকার কেউ বিশেষ সফলকাম হন নি। সমস্ত দেশের মধ্যে মাপ বিষয়ে কোন সমতা আনবার কাজে বাধা ছিল অনেক। কোনো এলাকার মানুষই তাঁদের নিজেদের এলাকায় প্রচলিত পদ্ধতি ছাড়তে চাইতেন না। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ব্যাপারই প্রায় চলেছিল। তারপর তাঁরা অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন।

আগেই বলেছি ঘটনা ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের। ফ্রান্সের সম্রাট তখন চতুর্দশ লুই। এই বছরই ৮ই মে তারিখে ফ্রান্সের তদানীন্তন জাতীয় মহাসভা (ন্যাশন্যাল এসেমব্লী অব ফ্রেন্চ) চতুর্দশ লুইয়ের অনুমোদন অনুসারে, তিনি যেন নিজে অগ্রণী হয়ে এ বিষয়ে কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তাঁরা আরও বললেন, যে সম্রাট লুই যেন ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে একটা সভা করে এ বিষয়ে আলোচনা করেন, এবং কোন সমাধান করেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যদি কোন পরিমাপ প্রণালী ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে আইনত চালু হয়, তবে তা হয়ত ইউরোপের অন্যান্য জায়গাগুলোতেও বিস্তার লাভ করবে। কিন্তু ইংলণ্ড থেকে এ বিষয়ে বিশেষ সাড়া পাওয়া গেল না। তদানীন্তন রাজনৈতিক ঘটনাবলী এর জন্য দায়ী বলে অনেকে মনে করেন।

কিন্তু ফরাসীদেশের উদ্যোক্তারা এতে দমলেন না। সেখানকার বৈজ্ঞানিকদের নিয়েই একটা সভা করা হ'ল—আর একটি কমিটিও

সর্বঋতুর সঞ্জীবনী
দই মিষ্টি
গাঙ্গুরাম গ্র্যাণ্ড সন্স্
ভবানীপুর ও কালীঘাট
— কলিকাতা —
ফোন: ৪৭-২৩৭৭

দেওয়ালীর সাদর সম্ভাষণ

আত্মীয়তা ও মিত্রতা স্মরণীয় রাখায় সহায়তা করে
ন্যায্যমূল্যে আমাদের রকমারী আধুনিক ডিজাইনের সিল্কের শাড়ী ও তাঁতের ধুতি শাড়ী।
রামগোপাল গোরামল
৪৮নং মনোহর দাস স্ট্রীট (সোনাপটি), দোতালা, কলিকাতা-৭
ফোন নং ৩৩-৩৫৯৪

হল। প্রায় একবছর পর ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ তাঁরা একটা রিপোর্ট দিলেন। তাতে বিশেষ কেউ আপত্তি করলেন না—ফলে তাঁদের রিপোর্ট গৃহীত হ'ল। সেই সঙ্গে তাঁরা একটা মূল এককও ঠিক করে ফেললেন। ফরাসীদেশের রাজধানী প্যারিসের ওপর দিয়ে বিষুব রেখা থেকে উত্তর মেরু পর্যন্ত যে দূরত্ব—তার এক কোটি ভাগের এক ভাগকে তাঁরা দৈর্ঘ্যমাপার একক ধরলেন। এমনি ধরে নেওয়া কোন মাপকে তাঁরা গ্রহণ করলেন না। তখন চারদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। তখনকার দুজন ফরাসী গণিতবিদ্ ডিলাম্বার (Delambre) ও মে'সা (Mechain) ডানকার্ক বার্সিলোনা পর্যন্ত জায়গার দূরত্ব মেপে ফেললেন। তখন আবার ইউরোপের নানা দেশ থেকে বাইশজন খ্যাতনামা ব্যক্তিকে নিয়ে একটি কমিটি বসল। ঐ দুজন গণিতবিদের মাপা দূরত্বকে এক কোটি ভাগ করে তার এক ভাগকে "এক মিটার" বলে স্বীকার করা হ'ল—আর ঐ মিটার থেকেই দৈর্ঘ্য মাপার অন্য একক-গুলোও ঠিক করা হ'ল।

এই মাপ ১৮০২ সালে ফ্রান্সে আইন করে পাশ হ'ল। এক মিটার মাপের একটি দণ্ডও প্যারিসের "Palais des Archives" এ রাখা হ'ল।

তার মাপ হল আগে বলা দূরত্বের এক কোটি ভাগের এক ভাগ। এভাবে যে মাপ ঠিক করা হল, তাকে "ন্যাচারাল ইউনিট" বা স্বাভাবিক একক বলে দাবি করা হ'ল। প্যারিসে রাখা এক মিটার মাপের দণ্ডটি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, কিন্তু বিষুবরেখা থেকে, প্যারিসের ওপর দিয়ে উত্তর মেরুর দূরত্ব চিরকাল একই থাকবে। ইংলণ্ডের গজ মাপের ওপর মিটার মাপ এভাবে কৌলীন্য বিস্তার করল।

মিটার মাপ ঠিক করার পর তাকে অর্ধেক, বা সিকিভাগ করে, আধমিটার বা সিকি-মিটার বলে কোন মাপ সৃষ্টি হ'ল না। মেট্রিক পদ্ধতির এককগুলোর আগে কত-গুলো গ্রীক ও ল্যাটিন শব্দ জুড়ে মিটারের গুণীতক বা অংশকে প্রকাশ করা হ'ল। সেই শব্দগুলো হ'ল ডেকা, হেক্টো, কিলো—মানে দশগুণ, এক শতগুণ বা হাজার-গুণ। আর ডেসি, সেন্টি, মিলি, অর্থাৎ, দশভাগের একভাগ, একশ-ভাগের একভাগ, হাজার ভাগের একভাগ। এই শব্দগুলোর মধ্যে ডেকা, হেক্টো, কিলো, হ'ল গ্রীক্ শব্দ, আর ডেসি, সেন্টি, মিলি হ'ল ল্যাটিন শব্দ। আমাদের ভাষায় যেমন, আধ বা সিকি বলতে দুভাগের এক ভাগ বা চারভাগের একভাগ বোঝায়, ঠিক তেমন এই শব্দগুলোয় দুয়ের গুণীতক বা অংশ না বুঝিয়ে দশের অংশ বা গুণীতক বোঝায়। তাই এক মিটারের হাজার ভাগের এক ভাগ হ'ল এক মিলিমিটার। একশ ভাগের এক ভাগ, এক সেন্টিমিটার। দশভাগের একভাগ এক ডেসিমিটার। আবার দশ মিটারে এক ডেকা মিটার। একশ মিটারে এক হেক্টো-মিটার বা হাজার মিটারে এক কিলোমিটার। ভৌগোলিক দূরত্ব মাপার বেলায় সাধারণত কিলোমিটারকে একক ধরা হয়, ছোটখাট মাপে মিটার এবং আরও ছোট মাপ হলে সেন্টিমিটার বা মিলিমিটারকে একক ধরে কাজ করা হয়।

এই মাপ চালু হওয়ার পর 'স্বাভাবিক মাপ' হিসেবে বেশ চলছিল, কিন্তু গোলমাল বাধল, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে। কারণ এই বছর আরও কয়েকজন বৈজ্ঞানিক বিষুবরেখা থেকে উত্তরমেরুর দূরত্ব মেপে দেখালেন যে, আগের মাপে কিছু ভুল আছে। তাঁরা মেপে দেখালেন, আগে যে দূরত্বকে এক কোটি মিটার বলে ধরা হয়েছিল বা যে দূরত্বের এক কোটি ভাগের একভাগকে এক মিটার ধরা হয়েছিল তা আসলে ১০০০,০০০০ মিটার না হয়ে ১০০০০৮৫৬ মিটার। তার মানে আগেকার তৈরী মিটার দণ্ডটিতে প্রায় দু' মিলিমিটারের গোলমাল আছে। কিন্তু তাতে মাপের কোন পরিবর্তন হ'ল না—কেবল মিটার মাপ তার কৌলীন্য হারাল। তাকে আর স্বাভাবিক একক বলা চলল না—সেটা হয়ে দাঁড়াল প্যারিসে রাখা একটি প্লাটিনাম-ইরিডিয়ামের দণ্ডের সঙ্গে সমান।

এই মাপের বিশেষত্ব হচ্ছে যে কোন একক, তার ওপর বা নীচের এককের দশভাগের একভাগ বা দশগুণ। তাই এক একক থেকে অন্য এককে যেতে হলে শুধু দশমিকবিন্দুর জায়গা বদলালেই কার্যোদ্ধার হবে। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ধরুন বার গজকে ইঞ্চি করতে হবে। প্রথমে তিন দিয়ে গুণ করে ফুট—তারপর বার দিয়ে গুণ করে ইঞ্চি বানাতে হবে। কিন্তু যদি বার মিটারকে মিলিমিটার করতে হয়, তবে তিনবার দশ দিয়ে গুণ করলেই হয়—সেরেফ বারর পেছনে তিনটে শূন্য বসালেই হল। আগের বেলায় তিনবারং ছত্রিশ পর্যন্ত এসেই আপনি থেমে গেছেন কারণ ছত্রিশবারং কত বলতে আপনাকে দুবার ভাবতে হবে।

শুধু দৈর্ঘ্য মাপার ব্যাপারেই নয়, অন্য-মাপ, যেমন ওজন বা ঘনপরিমাণ বা মুদ্রার ব্যাপারেও মেট্রিক পদ্ধতি আমাদের এই সুবিধে দেয়। এই ধরনের মাপজোখের পদ্ধতি মিটার মাপ থেকেই শুরু হয়েছে বলে এই প্রণালীকে মেট্রিক প্রণালী বলা হয়ে থাকে।

এই পদ্ধতিতে ঘন বা ভলুম মাপার মাপ-কাঠিও কিছুদিন পর বেরল। এক মিটারের দশ ভাগের এক ভাগকে বলে এক ডেসি-মিটার। এখন যদি এমন একটা পাত্র বানানো যায়, যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা সবই এক ডেসিমিটার, তবে তার মধ্যে যে পরিমাণ জল

গ্রামের দোকানদার বলেন ঃ
"ব্যবসায়ী হিসাবে যে টাকা আমি খরচ করি তার যতটা পারি উসুল করে নেবারই চেষ্টা করি। তাই, সাইকেল কেনার যখন প্রয়োজন হ'ল তখন র‍্যালেই কিনলাম, কারণ র‍্যালে অত্যন্ত মজবুত, যথেষ্ট মাল বইতে সক্ষম, আর স্বচ্ছন্দ ও ক্ষিপ্রগতি।"
র‍্যালে
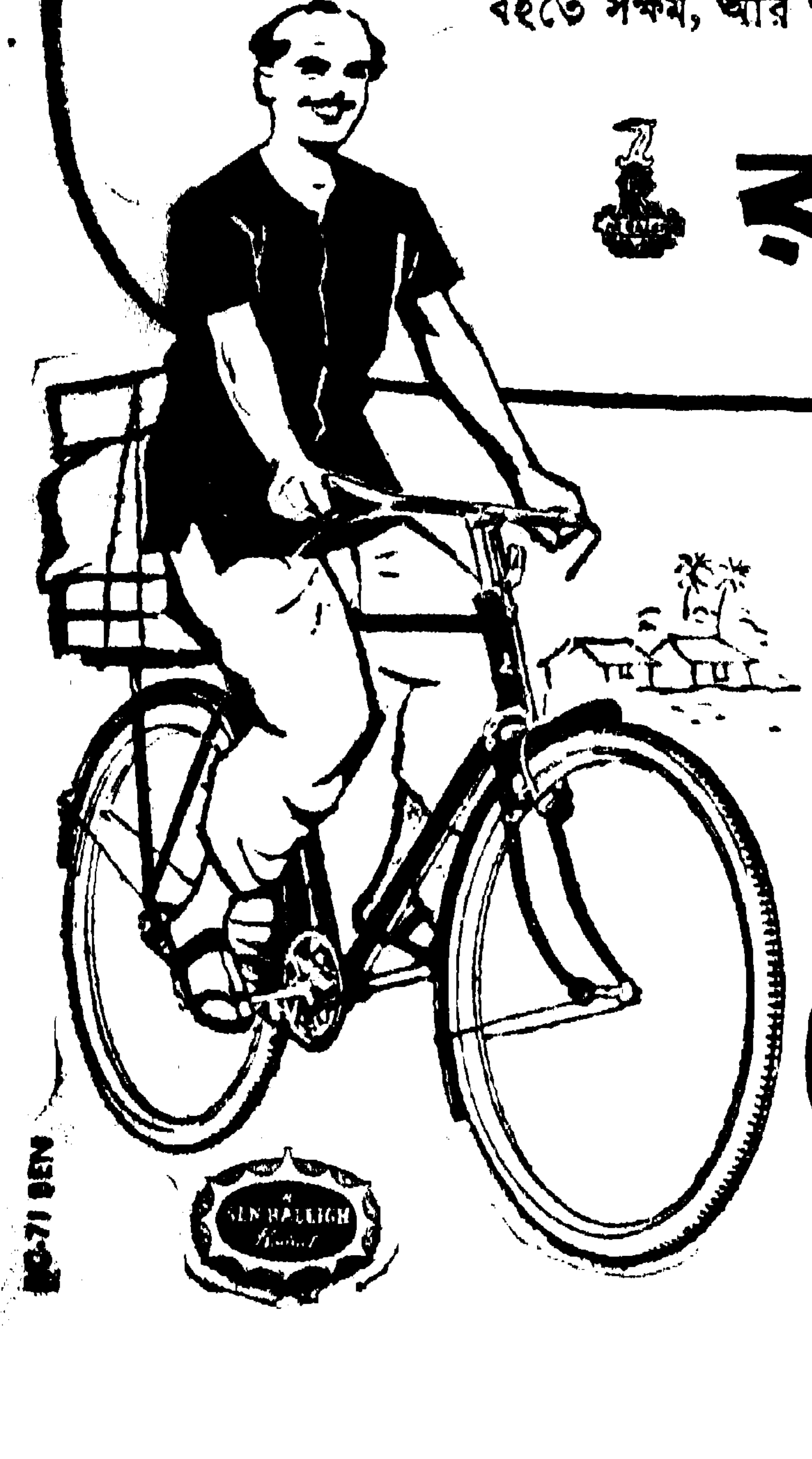
গত ৭৫ বছর ধরে সাইকেলের তালিকায় শীর্ষতম নাম
অধিকতর আরামের জন্য উইট্কপ সীট লাগান
সেন-র‍্যালে

বা অন্য কোন তরল পদার্থ ধরবে—তাকে বলা হ'ল এক 'লিটার' আর এই লিটারকেই ধরা হ'ল ঘন বা 'ভল্যুম'-এর একক। তারপর তার আগে ডেসি, সেণ্টি, মিলি, বা ডেকা, হেক্টো, কিলো, জুড়ে এক লিটারের অংশ বা গুণিতক বোঝান হ'ল—ঠিক যেমন মিটারের আগে বা পেছনে লাগান হয়েছিল।

ওজনের ব্যাপারেও খুব তাড়াতাড়ি এই পদ্ধতি চালু হয়ে গেল। ওজন পরিমাপের একক ঠিক হ'ল এক 'গ্রাম'। এক ঘন সেণ্টি-মিটার, আয়তনের যে পাত্র, তার মধ্যে চার ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড তাপে যে জল ধরে তার ওজনকেই বলা হ'ল এক 'গ্রাম'। এখানে জল কতটা গরম থাকবে, তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, —কারণ জলের (বা যে কোন পদার্থেরই) ঘনত্ব (density) সব উত্তাপে এক নয়। চার ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড যখন জলের তাপ, তখন তার ঘনত্ব থাকে সবচেয়ে বেশী—তাই এই তাপমাত্রাটাকে ব্যবহার করা হয়েছে। এই 'গ্রামে'র আগেও, ডেকা, হেক্টো, কিলো, বা ডেসি, সেণ্টি, মিলি, বসিয়ে এর গুণিতক বা অংশকে বোঝান হল।

তারপর এক কিলোগ্রাম বা হাজারগ্রাম ওজনের এক প্রামাণ্য বাটখারা বানিয়ে সেটা প্যারিসের Palais des Archives-এ রাখা হ'ল।

কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা গেল যে, চার ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড তাপে এক ঘন সেণ্টি-মিটার জলের ওজন আগে ঠিক করা এক গ্রামের সমান নয়, বা যাদুঘরে রাখা এক কিলোগ্রামের হাজার ভাগের একভাগও নয়। তার ওজন এক গ্রামের কিছু বেশী, ১·০০০০১৩ গ্রাম। তাই পরের এক গ্রামের 'ডেফিনিশন' গেল বদলে—তাকে চার ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড তাপে, এক ঘন সেণ্টিমিটার জলের ওজন না বলে, প্যারিসে রাখা এক বাটখারার হাজার ভাগের এক ভাগ বলা হল। সংজ্ঞাটা পালটালেও ওজনটা কিন্তু ঠিকই থাকল।

আমাদের দেশে আজ মেট্রিক পদ্ধতির মাপ ও দশমিক মুদ্রা চালু হয়েছে—আর কিছুদিন পর থেকে পুরোন মাপ সব উঠে গিয়ে মেট্রিক পদ্ধতি বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। এতে (সেকালের লোকেরা যাই-ই বলুন) হিসেবের ব্যাপারটা প্রায় 'জলবৎ-তরলং' হয়ে দাঁড়াবে। আগেকার মাপের সঙ্গে এখনকার মাপের সম্পর্ক আমি এখানে বলব না—কারণ তা আপনারা প্রায় রোজই কাগজে, পোস্ট অফিসের কাউণ্টারের পাশে এনামেল করা পোস্টারে, রেলওয়ে স্টেশনে, পেট্রোল পাম্পের বিজ্ঞাপনের ব্যানারে, আরও হাজার জায়গায় দেখছেন। কিন্তু ব্যাপকভাবে, আমরা এটাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করছি বলে এখনও মনে হচ্ছে না। এই পদ্ধতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা কিন্তু আমাদের এখন থেকেই করা উচিত।

ভাল ইংরেজী শেখার 'প্রেসক্রিপশন' দিতে গিয়ে কোন এক বিখ্যাত পুরুষ ইংরেজীতে ভাববার পরামর্শ দিয়েছিলেন—সেইরকম যদি আমরা মেট্রিক পদ্ধতি নিয়ে ভাবতে শুরু করি, তবে ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন ধরুন, এক মণ বা এক মাইল সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা আছে। —কিন্তু এক কিলোমিটার কতটা দূরত্ব বা এক কিলোগ্রাম চিনি আনতে কতবড় ঠোঙা লাগবে—তার সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই নেই। আর নেই বলেই মেট্রিক পদ্ধতির ব্যবহার নিয়ে আমাদের ঝামেলায় পড়তে হচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে 'কনভারশন' টেব্‌ল দেখার অভ্যাসটা যদি আমরা ছাড়তে পারি —তবে ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে দাঁড়ায়। কয়েকটা উদাহরণ নেওয়া যাক্‌।

বলা হল—আপনার বাড়ি থেকে আমার বাড়ির দূরত্ব এক কিলোমিটার পথ—সেটা কি হেঁটে যাওয়া সম্ভব! আপনি ভাবতে বসলেন। যদি বলি, সেই দূরত্বটা আধ মাইলের একটু বেশী অর্থাৎ 'আধমাইলটাক' হবে,—তখন আপনি বিনা দ্বিধায় বলবেন, —হ্যাঁ, হেঁটেই যাওয়া যাবে। আধমাইল দূরত্ব কতটা—তা আমাদের মনে গাঁথা হয়ে গেছে বলেই এটা সম্ভব।

আপনার ধুতির মাপ কত? দশহাতি আর বলবেন না বলুন, ৪·৮০৮ মিটার। আপনার ডবল খাটটির মাপ, ১·৮৪ মিটার× ২·১৫ মিটার। বেবী ট্যাক্সির ভাড়া গড়-পড়তা কত পড়ে জানেন? প্রতি কিলো-মিটারে প্রায় ৩২ নয়াপয়সা। আচ্ছা! আপনাকে একটা প্রশ্ন করি? ১·৮৪ মিটার লম্বা লোক কি বেঁটে? না সাধারণ? না টল ফিগার? আপনি একটু অসুবিধেয় পড়লেন না? এখন থেকে ধারণাটা করে রাখুন—আর যেন অসুবিধেয় না পড়েন। পড়েন। বার বার যেন পকেট থেকে কন-ভারশন টেব্‌লটা বের করে খুঁজতে না হয়। ১·৮৪ মিটার বা ১৮৪ সেণ্টিমিটার প্রায় ৬ ফুট। ঐ হাইটের লোক নিঃসন্দেহে 'টল-ফিগার'। মানুষের সাধারণ উচ্চতা ১৪০ সেণ্টিমিটার থেকে ১৮০ সেণ্টিমিটার ধরতে পারেন।

আপনার বাড়িতে কয়লা লাগে কত? ধরুন মাসে ৭৬ থেকে ৯৫ কিলোগ্রাম। অবশ্য আপনার বাড়ি মেসবাড়ি না হয়ে ছ-সাতজনের পরিবার ধরে নিয়েই এ-কথা আমি বললাম। দৈনিক মাছ আসে আধ সের না বলে ৫০০ গ্রাম (প্রায়) বলুন। আপনার মেয়ের স্কুল বাড়ি থেকে প্রায় ৫ কিলো-মিটার,—না অতটা পথ রোজ দুবার করে হাঁটতে বাচ্চা মেয়ের অসুবিধে হবে—তার জন্য বাসটা ঠিক করুন।

মোটর গাড়ি কিনতে গেলে তা[illegible] "মাইলেজ" কত—এ প্রশ্ন স্বভাবতই ও[illegible] মাইলেজ মানে এক 'গ্যালন' পেট্রলে সে গা[illegible] কতদূর যায়। এখন থেকে সেটা ভুলে [illegible] বলুন এক লিটার তেলে কত কিলোমি[illegible] চলে? ধরুন কোন গাড়ি গ্যালনে কুড়ি-মাইল যায়—তাকে এখন থেকে বলুন লিটারে সাত কিলোমিটার যায়। এভাবে নূতন মাপ-গুলোর বিষয়ে একটা ধারণা করে নিন। যদি আপনার পাশের টেবিলের হাইথিংকিং কেরানী ছেলেটি বলে—"জানেন মশাই 'রোল্‌স রয়েসের' নূতন মডেল বেরিয়েছে, লিটারে সাতষট্টি কিলোমিটার যায়," আপনি তখন কনভারশন টেব্‌ল ব্যবহার না করেই বলতে পারবেন, "থাক ভাই, আর গল্প মেরো না।"

এভাবে ধারণা জন্মে নিলে, ক'দিন পর দেখবেন, সব ঠিক হয়ে গেছে। কত ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড টেম্পারেচার উঠলে কেমন গরম লাগে তা দু'য়েকবার দেখে নিন। তারপর রেডিওর, "অর্থাৎ এত ডিগ্রি ফারেনহিট" শোনবার আগেই, কোনো জায়গার গরম সম্বন্ধে আপনি ধারণা করে নিতে পারবেন সেণ্টিগ্রেডের ছোট অংক শুনেই।

ছোটবেলাকার লঘুকরণ নামক অংকের কথা আপনি মনে করতে পারেন কি? সেগুলো কি আদপেও লঘু ছিল? তারপর মিশ্রগুণ, মিশ্রভাগ? এখন কিন্তু আর সে ঝামেলা নেই। এখন লঘুকরণ সত্যিই লঘু। পরপর অংক বসালেই হয়। ধরুন একটা অংক দেওয়া গেল, "২ কিলোগ্রাম, ৩ হেক্টোগ্রাম, ৫ ডেকাগ্রাম, ৮ গ্রামকে গ্রামে পরিণত কর।" অংকে দেওয়া হলে কি হবে—এটা কোন অংকই নয়। ২৩৫৮ গ্রাম। ব্যস। হয়ে গেল। ধারাপাত থেকে গণ্ডাকিয়া, পাইকিয়া, বুড়ি-কিয়া, কড়াকিয়া, সেরকিয়া, বাদ দিন। সোজা

ডাঃ গুরুদাস পালের
— আধুনিক সামাজিক উপন্যাস —
নূতন 'শিবানী' বই
বর্তমান সমাজ-সমস্যার একটি জীবন্ত ছবি।
যুগান্তর:—যুক্তিতর্কের বাঁধুনি অভিনন্দন-যোগ্য ও প্রশংসনীয়।
মূল্য—২ টাঃ ৫০ নঃ পঃ
পরিবেশক—ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
(সি-৮৪৮৩)

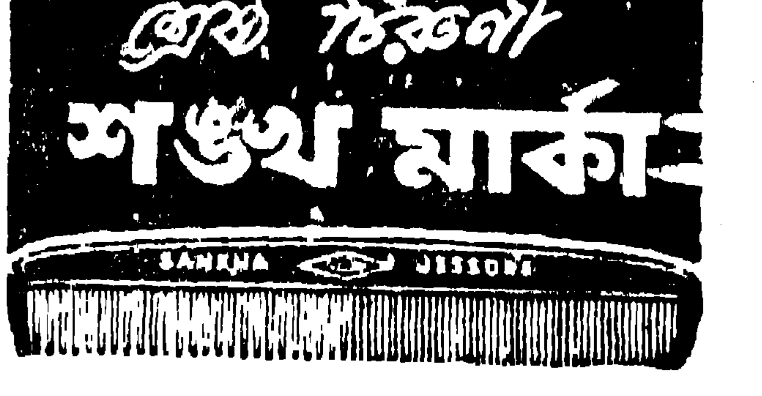

কে, হোড়ের
কনক
পাউডার

কথার মানুষ আপনি, আর বাঁকা কথায় যাবেন কেন?

কিন্তু একটা কথা। ছেলেমেয়েদের দশমিকের গুণভাগ, যোগবিয়োগগুলো একটু ভাল করে শেখান,—আর নূতন নিয়মের মাপজোখ-এ কতটায় কি হয়—সে সম্বন্ধে ওদের মনে একটা ধারণা জন্মে দিন। যেমন খেলার পাতায়, বা মাঠে "হাণ্ড্রেড্ মিটারস্" রেস দেখে "হাণ্ড্রেড মিটারস্" সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা হয়ে গেছে—তাই "হাণ্ড্রেড মিটারস্" শুনে আর আমরা 'কনভারশন টেব্‌ল' খুলি না। বাড়িসুদ্ধ সব্বাই মিলে কয়েকদিন ট্রায়াল দিন—দেখবেন হাতে হাতে ফল পাবেন। চাই কি, কোনদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে দেখবেন, আপনার গিন্নী বিপুলবিক্রমে কয়লাওলা কুলীর সঙ্গে কাজিয়া বাধিয়ে বসেছেন, বলছেন, "এই তো অল্প ৭৫ কিলোগ্রাম কয়লা। মাত্র আধ কিলোমিটার নিয়ে এসেছ আর আশী নয়া পয়সা দাম চাইছ? পয়সা কি জলে ভেসে এসেছে?"

মেট্রিক ওজন ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক

১৯৬০ সালের ১লা অক্টোবর থেকে নিম্নলিখিত এলাকাগুলিতে সমস্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র মেট্রিক ওজন ব্যবহার বাধ্যতামূলক হয়েছে। ব্যবসার জন্য ব্যবহারকল্পে সমস্ত মেট্রিক বাটখারায় ওজন ও পরিমাপ কর্তৃপক্ষের মোহর থাকা চাই। অন্য কোন রকম বাটখারা ব্যবহার করা বে-আইনী হবে।

অন্ধ্র প্রদেশ: বিশাখাপটনম, কৃষ্ণা, গুনটুর, কুরনুল, হায়দ্রাবাদ, ওয়ারাঙ্গল, নিজামাবাদ জেলাসমূহ এবং রাজ্যের সমস্ত নিয়ন্ত্রিত বাজারসমূহ।

আসাম: নওগাঁ জেলা এবং গৌহাটি শহর।

বিহার: ভাগলপুর ও রাঁচি ডিভিসন এবং পাটনা ও ত্রিহুত ডিভিসনের পৌর ও নির্দিষ্ট এলাকাসমূহ।

গুজরাট: আমেদাবাদ, রাজকোট ও বরোদা শহরসমূহ এবং রাজ্যের সমস্ত নিয়ন্ত্রিত বাজারসমূহ।

কেরালা: কোজিকোড, এরনাকুলাম এবং কুইলন জেলাসমূহ।

মধ্যপ্রদেশ: সেহোর, ইন্দোর, গোয়ালিয়র এবং জব্বলপুর জেলাসমূহ।

মাদ্রাজ: মাদ্রাজ, চিংগেলপুট, দক্ষিণ আরকট, উত্তর আরকট জেলাসমূহ এবং রাজ্যের সমস্ত নিয়ন্ত্রিত বাজারসমূহ।

মহারাষ্ট্র: বোম্বাই, পুণা, নাগপুর, ঔরঙ্গাবাদ, শোলাপুর, কোলহাপুর, আকোলা, অমরাবতী, ওয়ার্ধা, ইওটমল শহরসমূহ এবং রাজ্যের সমস্ত নিয়ন্ত্রিত বাজারসমূহ।

মহীশূর: বাঙ্গালোর, রাইচুর, ধারওয়ার জেলাসমূহ এবং রাজ্যের সমস্ত নিয়ন্ত্রিত বাজারসমূহ।

উড়িষ্যা: ব্রহ্মপুর, কটক এবং সম্বলপুর শহরসমূহ।

পাঞ্জাব: অমৃতসর, জলন্ধর, লুধিয়ানা, আম্বালা, পাতিয়ালা, গুরগাঁও জেলাসমূহ এবং রাজ্যের সমস্ত নিয়ন্ত্রিত বাজারসমূহ।

রাজস্থান: আজমীর, বিকানীর, যোধপুর, জয়পুর, কোটা ও উদয়পুর জেলাসমূহ।

উত্তরপ্রদেশ: মীরাট, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, বেরিলী, মোরাদাবাদ, বারাণসী, কানপুর, ঝান্সি, এলাহাবাদ ও গোরখপুর শহরসমূহ।

পশ্চিম বাঙলা: কলকাতা ও হাওড়ার পৌর এলাকাসমূহ।

দিল্লী: দিল্লীর সমস্ত এলাকা।

হিমাচল প্রদেশ: মণ্ডী ও সিরমুর জেলাসমূহ।

মণিপুর: ইম্ফল।

ত্রিপুরা: আগরতলা শহর।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ: পোর্ট ব্লেয়ার শহর।

পণ্ডিচেরী: পণ্ডিচেরির সমস্ত এলাকা।

*

নিম্নলিখিত শিল্প ও ব্যবসার লেনদেনে মেট্রিক পদ্ধতির ওজন ও মাপ ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক:

পাট, সুতী বস্ত্র, লৌহ ও ইস্পাত, ইঞ্জিনীয়ারিং, ভারী রসায়ন, সিমেণ্ট, লবণ, কাগজ, রিফ্রেক্টরিজ, অলৌহ ধাতু, রবার শিল্প, বনস্পতি, সাবান, পশমী দ্রব্য, তুলার অগ্রিম বিক্রয় বাজার এবং কফি বোর্ডের লেনদেনের ক্ষেত্রে।

মেট্রিক পদ্ধতি

সরলতা ও অভিন্নতার জন্য

ভারত সরকার কর্তৃক প্রচারিত।

DA 60|409

॥ চব্বিশ ॥

কেঁদে কেঁদে পাথর হয়ে গিয়েছে রুক্মিণী। আর কত সে কাঁদবে। বছরের পর বছর শীর্ণ আঙুলের কর গুনেছে—"সুবেদার সিং, যশবন্ত সিং, ধম্মন সিং, উনকে বাপ আউর তহসীলদার"—আর অঝোরে কেঁদেছে। সব গিয়েছে—"উসকে বাদ সব খতম্।" টিম টিম করে স্বামীর ঘরের প্রদীপ জ্বলছে মৈনী কারাগৃহের অন্ধকার মেলে। আজ নয় কাল, হয়তো দপ্ করে নিভে যাবে। তারপর, তারপর আর রুক্মিণীর নিজের বাঁচার কোনো দরকার নেই। এখনও নেই। তবুও বেঁচে আছে যদি, যদি "ভগবান কি কৃপা"য় তার চোখের মণি তহশীলদার ফিরে আসে। দিনের পর দিন সে ভোর বেলায় উঠে দাঁড়িয়েছে গাঁয়ের মোড়ে, অনেকদূরে দৃষ্টি দিয়ে দেখেছে—কৈ সেই কে যেন বলেছিল, কোথা থেকে এক "বাবা" আসবেন, তিনি তো এলেন না। তহশীলদারের ছেলে শ্যাম সিংকে জিজ্ঞাসা করেছে বারবার "বাবা" তো এল না। বুঝিয়েছে শ্যাম সিং, "বাবা" ঠিক দিনেই আসবে। রুক্মিণীর সমস্ত আশা, সমস্ত ভরসা ঐ "বাবা"র ওপর। যদি, যদি তহসীলদার ফিরে আসে। তা'হলে, তা'হলে কি করবে সে। ভাবতে পারে না রুক্মিণী। অঝোরে আবার কেঁদে ফেলে। কে তাকে বোঝাবে তহসীলদার বেঁচে গেলেও তার কাছে ফিরে আসবে না। যেদিন ফিরে আসবে সেদিন হয়তো রুক্মিণী থাকবে না।

তারপর "বাবা" এসেছেন সুদূরে উদিত-পুরায়। ছুটে গিয়েছে বাবার দর্শন করতে। বাবা নিজেও এসেছেন তার বাড়িতে। বাবার পায়ে লুটিয়ে পড়েছে সে নিজে। তহসীলদারের বউ আর নাতীনাতনীরাও 'বাবা'র পা জড়িয়ে ধরেছে। "বাবা" এত লোকের এত করছে আর তার ছেলের জীবন ফিরিয়ে দিতে পারবে না। তার স্বামীর সম্পত্তি খেড়া-রাঠোরের সেই "গড়হী" সে কি আর দেখতে পাবে না। তারপর 'বাবা' চলে গিয়েছে উদিতপুরা ছেড়ে। তার ছেলে, "দাউ"-এর চোখের মণি তহসীলদারের জীবন বেঁচে গিয়েছে কিন্তু সে তো তার কাছে ফিরে আসেনি। কই রুক্মিণীর চোখের জল ত এখন শুকোয় নি। পাথর সে অনেকদিনই হয়ে গিয়েছে কিন্তু সময়-ভারাক্রান্ত অগুনতি নির্মম দাগ-কাটা লোল চর্ম গাল বেয়ে তো অবিরাম ধারায় ঝরে চলেছে জল।

হ্যাঁ সেদিন, অনেকদিন পরে রুক্মিণী হেসেছিল। খুশীর জোয়ারে মন ভরে উঠেছিল। হাসতে হাসতে কেঁদেই ফেলেছিল। তার জীবনে এমন দিন আসবে রুক্মিণী কোনোদিন ভাবতেই পারেনি। সবাই এসেছে—সবাই। লুক্কা, কানহাই আরো সবাই। উদিতপুরায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে তারা গিয়েছে রুক্মিণীর বাড়ি। "মাজী" বলে লুটিয়ে পড়েছে তার পায়ে। লুক্কা আর কানহাইকে বুকের কাছে টেনে নিয়েছে রুক্মিণী, তারপর কেঁদেছে অঝোরে। নাতী-নাতনীদের ডেকে দেখিয়েছে, "লুক্কে, কানহাই"—"দাউ"-এর আদরের "বেটারা"। কানহাইকে কাছে টানতে গিয়ে রূপার কথা মনে হয়েছে আর "রূপে"র জন্য হাউ-হাউ করে কেঁদেছে বৃদ্ধা রুক্মিণী। "দাউ"-এর কথা বলেছে সবাই। মাজীর সঙ্গে কেঁদেছে লুক্কে আর কানহাই। অনেকক্ষণ থেকেছে "মাজী"র কাছে। কেন লুক্কাই ত বলল, "এ বাড়ি আমাদের তীর্থ"। তারপর বৃদ্ধা রুক্মিণী সবাইকে বসে খাইয়েছে। যখন তারা উদিতপুরা ছেড়ে চলে গিয়েছে—তার বুকটা হু হু করে উঠেছে। মনে হয়েছে—সব বুঝি আবার অন্ধকার হয়ে গেল।

দীর্ঘ পনেরো বছর পর আবার একদিন বৃদ্ধা রুক্মিণী সুদূর খেড়া-রাঠোড় গেল, সঙ্গে নাতি শ্যাম সিং, তহসীলদার-এর ছেলে। গাঁয়ে ঢোকবার সময় আর সে ঠিক থাকতে পারেনি। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছে। কত বদলে গিয়েছে তার অতি-পরিচিত খেড়া রাঠোড়। সব কিছুই বদলে গিয়েছে। রাস্তায় লোকে ভিড় করেছে তাকে দেখতে—মানসিং-এর স্ত্রীকে দেখতে। সব জানতে পেরেছে রুক্মিণী, সব সে শুনেছে। পনেরো বছর পরেও আগুন নেবেনি। গাঁয়ের ব্রাহ্মণরা এখন ভুলতে পারেনি সব কথা। কত প্রায়শ্চিত্ত আর সে করবে। কোনোদিন রুক্মিণী ভাবতে পেরেছে তাকে খেড়া রাঠোড়ে আসতে হবে মাথা নীচু

১৯৬০-৬১ সালে আপনার ভাগ্যে কি আছে?

আপনি যদি ১৯৬০-৬১ সালে আপনার ভাগ্যে কি ঘটিবে তাহা পূর্বাহ্নে জানিতে চান, তবে একটি পোষ্টকার্ডে আপনার নাম ও ঠিকানা এবং কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া পাঠাইয়া দিন। আমরা জ্যোতির্বিদ্যার প্রভাবে আপনার বার মাসের ভবিষ্যৎ লাভ-লোকসান, কি উপায়ে রোজগার হইবে, কবে চাকুরী পাইবেন, উন্নতি, স্ত্রী পুত্রের সুখ-স্বাস্থ্য, রোগ, বিদেশে ভ্রমণ, মোকদ্দমা এবং পরীক্ষায় সাফল্য, জায়গা জমি, ধন-দৌলত, লটারী ও অজ্ঞাত কারণে ধনপ্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয়ের বর্ষফল তৈয়ারী করিয়া ১।০ টাকার জন্য ভি-পি যোগে পাঠাইয়া দিব। ডাক খরচ স্বতন্ত্র। দুষ্ট গ্রহের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উপায় বলিয়া দিব। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা জ্যোতিষবিদ্যায় কিরূপ অভিজ্ঞ। মিথ্যা প্রমাণিত হইলে আমরা মূল্য ফেরৎ দিবার গ্যারান্টি দিই। পণ্ডিত দেবদত্ত শাস্ত্রী, রাজ জ্যোতিষী। (DC-3) জলন্ধর সিটি।

Pt. Dev Dutt Shastri, Raj Jyotishi, (DC-3)
Jullundur City.

...র ভয়ে ভয়ে, যাতে তার আসার জন্যে গাঁয়ে আবার কোনো গণ্ডগোল না হয়। শুধু সে কেন, কেউ কি ভাবতে পারতো যে, রুক্মিণী নিজে যেচে পণ্ডিত তলফীরায়ের বাড়ি গিয়ে তার বংশধরদের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের অনুরোধ করবে পুরানো কথা সব ভুলে যেতে। সব সে করেছে লোকের কথায়। কিন্তু কেউ কি ভুলতে পারে পুরানো কথা! সে নিজেও তো ভুলতে পরেনি। লোক-দেখানো লৌকিকতা গাঁয়ের কিছু লোকে করেছে কিন্তু রুক্মিণী বেশ বুঝতে পেরেছে, তাকে আর কেউ চায় না এখানে। আজ থাকতো যদি সে বেঁচে তাহলে! রুক্মিণী ভাবতেও পারে না তাহলে কি হতো। সব ঘটনা তার মনে আবছা আবছা ভেসে ওঠে। বদলে গেলেও খেড়া-রাঠোড় তাকে চিনিয়ে দিতে হয় না। এখানকার প্রতিটি গাছ, পাথর, প্রতিটি ধূলিকণা সে যে চেনে।

যখন তাকে এসে সবাই বুঝিয়েছিল সে খেড়া-রাঠোড়ে ফিরে যাক তার সম্পত্তি সে ফেরত পাবে, রুক্মিণী আনন্দের আবেশে বার বার করে কেঁদে ফেলেছিল। সে বোধ হয় শুধু এই দিনটা দেখবার জন্যেই বেঁচে ছিল। এতদিন পরে, কি তার দুঃখের

'গড়হী'র দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রুক্মিণী

অবসান হল। কিন্তু রুক্মিণী তো জানতো না যে, খেড়া-রাঠোড় আর সে খেড়া-রাঠোড় নেই।

ধক্ করে উঠেছিল বুকটা তার। আজ থেকে অনেক বছর আগে রুক্মিণী যখন প্রথম খেড়া-রাঠোড়ে এসেছিল সেই দিনটার কথা তার মনে পড়ে যায়। এসেছিল উদিতপুর থেকে বধূরূপে। গাঁয়ে এসেছিল নতুন "দুলহন্"—বিহারী সিং-এর ছেলে মানসিং-এর "আউরত"। গাঁয়ে হয়েছিল ধুমধাম, বেজেছিল বাজনা, পুড়েছিল বাজী। আর আজ সে এসেছে সেই খেড়া-রাঠোড়ে আবার সেই সুদূর উদিতপুরা থেকে—ডাকু মানসিং কি বুঢ়ী "বেওয়া" (বিধবা)। কোনো ধুমধাম হয়নি, কোনো বাজনা বাজেনি, কোনো বাজী পোড়েনি। শুধু পুড়েছে তার কপাল। কোথায় তার সম্পত্তি কোথায় তার সেই "গড়হী"? কই "গড়হী"র সামনের সেই বড় ফটকটা তো নেই। আর এই কি তার সেই "গড়হী"? হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছে বৃদ্ধা রুক্মিণী। "গড়হী"র কাছেও কেউ আজ যায় না। হাড়-পাঁজরা বের করা মড়ার মত রয়েছে শুধু ইঁট-পাথর-কাঠের একটা বিরাট জর্জর কাঠামো। থাকতে পারেনি রুক্মিণী, আছড়ে পড়েছে "গড়হী"র সামনে। আর তার ক্ষেত-খামার তো সরকারী আইনের মারপ্যাঁচে ডুবে কবে তলিয়ে গেছে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

আমার জীবনের সেরা গল্প বা রূপকথা!

ছেলেবেলা বুদবুদ ওড়াতাম সাবানের ফেনার। খড়ের মুখে, সাবানের ফেনায় আমার ফুসফুস-চোঁয়ানো বাতাসে ফুলে গোল হয়ে রঙিন হয়ে তারা কোথায় উড়ে চলে যেত। আর আসত না। তারপর একটু বড় হলাম। আনন্দের পিছনে প্রজাপতি ধরার আমোদে ছোটা। কত সুখের না পাপড়ি ছিঁড়েছি, কত খুশির ছবি পেনসিল ঘষে নষ্ট করেছি। নষ্ট করব বলে নয়, রঙ করব বলে। সেই সোনার ছবিও। বিলিতী রূপকথার বইটার খসখসে কাগজ আমার খুব মনে পড়ে, অনেক মনে পড়ে। —মেয়েটা সিঁড়ি দিয়ে ছুটছে। গলায় একরাশ স্ফটিকের মালা, কানে বেবেল্সি রিঙ্, আর কাঁচ কাঁচ পোশাকের তলায় চিকন চিকন শরীরের রেখা। একটা পা খালি। আর সিঁড়ির নীচে ছিটকে-পড়া একপাটি কাঁচের জুতো। —সে বই হারিয়ে ফেলেছিলাম, সে ছবি কতদিন দেখিনি।

তারপর একদিন তাদের খুঁজে পেলাম। বাবার কিনে-দেয়া প্রথম শাড়িটার সঙ্গেই কি তারা ঘরে এলো। আবার বিকেলেরা কি আশ্চর্য রঙিন। ছোটবেলাকার সেই হারিয়ে-যাওয়া বুদবুসগুলো ফিরে ফিরে আসছে। তাদের এখন বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখি, আর পালিয়ে যেতে দিই না। সেই গল্পগুলো, সেই গল্পটা একঝাড় রঙিন গ্যাস-ভরা বেলুনের মত আমি আকাশে উড়িয়ে দিয়েছি। সুতোগুলো কিন্তু পৃথিবীর ইঁটে বাঁধা। ইচ্ছে হলেই যাতে মাটিতে নামিয়ে আনতে পারি।

সেই শহরটা আমার বড় ভালো লাগে। আমি যেন তার রাত্রির আকাশ দিয়ে সোয়ালো পাখির মত উড়ে যাচ্ছি। ওপরে গভীর মানিক-নীল আকাশে সোনালী তারা-রুপোলী তারা। তারা দপ দপ করে জ্বলছে। মেঘগুলো যেন সুখদুঃখের তুলো। উড়ে যাচ্ছে। ওই নীচে, কত নীচে সেই শহর। উঁচু-নিচু বাড়ি। আলোয় ছায়ায় কত তেরছা, কোণা, চৌকো, চিকরি। কত ছাদ, কত গম্বুজ, কত চুড়ো। সবুজ বাতি জ্বলা সুখী চিলেকোঠা—এই শহর আমি। যতদিন যাচ্ছে গলিঘুঁজি বাড়ছে, জটিল হচ্ছি, সুন্দর-পুরোনো হচ্ছি।

কিন্তু সেই মেয়েটিও আমি। যে এই শহরেরই আঁকাবাঁকা, পাকানো পাকানো রাস্তার জিলিপীর প্যাঁচের শেষ প্যাঁচটিতে, যেখানে শহর একেবারে শোড়ো, যেখানে গলি একেবারে বন্ধ, সেইখানে ছোট্ট একটা পুরানো ঝুরঝুরে বাড়িতে থাকত। সেই বাড়ির ঘরগুলো শ্যাওলা-ধরা চৌবাচ্চার মত ঠাণ্ডা, পুরোনো আর সবুজ। সেই বাড়ির ঘরের মধ্যে মেয়েটি থাকত, তার মা থাকত, তার বাবা থাকত। দিনের বেলা সেই বাড়িতে তার বাবা দাড়ি কামাত, শব্দ করে দাঁতন করত, ঝপঝপ করে চান করত, পান চিবুতে চিবুতে আপিস যেত। তার মা রান্না করত, ঘর গুছোত, বাসন মাজত। আর তাকে নিয়ে আদর করত।

দিনের বেলা মেয়েটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচত। আরত রাতের বেলায়ও বুঝি আর সবার বাবার মত তার বাবা বাড়ি ফিরবে, তাকে পড়াবে, মার সঙ্গে গল্প করবে; তার মা মাথায় ঘোমটা দিয়ে জানালায় দাঁড়াবে, বাবাকে জলখাবার এনে দেবে, রাত্রিতে শোয়ার আগে গালে পান দিয়ে দরজা-জানলার শেকল টেনে টেনে দেখে সুখী সংসারটাকে রাতের পুতুলের প্যাঁটরায় শুইয়ে রেখে, নিজেও ঘুমোতে যাবে।—কিন্তু তা হত না। কত রাত হয়ে গেলে তার বাবা বাড়ি ফিরত। তার বাবার চিৎকার, গালাগাল অনেকেব কানে যেত। তার মার চাপা কান্নায় পাড়ার লোক জানালার খড়খড়ি তুলে দাঁড়াত; আর তার

এত লজ্জা হত, সে বালিশে মুখ গুঁজে থাকত। মাথায় বালিশ চাপা দিত। ভাবত সকাল হলেই বাঁচে। বুকের মধ্যে বালিশ চেপে মা বাবার ঘরের দরজা পেরিয়ে তার ঘরে চলে আসত। মা গুনগুন করে কাঁদত। মার কান্না শুনতে শুনতে সে এমন দুঃখের মধ্যে চলে যেত, যেখানে দুঃখের নিয়ম কড়া হতে হতে, কড়া হতে হতে হঠাৎ ছিঁড়ে গিয়ে একদম আল্‌গা হয়ে গেছে! রাত্রি তাকে কোলে নিয়ে একটা ঝিমঝিম ট্রেনে চেপে সকাল থেকে এতদূরে নিয়ে যেত, যেখান থেকে মনে হত, সকালে যাওয়া যেন স্বপ্নের মত মিথ্যেতে ফিরে যাওয়া। ঠিক তখনই জানালা দিয়ে ছোট্ট ছোট্ট চাঁদের আলোর খরগোশেরা তার চার পাশে লাফিয়ে লাফিয়ে নামত। তার হাতে গলায় গালে তাদের নরম নরম রোঁয়া ঘষত, আর ফিসফিস করে বলত, 'কাঁদিস নারে মণি, কাঁদিস নে।' দুঃখ ভোলানি চাঁদকে তার বালিশে পেয়ে, বালিশকেই চাঁদ ভেবে সে কত আদর করত। তার দুঃখের নিয়মেরা কেমন চাঁদের আলোয় ভিজে আল্‌গা হয়ে যাচ্ছে। একদম আল্‌গা হলেই এই ঘর কেমন টুক্‌ করে বদলে যাবে। ছোপছোপ চাঁদের আলো নিয়ে নীল নীল অন্ধকার দিয়ে কাদের সুন্দর হাত, এর তোরঙ্গ বাক্স, বিছানার রাশ ঢেকে খুলে যেমনটি হলে ঠিক মানায় তেমনটি করে যাবে। অমনি ছাদের টবে বেলফুলগুলো চন্দনের তারা হয়ে ফুটফুট ফুটে উঠবে আর তারার ঝাড়গুলো জমে জমে সেই ভালো পরী হয়ে নেমে আসবে। তার পোশাকে কত জরির ঝিরিঝিরি, তার হাতে সোনার যাদুকাঠি। মাকে সে নিমেষে রাজ-কন্যা করে দেবে আর বাবাকে একটা বিচ্ছিরি খুব বিচ্ছিরি বামন। রূপকথায় কত সহজেই রূপের ঠুনকোপনা বোঝানো যায়, কত সহজেই মানুষকে তার ভুল বুঝিয়ে সুখী করা যায়। তারপর বাবার যখন খুব অনুতাপ হবে, তখন সে কিরণমালা হয়ে...। ভাবত আর ভাবত।

সকালবেলা উঠে মণির মনে হত কি করে সে ঘুমোলো? তার মা ঘুমোলো? রূপ-কথা ছিল বলে? পৃথিবীর মানুষরা সব আধখানা। সব পথই অন্ধ গলি। কারা ওদের পুরো করে দেয়, অন্ধ গলিতেও দরজা ফোটায়......। পরীরা পরীরা।

নিশ্চয় মা রূপকথা ভাবত। মা তাই পরীদের সঙ্গে অন্ধগলির দরজা খুলে জ্যোৎস্নায় চলে গেল। আমাদের বাড়ির পেছনের পাঁচিলে যে ভাঙা ফাটল তার পরেই দোকানিদের পোড়ো ভিটে। ওইখান দিয়েই মা সেই দরজাটা পেয়েছিল। তাই আমি যখনই ওখানে দাঁড়াই রাত্রিকে আরো সুন্দর মনে হয়, জ্যোৎস্নাকেও। মা ওইখানকার সব কিছুতেই যেন ফোঁটা ফোঁটা হয়ে ছড়িয়ে গেছে।

এইখানে দাঁড়িয়েই একদিন দোকানীদের ইস্কুলে-পড়া ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করে-ছিলাম,

—এই তোর বাবা তোর মাকে মারে?

ছেলেটা আমার দিকে তাকিয়েছিল। অনেকক্ষণ।

—ছি, মণি, ও কথা বলতে নেই, কারুর কাছে বল্‌বি না।

—কেন তোরা ত সব শুনতে পাস, বল্‌না, তোর মাকে তোর বাবা......

ছেলেটা হাসত একটু। তারপর তাদের নতুন কোঠার দিকে চলে যেত।

আমি তখন কত ছেলেমানুষই না ছিলাম,......

ভাবলেও হাসি পায়।

মা মারা যাবার পর বাবা নতুন মাকে এবাড়িতে নিয়ে এল। নতুন মা আমাকে কষ্ট দেননি, আদরও করেননি। আমি সেই কাঁচের জুতো হারিয়ে যাওয়া মেয়েটার মত অত দুঃখী ছিলাম না। তাই আমার রূপ-কথারাও অত সুন্দর ছিল না। তবু শিশু-বেলাকে আমি জানতাম। মাঝে মাঝে কয়লা ভাঙতে ভাঙতে আমি কখনো চোখ তুলে চারিদিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেছি। বুক-চাপা জানলাহীন ঘরে ভেলভেটের রোঁয়ার মত মোলায়েম অন্ধকার। তিনটে লম্বা লম্বা ঘুলঘুলির আলোকিত দাঁড়ি থেকে ছড়িয়ে পড়া আলোর বিভা কোণের মাকড়সার জালে লেগেছে, স্যাঁতস্যাঁতে ঘাম-ওঠা দেয়াল পঙ্খের কাজের মত চকমক করছে, পাতলা মসলিনের মত জালগুলো দুলছে, তার মধ্যে আটকে আছে কাঁচপোকার কারুকাজ ডানা। নরম, সবুজ। বড় নরম, বড় সবুজ, আমরুল

শাকের ফাঁকে ফাঁকে মানুষকনে ছত্রাক। উদ্ভিদের গন্ধ, ভিজে লাল ধুলোর গন্ধ এরা আমার চোখের সামনে কত অলৌকিক ছবি খুলে দিত। সিন্ডারেলার কয়লার ঘরে বোধহয় ওই তিনটে আলোকিত দাঁড়িও ছিল না। তাই সে আমার চেয়েও ভালো রূপকথা ভাবতে পারত।

কয়লা ভাঙতে ভাঙতে ছোট্ট সিন্ডারেলা তার অসম্ভব বড় বড় চোখ মেলে তাকাত। অন্ধকারে তারারা তার মায়ের ছবি তৈরী করত। তার মায়ের ছবি আবার সেই পরীর ছবিতে মিশে যেত। তার ভাঁজ করা হাঁটুর চাপে পিষে যাওয়া বুকের পাঁজরের রেলিঙ আঁকড়ে রক্তে ভরা হৃৎপিন্ডটা ঘন ঘন দুলত, —ঠিক তখনি—কোথাও—কোন গলিতে, কোনো ঘড়িতে, কোনো ফিটন গাড়ির ধাতব ঘণ্টায় আওয়াজ উঠত। নাবিক-নীল আকাশে সোনালী তারা, রুপোলী তারা দপদপ করে জ্বলত, আর নিবত, এক ঝাঁক জোনাকি পোকার মত আবার তারারা ঝাঁক বেঁধে নেমে আসত কয়লার স্তূপের ওপর...... তারারা, তারারা......পরীরা, পরীরা......।

—যাবি সিন্ডারেলা, তুইও যাবি রাজপুত্তুরের রঙের মেলায় তুইও যাবি,

অমনি মাকড়সার জাল হয়ে যেত সবুজ হাওয়াই শাড়ি, সবুজ ভেলভেটের কাঁচুলি হত পাঁচিলের সবুজ শ্যাওলা আর কয়লা-মাখা পায়ে জ্বলত কাঁচের জুতো। তখনি হয়ত নতুন মা বলতেন—যাও ত মণি, দোকান থেকে ধারে এক পো তেল নিয়ে এস ত।

ঝাপ্‌সা লাগত। ধাক্কা লাগত আমার। আমি বাড়ির সামনের দোকানে গিয়ে দাঁড়াতাম। এত বড় মেয়েটা দোকানে এলে রকে বসা ছেলের পালে রসের ঘূর্ণি উঠত। মন্দির করা চিনি চাল ডালের ওপর দিয়ে কালা ছেলেটা আমার হাতে তেলের শিশি তুলে দিত। সেও হাসত। অদ্ভুত হাসত। হাসুক গে। বেচারীরা কিচ্ছু জানে না। কখন বারোটা বেজে গেছে। তাই আমার আঙুলে আবার কয়লা, আমার শাড়িতে আবার সেলাই, রোজ সন্ধ্যাবেলা যে রাজ-কন্যা চৌঘুড়ি চেপে দোকানের সামনে দিয়ে চলে যায় সেই আবার ছেঁড়া কাপড় পরে ছোট্ট দোকানে ধারে তেল কিনতে এসেছে। আমাদের বাড়ি থেকে একটু দূরে ওই তিনতলা বাড়িটায় থাকত রানী, রানীর বোন আনি, মীরা শেফালি...ওদের আমি হিংসে করতাম। ওরা আমায় করুণা করত। আমি যখন কয়লা ভেঙে রান্নাঘরে ঢুকতাম, ওরা তখন গা ধুয়ে বডি পাউডার মাখত। আঁট আঁট বিনুনি করে রঙীন ফিতের প্রজাপতি দুলিয়ে বাইরে আসত। অমনি সারা বিকেল সেই আশ্চর্য বাঁশীআলার মত ওদের ভুলিয়ে নিয়ে যেত, নাচিয়ে নিয়ে যেত। ওরা যত বাইরে বেরোত আমি তত ভিতরে ঢুকতাম। রান্নাঘরের পিঁড়িতে বসে ক্রমাগত উনুনে হাওয়া করতাম। আমার চোখ কালো কয়লার চারপাশের কমলা আগুনে লেগে যেত। সে উজ্জ্বলতা থেকে নড়তে পারত না। আমি জোর করে চোখ সরিয়ে যদি কখনো রান্নাঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতাম, দেখতাম পড়ন্ত বেলার কাঁচা-সোনা রঙের রদ্দুর বাইরে কুসুম ফুলের পরাগের মত উড়ে বেড়াচ্ছে। তার মধ্যে কার আবছা ছবি তৈরী হত। কোন হলুদ পরীর!

—যাবি সিন্ডারেলা,, তুইও যাবি,

না যাব না যাও,—এখন বুঝি ডাকা হচ্ছে—রাজপুত্তুরের আসরে কত গান হয়ে গেল, কত কথা হয়ে গেল তারপর আবার

দ্‌ চোখে ইচ্ছারা ঝিলিক দিয়ে উঠত— যাবো ত বল্লে, কি করে যাবো? আমার শাড়ি কই, গয়না কই......ততক্ষণে কড়ার সোনালী তেলের সব হলুদ ঝরে গিয়ে নীল ধোঁয়া উঠছে, আমি পাঁচফোড়ন ছেড়ে দিতাম। তারা ঘূর্ণিতে নৌকার মত অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াতো, আমি তরকারির সবুজ টুকরোগুলো ছেড়ে দিতাম। যত তাদের সবুজ মরে যেত, তত ঝড়ের মত শব্দ। জল ঢেলে যখন শব্দ থামিয়ে দিয়ে আবার জানালার দিকে তাকাতাম তখন হলুদ পরী চলে গেছে। জানলার ওপাশে বিকেলের হলুদে নীল মিশছে। ক্রমাগত নীল, আরো গভীর নীল। নীল আকাশের গায়ে গাঢ় কালো পাতা আঁকা লাউগাছের জাফ্‌রির ওপাশে দ্‌ একটি টল্‌টলে তারা। আঁধার হয়ে আসা রান্নাঘরে বসে ভাবতাম মায়ের কথা। মা নেই, আমার মা নেই। উনুনে থেকে গলগল করে ধোঁয়া উঠছে। আমার নিঃশ্বাস আটকে যেত, তবুও আমি উঠতে পারতাম না।

মাকে বলতাম—মা গল্প বলো।

—কোন গল্পটা মণি ?

—সেই যে কাঁচের জুতো।

—আমিও ওই গল্পটা ভালোবাসতাম।

আমি মার বুকের মাঝখানে শুকনো সাবানের গন্ধ পেতাম। মা' মা' গন্ধ। মার থলথলে মোটা শরীরটা যেন ঠাণ্ডা পাথর। মার নাকছবি লাগানো কচি মুখখানার জন্যে কষ্ট হত। চাঁদের আলোয় ভেজা পানখোয়া ফ্যাকাশে ঠোঁট দুটো নেড়ে মা গুনগুন করে গল্প বলত।

মার কথা মনে এলেই আমার ভয় করত। মার কাছে যারা বেড়াতে আসত সেই নীরা মাসিমা, সুধা মাসিমার কথা মনে এলেও ভয় করত। এত ভয় যে, আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পেতাম আমার যে বর হবে সে এই শহরের কোনো রাস্তার কোনো বাড়িতে বসে পায়রার ডানা ছিঁড়ছে, কুকুর ছানার গায়ে ঢিল ছুঁড়ছে......নিষ্ঠুরতার প্রথম পাঠ নিচ্ছে।

মণি, মণি,

নতুন মা ডাকছেন, আমি ওপরে উঠে যাচ্ছি। আজ শনিবারের বিকেল। বাবা আর নতুন মার বেড়াবার দিন। আর আমারও আজ, শনিবারের বিকেল। বাবা আর নতুন মা ছবি দেখতে যাবেন। এই শহরের ভাঙা-পোড়ো দিকটাকে পেছনে রেখে, অ্যালুমিনিয়াম-রঙা সেতুটা পেরিয়ে ওপাশের শহরে। ও'রা বেরিয়ে গেলে সদর দরজা বন্ধ করে এই পুরানো বাড়িতে আমি কি সুন্দর একলা হব।

রান্না হয়ে এলো। ভাতের হাঁড়ির মুখে ঢাকনাটা টুকটুক নড়ছে। ঢাকনাটা খুলে দিলাম। তারপর কৃষ্ণকলি গাছের পাশে বাঁধানো সিমেন্টের রকে স্থির হয়ে বসলাম। এবার উল্টো দিক দিয়ে ভাবি। এই জিলিপীর প্যাঁচের শেষ বিন্দুতে আমাদের বাড়ি। তার পর ছোট রাস্তা, সেজ রাস্তা, মেজ রাস্তা, সেতু, তার পর বড় রাস্তা, রাস্তায় অদ্ভুত আলোর সারি, কত গাড়ি, কত সিনেমা, কত ভিড়। আমি এখন বড় হয়েছি। আমি যদি যেতে পারতাম। বড়-হওয়া মেয়েদের ইচ্ছা কি করে আমার রান্নাঘরের মধ্যে দিয়ে এসে আমাকে খুঁজে বের করে আমার মনের কৌটোর ডালা খুলল? —আমি তবে মাকড়সারি জালের মত বেগম-বাহার শাড়ি পরতাম, উঁচু করে চুল বাঁধতাম, তাতে একথোকা লাল ফুল গুঁজতাম, তার পর যখন দোকানের সামনে দিয়ে যেতাম, পাড়ার নতুন বড়-হওয়া ছেলেরা বলত—এ কে কে? ....আমি কিন্তু তাদের দিকে তাকাতামও না, চলে যেতাম, সেই অনেক-কাণ্ডর মোহনায়, যেখানে আরো সুন্দর ছেলেরা থাকে। তাদের মধ্যেকার সুন্দরের মধ্যে সুন্দর ছেলেটি আমায় ডাকত,

—মণি, তুমি আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে?

—না, নতুন মা বকবে, বাবা বকবে......

তারপর চোখে ইচ্ছার ঝিলিক দিত,—তুমি আমায় ঠিক বারোটার মধ্যে ফিরিয়ে দেবে ত?'

আঃ, কি পাগল আমি, সত্যিই যেন এসব হচ্ছে, কথাটা আমি নিজের ঠোঁটে বলছি।

ছেলেরা এত খারাপ, তা-ও তাদের কথা ভাবছি......ভাবছি।

আমার গা থেকে এখন উনুনের আঁচ সরে গেছে। ভাত নামালাম। এবার আমি গা ধোব। খোলা উঠোন। সেখানে চৌবাচ্চা। তা হোক না। কেউ ত নেই। এখন আমি ইচ্ছে করলে চৌবাচ্চার দুদিনের বাসি হিম জলে নামতেও পারি। জল আমার বন্ধু। সখি। জলে নামলেই গান পায়। বিষম গান পায়। জলে কি গানেরা থাকে, না, গানেরাই জল হয়ে যায়; আমি যেন কিছুই বুঝতে পারি না। জল খালি আমার বুক বেয়ে শামুকের মত ওঠে। খোলা কাঁধে হাওয়া লাগে।

—যাবি, সিণ্ডারেলা যাবি?

—কি করে যাবো? গাড়ি চাই, ঘোড়া চাই, পোশাক চাই, গয়না চাই, কোথায় পাবো?

—নিয়ে আয় ঐ কুমড়োটা।

মা বলত, ওমা, যাদুকাটি ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতেই সেটা একটা সোনালী রঙের গাড়ি।......

জল আমায় খুব ঠাণ্ডা করেছে, খুব নরম করেছে, কত বিলাসী করেছে......

সারা শরীর ভিজে কাপড়ে মুড়ে আমি ওপরের সিঁড়ি দিয়ে ছুটছি। আমি আজ যেন কোথায় যাবো, কোনো রাজবাড়ি। আমি চলেছি, গাড়ির জন্যে কুমড়ো আনতে, ঘোড়ার জন্যে ইঁদুর আনতে?

বাক্সর ডালা খুলে শুধু শুধুই পরলাম বেগম-বাহার শাড়ি। আয়নায় বড় দাগ। আলোর বাল্বে ঝুল। পাওয়ার কম। তাই আমাকে দেখতে আরো ভালো লাগছে। আমি লাল কুমকুমের টিপ পরলাম, ঝুরো চুল দুলিয়ে দিলাম কপালে। কানে দোলালাম কালীঘাট থেকে কেনা ঝুটো মুক্তোর কানবালা। আয়নার কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালাম। আমাকে কি ভালো লাগছে!

তাই রাজপুত্তুর যেই বলল—তুমি আমার সঙ্গে নাচবে সিণ্ডারেলা—

রাজপুত্তুরের বাহুতে মাথা রেখে অমনি সিণ্ডরেলা জগৎ ভুলে গেল।

—আয়নার মধ্যে নিজের ছায়াকে রেখে আমি রাজপুত্তুর হলাম।

—তোমায় ভালোবাসি মণি, খুব ভালোবাসি।

আমার ঠোঁট মণির ঠোঁটের ওপর আলতো পড়ল। আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম।

মণিতে আমাতে গলাগলি করে ছাদে এসে দাঁড়ালাম।

—তোমার যদি কোনোদিন বর আসে, আয়নার ছায়া বলল।

—আমার মার কথা মনে হবে মণি।

—না, তুমি মার কথা ভুলে যাবে।

এই যে
রবিনসন্স
পেটেণ্ট'বার্লি
এসে গেছে!

দেখবেন, খোকাবাবু সবটুকু খেয়ে নেবে। রবিনসন্স পেটেণ্ট বার্লি গোরুর দুধের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে শিশুর কোমল পাকস্থলীতে দুধ চাপ বাঁধতে পারে না, কাজেই শিশুর পক্ষে হজম করা সহজ হয়। তাছাড়া, রবিনসন্স পেটেণ্ট বার্লি শিশুদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগায়, ওরা খেয়ে তৃপ্তি পায় আর এতে ওদের শরীরও গড়ে ওঠে।

এই বার্লিতে অনধিক
০.০২৮% আয়রন বি-পি
ও ১.৫% ক্রিটা প্রিপঃ-এর
সংমিশ্রণ আছে।

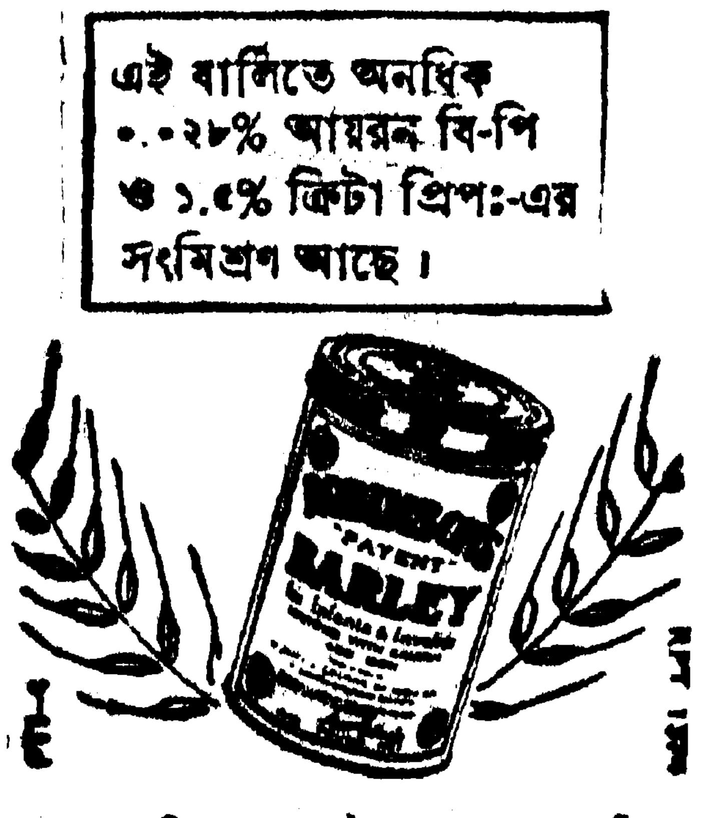

ক্যালসিয়াম ও লৌহ সংযোগে সুরক্ষিত

—না।

—তুমি জগৎ ভুলে যাবে।

—না, অমন কথা বোলো না।

—সবাই ভুলে যায়, তাতে লজ্জা নেই, তুমি বড্ড ছেলেমানুষ!

—তাই।

আয়নার ছায়া মাথা নাড়ে, তাই নয়? তাহলে বরের কথা ভাবো কেন? পুরুষের কথা ভাবো কেন? ভাবোনি তুমি রাজপুত্তুরের সঙ্গে দেখা হলে,......মনে করো ওই ত সামনের রাজপুত্তুর। তোমার পায়ে পা বেঁধে যাচ্ছে। তুমি সব ভুলে যাচ্ছো, লজ্জায় এতটুকু হয়ে যাচ্ছ—চিনেবাদামের ছোট্ট একটা খোলায় তোমায় এখন রাখা যায়। তোমার রাতের ঘুম গেল। আয়নার ছায়া হাসছে। রাজপুত্তুরের বাহুতে মাথা রেখে তুমি জগৎ ভুলে গেলে। রুনু মাসী সুধামাসীর দুঃখী মুখ ভুলে গেলে—মার মুখ ভুলে গেলে। পেটাঘড়ির বারটা বাজাতেও ভুলে গেলে।

কিন্তু সময় তোমার ভোলেনি। সে শোধ নিচ্ছে। তোমার জরির পোশাক ন্যাকড়া হয়ে যাচ্ছে। তুমি ছুটতে ছুটতে সিঁড়ি দিয়ে নামছো। কোথায় যেন তোমার একপাটি কাঁচের জুতো পড়ে গেল। তুমি ভয়ে কুড়োলে না। তুমি ছুটছো ছুটছো ছুটছো—

দরজায় কড়া নড়ছে। মা বাবা বাড়ি ফিরে এসেছেন। সত্যি কখন বারোটা বাজলো। এখন কাঁচের জুতো খোলা হল না। থাক, এখন শাড়ি খোলা, টিপ মোছা, আর ছুটে দরজা খুলে দেয়া, ও'রা যেন টের না পায় তুমি সেজেছিলে—

নতুন মা বাতাসে গন্ধ নিলেন—আমার তোলা এসেন্স মেখেছিলি বুঝি?

আমি চুপ করে রইলাম। তবু ধরা পড়ে গেলাম। রাতে খাওয়ার পাতে বাবা থু-থু করে তরকারি ফেলে দিলেন—নুন নেই, একদম নুন নেই।

নতুন মা অদ্ভুত হেসে বললেন—বুঝতে পারলে না এখনো, মণি তোমার বড় হয়ে গেছে। ......তার আর রান্না করায় মন নেই......

খাওয়া-দাওয়া চুকে গেলে আমি পাঁচিলের ফাটলে এসে দাঁড়ালাম। চারিদিক নিশুতি। চাঁদের আলোয় নিঝুম হয়ে আছে দোকানীদের পোড়ো ভিটে। ওপাশে ওদের নতুন কোঠাটুকু, রাত্রিতে শান্তিতে কেমন নরম ডুবে আছে। মার জন্যে আমি যদি সেই শান্তিটুকু চুরি করতে পারতাম। লণ্ঠন হাতে এদিকে আসছে ছেলেটা। ছেলেটাই আসছে। ও জানে, রান্না-খাওয়ার পর বাসন মেজে আমি এখানে একটু দাঁড়াই। এইখানটা মায়ের জন্যে কাঁদবার জায়গা......তা-ও হয়ত জানে। আমার কাছে এসে দাঁড়াল ও। ওর চোখের সাদা দুটো, রুপোলী কালো দুটো ঘোর আঁধার। ওর মুখের একপাশে লণ্ঠনের হলুদ আলো, অন্য পাশে চাঁদের নীল আলো। হাল্কা গোঁফের রেখা-ওঠা ঠোঁট দুটো কেমন থর থর কাঁপছে। ওর নাম অনন্ত। কিন্তু ওর নাম যদি নীলকমল হত। ...ওকে আমি বলব নাকি, ...আমি বলতেই গেলাম প্রায়।

—এই, জানো, আমি বড় হয়ে গেছি।

বলতে পারলাম না। ভয় হল। ছেলেটা যদি ছোটবেলার মত বলে—

—ছি, মণি, ওকথা কাউকে বলতে নেই!

আমি ছুটে ওপরে চলে গেলাম। ছন্দ

—আপনিও দ্রুত, নিশ্চিতভাবে ও নিরাপদে ব্যথা কমাতে

সারিডন-এর ওপর নির্ভর করতে পারেন

আপনার খুকু তার কষ্ট কমিয়ে দেবার জন্য আপনারই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আর সত্যই আপনি তা পারেন। কেননা সারিডন চটপট ব্যথা-বেদনা কমিয়ে দেয়... অথচ খুবই নিরাপদ।

সারিডন-এ অনিষ্টকারক কোন কিছু নেই, এতে হার্টের কোন ক্ষতি বা হজমের কোন গোলমাল হয় না। তার ওপর বিশেষ উপাদানে তৈরী বলে সারিডন আশ্চর্যরকম তিনটি কাজ দেয়—এতে যন্ত্রণার উপশম হয়, মনের স্বাচ্ছন্দ্য আসে ও শরীর ঝরঝরে লাগে।

মাথাধরা, গা ব্যথা, দাঁতের যন্ত্রণা ও সাধারণ ব্যথা-বেদনায় তাড়াতাড়ি আরাম দেয় সারিডন... সারিডন নিরাপদ বেদনা-উপশমকারী।

TVT 88

একটিই যথেষ্ট

একটি ট্যাবলেট ১২ নঃ পঃ

★ সারিডন স্বাস্থ্যসম্মত মোড়কে থাকে, হাতে ধরা হয় না

★ একটি সারিডনই প্রায় ক্ষেত্রে পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে একমাত্রা

★ সিকি থেকে আধখানা শিশুদের মাত্রা

একমাত্র পরিবেশক : **ভলটাস লিমিটেড**

থেকে উঁকি দিয়ে দেখলাম, ছেলেটা লণ্ঠন দোলাতে দোলাতে চলে যাচ্ছে।

ঘরে এসে শুলাম। আমার বিছানায় চাঁদের আলোর খরগোশরা আর আসে না।

খাটের হেলান-দেয়া ছত্রিগুলোকে সাঁজোয়া-পরা বীরপুরুষ বলে মনে হয়। চাঁদের আলো এখন শুধু নামহীন ঝরনার মত পড়ে আমার বালিশ-বিছানা ভিজিয়ে একাকার করে দেয়। জানলার ওপাশের আমড়া গাছটা গত বছর কেটে ফেলা হয়েছে। তাই খরগোশরা আসবে না। আমি উপুড় হয়ে শুই। আমি এপাশ-ওপাশ করি। আবার উপুড় হয়ে শুই। মাথার চুলগুলো উল্টে চেপে দিই। আমার ঘাড়ের চামড়ার ওপর হাওয়ারা কার নিঃশ্বাসের মত পড়ে। যেন চুলের শুঁয়োপোকাগুলো আস্তে আস্তে চামড়া কাটছে। আমি কানের কাছে কার যেন ফিসফিস শুনতে পাই—যাবি সিন্ডারেলা—যাবি?

তারপর আরো আছে।

রাজপুত্তুরের গল্প। এই বাড়িতে কত রাজপুত্তুর এল। কত সন্ধ্যায় কতবার, কত দিন, কত মাস।

মনে আছে—কত দিন আমি জানলায় দাঁড়িয়ে গলির বুক থেকে উঠে-আসা গ্যাসের সবুজ লণ্ঠনটাকে বললাম—জানো আজ আমার সেই কাঁচের জুতো ফিরে পাবো।

বাতিটা চোখ টিপল—যাঃ, সে ত রূপকথার গল্প—

মা বলত—রাজপুত্তুর কি পাগল হলো। সেই কাঁচের জুতো বুকে চেপে আছেই ত আছে।

তারপর চলল সব মেয়েদের জুতো পরাতে—কাউকে বাদ দিল না—কিন্তু কারো পায়ে জুতে—আর হয় না—

আমি আচমকা উঠে বসতাম—

মা বলত—কিরে মণি?

—আমার পা-কি খুব বড়?

মা আমাকে টেনে শোয়াত—আমিও ওকথা ভাবতুম রে—

গ্যাসের চালাক বাতিটাকে বলতাম—তুমি মরো, তুমি মরো—

গ্যাসের আলো চটুল মেয়েটার মত আমাকে জিভ্ দেখাত আর বলত—তুই মর্, তুই মর্—

রাজপুত্তুররা পছন্দের কাঁচের জুতো কখনো পরায়, কখনো পরায় না। কাঁচের জুতো পরানোটা যেন কিছু না। তার পরেই তাকিয়ে দেখে আমার আয়নার দিকে, শাড়ির দিকে। বাবাকে জিজ্ঞেস করে আমার সেসব গয়নার কথা, শাড়ির কথা।

আমি কাজল-পরা চোখে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। আরে আমাকে কেউ চিনতে পারছে না। বারোটা বেজে গেছে। তাই আমার শাড়ি, গয়না পরীর দেশে চলে গেছে, কিন্তু তবুও আমি সিন্ডারেলা। শুধু আমার বারোটা বেজে গেছে—

কথাটা নতুন মার মুখে শুনলাম।

যখন এত নকল রাজপুত্তুর এল, এত নকল রাজপুত্তুর যে, গলির মোড়ের বখা ছেলেগুলোরও গুনতিতে গোলমাল হয়ে গেল। তখনই একদিন দোকান থেকে নুন কিনে ফিরছি, নতুন মার গলা শুনতে পেলাম। বাবাকে বলছেন—এবার একটা দোজবরে-টরে দেখো, মেয়ের দিন-দিন যা হাড়গিলের মত চেহারা হচ্ছে, ও-মেয়ের আর বিয়ে-থাওয়া হবে বলে মনে হয় না, একেবারে চেহারার বারোটা—

আমার হাতের ঠোঙাটা ফেটে নুনগুলো ঝুরঝুর করে পড়ে যাচ্ছে। আমি দুহাতে মুখ চাপা দিলাম।

আমি এখন পাঁচিলের খাঁজে এসে দাঁড়িয়েছি। রাত্রি নিশুতি। অল্প অল্প বৃষ্টি। দোকানীদের নতুন কোঠাটা আবছা দেখা যায়। অন্ধকারে শান্তিতে ডুবে আছে। এপাশে পোড়ো ভিটেটা অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তবু বুঝতে পারছি, আকন্দ পাতাগুলো জলে ভিজে কেমন ভারি হয়ে নুয়ে পড়েছে। শিয়ালকাঁটার হলুদবাটিগুলো জলে টই-টম্বুর। মাটির ওপারে গর্ত থেকে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসা পিঁপড়েরা সাদা সাদা ডিম মুখে উঁচু নতুন ভিটের দিকে চলে যাচ্ছে।

মা বলছে—গল্পের শেষটা আগে হয়ে গেল, এবার যেটুকু ফেলে গেছি শুনবি মণি—

—হ্যাঁ মা, শুনব—

—বারোটা বাজার পর মেয়েটা যখন ফিরে এলো কেউ তাকে চিনতে পারেনি। ভিজতে ভিজতে, কাঁদতে কাঁদতে সে যখন বড় রাস্তা, মেজ রাস্তা, সেজ রাস্তা দিয়ে তার ঝুরঝুরে বাড়ির কয়লার ঘরে ফিরে এলো, তখন রাস্তায় যে লোকটা তাকে দেখেছিল, সে তাকে চিনতে পারেনি, তাই রাজপুত্তুর যখন বললে—হেঁগো এ-রাস্তায় কোন রাজকুমারীকে দেখেছ?

সে বলল—না ত, সে ত একটা পাঁশকুড়ুনি—

আমি চুপ করে ভিজছি। আমি ভিজব। এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকব। ও আসবে, দাওয়া থেকে লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে এদিকে আসবে। আমার মুখের কাছে লণ্ঠনটা তুলে

পরিবারের সকলের পক্ষেই ভালো

জীবাণুনাশক নিমতেল থেকে তৈরী, সুগন্ধি মার্গো সোপ কোমলতম ত্বকের পক্ষেও আদর্শ সাবান। মার্গো সোপের প্রচুর নরম ফেনা রোমকূপের গভীরে প্রবেশ ক'রে ত্বকের সবরকম মালিন্য দূর করে। প্রস্তুতির প্রত্যেক ধাপেই উৎকর্ষের জন্য বিশেষভাবে পরীক্ষিত এই সাবান ব্যবহারে আপনি সারাদিন অনেক বেশী পরিচ্ছন্ন ও প্রফুল্ল থাকবেন।

মার্গো সোপ

পরিবারের সকলেরই প্রিয় সাবান

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড, কলিকাতা-২৯

মেয়ে। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখব ওর ভুরুতে বৃষ্টি, ওর চুলের ঢেউ-এ ঢেউ-এ মানিক জ্বলছে, ওর মুখের একদিকে লণ্ঠনের হলুদ আলো, অন্যদিকে অন্ধকার। আমি তাহলে যেমন সব কথা ঢাকে বলি, তেমনি করে একথাটাও বলব —এই জানো, আমার বারোটা বেজে গেছে, হ্যাঁ নতুন মা-ও বলেছে......

ও সেই ছোটবেলার মত আমায় বলবে না, একবারো বলবে না—ছিঃ, মণি, ওকথা কাউকে বলতে নেই—

আকাশ কেঁপে বৃষ্টি এলো। কিছু যেন আর দেখতে পাচ্ছিনে। দেখ ত মা লণ্ঠনটা দাওয়া থেকে উঠল কিনা? যেন মনে হয়, দুলে দুলে এদিকে আসছে। আর কি কেউ কোনোদিন বলবে আমায়—যাবি—সিণ্ডারেলা, তুইও যাবি! —মা, তুমিও এইখান দিয়ে, বন্ধ গলির দরজা ফুটিয়ে পরীদের সঙ্গে চলে গিয়েছিলে, তোমার মণি কি সে-পথ খুঁজে পাবে না।

সর্বত্র গৃহিণীরা বলাবলি করছেন

- সার্ফে কাচলে বোঝা যায়

সাদা জামাকাপড়

কতখানি ফরসা হতে পারে!

সার্ফে কাচলেই বুঝতে পারবেন যে সার্ফ জামাকাপড়কে শুধু "পরিষ্কার" করে না, ধবধবে ফরসা করে। সার্ফে কাচারও কোন ঝামেলা নেই। সহজেই সার্ফের দেদার ফেনা কাপড়ের ময়লা টেনে বার করে, কাপড় আছড়াবার কোন দরকার নেই। আর সার্ফে কাপড় যা পরিষ্কার হয় তা, না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। এর কারণ সার্ফের অদ্ভুত কাপড় কাচার শক্তি! দেখবেন সার্ফে রঙীন কাপড়ও কেমন ঝলমলে হবে! সার্ফে সবচেয়ে সহজে আর সবচেয়ে চমৎকার কাপড় কাচা যায়। ধুতি, শাড়ী, ফ্রক, জামা, তোয়ালে, ঝাড়ন-এক কথায় বাড়ীর সব জামা কাপড় সার্ফে কাচুন—দেখবেন ধবধবে ফরসা করে কাচতে সার্ফের জুড়ী নেই!

সার্ফ দিয়ে বাড়ীতে কাচুন, কাপড় সবচেয়ে ফরসা হবে

SU. 12-X52 BO.

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

॥ ৬ ॥

লেখকদের সঙ্গে আর তাঁদের লেখার সঙ্গে পরিচয় আমাদের খুব ছেলেবেলা থেকেই। কত্তাবাবা, দাদামশায়, বাবার কথা ছেড়েই দিলুম, এ ছাড়া লেখক-সমাগম জোড়াসাঁকো বাড়িতে বড় কম হত না। আমাদেরও তাই শখ যেত লেখার। খুব ছেলেবেলা থেকেই। কিন্তু পারব কোত্থেকে? একে ছেলেমানুষ, তার উপর বিদ্যা-বুদ্ধির একান্তই অভাব। দাদামশাকে দুঃখের কথা জানালুম। গল্প লিখতে গেলে একটি প্লট দরকার। প্লট পাই কোথা থেকে?

দাদামশায় বললেন—এর জন্যে ভাবছিস? কেন, স্বপ্ন দেখিস্ না? স্বপ্নগুলো লিখে ফেল, দেখবি গল্প আপনি এসে যাবে।

এ এক নতুন কথা শোনালেন আমাদের দাদামশায়। আমরা ভাবলুম, সত্যিই তো, স্বপ্নগুলো অনেক সময় গল্পের মতোই আসে। গল্পের চেয়েও ভালো কোন কোন সময়। শুধু লিখে ফেললেই হল।

দাদামশায় বললেন—কাল সকালে যে যে স্বপ্ন দেখবে, চলে আসবে আমার বারান্দায়। স্বপ্ন লিখে তারপর শুরু করবে লেখাপড়া।

পরদিন সকালবেলা মাস্টারমশায় এসে দাদামশায় ব্যবস্থা দেখে তো থ। দু-তক্তা শ্রীরামপুরী কাগজ লম্বা-লম্বি চার টুকরোয় কেটে গঁদের আঠা দিয়ে পর পর জুড়ে রাখা হয়েছে। এতেই স্বপ্নের পর স্বপ্ন লেখা হবে। আর যেমন যেমন লেখা হবে তেমনি কোষ্ঠীর মত গুটিয়ে রাখা হবে। জিনিসটার নাম দেওয়া হয়েছে 'স্বপ্নের মোড়ক'।

আমরা সেদিন যে যা স্বপ্ন দেখেছি কেউ ভুলিনি। ঘুম-চোখেই চলে এসেছি এবং প্রাণপণে মনে রাখবার চেষ্টা করছি। স্বপ্নের তো প্রধান দোষই যে, ঘুম ভাঙলেই স্বপ্নটা পালিয়ে যায় আর মন থেকেও যায় মুছে। লেখাপড়ার আগেই স্বপ্ন লিখতে হবে দাদামশার হুকুম। লেখাপড়ার চেয়ে জিনিসটা অনেক ভালো, অনেক মজার। স্বপ্নের এখানটা ওখানটা ভুলে গেলে বানিয়ে দিলেও চলবে, কেউ ধরতে পারবে না।

মাস্টারমশায় বই গুটিয়ে বসে রইলেন। আমাদের একজনের পর একজনের স্বপ্ন লেখা চলতে লাগল। প্রথম উৎসাহে সকলেই কিছু বাড়িয়ে বাড়িয়ে লিখেছিলুম নিশ্চয়, কারণ, স্বপ্নের স্রোত সেদিন যেন আর শেষ হতে চায় না। অপটু লেখক সকলেই, বাংলা বানান-ই দুরস্ত হয়নি অনেকের। কাটাকুটি আর ঘন ঘন দোয়াতে কলম চোবানো, পড়াশুনার বদলে এ-ই চলল সেদিন সকালে। শেষে দাদামশায় বললেন—মাস্টারমশায়কে দিয়ে একটা স্বপ্ন লিখিয়ে নে।

আমরা ছাড়লুম না। স্বপ্নের মোড়কের প্রথম তারিখে মাস্টারমশায়কে দিয়ে লিখিয়ে নিলুম। পড়ার ঘণ্টা শেষ হয়ে গেল। বই খোলা আর হল না। স্বপ্নে স্বপ্নে ভরে গেল আমাদের শ্রীরামপুরী কাগজ আর আমাদের দক্ষিণের বারান্দা আর আমাদের পড়ার ঘণ্টা। এইভাবে শুরু হয় আমাদের স্বপ্নের মোড়ক। অনেকদিন চলেছিল সেই মোড়ক। দাদামশায়ও লিখেছিলেন তাতে। বড়রা অনেকে লিখেছিলেন। মাঝে মাঝে মোড়ক খুলে পড়া হত স্বপ্ন। দাদামশার একটা স্বপ্ন ছিল ভারি সুন্দর। দাদামশায় কোথা থেকে যেন একটা নতুন রকমের বীণা পেয়েছেন। সেই বীণাটা নিয়ে ছাদের এক কোণে বসে বাজাবার চেষ্টা করছেন। আকাশে কালো মেঘ। এলোমেলো হাওয়া। নৌকোর পালের মত ফুলে ফুলে উঠছে মেঘ আর মাঝে মাঝে যাচ্ছে ছিঁড়ে। সেই ছেঁড়া মেঘের মধ্যে দিয়ে সোনার সুতোর মতো থেকে থেকে রোদ এসে পড়ছে দাদামশায় কোলে। আর ঠিক তখনই বীণা উঠছে বেজে। বীণার তার থেকে সুর উঠছে কি আলোর রশ্মি থেকে ঝঙ্কার উঠছে বোঝা যাচ্ছে না। দাদামশার কোলে বীণা। হাত উঠছে পড়ছে। কখনও বেজে উঠছে বীণা, কখনও নীরব। মেঘে ঢাকা পড়ছে সূর্যের আলো। আবার বেরিয়ে পড়ছে ফুটো দিয়ে সোনার তন্ত্রীর মতো। এই স্বপ্ন। এরকম স্বপ্ন আমরা কখনও দেখতুম না। এ যেন একেবারে কবিতা। আমরা অনেকবার চেষ্টা করেছি দাদামশার মত স্বপ্ন দেখবার। কিন্তু পারিনি। পারব কোত্থেকে? স্বপ্ন কি আর চেষ্টা করে দেখা যায়? দাদামশার স্বপ্নগুলো হত সুন্দর সুললিত রচনার মতো আর আমাদের গুলো একেবারে বোদা। এ দুঃখ আমাদের বরাবর ছিল।

দাদামশায় বলতেন—ওরে আমি কি তোদের মত শুধু চোখ বুজে স্বপ্ন দেখি? আমি যে জেগেও স্বপ্ন দেখি। তোরাও দেখবি একদিন।

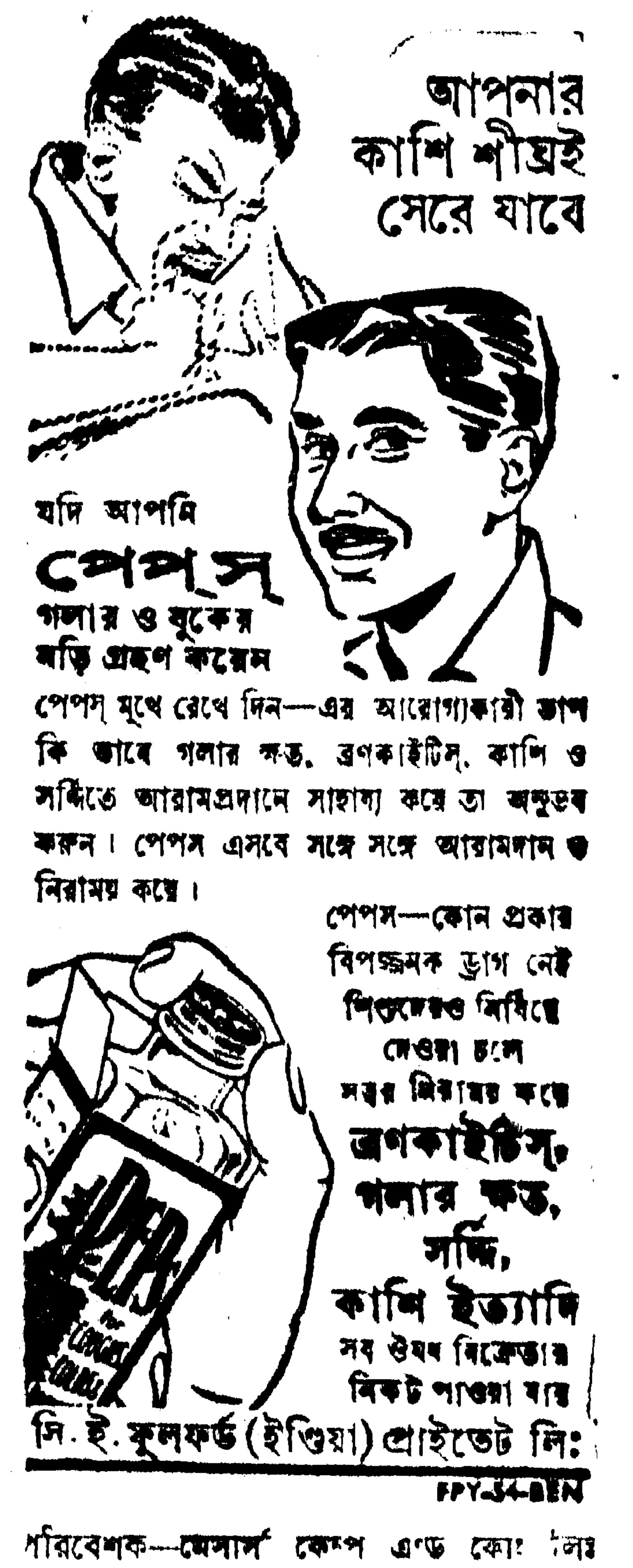

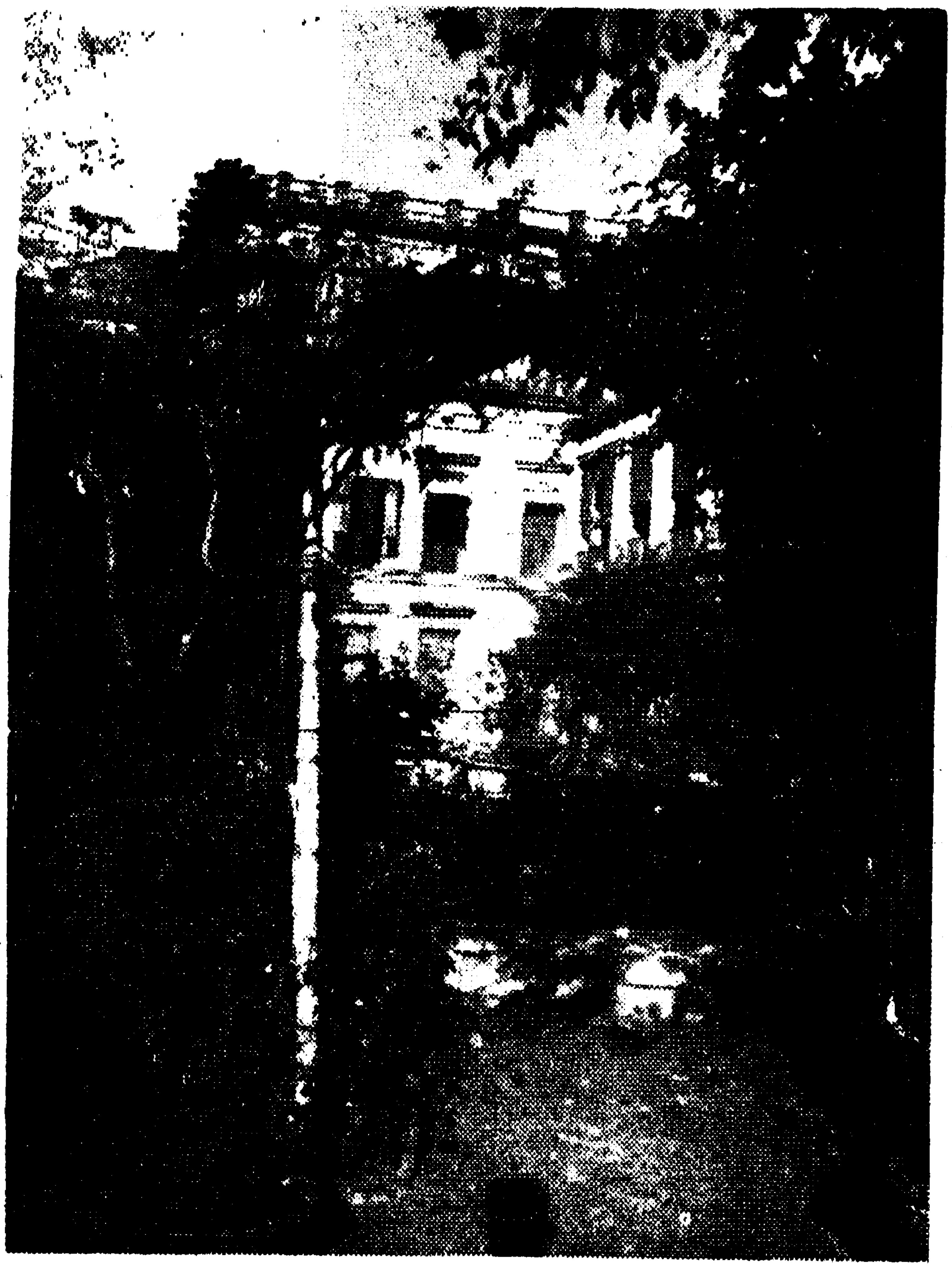

জোড়াসাঁকোর পাঁচ নম্বর বাড়ির বাগান

স্বপ্নের মোড়ক কিছুদিন চলবার পর তাতে আপনিই ভাঁটা পড়ে এল। স্বপ্ন লেখায় আমাদের হাত ততদিনে পেকে গেছে। আমরা তখন ঠিক করলুম আরও কিছু করবার। দাদামশাকে বললাম—আমরা একটা হাতের লেখা পত্রিকা বার করতে চাই।

দাদামশায় বললেন—বেশ তো। নাম দে দেয়ালা। কচি ছেলেরা দ্যায়লা করে—তাই হোক তোদের কাগজের নাম।

সঙ্গে সঙ্গে নাম পেয়ে যাওয়ায় আমাদের উৎসাহ বেড়ে গেল। আমরা তোড়জোড় শুরু করে দিলুম। আমাকে করে দেওয়া হল সম্পাদক। কাজেই সমস্ত কাজের ভার আমার উপর এসে পড়ল। খাতা বাঁধালুম একটা। মলাট দিলুম তাতে। মলাটের উপর যত্ন করে বড় বড় করে লিখলুম—দেয়ালা। তারপর দাদামশার কাছ থেকে একটা লেখা আদায় করলুম। দেয়ালা নাম দিয়ে দাদামশায় ছোট্ট একটি গল্প লিখে দিলেন।

................গাছ ঘুমোয়, গাছের পাতা ঘুমোয়, মাঠ ঘাট ঘুমোয়, মেঝেয় পড়ে কুঁড়ের মানুষ ঘুমোয়—সবাই স্বপন দেখে ছাওয়া তাদের বড় হয়েছে! সেই যে এতটুকুখানি ছাওয়া—যে মাঠের শেষ দেখতে চাইতো, পাখিদের সঙ্গে পাখি হয়ে উড়ে পালাতে চাইতো আকাশের শেষে—সে এখন সেই সব তেপান্তর মাঠের চেয়ে, সেই নীল আকাশের চেয়ে বড় হয়ে গেছে। ভয়ে গাছপালা মাঠ-ঘাটের গা ঝিম্‌ঝিম্ করতে থাকে আর এক একবার চমকে উঠে তারা স্বপন দেখে, দেয়ালা করে, হাসে, কাঁদে, চায় আর ঘুমোয়। অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে সাঁতরে চলে একটার পর একটা বাদুড় ছাওয়াকে খুঁজতে খুঁজতে দূর-দূর দেশে! সেই সময় চুপি-চুপি আলো আসে—একটু-খানি চাঁদের আলো—বাতাসের গায়ে আলো পড়ে, গাছের শিয়রে আলো পড়ে। ঘুমের ঘোরে সবাই বলে—ছাওয়া? ঘুম ভাঙানো পাখি ডেকে বলে—ওই যে আলো, ওই যে ছাওয়া! চমকে উঠে গাছ দেখে ছাওয়া!

তারপর—

................ছোট্ট গাছের ছাওয়া বলে গাছকে—আজ কি খবর?

গাছ বলে—আজ দেখেছি কি জানিস্?

ছাওয়া বলে—কি?

গাছ বলে—সেই আমাদের পাতায় ঢাকা কুঁড়ি আজ ফুটেছে।

ছাওয়া বলে—তারপর?

গাছ বলে—প্রজাপতি তাকে দেখতে এল সোনার ডানা মেলে।

ছাওয়া বলে—তারপর?

গাছ বলে—রোদ পড়ল তার গায়ে, বাতাস তাকে দুলিয়ে গেল।

ছাওয়া বলে—ওকে আমায় দে।

গাছ বলে—এই নে দেখ্ কেমন সুন্দর ফুল।

ফুলকে বুকে নিয়ে ছাওয়া বলে—ফুল!

ফুল কথা কয় না।

ছাওয়া গাছকে বলে—ফুল কথা কয় না যে?

গাছ বলে—ঘুমিয়ে আছে, জাগাস্ নি!

ফুল ঘুমিয়ে থাকে ছাওয়ার বুকে। ছাওয়া নড়ে চড়ে ফুলকে দেখে।

গাছ নড়ে-চড়ে শুধোয়—কি করছে?

ছাওয়া বলে—ঘুমুচ্ছে।

আর এক সময় বাতাস এসে ফুলকে ছুঁয়ে যায়, ছাওয়া বলে—দেয়ালা করছে আমাদের ফুল।

কুঁড়ের ঝাঁপ খুলে দেখে মানুষ—গাছের তলায় ঝরা ফুল, তার গায়ে ছাওয়া হাত বোলাচ্ছে। কুঁড়ের মানুষের ছেলেটা বেরিয়ে আসে, ফুল তোলে বেড়ার গাছে গাছে।

গাছ বলে—কি করবি ফুল নিয়ে?

ছেলে বলে—খেলা করব।

ফুল তুলে ছেলে চলে যায়। মেয়ে আসে। সে এতটুকু—গাছে হাত পায় না, ছাওয়ায় ছাওয়ায় ফুল কুড়িয়ে বেড়ায়।

ছাওয়া বলে—কি করবি ফুল নিয়ে?

মেয়ে বলে—ওকে মালায় গেঁথে ধরে রাখব।

ছাওয়া বলে—তারপর, খেলা হলে ফিরিয়ে দিবি তো?

মেয়ে—দোব না—বলে ফুল আঁচলে তুলে নেয়।

ছায়া তার পা জড়িয়ে বলে—নিয়ে যেও না।

গাছ বলে—যাক্ না নিয়ে, কাল সকালে দেখবি তোর ফুল পালিয়ে এসেছে তোর বুকে।

দিন কাটে, রাত কাটে, ফুলের স্বপন দেখে গাছ আর গাছের ছাওয়া দু-জনে মিলে। সকালের কুঁড়ি ফোটে গাছে, ফুল ফেরে ছাওয়ার কোলে।

এই হল দেয়ালার প্রথম গল্প। নকল করে ফেললুম তখনই।

দাদামশায় বললেন—তোরাও লেখ।

লেগে গেলুম আমরা সকলে কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে। লেখা যোগাড়ের কোনো

চিন্তাই রইল না সম্পাদকের। কাউকে তাগিদ দিতে হল না। সবাই হঠাৎ লিখিয়ে হয়ে পড়ল। বাবার কাছ থেকে লেখা আদায় করলুম। মাস্টারমশার কাছ থেকে লেখা আদায় করলুম। এমনি করে প্রায় দু-মাসের মতো রসদ জমে উঠল আমাদের।

লেখাগুলো নকল করছি। বৈশাখ মাসের দু-তিন তারিখ হয়ে গেছে। পাঠক পাঠিকারা সব অধৈর্য। সবাই একবার করে উঁকি মেরে যাচ্ছে আমার কাঁধের উপর দিয়ে আর জিজ্ঞেস করছে—কবে বেরবে দেয়ালার প্রথম সংখ্যা? প্রথম সংখ্যা ভাল করে বার করা দরকার, তাই সবকিছু যত্ন করে করতে হচ্ছে। কিছু কিছু ছবি এঁকে দিতে হচ্ছে এখানে ওখানে। এতেই দেরি হচ্ছে আরো। একদিন সারা দুপুর নকল করে বৈশাখ সংখ্যাটা প্রায় শেষ করে এনেছি, সেই সময় দাদামশায় হঠাৎ এসে বললেন—ওরে তোদের পত্রিকা ভরে গেল নাকি? একটা ধাঁধার জন্যে জায়গা রাখিস। পত্রিকা করচিস, ধাঁধা দিবিনে? নিয়ে যা একটা ধাঁধা। লিখে দিচ্ছি। এই বলে এইটে লিখে দিলেন।

ধাঁধা

হবুচন্দ্র ঘুম ভেঙে গবুচন্দ্রকে হাঁক দিলেন—মন্ত্রী, ও মন্ত্রী! দেখসে পশ্চিমে সূর্যোদয় হচ্ছে। মন্ত্রী ভাবলেন, রাজা দেয়ালা করছেন, তাই পাশ ফিরে নাক ডাকিয়ে চললেন। রাজা আবার ডাকলেন—মন্ত্রী, দেখ-সে আশ্চর্য ব্যাপার, পশ্চিমে সূর্য উঠছে। এমনি বার বার তিনবারের পর মন্ত্রী এসে বললেন—মহারাজ এ কি প্রলাপ বকছেন? রাজা বললেন—বিশ্বাস হল না? এই দেখ। এদিকে ঘড়িতেও ঠিক সকাল ছ-টা বাজল। গবুচন্দ্র ভাবতে ভাবতে চললেন—এ আশ্চর্য ঘটনা কেমন করে ঘটল?

ধাঁধাটা টুকে নিলুম। নিয়ে বললুম—উত্তর?

দাদামশায় বললেন—উত্তর এখন জানাবো না। ভাবুক সকলে। তারপর বললেন—আচ্ছা দে একখানা খাম। বলে এক টুকরো কাগজে উত্তরটা লিখে খামে মুড়ে আঠা দিয়ে সেঁটে দিলেন। বললেন—মাসের শেষে তবে খুলবি। এখন রেখে দে তোর ডেস্কে।

ধাঁধার সদুত্তর কেউ-ই দিতে পারল না। শেষে আমরা খাম ছিঁড়ে খুলে ফেললুম। খুলে দেখলুম উত্তরটা এইরকম—

হবুচন্দ্র রাজার ঘরে পশ্চিম দিকের দেয়ালে তাঁর ঠাকুরদার আমলের একখানা মস্ত আয়না টাঙানো ছিল।

এই উত্তরে অনেকে আপত্তি করেছিল। তারা বলেছিল, ঠাকুরদার আমোলের আয়না টাঙানো থাকলে রোজই তো পশ্চিমদিকে সূর্যোদয়ের ছবি দেখা যাবে। তবে হবুচন্দ্র হঠাৎ সেদিনই একথা বললেন কেন?

তার উত্তরে দাদামশায় বলেছিলেন—হবুচন্দ্র বলেই তো? নইলে আর হবে কেন?

দেয়ালা আমাদের বেশ রীতিমত জমে উঠল। দাদামশায় আর বাবার কাছ থেকে ভালো ভালো গল্প ও কবিতা আমরা পেতে থাকলুম। এইসব লেখা পরে মৌচাকে ছাপা হয়েছিল। বাবার লেখা 'পারম্পর্য' দেয়ালাতেই প্রথ বেরয়। দাদামশায় লেখা 'সহজ চিত্র শিক্ষা' প্রতি মাসে দফায় দফায় দেয়ালায় বার হত দাদামশার আঁকা স্কেচ সহ। আমাদের লেখা দাদামশায় একটু আধটু কাটাকুটি করতেন কিন্তু কখনও শোধরাতেন না। বলতেন, নির্ভয়ে লিখে যা।

এত নির্ভয় দিতেন যে, আমরা বেপরোয়া কলম চালিয়ে যেতুম। সাপ ব্যাং কি বেরচ্ছে সেদিকে লক্ষ্যই করতুম না। একবার শুধু গবামামার (শ্রীব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর) একটি কবিতা সম্পূর্ণ কেটে নিজে লিখে দিয়েছিলেন। সেটি কোথাও ছাপা হয়নি।

সেই যেখানে শীতের বাতাস
বইছে খরতর
বৃদ্ধ তমাল শাখা তাহার
কাঁপায় থরথর।
সেইখানেতে বনের তলায়
সন্ধ্যা আসে নামি
ফুরায় বেলা, সূর্য ডোবে,
স্বপন দেখি আমি।
নীল আকাশের সেই ওপারে
আলোক সাগর দোলে
সোনার গড়া মায়াপুরীর
উপবনের কোলে।
মনে করি ভাসিয়ে তরী
খুজতে চলে যাই
কার খোঁজে যে যেতে হবে
মনে কিছুই নাই।
হারিয়ে যাওয়া তারে খুঁজে
চলে আমার হিয়া
রঙিন সাঁঝে রঙে রাঙা
আলোয় সাঁতার দিয়া।

কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, ধাঁধা সব কিছুই আমাদের কলম দিয়ে বেরিয়ে চলল হু হু করে। এ সবের পিছনে ছিল দাদামশার আশ্বাস—নির্ভয়ে লিখে যা।

অরুদা (অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর) এসে সেই সময় রোজই বসতেন দক্ষিণের বারান্দায়। দাদামশায় বললেন—অরুদার কাছ থেকে তোদের ম্যাগাজিনের জন্যে লখা আদায় কর। অরুদার অনেক ভালো ভালো গল্প জানা আছে।

অরুদা-কে ছেঁকে ধরলুম আমরা। কিন্তু অরুদা চুপচাপ বসেই থাকতেন। তাঁকে দিয়ে কলম ধরানো যেত না। আমরাও ছাড়বার পাত্র নই। রোজই বলি—অরুদা আজ হল না, কাল কিন্তু চাই-ই চাই আমাদের লেখা।

একদিন সকালবেলা অরুদা এসে হঠাৎ বললেন—ওরে, লিখে নে, একটা ভালো ছড়া মনে পড়ে গেছে। তোদের ম্যাগাজিনের জন্যে বেশ হবে দাড়ির গান।

আমি লিখে ফেললুম—

আব্ দাড়ি চাপ্ দাড়ি
বুলবুলে চস্‌মেদার দাড়ি—
কুল পাক্কা এক কাঁচ্চা
সবুসে দাড়ি ওহি আচ্ছা
এক দাড়ি মান মনোহর
এক দাড়ি ভম্বো
এক দাড়ি খালিফ ফজিহৎ
এক দাড়ি ঠংঢো!
ইত্যাদি ইত্যাদি

দাদামশায় কাছেই বসেছিলেন। বললেন—দেখি দেখি নিয়ে আয় তো। অ্যাদ্দিনে অরুদার স্টক থেকে বেরল কিছু।

এই বলে অরুদার সেই দাড়ির গানকে অবলম্বন করে এক সুরসাল গল্প লিখে ফেললেন। দেয়ালার আমাদের রসদ হল। 'কাঁচায় পাকায়' নামে দাদামশার এই বিখ্যাত গল্প পরে 'মৌচাক'-এ এবং 'একে তিন তিনে এক' গ্রন্থে ছাপা হয়েছিল।

এর পর অরুদাকে দিয়ে পুরো একটা গল্প দেয়ালার জন্যে লেখাতে পেরেছিলুম। 'ফির্নি খাওয়ার গল্প' নামে তা পরে রংমশালে ছাপা হয়েছিল। অরুণেন্দ্রনাথের এ ছাড়া আর কোনো ছোট গল্প নেই।

বড়দাদামশায়কে (গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর) ধরেছিলুম দেয়ালায় ছবি দেবার জন্যে। ফস্ ফস্ করে চীনা কালিতে ছবি এঁকে বড়দাদা আমাকে দিতেন। সে ছবিগুলি এত চমৎকার হত যে, আমাদের দীন পত্রে সেগুলিকে আঠা দিয়ে জুড়ে নষ্ট করতে মন সরত না। ছবিগুলি জমিয়ে একপাশে রেখে দিতুম আর ভাবতুম কি করে দেয়ালার পাতে এগুলিকে দেওয়া যায়। শেষে আমরা ঠিক করলুম, কোনদিন যদি দেয়ালাকে ছাপিয়ে বার করতে পারা যায়, সেদিনই এই ছবিগুলি ব্যবহার করা হবে। এখন জমানো থাক।

বড়দাদামশাকে বললুম—বড়দা, তুমি বরং একটা গল্প লিখে দাও—হাতের লেখা দেয়ালায় অন্তত সেটা যাবে।

বড়দাদা বললেন—আমি কি আর গপ্প

ঔপনিষদ
চিত্রিতা দেবী প্রণীত (লীলা পুরস্কারপ্রাপ্ত)
নূতন উপনিষৎ সংযোজিত
বহু প্রতীক্ষিত ২য় সংস্করণ
মূল্য—৫ টাকা
প্রাপ্তিস্থান: শ্রীশঙ্কর পাবলিশার্স
১৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
ও অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

লিখতে পারি যে? ও সব অবনের কাজ।

আমরা বললুম—তা হবে না। অনুদা লিখেছেন, তোমাকেও লিখতে হবে।

দারুণ উৎসাহ তখন আমাদের। সবাইকে দিয়ে লেখানো, এই আমাদের পণ।

শেষে হল কি, আরম্ভের দিকে অত উৎসাহ সত্ত্বেও এক বছরের কাছাকাছি এসে আমাদের হাতের লেখা পত্রিকা বার করার উদ্যম ফুরিয়ে গেল। এবং শেষ সংখ্যা যখন আধখানা নকল হয়ে পড়ে আছে, আর এগচ্ছে না, সেই সময় বড়দাদামশায়ের কাছ থেকে পেলুম এক অপূর্ব রচনা—'দাদাভায়ের দেয়ালা'!

এ লেখা দেয়ালায় আর দেওয়া গেল না। এটা ছাপা হল শেষে শারদীয়া বসুমতীতে, এবং পরে ভোঁদড় বাহাদুর নামে সিগনেট প্রেস থেকে বই আকারে এটাই ছাপা হয়।

অনুদার মতো বড়দারও এটাই একমাত্র গল্প। দু-এরই জন্ম হয়েছিল আমাদের মতো ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেয়ালা করতে গিয়ে। (ক্রমশ)

একটি সাম্প্রতিক সংবাদে জানা গেল যে, অতঃপর রোগনির্ণয়ে আর এক্স-রে বা অন্যান্য মূল্যবান যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হইবে না, নাড়ী দেখিয়াই রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হইবে। এই প্রসঙ্গে বিশুখুড়ো একটি গল্প শুনাইলেন:—"এক কবরেজের কাছে একটি ছেলে আয়ুর্বেদ শিক্ষা করত।

তার শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ করবার জন্য কবরেজ মশাই যখন রোগীর বাড়ি যেতেন তখন ছেলেটিকেও সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কোন এক জ্বরের রোগীর জ্বরটা ফিরে এসেছে বলে কবরেজ চিন্তিত হয়ে তার নাড়ী দেখলেন। দেখে বললেন—কোনরকম কুপাথ্য করেছেন কি? রোগী বললে—না, তো। কবরেজ আবার নাড়ী টিপে বললেন—এই যেমন ধরুন আমটা আঁশটা খেয়েছেন কি? রোগী স্বীকার করল সে একটা আম খেয়েছে। ছাত্রটি গুরুর কৃতিত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। বাড়ি ফেরার পথে সে গুরুকে বলল—আপনার দয়ায় অনেক কিছুই শিখেছি। কিন্তু নাড়ী দেখে রোগী কি খেয়েছে না খেয়েছে বলা তা তো শিখিনি। গুরু হেসে বললেন—সব ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদ চলে না। মাঝে মাঝে একটু বুদ্ধি খাটাতে হয়। রোগীর শয্যার পাশে দেখলাম একটি আমের আঁটি পড়ে আছে। অনুমান করলাম আম খেয়েছে। এরপর ছাত্র একদিন একা এক রোগীর বাড়ি যায়। রোগীর নাড়ী টিপে সে বিজ্ঞের মতো বলে—কোনরকম কুপাথ্য করেছেন কি, এই যেমন ধরুন জুতোটা আঁশটা।—রোগীর শয্যার কাছে একজোড়া চটি জুতো পড়েছিল তা দেখেই এই অনুমান।" গল্প শেষ করিয়া খুড়ো বলিলেন—"মাগ্গি গণ্ডার বাজারে আর এক্স-রে করিয়ে খরচ না করলে তো সবাই বেঁচে যায়। তবে কথা, শুধু নাড়ী দেখে না ডাক্তার জুতোটা আঁশটা খাওয়ার কথা বলেন!!"

• • •

বৃটেনের এক কৃষি-গবেষণা সংস্থার জীব-রসায়ন বিভাগের অধ্যক্ষ বলিয়াছেন যে, আমিষ জাতীয় উপাদানে রূপান্তরিত

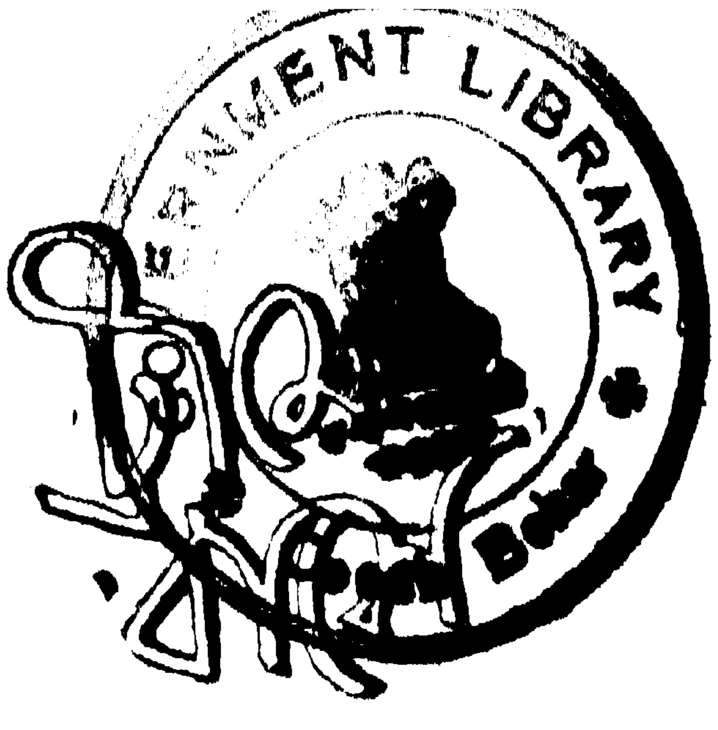

উদ্ভিদের সাহায্যে মানুষের খাদ্য চাহিদা মিটাইতে হইবে।—"গবেষণার প্রয়োজন হবে না। আমরা ইতিমধ্যেই কচু-কলমি দিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছি"—বলে শ্যামলাল।

• • •

সুপ্রীম সোবিয়েৎ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বের মহাবিদ্যালয়" মস্কোতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।—"বৃত্তি পেলে ভারত থেকে অনেক পড়ুয়া সেই ইস্কুলে ভর্তি হতে পারে; কালে তাদের সর্দার পড়ুয়া হওয়াও অসম্ভব নয়"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

ইংলণ্ডের সাদাম্পটনে জনৈক ব্যক্তি ৮৪ ঘণ্টা ১ মিনিট ৪২ সেকেণ্ড নাগাড়ে ড্রাম বাজানোর রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন।

—"কিন্তু এ আর এমন কী রেকর্ড। আমরা সারা জীবনভর নাগাড়ে নিজের ঢাক নিজে পেটানোতে হাত পাকিয়েছি"—বলেন বিশুখুড়ো।

• • •

মঃ খ্রুশ্চেফ রবিবারে নিউইয়র্ক যাত্রা করিয়াছেন। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন—"নিষ্ফলা বারটা বাদ দিয়ে যাত্রা করলেই পারতেন।"

• • •

আফ্রিকাতে কোন এক স্বামী আদেশ পালন করে না অজুহাতে স্ত্রীকে জেলে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।—"চালাক স্বামীরা অবশ্য জেলটা নিজের বাড়িতেই তৈরী করে রাখে, বিয়ের রাত থেকেই"—বলে শ্যামলাল।

• • •

হৃৎপিণ্ডের গোলযোগ সম্বন্ধে সতর্কী-করণের জন্য লণ্ডনে নাকি একটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে।—"কিন্তু মুশকিল হলো, হৃদয়ের সমস্ত গোলযোগ যন্ত্রে ধরা পড়ে না"—মন্তব্য করেন এক সহযাত্রী।

• • •

একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সংবাদে শুনিলাম, আগ্নেয়গিরি হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হইতেছে। খুড়ো

বলিলেন—"আগ্নেয়গিরির অভাবে আমাদের দেশে জ্বালামুখী বক্তৃতা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় কি না তা বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

• • •

ইঁদুরের মস্তিষ্ক হইতে ঔষধ আবিষ্কার করিয়া ঘোড়ার রোগ সারাইবার পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে।—"অনাবিষ্কৃত থেকে গেল শুধু মানুষের ঘোড়ারোগের ওষুধ, এ একেবারে শিবের অসাধ্য ব্যাধি"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

• • •

করাচীতে মেয়েদের নাইলন শাড়ি ব্যবহার বন্ধ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। শ্যামলাল বলিল—"কিন্তু প্রগতিবাদীরা আরো একটু এগিয়ে গিয়ে বলছেন—নাইলনে কিবা কাজ, ঢেকে দিব সব লাজ, সিন্ধুর জলে"—কবিতাটি আবৃত্তি করিয়া শ্যামলাল বলিল—"ছন্দ হলো না বটে কিন্তু কথাটা সত্যি।"

আবশ্যক

শালের জন্য আংশিক-সময়ের এজেণ্ট। বিস্তৃত বিবরণ ও বিনা-মূল্যের নমুনার জন্য লিখুন—
GIRSON KNITTING WORKS, LUDHIANA. (207).

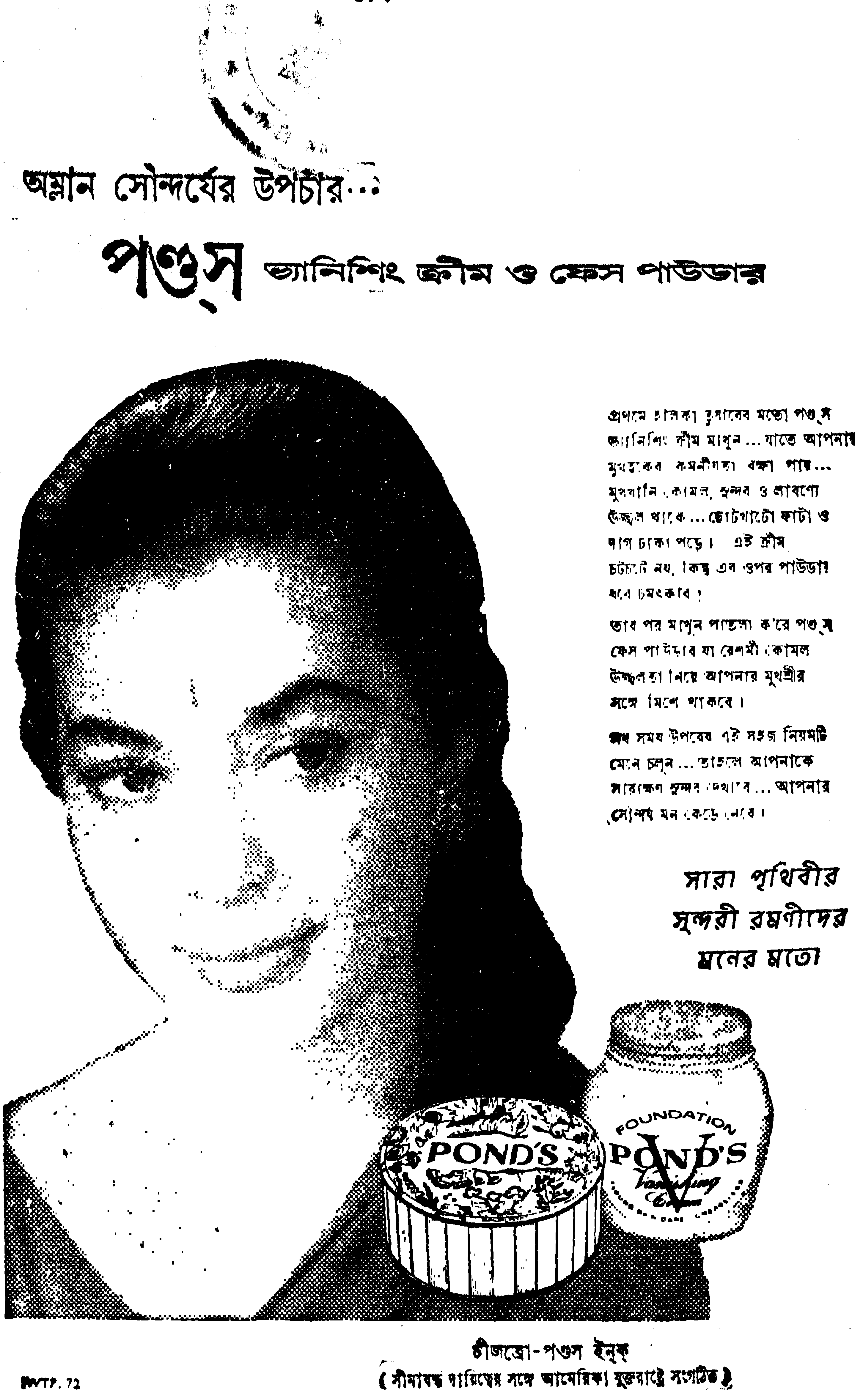
অম্লান সৌন্দর্যের উপচার...
পণ্ডস্ ভ্যানিশিং ক্রীম ও ফেস পাউডার
প্রথমে হালকা তুষারের মতো পণ্ডস্
ভ্যানিশিং ক্রীম মাখুন ... যাতে আপনার
মুখত্বকের কমনীয়তা রক্ষা পায়...
মুখখানি কোমল, সুন্দর ও লাবণ্যে
উজ্জ্বল থাকে ... ছোটখাটো ফাটা ও
দাগ ঢাকা পড়ে। এই ক্রীম
চটচটে নয়, কিন্তু এর ওপর পাউডার
হবে চমৎকার!
তার পর মাখুন পাতলা ক'রে পণ্ডস্
ফেস পাউডার যা রেশমী কোমল
উজ্জ্বলতা নিয়ে আপনার মুখশ্রীর
সঙ্গে মিশে থাকবে।
সব সময় উপরের এই সহজ নিয়মটি
মেনে চলুন ... তাহলে আপনাকে
সারাক্ষণ সুন্দর দেখাবে ... আপনার
সৌন্দর্য মন কেড়ে নেবে।
সারা পৃথিবীর
সুন্দরী রমণীদের
মনের মতো
POND'S
FOUNDATION
POND'S
Vanishing Cream
চীজব্রো-পণ্ডস ইনক্
(সীমাবদ্ধ দায়িত্বের সঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)
JWTP. 72

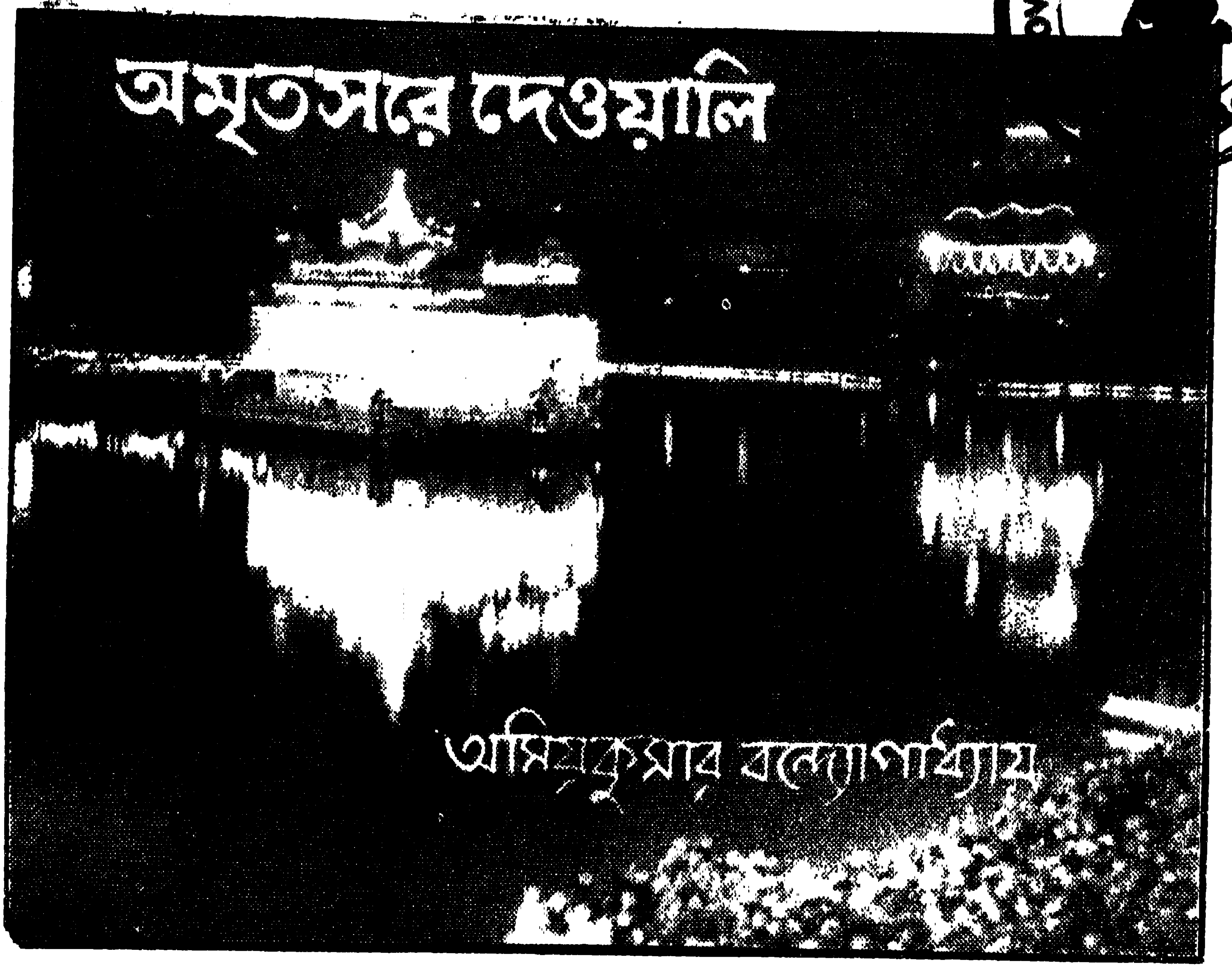

দীপ সজ্জিত স্বর্ণ-মন্দির

উত্তর ভারতের সর্বোত্তম উৎসব যে দেওয়ালি এ-বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। আর অমৃতসরে এই পরব নাকি এত জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় যে, তার অল্পবিস্তর বিবরণ কলকাতা থেকে বার হবার আগেই শুনেছিলুম। অতএব, ভ্রমণ-তালিকার কিঞ্চিৎ রদবদল করে, দেওয়ালির রাত্রিটা রাখলুম অমৃতসরের জন্যে। তামাম পাঞ্জাব সেদিন উৎসববেশে সমবেত হবে স্বর্ণমন্দিরের প্রাঙ্গণে। একটা গোটা সম্প্রদায়কে কাছ থেকে দেখতে পাবার এরকম সুযোগ সত্যিই দুর্লভ।

দেওয়ালির মরসুমে তাবৎ পঞ্চনদবাসীর অমৃতসরে উপস্থিতির কথাটা যে মিথ্যা নয় তার পরিচয় পেলুম আগের রাত্রে অমৃতসর স্টেশনে নেমে। প্ল্যাটফর্ম লোকে লোকারণ্য। পাঞ্জাবী আবালবৃদ্ধবনিতার সে এক চাপাচাপি ঠাসাঠাসি ভিড়। লটবহরের প্রাচুর্য দেখে মনে হয়, সকলেই দু' পাঁচদিন থাকতে এসেছে। পরশ্রমজীবিনী রঞ্জিত-অধরারাও যেমন সেই ভিড়ের সামিল, তেমনই আবার আছে ভারী নাগরা-পরা কিষাণ ঘরের বউ ঝি। অতীতে কোনকালে আকাশপথে বিদেশে ভ্রমণ করেছেন একথা জাহির করবার জন্য হাওয়াই-কোম্পানির ব্যাগ কাঁধে সুসজ্জিত যুবারও যেমন অভাব নেই, তেমনি উপস্থিত আছে চটে-বাঁধা মোট গাঁঠরি মাথায় দেহাতী জনতা। সে-ভিড় ঠেলে স্টেশনের বাইরে আসা এক বিরাট পর্ব। অনেক সময় নিয়ে, অনেক ঠেলা-গুঁতো খেয়ে, বাইরে বেরোলুম অবশেষে। কিন্তু নাজেহালের তখনও শেষ হয়নি। সাইকেল রিক্সা ভাড়া করে যে-হোটেলেই যাই সেখানেই স্থানাভাব। অনেক দূর থেকে খুব ক্লান্ত হয়ে এসেছি। যাহোক একটা আস্তানা না জুটলেই নয়। আর্তত্রাণ করলে "গ্র্যান্ড হোটেল"। স্টেশনের অদূরে শরণার্থীদের ভাঙাচোরা দোকান পাটের পিছনে মামুলি দোতলা বাড়ি। দোতলায় ছোট ছোট এক-কামরা ঘর; একতলায় রেস্তোরাঁ। যদচ্ছ থাকো খাও—কোন ঝামেলা নেই।

'গ্র্যান্ড হোটেলে'র সামনে যে-চওড়া রাস্তা সেখানে দেহাতী বাস এসে দাঁড়ায়। সারা-রাত অগণিত জনতার কলরবে বুঝেছি যে, পাঞ্জাবের দূর দূরান্তর থেকে জনস্রোত এসে পৌঁছচ্ছে অমৃতসরের সঙ্গমে। রাতটুকু তাদের কাটবে পথের ধারে যেখানে সেখানে নয়তো স্টেশন প্ল্যাটফর্মে বা স্বর্ণমন্দিরের প্রাঙ্গণে। আগামীকাল যে পরব হবে তার আনন্দের তুলনায় এই কষ্টটুকু কিছুই নয়। পরদিন প্রাতঃকালে একতলার "মতিমহল রেস্তোরাঁ"য় চা পান করে যখন স্বর্ণমন্দিরের দিকে রওনা হলুম তখনও পথের ধারের গাছতলায় ঘুম থেকে ওঠেনি অনেকে। এদিকে যাত্রী আগমনের বিরাম নেই। ট্রেনে বাসে উদ্‌গ্রীব দর্শনার্থীরা প্রতিনিয়তই এসে পৌঁছচ্ছে। অমৃতসরে দেওয়ালির উৎসব শুধু রাত্রিতেই নয়। আগন্তুকদের সারাদিন কাটবে স্বর্ণমন্দিরের প্রাঙ্গণে অথবা অন্য শিখ ধর্মস্থানগুলির আঙিনায়। অনেক সময় লাগবে স্বর্ণ-মন্দিরের পুষ্করিণীতে পুণ্যস্নানে। আরও বেশী সময় লাগবে গ্রন্থ-সাহেবের পাঠ শুনতে। বেলা যখন পড়ে আসবে, তখন অমৃতসরসের চারিদিকের প্রশস্ত চত্বরে এসে বসবে সেই জনতা। আশেপাশের ছাতে তিল ধারণের স্থান থাকবে না। সন্ধ্যা হলে স্বর্ণমন্দির ও সংলগ্ন ইমারতগুলি অলংকৃত করে জ্বলে উঠবে আলোর মালা। সরোবরের কালো জলে কম্পমান ছায়া পড়বে সে-দীপাবলীর। তারপরে শুরু হবে আতসবাজির উৎসব। মসীকৃষ্ণ আকাশের গা চিরে চিরে হাউইয়ের উজ্জ্বল রেখা উঠে যাবে দূর শূন্যে; তারপরে ফেটে পড়বে

সরোবরে প্রতিবিম্বিত স্বর্ণমন্দির

রঙিন আলোর ফুলঝুরিতে। ফুলঝুরি, তুবড়ি, হাউই, চর্কিবাজির ব্যাপক সমাবেশে বড় জলুস হবে আজ রাত্রে। আর, এহেন রঙিন জলুসে আগ্রহশীল নয় এমন জনতা ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে কোথাও নেই। উৎসব ভাঙতে রাত হবে অনেক। সিদ্ধকাম, পরিশ্রান্ত যাত্রিদল ধীরে সুস্থে ফিরে যাবে নিজ নিজ গ্রামে। আবার দিন গুনবে আগামী বছরের দেওয়ালির।

স্বর্ণমন্দিরের প্রধান ফটকে যখন এসে পৌঁছলুম তখনও বেলা বাড়েনি। প্রবেশ দ্বারে রঙিন রুমাল-বাঁধা বর্শা হাতে শিখ ভলাণ্টিয়ার। তাদের নির্দেশক্রমে, পাশের স্টলে জুতোজোড়া জমা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলুম। ভলাণ্টিয়ারেরা হুঁশিয়ার করে দিলে মাথা যেন অনাবৃত না থাকে; মন্দিরে বা ভিতরের প্রাঙ্গণে পাগড়ি, রুমাল, ওড়না, ঘোমটা, যা কিছু দিয়ে মাথা ঢাকা রাখতেই হবে, এই নিয়ম। আরও এক নিয়ম আছে। কিন্তু সে-সম্বন্ধে স্বেচ্ছাসেবকেরা সতর্ক করে দেয়নি বলে গুরুতর এক প্রমাদ ঘটেছিল সেদিন। কিন্তু সে-কথা এখানে নয়।

বাইরের রাস্তাঘাট থেকে অমৃতসরোবর ও তার চারপাশের পাথর-বাঁধান চত্বর অনেকটা নিচু। সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে হয়। সিঁড়ির দুপাশে ফুলপাতা নিয়ে দোকানীরা বসেছে। আজ তাদের খুব বেচাকেনার দিন। সিঁড়ি এসে শেষ হয়েছে সমতল প্রদক্ষিণপথে। পুষ্করিণীর চারিদিকে ঘুরে গেছে সে-পথ। তীর থেকে প্রায় ত্রিশ, চল্লিশ ফুট চওড়া হবে। সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতেই স্বর্ণমন্দির চোখে পড়েছিল। সেই প্রসন্ন প্রভাতের উজ্জ্বল সূর্যালোকে সোনালী আলো যেন মন্দির-শীর্ষ থেকে চারিদিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে মনে হল। ঘষামাজা করে খুব পরিষ্কার রাখলেও অমৃতসরের এই মন্দিরের উপরের দিকে যে স্বর্ণ-আবরণ আছে তা কিন্তু আসল সোনার নয়। পাঞ্জাবকেশরী মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহ তামার পাতের উপর গিল্টি করিয়ে দিয়েছিলেন। সাদা চোখে সোনার থেকে কোন পার্থক্যই নজরে পড়ে না। গিল্টি-করা তামার পাতে মন্দিরের ঊর্ধ্বাংশ অলংকৃত করবার রীতি শিখ ধর্মসমাজে বহুল প্রচলিত। ত্রাণ তারণ বা অন্যান্য প্রসিদ্ধ শিখ গুরুদ্বারায়ও এই রীতিটি অনুসৃত হয়েছে।

ব্যক্তিগতভাবে সোনাদানার প্রতি বিশেষ কোন আকর্ষণ অনুভব করিনি কখনও। কিন্তু নীল সরোবরের জল থেকে যদি সোনার দেওয়াল সোজা উঠে যায় উপরে এবং তার উজ্জ্বল সোনালী ছায়া তরঙ্গে তরঙ্গে ভেঙে ভেঙে পড়তে থাকে ক্ষণে ক্ষণে তবে সে-সোনার দাম অনেক। কথাটা আশ্চর্য শোনালেও আমার কাছে সত্য যে, স্বর্ণমন্দিরের গাঁথুনি থেকে তার ক্রীড়াশীল ছায়া আমাকে আকৃষ্ট করেছে অনেক বেশী। নীলে-সোনালীতে সে যেন এক অপরূপ জলকেলি। এই জলকেলি দেখতে তীরের কাছাকাছি এক গাছের ছায়ায় এসে বসলুম।

এ-কথায় কোন ভুল নেই যে, শিখ সম্প্রদায়ের কাছে অমৃতসর শুধু সর্বপ্রধান তীর্থক্ষেত্রই নয়, তাঁদের সমাজজীবন ও জাতীয় চেতনার একেবারে কেন্দ্র অধিকার করে আছে এই শহর, বিশেষ করে, এই মন্দিরটি, যাকে তাঁরা স্নেহভরে দরবার সাহেবও বলে থাকে। মুঘল আমলে শিখ জাতির উপর অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী সর্বজনবিদিত। শিখ ধর্মমতকে খর্ব করবার জন্য, উৎখাত করবার জন্য এই নির্যাতন-স্রোত বার বার প্রবাহিত হয়েছে মন্দিরটির দিকে। বিজয়ী তরবারির আস্ফালনে লুণ্ঠিত হয়েছে ধন-সামগ্রী, কলুষিত হয়েছে উপাসনার পুণ্যভূমি, অপবিত্র হয়েছে অমৃতসরসীর নীল জল। কিন্তু শত লাঞ্ছনায়ও শিখদের মনোবল ভাঙেনি। বিক্ষিপ্ত হীনবল শক্তিগুলি আবার এসে জড়ো হয়েছে এই শহর ও এই মন্দিরের চারিপাশে। আবার শুরু হয়েছে সংগ্রাম, স্বাধীন আদর্শে জীবন যাপনের সংগ্রাম। তীর্থক্ষেত্র ছাড়াও, আজকের অমৃতসর নানাবিধ সরকারী কর্মব্যস্ততা ও ব্যবসা বাণিজ্যের বিরাট শহর। কিন্তু শিখ সম্প্রদায়ের সকলের কাছে এ-শহরের সর্বোত্তম পরিচয় এক প্রতীক হিসেবে। পরবশ্যতার গ্লানি থেকে মুক্তিকামনার সে-প্রতীক প্রতিটি শিখেরই অতিশয় হৃদয়গ্রাহী।

অমৃতসরকে খুব বেশী দিনের নগর বলা যায় না যদিও কিংবদন্তী অনুসারে এ-শহর পৌরাণিক কালের। বৈবস্বত পুরাণে ইরাবতী ও বিপাশার মধ্যবর্তী স্থানে অমর কুণ্ড নামে এক হ্রদের উল্লেখ আছে। জনশ্রুতি এই যে, সে-হ্রদের দখল নিয়ে দেব

ও দানবের মধ্যে একটা তুমুল যুদ্ধ হয় কেননা এই সরসীর জল নাকি ছিল অমৃত তুল্য। উত্তরকালে এই অমৃত সরসীই অমৃতসরে রূপান্তরিত হয়েছে। এ-কাহিনী কিংবদন্তী-আশ্রিত, ইতিহাসে এর কোন সমর্থন নেই। ইতিহাস বলে, গুরু নানকের পূর্বে অমৃতসর এমন কিছু উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল না। তাঁর জীবদ্দশার কাল ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দ অবধি। এই সময়েই এ-শহরের পত্তন হয়। শিখদের প্রথম গুরু নানক সম্বন্ধে নানারূপ লোককথা প্রচলিত আছে: অমৃতসরের পত্তনও তার মধ্যে একটি। জনশ্রুতি এই যে, একদা গুরু নানক নিকটবর্তী এক গ্রামে এসে উপস্থিত হন। পথশ্রম দূর করবার জন্য এক রাখালকে তিনি একটু পানীয় জল আনতে বলেন। কাছাকাছি এক সরোবর ছিল বটে কিন্তু নিদারুণ গ্রীষ্মে তা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে রাখাল সেকথা জানালে। নানাক তবুও সেই জল-হীন সরোবরেই যেতে বললেন। আদেশ পালন করতে গিয়ে রাখাল দেখে যে, পুষ্করিণী অতি নির্মল সুপেয় জলে পরিপূর্ণ হয়েছে ইতিমধ্যে। সেই থেকেই অমৃতসরের খ্যাতি।

গুরু নানকের অলৌকিক শক্তির সঙ্গে এইভাবে জড়িত হয়ে শিখ সম্প্রদায়ের কাছে অমৃতসরের পবিত্রতা স্বীকৃত হলেও চতুর্থ গুরু রামদাসের পূর্বে রীতিমত শহরের পত্তন হয়নি এখানে। অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির ও সংলগ্ন পুষ্করিণী আজ যেখানে অবস্থিত সে-জমি আকবর বাদশাহ দান করেন গুরু রামদাসকে এবং তিনিই এই জলাশয় খনন করে তার মধ্যবর্তী মন্দিরটি নির্মাণ আরম্ভ করেন। শুরুতে সেজন্য অমৃতসরের নাম হয়েছিল রামদাসপুর। শিখদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে অনেক স্থানে এই নামেরই উল্লেখ আছে। বলা বাহুল্য, এ-আখ্যা বেশীদিন টেকেনি। পঞ্চম গুরু অর্জুন মন্দিরটি সম্পূর্ণ করেন ও পবিত্র সরোবরটি বাঁধিয়ে দেন পাথর দিয়ে। তাঁরই সময়ে জনসংখ্যার দিক থেকে অমৃতসর শহরের মর্যাদা লাভ করে।

গুরু অর্জুনের সময়েই মুঘল অত্যাচার শুরু হয় পাইকারিভাবে। পঞ্চম গুরু নিজেই লাহোরে মুঘলের কারাগারে প্রাণ দেন। নিরবচ্ছিন্নভাবে এই পীড়ন চলে দশম গুরু গোবিন্দের সময় অবধি। ইতিমধ্যে নির্যাতনের ফল ফলতে আরম্ভ করেছে। লক্ষ প্রাণে আর কোন শঙ্কা নেই: জীবন মৃত্যু তখন পায়ের ভৃত্য অগণিত শিখের। মুঘলের বিরুদ্ধে শিখদের এই ধর্মযুদ্ধে অমৃতসর বারংবার ব্যবহৃত হয়েছে প্রধান কর্মকেন্দ্র হিসাবে। গুরু গোবিন্দ ও বান্দার পরে যে ছ'টি মিছিল বা দলে শিখ যোদ্ধারা বিভক্ত হয়ে পড়েন

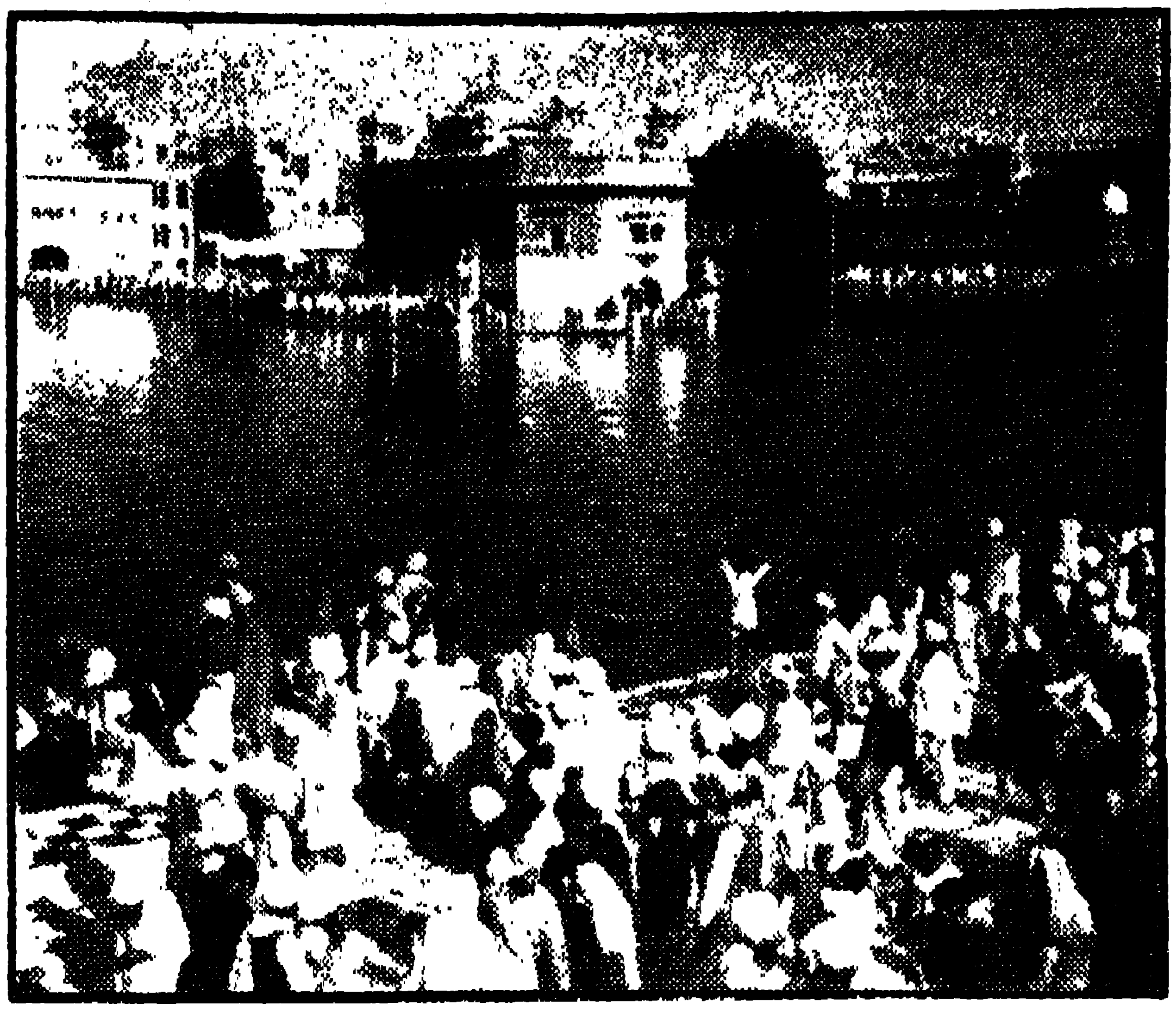

দেওয়ালির পুণ্যদিনে অমৃত সরোবরে স্নানার্থীর ভিড়

তাদের মিলনকেন্দ্র ছিল এই শহর। শিখদের সেকালের জাতীয় পরিষদের সভা স্বর্ণমন্দিরেই বসত। কালক্রমে দুটি বাৎসরিক উৎসবের সূত্রপাত হয় এখানে। একটি গ্রীষ্মে অনুষ্ঠিত বৈশাখী ও অপরটি হেমন্তে অনুষ্ঠিত দেওয়ালি। মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহ যখন পাঞ্জাবের একচ্ছত্র অধিপতি (১৮০১—১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ) তখন খুব বাড়বাড়ন্ত অমৃতসরের। লোকসংখ্যায় অমৃতসর তখন ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান শহর। অগণিত তীর্থযাত্রীর সৌজন্যে স্বর্ণমন্দিরও তখন ভারতের বিত্তশালী মন্দিরগুলির অন্যতম। উত্তরকালে এ-মন্দিরটির ধনাঢ্যতা বেড়েছে বই কমেনি। এই দেবালয়ের পরিচালনার ভার এখন একটি সুগঠিত সংস্থার উপরে ন্যস্ত। শিখ সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় এই সমিতিটি স্বর্ণমন্দিরের যাবতীয় কার্য সুনামের সঙ্গে পরিচালিত করে থাকেন।

ভারত-ইতিহাসে যে-সম্প্রদায়ের অবদান কিছুমাত্র নগণ্য নয়, তাদের সমাজ-জীবনের

স্বর্ণমন্দিরের প্রবেশদ্বারে জনতা

মর্মমূলে দেখতে এসেছি এই মন্দিরে। কালো জলে ক্রীড়াশীল স্বর্ণমন্দিরের সোনালী ছায়াকে যেন এক প্রতীক বলে মনে হল কিছুক্ষণ পরে। একদা শিখদের স্বাধীনতার সোনালী স্বপ্ন ঠিক এইভাবে টুকরো টুকরো হয়ে মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে। পরক্ষণেই আবার সে-স্বপ্ন রূপ নিয়েছে সাবেক উজ্জ্বলতায়। আবার ভেঙেগেছে। আবির্ভূত হয়েছে আবার। স্বর্ণমন্দিরের সদা-প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের মত সে-স্বপ্নকে কখনই নিশ্চিহ্ন করা যায়নি সম্পূর্ণভাবে। বজ্রসুকঠিন রাজ-শক্তিকে অবহেলায় অগ্রাহ্য করে শিখ যোদ্ধারা অনির্বাণ জ্বালিয়ে রেখেছে তাদের অন্তর-প্রদীপখানি।

পুকুর পাড়ের সেই গাছের ছায়ায় বিক্ষিপ্ত চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে কতক্ষণ বসে-ছিলুম মনে নেই। এইবার উঠতে হয়। গুরুদ্বারা প্রবন্ধক সমিতির সম্পাদকের কাছে কলকাতা থেকে চিঠি লিখে অনুমতি সংগ্রহ করেছিলুম যাতে শিখ গুরুদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র ও মন্দিরের ভিতরের ছবি তুলতে অসুবিধা না হয়। সম্পাদক মহাশয় অতিশয় অমায়িক। আমাকে এক শিখ ভলান্টিয়ারের হাতে জিম্বা করে দিলেন যে আমাকে সব কিছু ঘুরিয়ে দেখাবে। পুণ্যস্নানের সময় হয়েছে ইতিমধ্যে; স্নানার্থীর ভিড়ও বেড়েছে যথেষ্ট। স্বেচ্ছাসেবকটির পিছু পিছু সে-জনতায় মিশে গেলুম। ঘণ্টা দুয়েক ধরে ছায়ার মত সে আমার সঙ্গে সঙ্গে রইল। আমাকে নিয়ে গেল যাবতীয় দ্রষ্টব্য স্থানে। জনতার মধ্য থেকে বাছাই-করা মুখের ফটো নিতে যে কতবার সাহায্য করলে তার ইয়ত্তা নেই। অতি-উৎসাহী জনতাকে ক্যামেরার সামনে থেকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সরালে বারংবার। দুপুর যখন গড়িয়ে গেল, আমি তাকে যেতে বললুম। নিশ্চয়ই তার স্নানাহারের প্রয়োজন। আমার মত সতত চিউয়িংগামসেবী বলে তাকে ঠাওরাই কি করে। অতিশয় বিনয়ের সঙ্গে সে বিদায় নিলে।

ভিড় ক্রমশই বাড়ছে। পুকুরের চারপাশের প্রদক্ষিণপথে এখনও চলাফেরা করা যাচ্ছে কিন্তু কতক্ষণ যে যাবে তার স্থিরতা নেই। সরোবরের পশ্চিম তীর থেকে যে সরু পথ জলের উপর দিয়ে মন্দির অবধি গেছে তার প্রবেশদ্বারেই ভিড়টা সবচেয়ে বেশী। উৎসব বেশ সকলেরই, সকলেরি মাথায় রঙিন পাগড়ি। একটু উঁচু থেকে ছবি তুলতে পারলে এই নানা রঙের পাগড়ি যে ঠাসাঠাসি ফোটা ফুলের বাগানের মত দেখাবে এমন আন্দাজ করে উঠলুম গিয়ে কাছাকাছি এক পাঁচিলের উপর। ছবি তুলতে [illegible] ভিড়ের একপাশে দুটি শিখ তরুণকে লক্ষ্য করলুম—তারা উৎসাহের

সঙ্গে দেখছে আমার কাণ্ডকারখানা। নেমে আসতেই এগিয়ে এসে আলাপ করলে কৃপাল সিং ও যোগীন্দর সিং। লম্বা চওড়া চেহারা কৃপালের। জালে-বাঁধা দাড়ি, ঘাড়-লাগানো ফণা-তোলা পাগড়ি, বয়স চব্বিশ প'চিশ হবে। যোগীন্দরের চেহারাটা তত বলিষ্ঠ নয়, দাড়িও জালাবৃত হবার কৌলীন্য লাভ করেনি, বয়সও বোধ করি একটু কমই হবে।

শহরতলীর এক কারখানায় কাজ করে দুই দোস্ত। আজ ছুটির দিন; স্বর্ণ-মন্দিরের আশেপাশে ঘুরে বেড়াবার দিন। আমার সংগী হতে আপত্তি তো নেইই, প্রচুর উৎসাহ আছে। আর কলকাতার লোক তাদের এমন কিছু অপরিচিতও নয়। নিজেরাই এসেছে সেখানে দু'একবার। চেনা-পরিচিত, আত্মীয়-স্বজনও অনেকে সে-শহরে প্রবাসী।

মেলার মধ্যে ঘুরে ঘুরে উৎসবমুখর পাঞ্জাবের অনেকগুলি ভাল ছবি তুলতে সাহায্য করল যোগীন্দর আর কৃপাল।

বেলা যখন তিনটে তখন খিদেটা বেশ চাড়া দিয়ে উঠল। "মোতিমহল রেস্তোরাঁয়" সেই যে সকালে চা খেয়ে বেরিয়েছি তারপরে চিউইংগাম ছাড়া আর কিছু মুখে পড়েনি। কৃপাল বললে, চারটে নাগাদ স্বর্ণমন্দিরের সব ক'টি ফটকই বন্ধ করে দেওয়া হবে। ভিতরে ঢোকা মুশকিল হবে তখন। তার আগেই বাইরের দোকান থেকে কিছু খেয়ে আসা উচিত।

মন্দির এলাকার বাইরে এক সংকীর্ণ গলিতে মামুলি এক চায়ের দোকানে এসে বসলুম। সারাদিন ভিড়ের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেশ পরিশ্রম হয়েছে। আহারান্তে পকেট থেকে সিগারেট বার করে পরম পরিতৃপ্তি-ভরে ধরালুম একটা। কৃপাল যোগীন্দরের দিকে প্যাকেটটি প্রসারিত করতে গিয়ে দেখি তাদের মুখ গম্ভীর। হঠাৎ কি হল তাদের? ......কৃপাল বললে, ওই সিগারেটের প্যাকেট তোমার পকেটেই ছিল বরাবর? বললুম—হ্যাঁ। মন্দিরের ভিতরে যতক্ষণ ঘুরছিলে তখনও ওই সিগারেট ছিল তোমার সঙ্গে? অস্বীকার করলুম না। কিন্তু এতে আপত্তির কি থাকতে পারে? জিজ্ঞেস করলুম সে-কথা। থমথমে মুখে কৃপাল বললে, মন্দিরের চৌহদ্দির ভিতর তামাক নিয়ে যাওয়া একদম বারণ এ-কথা জানতে না তুমি? অকপটেই আমার অজ্ঞতা জ্ঞাপন করলুম। তবু প্রসন্ন হল না কৃপাল যোগীন্দরের মুখ। বললে, খুব খারাপ কাজ করেছ তুমি। যদি আমাদের সঙ্গে আবার মন্দিরে যাবার ইচ্ছে থাকে তোমার তবে ঐ সিগারেট, দেশলাই, তামাক যা কিছু আছে তোমার কাছে বাইরে রেখে যেতে হবে।

সংগী দু'টির আপত্তির গভীরতা ইতি-মধ্যে আন্দাজ করতে পেরেছি। বিনা বাক্যব্যয়ে দেশলাই আর সিগারেটের প্যাকেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলুম বাইরের রাস্তায়।......

তারপরে, কৃপাল যোগীন্দরের পিছু পিছু কোথা থেকে যে কোথায় গেলুম সঠিক মনে নেই। ঘড়িতে তখন সবে সাড়ে তিনটে, কিন্তু ফটক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মন্দিরের। সংগীরা বললে, এবছর ভিড়টা খুব বেশী; তবু ভিতরে ঢোকবার উপায় করতে হবে একটা। গলিপথে পেছু হটে আর একটা গেটের কাছে উপস্থিত হলুম। সেখানেও অগণিত লোক সরীসৃপের মত উঁচু লোহার ফটক পার হবার চেষ্টা করছে। ক্যামেরার ব্যাগ নিয়ে তাদের দৃষ্টান্ত অনু-সরণ করা নিতান্তই হঠকারিতা হবে। কৃপাল-যোগীন্দর কি একটু পরামর্শ করল নিজেদের মধ্যে। তারপরে, নানারকম ঘুরপথ পার হয়ে, একটা ইঁটের গাদা, কাঁটাতারের বেড়া ও নিচু এক পাঁচিল ডিঙিয়ে অবশেষে এক সময়ে নেমে পড়লুম মন্দিরের প্রাঙ্গণে। তারপরে সেই চাপাচাপি ভিড়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলুম তিনজনে। একটু নিরিবিলি, একটু উঁচু যে-কোনরকম একটা জায়গা আমাদের লক্ষ্য। সেখানে পৌঁছে ক্যামেরা বার করে বসা যাবে।

এরকম ভিড়ে সর্বত্রই যা হয়ে থাকে তাই হল হঠাৎ। একদিক থেকে একটা প্রবল চাপ ঢেউয়ের মত ভেসে এসে আছড়ে পড়ল আমাদের উপর। অনেকে উবু হয়ে পড়ল; আমরাও পড়লুম। প্রাণপণ শক্তিতে ক্যামেরার ঝোলাটাকে এক হাতে উঁচু করে ধরে বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগলুম সেটাকে; অন্য হাত মাটিতে। আরও দেরি হলে কি হত জানি না। ঠিক সেই মুহূর্তে এক বলিষ্ঠ বাহুতে আমার কোমর বেষ্টন করে আমাকে খাড়া করে তুলল কৃপাল। অন্য হাতে ক্যামেরার ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে ভিড়ের ওপরে সেটাকে উঁচু করে ধরল। এদিকে পাগলের মত লাথি ঘুঁষি চালিয়ে রোগা যোগীন্দর একটু পথ করলে সামনের দিকে। সেই পথে অতি কষ্টে বার হয়ে এলুম সেই জনারণ্য থেকে। ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে; চশমায় ঝাপসা দেখছি। কিন্তু—কৃপাল যোগীন্দরকে ধন্যবাদ—ক্যামেরার ঝোলাটার কোন ক্ষতি হয়নি।

ভিড়ের পিছনের সেই নিরিবিলি জায়গা-টুকুতে অনেকক্ষণ জিরোলুম। একটু

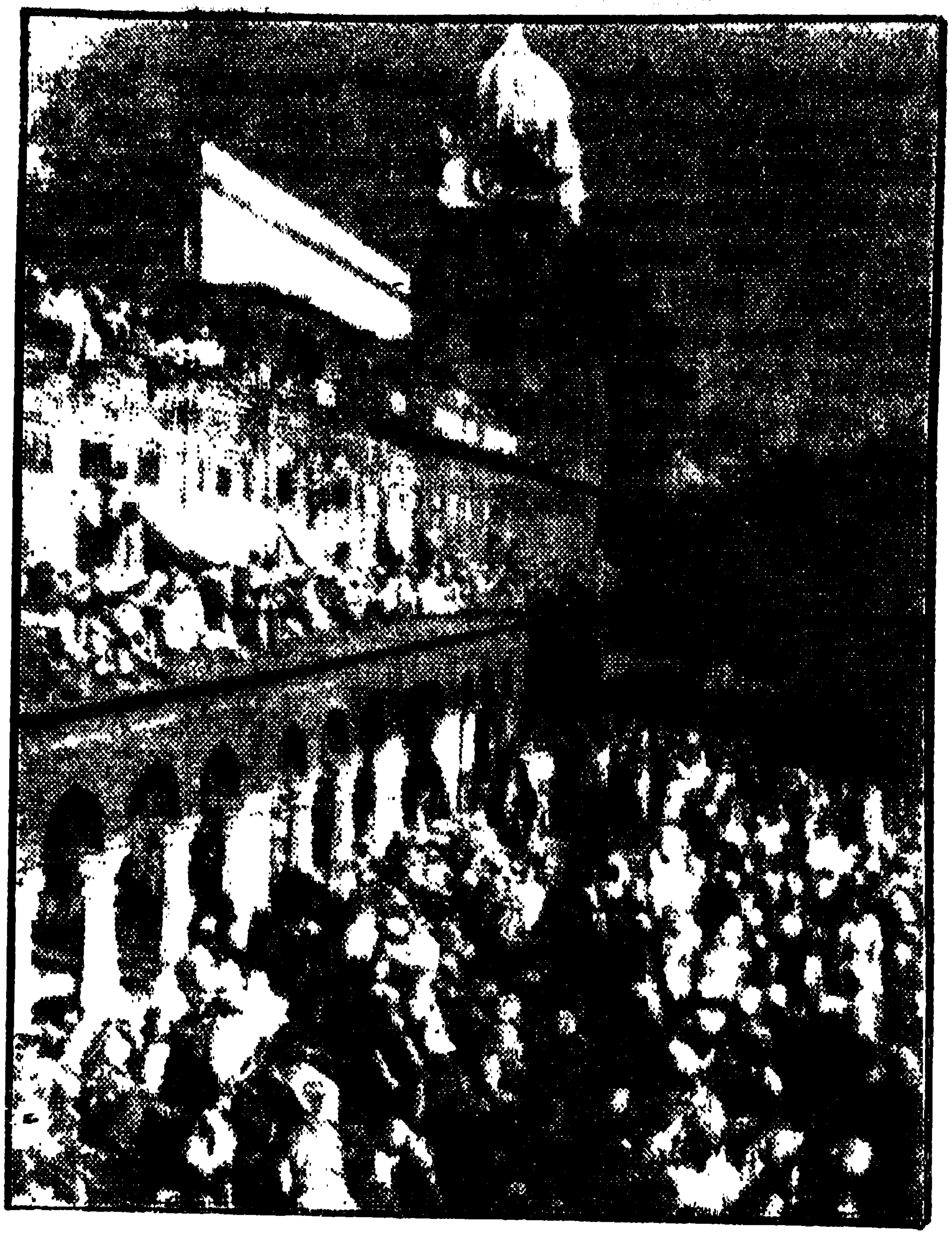

আতসবাজির অপেক্ষায় জনতার একাংশ

"টপ অ্যাংগল" থেকে দীপসজ্জিত স্বর্ণ-মন্দির ও সরোবরের জলে প্রতিফলিত ছায়ার যে-ছবিগুলি তুলব বলে আশা করেছিলাম তা এখন অলীক কল্পনা। আমাদের পিছনে তালাবন্ধ ফটক, সামনে পঞ্চাশ ফুট পুরু চাপাচাপি ভিড়। করবার কিছুই নেই। উসখুস করছে কৃপাল যোগীন্দর। আমার অভিলাষ তারা বিলক্ষণ জানে।

হঠাৎ পাশের বাড়ির ছাতে যোগীন্দর তার এক দোস্তকে আবিষ্কার করলে। এদিকটায় মন্দির-প্রাঙ্গণের ভিতরেই কয়েকটি দোতলা বাড়ি। কিন্তু প্রাণপণে চিৎকার করলেও দোস্ত শুনতে পায় না; সেই বিশৃঙ্খল জনতার এতাদৃশ গণ্ডগোল। বেগতিক দেখে আমার নোটবইয়ের পাতা ছিঁড়ে নিয়ে চটপট এক চিঠি লিখে ফেলল। তারপরে এক ঢিলে মুড়ে সে-চিঠি ছুঁড়ে দিলে ছাতে। বললে, লিখলুম, বাংলাদেশ থেকে আমাদের এক অতিথি এসেছেন; যে কোন উপায়ে তাকে ওপরে তোলবার ব্যবস্থা করতেই হবে। অদৃষ্ট প্রসন্ন সন্দেহ নেই। দোস্ত এসে বাড়ির পিছন দিকের এক দরজা খুলে দিলে আর আমরা তিনটিতে অবলীলাক্রমে ছাতে উঠে এলুম।

কী অপূর্ব দৃশ্য যে দেখলুম সেখান থেকে। পুষ্করিণীর চারিদিকের চত্বরে জনতা তৎক্ষণে থিতিয়ে বসেছে। লক্ষ লক্ষ রঙিন পাগড়ির সে এক অতি অপরূপ মোজায়েক। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। একটু পরেই এই রঙিন বিন্দুর রাশি অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে। তখন শুরু হবে আতস-বাজির ফুলঝুরি। আর জ্বলে উঠবে আলোর মালা স্বর্ণমন্দিরের গায়ে, আশে-পাশের বাড়ির ছাতে। পুকুরের কালো জলে সে-আলোর ছায়া মৃদু শিহরণে কাঁপবে।......

কিন্তু যে-রকমটি ভেবেছিলুম সে-রকম হল না মোটেই। হঠাৎ এক সময়ে স্বর্ণ-মন্দিরের সর্বাংগে রঙিন বৈদ্যুতিক বাল্ব জ্বলে উঠল দপ্ করে। আমি এত সেকেলে যে, বিজলীবাতির সমারোহকে দীপাবলী বলে ভাবতে মন এখনও হোঁচট খায়। এই কৃত্রিম আলোকসজ্জায় মন্দির পরিচালকদের বিত্তের পরিচয় যতটা পেলুম, চিত্তের ততটা নয়। কিন্তু আপসোস করে লাভ কি! আধুনিকতার প্লাবনে সেকেলে অভিলাষ সবই তো ভেসে যাচ্ছে চারিদিকে।

দেওয়ালির রাত্রির সংগে আলোয় আঁধারে মেশা একটি কমনীয় মুখের ছবি জড়িয়ে আছে আমার মনে। প্রদীপের মৃদু আলোয় উদ্ভাসিত সে-মুখ। ঠিক উদ্ভাসিত নয়, অন্ধকারের আবরণ যতখানি থাকলে মুখশ্রী রহস্যময়, অনুপ্রেরণাময় হয়ে উঠে সে-মুখে তাই ছিল। এইরকম এক দীপান্বিতায় কোমল দুটি হাতের স্পর্শে একটি একটি করে জ্বলে উঠতে দেখেছিলুম এক সারি প্রদীপ। আর দেখেছিলুম সেই আনত মুখটিতে দীপশিখার প্রতিফলন। একটু ভীরু আশা ছিল মনে। স্বর্ণমন্দিরের দেওয়ালে কার্নিশে বুঝি বা ঘৃতের প্রদীপ তেমনইভাবে জ্বালান হবে। হল না।......

তারপরে অনেক রাত্রি অবধি রাশি রাশি ফুলঝুরি, হাউই তুবড়ি আকাশের কাল আঙিনায় নানা নকশার আলপনা আঁকলে। নিচের সোল্লাস জনতা হাততালি দিলে, আনন্দধ্বনি করলে বহুবার। সেই রঙিন তামাশারও শেষ হল এক সময়ে। ধীরে ধীরে ভিড় সরতে লাগল। আমরাও ছাত থেকে নেমে এলুম। মন্দিরের বাইরে সরু গলিতে এক সাইকেল রিক্সায় আমাকে সওয়ার করে বিদায় নিল কৃপাল যোগীন্দর। তাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ দিয়ে হোটেলের পথ ধরলুম।

রিক্সায় বসে আমার মনে সেই মুখখানি ভাসতে লাগল যে-মুখখানি অনেকদিন আগে দেখেছিলুম এক দীপাবলীর রাত্রে।

[আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত]

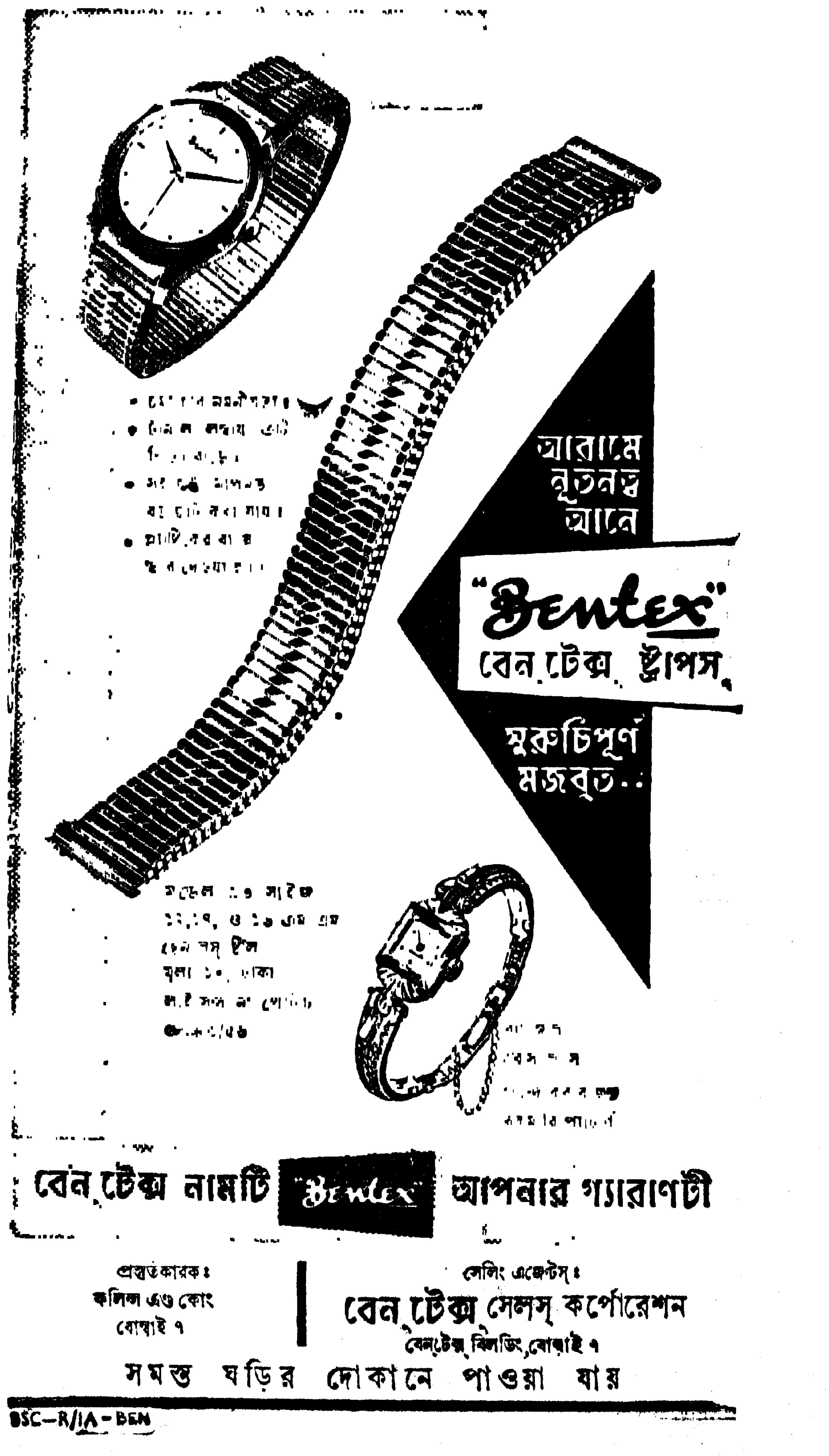

কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

(৪০)

কোথা দিয়ে সব কী যে হয়ে গেল। মাথাটায় বেশি লাগেনি তাই রক্ষে। সারাদিন পরিশ্রমের পর একটু লাগতেই দীপংকর পড়ে গিয়েছিল।

মনে আছে অঘোরদাদু সেই রাত্রেই নেমে এসেছিল ওপর থেকে। না নামলেই হয়ত ভালো হত। বুড়ো মানুষ। চোখে দেখতে পায় না, কানে শুনতে পায় না। সারা-জীবন যজমানদের কাছ থেকে সম্মান শ্রদ্ধা ঐশ্বর্য পেয়ে এসেছে—নিজের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি অর্জন করেছে। হঠাৎ শেষ বয়েসে পৌঁছে কি না দেখলে, বে-ভিতের ওপর তার সমস্ত কিছুর প্রতিষ্ঠা, সেই ভিতটাই ফাঁকি দিয়ে তৈরি। তার সংসার একদিন নিজের মনের দুর্বলতার সুযোগে আপনিই গড়ে উঠেছিল। অঘোরদাদু এতদিন সেই সংসারের গোড়ায় জল দিয়ে সার দিয়ে জিইয়ে তুলেছিল তাকে। হয়ত কোনও দুর্বল মুহূর্তে আশা করেছিল তাতে ফুল ফুটবে, ফল ফলবে। সেই সংসারের ফুল ফল ভোগ করবে অঘোরদাদু বুড়ো বয়েসে। কিন্তু হঠাৎ একদিন অঘোরদাদু টের পেলে, যে-ফল তাতে ফলেছে তা বিষ-ফল। যে-ফুল তাতে ফুটেছে তা কাঁটা-ফুল। তখন থেকেই নীতিবাদী হয়ে গেল অঘোরদাদু। তখন থেকেই বলতে লাগলো—কড়ি দিয়ে সব কেনা যায়—সব কেনা যায় কড়ি দিয়ে—।

তখন থেকেই অবিশ্বাস করতে শুরু করলে সমস্ত পৃথিবীটাকে। তখন থেকেই অঘোরদাদুর কাছে সমস্ত মানুষ মুখপোড়া হয়ে গেল। নিজের নাতিও মুখপোড়া হয়ে গেল, নিজের নাতনিও মুখপোড়া হয়ে গেল। হয়ত নিজেও মুখপোড়া হয়ে গেল নিজের কাছে।

তখন থেকেই সব স্নেহ, সব মায়া, সব মমতা গিয়ে পড়লো টাকার ওপর। টাকা থাকলে কাকে পরোয়া? টাকা থাকলে কীসের ভয়? তাই টাকাকেই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে শেষ পর্যন্ত বাঁচতে চেয়েছিল অঘোরদাদু। ভেবেছিল টাকাই তাকে শেষ জীবনে শান্তি দেবে, সান্ত্বনা দেবে। টাকার কাছে আত্মসমর্পণ করেই অঘোরদাদু নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ছিল।

তবু টাকা তো কথা বলে না, টাকা তো সজীব পদার্থ নয়, টাকা তো ভাল-বাসার প্রতিদান দিতে জানে না—তাই দীপংকরকে দিয়ে সে সাধ কিছুটা মেটাতো। তাই একজামিনে পাশের খবর শুনে অঘোরদাদু নতুন কাপড় কিনে দিত দীপংকরকে। চাকরি হবার খবর শুনে আনন্দ হতো। মাঝে মাঝে ভালবাসার চিহ্ন স্বরূপ পচা বাতাসা কি সন্দেশ উপহার দিত।

কিন্তু এতদিনে বুঝি সেই ভালবাসা স্নেহমমতাটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেল দীপংকরের জীবন থেকে।

কিরণদের বাড়ির সামনে থেকে ফেরবার সময়ও দীপংকর এ-কথা কল্পনা করতে পারেনি। জ্বর হয়েছিল বুঝি দুপুর বেলা থেকেই। দীপংকর তখন অফিসে। চন্নুনীর ক'দিন থেকেই শরীর খারাপ ছিল। উঠোনের কোণে তার নিজের ঘরটার ভেতর শুয়ে ধুঁকছিল ক'দিন ধরে। আজই একটু বাড়াবাড়ি হয়েছিল। দুপুরবেলা মা গিয়ে ঘরে ঢুকে চন্নুনীর কপালে হাত দিয়ে দেখেছিল—কপাল যেন পুড়ে যাচ্ছে—

মা জিজ্ঞেস করেছিল—কিছু খাবে বাছা? কিছু খেতে ইচ্ছে করছে তোমার?

চন্নুনী বলেছিল—তোমার দীপু কোথায় দিদি?

মা বলেছিল—কেন, দীপু কী করবে? দীপু তো আপিসে—

চন্নুনী বলেছিল—আমি আর বাঁচবো না দিদি—

—বালাই ষাট, মরবে কেন তুমি? জ্বর-জারি কি হয় না কারো?

তারপর একটু থেমে মা আবার জিজ্ঞেস করেছিল—তোমার মেয়েদের খবর দেব? মেয়েদের ডাকবো?

চন্নুনী ঘাড় নেড়েছিল। যে-মেয়েরা

'এনাসিন'

মাথাধরা সর্দি জ্বর ও পেশীর বেদনায় সত্বর আরাম দেয়, কারণ এতে চারটি ওষুধ রয়েছে

Registered User : GEOFFREY MANNERS & CO. PRIVATE LTD.

বাজারে গিয়ে উঠেছে তাদের ওপর চন্নুনীর কোনও টান ছিল না কোনওদিন। নিজের কলঙ্কিত জীবনের ছোঁয়াচ থেকে মেয়েদের বাঁচাতে পারেনি বলে চন্নুনীর যে ক্ষোভ ছিল তা বুঝি এতদিন পরে স্পষ্ট করে ধরা গিয়েছিল। সেই জন্যেই বুঝি একদিন আকাশ-বাতাসকে লক্ষ্য করে তার অশ্রাব্য গালাগালির ঠেলায় কানে আঙুল দিয়ে থেকেছে। তাই বুঝি রোগশয্যায় শুয়েও চন্নুনী মেয়েদের নাম শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো।

বললে—সে মুখপোড়াদের নাম কোর না দিদি—

মা বলেছিল—তবু তো মেয়ে তোমার বাছা, নিজের পেটের মেয়ে—

নিজের পেটের মেয়ে বলেই চন্নুনী তাদের গালাগালি দিতে পারতো আগেকার মতন স্বাস্থ্য ভাল থাকলে আবার আগেকার মত চেঁচিয়ে পাড়া মাত্ করে দিত। কিন্তু সে-সব কিছুই করলে না চন্নুনী। বিছানার তলায় হাত দিয়ে একটা হার বার করলে। সোনার বিছে হার। হয়ত যৌবনকালে অঘোরদাদুরই দেওয়া।

বললে—এই হারটা তোমার দীপুকে দিও দিদি—

—এ কি, বলছো কী তুমি চন্নুনী?

মা একেবারে যেন সাত হাত পেছিয়ে এসেছে। বললে—তুমি দীপুকে হার দিতে যাবে কেন বাছা! না না, তুমি ভাল হয়ে যাবে দেখো, ঠিক ভাল হয়ে যাবে, ও হার তুমি রেখে দাও—

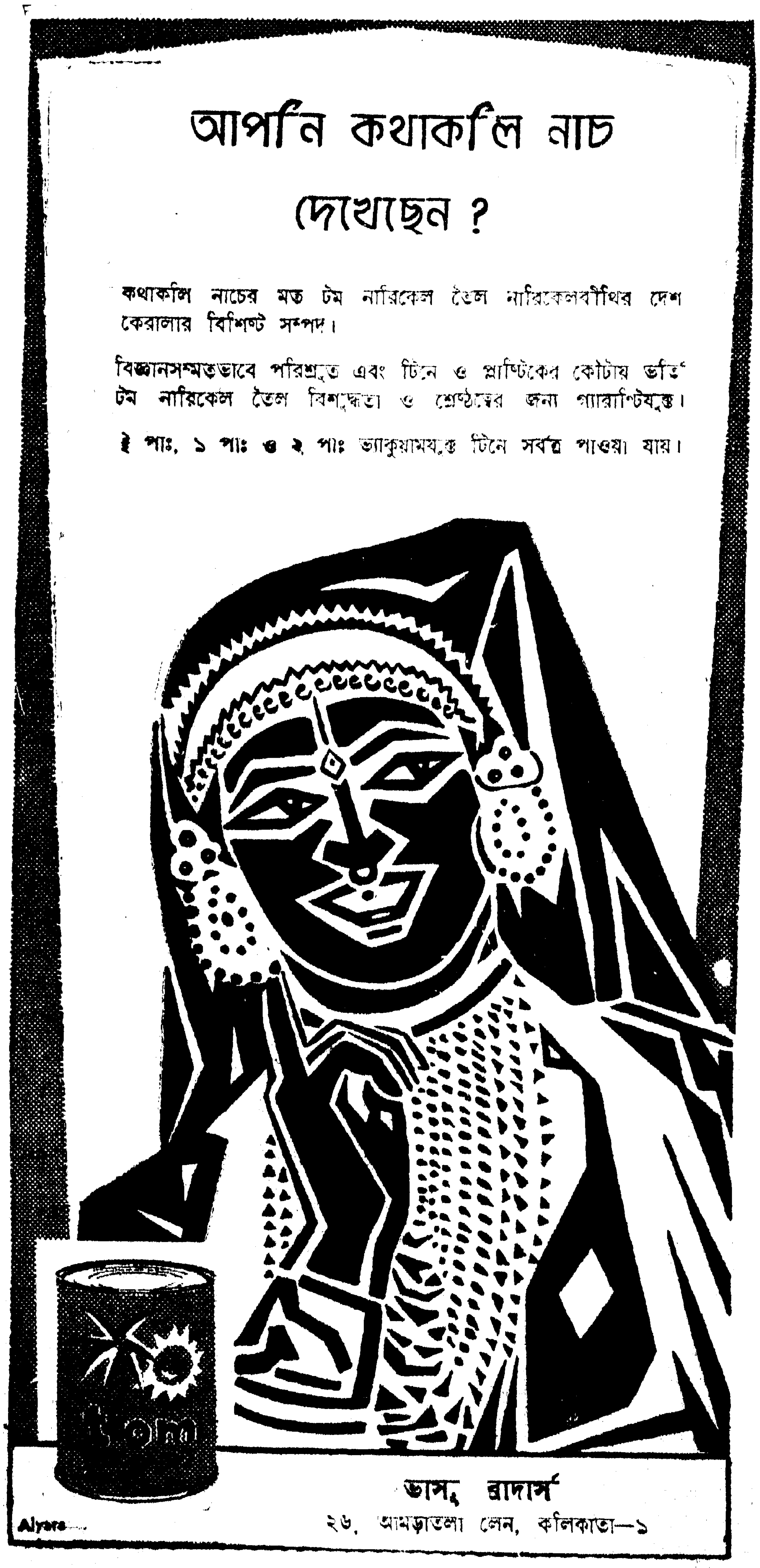

তারপর দুপুর বেলা চন্নুনীকে সাবু বার্লি করে দিয়েছে মা। একদিন চন্নুনীর দাপট ছিল, বয়েস ছিল। একদিন চন্নুনী এই সংসারের গৃহিণী ছিল। দীপংকরের মা যখন প্রথম বিধবা হয়ে ছেলে কোলে করে এ-বাড়িতে এসেছিল। সে-দিনের কথাও মনে পড়লো। এই-ই মানুষের পরিণতি। সেদিন চন্নুনীর দাপটে ভাড়াটেরা টিকতে পারতো না। চন্নুনীকে সেদিন খোসামোদ করে চলতে হয়েছে সকলকে। অঘোরদাদু সেদিন চন্নুনীর কথায় উঠেছে বসেছে। তারপর আস্তে আস্তে চন্নুনীর দিন গেল, দাপট গেল, বয়েস গেল। চোখে ছানি পড়লো। লক্কা আর লোটন তার আগেই হয়েছিল। তাদেরও বয়েস হলো একদিন। তারপর একদিন তারাও চলে গেল বাজারে!

দীপংকরের মা কাজ করতে করতে আর একবার গিয়ে দেখে এল ঘরের ভেতরে।

—বলি, এখন কেমন আছো গো চন্নুনী?

তখন আর গলার আওয়াজ বেরোচ্ছে না। কেমন ভয়-ভয় করতে লাগলো মা'র। কপালে হাতটা ঠেকালে। মাথাটা নিচু করে মুখের দিকে চেয়ে দেখলে।

—ও চন্নুনী, চন্নুনী?

এ-সব খবর বোধহয় কাকের মুখে-মুখে ছড়ায়। বিকেল বেলা কলে জল এসেছে। দীপু অফিস থেকে আসবে সেই ছ'টার সময়। দীপংকরের মা'র হাত-পা দু'টো যেন অবশ হয়ে আসতে লাগলো। মানুষটার জন্যে কেমন যেন দুঃখ হতে লাগলো। যতই ঝগড়া করুক, যতই খিট্‌খিটে লোক হোক, তবু তো জল-জ্যান্ত একটা মানুষ!

বিন্তী বললে—কী হবে দিদি?

মা বললে—তুমি কিছু ভেবো না মা, ভগবানকে ডাকো—

—দাদুকে তুমি খবর দিয়েছ?

মা বললে—দিয়েছি—

অঘোরদাদুর বলে নিজেরই জ্বালা। তাকে নিজেকেই কে দেখে তার ঠিক নেই। তারও তো যাবার অবস্থা। তাকেও তো দেখা

দরকার। একে অঘোরদাদু নিজের জ্বালা নিয়েই অস্থির, তার ওপর চুন্নুনীর কথা আর শুনতে ভাল লাগে না।

অঘোরদাদু বললে—ও বুড়ী মরুক গে, ও মুখপোড়া মরলে হাড় জুড়োয়—

তবু দীপঙ্করের মা নিজেই একবার গিয়ে ফণি ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এল। হাতের কাছে ফণি ডাক্তার থাকতে বিনা-চিকিৎসায় মারা যাবে মানুষটা! ডাক্তার এসে চন্নুনীকে দেখলে, ওষুধ দিলে। একটা টাকাও দিতে হলো তাকে। তারপর সন্ধ্যে হলো। বড় টিপি-টিপি পায়ে যেন সন্ধ্যে এলো সেদিন ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের বাড়িটাতে! সমস্ত কাজের মধ্যেও কোথায় যেন একটা আতঙ্ক লুকিয়ে ওত পেতে ছিল। দরজায় একটু শব্দ হলেই মা যেন চমকে উঠছিল—ওই আসছে দীপু! যেন দীপু এলেই সব আতঙ্কের অবসান হবে। যেন দীপু এলেই এই অবধারিত মৃত্যু এড়ানো যাবে।

—কে রে? দীপু?

সদর দরজায় খিল দেওয়া ছিল। শব্দ হতেই মা তাড়াতাড়ি হারিকেনটা হাতে নিয়ে দরজাটা খুলতে গেছে।

—তুই এত দেরি করে এলি বাবা? দেখ্ তো, এদিকে চন্নুনী যায়-যায়!

কিন্তু দরজা খুলতেই দীপুর মা অবাক হয়ে গেছে। চন্নুনীর বড় মেয়ে। লক্কা। দরজাটা খুলে মা খানিকটা নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। কখনও চন্নুনীর মেয়েদের সঙ্গে ভাল করে কথা বলেনি। মাজা-ঘষা চেহারা। কানে সোনার মাকড়ি, হাতে কাচের চুড়ি। মাথার চুলগুলো আঁট করে খোঁপা বাঁধা। গা ধুয়ে এসেছে বোধহয় এখনি। গা দিয়ে সাবানের গন্ধ বেরোচ্ছে ভুর ভুর করে।

বললে—মা কেমন আছে মাসি? মা'র নাকি অসুখ?

তারপর আর দাঁড়াল না। একেবারে শোক যেন উথলে উঠলো মেয়ের। চোখ ছল্ ছল্ করতে করতে দৌড়ে গেল চন্নুনীর ঘরের দিকে।

বিন্তী রোয়াকে দাঁড়িয়ে দেখছিল।

মা বললে—তুমি ঘরে যাও মা, ওদের দিকে দেখো না—

চন্নুনীর ঘরে গিয়ে ঢুকলো বড় মেয়ে। তারপর এলো ছোট মেয়ে। লোটন্। তারও শোক উথলে উঠেছে। মা'কে একটা পয়সা দিয়ে কখনও সাহায্য করেনি মেয়েরা। কখনও একটা ভাল-মন্দ জিনিস হাতে করে এনে মাকে দিয়ে বলেনি—মা তুমি এটা খাও—! সেই মেয়েদেরই কাণ্ড দেখে হাসি এল। এই তো পৃথিবী গো! বাপ বলো, মা বলো, মেয়ে বলো, পুত্ বলো, কেউ কারো নয়। এখন এসেছে মাকে দেখতে।

হঠাৎ এলো ফোঁটা। সে-ও খবর পেয়েছে। সঙ্গে ফণি ডাক্তার।

দীপুর মা বললে—আমি তো ডাক্তার-বাবুকে ডেকেছিলুম, তুমি আবার কেন ডেকে আনতে গেলে—

ফোঁটার বড় আটা। বললে—তা হোক দিদি, আমার কর্তব্য আমি করছি, বাঁচা মরা তো ভগবানের হাত—

সকাল বেলাই ফণি ডাক্তার এসেছিল। আর একবার এল ফোঁটার সঙ্গে। আবার একটা টাকা পেলে। কী দেখলে ডাক্তার কে জানে! নাড়ি ঠিকই আছে। ওষুধ সকালেই দিয়েছিল। আবার ওষুধ দিলে। চন্নুনীর তক্তপোষের পাশে বসলো খানিকক্ষণ। লক্কা আর লোটন্, দু'জনে তক্তপোষের দু'ধারে দাঁড়িয়েছিল।

হঠাৎ ছিটে ঢুকলো আর একজন ডাক্তার নিয়ে। নটে ডাক্তার।

সবাই অবাক হয়ে গেছে।

ফোঁটা বললে—আবার কেন ডাক্তার আনলি দাদা?

ছিটে বললে— বেশ করেছি এনেছি, তুই ভেবেছিস তুই আগে ডাক্তার এনে জিতে যাবি?

—তার মানে?

ফোঁটাও বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো। ফণি ডাক্তার আর নটে ডাক্তার দু'জনে দু'জনের মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেছে। এমন রোগী দেখতে তারা কখনও কোনও বাড়ি যায়নি!

ছিটে বললে—হারামজাদা, মায়ের গয়নার লোভে তুই ডাক্তার এনেছিস, তা আমি বুঝতে পারিনি ভেবেছিস?

—গয়নার লোভে?

—হ্যাঁ গয়নার লোভে। দশ ভরি বিছে হারের জন্যে ডাক্তার ডেকে ভারি একেবারে ডিউটি করছিস, তা আমি বুঝি না কিছু?

লোটন গালে হাত দিলে। বললে—ওমা, সে কী কথা গো! কী বলে দেখ! আমরা ডাক্তার ডেকেছি দশ ভরি গয়নার লোভে?

লক্কা বললে—তা না তো কী! আর

ভ্যাস্‌মল

পক্ক কেশকে উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ করে

ভ্যাস্‌মল—একটি বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি—কেশ প্রকৃত কালো করা, সুগন্ধি কেশ বিন্যাসক ও হেয়ার টনিক—এই তিন কাজই এক ফর্মুলায়, অথচ ইহার দাম‌ও একটি ভালো কেশ তৈলের অপেক্ষা বেশী নহে।

ভ্যাস্‌মল

অব্যর্থভাবে কেশরাশি কৃষ্ণবর্ণ করে

দুই প্রকারে পাওয়া যায়: তরল কেশ তৈল রূপে ও পমেড রূপে। সকল কেমিষ্টের নিকটে ও দোকানে পাওয়া যায়।

ল্যানোলিন-সমৃদ্ধ ভ্যাস্‌মল কেশের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট।

প্রস্তুতকারী:
হাইজিনিক রিসার্চ ইনষ্টিটুট
পোষ্ট বক্স নং ১১৯২ বোম্বাই ১.

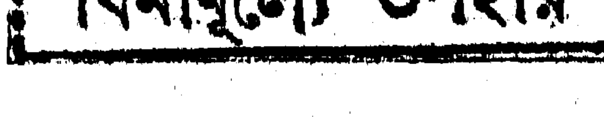

বিনামূল্যে উপহার

প্রতি ভ্যাস্‌মল বোতলের সঙ্গে বিনামূল্যে একটি অপরূপ চিরুণী দেওয়া হবে। অক্টোবর ও নভেম্বর ১৯৬০ সাল পর্যান্ত অথবা ষ্টক থাকাকালীন এই সুযোগ পাবেন

'HUB'

ছেনালী করিসনি, তোর ছেনালী দেখলে গা জ্বলে যায় মাইরি—

ফোঁটা চেঁচিয়ে উঠলো—খবরদার, মুখ সামলে কথা বলবি—

ছিটেও এগিয়ে গেল—কী, আমার মেয়েমানুষকে শাসাচ্ছিস—?

—তোর মেয়েমানুষকে চুপ করতে বল্ ছিটে, সাবধান করে দিচ্ছি এখনও—

লক্ষ্মী হাউ-মাউ করে উঠলো। বললে—ওমা, কোথায় যাবো গো, আমাকে খুন করে ফেলতে আসছে যে গো—

সে এক তুমুল চীৎকার শুরু হলো চন্নুনীর ঘরের ভেতর। ফণি ডাক্তার আর নটে ডাক্তার হাত গুটিয়ে কাণ্ড দেখছে। চন্নুনীর তখন কথা বলবারই অবস্থা নয়। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল উদ্দেশ্যহীন ভাবে। আর ওদিকে দুই সহোদর ভাই আর সহোদর বোনে কুৎসিত ঝগড়া আরম্ভ হয়ে গেল।

—বেরো শালা এখান থেকে, বেরিয়ে যা!

—কেন রে শালা বেরিয়ে যাবো, আমার বাড়ি, আমি আলবৎ বসে থাকবো এখানে, তোর শালার কী রে?

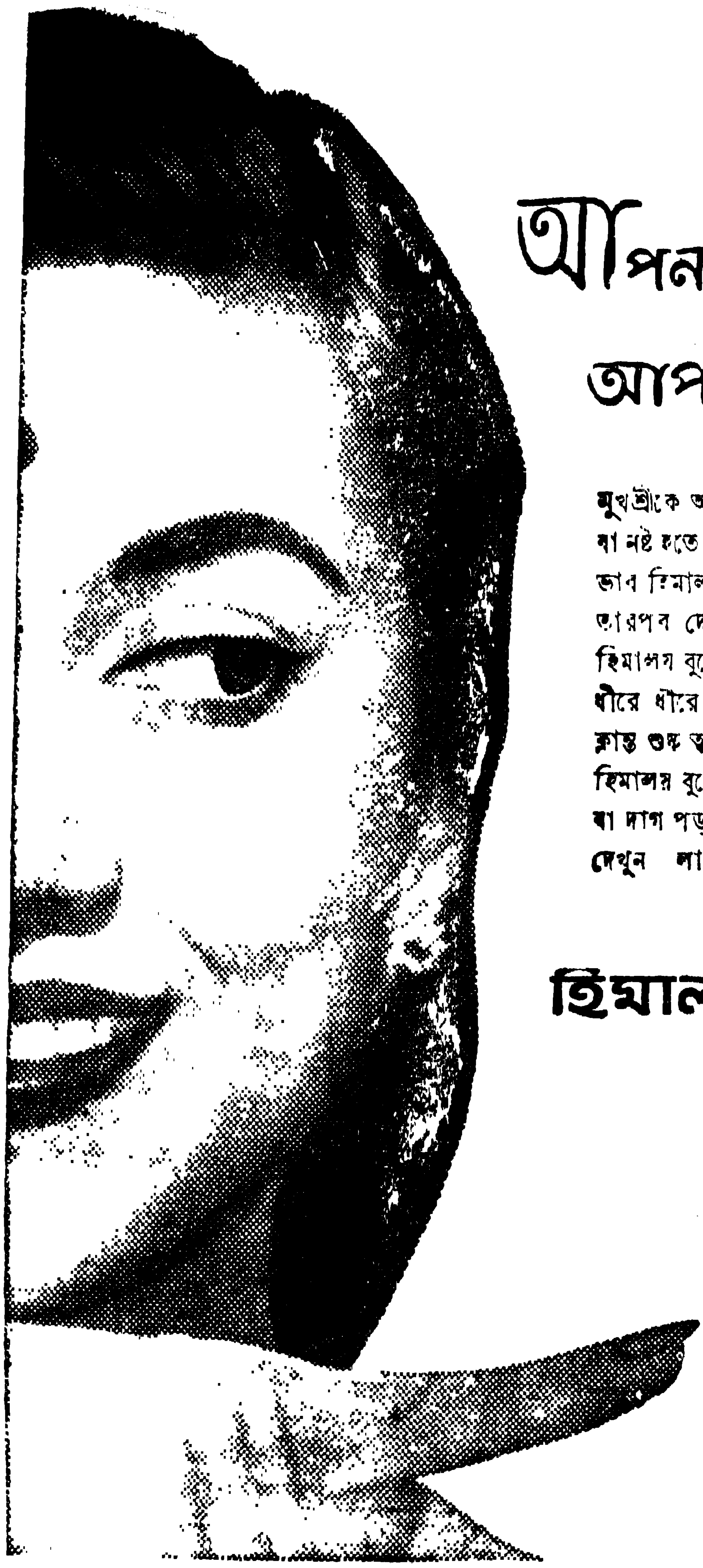

আপনার রূপ লাবন্য
আপনারই হাতে!

মুখশ্রীকে অকারণ রোদে—ধুলোয় কালো বা নষ্ট হতে দেন কেন? চেহারার লাবণ্যতা রক্ষার ভার হিমালয় বুকে স্নোর ওপরই ছেড়ে দিন—তারপর দেখুন চেহারার চমক। একটু খানি হিমালয় বুকে স্নো ঘষে দেখুন, হারানো কান্তি ধীরে ধীরে আবার কেমন ফিরে আসছে! ক্লান্ত শুষ্ক ত্বক সজীব হয়ে উঠছে! হিমালয় বুকে স্নো আপনার মুখে কখনও ব্রণ বা দাগ পড়তে দেবে না। নিজের চেহারায় দেখুন লাবণ্যতা এনে ধরেছে···

হিমালয় বুকে স্নো!

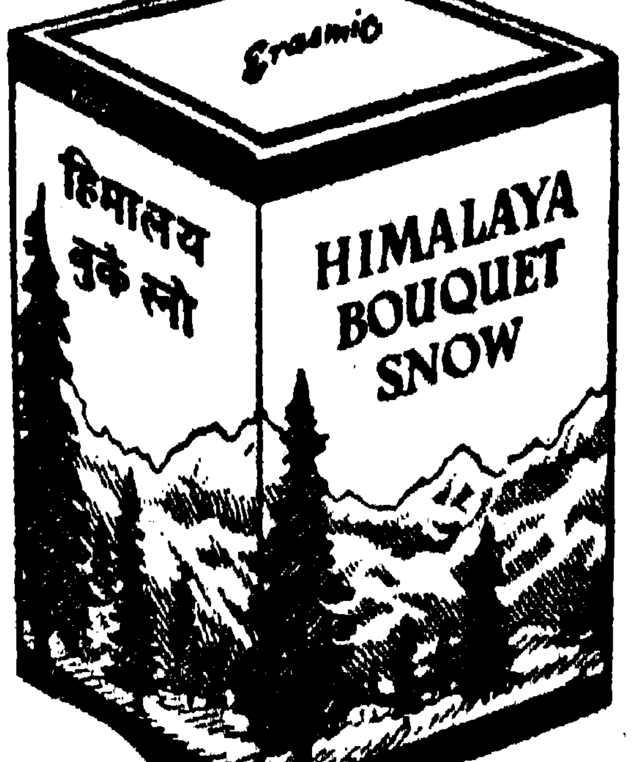

ইরাসমিক লণ্ডনের পক্ষে, ভারতে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের তৈরী

—আবার গালাগালি দিচ্ছিস? খবরদার বলছি, মেরে খুন করে ফেলবো!

—তবে রে, যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা!

লোটন হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো—ওগো, মেরে ফেল্লে গো, ওগো মেরে ফেল্লে—

লক্কাও কম যায় না। সেও চেঁচাতে জানে। বললে—ওগো কী সব্বনাশ হলো গো আমাদের

ফোঁটা হাতের কাছ থেকে একটা চ্যালা কাঠ তুলে নিয়ে তেড়ে এসেছিল ছিটের দিকে।

বললে—দাঁড়া দেখাচ্ছি তোকে, তোর বাপের নাম ভুলিয়ে দেব একেবারে—

ফণি ডাক্তার আর নটে ডাক্তার তখন প্রাণের ভয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

লক্কা লোটনের চুলের মুঠি ধরে টেনে ধরলে। বললে—হারামজাদী, ছেনালী, তোর মতলব্ আমি বুঝিচি, তোর পেটে পেটে এমন বুদ্ধি—

ছিটে হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে একেবারে বাইরে বেরিয়ে এল। চীৎকার করতে লাগলো—আমি কালীঘাটের গুণ্ডা, আমাকে চেনোনি শালা, আমি তোকে খুন করে গঙ্গায় কুচি কুচি করে কুটে ফেলে দেব —তবে আমার নাম ছিটে ভট্চায্যি—

বলে একেবারে বাইরের সদর দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। যেন সাকরেদদের ডাকতে যাচ্ছিল। আর সেখানেই দীপঙ্করের সঙ্গে দেখা।

দুই ভাইএর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটা কথা বলতে গিয়েই যত গণ্ডগোল বেধেছিল সেদিন। ফোঁটার চ্যালা-কাঠটা এসে ঠিক মাথার ওপর পড়লো। আর দীপঙ্করের মা বোধহয় দূর থেকে দেখেছিল সব। এতক্ষণে তার মুখ দিয়েও একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল।

—মা গো!

সেইটুকুই কানে গিয়েছিল নিজের, তারপরে একটু জল মাথায় দিতেই জ্ঞান ফিরে এসেছিল দীপঙ্করের। ডাক্তার দু'জন ছিল সেখানেই। সেখান থেকে উঠিয়ে সবাই ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে এসেছিল সেদিন। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। খানিকপরেই ওপর থেকে বুড়ো মানুষটা চিৎকার শুনে হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়ে এসেছে।

—মুখপোড়া, মুখপোড়ারা আবার এসেছে জ্বালাতে। মুখপোড়াদের খ্যাংরা মারি মুখে—কোথায় গেল মুখপোড়ারা? কোন্ চুলোয় গেল তারা!

অন্ধ মানুষ। সেই অন্ধকার রাত্রে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে গালাগালি দিচ্ছে।

—হারামজাদা, আবার এ-বাড়িতে এসেছে, মুখপোড়াদের বের করে দেব বাড়ি থেকে! হারামজাদা মুখপোড়া কোথাকার—কোথায় গেল মুখপোড়ারা—

নামতে নামতে হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটে গেল। বিরাট ভারি লম্বা-চওড়া দশাসই শরীরটা। আর বুঝি ভার সইতে পারলে না। বোধহয় হোঁচট্ খেলে অঘোরদাদু। তারপর একেবারে গড়াতে গড়াতে এসে পড়লো উঠোনে। তখনও মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে—মুখপোড়া, মুখপোড়াদের......

জীবনের পথ তো অত সহজ, অত সরলগতি নয়। জীবন উপন্যাসও নয়। সে নিজের পথেই চলে। তার একটা বাঁধা নিজস্ব পথও আছে। তার নিয়ম-কানুনও আছে। জীবনের পথ-চলার আইন জীবনেরই নিজস্ব আইন। সেই পথ ধরেই দীপঙ্করের পথ এতদিন চলে এসেছে। সেদিন সেই কথাই বার বার মনে হয়েছিল দীপঙ্করের। পরের দিন সকাল পর্যন্ত অঘোরদাদুর জ্ঞান ফেরেনি মনে আছে। বুড়ো সকালবেলা একবার চোখ খুলেছিল। তা-ও খানিকক্ষণের জন্যে।

দীপঙ্করের মা মুখে একটু জল দিয়েছিল।

মাথাটা নিচু করে জিজ্ঞেস করেছিল—আর একটু জল দেব বাবা?

বুড়ো মানুষটা যতদিন শক্ত সামর্থ্য ছিল, ততদিন কারো টু-শব্দ করবার সাহসটুকু পর্যন্ত হয়নি। কিন্তু সেইদিন ছিটে ফোঁটা যেন বাড়িতে এসে গেড়ে বসলো। নিচেয় উঠোনের সামনে ঘরের দাওয়ার ওপর এসে বসে রইল ছিটে ফোঁটা। সকাল থেকে রান্না-বান্না কিছু হয়নি। চন্নুনিরও শেষ অবস্থা। অঘোরদাদুরও তাই। একা মা'কেই সব দিক সামলাতে হচ্ছে।

কিন্তী সেই যে ঘরে ঢুকেছে, আর বাইরে বেরোতে সাহস হচ্ছে না তার।

মা নিচেয় আসতেই ছিটে ধরলে—দিদি, চাবিটা কার কাছে?

—কীসের চাবি বাবা?

ছিটে যেন ধমকে উঠলো। বললে—কীসের চাবি জানো না? সিন্দুকের—আবার কীসের?

দীপঙ্করের কানেও কথাটা গেল। অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। এখনও যে অঘোরদাদু মরেনি, এখনও যে বেঁচে আছে বুড়ো মানুষটা। এখনই এরা চাবি চায় সিন্দুকের?

মা বললে—দেখছো তো বাবা, বুড়ো মানুষটার এখন শ্বাস উঠছে—তোমাদের নিজের দাদু হয়ে এই কথা বলতে পারছো?

—তা বুড়ো মরতে এত দেরি করছে কেন?

সমস্ত রাত মা'র যে সে কী কষ্ট গেছে। রাত্রে খাওয়া হয়নি, ঘুম হয়নি। কোথায় ডাক্তার, কোথায় ওষুধ! কোথায় পথ্য! একটা মানুষ কত দিকে দেখবে। বাড়িটা যেন হাট হয়ে উঠেছে। চন্নুনীর মেয়ে দুটো বাড়ি ছেড়ে নড়তে চায় না।

দীপঙ্কর বলেছিল—মা, ও হার আমার দরকার নেই, তুমি ওদের দিয়ে দাও—

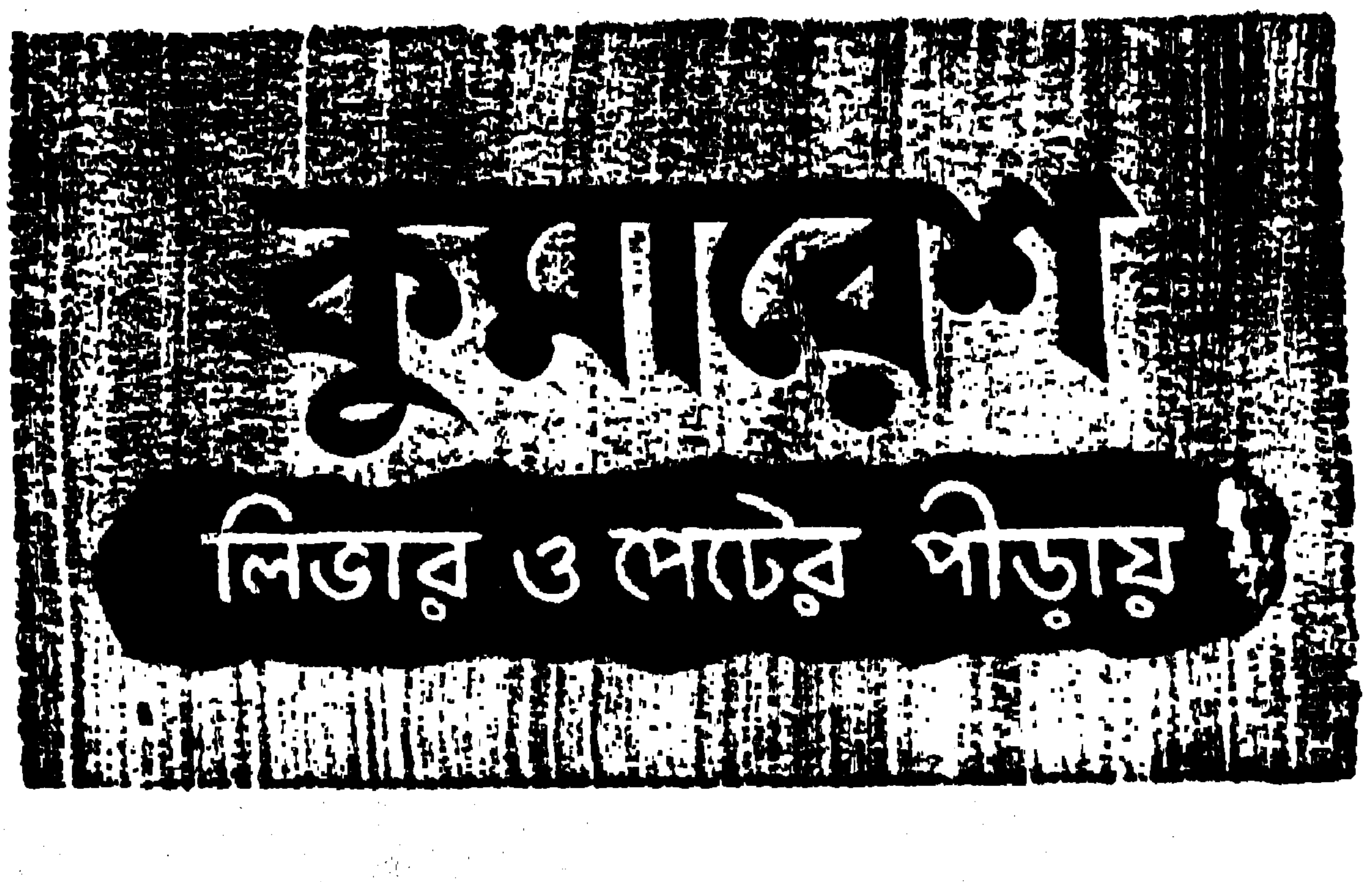

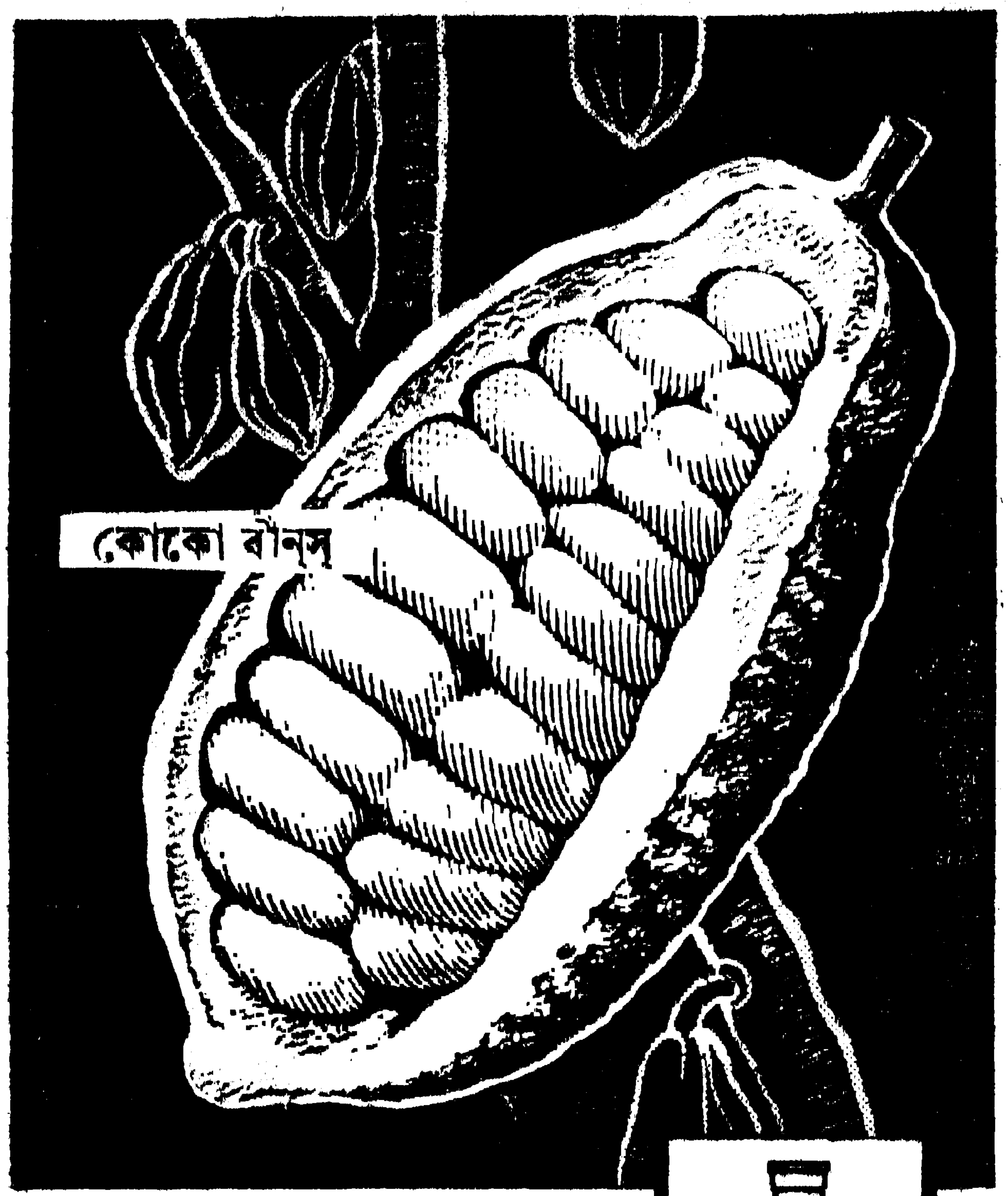

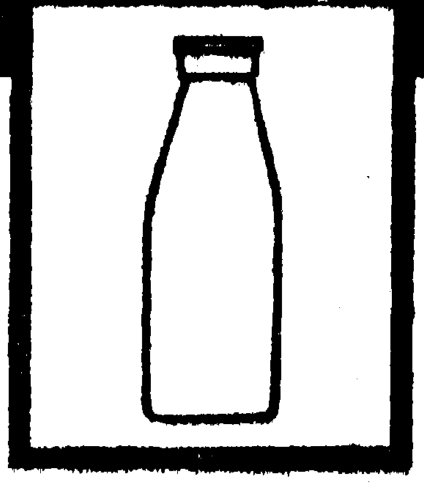
দুধ

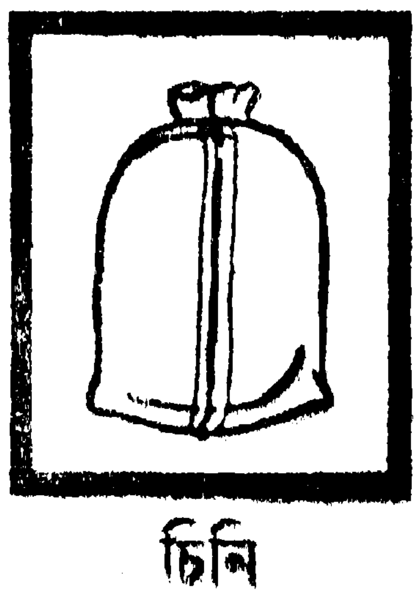
চিনি

ক্যাডবেরীর চকোলেট আপনার জন্য উপকারী কেন ?

কারণ এতে আছে টাটকা দুধ, পরিশুদ্ধ চিনি এবং পুষ্টিকর কোকো বীনের যাবতীয় স্বাভাবিক সদ্‌গুণ এবং দেহে উত্তাপ সঞ্চারের ক্ষমতা।

ক্যাডবেরীর মিল্ক চকোলেট ছেলে-বুড়ো সকলেরই অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য, আর খেতেও অতি সুস্বাদু !

ক্যাডবেরী মানেই সেরা

মা বললে—কিন্তু চন্নুনী যে হারটা জোর নাম করে দিয়েছিল—?

সামান্য একটা হার। হোক্ দশ-ভরি সোনার হার। তা বলে মানুষের প্রাণের চেয়ে সোনার দামটাই তো আর বেশি নয়! তবু সেই রাত্রে সেই হারই কাটারি দিয়ে কেটে দু'ভাগ করা হলো। সেই হারই অর্ধেকটা নিলে লক্কা, অর্ধেকটা নিলে লোটন। তারপর সারা রাত বসে ছিল দু'জন। এক একবার মাকে দেখে আর জিজ্ঞেস করে—দিদি, বুড়ো মরেছে?

যত বেলা বাড়তে লাগলো, ততই যেন অধৈর্য হয়ে উঠলো ছিটে ফোঁটা!

বললে—আটটা বাজতে চললো, এখনও মরলো না বুড়ো?

তারপর কোথা থেকে একে-একে ছিটে ফোঁটার সাকরেদরা এসে জুটতে লাগলো। তারাও বাড়ির ভেতর এসে বসলো সব উঠোনে। দুটো দল হয়ে গেল বাড়িতে। বসে বসে বিড়ি ফুঁকতে লাগলো। দীপঙ্করের ঘরের ভেতরের সিন্দুকটার দিকে উঁকি দিয়ে দেখে গেল বার-কয়েক। দীপঙ্কর উঠে গিয়ে অঘোরদাদুর পাশে, গিয়ে দাঁড়াল।

আবার ডাক্তার এল। মা জিজ্ঞেস করলে—কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু?

দীপঙ্করের মনে হলো অঘোরদাদুর সঙ্গে যেন একটা যুগও চলে যেতে বসেছে। যখন সবাই চলে গেছে, তখন একমাত্র অঘোর-দাদুই ছিল দীপঙ্করের শেষ বন্ধন। সেটাও বোধহয় চলে গেল। অঘোরদাদুর পাশে দাঁড়িয়ে চোখ দুটো ছল্ ছল্ করে এল তার! আর কেউ রইল না। কেউই রইল না আর। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দীপঙ্করের যেন বড় কষ্ট হতে লাগলো। অনেক কথা মনে পড়তে লাগলো। এই তো শেষ। এই-ই তো পরিণতি। অঘোরদাদুর সেই তেজ কোথায় গেল! সেই দাপট কোথায় গেল। কার জন্যে এতদিন এত ঐশ্বর্য জমিয়ে এসেছে! কার জন্যে এতদিন টাকাকড়ি গয়না-বাসন সন্দেশ জমিয়ে জমিয়ে পাচিয়েছে! কে খাবে এসব? কার ভোগে লাগবে? টাকা দিয়ে কি সব হয়? সব কেনা যায় কড়ি দিয়ে? কোথায় গেল সেই যজমানরা? কার ভরসায় এতদিন ছিল অঘোরদাদু? কোথায় তারা? দীপঙ্কর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো মুখখানার দিকে। কয়েকদিন কামানো হয়নি। খোঁচা খোঁচা দাড়ি বেরিয়েছে সারা মুখে। ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক হয়ে রয়েছে—ভেতরে দাঁত নেই। তোবড়ানো মুখ। মনে হলো অঘোরদাদু যেন হাসছে। আবার মনে হলো যেন হাসছে না—কাঁদছে। হাসি-কান্না কিছুই বোঝা যায় না। বড় অদ্ভুত করুণ হয়েছে মুখখানা। যেন চোখের পাতা দুটো একটু জড়ানো। যেন ঠোঁটটা একটু চমকে উঠলো কোণের দিকে। কিন্তু না, আর নড়ছে না। দীপঙ্করের মনে হলো একবার

জিজ্ঞেস করে এখন কেমন লাগছে অঘোরদাদুর! মরবার আগে মানুষের কী মনে হয়, কেমন অনুভূতি হয় তা যেন অঘোরদাদুর কাছ থেকে জেনে নিলে ভাল হতো! খুব কি যন্ত্রণা হয়? খুব কি কষ্ট হয়? মরবার আগে মানুষ কি বুঝতে পারে যে তার জীবনের পালা শেষ হলো? বুঝতে পারে যে এতদিনের পৃথিবীটাকে ফেলে যেতে হচ্ছে?

ডাক্তারবাবু উঠে দাঁড়াল এবার।

মা মুখের দিকে চাইলে। একটা আশার কথাও বোধ হয় শুনতে চাইলে।

বললে—কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু?

দীপঙ্করও উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে রইল ডাক্তারবাবুর দিকে।

হঠাৎ ছিটে ফোঁটার দল একেবারে হুড়-মুড় করে উঠে এসেছে। তারা বোধ হয় আর অপেক্ষা করতে পারেনি।

ফোঁটা বললে—কী হলো? মরলো?

এ-কথার কে উত্তর দেবে! ছিটে বললে—সারা রাত খাওয়া নেই দাওয়া নেই, শালা বুড়ো তো জ্বালালে খুব—

ফোঁটা আর দাঁড়াল না। অঘোরদাদুর ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। দলের লোকরাও সঙ্গে গেছে। ছিটের দলের লোকরাও পেছ্‌পা নয়। ঘরটা খোলা ছিল না। অন্য দিন হলে অঘোরদাদু লাঠি উঁচিয়ে আসতো—মুখপোড়া বলে গালাগালি দিত। আজ আর কেউ বাধা দিলে না। ছিটে ফোঁটারা দল তচ-নচ করে ফেললে সমস্ত জিনিস-পত্র। কোথায় ছিল পচা সন্দেশ, কোথায় ছিল ময়লা কম্বল বালিশ—সব উল্টে পাল্টে সে এক তান্ডব কান্ড শুরু করে দিল।

দীপঙ্কর রেগে হয়ত কিছু বলতে যাচ্ছিল। মানুষটা এখনও মরেনি—এরই মধ্যে লোকটাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে চায় নাকি! কিন্তু মা ইশারায় বারণ করলে। বললে—তুই কিছু বলিস নি, ওদের জিনিস, ওরা যা খুশি করুক—

আর তারপর হয়ত চাবির গোছাটা পেয়ে গেল। সেই চাবিটার গোছা নিয়ে হুড়-মুড় করে আবার নিচেয় নেমে গেল সবাই। তারপর গিয়ে ঢুকলো দীপঙ্করদের ঘরে। যে-ঘরে সিন্দুকটা ছিল।

দীপঙ্কর ওপর থেকে কান্ড দেখে বললে—মা, ওরা যে সব আমাদের ঘরে ঢুকলো—

মা বললে—ঢুকুক—

আর তারপর সিন্দুক ভাঙার পালা। দুম্ দাম্ শব্দ হতে লাগলো হাতুড়ির। তালা খুলতে পারেনি তাই হাতুড়ি শাবল ছেনি যা পেয়েছে তাই দিয়ে ঘা দিচ্ছে। কোথা থেকে যে এত লোক এল, কোথা থেকে যে কী সব হলো, কিছুই যেন কল্পনা করা যায় না। হৈ হৈ শব্দ করে চিৎকার করলে। কী আছে সিন্দুকের মধ্যে কেউ জানে না। অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করেছে তারা। অনেক অপমান গঞ্জনা পেয়ে এসেছে অঘোরদাদুর কাছে। আজ যেন এতদিন পরে তার প্রতিশোধ নিচ্ছে।

দীপঙ্করের সারা বুকটা যেন শির শির করে উঠলো। এ-সংসারের মায়া-দয়া ভাল-বাসার কি কোনও মূল্য নেই? অঘোরদাদু কি জানতো এমন হবে একদিন? অঘোরদাদু কি কল্পনা করতে পেরেছিল এইসব ঘটনা? অঘোরদাদুর মুখের দিকে আবার চেয়ে দেখলে দীপঙ্কর। অঘোরদাদুর মুখে কোনও বিকার নেই যেন। যেন সমস্ত পার্থিব সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। মা পাশে বসে অঘোরদাদুর মুখখানার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। স্থির হয়ে অন্তিম মুহূর্তের জন্যে প্রতীক্ষা করছে।

নিচের উঠোনে লক্কা আর লোটন আবার এসে হাজির হয়েছে। এবার সেজে গুজে এসেছে দুজনে। হাতের ভাগাভাগি হয়ে গেছে। এখন আর তেমন ঝগড়া নেই। পান খেয়ে মুখ লাল করেছে।

দীপঙ্কর আবার ডাকলে—মা—

মা চাইল ছেলের মুখের দিকে মুখ তুলে!

—ওরা যে আমাদের ঘরের সব কিছু নষ্ট করে দিচ্ছে—আমি যাবো?

মা গম্ভীর গলায় বললে—না—

তারপর হঠাৎ যেন নিচে থেকে একটা সোরগোল উঠলো খুব জোরে। সবাই চিৎকার করে উঠলো পাড়া কাঁপিয়ে। আশে-পাশের বাড়ির কিছু লোক তখন ঢুকে পড়েছে বাড়ির উঠোনে। আজ এ-বাড়িতে রান্না নেই, খাওয়া নেই। একদিকে উন্মত্ত মানুষের কোলাহল। লুন্ঠন সম্পদের জন্যে হুড়োহুড়ি। যে-সম্পদ তাদের মায় শায়ে ফেলে কাউকে উপার্জন করতে হয়নি, যে-সম্পদ ঠাকুরের নাম করে দিনের পর দিন সঞ্চয় করেছে, সে-সম্পদ ঈশ্বরকে ঠকিয়ে একজন কৃপণ আহরণ করেছে ভোগের উপকরণ হিসেবে—। আর একদিকে মৃত্যু। ধীর স্থির গম্ভীর অবধারিত মৃত্যু! দীপঙ্করের মনে হলো যেন সমস্ত পৃথিবীটা একেবারে উলঙ্গ হয়ে উঠলো তার চোখের সামনে। শুধু ছিটে-ফোঁটা নয়। ওই যারা নিচের উঠোনে ভিড় করে আছে, ওরা সব কে-জি-দাশবাবু, ঘোষাল সাহেব, অনন্ত রাও ভাবে। ওই লক্কা লোটন—ওদের সঙ্গে মিস্ মাইকেলেরও যেন কোন পার্থক্য নেই। উনিশের একের বি ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন যেন নয় এটা—এটাই যেন পৃথিবী। দীপঙ্করের দেখা-অদেখা গোটা পৃথিবীটা যেন মূর্তি গ্রহণ করেছে এখানে! মৃত্যুর ওপর কোনও শ্রদ্ধাও নেই যেন ওদের। ওরা হাসছে, কথা বলছে, পান খাচ্ছে।

ছিটে বিড়ি খাচ্ছিল আর তদারক করছিল। বললে—তালাটাকেই তোরা ভাঙতে পারলি না, সর্ তোরা, আমি দেখি—

বলেই একটা শাবল নিয়ে তালার ভেতর ঢুকিয়ে দিলে।

প্রতিথযশা সাহিত্যিক

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য বই

RUSSIA TODAY

২য় সং। লেখকের ব্যক্তিগত ভ্রমণ অভিজ্ঞতা। মূল্য ৭

কাশ্মীর

খালি ছবি সম্বলিত কাশ্মীরের কথা। মূল্য ৪.৫০

সম্ভবামি যুগে যুগে

নাটক। অবিশ্বাসী নরেন্দ্রনাথের বিশ্বাসী বিবেকানন্দে রূপান্তরের নাটকীয় ঘটনাবলী অবলম্বনে লিখিত। মূল্য ২.৫০

রক্ততিলক

নাটক। ১৯৪২-এর বিপ্লবের ও মন্বন্তরের পটভূমিকায় বাংলার সমাজের রাজনৈতিক ঘাতপ্রতিঘাত। মূল্য ২

BANKER'S GUIDE

ব্যাঙ্কিং বিষয়ে ছাত্র ও পরিচালকদের অবশ্য পাঠ্য। মূল্য ৮

বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট।

অঘোরদাদুর তালা। সহজে ভাঙবার মত নয়। তবু চাড় দিতে লাগলো ছিটে।

ফোঁটাও বিড়ি ফুঁকছিল গামছা কাঁধে নিয়ে। বললে—মাল নেই পেটে, গায়ে জোর আসবে কোত্থেকে—

কাছেই একজন সাকরেদ হুকুমের অপেক্ষা করছিল। বললে—মাল আনবো দেবতা?

—আন্—

বলে ফোঁটা পকেট থেকে টাকা বার করে দিলে। ঘেমে নেয়ে উঠেছে সবাই। অথচ জায়গাটা ছেড়েও চলে যেতে পারছে না কেউ। অনেক দিনের সিন্দুক। অনেক দিনের লোভ এই সিন্দুকটার ওপর। সে কি আজকের কথা! অঘোরদাদুর এতটুকু স্নেহ মমতা পায়নি এরা। বয়েস বাড়বার সংগে সংগে বিষ নজরে পড়ে গেছে তার। তারপর থেকে রাস্তায় ঘুরে তবলা বাজিয়ে আর নিতান্ত বুদ্ধির জোরে নিজেদের জায়গা করে নিতে হয়েছে সংসারে। জেলে গেছে, হাজতে গেছে, একবারে সমাজের ডাস্টবিনে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে তাদের। তবু তাদের নিজের জগতে তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এতদিন কালিঘাটের বস্তিতে কাটিয়েছে, এবার এখানে এসে উঠবে। উঠে অনেক টাকার মালিক হবে। লক্কা লোটনকে নিয়ে সমাজের মধ্যে বাস করবে। তাই বোতলটা আনতেই ফোঁটা প্রাণ ভরে মুখের মধ্যে উপুড় করে দিলে।

সাকরেদ পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। বললে—একটু পেসাদ দ্যান্ দেবতা—

—দেব, দেব, আগে সিন্দুকটা খোল্!

ছিটে দেখতে পেয়েই কাছে সরে এল। বললে—কী রে, একলাই খাবি নাকি?

ফোঁটা বললে—বেশ করবো খাবো, নিজের মেহনতের টাকায় খাচ্ছি—তোর বাপের টাকায় খাচ্ছি না তো—

ছিটেও রেগে গেল: বললে—তুই বাপ তুলে কথা বলছিস্?

—বেশ করবো, বাপ তুলবো!

—তবে রে হারামজাদা—

বলে ছিটে বোধহয় একটা রক্তারক্তি কাণ্ড বানিয়ে দিত। কিন্তু হঠাৎ দীপঙ্কর ঘরে ঢুকলো। দীপঙ্করকে ঘরে ঢুকতে দেখে সবাই একটু আলাদা হয়ে বসলো। ছিটেও চাইলে দীপঙ্করের মুখের দিকে। ফোঁটাও চেয়ে দেখলে।

দীপঙ্কর একটু চুপ করে থেকে বললে—অঘোরদাদু মারা গেছে—

—মারা গেছে?

সে কী উল্লাস! মারা গেছে! মারা গেছে! সমস্ত লোকগুলো যেন আত্মহারা হয়ে যাবার জোগাড়। ফোঁটা প্রথমে কথাটা বিশ্বাস করেনি। তারপর একটু সম্বিত পেয়েই মুখের মধ্যে গড়-গড় করে ঢেলে দিলে সবটা। উপুড় করে নিঃশেষ করে ফেললে সমস্ত বোতলটা। তারপর আরো বোতল এল। আরো হুল্লোড় বাড়লো তাদের।

দীপঙ্কর আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। সমস্ত মনটা যেন ফাঁকা হয়ে গেল এক নিমেষে। এই এদের এত গোলমাল, এত হল্লা, তার মধ্যেও দীপঙ্করের মনে হলো যেন সব নিস্তব্ধ, সব নিঝুম, সব শূন্য! পাড়ার কয়েকজন মেয়ে, কয়েকজন ছেলে মজা দেখতে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছে। দু'একজন মা'র কাছে গিয়ে বসেছে। বিন্তীও মা'র আঁচল ধরে বসে আছে। মা'র চোখ দিয়ে শুধু নিঃশব্দে টস্ টস্ করে জল গড়িয়ে পড়ছে। আর অঘোরদাদুর স্তব্ধ দেহটা কাঠ হয়ে পড়ে আছে সামনে। একটু নড়া নেই চড়া নেই, একটু প্রতিবাদও নেই মুখে। মৃত্যুর আগে একটা কথাও বলে যেতে পারেনি অঘোরদাদু। কাউকে প্রাণ ভরে গালাগালিও দিয়ে যেতে পারেনি। পনেরো ষোল ঘণ্টা অসাড় হয়ে পড়েছিল শুধু চোখ বুজে।

মা শুধু এক ফোঁটা গঙ্গাজল দিয়েছিল মুখে শেষ সময়টায়।

অঘোরদাদু শেষ হয়ে গেল। তবু শেষ হয়ে গেলেই তো সব শেষ হয় না। দীপঙ্কর উঠোনটার ওপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে তাই ভাবছিল। যা ইচ্ছে নিক ওরা। সিন্দুক ভেঙে সব কিছু ওরা নিয়ে যাক্। দীপঙ্কর কিছু বলবে না। তার কিছু বলবারও নেই। আবার মা'কে নিয়ে এই বাড়ি ছেড়ে অন্য কোনও আশ্রয়ের সন্ধান করতে হবে।

সেই ভিড়ের মধ্যেই হঠাৎ কে যেন ডাকলে।

—দীপঙ্করবাবু হ্যায়?

দীপঙ্কর ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলে। একেবারে অচেনা মুখ।

—দীপঙ্করবাবু কৌন্?

বেশ খাঁকি পোশাক পরা হিন্দুস্থানী একজন। বাড়ির সদর-দরজা দিয়ে একেবারে খানিকটা ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

দীপঙ্কর এগিয়ে গেল সামনে। বললে—কাকে খুঁজছো?

—দীপঙ্করবাবুকে!

—আমিই দীপঙ্করবাবু!

লোকটা বললে—আপনাকে বৌদিদিমণি ডাকছেন বাইরে—

—কে বৌদিদিমণি?

লোকটা বললে—বাইরে গাড়িমে বসে আছেন—

—বাইরে কোথায়? দীপঙ্কর লোকটার সংগে বাইরে এল। এ-রাস্তায় গাড়ি ঢোকে না। দু'পা হেঁটে গেলেই নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রীটের চওড়া রাস্তা। রাস্তাটার ওপর একটা বিরাট গাড়ি দাঁড়িয়ে। বাদামী রং। দীপঙ্করের কী যেন সন্দেহ হলো। হঠাৎ বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। যেন চেনা মুখ একটা গাড়ির ভেতরে। তাড়াতাড়ি কাছে যেতেই অবাক হয়ে গেছে দীপঙ্কর!

—সতী, তুমি?

বেশ সিঁথির ওপর টকটক্ করছে সিঁদুর। আরো যেন ফরসা দেখাচ্ছে সতীকে। আরো যেন মোটা হয়েছে। আরো যেন সুন্দর হয়েছে।

কিন্তু সতীও দীপঙ্করকে দেখে কম অবাক হয়নি। বললে—ও কি, তোমার মাথায় কী হলো?

দীপঙ্কর বললে—ও কিছু না, কালকে মাথায় চোট লেগেছিল—কিন্তু তুমি হঠাৎ, কী মনে করে?

সতী হাসলো। বললে—তোমার সংগেই দেখা করতে এলাম!

আমার সংগে?

—কেন, আসতে নেই?

বলে সতী আবার হাসলো একটু।

দীপঙ্কর বললে—কাল তো তোমার বাড়িতে গিয়েছিলাম আমি, তোমার শ্বশুর-বাড়িতে, প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে। কিন্তু অনেক রাত তখন, তুমি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলে—তাই ডাকতে ভয় হলো—

তারপর একটু থেমে বললে—তুমি নামবে না?

সতী বললে—আর নামবো না এখন, কেন এসেছি তোমাকে বলে যাই শোন—আসছে সোমবার দিন একবার আমাদের বাড়ি যেতে পারবে? সোমবার সন্ধ্যেবেলা—

(ক্রমশ)

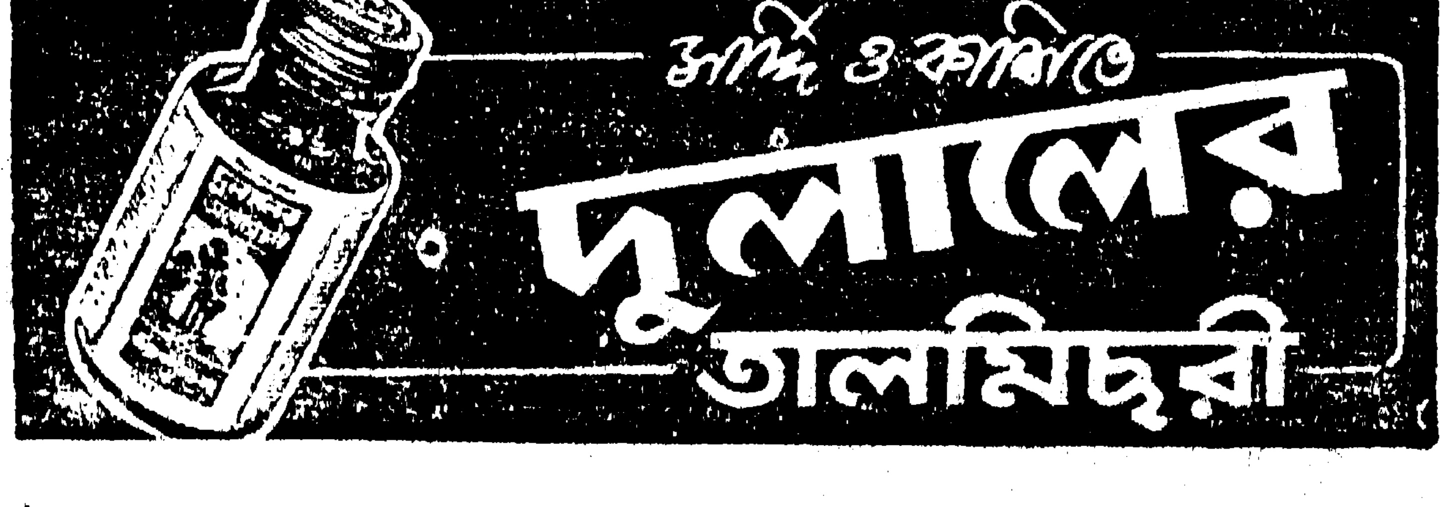

প্রস্তুতকারক— দুলাল চন্দ্র ভড়

চিত্র প্রদর্শনী

গত সপ্তাহে আর্টিস্ট্রী হাউস-এ শ্রীইলা রায়চৌধুরী, শ্রীঅতীন মিত্র এবং শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায়ের চিত্রকলার প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এ'রা তিনজনেই কলকাতার গভর্নমেণ্ট কলেজ অব আর্ট অ্যাণ্ড ক্র্যাফটএর প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী। শ্রীমতী ইলা রায়চৌধুরী এবং প্রণব মুখোপাধ্যায় ছিলেন ইণ্ডিয়ান পেইণ্টিং-এর শিক্ষার্থী এবং অতীন মিত্র ছিলেন সুকুমার শিল্প বিভাগের শিক্ষার্থী।

অতীন মিত্রের ছবি আমরা আগে দেখেছি 'আর্টিস্টস গ্রুপ'-এর প্রদর্শনীগুলিতে। তেল রঙে নিসর্গ রচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত। তুলি এবং রঙের ওপর এমন দখল খুব কম শিল্পীরই দেখা যায়। রচনাগুলি কষ্টকল্পিত নয়, যথার্থই স্বতঃস্ফূর্ত। কোনও ইজম-এর মন্ত্রে এখনও ইনি দীক্ষিত হন নি। সাদৃশ্য সত্যকেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন প্রধানভাবে। তবে এ'র করণকৌশল এবং টানটোন সাবেকি আমলের নয়। টানটোনগুলি বেশ ক্ষিপ্র এবং স্পন্দনশীল। এ'র শক্তির পরিচয় বিশেষভাবে পাওয়া যায় 'মনসুন', 'ইয়েলো হাট', 'উইণ্টার', 'রিটার্নিং ফ্রম দি মার্কেট' এবং 'থর্ন অ্যাণ্ড দি ফ্লাওয়ার' এই কয়টি রচনায়।

প্রণব মুখোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ান পেণ্টিং-এর ছাত্র হলেও এ'র রচনাগুলি ইণ্ডিয়ান পেণ্টিং গোষ্ঠীভুক্ত হতে পারে না। ভারতীয় করণকৌশলে চমৎকারভাবে শিল্পী প্রকাশ করেছেন আপন ব্যক্তিমানসকে। শিল্পী যে অত্যন্ত চিন্তাশীল তার প্রমাণ এ'র প্রত্যেকটি রচনা। ইনি যা বলতে চেয়েছেন তা প্রকাশ করতে পেরেছেন এ'র একান্ত স্বকীয় অত্যুক্তিমূলক ভাবব্যঞ্জনা পদ্ধতির মাধ্যমে। 'হি বিল্ডস দি নেশন' রচনায় ইনি প্রকাশ করেছেন একজন স্কুল টিচারের যথার্থ রূপ। আমার চোখে এইটেই শিল্পীর শ্রেষ্ঠ রচনা বলে মনে হয়েছে। এ ছাড়া 'স্ট্রীট জাগ-লার', 'সিটিজ প্রবলেম', 'রেন অ্যাণ্ড দি পেপার বোট', 'ফ্লাড' এবং 'মিসড দি এম' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রেষ্ঠ সমকালীন শিল্পীদের রচনার সংগে প্রণববাবুর রচনাগুলির তুলনা করার মত দুঃসাহস অবশ্যই আমার নেই, তবে একথা বলতেও আমি ইতস্তত করি না যে ইনি ভবিষ্যতে শ্রেষ্ঠদের মধ্যেই পরিগণিত হবেন। সে রকম লক্ষণ আমরা দেখতে পেয়েছি এ'র রচনার মধ্যে।

শ্রীমতী ইলা রায়চৌধুরী প্রণববাবুর মত ইণ্ডিয়ান স্টাইল ছেড়ে অত্যুক্তিমূলক ভাব ব্যঞ্জনা পদ্ধতি আয়ত্ত করেন নি। প্রথাগত ভারতীয় পদ্ধতিতেই রচনা করেছেন। এ'র মিনিয়েচারগুলি প্রশংসনীয়। তবে এ'র সাথীদের অত্যন্ত জোরালো রঙীন ছবিগুলির পাশে এ'র ছবি ম্রিয়মাণ। আমার মনে হয় ইনি স্বতন্ত্রভাবে প্রদর্শনী করলেই রচনাগুলির উৎকর্ষ দর্শকদের নজরে পড়তো।

আমরা এ প্রদর্শনীটি যথার্থই উপভোগ করেছি। আশা করি কলকাতার শিল্পামোদি দর্শকেরা সকলেই প্রদর্শনীটি উপভোগ করেছেন। ভবিষ্যতে এ'দের কাছ থেকে আরও ছবি দেখবার আশায় রইলাম।

•

১লা অক্টোবর থেকে ইন্ডো-আমেরিকান সোসাইটির ব্যবস্থায় অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস ভবনে ডাকটিকিটের প্রদর্শনী চলছে। প্রদর্শনীটি আগামী ২৩শে অক্টোবর অবধি চলবে। কলকাতায় এমন ব্যাপকভাবে ডাকটিকিটের প্রদর্শনী এর আগে কখনও হয় নি। এ প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য দুইটি—প্রথম, বাংলা, বিহার, আসাম এবং উড়িষ্যার ডাকটিকিট সংগ্রহকারীদের সংগ্রহ জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করা এবং দ্বিতীয়, ডাকটিকিটের মাধ্যমে গত আন্তর্জাতিক কৃষি প্রদর্শনীতে আমেরিকি মেলা উদ্বোধন কালে আইজেনহাওয়ার কর্তৃক উচ্চারিত, খাদ্য, পরিবার, মৈত্রী এবং স্বাধীনতা এই চারটি শব্দের প্রচার করা। ডাকটিকিট সংগ্রহের প্রতিযোগিতায় দেখা যায় দুইটি বিভাগ, একটি ছোটদের এবং আরেকটি বড়দের। সংগ্রহগুলি কৌতূহলোদ্দীপক।

স্বাধীনতা পাবার পরবর্তীকালের ভারত সরকারের বিভিন্ন ডাকটিকিটগুলি বিশেষভাবে প্রদর্শিত হয়েছে এ প্রদর্শনীতে। মার্কিন সরকারের 'চ্যাম্পিয়ানস অব লিবার্টি' সিরিজে এবার মহাত্মা গান্ধীর ছবি থাকবে এ সংবাদ প্রচার করে ঐ সিরিজের আগেকার কয়েকটি ডাকটিকিট অত্যন্ত যত্নসহকারে প্রদর্শিত হয়েছে। ডাকটিকিট কিভাবে তৈরী হয় সে সম্বন্ধেও কিছু ছবি মার্কিন সরকার পেশ করেছেন। ডাকটিকিট সংগ্রহ করা যাঁদের নেশা তাঁদের কাছে প্রদর্শনীটি সত্যিই উপভোগ্য।

শিল্পী শৈলজ মুখোপাধ্যায়

৬ই অক্টোবর সকালে খবরের কাগজ খুলেই দেখলাম শৈলজ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুসংবাদ। এ যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! তাঁর অসুস্থতার কোন খবরই আমরা পাইনি আগে!

শৈলজ মুখোপাধ্যায় ছিলেন ভারতের সমকালীন শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম। বাঙ্গালী হলেও শিল্পী বাংলাদেশ ত্যাগ করেছিলেন বহুদিন। তাঁর শিল্পী জীবনের বেশীরভাগ সময় কেটেছে দিল্লীতে। তাই দিল্লীর শিল্পী গোষ্ঠীর মধ্যেই তাঁকে ধরা হত। শৈলজের জন্ম হয় ১৯০৮ সালে বর্ধমানে। স্কটিশ চার্চ স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর ইনি কলকাতার সরকারী চারুকলা বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। মারা যাবার সময় শৈলজের বয়স ৫৩ বছর হলেও স্বভাব তাঁর বদলায় নি একটুও: কথায় বার্তায় চাল চলনে ছাত্রাবস্থার শৈলজকেই যেন দেখা যেতো। বয়সটা বোঝা যেতো কেবল পাকধরা চুল থেকে। বেশী লোকজনের সংগে মেলা মেশা তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁকে চলাফেরা করতে দেখা যেতো দিল্লীর কনট প্লেসে সন্ধ্যার সময়, অত্যন্ত নিস্পৃহভাবে, ধীরগতিতে এবং

বাজার — শৈলজ মুখোপাধ্যায়

সানাই বাদক — শৈলজ মুখোপাধ্যায়

একা। উচ্চতায় মেরেকেটে ৫ ফুট, অত্যন্ত সাদাসিধা পোশাক পরিহিত শৈলজকে দেখে বিফলচেষ্ট সেলসম্যান বা অতিসাধারণ কেরানী ছাড়া আর কিছুই মনে হত না। কিন্তু কাছে এসে তাঁর মুখের দিকে তাকালে ফাঁকা চাউনির অন্তরালে অনুভব করা যেতো অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্তি। ছাত্রাবস্থায় ছবি আঁকার থেকে তাঁর ঝোঁক ছিল বেশী খেলাধুলো এবং স্কাউট আন্দোলনে। শৈলজ প্রথমবার ইউরোপে যান স্কাউট হিসাবেই আন্তর্জাতিক জাম্বোরী অনুষ্ঠানে যোগদান করতে। সেই সময় ইনি হল্যান্ড, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং জার্মানীর বিভিন্ন আর্ট গ্যালারীগুলি পরিদর্শন করার সুযোগ পান। পরে ইনস্টিটিউট অব মিডল অ্যান্ড এক্সট্রীম ওরিয়েন্ট থেকে বৃত্তিলাভ করে পাশ্চাত্ত্য শিল্প মক্স করতে যান ইতালীতে। পেশাদার সুকুমার শিল্পী হবার আগে ইনি কিছুদিন বিজ্ঞাপন শিল্পী হিসাবেও কাজ করেন। শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা এবং সেলসম্যানশিপেও এ'র কিছু কিছু অভিজ্ঞতা ছিল। শৈলজের প্রথম একক প্রদর্শনী হয় কলকাতায় ১৯৩৭ সালে।

বাংলার শিল্পী হয়েও বেঙ্গল স্কুলের ধারা অনুসরণ না করে, পাশ্চাত্ত্য তথাকথিত আধুনিক শিল্পীদের আঙ্গিকে চিত্র আন্দোলন, বাংলাদেশে সর্বপ্রথম চালু করেছিলেন যে কজন শিল্পী, তাঁদের মধ্যে শৈলজ মুখোপাধ্যায় অন্যতম। ফ্রান্স এবং ইতালীতে থাকাকালে ইনি সেখানকার পথিকৃৎ অনেক শিল্পীরই সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেয়েছিলেন। বিশেষ করে, অ্যঁরী মাতীজ-এর সঙ্গে ইনি বেশ ঘনিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। ঐ সব বিরাট বিরাট ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসার ফলে তাঁদের কিছু কিছু প্রভাব অবশ্যই পড়েছে শৈলজের চিত্রকলায়, কিন্তু স্বদেশের মাটির প্রতিও কতটা অনুরক্ত ছিলেন শিল্পী, তাঁর প্রতিটি রচনা থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। শৈলজের অনুপ্রেরণার উৎস ছিল কাংড়া কলম এবং বিভিন্ন প্রদেশের লোক চিত্রকলা। কাংড়া কলমের ছান্দসিক চরিত্র এবং লোকচিত্রকলার সরলতাই এ'র ছবির প্রধান বৈশিষ্ট্য। অত্যন্ত পাকা হাতের টানটোন রচনাগুলিকে করে তুলতেন মাতীজ-এর ছবির মতই স্পন্দনশীল এবং বর্ণবহুল। অমৃত শেরগীল-এর ছবির মত প্রথাপ্রকরণে বিদেশীয়ানার লক্ষণ থাকলেও এর ছবির বিষয়বস্তু সব সময়েই হ'ত খাঁটি ভারতীয়—কখনও-বা গাঁয়ের মেয়েরা কুঁয়ো থেকে জল তুলছে, কখনও বা শানাই বাদকরা শানাই বাজাচ্ছে, আবার কখনও বা বাজার বসেছে ছোট কোন শহরে। তবে শেরগীলের মত এ'র ছবিতে বিষাদের ছায়া কখনও পড়েনি। শৈলজের সব ছবিতেই শোনা যায় যেন আনন্দের ধ্বনি। একসময় শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ শৈলজের ছবি দেখে বলেছিলেন, 'এই তরুণ শিল্পীর কাজে প্রকাশ পেয়েছে আধুনিক চিত্রধারার অত্যন্ত সরল রূপ।' এবং কতকগুলি রচনার মধ্যে শিল্পগুরু দেখতে পেয়েছিলেন ভ্যান গগের প্রভাব। শৈলজের জীবনও ছিল ভ্যান গগের মত বৈচিত্র্যময়।

ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রায় সব চিত্রপ্রদর্শনীতেই শৈলজের ছবি দেখতে পাওয়া যেতো। ১৯৪৭ সালে প্যারিসে ইউনেসকোর তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমকালীন শিল্পের প্রদর্শনীতেও এ'র চিত্রকলা দেখা গিয়েছিল। ১৯৫২ সালে প্যারিসে সালোঁ দ্য মে-তে পিকাশো এবং ইউরোপের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় শিল্পীদের পাশে

গ্রীষ্মকালের কুয়া — শৈলজ মুখোপাধ্যায়

শৈলজের ছবিও দেখা গিয়েছিল। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রসমালোচকদের নজরে যে দু চারজন ভারতীয় শিল্পী পড়েছেন, শৈলজ তাঁদের মধ্যে একজন। ভারতের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর চিত্রকলার প্রশংসামূলক সমালোচনা তো প্রকাশিত হয়েইছে, প্যারিসের বো আর্ট পত্রিকায়, রোমের এসিয়াটিকা পত্রিকায়, লণ্ডনের আর্ট অ্যান্ড লেটার্স, দি স্টুডিও, দি ওয়ার্লড রেভিউ এবং ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট পত্রিকাতেও এঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে।

ইদানিং অনেকের মুখেই শোনা যেতো শৈলজ নাকি মন দিয়ে আর চিত্রচর্চা করেন না। কিন্তু সে কথা যে আদৌ সত্য নয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় শিল্পীর সম্প্রতিকালের অভিনব সৃষ্টিগুলি থেকে। এসব রচনায় বিস্তৃত ফাঁকা ফ্রেমের মধ্যে সুনিপুণভাবে প্রকাশ করেছেন মিনিয়েচার পেইণ্টিং-এর মেজাজ। ইদানিং তাঁর অনুপ্রেরণার উৎস হয়েছিল রাজস্থান। শৈলজের কোন অনুসরণকারী নেই, সুতরাং অনেকের ধারণা, শৈলজ শিল্পীমহলে জনপ্রিয় ছিলেন না। কিন্তু আসল কারণ শৈলজকে নকলকরা অত্যন্ত শক্ত। অনেকেই তাঁকে অনুগমন করার চেষ্টা করছিলেন বটে কিন্তু শেষ-পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে ওপথ ছেড়ে দিয়েছেন। শৈলজের প্রথাপ্রকরণ, শৈলজের প্রিয় সব বর্ণ অনেকেই ব্যবহার করেছেন কিন্তু শৈলজের ছবির উৎকর্ষ তাঁদের রচনায় পৌঁছয় নি। তাই শৈলজের সৃষ্টি একান্তই স্বকীয়। তাঁর নকলনবিশেরা অন্ধি সন্ধি পায়নি কোন্ পথে গিয়ে শিল্পী আবিষ্কার করতেন পরম মণিটিকে।

অর্থলিপ্সা শৈলজের ছিল না, তাই তাঁর সম্বন্ধে কোনরকম প্রচারও তিনি পছন্দ করতেন না। তা সত্ত্বেও তাঁর ছবি ক্রমাগত বিক্রি হয়েছে স্বদেশে এবং বিদেশে। ভারতের শিল্পাকাশে শৈলজ মুখোপাধ্যায় ছিলেন ধ্রুবতারার মতই অত্যন্ত উজ্জ্বল একটি তারকা। সে তারা আজ খসে গেল। এ ক্ষতি পূরণ হবার নয়।

পুস্তক পরিচয়

ছোটগল্প

মুক্তবন্ধ—রমাপদ চৌধুরী। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—৩৲ টাকা।

রমাপদ চৌধুরী জনপ্রিয় লেখক। যদিও এই জন জনপ্রিয়তার জন্য দায়ী তার কয়েকটি সফল উপন্যাস, তথাপি একথা ভুলে গেলে অন্যায় হবে যে, তিনি সাহিত্যপথে পদক্ষেপ শুরু করেছিলেন ছোট গল্প দিয়ে। দীর্ঘ পথপরিক্রমায় তাঁর রচনার নীতি-ভঙ্গিতে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে—সেদিনকার সচেতন সৌন্দর্যপিয়াসী লেখক আজ হয়ে উঠেছেন মননধর্মী সংবেদনশীল। ঘটনার ব্যাপ্তি এবং চমক সংগত হয়ে সহজ সৃষ্টির কাছে প্রশান্তরূপে প্রতিভাসিত হয়ে উঠেছে। একজন গতিশীল লেখককে চিনতে পারা যাবে, তাঁর এই সাম্প্রতিকালে প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'মুক্তবন্ধ' থেকে।

কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, রমাপদ চৌধুরী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আজ আর কেবলমাত্র কয়েকটি মানুষকেই খুঁজে বেড়ান না, তিনি আরও গভীরে প্রবেশ করে, তাঁদেরও উৎস সন্ধানে সচেষ্ট হয়েছেন। তাই মুক্তবন্ধের গল্পগুলোতে বর্তমান কালটাকে যেন চোখের সামনে স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায়। মহৎ লেখক হওয়ার প্রলোভনে তিনি সহজেই প্রতিটি গল্পের পরিণতিতে একটি স্বর্গীয় আশাবাদ প্রচার করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করতে পারেননি। পারেননি এইজন্য যে, সময় ও সাহিত্য দুই-এর প্রতিই তিনি সত্যবন্ধ। এই সততার জন্যই বলতে হবে রমাপদ চৌধুরী সৎ লেখক। 'আমি আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া', 'পাঠক', 'ইমলী', 'টাকুর দাম' এবং 'আজকের গল্প' লেখকের এই সততার এক একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। অন্যান্য গল্পগুলিতেও সময়কে ধরবার এই প্রয়াস সহজেই লক্ষ্য করা যায়। তথাপি বলবো, শুধু একটি গল্প হিসেবে ধরলেও 'নমিতার প্রতিশোধ' তাঁর নিজেরই একটি সার্থক কীর্তি। ৩৫৮।৬০

গ্রামীন সংস্কৃতি

গ্রামীণ নৃত্য ও নাট্য—শান্তিদেব ঘোষ। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭। তিন টাকা।

সংগীতজ্ঞ হিসাবে শ্রীযুত শান্তিদেব ঘোষের নাম রসিক বাঙালীমাত্রেরই অতি সুপরিচিত। কিন্তু কেবলমাত্র সংগীত-চর্চার মধ্যেই তিনি আবদ্ধ থাকেননি। আন্তরিক অনুসন্ধিৎসা-কৌতূহলের তাগিদে তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এবং ভারতের বাইরেও গ্রামে-নগরে ঘুরে ঘুরে তদাঞ্চলিক প্রাচীনতম সমাজচিহ্ন সংগ্রহ করেছেন। প্রাচীন সমাজের মানসিক ধারা তার স্বভাবোক্ত শিল্প প্রকরণের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পেয়ে থাকে। ব্যষ্টি-সমষ্টিগত এই মানসকলা নৃত্য-গীত এবং নাট্যের মধ্যে অবশ্য প্রতিফলিত। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরকাল তিনি গভীর নিষ্ঠা এবং ক্লান্তিহীন কৌতূহল নিয়ে মানব-সভ্যতার এই মনস্তাত্ত্বিক পদচিহ্ন লক্ষ্য করে গেছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এ-বিষয়ে সমসাময়িককালে আলোচনা-প্রবন্ধও লিখেছেন। সেই লেখাগুলির মধ্য থেকে নটি বেছে নিয়ে বর্তমান গ্রন্থ সজ্জিত হয়েছে। বাংলার বাউল ইত্যাদি নাচের পাশাপাশি আসাম, দক্ষিণ ভারত এবং সিংহলের প্রসিদ্ধ নৃত্যাবলীর আলোচনা করেছেন। নৃত্যাঙ্গিকের নিখুঁত বর্ণনার পাশাপাশি তাদের পশ্চাদপট-ইতিহাস এবং আলোকচিত্র সংযোজিত হয়েছে।

গ্রামীণ সংস্কৃতি সম্বন্ধে কৌতূহলী পাঠকের কাছে গ্রন্থটি মূল্যবান প্রদর্শকের কাজ করবে। শ্রীযুত শান্তিদেব ঘোষের কাছে গ্রন্থান্তরে আমরা অন্যান্য দেশী-বিদেশী নৃত্যনাট্যের আলোচনা আশা করি। ৫২০।৬০

কালী কীর্তন (২য় সংস্করণ)
গণপতি পাঠক সম্পাদিত নূতন ধরণের শাক্ত পালাকীর্তনের পুস্তক। মূল্য ৭৫ নঃ পঃ। প্রকাশক—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দক্ষিণ কলিকাতা—প্রাপ্তিস্থান:—রায় চৌধুরী এণ্ড কোং, ১১৯ আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিঃ-২৫। গ্রন্থ-ভারত, ৪১বি রাসবিহারী এভেনিউ, কলিঃ-২৬। (সি ৮৬০১)

পূর্বপত্র
ত্রৈমাসিক সাহিত্য-পত্রিকা
আশ্বিন—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭
এই সংখ্যায় লিখেছেন:
জীবনানন্দ দাশ, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, গোপাল ভৌমিক, তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়, কুমার রায়, অশ্রুকুমার সিকদার, নবেন্দু চক্রবর্তী, সেলিম আমেদ, সোমেন সেন, পবিত্র মুখোপাধ্যায় ও অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়।
মূল্য: পঞ্চাশ নয়া পয়সা
নিও-লিট পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১নং কলেজ রো, ক'লকাতা-৯

সাহিত্য আলোচনা

সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ (প্রথম পর্ব)—জীবেন্দ্র সিংহ রায়। ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। আট টাকা।

বর্তমান পর্বে রামমোহন থেকে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যের সম্যক আলোচনা করেছেন লেখক। যুগচিন্তা ও চিত্ত বিশ্লেষণ করে ভাবজগতের বৃহত্তর ক্ষেত্রে বাঙালী-সাধনার ইতিহাস বিবৃত করেছেন। এই শ্রমসাধ্য রচনায় লেখকের শৈথিল্যের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। বহ্বারম্ভী পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের গতানুগতিক পথে না গিয়ে জীবেন্দ্রবাবু সত্যকার সাহিত্যসেবীর পরিচয় দিয়েছেন। সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক উভয় দায়িত্ব পালন সহজ কথা নয়, সেদিক থেকে তিনি কৃতী প্রবন্ধকার। বাংলা সাহিত্যের উনবিংশ শতাব্দীরই শুধু নয়, আধুনিক ফলশ্রুতির সম্পর্কে জীবেন্দ্রবাবুর ধ্যানধারণার কোথাও বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতা নেই। স্বচ্ছ দৃষ্টিতে তিনি যা লক্ষ্য করেছেন, স্বচ্ছন্দ ভাষায় তাই লিপিবদ্ধ করেছেন। দলনিরপেক্ষ নির্ভীকতারও পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কথারম্ভের ঢঙটি সুন্দর। দু একটি ক্ষেত্রে হালকা চালের বাক্য ব্যবহার করেছেন, না করলেই ভালো হত। আর একটু আত্মস্থ ও সংযতবাক্ হতে পারলে গ্রন্থের আকর্ষণ ক্ষমতা বর্ধিত হত।

নামকরণ ভালো হয়েছে কিন্তু পর্বে খণ্ডিত হওয়ায় কিঞ্চিৎ খর্ব হয়েছে। পাঠক-সাধারণ অনেকেই রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ নামটি লক্ষ্য রেখে গ্রন্থটি সংগ্রহ করবে কিন্তু রঙ্গলাল পর্যন্ত এসে স্থগিত হবে। এটি গৌণ ব্যাপার। আমরা লেখকের কাছে দ্বিতীয় পর্বের প্রত্যাশায় থাকলাম কারণ কেবলমাত্র বিষয়ভাবেই নয়, রচনারীতির জন্যও উভয়-পর্ব পরস্পরের পরিপূরক হয়ে রয়েছে। এই গ্রন্থ রচনার জন্য লেখককে আমরা ধন্যবাদ জানাই। ২৫১।৬০

নাটক

জীবনস্রোত—শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—পুস্তকালয়, ৬, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। দাম—২·৫০ নয়া পয়সা।

দিগিন্দ্রচন্দ্র আধুনিককালের একজন খ্যাতিমান নাট্যকার। তাঁর খ্যাতি লাভের পেছনের কারণটা ভুয়ো নয়। বাস্তব জগৎ ও জীবনের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত তাঁর দৃষ্টিতে যেমন সত্যরূপে ধরা দেয়, নাটকে তিনি তা প্রকৃতরূপে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেন। শুধু তাই নয়, সে বাস্তব সত্য অনিবার্যভাবে যখন সুস্পষ্ট সমস্যার রূপ নিয়ে লেখকের সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন তিনি তার সমাধানের জন্য কোনো ফাঁকির আশ্রয় নেন না। নাটকের পরিণতিতে, তাই নাট্যকারের ব্যক্তিগত একটা মীমাংসা—সোচ্চারে হয়ে প্রকাশ পায়, যা পাঠকের বা দর্শকের মনকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত চিন্তিত রাখে। 'জীবনস্রোত' তেমনি একটি সমস্যা-কীর্ণ আধুনিক নাটক। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে লেখক এখানে নতুন কিছু সমস্যার অবতারণা করেননি, বলেছেন গতানুগতিক বক্তব্যই। কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে, নরনারীর প্রেম যদিও চিরন্তন এবং ধর্মদ্বন্দ্বও তাই, তথাপি জিতেন্দ্র ও গীতার মধ্যে এই প্রেম ও দ্বন্দ্ব ঠিক চিরাচরিতরূপে ধরা দেয়নি। তাদের সমস্যা বস্তুত প্রাচীন ও নবীন পন্থার সমস্যা। তাই তেজসানন্দকে ব্যাকুল হয়ে সত্যের সন্ধান করতে হয়। পৃথিবীতে তেজসানন্দদের মতো দু' একজন মানুষ সব সময়ই থাকেন বলেই প্রেম মরে না, মিথ্যার মুখোশ শেষ পর্যন্ত উন্মোচিত হয়ই। অন্য পক্ষে বলা যায়, লেখকের তৈরী আশ্রমটি আধুনিককালের এই পৃথিবীরই প্রতীক মাত্র: অঘোরানন্দ, এলিজা, রাম-বাহাদুরেরা তাকে তাদের নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করবার জন্য উদ্‌গ্রীব। কিন্তু সত্য-সন্ধানী তেজসানন্দরা তাকে বাঁচিয়ে রাখে হেমাঙ্গিনী যূথিকাদের সহায়তায়। এমনকি তাপসের মতের বস্তুতান্ত্রিকের বিদ্রূপেও তা বিন্দুমাত্র টলে না। ঘাতে-প্রতিঘাতে নাটকটি সার্থক হয়ে উঠেছে। আশা করা যায়, এ-নাটক মঞ্চসফলও হবে।

৩১১।৬০

যা হচ্ছে তাই—কিরণ মৈত্র। পরিবেশক—সিটি বুক এজেন্সী। ৫৫, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। দাম দুই টাকা।

'যা হচ্ছে তাই' এবং 'যা হলো তাই' নামে দুটো একাঙ্ক প্রহসন নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে এই গ্রন্থ। প্রথমটি একটিমাত্র স্ত্রী-চরিত্রবিশিষ্ট ব্যঙ্গ নাটক, এবং দ্বিতীয়টি স্ত্রীভূমিকাবর্জিত। 'যা হচ্ছে তাই' মিউনিসিপ্যালিটির একজন চোরা-কারবারী চেয়ারম্যানের উচ্চাকাঙ্ক্ষার অধঃপতন—এবং পতনের কারণ তারই আদরের কন্যা। নাটকের মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন একটি সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল, লেখক কেন যে শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে সরে গেলেন, বোঝা গেলো না। প্রহসন হলেও এ-কথাটা ভাবতে কষ্ট হয়, রমেনের মতো একজন আদর্শবাদী যুবক চেয়ারম্যানের আদুরে কন্যার প্রেমে পড়তে পারে, তা-ও এমন অকস্মাৎ। বস্তুত তাতে যে রমেনের আদর্শও অধঃপতিত হচ্ছে, নাট্যকার কি তা ভেবে দেখেননি? সে-তুলনায় 'যা হলো, তাই' প্রহসনটিকে অবশ্যই অভিনন্দন জানাতে হয়। প্রহসনের মূল উদ্দেশ্য যদি হয় বিমল আনন্দ পরিবেশন করা, তবে এ-নাটকটি তা করতে সমর্থ হয়েছে। সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি বিদ্রূপ যে একেবারেই নেই তা নয়, তবু তা শুধু মাত্র ব্যঙ্গের মধ্যে মিশে আছে বলেই এখানে তার বেশী মূল্য নয়। অভিনয়ের পক্ষে দুটি নাটকই উপযুক্ত, অন্তত ব্যঙ্গকৌতুক উপভোগ করতে দর্শকদের অসুবিধা হবে না। ২৯৮।৬০,

জীবনী

বিদ্যাসাগরের ছাত্র জীবন—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু। প্রকাশক—বলাকা প্রকাশনী, ৫৩, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা—৯। দাম—২·২৫ নয়া পয়সা।

মহৎ জীবনের আদর্শকে যদি পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরা সাহিত্যের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য হয়, তবে বাস্তব জীবনে যাঁরা মহত্ত্বের প্রতীক, তাঁদের জীবন-কাহিনী অবশ্যই আদর্শ সাহিত্যের বিষয়বস্তু। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শুধু বাংলা দেশের পক্ষেই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষেই উনিশ শতকের প্রচণ্ড বিস্ময়। বিদগ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলী যাঁকে ছাত্রাবস্থাতেই 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন, যৌবনকালের মধ্যেই দেশের লোক যাঁকে 'দয়ার সাগর' বলে চিনতে পেরেছিলো, এবং পরবর্তীকালের অনলস কর্মজীবনে যিনি ছিলেন অকৃত্রিম সমাজ-সুহৃদ, তাঁকে জানবার আকাঙ্ক্ষা বোধ হয় কখনই শেষ হতে পারে না। বিদ্যাসাগরের জীবনকে ইতিপূর্বে আরো জ্ঞানগর্ভ এবং বিস্তৃত আলোচনা করে অনেকেই কৃতার্থ হয়েছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁদের পথিকৃৎ। সমস্ত কর্মধারার যোগফল থেকে বিদ্যাসাগরের যে মূর্তিকে আমরা অখণ্ডরূপে দেখতে পাই, তা মহত্তম এক পুরুষের প্রশান্ত প্রতিমূর্তি। কিন্তু সে-পরিণতিতে পৌঁছনোর আগে, আর সকলেরই মতো, তাঁরও একটা প্রস্তুতি ছিল। তিনি অবতার ছিলেন না বাল্যে, কৈশোরে তিনিও শৈশবসুলভ চপলতা দেখিয়েছেন, ভুল ত্রুটি তাঁরও হতো। কিন্তু সেসব ছাপিয়ে ধীরে ধীরে কেমন করে সেই গরীব ব্রাহ্মণ সন্তান চরম সার্থকতার পথে এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন তাও সকলের জানা দরকার। বিশেষ করে দরকার তাদের, যারা আজ তাঁরই মতো ছোট ছোট ভুল-ত্রুটি এবং চপলতার মধ্য দিয়ে বৃহত্তর জীবনের দিকে এগিয়ে চলেছে। 'বিদ্যাসাগরের ছাত্র জীবনে' লেখক সুন্দর ভাষায় বিদ্যাসাগরের সেই প্রস্তুতির কাহিনী বলেছেন ছেলেদের জন্য। তথ্য আছে যথেষ্ট, কিন্তু পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা করেননি লেখক কোথাও। বরং রচনার ভঙ্গি পাঠকের কৌতূহলকে জাগাতেই সাহায্য করে। বইটির বহুল প্রচারই শুধু

কাম্য নয়, ছোটদের মতো বড়দেরও এই বইটি শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়া উচিত।

৩৬৪।৬০,

কবিতা

আকাশ কন্যা—সাধনা মুখোপাধ্যায়। আনন্দ প্রেস, নিউ দিল্লী থেকে মুদ্রিত। দাম দুই টাকা।

সাধনা মুখোপাধ্যায় যে মহৎ কবি নন, আকাশ কন্যায় তার প্রমাণ আছে। কিন্তু সাধারণ অর্থে তিনি ভালো কবিতা লিখতে পারেন। মুহূর্তের এক-একটি অনুভবকে ছন্দোময় কথা দিয়ে ধরবার ক্ষমতা তাঁর আছে। আধুনিক কাব্যের দোষ-গুণ তাঁর মধ্যে কিছুই নেই এই কারণে যে, মূলত তিনি প্রাচীনপন্থী এবং বলতে বাধা নেই, সেদিক থেকে তিনি অনেকটা সফলও। তাঁর কোনো কবিতায় আপত্তিকর ছন্দ-পতন বিশেষ চোখে পড়ে না—যার ফলে আবৃত্তির পক্ষে প্রায় সব ক'টি কবিতাই উপযুক্ত।

বইটির কাগজ, ছাপা, সর্বোপরি প্রচ্ছদপট বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে একটি লক্ষণীয় বিষয়। ছাপার ব্যাপারে প্রকাশক কোনো ত্রুটি রাখেননি।

৪০।৬০

কথা ও ছাই—বিতোষ আচার্য। প্রকাশক—মৈত্রেয়ী পাবলিশার্স, ৭০বি মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা ১৪। দাম—২, টাকা।

'কথা ও ছাই' কাব্যগ্রন্থ থেকে যদিও কবির বিশেষ একটি মর্মবাণীকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়, তথাপি বলতে বাধা নেই, কবিতা কয়টি সুলিখিত। বিতোষ আচার্যের কাব্য-পাঠ ব্যর্থ হয়নি, কেননা কাব্যরচনায় তিনি নিজস্ব একটি ভঙ্গিকে আয়ত্ত করতে পেরেছেন। অন্তত তাঁকে একজন আধুনিক কবি বলে স্বীকার করতে পাঠকদের অসুবিধা হবে না। আধুনিকতার জন্য নয়, কবিতার সাধারণ সংজ্ঞা জেনেই একটি কথা বলা প্রয়োজন, কয়েকটি কবিতা, সুলিখিত হয়েও, অর্থবহ হয়ে ওঠেনি। বলা বাহুল্য, দুর্বোধ্যতা তাদের ত্রুটি নয়, ত্রুটি কবিমনের প্রকাশের ব্যর্থতায়। সংকলন প্রকাশের আগে এ-রকম দু' একটি কবিতা সম্বন্ধে কবি ভেবে দেখলে ভালো করতেন। প্রচ্ছদপট ও সি গাঙ্গুলীর আঁকা। ছবিটি নিশ্চয়ই গূঢ়ার্থবোধক কিন্তু একটি কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদপট হিসেবে তা কতখানি দৃষ্টিশোভন তা কাব্যরসিকরা বিচার করে দেখবেন।

৩৩২।৬০

বন্দী মুহূর্ত—আবদুর রসিদ খান। প্রকাশক—এশিয়া বুক হাউস, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা—১। দাম আড়াই টাকা।

রাষ্ট্রীয় কারণে পূর্ব পাকিস্তান ভারতবর্ষের বাইরে হলেও, পূর্ববঙ্গের কবি মূলত বাঙালী কবিই। সুতরাং আধুনিক বাংলা কাব্যধারার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানের কোনো কবির কাব্যালোচনা করাই বোধহয় বিধেয়। সেদিক থেকে বিচার করলেও বলা যায়, আবদুর রসিদ খান অক্ষম কবি নন। আধুনিক বাংলা কাব্যের সঙ্গে যে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, তা বন্দী মুহূর্ত পড়লে স্পষ্টই বোঝা যায়। সে সঙ্গে এ-ও লক্ষ্য করা যায় যে, কবি চিন্তাক্ষেত্রে নিজস্ব একটি বক্তব্যকে প্রকাশ করতেও সচেষ্ট। তাতে সব সময়েই যে তাঁর কাব্য-প্রচেষ্টা সফল হয়েছে তা নয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো কবিতাই যে একেবারে ব্যর্থ হয়ে যায়নি তার কারণ তিনি কবিতা লিখতে জানেন। অন্তত ছন্দবোধ যে কবির অত্যন্ত সজাগ, এ-কাব্যগ্রন্থের যে-কোনো কবিতা পড়লেই পাঠক বুঝতে পারবেন। অনেক কবিতায় কবির সংবেদনশীল হৃদয়টিকেও অনুভব করা যায়। ৫৩৯।৫৯

সাধক-প্রসঙ্গ

১। তাঁহারি প্রকাশ—।০
২। গুরুশক্তি সঞ্চার মাহাত্ম্য—।০
৩। শিক্ষাষ্টক—।।০

স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী প্রণীত এবং শ্রীশ্রীনিগমানন্দ ভক্ত সংঘ হইতে শ্রীকৃষ্ণকুমার নাগ কর্তৃক ২৮, শ্যামপুকুর স্ট্রীট, কলিকাতা—৪ হইতে প্রকাশিত।

প্রথমোক্ত পুস্তিকাখানি গুরুতত্ত্ব সম্পর্কিত। দীক্ষাগুরু এবং চৈত্ত্যগুরু, অর্থাৎ ভগবান একই। শিক্ষাগুরুরূপে কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে সাধক গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই সিদ্ধান্তকে পরিস্ফুট করিয়াছেন। বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত মতে গুরু ভগবানের দাস হইলে তাঁহারই প্রকাশ শক্তিরূপে পূজিত। প্রকাশ স্বরূপ হইতে পৃথক্ নয়। গ্রন্থকার জ্ঞান এবং ভক্তি উভয় সাধন প্রকরণেই গুরুর মাহাত্ম্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সমালোচনা সুচিন্তিত এবং সারগর্ভ। পাঠে সকলেই উপকৃত হইবেন।

'গুরু শক্তির সঞ্চার মাহাত্ম্য' শীর্ষক পুস্তিকায় গুরু কর্তৃক শিষ্যে নিজ সাধন শক্তি সঞ্চারের রহস্য আলোচিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে শক্তির এমন সঞ্চার সামর্থ্য যাঁহার আছে, তিনিই সংগুরু। সর্বশক্তিসম্পন্ন ভগবানের সহিত যিনি একীভূত হইয়া গিয়াছেন, শক্তি সঞ্চার সামর্থ্য শুধু তাঁহারই আছে। গ্রন্থকার এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা উল্লেখ করিয়াছেন। অধ্যাত্ম-রস-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই পুস্তিকাখানি পাঠে উপকৃত হইবেন এবং আনন্দলাভ করিবেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের স্বমুখোচ্চারিত

পূজায় প্রকাশিত হয়েছে
সাম্প্রতিক কালের একটি
উল্লেখযোগ্য উপন্যাস

বিমল করের
মল্লিকা

একটি মেয়ে, নাম মল্লিকা। একটি যুবকের জীবনের মোহ। যে যুবক একদা অবাক হয়ে আপন বৃত্তের বাইরে এসে কুসুমের রঙের বিহ্বলতায় প্রগাঢ় হল, জলের বুকে বিলি কেটে-কেটে আলপনা আঁকল; অথচ ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার গাঢ়তায় একদা শুধু অন্ধকারকেই জানল। তার সেই পুরণো বৃত্তের বাইরে থেকেই মল্লিকা হারাল, কেমন ক'রে অনাবশ্যক হয়ে ফুলের পাপড়ি গুটিয়ে গন্ধ ঢাকল! তবু গন্ধ গেলো না, ফুরলো না, স্মৃতির সম্পদ হয়ে শুধু অদৃশ্য থেকে এক অনন্ত-মাধুর্যের আধার হল। ...এ-সেই প্রথম প্রেমের সুরভিমধুর আর অন্তর্দ্বন্দ্বময় অথচ অনিঃশেষ জীবনের স্পর্শাতুর কাহিনী। দাম ঃ ৩,

●

আমাদের প্রকাশনীর
জনপ্রিয় ৪টি উপন্যাস

বারীন্দ্রনাথ দাশের
দুলারী বাঈ
দাম—৪,

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের
তারার আঁধার
দাম—৩।।০

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বৈশালীর দিন
দাম—৩।০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
কস্তুরী মৃগ
দাম—৪,

একমাত্র পরিবেশক ঃ ত্রিবেণী প্রকাশন
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ঃঃ কলিকাতা-১২

মফঃস্বলের অর্ডার ঃ কথাকলি
১, পঞ্চানন ঘোষ লেন ঃঃ কলিকাতা-৯

শিক্ষাষ্টক ভক্ত সমাজের সর্বত্র পরম আদরের বস্তু। গ্রন্থকার সাধনালব্ধ অনুভূতির দ্বারা শিক্ষাষ্টকের অমৃতরস আস্বাদন করিয়াছেন। পাঠে সকলেই পরিতৃপ্ত হইবেন। নামের মাহাত্ম্য এবং মাধুর্য অন্তরে চিদানন্দের ছন্দ সঞ্চার করে। ভাষা এবং ভাব সুমধুর।

ভক্তমালের ভক্তচরিত—(প্রথম খণ্ড)। স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী প্রণীত। শ্রীজিতেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক ৩১নং শ্যামপুকুর স্ট্রীট, বরেন্দ্র স্মৃতিভবন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা।

গ্রন্থকার সাধক পুরুষ। তাঁহার লিখিত 'শ্রীজগন্নাথী মাধবদাস' নামক পুস্তকখানি জনসমাজে বিশেষভাবে সমাদর লাভ করিয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানিতে প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থ ভক্ত মালের ৮টি চরিতের আলোচনা আছে। স্বামীজী সমগ্র মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া ভক্ত-মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। প্রতিটি চরিত্র পাঠকালে ভাষার চাতুর্য এবং ভাবের মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া পড়িতে হয়। এমন পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। ৪০২।৬০

উপন্যাস

আকাশ-নন্দিনী—গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। গ্রন্থভবন, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭। দাম—সাড়ে তিন টাকা।

"আকাশ-নন্দিনী" উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বুলা। বুলা একদিন ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় এসে কলেজে ভর্তি হয়েছে। সুন্দরী ও প্রাণোচ্ছল বুলার জীবন ও যৌবনে উম্মাদনার জোয়ার এসেছে। তবু কী এক রহস্যের হাতছানি থেকে থেকে বুলাকে কেমন যেন উন্মনা করে তোলে। কী যেন হতে না পারার ব্যর্থতায় সে বিড়ম্বিত। বুলার রহস্য উতলা করে তোলে তার দাদামণিকে—যিনি ছোটবেলা থেকে মা-মরা বুলাকে বড় হতে দেখেছেন এবং অনাত্মীয় হয়েও যিনি তার পরমাত্মীয়। বুলার প্রতি এই পরমাত্মীয়ের এক অস্বাভাবিক অনুচ্চারিত অনুরাগের ভেতর দিয়েই কাহিনীর ভাববিন্দু গড়ে উঠেছে। অন্য পুরুষের চোখে যে ভাষা দেখলে বুলার ভালো লাগে দাদামণির চোখে সে ভাষা ফুটে উঠলে বুলার কান্না পায়। দাদামণির মনের আকাশে বুলা একটি বেদনার তারা হয়েই জ্বলতে থাকে।

নর-নারীর সম্বন্ধের এক জটিল মনোবিশ্লেষণকে ভিত্তি করেই উপন্যাসটির রসের বিস্তার। কাহিনী বর্ণনায় লেখকের দক্ষতা প্রশংসনীয়। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট সুন্দর ২৫৫।৬০

শারদ-সাহিত্য

মহরং—১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা। সম্পাদক—শ্রীগণেশ নন্দী, ৮।৫৩, ফার্ন রোড, কলিকাতা-১৯ হইতে প্রকাশিত। মূল্য—২৲ টাকা।

পূজা সংখ্যা দিয়েই 'মহরং'-এর শুরু। পত্রিকাখানিতে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যের ছাপ কোথায়ও পেলাম না। গতানুগতিক।

আলোচ্য পূজা সংখ্যাখানিতে একটি উপন্যাস, কয়েকটি ছোট বড় গল্প ও প্রবন্ধ ও একটি নাটিকা স্থান পেয়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জিগীষা—সম্পাদক—জয়গুরু চক্রবর্তী। ১৩৫-এ মুক্তারামবাবু স্ট্রীট, কলিকাতা-৭। মূল্য ২৲ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

আলোচ্য শারদীয়া সংখ্যাখানিতে নাট্যকলা সম্পর্কে বহু সুচিন্তিত রচনা স্থানলাভ করিয়াছে। লেখকগণের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আথর—সম্পাদক : শ্রীরমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও শ্রীকানাই কর্মকার। ১৬৯।ই, কাশীনাথ দত্ত রোড, কলিকাতা-৩৬ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২৫ নঃ পঃ।

কয়েকটি ছোটগল্প, কবিতা এবং প্রবন্ধ সমৃদ্ধ শহরতলীর একটি ত্রৈমাসিক সাহিত্য-পত্র। অধ্যাপক নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়-এর গুপ্ত-কবি সম্বন্ধে ক্ষুদ্র আলোচনা ছাড়াও তরুণ লেখকদের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। প্রচ্ছদ মনোরম।

পরিধি—শারদীয় সংখ্যা সম্পাদকমণ্ডলী কর্তৃক পুরী হইতে প্রকাশিত।

প্রবাসী বাঙালী ও অন্যান্য লেখকদের যুগ্ম প্রচেষ্টা। প্রবন্ধ, ছোট গল্প, সিনেমা আলোচনা ও কবিতা সম্বলিত সংক্ষিপ্ত সংকলন।

খেলার জগৎ—সম্পাদক মণ্ডলী কর্তৃক ৮৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৫০ নঃ পঃ।

খেলাধুলোর সংবাদ ছাড়াও খেলার বিষয় নিয়ে লেখা নাটিকা, গল্প ও কবিতা এবারের শারদীয় সংখ্যার মুখ্য আকর্ষণ।

ঘরে বাইরে—সম্পাদিকা কনক মুখোপাধ্যায়। ১৮৮।২, বহুবাজার স্ট্রীট, কলি-১২। এক টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।

মহিলাদের অন্যতম মুখপাত্র 'ঘরে বাইরের' শারদীয়া সংখ্যাটি গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, রহস্য উপন্যাস ও কৌতুক নাটিকায় সুশোভিত। লেখিকাদের মধ্যে অনেকেই সাহিত্যিক মহলে সুপরিচিতা; তন্মধ্যে জ্যোতির্ময়ী দেবী, সীতা দেবী, মণিকুন্তলা সেন, ডঃ রমা চৌধুরীর প্রবন্ধ; মৈত্রেয়ী দেবী, প্রমিলা নজরুল ইসলাম, উমা দেবীর কবিতা এবং সুরুচি সেনগুপ্তা, হাসিরাশি দেবীর গল্প আলোচ্য সংখ্যার আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে॥

মানস—সম্পাদক—রবি রায়। ৬৪ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে প্রকাশিত। দু'টাকা।

প্রখ্যাত ও প্রতিশ্রুতিবান লেখকগোষ্ঠীর মননশীল প্রবন্ধ, ছোটগল্প, কবিতা এবং রম্যরচনা প্রভৃতি বিবিধ রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্রিকা 'মানসের' পঞ্চম বার্ষিক শারদ সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। শারদ সংকলনে প্রকাশিত প্রিয়তোষ মৈত্রেয়, গোপিকানাথ রায় চৌধুরী এবং পুলিনবিহারী চক্রবর্তীর আলোকচিত্র সম্পর্কিত প্রবন্ধ বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যে পত্রিকাটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে; অমিয়ভূষণ মজুমদার, দেবেশ রায়, শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, অজয় গুপ্ত, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, শুভ্রাংশু ভট্টাচার্যের গল্প এবং বিষ্ণু দে, মণীন্দ্র রায়, অরুণ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন বসু, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, মলয়শংকর দাশগুপ্ত, রাম বসু, সিদ্ধেশ্বর সেন, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির কবিতা; উৎপলকুমার বসুর রম্যরচনা ইত্যাদি পত্রিকাটির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে। সুভাষচন্দ্র বসুর অপ্রকাশিত পত্রাবলী 'মানসের' বর্তমান সংখ্যার প্রধান আকর্ষণ।

জাগরী—সম্পাদক শ্রীঅপূর্বকুমার সাহা। ৯এ, হরলাল মিত্র স্ট্রীট, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

আলোচ্য শারদীয়া সংখ্যাখানি, কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক, রম্যরচনা, গল্প প্রভৃতিতে সমৃদ্ধ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। লেখকগণের মধ্যে হরপ্রসাদ মিত্র, পরিমল গোস্বামী, পশুপতি ভট্টাচার্য, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় দেবজ্যোতি বর্মণ, মৌমাছির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রচ্ছদ ফটো মনোরম।

প্রাপ্তি স্বীকার

ভূদানযজ্ঞ (বিনোবা জয়ন্তী সংখ্যা) ষষ্ঠ বর্ষ ২৭ সংখ্যা, ২৫শে ভাদ্র, ১৩৬৭—
—সম্পাদক শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী।

নীতির বিচার—মিলোভান জিলাস্। অনুবাদক বিকাশ মজুমদার।

আলোর চকোর—পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

অন্য এক সমুদ্র—শান্তিকুমার ঘোষ।

বিভূতি-সাহিত্য পরিক্রমা—রমেন্দ্রনাথ মল্লিক।

Religion and Realisation
—By Diamond

রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

রঙমহলে "সাহেব বিবি গোলাম"

রবীন্দ্র-শরত্তোত্তর যুগের যে কটি রসোত্তীর্ণ উপন্যাস সর্বশ্রেণীর পাঠকদের অভিনন্দন পেয়েছে, বিমল মিত্র রচিত 'সাহেব বিবি গোলাম' তার অন্যতম। রঙমহল রঙ্গমঞ্চের বর্তমান আকর্ষণ 'সাহেব বিবি গোলাম' এই জনপ্রিয় উপন্যাসেরই নাট্যরূপ।

ঊনবিংশ শতকের প্রদোষকালের কলকাতা এই উপন্যাসের পটভূমি। সামন্ত আভিজাত্য তখন মুমূর্ষু, কলকাতার নগর-সভ্যতা তখন নতুন প্রাণপ্রবাহে চঞ্চল। যুগমানসের এই যুগসন্ধিক্ষণে একদা-বিপুল বৈভবের অধিকারী এক ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত পরিবারের করুণ বিলোপের যে-কাহিনী এই উপন্যাসে উদ্ঘাটিত, তার মধ্যে সামন্ত বিলাস-ব্যভিচারের পাশে রূপ নিয়েছে নিষ্কলঙ্ক হৃদয়াবেগের মধুর উপাখ্যান। দুই ধারায় প্রবাহিত উপন্যাসের কথাবস্তুতে ভিড় করে এসেছে অনেক চরিত্র—বড়বাড়ির ভর্তা, ভার্যা ও ভৃত্য ব্যতীত আরও অনেক নর-নারী। তাদের মধ্যে মুখ্য হয়ে উঠেছে সামন্ত আভিজাত্য ও উচ্ছৃঙ্খলতার দুই মূর্ত প্রতীক বড়বাড়ির মেজবাবু ও ছোটবাবু; চৌধুরী পরিবারের কনিষ্ঠা বধূ, বেদনার প্রতিমূর্তি পটেশ্বরী; সুখ ও সৌভাগ্যের ছলনায় ম্লানমুখী জবা এবং এদের সকলের জীবনের আনন্দ-বেদনা ও একটি উদ্‌ভ্রান্ত লক্ষ্যভ্রষ্ট পরিবারের নিদারুণ অবক্ষয়ের দরদী দর্শক ভূতনাথ। ভূতনাথের মনের পটে পটেশ্বরী বৌঠানের জীবনের করুণ কাহিনী গভীর ও নিবিড় ব্যথার যে আলপনা এঁকে যায়, এবং জবার আশা-অভীপ্সা যে অনির্দেশ্য উন্মাদনার ছবি ফুটিয়ে তোলে তাকে ঘিরেই কাহিনীর অন্তর্লীন নাট্যরসের বিস্তার।

'সাহেব বিবি গোলাম'-এর নাট্যরূপে পটেশ্বরী বৌঠান ও জবার চরিত্রের বেদনা-মিশ্রিত মাধুর্যের আভাস মেলে। পটেশ্বরীর চরিত্রটি নাটকে নিষ্ফল চিত্তদাহ ও দুঃসহ বিড়ম্বনার অশ্রুসজল রেখায় অঙ্কিত। কিন্তু ভূতনাথের সান্নিধ্যে পটেশ্বরীর জীবনের ব্যর্থতা ও অন্তর-সংঘাতকে কেন্দ্র করে মূল কাহিনীতে যে স্নিগ্ধ মর্মস্পর্শী নাট্যোপাখ্যান রূপ নিয়েছে নাটকটিতে তা অনুপস্থিত।

ভূতনাথের জীবনে জবার আবির্ভাবকে উপলক্ষ্য করেও নাট্যকার নাটকটিতে ঈপ্সিত নাট্যাবেগ সৃষ্টি করে তুলতে পারেননি। মূল কাহিনীর এই দুই রসমধুর নাট্যোপাখ্যানের পরিবর্তে নাটকটিতে অবাঞ্ছিত প্রাধান্য পেয়েছে চৌধুরী-বাড়ির দুই কর্তার উচ্ছৃঙ্খল ও নীতিবোধহীন উন্মার্গ জীবন-যাপন, বাইজীর নাচ এবং সুর ও সুরার প্রস্রবণ। এর ফলে নাটকটি আমোদের নেশা ও রোমাঞ্চ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু মর্মসঞ্চারী নাট্যরসের আকর হয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু নাটকটির গতি স্বচ্ছন্দ এবং এর বিশেষ কয়েকটি দৃশ্য সুপরিকল্পিত ও রসসমৃদ্ধ। এবং নাট্যরূপের ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে নাটকটি দর্শকের চিত্ত-বিনোদনের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছে। এর জন্যে নাট্যপরিচালক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং অংশত নাট্যকার, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রসিকজনের প্রশংসাভাজন হবেন।

সম্মিলিত অভিনয়-সৌকর্যে নাটকটি সমৃদ্ধ। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ভূতনাথ-বেশী তরুণ অভিনেতা বিশ্বজিতের সংবেদনশীল ও সংযত অভিনয়ের কথা। চরিত্রটির অনাসক্ত দরদ, অপরের দুঃখে তার মনের অস্ফুট প্রতিক্রিয়া, অনুচ্ছ্বাস কৌতূহল, বিনয়, সরলতা ও সর্বোপরি অন্তর্দ্বন্দ্বের অভিব্যক্তি বিশ্বজিৎ তাঁর অভিনয়ে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। ছোটবাবুর ভূমিকায় নীতীশ মুখোপাধ্যায়ের চরিত্র-চিত্রণও মনোগ্রাহী। বিধু সরকারের রূপসজ্জায় জহর রায়ের প্রাণোচ্ছল অভিনয় নাটকটির অন্যতম বিশেষ সম্পদ। তাঁর এই চরিত্র-সৃষ্টি স্মরণীয়।

অন্যান্য পুরুষচরিত্রের মধ্যে স্বল্প অবকাশে দর্শকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অজিত চট্টোপাধ্যায়। ভৃত্য বংশীর ভূমিকায় এই কৌতুকাভিনেতা সুষ্ঠু চরিত্রাভিনয়ের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বুড়-বাড়ির এক দরদী পুরাতন ভৃত্যের মনোময় চরিত্র তাঁর অভিনয়ে অঙ্কিত। মেজবাবুর

সিনে আর্ট প্রোডাকশনের "গঙ্গা" চিত্রে সন্ধ্যা রায়

এক মদ্যপ পার্শ্বচরের চরিত্রে হরিধন মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় সুন্দর ও চরিত্রানুগ। ঘড়িবাবু'র চরিত্রে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় অতিশয়তার দোষে দুষ্ট। মেজবাবুর ভূমিকায় নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় মনে রেখাপাত করে না। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশংসনীয় অভিনয়-কৃতিত্ব দেখিয়েছেন রবীন মজুমদার (ননীলাল) ও ঠাকুরদাস মিত্র। কয়েকটি ছোট চরিত্রে উল্লেখযোগ্য সমর চট্টোপাধ্যায়, অশ্রু ভট্টাচার্য ও মিণ্টু চক্রবর্তী।

নাটকটির নারী চরিত্রগুলির মধ্যে পটেশ্বরীর রূপসজ্জায় শিপ্রা মিত্র তাঁর আবেগমণ্ডিত অভিনয়ের জন্য দর্শকদের প্রশংসা পাবেন। কিন্তু চরিত্রটির গভীরতর জীবনবেদনা তাঁর অভিনয়ে অপরিস্ফুট। চুনীবালার ভূমিকায় কেতকী দত্তের অভিনয় বাস্তবানুগ। জবা'র চরিত্রে শিপ্রা সাহা স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল অভিনয়ের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অন্য কয়েকটি পার্শ্বচরিত্রে

এম-আর-এম প্রোডাকশন্সের হিন্দী ভক্তি-চিত্র "ভক্তি মহিমা"র একটি বিশিষ্ট চরিত্রে সরোজা দেবী।

কবিতা রায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দীপিকা দাস উল্লেখযোগ্য।

অনিল বাগচীর সংগীত পরিচালনা নাটকটির এক বিশেষ আকর্ষণ। অনিলা দেবী ও শ্যামলী মুখোপাধ্যায় (বাঈজী) এবং শিপ্রা মিত্র'র কণ্ঠের গানগুলি শ্রীবাগচীর সুরারোপে সুখশ্রাব্য। তাঁর রচিত আবহ-সংগীতও পরিবেশানুগ। শুক্লা দাসের একটি নৃত্যাংশ ছবির আমোদ আয়োজনের অন্যতম উপাদান।

নাটকটির মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত ও পাত্র-পাত্রীদের রূপসজ্জার জন্যে যথাক্রমে প্রশংসা পাবেন অমলেন্দু সেন, অনিল সাহা ও সেখ মেহবুব।

চিত্রালোচনা

"শেষ পর্যন্ত ও "অজানা কাহিনী" এই দুটি নতুন বাংলা ছবি এ সপ্তাহের বিশেষ আকর্ষণ।

প্রোডাকশন সিণ্ডিকেটের 'শেষ পর্যন্ত'

ফিল্ম ক্র্যাফ্‌টের "বেনারসী"র মুখ্য দু'টি ভূমিকায় রুমা গাঙ্গুলী ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

তোলা হয়েছে কুমারেশ ঘোষের একটি কৌতুকোজ্জ্বল কাহিনী অবলম্বনে। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এর চিত্রনাট্য লিখেছেন এবং সুধীর মুখোপাধ্যায় ছবিটি পরিচালনা করেছেন। ছবি বিশ্বাস, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবেন বসু, বিশ্বজিৎ, তরুণকুমার, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্তা, রেণুকা রায়, গীতা দে, তুলসী চক্রবর্তী ও নবাগতা সুলতা চৌধুরীকে নিয়ে এর মুখ্য ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। সুরযোজনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। নেপথ্য কণ্ঠশিল্পীদের মধ্যে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

জয়শ্রী পিকচার্সের 'অজানা কাহিনী'-র নায়িকা অভিনেত্রী সুপ্রিয়া চৌধুরী। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন অসিতবরণ, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, রবীন মজুমদার, তরুণকুমার, নমিতা সিংহ, তুলসী চক্রবর্তী প্রভৃতি। কমল দেব লিখিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন সুনীলবরণ। অপরেশ লাহিড়ী এর সুরকার।

• • •

অরূপ গুহ ঠাকুরতার পরিচালনায় ফিল্ম ক্র্যাফটের প্রথম প্রয়াস 'বেনারসী'র চিত্র গ্রহণ টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে অগ্রসর হচ্ছে। রুমা গাঙ্গুলী একাধারে এর নায়িকা ও কণ্ঠশিল্পী। তাঁর সঙ্গে যাঁরা অভিনয় করছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী ও অনুপকুমারের নাম। ছবিটির বহির্দৃশ্য তুলতে পরিচালক গুহ ঠাকুরতা সদলবলে সম্প্রতি রাঁচীতে [illegible]। দীনেন গুপ্ত ও দুর্গা মিত্র যথাক্রমে [illegible] ও শব্দগ্রহণের দায়িত্ব বহন করছেন। ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ এ ছবির সুরকার। 'বেনারসী' বিমল মিত্রের ঐ নামের একটি বিখ্যাত উপন্যাসের চিত্ররূপ।

• • •

কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে পাঁচটি স্বল্প-দৈর্ঘ্যের ছবি তুলতে প্রবীণ পরিচালক দেবকীকুমার বসু চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন—এ সংবাদ আগেই প্রকাশিত হয়েছে। গত সপ্তাহে এই পর্যায়ের একটি ছবির সংগীত গ্রহণ ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে সম্পন্ন হয়েছে। কমল দাশগুপ্ত তার সুরস্রষ্টা। দীর্ঘ অবসরের পর এই যশস্বী সুরকারের প্রত্যাবর্তনে সংগীতানুরাগী মাত্রেই আনন্দিত হবেন। ছবিটি ভক্ত রুইদাসের জীবনালেখ্য। অস্পৃশ্যতা নিবারণের সাধু উদ্দেশ্যে ছবিগুলি তোলা হবে।

• • •

সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনাধীনে সুচিত্রা সেনের অভিনয় দেখবার সুযোগ চিত্রামোদীরা পাবেন শ্রী এন সি এ প্রোডাকশন্সের আগামী চিত্র 'দেবি চৌধুরানী'-তে। এই মর্মে দুই পক্ষই গত সপ্তাহে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই কালজয়ী উপন্যাসকে বাংলা এবং হিন্দী দুভাষাতেই চিত্রান্তরিত করবার সংকল্প প্রযোজক প্রেম আঢ্যের আছে। তাছাড়া সুযোগ ও সুবিধা পেলে ইংরেজীতে এর একটি আন্তর্জাতিক সংস্করণও নির্মিত হবার সম্ভাবনা আছে। ছবির ভূমিকালিপি এখনও বিবেচনাধীন। যদি ইংরেজীতেও ছবিটি তোলা সাব্যস্ত হয়, তাহলে সিনেমাস্কোপ পদ্ধতিতে 'দেবী চৌধুরানী' তোলবার পরামর্শ দিয়েছেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়।

• • •

হিন্দী চিত্রনির্মাতাদের কাছে বাংলা গল্পের জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বোম্বাইতে গত সপ্তাহে বিমল রায় প্রোডাকশন্সের দু'খানি হিন্দী ছবির মহরৎ একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। একটির নাম 'প্রেমপত্র', অগ্রগামী পরিচালিত বাংলা ছবি 'সাগরিকা'-র কাহিনী অবলম্বনে তা তোলা হবে। নিতাই ভট্টাচার্য এর কাহিনীকার। জরাসন্ধ রচিত তামসী-র' একটি নাটকীয়

রঙমহল
— ফোন : ৫৫—১৬১৯
প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার : ৬॥টায়
রবি ও ছুটির দিন : ৩টা - ৬॥টায়
বিমল মিত্রের যুগান্তকারী কাহিনী

সাহেব বিবি গোলাম

নাট্যরূপ : শচীন সেনগুপ্ত
পরিচালনা : বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র
সুরসৃষ্টি : অনিল বাগচী
শ্রেষ্ঠাংশে—নীতীশ, রবীন, হরিধন, সত্য, জহর, বিশ্বজিৎ, নবদ্বীপ, অজিত, ঠাকুরদাস, নির্মল, মিন্টু, সমর, কার্তিক, সুনীত, শিপ্রা সাহা, কেতকী দত্ত, কবিতা রায়, শুক্লা দাস, মমতা বন্দ্যোঃ, অমিলা দেবী, শ্যামলী মুখোঃ, দীপিকা দাস ও শিপ্রা মিত্র।

ষ্টার থিয়েটার
[শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত] ফোন: ৫৫-১১৩৯

শ্রেয়সী

আজকের সমাজ-সমস্যার সম্মুখীন হয়ে যে নাটক কথা বলছে—
কাহিনী: সুবোধ ঘোষ
নাটক ও পরিচালনা: দেবনারায়ণ গুপ্ত
দৃশ্য ও আলোক: অনিল বসু
প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ৬॥টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটীর দিন ৩টা ও ৬॥টায়
রূপায়ণে: ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, সাবিত্রী চট্টোঃ, বসন্ত চৌধুরী, অজিত বন্দ্যোঃ, অপর্ণা দেবী, অনুপকুমার, জিজি চক্রঃ, শ্যাম লাহা, নীলা পাল, তুলসী চক্রঃ, পঞ্চানন, বেলারাণী, প্রেমাংশু বোস ও ভানু বন্দ্যোঃ

'সুরের পিয়াসী'র একটি দৃশ্যে প্রবীরকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী ও মিহির ভট্টাচার্য।

কাহিনীকে ভিত্তি করে দ্বিতীয় ছবিটি নির্মিত হবে। এর নাম রাখা হয়েছে 'বন্দিনী'। দুটি ছবিরই পরিচালনা করবেন বিমল রায়।

ওদিকে প্রযোজক-অভিনেতা অশোককুমার শরৎচন্দ্রের 'মেজদিদি'-র হিন্দী চিত্র-স্বত্ব ক্রয় করেছেন। হিন্দীতে ছবিটির নাম হবে 'মাঝলি দিদি'। পরিচালনা করবেন 'কল্পনা'-খ্যাত রাখন।

২০০
রজনীর
পথে
অঙ্গার
মিনার্ভা থিয়েটারে
(সি-৮৪৮৯)

মামুলি সামাজিক কাহিনী

পুষ্প পিকচার্স-এর 'নঈ-মা' হিন্দী ছবির কয়েকটি বহুব্যবহৃত ও অতিপরিচিত আমোদ ও নাট্য-উপকরণের ভিত্তিতে তৈরী।

ছবির যিনি 'নঈ-মা' চিত্রামোদীদের কাছে তিনি মোটেই নতুন নন। উন্নাসিক আধুনিক সমাজ থেকে এক সজ্জন সদ্য-বিপত্নীকের ঘরের ঘরণী হয়ে আসেন তিনি। বলা বাহুল্য, এই পরিণয় স্বামীর প্রতি তার পূর্ব প্রণয়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপেই দেখা দিয়েছে। স্বামীর ঘরে এসে তিনি লোকান্তরিতা সতীনের শিশুপুত্রকে কিছুতেই আপন করে নিতে পারেন না। শিশুপুত্রটি অতিরিক্ত পরিমাণে উদার। সে তার পিতার কাছে বিমাতার কোন অনাদর অবজ্ঞার কথাই প্রকাশ করতে নারাজ। কিন্তু একদিন যখন 'নঈ-মা'র অত্যাচার চরমে ওঠে তখন গৃহকর্তার কাছে কিছুই আর গোপন থাকে না। 'নঈ-মা' স্বামীর কাছে তিরস্কৃত হয়ে চলে আসেন পিতৃগৃহে। কিন্তু পিতার কাছে তিনি প্রশ্রয়ের পরিবর্তে গঞ্জনা পেয়ে শেষপর্যন্ত কী-ভাবে কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করেন এবং সতীনপুত্রের কাছে মায়ের আসন পেয়ে স্বামীসোহাগিনী হয়ে ওঠেন তা-নিয়েই ঘটে কাহিনীর নাট্যপরিণতি।

ছবির এই মূল কাহিনী একাধিক ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে বিস্তৃত। নায়কের বেকার-জীবনের দুর্ভোগ, অসৎসঙ্গে তার বিপত্তি ও স্ত্রীবিয়োগ, এবং তার এক তস্কর ও পকেটমার বন্ধুর চারিত্রিক রূপান্তর ছবির প্রধান স্থান অধিকার করে নিয়েছে।

মূল কাহিনী ও আনুষঙ্গিক সকল উপাখ্যানের চিত্রায়ণে গোঁজামিল, কষ্টকল্পনা ও
অসঙ্গতি স্তরে স্তরে স্তূপীকৃত
উঠেছে। পরিচালক পি এল সং
কাহিনীর এই সব নীরস উপাদান
মামুলী প্রয়োগধারায় বিন্যস্ত করে ছবি
স্বল্পবুদ্ধি দর্শকদের কাছে আদরণীয়
তুলতে কোন ত্রুটি রাখেন নি। আর চ
মতি চিত্রামোদীদের জন্যে রেখেছেন
গান ও কৌতুকের সম্ভার।

চিত্রনাট্যের প্রয়োজন মিটিয়ে ছবির
দুটি চরিত্রের রূপদান করেছেন বল
সাহ্নী ও শ্যামা। বলরাজ সাহ্নীর অ
কোন কোন মুহূর্তে দর্শকমনে রেখা
করলেও, শ্যামার অভিনয় মোটেই চিত্তাক
হয়নি। ডেইজি ইরাণীর অভিনয়ের অব
পকতা পীড়াদায়ক। অন্যান্য বিশেষ চ
রয়েছেন পিস কনওয়াল; মারুতি ও নি
শর্মা।

রবি পরিচালিত ছবির সংগীত
বৈশিষ্ট্যবর্জিত। কলাকৌশল ও আ
সৌষ্ঠবের বিভিন্ন দিক পরিচ্ছন্ন।

দুটি তথ্যচিত্র

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বি
প্রযোজিত 'সংগীতনায়ক গোপেশ্বর ব
পাধ্যায়' জীবনীচিত্রটি গত সপ্ত
কলকাতার বিভিন্ন চিত্রগৃহে মুক্তি
করেছে।

বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্যদীপ্ত সংগীতসাধ
এই একনিষ্ঠ উত্তর-সাধক অশীতিপর ব
বয়সে আজও নীরব সাধনায় নিমগ্ন। বি
পুরে নিজ আলয়ে তাঁর সহধর্মিণী নি
প্রভাতে তানপুরা'র তারে সুরের ঝং
তোলেন, আর বৃদ্ধ সংগীত-নায়ক গো
শ্বরের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে বিভিন্ন রা
রাগিণী। শুধু নিজের সাধনা নিয়েই যে ব
শিল্পী ব্যাপৃত থাকেন তা নয়, প্রিয় শি
শিষ্যাদের সংগীত শিক্ষাদানে আজও তি
অক্লান্ত।

পিতা 'অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কা
অতি কৈশোরে গোপেশ্বর সংগীত-সাধন
দীক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর একাধিক গুরু
কাছে সুরচর্চা করে তিনি একদিন ভার
বিখ্যাত হন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁ
'স্বর-সরস্বতী' উপাধিতে ভূষিত করেন।

সংগীতনায়কের এই কীর্তিময় জী
এবং তাঁর সাধনা ও সিদ্ধির পরিচয় তু
ধরা হয়েছে দুই রীলের এই তথ্যচিত্রটিতে

সংগীতনায়ক গোপেশ্বর ও তাঁর সুযোগ
পুত্র রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাও
শাস্ত্রীয় সংগীত এ-ছবির প্রধান আকর্ষ
সব্যসাচীর মধুর নেপথ্যভাষণে সংগী
নায়কের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা জানা
হয়েছে দর্শকদের। এবং সেই সঙ্গে দেখা
হয়েছে সংগীতসাধনার পীঠভূমি বিষ্ণুপুরে
বিভিন্ন দৃশ্য। প্রণব রায় পরিচালিত এ
জীবনচিত্র জনসাধারণের কাছে অভিনন্দি
হবে। বিজন সেনের নির্দেশনা ও পরি

দপ্তরের আলোকচিত্র গ্রহণ ছবিটিকে বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত করে তুলেছে।

প্রচার বিভাগ প্রযোজিত আরও একটি প্রামাণিক চিত্র এই সংগে মুক্তিলাভ করে। ছবিটির নাম 'শাঁখা ও শাঁখারি', বিষ্ণুপুরের শঙ্খশিল্পের একটি মনোজ্ঞ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে ছবিটিতে। শঙ্খ থেকে কেমন ভাবে শাঁখা ও নানা জাতীয় শিল্পদ্রব্য তৈরী তেমনি চমৎকারভাবে রূপায়িত হয়েছে, তেমনি চমৎকারভাবে রূপায়িত হয়েছে শাঁখারিদের নিষ্ঠাপূর্ণ শ্রমক্লান্ত জীবন। এই ছবিটিও পরিচালনা করেছেন প্রণব রায়।

অনুষ্ঠান সংবাদ

নব নাট্য আন্দোলনের অনন্য পুরোধা নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের জন্ম-দিবস পালনের জন্য শিল্পী নিকেতন গত ২রা অক্টোবর সন্ধ্যায় তাঁদের কার্যালয়ে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সভার উদ্বোধন করেন প্রশান্তচন্দ্র ঘোষ এবং নাট্যাচার্যের কর্মবহুল জীবনের ঘটনা ও লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে 'শিশির-জীবন-স্মৃতি' ও 'নব নাট্য আন্দোলনের নাট্যাচার্যের ভূমিকা' প্রসংগে দুটি সুন্দর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন জীবনকৃষ্ণ ঘোষ ও প্রশান্তচন্দ্র ঘোষ। নাট্যাচার্যের প্রিয় কবিতা আবৃত্তি করে গৌতম মুখার্জী, কমলেন্দু ব্যানার্জী, হেনা দেব ও প্রশান্ত ঘোষ সকলকে আনন্দ দান করেন।

বেলেঘাটার শ্রমপল্লী পূজা প্রাঙ্গণে পূর্ব সারথী সম্প্রদায় গত ১লা অক্টোবর রাত্রে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। সু-অভিনয়ের গুণে প্রায় দু'হাজার দর্শক নাটকটি দেখে আনন্দলাভ করেন। উল্লেখযোগ্য অভিনয়ে যাঁরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাট্যকার-পরিচালক কালীপদ চক্রবর্তী, মিঃ দাস, রামেশ্বর ভদ্র, শংকর চক্রবর্তী, হরেন্দ্র বিশ্বাস, তিলোত্তমা ভট্টাচার্য, সলিল ঘোষ, প্রবোধ অধিকারী ও বিভা মৌলিক-এর নাম।

প্রতিযোগিতা সংবাদ

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত—দ্বিতীয় বার্ষিক গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতা (একাংক) বিশ্বরূপা মঞ্চে আগামী ২২শে অক্টোবর শনিবার ২॥টায় শুরু হবে। ৬৭টি নাট্য সংস্থা যোগদানের জন্য আবেদন করেছেন।

নাটক রচনা প্রতিযোগিতায় নাটকের পাণ্ডুলিপি দাখিলের শেষ তারিখ ২২শে অক্টোবর পর্যন্ত বিশেষ অনুরোধে বর্ধিত করা হয়েছে।

গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতার (পূর্ণাঙ্গ) আবেদনপত্র আগামী ১৯শে অক্টোবর থেকে বিশ্বরূপা অফিসে পাওয়া যাবে। আবেদনপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ২৯শে অক্টোবর, ১৯৬০। এবারে কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের নাটক অথবা রবীন্দ্রনাথের গল্প বা কবিতা অবলম্বনে রচিত নাটকের মধ্যেই এই প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ থাকবে।

এম এম প্রোডাকশন্সের "মধ্যরাতের তারা" র একটি দৃশ্যে অজিত ভট্টাচার্য, মধুছন্দা ও রেণুকা রায়।

নৃত্যানুষ্ঠান

গত ৩রা অক্টোবর পার্কসার্কাস ও বেনিয়াপুকুর সংযুক্ত পূজামণ্ডপে নৃত্য-শিল্পী নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের নৃত্যানুষ্ঠান হয়। মহিষাসুর-বধ নৃত্যে—কুন্দা চক্রবর্তী ও অনুপকুমার, কার্তিকেয় নৃত্যে—শক্তি গুপ্তা, কথক নৃত্যে—স্বপ্না ঘোষ, পাপড়ী বোস ও শুক্লা সেনগুপ্তা ও মণিপুরী রাধা-কৃষ্ণের ভূমিকায়—আলো বাগচী ও সাথী গুপ্তার অভূতপূর্ব নৃত্যভঙ্গিমায় দর্শক-বৃন্দকে মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিচালনা করেন স্বপ্না সেনগুপ্তা। যন্ত্র-সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন—'সুর ও মালা', অরবিন্দ মিত্র প্রভৃতি।

একটি প্রতিবাদ

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

কোনও একটি সিনেমা পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় আমাদের সংগে সাক্ষাৎকারের একটি বিবরণ ছাপা হয়েছে। আমরা ঐ কাগজের কোনও লোককে চিনি না, এবং তাঁদের সংগে এরকম কোন সাক্ষাৎকার আমাদের সংগে হয়নি। এই লেখাটাতে আমাদের উক্তি বলে এমন কথা ছাপা হয়েছে যা কস্মিনকালেও আমরা ভাবি না বা বলি না। আমাদের বন্ধুবর্গের সংশয় অপনোদনের জন্য এই চিঠি দিতে বাধ্য হলাম। ইতি—

শম্ভু মিত্র,
তৃপ্তি মিত্র।

পূজায় নূতন গানের রেকর্ড

এ বৎসরের পূজার উৎসবে এইচ এম ভি ও কলম্বিয়া যে সমস্ত রেকর্ড বাহির করিয়াছেন, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্যঃ

বই ! বই !! আর বই !!!

বাংলা সাহিত্যে ছোটদের এতো ভালো বই ইদানীং আর বেরোয়নি

ভানুমতীর বাঘ ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র । ২·০০
হ্যামেলিনের বাঁশিওলা ॥ বুদ্ধদেব বসু । ২·০০
ভালো ভালো গল্প ॥ শিবরাম চক্রবর্তী । ২·০০
ডাকাতের হাতে ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত । ২·৫০
আহ্লাদে আটখানা ॥ গল্প সঙ্কলন । ৩·০০
নোটন নোটন (ছড়ার বই) ॥ বিশ্বনাথ দে । ১·০০

শ্রী প্র কা শ ভ ব ন
এ ৬৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট । কলিকাতা ১২

বিশ্বরূপা

(অভিজাত প্রগতিধর্মী নাট্যমঞ্চ)

[ফোন : ৫৫-১৪২৩, বুকিং ৫৫-৩২৬২]

বৃহস্পতি ও শনি | রবি ও ছুটির দিন
সন্ধ্যা ৬॥টায় | ৩টা ও ৬॥টায়

প্রয়োগসৌন্দর্যে, অভিনয়মাধুর্যে অতুলনীয়

সেতু

২৩৬ হইতে ২৫৪ অভিনয়

একটি চিরন্তন মানব অনুভূতির কাহিনী

নাটক—বিধায়ক ভট্টাচার্য

আলোকসম্পাত—তাপস সেন

শ্রেঃ নরেশ মিত্র - অসিতবরণ

জ্ঞানকুমার, প্রমতাজ, সন্তোষ, তমাল, জয়শ্রী, সুব্রতা, ইরা, আরতি প্রভৃতি

ও

তৃপ্তি মিত্র (বহুরূপী)

বিশ্বরূপায় বহুরূপীর অভিনয়

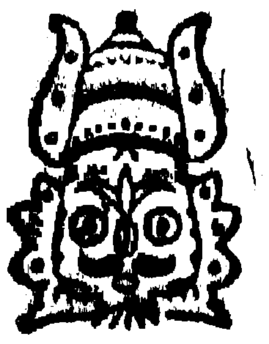

রবীন্দ্রনাথের

রক্তকরবী

১৮ই অক্টোবর, মঙ্গলবার—সন্ধ্যা ৬॥টায়

নির্দেশনা—শম্ভু মিত্র

আলোক—তাপস সেন

ভূমিকায়—তৃপ্তি মিত্র, শম্ভু মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, অমর গাঙ্গুলী, কুমার রায়, শোভেন মজুমদার, আরতি মৈত্র ও শান্তি দাস

গিরিশ থিয়েটার

কলিকাতায় ৫ম স্থায়ী নাট্যশালা

প্রযোজনা ও উপস্থাপনা—বিশ্বরূপা থিয়েটার

স্থান : বিশ্বরূপা থিয়েটার (৫৫-৩২৬২)

জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনে উৎসর্গীকৃত নাটক

সোমবার,
বুধবার
ও শুক্রবার
সন্ধ্যা ৬॥টায়

জাতুন ক্লোন

এবং রবি ও ছুটির দিন সকাল ১০॥টায়

নাটক—সলিল : পরিচালনা—বিধায়ক

আঙ্গিক নির্দেশনা—তাপস সেন

শ্রেঃ—মহেন্দ্র গুপ্ত, জ্ঞানেশ মুখার্জি, বিধায়ক ভট্টাচার্য, সুনীল ব্যানার্জি, অরুণ, রমেশ, প্রভাত, গীতা দে ও জয়শ্রী সেন

প্রোডাকশন সিণ্ডিকেটের "শেষ পর্যন্ত"-র নায়িকা নবাগতা সুলতা চৌধুরী।

এইচ এম ভি—পি ১১৯৩৪—কুমার শচীন দেববর্মণের গাওয়া দুখানি পল্লীগীতি; এন ৮২৮৮৭—সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের আধুনিক গান; এন ৮২৮৮৮—উৎপলা সেনের আধুনিক গান; এন ৮২৮৮৯—তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আধুনিক গান; এন ৮২৮৯০—কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া রবীন্দ্রগীতি; এন ৮২৮৯১—সনৎ সিংহের আধুনিক; এন ৮২৮৯২—নির্মলেন্দু চৌধুরীর পল্লীগীতি; এন ৮২৮৯৪—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আধুনিক; এন ৮২৮৯৫—ইলা বসুর আধুনিক; এন ৮২৮৯৬—মান্না দে-র আধুনিক; এন ৮২৮৯৭—নির্মলা মিশ্রের আধুনিক; এন ৮২৮৯৮—শ্যামল মিত্রের আধুনিক।

কলম্বিয়া:—জি ই ২৫০১৬—আধুনিক—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য; জি ই ২৫০১৭—গায়ত্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের আধুনিক; জি ই ২৫০১৮—পান্নালাল ভট্টাচার্যের ধর্মমূলক; জি ই ২৫০১৯—দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের আধুনিক; জি ই ২৫০২০—প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আধুনিক; জি ই ২৫০২১—গায়ত্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্মমূলক; জি ই ২৫০২২—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের আধুনিক; জি ই ২৫০২৩—লতা মঙ্গেশকরের আধুনিক; জি ই ২৫০২৩—গীতা দত্তের আধুনিক; জি ই ২৫০২৫—গায়ত্রী বসুর আধুনিক; জি ই ২৫০২৬ রথীন্দ্রনাথ ঘোষের ধর্মমূলক ও জি ই ২৫০২৭—কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের গাওয়া দ্বিজেন্দ্রগীতি। এবারে চিত্রগীতির মধ্যে আছে 'কোন এক দিন', 'ক্ষুধা', 'সখের চোর' ও 'কানামাছি' ছবির গানগুলি।

জ্ঞাতব্য তথ্য

১৯৫৯ সালে ভারতবর্ষে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি তোলা হয় ৩১০ খানি—তার মধ্যে হিন্দীতে ১২১, তামিলে ৭৮, তেলেগুতে ৪৬, বাংলায় ৩৬, মারাঠীতে ১০, অসমিয়ায় ৫, কানাড়ীতে ৫, মালয়ালমে ৩, গুজরাটীতে ২, ওড়িয়াতে ২ এবং পাঞ্জাবী ও ইংরাজীতে ১টি করে।

১৯৩১ সালে ভারতবর্ষে সবাক চিত্রের নির্মাণ শুরু হয়। সে বছরে তোলা পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবির সংখ্যা ২৮ খানি মাত্র।

সংখ্যানুপাতে ভারতের স্থান জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই।

বর্তমানে ভারতবর্ষে কিঞ্চিদধিক ৪২০০টি সিনেমা আছে। ১৯২৮ সালে অবিভক্ত ভারতে সিনেমার সংখ্যা ছিল মাত্র ৩২০টি। ১৯৩৯ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে ১৫০০-তে দাঁড়ায়।

সারা দেশে সবসুদ্ধ ৬৩টি ফিল্ম স্টুডিও আছে। তার মধ্যে ২৮টি বোম্বাই অঞ্চলে, ২৩টি দক্ষিণ ভারতে এবং ১২টি কলকাতায় অবস্থিত।

আনুমানিক হিসাবে বলা যায় যে প্রতি বছরে ৭০ কোটির ওপর লোক সিনেমা দেখে। গড়পড়তায় প্রত্যেক ভারতবাসী বছরে দুখানি ছবি দেখে।

ফিল্মস ডিভিশন ইংরাজী ও ভারতের প্রধান ভাষাগুলিতে প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ করেন। ১৯৫৯ সালে তাঁদের তোলা প্রামাণ্য ছবির সংখ্যা দাঁড়ায় ১১২। এছাড়া প্রতি সপ্তাহে একটি করে সংবাদ-চিত্রও তাঁরা তোলেন। ভারতের বাইরে বাইশটি দেশের সঙ্গে এই সংবাদ-চিত্র বিনিময়ের ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া বিভিন্ন দেশে ভারতীয় প্রামাণ্য চিত্র নিয়মিতভাবে প্রদর্শিত হয়—সিনেমাতে এবং টেলিভিশান-এও।

১৯৫৯ সালে বহির্বাণিজ্য বাবদ ভারতীয় ফিল্ম এক কোটি সত্তর লক্ষ টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে চলচ্চিত্রের বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষাদানের জন্যে পুণাতে একটি ফিল্ম ইনস্টিটিউট বর্তমানে গঠন পথে। ন্যায্য সুদে চিত্র-প্রযোজকদের টাকা সরবরাহ করবার জন্যে একটি ফিল্ম ফিন্যান্স কর্পোরেশনও গঠিত হয়েছে। তাছাড়া শিশুচিত্র নির্মাণে উৎসাহ দেবার জন্যেও কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক ও অন্যাবিধ সাহায্যের ব্যবস্থা করেছেন।

১৯৫৯ সালে কেন্দ্রীয় ফিল্ম সেন্সর বোর্ড ৮৭৬টি ভারতীয় এবং ১৭৭১টি বিদেশী ছবিকে এদেশে প্রদর্শনের জন্যে ছাড়পত্র দেন। ৫৭টি ছবি প্রদর্শনের অনুপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় ছাড়পত্র পায়নি—তার মধ্যে ভারতীয় ছবির সংখ্যা ৮।

মসফিল্ম স্টুডিওতে একদিন

(জনৈক সংবাদদাতা)

মস্কোর দক্ষিণ-পশ্চিম জেলায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ইমারতটির অনতিদূরে, একটি অদ্ভুতদর্শন শহর। এই শহরের চারদিক দেয়াল দিয়া ঘেরা। আয়তনে ও জনসংখ্যার দিক দিয়া এই শহরটি মফস্বলের একটি ছোটখাটো শহরের তুলনায় কম যায় না। ৪২ হেক্টার জমি জুড়িয়া আছে বড় বড়, ইমারত, প্যাভিলিয়ন ও বহু প্রশস্ত

বাঁধানো পার্শ্বপথ। দৈনিক এখানে আসিয়া জড়ো হয় তিন সহস্রাধিক লোক। আর একটি দিক হইতেও যে কোনো ছোট্ট সোভিয়েত শহরের সহিত এই শহরটির মিল আছে। শহরের প্রায় সর্বত্র ব্যাপক নির্মাণ-কার্য চলিতেছে।

এই পর্যন্তই মিল। আর সব কিছুতেই দেখা যাইবে অমিল। যেমন, ধরুন, এই শহরের কোনো একটা রাস্তায় আপনার সঙ্গে একজন বিখ্যাত লেখকের দেখা হইয়া যাইতে পারে। প্রায় এক শ' বছর আগে এই লেখকের মৃত্যু হইয়াছে। কিংবা দেখা হইতে পারে একজন উদাসীন নাবিকের সঙ্গে, যাহার কোমরে কার্তুজ-বেল্ট। অথবা তুষার-ঢাকা রাস্তা হইতে একখানি ইমারতের মধ্যে প্রবেশ করিলেই হঠাৎ আপনি দক্ষিণে আসিয়া পড়িবেন—আপনার সামনে তখন তাল গাছের সারি আর মাথার উপর কড়া সূর্য। তবু এখানে আসিয়া এইসব দেখিয়া কেহ অবাক হন না। কেননা শহরের প্রবেশদ্বারে "মসফিল্ম" এই সাইন-বোর্ড দেখিয়াই পরিদর্শকরা বুঝিতে পারেন, তাঁহারা ইউরোপের সর্ববৃহৎ ফিল্ম-স্টুডিওর চৌহদ্দির মধ্যে আসিয়া গিয়াছেন।

এইখানে, এই স্টুডিওতে, কাজ করেন বিখ্যাত চলচ্চিত্র-পরিচালকরা — ইভান পিরিয়েফ, মিখাইল কালাতোফজ, গ্রিগোরি আলেক্সান্দ্রোফ, সের্গেই ইয়ুৎকেভিচ ও তাঁহাদের তরুণ সহকর্মী দল। কিছুকাল আগে এই স্টুডিওতে আমি পুরা একদিন কাটাইয়াছি।

আমরা মস্কোর কলধ্বনিত রাজপথগুলি অতিক্রম করিয়া লেনিন পাহাড়ে উঠিয়া গেলাম। তারপর পৌঁছিলাম এই আশ্চর্য শহরে। প্রথমেই আমরা প্রধান ইমারতের দরদালানের দিকে গেলাম। গোটা স্টুডিওর প্রাণস্পন্দন সবচেয়ে বেশি করিয়া টের পাওয়া যায় এইখানে আসিলে। এখানে বহু লোকের ত্রস্ত আনাগোনা লাগিয়াই আছে। কেহ গভীর বিষয় লইয়া আলোচনায় রত, কেহ কেহ এক কোণে সোফার উপর বসিয়া তর্কবিতর্কে মাতেন। চারদিক হইতে নানা ভাষার সংলাপ কানে আসে—চীনা, ফিনিশ, আলবেনীয় ইত্যাদি হরেক রকম ভাষা। ওয়াকিবহাল ব্যক্তিরা বলেন, এইসব কথোপকথন ও তর্ক বিতর্কের মধ্য হইতেই ছায়াচিত্রের উপযোগী বহু মনোজ্ঞ কাহিনী বা গল্পের কাঠামো জন্মলাভ করিয়া থাকে। পরে এই কাহিনীগুলি স্টুডিওর সর্বোচ্চ অঙ্গ কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ইহাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই যে, দরদালানে যে সব পরিচালক ও চিত্রনাট্য-লেখকরা প্রায়ই গিয়া ভিড় করেন ও বিতর্কে মাতেন তাঁহাদেরই লইয়া উপরোক্ত আর্ট কাউন্সিল গঠিত। তাঁহারা দরদালানের

মুক্তিপ্রতীক্ষিত 'লক্ষ্মীনারায়ণ'-এর একটি দৃশ্যে কমল মিত্র ও অনুভা গুপ্তা

বিতর্কের আসরকে দপ্তর পর্যন্ত পৌঁছিতে দেন না। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র কর্মীদের এইরূপ মন্তব্য করিতে শোনা গিয়াছে যে, চলচ্চিত্র নির্মাণ-শিল্পের প্রকৃতিই এমনি যে, এই ক্ষেত্রে দপ্তরের লালফিতার উৎপাত ও দীর্ঘস্থায়ী আলোচনার স্থান নাই।

দরদালানের ছবির স্ট্যান্ডগুলিতে নির্মীয়মান ছায়াছবির স্থির চিত্র প্রদর্শিত হয়। এইখানে আপনি চলচ্চিত্র জগতের প্রখ্যাত তারকাদের ও ভবিষ্যতের তরুণ তারকাদের মুখগুলি দেখিতে পাইবেন। এই ছবির স্ট্যান্ডগুলির কাছ দিয়া চলিয়া গেলেই আপনি বুঝিতে পারিবেন মসফিল্মের অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা কত বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন বিষয়বস্তুর চিত্রে অবতীর্ণ হইতেছেন। কোনো ছবির বিষয় বর্তমানের জীবন, কোনো ছবির উপজীব্য সুদূর অতীত, কোনোটা বা একখানি উপন্যাসের চিত্ররূপ, কোনো ছবির বিষয়বস্তু কপোলকল্পিত অদ্ভুত কাহিনী। অন্যান্য দেশের চলচ্চিত্র স্টুডিওগুলির সহযোগিতায় যুগ্ম-প্রচেষ্টায় ছায়াছবিও তোলা হইতেছে।

দরদালান হইতে আমরা উপরতলায় গেলাম। যে হলটিতে আমরা ঢুকিলাম তাহার মধ্যে অনায়াসে একটি চারতলা ফ্ল্যাট-বাড়ি ধরানো যায়। এই হলের মধ্যে কোনো জাঁকালো সেট আমাদের চোখে পড়িল না। যাহা দেখিলাম তাহা হইতেছে সেন্ট পিটার্সবুর্গের একখানি পুরাতন বাসগৃহের অভ্যন্তর-ভাগ—দস্তয়েভস্কির "হোয়াইট-নাইটস্" উপন্যাসের চিত্ররূপের একটি ঘটনাস্থল। "কোনোরূপ আওয়াজ করিবেন না" এই সঙ্কেত জ্বলিয়া ওঠার পরক্ষণেই শুরু হইল শুটিং। পরিচালক ইভান পিরিয়েফ আগেভাগেই তরুণী অভিনেত্রী লুদমিলা মার্চেংকোকে তালিম দিয়া রাখিয়াছিলেন। লুদমিলা এই ছবির

উমাচল-গ্রন্থাবলী
শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী প্রণীত
যোগবলে রোগ আরোগ্য
(সহজ যৌগিক উপায়ে সর্বরোগের চিকিৎসা)—৫৷৷০; Yogic Therapy (ঐ, ইংরাজী)—৭৲; যৌগিক ব্যায়াম (আসন-মুদ্রা ও প্রাণায়াম ইত্যাদি)—৪৲; ব্রহ্মচর্য—১৷৷০; ঈশোপনিষৎ—২৲; খাদ্যনীতি—১৷০ = [সব বই একত্র—২০৲]
শ্রীনারায়ণী—লিজেল রেম'র **নিবেদিতা—৭৷৷০**
(যুগাচার্য বিবেকানন্দ স্বামীর মানসকন্যা নিবেদিতার অপরূপ জীবনী—মূল ফরাসী হইতে সুললিত বাংলায় স্বচ্ছন্দ অনুবাদ)।
উমাচল প্রকাশনী
৫৮।১।৭বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলি—৬
(সি-৮৬৬৭

বিশ্বভারতী চিত্রমন্দিরের নির্মীয়মান ছবি 'শংকাতিলক'-এর একটি দৃশ্যে তরুণকুমার কাম্যো ও শ্রীমান পল্লব।

নাস্তেংকার ভূমিকায় নামিয়াছেন। তাঁহার অদূরেই একজন অভিনেতা দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে চিনিতে আমাদের এক মুহূর্ত দেরি হইল না। ইনি জনপ্রিয় অভিনেতা ওলেগ স্ত্রিঝেনফ। "হোয়াইট্ নাইটস্ ছবির স্বপ্নদর্শীর ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। আফানাসি নিকিতিনের জীবন লইয়া তোলা "পরদেশী" ছবিতে স্ত্রিঝেনফের অভিনয়ের কথা নিশ্চয় আপনাদের মনে আছে। ক্যামেরাম্যান খুব ব্যস্তসমস্ত হইয়া কাজ শুরু করিয়া দিলেন। একটি সমগ্র দৃশ্যের "শুটিং" সাংগ হইল।

পরিচালকের কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসে ঃ "আর একবার"। অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের আবার সেট্-এ আসিয়া দাঁড়াইতে হয়। পর পর পাঁচবার তাঁহাদের একই অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি করিতে হইল। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিলাম ছায়াচিত্র অভিনয় করা কী কঠিন ব্যাপার। পর্দার উপর এই দৃশ্যটি যখন দর্শকদের কাছে সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইবে তখন কে ভাবিতে পারিবে যে, ইহার পিছনে এত কাঠখড় পোড়াইতে হইয়াছে।

অতঃপর আমরা কাছাকাছি আর একটি সাউণ্ড-রুম্-এ গেলাম। সেখানে তখন "ব্যালাড্ অব্ এ সোলজার" ছবির শব্দ-গ্রহণের কাজ চলিতেছিল। এই ছবিখানির পরিচালক গ্রিগরি চুখরাই। এই তরুণ পরিচালকের ইহা দ্বিতীয় ছবি। দর্শকসমাজ সাগ্রহে এই ছবির মুক্তির দিন গুণিতেছে। চুখরাই-এর প্রথম ছবি "ফর্টি-ফার্স্ট" সোভিয়েত দেশে ও বিদেশে অত্যন্ত সমাদর লাভ করিয়াছিল।

আমরা যখন ইমারতটির বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম সূর্য তখন মাথার উপরে। স্টুডিও সেন্ট্রাল স্কোয়ারে কয়েকটি বাস্-এর সামনে মস্ত বড় একটি দল। ইঁহারা গ্রিগরি আলেকজান্দ্রোফের নির্মীয়মাণ "দি রাশিয়ান সুভেনির" চিত্রের নটনটী। তাঁহারা হোটেল উক্রাইনায় যাইতেছেন, সেখানে কতকগুলি দৃশ্যের শুটিং-এর জন্য। এই দলের মধ্যে আমরা দেখিয়াই চিনিলাম বিখ্যাত লুবফ ওর্লোভাকে, এলিনা বিস্ত্রিৎস্কায়াকে ও ইরাস্ত গারিনকে।

এবার আমরা ইমারতের দক্ষিণাংশে গেলাম। এই অংশটিকে বলা হয় "ছায়াছবির দোলনা-ঘর"। ইহাই স্টুডিওর সিনারিও বিভাগ।

এখানে কিছুক্ষণ কাটাইবার পরেই আমরা বুঝিতে পারিলাম এই বিভাগের খুঁটিনাটি কাজের সংগে একটা পরিচয় লাভ করিতে হইলে বেশ কয়েক ঘণ্টাও যথেষ্ট সময় নয়। এইখানেই লেখকরা ও এডিটররা ভাবী ছায়াছবিগুলির চিত্রনাট্যরূপ লইয়া মাথা ঘামান।

তথ্য ও পদ্ধতি বিভাগের কাজকর্ম যেমন বিচিত্র, তেমনি জটিল। পৃথিবীতে হেন বিষয় নাই যে সম্পর্কে এই বিভাগকে ওয়াকিবহাল থাকিয়া আবশ্যক তথ্যাদি সরবরাহ করিতে না হয়। স্টুডিওর একজন কর্মী জানিতে চাহিলেন, কয়েক শতাব্দী পূর্বে একজন নিরক্ষর রুশ চাষীর দ্বারা উদ্ভাবিত প্রথম গ্লাইডার কীভাবে ডিজাইন্ করা হইয়াছিল। আর একজন জানিতে চান চীনের চীনামাটির জিনিসপত্র উৎপাদনের টেকনোলজি সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য। তৃতীয় ব্যক্তিটির প্রয়োজন অধুনাতম জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি। এইসব বিষয়ে তথ্য ও পদ্ধতি বিভাগকে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ উত্তর প্রদান করিতে হয়, আনুষঙ্গিক ও আবশ্যক বইপত্র, আলোকচিত্র, রেখাংকন ইত্যাদি সব সময় হাতের কাছে রাখিতে হয়।

কাছাকাছি অবস্থিত রূপসজ্জার (মেক-আপ) ঘরগুলি দেখিতে একটা গোটা কারখানার মত। স্টুডিওর নিজস্ব কারখানায় রূপসজ্জার রং, ক্রীম, পরচুলা ইত্যাদি তৈরি হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া আছে মস্ত একটি দর্জি-বিভাগ, পোশাক-আশাক তৈরির বিভাগ, সেট তৈরির বিভাগ, আলোক-সম্পাত বিভাগ, কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি, টেকনিক্যাল ল্যাবরেটরি। ছায়াচিত্র নির্মাণে এই সমস্ত বিভাগেরই প্রচুর দান-অবদান আছে।

সর্বশেষ বিভাগটি দেখিয়া আমরা যখন বাহিরে আসিলাম তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে।

ছিয়াদয় পিকচার্সের নির্মীয়মান চিত্র "বিষকন্যা"-র একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস।

খেলার মাঠে

রোম অলিম্পিকের এ্যাথলেটিকসের ফলাফল ধারাবাহিকভাবে 'দেশের' পাতায় প্রকাশ করা হচ্ছে। স্থানাভাববশত সমস্ত ফলাফল একসঙ্গে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এ সপ্তাহে পুরুষ ও মহিলাদের এ্যাথলেটিকসের আরও কতগুলি ফলাফল প্রকাশ করা হল।

লোহ গোলক নিক্ষেপ

বিশ্ব রেকর্ড—বিল নাইডার (ইউ এস এ) ৬৪ ফিঃ ৭ ইঃ।

প্রাক্তন অলিম্পিক রেকর্ড—প্যারী ও'ব্রায়েন (ইউ এস এ) ৬০ ফিঃ ১১¼ ইঃ।

১ম—বিল নাইডার (ইউ এস এ) ৬৪ ফিঃ ৬¾ ইঃ (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড)।

২য়—প্যারী ও'ব্রায়েন (ইউ এস এ) ৬২ ফিঃ ৮½ ইঃ।

৩য়—ডালাস লং (ইউ এস এ) ৬২ ফিঃ ৪½ ইঃ।

[শক্তিধর অ্যাথলেটদের প্রতিযোগিতা লোহ গোলক নিক্ষেপের তিনটি পদকই ভাগাভোক করে নিয়েছেন মার্কিন মুলুকের তিন শক্তিধর অ্যাথলেট। তবে হেলসিংকি ও মেলবোর্ন অলিম্পিকে স্বর্ণপদকের অধিকারী প্যারী ও'ব্রায়েনের জন্য দুঃখ হয়। এবার পেয়েছেন তিনি রৌপ্য পদক, পর পর তিনটি অলিম্পিকে স্বর্ণপদক লাভের অতুলনীয় কৃতিত্বের অধিকারী হতে পারেন নি]

ডিসকাস ছোড়া

বিশ্ব রেকর্ড—ই পিয়াটকোয়াস্কি (পোল্যাণ্ড) ১৯৬ ফুঃ ৬½ ইঃ

প্রাক্তন অলিম্পিক রেকর্ড—এ ওর্টার (ইউ এস এ) ১৯১ ফুঃ ৮½ ইঃ

১ম—এ ওর্টার (ইউ এস এ) ১৯৪ ফুঃ ১½ ইঃ (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড)

২য়—আর বাবকা (ইউ এস এ) ১৯০ ফুঃ ৪½ ইঃ

৩য়—আর ককরাম (ইউ এস এ) ১৮৭ ফুঃ ৬½ ইঃ

[ডিসকাস ছোড়ায় বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী পিয়াটকোয়াস্কি পঞ্চম স্থান পেয়েছেন। মেলবোর্ণ অলিম্পিকে স্বর্ণ পদকের অধিকারী অল ওর্টার এবারও স্বর্ণ পদকের অধিকারী হয়ে আমেরিকার এম শেরিডানের সমকৃতিত্ব অর্জন করেছেন। ১৯০৪ ও ১৯০৮ সালের অলিম্পিকে শেরিডন বিজয়ী হয়েছিলেন]

হাতুড়ি ছোড়া

বিশ্ব রেকর্ড—হ্যারোল্ড কনোলী (ইউ এস এ) ২২৫ ফুঃ ৪ ইঞি;

প্রাক্তন অলিম্পিক রেকর্ড—হ্যারোল্ড কনোলী (ইউ এস এ) ২০৭ ফুঃ ৩½ ইঃ

একলব্য

১ম—ভি রুডেনকভ (রাশিয়া) ২২০ ফুঃ ১½ ইঃ (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড)

২য়—জি জিভোটস্কি (হাঙ্গেরী) ২১৫ ফুঃ ১০ ইঃ;

৩য়—টি রাট (পোল্যাণ্ড) ২১৫ ফুঃ ৪½ ইঃ;

বর্শা ছোড়া

বিশ্ব রেকর্ড—এ ক্যান্টেলো (ইউ এস এ) ২৮২ ফুঃ ৩½ ইঃ

অলিম্পিক রেকর্ড—ই ডেনিয়েলসন (নরওয়ে) ২৮১ ফুঃ ২½ ইঃ

১ম—ভি টিসিবুলেঙ্কো (রাশিয়া) ২৭৭ ফুঃ ৮½ ইঃ

২য়—ডব্লিউ ক্রুগার (জার্মানী) ২৬০ ফুঃ ৪½ ইঃ

৩য়—জি কুলসার (হাঙ্গেরী) ২৫৭ ফুঃ ৯½ ইঃ

[বর্শা ছোড়ায় এ ক্যান্টেলো ও বিল অ্যালের কোন পদক না পাবার ঘটনা অপ্রত্যাশিত। কারণ ক্যান্টেলো এখনও বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী আর বিল অ্যালে অলিম্পিকের আগে ২৮৩ ফুট ৮ ইঞ্চি দূরে বর্শা ছুড়ে বিশ্ব রেকর্ডকেও ম্লান করে দিয়েছিলেন। অবশ্য অ্যালের রেকর্ড আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের অনুমোদন পায়নি। স্বর্ণ পদকের অধিকারী টিসিবুলেঙ্কো কোনদিন ২৬৩ ফুট ১১ ইঞ্চির উপর বর্শা ছুড়তে পারেন নি। কিন্তু অলিম্পিকে তিনি ২৭৭ ফুট ৮½ ইঞ্চি দূরে বর্শা ছুড়ে স্বর্ণ পদক লাভ করেছেন।]

ডেকাথলন

বিশ্ব রেকর্ড—রাফের জনসন (ইউ এস এ) ৮৬৮৩ পয়েণ্ট।

প্রাক্তন অলিম্পিক রেকর্ড—মিল্টন ক্যাম্বেল (ইউ এস এ) ৭৯৩৭ পয়েণ্ট।

১ম—রাফের জনসন (ইউ এস এ) ৮৩৯২ পয়েণ্ট (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড)।

২য়—ইয়াং চুয়াং কুয়াং (ফরমোজা) ৮৩৩৪ পয়েণ্ট।

৩য়—ভ্যাসিলি কুজনেৎসভ (রাশিয়া) ৭৮০৯ পয়েণ্ট।

চৌখস অ্যাথলেটদের প্রতিযোগিতা হচ্ছে ডেকাথলন। অ্যাথলেটিকসের সমস্ত বিষয়ে পারদর্শী না হলে ডেকাথলনের প্রতিযোগী হওয়া যায় না। ডেকাথলন, অর্থাৎ ১০ রকমের প্রতিযোগিতার মধ্যে দৌড় আছে তিন রকমের ১০০ মিটার, ৪০০ মিটার ও ১৫০০ মিটার; ছুড়তে হয় তিন রকমের জিনিস—লোহার বল, ডিসকাস ও বর্শা; লাফ আছে তিন রকমের—উঁচু লাফ, দীর্ঘ লাফ ও পোলভল্ট; বাকী বিষয়টি হচ্ছে ১১০ মিটার হার্ডলস। সুতরাং ডেকাথলন সর্ববিশারদ অ্যাথলেটের কষ্টসাধ্য প্রতিযোগিতা। তাই ডেকাথলন বিজয়ীর সম্মানও অনন্য। এতে গতিবেগের যেমন প্রয়োজন, শ্রমশীলতা ও সাধনার যেমন দরকার, তেমন দরকার নৈপুণ্য শক্তি ও সাহসের।

বিশ্বের যে তিনজন চৌখস অ্যাথলেট রোম অলিম্পিকে ডেকাথলনের স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন এরা মেলবোর্ণেও

লোহগোলক নিক্ষেপে মার্কিন মুলুকের তিন মহাশক্তিধর। ডানদিকে—বিল নাইডার (প্রথম), মাঝখানে—প্যারী ও'ব্রায়েন (দ্বিতীয়), বাঁদিকে—ডালাস লং (তৃতীয়)

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

৩রা অক্টোবর—আসামের ভাষাগত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংগে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বি পি চালিহা পাঁচদিনব্যাপী আলোচনা চালাইবার পরও সরকারী ভাষা সমস্যার কোন সমাধান হয় নাই। নির্ভরযোগ্য সূত্র হইতে জানা গিয়াছে যে, অবস্থা আলোচনার শুরুতে যাহা ছিল শেষেও তাহাই আছে।

ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির জনৈক মুখপাত্র অদ্য পি টি আই-এর প্রতিনিধিকে বলেন যে, আগামী নবেম্বর মাসের প্রথম দিকে মস্কোতে ২০টি কম্যুনিস্ট পার্টির যে সম্মেলন হইবে তাহাতে পার্টির পাঁচজন সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল যোগদান করিবে।

৪ঠা অক্টোবর—বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে যে, ত্রিপুরা রাজ্যের কংগ্রেস সংগঠন আসাম প্রদেশ কংগ্রেস হইতে পৃথক হইবার চেষ্টা করিতেছেন। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডির নিকট প্রেরিত এক পত্রে ত্রিপুরা কংগ্রেসকে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস হইতে স্বতন্ত্রভাবে গড়িয়া তোলার জন্য সাংগঠনিক অনুমোদন প্রার্থনা করা হইয়াছে।

উত্তর প্রদেশে পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনা করা হইয়াছে, সেই সমস্ত পরিকল্পনার জন্য কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় উত্তর প্রদেশ সরকারকে নয় লক্ষাধিক টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

৫ই অক্টোবর—এক সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, সরবরাহ ও ডিসপোজাল বিভাগের জনৈক স্থায়ী ডেপুটি ডিরেক্টরকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। উক্ত অফিসার নিজের নামে কিম্বা স্ত্রী অথবা পুত্রের নামে যে প্রায় দুই লক্ষ টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আছে, তাহা উপার্জনের কোন সন্তোষজনক কারণ দর্শাইতে পারেন নাই।

৬ই অক্টোবর—খিদিরপুর ডকে প্রায় এক হাজার শ্রমিক হঠাৎ কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় গত দুই দিন যাবৎ প্রায় পঞ্চাশ হাজার টন মার্কিন গম জাহাজেই পড়িয়া আছে; উহা খালাস হইতেছে না বলিয়া জানা গিয়াছে।

স্বাধীন ভারতের দ্বিতীয় আদমসুমারীর প্রাথমিক পর্যায়ে গৃহ চিহ্নিতকরণ ও সংখ্যা নিরূপণের কাজ অদ্য কলিকাতা শহর সহ পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র আরম্ভ করা হইয়াছে।

৭ই অক্টোবর—লাদকের প্রধান শহর লে হইতে শ্রীনগরে বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, চীনা সৈন্যবাহিনী পূর্বে লাদকের যেসব অংশ অধিকার করিয়াছিল, তথা হইতে তাহারা দশ মাইল পূর্বে সরিয়া গিয়াছে।

কর্তৃপক্ষ স্থানীয় জনৈক মুখপাত্র অদ্য পি টি আই-এর প্রতিনিধিকে বলেন যে, আগামী সোমবার আসাম বিধানসভায় আসাম সরকারী ভাষা বিল পেশ করা হইবে। এই বিলের বিধান অনুযায়ী অসমীয়া এবং ইংরাজী আসামের সরকারী ভাষা হইবে এবং যথাসময়ে ইংরেজীর পরিবর্তে হিন্দী সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা হইবে।

৮ই অক্টোবর—কেন্দ্রীয় উপরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ আজ শিলং-এ বলেন, প্রচলিত ব্যবস্থা যাহাতে ব্যাহত না হয়, তজ্জন্য হিন্দী ইংরাজী ভাষার স্থলাভিষিক্ত না হওয়া পর্যন্ত সরকারী দপ্তরখানায় এখনকার মত ইংরাজীতেই কাজ চলিবে। উপত্যকার জেলাগুলির ভাষা হইবে অসমীয়া ও কাছাড়ের বাংলা। পার্বত্য জেলাগুলিতে নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী ভাষা ব্যবহৃত হইবে।

৯ই অক্টোবর—আজ সন্ধ্যায় একদল লোক গৌহাটীর উজানবাজার এলাকায় আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীসিদ্ধনাথ শর্মার বাসভবনের সম্মুখে শ্রী শর্মার ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহার কুশপুত্তলিকা দাহ করে। অসমীয়া ও হিন্দীকে রাজ্যভাষা করার জন্য আগামীকাল বিধানসভায় সরকার যে বিল আনিতেছেন, তাহারই প্রতিবাদে এইভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

আসাম রাজ্যের অর্থমন্ত্রী শ্রীফকরুদ্দিন আমেদ আজ শিলং-এ বলেন, গত জুলাই মাসের গোড়ার দিকে যেরূপ হাংগামা হইয়াছে, সেইরূপ হাংগামার সময় রাজ্যে সংবাদ প্রকাশ এবং সংবাদপত্রের প্রবেশ ও প্রচার নিয়ন্ত্রণের জন্য আসাম সরকার আইন অনুযায়ী ক্ষমতা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

এক অসমর্থিত সংবাদে জানা যায় যে, ভাটিণ্ডা জেলে আটক আকালী বন্দীরা হাংগামা করায় পুলিস তাহাদের উপর গুলীবর্ষণ করে। প্রকাশ যে, গুলীবর্ষণের ফলে ছয়জন বন্দী নিহত এবং প্রায় ৫০ জন আহত হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

৩রা অক্টোবর—রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন আজ আরম্ভ হইলে সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী শ্রীনিকিতা ক্রুশ্চেফ বক্তৃতা প্রসংগে সেক্রেটারী জেনারেল শ্রীদাগ হ্যামারশিল্ডের তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি সম্বন্ধে রাষ্ট্রপুঞ্জের এই নায়কের মনে গোঁড়ামি বদ্ধমূল হইয়া আছে।

প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার এবং শ্রী ক্রুশ্চফের মধ্যে নূতন যোগাযোগ স্থাপনের জন্য আহ্বান করিয়া নিরপেক্ষ পঞ্চশক্তি যে প্রস্তাব আনিয়াছেন, তাহা যত শীঘ্র সম্ভব গ্রহণের জন্য ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু সাধারণ পরিষদকে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

৪ঠা অক্টোবর—সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী শ্রীনিকিতা ক্রুশ্চেফ গতকল্য সন্ধ্যায় বলেন, তাঁহার স্থির বিশ্বাস যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেণ্টের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে। তিনি বলেন যে, তিনি আর একটি শীর্ষ বৈঠকের পক্ষপাতী এবং ঐরূপ শীর্ষ বৈঠকের উপযুক্ত সময় আসিয়াছে।

সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী শ্রী ক্রুশ্চেফ আজ বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী শ্রীহ্যারল্ড ম্যাকমিলানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইতিপূর্বে গত বৃহস্পতিবার শ্রী ম্যাকমিলান শ্রী ক্রুশ্চেফের সংগে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

৫ই অক্টোবর—গত রাত্রিতে বোস্টন বন্দরে ইস্টার্ন এয়ার লাইনসের যে বিমানটি দুর্ঘটনায় পতিত হয়, তাহা হইতে একটি গোপনীয় দলিল হারাইয়া গিয়াছে। উক্ত বিমান দুর্ঘটনায় ৬০ জনের জীবনহানি ঘটে।

আমেরিকা আজ একটি 'চৌম্বক মস্তিষ্ক' বিশিষ্ট কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবীর চতুর্দিকস্থ কক্ষপথে স্থাপন করিয়াছে। ৫ শত পাউণ্ড ওজনের এই উপগ্রহটিতে ৫টি চৌম্বক টেপ রেকর্ডার ট্রান্সমিশন যন্ত্র এবং সৌরশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত করার ব্যবস্থা রহিয়াছে। উহা প্রতি মিনিটে ৬৮ হাজার শব্দ গ্রহণ ও প্রেরণ করিতে পারে। বারো মিনিটে উহা সমগ্র বাইবেলখানা মুখস্থ করিয়া পৃথিবীর প্রত্যেকটি মহাদেশকে শুনাইয়া দিতে পারে।

পুলিস ঘোষণা করে যে, অদ্য প্রত্যূষে তাহারা এক ব্যক্তিকে মলোটভ ককটেল বোমা সহ রাষ্ট্রপুঞ্জ হেড কোয়ার্টার্সের নিকট গ্রেপ্তার করিয়াছে। ঐ ব্যক্তি মিঃ নিকিতা ক্রুশ্চফকে চাহে বলিয়া জানায়।

৬ই অক্টোবর — আর্জেণ্টিনার প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার এবং শ্রী ক্রুশ্চেফের নাম বাদ দিয়া সোভিয়েট রুশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের কথা বলিয়া যে সংশোধন প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণ পরিষদে গৃহীত হওয়ায় শ্রী নেহরু পঞ্চরাষ্ট্রের প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করেন।

ভারতবর্ষের দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ পরিদর্শন এবং বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিবার জন্য যাঁহারা বি অথবা সি শ্রেণীর ভিসা লইয়া ভারতবর্ষে যাইতে চাহেন, তাঁহারা ১২ মাসের মধ্যে মাত্র একবার ভারতবর্ষে যাইতে পারিবেন বলিয়া কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার সম্প্রতি যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন, আগামী ১০ই অক্টোবর মধ্যরাত্রি হইতে সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারতবর্ষে গমন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা বলবৎ হইবে।

৭ই অক্টোবর—প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ গতকল্য পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের রাজধানী মুজাফরাবাদে এক জনসভায় বলেন যে, কাশ্মীর সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তান ভারতকে বিশ্বাস করিতে পারে না।

৮ই অক্টোবর—আগামী বৎসরের প্রথম দিকে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে উচ্চস্তরে আলোচনার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিবার জন্য শ্রীনিকিতা ক্রুশ্চেফ গতকল্য যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, আজ শ্রীনেহরু তাহাকে স্বাগত জানান।

৯ই অক্টোবর—ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু গতকাল নিউইয়র্কে ঘোষণা করেন যে, কাশ্মীরের স্থিতাবস্থা নষ্ট করিবার চেষ্টা করিলে উহার ফলে বহু প্রকারের অমঙ্গল দেখা দিবে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা — ৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮০। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

দেশ

DESH 40 Naya Paise
Saturday, 22nd October, 1960.

২৭ বর্ষ ॥ ৫০ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৫ কার্তিক ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

শিক্ষা পরিকল্পনা

তৃতীয় যোজনাকালে পশ্চিম বাংলায় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের যে পরিকল্পনা রচিত হয়েছে তার ছকটা মনোরম। প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের উদ্যোগই এই পরিকল্পনায় সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছে। নিরক্ষরতা এ-দেশে এখনও বহু দূর বিস্তৃত; ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশ ছিল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশের সর্বত্র প্রাথমিক শিক্ষার আবশ্যিক করা হবে। নির্দেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন সম্ভব হবে না, কেন্দ্রীয় সরকার স্বয়ং তা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। তবুও যেখানে যতটা সম্ভব প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা আবশ্যিক করবার উদ্যোগ চলছে এবং চলা উচিতও। গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে জনগণই শক্তির উৎস; আমাদের সংবিধানের উপক্রমণিকাতে তার সুস্পষ্ট স্বীকৃতি। জনগণের অধিকাংশ নিরক্ষর থাকা গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের পক্ষে মঙ্গলকর নয়। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ব্রিটেনে যখন পার্লামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থার উপর জনসাধারণের অধিকার ধীরে ধীরে বিস্তৃত হচ্ছে তখন ও-দেশেও প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারের জোর তাগিদ দেখা দিয়েছিল। আজকের ব্রিটেনের জনসাধারণের শিক্ষাগত যোগ্যতার উন্নত মানের দিকে তাকিয়ে কল্পনাই করা যায় না যে এক শতাব্দী আগে ও-দেশেও নিরক্ষরতা দূর করবার সমস্যাটা নিতান্ত ছোট ছিল না। জন-শিক্ষার প্রয়োজন জরুরী অনুভব করে সে-সময় ব্রিটেনের পার্লামেণ্টে একজন দূরদর্শী রাজনীতিক যে উক্তি করেছিলেন সেটি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে: তিনি বলেছিলেন, "আমাদের মনিবদের অর্থাৎ জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলতেই হবে" (We must educate our masters). আমাদের দেশেও এখন সেই কথা।

তৃতীয় যোজনাকালে পশ্চিম বাংলায় আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে সতের কোটি টাকা। শিক্ষাদপ্তরের আশা, তৃতীয় পাঁচ-সালার সমাপ্তিতে এই রাজ্যে ছয় থেকে এগারো বছরের ছেলে মেয়েদের শতকরা নব্বইজন প্রাথমিক শিক্ষালাভের সুযোগ পাবে। আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিস্তার সত্যিই এই পরিমাণ দ্রুত হলে পশ্চিম বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে বেশ বড় রকমের পরিবর্তনের সূচনা হবে ধরে নেয়া যায়। তবে এ বিষয়ে একটা প্রশ্ন। আমাদের দেশে আধুনিককালে শিক্ষা ব্যবস্থাটা প্রধানত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রয়োজন এবং রুচি অনুযায়ী গড়ে উঠেছে। আর বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য উচ্চাশী, একথা সকলেই জানেন। সে-বিচারে প্রাথমিক শিক্ষাটা কলেজী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার উচ্চ চূড়ায় উঠবার প্রথম ধাপ মাত্র। প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজন সম্পর্কে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এই মনোভাব জনসাধারণের মধ্যেও অনেকদূর বিস্তৃত হয়েছে। তার ফল ভালো হয়নি। কারণ প্রাথমিক শিক্ষা সকলের জন্য বটে, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত সকলের জন্যই উচ্চ শিক্ষা নয়। আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে যাতে অল্প বয়সের ছেলেমেয়েরা সকলেই কিছু ভাষাজ্ঞান, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞানের পাঠ এবং কিছু ব্যবহারিক কাজে নিপুণতা লাভ করে জীবনের নানা ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের উপর গভর্নমেণ্ট সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন ভাল কথা, সেই সঙ্গে গ্রামে এবং শহরে নানা স্তরের ও শ্রেণীর অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়েদের জন্য বাস্তব জীবনধারার উপযোগীভাবে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম এবং শিক্ষণব্যবস্থা রচনা করা উচিত।

পরিকল্পনার অন্যান্য পর্বে মাধ্যমিক শিক্ষা, কারিগরী বিদ্যাশিক্ষা বিশ্ব-বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা প্রসার এবং উন্নয়নের সংকল্প স্থান পেয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার এবং উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে পরিকল্পনা বর্তমানে অনুসরণ করছেন তার মূল ছকটায় বিশেষ ত্রুটি নেই। মাধ্যমিক শিক্ষায় পুরানো ছাঁচটা বর্জন করে আগাগোড়া নতুন ছাঁচে উচ্চ মাধ্যমিক এবং বিবিধার্থসাধক শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে প্রথম দিকে কিছু কিছু অসুবিধা ঘটবেই। তা সত্ত্বেও উচ্চ মাধ্যমিক এবং বিবিধার্থ সাধক শিক্ষার আয়োজন অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে; পুরানো ছাঁচের মাধ্যমিক শিক্ষার তুলনায় নতুন ব্যবস্থা যে অনেক বেশী উন্নত এবং সময়োপযোগী সে বিষয়ে এখন কোনই সন্দেহ নেই। সমস্যা হল পুরানো ছাঁচের মাধ্যমিক স্কুলগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত করবার। তৃতীয় যোজনাকালে ছয়শ চল্লিশটি স্কুল উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করা হলেও পুরানো ধারার প্রায় সাতশ স্কুল 'জুনিয়র' পর্যায়ে থাকবে। এরপর আছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর সংখ্যা-স্ফীতি অর্থাৎ "দি গ্রেট বাল্‌জ" (the great bulge) যার ধাক্কা সামলাবার সমস্যা ব্রিটেনের শিক্ষা ব্যবস্থাতেও দেখা দিয়েছে।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির চাপের কথা না-ই তোলা গেল। কারণ উচ্চ শিক্ষা সংকোচের সংকল্পটা সামাজিক, বৈষয়িক এবং আরও নানা কারণে যুক্তিসঙ্গত মনে না করে উপায় নেই। তবে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে যারা বঞ্চিত হবে তাদের জীবন ও জীবিকার্জনের পথ যাতে স্বচ্ছন্দ ও প্রশস্ত হয় সেজন্য বিকল্প ব্যবস্থার যথোচিত আয়োজন করা বিষয়ে রাজ্যের শিক্ষা বিধায়কগণ যথেষ্ট পরিমাণে উদ্যোগী হবেন আশা করি।

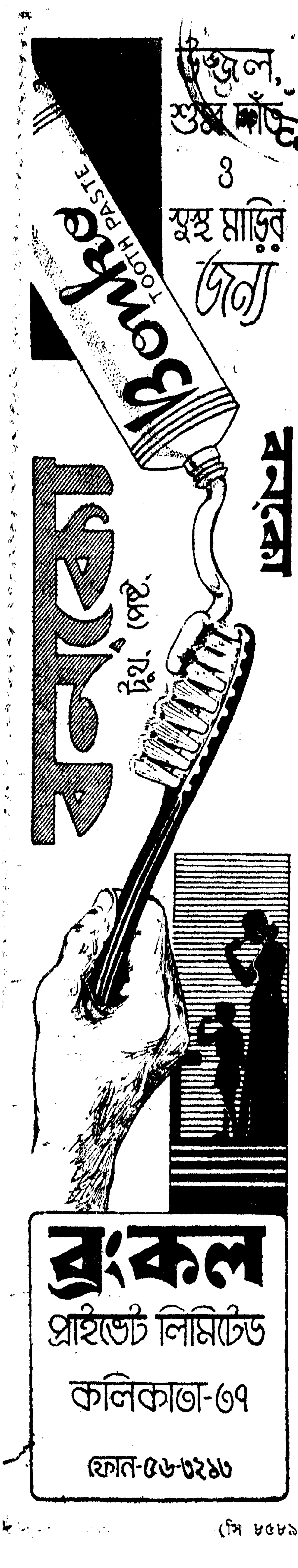

(সি ৮৫৮৯)

বৈদেশিকী

দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের অমানুষিক নিষ্ঠুর বর্ণবৈষম্যমূলক নীতির কথা তুললেই সেটা দক্ষিণ আফ্রিকার আভ্যন্তর বিষয়ে ইউনাইটেড নেশনসএর বে-আইনী হস্তক্ষেপ হচ্ছে বলে ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের পক্ষে বহু বৎসর যাবৎ একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা সত্ত্বেও কোনো না কোনো-রূপে বিষয়টির আলোচনা হয়ে আসছে যদিও তার দ্বারা দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের নীতি অথবা মনোভাবের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়নি এবং ইউনাইটেড নেশনসও দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের প্রতি বাধ্যতামূলক কোনো নির্দেশ দিতে সমর্থ হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকায় যা চলছে প্রকাশ্য তার সমর্থন করা অতি বড়ো নির্লজ্জের পক্ষেও কঠিন, কিন্তু আভ্যন্তর ব্যাপারে ইউনাইটেড নেশনসএর হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই—এই যুক্তির আশ্রয় নিতে অনেকে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারকে সাহায্য করেছে।

অবশ্য এই যুক্তির কোনো সারবত্তা নেই। কোনো দেশের আভ্যন্তর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার বিষয়ে ইউনাইটেড নেশনস্‌এর বিধানে যে নির্দেশ আছে বিধানের অন্যান্য নির্দেশ এবং সংস্থার মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিলিয়ে তার অর্থ করতে হবে। কয়েক বছর আগে ইউনাইটেড নেশনস কর্তৃক নিযুক্ত একটি কমিশন এই বিষয়টি নানাদিক থেকে গভীরভাবে পরীক্ষা করে যে-রিপোর্ট দেন তার সিদ্ধান্ত মানলে আভ্যন্তর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার যে যুক্তি দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের পক্ষে আওড়ানো হয় সেটা সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু যেখানে আলজেরিয়ার যুদ্ধ, হাঙ্গারীর জাতীয়তাবাদীদের দমন এবং তিব্বতীদের জাতীয় সত্তার বিনাশকে "আভ্যন্তর ব্যাপারের" পর্যায়ে ফেলে ইউনাইটেড নেশনসএর এক্তিয়ারের বাইরে রাখার চেষ্টা হয় সেখানে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের দুষ্কৃতিকেও ঐভাবে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা হবে এতে আশ্চর্য হবার কী আছে!

তবে এই যুক্তির আশ্রয় হয়ত আর বেশিদিন নির্ভরযোগ্য থাকবে না বলে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার অনুভব করছেন। বৃটিশ গভর্নমেন্ট, যাঁরা এতোকাল দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে "আভ্যন্তর ব্যাপারের" যুক্তিতে সায় দিয়ে এসেছেন, তাঁদেরও ভাব পরিবর্তনের সম্ভাবনা হয়েছে, যেমন আলজেরিয়ার সম্পর্কে ফ্রান্সের পক্ষে "আভ্যন্তর ব্যাপারের" যুক্তিতে আমেরিকা কিছুকাল থেকে সায় দিচ্ছে না। সুতরাং দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জন্য একটি নূতন অস্ত্র গ্রহণ করেছেন, সেটি হচ্ছে যারা দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের মানবতাবিরোধী বিপজ্জনক নীতি ও কৃতকর্মের সমালোচনা করে তাদের এলোপাতাড়ি গালি দেওয়া। সম্প্রতি ইউনাইটেড নেশনস-এর জেনারেল অ্যাসেমব্লীতে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের প্রতিনিধি ভারতবর্ষ ও অন্য কয়েকটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন। অমুক অমুক ব্যাপার যাদের দেশে সংঘটিত হয় তাদের দক্ষিণ আফ্রিকার বিষয়ে কিছু বলার অধিকার নেই, এই হল তাঁর বক্তব্যের ধারা। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের প্রতিনিধি যে-সব কথা বলেছেন তথ্য হিসাবে অর্ধসত্য, বিকৃত সত্য এবং মিথ্যার মিশ্রণ, কিন্তু সেগুলি সত্য হলেও দক্ষিণ আফ্রিকার যে অবস্থা নিয়ে আলোচনা তাতে সেগুলির উল্লেখ অবান্তর হত কারণ উভয়ের মধ্যে কোনো তুলনাই চলে না। কিন্তু তাই বলে এটা নিশ্চিন্ত হয়ে থাকার মতো বিষয়ও নয়।

কারণ ব্যাপারটা কেবল যুক্তিতর্কের কথা নয়। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের প্রতিনিধির কথা অযৌক্তিক, সেটা বর্তমান আলোচনায় খাটে না, এই বললেই ল্যাটা চুকে যায় তা নয়। যে মানবতাবিরোধী মনোবৃত্তি দ্বারা দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার চালিত হচ্ছেন, ভারত সরকারের অনুসৃত কোনো নীতিতে তার ছোঁয়া পাওয়া যাবে না, একথা ঠিক এবং পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহের নিকট একথা সুবিদিতও বটে, কিন্তু কার্যত আলোচনার গণ্ডী এতে সীমাবদ্ধ থাকবে না। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের প্রতিনিধি যখন বলেন যে, যারা দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তারা নিজেরা নির্দোষ নয়, তাদেরও হাত কলঙ্কিত, তখন তিনি যে বাদবিচার করে দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থার সঙ্গে তুলনীয় দৃষ্টান্তগুলির মাত্র উল্লেখ করবেন তা আশা করা যায় না। ফরিয়াদী বা সাক্ষীর সুনাম নষ্ট করার সময়ে এরূপ বাদবিচার করা হয় না, যে-কোনো দোষ দেখাতে পারলেই কিছুটা কাজ হয়। সুতরাং দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের ভারতবর্ষের প্রতি গালিবর্ষণ এলোপাতাড়ি হলেও সেটা উপেক্ষনীয় নয়। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের গালিগালাজের মধ্যে অতিরঞ্জন, সত্যের বিকৃতি ও মিথ্যা উদ্ভাবন যা আছে তা নিরসনে বিদেশে যে সুষ্ঠু প্রচারের আবশ্যকতা আছে তা তো করতেই হবে, তারচেয়ে আরো প্রয়োজনীয় কাজ দেশের ভিতরে করার আছে। কারণ ভারতকে গালাগাল দিতে গিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের প্রতিনিধি যে-সব বিষয়ের উল্লেখ

GOVER RARY
Cooch Behar

করেছেন সেগুলিকে তিনি বিকৃত করে ফেললেও তার অনেকগুলির পশ্চাতে যে অমীমাংসিত সমস্যা রয়েছে সে সম্বন্ধে সজাগ হওয়া আবশ্যক। ভারতবর্ষের সরকারী নীতি বৈষম্যমূলক সমস্ত রকম কুবিচারের অবসান ঘটাতে প্রতিশ্রুত; কিন্তু এই প্রতিশ্রুতির কাগজী দলিল দেখিয়েই পৃথিবীকে সন্তুষ্ট করা যাবে না, নিজেদেরও নয়। যদি যেত তবে স্বাধীন ভারতবর্ষে প্রত্যহ এতো গণ্ডগোল, খুনখারাপি, গুলী-চলা দেখতে হত না। আজ কিছুতেই বলা চলে না যে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠ আছে। যদি থাকত তবে পৃথিবীতে ভারতবর্ষের নৈতিক প্রভাব আরো অনেক বেশি দেখা যেত। বর্তমানে ভারত-বর্ষের বা অন্যান্য "নিরপেক্ষ" রাষ্ট্রের নৈতিক প্রভাবের কথা যা বলা হয় তাতে প্রকৃত পরিমাণে প্রোপাগাণ্ডার খাদ মিশানো আছে। এ প্রোপাগাণ্ডা যে আমরা কেবল করছি তা নয়, যে-দুদলের মধ্যে আমরা "নিরপেক্ষ" তারাও এই প্রোপাগাণ্ডা করছে; বস্তুত আমরা বেশির ভাগ তাদের কথারই প্রতিধ্বনি করছি।

কিন্তু এই নৈতিক প্রভাবের মূলে কী আছে একটু তলিয়ে দেখলেই তার মূল্য বুঝা যাবে। যে বিবদমান দুইজন আমাদের নৈতিক প্রভাবের সার্টিফিকেট দিচ্ছে তাদের কাছে আমাদের প্রভাবের ভিত্তি কী? সে ভিত্তি হচ্ছে ভয়—একদলের ভয় পাছে আমরা (অথবা অন্য নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি) অন্য দলে যোগ দিই, অন্যদিকে ঝুঁকি। আমাদের প্রভাব এক দলের উপর পড়তে পারে এটা চিন্তার বিষয় নয়, চিন্তার বিষয় হচ্ছে আমরা পাছে এ বা ও দলের আওতায় গিয়ে পড়ি। এরই নাম দেওয়া হয়েছে "নৈতিক প্রভাব", আসলে একে আদৌ নৈতিক প্রভাব বলা উচিত নয়। আসল নৈতিক প্রভাব হবে যদি আমাদের অনুসৃত পথ বা আদর্শের দ্বারা অপরে প্রভাবিত হয় বা অপরকে প্রভাবান্বিত করার সম্ভাবনা থাকে। তবে সেই পথ বা আদর্শ পসিটিভ বা অস্তিবাচক হওয়া চাই। আমরা ভিক্ষা করতে বেরুলাম দেখে যদি আমাদের পাড়াপ্রতিবেশীরাও ভিক্ষা করতে বেরোয় তবে সেটাকেও এক ধরনের প্রভাব কেউ বলতে পারেন; কিন্তু সেটাকে কোন কারণেই নৈতিক প্রভাব বলা সংগত হবে না। আসলে নিজের দেশে কারা কী গড়তে পারল আসলে তার উপরেই বাইরে কার কতটুকু প্রভাব হবে সেটা নির্ভর করে। একটা বৃহৎ দেশ যদি এলোমেলো হয়ে থাকে তবে তার প্রতি শক্তিশালীরা একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে, কেন করে তা বলাই বাহুল্য। তখন সেই এলোমেলো দেশকে "ভজানো"র জন্য তার নৈতিক প্রভাবের তারিফ করা বর্তমান জগতের আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে দেখা দেয়।

১৪।১০।৬০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
ভস্মপুতুল ৫·০০
নারায়ণবাবুর এই নতুন উপন্যাস বর্তমান বাংলার সমাজচিত্র হিসেবে অনন্য বইটি কিন্তু এ-বইয়ের আসল তাৎপর্য এক মহৎ-ধ্যানকে মূর্ত করে তোলার মধ্যে, ইতিহাসের দিক-নির্দেশে। সম্প্রতিকালের সামগ্রিক অবক্ষয়ের পটে এ-বই এক শুদ্ধ ভবিষ্যতের স্বপ্ন। সবে বেরল। অন্যান্য বই ঃ
সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী ২॥০ সাহিত্যে ছোটগল্প ৮৲ নীল দিগন্ত ৩৲

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের
পরম পিপাসা ৩·৫০
বাংলাসাহিত্যে মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য হার্দ্য-উপলব্ধির এমন একটি আবহাওয়া ও পরিমণ্ডল গড়ে নিয়েছেন, যেটি তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব। সমৃদ্ধ-কল্পনায় এবং প্রবল হৃদয়াবেগে তাঁর সাম্প্রতিকতম উপন্যাস "পরম পিপাসা" সাহিত্যে স্থায়ী-স্বীকৃতির দাবি নিয়ে এসেছে। প্রতিভাময়ী লেখিকার শ্রেষ্ঠ বই। সবে বেরল।

প্রকাশের অপেক্ষায়
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সর্বশেষ উপন্যাস মাটির পথ ৬·৫০
গদাধরচন্দ্র নিয়োগীর ভ্রমণকাহিনী পথ আমায় ডাকে ৪·০০
ডঃ সুরেশ চক্রবর্তীর বিখ্যাত গ্রন্থ সঙ্গীত প্রবেশ ৩য় ভাগ ৩·৫০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন মুদ্রণ মাটি ২·৫০

অন্যান্য নতুন বই
অন্নদাশঙ্কর রায়ের গল্প ৫·০০
যাঁর প্রতিটি গল্পই অনন্য তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলন করতে হলে তাঁর সমস্ত গল্পই একত্রীকরণ করতে হয়। বাংলাসাহিত্যের সবচেয়ে সংযমী ও স্বল্পলিপি লেখকের এই গল্পগ্রন্থে ১৯২৯ থেকে '৫০ পর্যন্ত লেখা সমস্ত গল্পই সংকলিত হয়েছে। উপহার উপযোগী সংস্করণ।

নবগোপাল দাসের অভিযাত্রী ৫·০০
১৯৪২ থেকে '৫২ পর্যন্ত সময়কালটা বাংলার ইতিহাসে গভীর সংকটের যুগ। তারই পটে 'অভিযাত্রী' এক মূল্যবান মানবিক দলিল।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উত্তরপুরুষ ২·৫০
"এই কাহিনীতে এমন একটা দরদী মনের স্পর্শ আছে, যা পাঠককে সহজেই অভিভূত করে।......চরিত্রগুলি অদ্ভুত সজীব।"—আনন্দবাজার।
অন্যান্য বই ঃ সঙ্গদয়া ৪৲ শুক্লপক্ষ ৩৲

রমাপদ চৌধুরীর
এই পৃথিবী পান্থনিবাস ৫·০০
কারো কারো মতে এইটেই রমাপদর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।
লালবাঈ ৬·০০
নবম মুদ্রণ
প্রথম প্রহর ৫·০০ অরণ্যআদিম ৩·০০

বিমল করের অপরাহ্ণ ৩·০০
একটি সুখের সংসার ভেঙে যাবার বিক্ষুব্ধ চূড়ান্ত মুহূর্তগুলির রুদ্ধশ্বাস কাহিনী।
অন্য বই ঃ দেওয়াল ১ম ভাগ ৪॥০, ২য় ভাগ ৬৲

সুরজিৎ দাশগুপ্তের একই সমুদ্র ৩·৫০
একালের তারুণ্যের সমস্যাকে নবীন লেখক যে রকম পষ্টাপষ্টি খোলাখুলিভাবে তুলে ধরেছেন তা সত্যই দুঃসাহসিক। এর নায়ক বিশ শতকের ট্রাজেডি।

ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের
জেলোডিঙি (নাটক) ২·৫০
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
অভিসারিকা ৩·৫০

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের
স্মরণচিহ্ন ৫·০০
প্রাণতোষ ঘটকের
রানীবৌ ৪·০০

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের ডাক্তারের জেলখানা ২·৫০

ডি· এম· লাইব্রেরী ঃ ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা—৬

সহশিক্ষা ও জাতীয় উন্নতি

অমল মুখোপাধ্যায়

দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষিত মানুষের মনকে উদ্‌বেজিত করছে, অথচ অনুচ্চারিত, বহু সমস্যার মধ্যে সহশিক্ষার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকতার সংগে যুক্ত কোনো কোনো মানুষের মনে এমন একটি আশংকা উদিত হয়েছে যে, আধুনিক ছাত্রছাত্রী তথা তরুণ সমাজের মানসিক অসংস্থিতি, অস্থিরতা এবং অসুস্থচিত্ততার মূলে একটি বিশেষ কারণ সহশিক্ষা প্রথা। এই প্রথা-উদ্ভূত বিশেষ ধরনের মানসিক রোগ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধির মত বিস্তৃত হচ্ছে এবং এই বিস্তৃতির 'দক্ষিণা হাওয়া' হয়েছে আধুনিক চলচ্চিত্র। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অমনোযোগিতা, উদ্‌ভ্রান্ততা, মনোনিবেশে অক্ষমতা, ফলে, খুব বেশী পরিমাণে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, ভদ্রতা, শিষ্টতা এবং সুরুচিবোধও ক্ষুন্ন হয়েছে অনেক পরিমাণে। ছাত্রছাত্রীদের চলাফেরা, বেশবাস লক্ষ্য করলেই সেটা বেশ বোঝা যায়।

পরিসংখ্যান দিয়ে এই সত্যগুলোকে প্রমাণ করা যায় না বটে, কিন্তু দেশকালপাত্র সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তিমাত্রেই এটা অনুভব করতে পারবেন। এই সকল অস্বস্তিকর আবহাওয়ার দিকে লক্ষ্য রেখে, প্রত্যেক কলেজের পাশাপাশি, মেয়েদের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সচেতন এবং অসচেতন প্রয়াস আজকাল প্রায়ই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এবং অভিভাবকরা অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে এটাকে সামাজিক উন্নতির প্রয়াস বলে মেনে নিয়েছেন এবং সহশিক্ষামূলক বিদ্যায়তন থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিজের মেয়েকে মহিলা-কলেজে পাঠিয়ে প্রত্যক্ষ সমর্থন জানিয়েছেন। কিন্তু এখানেই একটা মস্ত বড় ভুল করে ফেলেছেন তাঁরা।

এখন মুশকিল যে, একটি বিশেষ কাজ সুচিন্তিতভাবে সম্পাদনার আনন্দে যে মানুষ মশগুল তাকে যদি কাজটা 'ভুল' হয়েছে নির্দেশ করা যায়, অতি প্রাথমিক স্তরে তার একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই বিষয়টি স্থিরভাবে বিবেচনার প্রয়োজন আছে।

আমার বক্তব্য হল, ছাত্র-উচ্ছৃংখলতার যে কারণই থাক, সহশিক্ষা প্রথা অন্তত তার জন্য কিছুতেই দায়ী নয়। কারণ, সহশিক্ষা বলতে আমরা যে শিক্ষার কথা বুঝি, আমাদের দেশের কলেজগুলিতে সেই অর্থে সহশিক্ষার প্রবর্তন আজো হয়নি। উপমা দিয়ে বলতে গেলে বলতে হয়, এ যেন বড়-লোকের বাড়ির নীচুতলার কোঠাখানা দয়া করে খুলে দেওয়া। 'আমার আছে অনেক; তুমি থাকলে থাকতে পার।' এমন ক্ষেত্রে এই কৃপাপাত্রটির সংগে পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের আন্তরিক যোগ ঘটা কখনোই সম্ভব নয়। আমাদের সহশিক্ষা প্রথার চিত্রটিও প্রায় এই।

মেয়েরা কলেজে আসে। অধ্যাপক ক্লাসে গেলে ক্লাসে যায়। ক্লাসঘরের এক কোণের দিকে আট দশটি বেঞ্চি নিয়ে বসে। বক্তৃতা শোনে। বাড়ি চলে যায়। বিশেষ কোন প্রয়োজন না হলে অধ্যক্ষ মহাশয়ের সংগে তাদের যোগ সামান্যই থাকে। লজ্জা এবং সংকোচ অধ্যাপকদের কাছ থেকে তাদের অনেক দূরে সরিয়ে রাখে। সর্বোপরি গোষ্ঠীগতভাবে ছাত্রদের সংগে তাদের কোন যোগ থাকে না বললেই চলে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই দেওয়াল তোলার প্রধান সমর্থক; তাই সহশিক্ষা প্রবর্তনের অর্ধশতাব্দীর উপর উত্তীর্ণ হওয়ার পরও সাংস্কৃতিক উৎসব ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের মিলিত প্রয়াসকে আইন করে বন্ধ করা হয়েছে। একসংগে তারা নাটক করতে পারবে না, এমন কি মেয়েরা নিজেরাও কোন নাটক করতে পারবে না। আবার মেয়েদের অনুষ্ঠানে ছাত্রদের সাহায্য পর্যন্ত নিয়ম-সংগত নয়।

কাজেই বলতে পারি, ছাত্রছাত্রীদের অশোভন আচরণের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত ছেড়ে দিলে, সামগ্রিকভাবে ছেলে ও মেয়েরা পারস্পরিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত নয়। জীবনের দুটি কি চারটি বছরের মধ্যে অর্ধাংশেরও বেশী সময় শিক্ষায়তনের সংগে ছাত্রছাত্রীদের কোন যোগ থাকে না। যেটুকু থাকে তার মধ্যে পনেরো আনা অংশই পড়াশুনা ও পরীক্ষা নিয়ে সকলেই ব্যস্ত থাকে। বাকি সময় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যেটুকু যোগ ঘটা সম্ভব তাতে খুব একটা মানসিকতার পরিবর্তন সম্ভব বলে আমাদের মনে হয় না। অতএব বর্তমান কালের ছাত্রছাত্রীর চরিত্রের পরিবর্তনের মূলে আর যাই থাকুক সহশিক্ষা প্রথার অন্য কোন দায়িত্ব নেই।—বরং প্রকৃত অর্থে 'সহশিক্ষা' প্রথার অভাবই বর্তমানকালের নারীপুরুষের নানান সামাজিক সম্পর্কের অধঃপতনের মূলে। বর্তমান প্রবন্ধের বক্তব্য সেখানেই থাকবে।

ভারতবর্ষে নারীশিক্ষার ব্যাপক আয়োজন বেশীদিন আগেকার কথা নয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শুধুমাত্র মমত্ব বোধ নয়, সামাজিক বোধজনিত দূরদৃষ্টি নারীশিক্ষার চিররুদ্ধ দুয়ার ভেঙেছে। তিনি চেয়েছিলেন আত্মনিয়ন্ত্রণের বোধটুকু অন্তত আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে উদ্‌বোধিত হোক। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দুর্ভাগ্য, এক শতাব্দী উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, তবু আমাদের দেশের মেয়েরা নিজেদের সম্পর্কে ভাবতে শিখলে না। যদি ভাবতে শিখতো, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উগ্রনীতিবোধের পরোক্ষ অপমানটুকু তাদের নীরবে গিলতে হোত না।

আমাদের সামাজিক চেতনা চিরকালই দুর্বল। তাই সহশিক্ষার আন্তরিক অর্থটি আমাদের কাছে এখনো অজ্ঞাত। একটি সুস্থ সামাজিক বনিয়াদ গড়ে তোলার পক্ষে আমাদের মত কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশে এই একটি ঘুলঘুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি পড়া উচিত ছিল। আধুনিক সভ্য জগতের দিকে তাকালেই নিঃসংশয়ে একথায় সায় দেওয়া যাবে যে, নারী ও পুরুষের মিলিত প্রয়াস ছাড়া, কোনো দেশের সত্যিকার উন্নতি হতে পারে না। ইউরোপ একথা বুঝতে পেরেছিল বলেই ঘরে বাইরে সবটাই তাদের মিলিত প্রয়াস। তাদের বহির্জগতে সার্থকতার চিহ্ন আভ্যন্তরীণ জীবনের প্রতিফলনও বটে। অথচ নারী ও পুরুষের এই যে সহজ সম্পর্ক এতো চিরকাল ছিল না; গড়তে হয়েছে। বৈঠকখানায়, ভোজ-টেবিলে, চা-মিলনে, শিক্ষায়তনে, চার্চে, নানান সামাজিক পরিবেশে নারীপুরুষের সহজ সম্পর্ক ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। অবশ্য এই সবই ইউরোপীয় সামাজিক রীতিনীতিরই অংগ (তবু রীতিনীতি তো দৃষ্টিভংগী মনোভংগী থেকেই আসে)।

ইউরোপে নারী ও পুরুষ উভয় উভয়কে কখনো বন্ধু হিসেবে, কখনো সহকর্মী হিসেবে, কখনো সহকারী হিসেবে, কখনো বা পরিচিতজন হিসেবে পেয়েছে। ফলে উভয়কে উভয়ের জানাচেনার সুযোগও

হয়েছে গভীরভাবে। এমনি করে আন্তরিক নম্রতার (flexibility) যোগে বিভিন্ন স্তরে নারীপুরুষের মিলিত প্রয়াস অনিবার্য সাফল্যে পরিণত হয়েছে। উৎসাহ প্রেরণার যোগে কর্মের প্রতিশ্রুতিও তাঁদের অনেক বেড়ে গেছে।

আর আমাদের দেশে? দীর্ঘ কয়েকশত বছর ধরে নারী ও পুরুষের সম্পর্ক শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ভালবাসা, প্রেমের মত মহত্তম বৃত্তিকে পর্যন্ত গলা টিপে হত্যা করা হয়েছিল। নারী ও পুরুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ ও কৌতূহল সমাজের রক্তচক্ষুর কাছে নির্জীব হয়ে পড়েছিল—অথচ তার আভ্যন্তরীণ দুর্দমনীয় বৈদ্যুতিক শক্তি গোপন সুড়ঙ্গপথে ব্যাভিচারের বিলাসবাটি সৃষ্টি করেছিল। আধুনিক ইংরেজী শিক্ষা আমাদের সেই অন্ধকার ক্লেদাক্ত পথ থেকে অনেকটা দূরে সরিয়ে এনেছে বটে, কিন্তু আমাদের গুণেই আমরা মুক্তির পথ চিনে নিতে পারিনি। পারিনি বলেই সামাজিক বিবেচনায় নারী ও পুরুষের মধ্যে আশমান জমিন ফারাক্ রেখেই দেওয়া হল।

তাই স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক ছাড়া, ঘরের বাইরে, নারী ও পুরুষের মধ্যে অন্য কোন সম্পর্ক থাকতে পারে আজো বহু মানুষের কল্পনাতীত। অবশ্য আমাদের পারিবারিক আচার-আচরণ ও অন্যান্য সম্পর্কগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি। যে যুবক নিতান্ত বাড়ির কয়েকজন আত্মীয় ছাড়া অন্য কোন মেয়ের সংগে আলাপ করা বা পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়নি, কর্মক্ষেত্রে তার সহকর্মিণীর প্রতি একটি বিশেষ দুর্বলতা পোষণ অস্বাভাবিক কিছুই নয়। আশৈশব কৌতূহল ও আকর্ষণ একটি বিশেষ ক্ষেত্রে দুর্বলতা হয়ে দাঁড়াতেই পারে। কাজেই এরকম ক্ষেত্রে মিলিত প্রয়াস, অনেকখানি শক্তিহীন হয়ে পড়ে। আমাদের দেশে হয়েছেও তাই।

আসল কথা, আমরা যদি সহজভাবে স্বীকার করতে পারি ভাল হয় যে, যৌন-প্রবৃত্তি মানুষের প্রবলতম প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির অন্তরালে নিহিত আছে মানুষের দুর্বার শক্তি। মহৎ ও অমহৎ অধিকাংশ কর্মের উৎস মনুষের এই মূল (Basic) এবং শাশ্বত বৃত্তিটা। কাজেই মানুষের মধ্যেকার এত বড় শক্তিটিকে কোনক্রমেই উপেক্ষা করা যায় না; যার ভাল ও মন্দ দুই-ই করার অসাধারণ শক্তি আছে। সামাজিক দিক থেকে এই শক্তিকে সংহত করে, সুনিয়ন্ত্রিত পথে পরিচালনার কথা বিবেচনার প্রয়োজন আছে। আশৈশব নারী ও পুরুষের পারস্পরিক কৌতূহল এই বোধজনিত। বলা বাহুল্য, এর মধ্যে অসুন্দর কিছু নেই। তবু সামাজিক দৃষ্টিতে আমাদের দেশে এই কৌতূহলকে

● বেঙ্গলের বই মানেই সেরা লেখকের সার্থক সৃষ্টি ●

সমরেশ বসুর আশ্চর্য উপন্যাস

বাঘিনী

॥ সাত টাকা ॥

আর এক আশ্চর্য জগৎ ও জীবনের প্রতিচ্ছবি

বি টি রোডের ধারে (৩য় মুঃ) ২.৫০ ॥
শ্রীমতী কাফে (২য় মুঃ) ৬.০০ ॥
গঙ্গা (৫ম মুঃ) ৫.৫০ ॥
[বাংলা ছায়াচিত্রে রূপায়িত হচ্ছে]

জরাসন্ধের নবতম উপন্যাস

ন্যায়দণ্ড

॥ সাড়ে ছয় টাকা ॥

বিচারশালার পটভূমিকায় মর্মস্পর্শী কাহিনী

লৌহকপাট ১ম খণ্ড (১৩শ মুঃ) ৪.০০ ॥
২য় খণ্ড (১০ম মুঃ) ৩.৫০ ॥
৩য় খণ্ড (৫ম মুঃ) ৫.০০ ॥
তামসী (৭ম মুঃ) ৫.৫০ ॥
[বাংলা ও হিন্দী ছায়াচিত্রে রূপায়িত হচ্ছে]

সৈয়দ মুজতবা আলীর অপরূপ রম্যরচনা

চতুরঙ্গ

॥ সাড়ে চার টাকা ॥

ময়ূরকণ্ঠী (১২শ মুঃ) ৩.৫০ ॥

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর নতুন উপন্যাস

তুঙ্গভদ্রা

॥ চার টাকা ॥

মণিপদ্ম ৪.০০ ॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মহাশ্বেতা (২য় মুদ্রণ) ৫.৫০ ॥
সপ্তপদী (১৩শ মুঃ) ২.৫০ ॥
[বাংলা ছায়াচিত্রে রূপায়িত হচ্ছে]

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

সুখদুঃখের ঢেউ (২য় মুঃ) ৪.০০ ॥
কন্যাকুমারী (২য় মুঃ) ৩.০০ ॥
সঙ্গিনী (৩য় মুঃ) ২.৫০ ॥
অনুরাগিণী (২য় মুঃ) ২.০০ ॥
হাসুবানু (৪র্থ মুঃ) ৮.০০ ॥
নওরঙ্গী ৩.০০ ॥
শ্যামলীর স্বপ্ন (৬ষ্ঠ মুঃ) ৪.০০ ॥
গল্প সংগ্রহ ৪.০০ ॥

প্রবোধকুমার সান্যালের

দেবতাত্মা হিমালয়

১ম খণ্ড (১০ম মুঃ) ৯.০০ ॥
২য় খণ্ড (৫ম মুঃ) ১০.০০ ॥

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

অপারেশন (২য় মুঃ) ৬.০০ ॥
বিষকুম্ভ (২য় মুঃ) ৪.০০ ॥

প্রফুল্ল রায়ের

সিন্ধুপারের পাখি (২য় মুঃ) ৯.০০ ॥
পূর্ব-পার্বতী (২য় মুঃ) ৮.৫০ ॥

নিখিলরঞ্জন রায়ের

সীমান্তের সপ্তলোক ৩.০০ ॥

ধনঞ্জয় বৈরাগীর নাটক

রূপোলী চাঁদ (২য় মুঃ) ২.৫০ ॥

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের

চরণিক ৩.০০ ॥

সন্তোষকুমার দে-র

বৈঠকী গল্প ২.৫০ ॥

বরিস পাস্তেরনাকের

বহু বিতর্কিত চাঞ্চল্যকর উপন্যাস

ডাক্তার জিভাগো

॥ সাড়ে বারো টাকা ॥

কবিতার অনুবাদ ও সম্পাদনা:

বুদ্ধদেব বসু

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের প্রবন্ধ-গ্রন্থ

সুখের সন্ধানে

[The Conquest Of Happiness]

॥ পাঁচ টাকা ॥

অনুবাদ : পরিমল গোস্বামী

● সেরা বই দুটি রূপা অ্যাণ্ড কম্পানির সহযোগিতায় প্রকাশিত ●

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড :: কলিকাতা : বারো

নানা অবিবেচনার দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে; তাই শিশুদের মধ্যে পর্যন্ত নারী-পুরুষের দেয়াল তুলে, অংকুরেই একটা অপরাধবোধের জন্ম দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। বরং সামাজিক ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশার কথাটিতে সচেতন বা অচেতন ভাবে খুব বেশী রক্তনেত্রীয় গুরুত্ব আরোপিত হওয়ায়, একটা বিষম অনাচারের পথে খুব বড় রকমের এই শক্তিটার অপচয় হয়ে চলেছে। একে তো আমাদের এমন কোনো সামাজিক মিলন-ক্ষেত্র নেই, যেখানে নারী ও পুরুষ সহজভাবে মেলামেশা করতে পারে, তার উপর ঘরোয়া উৎসব-গুলিতে পর্দার খোঁজ আগে পড়ে—বিয়েতেই বলুন, চায়ের আসরেই বলুন, আর ভোজ-সভাতেই বলুন।

অতএব দেখা যাচ্ছে, সামাজিক ক্ষেত্র গেল, ধর্মীয় উৎসব-পার্বণ গেল, সেখানে নারী ও পুরুষের সহজ মিলন সম্ভব হচ্ছে না। এবার রইলো শুধু আমাদের শিক্ষাক্ষেত্র। আমার মনে হয়, এই শিক্ষা-ক্ষেত্রই একমাত্র জায়গা, যেখানে ছাত্রছাত্রীদের সহজ মেলামেশা সম্ভব। অবশ্যই কোনো কৃত্রিম উপায়ে মেলামেশার জন্য ফর্দ আমি টানবো না। তবে খুব স্বাভাবিকভাবে তাদের মেলামেশার যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তাকেও রুদ্ধ করে দেওয়া সমর্থন করবো না। কলেজীয় সবগুলি উৎসবেই—নাটক করার ব্যাপারে, বাৎসরিক মিলনোৎসবে, বাৎসরিক উৎসবের ক্ষেত্রে, শিক্ষামূলক ভ্রমণের ক্ষেত্রে, আরো অনেক আনন্দোৎসবই ছেলেমেয়েদের পারস্পরিক যোগে সার্থক হয়ে উঠতে পারে। অবশ্য এ সকল ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকদের দৃষ্টি উৎসব-ক্ষেত্রটিকে ত্রুটিশূন্য করে তুলবে। ফলে এমন একটা মানসিক ক্ষেত্র সৃষ্টি হওয়া সম্ভব, যেখান থেকে আমাদের জাতীয় যাত্রা অনেক দ্রুত হয়ে যাবে।

অন্যান্য ক্ষেত্রের কথা বাদই দিলাম, চীন ও রাশিয়াতে খেলাধুলার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের একত্রিত উৎসাহ তাদের চরম অনুপ্রেরণার স্থল হয়েছে। অথচ শিক্ষা পেয়েও আমাদের দেশের অধিকাংশ মেয়েই শুধুমাত্র স্কুলঘর ও অফিসের বাইরে যেতে খুব কমই পেরেছে। এর পেছনে ভয়, অবিশ্বাস ও সংকোচ খুব বেশী পরিমাণে ক্রিয়াশীল। আর এই সংকোচ, ভয়, নারী-পুরুষের সহজ মিলনের ক্ষেত্র সৃষ্টি না-হলে কখনো তিরোহিত হবে না। যদি না-হয়, জাতীয় উন্নতি যে অবশ্যই ব্যাহত হবে, তাতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই।

তাছাড়া উৎসাহী ছাত্রীদের দৃষ্টিকোণ থেকেও একটা দাবি তোলা যায়। সে হল বিখ্যাত অধ্যাপকদের কাছে পড়তে পারার অধিকার নিয়ে। প্রাকৃতিক কারণেই মেয়েদের অভিজ্ঞতার দিগন্ত ছেলেদের চেয়ে অবিস্তৃত হয়; ফলে অভিজ্ঞতার সঙ্গে বোধ, বুদ্ধিদীপ্তি এবং প্রকাশ ক্ষমতার যে একটি প্রত্যক্ষ যোগ আছে, তা মেয়েদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কম উপস্থিত থাকে। ফলে শুধুমাত্র মহিলা অধ্যাপিকার কাছে পড়ার ক্ষতি ছাত্রীদের স্বীকার করতেই হয়।

কাজেই একথা বলা বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না যে, অন্তত কলেজীয় শিক্ষায় সকল শিক্ষায়তনে সহশিক্ষার প্রবর্তন করা উচিত হবে। সামান্য একটা নীতির অজুহাতে, যে-কোনো কলেজে ছাত্রছাত্রী সকলকে পড়াশুনার সুযোগ না-দেওয়ার মধ্যে যে সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচয় আছে, আজকের দিনে তা হাস্যকর। তাছাড়া ভুলে গেলে চলবে না, ছাত্রছাত্রীদের নিজেদেরও নিশ্চয় দায়িত্ববোধ আছে—কমপক্ষে নিজের প্রতি নিজের দায়িত্ববোধ। কর্তৃপক্ষ সবটাই আইনের শাসনে নিয়ন্ত্রিত করবেন, এমন যদি মনে করে থাকেন, তাহলে বলতেই হল, অযথা নিজেদের ক্ষমতার উপর বড় বেশী গুরুত্ব আরোপ করে ফেলেছেন। আর, অর্থনৈতিক দিক থেকেও সহশিক্ষাই সমর্থনযোগ্য। কারণ আজকাল দেখা যাচ্ছে, অল্পসংখ্যক ছাত্রী নিয়েও বাংলা দেশে বহু কলেজ চালানো হচ্ছে। অথচ অন্যান্য কলেজগুলিতে অস্বাভাবিক ভিড় লেগেই আছে। এই কমানোর পন্থা মেয়েদের জন্য ভিন্ন কলেজ গড়া নয়, আরো কলেজ বাড়ানো। অথচ মেয়েদের জন্য যে কলেজগুলি তৈরী হচ্ছে, তাতে ব্যয়ের মাত্রা যে কিছু কম হচ্ছে, তাতো নয়। সরকারী অর্থব্যয় করে যে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত, আমাদের লক্ষ্য সব সময় থাকা উচিত কি করে আমরা তার থেকে সর্বাধিক সুযোগ গ্রহণ করতে পারি।

এবার আমাদের বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ করে তাই বলতে পারিঃ

(১) সামাজিক দৃঢ় বনিয়াদ গড়ে তোলার জন্য কলেজীয় শিক্ষায় সহশিক্ষা প্রথার সার্বিক প্রচলন আবশ্যক;

(২) এর ত্রুটির দিক একেবারেই নেই বলছি না; সেখানে শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকদের দৃষ্টি ছাত্রছাত্রীদের যে-কোনো মিলিত প্রয়াসকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে পারে;

(৩) আপাতত, অন্ততপক্ষে, ছাত্রছাত্রীদের সহজ মেলামেশার পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে দৃষ্টিকটু নিয়মগুলি আছে, সেগুলি সংশোধন করা উচিত;

(৪) ছাত্রছাত্রীদের দায়িত্ববোধকে এ পর্যায়ে সবচাইতে বেশী সম্মান দেওয়া হবে। তাদের বিচার-বিবেচনা, শুভাশুভ-বোধ উদ্বোধিত করতে হবে।

এ হলেই জাতীয় জীবনে মস্ত বড় একটা বাধার প্রান্তর উন্মুক্ত হয়ে যাবে। তবেই হাটে-মাঠের কাজকর্মে ছেলেমেয়েরা মিলিতভাবে সমস্ত অন্তর দিয়ে কাজ করতে পারবে, আত্মনিয়ন্ত্রণের পথ আবিষ্কার নিজেরাই করতে পারবে। যে ছাত্র অথবা ছাত্রী এই পারস্পরিক মেলা-মেশার ক্ষেত্রে সুশোভন বিচার-বিবেচনার পরিচয় দিতে পারবে না, আমাদের সমাজ তাদের কাছে কিছু প্রত্যাশা করে না। সেক্ষেত্রে হা-হুতাশ করে লাভ নেই। সব জায়গায়ই ছেলেমেয়েদের আমরা পাহারা দিয়ে রাখবো, কাল্পনিক ভূতের স্পর্শ বাঁচিয়ে রাখবো, এ-মেজাজ সমর্থনযোগ্য নয়। বরং 'দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে'।

আলোচনা

অভিশপ্ত চম্বল

দেশ পত্রিকায় কিছুদিন যাবত "অভিশপ্ত চম্বল" নামক একটি সুন্দর বর্ণনামূলক কাহিনী প্রকাশিত হইতেছে। ঐ কাহিনীর লেখক যে অসাধারণ ক্লেশ স্বীকার করিয়া প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন তাহার জন্য দেশবাসী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইবেন সন্দেহ নাই। যে দক্ষতা ও সাহসের সঙ্গে তিনি দুরতিক্রম্য দুস্তর বেহড়পথ অতিক্রম করিয়া দুর্ধর্ষ দস্যুদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছেন তাহা যুগপৎ বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। কিন্তু তিনি আচার্য বিনোবার শান্তিমিশন সম্পর্কে যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন তাহা যুক্তিসংগত বলিয়া মনে হয় না।

"অভিশপ্ত চম্বল" ঘটনা ভিত্তিক কাহিনী কিন্তু লেখক এই কাহিনীকে উপন্যাসের রঙে রাঙাতে চেয়েছেন আর খুব সম্ভবত এই কারণেই বিনোবা ভাবের শান্তি মিশন তাঁর ভাল লাগে নি। বিনোবার জীবন এবং বাণীর মধ্যে কোথাও সস্তা নাটুকেপনার স্থান নাই—"খুনকা বদলা খুনের" মত কোন রোমাঞ্চকর ঘটনার স্থান নাই। স্বভাবতই উপন্যাস ধর্মী "অভিশপ্ত চম্বলের" মধ্যে বিনোবা মিশন একটা ছন্দ পতনের মত ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে পারে। মানুষের হৃদয় যে সত্যই পরিবর্তন করা যায়—তা সে যত মারাত্মক অপরাধপ্রবণ মনই হউক না কেন—এই সহজ চিরন্তন সত্যকে লেখক অস্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং "দাউ" মানসিং-এর পুত্রের প্রাণ-রক্ষার্থে লুক্কা-কানহাইয়ার দলের আত্মসমর্পণের কল্পিত কাহিনী অবতারণা করিয়া তিনি বিনোবা মিশনের বৈপ্লবিক অবদানকে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছেন। বিনোবার চম্বল শান্তি মিশন যে সম্পূর্ণ সফল হয় নাই, সে জন্য লেখক বিনোবা অথবা সাধু যদুনাথকে দায়ী করেন নাই এবং তাঁহাদের ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধার আসন দিয়াছেন কিন্তু তাঁহার লেখা হইতে ইহা স্পষ্টভাবেই বুঝা যায় যে, সর্বোদয়ের দৃষ্টিভঙ্গীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুধাবন করার ধৈর্য পর্যন্ত তাঁহার নাই। বস্তুত আজ সমগ্র পৃথিবীতে যখন বিবাদ বিসম্বাদ ও রক্তপাত বন্ধ করার জন্য সকলের আগ্রহ দেখা যাইতেছে এবং সকল রাজনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যারই শান্তিপূর্ণ সমাধানের অনিবার্যতা স্বীকৃত হইতেছে অর্থাৎ সর্বোদয়ের পথে মানব সমাজ ক্রমশ অগ্রসর হইতে সক্ষম হইতেছে তখন আমাদের দেশে শ্রীভাদুড়ীর (লেখক) মত কিছু সংখ্যক লোক এখনও এই অনিবার্যতাকে স্বীকার করিয়া লইতে কুণ্ঠিত হইতেছেন ইহা বাস্তবিকই দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। এখনও এদেশে এমন অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি রহিয়াছেন যাঁহারা সংঘর্ষ এবং রক্তক্ষয়ী সমরকে অনিবার্য বলিয়া মনে করিতেছেন এবং দেশবাসীর রুচি এবং দৃষ্টিভঙ্গীকে কিছু পরিমাণে প্রভাবিত করিতেছেন। আমার মনে হয় শ্রীভাদুড়ী নিজের অজ্ঞাতসারে মানবসমাজে জঙ্গীভাব জাগাইয়া রাখার ইন্ধন যোগাইয়া দেশের ক্ষতিসাধন করিয়াছেন।

আচার্য বিনোবা চম্বলের সমস্যার সমাধানের উপায় স্বরূপ ভূদানের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। ভূদান এবং গ্রামদানের মাধ্যমে ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হইলে মুষ্টিমেয় কয়েকজন দস্যুসর্দার চম্বলের আগুন আর কয়দিন জ্বালাইয়া রাখিবে? সুতরাং চম্বলের দস্যু সমস্যার সমাধান একমাত্র সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই হইতে পারে। তবে কে উহা প্রতিষ্ঠা করিবে এবং কবে উহা প্রতিষ্ঠিত হইবে সে প্রশ্ন রহিয়াছে। মহাবীর যদুনাথ যখন সর্বোদয়ের আদর্শে আস্থা রাখিতে পারেন তখন চম্বলের বীর অধিবাসীরাই বা তাহা পারিবেন না কেন?

বিনীত

সুদিন ভট্টাচার্য

লেখকের উত্তর

শ্রীসুদিন ভট্টাচার্যকে কি উত্তর দেব ভেবে পাচ্ছি না। "অভিশপ্ত চম্বল"কে আমি উপন্যাসের রঙে রাঙাতে মোটেই চাইনি। যদি বাস্তবই তাঁর উপন্যাসের মত লাগে তাতে লেখকের দোষ কোথায়? 'বিনোবা মিশন' ছন্দ পতন ঘটিয়েছে বা আমার ভাল লাগেনি, এসব কথার অর্থ আমি বুঝতে পারলাম না। যদি তাই হতো তাহলে আমি বিনোবা মিশনের কোন কথাই লিখতাম না। না লিখলেও কোন ক্ষতি হতো না। কলকাতায় বসে বিনোবার শান্তি মিশনের সফলতা বা ব্যর্থতা নিয়ে তর্ক করা সহজ। এক মাস ভীষণ গ্রীষ্মে রোদে পুড়ে রোজ দশ মাইল হেঁটে চোখের সামনে সব জিনিস দেখে বুঝে লেখা অন্য ব্যাপার। বিনোবার সর্বোদয় পন্থা সম্বন্ধে আমি কোন কথাই বলিনি। সুদিনবাবু নিজেই বলেছেন সর্বোদয় সমাজ "কবে প্রতিষ্ঠিত হইবে সে প্রশ্ন রহিয়াছে।" আমি তো নিজেই বলেছি বিনোবার সর্বোদয় সমাজ থেকে আমরা এখনও অনেক দূরে। মেঃ জেনারেল যদুনাথ সিং বা সুদিনবাবুর নিজের বা আরও কারুর সর্বোদয় আদর্শে আস্থা রাখার প্রশ্ন উঠে না। তফাত শুধু এই যে আমি এবং আমার মত অনেকেই দেখেছে কি রকম ধরনের হৃদয়-পরিবর্তন "বাগী"দের হয়েছে। হৃদয়-পরিবর্তন করা যায় কি না সে কথা অবান্তর। বিনোবার কাছে যারা আত্মসমর্পণ করেছে তাদের হৃদয় পরিবর্তন হয়নি। জেলে তাদের সব ব্যাপার জানতে পারলে সুদিনবাবু মত বদলাতেন বোধহয়। বিনোবার প্রতি আমার শ্রদ্ধা কারুর চেয়ে কম নয়—সুদিনবাবুর চেয়েও নয়, তবুও বলব বিনোবার চম্বলের শান্তি মিশন সাফল্য লাভ করেনি। আর সর্বোদয়ী-দের ত সত্যটাকে মেনে নেওয়া উচিত কারণ—সর্বোদয় সমাজ বিনোবার মতে বোধহয় কল্পনা-রাজ্য নয়? আর বিনোবার সর্বোদয়ের আদর্শ এত ঠুনকো নয় যে কঠিন বাস্তবের সংস্পর্শে এলেই তা ভেঙে যাবে। নাইবা হোলো চম্বলের ডাকাতদের হৃদয় পরিবর্তন? সাধু চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু সাফল্য লাভ হয়নি তার জন্য আমায় কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার যৌক্তিকতা কোথায়?

—তরুণকুমার ভাদুড়ী

ভূপাল

আকাশবাণীর কথিকা

সবিনয় নিবেদন,

'দেশ' পত্রিকার নিয়মিত বিভাগ 'গানের আসরে'র গত সপ্তাহের (২৭ বর্ষ॥ ৪৮ সংখ্যা) শার্ঙ্গদেবের আকাশবাণীর কথিকা ইত্যাদির উপরের আলোচনাটি সুপ্রযোজ্য ও সময়োচিত হয়েছে। দিল্লীর কয়েকজন ভদ্রমহিলার খবর বলার ভঙ্গী সম্বন্ধে তিনি যথার্থই বলেছেন, "তাঁদের পড়ার ভঙ্গী এত অস্পষ্ট যে, অনেক সময় তা বোঝাই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। কাজ-সারার তাড়া তাঁদের এত যে, শ্রোতাদের কর্ণপীড়াটা তাঁরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না।" দিল্লীর সংবাদ প্রচারকদের পড়ার তাড়ায় মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তাঁরা বুঝি কোন দ্রুত পঠনের

॥ সদ্য প্রকাশিত ॥

'শেষ পর্যন্ত' ছায়াচিত্রে রূপায়িত

বিনোদিনী বোর্ডিং হাউস

কুমারেশ ঘোষের

সচিত্র সরস উপন্যাস। ২·৫০

॥ আজই সংগ্রহ করুন ॥

গ্রন্থ-গৃহ

৬ বংকিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

এবং ডি. এম লাইব্রেরী। বেঙ্গল পাবলিশার্স

সিগনেট বুকশপ

প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ (বা অবতীর্ণা) হয়েছেন। এ কথা শুধু দিল্লীর নয় কলকাতা কেন্দ্রের 'স্থানীয় সংবাদ' সম্বন্ধেও খাটে। বিশেষ করে জনৈকা প্রচারিকা সম্বন্ধে। বেতার বক্তাদের কণ্ঠস্বরের যোগ্যতা ত বিচার করা হয়ই না, এমন কি যাঁরা বেতার অনুষ্ঠানগুলি পরিচালনা করেন এবং অনুষ্ঠান ঘোষণা করে থাকেন তাঁদের কণ্ঠস্বরও বেতারপ্রচারের উপযুক্ত কিনা তা তেমনভাবে পরীক্ষা করা হয় না বলেই আমার বিশ্বাস।

কলকাতা কেন্দ্রের একাধিক ঘোষণাকারীর (বিশেষত ঘোষণাকারিণীগণের) কণ্ঠস্বর ও বাচনভঙ্গী রীতিমত কর্ণপীড়াদায়ক। কেউ কেউ আবার গানের কলি ঘোষণা করতে গিয়ে অনাবশ্যক আবেগ প্রকাশ করে থাকেন, যাকে কোন রসঘন নাটকের রোমাঞ্চকর দৃশ্যের সংলাপ বলে ভুল হয়। এ বিষয়ে বহু পত্রাঘাত করেও কোনো লাভ হয়নি। ইতি—

শ্রীপরিতোষ চক্রবর্তী,
শিরাকোল, ২৪ পরগণা।

সোনার মেয়ের
হরিণ চোখে
রূপের নাচন দেখে...

কামিনীকদম—ভি. অভদূতের
'লাখোঁ কি কাহানী' ছবিতে

সোনার মেয়ের হরিণ চোখে
রূপের নাচন দেখে, শিউলী শাখে কোকিল
ডাকে, মনমাতানো সুরে···নাচিয়ে হৃদয়
মনের ময়ূর নাচছে অনেক দূরে !
লাস্যময়ী চিত্রতারকা কামিনী কদমের চোখে মুখে
আজি ময়ূর-নাচের চঞ্চলতা, রূপের মহিমায়
উদ্ভাসিত আজ এ নারী হৃদয়। 'কোনই বা হবেনা,
লাক্সের কোমল পরশ যে আমি প্রতিদিনই
পাচ্ছি'—কামিনীকদম জানান তাঁর রূপ
লাবণ্যের গোপন রহস্যটি।

LUX
TOILET SOAP

আপনিও ব্যবহার করুন
চিত্রতারকার বিশুদ্ধ, শুভ্র,
সৌন্দর্য্য সাবান

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

L.TS. 71-X52 BG

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

৪৮

সেদিনটা ছিল বুধবার, আমাদের এখানে 'ইরাণের রানী'র অভিনয়, সেইজন্য 'সীতা' কেমন হচ্ছে, তা দেখতে যেতে পারছি না, কিন্তু মনটা ঔৎসুক্যে ভ'রে রয়েছে! হরিদাসবাবু নিমন্ত্রিত হয়ে দেখতে গেছেন অবশ্য, কিন্তু তিনি ত আজ রাত্রে আর ফিরে আসছেন না যে, টাটকা-টাটকা খবরটা শুনব! ও'র সঙ্গে আমাদের দেখা হবে কাল। কিন্তু দেখা হলেই বা কী, বিশেষ কিছু পরিষ্কারভাবে জানা যাবে না। পরের সমালোচনা নিয়ে উনি থাকেন না। 'ভালো হয়েছে' তাছাড়া আর কিছুই শোনা যাবে না। এটাই ওঁর স্বভাব, পুরানো মনোমোহনের সমালোচনাও কখনো শুনিনি ওঁর মুখে ওঁর নিজের জিনিস বলে। আমাদের ছিলেন অবশ্য কঠোর সমালোচক। তাও দেখেছি, কোনো উপদেশ বা পরামর্শ দিতেন না। বলতেন—এই দোষ হয়েছে। ব্যস। সে' দোষ কী ক'রে শুধরে নেওয়া যাবে বা কী করা উচিত, তা উনি বলতেন না কখনো। সেইজন্য খবরের আশায় ও'র দিকে ততটা না তাকিয়ে অপর এক ভদ্র-লোকের আশা করছিলাম আমরা। ভদ্র-লোকটি সেই ইভনিং ক্লাবের যুগ থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের পরম ভক্ত ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের স্নেহপাত্রও ছিলেন তিনি, সকল সভাই জানতেন ওঁকে বিশেষভাবে। আর্ট থিয়েটার ও নাট্যমন্দির, উভয় থিয়েটারের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় ছিল, দুটি থিয়েটারেই যাতায়াত করতেন, মহলাতেও যেতেন। সেইজন্য ও'র মারফত আমরা নাট্যমন্দিরের রিহার্স্যালের খবরও জানতাম। হরিদাসবাবুর ছিলেন উনি বিশেষ জানা-শোনা ব্যক্তি। আমরা ও'র সঙ্গে বসে বসে গল্প করতাম মাঝে মাঝে। দেখে একদিন হরিদাসবাবু বললেন—এ'র সঙ্গে আলাপ করছেন?

বললাম—হ্যাঁ। উনি থিয়েটার জগতের নানান খবর রাখেন দেখছি।

আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে হরিদাসবাবু বললেন—তাত রাখবেনই। ও'র নাম কী জানেন? গুজব-সম্রাট।

আমরা একটু অবাক হলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—কী রকম?

হরিদাসবাবু বললেন—গুজবের ছোট-খাটো ব্যাপারী বা খুচরো কারবারী ইনি নন। মহাজনও নন, এমন কি আমীর ওমরাহও নন উনি, একেবারে সম্রাট। যাঁদের কথা বসে-বসে শুনছেন, তাঁরা আবার শুনবেন আপনাদের কথা কাল সকালেই।

আমরা ভদ্রলোকটাকে ধ'রে বসলাম, বললাম—কী মশাই?

উনি ততক্ষণে বিলক্ষণ অপ্রস্তুত হয়ে গেছেন, বললেন—হরিদাসবাবুর কথা শোনেন কেন, উনি আমাকে স্নেহ করেন, তাই এমন বলে থাকেন।

বলে, চলে গেলেন তাড়াতাড়ি।

হরিদাসবাবু বললেন—গণদেবকে জিজ্ঞাসা করবেন, সে বলবে'খন। তখনো উনি সম্রাট হননি, যুবরাজ ছিলেন, আমরা তখন ও'র নাম রেখেছিলাম—কাবলেশ খাঁ।

'কাবলেশ খাঁ' কথাটা আজকের পাঠক বুঝেছেন ত? দ্বিজেন্দ্রলালের 'দুর্গাদাস' নাটকের একটি চরিত্র। শম্ভাজীর অনুগ্রহ-ভাজক জনৈক অনুচর। এদিকে খুবই সেবা করছেন শম্ভাজীকে, ওদিকে গোপনে ঔরংজীবের কাছ থেকে টাকা খেয়ে, নারীর প্রলোভন দেখিয়ে মত্ত অবস্থায় শম্ভাজীকে দুর্গ থেকে বাইরে টেনে নিয়ে আসেন, যার ফলে শম্ভাজী ধরা পড়ে যান মোগল-সৈন্যের হাতে।

হরিদাসবাবু উক্ত ভদ্রলোকের নাম করে বললেন—দ্বিজেন্দ্রলালের খুবই স্নেহভাজন ছিলেন উনি, কিন্তু পরে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতেও ছাড়েননি, এমন কি ক্ষতিই করেছিলেন তাঁর। সেইজন্য আমরা ঐ নাম দিয়েছিলাম ও'র। তবে হ্যাঁ, সময় বেশ কাটে ও'কে নিয়ে। তাই আমরা ওকে কিছুটা প্রশ্রয় দিয়েছি, আপনারাও হিসেব করে প্রশ্রয় দেবেন। এহেন কাবলেশ বা গুজব-সম্রাট আমাদের আশ্বাস দিয়ে-ছিলেন যে, ইরাণের রানী ত তেমন বড়ো নয়, সীতার আগেই ভাঙবে। ভাঙলেই আমরা যেন চলে না যাই, ও'র জন্য একটু অপেক্ষা করি। উনি এসে সব খবরাখবর দিয়ে যাবেন।

আমি আর ইন্দু প্রবোধবাবুর ওখানে তাই কিছুক্ষণ বসে রইলাম। আজ আর ভদ্রলোকের নামটি উচ্চারণ করব না, যাঁরা জানেন তাঁরা বুঝে নিন, আর যাঁরা জানেন না, তাঁরা ধ'রে রাখুন নামটা—গুজবসম্রাট।

উৎসবে

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট • কলিকাতা

এলেন কিছুক্ষণ পরে। বললেন সব কথা। বললেন—খুব লোক হয়েছে। লোকের উৎসাহও দেখলাম খুব। কিন্তু অভিনয় তেমন হয়নি। মানে, নাটকটা তেমন জমেনি, কেমন যেন ছাড়া-ছাড়া মনে হচ্ছে, একের পর আরেক অঙ্ক আসছে, মনে হচ্ছে, যেন অন্য জিনিস।

প্রবোধবাবু আমাদের দিকে তাকিয়ে ওঁর অলক্ষ্যে চোখ টিপলেন। আমরা তারপরে চলে গেলাম। ওঁর কথা কিছুই গ্রহণ করলাম না মন দিয়ে। ভাবলাম, কাগজেই দেখা যাবে কী লেখে।

এবং সত্যি কথা বলতে কী, অতঃপর শুরু হয়ে গেল কাগজের যুদ্ধ। সপক্ষ বিপক্ষ, নিরপেক্ষ—তিন রকম। সপক্ষের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, তাঁরা ত খুব ভালো বলবেনই, স্থানে-স্থানে অতিরঞ্জিত করেই বলবেন। বিপক্ষের কথাও ছেড়ে দিলাম, তাঁরা ত ভালো দেখবেনই না, অতি-রঞ্জিত করে খারাপ বলবেন। নিরপেক্ষ যাঁরা, তাঁদের মধ্যে দেখলাম, যুদ্ধটা নাটক নিয়েই বেশী হলো! অভিনয়ের অবশ্য খুবই সুখ্যাতি করলেন। শুধু দু'চার যায়গায় তাঁরা আপত্তি করেছিলেন। চরিত্রের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি নাকি পৌরাণিক পরিবেশ কোথাও-কোথাও ব্যাহত করেছে। যেমন কথা বলতে বলতে আসনের ওপর পা রেখে দাঁড়ানো ইত্যাদি সব বিলিতি কায়দা। কোথায় এক যায়গায় শিশিরবাবু দাঁড়ানো অবস্থায় ঈষৎ-উচ্চাসনের ওপর একটা পা তুলে দিয়ে-ছিলেন, সেইসব ছোটখাটো ত্রুটিবিচ্যুতির কথা আর কী!

তা' পরে এসব সংশোধন করে নিয়েছিলেন শিশিরবাবু। যেটা আলোচনার মূল লক্ষ্য-বস্তু, সেটা কিন্তু নাটক নিয়ে। সেসব পড়তে পড়তে মনে হতে লাগল, নাট্যকার নাটক লিখতে গিয়ে যে বিষয়বস্তু বেছে নিয়েছেন, সেটা একটা দুরূহ কর্ম। নাটক-বিন্যাসের পক্ষে যথেষ্ট জটিলতা-সম্পন্ন। এই বিষয়-বস্তু নিয়ে নাকি লিখতে গিয়ে স্বয়ং ভবভূতিও এই জটিলতা থেকে মুক্ত হতে পারেননি। অর্থাৎ, রামকে অনেক বাঁচাবার চেষ্টা করেও নিষ্কলঙ্ক করতে পারেননি। রামায়ণের তিনি অনেক কিছুই নেননি, স্বাধীন কল্পনার যথেষ্ট সাহায্য নিয়েছেন, এমন কি, নাট্যের অলঙ্কার-শাস্ত্র মানতে গিয়ে তাঁকে মিলনান্তক পর্যন্ত করতে হয়েছে তাঁকে। তবু রামের সীতাকে বনবাস দেওয়ার পিছনে জোরালো যুক্তি দিতে পারেননি তিনি, সেখানে রাম-চরিত্রে কলঙ্কের ছাপ রয়েই গেছে।

আসলে এই বিষয়বস্তু দুরূহ হয়ে দাঁড়ায় এইখানেই। সীতাকে বনবাস দেওয়ার 'জাস্টিফিকেশন' যতো দেওয়ার চেষ্টাই হোক না কেন, ওটা গ্রহণ করতে দর্শকের মন সহজে চায় না। কারণ যা দৃশ্য-কাব্য তার নাট্যক্রিয়া পড়েও যেমন অনুভব করবার, তেমনি চোখের সামনে সেই অনুভূতির সম্যক বিনাশ প্রত্যক্ষ করার প্রশ্নটাও এড়িয়ে যাওয়া যায় না। রাম নাটকের নায়ক, খলনায়ক নয়। দ্বিতীয়ত, রাম-চরিত্রকে প্রথম বয়স থেকে যেভাবে অগ্রসর হতে দেখি রামায়ণে, কিশোর-বয়সে তাড়কা-বধ, তারপরে বিবাহের পরে, পিতৃ-সত্যরক্ষার্থে বনগমন। একের পর এক কতো ঘটনা! সীতাহরণ, সীতার পুনরুদ্ধার ইত্যাদি। ওসবের মধ্য দিয়ে রাম আমাদের হৃদয়ের সমস্ত সমবেদনা কেড়ে নিয়েছেন। রামকে অযোধ্যার সিংহাসনে পুনর্বার অধিষ্ঠিত দেখলেও, ভুলতে পারি না তাঁর বিগত জীবন-সংগ্রাম কথা। সে-সব দিনের দুঃখ ও যাতনার ছবি যেন রাম ও সীতার সঙ্গে অনুক্ষণ ঘোরাফেরা করতে থাকে। সেইজন্য রাম-কর্তৃক সীতাকে বনবাসে প্রেরণ, এ প্রসঙ্গ নাট্যরসের মাধ্যমে যখন বিশ্লেষণের মুহূর্তগুলিতে দেখতে থাকি, অর্থাৎ রাম যখন সাধারণ এক মানুষের মতোই দ্বন্দ্ব সমাকীর্ণ মন নিয়ে ঘোরাফেরা করছেন দেখা যায়, তখন দর্শকমন সে অনু-অনুভূতির সঙ্গে সমব্যথী হয়ে উঠতে পারে না, এবং পারলেও, সহজেই তা পারে না। তাই, নাট্যকারের পথে এই 'মুহূর্ত'গুলিকে বিশ্লেষণ করা হয়ে পড়ে অত্যন্ত কঠিন কাজ।

গিরিশচন্দ্র তাঁর সীতার বনবাস-এ রামকে কিন্তু আদর্শপুরুষ বলেই দেখিয়ে গেছেন, অর্থাৎ অতিমানবরূপে। অতিমানব কেন, স্বয়ং নারায়ণের অবতাররূপে। তবুও স্থানে স্থানে কিছু যুক্তি প্রয়োগ করতে তাঁকেও দেখা গেছে, যদিও তিনি পৌরাণিক নাটকে কখনো নিজস্ব যুক্তি প্রয়োগ করেন না।

এক হাস্যমুখর অভ্যর্থনা

একখানি ধর্মযুগ নিয়ে বাড়ি ফিরুন···দেখবেন কতো আদর আপ্যায়নই না পাচ্ছেন। আর সেই ধর্মযুগ পড়ে সেই মজাই আপনি পাবেন। মানতে সেই বাধ্য হবেন যে অন্য যে কোনও হিন্দি সাপ্তাহিকে আপনি পাবেন না.... এরকম ভালো গল্প···মনোরম রঙিন ছবি···সমকালীন সমস্যা নিয়ে তথ্যবহুল তথা উপভোগ্য ও চিন্তাশীল প্রবন্ধ। রুচিপূর্ণ মজা পেতে-প্রতি সপ্তাহে··· পড়ুন

সব চেয়ে জনপ্রিয় পত্রিকা

একটি টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়া প্রকাশন।

মূল্য: ৫০ ন. পয়সা

টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়া ও ইলাসট্রেটেড উইকলী অফ্ ইণ্ডিয়ার এজেন্টগণের নিকট বা পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা বিক্রেতাগণের কাছে পাবেন, অথবা সরাসরি টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়া, বোম্বাই। ১০ নং দরিয়াগঞ্জ, দিল্লী। ১৩/১, ১৩/২, গভর্ণমেণ্ট প্লেস্ ইস্ট, কলিকাতা। এলাহাবাদ স্ট্রীট, লণ্ডন, এই সব ঠিকানা থেকে পাওয়া যায়।

কিন্তু যুক্তি দিয়ে গিরিশচন্দ্র বাঁচাতে পারেননি রামকে কলঙ্ক থেকে। তবু, তাঁর পক্ষে বলার কথা এই যে, রাম স্বয়ং নারায়ণ, এবং আদর্শপুরুষ, তাঁর জীবনের এই যে ত্রুটি, এ তাঁর লীলারই নামান্তর, লোক-শিক্ষার জন্যই এটা করতে হয়েছে রামরূপী নারায়ণকে। অর্থাৎ সাধারণ ধর্মপ্রাণ নরনারী যে-চোখে রামকে দেখে থাকেন, গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকের ভিত্তিভূমি স্থাপনা করেছেন সেই বিশ্বাসেরই ওপরে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল রামকে দেখেছেন তাঁর নাটকে যুক্তিবাদী মন দিয়ে। এ এক অভিনব দৃষ্টিপাত বটে, কিন্তু নাট্যকারের পক্ষে ঐ যে 'ক্রাইসিস্'—যার কথা আগে বলেছি, সে 'ক্রাইসিস' অতিক্রম করতে দ্বিজেন্দ্রলালও ততটা সক্ষম হননি। রাম যে নির্দোষীকে শাস্তি দিয়ে অন্যায় করেছেন, এ অন্যায়ের 'জাস্টিফিকেশন' হবে কী উপায়ে? সমস্ত অপরাধ তিনি চাপিয়েছেন বশিষ্ঠের নির্দেশের ওপরে, তা সত্ত্বেও রাম অপরাধ থেকে নিষ্কৃতি পান না। সীতার কাছে নতজানু হয়ে ক্ষমা-প্রার্থনা পর্যন্ত করেছে দ্বিজেন্দ্রলালের রাম, তবু কি তিনি কলঙ্ক থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন? সীতাকে যখন বনবাস দিলেন রাম, তখন, তিনি যে নির্দোষ, নিষ্পাপ,—এ সত্য তিনি ছাড়া আর কে বেশী জানে? এ ত বিশ্ববিদিত ঘটনা, এর ওপর আর চুনকাম চলে না। এ অপরাধ, অপরাধই। এক, ঐ যে বললাম, যদি ধরা যায় রাম—অবতার স্বরূপ, জগতকে শিক্ষা দিতে এসেছেন, পূর্ণ আদর্শবাদ প্রদর্শনই তাঁর উদ্দেশ্য, সেই ভাব ও বিশ্বাসকে নাটকে যদি সঞ্চারিত করতে পারা যায়, তাহলেই কিছুটা পার পাওয়া সম্ভব। গিরিশচন্দ্র যেভাবে নিয়েছিলেন আর কী। অর্থাৎ, বাঙালী যেভাবে নিয়েছে। বাঙালীর কাছে রাম-ও আদর্শ-ছিল, সীতাও আদর্শ। সেজন্য সীতার মুখ দিয়ে গিরিশচন্দ্র এক জায়গায় বলিয়েছেন—

"যেন জন্মজন্মান্তরে
হয় মম রামসমস্বামী,
সীতা নারী না হয় তাহার।"

অতো কষ্ট পেয়েও সীতা বলছেন, রামের মতো স্বামী যেন আমার জন্মজন্মান্তর হয়। তাঁর হাহাকার হচ্ছে ঐ কথার মধ্য দিয়ে—'সীতা নারী না হয় তাহার!' অর্থাৎ, সীতার মতো দুর্ভাগ্য নিয়ে কেউ যেন তাঁর স্ত্রী না হয়। কিন্তু, যা বলছিলাম, জনপ্রিয় বিশ্বাসের বাইরে গিয়ে যতই যুক্তি দিয়ে নতুন রঙ করা হোক না কেন, তা সহজেই গ্রাহ্য হতে চায় না। লৌকিক সীতা ও রামকে ধরলে এই বিপদ। প্রসঙ্গত একটা কথা বলা যাক। ভবভূতির "উত্তর রামচরিতে" আছে, শম্বুকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য যখন রাম দণ্ডকারণ্যে অনুপ্রবেশ করেছেন, তখন সীতার পূর্বতন বান্ধবী বাসন্তীর সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। এই 'বাসন্তী' ভবভূতির নিজস্ব চরিত্র। সীতাকে সঙ্গে নিয়ে পূর্বে যখন বনবাসে এসেছিলেন রাম, এই বাসন্তী ছিলেন সীতার সঙ্গিনী। এবার যখন দেখা হলো, বাসন্তী রামকে নিয়ে সেই সব স্মৃতিচিহ্ন-আকীর্ণ পূর্বপরিচিত স্থানগুলি দেখাচ্ছেন একে-একে, এবং সে সব দেখে কাতর হয়ে পড়ছেন রাম। তখন বাসন্তী বলছেন—"তুমি আমার জীবন, তুমি আমার দ্বিতীয় মন, তুমি চক্ষুর কৌমুদী, অঙ্গের অমৃত, —এই সব প্রিয়বাক্যে সেই সরলা সীতাকে বিমুগ্ধ করে—যাক, আর বেশী কথায় কাজ নেই।"

বাসন্তীর বাক্যাংশের মধ্য দিয়েই বেরিয়ে পড়েছে রচয়িতার অন্তরের ক্ষোভ, এই প্রচ্ছন্ন তিরস্কারের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে ভবভূতির তিরস্কার।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা'র যতটুকু পারেন, তা গ্রহণ করেছেন যোগেশবাবু, এবং যতটা কোমল করা সম্ভব, তা করেছেন। এত সত্ত্বেও, অর্থাৎ আপোস করা 'সীতা' হওয়া সত্ত্বেও, গুঞ্জন কম উঠল না, তাই ভাবছি, তখন দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' হলে না জানি কী হতো! এর থেকে এ কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক, আর্ট থিয়েটার শিশিরবাবুকে অসুবিধায় ফেলবার জন্য দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা'র অভিনয়-স্বত্ব সংগ্রহ করে থাকলেও, তাতে করে আর্ট থিয়েটারের কোনো লাভ হয়নি। আর্ট থিয়েটার 'সীতা'র অভিনয়-স্বত্ব সংগ্রহ করেও তা যখন অভিনয় করবার চেষ্টা পর্যন্ত করলেন না, তখন লোকের মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, শিশিরবাবুকে অসুবিধায় ফেলবার জন্যই তারা এটা করে থাকবেন। জনসাধারণ এ বিষয়ে যে ধারণা করেছিলেন, তা-ই যদি সত্যি হয় ত, আর্ট থিয়েটারের সে উদ্দেশ্য একেবারেই সিদ্ধ হয়নি। সাধারণের গ্রহণ-যোগ্য করে এই যে যোগেশবাবু নাটক করে দিলেন, আমি ত মনে করি, এতে শিশিরবাবুর শাপে বর হয়েছে। যে অসুবিধার কথা ভেবেছিল সেদিন স্টার, সে অসুবিধায় তাঁরা ফেলতে পারেননি শিশিরবাবুকে।

যাই হোক, এ তো গেল নাটকের কথা। এবার অভিনয়ের কথা ধরা যাক। অভিনয় নিয়েই বা এত মতবিরোধ কেন? একদিন ছুটি নিয়ে দেখতে গেলুম, তখনো 'ওরিজিন্যাল কাস্ট' বা 'ভূমিকালিপি পূর্ববৎ'—এই অভিনয় চলছে ওঁদের। ভূমিকালিপি মোটামুটি আগেই দিয়েছি, সংগঠনকারীদের মধ্যে প্রধান যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সম্পাদক বা সেক্রেটারী—সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় ছিলেন আমার পূর্ব পরিচিত। চিত্রশিল্পী ছিলেন চারুচন্দ্র রায়। এঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল পরে, এবং সে আলাপ আজও অক্ষুন্ন আছে। আর আলাপ ছিল ওঁর সহকারী রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (দেবু)-র সঙ্গে, যার কথা পরে আরও বলতে হবে।

অভিনয় আমার কিন্তু বেশ ভালোই লাগল। শিশিরবাবুর কথা বাদ দিলে, সবচাইতে যাকে ভালো লাগল, তিনি হচ্ছেন—বাল্মীকি—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। এমন ভঙ্গিতে উনি কথাবার্তাগুলি বললেন, এমন হাবভাবের সঙ্গে উনি অভিনয় করলেন যে, আমাদের চোখে তা নতুন লাগল। মনে হলো, এরকম বিশেষ বাচনভঙ্গীতে ত আমরা অভিনয় করি না! সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে

মানুষ গড়ার কারিগর
দ্বিতীয় মুদ্রণ
৫·৫০ নঃ পঃ

Amritabazar (2-10-60) ... An intense account of a Calcutta teacher — the youthful idealism, the brief breath of romance, the domestic shacles, the withering away of idealism, the struggle of a living against the hostile background of rising costs, the changing times, and finally, futility of life-long service in the unrelieved insecurity of old age. It seems MANOJ BASU's career as a teller of stories would have remained incomplete without this moving testament of misery. Here as in **Bhuli Nai** Sri Basu has written with insight and complete fidelity simply and without rancour. The telling has been superb.

সবুজ চিঠি
তৃতীয় সংস্করণ বেরুল ॥ ৩·০০ ॥

দেশ—একটি মধুর গৃহকোণ থেকে কাহিনী নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জীবনের এক বিশাল প্রান্তরে এসে এসে উপস্থিত হয়েছে।

বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রা) লিমিটেড ঃ কলিকাতা-১২

অনুপম আঙ্গিকে লেখা সংকৃতি রায়চৌধুরীর

তপোময় তুষারতীর্থ

১২টি চিত্রশোভিত সাবলীল ভাষায় 'কেদার-বদরী ভ্রমণ কথা। পাঠে মনে হবে হিমতীর্থে পৌঁচেছেন। দাম ৪.৫০। ভূমিকা লিখেছেন শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

দি বুক হাউস, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলি-১২ (সি ৪০২৮)

কলিঙ্গ-স্থাপত্য ও শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন

কোনার্কের সূর্য-মন্দির

দেখতে হলে

"KONARKA AT A GLANCE"-

এর লেখক

অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের

বহু চিত্র সমন্বিত ও তথ্যপূর্ণ

কোণার্ক

পড়তে ভুলবেন না

দাম দুই টাকা

বড় বড় বই-এর দোকানে পাওয়া যায়। (সি-৪৬২৫)

সদ্য প্রকাশিত

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

রহস্য উপন্যাস

মদন ভস্ম

॥ তিন টাকা ॥

আর. এন. চ্যাটার্জী এন্ড কোং

২৩, নির্মল চন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

কাঞ্চন

সুরভিত

কেশ

তৈল

কোণার্ক কেমিক্যাল

কলিকাতা - ১৫

হয়েছিল, তাঁর প্রতিটি কথা এবং চলাফেরা, তাঁর অভিনয় চরিত্রটির সঙ্গে একেবারে খাপ খেয়ে গেছে। এগজিবিশনে যখন শিশিরবাবু 'সীতা' করেছিলেন, তখন সে 'সীতা' দেখিনি, বলতে পারব না সে অভিনয়ের 'বাল্মীকি'র কথা, কিন্তু, এখানে 'বাল্মীকি' যা দেখলাম, তাতে চমৎকৃত না হয়ে উপায় নেই। এমনই ছাপ উনি দিয়েছিলেন, সেই থেকে মনোরঞ্জনবাবুর থিয়েটার-মহলে নামই হয়ে গেল—'মহর্ষি।' এরকম অভিনয়ে চরিত্রের নামে নাম হয়ে যাওয়ার রীতি অবশ্য প্রচলিত ছিল আগেকার থিয়েটারে। মহর্ষির 'বাল্মীকি' এমনি এক সৃষ্টি, যে, মনে হচ্ছিল, উনি ছাড়া 'বাল্মীকি' ওঁর থেকে বড়ো অভিনেতাও অমনভাবে করতে পারতেন না। আর ভালো লেগেছিল ললিতমোহন লাহিড়ী মশায়ের 'বশিষ্ঠ।' এমন গাম্ভীর্যসম্বলিত, ধীর স্থির ভাব, এমন ব্যক্তিত্বের আরোপ, 'বশিষ্ঠ' হয়েছিল দেখবার মতো জিনিস। এছাড়া, দুর্মুখ-রূপী অমিতাভ বসুকেও খুব ভালো লেগেছিল। লব-কুশের মধ্যে কুশ-রূপী রবীন্দ্রমোহন রায়-কেই লেগেছিল বেশী ভালো। প্রভার সীতা অতি সুন্দর। ছোটখাটো ভূমিকাগুলির মধ্যে পুত্রশোকাতুর ব্রাহ্মণ-বেশী নৃপেন্দ্রনাথ রায় মশাইও বেশ চোখে পড়েন। আর বাকী রইলেন শিশিরকুমার স্বয়ং। প্রতিটি দৃশ্যে দর্শক বিমুগ্ধ বিস্ময়ে দেখেছে তাঁর অভিনয়। অভিনেতার ভালো অভিনয়ের মধ্যেও সব জায়গায় যে চমকপ্রদ হয়, তা নয়। সেটা নিয়মও নয়। তাহলে ত চমকটাই সাধারণ পর্যায়ে এসে দাঁড়ালো! চমক আসে বিশেষ মুহূর্তে, বিশেষ স্থলে, তা-ও সব দৃশ্যে নয়। সব থেকে বড়ো চমক পেয়েছিলাম সেই দৃশ্যে, যে দৃশ্যের আরম্ভ হচ্ছে রামের এই স্বগতোক্তি দিয়ে—"সহস্র বান্ধব মাঝে রহিব একাকী, আমার প্রাণের দুঃখ কেহ বুঝিবে না, মৃত্যু হবে তীব্র নিরাশায়—?"

এই দৃশ্যটিতে আমরা সব বসেছিলাম মন্ত্রমুগ্ধের মতো। বিশেষ করে সেই বিশেষ সময়টিতে, যখন লব এসেছে রাজধানীতে। রাম যখন পুনঃ প্রবেশ করছেন—"কার কণ্ঠস্বর, কার কণ্ঠস্বর!"

তারপরে লবকে দেখে অবাক বিস্ময়ে বলে উঠছেন—"সেই নীল-নলিন-নয়ন দুটি!"

মানুষ যেন তখন বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে উঠত!

তারপরে আরও আছে। লব তখন দ্রুত বেরিয়ে গেল, তখন পিছন থেকে রামের চীৎকার—"ভরত, লক্ষ্মণ, ফিরাও—ফিরাও বালকে!'

বলে, অজ্ঞান হয়ে পড়লেন রাম, আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাড়ি যেন ভেঙে পড়ল হাততালিতে। যদি হাততালি দেওয়া এই থিয়েটারে নিষিদ্ধই হয়ে থাকে, ত, কোনো দর্শকই তা মানলেন না।

এসব ছাড়া, আর ভালো-লাগার বস্তু ছিল 'সীতা' নাটকের গানের সুরগুলি। নাচও অতি সুন্দর হয়েছিল। এবং হয়েছিল নতুন রকমের। দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, এই ত সেই, যা আমরা এই যুগে চাইছিলাম। পরিচয়-পত্রে ছিল—নৃত্যশিক্ষক—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু এবং তাঁর সহকারী—ব্রজবল্লভ পাল। এঁরা নাচে হয়ত সখীদের তুলে দিয়েছিলেন, কিন্তু শুনেছি, আসলে এই নৃত্যভঙ্গীর পরিকল্পনা করেছিলেন—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। আর গানগুলি? যোগেশবাবু 'সীতা' নাটকের বই-এ যে ভূমিকা লিখেছিলেন, তাতেই আছে,—'কয়েকটি গান' রচনা করেছিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। এর থেকে কী বুঝব? কয়েকটি গান মাত্র হেমেন্দ্রকুমার-রচিত মনে হচ্ছে, সব-কটি গান নয়। বাকী গানগুলি তাহলে কার? যোগেশবাবুর নিজের?

গানগুলির সুর যেমন ভালো হয়েছিল, তেমনি গেয়েছিলেন বটে কৃষ্ণচন্দ্র দে! লোকের মুখে মুখে ফিরত তখন কৃষ্ণবাবুর 'সীতা'র গানগুলি! বিশেষ করে, "অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে!' গানখানি ত, যাকে বলে, 'হিট্!' এরকম 'হিট্' আবার দেখা যায় না। এখানে-সেখানে, অলিতে-গলিতে, বাড়িতে-বাড়িতে, ঐ গান—'অশ্রুবাদল ঝরে'

যাই হোক, যত সমালোচনাই হোক না কেন, 'সীতা' শুরু করল তার জয়যাত্রা। আমাদের 'কর্ণার্জুন'-এর এক বছর দেড়মাস পরে—১২৩ রাত্রি অভিনয়ের পরে—'সীতা' এলো আমাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে।

এরপরে, আবার ফিরে আসা যাক আমাদের থিয়েটারের কথায়। 'কর্ণার্জুন' 'ইরাণের রাণী' ত চলছে, 'চন্দ্রগুপ্ত'-ও চলছিল সুসমারোহে, তার কিছুদিন পরেই কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিলেন, 'চন্দ্রগুপ্ত'-এর জায়গায় হবে—'প্রফুল্ল'। গিরিশচন্দ্রের যুগান্তকারী নাটক। অপরেশচন্দ্র আমাকে জানিয়ে দিলেন—আপনি কিন্তু করবেন 'রমেশ।'

রমেশ! শুনে মনে আনন্দই হলো। 'প্রফুল্ল' যখন প্রথম অভিনয় হয়—সেই ১৮৮৯ সালে—এই স্টারেই হয়েছিল সেই অভিনয়—তাতে 'রমেশ' করেছিলেন নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু। ওঁর পরে আরও বহু লোক 'রমেশ' করেছে, সেসব তেমন গা করি নি, মনে মনে ভাবছিলাম অমৃতলালেরই 'রমেশ'-এর কথা। ভাবতে ভাবতে একটু ভয়ও যে না হচ্ছিল এমন নয়। পার্টটা ভালো করে পড়তে লাগল। চরিত্রের একটা ছবি মনে মনে এঁকে ফেলতে লাগলাম। আর জানতে চেষ্টা করতে লাগলাম, 'রমেশ' কেমন করেছিলেন অমৃতলাল সে যুগে?

তাঁর সে অভিনয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মনে রেখেছে, এমন আছেন কে-কে? সে ত আজকের নয়, পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা। দানীবাবুকে জিজ্ঞাসা করি, অপরেশ-বাবুকে জিজ্ঞাসা করি, জিজ্ঞাসা করি হরি-প্রসাদ বসু মশাইকে। এ'র কথা আগে বলেছি, হাতিবাগানে সেই যে 'স্টার'-এর পতন হলো গিরিশচন্দ্রের আনুকূল্যে, সেই স্টারের যে চারজন অংশীদার হয়েছিলেন, সেই চারজনের একজন হচ্ছেন এই হরিপ্রসাদ-বাবু। ইনি মাঝার বশে এখনো আসেন স্টারে। এসে বসে থাকেন, যেখানে তার ঘরটি ছিল, তার সামনে, চেয়ার নিয়ে। এ'র বৈশিষ্ট্য ছিল, ব্রাহ্মণ দেখলেই পায়ের ধুলো নেবেন। এক টুকরো ন্যাকড়া থাকত পকেটে পাট-করা, সেটি দিয়ে পায়ের ধুলো নিতেন। লোক দেখলেই নাম জিজ্ঞাসা করতেন। আর, যেই শুনতেন—ব্রাহ্মণ, অমনি পায়ের ধুলো নেবার প্রয়াস! হাবুলে বসে থাকে বুকিং-এ, সে ব্রাহ্মণ, তার পায়ের ধুলো তার নেওয়া চাই-ই। বৃদ্ধ ব্যক্তি হাবুলের পক্ষে সংকোচ বোধ করা স্বাভাবিক। ইন্দু ব্রাহ্মণ, ইন্দুরও হতো ঐ অবস্থা। দুর্গারও হতো। থিয়েটারে এসেই খোঁজ নিতেন—অপরেশ এসেছে?

এসেছেন শুনলেই চলে আসতেন ভিতরে। এসে অপরেশবাবুর পায়ের ধুলো নিতেন। পায়ের ধুলো নিলে ব্রাহ্মণকে হাত উঠিয়ে আশীর্বাদ করতে হয়, অপরেশবাবু তা না করে, প্রতিনমস্কার জানাতেন হাত জোড় করে। বৃদ্ধের তাতে কিন্তু ঘোরতর আপত্তি। আশীর্বাদ কেন পাবেন না তিনি?

আমিও ব্রাহ্মণ হলে অনুরূপ বিপদে পড়তাম। নাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তারপরে বলেছিলেন—চৌধুরী? ব্রাহ্মণ, না কায়স্থ?

—কায়স্থ।

বেঁচে গেলাম।

এ হেন হরিবাবুকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম অমৃতলালের 'রমেশ'এর কথা। ত' বললেন—ও বাপু আমার কি মনে আছে? তুমি অপরেশকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো।

বললাম—উনি দু'একবার দেখেছেন, মনে আছে কী? আপনি বলুন।

মনে করে করে দু'একটি জায়গার কথা বললেন। তারপরে বললেন—আর মনে নেই। তুমি এক কাজ করো না? যাও না চলে ভুনিবাবুর কাছে?

ভুনিবাবু, অর্থাৎ অমৃতলাল। না-না, সে ভরসা হলো না। যা সংগ্রহ করতে পারলাম, তার ওপরে ভিত্তি করেই 'রমেশ'কে দাঁড় করাবার চেষ্টা করব ঠিক করলাম, সঙ্গে নিজস্ব কল্পনা ত আছেই! খট্‌কা লাগল এসে একটি যায়গায়। শেষ দৃশ্যে, যেখানে রমেশ তার স্ত্রী—প্রফুল্লকে যাদবের শয্যা-পার্শ্ব থেকে সজোরে সরিয়ে এনে খুন করছে, সেই দৃশ্যের ঐ নাট্যকর্মটির পরি-কল্পনা তেমন মনে লাগল না। উনি করতেন এইরকমঃ—

যাদব শয্যায় শুয়ে আছে, মাথার কাছে প্রফুল্ল বসে। যাদবের বালিশের তলায় আলতা ভিজিয়ে নুটি বা 'গোল' করা থাকত। যখন রমেশ উত্তেজিত কণ্ঠে বলছে—সরে যা, নইলে তোকে খুন করব!

তখন, 'না, যাব না' এই কথা বলে যাদবকে আট্‌কাবার জন্য নীচু হতো প্রফুল্ল। এবং এই সময়েই সেই আলতার নুটিটা লুকিয়ে মুখে পুরে দিতো। রমেশ তখন প্রফুল্লকে ধরে গলা টেপার অভিনয় করেই ঠেলে ফেলে দিতো। দেখা যেতো, প্রফুল্ল যখন মেঝেতে পড়ে গেছে, তখন তার মুখের কস বেয়ে রক্তের ধারা ঝরে পড়ছে। মুখে-রাখা আলতার নুটিটাতে দাঁতের চাপ দিলেই ওটা হতো আর কী!

বরাবর এই ব্যবস্থাই চলে আসছে প্রফুল্লর শেষ দৃশ্যে, রমেশ-প্রফুল্লের অভিনয়ে। আমার কিন্তু ব্যাপারটা তেমন মনঃপূত হলো না, আমি চিন্তা করতে লাগলাম। গলা টিপলে মানুষ হয়ত মরে যায়, কিন্তু স্টেজে ওটা ভালো দেখায় কী? 'ভালো' অর্থে—যথাযথ। যথাযথ হত্যা করার বিভ্রম সৃষ্টি করা তেমন যায় কি ওতে! অথচ, নাটকের দিক থেকে দেখতে গেলে ওখানে একটা আতংকের অনুভূতি দর্শকদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়া দরকার। ভাবতে-ভাবতে দু'তিন দিনের মধ্যেই একটা কল্পনা মাথায় এলো। সেটা ঠিক করে নিয়ে আমাদের প্রফুল্ল অর্থাৎ নীহারকে গিয়ে বললাম। বললাম একান্তে ডেকে নিয়ে—একটা কাজ করতে পারবে?

কী?

বললাম—দেখ, যদি সাহস করো ত, অ্যাক্‌শনটা করব। সাহস না হয়ত, তা-ও বলো।

—সাহস করব না কেন?—নীহার বললে—তুমি বলেই দেখ না!

বললাম শেষ দৃশ্যের কথাটা। বললাম—তুমি যখন আলতার নুটি-টা মুখে পুরে দেবে, তখন আমি তোমার হাত ধরে টেনে এনে গলা টিপে ফেলে দেবো, এই ত? এটা কী করে করব জানো? তুমি আমার বাঁ-দিকে পজিশন নেবে, নইলে হবে না। আমি প্রথমে বাঁ-হাত দিয়ে তোমার ঘাড়ের পিছনে শক্ত করে ধরব, তারপরে অনুরূপভাবে ধরব ডান হাত দিয়ে। তখন দাঁড়ালো কী? আমার দুটি হাতের আঙুলগুলো গেল তোমার ঘাড়ের পিছনে। শুধু বুড়ো আঙুলদুটো এগিয়ে এনে রাখব তোমার চোয়ালের হাড়ের নীচে। আমার হাত দুটি দেখতে হবে, ঠিক যেন 'প্যারালাল বার।' তুমি তখন তোমার দুটি হাত দিয়ে আমার সম্মুখ-বাহু বা ফোর-আর্ম দুটি শক্ত মুঠোয় ধরবে। তখন সেই অবস্থাতেই তোমাকে ধরে আমার সামনে

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
মনের মানুষ — তিন টাকা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
বহু যুগের ওপার হতে — দু টাকা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
তিন শূন্য — তিন টাকা পঞ্চাশ

সুবোধ ঘোষ
ভারত প্রেমকথা — ছয় টাকা

সরলাবালা সরকার
গল্পসংগ্রহ — পাঁচ টাকা

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন
চিন্ময় বঙ্গ — চার টাকা

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
বিবেকানন্দ চরিত — পাঁচ টাকা
ছেলেদের বিবেকানন্দ — এক টাকা পঁচিশ

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী
রবীন্দ্র মানসের উৎস সন্ধানে — তিন টাকা পঞ্চাশ

লিপিকার বই
বিদূষক
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
দুই টাকা পঞ্চাশ

সাহিত্যের সত্য
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
দুই টাকা পঞ্চাশ

আনন্দ পাবলিশার্স
প্রাঃ লিমিটেড। কলিকাতা-৯

নিয়ে আসব। অর্থাৎ, তোমার পিছনটা থাকবে দর্শকদের দিকে, আর আমার মুখটা থাকবে দর্শকদের দিকে। তারপরে তোমার ঘাড়ে আমার হাতের চাপের ইঙ্গিত পেয়ে তুমি তোমার পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর চাপ দিয়ে লাফিয়ে উঠতে চেষ্টা করবে। যতটুকু পারো ততটুকু উঠো, আমি ঠিক তোমাকে উঠিয়ে নেবো। তোমার ভর আমি ঠিক রাখতে পারব। প্রায় একহাত ওপরে তুলব তোমাকে। তারপরে ঐ অবস্থায় তোমাকে বার দুই তিন ওঠা নামা করিয়ে, তারপরে ছেড়ে দেবো। তুমি একটা আর্তনাদ করতে থাকবে, যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে তোমার। তারপরে আমি ছেড়ে দেবার পর তুমি লুটিয়ে পড়বে স্টেজের ওপরে। গালের কস বেয়ে নামবে দুটি রক্তের ধারা। বুঝলে? কাজটা সহজ নয়। প্র্যাকটিস করতে হবে।

নীহারের অদ্ভুত গুণ দেখেছি, নতুন কিছু করতে, নতুন কিছু শিখতে ওর উৎসাহের অন্ত ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে ও রাজী হয়ে গেল। বললাম—কাউকে জানতে দিও না। লুকিয়ে লুকিয়ে প্র্যাকটিস করতে হবে। একেবারে প্রথম রাত্রে এই অভিনয় করে আমরা সবাইকে চমকে দেবো।

তাই হতে লাগল। কিন্তু যতোই এগিয়ে আসতে লাগল প্লের তারিখ, ততই ভয় হতে লাগল মনে! কী জানি কাউকে ত জানতে দিলাম না, যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে! আমি যদি ওর দেহের ভার দু'হাতের ওপর না রাখতে পারি, বা, নীহার যদি ঠিকমতো লাফাতে না পারে ত, বিপদ হতে পারে!

নারায়ণ চক্রবর্তীর
তীর্থাঞ্জলি
ভারত-ব্রহ্ম-চীনের বিস্তৃত পটভূমিকায় লেখা অনন্যসাধারণ রহস্য-উপন্যাস। ৩.০০
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২ ও অন্যান্য পুস্তকালয়।

কে, হোড়ের
কনক
* পাউডার *

শঙ্খ মার্কাই
শ্রেষ্ঠ গেঞ্জী
যশোর কুম্ভ ইণ্ডাস্ট্রী কোং
কলিকাতা-৯

সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে শেষপর্যন্ত প্রবোধবাবুকে গিয়ে বললাম কথাটা। প্রবোধবাবু তখন ব্যাপারটার গুরুত্ব বোধহয় ঠিক বুঝতে পারলেন না। বললেন—তা ঠিক আছে, দুজনে মিলে ওটা ঠিক করে নাওনা রিহার্সাল দিয়ে?

যাক, আমি বলে খালাস। প্রস্তুত হয়ে রইলাম, ঐ সিনের আগে যেন খোঁপা খুলে নিয়ে একটা এলো খোঁপা করে রাখে। এলো চুল করে থাকার রেওয়াজ তখন ছিল না বউদের, না হলে ঐ সিনে এলোচুল থাকলে সুবিধা হতো। কিন্তু, সেটা করা যাবে না, বিসদৃশ ঠেকবে। তাই, পরামর্শ দিলুম ঘাড়ের কাছে চুলে একটা ফাঁস দিয়ে রাখতে। যাতে করে, ঐ বিশেষ নাটকীয় ক্রিয়ার মুহূর্তে ওর চুলটা খুলে গিয়ে এলো হয়ে যায়, তাতে 'এফেক্ট' হবে চমৎকার!

আসলে, এ হলো সম্মিলিত অভিনয়। দুজনের সঙ্গে সম্যক বোঝাপড়া না থাকলে এসব এফেক্ট আনা সম্ভব নয়। যে-অভিনয়টা ঐ দৃশ্যে আমরা করব, তাতে বিভ্রম হবে এই যে, দম বন্ধ করা শুধু নয়, আমি একটা মানুষের ঘাড়ের পিছনের 'মেডুলা'তে চাপ দিয়ে ভেঙে দেবারও চেষ্টা করছি।

যাই হোক, আমরা প্রস্তুত হয়ে রইলাম। অভিনয়ের তারিখ হলো—আঠাশে আগস্ট, ১৯২৪। যোগেশ করলেন দানীবাবু। রমেশ—আমি। প্রফুল্ল—নীহার। সুরেশ—ইন্দু। শিবনাথ—দুর্গাদাস। ভজহরি—নির্মলেন্দু। মদন ঘোষ—অপরেশচন্দ্র। কাঙালীচরণ—সন্তোষ দাস (ভুলো)। পীতাম্বর—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত। জ্ঞানদা—কুসুমকুমারী। উমাসুন্দরী—কোহিনুরবালা। যাদব—ফুল্লনলিনী।

হলো অভিনয়। দানীবাবুর 'যোগেশ' কোনোদিন দেখিনি, এই প্রথম দেখলাম। খুবই ভালো, এবং কণ্ঠস্বর ওঁর যেমন, তাতে চমৎকার মানিয়ে গেল। কিন্তু, স্মৃতিতে যে ছাপ রেখে গেছেন গিরিশচন্দ্র, তাতে মনে হলো, এর থেকে সে যোগেশের ছবিটা আরও বড়ো। অবশ্য যে বয়সে সে-যোগেশ দেখেছিলাম, তখন অভিনয় ততটা বোঝবার যোগ্যতা হয়নি, কিন্তু সে-ছাপ মুছবারও নয়, অস্বীকার করবারও নয়!

তাহলেও বলব, বিস্ময়কর অভিনয় করলেন স্থানে-স্থানে দানীবাবু। বহু দৃশ্যই একসঙ্গে করতে হয়েছে, তাতে ওঁর অভিনয়-শক্তিকে অভিনেতা রূপেও অনুভব করবার সুযোগ হয়েছে। আমি যে দৃশ্যে যাদবকে বকছি আর সে কাঁদছে, এমন সময় পিছন থেকে মত্ত অবস্থায় এলেন উনি, বললেন—'উকিল কী চীজরে!'

—'কী মাতলামো করেন!'—বলে আমি তাড়াতাড়ি চলে যেতেই উনি যখন বলে উঠলেন—'যেদো, ধর-ধর—তোর কাকাকে ধর!'—তখন, চড়চড় করে পড়ে গেল হাততালি।

গম্ভীর দৃশ্যেও ওঁর অভিনয় দেখবার মতো হতো। জ্ঞানদার সঙ্গে সেই দৃশ্য,—যখন বলছেন—'মরছ, মরো! —রাস্তায় মরছ!' তখন উৎকণ্ঠিতচিত্তে আমরা দেখেছি তাঁকে উইংসের পাশ দিয়ে।

তারপর, শেষ দৃশ্যটি তো হত মর্মান্তিক! রমেশকে হাতে হাতকড়ি দিবার পর, যখন পাগলের মতো প্রবেশ করছেন, বলছেন—'এই যে, মড়া পুড়িয়ে আমার বাড়িতেই এসে সব জটলা করছ!'

তারপর, ফ্যালফ্যাল করে চারিদিকে তাকিয়ে,—'এই যে যেদো, এই যে মা!'

'এই যে রমেশ'—বলে যখন আমার দিকে তাকালেন, সে অদ্ভুত চোখের দিকে আমি তাকাতে পারলাম না।

উনি ততক্ষণে বলে চলেছেন—'দেখছ? আরও দেখবে!' ইত্যাদি।

তারপরেও আছে। আস্তে আস্তে, হেঁটে মঞ্চের বাঁদিক থেকে ডানদিকে চলে যাচ্ছেন আর বলছেন—'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।'

দুতিনবার বলতেন কথাটা। তারপরেই—যবনিকা।

দানীবাবুর অভিনয় ত ভালো হলোই, সবার অভিনয়ই ভালো হলো। নীহার 'প্রফুল্ল' যা করলে, তা এক কথায়—চমৎকার। তার সেই প্রথম দৃশ্যের আবদারী কথা থেকে শুরু করে শেষ দৃশ্যে যাদবকে বাঘিনীর আগলে রাখবার চেষ্টা, সে এক সত্যিই দেখবার মতো জিনিস হয়েছিল। তারপরে, আমাদের সেই দৃশ্যটি। হত্যার পরেই ত পীতাম্বর ঢুকবে সবাইকে নিয়ে। তাই তারা দাঁড়িয়ে আছে উইংসের পাশে। সেখান থেকে দেখছে তারা অবাক হয়ে, আর ভাবছে, ওরা দুজন করছে কী! বাস্তবিকই, নীহারের সাহস ও সহযোগিতা না পেলে ঐ 'প্রজেক্ট' আমি আনতেই পারতাম না! একেই বলে অভিনয়ের 'কো-রিলেশন'

দৃশ্যটি দেখতে দেখতে দর্শকেরা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। রুখে উঠেছিল রমেশকে মারবে বলে। ভাগ্যিস ওটা হলো মঞ্চের ওপর। নীচে থাকলে, হয়ত কেউ কেউ ছুটে এসে আমাকে মেরেই ফেলত!

দৃশ্যটির শেষে ড্রপ পড়লে, কত লোক গ্রীনরুমের দরজায় এসে প্রশ্ন করছেন—শ্রীনীহারবালার লাগে নি ত?

ডাঃ নরেন বোসের কথা আগেই বলেছি। তিনি তাড়াতাড়ি ভিতরে এসে আমাকে চোখ পাকিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—কী করলেন ওটা?

বললাম—ওটা ট্রিক্।

আরেকবার দেখিয়েও দিলাম ওঁকে ব্যাপারটা। উনি বললেন—ট্রিক যে বেট্রিক হয়ে যাবে। ওতে যে ফাঁসি হয়ে যায়! হয়ে গেলে হাতে যে দড়ি পড়বে মশায়! খবরদার, এটা কখনো করবেন না।

(ক্রমশ)

প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

৫৪

প্রায় দুটো, কাকলির ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল।

সামান্য চা-টোস্টে নিরীহ টিফিন করছে কাকলি, তাতে পর্যন্ত বিঘ্ন। বাজুক গে, তুলবে না রিসিভার।

বাঁ হাতে আধখাওয়া টোস্ট, ডান হাতে ডাঁটিধরা চায়ের পেয়ালা—টেবিলের উপর মেলে-ধরা পত্রিকাটার পৃষ্ঠায় চুপচাপ চোখ রেখে বসে রইল কাকলি।

বাজুক কত বাজতে পারে। এক সময় নিজেই ক্লান্ত হয়ে ছেড়ে দেবে। অনুমান করে নেবে ঘরে কাকলি নেই। অন্যত্র গিয়েছে।

হয়তো বাজে ডাক কিন্তু টেলিফোনটা বেজে-কেঁদে এখন একটা ভাব দেখাবে যেন কত জরুরী। যেন কান পেতে কথাটা না শুনে নিলে রাজ্য ভেসে যাবে। একটা জ্যান্ত লোক সশরীরে দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করলে কেউ গ্রাহ্য করে না, কিন্তু ফোন বেজেছে কী, তক্ষুনি তার তাঁবেদারি করতে ছোটো। রেহাই দেবে না, কান-প্রাণ ঝালাপালা করে ছাড়বে। দশদিক থেকে দশটা লোককে ছুটিয়ে আনবে হন্যের মত। এতটুকু ভদ্রতা নেই, নীরবে এতটুকু প্রতীক্ষা করবার শালীনতা জানে না।

টেলিফোনটা একেকসময় বেআব্রু যন্ত্রণা।

বাজুক যত খুশি। কান দেবে না।

সাধ্য কী উদাসীন থাকো। দরজার পাশে চাপরাসী মোতায়েন, সে উঠে এল। মেম-সাহেব কি ঘুমিয়ে পড়েছেন? না কি অন্য-ভাবে ব্যস্ত?

রিসিভারটা তুলে নিল কাকলি।

'হ্যালো।'

'আমি কি মিস মিত্রর সঙ্গে কথা বলছি?' ওপার থেকে প্রশ্ন এল।

'হ্যাঁ। মিস মিত্র। বলুন।'

'সেই ফতেচাঁদ মাধমলের ফাইলটা নিয়ে আপনার সঙ্গে একটু কথা বলার ছিল।'

'কার ফাইল?'

নামটা ওপার থেকে পুনরুক্ত হল।

'কী বললেন? লালচাঁদ জেঠমল? বেশ তো আপনার যা বক্তব্য, নোট দিয়ে দিন না।' বললে কাকলি।

'শুধু নোট দিলে হবে না। একটু ডিস-কাশন দরকার।'

'যদি ডিসকাশন দরকার বোঝেন ফাইলটা নিয়ে চলে আসুন।'

'এখুনি যাব, না, অন্য সময়?'

'বিষয়টা যখন জরুরী তখন এখুনি বই কি।' কাকলি একবার অবশিষ্ট চায়ের পরি-মাণ ও টোস্টের আয়তন দেখে নিল। 'যদি অসুবিধে না হয় এই মুহূর্তে।' টোস্টের বাকি টুকরোটা মুখে পুরে বাকি চাটুকু এক ঢোঁকে শেষ করে ছিমছাম হয়ে বসল কাকলি।

চারদিকের দেয়ালগুলোকে ঠিক শোনানো হয়েছে। ঠিক শোনানো হয়েছে আর্দালী চাপরাসীকে। আর যদি কারু আড়ি পাতা অভ্যেস থাকে সেও শুনে রাখো।

ফাইল হাতে সুকান্ত কাকলির ঘরে ঢুকল। সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিল চাপরাসী।

মুখোমুখি চেয়ারে বসল সুকান্ত। এক-রাশ গাম্ভীর্য দিয়ে মুখের মৃদু হাসিটি চাপা দিল কাকলি।

'আপনার টিফিন হয়ে গিয়েছে?' জিগগেস করল সুকান্ত।

'হ্যাঁ। আপনার?' কাকলি চোখ তুলল।

'না। এবার যাব ক্যান্টিনে।'

'কেন, আপনার হোটেল থেকে আনিয়ে নিলেই তো পারেন।'

'হরে-দরে সেই একই কথা। যা হোটেল তাই ক্যান্টিন। যা মেকি তাই ভেজাল।'

'হ্যাঁ, যখন বাড়ি হবে, তখনই আসবে বাড়ি থেকে।'

'আর, তখন, যদি আপত্তি না করেন, ঐ সঙ্গে আপনারটাও আসবে।'

হাসি উঁকি দিতে চাচ্ছিল, আবার তা ঢেকে দিল কাকলি। বললে, 'ডিসকাশন তো হল, ফাইলটা রেখে যান।'

উঠতে চেয়েও উঠল না সুকান্ত। বললে, 'কিন্তু দেখবেন মেন পয়েন্টটা যেন মিস করবেন না।'

'হ্যাঁ, দেখছি। কী বলুন তো পয়েন্টটা।'

হঠাৎ গলা নামাল সুকান্ত। প্রায় ধুসর বর্ণের করে তুলল। বললে, 'ছুটির পর দুজনে একত্র ফিরব।'

কাকলি কথা না বলে ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি দিল।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের

যাঁরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিচার করতে চান, তাঁরা গল্পের ছলে লেখা

জ্যোতিষী সৌরেন গুপ্তের

বইগুলি পড়ে বিশেষ আনন্দ পাবেনঃ

১। Influence of Gems & Hindu Astrology Rs. 3.00

২। ছেলে মানুষ করার সোজা উপায় টা ১·৫০

৩। মন জয় করার উপায় টা ১·৫০

৪। গ্রহরত্নের কথা টা ২·৫০

জ্যোতিষের আসর

৪০, রামধন মিত্র লেন : কলিকাতা-৪

(সি ৪৫৫৭)

৫ম সংস্করণ

সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের

ইস্পাত ওরা ভাঙবেই ৪৲

লেখকের আরেকখানি উপন্যাস

এলো আহ্বান ৪৲

(৬ষ্ঠ সংস্করণ চলছে)

সাধারণতন্ত্রী প্রকাশালয়, ৪৪, কালী-কুমার মুখার্জি লেন, শিবপুর, হাওড়া ও কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে

(সি ৪৪৯৫)

উঠে চলে যাচ্ছিল সুকান্ত। দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরল। বললে, 'হ্যাঁ, আরো একটা পয়েণ্ট আছে। মাইনর মনে হতে পারে কিন্তু অল দি সেম—

'কী বলুন।'

টেবিলের প্রতিকূলে না দাঁড়িয়ে একেবারে পাশে এসে দাঁড়াল সুকান্ত। অস্ফুটে বললে, 'এই আপনাকে আপনি করে বলতে খুব মিণ্টি লাগছে।'

মধুতে মুখ-চোখ ভরে গেল কাকলির। পরিহাসের দীপ্তিটুকু বাঁচিয়ে রেখে বললে, 'বেশি আপনার হলে অমনি করেই বোধহয় বলতে হয়। তেমনি বোধহয় নিয়ম বাঙলা ভাষার।' বলেই বন্ধ ঠোঁটের উপর কাকলি তর্জনী রাখল। যেন শব্দ করে না হেসে ওঠে সুকান্ত।

অফিস ছুটির পর দুজনে, সুকান্ত আর কাকলি একত্র হল। গাড়িঘোড়া দূরে স্থান, দুজনে চলল পদব্রজে।

'জগজ্জন আমাদের দেখছে।' চলতে-চলতে বললে কাকলি।

'তার চেয়ে বড় কথা, আমরা আমাদের দেখছি।' সুকান্ত দূরে ছিটকে পড়লেও ভিড়ের ব্যবহারে আবার কাছে সরে এল। 'দেখছি আমাদের অফুরন্ততা। আমাদের অনেক স্থান, অনেক আশা অনেক ভবিষ্যৎ। দেখছি বিচ্ছেদের শেষ আছে কিন্তু মিলনের শেষ নেই।'

আর ভালোবাসার?' ডালহৌসি স্কোয়ারের মত জায়গায় এ প্রশ্ন চলে কিনা ভেবেও দেখল না কাকলি।

'প্রহরের শেষ আছে কিন্তু মধুরের শেষ কই। শুনুন—'

'শুনছি।'

'আমার হোটেলে আপনার বন্ধু বিনতার যেদিন নেমন্তন্ন, আমার ইচ্ছে সেদিন আপনিও থাকেন সেই আসরে।'

'মানে সেদিন আমারও নেমন্তন্ন?' খুশিতে উছলে উঠল কাকলি। 'সে নেমন্তন্ন তো রাতে।'

'আমার ইচ্ছে আপনি সেদিন সন্ধ্যে থেকেই আমার হোটেলে থাকেন।'

'সন্ধ্যে থেকেই?'

'মানে বিনতার পৌঁছুবার আগে থেকেই। ধরুন,' কাকলিকে একটা জায়গায় দাঁড় করাল সুকান্ত। 'ধরুন, বিনতাকে সময় দেওয়া হল আটটা, আর আপনি একঘণ্টা আগে থেকে, সাতটা থেকেই, উপস্থিত।'

'কেন, আমিও তো আগন্তুক, বাইরের লোক, আমিও আটটার সময়ই আসব।' বললে কাকলি।

'না, না, সেদিন আপনার অনেক কাজ, আপনি আগে না এলে চলবে না।' সুকান্তর স্বরে মিনতি ঝরতে লাগল। 'আপনি এসে ঘরদোর সাফসুতরো করবেন, খাবার টেবিলটা একটু সাজাবেন-গুছোবেন, মানে ঘরের একটু কাজকর্ম করে দেবেন আর কি।'

'বুঝেছি।' মুচকে হাসল কাকলি।

'কী বুঝেছেন?'

'বুঝেছি, যাতে বিনতা এসে বুঝতে পারে আমিই আগে থেকে ঘর জুড়ে রয়েছি—তার ঢুঁ মারা বৃথা।'

'ঠিক বুঝেছেন।' উল্লসিত হয়ে উঠল সুকান্ত। 'আপনি কী বুদ্ধিমতী! বুদ্ধিমতী না হলে এত উন্নতি হয় আপনার?

'কিন্তু, না, সেটা ঠিক হবে না।' আবার চলতে শুরু করল কাকলি।

'না, না, ঠিক হবে সুন্দর হবে।' কখনো রাস্তায় কখনো ফুটপাথে, নেমে-উঠে উঠে-নেমে পথ করতে লাগল সুকান্ত। 'আমাকে তাহলে আর বক্তৃতা করে বোঝাতে হয় না। ছোট্ট নীরব দৃশ্যটি থেকেই ও সব বুঝে নিতে পারে। যেমন সেদিন আপনাদের বাড়ির দরজায়, কিছু বলতে-কইতে হয়নি, কাঠখড় পোড়াতে হয়নি, চক্ষের নিমেষে বুঝে নিয়েছিল বরেন।'

'বরেনবাবুর কথা আলাদা।' নিজেই এবার দাঁড়াল কাকলি। 'বরেনবাবুর জন্যে সে দৃশ্য দৈব রচনা করেছিল। তার উপর কারু হাত নেই। আর বিনতার জন্যে এ দৃশ্য আমরা নিজেরা রচনা করতে যাচ্ছি। মানে ওকে ডেকে এনে আঘাত দিতে যাচ্ছি। এ রূঢ়তাটা ঠিক নয়। কী দরকার এই রূঢ়তার?'

'মানে বোঝানোটা নির্বিবাদ করা যেত।'

'কী দরকার! আমি নিজেই গিয়ে বলব সব ওকে।'

'আপনিই বলবেন? কী বলবেন?'

'বলব,' এক মুখ হাসল কাকলি। 'বলব যে রাম মরেও মরে না। ভালোবাসাকে তাড়িয়ে দিলেও যায় না চলে। দরজার কোণে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে।'

নর্টন কিংবা অ্যাডমিরাল নিন

স্বচ্ছন্দে নিয়ন্ত্রণ...

কেবল এদের সেলফ-অ্যালাইনিং ফর্ক ফিটিং-এর জন্যই সম্ভব।

হিন্দ সাইকেলস্ লিঃ ২৫০, ওরলি বোম্বাই-১৮

ASP/HC-162

সোল অর্গানাইজার

মেসার্স মডার্ণ ডিলার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা-১

টেলিফোন নং ২২২৬২৭

কিস্তিতে ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন

মেসার্স মডার্ণ ডিলার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা-১

টেলিফোন নং ২২২৬২৭

হাঁটতে হাঁটতে দুজনে চলে এল মার্কেট। ছেলেমানুষির হাওয়া লাগল দু'জনকে।

'জীবনে ভোগ্য কী জানেন?' জিগগেস করল কাকলি।

'জানি।'

'কী?'

'জীবনে ভোগ্য সহজ সুখ।'

'আপাতত কী?'

'আপাতত ডালমুট কিনে খাওয়া।'

'ছাত্র হিসেবে আপনি বরাবরই ব্রিলিয়্যাণ্ট। কী সুন্দর পারলেন বলুন তো।'

একই ঠোঙা থেকে তুলে-তুলে দিব্যি এগুতে লাগল দুজনে। বেরিয়ে আসছে, হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কাকলি, 'এ কি, ভুলে যাচ্ছেন কেন? ওজন নিতে হবে না?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' পরিপূর্ণ প্রতিধ্বনি করল সুকান্ত। 'সেই সেবার বিয়ের আগে ওজন নিয়েছিলাম, এবার আবার বিয়ের আগে ওজন নিতে হয়।'

আর দরকার নেই। মাথায় আলোর টুপি পরা গাড়ি পাওয়া গিয়েছে একটা। দুজনে ছুটে গিয়ে উঠে বসল।

'সেবারে ওজন কমে গিয়েছিল।' বললে কাকলি।

'এবারে নির্ঘাত বেড়েছে।' সুকান্ত বললে।

ট্যাক্সিটা কাকলিদের বাড়ির কাছে এসেই থামল। নামবার আগে সুকান্ত বললে, 'তাহলে বিনতার নেমন্তন্নটা ক্যানসেলড হল?'

'হ্যাঁ, ক্যানসেলড। ওর নেমন্তন্নটা এ-বাড়িতে হবে। আমিই ওকে বলে বুঝিয়ে এখানে নেমন্তন্ন করে আসব।' তন্গত হয়ে বললে কাকলি। 'ও কেন অসুখী হবে! আমি আমার নিজের জিনিসই ফিরে পাচ্ছি। এতে ওর ঈর্ষা করবার কিছু নেই। ও ভালো মেয়ে। ও ঠিক খুশি হবে দেখবেন। আসবে নেমন্তন্নে। ও আমাকে আবার সাজিয়ে দেবে।'

'দিক। মনে রাখবেন ওর নেমন্তন্নটাই ক্যানসেলড। আপনারটা নয়।' বললে সুকান্ত, 'তাই আপনি আসবেন—'

'হ্যাঁ, যতক্ষণ কলিগ আছি যাব মাঝে-মাঝে।'

'আর যখন কলিগ থাকবেন না? কিংবা কলিগ ছাড়া আরো কিছু হবেন?'

'তখন আর যাব কী! তখন থাকব।'

দুজনে একসঙ্গে নামল আর নেমেই দেখল সামনে দাঁড়িয়ে গায়ত্রী। স্তব্ধ ক্রুদ্ধ উত্তেজিত মূর্তি। যেন ওদেরকে দেখবার জন্যেই রয়েছে দাঁড়িয়ে।

'বাবা জেগে আছেন?' জিগগেস করল কাকলি।

'না, ও'র শরীর ভালো নেই এবেলা। ওঁকে এখন ডিস্টার্ব করাটা ঠিক হবে না।'

'আমি তাহলে আরেক সময় আসব।' ট্যাক্সি ছেড়ে দেয়নি, ওটা নিয়েই ফিরে গেল সুকান্ত।

কতক্ষণ পরে বনবিহারী কাকলির খোঁজ করলেন।

কাছেই বসে ছিল গায়ত্রী, বললে, 'এখনো ফেরেনি।'

'ফেরে নি? সে কী? রাত কত হল?'

ঘরে মৃদু নীলাভ আলো জ্বলছে, ঘড়ি দেখা যায় না। 'কে জানে কত!' গায়ত্রী বিরক্তিতে বিষিয়ে উঠল। 'কোথায় কোথায় ঘুরছে!'

'আহা ঘুরুক। কতদিন পরে বালিতে-পোঁতা পরশমণির টুকরোটা ওরা কুড়িয়ে পেয়েছে, যা কিছু ছুঁচ্ছে সোনা করে দেখছে। আহা তাই দেখুক, সমস্তই সোনা করে দেখুক।' নড়ে চড়ে উঠলেন বনবিহারী। 'কিন্তু সুকান্ত একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে না কেন? ওর বিয়ে, ওরই তো তোড়জোড় করার কথা। বাঁধন ও-ই ছিঁড়েছে, ও-ই তো উদ্যোগ করে এসে গ্রন্থি দেবে। বিয়ের পর কাকলিকে নিয়ে কোথায় উঠবে, ফ্ল্যাটে না বাড়িতে—সব আমার সঙ্গে পরামর্শ করবে তো! শোনো, কালকেই নরনাথকে ডাকাও, দেবনাথকে পাঠাও ওর কাছে। নরু এসে না পড়লে কিছু হবে না।'

কাউকে পাঠিয়ে কাজ নেই, গায়ত্রী পরদিন নিজেই গেল নরনাথের কাছে। বললে, 'ঠাকুরপো উদ্ধার করো।'

'কেন, কী হল?' হাসতে হাসতে নরনাথ বললে, 'কোনো বিয়ে সংক্রান্ত ব্যাপার হয় তো, বলুন, ঠিক ম্যানেজ করে দেব।'

'কাকলি সেই বিয়ের নোটিস দিয়েছিল না —তুমি তো জানো—' ইন্দিরা এসে গিয়েছে, তাকে লক্ষ্য করল গায়ত্রী। 'সেই বরেনের সঙ্গে বিয়ে।'

'বা, জানি বৈ কি।' ইন্দিরা গর্বের ভাব করল, 'আমি তো ছিলাম যখন নোটিস সই করে দু'জনে। কেন, এখন কী হয়েছে?'

'কাকলি টালবাহানা শুরু করেছে। ঐ নোটিসে এক্ষুনি-এক্ষুনি বিয়ে করতে চাচ্ছে না।'

'কী বলছে?' নরনাথ গম্ভীরমুখে প্রশ্ন করল।

'বলছে, শরীর খারাপ, মন অস্থির—হেন-তেন, যত সব ছেঁদো কথা।' গায়ত্রী গলা নামাল। 'আসল কারণ যা আন্দাজ করছি, ঐ লোকটা, আগের ঐ স্বামীটা ওর পিছু নিয়েছে। তাইতেই ওর মনটা নরম হতে চাইছে, সময় চাইছে, বলছে এ নোটিসটা যাক, দরকার হয় আবার না-হয় নতুন দেব।'

'ছি ছি ছি, আবার ঐ সুকান্তটার সঙ্গে মিলবে?' নরনাথ ধিক্কার দিয়ে উঠল। 'তাহলে তো আবার ঝগড়া, আবার কোর্ট, আবার ডিভোর্স—। যে দু কাঠি একবার বাজে, বারেবারেই বাজে। তা ছাড়া বরেনের কাছে সুকান্ত একটা পাত্র! কুমিরের কাছে টিকটিকি!'

'তা হলে তুমি একটা বিহিত করো।' গায়ত্রী উৎসাহে এগিয়ে এল।

'তা করে দিচ্ছি। নোটিসের আয়ু আর কতদিন?'

'যতদূর শুনেছি দু-চার দিন আরো আছে।'

'বেশ, কাল শনিবার, কালকেই বিয়ে লাগিয়ে দিতে হয়।'

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস

অজিত দত্ত

প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত হাস্যরসাত্মক রচনার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস, বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান হাস্যরসিক লেখকের রচনার বিস্তৃত আলোচনা এবং তাঁদের সাহিত্য-কৃতিত্বের সর্বাঙ্গীণ আলোচনা বইখানিকে একটি অসামান্য সমালোচনাগ্রন্থের মর্যাদা দিয়েছে। সকল শ্রেণীর সাহিত্যরসিক, বিশেষতঃ স্নাতকোত্তর পরীক্ষার্থীদের পক্ষে বইখানির মূল্য অসামান্য হবে বলে আশা করা যায়। বইটিতে যে-সব লেখক ও তাঁদের রচনাবলীর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আছে, তাঁদের মধ্যে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, দীনবন্ধু মিত্র, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রামনারায়ণ তর্করত্ন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও সুকুমার রায় প্রধান। এ বইয়ে আলোচিত অনেক বিষয়ই পূর্বে কোনোদিন এরূপ বিস্তৃতরূপে আলোচিত হয়নি।

উৎকৃষ্ট ছাপা বাঁধাই। মূল্য বারো টাকা।

১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ কলিকাতা-২৯ ॥ জিজ্ঞাসা ॥ ৩৩, কলেজ রো কলিকাতা-৯

'কালকেই?'

'হ্যাঁ দেরি করা চলবে না। একবার একটা নোটিস ল্যাপস করে গেলে দ্বিতীয় নোটিসে বরেনকে পাওয়া যাবে এ মনে হয় না। তার বয়ে গেছে অপেক্ষা করতে।' নরনাথ পায়ের উপর পা তুলে গ্যাঁট হয়ে বসল চেয়ারে। 'যে নোটিসটা দেয়া হয়েছে সেটা আসলে বরেনকেই আটকাবার ফাঁদ। ওটাকে কিছুতেই ফসকাতে দেওয়া নয়। সুতরাং শুভস্য শীঘ্রং, হ্যাঁ, কাল, কালই বিয়েটা হয়ে যাবে।'

'হয়ে যাবে!'

'কঠিনটা কী! ম্যারেজ-অফিসে গিয়ে ফর্মটা সই করে দেওয়া। আর তিন জন সাক্ষী হওয়া। সে আমি, তুমি আর ইন্দিরাই হতে পারব।'

'কিন্তু কাকলিকে সেখানে নেবে কী করে?'

হাসল নরনাথ। 'সে আমি দেখব।'

'আর নিলেই বা কী! সই করাবে কী করে?'

'যদি নিয়ে যেতে পারি, সই করাতে বেগ পেতে হবে না।' নরনাথ অনুতাপের সুর আনল। 'ও জানেনা ও কী হারাতে বসেছে! ওর যা দ্বিধা তার মূলে একটা প্রাচীন সংস্কার শুধু কাজ করছে। কলমের নিবের এক আঁচড়ে কেটে যাবে সেই দ্বিধা, আর যখন পরিচ্ছন্ন অক্ষরে ও দলিল সই করে উঠবে দেখবে সমস্ত কিছু পরিচ্ছন্ন। আরেক আকাশে আরেক সূর্যোদয়। কিন্তু দাদা, দাদা কী বলেন?'

'যার পক্ষাঘাত দেহে তার পক্ষাঘাত মনেও!'

'বুঝেছি। তুমি কিছু ভেবো না। সব ব্যাধি সেরে যাবে।' নরনাথ পা নামাল। 'তুমি বাড়ি যাও। চুপচাপ থাকো। আমি সব ব্যবস্থা করছি। ব্যবস্থা তো ভারি! শুধু ফর্মে কাকলির একটা সই! তা আর করিয়ে নিতে কতক্ষণ। এমন সোনার নোটিস অবহেলায় বা ঔদাসীন্যে বরবাদ করে দেওয়া যায় না।'

বরেনের অফিসে খবর নিয়ে জানল বরেন ক'দিন আসছে না অফিসে। না, তেমন কোনো অসুখ-বিসুখ নয়, এমনি আসছে না। বাড়িতেই আছে। বিশ্রাম নিচ্ছে।

বেশ, ওকে ওর বাড়ি থেকেই তুলে নিতে হবে। বেশ একটা বিস্ময়ের ব্যাপার হবে ওর কাছে। বিরাট আনন্দের ব্যাপার।

সন্ধ্যের দিকে নরনাথ গেল বনবিহারীর কাছে।

'ডেকেছেন?'

'হ্যাঁ, এবার তাড়াতাড়ি লাগিয়ে দাও বিয়েটা। তুমি এসে না পড়লে কিছু হবে না।' স্বপ্নের চোখে বলতে লাগলেন বনবিহারী। 'এবার ছাদ জুড়ে প্রকাণ্ড প্যান্ডেল তোলো, আলো জ্বালাও। নহবত বসাও। খরচের এস্টিমেট করো। নিমন্ত্রণের লিস্টি—'

'ইন এনি কেস, বড় করে নেমন্তন্ন তো একটা করতেই হবে।' বললে নরনাথ।

'তা তুমি খরচের জন্যে ভেবো না। সেই দশ হাজার টাকা যা একবার কাকলিকে দিয়ে ফের ফিরিয়ে নিয়েছিলাম তা তোলা আছে।' বললেন বনবিহারী, 'সেই টাকা এবার কাজে লাগবে।'

'তা সব করে দিচ্ছি ঠিকঠাক। অর্থাৎ যা মহামায়া করাচ্ছেন।' বিজ্ঞের মত হাসল নরনাথ। 'কই বৌদি কই, কাকলি কই! কালকে দুপুরে আমাদের ওখানে নেমন্তন্ন তোমাদের।'

'কেন, কাল কী?' হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল গায়ত্রী।

'কালকে আমাদের বিয়ের অ্যানিভার্সারি।' অলজ্জের মত হাসল নরনাথ। 'এ উৎসব তো ঢোল সহরত করে করা যায় না। একটু গোপনেই করতে হয়। তাই নেমন্তন্নটা বাড়িতে নয়, হোটেলে। লাঞ্চের নেমন্তন্ন।' কাকলিকে দেখা গেল বাইরে, তাই এবার তাকে লক্ষ্য করল নরনাথ। 'বারোটার মধ্যেই ফিরে এস বাড়ি; বেশ, সারে বারোটা। আমি আর ইন্দিরা আসব গাড়ি নিয়ে। তৈরি থেকো। হ্যাঁ, কাল, শনিবার। শনিবার ভাঙা অফিস ফেলে চলে আসতে বেগ পেতে হবে না।'

কাকলি বললে, 'বিয়ের বার্ষিকীতে কী উপহার চলে—'

'ফুল, ফুল, যে কোনো অবস্থাতেই ফুল। জন্মদিনে মৃত্যুদিনে বিয়ের রাত্রে।'

'বিয়ের রাতের কথা কে বলছে? বিয়ের দিনে, মানে বিয়ের বার্ষিকীতে।'

'সিঁদুর—সিঁদুরের কৌটো।' গায়ত্রীর দিকে তাকাল নরনাথ।

পরদিন আফিসে গিয়ে সকালের দিকেই সুকান্তকে ফোন করল কাকলি।

'আমি আজ বারোটায় ফিরে যাচ্ছি বাড়ি। আমাকে আর মাকে লাঞ্চে নেমন্তন্ন করেছেন নরুকাকা। নরুকাকার বিয়ের অ্যানিভার্সারি আজ। না গেলেই নয়। আপনি তাই আজ একাই ফিরবেন'

'একাই ফিরব! ভবসংসারে একা এসেছি একাই ফিরব।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুকান্ত।

'শুনুন, আজ দুপুরে, একটা নাগাদ আপনি আসুন এ বাড়ি, বাবার সঙ্গে দেখা করুন। আজই সুবিধে, মা থাকবে না দুপুরে। চলে আসুন—'

'আপনিও তো থাকবেন না।'

'তার মানে কোনো বাধাই থাকবে না আপনার।' হেসে উঠল কাকলি। 'আমি বাবাকে বলে রাখব। বাবা আপনার জন্যে জেগে থাকবেন।'

সেই অনুসারে দুপুরে চলে এসেছে সুকান্ত। দরজা খোলা পেয়েছে। সোজা উঠে এসেছে বনবিহারীর কাছে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে চলতে-চলতে। কোনোদিকে কোনো বাধাই দেখতে পাচ্ছে না।

প্রণাম করে বিনম্র মুখে দাঁড়াল সুকান্ত।

বনবিহারী উঠে বসে একেবারে হাতে ধরে তাকে বসালেন পাশটিতে। অনেকক্ষণ সানন্দ স্নেহে তাকিয়ে রইলেন মুখের দিকে। তারপর কথা শুরু করলেন। অনন্ত কথা, অবান্তর কথা, অনন্ত আনন্দের অবান্তর কথা।

'তোমাকে একটু চা দেবে কে?'

'আমি আছি।' খাবারের প্লেট আর চায়ের ডিস নিয়ে পরালি বেরুল।

'কাকলি আর ওর মা নেই বুঝি বাড়ি?' বলে মুখে উদ্বেগের রেখা ফোটালেন বনবিহারী। 'কাকলি একা-একা বাইরে থাকে এ আর আমার এখন পছন্দ নয়। বাইরে যতক্ষণ তোমার জিম্মাদারিতে আছে ততক্ষণই আমি নিশ্চিন্ত। শোনো, তুমি ওকে বাইরে থাকতে দিও না একা-একা।'

'ও তো এখন মার সঙ্গে আছে, নরুকাকার সঙ্গে। এখন আর ভয় কী।' মৃদুরেখায় হাসল সুকান্ত।

'না, না, কাউকে বিশ্বাস নেই। পুরোপুরি কেউ জাগ্রত নয় তোমার মত।'

'কাকলি নিজেই জাগ্রত।'

'হ্যাঁ, আরো শোনো, তোমাদের বিয়েটার আর দেরি হচ্ছে কেন? টাকার কথা ভাবছ? টাকা আমি দেব। কাকলির দশ হাজার টাকাই আমার কাছে মজুদ আছে।'

'না, না, টাকার কথা নয়।'

'তবে? বিয়ের পরে বাসস্থানের কথা?'

'না, সেটা আবার সমস্যা কী।'

'তবে?'

'আইনের একটু বাধা আছে সামান্য।'

'আইনের বাধা?'

'হ্যাঁ, ডিভোর্সের ডিক্রির পর এক বছর না যেতে প্রাক্তন স্বামী-স্ত্রী ফের বিয়ে করতে পারে না।' হাসল সুকান্ত। 'তা, বছর ঘুরতে আর দেরি নেই। দেখতে-দেখতে কেটে যাবে কটা দিন। আপনি তার জন্যে ভাববেন না।'

'ততদিন আমি যদি না বাঁচি।' ক্লান্ত চোখ বুজে শুলেন বনবিহারী।

(ক্রমশ)

কে, হোড়ের
কর্ণক
পাউডার

ঢোল কোম্পানীর
দাদ ও কাউরের
অব্যর্থ মলম
কলিকাতা

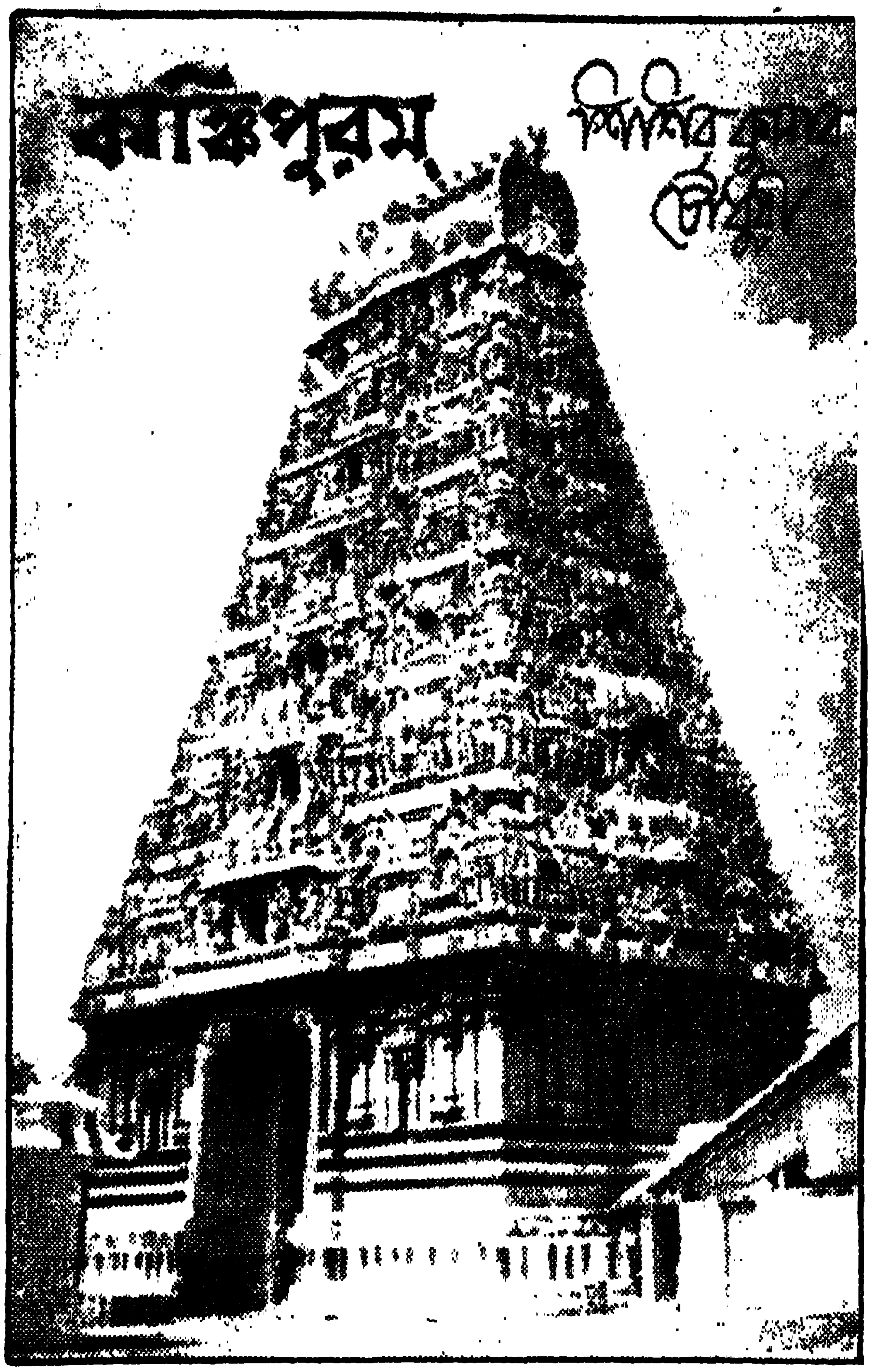

'কাঞ্জিভরম' শাড়ির উল্লেখে চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না এমন বঙ্গললনা বিরল। কাঞ্জিভরম্ রেশমের কুসুমসুলভ পেলবতা ও অপূর্ব কারুকার্যের খ্যাতি নিকট প্রাচ্য এমন কি ইউরোপ পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। এই প্রসিদ্ধিই আজ আমাদের টেনে নিয়ে চলেছে কাঞ্জিভরম্ রেশম শিল্পের জন্মভূমি—মন্দিরময় কাঞ্চিপুরমে।

মাদ্রাজ থেকে কাঞ্চিপুরমের দূরত্ব মাত্র সাতচল্লিশ মাইল। এই পথ পাড়ি দেওয়া চলে বাসে বা ট্রেনে, যার যেমন অভিরুচি। কাল রাত পর্যন্ত ঠিক ছিল, আমাদের দলে থাকবেন বাঁড়ুজ্জেও। কিন্তু শেষ-রাতের আতপ্ত শয্যার মোহিনী মায়ায় তিনি জানালেন, মন্দির রয়েছে মাদ্রাজের সর্বত্র, আর রেশম শিল্প দেখতে হলে আমাদের মুর্শিদাবাদ কি দোষ করেছে? অতএব মূর্খের মত ভোরে উঠে, কাঞ্চিভ্রমণের বিড়ম্বনা সহ্য করতে তিনি নারাজ। অগত্যা আমাদের শর্মা, ত্রিপুরার দত্ত, মনিপুরের সিং ও বঙ্গসন্তান আমি, এই চারজনই বেরিয়ে পড়েছি, বাঁড়ুজ্জের আশা ত্যাগ করে।

ভোর থেকেই মাদ্রাজ জর্জটাউনের বাস স্ট্যান্ডগুলি হয়ে ওঠে কোলাহলমুখর। শহরতলি বা দূরবর্তী স্থানগুলির প্রায় সব বাসই এখান থেকে ছাড়ে। আমরা কাঞ্চি-পুরমগামী, মাদ্রাজ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার একটি বাসে আসন পেয়ে গেলাম সহজেই। বড় নোংরা আর ঘিঞ্জি এখানকার পরিবেশ।

বাস ছাড়ল সকাল সাতটায়, এগিয়ে চলল পুনামালী রোড ধরে। শহরের সীমানা ছাড়াতেই মন প্রসন্ন হয়ে উঠল ভোরের উন্মুক্ত বাতাসে। ক্রমে শহরতলীও পিছনে পড়ে রইল। পথের দু পাশে, এখন শুধু বৃক্ষবিরল, রুক্ষ বন্ধ্যা খোলা মাঠ আর ছোট ছোট ঝোপঝাড়। ফাঁকা রাস্তায় বাস ছুটে চলেছে পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ মাইল বেগে। কিন্তু রাস্তার মসৃণতার জন্যে ঝাঁকুনি অতি সামান্যই। নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশী যাত্রী বহন নিষিদ্ধ, তাই এ পথ চলায় আছে আনন্দ আর আরাম দুটোই।

পঞ্চাশ মিনিট প্রায় একটানা চলে, আমরা মাদ্রাজ আর কাঞ্চিপুরমের মাঝামাঝি একটা ছোট জায়গায় এসে পৌঁছলাম। এখানে বাস থামবে কুড়ি মিনিট। কন্ডাক্টার স্ট্যান্ডের পাশের একটা কফিখানা দেখিয়ে বলল, এই দোকানের কফির বেশ সুনাম আছে। অমনি শর্মাজীর কাছ থেকে প্রস্তাব এল, একটু গলা ভিজিয়ে নিলে কেমন হয়?—আর কেমন হয়? আমরা তো পা বাড়িয়েই আছি।

দক্ষিণ ভারতের, বিশেষত মাদ্রাজ অঞ্চলের কফিখানাগুলোতে কফি পরিবেশন করা হয় দুটি পেতলের পাত্রে—তার একটি গ্লাস, অপরটি বাটি। উদ্দেশ্য, ঢালাঢালি করে চিনি মেশানো এবং পছন্দ মত ঠাণ্ডা করা। তারপর তারিয়ে তারিয়ে গ্লাসে চুমুক দেওয়াই হচ্ছে এখানকার কফিপানের রীতি। সমগ্র প্রক্রিয়াটি আমাদের মত বিদেশীর চোখের কিছুটা কৌতুকেরই খোরাক জোটায়।

কফির পালা শেষ হতে না হতেই বাস ছাড়বার হর্ন বেজে উঠল। আমরা আবার নিজের নিজের আসন দখল করে বসতেই বাস ছাড়ল।

প্রাকৃতিক দৃশ্য এবার অনেক পাল্টে গেছে। দুধারে সবুজ ধানের ক্ষেত, আর অজস্র তালগাছের সারি। পশ্চিম দিগন্তে রয়েছে, নীলাভ নীলগিরির ছোট ছোট ভগ্নাংশ।

কাঞ্চিপুরমে পৌঁছবার অনেক আগে থেকেই চোখে পড়তে লাগল বিভিন্ন মন্দিরের সুউচ্চ গোপুরমগুলি। নীল আকাশের পটভূমিকায় এই গৈরিক গোপুরমগুলির একটা বিশেষ আকর্ষণী শক্তি আছে, তা মনকে টেনে নিয়ে যায় সুদূর অতীতে।

মনে পড়ল, এই ঐতিহাসিক কাঞ্চিকেই কালিদাস বর্ণনা করেছিলেন নগরীশ্রেষ্ঠ বলে—'পুষ্পেষু জাতি, নরেশু রম্ভা, নদীষু গঙ্গা, নগরেষু কাঞ্চি।' বাইশশত বছর আগে পতঞ্জলিও তাঁর মহাকাব্যে এর উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন গ্রন্থে এবং খোদাই করা লিপিতে, কাঞ্চী, কাঞ্চীপুরী, কাঞ্চি ইত্যাদি কত নামেই না এই জনপদকে অভিহিত করা হয়েছে! শুনেছি, কূটনীতি বিশারদ চাণক্য ও ধর্মগুরু শঙ্করাচার্যের জন্মভূমি এই কাঞ্চি।

পুণ্যার্থীর কাছে কাঞ্চি পবিত্রতম তীর্থ-গুলির একটি। কাশী ও কাঞ্চি এক

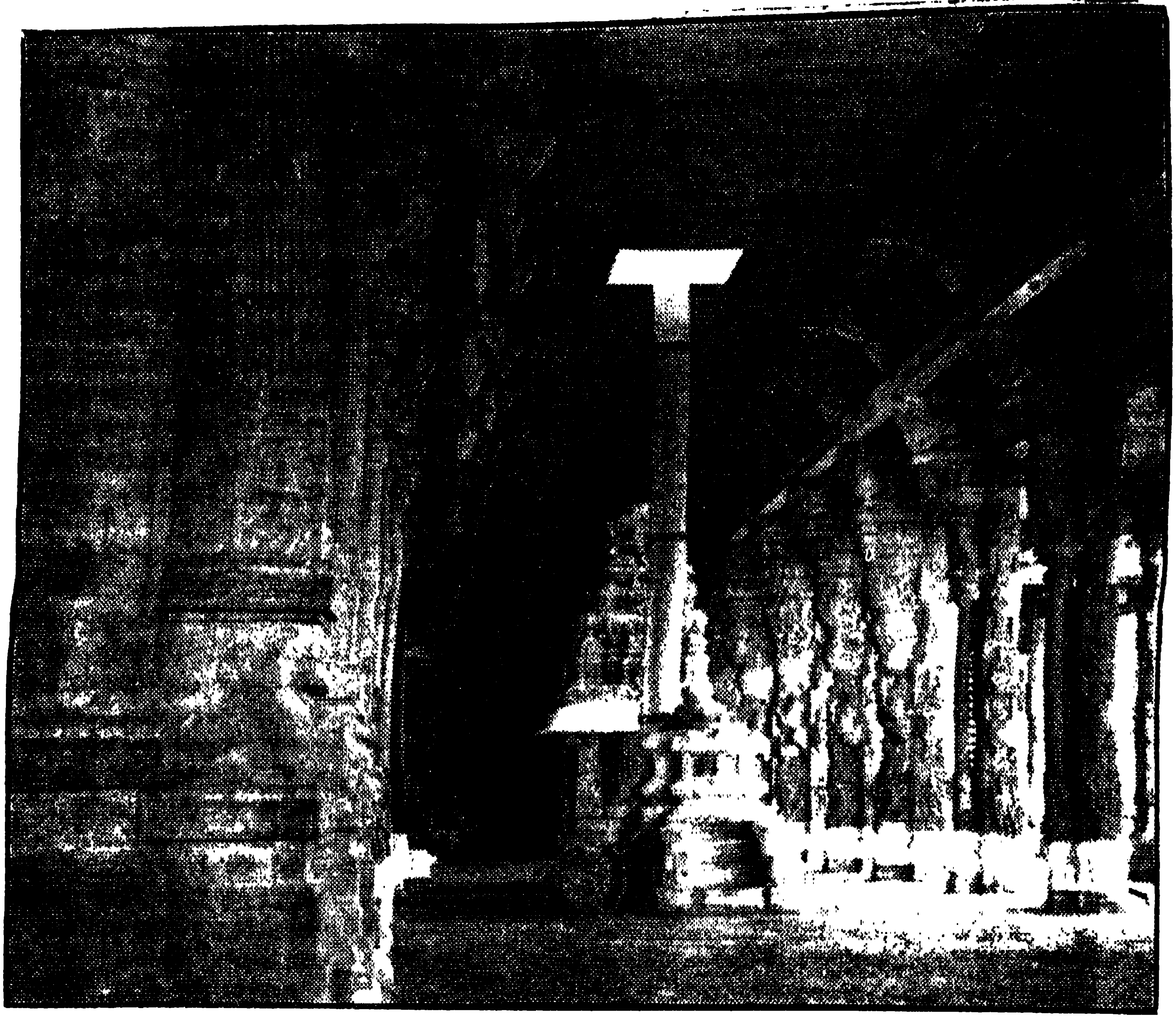

'একম্বেরনাথম মন্দিরের মণ্ডপম্'

নিঃশ্বাসেই উচ্চারিত হয়ে থাকে। কাঞ্চির গৌরব তার বর্তমান বয়নশিল্পীরা। এ'রা অতীত শিল্পীগোষ্ঠীর ঐতিহ্যই বহন করে চলেছেন। প্রাচীন দ্রাবিড় সভ্যতার আরো বহু চিহ্নই বুকে ধারণ করে আছে এই প্রাচীন জনপদ।

কাঞ্চিপুরমে পৌঁছলাম বেলা প্রায় ন'টা। সহজেই একটা ঝটকার ব্যবস্থা হল, সারাদিন যথেচ্ছ ব্যবহারের শর্তে মাত্র দু'টাকায়। ঝটকা, উত্তর ভারতের একা বা টাঙ্গারই আর একটা সংস্করণ মাত্র। সাধারণত চারজন যাত্রী এতে বহন করা চলে। উত্তর ভারতে একাওয়ালা যেমন 'হেট', 'হেট' বলতে বলতে গাড়ি হাঁকায়, এদিকে তেমনি বলে, 'এই', 'এই' হঠাৎ শুনলে একটু চমকে উঠতে হয়। 'এই' সম্বোধন, দাক্ষিণীরা সাধারণত জানোয়ারকে উদ্দেশ্য করেই করে থাকে। অভ্যাসবশে দু' একবার 'এই' বলে কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

ঝটকা বাহিত হয়ে প্রথমেই আমরা এলাম এখানকার প্রধান দর্শনীয় 'একেম্বর নামথ্'-এর মন্দিরে। এই মন্দিরে স্থাপিত লিঙ্গ-মূর্তি 'পৃথ্বীলিঙ্গম্'—পঞ্চলিঙ্গম-এর প্রধান। কাঞ্চিতে পৃথ্বীলিঙ্গম স্থাপনার সুন্দর একটি পৌরাণিক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

একদিন শিব যখন বিশ্বসৃষ্টির আনন্দে মেতেছিলেন, তখন রহস্য করে পার্বতী দু' হাত দিয়ে শিবের চোখ চেপে ধরলেন। ফলে ত্রিভুবন অন্ধকার হয়ে গেল। কুপিত শিব তখন পার্বতীকে দণ্ড দিলেন—মর্ত্যে নির্বাসন। মর্ত্যে এসে পার্বতী কাঞ্চিতে, কম্পা নদীর তীরে, বালির একটি লিঙ্গ-মূর্তি গড়ে নিয়ে তারই সামনে কঠোর তপস্যা শুরু করলেন। ঘোর তপস্যায় অবশেষে শিবের আসন টলে উঠল। তিনি ফিরিয়ে নিলেন তাঁর দণ্ড। ভক্তের বিশ্বাস পার্বতীপূজিত লিঙ্গই এ মন্দিরের বিগ্রহ। হর পার্বতীর এই মিলনকে উপলক্ষ করে প্রতি বৎসর ১০ই ফাল্গুন এখানে খুব বড় উৎসব ও মেলা হয়ে থাকে।

১৯২ ফুট উঁচু এই মন্দিরের প্রধান গোপুরম্ কাঞ্চির গোপুরম্গুলির মধ্যে সর্বোচ্চ। মন্দির চত্বরের মণ্ডপম-এর স্তম্ভগুলির কারুকার্যও বিচিত্র।

একটি কৌতুকাবহ ঘটনার উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। উত্তর ভারতের মন্দিরে পূজার শেষে যেমন প্রসাদ বিতরণ করা হয়, এখানে তেমনি লিঙ্গম-এর অঙ্গ বলে কিছুটা বালি বা মাটির গুঁড়ো 'প্রসাদম্' বলে দেওয়া হয়। এ তথ্য অজানা থাকাতে, প্রসাদের যে সদ্গতি আমরা করে থাকি এখানেও সেই চেষ্টাই করি। ফলাফল সহজেই অনুমেয়। রহস্যের সমাধান হল মন্দির দর্শন করে ফেরার পথে এক পূজারীর সঙ্গে আলাপ করে। ইনি উচ্চ শিক্ষিত। ইংরেজীতে এই মন্দিরের ইতিহাস ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য চমৎকার করে বুঝিয়ে দিলেন।

ভ্রমণ তালিকায় আমাদের দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য বিষ্ণুমন্দির। এই মন্দিরের অফুরন্ত ধন-সম্পদের মধ্যে আছে, লর্ড ক্লাইভ প্রদত্ত একটি মকরকান্তি। মিস্টার প্লেস বলে এখানকার এক প্রাক্তন জেলা শাসক নয় লক্ষ টাকা মূল্যের একটি রত্নখচিত মুকুটও এই

বিগ্রহকে উপহার দেন। মন্দির প্রাঙ্গণের 'শতস্তম্ভ মণ্ডপম্'টি দেখলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। গ্র্যানাইট জাতীয় পাথরে তৈরী, এই একশত স্তম্ভের প্রতিটিতে বিভিন্ন ভাস্কর্য চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। শতস্তম্ভ মণ্ডপম্-এর পাশে 'অনন্ত সরসম্'ও বিশেষ দর্শনীয়।।

কাঞ্চিপুরমে রয়েছে অগনিত মন্দির। তার মধ্যে প্রধান পনেরটি। আমাদের সময় অল্প, আরো দু' চারটি ইতস্তত দর্শনীয় বস্তু দেখে মন্দির দর্শন পর্ব সমাপ্ত করলাম।

স্থানীয় পৌরসভা শহরের প্রধান প্রধান জ্ঞাতব্যগুলি কয়েকটি বড় চৌরাস্তার মোড়ে পাথরের ফলকে লিখে রেখেছেন। তাই থেকে জানা গেল, কাঞ্চির বর্তমান লোক সংখ্যা ১ লাখের উপর। পৌর এলাকায় রয়েছে, একটি কলেজ, পাঁচটি হাইস্কুল ও সাত মাইল পাকা রাস্তা।

দুপুরের দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা স্থানীয় 'কাঞ্চি ভবনে' সেরে নেওয়া গেল। হোটেলের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন, আহার্য সুস্বাদু ও পরিমাণে পর্যাপ্ত। দক্ষিণাও আশাতীত সুলভ।

আহারাদির পর রেশমশিল্প দেখবার পালা। কিন্তু আজ রবিবার। সব দোকান পাটই এখানে বন্ধ। সমস্যার সমাধান হল, কথাটা ঝটকাওয়ালাকে জানাতেই। সে আমাদের পৌঁছে দিল স্থানীয় এক প্রসিদ্ধ রেশম বস্ত্র ব্যবসায়ীর গৃহে, পিছনের দরজা দিয়ে। গৃহের সম্মুখ ভাগে দোকান ও একপাশে সুতো রং করার কারখানা। এতদূর থেকে আমরা কাঞ্চি দেখতে এসেছি জেনে, শ্রেষ্ঠী দম্পতি বিশেষ আগ্রহ করে তাঁদের ব্যবসার নানা খুঁটিনাটি আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। ব্যবসায়ী বৃদ্ধ কিন্তু তাঁর ভার্যা তরুণী ও বিশেষ সুন্দরী। হিন্দীও ভাল বলতে পারেন। শ্রেষ্ঠী জানালেন, তাঁর উত্তর ভারতের ক্রেতারা তামিল একেবারেই বোঝেন না বলে গৃহিণীকে হিন্দী শিক্ষা করতে হয়েছে।

এরপর আমরা রেশম বয়ন শিল্প দেখতে আগ্রহ প্রকাশ করতে শ্রেষ্ঠী তারও ব্যবস্থা করে দিলেন। এখানকার তন্তুবায় সমাজে নারীরা পর্দানশীন নন। সেজন্য তাঁত শিল্পের খুঁটিনাটি দেখতে গিয়ে তাঁদের অন্দর মহলে প্রবেশেরও আমাদের কোন বাধা ছিল না। কর্মীদের সঙ্গে আলাপ করে অনেক তথ্যই জানা গেল।

সাধারণত একটি ভাল 'কাঞ্জিভরম্' শাড়ি বুনতে একজন তন্তুবায় ও তাঁর একজন অল্পবয়স্ক সাহায্যকারীর বার থেকে তের দিনের দরকার হয়। এরকম তাঁতের সংখ্যা এখানে ছয় হাজারেরও বেশী। পরিবারের সকলেই এই কাজে অংশ গ্রহণ করে থাকেন।

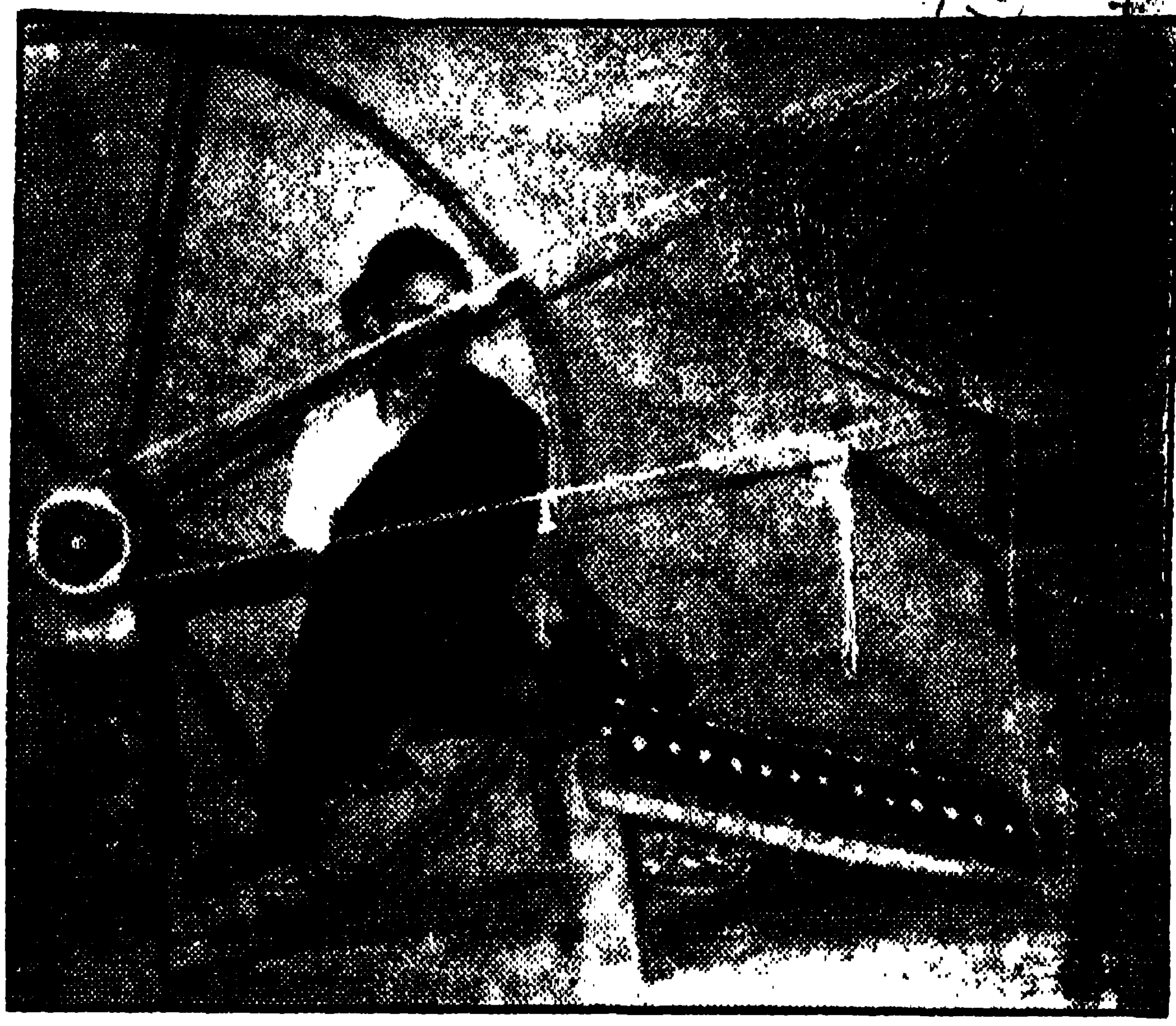

রেশমের 'নলি' তৈরী

আমরা বছর ছয়েকের মেয়েকেও তাঁত চালাতে দেখেছি। পূর্ণ বয়স্ক একজন কর্মীর মাসিক আয় গড়ে ৫০৲।৬০৲ টাকা। পাড়ের কাজ সাধারণত জ্যাকার্ডে করা হয়ে থাকে। পাড়ের ও জমির কতকগুলি সুন্দর জরির কাজের নমুনা আমাদের দেখান হল। রেশম সুতার আমদানী হয় বাঙ্গালোর ও কোল্লিগান থেকে। রং যোগায় ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ও সিবা কোম্পানী। জরি, সুরাট।

কর্মীদের সমবায় সংস্থা আছে, কিন্তু তার কাজ তেমন উৎসাহজনক নয়। বেশীর ভাগ কর্মীই মহাজনের কাছ থেকে দাদন পেয়ে কাজ করে থাকেন। কাঞ্চিপুরমের রেশম বস্ত্র ইটালীতে পর্যন্ত রপ্তানী হয়ে থাকে। এখানকার টিসু শাড়িও বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে।

আরো অনেক তথ্যই জানা গেল, যা ভ্রমণ কাহিনীর পাঠকের কাছে হয়ত নীরস বলে মনে হবে। কিন্তু সব তথ্যের যা মূল, তা হচ্ছে, বাংলার রেশম শিল্পীদের মত এখানকার শিল্পীরাও অর্ধভুক্ত থেকে সমাজকে এই বিলাসের সামগ্রী জুগিয়ে চলেন।

তাঁতী ভাইদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন মাদ্রাজগামী বাসে চেপে বসলাম, তখন অস্তগামী সূর্যের শেষরশ্মি গোপুরমের চূড়াগুলি থেকে বিদায় নিচ্ছে।

শাড়িতে জরির কাজ তোলা হচ্ছে

গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

কীর্তনের প্রগতি

কিছুকাল পূর্বে কীর্তনের পরিণতি সম্বন্ধে লিখেছি কিন্তু চিন্তা করে দেখা গেল কীর্তনের প্রগতি সম্বন্ধেও কিছু বলবার আছে না বললে বর্তমান কীর্তন-গায়কদের প্রতি সুবিচার করা হয় না।

নরোত্তম ঠাকুর যিনি ষড়ংগ প্রবন্ধ সংগীত থেকে পদাবলী কীর্তন সংগঠিত করেছিলেন তিনি যে রূপের পরিকল্পনা করেছিলেন সেই মূল রূপটি বেশি দিন বজায় থাকেনি। মনোহরসাই, রেণেটি, মন্দারিণী কীর্তনের এই তিনটি ধারা পরবর্তীকালে বিশেষ খ্যাতিলাভ করে; তারও পরে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঢপ-কীর্তনের উদ্ভব হয়। এই সমস্তই কীর্তনের প্রগতি নির্দেশ করে। বর্তমানে এই রূপগুলির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া শক্ত হয়ে পড়েছে। শক্ত কেন অসম্ভবই বলা চলে কেননা কেউ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন না যে, তাঁরা যা গাইছেন সেটিই হচ্ছে আসল মনোহরসাই, রেণেটি, বা মন্দারিণী। এমন কি ভাল ঢপ কীর্তনও শোনা কঠিন হয়েছে এ-যুগে। অথচ কীর্তনের একদা নানা উৎকর্ষসাধিত হয়েছিল এটা ঠিক এবং এক এক দিয়ে তার এক একটা ধারা গুরু পরম্পরা চলে আসছে—কিন্তু সেই ধারাটা যে বিশেষ কোন পর্যায়ের কীর্তন থেকে এসেছে সেইটা নির্ণয় করা শক্ত।

কীর্তন সম্পর্কে আর একটি মতবাদ প্রচলিত আছে যে, কীর্তনেও খেয়াল এবং ঠুংরির কিছু কিছু মিশ্রণ হয়েছে এবং বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে অনেকের বিশ্বাস যে, এই রকম মিশ্রণ সত্যিই ঘটেছে। কীর্তন এতই মিশ্রজাতীয় সংগীত যে কোন কোন ক্ষেত্রে খেয়ালের অনুরূপ তান বা ঠুংরির ধরণে ছোটখাটো বিস্তার অনায়াসেই ঘটতে পারে। এমন প্রয়াস যদি হয়েই থাকে তাহলেও তাকে অস্বীকার করা চলে না। তবে, একথা অবশ্য স্বীকার্য যে কীর্তনের মূল রূপটিকে বজায় রাখতেই হবে, তবেই না মুন্সীয়ানা।

খাঁটি কীর্তন কী জিনিস তার খোঁজ যিনি যতই করবেন ততই কীর্তনে নানা রীতির মিশ্রণের পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হয়ে উঠবেন। কীর্তনে হিন্দুস্থানী ভজনের প্রভাব যে যথেষ্ট পড়েছিল তা অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই। কীর্তনিয়ারা এই ধরনের গানকে কীর্তন বলেন কিন্তু আসলে এটি কীর্তন এবং ভজনের মিশ্ররূপ। কীর্তনিয়াদের মুখেই এমন তান মাঝে মাঝে শোনা যায় যাকে পুরোপুরি টপ্পার দানাদার তান বলা চলে। কবে থেকে এইসব তান প্রচলিত হয়েছে বলতে পারব না তবে এই রকম মিশ্রণও যে কীর্তনে হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এই সমস্ত ব্যাপার থেকে স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, কীর্তন ধীরে ধীরে বিভিন্ন সংগীতকে নিজের মধ্যে সুবিধা অনুসারে আকর্ষণ করে নিয়েছে এবং এই সংগে এইটাও প্রমাণ হয় যে কীর্তন কোন যুগেই নির্জীব হয়ে যায়নি। তার অগ্রগতি বরাবরই বজায় ছিল। এ-যুগে এটি একটি প্রধান গবেষণার বস্তু হওয়া উচিত। খোঁজ করলে নানা ধরনের কীর্তনের পরিচয় পাওয়া যাবে এবং সেগুলি "টেপ" করে পর পর শুনলেই বোঝা যাবে কীর্তনে কত রকমের গীতরীতি তাদের প্রভাব স্থাপন করে গেছে। অতএব কীর্তনের কেবলমাত্র একটি প্যাটার্নই আছে যা কীর্তন বলে স্বীকার্য অপরটি নয়—এমন মত যাঁরা কীর্তন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ তাঁরা দেবেন না।

কিভাবে এই সব মিশ্রণ ঘটেছে সেটা অনুমান করা শক্ত নয়। উত্তর ভারতের মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানের সংগে বাংলার বৈষ্ণবদের সুনিবিড় সম্পর্ক বহু-কালের। শত শত বৎসর ধরে বাংলার কীর্তনিয়াগণ বৃন্দাবনে এসে বাস করছেন এবং বৃন্দাবন অঞ্চলের বাসিন্দারা বাংলায় এলে বসতি স্থাপন করেছেন। এই গতায়াত নিষ্ফল হয়নি। উত্তর ভারতে প্রচলিত অনেক রীতির গান অনেকে আয়ত্ত করেছেন এবং সেগুলি তাঁদের গানে প্রয়োগ করেছেন। এইভাবে বহু উৎকৃষ্ট ভজন বাংলার কীর্তনের সংগে মিশে গেছে। শুধু ভজনই নয় আরও বিভিন্ন চালও এইভাবেই কীর্তনে স্বাভাবিক রীতিতে প্রযুক্ত হয়েছে। এমন মিশ্রণ অন্য দেশেও যে ঘটেনি এমন নয়। সুদূর মণিপুরের অধিবাসীরা বাংলার কীর্তনকে বিশেষ সমাদরের সংগে গ্রহণ করেছেন। মণিপুরীদের মত উৎকৃষ্ট খোলবাদক বাংলাতেও দুর্লভ। মহাপ্রভুর সময় দক্ষিণ ভারতের সংগে বাংলার যোগ স্থাপিত হয় এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দ দক্ষিণাঞ্চলের রীতিতে গাওয়া হত।

এই মিশ্রণ সম্বন্ধে কীর্তনশিল্পীরা বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করেননি এবং এবিষয়ে তাঁদের আগ্রহ থাকবারও কথা নয়। কীর্তন গানকে তাঁরা সাধনার অবলম্বনরূপে দেখেছেন, তার সুর এবং আকৃতির বৈজ্ঞানিক বিচার তাঁরা করেননি। তাঁরা এইসব মিশ্রগীতকে কীর্তন বলেই জানেন। অপরপক্ষে আমাদের মধ্যে অনেকেই কীর্তনের দু-একটি ধারা ব্যতীত অপর রূপের সংগে পরিচিত নন। অতএব যখনই কীর্তনে অন্য কোনো ঢঙের ছায়াপাত ঘটতে দেখি তখনই সন্দেহ হয় এ আদৌ কীর্তনই নয়। কীর্তন সম্বন্ধে আমাদের এই সংকীর্ণ ধারণা অনেক ক্ষেত্রেই অসংগত সমালোচনার কারণ হয়েছে। কীর্তন সম্বন্ধেও বহুশ্রুত হওয়া আবশ্যক।

বর্তমানে পদাবলী কীর্তনের মূল আর্ট এবং হিন্দুস্থানী সংগীতের সংগে কীর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে মিশ্রণ—এই দুটি নিয়ে অনুসন্ধান বিশেষ আবশ্যক হয়ে পড়ছে। কীর্তনশিল্পী এবং সংগীতবেত্তারসজ্ঞ সম্প্রদায় — উভয়েরই উচিত কীভাবে কীর্তনের প্রগতি সাধিত হয়েছে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা তাহলে অনেক জিনিস আমাদের কাছে শুধু যে পরিষ্কার হয়ে যাবে তাই নয় কীর্তনকলার প্রকৃত মূল্যায়ণও সম্ভব হবে।

BUY THE BEST
HIGHLY APPRECIATED
SAMSAD ANGLO-BENGALI DICTIONARY
1672 PAGES • Rs. 12·50 n.P.
SAHITYA SAMSAD
32-A, ACHARYA PRAFULLA CH RD. • CAL-9

জটীল ব্যাধ ও স্ত্রী রোগ

২৫ বৎসরের অভিজ্ঞ যৌনব্যাধি বিশেষজ্ঞ ডাঃ এস পি মুখার্জি (রেজিঃ) সমাগত রোগী-দিগকে গোপন ও জটিল রোগাদির রবিবার বৈকাল বাদে প্রাতে ৯—১১টা ও বৈকাল ৬-৮টা ব্যবস্থা দেন ও চিকিৎসা করেন।
শ্যামসুন্দর হোমিও ক্লিনিক (রেজিঃ)
১৪৮, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

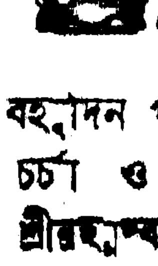
ধবল-শ্বেত কুষ্ঠ

বহুদিন পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম, দিনরাত চর্চা ও অনুসন্ধানের পর কবিরাজ শ্রীব্রহ্মস্বরূপ, বি এ উহা সমূলে বিনাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইংরাজীতে লিখিবেন।
আয়ুর্বেদিক কেমিক্যাল
রিসার্চ লেবরেটরিজ, ফতেপুরী, দিল্লী ৬

বিচিত্রা

তুলিপ এখন শুধু একটি সুন্দর ফুল বলেই পরিচিত, কিন্তু তিনশ পঁচিশ বছর আগে এই ফুলেরই ব্যবসায় সারা হল্যাণ্ড এমন উন্মত্ত হয়ে ওঠে যে, এর একটা কন্দের জন্য লোকে যথাসর্বস্ব পণ করতো।

তুলিপ একটা তুর্কী শব্দ, যার অর্থ পাগড়ি। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই ফুলটি পশ্চিম ইওরোপে প্রথম আমদানী হয়। কনার্ড জেসনার নামক এক ব্যক্তি জার্মানীর অগসবার্গে এই ফুলটি প্রথম দেখে ১৫৫৯ সালে। বাগানটি ছিল হেরেওয়ার্ট নামক এক কাউন্সিলারের। পণ্ডিত, রসিক এবং দুষ্প্রাপ্য বিদেশী সামগ্রীর সংগ্রাহক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি ছিল তার। তারই এক বন্ধু কনস্ট্যাণ্টিনোপল থেকে তাকে এই ফুলের কন্দ পাঠিয়ে দেয়। কনরাড জেসনার ফুলটি দেখেই মুগ্ধ হয় এবং অভিজাত মহলে এটিকে শখের জিনিস করে তোলায় সহায়ক হয়। এর পরের এগার বছর ধরে তুলিপ হল্যাণ্ড ও জার্মানীর ফ্যাশান হয়ে থাকে। ধনী ব্যক্তিরা এর কন্দ প্রভূত অর্থ-ব্যয়ে সরাসরি কনস্ট্যাণ্টিনোপল থেকে আনিয়ে নিত। ক্রমে বাতিকটা মধ্যবিত্ত লোকেদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। শেষে সামান্য আয়ের লোকেদের মধ্যেও বাতিকটা সংক্রামিত হয়ে যায়। এই ফুলের দাম অভাবনীয় রকম দাঁড়ায়।

১৬৩৪ সালে হুজুগটা এমন বেড়ে যায় যে, হল্যাণ্ডে সাধারণ সব শিল্প অবহেলিত হতে থাকে এবং সে সময় মনে হতো যেন হল্যাণ্ডের সমগ্র অধিবাসীই এই ফুলের বাণিজ্যে মেতে রয়েছে। বাতিক বাড়ার সংগে দামও এমন বেড়ে যেতে থাকে যে, ১৬৩৫ সালে কয়েক ডজন মাত্র তুলিপ কন্দ কিনতে তখনকার হিসেবে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকাও লোকে বিনিয়োগ করতো। হল্যাণ্ডের হারলেম নামক স্থানের এক ব্যবসায়ী তার সংগী-সাথীদের কাছ থেকে প্রশংসা লাভ করার জন্য একটিমাত্র তুলিপ কন্দের পিছনেই প্রচুর অর্থব্যয় করে।

কালক্রমে ফুলটি ওজন-দরে বিক্রীর কথা প্রবর্তিত হয়। 'এডমিরাল লিয়েফকেন' নামক ৪০০ পেরিট (এক পেরিট এক গ্রেনের কিছু কম) ওজনের একটা তুলিপের দাম ছিল সাড়ে ছ' হাজার টাকা; 'এডমিরাল ভ্যানডার আইক' নামক এক ৪৪৬ পেরেটি ওজনের তুলিপের দাম হয় পৌনে তিন হাজার টাকা; এবং সবচেয়ে মূল্যবান বলতে ২০০ পেরিট ওজনের একটি 'সেমপার অগাস্টাস' তুলিপ পৌনে দশ হাজার টাকায় পাওয়াটাও সস্তা বলে মনে করা হতো। কথিত আছে যে, ১৬৩৬ সালে সমগ্র হল্যাণ্ডে দুটি মাত্র 'সেমপার অগাস্টাস' ছিল। একটি ছিল আমস্টারডামের এক ব্যবসায়ীর কাছে এবং অপরটি হারলেমে। ফাটকাবাজরা এতো আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে যে, ওদের একজন হারলেমের তুলিপ কন্দটির পরিবর্তে বসতবাড়ি তৈরীর উপযোগী বারো একর জমি দিতে রাজী হয়। শেষে ঐ দুটির একটি বিক্রী হয় নগদ ছ' হাজার টাকা, একটি নতুন গাড়ি, দুটি ঘোড়া এবং ঘোড়ার সম্পূর্ণ সাজের পরিবর্তে।

সে সময়কার লেখক এলেক্স মান্টিং তুলিপ বাতিক নিয়ে এক হাজার পৃষ্ঠার একখানি গ্রন্থে 'দি ভাইসরয়' নামক একটি মাত্র তুলিপের কন্দ সংগ্রহ করতে যেসব সামগ্রী বিনিময় হয়েছিল, তার যে তালিকা প্রকাশ করেছেন, তা হচ্ছেঃ দু গাড়ি গম, চার গাড়ি রাই, চারটি মোটা ষাঁড়, আটটি শূকর, বারটি ভেড়া, দু পিপে মদ, চার পিপে বীয়ার, দুই বড় পিপে মাখন, এক হাজার পাউণ্ড পনির, পালংকসমেত একটা বিছানা, এক প্রস্থ স্যুট এবং একটি রুপার পানপাত্র, যার দাম হয় সাড়ে তিন হাজার টাকা।

এক ধনী বণিকের সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। একবার প্রাচ্য থেকে তার এক জাহাজ মূল্যবান সামগ্রী এসে পৌঁছেছিল। যে নাবিকটি মাল নিয়ে আসে, বণিক তাকে বেশ তাজা একটি লাল হেরিং মাছ উপহার দেয়। নাবিকটি পিঁয়াজ ভালবাসতো খুব। অবিকল পিঁয়াজের মতো একটি মূল সেই বণিকের কাউণ্টারে পড়ে থাকতে দেখে এবং আমদানী-করা মূল্যবান সিল্ক

(১)

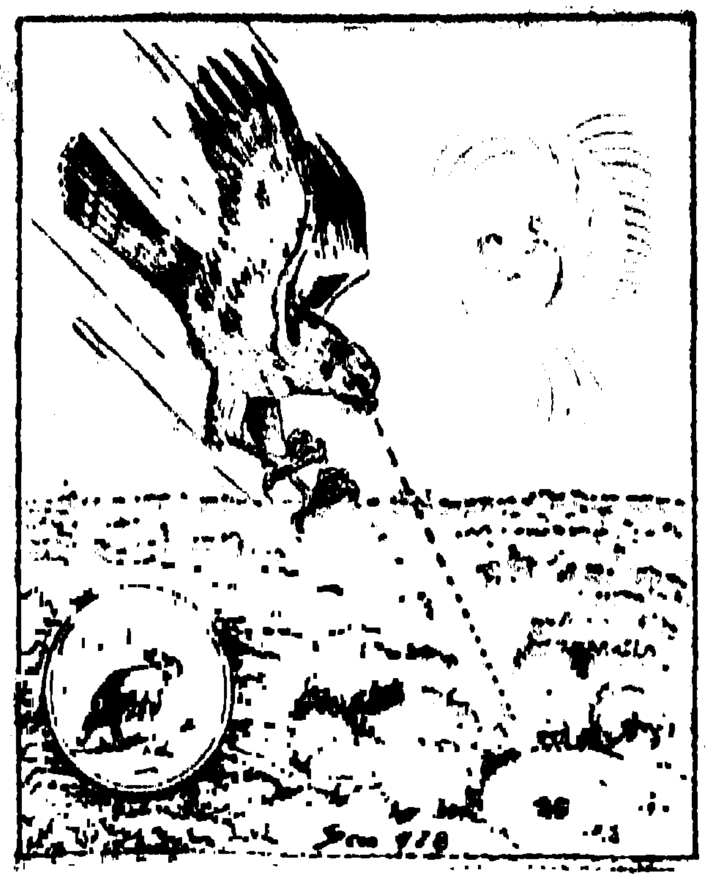

(২)

(৩)

১। অপ্রত্যাশিত চিলির ভূকম্পে দুর্গতদের সহায়তায় পৃথিবীর বাইশটি দেশ সাহায্য পাঠায়। যুক্তরাষ্ট্র পাঠিয়েছিল দুটি সম্পূর্ণ সামরিক হাসপাতাল এবং ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য সাহায্যকারি প্রায় চারশো কুড়িজন সেবাব্রতীকে। ২। কতকগুলি শিকারী পাখির চোখ তাদের মস্তিষ্কের চেয়ে বড় হয় যার ফলে তাদের দৃষ্টিশক্তি অধিকাংশ মানুষের চেয়ে আটগুণ বেশী হয়। ব পাখির চোখ এমন সুন্দর পেশীযুক্ত যে, ওর পক্ষে চোখকে প্রায় সংগেই সংগেই দূরবীক্ষণ থেকে অণুবীক্ষণে পরিবর্তিত ক সক্ষম। ৩। ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইওরোপীয়রা ফুল খেতে ভালবাসতো। ইংরেজদের র অষ্টাদশ রন্ধনপ্রণালী গ্রন্থে লাল গোলাপ বাহার জায়লেট ফুলের সিরাপ এবং গাঁদা ফুলের বড়া তৈরীর পদ্ধতি দেওয়া আ

ভেলভেটের গাইটের মাঝে ওটাকে পড়ে থাকতে দেখে হেরিংয়ের সঙ্গে খাবার জন্যে পকেটে পুরে নেয়। তারপর জেটিতে বসে মনের আনন্দে হেরিং দিয়ে তার প্রাতঃভোজন সমাধায় রত হয়। নাবিকটি চলে যাবার পরই বণিক দেখে তার সাড়ে চার হাজার টাকা দামের 'সেমপার অগাস্টাস' তুলিপের কন্দটি অদৃশ্য হয়েছে।

সারা জাহাজে হৈচৈ পড়ে যায়। শেষে একজনের মনে পড়লো সেই নাবিককে বেশ নিশ্চিন্তমনে দড়ির তাড়ার ওপর বসে 'পিঁয়াজ' খেতে দেখেছে। নাবিকটি স্বপ্নেও ভাবেনি, যে প্রাতঃরাশ সে উপভোগ করছে, তার যা দাম, তাতে জাহাজের সবায়ের এক বছরের খোরাক হয়ে যায়। হতভাগ্য নাবিকটির পাঁচ মাস জেল হয়ে যায়।

১৬৩৬ সালে তুলিপের চাহিদা এতো বেড়ে যায় যে, আমস্টারডাম, রটারডাম, হারলেম, লেইডেন, আল্কমার, হুর্ন এবং হল্যাণ্ডের অন্যান্য শহরের ফাটকাবাজারে বেচাকেনার ধুম পড়ে যায়। ব্যাপকভাবে জুয়া চলতে থাকে।

শুরুতে বিশ্বাস উঠেছিল চরমে এবং সকলেই বেশ পয়সা করতে থাকে। সকলে ভেবেছিল তুলিপের ওপর ঝোঁক চিরকালই থেকে যাবে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের ধনী ব্যক্তিরা হল্যাণ্ডে এসে যে-কোন মূল্যে কিনে নিয়ে যাবে। সারা ইওরোপের ধনসম্পদ এসে জমা হবে হল্যাণ্ডের বন্দরে এবং দারিদ্র্য চিরকালের জন্য ঘুচে যাবে।

সকল অবস্থার লোকই তাদের সমুদয় সম্পত্তি বিক্রী করে সেই টাকা এই ফুলের ব্যবসায় খাটাতে লাগলো। বাড়ি ও জমি জলের দরে বিক্রী হতে আরম্ভ হলো। বিদেশীদের মধ্যেও এই ঝোঁক সংক্রামিত হয় এবং নানা অঞ্চল থেকে হল্যাণ্ডে টাকা আসতে থাকে। জমির দাম এবং সংসার খরচও হু হু করে বেড়ে যেতে থাকে। এই ব্যবসাটা এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং এতো জটিল হয়ে দাঁড়ায় যে, এর জন্যে 'তুলিপ আইন' প্রবর্তন করা হয়।

বছর খানেক পর হল্যাণ্ডে অপেক্ষাকৃত হুঁশিয়ার অধিবাসীরা এটা বুঝতে লাগলো যে, এই নির্বুদ্ধিতা চিরকাল চলতে পারে না। শেষে কাউকে না কাউকে নির্ঘাত ক্ষতিগ্রস্ত হতেই হবে। এই ধারণাটা ছড়িয়ে পড়তেই দামও নেমে যেতে থাকে। ক্রমে বিশ্বাস একেবারে নষ্ট হয়ে যায় এবং সারা দেশে আতঙ্ক মূর্ত হয়ে ওঠে। নিত্য নতুন নতুন দেনদারদের তালিকা প্রকাশ হতে থাকে। শত শত লোক মাত্র ক' মাস আগেও যারা মনে করেছিল দারিদ্র্য বলতে কিছু নেই, হঠাৎ তারা দেখলে তাদের হাতে তুলিপ কন্দ রয়েছে, কিন্তু কেনবার লোক নেই।

দুর্দশা চরমে ওঠে এবং লোকে পরস্পরকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। যে কতিপয় ব্যক্তি ধনোৎপাদনে সক্ষম হয়েছিল, তারা তাদের সম্পদ লুকিয়ে বিদেশে চলে যায়। বড় বড় ব্যবসাদাররা একেবারে ভিখারী হয়ে যায় এবং বহু বংশানুক্রমে ধনী পরিবার একেবারে নিঃস্ব হয়ে দাঁড়ায়।

আতঙ্কের প্রথম ঢেউটা প্রশমিত হতে সারা দেশের তুলিপ কন্দের আড়ৎদাররা সাধারণের আস্থা ফিরিয়ে আনার উপায় উদ্ভাবন করতে জনসভা ডাকতে থাকে। গভর্নমেণ্ট প্রথমে হস্তক্ষেপ করতে চায়নি, তবে তুলিপ ব্যবসায়ীদের নিজেদের একটা উপায় উদ্ভাবনের উপদেশ দেয়। বহু সভা হয়, কিন্তু জনসাধারণের আস্থা ফিরিয়ে আনার কোন উপায়ই আর উদ্ভাবন করা সম্ভব হলো না। প্রত্যেকেই অভিযোগ তুলতে থাকে এবং সভাগুলি গরম আবহাওয়ায় ভরে ওঠে।

শেষে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, বাতিক চরমে ওঠার সময় বা ১৬৩৬ সালের নভেম্বরের পূর্বেকার সমস্ত চুক্তি বাতিল বলে ধরা হবে এবং ১লা নভেম্বরের পরবর্তী কালের চুক্তির ক্ষেত্রে ক্রেতারা বিক্রেতাকে শতকরা দশ টাকা দিলেই রেহাই পাবে। কিন্তু এ ব্যবস্থায় কেউই সন্তুষ্ট হলো না। বিক্রেতারা মনে করলে যে, তাদের ওপর অবিচার করা হচ্ছে। সারা দেশে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগে মামলা রুজু হতে লাগলো, কিন্তু আদালত জুয়ার কারবারকে গ্রাহ্য করতে রাজী হলো না। ব্যাপারটি শেষে হেগের জাতীয় কাউন্সিলে উত্থাপিত হয়, কিন্তু দীর্ঘ আলোচনার পর সদস্যরা এ বিষয়ে কোন রায়দান করতে অস্বীকার করে।

হল্যাণ্ডের কোন আদালতও টাকা আদায়ে সাহায্য করতে রাজী হলো না। এর কোন প্রতিকার বিধানে গভর্নমেণ্টও অক্ষমতা জানালে। হঠাৎ বাজার পড়ে যাওয়ার সময় যাদের হাতে তুলিপ কন্দ ছিল, তাদের পক্ষে ব্যাপারটিকে দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় রইলো না। লাভ যারা করেছিল, তাদের তা রাখতে দেওয়া হলো, কিন্তু দেশ একটা মস্ত আঘাত পেলে।

সেই থেকেই তুলিপ সারা ইওরোপের খুবই জনপ্রিয়। ওলন্দাজরা তাদের সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও কিন্তু ইওরোপের সব দেশের চেয়ে আজ বেশী তুলিপ উৎপাদন করে।

*

ধূমপানের বিরুদ্ধে জগদ্ব্যাপী একটা আন্দোলন চলেছে এবং প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় তামাকের অনিষ্টকর দিক নিয়ে খবর প্রকাশিত হয়। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা লোককে সাবধান করে দিতে এতো ব্যস্ত যে, এর ভাল বা উপকারী দিকটা নিয়ে কোন কথাই কেউ তোলে না। প্রাচীন কালের চিকিৎসকরা কিন্তু এর মধ্যে অন্তত আরোগ্যক্ষমতাসম্পন্ন বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করতো। এমন কি, আধুনিক-কালের চিকিৎসকেরাও তামাকের আরোগ্য-গুণ অস্বীকার করে না।

ধূমপান কালে দ্রুত চিন্তা করা যায় এবং মত স্পষ্ট করে তোলা যায়। এটা সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সত্য। তামাক চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির সহায়তা করে, কারণ তামাকের ধোঁয়ায় থাকে শক্তিশালী মস্তিষ্ক উত্তেজক গ্লুটামিক এসিড।

ক্ষীণবুদ্ধি শিশু এবং মানসিক রোগের চিকিৎসায় এই এসিডটি বহুকাল ধরে প্রযুক্ত হয়ে আসছে। ধূমপানকারীদের পরিপাক যন্ত্রও ভাল কাজ করে কারণ তামাকের সামান্য রেচক ক্ষমতা আছে।

এতে যে নিকোটিন থাকে তা পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ডকে অধিকতর কার্যক্ষম করে তোলে। এই গ্ল্যাণ্ড আমাদের দেহযন্ত্রে পরিপাক গ্ল্যাণ্ড, যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয়কে নিয়ন্ত্রিত করে। ধূমপানকালে অগ্ন্যাশয় অম্লরস নিষ্কাশিত করে এবং যকৃৎ থেকে নিষ্কাশিত হয় অধিকতর পিত্তরস যার ফলে অন্ত্রদেশ ভালভাবে কাজ করতে পারে।

সিগারেট পান দাঁতের ক্ষয় প্রতিরোধ করে। নিয়মিতভাবে বুরুশ দিয়ে না মাজলে দাঁত হলদে এবং এমন কি কালোও হয়ে যায় কিন্তু ধোঁয়ার একটা অংশ দাঁতের কলাইকে পাতলা একটা আবরণে ঢেকে রাখে। মুখে সঞ্চিত খাদ্যকণিকা থেকে উৎসারিত অম্লরস যা দন্তক্ষয়ের কারণ হয় তা থেকে দাঁতকে রক্ষা করে ঐ স্তর।

ধূমপায়ীরা শীতে হাত-পা ফাটায় কচিৎ ভোগে এবং এটা সম্ভব তামাকের নিকোটিনের গুণে। বহু বৎসর ধরে হাত-পা ফাটার চিকিৎসায় ডাক্তাররা নিকোটিন থেকে প্রস্তুত একটি ঔষধ ব্যবহার করে আসছে। জীবাণুকে নষ্ট করার ক্ষমতা থাকায় তামাক সর্দি ও ইনফ্লুয়েঞ্জার দ্রুত উপশম ঘটায় এবং নিউমোনিয়া ও অন্যান্য শ্লেষ্মাজাতীয় রোগের জীবাণু বিনষ্ট করে।

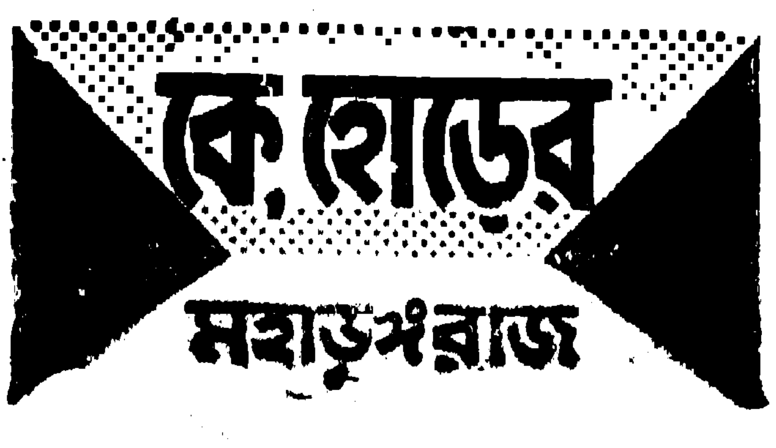

বৃষ্টির মধ্যে দৌড়ে সিনেমা হলে এসে উঠল প্রমথ। অঞ্জু কি সুধা কেউ আসেনি। খানিক বাদে বাসে সুধা এল। রাস্তা পার হতে হতে প্রমথকে খুঁজল। দেখে হেসে এগিয়ে এল, 'শোন। টিকিট পাওয়া যায়নি যে—'

ঠিক ছিল আগে এসে টিকিট হাতে অঞ্জু দাঁড়িয়ে থাকবে।

'চল অন্য ছবি দেখিগে।'

'থাক না—আর একদিন যাব।'

'কি করব—টিকিট পেল না অঞ্জু। বলল, তোরা আজ অন্য কিছু দেখে আয় মেজদি। আমি না হয় আর একদিন যাব তোদের সঙ্গে।'

বাস ট্রাম পাশাপাশি যাচ্ছে।

'উঁহু—অফিস থেকে ট্যাং ট্যাং করে এতটা এলাম'—কথাটা মিথ্যে। অফিস থেকে আজ সকাল সকাল টিকিট কিনে বাড়ি ফিরেছিল। ঘণ্টাখানেক আগেও ঠিক ছিল তিনজন এক সঙ্গে সিনেমায় যাবে। অঞ্জু সব ভেস্তে দিল। ভীড়ে অনেকে তাকাচ্ছে। 'চল কিছু খেয়ে নিই তবে'।

সিনেমা হলের লাগোয়া রেস্টুরেন্ট। কেবিনে বসে সুধা বলল, 'নতুন কিছু বেরোল? রেলের পরীক্ষার খবর—'

'কোথায়! সারাদিন ঘুমোচ্ছি। আমার কিচ্ছু হবে না!'

'ইন্টারভ্যুর রেজাল্ট?'

'মাস দুই যাক'। ঢিলে হয়ে বসে নিল। 'চাকরি নাও দিতে পারে। সবই ওদের ইচ্ছে!'

সুধা মাথা নামাল। কাঠের পার্টিশানে সরু তাকের ওপর টবে বিলিতি চারা। ডাঁটিয়ে খদ্দেরের মাস্টার্ড লাগান। মুখের গ্লাস থেকে সুধা সাবধানে খানিক জল ঢেলে দিল টবে।

চাকরির কথা ভাল লাগে না। অনেকক্ষণ ধরে কথা বলা যায় এমন কিছু নেই। অঞ্জু এলে এটা সেটা বলে সময় কাটত।

সুধা বলল, 'বুঝলে, যা খেয়েছি দুপুরে —সব হজম।'

'খাওনা কিছু। স্বাস্থ্যের লক্ষণ। আমি শুধু চা নেব।'

শরীর ভাল হওয়া নিয়ে সুধা কথা বলতে ভালবাসে। প্রমথ কথা বাড়াল না।

'চা ত খাবেই। আর কিছু নাও।'

'একদম খিদে নেই। সত্যি।'

দেখা হলে সুধা খাওয়ায়। সঙ্গে পয়সা থাকলে ক্ষুধা থাকে না।

মাসের প্রথম দিক। ব্যাগে দুটো এক টাকার নোটের গোছা ঠুসে দিয়ে সুধা একটা দশ টাকার নোট ভাঁজ করে রাখল। 'টিফিনের টাকা আলাদা করে রাখি। কদিন পরে রোজ একটা করে টাকা চেয়ে নেবে মা। ম্যাথরের মাইনে পাঁচসিকে দাওরে!' বলতে বলতে হেসে ফেলল, 'আচ্ছা আগের চেয়ে একটু মোটা হইনি? দেখ।'

'খানিকটা হয়েছ।' কোথায় ফুলেছে বলা কঠিন।

'লাইট হাউসে ওজন নিলাম আজ। তিন পাউন্ড বেড়েছি।' বাইরে পাতলা বৃষ্টি। সুধা ডিমসেদ্ধর অর্ডার দিল। বেয়ারা বলল নেই। প্রমথ দুটো ওভালটিন দিতে বলে দিল। তখন সুধা ছোট আয়না বের করে চোখের কোণ থেকে কাজল মাখান ছোট একটু পিচুটি তুলে এনে শাড়িতে মুছল, 'বুঝলে, হিন্দী পরীক্ষায় পাশ করেছি। এবারে একটা ইনক্রিমেণ্ট দিচ্ছে—'

এসব কথায় সুখ নেই। চাকরিতে ইনক্রিমেণ্ট হয়।

এদিকে মুখ করে প্যাসেজে ভাতের ফেন গালতে বসল বুড়ো বয়। ফাঁপানো চুল—চোখে কাজল। হাড়ি বেয়ে বেয়ে ফেন পড়ে ফাটা নর্দমা বুজে যাচ্ছে। উটকো হয়ে শব্দ করে বড় হাড়িটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দোলাতে লাগল। খারাপ চালের বিটকেলে গন্ধট চারিয়ে গেল সারা ঘরে।

ওভালটিন দিয়েছে।

গরম ভাতের ধোয়ায় সরু প্যাসেজ ভর্তি। গন্ধে ওক্ দিয়ে বমি আসছে। পিঠ বেঁকে প্রমথ একটা কাশি থামাল। বমি চাপতে গিয়ে ঠোঁটে থুথু এসে গেছে।

সুধা মুখ নিচু করে ওভালটিনে চুমুক দিতে দিতে দেখল প্রমথর কোনদিকে ঠিক এখন চোখ নেই। চুরি করে দেখতে গিয়ে ভাল লাগল। ঘরটা গরম। গায়ে কোথাও ঘাম নেই।

'দু আনা পয়সা হবে?'

'এই এক ব্যাড হ্যাবিট তোমার!' হাতের কাপটা ঠক করে প্লেটে রাখল সুধা।

'কোন্‌টা?' বলে বুঝতে পারল প্রমথ, অনেকক্ষণ ঠোঁট ফাঁক করে হাসছে। শব্দ নেই। আর কিছুক্ষণ থাকলে চোয়াল ব্যথা করবে। সঙ্গে সঙ্গে হাসি বন্ধ করে দিল।

সুধা আর একটা চুমুক দিল, 'পয়সা চাওয়া। কি দরকার? সত্যি?' এখানে একটু কাঁদলে হত। 'যখন চাও এত খারাপ লাগে!'

'অ।'

টেবিলের নীচে পা দিয়ে খোঁচাল সুধা। 'হল কি? কথা বলছ না।' বৃষ্টি ধরে গেছে। 'কিছু খেলেও না।' পয়সার কথাটা মুখে এসে পড়াতে আটকাতে পারেনি। শীগগির চাকরি হবে প্রমথর। পয়সা থাকে না, রুমাল না। খেতে দিলে হাত ধুয়ে হাত মোছে পর্দায়, নয়ত প্যান্টের সর্দিতে মাথা বোঝাই। শীতের বৃষ্টি পকেটে।

বিচ্ছিরি। এখন বিছানায় শুয়ে থাকলে ভাল হত। নাকের ওপর কাপ উলটে চা খেল প্রমথ।

'কি হয়েছে?'

'মাথা ধরেছে। অ্যানাসিন খেলে হত—' লাল চোখ তুলে তাকাতে প্রমথর মুখ দেখল সুধা।

'ভেরি সরি।' উঠে ব্যাগ খুলে বেয়ারাকে পয়সা দিল। ফিরে প্রমথকে সরিয়ে দিয়ে পাশে বসল। 'জায়গাটা এত অসভ্য। সবাই তাকাচ্ছে।'

'দেখুকগে!' প্রমথর চোখ বোজা। মাথার পেছনের চুল মুঠি করে টানতে লাগল সুধা।

'ভাল লাগছে?' উত্তর দিতে গিয়ে গলার স্বর সর্দিতে মেখে গেল।

'চুল পেকেছে যে! দেখি দেখি। তুলে দিচ্ছি।'

'অনেকদিন পেকেছে। থাকুক, দেখতে পাবে না কেউ।'

'আমি!'

প্রমথ উত্তর দিল না। মোড়ের ঘড়িতে ছ'টা দশ।

'রোজ এত বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।'

কথা বলল না সুধা। শক্ত করে মাথার পেছনের চুল মুঠো করে ধরল।

'ভারি বয়েস।' কলেজে গোড়ার দিকে কিছুদিন একটা ছেলের সংগে মাখামাখি ছিল। সে সোজা সোজা কথা বলত।

গরম চা দিয়ে অ্যানাসিন খাও। একদম ছেড়ে যাবে।'

. প্রমথ রুগী না। অথচ রুগী হয়ে যাচ্ছে। ভাবটা ঝেড়ে ফেলে দেওয়ার জন্যে সোজা হয়ে বসল।

'কি কি খেলে অফিসে?'

'রুটি, ছানা, একটা আপেল আর বেগুন ভাজা।'

'রুটিতে মোটা হবে, বেগুনে গলা চুলকোয়।' প্রমথর নিজের চুলকোয়।

'কক্ষনো না। কাশীর বেগুনপোড়া খেয়েছ—মাখনের মত।'

'বেশ। আপেলটা কাঁচা না পাকা ছিল?' ডাক্তাররা এভাবে বলে।

'কাঁচা'

'তাহলে সি ভিটামিন ছিল। চেহারায় *গ্লেজ বাড়বে।'*

প্রমথর দিকে তাকিয়ে ছিল সুধা। গ্লেজের কথায় মুখ নামাল। মাথায় অনেক *চুল ছিল। টিউবয়েলের জলে এত আয়রণ— চুলে উঠে যাচ্ছে—।* কতদিন বলেছে, 'খানিক টাটকা জবা ফুল কিনে এনে দাও না।'

জবার নরম লাল লেই লেই পাপড়ি মাথায় আর নাভিতে ডলে ডলে মাখলে চুল ওঠে না। কলকাতায় জবার বাগান নেই। দু দুবার কালীঘাটের মা কালীর পুজোর জবার মালা কিনে এনে দিয়েছে— যত পার ডল!—পয়সায় পোষায় না।

মাথা তুলল সুধা, 'অশু আসেনি বলে খারাপ লাগছে না ত।'

প্রমথর ভয় হল। কার খারাপ লাগছে। মাথার মধ্যে হাতুড়ি পড়ছে। কথা বলল না। তাকিয়ে থাকল শুধু।

'ধুতিটা ম্যাচ করেনি মোটে।'

'এইটেই ছিল। লণ্ড্রীটা একের নম্বরের—!'

প্রমথ আর কথা বলতে পারল না। মাথাটা ভারি হয়ে আসছে। ভাতের সেই গন্ধটা। মাথার মধ্যে সব গুলোচ্ছে। তাড়াতাড়ি চা দিয়ে আনাসিনের দুটো বড়িই মুখে দিল।

চোখ বড় করে তাকাচ্ছে সুধা। ঠোঁট উলটোল। চোখ কোঁচকাল। ভর্তি রেস্টুরেণ্ট। লোকজন চারিদিকে। কি বলতে গিয়ে থেমে গেল প্রমথ। বলতে যাচ্ছিল, মুখ কোঁচকাও কেন? লোকে কি বলবে। এমন সময় গলা দিয়ে ছিটকে এসে একমুখ টকটক বমি কুলকুচির মত মুখ ভর্তি করে দিল। এখনই না ফেলে দিলে মুখ দিয়ে নাক দিয়ে গল গল করে বেরোতে থাকবে। গন্ধটা মাথার মধ্যে গিয়ে মোচড় দিল। সুধা এসব কিছু জানে না।

সুধা নিজের কথাও জানতে পারে না। দু একদিন সুধার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকার সময় প্রমথ অদ্ভুত এক আওয়াজ পেয়েছে। সুধার পেটের কাছে প্রমথর মাথা পড়েছিল। কেমন কল কল করে পেট ডেকে ওঠে সুধার। প্রমথ শুনতে পেয়েছে শব্দটা।

সুধা প্রমথর ভেতরটা দেখতে পাচ্ছে না। মাথা ধরলে কোন শব্দ শোনা যায় না। শুধু ঘাড় ঘুরিয়ে দাঁত দিয়ে মাড়ি চেপে ধরলে কেমন 'কচ কচ' শব্দ হয়। সে শব্দ যার মাথা ধরে সে শুনতে পায়।

সুধা কাছে এসে পর্দা বাঁচিয়ে গলায় হাত রাখল। প্রমথর মুখের বমি গাল ফুটো করে পিচকিরি হয়ে বেরোতে গেল। মাথাটা দপ করে উঠল। সুধার হাত এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে দৌড়ে বেসিনে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল প্রমথ। সাদা সাদা দইর দানার মত—খানিক থেঁতলানো ডাঁটার ছিবড়ে, দুটো একটা ভাত—গন্ধ। কল খুলে বেসিন ধুয়ে দিল। মুখে চোখে ঘাড়ে জল দিল। সবাই তাকাচ্ছে। কেবিনে ফিরে পর্দাটা ভাল করে টেনে দিল।

বসতে না বসতেই সুধা দু হাত দিয়ে

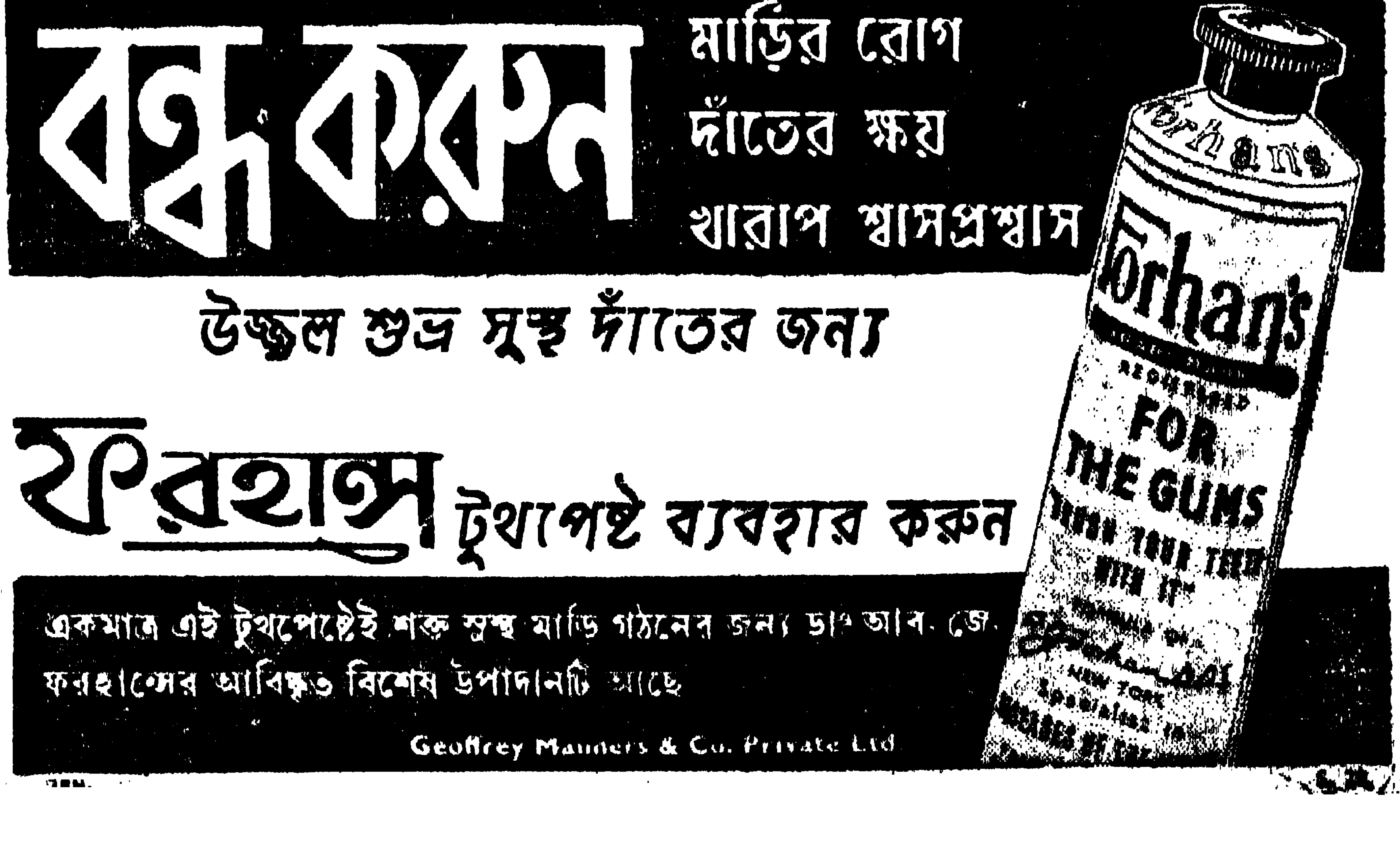

বড়দির বন্ধু সুনীলবাবু। চেনো তাকে। খুব প্রেম। বড়দি সোয়েটার দেয়।

অঞ্জুর কেউ আছে নাকি?

দেখনি তাকে? পাড়ার ছেলে। সুধা গলা জড়িয়ে ধরল। অন্য সময় ভালই লাগে। একটা মেয়ে গলা জড়াচ্ছে। এখন এই বমির গন্ধ ভর্তি মুখে বাধা দেওয়ার আগেই সুধা প্রমথর মাথা জাপটে ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চেপে ধরল। কি বলতে শুরু করেছিল, 'কোনদিন ছেড়ে...।'

কথা শেষ করতে পারল না সুধা। কি বলবে প্রমথ জানে। 'কোনদিন ছেড়ে যেও না আমাকে।' ভীষণ ভয়—প্রমথ যদি চলে যায়। সাদা মেয়ে। প্রমথকে ছেড়ে দিয়েই সুধা কোণে গিয়ে দু হাতে মাথা রেখে ফুলে উঠতে লাগল।

এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল। কিছু বুঝতে পারল না প্রমথ। কিছুক্ষণ না নড়ে তাকিয়ে থাকল। পর্দা দেয়া ঘরে সুধা কাত হয়ে টেবিল ধরে পড়ে আছে।

'কি হল। কাঁদছ?' কোমরে একটা খোঁচা দিল আঙুল দিয়ে। 'কাঁদাকাটির কি হল? অ্যা!'

'আবার খেয়েছ?' সুধা মুখ না তুলেই বলল।

অন্ধকারে সুধাকে একটানে হিঁচড়ে ধরেই ফেলে দিল। কাপটা পড়ে যাচ্ছিল, কোথাকার ফ্যাকড়া বাধানোর ইয়েরে!

তারপর চুপ করে বসে থেকে প্রমথ বলল, 'বাজে বকো না। কবে ছেড়ে দিয়েছি। আর সে ত শখ করে। পয়সা? সত্যি—।' হাসতে গিয়ে দেখল রাগটা চন চন করে মাথায় উঠছে।

'চোখ লাল—গন্ধ বেরোচ্ছে—বমি ত হবেই—মাথা ধরার দোষ কি?

বলতে বলতেই সুধা বুঝল প্রমথ ওসব খায়নি।

'রাবিশ। গরম চায়ে জিবের ওপর দুটো অ্যানাসিনই গলে গেছে। তেতো। বমি করব না ত কি? যাও! ওপাশে গিয়ে সরে বস—' এক ঝটকায় সুধাকে সরিয়ে দিল।

এটা কিরে! গায়ের সঙ্গে লেগে যায়!—এসব ভাবছে টের পেয়ে প্রমথর নিজেকে খারাপ লোক মনে হল।

মাথার মধ্যে হাতুড়িটা আবার হাড় আর মাংস থেঁতলাচ্ছে। সত্যি সুধার কোন দোষ নেই। গাম পচেও যা, ভাত পচেও তাই, বার্লি গেঁজেও সেই একই। বমির গন্ধও টকটক। ভুল হতেই পারে। তাছাড়া তার নিজের পাস্ট রেকর্ড ভাল না।

প্রমথর সঙ্গে আলাপ হওয়ার আগেই গন্ধটা সুধা চেনে। বাবা খায়।

সুধা কাছে সরে এল। হাত রাখল কাঁধে। 'দরকার নেই। জানবে না শুনবে না।'

'রাগ করেছ?'

'হঠাৎ কি এত জড়িয়ে ধরার দরকার হল?'

সুধা প্রথমে মাথা তুলতে পারল না। অফিসে বসবার ঘরের পাশে টয়লেট। প্রমথ দেখা করতে গেলে তার উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে থাকে। সেখান থেকে বেরিয়ে প্রথমে কেউ মাথা তুলতে পারে না। প্রমথ সোজা মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সবিতা একদিন ঘেমে একাকার। কি নালিশ সুধার কাছে। অনেক পরে সুধা বলল, 'খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে।'

'মাথা ধরলেই আমাকে ভাল লাগে।'

সুধার গর্ব করতে ইচ্ছে হল। প্রমথর ভারি মুখে তার নিজের আদল আসে। সেদিন অফিসে গিয়েছিল প্রমথ। মীরাদি বলছিল, তোদের দুটিকে ভাইবোন বলে ভুল হয়। 'কক্ষনো না।'

সুধা বলল, 'না সাজলেও চলবে তোমার।'

এ কথার কান না দিয়ে বুঝতে পারল সুধাকে প্রায়ই যেমন খারাপ লাগে আজও তেমন খারাপ লাগছে। বুঝতে পেরে সুধার জন্যে কষ্ট হল। এখুনি হিসেব করা দেখা যায়—সুধার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। অথচ সুধা জানে—প্রমথ একটা কথা পেয়ে গেল। 'অফিস থেকে আসবে। তাই আর ধোপ ভাঙিনি।'

'বেশ করেছ।'

হাতা গোটান পাঞ্জাবির ভাঁজে ময়লা হয়েছে। এটা মজুমদারের দোকান থেকে সুধার কিনে দেওয়া। মাঝে মাঝে ব্লাউজ দিতে চায় প্রমথ। না হোক ব্লাউজ পিস। সুধা রাজি হয়নি। প্রমথকে নিজের কিনে দেওয়া জামা পরতে দেখলে আরাম লাগে। বিয়ের পরে শরীর ভাল হলে প্রমথ ভাববে সুধা যা—শেষ হয় না। প্রমথর সঙ্গে যদি বিয়ে না হয়।

প্রমথ সুধার দিকে তাকাল না। মুখোমুখি হলে কথা বলতে হবে। একটা সন্দেহ গোড়া থেকেই পাক খাচ্ছে। সন্দেহ সুধাকে নিয়ে। ছবিটা পুরনো। মঙ্গলবার ভিড় থাকে না। সন্ধ্যের টিকিট সকালে এসেও পায়নি অঞ্জু? সুধা কি অঞ্জুকে টিকিট কাটবার জন্যে টাকা দিয়েছিল?

যদি না-ও দিয়ে থাকে তা মুখ ফুটে বলা যাবে না। যদি বলা হয়—তবে জিজ্ঞাসা করবে—'তুমি কি আমাকে বিশ্বাস কর না?' কিন্তু সুধা মিথ্যে বলে—প্রমথও বলে। কতদিন সুধাকে জড়িয়ে ধরে গলগল করে বলে গেছে (— — — — — —)—সুধাও বলেছে।

এদিকে সুধার মন খিঁচড়ে আছে। ভেবে দেখল—আজ সকালে বাড়িতে যা হল—তা না ঘটলে তিনজনে দিব্যি সিনেমা দেখত আরামে। প্রমথর সামনে কথা না বলে বসে থাকতে খুব খারাপ লাগে। অঞ্জুর ওপর রাগ হল। আজ সারাটা সন্ধ্যে অঞ্জু একাই ভেস্তে দিল।

ভোরে বড়দির পাশে বিছানায় সুধা শুয়ে। বড়দির পা ভেঙেছে কদিন।

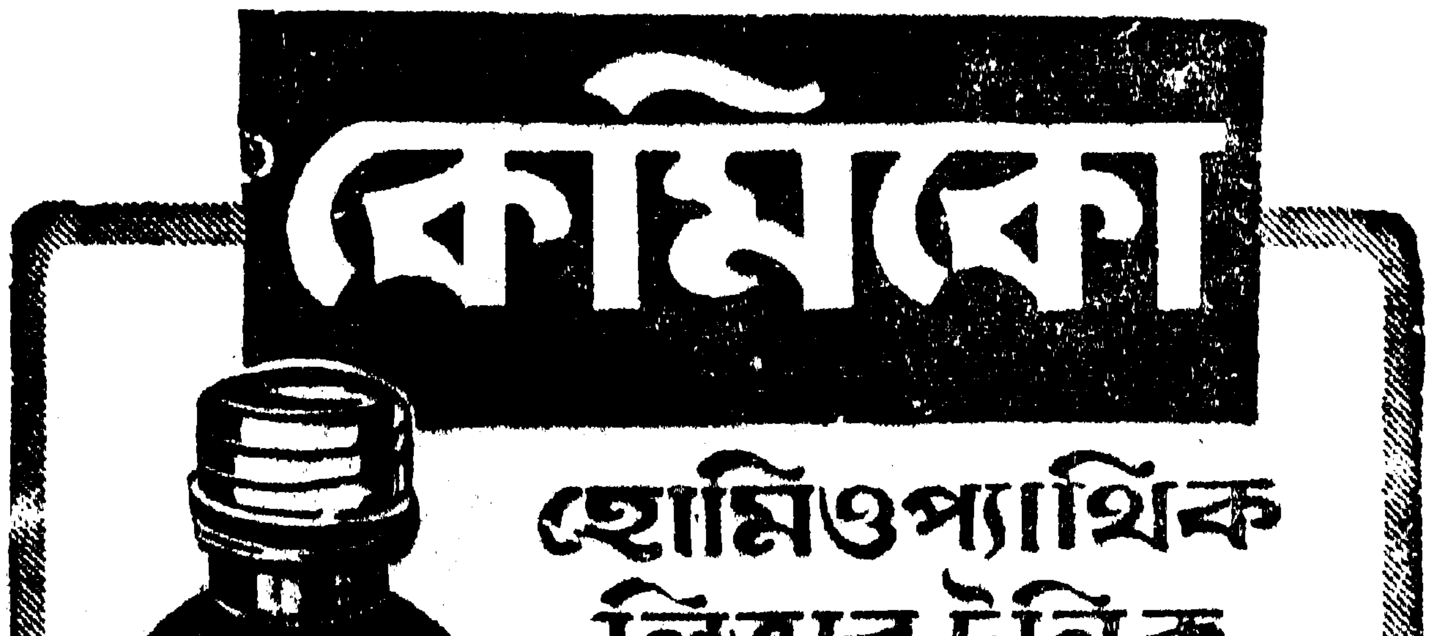

বড়দি গল্পের বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল। সুধা কোল বালিশের সংগে মিশে আছে। অঞ্জু ভোরের চা দিয়ে কলেজে যাবে।

নে মেজদি চা নে। বড়দির চা আগেই রেখে দিয়েছে। ওঠ মেজদি। টাকা দে। টিকিট কাটতে হবে না। সুধার ঘুম ভেঙেছে আগে। চোখ খুলবে কি না ভাবছিল। যা ভয় ছিল তাই হল। কাল সন্ধ্যেবেলা কখন বলেছে, সে প্রমথ আর অঞ্জু তিনজনে সিনেমায় যাবে এক সংগে। অঞ্জু ভোলেনি। প্রমথ যত নষ্টের গোড়া। কেন যে তিনজনের এক সংগে সিনেমায় যাওয়ার কথা পাড়ল।

তোর নীল শাড়িটা পরছি কিন্তু মেজদি। ঝগড়া করতে পারবি না।

চোখ বুজে শুনছিল সুধা। একবার পরা শাড়ি পরতে পেয়ে অঞ্জু খুশী। যাক না তিনজন এক সংগে। কি হবে তাতে। প্রমথ মজার মজার গল্প চালাবে হাফটাইমে। আড় ভাঙতে ভাঙতে চোখ খুলল। অঞ্জু নীল শাড়িটা ঘুরিয়ে পরেছে। আয়নায় ঝুঁকেছে। ভ্রূতে টিপ দেবে।

প্রথমে খুব ভাল লাগল। বড়দিও বই বন্ধ করে তাকিয়েছিল। কি ভেবে আয়নার সামনে গেল। 'সর ত অঞ্জু'। দুবার সেলাই করেছে ব্লাউজটা ফিরিয়ে ফিরিয়ে। হাতটা বগলের কাছে ঢিলে হয়ে ভাঁজ হয়ে আছে।। কোমরের কাছে হলহলে লাগছে। কাঁধের হাড় হাতের আঙুলের মত। জোর করে চেপে ধরে মুট করে ভেঙে ফেলা যায়।

সুধা আয়নায় হাসল। হাসি হল না। সাদা দাঁত। এই সেদিন স্কেপ করিয়েছে। ডেণ্টিস্ট ঠোঁট উল্টে ধরে মাড়ির ওপর দিয়ে আঙুল চালিয়ে দেয়। আয়নার সামনে চেয়ারে বসে চোখ বুজে থাকতে হত। চোখের সামনে বড় ফটোতে বাঁধান সুন্দর একটা মেমের হাসি হাসি কাটামুণ্ডু। ঠোঁট নেই। পরিপাটি খোঁপা বাঁধা মাথা।

অঞ্জু নিচু হয়ে জুতোর স্ট্রাপ বাঁধছিল। টাকা দে। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

একটু দম নিল সুধা। ট্রামের মান্থলি কাটা হয়নি যে। মনেই ছিল না। আজ লাস্ট ডেট।

তবে প্রমথদাকে কাল আসতে বললি যে।

অঞ্জুর দিকে তাকাল না সুধা। প্রমথর জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।

মুখে বলল, সে আমি বলে দেবখন। বলে দেখল, বড়দি তাকে দেখছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকের থেকে টাইমপীসটা নামিয়ে কট্ কট্ করে চাবি মোচড়াতে লাগল। বুড়ো আঙুলটা চাবিতে। আর একটু করে পাতলা মাংস আঙুলটার দু পাশে থাকলে ভাল হত।

চায়ে চুমুক দিল সুধা। অঞ্জু বই গুছিয়ে বেরিয়ে গেল। বাঁ পা সায়ার বাইরে টান করে দিয়ে খাটে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। সায়ার লেসের সুতো এদিক ওদিক খুলে আসছে। গোড়ালি বেয়ে পিল পিল করে তিনটে শিরা পায়ের নীচে চলে গেছে। অফিসে যাওয়ার সময় বড়দি ডাকল।

মেজ। চিঠিটা সুনীলকে দিবি। সংগের লিভ এক্সটেনশনের চিঠিটা অ্যাডমিন-স্ট্রেশনের ও এস কে দিতে বলবি।

চিঠি দুখানা ব্যাগে রাখল। আরও পনেরদিন ছুটি চাই বড়দির। চিঠিটা খুলে দেখার ইচ্ছে হল না। কি আছে

এজেণ্ট ঃ মেসার্স শা বর্ত্তাশি এণ্ড কোং, ১২৯, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

সুধা জানে। সোনা, আমি যখন থাকব না, শনিবার চড়কডাঙার ঘড়ির নীচে থেক।

দু' একবার চিঠি লিখেছে প্রমথকে। আমি ভাল আছি। আশা করি তুমি ভাল আছ।

টিফিনের কৌটোটা ব্যাগে গলাতে গলাতে বেরোচ্ছিল। বড়দি ডাকল আবার।

তাড়াতাড়ি বল। চিঠি ঠিক পেণছে দেব।

তুই দুধ খেলে পারিস টিফিনে।

সুধার থামতে হল।

কাল প্রমথ বলছিল তোর শরীরটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

খুব মায়া। প্রমথ ভাবে, দেখলে বোঝা যায় না। দেখা হলে ভাল করে কথা বলবে। এমন বেয়াড়া সময়ে এসে চুপচাপ বসে থাকে।

ছুটি নিয়ে কানুপিসির ওখান থেকে ঘুরে আসবি। ভীষণ ক্ষিধে হয়। সতের-দিনে দু পাউন্ড বেড়েছিল। বলিস ত তোর জন্যে পাশের কথা লিখে দিই সুনীলকে। দেব?

বিছানায় উঠে বসল বড়দি। ছাব্বিশ তারিখে পায়ের ব্যান্ডেজ খোলা হবে। চোখ তেলে টাল্‌টেলে হয়ে আছে। ঠিক করল অফিস যেয়ে কাজ নেই। আজকে বড়দির পাশে বসে গল্প করবে। কিন্তু এসব করতে হবে ভেবে লজ্জা হল।

না। সে আরেক ঝাক্ক।

শোন। প্রমথকে সামনের রবিবার নেমন্তন্ন করে আসবি তবে।

কেন?

সে শুনে তোর কি হবে। বিকেলে আসে যেন। বুঝলি। আমার কাঞ্জিভরমখানা পরবি তুই। বড়দি জানলার দিকে ফিরে শুলো। শুতে শুতে বলল, অফিস থেকে এসে আমার কাছে চুল বাঁধলে পারিস। শুয়েই থাকি সারাদিন।

জানলা খুললে বাড়ির পেছনের জলে ভেজা লতার—অশ্বথ ঝুরির গন্ধ আসে। তার ওপাশে ভাঙা শিশি, কেরোসিনের বোতল মোছা ন্যাকড়া, পুরনো খবরের কাগজ ছড়ান মাঠ। বড়দি পেছন ফিরে শয়ে। ফাঁকা আয়না। ঘরে কেউ নেই। অফিসে বেরিয়ে গেল সুধা।

ট্রামের মান্থলি সত্যি কাটতে হবে। কেটেও টিকিট কিনবার মত পয়সা বাঁচবে। কিনে নিয়ে যাবে টিকিট। কিন্তু দুখানা কাটলে প্রমথ কি ভাববে। বলবে অঞ্জু দুখানা কিনে এনেছে—ওর কাজ আছে। যে কোন কাজের নাম চালান যায়। কিন্তু প্রমথ কোন কথা না বলে হাসবে শুধু। এর চেয়ে অঞ্জুকে টিকিট কাটতে দেওয়াই ভাল ছিল। সুধার কোন দোষ নেই। ঘুম থেকে উঠে অঞ্জুকে দেখে এত সুন্দর লাগল। অফিস মুখো ট্রামে উঠে ঠিক করতে পারল না ফিরে গিয়ে তিনখানা টিকিট কিনে নিয়ে যাবে কি না।

কিনে, সকাল সকাল বাড়ি গিয়ে বলল, নে চল অঞ্জু। নিয়ে এলাম তিনখানাই। মীরাদি আজ টাকাটা শোধ করে দিল।

অঞ্জু তখনও বড় খাটে বিছানায় চাদর বদলাচ্ছিল। তুমি যাও। আমার শাড়ির যা চেহারা হয়েছে।

ঐ শাড়িতেই চল। তোর ছোট হাতার ব্লাউজটা কোথায়রে।

অঞ্জু ব্লাউজটা দান করে দিল। সুধা গায়ে দিয়ে আয়নায় দেখল। মানায়নি। সেদিন অঞ্জু পরেছিল। সুন্দর দেখাচ্ছিল। অঞ্জু বড়দির কলার তোলা ব্লাউজটা পরে হাত পেছনে পাঠিয়ে ঘাড়ের বোতাম আঁটছিল। মেজদি ভাই একটু লাগিয়ে দে না।

সুধা দাঁতে শাড়ি কামড়ে আয়নার সামনে গেল। পাড়ার রতিকান্ত বাবার মক্কেল। খাটাল আছে। বাবা নথি দেখছে। রতিকান্ত জানলা দিয়ে এদিক তাকিয়ে। রতিকান্তর ওপর রাগ একটু পরে অঞ্জুর ওপর ঝাড়ল।

পিঠের বোতাম আটকাতে গিয়ে পিঠ হাতে লাগল। ব্লাউজের কলার এ'টে বসেছে। পুরন্ত টান টান গলা। সুধার গলা আয়নায়। কোয়া খসানো কাঠালের বোঁটার মতন গি'ট গি'ট কণ্ঠা মাংসে ঢাকা পড়েনি। বোতাম এটে দিয়ে বেণী দুটো কষে বেঁধে দিল। দোতলার ইনকাম ট্যাক্স অফিসারের বৌকে ঝি ব্লাউজ পরিয়ে কাজল টেনে পান খাইয়ে বেতের চেয়ারে বসিয়ে দেয় বিকেলবেলা। হার্টের অসুখ ভদ্রমহিলার। সুধা অভদ্রমহিলা। ফস করে বলে বসল, তোর প্রমথদা এমনিতেই কাত। অত না সাজলেও চলবে।

আয়নায় দেখল অঞ্জুর মুখ কালো হয়ে গেছে। বেরোবার সময় অঞ্জু থামল। আমার টিকিট কোথায়।

কথাটা বলে মনে মনে কষ্ট পাচ্ছিল সুধা। হালকা করার জন্যে সুযোগ খুঁজছিল। টিকিট চাওয়াতে তিনখানা টিকিটই এগিয়ে দিল।

মানে?

বদলে নিতে হবে না। তোমরা একতলায় বসলে আমি দোতলায়। তোমরা দোতলায় বসলে আমি একতলায়।

কেন?

সবই যখন জান তখন তোমার প্রমথদাকে সামলে রাখতে পার না। বলে অঞ্জু খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ল। সুধা ঘড়ি দেখল। সাড়ে পাঁচটা। বৃষ্টি হচ্ছে। বড়দি পাশের ঘরে বসে পা চুলকোচ্ছে। প্লাস্টারের ভেতর ফোস্কা মত কি হয়েছে কদিন।

প্রমথ এসে দাঁড়িয়ে থাকবে। সিনেমায় গিয়ে কাজ নেই। দোতালার বিজুর হাতে টিকিট দিয়ে বেচতে পাঠিয়ে খানিক বসে থাকল। অঞ্জু সাড়াশব্দ না দিয়ে বেরোনোর শাড়ি ব্লাউজ খুলে ভাঁজ করে ট্রাঙ্কে রেখে দিল। ছ'টা বাজতে বারো। প্রমথ এসে ফিরে যাবে। টুক টুক করে বৃষ্টিতেই বেরোল।

প্রমথকে সামলাবে কি। নড়া-চড়াই করে না। চেয়ারে বসে থাকে। বড়দি ঘরে ঢুকল। বলবে, কি গ্র্যান্ড খোঁপা বেঁধেছ। সুধার অফিসে গিয়ে হাজির সেদিন। ক্যান্টিনে

রবিনসন্স

'পেটেন্ট' বার্লি

খাওয়াবার

এই ত সময়

রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লি গোরুর দুধের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে শিশুর পাকস্থলীতে দুধ শক্ত চাপ বেঁধে হজমের অসুবিধা ঘটায় না বরং তা হজম করা শিশুর পক্ষে আরো সহজ হয়। তাছাড়া, রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লি শিশুর পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগায়। রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লি শিশুরা খেয়ে তৃপ্তি পায়—এতে ওদের শরীরও গড়ে ওঠে। আপনার খোকাকে খাইয়ে দেখুন সে কেমন বেড়ে ওঠে।

এই বার্লিতে অনধিক ০.০২৮% আয়রন বি-পি ও ১.৫% ক্রিটা প্রিপঃ-এর সংমিশ্রণ আছে।

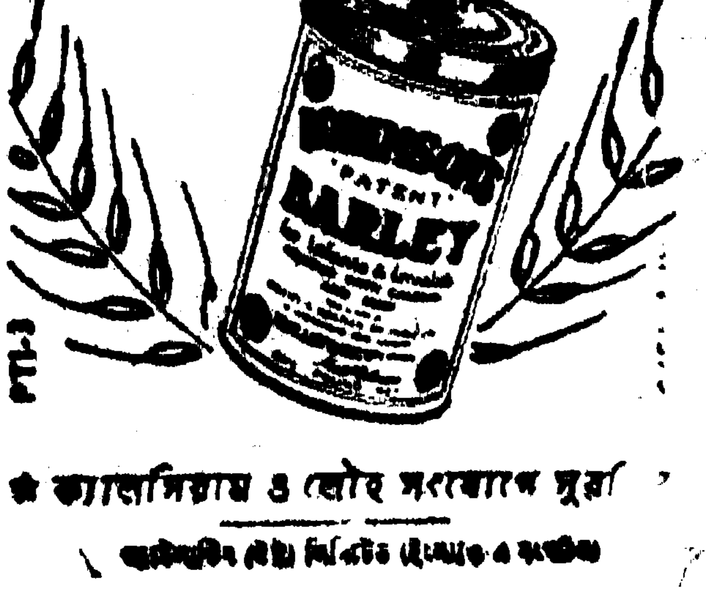

ক্যালসিয়াম ও লৌহ সংযোগে পুষ্ট

জে. এল. মরিসন, সন এণ্ড জোন্স (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড

বোম্বাই ∘ কালকাতা • মাদ্রাজ • দিল্লী

বসে বলল, রোজ এত সেজে আস। আর যারা আসে তাদের কাজের ক্ষতি হয় না। অঞ্জু ঘরেই থাকে সন্ধ্যেবেলা। বলবে, ইস কি ভুলই করেছি। আগে কি আর বোঝা গেছে এমন হবে পরে।

অঞ্জুর কাছে জানতে ভয় করে। বোঝা যায় না। চায়ের সংগে আলুর চপ হলে খুশী রাখতে পারে না। অফিসের অজয় বাবু প্রমথর বয়সীই। অফিসে সুধাকে চেনে না। দরকার হলে অফিস পাড়ার বাইরে কথা বলে। সব সময় ভয় সুধার সংগে কথা বললে অফিসের কেউ যদি দেখে ফেলে।

এখন সুধা না থাকলেও অজয় আসে। সায়েন্স ছিল অজয়ের। অঞ্জু তার ফিলোসফির বই খুলে—স্পর্শ থেকে কি কি অনুভূতি হয় তা নিয়ে অজয়ের সংগে কথা বলে। অজয় খাটে বসে ঘামে। অঞ্জু হাসে তখন। অজয় মাথা না তুলে আরও ঘামে। অঞ্জু মজেনি। ঐ এক খেলা।

বৃষ্টি ভিজে সিনেমা হলে আসতে আসত অঞ্জুর কথার উত্তর দিচ্ছিল মনে মনে।

অঞ্জুর কথার পিঠে কথা খুঁজে না পেয়ে প্রমথর ওপর রাগ হচ্ছিল সবচেয়ে। কি দরকার ছিল সিনেমার কথা পেড়ে। বুড়ো ভাম কোথাকার। প্রমথর সামনে অঞ্জু শান্ত হয়ে কথা বলে। তাতে আরও খারাপ লাগে। প্রমথকে দেখে হাসুক অঞ্জু। যেমন অজয়কে হেসে হেসে ঘামায়।

ওভালটিন খাওয়া হয়ে গেল সুধার। মোড়ের ঘড়িতে সাতটা বাজতে দশ। বৃষ্টি নেই। অনাথ আশ্রমের ছেলেরা লাইন করে ফিরছে। আগে আগে লাঠি হাতে হাফপ্যান্ট পরা বুড়ো। পুরনো অনাথ। একটা মেয়ের সংগে দুটো ছেলে এসে বসল। সুধা তাকিয়ে ছিল।

বাঁদিকেরটা প্রেমিক।

প্রমথ বলল, ডান পাশেরটি বুঝি ভিকশনারির অথর?

তা না। তবে কেমন চোয়াড়ে চোয়াড়ে। লাভার না। বলে হেসে ফেলল। আমাকে তোমার লাভার মনে হয়?

হা করে মৌরি ছুড়ে দিল মুখে। কতক টেবিলে পড়ল। হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলল, খুব।

মীরাদি বলছিল দেখলে মনে হয় তুমি আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছ।

তুমি কি বল?

উড়িয়ে দিই। বলি ওসব বিশ্বাস করবেন না। যতক্ষণ না বিয়ে হয় ততক্ষণ সব ফাঁকা।

ও। সুধার সিনেমা দেখাবার কথা ছিল। অঞ্জু না আসাতে এখন চা খাওয়াচ্ছে। সুধা অ্যানাসিন আমানোতে মাথা ছাড়ল। প্রমথ অন্য মেয়ে বিয়ে করতে পারে।

চালাক। কদিন ঘ্রে ঘ্রে করল। দ্-একখানা চিঠি ছ্ঁড়েছিল।

তারপর? প্রমথকে দেখল। উঠে সোজা হয়ে বসেছে। বানিয়ে বলবে। অঞ্জুকে ভাল লাগলে স্ধা খ্শী। তাহলে প্রমথ বাঁচে। ফস্ ফস্ করে সিগারেট টানে। মন দিয়ে চাকরি খ্ঁজলে চাকরি হয়। স্ধার পঁচিশ। কবে বিয়ে করবে। আয়নায় তাকালে গরমে ভেপসে ওঠা ভাতের মত নরম লাগে ম্খের চামড়া।

স্ধার নিজেকে দানশীলা মহিলা বলে মনে হতে লাগল। এইমাত্র এক সম্ভ্রান্ত দ্ঃস্থ অঞ্জুর হাতে প্রমথকে ব্যাগে প্রে সাহায্য হিসেবে যেন ঝোলাটা দান করে দিয়েছে।

আমরা বলেছি—যাকে ইচ্ছে বিয়ে কর। কিন্তু দেখে করো। ছেলেটা কদিন নাছোড়বান্দা হয়ে ঘ্রল। ম্যাট্রিক পাশ। ব্যবসা করে। অঞ্জুই সব ব্ঝে কানেকশন কাট আপ করেছে। সত্যিই ত, বি-এ পাশ করতে চলল অঞ্জু।

মাথাটা ছেড়ে এসেছে। স্ধা অঞ্জুকে ভবিষ্যৎ ভেবে চলতে বলেছে। নিজে তাই চলে।

পালিত রোডে একটু যাবে? ওখানে একটা ইস্কুল আছে।

প্রমথ ব্ঝল গান বাজনা শেখার ইস্কুল। কদিন ধরে বলছে।

বেশ ত বসে আছি। বৃষ্টি হয়ে গেল একটু আগে। ভিড় বাইরে।

না। আমি যাব।

প্রমথ বলতে যাচ্ছিল—বেশ ত, তুমি যাও। কথাটা অকৃতজ্ঞের মত শোনাবে বলে বলতে পারল না। অকৃতজ্ঞ ভাবল কেন। কৃতজ্ঞতা ব্যাপারটা জিনিসপত্তর দেওয়া নেওয়া নিয়ে হয়। প্রমথ জানে সে স্ধাকে ভালবাসে। ম্শকিল হয় স্ধার দিকে তাকালে। ঘাম আসে। প্রমথ তখন মনে মনে বারে বারে আওড়ায়, স্ধাকে ভালবাসি। আমি স্ধার লাভার। স্ধা একা। প্রমথ ভাবতে গিয়ে দেখল সে স্ধাকে ভালবাসে না। স্ধা একটা মেয়ে। বয়স পঁচিশ। কলেজ ছাড়ার পর পাঁচ ছ বছর যাতায়াত আছে। মাঝে মধ্যে ফাঁকা পথে পাশাপাশি হাঁটে। প্রমথ প্রথম প্রথম বিয়ের কথা বলত। স্ধা উড়িয়ে দিত। এখন স্ধা বিয়ের কথা বলে। প্রমথ উড়িয়ে দিতে পারে না। চুপ করে থাকে। প্রমথ স্ধার কাছে খ্চরো নোট মাঝে মাঝে নিয়ে ফেলেছে। হাতেও থাকে না। দেওয়া হয়নি।

এখন ভাল না বাসাটা প্রমথ ঢেকে রাখতে চায়। ঢেকে রাখতে গিয়ে চুপ করে থাকে। কথা বললে বিরক্তিতে যদি বেফাঁস কিছ্ বেরোয়।

স্ধাকে সহান্ভূতি জানান যায় না। কর্ণা করার মত কিছ্ হয়নি স্ধার। চাকরি আছে। পেনসন পাবে শেষ বয়সে। ছেলেবন্ধ্, ইচ্ছে করলেই পেতে পারে।

কর্ণা প্রমথকে করা যায়। ছোট চাকরি করবে না, অবিশ্যি পাচ্ছেও না। এখন বাবা মা আছে—বয়স আছে। যোগাড় যন্ত্র করে এখনই ঢ্কে পড়া উচিত। যাত্রা দলের সং। ওসব ঝেড়ে ফেলে সময় থাকতে সোজা হয়ে দাঁড়ান উচিত।

প্রমথ উঠে দাঁড়াল। চল তোমার ইস্কুল কোথায় দেখি।

কাজ নেই। তুমি বরং বাড়ি গিয়ে শ্য়ে থাক। আমিই দেখছি।

প্রমথ হাসল। এরকম দাঁত চেপে হাসলে তাকে সবচেয়ে স্ন্দর লাগে। মাঝে একটা মেয়ের সংগে সবকিছ্ ঠিক হয়েও ভেঙে গেল। তার কথা। এখন মাথাটা একদম ছেড়েছে।

তোমার বোধহয় মন ভাল নেই। অঞ্জুর বিকেলের কথাটা ভেবেই বলল স্ধা। প্রমথকে সামলাতে পারে না। সামলাতে হলে মেয়েদের যা যা থাকা দরকার স্ধার তা নেই। টিফিনে বসে র্টি ছানা আপেল চিবোতে খারাপ লাগে। অনেকদিনের ভাল খাওয়ার লাবণ্য একদিনে যদি হয়ে যেত। চোয়াল নাড়ান কি একঘেয়ে।

ঠিক ধরেছ। ম্খে হাসি লেগে আছে প্রমথর।

স্ধা ভাবল, কি ধরেছি। অঞ্জু আসেনি তাই মন খারাপ। পয়লা নম্বরের চীট্। অঞ্জুর গা ভর্তি। ফ্রকের বাইরে এই সেদিনও পাংশ্টে পা ঝ্লত। বিনিয়ে বিনিয়ে ইতিহাস ম্খস্থ করত। প্রমথ বলত, অঞ্জুর ইতিহাসের গলাটা ভাল। শেষে ব্ঝিয়ে বলত, ইতিহাস পড়লে মনে হয় পাঁচালি পড়ছে। প্রমথকে তখন অঞ্জুর দিকে ঝ্ঁকতে দেখা যায়নি। এখন প্রমথ প্রায়ই অঞ্জুকে দেখে। সোজাস্জি। কিছ্ বলা যায় না। সন্দেহ হলে নিজেকে নীচ মনে হয়। স্ধা কেন যে শ্কিয়ে যাচ্ছে।

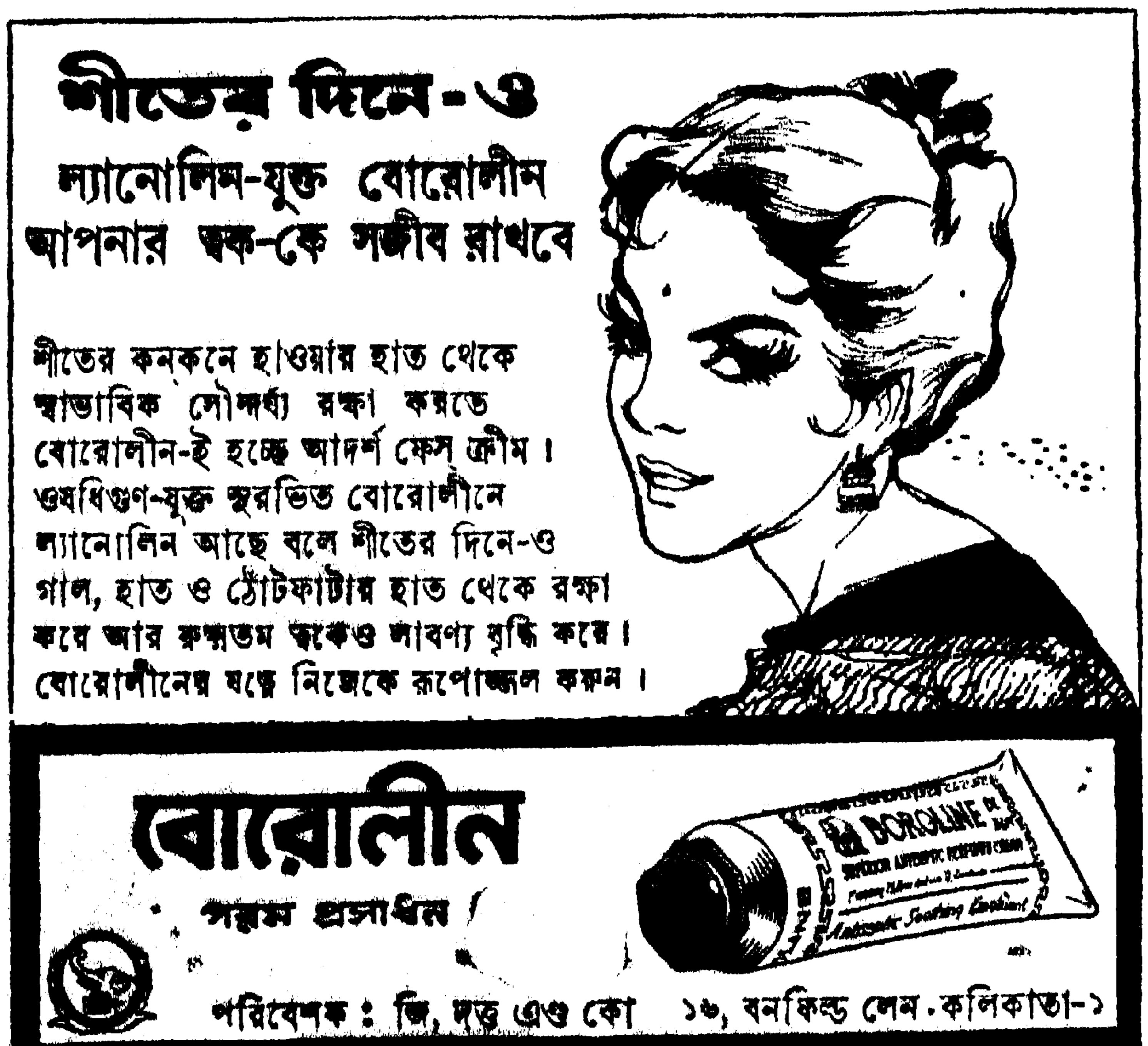

adarts/50

ঠিকানা জান ইস্কুলটার?

না। খুঁজে নিতে হবে।

এত বড় রাস্তা। কোথায় খুঁজবে?

কপা এগোলেই পাব। কেন আমার সঙ্গে হাঁটতেও খারাপ লাগে আজকাল?

এই দেখ। কি মুশকিল।

সুধা কি একটা শৌখিন নাম বলল, ইস্কুলটার। ধ্যানেশ্রী।

সুধার গান কোনদিন শোনেনি। গাইবে বলে একদিন মাঠে বসে খানিকক্ষণ গুনগুন করেছিল। আশেপাশে লোকজন বলে আর গাওয়া হয়নি। তাছাড়া দুটো একটা ছেলে তাকাচ্ছিল। সুধা ফস করে বলে দিল খচ্চর। কথাটা শুনে মনে হয়েছিল প্রমথর—নতুন জুতো পরে ঘোড়ার ময়লায় পা দিয়ে ফেলেছে। সুধাকে এত খারাপ লাগছিল। খচ্চর বলল কেন? এমন ত ছেলেরা ঘোরেই।

তোমাকে বাড়িতে পেঁছে দিয়ে আসি।

না।

দিয়েই চলে আসব।

সে হয় না।

অজয়বাবু যায় যে।

অজয় ত ছোটদের পড়ায়। তুমি কি করবে বসে বসে। অঞ্জু তোমার সামনে জোরে পড়তে লজ্জা পায়। পড়তে পারে না।

অঞ্জু লজ্জা পায় না কচু পায়। এখন যদি প্রমথ সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি যায় তাহলে টিকিট কাটা না কাটার ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। হয়ত অঞ্জুকে একদম টিকিট কাটতে পাঠায়নি। তাছাড়া অঞ্জুর সামনে এখন প্রমথকে ফেলে দেবে না সুধা। যা পাবে তাই খাবলে তুলবে। প্রমথটা একটা ছাগল। ভাবলেশ নেই মুখে। নেশা করে নাকি? মোদক। না হোক ভাঙ।

হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে তোমার?

প্রমথ বলল, না ত।

এই একটা উত্তর হল। আগে হলে প্রমথ বলত, আস্তে হাঁট না। পথটা শেষ হয়ে যাচ্ছে।

সে কথা থাক।

কি করে এই আটটা না বাজতে অঞ্জুর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বই সামনে রেখে কোনদিকে না তাকিয়ে ফিক্ করে হাসবে অঞ্জু। জিভ দিয়ে ঠোঁটের গা ঘেঁষে সরু গজদন্তটাকে খোঁচাবে।

হয়ত বলবে, ইংরাজী ছবি ছোট হয়! সব নষ্টর গোড়া প্রমথ। এই লোকটা। পাশে পাশে হাঁটছে।

ধুতি পাঞ্জাবিপরা নেশা করা শয়তান। মুখে বলে, সুধা কিছু ভাল লাগে না।

মোড়ের মাথার দেবদারু গাছে ক্রেন লাগিয়ে লাল গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তারে লাগবে বলে ট্রাম কোম্পানীর লোক আলো জেবলে ডালপালা ছাঁটবে। ও ফুটপাথে উঠল। প্রমথ পেছনে পড়ে গেছে। ফিরে দাঁড়াল সুধা। প্রমথ নেই।

ট্রাম কোম্পানীর লোকেরা দেবদারু গাছটার গায়ে কল চালাচ্ছে। কড়া আলো। ট্যাক্সি ড্রাইভার, লাইন মেরামতের মিস্ত্রি জটলা বেঁধে দাঁড়ানো। জায়গাটা বিয়ে বাড়ির মত। এখন ডাল কাটবে। ঝাঁকিতে গাছটা আগাগোড়া দুলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আলোর মধ্যে সারা গা জুড়ে পাতাগুলো কেঁপে থেমে গেল।

প্রমথ উল্টোদিকের ফুটপাথ দিয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে আসছে। মুখে সিগারেট। আগুন খুঁজছিল—পায়নি। পরনে ধুতি পাঞ্জাবি। পেছনে আলোর মধ্যে দেবদারু। চাদরের ছায়ায় মুখ দেখা যাচ্ছে না।

ভালবাসা কি। সুধা নাক চুলকোল। একটা লোকের জন্যে কষ্ট হলে, টান হলে, তার নাম ভালবাসা! প্রমথ আসছে। হাতে খোঁচা। নাক, মুখ, চোখ, চুল, গানের গলা ভাল না হলে টান শুকোয় কেন। পর পর দুটো লরি গেল। কোনোটায় কিছু নেই। সুধা জানে না। নাক মুখ চোখ সুন্দর মানে কি। আরও খানিক এগোলে পি জি হাসপাতাল। আউটডোর সকাল নটার পর বন্ধ হয়ে যায়। টিকোল নাক, বাঁকা ভ্রূ, টানা চোখ। বিড়ির দোকানে পোড়া তামাকের গন্ধ। রিকশা গেল। ওসব জায়গারটা জায়গায় থাকলেই হল। একটা লোকের কাছে, সিগারেট হাতে নিয়ে কি বলছে। নিশ্চই আগুন। পেল না।

প্রমথ কাছে আসতে একটা দশ নয়াপয়সা দিয়ে বলল, কিনে নিয়ে এসো একটা। বেরোনোর সময় দেখলাম মার লক্ষ্মীর আসনে দেশলাই নেই।

সুধাকে দেশলাইটা দিল। কোন কথা নেই। সো সো করে সিগারেটে টান দিচ্ছে। প্রমথ আগের মত হও। আদর কর। অঞ্জুকে কি দরকার। অঞ্জু ভালভাবে জানেও না তুমি কেমন লোক। কাছে এসে হাঁপাবে। পালাবার জন্যে জলে ডুববে। প্রমথ আগের মত হয়ে যাও। এ ভাবে চললে মরে যাবে। ভাগলপুরে গিয়ে মোটা হয়ে আসব। আগের

ছোটদের নাটক?
বাংলা তথা ভারতে শিশুমহলে
এই অপূর্ব সৃষ্টি। সমর
চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিভা উজ্জ্বল
ও নাটকের অপূর্ব সংকলন
সি.এল.টি সাফল্যের
অর্জন করুন।

অবনপটুয়া ২.৫০ মিঠুয়া ১.০০
জিজো .৭৫ সাত ভাই চম্পা ২.৫০
যাদুকরের দেশে— | যন্ত্রস্থ
একটি ঘাসের পাতা— |
সর্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক
শিশুরংমহল প্রকাশনী
২ তিলক রোড, কলিকাতা—২৯
ফোন : ৪৬—১২০০

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.-প্রণীত

ব্যায়ামে বাঙালী	২.০০	বাংলার ঋষি	৩.০০
বীরত্বে বাঙালী	১.৫০	বাংলার মনীষী	১.২৫
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪.০০	বাংলার বিদুষী	২.০০
আচার্য জগদীশ	২.০০	রাজর্ষি রামমোহন	১.৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১.৫০	যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১.৫০
জীবন গড়া	.৭৫	রবীন্দ্রনাথ	১.২৫

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী • ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

জগদীশবাবুর গীতা

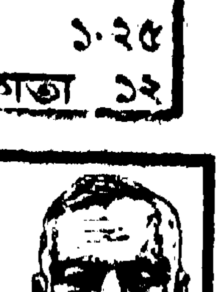

মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা তত্ত্ব-রহস্য ভূমিকাসহ অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়মূলক যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ৬.০০

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম — শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার যুক্তিপূর্ণ আলোচনা ৩.০০

ভারত-আত্মার বাণী — ভারতের শাশ্বতবাণী ঋষিদৃষ্টির কথা ৩.০০

শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১.৫০

কর্মবাণী ১.২৫

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী · ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

মত হব। দেখলে চোখ ফেরাতে পারবে না। আমার চোখ সুন্দর না প্রমথ। দেখ।

পথের মধ্যে পা ছড়িয়ে কাঁদতে ইচ্ছে হল সুধার। অনেক লোক। শীত। আলো। এটা পাঁচের রাস্তা।

প্রমথর হাঁটতে ভাল লাগছে না। ছিট ছিট বৃষ্টি। ঘড়িতে আটটা পাঁচ।

ঐ ত তোমার গানের ইস্কুল। প্রমথ আঙুল দিয়ে দেখাল। ছিমছাম ঘর। পিয়ানো শিখছে একটা লোক। পাশের ভদ্রলোক কথা বললেন। কে শিখবেন?

আমার এক বান্ধবী। সুধা বলল। বান্ধবী না সুধা নিজেই শিখবে। প্রমথর আড়ালে শিখবে। হঠাৎ জানতে পেরে অবাক হবে প্রমথ।

রেট কি রকম?

সপ্তাহে একদিন করে। মাসে দশ। ভর্তির সময় সব মিলিয়ে সাড়ে সতের।

কোন সময় শেখান।

স্টুডেন্টের সুবিধা মত।

সন্ধ্যের দিকে?

ভদ্রলোক মাথা নড়ল। নিজের সময় সুবিধার আঁচ নিল সুধা।

সেভেনথ্ আমাদের অ্যানুয়াল ফাংশান। একটা টিকিট নিন্ না।

প্রমথ বলল, আমি ওসব দেখি না।

প্রমথর কথায় ভদ্রলোককে চমকাতে দেখে সুধা সামলে দিল। শনিবার আপনাদের খোলা থাকবে ত?

সামনে ফাংশান বলে এখন রোজ খোলা থাকবে।

তাহলে সেদিন ভর্তি হয়ে টিকিট নেব। দু'খানা রাখবেন।

প্রমথ পাশে বসে উসখুস করছিল। পথে বেরিয়ে সুধা বলল, একটু হাঁটবে।

নিশ্চয়ই। বলে মনে হল 'নিশ্চয়ই' না বলে বলা উচিত ছিল 'চল না।'

কিন্তু একথা সত্যি প্রমথর সুধাকে ভাল লাগছে না। আগে লাগত। এখন ভাল না লাগাটা খারাপ হয়ে বুকে বসে যাচ্ছে। মনে লাগে। প্রমথ তোমার ভাল লাগা উচিত। প্রমথ পারে না। কোন যোগ নেই এই সন্ধ্যার সংগে। সিনেমায় না গিয়েও এতগুলো পয়সা গেল সুধার। অথচ সন্ধ্যেটাই মাটি।

কিছুদিন আগে সুধাকে নিয়ে এক কাগজের অফিসে গিয়েছিল। সম্পাদক টেবিলে বসে। এ কাগজে প্রমথ লেখে। সম্পাদকের বয়স বছর চল্লিশ। পরিষ্কার লোক। দোহারা চেহারা। গল্প লিখিয়ে হিসেবে নাম আছে। বাজারে বইও কাটে ভাল। বৌ ছেলে মেয়ে আছে। শহরতলিতে বান্ধবী আছে। সুধা আড়ালে যেতেই বললেন, ভূষিমাল জোটালে কোত্থেকে?

কথাটায় প্রমথর লেগেছিল। অবিনাশদার ভালবাসার দুই চেহারা। কখনও উদার

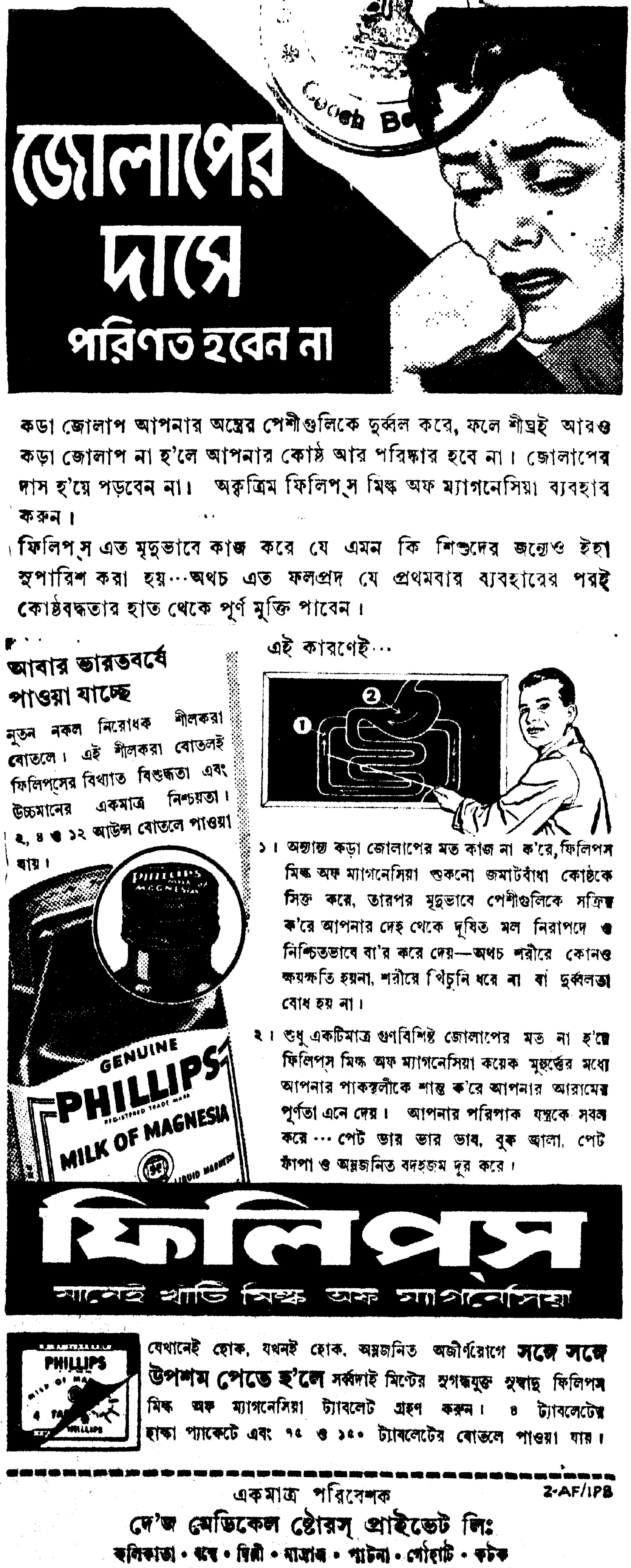

কখনও দয়ামায়ার বালাই থাকে না। মুখে এসব বলতে পারেনি প্রমথ। অস্পষ্ট কিছু একটা বলেছিল।

অবিনাশবাবু চাপা দিয়ে দিয়েছিলেন, মেয়েটাকে নষ্ট করছ কেন?

উত্তর দেয়নি প্রমথ। দুই মাছমারা চুপ করে হাসছিল। মাছটা বাথরুমে। নষ্ট কথাটায় পুরুষলোকের এত সুখ।

কিন্তু গয়না ভুমি না হলেও সুধাকে ভাল লাগছে না। খারাপও লাগছে না। অপমান করা যায় না। ছেড়ে যাওয়া যায় না। সুধা বড় একা। আমি প্রমথ দত্ত, সুধাকে আগে ভালবাসতাম। এখন কি করি জানি না। তবে জানি সুধার সংগে আমার যোগ নেই। অবিনাশদা সেন্ট পারসেন্ট কারেক্ট না হলেও প্রায় ঠিক। কৃতজ্ঞতার এ এক সং সাজানো প্রাণান্ত। সুধা তুমি চলে যাও।

কথা বলছ না যে। আজ তোমার কি হল?

কিছু না। এই ত তোমাদের বাড়ির মোড়। এবারে এস।

আর একটু হাঁটতে আপত্তি আছে। কথাটা বলে সুধা মরে গেল। পুরুষলোক সুধা চেনে। ঘড়িতে আটটা পনের।

প্রমথর আর হাঁটতে ভাল লাগছিল না। সন্ধ্যেটা জলে গেল।

ECHO. 4A-50 BB এরাসমিক কোং লিঃ লণ্ডনের পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত।

অথচ গতকাল সন্ধ্যেবেলা এই সময়টা দিব্যি কেটেছে। গতকাল বিকেল পাঁচটা থেকে নটা অবধি সুধাদের বাড়িতে ছিল। সুধার অফিস ছুটি হয় পোনে পাঁচটায়। এটা ওটা কেনাকাটা করে বাড়ি ফিরতে ছটা সোয়া ছটা বাজে। বিকেলে একটু মেঘ ছিল। সুধার মার জ্বর, পাশের ঘরে শুয়ে। কপালে হাত রেখে বিছানায় কাত হয়ে রেডিও শুনছে অঞ্জু।

প্রমথদা। কখন এলেন। তারপর অস্বস্তি মিশিয়ে বলল, আপনি ঐ চেয়ারটায় বসুন না। একেবারে আপনার দিকে পা ছড়িয়ে শুয়ে আছি। পাপ হবে।

থাকো না। দেখতে ভাল লাগছে।

মুশকিল। আপনাকে নিয়ে হয়রান আমি। লে উঠে বসল। কোলের কাছে হাত জড়ো রা। মেজদি এল বলে। তারপর হেসে বলল, ড় আলোটা জেলে দেব? আমার আবার চাখের যন্ত্রণা কিনা।

না, না থাক।

তবে বসি। বসে দেখল প্রমথ তখনও াকিয়ে আছে। বুকের কাপড়টা টেনে দল। একবার চোখ কোঁচকাল। কি হয়েছে লাকটার। কিছুদিন এমনি তাকিয়ে থাকে সাজাসুজি। আমি অঞ্জু। আমার কি প্রাণ নই। এইত আমি নিঃশ্বাস টানি।

চোখ কুঁচকে চোখে বকলো। আমাকে দখতে পাচ্ছেন না। বড় আলোটা জ্বালি। ারণ করবার আগেই জেলে দিয়ে বসল। সই দেওয়াল। নীল রঙ উঠে গেছে। াগেকার মেনকা আয়না। ইস্কুল কলেজের াল করা বই তাকে। জুতোর র‍্যাক। কাচের ালমারিতে পুঁতির মালার পাশে চীনে-াটির পুতুল। ছাদ ঘেঁষে কখানা ছাতকুড়ো াখান ছবি ঝুলছে। এর মধ্যে অঞ্জু নতুন। য়েস উনিশ। ফোর্থ ইয়ারে পড়ে।

যদি ক'বছর পরে জন্মাতাম অঞ্জু!

তাহলে কি হত। আমাকে পেতেন? ক্ষনো না। মেজদি আসুক বলে দেব।

প্রমথ জানে অঞ্জু বলবে না। অঞ্জুর মথকে ভাল লাগে। কিন্তু প্রমথর কি ভাল াগা ঠিক। এ ত পাপ। মানে অন্যায় আর ক। সুধা বাড়ি নেই।

বড়দি ঘরে ঢুকল। বা পা ফ্রাকচার। াস্টার জড়ানো। টেনে টেনে খাটে এসে সল। প্রমথর চেয়ে অল্প ছোট। তবু মথ বড়দি ডাকে। সুধার লাভার বলে ুধার বড়দি তারও বড়দি।

বিছানায় শুয়ে পড়ল বড়দি।

রাগের ভান করল প্রমথ। এরকম দেখাচ্ছে য়ে। এখনও অফিস থেকে ফেরেনি। কার ংগে মেশে আজকাল?

বড়দি খুশি হল। আজ বকে দেব। তার-পর থেমে বলল, কেনাকাটা করছে বোধহয়।

প্রমথ বড়দির সামনে অঞ্জুকে আমল দিল না। বড়দি ঘরে শুয়ে থাকে। ঠাণ্ডা। তার চোখে ধুলো দেওয়া কঠিন।

অঞ্জু কোমরে কাপড় জড়িয়ে ঘরে ঢুকল, দেশলাইটা দিন মশাই। উনুন জ্বালব।

বড়দি বলল, ঠাকুর বাড়ি গেছে। ফিরতে জানুয়ারী যাবে।

প্রমথ বলল, আমাকে ঠাকুর রাখ। ভাল রাঁধি।

অজয়ও তাই বলছিল। অজয় সকালের ভাত দেবে। তুমি সন্ধ্যের।

অঞ্জু মজা পেল, তাহলেই হয়েছে। চোখ কুঁচকে তাকাল। মনে মনে বলল, দৌড় জানি।

অঞ্জু চলে যেতে বড়দি বলল, সুধার শরীরটা সারছে না মোটে। তারপর এতক্ষণ টইটই।

প্রমথর সংগে সুধা মাঝে মাঝে বেরোয়। কথা বলতে বলতে অনেক হাঁটে। শরীরে পোষায় না। বারণ করলে জেদ বাড়ে—'আরও হাঁটব।'

ভাল ডাক্তার দেখিয়ে কোন টনিক খেলে পারে।

খাওয়ার কিছু কম পড়ছে না। গায়ে লাগে কোথায়? তারপর প্রমথর দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি শক্ত হাতে না ধরলে কিছু হবে না। সে চাকরিটার কি হল?

কত চাকরির জন্যে চিঠি লিখছে প্রমথ। তিন কপি করে টাইপ। ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট। কত দিন আগে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। সে সময়ের ক্লাস থ্রীর ছেলেরাও এম এ পাশ করতে চলল।

ভালবাসার লোকের টাকা দরকার। সবার থেকে আলাদা করে ভালবাসার মত উদ্যোগ চাই। ভাবলেই বন্দী লাগে।

সুধার মা বড়দিকে থার্মোমিটার দেখতে ডাকল। অঞ্জু রান্নাঘরে। রাধু, বিবি পাড়ায় বন্যাত্রাণ কমিটির জলসায় আবৃত্তি করতে গেছে। বড়দি পা টেনে টেনে ওঘরে গেল। সুধার মার গলা শোনা যাচ্ছে। অজয় আসবে। রাধু, বিবি কোথায়। ডাকতে পাঠা।

খচ্ করে দেশলাইটা ছুঁড়ে দিল অঞ্জু। ক্যাচ্ ধরুন। চমকে ধরতে গিয়ে হাত থেকে পড়ে গেল। কিছু না আপনি। শুধু ঘ্যান ঘ্যান করতে পারেন।

অঞ্জু তুমি খুব সুন্দর।

তাই নাকি? জানাতে হচ্ছে মেজদিকে। থেমে বলল, মা বসতে বলেছে। গা ধুয়ে এসে রুটি আর তরকারি দিচ্ছি। তোয়ালে সোপ-কেস হাতে নিয়ে যাওয়ার আগে আর একবার দেখল প্রমথকে। অঞ্জু আমার খুব দরকার তোমাকে। এস। কি করে প্রমথদা এসব বলে। আমি কুকুর না!

পাশের ঘরে ঢুকেই বেরিয়ে এল অঞ্জু। অজয় কখন এসে পড়াতে বসেছে।

প্রমথ দেখেছে। বলল, বেরিয়ে এলে। যাও ওঘরে।

এভাবে যাওয়া যায়? শাড়ি, কোমরে পেঁচান তোয়ালে। চোখ দিয়ে দেখাল।

অজয়ের মাথাটি ত বেশ চিবিয়েছ।

এই মারব!

মার। আমাকে ত তোমার লজ্জা নেই। যত লজ্জা ওঘরে।

হাটের মধ্যে লজ্জা থাকবে না? বলতে বলতে কলতলায় চলে গেল।

একটু পরে বড় আলোটা জেবলে দিয়ে ভিজে চুল বাঁধতে বসল। আয়নায় অঞ্জুর মুখ দেখতে পাচ্ছে প্রমথ।

প্রমথর একঘেয়ে তাকিয়ে থাকা দেখে আয়নায় চোখ মটকে শাসন করল অঞ্জু। প্রমথ চোখ নাবিয়ে ভারি হয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকল। এভাবে তাকিয়ে থাকলে আগের মেয়েটি দুর্বল হয়ে পড়ত। চুল বাঁধা হয়ে গেল। ফিরে বলল, খাবার দিচ্ছি বসুন।

রুটি, বড়ার ঝাল, তরকারি—কম পড়লে খানিক গুড় থালায় করে ধরে দিল।

এমন সময় সুধা ঢুকল। খাবার দেওয়া দেখল।

অঞ্জু দৌড়ে গিয়ে একটা কাপড়ের পুঁটলি কেড়ে নিল সুধার হাত থেকে।

সায়ার কাপড় এনেছিস্?

সুধা চুপ করে অঞ্জুকে দেখল। টেবিল ফ্যানের সামনে গিয়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল।

কোথায় কোথায় ঘুরিস? কখন থেকে বসে আছে। বড়দি বকল।

চোখে কাজল দিলে প্রমথর ভাল লাগে। আজ দিয়েছে। কিচ্ছু দেখল না কিন্তু। মুখের দিকে তাকাবে না। লকেটের ওপর কিংবা বুকের ওপর তাকাচ্ছে। প্রমথর আসায় জল ঢেলে দিতে পারত যদি এক্ষুনি সব শুকিয়ে যেত। টিফিনে ও ছানার পাট তুলে দেবে। কেন যে শরীরটা থাকে।

বস একটু।

বসেই আছি। অঞ্জু চা নিয়ে এল। হাতে চা ধরিয়ে দিয়ে বলল, দেখুন ত চিনি হয়েছে কি না। গম্ভীর মুখ। মেজদি এখন এল কোন। এখন তাকে সবচেয়ে ভাল দেখাচ্ছে। চুলবাঁধা ফিনিস।

প্রমথ সুধাকে বলল, চান করে এস না। বসেই আছি। একই নিঃশ্বাসে অঞ্জুকে বলল, ভাল হয়েছে চা। আদা দিয়েছ বুঝি?

হু। আদায় মাথাটা ছাড়বে আপনার। হেসে পাশের ঘরে গেল। প্রমথ নড়ে চড়ে বসল।

যদি ক'বছর পরে জন্মাতাম। কি হত। যন্ত্রণায় পড়ত না। কালো ঝকঝকে মণি, গাদা করা চুলের খোঁপার ঘাড় ঠেলে মাথায়, শাড়ির জরির সংগে অঞ্জু মিশে আছে মাঝের পর্দাটা দরজার ওপর তোলা।

কাকের মত একটু জল ছুঁয়ে চলে এল সুধা। অঞ্জুকে একা রাখা ঠিক না।

ওরকম কলসীবাবুর মত সেজে এসেছ কেন? পাঞ্জাবির ওপরের দুটো বোতাম খুলে দেও। সুধা ধমকাল।

শীত করছিল বলে বোতাম দুটো একটু আগে আটকে ছিল। খুলে দিল। হাই ভেঙে সুধা বলল, উঃ। কদিন ধরে অফিসের ছেলেগুলো আসছে। সেই কবে বিজয়া গেছে। এখনও মাসীমা বলে প্রণাম করতে আসে। বুঝলি বড়দি, কাল ঘোষ বলছিল আসবে। দিলাম বলে, রবিবার কাটোয়া যাচ্ছি। প্রমথর দিকে ফিরে বলল, বলত কাহাতক পারা যায়। পয়সার একটা খরচ আছে ত।

প্রমথ পয়সার কথায় কুঁচকে বসে থাকল। সুধা সাতাশ টাকা পায়। দেওয়া হয়নি।

প্রমথকে চুপ দেখে সুধা বলল, তারপর। মাথার ওপর চুল চুড়ো করা। এবারে আঁচড়াবে। প্রমথ এতক্ষণ যেন সুধাকে একটা লম্বা গল্প বলছিল। শুধু শেষটা বাকি।

আপনার শুভাশুভ ব্যবসা, অর্থ, পরীক্ষা, বিবাহ, মোকদ্দমা, বিবাদ বাঞ্ছিতলাভ প্রভৃতি সমস্যার নির্ভুল সমাধান জন্য জন্ম সময়, সন ও তারিখ সহ ২, টাকা পাঠাইলে জানান হইবে। ভট্টপল্লীর পুরশ্চরণসিদ্ধ অব্যর্থ ফলপ্রদ—নবগ্রহ কবচ ৭,, শনি ৫,, ধনদা ১১,, বগলামুখী ১৮,, সরস্বতী ১১,, আকর্ষণী ৭,।

সারাজীবনের বর্ষফল ঠিকুজী—১০, টাকা

অর্ডারের সংগে নাম গোত্র জানাইবেন। জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য বিশ্বস্ততার সহিত করা হয়। পত্রে জ্ঞাত হউন।

ঠিকানা — অধ্যক্ষ ভট্টপল্লী জ্যোতিঃসঙ্ঘ
পোঃ ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা।

খাবার দেখে ভয় হচ্ছে?

হিউলেট্স
মিকশ্চার

খাওয়া দাওয়ার পরে পাকস্থলীর ব্যথায় দীর্ঘস্থায়ী আরাম এনে দেবে।

সি, জে, হিউলেট এণ্ড সন (ইণ্ডিয়া)
প্রাইভেট লিমিটেড
৮৬।এ, নাইনিয়াপ্পা নায়ক স্ট্রীট
মাদ্রাজ-৩

TCH 1137

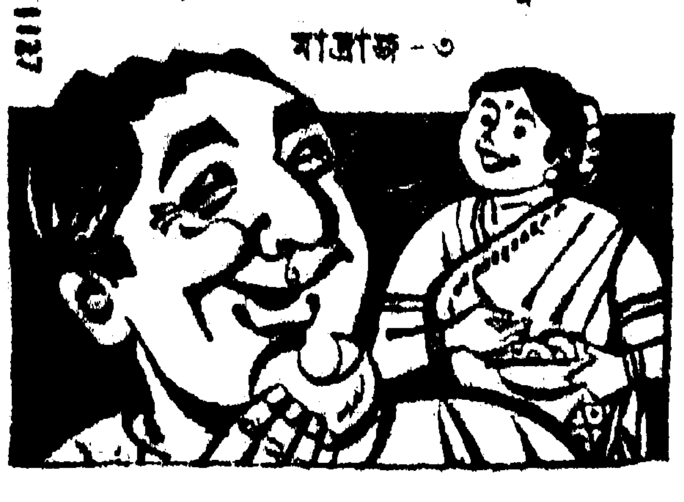

রোববার নিত্যর বান্ধবীর ওখানে গেলাম। নিত্য নিয়ে গেল। মেয়েটির খুব পছন্দ আমাকে।

বেশ।

থাম। সব বলি আগে। নিজের জন্যে না। মেয়েটির ছোটবোন চায়নার জন্যে।

দেখা হল?

না। মধ্যমগ্রাম থেকে এসে দিদির হস্টেলে সারাদিন ছিল। দিদি নার্স। সন্ধ্যের ট্রেনে ফিরে গেছে। না হলে ফিরতে রাত্তির হয়ে যাবে। আমাদের পেঁছনোর খানিক আগে। নিত্য ত আগে বলেনি, কারও সঙ্গে দেখা করতে হবে। জানলে আরও আগে যেতাম।

সামনের দিন শেয়ালদায় গিয়ে রিসিভ করে এনো। দেখা হয় যেন।

চিনি না ত। ধ্যুস্ পাগল হয়েছ। মোটে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে।

তাই ত ভাল। একেবারে ডাশা।

সুধার সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা বলা যায় না। চোখ মুখ ওলটালে খারাপ দেখায়। তাই করছে। এবারে খুব যা তা লাগল। ডাশা মেয়ে ভাল। কথাটা মনে এলেও, মুখে খারাপ লাগে। অবিনাশদা গরুর খাবার ভুষিমালের কথা বলেছিল। কে পশু। প্রমথ পশু। সুধা। সুধা ডাশা বলল কেন। এমন কথা বলি না আমি।

প্রমথ অঞ্জুকে দেখবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। সুধা রুটি খেতে গেছে। এখন অনেকক্ষণ চিবোবে। অজয় হাতপাখা'র কাঠি ভাঙছে বসে বসে। মজা কুড়োচ্ছে অঞ্জু। আলনার কাপড়ের পাশে দাঁড়িয়ে একটা একটা করে কথা ছাড়ছে। সুধার মা বালিশে হেলান দিয়ে সকালের কাগজ দেখছে।

প্রমথ অজয়ের পেছনে খাটে এসে বসল। অঞ্জু দেখল পাশের ঘরে মেজদি রুটি খুঁজছে মিটসেফে। দেখে মার পাশে গিয়ে বসল।

সুধার মা ঝাঁঝি দিয়ে উঠল, তুই পড়না গিয়ে।

হাইড্রোসিল (একশিরা)
কোষসংক্রান্ত যাবতীয় রোগের জন্য
ডাঃ কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, এম বি (ক্যাল)
দি ন্যাশনাল ফার্মেসী
(স্থাপিত ১৯১৬)
৯৬-৯৭, লোয়ার চিৎপুর রোড (দোতলায়)
কলিকাতা-৭
প্রবেশ পথ—হ্যারিসন রোডের উপর, জংশনের পশ্চিমে তৃতীয় ডাক্তারখানা।
ফোন: ৩৩-৬৫৮০। সাক্ষাৎ সকাল ৯টা হইতে রাত্রি ৮টা। রবিবারও খোলা থাকে।
(সি-৮২৮৬)

প্রমথদার সামনে চেঁচিয়ে পড়তে লজ্জা করে। মুখে হাসি।

সুধার মা অঞ্জুকে কি বলল। শুনতে পেল না প্রমথ। বুঝতে পারল, সন্ধেবেলা তার আসাতে বাড়ির পড়াশুনোর অসুবিধে হচ্ছে। অঞ্জু ঝগড়া করে উঠে দাঁড়াল।

ব্যাপার বুঝে এ ঘরে চলে এল প্রমথ।

বড়দির সঙ্গে কথা হল খানিক। ছুটি-ছাটা'র সুবিধে কতখানি। এসব।

সুধা বলল, কাল সিনেমায় যাবে?

কথাটা শোনার আগেই কি যেন বলবে ঠিক করে রেখেছিল প্রমথ। বলে ফেলল, অঞ্জু কোথায়?

ঐ ত জানলায় বসে। আঙুল দিয়ে দেখাল সুধা। দেখিয়ে রাগ হল। তুমি পুরুষলোক প্রমথ। আমার ছোটবোনের খোঁজে তোমার কি এত দরকার? অঞ্জুও বলিহারি। ছবির হিরোইনের মত শাড়িতে পা মুড়ে খোঁপা ভেঙে জানালার শিকে মাথা রেখে কাঁদতে বসেছে। আজকে অঞ্জু সন্ধ্যে থেকে হাওয়ায় ভাসছে। প্রমথই ভাসাচ্ছে। মা'র যত বাড়াবাড়ি। একদিন পড়া বন্ধ থাকলে কি ক্ষতি!

অঞ্জুও চলুক।

সুধা ডেকে বলল, শোন্। কাল আমার আর তোর প্রমথদার সঙ্গে সিনেমায় যাবি?

অঞ্জু কথা বলল না।

প্রমথ বলল, কোথায় দাঁড়াব?

সিনেমা হলে এস। অঞ্জু আগে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে টিকিট নিয়ে। ভোরে কলেজ যাওয়ার পথে কেটে রাখবেখন।

হাঁটতে হাঁটতে পার্কের কাছে এসে পড়েছে। এখন প্রমথকে বাড়ি নিয়ে যাবে না সুধা। বাড়িতে অঞ্জু আছে। অঞ্জু প্রমথকে ভেড়া করে দেবে। কিংবা অঞ্জুর টিকিট না পাওয়ার গল্পটা মিথ্যে তা জেনে ফেলবে। আর এখনও ত ছবি ভাঙেনি। সাড়ে আটটা। সুধা আর প্রমথ এখন সিনেমা হলে বসে আছে। সামনের পর্দায় ছবি।

অনেক হেঁটেছ। এবারে বাড়ি ফের। খিধে পায়না তোমার। প্রমথ নরম করে বলতে পারল না। প্রমথর সঙ্গে সুধা হাঁটছে। সুধার সঙ্গে প্রমথর কৃতজ্ঞতার যোগ। সুধা প্রমথকে ভালবাসে। প্রমথ পারে না। না, পেরে কষ্ট পায়।

প্রমথ আজ ঠিক করেছিল আগে এসে সিনেমা হলের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অঞ্জুর সঙ্গে কথা বলবে। ভিড়ের মধ্যে কেউ শুনতে পাবে না।

অঞ্জু দেখ। আমার খুব কষ্ট হয়। তুমি এস।

বাঃ! এই ত দাঁড়িয়ে আছি। ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বলবে। যেন ভিড় একটা ছবি। হঠাৎ ফিরে বলবে, মেজদি খুব কাঁদবে। তখন অঞ্জুর চোখও ভারী লাগবে।

কথা হাতড়াতে থাকবে প্রমথ। তোমার মেজদি আমার জন্যে অনেক করে। কিন্তু—

মাথা ঝাঁকিয়ে তাকাবে অঞ্জু। 'বুঝি'। কি বলতে যাবে আরও। সুধা ট্রাম থেকে নেমে খুশি চাপতে চাপতে কাছে এসে দাঁড়াবে। একসঙ্গে সিনেমায় যাওয়ার মজা। দুজনের কথা বন্ধ হয়ে যাবে। সুধা প্রথমে রেস্টু-রেন্টে নিয়ে তুলবে। বলবে, কি বৃষ্টি! উঃ! কি খাবে?

প্রমথ অস্পষ্ট স্বরে বলবে—রাধাবল্লভী। অঞ্জু বলবে, কাটলেট।

সুধা তার পাশে। শক্ত করে বলল, না খিদে পায় না। আমি একটু মার্কেটে যাব। দুটো আপেল নেব।

বৃষ্টি থামলেও ঠান্ডা হওয়া দিচ্ছে।

প্রমথ বলল, সন্ধেটাই মাটি। সিনেমা ত গয়া। বাড়িতেও নিয়ে যাবে না। থেমে বলল, অবিনাশদার ওখানে যাচ্ছি একটু। তোমার কথায় বেরোলাম। এখন কোথাও ত যেতেই হবে।

সুধা প্রমথর মনের অশান্তি মাপতে গেল। প্রমথটা কি! আমি প্রমথর সম্পত্তি না। দেমাক আছে ষোল আনা। 'আমি সুধাকে ভোলাতে পারি'। ভাজাউলি তাকাচ্ছে। মর মাগী। সব প্রমথর জন্যে। বুলি আছে। কায়দা জানে। কায়দা নিয়ে সুখী থাক প্রমথ! এভাবে বাঁচবে না তুমি প্রমথ। এই জন্যে তুমি সন্ধ্যেবেলা সাজগোজ করে আমাদের বাড়ি এসে বসে থাক। তখন তোমাকে ভাল দেখায়। শেষ অবধি একই, একই শেষ।

প্রমথ বাসে উঠল।

জানলা ঘেঁষে দোতলায় বসল। সুধা মার্কেটে যাচ্ছে। সবুজ আপেল নেবে দুটো। সি ভিটামিন থাকে। দুদিনের টিফিন। বিখ্যাত ইংরাজী প্রবাদ মেনে চলে সুধা। দৈনিক একটা আপেল।—বাকিটা কি। মনে পড়ছে না। বাকিটা বোধ হয় আয়ু। যদি লাবণ্য হয়! গ্লেজ। চেহারা খোলে। ঘাড়ে, গলায়, হাতে মাংস হয়।

সুধা, প্রমথ একা। খুব একা। হাত পা নাক মুখ চোখ রঙ চুল ভাল না হলে টান শুকোয় কেন সুধা। ভালবাসা কি সুধা। সুধা জানে না। সুধা জানে একটা লোকের জন্যে কষ্ট হলে তার জন্যে টান হলে তার নাম ভালবাসা। তোমার জন্যে আমার কষ্ট হয় সুধা। আমি তোমাকে ভালবাসি না। ভালবাসতে না পেরে কষ্ট হয় আমার। আমি তোমার আগেকার লাভার—এখনকার কি—তা জানি না।

এবারে নীল আলো জ্বলল। ডবল ডেকার ঝাঁকি খেয়ে চলতে শুরু করেছে। সামনে পার্ক স্ট্রীট। এখন অনেকক্ষণ হুহু করে চলবে।

॥ ৭ ॥

—ওরে টেলিস্কোপটা নিয়ে যেতে ভুলিসনে। সেটা কোথায় গেল দেখ তো!

পুরোনো বইএর আলমারিতে সারি দেওয়া বইএর পিছনে ধুলোর মধ্যে পড়ে ছিল চামড়ার খাপে মোড়া বহুদিনের দূরবীনটা। দাদামশায় সেটাকে নিয়ে পরিষ্কার করতে বসলেন।

এটাকে নিয়ে যেতে হবে দার্জিলিং-এ। দার্জিলিং যাবার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। দাদামশায় এটা বাছছেন ওটা বাছছেন। রং তুলি কাগজ বোর্ড লাঠি আর ঐ টেলিসকোপ।

—পাহাড়ে অনেক দূরে চোখ চলে। দূরবীন না হলে হয়?

রীতিমত লটবহর নিয়ে তবে দার্জিলিং যাওয়া। গোছ-গাছ করতে ক-দিন চলে গেল। নীল রং-এর ডোরা কাটা বড় বড় সতরঞ্চি মুড়ে ঢাউস ঢাউস বিছানা বাঁধা হল। পেট-মোটা কাঠের সিন্দুকে বাসন কোসন। টিনের আর চামড়ার ট্রাঙ্ক-এ গরম কাপড় জুতো মোজা গেঞ্জি। আর ঝুড়ি ভরা ভরা খাবার রাস্তার খাবার জন্যে।

যাবার দিন দাদামশায় সকলের আগে তৈরী। প্রায় ঘণ্টা তিনেক আগে কাপড় ছেড়ে, হাতে লাঠি, মুখে চুরুট নিয়ে বসে আর সবাইকে তাড়া দিচ্ছেন।

দিদিমা বলছেন—তোমার যেমন! এত তাড়াতাড়ি গিয়ে কি হবে?

দাদামশায় বোঝাচ্ছেন—এখানে বসে থেকেই বা হবে কি? তার চেয়ে স্টেশনে গিয়ে বসে থাকা যাক।

একবার বেরিয়ে পড়তে পারলে তবে নিশ্চিন্ত। এরকম প্রায়ই দেখেছি। একবার ইণ্ডিয়ান সোসাইটির মিটিং-এ যাবেন, মিটিং সাড়ে ছটায়, দাদামশায় তিনটের সময় তৈরী হয়ে মিশির ড্রাইভারকে গাড়ি আনতে হুকুম দিচ্ছেন।

শরীরটা এই সময় ভালো আছে, এই বেলা বেরিয়ে পড়ি। পরে আবার শরীরটা কেমন হয় কে জানে?

ট্রেনে ভোরবেলা ঠেলে তুলেছেন আমাদের। সোজা উত্তরমুখো চলেছে ট্রেন, তখনও শিলিগুড়ি পৌঁছতে কিছু দেরি। নীল আকাশের বুকে হিমালয়ের বরফ-চুড়ো পূব থেকে পশ্চিম অবধি টানা। দাদামশায় বলছেন—দেখে নে, দেখে নে। ঐ দেখ মহাদেব শুয়ে আছেন নাক উঁচু করে।

ভোরের আকাশের পটে হালকা সাদায় আঁকা অমন ছবি আমরা কি আর দেখেছি কখনও? আমরা তো হাঁ হয়ে গেছি। দাদামশায় এদিকে ট্রেনের মধ্যে মহা হই চই লাগিয়ে দিয়েছেন।—টেলিস্কোপটা গেল কোথায়? কোন্ বাক্সে রাখা হয়েছে? কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। গেল নাকি হারিয়ে? ফেলেই আসা হল নাকি বাড়িতে?

দাদামশায় হতাশ হয়ে বললেন—গেল এতদিনের দূরবীনটা। দার্জিলিং যাওয়াটাই দেখছি এবারে মাটি।

শুনে দিদিমা বললেন—যাবে কেন? তোমার দূরবীন তো বড়বিছানার মধ্যে প্যাক করা হয়েছে।

বড়-বিছানা মানে সে এক বিরাট ব্যাপার! গদি, তোশক, বালিশ, লেপ, কম্বল থেকে আরম্ভ করে জুতো, লাঠি, আমাদের খেলনাপত্র বই সব কিছু তার মধ্যে। চারিদিক তার আষ্টে পৃষ্ঠে দড়ি দিয়ে এমন করে বাঁধা যে এই ট্রেনের কামরায় তাকে খোলা অসম্ভব।

দাদামশায় শুনে বললেন—ওঃ তাই বল। যা ভাবনা হয়েছিল। তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন—কাঞ্চনজঙ্ঘাকে চট্ করে তোদের হাতের কাছে এনে দেব ভেবে ছিলুম। তা দেখছি তোদের কপালে নেই।

আমরা তখনও মুগ্ধ হয়ে দূর কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য দেখছি।

পাহাড়ে উঠে দার্জিলিং-এর হাড়-কাঁপানো শীতে আমরা সব জবু থবু হয়ে গেলুম। দিনের বেলা রোদে গিয়ে বসতুম আর রাত্রে কাঠের আগুন জেনলে সকলে মিলে গোল হয়ে বসে গল্প করতুম। আর একবার লেপের মধ্যে ঢুকে পড়লে সহজে বেরতে চাইতুম না। হরিদাসী পাশের ঘরে বসে আগুন পোয়াতো, হী হী করে কাঁপত আর একঘেয়ে সুরে বলে যেত—এ কোন্ দেশে আনলে গো? এ দেশ যে এদের বড্ড ভালো লেগেছে গো! এরা যে যাবার নামটি করে না গো! এরা কবে যাবে গো! আমরা শুনতুম আর খুব হাসতুম।

সকলের মত আমিও বেশ বেলা করে উঠতুম। রোদ না উঠলে বিছানা ছাড়তে চাইতুম না। কিন্তু একদিন কি খেয়াল হল, উঠে পড়লুম ভোরে। তখনও আধা অন্ধকার। বাড়ির মধ্যে ঘুম থেকে কেউ ওঠে নি। বাইরে কুয়াশার পর্দা। উঠে মুখ ধুয়ে গরম কাপড় পরে কাঁচের জানলা ঘেরা কাঠের বারান্দায় এসেছি, শুনি ভারি পায়ের মশ্

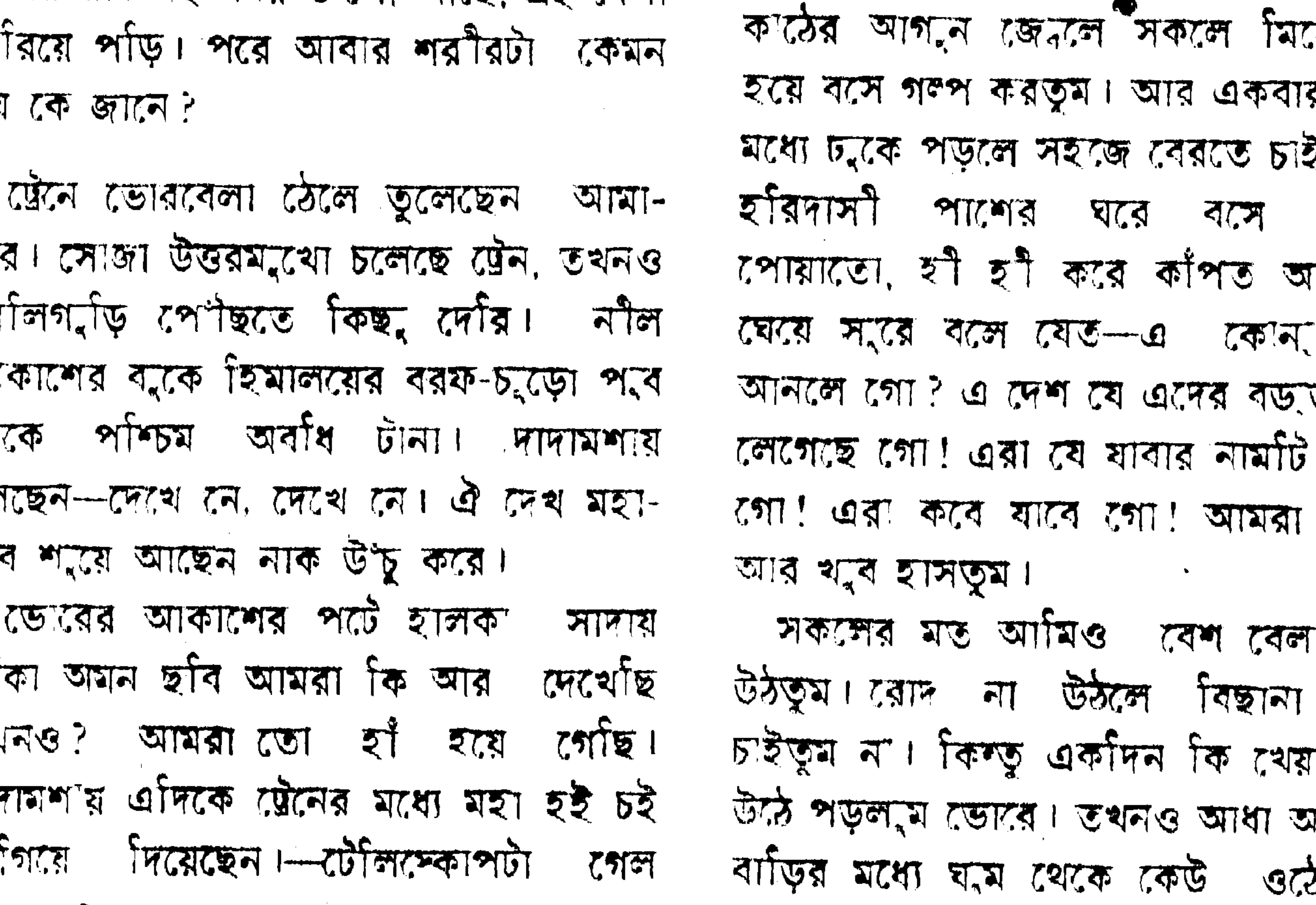

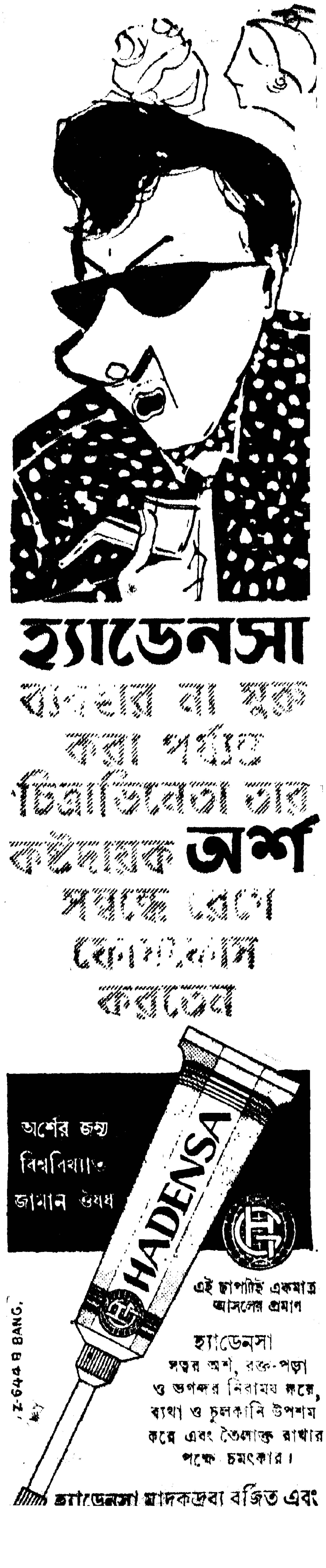

মশ্‌ শব্দ। দেখি অন্য দিক দিয়ে দাদামশায় বারান্দায় ঢুকছেন।

আমায় দেখতে পেয়ে খুশী। বললেন—কি রে? উঠে পড়েছিস? এখানে ভোরেই মজা। চল্‌ তোকে দেখাই। তার আগে খেয়ে নে কিছু।

বুঝলুম দাদামশায় রোজই ভোরে ওঠা অভ্যেস। আমি বললুম—খাবো কি? এই সকালে কে খাবার দেবে আমায়?

দাদামশায় বললেন—আয় না। বলে আমায় নিয়ে ঢুকলেন খবার ঘরে। সেখানে জাল-দেওয়া আলমারিতে খাবার থাকে জানতুম, কিন্তু সে-সব আলমারিতে হাত দেওয়া আমাদের বারণ। দাদামশায় নিজেই টেনে খুললেন জাল-দেওয়া পাল্লাটা। তার ভিতর থেকে বার করলেন মস্ত একটা কেক!

সেই কেক থেকে এই এতটুকু করে আমাদের প্রত্যেকের সাড়ে আটটার সময় বরাদ্দ এই আমি জানতুম। দাদামশায় ছুরি দেখিয়ে বললেন—কাট্‌ বড় দেখে দুটো টুকরো। আমি ইতস্তত করছি দেখে বললেন—কাট্‌ না ভয় কি? ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ। কেক দুটো পকেটে ফেলে চল বেরিয়ে পড়ি।

তখন আর আমায় পায় কে? পরেন্টু গোছের দু-টুকরো কেক হাতে নিয়ে দাদামশায় আর নাতি বেরিয়ে পড়লুম। আঃ, সেদিন কেক খেতে যা ভালো লেগেছিল। অমন কেক সারা জীবনে খাইনি।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে চললুম দু-জনে গাছ-পালার আড়ালে আড়ালে। বেশ শীত। দাদামশায় গায়ে পা পর্যন্ত ঢাকা লম্বা তিব্বতী বকু, মাথায় মখমলের টুপি। আমার গায়ে বেখাপ্পা ওভারকোট, তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে শীতে কুঁকড়ে চলেছি। মুখের উপর ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া কিন্তু ভারি চমৎকার লাগছে। পাকদণ্ডি দিয়ে খানিকটা উঠেই দাদামশায় থামলেন। ঘন গাছের আড়ালে খানিকটা ফাঁক। তারই মধ্যে দিয়ে দেখা যায় কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ো। ঠিক যেন ফ্রেমে আঁটা একখানি ছবি। বরফের রং তখনও পাঙাশ, যেন মৃতের মতো।

দাদামশায় বললেন—এক্ষুনি জেগে উঠবে। দেখ্‌ না কি কাণ্ড হয়। তুই দাঁড়া ঐখানটায়। আমি একটু বসি। বলে একটা ওপড়ানো পাইন গাছের উপর বসে বকুর পকেট থেকে একটা বর্মা চুরুট বার করে ধরালেন।

আমাদের চোখের সামনে কুয়াশা আস্তে আস্তে ভোরের হাওয়ায় সরে যাচ্ছে। খানিক পরেই হঠাৎ কোথা থেকে আলো এসে পড়ল বরফের চূড়োয়। তারপর মুহূর্তে মুহূর্তে বদলে যেতে থাকলো বরফের চেহারা, আকাশের চেহারা! জেগে উঠতে থাকলো পৃথিবী। রং-এর আর আলোর ঢেউ বয়ে গেল চারিদিকে। আর সমস্ত [illegible] ফ্রেমে আঁটা [illegible] স্থির ছবি যেন

চুপটি করে অনেকক্ষণ ধরে দেখলুম, যতক্ষণ না সূর্য বেশ খানিকটা উঠে পড়লেন আকাশে।

দাদামশায় বললেন—রোজ এমনটি হয় না। কুয়াশা থাকলেই মুশকিল।

আমরা মনের খুশিতে আরো খানিকটা এদিক ওদিক ঘুরে বাড়ি ফিরে এলুম। ততক্ষণে সবাই একে একে উঠতে আরম্ভ করেছেন। আর রান্নাঘরের দিক থেকে ডিম-ভাজার গন্ধ আসছে। দাদামশায় আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপে বললেন—আর একবার হবে! বুঝলুম কেক্‌-এর কথা বলছেন।

এর পর থেকে প্রায় রোজই ভোরে উঠে দাদামশায় প্রথম একচোট হাঁটায় সঙ্গী হতুম আমি।

দ্বিতীয় চোট হাঁটতে বেরুতেন দাদামশায় সকালের খাওয়ার পরেই। অত বড় শিল্পী দার্জিলিং-এ এসেছেন, বনের শোভা, পাহাড়ের শোভা, মেঘের দৃশ্য দেখে বেড়াবেন, পাখির গান শুনবেন, এই বোধ-হয় হওয়া উচিত, কিন্তু দাদামশায় ঘুরতেন বাজারে আর গলিতে। দোকান দেখতেন, পাহাড়ীদের ঘর দেখতেন, তাদের সঙ্গে কথা কইতেন মাঝে মাঝে। মানুষের বসতি যেখানে, সেইখানেই ঘোরা-ফেরা করতেন বেশী। একদিন এইভাবে হাঁটতে হাঁটতে বাজার থেকে উঠে আসছেন মল্‌এর কাছে এমন সময় চোখে পড়ল সামনেই একটা ঝুটোপুটি হচ্ছে। দেখেন, একটি ভুটিয়া মেয়ে রাস্তার ধারে চীনে-বাদাম সাজিয়ে বসেছিল, দু-তিনটে সায়েবদের ছেলে তাই উলটিয়ে ফেলে ছড়িয়ে দিচ্ছে, ভুটিয়া মেয়েটি সামলাতে পারছে না।

এই আর দাদামশায়কে পায় কে? লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে গেলেন। ছেলেগুলোও তেমনি বাঁদরা—তাড়া খেয়ে পালিয়ে গিয়ে আবার রুখে আসে। কে জানে, হয়তো কোনো লাট-বেলাট-এর ছেলে, তখন তো সায়েবদের রাজত্ব। ছেলেগুলোর সঙ্গে এক চাপরাসী—সে রুখে আসে আরো বেশী। যাই হোক, দাদামশায় উঁচানো লাঠি দেখে লাট-পুত্রই হোক আর উজির-পুত্রই হোক তারা তো পালালো। ভুটিয়া মেয়েটিও তার ছড়ানো চীনে-বাদাম গুছিয়ে নিলে।

দাদামশায় তার পরদিন যখন মল্‌এ এসেছেন, দেখেন সেই ছোট্ট চীনে-বাদাম-ওয়ালী হাতে একটি ছোট্ট চীনে-বাদামের ঠোঙা নিয়ে উঠে এসে দিতে চাইছে। দাদামশায় বলেন—আরে চীনে-বাদাম নিয়ে আমি কি করব? সে তবু বলে—নাও। দাদামশায় বললেন—চীনে-বাদাম আমার হজম হবে না রে! রেখে দে তুই। এই বলে পাশ কাটালেন। তারপর থেকে যখনই দাদামশায় মল্‌-এ যেতেন, সেই ভুটিয়া মেয়েটি দেখতে পেলেই দাদামশাকে এক-ঠোঙা চীনে-বাদাম দেবার চেষ্টা করত।

অনেক বছর পরে শ্নেছিলুম, দাদামশায় যেবার কার্শিয়াং পাহাড়ে গিয়েছিলেন সেই-বার। কার্শিয়াং থেকে একদিন দার্জিলিংএ বেড়াতে গেছেন। মল্-এ এসেছেন। হঠাৎ কোথা থেকে সেই ভুটিয়া মেয়ে হাতে এক ঠোঙা চীনে-বাদাম নিয়ে ছুটে এসেছে। তখন সে আর ছোট্টটি নেই, বড় হয়ে গেছে। তার বাপকে সুদ্ধ ধরে নিয়ে এসেছে দেখাবার জন্যে। এতদিন পরে তার সেই পুরোনো উপকারী বন্ধুকে দেখে কত খুশী! দাদামশায় এত বার তার দেওয়া চীনে-বাদাম ফিরিয়ে দিয়ে এসেছেন, এবারে কিন্তু আর পারলেন না। নিতে হল। কার্সিয়াং-এ ফিরে এসে গল্পখানা আমাদের বলে বললেন—চীনে-বাদাম-ওয়ালী কি না তাই ঠিক চিনে ফেলেছে।

সকালের বেড়ানো থেকে ফিরে এসে দাদা-মশায় ছবি আঁকতে বসতেন অথবা টেলি-স্কোপ নিয়ে দেখতেন। বাড়ির সামনের জমিতে বাঁশের খুঁটি পুঁতে টেলিস্কোপ বসাবার একটা স্ট্যান্ড তৈরী করা হয়েছিল। তাইতে দূরবীনটা বসিয়ে পাহাড়ের শ্রেণীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখা যেত। দুপুর বেলাও খাওয়া দাওয়ার পর ছবি আঁকা বা দূরবীন দেখা চলত। আমা-দেরও দূরবীন দেখতে দিতেন। অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন দাদামশায় এই দূরবীন নিয়ে। দূরের পাহাড়ে একটি ছোট্ট পাহাড়ী গ্রাম ছিল। সামান্য কয়েকটি ঘরের একটি ছোট্ট বস্তি। গ্রামের বাচ্চা ছেলেমেয়ে গুলো ছাগল আর হাঁস চরাতো। দুপুরে বেলাকার নিঝুম গ্রাম। গাঁয়ের মরদরা কাজে বেরিয়ে গেছে। বাচ্চারা কে কোথায় লুকিয়েছে কোনো চিহ্ন নেই। সব চুপচাপ। হঠাৎ এক কুটিরের দরজা খুলে গেল। দরজার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল এক পাহাড়ী মা। চেঁচিয়ে ডাকল যেন কাকে। দূরবীনের মধ্যে দিয়ে শব্দ শোনা গেল না বটে কিন্তু দেখা গেল লাফাতে লাফাতে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে একপাল হাঁস খেদিয়ে বাড়ির দিকে ফিরছে। পাহাড়ী-মায়ের হাতে একটা টুকরি। তার থেকে এক খাবলা কি বার করে ছেলেটার আর মেয়েটার হাতে দিল। তারা বসে গেল দরজার চৌকাঠে খেতে। হাঁসগুলো কিল্‌বিল্ করে ঘুরে বেড়াতে লাগলো কুটিরের আশে পাশে। শুধু-চোখে এ-সব কিছুই দেখা যেত না। দাদামশায় দূর-বীন দিয়ে বায়োস্কোপের মতো দেখতেন।

একদিন দুপুর বেলা হঠাৎ দাদামশায় গলা শোনা গেল— দেখে যা, দেখে যা! ওরে মোহনলাল কোথায় গেল, ডাক ডাক!

আমরা সবাই কাচের ঘরে বসেছিলুম, কেউ বই নিয়ে, কেউ অর্ধনিদ্রার কোলে। তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে এলুম।

দাদামশায় বললেন—চোখ লাগিয়ে দেখ। [illegible] নির্ঝরের [illegible]!

দূরবীনে চোখ দিয়ে দেখি বরফ আর বরফ।

দাদামশায় বললেন—দেখতে পাচ্ছিস না?

—শুধু তো বরফ দেখছি।

—দেখি। আবার নড়াস্‌নি টেলি-স্কোপটাকে। বলে নিজে চোখ দিলেন।

—ঐ তো ছোট্ট একটি ঝরনা। দেখ ভাল করে। ঝুর-ঝুর করে জল পড়ছে।

তখন ভালো করে সবাই আমরা একে একে দেখলুম। বেশ স্পষ্ট একটা ঝরনা দেখা গেল বহুদূরে হিমালয়ের কোলে।

দাদামশায় বললেন—দেখছিলুম বসে বসে পাহাড়ের দৃশ্য। বরফের দিকে টেলি-স্কোপটাকে ঘুরিয়ে দেখছি, হঠাৎ মনে হল কি একটা নড়ছে। বরফের উপর কোনো প্রকাণ্ড জন্তু না কি—তাই মনে হল। তারপর দেখলুম একটা মস্ত বরফের ধস্—হুড়মুড় করে [illegible] পড়ল। তার সংগে তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল ঐ নদীটা। এতদূর থেকে দেখছি—নিশ্চয় প্রকাণ্ড একটা ব্যাপার—কি হচ্ছে ওখানে এখন কে জানে!

সত্যিই কত্তাবাবার নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ!

দাদামশায় বললেন—ভাগ্যিস্ টেলিস্কোপটা এনেছিলুম।

আরে টেলিস্কোপ তো কত লোকেই আনে। তাই বলে হিমালয়ের প্রাচীর ফাটিয়ে স্রোতস্বিনী বেরিয়ে আসছে টেলি-স্কোপের মধ্যে দিয়ে এ দৃশ্য দেখবার ভাগ্য কার হয়।

এরপর থেকে যতদিন দার্জিলিং-এ ছিলেন, দাদামশায় টেলিস্কোপ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেই ঝরনাটা বার বার করে প্রায়ই দেখতেন।

(ক্রমশ)

শান্তিপর্ব

সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

দুর্যোধন পাশাখেলায় হারিয়া গেলেন। প্রথমে রাজকোষের সঞ্চিত অর্থ, তারপরে হীরা-জহরৎ মণি-মাণিক্য, তারপর রাজ্যপাট বাজি রাখিয়াও হারিয়া গেলেন।

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'এইবার কি বাজি রাখিবে?'

দুর্যোধন বলিলেন—'শতভাইয়ের শত স্ত্রী।'

দুর্যোধন আবার হারিলেন। যুধিষ্ঠির বাঁকা হাসিয়া বলিলেন—'দুর্যোধন, আর কি বাজি রাখিবে?'

'তুমিই বল।'

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'বেশ, এ দানে যদি হার, তাহা হইলে, তোমাকে দ্বাদশ বৎসর বনে যাইতে হইবে। আর যদি আমি হারি, তাহা হইলে তুমি যাহা হারিয়াছ—তাহা সমস্তই ফেরৎ পাইবে।'

আবার পাশার দান পড়িল। দুর্যোধন এবারও হারিলেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন—'এবার তোমার অন্তঃপুরের মহিলাদের রাজসভায় আনয়ন কর।'

দুর্যোধন বলিলেন—'আমাদের স্ত্রীরা আমাদের কথা শুনে না। তুমি নিজেই আদেশ কর।'

যুধিষ্ঠির লোক পাঠাইলেন। দুর্যোধনের স্ত্রী তাহাদের হাঁকাইয়া দিয়া বলিলেন—'আমরা অন্তঃপুরে থাকি, তোমরা পুরুষরা বাহিরে কি করিতেছ তাহা জানি না, জানিতেও চাহি না। প্রথমত দুর্যোধন আমাদের পণ রাখিয়াছেন কিনা, রাখিলেও বাজি হারিয়াছেন কিনা, হারিলেও এইরূপ বাজি রাখিবার তাঁহার অধিকার আছে কিনা—এই সমস্তই আগে সাব্যস্ত হউক, তারপর নয় রাজসভায় যাইব।'

ব্যাপার গোলমেলে দেখিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন—'স্ত্রীলোকের সহিত কলহ করিয়া পারা যাইবে না। দুর্যোধন, তুমি তোমার কথা রাখ, রাজ্য ছাড়িয়া একবস্ত্রে বনে চলিয়া যাও।'

দুর্যোধন হাসিয়া বলিলেন—'পাশাটা একটা খেলা। খেলায় হারিয়া কে কবে রাজ্য ছাড়িয়া দেয়? তোমার কি কোনো sportsman spirit নাই?'

যুধিষ্ঠির রাগিয়া বলিলেন—'তুমি প্রকৃত ক্ষত্রিয় হইলে কখনই একথা মুখে আনিতে পারিতে না।'

দুর্যোধন বলিলেন—'তুমি রাজা বটে কিন্তু রাজনীতির কিছুই বোঝ না। আমি বলিতেছি—দ্যুতক্রীড়ায় তুমি অসাধু উপায় অবলম্বন করিয়াছ। তোমার পোষা ইঁদুর সকলের অলক্ষ্যে পাশার দান উল্টাইয়া দিয়াছে। অস্বীকার করিতে পার?'

যুধিষ্ঠির চিৎকার করিয়া উঠিলেন—'কি, এতবড় মিথ্যা কথা! সকলেই সাক্ষী আছে—আমি কোনো জুয়াচুরি করি নাই।'

দুর্যোধনের স্ত্রী তাহাদের হাঁকাইয়া দিয়া বলিলেন

'আমি বলিতেছি—নিশ্চয়ই করিয়াছ।'

'ও, তাহা হইলে তুমি মানিবে না? বেশ, আমি মামলা করিব।'

'তাহাই কর।'

সুপ্রিম কোর্টে মামলা শুরু হইয়া পৃথিবীর উচ্চতম আদালত রাষ্ট্রপুঞ্জে গড়াইল। উভয় পক্ষ জলের মত অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। এ পক্ষের সাক্ষী ও পক্ষের লোক ভাঙ্গাইয়া লইতে লাগিল। ধৃতরাষ্ট্র সাক্ষ্য দিলেন—তিনি অন্ধ কিছুই দেখেন নাই। কর্ণ, দ্রোণ প্রভৃতি সাক্ষ্য দিলেন—তাঁহারা অন্য রাজকার্যে ব্যাপৃত থাকায় খেলার দিকে নজর দেন নাই। কেবল পিতামহ ভীষ্ম সত্য সাক্ষ্য দিলেন। ইহার পরে, দুর্যোধনের পক্ষ হইতে পিতামহ ভীষ্মকে ভীমরতিগ্রস্ত পাগল বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধোপে টিঁকিল না। বার বৎসর পরে রায় বাহির হইল—যুধিষ্ঠির রাজ্যের মালিকানা পাইবেন এবং দুর্যোধনকে বনে যাইতে হইবে। দুর্যোধনের স্ত্রী রাজকীয় আড়ম্বরে রাজ্য মধ্যেই বসবাস করিবেন এবং যুধিষ্ঠির তাহার সকল ব্যয় বহন করিবেন।

বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া, ব্যাণ্ড বাজাইয়া দুর্যোধনের প্রজাদের সম্মুখে যুধিষ্ঠিরের দল বিজয়বার্তা ঘোষণা করিয়া গেল।

দুর্যোধন কিন্তু রাজ্য ছাড়িলেন না

যুধিষ্ঠিরের আবেদনে সর্বোচ্চ আদালত জানাইলেন—আমরা বিচার করিয়া দিতে পারি। কিন্তু কেহ যদি আমাদের নির্দেশ অমান্য করে, তাহা হইলে কিছু করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। এখন যুধিষ্ঠির

যুধিষ্ঠিরকে ঠিক এইভাবে নস্যাৎ করিয়া দিব

যদি বলপ্রয়োগ করেন, তাহা হইলেই তাহা আইনসম্মত হইবে।

অর্জুন বলিলেন—'দাদা, বৃথাই সময় ও অর্থব্যয় হইল, অন্য কোনো উপায় গ্রহণ করা ছাড়া ইহার আর কিছু প্রতিকার নাই।'

কৌরব ও পান্ডব শিবিরে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। দুর্যোধন এক টিপ নস্য লইয়া বলিলেন—'ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি বড় বড় মহারথীরা সকলেই আমার পক্ষে। আমি যুধিষ্ঠিরকে ঠিক এইভাবে নস্যাৎ করিয়া দিব।' পদ্ধতিটাও সকলকে দেখাইলেন।

ইতিমধ্যে এক বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। ভীষ্মের শিবিরে যুধিষ্ঠিরের লোকজন অনেকদিন হইতেই গোপনে আনাগোনা করিতেছিল। তিনি সহসা সদলবলে যুধিষ্ঠিরের শিবিরে যোগদান করিলেন। শক্তিসাম্য নষ্ট হইয়া যাওয়ায় দুর্যোধন মহা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। শকুনি পরামর্শ দিলেন—শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণকে হাত কর। তিনি এখনও কোন শক্তিজোটে যোগদান করেন নাই।

পাদ্যঅর্ঘ লইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিতে গিয়া দুর্যোধন দেখেন—যুধিষ্ঠিরের দলের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি সেখানে আগে-ভাগেই রাজসভা আঁকড়াইয়া বসিয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন—জানি, আগামী মহাযুদ্ধে তুমি আমাকে বরণ করিবার জন্য আসিয়াছ। যুধিষ্ঠিরের আহ্বান আগেই পাইয়াছি। কিন্তু তোমরা উভয়েই আমার কাছে সমান। আমি কাহাকেও অসন্তুষ্ট করিতে পারিব না। আপাতত নানা বিপর্যয়ে যাদবরাজ্য বড়ই হতবল। রাজ্য পুনর্গঠন করিতে হইবে। সৈন্যদল গড়িতে হইবে। অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ার করিতে হইবে। সেজন্য টাকা চাই—প্রচুর টাকা। যদি আমার সাহায্য চাও, তাহা হইলে প্রথমে আমাকে সাহায্য কর।'

দুর্যোধন বলিলেন—'টাকার জন্য ভাবনা নাই। কিন্তু আপনাকে আমার পক্ষে যোগদান করিতেই হইবে।'

শ্রীকৃষ্ণ মুচকি হাসিয়া বলিলেন—'যুধিষ্ঠির কিন্তু এইরূপ কোনো শর্ত আরোপ করে নাই। ভয় নাই, আপাতত আমি কোনো পক্ষেই যোগদান করিতেছি না। আমার নারায়ণী সেনা বহুদিন হইতে মালপো খাইয়া খাইয়া একেবারেই অহিংস হইয়া গিয়াছে। টাকা পাইলে, মাংস খাওয়াইয়া তাহাদিগকে সর্বাগ্রে সহিংস করিতে হইবে। তবে ত তাহারা যুদ্ধ করিতে পারিবে। আরেকটা কথা—আমি নিজে নিরপেক্ষ। তোমরা উভয়েই আমার আত্মীয়; উভয়পক্ষেই আমার শুভেচ্ছা থাকিবে। আমি যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই। তবে যুদ্ধ যদি বাধেই, তবে কোন পক্ষে যোগদান করিব ভাবিয়া দেখিব।—' এই কথা বলিয়া টাকার থলির দিকে একবার ইঙ্গিতপূর্ণ কটাক্ষ করিলেন। দুর্যোধন ইঙ্গিতটা বুঝিলেন। মনে মনে ভাবিলেন —বেটা আচ্ছা ধড়িবাজ ত, গাছেরও খাইবে—তলারও কুড়াইবে। আচ্ছা, আগে কার্যটা উদ্ধার করি, তাহার পর দুই নৌকায় পা দেওয়ার মজাটা ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিব।

দুর্যোধনকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের লোকটি আগাইয়া আসিয়া অনেক শূন্য লাগানো একটি মোটা অঙ্কের চেক শ্রীকৃষ্ণের হাতে দিয়া বলিলেন—'আপাতত যৎসামান্য রাখুন। প্রভু বলিয়া

অন্য কাহারও কাছে আপনার হাত পাতিবার দরকার নাই

দিয়াছেন আপনার টাকার প্রয়োজন হইলেই তাঁহাকে জানাইতে। অন্য কাহারও কাছে আপনার হাত পাতিবার দরকার নাই।'

দুর্যোধন নিজ রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে একটি ব্যাংক চেক পাঠাইয়া দিয়া লিখিলেন—টাকার অংকটা আপনি নিজেই বসাইয়া লইবেন। তবে আমার স্টেট ব্যাংক ছাড়া অন্য কোনো রাজ্যে এই চেক ভাঙ্গানো যাইবে না। তারপর যুধিষ্ঠিরকে একটি কড়া পত্র হাঁকাইলেন—বেশী লোভ করিও না। যাহা পাইয়াছ, তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাক। আমার হাতে আছে অমোঘ অস্ত্র—ব্রহ্মাস্ত্র; তাহার ফরমুলা অন্য কেহ জানে না। প্রয়োজন বুঝিলে তাহা প্রয়োগ করিব। অতএব, সাবধান।

যুধিষ্ঠির কিন্তু মোটেই ভয় পাইলেন না। বলিলেন—তোমার ব্রহ্মাস্ত্রের ভয় আমি অন্তত করি না। মনে করিও না, আমি এতদিন চুপ করিয়া বসিয়া আছি। গুপ্তচরের সাহায্যে তোমার ব্রহ্মাস্ত্রের রহস্য আমি ফাঁস করিয়াছি এবং তদপেক্ষাও শক্তিশালী পাশুপত অস্ত্র তৈরী করিয়াছি। ইচ্ছা করিলে, তাহা দিয়া বিশ্ব ধ্বংস করিতে পারি। তুমি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলে আমিও পাশুপত ছাড়িব।' পুনশ্চ আরো বলিলেন—'কিন্তু তাহাতে লাভ কি? তুমি আমি দুজনেই মরিব। তার চেয়ে এসো না, সন্ধি করি।'

"কী শর্তে?"

"আগামী মহাযুদ্ধে ব্রহ্মাস্ত্র ও পাশুপত অস্ত্র বর্জন করো।"

"রাজী আছি কিন্তু আমারও শর্ত আছে।"

"কী শর্ত?"

"তোমার রাজ্যের চতুর্দিকে এরূপ এক লৌহবেষ্টনী তৈরী করিয়াছ যে, মাছি পর্যন্ত ঢুকিতে পারে না; এই লৌহবেষ্টনী তুলিয়া দিতে হইবে। তোমার অস্ত্রাগার পর্যবেক্ষণ করিতে দিতে হইবে। এবং পাশুপত অস্ত্রের ফরমুলাও বলিয়া দিতে হইবে।"

"বেশ, তাহাই হইবে; আগে আমার শর্ত পূরণ কর।"

"পূরণ করিব। আগে আমার প্রস্তাবটা মানিয়া লও।"

কে আগে করিবে—ইহা লইয়া তুমুল বিতণ্ডা চলিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো মীমাংসাই হইল না। কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করে না—সুতরাং সব আলোচনাই ফাঁসিয়া গেল।

দুর্যোধন শকুনিকে ডাকিয়া বলিলেন—মামা, এবার কি উপায়?

শকুনি অনেক ভাবিয়া বলিলেন—'একটি উপায় আছে। যুধিষ্ঠিরকে পাত্তা না দিয়া যুধিষ্ঠিরের দলের সমস্ত লোক এবং প্রজাদের তোমার দলে টানিতে হইবে।'

"তাহা কি সম্ভব?"

'অসম্ভব নয়। জনসাধারণ অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করিতেছে। তাহারা যুদ্ধ চায় না। শান্তির জন্য পাগল। তুমি এখন যুদ্ধের কথা ছাড়িয়া শান্তির ললিত বাণী শুনাইতে থাক এবং যুধিষ্ঠিরকে একটি রক্তলোলুপ রাক্ষস বলিয়া ক্রমাগত প্রচার

চণ্ডালেরা শ্বেত পারাবত উড়াইতে লাগিল

করিতে থাক। দেখ, তাহার কি চমৎকার ফল হয়।'

দুর্যোধন হুকুম দিলেন—এখন হইতে রাজকোষের অধিকাংশ অর্থ শান্তিপ্রচারে ব্যয়িত হইবে।

গ্রামে গ্রামে শান্তিসেনা তৈয়ারী হইতে লাগিল। নগরে নগরে শান্তি সম্মেলন চলিতে লাগিল।

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'বটে, তবে আমিই শান্তি চাই না?' সুতরাং পাল্টা শান্তি-বাহিনী এবং শান্তি কংগ্রেস সৃষ্টি হইল।

উভয় পক্ষের শান্তিপ্রচারের চোটে দেশের লোকের ঘুম ছুটিয়া গেল। ট্রাম-বাস, বাড়ির প্রাচীর পোস্টারে পোস্টারে ছাইয়া গেল। বড় বড় ঋষিরা শান্তির বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়া বিবৃতি দিতে লাগিলেন। কবিরা শান্তিকাব্য লিখিলেন। শিল্পীরা শান্তি-নাটক অভিনয় করিতে লাগিলেন। অমাত্যেরা শান্তি সফরে বাহির হইলেন। চিত্রকরেরা যুদ্ধের বিভীষিকার ছবি আঁকিতে লাগিলেন। চণ্ডালেরা শ্বেত-পারাবত উড়াইতে লাগিল। শিক্ষকেরা পড়ানো ছাড়িয়া শান্তির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ছাত্রদের নিকট বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। ছাত্রেরা বড় বড় শোভাযাত্রা করিয়া—'শান্তি চাই শান্তি চাই'—বলিয়া আকাশ ফাটাইতে লাগিল। বিশ্বশান্তির জন্য নোবেল প্রাইজ কাহার পাওয়া উচিত—ইহা লইয়া কাগজে তুমুল আলোচনা চলিতে লাগিল। মেয়েরা শান্তি চচ্চড়ী, শান্তি সুক্তনী রাঁধিতে লাগিলেন এবং শান্তিপুরী কাপড়ের উপর শান্তিনিকেতনী নক্সাপাড় বসাইয়া সেই শাড়ি পরিয়া শান্তি সপ্তাহ উদ্‌যাপন করিতে লাগিলেন। শিশুরা কুড়মুড় করিয়া শান্তিনাড়ু চিবাইতে লাগিল। রাজকর্মচারীরা রাজকার্য ছাড়িয়া কেবল শান্তিরক্ষাই করে। প্রজারা খাইতে পায় না, পরিতে পায় না, কিন্তু সেজন্য মারামারি করিতে যায়—তাহাতেই শান্তিভঙ্গ হয়।

দেশবাসী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল—এ কি অশান্তি! সকলেই যদি শান্তি চায়, তাহা হইলে বাধাটা কোথায়? অবশেষে সকলে দল বাঁধিয়া মহর্ষি বেদব্যাসের আশ্রমে গিয়া ধরনা দিল। সমস্ত শুনিয়া বেদব্যাস কহিলেন—বৎসগণ, শান্তি অতি দুর্লভ বস্তু। চাওয়া মাত্রই পাওয়া যায় না। তাহার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিবার ব্রত গ্রহণ করিতে হয়। এজন্য তোমরা প্রস্তুত আছ কি?

"হাঁ প্রভু, আমরা প্রস্তুত।"

"তাহা হইলে, আগামী মহাযুদ্ধে যথা-সর্বস্ব এবং দেহের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত দান করিবার জন্য স্থির সংকল্প হও।"

'হ্যাঁ, আবার যুদ্ধ!'—যুদ্ধের বিভীষিকায় সকলেই আঁতকাইয়া উঠিল।

'হাঁ। যুদ্ধ ছাড়া শান্তির আর কোনো দ্বিতীয় পথ নাই। তবে যুদ্ধ হইলেও ইহা শান্তির জন্য যুদ্ধ। সুতরাং ইহাতে কোনো পাপ নাই।' কৌরব ও পাণ্ডবশিবিরে যুদ্ধের আয়োজন বিদ্যুগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। উভয় শিবির নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইতে লাগিল। বাহিরে শান্তির হল্লাও তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে লাগিল। অস্ত্রনির্ঘোষের সম্মিলিত শব্দে অন্তরীক্ষ যতই গমগম করিতে লাগিল—প্রজাবৃন্দ ভাবিল আসল শান্তি ততই নিকট-বর্তী হইতেছে।

অথ—কুরুক্ষেত্র পর্ব।

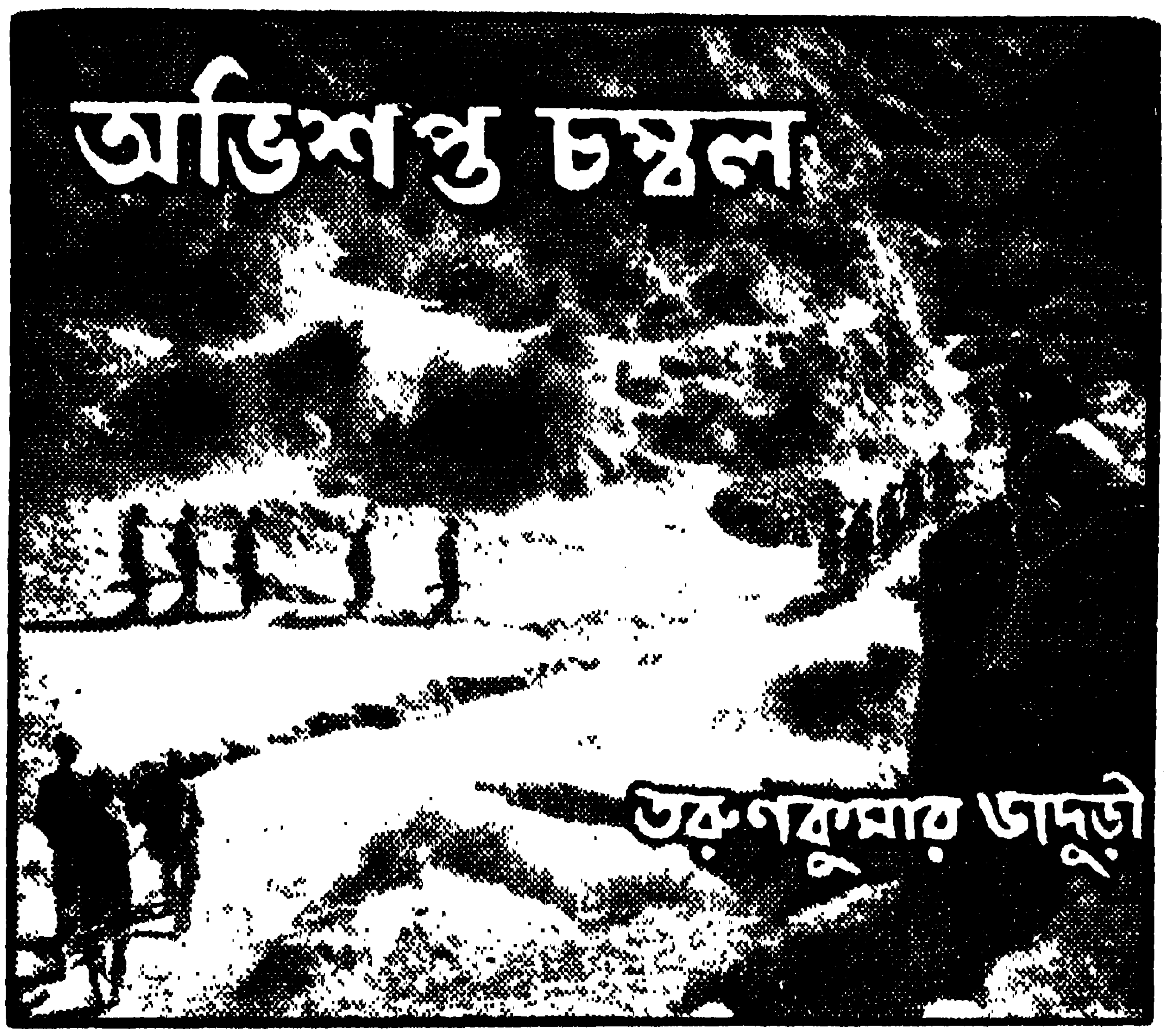

পঁচিশ

ফিরে এসেছে রুক্মিণী আবার উদিত-পুরায়। আর হয়তো কোনোদিন সে ফিরে যাবে না খেড়া-রাঠোড়ে। একদিন সেও থাকবে না আর হয়তো থাকবে না খেড়া-রাঠোড়ে স্মৃতি। অনেক বছর পরে যখন মাটি খুঁড়ে খেড়া রাঠোড়ের বুক থেকে একদিন 'গড়হী' আবার খুঁজে পাওয়া যাবে, কোনো প্রত্নতত্ত্ববিৎ তো তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না, কারণ ইতিহাসে খেড়া-রাঠোরের 'গড়হী' বা মানসিং-এর কোনো দাম নেই। 'গড়হী'র জর্জর কাঠামোটা দাঁড়িয়ে থাকবে শুধু অভিশপ্ত চম্বলের অভিশপ্ত সাক্ষীর মত। চম্বলের পাড় থেকে ভেসে আসা দুরন্ত হাওয়া যখন সেই প্রেতপুরীর ওপর দিয়ে বয়ে যাবে, মনে হবে হাজার হাজার বুভুক্ষ অতৃপ্ত প্রেতাত্মার দীর্ঘশ্বাস—মানসিং, সুবেদার সিং, তলফী-রাম, ছাবরাম, নেতরাম, রুপার দীর্ঘশ্বাস। হয়তো বা রুক্মিণীর দীর্ঘশ্বাস মেশানো ফোঁপানো কান্না।

বলেছিলাম আর কোনোদিন উদিতপুরা যাব না কিন্তু যেতে আমাকে হয়েছিল। আবার দাঁড়িয়েছিলাম রুক্মিণীর বাড়ির সামনে। মুখটা একেবারে আমার কাছে এনে রুক্মিণী বলেছিল 'আও বেটা'।

"কৈয়সী হো মাজী" জিজ্ঞাসা করেছিলাম রুক্মিণীকে।

কেঁদে ফেলেছিল রুক্মিণী। আরো বয়স হয়েছে। দৃষ্টি হয়েছে আরো ক্ষীণ। জীবনের সঙ্গে, দারিদ্র্যের সঙ্গে, অভাব-অনটনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে রুক্মিণী শ্রান্ত। সে হেরে গিয়েছে। অনেকক্ষণ সেদিন বসে-ছিলাম তার কাছে। আদর করে রুক্মিণী আমায় কাছে বসে খাইয়েছে। আমার পাশে বসে খেয়েছে লক্কা, কানহাই আরো সবাই। ওরা চলে গিয়েছে আর আমি বসে থেকেছি বৃদ্ধার পাশে। শতচ্ছিন্ন ময়লা শাড়ী পরনে—রাজা মানসিং-এর স্ত্রী রুক্মিণী আমায় কেঁদে কেঁদে আবার বলেছে তার দুর্দশার কথা।

"জানো বেটা" রুক্মিণী যেন সেই আবার অনেক দূরের মানুষ। "একদিন ছিল যখন আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে এক্কা, আর গরুর গাড়ির লোকেরা ডেকে আদর করে আমায় বসিয়ে যেখানে চেয়েছি পৌঁছে দিয়েছে। এই তো বেশীদিনের কথা নয়। হ্যাঁ এই উদিতপুরায়ই।"

"কেন, এখন কি হয়েছে?"

"এখন?" রুক্মিণী হাসতে চেষ্টা করে। "এখনও তারা বসায়। কিন্তু বসাবার আগে শুধু হেসে জিজ্ঞেস করে, "তেরে পাস পয়সা হ্যায় বুঢ়ী?"

"আমার কিছু চাই না। আমি "জিন্দগীতে" পয়সা, ইজ্জত সব পেয়েছি। আজ নয় কাল আমি মরব। যেদিন আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত শেষ হবে সেদিন আমি মরব। কিন্তু এই যে ছোটো ছোটো নাতী-নাতনী। এদের কান্না, এদের দুঃখ আমি তো আর দেখতে পারি না। আমার কিছু চাই না। আমার তহসীলদারকে আমার বুকে ফিরিয়ে এনে দাও। সে সব ঠিক করে নেবে। সব ক'টাই তো গিয়েছে। শুধু বাকী আমার তহসীলদার। সে ফিরে আসুক। আমি আর কিছু চাই না।"

আবার শীর্ণ আঙুলের কর গোণে রুক্মিণী। আবার চুড়িহীন নিজের খালি হাতটার উপর শীর্ণ আঙুল বোলায়। হয়তো মনে পড়ে যায় সেদিনের কথা যখন বড়ো দুঃখে পাগলের মত চিৎকার করে মানসিংকে বলেছিল "নাও, সাহস না থাকে মেয়েমানুষের মত চুড়ি পরে ঘরে বসে কাঁদো।"

আর বেশীক্ষণ বসতে সাহস হয়নি। যদি আবার রুক্মিণী আমায় সেই প্রশ্ন করে বসে। যখন আমায় বলবে "ইন বাচ্চোঁকো ক্যায়া কসুর?" তখন কি জবাব দেব আমি? আগেও দিতে পারিনি সেদিনও দিতে পারিনি আর আজো আমার কাছে রুক্মিণীর প্রশ্নের জবাব নেই। আর নেই বলেই তো রুক্মিণীর কাছে যেতে আমার সাহস নেই। হয়তো আবার একদিন যেতে হবে উদিত-পুরায় তখন হয়তো আমার কাছে উত্তর

ডাঃ কার্তিক বসুর
টাইকোসোডা | নানালা
অম্ল, অজীর্ণ ও ডিসপেপসিয়ায় | ব্যথা ও বেদনায়
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ - কলিকাতা ৯

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন!
যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র
বহু গুল্ম গাছড়া দ্বারা বিশুদ্ধ মতে প্রস্তুত
বাকলা
ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন
ভারত গভঃ রেজিঃ নং ১৬৮৩৪৪
অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা,
মুখে টকভাব, ঢেকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দাগ্নি, বুকজ্বালা, আহারে অরুচি, স্বল্পনিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ন নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যাঁরা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও বাকলা সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। নিষ্ফলে মূল্য ফেরৎ।
৩২ তোলার প্রতি কৌটা ৩্ টাকা, একত্রে ৩ কৌটা — ৮॥ আনা। ডাঃ মাঃ ও পাইকারী দর পৃথক।
দি বাকলা ঔষধালয়। হেড অফিস - বরিশাল (পূর্ব্ব পাকিস্তান) ব্রাঞ্চ-১৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৭

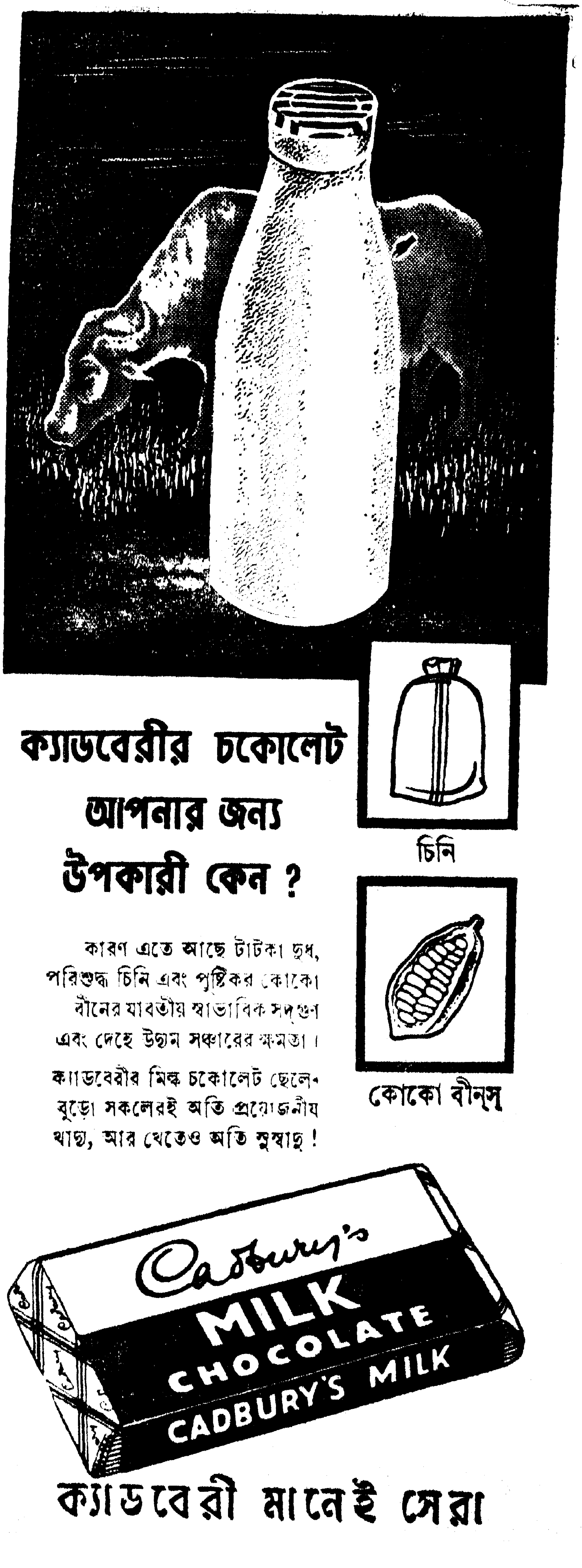

থাকলেও, সে উত্তর শোনার জন্যে রুক্মিণী হয়তো থাকবে না।

"আচ্ছা মাজী রাম রাম" বলে সেদিন উদিতপুরা ছেড়ে চুপচাপ চলে এসেছিলাম। ঠিক সেইরকমভাবেই রুক্মিণী আবার দরজায় হাত দুটো রেখে দাঁড়িয়েছিল। গাঁয়ের লাল ধুলো উড়িয়ে আবার আমার জীপে করে চলে এসেছি। তারপর উদিতপুরা ছেড়ে গিয়েছি ভিন্ড আর ভিন্ড থেকে গিয়েছি আরো আগে। থেমেছি সেই জায়গায় যেখানে গব্বর সিং মারা পড়েছিল পুলিসের হাতে। মনে নেই সব কথা যা সঙ্গের পুলিস অফিসার সেদিন বলেছিল। অনেক নাক কাটবে প্রতিজ্ঞা করেছিল গব্বর সিং। গাঁয়ের লোকেরা ডাকতো গবরা। কেটেও ছিল অনেক নাক কিন্তু যেদিন পড়ল সেই অসমসাহসিক পুলিস এনকাউণ্টারের সামনে তার নিজের নাকই উড়ে গেল ব্রেনগানের গুলীতে। রাস্তার কাছেই হয়েছিল সেই তুমুল যুদ্ধ। বাস, লরী, গাড়ি সব দাঁড়িয়ে পড়েছিল আর লোকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল গব্বর সিং-এর বাঁচবার জন্যে কি আপ্রাণ চেষ্টা আর শুনেছিল তার সেই ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার "দুর্গা মাইয়া আপকী নিকল যানে দে। ফির কভী নহী আউংগা"। যখন ডেপুটি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মোদীর ব্রেনগানের গুলী লেগেছে ধপাস করে পড়েছে গবরা আর বলেছে "হায় মোদী, মার ডালা।"

সব কথা আমি শুনতে পাইনি। সব মনেও নেই। সঙ্গের পুলিস অফিসার বলছিল কিন্তু আমি ভাবছিলাম রুক্মিণীর কথা। যাবার সময় বলেছিল "রাম রাম বেটা ফির আনা"। আরো বলেছিল তার তহসীলদারের কথা লিখতে "মেরে তহসীলদার ওয়াপস আ যায়ে।" তহসীলদারের কথা আমি লিখতে পারিনি কিন্তু আমি লিখেছি অভীশপ্ত চম্বলের রক্তাপ্লুত কাহিনী।

আবার আসতে বলেছে আমায় রুক্মিণী। হয়ত যাব, হয়ত যাব না। যেদিন যাব সেদিন হয়তো রুক্মিণী আর থাকবে না আর যদি যাই আর রুক্মিণী থাকে যদি সে আমায় আবার সেই প্রশ্ন করে তাহলে কি উত্তর দেব? সে যদি তার তহসীলদারকে ফেরত চায় কোথা থেকে তাকে আমি তার তহসীলদারকে ফেরত এনে দেব?

অতীতের চর্ম্মণ্বতী আজ হয়েছে অভিশপ্ত চম্বল। সে বয়ে চলবে যুগযুগান্ত ধরে তার অতি-নিজস্ব গতিতে ভাঙনের গান গেয়ে। অভিশপ্ত 'বেহড়ে' থেকে যুগ-যুগান্ত ধরে হয়তো শোনা যাবে দীর্ঘশ্বাস। চম্বল থেকে ভেসে-আসা হাওয়া আছড়ে পড়বে হয়তো দিগন্তব্যাপী 'বেহড়ে'র বুকে আর তার থেকে হয়তো যুগ-যুগান্ত ধরে প্রতিধ্বনিত হবে "উসকে বাদ্—উসকে বাদ্ উসকে বাদ্"।

[সমাপ্ত]

কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

(৪১)

দীপংকর বললে—আসছে সোমবার সন্ধ্যে-বেলা?

সতী বললে—হ্যাঁ—

দীপংকর বললে—কেন যেতে পারবো না? কিন্তু হঠাৎ কী ব্যাপার?

সতী বললে—তুমি আমার ওখানেই খাবে—

দীপংকর মাথাটা নিচু করে কথা বলছিল। বললে—খাবো?

—হ্যাঁ, যাকে নেমন্তন্ন বলে আর কি, তাই!

দীপংকর বললে—খুব আশ্চর্য তো—

সতী বললে—কেন, আশ্চর্য হবার কী আছে? খাওয়াতে নেই? মানুষ তো মানুষকে নেমন্তন্ন করেই—

দীপংকর বললে—না, সে-জন্যে বলছি না! কাল রাত্তির বেলা আমি তোমার শ্বশুর-বাড়ির সামনে গিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম। তোমার সঙ্গে দেখা করবার অনেক চেষ্টা করেছিলুম, অথচ আজ তুমিই এসে গেলে—

—তা ডাকলে না কেন? আমি তো ছিলুম বাড়িতে!

দীপংকর বললে—খুব ভয় করতে লাগলো আমার—ভাবলাম বড়লোকের বাড়ি ঢুকবো, শেষে যদি কেউ কিছু বলে!

সতী খুবই হাসলো। কিন্তু প্রতিবাদ করলে না। শুধু বললে—বাবা তো বড়লোক দেখেই আমার বিয়ে দিয়েছেন!

তারপর হঠাৎ সে-প্রসঙ্গ বদলে নিয়ে বললে—থাক্ গে, তুমি তা হলে যেও ঠিক, বুঝেছ?

দীপংকর জিজ্ঞেস করলে—তোমাকে বুঝি এখন অনেক লোককে নেমন্তন্ন করতে যেতে হবে?

সতী বললে—অনেক লোককে? কেন? অনেক লোককে নেমন্তন্ন করতে যাবো কেন? শুধু তোমাকেই নেমন্তন্ন করলাম—আর কাউকে বলছি না—

—শুধু আমাকে!

দীপংকর যেন একটু অবাকই হয়ে গেল। আর কাউকে নেমন্তন্ন করেনি, শুধু একলা তাকে? দীপংকর সোজা সতীর মুখের দিকে মুখোমুখি চেয়ে দেখলে। সতীর গায়ে অনেক গয়না, সতীর মুখে অনেক রূপ, সতীর চোখেও যেন অনেক আত্মীয়তা। এত-ক্ষণ যেন এসব কিছুই নজরে পড়েনি তার। দীপংকর চোখ ভরে দেখতে লাগলো।

বললে—এত লোক থাকতে বেছে বেছে শুধু একলা আমাকেই যে নেমন্তন্ন করলে?

সতী বললে—করলুমই বা! করতে নেই?

তারপর গলাটা একটু নামিয়ে বললে—যাবে তো?

বড় করুণ শোনালো সতীর গলার স্বরটা। দীপংকর বললে—তুমি এমনভাবে কথাটা বলছো যেন তোমাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়ে আমি তোমাদেরই উপকার করবো, অথচ তুমি নিজে না এসে তোমাদের চাকরকে দিয়ে ডেকে পাঠালেও আমি যেতাম—জানো—

—তাহলে আমি যাই? মনে থাকবে তো? ঠিকানা চিনতে পারবে তো?

কী যে বলে সতী! সতী তো জানে না অফিসে কাজ করতে করতে, রাস্তায় ট্রামে চলতে চলতেও কতবার সতীর কথা ভেবেছে! বাড়ি আসবার পথে কতবার ওই প্রিয়নাথ মল্লিক রোডটার দিকে চেয়ে দেখেছে।

ড্রাইভারটা গাড়িতে স্টার্ট দিতে যাচ্ছিল। সতী বললে—মাসীমার সঙ্গে আর দেখা করে

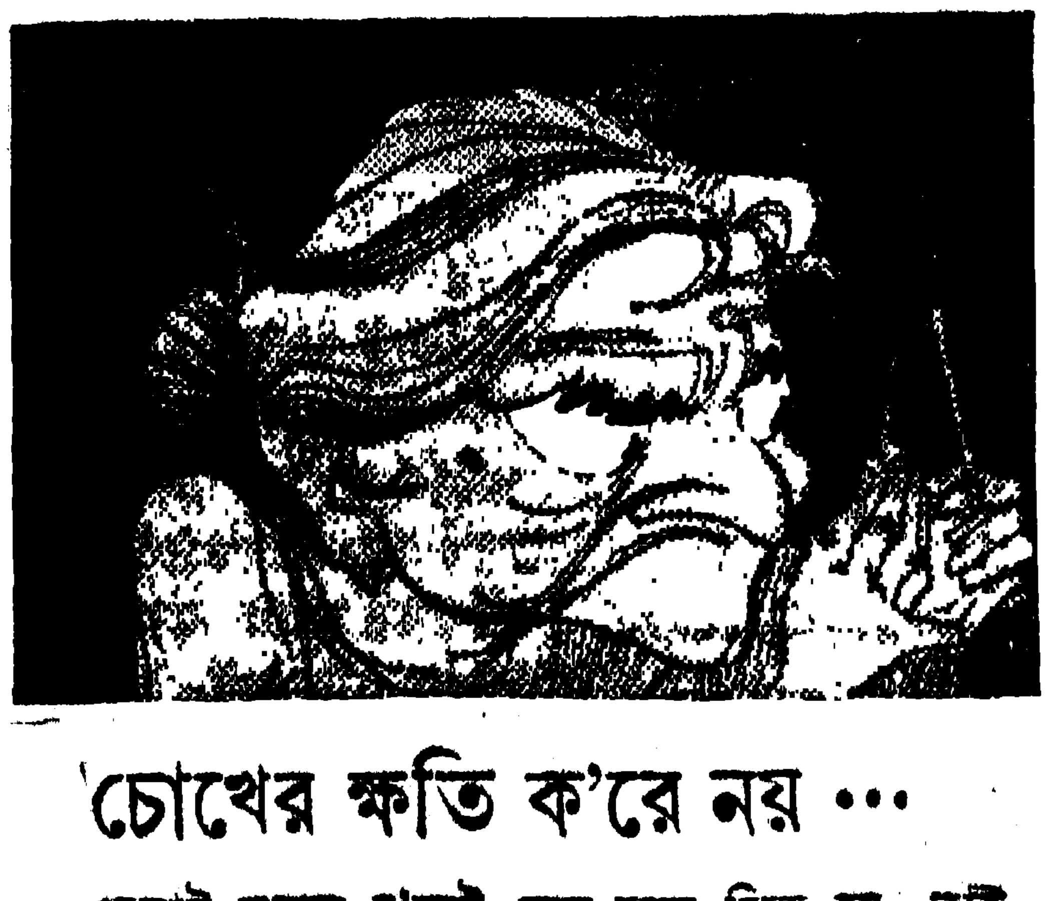

চোখের ক্ষতি ক'রে নয় …

স্বচ্ছন্দ আরামে সেলাই করুন

সেলাই করতে হ'লেই সূক্ষ্ম নজর দিতে হয়, তাই কম আলোয় সেলাই করা মানেই চোখের অপূরণীয় ক্ষতি করা। এখন থেকে ফিলিপ্স আর্জেন্টা বাল্‌ব লাগিয়ে নিন। আর্জেন্টার উজ্জ্বল অথচ আরাম-দায়ক আলোয় স্বচ্ছন্দে সেলাই করতে পারবেন—চোখের ক্ষতি হবে না। আপনি নিজেই বলবেন, ফিলিপ্স আর্জেন্টার আলোয় সেলাই করা কত আরাম!

৪০, ৬০, ৭৫, ১০০ ও ১৫০ ওয়াটস্‌-এ পাওয়া যায়

ফিলিপ্স আর্জেন্টা

উজ্জ্বল আলো, চোখে লাগে না

PHILIPS

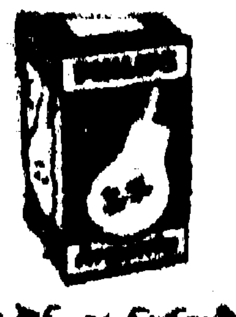

ফিলিপ্স ইণ্ডিয়া লিমিটেড

গেলাম না, কিছু মনে করেন না যেন, তুমি একটু বুঝিয়ে বল, বুঝলে?

দীপংকর বললে—দেখা না-করেছ ভালোই করেছ, মা'র এখন কথা বলবারই সময় নেই—

—কেন? খুব কাজে ব্যস্ত বুঝি?

—না, আমার অঘোরদাদু এখুনি মারা গেল!

—সে কি?

দীপংকর বললে—হ্যাঁ, এই তুমি ডাকবার একটু আগেই মারা গেল! বাড়িতে এখন যে-কাণ্ড চলেছে তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে কাল থেকে! আমাকে নিজের নাতির মত ভালবাসতো অঘোরদাদু। নিজের নাতির চেয়েও বেশি ভালবাসতো—তুমি তো সবই জানো! সংসারে আমার মা ছাড়া নিজের বলতে আর তো কেউ রইল না—

—কী হয়েছিল?

দীপংকর বললে—সে অনেক কথা, সব কথা বলবারও আমার সময় নেই, তোমারও শোনবার সময় হবে না এখন। তোমরা চলে যাবার পর অনেক কিছু ঘটে গেছে আমার জীবনে, সব কথা বললেও তুমি বুঝতে পারবে না—

—তা হলে তোমার আর সময় নষ্ট করবো না। আগে বললে তোমার এতক্ষণ সময় নষ্ট করতাম না। আমি চলি তাহলে—

—হ্যাঁ, সে-সব শুনে তোমার কাজ নেই।

—তাহলে সোমবার, মনে থাকে যেন, আমি অপেক্ষা করবো—

সতীর গাড়িটা চলে গেল একটা মৃদু শব্দ করে। কী আশ্চর্য! দীপংকরের মনে হলো, এমন আশ্চর্য ঘটনাও ঘটে সংসারে! এই ক'টা বছর কতবার যার কথা মনে পড়েছে, সেই সতীই এমন করে আসবে আবার তারই খোঁজে, এমনও সংসারে ঘটে তাহলে! অনেক কথাই তো জিজ্ঞেস করার ছিল, অনেক প্রশ্নই তো জমে ছিল দীপংকরের মনে! কিন্তু কিছু তো জিজ্ঞেস করা হলো না! তাকে নেমন্তন্ন করে গেল সতী!

—দীপুবাবু, দেবতা আপনাকে ডাকছে!

দীপংকর হঠাৎ পেছন ফিরলো। দেখলে ফোঁটারই এক সাকরেদ। এতক্ষণ পরে রাস্তাটার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চেয়ে দেখলে সতীর গাড়িটার চিহ্নও নেই কোথাও। তার পর আস্তে আস্তে বাড়ির ভেতরে ঢুকলো। রীতিমত উৎসব শুরু হয়ে গেছে সেখানে। তাদের ঘরের ভেতরে তখনও অনেক ভিড়। ছিটে ফোঁটা সবাই আছে। সিন্দুকটার তালা ভাঙা। ভেতরের জিনিসপত্র সব বার করেছে! রুপোর বাসন, সোনার মোহর, টাকা, পয়সা, আনি, দোয়ানি, নানান জিনিসের স্তূপ। দু'ভাগে চুলচেরা ভাগ হচ্ছে।

ফোঁটা দেখতে পেয়েই বললে—কী রে দীপু? কোথায় গিয়েছিলি? আমি ভাবলাম পালালি বুঝি। ওদিকের খবর কী?

ফোঁটার এক হাতে গ্লাস। ছিটেরও তাই। ঘরের চারদিকে চেয়ে দীপংকরের রাগ হয়ে গেল। এই তাদের শোবার ঘর। এইখানেই তার মা শোয়। তার মা'র কাঠের ক্যাশ-বাক্সটা রয়েছে। এই সিন্দুকের ওপরই মাথা ঠেকিয়ে রোজ মা প্রণাম করে। মা'র কাছে এই সিন্দুকটাই তো লক্ষ্মী! এরা সমস্ত কিছু নোংরা করে দিয়েছে। সমস্ত অশুচি অপবিত্র করে দিয়েছে।

দীপংকর আস্তে আস্তে মা'র কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সমস্ত রাত মা অঘোরদাদুর পাশে বসে আছে ঠায়। এক মিনিটের জন্যে উঠে যায়নি কোথাও। অঘোরদাদু চিত হয়ে শুয়ে আছে। ধীর স্থির মূর্তি। বিন্তিও পাশে বসে আছে মা'র কাছ ঘেঁষে।

দীপংকর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই মা মুখ তুলে চাইলে। বললে—আজকে আর অফিসে যেও না তুমি, তোমাকেই তো সব করতে হবে—

দীপংকর বললে—আমি তাহলে সাহেবকে একটা টেলিফোন করে দিয়ে আসি মা—

—তাই দাও!

কাছেই শ্মশান। ক্যাওড়াতলা শ্মশান থেকে দীপংকর অফিসে টেলিফোন করে দিলে। রবিনসন সাহেব জিজ্ঞেস করলে—হোয়াটস্ রং উইথ ইউ? কী হয়েছে তোমার?

দীপংকর বললে—আমার গ্র্যান্ড-ফাদার মারা গেছে!

সাহেব বললে—কিন্তু তুমি তো বলেছিলে তোমার মাদার ছাড়া আর কেউ নেই!

—এ আমার নিজের গ্র্যান্ড-ফাদার নয় স্যার, কিন্তু নিজের গ্র্যান্ড-ফাদারের চেয়েও আপন—আমার আপন-জনের চেয়েও আপন!

সাহেব আবার জিজ্ঞেস করলে—কবে অফিসে আসতে পারবে?

দীপংকর বললে—মঙ্গলবার!

সাহেব জিজ্ঞেস করলে—ডেফিনিট্‌লি মঙ্গলবার?

—হ্যাঁ স্যার!

সতীদের বাড়িতে সোমবার সন্ধ্যাবেলা যেতে হবে। তারপরেই অফিসে যাবে। ঠিক তার পর দিন!

সেই শ্মশান। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে বাড়ি। ছোটবেলা থেকে শ্মশান দেখা অভ্যেস আছে দীপংকরের। প্রতিদিন রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে তখন শ্মশানের চীৎকার কানে আসে। কিরণের সঙ্গে শা'নগর রোড দিয়ে যেতে যেতে ওই

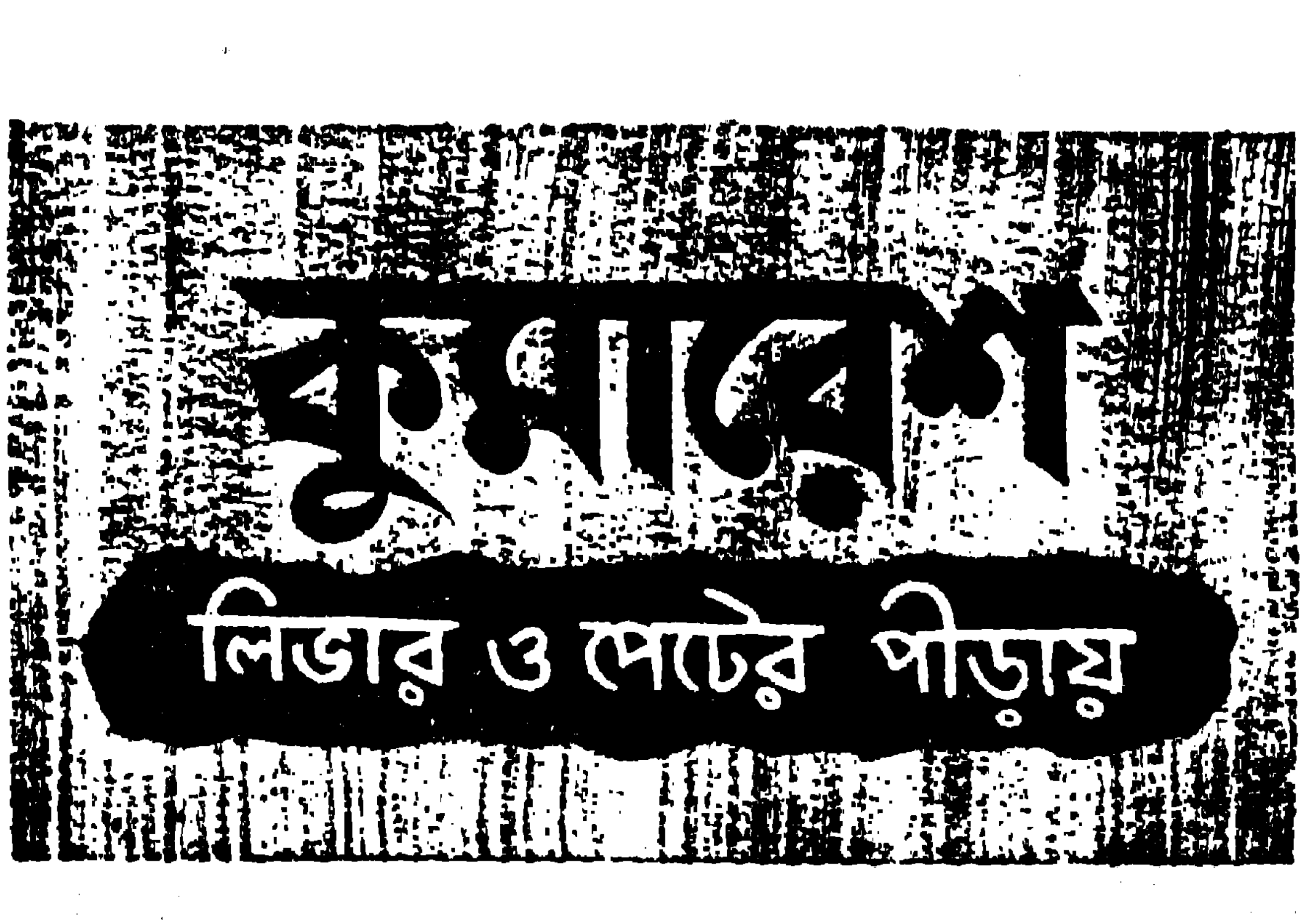

শ্মশানের পাশেই কতদিন আলুর চপ বেগুনী কিনে খেয়েছে। শ্মশান সম্বন্ধে কোনও ভয়, কোনও আতঙ্ক দীপংকরের মনে নেই। এ যেন তাদের বাড়ির উঠোন। এই উঠোনেই যেন ছোটবেলা থেকে দীপংকর বড় হয়েছে। এই শ্মশান থেকেই দীপংকর জীবনের বীজ আহরণ করেছে। সেই চেনা শ্মশানটাই যেন সেদিন আবার নতুন করে চিনতে হলো। বার বার চিনে-চিনেও যেন শ্মশানটা পুরোন হয় না দীপংকরের। এই সেদিন কিরণের বাবাকে এই শ্মশানেই এনেছিল। এখানেই জীবন-মৃত্যুর মহা-সন্ধিস্থলে যেন দীপংকরের আবার নতুন করে নবজন্ম হলো সেদিন।

ফোঁটা কাছে এল হঠাৎ। বললে—হ্যাঁ রে, দীপু, তোরা নাকি আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছিস?

দীপংকর বললে—কে বললে? কার কাছে শুনলে?

ফোঁটা বললে—দিদি বলছিল! আমরা না-হয় লেখা-পড়া শিখিনি, তোরা তো লেখা-পড়া শিখেছিস, তোদের এ কী রকম বুদ্ধি শুনি?

দীপংকর বললে—এতদিন অঘোরদাদু ছিল, এতদিন একটা জোরও ছিল, এখন আর কে আছে বলো? কার জোরে থাকবো?

ফোঁটা বললে—কেন? কোন্ শালা তোদের তাড়াবে? আমি থাকতে কোন্ শালা তোদের বাড়ি থেকে বার করে দেয় দেখি?

দীপংকর বললে—না, সে কথা নয়, এখন তো আমি বড় হয়েছি ভাই, এখন আলাদা বাড়ি ভাড়া করে উঠে যাওয়াই ভাল, চির-কাল তোমাদের বাড়িতে থাকবো সেটাই কি ভাল দেখায়?

ফোঁটার তখন ঠিক অজ্ঞান অবস্থা নয়। সকাল থেকেই অনেক টেনেছে। সারা দিনই টানছে। শুধু ফোঁটা নয়, ছিটেও সংগে সংগে চালিয়েছে। অনেক মোহর, অনেক গয়না এসেছে হাতে। এতদিন পরে বাড়িটাও হাতে এসেছে।

ফোঁটা বললে—যতদিন ইচ্ছে তুই থাকবি, কোন শালা কিছু বলবে না।

দীপংকর বললে—তুমি এখন ওদিকে যাও ফোঁটা। এখন তোমার এ-সব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না—

ফোঁটা বললে—কী বললি তুই, আমি মাতাল হয়েছি?

দীপংকর বললে—না, তা বলিনি, আমি বলছি, এখন আমার মনটা খারাপ, ও-সব আলোচনা না-করাই ভাল—

সত্যিই অঘোরদাদুর মৃত্যুটা যেন দীপংকরের জীবনের ভিতটা পর্যন্ত টলিয়ে দিয়েছিল। এতদিনকার সম্পর্ক, এতদিন-কার আকর্ষণ সব এমনি করেই বুঝি একদিন ছিঁড়ে যায় মানুষের। সেই ছোটবেলা থেকে ধীরে ধীরে কত লোকের সংগে কত সম্পর্ক গড়ে উঠলো, আবার একদিন কত সম্পর্ক ছিঁড়ে-খুঁড়ে নিঃশেষ হয়ে গেল, তার হিসেব নিকেশ করতে গেলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এমনি করেই বুঝি একদিকে যেমন ভাঙে, আর একদিকে তেমনি গড়ে ওঠে। অঘোরদাদুকে খাটে তোলবার সময় কেউ কাঁদবার ছিল না বাড়িতে। কেউই কাঁদেনি সেদিন। একটা সস্তা তিন টাকা দামের খাটিয়া। আর দশ পয়সার নারকোল দড়ি। কিছু ফুল কেনবার ইচ্ছে ছিল দীপংকরের, কিন্তু ফোঁটা বলেছিল—দূর ফুলটুল দরকার নেই, মিছিমিছি পয়সা নষ্ট!

হয়ত সত্যিই পয়সা নষ্ট! কিন্তু তবু দীপংকরের মনে হয়েছিল যে-মানুষটা এত বড় সংসারের কর্তা ছিল একদিন, তার মৃত্যুতে এই পয়সা নষ্ট করাটাও যেন দরকার। সামান্য দু-আনার ফুল কিনে খাটের ওপর ছড়িয়ে দিলেই চলতো। কিন্তু তাতেও উত্তরাধিকারীদের আপত্তি। অঘোর-দাদু বেঁচে থাকলে নিজেও হয়ত আপত্তি করতো না। দশ পয়সার দড়ি আর তিন টাকার একটা পলকা খাটিয়া। আর সংকারের খরচ তিন টাকা চার আনা। মোট ছ' টাকা সাড়ে ছ' আনা খরচ। লাখপতির শেষ খরচ। সেই সামান্য খরচটুকু করতেও যেন উত্তরাধিকারীদের আপত্তি।

একাদশী বাড়ুজ্জেমশাই খবর পেয়ে এসেছিলেন। বিরাট গাড়ি তাঁর। গাড়ি থেকে নেমে খালি পায়ে এসে অঘোরদাদুর শেষ নশ্বর দেহটা দেখে গিয়েছিলেন। চাউলপটি রোডের বড়লোক যজমানরাও এসেছিলেন। যাঁরা যাঁরা খবর পেয়েছিলেন তাঁরাই এসেছিলেন। পাড়ার লোকরাও এসেছিল। হালদারবাড়ির কয়েকজন সেকেলে লোকও এসেছিল। যৌবনে এক-কালে যাঁদের সংগে অঘোরদাদু মেলা-মেশা করতো, যাদের সংগে গল্প-গুজব করতো—তারাও শেষবারের মত এসে কর্তব্যটা করে গেল।

কেউ কেউ বললেন—আহা বড় ভাল-লোক ছিলেন ভট্টাচার্যি মশাই—

কেউ বললেন—পুণ্যাত্মা লোক ছিলেন তিনি, স্বর্গে চলে গেলেন—

একজন বললেন—কালিঘাট কানা হয়ে গেল এতদিনে গো—

অঘোর ভট্টাচার্যির সংগে দীপংকর কোনও দিন কাউকে মিশতে দেখেনি। অঘোর-দাদুকে চিরকাল একলা মানুষই জেনে এসেছে দীপংকর। অঘোরদাদু শুধু রিকশা চড়েছে আর দেবতার নৈবেদ্য নিয়ে এসে নিজের ঘরে জমিয়েছে। আর সারাদিন সমস্তক্ষণ পৃথিবীর সব মানুষের মুখ পুড়িয়ে ছেড়েছে। সেই মানুষকেই এক মুহূর্তে পুণ্যাত্মা হতে দেখে দীপংকর কেমন যেন অবাক হয়ে গিয়েছিল।

চলন্তিকার
কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস

॥ শক্তিপদ রাজগুরু ॥

মন মানে না ৩·০০

অবাক পৃথিবী ৩·৫০

পথ বেঁধে যায় ৩·৭৫

॥ চিত্রগুপ্ত ॥

আমি চঞ্চল হে ৩·০০

॥ মদন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

পরপূর্বা ২·৫০

॥ শান্তি দাশগুপ্তা ॥

অগ্নিসম্ভবা ৩·৭৫

॥ মনোজিৎ বসু ॥

বেলাভূমি ২·৫০

॥ শিবদাস চক্রবর্তী ॥

মেঘমেদুর ২·৫০

॥ মনোজ সান্যাল ॥

শ্বেত-চন্দন ৩·৭৫

• অনুবাদ সাহিত্য •

এমিল জোলার "হিউম্যান বিস্ট"-এর বঙ্গানুবাদ

পাশবিক ৫·৫০

এ্যালবার্টো মোরাভিয়ার The Woman of Rome-এর বঙ্গানুবাদ

রোমের রূপসী (প্রথম খণ্ড) ৪·৫০

রোমের রূপসী (দ্বিতীয় খণ্ড) ৫·০০

অনুবাদক: প্রবীর ঘোষ

চলন্তিকা প্রকাশক

২২নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

শ্মশান থেকে যখন ফিরলো সবাই তখন বাড়িটা নিঝুম।

ফোঁটা একবার চিৎকার করে উঠলো—বল হরি, হরি বোল্—

সকলের সমবেত চিৎকারে ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনটা যেন হঠাৎ থম্‌থম্‌ করে উঠলো। একটা মানুষ শেষ হয়ে গেল, একটা যুগ শেষ হয়ে গেল। একটা পরিচ্ছেদ শেষ হয়ে গেল।

মা তৈরিই ছিল। নাপিত অপেক্ষা করছিল সকলের জন্যে। সকলের হাত-পায়ের নখ কেটে দিলে। প্রত্যেকের জন্যে একটু নিমপাতা আর একটা করে বাতাসা। নিমপাতাটা দাঁত দিয়ে কামড়ে বাতাসাটা খেতে হয়। ওতে কল্যাণ হয় পরলোকগত পিতৃপুরুষের। ওতে 'না' বলতে নেই, ওকে অস্বীকার করতে নেই। যুগ যুগ ধরে এই অনুষ্ঠান আর সংস্কারের শৃংখল দিয়ে বাঁধা তাদের জীবন। ভালো হোক মন্দ হোক—যদি অঘোরদাদুর আত্মার কল্যাণ হয় তাতে দোষ কী!

দীপংকর উঠোনের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারদিকটা চেয়ে দেখছিল। সমস্ত বাড়িটাই যেন ফাঁকা মনে হলো আজ। একদিন কাকাবাবুরা পাশের বাড়িটা ছেড়ে চলে গিয়েছিল—সেদিনও ফাঁকা মনে হয়েছিল। কিন্তু সে অন্যরকম। আজ যেন বাড়িটার আত্মাও মরে গেছে। আর কেউ স্নেহ দিয়ে ভৎসনা দিয়ে গালাগালি দিয়ে দীপংকরকে রক্ষা করবার নেই। আজ দীপংকর আর তার বিধবা মা আবার যেন নিরাশ্রয় হয়ে গেল।

বিন্তীদি মা'র কাছ ছাড়া হচ্ছে না সকাল থেকে। সকাল থেকে মা'র পাশে পাশে ঘোরা-ফেরা করছে। মুখটা শুকিয়ে এত-টুকু হয়ে গেছে। ঘরের সিন্দুকটা সকালেই ছিটে-ফোঁটা সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানটা ফাঁকা হয়ে আছে। দীপংকর ঘরে ঢুকে দেখলে একটা মাদুর পেতে মা সেখানেই দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে। আর পাশে বিন্তীদি মায়ের কোল ঘেঁষে বসে আছে।

দীপংকর বললে—মা, আমি একটু বেরোব—

মা বললে—এখন এত রাত্রে আবার কোথায় বেরোবি তুই?

দীপংকর বললে—এ-বাড়ি তো এবার ছাড়তে হবে আমাদের—

মা বললে—তা তো হবেই—কিন্তু তা বলে আজই? শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে যাক্—

দীপংকর বললে—কিন্তু এখন থেকেই তো খোঁজ-খবর করতে হবে। একটু ভদ্দর-লোকের পাড়ার মধ্যে না হলে তো আর থাক যাবে না—!

মা বললে—তা তুই যা ভালো বুঝিস কর—আমি আর কী বলবো—

—বা রে, তোমার জন্যেই তো বাড়ি ছাড়া! তুমিই তো বরাবর বলতে অন্য পাড়ায় যেতে! এতদিন অঘোরদাদুর জন্যেই তো যাওয়া হয়নি, এখন তো আর সে ভয় নেই। এখন তো তোমাকে গালাগালি দেবারও আর কেউ নেই!

মা কিছু বললে না। চুপ করে রইল শুধু। দীপংকরের মনে হলো অঘোরদাদুর মৃত্যুতে মা'র শোকটাই যেন সবচেয়ে গভীর। সেই অঘোরদাদুর পড়ে যাওয়া থেকে শুরু করে এই সংকারের শেষ অনুষ্ঠানটুকু পর্যন্ত একলা মুখ বুজে মা'ই সব করে এসেছে। এতটুকু কাঁদেনি। এতটুকু চোখের জল ফেলেনি। বাড়িতে চোখের সামনে এত বড় অনাচার, অবিচার, অত্যাচার হয়েছে তাতেও যেন মা এতটুকু বিচলিত হয়নি। মা'র নিঃশব্দ ব্যবহারই যেন সব শোকের পূর্ণতা প্রকাশ করে ফেলেছে। মা'র মুখে সকাল থেকে কথা বেরোয় নি একটা। যা কিছু করণীয় সব কিছু করে গেছে নিঃশব্দে। মানুষটাকে যখন সবাই শ্মশানে নিয়ে গেছে, মা বিন্তীদিকে কোলের মধ্যে পুরে সান্ত্বনা দিয়েছে। তারও যে কেউ নেই। মা'কে কাঁদতে দেখলে তার যে কান্না রাখবার জায়গা থাকবে না। সে কার কাছে সান্ত্বনা খুঁজবে, কার কাছে আশ্রয় চাইবে। কতদিন মেয়েটার একটা বিয়ে দিয়ে দিতে চেয়েছে, কতদিন কত লোক এসে দেখে গিয়েছে তাকে। জলযোগ করেছে, মিষ্টি খেয়েছে, মেয়ে দেখেছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তারপর আর কোনও খবর দেয়নি তারা। কোথাকার কার একটা মেয়ে, বাপ-মা মরা মেয়ে বিন্তী! তাকে নিয়েই মা বাঁধা পড়ে গেল এখানে।

মুখখানা হাত দিয়ে তুলে ধরে মা বলে—হ্যাঁ রে, তোর কি ঘুমও পায় না? তুই সারাদিন আমার আঁচল ধরেই থাকবি?

কথা বললেও তবু বোঝা যেত, কিন্তু এ-মেয়ে কথাও বলে না, কাঁদেও না, রাগও করে না। শুধু বোবার মতন মা'র পিছু-পিছু ঘোরে।

—হ্যাঁ রে, তোর জন্যে কি আমি নরকেও যেতে পারবো না মা?

অঘোরদাদুর মৃত্যুর কয়েকদিন পর পর্যন্ত যেন অসাড় হয়ে গিয়েছিল এ-বাড়ির আধখানা জীবন। এই দীপংকর, এই দীপংকরের মা, আর বিন্তীদি। আর আধ-খানা যেন নতুন জীবন পেয়ে গেছে! ছিটে ফোঁটা আসর জাঁকিয়ে বসেছে এখানে। লক্কা লোটনও এসে উঠেছে এ-বাড়িতে। নতুন গয়না গড়িয়েছে দু'জনে। গাল ভর্তি করে পান খেয়েছে। পুরুত আসে, শ্রাদ্ধের ফর্দ তৈরি হয়। ষোড়শ হবে, বৃষোৎসর্গ হবে। শুধু তাই নয়। একশো একজন ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফরমাস দিয়েছে ফোঁটা। বলেছে—ঘটা করে শ্রাদ্ধ করতে হবে অঘোর ভট্টাচার্যির। নইলে বদনাম হবে। যজমানরা অসন্তুষ্ট হবে।—

এ-সমস্তই লক্ষ্য করেছে দীপংকর। কিন্তু কোনও কথাতেই কথা বলেনি। দীপংকরও বলেনি, মা-ও বলেনি, বিন্তীদিও বলেনি। এরা যেন এ-তরফের, ওরা ও-তরফের। বাড়ির সমস্ত আবহাওয়াই বদলে গিয়েছে। এ-বাড়িতে এতদিন হাসি ছিল না, শব্দ ছিল না, গোলমাল ছিল না। এখন সব এসেছে। ছিটে ফোঁটা এখন এ-বাড়িতে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়। লক্কা লোটন এখন চেঁচিয়ে কথা বলে।

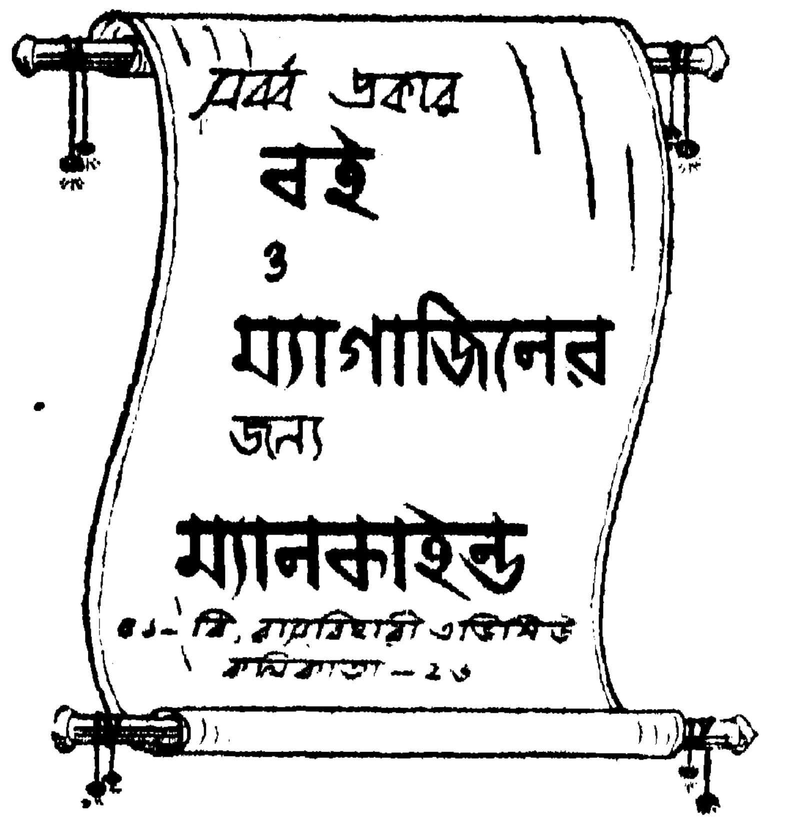

সি ৪৫৩৯।১

ধবল বা শ্বেত

শরীরের যে কোন স্থানের সাদা দাগ, একজিমা, সোরাইসিস ও অন্যান্য কঠিন চর্মরোগ, গাত্রে উচ্চবর্ণের অসাড়যুক্ত দাগ, ফুলা, আংগুলের বক্রতা ও দূষিত ক্ষত সেবনীয় ও বাহ্য দ্বারা দ্রুত নিরাময় করা হয়। আর পুনঃ প্রকাশ হয় না। সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট হাওড়া। ফোন : ৬৭-২৩৫৯। শাখা : ৩৬ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯। (পূরবী সিনেমার পাশে)।

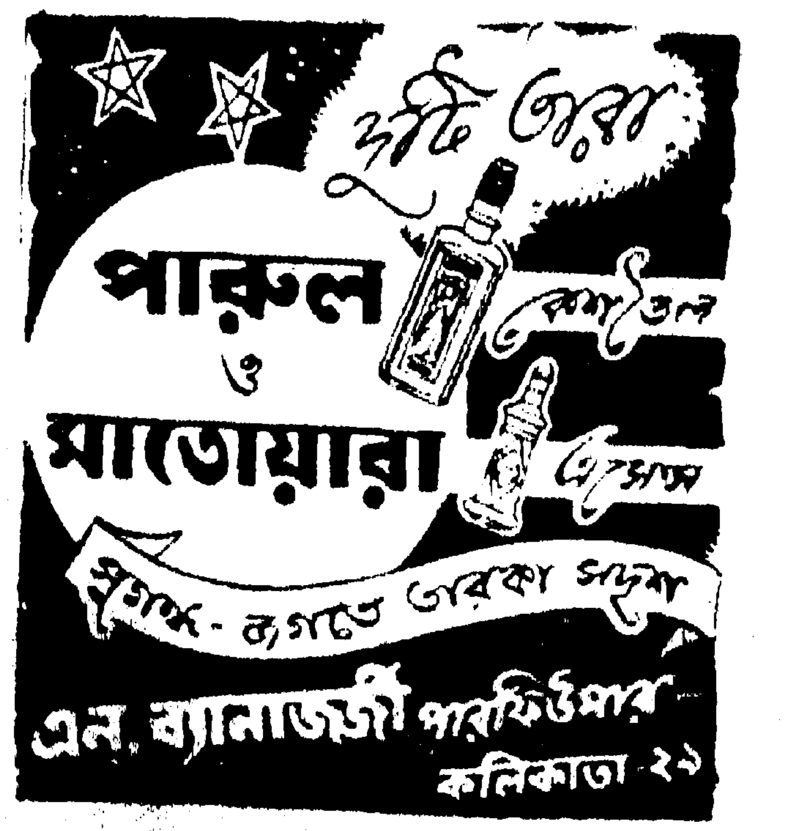

পুরুত মশাই আসেন। বলেন—বৃষোৎসর্গ হবে তো বাবাজী?

ছিটে বলে—আলবাৎ হবে, বৃষোৎসর্গ না-হলে শ্রাদ্ধ কিসের?

—আর দান কেমন হবে?

যা যা প্রয়োজন, সবই করা হবে! অন্য লোকের শ্রাদ্ধে যা হয়, তার চতুর্গুণ হবে! দীপঙ্কর সবই শুনতে পায়। মা-ও সব শুনতে পায়। বিন্তীদিও শুনতে পায় সব। বড় বড় হাঁড়ি কড়া এসেছে, মণ মণ কাঠ এসেছে। ছিটে ফোঁটার সাকরেদরা এসে বাড়ি গুলজার করে তোলে।

দীপঙ্করের মা একবার গিয়ে দাঁড়ায় চন্নুনীর ঘরে। চন্নুনী কথা বলতে পারে না ভাল করে। ময়লা বিছানাটার ওপর বেঁকে কুঁকড়ে শুয়ে থাকে। আর দীপঙ্করের মা'কে দেখলে চোখের জল ফেলে।

দীপুর মা বলে—কেমন আছো বাছা আজ?

চন্নুনী হাত নাড়ে। বলে—নেই—দিদি আমি আর নেই—

মা বলে—আমরা চলে যাচ্ছি, জানো চন্নুনী, আমরা বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছি—

চন্নুনী বুঝতে পারে কথাটা। চোখ দিয়ে আরো বেশি করে জল পড়ে। হাত দিয়ে দীপুর মা'র হাতটা ধরে। কী যেন বলতে চায় বুড়ি। হয়ত বলতে চায় তার দশ ভরি সোনার হারটা দীপুকে দিয়েছে কি না। হয়ত আরো অনেক কিছু। মা বুড়িকে খানিক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করে আবার নিজের ঘরে এসে ঢোকে। আজকাল মা'র আর কোনও কাজ নেই। দু'টি মানুষের রান্না। আর খাওয়া।

দীপঙ্কর সকালবেলা যথারীতি অফিসে যায়। আবার সন্ধ্যেবেলা ফিরে আসে। আবার কোথায় বেরিয়ে যায় মাঝে মাঝে। কোথাও একটা মনের মত বাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না।

গাঙ্গুলীবাবু বললে—আমাদের পাড়ায় ভাল বাড়ি আছে একটা, নেবেন সেনবাবু?

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু শ্যামবাজারে যাবো না, এই ভবানীপুরের দিকে খুঁজছি! গঙ্গার কাছে হলে ভাল হয়—

গাঙ্গুলীবাবু বললে—আচ্ছা, যদি খোঁজ পাই তো বলবো আপনাকে—

দীপঙ্কর বললে—আমার কিন্তু খুব শিগ্‌গির দরকার—ও-বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না গাঙ্গুলীবাবু—আজ পেলে আজই উঠে যাই—

দু'খানা ঘর হলেই চলবে! একখানাতে মা থাকবে আর একখানাতে দীপঙ্কর। যদি তিনখানা ঘর হয় তো আরো ভালো। সেখানা বসবার ঘর হবে! বাইরের লোক-জন এলে বসবে!

শেষকালে পাওয়া গেল একটা বাড়ি। বেশ খোলা চারদিকে। বাইরের 'টু-লেট' টাঙানো দেখে ঢুকেছিল। সম্পূর্ণ আলাদা বাড়ি। দোতলাবাড়ি। নিচেয় একখানা বড় ঘর, ওপরে দু'খানা। কলের জল আছে। বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে। স্টেশন রোড। ওপরের বারান্দা থেকে রেলওয়ে লাইন দেখতে পাওয়া যায়। দিন-রাতই ট্রেন আসা-যাওয়া করে। একটু শব্দ হবে। তা হোক। অভ্যেস হয়ে গেলে ওতে কোনও অসুবিধে হবে না। গঙ্গাটা একটু দূরে হয়ে গেল। মা'র গঙ্গাস্নান করতে অসুবিধে হবে। কিন্তু ভাড়ার দিকটাও দেখতে হবে। কুড়ি টাকা ভাড়া। এমন কিছু বেশি নয়।

পাশেই মালিকের বাড়ি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কী কাজ করেন?

দীপঙ্কর বললে—রেলওয়েতে—

ভদ্রলোকও নিশ্চিন্ত হলেন। বছর দু'-তিন কোনও ভাড়াটেই পাচ্ছিলেন না ভদ্র-লোক। খালি পড়ে ছিল বাড়িটা। আসলে কে আর শহর ছেড়ে এই বন-জঙ্গলের দিকে আসতে চায় বলুন। এখন তবু এদিকে লেক-টেক হয়েছে, একটু লোকজনের মুখ দেখতে পাচ্ছি। এই সেদিনও শেয়াল ডাকতো বাড়ির পেছনে। এই গড়িয়াহাটের মোড়ে তখন বাজার হয়নি। ট্রামই ছিল না মশাই। লোকে আসবে কী করতে। এক-মাত্র এই রেল যা ভরসা। দীপঙ্কর পাঁচ টাকা আগাম দিয়ে দিলে।

ভদ্রলোক বললেন—কবে থেকে আসবেন?

দীপঙ্কর বললে—আজ থেকেই আসবো—আজ আর অফিসে যাবো না,—

—সকালে না সন্ধ্যেবেলা?

দীপঙ্কর বললে—আজ দুপুরের মধ্যেই আসবো—

বাড়িতে ফিরতেই মা বললে—কী রে, এত দেরি? অফিস যাবি না?

দীপঙ্কর বললে—চলো মা, বাড়ি ঠিক করে ফেলেছি, আজকে আর অফিস যাবো না—

মা বললে—সে কী রে, বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ ওমনি গেলেই হলো?

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু আর যে আমার এখানে এক মিনিট থাকতে ইচ্ছে করছে না—

—তা এতদিন কাটালি, আর এই একটা দিন থাকতে পারবি না! কাল না-হয় যাবো—

দীপঙ্কর বললে—একটা দিনও আর আমার এখানে থাকতে ভাল লাগছে না মা, আমি এখুনি চলে যাবো—এখানে কি ভদ্দর-লোকে থাকতে পারে এর মধ্যে?

মা বললে—কিন্তু আজকে যে তোর জন্ম-দিন বাবা, জন্মদিনে এতদিনের বাসা ছাড়বি?

শ্রীজওহরলাল নেহরুর

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

বিশ্ব-বিশ্রুত "GLIMPSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। এ শুধু সন-তারিখ-সমন্বিত ইতিহাস নয়—ইতিহাস নিয়ে সরস সাহিত্য। গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পটভূমিকায় গৃহীত মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন যুগের চিত্রাবলী নিয়ে লিখিত একখানা শাশ্বত গ্রন্থ। জে. এফ. হোরাবিন-অঙ্কিত ৫০খানা মানচিত্র সহ। প্রায় হাজার পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ।

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৫·০০ টাকা

শ্রীজওহরলাল নেহরুর
আত্ম-চরিত ১০·০০ টাকা

শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারীর
ভারতকথা ৮·০০ টাকা

প্রফুল্লকুমার সরকারের
জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ২·৫০ টাকা
অনাগত (উপন্যাস) ২·০০ টাকা
ভ্রষ্টলগ্ন (উপন্যাস) ২·৫০ টাকা

অ্যালান ক্যাম্বেল জনসনের
ভারতে মাউণ্টব্যাটেন ৭·৫০ টাকা

আর জে মিনির
চার্লস চ্যাপলিন ৫·০০ টাকা

শ্রীসরলাবালা সরকারের
অর্ঘ্য (কবিতা-সঞ্চয়ন) ৩·০০ টাকা

ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর
আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে ২·৫০ টাকা

ত্রৈলোক্য মহারাজের
গীতায় স্বরাজ ৩·০০ টাকা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ । ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

—কিন্তু আমি যে কথা দিয়ে এসেছি মা তাদের কাছে, আজকে দুপুরের মধ্যেই আসবো!

—তা আমাকে জিজ্ঞেস না-করে কেন কথা দিতে গেলি অমন? জানিস না আজ তোর জন্মদিন?

জন্মদিন বলে বাড়ি ছাড়া যাবে না, এমন কথা জানা ছিল না দীপংকরের! তা ছাড়া আজকেই যে তার জন্মদিন, তাই-ই কি তার মনে ছিল।

দীপংকর বললে—আমি পাঁচ টাকা বায়না দিয়ে এলুম যে!

—তা টাকা তো মারা যাচ্ছে না। জন্মদিনে কেউ বাড়ি ছাড়ে? তুই না-হয় এসব মানিস না, কিন্তু আমি মা হয়ে কেমন করে না-মেনে থাকতে পারি বল্?

—তা হলে কবে যাবে?

মা বললে—কাল! কাল চল্—

তা শেষপর্যন্ত তাই ঠিক হলো। কালই যাওয়া হবে। এতদিনকার বাস উঠিয়ে কাল এখান থেকে চলে যাবে। এখানকার ভাল মন্দ সমস্ত কিছুর সংস্রব ত্যাগ করে চলে যাবে। এখানকার কথা আর ভাববে না দীপংকর। এই ধর্মদাস ট্রাস্ট মডেল স্কুল, এই কালীঘাট, এই পাথর-পটি, এই সোনার কার্তিকের ঘাট, এই মায়ের মন্দির, এই হাজি-কাশিমের বাগান—এই সব কিছু ভুলে যাবে। বড় মধুর, বড় তিক্ত এই এখানকার স্মৃতি। এই সব স্মৃতি মুছে ফেলেই চলে যাবে। আর কাউকে মনে রাখবে না।

দীপংকর বললে—তা হলে সঙ্গে কী-কী জিনিস যাবে বলো, আমি গুছিয়ে নিই।

মা বললে—তা এত তাড়াতাড়ি কিসের, বিকেল রয়েছে, সন্ধ্যে রয়েছে—পরে করলেই তো হবে, আপিস থেকে এসেই না-হয় করিস—

দীপংকর বললে—মা, সন্ধ্যেবেলা আমার বাড়ি আসতে দেরি হবে আজকে—

—কেন? সন্ধ্যেবেলা আবার কোথায় যাবি?

দীপংকর বললে—রাত্রে আমি বাড়িতে খাবো না, আজকে—

—কেন? কোথায় খাবি? কোথাও নেমন্তন্ন আছে নাকি?

দীপংকর বললে—হ্যাঁ—

—তা এতদিন থাকতে আজকেই নেমন্তন্ন? আজকে যে আমি তোর জন্যে ভাল-মন্দ রান্না করবো ভাবছিলাম—!

দীপংকর বললে—তা কী করা যাবে!

—তা কোথায় নেমন্তন্ন শুনি? কে নেমন্তন্ন করলে তোকে?

দীপংকর বললে—সতী!

সতী! মা-ও যেন চমকে উঠেছে।

বললে—কোন্ সতী? আমাদের সতী? সে আবার তোকে নেমন্তন্ন করতে গেল কেন? তার সঙ্গে তোর কোথায় দেখা হলো?

দীপংকর বললে—এই এখানে। আমাদের বাড়িতে এসেছিল পরশুদিন—

—সে কী রে? আমি তো জানি না কিছু?

দীপংকর বললে—সেই যেদিন অঘোরদাদু মারা গেল, সেই তখন। সব শুনে আর তোমার সঙ্গে দেখা করলে না। আমাকে বলেই চলে গেল। আর তখন বাড়ির মধ্যে যা কাণ্ড, কী করেই বা আসতে বলি—

মা বললে—তা তার তো বিয়ে হয়ে গেছে! কী রকম বিয়ে হলো কিছুই তো জানতে পারলুম না! তুই তার শ্বশুরবাড়ি চিনিস? তোকে ঠিকানা দিলে বুঝি?

দীপংকর বললে—হ্যাঁ—

—কিসের নেমন্তন্ন হঠাৎ?

দীপংকর বললে—তা আমি কী করে জানবো বলো। তখন কি জিজ্ঞেস করবার সময়? হঠাৎ এসে বলে চলে গেল, তখন আর অত-শত জিজ্ঞেস করবার সময় ছিল না।

—তা আরো সব লোকজন বোধহয় আসবে!

দীপংকর বললে—না, আর কেউ নয়, শুধু আমাকে একলাই যেতে বলেছে।

মা তবু ব্যাপারটা বুঝতে পারলে না। এত দিন বাদে এত লোক থাকতে দীপংকরকেই বা একলা যেতে বলবে কেন? তারা তো বড়মানুষ। অনেক টাকা-কড়ি তাদের। দীপংকরদের সঙ্গে তাদের কীসের সম্পর্ক! একদিন ভাড়াটে হয়ে এসেছিল। এমন কত ভাড়াটেই তো এসেছে গেছে। কেউ তো আর কখনও ফিরেও একবার দেখা করতে আসেনি।

মা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ রে, ছেলে-পুলে কিছু হয়েছে নাকি সতীর? দেখলি কিছু?

দীপংকর হেসে ফেললে। বললে—সে-কথা বাপু আমি জিজ্ঞেস করতে পারিনি—ও-সব কি মেয়েদের জিজ্ঞেস করতে পারা যায়?

মা বললে—জিজ্ঞেস করবি কেন, ও তো দেখেই বোঝা যায়! হলে তো সঙ্গেই থাকতো—

—না মা, ছেলে-মেয়ে কিছু সঙ্গে ছিল না। গাড়িতে আর কেউ ছিল না, একলাই এসেছিল।

দীপংকর খেয়ে-দেয়ে অফিসে চলে গেল। গাঙ্গুলীবাবু টিফিনের সময় এসেছিল। দেখে অবাক হয়ে গেছে। বললে—এ কি সেন-বাবু, আজ যে ধুতি পাঞ্জাবি পরে এসেছেন?

দীপংকর বললে—আজ একটা নেমন্তন্ন আছে, সোজা অফিস থেকেই যাবো সেখানে—

—কোথায়? আত্মীয়ের বাড়িতে?

—না, আত্মীয় স্বজন নয়, আমাদের পুরোন ভাড়াটে ছিল এককালে। খুব বড়-লোকের বাড়িতে বিয়ে হয়েছে, হঠাৎ নেমন্তন্ন করে গেল।

—উপলক্ষটা কী?

—তা জানিনে মশাই, এসে খেতে বলে গেল, আর আমিও রাজি হয়ে গেলুম।

—কিছু দিতে টিতে হবে না, শুধু খাওয়া?

দীপংকর বললে—সে সব তো কিছু বলে যায়নি, শুধু বলেছে খেতে!

—তা হলে বোধহয় ম্যারেজ অ্যানিভার্সারী, বিবাহ-বার্ষিকী! আজকাল ওই সব স্টাইল হয়েছে এক-রকম। অনেক জিনিসপত্র উপহার পাওয়া যায় ওতে—

দীপংকর ভাবলে—তা হয়তো হতে পারে! হয়ত বিয়ের বার্ষিক উৎসব পালন করছে। কিন্তু সে-সব তো কিছুই বললে না সতী!

গাঙ্গুলীবাবু বললে—ওই, আমি যা বলেছি তাই, নিশ্চয়ই বিয়ের বার্ষিক উৎসব, আপনি বরং একটা কিছু উপহার কিনে নিয়ে যান—

—কী কিনবো বলুন তো?

গাঙ্গুলীবাবু বললে—যা-ই কিনুন, এক টাকা দু'টাকার কমে কিছুতেই হবে না।

দীপংকর বললে—কিন্তু আমি তো বেশি টাকা সঙ্গে আনিনি—আগে কথাটা মনেই আসেনি! শুধু ট্রামভাড়া আছে পকেটে, সকাল বেলাই আবার পাঁচটাকা বায়না দিয়ে এলুম বাড়িওয়ালাকে কিনা—

১৯৬০-৬১ সালে আপনার ভাগ্যে কি আছে?

আপনি যদি ১৯৬০-৬১ সালে আপনার ভাগ্যে কি ঘটিবে তাহা পূর্বাহ্নে জানিতে চান, তবে একটি পোষ্টকার্ডে আপনার নাম ও ঠিকানা এবং কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া পাঠাইয়া দিন। আমরা জ্যোতির্বিদ্যার প্রভাবে আপনার বার মাসের ভবিষ্যৎ লাভ-লোকসান, কি উপায়ে রোজগার হইবে, কবে চাকুরী পাইবেন, উন্নতি, স্ত্রী পুত্রের সুখ-স্বাস্থ্য, রোগ, বিদেশে ভ্রমণ, মোকদ্দমা এবং পরীক্ষায় সাফল্য, জায়গা জমি, ধন-দৌলত, লটারী ও অজ্ঞাত কারণে ধনপ্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয়ের বর্ষফল তৈয়ারী করিয়া ১৷৹ টাকার জন্য ভি-পি যোগে পাঠাইয়া দিব। ডাক খরচ স্বতন্ত্র। দুষ্ট গ্রহের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উপায় বলিয়া দিব। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা জ্যোতির্বিদ্যায় কিরূপ অভিজ্ঞ। মিথ্যা প্রমাণিত হইলে আমরা মূল্য ফেরৎ দিবার গ্যারাণ্টি দিই। পণ্ডিত দেবদত্ত শাস্ত্রী, রাজ জ্যোতিষী। (DC-3) জলন্ধর সিটি।

Pt. Dev Dutt Shastri, Raj Jyotishi, (DC-3)
Jullundur City.

—কোথায় বাড়ি পেলেন?

—বালিগঞ্জে, স্টেশন রোডে!

গাঙ্গুলীবাবু বললে—কিন্তু সেখানে কি থাকতে পারবেন, শুনেছি বালিগঞ্জে তো ভীষণ মশা, আর কেবল বন-জঙ্গল চার দিকে—

দীপংকর বললে—না গাঙ্গুলীবাবু, সে বালিগঞ্জ আর বন-অঞ্চল নেই, আপনি অনেকদিন যাননি ওদিকে—গিয়ে দেখবেন, গড়িয়াহাটার মোড়ে একটা মস্ত বাজার হয়েছে, অনেক বড় বড় বাড়ি তৈরি হচ্ছে ওদিকে—একেবারে চিনতেই পারবেন না গেলে—

গাঙ্গুলীবাবু বললে—যাক্ গে, আপনি বরং দু'আনা দিয়ে একটা রজনীগন্ধার ঝাড় কিনে নিয়ে যান। সস্তাও হবে, স্টাইলও হবে—

হঠাৎ মিস্টার ঘোষাল ঘরে ঢুকে পড়েছে।

ঘরে ঢুকেই বললে—হোয়ার ইজ্ মিস্ মাইকেল? মিস্ মাইকেল কোথায়?

গাঙ্গুলীবাবু আর দীপংকর দু'জনেই দাঁড়িয়ে উঠলো। দীপংকর বললে—মিস্ মাইকেল আজকে অফিসে আসে নি স্যার—অ্যাব্‌সেণ্ট!

—আই সী!

তারপর মিস্টার ঘোষাল কী ভাবলে কে জানে! হঠাৎ চলে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—সেন্, সী মি ইন্ মাই রুম, আমার ঘরে একবার দেখা করবে এসো—

বলেই গট্ গট্ করে মিস্টার ঘোষাল তার নিজের ঘরে চলে গেল।

গাঙ্গুলীবাবু বললে—হঠাৎ আপনাকে ডাকলে যে ঘোষাল সাহেব, সেনবাবু?

—কী জানি! দেখি—

বলে দীপংকর সোজা মিস্টার ঘোষালের ঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই মিস্টার ঘোষাল হঠাৎ বললে—টেক্ ইয়োর সীট সেন, বোস চেয়ারটায়—

দীপংকর বসলো। কিন্তু কেমন অবাক হয়ে গেল। এমন ব্যবহার তো করে না ঘোষাল সাহেব। কদর্য মুখটা যেন হাসি-হাসি। বললে—ডু ইউ নো, আমি তোমায় প্রোমোট্ করেছি—?

দীপংকর তবু বুঝতে পারলে না। কাল রাত্রেই ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে মিস্ মাইকেলের ঘরে দেখা হয়েছিল। তখনই ঘৃণায় রি রি করে উঠেছিল মনটা। আজ হাসিমুখ দেখেও দীপংকরের কোনও ব্যতিক্রম হলো না।

মিস্টার ঘোষাল সিগ্রেট ঠোঁটে লাগিয়েই বললে—ইয়েস, আই হ্যাভ্ প্রোমোটেড্ ইউ টু ডি-টি-আই—তোমার পেপার আমি দেখেছি—ইউ হ্যাভ্ ফেয়ার্ড ওয়েল—

কথাটা বলে যেন মিস্টার ঘোষাল একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে লাগলো।

তারপর বললে—তোমার প্রস্‌পেক্ট আছে, তুমি উন্নতি করবে জীবনে, মন দিয়ে কাজ করবে, আরো উন্নতি করে দেব তোমার—যাও—

ব্যাপারটা এত হঠাৎ ঘটলো যে দীপংকর ধন্যবাদ দিতেও যেন ভুলে গেল। কী জঘন্য প্রকৃতির লোক। এমন সোজা সরল মিথ্যে কথাটা বলতেও বাধলো না!

বাইরে আসতেই গাঙ্গুলীবাবু জিজ্ঞেস করলে—কী হলো সেনবাবু? কী বললে ঘোষাল সাহেব?

দীপংকরের কাছে ব্যাপারটা শুনে গাঙ্গুলীবাবু বললে—শালা একেবারে আসল শুয়োরের বাচ্ছা, করলে রবিনসন্ সাহেব আর ক্রেডিট্ নিলে নিজে? এ তো মানুষ খুন করতে পারে মশাই—! আপনি কিছু বললেন না?

দীপংকর বললে—বলতে দিন, মানুষ চিনতে পেরেছি, এইটেই তো আসল লাভ, আর কী চাই—

গাঙ্গুলীবাবু চলে গেল। রবিনসন সাহেবও সকাল সকাল চলে গেল। ঘন ঘন ঘড়ির দিকে দেখছিল দীপংকর। জানলা দিয়ে বাইরেও একবার চেয়ে দেখলে। সন্ধ্যের সময় যেতে বলেছে সতী। ছ'টার সময়েও সন্ধ্যে! ঠিক কখন গেলে যে মানানসই হয় তা ঠিক করতে পারলে না দীপংকর।

রাস্তায় বেরিয়ে ট্রাম ধরে জগুবাবুর বাজারের মোড়ে নামতে হলো। অনেক বেছে বেছে রজনীগন্ধার একটা ঝাড় কিনলে। গাঙ্গুলীবাবু বলেছিল দু'আনা নেবে। কিন্তু ছ'পয়সাতেই দিয়ে দিলে। একটা পাতলা শাদা কাগজে বেশ ভাল করে মুড়ে দিলে। তারপর আবার ট্রামে উঠে হাজরা রোডের মোড়ে এসে নামলো।

প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের ভেতরে ঢুকে সতীদের বাড়িটা।

দারোয়ানটা বসে ছিল। সামনে গিয়েও কেমন একটু বুকটা কাঁপতে লাগলো দীপংকরের।

কিন্তু সামনে যেতেই দারোয়ানটা উঠে দাঁড়াল।

বললে—আপনার নাম দীপন্‌করবাবু?

দীপংকর বললে—হ্যাঁ—

দারোয়ান বললে—আইয়ে, ভিতর আইয়ে—

দারোয়ানটা আগে আগে চলতে লাগলো। দীপংকর পেছনে। ইঁট বাঁধানো লম্বা রাস্তা গিয়ে মিশেছে সোজা আস্তাবল-বাড়ির দিকে। উত্তর দিকে লন্। লন্-এর চারপাশে বাগান। বড় রাস্তাটা থেকে আর একটা ইঁট বাঁধানো রাস্তা চলে গেছে বাঁদিকে। সেদিকে একতলায় অনেকগুলো ঘর পাশা-পাশি। কাচের জানলার ভেতরে ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে। তার সামনেই দোতলায় উঠবার সিঁড়ি। সিঁড়ির ওপর কার্পেট পাতা। দীপংকর চারদিকে চেয়ে হতবাক হয়ে গেল। এত ঐশ্বর্য! এই ঐশ্বর্য দেখাতেই সতী তাকে ডেকেছে নাকি?

দারোয়ানটা হঠাৎ বললে—আইয়ে বাবুজী—উপর আইয়ে—

দারোয়ানের পেছন পেছন দীপংকর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। (ক্রমশ)

পরিবার-নিয়ন্ত্রণ
(জন্মনিয়ন্ত্রণে মত ও পথ)
সচিত্র সুলভ তৃতীয় সংস্করণ।
প্রত্যেক বিবাহিতের বাস্তব সাহায্যকারী অবশ্যপাঠ্য। মূল্য সডাক ·৮০ নয়া পয়সা অগ্রিম M. O.-তে প্রেরিতব্য। পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় জন্য সাক্ষাৎ বেলা ১—৭টা।
মেডিকো সাপ্লাইং কর্পোরেশন্
FAMILY PLANNING STORES.
রুম নং ১৮, টপ্ ফ্লোর
১৪৬, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা—৯
ফোনঃ ৩৪-২৫৮৬

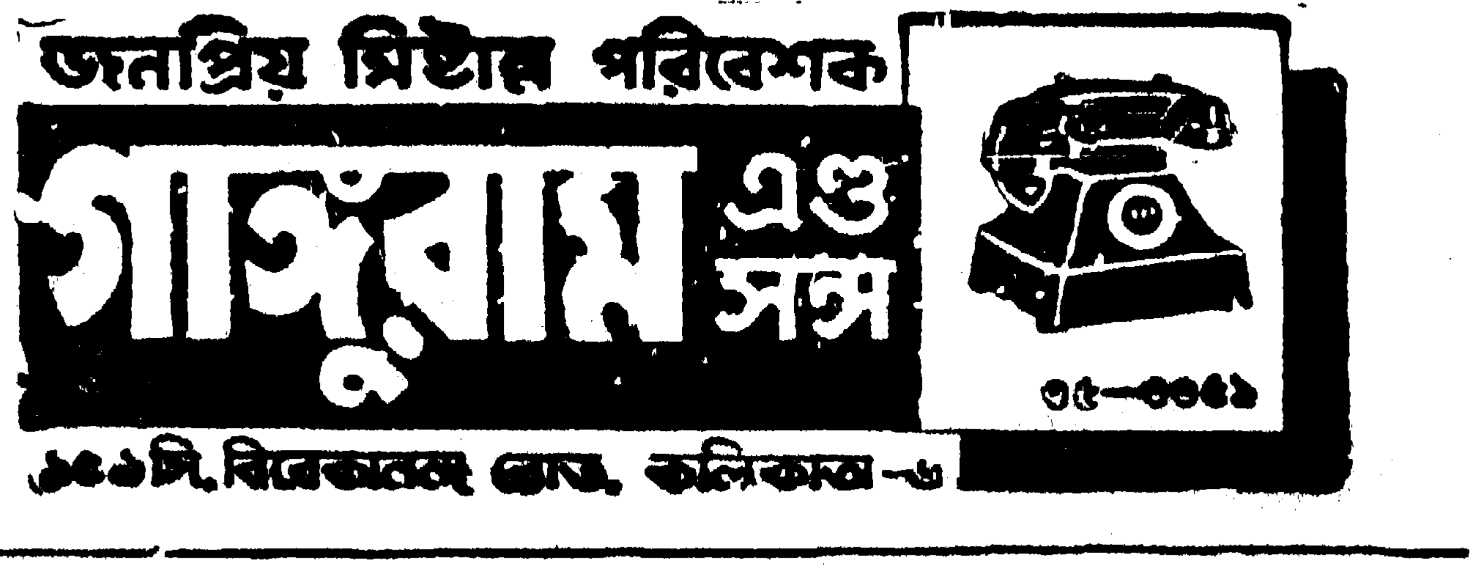

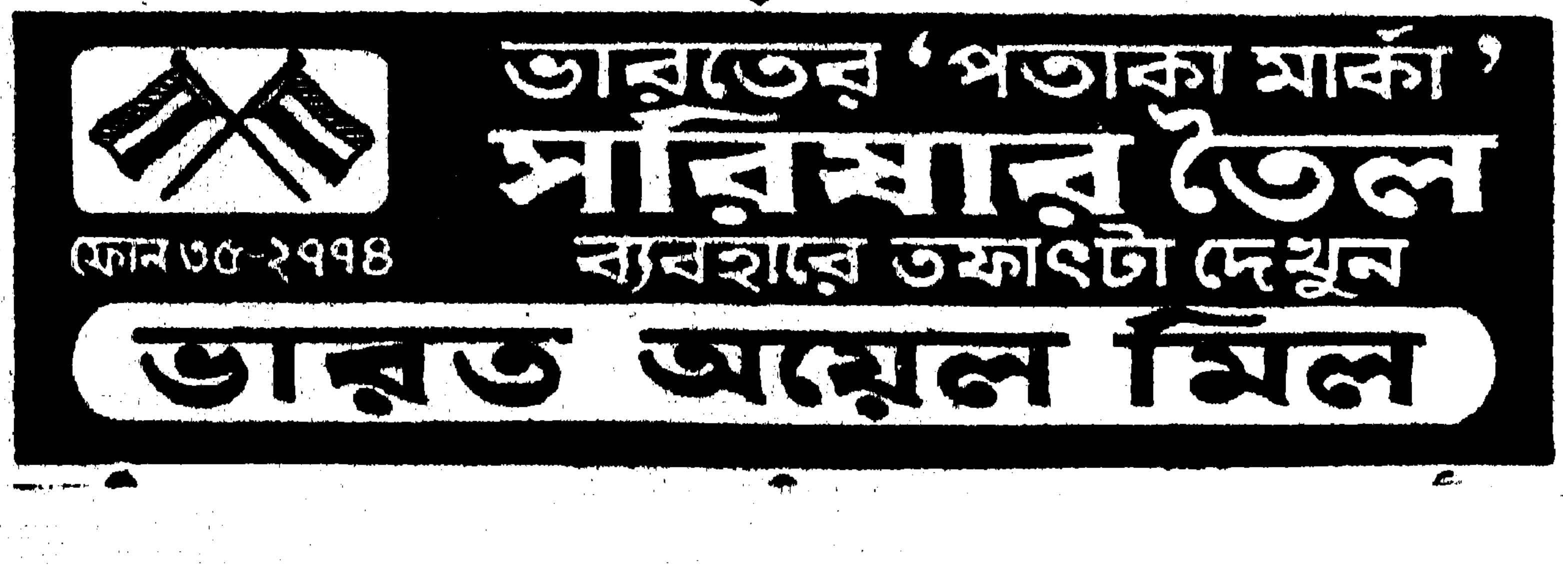

সেসটিনা : পরিক্রমা

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমার পৃথিবী ঘিরে কালের কঠিন অন্ধকার :
ধূসর আকাশ কাঁপে। দিকে দিকে মৃত্যুর যন্ত্রণা;
হৃদয়ের আর্তনাদ নিষ্করুণ উন্মত্ত বাতাসে।
কাঁটায় কাঁকরে পথ সমাকীর্ণ, অশ্রুতে আবিল :
বুকের পাঁজরে জেবলে তবু এক প্রত্যয়ের আলো
উদভ্রান্ত পথিক আমি পরিশ্রান্ত পায়ে পথ চলি।

মাড়িয়ে অসংখ্য শব অবসন্ন পায়ে পথ চলি :
পাশে শূন্য শস্যক্ষেত, দুর্ভিক্ষের ছায়া, অন্ধকার;
ঝড়ের ঝাপটায় মুছে গেছে নীল দিগন্তের আলো,
বুকে তার কালো মেঘ, বিদ্যুতের দুঃসহ যন্ত্রণা,—
শহর নগর গ্রাম জনপদ কান্নায় আবিল :
বুঝি কোন সর্বনাশা বাঁশি বাজে দুরন্ত বাতাসে!

ছড়ায় মৃত্যুর বীজ, মহামারী বাতাসে বাতাসে;
দুর্বার বাঁচার সাধ বুকে নিয়ে তবু পথ চলি।
যদিও কণ্ঠের গান অশ্রুধারে হয়েছে আবিল,
সামনে শুধু প্রেতছায়া, ভয়ের ভ্রূকুটি, অন্ধকার,
অঙ্গে অঙ্গে জবলে কালনাগিনীর বিষের যন্ত্রণা;
তবু খুঁজি রাত্রিদিন একমুঠো সঞ্জীবনী আলো।

আমার দুচোখ থেকে মুছে নিলো কে আশার আলো?
নামহীন কতো ফুল ঝ'রে গেলো উত্তপ্ত বাতাসে;
হয়তো ধুলোয় ঘাসে লেখা আছে তাদের যন্ত্রণা।
বিষণ্ণ পথিক আমি তবু ক্লান্ত পথ বেয়ে চলি :
এখানে হতাশা, দুঃখ, দুর্ভেদ্য কুয়াশা, অন্ধকার;
এ-পথ রক্তের দাগে, অশ্রুজলে পিছল আবিল।

প্রাণের স্পন্দন নেই; দেহমন নিষ্ক্রিয় আবিল।
কোথায় কোথায় বলো একবিন্দু চেতনার আলো?
সূর্য এসে মুছে দেবে নিকষ রাত্রির অন্ধকার,
সকালের সান্ত্বনার সুখস্পর্শ ছড়াবে বাতাসে,—
এ-দুর্মর আশা নিয়ে তবু ক্লান্ত পথ বেয়ে চলি;
থাক-না আমার মনে দুর্বিষহ মরুর-যন্ত্রণা।

পৃথিবী কি চিরকাল ব'য়ে যাবে যুগের যন্ত্রণা?
আকাশ কি নিরন্তর মেঘে-মেঘে থাকবে আবিল?
হৃদয়ে আগুন জেবলে আর কতো দীর্ঘ পথ চলি!
মেঘজাল ছিঁড়ে জানি দেখা দেবে প্রত্যাশার আলো,
বাজবে নতুন গান জীবনের বসন্ত-বাতাসে;
পার হবো এ-নীরন্ধ্র নিরাশার গাঢ় অন্ধকার।

অজ্ঞাতবাস থেকে

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

বড়ো দীর্ঘকাল আছি, এই বাড়ি, প্রখর একাকী।
ছেড়ে যাবো-যাবো ভাবি। কিন্তু দেখ সেঁজুতি আকাশ
ছাদের শিয়রে ভাসে, উড়ু-উড়ু রাতের বাতাস
ঘুমের ভিতরে কাঁপে। মাঠে ডাকে গরিব জোনাকি।

ভাবি মৃদু লক্ষ্য করি অই দূর বুকের প্রভাত।
বয়স আসিয়া গেছে ঝরা শীতে শায়িত শিথান......
কয়েকটি আত্মীয়—তারা দৃশ্যে নাই, পুরানো বাগান
কিছু আর পড়ে নাই। বাঁকা রৌদ্রে পুড়েছে প্রপাত।

নতজানু হয়ে আছি হে শব্দের বনের ঈশ্বর,
স্খলিত ঋতুর স্পর্শ নেমে যায় ঘুরানো সোপান
উপরে প্রদীপ্ত শিলা, লীলাময় ফোয়ারার গান:
কে চাও ফিরাতে আজ, ডাকিও না প্রিয় ওষ্ঠাধর—
অই দূরে জাগিয়াছে প্রতিবিম্ব......শীতল সম্মান।

উদাস রক্তের পুষ্পে কোথা ফোটো, বনের ঈশ্বর!

GOVERNMENT LIBRARY Bihar

টেলিভিশনের নানান দিক

কৃষ্ণা বসু

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের প্রবাস-জীবন প্রায় তখন শেষ হয়ে আসবার মুখে। শীগগিরই দেশের পথে রওনা হতে হবে। গোছগাছ শুরু হয়ে গেছে। সেদিন সকাল থেকে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। নভেম্বর মাস, ঠান্ডাও বেশ। টেলিভিশনটা খুলে দিয়ে তার সামনে তিন বছরের শিশু পুত্রকে বসিয়ে দিয়ে কিছু কিছু জিনিসপত্র প্যাক করতে ব্যস্ত ছিলাম। কাজের ফাঁকে ফাঁকে একনজর চেয়ে দেখছি, পুত্র কি করছে। না, চিন্তার কোন কারণ নেই। মস্ত সোফার মধ্যে ডুবে বসে নিবিষ্টচিত্তে টেলিভিশন দেখতে ব্যস্ত। সকাল বেলা ছোটদের কি যেন একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে। কি সব যেন কার্টুন দেখাচ্ছে।

কাপড়-চোপড় গুছিয়ে রাখতে রাখতে মনে মনে ভাবছিলাম, প্রথম যখন এদেশে এসে বসবাস শুরু করি, তখন বাড়িতে টেলিভিশন রাখা উচিত হবে কি হবে না, কত চিন্তা। টেলিভিশনের অপকারিতা (এবং উপকারিতাও) সম্পর্কে এত রকম বিভিন্ন মতামত শুনলাম যে, মনের মধ্যে সবই গোলমাল হয়ে গেল। ভাবছিলাম, অপকারিতা অনেক আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এক দিক থেকে টেলিভিশনটা মস্ত বড় সাহায্যও হয়েছিল। আমার তো বেবি-সিটিং বা ছেলে-রাখার কাজটা মাঝে মাঝে টেলিভিশন দিয়েই বেশ চলে যেত। সাধে কি আর টেলিভিশনকে "মেকানিক্যাল ন্যানী' বলা হয়েছে। ছেলে যখন অবাক চোখে টেলিভিশন দেখছে, আমি হয়ত রান্নাটা বা বাসন-ধোয়া বা কাপড়-কাচা যাহোক কিছু হাতের কাজ সেরে রাখি।

আমার চিন্তায় আকস্মিক বাধা পেলাম। পেছন থেকে কাঁদ-কাঁদ গলায় হঠাৎ পুত্র কি যেন বলে উঠল।

কি ব্যাপার! কি আবার হল!

"মাম্মা, আমি একটা রেনকো টয় নেব।"

কি, কি নেবে। বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাকালাম। দেখি দু চোখে জল, রুদ্ধ কণ্ঠে বলছে, "টি ভি-তে যে বলল, টেল ইয়োর মামি ইয়্যু মাস্ট হ্যাভ এ রেনকো টয়।"

কি সর্বনাশ!

প্রথম ঝোঁকেই মনে হল ভাগ্যিস, আর এদেশে থাকছি না। ও বেশী বড় হয়ে পড়বার আগেই অন্তত টেলিভিশনের প্রভাব থেকে দূরে চলে যাচ্ছি। অবশ্য পর-মুহূর্তেই মনে হল, কিন্তু যাচ্ছি কোথায়? ইতিমধ্যেই দেশের কাগজে দেখেছি, বোম্বাই ও দিল্লীতে টেলিভিশন সার্ভিস চালু করার চেষ্টা শুরু হয়েছে। আজ হোক, কাল হোক, টেলিভিশনের প্রভাব নিয়ে নানান সমস্যা আমাদের দেশেও দেখা দিল বলে।

টেলিভিশন প্রোগ্রামের 'কমার্শিয়াল' অর্থাৎ বিজ্ঞাপনগুলো উৎপাতবিশেষ আর ছোটদের পক্ষে তো রীতিমত বিপজ্জনক। সাধারণভাবে টেলিভিশনের প্রভাব ছোটদের ওপর কিরকম হতে পারে, তা নিয়ে পর্যালোচনা কম হয়নি। তারা রাত জেগে টেলিভিশন দেখে কিনা, বড়দের প্রোগ্রাম তারা যাতে বিশেষ দেখবার সুযোগ না পায়, সেভাবে প্রোগ্রামের সময় নির্ধারণ করা উচিত কিনা, তাদের পড়া-শুনো, খেলাধুলোয় ব্যাঘাত ঘটে কিনা, টেলিভিশন তাদের নিষ্ঠুর ও হিংস্র প্রকৃতির করে তোলে না, সামাজিকতা বোধ বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে—এমনি আরো কত সমস্যাই তো আলোচিত হয়েছে, কিন্তু অষ্টপ্রহর টেলিভিশন মারফত বিজ্ঞাপনী প্রচার এবং বিশেষ করে শিশুদের উদ্দেশে প্রচারিত বিজ্ঞাপনের কি প্রতিক্রিয়া শিশু-মনের ওপর হতে পারে, এ নিয়ে বিশদ আলোচনা এখনো হয়নি। অথচ দিন দিন শিশুদের উদ্দেশে এ-ধরনের সরাসরি প্রচার বেড়েই চলেছে।

কমার্শিয়াল টেলিভিশনে আবার বিজ্ঞাপনী প্রচার এড়িয়ে যাওয়াও চলে না। এক-একটা প্রোগ্রাম 'স্পনসর' করছেন, অর্থাৎ পরিবেশনের খরচ বহন করছেন হয়ত এক-একটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। ফলে প্রোগ্রামের ফাঁকে ফাঁকে চলে তাদের প্রচারকার্য। হয়ত বেশ উঁচু দরের কোন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হচ্ছে—শেক্সপীয়রের কোন নাটক। কিন্তু তার উদ্যোক্তা হল কোন সাবান, টুথপেস্ট বা সিগারেটের কোম্পানী। নাটকের কোন এক সংঘাতময় মুহূর্তে ফস্ করে পর্দায় ভেসে উঠল বাথটাব-ভরা সাবানের বুদবুদে ভেসে-থাকা কোন সুন্দরীর মুখ, নয়ত ফুটফুটে ছোট্ট মেয়ে ঝকঝকে দাঁতে হেসে মাকে বলে উঠল, "লুক্ মা নো ক্যাভিটিজ" কিম্বা সিগারেটে দীর্ঘ টান দিয়ে কোন সুবেশ তরুণ পরম পরিতৃপ্তি সহকারে বললে, "বিলিভ মি, ইট টেইস্টস্ গ্রে-ট।" রসভঙ্গ আর কাকে বলে।

শুধু অনুষ্ঠান উপভোগের তাল কেটে যাওয়াই নয়। তার চাইতে অনেক গুরুতর, অনেক সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করবার শক্তি এই সব কমার্শিয়ালগুলো রাখে। সকাল থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত টেলিভিশন মারফত যদি কেবলি এটা কেনো, ওটা কিনো না, এ-জিনিসটা ব্যবহার করো, অমুকটা করো না, এই চলতে থাকে এই প্রচারের বিরুদ্ধে কতক্ষণ প্রতিরোধ করা যায়। নিজের অজ্ঞাতসারেই দেখি, কখন হয়ত একটি বিশেষ ব্র্যান্ডের কফি কি কোন একটা বিশেষ কাপড়-কাচা সাবান কিনতে শুরু করেছি।

যুক্তরাষ্ট্রের টেলিভিশনে বোধহয় সব-চাইতে বেশী বিজ্ঞাপিত হয় বিভিন্ন ধরনের টুথপেস্ট। পাশ্চাত্যের সব দেশের মত আমেরিকাতেও শতকরা নব্বুইজনই

ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দজী লিখিত

কয়েকখানি সৎ গ্রন্থ ঃ

Saint Bejoykrishna	Rs.	1.00
Yogiraj Kuladananda	Rs.	3.50
Gospel from Sadgurusanga	Rs.	2.00

নীলকণ্ঠ—

শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী

(বিস্তৃত জীবনী) যন্ত্রস্থ

ভগবান বিজয়কৃষ্ণ

(অপূর্ব নাট্যজীবনী) ৩্

পারের কড়ি—সদ্‌গুরু বিজয়কৃষ্ণ-কুলদানন্দের পত্রাবলীর মাধ্যমে

অপূর্ব সাধন সংকেত ৩·৫০

ঐ হিন্দী উতরাই ৪্

সদ্‌গুরু মহিমা—২ খণ্ড—

॥০ প্রত্যেকটি

যোগিরাজ কুলদানন্দ

অলৌকিক ঘটনাবলী ২·৫০

শ্রীসদ্‌গুরু সাধন সঙ্ঘ

৬০, সিমলা স্ট্রীট, কলিকাতা–৬

টেলিফোন ঃ ৫৫—২৮৮১

(সি ৮৬৯২)

বোধ করি দাঁত নিয়ে ভোগে। তারপরই আসবে নানান রকমের হাতে মাখবার লোশন্। আমেরিকান মেয়েদের গৃহকর্ম করতে হয় অনেক। বাসন-ধোয়া, কাপড়-কাচা, ঘরের মেঝে ঘষামাজা করা, মোটর-গাড়ি পরিষ্কার করা, সব কাজেই হরদম গরম জল ও লিকুইড ডেটার্জেণ্টে বা তরল সাবানে হাত ডোবাতে হচ্ছে। টেলিভিশনের পর্দায় তাই ঘন ঘন দেখা যায়, ফাটা-ফাটা রুক্ষ হাত, তার ওপর পড়ল বিশেষ কোন লোশনের প্রলেপ, অমনি ম্যাজিকের মত হাত হয়ে গেল মসৃণ, লাবণ্যময়। এর পর গ্রীষ্মকালে আছে হরেক রকমের কোল্ড ড্রিংকস আর শীতকালে 'কোল্ড'-এর বিরুদ্ধে নানান রকমের ট্যাবলেট। প্যাট আর জুডি দুই বন্ধু। আজ সন্ধ্যায় দুজনেরই 'ডেট' আছে, এমন সময় হঠাৎ মাথাটা ধরে উঠল। প্যাট তাড়াতাড়ি টেলিফোন করে বাতিল করে দিল ডেট। কিন্তু বুদ্ধিমতী জুডি দেখুন কেমন টপ করে একটা বড়ি খেয়ে ফেলেছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে মাথাধরা উধাও। বয়ফ্রেণ্ড এসে কলিংবেল টিপলে জুডি সেজেগুজে হাসতে হাসতে ডেটিং-এ চলে গেল তার সঙ্গে।

প্রথম প্রথম হাস্যকর ঠেকবে, তারপর অসহ্য ন্যাকামি মনে হবে, বিরক্ত বোধ হবে। তারপর আত্মসমর্পণ, নিঃশব্দে মেনে নেওয়া। আমাদের এক বন্ধুকে দেখতাম, মস্ত মোটা কেমিস্ট্রির বই নিয়ে টেলিভিশনের সামনে বসে আছেন। প্রোগ্রামের ফাঁকে ফাঁকে পাঁচ-দশ মিনিট অন্তর কমার্শিয়াল সে সময়টুকু তিনি নাকি সিরিয়স স্টাডি করেন। সময় নষ্ট হয় না। কতটা কৃতকার্য হতেন জানি না।

টেলিভিশনের কুইজ শো (Quiz) গুলো হল এর আর-এক আজব ব্যাপার। কুইজ শো'তে যারা অংশ গ্রহণ করে জিততে পারলে, তারা নানান মোটা রকম পুরস্কার পেয়ে যায়—যেমন রিফ্রেজেরেটর, মোটর-গাড়ি, ওয়াশিং মেশিন বা নগদ হাজার হাজার ডলার। গোপনে স্বীকার করছি, মাঝে মাঝে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবতাম, নেমে পড়ব নাকি একটি কুইজ শো'তে। ইতিমধ্যে গত বছর কতকগুলো কুইজ শো কেলেঙ্কারি ধরা পড়ে গিয়ে আমেরিকাতে হৈচৈ পড়ে গেল। তখন ভাবলাম, ভাগ্যিস সত্যিই নেমে পড়িনি। প্রকাশ হয়ে পড়ল কোন কোন কুইজ শো'তে যারা অংশ গ্রহণ করছে, প্রোগ্রাম কর্তারা আগে থাকতেই তাদের কাউকে কাউকে 'কোচ' করে দিয়েছেন, অর্থাৎ কি প্রশ্নের কি উত্তর হবে শিখিয়ে দিয়েছেন। জনসাধারণকে প্রতারণা করার অভিযোগে অভিযুক্ত হলেন এঁরা।

লোক-ঠকানো কুইজ শোগুলোর কথা থাক। আপাতনির্দোষ শো'র মধ্যেও বেশীর ভাগই ছেলেমানুষীর চূড়ান্ত। দু-একটার বর্ণনা দিই। একটা হল 'দি প্রাইস ইজ রাইট।' অংশগ্রহণকারী জন-চারেক ভদ্রলোক ও মহিলা এক দিকে বসলেন। একজন মডারেটর কণ্ডাক্ট করছেন সবকিছু। সামনে থেকে পর্দা উঠে গেল। পর্দার আড়াল থেকে বার হল হয়ত আস্ত একটা ডাইনিং রুম, স্যুট বা একটা মোটরগাড়ি, নয়ত প্রকাণ্ড 'ইয়াট' বা প্রমোদতরী। এগুলোর কোনটার দাম কত, আন্দাজ করবার চেষ্টা করবেন অংশ-গ্রহণকারীরা। যিনি সঠিক দামের সবচেয়ে কাছাকাছি আন্দাজ করতে পারবেন, অথচ তার উপরে চলে যাবেন না, তিনি পেয়ে গেলেন জিনিসগুলো।

এই ধরনের শোগুলির মধ্যে জনপ্রিয় হল কোন কোন প্যানেল গেম। এতে সাধারণত তিন-চারজন সবজান্তা গোছের লোক নিয়ে একটা প্যানেল তৈরী হয়। আর থাকে একজন মডারেটর। এরকম একটি শো হল What's my line?' বা 'আমার পেশা কি?' চারজনের প্যানেলের সামনে উপস্থিত করা হত একজন লোককে, তার নামটা হয়ত শুধু বলা হবে। তারপর প্যানেল তাকে নানারকম প্রশ্ন করবেন। সেই প্রশ্নোত্তরের মধ্য থেকে প্যানেল আঁচ করতে চেষ্টা করবেন তার পেশা কি? এবং সে চেষ্টা করবে যথাসাধ্য এড়িয়ে যেতে। দু-একদিন দেখতে দেখতে এটা কিন্তু একটু যেন ভালই লেগে পড়ত। আমরাও চেষ্টা করতাম আন্দাজ করতে, এর পেশা কি। হয়ত সেদিন এসেছে কোন সুন্দরী তরুণী। আমি বল্লাম, নিশ্চয় কোন স্বপ্নচেনা ফিল্ম স্টার। আর কেউ বলল না, পোশাকের দোকানের মডেল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল হয়ত সে একজন barbar—হ্যাঁ, নাপিত বা নাপতানী। Barbar's College থেকে পাশ করেছে, এখন প্র্যাকটিস করে।

আর একটি হল Tell the truth। এটাতে তিনজনকে উপস্থিত করা হত একটা প্যানেলের সামনে। তিনজনই একই নাম, ধাম, পেশা বলে দাবি করত। তিনজনকে প্রশ্ন করে করে বার করে নিতে হবে সত্যিকারের ওই নাম ধাম, পেশা কোন্ জনের? হঠাৎ একদিন এই শোতে তিনজন ভারতীয়কে দেখে চমকে গিয়ে-ছিলাম। তিনজনই বর্ধমানের মহারাজার পুত্র বলে দাবি করলেন। যতদূর মনে পড়ে প্যানেল সেদিন ঠকেছিলেন; ধরতে পারেননি কোন্ জন সত্যি মহারাজকুমার।

টেলিভিশনের আর-একটা বিভীষিকা-বিশেষ হল এর ওয়েস্টার্ন (western)-গুলো। মরুপ্রান্তর পার হয়ে ঘোড়ার খুরে ধুলো উড়িয়ে আসছে একদল হারেরেরে করে। হাতে পিস্তল, মাথায় তাদের বাঁকানো টুপি। তারপর হঠাৎ কোন কারণে কিম্বা অকারণে শুরু হয়ে গেল পিস্তল ছোঁড়াছুঁড়ি, ঘোড়ার ওপর থেকে ঝড়াঝড় পড়ে গেল জনকতক। এ ওকে চড় বসিয়ে দিল ঠাস্ করে, এ তাকে গুলী করে ফেলল ঘোড়ার পায়ের তলা দিয়ে তাক্ করে। নেহাতই ভীতুস্বভাব বাঙালী মেয়ে, নার্ভে অতটা সহ্য হত না। উঠে গিয়ে বন্ধ করে দিতাম তাড়াতাড়ি।

এদের দেশের কিশোরদের মধ্যে অপরাধ-প্রবণতার একটা কারণ এসব ওয়েস্টার্নের প্রভাব। সব কিশোরেরই শখ ওয়েস্টার্নের হিরো হবে। ছোট ছোট শিশুরাও খেলছে খেলনা পিস্তল নিয়ে। অনেক চেষ্টা করেও, ওয়েস্টার্নের সময় টেলিভিশন বন্ধ করে রেখেও শেষ রক্ষা করা গেল না। খেলার সাথীদের কাছ থেকে আমার পুত্রও শিখে ফেলল। একটা ছোট্ট পিস্তল যোগাড় করে আমার দিকে উঁচিয়ে বলতে লাগল, "মাম্মা, আই শুট ইয়ু।" আর সেখানেই শেষ নয়। সঙ্গে সঙ্গেই কার্পেটের ওপর পড়ে যেতে হবে মৃত সৈনিকের ভূমিকা নিয়ে।

টেলিভিশনের সবই তা বলে খারাপ নয়। লোকরঞ্জন ও লোকশিক্ষা দুদিকেই টেলিভিশন করতে পারে অনেক কিছু, ইচ্ছা করলে এবং প্রোগ্রাম স্পনসরদের হাত থেকে কিছু স্বাধীনতা পেলে। কোন কোন টেলিভিশন চ্যানেল আছে, যারা শুধু শিক্ষামূলক প্রোগ্রামই প্রচার করে। ভাষা শেখাচ্ছে, ফিজিকস পড়াচ্ছে, ভাল ভাল কনসার্ট প্রচার করছে। বস্টন সিমফনি অর্কেস্ট্রা বা নিউ ইয়র্ক ফিলহারমনিক—আপনি ঘরে বসে শুনলেন, ইউ এন-এর অধিবেশন ঘরে বসে দেখলেন। আর্ট নিয়ে, বই নিয়ে, সঙ্গীত নিয়ে ভাল ভাল আলোচনা হয়। এদের কোন প্রোগ্রাম স্পনসর নেই। মাঝে মাঝেই জনসাধারণের সাহায্য সাদরে গৃহীত হবে বলে ঘোষণা করা হয়।

সাধারণ চ্যানেলেও ভাল প্রোগ্রাম অনেক থাকে। ভাল নাটক অভিনীত হয়। হয়ত লিংকনের জন্মদিন, অমনি দেখা যাবে উঁচু দরের ডকুমেণ্টারী। খ্যাতনামা লেখক, বিজ্ঞানী, রাজনীতিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার দেখতে পাওয়া যায়। শুনেছি এই সব টেলিভিশন ইণ্টারভিউ কোন কোন সময় রাষ্ট্রনেতাদের রাজনৈতিক জীবনের ওঠা-পড়ার কারণ হয়। খবরের কাগজের বিবৃতি বা মেঠো বক্তৃতায় জনসাধারণকে ধাপ্পা দেওয়া যেতে পারে। টেলিভিশনের সাক্ষাৎকার কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলার মত। সেখানে ফাঁকি দেওয়া কঠিন।

টেলিভিশনের একটা জিনিস আমার বিশেষ ভাল লাগত, তা হল টেলিভিশন-

সাংবাদিকতা। টেলিভিশনের মাধ্যমে সংবাদ পরিবেশনকে যেন জীবন্ত করে তোলা যায়। সন্ধ্যাবেলার খবরটা শুনবার জন্য আগ্রহ করে থাকতাম। খবর বলে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে দেখানো হচ্ছে টুকরো-টুকরো ডকুমেণ্টারী—কেরালাতে গোলামাল হচ্ছে, কলকাতায় ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে, যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণরত কিকোয়ানকে জনতা প্ল্যাকার্ড দেখাচ্ছে—go to the Moon and stay there—রানী এলিজাবেথ কানাডা পরিদর্শন করছেন, হয়ত নিউ ইংল্যাণ্ডে বরফ পড়েছে প্রচুর কিম্বা হারিকেন ক্যারল হিট্ করেছে কোথাও, ঘরের কাছের খবর, দূরের খবর, সবই বসবার ঘরের চেয়ারে বসে কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে দেখা যাচ্ছে। খবর পরিবেশনের ভঙ্গীও বেশ সরস। নিউ ইয়র্কের সংবাদদাতা বলছেন খানিকটা খবর—নাউ ডেভিড, বলে মুচকে হেসে ছেড়ে দিলেন—ওয়াশিংটনের সংবাদদাতা সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিলেন সংবাদের সূত্র।

ক্রুশ্চেভ এলেন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে। প্রথমবারের কথা বলছি। টেলিভিশনের কল্যাণে মনে হল ক্রুশ্চেভের সঙ্গী হয়ে আমরাও যুক্তরাষ্ট্রের একপ্রান্ত থেকে আর-একপ্রান্ত ঘুরে এলাম। সারাদিন ধরেই ক্রুশ্চেভের গতিবিধির খবর টেলিভিশন মারফত পাওয়া যাচ্ছে। ওয়াশিংটন এসে পেঁছিবেন। বিমানঘাঁটিতে অভিনন্দন গ্রহণ করছেন। পথের দুধারে জনতা। ভয়ানক ভদ্র অথচ নিরুত্তাপ শীতল অভ্যর্থনা। ক্রুশ্চেভ সসেজ ফ্যাক্টরী দেখছেন। সাগ্রহে সসেজ খেতে খেতে বলছেন—হ্যাঁ, আমরা চাঁদে রকেট পাঠানোতে তোমাদের চেয়ে এগিয়ে আছি বটে, কিন্তু সসেজ তৈরীতে দেখছি তোমরাই ফার্স্ট। ডিজনীল্যাণ্ডে যেতে দেবে না শুনে চটেছেন ভয়ানক। জনসভায় হাত মুঠো করে বক্তৃতা করছেন, ধমক্ধামক্ করছেন সকলের উদ্দেশ্যে। সাংবাদিক বৈঠক হচ্ছে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে কোনঠাসা করতে চেষ্টা করছেন সাংবাদিকরা। আইজেনহাওয়ারের নিমন্ত্রণ সভায় যাবেন ক্রুশ্চেভ। রুশ রাষ্ট্রদূতের বাসভবনের সামনে অপেক্ষমাণ জনতা ও সাংবাদিকদের সঙ্গে মনে হচ্ছে আমিও রয়েছি। সকলের সঙ্গে জল্পনা করছি কি করে বেরোবেন ক্রুশ্চেভ, ডিনার জ্যাকেট, না যে ওয়ার্কিং সুটটা পরে এসেছেন সেটাই?

লোকশিক্ষার পক্ষে টেলিভিশনের ক্ষমতা নিঃসন্দেহে অসীম। কিন্তু শিক্ষামূলক প্রোগ্রামগুলো জনপ্রিয় করে তোলা অত্যন্ত কঠিন। খুব বেশী মাস্টারী-মাস্টারী ভাব প্রকট হয়ে পড়লে সাধারণত লোকে বিমুখ হয়ে যায়। যে উৎসাহ নিয়ে ওখানকার "টিন-এজার" বা পার্ট বুনের শো বা ডিক্ ক্লার্কের আমেরিকান ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডের নৃত্যগীতে যোগ দেয়—চুয়িং গাম চিবুতে চিবুতে হাততালি দিয়ে চলে—"এভরি বডি লাভস্ দি চা-চা-চা"—ঠিক ততখানি উৎসাহ কি দেখতে পাওয়া যাবে কোন গুরুগম্ভীর আলোচনায়? নিজেকে দিয়েই বিচার করতে চেষ্টা করি। প্রতি মঙ্গলবার মনোযোগ দিয়ে শুনি বস্টন মিউজিয়ম্ অফ্ ফাইন আর্টস থেকে প্রচারিত আর্টের ওপর কথিকা বা হার্ভার্ডের এক হল থেকে প্রচার করা চার্লস মানচের নেতৃত্বে সিম্ফনি। কিন্তু যদি সেই প্রোগ্রামের একই সঙ্গে অন্য চ্যানেলে থাকে কোন রহস্য নাটিকা—এলেরী কুইন, রিচার্ড ডায়মণ্ড বা সেভেনটি সেভেন সানসেট স্ট্রিপ্? তবে? কি জানি হয়ত আলোচনাটাই শুনব কি সঙ্গীত। কিন্তু যদি থাকে আলফ্রেড হিচ্ককের কোন থ্রিলার? তবে প্রলোভন জয় করতে পারব কিনা জানি না।

লোকে শিখতে চায় না, নিছক এনটারটেনমেণ্ট চায় একথাও কিন্তু সত্যি নয়। নিউইয়র্কের ভোরের দিকের একটা প্রোগ্রামে ভাল বই নিয়ে আলোচনা হত। কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানই নাকি এই প্রোগ্রামটা স্পনসর করতে চাইছিলেন না অত সকালে তার বই নিয়ে আলোচনা কে দেখছে? কি করে যেন এই প্রোগ্রামটি সাফল্য লাভ করেছিল। এর সম্বন্ধে বহুল প্রচলিত মজার গল্প হল, একদিনে নিউইয়র্কের সব এলার্ম ক্লক ও Le Ronge et le noir-সব কপি বিক্রী হয়ে গিয়েছিল।

"টেলিভিশন অ্যাডিক্ট" কথাটা শুনতে পাওয়া যায় খুব। টেলিভিশন দেখতে দেখতে নেশা যে একটু হয় সে কথা অস্বীকার করা যাবে না। তবে নেশা কিসে না হয়? বই পড়াতেও হয়, সিনেমা দেখাতেও হয়। গত স্বাধীনতা দিবসে সকালবেলায় লালকেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রী জবাহরলাল নেহরুর বক্তৃতা শুনছিলাম রেডিওতে। কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে—কিন্তু শুধুই কণ্ঠস্বর আর কিছু নয়। কেবলি মনে হচ্ছিল কি যেন নেই, কি যেন একটার অভাব বোধ করছি।

এমন দিন হয়ত আসবে যখন সোভিয়েট রাশিয়ার মত ভারতবর্ষেও সুদূরতম শহরে গ্রামেও টেলিভিশন নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। একটা ন্যাশনাল টেলিভিশন সার্ভিস চালু করার পক্ষে আমাদের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা ও সংস্কৃতি অন্তরায় হতে পারে। দেশে টেলিভিশনের বহুল প্রচারে প্রকৃতপক্ষে হয়ত অহেতুক উৎকণ্ঠা বা অহেতুক উল্লাসেরও কোন কারণ নেই। অন্তত কয়েকজন ব্রিটিশ টেলিভিশন বিশেষজ্ঞের কথা মেনে নিলে তাই মনে হয়।

নাফিল্ড ফাউণ্ডেশনের পক্ষ থেকে কিছুকাল আগে এঁরা শিশুমনের ওপর টেলিভিশনের প্রভাব সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন। এই রিপোর্টের অনেক মন্তব্য সাধারণভাবে সব টেলিভিশন দর্শক সম্পর্কেই খাটে। এই রিপোর্টের মতামত টেলিভিশনের সমর্থক ও তার বিপক্ষীয় উভয় দলকেই হতাশ করেছিল। কারণ এতে বলা হয়, টেলিভিশন নিয়ে কোনদিকেই বাড়াবাড়ি করার প্রয়োজন নেই। টেলিভিশন এমন কিছু ঘোরতর অনিষ্ট সাধন করতে পারে না। চোখ খারাপ হওয়া, ঘুমের ব্যাঘাত ঘটা, দর্শককে কর্মবিমুখ অলস করে তোলা—এসব কিছুর জন্যই টেলিভিশন দায়ী নয়। তেমনি টেলিভিশন থেকে অনেক কিছু আশা করাও ভুল। টেলিভিশন থেকে দর্শক নানা বিষয়ে উৎসাহী হয়ে উঠেছেন, বা তার সাধারণ জ্ঞান বেড়ে যাচ্ছে বা সবাই একসঙ্গে বসে আনন্দোপভোগ করার ফলে পারিবারিক বন্ধন দৃঢ়তর হচ্ছে—এসব কিছুই কার্যক্ষেত্রে বিশেষ দেখা যায় না।

রেলগাড়ি, এরোপ্লেন থেকে শুরু করে এটমিক শক্তি পর্যন্ত সব নূতন আবিষ্কারই প্রথমে মানুষের মনে দ্বিধা, সংশয়, অপপ্রয়োগের ভীতি জাগিয়ে তোলে। আশা করা যায়, টেলিভিশনও প্রাথমিক অনিশ্চয়তার যুগ পার হয়ে একদিন আমাদের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের মহিমা প্রচারে

নাম-মহিমা (নাটক)—২৲

সুধী ও ভক্তজনকে অর্ধমূল্যে

প্রাপ্তিস্থান : নাট্যকার ভবানী ভট্টাচার্য

১৬, চন্দ্রনাথ সিমলাই লেন, কলিঃ—২

(সি-৮৬৪২)

ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস

জব চার্ণকের বিবি

কলকাতা স্রষ্টা জব চার্ণকের প্রেমময় জীবন আলেখ্য। পাঁচ টাকা

অর্চনা পাবলিশার্স

৮বি, রমানাথ সাধু লেন, কলিকাতা-৭

ফোন : ৩৪-১২২৫

সি-৮৫৫০

মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল

আরোগ্য করিতে ২৭ বৎসর ভারত ও ইউরোপ-অভিজ্ঞ ডাঃ ডিগোর সহিত প্রতি দিন প্রাতে ও প্রতি শনিবার ও রবিবার বৈকাল ৩টা হইতে ৭টায় সাক্ষাৎ করুন। ৩বি জনক রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

(সি ৮৬৮৮)

চিত্র প্রদর্শনী

আর্টের পীঠস্থান এই কলকাতা। মস্ত মস্ত চিত্রকর এবং ভাস্কর উঠেছেন এই কলকাতা থেকে। নানান রকম আন্দোলন হয়েছে এই কলকাতায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এযাবৎকাল কলকাতায় এমন কোন গ্যালারী ছিল না, যেখানে গেলে ছবি কিনতে পাওয়া যেতো। এখানে আর্ট নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান, তাঁদের মাথায়, কিন্তু কোন স্থায়ী গ্যালারী বা ছবির দোকান খোলার কথা আসেনি কখনও। কিছু দিন আগে কয়েকজন তরুণ শিল্পী একটি স্থায়ী গ্যালারী চালু করার কথা চিন্তা করেছিলেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গতিতে আর কুলোয় নি। অনেকেই জিজ্ঞেস করেছে আমাকে—কোথায় গেলে এখানকার শিল্পী-দের চিত্রকলা দেখতে পাওয়া যাবে।' তাদের জবাব দিয়েছি, 'অপেক্ষায় থাকো প্রদর্শনী হলে ছবি দেখতে পাবে'। কলকাতার মত শহরে কোনও স্থায়ী গ্যালারী নেই—একথা তারা বিশ্বাসই করতে পারেনি। গত বছর অস্ট্রিয়ার শিল্পী শ্রীমতী এলসা সীলারও এই প্রশ্নই করেছিলেন আমাকে। কিন্তু তাঁর পক্ষে আর অপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। দুদিন পরেই তাঁকে দেশে ফিরে যেতে হয়েছিল।

কলকাতার এ-অভাব পূরণ হয়েছে; এটা সুসংবাদ বটে। ২১নং থিয়েটার রোডে একটি সমকালীন ছবির গ্যালারী চালু হয়েছে। গ্যালারীটির নাম অশোক গ্যালারী। গ্যালারীটির পরিচালিকা তিনজন। এঁদের মধ্যে প্রধানা হলেন শ্রীমতী হিমানী খান্না। শ্রীমতী খান্না দিল্লীতে শিল্পী মহলে বেশ সুপরিচিতা। ইনি এক সময় দিল্লীর ইণ্টারন্যাশনাল কালচার সেণ্টার-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টা ছিলেন। আর দুজনের নাম শ্রীমতী ফ্লোরা গব্বে, এবং শ্রীমতী ফিরোজা চোকসী। কলকাতায় এঁরা কেউই বিশেষ পরিচিতা নন। গ্যালারীটি ছোট্ট হলেও বেশ সুসজ্জিত। ৩০।৪০টি ছবি টাঙানো হয়েছে। দু মাস পরে এ-ছবিগুলি সরিয়ে অন্য ছবি টাঙানো হবে। এ-গ্যালারীর আসল উদ্দেশ্য ছবি বিক্রি করা।

ছবি দেখতে দেখতে চোখে পড়ল বোম্বাই আর দিল্লীর বিখ্যাত শিল্পী-দের নাম—হুসেন, আরা, গায়তোণ্ডে, হেব্বার, কুলকারনী, রেন্দ্রে, আলমেলকার, গুজরাল, কানোয়াল, দেবযানী, কৌশিক, বীরেন দে এবং আরও অনেক। এঁদের মধ্যে বাংলার শিল্পী সবেধন নীলমণির মত আছেন গোপাল ঘোষ। উদ্বোধনের দিন কেবল গোপাল ঘোষেরই দুটি ছবি বিক্রি হয়। বাংলা দেশে এত শিল্পী থাকতে একমাত্র গোপাল ঘোষেরই ছবি রয়েছে দেখে একটু বিস্মিত হয়েছি অবশ্যই জিজ্ঞেস করায় শ্রীমতী খান্না বললেন, এখনও বাংলার শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর পক্ষে যোগাযোগ করে ওঠা সম্ভব হয়নি। কলকাতায় যখন দোকান খোলা হল, তখন কলকাতার শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ না করেই দোকান খোলা—এটা কি সমীচীন হল? যাঁদের ছবি এখানে রাখা হয়েছে, তাঁরা অবশ্যই শক্তিশালী। বাংলা দেশেও শক্তিশালী শিল্পীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। এবং বাংলা দেশেই সর্বপ্রথম

পোরট্রেট —মালি

তথাকথিত মডার্নিস্টিক আঙ্গিকে চিত্র-চর্চা শুরু হয়েছে। অবিশ্যি বোম্বাই এবং দিল্লীর বড় বড় খবরের কাগজের আর্ট-ক্রিটিকরা সে খবর রাখেন না। ওসব শহরের আর্ট-ক্রিটিকরা যে এ-খবর রাখেন না, তার প্রমাণ পেয়েছি, সম্প্রতি বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত বাংলার সমকালীন তরুণ শিল্পীদের আঁকা ছবির প্রদর্শনীর সমালোচনা পড়ে। সেখানকার সমালোচকরা বলতে চেয়েছেন, বোম্বাই বা দিল্লীর দেখাদেখিই বাংলা দেশে আজ তরুণ শিল্পীরা সমকালীন চিত্রভাষায় চিত্র-চর্চা শুরু করেছেন। গগনেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের নাম হয়তো তাঁরা শোনেন নি। ক্যালকাটা গ্রুপ-এর শিল্প-আন্দোলনের কথাও হয়ত তাঁরা জানেন না। তাই তাঁদের উক্তি ঐরকম। বাংলার তরুণ শিল্পীরা বোম্বাই, দিল্লীর দেখাদেখি অতিরঞ্জনমূলক বা অনুরঞ্জনমূলক চিত্র-চর্চা করছেন, একথা আদৌ সত্য নয়; এঁরা এখানকারই পথিকৃৎদের অনুসরণ করছেন এবং সেই কারণেই ভারত-শিল্পের অক্ষচ্যুত হয়ে এদিকে ওদিকে ঠোকর খেয়ে বেড়াচ্ছেন না। চিত্রভাষার ব্যাকরণ এঁরা জানেন এবং পরীক্ষণ-নিরীক্ষণে যতই আধুনিকতা থাক, এঁরা ব্যাকরণ সর্বদাই মেনে চলেন। এবং বর্তমান চিত্রপ্রকরণের মাধ্যমেই এঁরা প্রকাশ করেন বর্তমান কালকে। অশোক গ্যালারীর পরিচালিকাদের আমি অনুরোধ করি, এই সব তরুণ শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। উপযাচক হয়ে এঁদের মধ্যে কেউ তাঁদের কাছে ছবি পৌঁছে দিয়ে আসবেন না বলেই আমার বিশ্বাস। দিল্লি বা বোম্বাই-এর শিল্পীদের কাছ থেকে তাঁরা যেভাবে ছবি সংগ্রহ করে এনেছেন, এখানকার শিল্পীদের কাছ থেকেও তেমনি ভাবেই ছবি সংগ্রহ করতে হবে।

এই প্রতিষ্ঠানটির আমরা শুভ-কামনা করি সর্বান্তঃকরণে। বোম্বাই এবং দিল্লির শিল্পীদের প্রতি এঁদের যতটা দরদ দেখলাম, বাংলার শিল্পীদের প্রতিও যদি ততটাই দরদ এঁদের থাকে, তাহলে এঁরা সব সময়েই আমাদের সমর্থন পাবেন। উপস্থিত যে ক'টি ছবি এখানে দেখা গেল, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—দেবযানী কৃষ্ণের 'এম্প্রেস' এবং 'পিকক' কানওয়াল কৃষ্ণের 'শিভারিং সান', হুসেন-এর 'মাদার', মালির 'পোরট্রেট' এবং জেহাঙ্গীর সাবাভালার 'দি ভিলেজার্স"। মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত সকাল সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে বারোটা আবার সাড়ে তিনটে থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত এবং শনিবার ও রবিবার কেবল সকাল সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত গ্যালারীটি খোলা থাকে।

বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

সম্প্রতি রাসায়নিক হর্মোন তুলো গাছের ওপর প্রয়োগ করে বেশী পরিমাণে তুলো উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। হর্মোন তুলো গাছের ওপর ছিটাবার পর দেখা যাচ্ছে যে কুঁড়ি, ফুল এবং ফল গাছ থেকে কম পরিমাণে ঝরে যাচ্ছে—এর ফলে তুলো বেশী পরিমাণে গাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে। পাঞ্জাব এবং মধ্যপ্রদেশে 'ন্যাপথলিন এসিটিক এসিড' হর্মোন গাছের ওপর ছিটাবার পর প্রায় এক একর জমিতে ১০০ পাউন্ড বেশী তুলো পাওয়া যাচ্ছে। এই এক একর জমিতে হর্মোন ছিটাবার খরচ পড়ছে তিন থেকে চার টাকা। এ ছাড়া অন্য অন্য প্রদেশেও এই ধরনের পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। অবশ্য এই পরীক্ষা একটু অন্য ধরনের—যেমন হর্মোন দু দফায় দেওয়া হচ্ছে। প্রথম বার যখন কুঁড়ি আসছে আর দ্বিতীয়বার যখন ফুল আসছে।

*

বোখারো এবং রাণীগঞ্জ অঞ্চলে নতুন কয়লা খনির সন্ধান পাওয়া গেছে। এই খনির কয়লা ভাল জাতের। এই কয়লা আমাদের রূরকেলা এবং ভিলাই ইস্পাত তৈরীর কারখানার পক্ষে খুব বেশী প্রয়োজনীয়। আশা করা যাচ্ছে যে এই উন্নত ধরনের কয়লার খনির খোঁজ পাওয়ার দরুণ এই দুই ফ্যাক্টারীর তৃতীয় ব্লাস্ট ফারনেস শীঘ্র চালু করা যাবে।

*

"সী ফ্যালকন" কোনও রকম সামুদ্রিক জীব নয়—এটি একটি প্লাস্টিকের নৌকা। সী ফ্যালকনের ওজন মাত্র ১৪ পাউন্ড অথচ এটি ২৫০ পাউন্ড ভার বহন করতে পারে। এটি ৬১ ইঞ্চি লম্বা। পলিথিন দিয়ে নৌকাটির চারদিক তৈরি হয়েছে। সী ফ্যালকন ছোট পুকুর বা যে কোনও রকম জলাশয়ে নৌকা হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি বেশ শক্ত ও মজবুত।

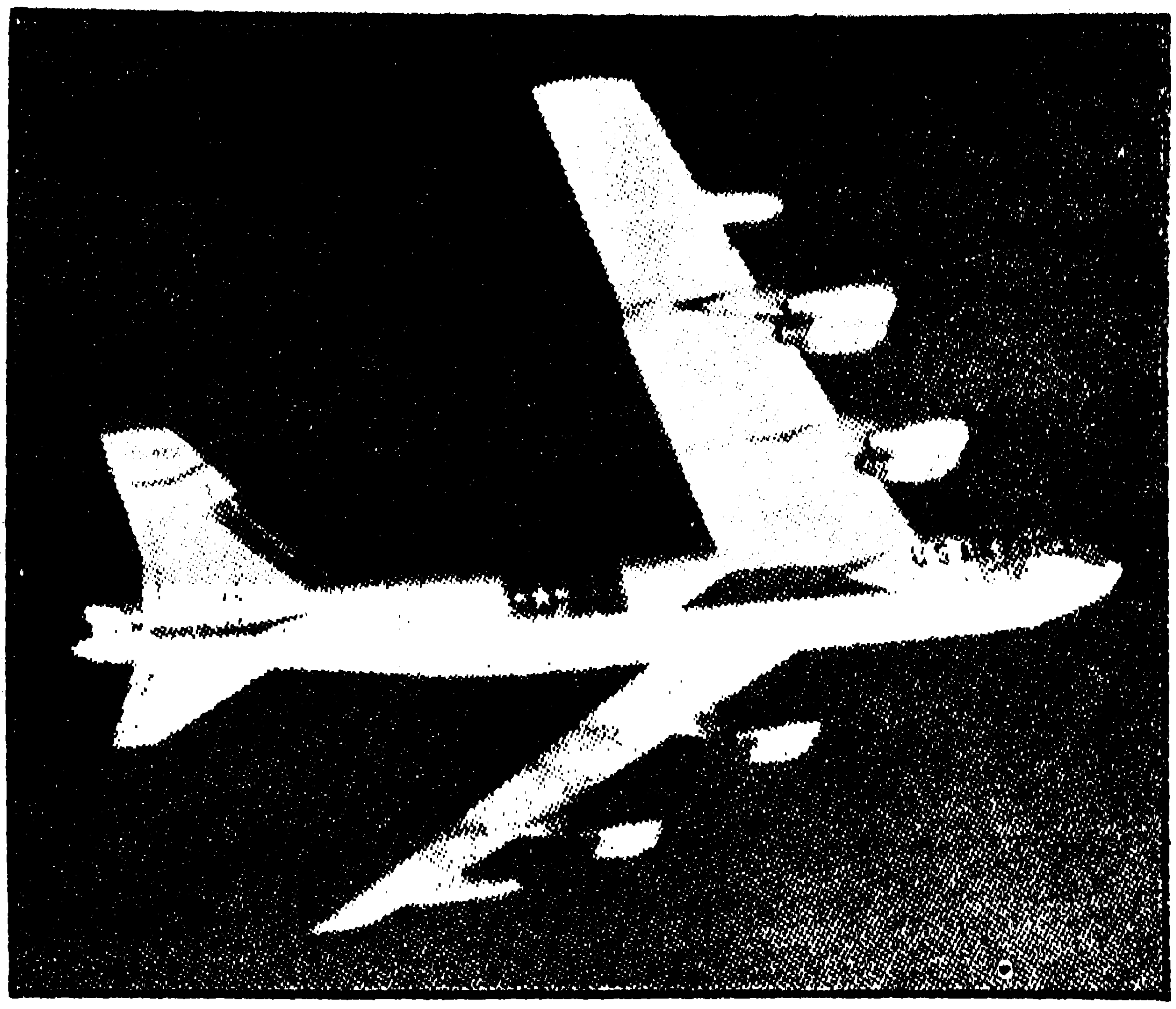

নতুন বোয়িং এরোপ্লেন

আমেরিকায় এক নতুন ধরনের বোয়িং এরোপ্লেন তৈরী করা হচ্ছে। এতে ৮টি ইঞ্জিন থাকবে—আর না থেমে এটা ৮০০০ মাইল উড়তে পারবে। এই সময়ের মধ্যে এর কোন প্রকার জ্বালানির প্রয়োজন হবে না।

*

আঙুলের ছাপ নিয়ে অনেক ধরনের গবেষণা করা হচ্ছে। খুব সহজে ছাপ

আঙুলের ছাপ নেওয়ার নতুন পদ্ধতি

নেওয়া এবং সেই ছাপ যাতে নষ্ট না হয়ে যায় তার এক নতুন পদ্ধতি বার করা হয়েছে। নাইলনের ওপর এক ধরনের তরল পদার্থ মাখিয়ে নিয়ে তারপর ছাপ নেওয়া হয়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই এটা শক্ত হয়ে যায় আর হাতের ছাপ পাকাপোক্তভাবে রেখে দেওয়া যায়।

*

জিওলজিকাল সার্ভে বিহারের আমজোড়ে যথেষ্ট পরিমাণে পাইরাইটের সন্ধান পেয়েছেন। পাইরাইট হচ্ছে আইরন সালফাইড যেটা সালফারের প্রয়োজন মেটাবে। বর্তমানে সালফার ভারতবর্ষের বাইরে থেকে আমদানী করা হয়। আশা করা যাচ্ছে যে, এই নতুন খনি থেকে যে পরিমাণে পাইরাইট পাওয়া যাবে তা দিয়ে আমাদের দেশের সালফারের চাহিদা বহু বছরের জন্য মেটাতে পারব।

*

এক ধরনের মাইক্রোব জেট প্লেনের জ্বালানি তেল খেতে ভালবাসে এবং শুধু যে ভালবাসে তা নয় তার থেকেও ওরা পুষ্টি সাধন করে। দেখা গেছে যে, এই মাইক্রোবগুলির এই তেলের মধ্যে বাস করার জন্য তেলের মধ্যে সর পড়ে এবং এক রকম হড়হড়ে জিনিস তৈরি হওয়ায় মাঝে মাঝে ইঞ্জিনের ছাকনি বন্ধ হয়ে যায় ফলে ঐ ছাকনি দিয়ে তেল যেতে না পারায় ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায়। এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের তল্লাসীর প্রয়োজন।

ট্রাম-বাসে

সেচ, সার এবং বণ্টন প্রথার সুব্যবস্থা হইলে নাকি পশ্চিমবঙ্গে চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে।—"অসম্ভব নয়। ন' মণ ঘি হলে রাধা নিশ্চয়ই নাচেন"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

সংবাদে প্রকাশ দার্জিলিং জেলাকে ভ্রমণবিলাসীর স্বর্গে পরিণত করার চেষ্টা চলিতেছে। শ্যামলাল বলিল—"চেষ্টা ফলবতী না হলেও আমরা দুঃখ করব না: নির্বোধের স্বর্গরাজ্য আর কে কেড়ে নিচ্ছে!!"

* * *

কেন্দ্রীয় মুষ্টি ভিক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের হতাশা—একটি সংবাদ শিরোনামা।—"কিন্তু এতে হতাশ হবার কিছু নেই. ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া কথার তত্ত্বও পশ্চিমবঙ্গই আবিষ্কার করেছে"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

রেলের যাত্রী-টিকিটে হিন্দী লেখার ব্যবস্থা হইবে বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম।—"দেখা যাক, যদি হিন্দীর দৌলতে বিনা টিকিটে ভ্রমণটা কমে"—মন্তব্য করিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * *

প্রসঙ্গত মনে পড়িল পূর্ব পাকিস্তানের একটি বিজ্ঞাপনের কথা—"বিনা টিকিটে ভ্রমণ করিবেন না, ধরা

পড়িবেন।" খুড়ো বলিলেন—"দেশ বিভাগ করা সহজ কিন্তু শিক্ষা সংস্কৃতি চলে তার নিজস্ব মহিমায়; এক্ষেত্রে পাক-ভারত কোন বিভেদ নেই!!"

* * *

সংবাদে শুনিলাম, রাজপথের গোলমালের মাত্রা নাকি দিল্লি ও বোম্বাইতে-ই বেশি। শ্যামলাল বলিল—"নাঃ, কলকাতার কোন দিক থেকেই কোন কৃতিত্ব আর রইল না, গোলমালেও তার হার!!"

* * *

লক্ষ্ণৌর প্লাবনের সময় একদিন একটি সিংহের খাঁচা জলে পড়িয়া যায় এবং দুইটি সিংহশাবক পথে বাহির হইয়া পড়ে। তত্ত্বাবধানের ভার যার উপর

ছিল সে ভয়ে একটি গাছে গিয়া চড়িল। কিন্তু তার কন্যা সিংহশাবক দুইটিকে খাঁচায় ফিরাইয়া আনে—"এ এমন একটা কোন সংবাদ নয়; মেয়েদের কাছে অনেক সিংহশাবককেই মেষশাবক বনে যেতে দেখেছি"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

করাচীতে ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে একই ফটক দিয়া কলেজে ঢুকিতে দেওয়া হয় না।—"কলেজের বাইরের রাস্তার নিয়ন্ত্রণ কীভাবে হচ্ছে তা সংবাদে প্রকাশ করা হয়নি"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

কৃষ্ণা ও গোদাবরীর জল বণ্টন বিরোধের কথা শুনিলাম।—"জলচুক্তিতে অজু যখন একবার সম্ভব হয়েছে, তখন আচমন-ই বা বাকী থাকবে কেন"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

বিগত অলিম্পিকে অস্ট্রেলিয়ার সাঁতারুদের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধানে নাকি জানা গিয়াছে যে, প্রণয়ই তাঁদের জয়ের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে—কয়েকজন নাম-করা সাঁতারু প্রতিযোগিতার আগেই প্রণয়-বিবাহে আবদ্ধ হইয়াছিল।—"জানিনে, প্রণয় পরিণয় খেলার মাঠে সাঁতারুদের ব্যর্থতার কারণ কিনা। কিন্তু এতে পারিবারিক জীবনে ডুব-সাঁতারে যে তাঁরা জয়ী হবেন তা হলফ করেই বলা যায়"—বলে শ্যামলাল।

* * *

ক্রিকেট খেলায় "সেকাল ও একাল" প্রবন্ধে ভি, জি লিখিয়াছেন—রঞ্জি ও গ্রেস কবর থেকে উঠে এলে পাঁচ বা ছ' দিনের টেস্ট দেখে হতবাক্ হয়ে যেতেন।—"টেস্ট দেখে নয়, টেস্টের কথা শুনে বলুন। কেননা, আমরা যদ্দুর জানি, রঞ্জি বা গ্রেসের পক্ষেও টেস্ট দেখার টিকিট সংগ্রহ করা সম্ভব হতো না!!"

* * *

পররাষ্ট্র দপ্তরের কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী শ্রীযুক্তা লক্ষ্মী মেনন নাকি বলিয়াছেন যে, অধিকাংশ ভারতীয় মাতাপিতার পক্ষে মেয়েদের কলেজগুলি শিক্ষানিকেতন নহে, বিজ্ঞাপনের কেন্দ্রস্বরূপ। কারণ, তাঁহাদের মেয়েরা ইহাতে ভাল স্বামী যোগাড় করিতে পারিবে।—"কিন্তু তিনি নূতন আর কী বললেন। কিঞ্চিৎ লিখনং বিবাহের কারণং আমরা অনেক আগে থেকেই জানি"—বলে শ্যামলাল।

* * *

একটি আবিষ্কার বার্তায় জানা গেল, বরফের উপর হকির বল ৮৮ মাইলের বেশি দ্রুত যায় না।—"তা হয়ত

যায় না। কিন্তু ঘাসের ওপর হকি বলের গতি এত দ্রুত যে তা চোখে পর্যন্ত দেখা যায় না, এ আবিষ্কার করেছেন ভারতীয় হকি খেলোয়াড় দল সাম্প্রতিক অলিম্পিকের মাঠে"—বলেন বিশুখুড়ো।

* * *

নিউইয়র্কে নাকি একটি লবণের তৈরি রাস্তা আছে।—"এই নুনের রাস্তায় ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে পারলে খুশ্চেফ হয়ত খানিকটা গুণও গাইতেন"—বলেন বিশুখুড়ো।

পুস্তক পরিচয়

গল্প সংকলন

গল্প—অন্নদাশঙ্কর রায়। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। পাঁচ টাকা।

কবি অন্নদাশঙ্কর রায়, একদা কালের সার্থক ছড়া রচয়িতা, গল্প রচনায় হাত দিয়েছিলেন প্রায় একুশ-বাইশ বছর আগে। অন্নদাশঙ্করের চরিত্রে এবং লেখার চরিত্রে প্রায় একই দীপ্তি দেদীপ্যমান, একই তীক্ষ্ণতা। সে ছড়ায় হোক, ভ্রমণ কাহিনী বা গল্প উপন্যাসে হোক। কথাটা বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন। ভালো গল্প আমরা অনেক পড়েছি কিন্তু তাদের স্বতন্ত্র করে চেনা, স্বতন্ত্র লেখকের বলে চেনা সব সময় সহজ-সাধ্য হয়নি। কিন্তু কতিপয় সৌভাগ্যবান লেখকের মতই অন্নদাশঙ্করের লেখা পড়লেই তাঁকে চিনতে পারা যায়।

প্রথম সাগর পারের গল্প, উচ্চতলীয় সমাজের রেখাচিত্র এবং একই সঙ্গে তৎকালীন দেশের রাজনৈতিক বারুদের গন্ধ অন্নদাশঙ্করের গল্পের মধ্যে ঘনীভূত হয়েছিল। বিষয়বস্তুর মধ্যে এই 'প্রকৃতি' ছড়ানো ছিল। আঙ্গিকের দিক থেকে অন্নদাশঙ্কর নতুন নতুন পরীক্ষা করে গিয়েছেন। কিন্তু কালের হাওয়া শুধুই দিক বদলায় না, শিল্প ও সাহিত্যে আঙ্গিকও বদলায়। তাই আজকের পাঠকের কাছে সেদিনের চমকপ্রদ লেখাও হয়ত তেমন নতুন ঠেকবে না। কিন্তু আলোচ্য লেখক শুধুমাত্র টেকনিক্যাল ছিলেন না, লেখার পশ্চাতে একটি সদাজাগ্রত হৃদয় এবং এক-জোড়া চোখ ছিল, যা উভয় অর্থেই তাঁর কবি-সত্তাকে প্রমাণিত করে। ভাষার মধ্যেও একটা জলুস ছিল, ছিল কারিগরি, এপিগ্রাম সংহত মূর্তি। তাঁর সেই প্রথম যুগের যৌবনের উত্তাপবহ গল্পগুলি থেকে শুরু ক'রে উনিশ শ' পঞ্চাশ পর্যন্ত রচিত গল্পের একটি সঞ্চয়ন এটি। পঁচিশটি ছোট বড় গল্প এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। গল্পগুলির নামকরণের মধ্যেও একটা চমকপ্রদ সরলতা পাঠক লক্ষ্য করবেন। গল্পগুলির সাহিত্যমূল্য নিয়ে আলোচনা না করেও বলা যেতে পারে যে, এই সংকলনটি কৌতূহলী গল্প পাঠকের কাছে যথেষ্ট মূল্যবান। কোনো লেখকের রচনা-সম্ভার একত্রে একই গ্রন্থায়তনের মধ্যে পাওয়া শুধু সুখের নয়, সৌভাগ্যেরও বিষয়।

২৯৬।৬০

মনের মত গল্প—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ভারতী প্রকাশনী, ৫বি কালাচাঁদ সান্যাল লেন, কলিকাতা-৪। দাম তিন টাকা।

ছয়টি নিখুঁত ছোট গল্প নিয়ে এই সংকলন কথাশিল্পী শৈলজানন্দকে আবার বর্তমানকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প লেখক রূপে নতুন করে ঘোষণা করবে। লেখকের বিষয় বস্তু হচ্ছে মানুষ আর মানুষের মন। প্রতিটি গল্প শৈলজানন্দের মানব প্রীতির সাক্ষ্য দেয়। জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি গল্পে লেখকের একটু বীতশ্রদ্ধ ভাব আছে কিন্তু যারা সেই জীবন যাপন করে সেই মানুষের প্রতি তিনি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। "আঁচড়" গল্পটিতে নিয়তির নির্মমতার কথা আছে কিন্তু ভুবনের মত একজন ভাল-মানুষকে নিয়তির করালগ্রাসে পড়তে দেখে আমরা একটু বিরক্ত বোধ করি। নিয়তির নির্মম হস্ত ভালমন্দ বিচার করে না তাই ভুবনের মৃত্যুকে নীরবে মেনে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। আবার "ভালমেয়ের ভালবাসা" গল্পে একজন স্বঙ্কৃত মানুষ উন্নতির পথে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছে দেখে আমরা আশান্বিত হই; জীবনে ভাল কিছুর দাম আছে জেনে আনন্দিত হই। "দুঃখ বিলাস" গল্পটি বর্তমান সংকলনের সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প। প্রায় প্রৌঢ়া এক মহিলা, স্বামীকে পরাসক্ত মনে করেন এবং এটা তাঁর সময় কাটাবার পক্ষে বেশ সুন্দর একটি চিন্তা। লেখকের মানবমনের গভীরতম প্রদেশের সঙ্গেও পরিচয় আছে সে কথা এই গল্পটিই প্রমাণ করে। মনঃস্তত্ত্বে এই ধরনের দুঃখ বিলাস বা স্যাডিজম নিয়ে অনেক গবেষণা করা হয়েছে কিন্তু শৈলজানন্দ তাঁর গল্পের মধ্যে কোন গূঢ় তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা না করেই, গভীর মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের পরি-চয় দিয়েছেন। গল্পগুলিকে লেখক তাঁর "মনের মত" বলেছেন এবং সেগুলি যে পাঠকের মনের মত হবে এ কথা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায়।

৩৭৮।৬০

উপন্যাস

বহু যুগের ওপার হতে—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা—৯। দাম দুই টাকা।

'প্রসাদগুণ' এবং 'রসালতা' শরদিন্দু-বাবুর রচনায় একত্রে বর্তমান। নরনারীর আবহমানকালীন গল্প-শ্রবণ-ক্ষুধার দিকে তিনি যেমন উদারহস্ত লেখক, রহস্য-চারিতার দিক থেকেও। গল্পের নিখুঁত কাঠামো রচনায় তিনি যেমন দক্ষ পুরুষ, চরিত্র চিত্রনেও তেমনি নিপুণ লিপিকার। এই কারণেই বোধ করি প্রবীণ লেখকদের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। আর-একটি দুর্লভ গুণ শরদিন্দুবাবুর মধ্যে রয়েছে, সেটি ঐতিহাসিক রোমান্স রচনার গুণ। এদিক থেকে তাঁকে বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র সার্থক উত্তরাধিকারী বলে মনে হয়।

বর্তমান ক্ষুদ্র উপন্যাসটি ঐতিহাসিক রোমান্স পর্যায়ের। গল্প নতুন নয়, পুরানো, তবে পরিমার্জন পরিবর্ধন ঘটেছে। তাঁর বিষকন্যা গল্পটির নবকৃত উপন্যাসরূপ এটি। রচনারীতি সম্পর্কে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। ২৭১।৬০,

আশীর্বাদ—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। প্রকাশক—দেবসাহিত্য কুটীর, ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯। দাম—৩, টাকা।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রথিতযশা

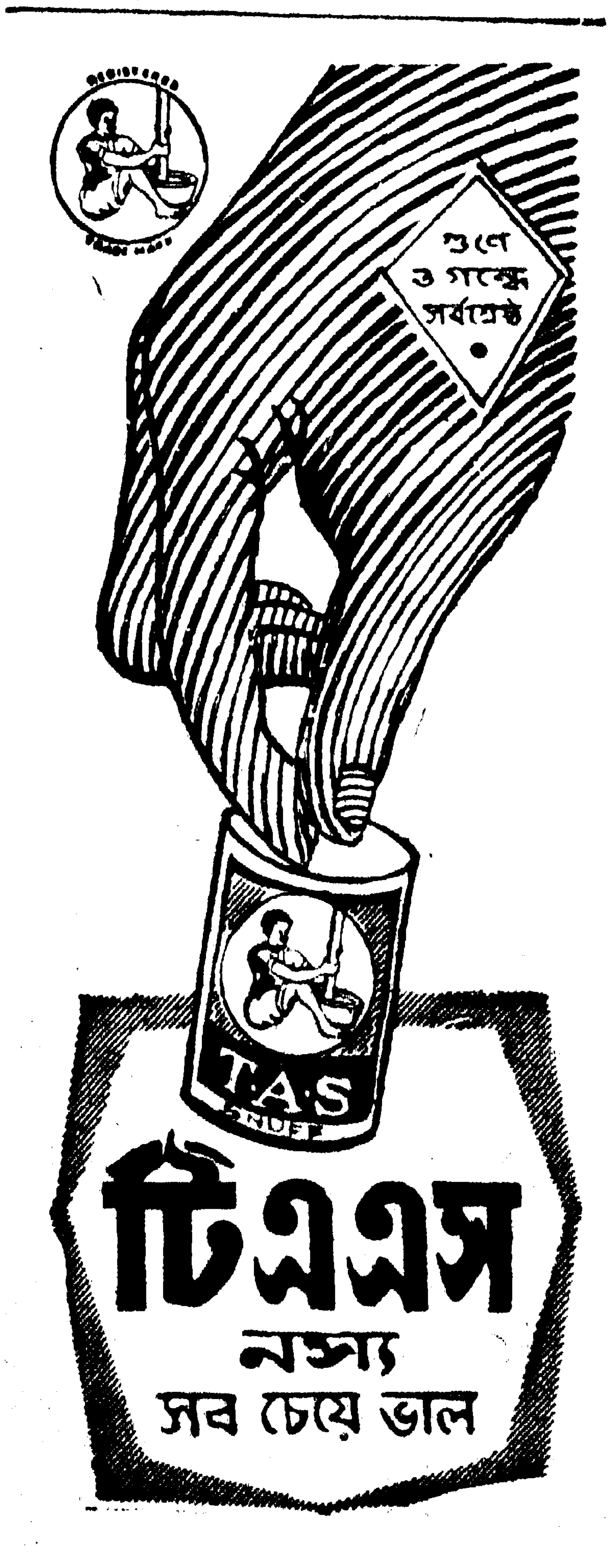

লেখিকা। আশা করা অন্যায় নয় যে, এই নতুন উপন্যাসটিতেও তিনি তাঁর অর্জিত সুনামকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবেন। যে-কোনো পাঠকই বইটিকে সহজে স্বাচ্ছন্দ্যে পড়ে শেষ করতে পারবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এইটুকুতেই কি সাহিত্যের যথার্থ সার্থকতা, না একজন সাহিত্যিক তাতে তৃপ্ত হতে পারেন? সে-প্রশ্নের উত্তরে দুঃখের সঙ্গে হলেও বলতেই হবে, এই নতুন উপন্যাসে লেখিকা কাহিনী সংস্থাপনে কিংবা চরিত্রসৃষ্টিতে কোনো দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে পারেননি। বরং বলা যায়, তিনি গতানুগতিক পদ্ধতিতে একটি পুরনো ধরনের গল্পকেই এখানে উপন্যাসের রূপ দিয়েছেন। তবু বইটি আগাগোড়া সুখপাঠ্য হতে পেরেছে লেখিকার সাবলীল রচনার গুণে। অন্তত সেদিক থেকে এ-রচনায় ত্রুটি নেই। ৩৫৩।৬০

তারার আঁধার—মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য। কথাকলি, ১, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলকাতা—৯। ৩·৫০ নঃ পঃ।

'বাংলা দেশে বর্তমান সময়ে মহিলা ঔপন্যাসিক বিরলপ্রায়। যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা অনেকেই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা প্ররোচিত নন। ভঙ্গীকে বাদ দিলে অবশ্যই তাঁরাও গল্প লেখেন, কিন্তু নিছক গল্প-বুভুক্ষা বর্তমান যুগের ক্ষুধা নয়। বাংলা সাহিত্যের মহিলা মহলের দিকে তাকালে মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের আগমন বেশ আশাপ্রদ ব্যাপার। অল্পকালের মধ্যেই তিনি সাহিত্যের দরবারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

'তারার আঁধার' উপন্যাস, রোমাণ্টিক উপন্যাস। কাহিনীর আবহ প্রেম, তবে কেন্দ্রে রয়েছে প্রয়োজন এবং অস্তিত্ববাদের দ্বন্দ্ব দেখাবার চেষ্টা। মধ্যবিত্ত সমাজে এমন অনেক চরিত্র জন্মায়, যারা ক্ষমতাবান, কিন্তু আত্মসচেতন নয়। অর্থাৎ বোহিমেবী, গরহিসেবী বললেই বোধ হয় ঠিক বলা হয়। আত্ম-সৃষ্ট জটিলতার মধ্যে জড়াতে জড়াতে একদিন তারা রুদ্ধশ্বাস হয়ে মারা যায়। বর্তমান কাহিনীর নায়ক বিজয় এমনই একটি চরিত্র।

ভাষা ও কথন-ভঙ্গী শিথিল নয়। উপন্যাসের ভূমিকাটি প্রায় নিষ্প্রয়োজন ছিল। ২১৬।৬০,

সাধক-প্রসঙ্গ

সৎপ্রসঙ্গ—(দ্বিতীয় খণ্ড) : স্বামী বিশুদ্ধানন্দ প্রকাশক স্বামী সৌম্যানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, শিলং, আসাম। পৃষ্ঠা ১৫২, মূল্য ২·৫০।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী বিভিন্ন সময়ে নানা-স্থানে ভক্তমণ্ডলীর নিকট ধর্মতত্ত্বের যে সকল আলোচনা করিয়াছেন তাহারই দ্বিতীয় সংকলন সৎপ্রসঙ্গ (২য় খণ্ড) কথপোকথন খুবই মর্মস্পর্শী। কথামৃতের তত্ত্বই ভক্ত-সমক্ষে প্রেরণাদায়কভাবে পরিবেশন করা হইয়াছে। স্বাভাবিক কারণে যে পুনরুক্তি সংকলনে ঘটিয়াছে তাহাতে আলোচ্য ভাব দৃঢ়ীভূত হইবে বলিয়া মনে হয়। পুস্তক-খানির ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদি সুরুচির পরিচায়ক। ৯২।৬০

গুরুপূর্ণিমা—স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী প্রণীত। শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক ৩১নং শ্যামপুকুর স্ট্রীট, কলিকাতা—৪ হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী ত্যাগী এবং সাধক পুরুষ। বাংলা দেশের ধর্মাচার্যদের মধ্যে তিনি অন্যতম। বর্তমান পুস্তক-খানিতে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে নানাদিক হইতে তিনি আলোচনা করিয়াছেন। গুরুর স্বরূপ কি, গুরু কাহাকে বলে প্রভৃতি সম্পর্কে অনেকে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। সরস্বতী মহারাজ তৎসমুদয়ের নিরসন করিয়াছেন। গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ বিস্তৃত, সুচিন্তিত এবং সারগর্ভ আলোচনা খুব কমই দেখা যায়। পুস্তক-খানি পাঠে অধ্যাত্মরসলিপ্সুমাত্রেই পরি-তৃপ্তি লাভ করিবেন। ৩১০।৬০

ম্যাক্স মুলার ভবন

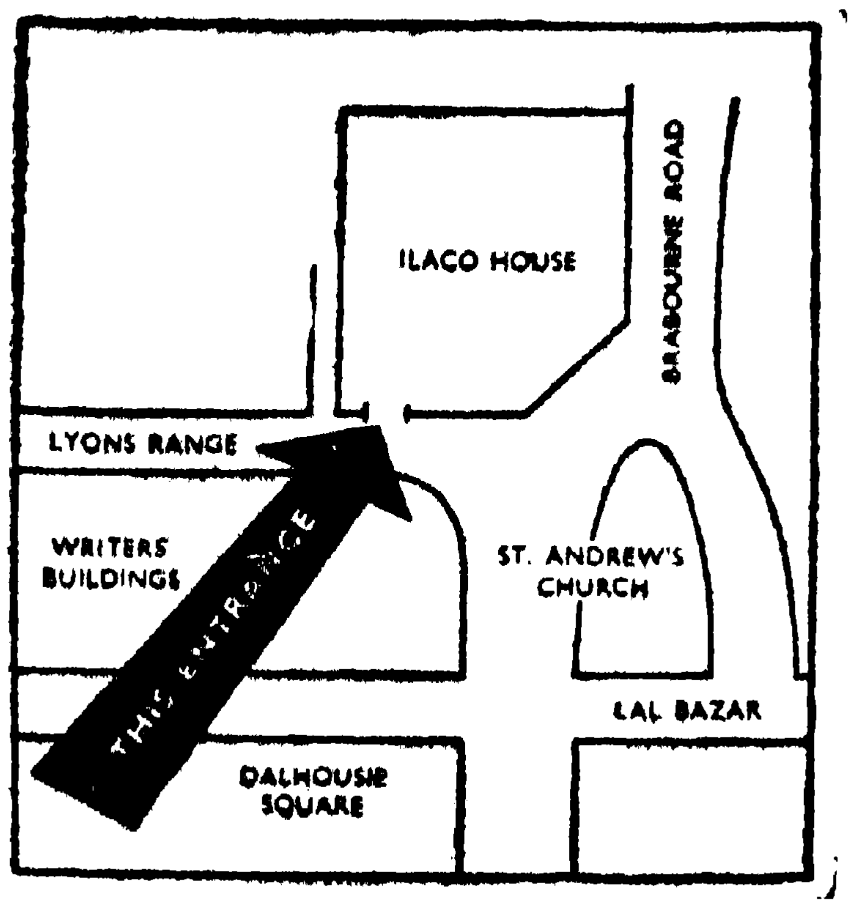

জার্মান ভাষা শিখুন!

আমাদের আগামী সেসন ৩রা নভেম্বর, ১৯৬০ থেকে শুরু হচ্ছে। আপনি এই সেসনে যোগ দিতে চান কি?

বিস্তারিত বিবরণ জানতে হ'লে আমাদের অফিসে আসুন। ভর্তির তারিখ ২৪-১০-৬০ থেকে ২-১১-৬০ পর্যন্ত—সময় বেলা ১টা থেকে সন্ধ্যে ৭টার মধ্যে।

জার্মান ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এবং গ্যেটে ইনস্টিট্যুট মিউনিক

কলিকাতা শাখা :

ইলাকো হাউস, ১/৩ ব্র্যাবোর্ণ রোড ● টেলিফোন : ২২-৫৭৫৫

(৮০২৮৫)

আলোচনা

কবিতার কথা—বিমলকৃষ্ণ সরকার। সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, ৯, রায়বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। পাঁচ টাকা।

কবিতা নিয়ে খণ্ড বিচ্ছিন্ন আলোচনা আজ পর্যন্ত অল্প হয়নি, গ্রন্থও অনেক বেরিয়েছে। কিন্তু অনেক কাব্যালোচনাই মৌলিক রসাস্বাদন-প্রযুক্ত রচনা হয়ে ওঠেনি, লেখার মধ্যে অধ্যাপনা এবং দলমত প্রচারের বাসনা প্রকট হয়েছে। সাহিত্য নিশ্চয়ই একমেবাদ্বিতীয় পন্থার অংক নয়, মতান্তরের অবকাশ অবশ্যই আছে কিন্তু প্রকৃত কবিতা এবং রস বিচারের ক্ষেত্রে দ্বিরুক্তির অবকাশ নেই।

'কবিতার কথা' গ্রন্থে কবিতা-স্বরূপের যৌক্তিক বিশ্লেষণ আমাদের আকৃষ্ট করল। ছ'টি অধ্যায়ে লেখক কবিতার বিষয়, লক্ষ্য, রূপবৈচিত্র্য, প্রকরণ, ইতিহাস ও রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করেছেন। লেখন-ভঙ্গী বাগাড়ম্বরহীন, স্বচ্ছ এবং ঋজু। অতিস্বল্প পরিসরের মধ্যে তিনি কবিতা বিষয়ে এবং বাংলা কবিতা বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ দৃষ্টিপাত করেছেন। সাহিত্য-বিষয়ের ছাত্রদের কাছেই শুধু নয়, সাধারণ পাঠকমাত্রের কাছেও গ্রন্থটি আদরণীয় হবে।

১৮২।৬০

বিভূতিভূষণ—চিত্তরঞ্জন ঘোষ। প্রকাশক: শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ২০, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা—৫। দাম পাঁচ টাকা।

যতদূর জানি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্কে ইতিপূর্বে কোন আলোচনা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন ঘোষ এ প্রসঙ্গে প্রথম গ্রন্থকার। কেবলমাত্র ছাত্রার্থে নয়, সাধারণ পাঠকের জন্যও বিভূতিভূষণ সম্পর্কিত সাহিত্যালোচনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল বর্তমান সময়ে। আলোচ্য গ্রন্থটি যথাক্রমে 'কবির আলোকে, সাহিত্যাদর্শ, শিল্পীমানস, প্রেম অপূর্ব-চরিতমানস, ছোটগল্প ও রচনারীতি'—সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। লেখকের ভাষা পরিচ্ছন্ন সুন্দর। বিশ্লেষণভঙ্গী ঋজু ও স্বচ্ছ। রচনায় প্রসাদগুণ আছে। তবে দু-একটি স্থানে অতিকথন ঘটেছে।

২৫।৬০,

বিবিধ

শিকারীর রোজনামচা—ইভান তুর্গেনেভ। বিদেশী ভাষার সাহিত্য প্রকাশালয়, ২১, জুবোভস্কি বুলভার, মস্কো। পরিবেশক: ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২। ২·৮১ ন প।

শিকারীর রোজনামচা মূলত শিকার কাহিনী নয়। ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে জনসাধারণের সরল হৃদয়ের অভাব-অভিযোগকে সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন অমর লেখক। স্কেচধর্মী উপভোগ্য রচনা, ছোট ছোট চিত্র ও চরিত্রের বাস্তব সমাহার।

১২৭।৬০

তবলার কথা (প্রথম খণ্ড)—শ্রীসুবোধ নন্দী। এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা। প্রাপ্তিস্থান—ডি এম লাইব্রেরী, জ্ঞান ব্রাদার্স, আর বি দাস ও পি রানা অ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা।

গ্রন্থকার তবলা এবং মৃদঙ্গ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। দীর্ঘকাল এই সকল বাদ্যের অধ্যাপনায় তিনি শিক্ষার্থীদের যেসব বিষয় জানা প্রয়োজন মনে করেছেন, সেগুলি এই গ্রন্থে অত্যন্ত সরলভাবে সন্নিবেশিত করেছেন। এই বিষয়গুলির মধ্যে তবলার ইতিহাস পরিচয়, তবলার ধ্বনি সম্বন্ধে জ্ঞান, বাণী উৎপাদন রীতি, বোললিপি-পদ্ধতি, তবলার পরিভাষা, তবলার অবয়ব পরিচয়, আসন প্রণালী এবং সুরবাঁধা প্রণালী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তবলার প্রচার এবং প্রচারকগণের উল্লেখ ও বিবরণ এই গ্রন্থের মূল্যবৃদ্ধি করেছে। বাংলা এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে তবলার প্রচার কিভাবে হয়েছে, সে সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়েছে। তবলা সম্বন্ধে বহু পারিভাষিক শব্দ আছে, যেগুলির তাৎপর্য অনেকের কাছে স্পষ্ট নয়। গ্রন্থকার সেগুলি সহজে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। বইটির মধ্যে কোথাও কোন আঞ্চলিক রীতি সম্বন্ধে গোঁড়ামি নেই। জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি বিজ্ঞানসম্মতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটি আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও জ্ঞাতব্য বিষয়ে সমৃদ্ধ এবং শিক্ষার্থীরা এই গ্রন্থে বিশেষ উপকৃত হবেন। শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ক্ষুদ্র ভূমিকায় তবলা শিক্ষায় প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

ট্রেড ইউনিয়নিজম—প্রভাসকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—ওয়ার্কার্স পাবলিকেশন হাউস (প্রাইভেট) লিঃ। ২০, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১।

আলোচ্য পুস্তকখানি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাস নহে। ইহা এদেশের শ্রমিক আন্দোলনের গঠনতন্ত্র এবং তাহার ত্রুটি-বিচ্যুতির দার্শনিক ব্যাখ্যা মাত্র। ১৮৮৫ সালে ভারতে প্রথম শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং ১৯২০ সালে সারা-ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সৃষ্টি হয়। শ্রমিক সংস্থা গঠন প্রণালীর গোড়ার গলদ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতলব সিদ্ধির প্রয়াসের ফলে সারা-ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে ফাটল ধরে। ক্রমশ এদেশে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের সৃষ্টি হয়।

এই প্রসঙ্গে, লেখকের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে শ্রমিক সাধারণের পক্ষে অত্যন্ত দুর্বোধ্য হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। অন্যপক্ষে বিভিন্ন দেশের ট্রেড ইউনিয়নের গঠন প্রণালীর সঙ্গে ভারতের ট্রেড ইউনিয়নের গঠন প্রণালীর তুলনামূলক বিশ্লেষণ সহজবোধ্য ভাষায় বিবৃত হইলেও শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে জিজ্ঞাসু মনের তৃষ্ণা মিটিতে পারিত। শ্রমিক সংস্থার সহিত যে শ্রেণীর লোক ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাহারা এই পুস্তক পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন বলিয়া আশা করা যায় না।

৮৭।৬০

শারদ-সাহিত্য

বিপ্লবী বাঙ্গালী—সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র। ৪, বলরামদাস স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে 'বিপ্লবী বাঙ্গালী'র বিশেষ সংখ্যাখানিতে ডাঃ ভূপেন দত্ত, শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী ও শ্রীভূপেন্দ্র-কিশোর রক্ষিত রায় প্রমুখ বিপ্লববাদীদের কয়েকটি সময়োপযোগী প্রবন্ধ স্থান লাভ করিয়াছে। কয়েকটি তৎকালীন বরেণ্য দেশ-প্রেমিক এবং প্রাক্তন বিপ্লবী শহীদের ছবি সংখ্যাখানির বিশেষ আকর্ষণ। পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষে, পুলিসের হাত এড়াইবা'র জন্য নিজেদের রিভলভারের গুলিতে এবং ফাঁসি মঞ্চে যাঁহারা আত্মবলি দিয়াছেন এমন কয়েকজন শহীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

ভ্রম সংশোধন

গত সপ্তাহে প্রকাশিত 'মেট্রিক পদ্ধতি' প্রবন্ধে লেখক লিখেন—'১৭৯০ সালে ফ্রান্সের রাজা ছিলেন চতুর্দশ লুই।' চতুর্দশ লুইয়ের জায়গায় ষোড়শ লুই হবে।

প্রাপ্তি স্বীকার

আরও কথা বলো—বাণী রায়।
উত্তর সাগরের তীরে—বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়।
ভারতে জাতীয় আন্দোলন (ইসলাম ও পাকিস্তান)—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
শারদীয়া ছড়া—শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত।
বেদান্ত দর্শন (২য় খণ্ড)—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ।
পাট ও পুতুল—রজত সেন।
দুই সমতল—কার্তিক ভট্টাচার্য।
বনচাঁড়ালের কড়চা—গোপাল হালদার।
ঝড়—কুমারেশ ঘোষ।
শকুন্তলা দ্যানাটৌরিআয়—অ. কৃ. ব।
রোমের রূপসী (১ম ও ২য় খণ্ড)—এ্যালবার্টো মোরাভিয়া—অনুবাদক প্রবীর ঘোষ।
আমি চঞ্চল হে—চিত্রগুপ্ত।
তদন্ত—প্রণবেশ চক্রবর্তী।

রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

শিল্পের সেবা

চলচ্চিত্রসেবী বলে নিজেদের ভাবেন এমন ব্যক্তির অভাব নেই বাংলা চিত্রজগতে। তাঁদের সাক্ষাৎ বিশষে করে মেলে কোন আন্দোলন বা উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়োজনে। সরকার হয়তো কোন নতুন কর ধার্য করলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা'ও চিত্রশিল্পের উন্নতির মূলে "সরকারী কুঠারাঘাতে"র বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ালেন। সরকারের পক্ষ থেকে কোন নিষেধাজ্ঞা জারী হল, চিত্রসেবীরাও সঙ্গে সঙ্গে জড়ো হলেন তা প্রতিরোধ করতে। এ-কথা কেউই বলতে চাইবেন না যে সরকার যা করেন তা-ই ন্যায়, আর চলচ্চিত্র-সেবীরা যা চান তা-ই অন্যায়। চিত্রশিল্পকে বাইরের আঘাত থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এর অভিভাবকদের যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয় তার মধ্যে ব্যবহারিক প্রয়োজনবোধ ও ব্যবসায়িক স্বার্থের দিকটাই বড় হয়ে দেখা দেয়। চিত্রশিল্পের উন্নতির জন্যে ব্যবহারিক স্বাচ্ছন্দ্য ও ব্যবসায়িক সাফল্যের অপরিহার্যতাকে অস্বীকার করবার কোন কারণ নেই। এবং বলা বাহুল্য, চলচ্চিত্র-শিল্পের ব্যবহারিক স্বার্থরক্ষার সংগ্রামে যাঁরা এগিয়ে আসেন তাঁদের অধিকাংশই চিত্র-ব্যবসায়ী।

কিন্তু এমনিভাবে যাঁরা চলচ্চিত্রসেবীর ভূমিকা গ্রহণ করে আত্মশ্লাঘা অনুভব করেন, চলচ্চিত্রশিল্পের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি, প্রসার ও প্রগতির জন্যে তাঁদের কি আর কিছু করণীয় নেই? ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতির চুলচেরা বিচার নিয়ে যাঁরা সদা ব্যস্ত, খাটানো টাকা সুদে-আসলে ফিরে আসবে কী আসবে না এই ভাবনায় যাঁরা সদা অস্থির, রজতপট যাঁদের কাছে শুধুই মাত্র বাণিজ্যক্ষেত্র—তাঁদের কাছে চিত্রশিল্পের ব্যবসায়িক স্বার্থ-রক্ষা ব্যতীত আর কোন দ্বিতীয় চিন্তা কি নেই? অবশ্য কর্তব্য বলতে অন্য কিছুই তাঁদের চোখে পড়ে না। এর কারণ শিল্পপ্রীতির আদর্শে তাঁরা ভাবিত বা অনুপ্রাণিত নন।

বাংলা চিত্রজগতে শিল্পের উৎকর্ষ-বিধানের দায়িত্ব যেন অল্পসংখ্যক কয়েকজন চিত্রপরিচালকের। তাঁরা শিল্পরূপের সীমান্তবিস্তারের কথা ভাববেন, নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করবেন, বিদেশে বাংলা ছবির মান বাড়াবেন। আর স্বদেশে তাঁদের ছবি যদি টিকিটঘরের দাক্ষিণ্য না পায় তবে তাঁরা তথাকথিত চিত্র-ব্যবসায়ীদের কাছে উপহসিত হবেন।

সম্মিলিতভাবে এবং চলচ্চিত্রশিল্পের সংস্থাগত উদ্যোগে শিল্পের সেবা ও উৎকর্ষের (শুধু ব্যবসায়িক দিক দিয়ে নয়) জন্যে কোন শুভপ্রয়াসের আয়োজন নেই আমাদের চিত্রজগতে। "ইনস্টিটিউট" জাতীয় কোন সংস্থা গড়ে তুলে সেখানে নিয়মিত আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা করে ছায়াছবি নির্মাণের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে নবীন উৎসাহী কলাকুশলী ও শিল্পীদের শিক্ষা-দানের কোন ব্যবস্থা নেই বাংলা দেশে। এ-জাতীয় আয়োজনের জন্যে সরকারী সাহায্যের অপেক্ষা করে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। নতুন কোন শিক্ষা-ভবন তৈরীর ব্যবস্থা না-ই বা সম্ভব হল। চলচ্চিত্রশিল্পের যাঁরা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাঁরা একত্র হয়ে এই সাধু উদ্দেশ্যে যদি কোন চিত্রগৃহের মালিক কিংবা শহরের স্থায়ী হল-ঘরের কর্মকর্তাদের শরণাপন্ন হন তবে তাঁরা কেনই বা নিরাশ হবেন। প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন স্থানে তাঁরা আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা করতে পারেন। সেখানে সুযোগ্য চিত্র-পরিচালক, কলাকুশলী ও শিল্পীরা এসে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান নতুন বিদ্যার্থী-দের মধ্যে বিতরণ করার সুযোগ পাবেন। এমনিভাবে ধীরে ধীরে সত্যিকারের শিল্প-চর্চার পথ প্রশস্ত হবে, বাংলা চলচ্চিত্রশিল্প নবীন গুণীর সন্ধান পাবে এবং বাংলা ছবি শিল্পোৎকর্ষের দিক দিয়ে আরও এগিয়ে যাবে।

শিল্পোন্নতির এই প্রয়াস ব্যয়বহুল নয়, শুধু পরিশ্রম ও আন্তরিকতা সাপেক্ষ। চলচ্চিত্রশিল্পের কল্যাণ যাঁরা কামনা করেন, চলচ্চিত্রসেবী বলে যাঁরা নিজেদের জাহির করতে দ্বিধাগ্রস্ত নন, তাঁরাই এই শুভপ্রয়াসে অগ্রণী হয়ে আসতে পারেন।

চিত্রজগতের তথাকথিত "আড্ডা"য় পর-নিন্দা, পরচর্চা, রাজনীতিসুলভ কুচক্র এবং

চিত্রকল্পের "কোমল গান্ধার" (পরিচালনা ঃ ঋত্বিক ঘটক) ছবির একটি দৃশ্যে সুপ্রিয়া চৌধুরী ও অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

রুচিহীন রসালাপে অনেক দিন এবং অনেক আগ্রহ ব্যয়িত হয়েছে। প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিরা তাঁদের আশে-পাশের নিষ্কর্মা "আড্ডাবাজ" লোকদের দীর্ঘকাল যাবত তুষ্ট করে আসছেন। যে উন্নাসিকতা ও উন্মার্গগামিতা চিত্রজগতের মানসিকতাকে অধিকার করে বসেছে, তা-থেকে অনেকেই মুক্ত নন। আত্মিক অপব্যয়ের এই রাহুগ্রাস চিত্রজগতের সর্বস্তরেই অন্ধকারের মায়াজাল সৃষ্টি করে চলেছে। এই অন্ধকার থেকে আলোকে উত্তরণের পথ দেখাতে পারেন সত্যিকারের চলচ্চিত্রসেবীরা। শিল্পের প্রকৃত কল্যাণ কোন পথ দিয়ে আসতে পারে এবং এর জন্যে কতটুকু ত্যাগ ও আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন সে নির্দেশ দেবেন চলচ্চিত্রশিল্পের কল্যাণকৃৎ'রা। চিত্রজগতে কল্যাণকৃৎ যদি থাকেন তবে তাঁদের এগিয়ে আসবার সময় হয়েছে।

প্রণয় ও কৌতুকের সম্ভার

প্রণয় ও রঙ্গরসের রসায়নে আমোদের যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, প্রোডাকশন সিণ্ডিকেট-এর "শেষ পর্যন্ত" ছবিটিতে তা অনুপস্থিত নয়।

কুমারেশ ঘোষের যে কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি তৈরী, তার মুখ্যচরিত্র এক অল্পশিক্ষিতা তেজস্বিনী নারী। তার শিক্ষিত স্বামী বিশ্বাস মশাই জীবন-সংগ্রামে ব্যর্থ। কলকাতায় থাকেন। স্ত্রী ও ভাগ্নি মিনুকে নিয়ে ছোট্ট তাঁর সংসার। কিন্তু সংসারের অন্নসংস্থানের ক্ষমতা তাঁর নেই।

সংসার-পালনে স্বামীর ব্যর্থতা স্বচক্ষে দেখবার জন্যেই বিশ্বাসগিন্নী একদিন ভাগ্নি মিনুকে নিয়ে কলকাতায় স্বামীর মেসে এসে উপস্থিত হন। অসহায় স্বামী এতে বিপন্ন বোধ করলেও স্ত্রীর গঞ্জনার সামনে দাঁড়াবার সাহস তাঁর নেই। বুদ্ধিমতী বিশ্বাসগিন্নী নিজের সামান্য জমানো টাকা তুলে দেন স্বামীর হাতে। মেস থেকে তাঁরা চলে আসেন একটি ছোট্ট ঘর ভাড়া নিয়ে। ছোট্ট সংসারটিকে স্বচ্ছল করে তোলার এক দুরন্ত পণ বিশ্বাসগিন্নীর মনে। শেলাই-এর কাজ করে নিজেও তিনি রোজগারের পথে পা বাড়ান।

এমন সময় এক সামান্য কাজ নিয়ে গৃহকর্তা চলে আসেন পুরী। পুরীতে স্বামীর দিনযাপন সম্বন্ধে অস্বস্তিকর খবর পেয়ে বিশ্বাসগিন্নী অগত্যা মিনুকে নিয়ে এসে উপস্থিত হন পুরীতে। পুরী স্টেশন থেকে "সিন্ধুতটে" হোটেলের এক দালাল-কর্মচারী বিশ্বাসগিন্নী ও মিনুকে আদর করে নিয়ে এল সংগে করে। হোটেলে উঠেই বিশ্বাসগিন্নী স্বামীর সন্ধান করেন ও তাঁর দেখা পান। তারপর হোটেল থেকে বিদায় নেবার সময় বিল মেটাতে গিয়ে বিশ্বাসগিন্নী মনে মনে যেমনি জ্বালা অনুভব করলেন, তেমনি দেখতে পেলেন নতুন আশার আলো। হোটেলের মালিক ভুবন দত্তের ব্যবহারে ক্ষেপে গিয়ে বিশ্বাসগিন্নী মনে মনে সংকল্প করলেন যে, পাশাপাশি তিনিও হোটেল খুলবেন এবং হোটেল-ব্যবসার প্রতিযোগিতায় তাঁকে নাজেহাল করে তুলবেন। হোলও তাই। "সাগর-বেলায়" নাম দিয়ে হোটেল খুললেন বিশ্বাসগিন্নী। এই ব্যবসায়ে খুব উৎসাহ পাননি বিশ্বাস মশাই। তাঁর কাছে আরও খারাপ লাগল দুই হোটেলের মালিকের মধ্যে নোংরা রেষারেষি।

দুই হোটেলের এই শত্রুতার মধ্যে এক প্রণয়ী-যুগলের স্বপ্ন ও সাধ যেন ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে থাকে। ওরা হল মিনু ও পানু। পানুকে কলকাতা থাকতেই চিনত মিনু। পুরী এসে মিনু একদিন জানতে পারল যে, পানু তার মামীমারই পরম শত্রু ভুবন দত্তের ভাইপো এবং একমাত্র উত্তরাধিকারী। পুরীর সমুদ্রের বালুকা-বেলায় পানু ও মিনুর মন দেওয়া-নেওয়ার পর্ব এগিয়ে চলে এক পরম লক্ষ্যের দিকে। উদয়গিরির শিখর-চূড়ায় তারা একদিন শপথ করে, ওরা পরস্পরের জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে মধুমিলনের ক্ষণটি তাদের জীবনে যতদিন না আসে।

পানু ও মিনুর এই ভালোবাসার কোন মূল্য নেই তাদের অভিভাবকদের কাছে। এদিকে "সাগর-বেলায়" ফেঁপে উঠেছে দিন দিন, এবং অর্থে ও প্রতিপত্তিতে বিশ্বাসগিন্নী স্থান করে নিয়েছেন সমাজের উপর তলায়। মিনু ও পানুর প্রণয়ের মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছেন ভুবন দত্তর কুচক্র। এবং মিনুকে পানুর হাতে সমর্পণ করতেও তাঁর নতুন অর্থ-কৌলিন্য বাধা পায়। ভুবন দত্তের হোটেলের চরম দুরবস্থার দরুণ তখন পানুকে সামান্য সাইকেল মিস্ত্রীর কাজ করে অন্নের সংস্থান করতে হয়। তাই মিনুর বিয়ে বিশ্বাসগিন্নী ঠিক করেন এক বিলেত-ফেরত ছেলের সংগে।

নিজের ইচ্ছাকে রূপ দিতে গিয়ে বিশ্বাস-গিন্নী পদে পদে বাধার সম্মুখীন হন। সবচাইতে বড় বাধা হলেন তাঁর স্বামী। বিশ্বাসমশাই স্ত্রীর সৌভাগ্যে কোন ভাগ বসাতে চায়নি কোনদিন। তিনি নিজে লণ্ড্রির দোকান খুলে স্বাবলম্বনের পথ বেছে নিয়েছেন। অর্থ-কুলীন উন্নাসিক সমাজের প্রতি তিনি বিরূপ। তিনি চান মিনু তার মনের মানুষকে পেয়ে জীবনে সুখী হয়। মিনুর সুখ চান আরও একজন —তিনি বসুমশায়। "সাগর-বেলায়" তার কাছে ঋণী। এই হোটেলের উন্নতির মূলে তার অনেক অবদানের জন্যে বিশ্বাসগিন্নী তার প্রতি কৃতজ্ঞ। মিনু তার গভীর স্নেহের পাত্রী।

বিশ্বাসগিন্নীর নির্দিষ্ট পাত্রের সংগে মিনুর বিয়ের দিনই "সাগর-বেলায়" এসে উপস্থিত হন বসুমশায়। মিনু সেদিন মামীমা'র নজর এড়িয়ে গোপনে এসে সাক্ষাৎ করে পানুর সংগে। পানু ও মিনুর এত-দিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা সেদিন ধুলোয় লুণ্ঠিত হবার উপক্রম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা বিচিত্র ঘটনার ভেতর দিয়ে কীভাবে বিশ্বাসগিন্নীর অন্তরের পরিবর্তন ঘটে এবং প্রণয়ী-যুগল পরস্পরের সংগে মিলিত হয় তা-নিয়েই কাহিনীর সুখ-পরিণতি গড়ে ওঠে।

চিত্রনাট্যকার ও সংলাপ-রচয়িতা নৃপেন্দ্র-কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ছবির কাহিনীকে কৌতুকের পরিস্থিতি ও সরস সংলাপে সামগ্রিকভাবে উপভোগ্য করে তুলেছেন। কিন্তু ছবির প্রণয়োপাখ্যান সে-তুলনায় অনেকখানি নিষ্প্রভ। চিত্রনাট্যটি অপ্রয়োজনীয়ভাবে দীর্ঘায়িত এবং ক্ষণে ক্ষণে কৌতুকোজ্জ্বল ও নাট্যগম্ভীর পরিবেশের দ্বিমুখী ধারায় লক্ষ্যচ্যুত। চিত্রকাহিনীতে প্রেমোপাখ্যান ও দাম্পত্য-সম্পর্কের (বিশ্বাস-দম্পতির ক্ষেত্রে) সুর ধরে "মেলোড্রামা"র যে-সব মুহূর্ত স্থান করে নিয়েছে সেগুলি ছবির মূল মেজাজ ও রসের পরিপন্থী। স্ত্রীর স্বোপার্জিত সম্পদে ভাগ বসাতে যে-কোন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন স্বামীরই আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু ছবির বিশ্বাসমশাইয়ের মধ্যে এই আত্মমর্যাদাজ্ঞান "সাগর-বেলায়" স্থাপনের পূর্বে এবং বেশ কিছুকাল পর পর্যন্তও প্রকাশ পায়নি। ছবির শেষার্ধে হঠাৎ তা উগ্র হয়ে উঠেছে বিশ্বাসমশাইয়ের চরিত্রে। এবং সেই সংগে তার মধ্যে দেখা দিয়েছে স্বাবলম্বনের সন্তোষের পরিবর্তে বিত্তশালী সমাজের প্রতি অহেতুক উষ্মা। বিশ্বাস-পত্নীর মধ্যে ছবিতে স্বামীর প্রতি আনুগত্যের দিক থেকে কোন নিন্দনীয় ত্রুটী দেখা যায়নি। কিংবা তাকে উন্নাসিকতার মধ্যে গা ভাসিয়ে দিতে অথবা অর্থের দম্ভে আদর্শভ্রষ্ট হতেও দেখা যায়নি। তিনি চেয়েছিলেন প্রতিপক্ষের উপর জয় এবং সমাজে সম্মানের আসন। নিজের বুদ্ধি ও শক্তির জোরে তিনি লক্ষ্যে উপনীত হয়েছেন। জীবনসংগ্রামে এক অল্পশিক্ষিতা নারীর এই অভূতপূর্ব সাফল্য স্বামীর কাছে পেল অশ্রদ্ধা। এবং সেই সংগে স্বামীর কথা ও কাজে প্রকাশ পেল এক বিশেষ সমাজের প্রতি কটাক্ষ—যা সহজেই হতাশাক্লিষ্ট তিক্তমনের দর্শকের কাছে বাহবা পায়। নিছক রংগরস ও প্রণয়ের উপাদানে গড়ে ওঠা কাহিনীতে এ-ধরনের বক্তব্য-ধর্মিতা সুধীজনের অনু-মোদনলাভে সহজেই বঞ্চিত হবে।

পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায়ের রস-

বোধ ও কল্পনাশক্তির গুণে ছবিটি সর্বাঙ্গীণভাবে রসমধুর হয়ে উঠেছে। ছবিটির গতি ও পরিণতির পথে প্রেক্ষাগৃহে যে হাসির রোল ওঠে এবং দর্শকমনে যে কৌতূহল ও উদ্দীপনা দানা বেঁধে ওঠে তার মূলে রয়েছে কাহিনীর কতগুলি মজার পরিস্থিতি ও নাট্যমুহূর্তের সুষ্ঠু বিন্যাস। সংহত ও পরিমিত প্রয়োগ-কর্মের এই কৃতিত্বের জন্যে পরিচালক শ্রী মুখোপাধ্যায় রসিকজনের ধন্যবাদার্হ হবেন।

ছবির প্রেমোপাখ্যানের বিন্যাসে পরিচালক যতটা নৈপুণ্য দেখাতে পারেন নি, তার চাইতে অনেক বেশী দক্ষতা দেখিয়েছেন কাহিনীর কৌতুক উপকরণরাজির পরিবেশনে। ছবিতে প্রণয়ী-যুগলের মান-অভিমান, ভুল বোঝাবুঝি নিয়ে নাট্যরস বিস্তারের যে অবকাশ ছিল পরিচাল'ক তার যথাযথ সুযোগ নিতে পারেন নি। হোটেলে অল্পদিনের জন্যে এসে ওটা বাসিন্দাদের সঙ্গে বিবাহযোগ্যা মেয়ের যে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা দেখানো হয়েছে সেটাকে স্বাভাবিক ভেবে নেওয়ার মতো কোন পূর্ব-প্রস্তুতি ছবিতে নেই বলে অনেকের কাছে তা দৃষ্টিকটু মনে হতে পারে। ছবির অযথা দীর্ঘায়িত চিত্রনাট্যটিকে পরিচালক সামগ্রিকভাবে গতিসম্পন্ন করে তুলতে পারেন নি। অবশ্য এই ত্রুটীর জন্যে তিনি একা দায়ী নন।

প্রধান চরিত্রগুলির রূপায়ণে শিল্পীদের কৃতিত্ব ছবিটির অন্যতম সম্পদ। প্রথমেই অনবদ্য অভিনয়ের জন্যে অভিনন্দন জানাতে হয় বিশ্বাসগিন্নীর ভূমিকায় অনুভা গুপ্তকে। চরিত্রটিকে তিনি অপূর্ব অভিনয়ের গুণে প্রাণধর্মীই শুধু করে তুলেছেন তা নয়, ছবিটির একটি বিশিষ্ট সম্পদরূপে উপস্থিত করেছেন। অনেকদিন পর শ্রীমতী গুপ্তের এই অত্যাশ্চর্য অভিনয় দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করবে। তাঁর পরেই উল্লেখ করতে হয় ছবি বিশ্বাসের অভিনয়ের কথা। হোটেলের এক ধুরন্ধর মালিকের চরিত্রে তাঁর অভিনয় যেমনি প্রাণবান, জীবনের বিড়ম্বনা ও স্নেহশীল অভিভাবক-রূপে তাঁর অভিনয় তেমনি সংবেদনশীল। প্রণয়ী-নায়কের রূপসজ্জায় বিশ্বজিৎ একটি সুন্দর চরিত্র-চিত্রণের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রণয়ের অভিব্যক্তি এই সুদর্শন অভিনেতার অভিনয়ে মূর্ত এবং অন্তর-ব্যথার প্রকাশও মনোজ্ঞ। তাঁর প্রণয়িনীর চরিত্রে সুলতা চৌধুরীর অভিনয়ে প্রাণোচ্ছলতা যতটা রয়েছে, হৃদয়ানুভূতির অভিব্যক্তি ততটা নেই। সামগ্রিকভাবে তাঁর অভিনয় স্বচ্ছন্দ। বিশ্বাসমশাইয়ের ভূমিকায় কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় চিত্রনাট্যের দাবি মেনে চলেছে। চরিত্রটির অস্বাভাবিকতা শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়-দক্ষতা প্রকাশে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি বিশেষ ভূমিকায় জীবেন বসুর অভিনয় মনোগ্রাহী। অন্যান্য বিশিষ্ট পার্শ্বচরিত্রে প্রশংসা পাবার মতো অভিনয়-কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তরুণকুমার, তমাল লাহিড়ী ও গীতা দে।

সংগীত পরিচালনায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আবহ-সুরসৃষ্টিতে আশানুরূপ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। ছবির রঙ্গরসের মুহূর্তে আবহ-সংগীত যে বাঙ্ময় ভূমিকা নিতে পারে ছবিতে তা অনুপস্থিত। ছবির কয়েকটি প্রণয়-মুহূর্তের আবহ-সুররচনা মনোময়। ছবির গানের সুরারোপ বৈশিষ্ট্য-হীন। কিন্তু সুরকার শ্রী মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে একাধিক গান সুখশ্রাব্য হয়ে উঠেছে।

ছবির বহির্দৃশ্যাবলী মনোরম এবং এইসব দৃশ্যাবলীর চিত্রগ্রহণে আলোকচিত্র-শিল্পী দেওজী ভাই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। শব্দগ্রহণে সত্যেন চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল গুহ ঠাকুরতা, দেবেশ ঘোষ এবং সম্পাদনায় বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাজ কৃতিত্বপূর্ণ। কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজ ও আঙ্গিক সৌষ্ঠব উচ্চস্তরের। সত্যেন রায় চৌধুরীর শিল্পনির্দেশ ও শক্তি সেনের রূপসজ্জা প্রশংসার দাবি রাখে।

জেদের জের

এক তরুণীর জীবনে ব্যর্থ প্রণয় ও বিচিত্র পরিণয়ের দুটি উপাখ্যানকে ঘিরে রচিত হয়েছে জয়শ্রী পিকচার্স-এর "অজানা কাহিনী"র আখ্যানবস্তু।

কাহিনীর নায়িকা সুনীপা। সে ভালবেসেছে সুপ্রিয়কে। সুপ্রিয়'র সঙ্গেই সুনীপার বিয়ে ঠিক করেছেন তার বাবা। সুনীপার বাবা অবিনাশবাবু বিত্তবান ব্যবসায়ী। আজীবন বিত্ত সঞ্চয় করেছেন তিনি, কিন্তু সুখের সংসার রচনা করতে পারেননি। একদিন একমাত্র কিশোরী মেয়ের হাত ধরে তার স্ত্রী স্বামীর অর্থ-কৌলিন্যের দম্ভকে উপেক্ষা করে চলে গিয়েছিলেন নিজের ভাইয়ের বাড়িতে। সেই থেকে সুনীপা মামার বাড়িতেই মানুষ হয়। তারপর একদিন যখন সে ফিরে আসে বাবার কাছে, বৃদ্ধ অবিনাশ তখন কন্যাকে কাছে পেয়ে বাকী জীবনটা শান্তিতে কাটিয়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখেন।

কিন্তু সুখের স্বপ্ন তাঁকে বুঝি সারা-জীবনই ছলনা করে এসেছে। সুনীপা বাবার সাধ-আহ্লাদ পূর্ণ করতে পারল না। সুপ্রিয়র সঙ্গে তার বিয়ের দিন ঠিক হয়ে যাওয়ার পর সে বাবাকে হঠাৎ এসে বলে এ-বিয়ে ভেঙে দেবার জন্যে। স্বমনোনীত পাত্রকে তার বিয়ে করতে কেন আপত্তি তা সকলের কাছেই একটা রহস্য হয়ে থাকে।

বৃদ্ধ অবিনাশ মেয়ের এই খামখেয়ালী সহ্য করতে নারাজ। একদিকে পিতার রোষ, অন্যদিকে কন্যার জেদ। এই দুইয়ের

গিরিশ থিয়েটার

কলিকাতায় ৫ম স্থায়ী নাট্যশালা
প্রযোজনা ও উপস্থাপনা—বিশ্বরূপা থিয়েটার
স্থান : বিশ্বরূপা থিয়েটার (৫৫-৩২৬২)
জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনে উৎসর্গীকৃত নাটক
ছুটির দিন বাদে
সোমবার, বুধবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা ৬॥টায়
ডাউন ট্রেন
এবং রবি ও ছুটির দিন সকাল ১০॥টায়
নাটক—সলিল : পরিচালনা—বিধায়ক
আঙ্গিক নির্দেশনা—তাপস সেন
শ্রেঃ—মহেন্দ্র গুপ্ত, জ্ঞানেশ মুখার্জি, বিধায়ক ভট্টাচার্য, সুনীল ব্যানার্জি, অরুণ, রমেশ, প্রভাত, গীতা দে ও জয়শ্রী সেন

বিশ্বরূপা

(অভিজাত প্রগতিধর্মী নাট্যমঞ্চ)
[ফোন : ৫৫-১৪২৩, বুকিং ৫৫-৩২৬২]
বৃহস্পতি ও শনি সন্ধ্যা ৬॥টায় | রবি ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬॥টায়
প্রয়োগনৈপুণ্যে, অভিনয়মাধুর্যে অতুলনীয়
সেতু
২৫১ হইতে ২৫৮ অভিনয়
একটি চিরন্তন মানব অনুভূতির কাহিনী
নাটক—বিধায়ক ভট্টাচার্য
আলোকসম্পাত—তাপস সেন
শ্রেঃ নরেশ মিত্র - অসিতবরণ
তরুণকুমার, মমতাজ, সন্তোষ, তমাল, জয়শ্রী সুব্রতা, ইরা, আরতি প্রভৃতি
ও
তৃপ্তি মিত্র (বহুরূপী)

বিশ্বরূপায় বহুরূপীর অভিনয়

রবীন্দ্রনাথের
রক্তকরবী
২৫শে অক্টোবর, মঙ্গলবার—সন্ধ্যা ৬॥টায়
নির্দেশনা—শম্ভু মিত্র
আলোক—তাপস সেন
ভূমিকায়—তৃপ্তি মিত্র, শম্ভু মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, অমর গাঙ্গুলী, কুমার রায়, শোভেন মজুমদার, আরতি মৈত্র ও শান্তি দাস

হিমালয় পিকচার্সের "বিষকন্যা" (জরাসন্ধর "তামসী" গল্প অবলম্বনে) চিত্রের একটি দৃশ্যে অন্যান্য শিল্পী সহ বাণী গঙ্গোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া চৌধুরী

পরিণামে দেখা গেল পিতা-পুত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ। মায়ের মতই সুনীপা বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। বৃদ্ধ অবিনাশ এই আঘাত সইতে না পেরে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেন। এবং মৃত্যুর পূর্বে তিনি রেখে যান এক বিশেষ উইল। একটি শর্তেই সুনীপা পিতার সম্পত্তির অধিকারিণী হতে পারবে। এবং তা-হলো, নির্দিষ্টকালের মধ্যে তাকে বিয়ে করতে হবে। নতুবা সম্পত্তির অধিকারী হবে সুনীপারই এক কাকা অসচ্চরিত্র বলে যার দুর্নাম।

সুনীপা পিতার উইলের কঠিন শর্তে বিব্রত। এটর্নি-কাকার সৎপরামর্শ এক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে তার মনে। পিতার সম্পত্তি উচ্ছৃংখল কাকার হাতে পড়ে নষ্ট হবে, এটা কিছুতেই মেনে নিতে চায় না সুনীপার মন। অগত্যা সে শুধু পিতার উইলের শর্তপালনের উদ্দেশে বিয়ে করতে চায় এক খুনের আসামীকে। ফাঁসির অপেক্ষায় আসামীর দিন কাটছে কারাকক্ষে। অনেক কষ্টে সে বিয়েতে রাজী করাল প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত খুনের আসামীকে। বিয়েও তাদের হল। এই অস্বাভাবিক পরিণয়ের কিছুদিন পরেই জানা গেল, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামী নির্দোষ। সসম্মানে মুক্তি পেয়ে সে চলে যায় নিজের ঘরে। তার ঠিকানা সুনীপার অজানা।

এদিকে সুনীপার বিয়ে সিদ্ধ নয় বলে আদালতে মামলা আনে তার কুচক্রী কাকা। বিয়েকে সিদ্ধ বলে প্রমাণিত করার জন্যে স্বামীর সঙ্গে অন্তত কিছুকালের জন্যে গিয়ে বাস করে আসতে হবে সুনীপাকে। সুনীপা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে তার অচেনা স্বামীর খোঁজে। সুনীপা তার সন্ধান পেলে এক সুন্দর আদিবাসী অঞ্চলে। উচ্চশিক্ষিত, শিল্পী, আদর্শবান ও পরহিতব্রতী তার স্বামী। নাম তার অনিমেষ।

অনিমেষ প্রথমে স্ত্রীর অধিকার দিতে [illegible] তারপর সে যখন তাদের এই অস্বাভাবিক প্রণয়ের পেছনে সুনীপার এক বিশেষ উদ্দেশ্যের কথা জানতে পারল, তখন সে উভয়ের একত্রে বাস করাকেও বরদাস্ত করতে চাইল না। কিন্তু অনিমেষ জানত না যে, সুনীপার কাছে তখন সব ব্যবহারিক প্রয়োজন তুচ্ছ হয়ে উঠেছে, সকল স্বার্থের ঊর্ধ্বে তার জীবনে বড় হয়ে উঠেছে প্রেম। সুনীপা চলে আসে নিজের বাড়িতে। এবং তারপর একদিন এক চরম আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে ও অনিমেষকে তার জীবনের অজানা কাহিনী জানিয়ে সে কেমন করে তার অন্তর জয় করে এবং উভয়ের জীবন কী করে মিলনের আনন্দে ভরে ওঠে, তা নিয়েই দেখা দেয় কাহিনীর নাট্য-পরিণতি।

ছবির আখ্যানভাগে নতুনত্বের আমেজ আছে, এবং সেই সঙ্গে এতে রয়েছে অনেক অসংগতি ও বৈসাদৃশ্য। ফলে কাহিনীর স্বকীয় আবেদন ছবিতে অনেকখানি স্তিমিত। তদুপরি এর রস-আস্বাদনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় দুর্বল চিত্রনাট্য ও অপরিণত প্রয়োগ-কর্ম। ছবির শেষার্ধে নায়িকা ও তার স্বামীর মধ্যে ধীরে ধীরে অস্ফুট প্রণয়ের সম্বন্ধ গড়ে ওঠার উপাখ্যানটি ছবিতে পরিচ্ছন্নভাবে রসের ভেতর দিয়ে বিন্যস্ত। কিন্তু কাহিনীর সামগ্রিক বিন্যাসে তরুণ পরিচালক সুনীলবরণ পরিমিতিবোধ ও রসজ্ঞানের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। স্থানে স্থানে তিনি বহু-ব্যবহৃত উপাদান ও মামুলী প্রয়োগ-ধারার আশ্রয় নিয়েছেন। এবং আমাদের যেসব উপকরণ তিনি ছবিতে সন্নিবিষ্ট করেছেন, সেগুলি পরিচালকের উদ্দেশ্য সব ক্ষেত্রে সফল করে তুলতে পারেনি। এই সব উপকরণের মধ্যে হোটেল-নর্তকীর নৃত্যাংশটি দর্শকের রুচিবোধকে পীড়া দেয়।

সম্মিলিত অভিনয়ের দিক দিয়েও ছবিটি উল্লেখযোগ্য নয়। চিত্রনাট্যের দুর্বলতা শিল্পীদের স্বাভাবিক অভিনয়-দক্ষতা প্রকাশে কিছুটা বাধা হয়ে দাঁড়ালেও, নায়িকার ভূমিকায় সুপ্রিয়া চৌধুরী কয়েকটি বিশেষ নাট্যমুহূর্তে অভিনয়ের সংবেদনশীলতা দিয়ে ছবিটিকে আরও মরমী করে তুলতে পারতেন। সে ক্ষমতা তিনি দেখাতে পারেননি। তবে কয়েকটি লঘু মুহূর্তে তাঁর অভিনয় উপভোগ্য। ছবি বিশ্বাসের অভিনয়-নৈপুণ্যে নায়িকার পিতা অবিনাশের চরিত্রটি সুন্দর ও বাস্তবানুগ হয়ে উঠেছে। অবিনাশের এটর্নি-বন্ধুর চরিত্রে পাহাড়ী সান্যালের অভিনয় মনোগ্রাহী। নায়িকার প্রথম প্রণয়ী ছবির খল-নায়কের চরিত্রে দীপক মুখোপাধ্যায় চিত্রনাট্যের দাবি যথাযথভাবে মিটিয়েছেন। অনিমেষের

২০০ অভিনয় ২০০ অভিনয় ২০০ অভিনয়
২০০ অভিনয় ২০০ অভিনয় ২০০ অভিনয়
২০০ অভিনয় ২০০ অভিনয় ২০০ অভিনয়
মিনার্ভায় অভিনয় ২০০ অভিনয়
অভিনয় ২০০ অভিনয়
২০০ অভিনয় ২০০ অভিনয় ২০০ অভিনয়
২০০ অভিনয় ২০০ অভিনয় ২০০ অভিনয়
২০০ অভিনয় ২০০ অভিনয় ২০০ অভিনয়
২০০ অভিনয় ২০০ অভিনয় ২০০ অভিনয়
২০০ অভিনয় ২০০ অভিনয় ২০০ অভিনয়
২০০ অভিনয় ২০০ অভিনয় ২০০ অভিনয়
২০০ অভিনয় ২০০
২০০ অভিনয় ২০০ অঙ্গার
২০০ অভিনয় ২০০
২০০ অভিনয় ২০০ অভিনয় ২০০ অভিনয়
২০০ অভিনয় ২০০ অভিনয় ২০০ অভিনয়
২০০ অভিনয় ২০০ অভিনয় ২০০ অভিনয়
২০০ অভিনয় ২০০ অভিনয় ২০০ অভিনয়
২০০ অভিনয় ২০০ অভিনয় ২০০ অভিনয়
২০০ অভিনয় ২০০ অভিনয় ২০০ অভিনয়
২০০ অভিনয় ২০০ অভিনয় ২০০ অভিনয়
প্রতি শনি ও বৃহস্পতি ২০০ অভিনয় ২০০
৬॥ ২০০ অভিনয় ২০০
রবি ও ছুটির দিন ২০০ অভিনয় ২০০
৩ ও ৬॥ ২০০ অভিনয় ২০০
২০০ অভিনয় ২০০ অভিনয় ২০০ অভিনয়
২০০ অভিনয় ২০০ অভিনয় ২০০ অভিনয়
২০০ অভিনয় ২০০ অভিনয় ২০০ অভিনয়

রূপসজ্জায় অসিতবরণের অভিনয় মনোজ্ঞ। ছবির অন্যান্য বিশেষ কয়েকটি চরিত্রে প্রশংসনীয় অভিনয়ের জন্যে সাধুবাদ পাবেন জহর গাঙ্গুলী, নমিতা সিংহ, রবীন মজুমদার, তরুণকুমার ও চিত্রা মণ্ডল। কয়েকটি পার্শ্বচরিত্রে উল্লেখযোগ্য সমীর কুমার, বেচু সিংহ, অমর মল্লিক, তুলসী চক্রবর্তী, সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সঙ্গীত পরিচালনায় অপরেশ লাহিড়ী কয়েকটি গানের সুরারোপে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। গানগুলি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, ইলা বসু, বাঁশরী লাহিড়ী ও রবীন মজুমদারের কণ্ঠদানে সমৃদ্ধ। আবহ-সঙ্গীত পরিবেশানুগ।

ছবির কলাকৌশলের সকল বিভাগের কাজেই উন্নতির অবকাশ ছিল। সর্বাঙ্গীণ আঙ্গিক গঠনের পারিপাট্য সন্তোষজনক।

রেনেশাঁস ফিল্মসের প্রথম প্রয়াস "ঢেউ-এর পরে ঢেউ" চিত্রের একটি বিশিষ্ট চরিত্রে শম্পা।

চিত্রালোচনা

এ-সপ্তাহের চিত্রমুক্তির তালিকায় রয়েছে দুটি হিন্দী ছবি—"জমীন কে তারে" ও "ভক্তি-মহিমা"।

চন্দ্রা মুভীজ-এর "জমীন কে তারে" একটি শিশুচিত্র। দুটি শিশুর জীবনে নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসের এক অশ্রু-সজল কাহিনী এ-ছবির মূল আখ্যানবস্তু। ভাগ্যের বঞ্চনা ও বিড়ম্বনাকে উপেক্ষা করে দুই অপরাজিত শিশু ভগবানের অন্বেষণে কেমনভাবে নিজেদের জীবনকে সার্থক করে তুলতে চায়, তা নিয়েই ছবির বক্তব্যাশ্রয়ী নাট্যরস দানা বেঁধে উঠেছে। ছবির দুটি প্রধান শিশুচরিত্রের রূপদান করেছে ডেইজি ইরানি ও হানি ইরানি। অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রে রয়েছেন মতিলাল, অচলা সচদেব, আনোয়ার, কুমুদ ত্রিপাঠী, আগা, ভগবান, চার্লি প্রভৃতি। ছবির কাহিনীকার ও পরিচালক সর্দার চন্দুলাল শাহ। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন এস মহিন্দর।

এস আর এস প্রোডাকশন্স-এর ভক্তি-মূলক পৌরাণিক চিত্র "ভক্তি-মহিমা" দক্ষিণ ভারতের নতুন চিত্রোপহার। ব্যয়বহুল ও সঙ্গীত-নৃত্যমুখর এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন কে শঙ্কর। ছবির বিভিন্ন মুখ্য চরিত্রে অবতরণ করেছেন এন টি রামা রাও, নাগেশ্বর রাও, যমুনা, হেলেন, সরোজ দেবী, কমলা, লক্ষ্মণ ও গোপীকৃষ্ণ। দিলীপ এই ছবির সুরকার।

* * *

অজয় করের পরিচালনায় আলোছায়া প্রোডাকশন্স-এর "সপ্তপদী"র চিত্রগ্রহণ নিয়মিতভাবে শুরু হয়েছে গত সপ্তাহ থেকে। ছবির নায়ক-নায়িকা উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন'কে নিয়েই ছবিটির অন্তর্দৃশ্য গ্রহণের পর্ব আবার দীর্ঘকাল পর আরম্ভ হল। চিত্রগ্রহণের এই বর্তমান কার্যক্রম শেষ হলেই ছবিটি সমাপ্তির মুখে এগিয়ে আসবে বলে জানা গেল। ছবিটির জন্যে ফুটবল খেলার একটি উত্তেজনাপূর্ণ বহির্দৃশ্য সম্প্রতি গৃহীত হয়। নায়ক উত্তমকুমার এই দৃশ্যে নিপুণ খেলোয়াড়-রূপে অংশ গ্রহণ করেন। নায়িকা সুচিত্রা সেন উপস্থিত থাকেন দর্শকের আসনে। তারাশঙ্করের কাহিনী অবলম্বনে নির্মীয়মাণ এই ছবির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

* * *

সুপরিচিত কথাসাহিত্যিক সন্তোষ ঘোষের "স্বয়ম্বরা" গল্পটির চিত্ররূপ দেবেন নবগঠিত চিত্রপ্রযোজনা সংস্থা ইউনাইটেড ফিল্মস। ছবিটির সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন রবিশঙ্কর। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া চৌধুরী নায়ক-নায়িকারূপে নির্বাচিত হয়েছেন।

* * *

তাজমহলের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত একটি অতিপ্রাকৃত প্রেমের কাহিনী নিয়ে তৈরী হবে মুভী মেকার্স-এর পরবর্তী ছবি "হারানো প্রেম"। ছবিটি পরিচালনা করবেন অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়। অনতিবিলম্বেই আগ্রায় ছবিটির বহির্দৃশ্য গ্রহণের কাজ শুরু হবে বলে জানা গেল। ছবিটির দুটি মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে নির্মলকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরীকে।

* * *

শুভচিত্রম্ নামে নবগঠিত একটি চিত্র-প্রযোজনা সংস্থার প্রথম প্রয়াস "হারায়ে খুঁজি"র চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে গত মহানবমীর দিন ত্রিবেণীর এক পুজা-মণ্ডপে। ছবিটি পরিচালনা করছেন জয়ন্ত ভট্টাচার্য। বিভিন্ন চরিত্রের রূপদানের জন্যে নির্বাচিত হয়েছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জু দে, রাজলক্ষ্মী, কুমারী রত্না, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় তপতী ঘোষ, সুখেন প্রভৃতি। অজিত মিত্র ছবিটির সঙ্গীত পরিচালকরূপে নির্বাচিত হয়েছেন।

* * *

রঙমহল
— ফোন : ৫৫—১৬১৯ —
প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার : ৬॥টায়
রবি ও ছুটির দিন : ৩টা - ৬॥টায়
বিমল মিত্রের যুগান্তকারী কাহিনী
সাহেব বিবি গোলাম
নাট্যরূপ : শচীন সেনগুপ্ত
পরিচালনা : বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র
সুরসৃষ্টি : অনিল বাগচী
শ্রেষ্ঠাংশে—নীতীশ, রবীন, হরিধন, সত্য, জহর, বিশ্বজিৎ, নবদ্বীপ, অজিত, ঠাকুরদাস, নির্মল, মিণ্টু, সমর, কার্তিক, সুনীত, শিপ্রা সাহা, কেতকী দত্ত, কবিতা রায়, শুক্লা দাস, মঞ্জুলা বন্দ্যোঃ, অমিতা দেবী, শ্যামলী মুখোঃ, দীপিকা দাস ও শিপ্রা মিত্র।

"স্মৃতিটুকু থাক"খ্যাত যাত্রিক পরিচালক-গোষ্ঠী টাইম ফিল্মস-এর পতাকা তলে নরেন্দ্রনাথ মিত্র'র বহুপঠিত "তিন দিন তিন রাত্রি" উপন্যাসটির চিত্ররূপ দেবেন বলে মনস্থ করেছেন।

* * *

পরিচালক হিরন্ময় সেন "নেতাজী সুভাষ" ছবিটির প্রস্তুতিকার্যে সম্প্রতি হাত দিয়েছেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর কয়েকজন অবশিষ্ট অফিসার এই চিত্র-নির্মাণের ব্যাপারে শ্রী সেনকে সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ছবির কয়েকটি চরিত্রে তাঁদের দেখা যাবে বলেও জানা গেল।

নাট্যাভিনয়

'রূপান্তরী'র "বিংশোত্তরী"

নবগঠিত নাট্যসম্প্রদায় "রূপান্তরী" তাঁদের প্রথম উপহারেই রসিক জনের চিত্তে একটি ছাপ রেখেছেন। উপহারটি হল জোছন দস্তিদার রচিত "বিংশোত্তরী"। এই মাসের প্রথম দিকে নিউ এম্পায়ার মঞ্চে "রূপান্তরী"র সভ্যরা নাটকটি অভিনয় করলেন।

সমস্যাক্লিষ্ট বর্তমান বাংলার পটভূমিতে অর্থসংকটের সম্মুখীন এক শিক্ষিত তরুণ দম্পতির জীবন-সংগ্রামকে কেন্দ্র করে নাট্যকাহিনীর বিস্তার। কোন রকমে জীবন ধারণের জন্যে এই নববিবাহিত যুবক-যুবতীকে বস্তি অঞ্চলে একটি চায়ের দোকান খুলতে হয়। এই অসুন্দর পরিবেশ কীভাবে নায়কের পক্ষে ক্রমশ অসহনীয় হয়ে ওঠে, কীভাবে এ-ব্যাপারে স্ত্রীর ঔদাসীন্যের অর্থ সুস্থ মন দিয়ে বিচার করতে সে অক্ষম হয়ে পড়ে, তা-ই নিয়ে নাটকের চরম মুহূর্তটি গড়ে উঠেছে। নাটকের অন্তে নায়ক তার প্রেমে নতুন করে আস্থা ফিরে পেয়েছে, নতুন মন দিয়ে দুঃস্থ অসুন্দরকে সুন্দর করে তোলবার পথের সন্ধান জেনেছে।

নাট্যকার-পরিচালক জোছন দস্তিদার আশাবাদী, ন্যায়নীতির পুরাতন মূল্য-বোধে আস্থাশীল। আগেকার সমাজের রীতিনীতি হতে বিচ্ছিন্ন আজকের এই অর্থনৈতিক দুর্দশায় ক্লিষ্ট মানবগোষ্ঠীর মধ্যেও তিনি সেই ন্যায়নীতির প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন। তবে এ-কাজটি সুপরিকল্পিত নাট্যদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সুষ্ঠুতরভাবে সম্পন্ন হতে পারত।

প্রয়োগ-কর্মের দিক নাটকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত এবং পাত্রপাত্রীর রূপসজ্জা যথাযথ। নায়ক-চরিত্রে জোছন দস্তিদারের অভিনয় এক কথায় নিখুঁত। এ-চরিত্রের মনো-লোকের সূক্ষ্ম আলো-আঁধারি তিনি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন। চন্দ্রা চক্রবর্তীর রমা (নায়িকা) শুভবুদ্ধি ও সংযমের প্রতিমূর্তি। অন্যান্য ভূমিকায় যাঁরা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন মণীন্দ্রনাথ হালদার, তড়িৎ চৌধুরী, নিখিল চক্রবর্তী, সৌমেন পাল, গোপীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও মণিকা চক্রবর্তী।

* * *

বিশ্বরূপার বর্তমান নাটক "সেতু" গত ২০শে অক্টোবর ২৫০তম অভিনয়-রজনী অতিক্রম করার গৌরব অর্জন করেছে।

* * *

আগামী ২৪শে অক্টোবর সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে রঙ্গরূপ সমরেশ বসু রচিত ও পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক নাট্য-রূপায়িত "ছেঁড়া তমসুক" মঞ্চস্থ হবে।

* * *

গত ১৬ই অক্টোবর রবীন্দ্র-ভারতীর উদ্যোগে রবীন্দ্র ভারতী ভবনে রবীন্দ্রনাথের "শাস্তি" গল্পের নাট্যাভিনয় মঞ্চস্থ করেন রূপকার গোষ্ঠী।

মনোজ্ঞ বিজয়া সম্মেলনী

মণিপুর কি নাগা পাহাড় থেকে শুরু করে গুজরাট অথবা কাশ্মীর পর্যন্ত ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে রয়েছে নানা ছন্দের প্রাদেশিক নাচ আর লোকনৃত্য। এসোসিয়েশন অব মাস্টার প্রিণ্টার্স তাঁদের বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষে এমনি এক নাচের আয়োজন করেছিলেন; যেখানে নাগা, মণি-পুরী, সাঁওতাল এবং সমুদ্রোপকূলের জেলে-দের নাচ পর্যন্ত দেখানো হল। গত ১৫ই অক্টোবর সুবর্ণ বণিক সমাজ মঞ্চে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনীর শুভসূচনা হল কুমারী শুক্রা সেনের কথক নাচ দিয়ে। কুমারী সেন দীর্ঘ সময় ধরে কথক নৃত্যের মাধ্যমে 'রাধার জল আনতে যাওয়া', 'শ্রীকৃষ্ণের গিরি গোবর্ধন ধারণ', 'শিবতাণ্ডব', 'হোলি' ও 'কালীয়দমন' প্রভৃতি আখ্যানগুলি সুন্দরভাবে পরিবেশন করলেন। অনুষ্ঠানের সূচনাতেই দর্শকরা মোহিত হয়ে পড়েন। পরে 'ড্যান্সেস অব ইণ্ডিয়া'র প্রথম নাচটি শুরু হল 'মঞ্জির' দিয়ে। আরতি ও উৎপলা ভট্টাচার্য নৃত্যের উৎস শক্তির আবাহনে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদনের অপূর্ব ছন্দায়িত রূপটি পরি-বেশন করলেন মনোগ্রাহী দেবভঙ্গিমার মাধ্যমে।

ওড়িষ্যা পূর্ব উপকূলের জেলেরা সমুদ্রে মাছ ধরছে, এইরূপটি নাচ ও গানের মাধ্যমে প্রকাশ পেল। দুজন জেলের আনন্দ, ভয়, উল্লাসের রূপটি পরিবেশন করলেন গোপাল-কুমার এবং শিশির শোভন। তারপর এল সাঁওতাল নাচ। বিহু উৎসবের দিনে কলসী কাঁকালে দুজন সাঁওতাল যুবতী গেছে জল আনতে, পথে দেখা দুজন যুবকের সঙ্গে। দুজোড়া যুবক যুবতীর মিলিত নৃত্যে তাঁদের সরল স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল আনন্দোল্লাস প্রকাশ পেল। একে একে এল 'নাগা নৃত্য', পাহাড়ী তরুণীদের নাচ 'দীপ চণ্ডি', পাঞ্জাবের নব-বর্ষোৎসবের নাচ 'সিন্ধা-ভাণ্ডরা', মুঘল কোর্ট, রাজস্থানের 'কৃষি নৃত্য', ধ্রুপদী ছন্দের 'মালকোষ', এবং মহিষাসুর বধের 'দেবী চণ্ডিকা' নৃত্য। সবশেষের অনুষ্ঠানটি হল 'গুজরাটের এক রাত'। সৌরাষ্ট্রের এক-দল গ্রাম্য তরুণী কলসী কাঁকালে জল নিতে এল, সেখানে দেখা হল একদল রাখালের সঙ্গে। আকাশে চাঁদ, জ্যোৎস্নায় ধোয়া রাত আর তরুণ-তরুণীর প্রাণোজ্জ্বল নৃত্য দর্শক-দের প্রথম থেকেই মুগ্ধ করে রাখে।

সমগ্র নাচের আসরটি পরিচালনা করলেন গোপাল কুমার। মণি দে ছিলেন সুরারোপে। নাচে অংশ নিয়েছিলেন: উৎপলা ও আরতি ভট্টাচার্য, পূর্ণিমা সিংহ, শিশির শোভন, স্মৃতি, কুমার কিশোর, গোপেশ্বর, বিমল, অনিল, সুশীল, তারক এবং পরিচালক গোপালকুমার ও মণি দে।

মাঝে দুটি গানের আসরে গান গেয়ে শোনালেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিপ্রানী পাল।

এলিট
প্রত্যহ
৩, ৬ ও রাত্রি ৯টায়
জীবন ও যৌবনের আবেগ-উচ্ছ্বাস ও প্রণয় উন্মাদনার বলিষ্ঠতম কাহিনী!
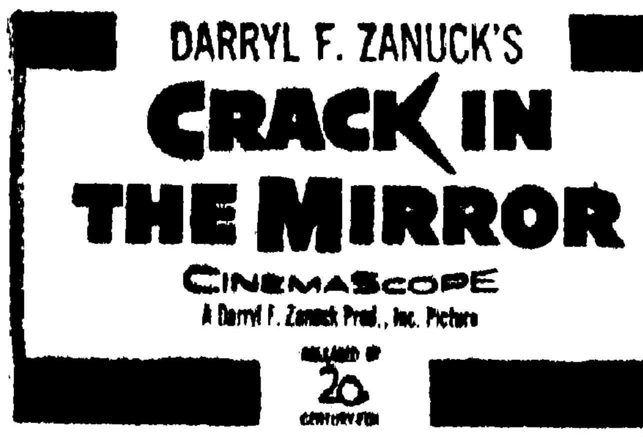

(এ) শ্রেষ্ঠাংশে:
অরসন ওয়েলস ● জুলিয়েট গ্রেকো
ব্র্যাডফোর্ড ডিলম্যান

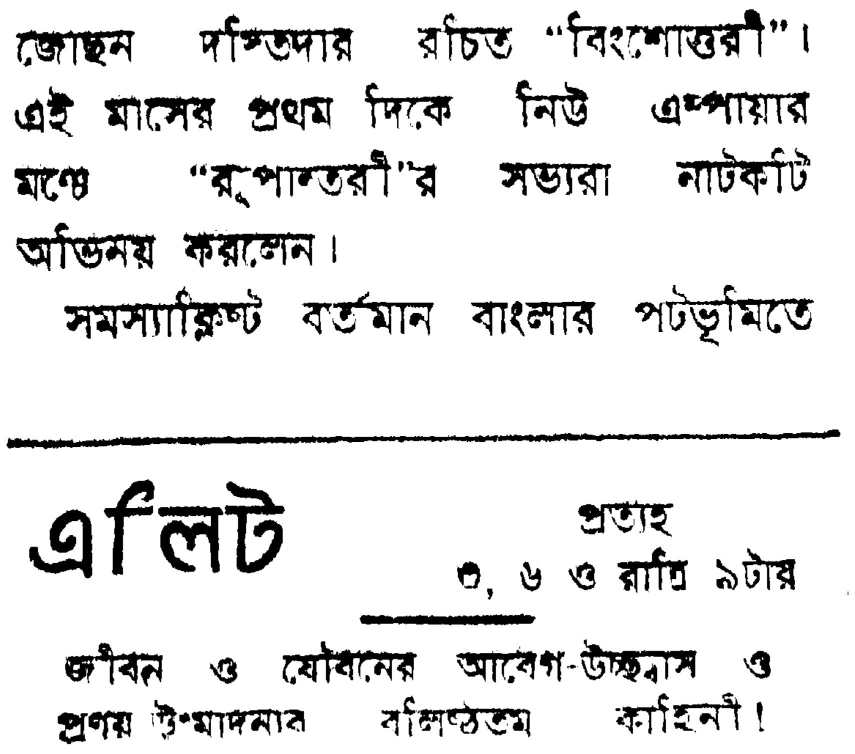

খেলার মাঠে

একলব্য

সম্প্রতি 'আজাদ হিন্দ বাগে' অনুষ্ঠিত জাতীয় সাঁতারের ৪ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে দর্শকদের মধ্যে এবার যে উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করেছি আমার ক্রীড়া সাংবাদিক জীবনের একুশ বছরের অভিজ্ঞতায় এমন উৎসাহ উদ্দীপনা আর লক্ষ্য করিনি। সত্যিই সাঁতার নিয়ে বাঙলার ছেলেমেয়ে, নারী পুরুষ যে এমনভাবে মেতে উঠবে একথা আগে বুঝতে পারিনি। ঠিক যেন ফুটবল খেলার উন্মাদনা। মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের খেলার সময় যেমন কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খ ধ্বনি শোনা যায় এবার সাঁতারেও তেমন কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খের আওয়াজ শোনা গেছে। তাছাড়া সাঁতারুদের উৎসাহিত করবার জন্য পটকাও কম ফাটানো হয়নি। আর মুহুর্মুহু করতালি ধ্বনি। সে তো ছিল প্রতিটি সাঁতারের প্রতিযোগিতার সময়কার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ৪ দিনব্যাপী সাঁতারে এমন মাতামাতি দেখে খুশী হয়েছি, আর মনে মনে ভেবেছি বাঙলার ছেলেমেয়েদের সাঁতারে এত উৎসাহ অথচ আজও কলকাতায় আন্তর্জাতিক মানের একটি সুইমিং পুল গড়ে ওঠেনি কেন? এই কেনর উত্তর খুঁজে পেতেও দেরী হয়নি। তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে ফুটবল রসিকরা স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখার যেমন স্বপ্ন দেখে আসছেন, বহুদিন ধরে সাঁতারু এবং সাঁতার-প্রিয় দর্শকরাও সুইমিং পুলে সাঁতার কাটা এবং সাঁতার দেখার আকাশ কুসুম কল্পনা করছেন। কতদিনে সে কল্পনা বাস্তবে পরিণত হবে কে জানে!

জাতীয় সাঁতারের সময় আজাদ হিন্দ বাগে কে আসেননি? সবাই এসেছেন। এয়ার মার্শাল থেকে আরম্ভ করে মেয়র, মন্ত্রী মহাকারনিক কেউ বাদ যাননি। শুধু সাঁতার দেখার আগ্রহ অবশ্য এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জিকে 'হেদোয়' টানতে পারেনি। আগ্রহের সংগে অপত্য স্নেহও কিছুটা মেশানো ছিল। তাঁর ছেলে সঞ্জীব মুখার্জি ছিলেন দিল্লী দলের অন্যতম সাঁতারু। বেশ ভালই সাঁতার কাটেন। যাই হক, মন্ত্রী শ্রীহেম নস্কর, শ্রী খগেন দাশগুপ্ত, শ্রীভূপতি মজুমদার, মেয়র শ্রীকেশব বসু, কনস্ট্রাকশন বোর্ডের চীফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীশচীন বন্দ্যোপাধ্যায়, লেডি রানু মুখার্জি প্রভৃতি গণ্যমান্যরা অনেকেই এসেছিলেন সাঁতার দেখতে। কলকাতায় একটি স্ট্যান্ডার্ড সুইমিং পুলের অভাবের কথা এদের কি একবারও মনে হয়নি?

ফুটবল স্টেডিয়ামের মত সুইমিং পুল সম্পর্কেও সাঁতারুদের দাবী অনেকদিনের। মাঝে মাঝে কথাটা ওঠে। আবার ধামাচাপা পড়ে যায়। সাঁতারু এবং সাঁতার প্রিয় দর্শকদের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কলকাতার কর্পোরেশনের কাছে কথাটা আমি আবার উত্থাপন করছি। আশা করি তারা কথাটা ভেবে দেখবেন। এবার সাঁতারের কথা।

সাঁতার, ডাইভিং ও ওয়াটারপোলো খেলা নিয়ে জলক্রীড়া বা জল খেলা। ইণ্ডিয়ান সুইমিং ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত সারা ভারতের সদস্য রাজ্য এবং রেল ও সার্ভিস দলের মিলিত সভ্যদের নিয়ে বার্ষিক জলক্রীড়ার আসরই জাতীয় সাঁতার নামে অভিহিত। এবার ছিল জাতীয় সাঁতারের সপ্তদশ বার্ষিক অনুষ্ঠান। বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন এবারকার জাতীয় সাঁতারের পরিচালনায় ভার পেয়েছিল। কলকাতায় শেষবার জাতীয় সাঁতারের আসর বসেছিল ১৯৫৫ সালে।

রেল ও সার্ভিস দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে জাতীয় সাঁতারে এবার যোগ দিয়েছিল ভারতের ১০টি রাজ্যের প্রায় আড়াইশ মেয়ে পুরুষ সাঁতারু। এর মধ্যে ১৬ বছরের কম বয়সী বালকের সংখ্যাও কম ছিল না। এ বছর থেকেই সর্বপ্রথম জাতীয় সাঁতারে জুনিয়র সাঁতারুদের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছে। রেলকর্মী সাঁতারুদের নিয়ে রেলওয়েজ দলের সর্বপ্রথম অংশ গ্রহণও এবারকার অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, মুষ্টিযুদ্ধ, টেবল টেনিস, ব্যাডমিণ্টন প্রভৃতি খেলাধুলার সমস্ত বিভাগেই ভারতীয় রেল সংস্থার সতর্ক দৃষ্টি। এবার দৃষ্টি পড়েছে সাঁতারের দিকে। এজন্য কয়েকজন প্রখ্যাত সাঁতারু রেলে চাকরিও পেয়েছেন। গুণী সাঁতারুদের পক্ষে এটা আশার কথা সন্দেহ নেই।

* * *

ভারতের নামকরা সাঁতারুদের মধ্যে কয়েকজন এ বছর জাতীয় সাঁতারে যোগদান করতে পারেননি। যেমন বোম্বের লালু বাজাজ, সুভাস লাঠি, সার্ভিসেস দলের রাম সিং, বাঙলার অনুরাধা গুহঠাকুরতা। লালু বাজাজ ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল ও ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে ভারত প্রধান। সুভাস লাঠি প্রধান ২০০ মিটার বাটার ফ্লাই স্ট্রোকে। রাম সিং পনেরোশো মিটার ফ্রি স্টাইলের প্রখ্যাত সাঁতারু। এদের কেউ অসুস্থ আছেন, কেউ আছেন ভারতের বাইরে। তবু জাতীয় সাঁতারে এবার

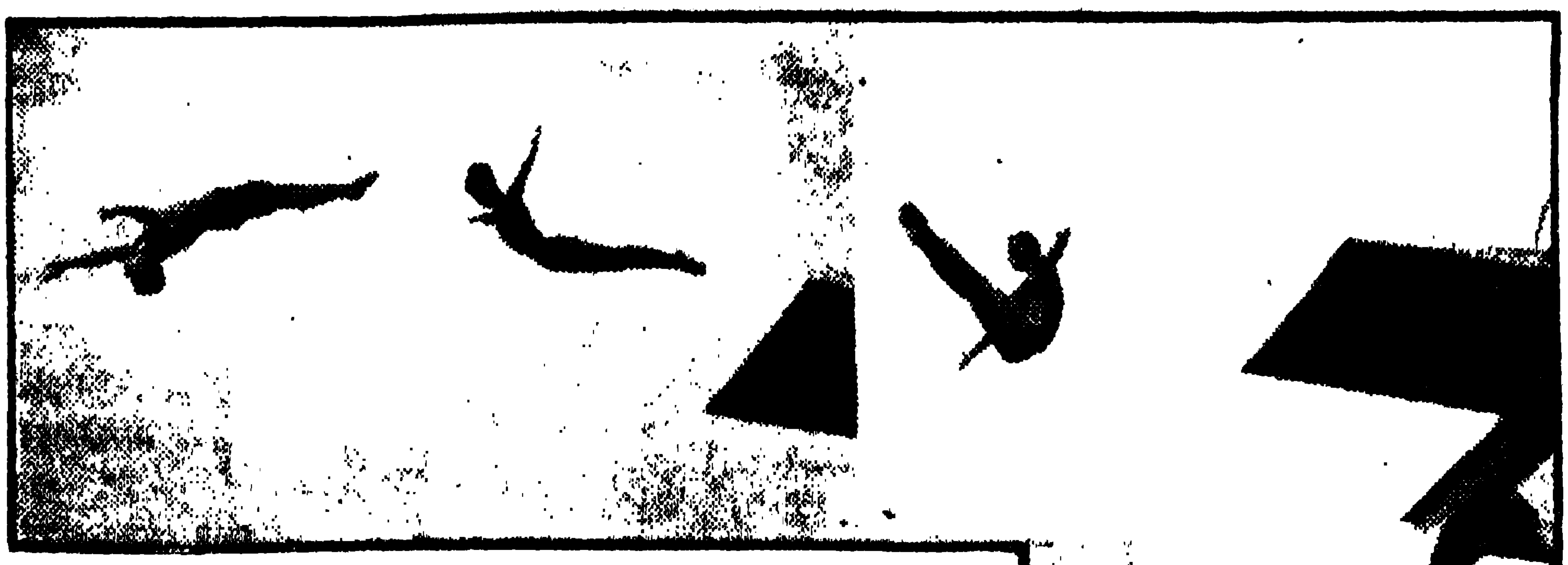

উড়ন্ত মানুষ নয়—ফিক্সড বোর্ড ডাইভিং-এর কলাকৌশল। জাতীয় সাঁতারের সময় আজাদ হিন্দ বাগে বজরঙ্গী প্রসাদ (ডান দিকে—প্রথম), কান্তি দত্ত (মধ্যে—দ্বিতীয়) ও অনুসূয়া প্রসাদের ডাইভিং-এর নানা ভঙ্গি দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছে

পাঁচটি বিষয়ে নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পুরুষদের সাঁতারে তিনটি আর মেয়েদের সাঁতারে দু'টি। পুরুষদের তিনটি রেকর্ডই হয়েছে সার্ভিস দলের সাঁতারুদের কৃতিত্বে। একা রামদেও সিং করেছেন ব্রেস্ট স্ট্রোকের দু'টি রেকর্ড—১০০ মিটার ও ২০০ মিটারে। ১০০ মিটার বাটার ফ্লাই স্ট্রোকে নতুন রেকর্ড করেছেন সার্ভিসের নিতাই পাল।

মেয়েদের ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে নতুন জাতীয় রেকর্ডের অধিকারিণী হয়েছেন বাঙলার মেয়ে কুমারী কল্যাণী বসু। জাতীয় সাঁতারে পঞ্চম রেকর্ড হয়েছে মেয়েদের ৪×১০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে রিলেতে।

পুরুষদের সাঁতারে সার্ভিসেস দল এবং

মেয়েদের ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে নতুন রেকর্ডের অধিকারিণী কুমারী কল্যাণী বসু

মেয়েদের ও ছোট ছেলেদের সাঁতারে বাঙলা চ্যাম্পিয়নশিপের পুরস্কার পেয়েছে। এবার নিয়ে সার্ভিস দল উপর্যুপরি ৪ বছর চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেছে।

ওয়াটারপোলো খেলার ফাইন্যালে বোম্বাইকে ৬—৩ গোলে হারিয়ে বাঙলার ওয়াটারপোলো টীম বোম্বাইয়ের কাছে গতবারের পরাজয়ের শোধ তুলেছে।

ফিক্সড বোর্ড ও স্প্রিং বোর্ড ডাইভিংয়ের নানা রকমের চোখ জুড়ানো ভঙ্গিতে দর্শকদের আনন্দ দিয়েছেন সার্ভিস দলের বজরঙ্গী প্রসাদ ও অনুসূয়া প্রসাদ। তবে বাঙলার ১৩ বছরের ছেলে কান্তি দত্তর ফিক্সড বোর্ডে দ্বিতীয় স্থান ও স্প্রিং বোর্ডে

১০০ মিটার বাটারফ্লাই স্ট্রোকে নতুন রেকর্ড সৃষ্টিকারী নিতাই পাল

তৃতীয় স্থান লাভ তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সাক্ষ্য দিয়েছে।

সাঁতারের আন্তর্জাতিক মানের তুলনায় যদিও আমরা অনেক পিছিয়ে আছি, তবু আমরা একটু একটু করে এগিয়ে চলেছি একথা ঠিক। এবারকার জাতীয় সাঁতারেও তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

অলিম্পিক ফলাফল

(মহিলাদের অ্যাথলেটিকস—পূর্ব প্রকাশিতের পর)

লোহার বল ছোড়া

বিশ্ব রেকর্ড—তামারা প্রেস (রাশিয়া) ৫৮ ফুঃ ৪ ইঞ্চি।

প্রাক্তন অলিম্পিক রেকর্ড—টি টিস-কোভিচ (রাশিয়া) ৫৪ ফুঃ ৫⅛ ইঞ্চি।

১ম—তামারা প্রেস (রাশিয়া), ৫৬ ফুঃ ৯¾ ইঞ্চি (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড), ২য়—জোহানা লাটগে (জার্মানী) ৫৪ ফুঃ ৫⅞

বর্শা ছোড়ায় স্বর্ণপদকের অধিকারিণী ওজোলিনা

ইঞ্চি, ৩য়—আর্লিন ব্রাউন (ইউ এস এ) ৫৩ ফুঃ ১০½ ইঞ্চি।

৮০ মিটার হার্ডল রেসের বিজয়িনী ইরিনা প্রেসের জ্যেষ্ঠ সহোদরা তামারা প্রেস নতুন অলিম্পিক রেকর্ড করে শুধু লোহার বল ছোড়াতেই স্বর্ণ পদক পাননি, ডিসকাস ছোড়াতেও পেয়েছেন রৌপ্যপদক।

ডিসকাস ছোড়া

বিশ্ব রেকর্ড—নীনা ডাম্বাজে (রাশিয়া) ১৮৭ ফুঃ ১½ ইঞ্চি।

প্রাক্তন অলিম্পিক রেকর্ড—ওলগা ফিকোটোভা (চেকোশ্লোভেকিয়া) ১৭৬ ফুঃ ১½ ইঞ্চি।

ডিসকাস ছোড়ার বিজয়িনী নীনা পনেমারেভা

১ম—নীনা পনোমারেভা (রাশিয়া) ১৮০ ফুঃ ৯⅜ ইঞ্চি (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড)

২য়—তামারা প্রেস (রাশিয়া) ১৭২ ফুঃ ৬½ ইঞ্চি।

৩য়—এল ম্যানোলিউ (রুমানিয়া) ১৭১ ফুঃ ৯ ৭/৪ ইঞ্চি।

হেলসিঙ্কি অলিম্পিকের বিজয়িনী নীনা রোমাসকোভা, মেলবোর্ন অলিম্পিকের তৃতীয় স্থানাধিকারিণী নীনা পনোমারেভা আর রোম অলিম্পিকে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি-কারিণী নীনা একই মেয়ে। কুমারী জীবনের রোমাসকোভা বিবাহিত জীবনে এখন পনোমারেভা। পর পর তিনটি অলিম্পিকে তিনি রাশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন। হেলসিঙ্কিতে তিনি ১৬৮ ফুট ৮½ ইঞ্চি দূরে ডিসকাস ছুঁড়েছিলেন, মেলবোর্নে ছুঁড়েছিলেন ১৭০ ফুট ৮ ইঞ্চি

দূরে; এবার আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে ১৮০ ফুট ৯½ ইঞ্চি দূরে ডিসকাস ছুঁড়েছেন। তৃতীয় স্থানাধিকারী রুমানিয়ার ম্যানোলিউ মেলবোর্নে নবম স্থান দখল করেছিলেন। মেলবোর্নের বিজয়িনী চেকোশ্লোভেকিয়ার ওলগা ফিকোটোভা, যিনি এখন আমেরিকার খ্যাতনামা অ্যাথলেট হ্যারোল্ড কনোলীর সহধর্মিণী, এবার কোন স্থান পাননি।

বর্শা ছোড়া

বিশ্ব রেকর্ড—এলভিরা ওজোলিনা (রাশিয়া) ১৯৫ ফুঃ ৪½ ইঞ্চি।

প্রাক্তন অলিম্পিক রেকর্ডস—জার্ডন জেম (রাশিয়া) ১৭৬ ফুঃ ৮½ ইঞ্চি।

১ম—এলভিরা ওজোলিনা (রাশিয়া) ১৮৩ ফুঃ ৭½ ইঞ্চি।

২য়—ডানা জ্যাটাপেকোভা (চেকোশ্লোভাকিয়া) ১৭৬ ফুঃ ৫½ ইঞ্চি।

৩য়—বি কালেডেনে (রাশিয়া) ১৭৫ ফুঃ ৪½ ইঞ্চি।

রাশিয়ার এলভিরা ওজোলিনা গত জুন মাসে বুখারেস্টে ১৯৫ ফুট ৪½ ইঞ্চি দূরে বর্শা ছুঁড়ে নতুন বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন। সুতরাং অলিম্পিকে তার স্বর্ণপদক লাভ সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত ফলাফল। কিন্তু 'হিউম্যান লোকোমোটিভ' এমিল জ্যাটোপেকের সহধর্মিণী ডানা জ্যাটোপেকোভার রৌপ্যপদক লাভ মোটেই প্রত্যাশিত ফলাফল নয়। হেলসিংকি অলিম্পিকে ডানা বর্শা ছোড়ায় স্বর্ণ পদক পেলেও মেলবোর্ন অলিম্পিকে চতুর্থ স্থান পেয়েছিলেন। কিন্তু এবার আবার তিনি পেয়েছেন রৌপ্য পদক। শুধু তাই নয় ওজোলিনার চেয়ে তার বর্শার দূরত্ব হয়েছে মাত্র ৭ ফুট ২ ২/৪ ইঞ্চি কম। দেখছি ৮ বছরেও ডানা জ্যাটোপেকোভার প্রতিভা কমেনি বরং বেড়েছে। কারণ হেলসিংকি অলিম্পিকে তার বর্শার দূরত্ব ছিল ১৬৫ ফুট ৭ ইঞ্চি।

হাই জাম্প

বিশ্ব রেকর্ড—আইল্যান্ডা ব্যালাস (রুমানিয়া) ৬ ফুট ১½ ইঞ্চি।

প্রাক্তন অলিম্পিক রেকর্ড—এম ম্যাকডেনিয়েল (ইউ এস এ) ৫ ফুট ৯½ ইঞ্চি।

১ম—আইল্যান্ডা ব্যালাস (রুমানিয়া) ৬ ফুট ½ ইঞ্চি (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড)

২য়—ডি শার্লি (গ্রেট ব্রিটেন) ৫ ফুট ১½ ইঞ্চি।

৩য়—জে জোজিয়াকোয়াস্কা (পোল্যান্ড) ৫ ফুট ৭½ ইঞ্চি।

রুমানিয়ার আইল্যান্ডা ব্যালাস হাই জাম্পে প্রথম স্থান দখল করবেন একথা সবারই জানা ছিল। কিন্তু অলিম্পিকে অপ্রত্যাশিত ফলাফল সংঘটিত হবার নজিরের অভাব নেই। পুরুষদের হাই-জাম্পই তার সবচেয়ে ভাল উদাহরণ। বিশ্ব শ্রেষ্ঠ জন টমাসকেও রোমে তৃতীয় স্থান দখল করতে হয়েছে। ব্যালাস অবশ্য অলিম্পিকে নিজ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েই স্বর্ণপদক পেয়েছেন, তবে নিজের বিশ্ব রেকর্ডকে ম্লান করতে পারেননি।

ওয়াটার পোলো খেলায় বিজয়ী বাঙলার ওয়াটার পোলো টীম

লং জাম্প

প্রাক্তন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড—ই ক্রেজেসিনস্কো (পোল্যান্ড) ২০ ফুঃ ১০ ইঃ।

১ম—ভি ক্রেপকিনা (রাশিয়া)—২০ ফিঃ ১০¾ ইঃ **(নতুন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড)**

২য়—ই ক্রেজেসিনস্কা (পোল্যান্ড)—২০ ফিঃ ৬½ ইঃ।

৩য়—এইচ ক্লাউস (জার্মানী)—২০ ফিঃ ৪½ ইঃ।

বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারিণী এবং মেলবোর্ন অলিম্পিকের বিজয়িনী এলিজাবেথ ক্রেজেসিনস্কা প্রথম স্থান দখল করবেন, না জার্মানীর ক্লাউস প্রথম হবেন এই নিয়েই অ্যাথলেটিক বিশারদদের মধ্যে গবেষণা চলছিল। কারণ অলিম্পিকের আগে ক্লাউস ২০ ফুট ১১½ ইঞ্চি পর্যন্ত লাফিয়েছিলেন। কিন্তু ক্লাউসের এ দূরত্ব বিশ্ব রেকর্ডের অনুমোদন পায়নি। যাই হক ক্রেজেসিনস্কা বা ক্লাউস কেউই রোম অলিম্পিকের স্বর্ণ পদক পেলেন না—পেলেন রাশিয়ার ভি ক্রেপকিনা, যিনি ২০ ফুট ১ ইঞ্চির বেশী কোনদিন লাফাতে পারেননি।

৪×১০০ মিটার রীলে

বিশ্ব রেকর্ড—ইউ এস এ (এম হাডসন, এল্ উইলিয়ামস, বি জোন্স ও ডবলিউ রুডলফ) ৪৪·৪ সেঃ (১৯৬০ সালের অলিম্পিকের হিটে)

অলিম্পিক রেকর্ড—অস্ট্রেলিয়া ৪৪·৫ সেঃ

১ম—আমেরিকা (এম হাডসন, এল্ উইলিয়ামস, বি জোন্স ও রুডলফ) ৪৪·৫ সেঃ (অলিম্পিক রেকর্ডের সমসময়)

২য়—জার্মানী ৪৪·৮ সেঃ।

৩য়—পোল্যান্ড ৪৫ সেঃ।

৪×১০০ মিটার রিলে রেসের হিটে আমেরিকার মেয়েরা সে সময় করেছিলেন, ফাইন্যালে সে সময় করতে পারেননি। হিটের সময়ই নতুন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

সহোদরা ইরিনা ও তামারা। রোম অলিম্পিকে ইরিনা হার্ডল রেসের ও তামারা (ডানদিকে) লোহার বল ছোড়ায় স্বর্ণপদক পেয়েছেন

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১০ই অক্টোবর—আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা অদ্য আসাম বিধান সভায় আটটি ধারা বিশিষ্ট ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের রক্ষাকবচ সম্বলিত আসাম সরকারী ভাষা বিল উত্থাপন করেন। ইহার পূর্বে এই বিল উত্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য দশ সহস্রাধিক পার্বত্য অধিবাসী দেড়মাইল দীর্ঘ এক মিছিল বাহির করিয়া রাজ্যের রাজধানীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

কেন্দ্রীয় সরকার সম্ভবত এক পক্ষকালের মধ্যেই ডাক ও তার কর্মীদের জাতীয় ফেডারেশন ও উহার সহিত সংশ্লিষ্ট নয়টি ইউনিয়নকে পুনরায় স্বীকৃতি দান করিবেন।

১১ই অক্টোবর—নিউইয়র্ক হইতে শ্রীনেহরু আজ ফিরিয়া আসিয়াছেন। ফিরিয়াছেন বটে, তবে এ-নেহরু যেন সে-নেহরু নন। সেই বাকচাপল্য নাই, চোখমুখ থমথমে। চালচলনে সেই চটপটে ভাব নাই, পদক্ষেপ ধীরস্থির। পনের দিনেই মানুষটি যেন বিলকুল বদলাইয়া গিয়াছে।

আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে দীঘা সমুদ্র সৈকত উন্নয়নের পরিকল্পনা আপাতত বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, উত্তাল সমুদ্রের ক্রমাগত হানায় বেলাভূমির অব্যাহত অবক্ষয়ের কারণেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঐ সিদ্ধান্ত লইয়াছেন।

১২ই অক্টোবর—গত সোমবার মুঙ্গেরের নিকট গঙ্গায় এক নৌকাডুবির ফলে ৪০ জনের সলিল সমাধি ঘটে। মুঙ্গেরের নিকট সিঙ্ঘিয়া ঘাটের অনতিদূরে ঐ শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে।

আনন্দবাজার পত্রিকা ও দেশ-এর সম্পাদক এবং আনন্দবাজার পত্রিকা সংস্থার ডিরেক্টর শ্রীঅশোককুমার সরকার পশ্চিম জার্মান সরকারের আমন্ত্রণে অদ্য পূর্বাহ্নে জার্মান বিমান লুফৎহানসা যোগে পশ্চিম জার্মানী যাত্রা করেন।

১৩ই অক্টোবর—দারিদ্র্য ও বেকারীর সমস্যা-পীড়িত পশ্চিমবঙ্গের অন্ধকার ভাগ্যাকাশে অবশেষে একটু আশার আলো দেখা দিয়াছে। এখন হইতে পশ্চিমবঙ্গের সকল রাষ্ট্রীয় সংস্থায় মাসিক ৩৫০, টাকার কম বেতনের সকল পদে কেবলমাত্র বাঙ্গালীদেরই নিযুক্ত হইবার অধিকার থাকিবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

দ্বিতীয় পাঁচসালা যোজনায় কেন্দ্রীয় সরকার কলিকাতা কর্পোরেশনের জল সরবরাহ ও পয়ঃ-প্রণালী ব্যবস্থার উন্নয়ন কল্পে ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার যে ঋণ বরাদ্দ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ এ পর্যন্ত এক পয়সাও খরচ করেন নাই বলিয়া জানা গিয়াছে। তাই প্রকাশ, পরিকল্পনাটি ফাইলে চাপা আছে এবং আজ পর্যন্ত সরকারের ঘরে ঐ টাকা পচিতেছে।

১৪ই অক্টোবর—প্রকাশ, চাকদহ থানার ২নং আশ্রয় শিবিরে অবস্থিত রাজ্য পুনর্বাসন বিভাগের দুইটি গুদামের টিন চুরি গত ৮।১০ মাস যাবৎ অব্যাহত গতিতে চলিতেছে। এ পর্যন্ত প্রায় ২০ হাজার টাকার টিন বেমালুম লোপাট হইয়া গিয়াছে। জনসাধারণের অভিযোগ—বড় হইতে ছোট স্থানীয় পুলিস এই ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়।

আসন্ন কালীপূজা ও দেওয়ালী উৎসব উপলক্ষে বে-আইনী বাজী পোরানো এবং তজ্জনিত বিপদের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে নগরীর পুলিস কর্তৃপক্ষ ভারতীয় বিস্ফোরক আইন বলে এ পর্যন্ত ২৫০ মণের অধিক (মূল্য প্রায় ২ লক্ষ টাকার বেশী) বাজী হস্তগত করিয়াছেন এবং এই সম্পর্কে ২৫ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন।

১৫ই অক্টোবর—আসাম বিধানসভায় আসামের সরকারী ভাষা সম্পর্কিত যে বিলটি উত্থাপিত হইয়াছে, আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি আজ রাত্রে তাহা সংশোধনের জন্য এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে।

ইউনেস্কো গবেষণা কেন্দ্র কলিকাতা হইতে নয়াদিল্লি স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত লওয়ায় কেন্দ্রের অনেক কর্মী বেকারীর কবলে পড়িবেন বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। প্রকাশ, বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে চলিয়াছেন ৪০।৫০ জন বাঙালী কর্মী। ইতিমধ্যেই অনেকের উপর নোটিস পড়িয়াছে বলিয়া জানা যায়।

১৬ই অক্টোবর—আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিকট আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে শ্রী নেহরু তাঁহার মতামত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন—দুইটি শক্তিজোট পরস্পরকে এত বেশী অবিশ্বাস করিতেছে যে, কাহারও পক্ষে বর্তমান অবস্থায় তাঁহাদের এক জায়গায় লইয়া আসা খুবই কঠিন।

বিদেশী সংবাদ

১০ই অক্টোবর—সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীনিকিতা ক্রুশ্চেফ গতরাত্রে বলেন যে, আগামী বৎসর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নূতন প্রেসিডেন্টের সহিত আর একটি শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হইতে তিনি প্রস্তুত আছেন। তাঁহার বিশ্বাস তাঁহাদের মধ্যে এই বৈঠক হইবেই।

কঙ্গোয় সামরিক অভ্যুত্থানের নেতা কর্নেল মোবুটুর সুসজ্জিত সেনাদল রাজধানীতে শ্রীলুমুম্বার ঘোরাফেরা বন্ধ করার জন্য এবং বাড়ির বাহিরে আসিলে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করার জন্য তাঁহার গৃহের চারিদিকে বেষ্টনীর আকারে মোতায়েন থাকে।

১১ই অক্টোবর—রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদ আজ রাত্রে সোভিয়েট রাশিয়ার আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া পুনরায় এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, তিব্বতে চীনের আক্রমণ সম্পর্কে পূর্ণ আলোচনা করা হইবে।

ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী উ নু পিকিং-এ চীন-ব্রহ্ম সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া চীন হইতে ফিরিবার পর আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হইবে; কারণ, উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীই শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য উদগ্রীব।

১২ই অক্টোবর—অদ্য শক্তিশালী জাপানী সমাজতন্ত্রী দলের সভাপতি শ্রীইনেজিরো আশানুমা সতের বৎসর বয়স্ক একটি ছাত্রের দ্বারা ছুরিকাহত হইয়া নিহত হইয়াছেন।

নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নটি রাজনৈতিক কমিটিতে না পাঠাইয়া সাধারণ পরিষদের পূর্ণ অধিবেশনে আলোচিত হউক এই মর্মে একটি সোভিয়েত প্রস্তাব গত রাত্রে পরিষদ কর্তৃক অগ্রাহ্য করা হইয়াছে।

১৩ই অক্টোবর—সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চফ অদ্য সাধারণ পরিষদে প্রথম জয়লাভ করেন। ঔপনিবেশিক দেশগুলির জনগণের স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁহার প্রস্তাবিত ঘোষণা সম্পর্কে প্রকাশ্য অধিবেশনে আলোচনা করিতে সাধারণ পরিষদ সম্মত হইয়াছেন।

বহু সহস্র বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী আজ সরকার বিরোধী ধ্বনি করিতে করিতে জাপানের সংসদের দিকে অগ্রসর হইলে সংসদ ভবনকে রক্ষা করার জন্য প্রচুর পুলিস মোতায়েন করা হয়। সমাজ-তন্ত্রী দলের নেতা শ্রীইনেজিরো আশানুমাকে গতকাল হত্যা করার প্রতিবাদে আজ ছাত্র এবং ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীগণ এই প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।

১৪ই অক্টোবর—কিউবা সরকার অদ্য কিউবার সকল ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়াছেন। অবশ্য রয়াল ব্যাঙ্ক অব কানাডা এবং ব্যাঙ্ক অব নোভাস্কোশিয়া ইহার আওতার বাহিরে আছে। ইহা ছাড়াও আইন জারী করিয়া ৩৮২টি কোম্পানী রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছে।

আজ বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইতালী নিরস্ত্রীকরণের জন্য ৬টি প্রধান মূলনীতি অনুসরণের প্রস্তাব করে। ৯৯টি রাষ্ট্র লইয়া গঠিত সাধারণ পরিষদে এই মূল নীতিগুলি একটি খসড়া প্রস্তাবের আকারে প্রচার করা হইয়াছে।

১৫ই অক্টোবর—সোস্যালিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান আশানুমার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ এবং অবিলম্বে বেতনবৃদ্ধি দাবি করিয়া ট্রেড ইউনিয়নের ৩০ হাজার সদস্য আজ মধ্যাহ্নে একটি জনসমাবেশে যোগদান করে এবং ডায়েট (পার্লামেণ্ট) ও প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের পাশ দিয়া অগ্রসর হয়।

১৬ই অক্টোবর—বিপ্লববিরোধী কার্যকলাপের অপরাধে আজ কিউবার সান্টিয়াগোতে এলেন টমসন ও রবার্ট ফুলার নামক দুইজন আমেরিকানকে ফায়ারিং স্কোয়াডের গুলিতে প্রাণ দিতে হইয়াছে।

গত সোমবার পূর্ব পাকিস্তানের সমুদ্রোপকূলে অঞ্চলের উপর দিয়া যে প্রবল ঘূর্ণবাত্যা ও জলোচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইয়াছে তাহার ফলে এক নোয়াখালি জেলাতেই প্রায় তিন হাজার লোক নিহত হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে।

গত এক বৎসরে পশ্চিম পাকিস্তানের লোকসংখ্যা ৭ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং মোট সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৪ কোটি। গত এক বৎসরে প্রতি মিনিটে ৪টি মানব সন্তান পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছে। এভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ১৯৬৫ সালের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের লোকসংখ্যা হইবে ৪ কোটি ৩৫ লক্ষ।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ
প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

দেশ

...RNMENT LIBRAR... Cooch Be...

DESH 40 Naya Paise
Saturday, 29th October, 1960.

২৭ বর্ষ ॥ ৫১ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১২ কার্তিক ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

দল, নীতি ও নেতৃত্ব

দলীয় রাজনীতিতে মতবিরোধ এমন কিছু অনাসৃষ্টি ব্যাপার নয়। কংগ্রেসের মত, পথ এবং কর্মসূচী নিয়ে বিরোধ আগেও ঘটেছে বহুবার। এখন যে ধরনের বিরোধে কংগ্রেস সংগঠন আলোড়িত হচ্ছে, তার মধ্যে মত ও পথের পার্থক্যের কোনও পরিষ্কার সূত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন। কঠিন আরও এই কারণে যে, অন্তর্বিরোধটা একান্তভাবে কতকগুলি অঙ্গরাজ্যের প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতৃমণ্ডলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ; বিরোধ যদি সত্যিই কংগ্রেসের আদর্শ, নীতি এবং কর্মসূচী নিয়ে হতো, তাহলে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সে-বিরোধে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হতেন। কিন্তু তা এখনও হয়নি; কংগ্রেস-সংগঠনের প্রাদেশিক স্তরে অনেকগুলি রাজ্যে যে উপদলীয় বিরোধ দেখা দিয়েছে, সে-সম্পর্কে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ভূমিকা কতকটা পরমসহিষ্ণু ক্ষমাশীল অভিভাবকের মত। উপমাটা পুরোপুরি সুপ্রযুক্ত অবশ্য নয়; শ্রীনেহরু-পন্থ-মোরারজী দেশাই-পাতিল-ডেবর-সঞ্জীব রেড্ডী প্রমুখ কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতাদের সর্বভারতীয় প্রতিপত্তি ও বিধিসঙ্গত ক্ষমতা যথেষ্ট হলেও দেখা যাচ্ছে, প্রাদেশিক স্তরে দলীয় সংগঠনে ক্ষমতা-দ্বন্দ্ব রোধ করতে পারা তাঁদের সাধ্যের বাইরে-প্রায়। কলহপরায়ণ সাবালক সন্তানদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন ব্যাপারে পিতৃস্থানীয়রা যেমন অসহায়, কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রায় সেই অবস্থা।

কংগ্রেসের সাম্প্রতিক অন্তর্বিরোধের সূত্র হল ক্ষমতার দখলী স্বত্ব, আর ক্ষমতা মানে শাসনক্ষমতা, মন্ত্রিত্ব গঠন-পরিচালনে ষোল আনা অধিকার; কিম্বা সংবিধামত অবস্থানুযায়ী ক্ষমতার ভাগ-দখল। অন্তর্বিরোধের চেহারাতেই তার স্বরূপ সুস্পষ্ট। দু' চারটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাগুণে দলীয় ঐক্য এখনও সর্বস্তরে অটুট; অনেকটা একই কারণে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এখনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হতে পারেনি। কিন্তু প্রাদেশিক স্তরে প্রধানত ক্ষমতা নিয়ে যে লড়াই একটির পর একটি রাজ্যের কংগ্রেস সংগঠনে বিস্তৃত হচ্ছে,

> **রবীন্দ্র-পত্রাবলী**
>
> শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্রাবলী আগামী সপ্তাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে। —সম্পাদক

তার প্রভাব কালক্রমে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকেও গ্রাস করতে পারে। হয়ত তার এখনও বিলম্ব আছে। তবে সন্দেহ নাই, দলীয় সংগঠনে ক্ষমতা-দ্বন্দ্ব সম্পর্কে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃমণ্ডলী নিরপেক্ষ এবং প্রায় নিরাসক্ত ভাব ধারণ করার ফলে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দল, নীতি এবং নেতৃত্ব, তিনটি বিষয়েই কংগ্রেস-সংগঠনে গত বার তের বৎসরে ধীরে ধীরে নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে কংগ্রেস-সংগঠনে উপদলীয় বিরোধ এবং ক্ষমতা-দ্বন্দ্ব কখনও কখনও তীব্র হয়েছে বটে, কিন্তু তার রাজনৈতিক পশ্চাৎপট এবং কংগ্রেসের ভূমিকাও তখন ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম। এখন দুটি ছাড়া আর সব কটি অঙ্গরাজ্যে কংগ্রেস দল এককভাবে ক্ষমতাসীন। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের রীতি অনুযায়ী বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেসী দলের ভোটের জোরে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার প্রতিষ্ঠা। পার্লামেণ্টারী দলকেও অবশ্য নানাভাবে প্রাদেশিক কংগ্রেস-সংগঠনের উপর নির্ভর করতে হয়; কংগ্রেস-টিকেট এবং নির্বাচন যুদ্ধে হারজিত ব্যাপারে প্রদেশিক কংগ্রেস-সংগঠনের অনেকখানি হাত। কিন্তু মুশকিল কী যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রায় ষোল আনা কংগ্রেস মন্ত্রিসভার করায়ত্ত। কংগ্রেসের বর্তমান বিরোধ এই রাজনৈতিক ক্ষমতায় অগ্রাধিকার নিয়ে। প্রকৃষ্ট প্রমাণ উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস-সংগঠনে উপদলীয় বিবাদ এবং তার পরিণতি। অন্য যে-সব রাজ্যের কংগ্রেস-সংগঠন অন্তর্বিরোধে দীর্ণ, সেখানেও এক কথা—একপক্ষ "মিনিস্টেরিয়ালিস্ট" অর্থাৎ কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সমর্থক, অপর পক্ষ মন্ত্রিত্ব-হারা "ডিসিডেণ্ট", যার ন্যায্য অর্থ "বিরুদ্ধমতাবলম্বী" হলেও আসলে এখানে মত বলতে যা বোঝায়, তা নিয়ে কোনও বিরোধ-বিতর্কের চিহ্ন নেই।

ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মত্ত যে-কোনও উপদল কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাকে বিপর্যস্ত করার জন্য প্রাদেশিক কংগ্রেস সংগঠনে ভোটের জোরে উলটপালট ঘটাতে পারে, যেমন ঘটেছে কোন কোন রাজ্যে। প্রদেশ কংগ্রেস-সংগঠনে এইভাবে উপদলীয় নেতৃত্বের অদলবদল ঘটলেই কি কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার ভাঙ্গাগড়া গণতান্ত্রিক নীতি-সঙ্গত হবে? তা নিশ্চয় হওয়া উচিত নয়। প্রথমত মন্ত্রিসভা ভাঙ্গাগড়ার সংবিধানগত অধিকার বিধানসভার সদস্যমণ্ডলীর। দ্বিতীয়ত, উপদলীয় দ্বন্দ্বে যেখানে পরিষ্কার কোনও নীতিগত বিরোধ নেই, শাসনক্ষমতা অধিকার অথবা হরণ করাই প্রধান উদ্দেশ্য, সেখানে কংগ্রেস-সংগঠনে ক্ষমতা হাতবদলের খেলা একবারের হারজিতেই শেষ হবার নয়। তবে কি দফায় দফায় উপদলীয় জয়-পরাজয়ের সঙ্গে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা ভাঙ্গাগড়া চলবে? তা যদি হয়, তবে কংগ্রেস-সংগঠনে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ঠাট মাত্র বজায় রাখার কোনই সার্থকতা রইবে না।

একদিকে কংগ্রেসের দলীয় প্রতিষ্ঠানগত সংগঠনের নেতৃত্ব, অন্যদিকে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা এবং কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দল—এ দুয়ের মধ্যে দায়িত্ব এবং ক্ষমতার সামঞ্জস্য বিধান খুবই দুরূহ সন্দেহ নাই। ব্রিটিশ লেবার পার্টিতেও দলীয় সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে পার্লামেণ্টারী দলের নেতাদের বিরোধ আছে দীর্ঘকাল ধরে। তফাৎ এই যে, ব্রিটিশ লেবার পার্টির এই বিরোধটা মন্ত্রিত্ব ভোগ এবং ভাগ-দখল নিয়ে নয়; বিরোধ নীতিগত। সম্প্রতি স্কারবরোতে ব্রিটিশ লেবার

পার্টির বার্ষিক সম্মেলনে সেই নীতিগত বিরোধের পরিচ্ছন্ন পরিচয় পাওয়া গেছে। পার্লামেণ্টারী লেবার পার্টির নেতা গেইটস্কেল বড়, না ব্রিটিশ লেবার পার্টির কর্মপরিষদের নেতারা বড়, তা নিয়ে বিরোধ নয়। ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে গেইটস্কেলের মতের সঙ্গে লেবার পার্টির অধিকাংশ সদস্যের তীব্র নীতিগত মতবিরোধ। এদিকে কংগ্রেসের অন্তর্বিরোধে "মিনিস্টেরিয়ালিস্ট" এবং "ডিসিডেণ্ট" দুপক্ষেরই ধ্যানধারণার বিষয় হল ক্ষমতার চাবিকাঠি। কোথায় স্কারবরো, আর কোথায় রায়পুর? স্কারবরোয় ব্রিটিশ লেবার পার্টির বার্ষিক সম্মেলনের সঙ্গে রায়পুরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির তুলনা করা নিরর্থক। রায়পুরে আর যাই হোক, কংগ্রেস-সংগঠনে উপদলীয় ক্ষমতা-দ্বন্দ্বের সুষ্ঠু সমাধানের জন্য কংগ্রেস-প্রতিনিধিরা নীতিগত বিতর্কে উৎসাহী হবেন আশা করা যায় না।

প্রসঙ্গত

সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক দুশ্চরিত্রা মহিলার কীর্তিকাহিনী নিয়ে আদালতে তুমুল মামলা শুরু হয়ে গিয়েছে। অভিযুক্ত মহিলাটি আর কেউ নন, বিখ্যাত উপন্যাসের নায়িকা লেডী চ্যাটার্লি, প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক ডি এইচ লরেন্স যাঁকে তাঁর বহু আলোচিত গ্রন্থ 'লেডী চ্যাটার্লি'জ লাভার'-এ অমর করে রেখে গিয়েছেন। আর আদালত? একেবারে খোদ লণ্ডনের সেণ্ট্রাল ক্রিমিন্যাল কোর্ট।

এমন একজন বিখ্যাত মহিলাকে বিচারের জন্য যখন আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে তখন স্বভাবতই দু পক্ষের উকিলের জেরায় নানা কেচ্ছাকাহিনী বেরোবেই এবং তা শোনবার লোভ কে সংবরণ করতে পারে। আদালতে লোক ভেঙে পড়বে এই আশঙ্কা করেই মামলাটি সেণ্ট্রাল ক্রিমিন্যাল কোর্টে দেওয়া হয়েছে। এই আদালতে বসবার স্থান মাত্র ১৫৫ জনের, তার মধ্যে সাংবাদিকদের আসন হচ্ছে ২৫টি। মামলার রায় কি হবে না হবে, তার জন্য সারা পৃথিবী আজ উৎসুক চিত্তে অপেক্ষা করে আছে। সুতরাং দেশ-বিদেশের সাংবাদিকদের মধ্যে সাড়া পড়ে গিয়েছিল আগেভাগে এসে কে আসন দখল করতে পারে। অনেক বিবেচনার পর আদালতের কর্তৃপক্ষ আমেরিকা, ক্যানাডা, ফ্রান্স, সুইডেন, ডেনমার্ক, ইতালী এবং জার্মানির সাংবাদিকদের আদালতকক্ষে উপস্থিত থাকার সুযোগ দিয়েছেন। উপরন্তু বৃটিশ সাংবাদিকরা ত আছেনই। দেশ-বিদেশের সাংবাদিকদের কেন এত ভীড় কেন এত আগ্রহ? এই মামলার বিবরণ ফলাও করে প্রচারের জন্য কেন আজ তারা এত ব্যস্ত? তারা জানে এই মামলার রায় ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। পরবর্তী যুগের আইনজ্ঞ ও সাহিত্য রসিকদের কাছে এই মামলার রায় এই গ্রন্থের মতই ক্ল্যাসিক বলে চিরকাল নিশ্চিত গণ্য হবে। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে বিশ্ববিখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী পেংগুইন প্রকাশকদের। কিছুদিন আগে এই প্রকাশক লরেন্সের আলোড়ন সৃষ্টিকারী নিষিদ্ধ গ্রন্থ 'লেডী চ্যাটার্লি'জ লাভার'-এর কাগজের মলাটে পূর্ণাঙ্গ সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করেছেন ২৫০,০০০ কপি। এতকাল এই গ্রন্থের অংশবিশেষ বাদ দিয়ে প্রকাশিত হয়ে এসেছে। পেংগুইন প্রকাশকের দৃঢ় সংকল্প, কোনো অংশ বাদ না দিয়ে সম্পূর্ণ উপন্যাস তাঁরা প্রকাশ করবেন এবং তারজন্য আদালত পর্যন্ত যেতেও তাঁরা প্রস্তুত। সংকল্প কাজে পরিণত হওয়ার সংগে সংগেই পাবলিক প্রসিকিউটার মামলা দায়রায় সোপর্দ করলেন। গত ২০ অক্টোবর থেকে রুদ্ধদ্বারকক্ষে মামলার শুনানি শুরু হয়ে গিয়েছে। লেডী চ্যাটার্লির ভাগ্য এখন নির্ভর করছে মামলার বারোজন জুরীর উপর। জুরীদের মধ্যে নয়জন পুরুষ ও তিনজন নারী। লেডী চ্যাটার্লি অবশ্য নারী জুরীদের উপর খুব বেশী নির্ভর করছেন না কারণ তিনি জানেন এ-বিষয়ে নারী চিরকালই নারীর শত্রু। হয়তো ঈর্ষাই এর কারণ অথবা মাত্রাতিরিক্ত রক্ষণশীলতা। একমাত্র পুরুষরাই ভরসা। মনোহারিণী রূপে আর গুণে যদি তিনি তাঁদের হৃদয় জয় করে নিজেকে নির্দোষ সাব্যস্ত করতে পারেন তাহলে গত তিরিশ বৎসরের অধিক লেখক লরেন্সের সংগে যে দুর্নাম ও কলংকের ভাগী হয়ে আত্মগোপন করে আছেন তা থেকে চিরকালের জন্য মুক্তি পেয়ে যাবেন।

মুক্তি দেবার মালিক হচ্ছেন বারোজন জুরী। মামলা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করে জুরীরাই এই গ্রন্থকে অশ্লীলতার কলংক থেকে মুক্তি দিতে পারেন। জুরীদের সিদ্ধান্ত যদি গ্রন্থের বিরুদ্ধে যায় তাহলে আগামী ৫ই নবেম্বর হয়তো এক তুমুল আন্দোলন দেখা দিতে পারে। এমনও হতে পারে যে গাই ফক্স-এর বোমা মেরে পার্লামেণ্ট উড়িয়ে দেবার মতো আরেকটি ঐতিহাসিক পাগলামি আদালতের সামনে ঘটতে পারে। কারণ, আগামী ৫ই নবেম্বর এই মামলার রায় প্রকাশিত হবার কথা। কিন্তু লণ্ডনের সাহিত্যিক ও আইনজ্ঞ মহলের অধিকাংশেরই ধারণা বিচারের রায় পেংগুইনের বিরুদ্ধে যাবে না।

ইংরেজ পাঠকদের মনোভাব হচ্ছে—যে যুগে এই বই লরেন্স লিখেছিলেন সে-যুগ আর এ-যুগে শ্লীল অশ্লীল বিচার-বোধে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। সমাজ গেছে পালটে, সেই সংগে রুচি এবং জীবনের মূল্যায়নও। সুতরাং একই সংগে লরেন্সের বইকে অশ্লীলতার অভিযোগে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে রুচিহীন যৌন আবেদনপূর্ণ রবিবারের দৈনিক পত্রিকাগুলির প্রতি চোখ ফিরিয়ে রাখার কোনো মানে হয়? তবুত লরেন্সের গ্রন্থে সাহিত্য আছে, আছে শিল্পকর্ম। লক্ষ লক্ষ সংখ্যা প্রচারিত দৈনিক পত্রিকার রবিবাসরীয় ক্রোড়পত্রে 'সেক্স' ও 'সেনসেশন' ছাড়া আর কিছুই নেই।

জুরীরা লরেন্সের গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত পাঠ করার কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। এটা তাঁদের আবশ্যিক কর্তব্য। শুধু পাতা উল্টে এখানে-সেখানে চোখ বুলালে চলবে না, প্রতি পৃষ্ঠার প্রতিটি পংক্তি গভীর মনোনিবেশ-সহকারে পড়তে হবে। অতীতে প্রসিকিউটারের পক্ষে সম্ভব ছিল গ্রন্থের কিছু-কিছু অংশবিশেষ বাছাই করে নিয়ে গ্রন্থকে আইনের কবলে এনে নিষিদ্ধ করা এবং বাজেয়াপ্ত করা। কিন্তু আজ সেদিনের আইনের কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। যে-কোনো অভিযুক্ত গ্রন্থের সামগ্রিক রূপ, আবেদন ও বক্তব্য নিয়েই বিচার করতে হবে, পাঠ্যবস্তুর বাছাই করা উদ্ধৃতি দিয়ে নয়। ইংরেজ আইনের ইতিহাসে এই প্রথম বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচকরা সাক্ষীস্বরূপ আদালতের কাঠগড়ায় উপস্থিত থেকে গ্রন্থের সাহিত্য মূল্যায়নে তাঁদের অভিমত দিতে পারবেন। গত বৎসর ইংলণ্ডে 'নিউ অবসীন পাবলিকেশন অ্যাক্ট' নামে একটি আইন পার্লামেণ্ট-এ পাস করিয়ে নেবার পর থেকেই এটা সম্ভব হয়েছে।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্বে র‍্যাডক্লিফ্ হল্-এর 'দি ওয়েল অব লোনলিনেস' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ অশ্লীলতার অভিযোগে যখন নিষিদ্ধ হয়েছিল তখন তৎকালীন প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচকরা এই নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে আদালতে গ্রন্থের সঠিক মূল্য যাচাইয়ের জন্য নিজেদের বক্তব্য পেশ করবার আবেদন জানিয়েছিলেন। আদালত কর্তৃক সে-আবেদন গ্রাহ্য হয়নি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আদালতের বিচারে যদি 'লেডী চ্যাটার্লিজ লাভার'-এর উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করারই সিদ্ধান্ত হয় তখন ভারতবর্ষ কি করবে। ভারতে কি পেঙ্গুইনের এই অবিকৃত সংস্করণ অবাধে বিক্রী করার সুযোগ দেওয়া হবে? কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটা নীতিগত বাধ্যবাধকতা আছে যার ফলে এই বই ভারতেও এতকাল নিষিদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষে পেঙ্গুইনের যারা এজেন্ট তাদের কাছে এটা এখন চিন্তার বিষয় হয়ে পড়েছে। তাছাড়া এই গ্রন্থের ভারতীয় ভাষায় পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ যদি কোনো ভারতীয় প্রকাশক প্রকাশ করতে চান, পুলিসের কাছে অনুবাদের পাণ্ডুলিপি দাখিল না করে এ-বই প্রকাশে তিনিও হয়তো সাহসী হবেন না।

ত্রিশ বৎসরেরও উপর হল ডি এইচ লরেন্স 'লেডী চ্যাটার্লিজ লাভার' লিখেছিলেন। এই বই প্রথম প্রকাশিত হয় ফ্লোরেন্স-এ, ১৯২৮ সালে। মাত্র এক হাজার বই ছাপা হয়। নির্দিষ্ট গ্রাহকদের মধ্যে প্রতি বই বিক্রী হয়েছিল দুই গিনি দামে। কিছুকাল যাবৎ এই বই ফরাসী দেশ থেকে গোপনে ইংলণ্ডে বিক্রী করা চলছিল, তাও মূল ফরাসী থেকে অক্ষম ইংরিজি অনুবাদ। ছাপা ও কাগজ নিকৃষ্ট শ্রেণীর। এতদিন ইংলণ্ডের কোনো পুস্তক প্রকাশক এই গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ ইংরিজি সংস্করণ প্রকাশে সাহসী হননি। সম্প্রতি পেঙ্গুইনের কর্মকর্তা স্যার অ্যালেন লেন লরেন্স-এর সমগ্র রচনাবলীর অবিকৃত সুলভ সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রথমেই 'লেডী চ্যাটার্লিজ লাভার' প্রকাশ করে বিখ্যাত মামলার সূত্রপাত করলেন। এই বছরের গোড়ায় আমেরিকার ফেডারেল কোর্ট এই বই অশ্লীল নয় বলেই ঘোষণা করেছেন। ১৯৫৮ সালে জাপানের সুপ্রীম কোর্ট এই বই প্রসঙ্গে রায় দানকালে বলেছেন, সাহিত্যের সংজ্ঞা যদি শিল্পসৃষ্টি হয় তাহলে, নিঃসন্দেহে এ-বই একটি উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টি। তথাপি এ-বই পড়ে পাঠকরা লজ্জায় ও ঘৃণায় অধোবদন হবেই।

সাহিত্যের আদর্শ, সাহিত্যের লক্ষণ, আর্টের উদ্দেশ্য এবং সাহিত্যে শ্লীলতা নিয়ে একদা যে প্রচণ্ড তর্কের উদ্ভব হয়েছে, বর্তমানে তাদের সার্থকতা ক্ষীণ হয়ে গেলেও একেবারে নিঃশেষিত হয়নি। লেডী চ্যাটার্লি আবার সমাজের বুকে সসম্মানে আত্মপ্রকাশ করতে পারবেন কিনা জানি না। হয়তো পারবেন, হয়তো আবার আত্মগোপন করতে হবে। আমরা আদালতের সেই সিদ্ধান্তের জন্যই উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছি।

— সদ্য-প্রকাশিত —

সমরেশ বসুর আশ্চর্য উপন্যাস

বাঘিনী

॥ সাত টাকা ॥

বি টি রোডের ধারে (৩য় মুঃ) ২·৫০ ॥
শ্রীমতী কাফে (২য় মুঃ) ৬·০০ ॥
গঙ্গা (৫ম মুঃ) ৫·৫০ ॥
[বাংলা ছায়াচিত্রে রূপায়িত হচ্ছে]

জরাসন্ধের নবতম উপন্যাস

ন্যায়দণ্ড

॥ সাড়ে ছয় টাকা ॥

বিচারশালার পটভূমিকায় মর্মস্পর্শী কাহিনী
লৌহকপাট
১ম খণ্ড (১৩শ মুঃ) ৪·০০ ॥
২য় খণ্ড (১০ম মুঃ) ৩·৫০ ॥ ৩য় খণ্ড (৫ম মুঃ) ৫·০০ ॥
তামসী (৭ম মুঃ) ৫·৫০ ॥
[ছায়াচিত্রে রূপায়িত হচ্ছে 'বিষকন্যা' নামে]

সৈয়দ মুজতবা আলীর
অপরূপ রম্যরচনা

চতুরঙ্গ

॥ সাড়ে চার টাকা ॥

পঞ্চতন্ত্র (১৬শ মুঃ) ৩·৫০ ॥

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর
নবতম উপন্যাস

তুঙ্গভদ্রা

॥ চার টাকা ॥

মণিপদ্ম ৪·০০ ॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মহাশ্বেতা (২য় মুদ্রণ) ৫·৫০ ॥
বিচারক (৮ম মুঃ) ২·৫০ ॥
রসকলি ৩·৫০ ॥

বারীন্দ্রনাথ দাশের
বেগমবাহার লেন (৩য় মুঃ) ৪·০০ ॥
রাজা ও মালিনী (২য় মুঃ) ৩·০০ ॥
কর্ণফুলি (৩য় মুঃ) ৩·৫০ ॥
রঙের বিবি (২য় মুঃ) ৩·০০ ॥
চায়না টাউন (২য় মুঃ) ৪·৫০ ॥

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
দুয়ার হতে অদূরে (৩য় মুঃ) ৩·৫০
তোমরাই ভরসা (২য় মুঃ) ৪·৫০ ॥
রূপান্তর (২য় মুঃ) ২·০০ ॥
বরযাত্রী (৬ষ্ঠ মুঃ) ৩·৫০ ॥
উত্তরায়ণ (৩য় মুঃ) ৪·০০ ॥

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের
রাজপথ (৭ম মুঃ) ৪·৫০ ॥
ছদ্মবেশী (৫ম মুঃ) ৩·৫০ ॥
দিকশূল (৩য় মুঃ) ৪·৫০ ॥
বিগত দিন ৩·৫০ ॥
আশাবরী (৩য় মুঃ) ৪·০০

বুদ্ধদেব বসুর
নীলাঞ্জনের খাতা ৪·০০ ॥
শ্রেষ্ঠ গল্প (২য় মুঃ) ৫·০০ ॥
হঠাৎ আলোর ঝলকানি (২য় মুঃ) ২·৫০ ॥

দেবেশ দাশের
ইয়োরোপা (৭ম মুঃ) ৩·০০ ॥
রাজোয়ারা (৬ষ্ঠ মুঃ) ৪·০০ ॥

দক্ষিণারঞ্জন বসুর
বিদেশ বিভূঁই ৬·০০ ॥
মধুরেণ ২·০০ ॥

বরিস পাস্তেরনাকের
বহু বিতর্কিত চাঞ্চল্যকর উপন্যাস

ডাক্তার জিভাগো

॥ সাড়ে বারো টাকা ॥
কবিতার অনুবাদ ও সম্পাদনা :
বুদ্ধদেব বসু

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের প্রখ্যাত-গ্রন্থ

সুখের সন্ধানে

[The Conquest Of Happiness]

॥ পাঁচ টাকা ॥
অনুবাদ : পরিমল গোস্বামী

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ঃ বারো

আলোচনা

অতি আধুনিক ছোট গল্প

মহাশয়,

গত এক বৎসর কিংবা তারও কিছু অধিক সময়ের মধ্যে, 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত অধিকাংশ ছোটগল্পগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করানো এই পত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। এবং এ বিষয়ের ওপর আমার যা বক্তব্য তা বেশীর ভাগ সাধারণ পাঠক-গোষ্ঠীর মনের কথা বলেই, আমার ধারণা, এ পত্রের অবতারণা অপ্রাসঙ্গিক বা যুক্তিহীন হবে না।

কাব্য-সাহিত্যে যখন আধুনিকতা থেকে চরম আধুনিকতার পর্যায়ে পৌঁছনো গেছে তখন গোঁড়াপন্থীদের মুখ থেকে এই-জাতীয় কাব্যের প্রতি যে বিভিন্ন অভিযোগ শোনা যায় তার মধ্যে দুর্বোধ্যতা অন্যতম এবং বিশিষ্ট। এই শেষোক্ত অভিযোগের গুরুত্ব সর্বাংশে সত্য না হলেও, এর ভিত্তিটা মিথ্যে নয়।

আমার বক্তব্য, চরম আধুনিক ছোটগল্পের ওপরেও এই দুর্বোধ্যতার অভিযোগ অনেকাংশে খাটে। বস্তুত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত (বিশেষ করে বেশ কিছু-কাল যাবৎ 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত) ছোট-গল্পগুলি আধুনিক কবিতার সহধর্মী। যেন গদ্যকেই লিরিক-ছন্দে—কাব্যের মাধুর্যে রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

এই প্রচেষ্টা অবশ্যই অভিনন্দনীয়। কিন্তু, যেটা আমাকে এবং আমার বিশ্বাস, অধিকাংশ সাধারণ পাঠককে পীড়িত করে সেটা হচ্ছে—এই গল্পগুলির বক্তব্যের অস্পষ্টতা, ভাবের বিচ্ছিন্নতা।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, এই ধরনের গল্পের বেশ কয়েকটির ভাবই আমার কাছে সম্পূর্ণরূপে স্বচ্ছ হয় নি। হতে পারে, সেটা আমার নিজের অক্ষমতার দোষ। এবং একথাও মিথ্যে নয় যে, আমি অতি সাধারণ পর্যায়ের একজন পাঠক।

কিন্তু সাধারণ্যে আনন্দ বিতরণই কি সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়?

বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে যাঁরা কালজয়ী স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাঁদের সাহিত্যই এর প্রমাণ।

বর্তমানে ছোটগল্প এবং একাঙ্কিকা নাটক ইত্যাদির দ্রুত প্রসারণের পেছনে আমরা একটা কারণ দেখাই—চলতি যুগটা গতির এবং ব্যস্ততার যুগ। একটা বৃহৎ উপন্যাস খুলে তার রস গ্রহণ করবার মত যথেষ্ট কালব্যয় করার সময় আমাদের হাতে নেই। খুব সত্যি কথা। সেইজন্যেই সাহিত্য-রস-লিপ্সা এবং আনন্দ-পিপাসা তৃপ্তি খুঁজে পাচ্ছে ছোটগল্পে, একাঙ্কিকায়।

সাধারণ পাঠকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে আমার জিজ্ঞাসা, অতি আধুনিক এই সমস্ত মনস্তত্ত্বমূলক গল্প কি আমাদের আশানুরূপ আনন্দ যোগাতে পারছে?

উদাহরণ দিয়ে পত্র দীর্ঘ করতে চাই না। গত বেশ কয়েক সংখ্যার 'দেশে' ছোটগল্প-গুলি স্মরণ করলেই আমার এই 'জিজ্ঞাসা' স্পষ্ট হয়ে যাবে। এবং আমার বিশ্বাস, আজকের অধিকাংশ পাঠক-মনেই এই 'জিজ্ঞাসা' ঘনিয়ে উঠেছে।

শুধুমাত্র সাধারণ পাঠক বলে কথা নয়, যাঁরা ছোটগল্প বোঝেন এমন জনকয়েক শিক্ষিত ব্যক্তিকেও প্রশ্ন করে জেনেছি, তাঁরা এই জাতীয় গল্পে সন্তুষ্ট নন।

এর বিপক্ষে হয়ত প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে কি নতুনের দিকে নতুনতরের দিকে পদক্ষেপকে আমরা উৎসাহিত করব না, স্বাগত জানাব না? নিশ্চয়ই জানাব। পুরনোকে ভেঙে চুরে নতুনের দিকে অভি-গমন সর্বকালে নন্দিত এবং বন্দিত হয়ে এসেছে। কিন্তু অতি আধুনিক ছোট-গল্পের যে যাত্রা তা কতদূর সুদূরপ্রসারী হবে কিংবা আদৌ হবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

বর্তমান পত্রলেখকের বিরুদ্ধে, এস্থলে একটি অভিযোগ উঠতে পারে যে, তিনি গোঁড়া। আত্মপক্ষ সমর্থনে আমি বলব, রবীন্দ্রনাথ এবং তৎপরবর্তী যুগের ছোট-গল্পের শীর্ষস্থানীয়দের বহু গল্পই আমার পড়া আছে। এছাড়া আরও বহু খ্যাতনামা আধুনিক লেখকের ছোট গল্পের রসাস্বাদনে কৃতার্থ হয়েছি। এবং এই আনন্দের জন্য তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

তবে চলতি ছোটগল্পে সেই আনন্দ দিতে পারছে না কেন?

আমি এই পত্র, সত্যি বলতে কি, কোন অভিযোগের কথা তুলতে চাই নি। কেবল নিজের মনের ভাবনাগুলিকে এবং অনু-সন্ধিৎসাকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি। সমালোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়।

তবু আমি বলব, আমরা জটিল মনস্তত্ত্ব চাই না। মানসিক অন্ধিসন্ধির গূঢ়তম খবর চাই না। আমরা আনন্দ চাই, দৈনন্দিন এবং সামাজিক জীবনকে কেন্দ্র করে মুহূর্তে মুহূর্তে যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা নতুন নতুন রূপ পরিগ্রহ করছে আমরা তারই কাহিনী শুনতে চাই। জীবন যেখানে দিন দিন জটিলতার পাকে জড়িয়ে পড়ছে, সাহিত্যকে সেখানে সহজ হতে হবে।

সহজ সুরে সহজ কথায় বলার স্বাভাবিক বিষয় কি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে, ফুরিয়ে গিয়েছে? মানব-জীবন থেকে সহজ রসের উৎস কি শুকিয়ে গিয়েছে?

বিনীত—

বিমল বসু,
বহরমপুর।

সাত দেউলিয়া আঝাপুর

সবিনয়ে নিবেদন,

'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধকে স্মরণ করতে তিন বছর পিছু হাঁটলাম। প্রবন্ধটির নাম 'সাত দেউলিয়া আঝাপুর'। প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর অনেকাংশ আমি এখনও মনে আনতে পারি এবং তা সংগত কারণেই। কেননা, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ উপর্যুক্ত গ্রামে জন্মগ্রহণ করে আমি নিজেকে ধন্য মনে করেছি। প্রবন্ধটি পড়ে আমাদের উৎসাহিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। প্রসিদ্ধ সাত দেউলিয়া আঝাপুরের মন্দির তথা গ্রামটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে চলেছে—এতে আমাদের আনন্দ পাওয়ারই কথা। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ থেকে কাজকর্ম কয়েকদিনের মধ্যেই আরম্ভ হবে, এমন আশার কথাও সে প্রবন্ধে উচ্চারিত হয়েছিল।

তারপর কয়েকটা বছর পার হয়ে আমরা বর্তমান সময়ে উপনীত হয়েছি। বলা বাহুল্য, প্রত্যাশার পদধ্বনি মিলিয়ে গেছে। কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের উপযোগী যতটুকু সামর্থ্য থাকা দরকার তার বোধহয় আমাদের অভাব আছে। কেননা, ইনি কলির, তাই জেগে ঘুম যান। এদিকে বছরের পর বছর মন্দিরটা বিনা সংস্কারেই দাঁড়িয়ে আছে। রেখদেউলের প্রাচীনতম নিদর্শন এটি। মন্দিরটাকে ঘিরে কত কালবৈশাখী কত বর্ষা কেটে গেছে তার ইয়ত্তা কে রাখে। মন্দিরটার জীর্ণদশা দেখে আজ আর বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, জীবনীশক্তি দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। তাছাড়া, জন্মাবধি আমরা দেখছি একটু হেলে আছে মন্দিরটা।

এই প্রসঙ্গে একটা গল্প শোনানোর লোভ সংবরণ করা আমার পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠল। টেলিগ্রাফিক ভাষায় বলি—গল্পটা এক মা আর

ডাঃ কার্তিক বসুর
টাইকোসোড়া
অম্ল, অজীর্ণ ও ডিস্পেপসিয়ায়
নানালা
ব্যথা ও বেদনায়
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ—কলিকাতা ৯

তার সাত ছেলেকে নিয়ে। মায়ের অভিভাবকত্বে ছেলেরা মানুষ হয়ে উঠল। বড় হয়ে মাকে স্মরণ করে সাতজনে সাতটা মন্দির তৈরী করল আর বলল—মায়ের ঋণ শোধ করলাম। বলার সংগে সংগে মন্দিরগুলো ভেংগে পড়তে লাগল। তখন সবার ছোট ছেলেটি বলে উঠল—না না, মায়ের ঋণ শোধ করা যায় না। তখন তার তৈরী মন্দিরটি পড়তে পড়তেও রয়ে গেল। তাই নাকি মন্দিরটা বে'কে দাঁড়িয়ে আছে।—এ গল্প সত্য তা আমি বলি না। আমার ঠাকুমার কাছ থেকে এ গল্প শুনেছি। গল্পের ছলে একটি নীতিকথা শোনানই যে এর উদ্দেশ্য—এ প্রসংগে আশা করি দ্বিতীয় মত জাগবে না।

সে যাই হোক, যা বলছিলাম তাই বলি। অনেক সময় বৃথা কেটেছে। এখনও সাবধান হওয়া ভাল। কালরোগ যদি ধরে তবে তাকে বাঁচাবে যে সে কোন চিকিৎসক! তাই প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রতি আমাদের করুণ আবেদন—দয়া করে সাত দেউলিয়া আঝাপুরের মন্দিরটির দিকে কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করে আমাদের কৃতার্থ করুন। ইতি—

সমর মিত্র

ভাষা কোন্দলী দুই

সবিনয় নিবেদন,

আমার বিতর্কমূলক প্রবন্ধটি প্রকাশ হবার সংগে সংগে মেদিনীপুর থেকে শ্রীযুত সুধাংশু তুংগ মহাশয় "দেশে"র উনপঞ্চাশ সংখ্যায় যে আলোচনা করেছেন, তা আমি লক্ষ্য করেছি। আমার মনে হয়, এই বিষয়ে আলোচনা এখানেই শেষ হয়নি। বরং যে-সূত্র আমি ধরিয়ে দিয়েছি তাতে বিভিন্ন রকমের আলোচনা আরো অগ্রসর হতে পারে। বোধ করি, অগণিত পাঠকও বসে নেই।

এই পত্র সুধাংশুবাবুকে জবাব দিতে নয়। অসমীয়া ভাষায় প্রকাশিত আসামের সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক "অসম-বাণী"র ১৪ই অক্টোবর তারিখে (সংখ্যা ১৬) জনৈক পড়ুয়া লিখিত এক পত্রের প্রতি সমগ্র আসাম ও পশ্চিমবংগের উভয়-ভাষী পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপাতত, সংগত কারণেই নিরপেক্ষ থেকে, আলোচনার গতি-প্রকৃতি জানার উদ্দেশ্য নিয়ে সেই পত্রটি হুবহু তুলে দিলাম। ইতি—

স্বরাজ মিত্র, আসাম।

অসমীয়া ভাষাত বঙলুরা শব্দ

সম্পাদক, ডাঙরীয়া—

আজি কিছুমান দিন আগতে আপোনার জনপ্রিয় বাতরিকাকত 'অসম-বাণী'তে উক্ত শিরোনামারে প্রকাশিত চিঠি এখনর ওপরত হোরা সমালোচনা কেইটিমান পঢ়িছিলোঁ। সেই সমালোচনারোরর ফলাফল 'অসম-বাণী'র পাঠক-পাঠিকা সকলে নিশ্চয় জানে। কিন্তু যোৱা ২৪ চেপ্তেম্বরর (৮ আশ্বিন, ১৩৬৭ বংগাব্দ—২৭ বর্ষ-৪৭ সংখ্যা) বঙালী আলোচনী "দেশ"ত স্থান পোৱা "ভাষা কোন্দলী দুই" নামর প্রবন্ধ এটিত তার লিখক স্বরাজ মিত্রই কথা প্রসংগত সেই চিঠি আরু সমালোচনার ওপরত মন্তব্য করিছে এনেদরে : "সম্প্রতি তাই দেখলাম আমাদের প্রাত্যন্তিক প্রদেশে 'অসমীয়া ভাষাত বঙলুরা 'শব্দের' অবাধ প্রবেশ নিয়ে কোন এক বিখ্যাত সাপ্তাহিকের মাধ্যমে জোর তর্কাতর্কি হয়ে গেল। জনৈক নামজাদা অসমীয়া লেখক ভাষার বিশুদ্ধতা ও স্বাতন্ত্র্যের দোহাই দিয়ে সংরক্ষণশীলতার মনোভাব প্রকাশ করাতে একাধিক আক্রমণ তথা কড়া সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। কেউ কেউ আবার উল্টো মতবাদও প্রকাশ করেছেন। এই উদ্ধৃতিখিনিত শ্রী মিত্রই 'বিখ্যাত সাপ্তাহিক' বুলি "অসম-বাণী"কেই যে কৈছে সন্দেহ নাই। তার উপরি 'জনৈক নামজাদা অসমীয়া লেখক কথাষারে শ্রীহোমেন বরগোহাঞিকে আঙুলিয়াইছে।

এতিয়া কথা হলে শ্রীবরগোহাঞিয়ে "অসমীয়া ভাষাত বঙলুরা শব্দ" শীর্ষক চিঠিত গতিশীলতার পরিচয় দিছিল নে শ্রীমিত্রই কোৱা দরে "ভাষার বিশুদ্ধতা ও স্বতন্ত্রার দোহাই দি সংরক্ষণশীলতার মনোভাব" প্রকাশ করিছিল? এই প্রশ্নর উত্তর দিব শ্রীহোমেন বরগোহাঞিয়ে নিজে। তদুপরি তেওঁ (শ্রীবরগোহাঞি) "একাধিক আক্রমণ তথা কড়া সমালোচনার সম্মুখীন হোৱা কথাষার শ্রীমিত্রই তেওঁর প্রবন্ধটিত লিখার আগেয়ে সেই চিঠির ওপরত মোৱা কিছুমান সমালোচনার প্রতিবাদ-কল্পে শ্রীবরগোহাঞিয়ে পিচত লিখা চিঠিখন ভালদরে প'ঢ় চোৱা উচিত আছিল। আশাকরোঁ শ্রীবরগোহাঞিয়ে এই সম্পর্কেও তেওঁর মতামত জনাব।

আমার একমাত্র কথা হ'ল উক্ত স্বরাজ মিত্রই লিখা "ভাষা কোন্দলী দুই" নামক প্রবন্ধটির ওপরত এটি সুচিন্তিত সমালোচনা হব লাগে। আমার মনেরে তাত চিন্তাকরিব বলগীয়া অনেক কথাই আছে। সেইবারে আমি অসমর খ্যাত-নামা সাহিত্যিক-সমালোচকসকলর লগতে শ্রীহোমেন বরগোহাঞির পরা সেই প্রবন্ধটির ওপরত অবিলম্বে সমালোচনা আহ্বান করিলোঁ।

—এজন পঢ়ুরৈ।

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

রাজশেখর বসু-অনূদিত

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

চিরায়ত সাহিত্যের সম্পদ-সম্ভার বাংলা ভাষায় সমৃদ্ধতর ঔজ্জ্বল্যে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে রাজশেখর বসুর সার্থক লেখনীতে। রাজশেখর-কৃত মহাভারত ও রামায়ণের অমৃত কাহিনীর সারানুবাদ যেমন আশ্চর্য কুশলতায় অতুলনীয়, ভাগবত গীতার প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদও তেমনি সুচারু সাহিত্যকর্মের বিশিষ্ট নিদর্শন।

পরশুরামের কবিতা

গল্পকার পরশুরাম বাংলা সাহিত্যের কীর্তিস্তম্ভ; আর সেই বিরাট স্তম্ভের আড়ালে যে স্বল্পোচ্চার কবিসত্তা ছন্দ ও মিলের মাধুর্যরহস্যে প্রচ্ছন্ন ছিল তারই দুর্লভ স্বাক্ষর 'পরশুরামের কবিতা' গ্রন্থ। পরশুরাম বিরচিত বিচিত্র রসের ছোটো-বড়ো অনেকগুলি কবিতার মনোজ্ঞ সংকলন।

এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বৈদেশিকী

প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার এবং মিঃ খ্রুশ্চফের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হোক—এই আশা প্রকাশ করে যে-প্রস্তাব পাঁচটি মুখ্য নিরপেক্ষ শক্তির তরফ থেকে পণ্ডিত নেহরু ইউনাইটেড নেশনস্-এর জেনারেল অ্যাসেমব্লীতে উত্থাপন করে পরে প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন তাই নিয়ে সেই সময়ে খবরের কাগজে যে-রকম লেখালেখি চলে তা থেকে অনেকের ধারণা হয়ে থাকবে যে, ভীষণ একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। পণ্ডিতজীর নিজের বক্তৃতায় যে-বিরক্তি এবং কিছুটা ঝাঁজ প্রকাশ পায় তার উপর রং ফলিয়ে "সংবাদ" প্রচারিত হতে থাকে। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী (যিনি পঞ্চনিরপেক্ষ শক্তির প্রস্তাবের উপর একটি "সংশোধনী" প্রস্তাব আনেন) এবং পণ্ডিত নেহরুর মতানৈক্যের সূত্র ধরে সংবাদ পরিবেশকদের কল্পনা নানাদিকে ধাবিত হয়। পণ্ডিত নেহরু পশ্চিমা শক্তিদের উপর ভীষণ চটে গেছেন, পশ্চিমা শক্তিরাও পণ্ডিতজীর উপর চটে গেছে, কারণ তারা ধরে নিয়েছে যে, শ্রীনেহরুর প্রস্তাব কম্যুনিস্ট পক্ষের সম্মতি বা প্ররোচনায় রচিত হয়েছে, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট নেহরুর উপর বিরক্ত হয়েছেন, তাঁদের মতে এরূপ প্রস্তাব করার পূর্বে পণ্ডিতজীর কমনওয়েলথের অন্য সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত ছিল, পণ্ডিতজীর নিউইয়র্ক থেকে ফেরার সময়ে লণ্ডন এয়ার পোর্টে কোনো বৃটিশ ক্যাবিনেট মন্ত্রী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যে আসেন নি তার কারণ বৃটিশ গভর্নমেণ্ট পণ্ডিতজীর উপর চটে আছেন—এই ধরনের নানা গরম "সংবাদ" কাগজে বেরিয়েছে। এইসব "সংবাদের" উপর গত সপ্তাহে নিউ দিল্লিতে পণ্ডিতজী তাঁর প্রেস কনফারেন্সে ইংরেজীতে যাকে বলে "ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেওয়া" তাই করেছেন।

ইউনাইটেড নেশনস্-এ তাঁর প্রস্তাব গৃহীত না-হওয়া নিয়ে তখন যেসমস্ত উত্তেজনাকর "সংবাদ" প্রচারিত হয়েছিল সেগুলিকে শ্রীনেহরু একরকম নস্যাৎ করে দিয়েছেন। তাঁর প্রস্তাবের বিরোধিতা দেখে তখন যাই বলে থাকুন, তারপর যে শ্রীনেহরু অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছেন সেটা তাঁর প্রেস কনফারেন্সের কথাবার্তা থেকে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। একটি প্রশ্নের উত্তরে ইংরেজ-সুলভ "আনডার স্টেটমেণ্ট" করার কায়দায় পণ্ডিতজী বলেন যে, তিনি জানেন যে, পশ্চিমা শক্তিদের মধ্যেও অনেকে মনে করেন না যে, তাঁর প্রস্তাব পাস হলে বিশেষ কিছু একটা অনিষ্ট হতো। অন্যপক্ষে পণ্ডিতজীর প্রেস কনফারেন্স থেকেও এই ধারণা করা অসংগত হবে না যে, নিরপেক্ষ শক্তিদের প্রস্তাব পাস হয়নি বলে ভয়ানক কিছু একটা অনিষ্ট হয়ে গেছে বা অন্যদের সঙ্গে ভারত সরকারের সম্পর্কে বিশেষ কোনো একটা ওলট-পালট হয়ে গেছে বলেও পণ্ডিতজী মনে করেন না। এসব ব্যাপারে ভারত এবং কমনওয়েলথ্ অন্তর্ভুক্ত অন্য অনেকে এক পথে না চলার দরুণ কমনওয়েলথ-এর মধ্যে নূতন কোনো সমস্যার উদ্ভব হওয়া বা ভারত ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে নূতন কোনো মনকষাকষি সৃষ্টি হওয়ার কথা শ্রীনেহরু সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন।

দেখা যাচ্ছে, পূর্ব এবং পশ্চিমা উভয় পক্ষকে তাল দিয়ে বা উভয়পক্ষের সঙ্গে তাল রেখে চলার নীতিতেও কোনো পরিবর্তন হয়নি। মিঃ খ্রুশ্চফের চার সপ্তাহব্যাপী নিউইয়র্ক বাসের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ইউনাইটেড নেশনস্-এর গঠন এবং কর্মপদ্ধতিতে পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা। এ ব্যাপারে সোভিয়েট নেতা একটা প্রচণ্ড নাড়া দিতে যে সমর্থ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, যদিও তাঁর বিশিষ্ট প্রস্তাবগুলি যে বিশেষ কিছু এগুতে পেরেছে তা নয়। সোভিয়েট নেতা ইউনাইটেড নেশনস্-এর সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ হ্যামারশিল্ডকে তাড়াবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। এ চেষ্টায় ভারত সরকারের সহায়তা তিনি পান নি, তবে কঙ্গোতে সেক্রেটারী

ভগিনী নিবেদিতা

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা রচিত

একমাত্র প্রামাণ্য জীবনী। মূল্য—৭-৫০

বিবেকানন্দের মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথের 'লোকমাতা'র অনন্যসাধারণ ত্যাগ ও ভালবাসার কথা ভারত কি এরই মধ্যে ভুলে গেল? যে ত্যাগকে রবীন্দ্রনাথ একমাত্র "সতীর তপস্যার" সঙ্গে তুলনা করেছেন? মাত্র অর্ধশতাব্দী আগে বাংলাদেশে দেশপ্রেমিক চিন্তানায়কদের মধ্যে এমন একজনও কি ছিলেন যিনি নিবেদিতার দ্বারা প্রভাবিত বা অনুপ্রাণিত হন নি? ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বক্তৃতা, সাংবাদিকতা প্রভৃতির যে কোনও বিষয়ে ভারতের অননুকরণীয়, অতুলনীয় মহোচ্চ আদর্শের কথা বিস্মৃত, লক্ষ্যচ্যুত ভারতবাসীর কানে নিরলস নিষ্ঠায় আজীবন ঘোষণা করেছেন কে? তিনিই কি ভগিনী নিবেদিতা নয়?

২৮শে অক্টোবর—নিবেদিতার জন্মদিনে

প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালী সেই পবিত্র জীবন অনুধ্যান করে ধন্য হোন্। উচ্চ প্রশংসিত সাতশত পৃষ্ঠার সেই অনুপম জীবনবেদ প্রকাশ করেছেনঃ—

রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বিদ্যালয়

বাগবাজার, কলিকাতা-৩

জেনারেলের অনুসৃত কর্মধারা যে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়নি এইরকম একটা ভাবও ভারত সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। ইউনাইটেড নেশনস্-এর গঠন ও কর্মপদ্ধতিতে পরিবর্তন আবশ্যক—সোভিয়েট সরকারের এই যুক্তি শ্রীনেহরু সমর্থন করেছেন কিন্তু সেক্রেটারী জেনারেলের পদ সম্পর্কে যে-ধরনের পরিবর্তনের প্রস্তাব মিঃ খ্রুশ্চফ করেছেন শ্রীনেহরু তার সমর্থন না করে বরঞ্চ তার সমালোচনা করেছেন। পশ্চিমারা যেখানে ইউনাইটেড নেশনস্-এর বর্তমান গঠনকে আঁকড়ে থাকতে চায় সেখানে শ্রীনেহরু পশ্চিমাদের সমালোচক এবং সোভিয়েট যে-ধরনের পরিবর্তন চায় তারও তিনি সমর্থক নন যদিও পরিবর্তন যে আবশ্যক একথা স্বীকার করা জরুরী বলে মনে করেন।

এইভাবে ভারতের "স্বাধীন" "নিরপেক্ষ" নীতি দুইদিকে তাল রেখে চলছে। সোভিয়েট সরকার যে-কারণে ইউনাইটেড নেশনস্-এ পরিবর্তন চান এবং যে-ধরনের পরিবর্তন চান ভারত এবং অন্য "নিরপেক্ষ" এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশগুলি সে কারণে চায় না। তবে একথা ঠিক যে, যে-কোনো ধরনের পরিবর্তন হলেই সেটা ইউনাইটেড নেশনস্-এ পশ্চিমা পক্ষের বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব কিছুটা ক্ষুণ্ণ করবে। সেদিক দিয়ে মিঃ খ্রুশ্চফের নিউইয়র্ক বাস ব্যর্থ হয়নি বলা যায়; কারণ তাঁর বিশিষ্ট কোনো প্রস্তাব বেশিদূরে এগুতে না পারলেও ইউনাইটেড নেশনস্-এর যে পরিবর্তন আবশ্যক এই ধারণা নিরপেক্ষ ও অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশগুলির (এদের সংখ্যাই এখন বেশি) প্রতিনিধিদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে বলা যায়।

অবশ্য এই ধারণা ঠিক কীভাবে এবং কী ধারায় ফলপ্রসূ হবে তা অনিশ্চিত। কারণ পরিবর্তনাকাঙ্ক্ষী "নিরপেক্ষ" এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বলতর দেশগুলির কর্তারা যে সকলে একভাবে ভাবছেন বা ভাবতে পারছেন তা নয়। নূতন স্বাধীন-হওয়া দেশগুলির মধ্যে অনেকের পক্ষে ভেবে কিছু স্থির করাও সহজ নয়, কারণ নিজেদের আভ্যন্তর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কার কী প্রয়োজন বা কার কোন ধারায় চলা উচিত অনেকের পক্ষেই সহসা তা স্থির করা কঠিন। যাদের স্বাধীনতা একেবারে সদ্যপ্রসূত নয় তাদের মধ্যেও লক্ষ্য ও চিন্তাধারায় পার্থক্য আছে। কারো কারো মতে হয়ত সাধারণভাবে এবং মোটের উপর অপেক্ষাকৃত দুর্বলতর দেশগুলির মতামতের প্রভাববৃদ্ধিই ইউনাইটেড নেশনস্-এর পরিবর্তনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। আবার কারো কারো মতে নিরপেক্ষ এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রগুলির নিজেদের একটা "ব্লক" করার প্রয়োজনীয়তা আছে। সকলে এই দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থক নয়। কারো কারো মতে তৃতীয় "ব্লকের" দ্বারা বিশ্বশান্তিরক্ষায় সহায়তা হবে, আবার কারো কারো মত এই যে, বর্তমান দুই "ব্লকের" দ্বন্দ্ব মেটাতে হলে "ব্লক"-মনোবৃত্তিরই উচ্ছেদ সাধন আবশ্যক। সুতরাং কোনো তৃতীয় "ব্লকের" পরিকল্পনা যুক্তিসংগত নয়।

এইরকম বিভিন্ন ভাবের চিন্তা দুই "ব্লকের" বহির্ভূত রাষ্ট্রগুলির কর্মকর্তাদের মধ্যেও চলছে। তাঁরা সকলেই অবশ্য দুই ব্লকের নায়ক বৃহৎ শক্তিদের প্রভাব হ্রাস চান, কিন্তু এপর্যন্ত নিরপেক্ষ এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বলতর দেশগুলি যেটুকু গুরুত্ব লাভ করেছে সেটা মুখ্যত দুই "ব্লকের" মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকার ফলে। এতে দুঃখিত হবার কিছু নেই, পৃথিবীতে শক্তির ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্যাপার চিরকাল ঘটে আসছে, কিন্তু এইরকমের প্রভাব বা গুরুত্বের বুনিয়াদ নিজেদের মৌলিক শক্তির দ্বারা দৃঢ় করতে না পারলে তার উপর নির্ভর করা যায় না। এখানে মুশকিল হচ্ছে এই যে, সেই মৌলিক শক্তি কীভাবে আহরণ ও প্রয়োগ করা উচিত বা সম্ভব সে বিষয়ে কারো পরিষ্কার ধারণা নেই। ইউনাইটেড নেশনস্ থেকে আমরা কী চাই এবং তা কীভাবে চাই সেটা ভালো করে আগে বুঝা দরকার। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউনাইটেড নেশনস্-এর সমস্ত খরচের তিন ভাগের এক ভাগ জোগাচ্ছে। যে-শক্তি টাকা দিয়ে সংগ্রহ করা যায় তার গুরুত্ব এবং প্রভাব যদি কমাতে চাই তাহলে অনেক মূলগত পরিবর্তন এবং তার দায়িত্বের ভার নিতেও প্রস্তুত হতে হবে।

২৫।১০।৬০

বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা
শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত

সাহিত্য-প্রকাশিকা ॥ চতুর্থ খণ্ড

বিশ্বভারতী-পুঁথিশালার সংগ্রহে যেসব পুঁথি আছে তাহার সম্পাদিত পাঠ ও সে সম্বন্ধে আলোচনা এই গ্রন্থমালায় ক্রমশ প্রকাশিত হইতেছে।

হরিদেবের রচনাবলী

সাহিত্য-প্রকাশিকার এই খণ্ডে দ্বিজ হরিদেবের রায়মঙ্গল শীতলামঙ্গল শীতলার গাড়িগান মুদ্রিত হইয়াছে।

দ্বিজ হরিদেবের বাসগ্রাম বর্তমান হাওড়া জেলার ঝোড়হাট হইতে শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক হরিদেবের এই পুঁথি সংগৃহীত।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য লইয়া অদ্যাবধি যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের কেহ পূর্বে দ্বিজ হরিদেবের সন্ধান পান নাই। পূর্ণাঙ্গ রায়মঙ্গল ও শীতলামঙ্গলের পরিচয়ও কাহারও জানা ছিল না। হরিদেবের রচনায় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণের ভাগীরথীর পশ্চিমকূলের কিছু কিছু স্থানীয় সংবাদ আহরণ করা যায়। সেই সময়ের সমাজচিত্রও ইহাতে দুর্লক্ষ্য নহে।

মূল্য পনেরো টাকা

বিশ্বভারতী

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

ট্রামে-বাসে

আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি অসমীয়াকে রাজ্যের একমাত্র সরকারী ভাষা হিসাবে সুপারিশ করায় নয়াদিল্লিতে হতাশার সঞ্চার হইয়াছে।—"কিন্তু ভাবা উচিত ছিল......ময়নাকে

একবার বুলি ধরালে, সে নিজে থেকেই কৃষ্ণ ছেড়ে শলা শলা-ও বলে"—বলেন বিশুখুড়ো।

* * *

সংবাদে শুনিলাম আসাম বিধানসভায় একটি ষাঁড় সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর চলে। শিবসাগরের চারিং পঞ্চায়েৎকে একটি ষাঁড় দেওয়া হইয়াছিল, সেই ষাঁড়টি এখন কোথায় ইহাই প্রশ্নের বিষয়বস্তু। শ্যামলাল বলিল—

"আসামের সাম্প্রতিক ধর্মযুদ্ধে ষাঁড়টি ধর্মের ষাঁড় বনে গেছে কিনা সে সম্বন্ধে কেউ কোন কথা বলেন নি!!"

* * *

কমলাকান্ত তাঁর আসরে লিখিয়াছেন—"সাধক মৃত্যুরূপা মাতাকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে।" "আমরা যারা অসাধক, আমাদের ততটা উপলব্ধি আসে না। তাই কালীপূজায় আমরা মৃত্যুরূপী উড়নতুবড়ীর ঊর্ধ্বে কিছু আর ভাবতে পারিনি"—বলেন এক সহযাত্রী।

* * *

এক সংবাদে পাঠ করিলাম—ওয়াশিংটন পশুশালার প্রধান কর্মী শ্বেতকায় ব্যাঘ্র প্রজননের প্রচেষ্টায় ভারতে আসিতেছেন।—"কিন্তু শিব গড়তে বাঁদর গড়ার মতো তিনি না সাদা বাঘের বদলে সাদা হাতী তৈরি করে বসেন। আমাদের এককালের শ্বেতাতঙ্ক এখনো যে ঘোচেনি"—বলেন বিশুখুড়ো।

* * *

"একালের মন নগরমুখী কেন"—জনৈক প্রবন্ধকারের জিজ্ঞাসা।—"নগরমুখী যেহেতু এখানে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ আছে, আছে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান, আছে সুচিত্রা-উত্তম"—মন্তব্য করে শ্যামলাল।

* * *

সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, লণ্ডনে সোনার আকস্মিকভাবে মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে। এই সঙ্গেই সংবাদ—কলিকাতায় সোনার দর চড়ে নাই।—"দর চড়েনি বটে কিন্তু বেয়াই-বাজারে সোনার চাহিদা বরাবরের মতোই তেজি রয়েছে"—বলেন এক সহযাত্রী।

* * *

অন্য এক সংবাদে প্রকাশ, কলিকাতার এক বাসে নাকি সম্প্রতি একটি এলসেশিয়ান কুকুর লাফাইয়া উঠিয়াছিল।—"অনুমান করছি, বর্ধিত হারে ভাড়া দিতে কুকুরটি নিশ্চয়ই আপত্তি করেছে"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * *

সাধারণ পরিষদের অছি কমিটিতে পাক-প্রতিনিধি সৈয়দ হোসেন বলেন—রাষ্ট্রপুঞ্জের রঙ্গমঞ্চে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের অভিনয় শেষ হয়। কিন্তু প্রথমাঙ্কে হিনীর যেখানে সূত্রপাত ঠিক সেখানেই সেই তার পরিসমাপ্তি।—"তার কারণ রোর ভূমিকা বণ্টনে এক অলঙ্ঘনীয় ধার সৃষ্টি হয় বলেই নাটক ভণ্ডুল হয়ে য়"—বলেন বিশুখুড়ো।

* * *

১৮ই অক্টোবরে প্রকাশিত এক সংবাদে প্রকাশ, চীনারা নাকি সীমান্তে ভারতীয় সৈন্যদের উপর গুলিবর্ষণ

করিয়াছে।—"হয়ত ঠিক গুলিবর্ষণ নয়; এটা ভূতচতুর্দশীর অগ্নি-উৎসবও হতে পারে"—মন্তব্য করেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * *

ফ্লোরিডা হইতে প্রকাশিত এক সংবাদে প্রকাশ, যে-তিনটি ইঁদুরকে মহাকাশে ৭৮০ মাইল ঊর্ধ্বে প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহাদিগকে জীবন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।—"মহাকাশে তখন নিশ্চয়ই কেউ মার্জার প্রেরণ করেন নি"—সংক্ষেপে বলে শ্যামলাল।

* * *

সোভিয়েৎ প্রধানমন্ত্রী মঃ খ্রুশ্চেফের একটি প্রশ্ন—"ভারত প্রথম শ্রেণীর শক্তিশালী রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য হইবে না কেন?" বিশুখুড়ো বলিলেন—"তার কারণ হয়ত এই যে, ভারত চাঁদে রকেট পাঠায় না, চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা বলে চাঁদকে ডাকে!"

* * *

এক সংবাদে শুনিলাম, যুক্তরাষ্ট্রে নাকি বরফের বাড়ি তৈয়ার হইতেছে।—"তাসের বাড়ির পর এটা একেবারে লোপাট সংস্করণ না হলেই হয়"—বলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

GOVE ARY Cooch Behar

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

৪৯

ডঃ নরেন বসু মশাইয়ের কথায় একটু যে দমে না গেলাম এমন নয়, মনে একটু ভয়ও হলো। ভাবলাম না হয় থাক ও ব্যাপারটা। কিন্তু পরবর্তী অভিনয়ের দিন, অর্থাৎ 'ইরানের রাণী'র দিন, বুধবার, অভিনয়ের শেষে নীহার বললে—তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? ওদের কথা কানে নিও না। ও'জিনিসটা বাদ দিলে কিছুতেই চলবে না। তুমি বরং বার-কতক রিহার্স্যাল দিয়ে জিনিসটা ঠিক করে নাও। আমি আছি।

নীহারের এইটেই ছিল বিশেষত্ব। নতুন কিছু জানবার, নতুন কিছু শিখবার যে অদম্য প্রেরণা ছিল ওর মধ্যে, তা এই এত দীর্ঘ-দিনের অভিনেতা-জীবনের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, খুব সুলভ নয়। ওর উৎসাহে আমারও মনের দ্বিধা দূর হয়ে গেল। বার কতক রিহার্স্যাল দিয়ে জিনিসটা আরও বসিয়ে নিলাম দুজনে। এবং তারপরে, অভিনয়ের দিন, যথারীতি জিনিসটা করে গেলাম, কোনো বিপত্তি ঘটল না, ঠিক হয়ে গেল দৃশ্যটা। 'প্রফুল্ল' নাটক স্টারে ছাব্বিশ সাল পর্যন্তও করেছি, বরাবর আমরা ওটা করে গেছি, কখনো কোনো বিপদ ঘটে নি, অসুবিধা হয়নি, কখনো বিফল মনোরথও হইনি। এর পরে, পরবর্তী কালে, কতোবার কত জায়গায় 'প্রফুল্ল' হয়েছে, আমি বহুবার 'রমেশ' করে গেছি, কত মেয়ে 'প্রফুল্ল' চরিত্রটি করেছে, প্রভা করেছে, রাণী করেছে, সরযু করেছে, নীহারের সঙ্গে ঐ যে বিশেষ মুহূর্তের অভিনয় যে করতাম, তা আর করা হয় নি। সত্যি কথা বলতে কী, নীহার ছাড়া কেউ ওটা তুলে নিতে চায়নি, সাহস করে নি বললেও চলে। শুধু মনে পড়ে, রাণী, অর্থাৎ রাণীবালা একবার আগ্রহান্বিত হয়েছিল, বলেছিল—শিখিয়ে দিন, আমি নীহারদির মতো ঠিক করব।

একটুক্ষণ থেমে থেকে, তারপরে বলে-ছিলাম—তোমার শরীর ভারী, তোমাকে দু'হাতের ওপর রাখতে আমি পারব না।

—দেখুনই না চেষ্টা করে।

—না।

—কেন?

বলেছিলাম—না। তুমি সাহস করলেও আমি করি না।

অতএব, নীহারের পর সে জিনিসটা আর করা হয়নি। ওদের সঙ্গে ঐ দৃশ্যটা আমি সাধারণভাবেই করতাম।

'প্রফুল্ল' অভিনয়ের আর একটা লক্ষ্যনীয় দিক হলো যে, কাগজগুলোতে বিপক্ষে কেউ কিছু লেখেনি, সবাই করেছে সুখ্যাতি। শুধু রাখালদা ছাড়া। সুখ্যাতিতে আনন্দ হয়, উৎ-সাহও আসে। সেদিনকার সেই আনন্দ আর উৎসাহের স্বাদ আবার একটু পাবার জন্য আমাদের সে সুখ্যাতির কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি।

"Jogesh was superbly rendered by that incomparable artist, Danibabu, the author's son. Indubhusanbabu in the role of Suresh was simply charming. The part of Ramesh was very able depicted in Ahinbabu's acting. Bhajahari, represented by Nirmalendubabu and the .part .of Madan Ghosh were able to provide sufficient wit to the audience. Prafulla, was very aptly represented by Srimati Niharbala." ("The Bengali"—13|9|24)

'নায়ক' লিখেছিলেন—"যোগেশের ভূমিকায় দানীবাবু যে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ করেছিলেন, তাহার তুলনা নাই। নব-যুগের উদীয়মান অভিনেতা শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী রমেশের ভূমিকায় অতি দক্ষতার সহিত অভিনয় করেছেন। আর অভিনয় দেখিলাম শ্রীমতী নীহারবালার—প্রফুল্লের ভূমিকায়। আর সুন্দর হয়েছিল শিশু যাদবের অভিনয়।"

এইভাবে, যখন দানীবাবু অভিনীত পুরানো বইগুলির আবার অভিনয় হতে লাগল একে একে, তখন দর্শকদের মধ্য থেকে একটা গুঞ্জন শোনা যেতে লাগল,—দানী-বাবুর 'ঔরংজেব' একটি বিখ্যাত ভূমিকা, সুতরাং 'সাজাহান' এরা অভিনয় করছেন না কেন? ক্রমে ক্রমে নানা গুজবও ছড়াতে লাগল, লোকে বলতে লাগল, স্টার—'সাজাহান' ধরছে। এমনকি কাগজেও লেখালেখি শুরু হয়ে গেল। চব্বিশ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর 'সার্ভেণ্ট' পত্রিকা যা লিখলে, তা তর্জমা করলে এই দাঁড়ায়ঃ—"শুনতে পাচ্ছি, এর পর স্টার নাকি অভিনয় করছেন দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান', যা অতীতে খুবই গৌরব অর্জন করেছিল পুরানো মিনার্ভায়। 'সাজাহান'-এর নামভূমিকা সে-যুগের প্রখ্যাতনট প্রিয়-নাথ ঘোষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। শুনছি, স্টারে এই ভূমিকা করবেন অপরেশ-চন্দ্র, আর দানীবাবু করবেন পুরানো ভূমিকা। যাঁরা প্রিয়নাথবাবুর সাজাহান দেখেছেন, তাঁরা অপরেশবাবুর চরিত্রাঙ্কন দেখে তুলনা করতে পারবেন। কিন্তু আমরা জানতে চাই কী-কী চরিত্র তিনকড়িবাবুকে, অহীন্দ্রবাবুকে, নির্মলেন্দুবাবুকে ও দুর্গা-দাসবাবুকে দেওয়া হলো।"

এই ধরনের লেখালেখি হচ্ছে কাগজে, গুজবও শুনছি নানারকম, কিন্তু, স্টার যে সত্যিই 'সাজাহান' ধরবে, এটা যেন অনুমান করেও সঠিক বুঝতে পারছি না। থিয়েটার-জগতে 'মন্ত্রগুপ্তি' বলে একটা কথা আছে, বিশেষ করে তখনকার দিনে ওটা খুবই মানা হতো, একটা কিছু ভিতরে-ভিতরে সম্পূর্ণ স্থির না হওয়া পর্যন্ত আমাদেরও অনেক সময় জানতে দেওয়া হতো না। আমাদের তখন বুধবার থেকে শুরু করে রবিবার পর্যন্ত —সপ্তাহে পাঁচদিন অভিনয় চলেছে। এরজন্যে শুক্রবারটা আমাদের কাছে ছিল 'ফান-ফ্রাইডে।' ও-কথাটা আমরাই তৈরী করে

মনোজ বসুর মহিমা-ভাস্বর তিন উপন্যাস

রক্তের বদলে রক্ত (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ২·৫০

মানুষ নামক জন্তু (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ৩·০০

মানুষ গড়ার কারিগর (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ৫·৫০

দেশ—আলোচ্য তিনখানি গ্রন্থ কাহিনীর দিক থেকে হয়ত মিলিত সংসার নয়, কিন্তু যুগ-জীবন দর্শনের ভিত্তিতে প্রায় সহোদর। রোমান্টিক মনোজ বসু ক্রমে ক্রমে রিয়ালিস্ট হয়ে উঠছেন, তার সুস্পষ্ট স্মারক গ্রন্থত্রয়ীতে বিদ্যমান।......

মানুষের ভদ্রাসনের বাইরে মানুষের দ্বিতীয় একটি মূর্তি বিদ্যমান—পশু এবং পিশাচ যেখানে পাশাপাশি বাস করে। মানুষের এই অবক্ষয়ের মানবতার এই অপভ্রংশী-করণের মর্মস্পর্শী গল্পেতিহাস মনোজ বসুর এই সাম্প্রতিক উপন্যাসত্রয়ীতে বিবৃত হয়েছে।......

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা—বারো ॥

নিয়েছিলাম। শুক্রবার সব হাসি-ঠাট্টা—রঙ্গ-ব্যঙ্গের বই দেওয়া হতো। যেমন—বিরহ, পুনর্জন্ম, বিবাহ-বিভ্রাট, কৃপণের ধন, রাত-কাণা ইত্যাদি। এসব বইগুলিতে আমার অবশ্য কোনো ভূমিকা ছিল না, ঐ দিন অভ্যেসমতো থিয়েটারে যেতাম বটে, কিন্তু আসলে ওটা ছিল আমার ছুটির দিন। অবশ্য ও-ছুটি আমাকে বেশীদিন ভোগ করতে হয়নি, কর্তৃপক্ষ শীগ্গিরই একদিন আমাকে ঠেললেন অমৃতলাল বসু-বিরচিত 'রাজা-বাহাদুর' নাটকে। চব্বিশ সালেরই দোসরা অক্টোবর প্রথম আমাদের স্টারে অভিনীত হলো ও-বই। এতে নামভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন—অপরেশবাবু। অবশ্য প্রথম কয়েক রাত্রি করার পরেই ছেড়ে দিলেন তিনি, তার-পর ওটা করতে লাগল ননীগোপাল মল্লিক। আমি করলাম—মিস্টার ফিশ্। কুসুমকুমারী করলেন—মনসা ঠাকুরুন।

এমনি প্লে-টে চলছে, এমন সময় ঘোষণা শোনা গেল, 'সাজাহান' খোলা হবে অবি-লম্বে। কিন্তু সাজাহানের ভূমিকা নিয়ে প্রথমেই একটা অসুবিধার সৃষ্টি হলো। অপরেশবাবুর বয়স হয়েছে, তার ওপরে ওর ঘাড়টা গেছে শক্ত হয়ে। এ অবস্থায় স্থবির সাজাহান অবশ্য ওঁকে মানিয়ে যেতো, কিন্তু উনি শেষ পর্যন্ত পার্টটা করতে চাইলেন না। এবং উনি যখন সত্যি সত্যিই অপারগতা জানালেন, তখন ও-পার্টটা পড়ল গিয়ে নরেশবাবুর ঘাড়ে। ঐ চব্বিশ সালেরই কথা। ২৩শে অক্টোবর কাগজে স্টারের আগামী অবদান হিসাবে 'সাজাহান'-এর প্রথম বিজ্ঞপ্তি বেরুলো:—

ঔরংজেব—নাট্যাচার্য সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ,
দারা— তিনকড়ি চক্রবর্তী,
সাজাহান—নরেশচন্দ্র মিত্র
জাহানারা—কুসুমকুমারী।

আর কারুর নাম প্রথম দিন বেরোয় নি। আমার এ বইতে কোনো ভূমিকা রইল না, আমার এ-বইতে হয়ে গেল ছুটি।

২৪শে অক্টোবর বিজ্ঞপ্তি বেরুলো এই বলে যে, ৩০শে অক্টোবর—বৃহস্পতিবার রাত আটটায় 'সাজাহান' হবে। ভূমিকালিপিতে যা বেরিয়েছিল, তার সঙ্গে নতুন নাম যোগ হলো—'দিলদার—নির্মলেন্দু লাহিড়ী।'

২৩শে, ২৪শে দু'দিনই প্লে ছিল, ২৫।২৬শে — শনি-রবিবার — 'কর্ণার্জুন'। নরেশবাবু যথানিয়মে অভিনয় করে বাড়ি চলে গেলেন। ২৭শে তারিখ—সোমবার হলেও—কালীপুজো বলে—ম্যাটিনী চারটেয় হলো—'অযোধ্যার বেগম'। ম্যাটিনী হতো পাঁচটায়, কিন্তু, মাত্র ঐদিনটির জন্য হলো চারটেয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে, 'অযোধ্যার বেগম' তাড়াতাড়ি আরম্ভ করে, রাত্রে যেটুকু সময় পাওয়া যায়, তাতে—'সাজাহান'-এর রিহা-র্স্যাল দেওয়া। রাত্রি ৮টা-৮॥টায় প্লে ভেঙে যাবার পর, রিহার্স্যাল বসতে বসতে ন'টা বাজল বটে, কিন্তু, দেখা গেল, আসল লোকই আসেন নি—নরেশবাবু। কর্তৃপক্ষ বেশ চিন্তিত হলেন নরেশবাবু না আসায়। নরেশবাবুরই বেশী করে মহলা দেওয়া দরকার। কেননা, তিনি বলেছিলেন—'আমি ও পার্ট কখনো আগে করিনি।'

পরদিন—মঙ্গলবার। রিহার্স্যালের জন্য মাত্র এইদিনটিই পাওয়া যাচ্ছে। কারণ, পর-দিন—বুধবার—'ইরানের রানী'র অভিনয়, এবং তার পরদিন—বৃহস্পতিবার—সাজাহান। কিন্তু, আশ্চর্যের ব্যাপার, মঙ্গলবারও এলেন না নরেশবাবু। অবশ্য খবর পাঠালেন, তিনি অসুস্থ তবে পার্টটা ভালো করে পড়ে সব দেখে নিচ্ছেন, কোনো চিন্তা নেই।

সুতরাং, ওঁকে বাদ দিয়েই রিহার্স্যাল হলো। কুসুমকুমারী একটু আপত্তি করলেন, বললেন—আমার সঙ্গে আগাগোড়া পার্ট, একটু দেখে না নিলে কেমন করে হবে?

মঙ্গলবারের সেই রাত্তিতেই প্রবোধবাবু আমাকে ডাকলেন, বললেন—তোমার ত সাজাহান করা আছে, পার্টটা একটু দেখে রেখো। অবাক হলাম কথা শুনে। দেখে রাখব, এটা উনি কী বলছেন? অবশ্য পার্ট আমার মুখস্থ, অ্যামেচারে বহুবার করেছি, নিজেদের ক্লাবেও করেছি, বাইরে-বাইরেও করেছি। কিন্তু, সে ত পেশাদারী মঞ্চের ব্যাপার নয়, এতে যে দায়িত্ব অনেক। রীতি-মত ভাবতে হবে, 'সাজাহান' চরিত্রে নতুন কী করা যায়। হুট্ করে বললেই কি অমনি করা সম্ভব? তবু, বলেছেন যখন, তখন মনে মনে প্রস্তুত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

উনি বললেন—অতো ভেবো না, হয়ত করতেই হবে না—নরেশ করবে ঠিক।

তবু, ভাবতে লাগলাম। বলা যায় না কিছুই, যদি নামতে হয়? বুধবার—অর্থাৎ ২৯শে, সকালবেলা উঠেই তাড়াতাড়ি কাগজ দেখলাম। দেখি, 'সাজাহান'-এর পাশে নরেশ-বাবুর নামটা আছে। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি নাম বেরুলো—পিয়ারা—আশ্চর্য-ময়ী। আশ্চর্যময়ী মডার্ন থিয়েটারে যোগ দেবেন বলেই ঠিক ছিল। কিন্তু, রাধিকাবাবু যখন ও'থিয়েটার ছেড়ে চলে এসেছেন, সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্যময়ীও চলে এসেছিলেন। এসে, উনি যোগদান করলেন স্টারে। মনোমোহনে 'পিয়ারা' ওর করাই ছিল, সেইজন্য ওঁর এতে কোনো অসুবিধাই হলোনা। বৃহস্পতিবার 'সাজাহান'-এ পিয়ারা করার পর, শুক্রবার স্টারে 'মৃণালিনী' অভিনয়ে সুবাসিনীর অনুপস্থিতিতে ইনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন গিরিজায়ার ভূমিকায়।

আমি ত ওদিকে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। যাক্, আজও যখন ও'র নাম পড়েছে, তাহলে আমাকে আর বোধহয় করতে হলো না। অবশ্য, এসব ভাবলাম বটে, মনে-মনে কিন্তু 'সাজাহান'-এর প্রস্তুতি চলেছেই। খালি এই চিন্তা, নতুন কী করা যায়? বুধবার থিয়ে-টারে গেলাম, 'ইরাণের রানী' প্লে আছে। প্লের পর রঙ তুলছি, হাবুল এসে দাঁড়ালো কাছে, বললে—কী? একটু রিহার্স্যাল দিয়ে নেবেন নাকি? মানে, নরেশবাবু করবেন ঠিকই, তবু থিয়েটারের ব্যাপার, কিছু বলা যায় না—হাবুলের মনের ভাবটা এইরকম।

ওকে বললাম—তা'হলে একটু থেকে যাও, আমি আসছি।

স্টেজে এলাম একটু পরেই। ওকে বললাম হাবুল, একটা নতুন জিনিস ভেবেছি, সেটা করলে হয়।

—কী?

বললাম—পক্ষাঘাতগ্রস্ত সাজাহান।

হাবুল আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপরে, চমকটা ভেঙে গেলে পর বললে—কখনো ত এরকম হয়নি সাজাহান। তবে, এটা নতুন রকমের হয় বটে। কিন্তু, লোকে নেবে কী?

বলে, একটুক্ষণ থেমে থেকে, আবার নিজেই বললে অবশ্য সাজাহান পক্ষাঘাত-গ্রস্ত কিনা, সেটা কেউ বা দেখেছে আর, কেউ

প্রসূতি ও শিশু

ডাঃ চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

মাতৃত্বের প্রথম লক্ষণ, গর্ভাবস্থার ক্রমবিকাশ ও তার নানা উপসর্গের প্রতিকার, প্রসূতির খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ও স্বাস্থ্যবিধি, প্রসব-বেদনার বিভিন্ন স্তর, সন্তান-প্রসব, স্তন্যদান, শিশুর খাদ্য-তালিকা, সন্তান পালন, প্রসব-পরবর্তী ব্যায়াম ইত্যাদি অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের বিস্তৃত বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা। যাঁরা সন্তানের জননী হয়েছেন, হতে চলেছেন বা হবেন তাঁদের সবার পক্ষেই গ্রন্থখানি অপরিহার্য। পুরু অ্যান্টিক কাগজে ছাপা ৩৫২ পৃষ্ঠার সচিত্র সংস্করণ। দাম ছয় টাকা। ভি-পি ডাকে সাড়ে ছয় টাকা মাত্র।

আধুনিক যৌন বিজ্ঞান

ডাঃ হানা স্টোন ও আব্রাহাম স্টোন

সকল দম্পতি ও যুবক-যুবতীর পক্ষে একখানি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। যৌনশাস্ত্র সংক্রান্ত অগণিত প্রসঙ্গের বিস্তারিত বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা। প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠার সচিত্র সংস্করণ। দাম ছয় টাকা। ভি-পি ডাকে সাড়ে ছয় টাকা মাত্র।

পপুলার বুক ক্লাব

৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলিকাতা—২০
ফোন: ৪৭-৪২৫৫

বা জেনে রেখেছে! তা বেশ, আপনার মনে যখন হয়েছে, তখন সেভাবেই করুন।

বললাম—না হে, ব্যাপারটা ওভাবে উড়িয়ে দেবার নয়। এটা ইতিহাসের কাহিনী। লোকে এসব খুবই জানে। তবে আমার যতদূর মনে হচ্ছে, এর সপক্ষে যুক্তি-প্রমাণও কিছু আছে দেবার মতো।

হাবুল বললে—তবে আর ভয় করছেন কেন? লেগে যান।

লেগে গেলাম। হাবুলের স্মারকতার সাহায্য নিয়ে একা-একাই স্টেজে মহলা দিয়ে নিলাম। ডানদিকটা পক্ষাঘাতগ্রস্ত, ওই ভাবটাই রপ্ত করে নিলাম। তারপরে, মহলা যখন শেষ হলো, থিয়েটার ছেড়ে যখন বাড়ি আসছি, তখনো ঐ কথা ভাবছি। রাত্রে শুয়ে-শুয়েও ভাবছি, রাতটা কাটল প্রায় অনিদ্রার মধ্য দিয়ে। যদি না করতে হয় ত, বুঝব, বাঁচালেন ভগবান। আর যদি সত্যি সত্যিই নামতে হয় সাজাহান সেজে? তখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত ভাবটির সপক্ষে যুক্তি কী? আইডিয়াটাকে তেমন করে যাচাই করে নেবার সময়ও যে পেলাম না! আমি যখন পুরানো দিনে মেট্‌কাফ হলে—ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে পড়তে যেতাম, তখন ভারতীয় ইতিহাসও খুব পড়েছি। পড়ার মূলে আর কিছু নয়, তখন ঐতিহাসিক নাটকেরই রেওয়াজ চলেছে কিনা, তাই মনে হয়েছিল, ইতিহাসের কথা কিছু জেনে রাখা দরকার। ওসব পড়তেও কিন্তু খুব ভালো লাগত। এমন সব ঐতিহাসিক কাহিনী পড়েছি, যা কল্পনাকেও হার মানিয়ে দেয়। দুঃখ হতো এই ভেবে যে, এইসব কাহিনীগুলো নাট্যকাররা কাজে লাগান নি কেন?

শৌখীন অভিনেতা হিসাবে 'সাজাহান' ত বহুবার করেছি; সেইজন্যই দৃষ্টি ছিল চরিত্রটির ঐতিহাসিকতার প্রতি। ইতিহাস তাই পড়েছিলাম যত্ন করে। তাতে, একটা ইঙ্গিত পেয়েছিলাম, যাতে পক্ষাঘাতগ্রস্ত সাজাহান রূপ দেওয়া চলে। কিন্তু সে-ও হয়ে গেল অনেকদিনের কথা, একেবারে সঠিকভাবে ব্যাপারটা মনে পড়ছে না ত! একটা মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে রয়েই গেলাম।

সকাল হলো। বৃহস্পতিবার। তাড়াতাড়ি উঠে খবরের কাগজটা নিয়ে পড়লাম। স্টারের বিজ্ঞাপন দেখতে গিয়ে সত্যিসত্যিই চমকে উঠলাম এবার। 'সাজাহান'-এর পাশে দেখি রয়েছে—আমার নাম। পালে বাঘ পড়েছে। সাজাহান আমাকেই করতে হবে শেষ পর্যন্ত। মোটমাট সেদিন পর্যন্ত ছ'টি নাম বিজ্ঞাপনে বেরুলো, আর কোনো নাম বেরোয়নি। ইন্দু করছে সোলেমান, আর দুর্গার করবার কথা—মহম্মদ। কিন্তু ও তখন অসুস্থ, ক'দিন ধরেই থিয়েটারে আসছিল না। তাই ওর হয়ে মহম্মদ করলে রাধাচরণ ভট্টাচার্য।

সেদিন একটু সকাল সকালই বেরুলাম বাড়ি থেকে। সোজাসুজি থিয়েটারে না গিয়ে আগে গেলাম চীৎপুরে, আবদুল বারির দোকানে। যখনকার কথা বলছি, তখন বাবু-হোসেন মারা গেছেন, তাঁর মুন্সী আবদুল বারি চালাচ্ছেন ব্যবসা, পুরানো বাড়ি ছেড়ে উঠে এসেছেন নতুন বাড়িতে। আমি ও'র ওখানে গেলাম সাজাহানের চুল আর দাড়ির জন্য। বলা বাহুল্য, বারিসাহেবই তখন আমাদের থিয়েটারে চুল-টুল দিতেন। আগে আগে থিয়েটারে নিয়ম ছিল, চুলওয়ালারা চুল নিয়ে আসবে ভাড়ায়, এবং সপ্তাহ অন্তে সেসব ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে আবার ধোয়া-পাট প্রভৃতি করে দিয়ে যাবে। কিন্তু আর্ট থিয়েটারের আমল থেকে নিয়মটি একটু পালটে গিয়েছিল। পুরানোরা বাধা দাড়ি পরতেন, কিন্তু আমরা তা নিতাম না, ও দাড়ি পরলে গালটা আবার একটু ফুলো ফুলো দেখায় এবং কথাও একটু অস্পষ্ট শোনায়। বাধা দাড়ি মানে, যে দাড়ির দুই প্রান্ত থাকে ফিতে দিয়ে বাঁধা, দাড়িটা মুখে লাগিয়ে, ফিতের প্রান্ত দুটো কানের ওপর দিয়ে টেনে মাথার পিছনে ফাঁস দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। এই ফিতের ওপরে মাথার চুল বসালেই ফিতের আর দৃশ্যমান হবার উপায় থাকে না। আমরা আবার পছন্দ করতাম না ও-দাড়ি। নরম ভালো চুলের ক্রেপ স্পিরিট গাম দিয়ে লাগিয়ে দিতো আমাদের মুখে। এছাড়া গোঁফের ব্যাপারও ছিল। পুরানো আর্টিস্টরা নিজেরাই গোঁফ-টোফ লাগিয়ে নিতেন। শুধু আমাদের—এই নতুনদের কজনকে, দরকার মতো সাহায্য করবার জন্য আসত বারির একজন লোক, এই বন্দোবস্ত ছিল। ওদের কারিগর সেখ ইদুই আসত সচরাচর। তবে কথা হচ্ছে, দাড়িগোঁফ তখন

বরণীয় লেখকের স্মরণীয় গ্রন্থ সম্ভার

বেনারসী
বিমল মিত্র
৪·৫০

দশ পুতুল
আগাথা ক্রিস্টি
৩·৫০

ক্রৌঞ্চ
অবধূত
৪·০০

সুচরিতাসু
প্রভাত দেবসরকার
৩·০০

হরিণ চিতা চিল
(কবিতা)
প্রেমেন্দ্র মিত্র
৩·০০

সৈয়দ মুজতবা আলী
শবনম ৫·০০
ধূপছায়া (৭ম সং) ৪·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
যোগভ্রষ্ট ৫·০০
রাধা (৪র্থ সং) ৭·০০

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী
হিরন্ময় পাত্র ৪·০০

গৌরকিশোর ঘোষ
জল পড়ে পাতা নড়ে ৮·০০
মন মানে না ৩·৭৫

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
জনপদবধূ (২য় সং) ৪·৫০
তীরভূমি ৪·৫০
নীলাঞ্জনছায়া ৩·০০

রমাপদ চৌধুরী
আপন প্রিয় (৫ম সং) ৩·০০
কথাকলি (২য় সং) ৩·০০
দুটি চোখ দুটি মন (২য় সং) ৪·৫০

বিক্রমাদিত্য
প্রথম প্রণয় ৩·০০

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
অন্দরমহল ৩·০০

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

আমাদের দরকার হচ্ছিল কই? 'কর্ণার্জুনে' আমাদের কারুর দাড়ি নেই, ইরানের রানীতেও নেই। পুরানোরা ত বাধা দাড়ি পরছেন। কিন্তু এবার? এবার সাজাহান-এ যে লাগবে ওসব! তাই, সরাসরি আমার সেদিন চীৎপুর যাওয়া।

বারিসাহেবকে সব কথা বললাম, উনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন, বললেন—কেউ কোনো খবর দেয় নি ত!

ভাবলাম খবর দেবেই বা কী? আর যারা যারা করবে, তাদের সবারই সব ঠিক করা আছে, বাকী ছিলেন নরেশবাবু। তা নরেশবাবু যে কী করবেন, না করবেন, তা ত জানা ছিল না! তাই, ও'র কাছে খবর আসে নি।

আমার কাছে সব শুনে ইদু গিয়ে ডেকে আনল বড়ো মিঞাকে। বড়ো মিঞা স্থবির হয়ে পড়েছেন, হাত কাঁপে থরথর করে, তবু ও'র উদ্যমের শেষ নেই। ও'র শিষ্য ইদুই তখন প্রায় সব কাজ করে দেয়। মাথা নেড়ে বড়ো মিঞা বললেন—আপনার মাথার চুল ত নেই!

রীতিমত দমে গেলাম, বললাম—কী হবে?

উনি বললেন—স্প্রিং-টিং করে এ'টে দেওয়া যাবে'খন ভালো করে।

—আবু দাড়ি?

বললেন—বাঁধা দাড়ি আছে, তাই দিয়ে কাজ চলে যাবে'খন আজ।

আমার চুল কর্তৃপক্ষ বরাবর অর্ডার দিয়ে তৈরী করিয়ে নেন। সাধারণ চুল করার নিয়ম হচ্ছে—বাইশ ইঞ্চি। অন্তত বাইশ ইঞ্চির কম কেউ করে না। কিন্তু আমার মাথা আবার ছোট, আমার মাথা ছিল ২১ ইঞ্চি। মাথায় বড়ো বড়ো চুল ছিল আমার, ফলে আরও আধ ইঞ্চি বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো সাড়ে একুশ ইঞ্চি। আর চেয়েছিলাম পাতলা কাগড়ের ওপর সেটিং-করা চুল, যার ওপর দিয়ে বেশ হাওয়া খেলে। কিন্তু সেসব কি আর এক-দিনের মধ্যে হওয়া সম্ভব?

বৃদ্ধ বড়ো মিঞা বললেন—আপনি যান, ইদু যাবেখন জিনিসপত্র নিয়ে।

এলাম থিয়েটারে। যথাসময়ে ইদু মিঞা এলো। যত্ন আত্তি করে নিপুণভাবেই সেসব দাড়ি-টাড়ি বেঁধে দিলে। পোশাক-আশাক পরে পূর্ণ রূপসজ্জা নিয়ে আয়নার সামনে গিয়ে নিজেকে দেখা, এই হচ্ছে আমার নিয়ম। বরাবরই দেখেছি, রূপসজ্জার পর আয়নায় নিজেকে দেখে যদি ভালো লাগে, তাহলে আমার অভিনয় সম্বন্ধে আর ভাবতে হয় না, লোকে আমাকে নেবেই। সারাটি জীবন আমার ছিল ঐ ধরন। আর তা না হলে এমন খুঁতখুঁতি থাকে যে ধীর ও প্রসন্ন মনে অভিনয় করতে পারি না। এবারেও আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, ইন্দু তার যথাসাধ্য করেছে, কিন্তু মন আমার খুশী হলো না। সোজাসুজি প্রবোধবাবুকে গিয়ে বললাম—সাজাহান ত চাপালেন, এক বাড়ি বিক্রি, এদিকে সাজা আমার পছন্দ হয়নি। একটা কথা ঠিক করে বলুন দেখি? সাজাহান কি বরাবর আমায় করতে হবে? তাহলে সাজবার ব্যাপারটা মনের মতো করে নেই।

উনি বললেন—নিশ্চয়। সাজাহান তোমাকেই করে যেতে হবে।

বললাম—তাহলে দয়া করে একটা হুকুম করিয়ে দিন দেখি। ইদুর সঙ্গে একটা মাসকাবারী বন্দোবস্ত করিয়ে দিন। ওর কাজ থাকুক বা না থাকুক, অভিনয়ের দিন ও যেন ঠিক আসে ওর জিনিসপত্র নিয়ে। এই দেখুন না? বাধা দাড়ি দিয়ে নামতে হচ্ছে, যা আমি কোনোকালে পছন্দ করি না। ক্রেপের ব্যবস্থা করা গেল না।

বুঝলেন প্রবোধবাবু। স্থির হলো, কালই বিজয় মুখুজ্যে গিয়ে বারির সঙ্গে কথা বলে সব ঠিকঠাক করে আসবে।

অভিনয়কাল ক্রমশ সমাসন্ন হয়ে এলো। দুরু দুরু বুক নিয়ে, ঠাকুর-প্রণাম ও পীঠ-বন্দনা সেরে সিনে ঢুকলাম গিয়ে। সাজবার ব্যাপার নিয়ে মনটা ভালো নেই, তার ওপরে করতে যাচ্ছি "নতুন রকমের এক সাজাহান", —কে জানে কী হবে।

এইখানে আরও একটি কথা বলে রাখি।

সেই যে বুধবার, হাবুলকে নিয়ে স্টেজে মহলা দিয়ে নিয়েছিলাম, সেদিন হাবুলকে বলে দিয়েছিলাম একটা কথা। বলেছিলাম, —হাবুল, সাজাহানের "দেই লাফ—দেবো লাফ"—কথাগুলো যেখানে আছে, সেই দৃশ্যটি বাদ দিয়ে দাও। চতুর্থ অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্য। সেই আরম্ভ হচ্ছে, আবার কি দুঃসংবাদ কন্যা! আর কি বাকি আছে?

ও অবাক হয়ে বললে—সে কী! ওটা ভাল সিন। প্রিয়নাথদা ওটা করতেন খুব ভালো। ওটা আপনি বাদ দিচ্ছেন কেন?

বললাম—দেখ, ও সিনটা আমি অ্যামেচার বহুবার করেছি। কথাগুলো মুখস্থও আছে। তার জন্য নয়। আমি বিবেচনা করে দেখেছি, ওটা একই রসের পুনরাবৃত্তি। সেই ক্ষোভ, মর্মবেদনা আর উন্মাদনার দৃশ্য। উন্মাদ দৃশ্য পরে যেটা আছে, সেই পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে, "দে বেটারা খুব দে"—সেই যে ঝড় কালে দৃশ্য, সেটাই সব থেকে ভালো সেটা রেখে, এটা কেটে দাও। ওটা দর্শকের কাছে একঘেয়ে লাগবে।

হাবুল একটুক্ষণ থেমে থেকে ভাবল ব্যাপারটা। তারপরে বললে—বাদ দেবেন? যদি প্রোগ্রামে ছাপা হয়ে গিয়ে থাকে—

বললাম—কালই খোঁজ নাও, ছাপা যদি না হয়ে থাকে ত, ওটা কেটে দিয়ে এসো।

ও' তাই করেছিল। প্রোগ্রামে ও'সিনটার উল্লেখ ছিল না।

যাই হোক, শুরু ত হলো অভিনয়। একবাড়ি বিক্রি, লোকে লোকারণ্য। যে-রকম ভাবে হাততালি পড়তে লাগল, তাতে ত মনে হলো, দর্শক আমায় নিয়েছে। বিশেষ করে,

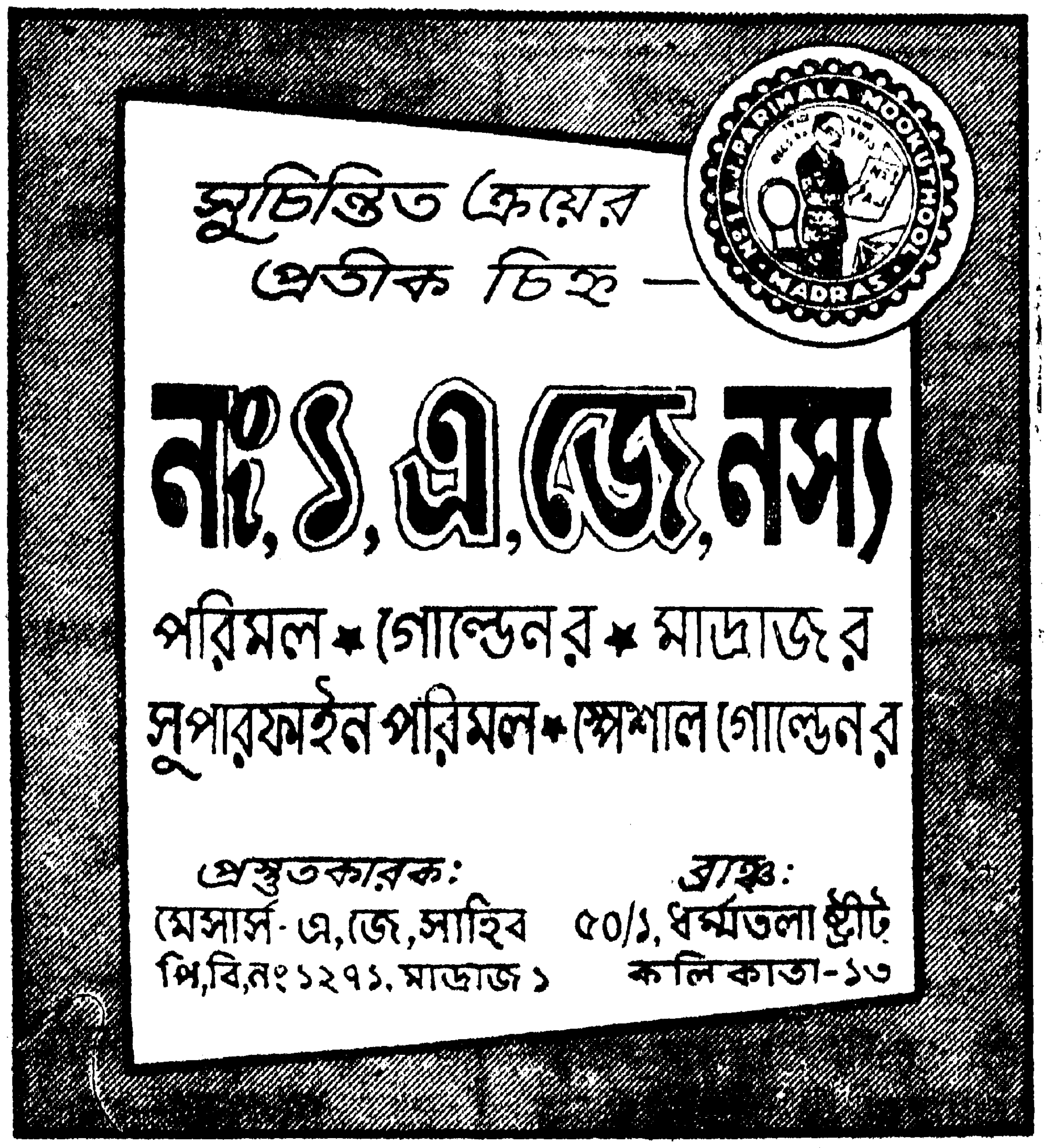

প্রথম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে, সেটা কিনা অঙ্কের ড্রপের সিন, ঐ যে যেখানে মহম্মদ এসেছে পিতৃ-আজ্ঞায় পিতামহকে বন্দী করতে, সেই দৃশ্যের শেষে যখন আমি বললাম—"ধূপের মতো একটা বিরাট জ্বলায় ঊর্ধ্বে উঠে—বিরাট হাহাকারে শূন্যে ছড়িয়ে পড়ি", তখন সারা বাড়ি একেবারে প্রচণ্ড হাততালির শব্দে যেন ভেঙে পড়ল। দর্শক উৎগ্রীব হয়ে এসেছিলেন 'সাজাহান' দেখতে, বহুদিনের বহু সুখ্যাতি অর্জন করা এই 'সাজাহান'। আর্ট থিয়েটারে অভিনয়, তার ওপরে যে কম্বিনেশনে অভিনয়টা হচ্ছে!

যাই হোক, প্রথম অঙ্কে এভাবে সাড়া পাবার দরুণ, অন্তরে উৎসাহ যেন দ্বিগুণ করে ফিরে পেলাম। বুঝলাম, লোকে আমাকে নিয়েছে। প্রথম প্রথম চুল আর দাড়ি নিয়ে খুঁতখুঁতি থাকলেও, এরপর আর রইল না, সেসব গেলাম ভুলে। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে একটা অসুবিধা অবশ্য অনুভব করেছিলাম। ঐ 'পক্ষাঘাতগ্রস্ত' ভাব দেখানোর জনাই অসুবিধাটা হলো। সাজাহান যখন দারাকে তাঁর পাঞ্জা দিয়ে আজ্ঞা করলেন রাজ্য শাসন করতে, তখন দারা নতজানু হয়ে অভিবাদন জানাবার পরই সাজাহান প্রস্থান করলেন। এবং তারপর দৃশ্যটিতে প্রবেশ করল নাদিরা আর সিপার। দারা, জাহানারা ও তাদের কিছু কথাবার্তা। তারপরে, দারাও চলে গেল, ওরাও চলে গেল, সিনে রইল জাহানারা। সেই সময় সাজাহানের আবার 'প্রবেশ' আছে —'দারা চলে গেছে জাহানারা?'

তারপরে, 'তুইও এর মধ্যে কন্যা' ইত্যাদি সংলাপ আছে সাজাহানের। কিন্তু এই যে দৃশ্যের মধ্যে প্রবেশ ও প্রস্থান, পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থার জন্য এতে বড়ো কষ্ট হলো, অসুবিধাও হলো। তাই দ্বিতীয় অভিনয় রজনী থেকে ও অংশটা এডিট করা হয়েছিল। নাদিরা-সিপার আর ঢুকবে না, প্রোগ্রাম থেকেও ওদের ও' দৃশ্যে আবির্ভাবের উল্লেখ বাদ দেওয়া হলো। আমি বসেই থাকব, দারা অভিবাদন করে প্রস্থান করবেন, এবং আমিও কন্যার দিকে ফিরে শুরু করব—'তুইও এর মধ্যে?'

এইভাবেই অভিনয় করে স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছিলাম, দৃশ্যটিও 'কমপ্যাক্ট' হলো। শুধু 'কম্প্যাক্ট'ই নয়, 'এফেক্টিভও' হয়েছেল।

কিন্তু বলছিলাম প্রথম অভিনয়-রজনীর কথা। অভিনয়ে আর কোনো অসুবিধা অনুভব করিনি। কেবল শেষ দৃশ্যে যখন দানীবাবু 'ঔরংজীব'রূপে পিতার কাছে ক্ষমা চাইতে এসে পায়ের ওপর পড়লেন, তখন ভিতরে-ভিতরে এমন অস্বস্তি বোধ করছিলাম যে বলার নয়! এদিকে দানীবাবু এক পুত্র অন্যদিকে তিনকড়িদা দারা সেজেছেন, উনি এক পুত্র। তার ওপরে আবার কন্যারূপিণী কুসুমকুমারী! বয়সের দিক থেকে মনে হলো, আমি যেন তলিয়ে যাচ্ছি!

যাই হোক, দর্শক খুব নিলে আমাকে, এটা বুঝলাম। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লিখতে হচ্ছে, দারার ভূমিকায় তিনকড়িদা যে খুব ভালো করবেন, আমাদের সবার আশা থাকা সত্ত্বেও উনি সেদিন কেন যে সুবিধা করতে পারলেন না, আমরা বুঝতে পারলাম না। উপরন্তু শেষের দিকে দর্শক দল ওঁকে বিদ্রূপ করে উঠতে লাগল। একটা যায়গায় অবশ্য সত্যি সত্যিই উনি ভুল করে ফেললেন। দিলদারের সঙ্গে দারার সেই যে দৃশ্যটি আছে, চতুর্থ অঙ্কের সপ্তম দৃশ্য? সেই দৃশ্যে দারা-রূপে তিনকড়িদা কেঁদে ফেলেছিলেন। দারাও দার্শনিক, দারাও বীর, দিলদারের সামনে তার কান্নাটা দর্শক গ্রহণ করতে পারল না।

তিনকড়িদা সুদক্ষ অভিনেতা, সেদিন তাঁর কী যে হলো! আমাদের সবারই খুব দুঃখ হলো। তিনকড়িদা নিজেও কেমন হতাশ হয়ে পড়লেন। আর উনি 'দারা' করবেন না, এও জানিয়ে দিলেন। আমরা বললাম—তা' কি হয়? ও কি কথা?

আমাদের অনুরোধে তার পরেও উনি নেমেছিলেন, এবং 'দারা'র অভিনয় যথেষ্ট সংশোধন করে নিয়েই নেমেছিলেন, কিন্তু তবু কী যে হলো, দর্শক ওঁকে তেমন নিলো না। উনিও 'দারা' ছেড়ে দিলেন। পরে, প্রফুল্ল সেনগুপ্ত করতে লাগল ঐ পার্ট।

প্রথম অভিনয়ের রাত্রে, এ' ত্রুটিটুকু ছাড়া আর সবই ভালো হয়েছিল। সবাই সুখ্যাতি করছে আমাকে, সবাই ভালো বলছে, এর মধ্যে দেখি, হরিদাসবাবু যেমন প্রতি অভিনয়-শেষে ভেতরে আসেন, তেমনি আসছেন। পরের ব্যাপারে উদার হলেও নিজের জিনিসে উনি কঠোর সমালোচনা করেন। তাই উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে বললাম—আমার কেমন হলো? হাসতে হাসতে উনি বললেন—ভালো যে করেছেন, তাতো নিজেই বুঝতে পারছেন। এখন আমার রাখাল দাস কী বলেন, কে জানে! মনটা দমে গেল। রাখালদা বিরাট ঐতিহাসিক, 'পক্ষাঘাতগ্রস্ত সাজাহান'কে তিনি সমর্থন করবেন কিনা কে জানে! না জানি এবার তিনি কী লিখে বসেন!

সেদিনের কথা বেশ মনে আছে। সব আনন্দ যেন মুহূর্তে নিভে গিয়েছিল। এমন সময়ও আর নেই যে ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীতে গিয়ে বইগুলো দেখে আসি। কাজে কাজেই আমি করলাম কী, পরদিন সেন ব্রাদার্সের দোকান থেকে চারভল্যুম মানুচির বই একেবারে কিনেই নিয়ে এলাম। এছাড়, 'বার্ণিয়ের'-এর বই "Bernier's Travels in the Moghul Empire" খানা আমার কাছে আগেই ছিল। ভালো করে পড়তে আরম্ভ করে দিলাম এসব বই। শনিবার—'কর্ণার্জুন'-এর অভিনয়ের দিন হরিদাসবাবুর সঙ্গে দেখা হলো। আমার 'পক্ষাঘাত'-এর সপক্ষে যা সব যুক্তি ও প্রমাণ ছিল, সবই ওঁকে দিলাম। (ক্রমশ)

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
শ্রেষ্ঠ রহস্য উপন্যাস
মদন ভস্ম ৩৲
সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস
পোড়ামাটি ভাঙ্গাঘর ৮৲
আর. এন. চ্যাটার্জী এণ্ড কোং
২৩, নির্মল চন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সতীশ কবিরাজের
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল
পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য বিজ্ঞানাচার্য স্বর্গীয় ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ডি. এস. সি কর্তৃক পরীক্ষিত ও সুবাসিত।
আর্য্য ঔষধালয় - কলিকাতা

প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

৫৬

পথে যেতে-যেতেই নরনাথ বললে, আরেকজনকে পিক আপ করে নিতে হবে।

'আগে থেকে বলা আছে তো?' মুখে বিরক্ত-বিরক্ত ভাব আনবার চেষ্টা করে গায়ত্রী বললে।

'আগে থেকে বলা না থাকলেই বা কী!' ড্রাইভারের পাশে বসা, নরনাথ বললে। 'পুরুষ মানুষ তো, এক ডাকে তৈরি হয়ে নেবে।' তারপরে কথাটা একটু চলুক, কথার পিঠে কাকলি কিছু বলুক, বলতে-বলতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে থাক, সেই আশায় নরনাথ বললে, 'এ তো আর মেয়ে নয়। মেয়েদেরই তো হয় না। হয় না, হয় না, হয়ই না। ঘর অন্ধকার হয়ে যাবার পর সিনেমায় ঢোকে।'

প্রতিবাদ যা এল, কাকলির থেকে নয়, ইন্দিরার থেকে।

'পুরুষদের কথা আর বলতে হবে না। বেরিয়েও বেরুনো হয় না, ফিরে আসে। সেদিন বেরিয়েছে সেজেগুজে, ওমা, কতক্ষণ পরে দেখি ফিরে এসেছে। কী ব্যাপার? না, পকেটে রুমাল নেই!' হাসতে লাগল ইন্দিরা।

'উঃ সে কী ট্রাজেডি, পকেটে রুমাল না থাকা। সঙ্গে পার্স না থাকলেও হয়তো ম্যানেজ করা যায়, কিন্তু রুমাল না থাকলে! ঈশ্বর রক্ষা করুন। পকেটে রুমাল নেই মানে বুকে হৃৎপিণ্ড নেই।'

'তারপর সেই রুমাল খোঁজা মানে প্রায় সীতা খোঁজা — প্রায় কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।' ইন্দিরাই বললে, 'সব দেখা গেছে। পুরুষেরও কম দেরি হয় না তৈরি হতে। বেরুবার আগে হয়তো দাড়ি কামাতে বসল নয়তো জুতোয় কালি দিতে—ওসব বালাই মেয়েদের নেই—'

'ও সব নন-এসেনশিয়্যাল, ও সব পুরুষ অনায়াসে বাদ দিয়ে দিতে পারে। কে বা তার মুখ দেখে, কে বা তাকায় পায়ের দিকে। কিন্তু মেয়েদের শুধু ম্যাচ করতে করতেই জীবন কাটল। স্যান্ডেলের স্ট্র্যাপের সঙ্গে ব্লাউজের হাতার, ব্লাউজের হাতার সঙ্গে শাড়ির পাড়ের। আবার সেই রঙের একঝাঁক প্লাসটিকের চুড়ি। এদিকে জীবনে আসল ম্যাচেই হয়তো ফাট হয়ে গিয়েছে।'

ঘাড় বেঁকিয়ে পিছনে তাকাল নরনাথ। কাকলি এতটুকু হাসছে না। যেন কানেই নিচ্ছে না কথা। বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে।

'যে যাই বলুক, কবরস্তম্ভকে চুনকাম করা মেয়েদের পক্ষে এসেনশিয়্যাল—'

'কথাটা কী বললে?'

'কবরস্তম্ভ।'

'সে আবার কী?'

'যতদিন মেয়েদের স্বাস্থ্য শ্রী যৌবন থাকে ততদিন পলেস্তারার দরকার হয় না। কিন্তু যখন ওগুলো চলে যায় গোরস্থানে তখন মুখখানি শুধু স্মৃতিস্তম্ভ, কবর-স্তম্ভ হয়ে থাকে। তখন তার কলি না ফিরিয়ে আর উপায় থাকে না। লজ্জায় মুখ চুন করার একটা কথা আছে বাঙলা ভাষায়। মুখ যখন আগে থেকেই চুন তখন আর লজ্জার দরকার কী! তাই লজ্জাও উঠে গিয়েছে দেশ থেকে।'

এ দস্তুরমতো আঘাত করার মত কথা। তবু কাকলির এতটুকুও চাঞ্চল্য নেই।

আরেকজন পুরুষকে গাড়িতে তুলে নেওয়া হবে অথচ সেকথা মা বা নরুকাকিমা কেউই কিছু ভাঙতে চাইছে না; আর নরুকাকা চেপে যাচ্ছেন এটা তার কাছে কেমন বিসদৃশ লাগল। পরিষ্কার করা উচিত। সে কি এক টেবিলে পড়ে, এক সংশ্রবে?

'হ্যাঁ, পুরুষদের বেলায়ও ঝামেলা কম নেই।' যত আজে-বাজে কথার জের টানছে নরনাথ। 'হয়তো পাটভাঙা কাপড়টা খুলতে যেতেই ছেঁড়া বেরুল। আরো মারাত্মক, বাইরে বেরুবার পর হাঁটুর উপর নজরে এল ছেঁড়াটা। তখন সেটাকে ঢাকবার কী দুশ্চেষ্টা। হাঁটুর উপরে হাঁটু তুলে বসার স্টাইল করা। কিংবা ধরো, ধোপদস্ত পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে দেখলে একটাও বোতাম নেই, বোতাম লাগাবার লোক নেই—'

'না, তোমার বোতাম কি আর লাগিয়ে দেওয়া হয়!' উত্তর দিল ইন্দিরা।

'মানে, ঠিক সে সময়টায় হয়তো প্রস্তুত নেই। তিনি থাকলেও ছুঁচ সুতো হয়তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তখন গোটা দুই আলপিন জড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়া—'

'যেন আলপিনই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে!'

'হ্যাঁ, তাই তো বলছি। পুরুষেরও অনেক ন্যায্য বাধা আছে, তবু সব সত্ত্বেও পুরুষ মেয়ের চেয়ে ক্ষিপ্র—'

কিন্তু এ কোন এলেকায় এসে পড়ল গাড়িটা?

গাড়িটা বেশ বড় যোগাড় হয়েছে, পিছনের সিটে মেয়ে তিনজন বসেছে আরাম করে, আগন্তুক ভদ্রলোককে অনায়াসে ধরবে ড্রাইভারের পাশে, তাতে কিছু ব্যস্ত হবার নেই। আর এ এলেকাতেই যে ভদ্রলোকের বাড়ি গাড়ি মন্থর হয়ে আসাতেই তা বোঝা যাচ্ছে।

'এক মিনিট!' গাড়িটা থামতেই সামনের দিকের দরজা খুলে দ্রুত নেমে পড়ল নরনাথ। 'বন্ধুকে ডেকে নিয়ে আসি।'

নরনাথ পাশের একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই বিদ্যুৎবেগে নেমে পড়ল কাকলি। 'যাই আমিও একটু ঘুরে আসি, কাছেই আমার এক বন্ধুর বাড়ি থেকে।'

ক্ষিপ্রতা আর কাকে বলে। নেমে পড়েই চোখের পলকের মধ্যে তীরের মত কতটা পথ বেরিয়ে গিয়েছে কাকলি। কে তাকে ধরে! কে তার পিছু নেয়।

'এ কী, কোথায় যাচ্ছিস তুই?' হাওয়ায় ক্ষীণকণ্ঠ তবু পাঠাল একবার গায়ত্রী।

কাকলি ফিরেও তাকাল না।

'ওদিকের গলিটার মধ্যে ঢুকল।' ইন্দিরা বললে।

'ওখানে ওর কে আছে?' ভাবনা ধরল গায়ত্রীকে। 'তবে ও পালাল নাকি?'

ডাঃ ইউ. এম. সামন্ত

বাইওকেমিক

গার্হস্থ্য-চিকিৎসা

দশম সং : দাম—২,

গৃহ চিকিৎসার একটি সরল ও সুন্দর পুস্তক। প্রতি গৃহে রাখা কর্তব্য।

সামন্ত বাইওকেমিক ফার্মাসী

৫৮/৭ ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড

কলিকাতা—২

বাইওকেমিক ঔষধ ও পুস্তকের

— প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান —

'না, পালাবে কেন? পালাবে কোথায়? ফেরবার সময় ঐ গলির ভিতর দিয়ে যাব —হর্ন দিলেই কাকলি বেরিয়ে আসবে।'

'ঐ গলির মধ্যে গাড়ি ঢ্কবে না।' ড্রাইভার বললে।

'আচ্ছা এটা যে বরেনের বাড়ি সেটা কাকলি ব্ঝতে পেরেছে?' অসহায়ের মত বাড়িটার দিকে তাকাল গায়ত্রী।

'তা কোন না পেরেছে! এত পরিচয়ের মধ্যে একদিনও কাকলিকে নিজের বাড়িঘর দেখায়নি এ কী করে কল্পনা করা যায়!'

'তাই আমার ইচ্ছে ছিল না, সবাই একসংগে এসে তুলে নিয়ে যাই বরেনকে। ম্যারেজ-অফিসে বরেন দিব্যি আগে যেত, আমরা পরে গিয়ে সামিল হতাম।' র্দ্ধ আক্রোশে ফ্'সতে লাগল গায়ত্রী। 'তখন দেখতাম কী করে পালিয়ে যেত ঝটকা মেরে!'

'যা, কাকলি যদি অনিচ্ছ্ক হত, বিয়ের ফর্মে সই করত না। জোর করে সই করাতে কী করে?' ইন্দিরা বললে। 'ধরতই না কলম। কী সব বলতে হয় মন্ত্র, উচ্চারণই করত না। বিয়ে পাশ করত না অফিসর।'

'রাখো,' নড়ে-চড়ে আঁট হয়ে বসল গায়ত্রী। 'আমি জানি কী করে ফর্মে ওর দিতে হয় সই, কী করে—'

'হ্যাঁ, সবই হচ্ছে সই, দলিলী ব্যাপার।' ইন্দিরা আরো গভীরে গেল। 'আর যখন দলিলী ব্যাপার তখন জোরজবরদস্তিতে যাওয়া কেন? সরকারী লোকদের ঘ্ষ দিয়ে এত সব কাণ্ড হচ্ছে আর একটা বিয়ে হবে না?'

'বিয়ে?'

'বিয়ে মানে বিয়ের দলিল তৈরি হবে না? তিন সাক্ষী আর বরের সই তো মজ্তই আছে, শ্ধ্ এক কনের দস্তখত। তা একটা মেয়েলী সই কারচুপি করা যাবে না? আর টাকায় এত সার্টিফিকেট হয় একটা ম্যারেজ সার্টিফিকেট হতে দোষ কী।'

'ঠিক বলেছ।' ক্রোধে আরো সংকীর্ণ হল গায়ত্রী। 'ঠাকুরপোই তা ম্যানেজ করতে পারবে। তখন দেখব,' উলটো গলিটার দিকে শ্যেন দ্ষ্টি ছ্'ড়ল। 'কোথায় পালায়? কে ওকে আশ্রয় দেয়?'

দ্প্রে ঘ্মচ্ছে বরেন, তাকে ঠেলে তুলতেই প্রলয়কাণ্ড।

'উঠ্ন, চল্ন চটপট—এখনো জামাই হওনি তাই তুমি বলছি না।' দরজার ছিটকিনি খ্লে দিতেই ঝড়ের মত ঢ্কে পড়ল নরনাথ। 'না, দেরি করবার সময় নেই। যতদ্র সম্ভব, সংক্ষেপে তৈরি হয়ে নিন। এই এতক্ষণ কথা হচ্ছিল তৈরি হয়ে বের্তে বেশ দেরী হয়ে গেল—'

'সে কী? কোথায় যাব?'

'ম্যারেজ অফিস।'

'সেখানে কী?'

জোলাপের দাসে পরিণত হবেন না

কড়া জোলাপ আপনার অন্ত্রের পেশীগুলিকে দুর্ব্বল করে, ফলে শীঘ্রই আরও কড়া জোলাপ না হ'লে আপনার কোষ্ঠ আর পরিষ্কার হবে না। জোলাপের দাস হ'য়ে পড়বেন না। অকৃত্রিম ফিলিপ্‌স মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া ব্যবহার করুন।

ফিলিপ্‌স এত মৃদুভাবে কাজ করে যে এমন কি শিশুদের জন্যেও ইহা সুপারিশ করা হয়···অথচ এত ফলপ্রদ যে প্রথমবার ব্যবহারের পরই কোষ্ঠবদ্ধতার হাত থেকে পূর্ণ মুক্তি পাবেন।

আবার ভারতবর্ষে পাওয়া যাচ্ছে

নূতন নকল নিরোধক শীলকরা বোতলে। এই শীলকরা বোতলই ফিলিপসের বিখ্যাত বিশুদ্ধতা এবং উচ্চমানের একমাত্র নিশ্চয়তা। ২, ৪ ও ১২ আউন্স বোতলে পাওয়া যায়।

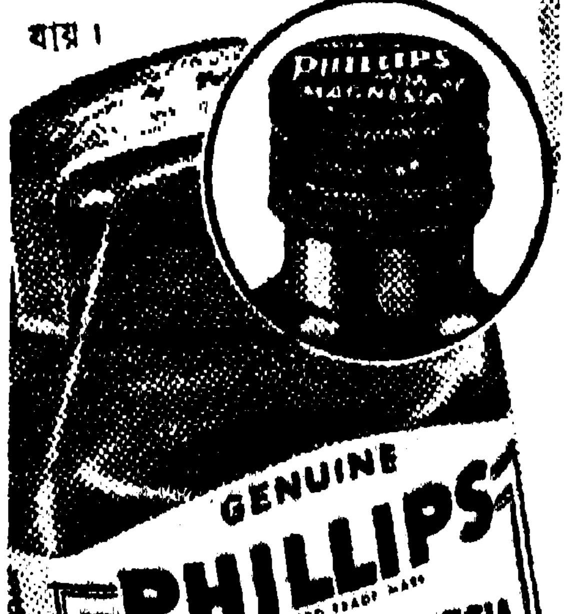

এই কারণেই···

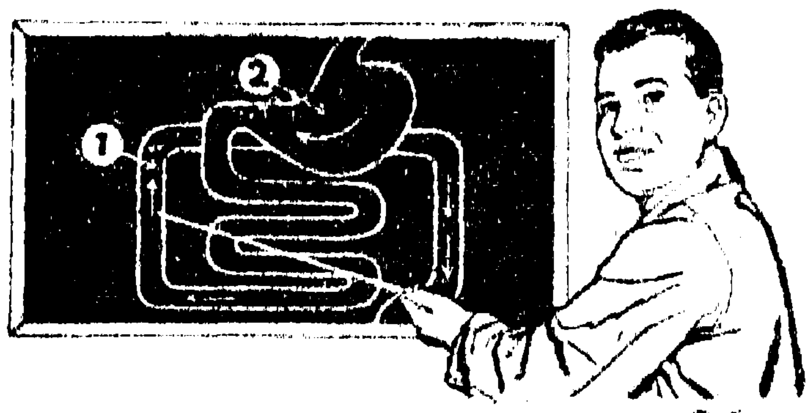

১। অন্যান্য কড়া জোলাপের মত কাজ না ক'রে, ফিলিপস মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া শুকনো জমাটবাঁধা কোষ্ঠকে সিক্ত করে, তারপর মৃদুভাবে পেশীগুলিকে সক্রিয় ক'রে আপনার দেহ থেকে দূষিত মল নিরাপদে ও নিশ্চিতভাবে বা'র করে দেয়—অথচ শরীরে কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়না, শরীরে খিঁচুনি ধরে না বা দুর্ব্বলতা বোধ হয় না।

২। শুধু একটিমাত্র গুণবিশিষ্ট জোলাপের মত না হ'য়ে ফিলিপস মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে আপনার পাকস্থলীকে শান্ত ক'রে আপনার আরামের পূর্ণতা এনে দেয়। আপনার পরিপাক যন্ত্রকে সবল করে ··· পেট ভার ভার ভাব, বুক জ্বালা, পেট ফাঁপা ও অম্লজনিত বদহজম দূর করে।

ফিলিপ্‌স
আসল খাঁটি মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া

যেখানেই হোক, যখনই হোক, অম্লজনিত অজীর্ণরোগে **সঙ্গে সঙ্গে উপশম পেতে হ'লে** সর্ব্বদাই মিণ্টের সুগন্ধযুক্ত সুস্বাদু ফিলিপস মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া ট্যাবলেট গ্রহণ করুন। ৪ ট্যাবলেটের হাল্কা প্যাকেটে এবং ৭৫ ও ১৫০ ট্যাবলেটের বোতলে পাওয়া যায়।

একমাত্র পরিবেশক

দে'জ মেডিকেল ষ্টোরস্ প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা • বম্বে • দিল্লী • মাদ্রাজ • পাটনা • গৌহাটি • কটক

2-AF/IPB

'সেখানে চণ্ডীপাঠ।' ঝাঁজিয়ে উঠল নরনাথ। 'সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার ভার্যা। সেখানে বিয়ে। বলুন, কার বিয়ে? তারও উত্তর দিচ্ছি, আপনার। বলুন, কার সংগে? বলুন, তারও চাই নাকি উত্তর?'

'বা সেই তো আসল জিজ্ঞাসা।'

'আর কাকে! আমার ভাইঝি, কাকলিকে। কী চিনতে পারলেন? না কি দেখতে চান একবার?'

বরেন হাসল। চেয়ারে বসল। মুখোমুখি চেয়ারটাতে নরনাথকে ইশারা করল বসতে।

'বসবার সময় নেই। দেরি হলে ম্যারেজ অফিস বন্ধ হয়ে যাবে।'

'কিন্তু কাকলিকে আমি বিয়ে করি কী করে?' বরেন সিগারেট বার করল। 'কাকলি যে বিবাহিত।'

'বিবাহিত?' খেপে উঠল নরনাথ। 'কে বললে? এই কোনো রিম্যারেজ তো হয়নি।'

'আহা রিম্যারেজ হতে যাবে কেন?' নরনাথের দিকে সিগারেটের কেসটা বাড়িয়ে দিল বরেন। নরনাথ নিলনা বলে নিজেই একটা ধরাল একা একা। বললে, 'ওর যে বিয়েটা হয়েছিল সেটাই এখনো চলে আসছে।'

'সেটা চলে আসছে কী!' নরনাথ তর্জে উঠল। 'সেটা কোর্ট নাকচ করে দেয়নি? ওদের বিয়ে ডিজলভড্ হয়ে যায় নি?'

'...ভালোবাসা আছে যা অনাত্র বিয়ে হয়ে গেলেও যায় না।' করুণ করে হাসল বরেন। 'তেমনি আবার ভালোবাসা আছে যা স্বক্ষেত্রে বিয়ে হয়ে সেই বিয়ে ভেঙে গেলেও বেঁচে থাকে।'

'তুমি কী বলছ আমি বুঝতে পাচ্ছি না।'

'আমিও পাচ্ছি না। এ কাগজ-কলমে হিসেবের অংক নয় যে বোঝানো যায়। এ বুদ্ধির অগম্য। রক্তের গভীরে এক প্রচ্ছন্ন ব্যাধি।'

'আমরা অত শত বুঝি না।' নরনাথ দৃঢ় হয়ে দাঁড়াল। 'আমরা বুঝি সজ্ঞানে যে নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে করেই হোক তার মান রাখতে হবে।'

'তার মানে ছলে বলে কৌশলে যে উপায়েই হোক বিয়েটা ঘটাতে হবে?' জিজ্ঞেস করল বরেন।

'নিশ্চয়ই। ঘি যখন আমার আর সেই ঘি যদি সোজা আঙুলে না ওঠে—'

'তখন আঙুল বাঁকা করে ঘি তুলতে হবে? না।' একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল বরেন। 'বাঁকা আঙুলের ঘিয়ে শ্রম বেশি স্বাদ কম। জোরের মধ্যে শুধু জেল্লাই আছে স্ফূর্তি নেই। কী হবে উৎসবের আলো জেনলে যদি প্রতিমায় না প্রাণ আনবরা মন্ত্র জানি। এ কথা শুধু আমি কেন, পুরাকালের সেই রাবণেরও জানা ছিল।'

'কার জানা ছিল?' হকচকিয়ে গেল নরনাথ।

'রাবণের। রামের সীতাকে যে চুরি করে লুকিয়ে রেখেছিল বনের মধ্যে। সে কি জোর করে সীতাকে বশীভূত করতে পারত না? শারীরিক, পাশবিক, শক্তি কি তার কম ছিল?'

'রাবণ তো মূর্খ।' উড়িয়ে দিল নরনাথ।

'রাবণ মহান। কামে ক্রোধে মদে দর্পে অন্ধ হলেও রাবণ বুঝেছিল সেই আদিম সত্য কথা যে কবিতা স্বয়ম্বাগতা না হলে রস নেই। সীতাকে বললে, পরস্ত্রীহরণ বা পরস্ত্রীগমন রাক্ষসের স্বধর্ম, কিন্তু সীতা, আমি তোমার অনিচ্ছায় তোমাকে স্পর্শ করতে চাই না। তুমি নিজে থেকে আসবে তারই আশায় আমি অপেক্ষা করে থাকব।'

সশব্দে হেসে উঠল নরনাথ। 'বা, নিজে থেকেই তো এসেছে।'

'নিজে থেকে এসেছে! কে নিজে থেকে এসেছে?' বরেন মূঢ়ের মত স্থির হয়ে রইল।

'সীতা নয়, অপনার কাকলি।'

'কাকলি?'

'শুধু এসেছে নয়, নিচে গাড়িতে বসে আছে।'

'বাজে কথা।' সিগারেটের ছাই ঝাড়ল বরেন।

'শুধু কনে একা নয়, তার বিয়ের তিন হবু সাক্ষী। এক সাক্ষী আমি আর সাক্ষী তার মা ও কাকিমা। এখন দয়া করে বর গাত্রোত্থান করলেই হাংগামা চুকে যায়।'

'বলেন কী! ওরা সব বাইরে বসে আছেন কেন? সে কী কথা? ও'রা ভেতরে এসে বসুন।' বরেন উদ্বেল হয়ে উঠল। পোড়া সিগারেটের টুকরো ছুঁড়ে দিল বাইরে। নিচে নামবার জন্যে উন্মুখ হল।

বাধা দিয়ে নরনাথ বললে, 'একেবারেই বেরুনো যাক চলুন। ম্যারেজ-অফিসে হিজিবিজি কাজটা সেরে সোজা হোটেলে। সেখানে লাঞ্চ তৈরি। তারপর আর সব।'

'না, না, তবু নিজের থেকে আগেই একবার দেখে নিই স্বচক্ষে।' ঘরোয়া পোশাকেই নেমে চলল বরেন। পিছনে নরনাথ।

দরজায় গাড়ি একটা দাঁড়িয়ে আছে বটে। হুইলে ড্রাইভার। ভিতরে দুজন মহিলা—কাকলির মা আর কাকিমা। কিন্তু এ কী গান্ধর্বী মায়া! কাকলি কোথায়?

'সে কি? কাকলি কোথায়?' রাস্তায় নেমে ব্যাকুল হয়ে জিগগেস করল নরনাথ।

'এই তো এতক্ষণ ছিল গাড়ির মধ্যে।' গায়ত্রী বললে, 'গাড়ি থামতেই নেমে পড়ল। এই একটু ঘুরে আসছি বলে চলে গেল ঐ দিকে, ঐ গলির মধ্যে—'

'এই এখুনি আসবে।' স্তোকের মত বললে ইন্দিরা। 'নয়তো যাবার সময় ওখান থেকে ওকে তুলে নেব।'

সকলের উদ্দেশে করজোড়ে নমস্কার করল বরেন। তারপরে সদর, যেটা সাধারণত এ সময় খোলাই থাকে, বন্ধ করল নিজের হাতে। তারপর উপরে, নিজের ঘরে চলে এল। বিছানাটার দিকে তাকাল। মনে হল এখনো কিছু ঘুমিয়ে নেওয়া যায়। তৃপ্তির শব্দ করে শুয়ে পড়ল আবার। পাশবালিশটা বুকে জড়িয়ে চোখ বুজল। বাকি ঘুমটুকুকে ডাকল, ডাকতে লাগল।

(ক্রমশ)

দিল্লীর প্রাচীন সেতু

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

সরিৎ দাস

মিনার, মসজিদ, কবর আর কেল্লা—দিল্লির প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন বলতে প্রধানত এইগুলিই বোঝায়। এর মধ্যে সেতুর স্থান নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও দিল্লিতে যে কয়েকটি পুরনো পুল আছে সেগুলি ঐতিহাসিক অথবা পুরাতাত্ত্বিক দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ না হলেও যারা এ বিষয়ে উৎসাহী তাদের কাছে যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক মনে হবে। পাঠান ও মোগল আমলের এই সব সাঁকো দিল্লি রাজ্যের এমন স্বল্প পরিচিত স্থানে রয়েছে যে এখানকার বহু পুরনো বাসিন্দাও এদের অবস্থিতি সম্বন্ধে মোটেই ওয়াকিফ্‌হাল নন।

মুসলিম শাসন কালে (অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১০০০ থেকে ১৮০০ পর্যন্ত) এদেশে স্থাপত্য শিল্পের অনেক রকম পরীক্ষা হয়ে গেছে। মুসলিম স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যই হল গতিশীলতা। মুসলমান স্থপতিরা শুধু হিন্দুর মন্দির ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হয়নি। হিন্দু শিল্পের আকর্ষণীয় গুণগুলি গ্রহণ করে নিজস্বভাবে একটি স্বাধীন শৈলী গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। তাছাড়া, দেশ-বিদেশের স্থাপত্য শিল্পের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে বহু যুগান্তকারী কলাকৌশল নিজেদের আয়ত্তে এনেছে! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, পুল—অর্থাৎ সেতু-নির্মাণ ব্যাপারে কোনও মুসলমান রাজাকে বিশেষ উৎসাহী দেখা যায়নি। উৎসাহিত বোধ করলে বিদেশ থেকে স্থপতি আনিয়ে সুবৃহৎ এবং সুদৃশ্য সেতু গঠন করা নিশ্চয়ই সম্ভব হত, যেমনটি সম্ভব হয়েছিল পারস্য দেশীয় স্থপতির সাহায্যে বিরাট হুমায়ুন সমাধি-সৌধ গঠন করতে। মনে হয় মসজিদ ও সমাধির মত সেতুও যে স্থপতি বিদ্যার বিরাট ও কালজয়ী নিদর্শন হয়ে থাকতে পারে এটা তাঁদের ধারণার বাইরে ছিল। অবশ্য খিলজী বংশীয় সম্রাট আলাউদ্দীনকে এর উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। আলাউদ্দীন ১৩০৩ সালে চিতোর জয় করেন। সেই জয় স্মরণীয় করবার উদ্দেশ্যে চিতোরে গম্ভীরা নদীর উপর একটি বিরাট সেতু নির্মাণ করেন। আজ অবশ্য সেই সেতুটির জরাজীর্ণ অবস্থা। এর উপরকার সবকিছু বিলুপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট আছে কেবল দশখানি খিলান। চুন পাথরের তৈয়ারী এই সুদৃশ্য বিরাটকায় খিলানগুলি দেখে বিশ্বাস করা মোটেই কঠিন নয় যে আলাউদ্দীন এই সেতু নির্মাণে বহু সুনিপুণ স্থপতি এবং অন্যান্য বহু শিল্পীদের সাহায্য নিয়েছিলেন।

এবার খাস দিল্লির কথায় আসা যাক্‌। পূর্বেই বলা হয়েছে দিল্লির পুরনো পুলগুলি এমন কিছু বিরাট ব্যাপার নয় যে দ্রষ্টব্য বস্তু হিসাবে সেগুলি কুতবমিনার অথবা লালকেল্লার পাশে স্থান দেওয়ার যোগ্য। যে কয়েকটি সেতু এখনও বর্তমান রয়েছে তার মধ্যে প্রাচীনতম হল শাহ্‌ আলমের পুল। দিল্লির উত্তরে ওয়াজিরাবাদ অঞ্চলে অবস্থিত শাহ আলমের দরগার পাশেই পুলটি আছে। ইতিহাসের সাধারণ পাঠকের কাছে এই শাহ্‌ আলমের নাম পরিচিত নয় মোটেই। ইনি চতুর্দশ শতকের একজন মুসলমান সন্ত। এঁর সমাধি রয়েছে বলে এ স্থানের নাম শাহ্‌ আলমের দরগা। দিল্লিতে ধর্মাত্মা ব্যক্তিদের এরূপ আরও তিনটি দরগা অর্থাৎ সমাধি আছে। প্রথম নিজামুদ্দীন, দ্বিতীয় কুতবুদ্দীন শাহ্‌ "কাকী" এবং তৃতীয় নাসীরউদ্দীন মামুদ যা রোশন চিরাগ বলে পরিচিত। পুণ্যাত্মাদের সমাধির পার্শ্বে নিজেদের শেষ শয়ন রচনা করবার ইচ্ছা অনেকেরই। কাজেই এই সব দরগাগুলির ভিতর বহু রাজা ও প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের সমাধি নির্মিত হয়েছে। কিন্তু শাহ্‌ আলমের দরগাটি এই

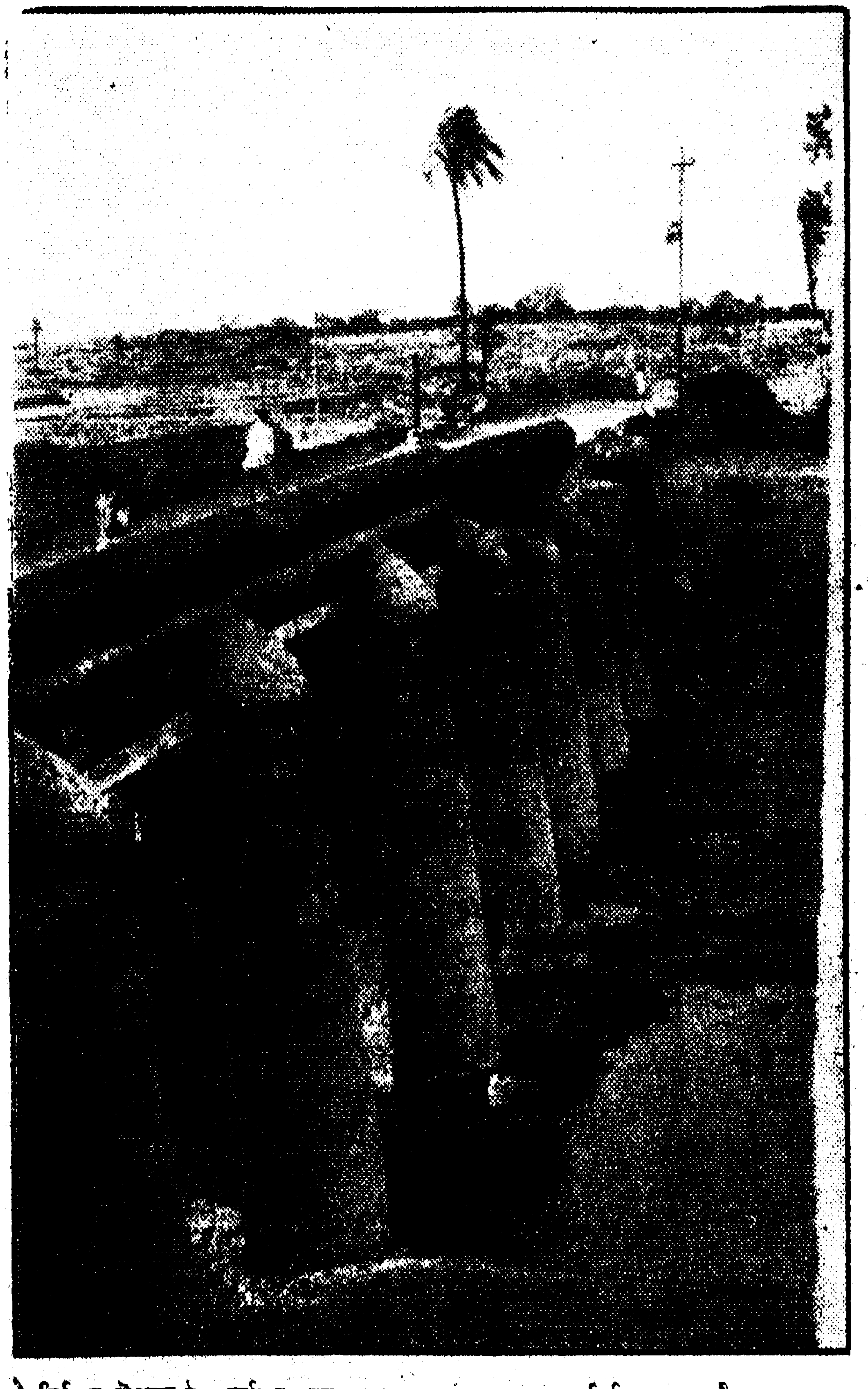

দিল্লির উপকণ্ঠে ওয়াজিরাবাদে শাহ আলমের পুল। দিল্লির প্রাচীনতম সেতু

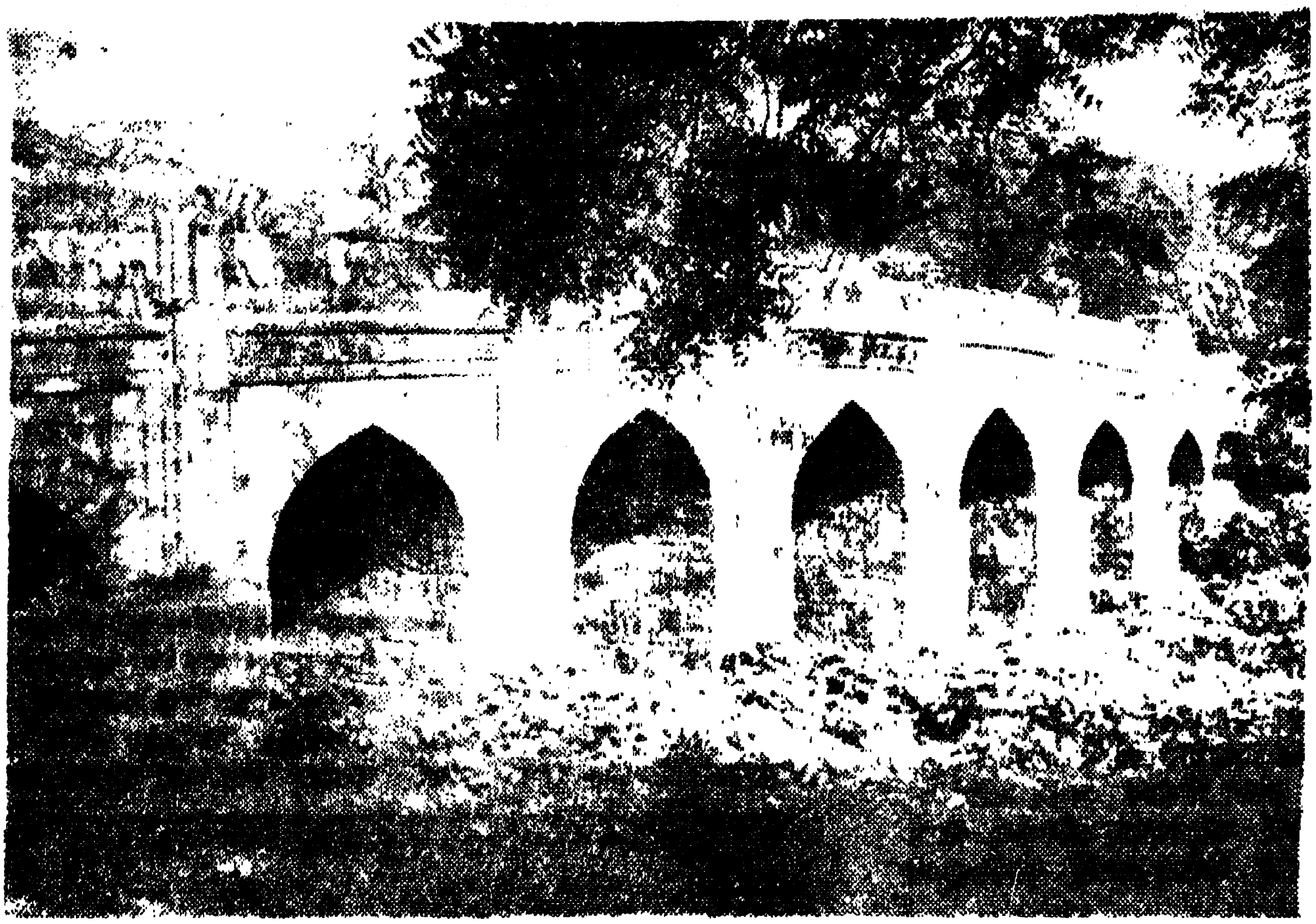

লোদী গার্ডেনে আঠপালা। তিনশত বৎসর আগে আকবরের জনৈক সভাসদ কর্তৃক নির্মিত এই সেতু এখনও কর্মক্ষম

প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম। সম্ভবত লোকালয় থেকে বহুদূরে অবস্থিত বলে এই নির্জন স্থানে কেউই সমাধি নির্মাণে রাজী হননি। তাতে অবশ্য একটি সুফল হয়েছে। নিজামুদ্দীন এবং অন্যান্য দরগাগুলিতে দেখা যাবে নানা যুগের নানা ধাঁচের বিচিত্র রকমের কবরের ভীড়। কিন্তু শাহ্ আলমের এই দরগায় আছে শুধু ছোট একটি মসজিদ, শাহ্ আলমের সমাধি এবং তার নীচে এই পুল। এদের শৈলীগত ঐক্য (যা অন্যান্য দরগায় অনুপস্থিত) এবং সহজ সুন্দর গঠন-ভঙ্গী সকলকে আকৃষ্ট করবে।

শাহ্ আলমের এই পুলটি যমুনার কাছেই অপরিসর একটি নালার উপর রয়েছে। এককালে এই নালাটি যমুনার একটি প্রধান উপনদী ছিল কিন্তু এখন এর ভিতর দিয়ে শহরের আবর্জনাই শুধু প্রবাহিত হচ্ছে। সুতরাং এখানকার পরিবেশ মোটেই সুখকর নয়। চতুর্দশ শতকে নির্মিত এই পুলটিতে সর্বসমেত ৯টি খিলান আছে। খিলানের থামগুলি নীচের দিকে প্রশস্ত এবং উপরে ক্রমেই সরু হয়ে গিয়েছে। ফিরোজশাহ্ তোগলকের অনুপ্রেরণায় তৈয়ারী বহু সৌধেই এই বৈশিষ্ট্য অনুসৃত হয়েছে। তাছাড়া ফিরোজশাহী আমলের অন্যান্য স্থাপত্যের মত এটিও ...তা মালমশলা দিয়ে নির্মিত। পুলটি দৈর্ঘ্যে ১৫৬ ফুট এবং চওড়ায় ১৬ ফুট। আশ্চর্যের বিষয় এখনও পুলটি কার্যক্ষম এবং এর উপর দিয়ে ২ টন পর্যন্ত ওজনের গাড়ি চলাচল করতে পারে।

'পুল' হিন্দুস্থানী শব্দ। মনে হয় 'পাল' অথবা 'পাল্লা'র সঙ্গে শব্দটির সম্বন্ধ আছে। 'পালা' নাম দিয়ে দিল্লিতে মোট তিনটি পুরান সাঁকো রয়েছে। যথা বারাপালা, সাতপালা অর আধপালা। কিন্তু এই 'পালা' শব্দটি বলতে কি বোঝায়? কানিংহ্যাম, শার্প প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এর অর্থ নিয়ে কিছুটা বিব্রত বোধ করেছেন। 'পালা' শব্দের অর্থ খিলান হতে পারে না—কারণ আধপালায় সাতটি এবং বারাপালায় এগারোটি খিলান আছে। তাঁদের মতে পালা বলতে পুলের নিম্নে যে থামগুলি রয়েছে সেগুলি এবং পুলের উপরে রেলিংএর উপরে জোড়ায় জোড়ায় যে থামগুলি রয়েছে সেগুলি বোঝাবে। বারাপুলা এমনই একটি পুল। এর উপরে বারো জোড়া ছোট ছোট থাম আছে। পুলটি নির্মিত হয় ১৬১২ খৃষ্টাব্দে অথবা সংশোধিত মত অনুসারে ১৬১১ খৃষ্টাব্দে। দিল্লি শহর থেকে নিজামুদ্দীনের দরগায় যাবার পথে আকবরের সুযোগ্য সভাসদ খান-ই-খান্না আবদার রহিমের অতি সুদৃশ্য সমাধি আছে। তারই কয়েক গজ পূর্বে যমুনার একটি খালের উপর বারাপালা নির্মিত হয়েছে। বারাপালা সম্বন্ধে আরও একটি ঐতিহাসিক তথ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—উইলিয়াম ফিঞ্চ্ একজন প্রাচীন ইংরেজ ভ্রমণকারী। ১৬০৯—১১ পর্যন্ত ইনি ভারত ভ্রমণ করেছিলেন। ইনি ইংরাজ কবি মিলটনের সমসাময়িক এবং ভারত সম্বন্ধে তাঁর রচিত ভ্রমণ কাহিনীর সঙ্গে মিল্টন বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। শেষ জীবনে 'প্যারাডাইস লস্ট' মহাকাব্য লিখতে মিলটন যে বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন ফিঞ্চ এর লিখিত কাহিনী তার মধ্যে অন্যতম। এই কাব্যের একাদশ খণ্ডে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। এই খণ্ডে আছে জ্ঞান বৃক্ষের ফল খাওয়ার অপরাধে আদম কে ঈশ্বর স্বর্গ থেকে নির্বাসিত করা স্থির করলেন। আদমকে তাঁর এই সংকল্প জানাবার জন্য তিনি তাঁর দূত মাইকেলকে আদম সমীপে প্রেরণ করলেন। কিন্তু পরম কারুণিক ঈশ্বর মাইকেলকে এও নির্দেশ দিলেন যে এই সংবাদে আদম যাতে শোকার্ত না হন সেইজন্য তাকে দিব্যদৃষ্টি দান করে তার সম্মুখে সমস্ত পৃথিবীর ভবিষ্যত চিত্র প্রকাশ করে ধরতে। মানুষের জন্ম থেকে আরম্ভ করে নোয়ার সময়কার মহাপ্লাবন পর্যন্ত ঘটনা লক্ষ্য করে আদম এর মধ্যে ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতার পরিবর্তে তাঁর অসীম করুণারই প্রমাণ পাবেন এবং প্রশান্ত মনে তাঁর দণ্ড গ্রহণ করবেন। মাইকেল যখন আদমকে "বিশ্বরূপ" দেখাবার জন্য একটি ছোট পাহাড়ের উপর নিয়ে যাচ্ছেন তখন কবি এই উপলক্ষে আর একজনের কথা স্মরণ করেছেন তিনি হলেন দ্বিতীয় আদম অর্থাৎ যিশুখৃষ্ট। শয়তান এই খৃষ্টকে ঠিক

এমনই এক পাহাড়ের উপর নিয়ে গিয়ে তাকে পৃথিবীর সমস্ত সম্পদশালী রাজ্যগুলি দেখিয়ে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারেনি।

"To show him all earth's kingdoms
and glory.
....
....
from the destined walls
Of Cambalv, seat of Cathaian can,
And Samarchand by Oxus, Temir's
throne,
To Paguin of Sinaean Kings, and
thence.
To Agra and Lahore of great
Mogul,
............"

গ্রেট্ মোগলদের এই লাহোর থেকে আগ্রা যাবার সময় ফিঞ্চ সাহেব বারাপুলো পার হয়ে গিয়েছিলেন। এ হেন ফিঞ্চ সাহেব যাঁর লেখা থেকে স্বয়ং মিলটনও উদ্ধৃত করেছেন তিনি দিল্লি সম্বন্ধে কি লিখেছেন সে বিষয়ে কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। ফিঞ্চ লিখছেন:—

"দিল্লি শহর (অর্থাৎ শের শাহের দিল্লি. যাকে ভুল করে ফিঞ্চ বলেছেন সেলিম) একটি মনোরম সমতলভূমির উপর অবস্থিত। ইহার মধ্যে রম্য উদ্যান এবং স্মৃতি সৌধ রহিয়াছে। এক তোরণ হইতে অন্য তোরণ পর্যন্ত এই শহর দৈর্ঘ্যে দুই কোশ (অর্থাৎ ক্রোশ)। ভারতের অন্যান্য বড় শহরের অদৃষ্টে যেমন ঘটিয়াছে এই দিল্লিতেও সেইরূপ হইয়াছে। ইহার অনেকখানি স্থান ধ্বংসপ্রাপ্ত।......এই ধ্বংসাবশেষ (অর্থাৎ রাই পিথোরার দুর্গ, জাঁহাপনা, সিরি এবং তুগলকাবাদ) এই স্থান হইতে কিছু দূরে অবস্থিত। জেমিনি'র (অর্থাৎ যমুনা নদীর) একটি শাখা ইহাদিগকে এই স্থান হইতে পৃথক করিয়াছে। এই শাখার উপর এগারো কিংবা বারো-খিলানের একটি পুল আছে।"

ফিঞ্চএর বর্ণিত এই সেতু দিল্লির পুরনো সেতুগুলির মধ্যে বৃহত্তম। ফিঞ্চও ভুল করে বারাপালার ইংরাজী করেছিলেন বীগ্ ব্রীজ। দৈর্ঘ্যে বারাপালা ২১৪ গজ এবং চওড়ায় ১৫ গজ। এর দুই পাশের ৭ ফুট উঁচু থামের সারি এর বৈশিষ্ট্য। খিলানগুলির মাপ হল ২০ ফুট। একটি খিলানের উপর খোদিত লিপি থেকে জানা যায় জাহাংগীরের রাজসভার এক খোজা সর্দার মীরবান আগা কর্তৃক পুলটি নির্মিত হয়েছে। এখন অবশ্য লিপিটি অদৃশ্য হয়েছে।

এককালে পুলটির উপর থেকে চারিদিকের দৃশ্য বড় সুন্দর দেখাত। তখন অবশ্য এর নীচের খালটি শুকিয়ে যায়নি। আবর্জনার বদলে সেখান দিয়ে নির্মল জলই প্রবাহিত হত। আর চারিপাশে জঙ্গলের মত বাড়ি-ঘর গজিয়ে উঠেনি। এই পুলের উপর দিয়ে যে পথটি গেছে পূর্বে সেটি মথুরা রোড নামে অভিহিত হত। এখন অবশ্য এইপথ মথুরা রোডের একটি শাখা মাত্র। আধুনিক মথুরা রোডের উপর দিয়ে যানবাহনের সংখ্যা পুলটির পক্ষে অত্যধিক। তাই খালের উপর একটি কালভার্ট বসিয়ে নতুন রাস্তাটি তার উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

খিড়কী গ্রামে সাতপালা মহম্মদ তুগলকের সময় তৈয়ারী প্রকৃতপক্ষে একটি বাঁধ, যদিও সেতু হিসাবেও ব্যবহৃত হত

এই খালের উত্তর পশ্চিম দিকে কিছু দূরেই নিজামুদ্দীনের দরগা। এই দরগার অন্তর্গত খাঁজাহান তিলাঙ্গিনীর (ফিরোজ সাহেব প্রধান উজীর) সমাধির নিকট এই খালের উপর আর একটি পুল দেখা যাবে। তবে পুলটি একেবারে ভাংগা। এর মাত্র তিনটি খিলান দাঁড়িয়ে রয়েছে। গঠন কৌশল দেখে মনে হয় পাঠান আমলে তৈয়ারী। এর উপরকার পথটি সম্ভবত মহম্মদ তুগলকের রাজধানী জাঁহাপনার দিকে গিয়েছিল। আরও পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলে এক মাইল পরে খয়েরপুর গ্রাম অধুনা লোদী গার্ডেন। এই লোদী গার্ডেনে অনেক গুলি কবর আছে তার মধ্যে সবচাইতে বড় সিকন্দার শাহ্ লোদীর কবর। এর পাশেই আঠপালা সেতু। অনুমান করা যায় যে এই আঠপালার উপর দিয়ে সিকন্দার শা লোদীর বাগান-ঘেরা কবরে যাবার পথ ছিল। সৈয়দ ও লোদী বংশের আরও কয়েকজনের সমাধি এখানে রয়েছে। এই স্মৃতিসৌধগুলি কেবল যে সুরক্ষিত তা নয়, এদের চারিপাশে আধুনিক প্রণালীতে রচিত বিস্তীর্ণ বাগান করে দেওয়া হয়েছে যা এখন লোদী গার্ডেনস নামে পরিচিত। ইলতুৎমিস্ থেকে আরম্ভ করে সৈয়দ ও লোদী রাজার সমাধিগুলির রচনা শৈলী ও উদ্দেশ্যের অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করবার বিষয়। ইলতুৎমিস্ ও তার পরবর্তী রাজাদের সমাধিগুলি ছিল ছোটখাট মসজিদের মত যাতে পরিবারের লোকেরা ঈশ্বরোপাসনা করতে পারেন। তুগলকদের সময় (দৃষ্টান্ত তুগলকাবাদ) রাজকীয় সমাধিগুলি হয়ে দাঁড়ায় দুর্গ বিশেষ যার ভিতর থেকে রাজারা শেষ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারেন শত্রুর বিরুদ্ধে। তারপর এল তৈমুরের আক্রমণ যার ফলে সারা দেশব্যাপী বিরাট নৈরাশ্য দেখা দিল। তখন মৃত্যুর মধ্যেই সকলে পরম শান্তি খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। মসজিদ মিনার প্রভৃতির বদলে সে যুগের একমাত্র স্থাপত্য হল সমাধি নির্মাণ। সারা দিল্লি বিরাট কবরখানায় পরিণত হল। সমাধিগুলি তখন প্রমোদ ভ্রমণ অথবা দার্শনিক ধ্যান ধারণার উপযুক্ত স্থান হয়ে দাঁড়াল। লোদী রাজাদের কবর ছাড়া পরবর্তীকালে হুমায়ুনের সমাধি সৌধ এবং আগ্রার তাজমহল প্রধানত এই উদ্দেশ্য নিয়ে তৈয়ারী হয়েছে। এই এই বাগান-ঘেরা লোদী সমাধি-সৌধগুলিতে যাবার জন্য আঠপালা পুল অবশ্য তৈরী হয়েছিল লোদী রাজাদের মৃত্যুর অনেক পরে। নবাব বাহাদুর নামে পরিচিত সম্রাট আকবরের এক সভাসদ প্রায় তিন'শ বছর আগে এই পুলটি নির্মাণ করেছিলেন। এর খিলানের সংখ্যা সাত আর থামের সংখ্যা আট। খিলানগুলি এক মাপের নয়। কানিংহ্যামের হিসাব অনুযায়ী মাঝের

উমানাথ ভট্টাচার্যের নাটক
জল মূল্য ২.৫০
নীচের মহল মূল্য ২.৫০
ঘূর্ণী মূল্য ২.২৫
কথকতা
৩৩সি, নেপাল ভট্টাচার্য লেন, কলি-২৬

বারাপালার একাংশ। দিল্লির প্রাচীন সেতুগুলির মধ্যে সবচাইতে বড়

খিলানটি মহত্তম, দৈর্ঘে ১২ ফুটের কিছু বেশী। অন্যান্য খিলানগুলির মাপ ১১ ফুট থেকে ৯ ফুটের মধ্যে। খিলান ও থাম সমেত পুলটির দৈর্ঘ্য হল ১৩২ ফুট। পুলের উপরে দু'পাশে সাড়ে ৩ ফুট উঁচু রেলিং। সমস্ত পুলটি পাথর দিয়ে তৈয়ারী এবং অতি সুদৃশ্য। পূর্বেই বলা হয়েছে পুলটি নির্মিত হয়েছে আকবরের সময়ে তিন'শ বছরেরও আগে, কিন্তু এত সুন্দর ভাবে রক্ষিত হয়ে এসেছে যে এখনও এর উপর দিয়ে যানবাহন চলাচল করতে পারে। এর নীচে খালটি একেবারে শুকিয়ে গেছে। অবশ্য মধ্যে মধ্যে অতিবর্ষণের পরে এর নীচে জল জমলে যমুনার এই লুপ্ত ধারাটি সম্বন্ধে মন সচেতন হয়ে উঠে।

এরপর বাকী রইল সাতপালা। পূর্বেই বলে রাখা প্রয়োজন—সাতপালাকে ঠিক সেতু বলা চলে না। প্রকৃতপক্ষে সাতপালা একটি বাঁধ যা সেতু হিসাবেও ব্যবহার করা হত। সাতপালা নির্মিত হয়েছে মহম্মদ তুগলকের সময়ে। প্রধানত মেওয়াতী দস্যুদের হাত থেকে রাজধানী রক্ষা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে মহম্মদ তোগলক তাঁর রাজধানীর চতুর্দিক প্রাচীর দিয়ে ঘিরে ফেলেন। তোগলকের রাজধানীর নাম ছিল জাঁহাপনা। আজও কোনও কোনও জায়গায় এই প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রাচীরের একই সারিতে নির্মিত হয়েছিল সাতপালা। উদ্দেশ্য কৃত্রিম হ্রদ সৃষ্টি করে প্রয়োজন মত তার জল নিয়ন্ত্রণ। সমস্ত তুগলক রাজাদেরই আত্মরক্ষা ব্যাপারে এই প্রকার কৃত্রিম জলাশয়ের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত ছিল। গিয়াসুদ্দীন নির্মিত তুগলকাবাদ দুর্গের দক্ষিণে যে বিস্তীর্ণ নিম্ন-ভূমি রয়েছে পূর্বে তা জলপূর্ণ থাকত। এই একই উদ্দেশ্যে মহম্মদ তুগলক তাঁর স্বরচিত দুর্গ আদিলাবাদের (তুগলকাবাদের নিকটেই) চারি দিক ইচ্ছামত জলমগ্ন করে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

ভাঙ্গা পাথর ও নিকৃষ্ট মালমশলা দিয়ে তৈয়ারী এই সাতপালা যে গ্রামের মধ্যে রয়েছে তার নাম খিড়কী। এই বাঁধটি (অথবা পুল) দোতলা। প্রত্যেক তলায় এগারোটি খিলান রয়েছে। খিলানগুলির দু'পাশে দুটি বড় আকারের স্তম্ভ আছে। খিলানের ভিতর সরু সিঁড়ি দিয়ে উপরে যাবার ব্যবস্থা আছে। খিলানগুলির দু'দিকের দেওয়ালে খাঁজ কাটা আছে যার সাহায্যে জল-নিয়ন্ত্রণকারী দরজাগুলি (স্লাইডিং গেটস্) উঠ'নামা করতে পারে। পাশের দুটি থামের ভিতর একটি করে আট কোণা কক্ষ আছে। এদের মধ্যে পশ্চিম দিককার কক্ষটি শস্য রাখবার গুদাম হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। দিল্লিতে এইরূপ অসংখ্য অরক্ষিত কবর ও অন্যান্য প্রাচীন গৃহ শস্যের গুদাম কিংবা গরু-ঘোড়ার আস্তাবল হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কুতবের কাছে মেহরুলী গ্রামে একটি গম্বুজ দেওয়া অরক্ষিত সমাধি ঘর আজ বহুদিন ধরে সরকারী ডিসপেন্সারী হিসাবে কাজে লাগান হয়েছে। আর শোনা যায়, এই সাতপালায় নাকি অনেকদিন পূর্বে একটি স্কুল বসত। তাই এর আর একটি নাম মাদ্রাসা (মুসলিম বিদ্যালয়)।

আজ সাতপালার ধ্বংসাবশেষ মাত্র টিকে রয়েছে। কিন্তু এর চারিপাশের দৃশ্য বড় মনোরম। এর অনতিদূরেই চতুর্দশ শতকে নির্মিত সুদৃশ্য কিন্তু অব্যবহৃত খিড়কীর মসজিদ রয়েছে। দিল্লির নিকটবর্তী জায়গাগুলির মধ্যে এই খিড়কী গ্রামেই আজও বুনো ময়ূর নিঃশঙ্কচিত্তে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। সাতপালার সামনেই রোশন চিরাগ (নাসিরুদ্দীন মামুদের দরগা)। শোনা যায় নাসিরুদ্দীন এই সাতপালার জলে স্নান করতেন, আর সেই কারণে এই স্পর্শ-পূত জল মুসলমানদের কাছে ঔষধের মত মূল্যবান। এখন অবশ্য জলের চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। যে স্বাভাবিক সৌন্দর্যের কথা পূর্বে লেখা হয়েছে সেও বোধ হয় লোপ পাবে, কারণ এই অঞ্চলে অতি দ্রুত বসতি স্থাপন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

এইবার যমুনার ধারের সেতুগুলির কথা বলে প্রবন্ধ শেষ করব। পূর্বে লালকেল্লার পূর্বদিকের প্রাচীর ছুঁয়ে যমুনা প্রবাহিত হত। উত্তর দিক থেকে লালকেল্লার প্রাচীর ছোঁবার আগে নদীর জলধারা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। এই দুই স্রোতের মাঝে দ্বীপের মত টিলা। মোগল রাজারা এই টিলার উপর পাঁচকোণা দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। এরই নাম সেলিমগড়। সেলিমগড় প্রধানত বন্দীনিবাস হিসাবে ব্যবহৃত হত। কুখ্যাত গোলাম কাদেরকে এখানে বন্দী করে রাখা হয় কিন্তু ইনি পালিয়ে যান। সেলিমগড়ের সঙ্গে লাল-কেল্লার সংযোগ রাখবার উদ্দেশ্যে সম্রাট জাহাঙ্গীর একটি পাঁচ খিলানের সেতু তৈয়ারী করেছিলেন। এই জাহাঙ্গীরই আবার সেলিমগড়ের নাম বদলে এর নতুন নাম রাখেন নূরগড়। কিন্তু সেলিমগড় এখনও তার পূর্ব নামেই পরিচিত। জাহাঙ্গীরের এই সেতুটি পরে ভেঙ্গে ফেলে এই স্থানে রেল যাবার জন্য আধুনিক ধাঁচের পুল তৈয়ারী করা হয়। রেল বসাবার সুবিধার জন্য লালকেল্লার কিছু অংশ ভেঙ্গে ফেলতে হয়েছে। এই রেল লাইন সেলিমগড়ের ভিতর দিয়ে যমুনার উপরকার বড় পুলের সঙ্গে মিশেছে। এখানে সেলিমগড়ের সঙ্গে কেল্লার যোগাযোগকারী আরও একটি সেতু আছে। তাছাড়া যমুনার উপর দিয়ে যে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড চলে গিয়েছে তার জন্যও আর একটি সেতু আছে। বলাবাহুল্য এগুলিকে এখন সেতু বলা ভুল কারণ নীচের জলের বদলে শুকনো জমি —আর তার উপর দিয়ে যানবাহন চলাচলের রাস্তা। যেখানে এখন রাজঘাট সেইখানে ছিল নৌকার তৈরী সেতু। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে এই সেতুটি এখন যেখানে রেলওয়ে ব্রীজ তার কাছেই বসান হয়। এই নৌকার সেতু দিয়েই ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহী সিপাহীরা মীরাট থেকে দলে দলে দিল্লি আক্রমণ করতে আসে। যমুনার উপরে বড় রেলপথের সেতুটি নির্মিত হয়েছিল ১৮৬৪ সালে।

[আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত]

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে

GOVERNMENT ... RARY Bihar

শ্রীসরলাবালা সরকার

১

স্বদেশী আন্দোলনের যুগ।—ধনী ব্যবসায়ী আর জমিদারেরা সশঙ্কিত হয়ে আছে কখন কার বাড়িতে ডাকাত পড়ে।

বারীন ঘোষেদের মামলার রায় বেরিয়ে গিয়েছে, কারুর হয়েছে দ্বীপান্তর, কারুর ফাঁসি।

কিন্তু বাংলার ছেলেদের কি বুকের পাটা, এখনও স্বদেশী ডাকাতির কমতি নেই। দায়মালে যাচ্ছে, ফাঁসির দড়িতে ঝুলছে, তবু যেন নেশায় মত্ত।

কৃষ্ণনগর দাতব্য হাসপাতালের ডাক্তারবাবু হাসপাতাল থেকে সবে বাড়িতে ফিরেছেন, ডাক পড়লো তাঁর, "ডাক্তারবাবু, আর এক গাড়ি জখমী এসেছে, দেখবেন না কি তাঁদের।"

হাসপাতাল আর ডাক্তারবাবুর একতলা বাড়িটা একেবারে কাছাকাছি। ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যায় সকাল বেলায় সার দিয়ে চলেছে নরনারী, হাসপাতালের দিকেই। প্রত্যেকেরই হাতে গলা বাঁধা একটা শিশি, কারুও কোলে বা ছোট বাচ্চা, হয় ছেলে, না হয় মেয়ে। ডিগ্‌ডিগে চেহারা, পিলে ভরা পেট, ওষুধ নিতে চলেছে তারা হাসপাতালে। অসুখ প্রায় সকলেরই এক, পালা জ্বর, লাগাজ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর।

বাড়িটা নেদেরপাড়ায়, হাসপাতালটাও পাড়ার হাসপাতাল। লোকের চাঁদায় চলে। কেউ চার আনা চাঁদা দেয়, কেউ ছ' আনা। আট আনার বেশী কেউ দিতে চায় না, আবার মাসে মাসেও আদায় হয় না, প্রায়ই বাকি পড়ে যায়।

খুচরা পয়সা থলিতে নিয়ে ডাক্তারবাবুর বিধবা বোন বিনতা বলে দাদাকে, "দাদা, আমার যে গুণোগার দিতে দিতে প্রাণ গেল; হিসাবে মেলে না কাজেই আমাকেই পূরিয়ে রাখতে হয় তবিল। ভালো এক কাজ জুটেছে আমার।"

ডাক্তারবাবু হাসেন, বলেন, "এইতো দাতব্য চিকিৎসালয়ের আয়, এরপর যদি মাইনে দিয়ে হিসাবের লোক রাখতে হয়, তা হলে তো গিয়েছি।"

তা মাইনে দিয়ে লোক রাখার দরকার হয়নি, বিনতাই নিয়েছে তহবিলের ভার।

ডাক্তারের একতলা বাড়ি, জরাজীর্ণ কতদিন মেরামত হয়নি তার ঠিক নেই, কিন্তু চারিদিকে গাছপালা আর বাগান, তাই বাইরের থেকে দেখতে মন্দ নয়। যেদিন সেই বাগানের কাঠের দরজায় একখানা ভাড়াটে গাড়ি এসে যখন লাগলো ডাক্তারবাবু তখন সবে হাসপতাল থেকে ফিরছেন।

অনেক দেরি হয় তাঁর ফিরতে, রুগীরা যেন চক্রব্যূহের মত ঘিরে ধরে তাঁকে। কম্পাউন্ডার আর ড্রেসার ধমক দিলেও ওরা গ্রাহ্য করে না।

আজ আবার এসে দাঁড়িয়েছে একটা গাড়ি। গাড়ি করে আবার রুগী এল নাকি? না রুগী নয়। এসেছে কলকাতার মানুষ, বগুলার স্টেশন অনেক দূরের পথ। রোগা রোগা ঘোড়া দুটো যেন ধুঁকছে। কৃষ্ণনগরে তখন স্টেশন হয়নি।

"কে এল আবার এত বেলায় কলকাতা থেকে? তোমার যেন হয়েছে বাড়ি তো নয়, হোটেল। বাবারে বাবা, আর পেরে উঠিনে।" বলতে বলতে ডাক্তারবাবুর স্ত্রী এসে দাঁড়ালেন রোয়াকে। "দেখ আবার কে এল।"

"ওমা, এ যে ছোটদিদিমা এসেছেন দেখছি, সংগে মেয়েটি কে? আপনার ছোট মেয়ে রাখালদাসী নাকি?"

"ছোটদিদিমা ডাক্তারবাবুর বিমাতার কাকিমা, তিনিই এসেছেন ডাক্তারবাবুর বাড়ি মেয়েকে সংগে নিয়ে। স্বামীও অবশ্য সংগে আছেন, আর আছেন মেয়ের ভাসুর অবনীনাথ।

দু' বছর মাত্র মেয়ের বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যেই দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে এসেছে, তেরো বছরের মেয়ের মাথার উপর যেন হঠাৎ বিনা মেঘে বাজ পড়েছে। জামাই ধরা পড়েছে স্বদেশী ডাকাতির মামলায়; এতদিন মামলা চলছিল, রায় বেরিয়েছে কয়েকদিন আগে। শিবপুরের জমিদার বাড়িতে যে ডাকাতের দল ডাকাতি করেছে, সে নাকি তাদেরই দলের এক সর্দার হয়ে ডাকাতি করতে গিয়েছিল।

কৃষ্ণনগর থেকে বেশী দূর নয় শিবপুর, ডাকাতের দল এসেছিল ঘোড়ায় চড়ে ডাকাতি করতে। সকলের মুখেই মুখোশ আঁটা। এসেই তারা চট্‌পট্ বন্দুকের আওয়াজ করতে করতে ঢুকে পড়েছিল দেউড়িতে। দারোয়ানরা রুখতে পারেনি তাদের।

সতর্ক হউন

এবং সতর্ক হতে সাহায্য করুন

একথা সবাই জানেন যে, আমাদের দেশে যত রকম কালি তৈরী হয়, তার মধ্যে ফাউন্টেন পেনের বিখ্যাত কালি সুলেখা অতুলনীয় গুণের জন্য সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়। তার এই জনপ্রিয়তা কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোককে আমাদের কাগজের বাক্স ও অক্ষরের ভঙ্গী নকল করে সুলেখা হিসাবে জাল কালি বিক্রি করতে প্ররোচিত ক'রছে। নামগুলি পর্যন্ত অনুরূপ ধরণের বেছে নেওয়া হচ্ছে।

যাতে প্রতারিত না হন, সেজন্যে সুলেখা ফাউন্টেন পেন কালি কেনার আগে ক্রেতাদের অনুরোধ করছি যেন তাঁরা বানান, অক্ষরের ভঙ্গী ও বাক্স ভাল করে দেখেন।

ডাক্তারবাবু বাইরে এসে বললেন, "এই যে আপনারা এসে গিয়েছেন দেখছি। কিহে যোগেশ, তোমারই ছোটভাই নাকি গোপেন? তোমরা তো রাজা হতে চলেছ, ইংরেজের হাত থেকে ভারত উদ্ধার করে তোমরাই নেবে রাজ্যভার। তোমরা কি যে সে লোক?"

যোগেশ গোপেনের বড় ভাই। ডাক্তারবাবুর খুড়্তুতো বোনের স্বামী। শালার এই পরিহাসে সে দুঃখের হাসি হেসে বলল, "রাজা হতেই চলেছি বটে। মোকদ্দমার খরচ হয়েছে এরই মধ্যে হাজার তিনেক, তবু তো ব্যারিস্টারবাবু টাকা নেন নি। এত করেও বাঁচাতে পারলাম না ছেলেটাকে, দশ বছরের জন্য দ্বীপান্তর হয়ে গেল।"

ডাক্তারবাবু এবার পরিহাস ছেড়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, "ভাই, সইতেই হবে এসব, উপায় নেই। তবু তো একদিক দিয়ে বাঙ্গালীর গৌরব বেড়েছে, সেও কম কথা নয়।"

"দাদা, চুপ করুন, কোথা থেকে কে শুনবে, দেওয়ালেরও কান আছে। আপনি গভর্নমেন্ট সারভেন্ট একথা ভুলে যাবেন না!"

ডাক্তারবাবুর বোন বিনতা এসে দাঁড়িয়েছেন গাড়ির কাছে। গাড়ি থেকে নামলেন একজন মহিলা, উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করতে করতে। তাঁকে দেখলে মনে হয়, অত্যন্ত কর্কশ প্রকৃতির এবং দাম্ভিকা মেয়ে।

বিনতা বলল, "এমন করে কাঁদবেন না ছোটদিদিমা। ওতে অকল্যাণ হয়। আসুন, হাত মুখ ধোবেন, একটু শান্ত হোন, তারপর শুনবো সব। এখান থেকে কি জেলারবাবুর তার পেয়েছিলেন কাল?"

"আর অকল্যাণ? অকল্যাণের বাকিটা কি আছে? লোকের কাছে মুখ দেখাবো কি করে? জামাই হল খুনে, ডাকাত। ছি, ছি, ছি, ভদ্রলোকের ছেলের এ কি প্রবৃত্তি? এর চেয়ে রাখালী কেন বিধবা হ'ল না?"

মেয়ে মায়ের কথা শুনে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। "মা তুমি চুপ কর। যে মানুষটা জন্মের মত ছেড়ে যাচ্ছে, দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তার নাম নিয়ে ওরকম করে বোল না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

রাখালদাসীর মা বিনতাকে সম্বোধন করে যেন গর্জন করে উঠলেন। "শুনলে তো, ঐ শোন। মেয়ের এখনো সে হতভাগার ওপর কি মায়া। এই যদি তোর মনে ছিল তবে বিয়ে করলি কেন হতভাগা? একটা মেয়ের সব্বনাশ করলি কেন অমন করে? তুই না একটা নামজাদা বংশের ছেলে? তুই না চারটে পাশ করেছিস্? পাশ না পাশ? কি আর বলবো ভাঙে তো মচ্কায় না, যেন কত বড় কীর্তিই করেছেন। বলেছেন জেলারবাবুকে—'যদি কাঁদাকাটি করে তাহ'লে দেখা করবো না।' আ মরি, শুনে অঙ্গ শীতল হ'ল। দেখা কে করতে চায় তোর সঙ্গে? জেলখানায় গিয়ে দেখা করবো কিনা একটা খুনে ডাকাতের সঙ্গে। মল্লিকবাড়ির বৌ হয়ে? দেখা করতে কে আসতো এত পথ, কাল থেকে মুখে জলবিন্দুটুকু দিইনি। বলেছিলাম তো যাব না কেষ্টনগর, তা ঐ হতভাগা মেয়ে যে মরছে কেঁদে কেঁদে। মামলার খবর শুনে অবধি যে শয্যে নিয়েছে হতভাগী, ওর জন্যেই আসতে হল কুটুমবাড়ি কালামুখ দেখাতে। তাও আসতাম না, কিন্তু না এসে যে উপায় ছিল না, এদিকে যে আবার এক বিপদ, কি জানি যদি ছেলেপিলে হয় তবে লোকে মানবে কেন হতভাগারই ছেলে বলে। মোটে তো দু মাস হল, ওর কাছ থেকে একটা লিখিয়ে না নিলে শেষে যদি সত্যিই কিছু হয়, লোকে যে গায়ে থুথু দেবে, জ্ঞাতি শত্তুরেরা কি ছেড়ে কথা কইবে? বলবে, "কার ছেলে কে জানে?"

বিনতা দেখল, রাখালদাসীর দুই চোখ রক্তবর্ণ, মুখ কিন্তু রক্তশূন্য, মনে হ'ল মেয়েটা হয়ত অজ্ঞান হয়ে যাবে। বলল, "থাক্ থাক্ ছোটদিদিমা, হাত মুখ ধোবেন আসুন। নীচের ঘরে আপনি যান, আর আমি রাখালদাসীকে ছাদের ঘরে নিয়ে যাচ্ছি। ছাদেও একটা ঘরে জল রাখা আছে বাল্তি করে। আপনার তো আবার আহ্নিক করাও হয়নি। আসুন, বেলা প্রায় দুটো হ'ল।"

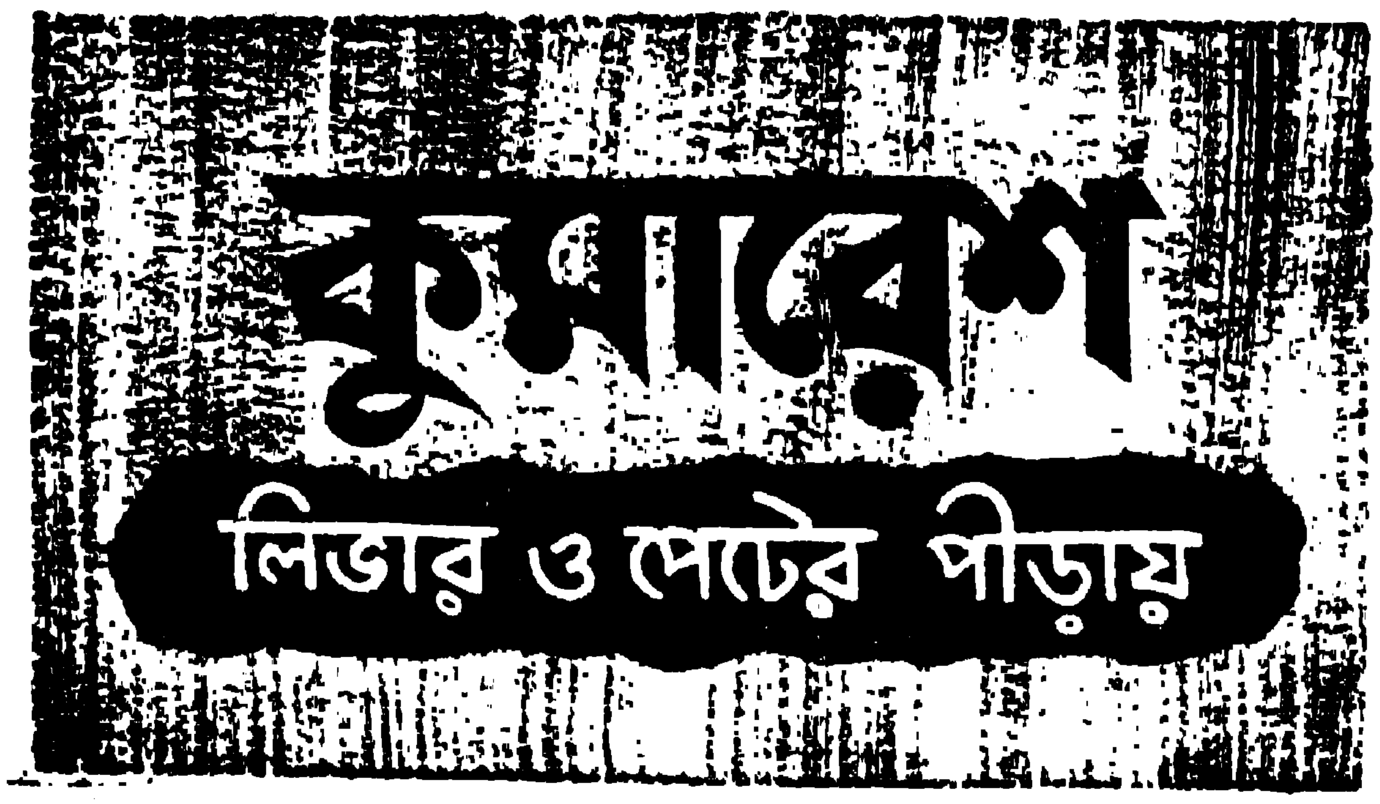

রাখালদাসীর মা বললেন, "আর আহ্নিক? ইষ্টিমন্তরই ভুলে বসে আছি। যে মেয়ে গভ্ভে ধরেছি, আর কি কিছু স্মরণ আছে? আমার শাশুড়ী ছেলে মারা যাচ্ছে সেই সময় বসেছিলেন আহ্নিকে।"

তিনি স্নানের ঘরের দিকে গেলে বিনতা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সহজভাবেই রাখালদাসীকে বলল, "চল্, ছাদে গিয়ে হাত মুখ ধুবি চল্। ওপরে কেউ যায় না। আয় আমার সঙ্গে।" যাবার সময় সিঁড়ির কাছে গিয়ে ডাক্তারবাবুর স্ত্রীকে একটা ডাক দিল, "বৌদি, ছোটদিদিমা চানের ঘরে গিয়েছেন, তাঁর আহ্নিকের জায়গা করে জলখাবার গুছিয়ে রাখ।"

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বিরক্তভাবে মটকার কাপড় পরে ঠাকুরঘরে গেলেন আহ্নিকের জন্য জায়গা করতে।

বিনতা রাখালদাসীকে নিয়ে গেল ছাদের উপর।

রাখালদাসী সম্পর্কে বিনতার মাসী, কেননা সে তার নূতন ঠাকুমার কাকার মেয়ে, কিন্তু রাখালদাসীই তাকে মাসী বলে, কেননা বয়সে সে অনেক ছোট।

ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটি, কেঁদে কেঁদে চোখ লাল করেছে, এখনও কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

বিনতা তাকে সস্নেহে বললে, "কেঁদ না মা, চুপ করো। তোমার মত ভাগ্য ক'টা মেয়ের হয়? স্বামীর সঙ্গে সুখভোগ করে যারা, তাদের চেয়ে তোমার সৌভাগ্য অনেক বেশী। সীতা গিয়েছিলেন রামের সঙ্গে বনে, রাজকন্যে আর দশরথ মহারাজের পুত্রবধূ তিনি, তবুও তিনি কত দুঃখ ভোগ করেছিলেন!"

বিনতার কথা শেষ হতে না হতেই রাখালদাসী ডুকরে কেঁদে উঠল, "মাসী গো, এমন মিষ্টি কথা আমাকে কেউ বলেনি। তুমি বলো, সত্যি করে বলো, উনি কেন এমন করলেন, কেন উনি গেলেন ডাকাতি করতে? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনে। উনি এত ভাল, পরের পয়সা উনি চুরি করবেন, ডাকাতি করবেন লোকের বাড়িতে, এ যে আমি ভাবতেও পারিনে। কি হল, কি হল আমার। আমি যে দেবতা বলে মনে করতাম ও'কে। সেদিনও আমাকে বলেছিলেন, "আচ্ছা রাখু, এমন যদি হয় যে সবাই আমাকে ঘেন্না করে, সবাই আমার নিন্দে করে, তুমিও কি ঘেন্না করবে আমাকে? তুমিও কি ভাববে আমিই তোম'র সকল দুঃখের মূল।" আমি বলেছিলাম, "কখ্খনো নয়।" আর আজ উঠতে বসতে মা বলছেন, "খুনে ডাকাত, ও'র সঙ্গে বিয়ে হয়ে নাকি তার মুখ দেখানো বন্ধ হয়েছে

লোকসমাজে। মুখ দেখানো যদি বন্ধ হ'ত তা হলেও তো বাঁচতাম। কিন্তু পাবনায় দলে দলে লোক আসতো বাড়িতে, সবাই বলত মাকে, বিয়ের আগে কি জামাইয়ের কি চরিত্তির বুঝতেই পারনি তুমি? এমন স্বর্ণ পিরতিমাকে তুলে দিলে একটা ডাকাতের হাতে? আমি গিয়ে ঘরে কপাট দিতাম, পাছে কেউ আসে আমার দুঃখে দুঃখ জানাতে। মাসী, তুমি অনেক লেখাপড়া করেছ, তুমি তো অনেক জান। সত্যি করে বল দেখি, সত্যিই কি উনি ডাকাতি করেছিলেন। তাদের লোহার সিন্দুক ভেঙেগ টাকা লুট করেছিলেন? মৈত্রদের সুদের কারবার ছিল, খত নিয়ে তারা টাকা ধার দিত। গোছা গোছা খত নাকি পুড়িয়ে দিয়েছিল ডাকাত ছেলেরা, মৈত্ররা নাকি সর্বস্বান্ত হয়েছে। বন্ধকী গহনা সবই নাকি লুটে নিয়েছে ডাকাতরা। মৈত্রগিন্নীর মাথামুড় খুঁড়ে সে কি অভিসম্পাত দেওয়া। মাসী সেই অভিসম্পাত যদি খেটে যায় কি হবে তা' হলে?"

"চুপ কর, চুপ কর রাখালদাসী, সব মিথ্যে। কোনও অভিসম্পাত ওদের গায়ে লাগবে না। ওরা কি যে সে ছেলে? না হলে এমন করে সর্বস্বত্যাগী হয়? এমন করে নিজের ঘেন্নাকে মাথায় তুলে নেয়? রাখালদাসী, আজ তোকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না, তবে তুই যদি আমার কথা বিশ্বাস করিস, এটুকু বিশ্বাস করিস যে, ওরা ভুল করেছে কি ঠিক করেছে তা নিয়ে বিচার করা মিথ্যে, ওরা যা ঠিক্ ভেবেছে তাই করবার জন্যে এত বিপদ মাথায় নিয়েছে। রাখালদাসী, কাল তো জেলখানায় যাবি ওকে দেখতে, গোপেন কাঁদতে বারণ করেছে, কাঁদিসনে যেন। আর কেনই বা কাঁদবি? যার এমন স্বামী সে কেন কাঁদবে? তারাই কাঁদুক যাদের স্বামী মানুষ হয়েও অমানুষ। ঐ মৈত্র কর্তা? কত বিধবার বাস্তুবাড়ি পর্যন্ত ক্রোক করে নিয়েছে, কত নাবালক কচিছেলেকে পথের ভিখেরী করেছে। তাই তো তুলেছে অত বড় ইমারত। তুই কি গোপেন যদি ঐ রকম হত তা হলে খুশী হতিস্? রাম যদি বনে না যেতেন, জোর করে দখল করতেন রাজসিংহাসন তা হলে কি সীতা নিজেকে ভাগ্যবতী বলে মনে করতেন? যাক্ এখন এসব বলবার সময় নয়, আস্তে আস্তে বুঝিয়ে বলবো এর পরে।"

রাখালদাসীর একরাশ রুক্ষ চুল, কতদিন তেল দেয়নি মাথায়।

"তেল দিসনে বুঝি মাথায়?"

"না মাসী, তেল দিতে পারিনে, ও'কে কি মাথায় তেল দিতে দেয় জেলখানায়? কি খান কে জানে। শুনেছি কি যেন ক্যানের মত খাইয়ে রাখে। মা যখন বলেন, 'খাও, খাও', আমার তখন এসব মনে হয়। মা'র কি একটু মায়াও হয় না সেই মানুষটার জন্যে। বিয়ের পর সে কী জামাই আদর,—"

এর পর যেন রাখালদাসীর মনটা অনেকটা শান্ত হয়েছে বলে মনে হ'ল। সেদিন খেতে বসে কিছু খেলও সে। তার মা দেখে খুশী হলেন। ভাবলেন, পুত্রশোকও দিনে দিনে কমে যায়, রাখালদাসীও দিনে দিনে শান্তি পাবে। বিধবা হয়েও তো মানুষ বেঁচে থাকে—খায় দায়, ঘুমোয়।

সকালবেলায় ভাড়াগাড়ি এসে দাঁড়ালো জেল হাজতের ফটকের সমুখে। গাড়ি থেকে নামলেন এক ভদ্রলোক। অসময়ে তাঁর চুল পেকে গিয়েছে, তাঁর স্ত্রী, আর কন্যা। ডাক্তারবাবুই জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, তিনিও গিয়েছেন সঙ্গে, জেলারের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই চলেছেন।

"দেখুন আজ আবার এক গরুরগাড়ি বোঝাই হয়ে এসেছে জখ্মী। হাসপাতালে তো বেড্ পাবার জায়গা নেই, তাই বারান্দায় পেতে দিয়েছি খাটিয়া। আজ সকালে সিভিল সার্জন এসে ফিরে গিয়েছেন, ঘরে ঢুকবার পথ না পেয়ে।"

জেলারটি বড় ভদ্র, তিনি মহিলাদের সঙ্গে খুবই ভদ্র ব্যবহার করছেন, আর বার বার তাকাচ্ছেন রাখালদাসীর দিকে। তাঁরও এত বড় একটি মেয়ে আছে, আজও তার বিয়ে দিতে পারেন নি, সেজন্য স্ত্রীর কাছে প্রতিদিন গঞ্জনা সহ্য করতে হচ্ছে তাঁকে। আজ তাঁর মনে হচ্ছে, ভাগ্যে বিয়ে হয়নি। বিয়ে হলে জামাইয়ের কি মতিগতি হ'ত কে জানে। দেশের হাওয়াটাই যেন কিরকম হয়ে গিয়েছে। সাহেব দেখে আর ভয় পায় না কেউ, বরং সাহেবরাই যেন ভয় পেয়ে গিয়েছে।

—ওয়েটিং রুমে দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়েছে। গোপেন এসে দাঁড়াল, জেল কয়েদীর জাঙিগয়া পরা, রুক্ষ চুল। গায়ে অনেক কালসিটের দাগ, বেশ ফুলে ফুলে রয়েছে কোন কোন দাগ।

রাখালদাসী যেন স্বামীর দিকে চাইতেই পারছে না, কিন্তু আর তো সময় নেই, এই আধ ঘণ্টা মাত্র সময়, এর মধ্যেই একবার দেখে নেবার সুযোগ যদি না নেয়, জীবনে হয়ত সে সুযোগ কোনদিনই পাবে না আর।

কিন্তু তার মা? একটুও যেন বিচলিত হননি। বাবা যখন 'বাবা গোপেন!' বলেই রুদ্ধবাক্ হয়ে থেমে গেলেন, মা তখন বেশ শান্ত দৃঢ়ভাবেই জানিয়ে দিলেন জামাইকে, "তোমাকে এই কথাটা বলবার জন্যই পাবনা থেকে এতদূর আসা। ওর অদৃষ্টে যা হবার তা তো হ'ল, এখন যেন কলংকও না সইতে হয় সে ব্যবস্থাও করে দিয়ে যাও। বোধহয় ওর ছেলেপিলে হবে, মাস তিনেক হ'ল বোধহয়। সেই যে ষষ্ঠীর সময় গিয়েছিলে তুমি, দুটি দিন ছিলে। সেই তো শেষ যাওয়া, আমারও শেষ জামাই নিমন্ত্রণ। যাক্, এ কথায় আর কাজ নেই, এখন দু' ছত্র লিখে দিয়ে যাও যে, যদি সন্তান হয়, ছেলে মেয়ে যাই হোক্, সে তোমারই সন্তান।"

জেলার কলম ও কাগজ এগিয়ে দিলেন, গোপেন স্বীকৃতিপত্র লিখে দিল।

পায়ের উপর পড়ে আছে কে? উপুড় হওয়া একটি দেহ, রুক্ষ চুলের রাশিতে পা ঢেকে গিয়েছে বন্দীর।

"জেলারবাবু!" গোপেন গলা পরিষ্কার করে নিল, "দেখুন তো, ইনি কি মূর্চ্ছা গিয়েছেন? ডাক্তারকে ডাকবার দরকার হবে কি?"

"না, দরকার হবে না, এই যে উঠে বসেছেন উনি।" জেলার বললেন। মনে মনে খুশীও হলেন। কোন হাঙ্গামা হয়নি।

হ্যাঁ, উঠে বসেছে রাখালদাসী, যদিও তার সর্বাঙ্গ তখন থর্ থর্ করে কাঁপছে। স্বামীকে সে অপ্রস্তুত করবে না এই বিদায়ের সময়। গোপেনেরই সহধর্মিণী সে।

তবু, তবুও আরও একবার যদি উপুড় হয়ে পড়তে পেত ওই দুটি পায়ের উপর, সেই সময় হয়তো দুটি ঠোঁটও ছোঁয়াতে পারবে পায়ে। শেষ বিদায়ের নীরব সম্ভাষণ।

কিন্তু তার আর সময় কই? সময় শেষ হয়ে গিয়েছে সাক্ষাতের।

জ্যাক অ্যাণ্ড জিল, হামটি ডামটি, উই উইলি উইংকে, এমনি আরও অনেকগুলি ইংরিজি রাইমস্-এর অনুবাদ—বাংলা ছড়ায়। অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর-এর দীর্ঘ ভূমিকাসহ

শ্রীসুকমল দাশগুপ্তের

বিলিতি ছড়া

দাম ১·২৫

দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

"জিজ্ঞাসা"য় খোঁজ করুন ঃ

১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভেনিউ, কলিকাতা-২৯

(সি-৮৭০১)

চিত্র প্রদর্শনী

এবছর নন্দলালের চিত্রপ্রদর্শনীর পর প্রায় প্রতি সপ্তাহেই অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস-এর ক্যাথিড্রাল রোডের নতুন বাড়িতে চিত্রকলা প্রদর্শনী লেগে রয়েছে। যে-ঘরটি অ্যাকাডেমী একক প্রদর্শনীর জন্যে রেখেছেন তার পরিবেশ অতি মনোরম সে বিষয় কোনই সন্দেহ নেই কিন্তু অনেক সময় দর্শকরা, যাঁরা প্রথম যান সেখানে তাঁদের পক্ষে প্রবেশপথ খুঁজে বার করা মুশকিল হয়। সুতরাং কিছু একটা নিশানার ব্যবস্থা থাকলে সুবিধে হয়। আরেকটি কথা, যাঁরা বড় ছবি আঁকেন তাঁদের পক্ষে কক্ষটি যথেষ্ট প্রশস্ত নয়। যাই হোক, আশা করি, অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস-এর কর্তৃপক্ষ এ বিষয় চিন্তা করে বড় ছবির প্রদর্শনীর জন্য আরও প্রশস্ত স্থানের ব্যবস্থা করবেন। অ্যাকাডেমীর এ বাড়ি মনে হচ্ছে, ক্রমশই শিল্পী মহলে এবং রসিক মহলে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। উপযুক্ত ব্যবস্থা হলে স্থানটি আশা করা যায় আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

এ সপ্তাহের আলোচ্য প্রদর্শনী হল, শ্রীমতী সরমা ভৌমিকের চিত্রকলা প্রদর্শনী। এ প্রদর্শনীটিও অনুষ্ঠিত হয় ঐ অ্যাকাডেমীর বাড়িতেই। আট বছর আগে সরমা ভৌমিকের ছবি দেখতে পাওয়া যায় প্রথম তাঁর একক প্রদর্শনীতে। এই আট বছরে শ্রীমতী ভৌমিক অনেক ছবিই এঁকেছেন।

স্নানার্থিনী —শ্রীমতী সরমা ভৌমিক

তার মধ্য থেকে পঞ্চাশখানি ছবি বাছাই করে এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়।

এই ছবির মাধ্যম জল রঙ এবং টেম্পারা। বিষয়বস্তু গ্রামের লোক, প্রকৃতির ঐশ্বর্য, ঘরোয়া পরিবেশ প্রভৃতি। তবে ইনি সাদৃশ্য সত্যসন্ধানী নন। বিকৃতিকরণেই ইনি আনন্দ পান। কোনও কোনও রচনায় লক্ষ্য করা যায় জ্যামিতিক সরল রেখা। এই সরল রেখার সাহায্যে যেসব ফর্মের সৃষ্টি হয়েছে তা প্রীতিকর হয়েছে কিনা বলতে পারি না (অন্তত আমার কাছে প্রীতিকর মনে হয় নি)। বেশীর ভাগ ছবিতেই ঠিক পেইন্টিং-এর মেজাজ যেন প্রকাশ পায় নি। বরং গল্পের ব্যাখ্যাকর চিত্রের মেজাজটাই স্পষ্ট। 'সিটি অ্যাট মিডনাইট' রচনাটিতে শিল্পী কিছুটা শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়া, ব্রেকফাস্ট, গসিপ, সামার এবং অন দি রিভার সাইড উল্লেখযোগ্য। শিল্পী এখনও নির্দিষ্ট কোনও ধারা গ্রহণ করতে পারেন নি। কখনও পটশিল্পের দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন (দি লালাবাই), কখনও অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টে আকৃষ্ট হয়েছেন আবার কখনও বা শান্তিনিকেতনের প্রভাব এসে পড়েছে।

শ্রীমতী ভৌমিকের শিল্পীসত্ত্বা অনস্বীকার্য। তবে কোন্ পথে গেলে শিল্পের পরম মণিটি আবিষ্কার করত পারবেন সে পথ ইনি এখনও খুঁজ পান নি। ইনি কোনও স্কুলে বা কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে শিল্প শিক্ষা লাভ করেছে কিনা জানি না (শিল্পীকে এ প্রশ্ন করবার সুযোগ আমার হয় নি করণ তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নি)। আমার মনে হয়, উপযুক্ত পথ-নির্দেশ পেলে শ্রীমতী ভৌমিক যথার্থ রসোত্তীর্ণ শিল্প রচনা অবশ্যই করতে পরারেন।

রবীন্দ্র চক্রবর্তীর পঞ্চাঙ্ক নাটক

আড়ৎদার পড়ুন, ভাবুন অভিনয় করুন

চক্রবর্তী ব্রাদার্স ঃ দেড় টাকা

৩৮, সুকিয়া স্ট্রীট ঃ কলিকাতা-৯

(সি ৪৮১১)

দি রিলিফ

২২৬, আপার সার্কুলার রোড

এক্সরে, কফ প্রভৃতি পরীক্ষা হয়

দরিদ্র রোগীদের জন্য—মাত্র ৮ টাকা

সময় :—সকাল ৯টা থেকে ১২-৩০ ও

বৈকাল ৪টা থেকে ৭টা

॥ ৮ ॥

দাদামশার মুখে প্রায়ই শুনেতুম—গল্পের সেরা গল্প আরব্য উপন্যাসের গল্প। ওর মত গল্প হয় না। অমন গল্প কোনো সাহিত্যে কোনোদিন লেখা হয়নি। প্রায়ই আরব্য উপন্যাস পড়তেন। ইংরিজীতে মোটা মোটা কয়েক খণ্ড বার্টন-এর সচিত্র 'অ্যারেবিয়ান নাইটস্'; রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের তিন খণ্ড আরব্য উপন্যাস; বটতলার একাধিক সহস্র রজনী; তাছাড়া উর্দু কিতাবের দোকান থেকে উর্দু ভাষায় আরব্য উপন্যাসের গল্প কিনে আনতেন।

সেই আরব্য উপন্যাসের আলিবাবার গল্প। দস্যুদের গুহায় ঢুকে 'চিচিং ফাঁক' মন্ত্র ভুলে গুহায় আটকা পড়ে কাসেম দস্যুদের হাতে ধরা পড়ে যায়। দস্যুরা তাকে চার টুকরো করে কেটে গুহার গায়ে লটকে দেয়। আলিবাবা সেই কাটা দেহ গাধার পিঠে চাপিয়ে বোগদাদে ফিরে এসে চুপি চুপি এক দর্জির বাড়ি গিয়ে দর্জিকে দিয়ে কাসেমের কাটা দেহ শেলাই করিয়ে নিয়ে যায়।

এই দর্জির ছবি দাদামশায় আঁকছেন। আরব্য উপন্যাসের ছবি তখন একটার পর একটা আঁকা চলেছে, এটা তারই একটা। আঁকছেন তো আঁকছেন, কিন্তু পছন্দ আর হচ্ছে না। মন খুঁত-খুঁত করছে। তুলি তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছেন ছবিখানা—কি হয়েছে ধরতে পারছেন না। আমাদের দেখান মাঝে মাঝে—দেখ্ তো, কি দোষ হয়েছে ছবিটার? আমরা কি বলব? দিব্যি হচ্ছে, দোষ আবার কোথায়?

প্রশান্ত রায় সে সময় প্রায় রোজই দাদামশার টেবিলের পাশে বসে বসে ছবি আঁকা দেখতেন। প্রশান্তবাবু তখন আজকের দিনের মতো এত বড় শিল্পী হননি। সবে তখন তাঁর শিক্ষানবিশী শুরু হয়েছে। শিক্ষানবিশী মানে, ঐ দাদামশার পাশে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছবি আঁকা দেখা। ঐ থেকে যা কিছু সংগ্রহ হয়। দাদামশার শেখাবার পদ্ধতিটাই ছিল ঐরকম। বলতেন ঘাড় ধরে কি আর কিছু শেখানো যায়? নিজে নিজেই শিখে নিতে হবে।

প্রশান্তবাবুকেও বলেন—দেখ তো, ছবির এইখানটায় কি যেন হয়েছে। ছবির নীচে একটা জায়গা বার করে দেখান। উপরে খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে দেখা যায় বুড়ো দর্জি সূক্ষ্ম ছুঁচের ফোঁড় দিয়ে শেলাই করে চলেছে। নীচে তিন দস্যু নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করছে। তারা বোগদাদে এসেছে কাসেমের মৃতদেহ কে চুরি করে এনেছে—তাকে খুন করতে। প্রশান্তবাবু বলেন—কেন, ঠিক-ই তো আছে। আমি তো কিছু দেখছি না।

দাদামশার খুঁত-খুঁতানি যায় না। ছবি এঁকে চলেছেন, মনে কিন্তু স্বস্তি নেই।

দু'দিন গেল এইভাবে। রং-এর পর রং চড়তে লাগল ছবিতে। ছবি প্রায় শেষ হয়-হয়। সেদিন বিকেলে রাধু এসেছে দাদামশার সরবত নিয়ে। রাধু আসতে ছবিটা উল্টিয়ে রাধুর দিকে এগিয়ে বললেন,—দেখ তো রাধু। ক'দিন ধরে আঁকচি ছবিটা, পছন্দ হচ্ছে না ঠিক। ছবির এইখানটা কি-একটা হয়েছে!

রাধু তো আর চিত্রকর হবার জন্যে ছবি আঁকার সাধনা বা শিক্ষানবিশী করছে না। তার কোনো ভয়-ডর নেই। সে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না-করে বলে দিল,—ঐ নীচের লোক তিনটে কি-রকম যেন!

দাদামশায় লাফিয়ে উঠে বললেন—ঠিক বলেছিস্! বলে পাথরের গেলাস ধরে চোঁ করে সরবতটা খেয়ে নিলেন।

—দেখলে প্রশান্ত! রাধুর চোখ আছে। ঐ লোক তিনটের জন্যেই যত কিছু গোল।

সমস্যা মিটে গেল।

প্রশান্তবাবু নির্বাক। নীচে গোটা-তিনেক লোক দিব্যি আঁকা হয়ে গিয়েছিল—রং-টং দিয়ে একেবারে ফিনিশ—এখন কিনা বলেন, ঐ তিন-মূর্তিই যত দোষের মূল!

রাধু সরবত খাইয়ে চলে গেল। আলো কমে আসছিল বলে সেদিনকার মতো ছবি আঁকাও বন্ধ হল।

তার পরদিন প্রশান্তবাবু এলে অন্য-দিনের মত দাদামশার টেবিলের পাশে ছবি দেখতে বসেছেন। ছবি আর চিনতে পারেন না। সে লোক তিনটে বেমালুম অদৃশ্য হয়েছে। তাদের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। দাদামশায় খুব খুশী। বললেন,—দেখ এইবার। ছবির দোষ ক্ষয় করে দিলুম। রাধু ধরেছে ঠিক। ঐ লোক তিনটেই গোল করছিল। দিলুম উড়িয়ে।

আরব্য উপন্যাসের ছবি যখন তেজে আঁকা চলেছে, তখন এক-একটা ছবি আঁকতে দাদামশার পাঁচ-ছ'দিন লাগত। কিন্তু প্রথম ছবিটা—যেখানে উজির-কন্যা শাহ্জাদী বাদশাকে গল্প বলছেন, সেখানা

একবার আঁকতে শুরু করে আর শেষ হতে চায় না। কুড়ি দিনের উপর লেগেছিল সেটাকে শেষ করতে। এমন ঘষা ঘষেছিলেন যে, ভিজলে ব্লটিং পেপারের মত দেখাতো। ছবিটা একবার করে জলে ডুবতো আর প্রশান্তবাবু দেখে ভয়ে কাঁপতেন—এই ছিঁড়ে যায় বুঝি! কিন্তু শুকোলেই আবার বেশ খড়খড়ে হয়ে উঠত।

এইভাবে আরব্য উপন্যাস সিরিজের ছবি আঁকা শুরু হয়। কয়েকটি ছবি হয়ে যাবার পর জসিমউদ্দীন একদিন এসে হাজির। দাদামশায় হাতে তখন তুলি রং কাগজ। জসিমকে দেখে বললেন—দেখ হে জসিমউদ্দীন, তোমাদের আলিফ্ লায়লা-ওয়া-লায়লার ছবি আঁকচি।

জসিমউদ্দীন কিছুই বুঝতে পারলে না।

দাদামশায় বললেন—নাঃ, এ নামেই

ভিম ব্যবহার করলে পরে
-দেখুন কেমন ঝলমল করে

ভিম অল্প একটু ব্যবহার করলে পরেই সবজিনিষের চেহারা বদলে যায়। মেঝে, বাথরুমের বেসিন ও সিঙ্ক, থেকে, রান্নার হাঁড়ী, ডেক্‌চী, বাসন-কোসন, কাঁচের ও চায়ের বাসন—সবই এক নতুন রূপ নেবে। ভিম দিয়ে পরিষ্কার করলে জিনিষপত্রে কোন রকম আঁচড় লাগে না। আর কত সোজা ও কম খাটুনিতে হয় ভেবে দেখুন। ভেজা ন্যাকড়ায় একটু ভিম দিয়ে আস্তে আস্তে ঘষুন—দেখবেন যত ময়লা আর দাগ নিমেষের মধ্যে মিলিয়ে যাবে। ভিম ব্যবহার করলে আপনার বাড়ী আপনার গর্বের কারণ হবে।

ভিম সবজিনিষেরই উজ্জ্বলতা বাড়ায়

V.42 X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড দ্বারা প্রস্তুত।

মুসলমান—উর্দুর কিছুই জানো না দেখছি। আরব্য উপন্যাস হে আরব্য উপন্যাস। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের আরব্য উপন্যাসের নাম শুনেছ?

জসিমউদ্দীন ততক্ষণে যে-কটা ছবি আঁকা হয়েছে, উল্টেপাল্টে একমনে দেখতে শুরু করেছে। দেখছে আর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। আমাদের জিজ্ঞেস করছে—কবে আঁকা শুরু করলেন এসব?

জসিমউদ্দীন আমাদের বাড়িতে এসে অবধি দাদামশাকে ছবি আঁকতে দেখেনি। সে যে সময় আমাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া শুরু করেছে, সে সময়টায়, কি-একটা হয়েছিল, দাদামশায় ছবি আঁকতেন না। লিখতেন, কিন্তু তুলি প্রায় ধরতেনই না। অনেক দিন এইভাবে ছবি আঁকা বন্ধ থাকার পর হঠাৎ আরম্ভ করেছেলিন আরব্য উপন্যাসের সিরিজ। আর আরম্ভ করেই এই অবারিত স্রোত! তাছাড়া এবারকার ছবিগুলি একেবারে নতুন ধরনের—এর আগে কখনও এই ধাঁচে ছবি আঁকেন নি।

জসিমউদ্দীন বললে,—আর কতগুলো এইরকম ছবি আঁকবেন দাদামশায়?

—সমস্ত এঁকে ফেলব। আরব্য উপন্যাসের কিছু বাদ রাখব ভাবছ নাকি? একাধিক সহস্র রজনী যেমন গল্পে গল্পে ভরে দিয়েছিল, তেমনি আমি ছবিতে ছবিতে ছেয়ে দেব।

জসিমউদ্দীন বললে—অতগুলি ছবি আপনি আঁকতে পারবেন?

—নিশ্চয় পারবো। ভাবছ কি তুমি! দেখে নিও!

—আরো ছেলেবেলায় যদি আরম্ভ করতেন বুঝতুম। কত দিন লাগবে আপনার সব ছবি আঁকতে ভেবেছেন? সমস্ত আরব্য উপন্যাস!

—যতদিনই লাগুক না, হয়েছে কি? হাত ব্যথা হয়ে যাবে ভাবছ? এই তো সবে শুরু। এখনও বাকী আলাদিন, আবু হোসেন, হারুন-অল-রশিদ। তারপর চার মাছের গল্প, উড়ন্ত কার্পেট, সিন্দবাদ নাবিক। তিন আপেলের একটা গল্প আছে। তিন বোনের একটা গল্প। চীন-রাজকন্যার গল্প পড়েছ? ন-টা পুতুলের গল্প আছে—তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে নামই শোনোনি কোনোকালে।

জসিমউদ্দীন বললে—এক-একখনা ছবি আঁকতে আপনার কতদিন লাগছে বলুন তো? এক হাজার ছবি আঁকতে আপনার কত বছর লাগবে তাহলে? একটা জীবনে কুলোবে?

দাদামশায় ছবি থেকে তুলি উঠিয়ে নিয়ে জসিমউদ্দীনের দিকে চেয়ে বললে—জসিমউদ্দীন, তুমি এখনও দেখছি জানো না যে, আর্টিস্ট যখন ছবি আঁকতে বসে তখন সে সময়ের হিসেব করে না। রং হাতে নিয়ে সে দেখে তার সামনে পড়ে আছে অনন্ত সময়, অক্ষয় জীবন। কোনোদিন তা শেষ হবে না। এই তুলি আর ঐ রং, এরও কোনো ক্ষয় নেই। কবিতা লিখেচ। যাও এই সাধনা করগে এবার।

আরব্য উপন্যাসের ছবি দাদামশায় সবসুদ্ধ সাঁইত্রিশখানা এঁকেছিলেন। কিন্তু তা হাজারখানা ছবিরই সামিল।

দাদামশায় তাঁর রং-এর বাক্সকে বলতেন অক্ষয় তূণ। ছেলেবেলায় আমরা অবাক হয়ে দেখতুম, দাদামশায় কত ছবি আঁকেন, কিন্তু তাঁর রং ফুরোয় না। অথচ আমাদের জন্যে চাঁদনী থেকে রকম বেরকমের কেক-সাজানো যে রং-এর বাক্স আসত, তা জলে গুলে আর তুলির খোঁচায় শেষ করে দিতে কতটুকুই-বা সময় লাগত আমাদের? দাদামশায় মাঝে মাঝে রং-ভরা বাক্স, চওড়া-মুখ কাঁচের শিশি-ভরা রং-এর কাস্কেট এর-ওর কাছ থেকে উপহার পেতেন। সে-সব তিনি যেমন-কে-তেমন তুলে রেখে দিতেন। কদাচিৎ হয়তো বার করে ব্যবহার করতেন এক-আধবার। ছবি আঁকতেন সব সময় সেই পুরোনো রং-এর বাক্স থেকে। ছেলেবেলায় আমরা সত্যিই বিশ্বাস করতুম। অক্ষয় তূণ। দাদামশার রং ক্ষইতো না।

একবার একটি ছেলে এসে উপস্থিত দাদামশার কাছে। একেবারে অচেনা। সটান হাজির দক্ষিণের বারান্দায়। বগলে এক-গাদা কাগজ, কাঁধে একটা ময়লা থলি। ঢিপ্ করে একটা প্রণাম করেই বলে—ছবি আঁকা শিখতে এলুম।

আমরা ছিলুম তখন সেখানে। দেখলুম দাদামশায় চটেছেন। ঐরকম হঠাৎ গায়ে-পড়া বা নিজেকে-জাহির-করা লোক একেবারেই পছন্দ করতেন না।

পা গুটিয়ে নিয়ে চশমার মধ্যে দিয়ে একটু ট্যারচা চেয়ে বললেন—কে তুমি?

ছেলেটি দাদামশার গলার স্বরে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললে—আজ্ঞে, আমার ছবি আঁকা শেখার খুব ইচ্ছে, তাই এসেছি। কিছু কিছু চর্চা করেছি নিজে থেকেই।

দাদামশায় বললেন—তা আর্ট স্কুলে গেলেই তো পারো, এখানে কেন?

ছেলেটি দেখলে তার আপ্যায়নটা যেমন হবে ভেবে এসেছিল, ঠিক তেমনধারা এগচ্ছে না। সে নরম হয়ে বললে—আমার ছবি যদি একটু দেখেন, তাহলে হয়তো... আপনার কাছেই এসেছি কিছু শিখতে।

চটে গেলেও ছবি দেখবার ঔৎসুক্য দাদামশার খুব—যেমনই ছবি হোক না। বললেন—দেখি কি ছবি এনেছ, বার কর তোমার থলি থেকে।

ছেলেটি কিন্তু ছবি কিছুই আনেনি। থলির মধ্যে তার রং-তুলির সরঞ্জাম। এঁকে কিছু দেখাতে চায়। সঙ্গে কাগজও আছে। দেখুন নিজের চোখে শিল্পগুরু তার বাহাদুরী!

দাদামশায় বললেন—বুঝেছি! ওরে ঐদিকের ঐ চেয়ারখানা সরিয়ে দে তো। ছবি লেখো তুমি ঐখেনে বসে, আমি ততক্ষণ ঘুরে আসছি।

বারান্দার দক্ষিণে রেলিং-এর ধারে মেঝের উপর ছেলেটির বসবার জায়গা করে দেওয়া হল। এক গামলা জল দেওয়া হল তাকে। শানের উপর কাগজ বিছিয়ে ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকা শুরু করে দিল।

দাদামশায় উঠে পড়লেন। চললেন বাগানে। সঙ্গে নিয়ে চললেন আমাদের।

—চল্ তোরা। আঁকুক নিজের মনে বসে-বসে ছবি। গোল করিসনে।

নতুন শিষ্য কেমন, কেমন তার হাত, এসব দেখবার কোনরকম উৎসাহ প্রকাশ করলেন না। বাগানের বেঞ্চিতে বসে একটা

ধবল বা শ্বেত

শরীরের যে কোন স্থানের সাদা দাগ, একজিমা, সোরাইসিস ও অন্যান্য কঠিন চর্মরোগ, গাত্রে উচ্চবর্ণের অসাড়যুক্ত দাগ, ফুলা আঙ্গুলের বক্রতা ও দূষিত ক্ষত সেবনীয় ও বাহ্য দ্বারা দ্রুত নিরাময় করা হয়। আর পুনঃ প্রকাশ হয় না। সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ফোন : ৬৭-২৩৫৯। শাখা : ৩৬ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯। (পূরবী সিনেমার পাশে)।

বর্মা চুরুট বার করে ধরালেন। বসে বসে সমস্ত চুরুট শেষ করে তারপর উঠলেন। আমরাও পিছু নিলুম। বারান্দায় পেঁাছে দেখি ছবি তৈরী। ছেলেটি খুশী-খুশী মনে বসে। মেঝের উপর দুটো-তিনটে রং-এর প্যালেট—তাদের গা দিয়ে রং-গোলা জল উপচে মেঝের উপর গড়াচ্ছে। রেলিং আর থামের গায়ে প্রচুর লাল আর সবুজ রং-এর ছিটে। ছেলেটির জামায় রং, হাতায় রং, আঙুলে রং। দাদামশার এক গামলা পরিষ্কার জল গাঢ় খয়রিটে-সবুজ বর্ণ ধারণ করেছে। মহা-উৎসাহের চোটে আশপাশের যতকিছুর উপর তার রং-এর আর প্রাণের প্রাচুর্য ফেলে ছড়িয়ে তছনছ করে বসে আছে তরুণ চিত্রকর, এটা বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না। ছবিটা হয়তো মন্দ হয়নি, কিন্তু দাদামশার মুখ দেখলুম থমথমে।

বললেন, বেশ নিষ্ঠুরভাবেই বললেন—খুব হয়েছে। আর ছবি আঁকতে হবে না। রং-এর দাম যে বোঝে না, তার হাতে তুলি মানায় না। এই নাও এই ন্যাকড়া দিয়ে আমার বারান্দাটা পরিষ্কার করে দিয়ে বাড়ি চলে যাও।

বলে তাঁর দেরাজ থেকে মইক্রোসকোপ-এর কাঁচ-মোছা একটা কাপড় বার করে ফেলে দিলেন। ছবিটার দিকে একবার দেখলেনও না।

ছেলেটি মুখ চুন করে বারান্দা মুছে তার রং-এর প্রাচুর্য গুটিয়ে নিয়ে চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল।

দাদামশায় বললেন—রং-এর দাম যেদিন বুঝবে, সেদিন আবার এসো।

ছেলেটি কিন্তু আর কোনোদিন আসেনি। আমি অন্তত দেখিনি। তার নাম-ও কারুর জানা নেই। ভবিষ্যৎ-জীবনে সে রং-এর মূল্য বুঝেছে কিনা, অথবা মূল্যের প্রতীক্ষা না-করেই বড় শিল্পী হয়ে গেছে কিনা, তারও খবর পাইনি।

একবার যখন মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের কথা সবার মুখে মুখে, বিলিতী কাপড় বর্জন করে লোকে খদ্দর পরছে, সিগারেট ছেড়ে দিয়ে ধরছে বিড়ি, সেই সময় দাদামশায় বললেন—সিগারেট তো আমি খাই না, বর্মা চুরুট খাই, অম্বুরী তামাক খাই, দুটোই খাঁটি স্বদেশী। তবে বিলিতী মার্কিনের ইজের কামিজ ছেড়ে দিয়ে খদ্দর পরতে বলো, পারবো না, গায়ে ফুটবে। তার চেয়ে আমার বিলিতী রং-এর বাক্স আমি ত্যাগ করচি—দিশী রং-এ ছবি আঁকব।

এই বলে ক্ষিতীশকে হুকুম দিলেন—যাও, বড় রাস্তার মোড় থেকে গুঁড়ো রং কিনে নিয়ে এস যত রকম পাওয়া যায়। আমাদের বললেন—আয় তোদের শিখিয়ে দিই, দিশী রং কি করে তৈরী করতে হয়।

ক্ষিতীশ এলা মাটি আনল, গেরী মাটি আনল, ভূষো কালি আনল, খয়ের আনল, এগুলো ধরা যাক খাঁটি স্বদেশী, কিন্তু আরো যা সব গুঁড়ো এল রং-এর দোকান থেকে—কমলা, লাল, নীল, সবুজ, হলদে সেগুলো বোধ করি জার্মান বা বিলিতী মোড়ক থেকে বার করা। কিন্তু দেশী রং করার উৎসাহে তখন ও-সব ছোটখাট বিষয় নিয়ে আমরা কেউ মাথা ঘামালুম না। পাড়ার বাঙালী রং-এর দোকান থেকে এসেছে—স্বদেশী হবার পক্ষে এই যথেষ্ট।

রং তৈরী শুরু হল। ছোটদের দল সবাই লেগে গেলুম আমরা এই স্বদেশী কারখানায়। গুঁড়ো রং বেটে গঁদ আর গ্লিসারিন মিশিয়ে কেমন করে রং-এর কেক তৈরী করতে হয় দাদামশায় জানতেন। আরো কি-সব মেশাতে লাগলেন নিজের মাথা থেকে বার করে। উৎসাহের চোটে গঙ্গামাটি দিয়ে একটা রং তৈরী করলেন। বললেন—বাস্ আর রং মিশিয়ে মিশিয়ে মাটি আঁকতে হবে না। এইটে গুলে লাগিয়ে দেব এবার থেকে।

কতকগুলি রং এর মধ্যে সত্যি খুব ভালো হয়েছিল। অনেক ছবি এঁকেছিলেন এই রং দিয়ে। নীল রংটা আশ্চর্য রকম উৎরে গিয়েছিল। বহুদিন ছিল এই রংটা—অল্পে অল্পে খরচ করতেন। বলতেন—নীল-বড়ি। নীল-সায়েবদের আসল নীলের মতো রংটা হয়েছে। বিলিতী বাক্সে ও রং পাওয়া যায় না।

গঙ্গামাটির রং দিয়ে ছবি এঁকেছিলেন এ সময়। সে-ছবি এখনও কিছু কিছু আমাদের কাছে আছে। নীল-বড়ি দিয়ে পাহাড়ী কুটিরের একখানা ছবি এঁকে চারুদিদিকে দিয়েছিলেন। আশ্চর্য গুণ ছিল সেই রংটার। চারুদিদির বাড়ি যতবারই গেছি, দেখতুম নীল রংটা যতদিন যাচ্ছে, ততই যেন উজ্জ্বল হচ্ছে। এই সময় রং-এর চর্চা চলেছিল অনেকদিন। শুধু ছবি আঁকার রং নয়, কাপড় ছোপাবারও নানারকম দেশী রং দাদামশায় খুঁজে বার করেছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের লেখা 'দেশী রং' নামে একখানি বই এই সময় বেরয়। তার থেকেও অনেক তথ্য পেয়েছিলেন দাদামশায়। দিদিমার জন্যে একবার একটা কাপড়ের টুকরো টকটকে লাল রং-এ ছাপিয়ে দিয়েছিলেন। সেটা যখন ধোপার বাড়ি থেকে ফিরল, তখন দেখা গেল কাপড়ের টুকরোটা রং-ফিরিয়ে গরগরে হলদে হয়ে গেছে। তখন সকলের সে কি হাসি!

এই সময় আমাদের বাগানের মাধবী লতার ফলগুলি ফেটে তার থেকে তুলো বেরিয়ে বাগানে উড়তে আরম্ভ করল। আমরা তাদের পিছনে পিছনে ছুটলুম ধরবার জন্যে। দাদামশায় দেখে বললেন—নিয়ে আয় একগোছা তুলো, দেখা যাক স্বদেশী তুলি করা যায় কিনা। আমরা মাধবী লতায় চড়ে শুকনো ফল ফাটিয়ে নরম পালকের মত একমুঠো তুলো সংগ্রহ করে দাদামশায়কে দিলুম। সেগুলি তিনি সরু সরু তুলির মত করে সুতো দিয়ে কয়েকটা বেঁধে ফেললেন। তারপর বাগানের চীনে বাঁশের ডগা কেটে কয়েকটা তুলির বাঁট তৈরী হল। তাইতে তুলির গোড়াগুলি ঢুকিয়ে দিয়ে ঝাউ গাছের আঠা আর গালা দিয়ে জুড়ে দেওয়া হল। সাদা ধবধবে তুলি তৈরী হল কতকগুলি।

কিন্তু জলে ডুবিয়ে রং তুলতে গিয়ে দেখা গেল মাধবীর ফুলও যেমন কোমল, মাধবীর তুলোও তেমনি নরম। জলে ডুবিয়ে রং তুলতে গেলে নেতিয়ে পড়ে। আঁচড় টানা তো যায়ই না, রংই উঠতে চায় না তুলির মাথায়। একেবারে জলে-ভেজা তুলো। দাদামশায় কয়েকবার চেষ্টা করে বিরক্ত হয়ে শেষে ছেড়ে দিলেন। বললেন—বাগানে কাঠ-বেরালী থাকলেও না-হয় দু-একটার ল্যাজ কেটে দেখতুম। তা তো নেই। গাছের তুলো দিয়ে ছবি আঁকার তুলি হয় না—একটা শিক্ষালাভ করা গেল। (ক্রমশ)

সাগরের জীবনের নিরাপত্তা

রামেশ্বর ভট্টাচার্য

সুদূর অতীতকাল থেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যাপারে সাগরপথ ব্যবহারের প্রচলন দেখা যায় বটে, কিন্তু সাগরে জীবন নিরাপত্তামূলক বিধিব্যবস্থা খুব বেশী-দিনের নয়। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সংগে সংগে সাগরে দুর্ঘটনার আশংকা আগের চেয়ে অনেক পরিমাণে কম বলে প্রতীয়মান হলেও একেবারে লোপ পায়নি। সমুদ্র পথযাত্রীদের নিরাপত্তায় পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে এখনও সচেষ্ট। অথচ আন্তর্জাতিক জলপথ ব্যবহার প্রসংগে দেশবিদেশে যে সব বাধা-নিষেধের অস্তিত্ব দেখা যায়, তার পরিপ্রেক্ষিতে সমুদ্রে নাবিক এবং যাত্রীসাধারণের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক স্তরেই বলবৎ থাকা উচিত।

গত শতাব্দীর শেষ পর্যায় থেকে জাহাজ-শিল্পে যে সমস্ত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে "সাগরে জীবনের নিরাপত্তায়" যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। আন্তর্জাতিক জলপথে জাহাজ চলাচলে স্বভাবতই যে সকল সমস্যা দেখা যায়, আপাতদৃষ্টিতে তাদের সমাধান নির্ণয় নিতান্তই দুরূহ বলে প্রতীয়মান হয়। যেহেতু নিরাপত্তামূলক সমস্যাগুলি কোন একটি বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সেজন্যও যে কোন সমাধান প্রচেষ্টা একান্তই কষ্টকর। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, জাহাজের দেহ, এঞ্জিন, মাল বোঝাই এবং খালাসের নিমিত্ত যন্ত্রপাতি, গুদামজাত মালপত্র এবং নাবিক-দের স্বাভাবিক যোগ্যতা নিরাপত্তামূলক বিধিব্যবস্থায় বিশেষ স্থান অধিকার করে। জাহাজ এবং জাহাজে গুদামজাত মালপত্র সম্বন্ধে জাহাজ কোম্পানীর দৃষ্টি সজাগ থাকলেও নাবিক এবং ভ্রমণকারী যাত্রীদের নিরাপত্তা বিষয়ে সর্বসাধারণের বিশেষ অবহিত হওয়ার আবশ্যকতা কোনমতেই উপেক্ষনীয় নয়। জাহাজ অথবা অপরাপর অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতি কোনসময়েই অপূরণীয় বলে বিবেচিত হয় না, কিন্তু সুদূর মহাসাগরে ভাসমান জাহাজে যে সকল সাহসী নাবিক জীবন বিপন্ন করে জাতীয় উন্নয়নে অংশ গ্রহণ করেন, তাঁদের অথবা শিশু ও নারীসহ যাত্রীদের নিরাপত্তায় যে মানবিকতার আবেদন রয়েছে, তা নিতান্ত বিশেষ কোন কর্মপ্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবিশেষের উপর ন্যস্ত হওয়া অপেক্ষা আন্তর্জাতিক-স্তরে তার বিধিব্যবস্থা অবলম্বন যে অধিকতর বাঞ্ছনীয়, সে কথা সর্বপ্রথম বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সকল রাষ্ট্রই স্বীকার করেন।

সরকারীভাবে আইন প্রণয়নের দ্বারা সাগরে জীবন নিরাপত্তার প্রথম প্রচেষ্টা দেখা যায় বৃটেনে ১৮৯০ সালে। কিন্তু ইউরোপের জার্মানী ব্যতীত অপরাপর সমুদ্রমাতৃক দেশে এই বিষয়ে বিশেষ তৎপরতার অভাব দেখা যায়। ১৯১২ সালে "টাইটানিক" জাহাজ নিমজ্জনের ফলে সমগ্র জগদ্ব্যাপী যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়, তার ফলে ১৯১৪ সালে লণ্ডনে "সাগরে জীবনের নিরাপত্তা" এই নামে প্রথম আন্তর্জাতিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার জন্য এবং কতকগুলি বিধিব্যবস্থায় বিশেষ জোর দেওয়া হয় বলে এই অধিবেশনে অস্থায়ী-ভাবে স্বীকৃত প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়নি। "টাইটানিক" নিমজ্জনের ফলে নৌ-নির্মাণবিজ্ঞানের উন্নতির এবং প্রথম মহাযুদ্ধের শেষভাগে কয়লা এবং তৈল রপ্তানীর ব্যাপারে জাহাজে অগ্নি-নির্বাপক সরঞ্জামের যথেষ্ট প্রয়োজন দেখা যায়। অধিকন্তু তরল পদার্থ এবং শস্যজাত মাল আমদানী রপ্তানীর কাজে জাহাজের ভারসাম্য রক্ষায় নৌনির্মাণ বিজ্ঞানের যে সমস্ত নূতন পরিস্থিতির আবির্ভাব হয়, তার সমাধানকল্পেও বিশেষ বাধানিষেধ আরোপ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অবশ্য একথা কোনমতেই অস্বীকার করা চলে না যে, অধুনালব্ধ অভিজ্ঞতার জন্য যে ক্ষতির পরিচয় পাওয়া যায়, তার পরিমাণ মোটেই সামান্য নয়।

সেইজন্য পুনরায় ১৯২৯ সালে লণ্ডনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সম্পূর্ণ নূতনভাবে "সাগরের জীবনের নিরাপত্তা"র বিধিব্যবস্থা উপস্থাপিত করা হয়। এই সম্মেলনে যাত্রীবাহী জাহাজের নিমিত্ত কঠোর নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অনুমোদন করা হয়। বারোজনের অধিক যাত্রীবাহী যে কোন জলযান সকল কঠোর ব্যবস্থার আওতার মধ্যে পড়ে। উপরন্তু জাহাজের আয়তন এবং যাত্রীসংখ্যা নিরাপত্তামূলক সকল ব্যবস্থার [illegible] "নির্দেশক" বলে পরিগণিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাহাজ চালনা-জনিত যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা হয়, তার ফলে যুদ্ধোত্তর যুগে ১৯২৯ সালের অনুমোদিত নিয়মাবলীর পুনরায় পরিবর্তনের দরকার পড়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ-ভাগে রেডার এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নৌচালনা ক্ষেত্রে যে যুগান্তর আনয়ন করে, সাগরে জীবন নিরাপত্তায় তাদের অবদান আজ বিশেষভাবে স্বীকৃত। ১৯৪৮ সালে "সাগরে জীবনের নিরাপত্তা" বিষয়ক তৃতীয় অধিবেশনে যে সব নূতন আইন প্রণয়ন করা হয়, তা সহজেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে। এই সংগে বিশেষ স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, উপরোক্ত অধিবেশনসমূহে অনুমোদিত সকল ব্যবস্থা অবশ্যই জাহাজশিল্পের অর্থনৈতিক সাফল্যের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল ছিল। সেইজন্য তীর্থদর্শনার্থীদের জন্য নিযুক্ত জাহাজসমূহ কিংবা যে সকল জাহাজে ডেকের ওপর যাত্রীদের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করা হত সেই সকল জাহাজসমূহ এবং মাছ ধরা জাহাজগুলি ১৯১৪, ১৯২৯ ও ১৯৪৮ সালের অধিবেশনে অনুমোদিত ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বহির্ভূত ছিল। ১৯৪৮ সালে অনুমোদিত নিয়মাবলী নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল নাঃ—

(১) যুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত জলপোত ও সৈন্যপরিবহণকারী জলযান।

(২) ৫০০ টনের কম আয়তনের মাল-বাহী জলযান।

(৩) প্রাচীন পদ্ধতিতে নির্মিত কাঠের জলযান।

(৪) যন্ত্রের দ্বারা চালিত নয় এমন জলযান।

(৫) প্রমোদবিহারে নিযুক্ত জলযান যখন ব্যবসায়ে লিপ্ত নয়।

(৬) মাছ ধরার কাজে নিযুক্ত জলযান।

এছাড়াও উত্তর আমেরিকার বৃহৎ হ্রদ অঞ্চলে চলাচলের জন্য নিযুক্ত জলযানগুলি অধিবেশনে নির্দিষ্ট বিধিব্যবস্থার অন্তর্গত ছিল না।

সাধারণভাবে জাহাজের নিরাপত্তা যে সমুদয় বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করে, তার বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত করা হল।

(১) পরিবহণ রেখা—বিভিন্ন ভৌগোলিক ও ঋতু অনুযায়ী প্রত্যেক জাহাজে যে "পরিবহণ রেখা" নির্দিষ্ট করা হয়, তা সেই জাহাজের সর্বোচ্চ গভীরতা নির্ণয় করে। এই নির্দিষ্ট সীমারেখার বিশেষ তাৎপর্য এই যে, কোন জাহাজে উপরোক্ত সীমারেখা পর্যন্ত মাল বোঝাই হলেও জলের ওপর ভেসে থাকার জন্য জাহাজের গুণাবলী যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকে এবং সাগরে

Government Library Cooch Behar

চলাচল সময়ে ঢেউএর আঘাতে জাহাজের দেহের ক্ষতিগ্রস্ত হবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে না। অধিকন্তু জাহাজের ডেকে চলা-ফেরার জন্য নাবিকদের কোনরূপ বিপদের সম্মুখীন হতে হয় না। অতিরিক্ত মাল বোঝাই-এর ফলে যদি কোন জাহাজের "পরিবহণ রেখা" জলের নীচে চলে যায়, তবে জাহাজের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। "পরিবহণ রেখা" নির্দিষ্ট করার ফলে জাহাজের অভ্যন্তরভাগ বা আবহাওয়া ডেকে জল-প্রবেশের সম্ভাবনা থাকে না। কোন জাহাজের ডেকের ওপর কাঠ বোঝাই করা হলে, অথবা তৈলবাহী জাহাজের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গভীরতা সামান্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা হয়।

(২) ভারসমতাঃ—১৯২০ সালের পূর্বে জাহাজের ভারসাম্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হত না। এই সময়ে কয়েকটি জাহাজের (বিশেষত কয়লাবাহী) নিমজ্জনের কারণ অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয় যে, জাহাজের

কামিনীকদম—ভি. অভদূতের 'লাখোঁ কি কাহানী' ছবিতে

সোনার মেয়ের হরিণ চোখে রূপের নাচন দেখে, শিউলী শাখে কোকিল ডাকে, মনমাতানো সুরে···নাচিয়ে হৃদয় বনের ময়ূর নাচছে অনেক দূরে! লাস্যময়ী চিত্রতারকা কামিনী কদমের চোখে মুখে আজ ময়ূর-নাচের চঞ্চলতা, রূপের মহিমায় উদ্ভাসিত আজ এ নারী হৃদয়। 'কেনই বা হবেনা, লাক্সের কোমল পরশ যে আমি প্রতিদিনই পেয়েছি'—কামিনীকদম জানান তাঁর রূপ লাবণ্যের গোপন রহস্যটি।

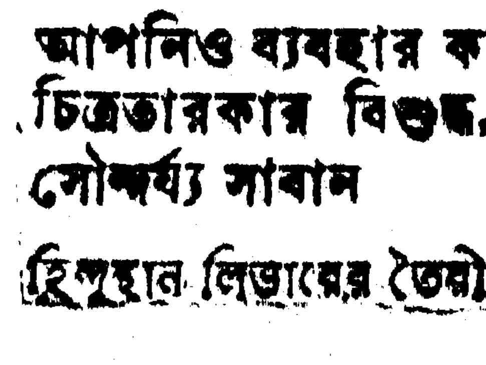

আপনিও ব্যবহার করুন
চিত্রতারকার বিশুদ্ধ, শুভ্র, সৌন্দর্য্য সাবান

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

ভারসাম্য রক্ষার বিষয়ে উদাসীন থাকা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। ১৯২৯ সালের "সাগরে জীবনের নিরাপত্তা" নামক দ্বিতীয় অধিবেশনে এই বিষয়ে সকল দেশই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, নবনির্মিত যাত্রীবাহী জাহাজের হস্তান্তরকালে জাহাজের ভাসমান অবস্থায় প্রয়োজনীয় সকল তথ্য জাহাজের অফিসারদের নিকট অর্পণ করা হবে। ১৯৪৮ সালের তৃতীয় অধিবেশনে উপরোক্ত বিধান শুধুমাত্র যাত্রীবাহী জাহাজ সম্বন্ধেই নয়, পরন্তু সমুদ্রগামী সকল প্রকার জলযানের ক্ষেত্রে বিস্তৃত করা হয়।

(৩) অন্তর্বিভাগঃ—জাহাজের অভ্যন্তরে জল প্রবেশ করলে সেই জল যাতে বেশীদূর বিস্তৃতি লাভ করতে না পারে, তার জন্য সমগ্র জাহাজকে "জলআঁট" বিশিষ্ট বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করা হয়। 'টাইটানিক' নিমজ্জনের পর নৌনির্মাণ ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(৪) এঞ্জিনঃ—ভুলভ্রান্তিবশত জাহাজের এঞ্জিনের কোন ক্ষতি না হয়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য। সরকারী অথবা নির্ভরশীল বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জাহাজের এঞ্জিন এবং অপরাপর যন্ত্রপাতির নিয়মিত পরিদর্শন আবশ্যক। জাহাজ নির্মাণকালে ও পরে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়মিত পরিদর্শনের প্রথা কঠোরভাবে মেনে চলা হয়। অধুনা ইলেকট্রনিক উপায়ে জাহাজের এঞ্জিন ঘরের নিরাপত্তা বজায় রাখারও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

(৫) মালপত্রঃ—বিশেষ মালপত্রের আমদানী ও রপ্তানীর ব্যাপারেও সাগরে নিরাপত্তা অনেক সময়ে ব্যাহত হয়ে থাকে। শস্যজাত দ্রব্য, কয়লা অথবা খনিজ পদার্থ পরিবহনকালে ভারবহনের অসমতা অনেক ক্ষেত্রে জাহাজ নিমজ্জনের কারণ হয়। সমুদ্রপথে জাহাজ নড়াচড়ার ফলে এই সমস্ত মালপত্র পার্শ্বদেশে স্থানান্তরিত হয় এবং মালবাহী ঘরের প্রস্থ অপেক্ষাকৃত বেশী হলে সমগ্র জাহাজ একদিকে ঢলে পড়ে। এই ঢলার পরিমাণ নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করলে জাহাজ একদিকে কাত হয়ে ধীরে ধীরে ডুবে যায়।

এতদ্ব্যতীত নানাপ্রকারের বিস্ফোরক দ্রব্য, যথা দিয়াশলাই, গোলাবারুদ, ডিনামাইট প্রভৃতি আমদানী রপ্তানীর সময়ে নিরাপত্তার খাতিরে বিশেষ সতর্কতার আবশ্যক হয়। বিশেষ আইন প্রণয়নের দ্বারা এইসব বিপজ্জনক মালপত্র হতে এঞ্জিন ও 'বয়লার' ঘরের যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রাখা হয়।

(৬) অগ্নিকাণ্ডঃ—ভাসমান জলযানের পক্ষে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ডের ফলে। এইজন্য সকল রকম জলযানেই অগ্নিপ্রতিরোধ, অগ্নিসন্ধান ও অগ্নিনির্বাপক আধুনিকতম সরঞ্জামের আয়োজন করা হয়। কয়লা, তুলা, তৈল প্রভৃতি সহজদাহ্য বস্তুর পরিবহণ ব্যাপারে অথবা যাত্রীসাধারণের অসাবধানতাবশত বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অগ্নিকাণ্ড প্রকাশ পায়। বর্তমানে প্রায় সকল আধুনিক জাহাজেই ধূম্র সন্ধানের জন্য স্বয়ংক্রিয় সংকেতের ব্যবস্থা করা হয়। যাত্রীবাহী জাহাজে অগ্নিকাণ্ডের ফলে বহুলোকের জীবনহানির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ১৯৩০ সালে "এশিয়ায়" (১০০ জন), ১৯৩২ সালে জর্জ ফিলিপারে (৪০ জন), ১৯৩৪ সালে মরো ক্যাসল (১১৫ জন)। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর "এম্প্রেস অব রাশিয়া", "এম্প্রেস অব কানাডা" প্রভৃতি জাহাজের ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সমুদ্রপথে যে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়, বন্দরে অবস্থিত জাহাজের অগ্নিকাণ্ডের সহিত তার তুলনা করা চলে না। বন্দরে অবস্থানকালে যে স্বল্পসংখ্যক নাবিক জাহাজে অবস্থান করেন, তাঁদের পক্ষে অগ্নি প্রতিরোধক সমগ্র ব্যবস্থা সুচারুরূপে পরিচালনা করা মোটেই সহজসাধ্য নয়।

যাই হোক, সর্বপ্রকার নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা সত্ত্বেও যাত্রী এবং নাবিকদিগকে অনেক ক্ষেত্রে জাহাজ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হতে হয়। ১৯২২ সালে টাইটানিক নিমজ্জনের পর জাহাজের প্রত্যেক নাবিক ও যাত্রীর জন্য বাধ্যতামূলকভাবে উদ্ধারকারী নৌকার ব্যবস্থা বলবৎ আছে। মানসিক উৎসাহ বর্ধনেও প্রত্যেকের জন্য উদ্ধারকারী নৌকার ব্যবস্থা অতীব প্রয়োজনীয়। প্রতিকূল সকল আবহাওয়াতে উদ্ধারকারী নৌকা যাতে অটুট অবস্থায় ভাসমান থাকে, সেজন্য উধারকারী নৌকা নির্মাণে যথেষ্ট যত্ন নেয়া হয়। এই নৌকা নির্মাণে প্রথমে কাঠ, পরে ইস্পাত এবং এখন অ্যালুমিনিয়াম ও কৃত্রিম বস্তুর যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। এছাড়াও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর উদ্ধারকার্যে রাবারের নৌকার প্রসার দেখা যায়। উপরিভাগ সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত রাবারের নৌকা হিমশীতল আবহাওয়ায় যে অত্যন্ত কার্যকরী সে বিষয়ে কাহারও মনে কোন সন্দেহ উপস্থিত হয় না। সমুদ্রোপকূলে চলাচলের উপযুক্ত জলযানে এই শ্রেণীর উদ্ধারকারী নৌকা অনুমোদন করা হলেও আন্তর্জাতিক জলপথে গমনাগমনকারী জাহাজসমূহে ব্যবহারের নিমিত্ত এখনও পর্যন্ত কোন স্বীকৃতি পাওয়া যায়নি।

আধুনিক জলযানে অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক উপকরণের মধ্যে বেতার ও দিকপ্রদর্শক যন্ত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সংবাদ সরবরাহ, সময় সংকেত, আবহাওয়া তথ্য, বরফ অবস্থান সম্পর্কে সতর্কতা, চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে উপদেশ, সংকটকালে অন্যান্য সমুদ্রপোত অথবা উড়ো জাহাজের সংগে সংযোগ স্থাপনার্থে বেতারযন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অপরদিকে দিকপ্রদর্শক যন্ত্র শুধুমাত্র জাহাজের অবস্থিতি নির্ণয়ন নয়, সংকটকালে বিপদগ্রস্ত জাহাজকে নিকটবর্তী বন্দরে নিয়ে যেতেও বিশেষ সাহায্য করে।

উপরোক্ত সরঞ্জাম ছাড়াও আধুনিক সমুদ্রগামী জাহাজে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, যথা, রেডারযন্ত্র, নেভিগেটর এবং প্রতিধ্বনি-জ্ঞাপক যন্ত্র আবহাওয়া নির্বিশেষে নিরাপদে জাহাজ চালনায় সবিশেষ প্রয়োজনীয়। ১৯৪৮ সালের সম্মেলনে আলোক সংকেত এবং কুয়াশা সংকেত ব্যবস্থায় বিশেষ আস্থা জ্ঞাপন করা হয়।

সাগরে নিরাপত্তার জন্য জাহাজে যে ব্যবস্থাদি বর্তমান, তা পুরোপুরিভাবে কার্যকরী করার জন্য পরিশেষে নাবিকদের দায়িত্ব অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার। উপযুক্ত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে সংকটকালে নিরাপত্তামূলক সব আয়োজনই যে নিরর্থক, অতীতের অনেক ঘটনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে যথেষ্ট ব্যক্তিগত শিক্ষা ছাড়াও বিপজ্জনক অবস্থায় "দলগত"ভাবে কাজ করার যোগ্যতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ উপলব্ধিকর। সকল অবস্থাতেই জাহাজের এঞ্জিন অথবা অন্যান্য যন্ত্রপাতি চালু রাখায় ইঞ্জিনীয়ারদের ওপর যেমন গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত থাকে, তেমনই নেভিগেটিং অফিসার, ওয়ারলেস অপারেটর ও নাবিকদের মধ্যে পরস্পরের সহযোগিতা বিশেষ প্রার্থনীয়।

১৯৪৮ সালের তৃতীয় অধিবেশনের পর বারো বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। "সাগরে জীবনের নিরাপত্তা" আয়োজনে এখনও পূর্ণভাবে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়নি। উপরন্তু পরমাণবিক শক্তি চালিত জাহাজ পরিচালনায় কিংবা সাগরজলের অভ্যন্তরে জাহাজ চালনা হেতু নিরাপত্তা ব্যবস্থায় যে রকম অনিশ্চয়তা দেখা যায়, এখন থেকেই সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া দরকার।

এই বৎসরে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত চতুর্থ আন্তর্জাতিক অধিবেশনে ভারত সমেত চুয়াল্লিশটি রাষ্ট্র সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন এবং আরও দশটি রাষ্ট্র দর্শক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৪৮ সালে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে অনুমোদিত দুটি বিষয় এই অধিবেশনে বিশেষভাবে সংশোধন করা হয়। এই প্রস্তাব দুটি হচ্ছে যথাক্রমে সাগরে জীবনের নিরাপত্তামূলক চুক্তি ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক সাগরপথে জাহাজ সংঘর্ষের প্রতিবিধানকল্পে বিধিসম্মত আইন প্রণয়ন।

১৯৪৮ সালের "সাগরে জীবনের নিরাপত্তা" অধিবেশনে অনুমোদিত নিয়মা-

বলীর যে পরিবর্তন করা হয়েছে এই বৎসরের সম্মেলনে, নীচে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হলঃ—

(১) মাল বোঝাই জাহাজের নিরাপত্তায় কঠোরতর ব্যবস্থা অবলম্বন এবং জাহাজের দেহ এবং এঞ্জিন সরকারীভাবে নিয়মিত পরিদর্শনের প্রয়োজন।

(২) যে কোন দেশের বন্দরে সেই দেশের সহিত জাহাজ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় চুক্তিবন্ধ অপর যে কোন দেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত অনুমতিপত্র বিনাবিচারে গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হবে।

(৩) ১৯৪৮ সালে মাল ও যাত্রীবাহী জাহাজে ইলেকট্রিক কেবল স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়ে যে বাধানিষেধ বলবৎ করা হয়েছিল, তা বিশেষ বিচারসাপেক্ষে ভবিষ্যতে লঘু-ভাবে বিচার করা হবে। তবে তৈলবাহী জাহাজে বর্তমানের সকল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই বলবৎ থাকবে।

(৪) যাত্রীবাহী জাহাজের ভারসাম্য রক্ষায় ব্যবহৃত সাগরজল পরিবহণ বিষয়ে বিশেষ নিয়মকানুন প্রবর্তন।

(৫) যাত্রীবাহী জাহাজের এঞ্জিন দৃঢ়ভাবে সংবন্ধ করা হলে পেট্রোল ব্যবহার নিষিদ্ধ।

(৬) অগ্নি প্রতিরোধক ব্যবস্থায় তিনটি যে নিয়ম বর্তমানে চালু আছে, তার সবিশেষ উন্নতিবিধান।

(৭) বাতাসে ফুলানো সবরকমের জীবন-রক্ষাকারী সরঞ্জাম ব্যবহারে অনুমতি দেওয়া হবে, তবে যাত্রী এবং তৈলবাহী জাহাজে বাতাসে ফুলানো পরিচ্ছদ কোনমতেই ব্যবহার করা চলবে না।

(৮) ১০০ জনের অধিক ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত জীবনরক্ষাকারী নৌকা অবশ্যই এঞ্জিনের দ্বারা চালিত হবে এবং এক সংগে ১৫০ জনের অধিক ব্যক্তির জন্য একটি নৌকার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হবে। উদ্ধারকারী নৌকায় পেট্রোলের এঞ্জিন ব্যবহার করা যাবে না।

(৯) বর্তমানে ৫০০ টনের বেশী আয়তনের জলযানে রেডিও যন্ত্র ব্যবহার অবশ্য কর্তব্য বলে যে নিয়ম প্রচলিত রয়েছে, তা ভবিষ্যতে ৩০০ টনের অধিক আয়তনের সকল জলযানের পক্ষে প্রযোজ্য করা হবে এবং ৩০০ থেকে ১৬০০ টনের মালবাহী জাহাজে রেডিও টেলিফোনী সংকেত ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়।

(১০) শস্যজাত, রেডিওঅ্যাকটিভ অথবা অন্যান্য বিপজ্জনক মাল পরিবহণ ব্যবস্থায় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা হবে। শস্যজাত মাল পরিবহণে চুক্তিবন্ধ যে কোন রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ব্যবস্থা বিনাবিচারে গ্রহণীয় এবং রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্তৃক বিপজ্জনক মাল সরবরাহ ব্যবস্থায় যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ রয়েছে, তা সর্বতোভাবে স্বীকার করা হবে।

(১১) পরমাণবিক শক্তির দ্বারা চালিত জাহাজের জন্য নিয়মাবলী নূতন পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে, তবে পরমাণবিক শক্তি চালিত জাহাজ কর্তৃক বন্দরে প্রবেশ লাভের অনুমতি প্রদান ভবিষ্যতেও বন্দরসমূহের নিজ কর্তৃত্বাধীনে থাকবে।

জাহাজের সংঘর্ষজনিত দুর্ঘটনা পরিহার প্রসংগে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি স্বীকৃত হয়েছেঃ—

(১) মাছধরা জাহাজের আলোকসংকেত ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হবে। পৃথিবীর সর্বত্র এই শ্রেণীর জলযানের জন্য একই রঙের আলোক অনুসরণের ব্যবস্থা করা হবে।

(২) রেডারযন্ত্রের জন্য নূতন ব্যবহার প্রণালীর প্রবর্তন এবং খারাপ আবহাওয়ায় বেতারযন্ত্র ব্যবহারে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন।

(৩) পালতোলা জলযানের নিমিত্ত নির্দিষ্ট আলোকসংকেত ব্যবস্থা।

আলোচ্য চুক্তিব্যবস্থায় অনেক নূতন নিয়মকানুনের সমাবেশ দেখা যায়। বর্তমানে সাগরে জীবনের নিরাপত্তামূলক বিধি-ব্যবস্থায় যেহেতু মাছধরা জাহাজ অন্তর্ভুক্ত করা হয় না, সেইহেতু চুক্তিবন্ধ দেশগুলিকে দুটি পৃথক ব্যবস্থায় স্বীকৃতিদানের প্রয়োজন, একটি পূর্বনির্দিষ্ট জলযানগুলির জন্য এবং যাহাতে মাছধরা জাহাজেও নিরাপত্তামূলক সকল ব্যবস্থাই অনুসরণ করা হয়, তার জন্য দ্বিতীয় স্বীকৃতিদানের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

এই প্রসংগে জাহাজের আয়তন নির্ধারণে, ভারসাম্য রক্ষায়, অগ্নিনির্বাপক সকল প্রকার আধুনিক ব্যবস্থার অনুসরণে, তৈলবাহী জাহাজের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থায়, জীবনরক্ষাকারী নৌকা ব্যবহারে, সংবাদ সরবরাহে, অবস্থিতি নির্দেশক যন্ত্রপাতির ব্যবহারে, ঝড় ইত্যাদি আবহাওয়া তথ্য প্রেরণে, বিপদকালে অপরাপর জাহাজ এবং উড়োজাহাজের সহিত সংযোগ-স্থাপনার্থে, জলযানের পরিচালনায় জলপথের সর্বত্র একই নিয়মাবলীর অনুসরণে, সাগরপথে চলমান জলযানের সহিত বন্দরসমূহের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সুপরি-কল্পিত নিয়মাবলী প্রস্তুত করা একান্তই প্রয়োজনীয়।

তবে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত এবারকার অধি-বেশনে পরস্পরের সংগে যে সৌহার্দ্য-মূলক পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, তাতে অনেকেই আশা প্রকাশ করেন যে, আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনে ন্যূনতম ১৫টি দেশের সমর্থন লাভ করা খুবই সহজ হবে।

GOVERA

পতঙ্গের মৃত্যু

নিখিল সরকার

ট্রেন থেকে নেমে নৌকোয়। এপারে এসে আরও একবার ভাবল তপন, সুধাদের বাড়ি যাবে কি যাবে না। যদিই বা যায়, সুধার স্বামী কিছু কি মনে করবে! তাছাড়া সুধা নিজেই বা আজ তাকে সহজভাবে নিতে পারবে কিনা, কে জানে। এলোমেলো ভাবতে ভাবতে স্টেশনের বেঞ্চিতে এসে বসল। স্টেশনে বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে পরের ট্রেনের জন্যে। একবার ভাবল টিকিটটা কেটে ফেলি, টিকিট কাটলে সুধাদের বাড়িতে যাবার আর কোন প্রশ্নই উঠবে না। শরীরটাও ভাল লাগছে না। কেমন জ্বর জ্বর লাগছে। সুধাদের বাড়িটাও এখান থেকে খুব বেশি দূর হবে বলে মনে হয় না। রেস্ট ক্যাম্পের পাশে। এই দূরত্বটাই এবার একটা চুম্বকের মত টানতে লাগল ওকে। প্রায় বছর খানেক আগে সুধা একটা চিঠি লিখেছিল। তাতে অবশ্য একবার এদিকে আসার নেমন্তন্ন ছিল তবু সেটা বড় কথা নয়, আরও একটা কারণ অনুভব করছিল ওর বাড়ি যাবার।

উঠে দাঁড়াল তপন। ডান হাতে পকেট হাতড়ে একটুকরো আধ-ময়লা কাগজ বের করে তার ওপর চোখ বুলোল; পরে ভাঁজ করে পকেটে রেখে কঁপা এগিয়ে গিয়ে একটা রিকশার সামনে দাঁড়িয়ে প্রায় জ্বরো রোগীর মতনই রাস্তাটার নাম করে তার ওপর চড়ে বসল।

দুপাশের রগ দুটো দপ্‌দপ্‌ করছে। চোখ দুটোয় জ্বালা। আসবার সময় ট্রেনের ধোঁয়ার কয়লাকুচি এসে চোখে পড়েছিল। ট্রেনের ধুলোবালিতে শরীরটা বেজুত, রুক্ষ হয়ে গেছে। থেকে থেকে গা ঘিন ঘিন করছে। রিকশাটা খুব জোরে ছুটছিল।

চমকে তাকিয়ে তপন জিজ্ঞেস করল—এসে গেছে?

রিকশাঅলা মাথা নাড়ল। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে আরও একটু দাঁড়িয়ে থাকল রাস্তার ওপর। একজন লোক আসছে এদিকে। কাছে আসতে জিজ্ঞেস করল—জ্ঞানেশ মিত্তিরের বাড়িটা কোন্‌দিকে হবে বলতে পারেন?

ভদ্রলোক একবার তপনের মুখের দিকে তাকালেন। এই রাস্তা ধরে আরও একটু হেঁটে ডানহাতি একটা গলি পাবেন, একটু গেলেই জ্ঞানেশবাবুর বাড়ি।

বেডিংটা তুলে নিয়ে তপন দুপাশের ছোট ছোট বাড়িগুলোর ওপর চোখ রাখতে রাখতে এক সময়ে গলিটা পেয়ে গেল। কটা বাড়ি পেছনে রেখে এগিয়ে.. দেয়ালে আঁটা নম্বরটার সঙ্গে পকেটের টুকরো কাগজের সংখ্যাটা আর একবার মনে মনে মিলিয়ে নিল।

দরজা বন্ধ। এগিয়ে এল তপন। বুকের স্পন্দনটা যেন এই মুহূর্তে বেড়ে গেছে। সুধা ওকে দেখে চমকে উঠবে। কখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। আশেপাশের বাড়ি থেকেও বড় একটা শব্দ, চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে না। চোখটা আবার জ্বালা করছে। বাড়িটা নীরব। জানলাটা খোলা। এখান থেকে কাউকে দেখতে পারছে না তপন। সুধারা কি নেই নাকি এখানে! মনে হতেই কঁপা এগিয়ে এসে জানলার ভেতর দিয়ে উঁকি দিল। এবারও কাউকে দেখল না। একটু সরে এসে কড়া নাড়ল। একবার... দুবার...।

জানলার তারের জালের ওপার থেকে মুখ ভেসে উঠল। সুধা। তপনের পা কেন যেন কেঁপে উঠল। সুধার ডাগর টানা চোখেও বিস্ময়। সুধা তপনের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটু সময়ের

সুধাই যেন অনেক কিছু ভেবে নিল। তারপর মাথায় আলতো করে ঘোমটা টেনে সুধা এগিয়ে এসে দরজার খিলটা খুলে দিল। চোখের তারায় একটা চেষ্টা-করা হাসির ভাব খেলিয়ে মৃদু অনুচ্চকণ্ঠে বলল, 'এসো।'

ঘরে এসে বেডিংটা একপাশে সরিয়ে রেখে তপন সোজা সুধার দিকে তাকাল না। ঘরের চারপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে একফাঁকে সুধার মুখের ওপর চোখ রাখল।

'এতদিনে মনে পড়ল!' সুধা কথা বলল। তপন এ-প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে চাইল। গলার স্বরে একটা সহজ-ভাব এনে মুখের রেখায় একটু হাসি ছড়াল, 'তোমার স্বামীকে যে দেখছি না।'

—এ সময় থাকে না। কথাটা এমনভাবে বলল সুধা যে, এটা ঠাট্টা না অন্য কিছু, তা ঠিক করে ধরতে পারল না তপন। তবে মনে মনে বলল, সুধা তুমি এখন অনেক পালটে গেছ। এত পালটে গেছ জানলে এভাবে তোমার কাছে আসতাম না।

তপন নিজেকে আরো সহজ করার জন্যে বলল, 'একটা পাখাটাখা এনে দাও না।'

পাখার কথায় সুধার চোখ দুটো যেন কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠে আবার পরক্ষণেই কি-এক বিষণ্ণতায় ভরে গেল।

পাখা আনল সুধা। ওর দিকে কেমন এক চোখে তাকিয়ে পাখার বাতাস করতে করতে আস্তে বলল, 'বাড়ির সবাই ভাল?'

—এই একরকম।

—অরুণ পড়ছে তো?

—হ্যাঁ।

—দিদির ওখানে যাচ্ছ?

—ইচ্ছে আছে।

তপনের মনে হলো সুধা যেন জোর করে একটা নিশ্বাস চাপল।

—ভাবতেই পারিনি যে, তুমি আসবে। বলে হাসি-হাসি মুখে এবার তপনের চোখে চোখ রাখল সুধা।

—আমিই কি ভাবতে পেরেছিলাম,—সুধার মুখের দিকে তাকিয়ে তপন দেখল, ওর মুখের হাসি আস্তে আস্তে কেমন মিলিয়ে যাচ্ছে। তপন সুধাকে ব্যথা দিতে চায়নি, কথাটা ফস করে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। এই অনিচ্ছাকৃত কষ্ট দেওয়ার জন্যে তপনেরও দুঃখ হচ্ছিল। নিজেকে যেন সংশোধন করে নিল তপন। হাসতে হাসতে বলল, 'কি, এভাবে বাতাস করলেই পেট ভরবে?'

কথাটা সুধার এতক্ষণ মনেই ছিল না। এবার লজ্জা পেয়ে বলল, 'তুমি আরও একটু জিরিয়ে নিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এসো, আমি ব্যবস্থা করছি।'

একটু পরে কলঘরে ঢুকল তপন। শরীরের গ্লানি মুছতে কত জল যে ঢালছিল। জল ঢালার শব্দ শুনে এক সময় সুধা আড়াল থেকে বলে গেল, এই অবেলায় অত জল ঢেলো না। আশ্বিনের শেষ। শেষে ঠাণ্ডাটাণ্ডা লাগিয়ে একটা কিছু করবে।

স্নান-খাওয়া সেরে বিছানায় এসে বসল তপন। বড় ক্লান্ত লাগছিল। চোখ দুটো ঘুমের আবেশে বুজে আসছিল। সামনের খোলা জানলাটা দিয়ে ফুরফুর করে শেষ-আশ্বিনের হাওয়া আসছিল। পকেট থেকে

সারিডন খেলেই তো খুব তাড়াতাড়ি ও নিরাপদে যন্ত্রণা দূর হয়

বাথাবেদনায় আর কষ্ট পেতে যাবেন কেন—সারিডন খেয়ে তাড়াতাড়ি ও নিরাপদে ব্যথার উপশম করুন।

সারিডন-এ অনিষ্টকর কোন কিছু নেই, এতে হার্টের কোন ক্ষতি বা হজমের কোন গোলমাল হয় না। তার ওপর বিশেষ উপাদানে তৈরি ব'লে সারিডন আশ্চর্যরকম তিনটি কাজ দেয়—এতে যন্ত্রণার উপশম হয়, মনের স্বাচ্ছন্দ্য আসে ও শরীর ঝরঝরে লাগে।

মাথা-ধরা, গা-ব্যথা, দাঁতের যন্ত্রণা এবং সাধারণ ব্যথা-বেদনায়, তাড়াতাড়ি আরাম পেতে হ'লে সারিডন খান... সারিডন নিরাপদ বেদনা-উপশমকারী।

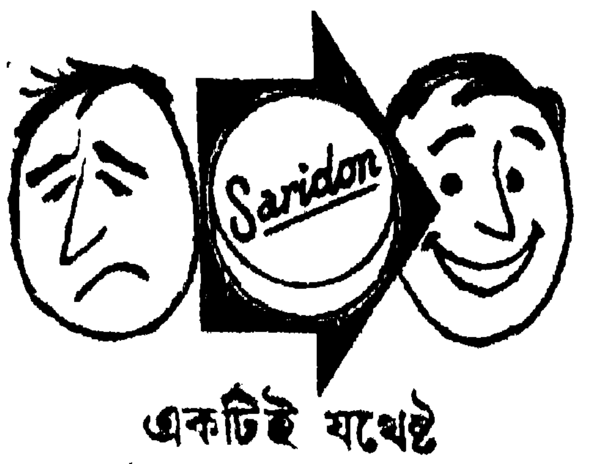

একটিই যথেষ্ট

একটি ট্যাবলেট ১২ নঃ পঃ

★ সারিডন স্বাস্থ্যসম্মত মোড়কে থাকে, হাতে ধরা হয় না।

★ সারিডন একটি ট্যাবলেটের দাম মাত্র বারো নয়া পয়সা।

★ একটি সারিডন-ই প্রায় ক্ষেত্রে পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে পুরো এক মাত্রা।

একমাত্র পরিবেশক: ভলটাস লিমিটেড

IW.VT 87

সিগারেট বের করে ধরাল। একটু পরে সুধা এল পান চিবোতে চিবোতে। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে মুখোমুখি বসল তপনের। সিগারেটে শেষ টান দিয়ে টুকরোটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সবে শুতে যাচ্ছিল তপন, সুধাকে চেয়ার টেনে বসতে দেখে সোজা হয়ে বসল।

—এসো। সুধার দিকে তাকাল তপন।

—তুমি না-হয় একটু ঘুমোও, আমি ভেবেছিলাম বুঝি জেগে আছ।

সুধার কথা বলার সুরে কেমন যেন একটা অভিজ্ঞ-মানুষের গলার গাম্ভীর্য ছিল, যেটা তপনের কাছে সম্পূর্ণ নতুন বলে ঠেকল। তপনের মনে হলো তিন-সুকিয়ায় দিদির ওখানে দেখা সুধা এখনকার সুধার মধ্যে কোথায় যেন আত্মগোপন করেছে।

—কি রোগা হয়ে গেছ। তপনের দেহের ওপর দিয়ে দৃষ্টিটাকে বুলিয়ে নিতে নিতে সুধা বলল।

—আমার কথা রাখ, এখানে এসে পর্যন্ত তো জ্ঞানেশবাবুকে দেখতে পাচ্ছি না—সুচতুরভাবে সুধার প্রসংগটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল তপন। এখন মনে হলো তপনের, সুধার চোখ দুটো বড় ম্লান। 'কখন বেরিয়েছেন ভদ্রলোক?'

—খুব সকালে।

—সকালে। সেকি, বেলা এখন যে সাড়ে তিনটে, অথচ লোকটার এখনও পাত্তা নেই। শুনেছি তো অপিস-টপিসের ঝামেলা পোয়াতে হয় না।

—অপিস না থাকলে বুঝি দেরি হতে নেই, চোখে-মুখে হাসি টেনে সুধা জবাব দিল।

তপন একটু অপ্রস্তুত হলো।

—তোমার কাছে এটা আশ্চর্য বলে মনে হচ্ছে দেখছি! সুধা বলল।

—একটু আশ্চর্য বৈকি, দিনের পর দিন এভাবে কাজ করে মানুষ বাঁচে?

—এলেই দেখতে পাবে। বলে সুধা তপনের চোখের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট কামড়ে হাসল।

এটা কি সুধা ওর স্বাস্থ্যের ওপর কটাক্ষ করল, না ওর স্বামীর স্বাস্থ্যের কথা জাহির করল, তপন ভাল করে ধরতে পারল না। আর ঠিক তখনি দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। সুধা কেমন যেন একটু চঞ্চল হলো। তাড়াতাড়ি উঠে গেল। তপন ঠিকঠাক হয়ে ভাল করে বসে অপেক্ষা করতে লাগল লোকটির জন্যে। সুধার স্বামী এসেছে। সুধা যেন ফিসফিস করে কি বলল। তপন এখান থেকে স্পষ্ট কিছু শুনতে পেল না। একটু পরেই এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে হাত তুলে নমস্কার করে বললেন, 'খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তো? তারপর একটা চেয়ারে বসে তপনের দিকে ভাল করে তাকিয়ে আবার বললেন, 'আমি খুব খুশি হয়েছি যে আপনি এখানে এসে উঠেছেন।'

তপনের বুকটা দ্রুত কাঁপছিল। যতদূর সম্ভব সংযত স্বরে বলল, 'তিনসুকিয়ায় যাবার পথে ভাবলুম একবার উঠি, এই আর কি।'

—না-না, বেশ করেছেন, উঠবেন না মানে, নিশ্চয় উঠবেন।

তপন বুঝতে পারল না ভদ্রলোক অন্য কোন ইংগিত করছেন কিনা। কি বলবে এর জবাবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে থাকল তপন।

—যাও তো, এখন কথা রেখে চান করে এসো। সুধা যেন আলতোভাবে ধমক দিল, 'খেয়ে-দেয়ে যত পার কথা বলো।'

—দেখছেন তো! ভদ্রলোক হাসতে হাসতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'এখন আর আপনাকে ডিসটার্ব করবো না, বিশ্রাম করুন।' বেরিয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

এই তাহলে জ্ঞানেশবাবু, সুধার স্বামী। কী বিশাল চেহারা। এরই জন্যে কি সুধা একটু আগে বলেছিল, এলেই দেখতে পাবে। সুধা ও-চেহারার পাশে একটা পুতুল ছাড়া আর কিছু নয়।

২

সন্ধ্যের দিকেই শরীরটা কেমন যেন বিচ্ছিরি রকমের খারাপ লাগছিল তপনের। গা-হাত-পা ম্যাজ ম্যাজ করছিল। কপালের রগ দুটো যেন ছিঁড়ে যাবে। সমস্ত শরীরটাই যেন বিষ-বেদনায় কাতরাচ্ছিল। পরের দিন সকালে আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারল না। গা পুড়ে যাচ্ছিল।

জ্ঞানেশবাবু ডাক্তার ডেকে আনলেন। গ্যারেজে না গিয়ে সেদিন নিজেই ডিসপেনসারী থেকে ওষুধ এনে সারাদিন বাড়িতে থাকলেন। সুধার বাচ্চা ছেলেটাও কেমন ভয় পেয়ে গেছে। খোকার চোখে আরও বিস্ময় বাবা আজ বাড়িতে কেন? সুধার কাছে এর কারণ জিজ্ঞেস করেছে বার বার, এক সময়ে সুধা জবাব দিয়েছে তোমার নতুন মামার জ্বর যে বাবা, তাই...।

ক'টা দিন কী করে যে কেটে গেল, তপন টের পেল না। তারপরও আর ক'টা দিন কাটল। জ্বরের পালা চুকলে, ক্লান্তির জের চলল। তবু এখন অনেকটা সুস্থ। ভদ্রলোক জ্বরের দিনগুলোতে সুধার সংগে সমানে ছিলেন। এক দুপুরে জ্ঞানেশবাবু এসে তার পাশে বসলেন। তপন পিঠে বালিশ হেলান দিয়ে দৃষ্টিটাকে জানলার ওপাশে ভাসিয়ে দিয়ে দূরের আকাশে ভাসন্ত মেঘের টুকরো দেখছিল। প্রথমটায় টের

শ্রীজওহরলাল নেহরুর

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

বিশ্ব-বিশ্রুত "GLIMPSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। এ শুধু সন-তারিখ-সমন্বিত ইতিহাস নয়—ইতিহাস নিয়ে সরস সাহিত্য। গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পটভূমিকায় গৃহীত মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন যুগের চিত্রাবলী নিয়ে লিখিত একখানা শাশ্বত গ্রন্থ। জে. এফ. হোরাবিন-অঙ্কিত ৫০খানা মানচিত্র সহ। প্রায় হাজার পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ।

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৫.০০ টাকা

শ্রীজওহরলাল নেহরুর
আত্ম-চরিত ১০.০০ টাকা

শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারীর
ভারতকথা ৮.০০ টাকা

প্রফুল্লকুমার সরকারের
জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ২.৫০ টাকা

অনাগত (উপন্যাস) ২.০০ টাকা

ভ্রষ্টলগ্ন (উপন্যাস) ২.৫০ টাকা

অ্যালান ক্যাম্বেল জনসনের
ভারতে মাউন্টব্যাটেন ৭.৫০ টাকা

আর জে মিনির
চার্লস চ্যাপলিন ৫.০০ টাকা

শ্রীসরলাবালা সরকারের
অর্ঘ্য (কবিতা-সঞ্চয়ন ৩.০০ টাকা

ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর
আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে ২.৫০ টাকা

ত্রৈলোক্য মহারাজের
গীতায় স্বরাজ ৩.০০ টাকা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ। ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

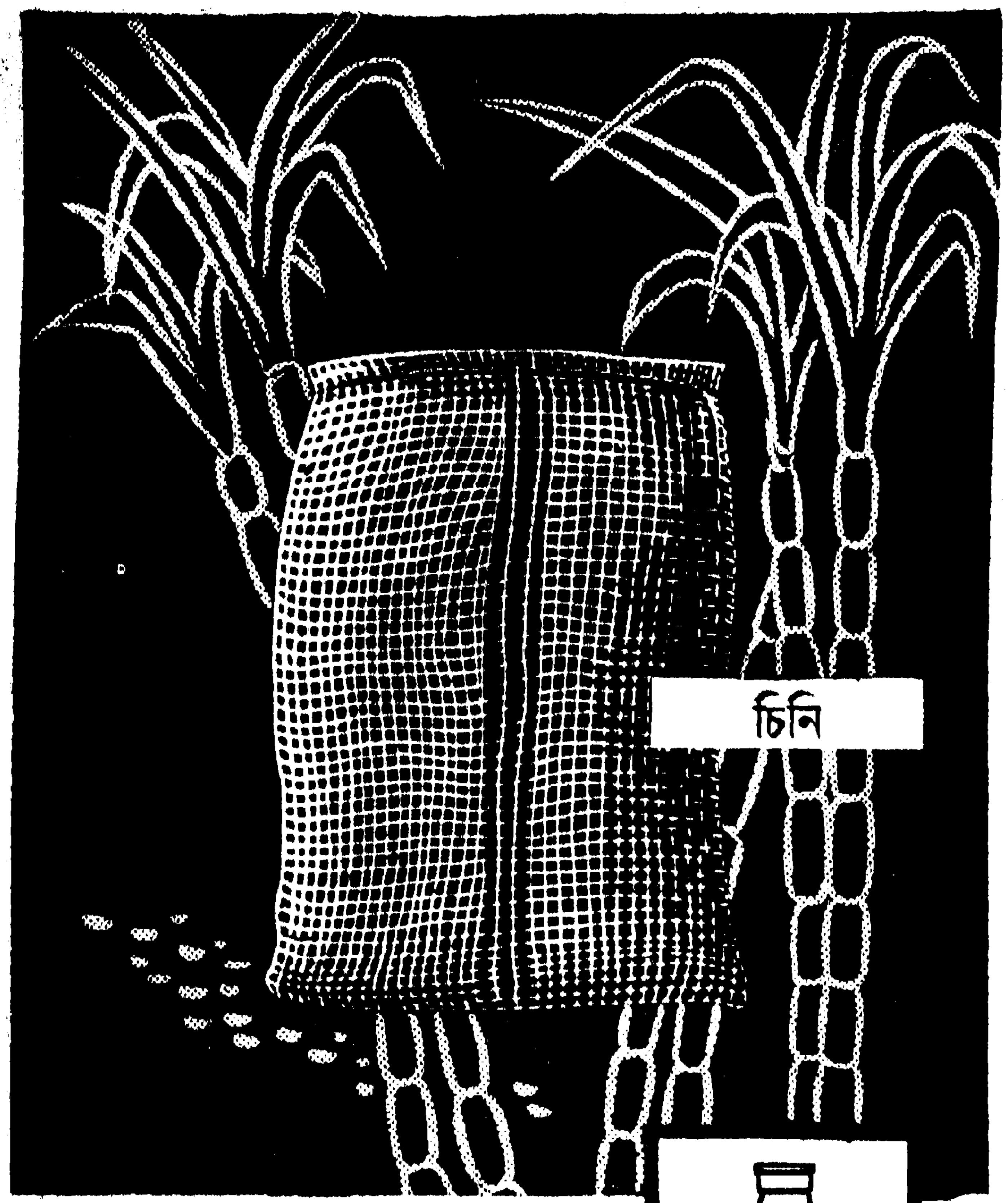

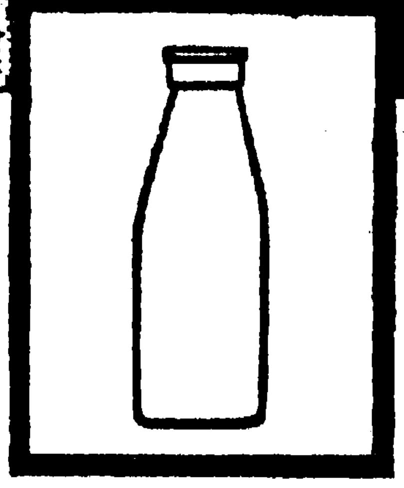

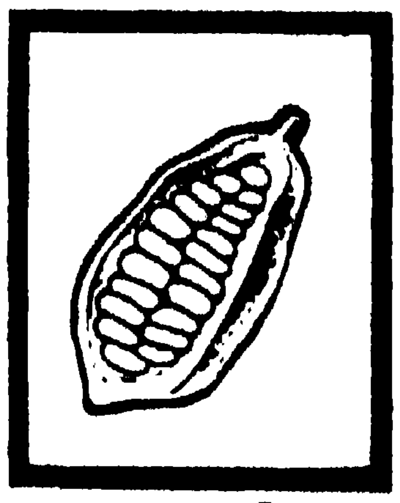

ক্যাডবেরীর চকোলেট আপনার জন্য উপকারী কেন ?

কারণ এতে আছে টাটকা দুধ, পরিশুদ্ধ চিনি এবং পুষ্টিকর কোকো বীনের যাবতীয় স্বাভাবিক সদ্‌গুণ এবং দেহে উত্তম সঞ্চারের ক্ষমতা।

ক্যাডবেরীর মিল্ক চকোলেট ছেলে-বুড়ো সকলেরই অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য, আর খেতেও অতি সুস্বাদু !

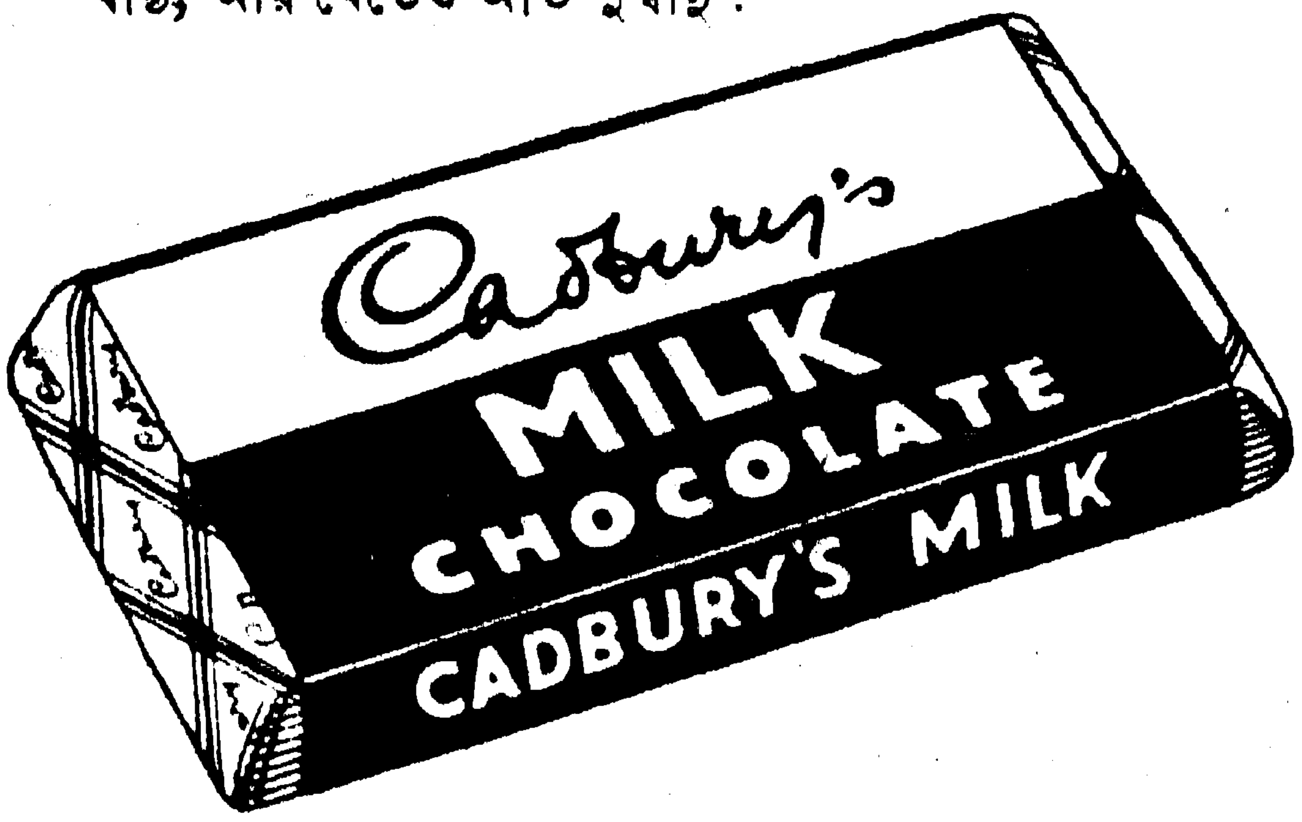

ক্যাডবেরী মানেই সেরা

পায়নি, জ্ঞানেশবাবু এসেছেন। টের পেয়ে উঠে বসতে যাচ্ছিল, ওকে থামিয়ে দিয়ে জ্ঞানেশবাবু বললেন, 'আজ কেমন লাগছে!'

—ভালই।

—যাক, ভালোয় ভালোয় সেরে উঠেছেন, এখন আবার এদিকটায় যেরকম ঘরে-ঘরে টাইফয়েড, নিমোনিয়া হচ্ছে। কি ভয়ই না পাইয়ে দিয়েছিলেন। ভদ্রলোক মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

এ-হাসিটা তপনের ভাল লাগল না। আসলে লোকটার উপস্থিতিই এখন কেন যে ওর কাছে বিরক্তকর লাগছিল।

—উঠি, আমার আবার অনেক কাজ।

এমন সময়েই সুধা ঘরে এল। জ্ঞানেশবাবু সুধার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার পানের কৌটোটা নিয়ে এসো তো।' বলে স্ত্রীর পিছু পিছু বেরিয়ে গেলেন।

ক'দিন থেকেই জ্বর ছিল না। আজ আবার শরীরের দুর্বলতার জন্যে কেমন একটা ঘুষঘুষে তাপ অনুভব করছে।

সুধা ঘরে ঢুকল। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কাছে এসে আস্তে করে ওর গায়ে ঠেলা দিয়ে বলল, 'ঘুম আসছ না বুঝি।'

তপন চোখ খুলল। —'না।'

—নিশ্চয়ই আবোল-তাবোল কিছু ভাবছ।

তপন চমকাল। হ্যাঁ, ভাবছিল। পুরনো কথাই ভাবছিল। কিন্তু সুধা জানল কি করে? তবে কি ওর মুখের মধ্যেই মনের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে আছে। আবার এও মনে হলো, মনে করতে ভাল লাগল, এভাবে হেঁয়ালির মত কথা বলে হয়ত সুধা ওকে পুরনো হারিয়ে-যাওয়া জগতটাতে নিয়ে ফেলতে চায়। তপন আরও একবার পরিপূর্ণভাবে তাকাল সুধার দিকে। সুধাও তাকিয়ে আছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তপন কোন্ গভীরে যেন একটু একটু করে তলিয়ে যাচ্ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তেই সুধা আরও এগিয়ে এসে ওর কোলের কাছে একটা বই রেখে দিয়ে সহজ সুরে বলল, 'এই নাও, শুয়ে শুয়ে পড়।' বলে একটু হাসল সুধা। তপনের মনে হলো, ওর চোখের তারা এই হাসিতে পুরোন কোন কথা বলছে। এবার সুধা একটু নিচু হলো। কুঁজো হয়ে তপনের ওপাশে কি যেন একটা দেখতে লাগল। সুধার দেহের গন্ধটা এবার কেন যেন উগ্র। সুধার শরীর তপনের কোমরটা ছুঁই-ছুঁই করল। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করল তপনের। ও চোখ বুজল। তারপর আস্তে আস্তে চোখের পাতা খুলে সুধার গলার কাছ থেকে দৃষ্টিটাকে বুলোতে বুলোতে এক-সময়ে কোমরের কাছে আনল। অথচ এই অশালীনতা—তপন অনুভব করল—তার মনে যন্ত্রণা ছড়াচ্ছে। প্রসন্নতাকে একটু

একটু করে নষ্ট করেছে। তপন একটু নড়ল। আর সুধাও এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল, দাঁড়িয়ে আর একবার ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি পড়, আমি ও-ঘরে শুতে যাচ্ছি।'

তপন কিছু বলল না। কোন কথা বলতে এখন, এই মুহূর্তে ইচ্ছেও করছিল না ওর। একটা ঢোক গেলার চেষ্টা করল। অন্যমনস্কভাবেই বইটা তুলল, পৃষ্ঠাগুলো উল্টে যেতে লাগল। জ্ঞানেশবাবু এখনও ফেরেননি।

শুয়ে থাকতেও ভাল লাগল না। উঠে বসল। একটা শালিক কোত্থেকে উড়ে এসে জানলার শিকটায় কাত হয়ে বসে ভেতরের দিকে তাকাচ্ছে। তপন দেখল শালিকটা হাঁপাচ্ছে। ওকে একটু নড়তে দেখেই ওটা ভয়ে উড়ে গিয়ে সামনের একটা গাছের ডালে বসল। তপন তাকিয়ে থাকল। এই ক্লান্ত অলস দুপুরে ও নিজেও যেন হাঁপাচ্ছে। এর একটু বাদেই আর একটা শালিক এসে ওই ডালেই বসল। প্রথমে একটু দূরে। পরে সরে আসতে আসতে খুব ঘন হয়ে বসল। শালিক দুটো দেখতে দেখতে তপন কেমন একটু অন্যমনস্ক হলো। একটা নাম বারকয়েক বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল। আজকের সুধার সংগে তার কোন মিল খুঁজে পেল না তপন।

হারানো একটা সুখবোধ আস্তে আস্তে জাল ফেলে এক সময়ে তার মধ্যে তপনকে জড়িয়ে ফেলল। একটা তপ্ত অনুভূতি ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। আরও কিছুক্ষণ বসে থাকল। এক সময় মনে হলো—বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। গলার কাছটায় দলা পাকিয়ে তৃষ্ণা আটকে আছে। ঘরের ভেতরে সব দিকে তাকাল। না, কোথাও জল রেখে যায়নি সুধা। আরও কিছুক্ষণ বসে রইল। ভাবল, একবার সুধাকে ডেকে এক-গ্লাস জল চায়। পরক্ষণেই মনে হলো, সুধা এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। পাশের বাড়ির দেয়াল ঘড়িতে তিনটা বাজল। বসে বসে ঝিমোন পাখির মতন দৃষ্টিতে ক্লান্তি ও অসহায় ভাব ফুটিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকল তপন। দেখল একটু দূরে, রাস্তার পাশে একটা টিউবওয়েল। সেখানেও এখন কোন ভিড় নেই। কেবল একটা কাক নাচতে নাচতে ভাল করে চারপাশটা দেখে নিয়ে কলের কাছে এসে নর্দমায় ঠোঁট দিয়ে জল খাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। এটা দেখার সংগে সংগে ওর গলার কাছের অসম্ভব কষ্টটা যেন হঠাৎ দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

সুধাকে ডাকল।

পাশের ঘর থেকে কোন প্রত্যুত্তর না পেয়ে এবার নিজেই তপন বিছানা ছেড়ে উঠল। সুধার ঘরের সামনে এসে থামল একবার। দরজাটা ভেজান। আস্তে করে একটা ঠেলা দিল। খোলা দরজা দিয়ে ওর দৃষ্টিটা সোজা ঘুমন্ত সুধার ওপর গিয়ে পড়ল। পা দুটোকে নাড়াতে পারছে না তপন। সুন্দর করে ঘুমোচ্ছে সুধা। গোঁড়ালি পর্যন্ত পায়ের কাপড়টা উঠে আছে। একটা পায়ের ওপর আর একটা পা জড়ানো। বুকের থেকেও আঁচলটা বিছানায় পড়েছে। সুধাকে এখন অনেক ফরসা, অনেক রহস্যময়তায় ঘেরা বলে মনে হলো। তপন যেন নেশা করছে। সুধা ওকে কেবলি কোন্ রহস্যের দিকে টানছে। এতক্ষণে ঠোঁটের ওপর একটা মাছি এসে বসেছে। তপন নিজের মধ্যেই এক ধরনের শিহরণ অনুভব করল। আলতোভাবে সুধার ঠোঁট দুটো একটু কাঁপল। মাছিটা এবার উড়ে গিয়ে গোঁড়ালির ওপর বসল। তপন নিষ্পলকভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সুধার দিকে।

অদ্ভুত একটা নীরবতা, নির্জনতা ছড়িয়ে রয়েছে। এভাবে তাকিয়ে থাকার ফলে এক সময়ে তপনের মধ্যে সুধাকে ঘিরে একদা পরিতৃপ্ত একটা লোভ আবার যেন জ্বলে উঠল। তপন বুঝতে পারছিল, কি যেন একটা বাধা তাকে পায়ে পায়ে পিছু টানছে। এই ঘোর আচ্ছন্নতার মধ্যে তপন তার নিজের ঘরেই ফিরে গেল।

ঘরে এসেও সুস্থির হয়ে বসতে পারছিল না। বাড়িটা বড় নির্জন, এই দুপুরের নির্জনতা ওকে অমোঘ নিয়তির মত টানছে।

৩

জাহাজঘাটায় এসে বসেছিল তপন।

সময়টা আশ্বিনের শেষ। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামার আগেই হিম পড়তে শুরু করেছে। দূরে দূরে পাহাড়ের টিলায়, বাড়িঘরে ধোঁয়া উঠছে। সূর্য ডুবল। খেয়াল হলো ঠাণ্ডা লাগবে। জামার বোতামটা ভাল করে দিয়ে আর একটু নড়েচড়ে বসল। তবুও ওঠবার নাম করল না। অল্প অল্প করে সরিসৃপের বুকে-হাঁটার মতন নিঃশব্দে গাছের পাতার ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে নদীর বুকে শূন্যতায় অন্ধকার এগিয়ে এল। একটু একটু সেটা গাঢ় হচ্ছে। এখন আরো বেশি করে হিম পড়ছে। কুয়াশা ঘন হচ্ছিল।

সন্ধ্যা ঘন হল। নদীর বুক থেকে হিম কুড়িয়ে একরাশ হিমেল হাওয়া তপনের চোখে-মুখে গায়ে সমস্ত শরীরে ঝাপটা মারল। ওর শীত-শীত ভাবটা আরও বাড়ল। কোলাহল কমে এসেছে, আর প্রায় নেই বললেই চলে। নদীর কিনারে কিনারে নৌকোগুলোয় যে সান্ধ্য আসর বসেছিল, তা-ও কখন ভেঙে গেছে। অন্ধকারটা ওর চোখের সামনে দুলতে লাগল। এবার ওঠবার তাগিদ বোধ করল তপন। সুধা হয়ত প্রতীক্ষা করছে, জ্ঞানেশবাবু হয়ত এতক্ষণে বাড়ি ফিরে এসেছেন।

বাড়িটা আর নীরব নির্জন নয় ভেবে তপন উঠতে পারল। জাহাজঘাটা থেকে রিকশা নিল।

সুধাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতে শিউলির ভুর-ভুর গন্ধটা এবার নাকের ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়ে মনে সৌরভ ছড়াল। তপন যেন এবার স্বাভাবিকভবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারছিল। সামনের বাড়িগুলো সন্ধ্যার অন্ধকারে ডুবে আছে। অনেক যোজন দূরে নক্ষত্রজ্বলা আকাশটার ওপর দৃষ্টি গেল তার। অনেক তারার মেলা। জ্বলজ্বলে ক'টা তারার ওপর চোখ দুটো স্থির হলো। ওগুলোকে বেশ চেনা ঠেকল তপনের। অন্ধকার রাত্রে এই তারা দেখার খেলা এক সময় ছেলেবেলায় ওর নেশার মত ছিল। অনেক দিন পর আজ আবার এই মুহূর্তে সে নেশাটা পেয়ে বসল। মনে মনে তারা ক'টার নাম মনে করার চেষ্টা করল। মনে আসছে না সব। অনেককাল আগে ছেলেবেলায় বিজ্ঞান বইয়ে পড়েছিল। ছেলেবেলার অনেক কিছু মনে পড়ে না। পড়া উচিত নয়। তপন মনে মনে বলল, অনেক কিছু পুরোন জিনিস মনে পড়া ভাল না। ভুলতে হয়।

সুধার বাড়ির দিকে পা বাড়াবার আগে তপন আরও বলল, কাল দুপুরে আর সে থাকবে না এখানে। দুপুরটা বড় নীরব, নির্জন এ-বাড়িতে। কেউ থাকে না।

জ্ঞানেশের গলা শুনতে পেয়ে সদরের কড়া জোরে জোরে নাড়তে লাগল তপন।

সর্বঋতুর সঞ্জীবনী
দই মিষ্টি
গাঙ্গুরাম গ্র্যাণ্ড সন্স্
ভবানীপুর ও কালীঘাট — কলিকাতা —
ফোন: ৪৭-২৩৭৭

অম্লান সৌন্দর্যের উপচার...

পণ্ড্স ভ্যানিশিং ক্রীম ও ফেস পাউডার

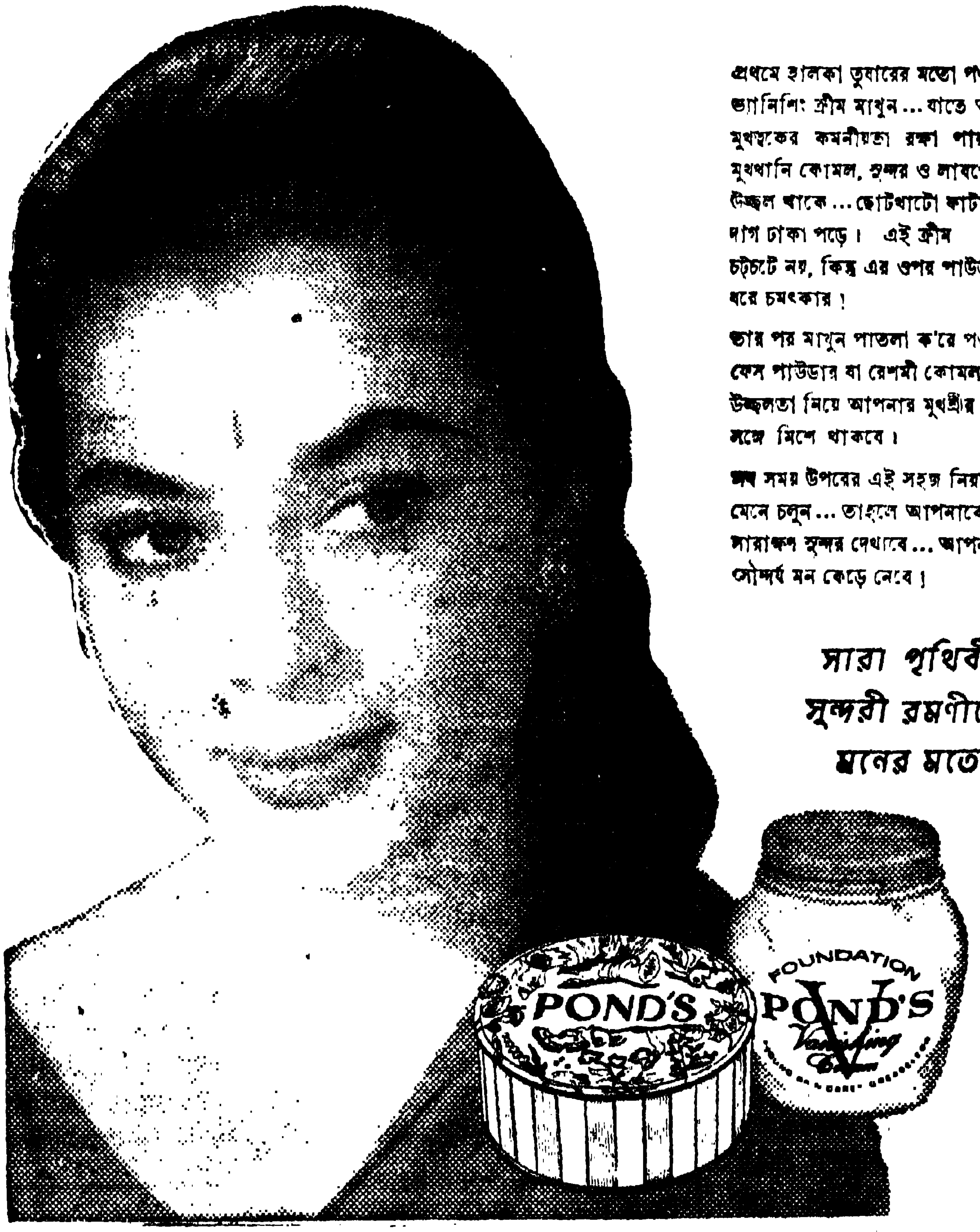

প্রথমে হালকা তুষারের মতো পণ্ড্স ভ্যানিশিং ক্রীম মাখুন... যাতে আপনার মুখত্বকের কমনীয়তা রক্ষা পায়... মুখখানি কোমল, সুন্দর ও লাবণ্যে উজ্জ্বল থাকে... ছোটখাটো কাটা ও দাগ ঢাকা পড়ে। এই ক্রীম চট্চটে নয়, কিন্তু এর ওপর পাউডার ধরে চমৎকার!

তার পর মাখুন পাতলা ক'রে পণ্ড্স ফেস পাউডার যা রেশমী কোমল উজ্জ্বলতা নিয়ে আপনার মুখশ্রীর সঙ্গে মিশে থাকবে।

সব সময় উপরের এই সহজ নিয়মটি মেনে চলুন... তাহলে আপনাকে সারাক্ষণ সুন্দর দেখাবে... আপনার সৌন্দর্য মন কেড়ে নেবে!

সারা পৃথিবীর
সুন্দরী রমণীদের
মনের মতো

চীজব্রো-পণ্ডস ইনক্
(সীমাবদ্ধ দায়িত্বের সঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

JWTP, 72

কড়ি দিয়ে কিনলাম

Cooch Behar

বিমল মিত্র

(৪২)

কত ঐশ্বর্য, কত বিলাস চারদিকে ছড়ানো। সিঁড়ির দু'পাশে ছোট ছোট টবে পাতা-বাহার গাছ। বাঁকের মাথায় মোরাদাবাদী ভসের ওপর ক্যাক্টাস্। কোথায়ও এতটুকু ধুলো নেই, এতটুকু অসংযম নেই। সিঁড়ির মাথায় একটা পাপোষের ওপর কালো অক্ষরে একটা মনোগ্রাম লেখা। দেয়ালগুলো সাদাও নয়, সবুজও নয়, দুটোর মাঝা-মাঝি কেমন একটা তেল-চকচকে জলুস! এ কোথায় তাকে নিয়ে যাচ্ছে দরোয়ানটা। এত পরিচ্ছন্নতার মধ্যে জুতো পরে চলতেও যেন মায়া হচ্ছে।

একতলা থেকে দোতলা। দোতলার পর তিনতলা।

সত্যিই ভুবনেশ্বরবাবু একটা মেয়ের বিয়ে দিয়ে অন্তত শান্তি পেয়েছেন। দীপঙ্কর অবাক হয়ে চারদিকে দেখতে লাগলো। এ কী বাহার, এ কী বিলাস। কলকাতা শহরের মধ্যে যাদের টাকা আছে তারা কি এমনি সুখেই জীবন কাটায়। এমন ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস করতে হলে অনেক সৌভাগ্য থাকা চাই। সতী ছোট থেকেই সৌভাগ্য নিয়ে জন্মেছে! তার যে এমন ঐশ্বর্য হবে, তখনই বোঝা গিয়েছিল। মা'র সঙ্গে মন্দিরে যেত, গঙ্গায় স্নান করতে যেত। বিন্তীদিকে দেখতে আসার সময় নিজের গয়নাগুলো পরিয়ে সাজিয়ে দিত। দীপঙ্করের বড় ভালো লাগলো। বড় ভালো লাগলো সতীর সৌভাগ্য দেখে। এতদিন মনে মনে যে-ক্ষোভটা ছিল তা এক মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। সত্যিই তো, দীপঙ্করের সঙ্গে তার সম্পর্কই বা কীসের। পাশাপাশি বাড়িতে ছোটবেলা থেকে থাকা ছাড়া আর কীসের সম্পর্ক!

—এই যে এসে গেছ, আমি ভাবলাম তুমি ভুলে যাবে!

বারান্দার একেবারে শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল সতী! দীপঙ্কর চোখ তুলে দেখলে। এই চারদিকের অফুরন্ত ঐশ্বর্যের মধ্যে সতীকে যেন অন্যরকম দেখালো। একেবারে অন্যরকম। হাসি হাসি মুখ। অল্প একটু ঘোমটা দিয়েছে। একটা নীল শাড়ি পরেছে। চুমকি বসানো ব্লাউজ একটা গায়ে। মাথার পেছন দিকটা খুব ভারি। মনে হলো যেন মস্ত বড় একটা খোঁপা ঝুলছে কাঁধের ওপর।

—দরোয়ান, তুমি নিচে চলে যাও—

দরোয়ান সসম্ভ্রমে সেলাম জানিয়ে চলে গেল। দীপঙ্কর স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছিল সতীর দিকে। বিয়ে হবার পর আজকেই বলতে গেলে সত্যিকারের প্রথম দেখা। সেদিন নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রীটে গাড়ির ভেতরে বসা সতী যেন এ নয়। এ যেন আলাদা।

সতীও একটু এগিয়ে এল। বললে—তোমার এত দেরি হলো যে?

দীপঙ্কর অবাক হলো। দেরি করে এসেছে নাকি সে! তার নিজের যেন মনে হচ্ছিল একটু সকাল-সকালই এসে পড়েছে। বললে—দেরি কোথায়, আমি তো ভাবছিলাম আরও পরে এলে ভালো হতো—

—ও, তুমি ভেবেছিলে খেয়ে-দেয়েই পালিয়ে যাবে!

দীপঙ্কর বললে—খাবার নেমন্তন্ন করলে আগে কী করে আসি?

সতী হঠাৎ বললে—হাতে কী তোমার?

দীপঙ্কর একটু লজ্জায় পড়লো। বললে—ফুল।

—ফুল? ফুল কী হবে? ফুল কার জন্যে?

দীপঙ্কর বললে—তোমার জন্যে?

—আমার জন্যে?

সতীও অবাক হয়ে চাইলে দীপঙ্করের মুখের দিকে। একটু আগেই বোধহয় সাবান দিয়ে গা ধুয়ে এসেছে সতী। মুখে স্নো পাউডার মেখেছে। গলা পর্যন্ত সমস্ত মুখখানা ধপ্‌ধপ্ করছে। বাগান থেকে তোলা টাটকা ফুলের মত! আর মাথার সিঁথির আগায় লাল টকটক্ করছে সিঁদুর। সিঁদুরের পাতলা রেখাটা যেন হোমের আগুনের মত জ্বলছে।

—তা আমার জন্যে আবার ফুল আনতে গেলে কেন?

দীপঙ্কর বললে—একটা কিছু উপহার তো দিতে হবে!

—কিসের উপহার?

—বারে, তোমাদের বিয়ের বার্ষিকী উৎসব করছো, আর আমি খালি হাতে আসি কী করে?

[illegible] হো হো করে হেসে উঠলো। হাতটা ধরে বললে—এসো এসো, ঘরে এসো—বসবে চলো—

চক্‌চকে মেঝে। দীপঙ্করের জুতো পরে চলতে লজ্জা হচ্ছিল। বললে—জুতোটা এখানে খুলি—

সতী বললে—কেন?

দীপঙ্কর বললে—তোমাদের বাড়ি যা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, জুতোটা খুলে এলেই ভালো হতো! বলে জুতো-জোড়া খুলে রাখলে দরজার পাশে। বললে—এখানে রাখবো?

সতী বললে—থাক্—

দরজায় পাতলা জালি-পর্দা ঝুলছিল। দু'পাশে কর্ড দিয়ে বাঁধা। ঘরের ভেতরে পরিষ্কার তক্ তক্ করছে মেঝে। মধ্যেখানে একটা মিনে করা বিরাট থালার মত টিপয়। তার ওপর জাপানী ফুলদানী। অনেক ফুল রয়েছে তাতে। টিপয়টার চারপাশে আপ-হোলস্টার্ড সোফা কোচ্ সাজানো। কিউবিজম্ ধরনের ডিজাইন সোফার গায়ে। দীপঙ্কর গিয়ে বসলো একটাতে। ঘরটা যে এত বড় তা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। এদিকটাতে সোফা কোচ্, আর আর এক প্রান্তে একটা ডবল ডিভান। আগাগোড়া লেদার ফিটিং। আর মাঝখানে অনেকখানি খালি মেঝে। দেয়ালের দিকেও চেয়ে দেখলে দীপঙ্কর। একজন বৃদ্ধ লোকের ছবি টাঙানো। প্রোট্রেট। ঠিক তার উল্টোদিকের দেয়ালে একটা জোড়া-ছবি। চেয়ারে বসে আছে সতী আর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে আর একজন অচেনা ভদ্রলোক।

ফুলের ঝাড়টা সতী একটা ভাসের মধ্যে রেখে দিয়ে দীপঙ্করের দিকে চেয়ে বললে—ওঁকে চিনতে পারছো তো? ওই আমার বাবা—

ভুবনেশ্বর মিত্র। এতক্ষণে চিনতে পারলে দীপঙ্কর। যেদিন প্রথম বর্মা থেকে আসেন ভদ্রলোক, সেদিনই দেখেছিল। সেই প্রথম আর শেষবার। ছোট একটু দাড়ি চিবুকের ওপর। সতী যেন বাবার কাছ থেকে সেই তেজটা পেয়েছে। যৌবনের আর রূপের তেজ। স্নিগ্ধ শান্ত অথচ প্রখর তেজ একটা। যে-তেজের জন্যে দীপঙ্কর বরাবর আকর্ষণ বোধ করলেও কেমন যেন দূরে দূরে থেকেছে।

সতী হাসতে লাগলো। বললে—আমার দিকে বার বার অমন করে কী দেখছো?

দীপঙ্কর বললে—তোমার বাবার চেহারার সঙ্গে তোমাকে মিলিয়ে নিচ্ছি—

সতী বললে—আমি বাবার চেহারার কিছুই পাইনি—। যাক্ গে, আর এদিকে এঁকে চিনতে পারছো? ইনিই হলেন আমার কর্তা—

সতীর 'কর্তা' কথাটা বলার ধরন দেখে দীপংকর বেশ মজা পেলে। বললে—ইনিই বুঝি সনাতনবাবু? বাঃ, বেশ চমৎকার চেহারা তো!

সতী নিজের স্বামীর চেহারার প্রশংসা শুনে যেন খুশী হলো মনে মনে। বললে—বাবা আমার অনেক দেখে-শুনে বিয়ে দিয়েছেন, খারাপ চেহারা দেখে বিয়ে দেবেন কেন?

দীপংকর কেমন অপ্রস্তুত হয়ে গেল। বললে—না, আমি তা বলছি না, সত্যি আমি ভাবতেই পারিনি এত বড়লোকের বাড়ি তোমার বিয়ে হবে! আরো একদিন তোমার সংগে দেখা করবো বলে তোমাদের বাড়ির সামনে ঘুরে গেছি, কিন্তু তোমাদের দরোয়ানের চেহারা দেখে ভয়ে ঢুকতে পারিনি—!

সতী বললে—লোকটা কিন্তু ভালো, ওই গোঁফজোড়াটা দেখলেই খালি ভয় করে—

দীপংকর বললে—তোমার বিয়ের সময় নেমন্তন্ন খেতে পাইনি বলে একটা দুঃখ

৩০ বছর ধরে... লক্ষ মানুষের তুষ্টি ও বিশ্বাস

ডালডার উৎকৃষ্টতায়

আপনার পরিবারই বা বঞ্চিত হবে কেন?

ডালডা একটি খাঁটি জিনিষ, কারণ সবচেয়ে খাঁটি ভেষজ তেল থেকে তৈরী। এবং ডালডা পুষ্টিকরও বটে, কারণ স্বাস্থ্যের জন্য এতে ভিটামিন যোগ করা হয়েছে।

তাই মাছ-মাংস, শাকসব্জী, তরি-তরকারী ডালডায় রাঁধলে সত্যিই সুস্বাদু হয়। আজ লক্ষ গৃহিণীও তাই তাঁদের সব রান্নাতেই ডালডা ব্যবহার করছেন। আপনিইবা তবে পেছনে পড়ে থাকবেন কেন?

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

ডালডা বনস্পতি

DL.54-X52 BG

ছিল মনে, তুমি সে-দুঃখটা আজ সুদে-আসলে মিটিয়ে দিলে—

বলে হাসবার চেষ্টা করলে দীপংকর। তারপর সতীর মুখের দিকে চেয়ে বললে—কিন্তু, একটা কথা বুঝতে পারছি না, তোমাদের বিয়ের বার্ষিক উৎসবে আমাকে একলা শুধু নেমন্তন্ন করলে কেন?

সতী মুখ টিপে হাসতে লাগলো। বললে—আমাদের বিয়ের বার্ষিকী, এ তোমায় কে বললে?

দীপংকর বললে—আমি বুঝতে পারি। প্রথমটায় আমার খেয়াল ছিল না। শেষে ভাবলাম বিনা উপলক্ষ্যে আমাকে কেন নেমন্তন্ন করতে যাবে সতী! অনেক ভেবে ভেবে তখন বার করলাম—তখন ওই রজনী-গন্ধার ঝাড়টা কিনে আনলুম—

সতী বললে—কেন, বিনা উপলক্ষ্যে নেমন্তন্ন করতে নেই কাউকে?

দীপংকর বললে—সত্যি বলো না, আর কাউকে নেমন্তন্ন করোনি কেন?

—আরে, একে নিয়ে তো এক মহা মুশকিলে পড়া গেল দেখছি! তোমাকে একলা নেমন্তন্ন করলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?

দীপংকর চুপ করে গেল। সত্যিই তো যার যাকে খুশি নেমন্তন্ন করবে, তাতে কা'র কী বলবার থাকতে পারে! কথাটা ভাবতে দীপংকরের একটু গর্বও হলো।

বললে—আমাকে একলা নেমন্তন্ন করে তুমি আমাকে খাতির করলে, না সম্মান দিলে তা বলতে পারি না, আমার কিন্তু মনে মনে খুব গর্ব হচ্ছে সতী!

তারপর একটু থেমে বললে—কিন্তু তিনি কোথায়?

—কে?

—তোমার স্বামী! সনাতনবাবু! তোমাদের বাড়িতে এসে একলা-একলা তোমার সংগে এক-ঘরে বসে গল্প করছি, এটা যেন কী-রকম দেখাচ্ছে! তিনি আসবেন না? তাঁকে ডেকে দাও?

সতী হাসলো। বললে—ওমা, তাঁকে ডাকবো কী করে? তিনি তো নেই বাড়িতে।

দীপংকর বললে—কোথাও বেরিয়েছেন বুঝি?

সতী অবাক হলো। বললে—ও, তোমাকে বলিনি বুঝি? তিনি তো পুরী গেছেন! তিনিও গেছেন, আমার শাশুড়িও গেছেন আজ তিনদিন হলো—

দীপংকর যেন আকাশ থেকে পড়লো। সেই জন্যেই কোনও শব্দ শোনা যায়নি। সমস্ত বাড়িটাতে ঐশ্বর্যের চিহ্ন থাকলেও যেন বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। সেই জন্যে বাড়িটাতে ঢুকে মনে হচ্ছিল যেন কেমন জন-মানবহীন! দরোয়ান চাকর-বাকর আছে বটে, কিন্তু যেন তবু কেউ নেই।

—তা তোমার ছেলে-মেয়েও বুঝি সংগে গেছে?

সতী হেসে গড়িয়ে পড়লো। বললে—তোমার আক্কেল তো বলিহারি! মা'কে ছেড়ে ছেলে-মেয়ে থাকতে পারে?

—আমিও তো তাই ভাবছি! তুমি রইলে এখানে, আর তোমার ছেলে-মেয়েরা চলে গেল বাবার সংগে! তা তারা কোথায়? তাদের তো দেখতে পাচ্ছি না?

সতী বললে—পারি না বাপু তোমার সংগে কথা বলতে!

দীপংকর বললে—কিন্তু আমি কী করবো বলো, মা'কে যখন বললাম যে তুমি নেমন্তন্ন করে গেছে, তখন মা-ই আমাকে জিজ্ঞেস করলে—তোমার ছেলে-পুলে হয়েছে কি না—

সতী বললে—তা হলে তো এতক্ষণ দেখতেই পেতে, কিন্তু না হলে কী করবো?

দীপংকর বললে—হয়ই নি?

দীপংকর মনে মনে হিসেব করতে লাগলো—কত বছর আগে বিয়ে হয়েছে সতীর!

—দাঁড়াও, আমি দেখে আসি মাংসটা কী হলো!

দীপংকর বললে—তুমিই রান্না করছো নাকি?

সতী বললে—না, ঠাকুর আছে, কিন্তু তোমাকে একদিনের জন্যে নেমন্তন্ন করেছি, তাকে দিয়ে বিশ্বাস নেই। শেষকালে যদি নুনে পুড়িয়ে দেয়, তখন কি আমার মুখ থাকবে? পুরোন ঠাকুরটাকে যে আমার শাশুড়ি পুরীতে নিয়ে গেছেন, এ তেমন সুবিধের ঠাকুর নয়—

—তাহলে তো তোমার খুব কষ্ট হলো?

সতী হাসলো। বললে—রাঁধতে কি কষ্ট হয় নাকি মেয়েদের?

দীপংকর বললে—না, তা বলছি না, ও'রা পুরী থেকে ফিরে এলেই নেমন্তন্ন করলে পারতে! তাহলে সনাতনবাবুর সংগেও আলাপ হতো, আর তোমারও এই দুর্ভোগ হতো না—

সতী বললে—বাঃ, জন্মদিন বুঝি কারো বদলানো যায়?

জন্মদিন! জন্মদিনের কথাটা মনে পড়ে গেল হঠাৎ! তার জন্মদিন, সে-কথা সতীর কী করে মনে থাকলো?

বললে—আজকে যে আমার জন্মদিন, তা তোমার কী করে মনে রইল?

সতী বললে—বোস, আমি মাংসটা দেখে এক্ষুনি আসছি—

বলে সতী ঘর থেকে চলে গেল! সতী চলেই যেতেই দীপংকর কেমন অবাক হয়ে গেল। তার জন্মদিনের কথা তো এক মা ছাড়া আর কারো জানবার কথা নয়। আর জানলেও মনে রাখবার কথাও তো নয়। আশ্চর্য তো! আর সতীই বা কেমন মেয়ে! স্বামী নেই, শাশুড়ী নেই বাড়িতে, হঠাৎ তাকে কি না নেমন্তন্ন করে বসলো! এদের সমাজে কি এটা চলে! আর সনাতনবাবুই বা কেমন, আর সতীর শাশুড়িরই বা কী-রকম আক্কেল! তাঁরা পুরী গেলেন তাঁদের বউকে একলা ছেড়ে! আর সতী তাকে ঠিক এই সময়েই নেমন্তন্ন করে বসলো, যখন বাড়ির লোকজন কেউই নেই! এটা কি সতীর পক্ষে ভাল কাজ হয়েছে!

খানিক পরেই সতী ঘরে ঢুকলো হাওয়ায় ভেসে। বললে—তোমাকে বসিয়ে রেখে গেছি অনেকক্ষণ,—কিছু মনে করলে না তো আবার—

দীপংকর বললে—বা রে বা, তোমার কাছে আমি আজ নতুন মানুষ হলুম নাকি?

সতী বললে—নতুন না হোক, আমার শ্বশুর বাড়ি তো নতুন—

দীপংকর বললে—আচ্ছা সতী, সনাতন-বাবুর এ-ব্যাপারটা তো বুঝতে পারছি না, মা'কে নিয়ে তিনি পুরী গেলেন তোমাকে এখানে একলা ফেলে? এটা কী রকম?

সতী খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো।

১৯৬০-৬১ সালে আপনার ভাগ্যে কি আছে?

আপনি যদি ১৯৬০-৬১ সালে আপনার ভাগ্যে কি ঘটিবে তাহা পূর্বাহ্নে জানিতে চান, তবে একটি পোষ্টকার্ডে আপনার নাম ও ঠিকানা এবং কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া পাঠাইয়া দিন। আমরা জ্যোতির্বিদ্যার প্রভাবে আপনার বার মাসের ভবিষ্যৎ লাভ-লোকসান, কি উপায়ে রোজগার হইবে, কবে চাকুরী পাইবেন, উন্নতি, স্ত্রী পুত্রের সুখ-স্বাস্থ্য, রোগ, বিদেশে ভ্রমণ, মোকদ্দমা এবং পরীক্ষায় সাফল্য, জায়গা জমি, ধন-দৌলত, লটারী ও অজ্ঞাত কারণে ধনপ্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয়ের বর্ষফল তৈয়ারী করিয়া ১৷০ টাকার জন্য ভি-পি যোগে পাঠাইয়া দিব। ডাক খরচ স্বতন্ত্র। দুষ্ট গ্রহের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উপায় বলিয়া দিব। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা জ্যোতির্বিদ্যায় কিরূপে অভিজ্ঞ। মিথ্যা প্রমাণিত হইলে আমরা মূল্য ফেরৎ দিবার গ্যারাণ্টি দিই। পণ্ডিত দেবদত্ত শাস্ত্রী, রাজ জ্যোতিষী। (DC-3) জলন্ধর সিটি।

Pt. Dev Dutt Shastri, Raj Jyotishi, (DC-3)
Jullundur City.

বললে—বিয়ের পর এতদিন কেটে গেল, এখনও ভয় থাকবে না কি? কী যে বলো তুমি? আমি কি বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবো?

—না পালিয়ে যাবার কথা হচ্ছে না, কিন্তু...

—কিন্তু কী? বিরহ?

দীপংকর বললে—তিনি তো তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারছেন?

সতী বললে—না গো না, তুমি যা সন্দেহ করছো, তা নয়, আমাদের দু'জনের খুব টান আছে!

তারপর একটু থেমে বললে—আসলে আমার শাশুড়ির একটা মানত ছিল কি না, তাই গেছেন। তা বাড়ি ছেড়ে সবাই চলে যায় সেটা তো ভাল দেখায় না, তাই আমি বললুম আমি থাকবো—

দীপংকর বললে—কবে আসবেন সবাই?

সতী বললে—গেছেন তো মাত্র তিনদিন আগে, আসতে সেই পরের সপ্তাহ হয়ে যাবে—

দীপংকর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো সতীকে। সেই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের ভাড়াটে বাড়ির সতী, কলেজে যেত বাসে করে, আর এখানে এসে একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে। কেমন যেন বউ-বউ চেহারা। গালে মুখে গলায় বুকে যেন একটু মন্থরতা এসেছে। একটু মোলায়েম হয়েছে। তা বিয়ের পর এই রকম তো স্বাভাবিক শুধু লক্ষ্মীদির চেহারাটাই আরো খারাপ হয়ে গেছে। যেন আরো কঠোর, আরো প্রখর।

—তা সারাদিন কী করো তুমি? এত চাকর-ঝি, তোমাকে বোধহয় কিছুই কাজ করতে হয় না। কী করে সময় কাটাও তোমার? দু'জনে বুঝি খুব ঘুরে বেড়াও গাড়ি নিয়ে?

সতী বললে—এক এক দিন যাই—

—কোথাও যাও?

—এই একদিন হয়ত বোটানিক্সে আর একদিন হয়ত যশোর রোড ধরে সোজা যতদূরে খুশি চলে যাই। তারপর যখন ও ফিরতে বলে তখন ফিরি। এক-একদিন ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি আসে, আমরা গাড়ির ভেতরে বসে বসে বৃষ্টি-পড়া দেখি—

দীপংকর বললে—সত্যি তোমরা খুব সুখে আছো সতী!

—তোমার হিংসে হচ্ছে বুঝি?

দীপংকর বললে—না, আমার নিজের কথা ভাবছি, সকাল বেলা তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে অফিসে যেতে হয় তো, তারপর কত রকম লোকের সঙ্গে কত রকম কথা বলতে হয়, সে এক জঘন্য জগৎ সতী! অথচ এখন ভাবি এই চাকরির জন্যেই একদিন কত খোসামোদ, কত ধরাধরি! এখানে বেশি দিন চাকরি করলে মনুষ্যত্ব চলে যাবে আমার মনে হচ্ছে—

—কেন?

দীপংকর বললে—সে তুমি বুঝবে না, আর বুঝতেও যেন কখনও না হয়। সে না-বোঝাই ভাল! চাকরির জন্যে মানুষ এমন হীন কাজ নেই যা করতে পারে না! মিথ্যে কথা বলতে গেলে মুখ একটা কোঁচকায় না পর্যন্ত—অফিসের কথা থাক্ গে—

—না, থাকবে কেন! আমি তোমাদের অফিসে যাবো একদিন!

—তুমি?

—হ্যাঁ, গেলে দোষ কী?

দীপংকর বললে—দোষ আর কী? কিন্তু তোমরা এত সুখে আছো, অফিসে যাবেই বা কেন! আর গেলে লোকেই বা বলবে কী?

—তোমার প্রমোশন-টমোশন কিছু হলো?

দীপংকর বললে সব। কেমন করে সামান্য চাকরি থেকে তাড়াতাড়ি উন্নতি হয়েছে তার। যা কখনও কারো হয়নি। অথচ ঘুষও দিতে হয়নি, খোসামোদও করতে হয়নি। কে জানে কেন যে রবিনসন্ সাহেবের সু-নজরে পড়ে গেছে সে, তার ফলেই চাকরিটা চলছে ভালমতন। নইলে প্রাণ বেরিয়ে যেত অফিসে। আরো অনেক কথা বলে গেল দীপংকর। নতুন বাড়ি ভাড়া করেছে স্টেশন রোডে, অঘোরদাদুর মৃত্যু, ছিটে-ফোঁটার ব্যবহার, লক্কা-লোটন কারোর কথাই বাদ গেল না। আর কিরণী?

সতী বললে—এখনও বিয়ে হয়নি?

দীপংকর বললে—তুমি একটু চেষ্টা করো না সতী। তুমি একটু চেষ্টা করলেই হয়। মেয়েটার জন্যেই মা ভেবে-ভেবে অস্থির। কী করে যে বাড়ি ছেড়ে যাবো আমরা তাই ভাবছি—। কিন্তু যাক্ গে—

বলে অন্য প্রসঙ্গ ওঠালে দীপংকর। বললে—ও-সব বাজে কথা থাক্, তোমার কথা বলো—

—আমার কী কথা?

সতী বললে—আমার কথা কী বলবো? আমাকে তো সামনেই দেখতে পাচ্ছো? খাই-দাই ঘুমোই, আর কী খবর থাকতে পারে?

দীপংকর বললে—বিয়ের পরে তো এই প্রথম তোমার সঙ্গে দেখা হলো। শ্বশুরবাড়ি কেমন, নতুন বর তোমার কেমন হলো, দু'জনে কেমন কাটাচ্ছো, সেই সব কথা বলো?

সতী হেসে ফেললে। বললে—যেমন সবাই কাটায় তেমনি কাটাচ্ছি—। বিয়ের পর একবার ওর সঙ্গে বাবার কাছে গিয়েছিলাম, এক মাস থেকে চলে এলাম—

দীপংকর বললে—এখানে এ-বাড়িতে ঢুকে পর্যন্ত আমার খুব ভালো লাগছে, জানো সতী! মনে হচ্ছে, অন্তত এমন একজনকেও জানি যে জীবনে সুখী হয়েছে। সংসারের চারদিকে নানান্ ব্যাপার দেখে দেখে মনটা বড় ভারি হয়ে গেছে। নিজের জীবনে সুখী না-ই বা হতে পারলাম, তুমি হয়েছ এতেই আনন্দ হয়েছে আমার—

সতী বললে—যাক্ গে, তোমাকে আর বুড়োমানুষী করতে হবে না! তোমার কী এমন কষ্টটা শুনি?

দীপংকর বললে—বলছো কী? কষ্ট নয়?

—শুনিই না, কীসের কষ্ট তোমার? চাকরিতে প্রমোশন হয়েছে, আলাদা বাড়ি ভাড়া করেছ—

—তা চাকরি আর বাড়ি হলেই বুঝি সব কষ্ট ঘুচে যায় মানুষের?

সতী হেসে বললে—এখন বাকি আছে শুধু বিয়েটা! আমিই মাসীমাকে গিয়ে কথাটা বলে আসবো! না, সত্যিই এবার তোমার বিয়েটা দেওয়া দরকার। একলা-একলা আর ভালো লাগছে না বুঝতে পারছি!

দীপংকর বললে—তোমার মত সুখের বিয়ে হলে বিয়ে করতেও রাজি আছি—

সতী বললে—বিয়ে করে আবার কারো কষ্ট হয় নাকি?

দীপংকর বললে—হয় না? আমাদের অফিসেই কত লোক আছে, বিয়ে করে পস্তাচ্ছে—তুমি নিজে সুখে আছো বলে তাই ওই রকম ভাবছো—তোমাদের এই

জগদীশবাবুর গীতা
মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা ... ভূমিকাসহ
অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়মূলক যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম ৫·০০ ভারত-আত্মার বাণী ৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১·৫০ কর্মবাণী ১·২৫
প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী · ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

সংসার, টাকার অভাব নেই, ঐশ্বর্যের অভাব নেই, এক গ্লাস জল পর্যন্ত তোমাকে গড়িয়ে খেতে হয় না, বিয়ে করা তো তোমাদেরই পোষায় সতী—

সতী বললে—তা আমরা সুখে আছি বলে তুমি যেন বাপু আবার নজর দিও না —হ্যাঁ—

—না না, দারিদ্র্য তো তুমি দেখনি সতী। আমি দেখেছি, এই আমার কথাই ধরো না, ছোটবেলায় কী কষ্টে যে মানুষ হয়েছি, বলতে গেলে ভিক্ষে করে পরের বাড়ি রান্না করে মা চালিয়েছে। সে তো তুমি দেখেছ। আমার বড় সাধ ছিল স্বদেশী করবার, দেশের শতকরা নব্বুই জনই তো আমাদের মতন অবস্থা, রাস্তার কাটা ডাব কুড়িয়ে এক-একজন ভদ্রলোকের ছেলে পেট ভরায়, জানো, তাই যখন স্বদেশীদের বোমার ঘায়ে বড় বড় জজ্-ম্যাজিস্ট্রেট, লাটসাহেবরা খুন হয়, তখন বড় কষ্ট হয় মনে। মনে হয়, আমি কিছু করতে পারছি না। আমি চাকরি করছি বাধ্য হয়ে, মনে হয়, আমি দেশের কোনও কাজে লাগলাম না—! তোমাদের মতন টাকা যদি থাকতো তো আমাকে চাকরি করে সময় নষ্ট করতে হত না—

সতী চুপ করে শুনতে লাগলো।

দীপংকর বললে—তোমাদের এত টাকা। এত সুখ দেখে বড় লাগলো তাই বলছি, এতদিন দেশের প্রত্যেকটা লোকের এইরকম সুখ, এইরকম ঐশ্বর্য যেদিন হবে, সেইদিনই আমার সুখ হবে—

সতী বললে—তুমি দেখছি এখনও সেইরকমই আছ—

কীরকম?

—যে-রকম ছিলে আগে! ভেবেছিলাম এতদিন পরে একটু সেয়ানা হয়েছ বুঝি।

দীপংকর বললে—তুমি জানো না সতী, আমরা সব প্রাণমথবাবুর হাতে-গড়া মানুষ। আমরা ভালোর সুগার-কোটিং দিয়ে খারাপ জিনিসের বেসাতি করি না। এককালে তুমি তো কিরণকে ঘেন্না করতে, কিন্তু জানো, সেই কিরণই......

সতী বললে—থামো বাপু, তুমি কি বক্তৃতা করতে এখানে এসেছো নাকি? তোমাকে নেমন্তন্ন করলুম কি তোমার বক্তৃতা শোনবার জন্যে?

দীপংকর যেন এতক্ষণে একটু সম্বিত ফিরে পেলে। বললে—সত্যিই, যত বাজে কথা বলতে আরম্ভ করেছিলাম—তা সত্যি তোমার কী করে মনে রইল যে, আজকে আমার জন্মদিন? আমি নিজেই তো ভুলে গিয়েছিলুম—

সতী হেসে বললে—মেয়েদের মনে থাকে সব!

—থাকে? সত্যিই থাকে?

—হ্যাঁ, সব মনে থাকে।

দীপংকর বললে—প্রথমদিন আমাকে সেই কুলী মনে করে চারটে পয়সা দিয়েছিলে, তাও আমার মনে আছে।

সতী বললে—তোমার তো বড় সাংঘাতিক মন? অত মনে থাকাও কিন্তু ভাল নয় আবার—জীবনে কখনও সুখ পাবে না তুমি!

হঠাৎ একটা চাকর ঘরে ঢুকলো। সতী বললে—কী রে শম্ভু, কিছু বলবি?

শম্ভু নামটা শুনে দীপংকরের মনটা চমকে উঠলো। শম্ভু! লক্ষ্মীদির মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো মুহূর্তের জন্যে!

শম্ভু বললে—ঠাকুর বলছিল, এখন লুচি বেলবে?

সতী দীপুর দিকে চেয়ে বললে—তুমি খাবে এখন দীপু? খিদে পেয়েছে? আমার সব তৈরি—

দীপংকর বললে—আমার জন্যে ভেবো না, তোমাদের যখন সুবিধে হবে, আমায় জিজ্ঞেস করছো কেন?

সতী বললে—তাহলে ভাজতে বল, আর খাবার জায়গা করে দে টেবিলে—

শম্ভু চলে গেল। সতী বললে—সকাল-সকাল খেয়ে যেন পালিয়ে যেও না,—

—তুমিও আমার সঙ্গে খাবে তো?

সতী বললে—না না, তা কখনও হয়? তুমি নতুন এলে, তোমার খাওয়ার তদারক করতে হবে তো—তুমি খেয়ে নিলে তারপর আমি খেয়ে নেব—! খাবার পর চলো কোথাও বেড়িয়ে আসি, গাড়ি তো রয়েছেই—

—কোথায়?

—এই ময়দানের দিকে!

—তোমরা বুঝি খাওয়া-দাওয়ার পর বেড়াও!

সতী বললে—মাঝে মাঝে বেড়াই বই কি! আমারও কিছু কাজ নেই, ওরও কিছু কাজ নেই—কী করি বলো!

—তাহলে তোমাদের এত বড় সংসার চলে কিসে?

সতী বললে—পৈত্রিক টাকা! টাকা জমে জমে পাহাড় হয়ে উঠেছে। শেয়ার কেনা আছে গাদা-গাদা। একেবারে যার নাম নেই, সেই সব শেয়ার, ডিভিডেন্ড্ আসে।—কিছু করবার দরকারই হয় না ওর! তাছাড়া, আমি ও-সব ব্যাপার নিয়ে মাথাই ঘামাই না—

—আর তোমার শাশুড়ি?

—শাশুড়িও বউ বলতে একেবারে অজ্ঞান! আমার শাশুড়িও খুব ভাল—

দীপংকর বললে—তা তো ভাল হবেই, এত টাকা-কড়ি, শাশুড়ি তো ভালবাসবেই, আর তুমি হলে বাড়ির একমাত্র বউ, বাড়িতে লোক-জনও কম—বেশ সুখে আছো সতী সত্যি - মাকে গিয়ে সব বলবো।—আর সেই কাকাবাবু, কাকীমা, তাঁরা কোথায় গেলেন?

সতী বললে—সেই কালীঘাটের সেদিন-কার কাণ্ডর পর তিনি বদলি হয়ে চলে গেছেন বর্মায়—

আবার বর্মায়?

সতী বললে—হ্যাঁ, কাকীমার তো ছেলে-মেয়ে কিছু নেই, কী করতেই বা কলকাতায় থাকবেন, অনেক চেষ্টা করে আবার চাকরিতে বদলি করে নিলেন—

দীপংকর বললে—জানো সতী, তোমার বিয়ের দিন আমি হাজত থেকে ছাড়া পেলাম, পেয়েই শুনলাম তোমার বিয়ে হচ্ছে, শুনে তখনি চলে এসেছিলাম—এই বাড়ির সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম, অনেক লোক-জন গাড়ি এসে দাঁড়াচ্ছিল, প্রথমটা একটু কষ্ট হয়েছিল—

—কেন, কষ্ট হয়েছিল কেন?

দীপংকর হাসলো। বললে—কষ্ট হচ্ছিল নেমন্তন্ন হয়নি বলে, শেষকালে মনে হলো, তোমার বড়লোকের বাড়িতে বিয়ে হয়েছে, এ তো সুখের কথা—অথচ লক্ষ্মীদি—

সতী জিজ্ঞেস করলে—লক্ষ্মীদি? লক্ষ্মীদির সঙ্গে দেখা হয় নাকি?

হঠাৎ শম্ভু এসে ডাকলে—বৌদিমণি!

শম্ভু এসে ঘরে ঢুকলো। বললে—এবার খাবার দেওয়া হবে? টেবিল তৈরি—

সতী উঠলো। বললে—চলো চলো—তুমি অফিস থেকে আসছো, খেয়েই নেবে চলো—

টিক্-20

টাটা—ফাইসনের তৈরী

ছারপোকা ধ্বংস করে

Geigy

গেইগী

ডায়াজিনন

এতক্ষণ যে-ঘরে বসেছিল—তার পাশেই আর একটা ঘর। পাশ দিয়ে বারান্দা গেছে। ঘরের মধ্যে শ্বেতপাথরের টেবিল্। দেয়ালের গায়ে স্টীল-লাইফ্ স্টাডি অনেকগুলো ঝুলেছে। আস্ত মাছ, কাটা তরমুজ। পাশের দেয়ালে নিচু মিট্-সেফ্।

সতী বললে—বোস—

দীপঙ্কর বললে—এত?

সতী করেছে কী! অসংখ্য বাটি সাজিয়েছে থালার চারিদিকে। কত রকমের যে মাছ। কত রকমের যে তরকারী। জীবনে এমন যত্ন করে এত পর্যাপ্ত খাবার আয়োজন কেউ করেনি দীপঙ্করের জন্যে। সতী বললে—নাও, ওইখানে, হাতটা ধুয়ে নাও ভাল করে, সাবান তোয়ালে সব আছে—

হাত মুখ ধুয়ে এসে দীপঙ্কর বসলো। সতী নিজে লুচিগুলো একটা একটা করে থালায় দিচ্ছে। বললে—তুমি একটা-একটা করে খাও, আমি একখানা করে দেব, তাড়াতাড়ি কোর না, আস্তে আস্তে খাও।

দীপঙ্কর বললে—এত আয়োজন করেছ আমার জন্যে?

সতী বললে—থাক্ ভণিতা থাক্, খাও, খেতে আরম্ভ করো—

দীপঙ্কর থালায় হাত দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ শম্ভু এল দৌড়তে দৌড়তে।

—বৌদিমণি?

—কী রে?

—মামণি এসেছে!

মামণি! দীপঙ্কর সতীর দিকে চেয়ে দেখলে। সতীর মুখখানা যেন কেমন যন্ত্রণায় হঠাৎ নীল হয়ে উঠলো এক নিমেষে। সতী যেন খানিকক্ষণের জন্যে দীপঙ্করের উপস্থিতিও ভুলে গেল। কী বলবে ভেবে পেলে না।

শম্ভু বললে—বাবুও এসেছেন—

—তুই যা, ওদের জিনিসপত্র সব নামিয়ে দিগে যা—

বলে সতী কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে রইল। তারপর হঠাৎ যেন দীপঙ্করের কথা মনে পড়তেই হেসে ফিরে তাকাল এদিকে।

দীপঙ্কর অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো নিজের মধ্যেই।

এক-সময়ে জিজ্ঞেস করলে—কে এসেছে সতী? কারা? সনাতনবাবু পুরী থেকে ফিরে এলেন নাকি?

সতী বললে—হ্যাঁ—

আর কিছু বললে না। দীপঙ্কর খেতে গিয়েও হাত গুটিয়ে বসে রইল। যেন খেতে পারলে না আর।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—আজকেই কি আসবার কথা ছিল ও'দের?

সতী কিছু কথা হয়ত বলতো কিন্তু তার আগেই অনেক লোকের পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। প্রথমে কয়েকজন চাকর-বাকর মালপত্র নিয়ে চলে গেল পাশের বারান্দা দিয়ে। তারপর এক ভদ্রলোক। বেশ ফরসা চেহারা। হাসি হাসি মুখ। একবার এ-ঘরের দিকে তাকালেন। তারপর যেন কিছুই ঘটেনি এমনিভাবে সোজা সামনের দিকে চলে গেলেন। তাঁর পেছনেই এলেন একজন বিধবা মহিলা। সাদা থান পরা। তিনি যেন চাকরদের সঙ্গে কী-সব কথা বলতে বলতে আসছিলেন। হঠাৎ এ-ঘরের সামনে আসতেই দীপঙ্করকে দেখে যেন থমকে দাঁড়ালেন একবার। অবাক হয়ে তাকালেন দীপঙ্করের মুখের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে সামনের দিকে চলে গেলেন।

দীপঙ্কর সতীর দিকে চেয়ে দেখলে। সতীর চেহারাটা যেন বিষের মত নীল হয়ে উঠেছে। দীপঙ্করের ইচ্ছে হলো সে এ-ঘর থেকে উঠে পালিয়ে যায়। এ-বাড়ি থেকে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে যায়।

—বউমা!

হঠাৎ যেন বাইরে বজ্রপাত হলো। সতী উঠলো। বললে—তুমি খেতে আরম্ভ করো দীপু, আমি শুনে আসি কী বলছেন।

সতী বাইরে চলে যেতেই সতীর শাশুড়ীর বজ্র-গম্ভীর গলার আওয়াজ শোনা গেল—ঘরে কে ও?

সতী যেন একটু দ্বিধা করছিল।

আবার আওয়াজ—কে ও, বলো?

সতী বললে—ও দীপঙ্কর, আমাদের কালীঘাটের বাড়ির পাশে থাকতো—

—পাশে থাকতো? ও! ত ওকে ঘরে এনে খাওয়াবার আর সময় পেলে না? না কি আমরা বাড়িতে ছিলাম না বলেই ডেকেছিলে?

—না, আজকে ওর জন্মদিন!

—যার তার জন্মদিন করবার জন্যেই কি ঘোষ-বাড়ির বউ করে এনেছি তোমাকে?

সতী বললে—আপনি জানেন না, ওর মাকে আমি মাসীমা বলে ডাকি, ও আমার ভাই-এর মতন—

—কিন্তু তোমার ভাইকে এতদিন তো একবারও ডাকোনি, যতদিন আমরা বাড়িতে ছিলাম! জন্মদিন কি এই প্রথমবার হলো তোমার ভাই-এর?

সতী বোধহয় চুপ করে ছিল। শাশুড়ীর গলা আবার শোনা গেল। বললেন—যাও, যা বলবার তোমার ভাইকে বলে এসো, আমি আছি আমার ঘরে, তোমার সঙ্গে কথা আছে—যাও—

খানিক পরেই সতী ঘরে এল। দীপঙ্করের মনে হলো সতী যেন থর থর করে কাঁপছে। কিন্তু মুখটায় একটা হাসি আনবার চেষ্টা করতে লাগলো।

সতী দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকলো। ঘরে আসতেই দীপঙ্কর দাঁড়িয়ে উঠলো। বললে—আমি তাহলে আসি সতী—

সতী হঠাৎ করুণ হয়ে উঠলো সমস্ত চেহারাটায়। বললে—দীপু, তোমাকে খেয়ে যেতেই হবে—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু এর পরেও তুমি আমাকে খেতে বলো?

—না, তুমি যেতে পাবে না! না-খেয়ে তুমি আজ যেতে পাবে না এ-বাড়ি থেকে!

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু সতী, আমার যে কিছুই মুখে উঠবে না, এর পরেও আমি খাবো কী করে?

সতী যেন কঠিন হয়ে গেল এক-মুহূর্তে। বললে—আমিও এ-বাড়ির বউ, আমারও অধিকার আছে তোমাকে খাওয়াবার, সেই অধিকারটুকু তুমি আজ প্রমাণ করে দিয়ে যাও—! তুমি না খেলে যে আমার অপমান হবে। এটা বুঝছো না কেন?

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু তোমার স্বামী? সনাতনবাবু?

—সে আমি বুঝবো! আমি তোমার জন্মদিনে তোমাকে নেমন্তন্ন করে ডেকে এনেছি, তোমাকে খেতেই হবে, তোমার মুখে না রুচলেও খেতে হবে, তুমি না খেয়ে চলে গেলে তোমার চোখের সামনে আমি আত্মহত্যা করবো—

দেখতে দেখতে সতীর চেহারাটা দীপঙ্করের চোখের সামনে যেন বাঘিনীর মত ভয়ংকর হয়ে উঠলো। (ক্রমশ)

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন!
যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দুর করতে পারে একমাত্র
বহু গাছগাছড়া দ্বারা বিশুদ্ধ মতে প্রস্তুত
বাকলা
ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন
ভারত গভঃ রেজিঃ নং ১৬৮৩৪৪
অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা,
মুখে টকভাব, ঢেকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দাগ্নি, বুকজ্বালা, আহারে অরুচি, স্বল্পনিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ন নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যাঁরা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও বাকলা সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিফলে মূল্য ফেরৎ।
৩২ তোলার প্রতি কৌটা ৩৲ টাকা, একত্রে ৩ কৌটা—৮৷৷৹ আনা। ডাঃ, মাঃ ও পাইকারী দর পৃথক।
দি বাকলা ঔষধালয়। হেড অফিস- বরিশাল (পূর্ব্ব পাকিস্তান)
ব্রাঞ্চ—১৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৭

লাওসের সঙ্কট

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

অজিতকুমার দাশ

॥ ১ ॥

দেওয়ালীর দিন ১৯শে অক্টোবর খবরের কাগজ খুলতেই দু'জায়গায় ছোট্ট দুটো খবর চোখে পড়ল।

প্রথমটি ওয়াশিংটনের খবর। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ঘোষণা করেছেন যে লাওস রাষ্ট্রকে যে আর্থিক সাহায্য এতদিন তাঁরা দিচ্ছিলেন, এবং কিছুদিন আগে যেটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, সেটা আবার চালু করা হ'ল।

দ্বিতীয় খবরটি হ'ল যে লাওস রাষ্ট্রে প্রথম রুশীয় রাষ্ট্রদূতকে লাওস রাষ্ট্রে আগমনের দিন সরকারী অনুমতি বিনা সেনাবাহিনীর সম্বর্ধনা জানাবার জন্য লাওসের প্রধানমন্ত্রী লাওস সামরিক বাহিনীর ক্যাপ্টেন কাং লে কে ১৪ দিনের জন্য "নামে বন্দী" করেছেন। অর্থাৎ কাগজে কলমে তাকে বন্দী করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করা হয়নি, অবাধ চলাফেরা, কাজকর্ম আগের মতই চলবে।

এক সপ্তাহ আগের দুটো ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল।

টোকিও থেকে দেশে ফিরছি। হংকংএ কিছু কেনাকাটা করে ম্যানিলা শহরে এসেছি। ১০ই অক্টোবর ইউনাইটেড প্রেস ইণ্টার ন্যাশানালের অফিসে বসে গল্প করছি। সতীর্থ, বন্ধু বেল মিলার বলছেন, একটা বিচ্ছিরি কাজ করেছি। একটি চীনা তরুণীকে আমি ভালবেসে বিয়ে করেছি। কি করব, চীনা মেয়েদের সংগে ভাব হ'লে প্রেমে না পড়ে থাকা যায় না। বিশেষত যদি সুন্দরী শিক্ষিতা তরুণী হয়। আর প্রেমে পড়লে বিয়ে না করেও থাকা যায় না।

আমেরিকান ছেলের মুখে অতি উপাদেয় কথা পরম আগ্রহের সংগে শুনছি। এমন সময় টোকিও থেকে টেলিটাইপ মেশিনে এক টুকরো প্রশ্ন এল "দাস কি ম্যানিলা ছেড়ে চলে গেছে, যদি না গিয়ে থাকে তো ওকে এক্ষুনি লাওস চলে যেতে বল। লাওসে আমাদের যে লোক ছিলেন খুব অসুস্থ হয়ে তিনি সাইগনে ফিরে গেছেন।

অতএব চল লাওস।

১১ই ব্যাংকক রওনা হ'লাম, ম্যানিলা থেকে লাওসের পথে। ঠিক হ'ল দুপুরে ব্যাংকক পেঁছে সেদিনই বিকেলে বা প্লেন না থাকলে পরের দিন ভোরে লাওসের রাজধানী ভিয়েনসান্ শহরে রওনা হ'ব।

প্লেন উড়ল ম্যানিলা থেকে ব্যাংককের পথে। আধ ঘণ্টাটেক উড়বার পর ক্যাপ্টেনের গুরুগম্ভীর গলা সবাইকে একটা ধাক্কা দিল। "দুঃখের সংগে জানাতে হচ্ছে যে আমাদের প্লেনে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেওয়াতে আমরা ম্যানিলা ফিরে যাচ্ছি। একজন স্টুয়ের্ডকে কাছে ডেকে বললাম, "ব্যাপারটা কি বল তো?" সে বলল, "একটা ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে। অর্থাৎ ৪-এর বদলে তিন ইঞ্জিন প্লেন চলছে। কোনও ভয়ের কারণ নেই, তিন ইঞ্জিনে সুপারকনস্টেলেশন এমন চলে, কি বলব।" বলার ভংগীটা এমন, যেন চতুর্থ যে ইঞ্জিনটা বন্ধ হয়ে গেছে, ওদের ভাষায় "ডেড্" হয়ে গেছে তার কোনও দরকারই ছিল না, একটা বাড়তি ফসিল ঝরে পড়েছে।

প্লেনে বসে এক সপ্তাহ আগের একটা ঘটনা বারবার মনে পড়তে লাগল। টোকিও ছাড়বার আগের দিন, অফিসে গিয়েছি সকলের কাছে বিদায় নিতে। বড়কর্তা আমায় দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, কোন কোম্পানীতে যাচ্ছ। কি প্লেনে? বললাম, "লকহিড ইলেক্ট্রা"। ব্যাস্ আর কথা নেই। আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে ফোটো বিভাগে নিয়ে এসে বললেন, এ কে (এ কে দাশের সংক্ষিপ্ত) কাল ইলেক্ট্রাতে পেসিফিক পাড়ি দিচ্ছে। ওতো আর গন্তব্য স্থানে পেঁছাবে না। ইলেক্ট্রা ক্র্যাশ করবে। ওর কয়েকটা ছবি তুলে রাখ; তবু আমাদের কাছে অন্তত একটা মৃত প্যাসেঞ্জারের ছবি থাকবে।

Gentlemen shake hands with A.K., say farewell boy. We will fly over Pacific in an Electra.

তার কিছুক্ষণ আগেই বস্টন থেকে খবর এসেছিল যে একটা লকহিড ইলেক্ট্রা ঠিক উড়বার পরই প্রায় ৬০ জন যাত্রী নিয়ে সমুদ্রে ভেংগে পড়ে—একটি যাত্রীও বাঁচেনি। আরও ছিল। গত কয়েক মাসে ইলেক্ট্রাতে দুর্ঘটনার সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী।

আমি বাংগালীর ছেলে আর কয়েক ঘণ্টা পরেই ইলেকট্রাতে চড়ব, আমার অবস্থা বুঝুন।

অভয় দিল বার্তা সংবাদক—"না, না তোমার কোনও ভয়ের কারণ নেই। ইলেকট্রা চড়লে ভয় শুধু দু'বার টেক্ অফ্ আর ল্যান্ডিংএর সময়। যখন জমিতে বা আকাশে থাকে কোনও ভয় নেই!"

যাক আজ যখন লিখতে পারছি। অবশ্যই জোর বেঁচে এসেছি।

সেদিনও তিন ইঞ্জিনে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ম্যানিলা এলাম এবং কপালজোরে দু'ঘণ্টা পর অন্য একটি প্লেন পেয়ে রাতে ব্যাংকক পেঁছালাম।

৯ই আগস্টের সশস্ত্র সামরিক বিদ্রোহের নেতা ক্যাপ্টেন কাংলে বক্তৃতা দিচ্ছেন

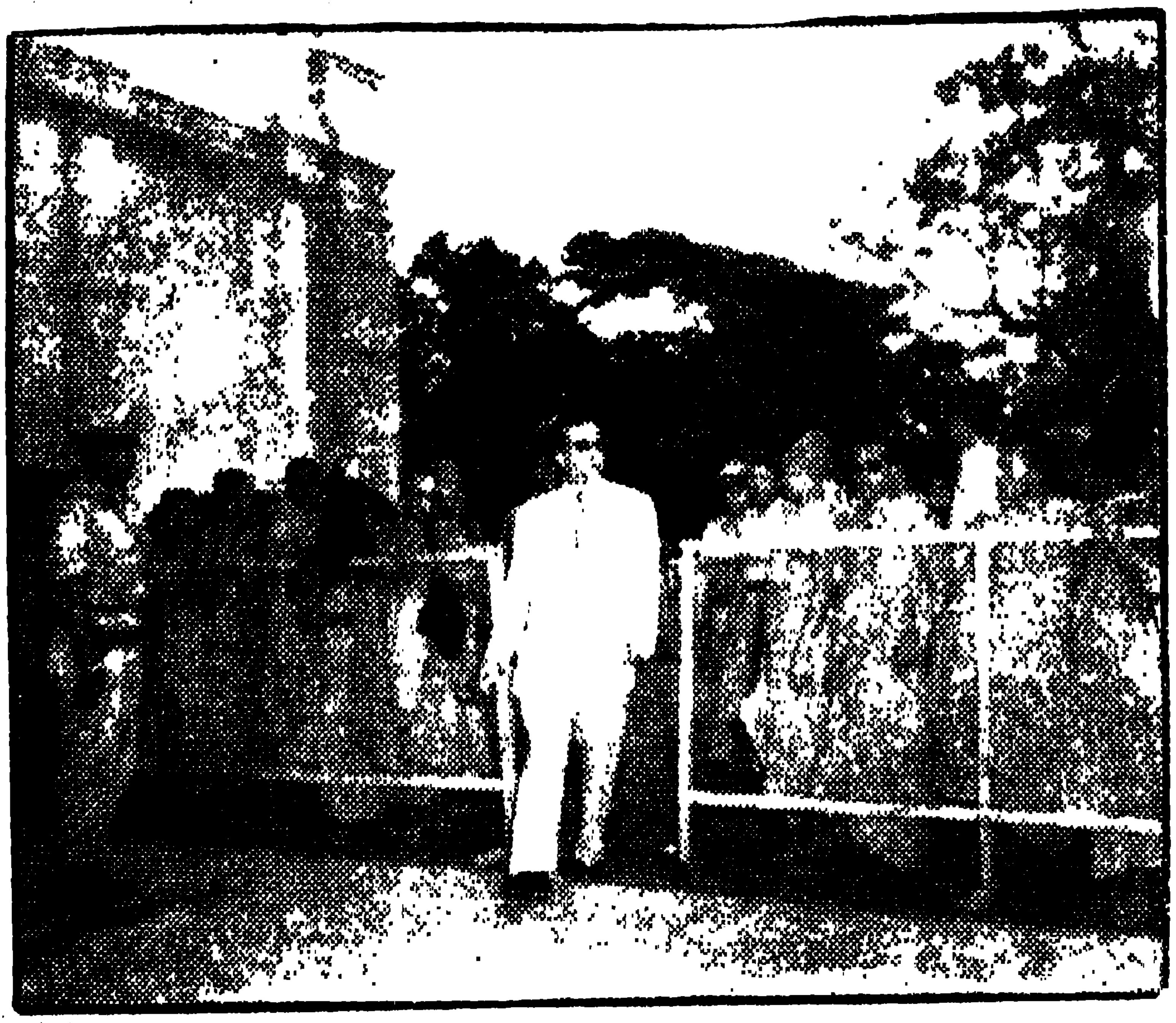

প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সোভানা ফুমা প্যাথেট লাও বিদ্রোহীদলের সংগে শান্তি আলোচনার জন্য এগিয়ে আসছেন

১২ই ভোরে ব্যাংকক অফিসের ম্যানেজার বন্ধু প্রাসাং ওয়াটাইয়া দেখা হ'তেই লাওস সম্পর্কে এমন একটা ভাব দেখালেন, যেন আমি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একটা শহীদ হ'তে চলেছি।

লাওসের ভিসা আছে তো?

না, নেই, এখানেই নেব, পাশপোর্টে এনডোর্সমেণ্ট আছে।

দেবে কি ভিসা, ভয়ানক কড়াকড়ি। জংগী সরকারের রাজত্ব। সাংবাদিক জানলে তো আরও দেবে না।

তোমাদের না দিতে পারে, লাওসের চারদিকে অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করেছ। না খাইয়ে শুকিয়ে দেশটাকে সায়েস্তা করার জন্য। আমি ভারতীয়, ভিসা পাব। আর না যদি পাই, সেটাই খবর।

লাওসের ভিসা অফিসার খুব ভাল করে আপাদমস্তক লক্ষ্য করলেন। দরখাস্ত ফর্মটা খুঁটিয়ে পড়লেন এবং কোনও দ্বিরুক্তি না করে ভিসা দিয়ে দিলেন।

এই যে ভিসা সম্পর্কে ভয় অথচ অতি সহজেই ভিসা পাওয়া:—লাওসের সম্পর্কে ঘটনা ও রটনার এটা একটা প্রতীক বলা যেতে পারে।

লাওস যাওয়ার আগে সবাই ভয় দেখিয়েছেন, সাবধানী বাণী বা সাহস দিয়েছেন। সবাই এক বাক্যে বলেছেন, গৃহযুদ্ধের সম্মুখে দাঁড়িয়ে লাওস। ৯ই আগস্ট প্যারাট্রুপার ক্যাপ্টেন কাং লে যাঁকে "নামে বন্দী" করার খবর এসেছে, সরে ভোরের আলো ফুটবার আগে বিদ্রোহ করে আগেকার পশ্চিমী ঘেঁষা সরকারের পতন ঘটান এবং নতুন সরকার গঠন করেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সোভানা ফুমাকে প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করতে রাজী করান।

তারপর থেকে লাওসে আধা জংগী শাসন চলছে, বলা চলে। রাতে কারফিউ। প্রথম প্রথম সন্ধ্যা ৭টা থেকে কারফিউ চালু হ'ত, এখন রাত ১০টায় চালু হয়।

অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত লাওস। পুরো রাষ্ট্রের ওপর সরকারের দখল বা শাসনতান্ত্রিক আধিপত্য নেই। উত্তর দিকে কম্যুনিস্ট ঘেঁষা উত্তর ভিয়েৎনামের সমর্থন-পুষ্ট পাথেট-লাও নামে বিদ্রোহী দল সাম্ নুয়া শহর অধিকার করে বসে আছে। তাদের নেতা প্রিন্স সুপানাভং। আবার দক্ষিণে পশ্চিম-ঘেঁষা প্রিন্স চম্পাসকের নেতৃত্বে এক বিদ্রোহী দল ভানাকেট্ শহর অধিকার করে বসে আছে। মধ্য লাওসে ভিয়েনসান্ শহরে রাজকীয় লাওস সরকারের রাজধানী।

সরকারী দলকে নিয়ে এই ত্রহস্পর্শের উৎপত্তিতে এবং ক্ষুদ্র লাওসের ক্ষুদে ৩০,০০০ সৈন্যের সৈন্যবাহিনী নিয়ে বিভক্ত হয়ে বেশ কিছু সৈন্য দুটি বিদ্রোহী দলে যোগ দেওয়ায় অশান্তি ও উদ্বেগের বীজ লাওসে থেকেই যাচ্ছে। এর ওপর লাওসের ভৌগোলিক অবস্থিতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ক্ষুদ্রতম এই রাষ্ট্রটিকে একরাশ বৈদেশিক রাষ্ট্রের আশা, আশঙ্কা, মান-অভিমানের বস্তু করে রেখেছে। লাওসের উত্তরে চীন, দক্ষিণে কাম্বোডিয়া, পূর্ব দিকে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম এবং পশ্চিমে ব্রহ্মদেশ ও থাইল্যান্ড—মাত্র ২০ লক্ষ জনসংখ্যা নিয়ে ৯০,০০০ বর্গমাইলের এই রাষ্ট্রটির জন্ম ১৯৪৬এর আগস্টে। যখন দ্বিতীয় যুদ্ধের পর জাপানী কবল থেকে মুক্ত হওয়ার পর ফরাসী সরকার এই অংশটির ওপর তাঁদের যুদ্ধের আগেকার কর্তৃত্ব আবার ফিরে পান এবং ১৯৪৬এ এই অংশটিকে স্বাধীনতা দান করেন।

স্বাধীন লাওস গত পাঁচ বৎসর প্রচুর পরিমাণে আমেরিকান আর্থিক ও সামরিক সাহায্য পেয়ে এসেছে। লাওসের রাজস্ব প্রায় নাই বললেই চলে। সমস্ত সরকারী শাসন ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। ১৯৫৫-এর ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৫৯-এর ১০ই জুন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র সরকার লাওসকে যে আর্থিক সাহায্য করেছেন তার মোট পরিমাণ ভারতীয় টাকার হিসাবে দাঁড়াবে প্রায় ১০০ কোটি টাকা। আমেরিকান সরকারী বিবৃতিতে এর সম্পর্কে বলা হয়েছে।

"Most of this amount was allocated to budgetary support for the Lao army police, and certain government services. A programme of technical assistance has also been carried on, primarily in the fields of agriculture, health and education, and funds have been made available for the expansion of power and transport facilities".

এই আর্থিক সাহায্যের বেশীর ভাগই লাওস সরকারের বাজেটে সৈন্যবাহিনী, পুলিস ও কিছু কিছু সরকারী কাজের জন্য বরাদ্দ ব্যয় সংকুলান করতে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কৃষি, জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষার খাতেও বিশেষজ্ঞদের মারফত সাহায্য পরিবেশন করা হয়েছে। যানবাহন ও বিদ্যুৎ ইত্যাদি শক্তির সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও টাকা দেওয়া হয়েছে।

অর্থাৎ লাওসকে দে'য়া আমেরিকান আর্থিক সাহায্যকে ১। শাসনতান্ত্রিক ও সামরিক এবং ২। অর্থনৈতিক এই দুভাগে ভাগ করা চলে। গত বছর ২০ কোটি টাকা মোট সাহায্য বরাদ্দের মধ্যে ১৪ কোটি টাকাই সামরিক ও পুলিস এবং অন্যান্য খাতে দেওয়া হয়েছিল। বাকী ৬ কোটি দেওয়া হয় অর্থনৈতিক খাতে।

সুতরাং বলাই বাহুল্য ৯ বছর ধরে লাওস সরকার মার্কিন সাহায্যের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। মার্কিনী সাহায্য না হ'লে পুলিস ও সৈন্যদের মাইনে দেওয়া যায় না। মার্কিন রাষ্ট্র তুষ্ট বা রুষ্ট হ'লে সঙ্গে সঙ্গে থাইল্যাণ্ডও তুষ্ট ও রুষ্ট হয়। আর থাইল্যান্ড থেকে এবং থাইল্যান্ডের স্থল পথেই লাওসের নিত্যপ্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্র আসে।

এমনি অবস্থায় গত ৯ই আগস্ট ক্যাপ্টেন কাং লে বিদ্রোহ করে নতুন

সরকার সৃষ্টি করলেন। নতুন সরকার বিদ্রোহী পাথেট-লাও দলের প্রতি খানিকটা সহানুভূতির বা আপোসমূলক একটা মনোভাব নিয়ে কাজ করতে লাগলেন। অবশেষে সেদিন পাথেট-লাও দলের প্রতিনিধিদের সংগে আলোচনা শুরু হ'ল ভিয়েনসান্ শহরে একটা আপোসের জন্য। উদ্দেশ্য হ'ল "লাওসবাসী আর লাওসবাসীদের সংগে লড়বে না" এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে।

পাথেট-লাও বিরোধী দল পুরোমাত্রায় কম্যুনিস্ট না হ'লেও অনেকটাই যে কম্যুনিস্ট ঘেঁষা সে সম্পর্কে সন্দেহ করার কোনও কারণ নেই। এদের বিদ্রোহ ও সরকারের ওপরে হামলার জন্য এরা উত্তর ভিয়েৎনামের কম্যুনিস্ট সরকারের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও বিভিন্ন রকমের সাহায্য পায়। রাজকীয় লাওস সরকারের এই অভিযোগ বহুদিনের।

৯ই আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানের নেতা ক্যাপ্টেন কাং লে পাথেট-লাওদের পছন্দও করেন না, ঘেন্নাও করেন না। বরং স্বদেশবাসী, বলে একটু সহানুভূতির সুরেই এদের কথা বলেন। সুতরাং অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভিয়েনসান শহরে পাথেট-লাও দলের সংগে সরকারের আলোচনা শুরু হওয়ার কথা ঘোষণা করার সংগে সংগেই আমেরিকা বললে তোমরা যদি ঐ বিদ্রোহীদের সংগে আপোস আলোচনা কর আমাদের কিছু বলার নেই, তবে আমরা সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক খাতে যে সাহায্য করি তা আর দিতে পারব না। তবে অর্থনৈতিক সাহায্য চলবে।

ভিয়েনসানে প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সোভানা ফুমা প্রমাদ গুণলেন। কি করে সরকার চালাবেন। সবাই যে সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। উনি বললেন, লাওসের এই আর্থিক সংকটে রাশিয়া যদি আমাদের সাহায্য দিতে চায় তা গ্রহণ করতে বাধ্য হ'ব। এতদিন রাশিয়ার সংগে লাওসের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না, সেটা সংগে সংগে চালু করা হ'ল।

প্যাথেট-লাও দলের সংগে আলোচনা শুরু হ'ল। ওদিকে রুশ সরকার জানালেন লাওসে রুশীয় রাষ্ট্রদূত রওনা হচ্ছে।

আমেরিকার দূর প্রাচ্যের বিশেষজ্ঞ বৈদেশিক সহ-সচিব জানালেন তিনিও লাওস আসছেন—কতটা কি করা যায় আবার আলোচনা করে দেখতে।

ওদিকে দক্ষিণ লাওস থেকে অন্য বিরোধী দল গর্জে উঠল, তাদের রেডিও বলল, পাথেট-লাও দলের সংগে আপোস করলেই শান্তি আসবে না। আমরা দেখব কেমন করে সরকার চলে।

লাওসের আকাশে বাতাসে এক নূতন চঞ্চলতার আভাস পাওয়া গেল। লাওসে জোর গৃহযুদ্ধ লাগল বলে, এই চিন্তায় লাওসবাসীর চাইতে বহির্বিশ্ব বেশী বিচলিত হয়ে পড়ল।

৯ই আগস্টের পরে প্রতিক্রিয়াশীল প্রাক্তন সরকারের বিরুদ্ধে গণমিছিল

ভিয়েনসানের পথ অতি ভয়াবহ, সাবধানে চলবে, এই বলে আমায় ভিয়েনসান পাঠান হ'ল।

॥ ২ ॥

সবে ভোর ৭টা বেজেছে। ব্যাংকক শহর তখনও পুরোমাত্রায় কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠেনি। কিছু কিছু দোকানপাট খুলেছে। গাড়ি-ঘোড়ার আনাগোনা আছে বটে, তবে কোথাও তেমন ভিড় নেই।

আমার ট্যাক্সিটা এসে "এয়ার লাওস" অফিসের সামনে থামল। একটু আগেই এসে পড়েছিলাম, ৭টা ২০ মিনিটে রিপোর্ট করার কথা ছিল।

এবার অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে এক তরুণী। হাতে বিরাট এক ঠোংগা। বেশভূষা সাধারণও বলা যেতে পারে, জমকালো বললেও মিথ্যে বলা হবে না। নীল স্কার্টের নীচের দিকটা চওড়া জরির পাড়।

গাড়ি থামা মাত্রই এগিয়ে এল। "এয়ার লাওসে"র হোস্টেস্ ডিউটি আরম্ভ হবার অনেক আগেই এসেছে। কারণ অতি ভোরে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা পাত্র হাতে নীরব ভিক্ষায় বের হ'ন। তাদের খাওয়াবে বলে এক ঠোংগা খাবার করে এনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। এক ঠোংগা মুড়ি, চিঁড়ে বা ভাংগা

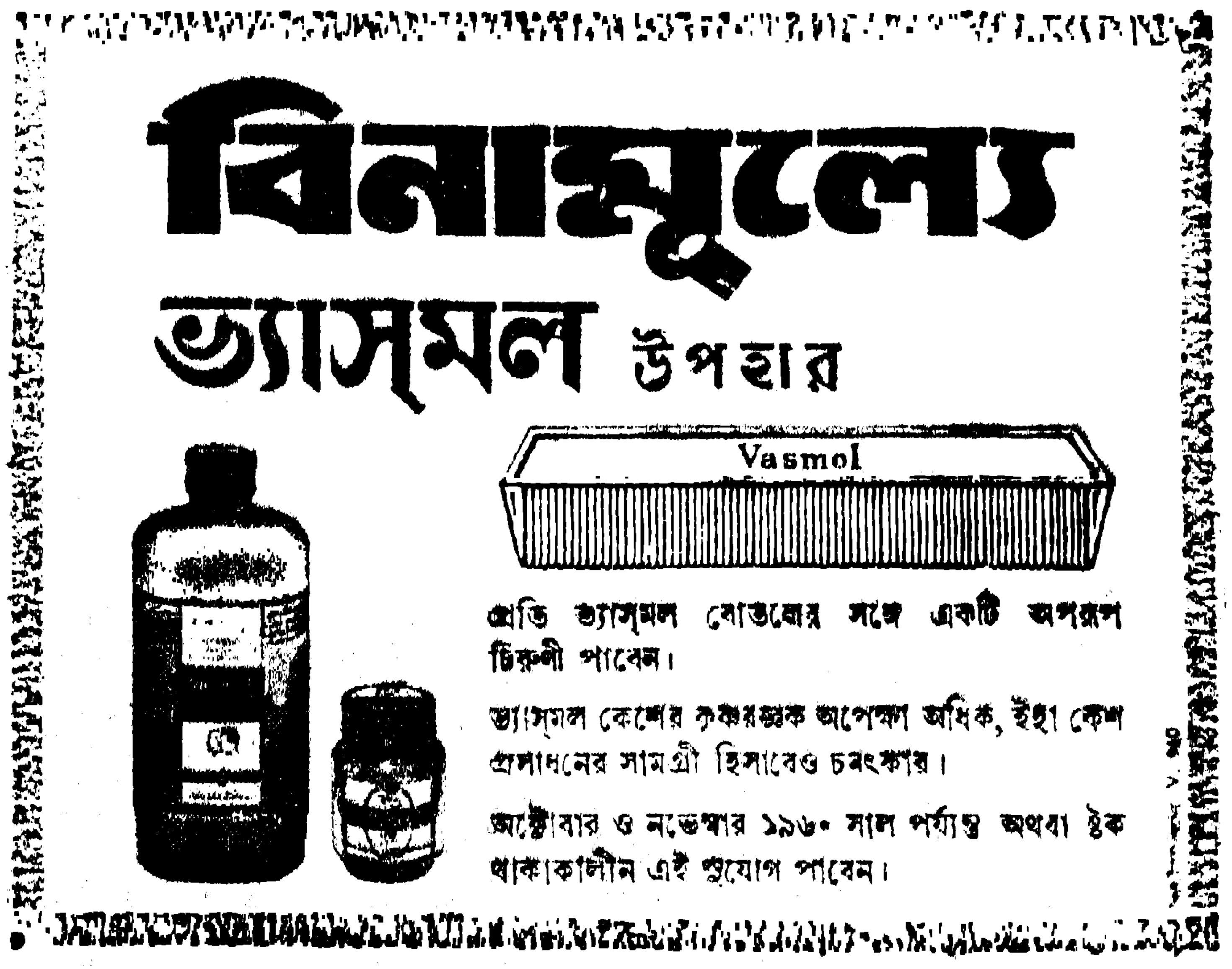

জিলিপী নয়, পরম যত্নে নারকোল আর ময়দা দিয়ে তৈরী এক জাতীয় পিঠে।

২০ বছরের তরুণী ফুমবি সায়াসান্ ভিয়েনসিয়ান্ শহরে বড় ডাক্তারের মেয়ে। আগে ব্রিটিশ রাজদূত অফিসে কাজ করত, কিন্তু বেশী মাইনে এবং নানা দেশ দেখতে পাওয়ার সুযোগ পাবে বলে এয়ার হোস্টেস হয়েছে। লাওসিয়ান ভাষা ছাড়া ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা খুব ভাল জানে।

লাওসে পোঁছাবার আগেই প্রথম লাওসের এই মেয়েটিকে দেখে লাওস সম্পর্কে যত ভয় তার আগের ২৪ ঘণ্টা ধরে আমার মাথায় ঢোকবার চেষ্টা হয়েছিল তার খানিকটা দূর হ'ল।

আগের দিন সাংবাদিক বন্ধু কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী হয়ে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন। কেউ বলেছিলেন, "ইউ উইল বি লস্ট", কেউ সাবধান করে দিয়েছিলেন, "খবরদার, ক্যামেরা, বাইনোকুলার চট করে বের করবে না। আর্মি রুল চলেছে, তোমায় সামান্য সন্দেহ হয়েছে কি মরেছ।" কেউ বুদ্ধি দিয়েছেন খাঁটি খবরগুলি কেমন করে সেন্সর বাঁচিয়ে চোরাপথে পাঠান যাবে। সবাই মিলে ভালমন্দ পাঁচ রকম খাইয়েছেন, যেন ঐটাই শেষ খাওয়া।

এবার অফিসে জানলাম যে আমরা মাত্র ১২ জন যাত্রী যাব, ৫৬ জনের একটি প্লেন-এ। কে মরতে যাবে, লাওসে। ভাবটা অনেকটা এই রকম।

যাত্রীর সংখ্যার চাইতে বড় কথা হ'ল ১২ জনের মধ্যে পাঁচজন আমেরিকান, ছয়জন রাশিয়ান আর আমি মাত্র একজন ভারতীয়।

কেচ্ছা এখানেই শেষ হ'লেও হ'ত। কিন্তু তা'তো হবার নয়। পাঁচ জন আমেরিকানই আমেরিকান সরকারী কর্মচারী—বেশীর ভাগই রাজদূত অফিসের লোক। আর ছয়জন রাশিয়ান হ'লেন লাওসের প্রথম রুশীয় রাষ্ট্রদূত ও তাঁর সঙ্গীবর্গ। রুশীয়রা কথা বলতেই চায় না, একটি আমেরিকানকে বললাম, "কি গুরু দায়িত্ব নিয়েই আমি লাওসের প্লেনে উঠছি। আকাশে তোমাদের দুপক্ষের লড়াই হ'লে একমাত্র নিরপেক্ষ এই রোগা ভারতীয়-কেইতো তা ঠেকাতে হবে, শান্তি রক্ষা করতে হবে।"

প্লেনে দু'দল প্যাসেঞ্জারই যেন মৃত্যুপথ যাত্রী। কারো মুখে কোনও কথা নেই। প্লেন উড়ে চলেছে। পাইলট প্যাসেঞ্জারদের বসাবার একটা বিশেষ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সামনের দিকে কক্‌পিটের কাছে আমেরিকানরা, পেছনে দরজার দিকে রাশিয়ানরা।

আগেই বলেছি যে লাওসে আমেরিকান আর্থিক সাহায্য বন্ধ এবং রুশদের নতুন কূটনৈতিক যোগাযোগ স্থাপনের জন্যই অবস্থা জটীল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, আমার যাওয়ার কারণ ঘটে। সেই রুশ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে একই প্লেনে চলেছি। মনটা এই সৌভাগ্যে খুশি হয়ে উঠল। প্লেনেই একটা এক্সক্লুসিভ্ ইণ্টারভ্যু মেরে দেব নাকি। কিন্তু তা' করলাম না। জানি ভদ্রলোক কিছু বলবেন না, অন্তত লাওস পেঁাছাবার আগে। দাঁতে দাঁত লাগিয়ে বসে পড়লাম।

দেখতে দেখতে সেই লাওস পেঁাছেছি, প্লেন নামছে, দেখি এয়ারপোর্ট ভর্তি সৈন্যবাহিনী। ভাবলাম, বন্ধুরা যা বলেছিলেন ঠিকই তো দেখছি, একেবারে জঙ্গী কারবার।

আসল কথা, প্লেন রাশিয়ানদের নিয়ে সামরিক বিমানঘাটিতে নামছে। নামলও। আমাদের, অর্থাৎ আমেরিকানদেরও বলা হ'ল এখানে আমরা নামব না। অর্থাৎ কেবল রশিয়ানরা নামবেন। নামলেনও। প্লেন আসতেই দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেঁটে মতন একজন ক্যাপ্টেন এগিয়ে এসে রুশ দলের নেতাকে অভিনন্দন করে নিলেন। ভাল কথা। এখন আমাদের নিয়ে প্লেনটি যথাস্থানে গেলেই বাঁচি।

কিন্তু এ কী ব্যাপার। একরাশ প্যারাট্রুপার চারদিকে এরোপ্লেন থেকে ঝাঁপ দিচ্ছে কেন? ৯ই আগস্ট এদের ক্যাপ্টেন কাং লে সামরিক বিদ্রোহ ঘোষণা করে পুরোন মন্ত্রিসভার ও সরকারের পতন ঘটান। আবার একটা বিদ্রোহ লেগে গেল নাকি। কি কাণ্ড, কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে হয়। আমি নেমে নিই। টেলিগ্রাফ অফিসের কাছে একটা আস্তানা পাতি, একটু সবুর করতে বাধা কি ছিল।

যাক—আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি। প্যারাট্রুপাররা চতুর্দিকে টুপ্, টাপ্ পড়ছে।

হিউলেট্‌স মিকশ্চার

বদহজমে ও খাওয়ার পরে পাকস্থলীর ব্যথায় দীর্ঘস্থায়ী উপশম দেবে। এতে আপনার জীবন আবার উপভোগ্য হয়ে উঠবে।

জ্বালাকর এসিডে পাকস্থলীর গায়ের কোন ক্ষতি হতে দেয় না, ফলে খুব দ্রুত পাকস্থলীর ব্যথা কমিয়ে দেয়। প্রায় ৮০ বছরের ওপর থেকে পৃথিবীর সব জায়গায় ডাক্তাররা এর ব্যবস্থা দিয়ে আসছেন।

শিশুদের জন্যে : হিউলেট্‌স মিকশ্চার শিশুদের পেটের গণ্ডগোলে চমৎকার উপকারী। পেট খারাপ হ'লে আফিম সংযুক্ত হিউলেট্‌স মিকশ্চার ব্যবহার করুন।

সি, জে, হিউলেট এণ্ড সন (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ
৮৩/এ, নাইনিয়াপ্পা নায়ক স্ট্রীট, মাদ্রাজ-৩

TCIH 1128

সামনে তাকিয়ে দেখি অনেক সৈন্য রাশিয়ান দলের নেতাকে গার্ড অব অনার দিচ্ছে। ওই প্যারাট্রুপাররাও স্বকীয়ভাবে গার্ড অব অনার দিল।

কিন্তু গার্ড অব অনার কেন? কোনও রাষ্ট্রদূতকে ঐভাবে সম্মান দেখানর রেওয়াজ নেই। কিন্তু ক্যাপ্টেন কাং লে রাশিয়ান রাষ্ট্রদূতকে বিশেষ সম্মান দিতে চান—কারণ আমেরিকার সঙ্গে তখন লাওসের আড়ি হয়ে গেছে। রুশই ভরসা।

কাং লে-কে ধন্যবাদ। সাধারণত সব সাংবাদিকই কোনও নতুন দেশে খবরের সন্ধানে এসে প্রথম মোটামুটি একটি তার পাঠায় শুধু বলতে, আমি পৌঁছেছি। আমারও গরম খবর পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া গেল

—"Hero's welcome extended to first Russian ambassadore designate in Laos.—"

প্লেন থেকে ছুটে নেমে কয়েকটা ছবিও তুললাম। এমন সময় আমাদের প্লেনটির লেজ ধরে টানতে আরম্ভ করছে, অন্যদিকে জনসাধারণের এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবার জন্য। লাফ দিয়ে পড়লাম।

ভিয়েনসানের কাস্টমস্ কি ঝামেলাই না করবে এই ভাবতে ভাবতেই দেখি যথাস্থানে এসে গেছি। নামলাম, সবাই নামল। সব কাস্টমস্-এ আনা হ'ল। আর্মির লোক দাঁড়িয়ে। আমি একটা কঠিন পরীক্ষার জন্য তৈরী হ'তে লাগলাম মনে মনে। কিন্তু কি রসিকতাই জানে লাওসের কাস্টমস্। কি লজ্জাই দিতে পারে। আমার একটি জিনিস কেউ খুলল না বা দেখল না, সব যেমন ছিল তেমনি ছেড়ে দিল। শুধু আমার জিনিস নয় কোনও আমেরিকানদেরও কিছু দেখল না। সব ভয়কে যেন কাস্টমস্ ভেংচি কেটে উড়িয়ে দিল।

আসলে লাওসের লোক শান্তি প্রিয়, ধর্মভীরু, অকারণ ঝামেলা পছন্দ করে না। আর্মির লোকরাও অকারণ গণ্ডগোল ভালবাসে না। অথচ এদের কপালে, যত গণ্ডগোল এদের কপালেই যেন ঝুলছে।

লাওসের শান্তিপ্রিয় স্বভাব সম্পর্কে সব বিদেশীরাই একমত। কনেস্টেলেশনের সব অধিবাসীই লাওসের গুণমুগ্ধ।

এই "কনস্টেলেশন" জায়গাটিকে কি বলব? এটা একটি হোটেল—এবং সব বিদেশী সাংবাদিকদের আবাস। আর যত বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের প্রেস অফিসার—যত গোপন সংবাদ সন্ধানী এখানেই আসে। কারণ ভিয়েনসানে কনস্টেলেশন একাধারে হোটেল, রেস্টুরেন্ট, বার, ক্লাব—প্রেস ক্লাব, নাইট ক্লাব। ঢোকা মাত্রই জিজ্ঞাসা করলেন সদাহাস্য মালিক—কোন কাগজের লোক। ঐটুকু জানা দরকার, কারণ সাংবাদিক না হ'লে জায়গা নাও মিলতে পারে,—হ'লে জায়গার ব্যবস্থা হবেই।

কনেস্টেলেশনে মাল ফেলে ছুটি আমাদের রাষ্ট্রদূত মিঃ রাতনাম-এর কাছে।—চিঠি দিয়ে দিয়েছিলেন টোকিওতে আমাদের ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের উপদেষ্টা ডাঃ শ্রীপূর্ণেন্দু ব্যানার্জি। আরও একটি পরিচয়পত্র আমি এনেছি। শ্রী রাতনামকে ডাঃ ব্যানার্জির চিঠি দেবার পর বললাম, তোমার কাছে আরেকটা চিঠি এনেছি, পড়ে দেখ তো!—ব্যাংককে কুমারী ফুমরি আমায় বললে, তোমাদের রাষ্ট্রদূতকে খুব চিনি আমি—আমাদের পরিবারের বন্ধু। আমায় খুব ভালবাসেন দাঁড়াও তোমায় একটা চিঠি দিয়ে দি। চিঠি দিল এক এয়ার হোস্টেস তার এক অখ্যাত প্যাসেঞ্জারের রাষ্ট্রদূতকে। কোনও দ্বিধা নেই, নেই কোনও লজ্জা। যা ভাল মনে করে লাওসবাসীরা তাই করে। ফুমরি তাই করেছে। তার চিঠিও মিঃ রাতনাম পরম যত্নভরে পড়েছেন। বলেছেন, বড় ভাল মেয়ে ফুমরি, মা-বাপ খুব খানদানী পরিবার।

মিঃ রাতনামের সঙ্গে কথা বলছি এমন সময় এলেন বৃটিশ রাজদূত। আমেরিকার নীতিতে বৃটিশ ভারতীয় বা অস্ট্রেলিয়ান রাজদূতরা কেউই তুষ্ট নয় মনে হচ্ছে। এরা দেখতে পাচ্ছে টাকার অভাবে বাধ্য হয়ে প্রায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও লাওস সমাজবাদী বা কম্যুনিস্টদের দিকে ঢলে পড়ছে, কি করা যায় তারই আলোচনা।

কি করা যায় তার উত্তর আমায় দিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সোভানা ফুমা। দেখা করতে গিয়েছিলাম। একা। বললেন বড়ো দুর্যোগে আছি। আমেরিকা হঠাৎ সাহায্য বন্ধ করল। আমি তো চাই আমার দেশ একেবারে নিরপেক্ষ থাকুক। নয়তো তার বাঁচার উপায় নেই। বিদেশী রাষ্ট্ররা ঠুকরে খাবে। যদি ভারতের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যেত, কেউ কিছু বলত না। ভারত নিরপেক্ষ দেশ। ভারতের কাছে হাত পাতা চলে।

ভারতও চায় লাওস সব আর্থিক ও রাজনৈতিক দুর্যোগ কাটিয়ে উঠুক, একটা নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়াক। কিন্তু কোনও সামরিক সাহায্য তো ভারত দিতে পারে না। সে হবে ভারতের নীতি বিরোধী। অর্থনৈতিক সাহায্য হয়তো কিছু দিতে পারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র তো অর্থনৈতিক খাতে সাহায্য বন্ধ করেনি।

এবং বন্ধ করবেও না। একথা প্রেস কনফারেন্সে বললেন মিঃ পারসন। বললেন, লাওসের পরিস্থিতি ক্রমেই ঘোরালো হয়ে পড়ছে। আমাদের অর্থনৈতিক সাহায্য বাদে অন্য সাহায্যের সদ্ব্যবহার নাও হতে পারে। সরি!

পারসন দেশে ফিরে গেলেন। লাওস তখন একেবারে দেউলিয়া হতে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে মরিয়াও। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যুক্ত রুশ-লাওস বিবৃতি বেরুল—রাশিয়া লাওসের জন্য যত রকম সম্ভব সাহায্যে প্রস্তুত।

কিন্তু লাওসের মন যেন সরে না। ৭ দিন হয়ে গেল রুশের রাজদূত এসে বসে রয়েছেন। অথচ রাজা তাঁর নিয়োগ মেনে নিচ্ছেন না, অর্থাৎ তাঁকে রাজদূত হিসাবে গ্রহণযোগ্য বলছেন না। সাধারণত কোনও রাষ্ট্র যদি বিদেশে কোথাও রাষ্ট্রদূত পাঠায় তার মনোনয়ন আগে পেশ করা হয়। সেটা গৃহীত হ'লে তবে রাষ্ট্রদূত আসেন। পরিচয়পত্র যথারীতি পেশ করেন।

অতি উৎসাহে রুশ দূত আগে এসে পড়েছেন। এদিকে রাজা মনে হয় ইতস্তত করছেন, বা আমেরিকাকে আরও সময় দিচ্ছিলেন সাহায্য চালু রাখার কথা পুনর্বিবেচনার জন্য।

সঙ্গে সঙ্গে পাথেট-লাও বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনাও চলেছে সন্ধির শান্তির জন্য।

২০শে অক্টোবর খবর এল পাথেট লাও দল তাদের অধিকৃত সামনুয়া শহর সরকারকে ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছে।

তারও একদিন আগে খবর এসেছিল যুক্তরাষ্ট্র সরকার আবার সাহায্য চালু করতে রাজী হয়েছেন।

ঘোষণার খবর প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়ে সাংবাদিকরা জানতে চান তাঁর এতে কি প্রতিক্রিয়া হ'ল।

আমার মনে হয় খবরটি ভুল; প্রধানমন্ত্রী বলেন।

এই লেখা শেষ করার সময় পর্যন্ত সঠিক খবর জানতে পারিনি। কোনটা ভুল, কোনটা ঠিক কে কবে নির্ভুল বলতে পেরেছে।

ছোট্ট শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্র লাওস। ভুলের মাশুল দিতে দিতেই মরল। কখনও ক্ষমতান্ধ স্বদেশবাসীর ভুল, কখনও শুভানুধ্যায়ীদের ভুল।

যদি সামনুয়ার দখল পাথেট লাও ছেড়ে দিয়ে থাকে। যদি আমেরিকা আর্থিক সাহায্য আবার চালু করে তবে এবারের স্বীপান্বিতা লাওসেও সার্থক হ'বে।

২০শে অক্টোবর

BUY THE BEST
HIGHLY APPRECIATED
SAMSAD
ANGLO-BENGALI
DICTIONARY
1672 PAGES • Rs. 12·50 n.p.
SAHITYA SAMSAD
32-A, ACHARYA PRAFULLA CH. RD. • CAL-9

নিজেকে নিয়ে বা অন্য অনেককে

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

বোকা লোকটা ভীরু লোকটা শিল্পের আশ্রয়ে এতকাল
ভেবেছিল আনন্দের ছবি
ফোটাবে, সযত্নে তাই সব শোক, যন্ত্রণা উত্তাল,
মৃত্যুর দুঃখকে ভুলে থাকতে চেয়েছে। শান্ত টবের করবী,
পাখি-ফুল-ঘাস-পাতা বিকেলের নদী ছিল তার
একমাত্র শিল্পের আশ্রয়,
বানানো সুখের গল্পে খুঁজে নিয়ে আনন্দ-বিস্ময়
যন্ত্রণাকে এতদিন সযত্নে করেছে পরিহার।

বোকা লোকটা ভীরু লোকটা এতকাল আনন্দের মানে
খুঁজতে চেয়েছে তার সন্তর্পণে সাজানো বাগানে।

বোকা লোকটা, ভীরু লোকটা। কখনো দ্যাখেনি তার মুখ
শতাব্দীর নিজস্ব দর্পণে,
দ্যাখেনি, সময় তার কী কঠিন বিষণ্ণ অসুখ
রেখে গেছে মানুষের মনে:
সংশয় জটিল চিন্তা, চিন্তার সংশয়, জটিলতা
রক্তের প্রবাহে আঁকে কী করুণ স্থির অন্ধকার,
দ্যাখেনি, বিপন্ন নীরবতা
ঘাস-ফুল-পাখি বা পাতার।

বোকা লোকটা ভীরু লোকটা কখনো বোঝেনি আগে, সে যা
চেয়েছে, তা এই ক্লান্ত শতাব্দীর গাঢ় রক্ত-ভেজা।

এবং আনন্দ নয় মূর্ত এক অরূপের ছবি,
এবং আনন্দ নেই শুধুমাত্র সুখে বা বিস্ময়ে,
যে-আনন্দ খুঁজে ফেরে শিল্পীর আঙুল
তা এই সময়ে মিশে আছে, লোভে-ঘৃণায়-সংশয়ে।
দুঃসহ শোকের ভাষা, তীব্রতম যন্ত্রণা উত্তাল
ঘাস-ফুল-পাতা-পাখি-নদী, শান্ত টবের করবী
সব কিছু ছুঁয়ে আছে অমোঘ নিয়মে চিরকাল।

বোকা লোকটা ভীরু লোকটা, এতদিনে ভাঙল তার ভুল॥

অবিনাশ বটব্যাল

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

দেয়ালে এ-কার ছবি অবিনাশ বটব্যাল, তুমি
এমন তন্ময় হয়ে দেখছো? পুড়ছে হাতের চুরুট ঃ
দশ বছর আগের বৈশাখে কোন আশ্চর্য মৌসুমী—
হাওয়ায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল কাসুন্দে খরুট!

সিগারেটে ধোঁয়া ছাড়তে স্নিগ্ধ হেসে; বুকের ইজেল ও
বর্ণোচ্ছ্বাস; বিলোল কটাক্ষে হতো প্রেমিকা উজ্জ্বল;
মনে ভাবতে, তোমার পিছনে আছে মাইকেল এঞ্জেলো।
তারপর সময় নদীতে কতো বয়ে গেছে ঢল!

প্রেম কি ত্রিকালদর্শী, বল্গাহীন ইচ্ছার সওয়ার?
জীবনটা কি বেতবনে শালিকের ক্ষণিক আশ্রয়!
অথচ তুমি কি জানতে কী আনবে যে দিনের জোয়ার?
প্রেমিকা কি জেনেছিল সে কোনো আলোকলতা নয়?

অবিনাশ বটব্যাল, চুরুটটা পুড়ে যাচ্ছে হাতে:
তুমি কি নক্ষত্র দেখছো? ঢেউ ভাঙছো হারানো নদীর?
চড়ুয়েরা খড়কুটো রেখে যাচ্ছে কড়িবরগাতে;
স্কাইলাইট মাথার ওপরে,—ওরা বাঁধতে চায় নীড়।

কাসুন্দিয়া এতোদিন কন্যাট প্লেসের বাতায়ন
ভাবেনি তো! অবিনাশ, প্রৌঢ় তুমি, মেনে নাও সবই—
ভালোবাসা মজে যায়, হৃদয়েরও আছে জরায়ণ;
কালের-গোপন ফুঁয়ে আলো নিভে, ঝাপসা হয় ছবি।

কালেরও প্রৌঢ়তা আছে, ইতিহাসচেতনায় তুমি
আজ যে আলেখ্য দেখছো, আলোকবর্ষের কোনো তারা
জ্বলে উঠে মরে গিয়ে ফেলিয়েছে আশ্চর্য-মৌসুমী
কোথাও, কোথাও আজ প্রেমশূন্য হৃদয়—সাহারা!

অবিনাশ, কী যে ভাবছো, প্রৌঢ়তা বয়সে নয়, মনে;
সুভগ আলোর থেকে পালিত কালের হাতে তুলে
ইতিহাস তুলে দ্যায়, অনিবার্য ইচ্ছা রূপায়ণে
তুমি তো সক্রিয় আছো, দ্বিধা-ভয়ে কাঁপেনি অঙ্গুলি।

বিশ্ব-বিচিত্রা

জার্মানিতে একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভূগর্ভস্থ ঘর অর্থাৎ বাড়ির নীচে কামরা। প্রায় সব রকমেরই বাড়ির নীচে কামরা থাকে যেখানে শীতকালে দুষ্প্রাপ্য হয় বলে খাদ্য-সামগ্রী এবং তাপ উৎপাদক উপকরণ জমা করে রাখা হয়। ভূগর্ভস্থ কামরাগুলির সুবিধে হচ্ছে গ্রীষ্মকালে বাইরের আবহাওয়ার চেয়ে ঠাণ্ডা থাকে এবং শীতকালে থাকে বেশ গরম। ইমারতের স্থায়িত্বের দিক থেকে এইসব কামরাগুলির একটা প্রয়োজনীয়তাও আছে, বিশেষ করে বৃহৎ অট্টালিকার ক্ষেত্রে ভূগর্ভস্থ কামরাগুলি চারপাশের দেওয়ালগুলির নোঙরের কাজ করে এবং সমগ্র ইমারতের বাঁধুনীকে অটল করে রাখে। জার্মানিতে গির্জা এবং টাউন হলগুলির নীচেও এই ধরনের ঘর দেখতে পাওয়া যায়। এইসব গৃহের নীচেকার ঘরগুলি বিশেষ কাজেই ব্যবহৃত হওয়াই স্বাভাবিক। গির্জাগুলির ক্ষেত্রে একটি পুরনো প্রথা হচ্ছে এইসব ঘরে কফিন রক্ষিত হতো।

উত্তর জার্মানির ব্রিমেন শহরের প্রধান গির্জায় আকস্মিকভাবে বহু শতাব্দী পূর্বে আনীত শবদেহ কফিনের মধ্যে মমিতে পরিণত অবস্থায় পাওয়া যায়। ভূগর্ভস্থ কামরার দেওয়ালের গায়ে লাগানো সীসাই শবদেহগুলিকে মমিতে পরিণত করে তোলায় সহায়ক হয়েছে বলে সে সময়ে অভিমত প্রকাশ করা হয়। অবশ্য সাম্প্রতিক নির্ধারণ হচ্ছে তেজস্ক্রিয়তাই শবদেহগুলির মমিতে পরিণত হওয়ার কারণ।

ব্রিমেন গির্জার নীচের সীসার ঘরগুলির চেয়ে একেবারে পৃথক হচ্ছে ব্রিমেনের "র‍্যাটসকেলার"— ব্রিমেনের বিখ্যাত প্রাচীন টাউন হলের নীচেকার বিরাট ঘর। জার্মানির বহু শহরেই এই ধরনের র‍্যাটসকেলার দেখা যায়। তবে ব্রিমেনের র‍্যাটসকেলারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি জার্মানির একটি বিখ্যাত পানাগার। বহু শতাব্দী ধরে বহু নাগরিক, দরিদ্র ও ধনী নির্বিশেষে সুরা ও খাদ্যের জন্য এখানে সমবেত হয়ে আসছে। জার্মানির বহু কবি ও লেখক ব্রিমেন র‍্যাটসকেলারকে তাদের রচনায় উল্লেখ করেছেন। আরো খ্যাতি এর দুশ ষাট রকমের দ্রাক্ষাজাত সুরার জন্য। এই র‍্যাটসকেলারে ১৮৮৯ সালে দ্রাক্ষা থেকে প্রস্তুত সুরা যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় একেবারে হাল আমলে, ১৯৫৯ সালে উৎপাদিত দ্রাক্ষা থেকে প্রস্তুত সুরা।

*

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের নৌবহর সাগরে একপ্রকার মাইন ডুবিয়ে রেখে দিত যা শব্দতরঙ্গে সক্রিয় হয়ে উঠত। নাবিকরা অবাক হতো দেখে যে, যেসব স্থানে মাইন ফেলা আছে তার ধারে কাছে কোন শত্রুজাহাজ না পৌঁছতেও মাইনগুলি বিস্ফোরিত হয়ে যায়। শেষে ধরা পড়ে যে —মূক, বধির ও নিঃশব্দ প্রাণী বলে পরিচিত—মাছেরাই মাইনগুলি বিস্ফোরিত হওয়ার কারণ।

মাছেরা যে শব্দতে সাড়া দিতে পারে এবং নিজেরাও শব্দ করতে পারে মানুষকে তা বরাবরই বিস্মিত করে তোলে। এমন কি খৃষ্টপূর্ব ১০০ সালেও মার্কাস ক্রেসাস নামক এক রোমান কনসাল হাতে তালি দিয়ে তাঁর পুকুরের মাছকে ডাকতেন বলে কথিত আছে।

এই ধরনের জ্ঞান থেকে পৃথিবীর সর্বত্র মৎস্যজীবীরা মাছ ধরার অসাধারণ সব পদ্ধতির উদ্ভাবন করে নিয়েছে। মাছেদের আকৃষ্ট করার জন্য তারা কাঠের যন্ত্রের সাহায্যে শব্দ করে। পৃথিবীর নানা অঞ্চলের মৎস্যজীবীরা শব্দ শুনে জলে মাছের সঠিক অবস্থান নির্ধারণ করতে পারে।

বার্লিনের এক সখের ডুবুরি, ফ্রেড মেথনার একবার ভূমধ্য সাগরের নীচে নেমে মাছেদের বিবিধ শব্দ শুনে এমন মুগ্ধ হন যে, মাছের সেই "ভাষা" টেপ-রেকর্ডে

ব্রিমেনের ভূগর্ভস্থ পানাগার র‍্যাটসকেলারের একাংশে ঐতিহাসিক সম্পদ একটি পিপার উপর উপবিষ্ট সুরার দেবতা বেকাস

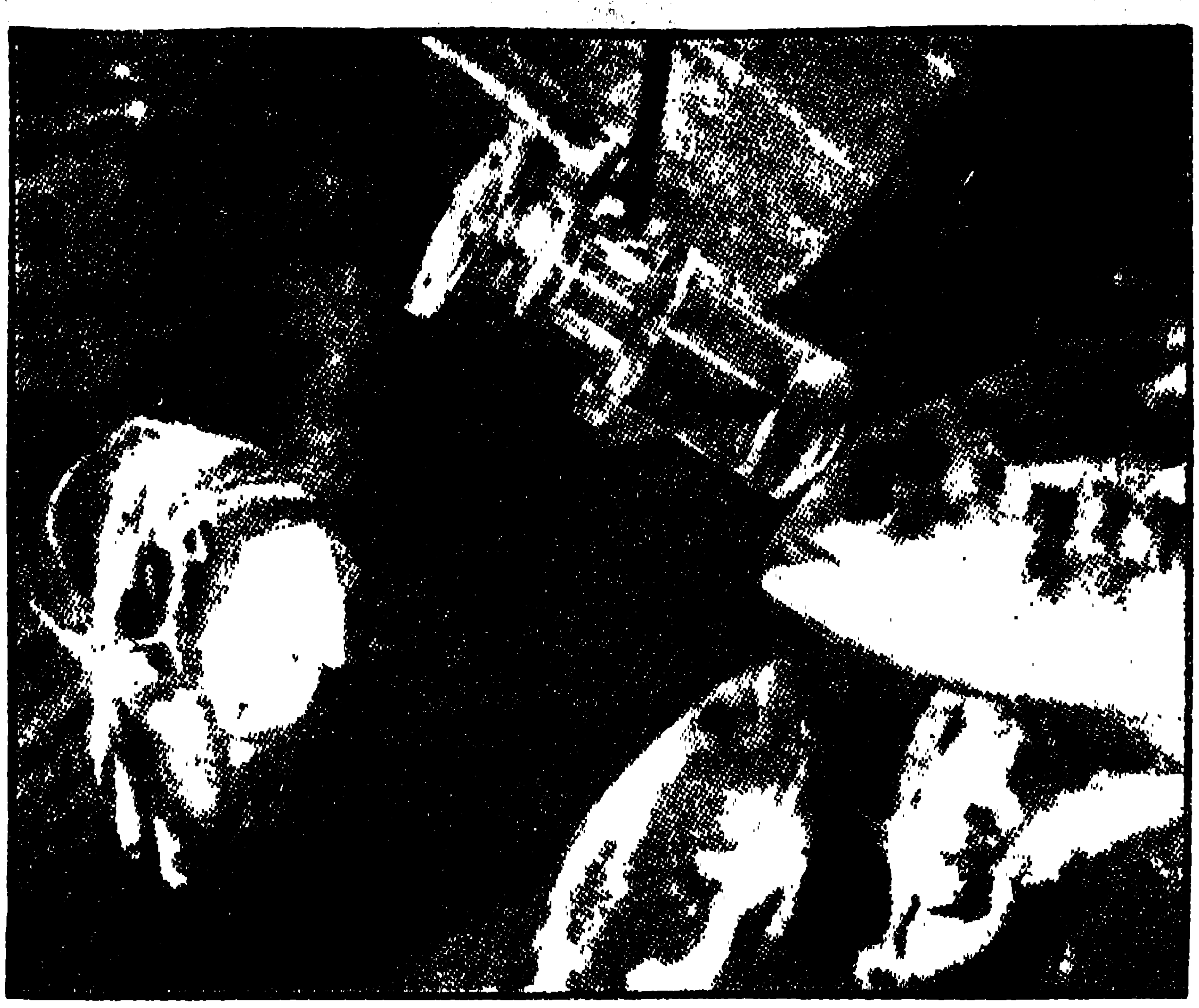

মাছেরা মাইক্রোফোনের সামনে তাদের "ভাষা" শোনাচ্ছে

তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত করেন। এ কাজে টেকনিকাল অসুবিধাগুলি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় বার্লিনের এক প্রতিষ্ঠান জলের নীচে রেকর্ড করার উপযোগী বিশেষ ধরনের মাইক্রোফোন ও টেপ-রেকর্ডার প্রস্তুত করে দেওয়ায়। ভূমধ্য সাগরে শব্দ গ্রহণ করতে অসুবিধেয় পড়তে হয় এই কারণে যে, মোটরবোট এবং ঢেউয়ের শব্দ এসে যেতে থাকায়।

সৌভাগ্যবশত হের মেথনার তাঁর প্রয়োজনমতো শান্ত পরিবেশের সন্ধান পেয়ে যান। বার্লিনের কাছে তাঁরই জন্মস্থানে একটি বৃহৎ একোয়ারিয়ামের অধ্যক্ষ এই প্রচেষ্টাটির প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রকাশ করেন। হের মেথনারকে তাঁর ইচ্ছামতো যেমনভাবে খুশী আড়ি পাতার অনুমতি দেওয়া হয়। ফলে মাছেদের কলরবের অদ্ভুত এক সংগ্রহ সম্ভব হয়ে ওঠে।

এমপ্লিফায়ারের সহায়তায় টেপ-রেকর্ডিংয়ে তোলা 'স্কেলেয়ার' মাছের খাবার শব্দ খরগোশের খুঁটে খুঁটে খাওয়ার মতো শোনায়। অধিকন্তু 'স্কেলেয়ার' খাবারে কামড় দিলে সেটা অনেকটা শ্যাম্পেন বোতলের ছিপি খোলার মত শোনায়। দক্ষিণ আমেরিকার বিপজ্জনক লুণ্ঠনজীবী মাছ পিরানহার খাবার শব্দ পাথরকুচি তোলার লোহার বালতির দাঁতে-দাঁত পড়ার শব্দের মতো শোনায়।

*

অনিদ্রারোগগ্রস্তদের তোয়াজ করে নিউ ইয়র্কের নৈশ প্রমোদাগারগুলি বেশ দুপয়সা রোজগার করে যায়। সম্প্রতি তারা "ঘুম-পাড়ানি কেন্দ্র"-র বিরুদ্ধে তাদের ব্যবসা মাটি করে দেওয়ার প্রতিবাদ জানাতে আরম্ভ করেছে।

মিঃ নর্মান ডাইন নামক এক ব্যক্তি নিউ ইয়র্কের ফিফটিফোর্থ স্ট্রীটে এই কেন্দ্রটি স্থাপন করেছেন। মিঃ ডাইন বলেন যে, নিউ ইয়র্কের অনিদ্রারোগীদের ঘুম পাড়াবার কথা ভাবতে সারারাত তিনি জেগে থাকেন।

তার প্রক্রিয়াটি হচ্ছে একটি "ভাইব্রো-বেড"। বিছানার গদির স্প্রীংয়ের সঙ্গে একটি মোটর যুক্ত করে দেওয়া হয়। মোটরটি চালিয়ে দিলে স্প্রীংগুলি মৃদু কাঁপতে থাকে আর তাতেই ঘুম এসে যায়।

আর একটি প্রক্রিয়াও অনেকের বেশ পছন্দ হয়েছে। এটির নাম "স্লাম্বারবাগ"। পালঙ্কের মাথার দিকে একটি স্পীকার খাটিয়ে দেওয়া হয়। সেই স্পীকারের সাহায্যে নদীর তীরে পাথরের নুড়ির ওপর ঢেউ এসে মিলিয়ে যাওয়ার শব্দ শোনানো হয়।

মাথায় সর্দি যাদের জমে তাদের জন্য ব্যবস্থা রয়েছে "স্লালেপাইন"। এটা হচ্ছে একটা পাখা যা পাইনবনের পরম তৃপ্তি-দায়ক সুবাস বিছানার ওপর প্রবাহিত করিয়ে দেয়। গন্ধে ঢুলু এসে যায় এবং শ্বাসযন্ত্রও পরিষ্কার হয়।

নিউ ইয়র্কের গৃহিণীদের কাছে বর্তমানে অতি প্রিয় হয়ে উঠেছে "টার্ন-ওভার ডার্লিং" নামে পরিচিত একটি উদ্ভাবন। এটা হচ্ছে নাক-ডাকা বন্ধ করার একটি উপায়। এই প্রক্রিয়ায় স্ত্রী তার বালিসের নীচে একটি বৈদ্যুতিক স্যুইচ রেখে দেয় যার সঙ্গে যুক্ত থাকে তার স্বামীর বালিসের নীচে রক্ষিত একটি "বাজার"।

স্বামীর ঘুম এতে ভাঙে না—এমন শব্দ হয় যাতে তাকে পাশ ফিরে শুতে বাধ্য করে—আর তাতেই নাক ডাকা বন্ধ হয়।

অনিদ্রা রোগ সম্পর্কিত প্যারিসের একটি প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র বলেন, রাত্রে আরামে সুনিদ্রা উপভোগের একটি নিশ্চিত উপায় তাদের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়েছে। প্রক্রিয়াটি হচ্ছে পেশী ও শ্বাস প্রণালীর কতকগুলি ব্যায়াম যাতে মন ও দেহের স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হয়। এরূপ দাবি করা হয় যে, দু সপ্তাহ ধরে প্রতি রাত্রে পনের মিনিট এই পদ্ধতি যারা অনুসরণ করে তাদের মধ্যে শতকরা পঁচিশ জন স্বাভাবিক নিদ্রা উপভোগে সক্ষম হয়।

ফ্রাঙ্কফোর্টের ডাঃ জেকব থিয়েল কর্তৃক উদ্ভাবিত "উইংকিঙ লাইট প্যানেল" জার্মানীতে ক্রমশঃই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এই পদ্ধতিতে বিছানার ওপর সিলিং থেকে ঝোলানো এক সেট ছোট্ট বৈদ্যুতিক বাল্বের দিকে রোগীকে চেয়ে থাকতে হয়। এমন ব্যবস্থা যাতে আলোর তেজের তারতম্য ঘটে। একবার অত্যন্ত নিষ্প্রভ আলো এবং পরক্ষণেই একটা তীব্র রশ্মি। অনবরত আলোর তেজের এই পরিবর্তন দৃষ্টিকে ক্লান্ত করে তোলে। এ পর্যন্ত কোন রোগীই দু ঘণ্টার বেশী ঐ আলোর দিকে চেয়ে থাকতে সক্ষম হয়নি—সাধারণত মিনিট পনের পরই ঘুমে ঢলে পড়তে হয়।

রোমের শহরতলীর অধিবাসী সিনর মারিও পাচেলি উদ্ভাবিত "স্কেরার-দেম-টু-স্লিপ চার্ট"-এর খরিদ্দার ক্রমশই বেড়ে চলেছে। এটা হচ্ছে প্রশ্নাবলীর একটি তালিকা। একটি নির্দিষ্ট কালের মধ্যে পোশাক, খাদ্য, কর প্রভৃতি বাবদ খরচের হিসাব রোগীকে লিপিবদ্ধ করতে হয়। উদ্ভাবক দাবি করেন যে খরচের হিসেব ভাবতে ভাবতে রোগী ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। অন্যান্য দেশে এখনও কবিতা আবৃত্তি করা, সংখ্যা গোণা প্রভৃতি পুরনো পদ্ধতিই অবলম্বিত হয়। তবে অভিনবত্বের দিক থেকে দক্ষিণ লণ্ডনে ডেনমার্ক হিলের সিরিল ব্রাকেনের পদ্ধতিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্রাকেন দাবি করে যে, শীতের রাতে আগুনের উষ্ণ ঢাকনার ওপর বসলে পৃথিবীর কোন শক্তিই ঘুম আটকাতে পারবে না।

কে. হোড়ের
কনক
পাউডার

গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

রেডিও সংগীত সম্মেলন

রেডিও সংগীত সম্মেলনের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থ। তিনি তাঁর ভাষণে বলেছেন যে, আকাশবাণী আমাদের সংগীতের মূলরূপটি যথাযথভাবে রক্ষা করবার জন্য সচেষ্ট থাকবে এবং সমাজের প্রয়োজনে যে পরিবর্তন ঘটছে তার সঙ্গেও সংগতি রক্ষা করে চলবে। লক্ষ লক্ষ লোক যাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে রেডিও শোনেন তাঁদের চাহিদা অনুসারে বেতার কর্তৃপক্ষ অনুষ্ঠান প্রচারে ব্রতী হবেন। শ্রীপন্থ বেতার প্রতিষ্ঠানকে সাধুবাদ প্রদান করে বলেন যে, স্বাধীনতা লাভের পর আমরা যে সব সাফল্য অর্জন করেছি তার মধ্যে একটি প্রধান কৃতিত্ব হচ্ছে বেতারের উদ্যোগে ভারতীয় সংস্কৃতির নবজাগরণ। বেতারমন্ত্রী শ্রীকেসকার তাঁর ভাষণে বলেন যে, রেডিও সংগীত সম্মেলন থেকে আমাদের কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে: যথা—সুসম্বন্ধ প্রণালীতে সংগীতকলার রূপায়ণ, সংগীতের মান উন্নয়ন এবং তরুণ শিল্পীদের উৎসাহ প্রদান। তিনি জানিয়েছেন যে, প্রত্যেক রেডিও স্টেশনে কেবলমাত্র বিবিধ ভারতী বা লাইট মিউজিক প্রচারের জন্য যাতে সম্পূর্ণভাবে একটি ট্র্যান্সমিটার ব্যবহার করা যায় তার একটি পরিকল্পনা করা হয়েছে। আকাশবাণীর ডাইরেক্টার জেনারেল শ্রী জে সি মাথুর বলেছেন যে, বেতারের প্রচেষ্টা হচ্ছে কলা এবং সংগীতের মাধ্যমে ভারতীয়দের মধ্যে একটা বোধ এবং একাত্মভাব জাগ্রত করা। তিনি একথাও জানিয়েছেন যে, আকাশবাণী লাইট মিউজিকের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন এবং লাইট মিউজিক শিল্পীদের যোগ্যতা নিরূপণের জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এইসব ভাষণগুলিতে আকাশবাণীর সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা সম্বন্ধে বহু সদুক্তি উচ্চারিত হলেও প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি উক্তির সত্যতা এবং যাথার্থ্য বিশেষভাবে বিচার করা প্রয়োজন। প্রথমেই স্বীকার করা ভাল যে, বেতার কেন্দ্র স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য রাজনৈতিক। বর্তমান ক্লান্তিকর সরকারী প্রচারের বহর দেখলেই সেটা অনায়াসে উপলব্ধি করা যায়। এই প্রচার বাদ দিয়ে যেটুকু সময় হাতে থাকে সেইটুকু পূরণ করবার জন্যই একটা সাংস্কৃতিক কার্যক্রম নির্ধারিত হয়ে থাকে। এর মধ্যেও প্রায়ই কোনও মন্ত্রী বা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর অপ্রয়োজনীয় বক্তৃতা শোনবার জন্যে কত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান খাতিল করে দেওয়া হয়। এছাড়া, রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা অনুসারে হিন্দীর প্রচার আছে যা আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অনেক অংশ দখল করে বসে আছে। অতএব আকাশবাণীর সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার কতখানি কার্যত সত্য সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ বর্তমান।

বেতারের উদ্যোগে আমাদের দেশে সংস্কৃতির নবজাগরণ ঘটেছে—এই দাবীও সত্য বলে স্বীকার করা গেল না। আসলে গত কয়েক বৎসর ধরে জনগণের প্রচেষ্টায় বড় বড় শহরে বহু সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এইসব অনুষ্ঠানেই প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাঁদের যোগ্যতা প্রমাণ করে স্ব স্ব ক্ষেত্রে ভারতজোড়া এমন কি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন ... শিল্পীরা যখন প্রভূত পরিশ্রমে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তখনই আকাশবাণী তাঁদের খ্যাতির সুযোগ গ্রহণ করবার জন্য এগিয়ে আসেন। আকাশবাণীর প্রচেষ্টায় কোনও শিল্পী দেশের মুখোজ্জ্বল করেছেন এমন দৃষ্টান্ত মিলবে কিনা সন্দেহ। অপরপক্ষে এমন অভিযোগ অনবরতই শোনা যায় যে, বহু সুযোগ্য শিল্পীর সম্মুখে দ্বার রুদ্ধ রেখে আকাশবাণী শিল্পী-সম্প্রদায়ে প্রভূত নৈরাশ্য সঞ্চার করছেন।

আগে বলতে ভুলেছি—শ্রীপন্থ তাঁর ভাষণে বলেছেন যে সংগীত এমন একটি একতাসম্পাদনকারী শক্তি যা জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়, ভাষা নির্বিশেষে তাবৎ লোককে একত্রিত করতে সক্ষম এবং এই সংগীতের প্রকৃত স্বরূপ যাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ বা বিনষ্ট না হয় সে বিষয়ে সাবধান করে দিয়ে তিনি বলেন যে, বিকৃতি, মানের অবনতি বা রুচির অধোগতির বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার কল্যাণকর ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য। উপদেশ খুবই সৎ এবং প্রয়োজনীয় সন্দেহ নেই কিন্তু আকাশবাণীর কার্যক্রমে এ বিষয়ে তৎপরতার যে বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয় দুঃখের সঙ্গে সেটি স্বীকার না করে উপায় নেই। সংগীতের ক্ষেত্রে একতা সম্পাদন দূরে থাক স্বজন পোষণ

"শারদীয়া নির্মলেন্দু একখানি সুবৃহৎ ও সচিত্র চলচ্চিত্র ও সাহিত্য পত্রিকা।"
—আনন্দবাজার পত্রিকা

একমাত্র নির্ভীক সাহিত্য ও সিনেমা

প্রতি সংখ্যা ·১৯ নঃ পঃ **নির্ম্মলেন্দু** পাক্ষিক পত্রিকা

আগামী বৈশাখে বেরুবে "নববর্ষ" সংখ্যা
১৮নং বাবুরাম শীল লেন, কলিকাতা-১২
একমাত্র স্বত্বাধিকারী—শ্রীনির্মলেন্দু ঘোষ

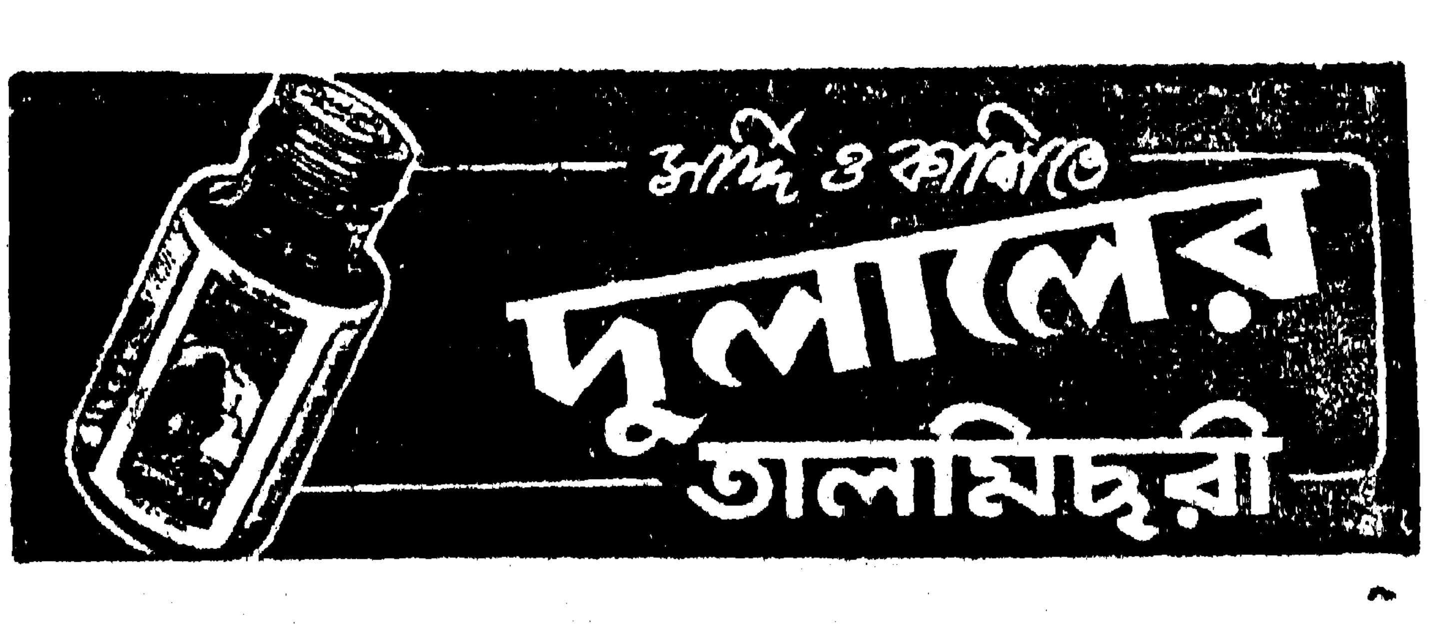

প্রস্তুতকারক— দুলাল চন্দ্র ভড়

এবং প্রাদেশিকতার উগ্র প্রশ্রয়ের প্রমাণ বর্তমান রেডিও সংগীত সম্মেলন থেকেই মিলবে। এ বিষয়ে আসছি, তার আগে আর একটু বক্তব্য সেরে নিই।

বর্তমান বেতারের উদ্যোগে সংগীতকে যত অসম্ভাব্য উপায়ে ভাগ করা হয়েছে এমন আর আমাদের দেশে ইতিপূর্বে ঘটে নি। শাস্ত্রীয়, উপশাস্ত্রীয়, রাগপ্রধান প্রভৃতি পর্যায় থেকে আধুনিক, বিবিধভারতী, রম্যগীতি লঘুসংগীত প্রভৃতি বহু কৃত্রিম ও কাল্পনিক শ্রেণীর উল্লেখ বেতারের অনুষ্ঠানসূচীতে পাওয়া যায়। কোনটারই স্পষ্ট সংজ্ঞা বেতার কর্তৃপক্ষের কেউ দিতে পারেন না। নিছক নূতনত্বের জন্যই এইসব নামকরণ করা হয়েছে এবং এর আবছা যেখানে শ্রেণীবিভাগ সেখানে সংগীতের প্রকৃত স্বরূপ বজায় রাখা সম্ভব নয় সেটা বলাই বাহুল্য। বেতার কর্তৃপক্ষ নিজেরাই হাজার গণ্ডা শ্রেণীবিভাগ করে শিল্পীদের ইচ্ছামত নানা গ্রুপে বিভক্ত করছেন এবং সবচেয়ে অবাঞ্ছিত ব্যাপার এই যে, লাইট মিউজিক নামক একটি উদ্ভট শ্রেণীর পরিকল্পনা করে তাঁরাই হালকা গানের প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন। তাঁদের প্রচারিত রম্যগীতির অধিকাংশই যোগ্যতার দাবী করতে পারে না। অতএব শ্রীপন্থ, শ্রীকেসকার এবং শ্রীমাথুর যে ভাষণগুলি প্রদান করেছেন তার কতটুকু বাস্তবে সত্য তা বেতারশ্রোতা এবং পাঠকগণ উপলব্ধি করুন।

১৬ই অক্টোবর থেকে ২৩শে অক্টোবর পর্যন্ত রেডিও সংগীত সম্মেলনের অনুষ্ঠানকাল নির্ধারিত হয়েছে। এই সম্মেলনের ছয়টি অধিবেশন নির্দিষ্ট হয়েছে দিল্লিতে, দুটি বোম্বাইতে এবং একটি কলকাতায়। মাদ্রাজ এবং দক্ষিণ ভারতীয় কেন্দ্রগুলিতে সর্বসমেত সাতটি অধিবেশন নির্দিষ্ট হয়েছে। ১৬ই অক্টোবরে অনুষ্ঠিত কলকাতার অধিবেশনটি প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ আমাদের হয়েছে এবং এটিকে উপলক্ষ্য করে আমাদের মন্তব্য প্রদান করছি।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনটিকে নিতান্ত মামুলি ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। বোম্বায়ের শ্রীমতী লক্ষ্মী শংকর মুলতানীতে খেয়াল গাইলেন। গলা ভাল কিন্তু গান খুব সাধারণ স্তরের। ধারোয়ার কেন্দ্রের শ্রীঅর্জুনসা নাকোড়ের পূরিয়া রাগে খেয়াল এবং কাফিতে ঠুংরি সাধারণ পর্যায়ের। কোনটিতেই উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গেল না। দিল্লির শ্রীগোপালকৃষ্ণ পূরিয়াকল্যাণ এবং ঝিঁঝিটে বীণা (বিচিত্র বীণা বলে শোনা গেল) বাজালেন। বীণার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে—সেটি পরিহার করে ইনি প্রধানত সেতারের আধুনিক ভঙ্গি ফোটাতে চেষ্টা করেছেন বলে মনে হল। এর ফলে বীণার গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কিছু কিছু সুর-বিচ্যুতিও ঘটেছে। বোম্বায়ের সেতারশিল্পী আবদুল হালিম জাফর খাঁ আমাদের সম্পূর্ণ হতাশ করেছেন। কয়েক বৎসর আগে কলকাতায় এঁর বাজনা শুনে খুবই আশান্বিত হয়েছিলাম কিন্তু দেখা গেল, পূর্বের নিষ্ঠা তাঁর অনেক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। তিলককামোদ বা খাম্বাজের মত চিত্তাকর্ষক রাগেও তিনি রসসৃষ্টি করতে সক্ষম হলেন না। বার বার তার মেলানো শ্রোতাদের কাছে বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যাই হোক, এই অবস্থাতেও তিনি যদি গাম্ভীর্য রক্ষা করে বাজিয়ে যেতেন তাহলেও তাঁর চেষ্টাকে আমরা সাধুবাদ দিতাম; কিন্তু এই অকৃতকার্যতা ঢাকবার জন্য তিনি তবলার সঙ্গে কতক-গুলি সস্তা লয়ের কাজ দেখাতে সচেষ্ট হলেন। এই ধরনের হাল্কা কাজ দেখিয়ে অনেকে আজকাল নানা অনুষ্ঠানে এক-শ্রেণীর শ্রোতার কাছ থেকে হাততালি কুড়োতে চেষ্টা করেন; কিন্তু আলোচ্য সম্মেলনটিতে এই ধরনের শ্রোতা ছিলেন না বলে শিল্পী একটিও সস্তা সাধুবাদ অর্জন করতে পারেন নি। তবলায় কলকাতার শ্রীকেরামৎউল্লা এবং শ্রীশ্যামল বসু আর সারেঙ্গিতে কলকাতার শ্রীসাগিরুদ্দিন ও শ্রীলড্ডন খাঁ তাঁদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

কথা হচ্ছে, কলকাতার মত উচ্চমানের সংগীত সংস্কৃতির কেন্দ্রে এই মামুলি বেতার সংগীত সম্মেলনের সার্থকতা কি? বেতারমন্ত্রী কেসকার যে ঘোষণা করেছেন রেডিও সংগীত সম্মেলনে সংগীতের মান উন্নয়ন করা হচ্ছে—এই যদি তার নমুনা হয়ে থাকে তাহলে উৎসাহ প্রকাশ করবার মত কোন হেতু খুঁজে পাই না। আমরা গতবারেও বলেছিলাম যে, কলকাতায় যেন যথার্থ যোগ্যতাসম্পন্ন শিল্পী পাঠানো হয়, কিন্তু আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষ সেদিকে কর্ণপাত করাও আবশ্যক মনে করেন নি। প্রসঙ্গত এটাও বলা প্রয়োজন মনে করি যে, কলকাতা থেকে কণ্ঠসংগীতে এমন এক ব্যক্তিকে বাছাই করা হয়েছে যাঁর কলকাতার সংগীত জগতে কোনও স্বীকৃতি নেই। রেডিওতে তাঁর গান শুনে কোনদিনই তাঁকে উত্তম শিল্পী বলে আমাদের মনে হয়নি। অথচ বহু গুণী ব্যক্তির বদলে এঁকেই

॥ দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ ॥

আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি
ও
বাংলা সাহিত্য

রামমোহন, ঈশ্বর গুপ্ত, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, ভূদেব, রাজনারায়ণ, রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু, প্যারীচাঁদ, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, তারকনাথ, গিরিশচন্দ্র, বিবেকানন্দ এবং বিহারীলাল প্রভৃতি স্মরণীয় ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বস্পর্শে আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার ক্রমবিকাশ সুনিপুণভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে বর্তমান গ্রন্থে। বিদগ্ধ পাঠক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষার্থীদের পক্ষে একখানি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। মূল্য—আট টাকা।

॥ অরুণ ভট্টাচার্য ॥
কবিতার ধর্ম ও বাংলা কবিতার ঋতু বদল - ৪·০০

॥ নারায়ণ চৌধুরী ॥
আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ন - ৩·৫০

॥ মণি বাগচি ॥
শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার - ১০·০০

॥ ডাঃ সাধন ভট্টাচার্য ॥
রবীন্দ্র নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা - ৬·০০
নাটক ও নাটকীয়ত্ব - ২·৫০
নাটক লেখার মূল সূত্র - ৫·০০

॥ অজিত দত্ত ॥
বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস - ১২·০০

১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ কলিকাতা-২৯ ॥ জিজ্ঞাসা ॥ ৩৩, কলেজ রো কলিকাতা-৯

নির্বাচিত করা হল। এই নির্বাচনের রহস্য আমাদের অজ্ঞাত।

অতঃপর কিভাবে এই সম্মেলনগুলির সংগঠন পরিকল্পনা করা হয়েছে তার একটি হিসাব দাখিল করছি। সম্মেলন উপলক্ষ্যে যে পুস্তিকাটি মহাজাতি সদনে আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষ বিতরণ করেছেন তা থেকেই এই সংখ্যাগুলি নির্ণয় করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, উত্তর ভারতীয় সংগীতের অনুষ্ঠানেই আমাদের এই আলোচনা সীমাবদ্ধ।

সম্মেলনগুলিতে বিভিন্ন কেন্দ্রের শিল্পী-সমাবেশ সংখ্যা নির্দেশে দেখানো হল—

বোম্বাই—১৭, দিল্লি—১৪, কলকাতা—১০, লখনউ—৫, পুণা—৩, ধারোয়ার—৩, এলাহাবাদ—২, আমেদাবাদ—১, নাগপুর—১।

সংগীতানুষ্ঠানে কণ্ঠসংগীতকেই সর্বপ্রধান বলে স্বীকার করা হয়। যাঁরা কণ্ঠসংগীতে অংশগ্রহণ করেছেন বিভিন্ন কেন্দ্র অনুসারে তাঁদের সংখ্যা কত তাও দেখানো হল।

বোম্বাই—৪, পুণা—৩, ধারোয়ার—৩, দিল্লি—৩, কলকাতা—২, এলাহাবাদ ১, লখনউ—১, আমেদাবাদ—১, নাগপুর—১।

দেখা যাচ্ছে, সবচেয়ে বেশি শিল্পী বাছাই করা হয়েছে বোম্বাই থেকে এবং কণ্ঠসংগীতের অধিকাংশ শিল্পী বোম্বাই অঞ্চলের। বোম্বাই, পুণা, ধারোয়ার, আমেদাবাদ এবং নাগপুর মিলিয়ে দেখলে দেখা যায়, এই কেন্দ্রগুলি থেকে ১২ জন কণ্ঠসংগীতের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন এবং কলকাতা, দিল্লি, লখনউ এবং এলাহাবাদ থেকে নির্বাচিত কণ্ঠসংগীতশিল্পীর সংখ্যা ৭ জন—অর্থাৎ বোম্বাই অঞ্চলের প্রায় অর্ধেক। ধারোয়ার কেন্দ্র যদিও দক্ষিণাঞ্চলের অন্তর্গত তথাপি এই কেন্দ্রে বোম্বাই অঞ্চলের অনেকেই অংশগ্রহণ করেন এবং মহারাষ্ট্রীয়দের সংগীতানুষ্ঠানও এই কেন্দ্রে প্রচারিত হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখযোগ্য যে, বোম্বাইতে সম্মেলনের দুটি অনুষ্ঠান হয়েছে কিন্তু কলকাতায় একটি। পুণা, ধারোয়ার, আমেদাবাদ এবং নাগপুর থেকে কেবলমাত্র কণ্ঠসংগীতের শিল্পীই বাছাই করা হয়েছে। এইভাবে বোম্বাই অঞ্চলের কোন প্রধান কেন্দ্রই বাদ রাখা হয় নি কিন্তু পাটনা, কটক, গোহাটি সম্পূর্ণ বাদ গেছে। অর্থাৎ বিহার, উড়িষ্যা এবং আসামে এমন কাউকেই আকাশবাণী খুঁজে পান নি যিনি সম্মেলনে কণ্ঠ অথবা যন্ত্রসংগীতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর [illegible] এলাহাবাদ, লখনউ সম্মেলনে ঠাঁই পেয়েছে নইলে তাদের বেলাতেও—"ঠাঁই হল না তোমার সোনার নায় গো" হত।

এইসব ব্যাপার থেকে আমাদের মনে যে সব প্রশ্নের উদয় হয়েছে সেগুলি আমরা উত্থাপন করছি। পূর্বের ভাষণগুলির পর এই প্রশ্নগুলি চিন্তা করে দেখুন এবং এঁদের কথায় আর কাজে কেমন চমৎকার সংগতি তাও বিচার করে দেখুন।

১। রেডিও সংগীত সম্মেলনে বোম্বাই কেন্দ্রের শিল্পীদের সংখ্যাধিক্য কেন এবং পুণা, আমেদাবাদ, নাগপুর, ধারোয়ার—অর্থাৎ বোম্বাই অঞ্চলের কেন্দ্রগুলি থেকেই বেছে বেছে কণ্ঠসংগীতের শিল্পী নির্বাচন করা হয়েছে কেন?

২। আজমীর জলন্ধর, পাটনা, কটক, গৌহাটি—এইসব কেন্দ্র থেকে কোনও শিল্পীকে নির্বাচন না করবার কারণ কি?

৩। বোম্বাইতে যেখানে সম্মেলনের দুটি অধিবেশন নির্ধারিত হয়েছে সেখানে কলকাতায় একটি কেন? কোনদিক থেকে বিচার করে বোম্বাইকে কলকাতার চেয়ে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হল? আর কেনই বা কলকাতার গুরুত্ব লাঘব করা হল?

৪। সম্মেলনে শিল্পী নির্বাচনের জন্য কারা দায়ী এবং কোন ভিত্তিতে তাঁরা শিল্পী নির্বাচন করেছেন যাতে তাঁদের নিরপেক্ষতা প্রমাণিত হয়। শোনা যায়, দিল্লি থেকে যাঁদের ইঙ্গিতে এই নির্বাচন হয় তাঁদের মধ্যে একজন বাঙালী পরামর্শদাতাও এই শুভকার্যে ব্রতী আছেন। তিনি নিশ্চয়ই কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করে কণ্ট্রাক্টের মেয়াদ বাড়াবার চেষ্টায় আছেন।

৫। যে সম্মেলনে রাগসংগীত প্রচারিত হচ্ছে সেখানে ধ্রুবপদকে উপেক্ষা করা হয়েছে কেন? ধ্রুবপদকে বাদ দিয়ে ভারতীয় সংগীতের সুসম্বন্ধ রূপ প্রদর্শন করা কি সম্ভব?

সমগ্র ব্যাপারটা থেকে যে বিষয়টা অত্যন্ত বিসদৃশভাবে স্পষ্ট হয় সে হচ্ছে বোম্বাই অঞ্চলের প্রতি আকাশবাণীর অতিরিক্ত পক্ষপাত এবং এর জন্য অপরাপর কেন্দ্রকে সম্পূর্ণ অবহেলা করতেও তাঁরা সংকুচিত হন নি। এই পক্ষপাতিত্বের কারণও সুস্পষ্ট। বোম্বাই অথবা বোম্বাই অঞ্চলকে তুষ্ট করলে বেতারমন্ত্রী শ্রীকেসকার তুষ্ট হবেন। আকাশবাণীর কর্তা শ্রীমাথুর এবং মন্ত্রীবর শ্রীকেসকার উভয়কেই আমরা আহ্বান করছি—তাঁরা উপযুক্ত জবাব দিয়ে প্রমাণ করুন আমাদের ধারণা ভুল।

কিন্তু, একেবারে টপ্-লেভেল তো হুকুম করেই খালাস। এর পরে অপটু শিল্পীদের অযোগ্য সংগীত পরিবেশনের [illegible] যখন বিভিন্ন কেন্দ্রে [illegible] হবে তাদেরই ভাগ্যে। এর ফলে বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে গৃহবিবাদের সূত্রপাত হবার সম্ভাবনাও অল্প নয়, শিল্পীদের মধ্যে মনকষাকষি তো বাড়বেই এবং ভবিষ্যতে আরো ধরাধরি করবার জন্য অপেক্ষাকৃত অপটু শিল্পীরা নানারকম উপায় উদ্ভাবন করবেন। বছরের পর বছর ভীশাস সার্কেল এইভাবেই চলতে থাকবে। পরিণতি কী হয় তার অপেক্ষায় আছি আমরা।

ধ্রুপদী
কার্তিক সংখ্যা
বেরিয়েছে
১৩।বি কাকুলিয়া রোড। কলিকাতা ১৯

॥ প্রথম প্রকার ॥
বই ও ম্যাগাজিনের
জন্য
ম্যানকাইন্ড

কে,হোড়ের
কণক
পাউডার

শ্রেষ্ঠ চিরুণী
শঙ্খ মার্কা
SANKHA JESSORE

ধবল-শ্বেত কুষ্ঠ
বহুদিন পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম, দিনরাত চর্চা ও অনুসন্ধানের পর কবিরাজ শ্রীব্রহ্মস্বরূপ, বি এ উহা সমূলে বিনাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইংরাজীতে লিখিবেন।
আয়ুর্বেদিক কেমিক্যাল
রিসার্চ লেবরেটরীজ, ফতেপুরী, দিল্লী ৬

বিজ্ঞান বৈচিত্র

চক্রদত্ত

ভারতবর্ষের অনেক বড় বড় শহরে আমাদের কাঁচা খাদ্যদ্রব্য যেমন বিভিন্ন জাতের ফল, সব্জী, মাছ মাংস তাপনিয়ন্ত্রিত ঠাণ্ডা ঘরে রেখে দেবার ব্যবস্থা আছে। প্রয়োজনের সময় আমরা এগুলো ব্যবহার করি। এই পদ্ধতিতে এই সব খাদ্যবস্তুর আসল স্বাদ এবং গন্ধর অনেক ক্ষেত্রে তারতম্য ঘটে। কি করে এদের আসল স্বাদ এবং গন্ধ এবং সজীবতা বজায় রাখা যায় সে বিষয় বৈজ্ঞানিকরা চিন্তা করছেন। আণবিক শক্তির সাহায্যে এদের কতদূরে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা যায় তার গবেষণা বর্তমানে করা হচ্ছে। বৈজ্ঞানিকগণ মাংস, মুরগী, ফলমূল, সবজী ইত্যাদির ওপর রেডিও এক্‌টিভ আইসোটোপ কোবাল্ট ৬০ বিকিরণ করে পরীক্ষা করে দেখছেন। এই বিকিরণ এই খাদ্যবস্তুর ভেতরকার সব জীবাণু এবং বীজাণু ধ্বংস করে এদের তাজা রাখাতে সাহায্য করছে। যে সমস্ত বস্তুর ওপর কোবাল্ট ৬০ বিকিরণ করা হবে সেগুলি একটি ৬ ফুট চওড়া কংক্রীটের দেয়ালের পেছনে রাখা হয়। যদিও কোবাল্ট ৬০র বিকিরণ মানুষের ক্ষতি করে কিন্তু যে সমস্ত খাদ্য বস্তুর ওপর কোবাল্ট ৬০ বিকিরণ করা হয় সেই সমস্ত খাদ্য বস্তু মানুষের কোন ক্ষতি সাধন করে না। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু খাদ্য বস্তুর স্বাদের তারতম্য হতে দেখা যায়। স্ট্রবেরী এবং আঙুর খুব বেশী পরিমাণে বিকিরণ সহ্য করতে পারে এবং এর কোন প্রকার স্বাদ অথবা গন্ধ নষ্ট হয় না, অথচ অনেক দিন পর্যন্ত রাখা যায়। এর পরেই আপেলের নাম করা যায়। দেখা গেছে, যে-পরিমাণ কোবাল্ট ৬০র বিকিরণে মানুষ মারা পড়ে তার প্রায় ৪০০ গুণ বেশী বিকিরণেও খাদ্য বস্তুর কোন ক্ষতি করে না। বিকিরণ বস্তুর ওপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে, বেশীর ভাগ মুরগীর ছানার ওপর, বিকিরণ দেবার আগে এদের একটি পলিথিনের থলের মধ্যে ভরে তবে এদের ওপর কোবাল্ট ৬০ বিকিরিত করা হয়। থলের মধ্যে পুরে বিকিরণ দেওয়ার ফলে গামা রশ্মি খাদ্যবস্তুর ভেতরের জীবাণু ধ্বংস করে। পলিথিন থলের মধ্যে থাকার দরুণ খাদ্যবস্তু আর বাইরের জীবাণুর সংস্পর্শে আসতে পারে না। বিকিরণ দেবার একটা আন্তর্জাতিক মাপ আছে—একে 'রেএড' বলে। এই মাপ অনুযায়ী মানুষ ৫০০ 'রেএড' বিকিরণে মারা যায়। কিন্তু আপেল ১০০,০০০ রেএড এবং স্ট্রবেরী ২০০,০০০ রেএড বিকিরণ সহ্য করতে পারে। এত বেশী 'রেএড' ও এদের স্বাদ, গন্ধের কোন তফাৎ হয় না। আলু গুদামে রেখে দিলে দেখা গেছে যে কিছুদিন বাদে তার থেকে গাছ বের হতে থাকে। এর ফলে আলু নরম হয়ে যায় এবং পচ ধরতে থাকে। আমেরিকা এবং রাশিয়াতে এই কোবাল্ট ৬০ ৫০০০ রেএড বিকিরণের সাহায্যে গুদামজাত আলুর গাছ বের হওয়া বন্ধ করা গেছে। এ ছাড়াও এই বিকিরিত আলু মানুষের শরীরের পক্ষেও উপকারী। বৃটেনে বর্তমানে আলুর ওপর কোবাল্ট ৬০ বিকিরণ করা হচ্ছে। এবং এ দেশের বৈজ্ঞানিকরা অন্যান্য খাদ্যবস্তুর ওপরও পরীক্ষামূলকভাবে বিকিরণের কথা চিন্তা করছেন।

*

ওকলাহোমা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ডাক্তার-বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, মানুষের যখন কাঁচা সর্দি হয় তখন সবচেয়ে বেশী নাক গন্ধ সম্বন্ধে সজাগ হয়। এই সময় নাকের ভেতরের পাতলা পর্দা একটু লালচে ভিজেভিজে এবং একটু ফোলা ফোলা থাকে। মানুষ গন্ধ সম্বন্ধে সবচেয়ে কম সজাগ হয় যখন তাদের নাকের ভেতরের পাতলা পর্দা শুকনো এবং কোঁচকান থাকে। ডাক্তার-বৈজ্ঞানিকদের মতে যারা নস্যি নেন তারা যে সাধারণ মানুষের চেয়ে কম গন্ধ পান এটা তাদের কল্পনা মাত্র। সর্দি পেকে গিয়ে যখন নাক সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় তখন আর কোন প্রকার গন্ধ পাওয়া যায় না। এরা লেবুর বিভিন্ন ধরনের গন্ধ নিয়ে কয়েকজন মহিলার ওপর পরীক্ষা করে দেখে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

*

ডাঃ টড হুর্ডলার আমাদের সামনে ভবিষ্যতের হাসপাতালের যে ছবি তুলে ধরছেন—তা আজকের দিনের হাসপাতালের ব্যবস্থা দেখলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করবে না। প্রথমত হাসপাতালগুলো মাটির নীচে তৈরী করা হবে—কারণ ভবিষ্যতে আমাদের আবহাওয়াতে রেডিও এক্‌টিভ বিকিরণের পরিমাণ যথেষ্ট বেড়ে যাবে। তার হাত থেকে বাঁচতে হলে মাটির নীচে বাস করা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই। মাটির ওপর শুধু মাঝে মাঝে কয়েকটা গম্বুজ দেখা যাবে—যাতে এলিভেটার' লাগান থাকবে। এতে করে ওঠানামা করা যাবে। রোগীরা হাসপাতালে আসা মাত্রই তাদের অজ্ঞান করে ফেলা হবে—আর এই অবস্থায় তাদের যতদিন না সুস্থ হয়ে উঠবে ততদিন রেখে দেওয়া হবে। অজ্ঞান অবস্থায় রোগীদের হয় শিরার ভেতর দিয়ে বা পাকস্থলীতে নলের সাহায্যে খাওয়ান ব্যবস্থা থাকবে। প্রত্যেক রোগীর সঙ্গে একটা করে ইলেক্‌ট্রিক যন্ত্র থাকবে যেটার সাহায্যে রোগীর ব্যথা, নাড়ী, শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃদয়নের কাজ শরীরের আদ্রতা মস্তিষ্কের কার্যকারিতা সব রেকর্ড করা যাবে। রোগী অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হবে আর সম্পূর্ণ সুস্থ হলে তার ঘুম ভাঙবে। ডাঃ হুর্ডলার বলেন যে, এই ধরনের হাসপাতালে কোন রকম গোলমাল, অনুযোগ, অভিযোগ কোন রকম চিন্তা, কোন প্রকার গন্ধ ইত্যাদি থাকবে না। এই হাসপাতালে রোগীদের আত্মীয় স্বজনের দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থা থাকবে না। প্রয়োজনীয় খবরাখবর টেলিফোনে অথবা হাসপাতালের বাইরে অফিস থেকে সংগ্রহ করা হবে।

পুস্তক পরিচয়

ছোট গল্প

মিতে-মিতিন—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ত্রিবেণী প্রকাশন, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—তিন টাকা।

"মিতে-মিতিন" কয়লাকুঠির কুলী-কামিন আর সাঁওতালদের নিয়ে লেখা বারোটি গল্পের সমষ্টি। শৈলজানন্দের এই গল্পগুলিতে এক বিশেষ পরিবেশ ও প্রাণধর্ম নিপুণতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর লেখনীতে মুংরা কিন্নি, মাইনু, গাংটু, দলিয়া, মুকরি, পরী, সোনা প্রভৃতি চরিত্র দুর্জয় প্রাণশক্তির প্রতীক রূপে অঙ্কিত হয়ে উঠেছে। সব কটি গল্পই এক অনবদ্য মৃত্তিকাশ্রয়ী জীবনরসে সিঞ্চিত। তবুও এ-গুলির মধ্য "প্রতিবিম্ব", "বনের হরিণ ছিল বনে", "সাঁওতাল-পল্লী" জননী' সহজেই পাঠকের মনকে আবিষ্ট করে রাখে। ১০৫।৬০

সভাপর্ব—নরেন্দ্রনাথ মিত্র। পরিবেশক: ডি হাজরা এন্ড কোং, ১৩, সূর্য সেন স্ট্রীট। কলিকাতা—১২। ২·৫০ নঃ পঃ।

'সভাপর্ব' কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের আধুনিক গল্পগ্রন্থ। মোট সাতটি ছোটগল্প বর্তমান সংকলনে স্থানলাভ করেছে; মধ্যবিত্ত সমাজ ও জীবনের রহস্যময় পরিবেশের আলোছায়া ঘেরা কাহিনী গল্পগুলিকে ঘিরে রয়েছে। আগামীকাল, পলাতক, দাম্পত্য, একটি চিত্রকাহিনী' গল্পপাঠে শিল্পী রেনন্দ্রনাথ মিত্রের স্বাদ পাওয়া যায়। প্রথম গল্পটি (সভাপর্ব ?) শিরোনামাহীন কেন? ৩১৪।৬০

বৈঠকী গল্প—সন্তোষকুমার দে। প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা১২। দাম— ২·৫০ নয়া পয়সা।

নাম 'বৈঠকী গল্প' হলেও গ্রন্থটি কেবলই মাত্র গল্প সংকলন নয়। কয়েকটি ছোটগল্পের পাশে কিছু রম্যরচনা, এমনকি একটি কবিতাও স্থান পেয়েছে। কবিতাটিকে অবশ্য একটি সরস গল্পও বলা যায়।

৩৫৭।৬০

দুই পকেট হাসি—প্রবন্ধ। বলাকা প্রকাশনী, ২৭সি, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। দাম দু টাকা প'চাত্তর নয়া পয়সা।

ইতিপূর্বে প্রকাশিত লেখকের এক পকেট হাসি পাঠকগণের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। কার্টুনসহ অসংখ্য চুটকি গল্পের সংকলনে সমৃদ্ধ আলোচ্য পুস্তকখানি অন্ন-বস্ত্রহীন বাঙালীর মনের ক্ষুধা মিটাইয়া মুখে হাসি ফুটাইতে সমর্থ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। মজালিসে, ট্রেন ভ্রমণে, অবসর বিনোদনে এবং নিঃসঙ্গ জীবনে এমন একখানা হাসির ছোট্ট-গল্পের বইয়ের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ৪৯৬।৫৯

নাটক

সাহিত্যিক—বীরু মুখোপাধ্যায়। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ। ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। মূল্য ২, টাকা।

সাইরেন—সরোজ ঘোষ। শোভনা প্রকাশনী। ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। মূল্য ২, টাকা।

অংকুর—সুনীল দত্ত। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। মূল্য দেড় টাকা।

ইদানীং বাংলা নাটক ও নাটমঞ্চ নিয়ে আন্দোলন ব্যাপক হয়ে উঠেছে। একাধিক তরুণ নাট্যকার নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপৃত। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, আঙ্গিক—সবদিকেই একটা নতুন কিছু করার প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য। তবে নাটক রচনায় তাঁরা সর্বক্ষেত্রে সার্থক হচ্ছেন, একথা বলা যায় না। হয়তো যে নাটক পড়তে ভালো লাগে না, মঞ্চে সেই নাটকই প্রয়োগ-নৈপুণ্যে ও অভিনয় সৌকর্যে সার্থক হয়ে ওঠে। তবে আশার কথা এই যে, তরুণ নাট্যকারদের নাটকে একটি যত্নশীল বক্তব্য উপস্থাপনের রীতি লক্ষ্য করা যায়।

শ্রীবীরু মুখোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যিক' আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার ওপর কশাঘাত। যে সাহিত্যিকের রচনায় পত্রিকা চলে, বক্স-অফিস ভরে ওঠে, সিনেমাশিল্প বেঁচে থাকে, সেই সাহিত্যিকই খেতে না পেয়ে দোরে দোরে ভিখিরির মতো ঘোরেন। আবার সেই সাহিত্যিকেরই মৃত্যু হলে জাঁকজমক করে শোকসভা হয়, হাহুতাশের পর বক্তৃতা চলে; অবশেষে স্মৃতি তহবিলে চাঁদা পড়ে। নাটকটি সম্পূর্ণরূপে সার্থক হত, যদি মাঝে মাঝে অতিনাটকীয়তা ও অবাস্তবতা মনকে আঘাত না করত। তাছাড়া, একাধিক টাইপ চরিত্রের ভিড় নাটকটির সুর লঘু করে দিয়েছে।

শ্রীসরোজ ঘোষ-এর 'সাইরেন'-এর বক্তব্য সম্পূর্ণ অন্য। এক কুচক্রী অর্থলোলুপ ব্যবসায়ীর চক্রান্তে সুখী সচ্ছল একটি ভদ্র ব্যবসায়ী পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। এ নাটকের আবেদন সার্মগ্রিক নয়। কিন্তু নাট্যকারের সংলাপ-শক্তি তীক্ষ্ণ ও বলিষ্ঠ। ভিন্নতর কালোপযোগী বিষয়বস্তুর প্রতি সজাগ হলে, নাট্যকারের কাছ থেকে সার্থক নাটক পাবার আশা করা যায়।

শ্রীসুনীল দত্তের 'অংকুর' একটি কিশোর নাটক। কয়েকটি ইস্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যেই এর বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ। নানা-প্রকারের ছাত্র আছে। নাট্যকার তাদের মধ্য থেকে বেছে নিয়েছেন কয়েকজনকে। যেমন, পলটু একজন ছাত্র—যে ছবি আঁকে, খেলে

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
পতঙ্গ (অপূর্ব গল্পগ্রন্থ) ২·৫০

নির্মল চট্টোপাধ্যায়
পশ্চিম দিগন্ত (আলোচনা) ২·০০

শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য
সাহিত্য ও পাঠক
(প্রবন্ধ) ৫·০০

প্রকাশ আসন্ন
শ্রীঅমলা দেবীর
মরু-মায়া
যাঁর লেখা একদিন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল তাঁরই সর্বাধুনিক উপন্যাস।
দাম—৩·২৫

সবেমাত্র প্রকাশিত
অ-ক্রু-র'র
শকুন্তলা স্যানাটোরিআম
(উপন্যাস) ২·৭৫

শিশুদের বই
আজব টাকা ৫০ ন.প.
শ্রীশ্যামাপ্রসাদ আচার্য
'সৃষ্টি'র বই

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য
গীতি-কবি শ্রীমধুসূদন ৫·০০
ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত
নীলদর্পণ ৩·৫০
দীনবন্ধু মিত্র
কুলীন-কুল-সর্বস্ব ৩·০০
রামনারায়ণ তর্করত্ন

কল্লোল প্রকাশনী, এ-১৩৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

এবং ভালো অভিনয় করে। কিন্তু লেখা-পড়ায় তার মনোযোগ নেই। আদর্শ শিক্ষক আশাপূর্ণবাবু তার মনবদলে সহায়তা করেন। নাটকটির এই ধরনের বিষয়বস্তুর মধ্যে অভিনব কিছুই পাওয়া যায় না। অন্তত, সুনীলবাবুর কাছ থেকে নতুন কিছু প্রত্যাশা করি। প্রগতি নাট্য আন্দোলনের ধারায় তাঁর নাম সুবিদিত। সেই নামকে তিনি উজ্জ্বলতর করুন—এই প্রত্যাশা করা অন্যায় বা বেশি কিছু নয়।

৩৪৮।৬০, ৩১৯।৬০, ২৪৬।৬০

উপন্যাস

পল্টন ছাউনি—অমিয় হালদার, দাশগুপ্ত এণ্ড কোং (প্রা) লিঃ; ৫৪।৩ কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা। দাম ৪·৫০ টাকা।

লঘু হাস্য পরিহাসের মধ্য দিয়েও যে ভয়াবহ এবং ভয়ংকর জিনিসের কথা বলা যায় এ কথা লেখক তাঁর 'পল্টন ছাউনি' পুস্তকে নতুন করে প্রমাণিত করলেন। এই কারণেই প্লট বা চরিত্র অপেক্ষা স্টাইল অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ কারণ স্টাইল, প্লট বা চরিত্র সৃষ্টির পূর্বেই লেখককে নিজস্ব সম্পদ হিসাবে থাকে এবং লেখককে চিনিয়ে দেয়। যুদ্ধের ভয়াবহতার কথা গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ, কবিতা উপন্যাস প্রভৃতির মাধ্যমে অনেকেই বলেছেন এবং উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য পর্যায়ভুক্ত হিসাবে সে-গুলি সমাদৃত। বর্তমান গ্রন্থের লেখক একই কথা বলেছেন কিন্তু কত সহজে এবং অন্তরঙ্গ ভাবে! তাঁর পুস্তকের জগৎ সাধারণ জগতের মত নয় সেখানে কঠিন সামরিক শৃঙ্খলা মানুষকে প্রায় যন্ত্রে পরিণত করেছে; কিন্তু মানুষে মারতে যেমন শিখিয়েছে তেমনি শিখিয়েছে মানুষকে ভালবাসতে। একই সৈন্যদলে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃস্টান পরস্পরের জন্য প্রাণ দিতে পারে, একের দুঃখে অপরে দুঃখিত হয়, একের সুখে অপরে নৃত্য করে। বাঙালী হিন্দুর দুর্গোৎসবে, সমস্ত জাতি এবং ধর্মের লোক সমান আগ্রহে অংশ গ্রহণ করে। এখানে লোকের জাতি নেই, ধর্ম নেই আছে একটি পরিচয়, তাহল সৈনিক পরিচয়। সমস্ত পুস্তকের মধ্যে কোথাও লেখকের কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই বরং আছে সৈনিকসুলভ নির্লিপ্ততা এবং একটি সদাহাস্যময় মানুষের বিচিত্র অভিজ্ঞতার অতি চিত্তাকর্ষক রোজনামচা। ভাষার জাদুতে তিনি অল্পসময়েই পাঠককে জয় করে নেন এবং জগতের এক বাস্তব ছবি দেখান যা যেমন কৌতুহলোদ্দীপক তেমনি জীবন্ত।

৩৮৫।৬০

অপকলঙ্ক—মদন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—ক্রিয়েটিভ প্রেস, ৩০, কলেজ রো, কলিকাতা—৯। দাম তিন টাকা।

দৈনন্দিন জীবনে মানুষ যতই সাবধানতা মেনে চলুক না, এমনি এক-একটি দুর্বল মুহূর্ত তার জীবনে অকস্মাৎ এসেই পড়ে, যার সুযোগে অভাবিত বিপর্যয় দেখা দেয় সংসারে। শ্রীলার বাবা বুড়োরও তেমনি এক অসতর্ক মুহূর্তের ফলে শ্রীলার জীবন নষ্ট হয়ে গেলো চিরদিনের মতো। আর স্নেহ দিয়ে, ভালোবাসা দিয়েও শ্রীলাকে ধরে রাখতে পারলো না বুড়ো কিংবা সোনা আম্মা। সেই একটিমাত্র ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে গেলো শ্রীলা শেষ পর্যন্ত। 'অপকলঙ্ক' উপন্যাসের পটভূমিতে এই ঘটনাটিকে কৌশলে ব্যবহার করেছেন লেখক মদন বন্দ্যোপাধ্যায় যথাসাধ্য। লেখক এই উপন্যাসে আর-একটি দিকেও পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে পেরেছেন। বংশধারায় পুবর্তনের দোষ-গুণ, এক কথায় রক্তের সম্পর্কে পূর্বপুরুষের প্রভাব অলক্ষিতে কাজ করে কিনা, সে-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ মহলে জিজ্ঞাসা আছে। এখানে মনে হয়, লেখক সেই প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই মানসিক সৌন্দর্যকে অতিক্রম করেও শ্রীলার প্রতি রক্তবিন্দুতে যে উচ্ছৃংখলতার উন্দামতা, তার পেছনে এই একটিমাত্র কারণ ছাড়া আর কিছু থাকতে পারে না। নর্তকী মায়ের মেয়ে সে, অজ্ঞাতকুলশীল তার পিতা। তদুপরি জন্ম তার অবাঞ্ছিত। রক্তের প্রভাবেই যেন সে-ও তেমনি জননী হয়েছে, আর-এক অবাঞ্ছিত ও অসামাজিক সন্তানের।

স্বীকার করতে হবে এরকম একটি কাহিনীকে অত্যন্ত সংযমের সঙ্গেই প্রকাশ করেছেন লেখক। এজন্য তাঁকে পরোক্ষ রীতিরও আশ্রয় নিতে হয়েছে। শ্রীলার অন্তরঙ্গ বন্ধু বিজয়ার জবানীতে বর্ণিত হয়েছে সমস্ত কাহিনী। কিন্তু আগাগোড়া নিজেকে আড়ালে রেখে শেষ পর্যন্ত যে আত্মত্যাগে সে নিজেকে সরিয়ে নিলো সমাজ-সংসার থেকে, তাতে শ্রীলাকেও অতিক্রম করে বিজয়াই নায়িকা হয়ে উঠেছে। এবং উপন্যাসটিও এই আত্মত্যাগের ফলে রসোত্তীর্ণ।

এমন একটি জটিল কাহিনীকে অত্যন্ত সাবলীলতায় প্রকাশ করা কঠিন ব্যাপার কিন্তু লেখক তা অনেকাংশে পেরেছেন, এবং তার চেয়েও আশ্চর্যের বিষয়, প্রচুর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও উপন্যাসটিকে তিনি অযথা বড় করতে চেষ্টা করেননি।

৬২৮।৬০,

নয়-ছয়—শামসুল হক। ইস্টবেঙ্গল পাব্লিশার্স, ৪৫ নং ইসমাইলপুর, ঢাকা—১। মূল্য ৩·৭৫ নঃ পঃ।

এই বৃহৎ উপন্যাসটি পড়ে সময়ের পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। যে অভিজ্ঞতা, চিন্তার স্থিরতা এবং লেখার কৌশল থাকলে লিখিত বিষয়বস্তু সাহিত্য-পদবাচ্য হয়—তার কিছুই এই উপন্যাসে নেই। অসার্থক পুঞ্জীভূত ঘটনার প্রক্ষেপ, অযথা চরিত্রের সমাবেশ এই উপন্যাসে যে পরিমাণে আছে তা পদে পদে বিরক্তির সৃষ্টি করে। হেলেন এবং প্রবালকুমার—এই

রামায়ন
কৃত্তিবাস বিরচিত

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত সুন্দর চিত্রাবলী ও মনোরম পরিসাজে যুগরুচিসম্মত অনিন্দ্য প্রকাশন। [২৲]

॥ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য ॥ ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত উক্ত বিষয়ের শুধু ইতিহাস নয়, শাক্তধর্মের আধ্যাত্মিক রূপটিও তুলে ধরা হয়েছে এই বইয়ে। [১৫৲]
॥ রমেশ রচনাবলী ॥ রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত মোট ছয়খানি উপন্যাস একত্রে গ্রন্থিত। [৯৲]
॥ বঙ্কিম রচনাবলী ॥ প্রথম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস (১৪ খানি একত্রে) [১০৲]। দ্বিতীয় খণ্ডে উপন্যাস ব্যতীত যাবতীয় রচনা। [১৫৲] ॥ জীবনের ঝরাপাতা ॥ রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী সরলা দেবী চৌধুরাণীর আত্মজীবনী ও নবজাগরণ-যুগের যুগালেখ্য। [৪৲]
॥ মহানগরীর উপাখ্যান ॥ শ্রীকরুণাকণা গুপ্তা রচিত উপন্যাস [২॥০]।

সাহিত্য সংসদ
৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ঃঃ কলিকাতা-৯
॥ আমাদের বই সর্বত্র পাইবেন। ॥

দুটি পার্শ্বচরিত্রকে উজ্জ্বল করে তোলার যথেষ্ট সুযোগ ছিল, কিন্তু লেখক তাদের প্রেমকেও যেমন অংকুরে বিনষ্ট করেছেন তেমনি উপন্যাসের মূল ভিত্তিকে আগাগোড়া এক ঘেয়েমির দ্বারা অংকুরে বিনষ্ট করেছেন। ৫১১।৫৯

জ্যোতিষ শাস্ত্র

জন্মরাশি ও লগ্ন বিচার—পণ্ডিত শ্রীহরিদাস জ্যোতিষার্ণব। জ্যোতিষ গণনা কার্যালয়, ১৯, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। মূল্য ৩·৫০ নয়া পয়সা।

করকোষ্ঠি বিচার—পণ্ডিত শ্রীহরিদাস জ্যোতিষার্ণব। জ্যোতিষ গণনা কার্যালয়, ১৯, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। মূল্য ৩·৫০ নয়া পয়সা।

শ্রীহরিদাস জ্যোতিষার্ণব লিখিত আলোচ্য গ্রন্থ দুইটি জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাসী এবং এ-সম্পর্কে কৌতূহলী পাঠকের পক্ষে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। জন্মরাশি ও লগ্ন বিচার গ্রন্থে—রাশি ও লগ্নের ফলাফল বিস্তৃত-ভাবে লিখিত হইয়াছে। সাধারণ পাঠকের পক্ষে এই গ্রন্থ সুবোধ্য।

করকোষ্ঠি বিচার অপেক্ষাকৃত জটিল গ্রন্থ। করতলের রেখা বিচার স্বভাবতই দুরূহ কর্ম, কাজেই গ্রন্থ দ্বারা তাহা পরিস্ফুট করা সহজ নয়। তবে মোটামুটি কর বিচার শিক্ষার পক্ষে গ্রন্থটি কাজে লাগিবে। ৪৩৬।৬০; ৪৩৭।৬০।

অনুবাদ গ্রন্থ

সেই পুরাতন কথা (প্রথম খণ্ড)—ইভান গনচারভ। অনুবাদকঃ অশোক গুহ। পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৫।১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য ৩·৫০ নঃ পঃ।

শ্রীযুক্ত অশোক গুহ মূলগ্রন্থের ব্যঞ্জনা-শক্তিকে অক্ষুন্ন রেখে যেভাবে অনূদিত গ্রন্থটিকে রসোত্তীর্ণ করে তোলেন, তাতে তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য উপরোক্ত উপন্যাসটিকে শ্রীযুক্ত গুহ মূল রুশ থেকে নয়—ইংরেজী থেকে অনুবাদ করেছেন। কিন্তু উপন্যাসটি বেশ সুখপাঠ্য। সেই পুরাতন কথার নায়ক হচ্ছেন আলেকজাণ্ডার। আর,নাদিয়াকে নিয়ে প্রেমের প্রতিবন্ধকরূপে মাঝখানে দেখা দিয়েছে কাউণ্ট নোভিনাস্কর। এই কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে উপন্যাসটির কোথাও আবেগ, কোথাও চঞ্চলতা, কোনোখানে গভীর স্থিরতা, কোথাও বা উজ্জ্বল আন্তরিকতাকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ২৮৫।৫৯

ধর্মগ্রন্থ

ভক্তি-ভারতী-ভাগীরথী (হিন্দী)—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সংকলিত। শ্রীননীবালা সুর কর্তৃক ১, নিবেদিতা লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১·২৫ নয়া পয়সা।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন বৈষ্ণব সাধক সমাজে স্বনামখ্যাত পুরুষ। আলোচ্য পুস্তক-খানিতে তাঁহার উপদেশাবলী সংকলিত হইয়াছে। ভাষা সহজ সরল ও সুমধুর। উপদেশগুলিতে ভক্তি সাধনার অনেক দুরূহ তত্ত্ব উন্মুক্ত হইয়াছে। বিবিধ শাস্ত্রের সার সিদ্ধান্তে উপদেশসমূহ উজ্জ্বল। পুস্তক-খানি পাঠ করিলে অধ্যাত্মরসপিপাসু ব্যক্তি মাত্রই উপকৃত হইবেন এবং আনন্দ লাভ করিবেন। ৬০০।৫৯

স ন্ধ্যা মা ল তী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির প্রকাশকমণ্ডলীর পক্ষে ৪নং ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো, কলিকাতা—২৫ হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানির মূল উদ্দেশ্য জনসাধারণের মধ্যে ধর্মভাব সঞ্চার করা। বইখানি তিনটি রচনার সমষ্টি—প্রথমটি পুস্তকের নামসম্বলিত একটি ভক্তিমূলক নাটকীয় রচনা। দ্বিতীয়টি উলটা পুরাণ, বহুনিন্দিত কৈকেয়ী চরিত্রের এক নূতন ব্যাখ্যান। তৃতীয় প্রবন্ধ সোজাসুজি তত্ত্বমূলক।

প্রথম রচনাটির মধ্যে মোট তিনটি চরিত্র—দুই নারী ও এক পুরুষ। প্রথমোক্ত দুই-জনের নাম সন্ধ্যা আর মালতী—পাপিষ্ঠা ও ভক্তিমতী, আর তৃতীয় চরিত্র পরম পুণ্যবান, ভগবানের দূতস্বরূপ। প্রতি মানুষের জীবনের মধ্য দিয়া যে ভগবানেরই লীলা প্রকট হইতেছে, পাপও যে ভগবৎ-সিদ্ধির সোপান হইতে পারে, ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়। এই সূত্র ধরিয়াই দ্বিতীয় রচনায় গ্রন্থকার কৈকেয়ী চরিত্রের উপর নূতন আলোকসম্পাত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তৃতীয় রচনার যুক্তিও পাণ্ডিত্যসহকারে এই একই তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। লেখা কয়টি মূলত ধর্মমূলক হইলেও রচয়িতার সাহস ও সাবলীল প্রকাশভঙ্গিতে বিশেষ সুখ-পাঠ্য হইয়াছে।

বিবিধ

The Old Messenger—Chun Ching; drawings by Ting Pin-tseng. Published by Foreign Languages Press, Peking !

পাতায়-পাতায় একরঙা ছবিতে বর্ণিত হয়েছে, কেমন করে বিপ্লবোত্তর চীনে একজন পোস্টাফিসের কর্মচারী আপন দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠেছে। গল্পটির বক্তব্য হচ্ছে, রাষ্ট্রের জন্য একটি ব্যক্তি আপন ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকে কখনই বড় স্থান দিতে পারে না; সমষ্টিগতভাবে প্রত্যেকের উচিত, রাষ্ট্রের সেবা করা। ছবিগুলো পাকা হাতের আঁকা। এ-বই ছেলেদের ভালো লাগবে। ১০০।৫৭

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
মনের মানুষ
— তিন টাকা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
বহু যুগের ওপার হতে
— দু টাকা

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়
তিন শূন্য
— তিন টাকা পঞ্চাশ

সুবোধ ঘোষ
ভারত প্রেমকথা
— ছয় টাকা

সরলাবালা সরকার
গল্পসংগ্রহ
— পাঁচ টাকা

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন
চিন্ময় বঙ্গ
— চার টাকা

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
বিবেকানন্দ চরিত
— পাঁচ টাকা

ছেলেদের বিবেকানন্দ
— এক টাকা পঁচিশ

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী
রবীন্দ্র মানসের উৎস সন্ধানে
— তিন টাকা পঞ্চাশ

লিপিকার বই
বিদূষক
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
দুই টাকা পঞ্চাশ

সাহিত্যের সত্য
তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়
দুই টাকা পঞ্চাশ

আনন্দ পাবলিশার্স
প্রাঃ লিমিটেড। কলিকাতা-৯

রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

অভিনব অভিযান

আজকের দিনে শিশুচিত্র নির্মাণের সংপ্রয়াসমাত্রই অভিনন্দনযোগ্য। সেদিক দিয়ে চন্দ্রা মুভীজ-এর "জমীন-কে তারে" হিন্দী শিশুচিত্রটির নির্মাতারা সহজেই সুধীজনের কাছে ধন্যবাদার্হ হবেন।

মাতৃহারা দুই বালককে ঘিরে আখ্যানবস্তু গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে একজন অভিজাত ঘরের ছেলে, অপরজন রক্ষণশীল সমাজের তথাকথিত বিধানে অস্পৃশ্য। কিন্তু বর্ণের ব্যবধান তাদের নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার পথে কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। এই দুই বন্ধুর মধ্যে বয়সে যে ছোট সে সদ্যমাতৃহারা। তার বন্ধুর ঘরেও রয়েছেন বিমাতা। তাই উভয়েই মায়ের অভাব অনুভব করে সমস্ত অন্তর দিয়ে। তারা ঠিক করে, মাকে ভগবানের নিকট থেকে যে-ভাবেই হোক মর্ত্যে ফিরিয়ে আনবে।

এক অভিনব অভিযানে বেরিয়ে পড়ে দুই বালক। তারা শোনে, ভগবানের অধিষ্ঠান হিমাচল পর্বতে। পথে পথে লোকের কাছে তারা লক্ষ্যের সন্ধান নেয়। তাদের যাত্রা শুরু হয় হিমাচলের দিকে।

দুই বন্ধুর মধ্যে বড়জনের অভিভাবক ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে আনবার জন্যে নিযুক্ত করেন দুজন অদ্ভুত ধরনের গোয়েন্দা। কিন্তু দুই বন্ধুর সঙ্গে বুদ্ধির লড়াইয়ে তারা হেরে যায়। শিশু অভিযাত্রীরা দুর্গম পথ বেয়ে, অনেক বাধা-কষ্টের ভেতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত গিয়ে উপস্থিত হয় হিমাচল পর্বতে অবস্থিত তুষারাচ্ছন্ন এক দেবালয়ে। সেখানকার পুরোহিত দুই বন্ধুর দুশ্চর অভিযানের উদ্দেশ্য শুনে মুগ্ধ হন এবং সেই সঙ্গে তাদের বুঝিয়ে দেন যে, সংসার-জ্বালায় স্বর্গগতদের ফিরিয়ে আনা উচিত নয়।

মায়ের কষ্ট দুই বন্ধু চায় না। তাই মাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা থেকে তারা বিরত হয়। এবং ঘরে ফেরার জন্যে পা বাড়ায়। ফেরার পথে অস্পৃশ্যের সঙ্গে বড় ঘরের ছেলের দৃশ্যত অসম হৃদ্যতা কেমনভাবে সংসার-সমাজের কাছে সচ্ছন্দ স্বীকৃতি পায়—তা নিয়েই দেখা দেয় চিত্রনাট্যের পরিণতি।

'মরুতৃষা' চিত্রে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় পদ্মা দেবী

ছবির কাহিনীতে এমন একটি রূপকথার স্বাদ রয়েছে যা শিশুমনকে সহজেই ভুলিয়ে রাখবে। ছবির প্রযোজক-পরিচালক চন্দুলাল শাহ কাহিনী-বিন্যাসে শিশুদের সামনে বিশেষ ভাবাদর্শ সুকৌশলে তুলে ধরেছেন। এই দুই বিশেষ গুণের জন্যে শিশুদের কাছে ছবিটি অবশ্য দ্রষ্টব্য।

কিন্তু চিত্রনাট্যের বিস্তার ও বিন্যাসে যে-সব ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে সেগুলি বিচারশীল দর্শকের দৃষ্টি এড়ায় না। প্রথমেই নজরে পড়ে বাস্তব ও কল্পনার এক অস্বাভাবিক মিশ্রণ—যা কল্পনাবিলাসী শিশুমনে বিতর্কের সূচনা না করলেও যুক্তিবাদী দর্শকমনকে সহজে তৃপ্তি দেয় না। সাধারণ হিন্দী ছবির মতো এ-ছবিতে নাচ-গান ও কৌতুকের মাত্রাধিক্য রয়েছে। এ-সব উপকরণ ছবির মূল সুর ও রসকে ক্ষুণ্ন করেছে।

ছবির প্রধান দুটি শিশুচরিত্রে অভিনয় করেছে ডেইজি ইরাণী ও হানি ইরাণী। এই দুই শিশুশিল্পীর অভিনয় ছবিটির বিশেষ সম্পদ। এদের মিষ্টি-মিষ্টি কথা ও অন্তরের সুখ-দুঃখের সহজ, সরল অভিব্যক্তি দর্শকের মনে দাগ কাটে। অন্যান্য ভূমিকায় মনোজ্ঞ অভিনয়ের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন মতিলাল, অচলা সচদেব ও আনোয়ার। কৌতুকশিল্পী আগা, ভগবান ও চার্লি তাঁদের কৌতুকাভিনয়ে ছবির আকর্ষণ বাড়িয়েছেন।

এস মহিন্দরের সুরারোপে ছবির গানগুলি সুখশ্রাব্য। কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সন্তোষজনক।

জনতা পিকচার্সের "স্বরলিপি" চিত্রের নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় সুপ্রিয়া চৌধুরী ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

চিত্রালোচনা

এ সপ্তাহে চারখানি নতুন ছবি মুক্তি পাচ্ছে—একটি বাংলা, দুটি হিন্দী ও একটি পাঞ্জাবী।

নদীয়া তথা সারা বাংলায় একদা যিনি প্রেমধর্মের বিজয় বৈজয়ন্তী তুলে ধরেছিলেন সেই কাঙালের ঠাকুরের নদীয়া-লীলার পুণ্যকাহিনী চিত্রিত হয়েছে প্রোগ্রেসিভ এণ্টারপ্রাইজার্স-এর "নদের নিমাই" ছবিতে। নাম-ভূমিকায় চিত্রাবতরণ করেছেন অসীমকুমার। তাঁর বিপরীতে বিষ্ণুপ্রিয়ার ভূমিকায় নেমেছেন সবিতা বসু। অন্যান্য চরিত্রে আছেন ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, শোভা সেন প্রভৃতি। "নীলদর্পণ"-খ্যাত শ্রীবিমল রায়ের পরিচালনায় ছবিটি তোলা হয়েছে। সুরসৃষ্টি করেছেন কীর্তনকলানিধি রথীন্দ্রনাথ ঘোষ।

শ্রীবিশ্বভারতী ফিল্মসের "বরসাত কি রাত" একটি প্রণয়মধুর হিন্দী ছবি। নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ভারতভূষণ ও মধুবালা। পার্শ্বচরিত্রগুলিতে রূপ দিয়েছেন শ্যামা, চন্দ্রশেখর, কে এন সিং, মির্জা মুশারফ, এস কে প্রেম প্রভৃতি। পি এল সন্তোষী ও রোশন যথাক্রমে এর পরিচালক ও সুরকার।

এ সপ্তাহের দ্বিতীয় হিন্দী ছবি হাইওয়ে ফিল্মসের "ব্ল্যাক টাইগার"। একটি রোমাঞ্চকর দুঃসাহসিক কাহিনীকে ঘিরে এর চিত্রনাট্য গ্রথিত হয়েছে। প্রধান ভূমিকাগুলিতে অভিনয় করেছেন নাদিরা, আজাদ, হবিব, নাজমা, শেখ প্রভৃতি। পরিচালনা ও সুরযোজনার দায়িত্ব যথাক্রমে আক্কু ও বুলো সি রাণী বহন করেছেন।

পাঞ্জাবী ছবিটির নাম "ইয়মলা জাট"। এ এস ফিল্মস এর নির্মাতা। ভূমিকালিপিতে আছেন ইন্দ্রা, সুন্দর, কুলদীপ কাউর, টুনটুন ও নবাগতা বুটা।

মুক্তিপ্রতীক্ষিত বাংলা ছবিগুলির মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় সিনে আর্ট কর্পোরেশনের "গঙ্গা"-র। সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি তুলেছেন "অন্তরীক্ষ"-খ্যাত পরিচালক রাজেন তরফদার। ছবিটি তুলতে সময় লেগেছে তিন বছরেরও বেশী। গঙ্গার বুকে ও তার আশে-পাশে কাহিনীর ঘটনাস্থল, তাই তার চিত্রায়ণে বহির্দৃশ্যেরই প্রাধান্য। দীনেন গুপ্তের ক্যামেরায় এই বহির্দৃশ্যগুলি নাকি অপরূপ শোভাময় হয়ে ধরা পড়েছে। রুমা গাঙ্গুলী, নিরঞ্জন রায় ও সন্ধ্যা রায় এর প্রধান তিন শিল্পী। সলিল চৌধুরীর সুরারোপে ছবিটি সমৃদ্ধ। নভেম্বরের মাঝামাঝি এর মুক্তি পাবার কথা।

মুভি ইণ্টারন্যাশনালের প্রথম চিত্রার্ঘ্য "বিয়ের খাতা"-র মুক্তিও সমাসন্ন। ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের একটি প্রসিদ্ধ উপন্যাস অবলম্বনে ছবিটি তুলেছেন পরিচালক নির্মল দে। এর ভূমিকালিপিতে আছেন আশীষকুমার, মঞ্জুলা সরকার, তরুণকুমার, জহর গাঙ্গুলী, সুনন্দা দেবী, তপতী ঘোষ, অনুপকুমার, দিলীপ রায়, পদ্মা দেবী, জহর রায় প্রভৃতি।

* * *

জগদ্বিখ্যাত সেতারশিল্পী রবিশঙ্কর এবার চিত্র-প্রযোজনার ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ

আই, পি, টি, এ কর্তৃক
বীরু মুখোপাধ্যায়ের

ভাঙ্গা গড়া খেলা

প্রযোজনা—প্রান্তিক শাখা
পরিচালনা—জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়
আবহসঙ্গীত—অনল চট্টোপাধ্যায়
আলোকসম্পাত—তাপস সেন

মিনার্ভা থিয়েটারে

মঙ্গলবার ১৫ই নভেম্বর সন্ধ্যা ৬॥টায়
টিকেট : ৫্, ৩্, ২্ ও ১্ টাকা

— প্রাপ্তিস্থান —

- রেডিও সাপ্লাই স্টোর্স—ডালহাউসী স্কোয়ার
- ন্যাশনাল বুক এজেন্সী—বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
- মেলডি—রাসবিহারী এভেনিউ।

(সি ৮৭৪০)

করবেন। তাঁর প্রযোজনা সংস্থার নাম রাখা হয়েছে ছায়ানট। এক সেতার-শিল্পীকে কেন্দ্র করে এর প্রথম ছবি তোলা হবে এবং ছবিটি তোলা হবে বাংলায়। অসিত সেনের ওপর এর পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। সুপ্রিয়া চৌধুরী নায়িকার ভূমিকায় থাকবেন। কাহিনীর মূল সূত্রটি রবিশঙ্কর পরিকল্পিত। বর্তমানে তার চিত্রনাট্য লিখছেন তাঁরই অগ্রজ রাজেন্দ্রশঙ্কর। বলা বাহুল্য, রবিশঙ্কর নিজে সংগীত পরিচালনা করবেন। এবং গল্পটি যখন এক সেতার-শিল্পীকে ঘিরে, তখন তাঁর নিজের অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেবার যথেষ্ট সুযোগ তিনি পাবেন এই ছবিতে।

* * *

শূদ্রকের কালজয়ী সংস্কৃত নাটক "মৃচ্ছকটিক" অবলম্বনে ঐ ভাষাতেই একটি ছবি তুলতে ব্রতী হয়েছেন পরিচালক প্রভাত মুখোপাধ্যায়। সম্প্রতি নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে এর শুভ মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উৎকল চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান এর নির্মাতা, এবং সংস্কৃত ছাড়াও ওড়িয়া ও তেলেগু এই দুই ভাষাতেই এর ভিন্ন দুটি সংস্করণ গৃহীত হবে। বাংলাতেও ছবিটি তোলবার সংকল্প প্রযোজক প্রতিষ্ঠানের আছে। এতদুদ্দেশ্যে বাংলা, বোম্বাই ও অন্ধ্র এই তিন রাজ্য থেকেই শিল্পী সংগ্রহ করা হচ্ছে। ভুবনেশ্বর, উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি অঞ্চলে ছবিটির অধিকাংশ বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা হবে।

গত ১৯শে অক্টোবর আরো একটি নতুন ছবির মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে। যদিও বাংলা ছবি, তবু এর নাম "সরি ম্যাডাম"। এটি হবে বি আর সি সিনে প্রোডাকশন্সের প্রথম প্রয়াস। বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায় এর নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় নির্বাচিত হয়েছেন। পরিচালনার ভার নিয়েছেন দিলীপ বসু।

* * *

নিউ থিয়েটার্স এক্‌জিবিটার্স ও সরকার প্রোডাকশন্সের যৌথ প্রচেষ্টায় তোলা "নতুন ফসল" ছবিটি বর্তমানে মুক্তির প্রতীক্ষা করছে। প্রকাশ যে, জীবন-ছন্দের উত্থান-পতনে বিচিত্র এই প্রেমের কাহিনী চিত্ররসিকদের দেবে এক স্বতন্ত্র রসের আস্বাদ—ছকে-বাঁধা কাহিনীর চিরাচরিত ধারায় এক মধুর ব্যতিক্রম। কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া চৌধুরী, বিশ্বজিৎ, নির্মল চৌধুরী, অনুপকুমার ও বাণী হাজরা আছেন ভূমিকালিপির পুরোভাগে। গানগুলিতে সুরারোপ করেছেন রাইচাঁদ বড়াল এবং ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ রচনা করেছেন এর আবহসংগীত। সরোজকুমার রায় চৌধুরীর বহুপ্রশংসিত উপন্যাসের ভিত্তিতে ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিনয় চট্টোপাধ্যায় এবং ছবিটি পরিচালনা করেছেন হেমচন্দ্র চন্দ্র।

অনুষ্ঠান সংবাদ

মিনার্ভা থিয়েটারে লিটল থিয়েটার গ্রুপ প্রযোজিত "অঙ্গার" নাটক একাদিক্রমে ২০০ রজনী অভিনয়ের গৌরব অর্জন করেছে গত রবিবার। এই উপলক্ষে আগামী বৃহস্পতিবার (৩রা নভেম্বর) একটি স্মারক উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এই উৎসবে সম্মানীয় অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন বিগত যুগের প্রবীণ নটনটীরা

জরুরী ঘোষণা

বাথগেটের পূজা গিফ্‌ট কুপন স্কীমের তারিখ ৩০শে নবেম্বর ১৯৬০ পর্যন্ত বর্দ্ধিত হইল।

আমাদের অগণিত গ্রাহকবৃন্দ হইতে অত্যধিক চাহিদা এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে মফঃস্বলে মাল পৌঁছাইবার অসুবিধার জন্য বাথগেটের পূজা গিফ্‌ট্ কুপন স্কীমের শেষ তারিখ ৩১শে অক্টোবরের স্থলে ৩০শে নবেম্বর, ১৯৬০ পর্যন্ত একমাস বর্ধিত করা হইল। অতএব ৩১শে অক্টোবরের তারিখ দেওয়া কুপনগুলি ৩০শে নবেম্বর, ১৯৬০ পর্যন্ত চালু থাকিবে।

১৯৬০ সনের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে লাকী কুপনগুলি নির্ণীত ও ঘোষিত হইবে এবং ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৬০ লাকী কুপনের বদলে উপহারগুলি হেড অফিস হইতে বিতরিত হইবে।

১৫০ বৎসরের বিখ্যাত বাথগেটের ক্যাষ্টর অয়েলের পশ্চিমবঙ্গের খরিদ্দারগণকে গিফ্‌ট্ কুপন সংগ্রহ করিয়া ১০৲ হইতে ৫০০৲ টাকা পর্যন্ত ১০০টি লাকী কুপনের এক বা ততোধিক উপহার পাইবার অধিকতর সুযোগ দেওয়া হইল।

আপনার নিকটস্থ দোকান হইতে "GIFT COUPON INSIDE" লেবেল যুক্ত বাথগেটের ৪ আঃ শিশির ক্যাষ্টর অয়েল এখনই খরিদ করুন এবং উপহার লাভ করিবার সুযোগ গ্রহণ করুন।

বাথগেট এণ্ড কোং লিঃ

১৭-১৯, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

প্রোগ্রেসিভ এণ্টারপ্রাইজার্সের "নদের নিমাই" চিত্রের প্রধান দুটি ভূমিকায় সবিতা বসু ও অসীমকুমার।

যাঁদের এখন আর পাদপ্রদীপের আলোর সামনে দেখা মেলে না।

* * *

নৃত্যশিল্পী অনুরাধা গুহ-র খ্যাতি এখন শুধু বাংলার মধ্যেই আর সীমাবদ্ধ নয়। পুজোর অব্যবহিত আগে ও পরে নানা প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে তাঁকে কলকাতা ও তার আশেপাশে, পাটনা, দিল্লী, এমনকি সুদূর অমৃতসরে পর্যন্ত কথকনৃত্য প্রদর্শন করতে হয়েছে। গত ১৪ই অক্টোবর বিড়লা ব্রাদার্সের উদ্যোগে শ্রী শিক্ষায়তনে একটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয় জাপানী বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের সম্মানে। এই সভায় কুমারী অনুরাধার নৃত্যানুষ্ঠান বিদেশী অভ্যাগতদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করে। কুমারী গুহ ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য হিসাবে ইতিমধ্যে মঙ্গোলিয়া, সোভিয়েত রাশিয়া, চীন ও ইন্দোচীন সফর করে এসেছেন। প্রতিটি দেশে তাঁর নৃত্যকলা শিল্পরসিকদের চিত্ত জয় করেছে।

*

গত রবিবার (২৩শে অক্টোবর) বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী ভবনে সংগীতাচার্য জয়কৃষ্ণ সান্যালের ৪৮তম জন্মোৎসব উপলক্ষে একটি সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কণ্ঠ-সংগীতে অংশগ্রহণ করেন যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ধ্রুপদ), প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় (খেয়াল ও ঠুংরী) এবং ললিতমোহন সান্যাল (খেয়াল)। বাদ্যশিল্পীদের মধ্যে মণি নাগ (সেতার), রাজীবলোচন দে (মৃদঙ্গ), অনিল রায় চৌধুরী (তবলা) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীলেখা মুখোপাধ্যায়ের কথকনৃত্য বিশেষ উপভোগ্য হয়।

*

তরুণ শিল্পীদের উৎসাহ ও সুযোগ-দানের উদ্দেশ্যে বিখ্যাত সংগীত প্রতিষ্ঠান "স্বরলিপি" একটি সংগীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। আগামী ৩০শে অক্টোবর থেকে প্রতিযোগিতার অধিবেশন শুরু হচ্ছে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সফল শিল্পীদের নানা ধরনের পুরস্কার বাদেও ছায়াছবি ও গ্রামোফোন রেকর্ডে সংগীত পরিবেশনের সুযোগ দেওয়া হবে। প্রতিযোগিতার বিষয় থাকবে কণ্ঠসংগীতে গীটার ও নৃত্য। প্রতিযোগিতা সম্পর্কে বিশদ বিবরণের জন্যে "স্বরলিপি"র সম্পাদকের সঙ্গে (১০৮-এ, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলি—২৫) যোগাযোগ করা যেতে পারে।

* * *

গত ১৬ই অক্টোবর পাভলভ ইনস্টিটিউট-এর উদ্যোগে ১৩।১এ, বলরাম ঘোষ স্ট্রীটে "নাটক ও দর্শকমন" সম্বন্ধে এক আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী এবং প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত।

* * *

গত ১৬ই অক্টোবর ৩০২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোডস্থ কাশিমবাজার ভবনে নাট্যকার সঙ্ঘের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ কার্যধারা আরও সংহত ও সুপরিকল্পিত-ভাবে পরিচালনার জন্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং আগামী বৎসরের জন্যে নতুন কার্যকরী সমিতি গঠন করা হয়। নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ

গিরিশ থিয়েটার

কলিকাতায় ৫ম স্থায়ী নাট্যশালা
প্রযোজনা ও উপস্থাপনা—বিশ্বরূপা থিয়েটার
স্থান : বিশ্বরূপা থিয়েটার (৫৫—৩২৬২)
জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনে উৎসর্গীকৃত নাটক!

ছুটির দিন বাদে
সোমবার, বুধবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা ৬।।টায়
এবং রবি ও ছুটির দিন সকাল ১০।।টায়
নাটক—সলিল : পরিচালনা—বিধায়ক
আঙ্গিক নির্দেশনা—তাপস সেন
শ্রেঃ—মহেন্দ্র গুপ্ত, জ্ঞানেশ মুখার্জি, বিধায়ক ভট্টাচার্য, সুনীল ব্যানার্জি, অরুণ, রমেশ, প্রভাত, গীতা দে ও জয়শ্রী সেন

বিশ্বরূপা

(অভিজাত প্রগতিধর্মী নাট্যমঞ্চ)
[ফোন : ৫৫—১৪২৩, বুকিং ৫৫—৩২৬২]
বৃহস্পতি ও শনি সন্ধ্যা ৬।।টায় | রবি ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬।।টায়
প্রয়োগনৈপুণ্যে অভিনয়মাধুর্যে অতুলনীয়

সেতু

২৫৫ হইতে ২৬৩ অভিনয়
একটি চিরন্তন মানব অনুভূতির কাহিনী
নাটক—বিধায়ক ভট্টাচার্য
আলোকসম্পাত—তাপস সেন
শ্রেঃ নরেশ মিত্র - অসীমকুমার
তরুণকুমার, মনোজ, সন্তোষ, তমাল, জয়শ্রী, সুব্রতা, ইরা, আরতি প্রভৃতি
ও
তৃপ্তি মিত্র (বহুরূপী)

বিশ্বরূপায় বহুরূপীর অভিনয়

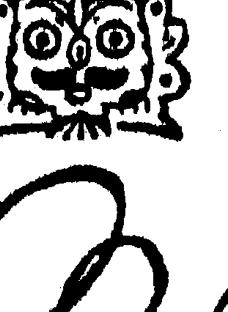

রবীন্দ্রনাথের

রক্তকরবী

১লা নভেম্বর, মঙ্গলবার—সন্ধ্যা ৬।।টায়
নির্দেশনা—শম্ভু মিত্র
আলোক—তাপস সেন
ভূমিকায়—তৃপ্তি মিত্র, শম্ভু মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, অমর গাঙ্গুলী, কুমার রায়, শোভেন মজুমদার, আরতি মৈত্র ও শান্তি দাস

সেনগুপ্ত সঙ্ঘের নতুন সভাপতি নির্বাচিত হন।

* * *

দক্ষিণ কলকাতার বিশিষ্ট নাট্যসংস্থা মঞ্চসারথী গত ১৬ই অক্টোবর টালীগঞ্জে (৩৫, রসা রোড) এক বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে চিত্র ও মঞ্চজগতের বিশিষ্ট শিল্পীরা উপস্থিত ছিলেন।

* * *

সুখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা রঙ্গসভা গত ১১ই অক্টোবর অশোক অ্যাভিনিউতে (টালীগঞ্জ) এক মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন অজিতকুমার দত্ত-চৌধুরী। কিছুকাল পূর্বে রঙ্গসভা কর্তৃক নিবেদিত "বোবা কান্না" নাটকে যেসব শিল্পী অংশ গ্রহণ করেছিলেন, এই অনুষ্ঠানে তাঁদের পুরস্কৃত করা হয়। রঙ্গসভার বিজয়া সম্মিলনীতে সাবিত্রী ঘোষ ও অচিন্ত্য মজুমদার কণ্ঠসংগীতে এবং পরিতোষ রায়

সর্বত্র গৃহিণীরা বলাবলি করছেন
- সার্ফে কাচলে বোঝা যায়
সাদা জামাকাপড়
কতখানি ফরসা হতে পারে!

সার্ফে কাচলেই বুঝতে পারবেন যে সার্ফ জামাকাপড়কে শুধু "পরিষ্কার" করে না, ধবধবে ফরসা করে। সার্ফে কাচারও কোন ঝামেলা নেই। সহজেই সার্ফের দেদার ফেনা কাপড়ের ময়লা টেনে বার করে, কাপড় আছড়াবার কোন দরকার নেই। আর সার্ফে কাপড় যা পরিষ্কার হয় তা, না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। এর কারণ সার্ফের অদ্ভুত কাপড় কাচার শক্তি! দেখবেন সার্ফে রঙ্গীন কাপড়ও কেমন ঝলমলে হবে! সার্ফে সবচেয়ে সহজে আর সবচেয়ে চমৎকার কাপড় কাচা যায়। ধুতি, শাড়ী, ফ্রক, জামা, তোয়ালে, ঝাড়ন-এক কথায় বাড়ীর সব জামা কাপড় সার্ফে কাচুন—দেখবেন ধবধবে ফরসা করে কাচতে সার্ফের জুড়ী নেই!

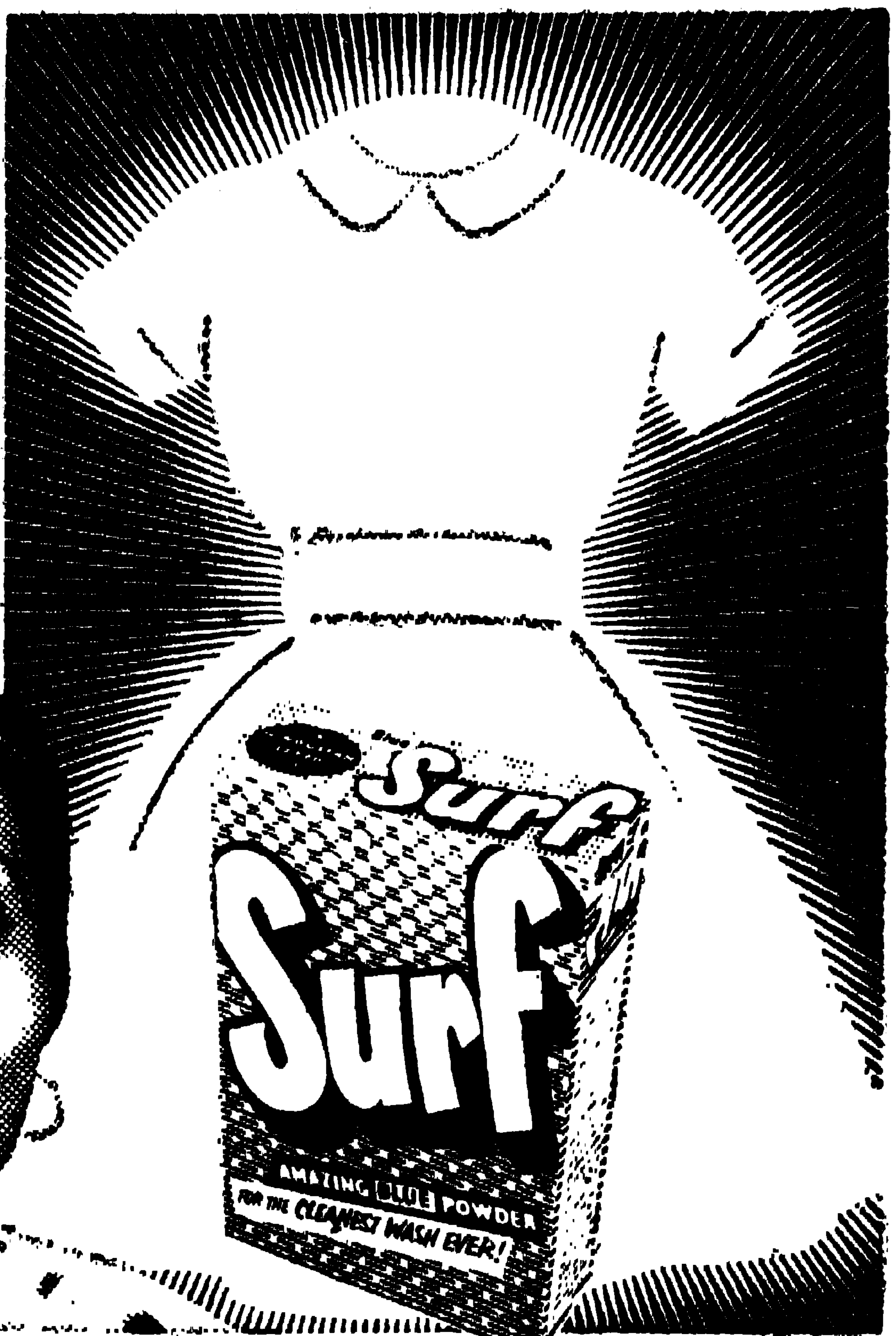

নীল সার্ফ দিয়ে বাড়ীতে কাচুন, কাপড় সবচেয়ে ফরসা হবে
হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

কৌতুক পরিবেশনে সকলকে আনন্দ দেন।

* * *

বোম্বাই-এর শিবাজী পার্কের বেঙ্গল ক্লাবের দুর্গাপূজা মণ্ডপে বীরভূমের সুপরিচিত কবিওয়ালা কিশোরীমোহন রায় গত ১লা ও ২রা অক্টোবর কবিগান পরিবেশন করে উপস্থিত সুধীবৃন্দকে মুগ্ধ করেন। তিনি স্বগ্রাম থেকে আমন্ত্রিত হয়ে বোম্বাই গিয়েছিলেন। কবিগানে তাঁর সংগে অংশ গ্রহণ করেন মদনমোহন মহারাজ ও পশুপতি মণ্ডল।

* * *

বেলগাছিয়ার বিশিষ্ট সংগীত কলাকেন্দ্র কাকলীর শারদীয় সংগীত সম্মেলন সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। কাকলীর ছাত্রীবৃন্দ কর্তৃক রবীন্দ্র-সংগীত দ্বারা অনুষ্ঠান শুরু হয়। লেখা লাহিড়ী এই সংগীত-অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। অন্যান্য কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীতে অংশ গ্রহণ করেন চামেলী চট্টোপাধ্যায়, শুভ্রা গুপ্তা, প্রতিমা রায়, মঞ্জু ভৌমিক, ছন্দা ঘোষ প্রভৃতি।

কাহিনীকারের অভিমত

আমার "সাহেব বিবি গোলামে"র অসংখ্য নাট্যরূপ আমি দেখেছি। প্রবীণ নাট্যকার শ্রীযুক্ত শচীন সেনগুপ্ত মহাশয় যে শেষ নাট্যরূপটি দিয়েছেন তা আঙ্গিকে, নাট্যরীতিতে ও বক্তব্য-উপস্থাপনায় অভিনব ও শ্রেষ্ঠতম। অভিনয় প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নীতীশ, রবীন, জহর, সত্য, হরিধন প্রমুখ সমস্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও কলা-কৃতিত্ব এ-নাটকের সম্পদ। পটেশ্বরী বৌঠানের চরিত্ররূপে শ্রীমতী শিপ্রা মিত্রের অভিনয়-কুশলতা এ-নাটকের এক অসামান্য বিস্ময়। সুরকার অনিল বাগচী তাঁর আশ্চর্য সুর-সৃষ্টির কৃতিত্বে সকলকে অপরিমিত আনন্দ পরিবেশন করেছেন। আর অভিনয় যে মূক হয়েও মুখর হতে পারে ভূতনাথ চরিত্রে শ্রীমান বিশ্বজিতের অভিনব অন্তর্মুখী অভিনয় তার সাক্ষী। তার অভিনয় এ নাটককে গৌরব-দীপ্ত করেছে। ইতি ১২ই অক্টোবর, ১৯৬০

(স্বাঃ) বিমল মিত্র

রঙমহল

ফোন ঃ ৫৫-১৬১৯

প্রতি বৃহঃ ও শনি ঃ ৬॥টায়

রবি ও ছুটির দিন ঃ ৩টা—৬॥টায়

নিউ থিয়েটার্স একজিবিটর্স ও সরকার প্রোডাকসন্সের যৌথ নিবেদন "নতুন ফসল"-এর একটি দৃশ্যে বাণী হাজরা ও বিশ্বজিৎ

চিঠিপত্র

ব্যভিচারের সমর্থন

মহাশয়,

"দেশে" সুশীল মজুমদার পরিচালিত "হসপিটাল" ছবির আলোচনা পড়ে আমরা আশ্চর্য হলাম। সমালোচনার একাংশে দেখলাম যে আপনি বলেছেনঃ "আধুনিক সমাজের অবিবাহিত মাতৃত্বের যে সমস্যা দিনের পর দিন উৎকট হয়ে দেখা দিচ্ছে তার একটি কল্যাণসিদ্ধ সমাধানের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ রয়েছে ছবিটিতে।"

"হসপিটাল" ছবি দেখে এই অঙ্গুলি-নির্দেশ যে কোন্ দিকে এবং তার বিষক্রিয়া আধুনিক সমাজের উপর কতখানি বিস্তার-লাভ করবে তা কল্পনা করে শিহরণ অনুভব না করে পারলাম না। যে প্রেমে ন্যূনতম সংযম নেই সে হলো মোহ, আর এই মোহ থেকেই জন্ম নেয় কাম—যার পরিণতি ব্যভিচারে। এই ব্যভিচারকেই মানবিকতার ঢাকনায় সমর্থনের দলিল হলো "হসপিটাল"। সবচেয়ে আশ্চর্য যে রহস্যবিদ নীহার গুপ্তের নবতম রহস্যের সমাধানে আপনার মত রুচিশীল সমালোচকের সমর্থন।

আপনার মতামত পড়ে মনে হলো উচ্চ-শিক্ষিত শর্বরী আর শৈবালের মত আধুনিকতম তরুণ তরুণীরা অসংযমী হয়ে যদি কোন অঘটন ঘটায় তবে তাদের নীতিগতভাবে সমাজের চোখে অপরাধী বলে গণ্য করা উচিত নয়, বরং তাদের ঘৃণা না করে "শুভবুদ্ধি ও শুদ্ধ মানবিকতার দাবিতে" সমাজে সম্মানের সহিত স্থান দেওয়া উচিত।

মানবিকতার দোহাই দিয়ে যে ব্যভিচারের বিষবৃক্ষ নীহার গুপ্ত রোপণ করলেন তার ফল যে ভেঙে-পড়া সমাজে কত সুদূর-প্রসারী নীতিবিগর্হিত কাজ করবে তা বলাই বাহুল্য এবং তাতে আপনার মত সমালোচকের সমর্থনও বিস্ময়কর। ইতি—

শান্তনু দাস,
বিশ্বনাথ কয়াল,
কলিকাতা—২৭।

মিনার্ভা থিয়েটারে

২০০ রজনী অতিক্রান্ত

লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপের

অঙ্গার

৩রা নভেম্বর বৃহস্পতিবার স্মারক উৎসব। উপস্থিত থাকবেন, বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রবীণতমা ও প্রবীণতম অভিনেতা, অভিনেত্রী ও মঞ্চকুশলী।

শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী, শ্রীমতী হেমন্তকুমারী, শ্রীতারক বাগচী ও শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস (নানুবাবু)

অনুষ্ঠান—৬॥টায়। অভিনয় ৭টায়

(সি ৮৭৮২)

সুশীল মজুমদার প্রোডাকসন্সের "কঠিন মায়া"-র তারকা-শিল্পীদ্বয় বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায় সুটিংয়ের আগে এক বার চিত্রনাট্যটি পড়ে নিচ্ছেন

সমালোচকের বক্তব্য

যে স্পর্শকাতরতা আমাদের সমাজকে নিয়ত ক্ষয়ের পথে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে তা-ই উদ্বুদ্ধ করেছে অগণিত তরুণ-তরুণীকে নানাবিধ পাপাচরণে — এমনকি ভ্রূণহত্যা করে অপরিণীতাকে মাতৃত্বের "কলংক" থেকে রক্ষা করতেও! শর্বরীর মত শিক্ষিতা মেয়ে সামাজিক বিচারে ভুল করলেও এই-ভাবে তার মাশুল দিতে তার শিক্ষায় ও নারীত্বের সংস্কারে বেধেছে। তাই মাতৃ-পরিচয়ে সে নিজের সন্তানকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। তার সে-চেষ্টা সফল না হলেও তার মাতৃত্ব তাতে ক্ষুণ্ণ হয়নি। শৈবালও নিজের ভুল বুঝতে পেরে শর্বরীকে স্ত্রী বলে স্বীকার করতে চেয়েছে, কিন্তু ঘটনাচক্রে তা সম্ভব হয়নি। এই দুই একনিষ্ঠ প্রণয়ীকে ব্যভিচারী আখ্যায় ভূষিত করে দূরে ঠেলে রাখলে সামাজিক রক্ষণশীলতা হয়তো বজায় থাকত, কিন্তু দুটি মূল্যবান জীবনের তাতে অপচয় ঘটত। "হসপিটাল" চিত্রে তা করতে দেওয়া হয়নি বলে সমাজের কল্যাণকামী হিসাবে আমরা কাহিনীকারককে সাধুবাদ জানিয়েছি।

বিবিধ সংবাদ

ভারতের বাইরেও ভারতীয় ফিল্মের চাহিদা যে দিন দিন বেড়ে চলেছে এ খবর
প্রায়ই শোনা যায় বিদেশ থেকে প্র
ভারতীয় চিত্রব্যবসায়ীদের মুখে। '
র্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উপয
কয়েকটি ভারতীয় ছবির সাফল্য—বিশে
ইয়োরোপ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সং
রায়ের অপু-চিত্রমালার অভাবনীয় সম
বিদেশী চিত্রামোদীদের ভারতীয় বি
প্রতি আকৃষ্ট করেছে। তারই ফলে
ভারতীয় চিত্রের বিশ্বপরিক্রমা সুরু হ
আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবগুলি
দিয়ে বিদেশের সঙ্গে এ দেশের
স্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছে। কা
ভেরি উৎসবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব
"হীরামোতী" নামক হিন্দী ছবিটি।
ফলে চেকোশ্লোভাকিয়া ও চীনে ছ
ব্যবসায়িক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হ
সম্প্রতি ছবিটির পরিবেশক আরো ক
ইয়োরোপীয় দেশের সঙ্গে এই ব্য
কথাবার্তা চালাচ্ছেন।

•

বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান মোশন পি
প্রোডিউসার্স এসোসিয়েশনের বাং
নির্বাচনে সুপ্রসিদ্ধ প্রযোজক-পরি
বিমল রায় সভাপতি নির্বাচিত হয়ে
গত তিন বছর এই পদে আসীন ছিলে
বি রুংতা। এসোসিয়েশনের কার্যনির
সমিতির অন্যান্য সদস্যদের নাম—গুরু
শক্তি সামন্ত, মোহন সেগল, আর
ওয়াদিয়া, বি আর চোপরা, কমল আমরো
জে বি রুংতা, চণ্ডুলাল সাহ, কে আ
আর চন্দ্র, পি এম অরোরা, ভি ভি গো
এফ সি মেহরা, এবং দর্শন।

•

কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সত্যজিৎ
রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে প্রামাণ্য চিত্র নি
করছেন তারই অন্তর্গত কয়েকটি
তুলতে তিনি সম্প্রতি ড্যালহাউসি পর্বতা
গেছলেন। ঐ ছবিটির কাজের জ
তিনি নবেম্বরের গোড়ায় দিকে প্যারিস
করবেন। তারপর লণ্ডনে কয়েকটি
তুলে নভেম্বরের শেষের দিকে তিনি দে
ফিরবেন। এই বছরের মধ্যেই তিনি ছব
শেষ করতে পারবেন বলে আশা করেন।

•

"অজন্তা কি মর্মবাণী" নামে এ
নৃত্যনাট্য আগামী রবিবার (৩০শে অক্টো
নিউ এম্পায়ারে সকাল সাড়ে দশটায় মঞ্চ
করবেন কলিকাতার সুখ্যাত নৃত্যগ
প্রতিষ্ঠান সংগীত শ্যামলা। মঞ্জুশ্রী
রায়চৌধুরী এর প্রধান অংশে মঞ্চাবত
করবেন। উদ্যোক্তারা পরে এই নৃত্যনাট্য
দিল্লি, বোম্বাই ও অন্যান্য বড় শহরে মঞ্চ
করবেন বলে স্থির করেছেন।

সারদাময়ী পিকচার্সের "এতটুকু আশা"র একটি প্রণয়মধুর দৃশ্যে আশিসকুমার ও সুব্রতা সেন

খেলার মাঠে

একলব্য

শীতকালে ক্রিকেট, বসন্তে হকি এবং গ্রীষ্ম-বর্ষায় ফুটবল। ভারতে খেলাধুলোর মরসুমের এইটাই নির্ধারিত রীতি। কিন্তু মরসুম হিসাবে খেলার সময়ের একটা বাঁধা-ধরা ব্যবস্থা থাকলেও ভারতে এখন সারা বছরই সব রকমের খেলার আসর পাতা থাকে। এক এক মরসুমে এক এক খেলা একটুখানি সোরগোল, খানিকটা আলোড়ন তোলে মাত্র।

এই ধরুন না এখন আমাদের দেশে কোন্ খেলার মরসুম? স্বভাবতই মনে হবে ক্রিকেট খেলার মরসুম। কিন্তু ফুটবলের মরসুম কি শেষ হয়েছে? আবার হকিও তো আসর জাঁকিয়ে বসে আছে। এখানে ওখানে চলছে—ব্যাডমিণ্টন, ভলিবল ও টেনিস ও টেবল টেনিস খেলার আসর। সাঁতারও সবে শেষ হ'ল।

কলকাতার ফুটবল লীগ ও আই এফ এ শীল্ডের খেলা অনেক আগেই শেষ হয়েছে। বর্তমানে প্রথম শ্রেণীর ফুটবল প্রতিযোগিতার মর্যাদাপ্রাপ্ত দিল্লি ক্লথ মিল ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলাও সবে শেষ হ'ল। ফুটবলের বড় বড় খেলার মধ্যে বোম্বাইতে রোভার্স কাপের খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। ডুরাণ্ড কাপ ও ভারতের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা — সন্তোষ ট্রফির খেলা আরম্ভের তোড়জোড় চলছে। আঞ্চলিক ভিত্তিতে লীগ খেলার পর জাতীয় ফুটবলের মূল খেলা আরম্ভ হবে কালীকটে জানুয়ারী মাসের ৭ তারিখ থেকে। ফুটবল আরম্ভ হয়েছে মে মাস থেকে আর শেষ হচ্ছে জানুয়ারীর প্রায় শেষ দিকে। তাহলে বছরে মাত্র তিন মাস ছাড়া ৯ মাসই আমাদের ফুটবল মরসুম।

ফুটবলের তুলনায় ক্রিকেট ও হকির মরসুম ক্ষণস্থায়ী। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে ক্রিকেট খেলা আরম্ভ হয়ে গেলেও বাঙলায় এখনো খেলা আরম্ভ হয়নি। ক্রিকেটের আমেজে খেলোয়াড়রাও মেতে ওঠেনি। এবার পাকিস্তান ক্রিকেট টীম ৩ মাসের জন্য ভারত সফর করছে। তাই ক্রিকেট এবার ভালই জমবে বলে মনে হয়। যদিও পাক-ভারত ক্রিকেট টেস্টে ভারতের মর্যাদা এখনও উপরে, রাবারের সম্মান এখনও ভারতের করায়ত্ত, তবু ক্রিকেটে পাকিস্তান সম্প্রতি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। ইংলণ্ডের মাটিতে পরম শক্তিশালী ইংলণ্ড দলকে পরাজিত করার কৃতিত্বও অর্জন করেছে। তাছাড়া রোম অলিম্পিকে হকির বিজয়মুকুট লাভের পর পাকিস্তানের কলজে অনেক বড় হয়েছে সন্দেহ নেই। পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে তারা ভারতের সঙ্গে ক্রিকেট মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এ বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ। পাকিস্তান টীম ভারত সফরের প্রথম খেলা আরম্ভ করছে আগামী ১৮ই নভেম্বর পুনায় সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় দলের সঙ্গে।

ভারতের এখানে ওখানে হকি খেলা চলছে এখন ঢিমে তালে। ত্রিবান্দ্রমে মহিলাদের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হয়েছে। দিল্লিতে নিউ স্টার ও শিখ রেজিমেন্টের মধ্যে হকি প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলায় কোন গোল না হওয়ায় দুই দলকে যুগ্মভাবে বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়ার ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের পর ডেনমার্কের বিশ্বখ্যাত খেলোয়াড় আরল্যাণ্ড কপস পশ্চিম ভারত ব্যাডমিণ্টনের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করতেও কোন বেগ পাননি। দুবারই ফাইন্যালে তিনি হারিয়েছেন ভারত-শ্রেষ্ঠ নন্দু নাটেকারকে। কিন্তু জব্বলপুরে মধ্যভারত ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইন্যালে উত্তরপ্রদেশের ১৯ বছরের ছেলে সুরেশ গোয়েলের কাছে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন আরল্যাণ্ড কপসের পরাজয় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। ভারতে কপসের এটাই প্রথম পরাজয়। সুরেশ গোয়েল অবশ্য চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করতে পারেননি। বাঙলা এবং রেলের উঠতি খেলোয়াড় দীপু ঘোষের কাছে গোয়েলকে সেমিফাইন্যালে হার স্বীকার করতে হয়েছে। আবার ফাইন্যালে দীপুকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন নন্দু নাটেকার।

• • •

রোভার্স, ডুরাণ্ড, জাতীয় ফুটবল এবং পাক-ভারত ক্রিকেট-যুদ্ধ ছাড়াও ভারতের শীতকালীন খেলাধুলোর নানা আকর্ষণ রয়েছে আগামী দু'তিন মাসের জন্য। হায়দরাবাদে জাতীয় টেবল টেনিস আরম্ভ হচ্ছে নভেম্বরের ২৭ তারিখ থেকে। তার পর ডিসেম্বরের ১০ তারিখ থেকে বোম্বাইতে

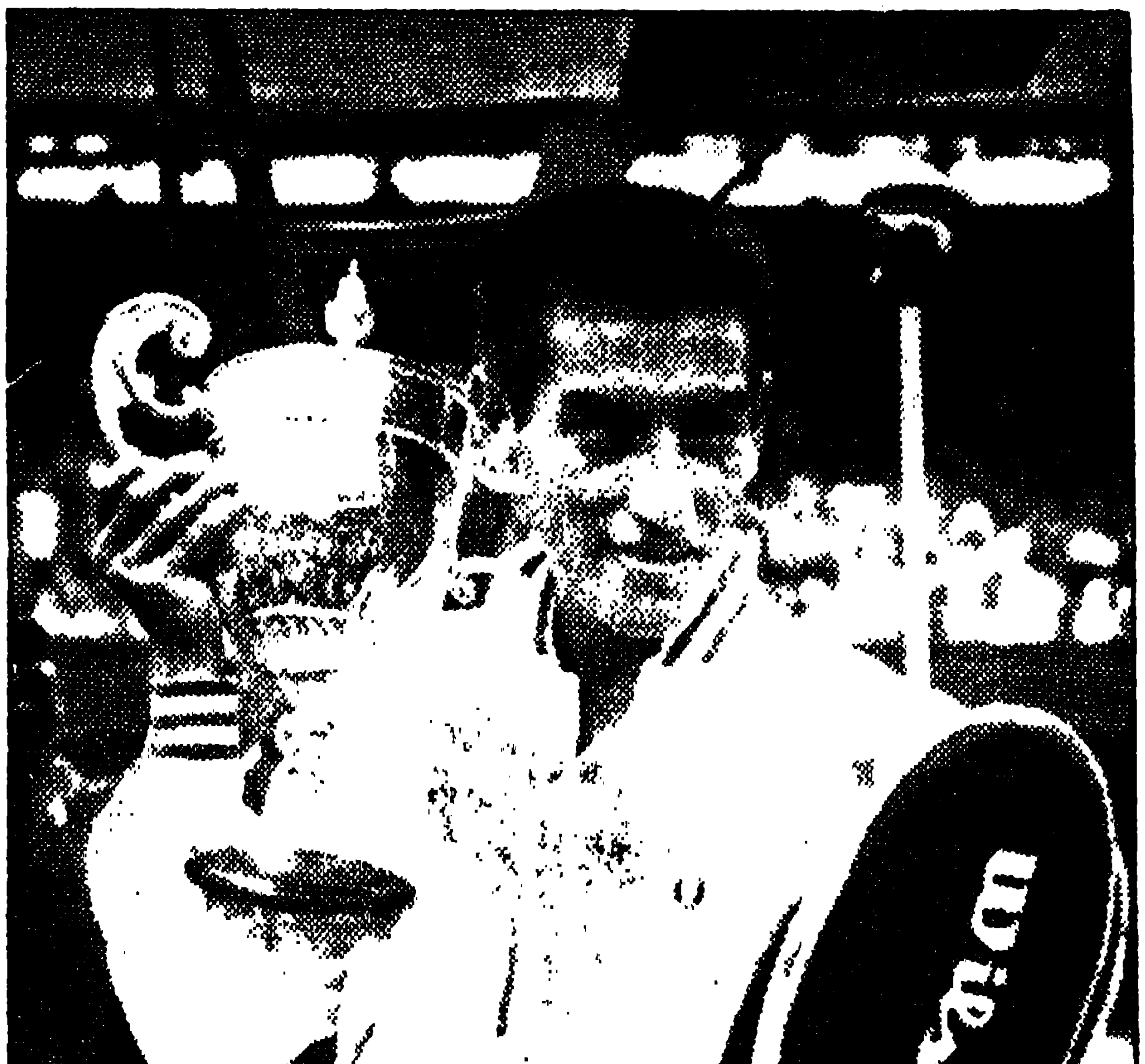

১৯৫৯ সালের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন এলেক্স অলমেডো

আরম্ভ হচ্ছে এশিয়ান টেব্‌ল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা। তারপর জানুয়ারীতে রাশিয়ান ভলিবল টীমের ভারত সফরের ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে। নভেম্বর মাসে রাশিয়া থেকে একটি ফুটবল দলকে ভারতে আনারও কথাবার্তা চলছে। কিন্তু তার আগে ভারতে এসে পড়ছে বিশ্বখ্যাত জ্যাক ক্র্যামারের পেশাদার টেনিস দল। দিল্লি, হায়দরাবাদ, বোম্বাই, ব্যাঙ্গালোর ও মাদ্রাজে প্রদর্শনী খেলায় অংশ গ্রহণের পর কলকাতার বিখ্যাত সাউথ ক্লাব লনে এরা খেলছে নভেম্বরের ৫ ও ৬ তারিখে। জ্যাক ক্র্যামারের দলের খ্যাতনামা ৪ জন খেলোয়াড় ভারত সফর করছেন। এদের মধ্যে আছেন ১৯৫৮ সালের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন *অ্যাসলে কুপার, অস্ট্রেলিয়ার কৃতী খেলোয়াড় মল এ্যান্ডারসন, স্পেনের এন্ড্রে সিমেনো* ও ১৯৫৯ সালের উইম্বলডন বিজয়ী এলেক্স অলমেডো।

বলা বাহুল্য, টেনিস খেলা আমাদের দেশে তেমন জনপ্রিয় নয়। কতিপয় ধনীর দুলাল এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই এর আকর্ষণ সীমাবদ্ধ। তবু জ্যাক ক্র্যামারের দলের বিশ্বখ্যাত খেলোয়াড়দের খেলা দেখবার জন্য অনেকেরই মন মেতে উঠবে। এর আগে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এবারও যাবে সন্দেহ নেই।

* * *

প্রায় দু' সপ্তাহ হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল টীম আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার বিজয়ীর পুরস্কার 'স্যার আশুতোষ ট্রফি' নিয়ে ফিরে এসেছে। এবার নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আশুতোষ ট্রফি পেয়েছে ৬ বার। শেষবার এরা জিতেছিল ১৯৫৭ সালে। গতবার ফাইন্যালে কলকাতা দলকে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ১—০ গোলে হার স্বীকার করতে হয়। খেলাটি হয় কাশ্মীরে। এবার নাগপুরে ফাইন্যাল খেলায় ওসমানিয়াকেই ২—০ গোলে হারিয়ে কলকাতা দল বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। গতবারের পরাজয়ের শোধও তুলেছে।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে অনেক কথা লিখতে হয়। সুতরাং সে চেষ্টা করব না। সংক্ষেপে শুধু কি ভাবে এখন খেলা পরিচালনা করা হয় এবং কলকাতা কি ভাবে বিজয়ী হয়েছে সেই সম্বন্ধেই আলোচনা করব।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতা যে ক্রমেই জনপ্রিয়তা অর্জন করছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে অংশ গ্রহণকারী দলের সংখ্যা বাড়ছে আর খেলার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অধিকতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও রেষারেষি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ভারতের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে 'জোন' বা আঞ্চলিক ভিত্তিতে ৪টি বিভাগে ফেলে এখন আন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা পরিচালনা করা হয়। আঞ্চলিক খেলার পর উত্তর, দক্ষিণ, পূব, পশ্চিম—এই চারটি 'জোনের' বিজয়ী চারটি বিশ্ববিদ্যালয় সেমিফাইন্যালে খেলার অধিকার পায়। সাধারণত এক এক বছর এক এক কেন্দ্রে সেমিফাইন্যাল ও ফাইন্যাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

এবার পশ্চিম অঞ্চল থেকে বোম্বাই, দক্ষিণ অঞ্চল থেকে ওসমানিয়া, উত্তর অঞ্চল

১৯৫৮ সালের উইম্বলডন বিজয়ী এ্যাসলে কুপার

থেকে জব্বলপুর এবং পূর্ব অঞ্চল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মূল প্রতিযোগিতার সেমি ফাইন্যালে ওঠে। সেমি ফাইন্যালে ওসমানিয়া ২—০ গোলে পরাজিত করে বোম্বাইকে, আর কলকাতা ও জব্বলপুরের খেলার ফলাফল ৪ দিনেও মীমাংসিত না হওয়ায় ইউনিভার্সিটি স্পোর্টস বোর্ডের সম্পাদকের নির্দেশ অনুযায়ী 'টসের' সাহায্যে জয় পরাজয়ের মীমাংসা করা হয়। 'টসে' জব্বলপুরকে পরাজিত করে কলকাতা ফাইন্যালে খেলার অধিকার পায়। এর আগে আঞ্চলিক খেলায় কলকাতা পরাজিত করে ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে ৪—১ গোলে, বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়কে ৩—০ গোলে এবং বিহার বিশ্ববিদ্যালয়কে ১—০ গোলে। খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হয় গোরক্ষপুরে।

জব্বলপুর ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সেমি ফাইন্যাল খেলার ফলাফল ৪ দিনেও মীমাংসিত না হবার ঘটনা নানা দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এভাবে ৪ দিন ফলাফল অমীমাংসিত থাকবার পর টসের সাহায্যে আর কোন জয়-পরাজয়ের মীমাংসা করা হয়েছে কি না সন্দেহ। দ্বিতীয়ত জব্বলপুর ও কলকাতার খেলায় যেমন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও রেষারেষির ভাব দেখা গেছে তারও দ্বিতীয় নজির খুঁজে পাওয়া ভার। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সুতীব্র উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে ১—১, ৪—৪ ও ৩—৩ গোলে তিনদিন খেলা অমীমাংসিত থাকে। দ্বিতীয় দিন কলকাতা দল ১—০ গোলে এগিয়ে থাকাকালে নির্দিষ্ট সময়ের ৮ মিনিট আগে দর্শকরা মাঠে ঢুকে পড়ায় খেলা বন্ধ হয়ে যায়। প্রথম দুই দিন খেলা হয় জব্বলপুরে। তৃতীয় ও চতুর্থ দিন নাগপুরে।

* * *

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবার 'আশুতোষ ট্রফি' লাভের ক্ষেত্রে ভাগ্যদেবীর বঞ্চনা এবং অনুকম্পা দুই লক্ষ্য করেছি। বঞ্চনা বলছি এই জন্য যে, জব্বলপুর দলের বিরুদ্ধে ৪ দিনই ভাল খেলে এবং তিন দিন প্রথম গোল করে এগিয়ে থেকেও খেলায় জিততে পারেনি। শেষ সময়ে পেনাল্টি কিকেরও অপব্যবহার করেছে। আবার অনুকম্পা বলছি এই জন্য যে, 'ভাগ্যের' খেলায় কলকাতাই তো বিজয়ী হয়েছে। 'টসে' জব্বলপুরের কাছে তারা হেরে যেতেও পারত। এ যেন এবারকার রোম অলিম্পিকের শেষ পর্যায়ের ফুটবল খেলার পুনরাবৃত্তি! রোমে ফুটবলের সেমি ফাইন্যালে গতবারের রানার্স যুগোস্লাভিয়া ইতালীকে 'টসে' পরাজিত করে ফাইন্যালে ডেনমার্ককে পরাজিত করে। আর এখানে গতবারের রানার্স কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেমি ফাইন্যালে 'টসে' বিজয়ী হয়ে শেষ পর্যন্ত লাভ করেছে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের বিজয়ীর পুরস্কার।

তাই বলে কলকাতার জয়লাভ মোটেই অনায়াসলভ্য নয়। অচেনা মাটিতে এবং প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে একটি দুটি করে মোট ৮টি ম্যাচ খেলে তাদের জয়ী হতে হয়েছে। শুধু প্রতিকূল পরিবেশ বললে সব কথা বলা হয় না। বেশ আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির মধ্যেই জব্বলপুরে জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কলকাতাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে। তাই কলকাতার এবারকার সাফল্য খুবই কৃতিত্বপূর্ণ।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার আলোচনা প্রসঙ্গে খেলোয়াড়দের খেলায় অংশ গ্রহণের যোগ্যতা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন বোধ করছি। কারণ এবারও কয়েকজন খেলোয়াড়ের খেলায় অংশ গ্রহণের বৈধতা সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে এবং প্রতিবারই স্পোর্টস বোর্ডের কর্তৃপক্ষকে এই ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে এবার কলকাতার কয়েকজন খেলো-

স্যার আশুতোষ ট্রফি সহ আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার বিজয়ী কলকতা বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টীম

...ড়ের বৈধতা সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল, আবার কলকাতার তরফ থেকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল জব্বলপুরের কয়েকজন খেলোয়াড় সম্পর্কে। ইউনিভার্সিটি স্পোর্টস বোর্ডের সম্পাদক অবশ্য কোন প্রতিবাদ'ই গ্রাহ্য করেননি। নীতিগত ভাবে গ্রাহ্য করার অসুবিধাও আছে। কারণ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার না হয় ভারপ্রাপ্ত স্পোর্টস অফিসার খেলোয়াড়দের যোগ্যতা-সূচক অভিজ্ঞানপত্রে স্বাক্ষর করে দেন। অর্থাৎ তিনি একরকম অংগীকার করেই বলেন যে, সে সব ছাত্রদের পাঠান হচ্ছে এদের সবারই বিশ্ববিদ্যালয় দলে খেলার যোগ্যতা আছে। এ ক্ষেত্রে রেজিস্টার বা স্পোর্টস অফিসারের কথা অবিশ্বাস করার অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের সততায় সন্দেহ প্রকাশ করা। তাই সাধারণত এ ধরনের 'প্রতিবাদ'কে আমল দেওয়া হয় না।

তাই বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দল গঠনে অসততার আশ্রয় নেওয়া হয় না, এ কথা মনে করলে ভুল করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় দলে খেলার যোগ্যতা নেই অথচ বিশ্ববিদ্যালয় দলের প্রতিনিধিত্ব করছেন প্রতি বছরই এমন খেলোয়াড়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

ইউনিভার্সিটি স্পোর্টস বোর্ড বিশ্ব-বিশ্ববিদ্যালয় দলে খেলার যোগ্যতা সম্পর্কে যে সব আইন-কানুন তৈরী করেছেন তাতে শুধু কলেজ বা ইউনিভার্সিটির ছাত্র হলেই বিশ্ববিদ্যালয় দলে খেলা যায় না। স্কুল ফাইন্যাল পাশের পর ৮ বছর পর্যন্ত একজন কলেজ ছাত্রের বিশ্ববিদ্যালয় দলে খেলার অধিকার থাকে। কিন্তু এক স্তরে পড়ার সময় তিন বছরের বেশী কেউ খেলতে পারে না। অর্থাৎ আই এ পড়ার সময় তিন বছর, বি এ পড়ার সময় তিন বছর। একজন ছাত্র যদি ৪ বছর ধরে আই এ-র ছাত্র থাকেন তবে তিনি প্রথম তিন বছরের পর আর খেলতে পারেন না। আবার তিনি খেলার অধিকার পেতে পারেন আই এ পাশ করার পর বি এ পড়ার সময়। কিন্তু কোন অবস্থাতেই স্কুল ফাইন্যাল পাশের পর ৮ বছর উত্তীর্ণ হয়ে গেলে তিনি আর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন না। অর্থাৎ ১৯৫০ সালে যিনি স্কুল ফাইন্যাল পাশ করেছেন, তিনি যদি ১৯৫৯ সালে আই এ-র জন্য কলেজে ভর্তি হন, তবে কোন অবস্থাতেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় দলে খেলবার অধিকারী নন।

এ ছাড়া আরও নিয়ম আছে। এক এক শ্রেণীর খেলায় একজন খেলোয়াড় পাঁচ বছরের বেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন না। অর্থাৎ ক্রিকেটের জন্য পাঁচ বছর, হকির জন্য পাঁচ বছর, অন্যান্য খেলার জন্যও এর বেশী নয়।

এ ভাবে আইন করার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য দুইটি। প্রথম, বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাধুলোয় কাউকে 'মনোপলি' করতে না দেওয়া। দ্বিতীয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলা-ধুলোর মধ্যে সততা বজায় রাখা। অর্থাৎ কলেজের খাতায় শুধু নাম থাকবে আর বছরের পর বছর তিনি বিশ্ববিদ্যালয় দলে খেলে বেড়াবেন, এমন ঘটনা যাতে না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আইন করা হয়েছে। আইন সম্বন্ধে অবশ্য আরও খুঁটিনাটি আছে এবং হাইয়ার সেকেণ্ডারী ও ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তনের পর যোগদানকারী ছাত্রের বয়সেরও একটা সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সে কথা এবার নয়, পরে কোন সময় আলোচনা করা যাবে।

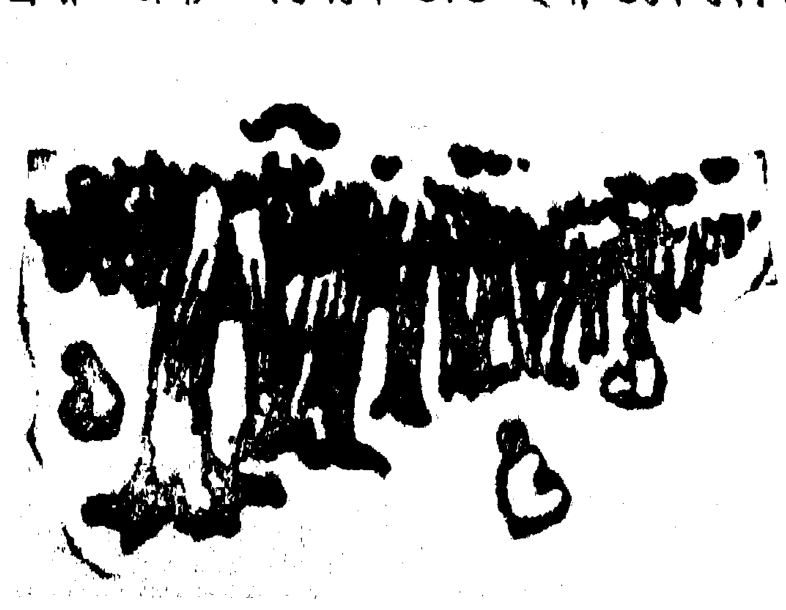

দেশী সংবাদ

১৭ই অক্টোবর—পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তুদিগকে আর্থিক সাহায্যদানের ব্যাপারে যে সমস্ত "নিয়মবিরুদ্ধ" কাজ করা হইতেছে, তৎপতি কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই সম্পর্কে তদন্ত করিয়া এইরূপ বিস্ময়কর সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, শতকরা প্রায় ৩৮টি ক্ষেত্রে "অনুপযুক্ত" ছাত্রগণকে সাহায্য দান করা হইয়াছে।

আসাম বিধানসভায় কম্যুনিস্ট দলের নেতা শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য অদ্য বলেন, যে গভর্নমেণ্ট নিজেরাই সত্য গোপনের ও সত্য বিকৃত করার অপরাধে অপরাধী, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের জন্য ক্ষমতা চাহিবার কোন অধিকার তাঁহাদের নাই।

১৮ই অক্টোবর—আসাম বিধানসভায় সরকারী ভাষা বিল যদি গৃহীত হয়, সমগ্র রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইবে। রাজ্য বিধানসভায় অদ্যকার অধিবেশনে এই আলোচনাই প্রাধান্য লাভ করে।

প্রায় ১৪,৮০০ ফুট উঁচু রণ্টি হিমবাহের কাছে নন্দাঘুণ্টি অভিযাত্রী দলের কয়েকজন সদস্য রহস্যময় তুষারমানবের পদচিহ্ন দেখিতে পাইয়াছেন। যে জায়গায় এই চিহ্ন দেখা গিয়াছে, সেটা এই অভিযাত্রী দলের এক নম্বর শিবিরের ৫০০ গজের মধ্যে।

১৯শে অক্টোবর—শিলং-এর সংবাদে প্রকাশ যে, নেফা সীমান্তে তুতিং-এর নিকট চীনা ফৌজ ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর উপর ৭ই অক্টোবর গুলীবর্ষণ করিয়াছে। চীনা হামলার ফলে ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর হতাহতের সংখ্যা এখনও জানিতে পারা যায় নাই।

অদ্য (শ্যামাপূজার রাত্রি) কলিকাতায় বিভিন্ন পূজামণ্ডপ ভস্মীভূত হওয়ার সংখ্যা দশ, বাজীর আগুনে বিভিন্ন হাসপাতালে আনীত আহতের সংখ্যা শতাধিক এবং বেআইনীভাবে বাজী পোড়ানো ইত্যাদির অভিযোগে গ্রেপ্তারের সংখ্যা প্রায় তিনশত।

২০শে অক্টোবর—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত উপাচার্য ডাঃ সুবোধ মিত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা সমস্যার আলোচনাকালে অদ্য রাত্রে এরূপ মন্তব্য করেন যে, "ছাত্ররা প্রয়োজন অনুযায়ী ট্রেনিং পায় না, ছাত্রসংখ্যার তুলনায় অধ্যাপকদের সংখ্যা অনেক কম এবং অধ্যাপনার সময়ও বেশ কম। সুতরাং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোর্স শেষ করা সম্ভব হয় না।

অদ্য সকাল হইতে সন্ধ্যার মধ্যে কলিকাতায় ছয়টি কালীপূজার মণ্ডপ অগ্নিকাণ্ডের ফলে সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রতিমারও ক্ষতি হয় বলিয়া প্রকাশ। পূর্বরাত্রে আরও দশটি মণ্ডপ ভস্মীভূত হইয়াছিল।

২১শে অক্টোবর—প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু অদ্য তাঁহার মাসিক সাংবাদিক বৈঠকে সরকারী ভাষা সমস্যা সম্পর্কে আসাম কংগ্রেস কমিটির নীতির সুস্পষ্টভাবে বিরোধিতা করেন। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিশেষ জোরের সহিত তিনি বলেন, অসমীয়া ভাষা আসাম রাজ্যের অনসমীয়া

সাপ্তাহিক সংবাদ

অধিবাসীদের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

জুনিয়ার, উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে কি কি ভাষা পাঠ্যক্রমরূপে নির্ধারণ করা যাইতে পারে, তৎসম্পর্কে বিবেচনা ও রিপোর্ট করিবার জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক যে কমিটি গঠন করা হইয়াছিল, ঐ কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গের মাতৃভাষা বাংলাকে প্রথম শ্রেণী হইতে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সকল স্তরে শিক্ষার বাহনরূপে নির্ধারণের নিমিত্ত সুপারিশ করিয়াছেন।

২২শে অক্টোবর — অর্থ-মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, আয়কর বিভাগ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আয়কর নির্ধারণ ব্যাপারে সহজ কর্মপদ্ধতি রচনা করিয়াছেন।

আজ সন্ধ্যা ৬-৪৫ মিনিটের সময় শিবপুর থানার অন্তর্গত শালিমারে বেআইনী মদ তৈয়ারীর আড্ডায় তল্লাসী করিবার সময় জনৈক আততায়ী কর্তৃক আবগারী সাব-ইন্সপেক্টর শ্রীমুরারিমোহন ঘোষ এবং দুইজন আবগারী পিওন ও দুইজন পুলিস কনস্টেবল ছুরিকাহত হইয়া হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত হইবার পর শ্রী ঘোষ সেখানে মারা গিয়াছেন বলিয়া এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

২৩শে অক্টোবর — শেয়ার বাজারে অন্যায় ফাটকাবাজি দমনের জন্য ভারত সরকার কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। সরকারী সূত্রে দাবি করা হয় যে, এই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে এবং ঋণের উচ্চতম হার সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক ঘোষণার দরুণ শেয়ার বাজার স্বাভাবিক বা প্রায়-স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে।

কালিম্পং-এ বিশ্বাসযোগ্য সূত্রে জানা গিয়াছে যে, চীনা, নেপালী, ভুটিয়া ও ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী উদ্বাস্তু বলিয়া পরিচিত দশ বারোজন তিব্বতী সিকিম দার্জিলিং ও ভুটানে চীনের পক্ষে সক্রিয়ভাবে কাজ করিতেছে।

বিদেশী সংবাদ

১৭ই অক্টোবর—রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা ও ভারতের প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী শ্রী ভি কে কৃষ্ণ মেনন "বিশ্বশান্তি সংক্রান্ত জরুরী সমস্যাগুলি সম্পর্কে আশু ও গঠনমূলক ব্যবস্থাসমূহের......" অনুরোধ জানাইয়া অদ্য সাধারণ পরিষদে আনুষ্ঠানিকভাবে কুড়িটি রাষ্ট্রের এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

তিব্বতস্থ চীনা কর্তৃপক্ষ নেপাল-তিব্বত সীমান্তে একটি চীনা ব্যাঙ্ক খুলিয়াছেন। তথায় নেপালী মুদ্রার পরিবর্তে চীনা মুদ্রা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

১৮ই অক্টোবর—নেপাল রাষ্ট্র ব্যাঙ্কের এক ঘোষণা অনুযায়ী গতকাল কাঠমাণ্ডুতে বৈধ মুদ্রা হিসাবে ভারতীয় টাকার প্রচলন রহিত করা হইয়াছে।

"নিউজ ক্রনিকেল" ও "স্টার"—বৃটেনের এই দুইখানা নামজাদা উদারনৈতিক সংবাদপত্র আজ রাত্রিতে বন্ধ হইয়া গেল—আগামীকল্য হইতে উহারা অপর দুইখানা সংবাদপত্রের সহিত মিলিয়া যাইতেছে।

১৯শে অক্টোবর—রাষ্ট্রপুঞ্জ এই প্রথমবার বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা হাতে লইবেন। তাঁহারা কাতাঙ্গা প্রদেশের দুইটি উপদ্রুত অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করিবেন। প্রদেশের অর্ধেকের বেশী লইয়া এই দুইটি অঞ্চল।

গত সপ্তাহের প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিবাত্যা ও জলোচ্ছ্বাসের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের উপকূল-বর্তী জেলা সমূহে যে বিপর্যয় ঘটিয়া গিয়াছে, সরকারীভাবে তাহার বিস্তারিত বিবরণ এখন পর্যন্ত পাওয়া না গেলেও জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর মতে—শুধুমাত্র নোয়াখালির রামগতি ও হাতিয়া দ্বীপেই কমপক্ষে পাঁচ হাজার লোকের জীবনান্ত ঘটিয়াছে।

২০শে অক্টোবর—গতকল্য লণ্ডনের সোনার বাজারে স্বর্ণক্রয়ের প্রবল আগ্রহের ফলে সোনার দর অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়া দর দাঁড়ায় আউন্স প্রতি ৪০ ডলার। ইহা সরকারী দর অপেক্ষা ৫ ডলার বেশী। সারা বিশ্বের সোনার বাজারগুলিতে এই ঘটনায় বিস্ময়ের সঞ্চার হইয়াছে।

সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চেফ আজ ১২ হাজার শ্রমিকের এক সমাবেশে ঘোষণা করেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের রকেট সজ্জিত আণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন রহিয়াছে।

২১শে অক্টোবর—লণ্ডনের সোনার দর অস্বাভাবিক বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ হংকং-এও সোনার দর অসম্ভব বৃদ্ধি পায়, ফলে সোনার বাজারে লেন-দেন সরকারীভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

সরকারীসূত্রে জানা গিয়াছে যে, কর্নেল জোসেফ মোবুতু যে ৪ দফা দাবি করিয়াছিলেন, রাষ্ট্রপুঞ্জ তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কর্নেল মোবুতু সর্বপ্রকার ক্ষমতা পাইবার জন্য এই দাবি করিয়াছিলেন।

২২শে অক্টোবর—প্রভূত বিত্তশালী মার্কিন শিল্পপতি ও সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চেফের বন্ধু শ্রীসাইরাস ইটন কানাডার সাংবাদিকদের এক অনুষ্ঠানে বলেন যে, মার্কিন সংবাদপত্রগুলি বিশ্বশান্তি বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে।

লিও পোল্ডভিলের কর্তৃপক্ষীয় মহল হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে, কর্নেল মোবুতুর সৈন্যগণ কর্তৃক যে সমস্ত অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে তৎসম্পর্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেলের বিশেষ প্রতিনিধি শ্রীরাজেশ্বর দয়াল গতকল্য রাত্রিতে কর্নেল মোবুতুকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

২৩শে অক্টোবর—উত্তর রোডেশিয়ার পুলিস বিভাগে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, কাতাঙ্গা প্রদেশের উত্তরাংশে উত্তর রোডেশিয়ার সীমান্ত সন্নিকটে কাতাঙ্গা পুলিসের সহিত সংঘর্ষে বালুবা খণ্ডজাতির ১৩৫ জন নিহত হইয়াছে। গত বৃহস্পতিবার বালুবাদের নিক্ষিপ্ত তীরে কাতাঙ্গা পুলিসের জনৈক ইউরোপীয় অফিসার আহত হইলে পর এই হাঙ্গামা বাধে।

সম্পাদক— শ্রীঅশোককুমার সরকার   সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা – ৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

॥ বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র ॥

Good Bo

২৭শ বর্ষ

(৪০ সংখ্যা হইতে ৫১শ সংখ্যা পর্যন্ত)

— অ —

অজ্ঞাতবাস থেকে (কবিতা)—শ্রীঅমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ... ৮৬০
অবিনাশ বটব্যাল (কবিতা)—শ্রীগোবিন্দ মুখোপাধ্যাপ ৯৩৮
অভিশপ্ত চম্বল—শ্রীতরুণকুমার ভাদুড়ী ২৭, ১০৯, ২৭৯, ৩৭৫, ৪২৫, ৫২১, ৫৯৩, ৬৮৯, ৭৫৩, ৮৫৯
অমৃতসরে দেওয়ালী—শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৭৬৯

— আ —

আচার্য তেজেসচন্দ্র সেন—সৈয়দ মুজতবা আলী ... ৯৩
আত্মীয় (কবিতা)—শ্রীতারাপদ রায় ... ৬৫৬
আমরা বিজ্ঞানী (কবিতা)—শ্রীপংকজকুমার রায় ... ৬৫৬
আলো অন্ধকার আলো (কবিতা)—শ্রীসমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ৫৮৯
আলোচনা— ১৩, ২৫৩, ৩৩৩, ৪১৩, ৫৭৩, ৬৫১, ৭৩৩, ৮১৫, ৮৯২
আশার আলোক— ... ৫৬৯
আসামের আবর্তনে—দরবেশ ... ১৭১

— ই —

রা দেবী চৌধুরাণী- ... ১৬৯
রা দেবী চৌধুরাণী—শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ... ১৭৭

— উ —

বের সংকল্প— ... ৪৮৯
—শ্রীনিশীথ দে ... ৬০৫

— ক —

া শ্রীতরুণবিকাশ লাহিড়ী ৬৮৯
ড় দিয়ে কিনলাম—শ্রীবিমল মিত্র ৪১, ১২১, ২০৭, ২৮৭, ৩৬৩, ৪৪৩ ৫৩১, ৫৭৭, ৬৬৬, ৭৭৫, ৮৫৩, ৯২৭
ংপুরুষ—শ্রীশিশিরকুমার চৌধুরী ... ৮২৭
পুরুষ—শ্রীপ্রফুল্ল গুপ্ত ... ৯৯৩
র্নিশ পার হলে—শ্রীমানস রায় চৌধুরী ... ২৬৫
জাগরী (কবিতা)—শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী ... ৭৪৩

— খ —

খেলার মাঠে—একলব্য ৭৭, ১৫৭, ২৩৭, ৩৯৭, ৪৭৭, ৫৫৭, ৬৩৭, ৭১৭, ৭৯৭, ৮৭৭, ৯৫৫

— গ —

গানের আসর—শার্ঙ্গদেব ৬৪, ২৮৫, ৪১৫, ৬০১, ৬৯৫, ৮৩০, ৯৪১

— চ —

চিত্র-প্রদর্শনী— ৪৯৫, ৬২৯, ৬৯৭, ৭৮৩, ৮৬৪, ৯১২

— ছ —

ছায়া (কবিতা)—শ্রীআনন্দ বাগচী ... ২৪

— ট —

টেলিভিশনের নানান দিক—শ্রীকৃষ্ণা বসু ... ৮৬১
ট্রামে-বাসে—৬২, ১৪০, ২১৯, ৩০৭, ৩৪৪, ৪৩০, ৫১২, ৬২৪, ৬৯৮, ৭৬৭, ৮৬৬, ৮৯৬

— দ —

দক্ষিণের বারান্দা—শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ৩৩৭, ৪১৭, ৫১০, ৫৯৭, ৬৮৫, ৭৬৩, ৮৪৫, ৯১৩
দল, নীতি ও নেতৃত্ব— ... ৮৮৯
দিল্লির প্রাচীন সেতু—শ্রীসরিৎ দাস ... ৯০৫
দুঃসময়—শ্রীদিব্যেন্দু পালিত ... ৩৫
দুর্ঘটনার পর—শ্রীসোমনাথ ভট্টাচার্য ... ৬৯৫

— ন —

নতুন তারা—শ্রীকিরণকুমার রায় ... ৫৭
নন্দাঘুণ্টি—শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ ... ৬৬১
নিজেকে নিয়ে বা অন্য অনেককে (কবিতা)—
শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায় ... ৯৩৮
নিজেরে হারায়ে খুঁজি—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী ৫১, ১০৩, ১৮৫, ২৬২, ৩৫৩, ৪৫৭, ৫০৫, ৬৯৯, ৭৪৫, ৮১৭, ৮৯৭

— প —

পতঙ্গের মৃত্যু—শ্রীনিখিল সরকার ... ৯২১
পালে পালে—শ্রীদেবেশ রায় ... ৬৭৩
পুবে ঝড় : ১৩৬৭ (কবিতা)—শ্রীদিনেশ দাস ... ৭৪৩
পুস্তক-পরিচয়—৬৫, ১৪৫, ২২৫, ৩০৮, ৩৮৫, ৪৬৫, ৫৪৫, ৬২৫, ৭০৫, ৭৮৫, ৮৬৭, ৯৪৫

প্রথম কদম ফুল—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ১৭, ৯৭, ২২১, ২৫৭, ৩৭৯, ৪৯৭, ৬২১, ৬৫৭, ৭৩৭, ৮২৩, ৯০২
প্রসঙ্গত— ১০, ৯০, ১৭০, ২৫০, ৩৩০, ৪১০, ৪৯০, ৫৭০, ৬৫০, ৭৩০, ৮৯০

— ব —

বঙ্গ ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা—শ্রীসুনির্মল দত্ত ... ৪৩৩
বন্ধু-স্মৃতি : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (কবিতা)—শ্রীবিষ্ণু দে ... ২৪
বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য— ৬৩, ২০৫, ৩০৫, ৪৩১, ৪৯৩, ৫৭৫, ৭৪৪, ৮৬৫, ৯৪৪
বিয়োগান্তক (কবিতা)—শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী .. ২০৬
বিশ্ববিচিত্রা— ২৫, ১৪২, ১৮১, ৩৫৯, ৫১৭, ৫৯৯, ৬৯৩, ৮৩১, ৯৩৯
বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে— ... ৩২৯
বৃষ্টি ভেজা তারা (কবিতা)—শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী ... ৫৮৯
বৃহন্নলা—শ্রীশ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ... ৮৩৩
বৈদেশিকী—১১, ৯১, ১৭৫, ২৫১, ৩৩১, ৪১১, ৪৯১, ৫৭১, ৭৩১, ৮১০, ৮৯৪
ব্রজবুলি—রূপদর্শী ১৩১, ৫২৫

— ভ —

ভারত পুনরাবিষ্কার— ... ৪০৯
ভাষা কোন্দলী দুই—শ্রীস্বরাজ মিত্র ... ৬১৩

— ম —

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন— ... ২৪৯
মৌলিক পদ্ধতি—শ্রীঅশোককুমার মুখোপাধ্যায় ... ৭৪৯

— য —

যতো দূরে যাই (কবিতা)—শ্রীমণীন্দ্র রায় ... ২০৬

— র —

রঙ্গজগৎ—চন্দ্রশেখর ৬৯, ১৪৯, ২২৯, ৩১৩, ৩৮৯, ৪৬৯, ৫৪৯, ৬৩০, ৭০৯, ৭৮৯, ৮৭০, ৯৪৮
রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ— ... ৯
রয়েল সোসাইটির ত্রিশতবার্ষিকী—শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৭
রাষ্ট্রপুঞ্জের ভাবনা— ... ৬৪৯
রাষ্ট্র রাজ্য ও ভাষা— ৭২৯

— ল —

লাওসের সংকট—শ্রীঅজিত দাশ ... ৯৩৩

— শ —

শবনম্—সৈয়দ মুজতবা আলী ৩৩, ১১৩, ২০১, ২৭৩
শরিক (কবিতা)—শ্রীসুনীলকুমার নন্দী ... ৪২৯
শান্তিপর্ব—শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ... ৮৪৮
শিক্ষা পরিকল্পনা— ... ৮০৯

— স —

সপ্তদশ অলিম্পিক—আরাব ... ২৯৭
সহশিক্ষা ও জাতীয় উন্নতি—শ্রীঅমলেন্দু মুখোপাধ্যায় ... ৮১২
সাগরে জীবনের নিরাপত্তা—শ্রীরামেশ্বর ভট্টাচার্য ... ৯১৭
সাপ্তাহিক সংবাদ—৮০, ১৬০, ২৪০, ৩২০, ৪০০, ৪৮০, ৫৬০, ৬৪০, ৭২০, ৮০০, ৮৮০, ৯৫৮
সিণ্ডারেলার নামে নৌকা—শ্রীকবিতা সিংহ ... ৭৫৫
সুরেশ অধিকারী—শ্রীঅনুপম বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪২১
সের্পাটিনা : পরিক্রমা (কবিতা)—শ্রীসুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় ৮৬০
স্বদেশী আন্দোলনের যুগে—শ্রীসরলাবালা সরকার ... ৯০৯
স্বাধীনতা দিবসের সংকল্পবাক্য— ... ৮৯

দেশ

DESH 40 Naya Paise
Saturday, 5th November, 1960.

২৮ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৯ কার্তিক, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

আমাদের নববর্ষ

এ সপ্তাহে 'দেশ' পত্রিকার অষ্টাবিংশ বর্ষের শুভারম্ভ। বাংলা, ইংরেজী কিম্বা যে কোনও প্রচলিত রীতিতে কালগণনায় নববর্ষের সূচনা পরম প্রীতিপূর্ণ একটি আনন্দলগ্ন। জন্মদিবসের স্বচ্ছন্দ পুনরাবর্তনও তেমনি আনন্দসূচক, ব্যক্তিমানুষের মত প্রতিষ্ঠানের জীবনেও। 'দেশ' পত্রিকা সাতাশ থেকে আঠাশ বৎসরে উত্তীর্ণ হল; এ সৌভাগ্য কেবল আমাদের নয়, এর অংশভাগী তাঁরাও যাঁদের অনুরাগ, উৎসাহ, সহানুভূতি এবং সহযোগিতা 'দেশের' প্রয়াসকে নিরন্তর সঞ্জীবিত, শ্রীমণ্ডিত করেছে। আমাদের নববর্ষের শুভারম্ভে তাঁদের সকলকেই কৃতজ্ঞতা জানাই ও প্রার্থনা করি ভবিষ্যতেও আমরা তাঁদের অনুরাগ এবং সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হব না।

'দেশের' বয়স কাল প্রায় তিন দশক পূর্ণ হতে চলেছে। বয়োবৃদ্ধির পরিচয়টা আপাতদৃষ্টিতে অসাধারণ না হতে পারে, কিন্তু আমাদের বেশীর ভাগ সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়াস সাধারণত যে কী পরিমাণ ক্ষীণজীবী সেকথা স্মরণ করলে 'দেশের' আঠাশ বৎসরে পদার্পণটা বিশেষ কৃতিত্বসূচক মনে করা আশা করি অন্যায্য হবে না। এ কৃতিত্ব শুধু আমাদের নয়, সেই অসংখ্য পাঠক এবং অনুগ্রাহকগণেরও, যাঁদের সাদর সমর্থন 'দেশ'কে সাতাশ বৎসরকাল বাঁচিয়ে রেখেছে, ধীরে ধীরে বিস্তৃততর পরিসরে বিচিত্র আয়োজনে সমৃদ্ধ হবার সুযোগ দিয়েছে। বাংলা সাপ্তাহিক ও সাময়িকপত্রের ইতিহাসে সম্ভবত এ রকম সুনিশ্চিত অগ্রগতির উদাহরণ আর নেই।

সাতাশ বছর আগে 'দেশ' যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকেরা ঘোষণা করেছিলেন, "সাহিত্যিক, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, রাজনৈতিক—সকলের সাহচর্যে মানবজাতির সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারে বর্তমান জগতের চিন্তামন্থ প্রবাহের সহিত দেশের আপামর জনসাধারণের পরিচয় সাধন" এই পত্রিকার আদর্শ সংকল্প। তাঁদের সেই আদর্শ সংকল্প এখনও আমাদের প্রয়াসের দিগ্দর্শন। সাতাশ বৎসর আগে জাতীয় জীবনের যে-পরিবেশে 'দেশ' জন্মগ্রহণ করেছিল সে-পরিবেশের অবশ্য আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। আমাদের স্বদেশ তখন ছিল বৈদেশিক শক্তির শাসনাধীন, এবং স্বভাবতই জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের সংকল্প ছিল তখন আমাদের দেশাত্মচেতনার সর্বস্তরে ওতপ্রোত। "দেশের" আদর্শ সংকল্পের প্রযোজনায় তাই তখনকার কালে সঞ্চারিত হয়েছে প্রবল প্রখর জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চেতনার দাহ ও দীপ্তি। জনমানসের গভীর আশা আকাঙ্ক্ষা আবেগ প্রকাশে 'দেশ' কুণ্ঠিত হয়নি, রাজরোষ উপেক্ষা করে অবিচলিত থেকেছে জাতীয় সংকল্প সমর্থনে। কিন্তু এ-ও ঠিক যে, 'দেশে' মানসক্ষেত্রে শুদ্ধ রাজনীতিকে কখনও সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল না। জাতীয় জীবনের এবং বিশেষভাবে বাঙ্গালীর সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রয়াসের সম্যক আলোচনা এবং অনুশীলন প্রথমাবধি 'দেশের' অন্যতম উদ্দেশ্য। সাহিত্য এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখার সমৃদ্ধি সাধনে প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত 'দেশ' নানাভাবে উদ্যোগী। সে উদ্যোগ কী পরিমাণ সার্থক হয়েছে তার পরিচয় 'দেশের' প্রতি বাঙ্গালী পাঠক ও সুধীবৃন্দের অনুরাগে।

যদিও সাহিত্য এবং সংস্কৃতির অনুশীলনে আমরা ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় বিশ্বাসী, কিন্তু সেজন্য সমসাময়িক চিন্তা ও ভাবধারার প্রতি আমরা কখনও যুক্তিহীনভাবে বিরূপ নই। 'দেশের' সাতাশ বৎসরের সাধনাই তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বাঙ্গালী সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়াসের এমন কোনও উল্লেখযোগ্য ধারা নাই যা গত সাতাশ বৎসরে 'দেশে' কোন না কোনভাবে প্রবাহিত হয়েছে; প্রবীণ অথবা নবীন এমন কোন সাহিত্যিক নাই যাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর 'দেশে' স্থান পায়নি। কেবল বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতি নয়, সমকালীন পৃথিবীতে সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ে যে সমস্ত প্রয়াস ও প্রবণতা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বাঙ্গালী পাঠকবৃন্দকে সেগুলির সঙ্গে পরিচিত করায় 'দেশ' সর্বদা উদ্যোগী। বাঙ্গালী পাঠকবৃন্দের কৌতূহল বহুদিক ও বহুদূর বিস্তৃত; বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজবিদ্যায় সমসাময়িক পৃথিবীর পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে বাঙ্গালী পাঠকের জ্ঞানতৃষ্ণা পূরণে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টায় আমরা উদাসীন নই। 'দেশের' একান্ত প্রয়াসী বাঙ্গালী পাঠকবৃন্দের রুচি-বিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য রেখে ঐতিহ্য এবং সমসাময়িক চেতনার সুস্থ সঙ্গতি সাধন।

এবারের নববর্ষ আমাদের ও 'দেশের' পাঠক অনুগ্রাহকবৃন্দের কাছে আরও একটি কারণে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, গৌরবমণ্ডিত। যে-ঐতিহ্য ও সমসাময়িক চেতনার সংকলন ও যোগসাধন আমাদের প্রধান প্রয়াস বাঙ্গালীর জীবনীশক্তি তার মূলাধার। সেই জীবনীশক্তির পরিচয় কেবল সাহিত্যে, সঙ্গীতে, শিল্পে নয়, দুঃসাহসিক অভিসারে, ক্ষুরধার দুর্গম পথে তুষারশুভ্র পর্বতচূড়ায়, তরঙ্গসংকুল, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষে অভিযানে। বাংলার তারুণ্যশক্তি যে নিঃশেষিত হয়নি, তার দুর্জয় সংকল্প যে এখনও সহস্র উপেক্ষা অবহেলা লাঞ্ছনা সত্ত্বেও অসাধ্য সাধনে অকুতোভয়, অমিতবীর্য তার প্রমাণ দিয়েছেন নন্দাঘুণ্টি শিখরবিজয়ী তরুণ বাঙ্গালী অভিযাত্রী দল। বাঙ্গালী জনজীবনে সাম্প্রতিক নিরাশার ঘোর অন্ধকারে নতুন আশার আলো জ্বালিয়েছেন নন্দাঘুণ্টি বিজয়ী এই তরুণ বাঙ্গালী অভিযাত্রিগণ। বাংলার যুবশক্তির পুনরুজ্জীবনের এই সার্থক প্রতিশ্রুতি সাহিত্যে, শিল্পে, সংস্কৃতিতে, বৈষয়িক ক্ষেত্রে, সর্বস্তরে সুস্থ ও বলিষ্ঠ সংঘবদ্ধ উদ্যোগে নূতন পরিচ্ছেদ রচনার স্থায়ী প্রেরণা দিক, আমাদের নববর্ষের শুভারম্ভে তাহাই কামনা করি।

প্রসঙ্গত

এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন কবি স্যাঁ-ঝন্ প্যার্স। ইনি ফরাসী। এ-দেশে এই কবি সম্পূর্ণ অপরিচিত বললে অত্যুক্তি হয় না। গত কয়েক বছরের মধ্যে নোবেল কমিটি এমন কয়েকজনকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দিয়েছেন যাঁদের সাহিত্য-কর্মের সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় হয় ছিল না, না হয় সামান্য মাত্র ছিল। ল্যাক্সনেস, প্যাস্টেরনাক, কোয়াসিমোদো প্রভৃতির নোবেল পুরস্কার লাভ আমাদের একদা যেমন বিস্মিত করেছিল প্যার্সের ক্ষেত্রেও অনুরূপ হয়েছে। তবে আশা করা যায় পূর্বতন শিল্পীদের বেলায় বিলম্ব হলেও আমরা মোটামুটি যে যোগস্থাপন করতে পেরে পাঠক হিসাবে মহৎ অভিজ্ঞতার স্বাদ পেয়েছি কবি প্যার্স-এর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না।

স্যাঁ-ঝন প্যার্স কবির ছদ্মনাম। তাঁর পৈতৃক নাম আলেক্সি লেজে (Alexis Leger)। ১৮৮৭ সালে ফরাসী উপনিবেশ গোয়াদলুপে তাঁর জন্ম হয়। বাল্যকাল থেকেই কবি জীবনের অফুরন্ত উদ্দীপনার সঙ্গে মিত্রতা করেছিলেন। স্বভাবের দিক থেকে প্রকৃতি প্রেমিক এই বালক ঔপনিবেশিক জীবনের কল্যাণে বহু জাতি ও ধর্মের মানুষের সংস্পর্শে আসেন। কথিত, জনৈক ভারতীয় ধাত্রীর স্নেহ সম্পর্ক লাভ করার সৌভাগ্যও তাঁর ঘটেছিল।

কৈশোরে কবি ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রথম যৌবনে পদাতিক বাহিনীতে যোগ দিয়ে সৈনিক জীবনের শিক্ষাপর্ব শেষ হলে বর্দোতে এসে তিনি উচ্চকুলে বিদ্যা শিক্ষার্থী হিসাবে ছিলেন। বিজ্ঞান এবং সাহিত্য বিষয়ে তাঁর অনুরাগ ছিল, মনস্তত্ত্ববিদের ক্লিনিকও ছিল পরম আকর্ষণীয় বস্তু, আবার এই অদ্ভুত ছাত্রের কাছে হেরাক্লিটাসের দর্শন ও প্রাচীন আইনও পরম প্রিয় ছিল।

১৯০৪-'৮ সাল পর্যন্ত কবি স্বনামে তাঁর কবিতা প্রকাশ করতেন। Les Eloges তাঁর প্রথম কবিতাগুচ্ছ। পরে তাঁর সমস্ত কবিতাই স্যাঁ-ঝন্ প্যার্স এই ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছে।

১৯২৪-এর আগে পর্যন্ত স্যাঁ-ঝন্ প্যার্সের অনুরাগী পাঠক সংখ্যা ছিল না। প্রায় দীর্ঘ দশ বছর প্যার্স সম্ভবতঃ নিজেকে ফরাসী কাব্য মালঞ্চ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। এবং এই দীর্ঘকাল তিনি য়ুরোপ ও সুদূর প্রাচ্য ভ্রমণ করে বেড়িয়েছেন। চীন কোরিয়া জাপান মধ্য-এশিয়া মালয় পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে তাঁর কাব্য মানসিকতাকে কতদূর প্রভাবিত করেছিল তার বিচার অন্যত্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা কর্তব্য, প্যার্স পররাষ্ট্রনীতিতে শিক্ষিত হয়েছিলেন এবং প্রাচ্য জগত সফর করার সৌভাগ্য হয়েছিল সে-কারণেই।

স্যাঁ-ঝন্ প্যার্স

দীর্ঘকাল তিনি প্রাচ্যের সংস্কৃতি এবং জীবনের অকপট সমর্থক ছিলেন। ১৯৩৩ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত পার্স কোয়াই দ্য'ওরসে-তে সেক্রেটারী জেনারেল রূপে নিজের রাজনৈতিক কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

১৯৪০ সালে পার্স মহাযুদ্ধের দুর্যোগে ইংলেণ্ডে চলে যান; সেখান থেকে নিউ-ইয়র্ক। ১৯৪৫ সাল থেকে তিনি ওয়াশিংটনে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন 'লাইব্রেরী অফ কংগ্রেসে' উপদেষ্টার কাজ নিয়ে। ১৯৫৮-এর আগে পর্যন্ত তিনি আর ইউরোপে পদার্পণ করেন নি বলেই জানি।

স্যাঁ-ঝন্ প্যার্সের এই অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী থেকে বোঝা যাবে, প্যার্সের দুটি বিপরীত জীবন ছিল, একটি লৌকিক অপরটি আত্মিক। বস্তুত ১৯২১ থেকে তাঁর কাব্য জীবনের শিখাটি জ্বলে উঠেছিল। Anabase—প্যার্সের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থের সূত্রপাত এ-সময়ে—পিকিং-এর এক পাহাড়ে তাও মন্দিরের আড়ালে বসে। ১৯২৪ সালে Anabase কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর স্যাঁ-ঝন্ প্যার্স কবি হিসাবে সর্বজনের স্বীকৃতি লাভ করেন। তারপর দীর্ঘকাল তাঁর অপর কোনো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে তিনি অনুমতি দেন নি।

১৯২৪ সালে যে-কবি অত্যন্ত বিশকত এবং ক্ষুদ্র এক গোষ্ঠীর সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন—১৯৪৫ 'এক্সাইল' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর তিনি বহু পাঠকের অসীম শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেন। অবশ্য ১৯৫০ থেকেই তাঁর কাব্যগ্রন্থ অনূদিত হতে থাকে। টি. এস. এলিয়ট এবং অন্যান্য বহু খ্যাতনামারা তাঁর কাব্য স্ব স্ব মাতৃ ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

প্যার্সের কবিতা সম্পর্কে সমালোচকদের ধারণা, তাঁর কাব্যে ফরাসী সিম্বলিজম এবং সুররিয়ালিজমের প্রভাব প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। মালার্মে র‍্যাঁবো ভালেরীর ঐতিহ্য প্যার্সের মধ্যে স্বভাবতই ফরাসী প্রতীকী কাব্যের অত্যাশ্চর্য ঐতিহ্য রেখে যাবে—কিন্তু সুররিয়ালিজমের প্রভাব তাঁর কাব্যে কী সূত্রে এসেছিল—বোঝা মুশকিল। কিন্তু সমালোচকই বলেছেন, প্রভাব যারই থাকুক প্যার্সের কাব্যে পূর্বসূরীদের এই প্রভাব কখনোই তাঁর নিজস্ব স্বরকে ছাপিয়ে যেতে পারে নি। আর প্যার্সের এই নিজস্ব স্বরকে বলা হয়েছে 'হাইলি লিরিক্যাল'। ১৯৪৫ সালে 'এক্সাইল' কাব্যগ্রন্থ যে জনসমাদর লাভ করেছিল তার অন্যতম কারণ : a ringing call to a change of heart.

প্যার্সের কাব্য গীতি সৌন্দর্যে যেমন অসামান্য; আবেগেও তেমনি আশ্চর্য গাম্ভীর্যময়। এই মহৎ কবির জীবন আপাত বিক্ষিপ্ত মনে হতে পারে—কিন্তু কাব্যের নিকেতনে তিনি এক প্রবীণ সাধক। ৭৩ বছর বয়সের এই বৃদ্ধ কবিকে সম্মান দিয়ে নোবেল কমিটি যে এক মহৎ শিল্পীর একান্ত সাধনার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ প্রদর্শন করেছেন সে-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই।

আলোচনা

Cooch Behar

অভিশপ্ত চম্বল

(১)

'দেশে' শ্রীতরুণকুমার ভাদুড়ীর "অভিশপ্ত চম্বল" পড়লাম। লেখক তার অদ্ভুত লেখনীদ্বারা আমাদের এমন এক জগতের খবর পরিবেশন করেছেন যা সত্যি বিস্ময় উৎপাদন করে। এজন্য লেখককে অসংখ্য ধন্যবাদ।

৩রা সেপ্টেম্বর দেশের ৪৪ সংখ্যায় "অভিশপ্ত চম্বল" রচনায় শ্রীতরুণকুমার ভাদুড়ী মেজর জেনারেল যদুনাথ সিং সম্বন্ধে লিখেছেন, 'সেদিন যখন তাঁর মৃত্যুর খবর পেলাম নিজের অজান্তেই দু ফোঁটা চোখের জল পড়েছে গড়িয়ে গাল বেয়ে।' পরে আর এক জায়গায় লিখেছেন, 'সেদিন যে তিনি সাইকেল করে আমার সামনে দিয়ে চলে গেলেন বেহড়ের মোড় ঘুরে সেইতো হল তার "পয়েন্ট অব নো রিটার্ন'।" সাধু জেনারেলের মৃত্যুর বিস্তৃত বিবরণ তিনি এর পরবর্তী কোন সংখ্যায় দেননি। সেদিন সাইকেল চড়ে বেহড়ে যাবার পর কি ভাবে তার মৃত্যু হোলো, আশা করি শ্রী ভাদুড়ী সে বিষয়ে কিছু আলোকপাত করবেন। ইতি।

শ্রীপ্রকাশকান্তি দত্ত

আগরতলা।

(২)

সবিনয় নিবেদন,

দেশ পত্রিকায় তরুণকুমার ভাদুড়ী রচিত "অভিশপ্ত চম্বল" কয়েকদিন আগে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখকের বেশ কয়েকটা সংখ্যাতেই লক্ষ করিলাম, ডাকাতদের সম্বন্ধে তিনি অনেক কথাই লিখিয়াছেন এবং তাহাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া কতকগুলি কথা ও ঘটনা এড়াইয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমি যে সম্বন্ধে বলিতে যাইতেছি, সেটা হইল লেখক এখন আর উদিতপুরা গ্রামে গিয়া মান সিংহের শ্রীরুক্মিনীর নিকট বসিতে সাহস করেন না। যদি রুক্মিনী তাঁহাকে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, "ইন বাচ্চাঁকো ক্যায়া কসুর?" তখন তিনি কি জবাব দিবেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'আগেও দিতে পারিনি, এখনো দিতে পারব না', আজ তাঁহার নিকট রুক্মিনীর সেই প্রশ্নের জবাব নাই। যদি তাঁহাকে কোনদিন উদিতপুরায় যাইতে হয় সেদিন হয়ত তাঁহার উত্তর দিবার থাকিলেও, সেই উত্তর শুনিবার জন্য রুক্মিনী থাকিবেন না, তাহার পরে গিয়া কি উত্তর দিবেন তাহা আমার জানা নাই এবং জানিলেও তাঁহার

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

ভস্মপুতুল ৫·০০

নারায়ণবাবুর এই নতুন উপন্যাস বর্তমান বাংলার সমাজচিত্র হিসেবে অনন্য তো বটেই, কিন্তু এ-বইয়ের আসল তাৎপর্য এক মহৎ-ধ্যানকে মূর্ত করে তোলার মধ্যে, ইতিহাসের দিক-নির্দেশে। সম্প্রতিকালের সামগ্রিক অবক্ষয়ের পটে এ-বই এক শুদ্ধ ভবিষ্যতের স্বপ্ন। সবে বেরল। অন্যান্য বই :

সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী ২৷৷০ সাহিত্যে ছোটগল্প ৮ নীল দিগন্ত ৩

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের

পরম পিপাসা ৩·৫০

বাংলাসাহিত্যে মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য হার্দ্য-উপলব্ধির এমন একটি আবহাওয়া ও পরিমণ্ডল গড়ে নিয়েছেন, যেটি তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব। সমৃদ্ধ-কল্পনায় এবং প্রবল হৃদয়াবেগে তাঁর সাম্প্রতিকতম উপন্যাস "পরম পিপাসা" সাহিত্যে স্থায়ী-স্বীকৃতির দাবি নিয়ে এসেছে। প্রতিভাময়ী লেখিকার শ্রেষ্ঠ বই। সবে বেরল।

প্রকাশের অপেক্ষায়

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সর্বশেষ উপন্যাস মাটির পথ ৬·৫০

গদাধরচন্দ্র নিয়োগীর ভ্রমণকাহিনী পথ আমায় ডাকে ৪·০০

ডঃ সুরেশ চক্রবর্তীর বিখ্যাত গ্রন্থ সঙ্গীত প্রবেশ ৩য় ভাগ ৩·৫০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন মুদ্রণ মাটি ২·৫০

অন্যান্য নতুন বই

অন্নদাশঙ্কর রায়ের গল্প ৫·০০

যাঁর প্রতিটি গল্পই অনন্য তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলন করতে হলে তাঁর সমস্ত গল্পই একত্রীকরণ করতে হয়। বাংলাসাহিত্যের সবচেয়ে সংযমী ও স্বল্পালাপি লেখকের এই গল্পগ্রন্থে ১৯২৯ থেকে '৫০ পর্যন্ত লেখা সমস্ত গল্পই সংকলিত হয়েছে। উপহার উপযোগী সংস্করণ।

নবগোপাল দাসের অভিযাত্রী ৫·০০

১৯৪২ থেকে '৫২ পর্যন্ত সময়কালটা বাংলার ইতিহাসে গভীর সংকটের যুগ। তারই পটে 'অভিযাত্রী' এক মূল্যবান মানবিক দলিল।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উত্তরপুরুষ ২·৫০

"এই কাহিনীতে এমন একটা দরদী মনের স্পর্শ আছে, যা পাঠককে সহজেই অভিভূত করে।......চরিত্রগুলি অদ্ভুত সজীব।"—আনন্দবাজার।

অন্যান্য বই : সহৃদয়া ৪ শুক্লপক্ষ ৩

রমাপদ চৌধুরীর

এই পৃথিবী পান্থনিবাস ৫·০০ — কারো কারো মতে এইটেই রমাপদর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

লালবাঈ ৬·০০ — নবম মুদ্রণ

প্রথম প্রহর ৫·০০ অরণ্যআদিম ৩·০০

বিমল করের অপরাহ্ণ ৩·০০

একটি সুখের সংসার ভেঙে যাবার বিক্ষুব্ধ চূড়ান্ত মুহূর্তগুলির রুদ্ধশ্বাস কাহিনী।

অন্য বই : দেওয়াল ১ম ভাগ ৪৷৷০, ২য় ভাগ ৬

সুরজিৎ দাশগুপ্তের একই সমুদ্র ৩·৫০

একালের তারুণ্যের সমস্যাকে নবীন লেখক যে রকম পস্টাপস্টি খোলাখুলিভাবে তুলে ধরেছেন তা সত্যই দুঃসাহসিক। এর নায়ক বিশ শতকের ট্রাজেডি।

ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেলেডিঙি (নাটক) ২·৫০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের অভিসারিকা ৩·৫০

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের স্মরণচিহ্ন ৫·০০

প্রাণতোষ ঘটকের রানীবৌ ৪·০০

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের ডাক্তারের জেলখানা ২·৫০

ডি· এম· লাইব্রেরী : ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা—৬

অভিমত ... হইবে কিনা জানিনা। লেখকের নিকট জিজ্ঞাস্য ইহাই এই যে, তিনি যাহা বলে ... রুক্মিনীর করুণ ও দুঃখমিশ্রিত কথা ভাবিয়া ব্যথিত হইয়াছেন, কিন্তু তিনি এই কথাটা কেন ভাবিয়া দেখিতেছেন না, যখন ডাকাতেরা গবর্ণমেণ্ট বা সরকারকে অভ্যর্থনা অথবা আহ্বান জানাইতে যেয়ে কতকগুলি নির্দোষ ও সরল প্রকৃতির লোককে হত্যা করে। তখন সেই রুক্মিনীর ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে "ইন আদমীয়োঁ কো কায়া কসুর থা" ... রুক্মিনীকে এই প্রশ্ন করা অপ্রয়োজন, কিন্তু লেখকের মার্জিত ভাষায় "ইন বাচ্চোঁকো কায়া কসুর থা" বার বার লিখিয়া লোকের সহানুভূতি সংগ্রহ না করিলেও পারিতেন।

কল্যাণ রায়
কলিকাতা—১৭

(৩)

সবিনয় নিবেদন,

যদিও সংবাদপত্র সমাজের বাসিন্দা নই বা সাংবাদিকতা পেশা নয় তবু শ্রীসুদিন ভট্টাচার্য ও শ্রীতরুণকুমার ভাদুড়ীর পত্রালাপের মাঝে কিছুটা অনধিকার প্রবেশের চেষ্টা করলাম। চম্বলের ধারে আর বেহড় নিয়েই আমাদের কাটাতে হয় তাই অভিশপ্ত চম্বলের প্রতি নিরুৎসুক থাকতে পারিনি। আর থাকতে পারেনি আমার অন্যান্য সাথীরাও। এদের কাছে ইংরাজী বা হিন্দীতে অনুবাদ করে পড়ে দিতে হয়েছে। সপ্তাহান্তে দেশ পত্রিকার জন্যে আমার চেয়ে এরাও খুব কম ঔৎসুক্য নিয়ে চেয়ে থাকতো না। হতে পারে রোমাঞ্চকর ঘটনার প্রতি এ আগ্রহ স্বাভাবিক। কিন্তু যে বাস্তব উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর তা থেকে আগ্রহকে টেনে নেয়ার ক্ষমতা কোন সুস্থ মানুষের-ই নেই।

যারা খবরের কাগজ পড়ে না বা দেশ পত্রিকাও যাদের ঘরে পৌঁছায় না তারা-ও কি এ বিষয়ে অনাগ্রহী? শ্রীসুদিন ভট্টাচার্য যদি সম্ভব মনে করেন তবে চম্বলের আশে পাশে গাঁয়ে দেখে যেতে পারেন নিরক্ষর চাষীরা দাউ মানসিংকে কী শ্রদ্ধার চোখেই দেখে। একটা বাচ্চা ছেলে পর্যন্ত তার কথা জানে। তারা যখন বেহড়ের রাস্তায় চলে তখন কী তাদের মধ্যে স্বাভাবিক রণোন্মাদনা না এসে পারে? শ্রীতরুণকুমার ভাদুড়ীকে তাহলে কাঠগড়ায় কী করে তোলা যায় জংগীভাব জাগানোর জন্যে?

খুনে কা বদলা খুন নিয়ে অনেক কোটি লোক এ পর্যন্ত মারা গেছে আর তা নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টির-ও অভাব হয় নি। কিন্তু তাতে মানুষের মনে জংগীভাব জাগানো হয়েছে এ অপবাদ কোথাও শুনিনি। বিনোবাজীর প্রচেষ্টা সফল বা বিফল হয়েছে এ নিয়ে বিতর্ক করতে বসিনি। তা সমাজ সেবী আর চিন্তাবিদদের হাতেই তোলা থাক। আমরা সাধারণ মানুষেরা একটা সাক্ষাৎকারের গল্প পড়ে খুবই আনন্দ পেয়েছি আর পড়ে ট্রাকটর থেকে লাফিয়ে নেমে রাইফেল হাতে ছুটেও যাইনি। আশে পাশের গ্রামেরও কাউকে যেতে দেখিনি।

পরিশেষে অভিশপ্ত চম্বলের একখানি ইংরাজী অনুবাদ হবার আশা রাখি।

ইতি—
বিনয় ব্যানার্জি,
কোটা, রাজস্থান।

লেখকের উত্তর

(১)

"সাথ" জেনারেলের মৃত্যুর বিস্তৃত বিবরণ আমি শুধু এই কারণেই দিইনি যে সে সংবাদ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি সংবাদপত্রে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। যদুনাথসিং কাশ্মীরে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি বাবার সঙ্গে কিছুদিন ছুটি নিয়ে "বেহড়ে" ঘুরেছিলেন। সাইকেল চড়ে চলে গিয়েছিলেন বাবার ক্যাম্প ছেড়ে, এই প্রতিজ্ঞা করে যে তিনি শীঘ্রই ছুটি নিয়ে আবার ফিরে আসবেন। ফিরে তাঁকে আর আসতে হয়নি। কিছুদিন পরই একদিন সকালে শ্রীনগরে গীতা পাঠ করতে করতে তিনি হার্ট ফেল করে মারা যান।

(২)

শ্রীকল্যাণ রায়ের কথাগুলি আমি ভেবে দেখেছি। বুঝতে বোধ হয় পারিনি তাঁর কথাটা কতদূর সত্য। রুক্মিনীর "করুণ ও দুঃখমিশ্রিত" কথা ভেবে আমার ব্যথিত হওয়া বা না হওয়ার প্রশ্ন ওঠেনা। তার প্রশ্নের জবাব আমার কাছে আজ নেই। কিন্তু তার মানে কি এই যে ডাকাতরা যখন "নির্দোষ ও সরল প্রকৃতির" লোককে হত্যা করে আমি সে সম্বন্ধে চিন্তিত হইনা বা ভেবে দেখিনা। রুক্মিণী যে বারবার আমায়

Profs. BOSE & MUKHERJI'S WORKS
ORDNANCE FACTORIES
APPRENTICE SELECTION EXAM 3'50
GUIDE WITH 4 YEARS QUES. & ANS.
B.O.A.T GUIDE-6/-
GEN. KNOWLEDGE AND CURRENT AFFAIRS. 1960 EDN. 3.50
INTERVIEW & VIVAVOCE 2/-
বাৎস্যায়নের সমগ্র কামসূত্র-৬,
সংস্কৃত মূল ও অধ্যাপক বসুর বঙ্গানুবাদ।
ORIENTAL BOOK AGENCY
28. SHAMA CH. DEY ST., CALCUTTA

শান্তিলতা
মানিক-প্রতিভার সর্বশেষ চমৎকার স্বাক্ষর! 'শান্তিলতা' ঘরে ঘরে সংগ্রহ করুন,—পড়ে, পড়িয়ে ও উপহার দিয়ে স্বর্গত লেখকের প্রতি শ্রদ্ধা দেখান!

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শান্তিলতা ২৷৷০
সর্বশেষ উপন্যাস

'অ্যাকাডেমী-পুরস্কার' ও 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' প্রাপ্ত স্বনামধন্য
প্রেমেন্দ্র মিত্রের নতুন উপন্যাস
আবার নদী বয় ৩৷০

পৌরাণিক রূপকথা আর ঘন সবুজের মেলা ভিন্ন পরিবেশ—ভিন্ন মানুষ আর তারই বৈচিত্র্য কাহিনীর সুষ্ঠু পরিণতিময় একটি সার্থক উপন্যাস
দেবাংশী ৩৲

শক্তিপদ রাজগুরুর
অবিস্মরণীয় উপন্যাস
দেবাংশী ৩৲
মেঘে ঢাকা তারা ৪৷৷০
(চলচ্চিত্র জগতে যুগান্তকারী উপন্যাস)

॥ আরও কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থ ॥
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের : তামস তপস্যা ৪৲, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের : মাশুল ৩৷৷০, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের : অবরোধ ৩৲, নীহার গুপ্তের : রঙের টেক্কা ৪৷৷০, প্রাণতোষ ভট্টাচার্যের : সোনার পুতুল ৩৷৷০ ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের : উপমা কালিদাসস্য ৩৲

সাহিত্য জগৎ—২০৩।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

প্রশ্ন করেছে তাই আমায় লিখতে হয়েছে। সহানুভূতি সংগ্রহ করা আমার কাজ না। কেন আমি তো আগেই লিখেছি—আমার লেখা পড়ে কেউ যদি ডাকাতদের জন্যে দুঃখে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলে, তাতেও যেমন আমার বলার কিছু নেই, তেমনি ঘৃণায় যদি কেউ থুথু ফেলে তাতেও আমার বলার কিছু নেই। শ্রী রায়কে আমার অনুরোধ রুক্মিণীর প্রশ্নের উত্তর যদি তাঁর কাছে থাকে তাহলে আমি তাঁকে নিজে উদিতপুরায় সেই বুধোর কাছে নিয়ে যাব। উত্তরটা যেন তিনি দিয়ে আসেন। রুক্মিণী উপদেশ অনেক শুনেছে তাই উপদেশ সে শুনতে চায়না। সে চায় তার সমস্যার সমাধান। আর তিন আদমী সেই কো কাম্বা... প্রশ্নের উত্তরও সেই ডাকাতরাই দিতে পারবে। এর উত্তরও আমার কাছে কোথায়। শ্রী রায় সেই সব ডাকাতদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন।... বন্দুক তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার।... কত বন্দুক নিয়ে যেন... অনেক কর্মচারী... আজও হচ্ছে। আজ এ সব থেকে যারা অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে চলে এসেছে তাদেরই বা কি 'কসুর' ছিল?

নরেন্দ্রকুমার ভাদুড়ী
ভূপাল

সহশিক্ষা ও জাতীয় উন্নতি

সবিনয় নিবেদন,

৫০ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীঅমল মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটি পড়লাম। লেখাটিতে তাঁর মতামত সর্বত্র যুক্তি-সমর্থিত নয়। প্রথমেই স্বীকার করছি, সহশিক্ষা ব্যবস্থার যৌন সম্বন্ধে। আমি চাই শিক্ষা গ্রহণের সাথে সাথে উৎসবে অনুষ্ঠানেও ছাত্র-ছাত্রী স্বাভাবিকভাবে মিলিত হোক। কিন্তু সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একথা স্বীকার করতেই হবে যে শুধুমাত্র কলেজ জীবনে সহ-শিক্ষা ব্যবস্থা শ্রী মুখোপাধ্যায়ের চিন্তিত জাতীয় উন্নতির পথ প্রশস্ত করবে না। যে শিশু শৈশবে স্ত্রী-পুরুষে ভেদাভেদ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে তাকে হঠাৎ কলেজ জীবনে অবাধ মেলামেশার সুযোগ দিলেও সে বিভেদ ভুলতে পারে না। কাজেই গোড়ায় শিশুর পরিবেশ পরিবর্তন না করলে সহশিক্ষার সুফল পাওয়া যাবে না।

আজকের দিনে আমাদের যুব শক্তি ব্যস্ত রয়েছে মনসা, ষষ্ঠী, শীতলার পুজোয় ও ভাসানে। বিচিত্রতর দেব-দেবীর নিরঞ্জন শোভাযাত্রায় প্রদর্শিত হচ্ছে বিকৃত যৌবনের বিসর্জন অনুষ্ঠান। অকারণে অপ্রয়োজনে, শক্তি সাধনার নামে আমাদের পূর্বসূরীরা একদিন দুর্বলকে বলি দিয়েছেন। সেই সব বলির রক্তে মাটি সিক্ত হয়েছে। অসহায় ক্রন্দনে দুর্বলের প্রেতাত্মা আজ জেগে উঠেছে। আমাদের মধ্যে উলঙ্গ উন্মত্ত হয়ে

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর
আয়ুবের সঙ্গে ২·০০ ॥
পাকিস্তানের বিচিত্র রাজনীতির পালাবদলের অনেক পালা-নায়কের পালার শেষে আবির্ভাব ঘটেছে নবনায়ক সামরিক ডিক্টেটর আয়ুব খানের। এই নবনায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ-আলাপের বিচিত্র কাহিনী বিধৃত রয়েছে এই গ্রন্থে। কবির দৃষ্টির সঙ্গে সাংবাদিকের তীক্ষ্ণ ও প্রখর দৃষ্টিপাতে এই সাক্ষাৎ-আলাপের কাহিনী হয়েছে আশ্চর্যভাবে জীবন্ত, কৌতূহলোদ্দীপক ও মনোজ্ঞ।

সমরেশ বসুর
'আনন্দ' পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস
গঙ্গা ৫ম মুদ্রণ ৫·৫০ ॥
[মারাঠিতে অনূদিত হয়েছে—দক্ষিণ অসমে]

জরাসন্ধের অবিস্মরণীয় উপন্যাস
তামসী ৫ম মুদ্রণ ৫·৫০ ॥
[বিহঙ্গনা নামে গুজরাটিতে অনূদিত হচ্ছে]

এই সপ্তাহে প্রকাশিত হচ্ছে
ডক্টর নবগোপাল দাসের
এক অধ্যায় ৩·০০ ॥
সরকারী সাহিত্যিক অনেক বই লিখেছেন। কল্পনায় চলে-ফেরা অসংখ্য কাহিনী বহু শুনিয়েছেন। কিন্তু এবার কথা-সাহিত্যিক দেখা দিয়েছেন সব্যসাচী রূপে। আই-সি-এস জীবনের শেষ দশকের স্মৃতি-কাহিনীর অনেক ঘটনার মাধ্যমে উদ্ঘাটন করেছেন লোকচক্ষুর অন্তরালে নিত্যকর্মীদের সমাজ ও ব্যক্তি-জীবনের ভয়ঙ্কর নৃশংস ঘটনার নায়ক-নায়িকাদের সত্যিকার স্বরূপ।

সমরেশ বসুর আশ্চর্য উপন্যাস
বাঘিনী ৭·০০

জরাসন্ধের নবতম উপন্যাস
ন্যায়দণ্ড ৬·৫০

সৈয়দ মুজতবা আলীর
অপরূপ রম্যরচনা
চতুরঙ্গ ৪·৫০

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর
মনোজ্ঞ উপন্যাস
তুঙ্গভদ্রা ৪·০০

গোপাল হালদারের
একদা (৬ষ্ঠ মুঃ) ৪·০০ ॥ অন্য দিন (৩য় মুঃ) ৪·৫০ ॥
আড্ডা (২য় মুঃ) ২·০০ ॥ আর এক দিন (২য় মুঃ) ৪·০০ ॥

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শ্রেষ্ঠ গল্প (৩য় মুঃ) ৫·০০ ॥ পুতুলনাচের ইতিকথা (৭ম মুঃ) ৫·৫০
পদ্মানদীর মাঝি (৯ম মুঃ) ৩·০০ ॥ সোনার চেয়ে দামী : বেকার (৩য় মুঃ) ২·২৫

বনফুলের
শ্রেষ্ঠ গল্প (৫ম মুঃ) ৫·০০ ॥ মানদণ্ড (৩য় মুঃ) ৪·৫০ ॥
দ্বৈরথ (৫ম মুঃ) ৩·০০ ॥ ব্যঙ্গ কবিতা ৬·৫০ ॥

বরিস পাস্তেরনাকের উপন্যাস
ডাঃ জিভাগো ১২·৫০ ॥
কবিতার অনুবাদ ও সম্পাদনা :
বুদ্ধদেব বসু

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের প্রখ্যাত গ্রন্থ
সুখের সন্ধানে ৫·০০ ॥
[The Conquest Of Happiness]
অনুবাদ : পরিমল গোস্বামী

[শেষ বই দুটি বুশো অ্যাণ্ড কম্পানির সহযোগিতায় প্রকাশিত]

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো

আত্মপ্রকাশ করছে। আমাদের যৌবনে অভিশাপ লেগেছে। এ অভিশপ্ত শক্তির হাতে জায়া ও জননীর সম্মান রক্ষিত হবেনা—হতে পারে না।

কিন্তু এ অপ্রিয় সত্য স্বীকার করতেই হবে। অন্য দেশে যেটা ভাল ফল দিয়েছে আমাদের দেশের সম্পূর্ণ ভিন্ন সামাজিক অবস্থায় তা ভাল ফল দেবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। এ অবস্থায় বিসদৃশ হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনগুলো তুলে দিলে ক্ষতি ছাড়া লাভ হবার সম্ভাবনা কম।

ইতি—
সনৎকুমার বাগচী
কলিকাতা—১২।

ভাষা কোন্দলী দুই

মহাশয়,

দেশের ৪৯ সংখ্যায় (১৫-১০-৬০) "ভাষা কোন্দলী দুই" প্রসঙ্গে শ্রীসুধাংশু তুঙ্গের পত্রখানি পড়ে এ বিষয়ে দুই একটি কথা নিবেদন করতে চাই।

(১) সুধাংশুবাবুর মতে "শঙ্কর দেব বাঙালী পদকর্তাদের অনুকরণেই ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেন।"......"কথাভাষার যোগসূত্রে বৈষ্ণব ভাবধারাটি বাঙলা হতে আসামে চলে যায়।"......"আধুনিক অসমীয়া বলে যে একটি স্বতন্ত্র ভাষার প্রতিষ্ঠা তা ছদ্মবেশী বাংলা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

উপরোক্ত কথাগুলি উচ্চারণ করার কোন যুক্তি আছে কিনা এবং বর্তমান সময়ে এইসব কথা বলার কোন অর্থ হয় কিনা 'দেশের' অগণিত পাঠকদের আমি সবিনয়ে চিন্তা করিতে বলবো। তর্কের খাতিরে সুধাংশুবাবুর উপরোক্ত যুক্তি যদি মেনেও নেওয়া যায় তাহলে কি এই ভয় থেকে যাচ্ছে না যে কাল উত্তরপ্রদেশের বা বিহারের হিন্দীভাষীরা বলবে, আধুনিক বাঙলা ভাষা ছদ্মবেশী হিন্দী ছাড়া আর কিছুই নয়?

(২) সুধাংশুবাবুর মতে "হাজার বছর আগে বাংলা ভাষার যে নমুনা পাওয়া গেছে চর্যার পদগুলিতে তা অনেকে অসমীয়া বলে দাবি করেছেন।.....চর্যাপদগুলি যে অসমীয়া ভাষায় লিখিত নয় তা জোর দিয়ে বলা যায়।"

চর্যাপদগুলি অসমীয়া ভাষায় লিখিত নয় একথা না হয় জোর দিয়ে বলা গেল, কিন্তু ওগুলি যে বাঙলা ভাষায় লিখিত তাই বা কে কবে ঠিক বলবে? তার চেয়ে এটা কি মেনে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয় যে, প্রাচীন চর্যাপদগুলি বাঙলা ও অসমীয়া দুই ভাষারই উৎসস্বরূপ। নমস্কারান্তে,

অনিলকুমার চক্রবর্তী,
গোরক্ষপুর।

কে, হোড়ের
কর্ণক
* পাউডার *

সিকিম র‍্যাফল
গ্যারান্টিযুক্ত নগদ পুরস্কার
বৃহত্তম প্রথম পুরস্কার ১,০০,০০০, টাকা — অবশ্যই লাভ করতে হবে, সেই সঙ্গে আরও পুরস্কার।
গত খেলা হয়েছে ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬০ তারিখে
প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন—শ্রীমতী পদ্মাবতী দেবী,
গ্রাম এন. পাটনা, পো. অ. রাজাড়া,
ভায়া কেন্দুপাড়া, জেলা কটক (উড়িষ্যা)
দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন—এস. সেবা সিং,
পিপারিয়া ভুরভির (খেরী), ইউ পি.
তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন—শ্রীরঘু ভুটে,
কর্ণাক বন্দর, বারদি বাজার,
পৌমার ৬৫৫৪, বোম্বাই।
পুরস্কারের টাকা ইতঃপূর্বেই স্টেট ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হয়েছে এবং ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ জামীন। সিকিম সরকার পুরস্কারের টাকার জন্য দায়ী।
কে জানে আপনি আগামী পুরস্কার পাবেন না!
"টিকিটের মূল্য প্রতিটি ১, টাকা"
১২টি টিকিটের একটি বই ১২, টাকা মাত্র
সকলের উপযোগী সর্বাধিক সস্তা।
টিকিট বিক্রয় বন্ধ—১৬-১১-১৯৬০ খেলার তারিখ—৩১-১২-১৯৬০
টিকিট ও ফরমের জন্য আবেদন করুন : দি অনরারী সেক্রেটারী
এইচ. আর. চ্যারিটিজ ফণ্ড, গ্যাংটক (সিকিম)
[ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৪-এ ধারা অনুসারে ২-৪-১৯৫৯ তারিখে সিকিম সরকার কর্তৃক অনুমোদিত (১১—জি এস/২/৫৯)]

আধুনিক ছোট গল্প

(১)

সবিনয় নিবেদন,

অতি আধুনিক ছোট গল্প সম্বন্ধে গত ১২ই কার্তিক, ১৩৬৭র 'দেশে' শ্রীবিমল বসু ঠিক কথাই বলেছেন। সাধারণ পাঠক হিসাবে আমার তাতে পূর্ণ সমর্থন আছে।

অন্ধকার ঘরে ইলেকট্রিক আলোর সুইচ হাতড়ে যখন পাই না তখন মনের যে অবস্থা হয় আজকার ছোট গল্প পড়েও আমাদের সেই অবস্থা। দুর্বোধ্যতার অন্ধকারে ক্রমাগত ডুবে যেতেই থাকি আলো আর জ্বালা হয় না।

মনস্তত্ত্ব ছাড়া গল্প হয় না স্বীকার করে নিয়েও একথা বলতে পারি কোনো মানসিকতা বোঝানোর জন্যে অসম্ভব সব প্রতীকের অবতারণা যুক্তিহীন। অথচ আজকের গল্পকারদের সেদিকেই ঝোঁক বেশী। আমার মনে হয় তাঁরা ভুলে গিয়েছেন—

'সহজ করে লিখতে আমায় কহ যে,
সহজ করে যায় না বলা সহজে।'

তবু তাঁদের কাছে প্রত্যেক আমাদের অনেক বলেই নতুন অথচ সহজ ও স্বাভাবিক দিকে পথ খোলানোর জন্যে আবেদন জানাই।

পরিশেষে একটি কথা বলি, ভারতীয় দেশের সব গল্পই নতুন ধারামুক্ত-সহজ-সুন্দর ও স্বাভাবিক।

বিনীত
মঞ্জুষ দাশগুপ্ত,
মেদিনীপুর।

(২)

মহাশয়,

৫১ সংখ্যার দেশে শ্রীবিমল বসু মহাশয় যে চিঠি লিখেছেন তা পড়েছি এবং মনে মনে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছি এবং এখানেও জানাচ্ছি।

দেশে বেশ কিছুদিন থেকে দেখা যাচ্ছে একধরনের ছোট গল্প বেরোচ্ছে যেগুলো বস্তুতঃকই বোধগম্য নয় একথার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য শ্রী বসু মহাশয়ের ভাষাতেই বলি "হতে পারে, সেটা আমার নিজের অক্ষমতার দোষ"। গল্পগুলো পড়লে মনে হয় যেন স্বপ্ন দেখা কতকগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা বিরামহীনভাবে বলা হচ্ছে। বক্তব্য বিষয়ের অস্পষ্টতাই এর কারণ। আমরা চাই সহজ সুরে লেখা সহজ ভাব বিন্যাস, এর বেশী নয়। নাই বা থাকলো ঘটনার ঘনঘটায় ভরা উৎকট রোমান্স, নাই বা থাকলো শিহরণ। ইতি

শ্রীপতিতপাবন গোস্বামী,
নবদ্বীপ।

চিত্র প্রদর্শনী

অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস গত সপ্তাহে কলিকাতার চিত্র-রসিকদের সামনে উপস্থিত করেছিলেন ব্রায়ান মার্টিন ক্লার্ক নামে এক ইংরাজ শিল্পীর কয়েকটি পেইন্টিং। ব্রায়ান ক্লার্ক-এর নাম দেশের পাঠক-পাঠিকারা সম্ভবত এই প্রথম শুনেছেন। সুতরাং এঁর কিছুটা পরিচয় এখানে দেওয়া দরকার মনে করি। শিল্পীর বর্তমান বয়স ২৭। ইনি ১১ বছর বয়স থেকেই চিত্রচর্চা শুরু করেছেন। ১৯৪৭ সালে ব্রায়ান সাসেক্স-এ আডিংলী কলেজ-এ ভর্তি হন এবং ১৯৫৯ সালে কেব ট্রেট পুরস্কার পেয়ে সে বছর সেখানকার শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সম্মান লাভ করেন। ১৯৬১ সালেও ইনি ঐ পুরস্কারটি লাভ করেন। ১৯৬২ সালে একটি বৃত্তি লাভ করে ব্রায়ান আমেরিকায় যান এবং সেখানেই আমেরিকান স্কুল-এর সমকালীন ধারার সন্ধান পান, যে ধারার প্রভাব এঁর কাজের মধ্যে অতি স্পষ্ট। আমেরিকায় থাকার সময়েই এঁর চিন্তাধারা সুররিয়ালিজম এবং নন-অবজেকটিভ আর্টে সিদ্ধ হয়। বর্তমানে ব্রায়ান কলিকাতায় প্রবাসী। বছর আড়াই হল এখানে রয়েছেন। যদিও এঁর ছবিগুলি চিত্রকরের মত, তা হলেও এঁকে আমরা শিল্পীদের দলভুক্ত করা চলে না। সঙ্গীত এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ব্রায়ান-এর নাম ক্রমশ সুপরিচিত হয়ে উঠছে।

আলোচ্য প্রদর্শনীতে পেইন্টিং ছিল সবসমেত আটটি। আগেই বলেছি, ব্রায়ান-এর ছবি সুররিয়ালিজম-এ সিক্ত। ল্যান্ডস্কেপগুলিকে সুররিয়ালিস্টিক বলা চলে না বটে, তা হলেও অসম্ভব রকম নিস্তব্ধতার ছাপ থাকায় এগুলির মধ্যেও যেন সুররিয়ালিজম-এর আঁচ অনুভব করা যায়। প্রকৃতির রূপ-বৈচিত্র্যের সাদৃশ্য তুলে ধরেছেন শিল্পী এসব রচনায় বটে, কিন্তু তার সঙ্গে আরও কিছু মিশিয়েছেন, যার ফলে রচনাগুলিকে দেখে মনে হয় যেন স্বপ্নে দেখা। পিরামিডস্ অব টিমবো, ভেরাইটি ফ্যানেস্ প্রভৃতি রচনায় শিল্পীর সুররিয়ালিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত স্পষ্ট। সুররিয়ালিজম্ হল এমন একটি ধারা, যার মধ্য দিয়ে শিল্পে মানুষের মনের গভীরতম স্তরে উপস্থিত হয়ে চাপা-পড়া অনুভূতিগুলিকে খুঁড়ে বার করা যায়। সুররিয়ালিস্টদের বিদ্রোহ হেতুবাদ, নিয়মানুবর্তিতা ন্যায়-অন্যায় বোধ প্রভৃতির বিরুদ্ধে। এসবের চাপে পড়েই মানুষ আজ কলের পুতুলে রূপান্তরিত হয়েছে। তাই যুক্তি এবং নিয়ম-শৃঙ্খলা ছিঁড়ে ফেলে এঁরা চান মানুষের আসল মনটিকে প্রকাশ করতে। এঁদের অঙ্কন কৌশল প্রায় ওল্ড মাস্টারদের মত। অন্য সমসাময়িক শিল্পীদের অস্থিরতা এবং উত্তেজনা উপেক্ষা করে এঁরা দৃষ্টি-স্থির মস্তিষ্ককে ওল্ড মাস্টারদের মতই সাবধানে সময় ধরে কর্মগুলি রচনা করেন। কিন্তু এঁরা বর্ণের বেলায় সাদৃশ্য সত্যকে অনুসরণ করেন না এবং এঁদের রচনায় উপাদানগুলির সংস্থিতিও হয় অবাস্তবভাবে, যেমন স্বপ্নে আমরা অসম্ভব সব ঘটনা দেখতে পাই। দর্শকদের কাছে উপাদানগুলি চেনা মনে হলেও সমগ্র রচনার মর্ম উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয় না, যদিও না ইনি মন থেকে যুক্তিকে সরাতে পেরেছেন এবং সম্ভবতার সীমা উৎক্রম করে অজানা, অচেনা, অসম্ভবের রাজ্যে প্রবেশ করতে পেরেছেন। সুতরাং সুররিয়ালিস্টিক ছবি দেখে কেউ যদি বলেন—কিছু বোঝা গেল না, তা হলে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। ব্রায়ান ক্লার্কের রচনাগুলি কিন্তু সুররিয়ালিস্টিক জাতীয় হলেও দেখবার একমাত্র আর্নিশমেন্ট ওপর রচনাটির মর্ম উদ্ঘাটন করতেই বেশ সময় যায়।

এই সঙ্গে ব্রায়ান আঁকার কিছু পেন অ্যান্ড ইংক-এ প্রচ্ছদ বা গল্পের ইলাস্ট্রেশন এবং লেখাটির বাড় বই-এর ম্যাটও প্রদর্শন করা হয়। বই-এর ম্যাট ফরেস্ট ক্যামারা একটি অসাধারণ রচনা।

প্রদর্শনীটি আমরা বিশেষভাবে উপভোগ করেছি। আশা রইল, অ্যাকাডেমীর আগামী বার্ষিক প্রদর্শনীতেও ব্রায়ান ক্লার্কের ছবি আমরা দেখতে পাবো।

ল্যান্ডস্কেপ — শিল্পী—ব্রায়ান ক্লার্ক

স্যাঁ-ঝন্ প্যার্স-এর কবিতা

অভিযান

(অষ্টম সর্গ)

আমরা চিরদিন রইব না এখানে এই মনোহরা সোনালী মাটির দেশে ..

মহাকাশের সমতলে সীমাহীন গ্রীষ্ম উষ্ণ আবহাওয়া নামিয়ে দিয়েছে স্তরে স্তরে
প্রকাণ্ড পৃথিবী ঘুরছে, চারিদিকে উপছে পড়ছে তার স্তিমিত ছাইচাপা আগুন,
শাশ্বত বর্ণালি জড়িয়ে আছে সব কিছুতে—গন্ধকে, মধুতে,
পুরোনো শীতের খড় জন্মে উঠেছে পৃথিবীর সর্বত্র
আর আকাশ তার নীল রস সংগ্রহ করছে নিরালা গাছের সবুজ ত্বক থেকে।

অভ্র-পাথর ছড়ানো এই মাটি। হাওয়ার মুখে নিটোল একটি বীজ, তা নয়;
আলো যেন মসৃণ তৈলধারা।
চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে ছুঁয়েছিলাম শৈলচূড়ার প্রান্ত
আমি জানি পাহাড় কান পেতে শুনেছিল
আলোর মৌচাকে ঝাঁকে ঝাঁকে নৈঃশব্দ্যের আনাগোনা;
এক পাল অশ্বানীকের ভার আমার হৃদয়ে, তাই আমি অস্থির।

লালচে ক্ষতের দাগ পিঠে বয়ে পশম-ছাঁটা কাঁচির নীচে শান্ত উষ্ট্রীর মতো
সারি সারি পাহাড় মেঠো আকাশের নীচে হেঁটে যাক
সমতলের মৃদুচ্ছটার উপর দিয়ে চলুক মৌনপদক্ষেপে
তারপর যাত্রার শেষে হাঁটু গেড়ে বসুক স্বপ্নের ধোঁয়ার মধ্যে
যেখানে অগণ্য জনতা পৃথিবীর মরা ধুলোয় নিশ্চিহ্ন।

সুদীর্ঘ শান্ত পথরেখা আশ্চর্য দ্রাক্ষাকুঞ্জের নীলে গিয়ে মেশে
এখানে ওখানে ঝড়ের রং পাকিয়ে তোলে পৃথিবী
মরা নদীর খাত থেকে উঠে আসে ধূসর বালুমেঘ
যেন শত শত চলিষ্ণু শতাব্দীর বসনাঞ্চল।..

মৃতদের কথা মনে ক'রে স্বর নীচু করো দিনমান তবু স্বর নীচু করো।
মানুষের মনে এত মাধুর্য তার কোন পরিমাপ নেই, এও কি সম্ভব?
"মন, তোমাকেই বলি শোন, হে আমার অশ্বগন্ধী মন!"
ঐ যে ডাঙ্গার পাখিরা পূব থেকে পশ্চিমে উড়ে চলেছে
ওরা যেন আমাদের সমুদ্রপাখিরই অবিকল অনুকৃতি।

এই বর্ণম্লান আকাশের পুরে—আকাশ যেন আস্তরণ-ঘেরা পুহ অংগন—
শান্ত মেঘগুলি থরে থরে সাজানো, সেখানে ধূপ আর শিরীষের ঘ্রাণ তীব্র,
ধোঁয়ার কুণ্ডলীমেঘ হাওয়ার দমকায় আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।
পৃথিবীর অধীর আগ্রহ জেগে আছে পতঙ্গের শুঁড়ে,
অনন্ত বিস্ময়ের আধার আমাদের এই পৃথিবী।

দ্বিপ্রহরে যখন জামের শিকড় সমাধিস্তম্ভের ভিতে ফাটল ধরায়
চোখের পাতা বুজিয়ে যুগযুগান্তের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নেয় মানুষ, দেহ জুড়ায়,
মরা ধুলোর পরিবর্তে দেখা দেয় স্বপ্নের তুরঙ্গ-সেনানী
হাওয়ার ঝটকায় এলোমেলো জনশূন্য পথ এসে আমাদের কাছে;
নদনদী মিলেছে সঙ্গমে, কোথায় সব প্রহরী যারা পাহারা দেবে?

পৃথিবীর উপর দিয়ে বয়ে চলেছে বিপুল জলস্রোত সরবে
স্বপ্নের মধ্যে চমকে উঠছে যেখানে যা কিছু নোনা—
এই জলধ্বনি হঠাৎ, বাঃ হঠাৎ, কী চায় আমাদের কাছে?
আসুক সেই সব মানুষ নদীর লাস-ঘরের উপর স্বচ্ছদর্পণের মতো—
আবেদন জানাক অনাগত শতাব্দীর কাছে।
আমার যশের উপর সমাধিস্তম্ভ তোল,
আমার নীরবতার উপর সমাধিস্তম্ভ তোল,
আর এই সব সমাধি আগলাবার জন্য রাজপথে দাঁড়াক
সবুজ ব্রোঞ্জেগড়া তুরঙ্গসেনা!...
(বিরাট এক গরুড়ের ছায়া আমার মুখের উপর।)...

অনুবাদ : জগন্নাথ চক্রবর্তী

॥ পত্রাবলী ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

Cooch Behar

> শ্রীযুক্তা নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র [illegible] পত্রাবলীর প্রথম [illegible] পত্র [illegible] [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] উক্ত [illegible] পত্র [illegible] [illegible] —সম্পাদক

পত্রাবলীর ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের [illegible] বছর আগে ১৯২৩ সালের [illegible] মাসে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম ব্যক্তিগতভাবে পরিচয়। তার আগে তাঁকে অনেকবার দেখেছি নানা সভাসমিতিতে। আজও মনে পড়ে তাঁর "সত্যের আহ্বান" [illegible] [illegible] শুনে কি রকম শরীর রোমাঞ্চ হয়েছিল। বাইরে ভিড়ের চাপে কাঠ ভেঙে যাবার উপক্রম, কিন্তু ঘরের ভিতর মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে শ্রোতারা। [illegible] সেই সময়েই নোতুন লেখা গান অপূর্ব গম্ভীর সুরে [illegible] মিলিত কণ্ঠে গাওয়া "দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী, আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।" দিনেন্দ্রনাথের গম্ভীর গলা অন্য সকলের গলা ছাপিয়ে উঠছে, সঙ্গে কবির পুরোনো বন্ধু নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়ের পাখোয়াজের সংগত। আমাদের কতো সৌভাগ্য যে এই রকম নানাদিনে আমরা রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি তাঁর অপূর্ব মহিমায়। কিন্তু সে যেন দূর থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার উপরে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের রঙের বিন্যাস দেখা, যাতে মন স্তব্ধ হয়, নত হয় সেই গাম্ভীর্যের মহিমায়, কিন্তু তবু সে অনেক দূরে।

তার কিছুদিন পরে তাঁকে আরো একটু কাছের থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম যখন তিনি আমাদের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পাশের গলির ভিতর ছাত্রসমাজের অন্তর্গত থিওফিলাস ফ্রেটারনিটি ক্লাবে মাঝে মাঝে এসে [illegible] নোতুন লেখা শুনিয়ে গিয়েছেন। [illegible] গলির ভিতরে সংগীত দেবীপ্রসন্ন [illegible] বাড়িখানা ভাড়া নিয়ে [illegible] মহলানবিশ থাকতেন, [illegible] ২১০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের [illegible] [illegible] [illegible]। সেই ছোট্ট বাড়িরই ছাদের উপরে আমাদের সভা বসতো। এখনও স্পষ্ট মনে আছে সেদিনের ছাদের আসর যে সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ "মুক্তধারা" বইখানা পড়ে শোনালেন। ঐ [illegible] [illegible] "সুমন, আমার সুমন" এই [illegible] [illegible] শুনতে পাচ্ছি। ঐ সময় এই নতুন [illegible] সমিতিতে [illegible] অনেক মনীষীকেই নিমন্ত্রণ করে আমাদের মাঝখানে পেয়েছি। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, [illegible] [illegible], [illegible] রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলে [illegible] এসেই আমাদের মাঝখানে বসে কিছু না কিছু পড়ে শুনিয়েছেন, আলোচনা সভার উদ্বোধন করেছেন, এক কথায় বলা যেতে পারে যে নানারকমে সাড়া দিয়েছেন, আনন্দ দিয়েছেন, মনে উৎসাহ জাগিয়েছেন।

স্বর্গীয় সুকুমার রায়। [illegible] [illegible] আমাদের [illegible], [illegible] তাঁরই সহকারী। এঁরা দুজনেই তখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যুবক সহকারী কর্মকর্তা। এঁরা দুজনেই কবির স্নেহধন্য মানুষ, কাজেই এদের ডাকে কবি সহজেই সাড়া দিতেন। এই কারণেই আমরা রবীন্দ্রনাথকে অনেক সময়েই আমাদের মাঝখানে পেয়েছি। ছাত্রসমাজের সেদিনকার যুব সমিতির সভ্যরা আজ সকলেই বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়। কেউ এখনও জীবিত আছি; আবার কেউ আমাদের ছেড়ে চলেও গেছেন। সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা, অনন্যসাধারণ মানুষ সুকুমার রায়ের চলে যাওয়া যৌবনের দরজা পার হবার আগেই। তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই যেন ছাত্রসমাজের উজ্জ্বল প্রদীপের আলো স্তিমিত হয়ে গেলো।

আমাদের ছাদের আসরে কবিকে যখন দেখেছি তখনও তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ঘটেনি যদিও তাঁকে আর সকলের মতোই গিয়ে প্রণাম করেছি, পিতৃপরিচয়ে পরিচিত হয়েছি, কাছে বসে তাঁর পড়া শুনেছি। তবু এ্যালফ্রেড থিয়েটার কিম্বা য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে যখন **"সত্যের আহ্বান"**, "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁকে দেখেছি [illegible] এই যুগে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলে মনে হয়েছে [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] পরিচয় ঘটেছে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মনে আছে। ১৯২৩ [illegible] [illegible] সেদিন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রবীন্দ্রনাথের [illegible] [illegible] "[illegible]" প্রথম অভিনয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়নি।

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিয়েছিলুম।

[illegible]

[illegible] —[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নেই [illegible] [illegible]। এই [illegible] [illegible] [illegible] শুক্লা একাদশী, [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] পারাবারের [illegible] [illegible] [illegible]" আরো কতো গান—"[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গানের ছড়াছড়ি।

রবীন্দ্রনাথকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কখনও দেখিনি, কারণ আমি তো ছিলাম

বাইরের লোক। সেদিন ও'র অযাচিত স্নেহের প্রকাশে বুঝলাম সে দূরত্ব ঘুচে গিয়েছে। আমার সঙ্গে ও'র সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও আমি ও'র বহুদিনের স্নেহের পাত্র প্রশান্তচন্দ্রের নববধূরূপে সামনে উপস্থিত—এক মুহূর্তের মধ্যেই আমাকে পরম আত্মীয়ের মতো গ্রহণ করলেন। সেইদিনই প্রথম আমার অস্তিত্বকে ও'র মন স্বীকার করেছিল, তার আগে একাধিকবার দেখলেও সে দেখা মনের মধ্যে গিয়ে পৌঁছয়নি একথা কবির মুখেই পরে শুনেছি।

পরদিন জোড়াসাঁকোয় দুজনে গেলাম রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করতে। ঐদিন তিনি আমেদাবাদের দিকে রওনা হবেন প্রায় মাস-দুয়েকের মেয়াদে। কবি তখন তেতলার দক্ষিণের ঘরখানাতে রয়েছেন। আমাদের দেখে খুসি হয়ে স্নেহের সঙ্গে বসালেন। তারপর "বসন্ত" নাটকটির সব গানগুলির বাঁধানো পাণ্ডুলিপিখানি আমাদের হাতে দিয়ে বললেন তোমাদের বিয়ের রাত্রেই এই নাটকের প্রথম অভিনয়, তোমাদেরই এটি পাবার অধিকার; তাই মনে ভাবলুম এই গানগুলোই হবে যোগ্য উপহার বিবাহের—আমি এর চেয়ে আর বেশী কি দিতে পারি। প্রণাম করে খাতাখানা হাতে নিয়ে খুলে দেখি প্রথম পাতায় লেখাঃ—

প্রশান্ত, রাণী

তোমাদের এই মিলন-বসন্তে
কবি দিলো বসন্ত-গান আনি।
সুন্দর প্রেম সার্থক আনন্দে
পরুক গলায় সুরের মালাখানি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫ ফাল্গুন,
১৩২৯

আনন্দে আত্মহারা হয়ে বসে রইলাম। যতক্ষণ ছিলাম আর একটিও কথা বলতে পারিনি। অবশেষে দুজনে প্রণাম করে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

এরপরে দ্বিতীয়বার দেখা চৈত্রসংক্রান্তির আগে শান্তিনিকেতনে। তারিখ এখন ঠিক মনে নেই—চৈত্রমাসের শেষে একদিন হঠাৎ রথীবাবু আমাদের আলিপুরের বাসায় এলেন শান্তিনিকেতন থেকে। বললেন তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছি নববর্ষের উৎসবে যোগ দেবার জন্যে। বাবা বম্বাই, কাঠিওয়ার, আমেদাবাদ প্রভৃতি নানা জায়গা ঘুরে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছেন—তোমাদের নিয়ে যেতে বলেছেন। নোতুন বউ যাবে তাই আমি নিজে নিয়ে যেতে এলুম।

আমার মন তো আনন্দে উৎফুল্ল। আগে কখনও শান্তিনিকেতন যাওয়া ঘটে ওঠেনি। লোকের মুখে শুনে শুনে কল্পনায় একটা ছবি এঁকে রেখেছি মনের মধ্যে। এইবার দেখা হবে বলে অধীর আগ্রহে আমার স্বামী ও আমি রওনা হলাম রথীবাবুর সঙ্গে সন্ধ্যের গাড়িতে। রাত্রে যখন পেঁৗছলাম তখন অনেক রাত, সারা আশ্রম যেন সুপ্তিমগ্ন। গাড়িতে যেতে যেতে আমি চেয়ে চেয়ে দেখছি, এখানে সেখানে ইলেকট্রিকের আলো জ্বলছে, মাঠের মধ্যে ছড়ানো ছোট ছোট বাড়ি, কিন্তু কোথাও সাড়াশব্দ নেই। খানিক পরেই আমাদের মোটর গিয়ে দাঁড়ালো একটা ছোট বাড়ির সামনে, খড় দিয়ে ছাওয়া তার চাল। বাড়িখানি একেবারে ছবির মতো দেখতে। শুনলাম এইটাই নাকি উইলি পিয়ার্সনের বাড়ি ছিলো, তিনি সেইদিনই বিকেলের গাড়িতে চলে গিয়েছেন সাগর পাড়ি দেবেন বলে। বিধির বিধানে সেই যাত্রাই তাঁর অগস্ত্য যাত্রা হয়েছিল।* তাই আমাদের থাকবার ব্যবস্থা সেই বাড়িতে করা গিয়েছে। এই কোণার্ক বাড়িখানার সে আমলে পাকা ছাদও ছিলো না, এতগুলো ঘরও ছিলো না। শুধু একখানি খোলা চাতাল ও তার একধারে ছোট একখানি শোবার ঘর ও তার কোণঘেঁষা একটা স্নানের ঘর।

গাড়ি থেকে নামতেই প্রতিমা দেবী হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন। অনেক রাত হয়ে গিয়েছে তাই বেশী কথাবার্তা না বলে আমাদের ঘরদুয়ার সব দেখিয়ে দিয়ে সে রাত্রের মতো প্রতিমাদেবী আর রথীবাবু দুজনে বিদায় নিলেন যাতে আমরা পথশ্রমের পরে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে পারি।

পাশেই উদয়ন, তখন বড় বাড়িটা তৈরী হচ্ছে, তাই প্রতিমাদিদের ও মীরাদির বাসা উদয়নের রান্না বাড়িতে—এক সারি ছোট ছোট ঘর ও সামনে বারান্ডা, তারই মধ্যে ও'দের ঘর সংসার।

শান্তিনিকেতনে প্রথম রাত্রের কথা জীবনে কখনও ভুলবো না। চারিদিকে নিস্তব্ধ নিঝুম, অভিনব একটা বাড়ি যার সবচেয়ে বড় ঘরখানাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "দ্বার-বাধাহীন", চতুর্দিকে উন্মুক্ত, হু হু করে চৈত্ররাতের শুকনো বাতাস গায়ে এসে লাগছে। ঐ খোলা চাতালটাকে অত্যন্ত সুরুচীপূর্ণ অথচ সংযতভাবে সাজানো হয়েছে অতিথিদের বসবার জন্যে। রাত্রের আলো-অন্ধকারে জড়ানো যেন একটা মায়াপুরীতে এসে পেঁৗছেছি। অধীর আগ্রহে ভোরের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করে রইলাম—দিনের আলোয় এই বিখ্যাত শান্তিনিকেতন আশ্রমকে দেখব বলে।

খুব সকালেই মীরাদি এবং আমার ছোট ননদ বাবলি (ভাল নাম, রেবা, অধুনা অধ্যাপক সুশোভন সরকারের পত্নী) আমার কাছে এসে হাজির। বাবলি তখন শান্তিনিকেতনের ছাত্রী—ওখানকার সকলের সঙ্গেই বিশেষ পরিচিত এবং স্নেহের পাত্রী। মীরাদি ঘরে ঢুকেই বললেন "বাবলি, দেখি তোমাদের নোতুন বউ কেমন হয়েছে?" তখন সবে আমি স্নান সেরে বেরিয়েছি, মীরাদি কাছে এসেই আমার হাতে জড়ানো খোঁপাটা খুলে দিয়ে বললেন, "আগে বউর চুল দেখি। বাঃ, বেশ তো চুল তোমার।" তাঁর এই রকম সোজাসুজি সহজ ব্যবহারে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেল। সকালের জল খাবার শেষ করে তিনি ও রেবা আমাকে আশ্রম দেখাতে নিয়ে গেলেন।

প্রথমেই গুরুদেবকে প্রণাম করতে যাওয়া। তিনি তখন রয়েছেন সুরুলের পথে "প্রান্তিক" বলে যে ছোট্ট বাড়িটা, সেইখানে। আমাকে দেখেই হাসি মুখে বললেন "কি, এসেছো তোমরা? কাল রাত্রে এসেছো? কি রকম লাগছে জায়গাটা?" বললাম খুব ভালো লাগছে। আবার জিজ্ঞাসা করলেন আমি কি আগে কখনও আর শান্তিনিকেতনে আসিনি? "না" বলাতে বাবলিকে বললেন, "তোর বৌদিকে সব ভালো করে দেখিয়ে দে। তুই যখন আছিস তখন ও'র আর ভাবনা কি?" আমি তো কবির কাছে অপরিচিত, তবু তাঁর কথায় বার্তায় সব কিছুতে এমন একটা স্নেহের স্পর্শ অনুভব করলাম যে মন ভরে উঠলো।

মীরাদি আমাকে তাঁদের বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি বাড়ি নিয়ে গিয়ে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি সকলের কাছেই "নতুন বৌ", কারণ প্রশান্তচন্দ্র তখন শান্তিনিকেতনে অতি পরিচিত মানুষ।* আমারই এই প্রথম আগমন। সকলের কাছেই আমার স্বামীর পরিচয়ে আমার পরিচয়, কাজেই যেখানেই যাই সেখানেই "নতুন বৌ"এর অভ্যর্থনা পাই। এটা আমি খুবই উপভোগ করেছিলাম।

সেইদিন সন্ধ্যেবেলা আবার কবির কাছে গেলাম। তখন আরো অনেকে সেখানে উপস্থিত। বারান্ডায় অন্ধকারের মধ্যে সবাই বসে, ঘরে আলো জ্বলছে। দু'চারটে কথার পরেই কবি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন "তুমি গান করতে পারো?" থতমত খেয়ে ভেবে পাই না যে কি উত্তর দেবো; "গান জানি" কেমন করে বলব?" কবি বল্লেন "আচ্ছা, শুনি কি রকম জানো—অন্তত

* ২৪ সেপ্টেম্বর (১৯২৩) ইতালিতে ট্রেনে ভ্রমণকালে কামরার দরজা খুলে পড়ে যাবার ফলে তাঁর মৃত্যু হয়।

* সেই সময় শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ দুজনেই বিশ্বভারতীর অবৈতনিক যুগ্ম-সম্পাদক।

গলাটা যে কি রকম তাতো বুঝতে পারবো?" আমার ততক্ষণে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। অথচ এটা বুঝতে পারছি যে অতবড় একজন মানুষের ইচ্ছা পালন না করলে তাঁকে অসম্মান দেখানো হবে। খুব কাতরভাবে বললাম আমার হয়তো সুর একেবারে ভুল হবে, কারণ আপনার গান যাদের কাছ থেকে শুনে শিখেছি তারা হয়তো ঠিক সুর জানে না। "তা হোক,, তুমি গাও না।" দুরু দুরু বুকে গান ধরলাম "আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী"—এ গানটা শিখেছিলাম ঝুনুদির কাছে (চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত তখন চিত্রলেখা ব্যানার্জি, অধুনা শ্রীযুক্ত নির্মল সিদ্ধান্তের স্ত্রী) তার বিয়ের আগে—ঝুনুদির কাছে শেখা, তাই মনে ভরসা ছিল হয়তো সুরটা ঠিকই আছে। গান শেষ হলে বললেন, "এতো ভয় পাচ্ছিলে কেন? সুর তো ঠিকই আছে, তবে পরে আমি এর আর একটা সুরও দিয়েছি, সেটা শিখে নিও এখানে কারো কাছে। তোমার গলাতে তো খুব জোরও আছে সুরও আছে তবে কেন যত্ন করে গান শেখোনি?" বললাম সেটা আমার দুর্ভাগ্য, ডাক্তাররা আমাকে গানের চর্চা করতে অনুমতি না দেওয়ায় আমার বাবা মা আমাকে গান শেখাবার চেষ্টা করেননি। আমি নিজে নিজে যা পারি তাই করি। সেদিন এতগুলো কথা কবির সঙ্গে বললাম, গান শোনালাম—বাড়ি ফিরবার পথে মনে হোলো যেন আরো একটু বেশী পরিচয় ঘটল।

নববর্ষের উৎসব শেষ করে কলকাতায় ফিরে এলাম। ঐ কয়দিনেই মীরাদি, প্রতিমাদির সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেলো। বিদায় নেবার সময় বার বার বলে এলাম এবারে যেন কলকাতায় এলে আমাদের কাছে কয়েকদিন কাটিয়ে যান। কবিকে এ অনুরোধ করবার মতো সাহস আমার হয়নি। কিন্তু আমার স্বামীর সঙ্গে কবির বহুদিনের যোগ, কাজেই তাঁর মনে তো আমার মতো ভয় থাকবার কথা নয়; কবিকে বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে এলেন যেন জোড়াসাঁকোর বদলে আমাদের আলিপুরের বাসায় এসে ওঠেন যখন এবারে কলকাতা আসবেন। আমার বিয়ের আগেও রবীন্দ্রনাথ আলিপুরের বাড়িতে এসে থেকেছেন কয়কদিন তাই তাঁর জানা ছিলো কি রকম সুন্দর খোলামেলা বাগানের মধ্যে এই হাওয়া আপিসের বাড়িখানা—সহজেই রাজী হলেন আমার স্বামীর প্রস্তাবে।

হঠাৎ একদিন খবর এলো কবি আসছেন কলকাতায়। তাঁকে যেন গিয়ে স্টেশন থেকে নিয়ে আসি। রবীন্দ্রনাথ আমাদের বাড়িতে এসে থাকবেন। আনন্দে একেবারে উতলা হয়ে রয়েছি। সবে সংসারে ঢুকেছি। নিজের গৃহিনীপনার উপর কিছুমাত্র আস্থা নেই। কবির মতো অতিথি! কি রান্না করবো, কেমন করে যত্ন করবো কিছুই যেন ভেবে পাচ্ছি না; তাই আনন্দের সঙ্গে উৎকণ্ঠা উদ্বেগও কম নেই মনে। একমাত্র ভরসা আমার স্বামীর কাছে আগেও উনি থেকে গিয়েছেন তাই তিনি আমায় বলে দিতে পারবেন কখন কি চাই না চাই। নিজের সাধ্যমতো ঘরদোর গুছিয়ে অপেক্ষা করে রইলাম। কবি আসবার অল্পক্ষণ পরেই মনের সব ভয় মিলিয়ে গেলো তাঁর সহজ হাস্য পরিহাসে ও সস্নেহ ব্যবহারে।

আমাদের বাড়িতে একটা বেলা থাকবার পর রাত্রে যখন খেতে বসেছি বললেন "জানো, এবারে ফস করে প্রশান্তর নেমন্তন্নতে রাজী হয়ে অবধি মনে মনে অনুতাপ করেছি। সত্যি বলছি আসতে ভয় পাচ্ছিলুম। তার কারণটা তোমাকে তাহলে বলি। তোমার বিয়ের প্রায় দুমাস আগে আমি আর একবার এ বাড়িতে থেকে গিয়েছি, তা জানো বোধহয়? বাগান-টাগান আছে শুনে খুসি মনেই এসেছিলুম। সে সময় ওর আর একজন ইংরেজ অতিথি স্যার গিলবার্ট ওয়াকার-ও* এখানে ছিলেন। মানুষটি বড় ভালো। অতবড় নামজাদা বৈজ্ঞানিক হলেও খুব রসবোধ আছে দেখলুম। সাহিত্য, সঙ্গীত, সব বিষয়েই খুব উৎসাহ। নিজে ভালো বাঁশি বাজাতেন, পাশ্চাত্ত্য সংগীত সম্বন্ধে সত্যিই জ্ঞান আছে। তাই আমাদের দুজনের আলাপ আলোচনা বেশ ভালোই জমতো। কিন্তু বিপদ শুধু খাবার সময়। প্রশান্তর যে বাবুর্চি সে বুঝে নিয়েছিল তার মনিবের সংসার চালনায় কতখানি দক্ষতা, তাই খেতে বসে রোজ দেখি শুধু রাশি রাশি ভাত আর মুলোর তরকারী আসছে টেবিলে। প্রশান্ত হতাশ হয়ে এদিক ওদিক তাকায় আর কি করবে তা ভেবে পায় না। দুদিন পরে দেখি ওর ভগ্নীটিকে ধরে এনেছে অতিথিদের তদারক করবার জন্যে। বাবুলি বেচারী ছেলেমানুষ, কোনো দিন সংসারের কিছু জানে না, সে কেমন করে এইসব বুদ্ধিমান চাকরদের সঙ্গে পারবে? এদিকে সায়ান্টিস্ট ভাবলো স্ত্রী জাতীয়া যে কোনো একজন বাড়িতে থাকলেই বুঝি টেবিলে খাবারের উন্নতি হবে। বেচারা বাবুলি। আমি দেখি সে সারাদিন অসহায়ভাবে এদিক ওদিক চায় আর দক্ষিণের বারাণ্ডায় একটা আরাম-চৌকীর উপর বসে বাড়িতে যতগুলো ছেঁড়া পাতার নভেল ছিল পড়ে শেষ করবার চেষ্টা করে। ঐ নেপালী চাকর 'কেটা' আর বাবুর্চিই অবাধে রাজত্ব চালাচ্ছে। (বাবুলি এখন অতি পাকা গিন্নি, কিন্তু কবির সেদিনকার বর্ণনা শুনিয়ে ওকে আমরা প্রায়ই উপহাস করেছি, সেও কবির সঙ্গে কপট ঝগড়া করেছে। এমনি করেই তিনি স্নেহের-জনদের নিয়ে ঠাট্টা করতেন।) সেই মুলোর তরকারীর ভীতি মনে ছিলো বলেই এবারে প্রশান্তকে কথা দিয়ে অবধি অনুশোচনা করছিলুম। কিন্তু আজ অসংকোচে স্বীকার করছি যে, আমি বৃথাই ভয় পেয়েছিলুম।" এমন বলবার ভঙ্গী যে আমরা স্বামী স্ত্রী দুজনেই হো হো করে হেসে উঠলাম। ওঁর এই সহজ হাস্য পরিহাসে আমার মন একেবারে হাল্কা হয়ে গেল। তখনই বুঝলাম এরকম অতিথির কাছে আমার কোনো ভাবনা নেই, যতই আনাড়ী গৃহিণী হই না কেন।

এর কয়েকদিন পরে সকালে খেতে বসে বললেন যে, তাঁর পিঠে একটা ব্যথা হয়ে কষ্ট দিচ্ছে—বোধহয় 'মাস্‌কুলার পেন' যাকে বলে তাই হয়েছে। আমি আমার ঘরে এসে আমার স্বামীকে বললাম যে, একটু 'উইন্‌-টোজেনো' ক্রীম মালিশ করে দিলে হয় না? ওটাতে খুব ব্যথা সারে তা দেখেছি। উনি হেসে বললেন, "কবিকে তো চেনো না, তাই এই কথা বলছো; মালিশ কি তিনি করতে দেবেন?" "কেন দেবেন না? নিশ্চয়ই দেবেন।" জবাব পেলাম, "কবি কখনও কারো কাছ থেকে পার্সোনাল সেবা নিতে চান না। একবার খুব বেশী জ্বর, আমি কাছে বসে বাতাস করতে গিয়েছিলাম, উনি তৎক্ষণাৎ পাখাটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিলেন। তাই বলছি, ওসব বুদ্ধি খাটিয়োনা, দেখবে বিরক্ত হয়ে এ বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবেন।" আমারও জেদ যে নিশ্চয়ই আমার সেবা নেওয়াতে পারবো। পরস্পরের মধ্যে বাজী রেখে ক্রীমটা হাতে নিয়ে কবির ঘরে গিয়ে ঢুকলাম—দেখি দরজার দিকে পিঠ ফিরিয়ে, বসে লিখ্‌বার টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে কি লিখছেন। আমি নিঃশব্দে চেয়ারের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে কোনো ভূমিকা না করেই পাঞ্জাবীটা টেনে তুলে নিয়ে পিঠে ক্রীম মালিশ করতে শুরু করে দিলাম। আমার স্বামী তো আমার দুঃসাহস দেখে অবাক, ভাবছেন এখনি বুঝি একটা ধমক খাবো। কবি কিন্তু আমাকে না বকুনি দিয়ে একটু হেসে বললেন, "ও কিও। ওটা আবার কি হচ্ছে?" বললাম, "আপনার পিঠে ব্যথা হয়েছে, তাই ওষুধ মালিশ করছি; এটাতে ব্যথা কমে যাবে।" শান্তভাবেই বললেন, "আচ্ছা দেখি তোমার ডাক্তারীর ফলটা কিরকম হয়।" বলবামাত্র আমি হো হো করে হেসে উঠলাম, আমার স্বামীর মুখেও অপ্রস্তুতের হাসি। কবি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এতটা কৌতুকের কি কারণ হোলো?" আমি বললাম, আপনার সায়ান্টিস্টকে বাজীতে হারিয়ে দিয়েছি," "কি রকম?" তখন বললাম সব বৃত্তান্তটা। উনি হাসতে হাসতে বললেন, "প্রশান্ত, এ কী কাঁচা কাজ করলে? আমাকে আগে বলতে

---

* Sir Gilbert Walker, F. R. S., সেই সময়ে Director General of Observatories; কলকাতায় এসেছিলেন।

হয়; তাহলে কি রানীকে আমি আমার ধারে কাছে ঘেঁষতে দিই?" তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, "প্রশান্ত ঠিকই বলেছে; আমি কখনও কারো সেবা নিতে রাজী হই না। কিন্তু তুমি তো আমার অনুমতি নাওনি, একেবারে হঠাৎ এসেই মালিশ করতে শুরু করে দিলে। মিথ্যে তোমাকে দুঃখ দেবো না বলে আপত্তি করলুম না। আর এখন দেখছি তোমার ডাক্তারীতে একটু আরামও লাগছে।" সেই একটি ঘটনাতেই সেদিন বুঝেছিলাম কবি আমাকে সত্যিই আপনজন বলে গ্রহণ করেছেন। আর সেইদিন থেকেই আমার সেবার দাবিটা কায়েমী হয়ে গেল; পরে তো অনেকদিনই আমাকে "হেডনার্স" বলে ঠাট্টা করতেন।

আমার বিয়ের দিন থেকে কবির মৃত্যু দিন পর্যন্ত এই আঠারো বছরের যে স্নেহের বন্ধন তাঁর সঙ্গে গড়ে উঠেছিল তার পরিচয় তাতো তাঁর চিঠিগুলির ভিতর দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে। এই অমূল্য পত্রাবলীর মধ্যে কখনো হাসি তামাসা কৌতুকের ছবি ফুটে উঠেছে, কখনও বিরক্তি প্রকাশ করেছেন, কখনও ভর্ৎসনা জানিয়েছেন কখনও স্নেহে করুণায় বিগলিত মনের পরিচয় দিয়েছেন। ভালোমন্দ দোষ ত্রুটি সব জড়িয়েই তিনি আমাদের ভালো বেসেছিলেন, কাছে টেনেছিলেন। এই গভীর স্নেহের আধার যিনি, তিনি বিশ্ববিখ্যাত অনন্যসাধারণ মানুষ হয়েও আমার মতো অতিসাধারণ মানুষ, যার বিদ্যে সাধ্যি কিছুই নেই, তার সঙ্গেও কিরকম ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্বন্ধ সৃষ্টি করেছিলেন তারই নিদর্শন এই চিঠিগুলি। সংসারে সত্যি বড় যাঁরা, তাঁদের এইরকমই সহজ স্বভাব।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সতেরো বছরের পত্রধারার একটা সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যাবে বলে এতবড় করে এই ভূমিকাটা লিখলাম। স্বভাবতই আমার নিজের নাম এই লেখার মধ্যে বারে বারে এসে পড়েছে; কারণ কবির সঙ্গে আমার নিজের পরিচয়ের সূচনার কথাই যে লিখতে চেয়েছি। তবু জানাতে চাই অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গেই একাজ করেছি। মনে আশা আছে পাঠক আমাকে এজন্যে মার্জনা করবেন।

প্রথম দিকে খুব কম সংখ্যক চিঠিই আছে, কারণ সে সময়ে আমি পারতপক্ষে তাঁকে চিঠি লিখতাম না। তা নিয়ে কিছু কৌতুকও করেছেন। তারপর ক্রমে ক্রমে চিঠির কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরিশেষে নদীর ক্ষীণস্রোতের মতো রোগের মরুভূমিতে সেই ধারাটি লুপ্ত হয়ে গেল। আমি ধন্য এতদিন ধরে তাঁর চিঠি পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

জীবনে বিদুষী হয়ে নিজের নাম প্রচার করবার আকাঙ্ক্ষা কখনও করিনি, কিন্তু সত্যভ্রষ্ট না হয়ে পিতৃগৌরব বজায় রাখবার আকাঙ্ক্ষা চিরদিন মনে পোষণ করেছি। রবীন্দ্রনাথের কাছেও এজন্যে আমি বিশেষ ঋণী।

—নির্মলকুমারী মহলানবিশ

১৩ই ভাদ্র, ১৩৬৭
"আম্রপালি", বরানগর

[এই পত্রগুচ্ছ শান্তিনিকেতন হইতে লিখিত]

ওঁ ॥ এক ॥

কল্যাণীয়াসু,

বোধ হয় তোমার মনে আছে একজন দরিদ্র জার্মান তার স্ট্যাম্পের খাতা আমাকে পাঠিয়েছিল। তার অনুরোধ ছিল তার পরিবর্তে তাকে ভারতের ডাকটিকিট উপযুক্ত পরিমাণে পাঠাতে। সেই চিঠি সুদ্ধ টিকিটের খাতা তুমি নিয়েছিলে। তোমার সংকল্প ছিল কাবুলকে এইগুলি দিয়ে তার পরিবর্তে তার কাছে থেকে অন্য টিকিট জোগাড় করে যথাস্থানে পাঠাবে। আমার কেমন মনে হচ্ছে তোমরা এ বেচারার কথা ভুলে গেছ। মাঝে মাঝে আমার নিজের মনে হয়েছিল এবং উৎকণ্ঠাও অনুভব করেচি। কিন্তু ইতিমধ্যে তোমরা গর-ঠিকানা অবস্থায় নানাস্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে বলে তোমাকে লিখতে পারিনি। এতদিনে নিশ্চয় তোমাদের আলিপুর পর্যবেক্ষণীতে আবার ঘরকন্না গুছিয়ে বসেছ। অতএব এখন যদি সেই জার্মান ভদ্রলোকটির সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা কর তাহলে আমার মনটা ভারমুক্ত হয়।

কিছুদিন থেকে আমি অসুস্থ হয়ে পড়াতে গান লেখা ছাড়া আর কিছুই করতে পারচিনে। গান বন্ধ হয়ে গেলে কাজে মন দিতে পারব। তোমাদের কোনো খবর অনেকদিন পাইনি। ইতি তারিখ জানিনে।

তোমাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ ॥ দুই ॥

কল্যাণীয়াসু,

রাণী, তোমার নামাঙ্কিত একখানি শূন্যগর্ভ পত্রাবরণী এইমাত্র আমার দপ্তরের মধ্যে আবিষ্কার করলুম। তোমার নামটি তোমাকে ফিরিয়ে দেবার ঔৎসুক্যবশত এই চিঠি লিখছি। অমনি সেই উপলক্ষ্যে একটা কাজের কথা বলে নিই।

মণ্টুর সঙ্গে কথোপকথন সূত্রে সঙ্গীত সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছি অন্য কোনো আকারে তা সম্ভবপর হত না। প্রকাশের প্রত্যেক প্রণালীরই একটি বিশেষত্ব আছে—তার দ্বারা বিশেষ ফললাভ করা যায়। অতএব মণ্টুকে বোলো এই তর্কটিকে তার স্বকীয়রূপেই প্রকাশ করে যেন। কিন্তু সাপ্তাহিকে নৈব নৈবচ। এবং একবার যেন আমার কাছে প্রুফ আসে। বলাবাহুল্য আমি কেবল নিজের কথিত অংশেরই দায়িত্ব নেব।

আমার দ্বারবাধাহীন ঘরের মধ্যে বসে বসে আমি মনঃকর্ণে সাহানা রাগিণীতে বিয়ের নহবৎ শুনছি। ইতি ৯ই বৈশাখ ১৩৩২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ ॥ তিন ॥

তর্জনীয়াসু,

আর দিন দশ পরেই আমার বয়স ৬০ হতে সত্তরের মাঝখানের স্টেশনে এসে পৌঁছবে। এই অতি দীর্ঘকালের মধ্যে স্বদেশের বা বিদেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে একজন লোকও আমাকে বলেনি আমার কাছ থেকে চিঠির জবাব চায় না। 'আমার জন্মভূমি'তে একজন বাঙ্গালী বালিকার এই স্পর্ধা দুঃসহ। অতএব জবাব দেবই, দেবই, দেবই। এবং এই চিঠির জবাব চাইনে, চাইনে, চাইনে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুনশ্চ: এই জবাবের জন্য শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর কৃতজ্ঞতা প্রাপ্য নয়। তোমার নিজের অপরিমেয় অহঙ্কারের কাছে কৃতজ্ঞ থেকো।

ওঁ ॥ চার ॥

কল্যাণীয়াসু,

রাণী এইমাত্র তোমার চিঠি পেলুম—কিন্তু খুশী হয়েছি কি করে বলব? তোমার জ্বর বেড়েছে শুনে আমার একটুও ভালো লাগছে না। ইচ্ছে করছে কোনো রকম ঝাঁকানি দিয়ে জোর করে তোমার ব্যামোটা ঝাড়িয়ে দিই। এই ব্যামোর বীজ কোন্ মর্মস্থলে আশ্রয় নিয়েছে সেখানে আরোগ্যের কোনো

চেষ্টাই নাগাল পাচ্ছে না, এর জন্যে আমার মনের মধ্যে ভারি একটা উদ্বেগ রয়ে গেছে। আজ এইমাত্র নটুদের একটা নতুন গান শেখাচ্ছিলুম কিন্তু তোমার চিঠি পড়ার ব্যথা আমাকে ভিতরে ভিতরে ভারি পীড়ন করছিল, কিছুতে ঝেড়ে ফেলতে পারছিলুম না। মানুষের মনের একান্ত উৎকণ্ঠার যদি কোনো শক্তি থাকত তাহলে আমার ইচ্ছার জোরে তোমার শরীর সুস্থ হয়ে উঠত। নিশ্চয় আর ওষুধ খেয়ো না।

আমি কতকটা ভালো আছি। কিন্তু বুকের কাছে ক্লান্তির বাসাটা ভাঙেনি। এখানে একটা বড় উৎপাত আছে। কত যে টুরিস্ট এসে আক্রমণ করে তার সংখ্যা নেই। শুনছি আজ এগারো জন মার্কিন অতিথি আসবে। তাছাড়া আজ ইটালীয়ান কন্সালদের আসবার কথা আছে। তাছাড়া আজ ...আসবে নোটিস দিয়েছে, তাছাড়া আরো অনেকগুলি ভারতবর্ষীয় এখানে ছুটি যাপন করে যাবে বলে শাসিয়ে রেখেচে।

সেই পাগল কবি বেচারা দিন তিনেক এখানে ছিল। কথায় বার্তায় হঠাৎ তাঁকে পাগল বলে চেনা যায় না। এমন কি, সে বেশ ভালো করেই আলাপ করতে পারে। আমাকে কাল বলছিল, আমার অবস্থা আপনার চিরকুমার সভার পূর্ণবাবুর মত—আমার এক রসিক দাদা আছেন (অর্থাৎ আমি) তাঁর কাছে এসে মনের সব কথা বলতে চাই কিন্তু কিছুই বলতে পারিনে। লোকটিকে দেখে আমার বড় কষ্ট হয়—একটুখানির জন্যে ওর তার ছিঁড়ে গেছে অথচ হয়ত ওর যন্ত্রটি ভালো করেই গড়া ছিল। ও যেন আমাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। কাজের ও বিশ্রামের ব্যাঘাত করলেও ওকে আমি ফিরিয়ে দিতে পারি না। আমাদের সকলের মধ্যেই একটা পাগল আছে, সে আমাদের সব দেখা ও ভাবার মধ্যে নিজের খেয়ালী রং মিশিয়ে দেয়, আমাদের ছবির মধ্যে নিজের তুলি বুলোয়, আমাদের গানের মধ্যে নিজের সুর লাগিয়ে বসে। ফলের মধ্যে আঁঠির কর্তা হচ্ছেন জ্ঞানী, তিনি তাকে পাকা রকমে পাহারা দেন, আর ফলের মধ্যেকার পাগল বসে বসে খামাকা তার খোসার উপর রং মাথায়, যে খোসা ফেলে দিতে হবে, তার শাঁসের মধ্যে রসের সাধনা করে যে শাঁস দুদিনে যাবে নষ্ট হয়ে, তাতে পাগলের খেয়াল নেই। যে পাগলের তুলি রং দিতে গিয়ে খোঁচা দিয়ে বসে, তাকে নিয়েই বিপদ। জীবনের মধ্যে পাগলের খোঁচা সম্পূর্ণ এড়ানো চলে না—এড়াতে পারলে বেশ ঠাণ্ডা হয়ে দিনে ঘুমিয়ে তাস পাশা খেলে নিরাপদভাবে সংসার যাত্রা করে নাতী নাতনীর মুখ দেখে কোম্পানীর কাগজ জমিয়ে আয়ুটিকে বায়ুর ধাক্কা থেকে বাঁচিয়ে চলা যেতে পারত। সে আর হয়ে উঠল না।

বুধবারে আমি বলিনি—কিন্তু মন খুঁত খুঁত করছিল—ভিতরকার পাগলটা তাড়া দেয়, ঠাণ্ডা থাকতে দেয় না। এখনো মনে হচ্ছে ফাঁক দেওয়াটা ভালো হয়নি। কেন না বুধবার পরের হিতের জন্য নয়, ওটা আমার নিজেরই গরজে। নিজের ভিতরকার কথা শুনতে পাইনে যদি কবিকে শোনাতে না বসি। এই ভিতরকার মানুষটা বাইরের মানুষটার সঙ্গে ঘর করে বটে কিন্তু তেমন চেনা শোনা নেই—সেইজন্যে তাকে চেনবার জন্যেই মাঝে মাঝে তাকে বাইরে আনতে হয়—তাতে করে অন্তত খানিকক্ষণের মতো বাইরের লোকটাকে থামিয়ে রাখা যায়। যাহোক সম্প্রতি এই বাইরের লোকটা তাগিদ দিচ্ছে স্নান করতে যেতে হবে—বেলা অনেক হয়ে গেল। আমার অন্তরের আশীর্বাদ জেনো।

ইতি ১৯শে চৈত্র (ঘোষের ডায়েরী থেকে তারিখ পেয়েছি।) ১৩৩২।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

GOVER... LIBRARY

॥ পাঁচ

কল্যাণীয়াসু,

রাণী, কোথাও একটা [illegible] ঘটনায় উপদ্রব হলে আমার বুকের ভিতর ভারি একটা ক্লেশ উপস্থিত হয়। এই হিন্দু মুসলমান উৎপাতে আমার শরীরটাকে ভারি পীড়ন করচে। এক এক সময় মনে হয় অবস্থা শোচনীয়তম না হলে অবস্থার পরিবর্তন হয় না। মারের বীজে আমরা ধর্মের নামে জল সেচন করে এসেছি, তারই ফল ফলে যখন মাথায় ভেঙে পড়বে তখনই চিকিৎসার কথা প্রাণপণে স্মরণ করতে হবে। অতএব মারকে পালন করার চেয়ে মারকে খাওয়াই ভালো। এইটি হচ্ছে প্রথম কথা, যেটা সম্প্রতি মাথার ভিতর সর্বদা ঘুরচে, তাই লিখে ফেললুম।

দ্বিতীয় কথাটা হচ্চে, তুমি খুব লক্ষ্মী মেয়ে। আমাকে বেশ ভদ্ররকম করে চিঠি লিখেছ, তাতে ঝগড়াঝাটির কোনো আমেজ নেই—কিন্তু রোজ শতকরা একশ ডিগ্রির হারে জ্বর করা এটা কি রকম? এক এক সময় মনে হয় কোনো কবিরাজী ভালো টনিক ব্যবহার করে দেখলে কিরকম হয়। কবিরাজ বলতে আমাকে বুঝে নিও না, তাতে আমাকে খাটো করা হবে—বিজ্ঞাপন প্রভৃতিতে নিশ্চয়ই দেখে থাকবে আমি কবিরাজ নই, আমি কবিসম্রাট।

তৃতীয় কথাটা হচ্ছে এই যে, দিলীপ আমাকে একখানি পত্র লিখেছিল আমি তার জবাবও লিখেছিলুম। সেই ডাক এবং ডাকের পেয়াদা একযোগে পঞ্চত্ব পেয়েছে কিনা জানিনে। রামানন্দবাবুকেও সেই জগদীশের পত্রাবলীর একটা ভূমিকা সমেত একটি রেজিস্ট্রী পত্র চালনা করেছিলুম। সেটাও পৌঁছলো কিনা খবর পাইনি।

ক্লান্ত হয়ে আছি—সর্বদাই কেবল ঘুম পায়। লিখতে লিখতে ঘুমিয়ে পড়ি—বই পড়তে গেলে সেটা যেন ক্লোরোফর্মের কাজ করে। মাঝে মাঝে চৌকিতে পড়ে আধ ঘুম আধ জাগা অবস্থার কুয়াসার ভিতর দিয়ে আমার ঐ মধুমঞ্জরী লতাবিতানের উপরকার আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের নিরন্তর হাত কাড়াকাড়ি দেখি আর ভাবি—

"ভালোবেসেছিনু এই ধরণীরে
সেই স্মৃতি মনে আসে ফিরে ফিরে
কত বসন্তে দখিন সমীরে
ভরেছে আমার সাজি।
আজ হৃদয়ের ছায়াতে আলোতে
বাঁশরী বেজেছে আজি।"

ইতি ২৫শে চৈত্র ১৩৩২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুনশ্চ: পয়লা বৈশাখে তোমরা আসবে ত? না হিন্দু মুসলমানের প্রেম সম্মিলনের জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে?

১৯২৬ সালে কলকাতায় যে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা বেধেছিল এ চিঠিতে তারই উল্লেখ রয়েছে।

আমরা চৈত্র সংক্রান্তির আগে গিয়ে পৌঁছই। তারপর ১লা বৈশাখের উৎসব হয়ে গেলেও আমি অনেকদিন শান্তিনিকেতনে ছিলাম। কবি থাকতেন কোনার্কে আর আমি মীরাদেবীর কাছে মৃন্ময়ীতে। এই মৃন্ময়ী নামে ঘরখানা কোনার্কেরই পাশে খড়ে ছাওয়া ঘর ছিল তখন।

কবি কোনার্কের চাতালে বসে সারাদিন গান লিখছেন, মেয়েদের শেখাচ্ছেন। সেইবারই "দিন পরে যায় দিন", "হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজী কি পাইনি" "লিখন তোমার ধূলায় হয়েছে ধূলি"

প্রভৃতি অনেক গান লেখা হয়। আমার এই চিঠিখানার শেষে ভালো-বেসেছিনু এই ধরণীরে

সেই স্মৃতি মনে আসে ফিরে ফিরে,
কত বসন্তে দখিন সমীরে
ভরেছে আমার সাজি।
আজ হৃদয়ের ছায়াতে আলোতে
বাঁশরী বেজেছে আজি"

এই কয়টা লাইন লিখেছিলেন। শান্তিনিকেতনে গিয়ে দেখি এইটাই একটা গানে পরিণত হয়েছে যার প্রথম লাইনটা হচ্ছে "হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজী কি পাইনি।" আমার চিঠির মধ্যে ছিল "আজ হৃদয়ের ছায়াতে আলোতে বাঁশরী বেজেছে আজি", পরে সেটাকে গানের মধ্যে সংশোধন করে বাঁশরী উঠেছে বাজি" করেছেন।

যতদূর মনে পড়ে সেইবার নববর্ষের দিনই সকালবেলা উৎসব অনুষ্ঠানের পরে "কোনার্কের" কাছে "পঞ্চবটীর" বৃক্ষরোপণ হোলো।

যখন "লিখন তোমার ধূলোয় হয়েছে ধূলি" গানটা কবির মুখে প্রথম শুনলাম, শেখাতে গিয়ে বল্লেন, "জানো এ গানটা লেখা হোলো কেমন করে? চাতালে বসে দেখলুম গ্রীষ্মের শুকনো হাওয়ায় লাল কাঁকরের রাস্তার উপর ফরফর করে একটা ছেঁড়া চিঠির টুকরো উড়ে চলেছে; ব্যাস, ঐটুকু। কেমন যেন মনের মধ্যে একটা ছবি তৈরী হয়ে উঠলো যে একদিন যে চিঠির কতো আদর ছিল আজ তা অনাদরে পথের ধূলোর উপর উড়ে চলে যাচ্ছে। এই ছবিটাতে মন উদাস হোলো বলেই সঙ্গে সঙ্গে গান আপনি তৈরী হয়ে উঠেছে। মনে করলে যেন কি রকম আশ্চর্য লাগে যে কতো সামান্য উপলক্ষ্য ধরে এক একটা কবিতা লেখা হয়েছে। এই বসন্ত কালে, এই বৈশাখের শুকনো বাতাসে সহজেই কেমন যেন মনটা কাজ ভুলে গিয়ে কেবলি গান তৈরী করতে চায়। সারাদিনই মাথার ভিতরে সুর গুন্ গুন্ করছে। খালি চুপ করে চেয়ে চেয়ে পৃথিবীটাকে দেখি আর ভাবি কি দরকার বিশ্ব-ভারতীর? কী দরকার কাজকর্মের? শুধু গান গেয়ে, কবিতা লিখে আলস্যে দিন কাটিয়ে দিলুমই বা। তাতে পৃথিবীর কিইবা ক্ষতি হবে? এই রকম মন নিয়েই তো লিখেছিলুম 'হেলা ফেলা সারা বেলা একি খেলা আপন মনে।' গান জিনিসটা ভারি বিশ্রী; একবার যখন পেয়ে বসে তখন অন্য সব দায়িত্ব ভুলিয়ে দেয়।"

মনে পড়ছে আর একদিন কবির মুখে শুনেছিলাম "আহা জাগি পোহালো বিভাবরী" গানটা লেখার বিবরণ। সেদিন কবি তাঁর বজরাতে ছিলেন পদ্মায়। সঙ্গে দুই ভ্রাতুষ্পুত্র—শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সন্ধ্যে থেকে দারুণ ঝড়, সারা-রাত সেই ঝড়ের মধ্যে উদ্বেগে কাটাতে হোলো। ক্ষণে ক্ষণে মনে হচ্ছে এইবার বুঝি নোঙ্গর ছিঁড়ে নৌকো উলটে যাবে। সমস্ত রাত তিনজনে জেগে বসে রইলেন। ভোরবেলা প্রকৃতি শান্ত হোলো। সেই ভোরে ঐ গানটি লেখা। হাসতে হাসতে বললেন, "গানটা শুনে কি কল্পনা করতে পারো যে এই রকম অবস্থায় ঐ গান লিখেছি? সেদিন কোনো সুন্দরীই ধারে কাছে ছিল না। শুধু ছিল আমার বন্ধু আর সুরেন, এবং কবিত্ব করবার মতো রাত্রি জাগরণ নয়, একেবারে জীবন মরণের দোলার মধ্যে রাত কেটেছিল। অথচ আশ্চর্য এই যে গানের মধ্যে সে উদ্বেগের কোনো চিহ্ন নেই।"

আর একটা গান সম্বন্ধেও বলেছিলেন। সেটা হচ্ছে "কখন বসন্ত গেলো এবার হোলো না গান।" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মানসী" নামে একটা স্টীমার ছিলো, বোধহয় তিনি যখন দেশী স্টীমার কোম্পানী করে বিদেশী প্রতিপক্ষদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছেন সেই সময়। কবি কয়েকদিন এই কলকাতার কাছে গঙ্গার-বুকে কাটিয়েছিলেন সেই "মানসীতে", সেই সময় ঐ গানটা গঙ্গাতে বসেই লেখা।

পয়লা বৈশাখের উৎসব শেষ হয়ে গেলে প্রতিমাদেবী একদিন কবির কাছে একটি দরবার নিয়ে উপস্থিত হলেন—পঁচিশে বৈশাখ কবির জন্মোৎসবে শুধু মেয়েদের নিয়ে একটা নাটক অভিনয় করাতে চান। সেটা এমন হওয়া চাই যাতে কোনো পুরুষের ছোঁয়া থাকবে না। তাই তাঁর বাবামশাই যদি পূজারিণী কবিতাটা নাটকে রূপান্তরিত করে দেন তাহলে সহজেই হয়ে যায়। প্রস্তাবটা কবির খারাপ লাগলো না। "বৌমার যখন শখ হয়েছে তখন ওটা আমাকে করতেই হবে। কিন্তু ও'র শুধু মেয়েদের প্রতিই এরকম পক্ষপাতিত্ব কেন। বেচারা ছেলেরা কি দোষ করলো?"

নাটক লেখা শুরু হোলো। মনে আছে সেই সময়ে প্রতি-দিন সন্ধ্যেবেলা আমরা সবাই কী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতাম পড়া শোনবার জন্যে। সারাদিনে যতটা লেখা হোতো সন্ধ্যেবেলা সবাইকে সেটা পড়ে শোনাতেন। দেখতে দেখতে বোধ হয় তিন দিনের মধ্যে "নটীর পূজা" বইখানা লেখা হয়ে গেলো।

(ক্রমশ)

GOVERNMENT LIBRARY

প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

৫৭

যত দূর সাধ্য জোরে পা চালিয়ে এ-রাস্তা ও-রাস্তা করে হাঁটতে লাগল কাকলি। দু একটা খালি ট্যাক্সি কোন না চোখে পড়ল এখানে-ওখানে। লোভ হলেও ডাকতে সাহস হল না। কে জানে কোন চক্রান্তে মানুষ ধরবার সোজা গাড়ি না হয়ে পাখি ধরবার ফাঁদ হয়ে এসেছে। কোন পথ দিয়ে ছুটিয়ে কোন আস্তানায় নিয়ে গিয়ে তুলবে তার ঠিক কি।

তার এখন কাজ হবে কি জালে পড়া আর জাল থেকে বেরিয়ে আসা?

বড় রাস্তা পেতে দেরি হল না। কিন্তু কোথাও কি একটু ছায়া নেই যে শান্তিতে দাঁড়ায়? দেখে-শুনে বাস ধরে?

বাণবেঁধা যন্ত্রণার মত লাগছে এখন এই দুপুরটাকে। যদি তেমন একটা দরজা-জানালা-আঁটা ছায়া-ছায়া-করা ঘর পাওয়া যেত আর একটা শীতলপাটির ঢালা বিছানা, তা হলে নদীর জলের উপর যেমন সন্ধ্যা পড়ে উপুড় হয়ে তেমনি কাকলি একরাজ্যের ঘুমের উপরে এক রাজ্যের ক্লান্তি হয়ে উপুড় হয়ে পড়ত। নিজের মনে হাসল কাকলি। কেন, তেমন ঘর তো একখানা তার নিজের বাড়িতেই আছে। নির্জনতা দিয়ে তৈরি, নিঃসঙ্গতা দিয়ে ছায়া করা। সেই ঘরের দরজা জানলা এঁটে দিব্যি ঘুমোনো যায় গা ঢেলে। আর ঘুমিয়ে পড়লে পর শীতলপাটি না শীতল মাটি এ কে খেয়াল করে? তবে বাড়ি ফিরে গিয়েই তো যন্ত্রণার লাঘব করা যায়। কে আর রোদ্দুরে টো-টো করে?

কিন্তু এখন এমন পরিস্থিতি ঘুমুবার সময়ও প্রহরী দরকার। বেশ বিশ্বাসী মজবুত, সতর্ক প্রহরী। ঘরের মধ্যে নিজের কাজকর্ম, পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত, অনাত্মমনস্ক থাকবে, আর পরিপূর্ণ অর্পণে স্তর থেকে স্তরে তল থেকে তলে ঘুমের সমুদ্রে নেমে যাবে কাকলি। কতদিন ঘুমোয়নি এমন নিশ্চিন্তে, অনুকূল পাহারার অধীন। নিশ্চিন্ত না হতে পারলে আর ঘুম কই, ঘুমের সুখ কই?

সুন্দর ব্যবস্থা। নিজের মনেই আবার হাসল কাকলি, আর আরো একজন হাসছে

সৌজন্য[illegible]

বুঝতে পারল। তুমি ঘুমুবে আর আমি পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকব? এদিকে ঘর অন্ধকার।

অন্ধকারে পড়া যায় এমন গ্রন্থও কিছু আছে হয়তো পৃথিবীতে।

তাই নাকি? পড়া যায় আর অনাত্মমনস্কও থাকা যায়!

কটা বাস ছেড়ে দিয়ে আরেকটা বাসএ উঠে পড়ল কাকলি। এতক্ষণে যদি বুদ্ধি করে গিয়ে থাকে বাবার কাছে। কথাটা যদি পেড়ে আসে। তারপর কাকার কাছে পাঠাব। তা হলেই পাকা হবে বন্দোবস্ত। পূর্ণ হবে পূর্বেশ্বর।

'বিনতা আছিস?' সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে হাঁক পাড়ল কাকলি।

'আছি। এইমাত্র আসছি।' ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এল বিনতা। 'এত তীব্র স্বর? আনন্দ না আর্তনাদ?'

'আনন্দও নয় আর্তনাদও নয়। এ প্রতিবাদ। এ ক্রোধ।'

'কার উপর? আমার উপর?'

'না। মার উপর।' ঘরের মধ্যে চলে এসে তক্তপোশে বসে পড়ল কাকলি।

'মার উপর? কেন, কী হল?'

'সেই চিরন্তন হস্তক্ষেপ—'

'কেন, কী বলছেন মাসিমা?' উৎসুক হল বিনতা। বসল মুখোমুখি।

'এদিকে বলছেন মেয়ের ইচ্ছেই একমাত্র গ্রাহ্য। আসলে তাঁর ইচ্ছের সঙ্গে মেয়ের ইচ্ছের মিশ খেলেই তবে তা গ্রাহ্য। নইলে ভেবে দ্যাখ আমি এত বড় ধাড়ী একটা মেয়ে, আমার একটা স্বাধীনতা নেই—'

'মায়ের কাছে মেয়ে কখনো বড় হয়? ডাক-নাম খুকিই থাকে।'

'খুকি? আমি খুকি? তোকে বরং খুকি বলা যায়, আমাকে নয়।' গর্বের ভাব করল কাকলি। 'আমি বিবাহিত।'

'আর বিবাহিত কোথায়?' মুখটিপে হাসল বিনতা।

'আর বিবাহিত কোথায় মানে? আমি কি তবে এখন প্রবাহিত?'

'প্রবাহিত!' বিনতা এবার শব্দ করে হাসল।

ভূতপূর্ব সৈনিক অমিয় হালদার রচিত পল্টন জীবনের চিত্তাকর্ষক কাহিনী

পল্টন ছাউনি

সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা "গল্প ভারতী"তে
ধারাবাহিকভাবে "পল্টন নম্বর ৩৪৩" নামে প্রকাশিত
দাম ঃ চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা
পরিবেশক ঃ—দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
৫৪।৩ কলেজ স্ট্রীট — কলিকাতা

(সি ৯০০৯)

মনোজ বসুর কালজয়ী উপন্যাস

মানুষ গড়ার কারিগর (২য় মুঃ) ৫·৫০
মানুষ নামক জন্তু (২য় মুঃ) ৩·০০
ভুলি নাই (২৯শ মুঃ) ... ২·০০
জলজঙ্গল (৩য় মুঃ) ... ৫·০০
বৃষ্টি, বৃষ্টি (৫ম মুঃ) ... ৫·৫০
বকুল (৩য় মুঃ) ... ২·০০
॥ এক বিহঙ্গী (৩য় মুঃ) ৪·০০
॥ রক্তের বদলে রক্ত ... ২·৫০
॥ সৈনিক (৭ম মুঃ) ... ৪·০০
॥ শত্রুপক্ষের মেয়ে (৪র্থ মুঃ) ৩·৫০
॥ বাঁশের কেল্লা (৫ম মুঃ) ২·২৫
॥ গল্প সংগ্রহ (১ম খণ্ড) ৪·০০

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা • ১২

'মানে আমি এখন শুধু বয়ে যেতে এসেছি?'

'বয়ে যেতে এলেই বা। প্রবাহিনীরইতো বেশি স্বাধীনতা।'

'হ্যাঁ, সেই কথাটা বল। নদী কি পরের হাতে আঁকা রেখা ধরে চলবে? শুধু জলের নদী নয় রক্তের নদী, হৃদয়ের আদি গোমুখী থেকে যার উৎসার—'

'বা সে কী কথা? হৃদয়ের উপর হাত দেবে কে? কেন মাসীমা বলছেন কী?'

'বলছেন যার-তার সঙ্গে প্রেম করা চলবে না।' বিনতার হাত চেপে ধরল কাকলি। 'বল এ কথা আমার মত সাবালক মেয়েকে কেউ বলতে পারে? নিজের পায়ে দাঁড়ানো রোজগেরে মেয়েকে?'

'বা, তা কী করে বলা যায়!'

'ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান স্বামীর সঙ্গে আমার ইচ্ছে প্রণয় করব। বল, এতে আইন আমার পক্ষে নয়? সমাজ? ধর্ম?'

'এ কথা এতদিন পরে ওঠে কী করে?'

'উঠতেই পারেনি। স্বপ্নটা শক্ত, দৃঢ় হয়ে আছে।'

'তা ছাড়া যার সঙ্গে প্রেম করছিস সে তো মাসীমার মনোনীত। বিরোধ তা হলে বাধে কিসে?'

'না, মনোনীত নয়। তারই জন্যে বিরোধ।'

'সে কি, মনোনীত নয়?' চমকে উঠল বিনতা।

'আমার কথা হচ্ছে, গোস্বামীকে ভালোবাসো, ভূস্বামীকে ভালোবোস, ঠিক আছে, কিন্তু খবরদার, শুধু স্বামীকে পাবে না ভালোবাসতে।'

'কাকে? মুখ্যস্বামীকে?'

'না, না, কোনো মাদ্রাসীকে নয়। শুধু-স্বামীকে। মানে পরের ভূতকে নয়, পূর্বের ভূতকে। সংক্ষেপে ভূতপূর্ব।' হাত ধরে ঝাঁকি মারল কাকলি। 'বল এমন কোনো গ্যাগ চলে — মানা যায় তেমন বন্ধন?'

'কী বলিস!' উছলে উঠল বিনতা: 'তোর কাছে ফিরে এসেছে সুকান্ত?'

'ফিরে আসার কথা নয়। স্বাধীনতার কথা। ফিরে আসতে পারার কথা, পথের কথা। ঘর বাঁধতে হবে বলে নতুন জমিতে নতুন সাজপাটে তুলতে হবে, পুরোনো ভাঙা ঘর মেরামত করে নেওয়া যাবেনা সাবেক বনেদে এমন নিষেধ অচল।'

একশোবার অচল।' গাঢ় সমর্থন করল বিনতা। 'যদি মেরামত করে নেওয়া যায়, যদি মেরামতির মশলা থাকে, তবে তার মত শ্রেয় তার মত প্রেম আর কী আছে, কী হতে পারে? যা শ্রেয় তা সব সময়ে প্রেয় নয়, যা প্রেয় তা সব সময়ে শ্রেয় নয়, চিরদিন এই দ্বন্দ্বের কথা শুনে এসেছি। কিন্তু এইখানে নির্দ্বন্দ্ব, এইখানে শ্রেয়প্রেয় একসঙ্গে।'

কী সুন্দর করে প্রশান্ত মুখে বলছে বিনতা। আর অমন নিপুণ করে কথাটা কাকলি সাজিয়েছিল বলেই না পেল অমন করে বলতে।

'হৃদয়ের কোন আকরে কোন মশলা যে লুকিয়ে আছে উপর-উপর বোঝা যায় না। গভীরে যখন ঘা লাগে তখনই কঠিনের শয্যায় রসের ঘুম ভাঙে।'

'কিন্তু এতে মাসিমার অপ্রসাদ কেন?

'আর তোর?' ভয়ে-ভয়ে তাকাল কাকলি।

'সোনার বাসন ভেঙে গিয়েছিল, আবার তা জোড়া পড়বে, এতে আমার আনন্দ, কার না আনন্দ, সকলের আনন্দ। আর তা ছাড়া যে-পুরাতন ছিল, ছিন্নমূল হবার পর ফের স্বস্থানে তার পুনর্বাসন হচ্ছে এ প্রসঙ্গের কাছে বিনতা-বরেন অবান্তর, তুচ্ছ। যেমন হৃদয়ের কাছে দেহাভ্যাস তুচ্ছ। যদি সুকান্তকে আনতে পারিস তবে তো তুই জয়ী, তোর প্রেম জয়ী। সে ক্ষেত্রে মাসিমার তো উচিত তোকে সংবর্ধনা করা।'

'মার ধারণা আমি সুকান্তকে আনছি না, সুকান্তই আমাকে টানছে। সুতরাং আমার মান-ইজ্জত থাকল না কিছু।'

'সুকান্ত আনীত না তুই টানিত এ প্রসঙ্গও অনর্থক। মরুভূমির হাওয়া শুকনো, তার মধ্যে জল নেই, তাই মেঘ এলেও তার থেকে বৃষ্টি সে আদায় করতে পারে না।' শান্তশ্রী মুখে মেখে কাকলি বললে, কিন্তু যেখানে মেঘেও জল হাওয়াতেও জল সেখানেই বর্ষণের আশীর্বাদ। যদি আবার তোদের মিলন হয়, আনন্দবর্ষণ হয়, এরই জন্যে হবে যে তোর প্রাণের এক কোণে একটুকু ভালোবাসা ওরও প্রাণের এক কোণে একটুকু ভালোবাসা জেগে ছিল। সে খুশী রঙ জেনানা [illegible]

দেবপ্রিয় দে তরুণ লেখক হলেও লেখার ভঙ্গিমা, ভাষা ও সর্বোপরি গল্পের অভিনবত্ব তাঁর তারুণ্যকে ছাড়িয়ে বহু ঊর্ধ্বে চলে গেছে।

মৃগতৃষ্ণা

এমন বিচক্ষণ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও বাস্তব সমস্যার অবতারণা বহু অভিজ্ঞ লেখকদের রচনার মধ্যেও বিরল।

মূল্য: ২·৫০ এই বইখানির ঘরে ঘরে প্রচার দরকার। বহু শিক্ষণীয় জিনিষ আছে এর মধ্যে।

নব বলাকা প্রকাশনী, ৪ নফরচন্দ্র লাহা লেন। কলি—৩৬

(সি ৮৭৬৭)

নতুন বই

...

শ্রীবাসব-এর সদ্যপ্রকাশিত নবতম উপন্যাস

আনন্দী কল্যাণ ২-৫০

উদ্ভট রাগ আনন্দী-কল্যাণের মতই বিচিত্র এই কাহিনীর সুর ও আলাপ বিস্তার। পরিচিত সমাজ সংসারের ক্ষুদ্রতা ও কলঙ্কের ঊর্ধ্বে আদিম দম্পতির মতই দুটি নরনারীর অপরূপ জীবনসাধনা। অসামান্য বলিষ্ঠ উপন্যাস।

দেওয়ান বাড়ি ॥ ৭·৫০ ॥ কত বিনোদিনী ॥ ৪·০০

এক মুঠো মাটি ॥ ৪·০০ ॥ (২য় সং)

প্রবোধকুমার সান্যাল-এর
নতুন ভ্রমণ-সাহিত্য
পায়ের দাগ ৪-০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র
বহুপ্রশংসিত উপন্যাস
ঢেউয়ের পর ঢেউ ৪-০০

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য-এর
সপ্তপর্ণী ৩-০০

জগদীশ গুপ্ত-এর
অপ্রকাশিত নতুন উপন্যাস
কলঙ্কিত তীর্থ ২-৫০

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে
কাজি নজরুল ইসলাম-এর অপ্রকাশিত কবিতা সঙ্কলন।

ঝড়

বিশ্ববাণী ॥ ১১-এ বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট ॥ কলিকাতা ৭ ॥

সেই ক্ষেত্রে ভালোবাসারই তো জয় দেব সবাই।'

'যদি বিয়ে হয় যাবি তো?'

'একশোবার যাব।' বলেই জিভ কাটল বিনতা। 'না, একশোবার নয়। একবার যাব। আর একবার। গিয়ে প্রাণ ভরে সাজাব তোকে। দুর্গার মতন সাজাব।'

সেখান থেকে ফের বাসএ করে সুকান্তর হোটেলে এল কাকলি। বললে, 'শিগগির কিছু খাওয়ান। লাঞ্চ ভেস্তে গিয়েছে। সারাদিন প্রায় অভুক্ত আছি।' নিজেই কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেল। 'কই ডাকুন কাউকে। মোগলাই পরোটার মত মুখ করে থাকবেন না।' বসল চেয়ারে।

'জানেন আপনাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম।'

'খেতে দিয়েছিল?'

'প্রচুর।'

'আর আপনি আমাকে দিচ্ছেন না কিছুই—'

'আর সবচেয়ে যা প্রচুর, আপনার বাবার সঙ্গে আলাপ হল।'

'হল? কেমন দেখলেন?'

'খুব ভালো। হিতৈষী। আপনার জন।'

'বিকেলে আরেকবার যাবেন মাকে দেখে আসবেন। জবরকে তো ডরাই না কাপুরুষকে ডরাই।' আতঙ্ক গ্রস্তের মত মুখ করল কাকলি।

'কাউকে ডরাই না। কিন্তু আপনাদের লাঞ্চটা ভেস্তে গেল কেন?'

'তার মানে, আপনার মতলব, আমি সেই বিরাট কাহিনী বিশদ করে বলি, আর বলতে বলতে তবু এখনো কোনোরকমে টি'কে আছি, শেষ পর্যন্ত না খেতে-খেতে টে'সে যাই। আপনার সর্বসমস্যার সমাধান হোক।'

ব্যস্ত সমস্ত হয়ে সুকান্ত বয়কে ডেকে বিস্তীর্ণ অর্ডার দিল। 'আমি কিন্তু কিছু খাবনা।'

'একটু একটু খাবেন।'

'একটু একটু? কেন আমি কি পাখি? চণ্ডুভোজী?'

'তবে—'

'কেন, আমি গোগ্রাসে খেতে পারিনা?'

'আপনি—আপনি সব পারেন।'

টেবিল সাজিয়ে দিল বয়।

খেতে-খেতে কাকলি বললে, 'এখন আরেকটা কাজ বাকি।'

'মোটে আরেকটা?' উসখুস করে উঠল সুকান্ত।

'হ্যাঁ, আরেকটা।' গম্ভীর হল কাকলি। 'কী বলুন।'

'এখন একবার আপনার বাড়িতে গিয়ে আপনার বাবাকে বলা—'

'আমার বাড়ি। আমার বাড়ি-টাড়ি কিছু নেই।' মুহূর্তে প্রতিহত হল সুকান্ত।

'সে তো কারুরই কিছু নেই। দারাপুত্র পরিবার, তুমি কার কে তোমার—এ সব ভাব

ভগিনী নিবেদিতার চতুর্নবতি জন্মদিবসে প্রকাশিত

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী-র

ভগিনী নিবেদিতা

ও

বাংলায় বিপ্লববাদ

'লোকমাতা' নিবেদিতা সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ জীবনালেখ্য।

উৎকৃষ্ট ছাপা ও বাঁধাই। মূল্য : পাঁচ টাকা

"......তিনি ছিলেন লোকমাতা।......তিনি যখন বলিতেন Our People তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত আমাদের কাহারও কণ্ঠে তেমনটি তো লাগে না। ভগিনী নিবেদিতা দেশের মানুষকে যেমন সত্য করিয়া ভালোবাসিতেন তাহা যে দেখিয়াছে সে নিশ্চয়ই ইহা বুঝিয়াছে যে দেশের লোককে আমরা হয়তো সময় দিই, অর্থ দিই, এমন কি, জীবনও দিই কিন্তু তাহাকে হৃদয় দিতে পারি নাই—তাহাকে তেমন অত্যন্ত সত্য করিয়া নিকটে করিয়া জানিবার শক্তি আমরা লাভ করি নাই।"..........রবীন্দ্রনাথ

১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ কলিকাতা-২৯ ॥ জিজ্ঞাসা ॥ ৩৩, কলেজ রো কলিকাতা-৯

উৎসবে

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট • কলিকাতা

তো আছেই। এ সব ভাব তো কেউ কেড়ে নিচ্ছে না। কিন্তু যেখানে আপনার বাবা মা, আপনার ভাই-বোন, আপনার—' দু চোখে আনন্দের আলো দুটি দীপ জ্বালল কাকলি।

'কে আমার?'

'আপনার সেন্টু—' দীপশিখা কাঁপতে লাগল, উজ্জ্বল হয়ে।

'ও! সেন্টু?' আপনমনে হাসতে লাগল সুকান্ত।

'যেখানে ওরা রয়েছে সেখানেই আপনার বাড়িঘর। তা আপনি শখ করে দূরেই থাকুন বা আলাদাই থাকুন—'

'আপনি আবার শখ করে ঐ বাড়ির মধ্যেই ঢুকতে চান নাকি?'

কাকলি হাসল। 'তার আমি কী জানি! আপনার বাড়ি, আপনি জানেন দেবেন কিনা ঢুকতে। কিন্তু এখন ঢোকার কথা হচ্ছে না। এখন বলার কথা হচ্ছে, ঘোষণার কথা হচ্ছে। তাই যান একদিন, বাবাকে গিয়ে বলুন সবিনয়ে।'

'উরে বাবাঃ, এ অসম্ভব। বাবা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।'

'সবাই সবাইকে তাড়িয়েছেন। আপনার বাবা আপনাকে, আমার বাবা আমাকে। আপনি আবার আমাকে, আমি আপনাকে। দুই মা বুঝি দুজনকেই। মনে হচ্ছে যেন অরাজক রাজত্বে ছন্নছাড়া প্রজার মত বাস করছি। কিন্তু না, রাজা একজন আছে ঠিক বসে, শত বিক্ষোভে-উপদ্রবেও তাকে তার সিংহাসন থেকে নামানো যায়নি, যায়না নামানো।'

'সিংহাসন আবার কোথায়?'

'সবই জানেন তবু জিজ্ঞেস করছেন!'

'সবই তো জানি তবু শুনতে ইচ্ছে হয়। শোনা দিয়ে জানায় আবার নতুন অর্থ আসে, আস্বাদ আসে।'

'সে সিংহাসন অন্তরে, আর সে রাজার নাম ভালোবাসা।'

'তার হাজার নাম থাক, কিন্তু আসল কথা, আমি গিয়ে বলতে পারবনা। আপনি গিয়ে বলুন।'

'আমি গিয়ে বলব কী! আমার তো কোনো লোকাস স্ট্যাণ্ডিই নেই।' কাকলি হেসে উঠল। 'বিয়ের আগে কনে শ্বশুর-বাড়িতে গিয়ে বলবে, আমি আপনাদের বউ এলাম। এ কোনো দিন কেউ শুনেছে?'

'তার চেয়ে আমি ভাবছিলাম একেবারে কাজ-টাজ সেরে সাজসজ্জা করে যুগলে গিয়ে হাজির হই, সবাইকে চমকে দিই এক সঙ্গে—'

'কাজ-টাজ আগেই সেরে ফেললে লোকে চমকাবে কখন! আর কাজ তো শুধু দুজনের নয়, দুটো বাড়ির কাজ।' ঝোলে মাথা আঙুল চুষতে লাগল কাকলি। 'দুটো বাড়িতে যদি আলোয় বাজনায় গানে হাসিতে মুখর করে দিতে না পারি তা হলে আর কী হল।'

'উঃ, ওসব প্যারাফার্নেলিয়া কী কঠিন ক্লান্তিকর!'

'গ্রাস মেলে খেয়ে নেওয়া তো সোজা কিন্তু তার পিছনে আয়োজনটা একটু দেখুন। সেই উনুন ধরানো থেকে শুরু করে বাজার করা কুটনো কোটা মশলা পেষা রান্না করা—হাজার রকমের অনুষঙ্গ। তবেই আপনার খাওয়া, আপনার ক্ষুন্নিবৃত্তি।'

'শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তি বলছেন কেন? আমার তুষ্টি, আমার পুষ্টি।'

'তবে কঠিন ক্লান্তিকর বলছেন কেন?'

'কিন্তু যাই বলুন, বাড়ি গিয়ে অমন নাটকীয় পোজে বাবার সামনে দাঁড়াতে পারবো না। আর কিছু ভাবুন।'

'ভেবেছি। কাকার কাছে গিয়ে বলুন।' ঝোলে আবার হাত ডোবাল কাকলি।

'এটা বরং সম্ভব। আর তার জন্যে বাড়িতে না গেলেও চলবে।'

'হ্যাঁ, আপিসেই পারবেন বলতে। আর আপিসে যখন, কথাবার্তা সংক্ষেপে হবে। কণ্ঠস্বর নিম্ন।'

'সে আবার আরেক হ্যাঙ্গাম। আকস্মিক অল্প কথায়ই বা কী বলা যায় ভদ্র ভাবে!'

'খানিকক্ষণ আমতা-আমতা করবেন, মুখটা লাজুক-লাজুক, বুঝে নেবেন কাকা।'

'সঙ্গে আপনিও চলুন।'

'মাথা খারাপ! আমি তো তখন পিকচারেই নেই, ফিল্ডেই নামিনি। আপনা-দের খুড়ো-ভাই পোর প্রাইভেট পরামর্শের মধ্যে আমার স্থান কই?'

'কী পরিশ্রমের মধ্যে যে ফেললেন!'

'উপায় নেই।'

'তা না থাক, কিন্তু মাংসের ঝোলমাখা আপনার মুখখানা দেখে আমার কী ইচ্ছে করছে জানেন?'

'জানি। সুতরাং ইচ্ছাকে অব্যক্ত রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।' হাসতে-হাসতে উঠে পড়ল কাকলি। বেসিনে হাত ধুতে গেল। তোয়ালে দিয়ে হাত মুখ মুছতে মুছতে কাকলি বললে, 'চলুন সিনেমায় যাই।'

বেলা ঢলে পড়েছে অনেকক্ষণ।

'চলুন আবার তেমনি ব্যালকনিতে সেই এসকোর্পিস্ট হয়ে বসি।'

'না, এসকেপিস্ট নয়।' কাকলির হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল সুকান্ত। বললে, 'বলো আমার একটা অনুরোধ রাখবে?'

মুখ নিচু করে কাকলি জিগগেস করল, 'কী?'

'সিনেমার পর আবার তুমি আসবে এখানে—'

'বাড়ি ফিরতে তবে দেরি হয়ে যাবে না?'

'হোক দেরি। এখানে থেকে যাবে কিছুক্ষণ। আমার কাছেই তো থেকে যাবে। কিছুক্ষণ মানে বেশ কিছুক্ষণ।'

সুকান্তর চুলে একটু হাত বুলিয়ে দিল কাকলি। বললে, 'এতদিন হল, আর কটা দিন অপেক্ষা করা যায় না?'

'যায়। কিন্তু তুমি তো জানো আমার সেই কৌমারহর হবার সাধ—'

হো-হো-হো করে হেসে উঠল কাকলি। 'আমি কি কুমারী?'

'তা ছাড়া আর কী! আপনি তো মিস মিত্র।'

'চলুন, চলুন উঠে পড়ুন। শো শুরু হতে আর দেরি নেই।'

হুলস্থুল করে বেরিয়ে পড়ল দুজনে।

শোর শেষে ট্যাক্সি করে কাকলিকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিতে এল সুকান্ত। আর বাড়ি ফিরে এসে মাকে কী ভাবে দেখবে তাই ভেবে সারা পথ ম্লান হয়ে রইল কাকলি।

গাড়ি থামতেই গায়ত্রীকে দেখা গেলনা। পঞ্চালি বেরিয়ে এসেছে। সুকান্তকে লক্ষ্য করে বললে, "বাবা আপনাদের ডেকেছেন।'

'মা কোথায় রে?' কাকলি জিজ্ঞেস করল।

'বাবার কাছে বসে।'

দুজনে, কাকলি আর সুকান্ত, বনবিহারীর কাছে এসে দাঁড়াল।

বনবিহারী বললেন, 'ট্যাক্সিটা ছেড়ে দাও। পরে আবার একটা ডাকিয়ে দেব। রাত্রে এখানে খেয়ে যাবে।'

বাবা খাওয়াচ্ছেন কী, মার আনুকূল্যে ছাড়া—কাকলি গায়ত্রীর মুখের দিকে তাকাল। আশ্চর্য, গায়ত্রীর মুখে হঠাৎ নতুন রঙ, কোমলতার রঙ, কমনীয়তার রঙ।

'জিজ্ঞেস করুন ভীষণ খেয়েছি দুজনে।' সুকান্ত সহাস্য প্রতিবাদ করল। 'আজ আর চলবে না কিছুই।'

'তা হলে কালকে এস।' গায়ত্রী বললে, একেবারে অফিস থেকেই চলে এস।' নেমন্তন্ন রইল। ভুলো না।' কাকলিকে বললে, তুই বরং কাল অফিসে একবার মনে করিয়ে দিস।'

কাকলি হাসল, হাসতে লাগল।

(ক্রমশ)

ভারতীয় সঙ্গীততত্ত্ব ও উইলিয়াম জোন্স

রাজ্যেশ্বর মিত্র

ভারতীয় সঙ্গীতের জ্ঞাতব্য তত্ত্ব এবং তথ্যাদি অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত পুঁথিপত্রের দুর্গম অংশে সংরক্ষিত ছিল। ১৭৮৪ সালে সার উইলিয়াম জোন্স ভারতীয় সঙ্গীতের রাগতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ প্রস্তুত করেন। এ প্রচেষ্টাকে অসাধারণ বলব, কেননা, যে যুগে এই নিবন্ধ রচনা করা হয়েছে সে যুগে আমরা যে নেহাৎ সভ্য সেটাই পাশ্চাত্ত্য জগতে সন্দেহের বিষয় ছিল এবং ভারতে অবস্থিত ইংরেজরা টাকা ছাড়া এ দেশ থেকে যে কিছু নেবার আছে এমন বিশ্বাস করতেন না। বলতে গেলে এই মনীষীই ভারতীয় কৃষ্টির সুমহৎ পরিচয় জগতের কাছে মেলে ধরেন। বহু বিষয়ে তাঁর অসামান্য আলোকপাতের মধ্যে সঙ্গীতবিষয়ক এই নিবন্ধটি অন্যতম। জোন্স সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন না তথাপি এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে তাঁর অসামান্য পরিশ্রমের এবং সাঙ্গীতিক বিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায়। আজকের বিচারে এই নিবন্ধে অনেক অসঙ্গতি ধরা পড়বে কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতের পুঁথিপত্র যে যুগে দুর্লভ ছিল সে যুগের নানা অসুবিধার মধ্যে এমন একটি তথ্যপূর্ণ নিবন্ধ রচনা নেহাৎ সহজসাধ্য ছিল না। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এই নিবন্ধটির অসামান্য প্রভাব বহুকাল পর্যন্ত আমাদের সঙ্গীতসাহিত্যিকদের ওপর ছিল। রাগসম্বন্ধীয় বিভিন্ন মতগুলি উদ্ধার করে বৈজ্ঞানিকভাবে সাজিয়ে দেবার প্রথম গৌরব বোধ হয় সার উইলিয়াম জোন্সেরই প্রাপ্য। নিবন্ধটির নাম— ON THE MUSICAL MODES OF THE HINDUS। ১৭৮৪ সালে এটি রচিত হলেও এটিকে পরিবর্ধিত করে ১৭৯২ সালে ASIATICK RESEARCHES এ প্রকাশ করা হয়।

নিবন্ধের প্রথমে জোন্স প্রাণীদের ওপর সাধারণভাবে সঙ্গীতের ক্রিয়া কিরকম হয় সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। অবশ্য সব প্রাণীই সঙ্গীত সম্বন্ধে সচেতন কিনা সে সম্বন্ধে তিনি প্রমাণ সহ জোর করে কিছু বলেন নি তবে সঙ্গীতের একটা স্নিগ্ধ প্রভাব যে সকল প্রাণীর ওপরেই পড়ে তা তিনি বিশ্বাস করতেন। এ সম্বন্ধে তিনি একটি বিবরণ দিয়েছেন। ব্যাপারটা নাকি একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা। সিরাজউদ্দৌলা যখন গানবাজনা উপভোগ করতেন তখন নাকি প্রায়ই দুটি অরণ্যচারী হরিণ এসে সেই সঙ্গীত উপভোগ করত। একদা নবাব তাদের সেই অবস্থার সুযোগ নিয়ে তীর মেরে হত্যা করেন। পণ্ডিতপ্রবর ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী তাঁর ভাষায় এই ব্যাপারটি বর্ণনা করবার সময় হরিণ দুটির বদলে দুটি গণ্ডারকে খাড়া করেছিলেন। বলা বাহুল্য, কল্পনাশক্তির প্রখরতা না থাকলে গণ্ডারের পরিকল্পনা এবং তীর সহযোগে তার চর্মভেদ করে মৃত্যু ঘটানো সম্ভব নয়। এইরকম বিকৃত উদ্ধৃতি আমাদের পুরাতন সঙ্গীতালোচনায়* প্রায়ই পাওয়া যায় এবং তখন বিশ্বাস করা শক্ত হয় যে, এই ব্যক্তিদের মস্তিষ্ক থেকেই স্বরলিপি উদ্ভাবিত হয়েছিল। এক এক সময় মনে হয়—যে সব পণ্ডিত ব্যক্তিরা নীরবে এবং নেপথ্যে রাজা, মহারাজা আর আচার্য গোস্বামীদের মাল-মশলা জোগাড় করে গৌরবান্বিত করেছিলেন স্বরলিপিও উদ্ভাবিত হয়েছিল তাঁদেরই কারুর মাথা থেকে কিন্তু নানা কারণেই প্রভুর চরণধুলার

সার জসুয়া রেনাল্ডস্‌-এর আঁকা সার উইলিয়াম জোন্সের তৈলচিত্র

ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস

জব চার্ণকের বিবি

কলকাতা স্রষ্টা জব চার্ণকের প্রেমময় জীবন আলেখ্য। ॥ পাঁচ টাকা ॥

অর্চনা পাবলিশার্স

৮বি, রমানাথ সাধু লেন, কলিকাতা-৭

(সি ৯০২৩)

জ্যাক অ্যান্ড জিল, হামটি ডামটি, টুই টুইংকল উইংকে, এমনি আরও অনেকগুলি ইংরিজি রাইমস্-এর অনুবাদ—বাংলা ছড়ায়। অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর-এর দীর্ঘ ভূমিকাসহ

শ্রীসুকমল দাশগুপ্তের

বিলিতি ছড়া

দাম ১·২৫

দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

"জিজ্ঞাসা"য় খোঁজ করুন:

১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভেনিউ, কলিকাতা-২৯

(সি-৮৭০১)

সারদা-রামকৃষ্ণ

শ্রীদুর্গাপুরী দেবী রচিত

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের এক সাধু লিখেছেন, ...চমৎকার বইখানি হয়েছে, যত পড়া যায় ততই আনন্দ পাওয়া যায়।...অপূর্ব মার ঠিক ঠিক ভাব এবং ঠাকুরের অত্যাশ্চর্য লীলাভাব যুগপ্রয়োজন মত পরিস্ফুট হয়েছে। শ্রীশ্রীমা শ্রীমতী মা দুর্গাপুরী দেবীর মধ্য দিয়া তাঁর ঐশ্বর্যপূর্ণ ভাব প্রকট করেছেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা:—তীর্থপিপাসু, সাধকগণের নিকট এই প্রামাণিক গ্রন্থখানি নিশ্চয়ই যোগ্য সমাদর লাভ করিবে।

যুগান্তর:—গ্রন্থখানি সর্ব প্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

পঞ্চম মুদ্রণ—পাঁচ টাকা॥

গৌরীমা

শিক্ষা ও সাহিত্য লিখেছেন:

এই তেজস্বিনী মহামহিমময়ী মহিলা বাঙালী নারীর চিরন্তন দুর্বলতার অপবাদ বিদূরিত করিয়াছেন। অসামান্য ইঁহার চরিত্র, অপূর্ব ইঁহার সাধনা, বিচিত্র ইঁহার জীবনকথা, রোমাঞ্চকর ইঁহার বিজয়াভিযান। এই পুস্তকখানি উপন্যাসের ন্যায় সরস, কাব্যের মত মাধুর্যমণ্ডিত এবং ধর্ম-পুস্তকের মত চিত্তোৎকর্ষসাধক।

তৃতীয় সংস্করণ—তিন টাকা॥

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

২৬, মহারাণী হেমন্তকুমারী স্ট্রীট, কলিকাতা

(সি ৮৩৯৮)

তলে তাঁকে মাথা নত করতে হয়েছিল। যাক, এ সম্বন্ধে বলে অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারণা না করাই ভাল।

যে সাধারণ অর্থে সংগীত শব্দটি ব্যবহৃত হয় জোন্স তাকে সিম্ফনি বলে অভিহিত করেছেন। তবে একথাও বলেছেন যে, ভারতীয় শাস্ত্র অনুসারে গীত, বাদ্য এবং নৃত্য—এই তিনটি কলাই সংগীত নামক আর্টের অন্তর্ভুক্ত। এই মহৎ আর্টটি কতকগুলি স্বাভাবিক সুবিধার ওপর নির্ভর করে পরিণতিলাভ করেছে এবং চিরকাল মানবচিত্তে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। গান বা কণ্ঠসংগীতের ক্ষেত্রে এই স্বাভাবিক সুবিধা রয়েছে সাতটি প্রধান স্বরের বিচিত্র সন্নিবেশে। এতে পর্যায়ক্রমে এক একটি স্বরের প্রাধান্য এবং তার সঙ্গে অপর দুটি স্বরের সহযোগিতায় প্রতিবারই বিভিন্ন রস সৃষ্টি করা সম্ভব।

"The first of those natural advantages is the variety of modes or manners in which the seven harmonic sounds are perceived to move in succession as each of them takes the lead and consequently bears a new relation to the Six others."

এই সমাবেশটিকেই শাস্ত্রে মূর্ছনা বলা হয়েছে এবং মূর্ছনাই আমাদের সংগীতের প্রধানতম উপাদান, কেননা, মূর্ছনাতেই রাগ-সংগীতের বীজ নিহিত। জোন্স এই সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি অবশ্য 'মোড' শব্দটি ঠিক মূর্ছনা অর্থে ব্যবহার করেন নি, রাগ বা ঠাট অর্থেই ব্যবহার করেছেন; তবে, সাতটি স্বরের যে বিচিত্র সন্নিবেশে একটি মাধুর্যমণ্ডিত রূপের বিকাশ ঘটে তাকেই তিনি 'মোড' বলে স্বীকার করেছেন। তাঁর নিবন্ধ থেকে এইটিই অনুমিত হয়। শ্রুতির দিক দিয়ে বিচার করে তিনি প্রত্যেক স্বরকে বলেছেন 'টোন' এবং দুটি স্বরের অন্তর্বর্তী শ্রুতিগুলিকে বলেছেন 'সেমি-টোন'। এই শ্রুতিগত ব্যবধানের অনুপাত সম্বন্ধে কোনও আলোচনায় তিনি প্রবেশ করেন নি। তিনি বলেছেন যে, 'টোন'গুলিকে বিভাগ করলে আমরা বারটি 'সেমি-টোন' পেয়ে থাকি। বলা বাহুল্য, বর্তমান ঠাট ধরেই এই বিচার করা হয়েছে অর্থাৎ সাতটি প্রধান স্বর এবং কড়ি ও কোমল মিলিয়ে আর পাঁচটি স্বর। এই বারটি স্বরকে সাত দিয়ে গুণ করে মোট হল চুরাশী। জোন্স সিদ্ধান্ত করেছেন যে, সর্বসমেত চুরাশী প্রকার 'মোড'-এর অস্তিত্ব সম্ভব। এর মধ্যে সাতটি মুখ্য এবং বাকি সাতাত্তরটি গৌণ। তিনি খবর নিয়ে জেনেছিলেন, পারস্যেও নাকি এই চুরাশী প্রকার 'মোড'-এর অস্তিত্ব বর্তমান। জোন্স অনুমান করতে পেরেছিলেন যে, এতগুলি ঠাটের মধ্যে হিন্দুরা কেবলমাত্র সেই ঠাটগুলিই প্রধানত বেছে নিয়েছিলেন যেগুলিতে প্রকৃতিগত ঐশ্বর্য বর্তমান। কতকগুলি ঠাটে এমন কতকগুলি গুণ বর্তমান যাতে বিভিন্ন মানসিক অনুভূতির উদ্দীপনা হয়। শিল্পীদের এ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হত যাতে তাদের কণ্ঠে সুন্দর সুরগুলি নিষ্প্রাণ গতানুগতিক আকৃতিতে পর্যবসিত না হয়। তাঁর অতুলনীয় ভাষা উদ্ধৃত করি—

The genius of the Indians had enabled them to retain the number of modes, which nature seems to have indicated and to give each of them a character of its own by a happy and beautiful contrivance... Let us be satisfied with knowing, that some of the modes have distinct perceptible properties, and may be applied to the expression of various mental emotions; a fact, which aught well to be considered by those performers who would reduce them all to a dull uniformity, and sacrifice the true beauties of their art to an injudicious temparament.

এ সম্পর্কে আলোচনায় তিনি বলছেন যে, গ্রীসে সংগীত দীর্ঘকাল কবিদের অধিকারগত ছিল এবং সেখানেও বিভিন্ন 'মোড'-এর প্রচলন ছিল; কিন্তু তাদের Eolian (soft), Lydian (tender), Ionic (voluptuous), Dorian (manly), Phrygian (animating) এইসব 'মোড' কেবল নামেই পর্যবসিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে কারুর স্পষ্ট ধারণা নেই।

এই প্রসঙ্গে তিনি পারসীক সংগীতের মূল সংগঠন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে পারস্য-সংগীতেও চুরাশীটি ঠাটের অস্তিত্ব বর্তমান। "চার দরবেশ"—নামক একটি ফার্সী কাহিনী আমাদের দেশে একদা বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। মূল গল্পে চারজন গাইয়ে বিভিন্ন যন্ত্র-সংযোগে সংগীত পরিবেশন করছে—এরকম বর্ণনা পাওয়া যায়। এতে বারটি মোকাম (rooms) বা পর্দা, চব্বিশটি সুবা (recess) এবং আটচাল্লিশটি গুসা (angles or corners)—এইগুলির উল্লেখ আছে। জোন্সের মতে এই চুরাশী প্রকার সুর আমাদের চুরাশী ঠাটেরই অনুরূপ। আমিন নামক অপর একজন ভারতীয় লেখকও নাকি বারটি পর্দা এবং সংশ্লিষ্ট সুরগুলির উল্লেখ করেছেন। জোন্স বিশেষজ্ঞদের মত অনুসারে জানিয়েছেন যে, পারস্যদেশেও প্রাচীনকালে সাতটি মূল স্বর স্বীকৃত হয়েছিল। এইসব ফার্সী ঠাট কয়েকটি জনপদ বা দেশ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল বলে মনে হয়। পর্দাগুলির মধ্যে হিজাজ, ইরাক, ইস্পাহান এবং সুবাগুলির মধ্যে জাবুল, নিশাপুর প্রভৃতি দেশ এবং নগরের নাম পাওয়া যায়। এর মধ্যে হিজাজ নামক সুরটি আমাদের দেশেও প্রচলিত হয়েছে।

জোন্স বলেছেন যে, বাংলার পণ্ডিতগণের মধ্যে সকলেই সংগীত সম্পর্কীয় অপর গ্রন্থের চেয়ে সংগীতদামোদরকে অধিকতর পছন্দ করেন; অর্থাৎ এই গ্রন্থের প্রাধান্যই বাংলায় স্বীকৃত হয়ে এসেছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সংগীত দামোদর তাঁরা (অন্তত জোন্সের উপদেষ্টা পণ্ডিতগণ) কেউ চোখেও দেখেন নি। জোন্স নিজেও জানিয়েছেন যে, তিনি উক্ত গ্রন্থের একটি উৎকৃষ্ট পুঁথি সংগ্রহ করতে পারেন নি। খণ্ডিত পুঁথিও পেয়েছিলেন কিনা সন্দেহ। যতদূর জানি, এ গ্রন্থটি এখনও বাংলায় ছাপান হয়নি। সংস্কৃত কলেজ থেকে এটি প্রকাশিত হচ্ছে শুনেছিলাম; অদূর ভবিষ্যতে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হবে আশা রাখি। দামোদরের পরিবর্তে কাশী থেকে সংগৃহীত সংগীত নারায়ণ নামক পুঁথির ওপরেই জোন্সকে সমধিক নির্ভর করতে হয়েছিল। নারায়ণেও অবশ্য দামোদর থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। আর একখানি গ্রন্থের সাহায্য তিনি গ্রহণ করেছিলেন; সেটি হচ্ছে তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-হিন্দ্‌ বা ভারতবর্ষের উপহার। গ্রন্থটি শা আজমের (বাহাদুর শা) অনুকূলো তাঁর পুত্র জাহাঁদার শা-র শিক্ষার নিমিত্ত পণ্ডিতপ্রবর মীর্জা খাঁ কর্তৃক সংকলিত হয়। মীর্জা খাঁ এই গ্রন্থের সংগীত অংশটি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সহায়তায় রাগার্ণব, রাগদর্পণ, সভাবিনোদ প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ থেকে তথ্যাদি আহরণপূর্বক সম্পাদিত করেন। এছাড়া, এই গ্রন্থে চারুকলা থেকে আরম্ভ করে হিন্দু সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ১৬৭৫ সালের আগেই এই গ্রন্থটি সমাপ্ত হয়। সংগীতদর্পণ নামক সংস্কৃত গ্রন্থটি যে ফার্সী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল জোন্স তারও উল্লেখ করেন।

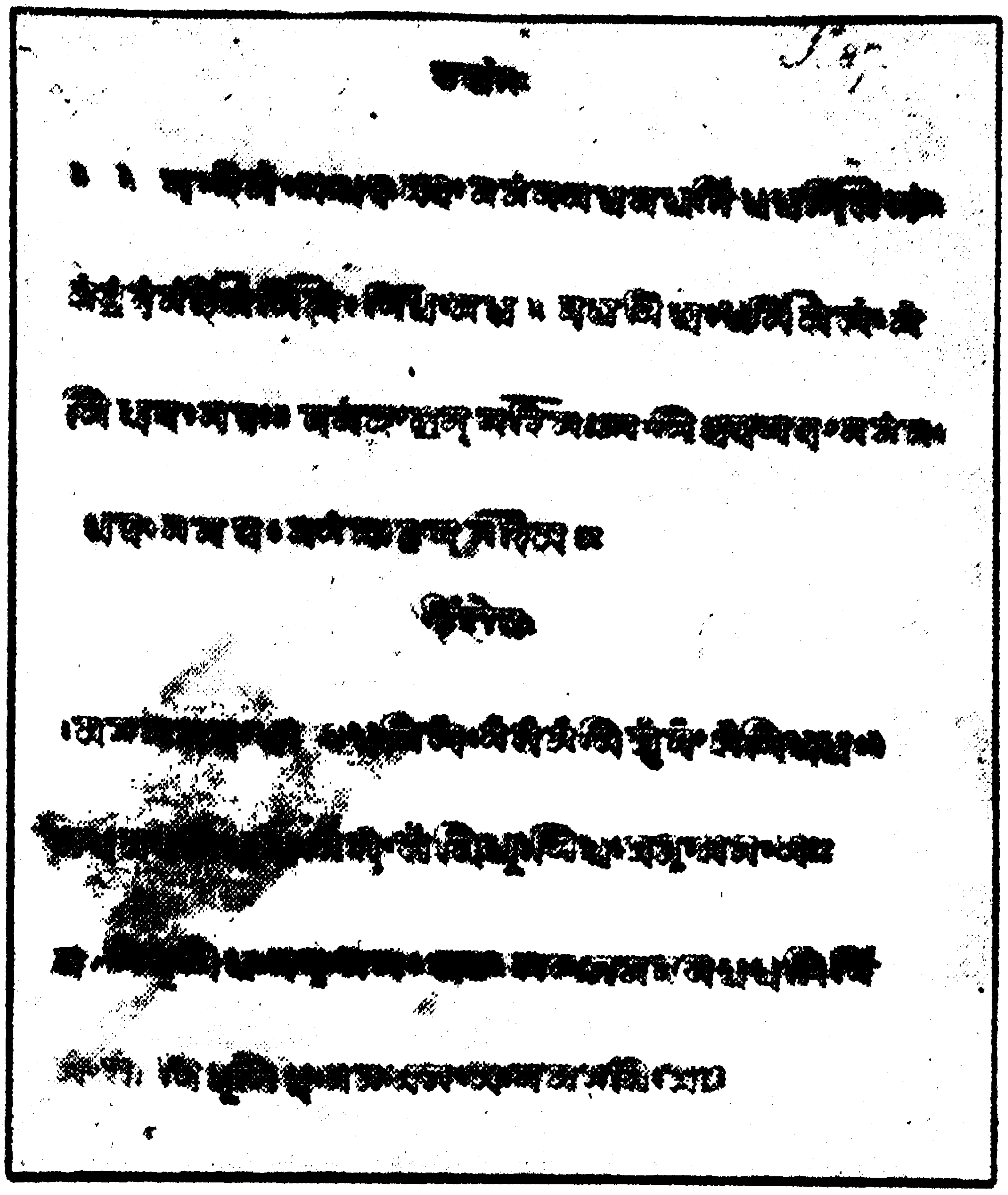

রাগবিবোধ গ্রন্থে প্রদত্ত বসন্ত এবং হিন্দোল রাগের বিস্তার

এই উপলক্ষে জোন্স মত প্রকাশ করেছেন যে, মোগলদের যথাযথ অনুবাদ সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। তাঁরা সংস্কৃত নামগুলি অত্যন্ত বিকৃতভাবে লিপিবন্ধ করেছেন এবং অনুবাদের নামে কতকগুলি অস্পষ্ট বিবরণ রেখে গেছেন মাত্র। এই দুটি থেকে তিনি আবুল ফজল বা ফৈজি কাউকেই অব্যাহতি দেন নি। এইরকম মত প্রকাশের আগে কিন্তু একটু চিন্তা করা উচিত ছিল। মুসলমানগণ প্রচলিত রীতি এবং শব্দাদিকেই বিশেষভাবে গ্রহণ করেছিলেন। ওস্তাদদের মধ্যে অনেক শব্দ প্রচলিত ছিল (হয়ত এখনো আছে) যেগুলি প্রাকৃত নিয়মে রূপান্তরিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ—মন্দর (মন্দ্র), শোরৎ (শ্রুতি), আরো (আরোহণ), আওরো (অবরোহণ), তেরব্‌ (তীব্র), কুঁয়ল (কোমল), খাড়ো (খাড়ব), ওড়ো (ওড়ব), আলপৎ (অল্পত্ব)—ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। জোন্সের উপদেষ্টা পণ্ডিত বা মৌলভীগণ নিশ্চয়ই সংগীতে প্রাজ্ঞ ছিলেন না নতুবা আসল ব্যাপারটা কী সেটা তাঁরা বুঝিয়ে দিতে পারতেন। সব ভাষাতেই শব্দের এইরকম পরিবর্তন হয়। আমরাও ফার্সী শব্দগুলি অতিশয় বিকৃতভাবে উচ্চারণ করি। স্বয়ং জোন্স "সুম্ভাবতী" নামক একটি রাগিনীর উল্লেখ করেছেন যার কোন অস্তিত্ব নেই। এটি খাম্বাবতী হওয়া উচিত ছিল। পাঠোদ্ধারের এই গোলমাল তাঁর বিশ্বস্ত পণ্ডিতগণ দেখিয়ে দিতে পারেন নি। তাঁর অপর সহযোগী উইলার্ড যেভাবে সংস্কৃত নামগুলি লিপিবন্ধ করেছেন তাকেও মোটেই মূলানুগ বলা যায় না।

আবুল ফজলও তাঁর সমসাময়িক সংগীতেরই বর্ণনা দিয়েছেন। লেখকের কাছে একটি পত্রে একজন অভিযোগ করেছিলেন যে আবুল ফজল এমন নির্বিচারে তথ্যাদি গ্রহণ করেছেন যে, 'যন্ত্র' শব্দটিকে তিনি একটি বিশেষ তারের যন্ত্র বলে নির্দেশ করেছেন, যন্ত্র অর্থে যে সাধারণভাবে যে কোন তারের যন্ত্র বোঝায় তা তিনি জানতেন না। সংগীতবিদ্‌ পণ্ডিত কল্লিনাথ কিন্তু এই যন্ত্র নামক একটি বাদ্যের স্পষ্ট উল্লেখ করে গেছেন। সংগীতরত্নাকরের টীকায় তিনি 'ত্রিতন্ত্রী' বীণার প্রসঙ্গে বলেছেন যে এই ত্রিতন্ত্রী বীণার অপর নাম যন্ত্র। আইন-ই-আকবরির বিবরণ অনুসারে এই বীণায় পাঁচটি তার ছিল। সম্ভবত পরবর্তীকালে তিনটির অতিরিক্ত আরো দুটি তার যুক্ত হয়। যাই হোক, যন্ত্র নামে যে একটি বিশেষ বীণা ছিল এবং এটি ভ্রম নয় সেটা বিশেষভাবেই প্রমাণিত হল। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হিসাবে আইন-ই-আকবরির সাধারণ বর্ণনা বিশেষ মূল্যবান; তবে লেখকের ধারণার সঙ্গে আমাদের ধারণার মিল সবক্ষেত্রে নাও হতে পারে।

সোমনাথ বিরচিত 'রাগবিবোধ' গ্রন্থটি জোন্সের মতে সব চেয়ে মূল্যবান। এই পুঁথিটি কর্নেল পোলিয়ার সংগ্রহ করেছিলেন এবং জোন্স এটি তাঁর পণ্ডিতদের দিয়ে নাগরীতে কপি করিয়ে নিয়ে ছিলেন। পরে তিনি নিজেও বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে এই কপিটি মূলের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বারো-কর্তৃক সংগৃহীত সংগীতরত্নাকরের উল্লেখ করেছেন কিন্তু উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নি। রত্নাকর এবং ভরতের নাট্যশাস্ত্র—এ দুটি গ্রন্থকে অবহেলা করাটা সে যুগে বিশেষ অসঙ্গত কাজ হয়েছে বলে মনে হয়। রাগবিবোধের কিছু গুরুত্ব থাকলেও রত্নাকর বা নাট্যশাস্ত্রের বিরাট
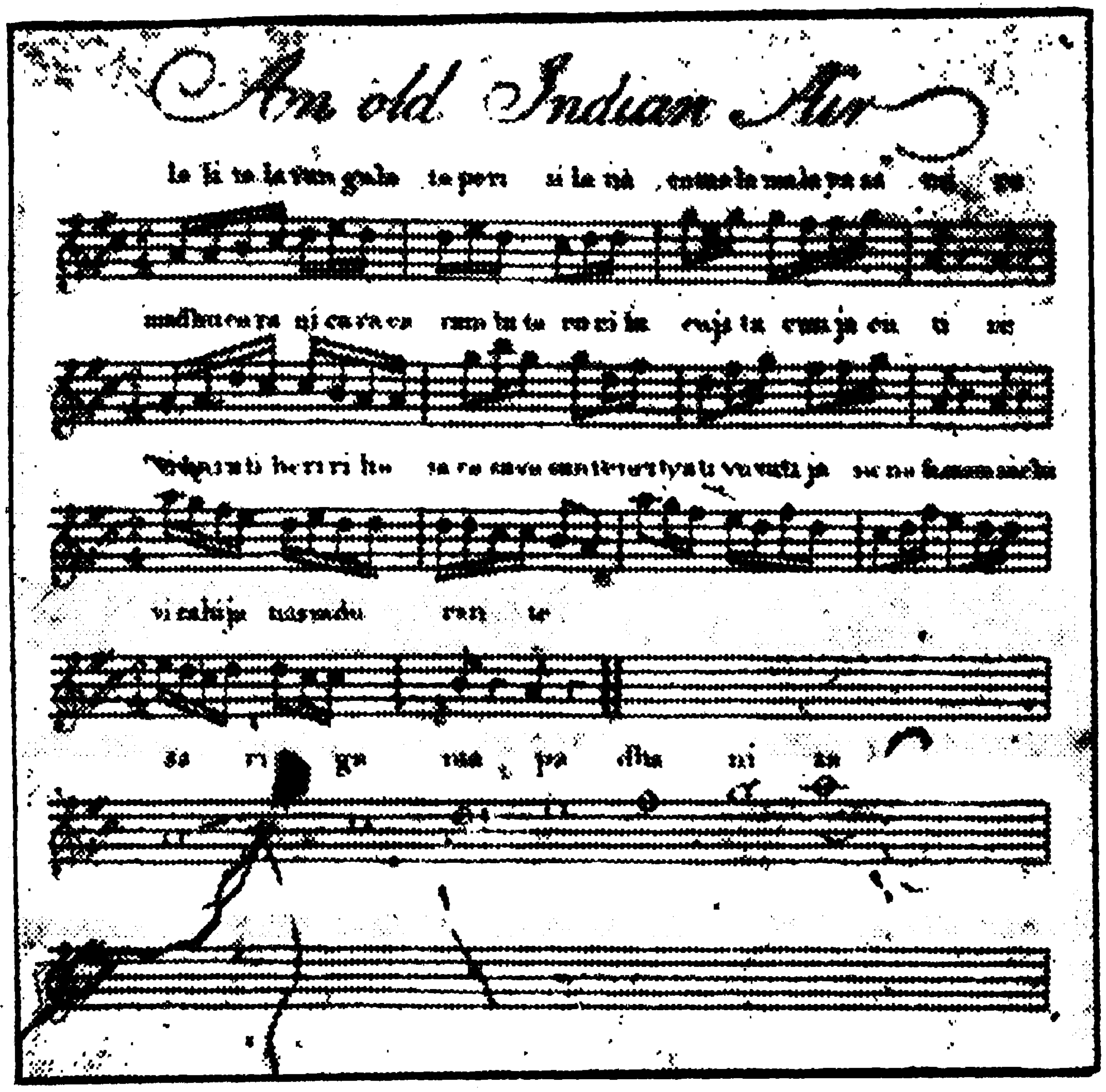
জয়দেবের ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলন গানটির পাশ্চাত্ত্য স্বরলিপি

গুরুত্বকে সর্বাগ্রে স্বীকার করা উচিত ছিল কেননা এই দুটি গ্রন্থে ভারতীয় সঙ্গীতের মূলতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। রত্নাকর নাট্যশাস্ত্রের বিষয়বস্তুকেই পারম্পর্য রক্ষা করে নৈপুণ্যের সঙ্গে সহজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এই দুটি গ্রন্থ থেকে আলোচনার সূত্রপাত করলে ভারতীয় সঙ্গীতের মূল ভাবধারা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আরো অনেক আগেই আমাদের পরিচয় ঘটত। জোন্স বা তাঁর পণ্ডিতগণ হাল আমলের যে সব গ্রন্থের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন আসলে সেগুলি প্রাচীন গ্রন্থাদির পুনরাবৃত্তি এবং তাও প্রায় স্থলেই বিকৃত। এ ছাড়া নানারকম পৌরাণিক আখ্যায়িকায় সংগীতের ইতিহাসও এ সব গ্রন্থে ঢাকা পড়ে গেছে।

রাগবিবোধের প্রতি শ্রদ্ধা এবং মীর্জা খাঁর সংকলনের প্রতি অনাস্থা সত্ত্বেও জোন্স কিন্তু দ্বিতীয়টির ওপরেই প্রধানত নির্ভর করেছিলেন। তিনি বলছেন—যদি আমরা মীর্জা খাঁর ওপর আস্থা স্থাপন করতে পারি তাহলে রাগসঙ্গীতে চারটি মত যে প্রচলিত ছিল সেটি স্বীকার করতে হয়। প্রথম মতটি 'ঈশ্বর' কর্তৃক স্থাপিত, দ্বিতীয়টি স্থাপন করেন ভরত তৃতীয়টির প্রতিষ্ঠাতা হনুমৎ এবং চতুর্থটি কল্লিনাথ-কর্তৃক প্রচারিত। এই ভরত যে নাট্যশাস্ত্রকার ভরত ন'ন সে সম্বন্ধে জোন্সের কোন ধারণা ছিল বলে মনে হয় না। কল্লিনাথ যে ঋষি ছিলেন না সেটি জানবার সুবিধাও তাঁর হয় নি।

রাগবিবোধ গ্রন্থের আলোচনা উপলক্ষ্যে জোন্স প্রথমে সাতটি প্রধান স্বর এবং বাইশটি শ্রুতির কথা উল্লেখ করেছেন। শ্রুতিগুলি তিনি যেভাবে প্রদর্শন করেছেন তাতে মনে হয় শ্রুতিবিভাগ সম্বন্ধেও তাঁর স্পষ্ট ধারণা ছিল না কেননা চতুঃশ্রুতিক ষড়্‌জ বলতে ষড়্‌জ এবং ঋষভের মধ্যে চারটি শ্রুতির অস্তিত্ব বোঝায় না যা তিনি দেখিয়েছেন। আসলে ষড়্‌জ স্বরটি নিষাদের পরবর্তী চতুর্থ শ্রুতিতে অবস্থিত। শ্রুতি অনুসারে যে ঠাট তিনি দেখিয়েছেন সেটি ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত।

জোন্স সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে দুটি বিবেচনার ওপর প্রাধান্য অর্পণ করে ভারতীয়গণ রাগনির্ণয় করেছিলেন। এর একটি—association of ideas অপরটি mutilation of regular scales। জোন্স মনে করেন যে, এই বিবেচনা অনুসারেই হনুমান ছ'টি রাগকে প্রধান বলে স্বীকার করে গেছেন। হনুমান নাকি এতদতিরিক্ত দিবসের পাঁচটি ভাগও নির্ণয় করেছিলেন। জোন্স ছ'টি রাগের উল্লেখ করেছেন—ভৈরব, মালব, শ্রী, হিন্দোল অথবা বসন্ত, দীপক এবং মেঘ। প্রত্যেকটির পাঁচটি রাগিণী এবং তাদের আটটি করে পুত্রের পরিকল্পনাও হয়েছিল। এই রাগরাগিণীর পরিকল্পনা যে শিল্পী এবং কবিদের মনে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিল জোন্স তারও উল্লেখ করেছেন। দামোদর, কলাঙ্কুর, রত্নমালা, নারায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থে এই সব বর্ণনা খুব আগ্রহের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে। জনসন এবং হে—এই দুইজনের সংগ্রহে রাগমালা চিত্রগুলি পরীক্ষা করেও তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি দুঃখ করে বলেছেন যে জয়দেবের গানগুলি নিয়েও হয়ত এরকম ছবি আঁকা যেতে পারত।

জোন্স গ্রহ, ন্যাস স্বর অনুযায়ী সোমেশ্বর, সঙ্গীত নারায়ণ এবং মীর্জা খাঁর মত গুলিকে আলাদাভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন। ঠাটগুলি এইরূপ—

ভৈরব—বরাটী, মধ্যমাদি, ভৈরবী, সৈন্ধবী, বঙ্গালী।

মালব—টোড়ী, গৌড়ী, গোণ্ডক্রী, খাম্বাবতী (পাঠোদ্ধারের ভুলে এটি 'সুস্থাবতী' হয়েছে), ককুভ।

শ্রী—মালবশ্রী, মারবী, ধন্যাসী, বাসন্তী, আশাবরী।

হিন্দোল—রামক্রী, দেশাক্ষী, ললিতা, বেলাবলী, পটমঞ্জরী।

দীপক—দেশী, কাম্বোদী, নট্ট, কেদারী, কর্ণাটী।

মেঘ—টক্ক, মল্লারী, গুর্জরী, ভূপালী, দেশক্রী।

সোমেশ্বরের বর্ণনায় খম্বাবতী, ককুভ, পটমঞ্জরী এবং মেঘ—এর পরিচয় পাওয়া যায় না। সঙ্গীতনারায়ণে ককুভ, দীপক, কেদারী এবং গুর্জরীর বর্ণনা নেই। মীর্জা খাঁ এই সবগুলির ঠাটই উদ্ধৃত করেছেন। জোন্স বর্ণিত ঠাটগুলি বর্তমানে ছাপান বই-এর সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করলে কোন কোন ক্ষেত্রে ঠিক মিলবে না কিন্তু তা সত্ত্বেও ঠাটের এই প্রাচীন তালিকাটি বর্তমান গবেষকদের কাছেও বিশেষ মূল্যবান।

স্বরের বিচিত্র সন্নিবেশে যে বহু রকম ঠাটের উৎপত্তি হতে পারে জোন্স তার উল্লেখ করে বলেছেন যে, কল্লিনাথ নাকি পাঁচটির পরিবর্তে ছয়টি রাগিণী ধরেছিলেন এবং সর্বসমেত নব্বইটি ঠাটের পরিকল্পনা করেছিলেন। এ ছাড়া ষড় রাগের মধ্যে কল্লিনাথ দীপকের পরিবর্তে পঞ্চম, মালবের পরিবর্তে নটনারায়ণ এবং হিন্দোলের পরিবর্তে বসন্তের উল্লেখ করেন। এ'র বর্ণিত ঠাটগুলি হনুমন্ত ঠাটের অনুরূপ নয়। ঈশ্বরের মত না কি হনুমানের মতের অনুরূপ তবে নামের এবং ঠাটের কিছু পরিবর্তন লক্ষিত হয়। ভরত নাকি আটচল্লিশটি নতুন রাগ নির্দেশ করে পুত্র এবং পুত্রবধূ সমেত একশ বত্রিশ প্রকার ঠাটের পরিকল্পনা করেছিলেন। এই সংবাদগুলি জোন্স কোথা থেকে আহরণ করেছিলেন জানা যায় না।

পরিশেষে আমাদের প্রাচীন সঙ্গীতরীতির বিলুপ্তি সম্বন্ধে জোন্স দুঃখ করেছেন। জয়দেবের গীতগোবিন্দ তাঁকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল; তিনি জয়দেবের

বর্ণিত মূলসূরের পরিচয় পাবার জন্যও বহু চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সারা ভারত অন্বেষণ করেও সফলকাম হন নি।

জোন্স সোমেশ্বর প্রণত বসন্ত এবং হিন্দোলের প্রস্তার উদ্ধৃত করে তাঁর নিবন্ধ সমাপ্ত করেছেন এবং এই বসন্ত রাগটি জয়দেবের "ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলন কোমল মলয় সমীরে" গানে আরোপ করে একটি স্বরলিপির নমুনাও দিয়েছেন। তাঁর ধারণা সোমেশ্বর জয়দেবের এই গানটি স্মরণে রেখেই বসন্তরাগের প্রস্তারটি রচনা করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত যে, জোন্স পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের উদ্দেশ করেই এই নিবন্ধ প্রস্তুত করেন এবং তাঁদের কাছে ভারতীয় রাগসংগীতের ভাবধর্মিতা ও গভীরতার পরিচয় প্রদান করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে তিনি যে বিশ্লেষণ পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তা থেকে পরবর্তীকালের ভারতীয়গণও বিলক্ষণ প্রেরণা ও সহায়তা লাভ করেছিলেন।

অশেষপ্রাজ্ঞ উলিয়াম জোন্স মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বেঁচেছিলেন এবং শেষ কিঞ্চিদধিক দশ বছর কাটিয়েছিলেন আমাদের দেশে। ১৭৪৬ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর লণ্ডনে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর বাবা ছিলেন গণিতবিদ্যায় অসামান্য পণ্ডিত। তাঁর মা ছিলেন আদর্শ মহিলা এবং সুশিক্ষিতা। জন্মের তিন বছর পরেই বাবা মারা গেলেন। প্রাথমিক শিক্ষা মার কাছ থেকেই পেয়েছিলেন তিনি। দুর্ভাগ্যক্রমে শৈশবেই একটা দুর্ঘটনায় তাঁর একটি চোখের দৃষ্টি নষ্ট হয়। দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতার জন্য তিনি বরাবর কষ্ট পেয়েছেন, অসুবিধা ভোগ করেছেন অনেক।

হ্যারো এবং অক্সফোর্ডে পড়বার সময় তিনি বিদ্যাচর্চায় খ্যাতিলাভ করেন। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে তিনি আরবী ও ফার্সী ভাষাও শিক্ষা করেছিলেন। পড়াশোনার বিরাট ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি ভবিষ্যৎ আর্ল অফ স্পেন্সার লর্ড অ্যালথর্পের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। এই সম্বন্ধ ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

১৭৭১ সালে তিনি ফার্সী ভাষায় একটি ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। ১৭৭২ সালে তিনি রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন এবং পরের বছর স্যামুয়েল জনসনের সুবিখ্যাত ক্লাবের সভাপদে মনোনীত হন। এই ক্লাবেই তিনি রেনল্ডস্, গীবন শেরিডেন বার্ক, গ্যারিক প্রভৃতি মনীষীদের সাহচর্য লাভ করেন। রেনল্ডস তাঁর একাধিক প্রতিকৃতিও চিত্রিত করেন। কলকাতার এসিয়াটিক সোসাইটিতে বালক জোন্সের একটি তৈলচিত্র আছে। এটি জসুয়া রেনল্ডসের আঁকা। ১৭৭৪ সালে তিনি ল্যাটিন ভাষায় ছয় খণ্ডে এসিয়ার কাব্য সাহিত্য সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ইতিমধ্যে আইনজ্ঞ হিসাবেও তাঁর খ্যাতি বিস্তৃতি লাভ করে এবং ১৭৭৬ সালে তিনি একটি সম্মানিত পদ লাভ করেন। বিলাতেই তিনি বাংলার শাসন কার্যের জন্য ইসলামীয় আইনবিধি সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৭৮২ সালে তিনি বিলাতের Society for Constitutional Information-এর সদস্য নির্বাচিত হন।

নর্থের Regulating Act অনুযায়ী কলকাতায় একজন প্রধান বিচারপতি এবং

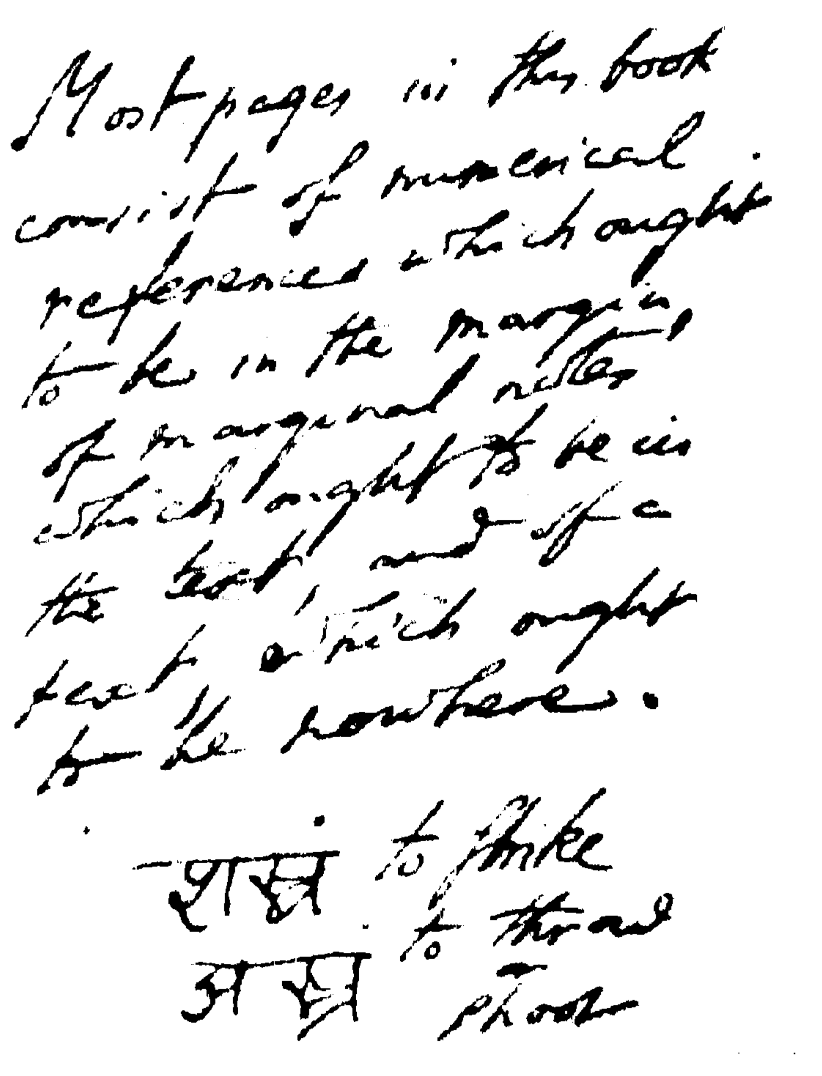

স্যার উইলিয়াম জোন্সের হস্তাক্ষর

তিনজন অধস্তন বিচারককে নিয়ে একটি সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস তখন ভারতের গভর্নর জেনারেল। ১৭৮৩ সালের মার্চ মাসে জোন্স সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতি নিযুক্ত হন। ভারত যাত্রার প্রাক্কালে তাঁকে নাইট উপাধি প্রদান করা হয় এবং ৮ই এপ্রিল অ্যানা শিপলির সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৭৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি সস্ত্রীক এদেশের মাটিতে পা দেন।

ভারতে এসেই তিনি তাঁর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৭৮৪ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করেন। ওয়ারেন হেস্টিংসকে সোসাইটির সভাপতি হবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল কিন্তু হেস্টিংসের অনুরোধে স্যার উইলিয়াম জোন্সই সোসাইটির সভাপতি নিযুক্ত হন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

১৭৮৯ সালে জোন্স শকুন্তলার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের মধ্যে এই গ্রন্থের বিশেষ সমাদর হয়েছিল। Goethe—এই গ্রন্থ পাঠে মুগ্ধ হয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত হন। এর আগে জোন্স পারসীক কবি হাফিজের কাব্য লয়লা মজনু সম্পাদিত করেন। বিধানশাস্ত্রেও তিনি কাজ আরম্ভ করেছিলেন। চার্লস্ উইলকিন্স মনুসংহিতার যে অনুবাদ আরম্ভ করে যান জোন্স সেই ভার গ্রহণ করেন এবং মৃত্যুর পূর্বে এই বিরাট কার্য পরিসমাপ্ত করেন। প্রকৃতপক্ষে এই কাজের জন্যই তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী দেশে ফিরতে পারেন নি। এবং এর জন্য কলকাতায় আটকে না থাকলে হয়তো এমন অকালে তাঁর মৃত্যু ঘটত না।

তিনি অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করতেন এবং সকাল সাতটা থেকে পণ্ডিতদের সঙ্গে সংস্কৃত শাস্ত্র এবং সাহিত্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হতেন। তার পরেই একজন পারসীক এবং একজন আরবীয়ের সঙ্গে উভয় ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। কোর্টের বাইরে যেটুকু সময় পেতেন সেটুকুও বিদ্যাচর্চাতেই অতিবাহিত করতেন। তাঁর জীবন ছিল সংযত এবং নিয়মিত। সেকালকার ইংরেজদের মত বৃথা আড়ম্বর, বিলাসিতা তাঁর ছিল না।

কলকাতার আবহাওয়া তাঁর স্ত্রীর সহ্য হয় নি। তিনি প্রায়ই পীড়িত হয়ে পড়তেন। জোন্স নিজেও একটানা দশ বৎসরকাল বাংলায় অতিবাহিত করবার পর দেশে ফিরে যাবার সংকল্প করেন। তাঁর স্ত্রীকে তিনি ১৭৯৩ সালে দেশে পাঠিয়ে দেন। কাজ শেষ হয় নি বলে তিনি আরও দু বছর ভারতে থেকে যাবার সংকল্প করেছিলেন। এই সময় কলকাতার জল হওয়া এত দূষিত ছিল যে, বিলক্ষণ সাবধানতার সঙ্গে না থাকলে যকৃতের পীড়া দেখা দিত। স্ত্রী দেশে ফিরবার পর তিনি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তেমন যত্ন নিতে পারতেন না। এদেশীয় সাহেবদের দলেও তাঁকে পূর্বের চেয়ে বেশি মিশতে হয় কতকটা বাধ্য হয়েই। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি যকৃতের পীড়ায় আক্রান্ত হলেন এবং

উমানাথ ভট্টাচার্যের নাটক
জল মূল্য ২.৫০
নীচের মহল মূল্য ২.৫০
ঘূর্ণী মূল্য ২.২৫
কথকতা
৩০সি, নেপাল ভট্টাচার্য লেন, কলি-২৬
(সি ৮৪১৮)

১৭৯৪ সালের ২৭শে এপ্রিল এই পীড়ায় তাঁর জীবনাবসান ঘটে। যথেষ্ট আড়ম্বর সহকারে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর অনুগ্রহভাজন পণ্ডিতগণ তাঁর মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। ১৭৮৭ সালে জোন্স লর্ড অ্যালথর্পকে বলেছিলেন,—

"It is my ambition to know India better than any other European ever knew it".

এই মহাপ্রাণ ব্যক্তি শুধু ভারতকেই নয় সমগ্র এসিয়াকেই বোধ হয় তাঁর পূর্ববর্তী ইউরোপীয়দের চেয়ে ভাল করে জেনেছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যকে তিনি যেমন জগতের কাছে তুলে ধরেছিলেন তেমনি তুলে ধরেছিলেন ফার্সী সাহিত্যকে। এ দৃষ্টান্তের আজ পর্যন্ত তুলনা মেলে নি।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার—শ্রীশিবদাস চৌধুরী, গ্রন্থাগারিক, এসিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা।

I II III WT

এ এক সমস্যার শ্রেণী !

এই শ্রেণীর যাত্রীদের 'ডবলু:টি' অর্থাৎ বিনা টিকিটের যাত্রী বলা হয় ; ট্রেণের সব কামরাতেই এঁরা থাকেন। বেশভূষা আর মুখের ভাব দেখে এঁদের এই বিশেষ শ্রেণীর যাত্রী বলে চেনা একেবারেই অসম্ভব। সময়ে অসময়ে সেইজন্যই টিকিট পরীক্ষা করতে হয়, যাত্রীদের বার বার হয়ত টিকিটও দেখাতে হয়। ফলে যথার্থ যাত্রীরা হয়ত বিরক্তই হন। কিন্তু তাঁরা রেল প্রতিষ্ঠানের এই অসুবিধা উপলব্ধি করে এই সমস্যার শ্রেণীকে শায়েস্তা করার কাজে টিকিট পরীক্ষকদের সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবেন — এটুকু কি আমরা আশা করতে পারি না ?

বিনা টিকিটে ভ্রমণ
বন্ধ করতে
সাহায্য করুন

পূর্ব রেলওয়ে

অজগর

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

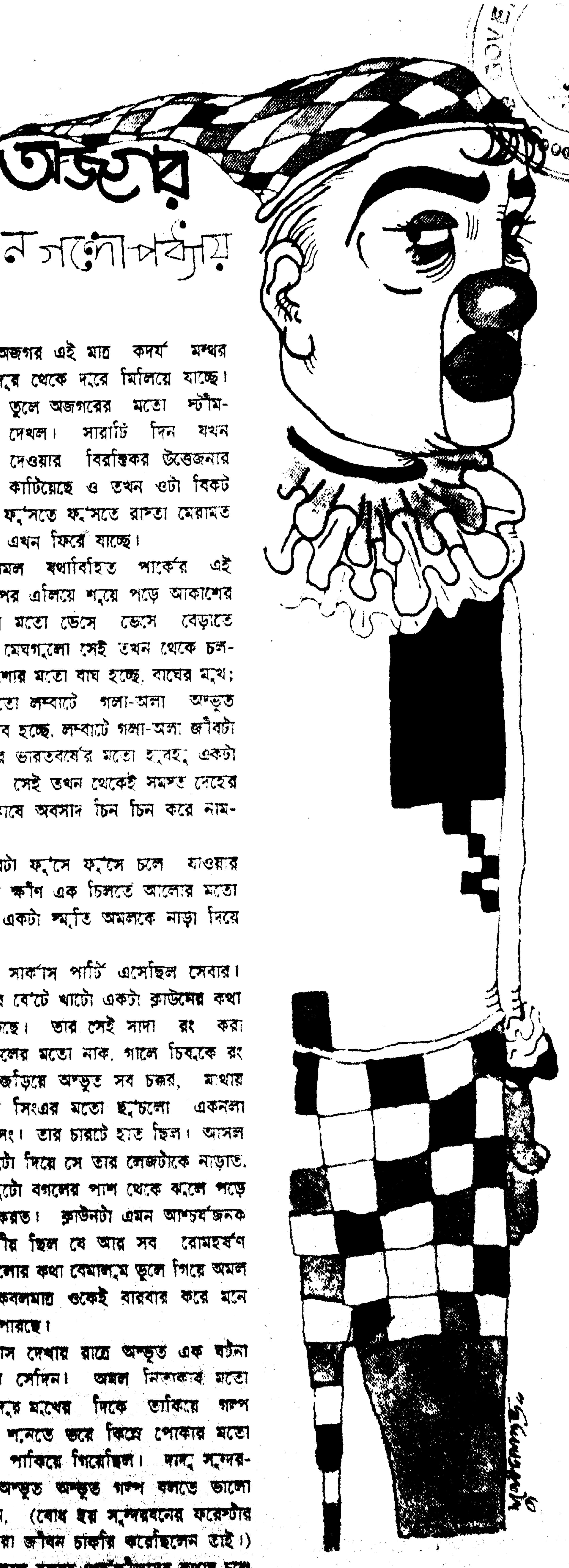

একটা অজগর এই মাত্র কদর্য মন্থর ভঙ্গিতে দূরে থেকে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। অমল ঘাড় তুলে অজগরের মতো স্টীম-ইঞ্জিনটাকে দেখল। সারাটি দিন যখন ইন্টারভিউ দেওয়ার বিরক্তিকর উত্তেজনার মধ্য দিয়ে কাটিয়েছে ও তখন ওটা বিকট শব্দ করে ফুঁসতে ফুঁসতে রাস্তা মেরামত করেছে। এখন ফিরে যাচ্ছে।

আর অমল যথাবিহিত পার্কের এই বেঞ্চের উপর এলিয়ে শুয়ে পড়ে আকাশের মেঘগুলির মতো ভেসে ভেসে বেড়াতে লাগল। মেঘগুলো সেই তখন থেকে চল-চিত্রের দৃশ্যের মতো বাঘ হচ্ছে, বাঘের মুখ; জেব্রার মতো লম্বাটে গলা-অলা অদ্ভুত একটা জীব হচ্ছে, লম্বাটে গলা-অলা জীবটা ভেঙে চুরে ভারতবর্ষের মতো হুবহু একটা মানচিত্র। সেই তখন থেকেই সমস্ত দেহের কোষে কোষে অবসাদ চিন চিন করে নামছিল।

অজগরটা ফুঁসে ফুঁসে চলে যাওয়ার পর অতি ক্ষীণ এক চিলতে আলোর মতো শৈশবের একটা স্মৃতি অমলকে নাড়া দিয়ে গেল।

একটা সার্কাস পার্টি এসেছিল সেবার। সার্কাসের বেঁটে খাটো একটা ক্লাউনের কথা মনে পড়ছে। তার সেই সাদা রং করা টোপা কুলের মতো নাক, গালে চিবুকে রং জড়িয়ে জড়িয়ে অদ্ভুত সব চক্কর, মাথায় গণ্ডারের সিংএর মতো ছুঁচলো একনলা একটা সিং। তার চারটে হাত ছিল। আসল হাত দুটো দিয়ে সে তার লেজটাকে নাড়াত, নকল দুটো বগলের পাশ থেকে ঝুলে পড়ে ঢলঢল করত। ক্লাউনটা এমন আশ্চর্যজনক আকর্ষণীয় ছিল যে আর সব রোমহর্ষণ খেলাগুলোর কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে অমল আজ কেবলমাত্র ওকেই বারবার করে মনে করতে পারছে।

সার্কাস দেখার রাত্রে অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটেছিল সেদিন। অমল নিজকার মতো তার দাদুর মুখের দিকে তাকিয়ে গল্প শুনতে শুনতে ভয়ে কিম্বে পোকার মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে গিয়েছিল। দাদু সুন্দরবনের অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প বলতে ভালো বাসতেন, (বোধ হয় সুন্দরবনের ফরেস্টার হয়ে সারা জীবন চাকরি করেছিলেন তাই।) গল্প বলতে বলতে পর্তুগীজদের কথায় চলে এসেছিলেন। সুন্দরবনের দুর্ভেদ্য জঙ্গলে রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাস করে। আজ থেকে তিনশ' বছর আগে পর্তুগীজ দস্যুরাও এই জঙ্গলে বাঘের মতো ওত পেতে পড়ে থাকত। ব্যাপারীদের নৌকা ভেসে যেতে দেখলে গর্জন করতে করতে ঝাঁপিয়ে পড়ত।

একবার ঐ ধরনের একটা দস্যুদল নতুন পত্তনী করা এক চরের ওপর হামলে পড়ল। গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করল, লুঠল, অত্যাচার করল। বৃদ্ধ অকর্মণ্য লোকগুলোকে রাস্তায় ধরে নদীতে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। জোয়ান মেয়ে মরদ জড় করে হাতের চেটোয় শিক ফুঁড়িয়ে চারটে চারটে করে হালি গাঁথল। তারপর মাছের লেজের চাবুক চালিয়ে লোকগুলিকে ওরা বিক্রি করে পয়সা আর করবার জন্য নৌকায় তুলল। তখন ক্রীতদাস প্রথা ছিল। পর্তুগীজরা ক্রীতদাসদের নিয়ে বন্দরে বন্দরে ফেরি করে পয়সা রোজগার করত।

গোগ্রাসে অমল সেই কাহিনীটা শুনেছিল সেদিন। শুনতে শুনতে ভয়ে বিস্ময়ে দাদুর বুকের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে গিয়েছিল। আর আজকের অমল সেই স্মৃতি-টার দিকে তাকিয়ে সার্কাস পার্টির ক্লাউনটাকে মানুষ ফেরি করে বেড়ানোর সঙ্গে মিশিয়ে কেমন একটা তালগোল পাকিয়ে নিল।

পার্কটা স্তব্ধতায় ডুবে যাচ্ছে। ভারত-বর্ষের মানচিত্রটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বে-আকৃতি হয়ে যাচ্ছে। সেই ছেলেবেলাকার ক্লাউন-টার ঘটনা, মানুষ ফেরি করার ঘটনার সঙ্গে মিশে অদ্ভুত একটা আকৃতি নিচ্ছে। যেন এ যুগের একটা মানুষ, অর্থাৎ সেই ক্লাউনটা তিনশ বছর আগে জন্মাতে পারে নি বলেই পর্তুগীজদের হাতের ক্রীতদাস হতে পারে নি। ক্রীতদাস হতে পারে নি বলে নিজেই নিজেকে ফেরি করে বেড়াতে শুরু করেছিল। ফেরি করে বেড়াতে হলে সামগ্রীর আকর্ষণী শক্তি চাই। মানুষটা, অর্থাৎ ক্লাউনটা, নিজেকে অদ্ভুত রঙে রাঙিয়ে নিল, টোপা কুলের মতো নাকটাকে, একটা লেজ, একটা সিং......বোধ হয় এই জন্যই আর সব রোমহর্ষণ খেলাগুলোর কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে ক্লাউনটাই এত বেশি করে ওর মনের মধ্যে গেঁথে গেছে।

অজগরটা অন্ধকারের মধ্যে আশ্রয় নিচ্ছে।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে দুজন লোক এদিক ওদিক হাঁটছিল। একটা তেল মালিশ-অলা শিশি ঠুকতে ঠুকতে প্রায় বেঞ্চটার গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। অমল সেই শব্দে চমকে উঠল। মাথার নিচ থেকে হাত দুটো তুলে এনে বুকের কাছে রাখতেই নিজের ইন্টারভিউ পাওয়া চিঠিটার স্পর্শ পেল অমল। সেই সকাল দশটা থেকে তিনটে অবধি ইন্টারভিউর ক্লান্তিকর উত্তেজনার

মধ্য দিয়ে কেটেছে। ইণ্টারভিউ দিতে আসা বিবর্ণ অনেকগুলি মুখের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গিয়েছিল অমল। মাত্র একটাই চাকরি। অথচ অনেকগুলি বিবর্ণ চোখের ভিড়। নিজের অবস্থাটাকে আর একবার খতিয়ে নিতে লাগল ও। সেলুনের দরজার মতো হাফ-দরজা ঠেলা দিয়ে বেল ও ভিতরে এসে পা দিচ্ছে। টেবলের চারপাশে গোল হয়ে বসা লোকগুলোকে আকুতি ভরা চাহনিতে নমস্কার জানাচ্ছে। মুখটাকে করুণ অভাব-গ্রস্ত মুখের মতো সাজিয়ে নিচ্ছে......

অমলের হাসি পেল। ক্লাউনটা তার মুখটাকে সাদা সাদা চক্কর কেটে সাজিয়ে নিয়ে আসরে আসত। অমলও মুখটাকে সকরুণ করে সাজিয়ে নিয়ে আসরে এল। ক্লাউনটা নিজেকে ফেরি করতে লাগল। অমলও নিজেকে বিক্রি করবার জন্য মূল্য যাচাই করতে লাগল। যারা ইণ্টারভিউ নিচ্ছিল তারাই এখন ক্রেতা। অমল নিজেকে জাহির করে করে জানাতে লাগল, আমাকে কিনুন, আমাকে কিনুন। ক্রেতারা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। হাসল। হাসির অর্থ দুর্বোধ্য, তবু অমলের মনে হল আর দশজনকে না দেখে না শুনে না যাচাই করে ......না, অমলকে হয়ত ওদের পছন্দ হচ্ছে না পুরোপুরি। সত্যি সত্যি যদি পছন্দ না হয়, সত্যি সত্যি যদি আপয়েণ্টমেণ্ট লেটার না পায় অমল! অমল আবার হাত দুটো টেনে নিয়ে মাথার নিচে রাখল।

আকাশের মেঘগুলির পেঁজা তুলোর মতো সাদাটে। হাওয়ায় ভর করে ভাসছে। ভাসতে ভাসতে দুটো কি চারটে এক সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে। আবার একটাই ভাঙতে ভাঙতে অনেক, অনেক হয়ে ছুটছে। ভারত-বর্ষের মানচিত্রখানা আশ্চর্য নিটোল হয়ে উঠেছিল, এখন হারিয়ে গেছে পুরোপুরি। বিক্ষিপ্ত বে-আকৃতি অসংখ্য মেঘ; মেঘের জলসা। পার্কের গাছগুলি জমাট বেঁধে নিস্তব্ধ। ফোয়ারাটার পাশে বিষন্ন কয়েক-জন বৃদ্ধ নুয়ে নুয়ে বসে আছে। একজন এমন একটি ভঙ্গিমায় বাঁকা, স্তব্ধ, যার দিকে তাকিয়ে কালী মন্দিরের সিঁড়ির ওপর নুয়ে থাকা পরম এক ভক্তের কথা মনে পড়ে। অমল অনেকক্ষণ বৃদ্ধটাকে লক্ষ্য করল। ওর মনে হল, যেন বেঁচে থাকার প্রতিটি মুহূর্তে বৃদ্ধটাকে ক্লাউনের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছে। এই ক্ষোভে এই দুঃখে বৃদ্ধ এখন পরম পিতা ভগবানের কাছে তার নালিশ জানাচ্ছে, হে ঈশ্বর তোমার সংসার, এমন কুৎসিত কেন? কেন কেন কেন?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অমল। বুকটা উঠল, আবার পড়ল। মাথার নিচেই হাত দুটো আঙুলে আঙুলে জড়াজড়ি করল। পা দুটো খানিকটা ভাঁজ করে নিয়ে আবার ও আকাশের দিকে চোখ রাখল। আবার অনেকক্ষণ স্তব্ধতা। অনেকক্ষণ, যতক্ষণ না আকাশের গুঁড়ো গুঁড়ো মেঘগুলি জমে হয়ে হয়ে বিরাট দৈত্যের আকৃতি নিয়েছে। দৈত্যটার সর্বাঙ্গ লোমশ। মাথায় সাদা সাদা অসংখ্য পালক গোঁজা। কোমর থেকে পা দুটো অসম্ভব লম্বা। ধারালো নখ। মুখের আকৃতি প্রাগৈতিহাসিক, ভয়ঙ্কর কুৎসিত। দৈত্যটা ক্রমশ চওড়া হয়ে হয়ে আরোও বিকট হল। যেন এইমাত্র আকাশ দিয়ে নির্ভয়ে উড়ে যাওয়া কোন এক পাখির ঝাঁক থেকে একটা পাখি তুলে নিয়ে তার টুঁটিটা হাত মুচড়ে ছিঁড়ে নিল। তারপর পাখির গা থেকে পালকগুলো উপড়ে নিয়ে

নিজের চুলের ভাঁজে গ‍ুঁজে নিয়ে পা ঠ‍ুকে দাঁড়াল। টুঁটি ছেঁড়া পাখিটাকে ছ‍ুঁড়ে ফেলে দিল তারপর।

দৈত্যটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে প্রাগৈতিহাসিক একদল বর্বর মান‍ুষের কথা মনে পড়ল অমলের। যেন মশাল হাতে এক-দল নরমাংসে ভোজী মান‍ুষ জংগলে জংগলে ঘ‍ুরে বেড়াচ্ছে। পাথরে পাথরে ঘষে নিয়ে আগ‍ুন জ্বালিয়েছে ওরা। ওদের চুলের মধ্যে পাখির পালক গোঁজা, কোমরে গাছের বাকল জড়ানো। দলের চিহ্ন হিসেবে প্রত্যেকের পিঠের ওপর ত্রিশ‍ূলের আকৃতি কাণা কাণা দাগ। জংগলে জংগলে ওরা ঘ‍ুরে বেড়াচ্ছে। জংগলের হিংস্র পশ‍ুগ‍ুলি ঝোপে ঝোপে গা ঢাকা দিচ্ছে। একটা বীভৎস রকম কিছ‍ু এখনই ঘটে যাবে, এই ম‍ুহ‍ূর্তেই। মান‍ুষগ‍ুলোর কুৎসিত লোল‍ুপ চাহনির মধ্যে সে ধরনের একটা ইংগিত স্পষ্ট।

এ সময় হঠাৎ পাহাড়ের পার একটা অপরিচিত দলছাড়া মান‍ুষকে ওরা দেখল। উলংগ বিজাতীর মান‍ুষটা পাহাড়ের গা বেয়ে ছ‍ুটতে লাগল। আর মশাল হাতে লোকগ‍ুলি সেই ম‍ুহ‍ূর্তেই অদ্ভুত এক ধরনের শব্দ করতে করতে লোকটাকে ধাওয়া করল। জংগলে ঘ‍ুরে বেড়াতে বেড়াতে নতুন এক শিকারের সন্ধান মিলেছে। নর-খাদকগ‍ুলি বীভৎস হয়ে উঠল।

আকাশে মেঘ জ‍ুড়ে জ‍ুড়ে দৈত্য হওয়া ছবিটা লম্বা একটা সাপের মতো হয়ে যাচ্ছে। অমল সাপ-হয়ে-যাওয়া-মেঘের দিকে তাকিয়ে সেই অসহায় লোকটার পরিণতির কথা ভাবতে লাগল। শেষ পর্যন্ত লোকটা নর-খাদকদের হাতের বন্দী হয়ে যাবে। ব‍ুনো লতায় আষ্টে প‍ৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে যাবে। নর-খাদকরা লোকটাকে ঘিরে ধরে আগ‍ুনের কুণ্ডের সামনে বীভৎস ভাবে নাচবে, উল্লাস করবে, তারপর অসহায় লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেদের খিদে মেটাবে। এ দ‍ৃশ্য ভাবা যায় না। বাঘের ম‍ুখ থেকে আধ খাওয়া একটা দেহকে সরিয়ে এনে যেমন সেই দেহটা আগলিয়ে বসে থাকতে গা ঘিন ঘিন করে তেমনি গা ঘিন ঘিন করে উঠল অমলের। এ দ‍ৃশ্য ভাবা যায় না।

ফোয়ারার পাশে সেই মন‍ুমে থাকা ব‍ুদ্ধটা এখনো পাথরের মতো বসে আছে। পাথরের ব‍ুদ্ধ বা কামানের মতো অনন্তকাল ধরে যেন ও ওখানেই বসে থাকবে। আশ্চর্য! চট‍ুল অংগভংগি করতে করতে দ‍ুটি মেয়ে মান‍ুষ ফোয়ারার দিকে এগোচ্ছে। বেশ্যারা অনেক রাত অবধি গলির দরজা থেকে বেরিয়ে এসে এ সব পার্কে নিজেদের ফেরি করে বেড়ায়। রং করা ম‍ুখ, ঢালা চোখ। দেহ বিক্রি করে। সার্কাস পার্টির ক্লাউন-দের সাজিয়ে আকর্ষণীয় করে নেয়। তারপর ঘ‍ুরে ঘ‍ুরে পার্কের ঘাসের ওপর পা ফেলে ফেলে, ফোয়ারার পাশে, বেঞ্চের ধার ঘেঁষে যেন নিঃশব্দে হাঁক দিয়ে দিয়ে বলে, আমাকে কিনবে? কিনে নাও না! দেখ আমি নকল নই আসল। আসল, আর তুমি পাবে না! আমার রক্ত মাংস, আমার চোখ ম‍ুখ ব‍ুক, আমার সব, কিনবে? কিনে নাও না।

অমল নিজেকে বিক্রি করবার জন্য ইন্টার-ভিউ বোর্ডের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। বোর্ডের সেই লোকগ‍ুলোকে সকর‍ুণ ভাবে জানিয়েছিল আমাকেই চাকরিটা দিন। আমাকেই পছন্দ করে নিন। দেখ‍ুন এই আমার বিদ্যে, এই আমার ব‍ুদ্ধি, আমাকে কিনে রাখ‍ুন। কিনবেন? কিন‍ুন না।

অমলের টানটান দেহটা আবার একটা মোচড় খেল। কপালের পাশে রগ দ‍ুটো এখনো টিপটিপ করছে। সর্বাংগে অবসাদ। পিঠের নিচে, শক্ত কাঠের বেঞ্চিতে, দেহটা প্রচণ্ডভাবে বসে যাচ্ছে যেন। হয়ত উঠে দাঁড়াতে গেলে অমল টলে টলে পড়ে যাবে। সত্যি সত্যি যদি চাকরিটা না হয় ওর।

আকাশের মেঘগ‍ুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ট‍ুকরো ট‍ুকরো অসংখ্য হয়ে যাচ্ছে। সম‍ুদ্রের ঢেউয়ের মতন অসংখ্য। রাত এগারোটার পর হোস্টেলের দরজায় তালা পড়বে। পড়‍ুক। অমল খ‍ুঁটিয়ে খ‍ুঁটিয়ে মেঘ-গ‍ুলোকে পরীক্ষা করতে লাগল। পরীক্ষা করতে করতে এক সময় অতর্কিতে আশ্চর্য একটা নতুন ম‍ূর্তি আবিষ্কার করল। ম‍ূর্তি-টার রাজা-বাদশাহী চাল স্পষ্টভাবে ভেসে উঠছে চোখে। কে, কার মতো ও? অমল স্ম‍ৃতি রোমন্থন করতে লাগল। কে? কার মতো? খানিকটা চেনা, খানিকটা অচেনা। পা দ‍ুটোকে আর একট‍ু কুঁচকে ছোট করে আনল। কিছ‍ুতেই ধরে উঠতে পারছে না, কে, কার মতো ও? স্কুলপাঠ্য ইতিহাস বইয়ের নবাব বাদশাহের মতো। নাদির শা, মহম্মদ ঘ‍ুরি, তৈম‍ুর লংগ......তৈম‍ুর লংগের মতো?

তৈম‍ুরকে নিয়ে স্কুল ম্যাগাজিনে কে যেন একটা গল্প লিখেছিল।

তৈম‍ুরের মতো দিগ্বিজয়ী বীরও শেষ জীবনে তার নকীবদের কাছে অন‍ুরোধ করছে, আমি মরে যাওয়ার পর আমাকে যখন আপনারা কফিনে শোয়াবেন তখন আমার দেহটা চিৎ করে শ‍ুইয়ে হাত দ‍ুটো ব‍ুকের ওপর জোড়া লাগিয়ে দেবেন। আমি সেই নিষ্পন্দ পবিত্র দেহে য‍ুগাতীত কাল ধরে আল্লার দিকে ম‍ুখ তুলে কাটিয়ে দেব। হয়ত তৈম‍ুর লংগ য‍ুগাতীত কাল ধরে এখনো কফিনের নিচে আল্লার দিকে ম‍ুখ তুলে তাকিয়ে আছে। হয়ত আজও সে আল্লার কাছে দোয়া মাগছে; আল্লা দোয়া কর, দোয়া কর!

কিন্তু কেন? অমল মনে মনে প্রশ্ন করল।

স‍ুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.-প্রণীত

ব্যায়ামে বাঙালী	৩.০০	বাংলার ঋষি	৩.০০
বীরত্বে বাঙালী	১.৫০	বাংলার মনীষী	১.২৫
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪.০০	বাংলার বিদ‍ুষী	২.০০
আচার্য জগদীশ	২.০০	রাজর্ষি রামমোহন	১.৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১.০০	য‍ুগাচার্য বিবেকানন্দ	১.৫০
জীবন গড়া	.৭৫	রবীন্দ্রনাথ	১.২৫

...লাইব্রেরী · ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

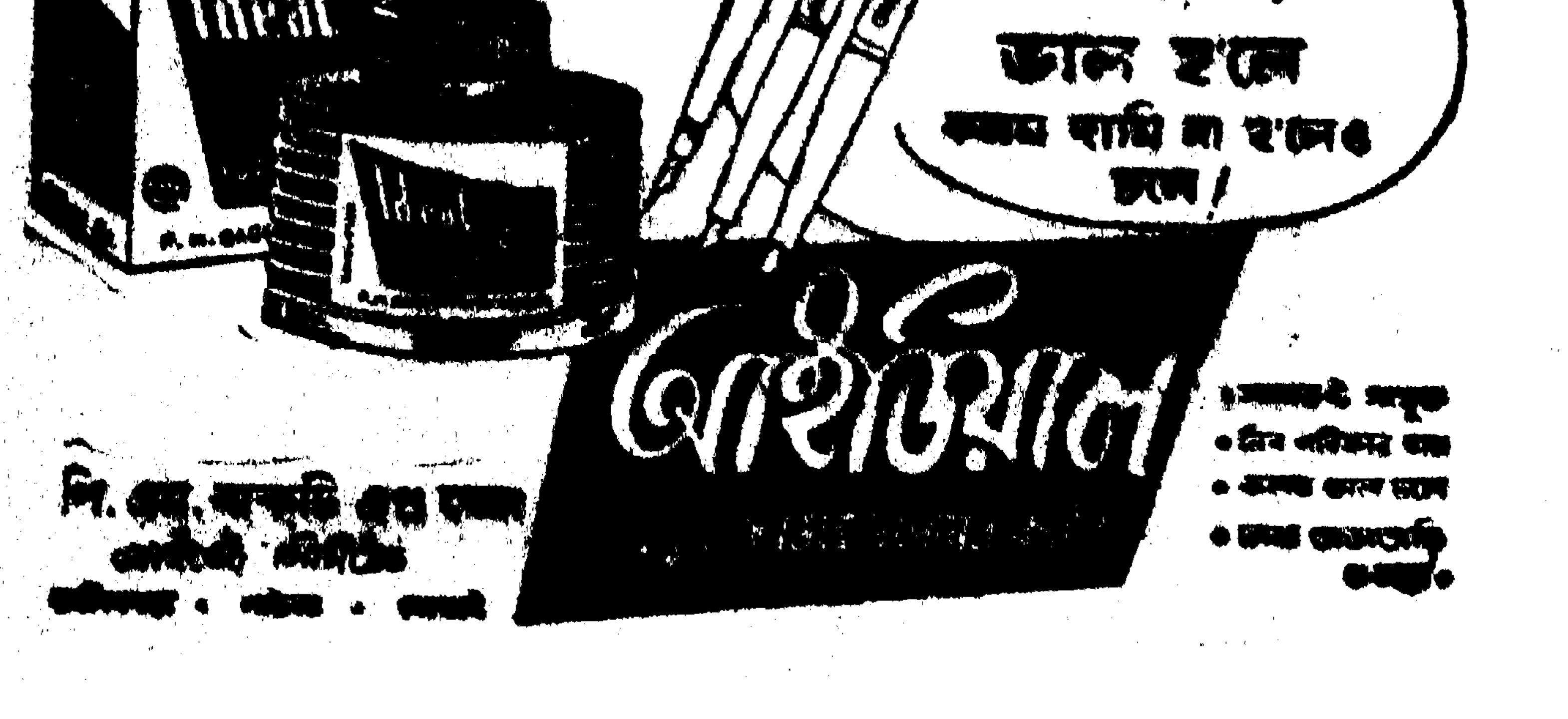

আল্লা ওর বাসনা অতৃপ্ত রেখেছেন, তাই কি? কে জানে। অমল প্রায়-পরিচিত মেয়ের মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে রইল।

যে অসহায় লোকটা প্রাগৈতিহাসিক যুগে নরখাদকদের মুখের গ্রাস হয়ে উঠেছিল সেই লোকটাই হয়ত আজকের যুগে সেই ক্লাউন হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে। যদি আজকের এই ক্লাউনটা তৈমুরের যুগে মরুভূমি বাসী কোন এক ইহুদী হয়ে জন্মাত তা হলে তাকে নিয়ে আশ্চর্য এক নাটক রচনা করা যেত। অমল মনে মনে একটা নাটক রচনা করতে লাগল।

তার দৃশ্যগুলি এরকম:

প্রথম দৃশ্যে দেখা যাবে মরুভূমির মধ্যে একটা তাঁবু। সময়—সন্ধ্যার পূর্ব প্রহর।

তৈমুর (নকীবদের প্রতি): আমরা অনেক-দিন এই মরুভূমির মধ্যে পড়ে আছি। নয় কি? (নকীবরা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করল।) এই দীর্ঘদিন একটাও নরহত্যা ঘটে নি। এমন কি সামান্যতম একটা রক্ত-

পাতও না। (নকীবরা অধীর আগ্রহে তাকাল) তাই আজ যদি কোন একটা বীভৎস মৃত্যু দৃশ্য দেখবার ইচ্ছে করি তবে কি অন্যায়?

তৈমুর তার বাসনা জানাবার সংগে সংগেই দৃশ্যান্তর ঘটল।

দ্বিতীয় দৃশ্য। স্থান—মরুপথ। একটা মরুদ্যান দেখা যাচ্ছে। জনৈক পথচারী (সেই আজকের যুগের ক্লাউনটা, সেই আদিম যুগের অসহায় মানুষটা) উটের সংগে হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত দেহে মরুদ্যানের দিকে এগোচ্ছে। ঢিলে ঢালা পোশাক। সন্ধ্যার পূর্বেই ওকে তৈরি হয়ে নিতে হবে আজানের সুর গাইবার জন্য। তৈমুরের সৈন্য প্রবেশ করল।

সৈন্যঃ কে যায়?

পথচারীঃ আমি।

সৈন্যঃ তুমি কি জান না সামনেই সৈন্য শিবির তৈমুরের। তৈমুর আল্লার মতো শক্তিমান। তুমি কি জান না?

পথচারীঃ না।

সৈন্যঃ জান না! এই অপরাধে তোমাকে বন্দী করতে আমি বাধ্য।

পথচারীকে বন্দী করার সংগে সংগে আবার দৃশ্যপট পালটে গেল। শুরু হল তৃতীয় বা অন্তিম দৃশ্য। তৈমুর তাঁবুর সামনে তাঁর নকীবদের নিয়ে বসেছেন। আর খানিক বাদেই সন্ধ্যা নামবে। বাতাসে ছোট ছোট বালুর কণা ভেসে বেড়াচ্ছে। বন্দীকে নিয়ে সৈন্য প্রবেশ করল।

তৈমুরঃ এ কেমন বন্দী যার জ্বলন্ত চোখ দুটো এখানেও এই আসরেও ধ্বক ধ্বক করে জ্বলবার সাহস রাখে?

(এক মুঠো বালি কুড়িয়ে নিয়ে অকস্মাৎ লোকটির চোখে মুখে ছুঁড়ে দেওয়া হল। লোকটি দু হাতে চোখ ঢেকে বালির সমুদ্রে থুবড়ে পড়ল।

তৈমুরঃ এবার ওর চামড়ার খোলসটা খুলে দেখাও। চামড়া উপড়ে নেওয়া জীবন্ত একটা দেহ কতদিন দেখি নি। দেখাও, দেখাও—

এর পর নিঃশব্দ নাটক। তলোয়ারের ফলা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে লোকটার গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া হল। চড়চড় করে চামড়া উপড়ে আসছে। চামড়া আর রক্ত। রক্ত যেন ফিনকি দিয়ে সারা আকাশ ছড়িয়ে যাচ্ছে। সূর্যটা ডুবে যাচ্ছে। চামড়া ছাড়ানো থকথকে দেহটা বালির ওপর কাতরে কাতরে জড়াতে লাগল। বালি আর রক্ত আর মাংস আর দেহটা অদ্ভুত একটা পরিবেশ রচনা করল। যতক্ষণ সম্ভব তৈমুর তার চকচকে চোখ দিয়ে বিকটভাবে লোকটার যন্ত্রণা উপভোগ করতে লাগল। তারপর গাঢ় একটা অন্ধকার নেমে এসে দৃশ্যটাকে ঢেকে ফেলল। যবনিকা পড়ল।

এমনু একটা নৃশংস দৃশ্য মনে মনে কল্পনা করে নিতে অমলের বিন্দুমাত্র কষ্ট হল না। মানুষের আইনেই মানুষকে শাস্তি দেওয়ার কুৎসিততম ছবি চোখের সামনে ভেসে আসছে। হ্যাঁ, সেই কাঁকর বিছানো রাস্তার ওপর দিয়ে হাত পা বাঁধা একটা দৈত্যের আকৃতি মানুষকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে নগরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। যাকে টানা হচ্ছে তার অর্ধাংগ ক্ষয়ে ক্ষয়ে পাথর কুচির সংগে মিশে যাচ্ছে...অর্ধ প্রোথিত একটা অপরাধীকে পোষা কুকুর লেলিয়ে টুকরো টুকরো ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে......চোখ উপড়ে নেওয়া কাকে যেন এই মাত্র হাতীর শুঁড়ে পেঁচিয়ে সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে দেওয়া হল ...ফুটন্ত গরম তেল কার গায়ের ওপর এইমাত্র যেন ছড়িয়ে দেওয়া হল......

সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষটার মতো অসহায় বোধ করতে লাগল অমল। নিজেকে দুমড়িয়ে নিয়ে মাথার নিচ থেকে আবার হাত দুটো টেনে বুকের ওপর রাখল। বুকের ওপর থেকে গড়িয়ে বেঞ্চের দুপাশ দিয়ে নিচের দিকে ঝুলে পড়ল।

আর ঠিক এ সময়ই কর্কশ একটা শব্দ করতে করতে একটা পুলিসভ্যান চলে গেল। চমকে উঠেছিল অমল। হয়ত কোন জুয়াড়ীর আড্ডায় ঝাঁপিয়ে পড়তে চলেছে পুলিসগুলো। হয়ত কোনও খুন-চক্রান্তের আসামীর সন্ধান পেয়েছে এইমাত্র। তীব্র সার্চ লাইট ফেলে কোন এক বস্তির গলিমুখে আছড়িয়ে পড়বে।

গাড়িটা দূরে থেকে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। শব্দটা ক্ষীণ হতে হতে এক সময় ফোয়ারার শব্দের সংগে মিশে এক হয়ে গেল। ফোয়ারার দিকে তাকিয়ে জলের দানাগুলোকে নিটোল, অতি পবিত্র এবং শুদ্ধ মনে হতে লাগল অমলের। মায়ের চোখের জলের সংগে এই শুদ্ধতার একটা মিল আছে। মায়ের কথা মনে পড়ল। মা এখন এক অজ-পাড়াগাঁয়ে অন্ধকূপ ঘরের মধ্যে ছেলের মূল্যের প্রত্যাশায় বসে বসে বেঁচে আছে। মাকে অনেকদিন চিঠি দেই নি। ইন্টারভিউটা ভাল হলে নিশ্চয়ই আজ লিখতাম: মা এবার চাকরি ঠিক হয়ে গেল, এবার আর কোন কথাই শুনব না, তোমাকে কলকাতা নিয়ে আসব।

মা, তুমি বড় দুঃখী। মা, জানো, এখন আমি এই পার্কের বেঞ্চিতে শুয়ে আছি।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই মানুষটার সংগে কোথায় যেন অমল নিজের একটা সাদৃশ্য খুঁজে পেতে লাগল। সেই তৈমুরলঙের আসরে গায়ের খোলাস উপড়ে নেওয়া লোকটার সংগেও। পর্তুগীজদের আমলে জন্মালে হয়ত আমি ক্রীতদাস হতে পারতাম। সেই লেজ-অলা ক্লাউনটা আশ্চর্য ধূর্ত, নিজেকে ফেরি করে পয়সা আয় করে। মা, তুমি এ সব জান না।

আর সেই তেল মালিশ-অলা সেই চটুল

নারায়ণ চক্রবর্তীর
তীর্থাঞ্জলি
ভারত-ব্রহ্ম-চীনের বিস্তৃত পটভূমিকায় লেখা অনন্যসাধারণ রহস্য-উপন্যাস। ৩.০০
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২ ও অন্যান্য পুস্তকালয়।

ঔপনিষদ
চিত্রিতা দেবী প্রণীত (লীলা পুরস্কারপ্রাপ্ত)
নূতন উপনিষৎ সংযোজিত
বহু প্রতীক্ষিত ২য় সংস্করণ
মূল্য—৫, টাকা
প্রাপ্তিস্থান: শ্রীশঙ্কর পাবলিশার্স
১৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
ও অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

৫ম সংস্করণ
সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের
ইস্পাত
ওরা
ভাঙবেই ৪৲
লেখকের আরেকখানি উপন্যাস
এলো
আহ্বান ৪৲
(৬ষ্ঠ সংস্করণ চলছে)
সাধারণতন্ত্রী প্রকাশালয়, ৪৪, কালীকুমার মুখার্জি লেন, শিবপুর, হাওড়া ও কলকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে
(সি ৮৪৯৫)

তেল কোম্পানীর
দাদ ও কাউরের
অব্যর্থ মলম
বরানগর • কলিকাতা

মেয়ে মানুষ দুটোর সঙ্গে তামাশা জুড়েছে। মেয়ে দুটো প্রমাণ করতে চাইছে ওরা নকল নয়, আসল। কেন না কিনবে? কিনে নেও না। আমাদের দেহ, রূপ রস গন্ধ, কিনে নাও না। নিজেদের দেহ বিক্রি করে ওরা পয়সা রোজগার করে। জীবন ধারণ করে।

ফোয়ারার পাশে বসে থাক। সেই বুদ্ধ-কনিষ্কের মতো বুদ্ধটা স্তব্ধতায় জমে জমে পাথর হয়ে উঠছে যেন। সামান্য একবারের জন্যও যেন ও দেহটাকে বাঁকাচ্ছে না। দেহটা নড়ে উঠলেই ঝুর ঝুর করে এখনই সব খসে পড়ে যাবে। এমন স্তব্ধতা।

এই স্তব্ধতার মাঝে অমলও ধীরে ধীরে ডুবে যেতে লাগল। আকাশের মেঘগুলি আবার গুড়ো গুড়ো অসংখ্য, অগণ্য হয়ে যেতে লাগল। ডুবে যেতে যেতে অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ অনুভব করল অমল। অতি অবাস্তব এক পাকচক্র। যেন সেই প্রাগৈতি-হাসিক যুগের মানুষগুলি বেঁচে উঠে সামনের ঐ ফোয়ারার পাশে ভিড় করে

৩০ বছর ধরে... লক্ষ মানুষের তুষ্টি ও বিশ্বাস

ডাল্‌ডার উৎকৃষ্টতায়

আপনার পরিবারইবা বঞ্চিত হবে কেন?

ডাল্‌ডা একটি খাঁটি জিনিষ, কারণ সবচেয়ে খাঁটি ভেষজ তেল থেকে তৈরী। এবং ডাল্‌ডা পুষ্টিকরও বটে, কারণ স্বাস্থ্যের জন্য এতে ভিটামিন যোগ করা হয়েছে।

তাই মাছ-মাংস, শাকসব্জী, তরি-তরকারী ডাল্‌ডায় রাঁধলে সত্যিই সুস্বাদু হয়। আজ লক্ষ গৃহিণীও তাই তাঁদের সব রান্নাতেই ডাল্‌ডা ব্যবহার করছেন। আপনিইবা তবে পেছনে পড়ে থাকবেন কেন?

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

ডালডা বনস্পতি

দাঁড়াচ্ছে। যেন সেই তৈমুরলঙ্গ তার কবরের নিচ থেকে উঠে এসে গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়াচ্ছে। বহুকালের ধুলো জীর্ণ জরির পোশাক থেকে উড়ে উড়ে পড়ছে। চোখ রগড়ে হাই তুলতে তুলতে তৈমুর দেখল, একপাল উলঙ্গ আদিম মানুষ বিকৃতভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তৈমুর নিঃশব্দ, যান্ত্রিকভাবে হাসল। ফোয়ারার জলের মতো হাসিটা অতি ক্ষীণ একটা শব্দ তুলল। নরখাদক বর্বর মানুষগুলি বিজাতীয় মানুষের চোখে, তৈমুরের চোখে, আশ্চর্য এক সম্মোহিনী শক্তির ছোঁয়া পেয়ে বশ্যতা স্বীকার করতে লাগল। এক, দুই, তিন, চার...একে একে পুরোদলটাই তৈমুরের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল। অমানুষিক, অসংস্কৃত একটা দৃশ্য।

তৈমুরের জরির পোশাক থেকে শতাব্দীর ধুলো হাওয়ায় হাওয়ায় খসে পড়তে লাগল। ঠোঁটের কুৎসিত কোণ ঘেঁষে সেই ফোয়ারার জলের হাসি। হাসিটা অনেকক্ষণ পর মিলিয়ে যেতে যেতে তৈমুর তার খোঁড়া পায়ের ওপর ভর দিয়ে আদেশের ভঙ্গিতে দাঁড়াল। একজন ক্ষীণকায় বর্বরের দিকে আঙুল তুলে নিঃশব্দে ইঙ্গিত করল অনাকে ওর গায়ের খোলস ছাড়িয়ে দেখতে......বহু-কাল গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া একটা দেহকে তৈমুর পরম নিশ্চিন্তে দেখবার সুযোগ পায় নি।

—ওর চামড়াটা ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিয়ে রক্ত মাংসের দেহটাকে তুলে ধরো আমি দেখব। তৈমুর তার বাসনা জানাল। এবং বাসনা জানানো শেষ হওয়ার আগেই এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল। আশ্চর্য, সেই টোপা কুলের মতো নাক-অলা ক্লাউনটা পার্কের গেট পেরিয়ে ভেতরে এসে ঢুকছে। ঢুকল। নরখাদকগুলোর চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে সে তার লোক হাসানো খেলাগুলি দেখাতে শুরু করল। ক্লাউনটা আশ্চর্য ধূর্ত। সে তার লোক হাসানো খেলাগুলি দেখিয়ে তৈমুরের কৃপা প্রার্থনা করার কৌশল চমৎকার রপ্ত করে নিয়েছে। সে সত্যিকে নকল হাত দুটো নাড়ল, আসল হাত দুটো দিয়ে লেজটাকে জাপটে ধরে হনুমানের মতো একটা লাফ দিল। সে নানা ভাবে জাহির করতে লাগল নিজেকে।

যে আদিম লোকটার চামড়া উপড়ে নেওয়ার কথা, সেই আদিম অসহায় লোকটা মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য ক্লাউনটার মতো অসহায় ভাবে অঙ্গভঙ্গি করতে করতে ক্লাউন হয়ে যেতে লাগল।

তৈমুরের চোখ জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। ফোয়ারার জলের মতো হাসিটা আবার গাঢ় হয়ে উঠছে। জরির পোশাকে বাতাস লেগে কুচি কুচি মনি মুক্তোগুলোর জলতরঙ্গের মতো মিষ্টি একটা আমেজের শব্দ উঠছে।

একে একে, এক দুই তিন চার...পুরো নরখাদকদের দলটাই ক্লাউনের মতো অঙ্গ ভঙ্গি করতে করতে নিজেদের জাহির করতে লাগল। পা টলে পড়ছে ক্লান্তিতে, জন্তুর মতো মুখ ভেসে যাচ্ছে ফেনায়। ঘন ঘন শ্বাস টানছে। পায়ে পায়ে ধুলো, ধুলোর সমুদ্রের মধ্যে ডুবে হারিয়ে যেতে লাগল নরখাদক আদিম মানুষগুলো। আর এ সময়ই আর্ত একটা চিৎকারের মতো শব্দ শোনা যেতে লাগল।

ককিয়ে ককিয়ে কুৎসিত একটা শব্দ শুনে অমল চমকে উঠল। শব্দটা ক্ষীণ হতে হতে রাত্রির নির্জনতায় মিলিয়ে যাচ্ছে। অমল বুঝতে পারল বড় রাস্তা ধরে প্রচণ্ড শক্তি-মান একটা দমকলের গাড়ি আগুন নেভাতে ছুটে যাচ্ছে। হয়ত এমন এক বস্তিতে আগুন লেগেছে যেখানে অনেকগুলো মা শিশু বৃদ্ধ যুবক পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

অমল ক্লান্ত ঘোলাটে চোখে পার্কের চার-পাশে তাকাল। বৃদ্ধটা লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। ফোয়ারার জল উথলে উঠে ঝির ঝির করে পাথরের গায় গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে। গাছগুলো ঘুমন্ত, জমাট বাঁধা। আর আকাশের মেঘগুলি নির্বিবাদে চলচিত্রের দৃশ্যের মতো বাঘ হচ্ছে, বাঘের মুখ জেব্রার মতো অদ্ভুত গলা-অলা একটা জীব। জীবটা ভেঙে চুরে হুবহু ভারত-বর্ষের মতো একখানা মানচিত্র।

হঠাৎ চমকে উঠল অমল। সেই আদিম বর্বর মানুষগুলোকেই যেন ঝাপসা আলোয় এইমাত্র দমকলের গাড়ির ওপর বসে থাকতে দেখেছিল ও। আশ্চর্য।

অজগরটা অন্ধকারের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে।

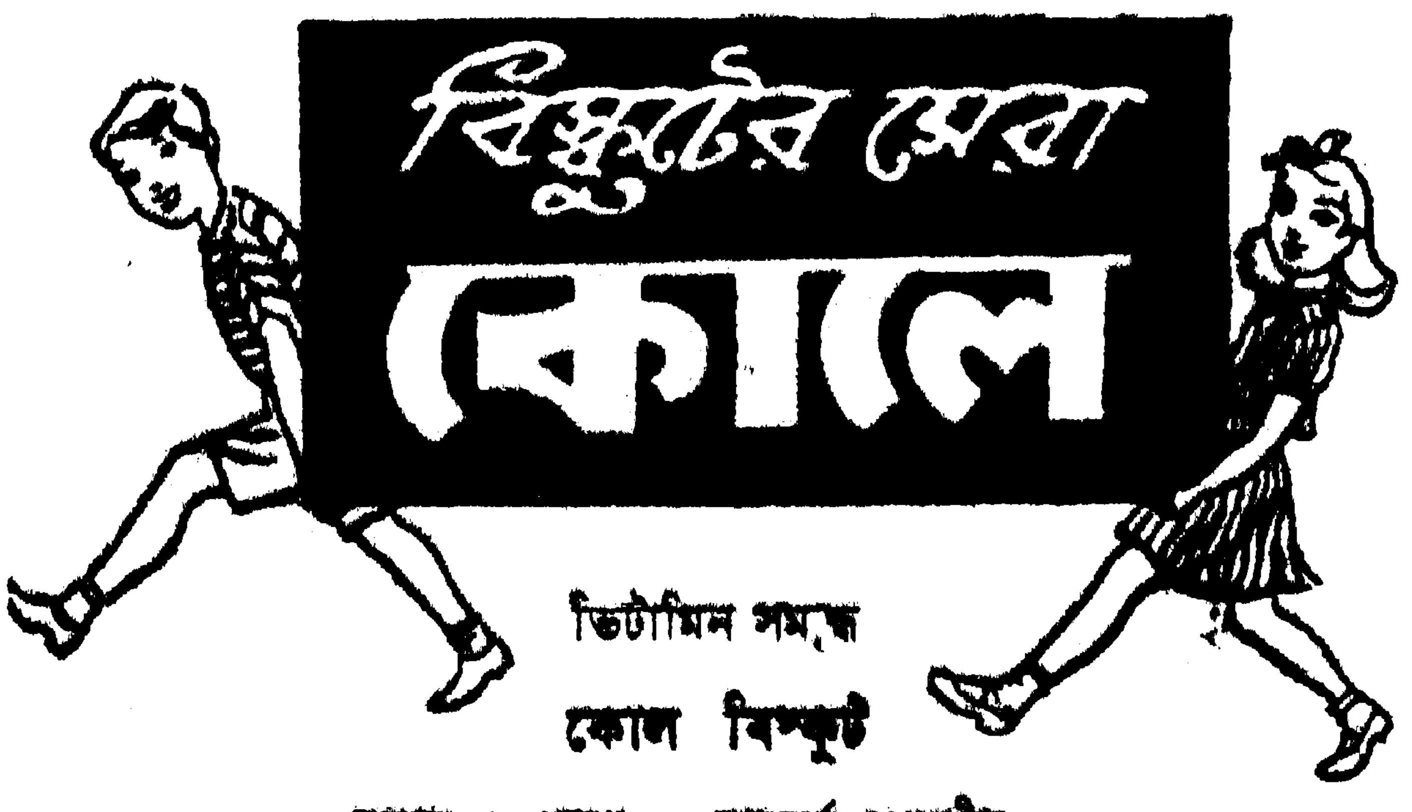

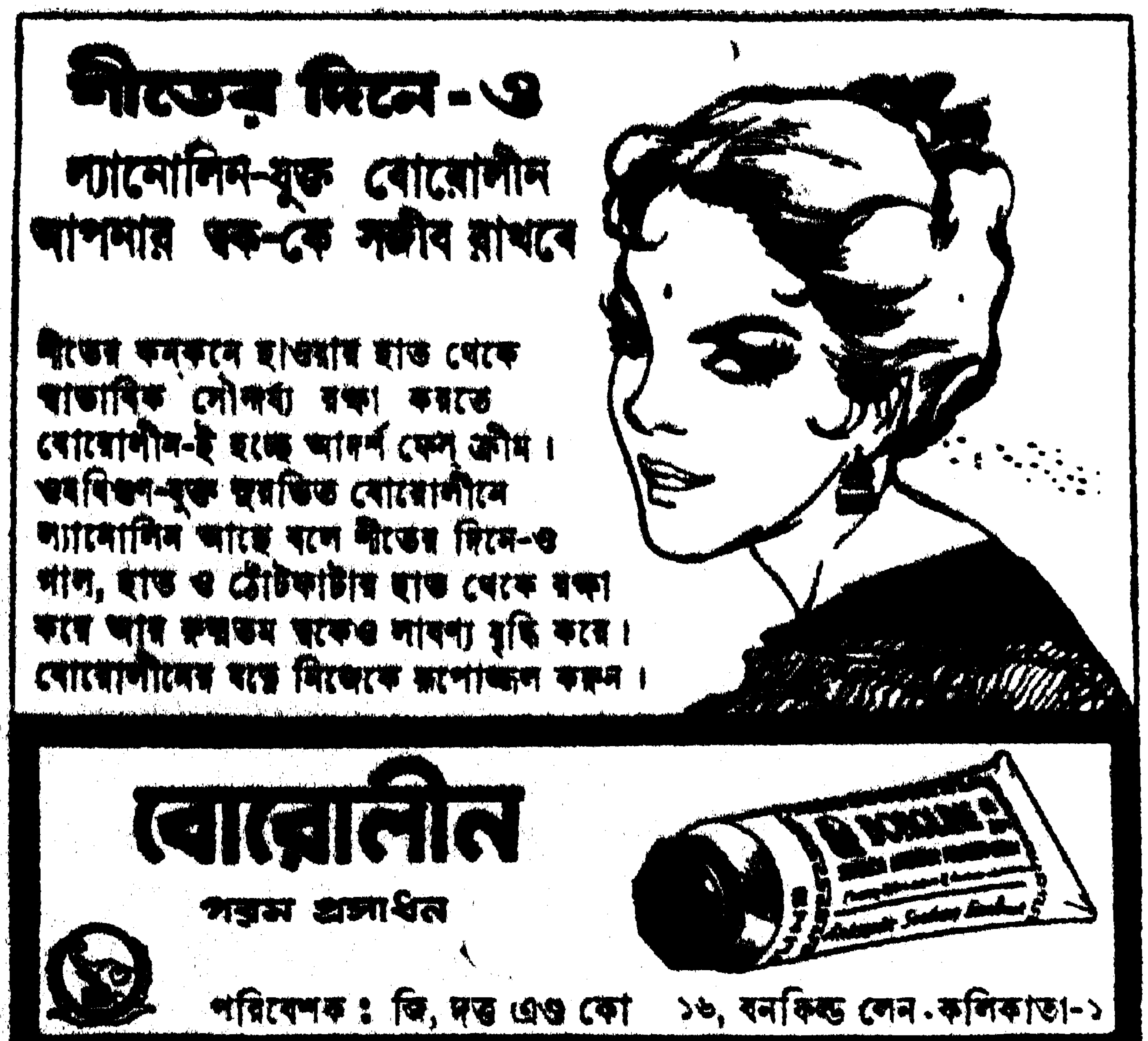

আপনাকে লাবণ্যে উজ্জ্বল ক'রে রাখবে

পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম

আপনার স্বাভাবিক মুখশ্রী আরো সমুজ্জ্বল ক'রে তুলুন…পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম ব্যবহার ক'রে আপনার মুখখানি নির্মল, কমনীয় ও মসৃণ রাখুন। এই ক্রীম ত্বকের গভীরে প্রবেশ ক'রে সমস্ত ময়লা দূর ক'রে দেয়, ত্বকে কোন দাগ হতে দেয়না এবং ত্বক লাবণ্যোজ্জ্বল রাখে। রোজ রোজ পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম আপনার মুখে মাখুন — দেখবেন, কত অল্পদিনে আপনি অম্লান লাবণ্যের অধিকারিণী হয়েছেন!

সারা পৃথিবীর সুন্দরী রমণীদের মনের মতো

চীজব্রো-পণ্ড্‌স ইন্‌ক (সীমিত দায়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

'শ্রীপালী': সিংহল

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কলম্বো থেকে বাস ছেড়েছিল সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে। অতি দ্রুত অন্ধকারে চারিদিক ছেয়ে গেল। বিষুবরেখার কাছাকাছি অঞ্চলে গোধূলির স্থায়িত্ব কম। এই ভৌগোলিক সত্যের প্রমাণ কলকাতা থেকে দু হাজার মাইল দক্ষিণে এসে গত কয়েকদিন হল পাচ্ছি। সূর্য যেন সহসা অস্ত যায়; মেঘের গায়ে গায়ে মাথায় মাথায় রঙ মাখানোর খেলায় তার যেন অভিরুচিও নেই, সময়ও নেই। আর অমনি নেমে আসে নীরন্ধ্র অন্ধকার। চারদিক ব্যাপ্ত করে, সমস্ত চিহ্ন লুপ্ত করে, সেই মন্থর অন্ধকার তারপরে শুধু চুপ করে বসে থাকে। অস্বাভাবিক লাগে একটু: তবু ভালো লাগে আমার। কেননা, ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে সেই কৃষ্ণ-যবনিকার গায়ে জোনাকির মালা জ্বলে ওঠে, রাশি রাশি যুঁইফুলের মত। মেঘের খেলার বদলে নীলাভ আলোর ফুলঝুরি। মন্দ কি।

আলোর চুমকি-বসানো কালো রঙের দুই সমান্তরাল দেওয়ালের মাঝখান দিয়ে আমাদের বাস চলেছে কলম্বো থেকে হোরানায়। হেড-লাইটের তীব্র আলো সামনের পথের ওপর পড়েছে। বর্শা-ফলকের মত বিদ্ধ করছে তামসী রাত্রিকে। আর অন্ধকারের ক্ষণিক পশ্চাদপসরণের সুযোগে অক্লান্তগতিতে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। কিছুক্ষণ পর আমার মনে হতে লাগল, এই আলোর লাগামই যেন তমসা-সমুদ্রের ভেতর দিয়ে টেনে নিয়ে চলেছে বাসটিকে। পথের দুপাশে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়। শুধু সাদা আর কালো, এই দুটি রঙে এত সুন্দর চিত্র হতে পারে, আগে তা কে জানত! মাইলের পর মাইল এত নিবিড় অন্ধকার আর এত অজস্র জোনাকি আর কোথাও দেখিনি। সিংহলের দুরপাল্লার যে-কোনো পথের দুধারে যে-আদিম অরণ্য তারও কানো তুলনা নেই। লতাগুল্মের সেই ঘন আস্তরণে দিনের বেলাই আঁধারের একাধিপত্য; রাত্রির অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

ঝিঁঝি-ডাকা এই অরণ্যপথে হোনারায় চলেছি—কলম্বো থেকে কুড়ি মাইল দূরে। পকেটে একখানা পরিচয়পত্র। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ মহাশয় সে-চিঠি লিখেছেন সিংহল পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য শ্রীযুত উইলমট আব্রাহাম পেরেরাকে। শ্রীযুত পেরেরার আরও পরিচয় আছে। তিনি কেবলমাত্র একজন এম পি নন, সিংহলের অন্যতম প্রধান জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান "শ্রীপালী"র তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান কর্মকর্তা। আমরা অনেকেই জানি না যে, ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সদলবলে সিংহলে গিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি-স্থাপনা করেন। শ্রীযুত শান্তিদেব ঘোষও সে-দলে ছিলেন। হয়ত রবীন্দ্রনাথ এই সংস্থার নাম দিয়েছিলেন শ্রী পল্লী; সিংহলী ভাষায় ভাষান্তরিত হয়ে সে-নাম এখন দাঁড়িয়েছে "শ্রীপালী"তে।

শ্রীপালী সিংহলী ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক স্কুল। প্রবেশিকা স্তর অবধি অধ্যয়নের ব্যবস্থা আছে। এছাড়া নৃত্য, গীত, কলা-ও বিবিধ শিল্পচর্চারও অতিশয় সুচারু বন্দোবস্ত আছে এই প্রতিষ্ঠানে। কয়েক বছর আগে আমি যখন শিক্ষালয়টি পরিদর্শন করি তখনই ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দেড় হাজারের কাছাকাছি। এখন হয়ত আরও বেড়ে থাকবে। সিংহলের তাবৎ বিদ্যালয়ের মধ্যে এইটিই যে শ্রেষ্ঠ সে-বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। শ্রীপালীতে ছেলেমেয়ে ভর্তি করতে পারলে সিংহলী সমাজের সর্বস্তরের অভিভাবকেরা যে নিশ্চিন্ত বোধ করেন একথার প্রমাণ সিংহল ভ্রমণের সময়ে আমি বিভিন্ন সূত্রে পেয়েছি। অধ্যয়ন-অধ্যাপনার দিক থেকে অপেক্ষাকৃত

●

শঙ্খ মার্কাই

যশোর কুম্ব ইণ্ডাষ্ট্রী কোং
কলিকাতা-৯

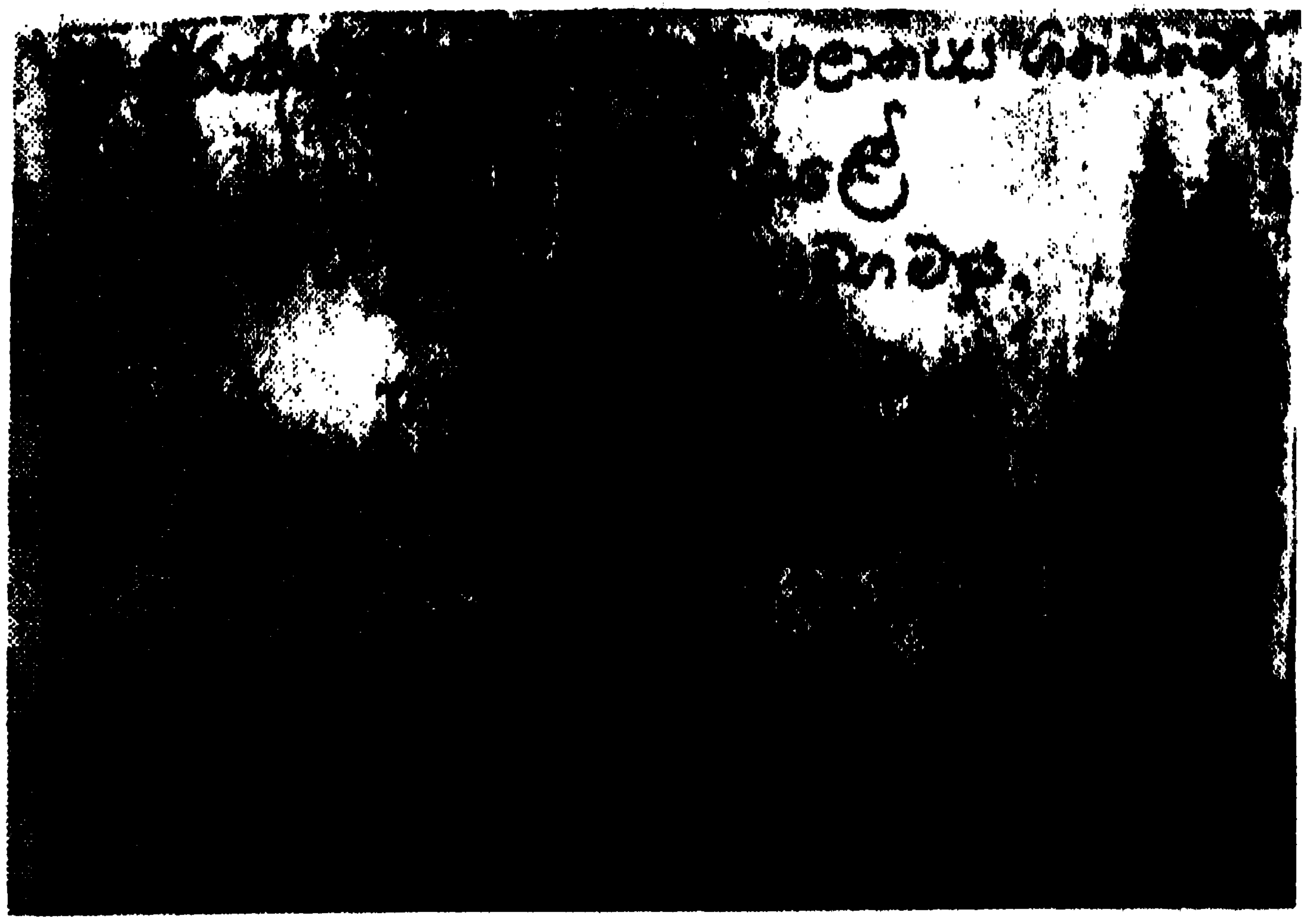

শ্রীপালীতে রবীন্দ্রনাথ স্থাপিত ভিত্তিপ্রস্তর

অগ্রসর পশ্চিম বাঙলায়ও এরকম একটি সুপরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব—বিশ্বভারতী ছাড়া—আমার জানা নেই।

রবীন্দ্রনাথ যে-প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন, সে-প্রতিষ্ঠান যে বিশ্বভারতীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে একথা বলাই বাহুল্য। শ্রীপালীর পরিচালনার ভার এখন একটি ট্রাস্টের হাতে ন্যস্ত। শ্রীযুক্ত পেরেরা এই ট্রাস্টের সভাপতি। ট্রাস্টের প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে একথা বিধিবদ্ধ আছে যে, এই সমিতি শ্রীপালীতে এমন একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা করবেন যেখানে জাতি, বর্ণ, ধর্ম ও রাজনীতি নির্বিশেষে সকল প্রকার ছাত্র ছাত্রীই জ্ঞানার্জন করবার সুবিধা পাবে যাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত সকলেরই ব্যক্তিত্বের পূর্ণতম বিকাশ সম্ভব হয়। ছাত্রছাত্রী মধ্যে এ-প্রত্যয় জাগ্রত ও পুষ্ট করাও সমিতির কর্তব্য যে, মানবজাতি মূলত এক, কেননা, এই বিশ্বাস থেকে ও দেশদেশান্তরের কৃষ্টির আদান-প্রদানের মাধ্যমেই তারা দেশ-জাতির ব্যবধানের ঊর্ধ্বে উঠে পৃথিবীর নাগরিক হিসেবে নিজেদের গণ্য করতে শিখবে। বিশ্বসভ্যতার নির্মল ধারাটির সংগে ভারতীয় কৃষ্টির প্রবাহটিকে মিলিত করাই যদি বিশ্বভারতীর লক্ষ্য হয় তবে শ্রীপালীর উদ্দেশ্যের সংগে তার বিশেষ পার্থক্য নেই।

শ্রীপালীর আর একটি প্রধান অভীষ্ট হল ভারত ও সিংহলবাসীর মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন সর্বপ্রযত্নে দৃঢ় করা। শ্রীপালীর প্রতিষ্ঠাতা ও কর্মকর্তাদের এ-বিশ্বাস বদ্ধমূল যে, সিংহল ও ভারতবর্ষের মধ্যে শত সহস্র বৎসরের কৃষ্টিগত যোগাযোগের ফলস্বরূপ এই আত্মীয়তা সাংস্কৃতিক ঘনিষ্ঠতা দ্বারা আরও পরিণতির পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। সিংহলের এই অনন্য প্রতিষ্ঠানটির পরিচালকেরা নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে সততই সেই চেষ্টা করে চলেছেন। প্রবল ভারতীয় বিদ্বেষের দিনেও তাঁরা এ-আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হন নি। একথা আমাদের ভাবতে ভাল লাগবে যে, রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণাই হয়ত এ বিষয়ে অনেকখানি সাহায্য করেছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির জন্মের কয়েক বছরের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ লোকান্তরিত হন। তার পরে, শ্রীপালীর অগ্রগতির জন্য তার কর্মকর্তারাই দায়ী। সে-দায়িত্ব যে তাঁরা অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন তাতে সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই।

সিংহলের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন ও এ-প্রবন্ধের রচনাকাল সমসাময়িক। বহু বৎসরের ভারত-বিদ্বেষের পরে সিংহলের রাজনীতিতে ভারত-প্রীতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সিংহল-প্রবাসী ভারতীয়ের ভবিষ্যৎ হয়ত এবার আশাপ্রদ ভিত্তির ওপর স্থাপিত হবে। এই শুভ পরিবর্তনের পিছনে, রাজনৈতিক অট্টরোলের অগোচরে, যে-ধৈর্যশীল প্রতিষ্ঠানটি নীরবে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে এসেছে, ভবিষ্যৎকালের ভারতবাসীরা নিশ্চয়ই তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বিরত হবেন না।

• • •

শ্রীপালীর আদর্শ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা নিয়েই সিংহলে গিয়েছিলাম। কলকাতা থেকে শ্রীযুক্ত পেরেরার সঙ্গে পত্রালাপও করেছিলাম অল্পবিস্তর। প্রতিষ্ঠানটিকে সরেজমিনে দেখবার ও, বিশেষ করে, তার প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে পরিচিত হবার বাসনা প্রবল ছিল। শুনেছিলাম শ্রীযুক্ত পেরেরা অতিশয় ধনাঢ্য ব্যক্তি; সিংহলের কয়েকটি রবার ও চা-বাগানের মালিক তিনি। বাঙলাদেশের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, রাসবিহারী ঘোষ, তারকনাথ পালিত প্রভৃতিদের তিনি সগোত্র। আমার কৌতূহলে সেজন্য অস্বাভাবিকতা কিছুই ছিল না।

হোরানার বাজারে যখন পৌঁছলাম তখনও দোকানপাট খোলা আছে। এ-অঞ্চলে শ্রীযুক্ত পেরেরাকে এক ডাকেই সকলে চেনে। কাছেই এক চা-বাগানের মাঝখানে টিলার ওপরে তাঁর সুরম্য ভবন; পৌঁছতে কোনো কষ্ট হ'ল না। গৃহস্বামী আমার প্রতীক্ষা করছিলেন। দোর খুলে দিলেন নিজেই।

শ্রীপালীতে হস্তশিল্পের একটি ক্লাস

দীর্ঘ স্বাস্থ্যবান পুরুষ। পরিচয়-বিনিময়ের পরেই আমার স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য অতিশয় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। হাঁক ডাক করে, লোকজন ডেকে তাঁর নিচের তলার দু-তিনটি অতিথি-কক্ষের একটিতে আমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিশ্চিন্ত হলেন তিনি। বুঝতে কষ্ট হয় না, অতিথিদের জন্য সদাব্রত খোলা আছে তাঁর বাড়িতে। এই কয়েকটি সুসজ্জিত ঘরে তাদের অবারিতদ্বার। কিছু ছেলেমানুষি, কিছু আত্মভোলা ভাব অথচ গুরুতর বিষয়ে শ্যেনদৃষ্টি—প্রথম যাচাইয়ে এইটিই তাঁর স্বভাবের কাঠামো মনে হয়। সিংহল পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য হিসেবে তিনি লঙ্কার রাজনীতির সঙ্গে জড়িত আছেন। তাঁর অগোছালো স্বভাব ও ঔদার্য নিয়ে রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি যে কতখানি পারদর্শী সে-বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ জেগেছে। তাঁর যোগ্য স্থান জনকল্যাণের প্রশস্ত অঙ্গনে। সৌভাগ্যের কথা, রাজনীতি তাঁর সমস্ত সত্তাকে গ্রাস করেনি। শ্রীপালীর মত লোকহিতকর একটি প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হবার যে-দায়িত্ব সে-সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন।

আহারাদির পরে যে-আলোচনা হ'ল তাতে তাঁর প্রিয় প্রতিষ্ঠানটি সম্বন্ধে অনেক নতুন কথা শুনলাম। শ্রীযুক্ত পেরেরা যে শান্তিনিকেতনে কিছুদিন ছিলেন ও শ্রীপালী প্রতিষ্ঠার প্রেরণা যে তিনি গুরুদেবের কাছেই পেয়েছিলেন, বিনয়ের সঙ্গে সে-কথা স্বীকার করলেন। এই বিশিষ্ট সিংহলবাসীর মুখে একথা শুনে আনন্দই হ'ল যে তাঁর ব্যক্তিগত ধ্যান ধারণা, আদর্শ, উচ্চাভিলাষ রবীন্দ্রনাথের স্পর্শে অনুপ্রাণিত। শ্রীপালীকে তিনি বহু লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য করেছেন। কিন্তু এই প্রভূত অর্থব্যয়ের কোন কথা তাঁর মনে নেই। শুধু মনে আছে, রবীন্দ্রনাথের আদর্শে তাঁর জন্মভূমিতে একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করবার উপলক্ষ হতে পেরেছেন মাত্র।

কথায় কথায় রাত হল অনেক। শ্রীপালীতে ক্লাশ বসে সকালে। শ্রীযুক্ত পেরেরা স্থির করলেন, পরদিন সকালে আমাকে প্রতিষ্ঠানটি দেখাতে নিয়ে যাবেন।

কয়েক বছর আগেকার কথা হলেও সেই আশ্চর্য সোনালী সকালটিকে আজও স্পষ্ট দেখতে পাই। বাঙলাদেশের হেমন্তকালের মত শিশির পড়েছে ঘাসে; সমস্তরাল প্রভাতী রোদ্দুরে পথের দুপাশে যেন রাশি রাশি মণিমুক্তা ছড়ানো। শ্রীযুক্ত পেরেরার বাড়ি থেকে শ্রীপালীর সীমানা বেশী দূরে নয়। হেঁটেই চলেছি দুজনে।

সহসা, আমাকে সম্পূর্ণ অভিভূত করে, দূর থেকে [illegible] রবীন্দ্র সঙ্গীতের

শ্রীপালীতে সকালের বৈতালিক

বিদেশে সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। আরও কাছে এসে বুঝলাম গানটি বাঙলা ভাষাতেই গীত হচ্ছে। স্কুল প্রাঙ্গণে এসে দেখি, সহস্রাধিক ছেলেমেয়ে সারিবদ্ধভাবে গান গেয়ে আশ্রম প্রদক্ষিণ করছে। এর পরে তাদের ক্লাশ বসবে। সময়োচিত রবীন্দ্র-সঙ্গীত দিয়ে প্রত্যহের কর্মসূচীর উদ্বোধন করা প্রচলিত প্রথা। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর সিংহলী ভাষায় রচিত গানেও আরোপ করা হয়েছে এবং সেগুলিও বৈতালিকের মত অনেক সময়ে গাওয়া হয়ে থাকে। শ্রীপালী থেকে বৃত্তি নিয়ে সিংহলী শিক্ষক-শিক্ষিকারা শান্তিনিকেতনে আসেন। শিক্ষা সমাপ্ত হলে শ্রীপালীতে ফিরে যান বিশ্ব-ভারতীর আদর্শ প্রচারের জন্য। শ্রীযুক্ত পেরেরার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন বিভাগ-গুলি পরিদর্শনের সময়ে শান্তিনিকেতনে শিক্ষাপ্রাপ্ত জনকয়েক শিক্ষকের সঙ্গে পরিচয় হল। তাঁরা বিশ্বভারতীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ, শান্তিনিকেতনের প্রশংসায় পঞ্চ-মুখ। বছরের পর বছর শত শত সিংহলী ছাত্রছাত্রীকে ভারত-সিংহল মৈত্রীর বন্ধনে অনুপ্রাণিত করবার গুরু দায়িত্ব তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছেন। স্কুলপাঠ্য

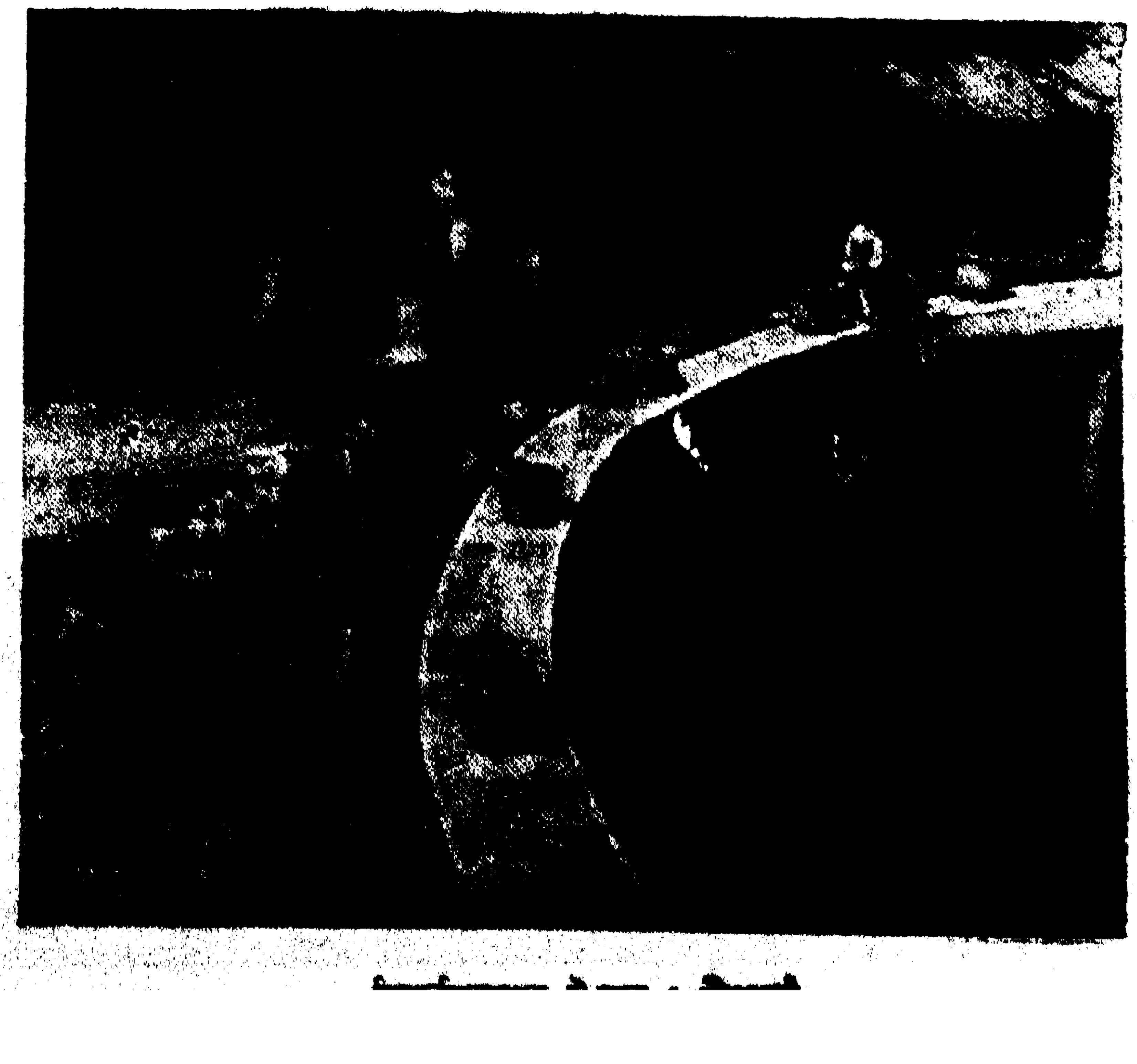

সাধারণ বিষয়গুলি ছাড়াও, নৃত্য, গীত, কলা ও হস্তশিল্পের বিভাগগুলি বিশেষভাবে সুপরিকল্পিত। বস্তুত, কাণ্ডি নৃত্যের অনুশীলনে যে কৃতিত্ব এখানে দেখেছি, খাস কাণ্ডি শহরেও তেমনটি দেখিনি। সাজ-সরঞ্জাম, সুবন্দোবস্ত, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য—কিছুরই অভাব নেই শ্রীপালীর। শ্রীযুক্ত পেরেরার অকৃপণ দান ও সিংহলী জনসাধারণের শুভেচ্ছা সব অভাবই পূর্ণ করেছে। তবু, অর্থের বিনিময়ে যা ক্রয় করা যায় না সেই সুশৃঙ্খল ঐকান্তিকতা ছাত্রছাত্রী ও কর্মীদের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি। শ্রীপালী যে সিংহলের একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান একথা তার ট্রাস্ট-পত্রে উল্লিখিত আছে। সেটি শুধু দলিল মাত্র। জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে শ্রীপালীর স্বীকৃতি তাবৎ শিক্ষিত সিংহলবাসীর হৃদয়ে। এমন একটি সুগঠিত, কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান যে-কোন দেশেরই গৌরবের বিষয়।

(আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত)

খুশীর মেলা...

ঘরে ঘরে খুশীর মেলা। নতুন ধানে ভরবে গোলা,
নতুন ফসল আসছে ঘরে;
বধূর তাই নেই অবসর, সাজায় বধূ বরণ ডালা,
আলপনা দেয় উঠান-দোরে।...
সোনার রঙীন স্বপ্নে মেতে, সোণার বরণ ধানের ক্ষেতে
শক্ত হাতে কাস্তে চালায় চাষি।...

ফুরিয়ে এলো কাজ, সাঙ্গ হলো আজ
এ বছরের মতো, ফসল কাটা যতো।
এরই তরে কষ্ট ভরে চেষ্টা শত শত!
চেষ্টা হতেই উঠবে গড়ে,
দুঃখ অনেক লাঘব করে, সুখের সংসার কত...।

আজকে শুধু নতুন নয়, অতীত দিনও সাক্ষ্য দেয়,
সমৃদ্ধির সৌরভে আর সাফল্যেরই গৌরবে,
হিন্দ লিভারের পণ্য ভরে, ভারত মাতার ঘরে ঘরে
জাগিয়েছিল নতুন করে, নতুন পরিবেশ—পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বলতা,
অনেক কথা; তবু এবার
আগামীতে চেষ্টা হবে আরও নতুন পণ্য গড়ে
নতুন দিনের চাহিদাটারে, মিটিয়ে দিতে নতুন করে।

আজও আগামীতেও দশের সেবায় হিন্দুস্থান লিভার

॥ ৯ ॥

এরপর একদিন দাদামশায় সঙ্গে তর্ক করেছিলুম আমরা।

আমাদের যুক্তি ছিল, তুলিই হচ্ছে আসল। জানোয়ারের লোম দিয়ে তুলি তৈরী করবার কায়দা যদি আবিষ্কৃত না হত তাহলে আর্টিস্টই জন্মাত না। অর্থাৎ দাদামশায় এত নামই হত না।

দাদামশায় বললে—তুলি না থাকলে কলম দিয়ে আঁকতুম, পেন্সিল দিয়ে লিখতুম।

আমরা ছাড়বো কেন? বললুম—কলম, পেন্সিল না থাকলে?

—খড়িমাটি দিয়ে আঁকতুম।

—খড়িমাটি না থাকলে?

—এটা দিয়ে। এটা না থাকলে ওটা দিয়ে। এই চলল খানিকক্ষণ।

শেষে গাছের ডাল, পাখির পালক সব যখন ফুরিয়ে গেল, তখন দাদামশায় নিজের ডান হাতের পাঁচটা আঙুল দেখিয়ে বল্লেন—কিছুই যদি না থাকত, তাহলেও এই আঙুল ক-টা দিয়ে দেগে চলতুম। ছবি আঁকা বন্ধ হত না। ভিতর থেকে ঠেলা দিত। আঙুল ক-টা নিস্-পিস্ করে উঠত। হাত যখন ছিণ্টি হয়েছে ছবিও ছিণ্টি হত। আগে যন্ত্র তারপর কারিগর, এ নয়। আগে হাত, পরে হাতিয়ার।

বাগানে মালীরা আগের দিন কাঠকুটো জ্বালিয়েছিল, বললেন—নিয়ে আয় কয়েকটা পোড়া কাঠি। দেখিয়ে দি।

আমরা কয়েকটা আধ-পোড়া কাঠ-কয়লা নিয়ে ফিরলুম। দাদামশায় তাই দিয়ে এক-টুকরো কাগজের উপর চমৎকার একটা ছবি আঁকলেন।

ছবিটা আমাদের খুব ভালো লাগল। কিন্তু কাঠ-কয়লা? কতক্ষণই বা টিঁকবে তার আঁচড়?

বললুম—এ তো এখনই মুছে যাবে। আর্টিস্টের নাম-ও কেউ করবে না।

দাদামশায় বললেন—রোস্ রোস্। শেষ করতে দে আগে। বলে জলে ডোবালেন কাগজটা। অর্ধেক ধুয়ে মুছে গেল। তারপর শুকিয়ে নিয়ে পোড়া কাঠের রেখার উপর ঘষতে লাগলেন আঙুল। কয়লা আর আঙুলের ঘষাঘষি চলল কাগজের উপর। একবার করে নতুন রেখা পড়ে, তার উপর আঙুলের ঘর্ষণ, তার উপর জলের প্রলেপ এমনি চলল সারা সকাল। শেষে একটি পাকা পোক্ত সাদায়-কালোয় ছবি শেষ করে বললেন—দে রোদে দিয়ে—আর উঠবে না।

বললেন—পোড়া কাঠের ছবি তো দেখলি? কিছু না থাকলে জ্বালানি কাঠ দিয়েও আঁকা চলত। আবার দোকান থেকে ছবি-আঁকা 'চারকোল' আর 'ফিক্সার' কিনে এনেও ছবি হয়। দেখবি?

এই বলে দেরাজের খুপরির মধ্যে থেকে টেনে কতদিনের পুরোনো চারকোল-এর টুকরো বার করে আমাদেরই কার একটা মুখ আঁকা শুরু করলেন। তারপর পাশা-পাশি দুটো ছবি রেখে বললেন—দেখ্। এ-ও ছবি ও-ও ছবি। কিছু তফাত দেখছিস্?

আমরা বললুম—আগেরটাই বেশী ভালো।

দদামশায় বললেন—হবেই তো। আঙুল পড়েছে কত। আঙুলের কাছে কি কিছু লাগে?

এই সময় সেই পুরোনো বাক্স থেকে বার করা চারকোল দিয়ে কিছু ছবি এঁকে-ছিলেন।

একদিন কত্তাবাবার কাছ থেকে এক চিঠি এসে হাজির। শান্তিনিকেতনে একজন সায়েব আর্টিস্ট এসেছেন, তিনি আইনস্টাইন প্রমুখ বহু মনীষী ও বিখ্যাত লোকের পোর্ট্রেট এঁকেছেন। শান্তিনিকেতনে কত্তা-বাবার, নন্দদা-র এবং আরো সকলের ছবি তো এঁকেইছেন, এইবার জোড়াসাঁকোয় এক-বার যেতে চান, দাদামশায়ের সঙ্গে দেখা করবেন এবং তাঁদের পোর্ট্রেট আঁকবেন।

সায়েব আসছে শুনে বারান্দার চেয়ার-টেয়ারগুলো একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে সারবন্দী করা হল। কার্নিশটা ঝেঁটিয়ে রাখা হল, আর বিশেষ কিছুই হল না। সায়েবই আসুক আর যে-ই আসুক বারান্দাতেই তাদের নিয়ে আসা হত, বারান্দাতেই তাদের বসতে বলা হত। সকলেরই স্থান ছিল ঐ বারান্দা। সাজানো গোছানো লাইব্রেরী-ঘর একটা ছিল বটে, কিন্তু সেখানে অতিথি-আপ্যায়ন করতে দাদামশাদের আমরা খুব কমই দেখেছি। অনেককাল আগে শুনেছি ঐ ঘরে দাদামশাদের আড্ডা টাড্ডা জমত। চীনা আর্টিস্ট, জাপানী আর্টিস্ট, লাট-বেলাটকে ঐ ঘরে বসিয়ে এককালে খাতির করা হয়েছে, কিন্তু হালে লাইব্রেরী ঘর পড়েই থাকত। শুধু গ্রীষ্মের দুপুরে ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা থাকত বলে তিন দাদা-মশায় দিবানিদ্রার জন্যে খানিকটা ব্যবহার করতেন, নইলে আর ঢুকতেন না।

সায়েব তো এলেন। ভারি চটপটে সায়েব। আলাপ-সালাপ করেই ব্যাগের মধ্যে থেকে কাগজ আর মোটা মোটা পেন্সিল বার করে বসে গেলেন পোর্ট্রেট আঁকতে। সায়েব বললেন—যে যেমন আছেন বসে থাকুন, যা কাজ করছিলেন করতে থাকুন। ব্যস্ত হতে হবে না, পোজ দিয়ে হবে না। আমি স্কেচ করে যাচ্ছি।

বারান্দায় তিন ভাই যেমন দক্ষিণ-মুখো হয়ে তাঁদের চেয়ারে বসতেন তেমনই বসে-ছিলেন। প্রথমে বড়দাদামশায় ছবি আঁক-ছিলেন, তিনি। তারপর দাদামশায়, তিনিও ছবি আঁকছিলেন। শেষে বারান্দার পুব

পরিবার-নিয়ন্ত্রণ

(জন্মনিয়ন্ত্রণে মত ও পথ)

সচিত্র সুলভ তৃতীয় সংস্করণ।

প্রত্যেক বিবাহিতের বাস্তব সাহায্যকারী অবশ্যপাঠ্য। মূল্য সডাক ·৮০ নয়া পয়সা অগ্রিম M. O.-তে প্রেরিতব্য। পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় জন্য সাক্ষাৎ বেলা ১—৭টা।

মেডিকো সাপ্লাই কর্পোরেশন্

FAMILY PLANNING STORES.

রুম নং ১৮, টপ্ ফ্লোর

১৪৬, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

ফোন: ৩৪-২৫৮৬

সায়েব-আর্টিস্ট-এর আঁকা অবনীন্দ্রনাথের স্কেচ্

কোণে গোল-সিঁড়ির পাশে মেজদাদামশায় বই পড়ছিলেন। দক্ষিণের বারান্দার পূব-কোণে নীচের তলা থেকে তিন-তলা পর্যন্ত একটা কাঠের গোল সিঁড়ি ছিল, চারিপাশ তার কাঠ দিয়ে ঘেরা। অন্ধকার সিঁড়ি, মাঝে মাঝে শুধু দু-একটা ফোকর। এটা ছিল খিড়কির সিঁড়ি। এই সরু অন্ধকার-অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে শুধু বাড়ির লোকেরাই আনাগোনা করতেন। বড়দাদামশায় সকাল-বেলা তিনতলা থেকে দোতলায় নামতেন। দাদামশায় দোতলা থেকে নামতেন বাগানে, আমরা লুকোচুরি খেলতুম। সন্ধ্যের পর যখন ঘুটঘুট্টি হয়ে যেতে সিঁড়িটা তখন ওদিকে ঘেঁষতেই আমাদের সাহস হত না।

প্রথম পোর্ট্রেট হল বড়দাদামশায়ের। কখন যে আঁকা শেষ হয়ে গেল বড়দাদা টেরই পেলেন না। ছবিখানা হল একেবারে জীবন্ত। সই করে দিলেন বড়দাদা ছবির নীচে।

তারপর সায়েব গেলেন মেজদাদার সামনে। চট্‌পট চলল হাত। চট্‌পট শেষ হল ছবি। হুবহু মেজদাদার মুখ। মেজদাদাও করলেন সই।

তারপর দাদামশার পালা। দাদামশা'য় এক মনে ঘাড় গুঁজে সটকা মুখে দিয়ে ছবি আঁকছিলেন। সায়েব এসে দাঁড়াতেই ছবি সরিয়ে রেখে মুখ থেকে সটকা নামিয়ে সোজা হয়ে বসতে যাবেন, সায়েব বাধা দিয়ে বললেন—ব্যস্ত হবেন না মিস্টার টেগোর। আপনি যেমন ছবি আঁকছিলেন আঁকুন। তামাকের নল থাকুক মুখে।

দাদামশায় ছবিটাকে সবে ভিজিয়েছিলেন। সেটাকে শুকোবার জন্যে একপাশে রেখে দিলেন। তারপর আর একটা কাগজ নিয়ে বসে গেলেন আবার একমনে। চলল ঘাড় গুঁজে ছবি আঁকা। মুখে রইল রুপোর মুখনল দেওয়া সটকা। ফুড়ুক ফুড়ুক করে টেনে চললেন তামাক, যেমন ছবি আঁকবার সময় সব সময় টানতেন। দাদা-মশার নীচের কি উপরের ঠিক মনে নেই, একটা দাঁত একটু ভাঙা ছিল। সেই ভাঙা-টুকুর মাঝে রুপোর মুখনলটা খাপে খাপে বসে যেত। কত সময় দেখেছি, ছবি আঁকতে আঁকতে তামাক পুড়ে গেছে, গুলের আগুন নিভে গেছে কিন্তু দাদামশায় দাঁতে নল চেপে বসে আছেন, নামিয়ে রাখেন নি। টেনেই চলেছেন। জলের মধ্যে দিয়ে শব্দ আসছে—গুড়ুক গুড়ুক—ধোঁয়া আসছে কি না-আসছে খেয়াল নেই।

সায়েব একটু পরেই তাঁর আঁকা শেষ করে ছবিটা বাড়িয়ে তাঁর কাঠ-কয়লার পেন্সিল এগিয়ে দিয়ে বললেন—আপনার নামটা সই করে দেবেন মিস্টার টেগোর—দয়া করে?

দাদামশায় বললেন—নিশ্চয়, নিশ্চয়। কিন্তু দয়া করে আপনার নামটা-ও সই করে দেবেন সায়েব?

বলে যে কাগজখানা কোলে নিয়ে বসে-ছিলেন, সেখানা এগিয়ে ধরলেন। কাগজে সায়েবের একখানা হুবহু পোর্ট্রেট।

সায়েবের চোখ তো কপালে উঠল। সায়েবের খুব নাম-ডাক যে তাঁর মতো এত তাড়াতাড়ি কেউ স্কেচ করতে পারে না। এইবার তাঁর এক প্রতিদ্বন্দ্বী জুটলো নাকি?

—এ কি, মিস্টার টেগোর? আপনি তো একবারের বেশী আমার মুখের দিকে তাকান নি। কখন আঁকলেন ছবিটা?

দাদামশায় নল মুখে দিয়েই হাসতে হাসতে বললেন—তুমি যতক্ষণ স্কেচ কর-ছিলে সায়েব তারই মধ্যে এটা এঁকে ফেলেছি।

সায়েব তাজ্জব বনে ছবির বদলে ছবি নিয়ে বাড়ি চলে গেলেন।

গান্ধী যেবারে ডাণ্ডিতে নুন তৈরী করতে গিয়ে সারাদেশকে আইনঅমান্য আন্দোলনের পথে টেনে নিলেন সেবার আমিও দেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে একদিন গ্রীষ্মের দুপুরে চুপি-চুপি কাউকে না বলে জোড়াসাঁকো বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লুম নুন তৈরী করার মতলবে। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির একটা আপিস কলেজ স্কোয়ারে ছিল। সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বে-আইনী নুন তৈরী করার স্বয়ংসেবকদের একটা ঘাঁটি। মোটা খদ্দরের ধুতি আর কালো খদ্দরের পাঞ্জাবী পরে একখানা ঝোলা কাঁধে দুপুরবেলা কংগ্রেস আপিসে হাজির হলুম। বললুম, এইবার আমাকে নুন তৈরী করতে পাঠানো হোক। শুনলুম, মেদিনিপুরে একটা দল যাবে, তারই সঙ্গে আমি হয়তো যেতে পারি। এখন অপেক্ষা করতে হবে। পাশের ঘরে ডুপ্লিকেটার ঘুরিয়ে খবরের বুলেটিন ছাপা হচ্ছিল, আমি গিয়ে বসলুম সাহায্য করতে।

হঠাৎ দেখি নন্দ-দা [শ্রীনন্দলাল বসু]। কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর একটা গোপন যোগা-যোগ ছিল জানতুম। কিন্তু নন্দ-দাকে এরকম নিষিদ্ধ জায়গায় একেবারে চোখের সামনে দেখে ফেলব ভাবিনি। মজা হল এই যে আমি নন্দদার কাছে ধরা পড়ে গেলুম না তিনিই আমার কাছে ধরা পড়ে গেলেন ঠিক বোঝা গেল না। দাদামশাকে নন্দদা ভয় করতেন। আর দাদামশায় ভয় করতেন এই সব কংগ্রেসী আন্দোলনকে, ধরপাকড় পুলিশ আদালত জেল গুলী বন্দুককে। দাদা-মশার কাছে নন্দদা কালক, আর এই সব ভয়ানক বিপদের মুখে এগিয়ে যাওয়া [illegible] অবোধ শিশু! নন্দদা ভাবলেন [illegible] বাড়ি গিয়ে বাবামশায়কে যদি বলে [illegible] তাহলেই চিত্তির। আর আমি [illegible]

যদি দাদামশায় কানে কথাটা তোলেন তাহলে তো এখনি আসবেন ধরে নিয়ে যেতে।

কিন্তু দু-জনেই অপরাধী। কাজেই কেমন করে জানি না, একটা নির্বাক রফা হয়ে গেল। 'এই-যে, হ্যাঁ, তাই-তো, না' বলে দু-জনে অতি দ্রুত দু-ঘরে সরে পড়লুম। নন্দদা কি জন্যে সেখানে এসেছিলেন আমি আজও জানি না। আমি যে কি করতে এসেছি, নন্দদা-ও জানতে চাইলেন না। এর কিছুদিন পরেই কংগ্রেস আপিস পুলিস এসে বন্ধ করে দেয়।

ইতিমধ্যে বাড়িতে এক কান্ড ঘটে গেল। আমি যে ছোট্ট চিঠি লিখে এসেছিলুম, নুন তৈরী করতে যাচ্ছি বলে, তা দাদামশায় হাতে পড়ল। কোথায় যাচ্ছি লিখিনি—কংগ্রেস আপিসের নামও করিনি। দাদামশায় সুতরাং বুঝতেই পারলেন না কি করা যায়। একটু ফাঁপরে পড়লেন। একমাত্র সুজন জানতো আমার গোপন অভিযানের খবর। সুজনের সঙ্গেই লুকিয়ে চুরিয়ে কিছু কিছু দেশোদ্ধারের আলোচনা, নিষিদ্ধ বুলেটিন, বাজেয়াপ্ত বই আর সংবাদপত্রের আনাগোনা চালাতুম। সুজন কাউকে কিছু বললে না। দাদামশায় বাড়ির উকিলকে টেলিফোন করলেন।

তিন দাদামশায় জীবনের যা-কিছু সমস্যা তা হয় বৈষয়িক না হয় রোগ সংক্রান্ত। বৈষয়িক হলে উকিলের আর কায়িক হলে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে তাঁরা অভ্যস্ত। অদ্ভুত নির্ভরশীলতা ছিল বাড়ির উকিল আর বাড়ির ডাক্তারের উপর। বাড়ির মানুষদের অসুখ যে সেরে যায়, বাড়ির ছেলে-মেয়েরা যে বেঁচে-বর্তে থাকে এর একমাত্র ব্যাখ্যা মহেন্দ্র ডাক্তারের অব্যর্থ ওষুধ। মৃত্যু অবশ্য আছেই—কিন্তু সে তো ঈশ্বরের অমোঘ বিধান। তেমনি রোজকার ডাল-ভাত, একটু আধটু সুখ-সুবিধে, এতগুলো মানুষের মাথার উপর আচ্ছাদন, এর আসল সহায় তো জমিদারির আয় নয়; জোড়াসাঁকো বাড়ির এই প্রবহমান স্বচ্ছন্দ জীবন যাত্রার প্রধান উৎস বাড়ির উকিলের নির্ভুল ব্যবস্থা ও উপদেশ।

আরো একবার হয়েছিল। সে-ও কংগ্রেসের ব্যাপার। পার্ক সার্কাসে যেবার কংগ্রেস অধিবেশন হয় আমরা কয়েকজন ছেলে গানের দলে যোগ দিয়েছিলুম। একদিন রিহার্সাল দিতে দিতে এত দেরি হয়ে যায় যে আমাদের বাড়ি ফিরতে রাত্র দশটা হয়েছিল। দেরি দেখে এবং কংগ্রেসের ব্যাপার বলে মেজদাদামশায় ঘন-ঘন উকিল-বাড়ি টেলিফোন করছিলেন—আমাদের কি হয়েছে—জেল না গুলির ঘায়ে মৃত্যু, তাই জানবার এবং তার সুরাহা করবার জন্য। আমরা ফিরে দেখি অন্ধকারে টেলিফোনের কাছে স্তব্ধ হয়ে মেজদাদা দাঁড়িয়ে। উকিল কোনো সাহায্যই করতে পারেনি বলে কিংকর্তব্য বিমূঢ়!

এবারও উকিল কোনো সদুপদেশ দিতে পারলেন না। তখন বাড়িরই কে একজন পরামর্শ দিলেন কংগ্রেস আপিসটা একবার দেখে আসতে। দাদামশায় মিশির ড্রাইভারকে ডেকে মোটরটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

কংগ্রেস আপিসে ঘণ্টা তিন মাত্র ছিলুম। নিষিদ্ধ বুলেটিন ছাপার কাজে শুধু সাহায্যই করেছি—পড়বারও সময় পাইনি। এমন সময় কানে এল আমাদের চেনা মোটরের ভেঁপু। প্রমাদ গণলুম। তারপর এল দাদামশায়ের চড়া গলা। নন্দদা ততক্ষণে টের পেয়ে এক দৌড়ে বারান্দার এক-কোণে দু-খানা থামের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছেন। আমি আর কোনো উপায় না দেখে আত্মসমর্পণ করলাম। দাদামশায় কংগ্রেসের কর্তাদের, তাঁরা নাকি ছেলেধরার ফাঁদ পেতেছিল বলে এমন ধমক লাগালেন যে, কেউ কোনো উত্তর দিতে সাহস করলেন না। তারপর আমাকে গাড়িতে তুলে হাওয়া। নন্দদা বেঁচে গেলেন।

বাড়িতে পৌঁছে খদ্দর টদ্দর ছেড়ে আবার মার্কিনের জামা পাজামা পরতে হল। আমি আপত্তি করেছিলুম, কিন্তু দাদামশায় শুনলেন না। বললেন, খুব হয়েছে। ছাড়ো ওসব। ঐ কালো পাঞ্জাবী আর ঐ ঝুলিটা দেখলেই পুলিসে ধরবে।

নিজেকে পুলিসে ধরানোই যে আমার আসল উদ্দেশ্য ছিল এটা দাদামশাকে বলতে সাহস হল না। সুতরাং কালো খদ্দর ছেড়ে ফেলতে হল। তারপর দাদামশায় জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় যাবার জন্যে বেরিয়েছিলুম আমি?

—তমলুক যাবার জন্যে।

—নুন তৈরী করতে?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা কাল পেয়েছে গাঁধী। নুনের টানে ছেলে ধরা। জাক, যা বকুনি দিয়েছি ওদের, তোকে আর ওরা ছোঁবে না।

—তাই তো মনে হয়।

—যা এখন ফূর্তি-মনে খেলা ধুলো কর গে। নুন তৈরী করে কি হবে? বেচে পয়সা পাবি?

এমনভাবে ধরা পড়ে গিয়ে এবং সব পয়সা ভেস্তে যাওয়ায় ফূর্তি আমার নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পরদিন সকালে মুখ লুকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, দাদামশায় ডেকে বললেন—নুন তৈরী করবি?

হঠাৎ এই প্রশ্নে আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলুম। কি মতলব দাদামশায় বুঝতে পারলুম না।

—বাড়িতেই নুন তৈরী হতে পারে। তার জন্যে তমলুক যাবার দরকার নেই।

এইবার বুঝলুম দাদামশায় মাথায় নতুন কোনো বুদ্ধি এসেছে।

—চলে যা গাছঘরের পিছনে, যেখানে যোগীমালী শুকনো নারকেল-পাতা জমা করে রেখেছে। নিয়ে যা এই দেশলাইটা। লাগিয়ে দে আগুন। আমি আসছি।

তখন মনে পড়ল, নারকেল-পাতা থেকে নুন তৈরী হয় একবার শুনেছিলুম বটে। কেমন করে করতে হয় জানতুম না।

সুজনকে ডেকে নিলুম—চলো চলো, নুন তৈরী হবে। দাদামশায় আসছেন।

শুকনো নারকেল পাতাগুলি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। যখন প্রায় সব পুড়ে গেছে, সুজন আর আমি ভাবছি, বে-আইনী নুনের জন্যে এইবার পাঁচিলের পিছন থেকে পুলিসের আবির্ভাব হবে নাকি, সেই সময় একটা বড় বাটি হাতে দাদামশায় এসে হাজির।

বললেন—ছাইগুলো ভরু এতে।

আমরা বাটি ভরে সাদা ছাই নিলুম।

—ঢাল জল।

জল ঢালা হল বাটি ভরে।

—এইবার যা একটা ধুতি-ছেঁড়া নিয়ে আয়।

ছেঁড়া কাপড়ের সলতে পাকিয়ে সেই ছাই-গোলা জলের বাটি থেকে গোটাকতক সলতে ঝুলিয়ে দিলেন। তাই বেয়ে টপ্ টপ্ করে স্বচ্ছ জল আর একটা বাটিতে পড়ে জমা হতে থাকল।

দাদামশায় স্নানে চলে গেলেন। বলে গেলেন—বিকেল বেলা এসে দেখিস্, বাটি ভরা নুন-জল তৈরী।

সত্যিই তারপর সেই নুন-জল শুকিয়ে আমাদের বে-আইনী নুন তৈরী হল। দাদামশায় বুদ্ধিতে বাটির মধ্যে লবণ-আন্দোলন হল, আইন অমান্য হল, নুন-ও তৈরী হল, অথচ পুলিস ধরতে পারল না।

(ক্রমশ)

ক্লীব ব্যাধি ও স্ত্রী রোগ

২৫ বৎসরের অভিজ্ঞ যৌনব্যাধি বিশেষজ্ঞ ডাঃ এস পি মুখার্জি (রেজিঃ) সমাগত রোগীদিগকে গোপন ও জটিল রোগাদির রবিবার বৈকাল বাদে প্রাতে ৯—১১টা ও বৈকাল ৮—৮টা ব্যবস্থা দেন ও চিকিৎসা করেন।

শ্যামসুন্দর হোমিও ক্লিনিক (রেজিঃ)
১৪৮, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

ত্বকের পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের জন্য একটি সাবান তৈরী করতে বিজ্ঞান প্রকৃতিকে সাহায্য করেছে

উত্তম নিম সাবান শরীরের ক্লেদ দূর করে' আপনার ত্বক্‌কে সম্পূর্ণ সুস্থ রাখে। উত্তম নিম সাবানে, বিজ্ঞান অন্যান্য বিশেষ উপাদানের সঙ্গে নিমের স্বাভাবিক বীজাণু-নাশক ও নিরাময়ক গুণাগুণ যুক্ত করে ত্বকের পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের জন্য আপনাকে একটি অপূর্ব ভেষজ সাবান উপহার দিতে সক্ষম হয়েছে।

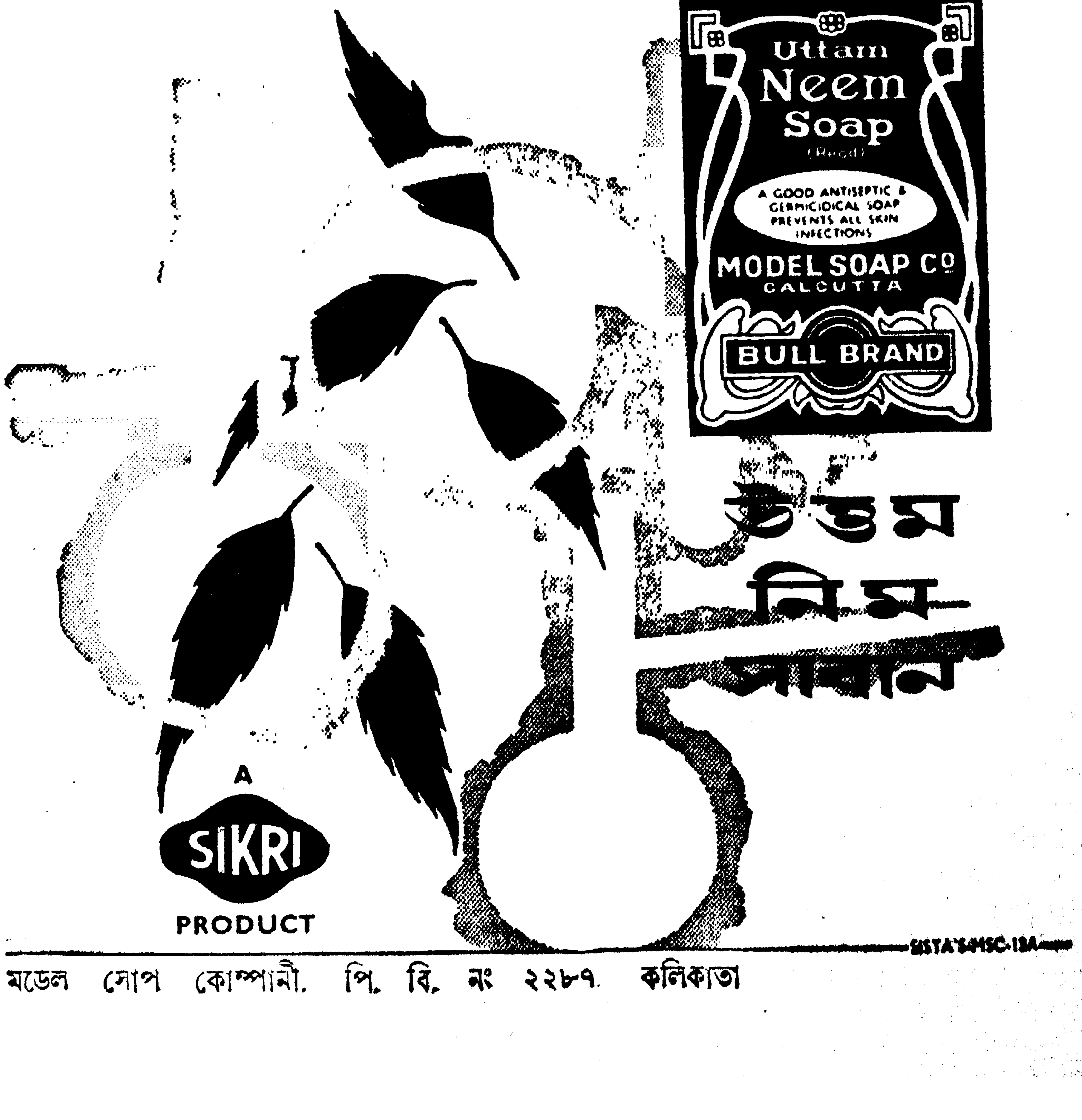

SISTA'S-MSC-13A

মডেল সোপ কোম্পানী. পি. বি. নং ২২৮৭ কলিকাতা

কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

(৪৩)

সেদিন কী অদ্ভুত অবস্থার মধ্যেই যে ।ড়ে গিয়েছিল দীপংকর! সতীর শাশুড়ীর গলার আওয়াজই কানে এসেছিল দীপংকরের। কিন্তু সতীর স্বামীর গলার আওয়াজ একবারও কানে আসেনি! কেন সতী এমন কাজ করলো! কেন সকলকে না-জানিয়ে তাকে নেমন্তন্ন করতে গেল। আর যদি নেমন্তন্নই করেছিল তবে কেনই বা সতীর স্বামী সতীর শাশুড়ী হঠাৎ খবর না দিয়ে এসে পড়লো!

দীপংকরের হাতও নড়ছিল না। মুখও নড়ছিল না।

সতী হঠাৎ আবার সামনে এসে বলল—ওকি, হাত গুটিয়ে রইলে কেন, খাও? আর লুচি নেবে?

দীপংকরের মনে হলো সে যেন বিষ খাচ্ছে। লুচিগুলো গলা দিয়ে ঢুকে গিয়ে যেন বিষক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। সে যেন ফাঁসির কয়েদী! সামনে যেন সতী চাবুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছে।

দীপংকর বললে—আর খেতে পারবো না আমি—

—না আমি কোনও কথা শুনবো না, তোমাকে খেতেই হবে। যা যা দিয়েছি সব খেতে হবে। কিছু ফেলে রাখতে পারবে না। আমি সারাদিন ধরে নিজে তদারক করে সব করিয়েছি, এ তোমায় ফেলে রাখতে দেব না!

দীপংকর বললে—কিন্তু কেন তুমি আমাকে নেমন্তন্ন করতে গেলে? এতদিন এতবার তো আমার জন্মদিন এসেছে, তুমি ডেকে খাওয়াওনি বলে তো আমার কোনও দুঃখ ছিল না। আমি তো তোমার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম—

সতী জোর গলায় ডাকলে—শম্ভু—

শম্ভু এল। সতী বললে—পান সেজেছে ভূতির মা?

—না বৌদিমণি।

সতী রেগে উঠলো। বললে—কেন? পান সাজেনি কেন?

দীপঙ্কর বললে—না-ই বা সাজলো সতী, থাক্ না, আমি তো পান খাই না—

সতী যেন রেগে গেছে খুব। বললে—তুমি চুপ করো, যা তুই পান সেজে নিয়ে আয় এখেনে, জানিস না বাড়িতে লোককে নেমন্তন্ন করলে পান দিতে হয়!

দীপংকর উঠলো। উঠে হাত মুখ ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে নিলে। সতী কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। পান আনতেই সতী বললে—নাও, পান খাও—

—পান? একটু বুঝি দ্বিধা করতে গেল দীপংকর। কিন্তু সতীর মুখের দিকে চেয়ে আর আপত্তি করতে ভরসা হলো না।

সতী আবার শম্ভুকে ডাকলে। বললে—রতনকে বল্ গাড়ি বার করতে, দীপংকর-বাবুকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবে—

শম্ভু বললে—মামণি গাড়ি বন্ধ করতে বলে দিয়েছে যে—

দীপংকর বললে—গাড়ি কী হবে, আমি তো এটুকু বেশ হেঁটেই যেতে পারবো—

সতী ধমক দিয়ে উঠলো। বললে—তুমি চুপ করো তো! তুই রতনকে বলে আয় গাড়ি যে-ই বন্ধ করতে হুকুম দিক, আমি হুকুম দিচ্ছি গাড়ি বেরোবে—যা বলে আয়—

শম্ভু চলে গেল। দীপংকরও পেছন-পেছন যাচ্ছিল।

সতী বললে—শোন দীপু—

দীপু পেছন ফিরলো।

সতী বললে—কালও তুমি ঠিক এই সময়ে এখানে আসবে—

—কাল? কালও খেতে হবে?

সতী বললে—হ্যাঁ, কাল তুমি এসো, তারপর যা করবার আমি করবো।

দীপংকর বললে—কিন্তু কাজটা কি ভাল করছো?

সতী বললে—ভাল-মন্দ সে আমি বুঝবো, আমি অনেক সহ্য করেছি,—ঠিক এসো—ভুলো না, আমি বসে থাকবো তোমার জন্যে—

দীপংকর সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শুনতে পেলে সতীর শাশুড়ীর গলার আওয়াজ—বৌমা, এদিকে একবার এসো তো—

পরিষ্কার তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দীপঙ্করের পা দুটো কাঁপতে লাগলো। তারপর বাইরে বাগানের

শ্রীজওহরলাল নেহরুর

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

বিশ্ব-বিশ্রুত "GLIMPSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। এ শুধু সন-তারিখ-সমন্বিত ইতিহাস নয়—ইতিহাস নিয়ে সরস সাহিত্য। গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পটভূমিকায় গৃহীত মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন যুগের চিন্তাবলী নিয়ে লিখিত একখানা শাশ্বত গ্রন্থ। জে. এফ. হোরাবিন-অঙ্কিত ৫০খানা মানচিত্র সহ। প্রায় হাজার পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ।

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৫·০০ টাকা

শ্রীজওহরলাল নেহরুর
আত্ম-চরিত ১০·০০ টাকা

শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারীর
ভারতকথা ৮·০০ টাকা

প্রফুল্লকুমার সরকারের
জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ২·৫০ টাকা
অনাগত (উপন্যাস) ২·০০ টাকা
ভ্রষ্টলগ্ন (উপন্যাস) ২·৫০ টাকা

অ্যালান ক্যাম্বেল জনসনের
ভারতে মাউণ্টব্যাটেন ৭·৫০ টাকা

আর জে মিনির
চার্লস চ্যাপলিন ৫·০০ টাকা

শ্রীসরলাবালা সরকারের
অর্ঘ্য (কবিতা-সঞ্চয়ন ৩·০০ টাকা

ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর
আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে ২·৫০ টাকা

ত্রৈলোক্য মহারাজের
গীতায় স্বরাজ ৩·০০ টাকা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ । ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

সামনে আসতেই দেখলে ড্রাইভার গাড়ি বার করে দাঁড়িয়ে। দীপংকর কাছে যেতেই দরজাটা খুলে দিলে। দীপংকর ভেতরে উঠে বসলো।

তারপর ইঁট বাঁধানো রাস্তাটা দিয়ে বাড়ির গেট পেরিয়ে গাড়িটা প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে গিয়ে পড়লো।

উনিশ শো উনচল্লিশ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর একদিন পৃথিবীর একটা অংশে যুদ্ধ বেঁধেছিল। ছোট যুদ্ধ সেটা ছিল প্রথমে। প্রথমে কি কেউ কল্পনা করেছিল তার জের এতদিন ধরে চলবে! কিন্তু যুদ্ধটা শেষ পর্যন্ত চলেছিল ছ' বছর একুশ ঘণ্টা তেইশ মিনিট ধরে। তারিখ-সময় সবই মনে আছে দীপংকরের। ঠিক ভোর চারটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সময় —শুক্রবারে। আর দীপংকরের জীবনের এই যুদ্ধটা শুরু হয়েছিল সোমবার ঠিক রাত আটটার সময়। প্রথমে সনাতন-বাবুও বুঝতে পারেন নি। প্রথমে সতীর শাশুড়িও বুঝতে পারেনি—দীপংকরও বুঝতে পারেনি। এমন কি সতী যে সতী—সে-ও বুঝতে পারেনি! অর্থাৎ কেউই বুঝতে পারেনি। শুরু যার এত সামান্য, শেষ তার এমন ভয়াবহ হবে কে কল্পনা করতে পারবে!

অনেকদিন পরে সতীর মুখ থেকেই শুনেছিল দীপংকর।

দীপংকরের একবার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়েছিল শম্ভুকে। শম্ভুকে জিজ্ঞেস করলেই সে হয়ত সব বলে দিত। বাড়ির চাকরদের কিছু জানতে বাকি থাকে না। গিন্নীরা বাবুরা কখন কী করে, কার সঙ্গে কখন কার ঝগড়া হয়, সব তারা জানে।

তবু দীপংকর সাহস করে জিজ্ঞেস করেছিল—আচ্ছা শম্ভু, তোমার মা-মণির কি আজকেই আসবার কথা ছিল?

—আজ্ঞে, না বাবু, কথা ছিল না তো! রেলের লাইন্-টাইন্ সব জলে ডুবে গেছে বলে রেল চলেনি, আট্‌কে ছিল রাস্তায়। বাবুরা তিনদিন কটকের ইস্টিশানে পড়ে। তাই এখন আবার রান্না-বান্না চাপিয়েছে ঠাকুর!

তারপর দীপংকর গাড়িতে উঠতেই দুই হাত জোড় করে বলেছিল—আচ্ছা পেন্নাম হই বাবু—

সিঁড়িতে নামবার সময়ই শাশুড়ির গম্ভীর গলার ডাক শোনা গিয়েছিল—বৌমা, এদিকে শুনে যাও তো একবার—

সতী গিয়ে কাছে দাঁড়াল। বহুদিনের বিধবা গিন্নী এ-বাড়ির। একদিন যখন এ-বাড়ির আরো জলুস ছিল, আরো জাঁক-জমক ছিল সেইদিন তিনি দুধে-আলতায় পা দিয়ে এই ঘোষ-বাড়িতে ঢুকেছিলেন। সেদিন পাড়ার লোক নতুন বউ দেখতে এসে থম্‌কে দাঁড়িয়েছিল সামনে। অঘোরদাদুর ওই সব যজমানদের বাড়ির লোকেদের সমপর্যায়ের লোক এরা। ব্যারিস্টার পালিতের সম-গোত্রীয়। খিদিরপুরের ডকে স্টিভেডোরের কারবার ছিল শিরীষ ঘোষের। সেকালের নাম করা স্টিভেডোর শিরীষ ঘোষ। বার্ড কোম্পানী, কিলবার্ন কোম্পানী, শ ওয়ালেশ কোম্পানীর একচেটিয়া কাজ করতো এই প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের শিরীষ ঘোষের ফার্ম। সাহেবরাও শিরীষ ঘোষকে মানতো, খাতির করতো। শিরীষ ঘোষও সাহেবদের মর্যাদা রেখে কথা বলতো। শিরীষ ঘোষের ছেলে গিরীশ ঘোষ-এর বিয়েতে কলকাতার বড় বড় কোম্পানীর সাহেবরা এসে নেমন্তন্ন খেয়ে গিয়েছিল। সেদিন ঘোমটার আড়ালে এই শাশুড়ির মুখ দেখেই তারা দামী দামী উপহার দিয়েছিল। তারপর শিরীষ ঘোষ বুড়ো বয়েসে একদিন মারা গেলেন। মারা যাবার আগে ছেলে-বউ-এর হাতে এই কারবার, এই স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তি তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন। যাবার সময় বলে-ছিলেন—টাকা বড় নচ্ছার জিনিস, ওটা দরকার, কিন্তু ওটাই সার জিনিস নয় [illegible], অনেক টাকা জমিয়েছি জীবনে, তোদের

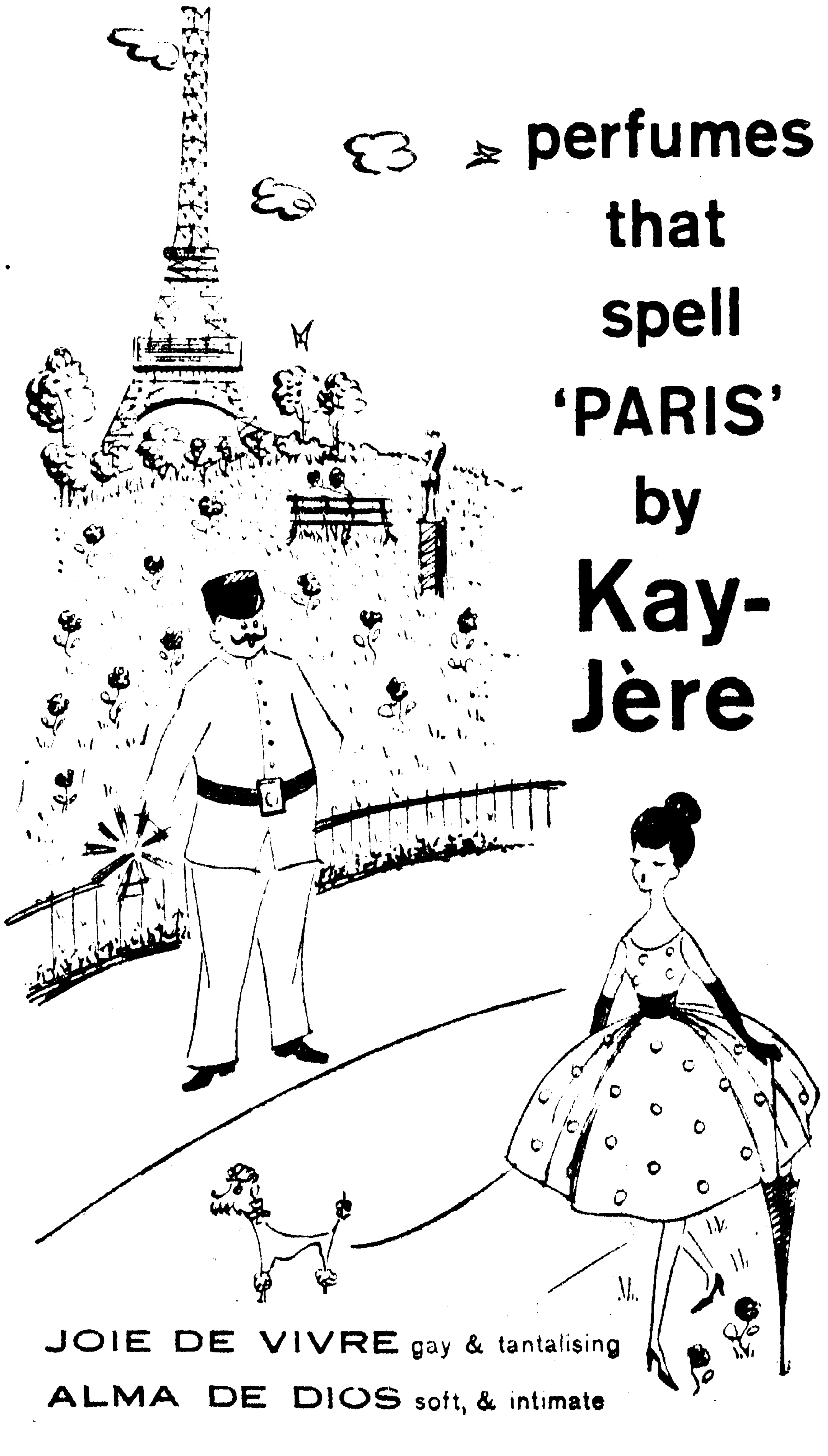

কিছু ভাবনা রেখে যাবো না—একটু দেখে চলবি—

আরো সব কী কী কথা বলেছিলেন শিরীষ ঘোষ। শেষ জীবনের সব আধা-বৈরাগ্যের কথা। সে-সময়ে সকলেরই বৈরাগ্যের কথা আসে। আসাটাই স্বাভাবিক। ব্যাঙ্কে তখন তাঁর লাখ বিশেক টাকা। সুন্দরবনে ছ' হাজার বিঘে আবাদ, সিন্দুকে সোনা - দানা - হীরে - জহরৎ—কোম্পানীর কাগজের মোটা সুদের টাকা, আর চালু কারবার। যাবার আগে নিজের সুখ-সাচ্ছন্দ্যের কোনও ত্রুটি রাখেন নি। সে-যুগেই ফ্যানের হাওয়া খেয়ে গিয়েছেন, তেতলা বাড়ি করেছেন, গাড়ি চড়েছেন। আবার কী করবেন?

সতীর শাশুড়ি নতুন বউ হয়ে তখন বেশিদিন আসেন নি। শ্বশুর মারা যাওয়ার পর সবই তাঁর ঘাড়ে পড়লো। স্বামী গিরীশ ঘোষ ছিলেন ভাল মানুষ গোছের লোক। দরকার হলে মিথ্যে কথাও বলতে পারতেন না, সত্যি কথাও জোর করে বলতে পারতেন না কখনও। প্রথম প্রথম নতুন বউ বলতেন—সব তাতেই যদি তুমি মাথা নাড়ো তো তোমার আসল মতটা কী?

স্বামী বলতেন—আসল মতটা না-বলাই ভালো, ওতে শুধু অশান্তি বাড়ে—

স্ত্রী বলতেন—কিন্তু এ-রকম কদ্দিন এড়িয়ে চলবে?

পুরনো কোম্পানীর সাহেবরা তখনও ঘোষ-কোম্পানীর কাছে কাজ দেয়। ঘোষ-কোম্পানীকে বিশ্বাস করে। সাহেবদের তখন ওই গুণটা ছিল। একবার এক ফার্মকে ধরলে সহজে অন্য কোথাও যাবার নাম করতো না।

গিন্নী বলতেন—কী হলো, আজ আবার মুখটা শুকনো কেন? কেউ মেরেছে নাকি?

গিরীশ হেসে উঠতেন। বলতেন—কী যে বলো, মারবে আবার কে?

—না, তুমি যে-রকম মুখটা করে রয়েছ, যেন কেউ চড় মেরেছে তোমার গালে।

স্বামী বলতেন—না, হয়েছে কি, এক-জনকে ঠকিয়ে ফেলেছি, প্রায় হাজার দুয়েক টাকা ঠকিয়েছি—

—তাতে হয়েছে কি?

—বলো কি? ঠকানো তো পাপ। পাপের সামিল। পাপই করে ফেললাম তো! এখন কোথায় যে তাকে পাই আবার—

—তাহলে আর কি! বসে বসে কাঁদো, কাঁদতে বোস!

কিন্তু বেশিদিন গিরীশ ঘোষকে এ-জ্বালা সহ্য করতে হয়নি। একদিন অফিস থেকে এসে সেই যে শুলেন সে ঘুম আর ভাঙলো না। খবর গেল ডাক্তারের কাছে। কিন্তু কিছু ফল হলো না। শ্বশুর বলে গিয়ে-ছিলেন—টাকা বড় নচ্ছার জিনিস—সেই নচ্ছার জিনিসই শেষ পর্যন্ত রইল আর তিনিই চলে গেলেন। তখন সোনার বয়স দু' বছর। সনাতন ঘোষ তখনকার কথা কিছুই মনে করতে পারেন না।

তা সেই সনাতন যে বড় হয়েছে, বুদ্ধিমান হয়েছে এর পেছনে শাশুড়ীর অক্লান্ত পরিশ্রম। স্টিভেডোরের কারবার সেদিন তুলে দিতে হয়েছিল সেই বিধবা শাশুড়িকে। মোটা টাকায় কোম্পানীর স্বত্ব উপস্বত্ব সমস্ত বিক্রি করে আঁচলে চাবি নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন কবে ছেলের বিয়ে দিয়ে তিনি তার হাতে সব ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। চারদিকে ঘটক লাগিয়েছিলেন। শেষে একজন এসে খবর দিয়ে গেল এই মেয়ের কথা। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে বাপের বন্ধুর কাছে থেকে লেখা-পড়া করে। আর বাপ থাকে বর্মায়। তাঁর কাঠের ব্যবসা। ছেলে নেই। একমাত্র মেয়ে। বাপের টাকার কথাটা উহ্য থাক। তিনি টাকার দিকটা দেখেন নি। সত্যিই টাকাটা নচ্ছার জিনিস। দেখেছেন শুধু কুল বংশ মর্যাদা রূপ গুণ। ভুবনেশ্বর মিত্র টেলিগ্রাম পেয়েই দৌড়ে এসেছিলেন কলকাতায়। রাতারাতি মেয়ে দেখা পাত্র দেখা সব কিছু হলো। সুন্দর-বনের ছ' হাজার বিঘে আবাদ, মোটা টাকার কোম্পানীর কাগজ, ভাল-ভাল বাছা-বাছা সব বিলিতি কোম্পানীর শেয়ার। সেটাও বড় কথা নয়। আসল হলো বংশ। আসল হলো বনেদিয়ানা। কাকাবাবুকে বললেন—কেমন দেখলে তুমি হে শচীশ?

কাকাবাবু বললেন—আমি তো সব রকম খোঁজ খবর নিয়েই আপনাকে খবর দিয়েছি, রায় বাহাদুরও চেনেন ওঁদের—

—কে রায় বাহাদুর?

—রায় বাহাদুর নলিনী মজুমদার। এক পাড়ারই লোক তো সব। ওই ধরনে খবর

ভগিনী নিবেদিতা

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা রচিত

একমাত্র প্রামাণ্য জীবনী। মূল্য—৭·৫০

বিবেকানন্দের মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথের 'লোকমাতা'র অনন্যসাধারণ ত্যাগ ও ভালবাসার কথা ভারত কি এরই মধ্যে ভুলে গেল? যে ত্যাগকে রবীন্দ্রনাথ একমাত্র "সতীর তপস্যার" সঙ্গে তুলনা করেছেন? মাত্র অর্ধশতাব্দী আগে বাংলাদেশে দেশপ্রেমিক চিন্তানায়কদের মধ্যে এমন একজনও কি ছিলেন যিনি নিবেদিতার দ্বারা প্রভাবিত বা অনুপ্রাণিত হন নি? ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বক্তৃতা, সাংবাদিকতা প্রভৃতির যে কোনও বিষয়ে ভারতের অনুকরণীয়, অতুলনীয় মহোচ্চ আদর্শের কথা বিস্মৃত, লক্ষ্যচ্যুত ভারতবাসীর কানে নিরলস নিষ্ঠায় আজীবন ঘোষণা করেছেন কে? তিনিই কি ভগিনী নিবেদিতা নয়?

২৮শে অক্টোবর—নিবেদিতার জন্মদিনে

প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালী সেই পবিত্র জীবন অনুধ্যান করে ধন্য হোন। উচ্চ প্রশংসিত সাতশত পৃষ্ঠার সেই অনুপম জীবনবেদ প্রকাশ করেছেন:—

রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বিদ্যালয়

বাগবাজার, কলিকাতা-৩

গাঠের একাদশী বাঁড়ুজ্জে, চাউলপট্টির গদাধর চাটুজ্জে—সকলের চেনা। শিরীষ ঘোষের নাম করলে এখনও সবাই কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে—বলে তিনি ছিলেন দেবতার মত—

সেই শিরীষ ঘোষেরই নাতি।

ভুবনেশ্বরবাবু বলেছিলেন — কিন্তু বাড়িতে তো ওই মা ছাড়া দু'টি প্রাণী নেই শচীশ, সতী যে-রকম ছটফটে মেয়ে, ও কি টি'কতে পারবে?

কাকাবাবু বলেছিলেন—তা নেই, ভালোই তো! ও ননদ ভাজ দেওর ও-সব না-থাকাই ভালো। থাকলেই ঝঞ্ঝাট যত! আপনার মেয়ে যেমনভাবে মানুষ হয়েছে তাতে ও-সব না-থাকাই ভালো! এখানেই দিয়ে দিন বিয়ে—

তারপর আর কিছু ভাববার সময়ও ছিল না। একটা মেয়ে সংসার ছেড়ে চলে গিয়েছে নিজেরই গাফিলতিতে। এ মেয়েটার বেলায় আর সে-ভুল করলেন না ভুবনেশ্বর মিত্র! তিনদিনের মধ্যেই আয়োজন অনুষ্ঠান সব পাকা হয়ে গেল। ঘটা করে বিয়েও হয়ে গেল। ভুবনেশ্বর মিত্র ভবানীপুরেই একটা দোতলা বাড়ি ভাড়া করে বিয়ের আয়োজন করে ফেললেন। লোকজন নেমন্তন্ন, কেনা-কাটা সবই করলেন কাকাবাবু। একদিন উলু দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে বেনারসী জড়িয়ে সতী এসে ঢুকলো এ-বাড়িতে!

তারপর অনেকদিন কেটে গেল। অনেক বছরও কেটে গেল।

কোথায় বর্মায় কোন্ এক মগের মুল্লুকে জন্ম হয়েছিল। সেখান থেকে ভাসতে ভাসতে কোথায় কোন্ ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের এ'দো গলিতে এসে উঠেছিল। আবার একদিন হঠাৎ এ-বাড়িতে বউ হয়ে আসতে হলো সতীকে!

শাশুড়ী বললেন—দেখি, খোঁপাটা খোল তো মা, চুলটা দেখি—

প্রথম প্রথম সতী কিছু বলতো না। যা বলতো শাশুড়ী মুখ বুঁজে শুনতো। বুঝতো নতুন-বউয়ের এ-সব সহ্য করতে হয়। দু'দিন বাদেই এ-সব বন্ধ হয়ে যাবে!

—চুল খুলতে বলছি, তা খুলছো না কেন, খোল?

সতী বললে—চুল তো আপনি বিয়ের সময়ই দেখেছেন, আবার কেন?

শাশুড়ী বললেন—তা হোক বাপু, কী রকম যেন পরচুলো-পরচুলো মনে হচ্ছে, আবার একবার দেখাও—

সতী খোঁপা খুলে পিঠের ওপর চুল এলিয়ে দিলে। শাশুড়ী মেপে দেখলেন।

সতী বললে—কী হলো? দেখলেন? সন্দেহ ঘুচলো?

এ-সব প্রথম দিকের কথা। বড় তেজী মানুষ শাশুড়ী। তিনি অনেক দেখেছেন, অনেক ভুগেছেন, অনেক বুঝেছেন। শ্বশুরের মৃত্যু হয়েছিল বলতে গেলে তাঁরই কোলের ওপর। স্বামীরও মৃত্যু হয়েছিল তাঁর কোলে। শ্বশুর স্বামী হারিয়ে অজস্র অর্থের মালিক হয়ে তিনি দেখেছেন সংসারে কড়া মানুষ না হলে কপালে অনেক দুঃখ। তাই এক-একদিন ছাদে উঠে হঠাৎ জেরা করতেন। বলতেন—ওদিকে কী দেখছিলে বৌমা?

সতীও সোজা মেয়ে নয়। বলতো—কোন্‌দিকে?

—ওই যে পাশের বাড়ির জানালার দিকে? ওখানে কে আছে?

সতী বলতো—আপনি নিজে দেখুন না এসে কাকে দেখছিলুম—আসুন, দেখে যান্—

ওই পর্যন্তই। বেশি দূর গড়াতো না এ-সব ঘটনা। শাশুড়ীও চুপ করে যেতেন, সতীও চুপ করে যেত।

রাত্রে সনাতন ঘোষ একটু দেরি করে ঘুমোতেন। দিনের বেলাও তাঁর খুব কাজ ছিল না। তবু এখানে ওখানে যেতে হতো। সনাতনকে মা'ও একটু সমীহ করে চলতেন। ছেলে পড়ছে, আস্তে আস্তে কাছে যেতেন। তারপর জিজ্ঞেস করতেন—সোনা, আজকে দুধ খেয়েছিস?

শুধু আজকেই নয়, সনাতন ঘোষ বরাবরই এমনি। একটু ভেবে নিয়ে বলতেন—হ্যাঁ মা খেয়েছি তো?

মা বলতেন—কাল অনেক রাত পর্যন্ত তোমার ঘরে আলো জ্বলেছিল বাবা, রাত জেগে জেগে কী পড়ো? অত পড়ে কী হবে? যারা রাত জেগে-জেগে বই লিখেছে, তাদের টাকার দরকার ছিল তাই লিখেছে, তোমার অত কষ্ট করবার দরকার কী বাবা?

মাঝে মাঝে মা ধমক দিতেন চাকরদের।

বলতেন—তোদের আক্কেলটা কী শুনি, দেখছিস দাদাবাবু ঘরে রয়েছে, আর তুই এখানে গলা ছেড়ে চেঁচাচ্ছিস্? যেয়ো এখান থেকে, দূরে হয়ে যা—

—বৌমা!

শাশুড়ী ভোর বেলা উঠেই ঘরের দরজার বাইরে গিয়ে ডাকতেন।

বলতেন—এত দেরি করে ঘুম থেকে ওঠা আমি পছন্দ করি না, সারা-রাত কী করো শুনি? সোনা না-হয় বেশি রাত অবধি জেগে পড়া শোনা করে, সে না-হয় দেরি করে উঠবে, কিন্তু তোমার কিসের ঘুম—তুমিও কি জাগো নাকি ওর সঙ্গে?

সতীর মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরোত না। শুধু বোবার মত কিছুক্ষণ শাশুড়ীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে অবাক হয়ে। এক-একটা ঘটনা ঘটে আর অবাক হয়ে ভাবে—এ কোন্ সংসারে, এ কাদের সংসারে এলো।

ভারতের 'পতাকা মার্কা'
সরিষার তৈল
ব্যবহারে তফাৎটা দেখুন
ফোন ৩৫-২৭৭৪
ভারত অয়েল মিল

Amico's
GREEN LINIMENT
আপনি কিসের দৈহিক ব্যথায় যন্ত্রণা পাচ্ছেন, কোথায়?
কোমরে, হাঁটুতে, কিম্বা কোন সন্ধিস্থানে?
শুনে খুশী হবেন,
সায়েটিক, বুক বা পিঠের পাঁজরার
বাতের ইত্যাদি যাবতীয় ব্যথায়
এ্যামিকো গ্রীন লিনীমেণ্ট
(সবুজ মালিশ)
বাস্তবিকই নির্ভরযোগ্য।
মূল্য বড় শিশি ২'৭৫ নঃ পঃ
ছোট শিশি ১'৭৫ নঃ পঃ
"মাশুল" স্বতন্ত্র
ব্যবস্থাপত্রের জন্য লিখুন—
আমিন এণ্ড ইসমাইল প্রাইভেট লিঃ
৮০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

পড়লো সে! এ কোথায় কাদের কাছে তাকে তুলে দিয়ে গেল তার বাবা! সমস্ত পৃথিবীটা যেন চোখের সামনে ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। এ-সব দিনকার প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ঘটনা সতী পরে দীপংকরকে বলেছে। ভোর হতে-না-হতেই সতীকে উঠতে হবে, উঠে কলঘরে যেতে হবে। তারপর সোনার শাশুড়ীর চা-জলখাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। লোকজন আছে। তাদের কাজ নেই কিছু। তাদের ঝগড়া, বিবাদ, দলাদলি—তার মধ্যে সতী সব দেখা শোনা করবে। এমনি করেই সমস্ত শিখতে হবে সংসারের কাজ। একদিন শাশুড়িও নাকি এমনি করে হাতে ধরে কাজ শিখেছেন, বকুনি খেয়েছেন, তবে এত বড় সংসারের হাল ধরে একে চালিয়ে নিয়ে এসেছেন এখানে। যখন শাশুড়ী থাকবেন না, তখন তো তোমাকেই সব চালাতে হবে। নইলে ঝি চাকরের হাতে সব ছেড়ে দিলে কিছু কি আর আস্ত থাকবে!

বাতাসীর মা আদ্যিকালের লোক এ-বাড়ির। বলতো—বৌদিমণি, তুমি কেন আবার রান্নাবাড়িতে এলে বাছা, দেখ তো, ধোঁয়া-কালির মধ্যে তোমার শরীল কী টিঁকবে? ঠাকুর একলাই তো সব পারে—

তা বাতাসীর মা বলতে পারে বটে এমন কথা। ঘোষবাড়ির আদি থেকে আছে। হয়ত অন্ত পর্যন্তই থাকবে। সে কারো পরোয়া করে কথা বলে না। একতলাটার তারই রাজত্ব। সেখানে তার মুখের ওপর কারো কথা বলার এক্তিয়ার নেই।

বলে—আমি কার পরোয়া করতে যাবো শুনি? আমি মাঙ্‌না খাই না পরি? গতর দিয়ে খাটি না? ওই দাদাবাবুকে মানুষ করিনি এই হাতে? বলুক তোদের মামণি কেমন না বলতে পারে?

হঠাৎ কথার মধ্যেই সতীকে আসতে দেখে বলে—আবার বুঝি খবরদারি করতে পাঠালে তোমাকে বুড়ি?

বাতাসীর মা নিজেই নিজের পরিচয় দিয়েছিল—আমার নাম বাতাসীর মা বৌদিমণি—বাতাসীর মা বললেই সবাই চিনবে.—এ-বাড়ির পান থেকে চুণ খসলে এই বাতাসীর মা'কেই জবাবদিহি করতে হয়, ওই তোমার কর্তাকে আমিই বুকে-পিঠে করে মানুষ করেছি, ও তোমার শাশুড়ি তো নড়ে বসতে মুর্ছো যেত তখন—এখন ভারি কাজ দেখাচ্ছে—

ভূতির মা বলতো—তুমি থাম তো বাতাসীর মা, নতুন বউ-এর সঙ্গে ওমনি পুরোন কাসুন্দি ঘাটতে বসো না—

—তা ঘাটবো না, বাতাসীর মা কাউকে কি পরোয়া করে? গতর আছে বলে এত খাতির আমার, নইলে কে পুছতো না?

তারপর বাতাসীর মা সতীর ওপর হঠাৎ সদয় হয়ে উঠতো। বলতো—দেখ তো,

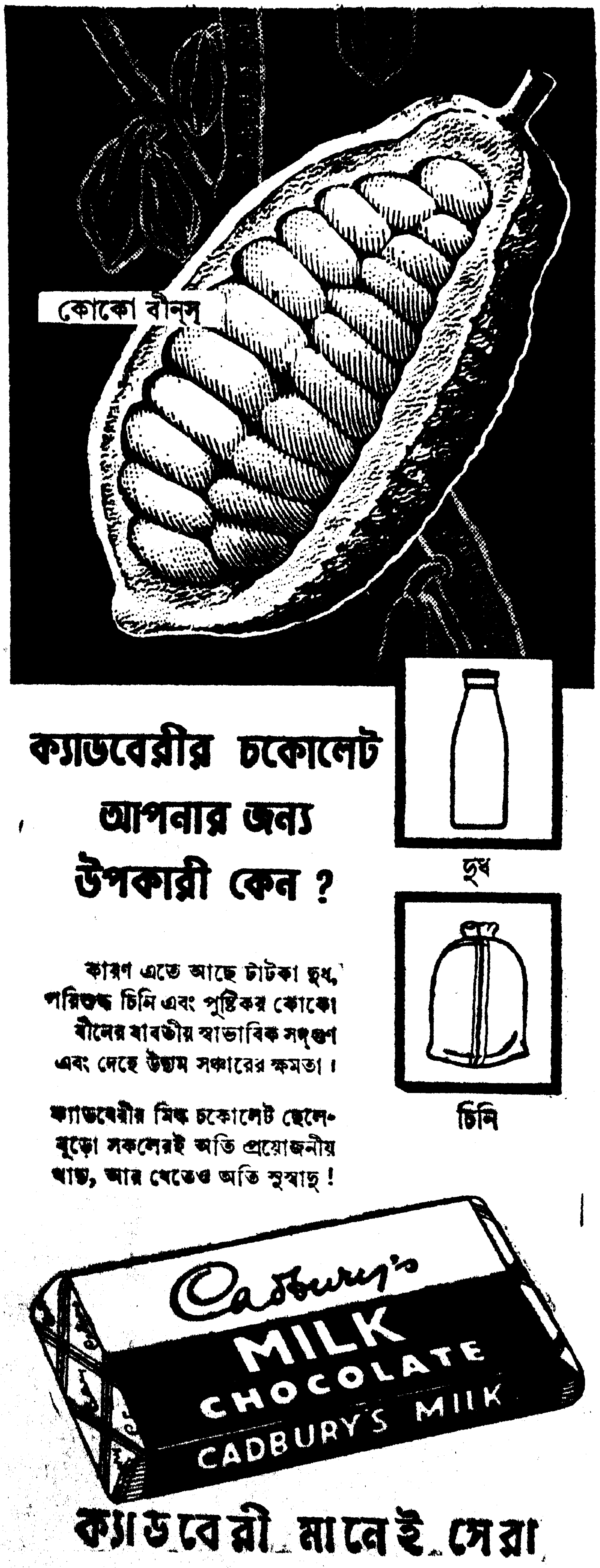

ঘেমে একেবারে নেয়ে উঠেছ বৌদিমণি—বাড়িতে আসতে না-আসতে একবারে কাজের কাজী করে তুলবে গা, এমন বৌ-কাটকি শাশুড়ি তো মায়ের জন্মে দেখিনি বাছা—আহা, মুখটা একেবারে শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে—

এমনি করে রান্নাবাড়ি, ভাঁড়ার ঘর, পুজোর দালান, বারবাড়ি ভেতরবাড়ি একে একে সব কিছুর সংগে পরিচয় করিয়ে দিলেন শাশুড়ি। কিন্তু সমস্ত দিনের শেষে যখন নিজের ঘরে শুতে যেত, তখনও সনাতনবাবু লাইব্রেরীঘর থেকে আসেন নি। কিছুক্ষণ বসে থাকতো সতী চেয়ারটায়। এটা ওটা ঘাঁটতো। এটা গুছিয়ে রাখতো, ওটা ঠিক করে দিত।

সনাতবাবু এসে ঢুকতেন এক সময়ে।

ক'টা বাজলো বল তো?

সতী ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখে বলতো—বারোটা বাজে—

—উঃ, বড় রাত করে দিলাম তো তোমার? তা তুমি শুয়ে পড়লেই তো পারতে—

তারপর হঠাৎ ছোট টেবিলটায় বসে পড়ে বলতেন—তুমি শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো—আমার একটু দেরি হবে—বলে আধ-পড়া বইটা আবার পড়তে বসতেন।

খানিক পরে বোধহয় খেয়াল হতো। বলতেন—আলোটা তোমার চোখে লাগছে না তো?

সতী বলতো—না,—

তারপর অনেকক্ষণ তেমনি করেই কাটতো। সনাতনবাবু মুখ নিচু করে পড়তেন এক মনে। কী যে পড়তেন, বিছানায় শুয়ে তা দেখা যেত না। সতী প্রথমে চিত হয়ে শুয়ে থাকতো। তারপর পাশ ফিরতো। ঘড়ির কাঁটাটা আস্তে আস্তে নড়তে নড়তে উত্তর থেকে দক্ষিণে গিয়ে পৌঁছোত। তখনও সনাতনবাবুর হুঁশ নেই। সতী ওপাশ ফিরে চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করতো। তখন পৃথিবীর কোথাও কোনও কোণে কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে না আর। শুধু ঘরের ঘড়িটার ধক্ ধক্ আওয়াজ কানে বিঁধছে কাঁটার মত। মুহূর্তগুলো তখন যেন সংগীন ঘাড়ে করে সতীর চোখের সামনে স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর সেইসব সময়ে সতীর মনে হতো পৃথিবীটা বুঝি এবার থেমে যাবে। একটা বিধ্বংসী প্রলয়ের মধ্যে পৃথিবীটা গড়িয়ে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে একেবারে। এমনি করে কত রাত কেটেছে ঘোষ-বাড়ির নতুন স্বামী-স্ত্রীর।

—কী বলছো! আমায় ডাকছিলে?

হঠাৎ সনাতনবাবুর যেন হুঁশ হতো! যেন আবার অদৃশ্য জগৎ থেকে ফিরে আসতেন নিজের শোবার ঘরে। লজ্জায় পড়ে যেতেন একটু। তারপর তাড়াতাড়ি আলোটা নিভিয়ে দিয়ে নিজের জায়গায় শুয়ে পড়তেন।

বলতেন—ইস্, বড় দেরি করে ফেললাম—

তারপর অনেকক্ষণ পর্যন্ত সতীর আর ঘুম আসতো না। সনাতনবাবু কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ একতালে বয়ে চলেছে। একবার শুলে তাঁর আর ঘুম আসতে দেরি হয় না। যে কাত্ হয়ে শোবেন সেই কাত্ হয়ে ঘুম থেকে উঠবেন। মাঝখানে একবার এপাশ-ওপাশও করতেন না। মাঝরাত্রে যখন একভাবে শুয়ে শুয়ে সমস্ত শরীরে ব্যথা হয়ে গেছে, তখন সতী উঠবে। উঠে পাশের বাথরুমে গিয়ে মুখে কপালে ঘাড়ে জল দিয়ে আসবে, একবার ঘড়িটা দেখবে। তারপর আবার নিজের বিছানায় এসে চিত হয়ে শুয়ে পড়বে। শুয়ে শুয়ে ঘড়ির ঘণ্টা শুনবে। একটা, দুটো। দুটোর পর তিনটে, তারপর চারটে......তারপর ভোর হয়ে যাবে। শাশুড়ীর ভোর বেলা ঘুম ভাঙে। তিনি দরজার বাইরে থেকে ডাকবেন—বৌমা, ও বৌমা—

এক-একদিন বিকেল বেলা শাশুড়ি সোজা লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে হাজির হন।

—সোনা?

সনাতনবাবু পড়তে পড়তে মুখ তোলেন।

—মা, তুমি?

—একবার আমার সংগে তোমার যেতে হবে যে বাবা, ন'দিদির নাত্নী হয়েছে, দেখতে যেতে বলেছিল, সময় তো আর হচ্ছে না—আজকেই চলো!

সনাতনবাবু ঘরে এসে বলেন—চলো, তৈরি হয়ে নাও—

সতীও অবাক হয়ে তাকায়। বলে—কোথায়?

সনাতনবাবু বলেন—মা যেতে বলেছে, মা'র ন'দিদির নাত্নী হয়েছে, অনেকদিন ধরে যেতে বলেছে, সময় পাওয়া যাচ্ছিল না মোটে, চলো—

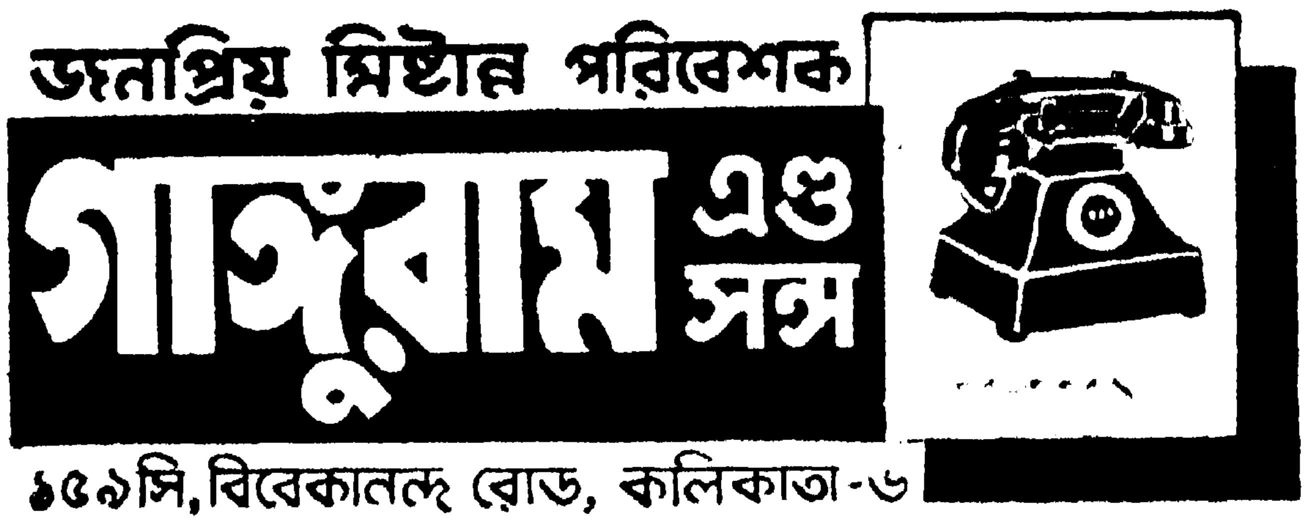

সনাতনবাবু তখন জামা-কাপড় পরে তৈরী। সতীও আলমারি খুলে গয়না বার করলে, শাড়ি বার করলে, ব্লাউজ বার করলে। অনেক শাড়ি, অনেক ব্লাউজ, অনেক গয়না দিয়েছে বাবা। একটাও পরা হয় না। নতুন কুটুমবাড়ি যাচ্ছে, যা তা পরে যাওয়া যায় না। বিছানার ওপর সব শাড়িগুলো একে একে নামিয়ে ফেললে।

সনাতনবাবু বললেন—আমি বেরোচ্ছি, তুমি এসো—

—শোন শোন, একটু দাঁড়াও—

সতী ডাকলে পেছন থেকে। বললে—একটু দাঁড়াও, এদিকে এসো না—

সনাতনবাবু কাছে এলেন। বললেন—কী হলো?

সতী বললে—কোন্ শাড়িটা পরি বলো তো?

সনাতনবাবু বললেন—যেটা ইচ্ছে পরো না—সবগুলোই তো ভালো—

—না না ও-রকম করে বললে চলবে না, ভালো করে ভেবে বলো,—

তারপর সতী একটা বেছে নিয়ে বললে—এটা মানাবে আমাকে, না গো—এটা বেশ বট্‌ল্ গ্রীন রং—

তা পরো—

যেন সতীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যেই সনাতনবাবু উত্তরটা দিলেন। বললেন—মা হয়ত রাগ করছে, তুমি এসো শিগ্‌গির, আমি গেলাম—

নতুন শায়া, নতুন ব্লাউজ, নতুন শাড়ি। বিয়ের পর এ-শাড়িটা আর পরাই হয়নি মোটে। একেবারে আনকোরা। কাপড়ের ভাঁজ খুলতে গিয়ে কেমন একরকম চমৎকার খস্ খস্ শব্দ হতে লাগলো। শাড়ির এই শব্দগুলো সতীর বড় ভালো লাগে। যেন আদর করে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলার মতন। অন্তরংগতার সুর মেশানো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গয়না পরলে। মুখে পাউডার দিলে, স্নো দিলে। তারপর টিপ দিলে দুটো ভুরুর মধ্যে। তারপর আয়নায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেখলে এপাশ-ওপাশ করে। বেশ দেখাচ্ছে এবার। চুলগুলো ছোটবেলা থেকেই কোঁকড়ানো। ঈশ্বর গাঙুলী লেনের সেই ছেলেটা এই চুলের দিকে চেয়ে থাকতো অনেকক্ষণ ধরে। দেখা যেন আর শেষ হয় না মুখখানা! তারপর ঘরের বাইরে বেরিয়ে একতলায় আসার মুখেই বাতাসীর মা'র সংগে দেখা।

—বাতাসীর মা, ভূতির-মা কোথায় গো?

—ডাকবো বৌদিমণি?

সারা শরীরে সেন্টের গন্ধ ভুর ভুর করে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। সতীর নিজের নাকেও লাগলো নিজের শরীরের গন্ধটা। বললে—আমি চললুম বাতাসীর মা, তাড়াতাড়িতে ঘরটা বন্ধ করা হলো না, ঘরময় কাপড়-চোপড় ছড়ানো রইল, ভূতির মাকে একটু বলে দিও তো—ঘরে ধুনো দিয়ে যেন দরজাটা চাবি-বন্ধ করে দেয়—

তারপর একটু থেমে আবার বললে—আর শম্ভু কোথায় গেল?

শম্ভু ওদিক থেকে দৌড়ে আসছিল। সতী বললে—শম্ভু, ঘরে সব ছড়ানো পড়ে রইল, ভূতির মা ধুনো দিয়ে দিলে, ঘরে চাবি দিয়ে দিস্, বুঝলি—

হঠাৎ যেন বাজ পড়লো মাথায়।

—বৌমা তুমি কোথায় যাচ্ছো আবার এখন?

সতী পেছনে চেয়ে দেখলে শাশুড়ী নামছেন সিঁড়ি দিয়ে। সাদা গরদের থান পরেছেন। সতী থমকে দাঁড়াল।

—তুমি আবার সাত তাড়াতাড়ি কোথায় চললে?

সতী অবাক হয়ে চাইল শাশুড়ীর দিকে মুখোমুখি।

—তুমি যে সেজে-গুজে বেরোচ্ছ বড়? আমি তোমাকে যেতে বলেছি?

বাতাসীর মা দাঁড়িয়ে ছিল, শম্ভুও পাশে দাঁড়িয়েছিল। দুজনেই শুনলো। আর সতীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত তখন থর থর করে কাঁপছে—

শাশুড়ী বললেন—আমি সোনাকে নিয়ে বলে একটা কাজে যাচ্ছি—আনন্দ করতেও যাচ্ছি না, নেমন্তন্ন খেতেও যাচ্ছি না, তো তুমি কী বলে এত সাজ-গোজ করে ঝামেলা করতে যাচ্ছো শুনি? কে যেতে বলেছে তোমাকে?

কথাটা বলে শাশুড়ী সামনে এগিয়ে গেলেন। বাগানে গাড়ির দরজা খোলার শব্দ হলো। গাড়ি স্টার্ট দেওয়ারও শব্দ হলো। তারপর গাড়িটা চলে যাবার শব্দও শুনতে পেলে সতী! তখনও কিন্তু সতী পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। তার শাড়ি, তার গয়না, তার স্নো পাউডার সেন্ট্—সমস্ত কিছু যেন তার শরীরে দাউ দাউ করে জ্বলছে। আগুনে যেন তার সমস্ত শরীর পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। তবু এতটুকু ভেঙে পড়লো না সতী। বাতাসীর মা, শম্ভু দুজনেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সতীর এই চূড়ান্ত অপমান চোখ দিয়ে দেখছিল। তাদের চোখের সামনে দিয়েই সতী আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে আবার ওপরে উঠতে লাগলো। উঠে নিজের ঘরে গেল। তারপর একে একে নতুন শাড়ি, গয়না, ব্লাউজ, শায়া সব খুলে ফেললে। আবার পুরোন শায়া

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

শ্রেষ্ঠ রহস্য উপন্যাস

মদন ভস্ম ৩৲

সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস

পোড়ামাটি ভাঙ্গাঘর ৮৲

আর. এন. চ্যাটার্জী এন্ড কোং

২৩, নির্মল চন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

১৯৬০-৬১ সালে আপনার ভাগ্যে কি আছে?

আপনি যদি ১৯৬০-৬১ সালে আপনার ভাগ্যে কি ঘটিবে তাহা পূর্বাহ্ণে জানিতে চান, তবে একটি পোষ্টকার্ডে আপনার নাম ও ঠিকানা এবং কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া পাঠাইয়া দিন। আমরা জ্যোতির্বিদ্যার প্রভাবে আপনার বার মাসের ভবিষ্যৎ লাভ-লোকসান, কি উপায়ে রোজগার হইবে, কবে চাকুরী পাইবেন, উন্নতি, স্ত্রী পুত্রের সুখ-স্বাস্থ্য, রোগ, বিদেশে ভ্রমণ, মোকদ্দমা এবং পরীক্ষায় সাফল্য, জায়গা জমি, ধন-দৌলত, লটারী ও অজ্ঞাত কারণে ধনপ্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয়ের বর্ষফল তৈয়ারী করিয়া ১৷৹ টাকার জন্য ভি-পি যোগে পাঠাইয়া দিব। ডাক খরচ স্বতন্ত্র। দুষ্ট গ্রহের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উপায় বলিয়া দিব। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা জ্যোতির্বিদ্যায় কিরূপ অভিজ্ঞ। মিথ্যা প্রমাণিত হইলে আমরা মূল্য ফেরৎ দিবার গ্যারাণ্টি দিই। পণ্ডিত দেবদত্ত শাস্ত্রী, রাজ জ্যোতিষী। (DC-3) জলন্ধর সিটি।

Pt. Dev Dutt Shastri, Raj Jyotishi, (DC-3) Jullundur City.

ব্লাউজ শাড়ি গায়ে জড়ালো। আশ্চর্য, চোখ দিয়ে এতটুকু জল পড়লো না। বিছানায় ঢলে পড়লো না। মুখে হাত চাপা দিয়ে কাঁদতেও বসলো না।

এ-সমস্তই দীপংকরের জানা। এ সমস্ত ঘটনাই সতী দীপংকরকে পরে বলেছে!

বর্মা থেকে ভুবনেশ্বর মিত্র চিঠি লিখেছেন—

"মা সতী, অনেক কাজের মধ্যে তোমাকে সব সময় সময়-মত চিঠি দিতে পারি না। তুমি কিছু মনে কোর না। তোমাকে সৎ পাত্রে অর্পণ করতে পেরেছি এই আমার এক পরম সান্ত্বনা। স্বামীকে ভক্তি শ্রদ্ধা করবে, স্বামী ছাড়া ত্রিভুবনে স্ত্রীলোকের আর কোন দ্বিতীয় দেবতা নেই। সর্বদা স্বামীর ধ্যানই স্ত্রীলোকের পরম কর্তব্য জানবে। আর তোমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী, তাঁকেও মায়ের মত সেবা করবে। শৈশবে তুমি মাকে হারিয়েছিলে, এখন বিয়ের পর শাশুড়ী ঠাকুরাণীই তোমার মায়ের স্থান গ্রহণ করেছেন। সুতরাং প্রাণ দিয়ে তাঁর তুষ্টি বিধান করবে। তোমার মা জীবিত নেই। থাকলে তিনিই তোমাকে এ-সব কথা লিখতেন। তাঁর অবর্তমানে তাই আমাকেই এত কথা লিখতে হচ্ছে। আমার শরীরে আর পূর্বের ন্যায় পরিশ্রম সহ্য হয় না। ভাবি বিশ্রাম নেব। কিন্তু আবার ভাবি, বিশ্রাম নিলে বাঁচবো কী নিয়ে? তোমাদের কুশল সংবাদ দিও। তোমরা দুজনে আমার আশীর্বাদ নিও। আর শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে আমার প্রণাম জানাবে। ইতি—আশীর্বাদক তোমার বাবা।

সনাতনবাবুর নজর সাধারণত ছোটখাট ব্যাপারে পড়ে না।

তবু বলেন—ওটা কার চিঠি?

—আমার বাবার। জানো, বাবার শরীরটা খুব খারাপ যাচ্ছে, বাবার শরীর খারাপের কথা শুনলে আমার রাত্রে ঘুম হয় না।

সনাতনবাবু বলেন—সত্যিই তো, বড় ভাবনার কথা—

বলেই অন্যমনস্ক হয়ে যান আবার।

সতী বলে—চিঠিটা পড়বে?

—না, তুমি তো পড়েছ, আমি আর কী করতে পড়বো!

তারপর অনেকক্ষণ ধরে বাবার কথা নিয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, যদি কারো সঙ্গে বসে বসে বাবার গল্প করা যেত! যদি কেউ কথাগুলো মন দিয়ে শুনতো একটু! দুপুরবেলা সতী বাবাকে চিঠি লিখতে বসে। একটা চিঠি লেখে। দু' পাতা চিঠি। নিজের মনের কথার কিছু আর বাকি থাকে না লিখতে।

অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে লেখে—

"পরম পূজনীয় বাবা, তোমার শরীর খারাপের কথা শুনে বড় চিন্তিত হলাম। তুমি এবার বিশ্রাম নাও একটু। নয়ত কিছু-দিনের জন্যে কোথাও বেড়াতে যাও। কাজ করলে তোমার শরীর আর টিঁকবে না। আর আমাকে তুমি সৎ পাত্রে অর্পণ করেছ লিখেছ। সৎপাত্রে যে অর্পণ করেছ তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এক এক সময় আমার সন্দেহ হয় বাবা, তুমি আমাকে কেন এত লেখা-পড়া শেখালে। কেন এত আত্মসম্মানের জ্ঞান দিলে। কেন আমি বোবা-কালা-কানা হয়ে জন্মালাম না বাবা? তাহলে এ-সব কিছুই দেখতে শুনতে হতো না আমাকে। তাহলে আমি মুখ বুজে এ-সংসারে নির্বিবাদে কাটিয়ে দিতে পারতুম। কিন্তু আমার চারিদিকে এত সুখ তুমি কেন দিলে? আমি যে সুখের উপকরণের জ্বালায় বেঁচে মরে আছি। আমি যে এখনও বেঁচে আছি, সে কেবল তোমার মুখ চেয়ে বাবা। আর কোনও কারণে নয়। ফেরত ডাকে তোমার চিঠি যেন ঠিক পাই—ইতি তোমার সতী।"

চিঠিটা ভাঁজ করে খামে পুরে খামের মুখটা এঁটে বাবার ঠিকানাটা লিখলে ওপরে।

তারপর ডাকলে—শম্ভু—

শম্ভু ঘরে এলে সতী বললে—এই চিঠিটা নিজের হাতে পোস্টবক্সে গিয়ে ফেলে দিবি বুঝলি? ভুল করে যেখানে-সেখানে ফেলিসনি যেন—

শম্ভু বরাবরই চিঠি ফেলে। এ আজ প্রথম নয়। তবু প্রত্যেকবারই সতী বার বার সাবধান করে দেয়। সতর্ক করে দেয়। ফিরে এলে আবার জিজ্ঞেস করে—ঠিক বাক্সের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ফেলেছিস তো? বাইরে পড়ে যায়নি?

শম্ভু বলে—হ্যাঁ বৌদিমণি, আমি বরাবর চিঠি ফেলছি আর আমি চিঠি ফেলতে জানবো না—

আজও শম্ভু চিঠি নিয়ে চলে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেছে। হঠাৎ কী যে হলো। সতী উঠে পড়লো। উঠেই ডাকলে—শম্ভু, ও শম্ভু—

তাড়াতাড়ি সতী সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল তর-তর করে। সেখানেও শম্ভু নেই। একেবারে বারবাড়ি পেরিয়ে হয়ত সদর রাস্তায় গিয়ে পৌঁছেছে। তাড়াতাড়ি বার-বাড়ির উঠোনে গিয়ে বাগানের সামনে দরোয়ানকে ডাকলে—দরোয়ান, শোন তো, শম্ভু চিঠি ফেলতে গেল এখখুনি—শম্ভুকে একবার ডাকতো, শিগগির—

অনেকক্ষণ পরে দরোয়ান শম্ভুকে ডেকে নিয়ে এল।

—কী রে চিঠি ফেলিস নি তো?

না, তখনও হাতে রয়েছে তার চিঠিটা। চিঠিটা তার হাত থেকে নিয়ে সতী টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললে। চিঠির টুকরোগুলো কুচো কুচো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে হাওয়ায় উড়তে লাগলো।

সতী তাড়াতাড়ি আবার ঘরে এল। ঘরে এসে আবার একটা নতুন চিঠি লিখলে—

"বাবা, তোমার শরীরের কথা ভেবে খুব ভাবনায় পড়লাম। দিনকতক তুমি বিশ্রাম নাও। আমাদের এখানে এসে থাকতেও তো পারো। আমার শাশুড়ী বললেন—তোমার বাবাকে লিখে দাও এখানে আসতে। আমার এখানে কোনও কষ্ট নেই। শাশুড়ী আমাকে মেয়ের মতন যত্ন করেন। ছোটবেলায় আমি মাকে হারিয়েছিলাম বলে আমার যে দুঃখ ছিল, বিয়ের পর আমার শাশুড়ী সে-দুঃখ মিটিয়েছেন। তুমি কেমন আছো, ফেরত ডাকে জানাবে। ইতি তোমার সতী।"

এ-সমস্ত দীপংকরের জানা ঘটনা। এ-সমস্ত ঘটনাই সতী দীপংকরকে পরে জানিয়েছে। (ক্রমশ)

উমাচল-গ্রন্থাবলী
শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী প্রণীত
যোগবলে রোগ আরোগ্য
(সহজ যৌগিক উপায়ে সর্বরোগের চিকিৎসা)—৫৷৷০; Yogic Therapy (ঐ, ইংরাজী)—৭; **যৌগিক ব্যায়াম** (আসন-মুদ্রা ও প্রাণায়াম ইত্যাদি)—৪; **ব্রহ্মচর্য**—১৷৷০; **ঈশোপনিষৎ**—২; **খাদ্যনীতি**—১৷০ = [সব বই একত্রে—২০] শ্রীনারায়ণী—লিজেল রেম'র **নিবেদিতা—৭৷৷০** (যুগাচার্য বিবেকানন্দ স্বামীর মানসকন্যা নিবেদিতার অপরূপ জীবনী—মূল ফরাসী হইতে সুললিত বাংলায় স্বচ্ছন্দ অনুবাদ)।
উমাচল প্রকাশনী
৫৮।১।৭বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলি—৬
(সি-৮৬১৭)

দি রিলিফ
২২৬, আপার সার্কুলার রোড
এক্সরে, কফ প্রভৃতি পরীক্ষা হয়
দরিদ্র রোগীদের জন্য—মাত্র ৮৲ টাকা
সময়ঃ—সকাল ৯টা থেকে ১২-৩০ ও বৈকাল ৪টা থেকে ৭টা

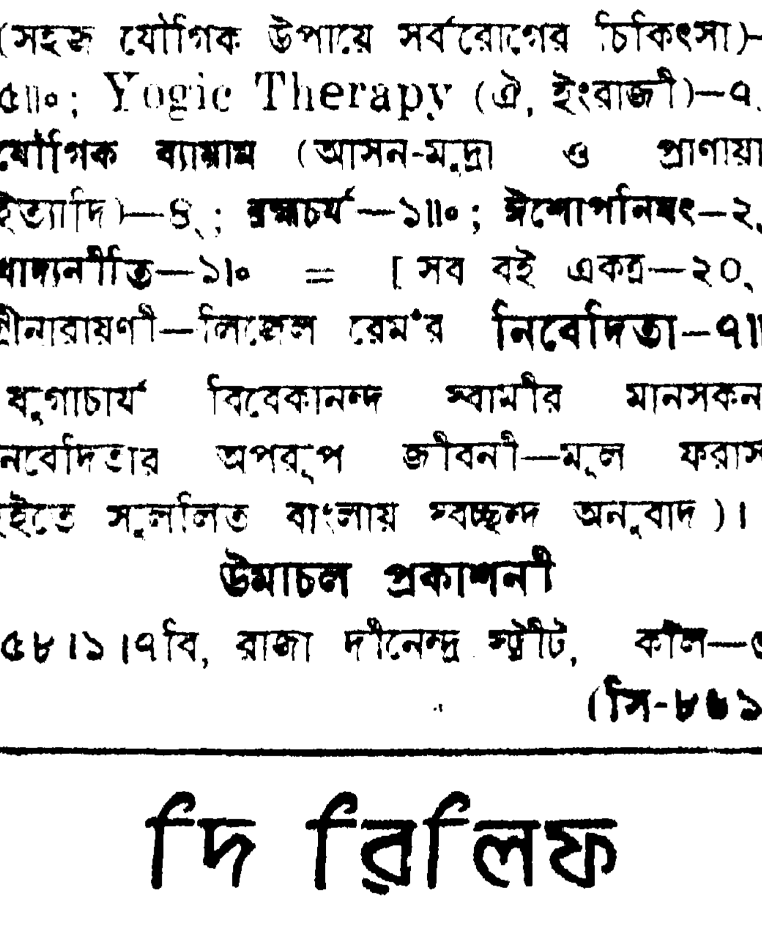

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

৫০

হরিদাসবাবুকে আমার যুক্তিগুলি দিলাম। তিনি মন দিয়ে সবই শুনলেন, কিন্তু বলে উঠলেন—তা', কথাগুলো ভালোই। তবে যুক্তি থাকে ভালোই, না থাকলেও ক্ষতি নেই। জিনিসটা ত ভালো হয়েছে? লোককে ত মুগ্ধ করেছেন, আবার কী!

উনি এভাবে ও'র মন্তব্য প্রকাশ করে গেলেন, কিন্তু, মনটা আমার শান্ত হলো না কিছুতেই। আমি ঐ চিন্তাতেই মগ্ন হয়ে রইলাম। পরে দেখেছি, ও' নিয়ে কেউই কোনোদিন প্রশ্ন করেন নি। অর্থাৎ তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন যে, শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে শিল্পীর কতগুলি স্বাধীনতা আছে। যে-ভাবের ওপর নাট্যকার চরিত্রটিকে দাঁড় করিয়েছেন, সেভাবটা বজায় থাকলেই হলো। ইনি এরকম দেখিয়েছেন, অন্য লোক অন্য-ভাবে দেখাবেন, ওর আর কী!

কিন্তু আমার জিজ্ঞাসু মন সেদিন অত সহজেই আমাকে রেহাই দেয় নি। কল্পনাকে আশ্রয় করতে পারি, কিন্তু তার ওপরে যদি যুক্তির একটা ছায়াও দেখা যায়, তাতে কতো-খানি বেড়ে যায় শিল্পীর মনোবল? তাই, আমার সব যুক্তিগুলিকে আমার চরিত্র চিত্রণের ভিত্তি না করে সেদিন ঠিক স্থির হতে পারি নি। এবার বলি, সাজাহানকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত দেখানোর সপক্ষে যে-সব যুক্তি ছিল, তার সূত্র ছিল এই:— প্রথমে মানুচির বই থেকেই তোলা যাক। তিনি লিখেছেন—

"Shahjahan brought this illness—on himself, for being already an old man of sixty-one, he wanted still to enjoy himself like a youth and with this intent took different stimulating drugs. These brought on a retention of urine for three days, and he was almost at death's door."

(এখানে, তাঁর বয়স যেটা উল্লেখ করা হয়েছে তা' নিয়েই মতভেদ রয়েছে। মানুচির বইখানার যে পৃষ্ঠা থেকে উক্ত উদ্ধৃতিটুকু দেওয়া হয়েছে, সেই পৃষ্ঠার নীচেই বইখানার অনুবাদক ও টিপ্পনীকার উইলিয়াম আরভাইন আই-সি-এস মহাশয় ফুটনোটে মন্তব্য করেছেন এই বলে, যে, যেহেতু সাজাহানের জন্মতারিখ হচ্ছে ১৫ই জানুয়ারী, ১৫৯২, সেই হেতু, ঐ বছর, অর্থাৎ ১৬৫৭ সালে তাঁর বয়স হয়েছিল—প্রকৃতপক্ষে—৬৭)

যাই হোক সাজাহানের উক্ত ধরনের অসুস্থতার কথা বার্নিয়েরও উল্লেখ করেছেন। এবং শুধু তাই নয়, তিনি আবার সাজাহানের ঐ সময়কার বয়স উল্লেখ করেছেন—৭০। তিনি বলেছেন—

"The Mogol, who had passed his seventieth years, was seized with a disorder, the natures of which it were unbecoming to describe: suffice it to state that it was disgraceful to a man of this age, who, instead of wasting, ought to have been careful to preserve the remaining vigour of his constitution."

এল্‌ফিনস্টোনও প্রতিধ্বনি ক'রে গেছেন ঐ কথার। এলফিনস্টোন-এর ইতিহাসের ভিত্তি হচ্ছে প্রাচীন ঐতিহাসিক কাজী খার রচিত ইতিবৃত্ত।

প্রসঙ্গত একথাও বলা যেতে পারে, সাজাহানের লাম্পট্যদোষ-সম্বন্ধে প্রাচীন ঐতিহাসিকরা অনেক কথাই বলে গেছেন। তার সবিস্তার ব্যাখ্যা এখানে অবান্তর, তবে একটি কথা এখানে না বললে প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণাঙ্গ হবে না। সেটি হচ্ছে এই যে, তাঁদের মতে, সাজাহান প্রচুর হাকিমী ওষুধ সেবন করতেন, এবং তার ক্রিয়া হচ্ছে,—মূত্ররোধ। এবং ঐ সব করতে করতেই শরীরে ঘটে গিয়েছিল স্নায়বিক বিপর্যয়। একদিকে এই সব প্রাচীনদের সাক্ষ্য, অন্যদিকে, ঐ বিদেশী ঐতিহাসিক-দের উক্তি,—'রিটেনশন্ অব ইউরিন'। সাজাহান যখন গুরুতর অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হলেন, এবং সে

একটি বিশিষ্ট একাঙ্ক নাটক সংকলন
—আনন্দবাজার

একাঙ্ক সঞ্চয়ন

এই সংকলনে—রবীন্দ্রনাথ, শচীন সেনগুপ্ত, তুলসী লাহিড়ী, তারাশংকর, মন্মথ রায়, বনফুল, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, পরিমল গোস্বামী, বিধায়ক ভট্টাচার্য, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অখিল নিয়োগী, সুনীল দত্ত, গিরিশংকর, সোমেন নন্দী, শীতাংশু মৈত্র, কিরণ মৈত্র, রমেন লাহিড়ী প্রমুখ খ্যাতনামা নাট্যকার-দের ২০টি শ্রেষ্ঠ নাটকের সমাবেশ। এছাড়া একাঙ্ক নাটিকার তত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্পাদকদ্বয় ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য ও ডঃ অজিত-কুমার ঘোষের দুইটি মূল্যবান আলোচনায় সমৃদ্ধ। দাম ৮·০০

গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত
বিদ্যুৎ বসুর
লার্নিং ফ্রম দি বার্নিং ঘাট ১·২৫
বীরু মুখোপাধ্যায়ের নতুন নাটক
সাহিত্যিক—২·০০
উমানাথ ভট্টাচার্যের মঞ্চ-সফল প্রহসন
শেষ সংবাদ—২·৫০
সুনীল দত্তের মর্মস্পর্শী পূর্ণাঙ্গ নাটক
অভিশপ্ত ক্ষুধা—১·৭৫

ছোটদের বাইশজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের
বাছাই-করা নাট্য-সংকলন

ছোটদের রঙমহল ৩·৫০

বিজন ভট্টাচার্যের **গোত্রান্তর** ২·৫০। বিধায়ক ভট্টাচার্যের **কান্নাহাসির পালা** ২·৫০। জোছন দস্তিদারের **দুই মহল** (২য় সং) ২·৫০। বীরু মুখোপাধ্যায়ের **সংক্রান্তি** (২য় সং) ২·৫০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রীভূমিকা-বর্জিত কৌতুক নাটক **বারো ভূত** ১·৫০। সুনীল দত্তের স্ত্রীচরিত্র-বর্জিত হাসির হুল্লোড় **হবুরাজার দেশে** ১·৭৫; **অংকুর** (২য় সং) ১·৫০ **লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার**—তুলসী লাহিড়ী ২·০০। **নাটক নয়**—কিরণ মৈত্র ১·২৫। **একাঙ্ক সপ্তক**—দিগিন বন্দ্যোঃ ৩·০০। **অপরাজিত**—রমেন লাহিড়ী ১·৭৫। **অপরাধী**—দীপংকর সরকার ০·৬২। **জিজ্ঞাসা**—শান্তি মুখোঃ ২·২৫। **জয়ের পথে**—সঞ্জীব সরকার ১·৫০। **উষার আলো**—অন্নদা বাগচী ১·৫০। সুনীল দত্তের **হরিপদ মাস্টার** (২য় সং) ২·০০, **জতুগৃহ** ১·৫০, **ত্রিনয়ন** ১·০০, **নটতস্কর** ০·৫০

জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা—৯

খবরে তাঁর পুত্রেরা সিংহাসনকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রবিপ্লব আসন্ন করে তুললেন, ঠিক সেই সময়ে সাজাহানের শারীরিক অবস্থা যে কি ছিল, তা' হৃদয়ংগম করতে গেলে ঐতিহাসিকদের ঐসব সাক্ষ্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। 'রিটেনসন অব ইউরিন' বলে যে-খানটার কথা ও'রা বলেছেন, সেটা হচ্ছে এই যে, মূত্রথলি পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, তা স্তম্ভিত হয়ে থাকে, এবং তারই ফলে স্নায়ুতে এমন অসাধারণ প্রতিক্রিয়া ঘটে যে, তার ফলে অংশত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। দুটো ব্যাপার হয়। এক, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ার দরুণ স্নায়বিক বিশৃংখলা এবং তারই ফলস্বরূপ ঐ অস্বাভাবিক মূত্ররোধ। দ্বিতীয়ত, উপর্যুপরি এবং অস্বাভাবিক মূত্রস্তম্ভনের জন্য স্নায়বিক বিপর্যয়, আর তার ফলে, আংশিক পক্ষাঘাত। এবং ঐ যে তিনদিনের 'রিটেনশন'-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার ফলে উনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন; মৃত্যুর দ্বারদেশে উপস্থিত হয়েছিলেন।

ব্লাডার র‍্যাপচার হয়ে সারা শরীরে বিষ সঞ্চারিত হয়ে সত্যিই মৃত্যু হওয়া সম্ভব হয়ে পড়েছিল। সম্রাট প্রতিদিন প্রাসাদ-সম্মুখস্থ ‘ঝরকা’য় বসে প্রজাদের দর্শন দিতেন এই ছিল রীতি। কিন্তু, তিনদিন তিনি তা' করতে পারেন নি বলে, প্রবল গুজব রটে গিয়েছিল এই বলে যে, সম্রাট আর বেঁচে নেই, তিনি মারা গেছেন। তাই, তিনদিন পরে, ঐ অবস্থাতেও যখন তিনি চোখ মেলে মাত্র চাইতে পারছেন, তাঁকে ধরাধরি করে ‘ঝরকা’য় এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপরে, ঐভাবে বেশ কিছুদিন ধরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন তিনি, বলে মন্তব্য করে গেছেন ঐতিহাসিকেরা। তবে, এর মধ্যে একটা কথা আছে। কতদিন ধরে এভাবে তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তার বিবরণ তেমন অবশ্য খুঁজে পাইনি। কিন্তু, তাহলেও, আমার পক্ষে, চরিত্র-চিত্রণের দিক থেকে ইঙ্গিতটুকুই যথেষ্ট ছিল বলে মনে করি।

এই যে সব প্রমাণ আর যুক্তি, এ-ই রইল হয়ে আমার বল-স্বরূপ। আর, অভিনয়ের দিক থেকে যে-সব অসুবিধা অনুভব করেছিলাম, দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে তা দূরে হলো। দাড়ি-চুল, যা নিয়ে আমার খুঁতখুঁতির অন্ত ছিল না, তা' সবই ঠিক হয়ে গেল, ইদু মিঞাও আসতে লাগল নিয়মিত। পোশাকও মনের মত করে তৈরী করিয়ে নিলাম। দু' রকমের পোশাক পরতাম ‘সাজাহান’-এ। প্রথম দৃশ্যে গয়না-গাঁটি যথেষ্ট ছিল। ছিল অরগ্যাণ্ডির মোগলাই কাবা, তার নীচে একটি বেনারসী ব্রোকেডের জ্যাকেটের মতো, সেটা ছিল—লাল। পা'জামা যেটা পরতাম, সেটাও ছিল লাল। ওপরের কাবাটা ছিল সাদা। বন্দী হবার দৃশ্যে—জ্যাকেট-টা খুলে রাখতাম—তার বদলে পরতাম আরেকটা জ্যাকেট—শাটিনের তৈরী। সেটা ছিল ক্রীম কালারের। আর, শেষের দিকে পরতাম অন্য পোশাক। ভেলভেটের কাবা—ফার-বসানো। রঙটা ছিল যাকে বলে—রাসেট কালার—চকোলেট নয়—গোল্ডেন ব্রাউন বলতে পারি। কালো ফার দেওয়া থাকত, আর বাঁধবার জায়গায় ছিল সোনালী ঘুন্টি দেওয়া টাসেল। চারটে টাসেল ছিল, বুকের পাশে ঝুলে থাকত। কোমরবন্ধ ছিল ঐ ভেলভেটেরই, তারও চারটে টাসেল ঝুলত। পা'জামা তখন পরতাম সাদা। কাবাটা বেশ লম্বা ছিল বলে, পাজামার নীচেকার একটু অংশমাত্র দেখা যেতো। পোশাকটিতে এ ছাড়া আর কোনো জাঁকজমক ছিল না।

তারপরে, দ্বিতীয় রাত্রি থেকে অভিনয়ও শুরু করা গেল সগৌরবে, দিনও যেতে লাগল, কিন্তু কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, আমাদের রাখালদা কোথাও কোনো সমালোচনা করেন নি। তাঁর সমালোচনার অর্থই ছিল বিরূপ বাক্য, তা' এবার তিনি সমালোচনা না করে বিরাট স্বীকৃতি দিলেন আমাদের ‘সাজাহান’-এর একথা মনে করতে দোষ নেই।

প্রসঙ্গত আরও একটা কথা বলে রাখি। সেই যে চব্বিশ সাল থেকে শুরু হয়েছিল, তারপর থেকে গত ৫৭ সাল পর্যন্ত যতদিন আমি থিয়েটার করেছি, কতবার কতো থিয়েটারে যে সাজাহান করেছি তার ইয়ত্তা নেই, কিন্তু ঐ আংশিক পক্ষাঘাত দেখাতে কোনোদিন কোনো ভ্রম হয়নি আমার।

যাই হোক, দ্বিতীয় রাত্রি থেকে জাহানারার পার্ট বদলে গেল। কুসুমকুমারী পার্টটিতে তেমন সুবিধা করতে পারেন নি। তাঁর বদলে ‘জাহানারা’ করতে যিনি এলেন, তিনি মনোমোহনে ‘জাহানারা’ অনেকবার করেছেন, অন্য বহুরকম পার্টও করেছেন। এমনিতে সুন্দরী, কিন্তু, একটু মোটা। এ'র নাম—রাণীসুন্দরী। (অমর দত্তের ক্লাসিকে যে রাণীসুন্দরী অভিনয় করতেন, ইনি তিনি নন।)

দুর্গাদাস আসবে, মহম্মদ করবে বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এ সপ্তাহেও সে এলো না, সে তখনো সুস্থ হয়নি। ভাবা গিয়েছিল, এ সপ্তাহের মধ্যে সে সুস্থ হয়ে উঠবে, কাজে আসবে, কিন্তু তা আর হলো না। কর্তৃপক্ষ দেখলাম এতে একটু অসন্তুষ্টও হয়েছেন ওর ওপরে।

মনোমোহন থেকে আরও কয়েকটি অভিনেত্রী এসেছিলেন আমাদের থিয়েটারে। যেমন, আশালতা। এ করেছিল জহরৎ। প্রথম রাত্রি থেকেই জহরৎ করছে। আর এসেছিল লক্ষ্মী-সরস্বতী, দুই বোন, নাচের দলে। ব্যালে গার্ল আরও এসেছিল। নাচের দিক থেকেই আর্ট থিয়েটার ছিল এযাবৎ কমজোরী, এরা নাচে ছিল সুদক্ষা, তাই নাচের দল এবার সবিশেষ পুষ্টিলাভ করল। অর্থাৎ দ্বিতীয় রজনী থেকে সগৌরবে চলতে লাগল—"সাজাহান।"

তিনকড়িদার কথা আগেই বলেছি, তিনি কয়েক রাত্রি করেই ছেড়ে দিলেন ‘দারা’। তাঁর পরে প্রফুল্ল সেনগুপ্ত করতে লাগল, কিন্তু কাগজগুলি তখনো লিখলে—কোনো ইমপ্রুভমেণ্ট হয়নি।

‘সাজাহান’-বইটার ব্যাপারে বরাবর একটা জিনিস লক্ষ্য করে এসেছি, সেই চব্বিশ সাল থেকে একেবারে সাতান্ন সাল পর্যন্ত, দীর্ঘকাল কতো থিয়েটার কতোবার করেছে, কতো কম্বিনেশনেই না হয়েছে, কিন্তু সবার অভিনয় নিখুঁতভাবে এতে কখনো হয়নি। আর্ট থিয়েটারে আমরা কতো-কতো বই করেছি, সব চরিত্রই নিখুঁতভাবে হয়েছে কিন্তু ‘সাজাহান’-এ ঐ গোটা তিন, বা চার বা যে কোনো পাঁচটি চরিত্র ছাড়া আর কোনো চরিত্রই তেমন

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
মনের মানুষ
— তিন টাকা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
বহু যুগের ওপার হতে
— দু টাকা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
তিন শূন্য
— তিন টাকা পঞ্চাশ

সুবোধ ঘোষ
ভারত প্রেমকথা
— ছয় টাকা

সরলাবালা সরকার
গল্পসংগ্রহ
— পাঁচ টাকা

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন
চিন্ময় বঙ্গ
— চার টাকা

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
বিবেকানন্দ চরিত
— পাঁচ টাকা

ছেলেদের বিবেকানন্দ
— এক টাকা পঁচিশ

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী
রবীন্দ্র মানসের উৎস সন্ধানে
— তিন টাকা পঞ্চাশ

লিপিকার বই
বিদূষক
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
দুই টাকা পঞ্চাশ

সাহিত্যের সত্য
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
দুই টাকা পঞ্চাশ

আনন্দ পাবলিশার্স
প্রাঃ লিমিটেড। কলিকাতা-৯

দেদীপ্যমান হয়ে চোখে লাগবার মতো হতো না।

এর পরে শুরু হলো পত্র-পত্রিকার সমালোচনা। এক-একটি পত্রিকা দুবার-তিন-বার করে সমালোচনা করেছে। পত্র-পত্রিকার সেদিনকার সব মন্তব্য কিছু কিছু তুলে সেই যুগের সৌরভ আঘ্রাণ করা যাক। আমি সুখ্যাতিই পেয়েছিলাম, কিন্তু কীভাবে তাঁরা সব সেকালে লিখতেন তার নমুনা দেখানোর জন্য কিছু কিছু তুলে দেই। বেঙ্গলী ৪ঠা নভেম্বর ১৯২৪ সালে আমার চরিত্রাঙ্কনকে "স্প্লেণ্ডিড পোর্টেয়াল" আখ্যা দিয়ে লিখেছেন—

"His interpretation of the old emperor is absolutely tine to life and this must have met a lot of original research and study on the part of that gifted actor. I am certain I cannot be accused of exaggeration when I say that had Shahjehan himself been aliv today, he would have been startled at the wonderful impersonation of Mr. Chowdhury and grave doubts would have assailed him as to his identity. He must have paused to think if he was Shahjehan or Mr. Chowdhury's creation of his real self. Nobody could possibly believe that Mr. Chowdhury was a young man, still on the right side of thirty for his mannerism, his mannerism, his utterances, his gait, his expressions (which spoke louder than any words now) his whole body were than of a man much more advanced in years."

ঐ 'বেঙ্গলী' আবারও লিখছেন ১৫ই নভেম্বর তারিখে আমার সম্বন্ধে

"Was the life-like and never to be forgotten personation of Shahjehan by that gifted and versatile actor."

আরও আছে—

"Beaten all his previous records" —"left no room for improvement."

তারপরে, নির্মলেন্দু-সম্পর্কেও লিখছে—

"With his easy and natural gait of movement and speech was a great success."

২৩শে নভেম্বর "ফরোয়ার্ড" কাগজ বিরাট রিভিউ লিখেছেন। আমার সম্বন্ধে তাঁরা যেসব লিখেছেন, তার থেকে একটা অংশ তুলছি এই জন্য যে, এর মধ্যে অভিনয়ের একটা জায়গাকার একটা বর্ণনাও আছে উৎসুক পাঠকের ভালো লাগতে পারে।

"He gave a new life to this role. When in the pangs of despair at the succession of misfortunes Ahindrababu was snatching the roles off his person, it really reminded us of Lear—"Pray undo this button, Kent !"

ইংলিশম্যান লিখছেন ৬ই ডিসেম্বর আমার সম্বন্ধে—

"Magnificent" "remarkably brilliant and natural." "Danibabu—welldone". Nibhanani's as Mahamaya was superb, Ascharyamayee's Piyara "excellent" etc.

বসুমতী লিখছেন ১৮ই নভেম্বরঃ— 'প্রতিভাবান অভিনেতা অহীন্দ্রনাথ বয়সে নবীন হইয়াও সাজাহান চরিত্রের সার্থকতা যেভাবে রঙ্গমঞ্চে সম্পন্ন করিয়াছেন তাহা বাঙলার রঙ্গমঞ্চে দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সাজাহানের চরিত্রচিত্রের ভাবাভিব্যক্তিতে তিনি যে অসামান্য কৃতিত্ব পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে বস্তুতই মুগ্ধ হইয়াছি। বৃদ্ধ, শীর্ণ, শোকশোকাকীর্ণ সম্রাট সাজাহানের একাধারে স্নেহপ্রবণ অথবা বাদশাহের মর্যাদাগর্ব দীপ্ত হৃদয়ের

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন!
যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দুর করতে পারে একমাত্র
বহু গাছড়া দ্বারা বিশুদ্ধ মতে প্রস্তুত
বাক্‌লা
ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন
ভারত গভঃ রেজিঃ নং ১৬৮৩৪৪
অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা,
মুখে টকভাব, ঢেকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দাগ্নি, বুকজ্বালা, আহারে অরুচি, স্বল্পনিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ন নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যাঁরা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও বাক্‌লা সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিফলে মূল্য ফেরৎ।
৩২ তোলার প্রতি কৌটা ৩ টাকা, একত্রে ৩ কৌটা — ৮॥• আনা। ডাঃ মাঃ ও পাইকারী দর পৃথক।
দি বাক্‌লা ঔষধালয়। হেড অফিস- বরিশাল (পূর্ব্ব পাকিস্তান) ব্রাঞ্চ-১৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ -৭

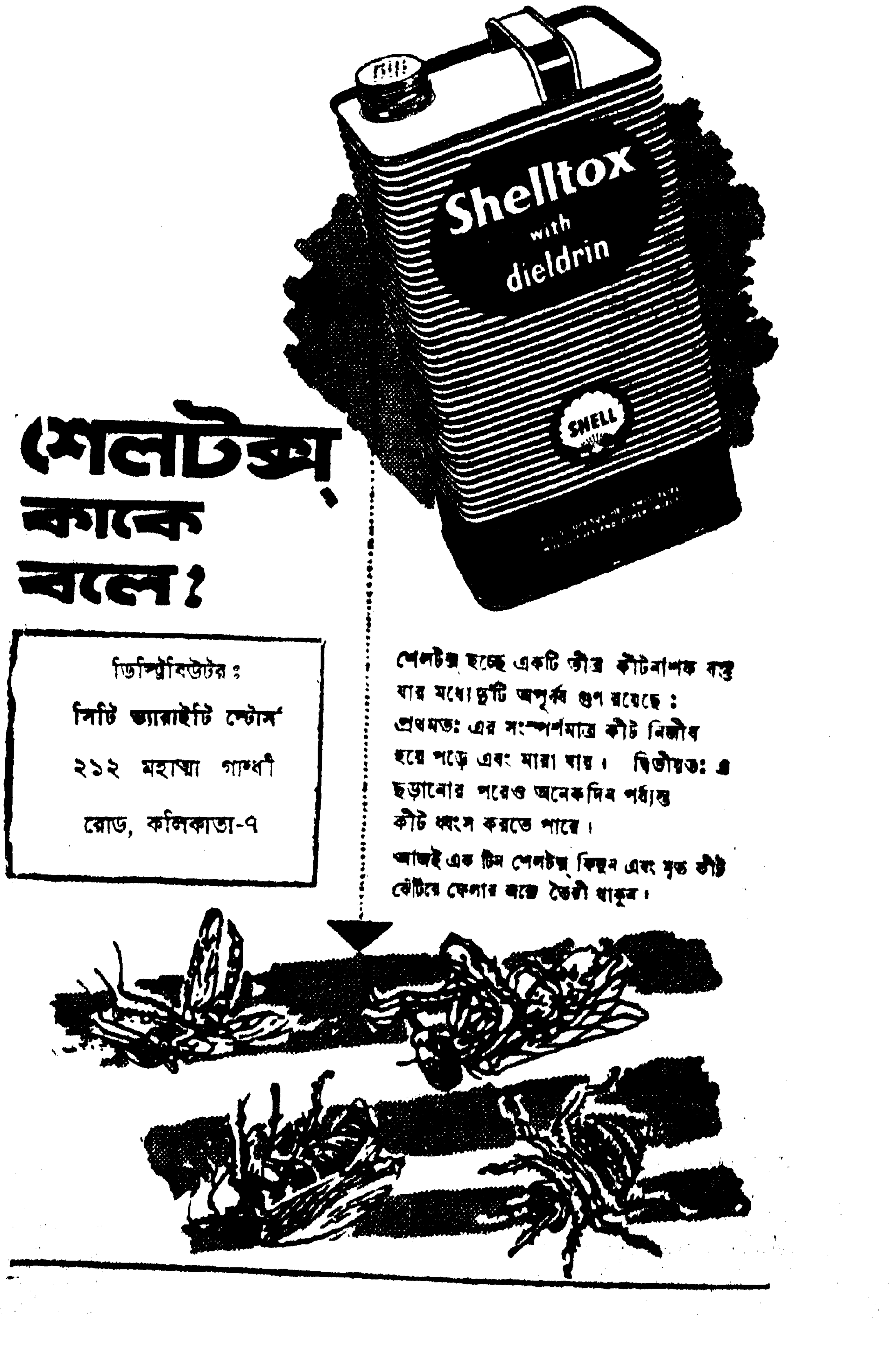

পরস্পরবিরোধী ঘাতপ্রতিঘাত উদগত রস-বৈচিত্র্যের সুনিপুণ সমাবেশে অহীন্দ্রনাথ সাজাহান চরিত্রের অভিনয়ে এক প্রাণোন্মাদকর সম্পূর্ণ অভিনব অবস্থা ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। আশ্চর্য, অপূর্ব সে অভিনয়।'

'শিশির' লিখলেন ১৫ই নভেম্বর:—দানীবাবু সম্বন্ধে:—"ঔরংজীব চরিত্রে অনেকরকম ভাবের সমাবেশ থাকার দরুণ এই অংশের অভিনয়ই দর্শককে আকৃষ্ট করে। একমাত্র দানীবাবুই আজ পর্যন্ত এই উৎকট চরিত্রের অভিনয় করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। দারার মৃত্যুদণ্ডাদেশ স্বাক্ষর করা ও আদেশপত্র জিহনকে দেওয়ার দৃশ্যে যে অভিনয়-নৈপুণ্য দেখিয়াছি, তাহার তুলনা হয় না।"

আমার সম্বন্ধে:—"উত্তম বলিলে সম্পূর্ণ বলা হয় না, অপূর্ব, আশ্চর্য। প্রিয়নাথবাবু 'সাজাহান' চরিত্র অভিনয় করিয়া যশঃলাভ করিয়াছিলেন, সেইটি আজও আমরা ভুলি নাই—কিন্তু এখন যাহা দেখিলাম তাহার তুলনা নাই, একেবারে অতুলনীয়। সাজাহান পঙ্গু, স্থবির, বৃদ্ধ, লোলচর্ম, পলিত কেশ, কিন্তু সাজাহান—সম্রাট—ভারতের ঈশ্বর—এই ভাবটি অহীন্দ্রবাবুর পূর্বে কোনদিনই সাজাহানে ফুটে নাই। অহীন্দ্রবাবু দেখাইয়াছেন, তাঁহার দেহের ডানদিকটা পক্ষাঘাতে পঙ্গু, অচল, স্থির, হৃদয়খানি একদিকে অপত্যস্নেহে ভরপুর, আবার অন্যদিকে অতীত-গৌরবে, সম্রাট-গর্বে ভরিয়া আছে।"

নির্মলেন্দু সম্বন্ধে বলেছেন—"দিলদার চরিত্রের গূঢ় রহস্যটি ধরিতে পারিয়াছেন। দিলদার-অংশের এমন সুন্দর অভিনয় দেখি নাই।"

আত্মসুখ্যাতি প্রসঙ্গত লিখে গেলাম কিছু কিছু, কিন্তু এর একটা কারণ আছে। থিয়েটারে এটাই আমার হলো যাকে বলে—গ্রাজুয়েশন। অর্থাৎ, আমি আজ রঙ্গমঞ্চের বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনয়ে বি এ পাশ করলাম। আমার এই কালটাকে ত বোঝাতে হবে।

'সাজাহান' চরিত্রে আমার কন্‌সেপ্‌শন বা ধারণা যা ছিল, তা এখানে একটু বলি। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাটকে সাজাহানকে যা দেখিয়েছেন, তা সমালোচকের পক্ষে এবং চরিত্রাভিনেতার পক্ষে বিশেষ অনুধাবনযোগ্য বলে আমি মনে করি। সেই যে প্রথম দৃশ্যে, যখন জাহানারা তিরস্কার করে বলছে—পুত্রকে পিতার শাসনও করতে হবে। তখন সাজাহান বললেন—'আমার হৃদয় এক শাসন জানে, সে শুধু স্নেহের শাসন। বেচারী মাতৃহারা পুত্রকন্যারা আমার! তাদের শাসন করব কোন্ প্রাণে জাহানারা?'

তারপর সেই দৃশ্যে, জাহানারা যখন ক্ষোভের সঙ্গে বলছে—উত্তম অভিনয় ঔরংজেব!

তখনো ক্ষমা করেছেন তিনি, বলেছেন—'কথা কস্‌নে জাহানারা। পুত্র আমার পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমাভিক্ষা চাচ্ছে। আমি কি তা না দিয়ে থাকতে পারি?'

আমার কথা হচ্ছে, এই যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মাতৃহারা পুত্রকন্যাদের জন্য সাজাহান-চরিত্রে অনর্গল স্নেহরস বইয়ে দিয়েছেন নাট্যকার, এর স্বরূপটা শিল্প-সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকতার থেকেও অনেক বড়। অপত্য-স্নেহের উৎসারণ তাঁর অন্য বইতেও আছে, কিন্তু এই বইতে যেন নাট্যকার তাঁর হৃদয়-রস নিংড়ে দিয়ে গেছেন। এক-একবার রাগ আসছে, একবার দৃপ্তভাব, একবার দম্ভ, একবার ক্ষেদোক্তি, কত ভাবেরই না আসা-যাওয়া! কিন্তু, তার মনে যখন জেগে ওঠে সুকোমল পুত্রস্নেহ, তখন—দারা-সুজা-ঔরংজেব—যার জন্যই হোক—সে-সব ভাব যেন বন্যার স্রোতের মুখে তৃণের মত ভেসে যায়! এমন কি, দারার যে হত্যাকারী, সেই ঔরংজীবকে যখন ঈষৎ ক্ষোভের সঙ্গে বলতে গেলেন—

—ঔরংজেব!

কিন্তু, পরক্ষণেই, তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে নিজের বুকে তার মাথাটি রেখে অশ্রুভেজা কণ্ঠে বলে উঠলেন—'না-না—সে-সব কথা আমি মনে করব না! মনে করব না! ঔরংজেব, তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করলাম।'

এই যে তাঁর অর্ধোন্মাদ অবস্থা—এই রাগ—এই দম্ভ—এই ক্ষোভ—আবার এই দুর্নিবার স্নেহে ভেসে যাওয়া!—এই-ই ত নাট্যকারের পরিকল্পনা। অবশ্য ঐতিহাসিকেরা তাঁকে অনেকভাবে বর্ণনা করে গেছেন। উদার-সাহসী-বীর-বিদ্রোহী সম্রাট শিল্পী-কবি-প্রেমিক-ইন্দ্রিয় বিলাসী, আবার স্নেহের সাগর! এ যেন মণিমাণিক্যের মত অনেক পল্ তোলা—এক-একরকম আলোর জ্যোতি এক-একসময় ঠিকরে বেরুচ্ছে! বিপরীতধর্মী এক অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব—লাম্পট্য ও প্রেম। তাঁর সম্ভোগের ছবি যা পুরাতন ঐতিহাসিকরা এঁকে গেছেন, তার তুলনা মোগল যুগেও নেই। এক জায়গায় মানুচি লিখেছেন—

"Not satisfied with so many inventions for his inordinate desires he also permitted great liberty to public women, of whom the quate were dancers and singers."

তাঁর সম্বন্ধে অদ্ভুত একটি কাহিনী শোনা যায়। এক উজীর এসে সম্রাটকে একদিন বলছেন—সম্রাট, হারামেই ত রয়েছে বহু সুন্দরীর মেলা, বাজার থেকে আর স্ত্রীলোক নিয়ে আসা কেন, প্রাসাদ-অলিন্দে?

উত্তরে একটু ভেবে সাজাহান বললেন—উজীর, তুমিও যা, তুমি ত খুব বুদ্ধিমানের মত কথা বললেন না। "মিঠাই নেক হর-দুকান কি বেশদ"—মেঠাই মাত্রই ভালো তা সে যে কোনো দোকান থেকেই আনা যাক না কেন!

লজ্জায় উজীরের মাথা হেঁট।

লজ্জায় মাথা হেঁট আমাদেরও, আমরা, যারা সেই সব বিবরণ পড়ছি। ভাবছি—সম্রাটের এ কী রূপ? যিনি তাজমহলের স্বামী, এ কী রূপ তাঁর?

আর, প্রেমিক? তার দৃষ্টান্তও বড় কম নেই। মুসলমান সম্রাট, চারটি বিয়ে করতেও তাঁর পক্ষে আটকাবার কথা নয়। তা' ত তিনি করেন নি! এক মমতাজ ছাড়া দ্বিতীয় পত্নীও তাঁর ছিল না। মমতাজের মৃত্যুর পরও ত দারপরিগ্রহ করেন নি তিনি।

আমার মনে হয়, সাজাহান প্রেমকে অতি পবিত্র স্থান দিয়েছিলেন তাঁর হৃদয়ে।

BUY THE BEST
HIGHLY APPRECIATED
SAMSAD ANGLO-BENGALI DICTIONARY
1672 PAGES • Rs. 12·50 n.p.
SAHITYA SAMSAD
32-A, ACHARYA PRAFULLA CH. RD. • CAL-9

সে যে আলাদা জিনিস, হৃদয়ের কন্দরে মন্দির মধ্যে রাখতে হয় সেই প্রেমকে। আর, অন্য যে-সব ব্যাপার, সে-সব হচ্ছে নিছক দেহের ক্ষুধা—লালসা। দুটির মধ্যে নারীর স্থান রয়েছে বটে, কিন্তু দুইটি ভিন্ন জগতের, নইলে, মমতাজ-স্মৃতি-বিজড়িত তাজমহলের সৃষ্টি হবে কেন? তাজমহল ত এক দাম্ভিক সম্রাটের মদগর্ব ঐশ্বর্যের প্রতীক নয়—তা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস! পূর্ণিমার রাত্রে তাজের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকলে মন যেন মৌন বিস্ময়ে আপনিই এক করুণভাবে ভরে আসে! চোখও আসে সজল হয়ে। ভেবে অবাক হই, এত করুণ রূপ নেয় কেন এই তাজ? তাই ত বলি, হে সম্রাট কবি, তুমি চিরদিনই দুজ্ঞের্য় রয়ে গেলে। ছড়িয়ে রয়েছে তোমার ব্যক্তিত্বের কত না বিভিন্ন রূপ! তোমার যুগেও, কোন্‌টা তোমার যে আসল রূপ, তা কেউ ধরতে পারেনি। আজ তেমনি তিনশ বছর পরে আমরাও পারছি না—তুমি সত্যিই দুজ্ঞের্য়! (ক্রমশ)

জনগণনা ১৯৬১

১০ই ফেব্রুয়ারী—৫ই মার্চ

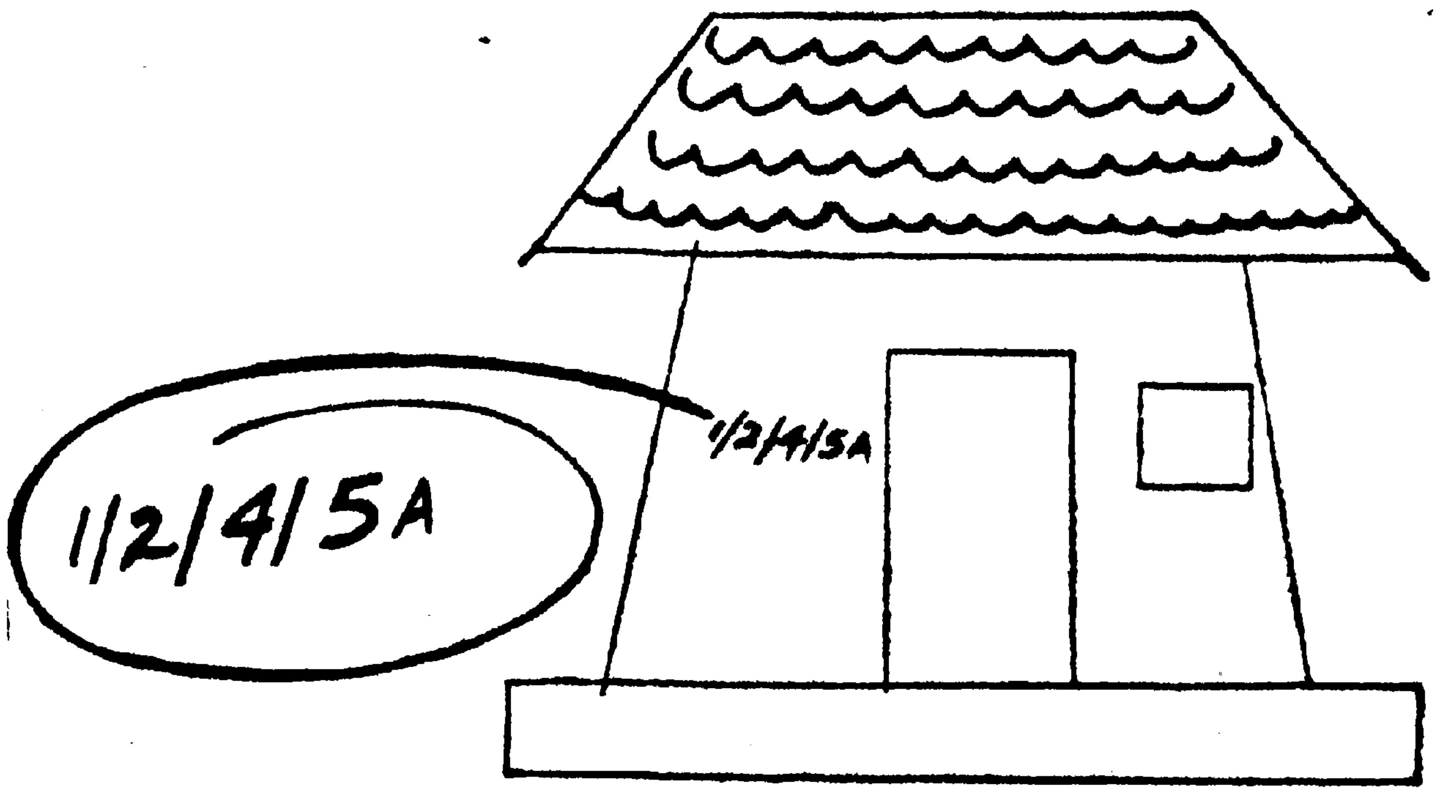

আপনি হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে, আপনার বাড়ীর দরজার পাশে দেওয়ালে, এই রকম একটি সংখ্যা ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে অথবা শিগ্‌গীরই হয়তো এই রকম একটি সংখ্যা দেখতে পাবেন।

আগামী জনগণনায় আপনি এই সংখ্যা দিয়েই চিহ্নিত হবেন এবং আপনাদের গণনা করা হবে। এই সংখ্যাটি হলো আপনার জনগণনার সংখ্যা। এই সংখ্যাটি যাতে অটুট থাকে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখুন এবং জনগণনার কাজে সর্ববিধ উপায়ে সাহায্য করুন।

আপনার প্রদত্ত তথ্যাদি সম্পূর্ণ গোপন থাকবে এবং সেই গোপনীয়তা বিশেষভাবে রক্ষিত হবে।

ভারত সরকার কর্তৃক প্রচারিত।

DA 60|459

বনস্পতি রঙ করার কি দরকার?

কেউ কেউ বলেন যে বনস্পতি রঙ করা উচিত, যাতে ঘিয়ে ভেজাল হিসেবে বনস্পতি ব্যবহার করলে সহজেই তা ধরা যায়।

কিন্তু খাবার জিনিসে মেশাবার মত এমন কোন রঙ নেই যা বনস্পতিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। অবশ্য বনস্পতিতে ৫ শতাংশ তিলের তেল থাকায় ঘিয়ের মধ্যে ৫ শতাংশ বনস্পতি ভেজাল দিলেও একটি সাধারণ রাসায়নিক পরীক্ষায় সহজেই তা ধরা পড়ে।

বনস্পতি ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তার জন্যে

একথা সত্য যে, ঘি ব্যবহারকারীদের স্বার্থরক্ষার জন্যে বনস্পতি রঙ করবার প্রস্তাব করা হচ্ছে, কিন্তু যে-রঙ মেশানো হবে তা যাতে লক্ষ লক্ষ বনস্পতি ব্যবহারকারীর স্বাস্থ্যের অনিষ্ট না করে, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়াও একান্ত প্রয়োজন। যে রঙই মেশানো হোক, তা ১৯৫১ সালে ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত "ঘি অ্যাডালটারেশন কমিটির" মৌলিক শর্তাবলী অনুযায়ী হওয়া চাই। তার প্রধান প্রধান শর্তগুলি হল :

১। "রঙটি বনস্পতিতে সহজেই মিশে যাওয়া দরকার।

২। "বনস্পতিতে মেশানোর পর বনস্পতির যে রঙ হবে তা দেখতে মনোরম হওয়া চাই।

৩। "রঙটি পাকা হবে এবং রাসায়নিক বা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় যেন সহজে পৃথক করা না যায়।

৪। "উত্তাপে যেন রঙের পরিবর্তন না হয় এবং রান্নার তাপেও (প্রায় ২০০° সেঃ) নষ্ট না হয়।

৫। "দীর্ঘদিন ব্যবহারেও রঙের দরুণ যেন বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া না জন্মায় কিংবা অনিষ্ট না হয়।" *

খাবার জিনিসে সাধারণতঃ যে সব রঙ ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে কোন রঙই এই সমস্ত শর্ত পূর্ণ করে না। সেগুলি হয় বনস্পতিতে মেশে না অথবা সহজেই বনস্পতি থেকে পৃথক করা যায়। পাকা সিন্থেটিক রঙে বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় কিংবা ক্যান্সার রোগ জন্মায়। সুতরাং বনস্পতিতে মেশাবার উপযুক্ত রঙ এখনো পাওয়া যায়নি।

জগতের বৈজ্ঞানিকদের দৃঢ় অভিমত এই যে, খাদ্য কিংবা পানীয় জিনিসে রঙ মেশানো উচিত নয়। কারণ, বহু বছর নির্দোষ ব'লে ব্যবহৃত অনেক রঙ পরে ক্যান্সার রোগের সৃষ্টি করে ব'লে প্রমাণ পাওয়া গেছে। সব উন্নত দেশেই খাদ্য ও পানীয়ে মেশাবার উপযুক্ত রঙের সংখ্যা ক্রমে কমিয়ে আনা হচ্ছে।

ঘিয়ে ভেজালের সমস্যা

যতদিন ঘিয়ে ভেজাল দেবার জন্যে কাঁচা বা পরিশোধিত তেল, জান্তব চর্বি ইত্যাদি জিনিষ সহজেই পাওয়া যাবে ততদিন কেবল বনস্পতি রঙ ক'রে ঘিয়ে ভেজাল বন্ধ করবার আশা বৃথা।

ঘিয়ে ভেজালের সমস্যা এদেশে খাদ্যে ভেজাল দেবার বিরাট সমস্যার একটা অংশ মাত্র। ১৯৫৪ সালের "খাদ্য ভেজাল নিরোধ আইন" এবং তার অন্তর্গত নিয়মাবলী খাদ্যে ভেজাল নিবারণের উদ্দেশ্যে রচিত। এই আইন যত কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করা হবে ততই খাদ্যে ভেজাল নিবারণের চেষ্টা সার্থক হবে। তাছাড়া, বনস্পতির মত ঘি-ও কেবলমাত্র সীলমোহর করা টিনে বিক্রি করা হলে এই চেষ্টা আরো সফল হবে।

বনস্পতি ব্যবহারকারীদের প্রতি আশ্বাস

বনস্পতি প্রস্তুতকারীদের কাছে এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে ঘিয়ে ভেজাল দিয়ে বনস্পতির অপব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথা তাঁরা জোর দিয়ে বলতে চান যে বনস্পতি সম্বন্ধে কোন পরিবর্তন করা হলে বনস্পতি ব্যবহারকারীদের হিতের দিকে লক্ষ্য রেখেই যেন তা করা হয়।

বনস্পতি প্রস্তুতকারীরা বনস্পতি ব্যবহারকারীদের এই আশ্বাস দিচ্ছেন যে বিশুদ্ধতা ও পুষ্টিকারিতার সর্বোচ্চ মান অনুসারেই বরাবর বনস্পতি তৈরী করা হবে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন :

দি বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া.

ইণ্ডিয়া হাউস, কোর্ট স্ট্রীট, বোম্বাই-১

TVMA 940

ট্রামে-বাসে

পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী সর্দার প্রতাপসিং কাইরনের বিরুদ্ধে একটি নূতন চার্জশীট শ্রী নেহরুর নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল। প্রধান মন্ত্রী তাঁর এক বিবৃতিতে

বলেন যে, চার্জশীটের কথা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এই স্মৃতি-বিভ্রমের জন্য নেহরুজী দুঃখ প্রকাশ করেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"স্মৃতি তাঁর বর্তমানে শিথিল হয়ে গেছে, এ-পরিচয় আমরা অনেক ক্ষেত্রেই পাচ্ছি। কিন্তু দুঃখ করে লাভ কী। জানি, অতীত দিনের স্মৃতি কেউ ভোলে না, কেউ ভোলে!!"

শ্রী চালিহা বিধান সভায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, আসাম হাঙ্গামা পূর্ব-পরিকল্পিত নয়। "না, ওটা হঠাৎ গাওয়া গানের মত এল প্রাণের দ্বারে"—গানেই মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

আয়কর বিভাগ জানাইতেছেন যে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আয়কর নির্ধারণ ব্যাপারে একটি সহজ কর্মপদ্ধতি রচনা করা হইয়াছে। —"ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা আয়কর ফাঁকির কঠিন কর্মপদ্ধতি রচনা না করলেই বাঁচোয়া"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

গ্রাম প্রসঙ্গেই শ্যামলাল রহস্য করিয়া বলিল—"এবারে গ্রামের উন্নতি না হয়ে যায় না। মেট্রিক ওজনে সবাই শুধু গ্রামের কথা—সেন্টিগ্রাম, ডেসিগ্রাম, গ্রাম, ডেকাগ্রাম, হেক্টোগ্রাম, কিলোগ্রাম—একবারে গ্রামে গ্রামে ছয়লাপ!"

কোন একটি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের এক সম্মেলনে খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন মহাশয় ম্যানেজারের ভূমিকা সম্বন্ধে একটি ভাষণ দান করিয়াছেন। —"ভাষণটি মন্ত্রীর ভূমিকা সম্বন্ধে হলেই জনসাধারণ বিশেষ জ্ঞানলাভ করে উপকৃত হতেন"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খাঁ কাশ্মীর সমস্যাটিকে একটি "টাইম বম"-এর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। বলিয়াছেন, বোমাটি ফাটিল বলিয়া। —"কিন্তু টাইমটা ভারতীয় স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম না পাকিস্তানী টাইম, সে সম্বন্ধে কোন কথা বলা হয়নি" —বলেন বিশু খুড়ো।

একটি সংবাদে জানিলাম, দন্ত চিকিৎসকদিগকে গ্রামাঞ্চলে কাজ করার আহ্বান করা হইয়াছে। —"চিকিৎসকগণ যদি গ্রামাঞ্চলকে শহুরে দেঁতো হাসির সংক্রমণ থেকে রক্ষা করেন, তা হলে

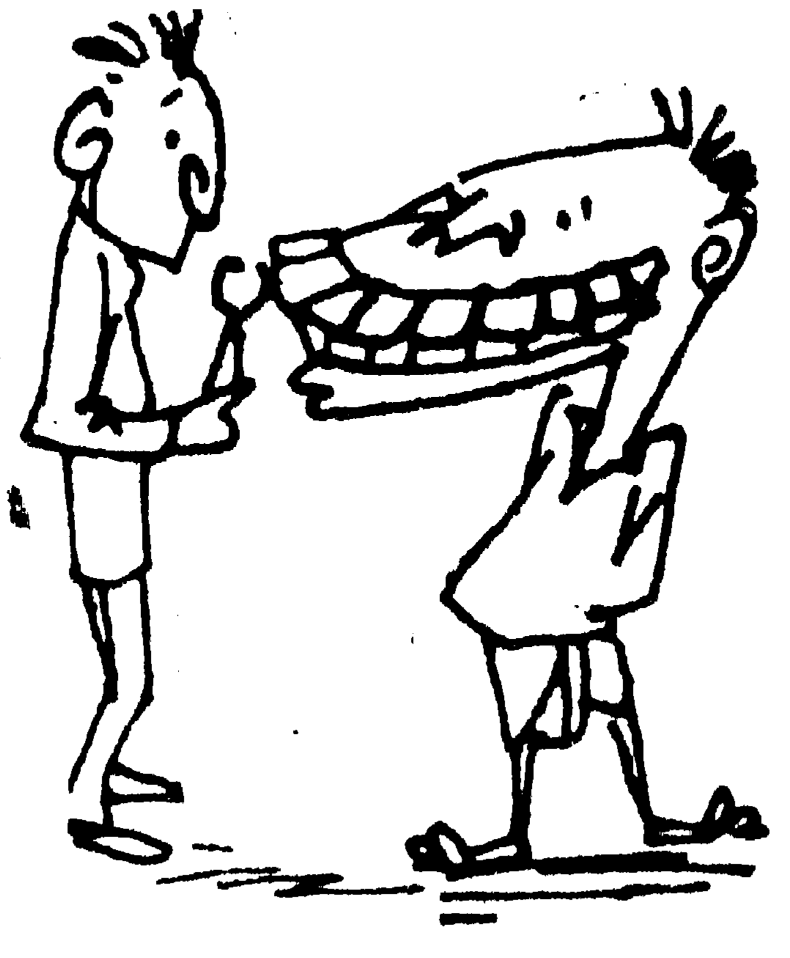

গ্রামবাসী নিঃসন্দেহে উপকৃত হবে"—মন্তব্য করেন অন্য এক সহযাত্রী।

'স্টেটসম্যান' কাগজ "নামে কি আসে যায়" প্রবন্ধে কলিকাতার অনেক রাস্তাঘাটের নামকরণের ইতিহাস লিখিয়াছেন; লিখিতে পারেন নাই শুধু "চোরবাগানের" ইতিহাস। —"ঠগ বাছতে গাঁ উজোড় হয়ে যাবে বলে চোরবাগানের ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা কেউ কোনদিন করেন নি"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ সাহেব তাঁর স্বদেশবাসীকে শির এবং দিল-এর সবকিছু দিয়া পাকিস্তানের উন্নতিতে সাহায্য করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"শির সম্বন্ধে কিছু বলবার নেই। কিন্তু আমাদের মনে হয়, দিলটাকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রসারিত করে রাখাই ভালো, কে জানে কবে কোন্ বিবিজান চলে জান লবেজান করি!!"

লণ্ডনের জনৈক চিকিৎসক ছিমছাম থাকিবার জন্য নাকি একটি নূতন ভেষজ আবিষ্কার করিয়াছেন। ভেষজটির

নাম — টাইমথাইলপেন্ট্যাডিসাইলসোনিয়াম। আমাদের শ্যামলাল বলিল—"এতে মেদ-বাহুল্য বর্জন হয়ত সম্ভব হবে কিন্তু নাম বলতে গিয়ে দন্তরোগের প্রাবল্য হতে বাধ্য।"

কলিকাতায় ঘোড়দৌড়ের মরসুম সমাসন্ন। এই প্রসঙ্গে শুনিলাম, গ্রীষ্মাবাস হইতে কলিকাতা ফিরিবার পথে কয়েকটি ঘোড়া "ট্রেন ফিভার" নামক রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা গিয়াছে। —"মানুষ আর মালের গাদাগাদিতে ট্রেন-ভ্রমণের নামেই সাধারণ মানুষের গায়ে জ্বর আসত; কিন্তু ঘোড়ার ট্রেন জ্বরের কথা এই প্রথম শুনলাম"—মন্তব্য করেন অন্য এক সহযাত্রী।

একটি সংবাদে শুনিলাম, কলিকাতা শহরে জল সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে। —"কিন্তু ভয় কি, মন্বন্তরে মরিনি আমরা মারি নিয়ে ঘর করি"—মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

শ্রী নেহরু বলিয়াছেন, ভারতে একটিও অনাথ নাই; সকলের জন্যই রহিয়াছেন ভারতমাতা। বিশু খুড়ো বলিলেন—"কিন্তু যে মায়ের ছেঁড়া কাঁথাতে তাঁর সন্তানেরা পরম নিশ্চিন্তে ঘিরে বসত, তাঁর ধবধবে নরম বিছানা দেখে ছেলেরা ঘাবড়ে গেছে, হকচাকিয়ে গেছে সে বিছানা নিয়ে ভি আই পি ছেলেদের কামড়া-কামড়িতে!!"

সৃষ্টির আদিকালে রাতের আবির্ভাব মানুষের কাছে ভয়াবহ ছিল। অন্ধকার ঘনিয়ে এলেই নিশাচর জন্তুদের খপ্পর থেকে বাঁচতে গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিতো। আগুনের আবিষ্কার রাতের ভয় কাটাতে মানুষের প্রথম পদক্ষেপ। আগুন মানুষকে রন্ধনের তাপ এবং সাধারণ ধাতব অস্ত্র ও হাতিয়ার তৈরীতে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। সেই সংগে আগুনের শিখা তাকে আলোও দিতে থাকে।

অতঃপর আদিমানুষ আগুনে মাংস ঝলসে নিতে চর্বি গলে গলে পড়ে হলদে শিখা উৎপন্ন হওয়াটা তার দৃষ্টিতে পড়ে। এই থেকেই চর্বি জড়ো করে আলোর ব্যবস্থা করার উপায়ের উদ্ভাবন হয়। আদিকালের বাতি ছিল চর্বিভরা পাত্রে এক টুকরো কাঠ বা তন্তু ভাসিয়ে বাতির ব্যবস্থা করা। প্রস্তরযুগের যে সব সামগ্রী আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে পাথর খোদাই করা প্রদীপ পাওয়া গিয়েছে। সামুদ্রিক শামুকের খোলাও প্রদীপ হিসেবে বহুদেশে ব্যবহৃত হতো। চার হাজার বৎসর পূর্বে মেসোপটেমিয়ায় সামুদ্রিক শামুকের খোলার প্রদীপ ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়।

কালক্রমে এই সাধারণ প্রদীপটির অনেক উন্নতি হয়। আগে প্রদীপে চর্বি ফেলে তাতে কাঠের সলতে ভাসিয়ে রেখে জ্বালানো হতো, পরে তন্তুর সলতে আটকে রাখার ব্যবস্থা হয়। তৈলাক্ত পদার্থটি ঢাকা দিয়ে একটি ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে সলতেটা বার করে জ্বালানোর ব্যবস্থাও হয়। পরে সলতেটা বাড়ানো ও কমানোর কল উদ্ভাবিত হয় এবং জ্বলন্ত তেলে অধিকতর বাতাস খেলার সুযোগ করে দেবার মতো করে প্রদীপের আকৃতি গড়ে নেওয়া হয়। এইসব উন্নতিকরণ সত্ত্বেও আজ যে প্রদীপ ব্যবহৃত হয় খৃষ্ট পূর্ব আড়াই হাজার বছর আগেকার প্রদীপের সংগে তার বিশেষ পার্থক্য নেই।

একশ বছর আগেও প্রদীপের জন্য ব্যবহারযোগ্য তেল আসতো জন্তুদের চর্বি আর উদ্ভিদ থেকে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে খনিজ তেলের উৎপত্তি হতে থাকে। পেট্রোলিয়াম থেকে চোলাই করে উৎপাদিত প্যারাফিন বাতি জ্বালানোর উপাদান হয়ে ওঠে। জন্তু ও উদ্ভিদজাত চর্বির অধিকাংশ তরল হলেও কঠিন চর্বিও আছে। এই চর্বি বহু সহস্র বৎসর ধরে লম্ফ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। এ থেকে মোমবাতির মতো বাতিও তৈরী হয়েছে।

গোড়ার আমলে এইসব তৈরী হতো গলানো চর্বিতে তন্তু ডুবিয়ে তাকে পাকিয়ে নিয়ে। এককালে ইওরোপে নলখাগড়ার বাতি খুবই প্রচলিত ছিল। নলখাগড়ার উপরের আবরণ ছাড়িয়ে শুধু মজ্জাটা রেখে গলিত চর্বিতে ডুবিয়ে নেওয়া হতো। এই বাতি তৈরী সহজও ছিল, সস্তাও ছিল। দু ফিট লম্বা নলখাগড়ার এই বাতি এক ঘণ্টারও বেশীক্ষণ জ্বলতো এবং খরচ পড়তো এখনকার হিসেবে এক নয়াপয়সা।

মোমবাতি এর চেয়ে সুষ্ঠু এবং ব্যয় সাপেক্ষ ছিল। মোমবাতি তৈরী করতে গলিত চর্বিতে তন্তুর সলতে ডুবিয়ে সেটা ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত হলে আবার তাকে চর্বিতে ডুবিয়ে নিতে হতো। মধ্য যুগে এই বাতি তৈরী অত্যন্ত সম্মানিত কাজ বলে পরিগণিত হতো। আধুনিককালের মোমবাতি তৈরী হয় যন্ত্রের সাহায্যে এবং বৈদ্যুতিক বাল্বের মতো খুঁটিনাটি ব্যাপারেও ইঞ্জিনীয়ারের দক্ষতার প্রয়োজন হয়।

এলিজাবেথের আমলে বাতির তদারক করার জন্য নিযুক্ত থাকতো—এদেশে যাকে মশালচি বলা হয়। আধ ঘণ্টা অন্তর তারা ঘুরে ঘুরে দেখতো বাতিগুলি ঠিকমতে জ্বলছে কিনা। কোনটা নিভে গেলে তার পলতেটা ছেঁটে দিতো। আজকালকার মোমবাতিতে পলতে এমনভাবে থাকে যে জ্বলতে জ্বলতে আপনা থেকেই পুড়ে যাওয়া অংশ নষ্ট হয়ে পড়ে যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে শিল্পগত বিপ্লব বেশ পূর্ণতা লাভ করে। কলকারখানায় কয়লার প্রয়োজনীয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাতির ক্ষেত্রে কয়লা সরাসরি কাজে লাগেনা। কিন্তু দেখা যায় যে বদ্ধ আধারে কয়লা উত্তপ্ত করলে একটা দাহ্য গ্যাসের সৃষ্টি হয়। এই গ্যাসটা বাইরের হাওয়ায় জ্বালালে একটা জ্বলন্ত শিখার সৃষ্টি করে এবং এটাকে বাতি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। উইলিয়াম মার্ডক নামক ইংলণ্ডের এক ইঞ্জিনীয়ার কয়লার গ্যাস নিয়ে প্রথম পরীক্ষা করেন। ১৮০২ সালে তিনি এতটা সাফল্য অর্জন করেন যে তার কর্মস্থল বার্মিংহামের বোল্টন এণ্ড ওয়াট কোম্পানীর বাইরের চত্বরটা সম্পূর্ণ আলোকিত করে তোলার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হন। এক বছর পর উক্ত প্রতিষ্ঠানের বাড়ির ভিতরাংশও আলোকিত করে তোলার ব্যবস্থা করেন।

সেই বছরই লণ্ডনের লাইসিয়াম থিয়েটার গ্যাসের আলোয় প্রজ্জ্বলিত হয়। ১৮০৬ সালে মার্ডক একটা সুতোর কলে গ্যাসের আলোর ব্যবস্থা করে দেন। ১৮০৯ সালের মধ্যে লণ্ডনের পেল মেল অঞ্চলটি সম্পূর্ণভাবে গ্যাসের আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে।

ক্রমে গৃহস্থের বাড়িতে এবং কলকারখনায় গ্যাসের আলো ছড়িয়ে পড়ে। তবে বর্তমানের তুলনায় তখনকার গ্যাসের আলো যথেস্ট অনুজ্জ্বল ও অনিশ্চিত ছিল।

১৮৫৫ সালে জার্মান রাসায়নিক বুনসেন গ্যাস বার্ণারের উদ্ভাবন করেন যা আজো রাসায়নিক লেবরেটরিতে ব্যবহৃত হয়। তাঁর এই আবিষ্কারে গ্যাস আগের চেয়ে ভালোভাবে প্রজ্জ্বলিত হলেও আলোর উৎপাদনে মোটেই সহায়ক হতে পারেনি। ত্রিশ-চল্লিশ বছর পর অটো ভন ওয়েলসবাক গ্যাসের জালি আবিষ্কার করেন। তুলোর সুতোয় থোরিয়া ও সেরিয়া নামক দুই বিশেষ খনিজ পদার্থ লাগিয়ে আলোর এই ঢাকনা তৈরী হয়। গ্যাসের উত্তপ্ত শিখায় এটি লাগালে সুতো পুড়ে গিয়ে এই খনিজ পদার্থের একটা জাল থেকে যায়। গ্যাসের মাত্রা বাড়িয়ে তাপ বেশী করলে এই খনিজ পদার্থ জ্বলে উঠে স্থিরভাবে আলো জ্বালিয়ে যায়। পাইপে প্রবাহিত গ্যাসের সাহায্যে আলোক উৎপাদন ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ার প্রায় একই সময়ে কৃত্রিম আলোর সৃষ্টি করতে আর একটি উপায়ও উদ্ভাবিত হয়।

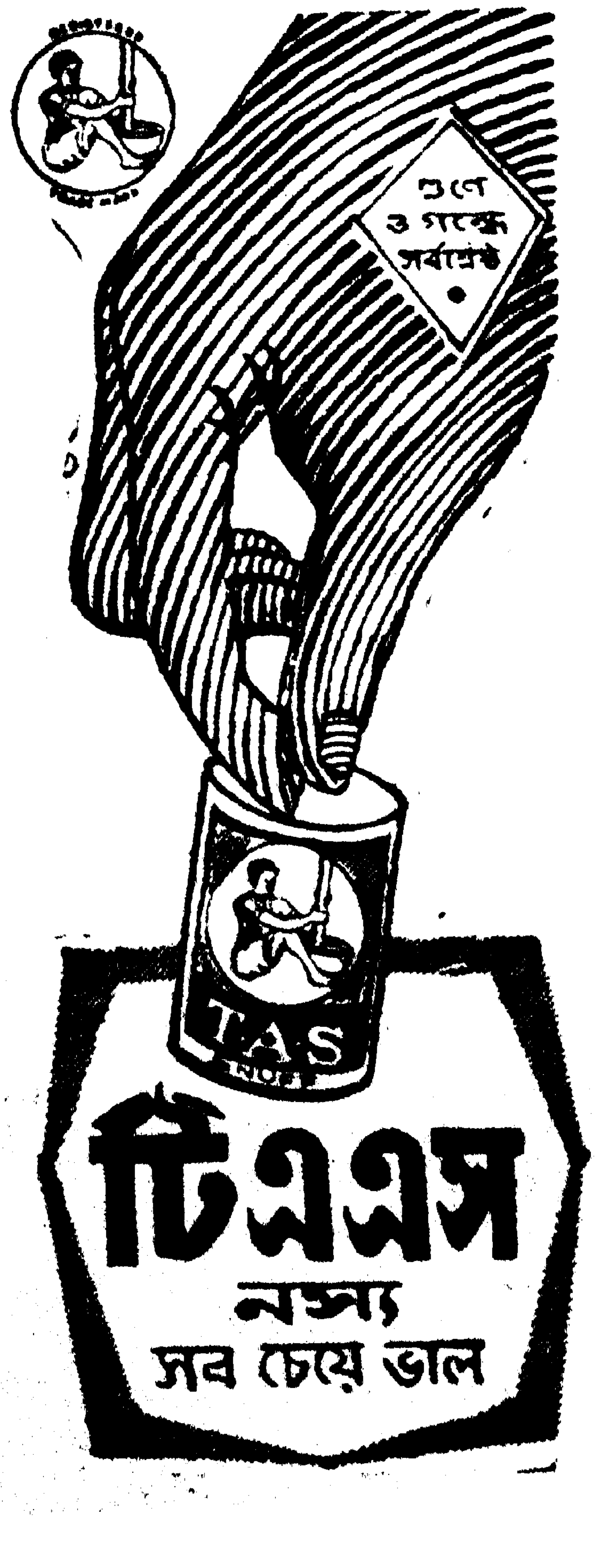

(১)

(২)

(৩)

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশন সম্প্রতি "অন্যান্য গ্রহের বুদ্ধিমানদের কাছ থেকে সংকেত লাভে মানুষের প্রথম নিয়মানুগ অন্বেষণ" কার্যে ব্রতী হয়। বিশেষ বেতার যন্ত্র ব্যবহার করে টওসেতি ও এপসিলন এরিডানি তারকার সংগে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা হয়—এই দুটি গ্রহেই পৃথিবীর অনুরূপ উপাদান আছে বলে বিশ্বাস করা হয়। ২। বজ্র নানা রঙের হতে পারে। সাধারণত শাদা রঙ যেটা দেখা যায় তার সৃষ্টি হয় অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন হেতু। জলীয় বাষ্প উপস্থিত থাকলে হাইড্রোজেন যোগ করে বলে রঙটি রক্তাভ হয়। ধূলিময় আবহাওয়া হলদে ও লাল আভার সৃষ্টি করে। বেগুনে ও সবুজ আভাও দেখা যায় তবে সেটা অত্যন্ত দুর্লভ। ৩। মাছের পেশী থেকে প্রভূত প্রোটিনযুক্ত চর্বিবিহীন "ময়দা" কানাডার দুজন গবেষক উদ্ভাবিত করতে সক্ষম হয়েছেন। কম প্রোটিনযুক্ত খাদ্যের পরিবর্তে এই ময়দা দেহ গঠনে সহায়ক হবে। এই ময়দা তৈরী হয় কড মাছের পেশী থেকে যা পৃথিবীর বহু মহাসাগরে পাওয়া যায়।

১৮১০ সালে সার হামফ্রি ডেভী দেখান কিভাবে বিদ্যুৎ দুটি কার্বন রডের মাঝের ফাঁক পূর্ণ করে একটি অবিচ্ছিন্ন স্ফুলিংগ বা "আর্ক" সৃষ্টি করে আলো বিকীর্ণ করে। কিন্তু তখনও মাইকেল ফ্যারাডে ডাইনামো তৈরী করে না ওঠায় অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ প্রবাহ সরবরাহের কোন উপযুক্ত উপায় ছিলনা। ১৮৩০ সালের পর ডাইনামো তৈরী হতে বৈদ্যুতিক আলোর যুগ এসে যায়। ১৮৪৬ সালে প্যারিস অপেরা হাউস বৈদ্যুতিক আর্কের সাহায্যে আলোকিত করার ব্যবস্থা হয়। অল্পকালের মধ্যেই বড় বড় রাস্তা এবং অট্টালিকাগুলিতেও আর্ক প্রবর্তিত হয়।

আধুনিক আর্কের আলোতে বৈদ্যুতিক স্ফুলিংগই জ্যোতির উৎস। গত শতাব্দীতে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যাপক বিস্তার সম্ভব হতে পেরেছে ফিলামেণ্ট বাতির উদ্ভাবনে। ধাতব তারের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ যখন প্রবাহিত হয় তখন তাতে ধাতু যে প্রতিরোধের সৃষ্টি করে সেটা দূর করার দরকার হয়। বৈদ্যুতিক শক্তিকে তাপে পরিবর্তিত করা হয় এবং তাতেই তারের উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। প্রতিরোধ যথেষ্ট বেশী মাত্রায় হলে তারটি জ্বলতে থাকে।

ফিলামেণ্ট বাতির মূলতত্ত্ব এমন সহজ হলেও সাধারণের ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠতে বহু বৎসর লেগে যায়। কারণ সন্তোষজনকভাবে আলোকপাত করতে ফিলামেণ্টগুলি অতি সূক্ষ্ম হওয়া দরকার। তাছাড়া এমনভাবে তৈরী হওয়া দরকার যাতে জ্বলেও সেটা পুড়ে না যায়। গ্রোভ তার প্লাটিনাম ফিলামেণ্ট বাতি তৈরী করার পাঁচ বছর পর যুক্তরাষ্ট্রে সিনসিনাটির উদ্ভাবক স্টার এমন একটি বৈদ্যুতিক ফিলামেণ্ট বাতি তৈরী করতে সক্ষম হন যাতে এই অসুবিধা দূরীভূত হয়। কার্বন ফিলামেণ্টকে পাতলা কাচের বালবে ভরে তার মধ্যে থেকে তিনি হাওয়া বের করে দেবার ব্যবস্থা করেন। ফিলামেণ্টের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে সেগুলি জ্বলে ওঠে এবং ভিতরে অক্সিজেন না থাকায় পুড়ে যাওয়া থেকে রেহাই পায়। ১৮৭৮ সালের মধ্যে যোশেফ সোয়ান কার্বন ফিলামেণ্ট বাতি বাজারে বের করতে সক্ষম হন। এর পর বৎসরই আমেরিকায় এডিসন অনুরূপ বাতি তৈরী করেন।

এখন বৈদ্যুতিক বাতির বালব সুবৃহৎ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে প্রস্তুত হয় এবং প্রতিদিনের উৎপাদন লক্ষাধিক সংখ্যায় পৌঁছয়। মানুষের কেশের অর্ধেক ঘন তার থেকে প্রস্তুত ফিলামেণ্ট এমন নিখুঁতভাবে তৈরী হয় যে তাদের পরস্পরের ঘনত্ব তারের ব্যাসের চাল্লিশ ভাগের এক ভাগের বেশী তফাৎ হয় না। আলোক উৎপাদনে বৈদ্যুতিক শক্তি নিয়োগের এই বিস্ময়কর উন্নতি সত্বেও নিছক যোগ্যতার দিক থেকে গর্ব করার তেমন কারণ নেই। আধুনিক গ্যাসভরা বালব মাত্র শতকরা একভাগ বিদ্যুৎকে কাজে লাগাতে পারে।

বছর কতক হলো একটি নতুন ধরণের বাতি বের হয়েছে যাতে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ অধিকতর মাত্রায় কাজে লাগে। এই ধরণের 'ডিসচার্জ' বাতি পুরাতন 'আর্ক' বাতিরই বংশধর। হক্সবী নামক এক ইংরাজ বৈজ্ঞানিক ১৭১৫ সালে রয়াল সোসাইটির সমক্ষে এক পরীক্ষা পরিচালনা করেন—একটি টিউব থেকে বায়ু নির্গত করে তার মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে দেওয়া হয়। বিদ্যুৎ প্রবাহকালে সেটি উজ্জ্বল হয়ে আলোক বিকীর্ণ করতে থাকে। প্রায় দু-শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে যায় আলোক উৎপাদনের এই পদ্ধতিটি দৈনন্দিন ব্যবহারে নিয়োজিত হয়ে উঠতে। আধুনিক 'ডিসচার্জ' বাতির এই হলো ভিত্তি।

আজকালকার বাতিতে নানাভাবে গ্যাসের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ ক্ষরণ দ্বারা আলোক উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে। সোডিয়াম রশ্মি সুস্পষ্ট আলোকে পরিণত হয়। বিভিন্ন হলদেটে আলো ইংলণ্ডের রাস্তায় আলোকপাতে নিয়োজিত রয়েছে। মার্কারি বাষ্প নীলাভ আলো বিকীর্ণ করে। ডিসচার্জ টিউবের ভিতরটায় আলোকবাহি পদার্থ মাখানো থাকায় উদ্গারিত অল্ট্রা-ভায়োলেট সুস্পষ্ট আলোকে পরিণত হয়। বিভিন্ন আলোকবাহি পদার্থের ব্যবহারে আলোর রঙ ভিন্ন ভিন্ন করে নেওয়া যায়।

ফিলামেণ্ট বালব যে পরিমাণ বিদ্যুৎ কাজে লাগায় তার এক-তৃতীয়াংশ দিয়ে ফ্লুয়োরেসেণ্ট বাতি একই মাত্রায় আলো দিতে পারে। টিউব-ল্যাম্প ফিলামেণ্ট বালবের চেয়ে তিনগুণ বেশী টিকে থাকে। এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে অনতিকাল মধ্যেই সারা পৃথিবীতে টিউব-ল্যাম্প ফিলামেণ্ট বালবকে স্থানচ্যুত করে দেবে।

গ্রন্থ পরিচয়

উপন্যাস

যোগভ্রষ্ট—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—৫৲ টাকা।

প্রচণ্ড প্রাণের অধিকারী হয়ে উজ্জ্বল সম্ভাবনা নিয়েও একটি মানুষ কেমন করে চরম ব্যর্থতায় নিঃশেষিত হয়ে যেতে পারে তারই নিদর্শন তারাশংকরের গভীর সুরের উপন্যাস যোগভ্রষ্ট। সুদর্শন সাধারণের থেকে সুস্পষ্ট এক ব্যতিক্রম সেই ছোটবেলা থেকেই। তাকে ঘিরে কত হিংসা, উত্তেজনা আর হাসিঠাট্টা তার সহপাঠীমহলে। কিন্তু কিছুতেই তাকে বিচলিত করতে পারে না। জীবন সম্বন্ধে, জীবনের পরিণতি সম্বন্ধে, তার অনন্ত জিজ্ঞাসা। সে-জিজ্ঞাসার প্রত্যক্ষ মীমাংসা পাওয়ার জন্য ব্যবহারিক জীবনের সমস্ত প্রলোভনকে মুহূর্তে ত্যাগ করে অনির্দেশ্য পথে বেরিয়ে পড়তে তার সাধনা। এবং সেই, বিবাগী জীবনেই আসে যত বন্ধন। কিন্তু তখনই আত্মদর্শনে ধরা পড়ে তার দ্বৈত সত্তা। একদিকে সংসার জীবনের প্রতি আগ্রহ, অন্যদিকে প্রাণের ভিতরে অজানাকে জানবার অনন্ত উৎসাহ। এই দোটানায় সুদর্শন সহজ পথ হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়। হয় এইজন্য যে, সহজ পথ তার জন্য নয়, আর বোধ হয় নিয়তি-নির্দেশও। নামতে থাকে সুদর্শন ধাপে ধাপে একেবারে অধঃপতনের শেষ সীমায়, আর আমরা তাকে দাঁড়াতে দেখি নরহত্যার অপরাধে অপরাধী হয়ে আসামীর কাঠগড়ায়।

তারাশংকর বিচিত্র জীবনকাহিনী বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত, এ-খবর আজ আর বাংলাদেশের পাঠকদের কাছে নতুন করে দেবার নেই। কিন্তু সুদর্শন অসম্ভব রকমের বিচিত্র। কিন্তু কাহিনী অসম্ভব ঘটনায় খেই হারায়নি। এবং সুদর্শনকেও অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না এইজন্য যে, শেষ দিন পর্যন্ত আত্মবিশ্বাসে সে দৃপ্ত। চরিত্রের এই দৃঢ়তা কোনো অঘটনেই বিচলিত হয়নি। তাই জগতের মঙ্গলের ইশারাকে ঠিক ঠিক চিনতে ক্ষণিকের জন্যও ভুল করে না সুদর্শন, যদিও তখন আর তার ফেরার সময় নেই।

অনেক ঘটনার বিচিত্র সমাবেশ, প্রচুর চরিত্রের আমদানী ঘটেছে এ উপন্যাসে। আবার সে-ঘটনা, সে-চরিত্র বৈশিষ্ট্যে একে অন্যের সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এমন কি বিপরীতও। কিন্তু লেখক অনন্য কৌশলে একটি স্থির লক্ষ্যের দিকে তাঁর সমস্ত ঘটনা ও চরিত্রকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। পাঠককে একটিবারের জন্য থমকে দাঁড়াতে হয় না। গভীর চিন্তাকে এমন ঘটনাবহুল উপন্যাসের মধ্যে গ্রথিত করার নিদর্শন যে আমাদের সাহিত্যে, বিশেষ করে আধুনিক কালে, বেশী নেই, তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। ৩।০।৬০

বিদূষক—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। লিপিকা, এণ্টালিবাগান লেন, কলিকাতা—৯। ২.৫০ নঃ পঃ।

'বিদূষক' একটি নাতিদীর্ঘ উপন্যাস, তবে হাসির উপন্যাস নয়। সমাজ-জীবনে

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা

॥ পত্রধারা ॥

ছিন্নপত্রাবলী

ছিন্নপত্র গ্রন্থে ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাদেবীকে লেখা ১৪৫টি পত্রের সারসংকলন করা হয় ১৩১৯ সনে। বর্তমান গ্রন্থে ইন্দিরাদেবীকে লেখা কবির আরও ১০৭টি পত্র সংকলিত। পূর্বোক্ত 'ছিন্ন পত্র'-সমূহেরও পূর্ণতর পাঠ এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে।

একাধারে কবি রবীন্দ্রনাথ ও ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের এমন অকৃত্রিম অন্তরঙ্গ পরিচয় আর কোথাও পাওয়া যায় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

গগনেন্দ্রনাথ-অঙ্কিত একখানি ত্রিবর্ণ ও অন্যান্য একবর্ণ চিত্রে অলংকৃত।

॥ বিশ্বযাত্রী রবীন্দ্রনাথ ॥

য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়েরি

১২৯৮ ও ১৩০০ বঙ্গাব্দে যথাক্রমে ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। কবিকর্তৃক সম্পাদিত পরবর্তী পাঠ রবীন্দ্র-রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডে বিচ্ছিন্নভাবে সংকলিত থাকিলেও এই দুই-খণ্ড গ্রন্থের যথাযথ পুনর্মুদ্রণ ইতিপূর্বে হয় নাই। বর্তমান সংস্করণে দুই খণ্ড একত্র গ্রথিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, 'ডায়ারি'র প্রাথমিক খসড়াটিও আদ্যন্ত সংকলিত হওয়ায় এই গ্রন্থের সাহিত্যিক মূল্য যেমন বহুগুণে বাড়িয়াছে, তথ্যসন্ধানী বিদ্বজ্জনের নিকট ইহার আকর্ষণ বা একান্ত আবশ্যকতাও অল্প হয় নাই।

একাধিক প্রতিকৃতিচিত্রে ও পাণ্ডুলিপিচিত্রে ভূষিত, প্রাসঙ্গিক সংকলন ও গ্রন্থপরিচয়-সংযুক্ত।

যন্ত্রস্থ অন্যান্য গ্রন্থ

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র · জাভাযাত্রীর পত্র · পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি · পারস্যে

বিশ্বভারতী

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা

শক্তিমান লেখক **নিশাচরের**
শ্বাসরুদ্ধকারী অপূর্ব রহস্যোপন্যাস

সুলতার বিয়ে [সদ্য প্রকাশিত] ৪৲
ভিয়েনা নার্সিং হোম [৩য় মুদ্রণ চলিতেছে] ৪৲

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস
কল্যাণী ৩৲

প্রমথনাথ বিশীর
অমনোনীত গল্প ৩৲

প্রাপ্তিস্থান : মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

ঋণাঞ্জলি

C. F. Andrews-এর What I Owe to Christ-এর অনুবাদ-
অনুবাদ করেছেন **নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়**। মূল্য: ৪·৫০

বসুমতী—* * * অনুবাদক নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মূল গ্রন্থের সম্পূর্ণ রস বজায় রেখে এই অনুবাদটি আমাদের উপহার দিয়েছেন—যা অনুবাদ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে দুর্লভ বললেও অত্যুক্তি হবে না। মূল গ্রন্থের রচয়িতা চার্লস ফ্রিয়ার অ্যাণ্ড্রুজ-এর নাম ভারতবাসী মাত্রই জ্ঞাত আছেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এতদুভয়ের মধ্যে মিলনসেতু নির্মাণে এই মহাপুরুষের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য: 'গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ একদিন তাঁকে যে দীনবন্ধু নামে ভূষিত করেন অ্যাণ্ড্রুজ-এর জীবনে সেই নাম সফল ও সার্থক হয়ে ওঠে সম্পূর্ণরূপে। * * * এই মহাপুরুষের জীবন-দর্শনকে উপলব্ধি করতে হলে বইটি অবশ্য পাঠ্য। আমরা পুস্তকটির বহুল প্রচার প্রার্থনা করি।

পরিমল গোস্বামীর	**মেরুপথের যাত্রীদল**	মূল্য—১·৫০
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চ্যাটার্জির	**নতুন পৃথিবীর নতুন মানুষ**	মূল্য—১·৭৫
আশাপূর্ণা দেবীর	**কনক দীপ**	মূল্য—৩৲
ফাল্গুনী মুখার্জির	**ত্রিশঙ্কু**	মূল্য—৩৲
সৌরীন সেনের	**অন্য কোনখানে**	মূল্য—৫·৫০
নীহাররঞ্জন গুপ্তের	**অজ্ঞাতবাস**	মূল্য—৫৲

এবং একটি রহস্য-উপন্যাস—দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হলো—

ইস্কাবনের সাহেব হরতনের বিবি		মূল্য—৪·৫০
নলিনীকান্ত সরকারের	**দাদাঠাকুর**	মূল্য—৫৲

আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর Men I have seen-এর অনুবাদ
মহান পুরুষদের সান্নিধ্যে মূল্য—৩·৫০ : অনুবাদিকা—**মায়া রায়**

শংকরনাথ রায়ের **ভারতের সাধক**

১ম—৬·৫০ (৩য় মুঃ), ২য়—৫·৫০ (২য় মুঃ নিঃশেষিত প্রায়), ৩য়—৮৲ (২য় মুঃ), ৪র্থ—৬·৫০, ৫ম—৬·৫০, ৬ষ্ঠ খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

প্রকাশের অপেক্ষায়:
মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের **আকাশ ছোঁয়া** দ্বারেশ শর্মাচার্যের **মায়া কঙ্কন**

রাইটার্স সিণ্ডিকেট
৮৭ ধর্মতলা স্ট্রীট — কলিকাতা-১৩

সি—১০৫০

অহোরাত্র যে অসংগতি ঘটছে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে দেখতে পারলে তাও যথেষ্ট হাসির উপকরণ হয়ে ওঠে। রিরংসা এবং হিংসার মধ্যেও একটি নির্মম হাসির ধারালো ছুরি বর্তমান। কিন্তু সমস্ত হাসির ছটার আড়ালেই যেমন চোখের জল বর্তে, তেমনি হাস্যকর সেজে যে হাসির খোরাক যোগায় তার জীবনের সরু মোটা প্রতিটি তারই বেদনার তার। নায়ক মুরারি ভট্টাচার্য তেমনি একটি চরিত্র। তার নিজের জন্মের উপরে যেমন তার হাত ছিল না, অনিবার্য ঘটনা এবং জীবনের উপসংহারের উপরেও তেমনি।

গল্পের কাঠামোটি বাস্তবধর্মী। এবং মুরারির মতন করুণ একটি চরিত্র পরিস্ফুট করার জন্যে লেখককে যথাসাধ্য সতর্ক থাকতে হয়েছে।

মানবজীবন সম্পর্কিত যে গভীর অভিজ্ঞতা থাকলে এইপ্রকার চরিত্রকে স্বাভাবিক ও হৃদয়গ্রাহী করা যায় নারায়ণবাবুর মধ্যে তা বিদ্যমান। তবু বলব, চরিত্রটি আরও জীবন্ত হতে পারত। পরিণামে তিনি তাঁর নায়ককে জীবনের যে সহজ মীমাংসায় উত্তীর্ণ করে দিলেন (রেললাইনে আত্মহত্যা করার ব্যাপারটি) তা প্রায় অমানবিক পর্যায়ে পৌঁছেছে।

৩২।৬০

আর এক জীবন—ইলা দেবী। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম চার টাকা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অনেক নগর ধূলিসাৎ করেছে, অনেক জীবন নষ্ট করেছে। অনেক জননীকে সন্তান হারা করেছে। লণ্ডন শহরের এক প্রবাসী বাঙালী পরিবারের একমাত্র সন্তান দেবকুমার কৃতি ছাত্র কিন্তু যুদ্ধের করাল গ্রাস তাকে রেহাই দিল না। মাতা ইন্দুমতির ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। লেখিকা বেশ প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠকদের বলেছেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। যুদ্ধের সময় লণ্ডন শহর এবং সেখানকার মানুষের অবস্থার বেশ ধারাবাহিক বর্ণনা তাঁর পুস্তকে আছে। সন্তানহারা জননীর হাহাকার পাঠকগণকে কিছুক্ষণের জন্য অভিভূত করবে সন্দেহ নেই। দাম আর একটু কম হওয়া উচিত ছিল।

৩৮৪।৬০

কবিতা সংকলন

কালপুরুষ — বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। গ্রন্থবিতান। কলকাতা-২৬। তিন টাকা।

'কালপুরুষ' রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত কবিতার সংকলন। রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ লেখা কাব্যসংকলন আরও আছে। কিন্তু

সেগুলি খুব নির্ভরযোগ্য নয়। কেননা সে-সব সংকলনে অনেক কবিই বাদ পড়েছেন। এবং আধুনিক কবিদের চিহ্নও সেখানে প্রায়শই অনুপস্থিত। অথচ আধুনিক কবিরাও রবীন্দ্রনাথে কম আকৃষ্ট হননি। তাঁদের চেতনাও কখনো কখনো রবিরশ্মিতে উদ্ভাসিত হয়েছে এবং সে উপলব্ধি থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁদের বক্তব্য কাব্যাকারে অভিব্যক্ত হয়েছে। একটি বিশ্বাসী ও নির্ভরযোগ্য কাব্যসংকলনে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে তাঁর সমসাময়িক কালের কবিদের থেকে শুরু করে এখনকার অভিব্যক্তি পর্যন্ত, বেশ সুসমঞ্জসভাবে তুলে ধরা হয়েছে। 'কালপুরুষ' একটি অভাব পূরণ করল। অক্ষয় বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন থেকে শুরু করে বাংলার তরুণতম কবিদের রবীন্দ্রনাথে নিবেদিত কবিতাগুলির চেহারা এখানে চোখে পড়ল।

এখনকার কবিরা রবীন্দ্রনাথের নির্দেশিত পথ হয়ত অনুসরণ করেন না। সময়ের রূপবদলের সংগে সংগে কাব্যাচারিত্রের রূপান্তর, বিষয় উপলব্ধি ইত্যাদির তারতম্য অনিবার্য, চিত্র প্রজ্জ্বলনের পদ্ধতিও হয়ত অনায়ূপ—তবু, গীতিনাট্য, মানুষের হৃদয়ের লক্ষ তরংগ-অভিব্যক্তের উপযোগী গানের—গানের অবিস্মৃতব্য অনির্বচনীয় পংক্তিতে, সামগ্রিক শিল্পসম্ভারে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করতে পারেননি একালের কবিরাও। চেতনার কোন না কোন স্তরে সার্বভৌম কবিপ্রতিভা রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁরা ঋণী। এই ঋণ স্বীকৃতির সাক্ষর কালপুরুষের কবিতাগুলিতে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হতে পেরেছে। সুপ্রতিষ্ঠিত প্রায় আশিজন কবির কবিতা এখানে একত্রিত এবং প্রতিশ্রুতিবান তরুণ কবিদের রচনা অবধি জের টানা হয়েছে। সম্পাদক বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ বইয়ের সম্পাদনার কাজে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন—মুদ্রণের পারিপাট্য, পরিচ্ছন্নতা এবং প্রচ্ছদপটের জন্য বইখানি প্রকাশনার একটি বিশিষ্ট নিদর্শন। রবীন্দ্র-অনুরাগীদের কাছে বইখানির মূল্য স্বীকৃতি হবে বলে বিশ্বাস করি। ৩৪১।৬০

প্রাপ্তি স্বীকার

হে বীর পূর্ণ কর—শ্রীমাখন গুপ্ত।

রজবুলি—রূপদর্শী।

কর্মখালি—মনোরঞ্জন বিশ্বাস।

আমার মাটি—মনোরঞ্জন বিশ্বাস।

এক অঙ্কে শেষ—কিরণ মৈত্র।

শহীদ প্রদ্যোৎ কুমার—শ্রীঈশানচন্দ্র মহাপাত্র।

দিল্লীর মিস্ মিত্র—শেফালী নন্দী।

পরম্পর্শা—মদন বন্দ্যোপাধ্যায়।

কুলদানী ও শেষ হাস্নুহানা—চিত্ত ভট্টাচার্য।

মৃগতৃষ্ণা—দেবপ্রিয় সেন।

নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী—প্রমোদ সেনগুপ্ত।

সোনা গাছ—শক্তিপদ রাজগুরু।

দূরের মালঞ্চ—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

পাহাড়ী ঢল—সমরেশ বসু।

অনুভজন—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

গীত গ্রীষ্মের স্মৃতি—দিব্যেন্দু পালিত।

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ।

রাত্রি ও আলো এবং অন্যান্য কবিতা—ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়।

শেষ সংবাদ—উমানাথ ভট্টাচার্য।

গন্ধর্ব তৃতীয় বর্ষ ১ম সংখ্যা প্রায় নিঃশেষিত। ৩টি পূর্ণাংগ নাটক এর অন্যতম আকর্ষণ।

গন্ধর্বের ২য় সংখ্যা আগামী ২৫শে ডিসেম্বর প্রকাশিত হবে। বিস্তৃত সূচী যথাসময়ে বিজ্ঞাপিতব্য।

গন্ধর্বের ৩য় সংখ্যা বিশ্বনাট্য সাহিত্য ও মঞ্চ সম্পর্কে মূল্যবান সংখ্যারূপে মার্চে ('৬১) বের হবে।

গন্ধর্বের রবীন্দ্র নাট্য সংখ্যা এবৎসরের তুলনারহিত সংকলন। প্রকাশিত হবে ১লা মে, ১৯৬১।

গন্ধর্বের ৪র্থ সংখ্যা জুলাইয়ে প্রকাশিত হয়ে তার ৩য় বর্ষ পূর্ণ করার সূত্রে বাংলা সাময়িকপত্র জগতে নাট্য পত্রিকা হিসেবে নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করবে।

গন্ধর্ব— নাট্যান্দোলনের একমাত্র ত্রৈমাসিক। প্রতি সংখ্যা ১·০০ বার্ষিক গ্রাহক সডাক (বুক পোস্ট) ৪·০০। রেজেস্ট্রীযোগে ৭·৭৫ ন. প.। নমুনা সংখ্যার জন্য ১·২৫ অগ্রিম প্রেরিতব্য। গ্রাহকদের রবীন্দ্র সংখ্যার জন্যে অতিরিক্ত দিতে হবে না।

১৩৩।১এ, আচার্য পি. সি. রোড, কলিকাতা-৬

(সি-৮১৩৬)

—যষ্টি-মধু—

ভংগ বংগের রংগ-ব্যংগের একমাত্র মাসিক পত্রিকা। কার্টুনে কণ্টকিত, রচনায় রসালো। আজই গ্রাহক বা এজেণ্ট হোন।

প্রতি সংখ্যা ·৪০, বার্ষিক ৪·৫০

সম্পাদক : কুমারেশ ঘোষ

৪৫এ, গড়পার রোড, কলিকাতা—৯

সা ধা র ণে র ব ই

বরেন বসু

প্রাক্তন ৪॥০

গোলাম কুদ্দুস

মরিয়ম ৪৲

ভবেশ গঙ্গোপাধ্যায়

শেষ প্রান্তর ৪॥০

মাহমুদ আহমদ

চার প্রহর ২৲

বরেন বসু

উপান্ত ৩৲

বাবুরামের বিবি — বরেন বসু — ২৲

আগন্তুক — মনী ভৌমিক — ২৲

নতুন ফৌজ (নাটক)—বরেন বসু — ১॥০

ছাউনি (নাটক)—অবনী বন্দ্যোঃ — ১॥০

সাধারণ পাবলিশার্স

৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট :: কলিঃ-১২

BE TALLER

and healthier by our new exercises and diet schedule. Details free.

288 (D.E.) Asad Market, Delhi-8

১লা অগ্রহায়ণ প্রকাশিত হইবে

অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ সরকারের

আধুনিক কবিতা প্রসঙ্গে

(মূল্য ২·০০ মাত্র)

আধুনিক কবিতার চরিত্র নিয়ে এমন সহজ-ভাবে সর্বাংগীণ আলোচনা ইতিপূর্বে আর হয়নি। এতে আধুনিক কবিতার উৎপত্তি গতি, আংগিক ও চিত্রকল্পের উপর সারগর্ভ আলোচনা রয়েছে। যে কোন কাব্যরসিকের অবশ্যপাঠ্য পুস্তক।

নবতম কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন

সুবোধ ঘোষের— দিগঙ্গনা ৩·০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের— সত্যাপর্ব ২·৫০

প্রভাত দেবসরকারের— প্রতিবিম্ব ২·০০

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের— ছায়ামানবী ২·০০

সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের— করবীর প্রেম ২·০০

বিশ্বনাথ ঘোষের— স্নিগ্ধ ধরিত্রী ৩·৫০

শিবরাম চক্রবর্তীর কয়েকটি বই

পঞ্চরত্ন ১·৫০, রসময়ীর রসিকতা ১·৫০, মধুচক্রান্ত ১·৫০, ভালবাসার অ, আ, ক, খ ২·০০, মনের মত বৌ ২·০০

ডি. হাজরা অ্যাণ্ড কোং

১৩, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

কৃষ্ণজগৎ

চন্দ্রশেখর

দিব্য জীবন মহিমা

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দিব্যজীবন কাহিনী নিয়ে ইতিপূর্বে কয়েকটি বাংলা ছবি তৈরী হয়েছে। প্রগ্রেসিভ এণ্টারপ্রাইজারস-এর "নদের নিমাই" এই ভক্তিমূলক ছবিগুলির তালিকায় একটি নতুন সংযোজন।

নবদ্বীপে মহাপ্রভুর আবির্ভাবকে ঘিরেই ছবির মূল আখ্যানবস্তুর সূত্রপাত এবং তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের মধ্যেই এর পরিসমাপ্তি। শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনের এই অধ্যায়ের কতকগুলি ঐতিহাসিক ও পরিচিত উপাখ্যান ছবিতে যেমনি রূপ নিয়েছে, তেমনি এর চিত্রনাট্যে স্থান করে নিয়েছে অনেক কাল্পনিক কাহিনী।

নবদ্বীপকে হরিনামের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ ও নীলাচল-যাত্রার পূর্বে তাঁর জীবনের যে-কয়টি প্রধান ঘটনা ছবিতে রূপায়িত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন শাস্ত্রে নিমাইয়ের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ, শাস্ত্রজ্ঞানের শুষ্কতার পরিবর্তে তাঁর মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমের স্ফুরণ, গয়াতে বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনের পর তাঁর মধ্যে দিব্যভাবের উন্মাদনা এবং নিত্যানন্দ ও অন্যান্য অন্তরঙ্গ পার্ষদ সহ কৃষ্ণনাম প্রচার, জগাই-মাধাই উদ্ধার এবং শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে ঘরে রেখে নিশীথে তাঁর গৃহত্যাগ।

মহাপ্রভুর জীবনের এই সব মুখ্য প্রামাণিক উপাখ্যানের সঙ্গে তাঁর দিব্য-মহিমার পরিচয়দানের উদ্দেশ্যে ছবিতে কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এবং সেগুলি দেখানো হয়েছে মহাপ্রভুর দিব্য শৈশব-লীলারূপে। শৈশবে শ্রীকৃষ্ণের দিব্যলীলার যেসব কাহিনী ভক্তদের জানা আছে, তারই অনুরূপ কয়েকটি অলৌকিক বিভূতিই দেখা গেল মহাপ্রভুর শৈশবে। কৃষ্ণলীলা ও গৌরাঙ্গলীলার এই সাদৃশ্য দেখানোর মধ্যে শুধু অপরিপক্ক চিন্তাধারারই প্রমাণ মেলে। বিভিন্ন অবতারের লীলা ও আত্মপ্রকাশ কেন বিভিন্ন রূপ নিয়েছে এবং যুগপ্রয়োজনে বিশেষ কোন অবতার কেন যোগমায়ায় নিজেকে আশৈশব আবৃত রেখে দিব্যসত্তার চাইতে মানবসত্তাকেই বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন সে সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব না হতে পারে। তাই এ-বিষয়ে প্রামাণ্য শাস্ত্র গ্রন্থের অনুসরণই শ্রেষ্ঠ পন্থা। আলোচ্য ছবির কাহিনীকার এই পন্থা অনুসরণ না করে স্বীয় কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। ফলে গৌরাঙ্গ-অবতারের শৈশবকালীন নরলীলা ছবিতে অনেকাংশে ব্যাহত হয়েছে এবং এই কারণে চৈতন্যাবতারের মাধুর্য ও গূঢ় আধ্যাত্মিক তাৎপর্যও বেশ খানিকটা ম্লান হয়ে পড়েছে।

ছবির কাহিনীকার নিত্যানন্দকে বলরামের বেশে প্রথম উপস্থিত করেও বুদ্ধিভ্রান্তির পরিচয় দিয়েছেন। ভক্তরা চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দকে কৃষ্ণ-বলরাম রূপে কল্পনা করে থাকেন। হয়তো এর পেছনে দেবগূহ্য আধ্যাত্মিক সত্যও রয়েছে। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণরূপে উপস্থিত করলে যেমন গৌরাঙ্গ অবতারকে ক্ষুন্ন করা হয়, তেমনি নিত্যানন্দকে বলরামের বেশে উপস্থিত করে এই দিব্যচরিত্রের সার্থকতা অনেকখানি ক্ষুন্ন করা হয়েছে। একই সত্তার বিভিন্ন রূপকেই অবতার জ্ঞানে ভক্তরা আরাধনা করে থাকেন। এই সহজ সরল সত্যটি ছবির পরিচালক ও কাহিনীকার সাময়িকভাবে বিস্মৃত হয়েছেন।

ছবির চিত্রনাট্যে তান্ত্রিক ব্যভিচার নিয়ে যে-সব ঘটনা রয়েছে সেগুলিও সুকল্পিত নয়। সামগ্রিকভাবে চিত্রনাট্যটি সুসংবদ্ধ নয় বলে কাল্পনিক ও প্রামাণিক ঘটনার সংমিশ্রণ ছবিতে ভক্তিরস বিস্তারে সক্ষম হয়নি। মহাপ্রভুর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার আধ্যাত্মিক ভাববাণীও ছবিতে পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি।

ছবির অধিকাংশ পার্শ্বচরিত্র অপরিণত। অদ্বৈতাচার্যের চরিত্রটি অসঙ্গতিতে ভরা। অদ্বৈতপ্রভুই প্রথম নবদ্বীপধামে [illegible] আবাহনে দীর্ঘ তপস্যায় [illegible] করেন এবং তাঁর আধ্যাত্মিক [illegible]

সবে বেরুলো : ফোন : ৫৫-৩১৪৮

সুভো ঠাকুরের ভবঘুরে রসোপন্যাস : **সপ্তদ্বীপ পরিক্রমা** ৪·৫০

সপ্তদ্বীপ পরিক্রমার চরিত্র-চিত্রণের বিচিত্র মিছিলে যোগদান করেছেন :

সঞ্জয় ভট্টাচার্য	প্রফুল্ল মিত্র	নির্মল ভট্টাচার্য	আয়াজ পরিভয়
সত্য দত্ত	মিনতি দেবী	হেনা মা	টুকটুক রণবীর
বন্ধুপ্রেম	শংকর হালদার	দেবু চৌধুরী	সিং
অরুণ ব্যানার্জি	জিনা	হিতু চৌধুরী	বিঠলভাই জাভেরি
নরেন দত্ত	অনুরাধা	মিতুন ঘটক	সুমতি মোরারজি
ভূপাল দত্ত	রহমান সাহেব	জলু বড়ুয়া	মুলুকরাজ আনন্দ
বিরাম মুখার্জি	কে. পি. সিং	চিত্রা বড়ুয়া	লাইডেন
'বঙ্কিম মুখার্জি	সুদেব ভট্টাচারিয়া	অনসূয়া দেবী	ল্যাংহামার
নাটু মহারাজ	বেবু গান্ধি	কুমার শরদিন্দু	শেলেঞ্জিংগার
সারদা দাশ	মনিষী দে	বসিরসাহেব	আরা
আরতি ঠাকুর	অমল মিত্র	আনন্দস্বামী	গার্ডে
ভূপৎ সিং	টুকু		গাইট্রোণ্ডে
মাণিক মুখার্জি	বিল্লি দেবী	যোগনাথ চ্যাটার্জি	কুলকারণি
আজন ঘোষাল	প্রসাদ সিংহ	স্যার কারয়াসজি	হুসেন
সুশীল গুপ্ত	পুষি দেবী	জাহাঙ্গির	সামন্ত

সুভো ঠাকুর নিজে। এঁদের মধ্যে অনেকেই হয়তো আপনার চেনা।

আরও বেরুলো : মরমী কবি ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের

রাত্রি ও আলো ... ১·০০

নীলকণ্ঠ : **নব বৃন্দাবন** (উপন্যাস) ... ৫·০০

নারায়ণ সান্যাল : **ব্রাত্য** (ঐ) ... ৩·০০

শুদ্ধসত্ত্ব বসু : **পুষ্পলাবী** (ঐ) ... ৩·৫০

সুনীল সিংহ : **পাড়ি** (গল্প) ... ২·৩০

গুরুদাস ভট্টাচার্য : **সাহিত্যের কথা** (সাহিত্য-জিজ্ঞাসা) ... ৪·০০

বিমলকৃষ্ণ সরকার : **কবিতার কথা** (ঐ) ... ৫·০০

অজিতকুমার ঘোষ : **নাটকের কথা** (ঐ) ... ৪·০০

রথীন্দ্রনাথ রায় : **ছোট গল্পের কথা** (ঐ) ... ৫·০০

অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : **সমালোচনার কথা** (ঐ) ... ৫·৫০

রথীন্দ্রনাথ রায় : **দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার**

(সুখপাঠ্য সুবৃহৎ গবেষণা-গ্রন্থ) ১২.০০

ছাপা হচ্ছে : **এক ঝাঁক পায়রা** (রস রচনা)—নীলকণ্ঠ ॥ **ধান** (গল্প)—জ্যোতির্ময়ী দেবী ॥ **একটি নির্জন তারা** (কবিতা)—সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ **উপন্যাসের কথা** (সাহিত্য-জিজ্ঞাসা)—দেবীপদ ভট্টাচার্য ॥ **শিল্পতত্ত্বের কথা** (সাহিত্য-জিজ্ঞাসা—দু সপ্তাহে বেরুবেই)—সাধনকুমার ভট্টাচার্য ॥

সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড : : ৯ রায়বাগান স্ট্রীট : কলিকাতা—৬

(সি-৯০৫২)

বিশ্বরূপা

(আভিজাত প্রগতিধর্মী নাট্যমঞ্চ)

[ফোন : ৫৫-১৪২৩, বুকিং ৫৫-৩২৬২]

বৃহস্পতি ও শনি | রবি ও ছুটির দিন
সন্ধ্যা ৬॥টায় | ৩টা ও ৬॥টায়

প্রয়োগনৈপুণ্যে, অভিনয়মাধুর্যে অতুলনীয়

সেতু

৩০০তম রজনীর পথে

একটি চিরন্তন মানব অনুভূতির কাহিনী

নাটক—বিধায়ক ভট্টাচার্য

আলোকসম্পাত—তাপস সেন

নায়িকা :—মঞ্চজগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেত্রী

তৃপ্তি মিত্র (বহুরূপী)

নায়ক :—জনপ্রিয় সুদর্শন চিত্রতারকা

অসীমকুমার

শ্রেঃ তরুণকুমার, মমতাজ আমেদ, সন্তোষ সিংহ, জয়শ্রী সেন

তমাল লাহিড়ী, তারক ঘোষ, জয়নারায়ণ, দয়িতা, ইরা, সুমিত্রা, আরতি

ও নটশেখর নরেশ মিত্র

বিশ্বরূপায় বহুরূপীর অভিনয়

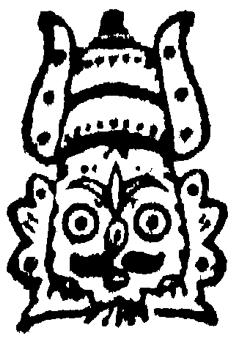

রবীন্দ্রনাথের

রক্তকরবী

৮ই নভেম্বর, মঙ্গলবার—সন্ধ্যা ৬॥টায়

নির্দেশনা—শম্ভু মিত্র

আলোক—তাপস সেন

ভূমিকায়—তৃপ্তি মিত্র, শম্ভু মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, অমর গাঙ্গুলী, কুমার রায়, শোভেন মজুমদার, আরতি মৈত্র ও শান্তি দাস

ধবল বা শ্বেত

শরীরের যে কোন স্থানের সাদা দাগ, একজিমা, সোরাইসিস ও অন্যান্য কঠিন চর্মরোগ, গাত্রে উচ্চবর্ণের অসাড়যুক্ত দাগ কুলা আঙ্গুলের বক্রতা ও দূষিত ক্ষত সেবনীয় ও বাহ্য দ্বারা দ্রুত নিরাময় করা হয়। আর পুনঃ প্রকাশ হয় না। সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট হাওড়া। ফোন : ৬৭-২৩৫৯। শাখা : ৩৬ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯। (পূরবী সিনেমার পাশে)।

একদিন শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের সত্যটি ধরা দেয়। মহাপ্রভুর অবতারলীলা অনুভব করে তাঁর চরণে অদ্বৈতাচার্যের আত্মসমর্পণ ছবিতে এত বিলম্বিত হল কেন এবং অন্তরে বিকৃত হয়েও তিনি এতকাল বৈষ্ণবকুল থেকে কেন দূরে সরে রইলেন তার কোন যুক্তিসংগত কারণ বোঝা গেল না। মহাপ্রভুর পাশে অদ্বৈতাচার্যের যে অন্যতম মুখ্য স্থান ছিল ছবিতে তা'ও শূন্য পড়ে রয়েছে।

ভক্তিমূলক গান ও কীর্তনের সুরে ছবিটিকে রসমধুর করে তোলার চেষ্টা করেছেন পরিচালক শ্রীবিমল রায়। সেদিক দিয়ে তাঁর চেষ্টা অনেকখানি সফল হয়েছে। ছবির দুয়েকটি দৃশ্যের ভক্তিরস দর্শকমনকে নাড়া দেয়। মহাপ্রভু ও বিষ্ণুপ্রিয়া'র সাক্ষাতের দৃশ্যগুলিতে পরিচালক আরও পরিমিতিজ্ঞানের পরিচয় দিতে পারতেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখে এত বেশী সংলাপ ও তার স্বামী-সোহাগ ভক্তপ্রাণ দর্শকদের কাছে পীড়াদায়ক মনে হবে। আধুনিককালের স্ত্রীর পক্ষে যা শোভন বিষ্ণুপ্রিয়ার ক্ষেত্রে যে তা অশোভন সে সম্বন্ধে পরিচালকের অমনোযোগিতা নিন্দনীয়। ছবির অধিকাংশ দৃশ্যের উপস্থাপন মামুলী এবং চৈতন্য-জীবন নিয়ে তোলা পুরনো একটি ছবির দৃশ্যবিন্যাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ছবির নাম-ভূমিকায় অসীমকুমারের অভিনয় মনোজ্ঞ। তাঁর অভিনয়ে ঈশ্বর-ব্যাকুলতার অভিব্যক্তি প্রশংসনীয়। যথোচিত সংযম ও নিষ্ঠার ভেতর দিয়ে তিনি চরিত্রটি রূপায়িত করেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপ-সজ্জায় সবিতা বসুর (চট্টোপাধ্যায়) অভিনয় চিত্রনাট্যের দাবি মেনে চলেছে। তাঁর অভিনয়ে চরিত্রটির অন্তর-ব্যথা যদি রূপ পেয়ে না থাকে তবে তার জন্যে দায়ী ছবির দুর্বল চিত্রনাট্য। শচীমাতার চরিত্রটি শোভা সেনের অভিনয়ে প্রাণবন্ত। নিত্যা-নন্দের ভূমিকায় প্রশান্তকুমারের অভিনয় আগাগোড়া কৃত্রিম বলে মনে হয়। জগাই-মাধাইয়ের চরিত্রে শ্যাম লাহা ও জহর রায় মামুলি ধারায় অভিনয় করেও দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ছবির অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে অল্প অবকাশে অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন জহর গাঙ্গুলী, ছবি বিশ্বাস, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও অপর্ণা দেবী।

কীর্তন কলানিধি রথীন ঘোষের সুরা-রোপে ছবির কয়েকটি বৈষ্ণবগীতি, কীর্তন ও কথকতা দর্শকমনকে আকৃষ্ট করে রাখে। যাদের কণ্ঠদানে ছবির কয়েকটি গান মধুময় হয়ে উঠেছে তাদের মধ্যে রয়েছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ছন্দা গঙ্গোপাধ্যায় ও চিন্ময় লাহিড়ী।

স্টার থিয়েটারে সাফল্যের সহিত অভিনীত দেবনারায়ণ গুপ্ত কর্তৃক নাটকে রূপান্তরিত সুবোধ ঘোষের নাটক। দাম ২·৫০

শ্রেয়সী

সলিল সেনের বাস্তবধর্মী অভিনব সামাজিক নাটক। দাম ২·০০

দিশারী

চলচ্চিত্রে রূপায়িত মিহির সেনের সাফল্যমণ্ডিত নাটক। দাম ২·৫০

প্রবেশ নিষেধ

ক্যালকাটা পাবলিশার্স,

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

কাহিনীকারের অভিমত

আমার "সাহেব বিবি গোলামে"র অসংখ্য নাট্যরূপ আমি দেখেছি। প্রবীণ নাট্যকার শ্রীযুক্ত শচীন সেনগুপ্ত মহাশয় যে শেষ নাট্যরূপটি দিয়েছেন তা আঙ্গিকে, নাট্যরীতিতে ও বক্তব্য-উপস্থাপনায় অভিনব ও শ্রেষ্ঠতম। অভিনয় প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নীতীশ, রবীন, জহর, সত্য, হরিধন প্রমুখ সমস্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও কলা-কৃতিত্ব এ-নাটকের সম্পদ। পটেশ্বরী বৌঠানের চরিত্রায়ণে শ্রীমতী শিপ্রা মিত্রের অভিনয়-কুশলতা এ-নাটকের এক অসামান্য বিস্ময়। সুরকার অনিল বাগচী তাঁর আশ্চর্য সুর-সৃষ্টির কাজে সকলকে অপরিমিত আনন্দ পরিবেশন করেছেন। আর অভিনয় যে মূক হয়েও মুখর হতে পারে ভূতনাথ চরিত্রে শ্রীমান বিশ্বজিতের অভিনব অন্তর্মুখী অভিনয় তার সাক্ষী। তার অভিনয় এ নাটককে গৌরব-দীপ্ত করেছে। ইতি ১২ই অক্টোবর, ১৯৬০

(স্বাঃ) বিমল মিত্র

রঙমহল

ফোন : ৫৫-১৬১৯

প্রতি বৃহঃ ও শনি : ৬॥টায়

রবি ও ছুটির দিন : ৩টা—৬॥টায়

কে. হোড়ের

মহাভৃঙ্গরাজ

যা ইচ্ছে হয় খান!

হিউলেট্স মিকশ্চার

খাওয়া দাওয়ার পরে পাকস্থলীর ব্যথায় দীর্ঘস্থায়ী আরাম এনে দেবে।

সি, জে. হিউলেট এণ্ড সন (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড
৮৬।এ, নাইনিয়াপ্পা নায়ক স্ট্রীট
মাদ্রাজ-৩

HCH 1124

ছবির আলোকচিত্র গ্রহণে, শব্দগ্রহণে ও সম্পাদনায় যথাক্রমে নির্মল গুপ্ত, অতুল চট্টোপাধ্যায় ও মণি বসু এবং গোবর্ধন অধিকারীর কাজ প্রশংসনীয়। কলা-কৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজ ও সামগ্রিক আঙ্গিক গঠন পরিচ্ছন্ন।

চিত্রালোচনা

"শ্রীমান সত্যবাদী" ও "এয়ার মেল"—সপ্তাহের মুক্তি-তালিকায় মাত্র এই দুটি হিন্দী ছবি।

ব্যবসায় জগতে অসত্য ভাষণ কিভাবে জনসাধারণকে প্রতারিত করছে, রূপকলা পিকচার্সের "শ্রীমান সত্যবাদী" রঙ্গ ও ব্যঙ্গের মাধ্যমে তারই নগ্ন রূপ চিত্রামোদীদের সামনে তুলে ধরেছে। রাজ কাপুর ও শাকিলা এ ছবির নায়ক-নায়িকা। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন মামুদ, নাজির হুসেন, স্বর্গত রাধাকিষণ, কাম্মো, ত্রিপাঠী, মণি চ্যাটার্জি প্রভৃতি। সুরসৃষ্টি করেছেন দত্তারাম।

পিপল্স পিকচার্সের "এয়ার মেল" স্টাণ্ট ছবির পর্যায়ে পড়ে। রঞ্জন, মালিনী, রাজেন কাপুর, মীরাজকর, শশী, কলা ও মালাকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। বি জে প্যাটেল ছবিটি পরিচালনা করেছেন। শার্দুল কোয়ট্রা এর সুরকার।

• • •

পরিচালক তপন সিংহ আগামী ১৬ই নভেম্বর তাঁর নতুন ছবি "ঝিন্দের বন্দী"-র চিত্রগ্রহণ শুরু করবেন। ছবিটি বি এন রায় প্রোডাকশন্সের পতাকাতলে তোলা হবে। উত্তমকুমার, রাধামোহন ভট্টাচার্য, তরুণকুমার ও দিলীপ রায়কে এর প্রধান কয়েকটি চরিত্রে দেখা যাবে। স্ত্রী ভূমিকাগুলিতে যাঁরা চিত্রাবতরণ করবেন তাঁদের নাম এখনও ঘোষিত হয়নি। প্রযোজক প্রতিষ্ঠান নতুন মুখের সন্ধান করছেন। তাছাড়া অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায় ও রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও এই সম্পর্কে শোনা যাচ্ছে। ছবিটি তোলা হবে স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটির স্টুডিওতে। এর বহির্দৃশ্য উদয়পুরে গৃহীত হবে। ওস্তাদ আলী আকবর খাঁর ওপর সুর-যোজনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে।

নভেম্বরেই আরো একটি নতুন প্রযোজক প্রতিষ্ঠানের যাত্রারম্ভ হবে। প্রতিষ্ঠানটির নাম পটমঞ্জরী, এদের প্রথম ছবির নাম "মেঘ"। একটি ক্রাইম-ড্রামা নিয়ে এ'রা প্রথম আসরে নামছেন। উৎপল দত্ত এর কাহিনীকার ও পরিচালক। চিত্র-পরিচালনার ক্ষেত্রে এই তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। অভিনয়েও তিনি একটি বড় অংশ নেবেন। তাঁর সহ-শিল্পীদের মধ্যে থাকবেন শেখর চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, তরুণ মিত্র, মনোজ ভট্টাচার্য, ভোলা দত্ত, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল মুখোপাধ্যায়, নীলিমা দাস ও একজন নতুন অভিনেত্রী। পণ্ডিত রবিশঙ্কর এই ছবিতে সুর-যোজনা করবেন। আগামী ২১শে নভেম্বর ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে "মেঘ"-এর শুটিং আরম্ভ হবে।

• • •

জনতা পিকচার্সের প্রথম চিত্রার্ঘ্য "স্বরলিপি" সমাপ্তির মুখে। পরিচালক অসিত সেন খুব অল্প সময়ের মধ্যে ছবিটির শুটিং-পর্ব শেষ করে এনেছেন এবং তা সম্ভব হয়েছে শিল্পী ও কলাকুশলীদের সহযোগিতা ও নিয়মানুবর্তিতার ফলে। সুপ্রিয়া চৌধুরী ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এর প্রধান দুই শিল্পী। অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য অনিল চট্টোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়,

বাদল পিকচার্সের 'সাথীহারা'-র এক টি দৃশ্যে তমাল লাহিড়ী ও মালা সিংহ।

শ্যাম লাহা, সুরুচি সেনগুপ্তা, চিত্রা মণ্ডল, অজিত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এতে সুর-যোজনা করছেন।

এপেক্স ফিল্মসের "শুন বরনারী" সেট-এর কাজ শেষ করে সম্প্রতি সম্পাদকের কামরায় প্রবেশ করেছে। নভেম্বরের শেষের দিকে ছবিটি মুক্তি পাবে বলে শোনা যাচ্ছে। সুবোধ ঘোষের একটি অভিনব কাহিনীকে ভিত্তি করে পরিচালক অজয় কর এই মনোজ্ঞ ছবিটি তুলেছেন। নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় চিত্রাবতরণ করেছেন উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী। অন্যান্য মুখ্য ভূমিকায় আছেন ছবি বিশ্বাস, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক মুখোপাধ্যায় ও বনানী চৌধুরী। রবীন চট্টোপাধ্যায় সংগীত পরিচালনা করেছেন।

বোম্বাইতে তোলা বাংলা ছবি "রায় বাহাদুর"ও আশু মুক্তির প্রতীক্ষা করছে। প্রদীপকুমার এর প্রযোজক ও প্রধান অভিনেতা। তাঁর বিপরীতে যাঁরা অভিনয় করেছেন তাদের মধ্যে বোম্বাইয়ের মালা সিংহ ও সবিতা চট্টোপাধ্যায় এবং বাংলার রেণুকা রায়, রাজলক্ষ্মী, জহর গাঙ্গুলী, জহর রায়, জীবেন বসু, মিহির ভট্টাচার্য ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় ছবিটি পরিচালনা করেছেন। সলিল চৌধুরী এর সুরকার।

• • •

যুগ যুগ ধরে চলে আসছে নরনারীর মন দেওয়া-নেওয়ার কাহিনী এবং চলবেও আবহমান কাল অবধি। তারই পরিপ্রেক্ষিতে একটি মিষ্টি-মধুর কৌতুকোচ্ছল কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে এস কে প্রোডাকশন্সের প্রথম ছবি "মন দিল না বঁধু"-তে। সন্তোষ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এর চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। এর ভূমিকালিপিতে আছেন সবিতা বসু, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, সুমনা ভট্টাচার্য, রাজলক্ষ্মী, হরেন মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, নবদ্বীপ হালদার, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

দেবী প্রোডাকশন্সের "ডাইনী"র কাজ ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে অগ্রসর হচ্ছে। গত ২৫শে অক্টোবর সুরকার কালোবরণের পরিচালনায় এর কয়েকটি সংগীত গৃহীত হয়েছে। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন সুরকার স্বয়ং, রমলা বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ সদ্য প্রকাশিত ॥
কুমারেশ ঘোষের
বিনোদিনী বোর্ডিং হাউস
'শেষ পর্যন্ত' ছায়াচিত্রে রূপায়িত
সচিত্র সরস উপন্যাস। ২·৫০
যম
পূর্ণাঙ্গ ব্যঙ্গ নাটক ১·৫০
ডি এম লাইব্রেরি
৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬
গ্রন্থ-গৃহ
৬ বংকিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল
আরোগ্য করিতে ২৭ বৎসর ভারত ও ইউরোপ-অভিজ্ঞ ডাঃ ডিগোর সহিত প্রতি দিন প্রাতে ও প্রতি শনিবার ও রবিবার বৈকাল ৩টা হইতে ৭টায় সাক্ষাৎ করুন।
৩বি জনক রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।
(সি ৮৯৪১)

২০০ রজনীর বিজয়োৎসব অতিক্রান্ত
লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপের
অঙ্গার
মিনার্ভা থিয়েটারে
ফোন : ৫৫-৪৪৮৯
প্রতি বৃহস্পতি ও শনি ৬॥
রবি ও ছুটির দিন ৩ ও ৬॥
(সি-৯০৪৫)

এলিট প্রত্যহ দুই প্রদর্শনী
৩-৩০ ও রাত্রি ৮টায়
ও রবিবার সকাল ১০-৩০টায়
যে ছায়া-ছবিখানি পৃথিবীতে সর্বাধিক সম্মানে ভূষিত হয়েছে !!!
৫টি একাডেমী এওয়ার্ড ও
৫২টি 'শ্রেষ্ঠতম চিত্র' পুরস্কার প্রাপ্ত
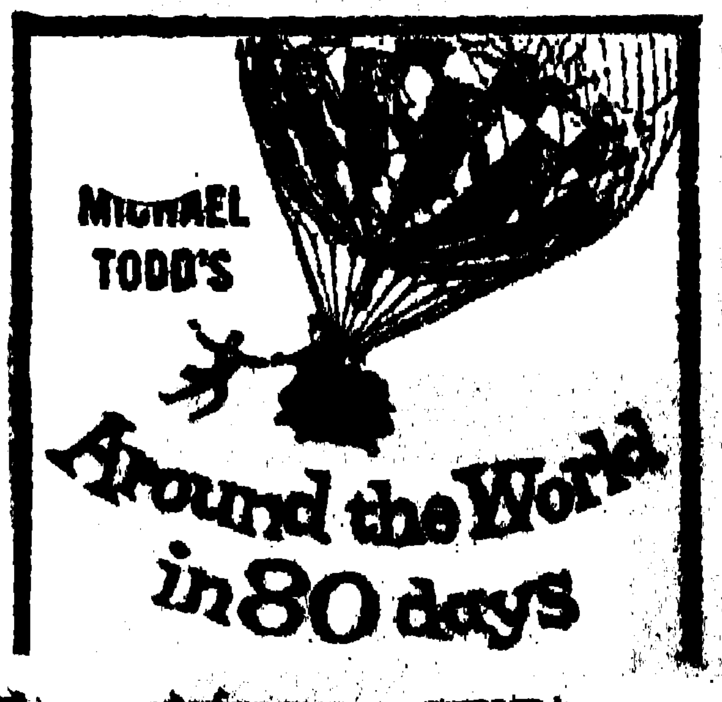

(ইউ) টেকনিকালার-এ অনুপম।
শ্রেষ্ঠাংশে : ডেভিড নিভেন - কান্টিনফ্লাস - রবার্ট নিউটন - শার্লি - ম্যাকলেইন
ও ৪৪ জন পৃথিবীবিখ্যাত শিল্পী

গিরিশ থিয়েটার
কলিকাতায় ৫ম স্থায়ী নাট্যশালা
প্রযোজনা ও উপস্থাপনা—বিশ্বরূপা থিয়েটার
স্থান : বিশ্বরূপা থিয়েটার (৫৫-৩২৬২)
বঙ্গরঙ্গমঞ্চের অবিস্মরণীয় নাট্যসৃষ্টি
দ্বিতীয় দিন বাদে
সোমবার,
বুধবার
ও শুক্রবার
সন্ধ্যা ৬॥টায়
উল্কা
এবং রবি ও ছুটির দিন সকাল ১০॥টায়
নাটক—সলিল : পরিচালনা—বিধায়ক
আঙ্গিক নির্দেশনা—তাপস সেন
শ্রে :—প্রবেন্দু গুপ্ত, জ্ঞানেশ মুখার্জি, বিধায়ক ভট্টাচার্য, সুনীল ব্যানার্জি, অরুণ, প্রকাশ, প্রভাত, গীতা দে ও জয়শ্রী সেন

ও শিবানী বন্দ্যোপাধ্যায়। "তথাপি"-খ্যাত পরিচালক মনোজ ভট্টাচার্য ছবিটি পরিচালনা করছেন। ছবি বিশ্বাস, গীতা দে, গঙ্গাপদ বসু, প্রশান্তকুমার, দিলীপ রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, তমাল লাহিড়ী প্রভৃতিকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে।

বন্য জীবনের চিত্র

গত মঙ্গলবার ২৫শে অক্টোবর বরানগরে কুটিঘাট রোডে একটি ঘরোয়া পরিবেশে প্রখ্যাত চিত্রকর কমল চৌধুরী কর্তৃক গৃহীত পূর্ব আফ্রিকার উগান্ডা এবং সোমালিল্যাণ্ড অঞ্চলের জীবজন্তু ও বন্য মানবের জীবন-যাত্রার একটি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শ ব্যবস্থা করেন স্থানীয় করেকজন।

উগান্ডা সরকারের শিক্ষা বিভাগে আ ট্রেনার হিসাবে চাকুরি গ্রহণ করে শ্রীচৌধু পাঁচ বছর আগে ভারত ত্যাগ করেন চলচ্চিত্র গ্রহণ করা এ'র পেশা নয়, নেশা

নিপুণ শিল্পীর দুটি হাত কাজ করে চলেছে···তাতে আজ যোগ দিয়েছে ইস্পাত।
কাপড় বোনা, নকসা তোলা বা সেলাই এ সবই আজ হচ্ছে ইস্পাতের যন্ত্রে।
আধুনিক কাপড় কলের সামান্য ছুঁচ থেকে বড় বড়
যন্ত্রপাতি সবই তৈরি হচ্ছে ইস্পাত থেকে।
জনসাধারণের জন্য লক্ষ লক্ষ গজ কাপড়
তৈরি করতে শত শত টন ইস্পাতের
প্রয়োজন। দেশের সেই ইস্পাত-সম্পদ
আজ বাড়ছে। তাই শীঘ্রই অল্প দামে পর্যাপ্ত
কাপড় পাবে দেশের জনসাধারণ।
প্রত্যেকের জন্য আরও বেশী ইস্পাত—এই একটি মাত্র
উদ্দেশ্য সাধনেই 'ইস্কো'র সমস্ত শক্তি আজ নিয়োজিত।
আপনাদের সেবার মাধ্যমে সমগ্র জাতির সেবা আমরা
করছি; আমাদের গর্ব তো সেখানেই।

ইস্পাত
মানেই
আরো
বস্ত্র

দি
ইণ্ডিয়ান আয়রন
অ্যাণ্ড স্টীল
কোম্পানি
লিমিটেড

INDIAN IISCO STEEL

এপেক্স ফিল্মসের মুক্তি-প্রতীক্ষিত চিত্র 'শুন বরনারী'-র প্রধান দুটি চরিত্রে সুপ্রিয়া চৌধুরী ও উত্তমকুমার।

অপেশাদার চলচ্চিত্র শিল্পী হয়েও ইনি যে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তা দেখে সমবেত দর্শকবৃন্দ সত্যই মুগ্ধ হয়েছেন। কমলবাবু কলকাতায় এসেছেন ছুটিতে। আবার চার বছর পর ইনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন এবং সে সময় আফ্রিকার আরও বিচিত্র সব জীবনযাত্রার ছবি তুলে আনবেন প্রতিশ্রুতি দেন।

একটি বিশিষ্ট বিদেশী ছবি

বর্তমান সপ্তাহে একটি সিনেমায় মুক্তিলাভ করেছে টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সের 'অ্যারাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ'। অ্যাকাডেমি পুরস্কারে ভূষিত মাইকেল টড-এর এই ছবিটির জন্যে দর্শকদের সাগ্রহ প্রতীক্ষা শুরু হয়েছিল বেশ কিছুদিন ধরে।

জুল ভার্ন-এর একটি প্রসিদ্ধ কাহিনী এ-ছবির আখ্যানঅবলম্বন। মাত্র আশী দিনে দুই ব্যক্তির বিশ্ব-পরিক্রমার এক চমকপ্রদ কাহিনী ছবিটিতে উদ্ঘাটিত। ছবিতে এত অল্পদিনে বিশ্ব-পর্যটন দেখানো হয়েছে এমন একটি কালে যখন আমেরিকার মতো দেশেও বিদ্যুতের প্রচলন হয়নি—বিমান তো দূরের কথা—এবং যখন কাঠ পুড়িয়ে চলা রেল ও স্টীমারের যাত্রা সবে শুরু হয়েছে। দুই বিশ্ব-ভ্রামামান শুধু সাহস, বুদ্ধি ও সময়ানুবর্তিতার জোরে আশী দিনে কেমনভাবে গোটা পৃথিবীটা ঘুরে আসে, নানা দেশের নানা মানুষ ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ পরিচয় কেমনভাবে ঘটে, কী-করে তারা পথের আনন্দকে বরণ করে ও আতঙ্ক জয় করে এবং ভারতভূমিতে আসামের জঙ্গল থেকে এক নারীকে নারকীয় অত্যাচারের হাত থেকে উদ্ধার করে তা-নিয়েই ছবির বিচিত্র আমোদ-রস দানা বেঁধে উঠেছে।

বহু বিখ্যাত শিল্পী অভিনীত এ-ছবির মুখ্যাংশে অবতরণ করেছেন ডেভিড

আশাপূর্ণা দেবীর
সর্বাধুনিক উপন্যাস

উত্তর লিপি

দাম : চার টাকা

পরিবেশক :
ত্রিবেণী প্রকাশন
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি:-১২

মফঃস্বলের অর্ডার :
ক থা ক লি
১, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলি:-৯

আই, পি, টি, এ কর্তৃক
(পশ্চিমবঙ্গ)

মঙ্গলবার ভাঙা
১৫ই নভেম্বর গড়া
সন্ধ্যা ৬॥টায় খেলা

—মিনার্ভা থিয়েটারে—

পরিচালনা : জ্ঞানেশ মুখো:
রচনা : বীরু মুখো:
আবহসঙ্গীত : অনিল চট্টো:
আলোকসম্পাত : তাপস সেন

টিকিট : ৫, ৩, ২ ও ১ টাকা

——প্রাপ্তিস্থান——

- রেডিও সাপ্লাই স্টোর্স, ডালহৌসী স্কোয়ার
- ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
- মেলডি, রাসবিহারী এভিনু
- কেন্দ্রীয় অফিস

১৪৪, ধর্মতলা স্ট্রীট (ফোন : ২৪-৩৯৩০)

(সি-৮৯৪৬)

প্রসূতি ও শিশু

ডাঃ চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

যে-সব প্রসূতিরা গ্রামে বা মফঃস্বল শহরে থাকেন বা যাঁদের পক্ষে ঘন ঘন চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া সম্ভব হয় না, তাঁদের কাছে এই অমূল্য বইখানি গৃহচিকিৎসকের কাজ দেবে। অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ও খুঁটিনাটি প্রসঙ্গের সরল আলোচনা। ৩৫০ পৃষ্ঠার সচিত্র সংস্করণ। দাম ৬.০০। ভি-পি ডাকে সাড়ে ছয় টাকা মাত্র।

আধুনিক যৌন বিজ্ঞান

ডাঃ হ্যানা স্টোন ও আব্রাহাম স্টোন

যৌনশাস্ত্র সম্বন্ধীয় বহুলপ্রশংসিত গ্রন্থ। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিতপ্রায়। সচিত্র সংস্করণ। দাম ৬.০০। ভি-পি ডাকে সাড়ে ছয় টাকা মাত্র।

পপুলার বুক ক্লাব
৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলিকাতা-২০

হাইড্রোসিল (একশিরা)
কোষসংক্রান্ত যাবতীয় রোগের জন্য
ডাঃ কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, এম বি (ক্যাল)
দি ন্যাশনাল ফার্মেসী
(স্থাপিত ১৯১৬)
৯৬-৯৭, লোয়ার চিৎপুর রোড (দোতলায়)
কলিকাতা-৭
প্রবেশ পথ — হ্যারিসন রোডের উপর, জংশনের পশ্চিমে তৃতীয় ডাক্তারখানা। ফোন : ৩৩-৬৫৮০। সাক্ষাৎ সকাল ৯টা হইতে রাত্রি ৮টা। রবিবারও খোলা থাকে।

(সি-৮৭৬৯)

কে, হোড়ের
কণক
* পাউডার *

নিভেন, ক্যাপ্টিনব্রাস, রবার্ট মিউচাম, শার্লি ম্যাকলেন, চার্লস বয়ার, জো-ই ব্রাউন, বাস্টার কীটন, রোনাল্ড কোলম্যান, রবার্ট মর্লি, মারলানা ডিয়েট্রিক, নোয়েল কাওয়ার্ড, ফার্নানডেল, গ্লিনিস জোনস্, পিটার লর, জন মিলস, টিম

ডাঃ কার্ত্তিক বসুর
টাইকোসোডা | নানালা
অম্ল, অজীর্ণ ও ডিস্‌পেপসিয়ায় | ব্যথা ও বেদনায়
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ - কলিকাতা ৬

বালক ও বালিকা আবশ্যক
সুবিখ্যাত ডিরেক্টরের পরিচালনায় "যিস্ দেশ কি ধর্‌তি সোনা হায়" ভারতীয় চিত্রের জন্য। মূল এবং পার্শ্ব চরিত্রের জন্য নূতন অভিনেতা ও অভিনেত্রী চাই। বোম্বাই, দিল্লী, কলিকাতা, মাদ্রাজ, নাগপুর, বাঙ্গালোর, কালিকট প্রভৃতি আরও ২৫টি প্রধান শহরে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা। মনোনয়নের পর দুই বৎসরের কণ্ট্রাক্ট অবশ্যই করিতে হইবে। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার নিষ্প্রয়োজন। বিবরণীর জন্য লিখুন:
SCREEN ART PRODUCTIONS
Film Producers, Amritsar—42

কুমারেশ
লিভার ও পেটের পীড়ায়

২, লালবাজার স্ট্রীট, কলি· ৯৭/৫৬, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলি-১২

ম্যাকর, ফ্রাঙ্ক সিনাত্রা, জর্জ র‍্যাফট, ে স্কেলটন এবং আরও অনেকে।

নাট্যাভিনয়

গত ৩১শে অক্টোবর হোটেল সিসিল-এ সুগায়ক ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও রাধাবল্ল গোস্বামীর যুগ্ম প্রযোজনায় এবং প্রখ্যা অভিনেতা জহর রায়ের পরিচালন 'আপটু-ডেট' নামে একটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। সিসিলিয়ান ক্লাবের বার্ষিক উৎস উপলক্ষে নাটকটি নিবেদন করেন সংস্থা সভ্যবৃন্দ। রঙ্গরস ও প্রণয়ে ভরা এই নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন সুবোধ গুপ্ত, কানুপ্রিয়া গোস্বামী শ্যামলী গোস্বামী, কুমুদ ঘোষ, দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, বিমল ঘোষ, মাণিক দত্ত, রাধাবল্লভ গোস্বামী, শ্যামলাল ভট্টাচার্য, রাম মল্লিক শ্যামশ্রী গোস্বামী, কেষ্টচরণ, সুজিত সেন রঞ্জিত বসু, অনু দত্ত এবং নাট্যপরিচালক ও সংগীতপরিচালক জহর রায়। নাট্যানুষ্ঠানের পূর্বে কণ্ঠসংগীত ও একাঁ কৌতুক-নক্সা পরিবেশন করেন যথাক্রমে নির্মলা মিশ্র ও সনৎ সিংহ এবং অজি চট্টোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠান সংবাদ

গত ৩০শে অক্টোবর হিন্দুস্থান পার্কে বিজয়া সম্মেলনী উপলক্ষে কমল ঘোষে ব্যবস্থাপনায় একটি মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠানে আয়োজন করেন স্থানীয় দুর্গাপূজা উৎস সমিতি। অনুষ্ঠানে রুমা গাঙ্গুলী পরিচালনায় ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ার মনোর লোকনৃত্যগীত পরিবেশন করে সকলকে প্রভূত আনন্দ দেন। আধুনিক গানে অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের তৃপ্তি দেন শ্যাম মিত্র, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, অপরে লাহিড়ী, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, নীতা সে ভূপেন হাজারিকা, অনিল দে, অনিল ব রবীন মজুমদার ও শৈলেন মুখোপাধ্যায় জহর রায়ের কৌতুক-নক্‌শা ও বটুর নন্দী যন্ত্র-সংগীত বিচিত্রানুষ্ঠানের বিশে আকর্ষণরূপে গণ্য হয়।

* * *

শিল্পী নিকেতনের সভ্যরা গত ২৩শে অক্টোবর সংস্থার কার্যালয়ে (১৪।এ, কান্ত মিস্ত্রী লেন) বিজয়া স উপলক্ষে "আনন্দমেলা" অনু আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন কমলেন্দু পাধ্যায়, বিমল ঘোষ, কেশব বল, সর গীতা বসু, বিভা মৌলিক, প্রশান্ত তারাপদ বিশ্বাস, দুর্গা সিংহ, চক্রবর্তী, রাধারানী সিংহ ও দাস।

খেলার মাঠে

একলব্য

দিল্লী ক্লথ মিল ফ্‌টবল প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলায় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ৩—১ গোলে পরাজিত করে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব 'দিল্লী ক্লথ মিল ট্রফি' লাভ করেছে। ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে দিল্লী ক্লথ মিল প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান এই প্রথম নয়। এর আগে ১৯৫০, ১৯৫২ এবং ১৯৫৭ সালেও ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এই প্রতিযোগিতার বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে। তাছাড়া ১৯৫৬ ও ১৯৫৮ সালে হয় ফাইন্যালে পরাজিত। ১৯৫৮ সালের ফাইন্যালে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কাছেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে হার স্বীকার করতে হয়েছিল। এবার মহমেডান স্পোর্টিংকে হারিয়ে তারা শ্ধ্ পূর্ব পরাজয়ের শোধই তোলেনি—সবচেয়ে বেশীবার দিল্লী ক্লথ মিল ট্রফি ঘরে তুলেছে।

ফাইন্যালের আগে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব পরাজিত করে জলন্ধরের ডি এফ এ দলকে ৮—০ গোলে, দেরাদ্নের বিজয় ক্যান্টনমেণ্টকে ৩—০ গোলে ও সেমি-ফাইন্যালে দিল্লীর ইয়ং স্টারস ফ্টবল দলকে ৪—১ গোলে। অপরদিকে কীর্কির বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রুপকে ২—১ গোলে, কলকাতার ইস্টার্ণ রেলকে একই ফলাফলে এবং মাদ্রাজ রেজিমেণ্টাল সেণ্টারকে ১—০ গোলে হারিয়ে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ফাইন্যালে ওঠে।

ফাইন্যাল পর্যন্ত দ্ই দলের খেলার ফলাফল দেখলে ব্ঝতে কষ্ট হয় না ফাইন্যাল পর্যন্ত একটি দলের সাফল্য অনায়াসলব্ধ, অপর দলের কষ্টার্জিত। সত্যি মহমেডান দল ভাল খেলতে পারেনি। ঢাকায় অন্ষ্ঠিত আগা খাঁ গোল্ড কাপের ফাইন্যাল খেলায় ইন্দোনেশিয়া দলকে পরাজিত করে তারা দিল্লী খেলতে গেলেও তিনটি দলকে পর পর হারিয়ে ফাইন্যালে উঠতে তাদের রীতিমত বেগ পেতে হয়েছে। কীর্কির বির্দ্ধে ২—১ গোলের জয়ের মধ্যে একটি ছিল পেনাল্টি গোল। ইস্টার্ন রেলের বির্দ্ধেও তারা জিতেছে সন্দেহজনক অফসাইড গোলে ২—১ গোলের ব্যবধানে। মাদ্রাজ রেজিমেণ্টাল সেণ্টার দলের বির্দ্ধেও মহমেডান দলের জয়লাভ ক্রীড়াধারার অগ্রগতিস্চক ফলাফল নয়। অপরদিকে ফাইন্যাল পর্যন্ত তিনটি খেলায় ইস্ট-বেঙ্গলের ১৫টি গোল তাদের সহজ সাফল্যের নিদর্শন।

তব্ কলকাতা তথা ভারতের খ্যাতনামা দুই ফ্টবল দলের মধ্যে দিল্লী ক্লথ মিল প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলা দেখার আকর্ষণ ছিল যথেষ্ট। এর একট্ কারণও আছে। ১৯৫৮ সালের ফাইন্যালে মহমেডান দল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে পরাজিত করা ছাড়াও গতবার ডুরান্ড কাপের সেমি-ফাইন্যালে ৫—১ গোলে পরাজিত করেছিল। তাছাড়া দ্ই দলের কয়েকজন নামকরা এবং অলিম্পিক খেলোয়াড়দের খেলা দেখার আকর্ষণ তো স্বাভাবিক। তাই ফাইন্যাল খেলায় দিল্লী গেট স্টেডিয়াম দর্শক সমাগমে কাণায় কাণায় ভরে যায়। কিন্তু খেলাটি হয় অতি সাধারণ ধরনের। ফাইন্যালেও মহমেডান দল আদৌ তাদের খ্যাতি অন্যায়ী খেলতে পারে না। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব পরি-কল্পিত এবং পারস্পরিক আদান প্রদানজনিত ক্রীড়াধারায় স্চনা থেকে আক্রমণ চালিয়ে প্রতিপক্ষকে বিপর্যস্ত করে তোলে এবং শেষ পর্যন্ত প্রাধান্যের পর্যাপ্ত পরিচয় দিয়ে ৩—১ গোলের ব্যবধানে বিজয়ী হয়ে চতুর্থ-বার লাভ করে 'ডি সি এম ট্রফি'।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের খেলোয়াড় নির্বাচক মনোনীত নতুন চেয়ারম্যান বিজয় হাজারে

আগের বিজয়ী ও রানার্স

বিজয়ী	রানার্স
১৯৪৫—এন ডি হিরোজ	কে ও ওয়াই এল
১৯৪৬-৪৮ খেলা হয়নি	
১৯৪৯—রাইসিনা স্পোর্টিং	সিটি ক্লাব লক্ষ্ণৌ
১৯৫০—ইস্টবেঙ্গল	৫৮ গ্র্খা—দেরাদ্ন
১৯৫১—রাজস্থান ক্লাব	৫৮ গ্র্খা— ,,
১৯৫২—ইস্টবেঙ্গল	৫৮ গ্র্খা— ,,
১৯৫৩—এরিয়ান জিমখানা-ব্যাঙ্গালোর	ই আই আর—অ্যাকাউন্টস
১৯৫৪—জিওলজিক্যাল সার্ভে—কলিঃ	হায়দরাবাদ—একাদশ
১৯৫৫—আই এ এফ—দিল্লী	ডি এস এ—এলাহাবাদ
১৯৫৬—আই এ এফ	ইস্টবেঙ্গল
১৯৫৭—ইস্টবেঙ্গল	ইস্টার্ন রেল
১৯৫৮—মহঃ স্পোর্টিং	ইস্টবেঙ্গল
১৯৫৯—সেণ্ট্রাল প্লিস—হায়দরাবাদ	এম ই জি—ব্যাঙ্গালোর

• • •

সম্প্রতি কটকে অন্ষ্ঠিত ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের বার্ষিক সভায় বোর্ডের কর্মকর্তা নির্বাচনে চিরাচরিত প্রথার কিছ্ হেরফের হয়েছে। অর্থাৎ থোড়-বড়ি-খাড়ার বদলে খাড়া-বড়ি-থোড় না হয়ে সঙ্গে কিছ্ আল্-ম্লোও যোগ হয়েছে। কিন্তু তাতে খাদ্যপ্রাণ বেড়েছে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

ক্রিকেট বোর্ডের কর্মকর্তা নির্বাচন পর্ব সমাধা হয় অনেকটা গণতান্ত্রিক ধারায়। ভোটই এখানে আসল কথা। কার কতট্কু যোগ্যতা সে প্রশ্ন গৌণ। স্তরাং নির্বাচন-প্রার্থীরা অনেকদিন থেকেই ভোট সংগ্রহের চেষ্টা করছিলেন। শ্ধ্ ক্রিকেটকে কেন্দ্র করে নয়। ফ্টবল এবং হকিকেও কাজে লাগিয়ে। অর্থাৎ খেলোয়াড় নির্বাচনের মাধ্যমে কারো মন রেখে, কারো মান বাঁচিয়ে ভোট পাবার ব্যবস্থা পাকা করা হয়েছিল,—কয়েকটি রাজ্য সংস্থার মধ্যে স্ষ্টি করা হয়েছিল একটি যোগসাজস। সেই যোগ-সাজসই শেষ পর্যন্ত ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচনে তথাকথিত করিতকর্মা কর্ম-কর্তাদের ভোট বৈতরণী পারে সাহায্য করেছে।

ক্রিকেট বোর্ডের নতুন সভাপতি হয়েছেন মাদ্রাজের শ্রী এম চিদম্বরম। নতুন সম্পাদক হয়েছেন মহীশ্রের শ্রী এম চিন্নাস্বামী। মাদ্রাজ ও মহীশ্রের জয়জয়কার। যাদের দাক্ষিণ্যে দক্ষিণের এই জয় তাদের ভাগ্যেও ছিটেফোঁটা জ্টেছে। সিংহভাগ না পেলেও বরোদা ও বাঙ্গলার প্রতিনিধিরা কিছ্ কিছ্ পদ পেয়েছেন। ৯ বছর সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত থাকবার পর বাঙ্গলার শ্রীঅমর

ঘোষ সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচক সমিতিতে বাঙলার শ্রী এম দত্ত-রায়ের সদস্যপদ যথাযথভাবে বহাল রয়েছে।

ক্রিকেট বোর্ডের সহ-সভাপতি নিশ্চয়ই হাকিমের পদ। কিন্তু সম্পাদকের দারোগার মর্যাদা যে হাকিমের চেয়ে অনেক কাম্য সে কথা বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু উপায় কি? পাকেচক্রে শ্রীঘোষকে হাকিমের পদই গ্রহণ করতে হয়েছে। ক্রিকেট খেলায় সবচেয়ে অগ্রগণ্য রাজ্য বোম্বাই রয়েছে এবারও কোণঠাসা হয়ে।

কিন্তু ক্রিকেট বোর্ডের কর্মকর্তাদের পদের চেয়েও খেলোয়াড় নির্বাচক সমিতির সদস্যদের পদ অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এদের উপরই নির্ভর করে খেলোয়াড়দের ভাল-মন্দর প্রশ্ন। এদের বিচারের একটুখানি হেরফেরে অনেক সময় প্রতিভাদীপ্ত খেলোয়াড়জীবনের অংকুরে বিনাশ ঘটে। অনেক সময় শুকিয়ে যাওয়া অযোগ্য খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করা হয় এবং তা করা হয় নির্বাচনে নিজেদের পদকে কায়েম করবার জন্য।

এবার খেলোয়াড় নির্বাচক সমিতির নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন অভিজ্ঞ খেলোয়াড় বিজয় হাজারে। সদস্যদের মধ্যে শ্রী দত্ত রায় স্বপদে বহাল রয়েছেন। নতুন দুইজন সদস্য হয়েছেন হেমু অধিকারী ও মাদ্রাজের এম জে গোপালন। দু' জনেরই ক্রিকেট সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু ভোট-যুদ্ধে পরাজিত লালা অমরনাথ, গোলাম আমেদ, কে এম রঙ্গনেকার ও সুটে ব্যানার্জি—এদের কারো চেয়ে নির্বাচিতদের অভিজ্ঞতা বেশী একথা আমি স্বীকার করতে রাজী নই। তবে অভিজ্ঞতাই সব নয়। অভিজ্ঞতার চেয়েও আন্তরিকতার দাম বেশী, তার চেয়েও দাম বেশী নিরপেক্ষতার, স্বাধীন মত প্রকাশের।

প্রথমে শোনা গিয়েছিল সি কে নাইডু খেলোয়াড় নির্বাচক সমিতির চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হবেন। কিন্তু বোর্ডের হালচাল দেখে তিনি সভায় উপস্থিতই হননি। সি কে নাইডু চেয়ারম্যান হলে বা লালা অমরনাথ চেয়ারম্যান থাকলে মামুলী কর্মকর্তাদের একটু অসুবিধাই হত; সুটে ব্যানার্জি, রঙ্গনেকার কিংবা গোলাম আমেদ সদস্য হলেও বিশেষ সুরাহা হত না। কারণ এরা ঠিক 'জো-হুকুম' তামিল করার মত লোক নন। হাজারে, অধিকারী, গোপালন সম্পর্কে অবশ্য এই আশা পোষণ করি। কিন্তু সরলপ্রাণ হাজারে চিরদিন পাঁচ-পয়জারের বাইরে থেকে এখন কি বোর্ডের ঝানু কর্মকর্তাদের কোন কায়েমী স্বার্থে আঘাত করতে পারবেন? মনে হয় না। কর্মকর্তা ও খেলোয়াড় নির্বাচক সমিতির সদস্য নিবাচনে কিছু নতুন মুখ দেখা গেলেও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সেই 'থোড়-বড়ি-খাড়া' ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৭৫ কিলোগ্রাম অর্থাৎ ১০৯ মাইল সাইকেল চালনায় অতি অল্পের জন্য প্রথমস্থান লাভ করতে না পেরে মনের দুঃখে কেঁদে ফেলেছেন ইটালীর সাইকেল চালক এল ট্রাপে

অলিম্পিক ফলাফল

(পূর্ব প্রকাশিতর পর)

[সাইক্লিং]

রোম অলিম্পিকে সাইকেল চালনা প্রতিযোগিতার ছয়টি স্বর্ণপদকের মধ্যে পাঁচটিই পেয়েছেন ইটালীর সাইকেল চালকরা। শুধু ১৭৫ কিলোগ্রাম অর্থাৎ ১০৯ মাইল রোড রেসে বিজয়ীর স্বর্ণপদক পেয়েছেন সোভিয়েট রাশিয়ার ভি ক্যাপিটোনফ। তাও অতি অল্পের জন্য।

প্রথম স্থানাধিকারী ক্যাপিটোনফ ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ইটালীর এল ট্রাপে একই সময়ে ১০৯ মাইল অতিক্রম করেছেন। শুধু ক্যাপিটোনফের সাইকেলের চাকা শেষ সীমারাখায় পৌঁছেছিল সেকেণ্ডের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতম ভগ্নাংশ আগে। আর তাতেই তিনি প্রথম হয়ে গেলেন। কল্পনা করুন, দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ইটালীর প্রতিযোগী ট্রাপের কি দারুণ মনোবেদনা। ১৭৫ কিলোগ্রাম রোড রেসের আগে ইটালী সাইকেল রেসের সবক'টি বিষয়ে বিজয়ী হয়েছে। সাইকেলের শেষ রেসেও বিজয়ী হয়ে ট্রাপে তার দেশকে সাইকেলের সব ক'টি রেসে বিজয়ী হবার অতুল সম্মান এনে দেবেন, নিজেও হবেন সম্মানিত এই আশায় বুক বেঁধেই তিনি দীর্ঘ ১০৯ মাইল মৃত্যু পণ করে সাইকেল চালিয়ে এসেছেন, আর শেষ মুহূর্তে অতি অল্পের জন্য তিনি সেই সম্মান লাভ করতে পারলেন না। তাঁর দুঃখ ও মনোবেদনা রাখবার স্থান কোথায়? তাই রেসের ফলাফল যখন ঘোষণা করা হল তখন ট্রাপে শিশুর মত কেঁদে উঠলেন। সত্যিই কাঁদবার মত ঘটনা।

সাইকেল চালনায় ইটালীর কৃতিত্বের কথা সর্বজনবিদিত। রোম অলিম্পিকে সাইকেল চালনায় ইটালীয়ানদের অসাধারণ কৃতিত্বের কথা শুনে এক সাংবাদিক বন্ধু ঠাট্টা করে বলেছিলেন—"তা না হলে ইটালী থেকে 'বাইসাইকেল থিভস'-এর মত অত ভাল ছায়াচিত্র বেরোয়?" 'বাইসাইকেল থিভস-এর কথা যাক! ক্যাপিটোনফ ও ট্রাপের ১০৯ মাইল রোড রেসের দৃশ্য এবং তার অভিব্যক্তি যে ছায়াচিত্রে ধরে রাখবার মত ঘটনা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সাইকেল রেসের সময় ডেনমার্কের সাইকেল চালক নুট এনামার্ক জেনসেনের মৃত্যুতে অলিম্পিক অঙ্গনে এক শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। এনামার্ক জেনসেন অবশ্য মৃত্যু বরন করেছিলেন হাসপাতালে। একশ কিলোমিটার বা বাষট্টি মাইল টাইম ট্রায়াল রোড রেসের সময় সাইকেল থেকে তিনি পড়ে গিয়ে হাসপাতালে মৃত্যু বরণ করেন। কোন দৈব-দুর্ঘটনায় তিনি সাইকেল থেকে পড়ে যাননি। পড়ে গিয়েছিলেন শ্রমকাতরতায়। প্রথমে বলা হয়েছিল রোমের অত্যধিক গরম আবহাওয়াই ন্যুট এনামার্কের মৃত্যুর কারণ। কিন্তু ন্যুট এনামার্কের মৃত্যু সম্পর্কে তদন্তের যে রিপোর্ট পাওয়া গেছে তাতে জানা যায় মাত্রাতিরিক্ত উত্তেজক ঔষধ সেবনের কুফলেই এনামার্কের মৃত্যু ঘটেছে। দৈহিক ক্ষমতা বাড়াবার জন্য এবং রক্ত চলাচলের গতিবেগ অপেক্ষাকৃত দ্রুত রাখার সংকল্পে 'রোনিয়াকল' নামক এক রকমের উত্তেজক ওষুধ খেয়ে এনামার্ক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন এবং অসাধারণ পরিশ্রমের ফলে 'মাদকতা' বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু বরণ করেন।

প্রতিযোগিতার সময় কোনো উত্তেজক ওষুধ খাওয়া খেলাধুলার 'এ্যামেচার' আইনের নীতিবিরুদ্ধ ঘটনা। এই সম্পর্কে বহুদিন থেকেই নানা রকমের গুজব শোনা যাচ্ছে। কিন্তু হাতে নাতে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ডেনিস সাইকেল চালক ন্যুট এনামার্কের দেহের ময়না তদন্তের ফলে আজ প্রমাণ মিলেছে। এনামার্ক অবশ্য ইহজগত থেকে বিদায় নিয়েছেন। তিনি এখন ধরাছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু ভবিষ্যতে যাতে খেলাধুলার ক্ষেত্রে এরকম উত্তেজক ওষুধের

ব্যবহার না হয় আশা করি, আন্তর্জাতিক ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থা সে সম্পর্কে একটা উপায় উদ্ভাবন করবে।

সাইকেল রেসের ফলাফল ঃ—

১,০০০ মিটার স্প্রিন্ট

১ম—এস গাইয়ারদানি (ইটালী)
২য়—এল স্টার্ক (বেলজিয়াম)
৩য়—ভি গাসপারেলা (ইটালী)

১০০০ মিটার টাইম ট্রায়াল

১ম—এস গাইয়ারদানি (ইটালী)—১ মিঃ ৭·৭ সেঃ
২য়—ধি গেসলার (জার্মানী)—১ মিঃ ৮·৭ সেঃ
৩য়—ডি ভারগানিকম (রাশিয়া)—১ মিঃ ৮·৮ সেঃ

২০০০ মিটার টানডেম

১ম—ইটালী (এস ব্রান্ডেটো ও জি বেগেটো)
২য়—জার্মানী (জে সাইমন ও এল স্টাবার)
৩য়—রাশিয়া (বি ভাসিলিয়েফ ও ভি লিওনফ)

৪,০০০ মিটার টিম পারস্যুট

১ম—ইটালী—৪ মিঃ ৩০·৯ সেঃ (এল আরিয়েন্টি, এফ টেস্টা, এম ভ্যালোটো ও এম ভিগনা)
২য়—জার্মানী—৪ মিঃ ৩৫·৭ সেঃ (পি গ্রোনিং, এম ক্লিম, এস খোলার ও আর নিটজ)
৩য়—রাশিয়া—৪ মিঃ ৩৪·৩ সেঃ (এস মস্কভিন, ভি রোমানফ, এল কলুমবাট ও বেলজগার্ট)

১০০ কিলোমিটার টিম রোড, টাইম ট্রায়াল

১ম—ইটালী—২ ঘঃ ১৪ মিঃ ৩৩·৫৩ সেঃ
২য়—জার্মানী—২ ঘঃ ১৬ মিঃ ৫৬·৩১ সেঃ
৩য়—রাশিয়া—২ ঘঃ ১৮ মিঃ ৪১·৬৭ সেঃ

১৭৫ কিলোমিটার (১০৯ মাইল) রেস

১ম—ভি ক্যাপিটোনোভ (রাশিয়া)—৪ ঘঃ ২০ মিঃ ৩৭ সেঃ
২য়—এল ট্রাপে (ইটালী)—৪ ঘঃ ২০ মিঃ ৩৭ সেঃ
৩য়—ডব্লিউ ভ্যানডেনবারগেন (বেলজিয়াম)—৪ ঘঃ ২০ মিঃ ৫৭ সেঃ

মুষ্টিযুদ্ধ

রোম অলিম্পিকে মুষ্টিযুদ্ধের ১০টি স্বর্ণপদকের মধ্যে তিনটি করে স্বর্ণপদক পেয়েছেন ইটালী ও আমেরিকার মুষ্টিকরা, বাকী চারটি স্বর্ণপদকের একটি করে পেয়েছেন হাঙ্গেরী, রাশিয়া, পোল্যান্ড ও চেকোশ্লোভেকিয়ার মুষ্টিযোদ্ধা। তবে সামগ্রিকভাবে ইটালী পোল্যান্ড ও আমেরিকার মুষ্টিযোদ্ধারাই কৃতিত্বের

ডেনিস সাইকেল চালক ন্যুট এনামার্ক জেনসেন। অলিম্পিকে মাত্রাতিরিক্ত উত্তেজক ওষুধ খেয়ে সাইকেল চালনার ফলে শ্রমজনিত ক্লান্তিতে সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে এঁর মৃত্যু ঘটেছে

পরিচয় দিয়েছেন। ১০টি বিভাগের স্তরে স্তরে মোট ২৮০টি লড়াই হয়েছে। প্রথম-দিকের লড়াইতে অনেকেই প্রতিপক্ষকে নক আউটে পরাজিত করেছেন। কিন্তু ফাইন্যালে এক হেভিওয়েট ছাড়া অন্য কোন বিভাগের বিজয়ী প্রতিপক্ষকে নক আউটে পরাজিত করতে পারেননি। ৯টি বিষয়েরই জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়েছে অর্জিত পয়েন্টের ব্যবধানে। তবে কতগুলি বিষয়ে বিচারক-দের বিচারের বিরুদ্ধে সমালোচনাও কম হয় নি। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এবং মুষ্টিযুদ্ধ সম্পর্কে বিশ্বের জ্ঞানসমৃদ্ধ বিচারকরাও একটি লড়াইয়ে বিভিন্ন রকমের রায় দিয়েছেন। কেউ বিজয়ীকে দিয়েছেন ৬০ পয়েন্ট বিজিতকে ৫৭ আবার কেউ বা ঠিক তার উল্টোভাবে পয়েন্ট দিয়েছেন। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলাধুলার আসরেও যদি বিচারের এমন প্রহসন হয় তবে অন্য স্থানে কি আশা করা যায়?

অলিম্পিকে প্রতি বিষয়ে ফাইন্যালের বিজয়ী পান স্বর্ণপদক, বিজিত রৌপ্যপদক আর সেমিফাইন্যালের পরাজিত দুইজন পান ব্রোঞ্জ পদক। নীচে মুষ্টিযুদ্ধের ১০টি বিভাগের ফাইন্যালের ফলাফল দেওয়া হল ঃ—

ফ্লাই ওয়েট—জি টরোক (হাঙ্গেরী) এস সিভকোকে (রাশিয়া) পয়েন্টে পরাজিত করেন। ব্রোঞ্জপদক পান—কে তানাবে (জাপান) ও এ এল গুইলি (ইউনাইটেড আরব);

ব্যান্টমওয়েট—ও গ্রিগরেভ (রাশিয়া) পয়েন্টে পি জাম্পারিনীকে (ইটালী) পরাজিত করেন। ব্রোঞ্জপদক পান—বি বেণ্ডিস (পোল্যাণ্ড) ও ও টেলর (অস্ট্রেলিয়া);

ফেদারওয়েট—এফ মুসো (ইটালী) পয়েন্টে জে এ্যাডামস্কিকে (পোল্যাণ্ড) পরাজিত করেন। ব্রোঞ্জপদক পান—ডব্লিউ মেয়ার্স (দঃ আফ্রিকা) ও জে লিমোনেন (ফিনল্যাণ্ড);

লাইটওয়েট—কে প্যাজদর (পোল্যাণ্ড) পয়েন্টে এস লোপোপোলোকে (ইটালী) পরাজিত করেন। ব্রোঞ্জ পদক পান—আর ম্যাকট্যাগার্ট (গ্রেট ব্রিটেন) ও এ লাউডিওনো (ইটালী);

লাইট ওয়েল্টার ওয়েট—বি নেমেসেফ (চেকোশ্লোভেকিয়া) পয়েন্টে সি কোয়াটেকে (ঘানা) পরাজিত করেন। ব্রোঞ্জ পদক পান—কিউ ডেনিয়েলস (ইউ এস এ) ও এম কাসপ্রিজক (পোল্যাণ্ড);

ওয়েল্টার ওয়েট—জি বেনভেনুটি (ইটালী) পয়েন্টে ওয়াই র‍্যাডোনিয়াকে (রাশিয়া) পরাজিত করেন। ব্রোঞ্জ পদক পান—এল ড্রগোজ (পোল্যাণ্ড) ও জে লয়েড (গ্রেট ব্রিটেন);

লাইট মিডল ওয়েট—ডব্লিউ ম্যাক্লুরে (ইউ এস এ) পয়েন্টে সি বোসিকে (ইটালী) পরাজিত করেন। ব্রোঞ্জ পদক পান—বি লাগুটিন (রাশিয়া) ও ডব্লিউ ফিশার (গ্রেট ব্রিটেন);

মিডল ওয়েট—জে ক্রুক (ইউ এস এ) পয়েন্টে টি ওয়ালাসেককে (পোল্যাণ্ড) পরাজিত করেন। ব্রোঞ্জ পদক পান—আই মোনিয়া (রুমানিয়া) ও ই কেওফেনফ (রাশিয়া);

লাইট হেভি ওয়েট—সি ক্লে (ইউ এস এ) পয়েন্টে জেড পিয়েত্রীজি কোয়াস্কিকে (পোল্যাণ্ড) পরাজিত করেন। ব্রোঞ্জ পদক পান—এ ম্যাডিগান (অস্ট্রেলিয়া) ও জি সারাউডি (ইটালী);

হেভি ওয়েট—এফ ডি পিকোলী (ইটালী) নক আউটে ডি বেকারকে (দক্ষিণ আফ্রিকা) পরাজিত করেন। ব্রোঞ্জ পদক পান—জে নেমেক (চেকোশ্লোভেকিয়া) ও জি সিসিমাও (জার্মানী)।

ধবল-শ্বেত কুষ্ঠ

বহুদিন পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম, দিনরাত চর্চা ও অনুসন্ধানের পর কবিরাজ শ্রীচন্দ্রস্বরূপ, বি এ উহা সমূলে বিনাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইংরাজীতে লিখুন।

আয়ুর্বেদিক কেমিক্যাল
রিসার্চ লেবরেটরিজ, ফতেপুরী, দিল্লী ৬

দেশী সংবাদ

২৪শে অক্টোবর—বাঙ্গালী ও পার্বত্য অধিবাসীদের দাবি নস্যাৎ করিয়া আসাম বিধান সভায় আজ সরকারী ভাষা বিল গৃহীত হয়। এই বিল অনুযায়ী রাজ্য পর্যায়ে অসমীয়াই হইবে একমাত্র সরকারী ভাষা এবং জেলা পর্যায়ে সেই স্থান অধিকার করিবে অন্যান্য ভাষাসমূহ। বিলে আরও বলা হইয়াছে, সেক্রেটারিয়েট ও অফিসসমূহে হিন্দী চালু না হওয়া পর্যন্ত ইংরাজীই চলিতে থাকিবে।

বর্ষাবসানে চীনেরা সিকিম ও ভুটান সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। যে কোন কারণেই হউক, অক্টোবর ও নভেম্বর মাসেই চীনেরা সৈন্য সমাবেশ করিতে চায় বলিয়া মনে হয়। গত বৎসরও এই রকম সময়েই তাহারা সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিল।

২৫শে অক্টোবর—ভাসমান-স্বর্ণখনি 'রুথ এভারেট' নামক জাহাজ অবশেষে কলিকাতার মায়া কাটাইয়া অদ্য বন্দর ত্যাগ করিয়াছে। এমনিতে নয়, প্রকাশ, বিদায় লওয়ার আগে ভারতের শুল্ক বিভাগকে পুরাপুরি ২৬ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হইয়াছে।

দীর্ঘ এক বছর টালবাহানার পর অদ্য কর্পোরেশনের স্ট্যান্ডিং ওয়াটার সাপ্লাই কমিটির সভায় পলতায় নূতন করিয়া একটি পরিশোধনাগার নির্মাণের জন্য একটি বিদেশী কোম্পানীর টেন্ডার ৫—৪ ভোটে অনুমোদিত হয়।

২৬শে অক্টোবর—অসমীয়াকে রাজ্যভাষারূপে গ্রহণ না করিলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাবাসীদের বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার হুমকি আসাম সরকারকে বিধানসভায় বহু বিতর্কিত রাজ্যভাষা বিল গ্রহণে বাধ্য করিয়াছে। আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহার অভিমত অন্তত তাই।

উৎকোচ গ্রহণ করিয়া জনৈক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবার অভিযোগে কলিকাতার একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিস কমিশনারের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় তদন্তের পর কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত পুলিস অফিসারকে আজ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার নির্দেশ দিয়া সমন জারীর আদেশ দিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

২৭শে অক্টোবর—হিমালয় সন্তান "নন্দাঘুণ্টি" অবশেষে তরুণ বাঙলার দুঃসাহসের কাছে পরাজয় মানিয়াছে। তুষারমৌলি দুর্জয় শৃঙ্গের সর্বোচ্চ শিখরে গত ২২শে অক্টোবর শনিবার অকুতোভয়ে বাঙালী অভিযাত্রী দলের বিজয় পতাকা সদর্পে উড়িয়াছে।

গ্যাংটক হইতে প্রাপ্ত নির্ভরযোগ্য সংবাদে জানা যায় যে, প্রায় ৮ ডিভিশন সৈন্য (প্রায় ৮০ হাজার) চীন-ভারত সীমান্তের বিভিন্ন স্থানে সমাবেশ করা হইয়াছে। লাদক সীমান্তে ত্রিশ হাজার, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে পঁচিশ হাজার এবং নেপাল-ভুটান ও সিকিম সীমান্তে পঁচিশ হাজার সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

২৮শে অক্টোবর—ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে নানাপ্রকারের শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কথা শোনা গিয়াছে। কিন্তু ডাক ও তার বিভাগের সিনিয়র ডি-এ-জি অফিসের কর্তৃপক্ষ এই অফিসের কর্মচারীদের এক্ষণে বাথরুমে যাইতে হইলেও নাকি উর্ধ্বতন অফিসারের অনুমতি গ্রহণের জন্য আদেশ দিয়াছেন।

ভারতের জীবনবীমা কর্পোরেশনের কলিকাতা ডিভিশনে কর্মরত বীমা এজেন্টদের প্রাপ্য পারিশ্রমিকের (কমিশন) একটা স্থিরতা আনার, কাজকর্মের অসুবিধা দূর করার এবং তাঁহাদের মধ্যে দৃঢ়বন্ধ ঐক্যের ভাব জাগাইয়া তোলার উদ্দেশ্যে এই ডিভিশনে একটি "অ্যাজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন" গঠিত হইয়াছে।

২৯শে অক্টোবর—দ্বিতীয় পাঁচসালা যোজনা শেষ হইতে চলিয়াছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সমবায়ের ভিত্তিতে বিদ্যুৎ-চালিত তাঁত বসাইবার পরিকল্পনা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অনেক পিছনে পড়িয়া আছে বলিয়া তথ্যাভিজ্ঞ মহলে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

৩০শে অক্টোবর—তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রস্তাব বিনাবাধায় গৃহীত হইলে এবং কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিটির পাঁচজন সদস্য নির্বাচিত হইবার পর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির দুইদিনব্যাপী অধিবেশনের পরিসমাপ্তি হয়।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সমস্যা ফাইলে লইয়া মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আগামী ৪ঠা নভেম্বর নয়াদিল্লি যাইতেছেন। প্রকাশ, এবারের দিল্লী সফরে ডাঃ রায় কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সহিত পশ্চিমবঙ্গে আগত আসামের বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের সমস্যা সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করিবেন।

বিদেশী সংবাদ

২৪শে অক্টোবর—কাতাঙ্গার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আজ কঙ্গো হইতে বিচ্ছিন্ন কাতাঙ্গায় রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রধান কর্মচারী শ্রীআয়ান বেরেন্ডসেনকে সামরিক বলপ্রয়োগ করিয়া সরাইবার হুমকি দেন।

দালাই লামা গত ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল শ্রীদাগ হ্যামারশিল্ডের নিকট লিখিত এক পত্রে বলেন যে, কম্যুনিস্ট চীন তিব্বতকে একটি ঔপনিবেশিক দেশে পরিণত করিয়াছে।

পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইনের প্রশাসক মেজর জেনারেল কে আবদুস রহিম খান সম্প্রতি বিমানযোগে দুর্গত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া আসিয়া বলেন যে, বরিশালের উপকূল অঞ্চলে সাম্প্রতিক ঘূর্ণিবাত্যায় প্রায় এক হাজার লোক নিহত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব পাকিস্তানে নিহতের সংখ্যা মোট প্রায় ৬ হাজার হইল।

২৫শে অক্টোবর—জার্মানীর সাধারণ মানুষ শান্তি, স্বচ্ছন্দভাবে জীবনযাপন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনগণের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপন করিতে চায়। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক এবং হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীঅশোককুমার সরকার ফেডারেল জার্মানীতে ভ্রমণ করিবার সময় জার্মান জনসাধারণের সঙ্গে যে আলাপ আলোচনা করেন তাহাতে তাঁহার পূর্বোক্ত ধারণা হইয়াছে।

কিউবান সরকার আজ ১৬৭টি মার্কিন কোম্পানী রাষ্ট্রায়ত্ত করেন। রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানীগুলির মধ্যে বহু হোটেল, ৩০টি বীমা কোম্পানী, ১৭টি রাসায়নিক এবং দুইটি রেল সংস্থা আছে।

২৬শে অক্টোবর—পাক প্রেসিডেন্ট আজ এক বেতার ভাষণে কাশ্মীর সমস্যাটিকে একটি 'টাইম-বোমা'র সহিত তুলনা করিয়া বলেন, এই বোমা যে কোন মুহূর্তে বিস্ফোরিত হইতে পারে, সে আশঙ্কা সর্বদাই বিদ্যমান।

ফরাসী কবি সাঁ জাঁ পার্সকে ১৯৬০ সালের নোবেল সাহিত্য-পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া আজ স্টকহলম হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে।

কর্নেল কাস্তিলোর নেতৃত্বে এক অভ্যুত্থানের ফলে আজ এল সালভাডোরের প্রেসিডেন্ট জোস ম্যারিয়া লেমাসের সরকারের পতন ঘটে, প্রচণ্ড কম্যুনিস্ট-বিরোধী প্রেসিডেন্ট লেমাস ১৯৫৬ সাল হইতে মধ্য আমেরিকার এই কফিপ্রধান রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব করিতেছিলেন।

২৭শে অক্টোবর—বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গতকল্য সোভিয়েট রাশিয়াকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছে যে, বার্লিনগামী বিমান-পথের অবাধ ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা হইলে এক বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হইবে এবং উহার ফলাফলের জন্য সোভিয়েট সরকারকেই পুরাপুরি দায়ী করা হইবে।

২৮শে অক্টোবর—মস্কো রেডিও হইতে আজ রাত্রে বলা হইয়াছে, কিউবায় আসন্ন মার্কিন আক্রমণের অশুভ ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। ইসভেস্তিয়ায় প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হইয়াছে, পোর্টোরিকো উপসাগরে ১৩ খানি মার্কিন জাহাজ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষিসংস্থা রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য দেশগুলি হইতে উদ্বৃত্ত খাদ্য সংগ্রহ করিয়া উহা অনগ্রসর দেশগুলির মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করিবেন।

২৯শে অক্টোবর—কঙ্গোলী উচ্চ সামরিক অফিসারদের একটা বড় দল সেনাধ্যক্ষ কর্নেল মোবুতুকে হুমকি দিয়াছেন যে, তিনি যদি রাষ্ট্রপুঞ্জের বিরুদ্ধে তাঁহার শক্তি প্রয়োগ না করেন তবে পাল্টা অভ্যুত্থান হইবে।

৩০শে অক্টোবর—জাপ প্রধানমন্ত্রী শ্রীইকেদা আজ তাঁহার প্রথম নির্বাচনী বক্তৃতায় বলেন, রাষ্ট্রপুঞ্জ যদি জাপানের নিরাপত্তা বজায় রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পাদিত নিরাপত্তা চুক্তি বর্জন করিতে আমরা দ্বিধা করিব না।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮০। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

দেশ

DESH 40 Naya Paise
Saturday, 12th November, 1960.

২৮ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২৬ কার্তিক, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

নেহরুর জন্মদিবসে

ভারতবর্ষের জনমানসে গত পঞ্চাশ বছরে সবচেয়ে গভীর রেখাপাত করেছেন গান্ধীজী, নেতাজী ও শ্রীজওহরলাল নেহরু। সামগ্রিক বিচারে মাত্র এই তিনজনের দেশনায়ক ভূমিকা সমসাময়িক কালে সর্বজনস্বীকৃত। এর মধ্যে শ্রীনেহরুর ভূমিকাই এখনও জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বিস্তৃত। দেশনায়ক নেহরুর জন্মদিবসে তাই বিস্ময় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয় যে এই একটিমাত্র বিরাট পুরুষের জীবনে, কর্মে ও মননে ভারতবর্ষের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সংযুক্ত রয়েছে। ত্যাগে, সাহসিকতায়, দৃঢ়চিত্ততায় শ্রীনেহরুকে অতুলনীয় বা অনন্যসাধারণ গণ্য করা যায় না বটে, কিন্তু অসাধারণ তাঁর নিরলস কর্মশক্তি, অতুলনীয় মানসিক গঠন যার স্বচ্ছন্দ বিস্তার এখনও বয়স এবং অভ্যাসের জড়তামুক্ত।

দেশনায়ক নেহরুর রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাফল্য এবং ব্যর্থতা কোথায়, কোনটা কতখানি, সে-বিষয়ে সকলে একমত নন, একথা বলা বাহুল্য। রাজনীতির বিচার কেবল কঠোর নয়, নানা মত এবং স্বার্থের দ্বন্দ্বে দুরূহ। শ্রীনেহরুর রাজনৈতিক নেতৃত্বের মূল্যায়ন দুরূহ আরও এই কারণে যে, জাতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ গণ্য হতে পারেন এমন কোনও ক্ষমতাধর অথবা জনপ্রিয় ব্যক্তি দেখা যায় না; কংগ্রেসের ভিতরে কিম্বা বাইরে কোথায়ও না।

প্রতিদ্বন্দ্বীহীন দেশনায়কের নেতৃত্ব দেশের আপাত-প্রয়োজন বিচারে অপরিহার্য হলেও দেশের অবাধ অগ্রগতি সম্পর্কে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে। অবশ্য এর জন্য শ্রীনেহরুকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করা উচিত হবে না। ঐতিহাসিক ঘটনাচক্রে শ্রীনেহরুই একমাত্র শক্তিমান পুরুষ যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে জাতীয় নেতৃত্বের পুরোবর্তী হিসাবে স্বাধীনতা লাভের পর দলমতনির্বিশেষে প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। শ্রীনেহরুর এই অনায়াস সাফল্যে বিস্ময়ের কারণ নেই, কিন্তু ভারতবর্ষে রাজনৈতিক নেতৃত্বসংকটের যে-সব লক্ষণ ক্রমে পরিস্ফুট হচ্ছে তার দিকে লক্ষ্য রেখে বলা যায়, দেশ-নায়ক নেহরু বর্তমানে অপরিহার্য বলেই দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অস্বস্তিবোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

"নেহরুর পর কে এবং কী?" এ-প্রশ্ন গত কয়েক বৎসর ধরে বার বার উঠেছে; দেশের ভিতরে এবং বাইরে। এক হিসেবে এই প্রশ্ন শ্রীনেহরুর অসামান্য শক্তিমত্তার এবং আমাদের দুর্বলতার পরিচায়ক। যদিও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের বিধান যে-দেশে চালু সে-দেশে এ রকম প্রশ্নের মামুলী সমাধান হয়ত অনায়াসে সম্ভব। কিন্তু শ্রীনেহরু নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকা সময়েই দেশে এমন সমস্ত বিপর্যয়কর শক্তি প্রবল ও সক্রিয় হয়ে উঠেছে যা শ্রীনেহরু নিজেও সংযত করতে সক্ষম হচ্ছেন না। অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্বের আরও এক মুশকিল—কংগ্রেস দলপতি এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর মতামত, কর্মসূচী সম্পর্কে সমালোচনার অভাব নেই; জাতীয় পরিকল্পনার রূপায়ণ, পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা এবং সম্প্রতি ভাষাগত বিরোধঘটিত সমস্যা এবং এমন বহু গুরুতর বিষয়ে শ্রীনেহরুর মতামত এবং আচরণ জনচিত্তে বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু মুশকিল এই যে, বহু গুরুতর বিষয়ে শ্রীনেহরুর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও, দেশনায়ক নেহরুকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং অপরিহার্য বলে মেনে নিতে হচ্ছে সকলকেই; শেষ পর্যন্ত প্রায় সকলকেই যেন নিরুপায়ভাবে বলতে হচ্ছে, "যা করেন নেহরু।"

এর প্রতিকার অবশ্য শ্রীনেহরুর সাধ্যায়ত্ত নয় এবং শ্রীনেহরুর নেতৃত্বে আর যাই ভুলভ্রান্তি ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটে থাকুক, তিনি ক্ষমতালোলুপ স্বৈরাচারী এক-নায়ক কখনই নন। এখানে বিলাতি রাজনৈতিক প্রবচনটা স্মরণযোগ্য—"জনসাধারণ যে ধরনের গভর্নমেণ্ট পাওয়ার উপযুক্ত তারা সেই রকম গভর্নমেণ্টই পেয়ে থাকে।" শ্রীনেহরুর রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব বর্তমানে অপরিহার্য, তার কারণ জনসাধারণ বিকল্প নেতৃত্বের সন্ধান পায়নি অথবা সন্ধান করায় নিরুৎসুক বা অক্ষম। গ্লাডস্টোনের বদলে ডিজরেলী, কিম্বা অ্যাণ্টনী ইডেনকে সরিয়ে ম্যাকমিলান—ব্রিটেনের জনসাধারণ এইভাবে দেশনায়ক এবং দলনেতা পরিবর্তনের পাঠটা দীর্ঘকাল ধরে আয়ত্ত করেছে। আমাদের জনসাধারণ রাজনৈতিক অধিকার পেয়েছে মাত্র তের বৎসর; বিচার বিবেচনা করে অধিকার প্রয়োগের পরিচ্ছন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন এখনও বহু সময়-সাপেক্ষ। আপাতত দেশনায়ক নেহরুর উপর দেশবাসীর একান্তনির্ভরতা তাই অপ্রতিরোধ্য। তার আরও কারণ জনচিত্তে শ্রীনেহরু কেবল প্রধানমন্ত্রী এবং কংগ্রেস দলপতিরূপে প্রতিভাত নন। শ্রীনেহরুর রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভালোমন্দ বিচার বাদ দিয়ে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যাঁর চিন্তা, চেষ্টা ও বাক্যে স্বাধীন ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্প সর্বাধিক প্রাধান্য লাভ করেছে।

বিরাট ভারতবর্ষের বিপুল ঐতিহ্যমণ্ডিত আধুনিক কালোপযোগী জাতীয় সংকল্প সাধনার উদ্যোক্তা ও প্রতিভূ শ্রীনেহরুর জন্মদিবসে তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

জয় হিন্দ

প্রসঙ্গত

দৈনিক পত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদে জানা গেল যে, বাংলাদেশের লেখকদের নিয়ে 'রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সংঘ প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে এবং কলেজ স্ট্রীটের থিওসফিক্যাল সোসাইটির বাড়িটি সরকারী প্রচেষ্টায় অধিকার করে এই সংঘকে দেওয়া হবে। আপাতদৃষ্টিতে এই সংবাদে লেখক সমাজ উল্লসিত হবেন সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের সংশয়সঙ্কুল চিত্তে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেওয়ায় বিষয়টি নিয়ে খোলাখুলি আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে হল।

বাংলাদেশে এক সময়ে সাহিত্যিকরা একজোট হয়ে সাহিত্যের উন্নতি প্রসারের জন্য কিছু মহৎ কাজ করেছিলেন—তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও বৎসরে একবার বাংলার বিভিন্ন জেলায় বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আজও আছে কিন্তু আজকের সাহিত্যিক সমাজের সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ প্রায়-বিচ্ছিন্ন। আর বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন দীর্ঘকাল লুপ্ত থাকার পর সম্প্রতি আবার তাকে চালাবার ক্ষীণ চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু সাফল্য লাভ করেনি। বহু সাহিত্যিক সে সম্মেলনে যোগদান করেননি এবং সম্মেলনের আলোচনা থেকে বোঝা গেল নতুন কোনো আশার সঞ্চারও তাঁরা করতে পারেননি। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন যদিও না[illegible] হয়ে আজ নিখিল ভারত বঙ্গ সা[illegible] সম্মেলন হয়েছে। বৎসরান্তে শীতকালে বাংলাদেশ ছাড়া অন্যান্য রাজ্যে জাঁকজমকের সঙ্গে সম্মেলন হয়ে থাকে। মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী, রাজ্যপাল প্রভৃতি সরকারী আমীর ওমরাহদের পদধূলি পেয়ে সম্মেলন কৃতার্থ হয়। বাংলার সাহিত্যিকদের কাছে এই সম্মেলনের সার্থকতা কতখানি আমরা আজও তা উপলব্ধি করতে পারিনি। সাহিত্য সম্মেলনের নামে একদল ভ্রমণেচ্ছু প্রতিনিধির জমায়েতটা শুনেছি ভালই হয়। আসল কথা, বাংলাদেশের সাহিত্যিক সমাজ একত্রে মিলিত হয়ে নিজেদের প্রয়োজনে কোনো সঙ্ঘ কোনোকালেই গড়তে পারেননি, বোধ হয় গড়া সম্ভবও নয়। বাংলার সাহিত্যিকরা চিরকালই স্বাতন্ত্র্য পছন্দ করেন, জোট বেঁধে কিছু করাটা তাঁদের ধাতে নেই, হয়তো সেটা জাতিচরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কিছুদিন আগে নববর্ষ উপলক্ষে এক সাহিত্যিক সমাবেশে বাংলার একজন জনপ্রিয় সাহিত্যিক বলেছিলেন যে বাংলাদেশের তিনজন সাহিত্যিক একত্রিত হলে তিনজন তিনদিকে মুখ করে বসেন। ভদ্রতার খাতিরে যদি আলোচনার সূত্রপাত করতেই হয় তবে আবহাওয়া নিয়ে নয়, কার বই কত সংস্করণ হয়েছে সেই তথ্য নিয়ে। শারদীয়া পূজোর সময় কোনো বইয়ের দোকান বা পত্রিকার দপ্তরে এক লেখকের সঙ্গে অপরের দেখা হলেই প্রশ্নোত্তর শুরু হয়—কে কটা লিখলেন। বাংলাদেশের লেখকরা চিরকালই বড় বেশী আত্মমুখী, নীরবে নিভৃতে আপন মনে সাহিত্য সাধনাতেই নিজেদের মগ্ন রাখা পছন্দ করেন, দল বেঁধে 'ইউনিয়ন' বা 'অ্যাসোসিয়েশন' তৈরী করে সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা তাঁরা কোনোকালেই করেননি। এবং তা করেননি বলেই স্থূল বাস্তবের ক্ষেত্রে লেখকদের অধিকাংশকেই নানাভাবে বঞ্চিত হতে হয়েছে।

বাংলাদেশে সাহিত্যিকদের মধ্যে মেলামেশা তা বলে কোনোকালেই ছিল না বা এখনো নেই তা নয়। গোষ্ঠীগতভাবে সাহিত্যিকদের আড্ডার ঐতিহ্য বাংলা সাহিত্যের শুরু থেকেই চলে এসেছে। বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সাহিত্যিক ও পত্রিকা সম্পাদককে ঘিরে লেখক গোষ্ঠী গড়ে ওঠার ইতিহাস আমাদের অজানা নয়। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন', রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'সাধনা' ও 'ভারতী', প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' এবং পরিশেষে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকার সাহিত্যিক গোষ্ঠীর কথা উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য ও সাহিত্যিক দুইই এঁরা সৃষ্টি করে গিয়েছেন, এঁদের সম্পাদিত পত্রিকা ঘিরে সাহিত্যিক গোষ্ঠী আপনা থেকেই গড়ে ওঠেছিল। এই সব পত্রিকার সম্পাদক ও লেখক গোষ্ঠী একটি লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে সাহিত্যকর্মে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সেই লক্ষ্য ও আদর্শের পথ থেকে আজকের সাহিত্যিকরা অনেক দূরে সরে এসেছেন। সে সম্পাদকও নেই, সে পত্রিকাও নেই, সেই লেখক গোষ্ঠীও আজ বাধ্য হয়ে পত্রিকা দপ্তর ছেড়ে আসর জমিয়েছেন কলেজ স্ট্রীটের পুস্তক-ব্যবসায়ীদের দোকানে। যে-কোনদিন সন্ধ্যায় কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় গেলেই দেখা যায় বিভিন্ন বইয়ের দোকানে সাহিত্যিকদের ছোটো ছোটো আড্ডা। ক্রেতা বই কিনতে এসে তার প্রিয় লেখককে চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্যে কৃতার্থ হন, লেখকও চোখের সামনের তাঁর বইয়ের ক্রেতাকে দেখে আত্মতুষ্টি বোধ করেন।

এই কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় যদি থিওসফিক্যাল সোসাইটির ভবনটি দখল করে 'রাইটার্স সোসাইটি' করা হয়, তা সাহিত্যিকদের সমাগমে পবিত্রকরা পুণ্য মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠবে কিনা জানি না তবে সরকার ও পুস্তক ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্যির ক্ষেত্র যে হয়ে উঠবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা আর পুস্তক ব্যবসায়ীদের আওতা থেকে দূরে সরে এসে আজকের দিনের সাহিত্যিকদের বুঝি বাঁচবার আর কোনো পথ নেই। তা না হলে সরকারী চেষ্টায় বাড়ি সংগ্রহই বা করতে হয় কেন এবং কলেজ স্ট্রীট পাড়াতেই সে বাড়ি সংগৃহীত হবে কেন।

ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক 'বেঙ্গল থিওসফিক্যাল সোসাইটি'র প্রাচীন ভবনটি ক্রয় করা সম্পর্কে জনসাধারণের পক্ষ থেকে আপত্তি উঠেছে। যাঁরা আপত্তি জানিয়েছেন তাঁদের বক্তব্য একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই ভবনে এখনও প্রতি সপ্তাহে দুইদিন সহস্রাধিক ধর্মপিপাসু ব্যক্তি মিলিত হয়ে ধর্ম, ঈশ্বর ও দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করে এবং ধর্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের নানা প্রশ্নের সদুত্তর এখানে এসে পেয়ে যায়। জনসাধারণের জন্য একটি পাঠাগার প্রতিদিন খোলা থাকে, বহু ব্যক্তি নিজেদের মত পথ ও ধর্ম অনুযায়ী পুস্তক পাঠের সুযোগ পান। বিচারপতি ফণীভূষণ চক্রবর্তী এখনও এই সোসাইটির সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ডাঃ অ্যানি বেসাণ্ট ও দার্শনিক পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্তর স্মৃতি-বিজড়িত এই ভবন ১৯১২ সালে নির্মিত হয়, এবং আজও 'হীরেন্দ্র মেমোরিয়াল' হল নামে একটি প্রকোষ্ঠ এই মনীষীর স্মৃতি বহন করে আসছে। প্রতি বৎসর বহু বিদেশী এখানে আসেন, ধর্ম ও দর্শন নিয়ে আলোচনাও হয়।

সুতরাং আপত্তি যাঁরা জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে তাঁদের অনুরোধ হচ্ছে এই আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন ভবনটিকে 'লেখকদের ক্লাব' না করে অন্যত্র করা হোক, জায়গার ত অভাব নেই।

আমরাও বলি, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দক্ষিণে ও সেণ্ট পলস গীর্জার আশেপাশে সংস্কৃতির পীঠস্থান একে একে গড়ে উঠছে। ফাইন আর্টস অ্যাকাডেমির ভবন হয়েছে, শতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্র-নামাঙ্কিত ন্যাশনাল থিয়েটারও ওখানেই নির্মিত হবে। সেখানেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি ছোটোখাটো এক টুকরো জমি দাতব্য করেন তাহলে সাহিত্যিকরা পুস্তক ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মোটা টাকার অর্থ সংগ্রহ করে 'রাইটার্স ক্লাব' নির্মাণ করতে পারেন। প্রস্তাবটা লেখকদের একবার ভেবে দেখবার অনুরোধ জানাই।

বৈদেশিকী

এই লেখা প্রকাশিত হবার পূর্বেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নূতন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়ে যাবে—মিঃ কেনেডি এবং মিঃ নিক্‌সন-এর মধ্যে কে মিঃ আইসেন-হাওয়ারের স্থান নেবেন জানা যাবে। অনেক সময়ে নির্বাচন-যুদ্ধের শেষের দিকে হঠাৎ অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যায়, সুতরাং নির্বাচনের ফলাফল সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে অনেকেই ভয় পান। অবশ্য দলীয় প্রোপাগান্ডাবাজদের কথা আলাদা। তাঁরা প্রথম থেকে ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত "আমাদের দলের প্রার্থীর জয় সুনিশ্চিত", এই ধ্বনি দিতে থাকেন। যাই হোক, এখন পর্যন্ত ভাইস-প্রেসিডেণ্ট নিক্‌সন ও সেনেটর কেনেডির নির্বাচন সফর ইত্যাদি সম্পর্কে যে-সব খবরাখবর এসেছে তাতে অবস্থা মিঃ কেনেডিরই অনুকূল বলে বোধ হয়।

আমেরিকার সংবাদপত্র এবং পত্রিকাদির শতকরা আশী ভাগের মালিক রিপাবলিকান পার্টির সমর্থক। তা সত্ত্বেও, এখন পর্যন্ত মিঃ নিক্‌সন জিতবেন, এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী জোর দিয়ে কোনো কাগজই করে নি। এই থেকে বুঝা যায় যে, রিপাবলিকান পার্টির সমর্থক কাগজগুলিও মিঃ নিক্‌সন-এর সাফল্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই কাগজের মালিক রিপাবলিকান পার্টির সমর্থক হলেও বা কাগজের সম্পাদকীয় সমর্থন রিপাবলিকান পার্টির পক্ষে থাকলেও সংবাদ সংগ্রহকারী রিপোর্টারদের মধ্যে ডেমোক্রাট মনোভাবাপন্ন-দের সংখ্যাই বেশি। তাছাড়া, সংবাদ পরিবেশনের ব্যাপারে কাগজের মালিকদেরও সাবধান থাকতে হয়। কারণ সম্পাদকীয় মতামত যাই প্রকাশ করা হোক না কেন, সংবাদ এবং জনমতের রূপাঙ্কনের ব্যাপারে সত্যের অপলাপ ঘটতে থাকলে কাগজের সুনাম ও বৈষয়িক স্বার্থ দুই-ই বিপন্ন হবার সম্ভাবনা। সুতরাং কাগজের স্বার্থেই সংবাদ পরিবেশনের ব্যাপারে মালিকের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক ঝোঁককেই সত্যাসত্য বিচার ও প্রকাশযোগ্যতার মাপকাঠি হয়ে উঠতে দেয় না। মালিকানার দিক থেকে আমেরিকার সংবাদপত্র এবং পত্রিকাসমূহের বেশির ভাগ রিপাবলিকান পার্টির সমর্থক হলেও সংবাদ পরিবেশনে তাদের পক্ষপাতিত্ব সাধারণত মাত্রা ছাড়িয়ে

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

ডক্টর নবগোপাল দাসের

এক অধ্যায়

...মধন্য সাহিত্যিকের নবতম গ্রন্থ। কল্পনার জালে-বোনা উপন্যাস নয়— চোখে-দেখা ও নিজ অভিজ্ঞতায় চেনা। সরকারী পদের নিরাপদ আড়ালে অবস্থানকারী অভিজাত নায়ক-নায়িকাদের বীভৎস লীলা-বিলাসের কাহিনী। আই-সি-এস জীবনের শেষ-বছরের স্মৃতিকাহিনীতে ডক্টর দাশ অনেক খণ্ডদৃশ্যের মাধ্যমে উদ্‌ঘাটন করেছেন এদের সত্যকার স্বরূপ। ৩·০০ ॥

দেবেশ দাশের

পশ্চিমের জানলা ৫·০০ ॥

প্রখ্যাত লেখকের নবতম রম্যগ্রন্থ। সপ্ত-সমুদ্রের পারে পশ্চিম জগতের জানলা দিয়ে দেখা জীবন-মিছিলের বিচিত্র রূপায়ণের অন্তরঙ্গ কাহিনী। 'ইয়োরোপা' ও 'রাজোয়ারা'র নবতম সঙ্গী। রঙ্গে রসে ব্যঞ্জনায় ও বিন্যাসে নিটোল মধুর ও আশ্চর্যভাবে সার্থক।

রাজোয়ারা (৬ষ্ঠ মুঃ) ৪·০০ ॥ ইয়োরোপা (৭ম মুঃ) ৪·০০ ॥

সমরেশ বসুর আশ্চর্য উপন্যাস

বাঘিনী ৭·০০ ॥

জরাসন্ধের নবতম উপন্যাস

ন্যায়দণ্ড ৬·৫০ ॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মহাশ্বেতা ২য় মুদ্রণ ৫·৫০ ॥

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চলাচল (৯ম মুঃ) ৬·৫০

সৈয়দ মুজতবা আলীর চতুরঙ্গ ৪·৫০ ॥

গঙ্গা ৫ম মুদ্রণ ৫·৫০ ॥

সম্প্রতি এই বইয়ের চিত্রস্বত্ব বিক্রি ঘটেছে

তামসী ৭ম মুদ্রণ ৫·৫০ ॥

'বিষকন্যা' নামে বাংলা ও 'বন্দিনী' নামে হিন্দী ছায়াচিত্রে রূপায়িত হচ্ছে।

সপ্তপদী ১৩শ মুদ্রণ ২·৫০ ॥

ছায়াচিত্রে রূপায়িত হচ্ছে

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

মুখর লণ্ডন (৩য় মুঃ) ২·০০ ॥

প্রদক্ষিণ (২য় মুঃ) ৪·০০ ॥

সুবোধ ঘোষের

একটি নমস্কারে (২য় মুঃ) ৪·০০ ॥

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শ্রেষ্ঠ গল্প (২য় মুঃ) ৫·০০ ॥

বিষের ধোঁয়া (৭ম মুঃ) ২·০০ ॥

রমাপদ চৌধুরীর

পিয়াপসন্দ্ (৫ম মুঃ) ৩·০০ ॥

মুক্তবন্ধ ৩·০০ ॥

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

সূর্যসারথি (৪র্থ মুঃ) ৩·৫০ ॥

তিমির-তীর্থ (৬ষ্ঠ মুঃ) ২·৫০ ॥

অসিধারা (৩য় মুঃ) ৬·৫০ ॥

বাংলা-গল্প বিচিত্রা (৩য় মুঃ) ৪·০০ ॥

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

রায়চৌধুরী ২·০০ ॥

কয়লাকুঠির দেশে ৩·৫০ ॥

নবেন্দু ঘোষের

ডাক দিয়ে যাই (৬ষ্ঠ মুঃ) ৩·০০ ॥

১৩৬৩-এর সেরা গল্প ৪·০০ ॥

বরিস পাস্তেরনাকের উপন্যাস

ডাঃ জিভাগো ১২·৫০ ॥

কবিতার অনুবাদ ও সম্পাদনা :

বুদ্ধদেব বসু

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের প্রখ্যাত গ্রন্থ

সুখের সন্ধানে ৫·০০ ॥

[The Conquest Of Happiness]

অনুবাদ : পরিমল গোস্বামী

[শেষ বই দুটি রূপা অ্যাণ্ড কম্পানির সহযোগিতায় প্রকাশিত]

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো

রবীন্দ্রনাথ

গুণময় মান্না

। রবীন্দ্র রচনার পূর্ণাঙ্গ

মার্কস্‌বাদী বিশ্লেষণ । ৪·৫০

"এই গ্রন্থখানি যাঁহারা পড়িবেন তাঁহারা লেখক স্থানে স্থানে বৃহত্তর সামাজিক পটভূমিকার উপস্থাপনে ও বিশ্লেষণে যে সূক্ষ্ম এবং পরিচ্ছন্ন চিন্তার পরিচয় দিয়াছেন, সাহিত্য ও সঙ্গীতের আকৃতি প্রকৃতির বর্ণনায় ও [illegible] যে নিপুণতার পরিচয় দি[illegible] তাহাকে সশ্রদ্ধভাবে গ্রহণ করিতেই প্রলুব্ধ হইবেন।" —ডাঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

বেঙ্গল পাবলিশার্স । কলিকাতা-১২

যায় না। সংবাদপত্র-লেখকদের মধ্যে ডেমোক্রাটভাবাপন্নদের সংখ্যাধিক্যই তার কারণ অথবা মুখ্য কারণ, এরূপ বলা যায় না। মুখ্য কারণ হল এই যে, মোটের উপর আমেরিকার জনসাধারণের মধ্যে—অতএব সংবাদপত্র পাঠকদের মধ্যেও ডেমোক্রাট পার্টির সমর্থকদের সংখ্যা বেশি। নিজেদের ব্যবসায়ের স্বার্থের খাতিরেই সংবাদপত্র প্রকাশকদের এই কথা মনে রাখতে হয়। ডেমোক্রাটভাবাপন্ন পাঠক যদি দেখে যে, কোনো কাগজে ডেমোক্রাট পার্টির অনুকূল যাবতীয় সংবাদ চাপা দেওয়া হয় অথবা বিকৃতভাবে ছাপা হয় তবে সেই কাগজের প্রতি তার বিতৃষ্ণা না জন্মে পারে না। সেটা কাগজের বৈষয়িক স্বার্থের পক্ষে বিপজ্জনক। অধিকাংশ কাগজ রিপাবলিকান পার্টির সমর্থক মালিকদের হাতে আছে বলে অনেক জায়গায় তাদের একরকম একচেটিয়া বাজার এবং সেজন্য পাঠকদের মতামতের তোয়াক্কা না রাখার ঝোঁক মালিকদের মনে আসতে পারে কিন্তু একচেটিয়া বাজারের খরিদ্দারদেরও চটানো অনেকেই নিরাপদ বলে মনে করে না, কারণ তারা জানেন যে, মতামতের পার্থক্য উপেক্ষা করে যারা কাগজ কিনছে তারা যদি মোটামুটি সত্য খবরও না পায় তবে একচেটিয়া বাজারের ভিত্তি ধসে যেতে দেরি হবে না। বেশির ভাগ কাগজের মালিক এক পার্টির সমর্থক এবং বেশির ভাগ কাগজের পাঠক অন্য পার্টির সমর্থক—সংবাদপত্র জগতে যেখানে এই অবস্থা সেখানে ভারসাম্য রেখে চলতে হলে নানারকম "কম্‌প্রোমাইজ্‌" আপনা থেকেই উদ্ভূত হয়। পাঠকের অধিকাংশ যেখানে বিরুদ্ধমতাবলম্বী সেখানে কাগজের "মতামতের" গুরুত্ব স্বভাবতই কমে আসে, সংবাদ এবং রকমারী "ফীচার"-এর প্রাধান্য বাড়ে। আমেরিকার সংবাদপত্র জগতে সম্পাদকীয় মতামতের তুলনায় "কলাম্‌-নিস্ট"দের মতামতের প্রভাব যে বেড়েছে এবং বাড়ছে তার এও একটা কারণ। মালিকের রাজনৈতিক মত বা কাগজের অফিশিয়াল রাজনৈতিক মত যাই হোক না কেন, সাধারণত "কলাম্‌নিস্ট"-এর যে-কোনো রাজনৈতিক মতের সমর্থন করার স্বাধীনতা থাকে। অনেক সময়ে একই "কলাম" বহু কাগজে বেরোয় যাদের নিজেদের মধ্যে রাজনৈতিক মতের ঐক্য নেই। এটাকেও পরস্পরবিরুদ্ধ মতাবলম্বী সংবাদপত্রের মালিক ও পাঠকের মধ্যে একধরনের "কম্‌প্রোমাইজ্‌" বলা যেতে পারে। রাজনৈতিক মতের দিক দিয়ে অত্যন্ত "রিঅ্যাক্‌শনারী" আমেরিকান কাগজেও তথ্য পরিবেশনের দিক দিয়ে অনেক সময়ে যে-প্রশংসনীয় যোগ্যতা দেখা যায় তারও মূলে হয়ত এই একই কারণ রয়েছে।

যাই হোক, যা বলছিলাম—কোনো রিপাবলিকান কাগজেও এখন পর্যন্ত মিঃ নিক্‌সন-এর জয়ের আশা জোরের সঙ্গে ব্যক্ত করতে সাহসী হন নি। আমেরিকার ভোটদাতাদের মধ্যে ডেমোক্রাট পার্টির সমর্থকদের একটা স্থায়ী সংখ্যাধিক্য দাঁড়িয়ে গেছে। এখন কোনো রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থীর পক্ষে বেশ কিছু ডেমোক্রাট ভোট না পেলে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়া সম্ভব নয় (আর হতে পারে যদি বহুসংখ্যক ডেমোক্রাট নির্বাচন দ্বন্দ্বের প্রতি উদাসীন থেকে ভোটই না দেয়)। তার অর্থ তাঁর এমন ব্যক্তিগত আকর্ষণী শক্তি চাই যাতে অন্য দলের অনেক ভোটারও তাঁকে সমর্থন করবে, যেমন জেনারেল আইজেনহাওয়ারের বেলায় হয়েছিল। এরূপ সম্ভব হবার [illegible] একটা কারণ আছে। সেটা হচ্ছে [illegible] আমেরিকার কোনো পার্টির মধ্যে [illegible] একভাবাপন্ন নয়। অনেক [illegible]

ঃ নূতন বই ঃ

শেফালি নন্দীর

সিস্টার মিস্‌ মিত্র ৩·৫০

(একটি নার্সের জীবন সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে লেখা উপন্যাস)

——— অন্যান্য বই ———

উপন্যাস :—

রোদ জল ঝড়
দক্ষিণারঞ্জন বসু - ৪·৫০

সাগরে হাওরে
শেফালি নন্দী - ৩·৫০

ডিকম নদীর দলং
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ২·২৫

ইভান ইভানোভিচ
কপতায়েভা - - ৪·০০

সেই পুরাতন কথা
গনচারভ - - ৩·৫০

কেরালার গল্পগুচ্ছ
বিশ্বনাথম - - ২·৫০

ভ্রমণ :—

ইন্দোচীনের কথা
অজিতকুমার তারণ - ২·৫০

সন্ধানীর চোখে পশ্চিম
শেফালি নন্দী - ২·৭৫

গীতিমুখর ভিয়েনা
শেফালি নন্দী - ২·০০

পান্নাদ্বীপ ঐ ১·০০

প্রবন্ধ, ইতিহাস :—

সাহিত্যের সমস্যা
নারায়ণ চৌধুরী - ৩·০০

ইয়োরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা
ডাঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য ৪·০০

ভারতের মুক্তি সন্ধানী
যোগেশ বাগল - ৫·০০

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম
অশোক গুহ - ২·০০

ঊনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য
ত্রিপুরাশঙ্কর সেন - ৫·০০

গ্রহ থেকে গ্রহে
স্তার্নফেলদ্‌ - - ১·৫০

স্মৃতি চিত্র—গর্কি ৪·০০

ছেড়ে আসা গ্রাম (২য় খণ্ড)
দক্ষিণারঞ্জন বসু - ৩·৫০

নাটক :—

ছায়ানট—উৎপল দত্ত ২·৫০

অঙ্গার— ঐ ৩·২৫

পপুলার লাইব্রেরী

১৯৫।১বি কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

আছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক মতামতে অনেক "রিপাব্লিকান"এর চেয়ে অনুদার এবং সেরূপ এর বিপরীতটাও সত্য। তা না'হলে কোনো রিপাব্লিকানের পক্ষে এখন আর আমেরিকায় প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হওয়া সম্ভব হত না।

এইজন্যই এ ব্যাপারে প্রার্থীর ভোটারদের উপর ব্যক্তিত্বের প্রভাব কীরূপ পড়ে, তার উপর ফলাফল অনেকটা নির্ভর করে। সে বিষয়ে মিঃ নিক্‌সন-এর চেয়ে মিঃ কেনেডী বেশি সুবিধা করতে পারছেন বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। সাক্ষাৎভাবে সভা প্রভৃতিতে বা টেলিভিশনে মিঃ কেনেডী অধিকতর বন্ধুভাব এবং উৎসাহ সঞ্চার করতে নাকি পারছেন। এখানে একটা কথার উল্লেখ করা যায়। মিঃ কেনেডী ধনীর সন্তান, প্রাচুর্যের মধ্যে তিনি লালিত পালিত হয়েছেন। মিঃ নিক্‌সন দারিদ্রের সন্তান। বাল্যকালে কীভাবে বৈষয়িক অসচ্ছলতার সংগে তাঁদের পরিবারকে লড়াই করতে হয়েছে, তার কাহিনী মিঃ নিক্‌সন মাঝে মাঝে ভোটারদের শুনিয়েছেন। কিন্তু তাতে ভোটারদের মনের উপর যে বিশেষ কোনো প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছে, তার নাকি কোনো প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। কষ্ট করে দারিদ্র্যের সংগে যুদ্ধ করে কেউ বড়ো হয়েছে, একথা শুনলে আগেকার দিনে আমেরিকান মনে সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার ভাব জাগত, এখন বোধহয় আর জাগে না। দারিদ্র্যের ছবি মনে আনতেও বোধহয় এখন আমেরিকান-দের ভালো লাগে না। যাই হোক, ব্যক্তিগত আকর্ষণের দিক দিয়ে মিঃ কেনেডীর কাছে মিঃ নিক্‌সনকে বোধহয় হঠতে হয়েছে। অবশ্য এখানে মিঃ কেনেডীর পক্ষে একটা আশঙ্কার ব্যাপার আছে। তিনি ক্যাথলিক, বেশির ভাগ লোকের নিকট সেটা তাঁর বিরুদ্ধে না গেলেও কিছু ক্যাথলিক-বিরোধী ভোট যে মিঃ নিক্‌সনের পক্ষে যাবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তার পরিমাণ কী হবে বলা যায় না।

নীতি নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে যে-বিতর্ক চলছে, তাতে মিঃ কেনেডীর যতটা সুবিধা করতে পারার কথা ছিল, ততটা করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। কারণ বিতর্কে অনেক সময়েই উভয় পক্ষই মূল প্রশ্ন সব এড়িয়ে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন ব্যাপার নিয়ে পড়েছেন। তাতে, বিশেষ করে আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কিত তর্কে মিঃ নিক্‌সনের কিছু সুবিধা হয়েছে, কারণ তর্কটা এমনভাবে চলেছে, যাতে শ্রোতাদের মনে হবে যে, রিপাবলিকান পার্টির নীতির লক্ষ্যের মধ্যে কোনো ভুল ছিল না। মিঃ কেনেডী নির্বাচিত হলে তাঁর গভর্নমেণ্টের নীতিরও ঐ লক্ষ্যই হবে—সেটা হচ্ছে আমেরিকার শক্তি বাড়িয়ে যাওয়া, যাতে সোভিয়েটের তুলনায় সেটা কম না হয়। এ বিষয়ে মিঃ ক্রুশ্চভ বোধহয় মিঃ নিক্‌সনকে কিছু সাহায্যই করছেন—নিশ্চয়ই ইচ্ছা করে নয়। সম্প্রতি কিছুকাল ধরে মিঃ ক্রুশ্চভের বাক্য ব্যবহারে রাশিয়ার শক্তির দিকটাই এতো বেশি প্রতিফলিত হয়েছে যে, আমেরিকানদের মনে সেই কথাটাই—রুশ শক্তির বিরুদ্ধে আমেরিকান শক্তির কথাটাই—মুখ্য হয়ে রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিক্‌সন-কেনেডী বিতর্ক স্বভাবতই একপেশে হয়ে গেছে। রিপাবলিকান গভর্নমেণ্টের নীতি আমেরিকার সামরিক শক্তি বাড়াবার দিকে লক্ষ্য রেখে চলেছে—মিঃ কেনেডীর পক্ষে মার্কিন জনমতের বর্তমান অবস্থায় মিঃ নিক্‌সন-এর একথার প্রতিবাদ করা অথবা এই নীতিকে ভুল বলা অত্যন্ত কঠিন। মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি অন্য দিক দিয়ে যেখানে যেখানে বিফল হয়েছে, এই গোলমালের মধ্যে সেগুলির কথাও বিতর্কে মিঃ কেনেডী সুস্পষ্ট করে তুলতে পারেন নি। সুতরাং ডেমোক্রাটিকদের কোনো উন্নততর বিকল্প পররাষ্ট্র নীতি আছে, একথা সাধারণ শ্রোতার বোধ হবে না।

কিন্তু সামরিক শক্তির আকর্ষণ যতই থাক, সাধারণ আমেরিকাবাসী নিশ্চয়ই অনুভব করে যে, মার্কিন গভর্নমেণ্টের গত অক্টোবরের পররাষ্ট্র নীতির একটা বড়ো এবং মৌলিক বিফলতার দিক আছে। নির্বাচনী বিতর্কে যে যাই বলুক বা বলতে পারেন, অনেকে অবশ্য এই আশাও করেছে যে, আমেরিকায় ডেমোক্রাট প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হলে নূতন কিছু হবে। আমেরিকার যে-নেতৃত্ব এখন আবশ্যক, সেটা ডেমোক্রাট পার্টির কাছ থেকেই আসতে পারে। তাছাড়া মিঃ নিক্‌সন যদি প্রেসিডেণ্ট হনও, তাহলেও তাঁর পক্ষে সুষ্ঠুভাবে, নিশ্চিন্তে জোরের সহিত কাজ চালানো সম্ভব হবে না, কারণ কংগ্রেসের উভয় পরিষদেই রিপাবলিকানরা সংখ্যালঘু। এই সময়ে যে ক'টি কংগ্রেস সদস্য নির্বাচন হচ্ছে, তার ফলেও রিপাবলিকানদের সংখ্যালঘুতা আরো বাড়ারই সম্ভাবনা।

সব মিলে সংবাদ মিঃ কেনেডীর সাফল্যের সূচক বলেই মনে হয়। কিন্তু এই সব জেনেও এক জ্যোতিষী আজকের একখানা খবরের কাগজে লিখেছেন যে, তিনি দুই প্রার্থীর কোষ্ঠী বিচার করে দেখেছেন যে, মিঃ কেনেডীর চেয়ে মিঃ নিক্‌সন-এর 'রাজযোগ' প্রবলতর। জ্যোতিষী মশায়ের কথার উপর নির্ভর করে আমার অন্তত মিঃ নিক্‌সন-এর জয়ের উপর বাজী রাখতে সাহস হয় না।

৬।১১।৬০

॥ ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ॥

হিন্দু-সাধনা

বিখ্যাত গ্রন্থ 'Hindu view of Life'-এর সরস বঙ্গানুবাদ।
অনুবাদিকা : শ্রীস্বর্ণপ্রভা সেন। মূল্য : তিন টাকা।

॥ ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী ॥

ভারত-জিজ্ঞাসা

ভারত আত্মার বাঙ্ময় প্রকাশ। ভারত সংস্কৃতির রূপান্তরে বিভিন্ন মনীষীর জীবনাদর্শের প্রভাব সম্পর্কে সুচিন্তিত আলোচনা। মূল্য : তিন টাকা।

মনোবিদ্যা ও দৈনন্দিন জীবন

প্রাত্যহিক জীবনে মনোবিদ্যার প্রয়োগ করে জীবনকে সর্বাঙ্গসুন্দর ও সার্থক করে গড়ে তোলার সুস্পষ্ট পন্থা-নির্দেশ দিয়েছেন সুপণ্ডিত সেন-শাস্ত্রী মহাশয়।
মূল্য : আড়াই টাকা।

১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯ ॥ জিজ্ঞাসা ॥ ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল

আরোগ্য করিতে ২৭ বৎসর ভারত ও ইউরোপ অভিজ্ঞ ডাক্তার ডিগোর সহিত প্রতিদিন প্রাতে ও প্রতি শনিবার, রবিবার বৈকাল ৩টা হইতে ৭টায় সাক্ষাৎ করুন। ৩বি, জনক রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা—২৯। (সি ৯২১৩)

আলোচনা

অতি আধুনিক ছোট গল্প

(১)

সবিনয় নিবেদন,

'দেশ' পত্রিকায় (১২ কার্তিক, ১৩৬৭) প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বিমল বসু মহাশয়ের চিঠিটি পড়লাম। বাংলা সাহিত্যের পাঠক হিসেবে সব রকম অভিমত প্রকাশের অধিকার তাঁর আছে। সেক্ষেত্রে আমার কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু বিমলবাবু যখন দাবি জানিয়ে বলেন, 'এ বিষয়ের ওপর আমার যা বক্তব্য তা বেশীর ভাগ সাধারণ পাঠকগোষ্ঠীর মনের কথা বলেই আমার ধারণা'—তখনই আমার বিনীত জিজ্ঞাসা থেকে যায় এই 'সাধারণ' শব্দটির যথার্থ অভিধা কি? আমি অসাধারণ পাঠিকা নই। তবু সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পের নতুনতর পদক্ষেপ প্রসংগে বিমলবাবু যে প্রশ্নগুলি উপস্থিত করেছেন, সে প্রসংগে আমার কয়েকটি বক্তব্য জানাতে চাই।

সাহিত্যের কোন শাখাই চিরকাল একই খাতে বইতে পারে না। নিতান্ত প্রয়োজনেই তাকে পথ বদল করতে হয়। বিবর্তিত মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে এই 'প্রয়োজনটা' প্রথম অনুভব করেন লেখক। কারণ চলতি জীবনের মধ্য থেকে এটাই তার আবিষ্কার। কিন্তু পরিচিত পথ থেকে হঠাৎ এই বিচ্যুতি পাঠককে প্রথম একটু চমকে দেয়। সে আপত্তি করে, কিন্তু বুঝতে পারে না, এছাড়া উপায় নেই। কবির নায়িকা কবির কাছে কবিতা দাবি করেন কিন্তু কবির কবিতা নায়িকার দুয়ারে যাচে 'নম্র চোখের কম্প্র কাজল রেখা'। লেখকের সাথে পাঠকের সম্পর্ক তাই। লেখক যে সমাজ এবং জীবন থেকে তার রচনার উপকরণ সংগ্রহ করছেন পাঠক তো সেই সমাজেরই মানুষ, সে তো তাদেরই জীবন। লেখক পাঠককে দেখছেন, কিন্তু মুশকিল এই পাঠক নিজেকে দেখছেন না। আরশি তুলে ধরার পরও না। পাঠক যদি সাহিত্যে-কাব্যে হাসি আর উল্লাস চান তবে সাহিত্যিকের সামনে যে তাকেই হাসতে হবে, বলতে হবে আমি সুখী। নইলে শোকে-দুঃখে অনুতাপে পীড়িত সমাজে 'আনন্দ দাও' বলে দাবি জানালে ঈশ্বরের কাছে ভক্তের আকুতির মতো শোনাবে। কিন্তু কবি-সাহিত্যিকরা আর যাই হোন, ঈশ্বর নন। নিষ্ঠায় সততা রাখতে হলে তাদের সত্যবাদী হতে হবে। অধুনা সমাজের যা অকৃত্রিম রূপ, তাঁরা তারই ছবি আঁকবেন। পাঠকের আবদার রাখতে হলে বানানো কথা বলবেন, যা নেই তার কথা, যা দুর্লভ তার কাহিনী; সেটা দিদিমাদের রূপকথা। অবশ্য রূপকথা সাহিত্য নয়, এমন কথা বলছি না। তবে সব সাহিত্যই তো রূপকথা নয়।

বিমলবাবু সম্প্রতিকালের অতি তরুণ গল্প লেখকদের সাহিত্য সাধনার প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়ে এই অভিযোগ এনেছেন যে, গল্পগুলির 'বক্তব্যের অস্পষ্টতা ভাবের বিচ্ছিন্নতা' তাঁকে পীড়িত করে। কিন্তু আমি অকপটে স্বীকার করছি, হাল আমলের বেশ কিছু ভাল গল্প পড়ার আনন্দ আমি পেয়েছি এবং এজন্য কয়েকজন তরুণ গল্প-লেখককে ও 'দেশ' পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বিমলবাবু বলেছেন, 'অতি আধুনিক এই সমস্ত মনস্তত্ত্বমূলক গল্প কি আমাদের আশানুরূপ আনন্দ জোগাতে পারছে?' আগেই বলেছি, এ জাতীয় আনন্দের স্বরূপ আমি জানি না। পত্রলেখক আরও বলেছেন, 'আমরা জটিল মনস্তত্ত্ব চাই না। মানসিক অন্ধিসন্ধির খবর আমরা চাই না।' এটাই কি যোগ্য পাঠকের উক্তি। তিনি কি আশা করেন লেখক তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য গল্প সাজাবেন। পাঠকের দায়িত্ব তো দাবি জানানো নয়, লেখকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে একাত্ম হবার চেষ্টা করা, উপলব্ধি করা, লেখকের বক্তব্যকে বিচার করা। ভাল না লাগলে ছাপার হরফে দ্বিতীয়বার সে লেখকের নাম দেখলে তাকে সযত্নে পরিহার করা। পত্রলেখক জানিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথ এবং তার পরবর্তী যুগের ছোটগল্পের শীর্ষস্থানীয়দের বহু গল্পই তিনি পড়েছেন এবং কৃতার্থ হয়েছেন। জানি না, আমাদের সেসব বরেণ্য লেখকদের রচনায় এমন কি লেখা তিনি পেলেন যেখানে 'জটিল মনস্তত্ত্ব নেই, মানসিক অন্ধিসন্ধির' খবর নেই

শেলটক্স কাকে বলে?

ডিস্ট্রিবিউটর:
সিটি ভ্যারাইটি স্টোর্স
২১২ মহাত্মা গান্ধী
রোড, কলিকাতা-৭

শেলটক্স হচ্ছে একটি তীব্র কীটনাশক বস্তু যার মধ্যে দুটি অপূর্ব্ব গুণ রয়েছে: প্রথমতঃ এর সংস্পর্শমাত্র কীট নির্জীব হয়ে পড়ে এবং মারা যায়। দ্বিতীয়তঃ এ ছড়ানোর পরেও অনেকদিন পর্য্যন্ত কীট ধ্বংস করতে পারে।

আজই এক টিন শেলটক্স কিনুন এবং মৃত কীট ঝেঁটিয়ে ফেলার জন্যে তৈরী থাকুন।

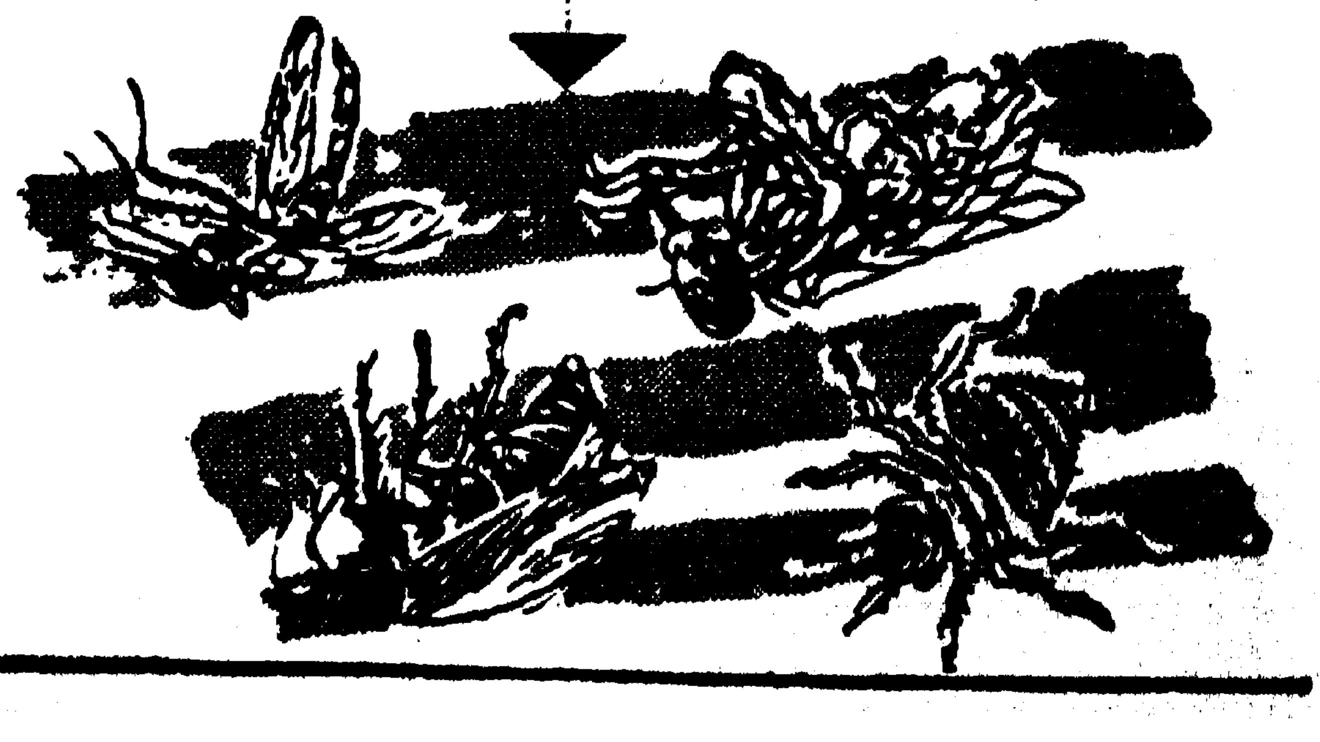

বিমলবাবুর চিঠির আরও একটি যুক্তি আমার কাছে খুব হাস্যকর ঠেকল—"জীবন যেখানে দিন দিন জটিলতায় পাকে জড়িয়ে পড়ছে, সাহিত্যকে সেখানে সহজ হতে হবে।"

পরিশেষে, আমি আমার প্রিয় লেখকদের কাছে এবং তাঁদের রচনার প্রকাশক ও উৎসাহদাতা হিসেবে আপনার কাছে একটি অনুরোধ জানাব। এটুকু জানি, তাঁদের নতুন উদ্যমে মিষ্টার খাদ নেই। তাঁদের চলতে দেওয়া হোক। তারা গল্প লিখেই তাঁদের বক্তব্য প্রমাণ করবেন। শ্রীযুক্ত বিমল বসুর বিচক্ষণতায় সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা জানিয়েই বলছি—আমাদের তরুণ লেখকদের বিরুদ্ধে যে বিরূপ সমালোচনা সৃষ্টি হয়েছে সে-সমালোচনা এখন পর্যন্ত কোন system পায়নি। অন্তত আরও কিছুদিন অপেক্ষা ক'রে হাল-আমলের বিদেশী সাহিত্যের সচেতন পাঠকরা আমাদের তরুণ লেখকদের অনুধাবনের চেষ্টা করুন। দোষ-ত্রুটি হয়তো তাঁদের আছে, কিন্তু যথার্থ সমালোচকের ভূমিকা নিয়ে তাঁদের পথ দেখানো এক কথা, আর বৈশাখ মাসের অনাবৃষ্টির আকাশের দিকে তাকিয়ে ফসলের ফলন সম্বন্ধে হতাশা বোধ করা অন্য কথা। আষাঢ় আসুক। সমাজ সচেতন সাহিত্য শুধু সচেতন লেখকের ওপর নির্ভর করে না, সে দায়িত্ব অনেকখানি পাঠকের। আপনি সেই সচেতন পাঠক তৈরি করুন। নমস্কারান্তে।

বিনীতা আয়েষা দেবী। কলকাতা-৬।

(২)

মহাশয়,

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রকাশিত (বিশেষত 'দেশ' পত্রিকায়) সমসাময়িক ছোট গল্পের পর্যালোচনায় এই কথাই স্পষ্ট স্বীকৃত যে, বাংলা ছোট গল্প কাব্যধর্মী; ইহা মনস্তত্ত্বের প্রবন্ধ নয়। গল্প পাঠে আনন্দ পাওয়ার মধ্যে পাঠকের মানসিক শক্তি কাজ করে। আধুনিক কবিতার অস্পষ্টতা এবং প্রভূত প্রতীকধর্মীতার বিষয়ে যথেষ্ট সমালোচনা হইয়াছে। আর অতি আধুনিক ছোটগল্পের একটি বিশেষ ধারা আজ সেই সমালোচনার পথে। গদ্য কাব্যের প্রবাহ এবং প্রতীকের কুয়াশা মাখা গল্পের অস্পষ্টতা রসাস্বাদনের পক্ষে অসুবিধা সৃষ্টি করে কিনা তাহা বিবেচ্য। মনে হয়, গল্প যদি সত্য গল্প হয় তবে মনস্তত্ত্ব অথবা প্রতীকের ব্যবহারেও তাহা সুপাঠ্য ও আনন্দদায়ক গল্প হইতে পারে। আবার সাধারণ ভাব ও ভাষার লিখিত গল্পও অপাঠ্য হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্তও যথেষ্ট আছে।

এইটুকু বলা যায় যে, অতি আধুনিক ছোটগল্পের গতি ও প্রকৃতি সময়ের সঙ্গে সমপদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে এবং এই প্রবাহকে সমাদরে অভিনন্দিত করা আমাদের প্রয়োজন। অস্পষ্টতা ও বিচ্ছিন্নতাই যদি বর্তমান হয় তবে বর্তমানকে বাদ দিয়া অতীতকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা কেন?

নমস্কার। ইতি—শান্তিভূষণ রায়

কলিকাতা—২৬

(৩)

সবিনয় নিবেদন,

সাহিত্য সম্পর্কিত যে কোন আলোচনার শুরুতে দুটি কথা স্মর্তব্য—সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে সাহিত্য সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেমন অনুচিত, তেমনি সেই সিদ্ধান্তকে খোলা চিঠির সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রকাশ করে সাধারণের গোচরে আনা কিয়ৎ পরিমাণে নিরর্থক। কারণ সাহিত্য সম্পর্কে যে কোন মতামত প্রকাশ করতে হলে বহু তত্ত্ব ও তথ্যের উল্লেখ প্রয়োজন। আর সাহিত্যের ক্ষেত্রে এখন অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে—তার ফলাফলটুকু না দেখে সে সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় নয়। যদিও স্বীকার করতে দ্বিধা স্বল্পই যে ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করবার অধিকার সকলেরই আছে। এবং এই সুযোগটুকু দেবার জন্য আপনারা ধন্যবাদার্হ। আর অতি আধুনিক ছোট-গল্প শীর্ষক পত্রটির লেখকও।

সাধারণ পাঠক হিসাবে স্বীকার করতে আমিও অপারগ নই যে, অতি আধুনিক ছোটগল্প সত্যিই কষ্টবোধ্য। নায়কের চিন্তাধারার বিবরণ, তার মনের বিচিত্র বাসনা-কামনার ধারাবাহিক বিবরণী তাঁরা লিপিবদ্ধ করেন ছোটগল্পে। কিন্তু শুধুমাত্র গীতি কবিতার কাঠামোতে রূপ দেবার চেষ্টা নয়—গল্প লেখার প্রচলিত রীতিকে ত্যাগ করে মানুষের মনোজগতের গভীরে নেমে সেখান থেকে মানিক তুলে হার গাঁথবার চেষ্টা করছেন আধুনিক ছোটগল্পকাররা।

তবু এ রীতির বিরুদ্ধে বাক্য উচ্চারিত হচ্ছে সম্ভবত দুটো কারণে: প্রথমত—এ রীতির সাথে অপরিচয় জনিত বাধা, দ্বিতীয়ত, আমার মনে হয়, কিছু লেখকরা যেসব চরিত্রের ছবি আঁকেন তাদের সাথেই তারা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত নন। ফলে লেখকদের মনের কথা রূপ পরিগ্রহ করছে চরিত্রগুলোর মনের কথায়। গল্পগুলো নিতান্ত ব্যক্তিগত হয়ে পড়ছে।

আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে যে অভিযোগের বাক্য উচ্চারিত হয়েছিল, অতি আধুনিক ছোটগল্পের বিরুদ্ধেও সেই বাক্যই সামান্য পরিবর্তন করে উচ্চারণ করছেন সাধারণ পাঠকেরা।

তবু সাহিত্য রসিক মাত্রেরই ছোটগল্প লেখার এই নতুন রীতিকে সমর্থন করা উচিত এবং এই রীতির স্বপক্ষে আর একটি কথা বলতে গেলেই পত্রলেখক

মনোজ দত্ত সম্পাদিত

সানাই

কার্তিক সংখ্যা বেরুবে
১৫ই নভেম্বর
দাম এক টাকা মাত্র

● এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ ●
স্বনামখ্যাত কথাশিল্পী
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সম্পূর্ণ উপন্যাস
দুই তীর, এক নদী

আর যা যা থাকবে
মনোজ দত্ত'র একটি প্রবন্ধ, চিত্রগুপ্তের বিচিত্র মানুষ, বিচিত্র পেশা, প্রফুল্ল বসুর দেশ বিদেশের দুর্ঘটনার কাহিনী, অমলেন্দু বসুর বন্ধে থেকে বলছি, হেমেন মিত্রর স্টুডিওর খবর বলছি প্রভৃতি
সানাই-এর সমস্ত নিয়মিত বিভাগ
ও অজস্র ছবি

● অঘ্রাণ সংখ্যায় থাকবে ●
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
সম্পূর্ণ উপন্যাস
উন্মোচন

পরিচালনায়:
প্রফুল্লকুমার বসু
স্বত্বাধিকারী
দি ম্যাগাজিন সিন্ডিকেট
২০৩।৪, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট,
কলকাতা-৬।

(সি ৯১৯৫)

বিমল বসুর একটি স্ববিরোধী কথার প্রতিবাদ করতে হয়।

তিনি লিখেছেন, "জীবন যেখানে দিন দিন জটিলতার পাকে জড়িয়ে পড়ছে, সাহিত্যকে সেখানে সহজ হতে হবে।"

মানুষের কথা বলাই সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য। জীবন যেখানে জটিল হয়েছে—তাকে পয়ার ছন্দের সরলতায় বাঁধব কি করে?

জটিল জীবনটার কথা বলবার জন্য নতুন পথ, নতুন রীতির আশ্রয় নিতেই হবে। নতুন যুগের সাহিত্যের রসাস্বাদন করতে হলে সাধারণ পাঠক তার মনকে তার জন্য প্রস্তুত করে নেবেন বই কি!

নমস্কারান্তে। উৎপল চক্রবর্তী; বাণীপুর।

সহশিক্ষা ও জাতীয় উন্নতি

সবিনয় নিবেদন,

'দেশ' পত্রিকায় (৫০ সংখ্যা) শ্রীঅমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'সহশিক্ষা ও জাতীয় উন্নতি' প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। বর্তমান শিক্ষাধারার প্রগতির পথে কি কি বাধা আজ সম্মুখীন তাহা শ্রীমুখোপাধ্যায় অতি সুন্দরভাবে প্রবন্ধাকারে ব্যক্ত করিয়াছেন।

'সহশিক্ষা' শিক্ষাধারার মূল উৎস। প্রত্যেক কলেজেই আজকে ছেলে মেয়ে উভয়কেই সহজভাবে মেলামেশা করিতে দেওয়া হয়। তবুও জাতীয় উন্নতির পথ রুদ্ধ হইতেছে। লেখক ছাত্রছাত্রীদের এর জন্য দোষারোপ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চিন্তা করা উচিত ছিল আজকের সমাজে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে সমানভাবে মেলামেশা সম্ভব নয়। যে শিক্ষাধারা বিশ্ববিদ্যালয় উভয় শ্রেণীর উপর আরোপ করিয়াছেন, তাহাতে ছাত্রছাত্রীদের মেলামেশা একটু দৃষ্টিকটু লাগিবে। আমি জানি আমাদের কলেজে ছাত্ররা মেয়েদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন নয়। অজান্তে একটা আকর্ষণ তাহাদের মনকে পীড়া দেয়। তবে ইহাও ঠিক যে, কলিকাতার সহশিক্ষা কলেজগুলি সম্পূর্ণ সুযোগ সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে বহু অসামাজিক ব্যাপার ঘটে। এর জন্য দায়ী ছাত্রছাত্রীরা নয়।

শ্রীমুখোপাধ্যায় বর্তমান সমাজের নীতি সম্বন্ধে আংশিক অজ্ঞ। তিনি হয়তো জানেন না ছাত্রছাত্রীরা যে-কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে মিশিবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাড়ির অভিভাবকের শ্যেন দৃষ্টি, বন্ধু-বান্ধবের ব্যঙ্গোক্তি আর সমাজের নগ্নতা তাহাদের অনুষ্ঠানকে পঙ্গু করিয়া দেয়। যেমন কোন ছাত্র যদি সহপাঠিনীর সংগে শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনায় রত থাকে, বহুজনের ধারণা হয়, তাহারা প্রেমালাপ করিতেছে। এই ক্ষেত্রে কে দোষী? ছাত্রছাত্রী না শিক্ষার ধারা বা শিক্ষাসমাজ।

সহশিক্ষা জাতীয় উন্নতির সহায়ক তথাপি বর্তমান শিক্ষার সংগে রাষ্ট্রের উন্নতির সামঞ্জস্য কম। কর্তৃপক্ষরা মনে করেন বৎসরে ১ লক্ষ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই দেশের উন্নতি হইবে। কিন্তু ইহা কি সত্য?

অমলবাবু তাঁহার প্রবন্ধে কয়েকটি মূল্যবান কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতামত বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রহণ করা উচিত। জাতীয় শিক্ষা না হইলে আমাদের দেশ, আমাদের দেশের যুবকযুবতী অচিরে ধ্বংস হইয়া যাইবে। লেখক বলিয়াছেন, যে যুবক নিতান্ত বাড়ির কয়েকজন আত্মীয় ছাড়া অন্য কোন মেয়ের সংগে আলাপ করা বা পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়নি, কর্মক্ষেত্রে তার সহকর্মিণীর প্রতি একটি বিশেষ দুর্বলতা পোষণ অস্বাভাবিক কিছুই নয়।" কথাটা সত্যি বটে। কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক যুবক তাহাদের সহকর্মিণীদের উপর দুর্বলতা পোষণ করে।

'সহশিক্ষা'র ব্যাপকতা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। ছাত্রছাত্রীরা দোষ করে বটে কিন্তু শিক্ষার প্রগতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশোধনের ফলে তাহা পরিবর্তিত হইতে পারে। ইতি—

[illegible]
[illegible]

শিশু-মনস্তত্ত্বের নতুন বই।
অসীম বর্ধনের
অবাঞ্ছিত শিশু
প্রত্যেক পিতামাতা অবশ্যই পড়বেন
দাম: ৪
এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজার্স
৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯
(সি ৯১৬৯)

ডঃ কার্তিক বসুর
টাইকোসোডা — অম্ল, অজীর্ণ ও ডিসপেপসিয়ায়
নানালা — ব্যথা ও বেদনায়
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ - কলিকাতা ৯

অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন বিশ্ববিখ্যাত ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ
তান্ত্রিক ও জ্যোতির্বিদ
জ্যোতিষ-সম্রাট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য জ্যোতিষার্ণব
এম-আর-এ-এস (লন্ডন), প্রেসিডেন্ট অল ইন্ডিয়া এস্ট্রোলজিক্যাল এন্ড এস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটী (স্থাপিত ১৯০৭ খৃঃ)। ইনি দেখিবামাত্র মানব-জীবনের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান
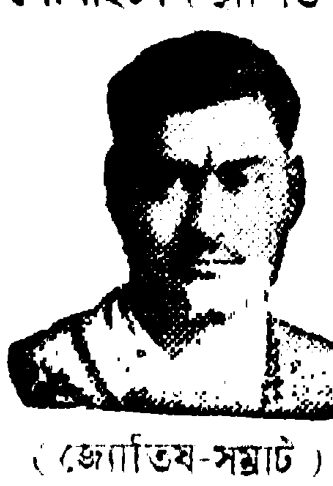
(জ্যোতিষ-সম্রাট)
নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। হস্ত ও কপালের রেখা, কোষ্ঠী বিচার ও প্রস্তুত এবং অশুভ ও দুষ্ট গ্রহাদির প্রতিকারকল্পে শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি তান্ত্রিক ক্রিয়াদি ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কবচাদির অত্যাশ্চর্য শক্তি পৃথিবীর সর্বশ্রেণী (আমেরিকা, ইংলন্ড, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর, হংকং, জাভা প্রভৃতির জনগণ) কর্তৃক অযাচিতভাবে উচ্চপ্রশংসিত। লক্ষ লক্ষ স্থলে পরীক্ষিত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েকটি অত্যাশ্চর্য কবচ। ধনদা কবচ—ধারণে স্বল্পায়াসে প্রভূত ধনলাভ, মানসিক শান্তি, প্রতিষ্ঠা ও মান বৃদ্ধি হয় (সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতি ও লক্ষ্মীর কৃপালাভের জন্য প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কর্তব্য)। (তন্ত্রোক্ত) সাধারণ—ব্যয়—৭৷৷৵০, শক্তিশালী বৃহৎ—২৯৷৷৵০, মহাশক্তিশালী ও সত্বর ফলদায়ক—১২৯৷৷৵০; সরস্বতী কবচ—স্মরণশক্তি বৃদ্ধি ও পরীক্ষায় সুফল—৯৷৷/০, বৃহৎ—৩৮৷৷/০; মোহিনী কবচ—ধারণে চিরশত্রুও মিত্র হয়। ব্যয়—১১৷৷০, বৃহৎ—৩৪৵০, মহাশক্তিশালী—৩৮৭৸৵০; বগলামুখী কবচ—ধারণে অভিলষিত কর্মোন্নতি, উপরিস্থ মনিবকে সন্তুষ্ট ও সর্বপ্রকার মামলায় জয়লাভ এবং প্রবল শত্রুনাশ। ব্যয়—৯৵০, বৃহৎ শক্তিশালী—৩৪৵০, মহাশক্তিশালী—১৮৪৷০ (এই কবচে ভাওয়াল সন্ন্যাসী জয়ী হইয়াছেন)। প্রশংসাপত্রসহ ক্যাটালগের জন্য লিখুন। হেড অফিস—৫০-২(দ), ধর্মতলা স্ট্রীট (প্রবেশপথ ওয়েলেসলী স্ট্রীট), 'জ্যোতিষ-সম্রাট ভবন', কলিকাতা-১৩। ফোন: ২৪-৪০৬৫। বেলা ৪টা—৭টা। ব্রাঞ্চ অফিস—১০৫, গ্রে স্ট্রীট, "বসন্ত নিবাস", কলিকাতা-৫। প্রাতে ৯টা—১১টা। ফোন: ৫৫-৩৬৮৫।

Cooch Behar

॥ পত্রাবলী ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

ওঁ ॥ ৬ ॥

কল্যাণীয়াসু,

রাণী, আমরা ছিলুম অস্তসূর্যের শেষ আলোয়, তোমরা ছিলে ঘাটের ছায়ায় দাঁড়িয়ে। ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে এলো, ক্রমে আড়াল পড়লো, বস্তুর আড়াল। ফিরলুম সেই ক্যাবিনে মনে পড়ে ক্যাবিনটা? মনে রাখবার মতো কিছুই না, দুদিনের বাসা। যেখানে আমরা পাকা করে বাসা বাঁধি সেখানে বাসার সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধস্মৃতি জড়িয়ে যায়—কিন্তু পথে চলতে চলতে পান্থশালার সঙ্গে কোনো গ্রন্থি বাঁধে না—স্রোতের শৈবাল যেমন নদীর বাঁকে বাঁকে ক্ষণকালের জন্যে ঠেকতে ঠেকতে যায় তেমনি আর কি। তবু পথিক-জীবনের পথচলা প্রবাহের মধ্যেও অনেক কথা মনের মধ্যে জড়িয়ে থাকে। প্রতিদিন তুমি নিজের হাতে সেবা যত্ন করেছিলে—কখন আমি কি পারি কখন আমার কি চাই সমস্ত তুমি জেনে নিয়েছিলে। তারপরে পথে পথে সমস্ত জিনিসপত্র তোমার হাতে বাঁধা আর খোলা। এ সবগুলো অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল—সেই অভ্যেসটা একদিনের মধ্যেই হঠাৎ আপন ছয়মাসব্যাপী প্রতিদিনের দাবী থেকে বঞ্চিত হয়ে বিমর্ষ হয়ে পড়ে।

এখনও প্রায় তিন হপ্তার পথ বাকী আছে। তারপরে শান্তিনিকেতন। আমার কেবলই মনে হচ্ছে সূর্যাস্তের দিক থেকে সূর্যোদয়ের পথে যাত্রা করছি। যে পর্যন্ত না পৌঁছই সে পর্যন্ত অন্ধকার, সে পর্যন্ত বেদনা। দিনের পর দিন, ঘটনার পর ঘটনা যখন বাইরে থেকে বিচ্ছিন্নভাবে আসে তখন বুঝতে পারি আপনার সত্যকে পাইনি। তখনি এই বাইরের আঘাতগুলো ক্রোধ লোভ মোহের তুফান তোলে। অন্তরের মধ্যে এই সমস্ত বহির্ব্যাপারের একটা কেন্দ্র খুঁজে পেলে তখন নিখিলের মহান ঐক্য নিজের ভিতর একান্তভাবে বুঝতে পারি—তাকেই বলে মুক্তি—প্রতিদিনের প্রতি জিনিসের জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছি। ইতি ২৬ নবেম্বর জাহাজ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসের শেষের দিকে কবি য়ুরোপ থেকে দেশের মুখে যাত্রা করেন। সমস্ত বলকান দেশের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে করতে এবং প্রত্যেক রাজধানীতে বক্তৃতা দিতে দিতে শেষকালে রুমেনিয়ার বন্দর কনস্টান্জা থেকে কবি যখন জাহাজে চড়েন তখনও আমরা দুজনে সঙ্গে ছিলাম। ছোট রুমেনিয়ান জাহাজখানা, টার্কি এবং গ্রীসে থেমে আলেকজান্দ্রিয়া যাবে। কবি সেইখানে নেমে মিশর দেশের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে কায়রো থেকে বড় জাহাজে চড়ে দেশে ফিরবেন এবং আমরা গ্রীসে নেমে পড়ে আবার য়ুরোপের ভিতর দিয়ে যাবো আমাদের টিকিটের জন্যে। পিরিউসের বন্দরে সকালে নাবা হল। এথেন্স-এ কবির সম্বর্ধনার জন্যে একটা হোটেলে লাঞ্চ-এর আয়োজন শহরের গন্যমান্য ব্যক্তিরা সকলে এসে অভ্যর্থনা করে কবিকে জাহাজ থেকে নাবিয়ে নিয়ে প্রথমে মোটরে করে পার্থেনন্ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো ঘুরিয়ে হোটেলে নিয়ে গেলেন। লাঞ্চের সভায় কবিকে একটা পদক দেওয়া হল। এইসব আমাদের আদর অভ্যর্থনার পালা চুকিয়ে আবার যখন বিকেলে জাহাজে ফিরলেন আমরাও সঙ্গে ফিরে আমাদের জিনিসপত্রগুলো জাহাজ থেকে নাবিয়ে নিয়ে আবার নৌকা করে ডাঙায় ফিরে এলাম। কবি এবং প্রতিমাদিরা সকলেই দূরে জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে—দেখতে দেখতে নৌকা ডাঙায় এসে লাগল। ঘাটে উঠে দাঁড়িয়েছি, আর জাহাজের বাঁশি বাজল। আস্তে আস্তে ও'রা আমাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন। বিদেশে সেদিন যেরকম অসহায় একা মনে হয়েছিল এমন আর কখনও হয়নি। কবিরা চলে যাবার আরো ৭ মাস পরে আমরা দেশে ফিরি।

ওঁ ॥ ৭ ॥

কল্যাণীয়াসু,

রাণী, নিজের কীর্ত্তি সম্বন্ধে glowing accounts প্রচার করতে হলে বেনামে করা উচিত শাস্ত্রে এই কথা বলে। কিন্তু আমার বিশ্বাস মনুসংহিতা খুঁজে দেখলে এমন কথাও পাওয়া যাবে যে উপযুক্ত সাঙ্গোপাঙ্গের অভাব ঘটলে নিজের কলমেও এ কাজ করা চলে। মোট কথা হচ্চে এই যে, আমার পশ্চিম অভিযানের অন্তিম বিভাগে জয়ধ্বনিতে কিছুমাত্র সুর কম পড়েনি। কিন্তু তার বিস্তৃত বিবরণ লেখবার মত শখ আমার নেই, কখনও এ কাজ করিনি। তার কারণ নিজেকে বিশেষ কোন একজন মনে করতে আজও পারিনে—এ সম্বন্ধে আমার স্বদেশে অনেক লোকের সঙ্গেই আমার মতের মিল হয়। আমার অন্তরলোকে কোনো একটা অগম স্থানে কেউ বাস করে—সে কোথা থেকে কথা কয়—সে কথার মূল্যও আছে—কিন্তু আমিই যে সে, তা ভাবতেও পারিনে—আমার মধ্যে তার বাসা আছে এই পর্যন্ত। যে-আমি প্রত্যক্ষগোচর সে নিতান্তই বাজে লোক—তাকে সহ্য করা শক্ত, বন্দনা করা দূরের কথা। তাকে কোনরকম করে তফাতে সরিয়ে দিতে পারলে তবে আমার অন্তরতম মানুষটির মানরক্ষা হয়। সেই চেষ্টায় আছি।

যাই হোক এদেশে বেশ একটু আন্দোলন করা গেছে। একটা সুবিধে, জর্মন বলবার দরকার হয়নি। তুমি থাকলে তোমার একটা মস্ত সুবিধে হত পঁচিশ ত্রিশপাতা চিঠি লেখবার পুরো খোরাক পেতে—তাতে আমারো জয়-ঘোষণা হত। বৌমার দ্বারা এ কাজ হবার জো নেই—রথীর

কলমেরও তেমন দৌড় নেই। অতএব এই পালার উপসংহার ভাগের ইতিবৃত্ত বঙ্গভাষার মধ্যে কোথাও স্থান পেল না। ইংরেজি ভাষায় ছাড়া ছাড়া ভাবে ছড়িয়ে আছে খবরের কাগজের ছাঁটা টুকরোয়। সেগুলো হয়ত আমাদের জার্নালের বুলেটিন বিভাগে জমা হবে।

এ জায়গায় অনেক দেখবার আছে। আমি তেমন দেখনে-ওয়ালা নই এই দুঃখ। কিন্তু তবু মুাজিয়মে যাবার লোভ সামলাতে পারিনি। দেখবার এত জিনিস খুব অল্প জায়গায় পাওয়া যায়। একটা ব্যাপার এখানে খুব সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েচে—শুনে অধ্যাপক বিস্মিত হবে। গ্রীসের যে পার্থেনন্ গ্রীসের স্বকীয় কীর্তি বলে এতদিন চলে এসেচে সেই পার্থেননের মূল প্রতিরূপ ইজিপ্টের ভূগর্ভে পাওয়া গেছে। যে স্থপতি এই রীতির স্তম্ভ প্রথম তৈরি করেছিলেন অতি প্রাচীন ঈজিপ্টে তিনি একজন অসামান্য রূপকার বলে পূজো পেয়েছিলেন। গ্রীকেরা তারই কাজের অনুকরণে নিজেদের মন্দির নির্মান করেছিল। এই ব্যাপার নিয়ে আরো অনেক মাটি ও মাথা খোঁড়াখুঁড়ি চলচে। মানুষ যে কত সুদূর যুগেও প্রতিভা প্রকাশ করেচে তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। কত অজানা সভ্যতার কত বিচিত্র গৌরব মাটির নীচে সমুদ্রের তলায় সর্বভুক্ কালের গর্ভে বিলুপ্ত হয়ে গেছে তারই বা ঠিকানা কে জানে। আমাদের কাহিনীও একদিন লুপ্ত ইতিহাসের নীচের তলায় কবে অদৃশ্য হয়ে যাবে। যতদিন উপরের আলোতে আছি ততদিন কিছু গোলমাল করা ভাল—সম্পূর্ণ চুপচাপ করবার সুদীর্ঘ সময় সামনে আছে। ইতি
২ ডিসেম্বর ১৯২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

য়ুরোপে কবির সঙ্গে যখন ঘুরছিলাম তখন নিয়মিত প্রত্যেক মেলে কারো না কারো কাছে কবির ভ্রমণের ইতিহাস চিঠিতে লিখে পাঠাতেম। প্রত্যেক দেশে কবির অসাধারণ আদর অভ্যর্থনা চোখে না দেখলে কল্পনা করা শক্ত। আমার কোনদিন ডায়ারী লেখা অভ্যাস ছিল না; এই চিঠিগুলোই প্রত্যেক সপ্তাহের ডায়ারীর মত করে লিখবার চেষ্ঠা করেছিলাম। ভেবেছিলাম চিঠিগুলো পড়ে কবির ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখবার সময় কাজে লাগাব।

কবি ইটালী থেকে বেরিয়ে আসার পর রোমাঁ রোলাঁ প্রভৃতি নানা লোকের সঙ্গে কথা বলে, অনেক অত্যাচারিত লোকেদের নিজের মুখের বর্ণনা শুনে যখন ফ্যাসিজ্‌ম্-এর ভিতরের অত্যাচারের কথা জানতে পারলেন তখন তার প্রতিবাদ করে ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডেনে পর পর তিনটে প্রবন্ধ লেখেন। সেই সময় ভারতবর্ষের কতকগুলো কাগজে কবিকে অত্যন্ত অন্যায় রকম করে আক্রমণ করা হয়। মুসোলিনী-প্রীতি তখন পৃথিবীর সব দেশেই কোনো-কোনো দলের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছে। কবি মুসোলিনীর আতিথ্য ভোগ করেও যে তার রাজনীতিকে সমালোচনা করলেন এটা তাদের কাছে অসহ্য লেগেছিল। তাই কবির প্রতি বাঙ্গোক্তি করে বলা হয় যে তাঁর "সাঙ্গোপাঙ্গোদের" দিয়ে নিজের সম্বন্ধে glowing accounts লেখাচ্ছেন। এই চিঠি লিখবার সময় সে খোঁচা তাঁর মনে ছিল।

ও ॥৪॥

কল্যাণীয়াসু

রাণী, কাল সুয়েজে এসে খবর পেলুম যে, সন্তোষ* মারা গেছে। মৃত্যুকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যে এত কঠিন তার কারণ অন্যের জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবন ঘনিষ্ঠ [illegible]। আমি আছি অথচ আর যে-একজন আমার সঙ্গে এমন একান্ত মিলিত ছিল সে একেবারেই নেই এমন বিরুদ্ধ কথা ঠিকমত মনে করাই শক্ত। আমরা নিজেকে অনেকখানি পাই অন্যের মধ্যে—সন্তোষ সেই তাদেরই মধ্যে অন্যতম ছিল। আমার মধ্যে যা কিছু সত্য ও শ্রদ্ধেয় জিনিস ছিল তার এমন অকৃত্রিম ও সুগভীর শ্রদ্ধা সন্তোষের মত এমন খুব কমলোকেরই দেখেছি। প্রতি বুধবার সকালে তার সেই শান্ত মুখে আগ্রহ প্রকাশ পেত এমন কারো না। প্রত্যেক ৭ই পৌষ ও ১লা বৈশাখ তার কাছে বড় মহার্ঘ ছিল। আমার মুখের তুচ্ছ আলোচনাও সে বড় আদরের সঙ্গে সঞ্চয় করে রাখত। আমি যখন ছেলে মেয়েদের নিয়ে কোনো ক্লাস করছি সন্তোষ তার সব কাজ ফেলে তাতে যোগ দিয়েছে। আমার জীবনের একটা বিভাগ, সকলের চেয়ে বড় ও সত্য বিভাগ—তাকে নিয়ে সম্পূর্ণ ছিল। আমার মনে হচ্চে সেই-খানে যেন ফাঁক পড়ে গেল। এবার ৭ই পৌষের কল্পনা আমার কাছে দরিদ্র হয়ে গেছে। কেননা অনেকেরই কাছে এই ব্যাপারটা একটা অনুষ্ঠান মাত্র, কিন্তু সন্তোষের পক্ষে এ ছিল প্রাণের অন্নপান। বাইরের সত্য আকাঙ্ক্ষা আমাদের অন্তরের সত্য দানকে আকর্ষণ করে। তার অভাব ঘটলে নিজের মধ্যেই দৈন্যের কারণ ঘটে। সন্তোষের প্রতি আমার একটি যথার্থ নির্ভর ছিল কেননা আমার গৌরবে সে একান্ত গৌরব বোধ করত—আমার প্রতি কোনো আঘাত তার নিজের পক্ষে সবচেয়ে বড় আঘাত ছিল। কিন্তু এ আমি কেবল নিজের দিক থেকে বলচি। তার মধ্যে যে অকৃত্রিম সৌজন্য ও মহত্ব ছিল, যে সরল নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা তাকে নিয়ত সাধনার পথে প্রবৃত্ত রেখেছিল তার মূল্য অনেকেই বুঝত না। কিন্তু তার স্বভাবের সেই সুন্দর দিকটা আমার কাছে ভারি মনোরম ও মূল্যবান ছিল। সেই জন্যে তার অনেক অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও আমি তাকে গভীর স্নেহ করতে পেরেছিলুম। কেন না তার মধ্যে যে একটি বিশিষ্টতা দেখেছিলুম সে আমি অনেকের মধ্যেই দেখিনি। আমার সমস্ত আশ্রয়ের মধ্যে আর কেউ নেই যে তার অভাব পূরণ করতে পারবে। সুতরাং আমার পক্ষে আমার এক অংশের মৃত্যুই হল। যাই হোক মৃত্যুই আমাকে নূতন প্রাণের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে এই আশা করে এবার শান্তিনিকেতনে যাচ্চি। কিন্তু যে একজন ব্যক্তি বাইরের-দিক থেকে শ্রদ্ধার দ্বারা আমাকে ডাক দিতে পারত সে রইল না। ৫ নবেম্বর ১৯২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

* সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও কর্মী।

ওঁ ॥৫॥

কল্যাণীয়াসু

রাণী, ভেবেছিলাম জাহাজ এডেনে দাঁড়াবে তখন তোমার চিঠি ডাকে দেব। খবর পেলুম সুয়েজ থেকে কলম্বোর মধ্যে জাহাজ কোথাও দাঁড়াবে না। তাই ভাবচি আরও একটুখানি লিখি। কেননা শান্তিনিকেতন পৌঁছিয়েই নানা আন্দোলনের মধ্যে গিয়ে পড়ব—বিশেষত এবারে। সামনে একটা বিপ্লব আছে—অনেক ভাঙাগড়ার পালা। যতটা সম্ভব এড়াতে ইচ্ছে করেছিলুম—কিন্তু কর্ম ফলের যতটা বাকী আছে তার সমস্ত ভোগ না করলে মুক্তি পাওয়া যায় না। এবারে ঠিক করেছি শান্তিনিকেতনের কর্তৃপদ থেকে [illegible] আমা ছুটি নেব। যাবার আগে আমার আসনটাকে [illegible] করে দিয়ে যেতে হবে—সেই জন্যে যা হাঙ্গামা।

[illegible]

এই সংসারটা থেকে যা-কিছু বাদ পড়ে সেটা কিনা নিজেরই মৃত্যু। এই আমাদের আপন সংসারের প্রত্যেককে নিয়ে বিশেষ কোনো-না-কোনো আকারে আমিই বিস্তৃত হয়ে আছি —কোথাও গভীর কোথাও অগভীর ভাবে। সেই সবটা নিয়েই আমার জীবন। কোনো ভালবাসার লোক চলে গেলে আমিই সেখানে ফাঁক হয়ে পড়ি—সেই জন্যই মানুষ এত কষ্ট পায়। আমরা যেখানে ভালবাসি সেখানে যে আমাদের এত গভীর আনন্দ তার কারণ সেই ভালবাসায় আমাদের সত্তার ব্যাপ্তি। তাইত যাজ্ঞবল্ক্য বলেন নবা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্র প্রিয়ো ভবতি-আত্মনস্তু কামায় ইত্যাদি। আমি জানি, আমার সত্তা বহুবিস্তৃত, নানা শাখায় নানা প্রশাখায়। বিশ্ব-জগতে আমার প্রায় কোন কিছুতেই ঔদাসীন্য নেই, তার মানে আমি খুব ব্যাপকভাবে বেঁচে আছি। কিন্তু যত ব্যাপ্তি তত তার আনন্দও যেমন দুঃখও তেমনি। প্রাণের পরিধি যেখানে প্রসারিত মৃত্যুবাণ সেখানে নানা জায়গায় এসে বিদ্ধ হবার জায়গা পায়। কিন্তু গভীর ভালবাসার একটা গুণ এই যে মৃত্যু ও ক্ষতির ভিতর দিয়ে তার সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয় না। মৃত্যু আমাদের জীবনব্যাপী খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতাকে জোড়া দিয়ে দেখায়; সন্তোষের একটি পরিপূর্ণ রূপ আজ আমার কাছে প্রকাশিত—তার মধ্যে থেকে যা কিছু তুচ্ছ যা কিছু অসঙ্গত অসম্পূর্ণ তা আপনিই বিলুপ্ত হয়ে যা তার সত্য ও স্থায়ী তাই আমার কাছে সুসম্বদ্ধ হয়ে উঠেছে। যাজ্ঞবল্ক বিত্ত সম্বন্ধেও বলেছেন যে, বিত্তের মধ্যে বিত্তশালী নিজেকে দেখেন বলে বিত্ত তার কাছে প্রিয়। কিন্তু বিত্ত যখন যা তখন কিছুই বাকি থাকে না—অন্য ভালবাসার মত বিত্তে ভালোবাসায় অসীমের স্পর্শ নেই। এই জন্যে বিত্তেতে যাদের জীবন তারাই যথার্থ কৃপণ, তারাই কৃপাপাত্র। জীবনে সত্য সাধনা হচ্চে অমরতার সাধনা, অর্থাৎ এমন কিছুতে বাঁচা যা মৃত্যুর অতীত। অনেক সময় প্রিয়জনের মৃত্যুতে যে বৈরাগ্য আনে তার মানে হচ্চে এই যে, তখন আহত প্রা এমন কিছুতে বাঁচতে চায় যার ক্ষয় নেই বিলুপ্তি নেই পিতৃদেবের জীবনীর প্রথম অধ্যায়ে সেই কথাটাই পাই। মৃত্যু যখন জীবনের সামনে আসে তখন এই কথাটাই প্রশ্ন করে "তুমি অমৃত কী পেয়েছ, আমি যা নিলুম তার ভিতরকা কি বাকী আছে। কিছুই যদি বাকী না থাকে তা হলে সম্পূর্ণ ঠকেচ।" প্রাণ প্রাণকেই চায়, সে কোনোমতেই মৃত্যুর দ্বারা ঠকতে চায় না—যেই ঠিকমত বুঝতে পারে ঠকছি অমনি ব্যাকুল হয়ে বলে ওঠে "যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তে কুর্য্যাম"। মানুষ কতবার এই কথা বলে আর কতবার এই কথা ভোলে। ইতি ৭ই ডিসেম্বর ১৯২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

(ক্রমশ

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

সুখী

সাধনা মুখোপাধ্যায়

সামান্য শাকান্ন আর তৃপ্তির নুনে,
ভরাতে জীবন আনি কুড়ি গুণে গুণে,
এখান ওখান থেকে যা পাই যেখানে,
প্রত্যাশারা গান হয়ে বাজে যেন কানে।

তারা যে আমার শুধু আমাকে কেন্দ্র করে বাঁচে,
আমার চোখের আলো ছায়া সম্পাতে,
একটু সুখের রোদে দুখের আঘাতে,
তাদের চোখেতে খুশি জ্বলে নেভে নাচে
স্বস্তির সুখ আর ম্লান কান্নাতে।

আমি পথ চলি নিয়ে সেই প্রেরণাই,
কুড়িয়ে বাড়িয়ে আনি তাদের যা চাই,
ভাবতে তাদের আমি দিই না কিছুই,
তারা যে অমূল লতা আমি ছুঁই ভুঁই।

আমিতো চাই না কিছু শুধু এই সুখ,
যদি দেখি হাসি হাসি মন ভরা মুখ;
যাদের জন্যে এতো পথ হাঁটিলাম,
আর সারাদিন এতো ঝরালাম ঘাম,
তাদের সুখেই আমি নিজেকে পেলাম,
রাত্রির এ বিছানায় আহা কি আরাম।

বর্ষণমুখর চিত্ত

সৈয়দ আলী আশরাফ

বর্ষণমুখর চিত্তে শব্দের প্রপাত; তবু বন্দী
বর্ণলুপ্ত মেঘাম্বর-চূড়ে: স্তব্ধ গতি: প্রতি পদ্মে
শুধু চাই শিরাস্নাতকারী আবিষ্ট মোক্ষণ;
যদিবা শৃগাল-মন তারি ফলে নিশান্ধ স্বভাব
ভোলে, ভোলে তার শব-লোভী কবর-খনন;
ধ্যানস্থ বৃক্ষের মত উপলব্ধি আর প্রজনন
পূর্ণ করে কচ্ছপের খরগোশ-জয়ের অভাব॥

বৃষ্টির জোয়ারে আর বৈপ্লবিক বজ্রের হুঙ্কারে
তবুও নৈকট্য তার প্লাবনিক দুপক্ষ বিস্তারে;
হয়ত ধ্বংসের লীলা অথবা তা জন্মের আক্ষেপ
অথবা মুক্তার মালা পুকুরের নিটোল চাতালে,
অথবা বিদ্যুৎ-তেজে তারি তীব্র চরণ-বিক্ষেপ
ক্রমশঃ বিলুপ্তি আনে মানসিক অতল পাতালে;
দুরন্ত চেতনা-পথে সে-ও আমি—নিতান্ত সংক্ষেপ॥

শব্দের মণ্ডপে শুধু অব্যক্ত প্রকাশ; পরিপূর্ণ
চিত্ততার দাদুরীই একান্ত সঙ্গী; সংগীতের
অদম্য বর্ষণে ঢাকা প্রাণ-সূর্য, বিনষ্ট অন্বেষা,
আমারো জীবন থেকে মুছে গেছে জীবনের নেশা,
পানপাত্র ফেলে দিয়ে অসম্পূর্ণ চেতনার চাই,
শব্দের চূড়ায় চড়ে ভুলে যাই প্রকাশের ভাষা,
বর্ষণ-মুখর চিত্তে অন্যাথাবৃত্তিও ভুলে যাই॥

চিত্র প্রদর্শনী

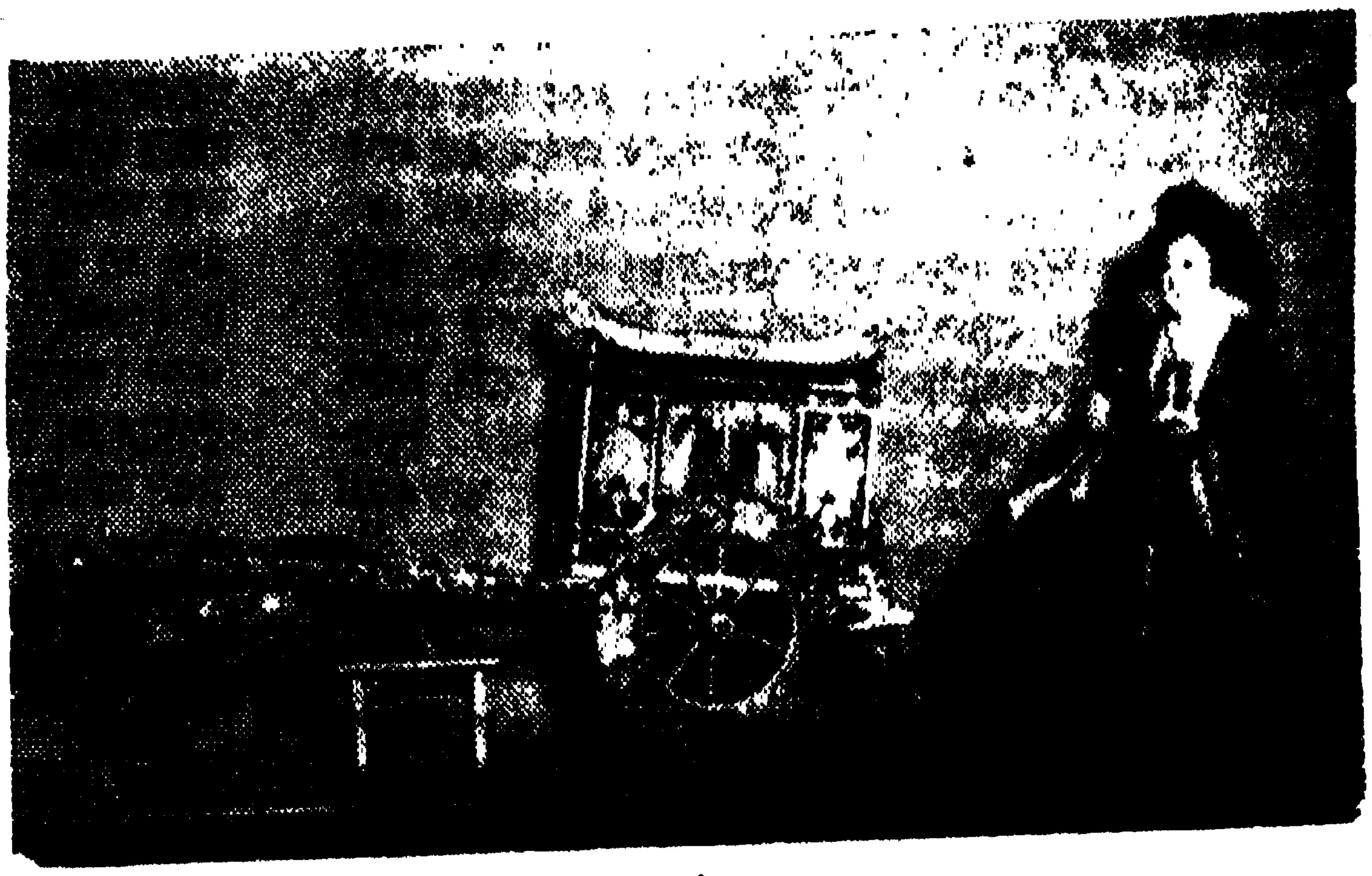

জাপানী কারু শিল্পের নমুনা

গত সপ্তাহে আর্টিস্ট্রী হাউস-এ আধুনিক জাপানের চারু ও কারুকলার একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। প্রদর্শনীটির উদ্যোক্তা ছিলেন তিনটি সংস্থা—ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস, এশিয়ান কালচার লাইব্রেরী, টোকিও এবং কলকাতার ইণ্ডো জাপানীজ অ্যাসোসিয়েশন। জাপানের সমকালীন চিত্রকলার প্রিণ্ট, ক্লাসিকাল চিত্রকলার প্রিণ্ট, পুতুল, নানান বিষয়ের বই, পোস্টার, ক্যালেণ্ডার প্রভৃতি এই প্রদর্শনীতে দেখানো হয়। স্বতন্ত্রভাবে বাচ্চাদের আঁকা ছবিও প্রদর্শন করা হয়। এবং এই বাচ্চাদের আঁকা ছবি দেখে স্তম্ভিত না হয়েছেন এমন দর্শক বোধ করি নেই। গাঢ় রঙ ব্যবহার করতে এদের কিছুমাত্র ভয় নেই। রঙের বদলে রঙীন কাগজ, কাপড়, সুতো এসবও জুড়ে জুড়ে চমৎকার সব নক্‌শা সৃষ্টি করেছে। নীল কাপড়ের ছোট ছোট টুকরো জোড়া আকাশ, উল জোড়া বেলুন, সাদা কাপড়ের টুকরো জোড়া মেঘ যে কি আনন্দ দেয় তা এদের রচনা না দেখলে বোঝা যাবে না। আর ছবির ভারসাম্য সত্যিই আশ্চর্য করে দেয় দর্শককে। অতটুকু-টুকু ছেলেমেয়েদের এ জ্ঞান কি করে হল! নিশ্চয় শিক্ষার গুণ। মনের মধ্যে যা এসেছে তাই এরা বেপরোয়াভাবে রচনা করেছে, ফুল, কলকব্জা, বেলুন, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, আরও কত কি!

ক্লাসিকাল জাপানী ছবির প্রিণ্টগুলিও বিশেষভাবে আনন্দ দিয়েছে দর্শকদের, বিশেষ করে ইউকিওয়ে (কাঠের ব্লক-এর প্রিণ্ট) পেইন্টিংগুলি। আজুচি-মসোয়ামার সময়ের সানরাকু কানো রচিত 'মর্নিং গ্লোরীজ', নাম না জানা শিল্পীর 'উওম্যান আফটার বাথ', তোহাকু হাসেগোওয়ার 'চেরী ব্লসমস', এবং নাম না জানা আরেকজন শিল্পীর 'ল্যাণ্ডসকেপ'-ও বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সমকালীন রচনাগুলি দেখে মনে হয় জাপান পুরোপুরিই অনুসরণ করছেন ইউরোপকে। যদিও রচনাগুলি অনন্যসাধারণ তা হলেও ইমপ্রেশনিস্ট অথবা তাঁদের পরবর্তীকালের শিল্পীদের প্রভাব এদের কাজে অত্যন্ত বেশী। অনেক সময় এমনও মনে হয়েছে যেন ফরাসী মাস্টারদেরই রচনা দেখছি। ফান খখ্, শারদাঁ, রানোয়ার প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীদের প্রভাব সমকালীন জাপানী শিল্পীদের কাজে অত্যন্ত স্পষ্ট। জল রঙের রচনাগুলি কিন্তু প্রথাগত জাপানী আঙ্গিকের ছাপ বহন করে সগর্বে। জলরঙের ছবির প্রিণ্টগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'মাউণ্ট ফুজি অ্যাট সানরাইজ', 'পিংক প্লাম ব্লসমস', 'দি মুন', 'অ্যামারিলিস' এবং 'ল্যাণ্ডসকেপ ইন উইন্টার'। ছাপার কাজে জাপান যে কত উন্নত হয়েছে আজ, তা সেখানকার বই এবং পোস্টারগুলি দেখলে বোঝা যায়। ফটোগ্রাফীতেও জাপানী শিল্পীরা জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের পাশাপাশি চলেন। রঙীন ফটোগ্রাফকে কিভাবে সেখানে বিজ্ঞাপনের কাজে লাগানো হয় তাও দেখবার বিষয়।

প্রদর্শনীটি আমরা বিশেষভাবে উপভোগ করেছি তবে আশা করেছিলাম ক্লাসিকাল এবং সমকালীন ছবির প্রিণ্ট না দেখে মৌলিক ছবিই দেখতে পাবো। উদ্যোক্তাগণের কাছে নিবেদন তাঁরা যেন জাপানী মৌলিক চিত্রকলার কলকাতায় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। জাপানের বিখ্যাত কাপড়ের পুতুলের কিছু নমুনা দর্শকদের বিশেষভাবে আনন্দ দিয়েছে এ প্রদর্শনীতে।

কাপড়ের পুতুল

প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

GOVERNMENT LIBRARY ... Behar

৫৮

হেমেন বাড়ি ফিরে চোরের মতন হয়ে গেল। মন বেশ ভালো করে এসেছিল, এবং তারই জন্যে হয়তো একটু আগে-আগে এসেছিল কিন্তু ঘরে পা দিতেই শুনতে পেল উপরে একটা কোলাহল হচ্ছে। কান তীক্ষ্ন করতেই টের পেল একটি কণ্ঠস্বর বিজয়ার। আরেকটি কার বলে দিতে হবেনা।

দেখল নিচে বসে প্রশান্ত চা খাচ্ছে।

'কী নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল হেমেন।

'প্রথম কী নিয়ে লেগেছিল জানিনা, এখন তো দেখছি ইলেকট্রিসিটি নিয়ে কথা হচ্ছে।' প্রশান্ত শান্তস্বরে বললে।

'ইলেকট্রিসিটি নিয়ে?'

'মানে কার ঘরে অকারণে কত লাইট-ফ্যান খরচ হচ্ছে তার খুঁটিনাটি হিসেব।'

'তারপরেই বিষয়টা বদলে যাবে।'

'গেল বলে।' — জলখাবারের তদারক করছিল বন্দনা, তার মুখের দিকে চেয়ে প্রশান্ত বললে, 'এক্ষুনি শাড়ি-টাড়ি নিয়ে শুরু হবে।'

'মানে কার কখানা আছে তা নিয়ে নয়, কাকে কবে কে দেয়নি কিংবা কে কবে কারটা পরতে নিয়ে ফেরত দেয়নি তার ইতিহাস।' হেমেন সমর্থন করল।

বন্দনার মুখ থমথম করছিল, কথা শুনে একটু হাসল। ওটুকু হাসিতে মেঘভার কাটলনা সম্পূর্ণ। তার মানে যে বিবাদটা চলছে তাতে বন্দনাও একেবারে অপক্ষ নয়।

'তারপর কথা হয়তো বাপের বাড়ির দিকে চলে যাবে।'

'ধর্মের দিকেও যেতে পারে, মানে ধর্মে কার কত গভীর বিশ্বাস সেই দিকে।'

'হ্যাঁ, যে কোনো দিকে।' বিরক্ত হয়ে ঘরে ঢুকল হেমেন।

তারই জন্যে আদালতের বলছে 'ইস্যু' ধার্য করে নিতে হয়। কোনো পক্ষকেই 'ইস্যুর' বাইরে যেতে দেওয়া হয় না। যা 'ইস্যুতে' নেই [illegible] নিয়ে [illegible] বে-আইনি। কিন্তু [illegible]

'ইস্যু' নেই, কেবল 'টিস্যু'—সুতোর পরে সুতোর বুনন, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর। খেলার মাঠে বল লাইনের বাইরে চলে গেলে খেলা স্থগিত থাকে যতক্ষণ না বল ফের মাঠে আসে। কিন্তু মেয়েদের বেলায় বল লাইনের বাইরে চলে গেলে মাঠও লাইনের বাইরে চলে যায়। মানে মাঠও বিস্তীর্ণ হতে থাকে। তাছাড়া এ বেলার বচসা এ বেলার ঘটনাতেই আবদ্ধ থাকেনা, তিন সন আগে কী ঘটেছিল সেই সব মরা কথা রক্তবীজের মত বেঁচে ওঠে। মেয়েদের ঝগড়া'র কথার তামাদি নেই।

'কোথায়?' হাঁক ছাড়ল হেমেন।

এক ডাকেই যা হোক ক্ষান্ত হল বিজয়া। রাগে ভর-ভর-দীপ্ত মুখে নেমে এল।

'কই সেই কথাটা বলবে না এখন?'

'কোন কথা আবার?' খাটে বসে উপুড় করে রাখা ম্যাগাজিনটা মুখের উপর মেলে ধরল বিজয়া। পড়তে-পড়তে কোথাও সাময়িক ডাক পড়ল বা উঠে যেতে হল তখন পড়া বন্ধ করতে হলে বইয়ের ঐ দশা হয়। পড়া বন্ধ হোক বই যেন বন্ধ না হয়। হাতের কাছে সব সময়েই চুলের কাঁটা জাতীয় পেজমার্ক কোথায়, পৃষ্ঠা খুঁজে শেষ পাঠরেখা বার করবারই বা ধৈর্য কোথায়, কেমন সব উত্তেজনা ছত্রে-ছত্রে, তাই পত্রিকারই বিপরীত শয়ন।

'যে কথাটা ঝগড়ার পরেই বলতে নির্ঘাৎ?

'কী বলতাম?'

'যে চলো এই বাড়ি ছেড়ে, ফ্ল্যাট দেখ।'

'না, সেই কথা বলার আর কী দরকার!' শরীরে গর্বের ঢেউ তুলল বিজয়া।

এক মুহূর্ত অচপল চোখে তাকিয়ে রইল হেমেন। বললে, 'ঝগড়ার মুহূর্তে চরম কথাটা মোক্ষম কথাটা বলে ফেলনি তো?'

'সেটা আবার কোন কথা?'

'যে, মিছে কেন চোপা করছেন, এই বাড়ি তো আমার, আপনারা তো আমার ভাড়াটে এক নোটিসেই উৎখাত—'

'ও সব কথা মনেও ছিল না।' পত্রিকার [illegible] মুখে ঢাকল বিজয়া।

হ্যাঁ, মনে আসতেও দেবেনা। আ
মনে করিয়ে দিলেও না।' জামা-কা
ছাড়তে-ছাড়তে হালকা হতে-হতে হে
বললে, 'আগামী যুদ্ধ যে-পক্ষ হারো-হা
হবে সেই নাকি প্রথম অ্যাটম বোম ছুঁড়
ঝগড়ায় তুমি কখনো হেরে গেলে
বেকায়দায় পড়লেও তুমি কখনো ছুঁড়
না সেই অ্যাটম বোম, কখনো না।'

সর্ব শরীরে গরিমার ভরিমা নি
বিজয়া বললে, 'আমি আর হারি না।'

নতুন বই :

শ্রী বাসব-এর

ছায়া দোলে - ৫·০০

নাজমা বেগম - ৫·০০

নীলকণ্ঠের অদ্বিতীয় উপন্যাস

দ্বিতীয় প্রেম - ৫·০০

নীহার গুপ্তের রহস্য উপন্যাস

ছায়া পথ - ৪·৫০

করুণা প্রকাশনী,
১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিঃ-১২

বাংলা সাহিত্যে প্রথম :

শঙ্করীপ্রসাদ বসুর

ইডেনে শীতের দুপুর

বাংলা সাহিত্য ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। তার নতুন প্রবেশ ক্রিকেট মাঠে 'ইডেনে শীতের দুপুর' গ্রন্থের মধ্য দিয়ে। প্রধান বাঙালী ও ভারতীয় ক্রিকেটারদের কথাচিত্র, ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট ম্যাচের দীর্ঘ নাটকীয় বর্ণনা, ইডেন গার্ডেনে রৌদ্র তপ্ত শীতের দুপুরের সুখস্মৃতির বর্ণনায় পূর্ণ এই লেখা। নানা মূল্যবান ছবিতে শোভিত। ৩·৭৫

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬
গ্রাম—বাণীবিহার : ফোনঃ ৩৪-৪০৫৮

নাটক সম্বন্ধীয় একমাত্র দ্বিমাসিক

সূত্র ধার

সদ্য প্রকাশিত তৃতীয় সংখ্যায় আছে : অভিনয়যোগ্য নাটিকা—অনন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় আলোচনা : নাটকের আধুনিক বিষয়বস্তু—ডঃ সাধন ভট্টাচার্য, হাসির নাটক—কুমারেশ ঘোষ, রবীন্দ্রনাট্য—ভবানী মুখোপাধ্যায়, রুশ নাট্যকার আর-কুজফ—আলী জাফর, ইংরেজী নাট্যশালা ও দ্বারকানাথ ঠাকুর—অমল মিত্র তামিল নাটক—অধ্যাপক পরম শিবনন্দন, বেতার নাটক—কুম্ভকর্ণ, নাট্যকার মন্মথ রায়ের বিস্তৃত গ্রন্থপঞ্জী। মূল্য ৭৫ নয়া পয়সা। কার্যালয় : ১০এ, অশ্বিনী দত্ত রোড। কলিকাতা-২৯। (সি-৯০৬৫)

এও তো এক মারাত্মক ভঙ্গি।

'কেন,কী করো?'

'টু দি পয়েন্ট গোটা কয়েক কথা বলেই 'চুপ করে যাই।'

'টু দি পয়েন্ট?' হাসল হেমেন। 'সে তা হলে ভীষণ পয়েন্টেড?'

'তা জানিনা। তবে কথা কমিয়ে আনছি। কথা কমিয়ে আনা ভালো।'

'কথা কমিয়ে আনতে আনতে শেষে এক কথায়, চূড়ান্ত কথায় না চলে আস।'

'বার বারে সেই কথাটা মনে করিয়ে দিচ্ছ কেন? চাও নাকি যে বলে ফেলি?'

'রক্ষে করো।' পরে মুখে নির্লিপ্ততা আনল হেমেন। 'তবে ঝগড়ার মধ্যে মৌলিক কথাটা শুনলে চমকাবে মাত্র, বিশ্বাস করতে চাইবেনা। বেশি কিছু বললে দলিল দেখতে চাইবে। তা দলিল দেখাবে কী করে? দলিল তো ব্যাংকে। তা যাকগে, আজ কথাটা কী নিয়ে? তেতলার ঘরে কে থাকবে?'

'তেতলার ঘরে কে থাকবে তা তো ঠিক হয়েই আছে।'

'ঠিক হয়েই আছে? কে থাকবে?

'কে আবার! আমি।' পা ছড়াল বিজয়া। 'বাড়ির নীচতা আর সইবনা কিছুতেই।'

'নীচতা মানে নিচে, নিচের তলায় থাকা তো?'

বিজয়া কথা কমাল। চোখের দৃষ্টিটাকে খোলা পৃষ্ঠায় রাখতে চাইল স্থির করে।

'আর যিনি সম্পর্কের উচ্চতার খাতিরে থাকতে চান উপরে?'

'তারই তো পরীক্ষা আজ সংসারে। মান বড় না ধন বড়?' চোখ না তুলেই সংক্ষেপে বলল বিজয়া।

'যাক গে, সে নিয়ে যখন আজকের ঝগড়া নয়। বলো না আজকের ঝগড়াটা কী নিয়ে?'

'দিদি হঠাৎ আবিষ্কার করলেন আমাদের কোনো গুণ নেই। যেহেতু আমরা বি-এ এম-এ নই, চাকরি করে পয়সা রোজগার করতে পারিনা, যেহেতু আমরা না জানি নাচতে বা গাইতে বা ছবি আঁকতে বা সভা-সমিতি করতে—,

'তাই বড় বৌমার মুখখানি ম্লান দেখলাম। একসঙ্গে তোমাদের দুজনকে ব্র্যাকেট করেছে—'

'যত গুণ শুধু তাঁর নিজের আর তাঁর ছোট বউয়ের!'

'তোমার গুণ নেই, রূপ কিছু আছে তো? আজকাল তো রূপও গুণ। রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর। কিন্তু তোমার গুণ নেই এ কে বলে? বাংলা দেশের সংস্কৃতির প্রধান ধারক তুমি, যত সিনেমা হয় সব তুমি দেখ, যত সিনেমার কাগজ বেরোয় সব তুমি পড়ো, যত ফাংশন হচ্ছে সর্বত্র তুমি টিকিট কাটো, তোমার গুণ নেই? এর নিদারুণ প্রতিবাদ করা উচিত।'

কথা বললনা বিজয়া।

'কিন্তু ছোট বউয়ের কথা কী বলছিলে? হেমেন মনোযোগে তীক্ষ্ণ হল। 'তাকে তো বানের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাকে বানের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয় তার আবার গুণ কী!'

'কার্কলির কথা কে বলছে?' আবার পা গুটোলো বিজয়া। 'এ হচ্ছে বিনতার কথা। যিনি ছোট বউ ছিলেন তিনি নন, যিনি ছোট বউ হবেন তিনি।'

'বিনতা! ও হ্যাঁ, কিন্তু—কিন্তু তার গুণ কেন?'

'দিদির মতে যারা অফিসে কাজ করে

বদহজম?

তা'হলে এই সাধারণ পরীক্ষাটি করুন—

পেটব্যথা, গা বমিবমি অথবা পেটফাঁপা—অম্লাধিক্যের এই অস্বস্তিকর লক্ষণগুলি দেখা দেবার সাথে সাথেই ম্যাক্লীন ব্র্যাণ্ড ইনডিজেশন পাউডারের একটি মাত্রা খেয়ে নেবেন। "ম্যাকলীন কার্ব্বোনেটস্" এবং "এ্যালুমিনিয়াম্ হাইড্রক্সাইড" এর সমন্বয়ে প্রস্তুত এই অপূর্ব্ব ঔষধটি আপনাকে অবিলম্বে দীর্ঘস্থায়ী আরাম এনে দিয়ে প্রমাণ করে দেবে যে ম্যাক্লীন ব্র্যাণ্ড ইনডিজেশন পাউডার শুধু পাকস্থলী থেকে অতিরিক্ত অম্লরস দূরই করে না, সাথে সাথে এর পুনর্গঠন প্রতিরোধ করে।

ম্যাকলীন ব্রাণ্ড
ইনডিজেশন্ পাউডার

আসল জিনিষের জন্য এই— Alex C. Maclean নামটি দেখে নেবেন।

তারা সব খারাপ। খারাপ মানে রুক্ষ উদ্ধত, দুর্বিনীত। কিন্তু যারা স্কুলে মাস্টারি করে তারা ভদ্র, বাধ্য, প্রশান্ত। পবিত্র পরিবেশে মহৎ ব্রত উদ্‌যাপন করছে বলে ওদের বাক্যে ও ব্যবহারে স্নিগ্ধতার লাবণ্য ঝরে পড়ছে। ওরাই সত্যিকার গুণী। সংসারকে স্বর্গ করবার সত্যিকার কারিগর। গুণের ফিরিস্তি দিয়ে পঞ্চমুখেও শেষ করতে পারছেনা দিদি। আমি বললাম, মাস্টারের কত গুণ তা জানা আছে। মাস্টারও যা ব্ল্যাকবোর্ডের ডাস্টারও তাই।'

'ও! এই বিয়ের কথাই বুঝি বলতে এসেছিল সুকু—' বেশ উচ্চঘোষেই বলল হেমেন।

'কোথায় বলতে এসেছিল?'

'আমার আপিস। আজ—এই তো, এই কতক্ষণ আগে।'

'কী বললে সুকু?'

'বললে, তার বিয়ে ঠিক হয়েছে, কনেকে আমরা যেন একদিন আশীর্বাদ করে আসি।' বলতে বলতে ইচ্ছে করেই ঘরের বাইরে চলে এল হেমেন।

'তুমি কী বললে?' উত্তেজনায় বিজয়াও বাইরে এল।

'আমি ওর কথায় বেশি গা করলাম না। বললাম, তুই বিয়ে করছিস তো করবি, তাতে আমাদের সংশ্রব কী! আমাদের কাছে আবার সাহায্য কিসের! তোর নিজের বাছা মেয়ে, তোর একার দায়িত্ব—এতে সংসারকে টানা কেন?'

'ওমা, সে কী কথা!' প্রত্যাশিত পদক্ষেপে নেমে এল মৃণালিনী। 'এ ওর নতুন বিয়ে, এ বিয়েতে সংসার আসবে না তো কী!'

'কেন, হোটেল, ওর হোটেল কী করতে আছে!' টিটকিরি দিয়ে উঠল হেমেন।

'যে অবস্থার জন্যে হোটেল সে তো শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন নতুন বিয়ে, নতুন পত্তন। তাই সংসারও আবার নতুন করে আরম্ভ।'

'তা হলে বলতে চাও এই বাড়ি থেকেই সুকুর বিয়ে হবে?'

'নিশ্চয়, একশোবার।' মৃণালিনী গলা চড়াল। 'আর বিয়ে করেও বউ নিয়ে উঠবে এই বাড়িতে। তেতলার ঘর নিয়ে খুব স্বপ্ন দেখেছিলে না? এই তেতলার ঘরে সুকু থাকবে, নতুন বউ নিয়ে।'

'কোন আইনে?' ফোঁস করে উঠল বিজয়া। 'ঘর তৈরি করবার টাকা দিলাম আমরা আর তাতে বাস করবেন নতুন বউ! আর রাজ্যে বামুন নেই—'

'টাকা সমস্ত দিলাই বা, কিন্তু সুকু তোর নিজের ছেলের মত। সে বিয়ে করে বউ আনছে, তাকে একটু স্নেহাশীষ দিতে তোর বুকটা ফেটে যাবে?'

জবাব দিল বিজয়া। 'কিন্তু তার নতুন বউ উড়ে এসে জুড়ে বসবে মাথার উপরে, এ সইবে না। যদি কার্কাল আসত হাসিমুখে ছেড়ে দিতাম।'

'তার কথা আলাদা।' বন্দনাও স্বীকার করল একবাক্যে।

'যা হয় না, হবার নয়, তা ভেবে কী! যা ছাই হয়ে গিয়েছে তাকে উ… দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।' … মৃণালিনী। 'যে নতুনের নামজারি হ… আসছে তাকেই উচিত সংবর্ধনা … ততক্ষণে কোর্ট থেকে ভূপেনও চলে এ…

সবুজ চিঠি

তৃতীয় সংস্করণ বেরুল ॥ ৩·০০ ॥

দেশ—একটি মধুর গৃহকোণ থেকে কাহিনী নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জীবনের এক বিশাল প্রান্তরে এসে উপস্থিত হয়েছে . . .

মানুষ গড়ার কারিগর

দ্বিতীয় মুদ্রণ ৫·৫০ নঃ পঃ

Amritabazar Patrika (2-10-60)....It seems MANOJ BASU's career as a teller of stories would have remained incomplete without this moving testament of misery. Here as in Bhuli Nai Sri Basu has written with insight and complete fidelity simply and without rancour. The telling has been superb.

বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রা) লিমিটেড : কলিকাতা—১২

নূতন উপন্যাস

"একটি জীবন"

ডাঃ অতুলচন্দ্র লাহিড়ী — ৪·৭৫ নঃ পঃ

বিশ শতকের প্রথম অর্ধের 'জীবনায়ন', উপন্যাসের মতো ভাবনিষ্ঠ, ইতিহাসের মতো সত্য নিষ্ঠ। আবার এক অনুপম দাম্পত্য জীবন। সেই সব দিনের কথা এমন করে ইতিপূর্বে আর কেউ বলেন নাই।

লেখকের প্রথম বই:

কৈলাস-মানসের-পথে

২য় সংস্করণ ৩·৫০ নঃ পঃ

ভ্রমণ সাহিত্যে এ একটি মূল্যবান সংযোজন।

পরিবেশক—ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

(সি ১০৬২/১)

রমেশ রচনাবলী

রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত এবং তাঁহার জীবদ্দশায় শেষ সংস্করণ হইতে গৃহীত ছয়খানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস একত্রে গ্রন্থিত। বঙ্গবিজেতা, মাধবীকঙ্কণ, মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত, রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা, সংসার ও সমাজ। [৯]

॥ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য ॥ ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত উক্ত বিষয়ের শুধু ইতিহাসই নয় শাক্তধর্মের আধ্যাত্মিক রূপটিও তুলে ধরা হয়েছে এই গ্রন্থে [১৫] ॥ রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত ॥ সুন্দর চিত্রাবলী ও মনোরম পরিসাজে যুগরুচিসম্মত অনিন্দ্য প্রকাশন। সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত। [৯] ॥ বঙ্কিম রচনাবলী ॥ প্রথম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস (১৪ খানি) একত্রে [১০]। দ্বিতীয় খণ্ডে উপন্যাস ব্যতীত যাবতীয় রচনা [১৫] ॥ জীবনের ঝরাপাতা ॥ রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী সরলা দেবী চৌধুরাণীর আত্মজীবনী ও ক্ষয়িষ্ণু যুগের যুগলেখা। [৪] ॥ মহানগরীর উপাখ্যান ॥ শ্রীকরুণাকণা গুপ্তা রচিত উপন্যাস [২॥০]।

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ॥ কলিকাতা-৯

কেদারবদরী ভ্রমণের সর্বাধুনিক কাহিনী!!!
সুকৃতি রায়চৌধুরীর
তপোময় তুষারতীর্থ
পড়তে পড়তে মনে হবে কেদারবদরী পৌঁচেছেন।
ভূমিকা লিখেছেন শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।
সুচারু প্রচ্ছদ। আর্টপ্লেটে বারোটি ছবি।
দাম ৪·৫০ নঃ পঃ।
দি বুক হাউস, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলি-১২।
(সি-৯০৫৭)

পাঁচ হাজার বছরেরও আগে যে কেশতৈল প্রবর্তিত হয়েছিল

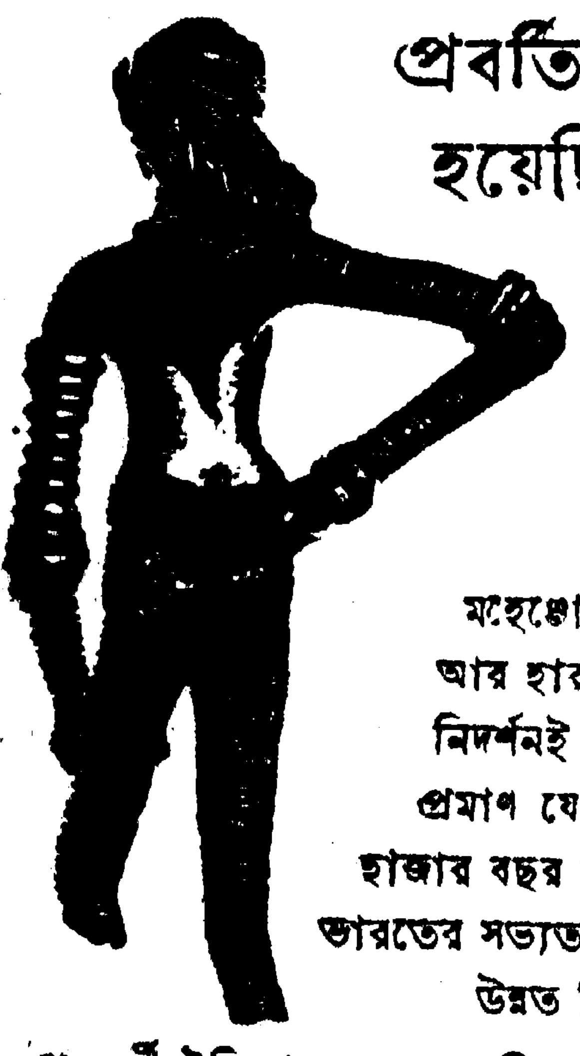

মহেঞ্জোদারো আর হারাপ্পার নিদর্শনই যথেষ্ট প্রমাণ যে পাঁচ হাজার বছর আগে ভারতের সভ্যতা কত উন্নত ছিল।

পরবর্তী ইতিহাসে অনেক কিছু লুপ্ত হয়েছিল যেমন বিশুদ্ধ ভেষজ কেশ-তৈল প্রস্তুত পদ্ধতি, যতদিন না আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণায় একটি বিশেষ ফলপ্রদ ভেষজ কেশতৈল আবার আবিষ্কৃত হয়েছে—যার নাম 'কেয়ো-কার্পিন'।

কেয়ো-কার্পিন

মনোরম গন্ধযুক্ত 'কেয়ো-কার্পিন' চুলের গোড়ায় প্রাণশক্তি যোগায়।

দে'জ মেডিকেল ষ্টোর্স প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা • বোম্বাই • দিল্লী • মাদ্রাজ
পাটনা • গৌহাটি • কটক

তার দিকে একবার আর হেমেনের দিকে অনেকক্ষণ করুণ চোখে তাকিয়ে রইল। 'যদি আবার ও বউ নিয়ে ঐ ছোট ঘরটাতে থাকে তা হলে আবার ওদের ছাড়াছাড়ি হবে। তোমরা আপনার লোক হয়ে, অভিভাবক হয়ে, ওর মঙ্গল দেখবেনা?'

কার আবার বিয়ে, কার আবার ছাড়াছাড়ি! ভূপেন হতবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

'সুকু আবার বিয়ে করছে—সেই কথা।' হেমেন ব্যস্ত হয়ে উঠল। 'আপনি হাত-মুখ ধুয়ে চা-টা খেয়ে শান্ত হোন, আমি সব বলছি।'

'সুকু—সুকু কোথায়?' ঝাপসা গলায় জিজ্ঞেস করল ভূপেন।

'বাড়ি আসেনি এখনো। আসবে। আমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল আমার আপিসে—হ্যাঁ, আজ, দুপুরবেলা—'

'কই, কই কাকা!' তার বেড়াল তাড়াবার ছোট্ট লাঠিটা নিয়ে নেমে এসেছে সেণ্টু। 'আমি তার ঠ্যাং ভেঙে দেব। কথা ছিল একজামিন হয়ে গেলে কাম্মাকে নিয়ে আসবে। তা কাম্মাকে না এনে বউ নিয়ে আসছে! কোথায় বউ? দাঁড়াও—' লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে এগুতে লাগল সেণ্টু।

হাত বাড়িয়ে বিজয়া তাকে লুফে নিল। বললে, 'তোর কাকা আর তার নতুন বউ কেউ আসেনি।'

'কিন্তু কাম্মা? কাম্মা আসবে না?'

'আসবে।'

'কবে আসবে?'

'তার একজামিনটা আগে শেষ হোক—'

'কবে শেষ হয়ে গেছে! একজামিন বুঝি এত দিন ধরে চলে! তুমি কিচ্ছু জানো না।' বিজ্ঞ মুখে বিষাদ মাখাল সেণ্টু। 'আণ্টি ইস্কুলে আমাদের একজামিন নিলে—ওয়ান থেকে টেন লেখ—একদিনেই তো শেষ।' বিজয়ার চিবুক ধরে মুখটা ঘুরিয়ে নিল নিজের দিকে। 'সেই যে সেবার আমাকে কাম্মার কাছে নিয়ে গিয়েছিলে অমনি আবার আরেক দিন নিয়ে চলো না ছোড়দিদি—'

'তার বাসা এখন কতদূরে তা কে জানে।'

'বেশ, আমাকে না নাও, তুমিই একদিন নিজে গিয়ে জেনে এসনা কবে তার একজামিন শেষ হবে, কবে আসবে বাড়ি, কবে আমাকে কোলে নেবে।' আবার বিজয়ার চিবুক ঘোরাল সেণ্টু। 'যাবে একদিন ছোড়দিদি?'

'যাব।'

নিরিবিলিতে বৈঠকখানায় ভূপেনের কাছে গিয়ে বসল হেমেন। বললে সমস্ত কথা।

নিজের ঘরে অফিসে বসে কাজ করছে, বেয়ারা কার্ড নিয়ে এল। কে? ভুরু কুঁচকে নাম দেখল হেমেন। এ কোন সুকান্ত বসু? আর কে! আমাদেরই শ্রীমান। ঘরে ঢুকে নত হয়ে প্রণাম করে বসল চেয়ারে।

'তুই? তুই কী মনে করে? ভালো আছিস?' হেমেনের সংবর্ধনাটা খুব মোলায়েম শোনাল না।

খানিকক্ষণ আমতা-আমতা করে সুকান্ত বললে, 'একটা ব্যাপারে আপনার কাছে এসেছি—'

'কী ব্যাপার?'

তবুও বিশদ হয়না সুকান্ত। গাইগুঁই করে।

'মানে কোনো বিপদ? চাকরি নিয়ে গোলমাল? অর্থাভাব? বলবি তো বিপদটা কী!'

'ঠিক বিপদ নয়। বিয়ে।'

'বিয়ে? তোর বিয়ে? তোর বিয়ে তো এখানে কী! কার সঙ্গে বিয়ে?'

'সেই যে কাকলি মিত্র—'

'কে কাকলি মিত্র?' খেঁকিয়ে উঠল হেমেন।

'সেই যে আপনার ছোটবউমা।' মাথা চুলকাতে লাগল সুকান্ত।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছোট বউমা। কই এসেছেন এখানে?' চঞ্চল হয়ে চেয়ার ঠেলে উঠতে চাইল হেমেন।

'না না, আসেনি।' গম্ভীরস্বরে নিরস্ত করল সুকান্ত।

উদ্বেগমাখানো মুখ নিয়ে হেমেন বললে, 'কেন, তার কী হয়েছে?'

'কিছু হয়নি।'

'তবে তার কথা ওঠে কেন?'

'ওঠে' আবার কান চুলকোতে লাগল সুকান্ত, 'তার সঙ্গে আমার বিরোধটা মিটে গেছে।'

'তা তো যাবেই।' চেয়ারে পিঠ ছেড়ে দিল হেমেন। 'তা ছাড়া বিরোধ কোথায়? শুধু তো একটা জেদ, গোঁয়ারতুমি, শুধু ঘাড়টা মোটা করে শক্ত করে থাকা। শুধু একটা সাময়িক সঙ্কীর্ণবুদ্ধি। মিটে গেছে! বেশ, ভালো কথা। টুটলেই ধিব,

ধবল বা শ্বেত

শরীরের যে কোন স্থানের সাদা দাগ, একজিমা, সোরাইসিস ও অন্যান্য কঠিন চর্মরোগ, গাত্রে উচ্চবর্ণের অসাড়যুক্ত দাগ, ফুলা, [illegible] বক্রতা ও দূষিত ক্ষত সেবনীয় ও বাহ্য ঔষধ দ্বারা দ্রুত নিরাময় করা হয়। আর [illegible] হয় না। সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত [illegible] শর্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ফোন : ৬৭-২৩৫৯। শাখা : ৩৬, [illegible] রোড, কলিকাতা-৯। [illegible]

মিটলেই মধু। তা এখন, মিটে যাবার পর?

'আমরা মিলতে যাচ্ছি।'

'সে তো সবাই জানে। তা আমাকে কী করতে হবে?'

'কিছু করতে হবেনা। আপনাকে জানিয়ে দিলাম।' ওঠবার ক্ষীণ চেষ্টা করল সুকান্ত।

'শুধু একটা সংবাদ দিলি? বেশ, সুখের কথা। বিয়েটা হবে কোথায়?

'কাকলির বাপের বাড়িতে। ওদের সঙ্গেও বিরোধটা মিটে গেছে।

'যা, চারদিকেই মেটামিটি। তারপর বিয়ে করে বউ নিয়ে উঠবি কোথায়? থাকবি কোথায়?'

'তা একটা ভালো ফ্ল্যাট দেখে নেব। এখন দুজনের চাকরি—'

'ছোট বউমাকে নিয়ে ফ্ল্যাটে উঠবি? তুই এই খবর দিতে আমার কাছে এসেছিস? গেট আউট। গেট আউট। আমার সমুখ থেকে এখুনি বেরিয়ে যা বলছি—'

লোকজন ছুটে আসতে চাইল চারপাশ থেকে। সুকান্ত একেবারে থ।

'তুই এবার সত্যি-সত্যি ভাঙবি আমাদের একান্নবর্তী পরিবার। আর তোর জন্যে তোদের জন্যে আমরা বাড়ি কিনছি, তেতলায় ঘর তুলছি।'

'তেতলায় ঘর?' উঠি-উঠি করছিল সুকান্ত, বসে রইল।

'হ্যাঁ, সকলের মাথার উপরে। হ্যাঁ, পৃথিবীর সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মাথার উপরে আমাদের, ভারতবর্ষের এই একান্নবর্তী পরিবার। সেই প্রতিষ্ঠানে তোরা কুড়ুল মারবি? কই, ছোট বউমা কোথায়? তাকে নিয়ে এলিনা কেন সঙ্গে করে? তাঁরও কি সেই মত? ছোট একটা স্বার্থের অন্ধকূপে হাত পা গুটিয়ে বাস করা? এমন একটা গাছ পোঁতা যার শুধু কাণ্ডটাই আছে, শাখাপ্রশাখা নেই, পুষ্প-পল্লব নেই, যার কোলে ছায়া নেই একবিন্দু। বল সেই সংসারে থাকবি যেখানে সেণ্টু নেই নাতিনাতনী নেই, নাতিনাতনীর আনন্দ নেই। ক্ষমা নেই, উদারতা নেই, স্বার্থত্যাগ নেই, অক্ষমকে রক্ষা করবার অমানীকে মান দেবার সাধনা নেই! তবে বসে আছিস কেন? উঠে যা। একটা শূন্য পুরীতে আজকের দুই যুবক-যুবতীর দুটো অন্ধপ্রায় জরাজীর্ণ বুড়ো-বুড়ি হয়ে অন্ধকার হাতড়ে বেড়াবার স্বপ্ন দ্যাখ। ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়ে বাসা ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে আর তোরা দুজনে অশক্ত অথর্ব হয়ে বুক চাপড়াচ্ছিস—'

'কিন্তু একসঙ্গে থাকতে গেলেই তো ক্ষুদ্রতা—'

'ক্ষুদ্রতা না থাকলে উদারতা দেখাবার অবকাশ কোথায়? আঘাত-অপমান আছে বলেই তো ক্ষমার অস্তিত্ব। শত্রুতা আছে বলেই তো পরোপকারের মাহাত্ম্য। কার্পণ্য আছে বলেই তো আত্মত্যাগের ঔজ্জ্বল্য। বিরোধ আছে বলেই তো নিষ্পত্তির শান্তি। নইলে ওসব মহৎগুণ মানুষ দেখাবে কোথায়? মানুষ বড় হবে কি করে?'

'তবে যখন বলছেন'—সুকান্ত আবার মাথা চুলকোল। 'বাড়িতেই ফিরে যাব। এখন তবে উঠি।'

তখন আবার সুকান্তকে ধরে রাখতে চায় হেমেন। কি করে কী হবে তার খুঁটিনাটি পরামর্শ করে। সন্দেশ এনে খাওয়ায়। নিজেও গোটা দুই একসঙ্গে মুখে পোরে।

'ঠিক করেছি আগে আমরা মেয়েকে আশীর্বাদ করতে যাব।' ভূপেনকে বললে হেমেন। 'পরে বিয়ের দিন পাকা হলে সুকান্ত বাড়ি আসবে।'

ভূপেন হাসতে লাগল।

বিজয়াকে ঘরের নিরিবিলিতে নিয়ে হেমেন বললে: 'তুমি জিজ্ঞেস করছিলে না, ধন বড় না মান বড়, তারই পরীক্ষা হবে সংসারে? পরীক্ষা হয়ে গেছে। সকলের চেয়ে সব কিছুর চেয়ে বড় হচ্ছে ভালবাসা।'

'ভালবাসা?'

'হ্যাঁ, তেতলার ঘর। তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়েছে। কে বলে তোমার গুণ নেই?'

'কেন, কী হয়েছে?'

'সুকান্ত কাকলিকে নিয়ে আসছে ফের বিয়ে করে।'

'সত্যি?' আনন্দে বিহ্বল হল বিজয়া।

'শাঁখ বাজাব?'

'ফুঁ, কী, টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করবে না। আগে মেয়েকে পাকা দেখে আসি। বউদিকে দেখাই। কি, কি গো, কার এখন তেতলার ঘর?'

'ভালবাসার। সুকান্ত-কাকলির।'

কোথায় তবে এই উদারতা দেখাবার অবকাশ! অন্যকে বিলিয়ে দিয়ে আনন্দিত হবার!

(ক্রমশ)

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়র

সম্পূর্ণ নতুন ধরনের উপন্যাস

উত্তর সাগরের তীরে

আট টাকা

সুদূর স্কটল্যাণ্ড থেকে ভারতবর্ষের পবিত্র বৌদ্ধতীর্থ রাজগীর অবধি বিস্তৃত বিরাট পটভূমিকায় রচিত এক নতুন ধরনের কাহিনী। অসংখ্য চরিত্রের সমন্বয় ঘটেছে এই সুবিশাল গ্রন্থে। তার মধ্যে প্রধান স্থান জুড়ে রয়েছে দর্শনের ছাত্র জ্যাক। যার সমস্ত জীবনটা গড়ে উঠেছে নানান ঘটনা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে যে পেয়েছে নিদারুণ বঞ্চনা। অবশেষে সে বাসনা ত্যাগের সংকল্পে স্থান নিয়েছে ভারতবর্ষে এসে নালন্দার মহাবিহারে।

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

সর্বাধুনিক উপন্যাস

অন্তরাল

তিন টাকা

বুভুক্ষিত মাতৃ হৃদয়ের এক অসামান্য কাহিনী

সরস্বতী গ্রন্থালয় ॥ ১৪৪ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট ॥ কলিকাতা-৬ ॥

নতুন উপন্যাস : নতুন উপন্যাস

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

মদন ভস্ম ৩৲

পোড়ামাটি ভাঙ্গাঘর ৮৲

আর. এন. চ্যাটার্জী এণ্ড কোং

২৩, নির্মল চন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

এ আই সি সি'র রায়পুরের সভায় আসাম সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করা হয় নাই বলিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছেন। "হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড" সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন—কংগ্রেস কর্তাদের চোখে এতই ছানি পড়িয়াছে যে, তাঁরা "দেয়ালের

লেখা" পড়িতে পারিতেছেন না। "কিন্তু পড়তে না পারার কারণটা চোখের ছানি নয়। অসমীয়াতে না লিখে দেয়ালের লেখাটা বাংলা ভাষায় লেখা ছিল বলেই কর্তারা তা পড়তে পারেন নি"—মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

কংগ্রেস প্রেসিডেন্টকে এবার একটি রোলস্ রয়েস কার ব্যবহার করতে দেওয়া হইয়াছিল। —"গরুর গাড়ির পর রোলস্ রয়েস ভ্রমণকেও যদি কেউ চরম উন্নতির প্রতীক বলে মনে না করে, তা হলে তো আমরা নাচার"—বলে শ্যামলাল।

নন্দাঘুণ্টি অভিযাত্রীদের সবাই অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেও স্থানীয় দুইএকটি বড় সংবাদপত্র নাকি এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। —"প্রদীপের নীচেই অন্ধকার থাকে, সুতরাং কাজে কাজেই"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

একটি সংবাদে প্রকাশ, মালয় সরকার নাকি ড্রাগনের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"এ সম্বন্ধে 'ড্রাগনের নিঃশ্বাস'-এর লেখক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রকে জিজ্ঞেস করলে তিনি হয়ত মালয় সরকারকে প্রাণীটির হদিশ দিতে পারেন"!!

সংবাদে শুনিলাম, বাতাবি নেবু আসিয়াছে বাতাভিয়া হইতে, মর্তমান কলা মার্টাবান হইতে। —"সোনা নিশ্চয়ই সোনারগাঁ হইতে আসেনি; আর পাক-প্রণালীটাও আশা করি পাকিস্তান থেকে আসেনি"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

ট্রামে-বাসে

এবার আমন ধান প্রচুর ফলিয়াছে—একথা দিনে সাতবার বলিতেছেন সকলেই। —"নজর দিয়ে দিয়ে না সবাই ফসলের বারোটা বাজিয়ে দেয়"—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

শ্রী নেহরু তাঁর সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন যে, ভারত আজ একটি নূতন "মহাভারত" রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই মহাভারতের কর্মসূচী হইল দারিদ্র্যের

বিরুদ্ধে সংগ্রাম। —"কিন্তু জনার্দন সাক্ষাৎ প্রধান মন্ত্রীর এই সংগ্রামে অস্ত্রধারণ করবেন তো"—প্রশ্ন করেন বিশু খুড়ো।

এইবারে শান্তির জন্য কোন নোবেল পুরস্কার দেওয়া হইবে না বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। বিশু খুড়ো একটি অসমর্থিত সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন—"বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতায় ইউ এস এ ও রাশ্যা নাকি শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। শান্তির নোবেল পুরস্কারটা এই দুই দাবা প্রতিযোগীর মধ্যে ভাগ ক'রে দেওয়া যায় কিনা সে সম্বন্ধে নোবেল পুরস্কার কমিটি বিবেচনা করছেন"!!

কেরালার একটি পোলট্রি ফার্মে সরকারের বছরে সাড়ে ষাট হাজার টাকা খরচ হয়। —"সেখানে নিশ্চয়ই 'কাগের বাসায় বগের ডিম' প্রজননের চেষ্টা চলছে"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

ক্রীড়া টিকাকার শ্রীবেরী সর্বাধিকারী জানাইতেছেন যে, ক্রিকেট বোর্ডের অদলবদল হইলেও কাজকর্মে কোন প্রভেদ

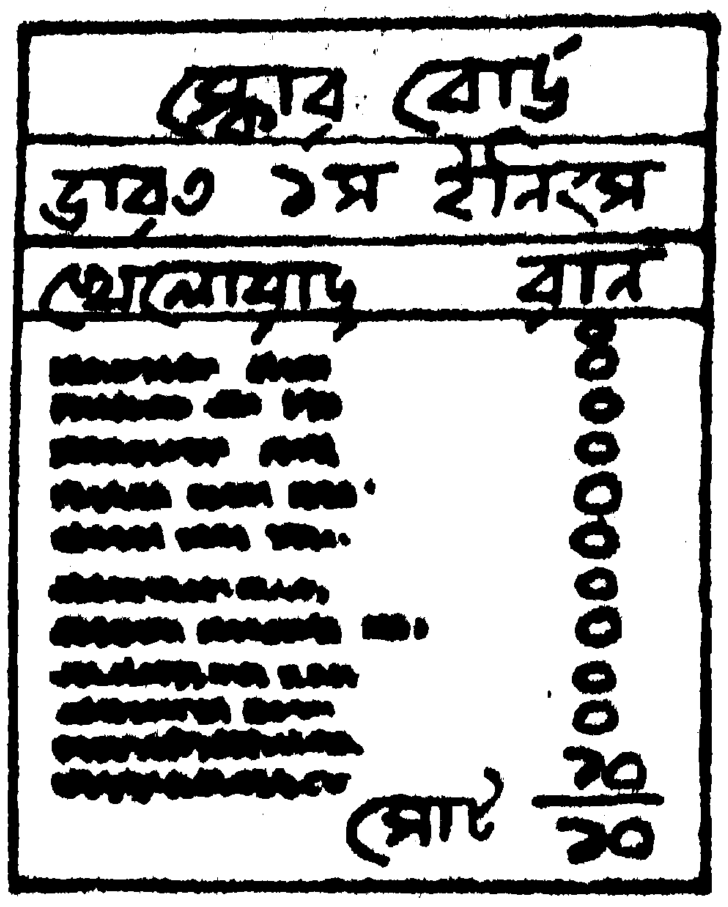

হইবে না। —"অর্থাৎ স্কোর বোর্ড আমাদের আগের মতোই থাকবে"—মন্তব্য করেন জনৈক ক্রিকেট-রসিক সহযাত্রী।

একটি বৈদেশিক সংবাদে শুনিলাম, কোন এক মহিলা নাকি যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেটিক প্রতিনিধি শ্রী কেনেডীর গায়ে একটি হুইস্কির গ্লাস ছুঁড়িয়া মারিয়াছেন। শ্রী কেনেডী বিরক্ত না হইয়া নাকি হাসিয়াছেন। —"পুষ্প দিয়ে মার যারে চিনল না সে মরণকে"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

কলিকাতার আসন্ন ঘোড়দৌড় প্রসঙ্গে 'স্টেটসম্যান' কাগজ জানাইতেছেন যে, 'শয়তান' আর 'লাভ্‌লি ওম্যানের' মরশুমের গোড়াতেই বাজি জিতিবার সম্ভাবনা। শ্যামলাল বলিল—"শয়তান আর লাভ্‌লি ওম্যান চিরকালই বাজি মেরে আসছে, স্টেটসম্যান এমন আর কী টিপ্‌স্ দিলেন"!!

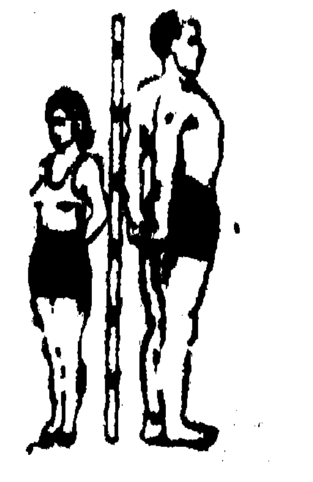

BE TALLER

and healthier by our new exercises and diet schedule. Details free.

283 (D.E.) Azad Market, Delhi-6

কে, হোড়ের
কণক
পাউডার

গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

স্বর ও সুর

সংগীতে স্বর এবং সুর—এই দুটি শব্দের মধ্যে সুর শব্দটি স্বর শব্দকে প্রায় স্থানচ্যুত করেছে বলা যায়। স্বর বলতে সংগীতে যা বোঝায়, সুর শব্দে তা তো বোঝায়ই উপরন্তু আরো অনেক বেশি বোঝায়। কীভাবে এই সুর শব্দটির প্রচলন হল, এটি গভীর চিন্তার বিষয়, কিন্তু এ সম্বন্ধে তেমন আলোচনা হয়েছে বলে মনে হয় না।

সুর শব্দটি স্বর শব্দের পরিণতি, এইটিই সাধারণ ধারণা। চলন্তিকারও এই অভিমত। এই অভিধানের মতে সুর বলতে সংগীতের রাগিণী, সা রে গা মা ইত্যাদি স্বর, ইংরেজিতে—নোট, টোন, কী (চাবি)—এই সব বোঝায়। উদাহরণ-স্বরূপ বলা হয়েছে—কণ্ঠস্বর (নাকী), বাজনার 'সুর' বাঁধা এবং গানের 'সুর'। উক্ত অভিধানে স্বর শব্দের অর্থ বলা হয়েছে কণ্ঠধ্বনি (ইংরেজিতে যাকে ভয়েস বলে), শব্দ (করুণ—উচ্চৈঃস্বর)। এছাড়া স্বর অর্থে সংগীতের ধ্বনি (অর্থাৎ সুর—ইংরেজি-নোট), স্বরগ্রাম—সংগীতের সপ্ত স্বর—এ সবও বুঝিয়ে থাকে।

এই আলোচনায় প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে, ভারতীয় সংগীতে স্বর বলতে কি বোঝাতো এবং এখন সুর বলতে আমরা যা বুঝি, স্বর বলতে সেটিও বোঝাতো কিনা; না বোঝালে আধুনিক সুর অর্থে যা বোঝা যায়, তাকে সংগীতের পরিভাষায় কী বলা হত।

সংগীতে ধ্বনি এবং নাদ শব্দের ব্যবহার হয়েছে উচ্চারণ বা প্রকাশ বোঝাতে। তার পরে শ্রুতি এবং শ্রুতির সাংগীতিক পরিপূর্ণতা ঘটেছে স্বরে। সংগীতে স্বর অর্থে মূলত সা রে গা মা পা ধা নি—সপ্তকের অংগকে বোঝায়। সাধারণ অর্থে স্বর বলতে কণ্ঠধ্বনি বোঝায় এবং সংগীত শাস্ত্রেও এইটি স্বীকৃত হয়েছে. কিন্তু স্বর বলতে কদাচ সংগীতের রাগিণী বা মাধুর্য বোঝাতো না, যা আজকাল আমরা সুর শব্দে বুঝে থাকি। 'সুর'—শব্দটি সংস্কৃত সংগীত সাহিত্যে নেই। সম্ভবত এই শব্দের প্রচলন আমাদের সংগীতে অনেক পরে ঘটেছে এবং এই শব্দকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করবার সুবিধা আছে বলে নানা অর্থেই এটি প্রযুক্ত হয়েছে।

এখন আমরা গানের সুর বলতে যা বুঝি, আগে তাকে কোন্ শব্দে প্রকাশ করা হত? এর উত্তরে আমাদের স্বীকার করতে হয় যে, সংস্কৃত সংগীত সাহিত্য থেকে অনুরূপ কোন বিশেষ শব্দ খুঁজে পাই না—রাগ, গীতি—এই সব শব্দই মনে আসে। কালিদাস শকুন্তলায় বলেছেন—"অহো রাগ-পরিবাহিনী গীতি।" সংস্কৃতে বা দেশীয় ভাষায় সুর-এর মত একটি শব্দ ছিল না বলেই এই শব্দটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আজ আমরা সুর বলতে

চমকপ্রদ, চাঞ্চল্যকর একটি বই!

আয়ুবের সঙ্গে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

দু' টাকা

●

বাংলা রম্যরচনার ক্ষেত্রে এ-বই যে এক অসামান্য আলোড়ন এনে দিয়েছে, তার কারণ, যেমন মনোরম এর বর্ণনাভঙ্গি, তেমনি চাঞ্চল্যকর এর বিষয়বস্তু। পাকিস্তানের ভাগ্যবিধাতা ফৌজী নায়ক ফীল্ড-মার্শাল মহম্মদ আয়ুব খাঁর সঙ্গে, একই যাত্রায়, মোটরে প্লেনে ট্রেনে এবং স্টীমারে, পূর্ববঙ্গ সফর করেছিলেন লেখক। সেই ভ্রমণকালীন অভিজ্ঞতারই জীবন্ত দলিল এই বই। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামাজিক ঝঞ্ঝাবর্তের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এত অসংখ্য চিত্রকে একই সঙ্গে এত সুন্দরভাবে আর-কেউ তুলে ধরেননি। তুলে ধরবার সুযোগও পাননি আর-কেউ। একদিকে আছেন আয়ুব আর তাঁর সঙ্গীরা; আর অন্যদিকে আছেন সুরাবর্দী, নুন, ফজলুল হক। ভাগ্যচক্রের আবর্তনে যাঁরা মসনদে উঠেছেন, এবং নীচে নেমে আবার ধুলায় মিশে গেছেন যাঁরা, সেই চেনা-অচেনা অসংখ্য চরিত্রের এ এক আশ্চর্য অ্যালবাম। গল্পের চেয়েও চিত্তাকর্ষক এই বই, উপন্যাসের চেয়েও আশ্চর্য।

●

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশকালেই এই চাঞ্চল্যকর ভ্রমণ-বিবরণী বিপুল-ভাবে সংবর্ধিত হয়েছিল। এখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল।

●

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড । কলকাতা ১২

ভারতের চিরায়ত সাহিত্য

কালিদাসের শকুন্তলা | **শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক**

স্বচ্ছন্দ আধুনিক গদ্যে
সরল ভাষান্তরণ
বহু দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান
চিত্রে শোভিত।
দাম : পাঁচ টাকা বার আনা

শেক্সপীয়রের লেখা নয়
কিন্তু পৃথিবীর প্রথম
শেক্সপীয়রীয় নাটক।
দাম : চার টাকা আট আনা

অনুবাদক—সত্রাজিৎ দাশগুপ্ত (সতু বাদা)
১৬এস, ডোভার লেন, কলিঃ—২৯
প্রাপ্তিস্থান : ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ডি এম লাইব্রেরী,
দাশগুপ্ত এণ্ড কোং ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়

সঙ্গীতাংশ বা পুরোপুরি মিউজিকই বুঝি।

এখন কথা হচ্ছে, 'স্বর' শব্দ থেকে 'সুর' শব্দের উৎপত্তি সম্ভব কিনা। এটা ভাষা-তাত্ত্বিকদের বিষয়, এ-বিষয়ে আমরা তাঁদের মতামতের অপেক্ষায় রইলুম—তবে একজন অভিজ্ঞ অধ্যাপক আমাকে বলেছিলেন যে, এটি অসম্ভব নয়, কেননা, 'ত্বরিত' শব্দ যদি 'তুরিত' হতে পারে, তবে 'স্বর' শব্দ 'সুর'-এ রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। কিন্তু খটকা লাগছে অর্থের দিক দিয়ে। দুটো শব্দের উচ্চারণগত পার্থক্য যাই হোক না কেন, অর্থের এত পার্থক্য ঘটে কি করে? এইতেই সন্দেহ হয়, সুর শব্দের উৎস স্বর নয়। প্রাচীন আভিধানিকগণ স্বর শব্দের অর্থ করেছেন উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত—এই তিন প্রকার ধ্বনি এবং সুর শব্দে কেবলমাত্র দেবতাবাচক শব্দই তাঁরা বুঝিয়েছেন। সুতরাং প্রাচীনকালে সঙ্গীত অর্থে সুর শব্দের প্রচলন ছিল না—এটাই আমাদের ধারণা হয়।

এইবার সুর শব্দটি কীভাবে প্রচলিত হল, সেই আলোচনায় আসা যাক। আমাদের ধারণা, 'সুর' শব্দটি প্রচলিত হয় মুসলমান আমলে, বিশেষ করে মোগল যুগে, যে সময়ে ফার্সীর প্রচলন ভারতে বিশেষ প্রসার লাভ করেছে। হুমায়ুন তুর্কী ভাষার মধ্যে মানুষ হলেও ফার্সী ভাষাই পছন্দ করতেন এবং মোগল দরবারে ফার্সীর প্রাধান্য স্থাপনে তাঁর যথেষ্ট উদ্যম ছিল। এর আগেও ফার্সীর যথেষ্ট সম্মান ছিল, তার প্রমাণ আমীর খুস্রৌ—তবে মোগল যুগে ফার্সী সারা ভারতে বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। অনেক ফার্সী শব্দ আমাদের সংগীতেও এসে গিয়েছে। ফার্সী ভাষায় 'সুরুদন্' শব্দের অর্থ গান করা এবং এটি বোঝাবার জন্য 'তারানা সুরুদন্' কথাটি ব্যবহৃত হত। আজও গান বোঝাতে 'তারানা' শব্দের ব্যবহার ভারতবর্ষে আছে। 'সুরুদ্' শব্দে গান বোঝায়। এইরকম আর-একটি শব্দ আছে—'সাজ্'। এই শব্দে যন্ত্রসংগীত বোঝায়। খুব বেশি দিনের কথা নয়, বাংলা দেশে আখড়াই, হাফ-আখড়াই-এর যুগে এই 'সাজ-বাদ্য' শব্দটির বিশেষ প্রচলন ছিল। এই শব্দেও যন্ত্রসংগীত বোঝাতো। এ ছাড়াও পশ্চিমাঞ্চলে সঙ্গীত অর্থে নাঘ্মা, নভা, সায়ের, নাজাম্, কাওয়ালী, আলহান্ প্রভৃতি শব্দ বিশেষ প্রচলিত। এর থেকে প্রমাণ হয় ফার্সী শব্দাদি আমাদের সঙ্গীতে কত ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। অতএব মুসলমান আমলে নবাব-বাদশাদের দরবারে 'সুরুদ্' শব্দটি প্রচলনের ফলে গায়ক-বাদকদের মধ্যেও এই শব্দের ব্যবহার প্রচলিত হওয়া খুবই সম্ভব এবং কলাক্রমে হয়ত এই শব্দটি কেবলমাত্র 'সুর'-এ পরিণত হয়েছে। লেখকের ধারণা, 'সুর' শব্দটি প্রথমে সংগীত অর্থেই ব্যবহৃত হত। তার পরে এটি রাগ অথবা টিউন, মেলডি প্রভৃতি বোঝাতে আরম্ভ করে; পরিশেষে স্বর বা পর্দাগুলিও এই শব্দের আওতায় এসে পড়ে।

'সুর' শব্দটির প্রচলন আকবরের আগেই ঘটেছিল বলে মনে হয়। যতদূর মনে পড়ছে, আবুল ফজল আইন-এ-আকবরিতে 'সুর' শব্দটি ব্যবহার করেছেন 'স্বর' বোঝাবার জন্য, কিন্তু রাগ, রাগিণী বোঝাবার জন্য বোধ হয় মোকাম এবং সুবাহ্ শব্দ ব্যবহার করেন। গান করা অর্থে "সুরুদন্" শব্দটি তিনি কিন্তু প্রচুর ব্যবহার করেছেন। এই সব প্রয়োগ থেকে একটি কথা মনে হয় এবং সেটি হচ্ছে এই যে, 'সুরুদ্' এবং 'স্বর'—এই দুটি শব্দের উচ্চারণগত মিলের জন্য একটি আর-একটিকে বোঝাবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করেছে এবং 'সুর' শব্দটি একটি মাঝামাঝি রূপ নিয়ে সমগ্র সংগীতকেই অধিকার করেছে।

এই প্রসঙ্গে যে আলোচনার উদ্যোগ করেছি, তা সবই অনুমানের ব্যাপার। এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতামত আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করব। তবে এই অনুমানের স্বপক্ষে কিঞ্চিৎ যুক্তি আছে বলেই আমাদের ধারণা। পরিশেষে একথাও বলা আবশ্যক মনে করি যে, দিল্লী অঞ্চলে নাচ-গান বলতে রক্স-সুরুদ কথাটি প্রচলিত। এতে 'সুরুদ' শব্দের প্রচলন যে আজও যথেষ্ট আছে, সেই কথাই প্রমাণ হয়।

বিশ্ববিপ্লবী দার্শনিক
মানবেন্দ্রনাথ রায়ের
New Humanism-এর বাংলা অনুবাদ
নয়া মানবতাবাদ ৩৲
রেনেসাঁস পাবলিশার্স, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ এবং রেনেসাঁস বুক ক্লাব পাবলিশার্স, ২৩৪এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯। (সি-৯০০০)

কলিঙ্গ-স্থাপত্য ও শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন
কোনার্কের সূর্য-মন্দির দেখতে হলে
"KONARKA AT A GLANCE"-এর
লেখক অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের
বহু চিত্র সমন্বিত ও তথ্যপূর্ণ
কোণার্ক
পড়তে ভুলবেন না
দাম দুই টাকা
বড় বড় বই-এর দোকানে পাওয়া যায়।
(সি-৯০৫৩)

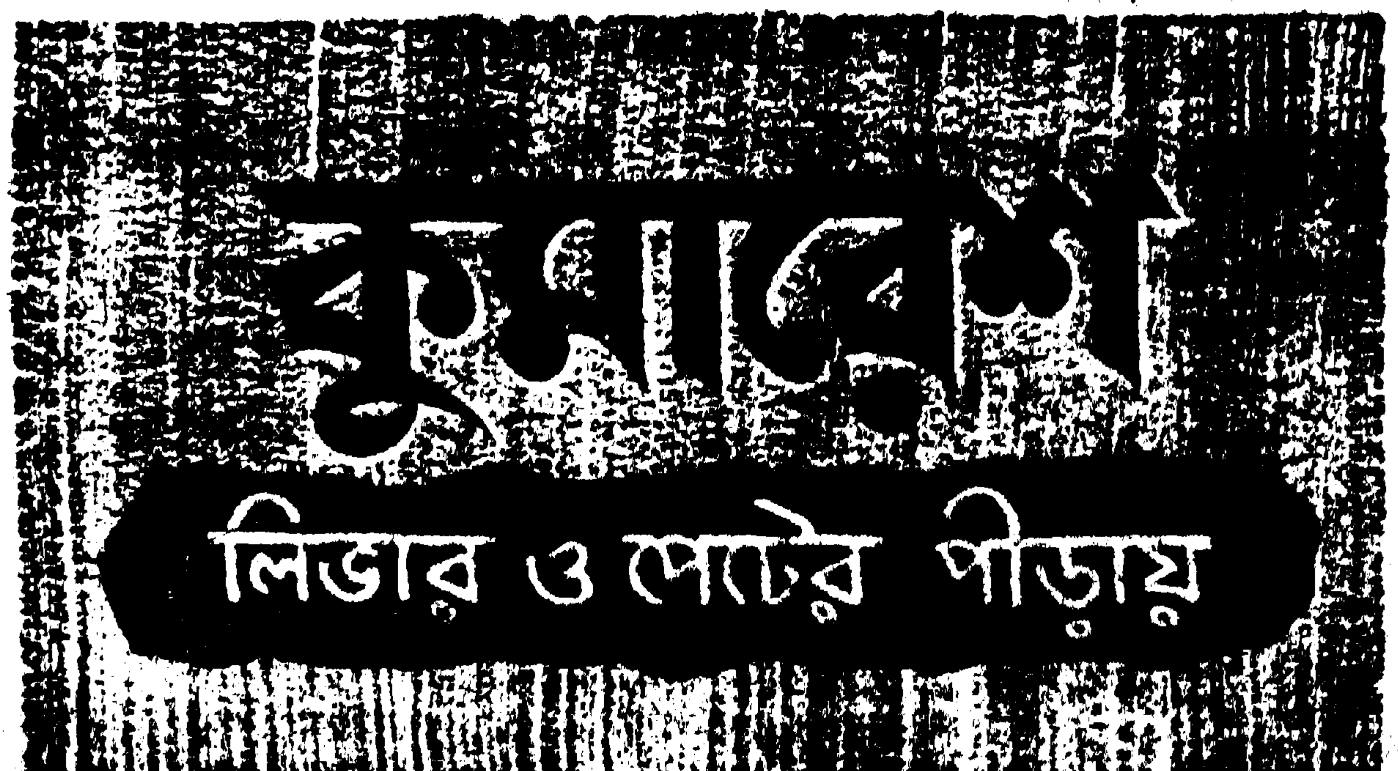

॥ ১০ ॥

কলকাতার দোকানে যখনই নতুন কোনো জিনিস উঠত, বিশেষ করে নতুন ধরণের খেলনা, বড়দাদামশায়ের তা কিনে আনা চাই। গ্রামোফোনের যুগের আগে ফোনো গ্রাফ যখন উঠেছিল বড়দাদা তাই নিয়ে অনেকদিন খেলা করেছিলেন। শব্দ তুলতেন, বাজাতেন শুনতেন, শোনাতেন সবাইকে। আমরা ছেলেবেলায় বড়দাদার ফোনোগ্রাফের চোঙএর সামনে দাঁড়িয়ে গান শুনেছি আর বড়দাদা যখন বলেছেন যে যন্ত্রটার মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট মানুষ আছে, তারাই গান করছে, তা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেছি। তারপর ফোনোগ্রাফের চোঙার আকৃতির রেকর্ডগুলো যখন অকেজো হয়ে গেছে তখন সেগুলোকে নিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে অনেক খেলা করেছি।

একদিন সন্ধ্যার সময় দক্ষিণের বারান্দার হেবির এক বিকট চীৎকার। আমরা ছুটে গিয়ে দেখি হেবি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর ইজি চেয়ারের উপর পা তুলে আধশোয়া অবস্থায় এক ভীষণ দর্শন দাড়ি-ওয়ালা মানুষ। ভয় একটু ভাঙতে কাছে গিয়ে দেখা গেল বড়দাদা মুখোশ পরে বসে রয়েছেন। হেবির ভয় দেখে মুখোশ খুলতেই বেরিয়ে পড়ল বড়দাদার মধুর হাসি ভরা মুখ। কলকাতার বাজারে বিলিতী মুখোশ উঠেছে—একেবারে আনকোরা জিনিস—তারই কটা কিনে এনেছেন।

ট্রাইসাইকেল চড়া আমাদের পুরোনো হয়ে গেছে। বাইসাইকেল চড়ার বয়েস তখনও আমরা পাইনি, সেই সময় কোথা থেকে বড়দাদা নিয়ে এলেন কাঠগুলো স্কুটার। কাঠের একখানা পাটার দু-মাথায় লাগানো দু-খানা ছোট ছোট চাকা। তার একমাথা থেকে লম্বভাবে উঠে এসেছে একটা হাতল। সেই হাতল চেপে ধরে পাটার উপর একটা পা রেখে অন্য পায়ে মাটির গায়ে ধাক্কা মেরে মেরে ছুট দিতে হয় সামনে। এমন তাজ্জব জিনিস কেউ কখনও চোখে দেখেনি। গোল-বাগানের বাঁধানো রাস্তার উপর স্কুটারের বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল। সকালের রোদে দলে দলে আমরা গোল-বাগানের গোল রাস্তার স্কুটারে চড়ে পাক খেতে লাগলুম। চাকার শব্দে গোল-বাগান মুখর হয়ে উঠল। বড়দাদার খেয়ালে আমাদের এইরকম নানান খেলনা লাভ হত।

একবার যখন এইরকম অনেক খেলনা আমাদের জমেছে, সেই সব খেলনা সাজিয়ে আমরা একটা মেলা করেছিলুম। উত্তরবঙ্গ সেবার বন্যায় ভেসে গেছে। চারিদিকে ভারি দুঃখ কষ্ট। অনেকে গৃহহারা আশ্রয় হারা সংগতিহীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দুস্থদের সাহায্যের জন্যে দেশের নানা জায়গায় চাঁদা তোলা হচ্ছে। আমরাও পড়ে গেলুম সেই স্রোতে। লেগে গেলুম চাঁদা তুলতে। আমাদের ছিল বড়দাদার দেওয়া নানা খেলনা—ভাঙা পুরোনো নতুন। তাই সাজিয়ে যে মেলা খুললাম তার নাম দিলুম—মৌচাক মেলা। ছোটদের পত্রিকা মৌচাকের তখন খুব নাম ডাক। তারই মারফত মেলায় তোলা টাকাটা পাঠিয়ে দিলুম বন্যা-ভাণ্ডারে।

এই মেলায় আমরা প্রচুর খেলনা আর পোস্ট-কার্ডে আঁকা ছবি বিক্রি করেছিলুম। আমরা হিজিবিজি আঁকতুম, বড়দাদা কিংবা দাদামশায় এক-আধটা আঁচড় দিয়ে ছবি-গুলোকে দাঁড় করিয়ে দিতেন। বেশ দামে বিক্রি হয়ে যেত ছবিগুলি। কর্তাবাবা যেবার প্রথম বর্ষামঙ্গল করেন এ হচ্ছে সেই বছর। বহু লোক, বহু গুণী জ্ঞানী বর্ষামঙ্গলের রিহার্সাল দিতে দেখতে আর শুনতে আসতেন। রিহার্সালের ফাঁকে ফাঁকে এঁদের ধরে নিয়ে আসতুম আমরা আমাদের মেলায়। খদ্দেরের অভাব হতনা। কর্তাবাবাকেও একদিন ধরে এনেছিলুম। আমাদের খেলনা তিনি কিনেছিলেন। কিন্তু আমাদের সব চেয়ে বড় খরিদ্দার ছিলেন বড়দাদামশায়। বড়দাদা একাধরে যেমন ছিলেন আমাদের খেলনা সরবরাহ কারক তেমনি ছিলেন তিনি মেলার প্রধান ক্রেতা। চাঁদার অঙ্কটা মোটা করবার জন্যে আমরা আমাদের স্কুটারগুলোকে পর্যন্ত লাটে

শক্তিমান লেখক নিশাচরের
শ্বাসরুদ্ধকারী অপূর্ব রহস্যোপন্যাস
সুলতার বিয়ে [সদ্য প্রকাশিত] ৪৲
ভিয়েনা নার্সিং হোম [৩য় মুদ্রণ চলিতেছে] ৪৲
আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস
কল্যাণী ৩৲
প্রমথনাথ বিশীর
অমনোনীত গল্প ৩৲
প্রাপ্তিস্থান : মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

চড়িয়েছিলুম। বড় শখের জিনিসগুলো, তবু মায়া ত্যাগ করেছিলুম। বড়দাদা এসেই সমস্ত স্কুটার কিনে নিলেন। তারপর সন্ধেবেলা ফিরিয়ে দিলেন আমাদের স্কুটারগুলো। হাতছাড়া হয়েই গিয়েছিল জিনিসগুলো—ফেরত পেয়ে বড় ভালো লাগল। বেশ করে চড়ে নিলুম ফের একবার। কিন্তু মৌচাক মেলার কি এক পরিবেশ, কি এক মোহ, আবার আমাদের ত্যাগের আমেজ লাগল। আবার আমরা স্কুটারগুলোকে লাটে চড়ালুম, বড়দাদা খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি মেলায় এসে স্কুটারগুলোকে দ্বিতীয়বার কিনে নিলেন। আমাদের উপর বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। তাই এবারে আর মৌচাক-মেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্কুটারগুলো আমাদের হাতে ফিরিয়ে দিলেন না। না দিয়ে ভালই করেছিলেন। স্কুটারগুলো তাই শেষ পর্যন্ত আমাদের নিজস্ব ছিল।

এরপর হঠাৎ একদিন বড়দাদা কোথা থেকে দুটো মডেল এরোপ্লেন কিনে নিয়ে

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

এলেন। সত্যিকারের এরোপ্লেন তখন আকাশে কদাচিৎ দেখা যেত। মডেল এরোপ্লেন পেয়ে আমরা হাতে স্বর্গ পেলুম। এরোপ্লেনের স্ক্রুটা রবারে পাক দিয়ে ছেড়ে দিলে আকাশে উড়ত। কিন্তু আমাদের বাগানে অনেক গাছ থাকায় এরোপ্লেনগুলো গোঁত্তা খেয়ে প্রায়ই ডাল-পালার মধ্যে আটকা পড়ে যেত। তাদের পাখনাগুলো যেত ভেঙে। বড়দাদা ভাঙা প্লেনগুলো নিয়ে বেরুলেন একদিন। যাদের কাছ থেকে কিনতেন তাদের দেখালেন। বললেন—কি করে সারানো যায় এগুলো? তারা বললে—খেলনা তো ভাঙবেই আবার নতুন কিনুন।

—উঁহুঃ!

বড়দাদার পছন্দ হলনা তাদের পরামর্শ। তিনি নতুন এরোপ্লেন না কিনে নানা দোকান ঘুরে শিরীষের আঠা, সরু কাঠ, বার্নিশ করা কাগজ, তার, পেরেক আর সুতো কিনে বাড়ি এলেন। তারপর ঐ নিয়েই পড়লেন বেশ কিছুদিন। ভাঙা এরোপ্লেন সারাতে গিয়ে বড়দাদা দেখলেন ঐ সব সরু কাঠ আর শিরীষের আঠা দিয়ে নতুন নতুন এরোপ্লেনও তৈরী করা যায়। এইভাবে নানা ধাঁচের এরোপ্লেন গড়তে শুরু করেছিলেন বড়দাদামশায়। শেষে নিজেই মাথা থেকে বার করলেন খুব হাল্কা ধরনের প্লাইডার। দেখতে এরোপ্লেনের মতো কিন্তু তাতে প্রপেলার লাগতনা। গোত্তা খেলে সেগুলো ভাঙতোও না। বহু দূরে উড়ে যেত। অনেক রকম আকৃতির প্লাইডার বড়দাদা তৈরী করেছিলেন।

এই প্লাইডার নিয়ে একবার এক কাণ্ড হয়। একটা ভারি সুন্দর প্লাইডার তৈরী করে ওড়াচ্ছেন, হঠাৎ কোথা থেকে এল এক দমকা হাওয়া। নীচে থেকে এক ঠেলা লাগল। উড়ে চললো সেটা পাখীর মতো। উড়ছে তো উড়ছেই। শেষে বসল গিয়ে একেবারে আমগাছের মগ ডালে। প্রকাণ্ড আমগাছ—সেখানে হাত পৌঁছয়না কারো। চাকর বাকর মালীরা তার মগডাল অবধি চড়তেই পারল না। লগি দিয়েও সেটাকে নামানো গেলনা। বড়দাদাই বারণ করলেন, বললেন—খোঁচা দিসনে, ছিঁড়ে যাবে। থাক বরং গাছে, গাছে চড়বার শখ হয়েছে যখন। এই ভাবে সেদিন রইলো বড়দাদার প্লাইডার আমগাছে চড়ে।

পরদিন সকালবেলা বড়দাদা বারান্দায় এসেছেন ছবি আঁকবার জন্যে। নিজের জায়গায় বসতে যাবেন, দেখেন পায়ের কাছে প্লাইডারটা পড়ে রয়েছে। পোষা কুকুর যেমন শুয়ে থাকে ঠিক তেমনি।

একে ডাকেন, ওকে ডাকেন। দেখে যা দেখে যা দুষ্টু ছেলেটা ফিরে এসেছে বলে চীৎকার করেন। চেঁচামেচি শুনে আমরা এসে ব্যাপার দেখে থ'। রাত্রে একটা ঝড়ো হাওয়া উঠেছিল, তাইতে চড়ে ফিরে এসেছেন ঘরের ছেলে ঘরে।

তারপর এলো বিলিতী বর্জনের যুগ। লোকে বিলিতি কাপড় পুড়িয়ে ফেলতে থাকল। বিলিতী সাবান এসেন্স ছেড়ে দিয়ে বেসন মেখে স্নান করতে লাগল। বড়দাদাও তাই বিলিতী খেলনা কেনা বন্ধ করে দিলেন। বহুদিন আমাদের বাড়িতে আর কোনো নতুন খেলনা নেই, নতুন টুকটাকি জিনিস নেই—সবই প্রায় পুরোনো হয়ে গেছে, ভেঙে গেছে। সেই সময় ভবানীপুরের পোড়াবাজারে এক স্বদেশী প্রদর্শনী হয়। দাদামশায়রা বললেন—যাই একবার দেখে আসি স্বদেশী প্রদর্শনীতে।

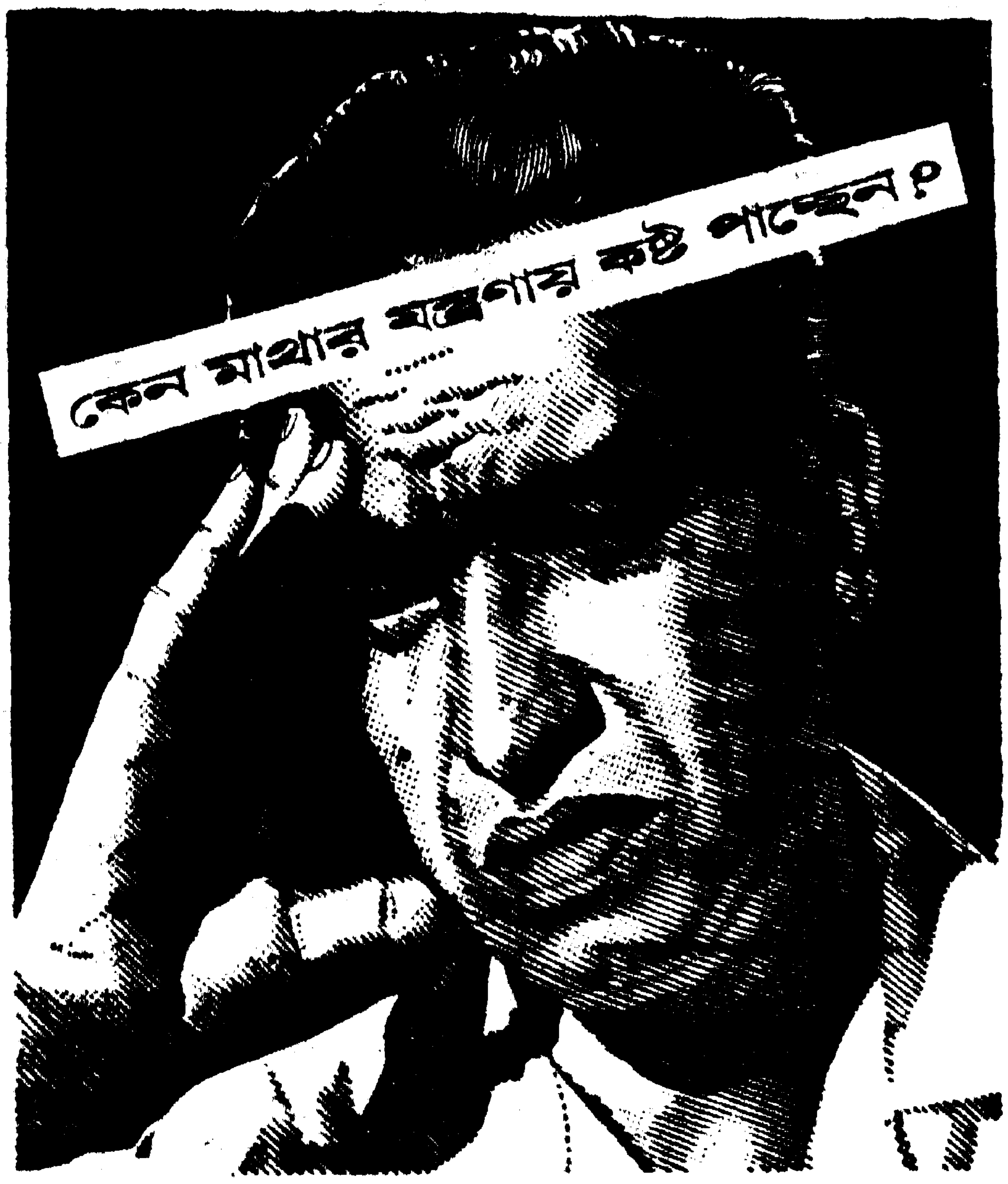

—সারিডন খেলেই তো খুব তাড়াতাড়ি ও নিরাপদে যন্ত্রণা দূর হয়।

মাথার যন্ত্রণায় আর কষ্ট পেতে যাবেন কেন—সারিডন খেয়ে সত্বর ও নিরাপদে যন্ত্রণা ও ব্যথার উপশম করুন।
সারিডন-এ অনিষ্টকর কোন কিছু নেই, এতে হার্টের কোন ক্ষতি বা হজমের কোন গোলমাল হয় না। তার ওপর বিশেষ উপাদানে তৈরি ব'লে সারিডন আশ্চর্যরকম তিনটি কাজ দেয়—এতে যন্ত্রণার উপশম হয়, মনের স্বাচ্ছন্দ্য আসে ও শরীর ঝরঝরে লাগে।
মাথা-ধরা, গা-ব্যথা, দাঁতের যন্ত্রণা এবং সাধারণ ব্যথা-বেদনায়, তাড়াতাড়ি আরাম পেতে হ'লে সারিডন খান... সারিডন নিরাপদ বেদনা-উপশমকারী।

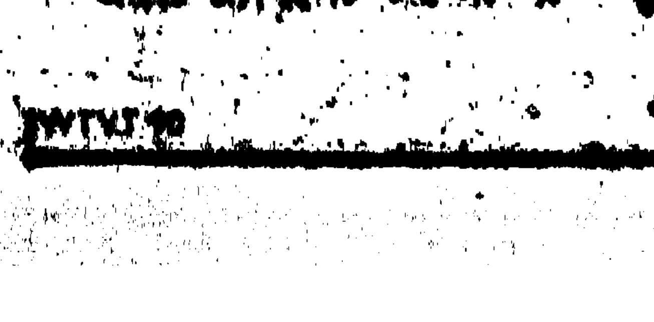

একটিই যথেষ্ট
একটি ট্যাবলেট ১২ নঃ পঃ

★ সারিডন স্বাস্থ্যসম্মত মোড়কে থাকে, হাতে ধরা হয় না।
★ সারিডন একটি ট্যাবলেটের দাম বারো নয়া পয়সা।
★ একটি সারিডন-ই প্রায় ক্ষেত্রে পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে পুরো এক মাত্রা।

একমাত্র পরিবেশক : ভলটাস লিমিটেড

নতুন কিছু উঠল কিনা। বড়দাদা বললেন—খেলনা টেলনা ওঠে তো নিয়ে আসব।

তিন দাদামশায় গেলেন পোড়াবাজারে স্বদেশী একজিবিশন দেখতে। বিকেল বেলা গেছেন, সন্ধেবেলা হঠাৎ খবর পাওয়া গেল পোড়াবাজারের প্রদর্শনীতে আগুন লেগেছে। নবুমামাই প্রথম খবর এনেছিলেন। কোথা থেকে শুনেছিলেন জানিনা—মুখ টুখ ভয়ে তাঁর সাদা। বললেন—ভিতরে যারা ছিল শুনলুম কেউ বেরতে পারেনি, সব মাংসের কোপ্তা হয়ে গেছে। টেলিফোনের পর টেলিফোন। লোকজন ছুটল। বাড়ির সকলে মহা চিন্তিত—দাদামশাদের দেখা নেই। অনেককাল আগে একবার পুড়েছিল বলে নাম পোড়াবাজার। আবার সেখানে আগুন লেগেছে। তাই যেন ভয়টা আরো বেশী।

তারপর অনেক পরে দাদামশারা ফিরলেন অক্ষত দেহে। আগুন লাগার ফলে ছুটোছুটি ধাক্কাধাক্কি শুরু হওয়ায়, গেটের দিকে ভীড়ের চাপ বাড়ায় দাদামশায়রা আর সেদিকে এগোননি। আশ্রয় নিয়েছিলেন একজিবিশনের এক নিরালা কোণে। তারপর হাঙ্গামা চুকে গেলে, সব ঠান্ডা হলে আস্তে আস্তে বেরিয়েছেন। তাইতে ফিরতে এত দেরি।

সকলে দাদামশায়দের জিজ্ঞেস করলে—একজিবিশনে কি দেখলে?

মেজদাদামশায় বললেন—এবার থেকে বিলিতী জিনিস না কিনলেও চলবে। সব কিছুই দেশে তৈরী হচ্ছে দেখে এলুম।

দাদামশায় বললেন—দেখলুম আগুনের বেড়াজাল। সাপের মত কিলবিল করছে দমকলের নলগুলো আর তাদের মুখগুলো ফুঁসছে। আঁকবার মতো।

আর বড়দাদামশায় বললেন—কোনো নতুন জিনিস দেখতে পেলুম না। গান্ধী এখন চরকা আর খাদি নিয়েই ব্যস্ত—নতুন জিনিস করবে কে?

আমরা হতাশ হয়ে বললুম—কিছু নতুন পেলেনা?

বড়দাদা আর দাদামশায় এক সঙ্গে বলে উঠলেন—পেয়েছি, এই দেখ।

বলে জোব্বার গভীর পকেট থেকে দুজনে টেনে বার করলেন দু-টুকরো ভাঙা কাঁচ। পুরু কাঁচের চাদর এমন করে ভেঙেছে যে দেখে মনে হয় এক একটি কাগজ-চাপা। কাঁচের ভিতরটা ভেঙে চৌচীর হয়ে রয়েছে—অতি বিচিত্র কারুকার্য তার। আগুনের হলকায় কোনো বড় দোকানের প্লেট গ্লাসের জনালা যখন তেতে আগুন হয়ে উঠেছে, সেই সময় হয়তো দমকলের নলের ঠান্ডা জল এসে পড়েছিল। তাইতে অমনি করে ফেটে ছড়িয়ে পড়েছিল কাঁচগুলো। সারা প্রদর্শনীতে আর কিছু নতুন না পেয়ে তাই কুড়িয়ে নিয়ে এসেছেন দাদামশায়রা।

রাত্রে ভালো বুঝতে পারিনি, সকাল বেলার আলোতে কাঁচের টুকরো দুটি দেখে আমরা অবাক। তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখার জড়াজড়ি আর তারই ফাঁকে ফাঁকে সবুজে আর নীলে মিশে নানান অদ্ভুত রং খেলে বেড়াচ্ছে। আচ্ছা জিনিস কুড়িয়ে এনেছেন দাদামশায়রা পোড়া একজিবিশন থেকে। দাদামশার কাঁচটা তাঁর ডেস্ক-এর মধ্যেকার গোল কাঠের বাক্সের মধ্যে টুকি টাকি নানা সংগৃহীত জিনিসের জঙ্গলে মিলিয়ে গেল। আর বড়দাদা সকালের আলোয় নিজের চৌকিতে বসে কাঁচটা ঘুরিয়ে তার মধ্যেকার রঙ আর নানা রেখার কারিগরি দেখতে থাকলেন।

এই কাঁচটি নিয়ে কিছুদিন নাড়া-চাড়া করার পর বড়দাদা হঠাৎ একদিন মহা উৎসাহিত অবস্থায় বিকেল বেলা বাড়ি ফিরেই একটা ব্রাউন কাগজের মোড়ক খুলতে লাগলেন। কি ব্যাপার দেখবার জন্যে আমরা সবাই ঝুঁকে পড়লুম। শুনলুম একটা রং দেখবার যন্ত্র কিনেছেন। জিনিসটা বিলিতী অবশ্য। কিন্তু বড়দাদা বোধ হয় ততদিনে ঠিকই করে ফেলেছেন যে স্বদেশীরা যখন কিছু তৈরী করতে পারলোই না তখন কিছু কিছু বিলিতী জিনিস কিনেই মজা পাওয়া যাক। ব্রাউন কাগজের মোড়ক খুলে বেরল জিনিসটা। সেটি ছোট মাইক্রোস্কোপের মত একটা যন্ত্র। একদিকে চোখ লাগিয়ে অন্য দিকে টুকরো কাঁচ বা স্বচ্ছ পাথর রাখলে নানা রকম রং দেখা যায়। ভাঙা কাঁচ, পাথর অনেক কিছু যোগাড় হল। আমরা সবাই চোখ দিয়ে দেখলুম। সবুজ, বেগুনী, হলদে, নীল, লাল নানা রং ঐ ভাঙা টুকরোগুলো থেকে দিকে বিদিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। যেন একটা রংএর ফোয়ারা। একটু ঘুরিয়ে দিলেই রংএর হেরফের হয়ে একটা নতুন সমবায় ও গঠনের সৃষ্টি হয়। নতুন রকমের রংএর ঢেউ উঠতে থাকে। ভারি মজার ব্যাপার। যন্ত্রটা যে কি, কোথা থেকে বড়দাদা কিনে এনেছিলেন এ বিষয়ে আজও আমার কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। সেটা আলোক রশ্মি বিশ্লেষণের কোনো বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, না শুধু একটা খেলা, বলতে পারিনা। তবে এটা জানি যে বড়দাদা সেটাকে খেলনার মতোই ব্যবহার করতেন। ঐ নিয়ে বসে থাকতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নানারকম রংএর খেলা দেখতেন আর থেকে থেকে আমাদের ডেকে দেখাতেন। লোকে থিয়েটার দেখে, বায়োস্কোপ দেখে, নাচ দেখে, একজিবিশনে গিয়ে ছবি দেখে, পাথরে-কাটা মূর্তি দেখে, বড়দাদা রং দেখতেন।

অনেকেই জানেন না এই হচ্ছে বড়দাদামশার কিউবিজম্ ছবি আঁকার প্রথম ইতিহাস। এই যন্ত্রের ভিতর দিয়ে রং আর রেখার কাটাকুটি দেখতে দেখতে বড়দাদার কিউবিজম্-এর ছবির প্রেরণা জাগে। প্রথম প্রথম যে-সব ছবি এঁকে আমাদের দেখান সেগুলি দেখেই আমরা বলে উঠেছিলুম—আরে এ তো ঐ নলের মধ্যে দেখেছি। বড়দাদার কিউবিজম্ স্টাইলে আঁকা বহু নাম-করা ছবি আছে। তার মধ্যে দুএকটি বিখ্যাত ছবি যেমন, 'দুই আলোক-পরীর নৃত্য' এ একেবারে ঐ কাঁচের পরকলার মধ্যে দিয়ে যা দেখেছিলেন হুবহু তাই আঁকা।

নতুন নতুন খেলনার শখ বড়দাদার বরাবর ছিল। বড়দাদার ছবি আঁকাটা-ও অনেকাংশে তাই। রং তুলি আর কাগজ নিয়ে খেলা। খেলার মতই তিনি ছবি আঁকতেন। একই ছবি বার বার আঁকতেন। পছন্দ না হলে ছিঁড়ে ফেলে আবার আঁকতেন। বড়দাদার টুকরো [illegible] ঝুড়ি প্রায়ই ছেঁড়া ছবিতে ভর্তি হয়ে উঠত। সেই ঝুড়ি হাতড়ে আমরা [illegible] সময় টুকরো বেছে ধারগুলো কেটে [illegible] ভালো ভালো ছবি পেয়ে গেছি।

১১শ

টি-বি সীল

বিক্রয় অভিযান

আরম্ভ হয়েছে ২।১০·৬০
সমাপ্ত হবে ২৬।১।৬১

প্রতিখানা ১০ নয়া পয়সা

একখানি সীল কেনার অর্থ আপনার দশ নয়া পয়সা ব্যয়; কিন্তু দুঃস্থের সেবায় এই সামান্য দানই অসামান্য হয়ে উঠবে—সার্বজনীনতার গুণে। অন্যকে কিনতে উদ্বুদ্ধ করুন।

বংগীয় যক্ষ্মা সমিতি

পি২১, স্কীম ৪৯, সি-আই-টি রোড,
কলিকাতা-১৪।

কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

৪৪

কিন্তু এর পরেই ঘটলো পুরী যাওয়ার ঘটনা। প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের ঘোষেদের বাড়ির বাইরে থেকে যারা দেখতো, তাদের চোখে পড়তো অন্য জিনিস। খাকি ইউনিফর্ম পরা দরোয়ান কাঠের টুলের ওপর বসে থাকতো গেটের পাশে। সরু ইঁট বাঁধানো লম্বা রাস্তাটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানকার গ্যারাজে পর পর দুখানা গাড়ি। তার পাশে বাগানের ফুল গাছের কেয়ারি। পাশের লাল রং-এর বাড়িটার রং করা দরজা-জানালা, শার্সি খড়খড়ি, আলো জাঁক-জমক—কোনও কিছুরই কমতি নেই। যারা আরো একটু ভেতরে ঢুকতো তারা আরো অবাক হয়ে যেত এ-বাড়ির ঐশ্বর্য দেখে। মার্বেল পাথরের ফ্লোর, মোরাদাবাদী ভাস-এ পাতাবাহারের চারা, বাগানের শেষ প্রান্তের এক কোণে রাজহাঁসের দল বেঁধে চরা। কলকাতা শহরের ভবানীপুর অঞ্চলের বুকের মধ্যেও যেন এ এক অন্য জগৎ। সমস্ত বাড়িটা সব সময়েই যেন বড় নিরিবিলি। রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ হয়ত গেট্ দিয়ে একটা গাড়ি হট্ করে বেরিয়ে এল। দরোয়ান তার আগেই হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। দেখা যেত গাড়ির ভেতর বসে আছে একজন গরদের থান পরা বিধবা মেয়েমানুষ। পাকা চুলের ওপর বেশ যত্ন করে চিরুনি বোলানো। আর তার পাশেই একজন ভদ্রলোক। ধব্ ধব্ করছে দুজনের গায়ের রং। প্রশান্ত গম্ভীর ধীর স্থির চেহারা। গাড়িটা বেরিয়ে যেতেই গেটটা আবার বন্ধ হয়ে যেত!

যারা দেখে তারা বলাবলি করে—খুব বড়লোকের বাড়ি মনে হচ্ছে হে—

কিন্তু সেদিন যখন গাড়িটা বেরলো তার ভেতরে তখন অন্য একজন। সেই বিধবা মেয়েমানুষটিও নেই, সেই প্রশান্ত চেহারার ভদ্রলোকটিও নেই। আছে অন্য একজন। বেশ সুন্দর ফরসা একটি বৌ। মাথায় কোঁকড়ানো চুলের খোঁপা। শরীরে আলো রূপের ঢেউ।

যারা দেখলে তারা বলাবলি করলে—খুব আরামে আছে মশাই এরা, এদেরই তো রাজত্ব হে—

হয়ত দীর্ঘনিশ্বাসও পড়লো কথাটার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু যাকে লক্ষ্য করে বলা সেই সতীর কানে এ সব পৌঁছুল না।

ড্রাইভার শুধু এবার জিজ্ঞেস করলে—কোন দিকে যাবো বৌদিমণি?

সতী বললে—ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন—কালীঘাট—

সমস্ত দিন ধরে সতী কেবল ভেবেছিল। প্রথমে কিছুই বলেননি শাশুড়ী। বাতাসীর মা সব খবর রাখে ভেতর-বাড়ির। সে-ও জানতে পারেনি। ভূতির মা, শম্ভু, দরোয়ান, বাড়ির অন্য চাকর ঝি তারাও কেউ জানতো না। সরকারবাবু নিজের ঘরে বসে হিসেব নিকেশ করে—তারও জানা ছিল না হয়ত। সনাতনবাবু লাইব্রেরী ঘরে ছিলেন। বাইরে থেকে মা ডাকলেন—সোনা—

সনাতনবাবু বললেন—আমাকে ডাকছো মা?

—হ্যাঁ, আজ রাত্রের ট্রেণে পুরী যাবো, আমার সঙ্গে যেতে হবে তোমাকে। অনেক দিনের মানত্ ছিল, এখন না গেলে হয়ত আর যাওয়া হবে না।

সরকারবাবু ডাক পেয়েই চশমাটা পরে দৌড়ে এলেন। শাশুড়ী বললেন—ক্যাশে টাকা আছে সরকারবাবু?

—আজ্ঞে কত?

—হাজার দুয়েক?

—আজ্ঞে মা, হাজার দুয়েক তো হবে না, আমি দেখছি কত আছে!

শাশুড়ী বললেন—দেখতে হবে না, আপনি ব্যাঙ্ক থেকেই তুলে আনুন, সোনা সই করে দিচ্ছে—

এসব ঘটনা ঘটেছে নিচের। কখন সরকারবাবু ব্যাঙ্কে গেছে টাকা তুলতে গেছে কখন ট্রেণের টিকিট কাটা হয়েছে, কিছুই জানতে পারেনি সতী। সকালে উঠে যথারীতি কলঘরে গেছে। সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছে, তারপর রান্নাবাড়িতে গেছে। তারপর দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়েছে। দুপুর বেলা নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে বইএর পাতাও উল্টিয়েছে। বিকেল বেলা সনাতনবাবু একবার ঘরে এসেছিলেন, তিনিও কিছু বলেন নি।

খবরটা দিলে শম্ভু।

শম্ভু এসে বললে—বৌদিমণি, দাদাবাবুর জামা-কাপড় বার করে দিন—

—জামা-কাপড়? জামা-কাপড় বার করে দেব কেন? ধোপা এসেছে?

—আজ্ঞে না, দাদাবাবু যে পুরী যাচ্ছেন মামণির সঙ্গে!

পুরী! আকাশ থেকে পড়লো সতী! হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই, পুরী যাচ্ছেন!

শম্ভু বললে—হ্যাঁ বৌদিমণি, ভাঁড়ারে হুকুম হয়ে গেছে, ঘি-ময়দা বেরিয়েছে

সর্ব্ব প্রকার
বই
ও
ম্যাগাজিনের
জন্য
ম্যানকাইন্ড
[illegible]
(সি ৮৫৩৯।১)

খাবার দেখে ভয় হচ্ছে?
হিউলেট্স
মিক্শ্চার
খাওয়া দাওয়ার পরে পাকস্থলীর ব্যথায় দীর্ঘস্থায়ী আরাম এনে দেবে।
সি. জে. হিউলেট এণ্ড সন (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড
৮৬।এ, নাইনিয়াপ্পা নায়ক স্ট্রীট
মাদ্রাজ-৩
HCM 1127

বাতাসীর মা লুচি ভাজতে বলেছে ঠাকুরকে বিছানা বাঁধছে কৈলাস. এবার সুটকেশ গোছানো হবে—

ধড়মড় করে উঠে বসলো সতী! পুরী যাচ্ছেন দুজনে—আর সে! সতী কি এখানে থাকবে? জামা-কাপড় বার করে দিলে আলমারী থেকে। একগাদা জামা-কাপড়। সমস্ত মাথাটা যেন গরম হয়ে গেল এক মুহূর্তে! শম্ভু জামা-কাপড়-গুলো নিয়ে যাবার পর সতী একবার দাঁড়ালো চুপ করে ঘরের মধ্যেই। মনে হলো তখনি ছুটে যায় লাইব্রেরী-ঘরে। কিন্তু তারপরেই আবার গিয়ে দাঁড়াল জানালার সামনে। জিনিস-পত্র বাঁধা ছাঁদা হচ্ছে, খাবার তৈরি হচ্ছে—আর সতী কিছুই জানে না! সতীকে কিনা খবরটা শুনতে হলো চাকরের মুখ থেকে।

সবসময় ছট্‌ফট্‌ করে বেড়াতে লাগলো সতী! ঘড়িতে চারটে বাজলো। পাশে চাকর-বাকরদের আনা-গোনার শব্দ হচ্ছে। তোড়-জোড় চলছে যাওয়ার। নিচের রান্না-বাড়িতে লুচি ভাজা হচ্ছে। হঠাৎ শম্ভুকে দেখেই সতী ডাকলে—শম্ভু শোন্—

শম্ভু আসতেই সতী জিজ্ঞেস করলে—সঙ্গে কে-কে যাচ্ছিস্ তোরা? তুই যাচ্ছিস্?

শম্ভু বললে—না বৌদিমণি, আমি যাচ্ছি না, কৈলাস, ঠাকুর আর বাতাসীর মা যাবে—

—তাহলে ঠাকুর গেলে এখানে রান্না করবে কে?

—নতুন বামুন ঠাকুর!

তারপর হঠাৎ কী মনে হলো। একটু থেমে বললে—দাদাবাবু তোর কোথায় রে? লাইব্রেরী ঘরে?

—না, মামণির ঘরে!

সতী বললে—আচ্ছা তুই যা—

কী যে করবে বুঝতে পারলে না। মনে হলো এখনি বাবাকে টেলিগ্রাম করে দেয়। আর এক মুহূর্ত এ-বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করছে না। দরকার নেই এই সংসারে। দরকার নেই। দরকার নেই। নিজের ঘরের মধ্যে ছটফট্ করতে লাগলো সতী! মনে হলো একটা খাঁচার মধ্যে যেন কেউ তাকে পায়ে শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে। আর বেরোবার উপায় নেই তার। হঠাৎ জামা-কাপড় পরা সাজা-গোজা সনাতনবাবু ঘরে এসে হাজির হলেন।

সতী সামনে গিয়ে কী বলবে বুঝতে পারলে না। হাঁফাতে লাগলো খানিকক্ষণ। তারপর বললে—তোমরা পুরী যাবে?

সনাতনবাবু যেন অন্য কিছু ভাবছিলেন। বললেন—হ্যাঁ, কেন?

—তা আমাকে তো জানাওনি কিছু তোমরা?

—তুমি জানতে না?

সনাতনবাবু যেন এতক্ষণ জানতেন না সে-কথা। বললেন—তা নাই বা জানলে, আমিও তো জানতুম না, এখন মা আমাকে বললে—

—কিন্তু আমাকে জানানোও কি তোমাদের উচিত ছিল না?

সতী কথাগুলো বলতে বলতে হাঁফাচ্ছিল।

—আমি কি তোমাদের বাড়ির কেউ নই?

সনাতনবাবু বললেন—সত্যিই তো, তোমাকে জানানোই উচিত ছিল—

বলে তিনি নির্বিকারভাবেই ঘর থেকে

... এণ্ড কোং. ১২৯ বাধাবাজার স্ট্রীট কলিক

চলে যাচ্ছিলেন। সতী তাঁর সামনে ঘুরে গিয়ে দাঁড়াল, বললে—তুমি কী বল তো? তোমরা সবাই চলে গেলে আমি একলা এ-বাড়িতে থাকবো কী করে? আমাকে একলা ফেলে যেতে তোমাদের কষ্ট হয় না—

সনাতনবাবু কেমন যেন বিব্রত বোধ করলেন। বললেন—না না, তুমিই বা একলা থাকবে কী করে? সত্যিই তো! দাঁড়াও মাকে বলছি গিয়ে, আমি বলছি গিয়ে মাকে—

সতী সনাতনবাবুর হাতটা খপ্ করে ধরে ফেললে। বললে—বলতে হবে না। বলতে হবে না তোমার মাকে—আমি যেতে চাই না, আমি একলাই থাকবো—একলা থাকতে কোনও কষ্ট হবে না—

সনাতনবাবু সতীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন—তা হলে বলবো না মাকে?

—না, বলতে হবে না। তোমরা যেখানে খুশী যাও, যতদিন ইচ্ছে থাকো, আমার দরকার নেই তোমাদের, আমি এখানে খুব আরামে থাকবো।

সনাতনবাবু যেন নিশ্চিন্ত হলেন মনে হলো। বললেন—হ্যাঁ, মা-ও সেই কথাই বলছিল, শম্ভুকে রেখে যাচ্ছি, আর নতুন বামুন ঠাকুর রইল। আর আমরা তো বেশি দিন থাকবো না। পাঁচ ছ'দিনের মধ্যেই ফিরে আসবো—

সতী হাতটা ছেড়ে দিলে। সনাতনবাবু আবার হঠাৎ ভেবে বললেন—তা তোমার যদি যাবার ইচ্ছে থাকে তো চলো না, তোমার কথাটা ঠিক আমার মনে ছিল না—

সতী বললে—না, থাক্, আমি যাবো না—

—তা হলে আসি, কেমন!

বাইরে থেকে শাশুড়ীর গলা শোনা গেল—সোনা—

—যাই মা—

সনাতনবাবু বেরিয়ে গেলেন। শাশুড়ী একটু পরেই ঘরে ঢুকলেন। সেই গরদের থান। মাথার পাকা চুলের ওপর চিরুনি বোলানো। ব্যস্ত খুব। শাশুড়ীকে আসতে দেখেই সতী সামনে এসে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। শাশুড়ী বললেন—সাবধানে থাকবে বৌমা, আমি সরকারবাবুকে সব বুঝিয়ে বলে গেলাম—তোমার অসুবিধে হবে না কিছু, শম্ভুকে রেখে গেলাম, নতুন ঠাকুরটাও রইল, দরোয়ানকে বলে দিচ্ছি একটু হুঁশিয়ার হয়ে যেন থাকে—আর, আর কিছু বলতে হবে?

সতী বললে—না!

—দেখ আমার মানত ছিল বলেই যাওয়া, নইলে কে যায় এই সময় সংসার ফেলে? তোমার কিছু অসুবিধে হলে শম্ভুকে বলবে, সরকারবাবুকে সব বলা আছে আমার—

তারপর হঠাৎ যেন কী মনে পড়ে গেল। বললেন—যাই, ট্রেনের দেরি হয়ে যাবে আবার—

বলে শাশুড়ী চলে গেলেন। সনাতনবাবু আগেই চলে গিয়েছিলেন। সতী ঘরটার মধ্যে একলা খানিকক্ষণ সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সদর রাস্তার গেট খোলার শব্দ শোনা গেল। গাড়ি বেরলো। গাড়ির শব্দটাও এক সময়ে মিলিয়ে গেল। তারপর সব ফাঁকা। সতীর মনে হলো সমস্ত বাড়িটা যেন নিঃশব্দে একটা অট্টহাসি হাসতে লাগলো তার দিকে চেয়ে। মনে হলো এই ঐশ্বর্য, এই গাড়ি, এই সুখ, আরাম, বৈভব সব যেন মিথ্যে। সব যেন ফাঁপা! এর চেয়ে যদি তার অসুখ করতো, যদি সে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে থাকতো সে-ও যেন অনেক ভাল ছিল তার পক্ষে। এর চেয়ে যদি একটা ছোট সংসারের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতো তার চিন্তা-ভাবনা-কর্ম, সে-ও যেন এর চেয়ে অনেক ভাল হতো। এই প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বিরাট বাড়িটার চেয়ে ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের পুরোন ভাঙা বাড়িটাও যেন অনেক ভাল ছিল।

শম্ভু এল ঘরে হঠাৎ। বললে—বৌদিমণি—

—হ্যাঁরে, ও'রা চলে গেছেন?

রাত্রে খাবে না-ই ভেবেছিল সতী! কিন্তু কেন খাবে না। কেন সে নিজেকে কষ্ট দেবে? কার ওপর অভিমান করে? কে তার অভিমানের মূল্য দেবে? আবার ডাকলে—শম্ভু—

শম্ভু ঘরে এল আবার। সতী বললে—আমি খাবো রে—

—তখন যে বললে খাবো না! উনুন নিবিয়ে দিয়েছে নতুন ঠাকুর—

—তা হোক, আবার উনুনে আগুন দিতে বল্, আমার জন্যে লুচি ভাজবে!

সেই অত রাত্রে আবার উনুনে আগুন দিতে হলো। বাতাসীর মা চলে গিয়েছে। ভুতিরমা'র ঘাড়ে পড়েছে সংসার। নতুন ঠাকুর আবার লুচি ভাজলে। আবার বৌদিমণির জন্যে লুচি ভাজা হলো। আবার তরকারী রান্না হলো। সতী চেয়ে চেয়ে খেলে। কী হয়েছে তার? কিছুই হয়নি। সে কেন শরীরকে কষ্ট দিতে যাবে। আরাম করে খেয়ে রাত ভোর ঘুমোবে। দেরি করে ঘুম থেকে উঠবে সকাল বেলা। শাশুড়ী নেই যে তাকে ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠতে হবে।

তারপর খাওয়া-দাওয়ার পর সতী বিছানায় শুয়ে পড়লো।

ভুতির মা বললে—বৌদিমণি, একলা শুতে তোমার ভয় করবে না তো?

—কেন, ভয় করবে কেন?

—না, বলি বলো তাহলে আমি তোমার দরজার বাইরে না-হয় শুচ্ছি—

চলন্তিকার

কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস

॥ শক্তিপদ রাজগুরু ॥

মন মানে না ৩·০০

অবাক পৃথিবী ৩·৫০

পথ বয়ে যায় ৩·৭৫

॥ চিত্রগুপ্ত ॥

আমি চঞ্চল হে ৩·০০

॥ মদন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

পরপূর্বা ২·৫০

॥ শান্তি দাশগুপ্তা ॥

অগ্নিসম্ভবা ৩·৭৫

॥ মনোজিৎ বসু ॥

বেলাভূমি ২·৫০

॥ শিবদাস চক্রবর্তী ॥

মেঘমেদুর ২·৫০

॥ মনোজ সান্যাল ॥

শ্বেত-চন্দন ৩·৭৫

• অনুবাদ সাহিত্য •

এমিল জোলার "হিউম্যান বিস্ট"-এর বঙ্গানুবাদ

পাশবিক ৫·৫০

এ্যালবার্টো মোরাভিয়ার The Woman of Rome-এর বঙ্গানুবাদ

রোমের রূপসী (প্রথম খণ্ড) ৪·০০

রোমের রূপসী (দ্বিতীয় খণ্ড) ৫·০০

অনুবাদক: প্রবীর ঘোষ

চলন্তিকা প্রকাশক

১২নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ক্যাডবেরীর চকোলেট আপনার জন্য উপকারী কেন ?

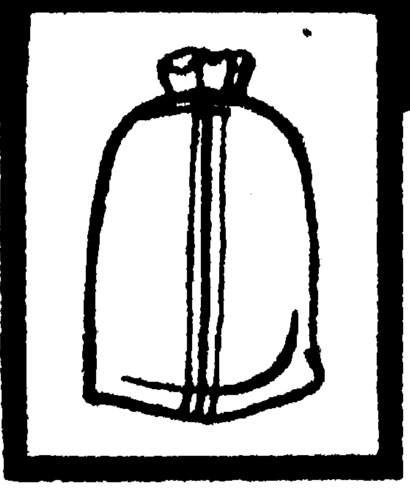

চিনি

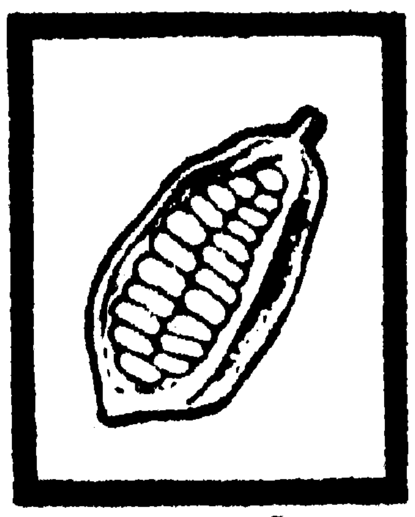

কোকো বীন্‌স্

কারণ এতে আছে টাটকা দুধ, পরিশুদ্ধ চিনি এবং পুষ্টিকর কোকো বীনের যাবতীয় স্বাভাবিক সদ্‌গুণ এবং দেহে উদ্যম সঞ্চারের ক্ষমতা।

ক্যাডবেরীর মিল্ক চকোলেট ছেলে-বুড়ো সকলেরই অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য, আর খেতেও অতি সুস্বাদু !

ক্যাডবেরী মানেই সেরা

—না, না আমার কী হয়েছে? তুমি তোমার নিজের ঘরে শোও-গে যাও ভূতির-মা, আমার জন্য তোমার কষ্ট করার দরকার নেই—

—তা হলে দরজায় খিল লাগিয়ে দিও বৌদিমণি!

ঘুম অবশ্য আসেনি সেদিন সতীর। ঘুম এলে অন্যায় হতো। সমস্ত রাত কত রাজ্যের শব্দ শুনেছে শুয়ে শুয়ে। তারপর শেষ রাত্রের দিকে একটু তন্দ্রাও এসেছিল বোধহয়। তা সেও খানিকক্ষণের জন্যে! তারপরেই ঘড়ির শব্দ কানে এসেছে আবার। আবার দূরে ট্রাম-বাস চলার আওয়াজ এসেছে কানে। সতী তখন বিছানা থেকে উঠে পড়েছে। উঠে বাইরে বারান্দায় এসে দেখেছে ভূতির মা দরজার সামনেই মেঝের ওপর শুয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে—

—ভূতির মা, ও ভূতির মা।

ভূতির মা ধড়মড় করে উঠে বললে—বৌদিমণি?

—সকাল হয়ে গেছে, উঠবে না?

তারপরে শম্ভুকে ডাকলে সতী। বললে—ড্রাইভারকে বলবি আমি বেরোব আজ গাড়িতে—

—কোথায় যাবে বৌদিমণি তুমি?

—তা তোর শোনবার দরকার কী? আমার যেখানে খুশী বেরোব, যা বলছি তাই কর গিয়ে—

তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিয়ে সতী একটা শাড়ি বেছে নিয়ে পরলে। ভাল শাড়ি। মুখটায় স্নো পাউডার ঘষে নিলে। প্রথমে কোনও ঠিক ছিল না কোথায় যাবে। শম্ভু বলেছিল—আমি তোমার সঙ্গে যাবো বৌদিমণি?

—না, তুই থাক্, দরোয়ান আমার সঙ্গে যাবে!

ড্রাইভার একবার জিজ্ঞেস করেছিল—কোন্ দিকে যাবো বৌদিমণি?

সতী বললে—ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন—কালীঘাট—

কিন্তু হঠাৎ কী যে হলো। গাড়িটা তখন হাজরা রোড় দিয়ে ঢুকে বাঁ দিকে ঘুরছিল। হঠাৎ সতী বললে—না সোজা চলো—

তখন সকাল। এত সকালে গেলে হয়ত সবাই বিরক্ত হয়ে উঠবে সেখানে। গলির ভেতরে তো গাড়িটা ঢুকবে না। অনেক দিন পরে যাওয়া। হয়ত সতীকে দেখে সবাই অবাক হয়ে যাবে। হয়ত তাদের সেই বাড়িটাতে নতুন ভাড়াটে এসেছে। হয়ত দীপুরাও আর নেই সে-বাড়িতে। হয়ত দীপুরা উঠে গেছে অন্য কোনও জায়গায়। তার যাকে পরের [illegible] করতে হয় না। হয়ত দীপু [illegible]। হয়ত তার ছেলে-মেয়ে হয়েছে।

গাড়িটা সোজা একেবারে [illegible]

রোড দিয়ে চলছিল। আবার ঘুরে এল এদিকে। এবার আবার হাজরা রোড দিয়ে ফিরে এল গাড়িটা। হরিশ মুখার্জি রোড। হরিশ মুখার্জি রোডের ওপরেই জয়ন্তীদের বাড়িটা। লক্ষ্মীদির বন্ধু জয়ন্তী পালিত। ব্যারিস্টার পালিতের মেয়ে। আর সেই ব্যারিস্টার পালিতের ছেলে নির্মল পালিত। বহুদিন আগে একবার লক্ষ্মীদির সঙ্গে গিয়েছিল ওদের বাড়িতে।

সতী হঠাৎ বললে—না থাক্, সোজা চলো—একেবারে সোজা—

একেবারে সোজা। এইসব রাস্তা কত চেনা। কতদিন কলেজ যাবার পথে এই রাস্তা দিয়ে কলেজের বাসে করে গেছে। সে-সব দিন যেন চোখের ওপর ভাসছে। সতী হেলান দিয়ে বসে বসে ভাবতে লাগলো। সমস্ত কলকাতা যেন চষে বেড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে। মনের ইচ্ছেটা যেন গাড়ির চাকা হয়ে বন্ বন্ করে ঘুরছে। এ-রাস্তা যেখানে শেষ হবে, সেইখানে গিয়ে পৌঁছতে পারলে ভাল হয়। রাস্তা দিয়ে অফিস-যাত্রীর দল চলেছে। একটু পরেই অফিসের দরজাগুলো খুলবে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে বইখাতা নিয়ে। একদিন সতীও এই রকম করে স্কুলে গিয়েছে। কলেজে গিয়েছে, তারপর বড় হয়েছে। তারপর একদিন বিয়েও হয়ে গেছে তার। বিয়ের পর থেকেই যেন সব গোলমাল হয়ে গিয়েছে। বিশৃঙ্খল হয়ে গিয়েছে।

সতী হঠাৎ বললে—গাড়ি ঘোরাও, গাড়ি ঘোরাও—

গাড়ির চারটে চাকা কলকাতার রাস্তা তখন অনেক মসৃণ করে দিয়েছে। মনের অনেক উত্তাপ নিভে গেছে।

—কোন্ দিকে যাবো বৌদিমণি?

—ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন, কালীঘাট—

কথাটা বললে বটে সতী। কিন্তু তারা যদি সেখানে না থাকে আর। তারা যদি বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়ে থাকে। নতুন ঠিকানাটা নিশ্চয় পাওয়া যাবে ও-বাড়ি থেকে। গিয়ে বলবে সতী—এমনি এলাম! কেন, আসতে নেই নাকি! এতদিন আসেনি বলেই কি চিরকালের মত আসতে পারবে না! চিরকালের সম্পর্ক কি একেবারেই ঘুচিয়ে দিতে হবে নাকি! বলে একটু হাসবে! আর তা ছাড়া সম্পর্কটাও বড় কথা নয়। সংসারের কাজে কে কার খবর নিতে পারে। সবাই-ই তো নিজের নিজের সমস্যা নিয়ে জড়িয়ে আছে। বড়লোকের বাড়িতে সতীর বিয়ে হয়েছে বলে কি তার কোনও সমস্যাই থাকবে না?

কিন্তু নেপাল ভট্টাচার্যি স্ট্রীটের সেই রাস্তাটার ওপর গিয়ে গাড়ি থামতেই সতী কী যেন ভাবলে।

বললে—দরোয়ান, উনিশের একের বি নম্বর গিয়ে দেখে এসো তো, দীপঙ্করবাবু বলে কোনও লোক আছে কিনা, থাকলে ডেকে নিয়ে আসবে আমার কাছে—

দরোয়ান বুঝতে পারেনি। সতী আরো বুঝিয়ে দিয়ে বললে—ওই যে ইঁট বার করা বাড়িটা—ওইখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করো গে—

আর তারপরেই দীপঙ্কর এসেছিল। কী চেহারা হয়েছে দীপুর! মাথায় চুলগুলো উস্কো-খুস্কো। মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা!

আশ্চর্য! তখনও জানতো না সতী কেন সে এতদিন পরে আবার পুরোন পাড়াতে গিয়ে হাজির হয়েছিল। হঠাৎ খেয়াল হলো। দীপঙ্কর যদি জিজ্ঞেস করে সতী কেন এসেছে এতদিন পরে, তা হলে কী জবাব দেবে সে! হঠাৎ সতীর মনে পড়লো। দীপঙ্করের মা বরাবর প্রত্যেক বছর এই তারিখে ছেলের জন্যে পায়েস রান্না করতো। দীপুর মা এই দিনটাতেই ছেলের জন্যে ঝিকে দিয়ে বাজার করিয়ে আনতো। দীপু যা-যা খেতে ভালবাসে সেই সব রান্নার আয়োজন করতো। কতবার দীপুর মা সতীকে বলেছিল—দু'মাস বয়েস থেকে ওকে বুকে করে এখানে এসেছি মা, ও যে আবার বড় হবে, মানুষ হবে তা তো তখন ভাবিনি—

এমন করে কোনও মা'কে আর ছেলেকে এত ভালবাসতে দেখেনি কোনওদিন সতী!

মাসীমা বলেছিল—ভরা অমাবস্যার দিন জন্মেছিল দীপু, একেবারে মোনা অমাবস্যে, ও যখন হলো, লোকে বললে এ ছেলে তোমার চোর হবে—তা কী জানি কী হবে, ছেলে বেঁচে থাকলেই আমি খুশী মা, ছেলে-মেয়ে যে কী জিনিস তা যখন আবার তোমার ছেলে-মেয়ে হবে, তখন বুঝবে মা—

দীপঙ্কর যখন জিজ্ঞেস করলে—হঠাৎ, কী মনে করে তুমি?

সতী টপ্ করে বলে দিয়েছিল—সোমবারে তুমি আমাদের বাড়িতে যাবে, ওখানেই খাবে—

কথাটা হঠাৎই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। দীপুকে নেমন্তন্ন করবার কোনও কল্পনাই ছিল না সতীর যখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। কিন্তু কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল। যখন নেপাল ভট্টাচার্যি স্ট্রীট থেকে ফিরে এসেছিল তখনও সতীর সংশয় কাটেনি। কাজটা ভাল করেছে না মন্দ! ন্যায় না অন্যায় করলে সে। কিন্তু তখন আর উপায় নেই। তখন আর বারণ করবারও পথ বন্ধ। সব ব্যবস্থা স্থির হয়ে গেছে। দীপঙ্কর সোমবার আসবে। ফাঁকা বাড়িটার মধ্যে কাটা দিন কী অস্বস্তিতেই যে কাটলো! কেন সে নেমন্তন্ন করতে গেল দীপুকে! কেন সে এমন কাজ করে বসলো! কার সঙ্গেই বা সে পরামর্শ করবে! কেমন করে তাকে বারণ করবে!

দেখতে দেখতে সোমবার এসে গেল।

ভূতির মাকে ডেকে পাঠালে সতী। বললে—ভূতির মা, আজকে একজনকে

জগদীশবাবুর গীতা
মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা অনু-রহস্য ভূমিকাসহ
সার্বসাম্প্রদায়িক সমন্বয়মূলক যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম ভারত-আত্মার বাণী
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১·৫০ কর্মবাণী ১·২৫
প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী· ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

সর্বঋতুর সঞ্জীবনী
দই মিষ্টি
গাঙ্গুরাম এণ্ড সন্স ভবানীপুর ও কালীঘাট — কলিকাতা — ফোন: ৪৭-২৩৭৭

…মন্তন্ন করেছি বাড়িতে, তুমি ব্যবস্থা …রতে পারবে?

ভূতির মা বললে—কেন পারবো না …বৌদিমণি, বাতাসীর মা নেই বলে কি …গেরস্থবাড়ির কাজ-কম্ম বন্ধ হয়ে যাবে?

—তুমি তা'হলে শম্ভুকে বলে দাও ভূতির …, কী কী আনতে হবে! যেন গ‍ুছিয়ে …ছিয়ে সব নিয়ে আসে, অনেক রকম মাছ, মাংস, ডিম—আর পায়েসও করতে হবে গন্ধ-চালের—

ভূতির মা সত্যিই বাঁচিয়ে দিলে। বললে —তুমি কিছু ভেবোনি বৌদিমণি, হারাম-জাদী বাতাসীর মা নেই বলে ভেবোনি ভূতির-মা মরে গ্যাচে। আমি থাকতে কিচ্ছু ভাবনা কোরনি তুমি, আমি সব যোগাড়-যন্তর করে দিচ্ছি—

—আর রান্না? নতুন বামুন-ঠাকুর কি পারবে?

ভূতির মা'র যেন আত্মসম্মানে আঘাত লাগলো। বললে—রান্না না করতে পারে তা আমি আছি কী করতে? আমি কি মরেছি?

সমস্ত দিন সত্যিই খুব খাটুনি গেল সতীর। একটা-একটা করে রান্না। কেন

সর্বত্র গৃহিণীরা বলাবলি করছেন

- সার্ফে কাচলে বোঝা যায়

সাদা জামাকাপড় কতখানি ফরসা হতে পারে!

সার্ফে কাচলেই বুঝতে পারবেন যে সার্ফ জামাকাপড়কে শুধু "পরিষ্কার" করে না, ধব্‌ধবে ফরসা করে। সার্ফে কাচারও কোন ঝামেলা নেই। সহজেই সার্ফের দেদার ফেনা কাপড়ের ময়লা টেনে বার করে, কাপড় আছড়াবার কোন দরকার নেই। আর সার্ফে কাপড় যা পরিষ্কার হয় তা, না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। এর কারণ সার্ফের অদ্ভুত কাপড় কাচার শক্তি! দেখবেন সার্ফে রঙ্গীন কাপড়ও কেমন ঝলমলে হবে! সার্ফে সবচেয়ে সহজে আর সবচেয়ে চমৎকার কাপড় কাচা যায়। ধুতি, শাড়ী, ফ্রক, জামা, তোয়ালে, ঝাড়ন এক কথায় বাড়ীর সব জামা কাপড় সার্ফে কাচুন—দেখবেন ধবধবে ফরসা করে কাচতে সার্ফের জুড়ী নেই!

সার্ফ দিয়ে বাড়ীতে কাচুন, কাপড় সবচেয়ে ফরসা হবে

SU. 12-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

যে হঠাৎ নেমন্তন্ন করতে গেল দীপুকে কে জানে! অথচ যখন নেমন্তন্ন করা হয়েছে তখন তো আর পেছানো যায় না। সমস্ত দিন রান্না-বান্নার পরিশ্রমের পর গা ধুয়ে যখন তৈরি হয়েছে, তখন দীপংকর এসে গেল।

আগে থেকেই দরোয়ানকে বলে রেখেছিল সতী! বাবু এলেই যেন ওপরে নিয়ে আসে। কিন্তু তার আগেই শম্ভু এসে খবর দিয়ে গেছে। বুকটা একটু কেঁপে উঠেছিল এক মুহূর্তের জন্যে! কোনও অন্যায় কাজ করছে নাকি সে! কিন্তু তখনি মনটাকে দৃঢ় করে নিয়েছিল। অধিকার আছে বৈ কি তার। অধিকার আছে বৈ কি নিজের আত্মীয়-স্বজনদের নেমন্তন্ন করবার। সে-ও এ-বাড়ির বউ। এ-বাড়িতে অন্য সকলের মত তারও অধিকার আছে।

আর তারপর শেষ মুহূর্তে সেই দারুণ দুর্যোগ।

সেই ঘটনার পরও দীপংকর খেলে। খেতে বাধ্য করলে সতী। সমস্ত বুকটা থর থর করে কেঁপে উঠেছিল সতীর। তারও অধিকার আছে। সতী বলেছিল—আমারও অধিকার আছে এ-বাড়িতে—তুমি খেয়ে তার প্রমাণ দিয়ে যাও আজ—

যতক্ষণ খেয়েছে দীপংকর, ততক্ষণ এক অস্বাভাবিক উত্তেজনায় থর থর করে কেঁপেছে শুধু সে। তারপর যখন দীপংকর চলে যাবার জন্যে তৈরি সতী শাশুড়ীকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলেছে—কালও তুমি আসবে—আবার কাল আসবে—বুঝলে—

দীপংকর চলে যাবার পর শাশুড়ী আবার ডাকলেন—বৌমা, একবার শুনে যাও এদিকে—

সতী নিজেকে শক্ত করে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল শাশুড়ীর সামনে।

শাশুড়ী তখনও দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই একই জায়গায়। তখনও ট্রেনের সাজ-পোশাক ছাড়েন নি তিনি।

বললেন—আমি এখনও মরিনি বৌমা, আমার মরার আগেই আমার শ্বশুরের ভিটেতে দাঁড়িয়ে তুমি আমারই সামনে আমাকে অপমান করলে—

সতী চুপ করে রইল মাথা নিচু করে।

শাশুড়ী আবার বললেন—আর আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে তুমি যা পরে বললে তা-ও আমি শুনেছি, কিন্তু মনে রেখো এখনো আমি বেঁচে আছি—

তারপর একটু থেমে বললেন—যাও—

সতী আস্তে আস্তে নিজের ঘরে চলে এল। দেয়ালের ঘড়িটার বুকের মধ্যে তখন বোধহয় তুমুল শব্দে তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। সতী খাটের বাজুটা ধরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে, যেন ছেড়ে দিলে পড়ে যাবে সে। যেন পড়ে অজ্ঞান হয়ে যাবে।

বৌদিমণি!

শম্ভু ঘরে এসেছে। বললে—তোমার খাবার দেব বৌদিমণি?

সতী হঠাৎ পেছন ফিরলো। বলল—না, তুই যা, বাতাসীর মাকে বলগে যা, আমি খাবো না আজ—

শম্ভু চলে গেল। খানিক পরে ভুতির মা আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকেছে। বললে—হ্যাঁ বৌদিমণি, তুমি খাবে না কেন? চোপর রাত না-খেয়ে থাকলে পিত্তি পড়বে যে, চলো খাবে চলো—

সতী বলল—না ভুতির মা, আমার খিদে নেই, সত্যি বলছি—তুমি যাও এখন এখান থেকে—

ভুতিরমা তবু নড়ে না। বলে—তুমি না খেলে আমরা খাই কী করে বলো দিদি—?

—না, খাওগে যাও ভুতির মা, তাতে কোনও দোষ হবে না, যাও তুমি, খেয়ে নাও গে—

সতীর সেই সব দিনের কথা দীপংকরের এখনও মনে আছে। প্রত্যেকটি কথা প্রত্যেকটি ঘটনার খুঁটিনাটি পর্যন্ত সতী দীপংকরকে বলেছিল। এ-এক অদ্ভুত আরামের জীবন সতীর। এ আরামের জ্বালা যত, মাদকতাও তত। সতীর দিন-গুলো যেন আরামের আতিশয্যে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যেত। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যেন যন্ত্রণার কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেত। অথচ কোথায় যেন একটা আকর্ষণও ছিল সনাতনবাবুর জন্যে!

রাত যখন অনেক, তখন সনাতনবাবু ঘরে এলেন। ভারি হাসি হাসি মুখ।

বললেন—দেখ, ভগবানের ইচ্ছে না থাকলে কোনও আশা কি মেটে মানুষের?

সতী ভেবেছিল সনাতনবাবুও বোধ হয় প্রথমে এসেই সেই প্রশ্ন করবেন। কে এসেছিল? কাকে নেমন্তন্ন করেছিল সতী। কিন্তু সে-সবের ধার দিয়েও গেলেন না তিনি। বলতে লাগলেন—আর ঘণ্টা চার-পাঁচেকের মধ্যেই পুরী পৌঁছে যাবো, হঠাৎ একটা জায়গায় গিয়ে ট্রেনটা এমন আটকে গেল, আর যায় না—লাইন-টাইন সব জলে ডুবে একাকার—

সতী কিছু কথা বললে না।

সনাতনবাবু বলতে লাগলেন—তারপর ট্রেনটা পেছু হেঁটে কটক স্টেশনে এল আবার, ভাবলাম যাওয়া যখন হলো না, তখন কলকাতাতেই ফিরে আসতে হবে, কিন্তু সেদিকেও রাস্তা বন্ধ তখন, সেদিকেও নদীর জল উঠে লাইন আটকে আছে! দু'দিন সেই গাড়িতেই বসা—শেষকালে মাকে বললুম—

কী সব অনেক কথা বলে গেলেন সনাতনবাবু। কিছুই কানে গেল না। অন্যদিককার মত সনাতনবাবু আর বই নিয়ে টেবিলে পড়তে বসলেন না। তিনদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি তাঁর শরীরে। আস্তে আস্তে জামা খুলতে লাগলেন। সতীর মনে হলো এই-বার বোধ হয় বলবেন। এইবার বোধ হয় জিজ্ঞেস করবেন।

কিন্তু সে-সব কথাই উত্থাপন করলেন না সনাতনবাবু। জামা খুলে সনাতনবাবু বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন। তারপর হঠাৎ যেন খেয়াল হলো। বললেন—এ কি, তুমি শোবে না?

—হ্যাঁ, শুই!

সতী আস্তে আস্তে এসে পাশে শুলো। এক বিছানা। একেবারে পাশাপাশি। আলো নিভিয়ে দিয়েছে সতী। সমস্ত ঘরখানা অন্ধকার। একবার উস্‌খুস্‌ করে উঠলেন

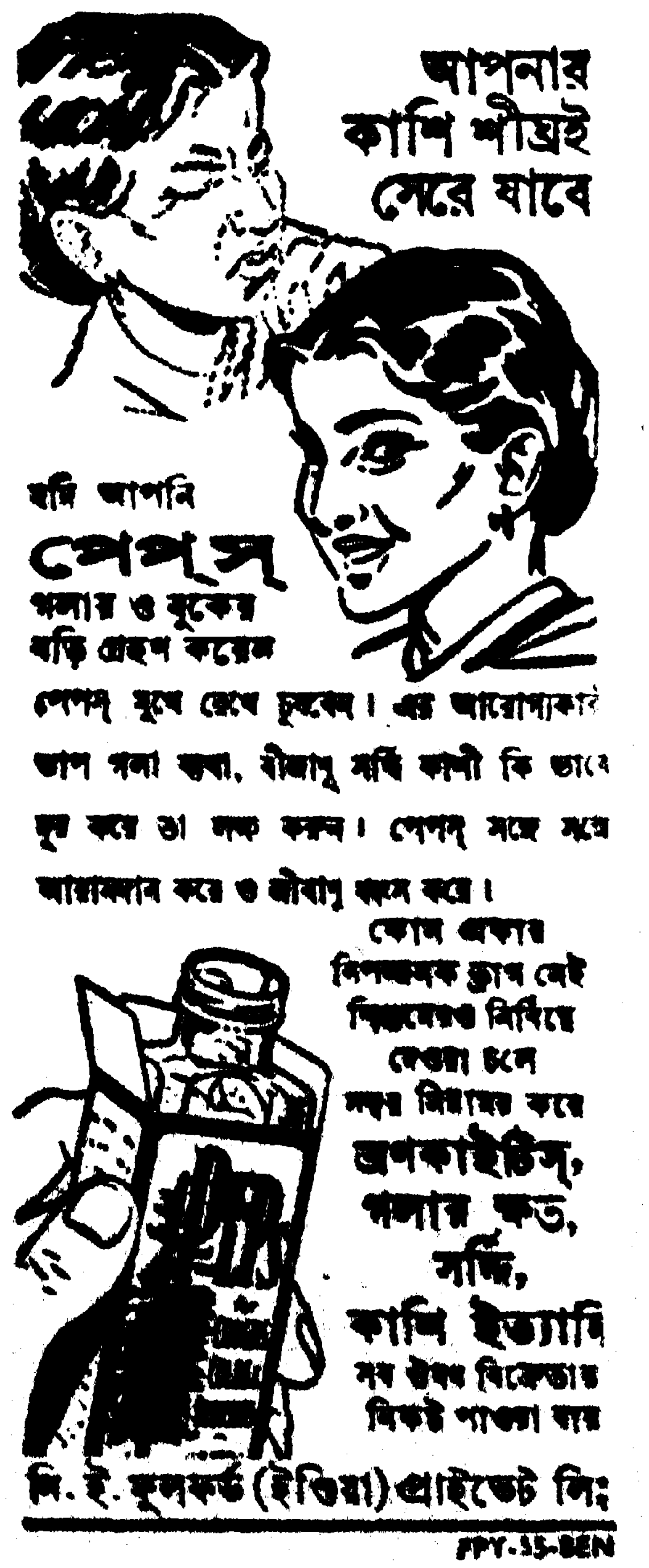

পরিবেশক—মেসার্স কেম্প এণ্ড কোং লিঃ
১২সি চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১২

সনাতনবাবু। ওপাশ ফিরলেন। সতী চমকে উঠলো এক মুহূর্তের জন্যে। এইবার বোধ হয় জিজ্ঞেস করবেন। এইবার বোধ হয় প্রশ্ন করবেন—কে ও? কে এসেছিল বাড়িতে! কাকে বসে খাওয়াচ্ছিলে!

কিন্তু সনাতনবাবু কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। ঘড়ির বুকের ধুক্‌ধুকুনি বাড়তে লাগলো। টিক্ টিক্ শব্দটা যেন সতীর বুকের মধ্যে ঘা দিতে লাগলো। যেন আঘাত লাগতে লাগলো জোরে জোরে। যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে তার।

—দেখ, একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

সতী উদ্‌গ্রীব হয়েই ছিল। এইবার নিশ্চয় কথাটা বলবে। বললে—কী কথা?

সনাতনবাবু বললেন—উনিশ শো বত্রিশ সালেও এই বর্ষার সময়ে একবার রেল-লাইন এই রকম ডুবে গিয়েছিল জানো—তাই ভাবছিলাম বর্ষাকালে পুরী যাওয়াটাই আমাদের ভুল হয়েছে।

বলে সনাতনবাবু চুপ করে গেলেন। তারপর মনে হলো তিনি বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়ছেন।

সতী আর থাকতে পারলে না। বললে—আর কিছু বলবে না তুমি?

সনাতনবাবু ঘুমের মধ্যেই যেন উত্তর দিলেন—হুঁ—

—তুমি ঘুমিয়ে পড়লে?

সনাতনবাবু বললেন—না, কিছু বলছিলে তুমি?

সতী বললে—থাক্, তোমার ঘুম পাচ্ছে তুমি ঘুমোও—

—না না, একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তা এখন জেগে উঠেছি, বলো না কী? কিছু বলছিলে তুমি?

সতী একটু থেমে বললে—তুমি তো কিছু বললে না আমায়?

সনাতনবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন—কীসের জন্যে?

—ওই যে যাকে তুমি দেখলে আমার ঘরে, তুমি তো জিজ্ঞেস করলে না, ও কে?

সনাতনবাবুর যেন এতক্ষণে মনে পড়লো। বললেন—ও, তাই তো বটে! ও কে?

—কিন্তু তুমি জিজ্ঞেস করলে না কেন?

সনাতনবাবু বললেন—আমার ঠিক মনে ছিল না—

—সে কি, তোমার স্ত্রীর সংগে একজন অচেনা লোক বাড়ির ভেতরে ঢুকে কথা বলছিল, আর তুমি একবার জিজ্ঞেসও করলে না, ও কে? এ-কথা মানুষ ভুলে যায়? ভুলতে পারে?

সনাতনবাবু যেন নিজের ভুল স্বীকার করলেন। বললেন—তা যাক্‌গে তুমিই বলো না ও কে?

—না, তা আমি বলবো না, কিন্তু তুমি আগে বলো তুমি কেন জিজ্ঞেস করলে না?

সনাতনবাবু বোধ হয় কী বলবেন বুঝতে পারলেন না।

সতী বললে—তোমারই তো আগে জিজ্ঞেস করা উচিত, ও কে?

সনাতনবাবু স্বীকার করলেন। বললেন—হ্যাঁ, আমারই আগে জিজ্ঞেস করা উচিত—

—তা জিজ্ঞেস করলে না কেন?

হেসে ফেললেন সনাতনবাবু এবার। বললেন—এই দেখ, কী মুশকিলে ফেললে তুমি আমাকে—

—না বলো, তোমাকে জবাব দিতেই হবে।

সনাতনবাবু বললেন—এবার থেকে জিজ্ঞেস করবো, এবার মনে রাখবো ঠিক!

সতী বললে—আমি কালকেও ওকে আসতে বলেছি—

—ভালোই করেছ!

—কালকে এলে আমি তোমার সংগে আলাপ করিয়ে দেব, তুমি কথা বলবে ওর সংগে, তুমি আমার সম্মান বাঁচাবে, তুমি আমার কথার মর্যাদা রাখবে—

—নিশ্চয়ই রাখবো। কালকে আমি নিশ্চয়ই কথা বলবো—

সনাতনবাবু বোধ হয় সত্যিই ক্লান্ত ছিলেন খুব। তিনি ওপাশ ফিরে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলেন। খানিক পরে ঘুমিয়েও পড়লেন। একটানা নিশ্বাস পড়তে লাগলো।

প্রত্যেকেই উইস্‌ডম টুথব্রাস পছন্দ করেন

★ একমাত্র উইস্‌ডম টুথব্রাসই সাতটি মাপে পাওয়া যায়
★ দশটি বিভিন্ন রং
★ প্রেক্সট্রন কিংবা নাইলনের কুঁচি দু'ও
★ চার রকমের পছন্দসই বুরুশ
★ ঠিক আকারের যা'তে অনায়াসে বুরুশ করা যায়
★ দন্তচিকিৎসকগণ উইস্‌ডমই অনুমোদন করেন।

জে. এল. মরিসন, সন এণ্ড জোন্স (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড

বোম্বাই • কলিকাতা • মাদ্রাজ • দিল্লী

সতীও ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলো। প্রথমে চোখ দুটো বুজে অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে এলিয়ে দেবার চেষ্টা করলে। শুধু ঘুম, কোথাও কিছু অশান্তি নেই। পৃথিবীর সব জায়গায় অখণ্ড শান্তি আছে। আমিও সুখী। আমারও কোনও দুঃখ নেই। এমনি করে একমনে ঘুমের সাধনা করে অনেকবার ঘুম এসেছে তার। প্রথম আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টা একটু চেষ্টা করতে হয়, তারপরে মনের সংগে সংগে শরীরের সমস্ত অংগ-প্রত্যংগগুলো কেমন শিথিল হয়ে আছে। তারপর নিরবিচ্ছিন্ন ঘুম, নিস্তরঙ্গ বিশ্রাম!

সতী আবার চিৎ হয়ে শুলো। মনে হলো কোথায় যেন শব্দ হলো একটা। খুট্-খুট্ শব্দ! কোথায় শব্দ হবে? কে শব্দ করবে? ওপরে তেতলায় তো কেউ চাকর-বাকর শোয় না। সবাই একতলায় সরকার বাবুর পাশের ঘরে শুয়েছে। কেউ তো কোথাও নেই! তিন-চারখানা ঘর পেরিয়ে শাশুড়ি শুয়ে আছেন তাঁর নিজের ঘরে। সনাতনবাবু পাশেই শুয়ে আছেন। তাঁর তো একটানা নিশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছু শব্দ হয় না কোনও দিন।

সতী বিছানা ছেড়ে উঠলো। তার হয়ত ঘড়িটার শব্দ। বিরাট ঘড়ি। মাঝে মাঝে ভেতর থেকে কেমন একটা কল-কব্জার খুট্-খাট্ শব্দ হয়। সতী উঠে দাঁড়াল গিয়ে ঘড়িটার তলায়। আশ্চর্য! ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দটাও তো হচ্ছে না আর! অন্ধকারের মধ্যেই সতী ঘড়িটার দিকে তাকাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে। ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। কখন রাত একটা বাজার পর আর চলে নি। কাঁটা দুটো এক জায়গায় এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হয়ত দম দেওয়া হয় নি। হয়ত দম ফুরিয়ে গিয়েছে!

সতী আবার নিজের বিছানায় এসে শুলো। তখন কত রাত কে জানে!

অনেক দিন পরে এই ঘটনা শুনতে শুনতে দীপংকর জিজ্ঞেস করেছিল—কিন্তু শব্দটা হয়েছিল কিসের?

সতী বলেছিল—তখন বুঝি নি শব্দটা কিসের, কিন্তু পরে বুঝেছিলাম—ও বাইরের শব্দ নয়, ও ভেতরের,—আমার অন্তরাত্মার শব্দ, আমার হৃদপিণ্ডের শব্দ—

দীপংকর জিজ্ঞেস করেছিল—তার মানে?

সতী বলেছিল—তার মানে তুমি বুঝবে না, ও সবাই বোঝে না—সবাই শুনতেও পায় না। কপাল যখন কারো ভাঙতে শুরু করে, ও শব্দ শুধু সে-ই শুনতে পায়—

সতীরও সেদিন তাই মনে হয়েছিল বিছানায় শুয়ে শুয়ে। একটু ভয় পেয়েছিল প্রথমে। তারপরে আবার ঘুমোতে চেষ্টা করেছিল। কেবল মনে পড়ছিল—দীপংকর এলে তার সংগে আলাপ করিয়ে দেবে। সনাতনবাবু তার সংগে কথা বলবে, সতীর সম্মান বাঁচাবে, সতীর কথার মর্যাদা রাখবে...

সব রাতই এক সময়ে ভোর হয়, সব দিনই এক সময়ে আবার সন্ধ্যেবেলায় গিয়ে ঠেকে। তবু সেদিন রাতটা যেন কাটতে চায় নি দীপংকরের। দীপংকরের মনে আছে সতীদের গাড়িটা যখন তাকে নেপাল ভট্টাচায্যি স্ট্রীটে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল তখনও দীপংকর যেন সম্বিত ফিরে পায়নি। তখন যেন সতীর কথাটা তার কানে বাজছে—আমারও যে এ-বাড়িতে একটা অধিকার আছে, সেটা তুমি আজ খেয়ে প্রমাণ দিয়ে যাও—

তখনও যেন সতীর নীল চেহারাটা চোখের সামনে ভাসছে। সতীর সমস্ত শরীরটা থর থর করে কাঁপছিল যেন তখনও।

তাড়াতাড়ি যেন জ্ঞান ফিরে পেয়ে দীপংকর নিজের বাড়ির মধ্যে ঢুকলো। অন্যদিন এ-সময়ে অন্ধকার থাকে। চন্নুনী সকাল-সকাল তার নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। বিন্তীদিও নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে খিল দিয়ে দেয়। তখন আর কোনও কাজ থাকে না মা'র। তখন মা-ও ছিটে-ফোঁটার ভাত ঢাকা দিয়ে রেখে শুয়ে পড়তো। কিন্তু এখনকার চেহারা আলাদা। এখন অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলে ঘরে ঘরে। লক্ষ্মী লোটনের হাসি-ঠাট্টার আওয়াজ শোনা যায়। এখন বাইরে হল্লা চলে বটে। ছিটে-ফোঁটার সাকরেদরা এসে অনেক রাত পর্যন্ত আসর জমায়—কিন্তু মা নিজের রান্নাটা সেরে বিন্তীকে খাইয়েই ঘরে খিল দিয়ে দেয়। আধখানা বাড়ি তখন অন্ধকার।

মা দেখতে পেয়েই বললে—খেয়ে এলি?

ছেলের মুখের দিকে চেয়ে যেন কেমন ভাবনাও হলো আবার। বললে—কী রে, মুখ দেখে মনে হচ্ছে পেট ভরেনি যেন তোর?

—না মা ভরেছে।

তারপরে হঠাৎ দীপংকর বললে—কাল ভোরবেলা কিন্তু যাওয়া আমাদের, মনে আছে তো? যা নেবার গুছিয়ে নিয়েছ তো?

নেবার আর কীই বা আছে দীপংকরদের। যা কিছু সম্পত্তি সব তো অঘোরদাদুর। যে-তক্তপোষটায় শোয় দীপংকর, তা-ও অঘোরদাদুর। যে থালাটায় খায়, তা-ও অঘোরদাদুর। এই যা কিছু সবই অঘোর-দাদুর দেওয়া। যখন মা'র কোলে চড়ে এখানে এসেছিল, সেদিন যা সংগে ছিল আজও তাই সংগে যাবে। শুধু পাথরপটি থেকে একটা কাঠের বাক্স মা কিনেছিল। তাও অনেকদিন হয়ে গেছে। সে-বাক্সটার কব্জা ভেঙে গেছে, রঙ চটে গেছে। সেইটেই একমাত্র সংগে যাবে। আর যাবে জামা-কাপড়, মা'র দু'একখানা সাদা থান। এই!

দীপংকর আবার বললে—কাল ভোরবেলাই

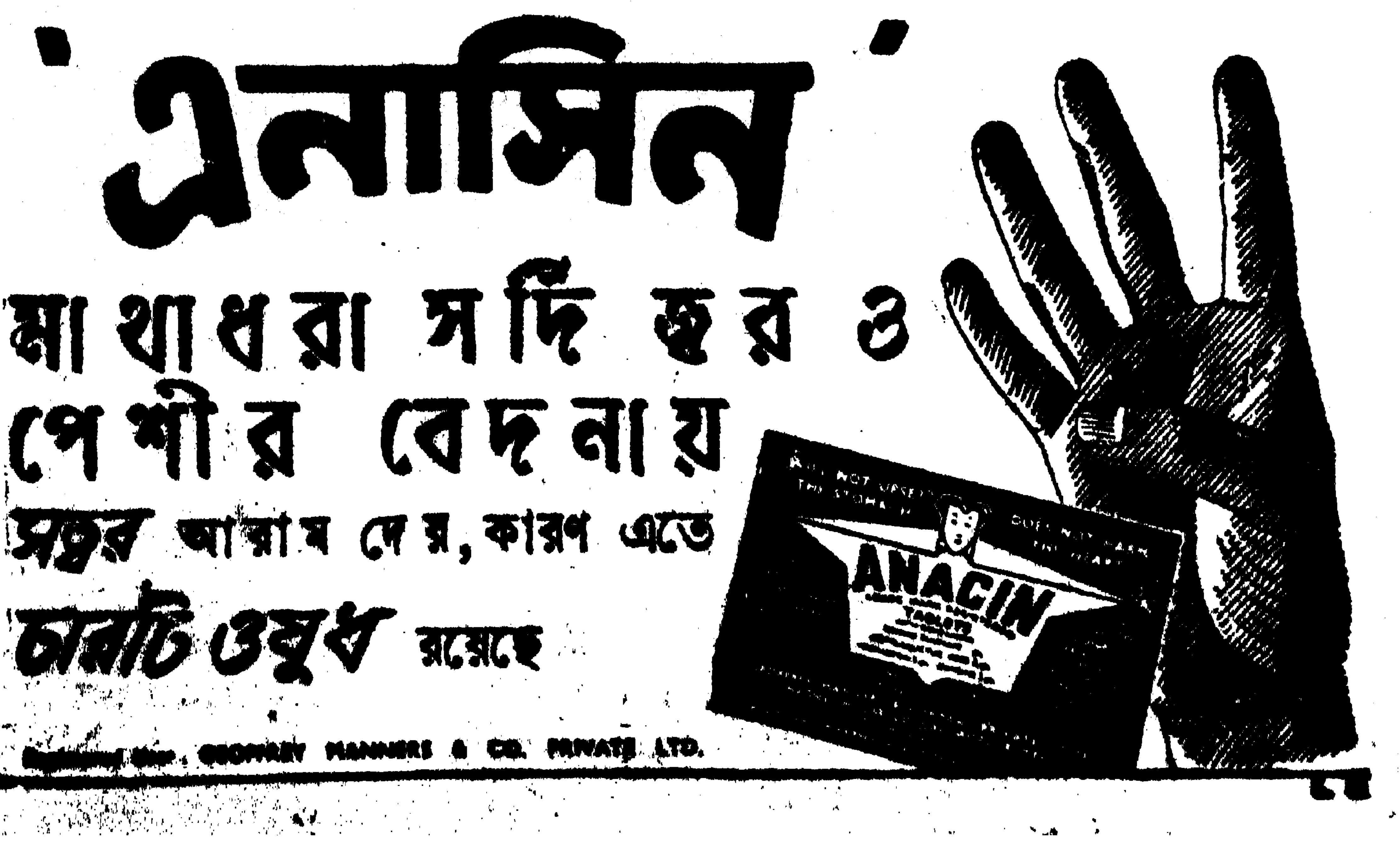

আমি গাড়ি নিয়ে আসবো দেরি কোরো না যেন, আমাকে আবার ঠিক সময়ে অফিসে যেতে হবে—

মা বললে—যাওয়া আমার হবে না কাল—

—কেন?

—এই যে, এই শত্তুরকে ফেলে কেমন করে যাই বল্? একে কোথায় রাখি?

বিন্তীদি মা'র গা ঘে'ষে এতক্ষণ বসে ছিল। বাড়িতে যে এত হৈ-চৈ উৎসবের আয়োজন হচ্ছে, এ-মেয়ে যেন সে-সবের মধ্যে নেই। এ যেন একেবারে দলছাড়া।

দীপঙ্কর বললে—তা বিন্তীদিকেও নিয়ে চলো না আমাদের সঙ্গে—বিন্তীদিও যাক্—

—দূর, তা কী করে হয়। এদের মেয়ে, এর মায়ের পেটের ভাইরা থাকতে আমি নিয়ে যাবো, লোকে বলবে কী! আর ভাইরাই বা ছাড়বে কেন? আমরা তো পর!

তা-ও বটে। তা রাতটা কাটলো সেই রকম করেই। কিন্তু ভোর বেলাই একেবারে অন্যরকম। মা রাত থাকতেই উঠেছে। উঠে চন্নুনীর ঘরে গিয়েছে। ভেতরে ঢুকে বললে—আমরা আজ চল্লুম বাছা—তুমি যেন কিছু ভেবো না আবার—

চন্নুনী কথা বলতে পারলে না। হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো।

মা আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিলে। বললে—কে'দে কী করবে বাছা, চিরকাল কি কেউ থাকে সংসারে? একদিন-না-একদিন তো যেতেই হবে সকলকে—

পেছন থেকে দীপঙ্কর এসে ডাকলে। বললে—মা চলো—ট্যাক্সি এসেছে—

মা বললে—ওরে, বুড়ী কাঁদতে লেগেছে, তুই একবার আয় বাবা, কাছে আয়, তোকে ছোটবেলায় কত কোলে-পিঠে করে বেড়িয়েছে, আহা তোকে দেখলেও একটু শান্তি পাবে বেচারী মরবার সময়—

দীপঙ্কর ঘরে ঢুকলো। মা নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে বললে—এই আমার দীপু এসেছে বাছা। দীপুকে দেখ—

দীপঙ্করও ঝুঁকে দাঁড়াল। চন্নুনী দীপুর মাথায় হাত ছোঁয়ালো। হয়ত আশীর্বাদ করলে বুড়ী!

মা বললে—আশীর্বাদ করো বাছা, দীপু যেন আমার বড়মানুষ হয়—

সত্যিই, সেই মানুষই কেমন করে আবার বয়েস হলে এমন অথর্ব হয়ে পড়ে এটাই আশ্চর্য! সবাই একদিন এই রকম বুড়ো হবে। এই রকম অথর্ব হবে। এই রকম কথা বন্ধ হয়ে যাবে। অঘোরদাদুও শেষের কয়েক ঘণ্টা আর কথা বলতে পারে নি। জ্ঞান হারিয়ে গিয়েছিল। চন্নুনী মেয়েমানুষ, তাই হয়ত এত জোর। এখনও টি'কে রয়েছে।

দীপঙ্কর বললে—চলো মা, ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে—

—চল্ চল্ বাবা—

তারপর বললে—বিন্তীকে একবার ডাকলো না, যা অভিমানী মেয়ে, না বলে গেলে সে-মেয়ে কি আমার রক্ষে রাখবে—

তা বটে। বিন্তীদি হয়ত তখনও দরজায় খিল দিয়ে নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছে। মা সেই দিকেই যাচ্ছিল। হঠাৎ ফোঁটা টের পেয়েছে! সাধারণত ছিটে-ফোঁটা সকালে দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে। ওদিকে অনেক রাত [illegible] শোয়। তারপর বেলা আটটা-নটায় [illegible] ভাঙে তাদের। এখন তো আর [illegible] নেই। আগে যখন অঘোরদাদু [illegible] তখন ভোরবেলা উঠেই বাজারের [illegible] চলে যেত। ছোটবেলাকার দেখা [illegible] [illegible]

তারাই এখন বড় হয়েছে, এ-বাড়ির মালিক হয়েছে, অনেক টাকারও মালিক হয়েছে।

ফোঁটা দেখতে পেয়েই এসেছে। বললে—কোথায় যাচ্ছ তোমরা দিদি? বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছো?

যেন ধমকাতে ধমকাতে সামনে এসে দাঁড়াল।

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ—

মা বললে—হ্যাঁ বাবা, এখন তোমরা নিজেদের সংসার নিজেরা করো, আমার দীপু এখন বড় হয়েছে—সে কেন তোমাদের গলগ্রহ হয়ে থাকবে, এখন ছেলে চাকরি করছে, ছেলের বিয়ে-থা দেব আমি, আমারও তো সাধ-আহ্লাদ হয়—

ফোঁটা যেন কী ভাবলে। তারপর চীৎকার করে ডাকলে—ছিটে, ছিটে—

ছিটেও ঘর থেকে বেরিয়ে এল চোখ মুছতে মুছতে! ফোঁটা বললে—এই দ্যাখ, দীপুটার কান্ড দ্যাখ্, এখন লায়েক হয়েছে কিনা, মাকে নিয়ে কাউকে না-বলে-কয়ে ভেগে যাচ্ছে। দ্যাখ্ তুই—

ছিটে সব জিনিসটা বুঝে নিয়ে বললে—তার মানে? তার মানেটা কী?

মা বললে—তোমরা রাগ করো না বাবা, দীপু তো কোনও মন্দ কাজ করছে না, এখন তো স্বাধীন হয়েছে, এখন তো আমাদের চলে যাওয়াই ভালো—আর কার জন্যেই বা থাকা? অঘোরদাদুও তো চলে গেলেন—

ছিটে বললে—অঘোর ভট্টাচায্যি চলে গেল তা কী হলো? তার নাতিরা রয়েছে কী করতে?

ফোঁটা দীপঙ্করের দিকে এগিয়ে এল। বললে—কী মতলব তোর শুনি? বলি কী মতলব তোর?

দীপঙ্কর হাসতে লাগলো। বললে—আমি একটা বাড়ি ভাড়া করেছি, স্টেশন রোডে, বালিগঞ্জে, পনেরো টাকা ভাড়ায়, পাঁচ টাকা বায়না দিয়ে এসেছি—অনেক দিন তো তোমাদের জ্বালালুম, এবার—

ফোঁটা বললে—ভালো চাও তো এখানে থাকো, নইলে ভালো হবে না বলে দিচ্ছি—

ছিটে বললে—বাড়ি ভাড়া করতে হয় তো এই বাড়ি ভাড়া নাও—এই পাশের বাড়িটা তো খালি পড়ে রয়েছে—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু পাঁচ টাকা যে বায়না দিয়ে এসেছি সেখানে—

—কুছ পরোয়া নেই, পাঁচ টাকার জন্যে ফটিক ভট্চায্ গরীব লোক হয়ে যাবে না, আমি পাঁচ টাকা তোর দিয়ে দেব। তুই আমাদের বাড়িতে ভাড়া থাক্, কিন্তু চলে যেতে পাবে না। তোমার ট্যাক্সিওয়ালাকে চলে যেতে বলো—

তারপর কী ভেবে নিজেই বাইরে চলে গেল। বোধ হয় ট্যাক্সি ফেরত পাঠিয়ে দিতে গেল।

দীপঙ্কর মার দিকে চাইলে। মা-ও চাইলে ছেলের দিকে।

ছিটে বললে—আর ভাবাভাবি নেই, এখানেই থেকে যাও—

মা বললে—কিন্তু বাবা, বিন্তীর জন্যেই আমার ভাবনা, মেয়েটার বিয়ে-থা হলো না, তোমরাও কেউ দেখলে না ওকে, ও আমাদের কাছে থাকবে—

ছিটে বললে—তা থাক, কিন্তু ওর বিয়ে আমরা দেব বলে রাখছি, আমাদের বোনের বিয়ে আমরা দেব—কাউকে দিতে দেব না—

তা শেষ পর্যন্ত তাই-ই হলো। এত আয়োজন, এত কল্পনা, এত প্রচেষ্টা। শেষ পর্যন্ত সব পন্ডশ্রম। সতী, লক্ষ্মী, কাকাবাবু, কাকিমারা এতদিন যে-বাড়িতে কাটিয়েছে, সেই বাড়িতেই দীপঙ্কররা থাকবে ঠিক হলো। ভাড়া দেবে মাসে দশ টাকা করে। ভালোই হলো, মার মনটা একটু খুঁতখুঁত করছিল। গঙ্গা থেকে অনেক দূরে, মায়ের মন্দির থেকেও অনেক দূরে। শেষ পর্যন্ত ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে! আবার এতদিন পরে সেই বাড়িতে ঢুকবে, আবার সতী যে-ঘরে ঘুমোত, থাকতো, সেই ঘরেই থাকতে পারবে। তারও একটা আলাদা রোমাঞ্চ আছে বৈ কি!

মা-ও ভাবছিল বিন্তীটারই আনন্দ হবে সবচেয়ে বেশি। সেই ক'দিন ধরে ভাল করে কথা বলছিল না। কেমন যেন গম্ভীর গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। সে জানতো ভোরবেলায় দিদি চলে যাবে—সন্ধ্যে থেকেই দিদির কাছ-ছাড়া হয়নি।

মা বিন্তীর ঘরের কাছে যেতেই কেমন অবাক হয়ে গেল। বিন্তী কোথায়? দরজা হাট করে খোলা। এমন তো হয় না! নিজের ঘর ছেড়ে সে তো বড় কোথায়ও একটা যায় না। গেল কোথায়?

—ওরে দীপু, বিন্তী কোথায় গেল? এত সকালে ঘুম থেকে ওঠে না তো সে? গেল কোথায়?

দীপঙ্কর বললে—কলঘরে দেখেছ?

—হ্যাঁ, সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজলুম তো!

ছিটে-ফোঁটাও অবাক হয়ে গেল। এমন তো হয় না। কোথায় গেল! সমস্ত বাড়িটা তছনছ করে খুঁজে দেখা হল। চন্নুনীর ঘর, উঠোনের কোণ, হাজী কাশিমের বাগানের পাঁচিলটার ওপাশে। কোথাও নেই। হ্যাঁ গা, মেয়েটাকে কি ভূতে নিয়ে গেল! দীপুর মা'র মাথায় যেন আকাশের বাজ ভেঙে পড়লো। সে মেয়ে নিশ্চয় কোনও সর্বনাশ বাঁধিয়েছে। দাওয়ার ওপরেই দীপুর মা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। ক্রমশ

(ক্রমশ)

BUY THE BEST
HIGHLY APPRECIATED
SAMSAD ANGLO-BENGALI DICTIONARY
1672 PAGES · Rs 12·50 n.p.
SAHITYA SAMSAD
32 A, ACHARYA PRAFULLA CH. RD. • CAL-9

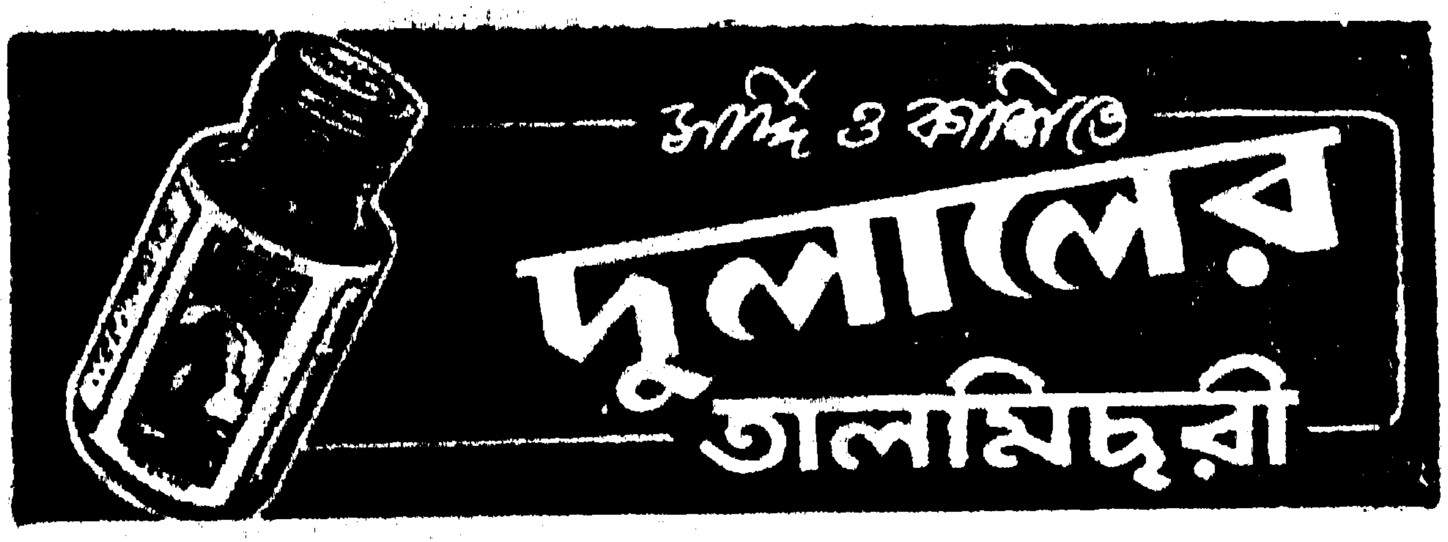

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন!
যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র
বহু গাছড়া দ্বারা বিশুদ্ধ মতে প্রস্তুত
বাক্‌লা
ভারত গভঃ রেজিঃ নং ১৬৮৩৪৪
ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন
অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা,
মুখে টকভাব, ঢেকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দাগ্নি, বুকজ্বালা, আহারে অরুচি, স্বল্পনিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যাঁরা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও বাক্‌লা সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। নিষ্ফলে মূল্য ফেরৎ।
৩২ তোলার প্রতি কৌটা ৩৲ টাকা, একত্রে ৩ কৌটা — ৮৷৷৹ আনা। ডাঃ মাঃ ও পাইকারী দর পৃথক।
দি বাক্‌লা ঔষধালয়। হেড অফিস-বরিশাল (পূর্ব পাকিস্তান) ব্রাঞ্চ-১৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড কলিঃ-৭

অম্লান সৌন্দর্যের উপচারক

পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম ও ফেস পাউডার

প্রথমে হালকা তুষারের মতো পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম মাখুন... যাতে আপনার মুখত্বকের কমনীয়তা রক্ষা পায়... মুখখানি কোমল, সুন্দর ও লাবণ্যে উজ্জ্বল থাকে... ছোটখাটো কাটা ও দাগ ঢাকা পড়ে। এই ক্রীম চটচটে নয়, কিন্তু এর ওপর পাউডার ধরে চমৎকার।

তার পর মাখুন পাতলা ক'রে পণ্ড্‌স ফেস পাউডার যা রেশমী কোমল উজ্জ্বলতা নিয়ে আপনার মুখশ্রীর সঙ্গে মিশে থাকবে।

সব সময় উপরের এই সহজ নিয়মটি মেনে চলুন... তাহলে আপনাকে সারাক্ষণ সুন্দর দেখাবে... আপনার সৌন্দর্য মন কেড়ে নেবে।

সারা পৃথিবীর
সুন্দরী রমণীদের
মনের মতো

চীজব্রো-পণ্ডস ইনক্
(সীমাবদ্ধ দায়িত্বের সঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

JWTP. 72

GOVER... RARY
Cooch Behar

রুচি ও মান

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

শ্লীলতা এমন একটি পদার্থ বা গুণ যা শুধু বাইরের জিনিস নয়, অন্তরেরও। এর প্রকাশ অবশ্যই বচনে ও ভাষায় কিন্তু জন্ম তার মানসে। আর সেই মনের মধ্যে যদি নিষ্কলুষ ভদ্রতা না থাকে, ভেতর থেকে সংযত ও শোভন প্রকাশের তাগিদ না জন্মায়, তা হলে ভাষা যতই আপাত-শিষ্ঠ ও মধুর হোক না কেন, সারাংশ চাপা থাকে না। এবং চাপা অশ্লীলতার মতন মারাত্মক আর কিছু নেই। তার চেয়ে সোজা খোলাখুলি অভব্যতা বোধগম্য। কারণ, পাঠ্য অথবা সাহিত্য হিসেবে তখন কোনও প্রশ্ন ওঠে না, ভুল বোঝার আশঙ্কাও হয় না।

সাহিত্যে শ্লীলতার প্রসঙ্গ হয়তো বর্তমানে কিছুটা অবান্তর, পুরাতন বিতর্ক এবং নিছক কৌতূহলের সামগ্রী বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু হাল আমলেও দেশে-বিদেশে এমন পাচক-পাচিকার অভাব নেই যাঁরা আদা-লঙ্কা, পেঁয়াজ-রশুন সহযোগে পচা মাছ পাতে দেওয়াটাকে রন্ধন-শিল্পেরই পরাকাষ্ঠা মনে করেন। কোনও কোনও অত্যাধুনিক মার্কিন লেখক, ফরাসী লেখিকা, ইতালিয়ান এবং ইংরেজ গল্পকার এ কাজ করেছেন ও করছেন। এঁদের কোনও ক্ষমতা নেই, এ কথা বলি না। কিন্তু এ জাতীয় রচনাকে উঁচু দরের সাহিত্য-কর্ম বলে হুজুগে মেতে যাওয়াও সমর্থন করা যায় না।

যেমন ধরা যেতে পারে, বাংলা ভাষায় লেখা কোনও কোনও বই। যেখানে লেখক পাঠকের মনে একটা বিশেষ ধরনের চাঞ্চল্য বা অবচেতন মনে তৃপ্তি আনবার জন্যে এমন দৃশ্য বা ইঙ্গিত এনে ফেলেন, যার সাহিত্যিক প্রয়োজন একেবারে নেই। জায়গা বিশেষে তা 'পারভার্সিটি'র সামিল বলেই মনে হয়। এদিক থেকে তন্ত্র-মন্ত্র নিয়ে লেখা গল্প খুবই সুবিধাজনক। কেননা পিশাচসিদ্ধ আচরণে সঙ্গতির বালাই নেই আর শ্মশান-বৈরাগ্যের আড়ালে মদ্য মাংসের প্রতি বিড়াল-তপস্বীর আধ-বোজা নজর বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতার নামান্তর বলে গ্রাহ্য হতেও বাধা নেই। পাঠক-বিশেষের অবদমিত প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়, আবার সমালোচকদের নির্বোধ বাহবায় লেখক-প্রকাশকের পরমার্থ উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়। অথচ এই বিষয়বস্তু নিয়ে উৎকৃষ্ট সাহিত্যও রচিত হয়েছে।

প্রমাণ—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শক্তিশালী গল্প 'পুষ্করা'। পরিবেশে কিছু বীভৎসতা আছে, কিন্তু পরিবেশনে খাঁটি শিল্প। কণ্ডূয়ন-বর্জিত নির্ভেজাল সাহিত্য। আরও নমুনা দেওয়া যেতে পারে, যেমন বিভূতি বাঁড়ুজ্যের 'তারানাথ তান্ত্রিকের' গল্প। কিংবা প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়ের 'তন্ত্রাভিলাসীর সাধুসঙ্গ'। এ সব রচনায় রস, আবেদন এবং উদ্দেশ্য অতি পরিষ্কার। কোথাও গোঁজা-মিল, লুকোনো কারবার নেই।

তা হলে দেখা যাচ্ছে যে জীবনের মধ্যে যে কুশ্রীতা, ব্যর্থতা ও জটিলতা আছে, তার উদ্ঘাটন মাত্রই অশ্লীল নয়। উন্মোচনের ভঙ্গিমাটা নিয়েই যত গোলমাল। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে জঘন্য উন্মোচন যেমন কুৎসিত লাগে, ধর্তে চাতুরীতে মাধুরীর আমেজ লাগিয়ে ঈষৎ-মুক্তির আন্তরিক অশ্লীলতা যেমন আরও আপত্তি ও বিপত্তির কারণ হয়ে ওঠে। যেন আর্সেনিকের গুঁড়ো-মেশানো মনোহর আইসিং-দেওয়া চকোলেট। জীবনের মধ্যে একটা আদিম ও প্রাকৃত সত্তা আছে। কখন কি ভাবে সেটা আত্ম-প্রকাশ করে, তা বলা যায় না এবং একমাত্র বলিষ্ঠ লেখক ও বড় জাতের শিল্পীই অকুণ্ঠ সত্যের সহজাত শক্তিতে তাকে প্রকাশের প্রতিষ্ঠা দিতে পারেন। কিন্তু সেই 'এলিমেন্টাল, ব্রুটাল কোয়ালিটি' দেখাতে গিয়ে যদি 'ব্রুটের' ঊর্ধ্বে উঠতে না পারি, তা হলে তার মধ্যে আর যাই থাকুক মহিমা নেই, কৃতিত্বও নেই। ঊর্ধ্বে ওঠার ক্ষমতাটুকু শুধু শিষ্টতা আর সৌজন্য নয়। ওটা মনুষ্যত্ব।

কিন্তু এ তো গেল এক দিকের কথা। অপর দিকেও বলবার কথা অনেক। শ্লীলতা নিয়েও অনেক বাড়াবাড়ি করা হয়েছে, আর্টের জাত বাঁচাতে গিয়ে অকারণ হট্টগোল, এমন কি ইতরতার সৃষ্টিও হয়েছে। অনেক ধুয়ো তোলা হয়েছে, সাহিত্যিক মহলে একদা প্রচুর উত্তেজনার বাষ্প জমেছে। সৌভাগ্যক্রমে সে কোলাহল আপনা থেকেই ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেছে। বিবেচনার স্নিগ্ধ ধারায় বিচারের শীতল হাওয়ায় শুচিবায়ুর প্রবল উষ্মার অবসান

শ্রীজওহরলাল নেহরুর

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

বিশ্ব-বিশ্রুত "GLIMPSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। এ শুধু সন-তারিখ-সম্বলিত ইতিহাস নয়—ইতিহাস নিয়ে সরস সাহিত্য। গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পটভূমিকায় গৃহীত মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন যুগের চিত্রাবলী নিয়ে লিখিত একখানা শাশ্বত গ্রন্থ। জে এফ. হোরাবিন-অংকিত ৫০খানা মানচিত্র সহ। প্রায় হাজার পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ।

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৫·০০ টাকা

শ্রীজওহরলাল নেহরুর
আত্ম-চরিত ১০·০০ টাকা

শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারীর
ভারতকথা ৮·০০ টাকা

প্রফুল্লকুমার সরকারের
জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ২·৫০ টাকা
অনাগত (উপন্যাস) ২·০০ টাকা
ভ্রষ্টলগ্ন (উপন্যাস) ২·৫০ টাকা

অ্যালান ক্যাম্বেল জনসনের
ভারতে মাউন্টব্যাটেন ৭·৫০ টাকা

আর জে মিনির
চার্লস চ্যাপলিন ৫·০০ টাকা

শ্রীসরলাবালা সরকারের
অর্ঘ্য (কবিতা-সঞ্চয়ন) ৩·০০ টাকা

ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর
আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে ২·৫০ টাকা

ত্রৈলোক্য মহারাজের
গীতায় স্বরাজ ৩·০০ টাকা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ : ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

হয়েছে। এই রকম হয়ে থাকে এবং প্রায়ই হয়, সাহিত্যের অঙ্গনে। সাহিত্যে ও সমাজে মধ্যে মধ্যে তীব্র আলোড়ন, আন্দোলন দেখা দেয় কতকগুলো মৌলিক প্রশ্ন অথবা গৌণ প্রসঙ্গ নিয়ে। তারপর প্রবল মন-কষাকষি ও বাদাবিতণ্ডার শেষে উত্তেজনার স্বাভাবিক অপসরণ হয়। তবে তার ঐতিহাসিক স্বাক্ষর থেকে যায় কোনও কোনও গ্রন্থে, সংবাদ-পত্রে কিংবা সাময়িক প্রবন্ধে।

অবশ্য পরবর্তী যুগে এই সব রচনা জোগায় কৌতূহলের খোরাক। সন্ধানী পাঠক গবেষকের কাছে খুবই চিত্তাকর্ষক, সন্দেহ নেই। বর্তমান কালের পাঠক পুরানো দলিলগুলি নেড়ে চেড়ে দেখলে মজা পাবেন। বিস্মিত হবেন দেখে, সামান্য অজুহাতে এক কালে কত কলহ ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে! সাধু বনাম চলতি ভাষার ব্যবহার, সাহিত্যে অশ্লীলতা প্রভৃতি কয়েকটি পরিচিত ও পুরানো তর্কের তর্জন-গর্জন আজকের দিনে হাস্যকর

অপরিণত বাগ্‌বাহুল্য বলে মনে হয়। 'সাহিত্য', 'নারায়ণ', ও 'উপাসনা' প্রভৃতি পত্রিকায় যে সব আলোচনা একদা প্রকাশিত হয়েছে, তা বর্তমান যুগের পাঠকদের কাছে অবাস্তব, হয়তো অর্থহীন ঠেকতে পারে। অথচ এ সব প্রবন্ধের মধ্যে ঐতিহাসিক তথা সামাজিক যুক্তির সারবত্তা পরিস্ফুট না হলেও, আবেগপ্রবণ বিশ্বাসের অভাবও ছিল না।

সমাজ আর সাহিত্যের এমনই সম্পর্ক যে একের রুচিতরঙ্গ অপরকে ধাক্কা দেবেই, অন্ততঃ কিছুকাল দোলাবেই। এ চাঞ্চল্য হয়তো দীর্ঘস্থায়ী নয়। কিন্তু দেশ-বিদেশের সাহিত্যিক ইতিহাসে এই রকম বহু আন্দোলনের নজির আছে। ইংলণ্ডে 'রেস্টোরেশ্যন' যুগের অটওয়ে, কংগ্রিভ প্রভৃতি নাট্যকার, মেটাফিজিক্যাল ও ক্যারো-লাইন কবি-কুলের শিরোমণি ডন্‌ এবং কেরু্য থেকে শুরু করে উনিশ শতকের প্রী-র‍্যাফেলাইট কবি-সম্প্রদায় কিংবা 'ন্যাটি নাইনটিজ'-এর অস্‌কার ওয়াইল্‌ড-প্রমুখ লেখকদের রচনায় দেহধর্মের ও চিত্রবিলাসের প্রকাশ অথবা ইঙ্গিত ছিল, তা নিয়ে সেকালে যথেষ্টই বিরূপ সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছিল। আমাদের দেশেও মধ্য যুগের সংস্কৃত সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্র-কাব্য-কথা, শরৎ-সাহিত্য এবং কল্লোল, কালি-কলম, প্রগতি, ধূপছায়া-যুগের রচনাও একাধিকবার রুচি-ভ্রংশ বা রুচিবিকারের জন্য সমালোচিত অথবা নিন্দিত হয়েছে। কিন্তু কালের স্বাভাবিক ব্যবধানে ও মূল্যায়নে অনেক অভিযোগই মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হয়েছে, অতিরঞ্জিত তর্ক-আন্দোলনের তীব্রতাও এখন লোপ পেয়েছে। যা স্থূল, নিছক দেহসর্বস্ব এবং ইন্দ্রিয়বাদিতার অতিরিক্ত ছিল না, তা ভেসে গিয়েছে। সে সব লেখক এবং সাময়িক রচনাও আজ বিস্মৃতির গর্ভে। আর যা দেহাশ্রয়ী হয়েও শিল্প-ভাবনার আর সৃষ্টি-ক্ষমতায় চিহ্নিত ছিল, তা শত বিদ্রূপে বিশোধিত হলেও আজও অম্লান এবং নির্বিশেষ গুণের অধিকারী বলে তার চিরন্তন সম্মান।

এর কারণ,-রুচিভেদ রুচি-বিবর্তন এবং নতুন করে বিচারের আয়োজন, নতুন মানের প্রয়োজন। রুচি ও নীতি মানুষের সৃষ্টি, সমাজ-বন্ধন ও রক্ষণের প্রয়াস-সূত্র। গড়ে ওঠে, আবার বাতিল হয়। এই রকমই হয়ে আসছে। আবার অনেক সময় বহু পুরাতন রীতি-নীতি সহজ সরল ও বলিষ্ঠ বলে নতুন করে স্বীকৃতি পায়, প্রশংসিত হয়—যেমন যম-যমীর আলাপন, ইহুদীদের সং স্তুতি, স্যাফো এবং হোরেস-এর প্রণয়-কাব্য। তাই চর্যাপদ ও বৈষ্ণব-কাব্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা মঙ্গল-কাব্যগুলির, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার, এমন কি কবিরাল গান ও তরজার প্রবক্তা-দোষ সত্ত্বেও পুনর্বিচার, ঐতিহাসিক প্রয়োজন বলে স্বীকৃত হয়।

আজকে না হয় ফাঁদি নথ-পরা গৃহিণীর মুখমণ্ডল, চাল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেকার 'ডাগর' মেয়ের সংসার-পক্কতা এবং 'মনের মানুস' চিনে নেবার অনায়াস-পটুত্ব কিংবা পতিপ্রাণা কোনও ত্রয়োদশীর অপূর্ব ত্যাগ-স্বীকারের আদর্শ, অথবা বিশ বছরের প্রবীণ যুবার পিতৃত্ব ও দায়িত্ব-বোধের কথা কল্পনাও করতে পারি না আমরা। পাখা-মেলা বেগুনী পাখির ছবি-দেওয়া গোলাপী রুল-টানা কাগজে, কোনও ছাতার বাঁটের অশিক্ষিত কারিগরও তার গোময়-লিপ্ত মফঃস্বলী প্রণয়িনীকে মর্মবাণী জানাতে আজ অত্যন্ত লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হবে। পঁয়ত্রিশ বছর আগে এই শহর কলকাতায় যদি কোনও ছেলে একটি মেয়ের সঙ্গে একটু দেখা করতে কি দুটো মনের কথা বলতে চাইত, তা হলে শুধু তার হৃৎকম্পন ও প্রস্তুতি-পর্ব নিয়েই একখানা রীতিমত অষ্টাধ্যায়ী উপন্যাস লিখে ফেলা চলত। কিন্তু এখনকার দিনে এ নিয়ে একটা ছোট গল্পও জমানো যায় না। রুচির পরিবর্তন ছাড়া আর কি! তাই সাহিত্যের আদর্শ, সাহিত্যের লক্ষণ, আর্টের উদ্দেশ্য এবং সাহিত্যে শ্লীলতা নিয়ে একদা যে প্রচণ্ড তর্কের উদ্ভব হয়েছে, বর্তমানে তাদের সার্থকতা ক্ষীণ হয়ে গেলেও, এইসব জল্পনা কল্পনা এবং উত্তেজনা অতীত চিন্তার ও আন্দোলনের নমুনা হিসেবে অন্তত মুখরোচক লাগবে।

সাহিত্যে শ্লীলতা—এ বাক্যটির মধ্যে দুটি শব্দ লক্ষ্য করতে হবে। প্রথমটি হচ্ছে—শ্লীলতা, সদর্থক এবং নঞর্থক—উভয় অর্থেই। এ শুধু শ্লীলতার বহিরবয়ব নয় অর্থাৎ অশ্লীলতার বাহ্য অনুপস্থিতি নয়, কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া নয়। অন্তর থেকে তাকে বর্জন করে শ্লীলতা অর্থাৎ সংযম ও শুভ্র রুচির প্রতিষ্ঠা। তার পরের প্রশ্ন হচ্ছে—সেই অশ্লীলতা বিষয়-বস্তুর না প্রকাশভঙ্গীর? অন্তরে যে বস্তুর লালসা রয়েছে, ভব্য ও নিপুণ, পরিচ্ছন্ন লেখনী তাকে আরও ভীষণভাবে লোভনীয় করে তুলতে পারে। আবার, গ্রাম্য ও স্থূল ভাষার মাধ্যমেও শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক কথামৃত পরিবেশন করে গেছেন।

দ্বিতীয় শব্দটি হল, সাহিত্য। অর্থাৎ

জাতীয় সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট সংযোজন

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বিরাট গ্রন্থ

ভারতে জাতীয় আন্দোলন

আন্দোলনের সূচনাকাল থেকে দেশ স্বাধীন হওয়া অবধি দীর্ঘ সময়ের সুসংবদ্ধ ও প্রামাণিক ইতিবৃত্ত। বহু তথ্য ও কাহিনী। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে লেখকের অকুণ্ঠ ও বলিষ্ঠ আলোচনা। আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে বাঙালী দেশকর্মীদের অবদানের বিবরণ। তৎসহ ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের সুচিন্তিত মুখবন্ধ এবং ডক্টর ওহদেদরের বিশদ গ্রন্থপঞ্জী বই-খানিকে বিশেষ মূল্যবান করেছে। সুচারু প্রচ্ছদ। সুদৃঢ় বাঁধাই। ১০·৭৫ ॥

অন্যান্য কয়েকখানি বিশেষ ধরণের রচনা :

ডেল কার্নেগির বিখ্যাত দু'খানি বই প্রতিপত্তি ও বন্ধুলাভ (How to Win Friends & Influence People) ৪·৫০ ॥ দুশ্চিন্তাহীন নতুন জীবন (How to Stop Worrying & Start Living) ৫·৫০ ॥ পরিমল গোস্বামীর আত্মজীবনী স্মৃতিচিত্রণ ৭·০০ ॥ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুরাণ কাহিনী অমৃতের উপাখ্যান ৩·৫০ ॥ চিত্তরঞ্জন দেবের ভ্রমণ তারাপীঠের একতারা ৩·৭৫ ॥ নন্দাঘুণ্টি অভিযানের সহ-নেতা বিশ্বদেব বিশ্বাসের পর্বত-অভিযান কাঞ্চনজংঘার পথে ২·৫০ ॥

একমাত্র পরিবেশক ঃ পত্রিকা সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড

১২।১, লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ ॥ শাখা ঃ দিল্লী — বোম্বাই — মাদ্রাজ

যে অশ্লীলতা অ-সাহিত্যিক, তা প্রকাশ্যে হোক বা গোপনেই হোক, আমাদের আলোচ্য নয়। তার জন্যে অন্য ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যে মুহূর্তে অশ্লীলতা প্রবেশ করল সাহিত্যে, সেই মুহূর্তে সমস্যার গুরুত্ব এল। আমরা সচেতন হলাম। কেন না, সাহিত্য কেবল ব্যক্তি-মনের নয়, সমাজ-মনের বাহক ও পোষক। আইন-কানুনে 'লাইবেল' ও 'ডীফেমেশান'-এর মানদণ্ড হল তৃতীয় পক্ষের সামনে তার প্রকাশ। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অনেকটা তাই। অতএব 'কম্যুনিকেশ্যান' অর্থাৎ পাঠক-সাধারণের চিত্তে কোনও কিছু সংক্রামিত করার ফলাফল বিবেচনায় দায়িত্ব বাড়ল, সতর্কতার প্রয়োজন ঘটল। আবার একথাও ঠিক যে, অনেক নগ্ন বাস্তব, অনেক অপ্রিয়, এমন কি কুৎসিত সত্য নিয়েও মহৎ সাহিত্য রচনা করা সম্ভব এবং তা হয়েওছে। কিন্তু সেখানেও আবার প্রশ্ন জাগে—এ সত্য কি সত্য? না কি সত্য-কল্প? ভঙ্গিমায় ছলনায় কোনও কুশ্রীতার মোহময় চিত্রণ, যার স্বপক্ষে রায় নেবার জন্যে সুধীজনের দরবার ছেড়ে বিচারকের এজলাসে হাজির হতে হয়?

সুতরাং একই তর্কসূত্রে ঘুরে ফিরে আসছে—আর্ট কিসের জন্যে? আর্ট ফর আর্ট'স সেক্, না কি ফর আর্টিস্ট'স সেক্? সাহিত্য শিল্প কি সমাজের জন্যে, না জীবনের দাবিতে রচিত হবে? সাহিত্য শিল্পের লক্ষ্য এবং চরিত্রের ওপর নির্ভর করে শ্লীলতার স্থান, তার মাত্রা-বিচার। এ সব রুচির প্রশ্ন অবশ্য অপেক্ষাকৃত হাল আমলের। রুচিবিকারের নমুনা কিন্তু আরও প্রাচীন।

চর্যাপদে, জয়দেবের কাব্যে, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব পদকর্তাদের রচনায়, কৃত্তিবাস কাশীরাম এবং মুকুন্দরামের কাব্যেও কোথাও কোথাও শ্লীলতার অভাব দেখা যায়। কিন্তু মধ্য-যুগীয় বাংলা সাহিত্যে শ্লীলতা-হানির এ অপরাধ নিয়ে মাথা ঘামাবার লোক ছিল না। যিনি কলম ধরলেন, তিনি এ যুগের বীরবল।

বাংলার তথা ভারতের প্রিয়ংবদ কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ যতই ললিত-পদ-মাধুর্য আর অশ্রুতপূর্ব ধ্বনি-ঝংকার থাকুক, প্রমথ চৌধুরীই বোধ হয় প্রথম বিরূপ সমালোচনা করলেন। দেখালেন, তাঁর কাব্যে যে ভাবের অভাব, মৌলিকতার দৈন্য, তা ঢেকে দেওয়া হয়েছে সুকৌশলে প্রেমের তামসিক ভাব-বর্ণনায়—যার মধ্যে উৎকৃষ্ট রুচির পরিচয় নেই। আবার ইংরেজ শাসনের প্রথম প্রতিষ্ঠার যুগে সমাজ শিক্ষা আচার-ব্যবহারে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল, আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সেই সামাজিক রুচি খানিকটা প্রতিবিম্বিত হল ভারতচন্দ্রের কাব্যে। তখনকার দিনে সভা-কবির বিদ্যাসুন্দর হয়তো খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কিন্তু প্রায় একশো বছর পরে, ১৮৭১ সালে সে যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী বঙ্কিম ভারতচন্দ্রের রুচি-হীনতার কঠোর সমালোচনা করলেন এইভাবে:

"ভারতচন্দ্রের কাব্যে এমন এক অশ্লীলতা আছে, যাহার জন্য তাঁহার কাব্য এই যুগে পুনঃপ্রকাশের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে......"

আবার এই ভিক্টোরিয়ন উক্তির প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে সেই ভারতচন্দ্রেরই অনাদৃত কাব্যে দীপ্তি ও প্রসাদ-গুণ আবিষ্কার করে প্রমথ চৌধুরীর আধুনিক গুণগ্রাহী মন তাঁকে ওস্তাদ শিল্পী বলে প্রশংসা জানাতে দ্বিধা করল না। বঙ্কিম ও বীরবল, উভয়েই বিদগ্ধ ব্যক্তি এবং সুস্পষ্ট সমালোচক। উভয়েরই অভিজাত শালীনতা-জ্ঞান ছিল। অথচ রুচি ও নীতি-সম্পর্কে তাঁদের কত ভিন্ন ধারণা।

অতএব রুচি-সম্পর্কে বিচারের মানদণ্ড স্থিতিশীল নয়। কার মন্তব্য গ্রাহ্য, আর কার মত ভ্রান্ত—সেটা বড় প্রশ্ন নয়। আসল কথা হচ্ছে সমালোচনার তথাকথিত মূলসূত্রগুলির এবং পদ্ধতির বিবর্তন। অর্থাৎ রুচি-বিভ্রমের সংশোধন থেকে সাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বা বিচার-দৃষ্টির ঐতিহাসিক নিরূপণ। রুচি-বিকারেরও কারণ আছে। যুগসন্ধিক্ষণে যখন ব্যক্তি আর সমাজের মধ্যে ভারসাম্যে ব্যাঘাত ঘটে আর সমাজ-পরিপার্শ্বের গ্লানি যখন লেখক-বিশেষকে সংক্রামিত করে' মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট করবার উপক্রম

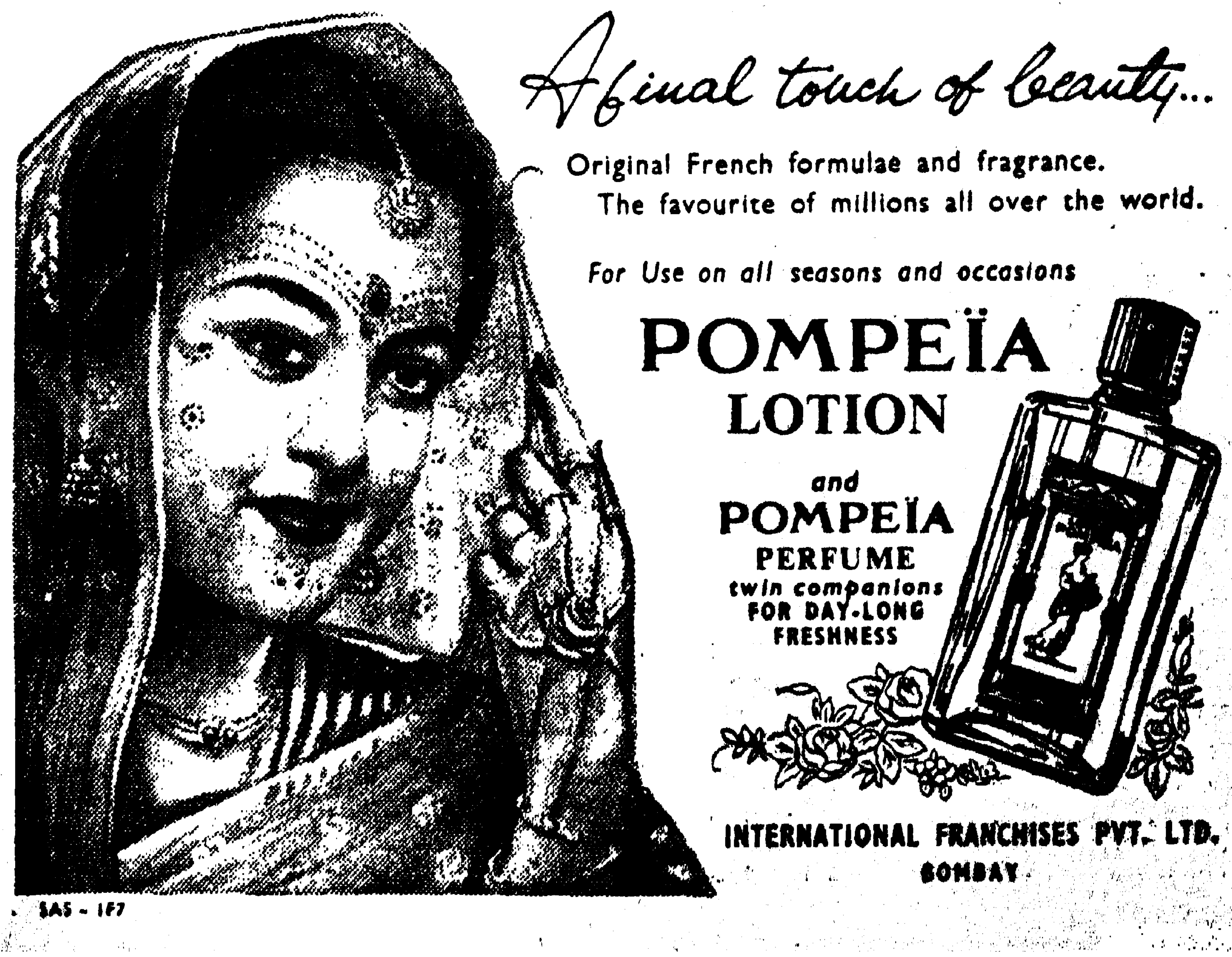

করে, তখন নৈরাশ্যের নীচু টান রুচি-বিভ্রম ঘটাতে পারে। আর একথা ঠিক যে, সমালোচনা যতই নৈর্ব্যক্তিক হোক, একেবারে নিরপেক্ষ হতে পারে না। ভালো লাগা কি মন্দ লাগার ঊর্ধ্বে উঠে, ব্যক্তিগত রুচি এবং প্রাগর্জিত ধারণা দূরে রেখেও শিল্পীর জগৎ-প্রতিষ্ঠা, শিল্পকর্মের সমন্বয়ী ব্যাখ্যা এবং মানস রুচির নির্ধারণ করা যায় এবং করা উচিত। এই বিশ্লেষণের পিছনে থাকে সামাজিক লক্ষ্য,—যাকে বাদ দিয়ে মানুষ বাঁচে না, সাহিত্যিক তো নয়ই।

সাহিত্যে প্রাকৃত রস নিন্দনীয় অথবা প্রশংসনীয় হোক্, কবিওয়ালাদের যুগ চলে গিয়েছে, যদিও সামাজিক ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু ছাত্রদের দৃষ্টি এদিকে ফিরেছে। সেকালে হাফ্ আখড়াই, আল্-কাপ যতই নয়া কলকাতার বাসিন্দাদের আনন্দ দিক, তাদের স্থূলতা,—কি বিষয়ে, কি পরিবেশনে—আজকের দিনে অপাঙক্তেয়। তৎকালীন রুচি-বিকৃতির উদ্দেশ করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন:

"তখন কবির আশ্রয়দাতা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি এবং সেই হঠাৎ-রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান।"

বঙ্কিমও তাঁর আগে লিখে গেছেন:

"এত সাহিত্যিক আবর্জনা ঐ যুগের মত আর কখনও বাংলা সাহিত্যে স্তূপীকৃত হইয়া উঠে নাই।"

এর পরের যুগে, প্রথম ইংরেজী শিক্ষার সংঘাতে উচ্ছৃংখল বাঙালী বাবুয়ানির বিদ্রূপ-চিত্র আঁকলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'নববাবুবিলাস' এবং 'নববিবিবিলাসে'। কিন্তু ব্যঙ্গ-নিপুণ হলেও তাঁর নিজের রচনা কুরুচি থেকে মুক্ত ছিল না।

ওদিকে ঈশ্বর গুপ্ত তৎকালীন লেখকদের গুরুস্থানীয় হলেও তাঁর কাব্যে অলংকার বাহুল্য আর গ্রাম্য ও অশ্লীল রসিকতা বঙ্কিমের কাছেই নিন্দিত হয়েছিল। বাস্তবিকপক্ষে বঙ্কিমই বাংলা সাহিত্যে প্রথম উন্নত রুচি, মাত্রাজ্ঞান ও শুচি সংযমের প্রবর্তন করেন। শুধু সাহিত্যে নয়, মজলিশী কথাবার্তাতেও। এই প্রসঙ্গে, বদ্ রসিকতা শুনে বঙ্কিম কি রকম লজ্জায় সংকোচে সভা থেকে সরে পড়বার উদ্যোগ করছেন, তার যে ছবি রবীন্দ্রনাথ কথায় এঁকেছেন, সেটি মনে পড়ছে। সমাজ ও সাহিত্যের মাননির্ণয়ে ও মানরক্ষায় বঙ্কিমের চেয়ে কেউ বেশি মনোযোগী ছিলেন না, একথা সত্য। তবে সাধু ও দৃপ্ত সমালোচক হলেও, বঙ্কিম সত্যিই গুণগ্রাহী ছিলেন। মাইকেলের প্রসঙ্গে, প্যারীচাঁদ মিত্রের রচনায়, দীনবন্ধুর নাটকেও স্থানে স্থানে শ্লীলতার বিলক্ষণ অভাব আছে। কিন্তু [illegible] শ্লীলতা-ভঙ্গের অভিযোগ" মেনে নিয়েও, তিনি দোষের সঙ্গে গুণের বিবেচনাও করেছিলেন এবং সুবিচারই করেছিলেন। বিশেষ করে, পরম সুহৃৎ দীনবন্ধুর সাহিত্যকর্ম আলোচনায়। যেটুকু কুরুচির স্পর্শ, সেটুকু বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গরসের আধিক্যবশত ঘটেছে। কিন্তু 'মেঘনাদবধ' আর 'নীলদর্পণ' যে কোনও সাহিত্যেরই গৌরব-বিপ্লব। বঙ্কিম তা জানতেন।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সংযম ও শালীনতার প্রতীক হয়েও তৎকালীন বিরূপ সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পান নি। তাঁর মতন শুচিশুভ্র মানসরুচি নিয়ে কোনও সাহিত্যিক অবতীর্ণ হয়েছেন কিনা জানি না। আন্তরিক সৌজন্য এবং শ্লীলতা-রক্ষাকে তিনি শুধু শিষ্টাচার মনে করতেন না, ভাবতেন মনুষ্যত্ব। কথায় লেখায় আচার-ব্যবহারে যে মানুষের ভদ্রতা ও পরিমিতি-বোধ ছিল অসামান্য, তাঁকেও রুচি-বিভ্রমের অপবাদ শুনতে হয়েছে। রুচি তাঁর নিখুঁতই ছিল, বিভ্রমটা ঘটেছিল ছিদ্রান্বেষীর দুষ্য চিন্তায়।

'সাহিত্য' কাগজের কর্ণধার শুধুই নিন্দুক ছিলেন, গুণপনার তারিফ করতে জানতেন না—এমন কথা বলি না। কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যের ভাব ও প্রকাশ-রীতি কোনোটাই তিনি পছন্দ করেন নি। ১৯১৯ সালে, ঐ কাগজে কবি-কল্পনাকে 'কল্পনার অপচার মাত্র' বলে নিন্দা করা হয়। আরও মজার কথা—'যামিনী না যেতে জাগালে না' গানটিতে অভিসার-চিত্র সন্ধান করে বলা হয়,—"অভিসার জিনিসটা খারাপ। ইহা পুরাকালে থাকিলেও ইম্‌মর‍্যাল, না থাকিলেও ইম্‌মর‍্যাল।" কাব্য-বিশারদের আক্রোশ বিদ্রূপ আর এই ধরনের গম্ভীর পন্‌টিফিক্যাল উক্তি বর্তমান যুগে অকল্পনীয়।

শরৎচন্দ্রের লেখাতেও শ্লীলতা ও রুচির অভাব লক্ষ্য করে এককালে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের তরফ থেকে যথেষ্ট বিদ্রূপ মন্তব্য করা হয়েছে। পরবর্তীকালে, তাঁর অভূতপূর্ব জন-খ্যাতি সত্ত্বেও সাহিত্যিক মান ও কৃতিত্ব নিয়ে যে সব পুনর্বিচার ও সমালোচনা হয়েছে, তার মধ্যে অন্তত শ্লীলতা-ভঙ্গের অভিযোগ আনা হয় নি। তিনি নিজেই প্রেসিডেন্সি কলেজের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য-অধিবেশনে এ অভিযোগের চমৎকার উত্তর দিয়েছিলেন 'পল্লী সমাজ' প্রসঙ্গে। তাঁর বক্তব্য ছিল যে, লেখক আর যা-ই হোন, সমাজ-সংস্কারক নন। নীতিবাগীশতা সম্পর্কে তিনি সরস মন্তব্য করেন, 'এর চেয়ে সংকীর্তনের দল খোলাই ভালো......'

কল্লোল যুগের একাধিক শক্তিমান্ লেখককেও সাময়িক বিশেষ পত্রিকায় শ্লীলতা-ভঙ্গের জন্য কটূক্তি করা হত।

তাঁদের সব রচনায় সুরুচির মাত্রা লঙ্ঘিত হয় নি একেবারে, একথা উগ্র সমর্থকরাও বলেন নি। কিন্তু সমালোচনায় যে কুরুচি ও অশিষ্টতার নমুনা ছড়ানো থাকত, তার জন্যে সুস্থ পাঠকবর্গের অনেকেরই লজ্জায় মাথা নীচু হয়ে যেত। কিন্তু সেদিনে শ্লীলতা ও সাহিত্য সম্পর্কে আপনার মতামত অক্ষুণ্ণ ও দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেও উদার-দৃষ্টি তরুণ লেখকদের আতিশয্য মার্জনা করে' তাঁদের মধ্যে কারুর কারুর নিশ্চিত প্রতিভাকে সাদর স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা করেন নি। সেইসব দিনের তর্ক-বিতর্ক, প্রবল উত্তেজনা, নর্দমা সাহিত্য বলে চিহ্নিত করার প্রয়াস স্মরণ করলে আজ শুধু হাসির উদ্রেক হয়।

সেদিনের সাহিত্যে আধুনিকতার অপবাদ-প্রসঙ্গে সবচেয়ে সুচিন্তিত সারবান্ মন্তব্য করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী। ১৩৩৫ সালে রামমোহন লাইব্রেরিতে এক সভায় তিনি বলেন, সাহিত্যিকদের পক্ষে সংযম অভ্যাস করাই ভালো। কিন্তু সুনীতি আর সুরুচি নিয়ে যে ধুয়ো চলেছে, তাতে চিন্তার দৈন্য দেখা যাচ্ছে। 'এমন লেখা আছে যা নীতি-পূর্ণ অথচ ঘোর অশ্লীল, অপরপক্ষে এমন লেখাও আছে যা শ্লীল অথচ যার নীতি ঘোর ভয়াবহ।' আসলে 'ফেটিশিজম' বা বস্তু-রতিটাই সাংঘাতিক। অর্থাৎ সেই পুরোনো, চিরকালের প্রতিপাদ্য। মানুষ আর সমাজ যখন কাল-নিরপেক্ষ নয়, তখন বিষয় ও বিষয়ী বিচারের মানদণ্ডও বদলে যায়। কেবল বিষয়টাই বড় কথা নয়। রসের প্রক্রিয়ায় বাচ্য ও বাচকের সমুচিত সংযোগই হল আসল কর্ম। অনুচিত হলে, বিষয়ের জোর বড় হলে, সত্য থাকে না—রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, হয়ে যায় 'রিয়ালিটির কারি পাউডার......'

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

৫১

'সাজাহান' ত এভাবে চলতে লাগল। আমার মনে হয়, কৃষ্ণভামিনী ও দুর্গাদাস যদি অসুস্থ হয়ে না পড়ত আর 'সাজাহান'-এ যদি ভূমিকা গ্রহণ করত, তাহলে 'সাজাহান' বই আরও ভালো হতো। এবং শুধু ওরা দুজন কেন, স্টারে যদি আবার এই সময় ফিরে আসতেন রাধিকানন্দবাবু, তাহলে ত আর কথাই ছিল না! 'দারা' তিনকড়িদা ছেড়ে দেবার ঠিক পরেই নির্মলেন্দু দুরাত্রি 'দারা' করেছিল, এবং বেশ ভালোই হয়েছিল সে দারা, কিন্তু তাহলে 'দিলদার' করবে কে? নির্মলেন্দুর যায়গায় প্রফুল্ল সেনগুপ্ত দিলদার করলে বটে, কিন্তু নির্মলেন্দুর 'দিলদার' ঠিক যে রূপটি নিয়েছিল, সেটি আর পাওয়া যায় না ওর কাছ থেকে? নির্মলেন্দু 'দিলদারে' দুদিন না নামায়, একটা প্রচণ্ড অভাব অনুভব করা গিয়েছিল নাটকে। অগত্যা প্রফুল্ল গেল 'দারা'য়, নির্মলেন্দু আবার 'দিলদার।' তখন এক একবার মনে হচ্ছিল, তিনকড়িদা 'দিলদার' করলে কেমন হতো? কিন্তু 'দারার' পর এমন ভগ্নমনোরথ হয়ে পড়েছিলেন তিনি যে, এ-বইতে আর কোনো ভূমিকাই তিনি নিতে চাইলেন না। আর করতে পারতেন অপরেশচন্দ্র। তিনি পুরানো মিনার্ভায় বহুবার করেও ছিলেন 'দিলদার'। কিন্তু তিনিও নামলেন না এ-বইতে, তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্যই এর কারণ। অবশ্য একথাও ঠিক, 'দিলদার'রূপে নির্মলেন্দু যে সাফল্য অর্জন করেছে, তাতে করে 'দিলদার' থেকে তাকে সরিয়ে আনা কোনক্রমেই যুক্তিসংগত ছিল না।

বলছিলাম রাধিকানন্দবাবুর কথা। মডার্ন থিয়েটার থেকে উনি সদলবলে চলে আসবার পর ঐ আলফ্রেড মঞ্চেই তখনকার সুবিখ্যাত শৌখীন সংস্থা—বৌবাজারের 'আনন্দ-পরিষদ' দল ওঁকে বাদ দিয়ে খুলে ছিলেন নবীন সেনের কাব্য "রৈবতক"-এর নাট্যরূপ। এটা হয়েছিল ঐ চব্বিশ সালেরই আগস্টের শেষাশেষি কোনো সময়ে। এই 'আনন্দ-পরিষদ' তখন "প্রফেসনাল" রূপে 'রৈবতক' দিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেও শৌখীন সংস্থা হিসাবে এঁরা নাম করেছিলেন শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয় উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ প্রযোজনা করে। এবং সেইসব নাটক ও'রা এত যত্নের সংগে, আর নিষ্ঠার সংগে অভিনয় করতেন যে, প্রশংসা না করে উপায় নাই। পরিবেশ-রচনায় বাস্তবানুগ হবার খুবই চেষ্টা করতেন এ'রা, আর তাতে কৃতকার্যও হয়েছিলেন। প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে এ'রা সেযুগে যেরকম মনোযোগ দিতেন, তাতে দর্শকদল অবাক হয়ে যেতেন। চন্দ্রনাথ, দেবদাস প্রভৃতি নাটকই তখন করেছেন এ'রা। এ'দের কেন্দ্রমণি যিনি ছিলেন, তাঁর নাম লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র। 'রৈবতকে' বাসুকী'র ভূমিকা ইনি করেছিলেন, এবং খুব ভালোই করেছিলেন বলে শুনেছি। 'দেখতে যাব-দেখতে যাব' করছি, এর মধ্যে, দুটি সপ্তাহ যেতে-না-যেতে দেখি আলফ্রেড মঞ্চে মিনার্ভার পোস্টার পড়ে গেছে!

চমকে উঠলাম। কে কী! কী হলো 'আনন্দপরিষদ'-পরিচালিত 'মডার্ন থিয়েটারের'? শুনলাম, বন্ধ হয়ে গেছে, 'রৈবতক' লোকে নিলো না। মনে দুঃখ হলো। এ'রা 'কর্ণার্জুন'-এর জন-প্রিয়তা আর 'সীতা'র সাফল্য দেখেই সম্ভবত অনুপ্রাণিত হয়ে পৌরাণিক নাটক ধরেছিলেন। কিন্তু তা না করে, যদি তাঁরা তাঁদের নিজস্ব ধারার অনুসরণ করে শরৎচন্দ্রের নাটকগুলিই তখন সাধারণ মঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে তুলে ধরতেন, তাহলে, সৃষ্টি করতে পারতেন এক ইতিহাস। এবং জনপ্রিয়তাও যে আসত না, একথা জোর করে কে বলতে পারে। তবুও একথা বলব, শরৎচন্দ্রের বই একের পর এক অভিনয় করে এ'রা তখন দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, ও'র বই দিয়ে নাট্যমঞ্চ থেকে জনচিত্তকে মুগ্ধ করা যেতে পারে। অবশ্য, এটাও ঠিক কথা, এ'দেরও আগে এই স্টার থিয়েটারেই, ১৯১৮ সালে গিরিমোহন মল্লিক মশাই লেসি হয়ে শরৎবাবুর বই প্রথম পেশাদারী মঞ্চে অভিনয় করান। বইখানি হচ্ছে "বিরাজ বৌ"। তারকপালিত সাজতেন নীলাম্বর, কুসুমকুমারী—বিরাজ, ক্ষেত্রমোহন মিত্র—পীতাম্বর।

ও'দের বদলে আলফ্রেডে এবার এলেন—মিনার্ভা। নাটকের নাম—'জীবন যুদ্ধ।' রিজিয়া-প্রণেতা মনোমোহন রায়ের বই। ভিক্টর হ্যুগোর 'লা মিজারেবল'-এর নাট্যরূপ এটি, স্থান-কাল আর পাত্র শুধু বদলে নিয়েছেন তিনি। যেমন, 'জাঁ ভলজাঁ'র নাম হয়েছিল এ'নাটকে—'মেঘনাদ'। এ'-ভূমিকায় নেমেছিলেন কার্তিকচন্দ্র দে। ইন্সপেক্টর সেজেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দে,। 'বিশপ' এ বইতে হয়েছেন 'পুরোহিত'।

এই মাসেই প্রকাশিত হবে—

অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত ও অধ্যাপিকা জ্যোৎস্না গুপ্তের

শরৎচন্দ্রের দেনা পাওনা

শরৎসাহিত্য সম্পর্কে নতুন দৃষ্টি-ভংগীতে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের আলোচনা।

মূল্য : দু'টাকা

অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তের

প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন

চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মনসামঙ্গল, বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, দ্বিজমাধব, মুকুন্দরাম, আলাওল ও পদ্মাবতী, মৈমনসিংহ গীতিকা, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস সম্পর্কে অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তের মননশীল তীক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণে এক অনন্যসাধারণ সাহিত্য-সমালোচনা গ্রন্থ। রসবেত্তা সাহিত্য পাঠকের পক্ষে এ গ্রন্থ অপরিহার্য।

মূল্য : আট টাকা

কুমুদরঞ্জনের কাব্য বিচার

(প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিতপ্রায়)

মূল্য : দু'টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা

নভেম্বরের ২য় সপ্তাহে প্রকাশিত হবে

অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত ও অধ্যাপিকা জ্যোৎস্না গুপ্তের

তারাশঙ্করের ধাত্রী দেবতা

গ্রন্থ নিলয়

১৭২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

নেমেছিলেন কুঞ্জলাল চক্রবর্তী। এ'দের সঙ্গে এক নবাগত তরুণকেও চোখে পড়ল, নাম, মণীন্দ্রনাথ ঘোষ। নাটক খুলেছিল ৯ই সেপ্টেম্বর। সেদিনটি মঙ্গলবার ছিল বলে দেখতে গেলাম আমি আর অপরেশ-চন্দ্র। যে-ধরনের উৎকৃষ্ট গল্প, সেধরনের জমাটি হয়ে দাঁড়ালো না অভিনয়। বেশ লম্বা-চওড়া দেখতে ছিলেন কার্তিকবাবু, গলার স্বরও খুব গম্ভীর, সেইজন্যই বোধহয় ও'কে দেওয়া হয়েছিল মুখ্য ভূমিকাটি। কিন্তু আমার সেদিন মনে হয়েছিল, পার্টটি ও'কে ঠিক খাপ খায়নি। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও খুব ভালো হলো না। তবে, অভিনয় ও'রা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

ততদিন রাধিকাবাবু-সম্বন্ধে গুজব রটে গেছে, তিনি নাকি আবার নতুন দল সংগঠন ক'রে নতুন থিয়েটার খুলবার চেষ্টায় রত হয়ে পড়েছেন। এ গুজব এতদূর ছড়ালো, যে, কাগজে পর্যন্ত মন্তব্য করে বসল, তিনি এসব দিয়ে শক্তিক্ষয় না করে এই যে এতগুলি থিয়েটার চলছে, এর একটিতে এসে যোগদান করুন না কেন?

এর পরের ঘটনা, ৯ই নবেম্বর আমাদের 'কর্ণার্জুন'এর ১৫০ রাত্রি পূর্ণ হবার স্মারক-উৎসব ও অভিনয়। মিনার্ভায় তখন সপ্তাহে একদিন-দুদিন 'জীবন-যুদ্ধ' চলে, অন্যদিনগুলিতে চলছে পুরোনো-পুরোনো বই। আর, নাট্যমন্দিরে চলছে 'সীতা'। আমাদের ছোটখাটো পরিবর্তনও হয়েছিল। ঐ রাত্রিতে 'পরশুরাম' করলেন দানীবাবুর ভাগ্নে দুর্গাপ্রসন্ন বসু। দুর্গাদাসের 'বিকর্ণ' করলে রাধাচরণ। কৃষ্ণভামিনীর 'পদ্মা' করলে নিভাননী। আর, নিভাননীর দ্রৌপদী করলে—আশালতা। রায়সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত মশাই এদিন এক মনোজ্ঞ অভিভাষণ দিয়েছিলেন। নিরবচ্ছিন্নভাবে ১৫০ রাত্রি একই ভূমিকায় অভিনয় করে যাওয়ার দরুণ ইন্দু মুখোপাধ্যায় আর নীহারবালা দুটি হীরক অঙ্গুরীয়ক পুরস্কার পেলেন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। আমরাও করে গেছি, তবে আমাদের 'ব্রেক' হয়ে গেছে, কখনো কেউ ছুটি নিয়েছি, কখনো ভূমিকা বদলে গেছে। যেমন, আমি করেছি কর্ণ, দুর্গাদাস করেছে অর্জুন। শুধু ইন্দু আর নীহার ছাড়া আর সবারই ঐরকম কিছু-না-কিছু ঘটে গিয়েছিল।

তারপর আবার ১২ই নবেম্বর হলো 'ইরাণের রাণী'র জুবিলী উৎসব—৫০ রাত্রি চলবার জন্য। এদিন অপরেশবাবুর বদলে 'দাউদশা' করলেন তিনকড়িদা। কাজী—দুর্গাদাসের বদলে করলে—রাধাচরণ। গুলরুখ—সুবাসিনীর জায়গায় করলে—নীহারবালা। সুবাসিনী তখন স্টার ছেড়ে দিয়েছে। রাণী—কৃষ্ণভামিনীর বদলে করলে নিভাননী। আর, দরবারের নর্তকী—নীহারের যায়গায় যে করলে, তার নাম—তারকবালা (লাইট)। আমাদের সেই 'বৃষকেতু' রূপিণী ছোট্ট মেয়েটিকে মনে পড়ছে কি পাঠকদের? এইছে সে-ই। আর্ট থিয়েটারের আমাদের আগে—অপরেশ-বাবুর আমলে—স্টারের কী একটা বইতে যেন পটলবাবু (পরেশ বসু) একটা ট্রিক-সিন করেছিলেন, যাতে, স্টেজে নির্দিষ্ট করা একটা যায়গায় নির্দিষ্ট সময়ে এসে ছোট্ট মেয়েটি দাঁড়াতো, আর তার গা থেকে একটা আলো বেরিয়ে আসত। স্টেজের এক জায়গায় একটা তার ফিট্ করা থাকত, সেইখানে এসে মেয়েটি দাঁড়ালেই, বিদ্যুতের সাহায্যে ওটা জ্বলে উঠত, এই ব্যবস্থাই করেছিলেন পটলবাবু। আর, এটা করবার জন্য বহুবার রিহার্স্যাল দিয়ে নিতে হতো পটলবাবুকে। ছোট্ট মেয়ে ত, এই এখানে আছে, অমনি ছুটতে ছুটতে আবার খেলাচ্ছলে কোথায় বুঝি চলে' গেল! সেইজন্য পটলবাবু বলে উঠতেন—এই দেখ, লাইট-মেয়েটা আবার কোথায়-গেল।

এই 'লাইট-মেয়ে' 'লাইট-মেয়ে' করতে করতেই তারকবালা 'লাইট' হ'য়ে গিয়েছিল আর কী! বেশ সুন্দর মেয়েটি—গৌরবর্ণ—বড়ো-বড়ো দুটি চোখ,—কথাগুলি বলতো একটু আধো আধো স্বরে—পরবর্তীকালে বেশ নাম-করা অভিনেত্রী হয়ে উঠেছিল সে।

যাইহোক, 'ইরাণের রাণী'র জুবিলীতে বহু সাহিত্যিককেও আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। পত্রিকাগুলি এতে সমর্থন জানিয়েছিলেন। তারা লিখেছিলেন—থিয়েটারে গুণী সমাগম হওয়া উচিত। এই সময় থেকেই পত্রিকা-সমালোচকেরা আমার সম্বন্ধে একটা কথা চালু করলেন। 'সার্ভেণ্ট'-যা লিখেছিলেন ১৪ই নবেম্বর '২৪ সালে, তার থেকেই তুলি "Great expressionist, carries more by expression than words." —এধরনের কথা অনেক বাঙলা কাগজও বলেছে। কিন্তু থাক এসব কথা। সেদিন বহু জ্ঞানী ও গুণীজনের সমাবেশ হয়েছিল থিয়েটারে, অনেকেই বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তার মধ্য যাঁর নাম স্মৃতির মণিকোঠায় অক্ষয় হয়ে আছে, তিনি হচ্ছেন, স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নাট্য-সমালোচনাই ছিল তাঁর আলোচ্য বিষয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি বক্তৃতা দিতে উঠেছিলেন শেষের দিকে, যখন থিয়েটার দেখবার জন্য দর্শকদল একেবারে অধৈর্য

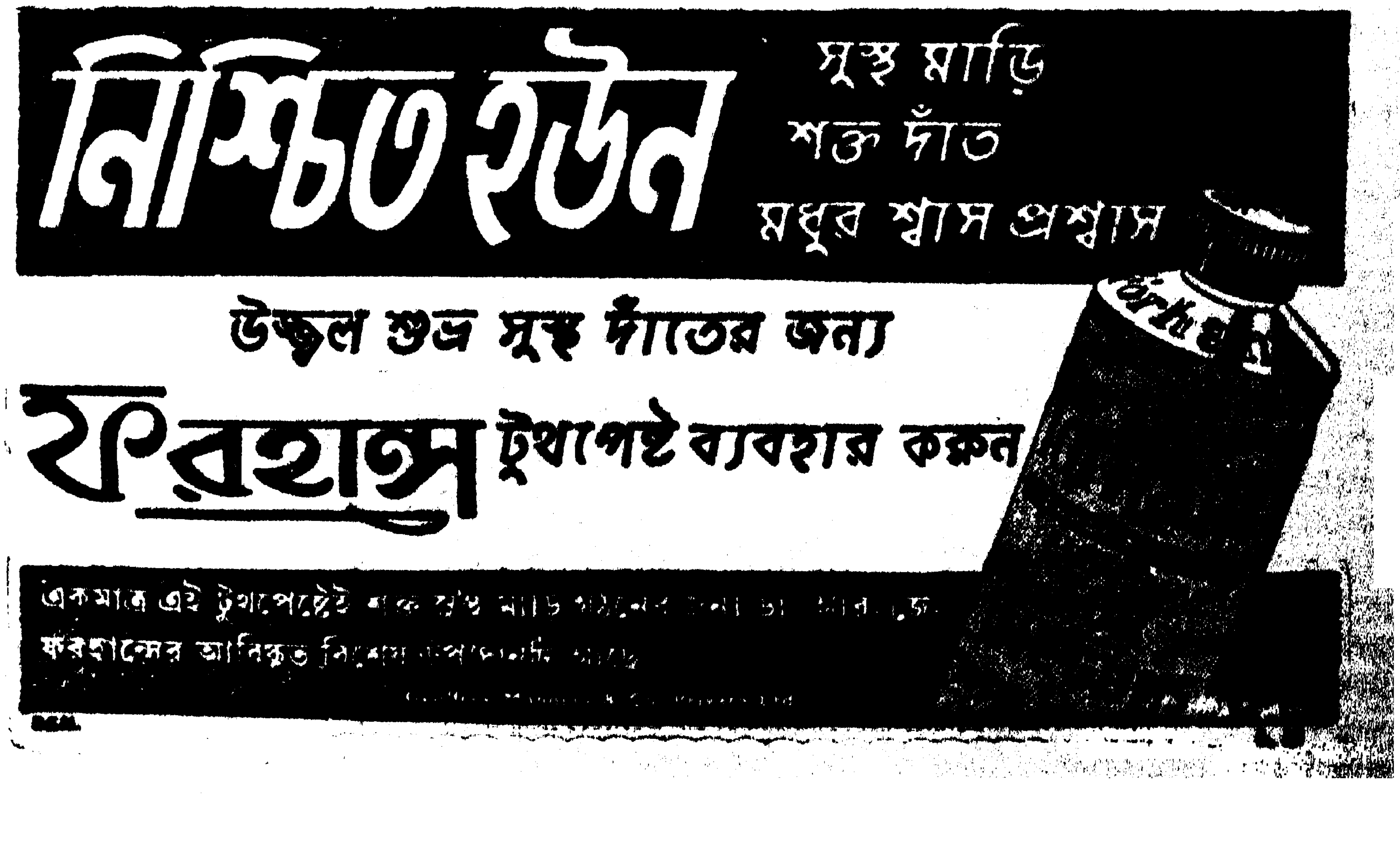

হয়ে গিয়েছিলেন। এটা বুঝেই তিনি বলেছিলেন, তাঁর ভাষণ তিনি খুব সংক্ষেপেই বলবেন এবং একেবারেই বেশী সময় নেবেন না। কিন্তু দর্শকদল ততক্ষণে এত অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছিলেন যে, কেউ কেউ তাঁর কথার মধ্যেই প্রবল বিঘ্ন সৃষ্টি করে বসলেন। ফলে, আমাদের দুর্ভাগ্য, তিনি মাঝপথেই থেমে গিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে বসে পড়লেন। কিন্তু যেটুকু তিনি বলেছিলেন, তাতেই রসজ্ঞ মন মুগ্ধ না হয়ে পারে না। বহু বিদগ্ধ ব্যক্তি ও গুণীজন সেই সব দর্শকদের ব্যবহারে বেশ ক্ষুন্ন হয়েছিলেন। বিজলী-পত্রিকা ক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছিলেন—"......বিশেষতঃ যখন দর্শকদের মনোভাব বুঝে শরৎবাবু আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনি খুব শীঘ্রই তাঁর বক্তব্য শেষ করবেন। কোনো মানীর অসম্মান করে তাঁকে খাটো করা যায় না, নিজেদেরই খাটো হতে হয়, এই সাদা সত্য কথাটা যেন আমাদের দেশবাসী না ভোলেন।" আমার কিন্তু আজও কানে বাজে তাঁর সেই কণ্ঠস্বর, তাঁর সেই সুললিত ভাষা যেন আজও ধ্বনি তোলে স্মৃতির নিভৃত প্রকোষ্ঠে। আজকাল নানান যায়গায় কথাপ্রসঙ্গে শুনতে পাই, শরৎচন্দ্র নাকি ভালো বক্তৃতা দিতে পারতেন না। কথাটা কানে আসে আর মনে মনে হাসি, আমার সেদিনকার সেই স্মৃতি যে কখনই মুছে যাবার কথা নয়!

এই 'ইরাণের রাণী' ৫২ রজনী একাদিক্রমে অভিনয় করে শেষ করে দেওয়া হলো ছাব্বিশে নভেম্বর। অবশ্য, কিছুদিন কেটে যাবার পর, আবার এ বইকে মাঝে মাঝে দিতে হতো, বইটি সত্যিই জনপ্রিয় হয়েছিল। বইটি তখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, বড়দিনে অনেক নতুন বই দিতে হবে বলে। বড়দিনের প্রোগ্রাম বিজ্ঞাপন দিয়ে জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া হলো আঠাশে নভেম্বর। নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা—রূপকুমারী। ভূপেন্দ্রবাবুর লেখা—বাঙ্গিনী। ক্ষীরোদপ্রসাদের—গোলকুণ্ডা। শরৎচন্দ্রের পল্লী-সমাজ। আরও দুজন সুদক্ষ শিল্পীও এসে যোগদান করলেন এবার। এঁদের একজন হচ্ছেন প্রাচীন স্টারের প্রসিদ্ধ সংগীতবিদ কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, আর দ্বিতীয়জন হচ্ছেন প্রাচীনা অভিনেত্রী—কুমুদিনী। কতকগুলি বিশেষ চরিত্রের অভিনেত্রী হিসাবে কুমুদিনী সুবিখ্যাতা ছিলেন। যেমন, 'প্রফুল্ল'-র জগমণি, এঁর মতো 'জগমণি' আমরা আর কখনো দেখিনি। খাসদখলে আহ্লাদী ঝি-য়ের ভূমিকাতেও ইনি ছিলেন অতুলনীয়া।

পরের বুধবার, অর্থাৎ, ৩রা ডিসেম্বর—'রূপকুমারী' খুলে গেলো। রূপকথার আকারে এটি একটি ব্যাটায়ার। তখন থিয়েটারের সমালোচনা করবার জন্য ভুঁইফোঁড় কতগুলি পত্রিকা গজিয়ে উঠত, কোনটার আয়ু ছিল একটি সংখ্যা, কতগুলি দু'চার মাস পর্যন্ত চ'লে, ধূপের ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে যেতো। ঐ সব ভুঁইফোঁড় পত্রিকাগুলিকে কটাক্ষ করেই লেখা হয়েছিল এই ব্যঙ্গ নাটিকা। এর মধ্যে মেয়েদের অংশই ছিল বেশী। কলাবতী সেজেছিল নীহার, রূপকুমারী—নিভাননী। ফিরিওয়ালা ও ফিরিওয়ালী সেজে রাধাচরণ ও ফিরোজাবালা (নেনী) গাইতো ডুয়েট গান এবং সেই সব গানের মধ্যেই ছিল সেই সব ব্যঙ্গোক্তি।

'রূপকুমারী' ছোট্ট বই, তাই এর সঙ্গে ছিল অমৃতলাল বসুর "খাসদখল"। আগে "খাসদখল" স্টারেই অভিনীত হয়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল ১৯১২ সালে। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'মোহিত', কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, 'ঠাকুরদা, আমাদের কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'মাইতি' খুব ভালো হতো বলে শুনেছি। আর ভালো হতো নাকি সুশীলাবালার "গিরিবালা"। আমাদের স্টারে এইবার যে খাসদখল খোলা হলো তাতে মোহিত সাজলে—নির্মলেন্দু, মাইতি—ঐ কাশীনাথবাবুই। ঠাকুর্দা—তিনকড়িদা এবং নিতাই—নরেশবাবু। গিরিবালা—আশ্চর্যময়ী। ("ওগো তোমরা বলো না গো ভাতার কেমন মিষ্টি—গিরিবালা-রূপিণী এই আশ্চর্যময়ীরই আশ্চর্য গান। তবে, পুরানো দিনে সুশীলবালাও গানটি খুব ভালো গাইতেন বলে শোনা যায়)। মোক্ষদা সাজল নীহারবালা, আহ্লাদী—কুমুদিনী, আর লোকনাথ—সাজলেন—বহু দিন পরে হেমেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, যিনি ছিলেন আমাদের 'কর্ণার্জুন'-এর যুধিষ্ঠির।

এর পরে, ৫ই ডিসেম্বর খুললেন—অপেরাজাতীয় নাটক—ঋষ্যশৃঙ্গ। এ বইটি অমৃতলাল বসুর আমলে স্টারে অভিনীত হতো, রাজকৃষ্ণ রায় মশাইয়ের লেখা।

আমাদের সময়ে, ঋষ্যশৃংগ সাজলে—নীহার নর্মসখা—কাশীবাবু। 'ঋষ্যশৃংগ'-এর সংগে কর্তৃপক্ষ জুড়ে দিলেন, গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমংগল।' নাম-ভূমিকায় অবতরণ করলে নির্মলেন্দু, ভিক্ষু—তিনকড়িদা, সাধক—অপরেশবাবু, পাগলিনী—আশ্চর্যময়ী, চিংতা—রাণী সুন্দরী ইত্যাদি। এই বিল্বমংগলের অভিনয়ের খুবই সুখ্যাতি হয়েছিল।

এর পরের ঘটনা হচ্ছে নাট্যমন্দিরের 'পাষাণী' অভিনয়। ১০ই ডিসেম্বর বইটি খোলা হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক, ১৯০০ সালে প্রকাশিত। এটি আগে কেউ অভিনয় করেনি, চব্বিশ বছর পরে এই বইটি ধরলেন শিশিরবাবু। এতে দুটি বিপরীত ভাবের ভূমিকায়—ইন্দ্র ও গৌতম—নামলেন—শিশিরবাবু। অভিনয় যাই হোক না কেন, নাটক নিয়ে এমন এক প্রবল ঝড় উঠল যে বলার নয়। এবং এই ঝড়ে, অভিনয়ের সৌকুমার্য, প্রয়োজনার অভিনবত্ব, সব একবারে যেন ভেসে গেল! নাটক নিয়ে এত তর্ক-বিতর্ক হতে লাগল পত্র-পত্রিকায়, যে, সে-ও এক ইতিহাস হয়ে রয়েছে। বইটি ১৯১০ সালে যখন প্রকাশিত হয়, তখনও হয়েছিল প্রচণ্ড বিরূপ সমালোচনা। তার প্রত্যুত্তরে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর "মন্দ্র" কাব্যের ভূমিকায় লিখেছিলেন ("মন্দ্র"-র প্রকাশকাল ১৯০২ সাল) "বাল্মীকির অহল্যা শব্দে ইন্দ্রকে ইন্দ্র বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে; দেবরাজ কিরূপ, জানিবার জন্য কৌতূহল পরবশ হইয়া ("দেবরাজ কুতূহলাৎ") কামরতা হইয়াছিলেন।" শিশিরবাবু অভিনীত "পাষাণী" নিয়ে যখন বাগ্‌-বিতণ্ডার সীমা পরিসীমা নেই, তখন নব্য সম্প্রদায়ের কাগজগুলি দ্বিজেন্দ্রলালের ঐ উদ্ধৃতিকে অবলম্বন করে গড়ে তুলেছিলেন তাঁদের সপক্ষ যুক্তিজাল। কিন্তু মনে রাখতে হবে ১৯২৪ সালের বাংলাদেশের সমাজ ও পারিপার্শ্বিকের কথা। দর্শকসাধারণকে প্রভাবান্বিত করতে পারেনি সেই সব যুক্তি। "পাষাণী"-র ২য় অংক ৪র্থ দৃশ্য—অহল্যা যেখানে ইন্দ্রের সংগে চলে যেতে চাইছে কোনো নিরালয় দ্বীপে কিম্বা পর্বতশৃংগে, কারণ, যদিও মহর্ষি গৌতম নেই আশ্রমে, কিন্তু শিষ্যবর্গ আছে ত? তাতে অবাধ মিলনে বাধা সৃষ্টি হচ্ছিল। অহল্যা বললেন—চল যাই। ইন্দ্র বললেন—চলো।

ও'রা দুজন যখন চলে যাচ্ছেন, তখন অহল্যার পুত্র শতানন্দ ঘুম থেকে জেগে উঠল 'মা-মা' বলে। ইন্দ্র বালককে ধমক দিলেন। কিন্তু শতানন্দ তাতে নিবৃত্ত হলো না। সে বলতে লাগল—"মা, তুমি কোথায় যাচ্ছ, সংগে ও কে?"

ইন্দ্র এতে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, চঞ্চল হয়ে উঠলেন। যাবার সময় ছেলেটা আচ্ছা জ্বালাতনে ফেললে ত? অহল্যা বললেন—কী করব? ইন্দ্র বললেন— "ওর কণ্ঠরোধ করো।" বালক তখন ক্ষুধার্ত, মায়ের কাছে খেতে চাইছে। তার উত্তরে অহল্যা "তবে দিতেছি মিটায়ে চির জীবনের ক্ষুধা" বলে এগিয়ে গিয়ে শিশুর কণ্ঠরোধ করলে। ইন্দ্র বললেন—"স্তব্ধ হইয়াছে পাপাত্মা জন্মের তরে। শীঘ্র চলে এসো।"

বলে, ও'রা দুজন পলায়ন করলেন।

আরও একটি যায়গা আছে। তৃতীয় অংকের ৫ম দৃশ্য। যখন ইন্দ্র ভোগতৃষ্ণা মিটিয়ে অহল্যাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তখন অহল্যা ক্ষিপ্ত হয়ে বলছেন—"নির্মম লম্পট! যাবে? এই যাও। স্বর্গপতি —যাও, কিন্তু নহে স্বর্গে ফিরি।

[কটিদেশ হইতে ছুরিকা লইয়া ইন্দ্রের স্কন্ধে আমূল আরোপণ]"

সত্যি কথা বলতে কী, এই সব দৃশ্য দর্শক সহ্য করতে পারলেন না। ইংরেজী দৈনিক, বাংলা দৈনিক এবং অন্য সব পত্র-পত্রিকা প্রবল আপত্তি জানালেন। সাধারণ বাঙালী কৃত্তিবাসী রামায়ণের সংগেই ঘনিষ্ঠ ছিলেন বেশী। তাতে আছে, ইন্দ্র গৌতমের ছদ্মবেশে অহল্যাকে ছলনা করেছিলেন। এর পর, গৌতম যখন ফিরে এলেন আশ্রমে, তখন কথোপকথনের মধ্য দিয়ে অহল্যা জানতে পারলেন, কী সর্বনাশ ঘটে গেছে! গৌতমও জানতে পারলেন ইন্দ্রের কথা। এবং তখনই দিলেন তিনি অভিশাপ। কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়ে পড়ে বাঙালীর ছিল ঐ ধারণা। দ্বিজেন্দ্রলালের 'পাষাণী' বাঙালীর এই [illegible] করল কুঠারাঘাত। বাল্মীকি-[illegible] "অহল্যার" দেবরাজ কুতূহলাৎ [illegible]

১৯৬০-৬১ সালে আপনার ভাগ্যে কি আছে?

আপনি যদি ১৯৬০-৬১ সালে আপনার ভাগ্যে কি ঘটিবে তাহা পূর্বাহ্নে জানিতে চান, তবে একটি পোষ্টকার্ডে আপনার নাম ও ঠিকানা এবং কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া পাঠাইয়া দিন। আমরা জ্যোতিষবিদ্যার প্রভাবে আপনার বার মাসের ভবিষ্যৎ লাভ-লোকসান, কি উপায়ে রোজগার হইবে, কবে চাকুরী পাইবেন, উন্নতি, স্ত্রী পুত্রের সুখ-স্বাস্থ্য, রোগ, বিদেশে ভ্রমণ, মোকদ্দমা এবং পরীক্ষায় সাফল্য, জায়গা জমি, ধন-দৌলত, লটারী ও অজ্ঞাত কারণে ধনপ্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয়ের বর্ষফল তৈয়ারী করিয়া ১৷৹ টাকার জন্য ভি-পি যোগে পাঠাইয়া দিব। ডাক খরচ স্বতন্ত্র। দুষ্ট গ্রহের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উপায় বলিয়া দিব। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা জ্যোতিষবিদ্যায় কিরূপ অভিজ্ঞ। মিথ্যা প্রমাণিত হইলে আমরা মূল্য ফেরৎ দিবার গ্যারাণ্টি দিই। পণ্ডিত দেবদত্ত শাস্ত্রী, রাজ জ্যোতিষী। (DC-3) জলন্ধর সিটি।

Pt. Dev Dutt Shastri, Raj Jyotishi, (DC-3)
Jullundur City.

সাধারণ বাঙালী তার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, সাধারণ বাঙালী বরাবর অনুসরণ করে আসছেন কৃত্তিবাসকে। এমন কী, বাঙালী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের অনেকেই মূল রামায়ণের উপর ঘটনাকে ততটা আমলে আনতেন না। প্রমথনাথ তর্কভূষণ মশাই কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভূমিকা লিখছেন সেই ভূমিকাটি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মত হচ্ছে, বাঙালী কবি কৃত্তিবাস বাঙালীর মনের মতো করে মূল রামায়ণ থেকে ভিন্নতর করে লিখে গেছেন তাঁর রামায়ণ। তর্কভূষণ মশাই লিখছেন—কৃত্তিবাসী রামায়ণ হচ্ছে "প্রাচীন বঙ্গীয় হিন্দু জীবনের আদর্শ।" তর্কভূষণ মশাই আরও বলেছেন, "খাঁটি বাঙালী সমাজের ছায়া।"

"পাষাণী" নাটকের সমালোচনার আরও একটা দিক ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল যদি বারাঙ্গনা-জীবন, তার বীভৎসতা এবং তার কুফল-প্রদর্শনই করে থাকেন, ও সমালোচক বলছেন, সেটা তিনি আরও বলিষ্ঠভাবে সামাজিক পটভূমিকায় লিখলেন না কেন? পৌরাণিক পরিবেশে এটা করাতেই তাঁদের যতো আপত্তি। মনে রাখতে হবে, সেটা চব্বিশ সালের বাংলাদেশ, একবারে আধুনিক যুগ নয়। তখনও সাধারণ গৃহস্থ-জীবনে রামায়ণের পঠন-পাঠন হয়, তখনো ধর্মপ্রাণ হিন্দু নরনারী দেশে কম নেই!

যাই হোক, এই সব তর্কাতর্কি শেষ পর্যন্ত এতদূর গড়ালো যে, দার্জিলিঙে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কানে গিয়েও পৌঁছেছিল। তিনি তখন অসুস্থ শরীরকে সুস্থ করবার জন্য দার্জিলিং-এ ছিলেন। স্বরাজ্য পার্টির কোনো কাজকর্মের ব্যাপারে সেখান থেকে তিনি ডেকে পাঠান ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে। 'ফরোয়ার্ড' ছিল দেশবন্ধু বা স্বরাজ্য পার্টির কাগজ, ঐ কাগজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন হেমেন্দ্রবাবু। তিনি হেমেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন:— "তুমি নাকি ফরোয়ার্ডে ভাদুড়ীর থিয়েটারের বিরুদ্ধে লিখছো?" (এটি ২৫ সালের ১৩ই জুন তারিখের ঘটনা।) হেমেন্দ্রবাবুর "দেশবন্ধু-স্মৃতি"তে ঘটনাটির উল্লেখ আছে। তিনি লিখছেন—"আমার মনে হইল নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তি সমস্ত সত্য প্রকাশ না করিয়া আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছে। আমি উত্তর করিলাম —শিশিরবাবুর অভিনয়-কুশলতার আমি প্রশংসা করিতাম, আমার লিখিতেও করিয়াছি, কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণকন্যা অহল্যাকে রঙ্গমঞ্চে বারাঙ্গনা সাজাইয়া অভিনয় করিবার আমি ভয়ানক বিরোধী ছিলাম।......তিনি ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বলেন,—হাঁ, ইহাতে তোমার কোন অন্যায় হয় নাই। হিন্দুর আরাধ্য দেবীকে হেয় করিতে কাহারও অধিকার নাই, কিন্তু ওরা ত আমাকে এরূপ বুঝায় নাই। তারপরে থিয়েটার সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। তিনি বলিলেন,—থিয়েটার আর্ট আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যদি ধর্ম ও জাতীয়তা প্রচারে সহায়তা করে, তবেই ন্যাশানাল থিয়েটারের উদ্দেশ্য সাধিত হয়।"

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, এর বছর চার পাঁচ আগে এই বিষয়বস্তু নিয়েই অবৈতনিক নাট্যসমাজ গীতাভিনয় করেছিলেন। সে নাটকখানির নাম—"আদর্শ ব্রাহ্মণ"। বইটি আমার কাছে আছে। তাতে দেখছি লেখক হিসাবে নাম রয়েছে "শ্রীশ্রীভগবদ্ বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মণ কৃত।" এটি অহল্যার কাহিনী হলেও এতে কৃত্তিবাসী ভাবধারারই অনুসরণ ছিল। এ নাটক কিন্তু তখন সুখ্যাতি অর্জন করেছিল।

শিশিরবাবু অভিনীত "পাষাণী" সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত "নবযুগ" লিখলে ২৪শে জানুয়ারী '২৫ সালে,—"এক শ্বেতাঙ্গ লরেন্স ফস্টার চরিত্র আছে বলিয়া পুলিসের হুমকিতে 'চন্দ্রশেখর' অভিনয় বন্ধ হইতে পারে, মুসলমানদের আপত্তিতে আওরঙ্গজেব চরিত্রের জন্য 'রাজসিংহ' অভিনয় বন্ধ হইতে পারে, 'মহম্মদ' নাটকের অভিনয় আরম্ভ না হইতেই তাহা বন্ধ হইতে পারে, 'সৎনাম' অভিনয় বন্ধ হইতে পারে, শিখদের আপত্তিতে 'গুরুগোবিন্দ' অভিনয় বন্ধ হইতে পারে, হিন্দুদের আপত্তিতে 'পাষাণী' অভিনয় বন্ধ হইতে পারে না?"

যাইহোক, আমি বলব, শিশিরবাবুর এটা একটা 'এক্সপেরিমেন্ট'। অভিনয়ে শিশিরবাবু উভয় ভূমিকাতেই সুন্দর অভিনয় করেছিলেন, একই নাটকে দুটি বিপরীত-ধর্মী ভাবের সুষ্ঠু চরিত্রাভিনয়, শিল্পীর পক্ষে নিঃসন্দেহে শক্তির পরিচায়ক। চিরঞ্জীব-রূপিণী মনোরঞ্জনবাবুও খুব ভালো করেছিলেন। আমি অবশ্য ও'র পাষাণী দেখিনি, 'দেখব-দেখব করছি, এমন সময় শুনলাম, 'পাষাণী' শিশিরবাবু বন্ধ করে দিয়েছেন। আমরা তখন আমাদের "বন্দিনী" নিয়ে মেতে আছি। অপরেশবাবুর নাটক। ভার্দি বলে এক সঙ্গীত-রচয়িতার অপেরা—ইটালিয়ান অপেরা—মিশরীয় পটভূমিকায় উপস্থাপিত একটি অপেরা-নাটক, নাম—'আইদা', তারই নাট্য-রূপান্তর হচ্ছে 'বন্দিনী।' কাগজে বেরিয়ে গেল—"বন্দিনীর মহলা জোর চলছে, এবার প্রডিউসার অহীন্দ্রকুমার। শুনলুম, তিনি যা নতুন দেখাবেন, তা আজপর্যন্ত বাঙলার কেউ দেখেনি। ভালো কথা!"

দায়িত্বটা আমার উপর অনেকখানি চেপেছিল সত্যি কথা, এবং সেটিই আমার জীবনের প্রথম পেশাদারী নাট্য-প্রয়োগের উদ্যম। কিন্তু, কাগজে ঐ টিপ্পনী বেরুতে, আমি আরও সচেতন হলাম। অর্থাৎ, ডিসেম্বরের গোড়া থেকেই আমার হয়ে গেল যাকে বলে, 'আহার-নিদ্রা বন্ধ।' 'বন্দিনী'তে অভিনয় করতে হবে। সুতরাং, খাটুনি যা পড়ল, তা' সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু 'বন্দিনী' নিয়ে যে অভ্যন্তরীণ নাটক গড়ে উঠবে, কাহিনী বলবার আগে মিনার্ভা-সম্বন্ধে একটা সংবাদ দিয়ে নেই। কথায়-কথায় সে ব্যাপারটা বলা হয়নি। অ্যালফ্রেড-মঞ্চের মিনার্ভা নতুন বই খুললেন ৮ই নভেম্বর '২৪ সালে। নাটকটি দুই অংকের হাস্যরসাত্মক নাটক, ভূপেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা—'জোর বরাত'। এই 'জোর বরাত' মিনার্ভার 'বরাত' খুলে দেয় বলা চলে। নাটকটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। দোলগোবিন্দ সেজেছিলেন মন্মথনাথ পাল (ইন্দুবাবু), আর, ব্যারিস্টার ঘটক সেজেছিলেন—কার্তিকচন্দ্র দে। এ' দুটি ভূমিকা অপূর্ব হয়েছিল। আমোদ-কুমার-রূপী সত্যেন দে মন্দ নয়। কার্তিক-বাবু এই অভিনয়ে খুবই নাম করেছিলেন. যেমন তাঁর মেক-আপ, তেমনি মুখে পূর্ব-বঙ্গীয় ভাষা বলার অপূর্ব ভঙ্গী।

(ক্রমশ)

কে, হোড়ের
কণক
* পাউডার *

"নির্মল"
আয়ুর্ব্বেদীয় দাঁতের মাজন
নিয়মিত ব্যবহারে অম্লজানিত দাঁতের ক্ষয় রোধ করে। দন্ত ও মাড়ি সুদৃঢ় করে। ইহা ব্যবহারে মুখের দুর্গন্ধ বিদূরিত হইয়া শ্বাসপ্রশ্বাস সুরভিত হয়।

আর্য্য ঔষধালয়
কলিকাতা ১৭

প্রচুর ফেনায় চুলের ময়লা কাটিয়ে দেয়
টাটা-র
শ্যাম্পু
আপনার চুল চক্চকে, পরিষ্কার
ও কোমল রাখে...
অবাধ্য চুল বশে আনে!
Shampoo
MADE FROM
PURE COCONUT OIL
[টাটার উৎপাদন]

জনম অবধি

প্রভাত দেবসরকার

সেদিনকার কথা এখনো মনে আছে। তারপর কতদিন হয়ে গেছে, কত কান্ড, কত ভূমিকম্প, কত ঝড়-বৃষ্টি, কত জাহাজ ডুবি, এমন কি, চাঁদে মানুষ পাঠানর চেষ্টাও।

আমার মিস্ দাসকে দেখে এতগুলো কথা মনে পড়ল। হিসেব করে দেখলে সেই তুলনায় মিস্ দাসের বয়সও কম হ'ল না! কিন্তু কি আশ্চর্য, কে বলবে, মিস্ দাসের এতটুকু বয়স বেড়েছে। সেদিন যেমনটি দেখেছিলুম, আজও তেমনটি আছেন—ঘাড়ের ওপর আলগোছা এলো খোঁপাটি, জোর পাওয়ারের সোনার চশমাটি তাল-শাঁসের মত টল টল করছে, হাতের ব্যাগটাও অবিকল সেই।

সেদিন মিস্ দাসের মত সুন্দরী আর একটিও বুঝি আমাদের চোখে পড়েনি। আমরা বিমুগ্ধ, বিমোহিত হয়ে গিয়ে-ছিলুম মিস্ দাসকে দেখে। মাথার চুল থেকে পায়ের নোখ পর্যন্ত এমন নিখুঁত মেয়ে লাখে একটা মেলে কি না [illegible]।

আমরা কিছু জানি না, হঠাৎ একদিন মিস্ দাস এসে আমাদের [illegible] যোগ দিলেন। মুখে হাসি না, রাগ না, গম্ভীর না, কেমন এক [illegible] ভাব যেন সেদিন দেখেছিলুম মিস্ [illegible]।

আমার সামনে [illegible] মিস্ দাস জিজ্ঞেস করেছিলেন, বড়সাহেবের ঘর কোন্‌টা?

সেদিন এমন ঘাবড়ে গিয়েছিলুম কি বলবো, মুখ দিয়ে কোন স্বর আমার বেরোয়নি বেশ কয়েক সেকেন্ড, মাথাটা তুলে সোজা করে চাইত পারিনি কতক্ষণ। অথচ সেই আমার প্রথম মেয়ে দেখা নয়, অনেক দেখেছি, একসঙ্গে কাজ করছি কয়েকজনের সঙ্গে আজ বেশ কয়েক বছর। আর কিছুদিন পরে আমরাই সংখ্যালঘু হয়ে যাব এই অফিসে। কর্তারা যে হারে মেয়ে কেরানী আমদানী করছেন, হিসেবে আর কুলোয় না।

আলোচনাটা আমরা নেপথ্যে করেছিলুম। বড়সাহেব কি করতে চান অফিসটা? কাজ হবে না কচু!...তা হোক, কাজে কিছু উৎসাহ মিলবে......একঘেয়ে গোঁফ-দাড়ি, ধুতি-পাঞ্জাবী ভাল নয়। শাড়ি-বেণীর দরকার আছে! তাছাড়া—

মিস্ দাস কিন্তু সে-সন্দেহের কোন অবকাশ দেননি। এমন কাজের মেয়ে আমাদের অফিসে দুটি ছিল না, ঘাড় গুঁজে সেই যে এসে কাজে বসতেন যার নাম পাঁচটা! কত বলেছি আমরা, মিস্ দাস কর্তব্যে অবিচলিতা! একনিষ্ঠা! টিফিনের সময় আর-মেয়েরা সব দল বেঁধে অফিস কম্পাউন্ডে ঘুরে বেড়াত, কি গাছ-[illegible] নিয়ে মাতত, আমরা দূরে থেকে দেখে কত কৌতুককর মন্তব্য করতুম, ইট-পাথর গাঁথা খাড়াই অফিসটাও বুঝি কিছু বলতে চাইতো সে-সময়!

কোন সময়ই বুঝি মিস্ দাস সিট ছেড়ে উঠতেন না। কি মধু যে উনি ফাইল-পত্তরের মধ্যে পেয়েছিলেন উনিই জানেন! কতদিন দেখেছি আমরা মিস্ দাসকে চুপ করে বসে থাকতে একভাবে। কতদিন আমাদের মনে হয়েছে, মিস্ দাসের সৌন্দর্যের মধ্যে একটা দূরত্ব আছে, যে-দূরত্ব শরতের অজস্র শিউলির সঙ্গে বিরল-দর্শন গোলাপের! সব তাতেই কেমন একটা নির্লিপ্ত ভাব যেন।

আমি জানি আড়ালে বা প্রসঙ্গক্রমে যারাই মিস্ দাসের ব্যক্তিত্বকে নিছক অহংকার বা দেমাক বলে অভিহিত করতো, তারাই আবার সুযোগ পেলেই চুরি করে মিস্ দাসের সৌন্দর্য-সুধা পান করতো। ছোঁক ছোঁক ভাবটা প্রায় আমাদের সবার ছিল মিস্ দাসকে নিয়ে। কে জানে উনি বুঝতেন কিনা, আর সেই জন্যে অমন নির্লিপ্ত থাকতেন কিনা।

ওঁর সহকর্মিণী অন্য মেয়েরা আমাদের দলে যোগ দিয়ে বলতো, রূপের অহংকারে ফেটে পড়ছে, শুধু যদি—

যদিটা মুখে স্পষ্ট করে কেউ আমরা বলতুম না। বড়সাহেবের ঘরে দিনে অন্তত পাঁচবার মিস্ দাসের ডাক পড়ত। আমরা

প্রসূতি ও শিশু

ডাঃ চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

যে-সব প্রসূতিরা গ্রামে বা মফঃস্বল শহরে থাকেন বা যাঁদের পক্ষে ঘন ঘন চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া সম্ভব হয় না, তাঁদের কাছে এই অমূল্য বইখানি গৃহচিকিৎসকের কাজ দেবে। অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ও খুটিনাটি প্রসঙ্গের সরল আলোচনা। ৩৫০ পৃষ্ঠার সচিত্র সংস্করণ। দাম ৬.০০। ভি-পি ডাকে সাড়ে ছয় টাকা মাত্র।

আধুনিক যৌন বিজ্ঞান

ডাঃ হ্যেনা স্টোন ও আব্রাহাম স্টোন

যৌনশাস্ত্র সম্বন্ধীয় বহুলপ্রশংসিত গ্রন্থ। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিতপ্রায়। সচিত্র সংস্করণ। দাম ৬.০০। ভি-পি ডাকে সাড়ে ছয় টাকা মাত্র।

পপুলার বুক ক্লাব

৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলিকাতা-২০

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

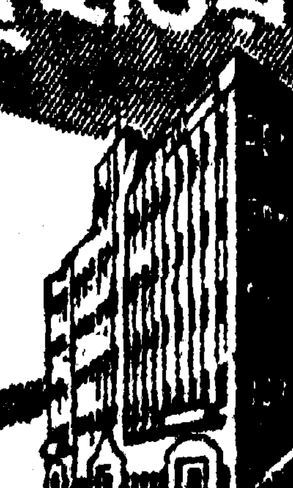

★ আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

★ আকর্ষণীয় হারে ক্যাস সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

★ স্পেশাল সেভিংস ডিপোজিট একাউণ্টে বার্ষিক ২½% হারে সুদ দেওয়া হয়।

হেড অফিস

৪ ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১

হ'লে বা ওঁর সহকর্মিণীরা হ'লে বর্তে যেতুম, অফিসটাকে তুড়ি দিয়ে রাখতুম, কাজের নামে ঘুড়ি চড়াতুম। মিস্ দাসকে কোনদিন প্রসন্নমনে বড়সাহেবের ঘর থেকে ফিরে আসতে দেখিনি, কেমন যেন বিরস-বদন মনে হয়েছে প্রতিবারই।

আমাদের দলের মেয়েরা বলতো, ওসব ঢঙ্! দেখাচ্ছেন সাহেবসুবোকে উনি কেয়ারই করেন না! এদিকে কাজ তো বেশ বাগিয়ে নিচ্ছেন!

মানে, অফিসে ঢুকতে না ঢুকতেই গোটা দুই প্রোমোশন হয়েছিল মিস্ দাসের। অনেকের মন টাটিয়েছিল, চোখ টাটিয়েছিল— ব্যাখ্যাটা ঐ বড়সাহেবের ঘরে ঘন-ঘন সেলাম দেওয়ার মধ্যে নিহিত ছিল। তবু মনে-মনে আমরা মিস্ দাসের কর্মদক্ষতার কথা স্বীকার করতুম। বড়সাহেব একেবারে নাক-কান-কটা নন! হয়তো—

সশব্দে নমস্কার করে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে মিস্ দাস প্রতি-নমস্কার করে মৃদুকণ্ঠে বললেন, ভাল আছেন?

মাথা নেড়ে বললুম, আপনি এখানে?

আমার প্রশ্নটা বোধ হয় ঠিক হয়নি, ভদ্রতার চেয়ে হঠকারিতাই যেন বেশি। মিস্ দাস একটু যেন মুশকিলে পড়েছেন মনে হ'ল। চশমার কোল দুটো জলভরা তালশাঁসের মত টল টল করছে যেন।

নিজেকে সংশোধন করে বললুম, আপনার তো আর দশটা-পাঁচটা নেই!

মিস দাস মাথা নাড়লেন। নেই!

তা হলে এ দুর্ভোগ কেন? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢেউ গোনা!

বললুম, এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে কখনো গাড়িতে উঠতে পারবেন না। চেষ্টা করতে হবে। সারভাইবেল অফ দি ফিটেস্ট!

সামান্য হেসে মিস্ দাস বললেন, আমার তাড়া নেই। ভিড় কমুক, তারপর—

এর পর আমার আর কিছু বলবার থাকে না, মিস্ দাসের পাশে দাঁড়িয়ে গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করাটাও দৃষ্টিকটু, অশোভন।

না, মিস্ দাসই আমাকে বাঁচালেন। বললেন, আপনার তাড়া আছে?

ধন্য হ'য়ে বললুম, না! তাড়া কি!

তবু বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম, ভিড়ের মধ্যে মিস্ দাসের পাশে দাঁড়িয়ে। লক্ষ্য করেছি, ওঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধের আন্দাজ করতে অনেক চক্ষু নিমীলিত এবং বিস্ফারিত হয়েছে, অনেক নিঃশব্দ হাহাকার অনুরণিত হয়েছে।

পড়ন্ত রোদে মিস্ দাসের মুখটি লাল হয়ে উঠেছে, ট্রাম গুমটিতে আলো-ছায়া খেলছে। ভিড়টা যেন দুরন্ত নদীর

আশ্চর্য, আজই যেন চোখে পড়ল সবে ট্রাম টার্মিনাসের এধারে অনেকগুলো গাছে নাম-না-জানা অনেক ফুল ফুটেছে! এত ছবি-ছবি কখনো মনে হয়নি জায়গাটা!

স্বরটা জড়িয়ে গেল, জিজ্ঞেস করলুম, দাঁড়িয়ে থাকবেন? তার চেয়ে—

মিস দাস যেন চমকে উঠলেন, বললেন, না।

আশ্চর্য, ঠিক সেই দিনের মত, যেদিন মিস্ দাস এসে আমাকে বড়সাহেবের ঘরটা কোথায় জানতে চেয়েছিলেন। আমার মুখে কোন কথা সরেনি। তেমনি যেন অপরিচিতা!

আমার এত লজ্জা করছে বলবার নয় অথচ এত আগ্রহ বোধ করছি ওঁর সম্বন্ধে প্রকাশ করতে পারছি না। এত অপ্রস্তুত কেন?

আমার বক্তব্যের সূত্র খেই হারিয়ে ও'র অস্ফুট 'না'র মধ্যে কেমন যেন মাথা কুটতে লাগল। কত ট্রাম তারপর এল, গেল, কত লোক উঠল, নামল। ট্রামের তারে যেন বাঁশি বাজছে মুহুর্মুহু।

শেষে আমাকেই মিস্ দাস চমকে দিলেন। বেশ সহজ করে, স্পষ্ট করে বললেন, চলুন না ততক্ষণ ঐ-ধারটায় গিয়ে খানিক বসা যাক, তারপর ভিড় কমলে—।

কথাটা সম্পূর্ণ না করেই মিস্ দাস এগুলেন।

সত্যিই কাব্য! এবং অবিশ্বাস্য, অভাবনীয় অচিন্ত্য!

বছর দুয়েক বুঝি একসঙ্গে কাজ করেছি মিস্ দাসের সঙ্গে। এমন আন্তরিকতা কোনদিন আমার সঙ্গে মিস্ দাস করেননি —কোনদিন অফিস থেকে বেরিয়ে একসঙ্গে হেঁটে ট্রাম লাইন পর্যন্ত আসবার সৌভাগ্য হয়নি। অনেকদিন নিজের মনে সেকথা হয়তো ভেবেছি। কবুর যে না-হয়নি এমন নয়।

বেশ বোঝা যায়, মিস্ দাস পুরনো সম্পর্কে আগ্রহশীল। আলাপ করতে চান।

আমার অবস্থা বর্ণনাতীত।

কার্জন পার্কের কোণটার এখনো আলো আছে, এখনো অফিস-পাড়া কোটিয়ে দিনের জঞ্জাল সাফ হয়নি, ট্রাম-বাস [illegible] ভ্যান!

অফিসে এককালে মিস্ [illegible] আমার চোখের উপর ছিল। [illegible] একরকম সহ্য হয়ে গিয়েছিল, [illegible] অন্যমনস্ক মিস্ দাসকে দেখে [illegible] মত মনে হয়েছে। আমার [illegible] অন্তরঙ্গতা! [illegible] আশ্চর্য এত মেয়ে [illegible] তো এ-ধারণা হয় না, [illegible] ভাবতে যাঁর না, [illegible] এ-মনোভাব [illegible]

আমাদের অফিস ছেড়ে একদিন চলে এসেছিলেন। হঠাৎ একদিন। সে-সময় ও'র একটা প্রোমোশনের কথাও হচ্ছিল। আর আমাদের সংগে হাটের মধ্যে বসবেন না, বড়সাহেবের পাশের ঘরে ও'র স্থান হবে। কিন্তু তার আগেই রেজিগ্‌নেশন দিয়ে উনি চলে এসেছিলেন। যেমন একদিন চাকরি করতে এসেছিলেন, শান্ত, ধীর, স্থির, না-রাগ না-হাসি, না-গম্ভীর! কেবল সোনার চশমাটা খুলে বার কতক ছোট্ট রুমাল দিয়ে চোখ মুছে ছিলেন। আর সেই দেখেছিলুম। প্রথম দিন, অফিসে হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে ছোট্ট আয়নায় নিজের মুখটা দেখেছিলেন সবার সামনে, শিথিল কবরীটাও যেন হাত দিয়ে ঘাড়ের ওপর ঠিক করে নিয়েছিলেন। আমাদের কারো কথা কানেই তোলেননি বিদায়-আয়োজনের কোন প্রস্তাবে!

আমি ইতস্তত করছিলুম, মিস্ দাস দিব্যি ঘাসের ওপর বসে পড়লেন পা মুড়ে। আমি রুমালখানা পেতে দেবার জন্যে পকেট থেকে বার করেছিলুম। তাতে আমার স্পষ্ট সংকোচ ছিল।

মিস্ দাস বললেন, ঘাস তো ভাল!

আমি বললুম, কত লোক বসেছে তার ঠিক কি!

শুধু ঘাসের ওপর না-বসার যুক্তিটা আমার নিজের কানেই কেমন ছেলেমানুষী মনে হল।

মিস্ দাস কিছু বললেন না।

আমিও আর কিছু বলতে পারছি না, প্রসারিত রুমালখানা গুটিয়ে নিয়ে বার-কতক মুখ মুছলুম, বেশ মনে হল মুখটা লাল হয়ে উঠেছে।

মনে পড়ে না আর কখনো এমনিভাবে একান্তে এসে বসেছি কিনা, আর সংগে কোন মহিলা থাকার কথা তো চিন্তার অগম্য! বেশ অনুভব করছি, আমার শিরার মধ্যে একটা ঝড় বইছে, চোখের তারা দুটো অবিরত নাচছে। ঐ যে অদৃশ্য বায়ুর স্পর্শে কটা ঘাস-ফুলও যেন দুলছে!

অনেকক্ষণ চুপ করে আছি মনে হচ্ছে। মানুষ কথা কইবার এত সুযোগ পেয়ে যে এমনি বোবা হয়ে যেতে পারে, আমার অভিজ্ঞতায় না পড়লে কোনদিন বুঝতে পারবো না। চিত্রার্পিত স্থির যেন আমার চতুর্দিক। এমন মোহগ্রস্ত এসপ্ল্যানেড কোনদিন মনে হয়নি।

কখন আলো নিভল, কখন অন্ধকার হল কিছুই খেয়াল করতে পারিনি। মিস্ দাসের ডাকে যেন সম্বিৎ ফিরল, চলুন, এবার ভিড় কমেছে।

সমস্ত মন হায় হায় করে উঠল। একি করলুম, চুপ করে [illegible] কথার ভার এমন করে [illegible] এই সেই উপযুক্ত স্থান, এই তো সেই উপযুক্ত কাল, এই তো সেই উপযুক্ত পাত্র! কত আদিম, কত অকৃত্রিম! মনের কথা অকপটে বলবার জায়গা এই!

বিষণ্ণ কণ্ঠে বললুম, চলুন!

যখন সহকর্মিণী ছিলেন, তখন আমরা কেউ মিস্ দাসকে বুঝতে পারিনি, আজো বুঝতে পারলুম না। একটু সময় ঘাসের ওপর চুপ করে বসবার জন্যে আমাকে পাশে ডাকবার কি মানে হয়? দুটো কথা স্পষ্ট করে বলতে বা আলাপ করতে কি আপত্তি ছিল? সে-ই যখন পরিচয়ের মর্যাদা দিলেন!

বেশ লাগল পৌরুষকে। অপমান ছাড়া আর কি, এমন ভদ্রতা মানুষের ব্যবহারে কে প্রত্যাশা করে?

এক সময় মনে হল, ও'কে কিছু না বলেই নিজের পথ দেখে নিই। এখন ও'র পিছনে ঘোরাটা নেহাতই কাঙালীপনার মত মনে হবে। এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান আমার থাকা উচিত।

সামনে একটা খালি ট্রাম দেখে মিস্ দাস হাত নেড়ে বললেন, আসুন এটাতে ওঠা যাক।

মনের মধ্যে আমার তখনো খচ্‌খচ্ করছিল। প্রকৃত ক্ষোভের কারণটা অনুধাবন করতে পারছিলুম না। মনে অদ্ভুত একটা বিদ্রোহ ভাব ঘনিয়ে উঠেছে। আমি জানি, আমাদের বিচ্ছেদের পর এর দাহ আমার মনে বহুক্ষণ থাকবে। মিস্ দাসের এ-ব্যবহারের কত মানে করবো। কত কষ্ট পাব তার ঠিক কি!

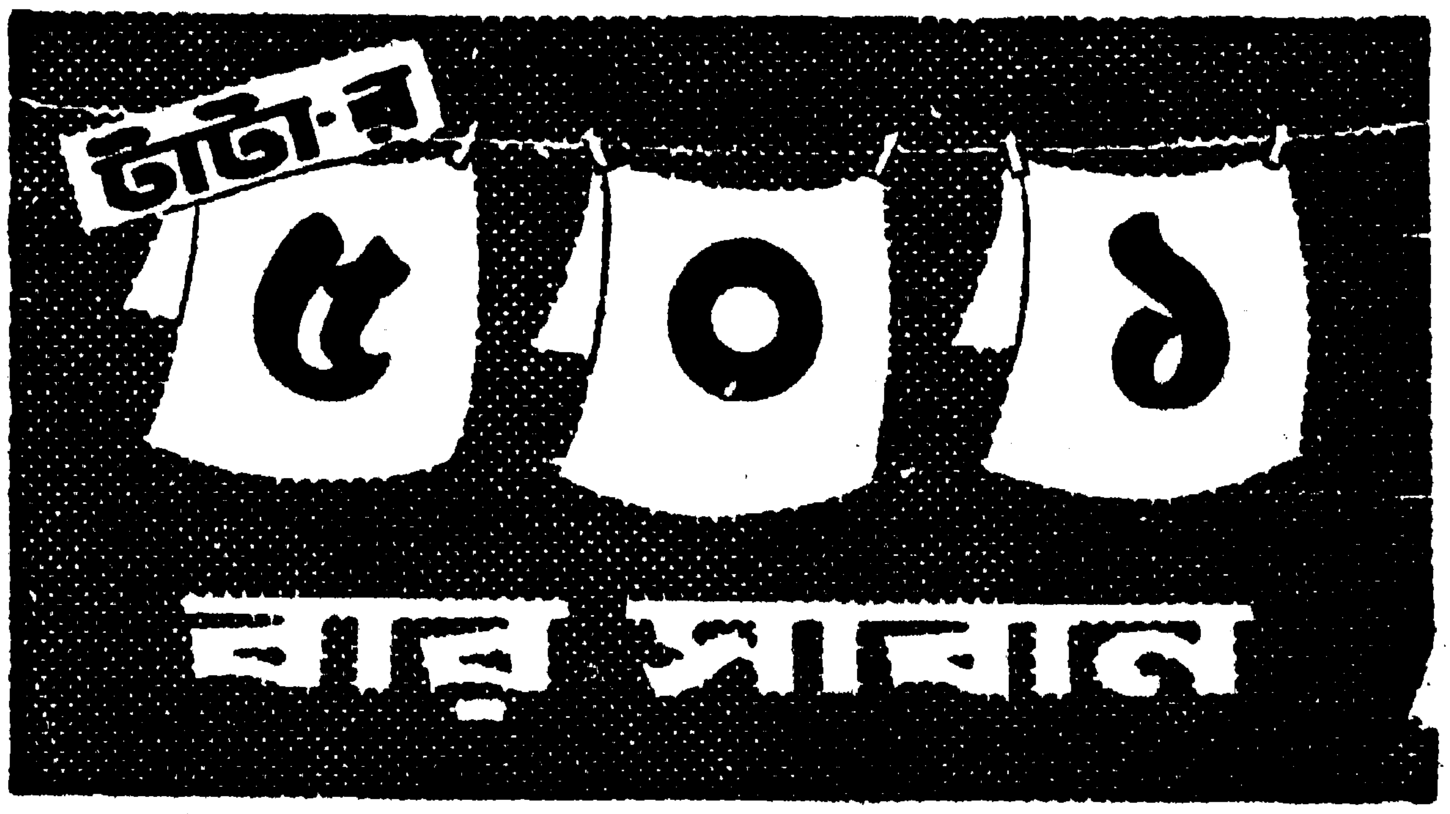

বালক ও বালিকা আবশ্যক

সুবিখ্যাত ডিরেক্টরের পরিচালনায় "যিস দেশ কি ধরতি সোনা হায়" ভারতীয় চিত্রের জন্য। মূল এবং পার্শ্ব চরিত্রের জন্য নূতন অভিনেতা ও অভিনেত্রী চাই। বোম্বাই, দিল্লী, কলিকাতা, মাদ্রাজ, নাগপুর, বাঙ্গালোর, কালিকট প্রভৃতি আরও ২৫টি প্রধান শহরে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা। মনোনয়নের পর দুই বৎসরের কণ্ট্রাক্ট অবশ্যই করিতে হইবে। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার নিষ্প্রয়োজন। বিবরণীর জন্য লিখুন:

SCREEN ART PRODUCTIONS
Film Producers, Amritsar—42

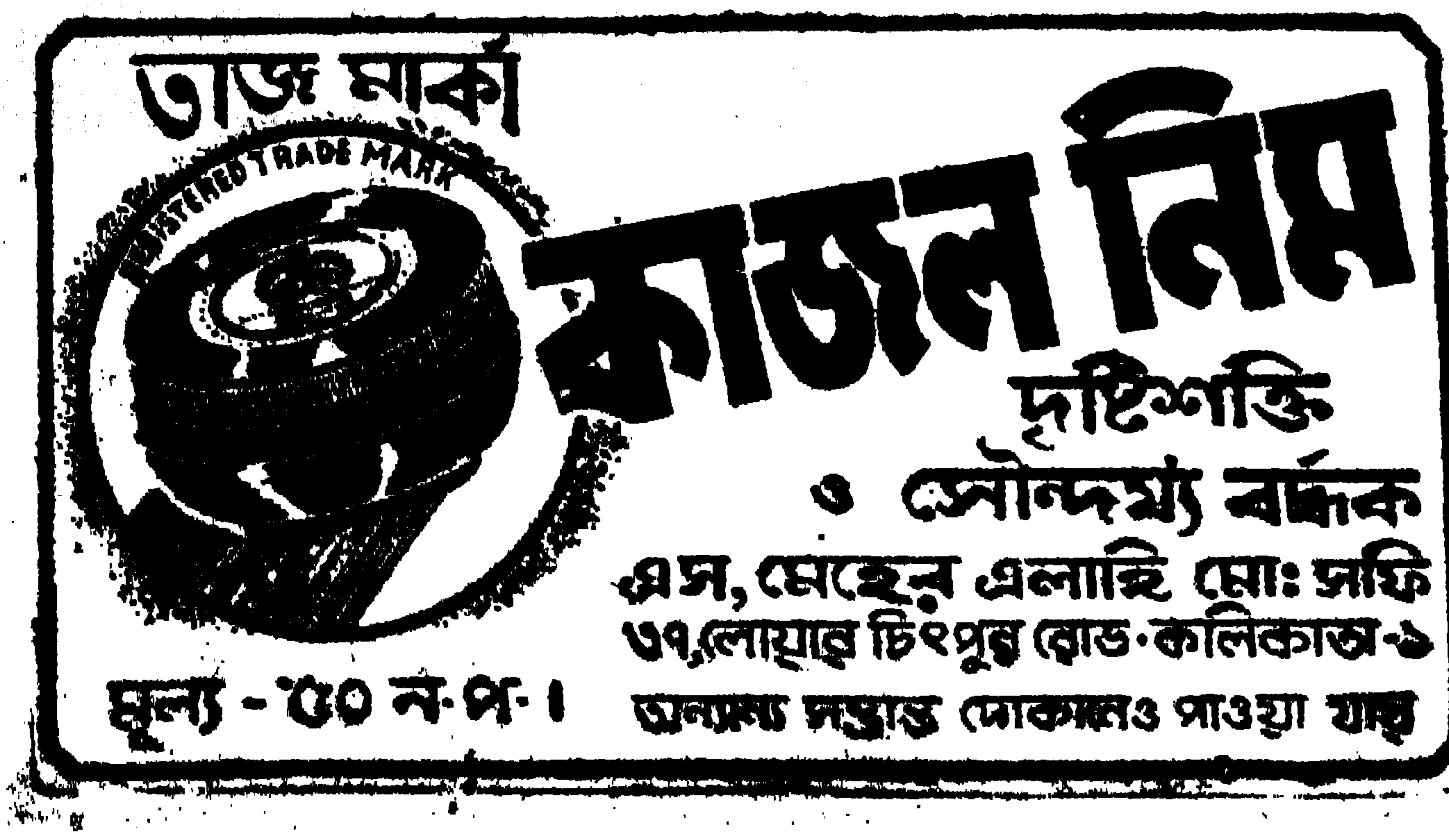

বেশ রূঢ় শোনাল আমার কণ্ঠস্বর, বললুম, আমি যাব অন্য দিকে! আপনি উঠে পড়ুন!

মিস্ দাস যেন বিস্মিত হলেন, হয়তো মনে মনে আমার অহেতুক উষ্মায় কৌতুক বোধ করলেন। বললেন, কেন, ভবানীপুর যাবেন না?

অকারণে একটু যেন পুলক সঞ্চার হল। ক্ষোভের মধ্যে কিছু শান্তি মিলল। মিস্ দাস আমার ঠিকানা জানেন তা হ'লে!

বললুম, হ্যাঁ।

আমিও ঐ ধারে যাব! মিস্ দাস সপ্রতিভ কণ্ঠে বললেন।

তবু খানিক ইতস্তত করে বললুম, আপনি তো আগে, মানে মর্থে থাকতেন—

মিস্ দাস বললেন, আমার বোনের বাড়ি বাগবাজারে।

এখন? ঠিক ঐ কথাটা জিজ্ঞেস করলুম তারপর। মিস্ দাস বললেন, এখন আছি কালীঘাটে।

আমাদের পাড়ায়, অথচ আমি কোন খবর রাখি না! ক্ষোভের কারণ যেন।

বললুম, কোন্‌খানে?

কালীঘাটের ট্রাম তখন গড়ের মাঠের আধখানা পেরিয়ে এসেছে নিঃশব্দে। মিস্ দাস জানালার বাইরে চেয়ে আছেন। আমার কথাটা বোধ হয় কানে গেল না। ও'র বঙ্কিম গ্রীবার মাঝে কেশদামের শিথিলতার সংগোপনে দৃষ্টি প্রসারিত করে যেন কেমন চমকে উঠলুম। মাঠের পুকুরে কত তারারা যেন উলঙ্গ হয়ে অবগাহন করছে। আশ্চর্য চাঞ্চল্য বোধ করলুম চিত্তে। এই নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের স্পর্শ কি, আকাঙ্ক্ষা কি, অভিলাষ কি, অর্থ কি? মনে মনে কি যেন চেয়েছি তার মানে করতে পারছি না।

মুখ ফিরিয়ে মিস্ দাস বললেন, অফিসে আর সবাই কেমন আছে? রজনীবাবু, সুবলবাবু, হরিৎবাবু, অনিলবাবু, ধীরেন-বাবু?

প্রায় সবার কথা মনে রেখেছেন মিস্ দাস। পুরনো সতীর্থ। মিইয়ে বললুম, ভাল।

লক্ষ্য করলুম, মিস্ দাসের মুখে কেমন একটা হাসি যেন ছুঁয়ে আছে।

হঠাৎ হাসিটা যেন প্রদীপ্ত হয়ে উঠল, মিস্ দাস জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের বড় সাহেব কেমন আছেন?

ঠিক যেন আগ্রহ বলা চলে না মিস্ দাসের প্রশ্নকে, কেমন যেন প্রচ্ছন্ন একটা বাগ্‌পোত্তি আছে একদা-বড়সাহেবের সংবাদ নেওয়ায়।

বললুম, কেন, ভালই আছেন।

এবারও মিস্ দাস নিজের মনে হাসলেন। আবার সেই হাসিকে রুমাল দিয়ে মুছলেন। অনেকক্ষণ রুমালটা মুখের কাছে ধরা ছিল।

অফিসের সবাই ভাবতো, বড় সাহেবের বড় প্রিয়পাত্রী ছিলেন মিস্ দাস। আমরাও আন্দাজ করতুম, বোধ হয় কিছু একটা বোঝাপড়া চলছে উভয়ের মধ্যে। অনেক রকমে তার ব্যাখ্যা করতুম নিজেদের মধ্যে। আবোল-তাবোল।

কিন্তু মিস্ দাস আমাদের [illegible] ছিলেন। মাঝখানে দাঁড়ি টেনে [illegible] দিয়েছেন। আমরা একটা [illegible] গিয়েছিলুম। আমাদের [illegible] কারো কাছে পাত্তা পায় না, [illegible] থিয়েটারে পর্যন্ত নেওয়া [illegible] একদিন বলেছিল, মিস্ [illegible] উপলব্ধি করে—যে [illegible] ইত্যাদি।

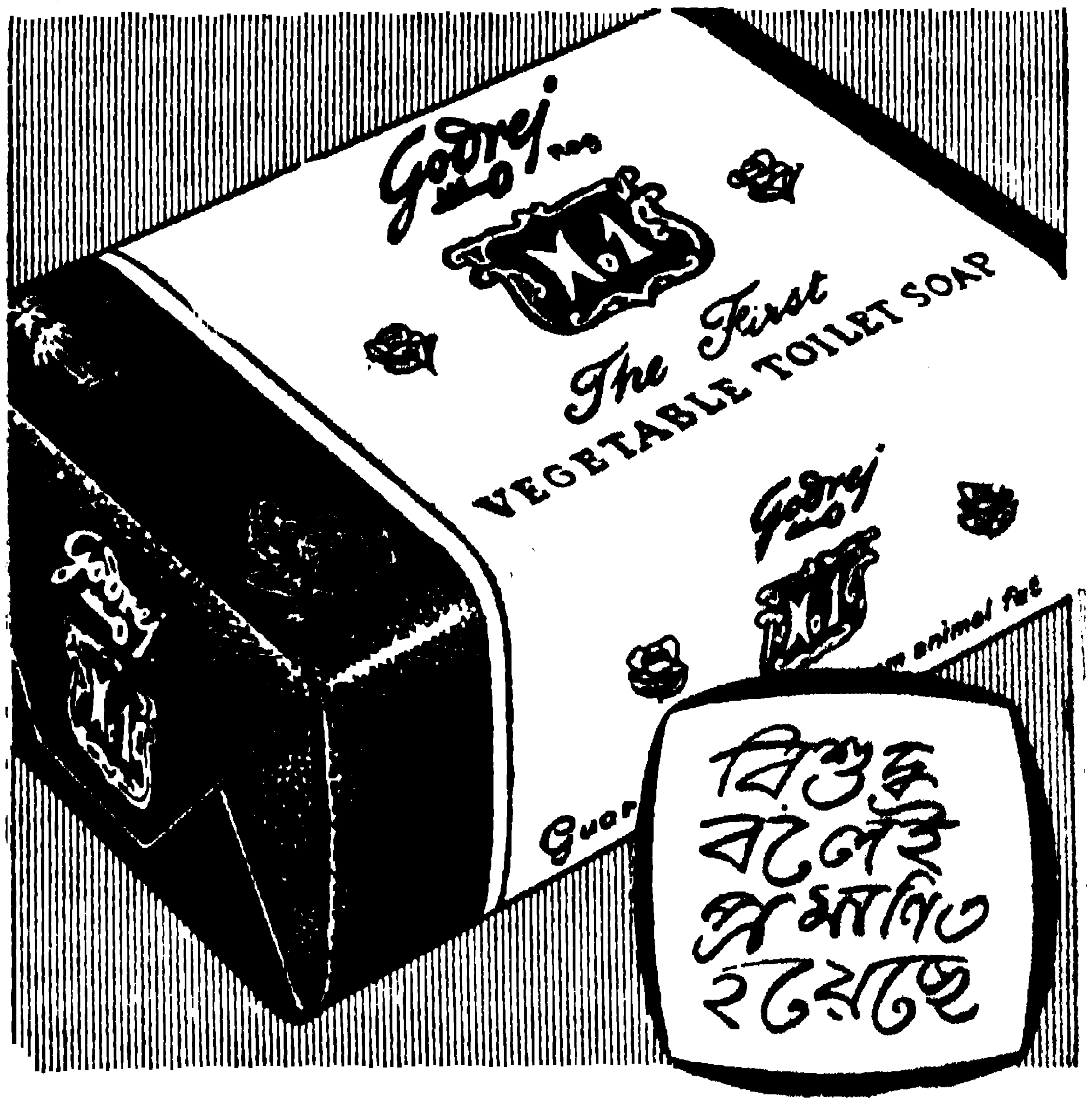

শীতকালে আপনার ফেটে যাওয়া ত্বককে শান্ত করতে সাবানের সেরা (রাজা) বড় সাইজের (রাজা সাইজের) গোদরেজ নং ১ সাবান দিয়ে স্নান করুন। ইহা মেশিনে মোড়া হয়। আর গোলাপ গন্ধযুক্ত তাই এর সৌরভ আপনাকে আনন্দ দেয়।

এ সাবানটিই প্রথম ভেষজ টয়লেট সাবান। সমঝদার ব্যবহার-কারী এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা উপকারী এবং বিশুদ্ধ বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

ভুলবশতঃ কতক সাবান স্বচ্ছ থাকায় বিশুদ্ধ বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু মনে রাখবেন স্বচ্ছ হলেই বিশুদ্ধ এবং ভাল* হবে এমন কোন নজীর নেই।

গোদরেজ নং ১
টয়লেট সাবান

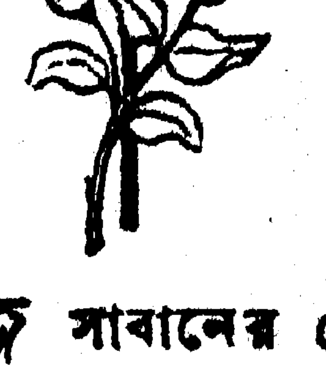

* ইউ. এস. ব্যুরো অব স্ট্যাণ্ডার্ড এর পরিপত্র "সাবান পরখ করার প্রণালী—"

Godrej গোদরেজ সাবানের সেরা নাম

ইঙ্গিতটা আমরা সেদিন সবাই বুঝলেও কথার কথা ভেবে কিছু মনে করিনি। মিস্ দাসের মত মেয়েদের দশটা পাঁচটা সহ্য হবে কেন। তবে আমরা দুঃখিত হয়েছিলুম মিস্ দাস আর পাঁচটি মেয়ের মত মিলে-মিশে থাকতে পারলেন না।

মিস্ দাস মুখের সামনে থেকে রুমাল সরিয়ে বললেন, থিয়েটার-টিয়েটার কেমন হচ্ছে? এবার কি বই করলেন?

কোনকালেই থিয়েটারে আমার আগ্রহ ছিল না, কেবল মিস্ দাস আসার পর যে বই-এর মহলা চলেছিল তাতে নির্বাক দর্শকের ভূমিকা নিয়েছিলুম নিয়মিত। অনেক কারণ ছিল, তার মধ্যে একটি বড়-সাহেবের মন রাখা (তাঁর আগ্রহ যখন অফিসের ছেলে-মেয়ে মিলে অভিনয় করা) এবং সেই সংগে মিস্ দাসের সান্নিধ্য!

কিন্তু সে-অভিনয় শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়ে গিয়েছিল। মিস্ দাস চাকরি ছেড়ে চলে এলেন, বড়সাহেব অফিস শুদ্ধ সবার নামে চার্জ সীট ইস্যু করলেন। সে একটা দিন গেছে বটে! কেউ জানি না, হঠাৎ এতটা উত্তেজনা এবং উষ্মার কারণ কি। যাই হোক, সে-যাত্রা আমরা রক্ষা পেয়েছিলুম সহযোগী অনিলবাবুর তৎপরতায়। তিনি একটি 'সাবস্টিটিউট' যোগাড় করেছিলেন। সেই থেকে মিস্ দাসের পর বাসবী সবার ঈর্ষার পাত্রী। ক'দিন আর চাকরিতে ঢুকেছে মেয়েটি, সবার জুনিয়র!

বললুম, সামাজিক বই একখানা—'নব দিগন্ত'!

মিস্ দাস জিজ্ঞেস করলেন, কে কে অভিনয় করলে? কেমন হ'ল?

বললুম অভিনয়ে কুশীলবদের নাম। শুনে খানিক কি যেন ভাবলেন মিস্ দাস। তারপর একটু প্রগলভ সুরে বললেন, আমার অভিনয় কেমন হচ্ছিল? স্টেজ হ'লে ভাল হ'ত কি বলেন!

আমাকে আর বলবার অবকাশ দিলেন না মিস্ দাস। নিজেই সব বলে দিলেন। মাথা নাড়লুম।

একটু যেন লজ্জিত হয়েছেন প্রগলভতা প্রকাশ করে মিস্ দাস। বললেন, থিয়েটার আমি কোনকালেই করিনি, ও জিনিস আমার আসে না!

একটু চাটুকারের ভঙ্গিতে বললুম, কেন, বেশ তো করছিলেন! শেষ পর্যন্ত কি হত বলা যায় না।

নিজের মনে মিস্ দাস হাসলেন। আত্ম-বিশ্বাস না আত্ম-অবিশ্বাস?

বললুম, খুব চমৎকার 'ভোকিজাজ' ছিল আপনার। বড়সাহেব তো—

কথা শেষ হল না, [illegible] কালো হয়ে গেল মিস্ দাসের। [illegible] না কোনও অসম্মানজনক [illegible] কিনা! বেশ থতমত [illegible]

মিস্ দাস বললেন, এমন জানলে কখনো রাজি হতুম না, অ্যামেচারেও যে এমন হতে পারে ভাবতে পারিনি!

বক্তব্যটা আন্দাজ করতে পারছি না। প্রকারান্তরে মিস্ দাস আমাদের সবাইকে বুঝি দোষারোপ করছেন! জিজ্ঞেস করতে ভয় হচ্ছে বিষয়টা কি। কি ভাবতে পারেননি মিস্ দাস।

জগুবাজার পর্যন্ত তারপর দুজনেই চুপ করে এলুম। শুধু অস্বস্তি নয়, কেমন যেন অপরাধ বোধ মনটাকে বিষণ্ণ করে দিলে। আমি থিয়েটার করি না, অফিস থিয়েটারের সংগে কোনকালেই কোন সংস্রব নেই, বুঝিও না, তবু মিস্ দাসের কথায় ক্ষুণ্ণ না হয়ে পারিনি। নাচতে নেমে যে মেয়ে ঘোমটা দিতে চায় তাদের বোঝাই দায়! মনে মনে রাগ হ'ল!

মিস্ দাস তৎক্ষণে সামলে নিয়েছেন, বেশ সহজ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, তা হ'লে বেশ আছেন বলুন! থিয়েটার, গান বাজনা পুরো দমেই চলছে?

রূপমঞ্জরী শ্রীমনীষা দেবীর উপন্যাসোপম জীবনী অবলম্বনে লেখা যতীশ চট্টোপাধ্যায়ের

মৃত্যুশোক সাধারণ—১, বোর্ড বাঁধাই—১।০

অখিল মানব মনের প্রিয়জন মৃত্যু বেদনার মর্ম-স্পর্শী আলেখ্য। ইণ্ডিয়ান বুক ডিস্ট্রিবিউটিং কোং, ৬৫/২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ—৯ (সি ৪৯২০)

জ্যাক অ্যান্ড জিল, হাম্‌টি ডাম্‌টি, উই উইলি উইংকি, এমনি আরও অনেকগুলি ইংরিজি রাইমস্-এর অনুবাদ—বাংলা ছড়ায়। অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর-এর দীর্ঘ ভূমিকাসহ শ্রীসুকমল দাশগুপ্তের

বিলিতি ছড়া

দাম ১·২৫

দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

"জিজ্ঞাসা"য় খোঁজ করুনঃ

১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভেনিউ, কলিকাতা-২৯

(সি-৮৭০১)

পরলোক-তত্ত্ব গ্রন্থমালা — আবালবৃদ্ধবনিতার পাঠোপযোগী

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের নবতম

এপার ওপার

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও বহু অলৌকিক ঘটনা পড়ুন। ২·২৫

মরণের পরে

পড়ুন—মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র ও দেবকণ্ঠ বাগচীর সম্মুখে ব্রহ্মদৈত্য...মহারাজা নন্দকুমারের স্বর্গীয় পৌত্র কর্তৃক সংগীতে অপূর্ব সুর-সংযোজন, নিশীথ রাত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সুন্দরী তরুণী ছায়া-মূর্তি ধরবার বৃথা চেষ্টা, মহর্ষি বিজয়কৃষ্ণের সমক্ষে মনোরঞ্জন গুহের অপূর্ব অভিজ্ঞতা প্রভৃতি। মূল্য ২·২৫।

ওপারের আলো

পরলোক সম্বন্ধে গ্রন্থকারের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা ও ব্রাহ্মধর্মের বিশিষ্ট প্রচারক ও মিডিয়াম কর্তৃক শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির উপস্থিতিতে সংঘটিত বহু রোমাঞ্চকর ঘটনার বিবরণ পড়ুন। মূল্য ২·২৫

অঘটন যা দেখেছি

লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে লেখা বহু অলৌকিক কাহিনী। মূল্য ২·২৫

আমাদের পাঠকেরা অন্ততঃ ৪খানি বই একসংগে নিলে ডাকব্যয় লাগবে না।

শিশির পাবলিশিং হাউস

২২।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের

ওপারের খবর

পরলোকের বিচিত্র সব কাহিনী। ২·২৫

অমর জীবন

জীবন যে অবিনশ্বর, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ রোমাঞ্চকর ৩১টি কাহিনী। ২·২৫

আলৌকিকী

মানুষের স্থূল-বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না এমনি বহু বৈচিত্র্যময় চমকপ্রদ সত্য কাহিনী। মূল্য ২৷০

ওপার থেকে আসেন

জড়জগতে এসে আত্মিকদের বিচিত্র সব কার্যকলাপ...দেশী ও বিদেশী বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা অজ্ঞাত জগতের বহু তথ্য উদ্ঘাটিত। মূল্য ২·২৫

মৃত্যু-হীন প্রাণ

এই দেহাবসানেই যে মানুষের সব শেষ হয় না, তার বহু বিচিত্র আখ্যান পড়ুন। ২·২৫

ভূতে পাওয়ার কাহিনী

দেশী-বিদেশী অদ্ভুত সব কাহিনী। ২৷০

পরলোকের বিচিত্র কাহিনী

পরলোকের গল্প

গ্রন্থদ্বয়ে বাঙলার বহু বিখ্যাত লোকের বিচিত্র অভিজ্ঞতা জানতে পারবেন। প্রত্যেকটি ২৷০

অন্যায় কিছু না। ও'র ব্যক্তিগত কারণ ছাড়া আর পাঁচজনের 'রিক্রিয়েশন' তো আছে! উনি যদি না পছন্দ করেন তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হবে কেন!

বেশ পরিচ্ছন্ন কণ্ঠে উত্তর দিলুম, এখন আরো জমেছে! মেয়েদের লজ্জা ভেঙেছে। মিস্ সরকার, যিনি কোন অবস্থাতেই দুটো কথা বলতে পারেন না, এইবারের অভিনয়ে তাঁর ধারে-কাছে কেউ ঘেঁসতে পারেনি। বড়সাহেব তাঁকে একটা রিস্টওয়াচ প্রজেণ্ট করেছেন!

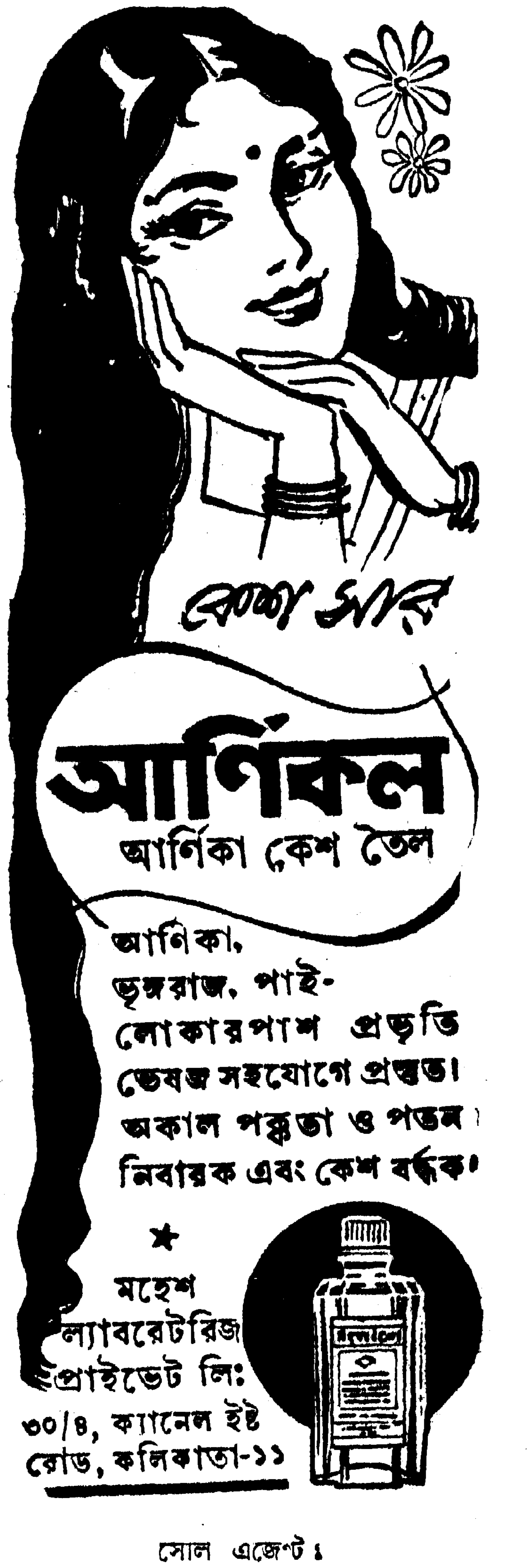

সোল এজেণ্ট ঃ

এম, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং
প্রাইভেট লিঃ,

৫৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

সঙ্গে সঙ্গে মিস্ দাস বললেন, প্রমোশনও?

মিথ্যে বলেননি মিস্ দাস, আমরাও জানি, মনে মনে জ্বলি। তবু মুখে বললুম, তা কেন! সেখানে কাজ করতে হবে।

মিস্ দাস যেন আমাদের একদা সন্দেহের জবাব চাইছেন, শোধও নিচ্ছেন। বললেন, আমি খুব কাজ করতুম, না?

বেশ বিস্মিত হয়ে বললুম, নিশ্চয়ই! অনেককে হার মানিয়েছিলেন, সে কথা সবাই স্বীকার করতো।

মিস দাস কোন উত্তর করলেন না। মুখের নিঃশব্দ হাসিটা বুঝি ঢাকতে চাইলেন রুমালে। আর এই সব যেন আমার খেয়াল হল, মিস্ দাস রুমালে গন্ধসার ব্যবহার করেন না। নাকটা আমার অনেকক্ষণ থেকেই সজাগ হয়ে আছে সেই মাঠ থেকে রোদ মুছে ট্রামের মধ্যে আলো জেবলে। কিন্তু কি গন্ধ চাই মেয়েদের? রূপ কি গন্ধ নয়?

কেমন যেন নির্বোধের মত বলে ফেললুম, আপনার সঙ্গে কারো তুলনাই হয় না!

ঘাড় বেঁকিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে মিস্ দাস হাসলেন। যার অর্থ করতে ভিতরে ভিতরে আমি ঘেমে উঠলুম।

অনেকক্ষণ কথাটা জিজ্ঞেস করবো করবো ভেবেছিলুম, অনেকবার মনে হয়েছে আমার, অন্য কথায় ভুলে গেছি, আশ্চর্য বিভ্রম মনের।

গন্তব্যের কাছাকাছি এসে প্রশ্ন করলুম, উপস্থিত কোথায় আছেন, মানে—

মানেটা মিস্ দাসই করলেন সপ্রতিভ কণ্ঠেঃ একটা প্রসাধন কোম্পানীর ফেরি-ওয়ালা! ডোর-টু-ডোর ক্যানভাসার!

আত্মপ্রসাদে বেশ হাসছেন মিস দাস। যেন একটা মনের মত কাজ পেয়েছেন।

কাঁচুমাচু হয়ে বললুম, খুব কষ্ট তো! পরিশ্রমের ব্যাপার!

একটুও না। মিস দাসের মুখের হাসিতে কেমন একটা মানে যেন অনুসারিত।

মিস্ দাস বললেন, কোম্পানীটা নতুন, একটা পাঞ্জাবীর। সার্ভিস কণ্ডিশান ভাল।

আর কিছু জানবার দরকার নেই। মনটা কেমন বিরূপ হয়ে উঠল। শেষটা এই-ই, বাঙালী মেয়ে হয়ে—কলম পিষতে বড় কষ্ট হচ্ছিল, একটু থিয়েটার করতে যত মান যাচ্ছিল? ছিঃ ছিঃ।

আর যেন চাইতে পারি না মিস্ দাসের মুখের দিকে, দৃষ্টি কেমন ছ্যাঁকা লাগে যেন।

নিজের মনে মিস্ দাস বলতে লাগলেন, বেশ ইণ্টারেস্টিং কাজ! বাড়ি বাড়ি ঘরে ঘরে নিজেকে দেখিয়ে বেড়ান খালি। খুশি মত, মর্জি মত।

দেখাবার মত রূপ বটে, এবং দেখেও সুখ সন্দেহ নেই। বুঝতে পারলুম না মিস্ দাস বিদ্রূপ করছেন কিনা। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র একথার কোন প্রতিবাদ কিনা।

খানিক দুজনেই চুপ করে রইলুম। এতক্ষণ যে-সুরে মন বাজছিল সুরটা কেটে গেল।

খুব সুলভ যেন মনে হ'চ্ছে মিস্ দাসকে। আমার দেহ-মনের অদ্ভুত মৌনতায় নিজেই যেন অবাক হয়ে গেছি। মনের হিরন্ময় রেখা বিলুপ্ত যেন।

মিস্ দাস হঠাৎ হেসে উঠলেন। নিজের মনে বললেন, দেখলুম সব এক। কি বাজে জিনিস যে চালিয়ে দিচ্ছি বলবার নয়। মনে মনে অবাক হয়ে যাই—

একটু হেসে প্রশ্নটা করলেন, আপনাদের অফিসে আমার চাকরি হতে পারে না? আর ভাল লাগে না এই কাজ।

অবাক হয়ে মিস্ দাসের মুখের দিকে চাইলাম। ঘসা কাচের মধ্যে দিয়ে বিজলী আলোর জৌলুস এসে মিস্ দাসের মুখে এমনভাবে লেপ্টে আছে যেন সদ্য পালিশ করা কোন আসবাব। বড় চক্চকে।

মিস্ দাস সাগ্রহে বললেন, সত্যি! নেই আর?

বললুম, বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা করে বলুন না!

তখুনি মুখটা কালো করে পাশ থেকে ভ্যানিটি ব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়ে মিস্ দাস চুপ করে বসে রইলেন।

আবার সেই নির্লিপ্ততা, সুদূর যেন।

আমি ওসব কথা ভাবছি না। মিস্ দাসের মুখচোখের পরিবর্তনও লক্ষ্য করছি না। ভাবছি, নারীরূপের যে আকর্ষণ তার সবটুকু কি প্রত্যক্ষ? আমার মনোগত ভাবটা সৌন্দর্য পিপাসা না, আর কিছু? এমন আচ্ছন্ন হয় কেন মন?

আর মিস্ দাসকে যদি সাথী হিসাবে পাই—

ছি, কি যা তা ভাবছি পাগলের মত! আমার স্টপটা পেরিয়ে এসেছি। কোথায় চলেছি?

ট্রামটা বেরিয়ে গেল চোখের ওপর থেকে—সেই সঙ্গে মিস্ দাসও।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ গন্তব্য ভুলে থ হয়ে রইলুম। তবু মন ভরে না যে।

প্রায় হন্তদন্ত হয়ে উঠে পড়ে মাঝপথে ট্রাম থামাতে বললুম। উত্তেজনায় ঘন ঘন ঘণ্টা বাজালুম। কনডাক্টর ব্যস্ত হয়ে উঠলো। সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

মিস্ দাসও ব্যস্ত হয়েছিলেন। মুখ তুলে স্মিতহাস্যে বললেন, এইখানে নামবেন বুঝি?

হ্যাঁ। প্রায় ঝাঁপ দিয়ে নেমে পড়লুম।

বিশ্বপরিচয়

আমেরিকার বর্তমান লেখকদের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত হলেন আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে এতো খ্যাতি আর কেউ লাভ করতে পারেননি। হেমিংওয়ের সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থগুলি হচ্ছে "দি সান অলসো রাইজেস", "এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস", "ফর হুম দি বেল টোলস" এবং "ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দি সী।" ১৯৫৩ সালে তিনি আমেরিকার সাহিত্য ক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ সম্মান পিউলিটজার পুরস্কার লাভ করেন। পর বৎসরই, ১৯৫৪ সালে তিনি সাহিত্য বিষয়ে জগতের শ্রেষ্ঠ সম্মান নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

হেমিংওয়ে নতুন কি লিখছেন, এইমাত্র খবরটুকুই দেশব্যাপী কৌতূহল সৃষ্টি করে তোলে। দু-যুগ পরে একটি দেশ পুনর্ভ্রমণ করে তাঁর ব্যক্তিগত উত্তেজনাপূর্ণ অভিজ্ঞতা অবলম্বনে সম্প্রতি একখানি উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছেন। হেমিংওয়ের যে-কোন অনুরাগী পাঠকই বলে দিতে পারে, এই দেশটি হচ্ছে স্পেন—তাঁর আগেকার দুখানি উপন্যাস "ফর হুম দি বেল টোলস" এবং "দি সান অলসো রাইজেস"-এর ঘটনাস্থল। স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের পর ওদেশে ভ্রমণ করে আসতে হেমিংওয়েকে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ষণ্ড-যোদ্ধার বিষয়ে সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লেখার জন্য অনুরোধ করা হয়। তিনি রাজী হন, কিন্তু একটি প্রবন্ধ না হয়ে সেটি এক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হয়ে দাঁড়ায়।

"দি ডেঞ্জারাস সামার" নামক এই গ্রন্থখানি স্পেনের দুই মাটাডোরের ঐতিহাসিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিবরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। লুইস মিগুয়েল ডামিনগুইন ও আন্তোনিও ওর্দোনেজ, দুজনেই হেমিংওয়ের ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। উপরন্তু এই গ্রন্থখানিতে একটা দেশের লোক, দ্রষ্টব্য স্থান ও জীবনধারার সহস্র জীবন্ত স্মৃতি তিনি এমনভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন, যা তাঁর মতো সুনিপুণ সাহিত্য-স্রষ্টার দ্বারাই সম্ভব।

আগামী বৎসরে প্রকাশ-নির্ধারিত "দি ডেঞ্জারাস সামার" মূলত হেমিংওয়ের, দুটি প্রিয় বিষয়ের পুনরবতারণা: স্পেন ও ষণ্ডযুদ্ধ। সেই সঙ্গে এতে থাকবে হেমিংওয়ের হিংসা ও মৃত্যু সম্পর্কিত বিশেষ মনোভাব। লেখকের অন্যান্য উপন্যাসের মতো এতেও থাকবে এমন এক নায়ক যে, অপরাজেয় প্রাকৃতিক শক্তির কাছে পরাভূত হলেও সম্মান, সাহস ও সহিষ্ণুতার নীতির প্রতি আসক্ত থেকে যায়।

স্টাইলের দিক থেকে অবশ্য সরল, সংক্ষিপ্ত ও চলতি ভাষাই তিনি ব্যবহার [illegible]

শিশুসুলভ এক কুশলী সরলতা হৃদয়-বিদারক দৃশ্যসমূহে বিশেষ মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে। ফলে, এমন কি, অত্যন্ত নৃশংস ষণ্ডযুদ্ধ এবং তারপর মাটাডোরের

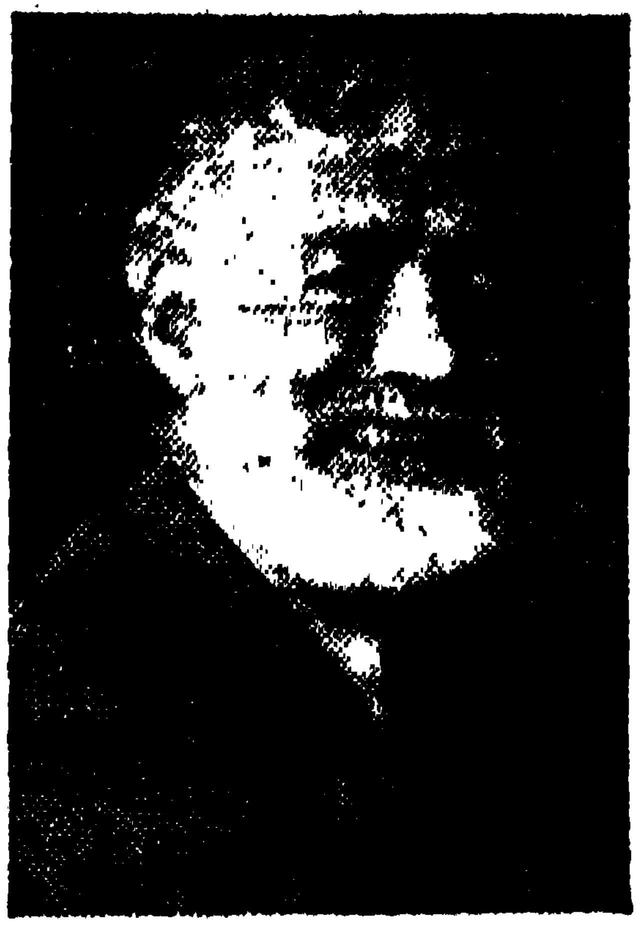

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

হাসপাতালে যাওয়া এমন স্বচ্ছন্দভাবে বর্ণনা করে যান যে, একেবারে শেষ না হওয়া পর্যন্ত পাঠক কোন নিরাসক্তি বোধ করে না।

নিঃসন্দেহে, তাঁর বিবৃতির মাধুর্য অনেকাংশে তাঁর নিজের বর্ণময় ব্যক্তিত্ব এবং জীবনের প্রতি উচ্ছল মনোভাব থেকেই উৎসারিত হয়ে ওঠে। হেমিংওয়েকে সমালোচকরা দীর্ঘকাল ধরেই যে সিরিয়াস শিল্পীর চেয়ে তেজস্বী অ্যাডভেঞ্চারার বলে অভিহিত করে আসছেন, সেটা নেহাৎ অকারণ-নয়। "দি ডেঞ্জারাস সামার" তাই জীবনের একটা ধারা হিসাবে ষণ্ডযুদ্ধের একটা নাটকীয় বিবরণ। কিন্তু মূলগতভাবে এবং এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে সর্বাধিক আবেদন—এটা হচ্ছে, একজন মানুষ ও তার এক পুরাতন বন্ধুর পুনর্মিলনের উপযুক্ত বাক্‌চিত্র।

*

আমাদের দেহযন্ত্র বিকল হলে চিকিৎসকেরা রোগের লক্ষণ মিলিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকেন। যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের সম্পর্কে এক্স-রে'র সাহায্যে আলোকচিত্র গ্রহণ করে রোগের অবস্থা, নিরূপণ করা হয়। এক্স-রের সাহায্যে দেহের অভ্যন্তরের অবস্থা যে কি তার একটা স্থির চিত্র পেতে পারি—কিন্তু দেহযন্ত্রের কাজ কেমন করে হচ্ছে, তার এবং রোগগ্রস্ত অংগ-প্রত্যংগের চলমান ছবি আমরা পাই না। তা দেখবার উপায়ও এতকাল ছিল না। তবে ফ্লোরোস্কোপিক নামে একটি যন্ত্র উদ্‌ভাবিত হয়েছে যার সাহায্যে আমাদের অভ্যন্তরীণ অংগ-প্রত্যংগের কাজ যে কেমন করে চলছে তার ছবি সূচিভেদ্য অন্ধকারে পর্দার উপরে প্রতিফলিত হয়। তবে চোখ তৈরী না থাকলে তা থেকে কিছু বোঝা কঠিন—এক্স-রের আলোকচিত্রের যা নেগেটিভের রেকর্ড থাকে, রোগীর ক্রমোন্নতি পরপর গৃহীত আলোকচিত্রে ধরা পড়ে। কিন্তু ফ্লোরোস্কোপিক যন্ত্রের

প্রথিতযশা

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কাশ্মীর

"তথ্যানুসন্ধানী মন নিয়ে লেখক কাশ্মীরকে দেখেছেন তার ঐতিহাসিক পটভূমিকায়। ফলত কাশ্মীরের বিভিন্ন বর্ণনার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে সে দেশের একটি সামগ্রিক চিত্র। সাধারণ ভ্রমণ বিলাসীর সঙ্গে এখানেই পার্থক্য শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। —আনন্দবাজার

"—৬৯খানি ছবি সম্বলিত। নিত্যনারায়ণবাবু ইতিপূর্বে অনেক ভ্রমণ করেছেন এবং অনেক বই লিখেছেন; সুতরাং এঁর লেখা ভ্রমণ কাহিনী রসপূর্ণ ও সুখপাঠ্য হবে এ ত' জানা কথা। মনে হয় আমাদেরও তিনি সঙ্গে নিয়ে চলেছেন ভূস্বর্গ কাশ্মীর দেখাতে। বর্ণনা বিদগ্ধও বটে।......মূল্য ৪·৫০। —দেশ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। কলি-৬

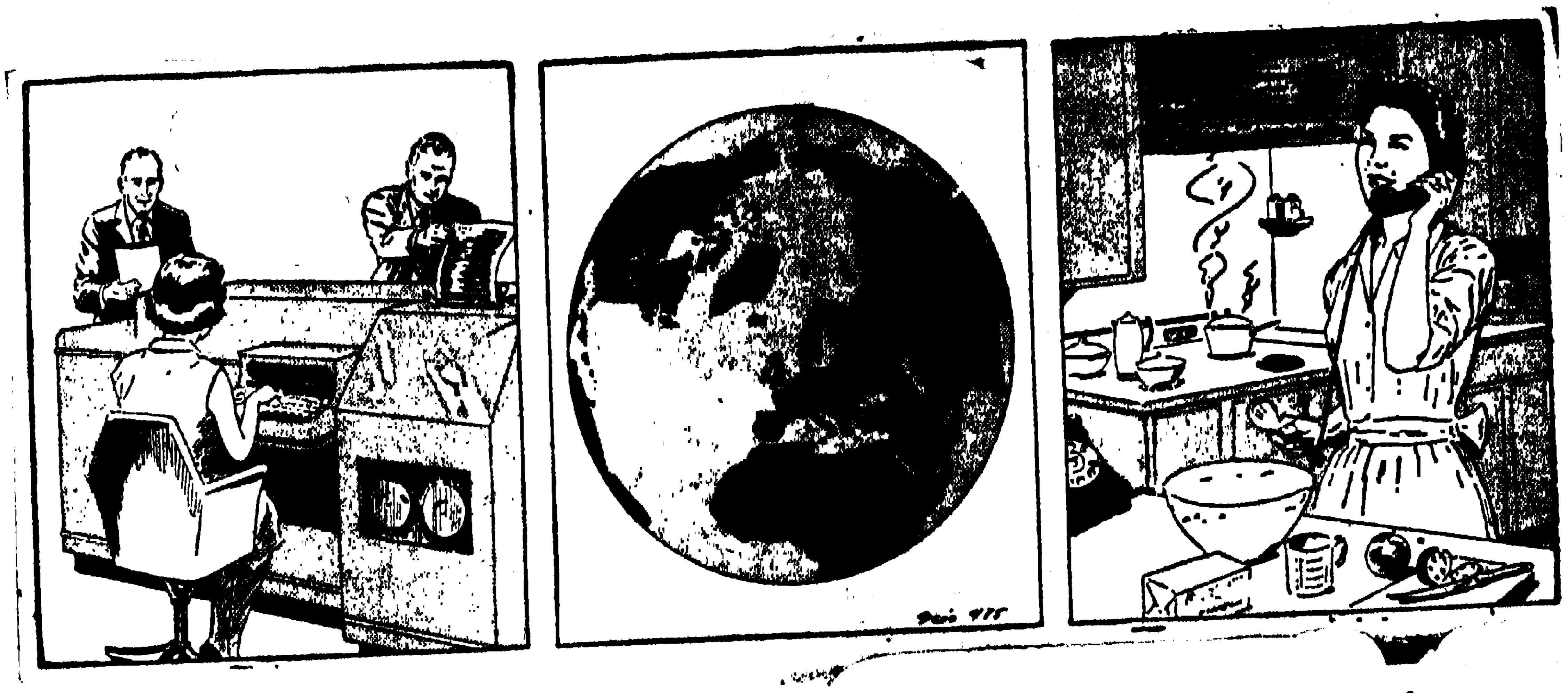

১ ২ ৩

১। যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিকরা একটি ইলেকট্রনিক অনুবাদ-যন্ত্রের উদ্ভাবন করেছেন যা প্রতি সেকেণ্ডে পঁয়ত্রিশটি শব্দ রূপ (যা যে কোন ভাষা থেকে) ইংরাজিতে অনুবাদ করে দিতে পারে। কোন বিদেশী ভাষা সম্পর্কে সামান্যতমও জ্ঞান নেই এমন ব্যক্তিও এই যন্ত্রটি চালনা করতে পারে। ২। সম্রাট অগাস্টাসের মৃত্যুকালে (১৪ খৃষ্টাব্দ) পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল পাঁচ কোটি চল্লিশ লক্ষ। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সারা ইউরোপের জন সংখ্যা বড়জোর পাঁচ কোটি ছিল। বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যা হচ্ছে তিনশো কোটি। ৩। ভিয়েনার টেলিফোন প্রতিষ্ঠান গ্রাহকদের কতকগুলি অসাধারণ সুযোগ দেয়। বাড়ির গৃহিণী ডায়াল ঘুরিয়ে নতুন কোন রন্ধন-প্রণালী জেনে নিতে পারে, তেমনি কোন সংগীতজ্ঞ ডায়াল ঘুরিয়ে তার বেহালার তার বেঁধে নিতেও পারে, আবার স্কুলের ছাত্রছাত্রী বাড়ির পড়াও জেনে নিতে পারে। অন্যান্য সহযোগিতার মধ্যে আছে খেলাধুলার খবর এবং সংগীত উপভোগ।

সাহায্যে আমাদের দেহের অভ্যন্তরের অংগ-প্রত্যংগের অবস্থা জানা গেলেও তাদের কোন রেকর্ড রাখা সম্ভব হয় না।

ডাঃ মরগ্যান নামে জনৈক বিজ্ঞানী সম্প্রতি এই অভাব পূরণ করেছেন। তিনি স্ক্রীন ইনটেনসিফায়ার নামে যে অভিনব যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছেন তাতে টেলিভিশন যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এই প্রতিক্রিয়ায় রোগীকে একটি টেবিলের উপর শুইয়ে রাখা হয় এবং টেবিলের নীচে থেকে এক্স-রে রশ্মি নিক্ষেপ করা হয়। এই রশ্মি তার দেহ ভেদ করে যখন আসে তখন ঐ এক্স-রে যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত টেলিভিশন যন্ত্রটি চালু হয়ে যায়। রোগীর অভ্যন্তরীণ অংগ-প্রত্যংগের সুস্পষ্ট ছবিও টেলিভিশন সেটে ফুটে উঠে।

ডাঃ মরগ্যান দশ বছর হোল এ নিয়ে গবেষণা করছেন। এই নতুন যন্ত্রটির সুবিধা হল যে, ব্যবহারে এক্স-রের নেগেটিভ বা আলোকচিত্রের জন্য অথবা ফ্লোরেস্কোপিক যন্ত্রের জন্য যে পরিমাণ রশ্মির প্রয়োজন হয় সেই পরিমাণ রশ্মির আদৌ প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া সূচীভেদ্য অন্ধকার ঘরেরও কোন প্রয়োজন হয় না বলে রোগীর ভয় পাওয়ার কোন কারণ থাকে না।

আর একটি সুবিধা—টেলিভিশন পর্দায় যে ছবিটি ফুটে উঠে তার চলচ্চিত্র গ্রহণ করে রাখা যেতে পারে—পরে এই রেকর্ডের ভিত্তিতে চিকিৎসকেরাও এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও আলোচনা করতে পারেন।

বর্তমানে রোগ নিদান ও শল্য চিকিৎসায় এই যন্ত্রটি খুবই ব্যবহৃত হচ্ছে।

*

আমেরিকায় পাঁচশ থেকে সাড়ে তিন হাজার টনের মহাশূন্যযানকে মহাশূন্য লোকে প্রেরণের জন্য অতি বৃহৎ রকেট নির্মাণের তোড়জোড় হচ্ছে। তরল নয়, ঘন ইন্ধনের সাহায্যেই এ সকল রকেট চালিত হবে। জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা এই ধরনের রকেটের প্রাথমিক নক্সা তৈরীর ভার তিনটি কোম্পানীর উপর দিয়েছেন।

এ সকল রকেটের ধাক্কার বা থ্রাস্টের পরিমাণ হবে মহাশূন্যযানের যা ওজন তার দু থেকে তিনগুণ। ঘন ইন্ধনের সাহায্যে বর্তমানে যে সকল রকেট চালিত হয়ে থাকে তাদের কোনটিরই ধাক্কার পরিমাণ এতো বেশী নয়। 'স্কাউট' ও 'বুস্টার' নামে যে দু প্রকার রকেট উদ্ভাবিত হয়েছে তাদের কোনটিরই ধাক্কার পরিমাণ ১১৫০০০ পাউণ্ডের বেশী নয়।

গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল রকেট কোম্পানী ৫০০ টনের মহাশূন্য যানের উপযোগী প্রথম পর্যায়ের এক হাজার টন ধাক্কার রকেট নির্মাণের এবং থিয়োকল কেমিক্যাল কোম্পানীর উপর সাড়ে তিন হাজার টনের মহাশূন্যযানের উপযোগী ৭ হাজার থেকে ১১ হাজার টন ধাক্কার রকেট নির্মাণের ভার দেওয়া হয়েছে। এরোজেট জেনারেল কর্পোরেশন উভয় শ্রেণীর মহাশূন্যযানেরই রকেট নির্মান করবেন।

এই তিনটি কোম্পানীকে এ বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নক্সা তৈরী করার জন্য ৬ মাসের সময় দেওয়া হয়েছে। এতে খরচ হবে প্রায় ২২৫০০০ ডলার। তবে জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা 'মার্শাল স্পেস ফ্লাইট সেণ্টারের' উপরই মহাশূন্যযান নির্মাণের সম্পূর্ণ ভার দিয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠানটির সহযোগিতায় ও নির্দেশেই ঐ তিনটি কোম্পানীর কাজকর্ম পরিচালিত হবে। ফ্লাইট সেণ্টার বর্তমানে শীঘ্র গ্রহে একটি যান প্রেরণের জন্য ১৫ লক্ষ পাউণ্ড ধাক্কার রকেট তৈরী করছে—এটি তরল ইন্ধনের সাহায্যেই চালিত হবে।

কে, হোড়ের
মহাভৃংগরাজ

ধবল-শ্বেত কুষ্ঠ
বহুদিন পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম, দিনরাত চর্চা ও অনুসন্ধানের পর কবিরাজ শ্রীব্রহ্মস্বরূপ, বি এ উহা সমূলে বিনাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইংরাজীতে লিখিবেন।
আয়ুর্বেদিক কেমিক্যাল
রিসার্চ লেবরেটরিজ, ফতেপুরী, দিল্লী ৬

লেডি চ্যাটারলির বিচার

শিশিরকুমার দাশ

কাগজে সেদিন দেখেছিলাম 'লেডি চ্যাটারলির প্রেমিক' বইখানি নিয়ে বেশ হৈচৈ হচ্ছে। প্রথমে খেয়াল করিনি। পরে দেখলাম মজার ব্যাপারই বটে। এতদিন পরে আবার ডি এইচ লরেন্সকে বিচারালয়ের কাঠগড়ায় টেনে আনা হয়েছে। হতভাগ্য লেডি চ্যাটারলিকে জনসমক্ষে টেনে এনে নির্দয় বিচার চলছে। বারোজন জুরী রুদ্ধ ঘরে বসে লেডি চ্যাটারলির প্রেমিক বইখানি রুদ্ধশ্বাসে পড়ে চলেছেন, তার পরে তাঁরা রায় দেবেন এই বই অশ্লীল কি না, তাঁরা নিজেদের মেয়েদের হাতে এ-বই অম্লানবদনে তুলে দেবেন কি না। পেঙ্গুয়িন কোম্পানীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে, তারা লরেন্সের বই ছাপছে বলে। এই নিয়ে হৈচৈ। রোজ সন্ধ্যেবেলার কাগজে কোর্টের খবর একটু একটু করে বেরুচ্ছে. আর ঊর্ধ্বলোক থেকে লরেন্স বোধ করি মানুষের মূঢ়তায় ভ্রূকুটি করছেন।

লরেন্স ভ্রূকুটি করবেন, কারণ তাঁর ভাগ্যে এর আগে এমন ঘটনা ঘটেছে। সারা পৃথিবীতে চিন্তাস্রোত যখন নানা ঘূর্ণির মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে, দিনে দিনে সব চিরন্তন, স্থানু মূল্যগুলোই ভেসে ভেঙে চলে যাচ্ছে, তখন কোথা থেকে যে আর্তকণ্ঠ ওঠে, যার মধ্যে শিল্পের জন্য সহানুভূতি নেই, বোধ নেই, তা বোঝাই কঠিন। লরেন্সের বিরুদ্ধে অভিযোগ 'অশ্লীলতা'। অথচ একথা আজকের দিনে চেঁচিয়ে বোঝাবার দরকার নেই, অশ্লীলতা একটা কোন বিশেষ বস্তু নয়, তা একটা মনোভাব মাত্র। সাহিত্যে যেখানে অশ্লীলতার ছায়া পড়েছে বলে মনে হয়—আসলে দেখতে হয় সেটার উদ্দেশ্য কী। সেই ক্ষণমুহূর্তের বর্ণনাটি সেইখানেই কী শেষ, না, সেই কথাটির উপর দাঁড়িয়ে অন্য কোন সত্যকে দেখতে পাচ্ছি! রামায়ণ মহাভারত হোক, সংস্কৃত অন্যান্য কাব্যই হোক, বোকাচ্চিওর গল্পই হোক বা টলস্টয়ের ক্রেৎসার সোনাটার মত উপন্যাসই হোক—তাদের মধ্যে যাকে আমরা আদিরস বলি, তার পরিচয় আছে। কোথাও কোথাও তা বেশ স্পষ্টভাবে আদিম, স্থূলে. কোথাও তা অস্পষ্ট, কিন্তু তার অস্তিত্ব আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার লক্ষ্য অন্য কোথাও, বলা চলে জীবনরস আবিষ্কার, অর্থাৎ বিচিত্রের পরিচয়। কিন্তু যুগে যুগে দেখা গেছে, বিষয়বস্তুর জন্যই সাহিত্যিক বা শিল্পীকে অপরাধী হতে হয়েছে।

ডি এইচ লরেন্স

এই লরেন্স ইতিপূর্বে অভিযুক্ত হয়েছেন তাঁর ছবির জন্যে। ১৯২৯ খৃঃ অব্দে, বোধহয় তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর আগে তিনি যখন ইটালিতে ছিলেন তখন তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়েছিল। সেই তাঁর প্রথম, সেই তাঁর শেষ ছবির প্রদর্শনী। বেশীর ভাগ ছবিই ছিল 'নগ্ন'। আর সেখানে কবি ব্লেকেরও কতকগুলি ছবি ছিল। দুয়েকজন শিল্পরসিক সেদিন অভিনন্দিত করেছিলেন এই সৃষ্টিকে কিন্তু স্বভাবতই সাধারণ মানুষের বিমুখতা ও প্রত্যাখ্যান ছাড়া লরেন্স আর কিছু পাননি। এই ছবির ফলে লরেন্সের বিরুদ্ধে অভিযোগ এল। তখনকার পুলিস সলিসিটার, মিস্টার মাস্কেট, ইনি আগে 'রেনবো' উপন্যাসটির জন্যও কেস করেছিলেন, লরেন্সের শিল্পকীর্তির বর্ণনা দিলেন 'স্থূল, কদর্য, কুৎসিত এবং অশ্লীল'।

এক লরেন্স-ভক্ত সাম্প্রতিক একটি কাগজে এই সম্পর্কে সেই সময়কার একটি কৌতুককর ঘটনা লিখেছেন। লেখকের সঙ্গে তাঁর এক পরিচিত লরেন্স-বিরোধীর কথাবার্তা এটি :

লরেন্স বলে কোন এক লোকের অতি বিশ্রী ছবির প্রদর্শনী দেখেছেন? আমি অবশ্য তার নামে এবং আরেকটা হতভাগা বোধহয় ব্লেক নামের ওয়ারেণ্ট বার করে দিয়েছি। কেন এইসব ছবি নষ্ট করা হবে না এই মর্মে সমন দেওয়া হচ্ছে।

আমি বললুম, ভালোই করেছেন। লরেন্সের নাম শোনেননি? তিনি ইংলণ্ডের এত বড় কবি, ঔপন্যাসিক।

বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস

(অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেনের ভূমিকাসহ)

অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত, এম. এ.

বাঙ্গালা সাহিত্যে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সূচনা হইতে আধুনিককাল পর্যন্ত ভূদেব, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র এবং অপরাপর সকল লেখকের ঐতিহাসিক উপন্যাসের পরিচয় ও সার্থকতার বিস্তৃত প্রথম পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা। সকল সুধী পাঠক, বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগারের পক্ষে অপরিহার্য গ্রন্থ। মূল্য আট টাকা।

নাট্য কবিতায় রবীন্দ্রনাথ

অধ্যাপক হরনাথ পাল প্রণীত

রবীন্দ্রনাথের নাট্যকবিতার স্বতন্ত্র, নির্ভরযোগ্য ও বিস্তারিত আলোচনা।

মূল্য—২·৭৫

বাংলার লোক সাহিত্য

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রণীত

পল্লী বাংলার মৌখিক সাহিত্যের ইতিহাস

মূল্য—১০·৫০

ক্যা ল কা টা বু ক হা উ স

১/১, কলেজ স্কোয়ার । কলিকাতা-১২ ফোন নং ৩৪-৫০৭৬

: না, মশাই, শুনিনি।

: আর ঐ ব্লেক—তিনি ত' বহুদিন আগের কবি, তৃতীয় জর্জের আমলেই লোকান্তরিত হয়েছেন।

: ওহো, তাহলে তিনি অবশ্য আমার আইনের বাইরে—কিন্তু ছিঃ, ঐ আদম ইভের ছবি, কী বিশ্রী—আর লরেন্স—আপনি ঠিক জানেন এই লরেন্সই সাহিত্যিক—মানে

আমি লরেন্সের সাহিত্য-প্রতিভা ব্যাখ্যা করতে উৎসুক হলুম। কিন্তু শ্রোতাটি বললেন : যাকগে এই প্রদর্শনী বন্ধ করতে হবে। ছবি নষ্ট করব না।

এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় সাহিত্যের বা শিল্পের বিচার কোন মহাপুরুষেরা করেন। সেদিন লরেন্সের স্বপক্ষে বলার সময় শিল্প সৃষ্টির স্বাধীনতা সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছিল, শিল্পের মূল্য সম্পর্কেও কথা হয়েছিল। কিন্তু সে কথা আইনজ্ঞেরা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রদর্শনী বন্ধ হল। তবে সেই ভদ্রলোক কথা রেখেছিলেন—ছবিগুলি ফেরত দিলেন।

লরেন্সের মনে এই আঘাত নিশ্চয়ই ভীষণভাবে বেজেছিল। তখন তিনি নির্জনে ইটালিতে বসে আছেন। অসুস্থ। সেই নিঃসঙ্গ বেদনার দিনে এই আঘাতে তিনি ব্যাঙের হাসি হেসেছিলেন। 'রেনবো'র বিচারেও আঘাত পেয়েছেন। ব্যথাহত চিত্তে একটি ইস্তাহার লিখেছিলেন, "Pornography and obscenity"। সেদিন জীবিত লরেন্সকে আঘাত করা হয়েছিল—সেদিন তাঁর মুখে ছিল ব্যাঙের হাসি। শেষ পর্যন্ত তিনি জানতেন, তাঁর রচনায় এমন এক শক্তি আছে, মানুষের এমন এক বলিষ্ঠতার ছবি আছে তার মূল্য স্বীকার না করার অর্থ নিজের সেই শক্তিকে অস্বীকার।

তাই লেডি চ্যাটার্লির বিচারে আজ হাসি পাচ্ছে। বিভিন্নজনের সাক্ষী নেওয়া হচ্ছে। উলউইচের বিশপ বলেছেন, এ বই খৃষ্টানেরও পাঠ্য—কারণ এর মধ্যে পবিত্র কিছু আছে। সাহিত্য সমালোচক গ্রাহাম হাউ বলেছেন, লরেন্স এই শতাব্দীর একজন অন্যতম লেখক এবং ইংলন্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। তিনি কোথাও যৌন আবেদনকে প্রধান করেছেন বলে আমি মনে করি না। তিনি শুধু মানুষের যৌন সম্পর্কের দৃশ্যগুলিকে স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। নরনারীর এই সম্পর্ক অত্যন্ত গূঢ় এবং সূক্ষ্ম। সেই সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্পষ্ট করতে গিয়ে লরেন্স এইসব দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। কিন্তু এই বইতে ত' সেইগুলিই শেষ কথা নয়, আরো কথা আছে। তাছাড়া, অবৈধ যৌন সম্পর্কের প্রশ্ন অত্যন্ত অবান্তর। কারণ লরেন্সের দ্বারা তা সমর্থিত হয়নি। আর যে যৌন সম্পর্কের চিত্র রয়েছে তা সমগ্র সাহিত্যের ইতিহাসেই আছে। কনি চ্যাটার্লির যে মানস বিবর্তন, তার চরিত্রের যে বিকাশ—তার পেছনে বহু ঘটনাই ক্রিয়াশীল। সেই চরিত্রের বিকাশের জন্যই ঐ চিত্রগুলির উদ্ভব। কিন্তু ভাষা? উকীল চেপে ধরলেন। এই ভাষা কি ঠিক? হাউ উত্তর দিলেন—এই ব্যাপারে আলোচনা করতে গেলে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যবহার করতে হয়, নয়ত লৌকিক ব্যবহারের ভাষা। আর ব্যবহারের ফলে সে ভাষার সঙ্গে অনেক অনুষঙ্গ জড়িয়েছে। তার অর্থ শিথিল হয়ে গেছে। সাক্ষীর পর সাক্ষী এসেছে। বড় বড় অধ্যাপক, সমালোচক, দু' একটি লেখকও ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ঝামেলা মিটেছে। বিচারপতি রায় দিয়েছেন। বই ছাপা হবে। কিন্তু এসব কথা বড় কথা নয়। বিচারপতি বলেছেন যে, কাটছাঁট ঠিক নয়—কারণ তাতে বই নষ্ট হয়। বলেছেন, বই বিচার করতে হবে সমগ্রভাবে। বইটির দাম সাড়ে তিন শিলিং হবে—এটাই অনেকের রাগের কারণ। তাহলে সবাই কিনবে—আর তার ফলে সভ্যতা ও সমাজ রসাতলে যাবে।

পেঙ্গুইনের পক্ষের বক্তব্যে মিঃ গার্ডিনার ঠাট্টা করে বলেছেন যে, ওরা 'sex' ছাড়া আর কিছুই আলোচনা করেনি, তার কারণ বেশীক্ষণ 'আবহাওয়া' নিয়ে আলোচনা করা চলে না।

এ সমস্ত কথা থাক। আমরা যারা সাধারণ পাঠক, যারা সাহিত্য ভালোবাসি এবং লরেন্সের উপন্যাস পড়ে আনন্দ পাই, কী ভাবছি। আরেকবার বইটি উল্টে দেখছিলাম। লরেন্স স্পষ্ট কিছু বলতে চাইছেন। বলতে চাইছেন যে, দেহ পবিত্র, আত্মার মতই পবিত্র। তাই দেহ থেকে যে আনন্দের জন্ম তা অপবিত্র নয়, অসুন্দর নয়। দেহ আত্মায় সম্মিলিত সুষমাই সৌন্দর্য। এর মধ্যে একটি অতি স্পষ্ট বলিষ্ঠতা রয়েছে, যা মানুষকে তার দেহ-মনের মধ্যে গুপ্ত রহস্যের সাধনার প্রেরণা দেয়, দেহাতীত সত্যেরও ইঙ্গিত দেয়। লরেন্স হয়ত এই সমাজে ও সভ্যতার মধ্যে মানুষের এই দেহ-সাধনার মধ্যে একটি ত্রুটি লক্ষ্য করেছেন, যা মানুষকে অসুস্থ করেছে। নরনারীর সেই সম্পর্ক সুস্থ ও সুন্দর হোক। তার চেয়েও বড় কথা সাহিত্যে, বিশেষ করে উপন্যাসে ব্যক্তির একটি সমস্যাকে নিয়ে লেখক ভেবেছেন, সেই সমস্যার রূপটি ব্যক্তিগত। কন্স্টান্স চ্যাটার্লির জীবনে যে সমস্যা তা ব্যক্তিগত। তার সমস্যা, জটিলতা ও তার রূপটিকে সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে লরেন্স দেখতে চেয়েছেন এই মাত্র। সেই সময়ের ছবিও হয়ত কিছু আছে গ্রন্থে। কিন্তু আজ সে ছবি অনেকটা মিলিয়ে এসেছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে, পৃথিবীর প্রাত্যহিক পরিবর্তনের মধ্যে। ঐ সামাজিক পশ্চাৎপটের ওপর একটি মানুষের ছবিই আরো স্পষ্ট, আরো প্রত্যক্ষ হয়েছে। আরো পঞ্চাশ বছর পরে পাঠক দেখবে একটি ব্যক্তিকে, তার তৃষ্ণা ও পরিতৃপ্তিকে। সেদিন দেখবে, একটি লেখক একমনে সাধনা করেছেন দেহের ও মনের। তান্ত্রিকের সাধনায় যেমন দেহ অপরিহার্য, তার সৌন্দর্য ও কুশ্রীতা কোনোটাই বাদ দেবার নয়, তেমনই লরেন্স দেহকে দেখেছেন। সেই তন্ত্রসাধনার মোহময়ী আকর্ষণ আমাদের যেমন লুব্ধ করে, তেমনই তান্ত্রিকের স্তব্ধগম্ভীর নিরানন্দ আদিমতা আমাদের বুকের মধ্যে গভীর বিস্ময় জাগায়। লরেন্সের সাহিত্যে তাই দেখি।

লেডি চ্যাটার্লি কোর্ট থেকে ছাড়া পেল। বই বেরুবে। কিন্তু বিংশশতাব্দীর মধ্যভাগেও এই বিচার সভায় প্রহসনে আমাদের সবচেয়ে অবাক হলেন স্বয়ং লরেন্স। তিনি অমর্ত্যলোক থেকে দেখবেন, তাঁর নিজের দেশে আজ ৩০ বছর পরে তাঁর লেখা বইটি পুরোপুরি আত্মপ্রকাশ করতে পারল।

সিউড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের পুস্তকাবলী :
(১) WORLD PHILOSOPHY
(A Synthetic Study)
By Swami Sa...nda
Price: Rs. 9/-
[Foreword by Dr. Satkari Mukherjee]
"The author has made an attempt to turn hearsay into seesay for the common reader."
— Hindusthan Standard.
(২) যুগে যুগে যার আসা—স্বামী সত্যানন্দ
মূল্য—৫॥০
"লেখকের অপরোক্ষ নিবিড় অনুভূতির ছাপ বর্তমান।" — ভারতবর্ষ
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন,
২নং প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন । কলি-৩৬
মহেশ লাইব্রেরী,
কলেজ স্ট্রীট । কলিকাতা-১২
(সি-৮১৯০)

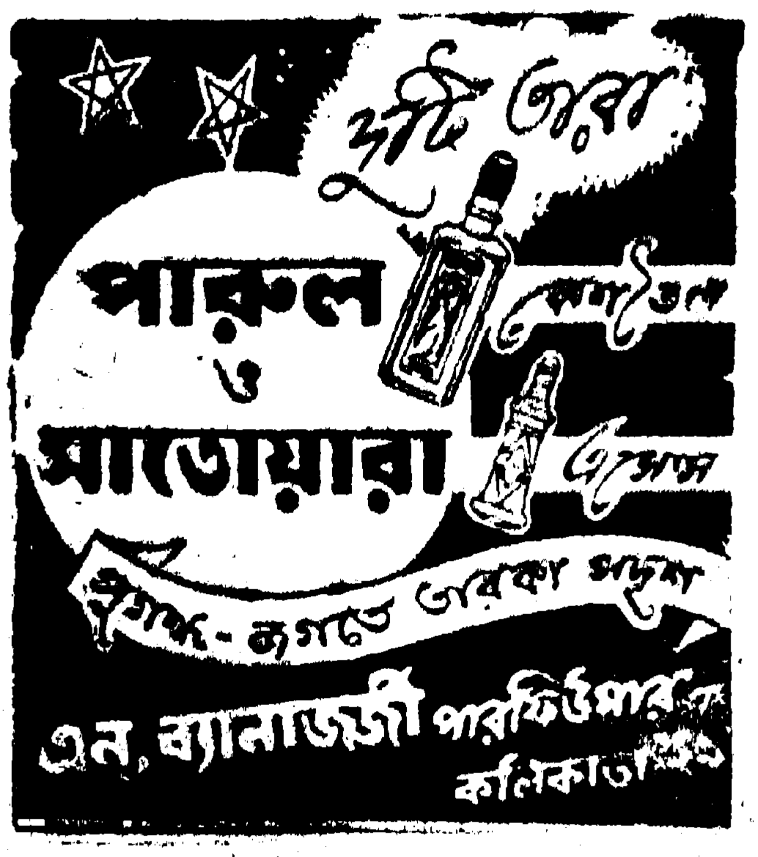

কাব্য সঙ্কলন

কাব্য-চয়নিকা—অক্ষয়কুমার বড়াল। প্রকাশক—বঙ্গ-ভারতী গ্রন্থালয়। ডাকঘর : সাঁতরাগাছি, হাওড়া। দাম—৫১

কাব্য-চয়নিকা — দেবেন্দ্রনাথ সেন। প্রকাশক—বঙ্গ-ভারতী গ্রন্থালয়। সাঁতরাগাছি, হাওড়া। দাম—৫১

অক্ষয়কুমার বড়াল এবং দেবেন্দ্রনাথ সেন দু'জনই রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবি এবং রচনা মাধুর্যে কবি হিসেবে দু'জনই যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ আপন মহিমায় এমনি একটি উচ্চ আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিলেন যে, তাঁর প্রখর আলোর কাছে প্রায় সকল কবিকেই নিষ্প্রভ হয়ে পড়তে হয়েছিলো। তার ফলে উত্তরসূরী কবিদের ওপর যেমন একমাত্র রবীন্দ্রনাথই প্রভাব বিস্তার করেছেন, তেমনি বাংলাদেশের কাব্যরসিকরা ধীরে ধীরে তাঁর নিকট প্রাক্তন ও সমসাময়িক কবিদেরও ভুলতে বসেছেন। অথচ আপন বৈশিষ্ট্যে অক্ষয়কুমার বড়াল এবং দেবেন্দ্রনাথ সেন এতই স্বতন্ত্র যে তাঁদের কবিতাকে বিশেষভাবে চিনতে কারো ভুল হবার কথা নয়। যদি কোনো পাঠক একটু অভিনিবেশ সহকারে সে কবিতা পড়ে দেখেন তাহলেই তাঁর চোখে ধরা পড়বে যে এ' দু'জন কবির কাব্য শুধুমাত্র ছন্দলালিত্যেই মধুর নয় ভাবগভীরতায় সুগম্ভীর। দুঃখের বিষয় এই যে, সার্থক কবি হয়েও আজ অক্ষয়কুমার এবং দেবেন্দ্রনাথ শুধু স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছেই কোনোরকমে পরিচিত হয়ে আছেন।

কাব্য-চয়নিকা প্রকাশ করে প্রকাশক পাঠকদের কাছে ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য হয়েছেন। সংকলনের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত কাব্যপরিচিতি দুটিও সুলিখিত। বিস্মৃত-প্রায় কবিদের কবিতা প্রকাশের প্রয়োজন সকলেই অনুভব করবেন, কিন্তু সে সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা সঙ্গত যে, এ প্রকাশ সাধারণ পাঠকদেরই কাব্যানুশীলনের জন্য। সেদিক থেকে বিচার করলে স্বীকার করতেই হবে এ গ্রন্থমালার দাম আর একটু কম হওয়া উচিত ছিলো—যদিও প্রকাশক বই দুটির অঙ্গসজ্জায় কোনো ত্রুটি রাখেননি।

৩৫১।৬০, ৩৫০।৬০

গল্প

বেনারসী—বিমল মিত্র। প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—৪·৫০ নয়া পয়সা।

বিমল মিত্র আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন জনপ্রিয় লেখক। সদর্থে জনপ্রিয়। তাছাড়া অন্যথায়, এমন অনেক লেখকের নাম করা যায়, যাঁরা নিজেদের স্বার্থকে চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে ভাষাকে যদৃচ্ছা ব্যবহার করেছেন, ক'রে পাঠকমহলে যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু বিমল মিত্র সে-দলের সাহিত্যিক নন। ভাষার অসাধারণ ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট। তাই তাঁর রচনায় ভাষাকে নিয়ে অনর্থক কারুকার্য প্রদর্শনের চেষ্টা দেখা যায় না। ফলে তাঁর কাহিনী সোজাসুজি পাঠকমহলে দোলা দেয়। তাছাড়া, কাহিনীকার হিসেবেও বিমল মিত্র বিশেষ একজন। সাহেব-বিবি-গোলামই তো সবচেয়ে বড় প্রমাণ। তাঁর রচনার সার্থকতার সবচেয়ে স্পষ্ট কারণ মোটামুটি এই কয়টি—বিষয়-বস্তুর সংস্থাপন, চরিত্র বিশ্লেষণ, ঘটনার বিশ্বাসযোগ্য পরিণতি এবং ভাষার সাবলীলতা।

লেখক চরিত্রের এই চারটি গুণই বেনারসী গল্পগ্রন্থের তিনটি গল্পের মধ্যেই উপস্থিত। কিন্তু তবু এই কয়টি গল্পের পরিণতি তিনি যেমন আশ্চর্য দক্ষতায় এঁকেছেন, তাতে তাঁর সাহিত্যিক সার্থকতা সম্বন্ধে কারো কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। অথচ একটু অসাবধান হলে কিংবা পাঠক-সাধারণের সহজ চাহিদা মেটানোর ইচ্ছে থাকলে সব কয়টি গল্পই এক অসম্ভব অবিশ্বাস্য পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছুতো। কিন্তু তাতে সাহিত্যিক হিসেবে লেখক ব্যর্থ হতেন।

বেনারসী, নায়ক-নায়িকা এবং আর এক রকম—তিনটি গল্পের কাহিনীই সাধারণ জীবনযাত্রা থেকে ভিন্ন। কিন্তু তারা অবিশ্বাস্য না, অসম্ভব তো নয়ই। বার-বণিতার সামাজিক প্রতিষ্ঠা, নরহত্যার অভিযোগ অভিযুক্ত আসামীর দৈবানুগ্রহে অশেষ বিত্তলাভ এবং প্রতিষ্ঠিত সামাজিক জীবনে জোচ্চুরির খেলা—কোনটাই অসম্ভব ঘটনা নয়, কিন্তু সহজ জীবনযাত্রায় এসব ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারও নয়। রচনা-ভঙ্গিতে বিমল মিত্রর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও বলতে বাধা নেই, কাহিনীর দিক থেকে এ গল্পগ্রন্থ লেখকের অন্যান্য রচনা থেকে চরিত্র হিসেবেও পৃথক। অনুরাগী পাঠকরা এখানে লেখককে অন্য-ভাবে চিনবেন, এবং এ-বৈচিত্র্যে মুগ্ধও হবেন।

৩৮৮।৬০

প্রকাশিত হইল :

শ্রীঅমলা দেবীর

মরু - মায়া

অনন্যসাধারণ উপন্যাস মূল্য—৩·২৫

দুর্ভাগ্যের স্রোতে ভাসতে ভাসতে, ঘাটে অঘাটে ভিড়তে ভিড়তে যে অভাগিনীর জীবন-তরী কূলে এসেও ডুবে গেল তারই মর্মস্পর্শী কাহিনী।

বহুদিন পর খ্যাতনামা লেখিকার উপন্যাস প্রকাশিত হইল·

কল্লোল প্রকাশনী, এ১৩৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

কিশোরদের জন্য এক অভাবনীয় বইয়ের সমাবেশ

ভানুমতীর বাঘ	প্রেমেন্দ্র মিত্র	... ২·০০
হ্যামেলিনের বাঁশিওলা	বুদ্ধদেব বসু	... ২·০০
ডাকাতের হাতে	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	... ২·৫০
ভালো ভালো গল্প	শিবরাম চক্রবর্তী	... ২·০০
আহ্লাদে আটখানা	(গল্প সংকলন)	... ৩·০০
নোটন নোটন (ছড়ার বই)	বিশ্বনাথ দে	... ১·০০

শ্রী প্রকাশ ভবন

এ৬৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা ১২ ॥

(সি ৮৯৬৫)

স্মৃতিচিত্র

যখন যেখানে—সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বর্তিক, ১।৩২এফ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা—২৬। ২·৭৫ নঃ পঃ।

গল্প সাহিত্যে গুণবাচক দুটি বিশেষণে সনাক্ত করা যায়, অর্থাৎ কিনা দুটি ভাগে ভাগ করে দেখা যায়। একটি হচ্ছে, গল্প হলেও সত্যি, এবং দ্বিতীয়টি সত্যি হলেও গল্প। একই বাক্যের এপিঠ ওপিঠ হলেও উভয়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান। যাকে আমরা সংবাদ যজ্ঞের চরু অর্থাৎ রিপোটাজ বলি, তা সত্যি হলেও শেষ পর্যন্ত গল্পই। এবং এই এক জিনিস যখন রকমফেরের স্তরের মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছে উপনীত হয়, হয়ত স্মৃতি-কথা পর্যায়ে পড়ে, হয়ত তাও নয়, তখন তাকে গল্প হলেও সত্যের মূল্য দিতে হয়। বস্তুত সাহিত্য, খাঁটি সাহিত্য মাত্রেই সেই অভিজ্ঞানের উপযুক্ত। 'যখন যেখানে' এগারটি ছড়ানো লেখার সংগ্রহ গ্রন্থ, এর মধ্যে উক্ত উভয়বিধ গল্পচারণের চিহ্ন বিদ্যমান। ফর্ম এবং উপসংহার দ্যোতনায় দু'তিনটি তো গল্পের অর্থাৎ ছোট গল্পের খুব কাছ ঘেঁষে গিয়েছে। শিল্পীর স্কেচবুক এবং ডায়েরী একত্র করলে যা দাঁড়ায় অপরগুলো তাই। মোটকথা, একটি ছন্নছাড়া দিন যাপনের সূত্রে এই বিভিন্ন দৃষ্টিপাত এক-গোত্রীয়। সুভাষবাবুর আত্মজীবনের এই খসড়াগুলো লঘু ভঙ্গীতে লেখা হলেও গীতিকবিতার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি এবং আন্তরিকতা অনেক স্থানেই উপস্থিত। রেখার আঁচড়ে চরিত্রাবলীর অন্তর-বাহিরের মুখচ্ছবি আঁকবার চেষ্টা করেছেন লেখক।

২৭৫।৬০

নাটক

একাংক সঞ্চয়ন—সম্পাদনায় ডঃ সাধন-কুমার ভট্টাচার্য ও ডঃ অজিতকুমার ঘোষ। প্রকাশক—জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা—৯।

নাটক সাহিত্যের অন্তর্গত একটি বিশিষ্ট অংগ হলেও, বাংলা দেশে নাট্য-সাহিত্য তার প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত ছিলো। তার কারণ সন্ধান গবেষকরা করুন; কিন্তু ইতি-মধ্যে একটি শুভঘটনা এই হয়েছে যে, সম্প্রতি নাটক-নাটিকা বাংলা সাহিত্যে সমান মর্যাদায় স্বীকৃতি পেতে শুরু করেছে। নাটকের প্রতি সাধারণ পাঠক-দর্শক মহলে কৌতূহল বাড়ছে যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সে-কৌতূহলকে স্তিমিত হয়ে যেতে না দিয়ে আরও বেশী করে উৎসাহিত করার প্রয়োজন। এ-ধরনের কোনো প্রয়ো-জনের তাগিদেই হোক বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, একটি যে সুষ্ঠু সুন্দর একাংক সঞ্চয়ন প্রকাশিত হয়েছে সেইটেই বাংলাদেশের পাঠকসাধারণের পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের কথা।

সম্পাদক দু'জনের নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে বিদগ্ধ অনুসন্ধানের কথা শিক্ষিত মহলে সুপরিচিত, সুতরাং এ-সম্পাদনায় যে হতাশ হওয়ার মতো কিছু ঘটবে না, এ-আশা অবশ্যই সকলে করতে পারেন। সম্পাদকেরা তাঁদের কৈফিয়ত হাজির করেছেন ভিন্ন ভূমিকায়। দুটোই সুলিখিত। ডঃ সাধন-কুমার ভট্টাচার্যের প্রবন্ধটি একাংক নাটক সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত ও তথ্যবহুল রচনা। ডঃ অজিতকুমার ঘোষের বক্তব্যও প্রণিধান-যোগ্য। কিন্তু তাঁর রচনাটি সম্বন্ধে একটি কথা বললে বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না। এ-সংকলনে যে-নাটিকা কয়টিকে স্থান দেওয়া হয়েছে তিনি তাঁর প্রবন্ধে তাদের সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্নভাবে আলোচনা করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে পাঠকের মনে কি তাতে রচনা পাঠের আগেই একটি মতামত তৈরী হয়ে যায় না। তাতে পাঠকের যে চিন্তা ব্যাহত হয় তাই-না সাহিত্যের রসাস্বাদনেও ব্যাঘাত ঘটে।

অধিকাংশ নাটিকাই সুন্দর এবং সফল হলেও, কয়েকটি রচনা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে সম্পাদক লেখকদের শ্রেষ্ঠ রচনাকে স্থান দিয়েছেন কিনা। আধুনিককালে যে দু-একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলে স্বীকৃত, আপত্তিটা তাদের রচনা সম্পর্কেই। সে-সব আপত্তিকেও না হয় মুলতুবী রাখা চলে, কিন্তু 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' কি সত্যিই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার পরিচায়ক? অন্তত রবীন্দ্রনাথের রচনা সংকলনের আগে সম্পাদকদ্বয় আর একটু ভেবে দেখলে পারতেন।

বলতে বাধা নেই, এ-সময়ে এরকম একটি সঞ্চয়নের সত্যিই প্রয়োজন ছিলো, এবং সে প্রয়োজন খানিকটা মেটাতে পেরেছেন বলে সম্পাদকরা নিশ্চয়ই ধন্যবাদার্হ।

৩৪৭।৬০

বিবিধ

১৯৬০ সালের শংকরস্ উইকলীর শিশু সংখ্যা—

প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট শংকর পরিচালিত আন্তর্জাতিক শিশু চিত্রকলা প্রতি-যোগিতা এবার একাদশ বছরে পদার্পণ করল। ১৯৫০ সালে এই প্রতিযোগিতা প্রথম শুরু হয়। প্রতিযোগিতাটি সারা পৃথিবীতে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে প্রতি বছরেই কিছু কিছু করে প্রতিযোগী-দের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রতিযোগিতা উপলক্ষে 'শংকরস্ উইকলী'র একটি করে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এ বছরেও তার অন্যথা হয়নি। এ বছরের সংখ্যায় আছে ১৩৪টি নানা রঙের ছবি এবং অসংখ্য এক রঙা ছবি। এ সব ছাপা ছবিগুলি মৌলিক রচনার প্রকৃত রূপের পরিচায়ক না হলেও এগুলি থেকে শিশুদের মনের কথা বোঝা যায়। এই সংখ্যায় শিশু রচিত কয়েকটি ইংরেজী প্রবন্ধও ছাপা হয়েছে এবং ১৯৫৮ সালে যে সব শিশু পুরস্কার পেয়ে

তিনখানা নূতন প্রকাশিত উপন্যাস

নীহার গুপ্তের সদ্য প্রকাশিত

কত নিশি পোহাওল ৩-৫০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

নতুন করে পাওয়া ৪-০০

নীলকণ্ঠের

ট্যাক্সির মিটার উঠছে ৪-০০

—শীঘ্রই প্রকাশিত হবে—

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের

নীলকুঠি

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ের

পিয়াসী মন

ভগীরথ শীল অনূদিত

বঞ্চিতা

(অধর্ম-কী-লুঠ'এর অনুবাদ)

● এতদ্ব্যতীত বাজারের সবরকম বই পাওয়া যায়। ●

দি নিউ বুক এম্পোরিয়ম

২২/১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রকাশিত হ'ল

আশাপূর্ণা দেবীর নবতম গ্রন্থ

মনোনয়ন

আশাপূর্ণা দেবী সেই জাতের লেখিকা যাঁদের হাতে মধ্যবিত্ত জীবনের ঘরোয়া পরিবেশের খুঁটিনাটি নিপুণ-ভাবে রূপায়িত হয়ে ওঠে; শুধু তাই নয়, জীবনের মৌল সত্য-সন্ধান ও মনের বিচিত্র ভাঙাচোরার বিশ্লেষণে কাহিনী আর কাহিনী থাকে না, একভাবের সত্যতায় অপরূপ হয়ে পাঠক-মনকে স্নিগ্ধতায় তৃপ্ত করে। মনোনয়ন তাঁর সর্বাধুনিক গ্রন্থ। এবং নিঃসন্দেহে লেখিকার বিশিষ্ট রচনার স্বাক্ষরে তা উজ্জ্বল। দাম ৩·০০

— অ ন্যা ন্য গ্র ন্থ —

বিমল কর

ফানুসের আয়ু (২য় সং) ... ৫·৫০
সোনারূপোর কাঠি ... ২·০০

সুবোধ ঘোষ

মনোবাসিতা (২য় সং) ... ৩·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ভাটিয়ালী (২য় সং) ... ২·৫০

বীরেশ্বর বসু

চা মাটি মানুষ (১ম পর্ব) ... ৪·০০
উন্মেষ ... ২·০০
রাস ... ২·০০
চা মাটি মানুষ (২য় পর্ব) ... ৫·৫০

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বর্বর যুগের পর ... ২·৫০

প্রবোধবন্ধু অধিকারী

বিহঙ্গবিলাস ... ৩·০০

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

জীবনস্বপ্ন ... ৪·০০

শৈলজানন্দ

ভাল লাগার নেশা ... ২·৭৫
মানুষের মতন মানুষ ... ৩·০০

অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

কান্নার প্রহর ... ২·৭৫

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

ভাগ্যবলাকা ... ৬·০০

সুনীলকুমার ধর

জোয়ার এলো ... ২·৫০

হরপ্রসাদ মিত্র

কবিতার বিচিত্র কথা ... ৮·০০

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের

কবিতা ও কাব্যরূপ ... ৮·০০

শিবরাম চক্রবর্তী

বিয়ের প্রকৃত বাই ... ২·৭৫
প্রিজিলার বিয়ে ... ২·৭৫

কথামালা প্রকাশনী

১৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২

ছিল তাদের মধ্যের ১৬০ জনের ফটো ছাপা হয়েছে। সংখ্যাটি সত্যই লোভনীয়।

প্রবাহ—সুতাহাটা সাংস্কৃতিক পরিষদ, মেদিনীপুর হইতে প্রকাশিত। মূল্য—এক টাকা।

বাংলা দেশের নানা লেখকের রচনায় সমৃদ্ধ হইয়া প্রবাহ ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধ, ছোট গল্প, কবিতা, খেলার খবর ও চলচ্চিত্রের সংবাদ সংখ্যাটির মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে।

নটরাজ (দীপালী সংখ্যা)। সম্পাদক: অমল হালদার। ১৮, নলিন সরকার স্ট্রীট, কলকাতা—৪ থেকে প্রকাশিত। পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

বাংলা দেশের নানা খ্যাতিমান লেখকের রচনায় সমৃদ্ধ হইয়া 'নটরাজ'-এর দীপালী সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংখ্যায় গল্প লিখিয়াছেন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ, শ্রীবিমল কর প্রভৃতি। ইহা ছাড়াও মূল্যবান প্রবন্ধ, রম্যরচনা, নবীন কবিদের কবিতা সংখ্যাটির মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে।

প্রাপ্ত সংবাদ

A Few Thoughts On Child-Guidance—S. B. Pal Choudhury.

A Short Synopsis Of Devayana Parts I & II—Dr. Hazari.

স্মৃতি-তীর্থ—(স্বর্গত বেণীমাধব দাসের পুণ্য স্মৃতি)।

ভারতের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল—শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী।

রম্যাণি বাক্য (রাজস্থান পর্ব)—শ্রীসুবোধ কুমার চক্রবর্তী।

রম্যাণি বীক্ষ্য (রাজস্থান পর্ব)—শ্রীসুবোধ কুমার চক্রবর্তী।

কালী-কীর্তন (৫ম খণ্ড)—স্বামী সত্যানন্দ।

মুখজং কুল নাশনম্—সন্ন্যাসিনী অর্চ্চনাপুরী।

অন্তরাল—সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

আফসোস—মহাতাবউদ্দিন।

জাল বই শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন—শ্রীবিপিনবিহারী দাশগুপ্ত।

চতুষ্কোণ—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

চল গল্প-নিকেতনে—হেমেন্দ্রকুমার রায়।

ছোটদের ক্যাকটি—শৈল চক্রবর্তী।

দুই নদীর তীরে—চিত্রিতা দেবী।

নানান গল্প—সুখলতা রাও।

বাংলা কাব্যে শিব—গুরুদাস ভট্টাচার্য।

বোমা—সুধীর সরকার।

বাল্মীকি রামায়ণ—শৈলেন্দ্র বিশ্বাস।

[illegible]—লীলা মজুমদার।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

মনের মানুষ

— তিন টাকা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বহু যুগের ওপার হতে

— দু' টাকা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তিন শূন্য

— তিন টাকা পঞ্চাশ

সুবোধ ঘোষ

ভারত প্রেমকথা

— ছয় টাকা

সরলাবালা সরকার

গল্পসংগ্রহ

— পাঁচ টাকা

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন

চিন্ময় বঙ্গ

— চার টাকা

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

বিবেকানন্দ চরিত

— পাঁচ টাকা

ছেলেদের বিবেকানন্দ

— এক টাকা পঁচিশ

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী

রবীন্দ্র মানসের উৎস সন্ধানে

— তিন টাকা পঞ্চাশ

লিপিকার বই

বিদূষক

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

দুই টাকা পঞ্চাশ

সাহিত্যের সত্য

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

দুই টাকা পঞ্চাশ

আনন্দ পাবলিশার্স

প্রাঃ লিমিটেড। কলিকাতা-৯

রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

বাংলা ছবির সমস্যা

বাংলা ছবির বর্তমান ও ভবিষ্যত নিয়ে ভাবতে গেলে মনের মধ্যে একই সঙ্গে আশা ও নিরাশার সুর বেজে ওঠে।

আশার সুর বাজে এই কারণে, যাঁরা গত অর্ধ দশকেরও অধিককাল ধরে বলিষ্ঠ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে বাংলা ছবিকে শিল্প-পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা তাঁদের সৃজনী ক্ষেত্রে আজও অক্লান্ত। বাংলা রজতপটে নবদিগদর্শনের পরিচয় দিয়ে চলেছেন তাঁরা একটির পর একটি নবতর সৌন্দর্যে সমুজ্জ্বল চিত্র সৃষ্টি করে। এবং তাঁদের শিল্পসাধনার সংগে সঙ্গে দর্শকদের রুচিরও দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। যা সুন্দর ও শোভন তাকে গ্রহণ করবার উপযুক্ত জমি তৈরি হচ্ছে দর্শকদের মনে। ভিন্নতর রসের ও শিল্প সমৃদ্ধ ছবির প্রতি আধুনিক দর্শকের সুস্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব তারই প্রমাণ বহন করছে। এই পক্ষপাতিত্ব মোটেই অবাঞ্ছিত নয়, কারণ ছবির শিল্প-সার্থকতা সেই পথ বেয়েই এসেছে এবং আসবে। তাই নানাবিধ নৈরাশ্যের মধ্যেও বাংলা ছবির অপ্রতিহত অগ্রগতি শিল্পরসিকের মনে আশার দীপ জ্বালিয়ে রাখে।

বাংলা ছবির ব্যবসায়ের দিকে তাকালে কিন্তু এই আশার দ্যোতনা অনেকখানি স্তিমিত হয়ে পড়ে। বাংলা ছবিকে জনকের স্নেহে যে সব প্রযোজক ও পরিবেশক সংস্থা নানা ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও পালন ও পুষ্ট করে গেছেন, তাঁদের অনেকেই আজ অবস্থার ফেরে বিত্ত ও ক্ষমতা হারিয়ে নিরপেক্ষ দর্শকের মত দূরে সরে দাঁড়িয়েছেন। যাঁরা হিন্দী ছবির পরিবেশন ব্যবসায়ে অর্থ ও প্রতিপত্তি লাভ করেছেন, তাঁরাই প্রধানত আজ বাংলা ছবির কর্ণধার হয়ে দাঁড়িয়েছেন। ব্যবসায়ে অর্থার্জন করাই যাদের মূল উদ্দেশ্য তাঁদেরই দ্বারে গিয়ে আজ বাংলা ছবির প্রযোজকদের হত্যে দিতে হচ্ছে। স্বতঃসিদ্ধ কারণেই এর ফল হয়েছে অবাঞ্ছিত।

নিছক ব্যবসায়ী শিল্পী তালিকার ওপর যতটা জোর দেন, কাহিনীর শ্রেষ্ঠত্বের ওপর ততটা নয়। আরও খুলে বলতে গেলে এই দাঁড়ায়—ছবির ব্যবসায়িক সম্ভাবনার প্রতি তাঁদের যতটা নজর থাকে, ছবির শিল্পমানের দিকে তাঁরা ঠিক ততটা নজর দেন না। ফলে ক্ষয়িষ্ণু "স্টার সিস্টেম" বাংলা ছবিতে নতুন করে বেঁচে উঠবার সুযোগ পায়। বাংলা ছবি একদিকে যেমনি নিত্য নতুন শিল্প-সৌকর্যের পথ খুঁজে বেড়ায়, তেমনি ব্যবসা-সিদ্ধ চিত্রপ্রযোজকদের হাতে বন্ধ্যাত্বের শৃংখলে বাঁধা পড়ে।

বাংলা ছবিকে এই দুর্গতির পথে টেনে নেওয়ার ব্যাপারে কোন কোন চিত্র-প্রযোজকের উৎসাহও উপেক্ষণীয় নয়। এমনও দেখা যাচ্ছে, কোন কোন চিত্র-প্রযোজক বিশেষ কোন চিত্রপরিবেশকের দাক্ষিণ্য অর্জনের জন্যে বিশেষ শিল্পী ব্যতীত ছবি তৈরীর কথা ভাবতেই পারছেন না। ফলে যে-সব চিত্রপ্রযোজক সত্যিই ভালো কোন কাহিনীর ভিত্তিতে ছবি তৈরীর কাজে অর্ধেক এগিয়ে গেছেন, তাঁরা বিশেষ কোন শিল্পী বা শিল্পী-জোড়কে তাঁদের ছবিতে নেননি বলে চিত্রপরিবেশকের অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন।

সম্প্রতি অনেকগুলি অবাঙালী চিত্র-পরিবেশক সংস্থা বাংলা ছবি প্রযোজনার ক্ষেত্রে অগ্রণী হয়ে এসেছেন। এবং আরও কেউ কেউ এক্ষেত্রে উৎসাহী হয়ে উঠেছেন বলে শোনা যাচ্ছে। বাইরের দিক দিয়ে বিচার করলে, এতে বাংলা ছবির পক্ষে ক্ষতির কারণ নেই। কারণ এর ফলে বাংলা ছবি তৈরী হচ্ছে বেশী এবং বাংলা ছবি নির্মাণের ক্ষেত্র আরও প্রশস্ত হবার সম্ভাবনা। বাংলা ছবিকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষমতা বাঙালী চিত্রব্যবসায়ীর যখন নেই, তখন যদি অবাঙালী চিত্রব্যবসায়ী বাংলা

সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত "সুরের পিয়াসী" চিত্রের একটি দৃশ্যে ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ সরোদ বাজাচ্ছেন

ছবিকে বাঁচিয়ে রাখেন তাতে গৌরববোধের কারণ না থাকলেও বাংলা ছবির অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার কারণ আছে।

কিন্তু এই নিশ্চিন্ততার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে যাচ্ছে আশংকার বীজাণু। ছায়াছবির ক্ষেত্রে বাংলার একটা নিজস্ব শিল্পরুচি আছে, ঐতিহ্য আছে। উপরন্তু বাংলা ছবির এক বিশ্ববন্দিত শিল্পগরিমাও গড়ে উঠেছে। বাংলা ছবির এই চিরাচরিত ও নতুন ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব অবাংগালী চিত্রপ্রযোজক ও চিত্রপরিবেশক সংস্থা সুষ্ঠুভাবে কতটুকু পালন করতে পারবেন তা নিয়ে মনে আশংকা জাগা অস্বাভাবিক নয়। চিত্রব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও অবাংগালীদের সংগে প্রতিযোগিতায় বাঙালীর হেরে যাবার এই যে পালা শুরু হয়েছে, এর ফলে বাংলা ছবির নবলব্ধ শিল্পগৌরব কতটুকু রক্ষিত হবে তা নিয়ে স্বল্প-অবশিষ্ট বাঙালী চিত্রব্যবসায়ী সংস্থাদের নতুন করে ভাববার সময় এসেছে।

চিত্রব্যবসায়ের ক্ষেত্রে—প্রযোজনা এবং পরিবেশনে—বাঙালীর নিজস্ব স্বচ্ছল প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় এক আঙুলে গোনা যায়। অন্যগুলির অধিকাংশই স্বল্পবিত্ত। বিত্তশালী যে সামান্য কয়টি সংস্থা ছবি তৈরী ও পরিবেশনের কাজে ব্যাপৃত তাঁরাও স্বজনপোষণ ও "স্টার সিস্টেম"-এর দাবিকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করেন। তাঁদের মধ্যে কেউ যদি নতুন যুগের বিপ্লবী শিল্পীদের ছবির প্রযোজনা ও পরিবেশনের দায়িত্ব নিয়ে থাকেন তার মধ্যে ব্যবসাবুদ্ধি যে একেবারেই নেই তা নয়। ব্যবসাক্ষেত্রে নেমে ব্যবসা বুদ্ধি রাখাটা অন্যায় এমন অযৌক্তিক কথা কেউ বলবেন না। কিন্তু বাংলা ছবির নতুন ঐতিহ্যকে শুধু শিল্পপ্রীতির মধ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার মতো বলিষ্ঠ বাঙালী ব্যবসায়ী সংস্থার প্রয়োজন আজ সর্বাধিক। দুঃখের বিষয়, এমন বাঙালী সংস্থার সংখ্যা আজ একাধিক নয়।

অবাঙালীরা চিত্রব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বাঙালীর প্রতিযোগী হয়ে এসেছেন সেটা দুঃখের বা ক্ষোভের কথা নয়। এই প্রতিযোগিতা বাংলা চিত্রশিল্পকে প্রসার ও প্রতিপত্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে যদি তা শিল্পের প্রকৃত কল্যাণের দিকেই নিয়োজিত হয়। প্রতিযোগিতার প্রাণশক্তি শুভপথে তখনই চালিত হতে পারে যখন বাঙালী চিত্রব্যবসায়ী সংস্থাগুলি বাংলা ছবির নতুন যুগের ভাবাদর্শকে সঠিক মূল্য দিতে পারবেন। মুষ্টিমেয় যে-কয়টি বাঙালী সংস্থা আজও অবশিষ্ট আছেন তাঁরাও যদি স্বজনতোষণ ও "স্টার সিস্টেম"-এর পঙ্কিল আবর্তে নিজেদের ডুবিয়ে রাখেন, তবে বাংলা ছবির দুর্গতিই শুধু ঘনিয়ে আসবে না, তাদের আত্মবিলোপের পথও প্রশস্ত হবে। কারণ জনচিত্তবিনোদনের পথে অবাঙালীদের সংগে প্রতিযোগিতায় জয়ী হবার মতো সম্বল তাঁদের নেই। তাঁদের একমাত্র সম্বল হতে পারে আদর্শপ্রীতি, ও শিল্পপ্রীতি এবং নতুন যুগের দর্শকদের উন্নত ও মার্জিত রুচিকে বাঁচিয়ে রাখা। এই কাজে তাঁরা যদি ব্রতী হন, নিঃসম্বল হয়েও বাংলা চিত্রব্যবসায়ে তাঁরা সাফল্যের স্বর্ণ-সিংহাসনকে অনায়াসে অধিকার করতে পারবেন। এবং অবাঙালী চিত্রব্যবসায়ী-দেরও শুদ্ধ ও সুচারু শিল্পের পথে অনুপ্রাণিত করতে পারবেন। তখনই শুধু বাংলা ছবির ভবিষ্যত নিয়ে আশঙ্কার সুরটি আশার আনন্দে মিলিয়ে যেতে পারে।

চিত্রালোচনা

প্রযোজক ডি সি দে'র প্রথম চিত্রার্ঘ্য "সুরের পিয়াসী" নামানুযায়ী একটি সংগীত মুখর ছবি। এক সংগীত বিদ্যালয়ের দু'জন ছাত্রছাত্রীকে ঘিরে এর কাহিনী। তাই সুরের মূর্ছনার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করবার প্রচুর অবকাশ পেয়েছেন ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ। তিনিই এ ছবির সুরকার। তাঁর সংগীত পরিচালনায় বহু বিখ্যাত সংগীত-শিল্পীর সমাবেশ ঘটেছে এ ছবিতে। কয়েকজনকে সর্বপ্রথম ছবির পর্দায়ও দেখা যাবে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য আলি আকবর খাঁ, হীরাবাঈ বরোদেকর, বিলায়েৎ হোসেন, ইমরৎ হোসেন, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গত পান্নালাল ঘোষ প্রভৃতির নাম। অভিনয় শিল্পীদের মধ্যে আছেন সুপ্রিয়া চৌধুরী, প্রবীরকুমার, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, সমিতা সিংহ, অপর্ণা দেবী, দীপক মুখোপাধ্যায়, মিহির

বিশ্বরূপা

(অভিজাত প্রগতিশীল নাট্যমঞ্চ)

[ফোন : ৫৫-১৪২৩, বুকিং ৫৫-৩২৬২]

বৃহস্পতি ও শনি সন্ধ্যা ৬॥টায় | রবি ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬॥টায়

একটি চিরন্তন মানব অনুভূতির কাহিনী

সেতু

৩০০তম রজনীর পথে

মনকে দোলা দেয়, ভরিয়ে দেয়

নাট্য—বিধায়ক আলোক—তাপস সেন

শ্রেঃ নরেশ মিত্র - অসীমকুমার

তরুণকুমার, মমতাজ, সন্তোষ, কমল, জয়শ্রী, সুব্রতা, ইরা, আরতি প্রভৃতি

ও

তৃপ্তি মিত্র (বহুরূপী)

বিশ্বরূপার বহুরূপীর অভিনয়

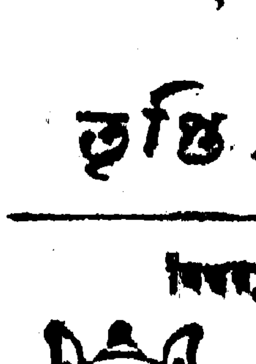

রবীন্দ্রনাথের

রক্তকরবী

১৫ই নভেম্বর, মঙ্গলবার — সন্ধ্যা ৬॥টায়

নির্দেশনা—শম্ভু মিত্র

আলোক—তাপস সেন

ভূমিকায়—তৃপ্তি মিত্র, শম্ভু মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, অমর গাঙ্গুলী, কুমার রায়, শোভেন মজুমদার, আরতি মৈত্র ও শান্তি দাস

“অংগার”এর ২০০ রজনীর উৎসবে মিনার্ভার লবিতে স্থাপিত শিশিরকুমারের আবক্ষ মূর্তির সামনে পণ্ডিত রবিশংকর, চিত্ত চৌধুরী, উৎপল দত্ত, শোভা সেন প্রভৃতি ফটো—অলক মিত্র

ভট্টাচার্য, পদ্মা দেবী প্রভৃতি। বিশু দাশগুপ্ত ছবিটি পরিচালনা করেছেন। এ সপ্তাহে “সুরের পিয়াসী” মুক্তি পাচ্ছে।

দুটি হিন্দী ছবিও এ সপ্তাহের মুক্তি-তালিকায় রয়েছে। জাঁকজমকের দিক দিয়ে রিপাবলিক ফিল্মস কর্পোরেশনের “কোহিনুর” দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত ছবি। দিলীপকুমার ও মীনাকুমারী এর নায়ক-নায়িকা। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন জীবন, কুমকুম, মুকরি, লীলা চিৎনিশ, কুমার প্রভৃতি। এস ইউ সানির পরিচালনায় ও নৌসাদের সুর-যোজনায় ছবিটি গৃহীত হয়েছে।

মুরলী মুভিটোনের “চাঁদ মেরে আজা” এ সপ্তাহের দ্বিতীয় হিন্দী ছবি। নৃত্য-গীত সমৃদ্ধ একটি পারিবারিক কাহিনী এর মধ্যে রূপ পেয়েছে। ভূমিকালিপির পুরোভাগে আছেন ভারতভূষণ, নন্দা, জীবন, নলিনী চোংকার, ললিতা পাওয়ার, সপ্রু প্রভৃতি। প্রযোজনা ও পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছেন রাম দরিয়ানী। সুর-সৃষ্টির কৃতিত্ব চিত্রগুপ্তের।

• • •

আগামী ১৮ই নভেম্বর সিনে আর্ট প্রোডাকশনের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত “গংগা”-র মুক্তি ঘোষিত হয়েছে। এ ছবিটি ভারতীয় চিত্রজগতে সাড়া তুলবে বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। তার কারণ সমরেশ বসুর যে কাহিনীকে ভিত্তি করে ছবিটি তোলা হয়েছে, রসের দিক দিয়ে তা যেমন অভিনব তেমনি মানবীয় আবেদনে তা মর্মস্পর্শী। পরিচালক রাজেন তরফদার অনন্যসাধারণ শিল্প-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন এর চিত্রায়ণে। দীনেন গুপ্তের অপরূপ ফটোগ্রাফি, সলিল চৌধুরীর সুরারোপ, নির্মলেন্দু চৌধুরীর লোকসংগীত, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনা—এই সব মিলিয়ে “গংগা” সহজেই অবিস্মরণীয় চিত্রসৃষ্টিগুলির মধ্যে স্থান করে নিতে পারবে বলে আশা করা যায়। নবাগত নিরঞ্জন রায় নায়কের ভূমিকায় সকলকারই দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। তাঁর বিপরীতে যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রধান রুমা গাংগুলী, সন্ধ্যা রায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সুমনা ভট্টাচার্য, মণি শ্রীমানি, সীতা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

• • •

তারাশংকরের দুটি জনপ্রিয় কাহিনীকে চিত্রান্তরিত করবার তোড়জোড় চলছে।

“শশীবাবুর সংসার” ও “শেষ পর্যন্ত”-এর প্রযোজক আর ডি বনসল তাঁর পরবর্তী ছবির জন্যে তারাশংকরের “রাজপুত্র” গল্পটি মনোনীত করেছেন। বর্তমানে এর চিত্রনাট্য লিখছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনা ও সুরযোজনার দায়িত্ব যথাক্রমে অর্ধেন্দু সেন (“হুদ”-খ্যাত) ও হেমন্তকুমারের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। নায়ক-চরিত্রে অভিনয় করবার জন্যে নির্বাচিত হয়েছেন উত্তমকুমার।

তারাশংকরের “বিপাশা” গল্পের চিত্ররূপ দেবেন সিলভার স্ক্রীন নামক একটি নবগঠিত প্রতিষ্ঠান। নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন। ছবিটি পরিচালনা করবেন অগ্রদূত গোষ্ঠী। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার চিত্রনাট্য রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

দুটি ছবিরই শুটিং আগামী ডিসেম্বরে শুরু হবার কথা।

• • •

আরো একটি নতুন ছবির কাজ ডিসেম্বরের গোড়াতেই শুরু হবে।

রবীন্দ্রনাথের “জীবিত ও মৃত” গল্পটি ছবিতে রূপান্তরিত করবার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন আলোকচিত্রশিল্পী অনিল গুপ্ত ও জ্যোতি লাহা বেশ কিছুদিন আগে। কিন্তু নায়িকা বিভ্রাটের দরুণ ছবি আরম্ভ করা এতদিন সম্ভব হয়নি। সুমিত্রা দেবী গল্পটির নাটকীয় সম্ভাবনায় আকৃষ্ট হয়ে চিত্র জগতে প্রত্যাবর্তন করতে রাজী হওয়ায় আবার নতুন উৎসাহে ছবির তোড়জোড় শুরু হয়েছে। অসিত সেনের পরিচালনায় আগামী ১লা ডিসেম্বর থেকে এর চিত্রগ্রহণ আরম্ভ হবে। টনি-বনি প্রোডাকশন্সের পতাকাতলে ছবিটির প্রযোজনা করবেন শ্রীগুপ্ত ও শ্রীলাহা।

• • •

কথাচিত্রমের “দিল্লী থেকে কোলকাতা” ছবিটির স্টুডিওর কাজ দ্রুত সমাপ্তির পথে। বীরেশ মুখোপাধ্যায়ের একটি হাসির গল্পের ভিত্তিতে পরিচালক সুশীল ঘোষ এর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। এই মাসের শেষের দিকে ছবির বহির্দৃশ্য তুলতে পরিচালক সদলবলে পুরীতে যাবেন। তরুণকুমার, জহর রায়, উৎপল দত্ত, অনুভা গুপ্তা, তপতী ঘোষ, মিতা চট্টোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে নিয়ে এর

লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপের

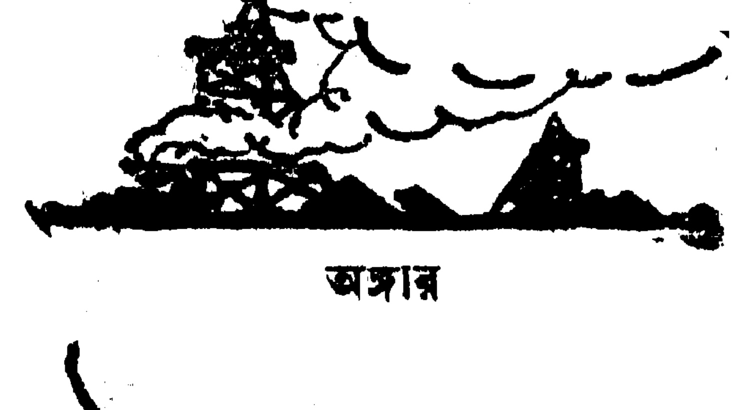

অঙ্গার

মিনার্ভা থিয়েটারে

প্রতি বৃহস্পতি ও শনি ৬৷৷
রবি ও ছুটির দিন ৩ ও ৬৷৷
(সি ৯৩১৩)

ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। বাঁশরী লাহিড়ী সুর যোজনা করছেন। এর আগে বাংলা ছবিতে আর কোন মহিলা সংগীত-পরিচালিকার আবির্ভাব ঘটেনি।

স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ স্টুডিওতে জ্যোতিরূপা ছায়াচিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রথম ছবি "সাক্ষী"র কাজ এগিয়ে চলেছে। "কোন একদিন"-খ্যাত অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে ছবিটি পরিচালনা করছেন দেবব্রত দাশগুপ্ত। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন মঞ্জু দে, নির্মলকুমার, অসিতবরণ, জহর রায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। নিখিল সেনের ওপর সুরসৃষ্টির দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

* * *

গত সোমবার (৭ই নভেম্বর) থেকে এল বি ফিল্মস ইণ্টারন্যাশানালের পঞ্চম চিত্র "নফর সংকীর্তন"-এর শুটিং ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে আরম্ভ হয়েছে। প্রযোজক প্রমোদ লাহিড়ী এবার নিজে পরিচালনার দায়িত্ব বহন করছেন। লিটল্ থিয়েটার গ্রুপের রবি ঘোষ নায়কের ভূমিকায় নির্বাচিত হয়েছেন। "নফর সংকীর্তন" ঔপন্যাসিক বিমল মিত্রের অন্যতম সার্থক রচনা।

বিমল মিত্রের সুবিখ্যাত উপন্যাস "সাহেব বিবি গোলাম" অচিরেই হিন্দীচিত্রে রূপান্তরিত হবে। গুরু দত্ত এই নতুন সংস্করণের প্রযোজক, পরিচালক এবং সম্ভবত প্রধান অভিনেতা। বোম্বাইতে এর চিত্রগ্রহণ শুরু হবার কথা এই সপ্তাহেই।

উপভোগ্য তথ্যচিত্র

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রযোজিত "ষষ্ঠীপদ'র সংসার" নামে একটি উদ্দেশ্যমূলক তথ্যচিত্র দু'এক সপ্তাহের মধ্যেই কলকাতার বিভিন্ন চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। প্রসিদ্ধ প্রেস ফটোগ্রাফার পান্না সেন ছবিটির কাহিনীকার, পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, সংলাপ-রচয়িতা ও সুরকার। তাছাড়া তিনি নিজে এতে অভিনয় করেছেন এবং গানও গেয়েছেন। বর্তমান সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো'তে পরিবার-নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা তুলে ধরা হয়েছে এই ছবিটিতে।

একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের অবয়বরূপে রচিত হলেও ছবিটির আখ্যানবস্তুতে নাট্যকাহিনীর স্বাদ আছে। এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালীর সংসারের পটভূমিতে ছবির আখ্যানভাগ বিস্তারিত ও এর মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত। পর পর অনেক সন্তানের জনক হয়ে ষষ্ঠীপদ তার ছোট সংসারে কোনমতে দিনের পর দিন নিত্য নতুন অভাব ও অশান্তি ডেকে আনে, সন্তান-পালনের ও সংসার পালনের গুরুদায়িত্ব বহন করতে না পেরে জীবনযুদ্ধে কী করে বিপন্ন হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত এক অকৃত্রিম সুহৃদের কাছে পরিবার-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কার্যকরী উপদেশ পেয়ে কীভাবে তার চৈতন্যোদয় হয় তা নিয়েই ছবিটির চিত্রনাট্য গড়ে উঠেছে।

ষষ্ঠীপদ'র জীবন সংগ্রাম, তার সংসারে সুখ ও দুঃখের ছোট ছোট ঘটনার প্রাত্যহিক আবর্তন, ছোট ছেলেমেয়েদের ঝগড়া-ঝাঁটি ও খেলাধুলো, সংসারের দুঃসহ বোঝার চাপে গৃহকর্ত্রীর মনের তিক্ততা এবং ছোটখাটো বিষয়ে স্বামীর সংগে মান-অভিমান প্রভৃতি চিনাট্যে এমন পুনিপুণ প্রয়োগ-কর্মের ভেতর দিয়ে সন্নিবেশিত যে স্বল্প-

রূপপ্রসাধনে শ্রেষ্ঠ অবদান

ফাউণ্ডেসন ক্রীম হিসেবেও এর ব্যবহার কার্যকরী ও আনন্দদায়ক।

বসন্ত মালতীর নিয়মিত ব্যবহারে ত্বকের সহজাত তৈলাক্ত ভাবটি অক্ষুণ্ণ থাকে বলেই সৌন্দর্যের সহজ রূপটি আরো মনোমুগ্ধকর হয়ে ওঠে।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

দৈর্ঘ্যের (দু' হাজার ফিটের কাছাকাছি) এই ছবিটি একটি সরস পারিবারিক নাটক আস্বাদনের আনন্দ সঞ্চার করে দর্শকের মনে।

ছবিটির সুগ্রথিত চিত্রনাট্যের বিন্যাসে চিত্রনির্মাতা পান্না সেন তাঁর প্রথম প্রয়াসেই প্রশংসনীয় কল্পনাশক্তি ও রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন দৃশ্যের চিত্রগ্রহণে শিল্পরুচির পরিচয় মেলে। শ্রীসেন রচিত ছবির আবহসংগীত এবং দুটি গানের কলির সুরারোপও সুন্দর।

হরিধন মুখোপাধ্যায় ও কেতকী দত্ত—এই দু'জন প্রখ্যাত শিল্পী অবতরণ করেছেন এর প্রধান দুটি চরিত্রে। তাঁদের অভিনয় এক কথায় উপভোগ্য। তাঁদের

এস-কে-এস ফিল্মসের "শিল্পলিপি"-তে নবাগতা সীমা মুখোপাধ্যায়

সু-অভিনয়ের ফলে ছবির আমোদ-সম্পদ খুবই বেড়েছে। ছবির আমোদ-রস বর্ধনে পরিচালক শিশু-শিল্পীদেরও সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

ছবির আলোকচিত্র গ্রহণ ও কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ পরিচ্ছন্ন ও উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। অরোরা স্টুডিওতে ছবিটি গৃহীত হয়। আলোকচিত্র গ্রহণ করেন অমিয় সেনগুপ্ত।

শিশু রঙমহলের পাপেট খেলা

বিশ্বশান্তি দিবস উপলক্ষে আগামী ১৪ই নভেম্বর দেশপ্রিয় পার্কে সন্ধ্যায় এক বিরাট অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলছে। এই অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ সি এল টির পাপেট খেলা অর্থাৎ পুতুল নাচ। ১৯৫৭ সালে যখন চেকোশ্লোভাকিয়ার পাপেট দল শিশু রঙমহলের অতিথিরূপে আসেন তখন সি এল টির বাচ্চারা মঞ্চের পিছন থেকে মনোযোগ দিয়ে তাদের খেলার কসরত দেখে। তাদের সঙ্গে ছিলেন সি এল টির শিক্ষক সুরেশ দত্ত। পাঁচদিন খেলার পর বাচ্চারা বলে "এ আমরাও পারি" আর সুরেশ দত্ত বলেন, "এ শেখান কিছুই কঠিন নয়"।

তারপর গত বছর আসেন রঘুনাথ গোস্বামীর পাপেট দল। এরাও বেশীর ভাগ গ্লাভ পাপেট ও কয়েকটি রড পাপেটের খেলা দেখান। এ রকম উচ্চমানের পাপেট খেলা ভারতবর্ষে আর কখনো দেখা যায়নি। এদের সাথে খেলা দেখায় আমেদাবাদ শ্রেয়স গ্রুপের ছেলেমেয়েরা। সি এল টির জেনারেল সেক্রেটারী নানা কাজের মধ্যে টের পাননি যে এ সমস্ত খেলাগুলিই সি এল টির ছেলেমেয়েরা অভিনিবেশ সহকারে দেখেছে। গত বছরের ফেস্টিভাল থেকেই বাচ্চারা বলে—"আমরা নাচতে পারি, গাইতে পারি—আমাদের মিউজিক আছে, আমাদের প্লে ব্যাক আছে— অতএব আমরা পুতুল খেলা দেখাব।" বেশ কথা। শ্রীমান সুরেশ দত্তর পরিচালনায় এসব ছেলেমেয়েরা—সবাই ১২ থেকে ১৪ বৎসর বয়সের—নিষ্ঠার সঙ্গে কাজে লেগে যায়। পুতুল তৈরী, সেট, স্টেজ, গল্প, আলোকসম্পাত সবই চলে বাচ্চাদের সহযোগিতায়। এক বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল "সি এল টি পাপেট ক্লাব"।

আপাতত শিশু রঙমহলের পাপেট শিল্পীরা শুধু Glove puppetএর খেলায় হাত পাকিয়েছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এরা রড পাপেট ব্যবহার করে দুষ্টু ইঁদুর, মিঠুয়া প্রভৃতি বড় ব্যালে পাপেটের মাধ্যমে দেখাতে পারবে। রবীন্দ্রনাথের "বীর পুরুষ"ও তৈয়ারী করা হবে।

এবারকার বিশ্ব শিশু উৎসবের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা গ্রামোফোন কোম্পানীর সহযোগিতায় সি এল টি'র গানের রেকর্ড। বাংলাদেশে স্কুল ঘরে ডেমনেস্ট্রশনের উপযুক্ত কোন গানই রেকর্ড করা হয়নি। এইবার গ্রামোফোন কোঃ-র উদ্যোগে সে অভাব ঘুচল। এই দিবসেই গ্রামোফোন কোঃ-র জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জর্জ, প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থেকে এই সংগীত মালিকার রেকর্ড দেশবাসীকে উপহার দেবেন। পরে গানের সাথে সি এল টির বাচ্চারা নৃত্য পরিবেশন করবে।

বিশ্ব শিশু দিবসের সাথেই সি এল টির নবম ফেস্টিভালের সূচনা।

"অঙ্গার"-এর ২০০ রজনী পূর্তি উৎসব

গত ৩রা নভেম্বর মিনার্ভা থিয়েটারে লিটল থিয়েটার গ্রুপ অভিনীত "অঙ্গার" নাটকের দুইশত রজনীর স্মারক উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়েছে। পেশাদারী মঞ্চে কোন নাটক একাদিক্রমে ২০০ রাত্রি ধরে অভিনীত হবার দৃষ্টান্ত আজ আর বিরল নয়। হাল আমলে অনেকগুলি নাটকের ভাগ্যেই এর চেয়ে অনেক বেশীদিন ধরে চলবার গৌরব সম্ভব হয়েছে।

তবুও "অঙ্গার"-এর বর্তমান সাফল্যে লিটল থিয়েটার গ্রুপকে অভিনন্দিত করবার বিশেষ কারণ আছে। প্রায় কপর্দকহীন অবস্থা থেকে আজ লিটল থিয়েটার গ্রুপ নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন এই নাটকের দৌলতে। তাই তাঁদের গৌরবে আজ নবনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেক নাট্যসংস্থাই আনন্দ অনুভব করবেন।

উৎসবে লিটল থিয়েটার গ্রুপের পক্ষ থেকে চিত্র চৌধুরী একটি মর্মস্পর্শী ভাষণে

আই. পি. টি. এ কর্তৃক
বীরু মুখোপাধ্যায়ের

ভাঙ্গা গড়া খেলা

প্রযোজনা—প্রান্তিক শাখা
পরিচালনা—জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়
আবহসঙ্গীত—অনিল চট্টোপাধ্যায়
আলোকসম্পাতঃ তাপস সেন

মিনার্ভা থিয়েটার

মঙ্গলবার ১৫ই নভেম্বর সন্ধ্যা ৬॥টায়
টিকেটঃ ৫, ৩, ২, ও ১ টাকা
শ্রেঃ জ্ঞানেশ মুখার্জী, বীরু মুখার্জী, সুনীল বন্দ্যোঃ, অজিতনাথ বন্দ্যোঃ, অমর মুখার্জী, মাস্টার জ্যোতিপ্রকাশ, শেফালী বন্দ্যোঃ, চিত্রা মণ্ডল, কালিন্দী সেন ও রেবা রায়চৌধুরী ॥

(সি ৯২১৫)

গিরিশ থিয়েটার

কলিকাতায় ৫ম স্থায়ী নাট্যশালা
প্রযোজনা ও উপস্থাপনা—বিশ্বরূপা থিয়েটার
স্থান : বিশ্বরূপা থিয়েটার (৫৫-৩২৬২)
বিবেকের তাড়নায় অস্থির যাত্রিপূর্ণ

সোমবার,
বুধবার
ও শুক্রবার
সন্ধ্যা ৬॥টায়

এবং রবি ও ছুটির দিন সকাল ১০॥টায়
নাটক—[illegible] : পরিচালনা—বিধায়ক
আঙ্গিক নির্দেশনা—তাপস সেন
শ্রেঃ—মহেন্দ্র গুপ্ত, জ্ঞানেশ মুখার্জি, বিধায়ক ভট্টাচার্য, সুনীল ব্যানার্জি, অরুণ, নরেশ, প্রশান্ত, গীতা দে ও জয়শ্রী সেন

নাট্যামোদীদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন যে, তাঁদের আশীর্বাদেই "অংগার" সাফল্য লাভ করেছে এবং লিট্‌ল্‌ থিয়েটার গ্রুপের বিপদ কেটে গিয়ে তাঁরা সুদিনের মুখ দেখেছেন। তিনি আরো বলেন, নাট্যামোদীরাই তাঁদের রক্ষা করেছেন এবং ভবিষ্যতেও নিশ্চয়ই করবেন।

বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রবীণতম কয়েকজন শিল্পী ও কলাকুশলীকে এই উপলক্ষে লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হয়। তাঁদের নাম—হেমন্তকুমারী (গিরিশচন্দ্রের আমলের), তারক বাগচী, নীরদাসুন্দরী, মণীন্দ্রনাথ দাস ওরফে নানুবাবু, ভূতনাথ দাস ও মনোরমা।

এই উৎসব উপলক্ষে মিনার্ভা থিয়েটারের লবিতে শিশিরকুমারের একটি আবক্ষ মৃন্ময় মূর্তি স্থাপিত হয়। মূর্তিটি নির্মাণ করেছেন কৃষ্ণনগরের জনৈক মৃৎশিল্পী।

উৎসবান্তে "অংগার" পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনীত হয়।

অনুষ্ঠান সংবাদ

গত ২৫শে অক্টোবর কলাবাগান (টালীগঞ্জ) শ্যামাপূজা উৎসব কমিটির উদ্যোগে স্থানীয় পূজামণ্ডপে একটি বিরাট বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন পশ্চিমবঙ্গের ডি-আই-জি শ্রী পি কে বসু এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন কলকাতার পুলিস কমিশনার শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায়। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, নির্মলেন্দু চৌধুরী, সমরেশ রায়, বাণী ঘোষাল, নীতা সেন, সাবিত্রী ঘোষ, ইলা বসু ও অনিল দত্ত কণ্ঠসংগীতে উপস্থিত শ্রোতাদের আনন্দ দেন। জহর রায়ের কৌতুক-নক্সা সকলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করে। কৌতুক পরিবেশনে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন মিণ্টু দাশগুপ্ত, মিণ্টু চক্রবর্তী, সুশীল দাস, অজিত চট্টোপাধ্যায় ও যোগেশ দত্ত (মূকাভিনয়)। জনপ্রিয় যন্ত্র-সংগীত পরিবেশন করেন ভি বালসরা ও তাঁর সম্প্রদায়।

* * *

গম্ভীরা পরিষদের বিজয়া সম্মেলন শ্রীসুধাংশু বক্সীর সভাপতিত্বে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল বিজয়া-গীতি আলেখ্য। এতে অংশ গ্রহণ করেন তারাপদ লাহিড়ী, রবি বন্দ্যোপাধ্যায়, রেবা লাহিড়ী ও পরিষদের অন্যান্য শিল্পীবৃন্দ। ডক্টর মণিনাক্ষ সান্যালের গম্ভীরা গান সম্বন্ধীয় বক্তৃতাটি উপভোগ্য হয়।

* * *

সিনে আর্ট প্রোডাকসন্সের "গংগা"-র একটি দৃশ্যে জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জীবন কাহিনী নাট্যাকারে সকলের সামনে উপস্থিত করবেন বহুমুখী সম্প্রদায়ের সদস্যেরা। সাধন সরকারের পরিচালনায় আগামী ১১ই নভেম্বর রঙমহলে এই নাটকটি অভিনীত হবে।

* * *

দিশারী সাংস্কৃতিক পরিষদ তাদের বার্ষিক মিলনোৎসব উপলক্ষে আগামী ১২ই নভেম্বর সন্ধ্যা সাতটায় গণেশচন্দ্র এভিনিউস্থিত এ বি টি এ হলে যোগেশ দত্তের মূক-অভিনয়ের আয়োজন করেছেন। দু' ঘণ্টাব্যাপী নির্বাক অভিনয়ের মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ কাহিনী পরিবেশন করবেন এই প্রখ্যাত মূক-শিল্পী। এদেশে এই ধরনের প্রচেষ্টা এই প্রথম। "দিশারী"র সভ্যেরা সংস্থার কার্যালয়ে (৯।৪এ, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, কলি-১৪) প্রবেশপত্র পাবেন।

বিবিধ সংবাদ

এ বছরকার লণ্ডন চলচ্চিত্র উৎসবে জগতের সেরা ছবির অভূতপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে। এইটি উৎসবের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন। সবশুদ্ধ চব্বিশটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফিল্ম এবারকার উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে গেছে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'জলসাঘর'। এর দুটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে। ৬ই নভেম্বর 'জলসাঘরে'-র শেষ প্রদর্শনীর সঙ্গে উৎসবেরও সমাপ্তি ঘোষিত হয়। যদিও উৎসবে প্রদর্শিত

সর্বত্র এজেণ্ট চাই
খবরের
কাগজের
আকারে
৮ পৃষ্ঠা
২০ নঃ পঃ
চিত্রজগৎ
সিনেমা পাক্ষিক পত্র
৭৪ লেক এভিনু, কলি-২৬
(সি ৯১৬০)

ষ্টারে (শীতাতপনিয়ন্ত্রিত)
ফোন : ৫৫-১১৩৯
প্রতি বৃহস্পতি ও শনি ৬॥ টা
প্রতি রবিবার ৩ টা ও ৬॥ টা
শ্রেয়সী
ছবি বিশ্বাস • কমল মিত্র
সাবিত্রী চট্টো • বসন্ত চৌধুরী
অজিত বন্দ্যো • অপর্ণা দেবী
অনুপ • লিলি • শ্যাম ও
ভানু বন্দ্যো

'দেবী চৌধুরাণী'-র আগামী চিত্র-সংস্করণ সম্বন্ধে পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের সংগে আলাপরত সুচিত্রা সেন। শ্রীমতী সেন ছবির নাম-ভূমিকায় নির্বাচিত হয়েছেন

অধিকাংশ ছবিরই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে লণ্ডনে প্রদর্শিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে, তবুও উৎসবের প্রতিটি প্রদর্শনীর টিকিট বেশ কিছুদিন আগেই নিঃশেষিত হয়ে যায়। 'জলসাঘর'-এর টিকিট পক্ষকাল পূর্বেই নাকি নিঃশেষিত হয়। বার্লিনে পুরস্কারপ্রাপ্ত ফরাসী ছবি 'লেজে দ্য লামুর' দিয়ে উৎসবের উদ্বোধন হয়। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ছবির নাম—চেকোশ্লোভাকিয়ার 'রোমিও জুলিয়েট এণ্ড ডার্কনেস', ইতালীর 'লাভেন্তুরা', জাপানের 'নো গ্রেটার লভ', পূর্ব জার্মানীর 'লভ্‌স কনফিউসান', পোল্যাণ্ডের 'ব্যাড লাক', আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 'স্ট্যাড্‌স্ লনিগ্যান' ও সোভিয়েত রাশিয়ার 'লেডি উইথ দি লিট্‌ল্ ডগ।'

* * *

নবগঠিত ফিল্ম ফিন্যান্স করপোরেশন সাহায্যপ্রার্থী চিত্রপ্রযোজকদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করেছেন তাঁদের ছবির বিস্তারিত বিবরণ সমেত। ছাপানো ফর্মে এই আবেদন করতে হবে। কর্পোরেশনের কার্যালয়ে (৯১, ওয়ালকেশ্বর রোড, বোম্বাই—৬) এক টাকা মূল্যে এই ফর্ম পাওয়া যাবে। প্রতি আবেদনের সংগে ফী হিসাবে আড়াই শো টাকা এবং জমা হিসাবে আড়াই হাজার টাকা পাঠাতে হবে। সেই সংগে প্রস্তাবিত চিত্রের চিত্রনাট্য ও ইংরেজীতে কাহিনীর সারাংশও দিতে হবে।

রঙমহল
ফোনঃ ৫৫ ১৬১৯
বিমল মিত্রের
সাহেব বিবি গোলাম
নাট্যরূপ শচীন সেনগুপ্ত

চিঠিপত্র

আধুনিক রূপকথা

মহাশয়,—উপরের শীর্ষলিপিতে গত ২২শে আশ্বিন সংখ্যায় যা লিখেছেন তাতে বাংলা কথাচিত্রের বর্তমান প্রগতির সীমা সম্পর্কে চিন্তার অনেক খোরাক পাওয়া যায়। যান্ত্রিক পরিচালিত 'স্মৃতিটুকু থাক' কথাচিত্রের পুনর্বিচারের জন্য কথাচিত্রের কয়েকটি দিকের সংক্ষেপে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক নয়। আধুনিক কথাচিত্রের দ্রুত অগ্রগতির ইতিহাসের কয়েকটি milestone বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। প্রতীচ্য দেশগুলিতে কথাচিত্রের যে অচিন্ত্যনীয় প্রগতি হয়েছে তার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় চার্লি চ্যাপলিন, আইজেনস্টাইন, ডি সিকা, সিসিল বি ডিমিল, ডিনো ডি লরেনসিসের কয়েকখানি ছবিতে। এই সকল পাশ্চাত্য শক্তিশালী পরিচালকের কয়েকটি সৃষ্টিমূলক কথাচিত্র আলোচনা করলেই বোঝা যাবে যে 'চিত্র কাহিনীর মৌলিক দুর্বলতা, অসঙ্গতি, বৈসাদৃশ্য' থাকলে চ্যাপলিন, আইজেনস্টাইন বা ডিনো ডি লরেনসিসের কথাচিত্রগুলি এত প্রাণবান ও 'true photography of life' হতে পারত না।

চ্যাপলিনের নির্বাক কথাচিত্র বাদ দিলেও সবাক কথাচিত্রগুলির মধ্যে 'গোল্ড রাশ' বা 'মঁসিয়ে ভার্দু' আলোচনা করলে দেখা যায় যে চ্যাপলিনের কথাচিত্র দুটি কেবল 'টেকনিকাল কোয়ালিটিতেই' অপূর্ব হয় নি তাই নয়, কথাচিত্র দুটি বলিষ্ঠ কাহিনীর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। আইজেনস্টাইনের 'ব্যাটলশিপ্ পটেমকিন্', 'আলেকজান্দার নেভস্কি', 'স্ট্রাইক্', 'আইভান-দি-টেরিবল্' কথাচিত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে 'টেকনিকাল কোয়ালিটিস্' ছাড়াও তাদের প্রাণবান কাহিনীই ছিল শক্তিশালী পরিচালক আইজেনস্টাইনের অনুপ্রেরণা। ডি সিকার 'বাইসাইকেল থীফ'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে লিণ্ডসে এণ্ডারসন বলেছেন,—

"......But before five minutes had passed my interpreter was forgetting to interpret, and I was forgetting to ask her to do so."

'বাইসাইকেল থীফে'র বলিষ্ঠ কাহিনীর প্রশংসা এর চেয়ে বেশী নিষ্প্রয়োজন। সিসিল বি ডিমিলের 'টেন কম্যাণ্ডমেণ্টস', ডিনো ডি লরেনসিসের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' ও বর্তমানে কলিকাতার প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত 'টেমপেস্ট্' এবং প্রাচ্যের 'য়ুকিওয়াদিস্', 'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিত', 'অপুর সংসার', 'কাবুলিওয়ালা', 'বাইশে শ্রাবণ'—এই সকল বলিষ্ঠ ও প্রাণবান কথাচিত্রগুলি আলোচনা করলে এই কথাটি স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে 'চিত্র কাহিনীর মৌলিক দুর্বলতা, অসঙ্গতি ও বৈসাদৃশ্য' থাকলে কোন পরিচালকের ক্ষমতা নেই যে তাঁর শিল্পরূপ বিন্যাসের গুণে সহজেই ঢেকে দেবেন। ইতি—অরুণকুমার জানদুরী, কলিকাতা—২

খেলার মাঠে

একলব্য

দিল্লী, হায়দরাবাদ, বোম্বাই, বাঙগালোর ও মাদ্রাজে প্রদর্শনী টেনিস খেলায় অংশ গ্রহণের পর বিশ্বখ্যাত জ্যাক ক্র্যামারের দলের পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়রা এসেছিলেন কলকাতায়। কলকাতায় সাউথ ক্লাবে এ'রা দুদিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দেশে ফিরে গেছেন।

বলা বাহুল্য, পেশাদার খেলোয়াড়রা প্রদর্শনী খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন নিজেদের মধ্যে। কারণ আন্তর্জাতিক টেনিস সংস্থা পেশাদার খেলোয়াড়দের সঙ্গে এমেচার খেলোয়াড়দের খেলার সুযোগ এখনো দেয়নি। কবে যে দেবে, তারও ঠিক-ঠিকানা নেই। তবে বিশ্ব টেনিসের আজ যা পরিস্থিতি, তাতে এমেচার ও পেশাদার খেলোয়াড়দের একসঙ্গে খেলার যে বাধা আছে, তা একদিন উঠে যাবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যাক সে কথা।

কলকাতায় পেশাদার খেলোয়াড়দের খেলা এই প্রথম নয়। সাম্প্রতিক কালের টেনিসে এটি তৃতীয় সফর। এর আগে দুবার জ্যাক ক্র্যামারের দল কলকাতায় খেলে গেছেন। প্রথমবার এসেছিলেন ক্র্যামার নিজে লুই হোড, কেন রোজওয়াল ও পাকো সেগুরাকে সঙ্গে নিয়ে। পরের বার এসেছিলেন ফ্রাঙ্ক সেজম্যান, টনি ট্রাবার্ট, কেন রোজওয়াল ও পাকো সেগুরা। এবারকার দলে ছিলেন অ্যাসলে কুপার, এলেক্স অলমেডো, ম্যাল এণ্ডারসন ও এণ্ড্রে জিমেনো। চারজনই তরুণ। টেনিসের নিপুণ শিল্পী। এর মধ্যে কুপার ও অলমেডো প্রাক্তন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান।

একেই পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়দের জগৎজোড়া নাম-ডাক তার উপর দলে দুজন রয়েছেন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান। সুতরাং এ'দের খেলা দেখার জন্য টেনিস-প্রিয় দর্শক সমর্থকরা মেতে উঠবেন, এটা খুবই স্বাভাবিক। তাই দুদিনই সাউথ ক্লাবে প্রচুর জনসমাগম হয়। অবশ্য জন-সমাগম না বলে ধনিক সমাগমও বলা যেতে পারে। অর্থাৎ ধনের যাঁরা অধিকারী, তাঁরাই ছিলেন সংখ্যাগুরু। 'জন' কথাটির মধ্যে সাধারণ মানুষের গন্ধ পাওয়া যায়। সাধারণের পক্ষে পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়দের খেলা দেখার সুযোগ কোথায়? আপনি যদি নিতান্তই টেনিস-রসিক হন, তাহলে আপনাকে একদিনের জন্য অন্ততঃ ১০টি টাকা খরচ করতে হবে। মধ্যবিত্ত দর্শকের পক্ষে একদিনের খেলা দেখার জন্য দশ টাকা খরচ করা প্রায় সাধ্যাতীত। সুতরাং এ-শ্রেণীর দর্শক কিছু না হলেন, এমন নয়। কিন্তু তার ফল? বেশী পয়সায় [illegible] পারেননি। কুড়ি, কিম্বা তিরিশ টাকার টিকিটে যাঁরা এসেছেন। টেনিস অভিজাত খেলা। এখানকার দর্শকও অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত। এ'রা শুধু খেলা দেখতেই আসেন না। আসেন টেনিসের আবহাওয়াকে গরম করতে, পারিপার্শ্বিকতায় রং ফলাতে। চিত্রিত পরিবেশের মধ্যে বিচিত্র বেশে।

এখন খেলার কথা। এর আগে দুবার পেশাদার খেলোয়াড়দের খেলা হয়েছে সাউথ ক্লাবের গ্রাস কোর্টে। কিন্তু এবার গ্রাস কোর্ট পুরোপুরি তৈরী হয়ে না ওঠায় এবং আকস্মিক বৃষ্টির জন্য হার্ড কোর্টে খেলার আয়োজন করা হয়েছিল। দুদিনের প্রদর্শনী খেলাকে আমন্ত্রণ টেনিস প্রতি-যোগিতা নামে অভিহিত করা হয়। দুটি সিঙ্গলস ও একটি ডাবলসের খেলা প্রতিদিনের অনুষ্ঠান তালিকায় স্থান পায়। প্রথম দিনের দুটি সিঙ্গলস খেলায় দুই বিজয়ী পরের দিন পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন আমন্ত্রণ প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে। আমন্ত্রণ প্রতিযোগিতাই বলা হক, আর প্রদর্শনী টেনিস খেলাই বলা হক, পেশাদার খেলোয়াড়দের খেলায় কে জিতল আর কে হারল, সেটা বড় কথা নয়। কে কেমন খেলল, সেইটাই বিচার্য বিষয়। এ বিচারে অবশ্য আমন্ত্রণ প্রতিযোগিতা বিজয়ী স্পেনের খেলোয়াড় এণ্ড্রে জিমেনো দর্শক-দের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। কুপার এবং এণ্ডারসনের খেলাতেও উন্নত কলাচাতুর্য প্রত্যক্ষ করা গেছে। অলমেডো তাঁর খ্যাতি অনুযায়ী খেলতে না পারলেও মাঝে মাঝে তাঁর নিপুণ হাতের মার দর্শকদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, তিনি কত উঁচু জাতের খেলোয়াড়। তবু বলব, এ'দের কাছ থেকে টেনিসের যে ছলাকলা দেখার আশা

জ্যাক ক্র্যামারের দলের দুজন টেনিস শিল্পী—স্পেনের এণ্ড্রে জিমেনো (বাঁ দিকে) ও পেরুর এলেক্স অলমেডো

জ্যাক ক্র্যামারের পেশাদার দলের অস্ট্রেলিয়ান জুটি—ম্যাল এণ্ডারসন (বাঁ দিকে) ও অ্যাসলে কুপার

করেছিলাম, তা দেখিনি। জ্যাক ক্র্যামারের দলের যাঁরা আগে এখানে খেলে গেছেন, তাঁদের সঙ্গে এ'দের খেলার তুলনামূলক বিচার করলে আগের খেলোয়াড়দের ভাল বলে স্বীকার করে নিতে হয়। উন্নত কলা-নৈপুণ্যে তাঁরা যেভাবে দর্শকচিত্ত জয় করে নিয়েছিলেন, এ'রা তা পারেননি।

জ্যাক ক্র্যামারের টেনিস দলকে বলা হয় ক্র্যামারের সার্কাস পার্টি। সার্কাস পার্টির মতই এ'রা সারা বিশ্ব ঘুরে ঘুরে খেলা দেখান, আর খেলার মধ্যেও থাকে সার্কাসের 'ভেল্কি'। তাই এ'দের খেলা দেখার এত আকর্ষণ। কিন্তু সেই খেলার মধ্যে যদি 'ভেল্কি'র কোন পরিচয় না থাকে, তবে স্বাভাবিকভাবেই দর্শকরা নিরাশ হয়ে পড়েন। এখানে দর্শকরা নিরাশ হয়েছেন, একথা বলি না; তবে খেলা দেখে দর্শকদের মন ভরেনি। একটা অতৃপ্তি রয়ে গেছে। যেন কিছু দেখলে তৃপ্তি পেতাম—এমন একটা ভাব।

ক্র্যামারের দলের সবাই টেনিসের নিপুণ শিল্পী সন্দেহ নেই। কিন্তু সব দিন ত সবাই ভাল খেলতে পারে না। শরীরের ভাল মন্দ আছে, আবহাওয়ার প্রতিক্রিয়া আছে, পথ-ভ্রমণের ক্লান্তি আছে, আছে বিরামহীন খেলার মানসিক প্রতিক্রিয়া। তাই সব দিন সব মা'র কার্যকরী হয় না। একটু ভুলচুক খেলার সমস্ত রং বদলিয়ে দেয়। বিশ্বখ্যাত লুই হোডের খেলাতেই আমরা এ-জিনিস প্রত্যক্ষ করেছি। 'পাওয়ার টেনিস' কাকে বলে লুই হোডই আমাদের তা দেখিয়ে গেছেন, টনি ট্রাবার্টের র‍্যাকেটেও তার আভাস পেয়েছি। কিন্তু হোড ও ট্রাবার্ট দুজনেই ভুলচুক করে গেছেন যথেষ্ট। নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে দর্শকচিত্ত জয় করে গেছেন কেন রোজওয়াল।

টেনিস বড় শক্ত খেলা। এর সব মা'র বা 'স্ট্রোক' সবাই করায়ত্ত করতে পারে না। কাউকে শেখানোও কষ্টকর। অভিজ্ঞতা এবং অনুশীলনের মাধ্যমেই তাকে আয়ত্ত করতে হয়। অধিগত বিদ্যাও আবার অনেক সময় 'বেইমানী' করে বিদ্যার অধিকারীর সঙ্গে। তাই টেনিস খেলায় এত অপ্রত্যাশিত ফলাফল।

উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান এলেক্স অলমেডো, যাঁর ক্রীড়ানৈপুণ্যের বলে ১৯৫৮ সালে আমেরিকান ডেভিস কাপ লাভ করে তিনি যে এখানে খ্যাতি অনুযায়ী খেলতে পারেননি, তার কারণ একই। ১৯৫৮ সালে অলমেডো অস্ট্রেলিয়ার অ্যাসলে কুপার এবং ম্যাল এণ্ডারসনকে হারিয়েই আমেরিকার জন্য ডেভিস কাপ পুনরুদ্ধার করেছিলেন। ১৯৫৯ সালে তিনি ছিলেন এমেচার জগতের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়—উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান। কিন্তু এখানে তিনি কুপার, এণ্ডারসন এবং জিমেনোর মত দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেননি। প্রথম দিন তিনি পরাজিত হন স্পেনের খেলোয়াড় জিমেনোর কাছে। পরের দিন অস্ট্রেলিয়ার ম্যাল এণ্ডারসনের কাছে। দুদিনই স্ট্রেট সেটে খেলার ফলাফল মীমাংসিত হয়।

এলেক্স অলমেডো ডেভিস কাপে আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব করলেও ইনি পেরুর অধিবাসী। আমেরিকার ইউনি-ভার্সিটিতে পড়বার সময় সেখানে বসবাস করবার অধিকারে আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব করেন। গায়ের বর্ণ শ্যাম। খুব ছোট করে চুল ছাঁটা। মজবুত গড়ন। কাটখোট্টা চেহারা। অনেকটা ব্রহ্মদেশের অধিবাসীর মত। বয়স ২৪ বছর। মুখে হাসি নেই বললেই চলে। খেলা দেখিয়েও দর্শকদের মুখে হাসি ফোটাতে পারেননি। উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভের পর ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ইনি পেশাদার বৃত্তি গ্রহণ করেছেন।

উইম্বলডন বিজয়ী না হলেও অস্ট্রেলিয়ার ম্যাল এণ্ডারসন অন্যান্য টেনিস কলা-কুশলীদের সমকক্ষ খেলোয়াড়। অ্যাসলে কুপার এবং এণ্ডারসন ছিলেন বিশ্বের অদ্বিতীয় ডাবলস জুটি। ম্যাল এণ্ডারসন ১৯৫৭ সালে 'ফরেস্ট হিলের' চ্যাম্পিয়ান-শিপ লাভ করেন এবং ১৯৫৮ সালে হন পেশাদার খেলোয়াড়।

এণ্ডারসনের হাতে সব রকমের মা'র আছে। সার্ভিস মেদিনী কাঁপানো। চারজনের সার্ভিসের মধ্যে এণ্ডারসনের সার্ভিসেই গতিবেগ ছিল সবচেয়ে বেশী। চমৎকার ব্যাকহাণ্ড। প্রথম দিন অ্যাসলে কুপারের কাছে পরাজয় স্বীকার করলেও বিজয়ীর চেয়ে এণ্ডারসন কোন অংশে মন্দ খেলেননি। আর দ্বিতীয় দিনে অলমেডোকে স্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন নিজের উপর পরিপূর্ণ আস্থা রেখে খেলে। এণ্ডারসনের খেলায়, যার অভাব লক্ষ্য করেছি, সেটা হচ্ছে 'স্টামিনা'। একটুখানি 'স্ট্যামিনার' অভাব আছে এণ্ডারসনের। অ্যাসলে কুপারের সঙ্গে এইজন্যই তিনি [illegible] ওঠেননি। ছিপছিপে দীর্ঘ দেহ এণ্ডার-সনের খেলার সময় একটা সদাহাস্য [illegible] অলমেডোর উল্টো। রসিক খেলোয়াড় হিসাবে পরিচিত। এখানেও তার [illegible] দিয়েছেন। কোন সময় কোমর [illegible]

একটু নেচে, কোন সময়ে নিজের স্ট্রোকে নিজেই হাততালি দিয়ে, দর্শকদের দিয়েছেন আনন্দ। জয়ে এবং পরাজয়ে সদা-হাস্যময় খেলোয়াড় এণ্ডারসন।

৪ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে অ্যাসলে কুপারের পেছনে 'তকমা' সব চেয়ে। ইনি ১৯৫৮ সালের শুধু উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নই নন। এই বছর ইনি আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ারও চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেন। অত্যন্ত পরিশ্রমী খেলোয়াড়। দেহের উচ্চতা কিছু কম। কিন্তু সে ক্ষতি পূরণ করে নিয়েছেন ইনি শ্রমশীলতার দ্বারা। কোর্টের যত্রতত্র গতাগতি। মারের হাতও চমৎকার। সার্ভিসও প্রতিপক্ষের ত্রাস সঞ্চারক।

দিল্লি, হায়দরাবাদ, বোম্বাই, বাঙ্গালোর, মাদ্রাজ—ভারতের কোথাও কুপার পরাজয় স্বীকার করেননি। জয়ের রথ চালিয়েই এসেছিলেন কলকাতায়। কিন্তু কলকাতায় তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে প্রথম পরাজয় স্পেনের তরুণ খেলোয়াড় এণ্ড্রে জিমেনোর কাছে। বোম্বাইতে জিমেনোকে হার স্বীকার করতে হয়েছিল তিন সেটের খেলায়। এখানে জিমেনো তার পরাজয়ের শোধ তুলেছেন বলা যেতে পারে। কোন জায়গাতেই বিজয়ীর জয় সহজ লভ্য হয়নি। বোম্বাইতে জিমেনোকে হারাতে কুপার যেমন হিমসিম খেয়ে উঠেছিলেন এখানেও জিমেনো হিমসিম খেয়েছেন কুপারকে পরাভূত করতে।

সত্যি কথা বলতে কি পেশাদার খেলোয়াড়দের দু দিনব্যাপী খেলার মধ্যে এই খেলাটিই দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে সব চেয়ে বেশী। ৯৪ মিনিট ধরে দর্শকরা দেখেছেন টেনিসের উন্নত ক্রীড়াশৈলী। জিমেনোর হাতের মারে যেমন আছে তীব্রতা তেমনই সূক্ষ্ম নৈপুণ্য। তার বল ফেরানোর কৌশল, ভাল মারার দক্ষতা, সার্ভিস সবই টেনিসের উচ্চগ্রামে বাঁধা।

এ্যাণ্ড্রো জিমেনো স্পেনের অধিবাসী। জ্যাক ক্রামার সর্বশেষে একে তাঁর দলভুক্ত করেছেন। কুপার, অলমেডো ও এণ্ডারসনের পেছনে যেমন কৃতিত্বের 'তকমা' আছে জিমেনোর পেছনে তা নেই। তার কৃতিত্বের মধ্যে আছে গতবার কুইন্স ক্লাবের চ্যাম্পিয়নশিপ। সে তো নগণ্য প্রতিযোগিতা! কিন্তু জহুরী জহর চেনে। জ্যাক ক্রামারের ঈগল-চোখ জিমেনোকে চিনতে ভুল করেনি। তার স্বল্পপরিসর টেনিসের মধ্যেই ক্র্যামার প্রতিভার সন্ধান পেয়েছেন।

দীর্ঘদেহী হাস্যোজ্জ্বল চেহারা এ্যাণ্ড্রে জিমেনোর। টেনিস খেলার উপযোগী দীর্ঘ তনু প্রসারিত হস্ত। খেলাও মাধুর্যে ভরা। ভবিষ্যতের একজন দিকপাল খেলোয়াড় এ্যাণ্ড্রে জিমেনো।

পেশাদার খেলোয়াড়রা ডাবলসের খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন অনেকটা হাল্কাভাবে এবং অনেকের হাতের মারেও বাহবাই দেখা [illegible]

ভারতে এদের খেলার ফলাফল দেওয়া হল:—

দিল্লিতে—ম্যাল এণ্ডারসন ৪-৬, ৬-৩ ও ৬-২ গেমে এ্যাণ্ড্রে জিমেনোকে পরাজিত করেন।

অ্যাসলে কুপার পরাজিত করেন এলেক্স অলমেডোকে ৬-৪ ও ৯-৭ গেমে।

ম্যাল এণ্ডারসন ও এলেক্স অলমেডো ডাবলসের খেলায় ৮-৬ ও ৬-১ গেমে অ্যাসলে কুপার ও এ্যাণ্ড্রে জিমেনোকে পরাজিত করেন।

হায়দরাবাদ—অ্যাসলে কুপার ৬-৪ ও ৬-৩ গেমে ম্যাল এণ্ডারসনকে পরাজিত করেন।

ডাবলসে জিমেনো ও অলমেডো কুপার ও এণ্ডারসনের বিরুদ্ধে ৫-২ গেমে এগিয়ে থাকা সময়ে অস্পষ্ট আলোর জন্য খেলা বন্ধ হয়ে যায়।

বোম্বাইতে (প্রথম দিন)—অ্যাসলে কুপার ৬-৩, ৪-৬ ও ১২-১০ গেমে জিমেনোকে পরাজিত করেন।

অলমেডো পরাজিত করেন এণ্ডারসনকে ৬-৩ ও ৬-১ গেমে।

ডাবলসে কুপার ও অলমেডো, এণ্ডারসন ও জিমেনোর বিরুদ্ধে ৭-৫ ও ১-০ গেমে এগিয়ে থাকা সময়ে খেলা বন্ধ হয়ে যায়।

(দ্বিতীয় দিন)—কুপার ১৩-১১ ও ৬-৩ গেমে অলমেডোকে হারিয়ে আমন্ত্রণ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন।

জিমেনো ৩-৬, ৬-১ ও ৬-৪ গেমে পরাজিত করেন এণ্ডারসনকে।

ডাবলসে কুপার ও জিমেনো এণ্ডারসন ও অলমেডোর বিরুদ্ধে ৬-৪ ও ৭-৭ গেমে এগিয়ে থাকা সময়ে খেলা বন্ধ হয়ে যায়।

অ্যাসলে কুপার ৬-৩, ১-৬ ও ৭-৫ গেমে এলেক্স অলমেডোকে পরাজিত করেন।

জিমেনো পরাজিত করেন এণ্ডারসনকে ৬-৪, ৩-৬ ও ৬-১ গেমে।

কুপার ও এণ্ডারসন এবং জিমেনো ও অলমেডোর মধ্যে ডাবলসের খেলায় জয়-পরাজয় অমীমাংসিত থাকে।

মাদ্রাজে—অ্যাসলে কুপার ১০-৮ ও ৬-২ গেমে এলেক্স অলমেডোকে পরাজিত করেন।

এণ্ডারসন জিমেনোর বিরুদ্ধে ৫-৪ গেমে এগিয়ে থাকা সময়ে বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ হয়ে যায়।

কলকাতায় (প্রথম দিন)—অ্যাসলে কুপার ৬-১, ৪-৬ ও ১০-৮ গেমে ম্যাল এণ্ডারসনকে পরাজিত করেন।

জিমেনো পরাজিত করেন এলেক্স অলমেডোকে ৬-২ ও ৭-৫ গেমে।

ডাবলসে কুপার ও জিমেনো ৬-৩ ও ৬-৪ গেমে এণ্ডারসন ও অলমেডোর বিরুদ্ধে বিজয়ী হন।

(দ্বিতীয় দিন)—ম্যাল এণ্ডারসন ৭-৫ ও ৬-২ গেমে অলমেডোকে পরাজিত করেন।

এণ্ড্রে জিমেনো ৯-৭ ও ৬-১ গেমে অ্যাসলে কুপারকে হারিয়ে আমন্ত্রণ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন।

অলমেডো ও জিমেনো বনাম কুপার ও এণ্ডারসনের খেলা ৭-৫, ৫-৬ ও ৭-৭ গেমে সমান সমান থাকবার পর অস্পষ্ট আলোর জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

—প্রকাশিত হ'ল—

প্রখ্যাত সাহিত্যিক
নীহাররঞ্জন গুপ্তের
মহত্তম সৃষ্টি

কত নিশি পোহাওল
৩·৫০

কথা শিল্পম
৩৬, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

—পরিবেশক—
দি নিউ বুক এম্পোরিয়াম
২২-১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

পট ও পুতুল (উপন্যাস) রজত সেন। দাম ২·৫০

দুটি নারী ও একটি যুবকের জীবনের বিচিত্র গতি রজতবাবু নিপুণ হাতে এঁকেছেন এই উপন্যাসে।

পরবর্তী প্রকাশের অপেক্ষায়

সাহিত্য আকাদমী ও রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ কবি ও কথাশিল্পী প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাস

"কুয়াশা"

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
আগে কহ আর

সুলেখা দাশগুপ্তার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। মিত্রা

ডি, এম, বি, প্রকাশন :: ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

স্বদেশী সংবাদ

৩১শে অক্টোবর—দুর্জয় নন্দাঘুণ্টি বাঙালী অভিযাত্রী দলের পদানত হইয়াছে। এই অভিযাত্রী দলের কৃতিত্ব একটি নয়, দুইটি। প্রথম—এঁরা একেবারে নতুন একটি রাস্তা আবিষ্কার করিয়াছেন, দ্বিতীয়—উপযুক্ত সাজসরঞ্জামের অভাব সত্ত্বেও মনের জোরে সাফল্যকে করায়ত্ত করিয়াছেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলির ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টিসাধনের উদ্দেশ্যে আগামী ১৫ই ডিসেম্বর হইতে বিনামূল্যে দুগ্ধ সরবরাহ করিবার এক প্রস্তাব হইয়াছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ শ্রীমালী ঐ পরিকল্পনাটির উদ্বোধন করিবেন।

আগামী ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি পশ্চিমবঙ্গের শিবিরগুলি হইতে আরও দুই হাজার পরিবারকে দণ্ডকারণ্যে লওয়া সম্ভব হইবে। দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যান শ্রীসুকুমার সেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত আলোচনাকালে এই কথা জানান বলিয়া প্রকাশ।

১লা নবেম্বর—অদ্য অপরাহ্নে গার্ডেন রীচ এলেকায় কেন্দ্রীয় সরকারের আঞ্চলিক খাদ্য দপ্তরের নির্মীয়মান এক গুদামের প্রায় ৯০×৭০ ফুট আয়তন কংক্রীটের ছাদ হঠাৎ সম্পূর্ণভাবে ধসিয়া পড়ে। ফলে ছাদ চাপা পড়িয়া একজন মিস্ত্রী ঘটনাস্থলেই মারা যায় এবং অন্যূন ষোল-জন মিস্ত্রী ও শ্রমিক আহত হয়।

২রা নবেম্বর—বর্তমান সরকারী নীতি অনুযায়ী পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুগণ স্বেচ্ছায় দণ্ডকারণ্যে যাইতে অনিচ্ছুক হইলে পরে তাঁহাদের দণ্ডকারণ্য গমন আবশ্যিক করা যাইতে পারে। বর্তমান নীতি সফল না হইলে শিবির-বাসী উদ্বাস্তুদের উপর নোটিস জারী করিয়া ডোল বন্ধ করা ছাড়া সরকারের গত্যন্তর থাকিবে না।

নেহরু-নুন চুক্তি অনুযায়ী ভারত-পাক সীমান্তের কয়েকটি স্থান পাকিস্তানের নিকট হস্তান্তরের জন্য একটি বিল লোকসভার আগামী শীতকালীন অধিবেশনে পেশ করা হইবে। বেরুবাড়ি ও অপর কয়েকটি অঞ্চলের হস্তান্তর সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্ট যে বিখ্যাত রুলিং দিয়াছিলেন, তৎপ্রসঙ্গেই এই বিলটি আনীত হইতেছে।

৩রা নবেম্বর—কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট কমিটির বিনা অনুমতিতেই নাকি কলিকাতা কর্পোরেশনের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও পৌরপিতার যোগসাজশে কয়েক লক্ষ টাকার গ্যাস পোস্ট জলের দরে বিক্রি করিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া এক অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

৪ঠা নবেম্বর—আজ নয়াদিল্লিতে রাজ্য শিক্ষা-মন্ত্রী সম্মেলনে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ কে এল শ্রীমালী তৃতীয় যোজনাকালে ছয় হইতে এগার বৎসর বয়স্ক শিশুদের অবৈতনিক ও বাধ্যতা-মূলক শিক্ষা পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য এক-চার দফা কর্মসূচী বিশ্লেষণ করেন।

অদ্য দুপুরে আসানসোলস্থিত 'সেন র‍্যালে' সাইকেল ফ্যাক্টরির টায়ার গুদামে এক অগ্নি-কাণ্ডের ফলে ঐ ফ্যাক্টরির ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন কর্মী আহত হন এবং অনুমান দেড় লক্ষ টাকার সম্পত্তির ক্ষতি হয় বলিয়া প্রকাশ।

৫ই নবেম্বর—উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রিসভা-সংকট সমাধানের উদ্দেশ্যে শ্রী নেহরুর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত দুইদিনব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার শেষে এক্ষণে সুস্পষ্টরূপে জানা গিয়াছে যে, ডঃ সম্পূর্ণানন্দ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর পদ ত্যাগের সঙ্কল্পে এখনও অটল রহিয়াছেন।

নির্ভীক জাতীয়তাবাদী ও খ্যাতনামা অর্থ-নীতিবিদ ডক্টর প্রমথনাথ ব্যানার্জি অদ্য বিকাল ৫টায় কলিকাতায় বিদ্যাসাগর স্ট্রীটে তাঁহার নিজ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮১ বৎসর হইয়াছিল।

৬ই নবেম্বর—বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে প্রধান-মন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ ভূপালে আনুষ্ঠানিকভাবে একশত কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির কারখানার উদ্বোধন করেন। সরকারী প্রচেষ্টায় নির্মিত ইহা অন্যতম বৃহৎ সংস্থা।

কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান এলাকায় প্রথম শিশু-নিকেতনের (বেবি ক্রেস) দ্বার অদ্য বিকালে টালা পার্কে উদ্ঘাটিত হয়। উহাতে প্রত্যহ দিবাভাগে আনুমানিক পঞ্চাশটি শিশুর রক্ষণা-বেক্ষণ, খেলাধুলা ও কিছু লেখাপড়ারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আজ অপরাহ্নে প্রায় ত্রিশ হাজার বাঙলাভাষী হিন্দু মুসলমানের এক বিরাট সমাবেশে বিভিন্ন বক্তা আসামের সরকারী ভাষা বিলের তীব্র সমা-লোচনা করিয়া বক্তৃতা দেন। আসামের নওগাঁ জেলার অন্তর্গত হোজাইয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিদেশী সংবাদ

৩১শে অক্টোবর—অদ্য রাত্রি আড়াইটায় সর্ব-শেষ সংবাদ হইতে জানা যায় যে, ঘূর্ণি-ঝঞ্ঝার গতিবেগ বৃদ্ধি পাইয়া ঘণ্টায় ৮০ মাইল হইতে ১৫০ মাইল পর্যন্ত দাঁড়াইয়াছে এবং তৎসহ সমুদ্রের প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও বাখরগঞ্জ জেলার উপকূলবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আঘাত হানিতেছে।

আজ ইরাণের রাণী ফারাহের (২২) আট পাউণ্ড ওজনের একটি পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে। এই শিশুটি ইরানের ময়ূর সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী ও যুবরাজ।

১লা নবেম্বর—লিওপোল্ডভিলের কর্তৃপক্ষ মহলের সংবাদে প্রকাশ, সেনাবাহিনীর জোরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা আর সম্ভবপর নহে বুঝিতে পারিয়া কর্নেল মোবুতু ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শ্রীলুমুম্বা ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের সহিত বুঝাপড়ায় উদ্যোগী হইয়াছেন।

২রা নবেম্বর—পূর্ব পাকিস্তানের প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের পূর্ণ বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই। অদ্য রাত্রি ২টায় কলিকাতায় প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, এই বিপর্যয়ে অন্তত সহস্রাধিক লোক প্রাণ হারাইয়াছে। বহু জাহাজ নিমজ্জিত হইয়াছে। কয়েকখানা দেশী ও বিদেশী জাহাজ নোঙর ছিঁড়িয়া সমুদ্রে ভাসিয়া গিয়াছে। সমগ্র চট্টগ্রাম শহর এক বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে।

লণ্ডনে শল্য চিকিৎসকগণ অস্ত্রোপচারের সাহায্যে পিতার দেহ হইতে মূত্রাশয় লইয়া পুত্রের দেহে লাগাইতে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়া আজ জানান হইয়াছে। পিতা পুত্র উভয়েই আরোগ্যলাভ করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ।

আজ নির্ভরযোগ্য মহলের এক সংবাদে প্রকাশ, রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেলের প্রতিনিধি শ্রীরাজেশ্বর দয়াল কঙ্গোতে রাষ্ট্রপুঞ্জের বিরুদ্ধে বেলজিয়ান সরকারের কিছু কিছু কাজকর্ম সম্পর্কে কঠোর মন্তব্যযুক্ত একটি রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছেন।

৩রা নবেম্বর—সোমবারের ঘূর্ণিবাত্যার ফলে চট্টগ্রাম অঞ্চলের ৯০ মাইল উপকূলভূমিতে প্রায় চার হাজার লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে। চট্টগ্রামের ডিভিশন্যাল কমিশনার উপরোক্ত মর্মে সংবাদ পাইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

শীঘ্রই বৃটেনে পৃথিবীর প্রথম 'উড়ন্ত গাড়ি'র কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হইবে। ইহা একটি চার চাকার গাড়ি; ঘণ্টায় স্থলপথে ৩০ মাইল পর্যন্ত চলাচল করিতে পারে এবং স্বল্প পাল্লায় শূন্যপথেও বিচরণ করিতে সক্ষম।

আজ সুইডিস বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি মার্কিন অধ্যাপক ডোনাল্ড এ গ্ল্যাসারকে পদার্থ বিদ্যায় কৃতিত্বের জন্য নোবেল পুরস্কার দিয়াছেন।

শ্রী হিউ গেটস্কেল আজ রাত্রে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীহ্যারল্ড উইলসনকে পরাজিত করিয়া পুনরায় বৃটিশ শ্রমিক দলের নেতৃপদে নির্বাচিত হন। শ্রী গেটস্কেল ভোট পান ১৬৬ ও শ্রী উইলসন পান ৮১।

৪ঠা নবেম্বর—আজ করাচীতে সরকারী সূত্র হইতে জানা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানে তিন সপ্তাহের মধ্যে দুইটি বিপর্যয়কর ঘূর্ণি-ঝঞ্ঝার ফলে ১৫ হইতে ২৯ হাজার লোক প্রাণ হারাইয়াছে এবং দুই লক্ষাধিক লোক গৃহহীন হইয়াছে। প্রথম ঘূর্ণিঝঞ্ঝা ঘটে গত ১০ই অক্টোবর এবং দ্বিতীয়বার ঘূর্ণিঝঞ্ঝা ঘটে গত ৩১শে অক্টোবর।

ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট চার্লস দ্য গল আজ রাত্রে তাঁহার রাজনৈতিক শত্রুদের এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন যে, প্রয়োজন হইলে তিনি পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দিবেন এবং আলজিরিয়ার সমস্যার সমাধান ও প্রজাতন্ত্রকে রক্ষার জন্য জাতীয় গণভোট গ্রহণের আবেদন জানাইবেন।

৫ই নবেম্বর—আজ অপরাহ্নে কাঠমাণ্ডু হইতে একশত মাইল পশ্চিমে ভৈরব বিমান ঘাটির রানওয়ে হইতে উড়িবার সময় রয়াল নেপাল এয়ার লাইনস-এর একটি ডাকোটা বিমান বিধ্বস্ত হইবার ফলে চারিজন বৈমানিক নিহত হয়। নিহতদের মধ্যে নেপালে প্রথম বিমান সার্ভিসের একজন বৈমানিকও আছেন।

৬ই নবেম্বর—চীনের রাষ্ট্রপ্রধান শ্রী লিউ সাও চী বলশেভিক বিপ্লবে যোগদানের জন্য গতকল্য মস্কোতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। শ্রীনিকিতা ক্রুশ্চেফ আজ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। 'তাস' সংবাদ দিয়াছেন যে, তাঁহাদের মধ্যে 'বন্ধুভাবে' আলোচনা হয়।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ
প্রতি সংখ্যা — ৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষান্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষান্মাসিক— ১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

দেশ

DESH 40 Naya Paise
Saturday, 19th November, 1960

২৮ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৩ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

সুব্রত স্মরণে

নাম যাঁর সুব্রত, দেশহিতব্রতে উৎসর্গিত কর্মজীবনে তিনি ছিলেন সার্থকনামা। ঘটনাচক্রে নয়, স্বীয় প্রতিভাবলেই বীর বৈমানিক সুব্রত মুখোপাধ্যায় কর্মসাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন। এ-সাফল্যের তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী, যে-জন্য ভারতীয় বিমানবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের আকস্মিক এবং অকাল মৃত্যুতে সারা ভারতের সর্বশ্রেণীর লোক প্রিয়জন বিয়োগ বেদনা অনুভব করেছে। এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের শূন্য পদের কর্মভার, আজ হোক কাল হোক, ভারতীয় বিমানবাহিনীর অন্য কোনও নেতৃস্থানীয় বৈমানিকের হাতে যথারীতি ন্যস্ত হবে সন্দেহ নাই, কিন্তু ভারতীয় বিমানবাহিনীর অন্যতম প্রধান সংগঠক হিসাবে সুব্রত মুখোপাধ্যায় যে অসামান্য প্রতিভা, বিচক্ষণতা এবং দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তার অভাব সহজে পূর্ণ হবে না। স্বাধীন ভারতের বিমানবাহিনীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়; ভারতীয় বিমানবাহিনীর পরিকল্পনা, সংগঠন, সম্প্রসারণ এবং আধুনিকীকরণের দুরূহ কর্মের প্রত্যেকটি পর্বে সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের প্রতিভার স্বাক্ষর, বিঘ্ন-বিপদ জয়ী সংকল্পের সার্থক প্রয়োজনা।

নবীন ভারতের দেশরক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তুতি পর্বেই ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রথম ভারতীয় সর্বাধিনায়ক সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যু একটি নিদারুণ শোকাবহ এবং বিপর্যয়কর ঘটনা। ভারতীয় বিমানবাহিনীর এখন বয়ঃসন্ধিকাল; ব্রিটিশ আমলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার ছয় বৎসর মাত্র আগে এদেশে ব্রিটিশ রাজকীয় বিমানবাহিনীর একটা শাখা গঠিত হয়। ভারতে বিমানবাহিনীর জন্মকাল থেকে সুব্রত মুখোপাধ্যায় তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তরুণ বৈমানিক সুব্রত সে-যুগেই অসাধারণ কৃতিত্ববলে বিমানবাহিনী পরিচালনায় উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদ

অধিকার করেন। স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দেশ বিভাগের ফলে ভারতীয় বিমানবাহিনীর পুনর্গঠনের সমস্যা একটা কঠিন পরীক্ষারূপে যখন দেখা দেয় তখনই বাংলার তথা ভারতের এই কীর্তিমান সন্তানের দেশপ্রেম, তাঁর দূরদর্শিতা এবং সংগঠনী প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায় বাস্তব কর্মক্ষেত্রে। কাশ্মীর রণাঙ্গনে, হায়দ্রাবাদ অভিযানে এবং সীমান্ত-রক্ষার আয়োজনে, গত তের বৎসরে ভারতীয় বিমানবাহিনী যে গৌরবময় ঐতিহ্য রচনা করেছে তার পশ্চাতে আছে বাংলার বরেণ্য সন্তান দেশহিতব্রতী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নিরলস কর্তব্যনিষ্ঠা এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্ব-ক্ষমতা। বিদেশে আকস্মিক মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত ভারতীয় বিমানবাহিনীর এই প্রতিভাধর বহুদর্শী অধিনায়ক সতত নিযুক্ত ছিলেন ভারত-সীমান্ত রক্ষার জন্য নূতন আয়োজনে বিমানবাহিনীর আধুনিক সংগঠন কর্মে। বীর বৈমানিক অধিনায়ক সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের এই নবারব্ধ ব্রতে অতর্কিত মৃত্যু এসে যে ছেদ ঘটাল তার আঘাত ও ক্ষতি দেশের পক্ষে দুঃসহ।

বাংলা ও বাঙ্গালীর পক্ষে এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যু আরও শোকাবহ, কারণ বাংলার যুবশক্তি সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের প্রতিভা-দীপ্ত কর্মময় জীবন থেকে নব নব বীরোচিত সংকল্পের প্রেরণা লাভ করেছে, গৌরব অনুভব করেছে স্বাধীন ভারতের দেশরক্ষা ব্যবস্থায় এই তরুণ বাঙ্গালী বৈমানিক অধিনায়কের নেতৃত্ব-ক্ষমতার সাফল্যে। সার্থক পৌরুষ এবং সর্বোচ্চ পদমর্যাদাই অবশ্য এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র পরিচয় নয়। নম্র, নিরহঙ্কার এই তরুণ বাঙ্গালী সন্তান ক্ষমতা ও খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে উঠেও আচারে-আচরণে ছিলেন নিতান্ত সহজ মানুষ। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের জীবন মৃত্যুর যবনিকান্তরালবর্তী হলেও অম্লান রইবে তাঁর চরিত্রমাধুর্যের স্মৃতি, অবিস্মরণীয় নবীন ভারতের সামরিক ইতিহাসে তাঁর বিস্ময়কর নেতৃত্ব ও প্রয়োগ-নৈপুণ্যের দান।

প্রসঙ্গত

হেমচন্দ্র নস্কর

পশ্চিম বাংলার সর্বজনপ্রিয় বন ও মৎস্য মন্ত্রী শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর তাঁর বেলেঘাটার বাসভবনে লোকান্তরিত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৭১। বয়সের দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় যে, তাঁর যাবার সময় হয়েছিল, তিনি চলে গেছেন। কিন্তু এই-বয়সেও তাঁর কর্মক্ষমতার কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, সেই সঙ্গে অনুশোচনা জাগে যে, এমন মানুষকে আমরা অকালে

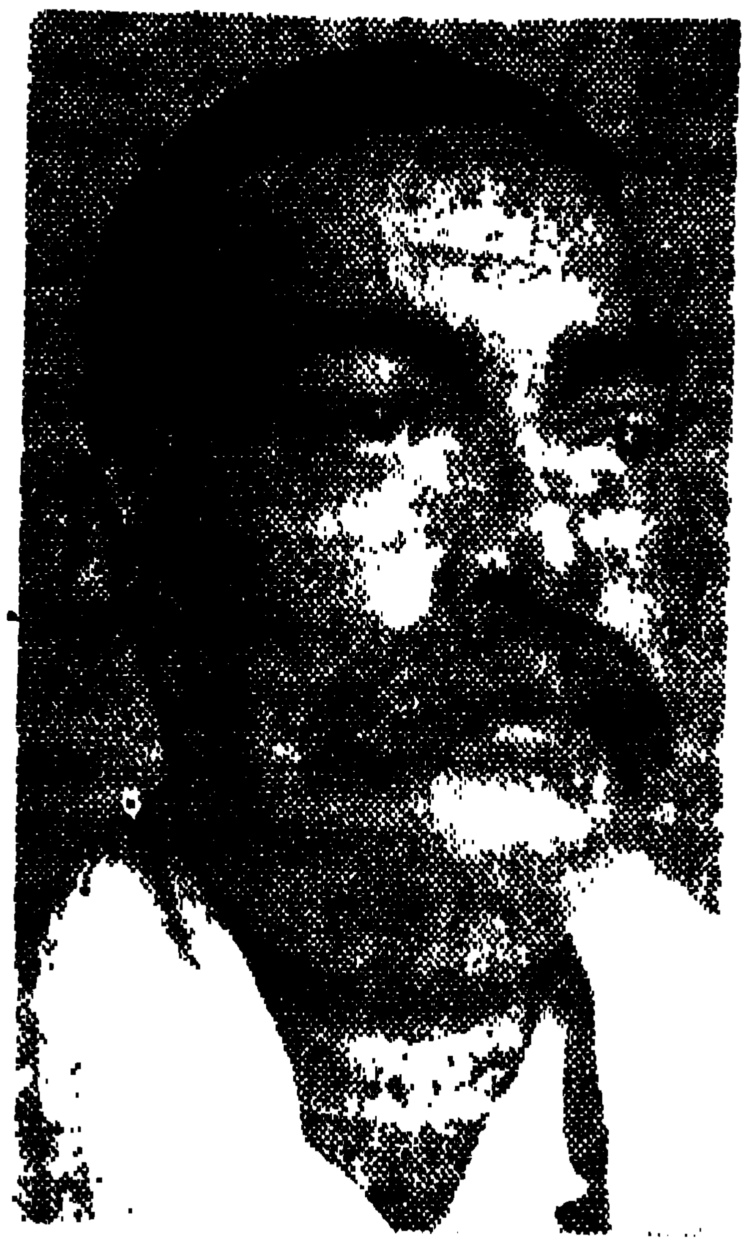

হারিয়েছি। হেমচন্দ্রের অশেষ গুণাবলীর মধ্যে প্রধান ছিল তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য। আপন-পর সকলকেই তিনি কাছে টানতেন, সকলেরই অকুণ্ঠ প্রীতি ও শ্রদ্ধা তিনি অর্জন করেছিলেন। কী বিধান সভায়, কী রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর শত্রু কেউ ছিল না। হেমচন্দ্র ছিলেন তাদেরই প্রতিনিধি যারা দীর্ঘকাল ধরে দেশ ও সমাজের কাছে পেয়ে এসেছে অপমান, অবহেলা ও অনাদর। সমাজের সেই সব চির-উপেক্ষিত মানুষের সেবাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত।

হেমচন্দ্র রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন যৌবনকালে। তখন থেকেই আপন কর্মদক্ষতায় তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন। কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের মেয়র হয়েছিলেন, তার চেয়েও গৌরবের বিষয় হচ্ছে দীর্ঘ তেরো বৎসর অবিচ্ছিন্নভাবে বাংলার মন্ত্রিত্বের পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। কলহ দ্বন্দ্ব বিরোধ থেকে তিনি দূরে থাকতেন বলে দল ও মতনির্বিশেষে তিনি সকলের শ্রদ্ধার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বিধান সভায় শত উত্তেজনা ও হট্টগোলের মধ্যে একমাত্র হেমচন্দ্রকেই দেখা যেত ধীর স্থির, মুখে প্রীতিপূর্ণ হাসি লেগেই আছে, আর আছে বাটা ভরা পান। দ্বন্দ্ব বিরোধ যতই ঘটুক না কেন, পরিশেষে সহাস্য মুখে পানের বাটা এগিয়ে দিয়ে আপন করে নিতেন। এমন নিরহঙ্কার নিরভিমানী মানুষ সংসারে বিরল বলেই তাঁর বিয়োগে দেশবাসী আজ শোকাভিভূত। তাঁর লোকান্তরিত আত্মার প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

লহ অভিনন্দন

নন্দাঘুণ্টি পর্বত অভিযাত্রী বীরবৃন্দ গত রবিবার সকালে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। বিপুল জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনে সেদিন হাওড়া স্টেশন মুখর হয়ে উঠেছিল। শঙ্খধ্বনি ও আনন্দধ্বনির মধ্যে তরুণ অভিযাত্রীদল যখন কামরা থেকে নেমে এলেন তখন চারিদিক থেকে ফুলের মালা ও ফুলের তোড়া অজস্র বর্ষিত হতে লাগল। অগণিত জনতা, অকুণ্ঠ অভিনন্দন, অজস্র পুষ্পবৃষ্টি। কেন? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর, আরেকবার সমগ্র বিশ্বের কাছে বাংলা দেশকে একদল তরুণ গৌরবের আসনে বসিয়েছে। তারা প্রমাণ করে দিয়েছে, বাঙালী আজও মরেনি, কোনোদিনও মরবে না। অভিযানে যাবার সময় 'দেশ' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার দলপতি শ্রীসুকুমার রায়ের হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দিয়েছিলেন। গৌরববাহী সেই জাতীয় পতাকা তিনি হিমাদ্রী-শিখরে উড্ডীন

দলপতি শ্রীসুকুমার রায়

করে জাতির গৌরবকে উচ্চে তুলে ধরেছেন। দুর্জয়কে জয় করার, অজানাকে জানার দুর্মর আকাঙ্ক্ষাই তারুণ্যের ধর্ম। সেই ধর্মের আহ্বানে বাংলার কয়েকজন তরুণ পর্বত-শিখরে আরোহণ করে বিশ্ববাসীর কাছে এই কথাই ঘোষণা করলেন—'বল বীর, চির উন্নত মম শির।'

বাংলার কবি একদিন বঙ্গজননীর কাছে আক্ষেপ জানিয়ে বলেছিলেন—সাত কোটি সন্তানেরে 'বাঙালী' করে রেখেছো, 'মানুষ' করোনি। পর্বতশীর্ষে আরোহণকালে হয়তো এই তরুণ অভিযাত্রী দলের মধ্যে তাজা 'মানুষে'র পরিচয় পেয়ে স্বর্গ থেকে কবির আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছিল। যাঁরা দেশ ও জাতির গৌরব বৃদ্ধি করলেন এবং সেই সঙ্গে বৃদ্ধি করলেন আনন্দবাজার পত্রিকার মর্যাদা, তাঁদের প্রতি দেশবাসীর স্বতোৎসারিত অভিনন্দনের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও বলছি—লহ অভিনন্দন!!

তামিল সাহিত্য সম্মেলন

গত শনিবার কলকাতায় গড়িয়াহাট রোডের রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট-এ তামিল লেখকদের তিন দিনব্যাপী এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ধরনের সম্মেলন কলকাতায় এই প্রথম এবং ভারতের সব জায়গার তামিল লেখকরা এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। শুধু তাই নয়, ব্রহ্ম ও সিংহল দেশ থেকেও লেখকরা এসেছিলেন।

এই উপলক্ষে বাংলার দুই প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্তা আশাপূর্ণা দেবীকে তামিল লেখক সংঘের পক্ষ থেকে রূপার বাতিদান উপহার দিয়ে সম্বর্ধিত করেন। তামিলনাদবাসীদের কাছে রূপার বাতিদান সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতীক।

দক্ষিণ ভারতে তামিল ভাষা ও সাহিত্য আজ সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে আসীন। বহু সাহিত্য-সম্পদ যদিও আজ কালের গর্ভে লীন হয়েছে, তবু যা আজও আছে তার প্রাচুর্য বিস্ময়কর। উদ্যোক্তারা কলকাতায় এই সম্মেলনের আয়োজন করে বাঙালীর অভিনন্দন লাভ করেছেন। ভারতের অন্যান্য ভাষীরাও যদি কলকাতায় এই ধরনের সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করে এক দেশের লেখকদের সঙ্গে অন্য দেশের লেখকদের পরিচয়ের সুযোগ করে দেন তাহলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে ভারত-ঐক্যের পথ সাহিত্যিকরাই সুগম করে তুলতে পারবেন। পাঠকদের মধ্যে অখণ্ড ভারতবোধ জাগিয়ে তোলার কাজে লেখকরাই হবেন অগ্রণী।

বৈদেশিকী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন-দ্বন্দ্বে মিঃ কেনেডি জয়ী হয়েছেন। ইলেকটোরাল কলেজের ভোটে মিঃ কেনেডি ও মিঃ নিক্‌সনের মধ্যে যথেষ্ট তফাত থাকলেও গণভোটে দুজনের মধ্যে তফাত সামান্যই হয়েছে। গণভোটের সংখ্যা মিঃ কেনেডির পক্ষে হয়েছে ৩৩৬১৩৫৮৮ (মোট প্রদত্ত ভোটের ৫০·২ শতাংশ) এবং মিঃ নিক্‌সনের পক্ষে হয়েছে ৩৩৩২৫৬৩৯ (মোট প্রদত্ত ভোটের ৪৯·৮ শতাংশ)। ভোটদান সম্বন্ধে নানারকম দুর্নীতির অভিযোগ করে রিপাবলিকান পার্টির নেতারা প্রদত্ত ভোটের পুনর্গণনা এবং পরীক্ষা দাবি করেছেন। এই দাবি অনুসারে পুনর্গণনা হলে অন্য রকম ফলও বেরুতে পারে একথা তর্কের খাতিরে স্বীকার করে নিলেও মিঃ কেনেডিই যে নির্বাচিত হয়েছেন এবং তাঁর নির্বাচণ বহালই থাকবে এ সম্বন্ধে আসলে কোনো সন্দেহ পোষণ করার কারণ নেই।

অন্য সব কারণ বাদ দিলেও, অন্তত একটা কারণের জন্য মিঃ কেনেডির নির্বাচন আমেরিকার সুনামের পক্ষে ভালো হয়েছে। মিঃ কেনেডি রোমান ক্যাথলিক। এ পর্যন্ত কোন রোমান ক্যাথলিক আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন নি। যাঁরা অতীতে প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা কেউ জিততে পারেন নি। রোমান ক্যাথলিক বলে মিঃ কেনেডির বিরুদ্ধেও অনেক বিদ্বেষ প্রচার হয়েছে। অবশ্য তার সংগে মিঃ নিক্‌সন্‌ এবং তাঁর ইলেকশন সহযোগীদের কোনো সাক্ষাৎ যোগ ছিল না। বরঞ্চ তাঁরা প্রকাশ্যে এই ধরনের প্রোপাগাণ্ডার নিন্দা করেছেন। মিঃ কেনেডি যদি নির্বাচিত না হতেন তবে জগতে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং সংকীর্ণতার অপবাদের রোল উঠত। মিঃ কেনেডির জয় হওয়াতে সেটা হবে না। যদিও একথা মোটেই বলা যায় না যে ভোটাভুটির উপর এই ধর্মের ব্যাপারটার কোনো প্রভাব পড়ে নি। হয়ত বেশ বেশি প্রভাবই পড়েছে। সাধারণভাবে রোমান ক্যাথলিক ভোটাররা মিঃ কেনেডির প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছে বলে অনেকেই মনে করেন। যে-সব স্টেটে বেশি সংখ্যায় ক্যাথলিক আছে সে সব স্টেটে মিঃ কেনেডির পক্ষে ভোট প্রায় সবক্ষেত্রেই বেশ বেশি হয়েছে। এই থেকে মনে হয় যে অনেক ক্যাথলিক ভোটার মিঃ কেনেডি ক্যাথলিক বলেই তাঁকে সমর্থন করেছেন। অন্য পক্ষে মিঃ নিক্‌সন্‌ যে এত বেশি ভোট পেয়েছেন তার কারণ অনেকে মনে করেন যে, বহু লোক মিঃ কেনেডি ক্যাথলিক বলেই তাঁকে ভোট না দিয়া মিঃ নিক্‌সনকে ভোট দিয়েছে, অর্থাৎ মিঃ কেনেডি যদি ক্যাথলিক না হতেন তবে তাঁর ও মিঃ নিক্‌সন্‌-এর ভোটের মধ্যে পার্থক্য এত কম হতো না, মিঃ নিক্‌সন্‌ আরো অনেক বেশি ভোটে হারতেন। এই যুক্তিকে একবারে অসার কিছুতেই বলা যায় না। আমেরিকার জনসাধারণের মধ্যে ডেমোক্রাট পার্টির সমর্থকের সংখ্যাই এখন বেশি। সুতরাং কোনো রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থীর প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হতে হলে তাঁর বেশ কিছু সংখ্যক ডেমোক্রাট ভোটারের সমর্থন পাওয়া চাই। সেটা সম্ভব হয় যদি জাতির চক্ষে প্রার্থীর ব্যক্তি-

রমাপদ চৌধুরীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

এই পৃথিবী পান্থনিবাস

একটি ছোট্ট স্বাস্থ্যনিবাসকে কেন্দ্র করে রচিত এ উপন্যাসটি, অনেকের মতে, লেখকের শ্রেষ্ঠ রচনাই নয়, আধুনিককালের বাংলা সাহিত্যেরও একটি বিশিষ্ট সম্পদ। আমাদের চেনা পৃথিবীর অতিপরিচিত চরিত্রগুলিই তাদের মৌল বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এর পাতায়। লেখকের তীক্ষ্ন দৃষ্টির বিচারে প্রতিটি মানুষের মধ্যে তাদের চরিত্রের আত্মবিরোধও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উচ্চকিত-যৌবন পাঞ্জাবী তরুণী ও ছুঁই-ছুঁই-বাতিকগ্রস্ত গ্রাম্য বৃদ্ধার মধ্যে সত্যই বুঝি কোন পার্থক্য নেই, স্থাপত্যকলার গবেষক প্রফেসর ঘোষ আর চিত্রতারকা গায়ত্রী দেবী, দুজনেই একচক্ষু। শিক্ষিতা মেয়ে রুমা আর গোয়েন্দা-কাহিনীর পাঠক সুপ্রিয়, পাখা কোম্পানীর দালাল শিবনাথবাবু আর তাঁর মেকানিক, খুঁতখুঁতে মনের বৃদ্ধ রমনীরঞ্জন এবং সংগঠক মিসেস ভট্টাচার্য, গৌরী দেবীর মত মিষ্টিমুখ আর বাচ্চা ছেলে বাদলের মত মিষ্টিমন—সর্বোপরি হোটেল-মালিক হিমাদ্রিবাবু ও কুৎসিত চেহারার পরিচারিকা কৌতুকী—সবাই এসে মিশেছে এখানে। একটি ছোট্ট পান্থনিবাস যেন বহু বিচিত্র এই পৃথিবীরই প্রতিচ্ছবি।

দাম পাঁচ টাকা।

লেখকের [illegible] ঐতিহাসিক উপন্যাস

লালবাঈ

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, নয়টি রসের পরেও আরেকটি রস আছে, ঐতিহাসিক রস। সে-রসের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন তিনি, তার বিচারে 'লালবাঈ' সার্থক উপন্যাস। ভাষার ভাস্কর্যে এ বই শুধু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম অধ্যায়ের বাংলাদেশকে যথাযথ পটভূমিতে উপস্থিত করেই ক্ষান্ত হয় নি, দিয়েছে একটি সংগীতের জন্মকথা, বাংলার একটি নিজস্ব ঘরোয়ানার সৃষ্টিকাহিনী। অষ্টম সংস্করণ। দাম ছয় টাকা।

লেখকের শৈশবজীবনীমূলক উপন্যাস

প্রথম প্রহর

আত্মজীবনীর আঙ্গিকে লেখা উপন্যাস বাংলা ভাষায় অল্পই আছে, শৈশব ও কৈশোরের সম্মিলন নিয়ে লেখা সার্থক উপন্যাস আরো কম। 'প্রথম প্রহর' এ দিক থেকে আধুনিককালের অন্যতম রসোত্তীর্ণ সৃষ্টি। ৪র্থ সং। পাঁচ টাকা।

ডি এম লাইব্রেরী : ৪২ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা

গত প্রতিষ্ঠার খুব একটা উচ্চস্থান থাকে অথবা ডেমোক্রাটিক পার্টির গবর্নমেন্টের কাজকর্মে মানুষ এমন বিরক্ত হয়েছে যে তারা পরিবর্তন চায় অথবা রিপাবলিকান পার্টির গবর্নমেন্ট এমন ভালো কাজ করেছে এবং করছে যে, লোকে তাকে সরাতে চায় না। বর্তমান ক্ষেত্রে এর কোনোটাই খাটে না। মিঃ নিক্সন্-এর ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা এমন নয় যে, রিপাবলিকান হওয়া সত্ত্বেও বহু-সংখ্যক ডেমোক্রাট ভোট তিনি আকর্ষণ করতে পারেন। শাসন করছিল রিপাবলিকান পার্টির গবর্নমেন্ট সুতরাং ডেমোক্রাট গবর্নমেন্টের উপর বিরক্ত হবার কথাই ওঠে না। বরঞ্চ গত কয়েক বছর রিপাবলিকান গবর্নমেন্টের কাজকর্মে অনেকের বিরক্ত হবারই কথা। তা সত্ত্বেও যে মিঃ নিক্সন্ ভোটসংখ্যায় মিঃ কেনেডির কাছাকাছি গেছেন তা থেকে এরূপ সন্দেহ করা অন্যায় হবে না যে অনেক ভোটার যারা স্বাভাবিক অবস্থায় ডেমোক্রাটিক প্রার্থীকে ভোট দিত তারা কোনো কারণে তাঁকে না দিয়ে রিপাবলিকান প্রার্থী মিঃ নিক্সন্কে ভোট দিয়েছে। সে কারণটা সম্ভবত এই যে, মিঃ কেনেডি রোমান ক্যাথলিক। যাই হোক মিঃ কেনেডি যখন হারেন নি তখন এই ব্যাপারটার জন্য আমেরিকানদের তত বেশি কথা শুনতে হবে না।

মিঃ কেনেডির নির্বাচনের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতির পরিবর্তন কতখানি হবে তাই নিয়ে জল্পনা কল্পনার অন্ত নেই। পরিবর্তন নিশ্চয়ই কাম্য। কিন্তু কেউ যদি মনে করেন যে, কেবল আমেরিকান নীতির পরিবর্তনের অভাবে এতদিন জাগতিক পরিস্থিতির উন্নতি আটকে আছে তবে সেটা ভুল হবে। আমেরিকার নীতির পরিবর্তন আবশ্যক সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্য দেশের কর্তারা যে যেখানে আছেন সেখানেই থাকবেন। কেবল আমেরিকাতেই পরিবর্তন হবে এরূপ আশা করা বাতুলতা। মিঃ কেনেডির কাছ থেকে যারা নূতন কিছু আশা করেন তাঁদের নিজেদেরও কিছু নূতন ভাব দেখাতে হবে। নির্বাচনী বিতর্কে মিঃ কেনেডি যে-সব কথা বলেছেন তাতে মার্কিন নীতির লক্ষ্য সম্বন্ধে দুই দলের মধ্যে যে খুব তফাত কিছু আছে তা নয়। আমেরিকার শক্তি বাড়ানো এবং সোভিয়েটের তুলনায় সে শক্তি কখনো কম না হয়—এ সম্বন্ধে দুই পার্টির মতের মধ্যে কোনো তফাত নেই। বস্তুত রিপাবলিকান পার্টি আমেরিকার শক্তি বাড়াবার যথোচিত চেষ্টা করে নি। সেই শক্তি বাড়াবার জন্য আরো খরচ করা উচিত ছিল। এই ছিল নির্বাচনী-বিতর্কে ডেমোক্রাট পার্টির অভিযোগ। আমেরিকার শক্তি বৃদ্ধির জন্য মিঃ কেনেডি আরো টাকা খরচ করতে প্রতিশ্রুত। অবশ্য শিক্ষা প্রভৃতির জন্য ব্যয় বৃদ্ধিও ডেমোক্রাটিক পার্টির ইলেকশনী ইস্তাহারের মধ্যে আছে। তবে মিঃ কেনেডি আমেরিকার সামরিক শক্তির উপর জোর কিছু কম দেবেন এরূপ মনে করার কোনো কারণ নেই। অবশ্য নির্বাচনের সময়ে যা বলা হয় তা যে সব করা হয়ে থাকে তা নয়। আর একথাও সত্য যে, কেনেডি সরকার সামরিক শক্তির উপর জোর কম না দিলেও অন্য অনেক বিষয়ের উপর বর্তমান মার্কিন সরকারের চেয়ে কিছু বেশি জোর দেবেন। আমেরিকার সরকারী দপ্তরের আবহাওয়াটা কিছু বদলাবে, কিন্তু পৃথিবীর অন্য দেশের সরকারী দপ্তরগুলির আবহাওয়া যদি যেমন আছে তেমনি থাকে, তবে মোট ফলে যে বিশেষ কিছু পার্থক্য হবে তা বলা যায় না। ৪৩ বছর বয়সের মিঃ কেনেডির সংগে কারবার করার জন্য ও'র কাছাকাছি বয়সের নেতা নির্বাচনের কথা কোনো কোনো দেশের লোকের মনে উঠতে পারে অথবা উঠা উচিত। ক্রুশ্চভ, অ্যাডিনয়ের, দ্য গল, ম্যাকমিলান, নেহরু প্রভৃতি এবং কেনেডির মধ্যে এক পুরুষ দেড় পুরুষের ব্যবধান।

• • •

বর্মার প্রধানমন্ত্রী উ নু দশদিনের জন্য ভারত ভ্রমণে এসেছেন। ভারত-চীন সীমান্ত সম্পর্কিত নজিরাদি পরীক্ষার জন্য দুই পক্ষের যে-কর্মচারীর দল নিযুক্ত আছেন তাঁরা এখন রেংগুনে বৈঠক করছেন। এই এঁদের শেষ বৈঠক। পূর্বে এরা দিল্লিতে এবং পিকিং-এ বৈঠক করেছেন। এবার বৈঠকের স্থান রেংগুন নির্বাচিত হল এবং তারপর উ নু ভারতে আসছেন—এই সব মিলিয়ে কাগজে অনেক রকম জল্পনা কল্পনা বেরিয়েছে। অনেকের ধারণা হয়েছে উ নু চীন ও ভারতের মধ্যে আপোস মীমাংসা করিয়ে দেবার দায়িত্ব নিয়েছেন। উ নুকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, এরূপ মধ্যবর্তিতার কাজ তিনি নেন নি, নিতে পারেনও না। তবে সম্প্রতি বর্মা ও চীনের সীমান্ত সম্পর্কিত যে-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তার কয়েকটি শর্ত সম্বন্ধে উ নু শ্রীনেহরুকে বুঝিয়ে বলবেন। তার প্রয়োজনও আছে। কারণ বর্মা-চীন চুক্তির কোনো কোনো অংশের প্রভাব অন্তত পরোক্ষভাবে ভারত-চীন সমস্যার উপর পড়তে পারে। সুতরাং সেগুলির মর্ম ভালো করে বুঝা দরকার। উ নু ভারত ও চীনের মধ্যবর্তীর কাজ করতে চান না। যদিও উ নু মিঃ চু এন লাইয়ের আপোস মীমাংসার জন্য আগ্রহের কথা বলছেন। উ নু চীন সম্পর্কে নিজে কী বিশ্বাস করেন জানি না। মধ্যবর্তী হয়ে চীনকে দিয়ে কিছু করানোর ভরসা যদি উ নুর থাকত তবে তাঁর মতো ধার্মিক বৌদ্ধ কি তিব্বতের জন্য কিছু করতেন না? যাই হোক উ নু ও শ্রীনেহরুর মধ্যে আলাপ আলোচনার বিষয় অনেক আছে। উ নু তো নিউইয়র্কে ইউনোর জেনারেল অ্যাসেমব্লীর অধিবেশনে যান নি। তখন তিনি এবং জেনারেল নি উইন পিকিং-এ চীন-বর্মা চুক্তির স্বাক্ষর উৎসব করছেন। সুতরাং শ্রীনেহরু উ নুকে বলতে পারবেন তিনি নিউইয়র্কে কী দেখে শুনে এলেন এবং উ নুও শ্রীনেহরুকে পিকিং-এর "বাতাবরণ" সম্বন্ধে কিছু সংবাদ দিতে পারেন।

১৩-১১-৬০

উপন্যাস

সোম-সবিতা— সরোজকুমার রায়-চৌধুরীর অনবদ্য উপন্যাস (২য় সংস্করণ—যন্ত্রস্থ) মূল্য ৪.০০ টাকা

আমারি আঙিনা দিয়া—গ্রাণ্ড হোটেলের প্রখ্যাত উপন্যাসিক ভিকি বামের রাগ-বিরাগের মর্মস্পর্শী আখ্যান—'MEN NEVER KNOW'—সরিৎশেখর মজুমদার অনুদিত

মূল্য ২.৫০ টাকা

গল্প

ফুলডোরে— বিভূতিভূষণ গুপ্তের একটি সার্থক গল্পগুচ্ছ (২য় সংস্করণ)

...মূল্য ৩.০০ টাকা

নাটক

॥ অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের নবতম পূর্ণাঙ্গ প্রহসন ॥

মৌন-মুখর—নাচে গানে সুরে আশ্চর্য এক হাসির নাটক।

...মূল্য ২.০০ টাকা

ঐ লেখকের আরও দুটি অসামান্য পূর্ণাঙ্গ নাটক

১। **নচিকেতা**— 'ভগবান বুদ্ধের আদর্শে অনুপ্রাণিত স্বাধীন ভারতবর্ষ আশা করি এ নাটকের যথার্থ মহিমা উপলব্ধি করতে পারবে।'—দেশ

...মূল্য ২.০০ টাকা

২। **থানা থেকে আসছি**...মূল্য

...মূল্য ২.০০ টাকা

॥ একাংক রচনার যাদুকর মন্মথ রায়ের ॥

ফকিরের পাথর ও নাট্যগুচ্ছ—মন্মথ রায় (একাঙ্কর জলসা)

...মূল্য ২.৫০ টাকা

অটো-প্রিণ্ট এণ্ড পাবলিসিটি হাউস, ৪৯, বলদেওপাড়া রোড, (মানিকতলা), কলিকাতা-৬

ফোন : ৩৫—২৯৫৯

আলোচনা

অতি আধুনিক ছোট গল্প

সবিনয় নিবেদন,

'দেশে'র ৫১ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীবিমল বসুর পত্র সম্পর্কে আমার দু' একটি বক্তব্য আছে; আপনার পত্রিকা মারফত সেগুলি প্রকাশের সুযোগ দিলে বাধিত হবো।

বিমলবাবুর মতো আমিও স্বীকার করি, দুর্বোধ্যতা বা 'obscurity' অনেক ক্ষেত্রেই এই গল্পগুলির রসগ্রহণের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে—আমি একথাও অস্বীকার করি না, গল্পের আঙ্গিকের এই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তরুণ গল্পলেখকরা এখনও সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি, কিন্তু শ্রীযুক্ত বসুর মতো তাঁদের প্রচেষ্টার পরিণতি সম্পর্কে আমি নৈরাশ্যবাদী নই। আমার মনে হয়, এটা খুবই সুলক্ষণ, এবং সাহিত্যের সজীবতার পরিচয়দ্যোতক। এ'দের যেটা সবচেয়ে প্রশংসনীয় গুণ, সেটা হলো এ'দের রুচিসম্পন্নতা—এ'দের লেখা পড়ে স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায়, এ'রা পাঠকদের কাছ থেকে সূক্ষ্মতার রুচি ও একপ্রকার অনুশীলিত সাহিত্যবোধ আশা করেন। বর্তমানে বাংলা দেশে যখন পাঠকের রুচি ক্রমশই স্থূল থেকে স্থূলতর হচ্ছে, সেই সময় এই গল্পলেখকদের শিল্পবোধ খুবই আশ্বাসের পরিচয়।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য নিয়ে শ্রীযুক্ত বসু যে মন্তব্য করেছেন, তা পুরোপুরি মেনে নেওয়া কঠিন। নিঃসন্দেহে, আনন্দ বিতরণই সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু সেই 'আনন্দ' বলতে আমরা মোলায়েম সুখপাঠ্য কাহিনী বুঝি না। সাহিত্য থেকে আমরা প্রত্যাশা করি, জীবনের নানা কঠিন প্রশ্ন নিয়ে নতুন করে ভাববার এক তীব্র, দুর্লভ ও বিদগ্ধ আনন্দ। 'বিশ্বসাহিত্যের' ইতিহাসে যাঁরা কালজয়ী স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তাঁদের রচনাবলী থেকে আমরা শুধু গল্পের সুখ উপভোগ করি না, তাঁদের প্রতিটি রচনায় মানবীয় অস্তিত্বের একটি না একটি মূল সমস্যার সঙ্গে মুখোমুখি হতে হয়। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-কর্মের বিচার করতে বসলে, তাঁকে 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' বা 'নৌকাডুবি'র লেখক হিসাবে বিচার করবো না—তাঁকে বিচার করবো 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', 'যোগাযোগ' এবং 'ঘরে বাইরে'র স্রষ্টা হিসাবে। জীবন যেখানে জটিল, সাহিত্য সেখানে কি করে সহজ হবে বুঝতে পারলাম না। সাহিত্য যদি হয় জীবনের প্রতিবিম্ব, তাহলে সাহিত্যের 'সহজ' হওয়া অসম্ভব। আর যদি তা করতে চেষ্টা করা হয়, তাহলে সে সাহিত্য হবে জীবনবিমুখ। সাহিত্যের পক্ষে এর থেকে বড়ো দুর্লক্ষণ বোধ হয় আর কিছুই হতে পারে না।

কবিতার প্রকৃতি সম্পর্কে ইলিয়ট একবার বলেছিলেন, 'যেহেতু যুগ হয়েছে জটিল, এ-যুগের কবিতাও জটিল হবে।' সাম্প্রতিক ছোট গল্পগুলি সম্বন্ধেও বোধ হয় এই উক্তিই প্রযোজ্য। নমস্কারান্তে ইতি—

অশোক সেন, রেডল্যান্ড, ব্রিস্টল, ইউ কে।

(২)

মহাশয়,

'দেশে' প্রকাশিত অতি আধুনিক ছোট গল্প সংক্রান্ত পত্রটির মধ্যে আমার মনের একটি বহু-লালিত প্রশ্নকেই সোচ্চার হয়ে উঠতে দেখে যথেষ্ট উৎসাহিত বোধ করছি এবং প্রলুব্ধ হচ্ছি এই পত্র লিখতে। 'ছোট গল্পে'র মূল কথা হচ্ছে—তা' ছোট এবং গল্প। 'উপন্যাস' ও 'ছোট গল্পে'র বহিরঙ্গের পার্থক্য এইখানেই। কিন্তু কেবলমাত্র আকৃতিগত বিচারে উত্তীর্ণ

'নাভানা'র বই

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'লো

অ চি ন্ত্য কু মা র - প্র ণী ত

এক অঙ্গে এত রূপ

অচিন্ত্যকুমারের মধ্যে একটি অপরিমেয়তা আছে যা তাঁকে একই অনুভবের বিন্দুতে আবদ্ধ রাখতে পারেনি। বারে-বারে তিনি নিজেকে অতিক্রম করেছেন। তাঁর বিস্তৃত ও বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভরা জীবনের অভ্রান্ত পৃষ্ঠা থেকে বারে-বারে উদ্ধার করেছেন অপরূপকে। এত বিভিন্ন রসে ও পরিবেশে এত সার্থক নিখুঁত আঙ্গিকে এত আশ্চর্য প্রেমের গল্প আর কে লিখেছে? প্রতিদিনের সত্যকে চিরদিনের সৌন্দর্যের মধ্যে আর কে দিয়েছে তর্জমা ক'রে? অন্তরে প্রেম নিয়ে সৃষ্টি করেছেন ব'লেই তাঁর রচনাকে তিনি এত সুন্দর করতে পেরেছেন। ''এক অঙ্গে এত রূপ'' আদ্যোপান্ত এক কুসুমলহর লাবণ্যের বন্যা ॥ দাম : তিন টাকা ॥

নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

পলাশী প্রকাশিত

এই দশকের গল্প

বিমল কর সম্পাদিত

সাম্প্রতিক কালের ষোলজন তরুণ লেখককে নিয়ে এই গ্রন্থ। যাঁরা সকলেই প্রায় এই দশকের মধ্য সময় থেকে লিখতে শুরু করেছেন। অতি স্বল্প সময়ে এঁদের সাহিত্য প্রচলিত ধারাকে অতিক্রম ক'রে বহু বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। তাই আঙ্গিক রীতি বক্তব্য ও বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতর স্বাদের জন্য এই সংকলন অবশ্যই গল্প-পাঠকের কাছে প্রিয় হবে। মূল্য ঃ ৪·০০

লেখক সূচী

অজয় দাশগুপ্ত, অমলেন্দু চক্রবর্তী, দিব্যেন্দু পালিত, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, প্রবোধবন্ধু অধিকারী, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, মতি নন্দী, যশোদাজীবন ভট্টাচার্য, রতন ভট্টাচার্য, শংকর চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, সোমনাথ ভট্টাচার্য, স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিবেশক ঃ নবগ্রন্থ কুটির
৫৪/৫এ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ১২

(সি-৯৩৪৪)

হলেই 'গল্প' সর্বক্ষেত্রে 'ছোট গল্পে'র কৌলীন্য দাবি করতে পারে না—যদি আনুষঙ্গিক গুণাগুণগুলি সমভাবে বর্তমান না থাকে।

আনুষঙ্গিক গুণাবলীর মধ্যে—'লিখন-ভঙ্গী' (টেকনিক অফ রাইটিং) সর্বাগ্রে বিবেচ্য। এ-বিচারে, অবশ্য বিভিন্নতা সত্ত্বেও, অধিকাংশ লেখকই আপন স্বাতন্ত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে সসম্মান ছাড়পত্রের দাবি করতে পারেন। এবং তা', পত্র-লেখকের মতে, অযৌক্তিকও নয়। কিন্তু টেকনিকই কি সবটুকু? একটি পরিবেশনের মাধ্যম (medium) মাত্র—একে ধারক বলেও অভিহিত করা যেতে পারে—কিন্তু এর পরেই ওঠে পরিবেশিত 'বিষয়বস্তু'টির প্রশ্ন। এবং এই প্রশ্নটিই অধিকতর গুরুতর ও জটিল। স্বর্ণপাত্রে 'গোময়' যেমন 'স্বর্ণপাত্রে'র শোভাবৃদ্ধিতে অক্ষম—চোস্ত টেকনিক পরিবেশিত গুরুত্বহীন হালকা বিষয়বস্তুও তেমনি টেকনিকেরই অঙ্গহানি ঘটায়। উপরন্তু তা' যদি দুর্বোধ্য হয় ত প্রায় দুষ্পাঠ্যের তালিকায় গিয়ে পড়ে।

শ্রী বসুর সঙ্গে আমিও একমত যে—'দেশ' পত্রিকায় বেশ দীর্ঘদিন ধরে 'ছোট গল্পে'র শিরোনামায় এমন এক ধরনের রচনা প্রকাশিত হচ্ছে যার সঙ্গে এই পত্র-লেখকের মত সাধারণ পাঠকের সম্যক পরিচয় নেই। অথচ, সাধারণ পাঠকের সংখ্যাই বেশী—যাঁরা অতিরিক্ত অনুশীলন, অতিরিক্ত মনন এবং অতিরিক্ত চিন্তার পরিশ্রমটুকু সতর্কতার সঙ্গে বাঁচিয়ে চলতে চান।

'ছোট গল্প' মানবজীবনের সামগ্রিকতার উপরে আলোক নিক্ষেপ করে না—করে একটি বিশেষ ও বিশিষ্ট দিকের 'পরে এবং এই বিশেষ দিকটিকেই বিশেষভাবে উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত করে তোলে। সুতরাং, সে-ক্ষেত্রে দুর্বোধ্যতার স্থান কোথায়? অবশ্য, এ-কথাও সত্য যে—মনোবিশ্লেষণ—মনস্তত্ত্ব বিচার—সে-ক্ষেত্রেও অসম্ভব নয়। আসল কথা, কোন গল্পকেই 'মনস্তাত্ত্বিক' আখ্যায় ভূষিত করা চলে না; গল্পমাত্রেই—মানবচরিত্র বিশ্লেষণই যদি তার উদ্দেশ্য হয়—কোন-না-কোন একপ্রকার মানসিকতার প্রতিফলন ঘটাতে বাধ্য।

কিন্তু এই জাতীয় 'ছোট গল্পে' মনস্তত্ত্বের নামে সাধারণের অবোধ্য এক ধরনের দুর্ভেদ্য রহস্যময়তা বিরাজমান—যা' 'ছোট গল্প' হিসাবে এগুলির মূল্যহানি ঘটিয়েছে।

যদি দুরূহ 'মনস্তত্ত্ব' বিশ্লেষণই গল্পকারদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে থাকে ত জটিল রহস্যজালে ঘেরা দুর্ভেদ্য রহস্যময় মানবচরিত্রকে অধিকতর জটিল ও দুর্বোধ্য করে প্রকাশ করে লাভ কি?

শ্রী বসুর সঙ্গে একটি ব্যাপারে একমত হ'তে পারলাম না। গল্পের মূলোদ্দেশ্যকে উনি 'আনন্দদান' বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রকৃতই কি তাই? এটা শুধু গতিশীলতার যুগই নয়—বাস্তববাদীতারও (Realism)। এ-যুগের চিন্তাধারা মুখ্যতই বাস্তবানুগ ঃ সত্যানুসন্ধিৎসু। এর অবশ্যম্ভাবী প্রতিফলনে সাহিত্যও নবজন্ম লাভ করেছে। যে-সকল কারণে মানুষ ভাববাদী হয়ে ওঠে—তার সমূহ অদর্শনই বোধ করি, এই বাস্তববাদী নতুন চিন্তাধারার জন্মলাভের কারণ। সুতরাং, 'ছোট গল্প' (বৃহত্তর ক্ষেত্রে সাহিত্য) শুধু আনন্দ দানে সক্ষম হ'লেই তাকে সার্থক বলা যায় না—যদি না তা' বাস্তব-দর্শন-জাত জীবন-নির্যাস হয়। বিনীত—

শঙ্কর চক্রবর্তী। মধ্যমগ্রাম

(৩)

মহাশয়,

৫১ সংখ্যার দেশে এবং পরবর্তী সংখ্যাতে আধুনিক ছোট গল্প সম্বন্ধে সুচিন্তিত মতামত পড়লাম। নিঃসন্দেহে বিষয়টি বিচার করে দেখবার মতো।

আধুনিক ছোট গল্প সম্বন্ধে যে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ আনা হয়েছে, তাকে কখনোই অস্বীকার করা যায় না। আমার মনে হয়, এই দুর্বোধ্যতা দু'রকমের; প্রথমত বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে, দ্বিতীয়ত, তার উপস্থাপনার বা শিল্পকৌশলে।

প্রবোধকুমার সান্যালের বহুখ্যাত উপন্যাস

নদ ও নদী ৬ষ্ঠ মুদ্রণ **ছ টাকা**

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের উপন্যাস
সীমান্তরেখা ৩৷৷৹
সমারোহ ২৸৹

বিমল মিত্র, গজেন্দ্র মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী প্রমুখ কথাশিল্পীবৃন্দের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল
উন্মেষ (উপন্যাস) ৩৷৷৹

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
মহুয়া কথা ৩৷৷৹
আশাপূর্ণা দেবীর
স্বপ্নশর্বরী ৩৲
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ক্ষণভঙ্গুর ২৷৹
প্রবোধকুমার সান্যালের
মল্লিকা ২৲

অবধূতের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি

দেবারিগণ দ্বিতীয় মুদ্রণ ৷৷ **সাড়ে চার টাকা**

গুপ্ত প্রকাশিকা, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বিষয়বস্তুর দিক হতে মনে হয়, অহেতুক মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাসই প্রধান ত্রুটি। এই মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাসে যৌন অনুভূতি হতে ক্ষয়িষ্ণু পারিপার্শ্বিকতা দুইই প্রাধান্য পায়। কিন্তু এর আধিক্য নিঃসন্দেহে পাঠকমনকে ক্লিষ্ট করে।

ফলত, এই অবাস্তব বিষয়ের বর্ণনার ভঙ্গিটিও স্বাভাবিক হতে পারছে না। অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা, স্বগত উক্তির বাহুল্য, উপমার বিসদৃশ্যতা—আধুনিক ছোট গল্পকে পাঠকের কাছে বিরক্তিকর করে তোলে। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অক্ষম অনুকরণও এর জন্য অনেকটা দায়ী।

কি উপায়ে এই ত্রুটি হতে মুক্ত হওয়া যায়, তা আলোচনার স্থান এখানে নয়। তবে এটা ঠিক যে, শারদীয়া দেশ পত্রিকার গল্প এই ত্রুটিমুক্ত। আধুনিক ছোট গল্পের দুর্বোধ্যতার যদি ব্যাপক প্রচার শুরু হয়, তবে মনে হয়, তা' অচিরেই আধুনিক কবিতার মতো সাধারণ পাঠকের আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ইতি—

সুজন বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা।

(৪)

সবিনয় নিবেদন,

"অতি আধুনিক ছোট গল্পে"র মতামত অনেকাংশে আমাদের চিন্তার ক্ষেত্রে বিপরীত ধর্মী। আমাদের মতামত "দেশ" পত্রিকার মাধ্যমে পেশ করলাম।

"If you want to enjoy art you must be an artistic cultured person." শিল্প সম্ভোগ পূর্বে মনন ক্ষেত্রের উৎকর্ষতার প্রাথমিক প্রয়োজন আমরা নিশ্চয় অস্বীকার করতে পারি না। অ-মননশীলতায় শিল্প বিচার প্রায়শ ভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

আমরা কি পরিশীলিত পাঠক? আমাদের দায়িত্ব সাধনায় আমরা কতটুকু ধ্যানী? জীববিদ্যা, শারীরবৃত্ত, অর্থবিদ্যা, মনোবিদ্যা, দর্শন থেকে টুকটাক খণ্ডিত ঘটনার সাথে আমাদের প্রাথমিক পরিচয়ে আমরা কি সবল? শিল্প নৈপুণ্যে, মানুষের মন সম্বন্ধে সূক্ষ্ম দৃষ্টি, জীবনের জনা গভীর সমস্যা সম্পর্কে প্রশ্ন, দার্শনিকতা, অসংস্কৃত পাঠক সম্প্রদায়ের কাছে দুর্বোধ্য মনে হতে পারে। কিন্তু জীবনমুখী মনন রসে পুষ্ট সাংস্কৃতিক সচেতন পাঠকের চিন্তায় বিমলবাবুর যুক্তি অসুস্থ মনে হবে। আমাদের ত মনে হয়েছে।

ছোটগল্পের আসরে যাঁরা কথাশিল্পী হিসাবে আসছেন তাঁরা এত বেশী সংবেদনশীল ও চিন্তাশীল যাঁদের লেখায় আমাদের গতানুগতিক জড় তমসায় পাঠক বুদ্ধি টলমল।

"তবুও আমি বলব, আমরা জটিল মনস্তত্ত্ব চাই না।" বিমলবাবু নিজের চিন্তার কাছে নিজেই স্পষ্ট নন। মানুষ নিজেই দুর্জ্ঞেয় রহস্য। সুতরাং রহস্য উন্মোচনের দায়িত্বে যদি অতি আধুনিক ছোটগল্পে কথাশিল্পীরা ব্রতী হন তাতে কি গল্পের রসমাধুর্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে ব হচ্ছে?

"মানসিক অন্ধিসন্ধির গূঢ়তম খবর চাই না"। আমরা ভাবি, বিমলবাবু বিশ্ব সাহিত্যের বহু অসামান্য ছোটগল্পের দিকে চেয়ে কি বলবেন? মানুষের বর্তমান অবস্থাকে স্বীকার করতেই হবে। এ যুগের জীবন যন্ত্রণা প্রকাশে সারা পৃথিবীর কথাশিল্পীরা এগিয়ে এসেছেন। আমাদের শিল্পীরা পিছিয়ে থাকবেন কেন?

বাংলা আধুনিক ছোটগল্পের ক্ষেত্রে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু তার গতি আরও বিস্তার লাভ করুক।

সনমস্কার। ইতি—কাশীনাথ দাস। তাপসকুমার সান্যাল। শ্রীশক্তিময় [illegible]। শ্রীআশিস মিত্র। [মালদহ কালেক্টোরেট]

প্রকাশিত হল — **এ বছরের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস**

নাগলতা

॥ সুবোধ ঘোষ ॥ ৩-৫০

পঁয়ত্রিশ বছরের স্বপ্ন-সাধ-আশার মাটিতে গড়া মায়ার দেশ শিউলিবাড়ি। সে-দেশের আলোছায়ার কাছে তার সৃষ্টিকর্তা মাটি-সাহেব সব-চেয়ে-বড় শ্রদ্ধা, উথলে-পড়া পূর্ণচাঁদের মায়া-আলো। সেই-আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ধরা পড়েছে নিরুপমা, সুনন্দা মোহিত-পুষ্কর বিন্ধ্যাচলী আর অগণিত চরিত্র। এদেরই প্রাণবন্ত কাহিনী নিয়ে সুবোধ ঘোষ সৃষ্টি করেছেন এই উপন্যাস—চিন্তায়-চমৎকারিতায়, আনন্দে-বিস্ময়ে অপূর্ব অনাস্বাসিতপূর্ব। দাম ৩·৫০ টাকা। বর্ণাঢ্য প্রচ্ছদ।

অন্যান্য বই

যোগভ্রষ্ট	॥ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	৫·০০
শবনম	॥ সৈয়দ মুজতবা আলী	৫·০০
বেনারসী	॥ বিমল মিত্র	৪·৫০
দশপুতুল	॥ আগাথা ক্রিস্টি	৩·৫০
হিরণ্ময় পাত্র	॥ জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী	৪·০০
ক্রীম	॥ অবধূত	৪·৫০
হরিণ-চিতা-চিল	॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র	৩·০০
সুচরিতাসু	॥ প্রভাত দেবসরকার	৩·০০
অন্দরমহল	॥ সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৩·০০

বনভূমি (২য় সং)	॥ বিমল কর	৩·০০
শুক্লসন্ধ্যা (২য় সং)	॥ সরোজকুমার রায়চৌধুরী	৫·০০
রমণীর মন	॥ "	৩·৫০
মুখের রেখা	॥ সন্তোষকুমার ঘোষ	৫·০০
পরমায়ু	॥ "	৩·৫০

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড | ২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট. কলিকাতা-১২

বিশ্ববিচিত্রা

আমেরিকার ইঞ্জিনীয়াররা এক নতুন ধরনের গাড়ী পরীক্ষা করে দেখছেন যা অদূরে ভবিষ্যতে এক শহর থেকে আরেক শহরে কমপ্রেসড বায়ুর পাতলা ঝিল্লির ওপর দিয়ে ঘণ্টায় ৫০০ মাইল বেগে যেতে সক্ষম হবে।

এই 'লেভাকার' সম্পর্কে ফোর্ড মোটর কোম্পানীর এলেক্স এল হেইনস্ বলেন, তাঁর কোম্পানী ইতিমধ্যেই কতকগুলি পরীক্ষাসাপেক্ষ লেভাকার তৈরী করেছে এবং এর আরো উন্নতির চেষ্টা করছে।

যাত্রীদের চাপিয়ে লেভাকার রেলের মতো ট্রাকের ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়। সেই ট্রাকে লাগানো 'লেভাপ্যাডে' জমাট বায়ু প্রবাহিত করিয়ে দিলে ট্রাক থেকে গাড়িখানি সামান্য উঁচুতে উঠে ঘর্ষণ প্রতিরোধ করে এবং বিমানের ইঞ্জিন তখন তাকে সামনে ঠেলে নিয়ে যায়।

হেইনস এবং তার সহকর্মী ডেভিড জে জেই সম্প্রতি আমেরিকান সোসাইটি অফ মেকানিকাল ইঞ্জিনীয়ার্সদের এক সভায় লেভাকার সম্পর্কে এক বিবরণ পেশ করেন।

এই বিবরণীতে বলা হয়েছে যে, বর্তমানের বেগবান জেট প্লেন এক শহর থেকে আরেক শহরে যেতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে মাটি ত্যাগ করে না। কয়েক শত মাইলের যাত্রীরা আকাশে যত সময় না-কাটায় বিমান ঘাঁটি থেকে যাওয়া আসায় তার চেয়ে বেশী সময় ব্যয় করে। চলতি রেল ও মোটরগাড়ি বড় জোর ঘণ্টায় একশ মাইল চলতে পারে। যে কোন চক্রযানের পক্ষেই দেড়শ মাইলের বেশী ঘণ্টায় চলা সন্তোষজনক হয় না কম্পন এবং ক্ষয়ের আশংকার জন্য।

লেভাকার, তাঁরা বলেন, ধাতুনির্মিত ট্রাকের ওপর অপেক্ষাকৃত সস্তায় এবং সহজভাবে খাটিয়ে ঘণ্টায় দুশ থেকে পাঁচশ মাইল অধিকতর নিরাপদে যেতে পারবে। তাঁরা বলেন, "বাতাসে গড়িয়ে চলার এই পদ্ধতি এবং তার সংগে স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই হচ্ছে আবহাওয়ার অবস্থা নির্বিশেষে নিরাপদ ও স্বল্পব্যয় এই পরিবহণের মূল ভিত্তি।

মূলত লেভেকারও একপ্রকারের বিমান, তফাত শুধু এই যে, প্রায় ভূমি ঘেঁষে যেতে বিমানের মতো এর ডানা বা লেজ দরকার করে না।

শক্তি সরবরাহ করতে যে কোন হাল্কা ইঞ্জিনই যথেষ্ট এবং সেই একই ইঞ্জিনকেই লেভাপ্যাডে বায়ুর চাপ সঞ্চার করতে কাজে লাগানো যায়।

*

আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা পরমাণুশক্তিতে চালিত এক প্রকার অভিনব ঘড়ি তৈরী করেছেন। এ ঘড়ি বর্তমানে যে সকল ঘড়ি আছে তাদের তুলনায় ১০০০০ গুণ সঠিক সময় রাখে। এই ঘড়িতে হাইড্রোজেন পরমাণুসমূহকে ধরবার ব্যবস্থা আছে, এরা সুনির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তেজস্ক্রিয়তা বিকীরণ করে থাকে—এই ধরনের ঘড়িতে মূলে যে বস্তুটি থাকে তা হাইড্রোজেন পরমাণুকে আলগা-ভাবে ধরে থাকে।

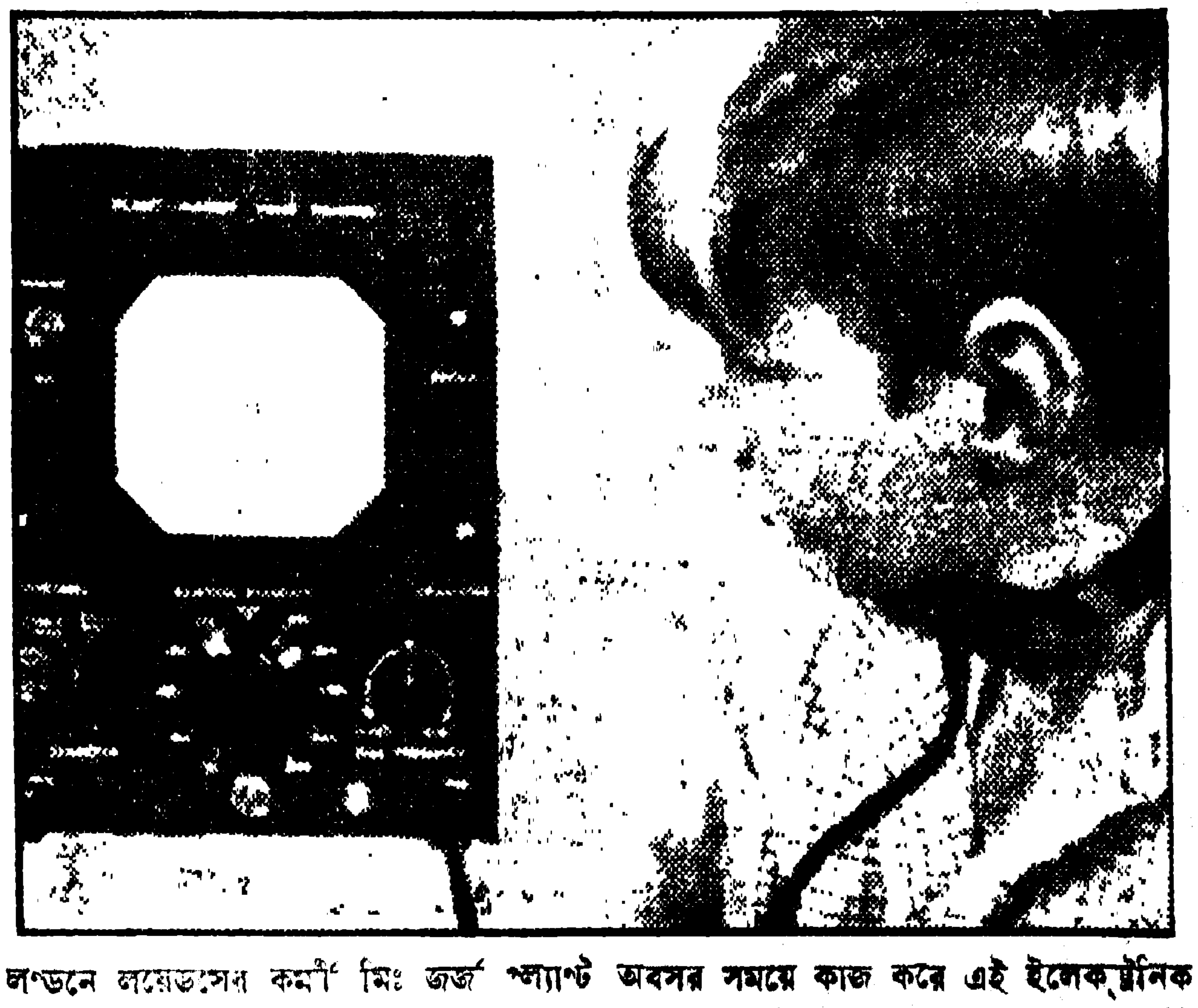

লণ্ডনে লয়েডসের কর্মী মিঃ জর্জ প্ল্যাণ্ট অবসর সময়ে কাজ করে এই ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছন যার সাহায্যে ধ্বনির মাত্রা, উচ্চতা এবং অনুরণন একটি ক্যাথড-রে টিউবে চিত্রিত হয়ে ওঠে। এর সাহায্যে বধির ছেলেমেয়েরা তার নিজের এবং তার শিক্ষকের ধ্বনির প্রতিফলন পর্দায় দেখে দেখে স্বর অনুকরণ করে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে শেখে

*

'সি কিউকাম্বার' নামে একপ্রকার সামুদ্রিক মাছের দেহ থেকে হাংগর প্রভৃতির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য 'হলোথুরিন' নামে একপ্রকার বিষ নিঃসৃত হয়। নিউ-ইয়র্কের জুলোজিক্যাল সোসাইটির বিজ্ঞানীরা এ জিনিসটি নিয়ে গবেষণা করছেন। কেবলমাত্র হাংগর প্রভৃতির প্রতিরোধেই নয়, ভেষজবিজ্ঞানেও এই জিনিসটিকে কাজে লাগানো যায় কি না,, সে সম্পর্কে তাঁরা পরীক্ষা করে দেখছেন। তাঁরা জানিয়েছেন যে, এই রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োগে রক্ত অতিঅল্প সময়ের মধ্যে জমাট বাঁধে, টিউমারের বৃদ্ধি বন্ধ হয় এবং স্নায়ুর মধ্য দিয়ে রক্তপ্রবাহও বন্ধ হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা সাদা ইঁদুরের উপর এ জিনিসটি প্রয়োগ করে এসকল তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

*

বর্তমানে যে সকল প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে তন্মধ্যে কাঠই একমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদ যা ঠিক ঠিক উৎপাদন করতে পারলে ভবিষ্যতে অপর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। অন্য কোন সম্পদই এই প্রকার সহজলভ্য নয়। এজন্য প্ল্যাস্টিক অথবা বর্তমানে যে সকল ধাতু রয়েছে তাদের তুলনায় কাঠের ভবিষ্যৎ অনেক বেশী উজ্জ্বল। আমেরিকার প্লাইউড কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রী এস ডব্লিউ অটোভিল, কর্পোরেশনের কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশনে এই মন্তব্য করেন। কাঠ থেকে বহু রাসায়নিক দ্রব্য ও প্লাস্টিকস প্রস্তুত হয়, অন্য অনেক জিনিসের তুলনায় যা খুবই সস্তা।

*

কিছুদিন আগে আমেরিকায় উইলহেম ই পোলসেন নামক এক ভদ্রলোক ছোট ছোট পাখীদের খাবার সুবিধে হয় এমন একটি খাঁচার পেটেণ্ট লাভ করছেন। খাঁচাটি এমনভাবে তৈরী যে, ছোট পাখীরা অনা-য়াসে তার দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে খেয়ে আসতে পারবে, কিন্তু কোন বড় পাখী হলেই দরজা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে।

চার পাশে কাঁচ দেওয়া এই খাঁচাটি একটি ১২×১৬ ইঞ্চি পায়ার ওপর বসানো থাকে। খাঁচাটি বাতাসে দোলে যাতে প্রবেশ পথটি সব সময়েই ঢাকা থাকতে পারে। দরজার সামনে থাকে একটা দাঁড় যেটা দু আউন্সের বা তার কম ওজনের পাখী হলে নড়ে না এবং তারা স্বচ্ছন্দে খাদ্য নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু তার বেশী ওজনের পাখী হলেই দাঁড়টা নিচে নেমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়।

॥ পত্রাবলী ॥

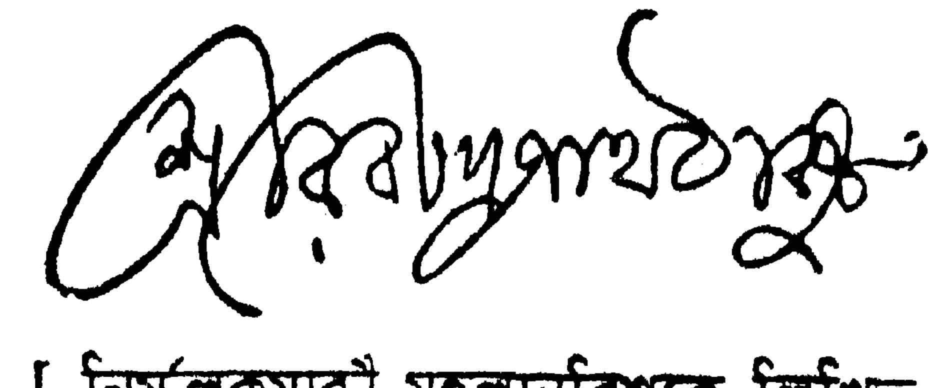

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ১০ ॥

এস এস ফ্লাডা

৯ ডিসেম্বর

কিছু খবর দেবার চেষ্টা করব। নইলে চিঠি বেশি ভারী হয়ে পড়ে। অনেক দিন থেকে চিঠিতে খবর চালান্‌ দেবার অভ্যেস চলে গেছে। এটা একটা ত্রুটি। কেননা আমরা খবরের মধ্যেই বাস করি। যদি তোমাদের কাছে থাকতুম তাহলে তোমরা আমাকে নানাবিধ খবরের মধ্যেই দেখতে। কি হল এবং কে এল এবং কি করলুম এইগুলোর মধ্যে গেঁথে নিয়ে তবে আমাকে স্পষ্ট ধরতে পারা যায়। চিঠির প্রধান কাজ হচ্ছে সেই গাঁথন সূত্রটিকে যথাসম্ভব অবিচ্ছিন্ন করে রাখা। আমি যে বেঁচে বর্তে আছি সেটা হল একটা সাধারণ তথ্য কিন্তু সেই আমার থাকার সঙ্গে আমার চারিদিকের বিচিত্র যোগ বিয়োগের ঘাতপ্রতিঘাতের দ্বারাই আমি বিশেষভাবে প্রত্যক্ষগোচর, এই জন্যেই চিঠিতে খবর দিতে হয়—দূরে থাকলে পরস্পরের মধ্যে সেই প্রত্যক্ষতাকে চালাচালি করবার দরকার হয়। প্রয়োজনটা বুঝি কিন্তু সত্যিকারের চিঠিলেখার যে আর্ট সেটা খুইয়ে বসে আছি। তার কারণ হচ্ছে কাছে থাকলে তুমি আমাকে আমার চারদিকের নব নব ব্যাপারের সঙ্গে মিলিয়ে যেমন করে দেখতে, আমি নিজেকে তেমন করে দেখিনে। অন্যমনস্ক স্বভাবের জন্যে আমি চারদিককে বড় বেশি বাদ দিয়ে দেখি। সেইজন্যে যা ঘটে তা পরক্ষণেই ভুলে যাই, ঐতিহাসিকের মতো ঘটনাগুলোকে দেশকালের সঙ্গে গেঁথে রাখতে পারিনে। তার মুস্কিল আছে। তোমরা কেউ যখন আমার সম্বন্ধে কোনো নালিশ উপস্থিত করো তখন তোমাদের পক্ষের প্রমাণগুলোকে বেশ সুসম্বন্ধ সাজিয়ে ধরতে পারো।

আমার পক্ষের প্রমাণগুলো দেখি আমার আনমনা চিত্তের নানা ফাঁকের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে গেছে। আমি কেবল আমার ধারণা উপস্থিত করতে পারি। কিন্তু ধারণা জিনিসটা বহু-বিস্মৃত প্রমাণের সম্মিলনে তৈরি। সে প্রমাণগুলোকে সাজিয়ে দিয়ে সাক্ষ্যমঞ্চে আনা যায় না। যাদের ধারণাগুলো শনিগ্রহের মত বহু প্রমাণমণ্ডলের দ্বারা সর্বদাই পরিবেষ্টিত তাদের ধারণার সঙ্গে আমার ধারণার ঠোকাঠুকি হলে আমার পক্ষেই দুর্বিপাক ঘটে।

কিন্তু খবর সম্বন্ধে এতক্ষণ যে তত্ত্বালোচনা করলুম তাকে খবর বলা যায় না। এখন কী দিয়ে আরম্ভ করব সেই কথা ভাবচি। আলেকজান্দ্রিয়ার থেকে খবরের ধারার মধ্যে এসে পড়েছি। যাঁরা আমার ইজিপ্টের পালা জমাবার ভার নিয়েছিলেন তাঁরা ইটালিয়ান,—নাম "সোয়ারেস"। ধনী ব্যাঙ্কার। আমাকে তাঁদের যে বাগানবাড়িতে রেখেছিলেন সে অতি সুন্দর।

সে বাড়ির বারান্দাগুলো খুব দিল-দরিয়া গোছের—একদিকে বাগান, আর একদিকে নীল সমুদ্র, আকাশ মেঘশূন্য, সূর্যের আলোয় শ্যামল পৃথিবী ঝলমল করচে, সমস্ত দিন নিস্তব্ধ নির্জন অবকাশের অভাব ছিল না।

যেদিন সকালে পৌঁছলুম তার পরদিন সায়াহ্নে বক্তৃতা সুতরাং মনটা গভীর বিশ্রামের মধ্যে অনেকক্ষণ তলিয়ে থাকতে পেরেছিল। সেজন্যে বক্তৃতাটি অতি সহজেই পাকা ফলের মতো বর্ণে রসে গন্ধে বেশ টসটসে হয়ে উঠতে পেরেছিল। যারা শুনেচে তারা পুরোপুরি তৃপ্তি পেয়েছে এইরকমের জনশ্রুতি। পরদিন কৈরোর পালা। ঘণ্টা চারেক গেল রেলগাড়িতে। এবার হোটেল। হোটেল বলতে কী বোঝায় তা তোমার খুব ভাল করেই জানা আছে। খুব বড় হোটেল—খুব মস্ত খাঁচা। পৌঁছলেম মধ্যাহ্নে, বৈকালেই সেখানকার সর্বোত্তম আরবী কবির বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ। কবির নিমন্ত্রণ ছাড়া এই নিমন্ত্রণের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, সেখানে ইজিপ্টের সমস্ত রাষ্ট্রনায়কের দল উপস্থিত ছিলেন।

পাঁচটার সময় পার্লামেণ্ট বসবার সময়। আমার খাতিরে এক ঘণ্টা সময় পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমাকে জানানো হল এমন ব্যবস্থাবিপর্যয় আর কখনো আর কারো জন্যে হতে পারত না। বস্তুত এটা আমাকে সম্মান দেখাবার একটা অসামান্য প্রণালী উদ্ভাবন করা। আমি বললেম, এ হচ্ছে বিদ্যার কাছে রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রণতি, এ কেবলমাত্র প্রাচ্যদেশেই সম্ভবপর।

ওখানে ক্বাহ্‌ন্‌ ও বেহালা যন্ত্রযোগে আরবী গান শোনা গেল—স্পষ্টই বোঝা গেল ভারতের সঙ্গে আরব পারস্যের রাগ রাগিণীর লেনদেন একসময়ে খুবই চলেছিল। মণ্টুকে বলব ইজিপ্টে এসে যেন সে এই তথ্যের গবেষণা করে। যখন ছুটি পেলুম তখন সমস্ত দিনের ক্লান্তির ভূত আমার মেরুদণ্ডের উপর চেপে বসেচে, তার উপর একটা অত্যুগ্র অজীর্ণ পীড়া আমার পাকযন্ত্রের মধ্যে বিপাক বাধিয়েছে। বাড়ি গিয়ে কেবল দুই পেয়ালা কফি এবং ঘন ঘন Natrum Sulph খেলুম। পাকযন্ত্রের কোনো অপরাধ ছিল না। প্রথমত রুমানিয়া জাহাজে যা খাদ্য ছিল তা পথ্য ছিল না, দ্বিতীয়ত সোয়ারেসের বাড়িতে যে নিরামিষ ভোজের ব্যবস্থা ছিল সেটাও ছিল অভ্যাসবিরুদ্ধ এবং গুরুপাক। এমন অবস্থায় ক্লান্তি ও ব্যাধি নিয়ে যখন বক্তৃতামঞ্চে উঠে দাঁড়ালুম তখন আমার মন কোনো মতে কথা কইতে চাচ্ছিল না।

পালে হাওয়া ছিল না, কেবলি লগি মারতে হল। স্পষ্ট বুঝতে পারছিলুম পাড়ি জমছে না। যা হোক কোনোমতে ঘাটে পৌঁছন গেল। সেটা কেবল কবিতা আবৃত্তির জোরে। সুইডেনের সেই মিনিস্টার ছিলেন। বক্তৃতা তাঁর ভালো লেগেছিল বললেন। যে মেয়ের পাত্র জোটা সহজ নয় যখন দেখি তারও বেশ ভালো বিয়ে হয়ে গেল তখন যেরকম মনে হয় এঁর মুখে প্রশংসা শুনে আমার সেইরকম মনের ভাব হল। ইনি যদি য়ুরোপের উত্তর দেশী লোক না হতেন তাহলে মনে করতে পারতেম কথাটা অকৃত্রিম নয়। পরদিন মিউজিয়ম দেখতে গিয়েছিলেম—দেখবার জায়গা বটে—তার বর্ণনা করতে

গেলে অনেক কথা বলতে হবে। ফেরবার পথে তোমরা নিজেরাই দেখে যাবে—তোমাদের সেই স্বচক্ষের উপরেই বরাৎ দিয়ে চুপ করা গেল। এই সব কীর্তি দেখে মনে মনে ভাবি যে, বাইরে মানুষ সাড়ে তিন হাত কিন্তু ভিতরে সে কত প্রকাণ্ড।

এখানকার ভারতীয় বণিকের দল আমাকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করেছিল। কিছু দক্ষিণার জন্যে দরবার করেছি বোধহয় তাও পাওয়া যায়। নারায়ণ দয়ালদাস বলে হায়দ্রাবাদের একজন ধনী দুইহাতে আমাদের সকলকেই নানারকমের উপহার দিয়েচেন। ইনিই একদা আমাকে সেই চমৎকার কাজ করা দেরাজ দান করেছিলেন।

এখানকার রাজার সঙ্গেও দেখা হল। তাঁকে বল্লেম য়ুরোপের অনেক রাজ্য থেকে বিশ্বভারতী অনেক গ্রন্থ উপহার পেয়েছেন, আরবী সাহিত্য সম্বন্ধে য়ুরোপে যে সব ভালো বই বেরিয়েছে যদি তদীয় মহিমা তা আমাদের দিতে পারেন তাহলে রাজোচিত বদান্যতা দেখানো হবে।

তদীয় মহিমা খুব উৎসাহের সঙ্গেই রাজি হয়েচেন।

ইতিমধ্যে মিস্ প— অবাধে ও অক্ষুণ্ণ শরীরে এসে আমাদের দলে ভিড়েচেন। ইটালীয় গবর্মেণ্ট ত বাধা দেয়ই নি এমন কি কায়রোর ইটালীয় কন্সলের বাসায় থাকবার জন্যে ভদ্রমহিলা নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। তার পর থেকে আলোয় ও অন্ধকারে, খালে ও সমুদ্রে একযাত্রায় আমরা চলেচি। হোটেলের বাইরে খোলা পৃথিবী থাকে, জাহাজের বাইরে মানুষের যোগ্য স্থান নেই।

এইজন্যে দলের লোকের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি অনিবার্য। তাতেও নতুন মানুষ যে ঠিক কি তা জানা যায়না বটে কিন্তু কি নয় তা অনেকটা আন্দাজ পাওয়া যায়। প্রথমত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এঁর কিছুই জানা নেই এবং ঔৎসুক্য ও আকর্ষণ নেই। বুদ্ধিগম্য বিষয় সম্বন্ধেও কোনো অনুরক্তি বা বোধশক্তি দেখা গেল না। সাদা কথার একটুমাত্র বাইরে গেলেই ওর পক্ষে ডুব জল হয়ে পড়ে। তার পরে আধ্যাত্মিক বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করা যে সহজ মানুষের পক্ষে সুসঙ্গত তাও ওর মনে হয় না। পর্শুদিন তার একটা প্রমাণ পেয়ে আমি বিস্মিত হয়েছি। একজন সহযাত্রী, ধনী জার্মান যুবক, আমাকে এসে বললেন তিনি পৃথিবী ঘুরতে বেরিয়েছেন জানবার জন্যে মানবজীবনের লক্ষ্যটা কি। আমি বললেম হুহু করে পৃথিবী ঘুরে বেড়ালে মানব জীবনের রহস্য বোঝা যাবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। তিনি ব্যাকুল হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন "can you tell me what life is?"

আমার যা বলবার কথা অনেকক্ষণ ধরে বললুম। লোকটির আগ্রহ আরও বেড়ে গেল—বললেন, But tell me how I must live. কথা আরও খানিকটা এগোলো। অবশেষে মানুষটি অন্তরের সঙ্গে সাধুবাদ দিয়ে চলে গেলেন। মিস্ প— ব্যাপারটা শুনে ভুরু কুঁকড়ে বললে, How funny! ঠিক এতদনুরূপ ব্যাপার কায়রোতে ঘটেছিল। আমার বক্তৃতা শোনার পরদিন একজন ইজিপ্‌শিয়ান ছাত্র আমাকে এসে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি যে মুক্তির কথা বলছিলে আর একটু স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দাও। আমি তাঁকে আমার যথাশক্তি স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেম। মিস্ প— সেদিনও বলেছিল "How very funny!" এই তো গেল যাকে ইংরেজী ভাষায় বলে স্পিরিচুয়েল বিষয়। কিন্তু এটা তত বেশি বিস্ময়জনক নয়—যেটা বস্তুতই অদ্ভুত ঠেকেছিল সেটা হচ্ছে কায়রোর মত জায়গায় একজন আর্টিস্ট মানুষের নিরাসক্ত নিরৌৎসুক্য। আমাদের সঙ্গে ম্যুজিয়মে গিয়ে আমাদের অনেক আগে ফিরে এসেচে তারপরে আর কোথাও কোনো চিত্রশালায় যাবার নামও করেনি। যে সব সুন্দর জিনিস আমাদেরও চোখে মনোরম লেগেচে, তাতে তাকে সম্পূর্ণ অবিচলিত দেখেচি। অবশ্য বলেনি "How funny!" কিন্তু এতেও আশ্চর্যের কথা কিছুই নেই, কিন্তু আসল আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাহলে আমার সঙ্গে যাচ্ছে কেন?

মনে কোরোনা, আমি কোনো সিদ্ধান্ত মনের ভিতর এঁটে বসে আছি। সিদ্ধান্তে মানুষের প্রতি অবিচার করার আশঙ্কা আছে। জন্তুরা তাদের অন্ধ সংস্কার থেকে ভয় পায়, সন্দেহ করে। প্রকৃতি তাদের বিচার করতে দেননি, বিচারে যতগুলো প্রমাণের দরকার হয়, তা সংগ্রহ করতে সময় লাগে,—ইতিমধ্যে বিপদ এসে পড়ে—যেটা চূড়ান্ত প্রমাণ সেইটেই চূড়ান্ত বিপদ। হরিণ শব্দমাত্র শুনলেই অন্ধ সংস্কারের তাড়ায় দৌড় মারে। শব্দটা ঝোপের ভিতরকার বাঘের কাছ থেকে এলো কিনা তার নিঃসংশয় প্রমাণ নিতে গেলে বাঘ এবং প্রমাণ ঠিক একসঙ্গে এসে পড়ে। মানুষ যখন কোনো কারণে বিষম সংকটের অবস্থায় থাকে অর্থাৎ যখন খুব তাড়াতাড়ি মন ঠিক করা অত্যাবশ্যক মানুষেরও তখন হরিণের অবস্থা হয়। পৃথিবীতে যে সব জাত নিজেদের সম্বন্ধে যথোচিত নিরাপদ ব্যবস্থা করতে পেরেচে, যাদের আইন যথোচিত পাকা, যাদের আত্মরক্ষাবিধি সুবিহিত তারা অন্ধ সংস্কারের হাত থেকে বেঁচেছে—কেননা ওটা তাদের পক্ষে সহায় নয়, বাধা। অতএব? অতএব মিস্ প—কে সন্দেহ করতে চাইনে। এটুকু বুঝতে পারচি যে, ভালো বুঝতে পারচিনে। কিন্তু না বুঝতে পারলে আরো ভালো করে বুঝতে চেষ্টা করা কর্তব্য—না বুঝতে পারলে অবিশ্বাস করাটা অন্ধতা।

মিস্ প— আমার সঙ্গে এখন সর্বত্যাগী ভাবে কেন যাচ্ছে আজ তা বুঝতে পারচিনে—সব তথ্য আমার কাছে নেই। কোনদিন থাকবে কিনা তাও বলা শক্ত। কিন্তু দিনে দিনে অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট হওয়া অসম্ভব নয়।

অপরপক্ষে বৌমা পুপের জন্যে যে মেয়েটিকে ঠিক করেচেন সেও এসে পৌঁচেছে। উত্তর দেশের মেয়ে সহজ, সরল, প্রফুল্ল এঁকে বুঝতে কোনো বাধা নেই। মনে কোরোনা আমি ভালো মন্দর দিক থেকে দুজনকে তুলনা করছি। তা করা সঙ্গত নয়। কেননা Mameselle Siggart অল্পবয়সী মেয়ে, এখনো জীবনের জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করে ঠোকাঠুকি খায়নি, মিস্ প— তা যথেষ্ট খেয়েছে। মিস্ প— আমাকে কেন চায় তা যে একেবারে বুঝিনে তা নয়। ওর জীবনে বিস্তর ভাঙাচোরা ঘটেচে—এদিকে ওদিকে অনেক ব্যথা অনেক আকারে ওর মধ্যে বাসা বেঁধে আছে।

ও মনে করেচে আমি বুঝি কোনো একরকম করে ওকে সাহায্য করতে পারি। কেননা ও অনেকের কাছে শুনেচে যে আমি তাদের সাহায্য করেচি। অথচ আমি যে কোথায় সত্য, কোথায় আমার সম্পদ, তা ও জানে না, বুঝতেও পারে না। ও মনে করেচে আমার কাছাকাছি থাকার মধ্যেই বুঝি সাহায্য বলে একটা পদার্থ আছে। বুঝতে পারেনা কাছাকাছি যাকে প্রত্যহ পাওয়া যায় সে অত্যন্ত সাধারণ ব্যক্তি, অনেক বিষয়ে সে নির্বোধ, অনেক বিষয়ে সে মন্দ। আসল কথা ও স্ত্রীলোক। আঁকড়ে থাকলেই একটা সত্য বস্তু পাওয়া যায় বলে ওর ধারণা। হায়রে পৌত্তলিক! প্রতিমার মাটি সত্য নয়, তাকে যতই গয়না দিয়ে সাজাইনে কেন। অথচ প্রতিমার মধ্যে যে সত্য নেই এতবড় ঘোর ব্রাহ্মিক গোঁড়ামিও ঠিক নয়—আসল কথা তাকে আঁকড়ে ধরতে গেলেই ভুলটাকে ধরা হয়, তখনি সত্য দেয় দৌড়। যে পোকা বইয়ের কাগজ কেটে খায় সেই পৌত্তলিক—যে তাকে চিত্ত দিয়ে পড়তে পারে কাগজ তার কাছে থেকেও নেই। এপর্যন্ত মনে হচ্ছে মিস্ প— আমার বইখানার কাগজ নিয়ে ঝাড়-পোঁছ করচে; কোনদিন তাতে হয়তো সিঁদুর চন্দনও মাখাবে—তাতে কিছু তৃপ্তিও পাবে। কিন্তু কোনকালে কি পড়তে পারবে মনে করো?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

কবি য়ুরোপে যখন নানা জায়গায় বক্তৃতা দিচ্ছেন সেই সময় বরাবরই বক্তৃতা শেষ করে তারপর নিজের বাংলা কবিতা যার ইংরিজি তর্জমা আছে এমন কয়েকটা লেখা বেছে নিয়ে লোকদের পড়ে শুনিয়ে সভা ভঙ্গ করতেন। বাংলা ভাষায় ওঁর কবিতা পড়বার আগে প্রথমে তার ইংরিজি তর্জমাটা পড়ে দিতেন, যাতে পরে বাংলা পড়াটা শোনবার সময় লোকে বুঝতে পারে যে বিষয়টা কি। বাংলার ছন্দ, ভাষার ঝংকার ও লালিত্য লোকে সংগীতের মত মুগ্ধ হয়ে শুনত। পড়া শেষ হয়ে গেলে লোকেদের উচ্ছ্বাস আর থামে না। হাততালির পর হাততালি দিয়ে দিয়ে লোকে কতোবার ওঁকে চার পাঁচটা কবিতা আরো বেশি করে পড়িয়েছে। প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক শহরে যেখানেই উনি বক্তৃতা দিতে গিয়েছেন এই একই ব্যাপার বারেবারে দেখেছি। ঘর ভরা লোক কিন্তু বক্তৃতা কিম্বা কবিতা পড়বার সময়ে কোথাও একটু চাঞ্চল্য নেই। একেবারে মন্ত্রমুগ্ধের মত নিস্তব্ধ হয়ে লোকে বসে শুনেছে; কিন্তু শেষ হবামাত্র হাততালির পর হাততালি সে আর কিছুতেই থামতে চায় না।

জার্মানীর কোন্ একটা শহরে ঠিক মনে নেই কবি যখন পড়ছেন "একি তবে সবই সত্য? হে আমার চিরভক্ত—" আমি শুনতে পেলাম আমার পিছনে দুটি মেয়ে অনবরত কবির গলার সুরের নকলে বলছে—"এ কি তবে সবি সত্য?" দুতিনবার শুনবার পরে আমি থাকতে না পেরে যেই ঘাড় ফিরিয়েছি দেখি দুটি ১৬।১৭ বছরের মেয়ে তাল দিয়ে দিয়ে লাইনটা বলছে। মেয়ে দুটি অত্যন্ত অপ্রস্তুত হাসি হেসে ভাঙা ইংরিজিতে বলল—"ক্ষমা করো; এরকম মিউজিকের মত ভাষা আর কখনো শুনিনি। কিছুতেই থাকতে পারলাম না নকল করবার চেষ্টা না করে। তোমাদের বাংলা ভাষা কি সত্যিই এত মিষ্টি? না এটা টাগোরের নিজেরই বিশেষত্ব?" হোটেলে ফিরে এসে কবিকে বললাম ঘটনাটা। তিনি খুব কৌতুক বোধ করলেন—"জার্মান জাতের কানে ভাষার ছন্দ আর মিউজিক ঠিক মতো গিয়ে বেজেছে।" কবি যখন ১৯২৬ সালের অক্টোবর মাসে ভিয়েনা যান সেখানে গিয়েই ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়ে বিছানায় পড়লেন। সেই সময় একদিন একটি অস্ট্রিয়ান মেয়ে মিস্ প— নামে কবির সঙ্গে দেখা করতে আসে। সে বললে যে, কবির অসুখ শুনেই সে এসেছে। কবির কাছে সে চাকরি করতে চায়। তাঁর সেবা করবে, সেক্রেটারীর কাজ করবে, কবি যা করতে বলবেন কোনটাতেই তার আপত্তি নেই। একসময় তারা অত্যন্ত ধনী অভিজাত বংশীয় পরিবারের লোক ছিল, গত মহাযুদ্ধের ফলে তাদের সর্বস্ব গিয়েছে। তাই সে চাকরি করবার দরবার নিয়ে ওঁর কাছে এসেছে। ওর কবির সঙ্গে ভারতবর্ষে যাবার বিশেষ ইচ্ছে। নিজে আর্টিস্ট স্কাল্পটার, তাই শান্তিনিকেতনে যাবার এত আগ্রহ। কবির বরাবর যা হোতো এবারেও তাই হল; কিছু দ্বিধা না করে ওকে রাখতে রাজী হয়ে গেলেন। আমরা দুজনে একটু আপত্তি করবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তাতে কোনো ফল হলো না। কাজে বহাল হবার পর মিস্ প— আমাদের সঙ্গে হাঙ্গেরী গেল এবং আমাদের সঙ্গে এক হোটেলেই ছিল। সে সমস্তক্ষণই কবিকে আঁকড়ে থাকতে চাইত তাতে দুদিনেই তিনি অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। কবির মনের স্বভাব না জেনে অনেকেই এ ভুল করেছে। অত্যন্ত বেশি করে তাঁকে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করলেই তিনি সবচেয়ে দূরে সরে যেতেন। সারাক্ষণ গায়ের সঙ্গে কেউ লেগে আছে এটা মনে হলেই বিপদ। প্রথমত মিস্ প— অপরিচিত, দ্বিতীয়ত তার ইংরেজী ভাষা পরিষ্কার নয়। বলবার ধরনও অস্পষ্ট তার ওপরে কৌতুক বোঝবার শক্তি নেই, কাজেই পরিচয়টা ভালো করে জমবার আগেই অধৈর্য হয়ে উঠলেন। আমরা তাকে কিছু না বলে পাকে-প্রকারে যতোটা সম্ভব দূরে সরিয়ে রাখবার চেষ্টা করতাম। মিস্ প— অনবরত কবিকে জানাবার চেষ্টা করত কোথায় কোন্ জায়গায় তার সব ধনী অভিজাতবংশীয় আত্মীয় স্বজন আছে। কোন্ দেশের কোন্ পররাষ্ট্র দপ্তরে তার খুড়তুত কী জ্যাঠতুত ভাই আছে, কোথায় কোন্ কাকা আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। হঠাৎ কবির একদিন মাথায় এল—মিস্ প—র সব জায়গায় পুলিস আর foreign office-এর সঙ্গে এত খাতির কিসের? তবে কি ও ইণ্টারন্যাশন্যাল স্পাই? সেইজন্যে আমার সঙ্গ নিয়েছে। তথ্য সংগ্রহ করবার সুবিধা হবে কোন্ দেশের কোন্ লোক আমার কাছে আসছে, কি কথা বলছে, সেক্রেটারী হয়ে ও সবই মুঠোর মধ্যে রাখতে পারবে। এই কথা মনে হবার পর থেকেই মিস্ প—কে দিয়ে আর কোনো কাজ করানো বন্ধ করে দিলেন। "প্রশান্ত, আমার কোন লেখা টাইপ করতে হলে তুমি নিজে কোরো, মিস্ প—কে দিও না।" ওঁকে আমি যখন বললাম যে কারণটা কী, উনি কবির সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিলেন। "কোন প্রমাণ তো পাননি তবে কেন আপনি এরকম ভাবছেন?" ইত্যাদি। একাধিক দিন এই ব্যাপার নিয়ে কবির সঙ্গে ওঁর তর্ক হয়েছে। কবির পরবর্তী চিঠিগুলো বুঝতে সাহায্য হবে বলে এই ইতিহাসটুকু দিলাম। এইসময় কবির মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল যে মিস্ প—র কবির কাছে চাকরি নেবার একটা গোপনতম কিছু কারণ আছে।

(ক্রমশ)

GOVERNMENT LIBRARY Cooch Behar

বনস্পতি

সম্বন্ধে সত্যিকথা

সম্প্রতি বনস্পতির পুষ্টিকারিতা সম্বন্ধে খবরের কাগজে ও জনসভায় কতগুলি বিভ্রান্তিপূর্ণ উক্তি করা হয়েছে। এই সব উক্তি নিতান্ত ভুলধারণা-প্রসূত—এগুলির ভিত্তি তথ্য বা নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

গত ৫০ বছরেরও আগে থেকে বনস্পতি বা শর্টনিং এবং মার্গারিন ইত্যাদি হাইড্রোজেনযুক্ত জমাট স্নেহপদার্থ তৈরী ও ব্যবহার করা হচ্ছে। ভারতীয় ও বিদেশী বৈজ্ঞানিকেরা তখন থেকেই পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা ক'রে দৃঢ় অভিমত দিয়ে আসছেন যে এসব স্নেহপদার্থ স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী ও পুষ্টিকর। এখানে কয়েকজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও জননেতার অভিমত দেওয়া হচ্ছে—

"বনস্পতি স্বাস্থ্যকর খাদ্য এবং পুষ্টির দিক থেকে বিচার করে দেখলে এর ব্যবহার বাড়ানোয় আপত্তির কিছু নেই।"

—ডাঃ ডবল্যু. আর. আইক্রয়েড, ভারতের প্রাক্তন ডিরেক্টর অব নিউট্রিশন রিসার্চ এবং বর্তমানে রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ডিরেক্টর অব নিউট্রিশন। (১৯৪৬)

"স্বাস্থ্যের ওপর বনস্পতির ক্ষতিকর প্রভাব নেই।"

—১৯৪৭-৪৯ সালে ভারত সরকার কর্তৃক কয়েকটি ধারাবাহিক অনুসন্ধানের ফল।

"আমার পরামর্শ হচ্ছে, বনস্পতি ব্যবহার করতে দেওয়া হোক, কারণ এটি ভাল ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য।"

—ডাঃ (স্যর) এস. এস. ভাটনগর, কে টি, ডি এস সি, এফ আর আই সি, এফ আর এস, ডিরেক্টর জেনারেল অব সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ। (১৯৪৯)

"গভর্ণমেণ্ট নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছেন যে বনস্পতির ব্যবহার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর নয়। বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তারী পরীক্ষায় বার বার দেখা গেছে যে বনস্পতি বা তার তুল্য জিনিস পৃথিবীর বারো আনা দেশেই ব্যবহার করা হচ্ছে কিন্তু তাতে কারুর কোন ক্ষতি হয়নি।"

—প্রধান মন্ত্রী, পণ্ডিত নেহেরু—১৯৫২ সালের ১০ই জুন লোকসভায় প্রদত্ত ভাষণ।

"হাইড্রোজেনযুক্ত জমানো তেলের ফলাফল পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে চিনাবাদামের তেল কি তিলের তেল প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ তেল এবং এসব তেলে তৈরী ৩৭° সেন্টিগ্রেড তাপে দ্রবণশীল বনস্পতি ও মাখনের পুষ্টিকারিতা প্রায় সমান। হজম হওয়ার দিক থেকেও বনস্পতি এবং জমানো হয়নি এমন উদ্ভিজ্জ তেল দুই-ই সমান। খাদ্যের ক্যালসিয়াম প্রভৃতি উপাদান পরিপাকে সাধারণ উদ্ভিজ্জ তেল ও মাখনের যা কাজ, বনস্পতিও সেই কাজই করে। উপরন্তু, ভারতে যে মাখন ও বনস্পতি পাওয়া যায় তা 'এ' ভিটামিনে সমৃদ্ধ।"

—ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চের অনুসন্ধানের ফল; ১৯৫৯-এর ১১ই ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডি. পি. কার্মারকার কর্তৃক লোকসভায় উপস্থাপিত।

প্রকৃত কথা হচ্ছে, বনস্পতি বিশেষ পুষ্টিকর। প্রতি আউন্স বনস্পতিতে ভিটামিন 'এ' ৭০০ ইণ্টারন্যাশনাল ইউনিট এবং ভিটামিন 'ডি' ৫৬ ইণ্টারন্যাশনাল ইউনিট মেশানো থাকে। অতএব, বনস্পতি আমাদের উৎকৃষ্ট ভোজ্য স্নেহপদার্থগুলির মতই পুষ্টিকর, বরং যেসব ভোজ্য তেলে ভিটামিন মেশানো হয় না তাদের চেয়ে বেশী পুষ্টিকর।

কাজেকাজেই, বনস্পতি যে ৩০ বছরেরও ওপর ভারতের ঘরে ঘরে প্রতিদিন ব্যবহার করা হচ্ছে এটা আশ্চর্যের বিষয় নয়। গত ১৮ বছর ধ'রে বনস্পতি আমাদের সৈন্যবাহিনীর লোকেদের খাদ্যের মধ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, উদ্বাস্তু শিবিরে, হোটেলে, রেস্তোঁরায়, ক্লাবে, হাসপাতালে ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে যেখানেই কম খরচে স্বাস্থ্যকর ও উপাদেয় খাবার তৈরী করা হয় সেখানেই বনস্পতি নিয়মিত ব্যবহার করা হচ্ছে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন :

দি বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া

ইণ্ডিয়া হাউস, ফোর্ট স্ট্রীট, বোম্বাই-১

VMA 939

GOVERNMENT LIBRARY Cooch Behar

বিলাতে রবীন্দ্রনাথ

ডঃ শশধর সিংহ

রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে বিলাত যান। তিনি লণ্ডন থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরবেন, এই ছিল পিতৃদেবের পরম অভিলাষ। ১৮৭৮ সাল থেকে যতকাল বিদেশে ছিলেন, তার চিত্তগ্রাহী বর্ণনা কবি "জীবন স্মৃতি'তে করেছেন। এখানে তখনকার ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি করা নিষ্প্রয়োজন।

একথা সর্বজন বিদিত যে, এবারায় রবীন্দ্রনাথকে শূন্যহস্তে, পড়াশুনা শেষ না করেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছিল। তথাপি ব্যারিস্টার হবার অভিপ্রায় তখনও একেবারে পরিত্যক্ত হয়নি। সুতরাং ১৮৮১ সালের মে মাসে কবি পুনরায় বিলাত যাত্রা করলেন। কিন্তু ভাগ্যের কি হেরফের, তাঁকে মাদ্রাজ থেকেই কলকাতায় ফিরে আসতে হ'ল। এই সম্পর্কে গুরুদেব লিখেছেন : "কিন্তু ব্যারিস্টার হওয়ার বিরুদ্ধে নিয়তি এমন কড়া রায় দিলেন যে, আমার বিলাত পর্যন্ত যাওয়াই হ'লনা।"

আদালতের রায় নিয়ে অনেক সময়েই জনসাধারনের মধ্যে মতদ্বৈধ হ'য়ে থাকে। কিন্তু উল্লিখিত রায়টি যে সর্বকালের জন্য মানবসমাজে প্রশংসিত ও অনুমোদিত হ'বে, সে-সম্বন্ধে কোন দ্বিতীয় মত হ'বে বলে মনে হয়না। রবীন্দ্রনাথ ব্যারিস্টার হ'তে সমর্থ হ'লেন না সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নথিচর্চার ব্যর্থতা থেকেও তিনি মুক্তি পেলেন। সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করবার পূর্ণ সুযোগ এবার তাঁর মিলল। এতে করে কলকাতা হাইকোর্ট নিশ্চয়ই ক্ষতি-গ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু নানাদিক দিয়ে সারা পৃথিবী যে লাভবান হয়েছে, তার প্রমাণ আগামী বৎসরে বিশ্বব্যাপী রবীন্দ্র শত-বার্ষিকী উদ্‌যাপনের বিপুল পরিকল্পনা ও আয়োজন।

আইন পড়া কবির কপালে ছিল না, তা হ'লেও প্রথম বারের বিলাতবাস একেবারে ব্যর্থ হয়েছিল বলা যায় না। য়ুনিভার্সিটি কলেজ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি নামজাদা পুরাতন শিক্ষায়তন। এখানে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী সাহিত্য অধ্যয়নের জন্য যোগদান করেন।

১৯৫৮ সালে, ভারত সরকারের অনুরোধে আমি বিলাতে রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত নানা তথ্য উদ্ঘাটন করতে সমর্থ হয়েছিলাম। এই সম্পর্কে ইউনিভার্সিটি কলেজের বর্তমান কর্মসচিবকে আমি এক পত্র লিখি। ভরসা ছিল, ছাত্র রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নতুন কিছু খবর পাওয়া যাবে। তিনি উত্তরে লিখলেন: "কবি ১৮৭৯-৮০ বিদ্যাভ্যাস সালে ইউনিভার্সিটি কলেজে যোগ দেন এবং এর জন্য আট গিনি দক্ষিণা প্রদান করেন। ঐ সময়ে তাঁর ঠিকানা ছিল—দশ নম্বর ট্যাভিস্টক স্কোয়ার।" সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মত গুরুদেবকেও যে আট গিনি ফী দিতে হয়েছিল, এই মাত্র হল নূতন খবর। এর বেশী কিছু আশা করাই ভুল হয়েছিল।

বলাবাহুল্য যে, এই দশ নম্বর বাড়ীটি ছিল ডাক্তার স্কটের বাসভবন। এঁর পরিবারের সঙ্গে কবির বেশ ঘনিষ্টতা হয়েছিল। 'জীবন স্মৃতি'র পাঠকমাত্রই তার খবর রাখেন।

কৌতূহল হ'ল বাড়িটা দেখে আসি গিয়ে। ট্যাভিস্টক স্কোয়ার ব্রিটিশ মিউজিয়ামের খুব কাছেই। পড়া কামাই করে একদিন ভোরে বেরিয়ে পড়লাম। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ১০ নম্বরের সন্ধান মিললনা। বাড়িটি নিশ্চিহ্ন হয়েছে। এখন তার পরিবর্তে উঠেছে উঁচু বড় ইমারত। দেখে মনে হ'ল আফিস-বাড়ি।

দেশে ফিরে আসবার পর বহু বৎসরের ব্যবধান চলল। ১৯১২ সালে গুরুদেব পুনরায় ইংলণ্ডে এলেন। বোধ করি ১৮৯৯ সালেও আরেকবার এসেছিলেন, কিন্তু এবিষয়ে কোন বিশ্বাসযোগ্য নজির চোখে পড়েনি।

বিলাতের সঙ্গে আবার নূতন করে যোগসূত্র স্থাপিত হ'ল। ১৯১২ সালের

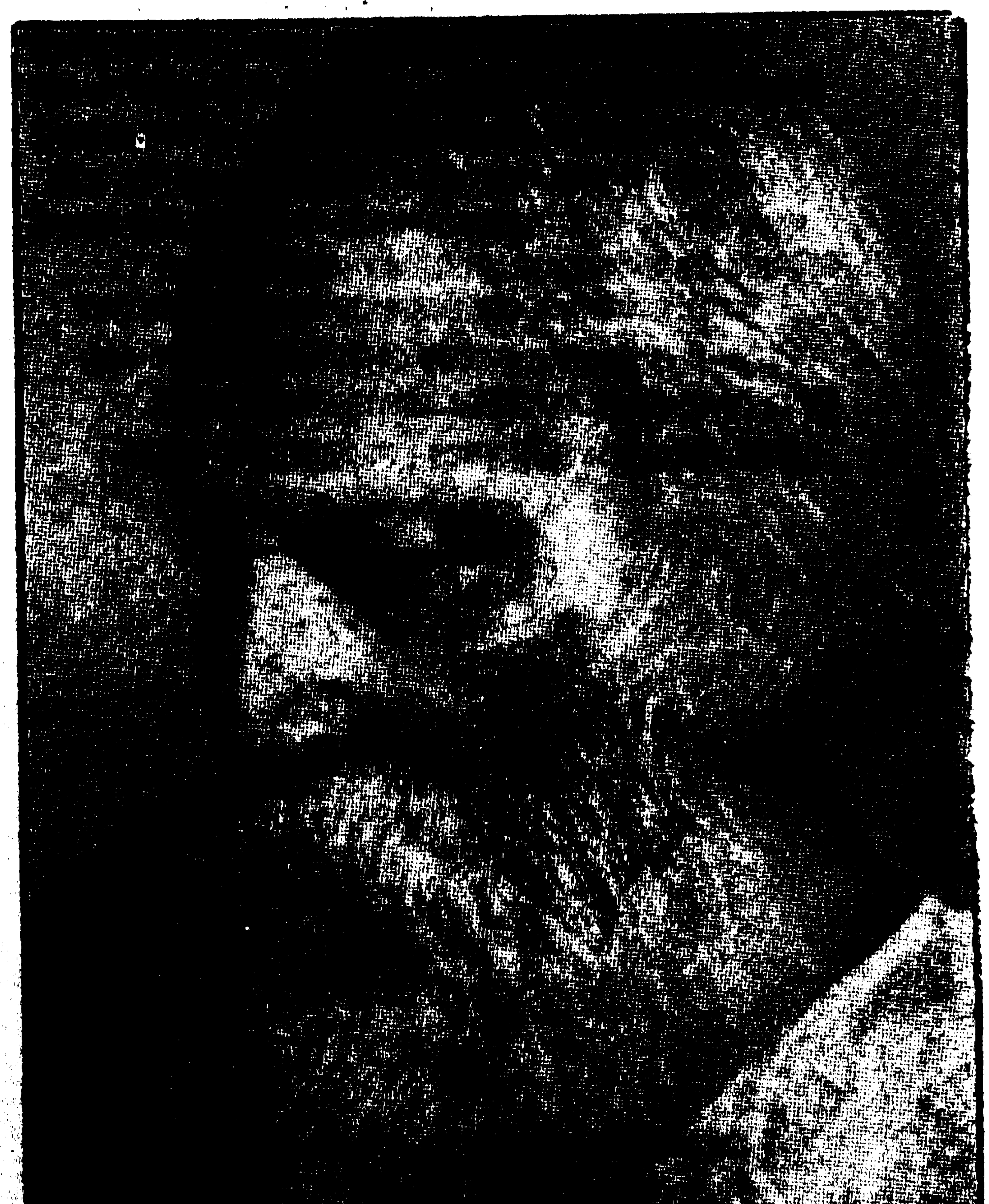

ফটো—শম্ভু সা.

পর্ব থেকে যে-যুগের সূচনা হ'ল, কবির জীবনে তাকে ফসল কাটার অধ্যায় বলা যেতে পারে। বিলাতে প্রকাশিত সমসাময়িক পুস্তক, সংবাদপত্র, স্মৃতিকথা ইত্যাদি থেকে গুরুদেবের ঐ সময়কার সাহিত্যিক ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-গগনে তিনি প্রথম উদয় হ'লেন ১৯১২ সালে, ইংরেজী ভাষায় 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। কবির জগতজোড়া যশোগাথার এই হ'ল সূত্রপাত।

এই প্রসঙ্গে, উইলিয়াম ইয়েটস্, উইলিয়স রদেনস্টাইন ও আরনেস্ট রীজ, এই তিনটি নাম উল্লেখযোগ্য। স্যর উইলিয়াম রদেনস্টাইন ভারত ভ্রমণে আসেন এবং সেই উপলক্ষে গুরুদেবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। বস্তুত এ'রই সহায়তায় ব্রিটিশ রাজধানীর সাহিত্যিক ও শিল্পী মহলে গুরুদেবের প্রবেশপথ সুগম হয়েছিল।

প্রসিদ্ধ আইরিশ কবি ইয়েটস লিখলেন 'গীতাঞ্জলি'র ভূমিকা। কবি রদেনস্টাইনকে পুস্তকখানি উৎসর্গ করলেন।

১৯১২ সালের জুলাই মাসে লণ্ডনের ট্রকাডেরো রেস্তরাঁতে রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দনের জন্য এক ভোজের ব্যবস্থা হ'ল। এই ভোজসভায় অন্যান্য অভ্যাগতদের মধ্যে এইচ, জি, ওয়েলস্ও উপস্থিত ছিলেন। কবিকে স্বাগত করলেন ইয়েটস্ এবং ভোজারম্ভে প্রশস্তিবাচন করতে গিয়ে তিনি বললেন : "আমার সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে আমি কাউকে জানিনা যিনি ইংরেজী ভাষায় এমন কিছু লিখেছেন, যার 'গীতাঞ্জলি' গীতিকাব্যের সঙ্গে তুলনা হ'তে পারে। এই কবিতাগুলি আক্ষরিক গদ্যে তর্জমা হয়েছে। কিন্তু এগুলিকে যখনই পড়ি, এদের মধ্যে ভাষা ও ভাবের অপূর্ব সমাবেশ দেখে আশ্চর্য হই।"

রদেনস্টাইন খড়ি-অঙ্কিত কবির প্রতিকৃতিগুলিতে তাঁর সাক্ষর রেখে গেছেন। ওয়েইলসের কবি রীজ এসম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেছেন: "এই প্রতিকৃতিগুলির ভিতর দিয়ে যুগপৎ কবি ও শিল্পী দুজনেরই পরিচয় পাই।"

রীজ রবীন্দ্রনাথের জীবনী লিখলেন এবং তাঁর অন্যান্য পুস্তকেও কবি সম্বন্ধে দৃষ্টিপাত করে গেলেন।

"Everyman Remembers" পুস্তকে তিনি লিখেছেন: "একদিন বিকালবেলা দরজায় ধাক্কা পড়ল এবং ঘোষিত হ'ল অতিথি এসেছেন। সত্যিই এমন আশ্চর্য-রকমের চিত্তাকর্ষক অতিথি আগে কখনও দেখবার সৌভাগ্য হয় নি। ঝি যখন দরজা খুলে দিল, এগিয়ে এলাম ও দেখলাম যে, চৌকাঠের গোড়ায় এক দীর্ঘকায় সুপুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে তাঁর কাঁচা-পাকা দাড়ি। গায়ে ধূসরবর্ণ আটসাট পরিচ্ছদ, পা পর্যন্ত গড়িয়ে পড়েছে। থমকে দাঁড়ালাম। মনে হ'ল যেন বাইবেলের আইজায়া আমার দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান। অচিরে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, এই রহস্যময় অতিথিটি দেখে ভীত হ'বার কোন কারণ ছিল না। ইনি আমাদের নিজের ভাষাতেই কথা বলেন। তাঁর কথাবার্তার শান্ত গাম্ভীর্য আমাদের মুগ্ধ করল। এমন সাদাসিধা, সহজ অতিথিকে তুষ্ট করা মোটেই কঠিন হয় নি। তিনি আশা করলেন না যে, তাঁর সঙ্গে গূঢ় অধ্যাত্ম বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। আমাদের কাছে তিনি আজগুবী খাদ্য দাবী করলেন না। অন্য সাধারণ লোকের মত তিনিও আমাদের প্রদত্ত ভারতীয় চা পান করলেন, আর তার সঙ্গে জাফরান রঙের "পান"ও খেলেন।"

গুরুদেব প্রায়ই কবি রীজের বিখ্যাত "৪৮" নম্বরের বাড়িতে আসতেন। তাঁর সঙ্গে ১৯৩০ সালে আমারও সেখানে যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। যাঁরা লণ্ডনে অনেককাল বাস করেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই শুনে খুশী হবেন যে, গুরুদেব অনেক সময়ে আমাদের মত এক-একটা সাধারণ বাড়িতে থেকেছেন এবং সেসব বাড়িতে অনেক প্রসিদ্ধ গান রচনা করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ "সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি" উল্লেখ করা যেতে পারে। "গীতিমাল্যে"র এই গানটি তিনি লেখেন উত্তর-পশ্চিম-লণ্ডনে, হ্যাম্পস্টেড এলাকায়। দুই নম্বর হলফোর্ড রোডে এই বাড়িটি এবং এর নাম হ'ল "দি হীথ"। এই বাড়িটি এখনও বিদ্যমান আছে, যদিচ এটা এখন একটা ছাত্রীনিবাসে পরিণত হয়েছে। নারী-স্বাধীনতা-বিশ্বাসী কবি এ খবরটা জানতে পেলে নিঃসন্দেহ খুশী হ'তেন। "তোমারি নাম বলব নানা ছলে" প্রভৃতি অন্যান্য আরও গান তিনি লিখলেন লণ্ডনের অন্য প্রান্তে, দক্ষিণ লণ্ডনে, টেমস্ নদীর কাছে এক বাড়িতে। কৌতূহলীরা চেলসি অঞ্চলে ষোল নম্বর মোরস্ গার্ডেনে গেলে বাড়িটি দেখতে পাবেন—যুদ্ধকালীন জর্মন বোমা-বর্ষণ সত্ত্বেও এখনও অক্ষত রয়েছে।

চিঠিপত্র লেখায় কোনকালে গুরুদেবের শ্রান্তি ছিল না। দেশেবিদেশে কত লোককে কত বিষয়ে তিনি চিঠি লিখেছেন তার ইয়ত্তা নেই। এ-সবের অনেকগুলি সংগৃহীত হয়েছে সত্য, কিন্তু বিদেশীদের কাছে লেখা বহুসংখ্যক চিঠির হদিস কোনকালে মিলবে বলে বিশ্বাস হয় না। এই ব্যাপারে আমি বিলাতে অনেক চেষ্টা করেও বেশী কিছু উদ্ধার করতে সমর্থ হইনি। যেগুলি পেয়েছিলাম তার অধিকাংশের মূল্য সাময়িক।

সাহিত্যসংক্রান্ত যে কয়েকটি চিঠি আমার নজরে পড়েছে, তার মধ্যে একটি বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। রবার্ট ব্রিজেসের সঙ্গে গুরুদেবের পত্রবিনিময় হয় ইংরেজীতে বিদেশী লেখার ভাষান্তর সম্পর্কে। কবি ব্রিজেস গুরুদেবের লেখার ইংরেজী তর্জমাগুলি পছন্দ করেন নি। তিনি সেগুলিকে সংশোধন করতে চেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য গুরুদেব তাতে সম্মতি দেন নি। তর্জমা সম্পর্কে গুরুদেবের মতামত এসব চিঠিতে পাওয়া যাবে। এই পত্র বিনিময়ের একটা ফোটোকপি আমি দেশে পাঠিয়েছিলাম। এই বাদানুবাদ নিয়ে দুই কবির মধ্যে একটু মনকষাকষি হয়েছিল বলে মনে হয়।

গুরুদেব তাঁর চিঠিপত্রে মাঝে মাঝে

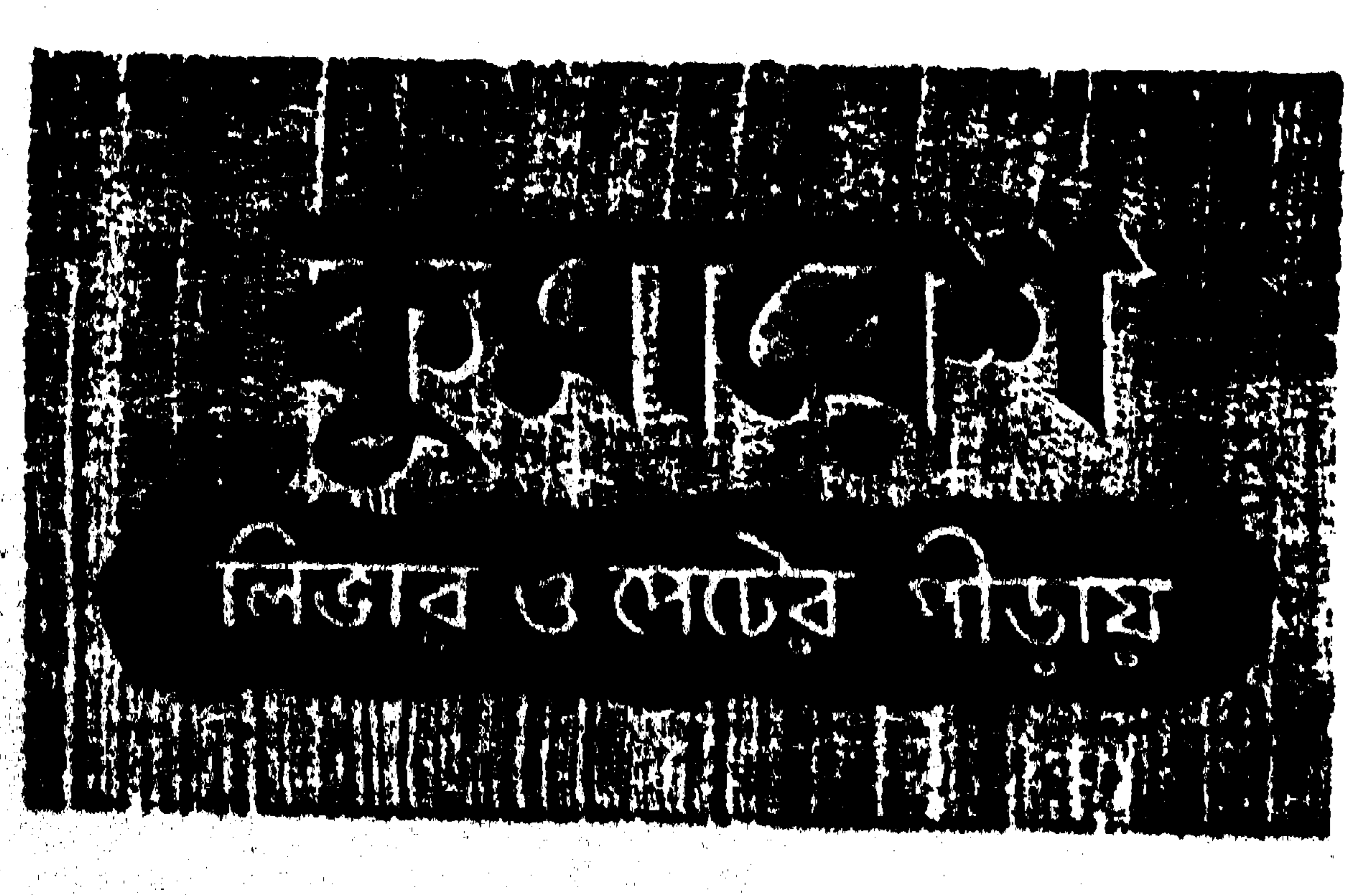

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক লেখকদের সম্বন্ধে যেসব মতামত প্রকাশ করেছেন, তারও মূল্য কম নয়।

কবি সম্বন্ধে কোন বিশেষ খবর জানতে হ'লে বিলাতের টাইমস্ ও ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকার পুরাতন সংখ্যাগুলি অবশ্য-দ্রষ্টব্য। টাইমস্ ইণ্ডেক্স এই বিষয়ে খনিবিশেষ বললে অত্যুক্তি হবে না। ১৯১২ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত গুরুদেব সম্বন্ধে তাতে যেসব তথ্যের উল্লেখ আছে, তার একটা সম্পূর্ণ তালিকা আমি দেশে পাঠিয়েছিলাম।

১৯১২—৩০ সাল, অর্থাৎ আঠার বৎসরকাল কবির পক্ষে সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ বলা যেতে পারে। কারণ এই সময়ে ইংরেজ জনসাধারণ রবীন্দ্রনাথের লেখা ও চিন্তাধারার সহিত সম্যকভাবে পরিচিত হয় ও তাঁর বাণী গ্রহণে ঔৎসুক্য দেখায়। আর তখন বিভিন্ন য়ুরোপীয় ভাষায় কবির রচনার তর্জমা পর পর প্রকাশ হ'তে থাকে এবং তাঁর বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে এই সব তর্জমার যেসব নাম পেয়েছিলাম, তারও একটা তালিকা দেশে পাঠাই। অনেকক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ তর্জমাগুলির এক এক পৃষ্ঠা ফোটোকপি করেও পাঠিয়েছিলাম।

এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন সাহেবের সঙ্গে গুরুদেবের প্রীতির সম্বন্ধ চিরজীবন অক্ষুণ্ণ ছিল। এমনকি, তাঁর এই দুইটি ইংরেজ বন্ধু ভারতীয় দৃশ্যপটের সামিল হয়ে গিয়েছিলেন বললেও অতিশয়োক্তি হ'বে না। ১৯২৪ সালে ভারতবর্ষে ফেরবার পথে ইটালীতে এক রেল দুর্ঘটনায় অল্প বয়সে পিয়ার্সন সাহেবের মৃত্যু ঘটে। এই শোচনীয় খবর পাবার কিছুদিনের মধ্যেই বোলপুরে আমি তাঁর কাছ থেকে এক চিঠি পেয়েছিলাম বলে মনে পড়ে।

পিয়ার্সন-পরিবারের সঙ্গে গুরুদেবের খুব আত্মীয়তা ছিল বলে, আমি পিয়ার্সন সাহেবের জ্যেষ্ঠা ভগিনী, মিসেস রিচার্ডসকে এক পত্র লিখি। আমি তাঁর প্রিয় ভ্রাতার প্রাক্তন ছাত্র জানতে পেরে, খুশি হয়ে এক দীর্ঘ চিঠি লেখেন। তিনি বললেন: "উইলির সঙ্গে কবির প্রথম দেখা হয় লণ্ডনের হ্যাম্পস্টেড অঞ্চলে—আটাশ নম্বর চার্চ রোতে (Church Row)। ঐ বাড়িতে ট্যাট্ গ্যালারীর ক্যুরেটর চার্লস এইটকেন আর আমার স্থপতি-ভ্রাতা লাইওনেল জি পিয়ার্সন কবির অভ্যর্থনার জন্য এক চায়ের ব্যবস্থা করেন। উইলি এসে তাঁকে (কবিকে) ভারতীয় প্রথায় গড় হয়ে প্রণাম করল। এই দেখে ইংরেজ-নিমন্ত্রক বন্ধুদ্বয় নিঃসন্দেহে আশ্চর্য হয়েছিলেন।"

এণ্ড্রুজ সাহেব ১৯১২ সালের গ্রীষ্মকালে লিখলেন: "এর কিছুকাল পরেই আমি ইংলণ্ডে আসি এবং আমরা দুজনে মিলে কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। ভারতবর্ষ সম্পর্কে পিয়ার্সন যাকিছু ভালবাসতেন, কবি ছিলেন তার প্রতীক।"

ইংরেজী ভাষায় রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ দখল ছিল। তথাপি তিনি তাঁর ইংরেজীতে লেখার ক্ষমতা সম্বন্ধে কখনও নিঃসন্দেহ হতে পারেননি। এই কথাটা ভেবে আমি অনেক সময় কৌতুক বোধ করেছি, কিন্তু আশ্চর্য হইনি। এই সম্পর্কে বোলপুরে ছেলেবেলার একটা কথা এখনও মনে পড়ে। কতবার দেখেছি, গুরুদেব তাঁর ইংরেজীতে লেখা চিঠির খসড়া আমাদের ইংরেজীর শিক্ষক নেপালবাবুকে পাঠিয়েছেন—দেখে দেবার জন্য। এর তাৎপর্য তখন বুঝিনি, এখন বুঝতে পারছি।

সিকিম র‍্যাফল

গ্যারাণ্টিযুক্ত নগদ পুরস্কার
বৃহত্তম প্রথম পুরস্কার ১,০০,০০০ টাকা — অবশ্যই লাভ করতে হবে, সেই সঙ্গে আরও পুরস্কার।

গত খেলা হয়েছে ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬০ তারিখে
প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন—শ্রীমতী পদ্মাবতী দেবী,
গ্রাম, এন, পাটনা, পো. অ. রাজাড়া,
ভায়া কেন্দ্রাপাড়া, জেলা কটক (উড়িষ্যা)

দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন—এস. সেবা সিং,
পিপারিয়া, ভূরভিরা (খেরী), ইউ. পি.

তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন—শ্রীরঘু ছুটে,
কার্ণক বন্দর, বারাদ বাজার,
স্টীমার ৬৫৫৪, বোম্বাই।

পুরস্কারের টাকা ইতঃপূর্বেই স্টেট ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে এবং ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ জামীন। সিকিম সরকার পুরস্কারের টাকার জন্য দায়ী।
কে জানে আপনি আগামী পুরস্কার পাবেন না।
"টিকিটের মূল্য প্রতিটি ১ টাকা"
১৯টি টিকিটের একটি বই ১২ টাকা মাত্র
সকলের উপযোগী সর্বাধিক সস্তা।।

টিকিট বিক্রয় বন্ধ — ৭-১২-১৯৬০ খেলার তারিখ — ৩১-১২-১৯৬০
টিকিট ও ফরমের জন্য আবেদন করুন : দি অনররী সেক্রেটারী
এইচ. আর চ্যারিটিজ্ ফণ্ড, গ্যাংটক (সিকিম)
[ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৪-এ ধারা অনুসারে ২-৪-১৯৫৯ তারিখে সিকিম সরকার কর্তৃক অনুমোদিত (১১—জি এস/১/৫৯)]

সিকিম র‍্যাফল এইচ আর চ্যারিটিজ-এর
টিকিট আমাদের কাছে পাবেন।
কে, সি চ্যারিটিজ ফাণ্ড (লটারি)
প্রতি টিকিট ১, ১৯টি ১২, ৭৬টি ৪০,
ক্লোজিং ৭-১২-৬০। ফর্ম বিনামূল্যে
ভাগ্যলক্ষ্মী ডিস্ট্রিবিউটার্স,
৭৫, শোভাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৫। ফোন : ৫৫-১৫৪২।

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন!
যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র

বাকলা

বহু গাছড়া দ্বারা বিশুদ্ধ মতে প্রস্তুত
ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন
ভারত গভঃ রেজিঃ নং ১৬৮৩৪৪

অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা,
মুখে টকভাব, ঢেকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দাগ্নি, বুকজ্বালা, আহারে অরুচি, স্বল্পনিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যাঁরা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও বাকলা সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিফলে মূল্য ফেরত।
৩২ তোলার প্রতি কৌটা ৩ টাকা, একত্রে ৩ কৌটা — ৮॥০ আনা। ডাঃ মাঃ ও পাইকারী দর পৃথক।

দি বাকলা ঔষধালয়। হেড অফিস- বরিশাল (পূর্ব পাকিস্তান) ব্রাঞ্চ—১৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৭

আমার ব্যক্তিগত দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, গুরুদেব সাধারণ ছাত্রদের মত শিক্ষার নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে মানুষ হননি বলে, তিনি তাঁর শিক্ষা ও জ্ঞান সম্বন্ধে কখনই নিঃসংশয় হতে পারেননি। সব সময়েই তাঁর মনে একটা দ্বিধা রয়ে গিয়েছিল। ইংরেজী ভাষায় লেখার ক্ষমতা সম্বন্ধে এর ছায়া সহজেই চোখে পড়ে।

অধ্যাপক র‍্যাটরে এই বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত দেখতে পাচ্ছি। তিনি কেমব্রিজ থেকে গুরুদেবের উপর একটা লেখা পাঠিয়েছিলেন। তার থেকে কবির ইংরেজী জ্ঞান সম্বন্ধে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করে দিয়েছিলেন।

বৃদ্ধ বয়সেও গুরুদেব এ বিষয়ে আত্ম-প্রত্যয় ফিরিয়ে পাননি। তার নিদর্শন পাই ১৯৩০ সালে লেখা এক চিঠি থেকে। ঐ বৎসরে হিবার্ট বক্তৃতা দিতে এসে তিনি কিছুদিনের জন্য টট্‌নেসে, ডারটিংটন হলে এলমহার্স্ট সাহেবের অতিথি হলেন। সেখান থেকে তিনি হিবার্ট বক্তৃতাগুলির প্রসঙ্গে অধ্যাপক এল পি জ্যাকসের পত্নীকে এক চিঠিতে লিখলেন: "আমি লাজুক-প্রকৃতির, আত্মবিশ্বাস আমার নাই, ইংরেজী ভাষায় সূক্ষ্ম চিন্তা করবার ক্ষমতা সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ হতে পারি না। এই হেতু আপনার স্বামীর প্রশংসাবাদ আমাকে কেবল আনন্দ দেয়নি, আশ্বস্তও করেছে।" প্রসিদ্ধ বিডেইলস্ স্কুলের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক জ্যাকসের পুত্র ডক্টর জ্যাকসের কাছ থেকে এই চিঠিখানা সংগ্রহ করেছিলাম।

অধ্যাপক র‍্যাটরে লিখেছেন: "কবি আমাকে বলেছিলেন যে, তাঁর পিতা তাঁর জন্য এক ইংরেজ শিক্ষক নিযুক্ত করেন, কিন্তু প্রথম দিনই তিনি বেঁকে বসলেন। কিন্তু পিতৃদেব এই নিয়ে বেশী পীড়াপীড়ি করলেন না। বালক রবীন্দ্রনাথ তৎপরে পিতার পাঠাগারে গিয়ে ডিকেনসের একটি বই নামিয়ে শক্ত কথাগুলি বাদ দিয়ে পড়তে শুরু করে দিলেন। এই অভ্যাস তিনি চালিয়ে গেলেন এবং এইভাবে ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করতে সমর্থ হলেন। ফল হল এই যে, তাঁর ব্যাকরণ-জ্ঞান চির-কালের জন্য কাঁচা রয়ে গেল। তাই তিনি যখন আমাকে তাঁর এক পাণ্ডুলিপি পড়তে দিলেন, আমি অবশ্য তাঁর ইংরেজী ভাষার দখল দেখে আশ্চর্য হলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেক ব্যাকরণ দোষও চোখে পড়ল, যেমন কর্তার বহুবচনের সঙ্গে ক্রিয়ার এক-বচনের প্রয়োগ। বলা বাহুল্য, এই সম্পর্কে আমার আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হ'ল এই যে, আমি একাধারে এক শ্রেষ্ঠ লেখকের ইংরেজী রচনা পড়ছি, আর সেই একই লেখা বিদ্যা-লয়ের ছাত্রের প্রবন্ধের মত সংশোধন করে যাচ্ছি। এই লেখাটি হ'ল আমেরিকার কবির প্রথম বক্তৃতা। 'The Problem of Evil'। ১৯১৩ সালে এটি Hilbert Journal-এ প্রকাশিত হয় এবং পরে 'সাধনা' পুস্তকে স্থান পায়।

পরিব্রাজক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের কম খ্যাতি ছিল না। সাধারণত তিনি বিলাতে আসতেন পি এণ্ড ও কোম্পানির জাহাজে করে। তাই দেখতে পাই, ১৯১২ সালে তিনি "সিটি অব্ লাহোর" জাহাজ থেকে "বাজাও আমারে বাজাও" গানটি লিখলেন। আবার ১৯২১ সালে, মোরিয়া জাহাজের যাত্রী হিসাবে লিখলেন তাঁর অনেকগুলি চিঠি, যেগুলি "Letters to a friend" হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এইগুলি এণ্ড্রুজ সাহেবকে লেখা।

১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যার পর কবি "স্যর" উপাধি পরিত্যাগ করলেন। তারপর থেকে বিলাতে যতবার এসেছেন, ব্রিটিশ রাজধানীতে তাঁর অভিনন্দনের হৃদ্যতা অনেকটা কমে এসেছিল বলে মনে হয়। তথাপি ১৯৩০ সালে কবি আবার এলেন "হিবার্ট"—বক্তৃতা দিতে। এই বক্তৃতা-গুলি পরে "The Religion of Man" আকারে প্রকাশিত হয়। লণ্ডনের বিখ্যাত আনউইন কোম্পানি এর প্রকাশক।

এদিকে বয়স বেড়ে চলল। কবি আর বিদেশে আসতে সাহস করলেন না। ১৯৩৫ সালে গুরুদেব স্যর ফ্রান্সিস্ ইয়াংহাজ-ব্যাণ্ডকে নিম্নোদ্ধৃত পত্র লেখেন। এটি আমি লণ্ডনে সংগ্রহ করেছিলাম। তিনি লিখলেন: আপনি আমাকে World Congress of Faiths-এর কোন একটা শাখায় পৌরোহিত্য করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে যে চিঠি লিখেছেন, তার জন্য আমি সত্যই কৃতার্থ বোধ করছি। এই সম্মান গ্রহণ করতে পারলে আমি খুবই খুশী হ'তাম। দুঃখের বিষয় এই যে, বয়োবৃদ্ধির চাপ অনুভব করতে পারছি এবং এই হেতু আবার বিলাতে পাড়ি দিতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। এইসব ভেবে আমি আপনার সাদর আমন্ত্রণ রক্ষা করতে অসমর্থ হ'লাম বলে আশা করি আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।"

১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে সব অবসান হ'ল। কবিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে গিয়ে টাইমস পত্রিকা সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখল: "গত বন্ধ বাঁধবার কয়েক বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডে কাব্য ও নাট্যচর্চার উপাদান সম্বন্ধ হ'ল এক নূতন উৎস থেকে। এর অতুলনীয় সৌন্দর্য সবাইকে মুগ্ধ করেছে। কবি ইয়েটস্ এর সম্বন্ধে জ্ঞান-বিস্তার করতে সাহায্য করলেন। লরেন্স বিনিয়ন তাঁর গভীর, পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাহিত্যবিচার দ্বারা এই প্রচারকার্যে সহায়তা করলেন। আর রবীন্দ্র-নাথের সুন্দর পুরুষোচিত মস্তক অঙ্কন করে স্যর উইলিয়াম রদেনস্টাইন ইংরেজী চিত্রাঙ্কনে এক নতুন সম্পদ নিয়ে এলেন। এই সময়ে ইংলণ্ডে কাব্যনাটকের ঐতিহ্য বিরল ও ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ইণ্ডিয়া সোসাইটির দাক্ষিণ্যে লণ্ডনের শ্রোতৃমণ্ডলী কবির "চিত্রা", "ডাকঘর" ও অন্যান্য কাব্য-নাটিকা উপভোগ করলেন। মনে হ'ল, যেন রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের উপর দিয়ে কোন এক সুবাস ভেসে এল, কিন্তু এ তো ইংরেজী স্বাদের মেঠো গন্ধ নয়, এ যে একেবারে সুদূর অরণ্যের অবিমিশ্র সৌরভ।

"ইংরেজ সৌন্দর্যপ্রেমিক সাধকদের এক অসাধারণ মনের সঙ্গে যোগাযোগ হ'ল। এই স্বপ্নালু মনটির আভিজাত্য ও সূক্ষ্ম সুরুচি বোধের সঙ্গে আজ কার না পরিচয়

মুক্ত হস্তে দান করুন
সায়ুধ সেনা পতাকা দিবস
(৭ই ডিসেম্বর)
পূর্বতন সৈনিক ও তাঁদের
পরিবারের কল্যাণের জন্য

নারায়ণ চক্রবর্তীর
তীর্থাঞ্জলি
ভারত-ব্রহ্ম-চীনের বিস্তৃত পটভূমিকায় লেখা অনন্যসাধারণ রহস্য-উপন্যাস। ৩.০০
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২ ও অন্যান্য পুস্তকালয়।

সদ্য-প্রকাশিত
বারীন্দ্রনাথ দাশের
অনেক সন্ধ্যা, একটি সন্ধ্যাতারা
বারীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্যময় লেখনীর আর একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সার্থক কাহিনী
মূল্য : চার টাকা
প্রকাশের অপেক্ষায়
যে উপন্যাস জনপ্রিয় হবে
সুবোধ ঘোষের
মুক্তিপ্রিয়া
প্রকাশক ও বিক্রেতা
গ্রন্থশ্রী প্রাইভেট লিমিটেড
৪৬।৫বি, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯
পরিবেশক :
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলি-১২
(সি ৯২২২)

আছে? বংশের দিক দিয়ে ইনি টলস্টয়ের সমকক্ষ। তাঁর মত ইনিও যৌবনে বৈষয়িকতার মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন। দুজনেরই ব্যক্তিত্বের কাছে সবাইকে মাথা নত করতে হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তীক্ষ্ম ব্যবহারিক ক্ষমতার দিক দিয়ে টলস্টয়ের থেকে বড় ছিলেন। এর সাহায্যে, এই শিল্পী, স্বপ্নলোকবাসী, প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রাচ্য কবি কি সাহিত্যে, কি ধর্মে নিজের আদর্শবাদকে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।"

একই দিনে ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান কবির উপর সম্পাদকীয় লিখল। তার থেকে কয়েকটি ছত্র উদ্ধার করে দিলাম: "যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, তাঁরা কখনই কবির মহান উপস্থিতি বা তাঁর অসাধারণ মুখাবয়বের কথা ভুলতে পারবেন না। তাঁর বিবিধ প্রতিকৃতি থেকে এই পার্শ্বচিত্রের সৌন্দর্যের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। কবি সর্বপৃথিবীর মানুষের ঐক্যে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁর অন্তিম স্মৃতি চিরকাল এই প্রগাঢ় বিশ্বাসের সংগে জড়িত থাকবে।"

সর্বত্র গৃহিণীরা বলাবলি করছেন

- সার্ফে কাচলে বোঝা যায়

সাদা জামাকাপড়

কতখানি ফরসা হতে পারে!

সার্ফে কাচলেই বুঝতে পারবেন যে সার্ফ জামাকাপড়কে শুধু "পরিষ্কার" করে না, ধবধবে ফরসা করে। সার্ফে কাচারও কোন ঝামেলা নেই। সহজেই সার্ফের দেদার ফেনা কাপড়ের ময়লা টেনে বার করে, কাপড় আছড়াবার কোন দরকার নেই। আর সার্ফে কাপড় যা পরিষ্কার হয় তা, না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। এর কারণ সার্ফের অদ্ভুত কাপড় কাচার শক্তি! দেখবেন সার্ফে রঙীন কাপড়ও কেমন ঝলমলে হবে! সার্ফে সবচেয়ে সহজে আর সবচেয়ে চমৎকার কাপড় কাচা যায়। ধুতি, শাড়ী, ফ্রক, জামা, তোয়ালে, ঝাড়ন এক কথায় বাড়ীর সব জামা কাপড় সার্ফে কাচুন—দেখবেন ধবধবে ফরসা করে কাচতে সার্ফের জুড়ী নেই!

সার্ফ দিয়ে বাড়ীতে কাচুন, কাপড় সবচেয়ে ফরসা হবে

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

SU. 12-X52 BG.

GOVERNMENT LIBRARY

কবি স্যাঁ-ঝন প্যার্স

অরুণ মিত্র

স্যাঁ-ঝন প্যার্স নোবেল পুরস্কার না পেলে আশ্চর্যের কিছু ছিল না, বরং তাঁর পাওয়াটাই যেন একটু অস্বাভাবিক। কারণ ফ্রান্সের বড় কবিরা এ-পুরস্কার পাবেন না, এটা একরকম ধ'রেই নেওয়া গিয়েছিল। অকালমৃত্যুর জন্যে আপলিন্যার ও পেগি যদি বাদ পড়ে গিয়ে থাকেন, অন্যেরা কিন্তু অনেকদিন বেঁচে থেকেও পাননি। ক্লোদেল, ভালেরি, সুপেরভিয়েল, রুভেরদি, এলুয়ার, কেউ না। সুতরাং প্যার্স কেন? অবশ্য সাহিত্যের জন্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার একজন ফরাসী কবিকেই দেওয়া হয়েছিল ১৯০১ সালে। দুঃখের বিষয়, তাঁর কবিতা আজ আর কেউ বিশেষ পড়ে না, এমনকি, সাহিত্যের ইতিহাসেও স্যুলি-প্রুদম নামটা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। হায় প্রচার, হায় পুরস্কার!

যাই হোক, এই সময় স্যাঁ-ঝন প্যার্সকে পুরস্কার দিয়ে নোবেল কমিটি ভালো কাজই করেছেন। তাতে কবির গৌরব না বাড়ুক, আমাদের কিছু উপকার হতে পারে। তাঁর কাব্যের প্রতি এখন সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট হবে। সেটা কাম্য। সাহিত্যে যখন কেরানী-কবিতার প্রাদুর্ভাব হয়, তখন ঐরকম সৃষ্টির দিকে তাকানো স্বাস্থ্যপ্রদ। প্যার্সের ফুসফুসে প্রচুর বাতাস, চোখের দেখা অবাধ এবং তাঁর পদক্ষেপ বিস্তীর্ণ পৃথিবীর পথে।

কবির আসল নাম আলেক্সি স্যাঁ-লেঝে লেঝে বা সংক্ষেপে আলেক্সি লেঝে। বরাবর পররাষ্ট্র বিভাগে বড় কাজ করেছেন। নিজের ঐ নামেই প্রথমে কবিতা প্রকাশ করেছেন, পরে নাম বদলে করেছেন স্যাঁ-ঝন প্যার্স। নাম বদল করেছেন বটে, কিন্তু কবিতার ভাবভঙ্গী বদলাননি।

স্যাঁ-ঝন প্যার্স বরাবরই কবিতা লিখেছেন গদ্যে। বাইবেলে ব্যবহৃত গদ্য স্তবকের মতো, ফরাসীতে যাকে বলে Verset। তবে ছন্দের সঞ্চার তাতে মাঝে মাঝে এনেছেন এবং সাধারণ গদ্যের বাক্যবিন্যাস প্রায়ই ভেঙে দিয়েছেন। তাঁর এই গদ্যভাষায় শব্দের প্রবেশ অবারিত। প্রচলিত ও অপ্রচলিত, সহজ ও কঠিন, বৈজ্ঞানিক, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সামরিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সব রকম শব্দ ও অভিধাই তিনি কাজে লাগিয়েছেন। Eloges, Anabase, Exil, Vents, Amers এবং শেষ প্রকাশিত (যতদূর আমি জানি) Chronique—তাঁর সব কাব্যেই এই রচনা-রীতি।*

তাঁর এই গদ্যকাব্য রচনায় পথপ্রদর্শক নিঃসন্দেহে র‍্যাঁবো, ক্লোদেল এবং Les Nourritures Terrestres-এর ঝিদ্। মনে হয়, এ পদ্ধতিই প্যার্স-এর বক্তব্যের উপযুক্ত বাহন। জীবনকে বিশালভাবে ধরতে গেলে হিসেব-করা পুরোনো ছন্দমিলে যেন আর কুলোয় না। জীবনকে এক opéra fabuleux-র মতো দেখা থেকে জন্মেছিল র‍্যাঁবোর হীরকপ্রভ গদ্য; দৃশ্য অদৃশ্য সব-কিছুতে ঈশ্বরসত্তার অনুভবে ক্লোদেল সৃষ্টি করেন তাঁর কবিতার গভীর ধ্বনিময় গদ্য; এবং "মাটির উপর খালি পা রাখার" প্রয়োজনবোধে ঝিদ্ তাঁর ঐ এক এক কাব্য-গ্রন্থের গদ্য, যা মাটির মতোই উষ্ণ নিবিড়।

কাব্যের শরীর ও প্রাণ উভয় দিক থেকেই এ প্রয়াস মালার্মের বিপরীত। মালার্মে কবিতাকে নিয়ে গিয়েছিলেন এক রুদ্ধতার পথে। শব্দ দিয়ে তিনি গড়তে চেয়েছিলেন এক স্বতন্ত্র স্বরাট জগৎ যেখান থেকে আমাদের এই জগৎ নির্বাসিত, যেখানে আমাদের প্রত্যক্ষ পদার্থের কোনো ব্যঞ্জনা নেই, যে ব্যঞ্জনা আছে তা তার বিলোপের। শেষ পর্যন্ত সেই অমানবিক জগতের সৃষ্টি-কর্তা নিজেরই সৃষ্টির মধ্যে বন্দী হ'য়ে গেলেন। বিংশ শতাব্দীতে যে কবিরা বস্তুর পৃথিবীর দিকে চোখ ঘোরালেন

* নামগুলির মোটামুটি উচ্চারণ যথাক্রমে এলঝ্, আনাবাজ্, এক্‌জিল, ভাঁ, আম্যার্, ক্রনিক্।

স্যাঁ-ঝন প্যার্স

যাত্রা শুরু করলেন মার্লার্মের উল্টো পথে, স্যাঁ-ঝন প্যার্স তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান।

প্যার্স-এর সৃষ্টি আশ্চর্যরকম অখণ্ড। বলা যায়, তিনি শুধু একটি মহাকাব্যই লিখেছেন। বিভিন্ন গ্রন্থ তারই এক-একটা পরস্পরসংযুক্ত অংশ। এক গ্রন্থের বিভিন্ন অংশও যেন সেইভাবে গ্রথিত। সমস্তটা এক সিম্ফনির মতো। অনেক বিচিত্র ও বিভিন্ন ধ্বনি মিলিয়ে এক সমগ্র বিশিষ্ট স্বরমণ্ডল। বিষয় যেমন ঘুরে ফিরে বারে বারে আসে, তেমন আসে শব্দ, বাক্য ও বাক্যাংশ। একই গ্রন্থের মধ্যে এবং বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে। এ রচনাকে ব্যবচ্ছেদ ক'রে দেখানো এবং লেবেল লাগানো সম্ভব নয়। সে ধরনের সুবোধ্যতাও তার নেই। সমগ্রভাবে তার ক্রিয়াটাই তার সার্থকতা। প্যার্স-এর মহত্ত্ব এই যে তাঁর কাব্য কবিতা-প্রেমিক পাঠককে অভিভূত করে, তাঁর কাব্যের আন্দোলনে সে আন্দোলিত হয়। এ ছাড়া, কাব্যের অন্য সার্থকতাই বা কি আছে?

কিন্তু এ মহাকাব্যের মূল বিষয় কি? এই বিশাল সঙ্গীতের থীম? এক কথায় উত্তর দেওয়া যায়; বস্তু ও মানুষ। সমস্ত বস্তু ও সমস্ত মানুষ। বিশেষ সময় ও স্থানের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম ক'রে কবি তাদের অবলোকন করেন। তাঁর এই অবলোকন প্রাণসন্ধানী। প্যার্স-এর কাব্য বস্তুপুঞ্জের বিদ্যমানতা, বিস্তার, বেগ, রূপান্তর এবং তারই সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে মানুষের ভাগ্য, ইতিহাস, জীবনযাত্রা, আকাঙ্ক্ষায় এক বিরাট ইঙ্গিতময় আলেখ্য। সসাগরা পৃথিবী ও নিরবধি কাল যেন তাতে বিধৃত এবং জঙ্গমতা তার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। গতির এমন স্পন্দন বর্তমান আর কোনো কাব্যে আছে কিনা সন্দেহ। প্রকৃতির শক্তি ও ব্যাপকতার রূপ যত কিছুতে তার স্থান তাঁর কল্পনায় বিশেষভাবে : সমুদ্র, বৃষ্টি, হাওয়া, মরুপ্রান্তর, তুষারপাত। এরা যেন উজ্জীবনেরও ধারক। সবচেয়ে দেখা দেয় সমুদ্র—সমস্ত প্রাণের প্রসবিত্রী আদি জননী সিন্ধু। কবির আজন্ম পরিচয়ও তার সঙ্গে। সমুদ্রঘেরা ক্যারিবিয়ান দ্বীপে তিনি জন্মেছিলেন।

চারদিকের বস্তুর নামোচ্চারণ এবং আবাহন। বস্তু শব্দটিকেই তিনি বার বার লিখেছেন। প্রথম কাব্য থেকে শেষ কাব্য পর্যন্ত। যেমন, বাল্যস্মৃতির চিত্রণে Eloges-এ :

প্রত্যেক বস্তুকে আহ্বান করে আমি আবৃত্তি
করতাম তা মহৎ...

এবং

আহা, স্তুতিময় বস্তুরা!

Anabase-এ :

শুনবার ও দেখবার অনেক বস্তু পৃথিবীতে,
আমাদের মাঝখানে জীবন্ত সব বস্তু।

Vents-এ :

তারা সব অন্বেষী বিপুল হাওয়া এই
পৃথিবীর সমস্ত পথের উপর,
সমস্ত নশ্বর বস্তুর উপর, ধরাছোঁয়ার মতো
সমস্ত বস্তুর উপর, বস্তুর সমগ্র পৃথিবীর
মাঝখানে।

Chronique-এ :

বস্তুর সাগর আমাদের বেষ্টন ক'রে।

বস্তুর অস্তিত্ব সর্বকালব্যাপী, নিছক তার উল্লেখ যান্ত্রিক অস্তিত্বের স্বীকৃতিমাত্র, যদি না তা মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। প্যার্স-কাব্যের কেন্দ্র। তাঁর নিজের ভাষায় প্রকৃতপক্ষে বস্তুর পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের নতুন সংযোগই তাঁর অন্বেষা। সঞ্জীবনী সংযোগ আজও হয়নি, আজও মানুষের নির্বাসিত জীবন। বিশ্বের জীবনে আমাদের জাগতে হবে, তার সঙ্গে সাযুজ্য স্থাপন করতে হবে, তবেই আমরা অদ্ভুত অবস্থা থেকে উদ্ধার পাব—মনে হয়, এই তাঁর কাব্যের মৌল ব্যঞ্জনা। তিনি বলেন :

সমস্তই আবার ধরতে হবে, সমস্তই আবার
বলতে হবে।

বস্তুর পরিবেশে মানুষের ভূমিকাই প্যার্স-কাব্যের কেন্দ্র। তাঁর নিজের ভাষায়

মানুষই হল প্রশ্ন, তার সাযুজ্যই হল প্রশ্ন।

বস্তুর আর মানুষের নিগূঢ় পরিচয়, যা অন্য কোনো কিছুতেই উদ্ঘাটিত হয় না, সেই পরিচয় উদ্ঘাটনের প্রয়াসই কবিতার সৃজনশীল ধর্ম। সুতরাং দুয়ের মধ্যে নতুন মিলনের সন্ধানে প্যার্স তাঁর কবি-সত্তাকেই নিয়োজিত রাখেন। বলেন :

মিলনাঙ্গুরীর জন্যে তোমার সোনা খুঁজে
নাও, কবি।

মানুষের প্রতিভূ ও প্রবক্তার ভূমিকা কবির। তার উদ্ধারের সন্ধানে কবি সদাজাগ্রত :

এবং কবি তোমাদের সঙ্গে আছে। তার
ভাবনা তোমাদের মাঝে রয়েছে পাহারার
বুরুজের মতো। সে যেন ঠিক থাকে সন্ধ্যা
পর্যন্ত, সে যেন মানুষের সুযোগের উপর
নজর ঠিক রাখে।

এবং

পৃথিবীতে কেউ কি কথা বলবে না?
মানুষের জন্যে সাক্ষ্য...
কবি তার কথা শোনাক, সে ন্যায় পরিচালনা
করুক।

বিশ্বের সমগ্র অস্তিত্ব ও রূপান্তর—সব অর্থে—প্যার্স-এর কবিদৃষ্টির অন্তর্গত। তাঁর কাব্যে প্রাচীন আধুনিক, বৃহৎ ক্ষুদ্র, সামাজিক প্রাকৃতিক সব বিষয়েরই উল্লেখ। কিন্তু ঝোঁক পড়ে মানুষের উপর। সেটাই কেন্দ্র। মানুষ, তার আত্মা হৃদয়। সুতরাং ভবিষ্যতের ভাবনা অনিবার্যভাবে আসে। অতীত ও বর্তমানের বিপুল উৎসার যেমন তাঁর কণ্ঠে তেমনি তাতে ভবিষ্যতেরও এক

১১শ
টি-বি সীল
বিক্রয় অভিযান
আরম্ভ হয়েছে ২।১০।৬০
সমাপ্ত হবে ২৬।১।৬১

প্রতিখানা ১০ নয়া পয়সা
একখানি সীল কেনায় অর্থ আপনার দশ নয়া পয়সা ব্যয়; কিন্তু দুঃস্থের সেবায় এই সামান্য দানই অসামান্য হয়ে উঠবে—সার্বজনীনতার গুণে। অন্যকে কিনতে উদ্বুদ্ধ করুন।
বংগীয় যক্ষ্মা সমিতি
পি২১, স্কীম ৪৯, সি-আই-টি রোড,
কলিকাতা-১৪।

প্রবল ধ্বনি। যা কিছু হয়েছে এবং হচ্ছে তা আর কিছু হ'য়ে ওঠার অভিমুখে। তাঁর কাব্যের মুখ ভবিষ্যতের দিকে ঘোরানো। ধ্বংস ও দুর্বলতার চেতনার মধ্যে এক উজ্জীবনের লক্ষ্য তাঁর সামনে, যেখানে পৃথিবীর সংগে মানুষের আত্মার আত্মীয়তা স্থাপিত হবে। তাই বলেনঃ

হে ভবিষ্যতের যত উপকূল, তোমরা যারা জানো কোথায় আমাদের পদশব্দ বাজবে, তোমরা ইতিমধ্যে নিরাবরণ পাথর আর নতুন পবিত্র জলপাত্রের উদ্ভিদকে সুরভিত করছ।

এবং

তোমরা যারা এক সন্ধ্যায় এই পৃষ্ঠাগুলির
মোড়ে ঝড়ের বিকীর্ণ অবশেষের উপর
আমাদের কথা শুনতে পাবে, ঈগলাঙ্ক
বিশ্বস্ত তোমরা, তোমরা জানবে যে
তোমাদের সংগে
আমরা এক সন্ধ্যায় মানবিকদের পথ ধরে-
ছিলাম।

আর জীবনের প্রান্তে এসে শেষ কবিতার শেষ ছত্রে লেখেনঃ

মানুষের হৃদয়ের পরিমাপ নাও।

প্যার্স-এর কবিতায় এত বিষয়ের উল্লেখ, এত বিচিত্র শব্দ আর রূপকল্প। কিন্তু সবই এক অপূর্ব কণ্ঠস্বরপ্রবাহে ধ্বনিময় ও ভাবময়। বলা যায়, মহৎ বাগ্মীতা। কুশল বাগ্মীতাও বটে, কিন্তু সেই কুশলতা যা বড় কবির স্বভাবগত। যে সব অংশ দিয়ে তাঁর কবিতার সমগ্রতা গড়া, তাদের প্রত্যেকেরই একটা অনুরণন আছে, শব্দ-গুলোই যেন অনেক সময় মানুষী আবেগে সজীব। তাঁর চিত্রকল্পও যেন এক উপস্থিতি, অলংকার নয়। আসলে প্রাণময়তা তাঁর কবিতার চারিত্র্য। কয়েকটি পৃষ্ঠার গদ্যের স্তবকে এবং শব্দের আবৃত্তিতে তিনি "স্মৃতি, পরিকল্পনা, আবেগ, দৃশ্য, রূপ-কথা ও ঘটনার" এক অনুভবনীয় জগৎকে উদ্ভাসিত করেন। সাধারণ যুক্তিগ্রাহ্য অর্থের জন্যে সেখানে মাথাব্যথা থাকে না।

তাঁর কবিতা ভেঙে ভেঙে বিশ্লেষণ করা যায় না, তার সমগ্র আবহাওয়াটাই অনুভব করবার। প্যার্স-এর অন্যতম ইংরিজী-অনুবাদক কবি এলিয়টও নাকি total impression-এর কথা বলেছেন। তবু কোনো কোনো ফরাসী রসজ্ঞ বিভিন্ন কাব্য-গ্রন্থের বিষয় ও বক্তব্যের কিছু বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের অনুসরণ ক'রে মোটামুটি একটা পরিচয় দেওয়া যাক। প্যার্সকে প্রথম যাঁরা পড়বেন হয়তো তাঁদের সুবিধে হতে পারে।

Eloges-এ কবির শৈশবস্মৃতি। সমুদ্র-ঘেরা দ্বীপে কৃষ্ণাঙ্গ পরিচারক ও পরিচারিকা পরিবৃত স্বচ্ছল জীবনধারা। সমুদ্র, আকাশ আর পাকা ফলের রঙে ভরা এক আশ্চর্য জগৎকে শিশু ধরতে চায়। পার্থিব স্বর্গের এক অসাধারণ বর্ণনা এই কাব্যে। উজ্জ্বল, বিচিত্রবর্ণ। মনুষ্যসন্তানের উপহার-পাওয়া নানা সম্পদের স্তুতিমুখর রূপ।

Anabase-এ মানবযাত্রীর চলা। রুক্ষ কঠিন মাটি, পৃথিবীর পরিমাপে আকাশের ঘেরাটোপ। হারানো স্বর্গের সন্ধান, অতৃপ্ত আত্মার উন্মাদনা, বিপুল অস্থির মাধুর্য। নিরালা বিশাল প্রকৃতির রূপ আঁকেন কবি, যেখানে অদম্য মানুষ দূরে সমুদ্রের ডাক শোনে, অন্য কোথাও অন্য কোনোখানে যাওয়ার তৃষ্ণা নিয়ে এগোয়। আবিষ্কারের গান যেন সর্বত্র ছড়ানো। সমস্ত বস্তুর প্রতি অপূর্ব অন্তরঙ্গতার প্রকাশ।

Exil এর বিপরীত দিক। বিচরণের স্বাধীনতা মানুষ হারিয়েছে, এক শত্রু তার পাখামেলা আনন্দকে অপহরণ করেছে। আত্মার মুক্ত ক্ষেত্রকে ফিরে পাবার জন্যে কবির আহ্বান তাঁদের কাছে যাঁরা আবেগ বা কোনো অন্বেষণকে রাজ-নির্বাসনে রূপান্তরিত করেছেন, আহ্বান বিপুল বৃষ্টি আর তুষারের কাছে যারা সব ধুয়ে দেবে, ঢেকে দেবে।

ডন ব্র্যাডম্যানের

ক্রিকেট খেলার অ, আ, ক, খ ... ৪৲

বিশ্ববিশ্রুত ক্রিকেটার ডন ব্র্যাডম্যানের How To Play Cricket-এর অনুবাদ।

কিরোর
হাতের গোপন কথা (৩য় সং) ... ২·৫০
হাতের ভাষা (২য় সং) ... ৪·২৫

পরীক্ষিতের নাটক
অন্তরঙ্গ — ২৲
বর্তমান সমাজজীবনের এক অন্তরঙ্গ প্রতিচ্ছবি

আর্ট অ্যান্ড লেটার্স পাবলিশার্স
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা—১২

॥ অজিত দত্ত ॥
বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস
শুধু হাস্যরসের সন্ধানই নয়; গোটা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসই তুলে ধরেছেন গ্রন্থকার। মূল্য ঃ বার টাকা।

॥ দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ ॥
আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য
রামমোহনের কাল থেকে বিহারীলাল পর্যন্ত বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যের নিপুণ বিশ্লেষণ। মূল্য ঃ আট টাকা।

॥ গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী ॥
ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ
বহু নতুন তথ্যসমৃদ্ধ লোকমাতা নিবেদিতার অপূর্ব জীবনালেখ্য। মূল্য ঃ পাঁচ টাকা।

॥ মণি বাগচি ॥
শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার
নটগুরুর প্রতিভাদীপ্ত জীবনের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এবং সেই সঙ্গে বাংলা থিয়েটারের আদ্যন্ত পরিচয়। মূল্য ঃ দশ টাকা।

রামমোহন	৪·০০	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ	৪·৫০
মাইকেল	৪·০০	কেশবচন্দ্র	৪·৫০

১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯ ॥ জিজ্ঞাসা ॥ ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

তরুণ নাট্যকার সরোজ ঘোষের দুটি নাটক
সদ্য প্রকাশিত * প্রতি খানার মূল্য দুই টাকা
সাইরেন | প্রিয়া
শোভনা প্রকাশনী
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯
(সি ৯৩৮২)

গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
শেষ রাতের শেষ প্রহর
রহস্য উপন্যাস : তিন টাকা
বাসন্তী বুকস্টল
১৫৩ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা-৬
(সি ৯৩৬৮)

কে. হাড়ের মহাভৃঙ্গরাজ

অভিনব আবিষ্কার
কাগমা
রেজি: নং ৪০২৭
অম্লপিত্ত, লিভার ব্যথা, অম্লশূল, পিত্তশূল
ইত্যাদি যাবতীয় পেটের বেদনায় অব্যর্থ
বিফলে মূল্য ফেরত।
সকল ঔষধের দোকানে পাইবেন
দি কাগমা ঔষধালয়
৮৭, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা-৩৭

জটীল ব্যাধি ও স্ত্রী রোগ

২৫ বৎসরের অভিজ্ঞ যৌনব্যাধি বিশেষজ্ঞ **ডাঃ এস পি মুখার্জি** (রেজিঃ) সমাগত রোগীদিগকে গোপন ও জটিল রোগাদির রবিবার বৈকাল বাদে প্রাতে ৯—১১টা ও বৈকাল ৬—৮টা ব্যবস্থা দেন ও চিকিৎসা করেন।
শ্যামসুন্দর হোমিও ক্লিনিক (রেজিঃ)
১৪৮, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

ধবল বা শ্বেত

শরীরের যে কোন স্থানের সাদা দাগ, একজিমা, সোরাইসিস ও অন্যান্য কঠিন চর্মরোগ, গাত্রে উচ্চবর্ণের অসাড়যুক্ত দাগ, ফুলা, আঙ্গুলের বক্রতা ও দূষিত ক্ষত সেবনীয় ও বাহ্য দ্বারা দ্রুত নিরাময় করা হয়। আর পুনঃ প্রকাশ হয় না। সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। **হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর**, প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ফোন : ৬৭-২৩৫৯। শাখা : ৩৬, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯। (পূরবী সিনেমার পাশে)।

Vents যেন মানব-ইতিহাসের এক মহাবিবরণী। হাওয়ারা মানুষকে শস্যের মতো ঝাড়াই বাছাই করে, দুরন্ত বেগে সভ্যতা ও মানব-মনের মরা পাতা উড়িয়ে নিয়ে যায়. গতিপথে জীবন্ত ও মৃত স্থাপত্যকে ছুঁয়ে যায়, গ্রন্থাগারের ধুলো উড়োয়। বণিক, ধর্মসংস্থাপক, সংস্কারক, পরশমণি আর পরমাণু সন্ধানী এবং নারী ও সন্ন্যাসের আকর্ষণের সামনে যাদের যেতে হয় তাদের সবার উল্লেখ করেন কবি। যে তাদের সবাইকে হাওয়ার মুখে ধরে সেই কর্মকে আহ্বান করেন। এ হাওয়ার সামনাসামনি না হলে, তার সঙ্গে যোগসাজস না করলে উদ্ধার নেই। জীর্ণ ও ঘুণধরা, ঝুটা ও পচনধরা সব কিছুকে যে নিশ্বাস গুঁড়িয়ে উড়িয়ে দেয় তার সঙ্গে হাত মিলোলেই তবে উদ্ধার। Vents যেন বর্তমান সভ্যতার পতনের এক মহাকাব্য।

Amers-এ সমুদ্রের অনুধ্যান। উপকূলে, জাহাজঘাটায় বাঁধের ধারে ভূমির সঙ্গে জলরাশির সাক্ষাৎ। সেখানে পরস্পরের সম্ভাষণ, গভীর কথোপকথন। পৃথিবী আর পৃথিবীর মানুষের উজ্জীবন তার কাছেঃ

> সমুদ্রের নিজের প্রশ্ন নয়, মানুষের হৃদয়ের উপর তার রাজত্বের প্রশ্ন।

মানুষ তার নিজের ইতিহাসের ভারে ভেঙে পড়বার উপক্রম করেছে, কিন্তু তার সামনে জন্মের অতলস্পর্শ উৎস সমুদ্রঃ

> বিরাট সবুজ সমুদ্র মানুষের পূর্বাচলে প্রত্যূষের মতো,
> আমাদের সীমান্তে নিশাজাগরণ আর উৎসব,
> মানুষের স্তরে গুঞ্জন আর উৎসব...

এ কাব্য মানুষের এক নবজীবনের গান।

পরিশেষে তাঁর আধুনিকতম রচনা Chronique। জীবনের অস্তাচলে পৌঁছে জীবনব্যাপী অন্বেষার বিবরণী। পথ এখনো শেষ হয়নি, কিন্তু দৃষ্টি স্থির হয়েছে মানুষের হৃদয়ের উপর, আত্মার শৌর্যের উপরঃ

> আজ-সন্ধ্যায় আমরা যে সমুদ্র দেখছি তা একই সমুদ্র নয়।
>
> সে স্থান যত উঁচুই হোক আর এক সমুদ্র উত্থিত হয় দূরে, মানুষের ললাটের স্তরে সে আমাদের অনুসরণ করে।...
> বৎসর দিয়ে যে সময় মাপা হয় তা আমাদের সময় নয়। ক্ষুদ্রতম বা নিকৃষ্টতমর সঙ্গে আমাদের কারবার নেই। আমাদের জন্যে দিব্য বিক্ষোভের শেষ আলোড়ন।

এ শেষ আলোড়নে চরম দায়িত্ব মানুষের হৃদয়ের পরিমাপ নেবার।

এ-ও এক উজ্জীবনেরই সঙ্গীত।

ভাবলে খুব অবাক হতে হয় এ কাব্য কি করে লিখলেন আলেক্সি লেঝে, যাঁর জীবন কেটেছে পররাষ্ট্র বিভাগে বড় চাকরী করে। রাষ্ট্রদূত ক্লোদেলকে তবু বোঝা যায়। তাঁর কবিতার বিষয় বিবেচনা করে এবং তাঁর দৈনিক উপাসনাদির কথা মনে রেখে একটা সামঞ্জস্য করা যায়। কিন্তু পৃথিবী ও মানুষের এই উত্তপ্ত প্রত্যক্ষ বিশাল সংস্পর্শ আলেক্সি লেঝে কেমন করে তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত রাখলেন? প্রথম আমলে তাঁর কবিতা লেখা দেখে প্রধানমন্ত্রী পোয়্যাঁকারে এক চিঠিতে তাকে লিখেছিলেন, "প্রিয় লেঝে, তুমি কাব্যদেবীর সঙ্গে খুনসুটি করছ।" খুনসুটি যে ছিল না তা দেখাই গেল, অবশ্য রাজনীতিকের পক্ষে তাই মনে করাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এই আশ্চর্য কবিসত্তাকে তিনি কোথায় রেখেছিলেন? Amers-এ কবি যেন স্মিতহাস্যে স্বপ্নময় চোখে এই প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছেনঃ

> হাসি আর সৌজন্যের আড়ালে আমার গোপন উক্তিকে কে ধরতে পারত? আমার রক্তের মানুষদের মাঝখানে বিদেশীর ভাষা বলে চলতাম—হয়তো কোনো পার্কের কোণে কিম্বা কোনো দূতাবাসের সোনালি ফটকের ধারে। হয়তো আমার মুখ পাশ ফেরানো থাকত এবং আমার কথার ফাঁকে দৃষ্টি থাকত দূরে, যেখানে বন্দরকর্তার দপ্তরের উপর পাখী গান গাইত।

সন্দেহ নেই তাঁর সরকারী কর্মদক্ষতাটা ছিল নিছক বুদ্ধিগত, আনুষ্ঠানিক; তাঁর অন্তরঙ্গ জীবন তার বাইরে মেলা ছিল।

তাঁর বিদ্যাও যেন আনুষ্ঠানিক ছিল। অন্তত তিনি নিজে তা পরে অবান্তর মনে করেছেন। নানা বিষয়ে তাঁর অনেক পড়াশুনো, তাঁর কাব্যে তার প্রচুর ছাপ। কিন্তু তাঁর কাব্যের যে প্রত্যক্ষ জীবন-রূপ তার মধ্যে শুকনো বিদ্যা চর্চার স্থান নেই। এ উপলব্ধি তিনি নিজেই কবিতায় প্রকাশ করেছেনঃ

> কোন্ সবুজ বসন্তের উৎসবে এই আঙুল ধুতে হবে, বইপত্রের তাকের ধুলোয় কলঙ্কিত এই আঙুল?...
> অসংখ্য বিষণ্ণ গ্রন্থ তাদের খড়ির মতো বিবর্ণ প্রান্ত নিয়ে সাজানো।

তিনি তাদের দলে "যাদের জন্মগত স্বভাব পরিচয়কে জ্ঞানের চেয়ে উঁচুতে রাখা।" সুতরাং বই সম্বন্ধে আগ্রহ শেষ-পর্যন্ত থাকে না। যুদ্ধের সময় থেকে অনেকদিন তিনি ওয়াশিংটনের কংগ্রেস-লাইব্রেরীতে ফরাসী সাহিত্য বিষয়ে পরামর্শদাতার কাজ করেন। তিনি কি ধরনের পড়াশুনা করেন তার হদিস পাবার জন্যে মার্কিন সাহিত্য সমালোচকরা পরে লাইব্রেরীতে খাতাপত্র তন্ন তন্ন করে খোঁজেন। কিন্তু বৃথা। প্যার্স নিজের পড়ার জন্যে পাঁচ বছরের মধ্যে একখানা বইও নেননি। বিদ্যাচর্চা তিনি অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছেন। মিলনাপুরীর জন্য সোনার সন্ধানী কবি তিনি, বইয়ের বিদ্যায় তাঁর কি আজ আর?

স্যাঁ-ঝন প্যার্স-এর কবিতা

অনুবাদ ঃ অরুণ মিত্র

(১)

আবেগের বাজনায় ঝংকার তুলে উচ্ছ্বসিত হও, হে গানের গুরু!

আর তুমি কবি, হায় পলাতক এবং চারবার বিশ্বাসত্যাগী, তুমি হাওয়ার মুখ রেখে ঝঞ্ঝার সঙ্গে একান্তরে গাও:

"হে ভবিষ্যতের যত উপকূল, তোমরা জানো কোথায় আমাদের কর্ম জাগ্রত হবে এবং কোন নতুন রক্তমাংসের মধ্যে আমাদের দেবতারা উত্থিত হবে, তোমরা আমাদের জন্যে সমস্ত দুর্বলতামুক্ত এক শয্যা রেখো......

হাওয়ারা প্রবল! হাওয়ারা প্রবল! এখনো শোনো সন্ধ্যার মর্মরপ্রস্তরে ঝড়ের কর্ষণ।

আর তুমি, কামনা, যে এবার হাসির বিসারে আর সুখের দংশনে গান গাইবে, তুমি এখনো সেই সংরক্ষিত স্থানের পরিমাপ ক'রে রাখো যেখানে গানের উদ্গীরণ হবে।

রক্তমাংসের উপর আত্মার দাবী চরম। সে দাবী যেন আমাদের ঊর্ধ্বশ্বাস ক'রে রাখে! এবং এক অতি প্রবল আন্দোলন যেন আমাদের নিয়ে যায় আমাদের সীমা পর্যন্ত এবং আমাদের সীমা ছাড়িয়ে।

বেষ্টনীর, সীমানাচিহ্নের অপসারণ...প্রবর্তকের হৃদয়কে জুড়োনো...এবং পৃথিবীর বিরাট বৃত্তে মানুষদের একই আওয়াজ হাওয়ার মধ্যে, তূর্যের মতো...এখনো সর্বদিকে উদ্বেগ...হে বস্তুর সমগ্র জগৎ..."

—Vents থেকে অংশ

(২)

যারা অতলান্তিকের মহান ভারত-দ্বীপপুঞ্জে গিয়েছিল পরম্পরের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে, যারা গহ্বরের তাজা মুখে নতুন চিন্তার আঘ্রাণ পায়, যারা ভবিষ্যতের দুয়ারে শিঙায় ফুঁ দেয়

তারা জানে নির্বাসনের বালিতে বিদ্যুতের চাবুকের ঘায়ে মোচড়ানো উত্তুঙ্গ আবেগ শোঁ শোঁ করে...জ্যোৎস্নের লবণ আর ফেনার নীচে হে অমিতব্যয়ী! আমাদের মাঝে তোমার গানের ঐন্দ্রজালিক শক্তিকে জীবন্ত রাখো!

তারই মতো যে দূতকে বলে, "আমাদের স্ত্রীদের মুখ অবগুণ্ঠিত করো, আমাদের পুত্রদের মুখ তুলে ধরো'; নির্দেশ এই যে তোমার দ্বারপ্রান্তের পাথর ধুতে হবে...আমি তোমাকে নিম্নস্বরে ব'লে দেব সেই প্রস্রবণের নাম যেখানে আগামীকাল আমরা এক বিশুদ্ধ ক্রোধকে অবগাহন করাব।" এই তার বাণী।

*

হে কবি, তোমার নাম, তোমার জন্ম এবং তোমার জাতির পরিচয় দেবার এখনই সময়।

—Exil থেকে অংশ

(৩)

আমাদের ভাবনা ইতিমধ্যেই রাত্রি থাকতে উঠে পড়ে যড় তাঁবুর মানুষদের মতো, যারা দিন হবার আগেই বাঁ কাঁধে তাদের জিন ব'য়ে লাল আকাশের নীচে হাঁটে।

এই আমাদের ফেলে-চলা জায়গা। মাটির ফল আমাদের পাঁচিলের নীচে, আকাশের জল আমাদের চৌবাচ্চায় এবং পাথরের মস্ত জাঁতা বালির উপর প'ড়ে।

হে রাত্রি, উপহার কোথায় নিয়ে যেতে হবে, কোথায় রাখতে হবে স্তুতি? আমরা হাতের ডগায়, চেটোর উপরে সদ্য ডানা-গজানো পাখির ছানার মতো তুলে ধরি মানুষের এই অন্ধকার হৃদয়কে যেখানে ছিল আগ্রহ, ছিল উদ্দীপনা এবং কত অপ্রকাশিত ভালোবাসা......

হে রাত্রি, শোনো শূন্যে প্রাঙ্গণে এবং নির্জন তোরণের নীচে, পবিত্র ধ্বংসস্তূপ আর চূর্ণ প্রাচীন বল্মীকের মাঝখানে গুহাহীন আত্মার প্রবল রাজ-পদক্ষেপ,

যেন খাতুর পাদপথে সিংহের বিচরণ।

*

অতি বৃদ্ধ বয়স, এই তো আমরা। মানুষের হৃদয়ের পরিমাপ নাও।

—Chronique থেকে অংশ

ট্রামে-বাসে

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় ডেমোক্রেটিক প্রতিনিধি শ্রীকেনেডি জয়লাভ করিয়াছেন।—"সংবাদ শুনে আমরা কতই না নেচেছি কুঁদেছি

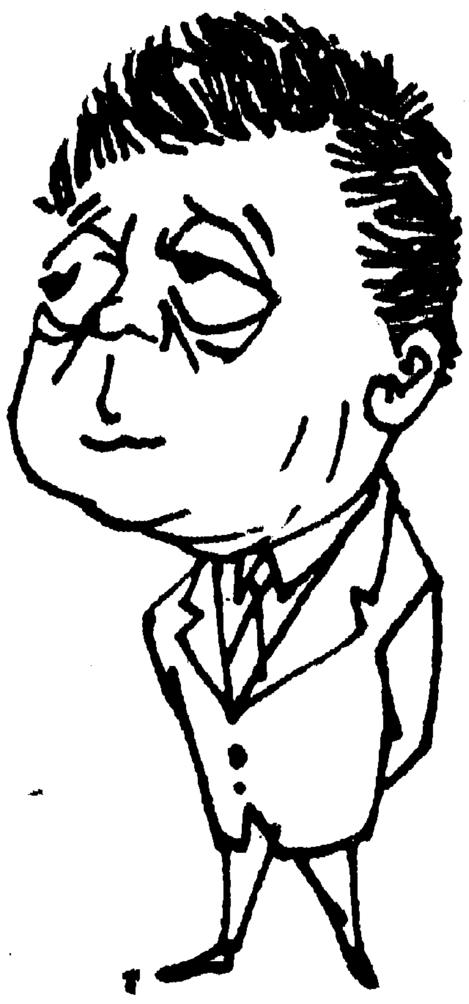

শুধু অকারণ পুলকে"—মন্তব্য করিলেন বিশু খুড়ো।

একটি প্রাক-নির্বাচনী সংবাদে পড়িলাম শ্রীনিক্সন তাঁর পারিবারিক ডাক্তারকে বলিয়াছেন তিনি যেন তাঁর শরীরের অবস্থার সমস্ত চার্ট সাধারণের কাছে প্রকাশ করেন।—"কোন নির্বাচন প্রার্থী আমাদের দেশে এত বড় সাহস দেখাতে পারবেন না। সব দিক দিয়ে স্বাস্থ্য ভালো থাকলেও অনেকে ছোটবেলার দেয়ালাটা কাটিয়ে উঠতে পারেন না; সেইটি ফাঁস হলেই তো ভোটের বারোটা"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

শ্রীনেহরু ভাত কম খাইবার পরামর্শ দিয়াছেন। — "ঠিক পরামর্শই দিয়েছেন। আমরা জানি ঊনো ভাতে দুনো বল। কিন্তু কথা হলো, এবারে শুনেছি

আমনধান খুব ভালো ফলেছে। সবাই কম ভাত খেতে আরম্ভ করলে এতো ভাত নিয়ে সরকার সমস্যায় পড়ে যাবেন যে, না পারবেন গিলতে, না পারবেন ফেলতে"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

শ্রীনেহরু চাপরাসী উঠাইয়া দিতে বলিয়াছেন। — "কিন্তু এক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দিতে বাধ্য। চাপরাস না হলে কেউ হুকুম মানে না, বলেছেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ। সুতরাং ব্যক্তি স্বাধীনতার ডামাডোলে চাপরাসটা থাকাইতো বোধ হয় ভালো"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

কমলাকান্ত তাঁর আসরে বলিয়াছেন যে মুসলিম লীগ গিয়াছে কিন্তু রাখিয়া গিয়াছে মারাত্মক সম্ভাবনায় পূর্ণ বাংলার আদ্যাক্ষর "অ" অক্ষরটি। কমলাকান্ত মনে করেন সেই "অ" হইতেই শেষ পর্যন্ত অমুসলমান "অনসমীয়া" "অ-বিহারী" প্রভৃতি ধ্বনির উদ্ভব হইয়াছে।—"কিন্তু এর জন্যে দায়ী মুসলিম লীগ নয়। দায়ী আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। গোড়াতেই এই "অ" অক্ষর আমাদের ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। ছোট বেলার পাঠ মনে করুন—অ-য় অজগর আসছে তেড়ে"—বলেন বিশু খুড়ো।

দিল্লীতে সাম্প্রতিক রাজ্যপাল সম্মেলনে কর্তৃপক্ষ ভাষাগত প্রশ্নে উদার মনোভাব গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"তাঁরা ঠিক পার্বতীসুত লম্বোদরই বলেছেন, কিন্তু ভাষাওলারা জিগীর তুলেছে—পাক দিয়া সুতা লম্বা কর।"

কামারহাটি উদয়ভিলাতে কো-অপারেটিভ সপ্তাহের এক মহিলা সভায় প্রধান অতিথি ডক্টর ফুলরেণু গুহ মন্তব্য করিয়াছেন—মহিলারা পুরুষদের সংগে পাশাপাশি চলিবে, ইহাই কাম্য। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"ট্রামে-বাসের দিকে তাকাইলেই দেখতে পাবেন মেয়েরা পুরুষদের সংগে পাশাপাশিই চলেছেন, শুধু তাঁদের সীটটা রেখেছেন সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত করে!!"

কংগ্রেস-সভাপতি তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে ব্যক্তি-পূজা পরিহারের আহ্বান জানাইয়াছেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"বড়ই কঠিন আহ্বান। ব্যক্তি-পূজাই যদি উঠে যায় তাহলে বারোয়ারি-তলার আসর কী দিয়ে জমাবেন সে কথাই ভাবছি!!"

কোন এক বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর মানুষের আয়ু আর মাত্র ৬৬ বছর। তারপরই মৃত্যু। কিন্তু যুদ্ধ, রোগ বা অনাহারে মানুষ মরিবে না, মানুষ মরিবে মানুষের ভীড়ের চাপে।—"অসম্ভব নয় ভীড়ের চাপে যে মানুষ মরতে পারে তা ট্রেন আর ট্রামে-বাসের ভীড় দেখেই বোঝা

যায়। সবাই যদি মরে যায় তবে আর দুঃখ কী। তবে একমাত্র প্রার্থনা মরবার আগে যেন গোলে হরিবোল দিয়ে মরতে পারি"—মন্তব্য করেন অন্য এক সহযাত্রী।

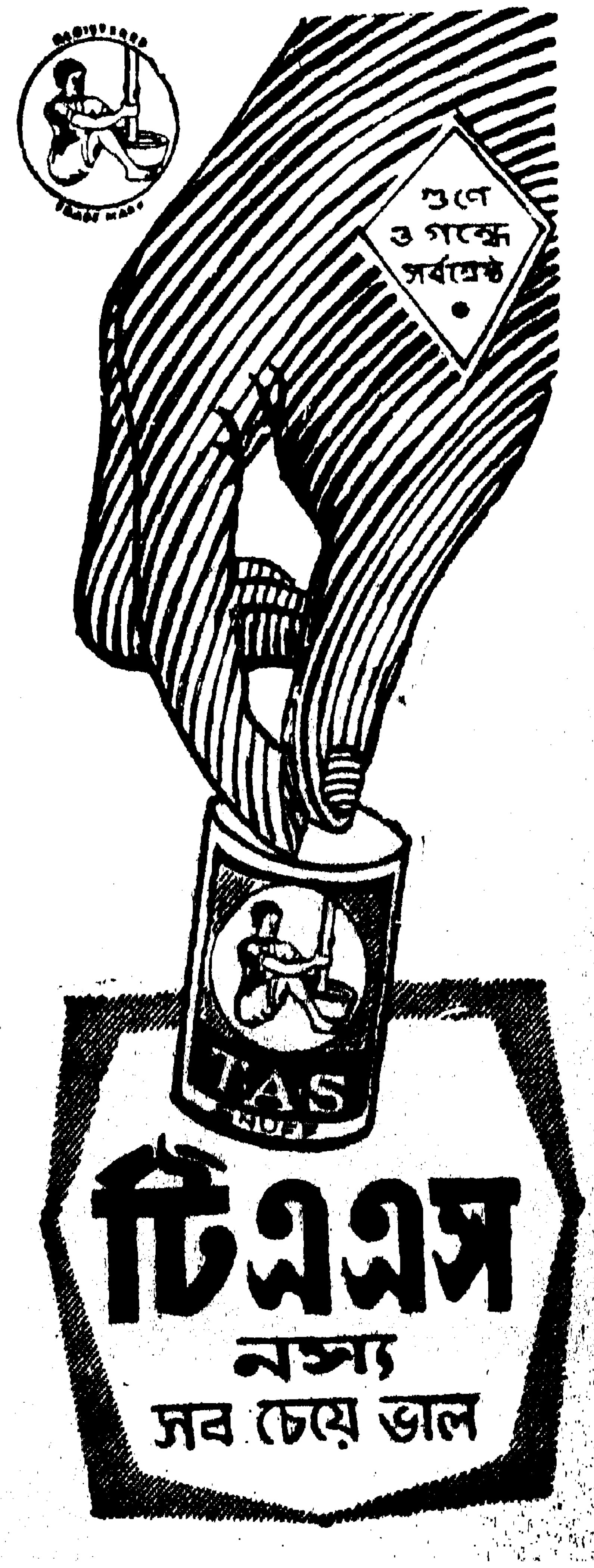

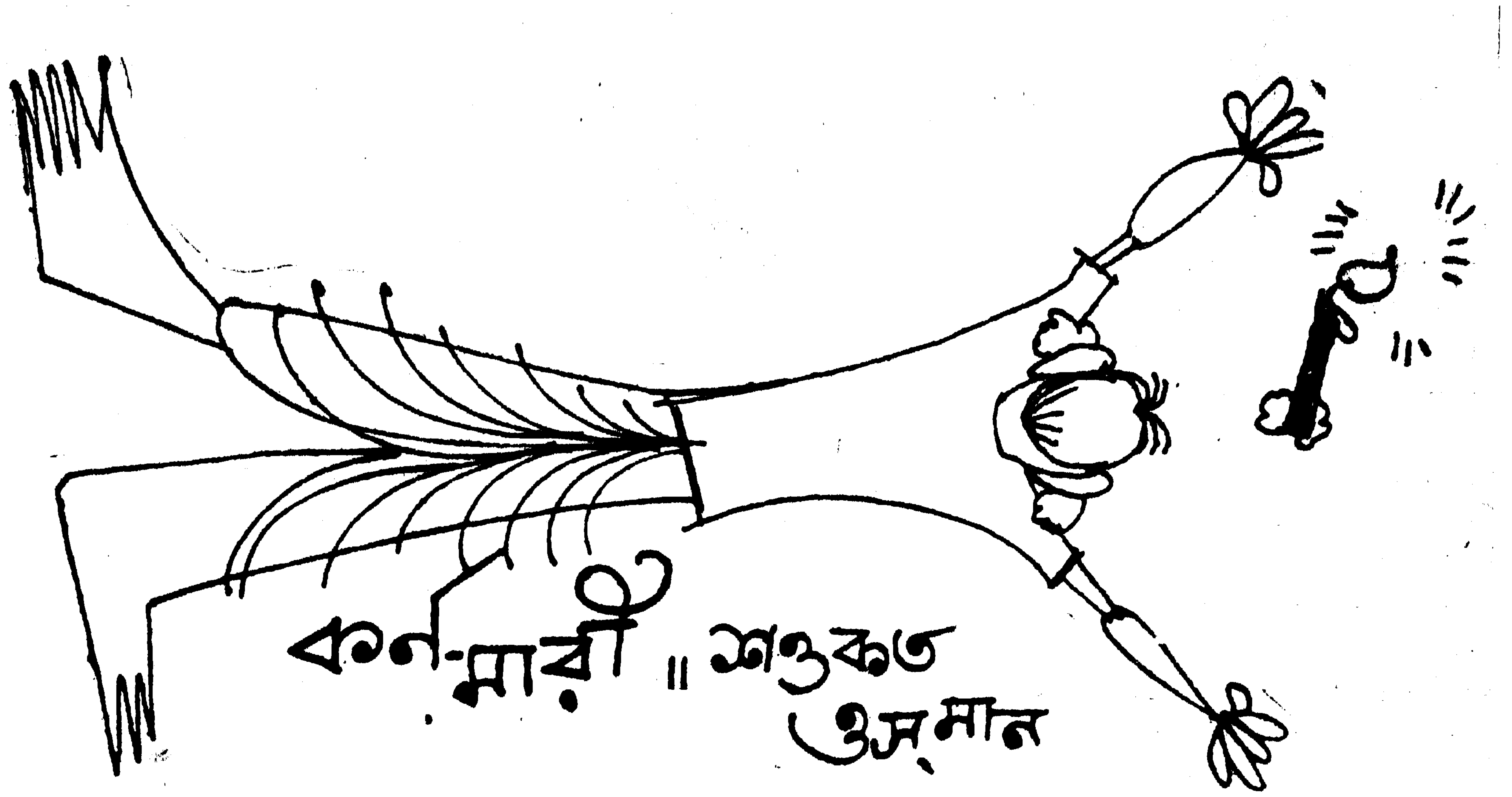

কান-মারী

শওকত ওসমান

বন্ধু শরীফের দুই কানে পুঁজ হয়েছিল। ধোপদুরস্ত বাতিকওয়ালার পক্ষে রীতিমত ফ্যাসাদ। ঘুমিয়ে আরাম নেই। রাত্রে জেগে দেখতে হয়, বালিশ রসে ভর্তি। খাওয়ার টেবিলে খুঁতখুঁত। তাছাড়া কাঁহাতক কানে তুলো গুঁজে রাস্তা হাঁটা যায়? বধির কানে গাড়ি চাপা পড়ে মরার চান্স ষোল আনা। হর্ন শোনা যাবে না।

শরীফ নিজেই বললে, "ব্যাটা ইংরেজরা বলতো কালা আদমী, তখন চটে যেতাম। এখন সত্যিই আমি কালা আদমী। তুলো গুঁজে আর পারা যায় না।"

"ভাই, তোকে প্রথম বড় ঠাট্টা করেছি, কিছু মনে করিস নে।"

"না-না."। বন্ধু জবাব দিলেও বিশ্বাস করতাম না। কারণ শুরু অব্দি আমি ওর কানের পেছনে লেগে ছিলাম। এখন দেখছি বেচারা সত্যিই ভুগছে। অন্তত আর বিদ্রূপ করা চলে না।

শরীফ চুপচাপ বসে ছিল না, তাই বলে। প্রথমে শুরু হয় হোমিওপ্যাথিক। দোসরা দফা, বায়োকেমিক। তেসরা কিস্তি, অ্যালোপ্যাথিক। চৌঠা দফায় তুকতাক হাতুড়ে কবিরাজী। কিন্তু পুঁজ অক্ষয় হয়ে আছে। সারার নাম নেই। শোনা যায়, শরীফ গোপনে থড়থড়ী পীরের রওজায় সাদা মোমবাতি দিতে দিতে বলেছিল, "বাবা জেন্দাপীর, সাদা মোমবাতি থেকে মোম যেমন গলে পড়ে, আমার কান থেকে শ্বেত পুঁজ তেমনি যেন নিঃশেষে সেরে যায়—আমি এক 'উরুস' মানত করলাম......ইয়া মুশকিল কোষাল......।" অবশ্য একথা সে মুখে স্বীকার করেনি। বরং চোটপাট চালিয়েছিল, "আমি কি জংলী ভূত যে, রোগ সারাতে দরগায় ছুটব।"

বন্ধু জংলী কি ভূত, তা যাচাই করিনি। তবে কানে পুঁজী-স্রোতের কামাই ছিল না। মাঝে মাঝে জোয়ার-ভাটা খেলত। দাওয়াই খেয়ে একটু হয়ত সারল। কিন্তু আবার যে-রাম সেই রহিম।

শরীফের এবম্বিধ দুর্ভোগে আমিও ঘাবড়ে গেলাম। অথচ বিহিত কোথায়?

আমার পাড়ার কাছে নতুন এক হেকিম এসেছিলেন, পথে বেরুতেই তাঁর দাওয়াই-খানা দেখা যায়। খুব ছোট ঘর। চারিদিকে শেল্‌ফ, শিশি-বোতল, সারি সারি সাজানো। মাঝখানে একটা তক্তপোশ, তার উপর বসে সাদা-দাড়ি কৃষ্ণকায় হেকি সাহেব আলবোলা ফোঁকেন। লেবা চুড়িদার পাজামা আর কল্লিওয়ালা সা পাঞ্জাবী। একদিন আলাপ হয়ে গেল ও সঙ্গে। হেকিম সাহেব দিল্লীর অধিবাস আজমল খাঁর সগ্‌গা সাগরেদ। খুব খু হয়েছিলুম এহেন গুণী ব্যক্তির পরি পেয়ে। তাছাড়া তিনি ভারী মিষ্টভাষ পাঁচ মিনিট কথা বললেই বোঝা যা হেকিম সাদা 'দিলের' মানুষ, শুধু ত কাপড় সাদা নয়। আরো পরিচয় ঘনি হল, তিনি আমির খসরুর প্রচণ্ড ভা অবিশ্যি হেকিম সাহেবের লোকমা ইলেম সম্বন্ধে আমার কোন কৌতূ ছিল না। তিনি আমার সঙ্গে কবিতা মোগলাই দিল্লীর হালচালের কথা বল বেশ ভালোবাসতেন। শরীফের নাজেহ অবস্থা দেখে ভাবলাম, হেকিম সাহে কাছে একবার বলে দেখা যেতে পা বন্ধুর কাছে প্রস্তাব উত্থাপন করলাম।

"না, আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি। ব কোথাও যাব না। শেষমেষ অ্যালোপ্যা চলছে চলুক।"

"চলো না একবার গিয়ে দেখা যাক।

"না, কবিরাজ হেকিমরা জানে ক এমনি আমার কোন আস্থা নেই। খাম আবার নাকাল হওয়া আমার পোষাবে ন আমি নাছোড়বান্দা। অগত্যা বন্ধু র হল, অবশ্য নিমরাজী বলাই বিধেয়।

একদিন জুম্মা-বাদ বিকেলে দু' হেকিম সাহেবের বারান্দায় পা দিল তিনি তখন তাকিয়ায় হেলান দিয়ে এ হিন্দী বই পড়ছিলেন। সঙ্গী হুক্কা মোতায়েন আছে। আমাকে দেখেই বক্ষু বিকশিত দাঁত সহযোগে হেসে বল "আইয়ে রমজান সাব। তশরীফ আ স্লামালেকুম।"

আমি কি জংলী ভূত?

"আলেকুমস্সালাম। আওর ভি মেহমান হ্যায়। ইয়ে মেরা বহুত আজিজ পেয়ারা দোস্ত শরীফউদ্দীন।"

"আইয়ে, আইয়ে", প্রৌঢ় হেকিম সাহেব তখন উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। করমর্দন, উপবেশন, কুশল-প্রশ্ন ইত্যাদি ভূমিকা খতম হল। হেকিম সাহেব এক কোণে ঝোলানো পর্দা ঠেলে ভিতরে গেলেন। একটিমাত্র কামরা। তিনি শেলফ ও পর্দার সাহায্যে একদিকে দাওয়াখানা আর একদিকে হাওয়াখানা বা আবাস বানিয়ে নিয়েছেন।

হেকিম সাহেব ফিরে এসে বললেন, "চায়ে বানানে কি পানি গরম হো রহা।"

বলা বাহুল্য, হেকিম সাহেব ভৃত্যহীন দরবেশ-কিসিমের মানুষ। স্ব-পাকে একাহারী। রাত্রে কিছু খান না। কালে-ভদ্রে চা ছাড়া। আমি আপত্তি জানালুম, "কিঁউ তকলীফ উঠাতে হেঁ আপ?" কিন্তু হেকিম সাহেব কোন কথা শুনবেন না। কয়েক মিনিট পরে স্টোভের ফোঁস ফোঁসানি থামিয়ে চা নিয়ে হাজির হলেন।

"আইয়ে......ফিন......ফরমাইয়ে।"

—চা চুমুক দিতে দিতে বন্ধুর বেদনা-সঙ্কুল ব্যাধির দীর্ঘ ইতিবৃত্ত সবিস্তারে, নিভাঁজ বিস্তৃত করলাম। দরদী শ্রোতা

আইয়ে ফিন ফরমাইয়ে

হেকিম সাহেব। শুনলেন, বন্ধুর কান দেখলেন আর কিছু বললেন না। কথার মোড় অন্যদিকে। দিল্লীর গল্প হেকিম সাহেবের মুখে এবার দেদার শুনুন। কবি হালী স্যার সৈয়দকে কেন 'ইব্‌নুল ওয়াকত্‌' (সময়ের বেটা) বলে গালি দিয়েছিল, গালীব একটা ছেলেকে মেয়ে ভেবে তার উপর কবিতা রচনার পর উপহার দেওয়ার সময় নিজের ভুল বুঝতে পেরে কি লিখে-ছিলেন, সিপাহী-বিদ্রোহের জমানায় ভয়ে ক'টা ইংরেজ মেয়ের গর্ভপাত হয়েছিল—দেদার শুনুন। আর হেকিম সাহেব রসিয়ে রসিয়ে যা বলবেন, তা সাহিত্যের বাপ দাদা। শরীফ পর্যন্ত তাঁর আলাপিতার মওজে তলিয়ে গেল। কত রঙের হাসি, গোস্বা, মশ্‌করা, কথকতা না হেকিমের গলা থেকে বেরোয়। গল্পের তরঙ্গে বিনা পাসপোর্টে তিনি কতবার হিন্দুস্থান-পাকিস্তান সফর করলেন আল্লাকে মালুম।

ওঠার সময় বন্ধুর ব্যাধির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হল।

"আপকা বিমারী"—হেকিম সাহেব একটু হেসে বললেন, "ঘাবড়াইয়ে মাত ঠিক হো যায়েগা খোদাকা ফজল সে।"

"আপকা মেহেরবানী।"

"আচ্ছা, আপ শাদী কিয়ে হে?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন সোজাসুজি।

"জী। খোদাকা ফজল হ্যায়।"

"আপকা বেগম টপ্পা জানতে হেঁ?" আবার প্রশ্ন। বন্ধুর ভাবাজ্ঞান আমার চেয়েও নীরেট, সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, "জী জানতে হে।"

বন্ধু প্রশ্ন-পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত নয়, তাই আবার বললে, "আমার বেগম পা টিপতে পারে।"

"ও নেহি, ও নেহি" হেকিম সাহেব শশব্যস্ত বলে ওঠেন, "গোড় দাবানা নেহি—সংগীত, গানা।"

টপ্পা গাইবে মুসলমান শরীফ খান্দানের মেয়ে (আর সে নিজেই যখন নামে শরীফ) অবাক করলেন হেকিম সাহেব।

"আচ্ছা জানে দিজিয়ে।" হেকিম সাহেব আমাদের নিরস্ত করলেন। পরে বললেন, "আপকা বাচ্চা হ্যায়?"

"জী নেহি।"

"আপকা বিমারী......" হেকিম সাহেব ঊর্ধ্বলোকে কড়িকাঠ পর্যন্ত কি যেন দেখে নিয়ে বাতলালেন, "কুছ হরজ নেহি। ঠিক হো যায়েগা।"

"আপকা মেহেরবানী।"

"ম্যায় এলাজ বাতাতা হুঁ। আপ বাজার সে কুই দুস্‌রা সুরাত দোঠো কাউয়া পাকড়িয়ে।"

"কাক? —কাউয়া?"

"জী বাংলা জবান মে ত কাউয়া কাহা জাতা।"

"কাক!"

আমরা দুজনে তাজ্জবের পাকে-পাকে ঘোল খেতে খেতে বললাম।

"হ্যাঁ। দো কাউয়া লিজিয়ে। আওর শোনে কা কামরা মে দোতরফ পিঁজরা মে বাঁধ রাখিয়ে। আওর উসে বাত কিজিয়ে। সাত রোজ বাদ আইয়ে।"

"বাত কিজিয়ে? কাউয়া সে বাত?"

"হা-হা সাব। চিড়িয়া নেহি পালতে আপ্‌লোগ?"

কাকের সঙ্গে কথা। আমরা তাজ্জব।

'পরিবারের সকলের পক্ষেই ভালো'

জীবাণুনাশক নিমতেল থেকে তৈরী, সুগন্ধি মার্গো সোপ কোমলতম ত্বকের পক্ষেও আদর্শ সাবান। মার্গো সোপের প্রচুর নরম ফেনা রোমকূপের গভীরে প্রবেশ ক'রে ত্বকের সবরকম মালিন্য দূর করে। প্রস্তুতির প্রত্যেক ধাপেই উৎকর্ষের জন্য বিশেষভাবে পরীক্ষিত এই সাবান ব্যবহারে আপনি সারাদিন অনেক বেশী পরিচ্ছন্ন ও প্রফুল্ল থাকবেন।

মার্গো সোপ

পরিবারের সকলেরই প্রিয় সাবান

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড, কলিকাতা-২৯

কিন্তু হেকিম সাহেব আর সময় দিলেন না। তাঁর চোখে-মুখে অসহিষ্ণুতার গন্ধটা ফেটে পড়ছে। তিনি পর্দা ঠেলে ওদিকে চলে গেলেন।

আমরা বারান্দায় বজ্রাহতের মত পা দিলাম, রাস্তায় নামব। রাস্তায় পা দিয়েছি। হঠাৎ মনে হল, হেকিম সাহেবের ঘরের ওপাশ থেকে কে যেন কেঁদে উঠল। কান খাড়া করলাম—দিলরুবার আওয়াজ। পাড়ায় বোধহয় কেউ সংগীত চর্চা করছে।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে শরীফ আমাকে শুধু মারতে বাকী রাখলে।

"এমন পাগলের কাছে এনেছ, তুমি যেমন উল্লুক। লোকটার মাথা খারাপ আছে। কিন্তু তোমার কি আক্কেল?"

শরীফের মুখের কাছে দাঁড়াব? আমার সাধ্যিতে কুলোয় না। এক পশলা ঝেড়ে, একটু শান্ত হল সে। এবার ভাবলাম, একটু ডিফেন্স নিতে হয়। বললাম, "শোনো শরীফ, দেখলে ত হেকিম সাহেব কি চমৎকার লোক?"

"ফের—"

"রাগ করো না। আমি ভাবছি, তুমি ত বহুৎ কিছু করলে। এখন মুরুব্বী লোকটার কথা শুনেই দ্যাখো না।"

"টিয়া, ময়না, কাকাতুয়া বললেও একটা মানে হতো। একদম কাক? কাকের সাথে, বলে কিনা উসসে বাত কিজিয়ে।"

লফ্‌জী কুস্তির আখড়ায় দুই বন্ধু খুব লড়লাম। শরীফ শেষে আমার কাছে স্লামালেকুমটুকু পর্যন্ত না বলেই নিজের রাস্তা ধরলে।

কয়েকদিন পরে বন্ধুর রাগ ভাঙানোর জন্য কাহেতটুলির গলির মধ্যে ঢু দিলাম। এখানেই শরীফের দোতলা বাসা। একটু এগিয়ে দেখি, কয়েক শ কাক তার বাড়ির ছাদে আর আশে পাশে চেল্লাচেল্লি করছে।

সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে চোখে পড়ল, খাঁচায় কয়েদী বায়স। পুরা পরিচয় পাওয়া গেল ঘরে ঢুকে, সেখানে আর এক কয়েদী বিহঙ্গ। শরীফ মুখ গুঁজে শুয়ে আছে।

"শরীফ।"

সে উঠে বসেই লাভা ছড়াতে লাগল "এসেছো। এই দ্যাখো অবস্থা। আগে ঘুমোতে পারতাম। এখন তো কান ঝালা-পালা। ঘুম আর হয় না। সকাল হলেই বাইরের কাকেরা ডাকাডাকি করে। আর সন্ধ্যা হলেই ঐ খাঁচার দুজন। ঘরে কেউ নেই। সবাইকে গ্রামে পাঠিয়ে দিলাম। এখন চাকরগুলো আমাকে পাড়ায় হয়তো পাগল রটিয়ে দিয়েছে।"

"তাতে ঘাবড়ে যেও না।"

"ঘাবড়াব না? ব্যাটারা মুখ টিপে টিপে হাসে।"

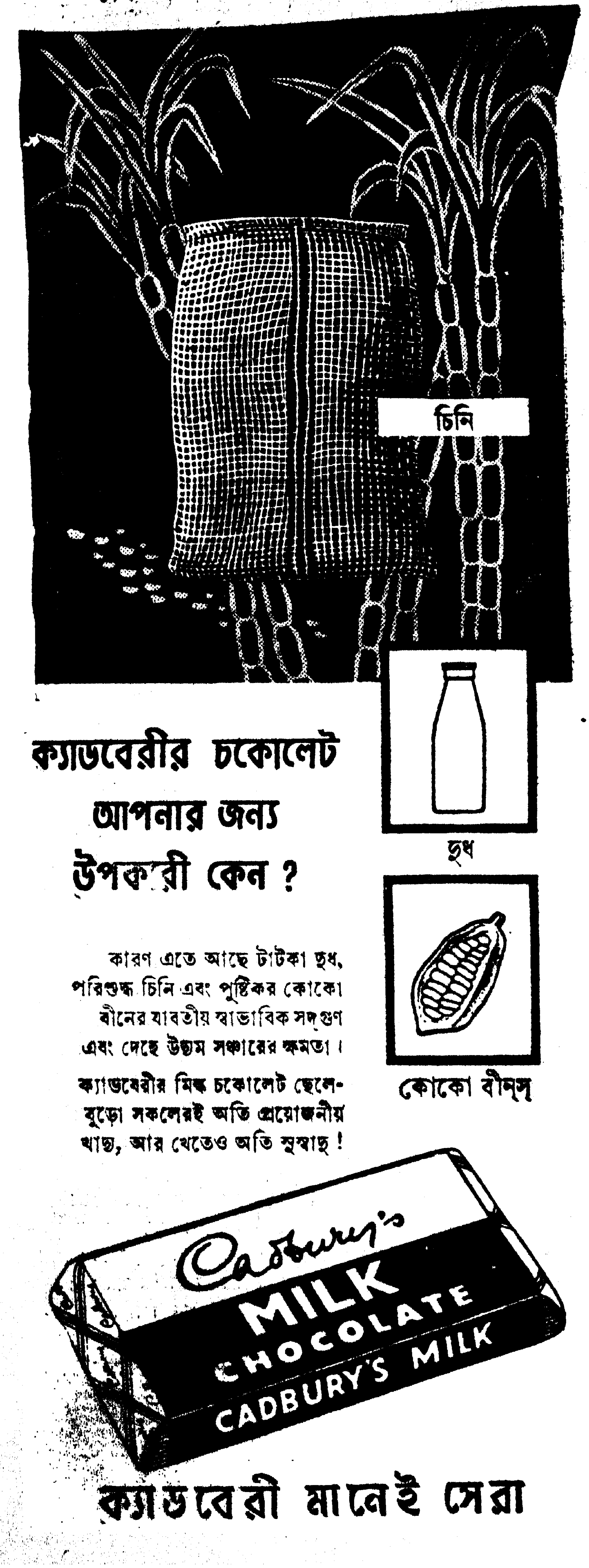

একটা চেয়ারে বসে হাসিযোগে জিজ্ঞেস করলাম, "উসসে বাত করছ ত?"

"তুমি খেপেছো। বাত করছি। কি বাত করব? ওদের শেখাচ্ছি হাকিমের মাথা।"

"তা যাহোক। উসসে বাত করো।"

বাইরে ছাদের উপর তখন জোর কা-কা রব শুরু হল; কান পাতা দায়। শরীফের তুলো-গোঁজা কানে পর্যন্ত ফাটল ধরার উপক্রম। আমি আঙুল গুঁজে রেহাই পেলাম।

"দ্যাখো, মজা।"

"দেখব কি? এত কিছু করে তো দেখেছ। হেকিম সাহেবের কথা মেনেই দ্যাখ না। চারদিন ত গেল। আর তিন দিন পর আমি তোমাকে এসে নিয়ে যাব।"

"আমি আসবো তৈরী থেকো।"

সেই মত সপ্তাহান্তে আমরা হেকিম সাহেবের কাছে পৌছলাম। তিনি বলা বাহুল্য, আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি রাখলেন না। নতুন নোস্‌খা দিলেন হেকিম সাহেব; "কুই আচ্ছা ধ্রুপদ গানেওয়ালা কা গানা শোনো এক হফ্‌তা।"

ধ্রুপদ-গায়কের গান!

আজ শরীফ অনেকটা শান্ত, তবু

ভিমের পরশ লাগলে পরে
-দেখুন কেমন ঝলমল করে

ভিম অল্প একটু ব্যবহার করলে পরেই সবজিনিষের চেহারা বদলে যায়। কাঁচের বাসন-কোসন, রান্নার ডেক্‌চী, হাঁড়ী, বেসিন থেকে ঘরের মেঝে সবই এক নতুন জলুষে ঝক্‌মক্‌ করে। ভিম দিয়ে পরিষ্কার করলে পরে জিনিষ-পত্রে কোনরকম আচঁড় লাগে না।

আর কত সোজা ও কম খাটুনিতে হয় ভেবে দেখুন। ভেজা ন্যাক্‌ড়ায় একটু ভিম দিয়ে আস্তে আস্তে ঘষুন-দেখবেন যত ময়লা আর দাগ নিমেষের মধ্যে মিলিয়ে যাবে। ভিম ব্যবহার করলে আপনার বাড়ী আপনার গর্বের কারন হবে।

ভিম সব জিনিষেরই উজ্জ্বলতা বাড়ায়।

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড দ্বারা প্রস্তুত

V.100-XS2BG

রাস্তায় নেমে সে চটে উঠল, "আমি ঐ ম্যা-ম্যা-করা শুনতে যাব, রমজান তুমি শুনতে ভালবাস যাও। বাঈজীর গান বললেও না-হয় যেতাম।"

আমি আবার সদ্যুক্তির জাম্বিল উজাড় করি, "ও'র কথা দু-চার মাস শুনেই দ্যাখো।" শরীফের বহুদিনের বন্ধু। আমার কাছে শেষ পর্যন্ত আর মাথা চালে না; রাজী হয়।

সদাঞ্জন ভঞ্জ বলে এক প্রৌঢ় ধ্রুপদ গায়কের সংবাদ পেলাম। রাত্রে তাঁর কাছে গান শোনার ব্যবস্থা হল।

প্রথম রাত্রির আসরের পর শরীফ বলল, "রমজান, তুমি আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে চাও, না চাও না?"

"হঠাৎ এই কথা? আমার কাছে দুনিয়া একদিকে আর তুমি একদিকে।"

"বেশ। তবে আমার কথা শোনো। ঐ এাাঁ—এাাঁ—এাাঁ—ওস্তাদী গান মানুষে শোনে? ওর চেয়ে কাউয়ার ডাক ঢের ভালো চল্‌ হেকিমের কাছে। কাউয়া তো ছেড়ে দিতে বললেন, আবার সেই একজোড় কাউয়া ধরব।"

"তুমি একটু স্থির হও। সদাঞ্জনবাবুর কি দরাজ মিষ্টি কণ্ঠ।"

"তা বেশ বুঝি। কিন্তু ঐ হে-হে-হে-হে করে যখন—"

"ওর নাম ছাগ-তান।"

"ছাগ-তান, কুত্তা-তান আমাকে দিয়ে শোনা হবে না।"

"আবার ছেলে-মানুষী করছ।"

"আচ্ছা।"

শরীফ শেষ পর্যন্ত পোষ মানল। কিন্তু এক সপ্তাহ পরে হেকিমের নির্দেশ মত শরীফ যখন গান শুনতে গেল, সদাঞ্জনবাবু অপমান করে আমাদের তাড়িয়ে দিলেন। ব্যাপারটা বলছি।

গান শেষ হওয়ার মাথায় হঠাৎ শরীফ কান থেকে তুলো বের করল। আমি খুব বন্দ হয়ে শুনছিলাম। কিন্তু ঐ দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ে।

তিনি হঠাৎ গান থামিয়ে ফেললেন, আমি আতঙ্কে উঠলুম।

তারপর জেরা শুরু করলেন তিনি, "আপনি কানে তুলো গুঁজে আমার গান শোনেন?"

"আজ্ঞে—আমার কানের অসুখ আছে।"

"কি অসুখ?"

"পুঁজ হয়।"

"এই পুঁজ নিয়ে আমার গান শুনতে এসেছেন? জানেন এই গান গাওয়া কি পরিশ্রম?"

শরীফ হতভম্ব। কিন্তু সদাঞ্জনবাবু আর থামেন না, "বাস্‌-বাস্‌ আপনারা। কুত্তার কাছে ঘি-ভাত বিলোতে নেই। যান।"

আমার [illegible] তিনি আর কথা বলতে রাজী হলেন না, মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিলেন।

আর হেকিমী দাওয়াই নয়, শরীফ প্রতিজ্ঞা করে বসল। এক মাস তার বাঁকা লেজ আর সিধা করা গেল না। কিন্তু তার কানের পুঁজ অনেকটা কমে গেছে। আর গড়িয়ে কান থেকে বাইরে পড়ে না।

এই অজুহাতে হেকিম সাহেবের কাছে তাকে টেনে নিয়ে এলাম। তিনি দু মাস কোন ওস্তাদের গান শোনার নোস্‌খা দিলেন। আমরা দুই বন্ধু এখন সন্ধ্যাবেলা ওস্তাদের বাড়ি যাই আর গান শুনি। আমাদের দুজনে গানের আলাপ চলে।

আপনি কানে তুলো গুঁজে আমার গান শোনেন?

শরীফ রীতিমত সংগীতের বিজ্ঞান-ও শেখার উৎসাহ দেখাতে লাগল।

এমন দফা চলছে, হেকিম সাহেব আবার নাস্‌খা দিলেন, দু সপ্তাহ নদীর চরে নৌকার উপর থাকো।

পুঁজ কমে দশ আনা আছে। হেকিম সাহেবের উপর শরীফ অনেকটা আস্থাশীল।

তাই এই নিদান সে অবহেলা করতে পারল না। সঙ্গে আমাকে নিল, আর দশ-বিশখানা কেতাব।

নৌকার ছয়ের তলায় দিন-রাত্রি কাটতে লাগল। দুজনে পড়ি, গল্প করি, আর নদীর ছলাৎ ছলাৎ শব্দ জরীপ করে বেড়াই। নৈশ নদী-বক্ষে জলের অবিশ্রান্ত কলরবের মাঝখানে শরীফের ঘুম ভাঙে, সে ঐ একটানা আওয়াজ মুগ্ধ হয়ে শোনে —সকালে রিপোর্ট পাই। আমরা উভয়ে জলচর। আকাশময় এখানে পৃথিবী পরিব্যাপ্ত। কিন্তু শব্দ রং ছাড়া আর বিশেষ কিছু অনুভূতির রাজ্যে পৌঁছায় না। আবার স্থলে ফিরে এলাম। হেকিম সাহেব গান শোনার নোস্‌খা দিলেন। প্রতি সন্ধ্যায় এখন আমরা সংগীত আলয়ের খোঁজে বেরুতে লাগলাম।

কয়েক মাস পরে বছরের [illegible] হেকিম সাহেব শরীফের কানে দু' ফোঁটা ওষুধ দিলেন। অবশ্য শরীফ এখন গান-শোনার ঝোঁকে হাবুডুবু। তার কানে আর তুলো গুঁজতে হয় না। ভেতরে পুঁজ অল্পই আছে। শরীফ নিজেই একদিন সদাঞ্জনবাবুর কাছে যাওয়ার প্রস্তাব করল। আমি তাই-ই চাই। তিনি ক্ষমাও আমাদের মঞ্জুর করলেন। শরীফ শেষে সমঝদারের মত সদাঞ্জনবাবুকে নানা প্রশ্ন করতে লাগল। তিনি খুশি হয়ে বললেন, "আবার খবর দিয়ে আসবেন।"

হেকিম সাহেব একদিন জিজ্ঞেস করলেন, "আপকা কান কৈসা?"

"বহুৎ আচ্ছা হো গয়া। লেকিন দরদ ভি হ্যায়।"

"সব আচ্ছা হো যায়েগা।"

শরীফ তবু হঠাৎ ভয় পেয়ে যেত। আবার কোনদিন কি নোস্‌খা আসে কে জানে।

তবে সে হেকিম সাহেবের আলাপিতায় মুগ্ধ।

বেশ কিছুদিন পরে হেকিম সাহেব বললেন, "ইয়ে বিমারী ক্রোরো আদমী কা হ্যায়।"

কোটি লোকের নাকি এই ব্যারাম হয়?

"কোটি কোটি লোকের?"

"হ্যাঁ। লেকিন সবকা পুঁজ বাহার নিকাল নেহি আতা।"

সকলের পুঁজ শুধু বেরিয়ে পড়ে না।

জিজ্ঞেস করলাম, "হাকিম সাহাব, এৎনা আদমী কা?"

এত লোকের এই ব্যারাম?

"হ্যাঁ।"

"এলাজ করায় না?"

'নেহি করওয়াতে।"

ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস

জব চার্ণকের বিবি

কলকাতা স্রষ্টা জব চার্ণকের প্রেমময় জীবন আলেখ্য। ॥ পাঁচ টাকা ॥

অর্চনা পাবলিশার্স

৮বি, রমানাথ সাধু লেন, কলিকাতা-৭

(সি ৯১১৪)

উপনিষদ

চৈত্রজা দেবী প্রণীত (লীলা পুরস্কারপ্রাপ্ত)

নূতন উপনিষৎ সংযোজিত

বহু প্রতীক্ষিত ২য় সংস্করণ

মূল্য—৫ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : শ্রীশঙ্কর পাবলিশার্স

১৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ও অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

অঙুল ছড়িয়ে হেকিম সাহেব হাতের উত্তাল সহযোগে রোগীদের জন্য করুণা প্রকাশ করলেন। শরীফ অবাক। এত লোকের কানের ব্যারাম। হেকিম সাহেব তখন এক অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন।

"আপলোগ জানতে হে' কোন্ জানোয়ার কা কান নেহি?"

"নেহি।"

"—সাঁপ—সাঁপ কা। জিস্‌কা কান নেহি হ্যায়, ও সাঁপ হ্যায়।"

শরীফের সমীহার চূড়ায় হেকিম সাহেব তখন তখ্‌ত পেয়ে গেছেন। রোগের উত্তরোত্তর নিরাময়ের সংগে তার হেকিম ও সংগীতপ্রীতি ভয়ানক বাড়তে লাগল। তবু মাঝে মাঝে মনে হয়, কানে কি যেন—ভার। আঙ্গুল ঢোকালেও অবশ্য তা আর পঁুজে ভিজে যায় না। একদিন সকালে শরীফ আমার কাছে এসে হাজির।

"কিয়া ব্যাপার?"

"চল্ হেকিম সাহেবের কাছে।"

"এই সকালে।"

"চল্। সাতটা বাজল। আজ ছুটির দিন।"

শরীফ ঘরে চা পর্যন্ত খেতে দিল না। পথে বেরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম; "কি আজ আবার নোস্‌খা নিতে যাচ্ছ, ফের যদি উসসে বাত করতে বলে।"

"বললে করব। কান বেশ ভালো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু।"

বারান্দায় পা দিয়ে দেখি, দাওয়াখানা খোলা, কিন্তু শুধু তাকিয়া সাদা চাদরের উপর হেকিম সাহেবের প্রতিনিধিরূপে পড়ে আছে। অবিশ্যি তিনি ভেতরে আছেন। কিন্তু তিনি শুধু ভেতরে আছেন তা নয়। তক্তপোশে বসে আমরা বুঝতে পারলাম, দিলরুবা, আশাবরী রাগ আর্তনাদ তুলছে। সে-কান্না মরমীর পক্ষে বেদনা-দায়ক। শরীফ আমার জামার আস্তিন চেপে ইঙ্গিত করল, যেন শব্দ না করি। আলাপ থেকে আস্থায়ীর চত্বরে আশাবরী এগিয়ে চলে। কান্নার দমক পাঁজর চিরে-চিরে যেন বের হচ্ছে। শরীফ সাপের মত ঝঙকারের সঙ্গে সঙ্গে দুলতে লাগল। কিন্তু তার পক্ষে এ-ঘরে বসে থাকা আর সম্ভব ছিল না। সে সোজা পর্দা তুলে ঘরে ঢুকে গেল। ভদ্রতার মাথা সে খেয়ে ফেলেছে কখন! আমি বাইরে।

হঠাৎ শুনি একটা তেহাই মেরে আশাবরী স্তব্ধ হয়ে গেল। আর উচ্ছ্বসিত সাদর সম্ভাষণ, "আও বেটা আও।"

সেই সুরেরই পশ্চাদবর্তী আহ্বান। শরীফ তখন চেঁচাচ্ছে, "ভেতরে আয় রমজান।" পর্দা তুলতেই আমার চক্ষুস্থির। তবলা, সেতার, ভায়োলিন প্রভৃতি পাঁচ-সাত রকমের যন্ত্র চারিদিকে। একটি সাধারণ তক্তপোশে চাদর-ঢালা বিছানার উপর হেকিম সাহেবের সম্মুখে দিলরুবা পড়ে আছে।

বসে-বসে তিনি শরীফকে আলিঙ্গন দিচ্ছেন। উচ্ছ্বাসের রেশ কেটে গেল। হেকিম সাহেব তখন বলছেন, "বেটা কান

শুধু তিন সের তার নিয়েছি

আচ্ছা হো গেয়া হ্যায়। দেখা না, আজ উধার তোম রহ্ নেহি সেকা।"

"আপকা মেহেরবানী। আভি থোড়া থোড়া ভারী ভারী—"

শরীফ কৃতজ্ঞতার সুরে বলতে চায়।

"ও তোমরা খেয়াল বেটা, অব তোমরা কান মে কুছ বিমারী নহি।"

তারপর চা পর্ব। আজ আমি স্টোভ ধরালাম। হেকিম সাহেবকে তক্‌লিফ করতে দেব না, আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। অন্দরেই চা-সংযোগে নানা রাগিনীর কথা উঠল। হেকিম সাহেবের মতে, কাকের কণ্ঠে পর্যন্ত সুর আছে। তাছাড়া জল-স্রোত, দুপুরের রৌদ্র, গাছের তলে, শুঁয়োপোকার ধূসর গায়ে পর্যন্ত সুর ছড়ানো। আজ আমরা খুব হাসলাম। শেষে তিনি বললেন, "হংস কিংকিনী শোনা?"

"জী, মেরা রেডিওমে শোনা।"

শরীফ তাড়াতাড়ি মুখ থেকে কথা খালাস করে তবে রেহাই পায়।

"তোমরা রেডিও হ্যায়? আহ্ বেটা মাফ করনা, তোমকো খামখা এ্যাৎনা তক্‌লিফ ওঠানে পড়া। হররোজ ভারী রাত কো বড়ে বড়ে ওস্তাদকা গানা শোনা তা কে তবিয়ত আওর কান ঠিক রাহে। মেরা রেডিও ত তোমরা সামনে পড়া হ্যায়।" বলে তিনি যন্ত্রগুলো দৃষ্টিমোছা করলেন। আনন্দে আজ শরীফ ডগমগ। ঘন ঘন সে আমার দিকে তাকায় লজ্জায় যতটা, তার চেয়ে বেশী হেকিমের—পরিচয় লাভের আনন্দে।

সেদিন হেকিম সাহেবের মোগ্‌লাই কাহিনী চায়ের পেয়ালায় মওজ তুলল।

তিনি বয়ান শুরু করলেন: বাহাদুর শা'কে রেঙ্গুনে নির্বাসনে পাঠানোর সময় এক সমস্যা উঠল। বাহাদুর শা'র হারেমে তখন তিরিশ ডজন বেগম আর সাতশ' বাহান্নজন বাঁদী। অথচ ইংরেজের হুকুম, সংগে মাত্র একটা বেগম আর একটা বাঁদী তিনি নিতে পারবেন।

সংবাদ শুনে ত বেগম-বৃন্দ দোপাট্টা ফেলে কাঁদতে বসল।

বাহাদুর শা বললেন, একজন আমার সঙ্গে এসো। কিন্তু সবাই 'যাব-যাব' বলে কোরাস গাওয়া শুরু করে।

মহা মুশকিল। ইংরেজ অফিসার পথ বাৎলায়। "সম্রাট লটারী করুন। যার নাম ওঠে, তা-কেই সংগে নিন।"

বাহাদুর শা' গোস্বায় ফাট্-ফাট্। সাদা চামড়ার ইংরেজ হারামীপনা করতে পারে। সে ওসব হারামী কাজ করতে পারবে না।

অফিসার বললে, "আপনার মরজী। কিন্তু যাবে মাত্র একজন।"

বাহাদুর শা' জবাব দিলেন, "আচ্ছা, আমিই ঠিক করছি—কে যাবে।" তিনি বেগমদের লাইনবন্দী দাঁড় করিয়ে ফুকার দিলেন, "বহেনোঁ (ভগ্নিগণ!), তোমরা আমার সঙ্গে যেতে চাও। কিন্তু সবাই ত যেতে পারবে না। আমি তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে ঈমানদার, তাকেই শুধু সঙ্গে নেব।

কে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ঈমানদার, হাত ওঠাও।"

সবাই একসঙ্গে হাত তুলল। তিনশ' বাটজোড়া হাত। বাহাদুর শা'র চক্ষু ত চড়কগাছ! বাহাদুর শা' বললেন, "আমি ধরতে পারব, তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে ঈমানদার। আচ্ছা বাতাও, আমার সঙ্গে যেতে, তোমরা কে কী সঙ্গে নিচ্ছো।"

বেগমরা কে কত হীরা মোতি আশরফী সোনা নিয়েছে, সেই সব ফিরিস্তি দিলে। শুধু একজন বেগম বললে, "জাঁহাপনা, আমি কিছুই নিইনি। শুধু তিন সের তার নিয়েছি, যেন দশ বছর আপনার সেতারের তারের অভাব না হয়।"

বাহাদুর শা' তার দিকেই হাত বাড়িয়ে বলে উঠলেন, "আও মাহবুবা, হামরা সিনা পর ঝুঁদ পড়ো।"

কে, হোড়ের
কণক
পাউডার

॥ ১১ ॥

কত্তাবাবা মাঝে মাঝে জোড়াসাঁকোয় অভিনয়ের আয়োজনে মাতিয়ে তুলতেন সবাইকে। শান্তিনিকেতনের দল তখনও তৈরী হয়নি। যা-কিছু করত কলকাতার দল। কলকাতায় এসে কত্তাবাবাকে দল সংগ্রহ করতে হত। দাদামশায়দের টানতেন, অন্যান্য আত্মীয়বন্ধুরা এসে যোগ দিতেন, শান্তিনিকেতনেরও কেউ কেউ আসতেন। এই ভাবে দল গড়ে উঠত। জোড়াসাঁকো হত জম-জমাট। রূপই বদলে যেত এ-বাড়ির ও-বাড়ির। লেখা-পড়া প্রায় হতই না আমাদের। খেলাও বন্ধ হয়ে আসত।

রিহার্সাল আরম্ভ হলে আমরা লক্ষ্য করতুম যে আমাদের ছোটদের মধ্যে থেকে একমাত্র খুকীমাসী ছাড়া আর কারুর কত্তাবাবার দলে ঢোকবার ডাক আসত না। খুকীমাসী 'ডাকঘর'এ মালিনীর পার্ট করে একসময় খুব নাম করেছিল। সেই থেকে তার কদর। বাকিদের করবার মতো পার্ট তাঁর নাট্যে থাকত না। কিংবা এমনও হতে পারে যে আমাদের কাউকে তিনি উপযুক্তই মনে করতেন না। এর ফলে আমরা চিরকাল দর্শকের কোঠায় পড়ে থাকতুম। অবশ্য দিনের পর দিন প্রতি সন্ধ্যায় রিহার্সাল দেখে ভারি আমোদ পেতুম—পার্ট সব মুখস্থ হয়ে যেত—কত্তাবাবার শেখানো ঢংগুলো পর্যন্ত। আর তার ফলে যতদিন তালিম শুনতুম ততদিন অভিনয় করতে না পারার কোনো দুঃখ আমাদের মনকে স্পর্শ করত না। কিন্তু অভিনয় সাঙ্গ হয়ে গেলে দল ভেঙে যে-যার পথে চলে গেলে, কত্তাবাবা শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলে আমাদেরও থিয়েটার করবার শখ জাগতো মনে।

বোধ হয় এই জন্যেই আমরা সেবার ঠিক করলুম পরের মুখ চেয়ে না থেকে আমরা নিজেরাই একটা কিছু করব। ভাগ্যিস করে-ছিলুম, না হলে জানতেই পারতুম না কোনোদিন যে আমাদের মধ্যেই যে-সব অভিনয়-কুশলী চাপা পড়ে ছিলেন, যেমন কোকোমামা, কালুমামা, শোভনলাল বা সুজন তাঁরা কেউই কত্তাবাবার দলের নাম-করা অভিনেতাদের চেয়ে কম নন। খুঁজে পেতে দাদামশায়ের লেখা একখানা নাটিকা বার করা গেল—ভারতীতে বেরিয়েছিল কিছুদিন আগে—নাম, এস্‌পার ওস্‌পার!

পার্ট বিলি আর রিহার্সাল শুরু হয়ে গেল। নাট্যের মধ্যে কিছু গান ছিল। প্রশান্ত রায়কে ধরে পড়লুম গানের ভারটা নিতে। কারণ তিনি ছাড়া হার্মোনিয়াম কে-ই বা বাজাবে? প্রশান্তবাবু হার্মো-নিয়ামে টুং টাং করে গানগুলোতে সুর দেবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। আর আমরা বই হাতে নিয়ে কার পক্ষে কোন পার্ট মানাবে পড়ে পড়ে দেখতে থাকলুম।

এই সব ব্যাপার আমাদের চলতো একতলায়। দোতলার বারান্দায় থাকতেন দাদামশায়। কেমন করে জানিনা, তিনি টের পেয়ে গেলেন আমরা রিহার্সাল দিচ্ছি। হঠাৎ একদিন সকালে নীচে নেমে আমাদের মধ্যে এসে হাজির।

বললেন—কিসের রিহার্সাল?

—এস্‌পার ওস্‌পার।

দেখালুম ভারতী থেকে নকল করে নিয়েছি খাতায়। খাতাটা দিলুম দাদামশায়ের হাতে। উল্টে পাল্টে দেখে বল্লেন—এটা লিখেছিলুম বটে মনে পড়ছে। বেছেছিস্ ভালো। কিন্তু এটা তো যাত্রা। রবি-কার প্লে-র মতো নয়। যাক্ চালিয়ে যা। দেখা যাক্ কি দাঁড়ায়।

আমরা উৎসাহ পেয়ে গেলুম।

প্রশান্তবাবুকে গানের সুর বেঁধে দেবার ভার দেওয়া তো হয়েইছিল, তা ছাড়া তিনি ছবি-টবি আঁকতেন বলে তাঁকে পার্ট দেওয়া হয়েছিল চিত্রকরের। দাদামশায় যখন এলেন তখন চিত্রকরের পার্ট চলেছে—

চিত্রকর বলছেন—আমি চিত্রকর তা জানো না বুঝি? আমাকে সুখী করা সহজ নয়। আমি বাজাতে পারি, নাচতে পারি, গাইতে পারি। এমন যে বনের হরিণ, গাছের পাখি, নদীর জল, আকাশের চাঁদ, সূর্য, তারা, আলো, অন্ধকার সব চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়িয়ে থাকে আমার সামনে।

প্রশান্তবাবু ছবি আঁকতেন, আর্টিস্ট ছিলেন, কিন্তু লোকটি ছিলেন ভারি আমুদে। তাঁর মুখে ঐ সব গম্ভীর গম্ভীর কথা কেমন যেন লাগতো। দাদামশায় শুনে বললেন—তোর কথাগুলো সব বদলে দিতে হবে। তোর মুখ দিয়ে চিত্রার্পিতবৎ বেরচ্ছেই না। দেখি আর কে কি করছে? বলে যা একে একে।

সমস্তটা শুনলেন। তারপর খাতাটা বগলে করে নিয়ে চলে গেলেন স্নানে।

আমরা বললুম—ভালই হল। দাদামশায় যখন হাত দিয়েছেন, উতরে যাবে।

া। বিকেল বেলায় আমাকে খাতাটা দিয়ে
ন—নে কপি করে ফেল।

দেখলুম প্রচুর কেটেছেন। প্রশান্তবাবুর
ন্যে একটা পার্ট লিখেছেন ব্যান্ড
স্টারের। দাদামশায় বল্লেন—নাটুকে ভাবটা
ড়িয়ে দিলুম। থাঁটি যাত্রার ছাঁচে ঢেলে

পরপর এসে একদিন দেখব।

আমি খুব তাড়াতাড়ি নকল্ল করতে পারতুম। সন্ধ্যার মধ্যে কপি করে ফেল্লুম সমস্ত লেখাটা। সবাইকে পড়ে শোনালুম। দেখা গেল আগে যারা কিছু মুখস্থ

ভেবেছিলুম দাদামশায় হয়তো কয়েকদিন পরেই আসবেন, কিন্তু তর সইলো না। পরদিনই এসে উপস্থিত আমাদের আড্ডায়। খুব জমলো সেদিন রিহার্সাল। ব্যান্ড-মাস্টার হয়ে প্রশান্তবাবু বেশ সহজ হয়ে গেলেন। কুমুদ পাল এসেছিল সেদিন—বসে বসে দেখছিল রিহার্সাল। দাদামশায় বললেন—বসে থাকবি কেন? করে দেব তোর জন্যে একখানা পার্ট। পুলিসম্যান সাজবি?

সঙ্গে সঙ্গে গান তৈরী হয়ে গেল—

মন আমার—
হাকিম হতে পারো এবার।
মন যদি হও হাকিম
আমি হই চাপরাসী।
চাপরাসি ব্রজবাসী।
কুমুদ পাল ভারি খুশী।

দাদা মশায় বললেন—এ গানের সঙ্গে নাচতে হবে—পুলিসম্যানের নাচ।

আমার ঐ পরিষ্কার করে নকল্ল-করা খাতায় সেদিন আবার কাটা-কুটি চললো। নতুন করে অনেক কিছু লিখলেন। আমি খাতার বাঁধন আলগা করে দিয়ে শোধরানো পাতাগুলোকে নতুন করে নকল করে ফেললুম।

তারপর দিন চললো আবার রিহার্সাল।

কিন্তু দাদামশার শোধরানো থামলো না। আমারও নকল্ল করা শেষ হল না। কত বদল কত যোগ-বিয়োগ যে হল তার ঠিক নেই। আমি তখন অগত্যা প্রম্পটারের পার্ট নিলুম, কারণ দেখলুম এমনি করে রোজ নতুন হলে কারুরই মুখস্থ হবে না। আমাকেই খাতা হাতে সকলের মুখে কথা যুগিয়ে যেতে হবে।

দাদামশায় বললেন—ক্ষতি কি? প্রম্পটারকে ঢুকিয়ে নেব যাত্রার মধ্যে। ঘুরে ঘুরে প্রম্পট করে যাবে।

কোকোমামা কি একটা পার্ট করছিল। সেটা বদলে হল রক্তমূর্তি। আরতি দীপালী এরা বসে বসে রিহার্সাল দেখতো। দাদামশায় বললেন—রোস, তোদের যাত্রার দলের সখী করে নিচ্ছি। বলে সখীর গান লিখতে বসে গেলেন। তারপর খানিক ভেবে বললেন—পুলিসম্যানের দু-দিকে দুটো সখী নাচিয়ে দে।

তারপর গান নিয়ে পড়লেন। পালাটা যাত্রার মতো করে যখন বাঁধা হয়ে গেছে তখন গানগুলোও বদলানো দরকার। সুরও দিতে হবে। প্রশান্তবাবু এতদিন সুর নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন। তিনি রেহাই পেলেন। প্রশান্তবাবু বসলেন হর্মোনিয়ামে আর দাদামশায় নিজের হাঁটুর উপর তাল দিয়ে দিয়ে দেখাতে লাগলেন নতুন

নতুন সুর। কিছু কিছু গান কেটে দিয়ে নতুন গান লিখলেন। আর আরো সব দেহতত্ত্বের আর ফকিরের গান কোথা থেকে খুঁজে বার করলেন জানি না। নহুষের একখানা গান ছিল—

ভেসে যাক
কুল ছেড়ে কাজ ভুলে
খেয়া তরী আমারি—
ভেসে যাক
মনোতরী আমারি—

এর বদলে এলো—

আমি করবো এ রাখালী কতকাল?
পালের ছয়টা গরু জুটে
করছে আমায় হাল বেহাল।
আমি সোজা পথে যদি যেতে চাই
তারা ঘুরে ফিরে বাঁকা পথে চলেছে
সদাই।

আত্মারামের একটা গান পাওয়া গেল পুরানো পুঁথি থেকে, সেটাও জুড়ে দিলেন—

প্রাণারাম আত্মারাম কোথায়
যারে শুধাই রে কাতরে
সেই ঘোরে ফিরে ঘোরায়।
কারে জিজ্ঞাসি ব্যথিত কে এমন
উপদেশ দানে প্রাণধনে মিলাবে আমায়

আমরা কত্তাবাবার গানে রবীন্দ্র সুরে অভ্যস্ত। আমাদের কানে একেবারে নতুন শোনাতে লাগল এ সব সুর। তারপর গানগুলো যখন আমাদের সকলের গলায় সমস্বরে ধ্বনিত হতে থাকল তখন মনে হল একটা মস্ত কীর্তি করতে চলেছি আমরা।

—এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
বাসরে নাহিক দিয়া
রাজা আছে ভাই
রাণী কাছে নাই
সখী গেছে পলাহয়া......

দৃশ্যপট কিছু নেই। ঘোর রজনীতে মেঘের ঘনঘটার দৃশ্য, রাজার অসহায়তার দৃশ্য গানের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হবে। সেই রকম সুর হওয়া চাই। সেই রকম গাওয়া চাই।

একটা গানের সুর নিয়ে শেষটা ঠেকে গেলেন। ব্যাণ্ড মাস্টারের নাম হয়েছিল শেষ পর্যন্ত র‍্যাং সাহেব। সাহেবের একটা ইংরাজী গান দরকার। গানটা হল—এ বি সি ডি......এক্স ওয়াই জেড। কিন্তু এই ইংরিজী অক্ষরগুলোকে ছন্দে আর সুরে বাঁধতে গিয়ে ভারি মুশকিলে পড়ে গেলেন। কিছুতেই আর বাগ মানে না। দু-তিন দিন ধরে [illegible] ধ্বস্তাধ্বস্তি। প্রশান্তবাবু হার্মোনিয়াম-এ বসে বসে ঘেমে গেলেন। একদিন সারা সকাল চেষ্টা করে শেষটা ছেড়ে দিয়ে দাদামশায় স্নানে গেছেন। প্রশান্তবাবুও বাড়ি যাবেন বলে তাঁর মোটাব বাইক্-এ স্টার্ট দিচ্ছেন, এমন সময় হঠাৎ দাদামশায় ছুটতে ছুটতে এসে হাজির—গা ভিজে, লুঙ্গি হাঁটুর উপরে গোটানো, সর্বাঙ্গ দিয়ে টস্‌টস্ করে জল গড়াচ্ছে। ভরা চৌবাচ্ছায় নেমেছিলেন স্নান করতে। গা ডুবিয়ে মাথায় জল দিয়েছেন, এমন সময় সুরটা এসে গেল

—ইউরেকা, ইউরেকা! বলে আর্কিমিডিস্-এর মত স্নানের টব থেকে ছুটতে ছুটতে দাদমশায় এসে হাজির।

—শিখে নে এক্ষুনি নইলে ভুলে যাবো। বলে প্রশান্তবাবুকে হার্মোনিয়ামে বসিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে গেয়ে চললেন—

এ বি সি ডি ই এফ্ জী!
এইচ আই জে কে এলোমেলো পী!
কিউ আ রেস্ টি ইউ ভী!
ডাবলু এক্স ওয়াই জেড এ বি সী!

—দেখলি তো, এ বি সি-টা শেষকালে জুড়ে দেওয়া দরকার। ঐটে হচ্ছিল না বলে যত গোল। মাথায় ঠান্ডা জল পড়াতে তবে এল সুরটা।

এদিকে পাতার পর পাতা যাত্রা প্রায়ই

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.-প্রণীত

ব্যায়ামে বাঙালী	২.০০	বাংলার ঋষি	৩.০০
বীরত্বে বাঙালী	১.৫০	বাংলার মনীষী	১.২৫
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪.০০	বাংলার বিদুষী	২.০০
আচার্য জগদীশ	২.০০	রাজর্ষি রামমোহন	১.৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১.৫০	যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১.৫০
জীবন গড়া	.৭৫	রবীন্দ্রনাথ	১.২৫

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী • ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

বিনামূল্যে
ভ্যাসমল উপহার

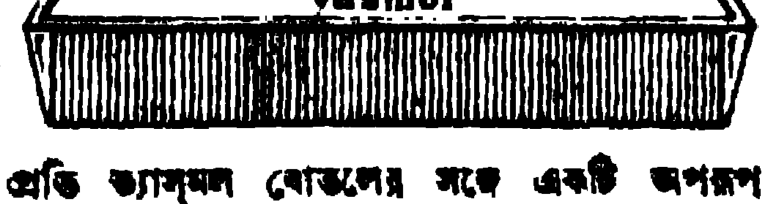

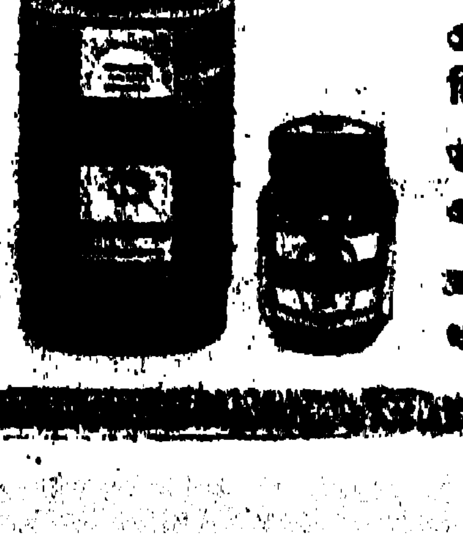

প্রতি ভ্যাসমল বোতলের সঙ্গে একটি অপরূপ চিরুনী পাবেন।

ভ্যাসমল কেশের কৃষ্ণরঞ্জক অপেক্ষা অধিক, ইহা কেশ প্রসাধনের সামগ্রী হিসাবেও চমৎকার।

অক্টোবর ও নভেম্বর ১৯৬০ সাল পর্যন্ত অথবা ষ্টক থাকাকালীন এই সুযোগ পাবেন।

HVP

হ্যাডেনসা
ব্যবহার না করে
কর্ণেল সাহেব
তাঁর কষ্টদায়ক
অর্শ
সম্বন্ধে খালি
অভিযোগ

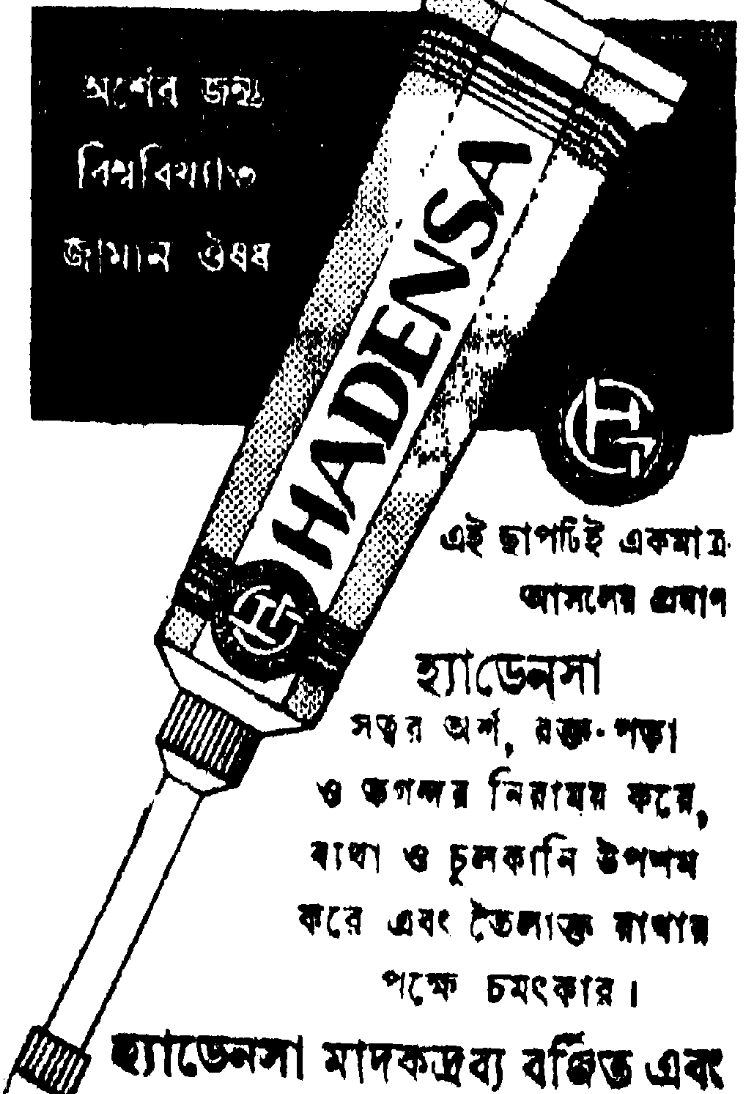

এই ছাপটিই একমাত্র
আসলের প্রমাণ
হ্যাডেনসা
সত্বর অর্শ, রক্ত-পড়া
ও ভগন্দর নিরাময় করে,
ব্যথা ও চুলকানি উপশম
করে এবং তৈলাক্ত বাধার
পক্ষে চমৎকার।
হ্যাডেনসা মাদকদ্রব্য বর্জিত এবং
দাগ লাগে না।
2-665-A-BNG

বদলে যাচ্ছে। আমি যদিও চট্‌পট্‌ কপি করে ফেলছি কিন্তু দাদামশার সঙ্গে পারছি না। যত কপি করছি, তত বদলাচ্ছেন। কেউ আর মুখস্থ করে উঠতে পারছে না। বেনেপুকুরের দিদিমা প্রত্যেক দিন টেলিফোন করে খবর নিতেন আজ যাত্রার রিহার্সাল হবে কি না। যাত্রার রিহার্সাল রোজই হত, একদিনও বাদ যেত না। বেনেপুকুরের দিদিমা-ও রোজই সন্ধেবেলা জোড়াসাঁকোয় চলে আসতেন। কিন্তু প্রত্যেক দিনই এসে দেখতেন নতুন পার্ট, নতুন গান। রোজই বদলে যাচ্ছে।

আমরা মুশকিলে পড়লুম। দাদামশায় উৎসাহের অন্ত নেই। কিন্তু এই করে আমাদের যাত্রা কিছুতেই আর তৈরী হয়ে ওঠেনা। রিহার্সালের শেষে খাতাটা চেয়ে নেন, ফিরিয়ে দেন যখন, অনেক কিছু বদলে গেছে ততক্ষণে। আমি বার বার পরিষ্কার করে নকল করি, দাদামশায় বার বার কেটে ছেঁটে নতুন করে দেন। তখন আমি ঠিক করলুম এইবার যাত্রার খাতাটা লুকিয়ে ফেলা দরকার। মুখস্থ যা হয়েছে হয়েছে। বাকিটা প্রম্পটিং-এ চালাতে হবে। দাদামশায়কে গিয়ে বললুম—যাত্রার তারিখ আমরা ঠিক করে ফেলেছি। আর দেরি করা যায় না—পর্শু হবে।

দাদামশায় শুনে বল্লেন—বেশ তো, দে তবে তাই লাগিয়ে। একটা ড্রেস্‌ রিহার্সাল দিয়ে ফেল।

ড্রেস রিহার্সালে আমরা সবাই সেজেগুজে নামলুম। র‍্যাং সাহেব প্যান্টালুন পরলেন, রক্তমূর্তি লাল গামছা বাঁধলেন মাথায়, হর্তা কর্তা কোটের উপর পাকানো চাদর ঝুলিয়ে দিলেন। আসরের কোথায় কে দাঁড়াবে, তুড়ি জুড়ি কোথায় দাঁড়িয়ে গাইবে, দাদামশায় সমস্ত দেখিয়ে দিলেন। যাত্রা কবে হবে, কবে হবে, এই যে অনিশ্চয়তাটা ছিল সেটা দূর হয়ে গেল। বোঝা গেল সত্যিই এবার যাত্রাটা হচ্ছে। রিহার্সাল হয়ে গেল। হল্‌ ঘরে আমাদের রিহার্সাল হতো। হল ঘরের এক কোণে থাকতো হার্মোনিয়ামটা। হার্মোনিয়ামের মধ্যে থাকতো পালার খাতাটা। খানিক পরে দাদামশায় এসে খোঁজাখুঁজি লাগিয়েছেন। হার্মোনিয়ামের ঢাকা তুলে দেখেন খাতা নেই। বল্লেন—ওরে খাতা চুরি গেছে। দেখ্‌ কোথায় গেল!

আমি এদিকে খুঁজি, ওদিকে খুঁজি। খাতা আর পাইনে। পাবো কোথায়? লুকিয়ে ফেলেছি যে অন্য জায়গায়। কোথায় গেল খাতা, কোথায় গেল, করে অনেকক্ষণ খোঁজবার পর দাদামশায় বুঝলেন ব্যাপারটা। কিছু বললেন না।

সেদিন তোতাকে সাজানো হয়েছিল দাঁড়ি। লম্বা চেহারা—হেলেও না, দোলেও না—তোতা ছিল ঠিক ধাক্কা-লেখের দাঁড়িরই মত। তোতাকে দেখে দাদামশার ইচ্ছে হয়েছিল তার পার্টটাকে আরো একটু সরস করবেন কিন্তু খাতা হারিয়ে যেতে বললেন—রস-কষের কিছু দরকার নেই। দাঁড়ি হবে শুকনো। আসরে ঢুকে একেবারে দাঁড়ি টেনে দিয়ে চলে যাবে। ঘেঁটু বলে একটি ছেলে সেদিন এসেছিল রিহার্সাল শুনতে। তাকে দেখে দাদামশায় বললেন—বসে আছিস্‌ কেন? আয় তোকে যাত্রায় ঢুকিয়ে দি। জুতো-চোর সাজবি? ঘেঁটু পার্ট পেয়ে গেল। জুতো-চোর জুতো-চোরই সই! দাদামশায় বললেন—খাতা যখন চুরিই গেছে তোর মুখে আর কথা দেব না। তুই শুধু শিস দিবি। ঘেঁটুর এক গুণ ছিল, সে মুখে-মুখে বুলবুলির মতো শিস দিতে পারত। ঘেঁটুর পার্ট হল ঢাকা খাঁচা হাতে আসরে ঢুকে খাঁচার মধ্যে জুতো চুরি করে যেন শ্যামা পাখিকে শিস দিয়ে পড়াচ্ছে এমনি করে আসর থেকে সরে পড়া।

দু-দিন পরে আমরা সাড়ম্বরে লাগিয়ে দিলুম এস্‌পার ওস্‌পার যাত্রা, দোতলার হল্‌-ঘরে আলো জেললে। দৃশ্য-পট নেই, ফুট-লাইট নেই, স্পট-লাইট নেই কিছু নেই, শুধু কথার মালা, গানের সুর, আর অভিনয় ভঙ্গী দিয়ে দৃশ্যের পর দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা। সম্বলের মধ্যে আমাদের শুধু অদম্য সাহস আর উত্তেজনা। আর দাদামশার অফুরন্ত উৎসাহ।

হলঘরের এক দরজা থেকে আর এক দরজা পর্যন্ত একখানা দড়ি টেনে দর্শকদের জায়গা আর অভিনেতাদের এলাকা আমরা আলাদা করে দিতে গিয়েছিলুম; দাদামশায় এসেই দড়ি তুলে ফেলে দিলেন। বল্লেন—যারা দেখতে আসবে তাদেরও দলে টেনে নে, তবে তো জমবে যাত্রা।

সত্যিই তাই হল। যাঁরা দেখলেন আর উপভোগ করলেন, আর দেখতে দেখতে আত্মবিস্মৃত হলেন তাঁরাও যেন অভিনয়ের অংশ গ্রহণ করেছেন বলে মনে হতে লাগল।

তিন দিন অভিনয় হয়ে যাবার পর কত্তাবাবা এসে দেখলেন। হল্‌-ঘরে এসে বসলেন পা গুটিয়ে সকলের সঙ্গে। যাবার সময় প্রচুর হেসে বললেন—এ জিনিস অবন ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না!

যাত্রায় আমাদের মোট খরচ হয়েছিল সাড়ে তের আনা। কিছু কর্ক কিনেছিলুম, পুড়িয়ে গোঁফ-দাড়ি করবার জন্যে। কিছু রঙিন কাগজ আর দড়ি। সবচেয়ে বেশী খরচ পড়েছিল রক্তমূর্তির খাঁড়াটা তৈরী করতে। এই খাঁড়ার জন্যে পিচবোর্ড আর জগজগা কিনতেই আমাদের পড়ে গিয়েছিল বারো আনা।

(ক্রমশ)

কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

(৪৫)

দীপংকর বললে—মা, তুমি ওঠো, আমি খ‍ুঁজছি, দেখছি কোথায় আছে, যাবে কোথায়, আছে বোধহয় কোথাও এখানেই—

মা চুপ করে রইল। ছিটেও বললে—তুমি ভাবছো কেন দিদি—যাবে কোথায় সে—আমি দেখছি—

সকাল থেকে সেই যে শুরু হলো, সে যেন আর থামতে চায় না। সত্যি সত্যি ছিটেও বেরোল আশে পাশে খ‍ুঁজে দেখতে। ফোঁটাও একটু ভাবতে লাগলো। এতদিন ধরে এত জিনিস নিয়ে ভেবেছে তারা, এত জিনিস নিয়ে ঝগড়া করেছে মারামারি করেছে, মুখ-খারাপ করেছে; নিজেদের অধিকার-বোধ নিয়ে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে চারদিকে। তারা এতদিন ধরে যা চেয়েছিল তা পেয়েছে। কিন্তু বোনটার কথা তো তারা ভাবেনি। একটা বোনও যে আছে তাদের, সে কথা তো তারা ভুলেই গিয়েছিল। কবে একদিন ছোট ফুটফুটে একটা মেয়ে তাদের সঙ্গেই এ-বাড়িতে বড় হয়েছে, মানুষ হয়েছে। কিন্তু তাদের মতন সে ঝগড়া করতে শেখেনি, প্রতিবাদ করতে শেখেনি। সংসারের প্রতিযোগিতার ভিড়ে অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্যে এদের মত ঠেলাঠেলি করে নিজের জায়গাটুকু দখল করবার কায়দাটুকুও শিখে নিতে জানেনি। তাই বুঝি তার কথা সবাই ভুলেই গিয়েছিল। এখন যেন তার কথা আবার নতুন করে মনে পড়লো সবার। শুধু মা'ই যেন ভুলতে পারেনি তাকে। সব সময় তাকে সামলে সামলে চলেছে। এ-সংসারে বিন্তীদিই বুঝি একমাত্র অচল মানুষ। সে কিছু কেড়ে নিতে জানে না, শুধু বোবার মত চুপ করে বড়-বড় চোখ তুলে চেয়ে থাকতে জানে আর কাঁদতে জানে।

আগের রাত্রে তার কান্নাটাও শুকিয়ে গিয়েছিল বুঝি। যখন বাড়ি-বদলাবার কথা আলোচনা করেছে দীপু আর দীপুর মা, যখন গুছিয়ে-গাছিয়ে পরদিন ভোরবেলা চলে যাবার ব্যবস্থা করেছে, তখনও সে বেশি কিছু বলেনি। কাঁদে নি তো। তারপর যত দিন গেছে, ততই যেন সে নিজের মনের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছে। একেবারে মনের অতলে গিয়ে ডুব দিয়েছে। এক মা ছাড়া আর কেউ যেন তার সন্ধানই পায়নি। তাই দীপুর মা'ই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো দাওয়ার ওপর।

মা'র অনেক দিন থেকেই যন্ত্রণার চাপ চলছে। একটার পর একটা যেন লেগেই আছে। একমাত্র ভরসা ছিল অঘোরদাদু। সেই অঘোরদাদু যেতে-না-যেতেই আবার এই।

ও-বাড়ি মানে পাশের বাড়ি। একদিন ও-বাড়িতে কত সন্তর্পণে ঢুকেছে দীপংকর। কত বিগত স্মৃতির বেদনায় জড়ানো ও-বাড়ির প্রত্যেকটা ইঁট। সেই বাড়িতেই এবার থেকে থাকবে দীপংকর। ভালোই হলো। এ-বাড়ির এই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের সঙ্গে দীপংকরের জীবন জড়িয়ে গেছে। এ ছেড়ে চলে না যাওয়াই ভালো। এ ছাড়তেও হয়ত পারা যাবে না আর। জীবনের সঙ্গে যা জড়িয়ে যায়, তাকে ছাড়তে পারা কি অত সহজ। এই বাড়িতেই একদিন লক্ষ্মীদি তাকে প্রাণপণে মেরেছিল, আবার এ-বাড়িতেই লক্ষ্মীদি তাকে ভালোও বেসেছিল, চকোলেট দিয়েছিল। এ-বাড়ি থেকেই কতদিন ভোরবেলা লক্ষ্মীদির চিঠি নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে দাতারবাবুকে দিয়ে এসেছে! আবার এই বাড়িতেই সতী তাকে তাচ্ছিল্য দিয়েছে, অবজ্ঞা দিয়েছে, হয়ত বা একটু কৃপা-কণাও দিয়েছে। আর এই পাড়া। এই পাড়ার এই বাড়ির সঙ্গে যে তার সারা-জীবনের যোগাযোগ। এইখানেই কিরণের সঙ্গে চাঁদা তুলে দীপংকর লাইব্রেরী করেছে, এইখানকার স্কুলেই প্রাণমথবাবু তাদের হাতে গড়ে মানুষ করেছেন। এই কালিঘাটের মাটিতেই বলতে গেলে গজিয়ে উঠেছে সে। এখানকে কি এত সহজে ছাড়া যায়।

ছিটেও ফিরে এল এদিক-ওদিক ঘুরে। বললে—নাঃ, বিন্তীটা পালিয়েছে নিশ্চয়—

দীপঙ্কর বললে—পালিয়েছে? পালাতে যাবে কেন?

ছিটে বললে—না পালালে যাবে কোথায়। কোনও জায়গা তো আর খুঁজতে বাকি রাখিনি—পাথুরে পটি, হালদার-পাড়া, পাণ্ডা-বাড়ি, ধর্মশালাগুলো সব চষে এলাম, কোথাও নেই—। কালিঘাটে থাকলে আমার চোখে ধুলো দিয়ে কোনও শালা লুকিয়ে থাকতে পারবে না—সে নেই, হাওয়া হয়েছে—

ফোঁটাও ফিরে এল। বললে—দিদি, পাওয়া গেল না—ভেগেছে সে নির্ঘাৎ—

দীপঙ্কর বললে—পুলিসে খবর দিয়েছ? থানায় খবর দিলে না কেন?

ফোঁটা বললে—থানার কথা ফটিক ভট্চাজ্যিকে বলতে হবে না,—থানা-পুলিস এ-শর্মাদের ঘর-বাড়ি—

সত্যিই শেষ পর্যন্ত কোথাও পাওয়া গেল না বিন্তীদিকে। সকাল সাতটা আটটা

: বাংলা সাহিত্যে প্রথম :

শঙ্করীপ্রসাদ বসুর

ইডেনে শীতের দুপুর

বাংলা সাহিত্য ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। তার নতুন প্রবেশ ক্রিকেট মাঠে 'ইডেনে শীতের দুপুর' গ্রন্থের মধ্য দিয়ে। প্রধান বাঙালী ও ভারতীয় ক্রিকেটারদের কথাচিত্র, ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট ম্যাচের দীর্ঘ নাটকীয় বর্ণনা, ইডেন গার্ডেনে রৌদ্র তপ্ত শীতের দুপুরের সুখস্মৃতির বর্ণনায় পূর্ণ এই লেখা। নানা মূল্যবান ছবিতে শোভিত। ৩·৭৫

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড

১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

গ্রাম—বাণীবিহার : ফোন: ৩৪-৪০৫৮

কে, হোড়ের

কণক

* পাউডার *

নটা বাজলো। তখন আর দেরি করা যায় না। অফিস আছে।

মা বললে—জানিস দীপু, সেই জন্যেই মেয়েটা কাল অন্যদিনের মত মোটে কান্নাকাটি করলে না—

দীপংকর বললে—তুমি অত ভাবছো কেন মা পুলিসে তো খবর দেওয়া হয়েছে, তারা নিশ্চয়ই খুঁজে বার করবে—

মা বললে—এতদিন বুকের কাছে রেখে রেখে সে যে আমার পেটের মেয়ের মত হয়ে গিয়েছিল রে, আমি না ভাবলে আর কে ভাববে—তার আছে কে?

সত্যিই তো, তার আছে কে? কার জন্যে সে এ-বাড়িতে থাকবে! অঘোরদাদুর মৃত্যুর পর থেকেই মা কেমন হয়ে গিয়েছিল। তারপর বিন্তীদির ব্যাপারে যেন আর ঠিক থাকতে পারলে না। কোথাকার কাদের মেয়ে, খুঁজলে তার সঙ্গে সম্পর্ক বার করা যাবে না, তবু কেন যে তার জন্যে দীপংকরেরও মনটা কেমন করতে লাগলো, কে জানে! মনে হলো এ তার কী হলো। পৃথিবীতে এত জিনিস আছে ভাববার, এত সমস্যা! বিরাট পৃথিবীর কত অসংখ্য মানুষ কত অসংখ্য সমস্যার ভারে একেবারে জর্জরিত হয়ে আছে, দীপংকর একলা ভেবে তার কতটুকু প্রতিকার করতে পারবে।

অফিসে বেরোবার সময় দীপংকর ফোঁটাকে দেখতে পেয়ে বললে—আমি অফিসে চললুম, তোমরা একটু খোঁজ নিও, জানো—

ফোঁটা বললে—তোর কিছু ভাবনা নেই দীপু, আমরা দু'ভাই খুঁজে বার করবোই—তুই নিশ্চিন্তে আপিসে যা—

দীপংকর বললে—মা'কে তো বলে বলেও মুখে একটু জল দেওয়াতে পারলুম না, মা সকাল থেকে কিছু খেলে না পর্যন্ত—এখন বিন্তীদিকে যদি না-পাওয়া যায় তো কী যে হবে বুঝতে পারছি না—

ফোঁটা বললে—সে কি, দিদি কিছু খায়নি? কেন? না খেলে কি সে ফিরবে? তা তুই কিছু ভাবিস নে, তুই অফিসে যা, আমি দিদিকে গিয়ে সব বুঝিয়ে বলছি—

দীপংকর তারপর অফিসে চলে এসেছিল। অফিসেও অনেক দায়িত্ব বেড়ে গিয়েছিল। প্রমোশন হলেই হয় না। হাতে কলমে কাজ করতে হোক আর না-হোক, দায়িত্বটা বেড়েছে। যারা একদিন দীপংকরের সঙ্গে পাশাপাশি বসে কাজ করেছে, তারাও আজ সসম্ভ্রমে সমীহ করে কথা বলে। যে জাপান-ট্র্যাফিক এতদিন এত জরুরী ব্যাপার ছিল তা নিয়ে আর কেউ-ই মাথা ঘামায় না। রবিনসন্ সাহেব এখন অন্য জিনিসে মাথা ঘামাচ্ছে। কখনও খেয়াল হলো তো একবার ফাইলটা এনে দেখে। দিল্লী থেকে জরুরী চিঠি না এলে আর তা নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্য করে না।

দীপংকরের নতুন চাপরাশি লোকটা ভালো। দীপংকর অফিসে যাবার আগেই ঘরের চেয়ার টেবিল পরিষ্কার করে রাখে মেদিনীপুরে দেশ মধুর।

দীপংকর ডাকে—মধু—

মধু তড়াক করে ভেতরে ঢুকে বলে—আমাকে ডাকছিলেন হুজুর—

—রবিনসন সাহেব আমাকে ডাকেনি?

—না হুজুর!

সবে ধন ওই এক কর্তা! কবে কখন এসে পড়ে সাহেব তার বাঁধা ধরা নিয়ম-কানুন নেই। খেয়াল হলো তো ভোরবেলাই কুকুর নিয়ে এসে হাজির। আবার এক-

আপনি আস্থা রাখতে পারেন ফিলিপস্-এর

প্রায় দুশো ফিলিপস্ রেডিও ডিলার সারা দেশে ছড়িয়ে রয়েছেন। তাঁরা আপনাকে সাহায্য করতে এবং আপনার প্রয়োজন মত কাজে লাগতে সব সময়ে প্রস্তুত।

প্রত্যেক ফিলিপস্ রেডিও ডিলার রেডিও সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। তিনি আপনাকে ঠিকমত পরামর্শ দেবেন এবং তাঁর কাছ থেকে আপনি মনোমত কাজ পাবেন। নানা রকমের মনোরম রেডিও সেট্ সানন্দে তিনি আপনাকে দেখাবেন। আপনার উপযোগী পছন্দসই রেডিও সেটটি বেছে নিতেও এবং সেটাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে তিনি আপনাকে সাহায্য করবেন।

ফিলিপস্-এর বৈশিষ্ট্য

* তৈরীর সময়ে প্রতি পর্য্যায়ে গুণাগুণ পরীক্ষা
* বিভিন্ন দামের রকমারি রেডিও সেট্
* যেখানেই কেনা হোক, যে কোন জায়গায় মেরামত করার সুবিধা
* সারা দেশ জুড়ে রেডিও বিক্রয়ের সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা।

PHILIPS

ফিলিপস্ নভোসোনিক রেডিও

ধ্বনির জগতে যুগান্ত

ফিলিপস্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

একদিন দশটা বেজে গেলেও সাহেবের দেখা নেই। দোতলা থেকে এজেন্টের খাশ-চাপরাশি বার-বার এসে রবিনসন সাহেবের খোঁজ করে গেছে। দ্বিজপদ সকাল থেকেই দরজা আগলে বসে আছে। কিন্তু সাহেবের দেখা নেই। দ্বিজপদ জানে কেন সাহেবের দেরি হচ্ছে। কুকুরের অসুখ। কুকুরের একটা কিছু অসুখ হলেই সাহেবের সব কিছু গোলমাল হয়ে যায়। ডাক্তারের কাছে ফোন্ করে। মাঝে মাঝে বাজারে কুকুরের বিস্কুট না-পাওয়া গেলেই সাহেব ক্ষেপে যায়।

বলে—ডু ইউ নো সেন, বাজারে বিস্কিট্ পাওয়া যাচ্ছে না—

দীপঙ্কর তো অবাক হয়ে যায়। বলে—পাওয়া যাচ্ছে স্যার—প্লেন্টি পাওয়া যাচ্ছে—

সাহেব বলে—অল্ রাইট্, তুমি এখনি বলো কোন্ দোকানে পাওয়া যাচ্ছে, আমি চাপরাশি পাঠাচ্ছি—

শেষকালে দ্বিজপদ বলে—না হুজুর, আমি চারদিন ধরে কলকাতার সব দোকানে খুঁজেছি, সে-বিস্কুট নয়—কুকুরের খাওয়ার বিস্কুট—

শেষে যখন কোথাও পাওয়া যায় না, তখন ডাক পড়ে মিস্ মাইকেলের। শর্ট-হ্যান্ড্ নোট নিতে হবে। লেখো চিঠি লন্ডনে। বিস্কিট-ম্যানুফ্যাক্চারার্স—লন্ডন। ফেমাস কোম্পানি সমস্ত। সেইখানে চিঠি লিখতে হয় রেলওয়ের কাগজে, রেলওয়ের কালিতে আর রেলওয়ের খরচে। সাতদিন ধরে সারা পৃথিবীর বিস্কুট-কোম্পানিদের চিঠি লিখতে লিখতে মিস্ মাইকেলের হাত ব্যথা হয়ে যায়। হাত টন্ টন্ করে। তখন রেল-ওয়ের কাজের কথা আর মাথায় ঢোকে না সাহেবের। কেউ মোটা ফাইল নিয়ে ঘরে ঢুকলে সাহেব বিরক্ত হয়। বলে—নো নো নট্ টো-ডে, মাই ডগ্ ইজ সিক্ নাউ—

তা সিক্ হলে কী হবে, সেই কুকুরই আবার অফিসে আসে। এসে টেবিলের ওপর উঠে বসে থাকে। আর সাহেব তার সঙ্গে কানে কানে কী সব বিড় বিড় করে কথা বলে। সে-কথা আর কেউ বুঝতে পারে না। দ্বিজপদ দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখে আর অবাক হয়ে যায়। হেসে ফেলে।

জার্নাল সেকশানের কে-জি-দাশবাবু দেখা হলে ঘাড় নিচু করে সসম্ভ্রমে হাত তুলে নমস্কার করে। কিন্তু সেকশানে গিয়ে বলে—কাজ করবো কী গাঙ্গুলীবাবু, কাজ করতে আর মন চায় না—

গাঙ্গুলীবাবু বলে—কেন বড়বাবু?

কে-জি-দাশবাবু বলে—আরে, সেদিনের ছোকরা, যাকে হাতে ধরে কাজ শেখালুম, তাকেই আবার গুড্-মর্নিং করতে হয়, মান-অপমান কিছু আর রইল না—

কথাটা গাঙ্গুলীবাবুই আবার দীপঙ্করের কানে তোলে। বলে—দেখুন সেনবাবু, আপনার প্রমোশন হয়েছে বলে বড়বাবুর হিংসেটা দেখুন—

দীপঙ্কর বলে—তা হোক গাঙ্গুলীবাবু, ওটা আমি হলে আমারও হতো, আমারও হিংসে হতো—

তারপর একটু থেমে দীপঙ্কর বলে—আমি জানি কে কী বলে আমার সম্বন্ধে।

গাঙ্গুলীবাবু বলে—সব কি আর আপনার কানে যায় সেনবাবু? সব কানে যায় না। আপনি যে এই সাদাসিধে কোটপ্যান্ট্ পরে আসেন তাতেও আপনার নিন্দে হয়—

—কেন, নিন্দে হয় কেন?

গাঙ্গুলীবাবু বললে—বলে ও-ও আপনার একটা চাল! অহঙ্কারটা ঢাকবার ও-ও একটা ছল্ আর কি! লোকে বলে আপনি রবিন-সন্ সাহেবের কুকুরকে বিস্কুট কিনে দেন টিন্-টিন্—তাইতেই আপনার প্রমোশন হয়েছে—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু আপনি তো জানেন গাঙ্গুলীবাবু, আমি কত গরীব। আপনাকে আমি সব তো বলেছি। আমার মা পরের বাড়িতে রান্না করে আমাকে মানুষ করেছে। আমার অজান্তে আমার মা নিবারণবাবুকে তেত্রিশ টাকা ঘুষ দিয়ে আমার চাকরি করিয়ে দিয়েছিল—তা-ও তো আপনাকে বলেছি! তা আমি কীসের অহঙ্কার করতে যাবো বলুন? আর অভাবের কথা যদি বলেন তো অভাব আমি যা দেখেছি তা আপনারাও দেখেন নি! আমি কিনতে যাবো সাহেবের বিস্কুট! আর রবিনসন্ সাহেব তাই নেবে?

সত্যিই, দীপঙ্করের মনে হতো এই চাকরি, এই প্রমোশন, এই ফরসা জামা-কাপড়ও যেন তাকে আজ লজ্জা দেয়। এই চাপরাশির সেলাম—এ-ও যেন তার পাওনার অতিরিক্ত। গেটে ঢোকবার মুখে দরোয়ান আজকাল তাকে সেলাম করে। কে-জি-দাশবাবু, রামলিঙ্গমবাবু, সবাই কেমন অন্যরকম চোখে চেয়ে দেখে। কোথায় যেন একটা সম্পর্কের বাধা-নিষেধ এসে দীপঙ্করকে সকলের থেকে আলাদা করে দিয়েছে। মাইনে বেড়েছে তার নিঃসন্দেহে। এখন আর মাইনে নেবার জন্যে পে-ক্লার্কের সামনে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াতে হয় না। এখন পে-ক্লার্ক নিজেই এসে তার হাতে মাইনে দিয়ে সই করিয়ে নেয়। এ-ও যেন ভালো লাগে না। পদ-মর্যাদা হয়েছে বলে সে কি দূর হয়ে যাবে? সে কি পর হয়ে যাবে? এক-একদিন নিজেই সেকশানে যায়। যেতেই সবাই যেন চকিত হয়ে ওঠে। কেউ-কেউ মুড়ি খেতে খেতে মুড়ির ঠোঙাটা লুকিয়ে ফেলে। যারা অফিসের

শ্রীজওহরলাল নেহরুর

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

বিশ্ব-বিশ্রুত "GLIMPSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। এ শুধু সন-তারিখ-সমন্বিত ইতিহাস নয়—ইতিহাস নিয়ে সরস সাহিত্য। গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পটভূমিকায় গৃহীত মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন যুগের চিত্রাবলী নিয়ে লিখিত একখানা শাশ্বত গ্রন্থ। জে. এফ. হোরাবিন-অঙ্কিত ৫০খানা মানচিত্র সহ। প্রায় হাজার পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ।

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৫·০০ টাকা

শ্রীজওহরলাল নেহরুর
আত্ম-চরিত ১০·০০ টাকা

শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারীর
ভারতকথা ৮·০০ টাকা

প্রফুল্লকুমার সরকারের
জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ২·৫০ টাকা

অনাগত (উপন্যাস) ২·০০ টাকা

ভ্রষ্টলগ্ন (উপন্যাস) ২·৫০ টাকা

অ্যালান ক্যাম্বেল জনসনের
ভারতে মাউণ্টব্যাটেন ৭·৫০ টাকা

আর জে মিনির
চার্লস চ্যাপলিন ৫·০০ টাকা

শ্রীসরলাবালা সরকারের
অর্ঘ্য (কবিতা-সঞ্চয়ন ৩·০০ টাকা

ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর
আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে ২·৫০ টাকা

ত্রৈলোক্য মহারাজের
গীতায় স্বরাজ ৩·০০ টাকা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ। ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

[illegible] খবরের কাগজ পড়ে, তারা হঠাৎ ধরা পড়ে গিয়ে কাগজটা লুকিয়ে মুখটা নিচু করে বসে থাকে। তবু কিছু বলে না দীপংকর। কেন বলবে? মানুষ তো মেশিন নয়। সকাল দশটা থেকে মুখ বুজে কাজ করলেই কি ভাল কাজ হয়? কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটু গল্প করা ভালো বৈ-কি! একদিন দীপঙ্কর এদের মধ্যেই এইখানে বসেই কাজ করেছে। সুতরাং সেকশানে কাজ হয় কি না-হয় কিছুই জানতে বাকি নেই। তবু দীপংকরের বলতে যেন কেমন বাধে! কে-জি-দাশবাবু এসে কমপ্লেন করেন। বলেন—কেউ কাজ করে না সেকশানে, এরকম করলে আমি কী করে কাজ চালাবো বলুন—আপনি কিছু বলেন না ওদের—ওরা তাই সাহস পেয়ে গেছে—

দীপংকর বলে—ওদের নিয়েই কাজ করতে হবে কে-জি-দাশবাবু, গল্প করার মধ্যেই কাজ তুলে নিতে হবে—

কে-জি-দাশবাবুর সংগে এইসব কথা নিয়ে আলোচনা করতেও বেন দীপংকরের

দেখুন !

আপনার বসবার জায়গা বেদখল করেছে কে?

দিব্যি আরামে ব'সে কেমন সরস আলোচনা জমিয়ে তুলেছে দেখুন! চারদিকের অন্যায় আর অসাধুতার জন্য হয়ত বা খেদ প্রকাশও চলছে! চার জনের জায়গা বেদখল করে বেশ জাঁকিয়ে বসে আছে অথচ মুখ দেখে বোঝবার এতটুকুও উপায় নেই যে বিনা টিকিটের যাত্রী! জায়গার জন্য দাম দিয়েছেন আপনি; কিন্তু একটি পয়সাও না দিয়ে আপনারই প্রাপ্য জায়গা থেকে আপনাকে ওরা বঞ্চিত করছে।

বিনা টিকিটে ভ্রমণ
বন্ধ করতে
সাহায্য করুন

পূর্ব রেলওয়ে

কেমন লজ্জা হয়। এই চেয়ার, এই চেয়ারটারই এত মূল্য? এই চেয়ারটাকেই তো তারা সম্মান দেয়। তারপর অফিস থেকে বেরোলে অগণিত মানুষের ভিড়ের মধ্যে দীপংকর আবার তখন যেন নিজেকে খুঁজে পায়। আবার যেন বেঁচে ওঠে সে। আবার যেন অস্বস্তি কেটে যায়। কিন্তু এমন একদিন তো আসবে, যখন এই চেয়ার থেকে তাকে সরে যেতে হবে—একদিন বাইরের পৃথিবীর মানুষের সংগে এক সারিতে গিয়ে দাঁড়াতে হবে, তখন কোথায় থাকবে এই ভয়, এই মর্যাদা, এই সেলাম, আর এই চেয়ার। অফিসে ঢোকবার পর মুহূর্ত থেকেই যেন সারাক্ষণ তাই আড়ষ্ট হয়ে কাটে। যেন সহজ-স্বাভাবিক হওয়া যায় না। যেন এখানে সে দীপু নয়, যেন এখানে সে ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে নয়। এখানে যেন সে রাজা। নকল-রাজা। যাত্রা-থিয়েটারের মত জরি আর ভেলভেটের জামা পরা নকল রাজা। এই নকল সাজ ছেড়ে সকাল বেলাই আবার তাকে ছেঁড়া শার্ট ময়লা ধুতি পরে আত্মপ্রকাশের বাস্তব ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। যখন দিল্লির বোর্ড থেকে চিঠি আসে, যখন সেকশানের বড়বাবুরা সেন সাহেবের মতামতের জন্যে উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষা করে থাকে, তখন হাসি পায় দীপংকরের। মনে হয়, এত সহজেই এরা এত গুরুত্ব দেয় একে। এদের কাছে ধর্ম গেলেও যেন ক্ষতি নেই, মনুষ্যত্ব গেলেও যেন লোকসান নেই, চাকরিটা যেন বাঁচে সেলাম যেন বাঁচে, চেয়ার যেন টিঁকে থাকে!

মিস্ মাইকেল এক-একদিন ঢুকে পড়ে। ঢুকে দীপংকরকে দেখে অবাক হয়ে যায়।

বলে—এ কি সেন, কী ভাবছো? বাড়ি যাবে না?

মিস্ মাইকেলের সেই এক-রকম চেহারা। সেই কাঁধ-কাটা গাউন, সেই বব করা চুল, সেই রং মাখা ঠোঁট! এক-একদিন এক-এক রকম ভ্যানিটি ব্যাগ। আজকাল আর বেশি দেখা হয় না আগেকার মতন। যেদিন প্রথম ঘরটা ছেড়ে চলে এসেছিল দীপংকর, সেদিন ভারি দুঃখ করেছিল মেম-সাহেব। কিন্তু হাসিমুখেই বলেছিল—কিন্তু আমি রিয়্যালি গ্ল্যাড্ সেন, আই উইশ্ ইউ মোর সাকসেস্—

তারপর বলেছিল—আর তুমি দেখে নিও সেন, আমিও আর বেশিদিন ইণ্ডিয়ায় থাকবো না—

—কেন? কোথায় যাবে?

মিস্ মাইকেল বলেছিল — আমি ভিভিয়ানকে চিঠি লিখেছি—

—ভিভিয়ানকে? কেন?

—আমি আমেরিকায় চলে যাচ্ছি, আই শ্যাল টেক্ এ চান্স—

মিস্ মাইকেলের ধারণা, যত কষ্ট বুঝি শুধু তারই কপালে। মিস্ মাইকেল ছাড়া আর সবাই যেন সুখে আছে। বলে—কী আছে আমার জীবনে? প্রত্যেক মাসে আমাকে লোন্ করতে হয়—এভাবে আর কতদিন চালাবো বলো—

—কিন্তু আমি এত কম টাকায় কী করে চালাচ্ছি?

মিস্ মাইকেল বলে—তুমি যে ড্রিংক কর না। ড্রিংক না করলে বেঁচে থেকে লাভ কী! তুমি সিগ্রেট খাও না, ড্রিংক কর না, তোমার ভাবনা কী?

—কিন্তু তুমিও তো না করে থাকতে পারো। তাতে অনেক পয়সা বাঁচে। লোন্ করতে হয় না। হেলথ্ ভালো থাকে, কত সুবিধে!

মিস্ মাইকেল হাসে। বলে—লাইফের তুমি আর কতটুকু জানো সেন, লাইফের তুমি কিছুই তো দেখলে না! মানি ইজ্ এভরিথিং, টাকাই জীবনের সব। যদি আমার ভিভিয়ানের মত টাকা থাকতো!

আশ্চর্য! অঘোরদাদুও ঠিক এই কথাই বলতো। টাকা দিয়ে সব কেনা যায়। সব কেনা যায় টাকা দিয়ে! কিন্তু সবই যদি টাকা দিয়ে কেনা সম্ভব, তাহলে লক্ষ্মীদি কেন দাতারবাবুর মত লোককে গরীব জেনেও বিয়ে করলে। আর টাকাই যদি সব, তবে সতীই বা অত ঐশ্বর্যের মধ্যে কেন বিষের মত নীল হয়ে শুকিয়ে যায়! একদিন দীপংকর চাকরির জন্যে কত ঘোরাঘুরি করেছে। সেদিন তেত্রিশ টাকার চাকরিটা পেয়ে মনে হয়েছিল হাতে বুঝি স্বর্গ পেলে সে। কিন্তু সেই তেত্রিশ টাকাই ধাপে ধাপে বেড়ে আজ এত উঁচুতে উঠেছে। কিন্তু সেদিনকার চেয়ে সুখ কি বেশি বেড়েছে তার? শান্তি কি বেশি পেয়েছে সে! বিচার করলে বোধহয় প্রমাণ হয়ে যাবে, সেদিনই দীপংকর বেশি সুখী ছিল! সেই এক পয়সার তেলে-ভাজা খেতে খেতে কিরণের সংগে কাটানো দিনগুলোই যেন বেশি আনন্দে কেটেছে তার। সেই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন দিয়েই দীপংকর এখন ফরসা ধোপ-দুরুস্ত কাপড় জামা পরে অফিসে আসে, দশজনে সসম্ভ্রমে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। হয়ত

সমীহ করে, হয়ত বা শ্রদ্ধাও করে। হয়ত ভয়ও করে। তার কাছ থেকে কৃপা পাবার জন্যে হয়ত উন্মুখ হয়ে থাকে। তবু ভয়ে সসম্ভ্রমে হয়ত কাছে আসতে পারে না। ছোট ছোট ছেলেরা সেই আগেকার মত চাঁদা তুলতে আসে। সরস্বতী পুজোর চাঁদা। দুর্গা পুজোর চাঁদা। দীপঙ্করের সামনে এসে ভয়ে ভয়ে চাঁদার খাতাটা এগিয়ে দেয়। ঠিক যেমন দীপঙ্কর একদিন দিত। তাদের দিকে চেয়ে দীপঙ্কর কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। তারও মনে পড়ে যায়, নিজের ছেলেবেলাকার কথা। কিন্তু ওরা তো জানে না, বাইরেই শুধু বয়েস বেড়েছে দীপঙ্করের —মনে মনে তো সেই ছোটই আছে সে! এখনও কিরণের সঙ্গে দেখা হলে যেন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তেলেভাজা কিনে খেতে পারে!

দীপঙ্কর হঠাৎ জিজ্ঞেস করে—তোমরা সব কোন্ পাড়ায় থাকো খোকা?

তারা বলে—হালদার পাড়ায়—

—তা এতদূরে ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে চাঁদা চাইতে এসেছো যে?

তারা বলে—আপনার নাম শুনে এসেছি—

—আমার নাম শুনে? দীপঙ্কর অবাক হয়ে যায়! দীপঙ্কর কি এ-পাড়ায় নামজাদা লোক হয়ে গেছে নাকি?

তারা বলে—হ্যাঁ, আপনি যে রেলের মস্ত বড় অফিসার! আমরা জানি যে! আপনি অনেক টাকা মাইনে পান।

হয়ত তারা কোনও খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে কথাটা বলেনি। হয়ত দীপঙ্করকে তারা সম্মান দিতেই চেয়েছিল কথাটা বলে। কিন্তু দীপঙ্করের মনে হলো তাকে যেন ছেলেরা চড় মারলে! দীপঙ্কর বেশি টাকা মাইনে পায়, এইটেই যেন তার পরিচয়! আর কিছু নয়। আর কিছু পরিচয় নেই তার! আর কোনও গুণ নেই! তাড়াতাড়ি টাকাটা দিয়েই দীপঙ্কর সোজা অফিসে চলে গেল। হঠাৎ যেন সমস্ত পৃথিবী থেকে আত্মগোপন করতে ইচ্ছে হলো তার! কিন্তু কোথায় যাবে! কোথায় গিয়ে বাঁচবে! কোথায় গিয়ে আত্মবিলোপ করবে! অফিসে যাবার আগেই, বাড়ি থেকে বেরোবার সময়ই মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে যায় রোজ! আবার সেই ঘরটাতে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বসতে হবে। সেই ফাইল, সেই মধু দরজাটা খুলে দিয়ে সবিনয়ে সেলাম করবে। আবার সেই দিল্লির বোর্ডের চিঠি, সেই রবিনসন্ সাহেবের কুকুরের প্রসঙ্গ, সেই মিস্টার ঘোষাল। সমস্ত দিনটা পুরোন ফাইলের চিঠির তলায় তলিয়ে যেতে হবে। তারপর যখন মুখ তুলে চাইবে, যখন জ্ঞান ফিরবে, তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দিনের পর দিন। সম্মান যেন মাইনে দিয়ে বিচার হবে সেখানে, মানুষের মূল্য যাচাই হবে টাকা আনা পাই দিয়ে।

তবু কাজ করতে হয়। যেতেও হয় রোজ। এক-একদিন রবিনসন্ সাহেব ডেকে পাঠায়। দ্বিজপদ এসে ডেকে নিয়ে যায়। ঘরে গিয়ে দেখে সাহেবের ঘরে হুলস্থূল কাণ্ড বেঁধে গেছে। মিস্টার ঘোষাল আছে। আরো কত লোক দাঁড়িয়ে আছে তার ঠিক নেই। সাহেবের কুকুর জিমিও আছে।

—লুক হিয়ার সেন,

দীপঙ্কর ঘরে ঢুকতেই রবিনসন সাহেব বললে—লুক হিয়ার, এই দেখ, এই চিঠিখানা বোর্ড থেকে এসেছে সাত তারিখে, অন্ সেভেনথ্ অব দিস্ মন্থ—রেকর্ড সেকশানে এসে তিনদিন পড়ে ছিল—সী—

দীপঙ্কর দেখলে। সত্যিই তারিখ স্ট্যাম্প সব লাগানো হয়েছে তিনদিন পরে। সেখান থেকে ট্র্যানজিট্ সেকশানে এসেছে পনেরো দিন পরে। সেখানে দু'দিন আটকে ছিল। সেখান থেকে রবিনসন্ সাহেবের কাছে আসতে লেগেছে আরো তিনদিন!

রবিনসন্ সাহেব বললে—কী ভাবে তোমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলছে—দেখ, দেখবার জন্যেই তোমাদের ডেকেছি—ঘোষাল, হ্যাভ্ ইউ সীন? তুমি দেখেছ?

মিস্টার ঘোষাল বললে—দেখেছি—

তারপর দীপঙ্করের দিকে চেয়ে বললে—দেখেছ সেন?

দীপঙ্কর মাথা নাড়লে।

রবিনসন্ সাহেব বললে—এখন বলো হোয়াট্ টু ডু? আমি কী করবো?

মিস্টার ঘোষাল বললে—স্যার, আপনি আমার হাতে ছেড়ে দিন কেস্‌টা, আমি ডীল করবো—

—কী করে?

মিস্টার ঘোষাল বললে—আই শ্যাল পানিশ দি কালপ্রিটস্—

—নো—

রবিনসন্ সাহেব বললে—তুমি সাউথ্ ইণ্ডিয়ান, তুমি গুড্-নেচার্ড লোক, তোমার দ্বারা হবে না—আমি সকলকে শাস্তি দিতে চাই, এমন শাস্তি দিতে চাই যাতে কেউ ভুলে না যায় লাইফে—

সকলের সামনে ঘোষালকে সাউথ-ইণ্ডিয়ান বলাতে সকলে অবাক হয়ে চাইলে এ-ওর মুখের দিকে। কিন্তু মিস্টার ঘোষাল গম্ভীর হয়ে রইল।

রবিনসন্ সাহেব বললে—সেন, আমি তোমাকে দিচ্ছি, ইউ মাস্ট্ পানিশ দেম্—আই লিভ্ ইট্ টু ইউ—

এমনি করেই অফিসের কাজ চলে। একটা চিঠি এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যেতে চোদ্দ দিন লাগে। একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে সারা অফিসে হৈ-চৈ পড়ে যায়। কে দোষী, কে গিল্টী তাই খুঁজতেই সব কাজ ফেলে রাখতে হয়। আসল কাজের কাজ কিছু হয় না। বোর্ড থেকে একটা চিঠি এলে তাই নিয়ে সবাই হুলস্থুলে কাণ্ড বাধিয়ে দেয়। কিন্তু সমাধান কেউ করে না। এমনি করেই চিরদিন অফিসের কাজ চলে আসছে, এমনি করেই হয়ত চিরদিন চলবে। দীপঙ্কর অনেক চেষ্টা করেও কাজের কোনও উন্নতি করতে পারেনি। দীপঙ্কর বুঝেছিল, দোষ আসলে ক্লার্কদের নয়, দোষ যদি কোথাও থাকে তো সে ওপর-তলায়। ওপর-তলার কর্তাদের সাত খুন মাপ। ওপর-তলার কর্তাদের জবাবদিহি করতে হয় না। তারা দরকার হলে ময়দানে খেলা দেখতে যায়, অফিসের চাপরাশি নিয়ে বাড়িতে বাটনা বাটায়, রান্না করায়। সেখানে কারোর কিছু বলার এক্তিয়ার নেই। কিন্তু জানে সবাই। দেখে সবাই। দেখে জেনেও কিছু বলবার উপায় নেই, বলবার অধিকারও নেই। পুওর ক্লার্ক যে ওরা!

সবাইকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে এল দীপঙ্কর। রেকর্ড সেকশান, ডেসপ্যাচ্ সেকশান, ট্র্যাফিক অফিসের সবাইকে ডেকে নিজের ঘরে আনলে দীপঙ্কর। সবাই দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে আসামীর মত তার দিকে মুখ করে।

দীপঙ্কর বলতে লাগলো—এমন কাজ কেন করেন আপনারা যাতে অন্য লোকের কাছে জবাবদিহি করতে হয়? নিজের কাজটুকুর মধ্যে কেন ফাঁকি দেন আপনারা? কেন ধরা পড়বেন? ভুল সকলেরই হয়, ভুল করাই মানুষের নিয়ম, কিন্তু ফাঁকি কেন দেবেন সেটা আমি বুঝতে পারি না।

কথাগুলো বলে দীপঙ্কর সকলের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলে।

তারপর আবার বলতে লাগলো—আপনারা সরকারী অফিসে কাজ করছেন, তাই চাকরির মূল্যটুকু বুঝতে পারছেন না—আজ মার্চেণ্ট অফিসের ভেতরে গিয়ে দেখে আসুন তো, দেখবেন সেখানে নিখুঁতভাবে কাজ হয়ে চলেছে। ভুল সব জায়গাতেই আছে, সেখানেও আছে, কিন্তু সেখানেও মানুষ কাজ করে, মেশিন নয় তারা—কিন্তু এখানকার মত এত ফাঁকি সেখানে চলে না—কারণ সেখানে শাস্তির ভয় আছে, সেখানে ফাইন হয়—

কথাগুলো বলতে বলতে দীপঙ্করের যেন কেমন অকারণ ভয় হতে লাগলো। হয়ত এখনি কেউ প্রতিবাদ করবে। হয়ত প্রতিবাদে কেউ বলবে—ফাঁকি শুধু আমরাই দিই না স্যার, ফাঁকি অফিসাররাও দেন, কই তাদের তো এমন করে জবাবদিহি করতে হয় না?

হয়ত কেউ বলবে—স্যার, আমরা পাঁচ মিনিট দেরি করে এলে আমাদের নামে ক্রস্ পড়ে যায়, আর সেদিন যে ক্রফোর্ড সাহেব দেরি করে অফিসে এলেন? তার বেলায়? অফিসাররাও তো দেরি করে আসেন। তাঁদের নিজের গাড়ি থাকতেও কেন তাঁদের দেরি হয়? তাঁরা যে খেলার মাঠে গিয়ে ক্রিকেট খেলা দেখেন নিশ্চিন্তে, আর এসে বলেন গার্ডেন রীচে ডিস্‌কাশান্ করতে গিয়েছিলেন ফাইল নিয়ে—, তার বেলায়? তাঁরা যে স্টেশন-ওয়াগনে করে ডিউটির নাম করে চৌরঙ্গীতে গিয়ে চুল ছেঁটে আসেন—তার বেলায়? ড্রাইভার যখন জিজ্ঞেস করে লগ্-বুকে কী লিখবো, তখন যে তাঁরা লিখিয়ে দেন,—অন টেস্ট্! তার বেলায়?

সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তবু দীপঙ্কর কথাগুলো বলতে বলতেই নিজের মধ্যে যেন ভয়ে শিঁটিয়ে উঠলো। কেন এরা এত নিরীহ, কেন এরা এত সহ্য ক'রে, কেন এরা এত বোবা! দীপঙ্কর প্রত্যেকের মুখের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলো। এখনি যদি কেউ সাহস করে বলে দেয়—স্যার আপনি যে এত কথা বলছেন আমাদের, আপনি নিজে নিবারণবাবুকে তেত্রিশ টাকা ঘুষ দিয়ে রেলে ঢোকেন নি? আপনি রবিনসন্ সাহেবের কুকুরের যখন কোথাও বিস্কুট পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন আপনি খুঁজে খুঁজে নিজের পয়সায় বিস্কুট এনে দেননি? আপনিই কি আমাদের চেয়ে বেশি অনেস্ট?

হঠাৎ ভয়ে একটা আর্তনাদ করে উঠতে

গিয়ে দীপঙ্কর নিজের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিলে। কেউ জানতে পারলে না দীপঙ্করের মনের ভেতরকার কথাগুলো। কেমন নিরীহ অপরাধীর মত সব দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে মুখ করে। এদের প্রত্যেকের সংসারে অভাব আছে, দুঃখ আছে। এদের বোনের বিয়ের পাত্র খুঁজতে খুঁজতে এরা হয়রান হয়ে যায়। এরা বৌ-এর অসুখের সময় পাড়ায় শেতলাতলার চরণামৃত খাইয়ে ডাক্তার-ওষুধের খরচ বাঁচায়। একটা কাপড় আর একটা শার্ট পরে সারা সপ্তাহ চালিয়ে এরা সমাজে ভদ্রতা বজায় রাখবার চেষ্টা করে। দীপঙ্কর সেন তো এদেরই সমগোত্রীয়। এদেরই দলে তো দীপঙ্কর। আজ এরা আসামী আর দীপঙ্কর এদেরই বিচারক হয়ে গদি-আঁটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বসে মাতব্বরি করছে। আজ ঘটনাচক্রে এদের বিচারের ভার তো দীপঙ্করের হাতে পড়েছে, কিন্তু দীপঙ্করের বিচার কে করবে? কবে করবে?

—আপনারা অফিসে এসে কতক্ষণ খবরের কাগজ পড়েন, আর কতক্ষণ অফিসের কাজ করেন তা আমি জানি, তারপর কতক্ষণ টিফিন-রুমে গিয়ে কাটান তা-ও জানি। অথচ পাঁচটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি যাবার বেলায় আপনারা এক সেকেন্ডও দেরি করেন না! কিন্তু এ ফাঁকি আপনারা কাকে দিচ্ছেন, ভেবে দেখেছেন কি? এখন যদি প্রত্যেককে আমি পাঁচ টাকা করে ফাইন করি?

দীপঙ্করের মনে হলো তার নিজের পিঠেই যেন সপাং করে কেউ চাবুক মারলো! এ কী বলছে সে? এ কাকে বলছে সমস্ত কথা? দীপঙ্কর কি নিজেকেও ভুলে গেছে এই গদি-আঁটা চেয়ারটায় বসে? দীপঙ্করও তো ওদেরই মতন একজন রাস্তার লোক। ফরসা জামা-কাপড় পরে এই চেয়ারে বসেছে বলেই কি তার সাত খুন মাপ হয়ে গেছে? কিন্তু আশ্চর্য, আশ্চর্য হয়ে গেল দীপঙ্কর লোকগুলোর মুখের দিকে চেয়ে। কারো দু'দিন দাড়ি কামানো হয়নি, কারো চশমার একটা ডাণ্ডি ভাঙা, কারো জামার নীচে ছেঁড়া গেঞ্জি দেখা যাচ্ছে। এদের কাছে চাকরির যে তাগা-তাবিজ। চাকরি যে এদের স্লেভ বানিয়ে ছেড়েছে। এরা কি স্পষ্ট কথা বলতে পারে, এরা কি সত্য কথা বলতে পারে? এরা কি আর মানুষ আছে আজ? এরা যে ক্লার্ক! দীপঙ্করের একটু সাহস হলো তখন। এরা জানেও না যে, এরা ইচ্ছে করলেই দীপঙ্করকে এখান থেকে এক নিমিষে সরিয়ে দিতে পারে। শুধু দীপঙ্করকে নয়, এই রবিনসন্ সাহেব, এই এজেন্ট, এই দিল্লির রেলওয়ে বোর্ডকেও এরা উৎখাত করতে পারে! অথচ এরা খবর রাখে না। খবর রাখবার সময়ই পায় না। সকাল থেকে এরা বাজার-হাট-সংসার-সন্তান-চাকরি-স্বাস্থ্য-উকীল-ডাক্তার নিয়েই ব্যস্ত। কখন খবর রাখবে! জানে না তাদের মতই ছেঁড়া শার্ট পরা একজন লোক উনিশ শো আঠারো সালে একদিন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোকের মুক্তি দিয়েছে—। সেও যুদ্ধের শেষের দিকে। সে বলেছিল—

"Comrades, labouring people, you are now the states supreme power. The revolution has put meaning into life for us just as it will for millions around the world, who now see no meaning in their eight-hour labour in some one elses factory, at monotonous toil at someone else's machines. We would free man from his enslavement by man."

দীপঙ্কর যেন বুক ফুলিয়ে চাইলে তাদের দিকে। এরা সে-খবর জানে না তাই রক্ষে। নইলে এতক্ষণে দীপঙ্করকে এরা পাল্টা প্রশ্ন করতো! প্রশ্ন করতো—কেন রবিনসন্ সাহেবের এত মাইনে আর কেনই বা তাদের মাইনে এত কম! প্রশ্ন করতো—কেন তাদের ছেলে-মেয়েরা পেট ভরে খেতে পায় না, অথচ রবিনসন্ সাহেবের কুকুরের কেন বিস্কুট খেয়ে খেয়ে জিভে অরুচি ধরে গেছে। প্রশ্ন করতো—কেন সেন সাহেবের চেয়ারে গদি আঁটা আর তাদের চেয়ারে কেনই বা ছারপোকার বাসা। প্রশ্ন করতো—কেন তাদের গাফিলতির জন্যে কৈফিয়ৎ তলব করা হয়, আর ক্রফোর্ড সাহেবের দেরি করে আসার ঘটনা কেনই বা চোখ বুজে সহ্য করা হয়!

দীপঙ্কর বাঁচলো যেন। ভালোই হয়েছে। ভালোই হয়েছে এরা সে প্রশ্ন করে না। এরা তো কিরণ নয়! এরা তো কিরণের মত সর্বস্ব জলাঞ্জলি দেবার দীক্ষা পায়নি। দীপঙ্কর নিজেকে আবার কঠোর করে তুললে। এরা জানে না, দীপঙ্করও একদিন ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় লাইব্রেরীর জন্যে চাঁদা চেয়ে চেয়ে বেড়িয়েছে। জানে না তাই বেঁচে গেল আজ। আর জানলেই বা কী হতো। দীপঙ্কর তো একলা নয়। দীপঙ্করের পেছনে মিস্টার ঘোষাল আছে, রবিনসন্ সাহেব আছে, এজেন্ট আছে, বোর্ড আছে, লেজিস্লেটিভ্ কাউন্সিল আছে। দীপঙ্করের পেছনে সমস্ত ব্রিটিশ গভর্নমেন্টই তো আছে।

—এখন যদি আপনাদের সকলকে পাঁচ টাকা করে ফাইন করি, কী করবেন আপনারা?

আশ্চর্য, লোকগুলো গরু-ভেড়ার মত চোখ পিট্ পিট্ করে চাইতে লাগলো দীপঙ্করের দিকে। যেন হাত-জোড় করে তারা তার কাছে ক্ষমা চাইছে! আশ্চর্য,

বদহজম?

তা'হলে এই সাধারণ পরীক্ষাটি করুন—

পেটব্যথা, গা বমিবমি অথবা পেটফাঁপা—অম্লাধিক্যের এই অস্বস্তিকর লক্ষণগুলি দেখা দেবার সাথে সাথেই ম্যাক্লীন ব্র্যাণ্ড ইনডিজেশন পাউডারের একটি মাত্রা খেয়ে নেবেন। "ম্যাক্লীন কার্বোনেটস্" এবং "এ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড" এর সমন্বয়ে প্রস্তুত এই অপূর্ব ঔষধটি আপনাকে অবিলম্বে দীর্ঘস্থায়ী আরাম এনে দিয়ে প্রমাণ করে দেবে যে ম্যাক্লীন ব্র্যাণ্ড ইনডিজেশন পাউডার শুধু পাকস্থলী থেকে অতিরিক্ত অম্লরস দূরই করে না, সাথে সাথে এর পুনর্গঠন প্রতিরোধ করে।

ম্যাক্লীন ব্র্যাণ্ড
ইনডিজেশন পাউডার

আসল জিনিষের জন্য এই—
Alex C. Maclean সই দেখে নেবেন।

বিদ্রোহ না করে, তারা ক্ষমা চাইছে! এরা আবার মানুষ!

দীপঙ্কর আর সহ্য করতে পারলে না। তার নিজের কড়া কথাগুলো নিজের কানেই যেন ভণ্ডামির মত শোনালো। এত নীচ, এত হীন এত জঘন্য কাজ করবার ভার দিয়েছে তাকে রবিনসন্ সাহেব! এ সে কাদের শাস্তি দিচ্ছে, কাদের পানিশ্‌মেণ্ট দিচ্ছে। দীপংকরকে শাস্তি দেবার কি কেউ নেই! এত বড়-বড় অন্যায়ের পরও তো সে ফরসা-জামা-কাপড় পরে অফিসে এসে বসছে। তাকে সবাই সম্মান করছে, খাতির করছে! তাকে তো কেউ জেলে দিচ্ছে না! এত বড় ভণ্ড হয়েও তো সে সমাজে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে! দীপংকরকে তো কেউ সন্দেহ করছে না। সে তো সকলের চোখে সাধু, সৎ, সভ্য মানুষ!

—যান্, এমন করে আর ফাঁকি দেবেন না! যান্—

সবাই চলে গেল আস্তে আস্তে! কৃতজ্ঞতায় তাদের চোখগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো যাবার সময়। তারা বাইরে এসে নিশ্চিন্তে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে।

একজন বললে—সত্যি, সেন সাহেব কী চমৎকার লোক—দেবতার মতন—

খানিকটা যেন আন্দাজ করতে পারলে দীপংকর। অস্বস্তিতে উস্‌খুশ্ করতে লাগলো মনটা। এত বড় মিথ্যে যেন সংসারে নেই আর। এত বড় ঠক্ যেন পৃথিবীতে আর নেই। ঘৃণায় লজ্জায় মাথাটা নিচু করে ফাইলের কাগজের মধ্যে ডুবিয়ে দিলে নিজেকে। ওরা তো জানে না, দীপঙ্কর সারা জীবন ভণ্ডামি করেছে! কিরণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, লক্ষ্মীদির কাছে ভালোমানুষির অভিনয় করেছে, সতীর সঙ্গেও ছলনা করেছে। আসলে দীপঙ্কর বুঝি ভদ্রলোক হতেই চেয়েছে কেবল, অথচ তারা কেউই তার ভেতরটা তো দেখতে পায়নি! দেখতে না পেয়ে ভালোই হয়েছে। তার চাকরিতে প্রমোশন হয়েছে। সবাই তার প্রশংসা করেছে। সকলের চোখে সে নিজেকে মহৎ প্রমাণ করেছে। অথচ তারা তো জানে না আসলে সে-ও তাদেরই মতন। লক্ষ্মীদির সঙ্গ তার ভাল লাগে, সতীর সান্নিধ্য সে কামনা করে। কিরণের মা'কে যে সে পাঁচ টাকা করে মাসে মাসে দেয়, সে তো তার মহানুভবতা নয়, সে তো তার অহঙ্কার: আর সত্যি কথা বলা? সেও তো আর এক ছল। মিথ্যে কথা বলবার ক্ষমতা তার আছে নাকি? মিথ্যে কথা বলতে পারা, ছিটে-ফোঁটার মত সংসার-সমাজকে অস্বীকার করা—ও-সব কি অত সহজ?

মিস্টার ঘোষাল হঠাৎ ঘরে এল। মুখে চুরোট। জুতোর আওয়াজেই বুঝেছিল দীপংকর যে ঘোষাল সাহেব আসছে। ঘরের ভেতরে এসেই একটা পা চেয়ারে [illegible] দিয়ে কায়দা করে বেঁকে দাঁড়ালো। বললে—কী করলে সেন? হাউ ডিড্ ইউ ডীল উইথ্ দেম্?

হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়লো। পাঁচটা বেজে গেছে! ইস্, সারাদিনটা এই সব বাজে কাজে কাটলো। অফিসের আসল কাজ কিছুই হয়নি। একগাদা ফাইল জমে গেছে। একটু পরেই সন্ধ্যে হবে। তারপর? তারপর সতীর ওখানে যাবার কথা আছে! সতী কেন যে আবার তাকে যেতে বললে কে জানে! কী অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যেই যে ফেলেছিল কাল সতী! পান দিলে, গাড়ি দিলে! এত খাতির কেন তাকে কে জানে!

মিস্টার ঘোষাল বললে—ফাইন করে দিয়েছ তো সবাইকে?

দীপংকর বললে—না—

—হোয়াই? তুমি ফাইন করোনি?

ঘোষাল সাহেব যেন আকাশ থেকে পড়লো! তোমাকে দিয়ে দেখছি অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশনের কাজ কিছুই চলবে না। মিঃ ঘোষাল চুরুটটা মুখ থেকে বার করে ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়লো!

বললে—হোয়াট্ ডু ইউ মীন?

দীপংকর বললে—বড় গরীব লোক ওরা মিস্টার ঘোষাল, আমি ওদের জানি, আমি ওদেরই মতন একজন ছিলাম, আমিও ওদের মতন একদিন গরীব ছিলাম। আমার মা পরের বাড়িতে এই সেদিন পর্যন্তও রান্না করে আমাকে মানুষ করেছে—আই নো দেম্ পারফেক্টলি ওয়েল্, দে আর হেলফ্‌লেস্ ক্রিচার্স—

—কিন্তু এখন তো তুমি আর পুয়োর নও, এখন তো তুমি ওদের বস্—

দীপংকর বললে—কিন্তু ওদের দেখে আমার নিজের অবস্থার কথা মনে পড়ে গেল।

—তার মানে?

—তার মানে, আমিও তো অন্যায় করি, আমিও তো ফাইল ক্লিয়ার করতে ডিলে করি, আমিও তো মাঝে মাঝে দেরি করে অফিসে আসি, আমিও তো তেত্রিশ টাকা ঘুষ দিয়ে চাকরিতে ঢুকেছি—

ঘোষাল সাহেব যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল দীপঙ্করের কথা শুনে। খানিকক্ষণ যেন চুরোট টানতেই ভুলে গেল।

বললে—কিন্তু ইউ আর অ্যান্ অফিসার, তুমি এখন ওদের বস্, তুমি এখন ওদের লর্ড,—

—কিন্তু আমি নিজেও তো কালপ্রিট্ মিস্টার ঘোষাল!

—সে কি?

দীপংকর বললে—ওদের মতন আমিও কত ভুল করেছি, কত মিস্‌বিহেভ করেছি, আমার ভুলের জন্যেও তো রেলওয়ের কত হাজার-হাজার টাকার লোকসান হয়েছে—

—বাট্ কিং ক্যান্ ডু নো রং!

দীপংকর হাসলো। বললে—এখনকার দিনে এ-কথার কোনও মূল্য নেই মিস্টার ঘোষাল। দু'দিন পরে পার্লিয়ামেন্টে কিং বলেই হয়ত কোনও জিনিস থাকবে না—

ভারতের 'পতাকা মার্কা'
সরিষার তৈল
ফোন ৩৫-২৭৭৪
ব্যবহারে তফাৎটা দেখুন
ভারত অয়েল মিল

১৯৬০-৬১ সালে আপনার ভাগ্যে কি আছে?

আপনি যদি ১৯৬০-৬১ সালে আপনার ভাগ্যে কি ঘটিবে তাহা পূর্বাহ্ণে জানিতে চান, তবে একটি পোস্টকার্ডে আপনার নাম ও ঠিকানা এবং কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া পাঠাইয়া দিন। আমরা জ্যোতিষবিদ্যার প্রভাবে আপনার বার মাসের ভবিষ্যৎ লাভ-লোকসান, কি উপায়ে রোজগার হইবে, কবে চাকুরী পাইবেন, উন্নতি, স্ত্রী পুত্রের সুখ-স্বাস্থ্য, রোগ, বিদেশে ভ্রমণ, মোকদ্দমা এবং পরীক্ষায় সাফল্য, জায়গা জমি, ধন-দৌলত, লটারী ও অজ্ঞাত কারণে ধনপ্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয়ের বর্ষফল তৈয়ারী করিয়া ১৷০ টাকার জন্য ভি-পি যোগে পাঠাইয়া দিব। ডাক খরচ স্বতন্ত্র। দুষ্ট গ্রহের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উপায় বলিয়া দিব। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা জ্যোতিষবিদ্যায় কিরূপ অভিজ্ঞ। মিথ্যা প্রমাণিত হইলে আমরা মূল্য ফেরৎ দিবার গ্যারাণ্টি দিই। পণ্ডিত দেবদত্ত শাস্ত্রী, রাজ জ্যোতিষী। (DC-3) জলন্ধর সিটি।

Pt. Dev Dutt Shastri, Raj Jyotishi, (DC-3), Jullundur City.

—কিন্তু কিং না থাকুক, তার বদলে ডিক্‌টেটর আসবে, যেমন জার্মানিতে, রাশিয়ায়, ইটালীতে......

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু সে তো ট্রেড্-ডিপ্রেশনের জন্যে! ওয়ারের পর বলেই এই হচ্ছে, এ-ওয়ারের এফেক্ট, কিন্তু একদিন সাধারণ মানুষ তো মাথা তুলে দাঁড়াবে, আমাদের কাছে আমাদের অত্যাচারের তো কৈফিয়ৎ চাইবে একদিন—সেদিন যে......

হঠাৎ ঝোলানো দরজাটা খুলে গেল।

—হুজ্ দ্যাট্?

অনুমতি না নিয়ে ঘরে ঢোকা অপরাধ। দরজাটা খুলতেই দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেছে। সতী! সতী এখানে! সতী অফিসে এসে হাজির হয়েছে! ঘোষাল সাহেবও পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে অবাক হয়ে গেছে। এ বেঙ্গলী লেডী!

দীপঙ্কর অবাক হয়ে বললে—তুমি?

সতী হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকলো। আজকে একটা অন্য শাড়ি পরেছে। নীল নয়, বটল্ গ্রীনও নয়। কেমন যেন কমলা-লেবুর মত রং। মেরুন না মভ্ কে জানে! সতীকে দেখে মিস্টার ঘোষালও যেন একটু আড়ষ্ট হয়ে গেছে। মিস্টার ঘোষাল সহজে আড়ষ্ট হবার লোক নয়। কিন্তু সতীর চেহারার মধ্যে কোথায় যেন একটা স্বাতন্ত্র্য আছে! মানুষকে যেন আকর্ষণ করে। আবার দূরেও ঠেলে। সতী সোজা এসে একটা চেয়ারে বসলো। বললে—তোমার কাজের ক্ষতি করলাম বোধহয় দীপু—

সতী ততক্ষণে নিজেই একটা চেয়ারে বসে পড়েছে। যেন বড় উত্তেজিত দেখাচ্ছে তাকে। সতীকে দেখে দীপঙ্কর আরো বিব্রত হয়ে পড়লো। তা বলে একেবারে অফিসে এসে হাজির হলো শেষকালে! বিশেষ করে মিস্টার ঘোষালের সঙ্গে দেখা হওয়াটা ঠিক যেন ভাল মনে হলো না। তাছাড়া, অনেক কাজও পড়ে আছে হাতে। সারাদিন কোনও কাজই হয়নি।

—হঠাৎ আমার অফিসে এলে যে?

—কেন, আসতে নেই?

—না, তা নয়। কিন্তু চিনতে কষ্ট হয়নি তো?

সতী বললে—না, কষ্ট হবে কেন? ড্রাইভারকে ঠিকানা বলে দিয়েছিলুম, সে-ই নিয়ে এল সোজা। ভাবলাম আমাদের বাড়ি যাবার কথাটা হয়ত তোমার মনে থাকবে না, তাই একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে এলুম!

—আবার আজকে? কালই তো গিয়েছিলাম, আজকে আর না-ই বা গেলাম।

হঠাৎ দীপঙ্করের মনে পড়লো মিস্টার ঘোষালের কথা। এতক্ষণ তার উপস্থিতি যেন ভুলেই গিয়েছিল দীপঙ্কর সতীকে দেখে। মিস্টার ঘোষালের দিকে ফিরে বললে—আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই মিস্টার ঘোষাল, ইনি হচ্ছেন শ্রীমতী সতী ঘোষ, আমার বাল্যবন্ধু—আর ইনি হচ্ছেন মিস্টার ঘোষাল, আমার ওপরওয়ালা—

সাধারণত মিস্টার ঘোষাল এত সব ফর্ম্যালিটির বালাই মানতে চায় না। বিশেষ করে মহিলাদের সঙ্গে আলাপের ব্যাপারে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে হাতটা সতীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে—অত্যন্ত খুশি হলাম মিসেস ঘোষ, আমি সামান্য একজন রেলওয়ের সেবক মাত্র,—মিস্টার সেনের উপরওয়ালা হওয়াটা আমার একমাত্র গৌরব বলতে পারেন—

সতীও নিয়ম-মাফিক নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিল মিস্টার ঘোষালের দিকে। দীপঙ্কর লক্ষ্য করলে মিস্টার ঘোষাল যেন সতীর হাতটা একটু বেশি জোরেই ঝাঁকুনি দিলে। তারপর বললে—বসুন, বসুন, আপনি—

সতী বসেছিল বটে কিন্তু কথাগুলো বলেছিল দীপঙ্করের দিকে চেয়ে। বলেছিল—তুমিই তো আমাকে অফিসে আসতে বারণ করেছিলে, বলেছিলে এখানে চাকরি করলে ভদ্রতা রক্ষে হয় না, মানুষ এখানে অমানুষ হয়ে যায়—

মিস্টার ঘোষাল বললে—সেন যদি এ-কথা বলে থাকে তো কোনও অন্যায় বলেনি মিসেস ঘোষ, এতক্ষণ আমাদের এই কথাই হচ্ছিল। আপনি তো আর আমাদের ক্লার্ক-দের দেখেন নি, আসলে তারা মানুষ নয়—

—মানুষ নয়? মানুষ নয় তো কী?

—তারা সব বীস্ট্, এক-কথায় বীস্টই বলতে পারেন তাদের! তাদের চেহারা দেখলেই বুঝতে পারবেন আপনি! তাদের জামা-কাপড়, তাদের দাড়ি, তাদের চাল-চলন কিছুই মানুষের মত নয়, এত নোংরা ডার্টি থাকে সে আপনি না-দেখলে বুঝতে পারবেন না।

কথাগুলো শুনতে শুনতে দীপঙ্করের কেমন অস্বস্তি লাগছিল। কাদের গালাগালি দিচ্ছে মিস্টার ঘোষাল! মনে আছে সতী ঘরে আসার পর থেকেই সেদিন গড় গড় করে কথা বলে যাচ্ছিল ঘোষাল সাহেব। যেন অনেক দিনের পরিচয় দুজনের। অনেক দিনের আলাপ। বিলেতের গল্প, নিজের ঐশ্বর্যের গল্প! ঘোষাল সাহেব যে এত কথা বলতে পারে, সতী না থাকলে তা জানতেই পারতো না দীপঙ্কর।

হঠাৎ দ্বিজপদ ঘরে ঢুকলো। বললে—হুজুর, সাব সেলাম দিয়া—

—কাকে? আমাকে?

মিস্টার ঘোষাল উঠলো। বললে—যাবেন না মিসেস ঘোষ, আমি আসছি—

মিস্টার ঘোষাল চলে যেতেই সতী বললে—কী রকম লোকের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলে দীপু, ও যে আমায়

নতুন বই:
শ্রী যাদব-এর
ছায়া দোলে - ৫·০০
নাজমা বেগম - ৫·০০
নীলকণ্ঠের অদ্বিতীয় উপন্যাস
দ্বিতীয় প্রেম - ৫·০০
নীহার গুপ্তের রহস্য উপন্যাস
ছায়া পথ - ৪·৫০
করুণা প্রকাশনী,
১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিঃ-১২

সাধারণের বই
বরেন বসু
প্রান্তর ৪॥০
গোলাম কুদ্দুস
মরিয়ম ৪৲
ভবেশ গঙ্গোপাধ্যায়
শেষ প্রান্তর ৪॥০
মাহমুদ আহমদ
চার প্রহর ২৲
বরেন বসু
উপান্ত ৩৲
বাবুরামের বিবি—বরেন বসু — ২৲
আগন্তুক — ননী ভৌমিক — ২৲
নতুন ফৌজ (নাটক)—বরেন বসু — ১॥০
ছাউনি (নাটক)—অবনী বন্দ্যোঃ — ১॥০
সাধারণ পাবলিশার্স
৬ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট :: কলিঃ-১২

পড়ে আলাপ করতে চায়, একেবারে ছাড়তে চায় না। এমন জোরে হ্যাণ্ডসেক করেছে যে, হাতটা এখনও টন্ টন্ করছে—

দীপংকর সে-কথার কোনও জবাব না দিয়ে বললে—হঠাৎ তুমি কী করতে এলে আবার আজই?

সতী বললে—ওই যে বললাম, তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যেতে—

—কিন্তু তোমাদের ব্যাপারের মধ্যে আমি নাই-ই বা গেলাম—মিছিমিছি তোমার শাশুড়ী কী ভাবলেন আমার সম্বন্ধে, কে জানে!

সতী বললে—কী আবার ভাবলে? বাড়ি তো তার একার নয়—

—আর তোমার স্বামী সনাতনবাবুই বা কী ভাবলেন বলো তো! আমি চলে আসার পর তিনি কী বললেন?

সতী বললে—তিনিই তো আজকে নিয়ে যেতে বললেন তোমাকে। বললেন, আজকে পরিচয় হলো না, কালকে ওঁকে আবার নিয়ে এসো—চলো চলো—

—কিন্তু এত সকাল-সকাল?

—তাতে কী হয়েছে! এখন গিয়ে গল্প করবে, চা খাবে, তারপর রাত্রে একেবারে খেয়ে-দেয়ে চলে আসবে—

—কিন্তু......

দীপংকর কেমন যেন দ্বিধা করতে লাগলো। বললে—জানো সতী, আজকে বাড়িতেও একটা কাণ্ড হয়েছে—

—কী কাণ্ড?

—সেই বিন্তীদিকে ভোরবেলা থেকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মা'র এত ভাবনা হয়েছে যে, কী বলবো। এদিকে নতুন বাড়ি ভাড়া করে পাঁচ টাকা বায়না দিয়েছিলুম, সেখানেও যাওয়া হলো না! সেই তোমরা যে-বাড়িটাতে ভাড়া ছিলে, সেই বাড়িতেই মা'কে নিয়ে উঠেছি। আজ সকালে বাড়িটাতে ঢুকে সমস্তক্ষণ কেবল তোমাদের সেই পুরোন কথাগুলো মনে পড়ছিল—

—কিন্তু বিন্তী গেল কোথায়? পেয়েছ তাকে শেষ পর্যন্ত?

দীপংকর বললে—না, অফিসে আসার সময় পর্যন্ত কোনও খবর জানি না—পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে—

—কোথায় যেতে পারে?

দীপংকর বললে—নিজের ঘর ছাড়া সে কোথাও যেত না, সেইজন্যেই মা সকাল থেকে খায়নি আজ—

সতী বললে—তা'হলে আর দেরি কর না, চলো চলো শিগ্গির চলো, আমি তোমাকে সকাল-সকাল ছেড়ে দেব, শেষকালে তোমাদের ঘোষাল যা লোক। হয়ত এখুনি এসে পড়বে আবার—

দীপংকরেরও ভয় হলো। সত্যিই যদি এখুনি এসে পড়ে তো আর ছাড়তে চাইবে না হয়ত। শেষকালে তাকে এড়াবার জন্যে মুশকিলে পড়তে হবে তাদের। অথচ অসংখ্য কাজ পড়ে রয়েছে টেবিলে। অনেক ফাইল দেখা হয়নি সকাল থেকে। বাড়িতেও বিন্তীদি ফিরে এসেছে কিনা কে জানে। সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল। আবার এখন সতীদের বাড়ি যেতে হবে! নিজের সংসার, নিজের স্বামী নিয়ে সতী সুখে থাকুক, তাতে দীপংকরও সুখী হবে। কিন্তু তার জীবনের সঙ্গে দীপংকরকে কেন মিছিমিছি জড়ানো!

সতী বললে—কী ভাবছো এতো? চলো—

—কিন্তু এখনও যে বিকেল!

—তা না হয় একটু বেড়িয়ে-টেড়িয়ে তারপর বাড়ি যাবো, এখন অফিস থেকে বেরোও তো!

দীপংকর উঠলো। তারপর বললে—আমি কিন্তু কালকের মত দেরি করতে পারবো না, আমাকে একটু সকাল-সকাল ছেড়ে দিও, কেমন?

সতী বললে—তাই ছাড়বো, এখন চলো—

(ক্রমশ)

হোমিওপ্যাথিক
পারিবারিক চিকিৎসা
একমাত্র বঙ্গভাষায় মুদ্রণ সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার
উপক্রমণিকা অংশে "হোমিওপ্যাথির মূলতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক মতবাদ" এবং "হোমিওপ্যাথিক মতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি" প্রভৃতি বহু গবেষণাপূর্ণ তথ্য আলোচিত হইয়াছে। চিকিৎসা প্রকরণে যাবতীয় রোগের ইতিহাস, কারণতত্ত্ব, রোগনিরূপণ, ঔষধ নির্বাচন এবং চিকিৎসাপদ্ধতি সহজ ও সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। পরিশিষ্ট অংশে ভেষজ সম্বন্ধ তথ্য, ভেষজ-লক্ষণ-সংগ্রহ রেপার্টরী, খাদ্যের উপাদান ও খাদ্যপ্রাণ, জীবাণুতত্ত্ব বা জীবাগম রহস্য এবং মল-মূত্র-থুতু পরীক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বিংশ সংস্করণ। মূল্য—৭·৫০ নঃ পঃ মাত্র।
এম, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
ইকনমিক ফার্মেসী, ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১

বিনামূল্যে
উপহার ১৯৬১ সালের সুন্দর ক্যালেণ্ডার প্রতি
বার্নল
টিউবের সহিত
বার্নল কিনুন—কাটা, পোড়া, কীটদংশন, ক্ষত ইত্যাদি জন্য আদর্শ এ্যান্টিসেপটিক মলমরূপে বিখ্যাত বিশ বছরের উপর।

'বুটস্'
—এর একটি
গুণসম্পন্ন ঔষধ
Boots
NATIONAL BB 17

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

৫২

ম্যাস্‌পেরোর "হিস্ট্রি অব ইজিপ্ট" বই-খানা ছিল আমার কাছে, সেই বই থেকে ছবি তুলে নিয়ে প্রথমে লেগে গেলাম পোশাক-আশাক তৈরী করতে। অলংকার কিনে আনালাম ইজিপ্‌শিয়ান প্যাটার্নের আর সিল্ক, শাটিন, ভেলভেট এসব কাপড় কিনে আনলাম পোশাকের জন্য। দরজীকে বসিয়ে দিয়ে নিজেদের তদারকিতে শুরু হলো পোশাকের কাজ। বিজ্ঞাপনে 'বন্দিনী' সম্পর্কে লেখা হয়েছিল—"অপরেশচন্দ্রের নব-রসাত্মক গীতিবহুল নাটক।" আগেই বলেছি ইটালিয়ান অপেরা 'আইদা' থেকে এটা নেওয়া তার ওপরে ইজিপ্‌শিয়ান পরি-বেশের কাহিনী। নৃত্যগীত একটু বেশীই ছিল এতে। তাই. নর্তকীদের ভালো করে সাজবার জন্য কেনা হলো নানারকম জিনিস। ভিতরে—'টাইট্‌' বাইরে শিফন। কিন্তু আর এক প্রস্ত পোশাকের জন্য অন্য আর এক বস্তু। এই বস্তুটি কেমন করে সেদিন পেয়েছিলাম, তা বলি। প্রবোধবাবু আর আমি ধর্মতলায় জিনিসপত্র কিনতে গেছি ত? ফুট পাথে দেখি, পিজবোর্ডের বাক্স সাজিয়ে এক নতুন ধরনের গেঞ্জি বিক্রি করছে। খেজুর-পাতা দিয়ে বোনার মতো জিগ্‌জ্যাগ প্যাটার্নে বোনা। প্রবোধবাবুকে দেখিয়ে বললাম—ঐ বেশ হবে. কী বলেন?

পছন্দ হলো। লোকটির কাছে ও জিনিস যতগুলি ছিল সব কিনে নিলাম। বললাম—আরও দরকার হলে দিতে পারবে?

সে বললে—কেন পারবো না? আনিয়ে দেবো!

বেশ এফেক্টিভ হয়েছিল এই গেঞ্জির পোশাক। এবার সেটের কথা। সেট-এর দিক থেকে বাস্তবিকই বিরাট ব্যাপার করে তুলেছিলাম আমরা। মঞ্চ-সহায়কদের অমানুষিক পরিশ্রম ছিল তার পিছনে। কাজ করতে করতে আমাদেরও বেশ রাত হয়ে যেতো। এমন বহু রাতই হয়েছে প্রবোধবাবু আমাকে গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছেন। কিন্তু, এত উদ্যম. এত পরিশ্রমের পরে যে আত্যন্তরীণ কি নাটকেরই সৃষ্টি হবে, তা' কে জানত?

প্রথম সেট-টাই ত ছিল বিরাট। ডাইনে প্রসিনিয়াম থেকে শুরু করে অর্ধ বৃত্তাকারে মঞ্চের শেষ উইংস্‌ পর্যন্ত চলে গেছে কছুটা উঁচু করা মঞ্চ, ধাপে-ধাপে বসানো আগাগোড়া, কোথাও ছেদ নেই! এই সিঁড়িগুলির ওপরেই লোক দাঁড়াবে। সিঁড়ির ওপরে আবার বিরাট-বিরাট থাম, তেনেস্তা দেওয়া, তার ওপরের ব্রু ভ্যালস্‌-পার রঙ মাখিয়ে দিয়েছিলাম, তার ফলে এমন চকচকে হলো যে, মুখ দেখা যায়। প্রথম প্রসিনিয়ামের পরেই—স্টেজের ডানদিকে একটি ফটক মতন, সেটিও বসানো হয়েছে সিঁড়ির ওপরে। বাঁদিকে রাজসিংহাসন—এ-ও সিঁড়ির ওপরে—সেখানে বসে আছেন মিশররাজ ফারাও ও তাঁর কন্যা। সভার নারীবৃন্দ তাঁদের বেষ্টন করে আছে। সিঁড়ির ওপরে বসে সভাসদগণ উৎসব নিরীক্ষণ করছেন। সেট্‌টার আর কোনো উইংগস্‌ ছিল না, সিঁড়ি-দেওয়া মঞ্চ যেন চলে গেছে অন্তরালে—বহু দূরে! প্যাসেজে উইংগস্‌ না থাকায় সেখান থেকে বাড়্‌তি আলো ফেলা হতো সিংহাসনের ওপরে, তাতে ভারী সুন্দর দেখাতো।

এই রকম পেল্লায় সেট্‌ ছিল চারটে। রাজকুমারীর কক্ষ করা হলো. তার বিরাট সিলিং পর্যন্ত ছিল। আরেকটি ছিল মাটির নীচেকার ঘর, যেখানে সেনাপতিকে বন্দী করে—অনাহারে তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। আলোর ব্যবস্থাতেও যে-সব অভিনবত্ব-সৃষ্টির প্রয়াস করা হয়েছিল, তার পিছনেও ছিল প্রচুর অধ্যবসায়ের স্বাক্ষর। এখনকার মতো উপকরণও তখন ছিল না, ছেলেরা টিন কেটে—টিনের চোঙা তৈরী করে—তেনেস্তা দিয়ে 'মাস্ক্‌' তৈরী করে নিয়ন্ত্রিত আলোক-প্রক্ষেপণ করে—কোথাও তারা দেখাচ্ছে—কোথাও চাঁদ দেখাচ্ছে! লাইট্‌ করবার জন্য লম্বা চোঙা থেকে 'স্লিট্‌' কেটে দিতো। আলাইয়ের দোকান থেকে করে এনে দেখাচ্ছে আমাকে, আমি স্টেজে বসে আছি। আর অভিনয়ের দিক থেকে, প্রতিটি ছোট চরিত্রকে পর্যন্ত বার বার রিহার্সাল করিয়ে নেওয়া হয়েছে। ছোট একটি ভূমিকা ছিল, দূত। ঐ প্রথম দৃশ্যেই—যখন খুব উৎসব চলেছে, তখন সে একেবারে দৌড়ে এসে, সিঁড়ি দিয়ে তর তর করে নেমে একেবারে সিংহাসনের সামনে—হাঁটু গেড়ে বসে প্রথমে মাথা ঠেকিয়ে হাত দুটো তুলে অভিবাদন জানিয়ে, তারপর মুখ তুলে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠব তার কথা। দৃশ্যটি হচ্ছে, সেনাপতি যুদ্ধে জয়-লাভ করে ফিরে এসেছেন, সেই উপলক্ষ্যে উৎসব হচ্ছে, রাজা খুশী হয়ে রাজকুমারীর সঙ্গে সেনাপতির বিবাহ স্থির করেছেন। ঘোষণা করতে যাচ্ছেন সেই সংবাদ, এমন সময় দূত ঐ ভাবে এসে বলে উঠবে—সম্রাট!

সম্রা॥ কে বাধা দিলে?

ধ্রুপদী

অগ্রহায়ণ সংখ্যা
বেরিয়েছে

১৩/বি কাঁকুলিয়া রোড। কলিকাতা ১৯

★ আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

★ আকর্ষণীয় হারে ক্যাস সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

★ স্পেশাল সেভিংস ডিপোজিট একাউণ্টে বার্ষিক ২½% হারে সুদ দেওয়া হয়।

হেড অফিস
৪ ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা ১

দূত ॥ সম্রাট! সিরিয়ার রাজা জালন্দর সীমান্ত-দুর্গ আক্রমণ করেছে।

দূতের এই যে প্রবেশ, এ' একেবারে সময় বেঁধে করতে হবে, অর্থাৎ ঠিক তালে ঢুকতে হবে। যে অভিনয় করছিল, সে তখন নতুন, তরুণ যুবক, স্বাস্থ্যবান, কিন্তু অদ্ভুত তার উদ্যম। যতবার সে আসে, হাঁটুমুড়ে বসে, আর ঠিক ঐভাবে না হওয়াতেই আমি অমনি বলে উঠি—হলো না। আবার করো।

করে যাচ্ছে, হাঁটু ছড়ে যাচ্ছে, তবু একটুও বিরক্তি নেই, পরম উৎসাহে কাজ করে চলেছে। শেষকালে এক সময় "দাঁড়ান স্যার, আসছি,"—বলে আড়ালে চলে গিয়ে দেখি হাঁটুদুটোকে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে এসেছে। জিজ্ঞাসা করতেই হেসে বলল—'ছড়ে যাচ্ছে, কতক্ষণে হবে কে জানে, তাই হাঁটুতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে নিলাম।'

সেদিনকার সেই দূত হচ্ছে আজকের বিখ্যাত অভিনেতা—তুলসী চক্রবর্তী। জিম্‌ন্যাস্টিক করত, বেশ ভালো স্বাস্থ্য,

শ্রীমতী ওয়াহেদা রেহমান
গুরুদত্তের "চৌদভি কা চাঁদ" ছবিতে

রূপ যেন
তার রূপ
কথারই
রাজকন্যার
মতো...

রূপে রূপে অপরূপ! যেন রূপকথার, রূপবতী রাজকন্যা! .... এত রূপ, এত লাবণ্য সে-ওতো ওর নিজেরই চেষ্টায়। রূপসী চিত্রতারকা ওয়াহেদা রেহমান জানেন, সৌন্দর্য্যের গোপন কথা হলো ত্বকের কুসুমসম কোমলতা। 'তাইতো আমি রোজই লাক্স ব্যবহার করি। এর সরের মতো ফেনায় সত্যিই ত্বক মোলায়েম আর লাবণ্যময়ী হয়' ওয়াহেদা বলেন। আপনার সুন্দরতাও বাড়িয়ে তুলুন—নিয়মিত লাক্স ব্যবহার করে।

চিত্রতারকার সৌন্দর্য্য-সাবান
বিশুদ্ধ, শুভ্র, লাক্স

LTS.42-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী।

ক্লাবে ক্লাবে ব্যালেন্সীং দেখাতো। ওর মতো চৌখস খুব কম দেখা যায়। গান গাইতে দাও, সং সাজতে দাও, অপূর্ব করবে।

যাই হোক, আমি ত নাটকের পিছনে লেগে রয়েছি, কারণ, যেটা মনের মধ্যে অনুক্ষণ জেগে উঠছে, সে হচ্ছে—আশঙ্কা। এ আমার শুধু অভিনয়ের ব্যাপারই নয়, এ আমার পরীক্ষা বলা যেতে পারে।

বড়দিনের দৈনিক অভিনয় ত চলছেই, তার পরে চলছে এই খাটুনি। ২৫শে ডিসেম্বর প্রথম অভিনয় হলো রাত সাড়ে সাতটায়। দ্বিতীয় দিনও তাই হবে, তৃতীয় দিন—২৭ তারিখে হবে ম্যাটিনী। পর পর—বৃহস্পতি, শুক্র, শনি—তিন দিনই 'বন্দিনী' অভিনয়। বিজ্ঞাপন লেখা হলো—"Mr. Aparesh Chandra Mukherjee's new drama Bandini—New Scenary—New light arrangements under expert supervision."

ভূমিকালিপি হলোঃ— কিল্লাদার—অপরেশবাবু, অ্যামোসিস (সেনাপতি)—আমি, ফারাও—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত, মিতানী-রাজ—দুর্গাপ্রসন্ন বসু, তাবেজ (ক্রীতদাস)—পুরুষের ভূমিকা—আশ্চর্যময়ী, রাজকুমারী আরভিয়া—রাণীসুন্দরী, নাহেরেম্—নীহার, বন্দিনী—ফিরোজাবালা, পুরোহিত—ব্রজেন সরকার, দূত—তুলসী চক্রবর্তী।

অভিনয় হচ্ছে ভালো, কিন্তু মুশকিল হচ্ছিল ঐ সব পেল্লায় সেটগুলিকে নিয়ে। এক-একবার কার্টেন পড়ছে, আর সেট্ সরাতে-সরাতে হিমসিম খেয়ে যেতে হচ্ছে। আমি আর অপরেশবাবু পর্যন্ত সেট্ সরিয়েছি। প্রবোধবাবু বহু বাড়তি লোক লাগিয়েছিলেন, কিন্তু ঐ সব বড়ো-বড়ো থাম, মাটির তৈরি স্ফিংক্স্, এসব ত চট্ করে সরানোও যায় না। সিন্ খুলতে দেরি হচ্ছে। গণদেব ভিতরে এসে তাগাদা দিচ্ছে, হরিদাসবাবু এসে পড়ছেন ভিতরে, উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করছেন—কী হলো?

যাই হোক্, অভিনয় ত শেষ হয়ে গেল, কিন্তু অপরেশবাবু গেছেন চটে। সে এক নাটকীয় পরিস্থিতিই বটে! আমিই নীচে আছি, প্রবোধবাবু ওপরে উঠে গেছেন, তালটা পড়ল আমার ওপরেই বলা চলে। অপরেশবাবু ততক্ষণে গর্জাচ্ছেন, বলছেন—কেবল সিন আর সিন! আমার নাটক যে এদিকে গেল! বুড়ো বয়সে কী ঝকমারি!

তারপরে, এমনভাবে চলে গেলেন, যেন, মনে হলো, তিনি থিয়েটারে আর পা দেবেন না!

মনের যে কী অবস্থা, তা সহজেই অনুমেয়। আমাদের এত পরিশ্রম, এত উদ্যম, সব যেন মুহূর্তে বৃথা হয়ে গেল! ব্যথিত মন নিয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে গেলাম অপরেশবাবুর কাছে। দেখি, মুখ-খানা খুব গম্ভীর করে বসে আছেন, শিফ্টাররা দাঁড়িয়ে, স্টেজ ম্যানেজার মানিকও কাছে আছে। আমাদের পার্মানেন্ট্ স্টেজ-কার্পেন্টারও ছিল। দেখি, অপরেশ-বাবু ওদের সবাইকে খোরাকীর পয়সা দিয়ে দিচ্ছেন, আর বলছেন—এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এসো সবাই। আরও চার-পাঁচজন ছুতোর নিয়ে এসো। আমি বসে আছি।

মানিককে ডেকে বললেন—যাও, তুমিও যাও।

ওরা সব চলে গেল। আমি ধীরে ধীরে শুরু করলাম—বকুনিটা আমার ওপরই হলো। ওই আমার প্রথম প্রযোজনার দায়িত্ব, প্রথমটাই মার খেয়ে গেল!

প্রবোধবাবু বললেন—সব ঠিক হয়ে যাবে। ওরা ফিরে আসুক, সারারাত আজ কাজ হবে।

আমি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপরে বললাম—থাকব?

প্রবোধবাবু বললেন—না, তুমি পরিশ্রান্ত, প্লে করেছ, তুমি যাও। তবে, সকালেই চলে এসো।

ও'র কথায় কিছুক্ষণ পরেই চলে এলাম বটে, কিন্তু মনটা একেবারে দমে গেল। মনে হচ্ছিল, আজ আমার মস্ত বড় পরাজয়! কারণ, খবরের কাগজে লিখেছিল—'এবার প্রডিউসার অহীন্দ্রকুমার!'

প্রডিউসার কথাটা তখনই নাট্যজগতে নতুন চালু হয়েছে বলা যেতে পারে। এবং ও কথাটার বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'প্রযোজনা' বলে যে কথাটা হামেশাই শোনা

দি রিলিফ
২২৬, আপার সার্কুলার রোড
এক্সরে, কফ প্রভৃতি পরীক্ষা হয়
দরিদ্র রোগীদের জন্য—মাত্র ৮্ টাকা
সময়ঃ—সকাল ৯টা থেকে ১২-৩০ ও বৈকাল ৪টা থেকে ৭টা

শঙ্খ মার্কাই
শ্রেষ্ঠ চিরুণী
যশোর কুম্ব ইণ্ডাষ্ট্রী কোং
কলিকাতা-৯

KAMA KALA
SOME NOTES ON THE PHILOSOPHICAL BASIS OF HINDU EROTIC SCULPTURE
By MULK RAJ ANAND. "An important publication ... Some excellent illustrations .. a thoughtful essay"—E. M. FORSTER in *The Listener*. "Very large and finely reproduced photographs, in the main too startling for the normal library"—*Daily Telegraph*. "Wonderful, luxurious book"—*Tribune de Geneva*. "An enlightened and courageous venture"—*Encounter* .... Here is the sap of life at its epitome. Here is sheer grandeur rendered with such sincere devotion and integrity. Kama Kala is a volume of surpassing beauty" ..... *Illustrated Weekly of India*. Super Royal 4 to more 147s.—Rs 117.60 nP.
Publisher:—CHARLES SKILTON LTD., London, S. W. 19.
Agents:—RUPA & CO., Calcutta-12, Allahabad-1, Bombay-1.

হেমাটো সার্সাপ্যারিলা
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ • কলিকাতা-৯
রক্তশোধক, বলবর্দ্ধক, স্নায়ু ও চর্মরোগ নাশক পুষ্টিকর সালসা
•
সকল বয়সে সমান উপযোগী

জনপ্রিয় মিষ্টান্ন পরিবেশক
গাঙ্গুরাম এণ্ড সন্স

৩৫-৩৩৫৯
১৫৯ সি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

BUY THE BEST
HIGHLY APPRECIATED
SAMSAD ANGLO-BENGALI DICTIONARY
1672 PAGES • Rs 12·50 n.p.
SAHITYA SAMSAD
32-A, ACHARYA PRAFULLA CH. RD. • CAL-9

যষ্টি-মধু
ভঙ্গ বঙ্গের রঙ্গ-ব্যঙ্গের একমাত্র মাসিক পত্রিকা। কার্টুনে কণ্টকিত, রচনায় রসালো। আজই গ্রাহক বা এজেণ্ট হোন।
প্রতি সংখ্যা ·৪০, বার্ষিক ৪·৫০
সম্পাদক ঃ কুমারেশ ঘোষ
৪৫এ, গড়পার রোড, কলিকাতা—৯

স্বাদের সতেজতা
দিনভোর বজায় রাখতে ইনটারফ্রান দিয়ে দাঁত মাজুন

ইনটারফ্রান ফেন্ ক্রীম স্নিগ্ধকর, পরিচ্ছন্ন ও লাবণ্যতাবর্ধক।
ইনটারফ্রান ট্যালকম পাউডার মধুর সুবাসযুক্ত ও স্বাচ্ছন্দ্যদারী।
ইনটারফ্রান
টুথ পেস্ট
ঝকঝকে দাঁত আর সুস্থ মাড়ীর জন্যে
ইনটারন্যাশানাল ফ্রানচাইশেজ প্রাঃ লিঃ, বোম্বাই

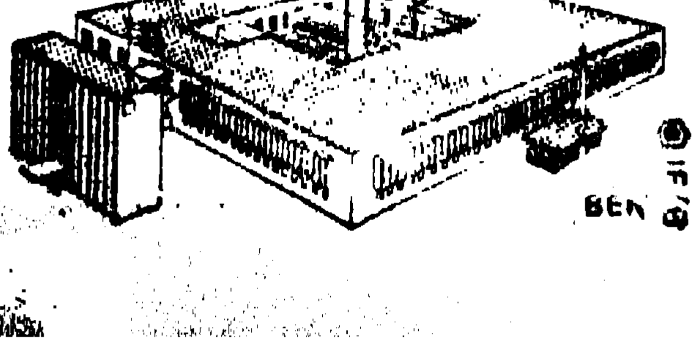

যায়, সে শব্দটাও অপরিজ্ঞাত ছিল সে সময়। শিশিরবাবুর 'সীতা' বইয়ের: পরিচয়-লিপিতে আছে, "অধিকারী—শিশিরকুমার ভাদুড়ী।" প্রযোজক বা প্রয়োগ-কর্তা বা প্রডিউসার বলে কারুরই নাম নেই। অনেক পরে অবশ্য 'সীতা'র প্রোগ্রামে প্রডিউসার বা প্রয়োগকর্তা হিসাবে নিজের নাম দিয়েছেন। অর্থাৎ, উনি যখন 'সীতা' খুললেন, তখনো 'প্রডিউসার' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করার রীতি আসেনি। গিরীশ বা গিরীশ-পরবর্তী যুগে 'শিক্ষক, অধ্যক্ষ বা ন্যাট্যাচার্য' এসব কথার উল্লেখ দেখা যায়। তাই, যখন অপরেশচন্দ্রের "রঙ্গিনী" বইতে লেখা আছে দেখা গেল,—

শিক্ষক ও আহার্যসংগ্রাহক	অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
(প্রডিউসার)	শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
	(ঐ সহকারী)

তখন, একটু অভিনবই ঠেকেছিল ব্যাপারটা!

যাই হোক, অমন মন খারাপ করে ত বাড়ি এলেম। শুয়ে-শুয়ে ঘুম আর আসতে চায় না! মনের মধ্যে কেবল তোলপাড় করেছে চিন্তাটা—শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলাম? প্রযোজনার অন্যতম প্রধান ব্যাপার হলো, কতো শৃঙ্খলায় মঞ্চে সবকিছু দেখানো যায়! দৃশ্যগুলি চমৎকার হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু ঐরকম গুরুভার সেট্ নিয়েই হয়ে গেল প্রধান সমস্যা!

পরদিন সকালে উঠে হাত-মুখ ধুয়েই ছুটলাম থিয়েটারে: পৌঁছতে পৌঁছতে হয়ে গেল—তা প্রায় সাড়ে আটটা হবে—না স্নান, না আহার! ওপরে উঠে দেখি, প্রবোধবাবু ঘরে নেই। কোথায় গেলেন আবার? বারান্দায় এসে উঁকি দিয়ে দেখি, বসে আছেন নীচে। তাড়াতাড়ি নেমে এলাম। পৌষ মাসের শীত, প্রবোধবাবু চয়ারে ঠেসান দিয়ে বসে আছেন—একটা ফতুয়া মাত্র গায়ে। তামাক খাচ্ছেন বটে, কিন্তু মুখখানা শুকনো, চুলগুলো রুক্ষখুস্কো। তখনো কিছু কিছু কাজ চলছে স্টেজে। প্রবোধবাবুর যে-অবস্থা দেখলাম, তাতে মনে হলো, সারাটি রাত্রিই জাগরণে কেটেছে। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন—এই যে বসো।

বড় বড় সেটগুলো কেটে ছোট করে নিতে হলো, এ ছাড়া আর উপায় কী?

চারদিকে তাকিয়ে কাঠ-কাঠরার বিধ্বস্ত রূপ দেখেই অবশ্য বুঝতে পারছিলাম সব, মনে একটা ব্যথাও পেলাম। এই নব মনের মত করে গড়ে-তোলা সেট, সব কেটে ফেলেছেন!

কিন্তু উপায়ই বা কী! কাজ চলতে লাগল। বেলা এগারোটা সাড়ে এগারোটায় উঠলেন প্রবোধবাবু, কাজ তখন শেষ হলো। ছুটি দিলেন সবাইকে, বললেন—দুটোয় আসবেন কিন্তু। তখন শিফ্‌টিঙ-এর রিহার্স্যাল হবে। কে কোন্‌টা কখন ধরে সরাবে, সেসব আগে থাকতেই ঠিক করে না নিলে কাজ তাড়াতাড়ি করা যায় না।

ওপরে গেলাম আমরা দুজনে। স্নান-খাওয়া এখানেই সেরে নিলাম। প্রথম অঙ্কের ছিল একটিই দৃশ্য—সেই সিঁড়ির সেট্—সেটা ঠিকই আছে, তবে সরাবার জন্য সিঁড়িগুলির নীচে বল-বিয়ারিং-রোলার ফিট্ করা হয়েছে, ঠেললেই সরে যাবে: আর অতো দেরি হবে না। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য ছিল 'রাজপ্রাসাদ, রাজকুমারীর কক্ষ'—সেই সিলিং দেওয়া সেটটা আর কী! এটি ছিল ছ' পাতার সিন, দুটো গান আছে। তার পরেই আসছে দ্বিতীয় দৃশ্য—কেল্লার সামনের ময়দান। এখানে ড্রপ ফেলে সেট্ সরিয়ে নিতে হতো, দেরি হচ্ছে। রাজকুমারীর কক্ষের সিলিং-এর জন্য ফ্ল্যাট সিনও ব্যবহার করা যেতো না। তাই প্রবোধবাবু করেছেন কী, সিলিংটা অর্ধেকটা কেটে ফেলেছেন। এবার দ্বিতীয় দৃশ্যটির জন্য ফ্ল্যাট সিন ফেলা যাবে, কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু 'কেল্লার সম্মুখ ভাগ'-এর জন্য কেল্লার সেট্ খাড়া করেছিলাম, এখন করব কী? ফ্ল্যাট সিন কোথায় পাবো? কেল্লা আঁকা কোনো সিন ত আমাদের নেই! আর নতুন করে যে আঁকিয়ে নেবো, সে সময়ও নেই। কী করা যাবে?

প্রবোধবাবু এক সময় বলে উঠলেন—ইউরেকা!

—কী হলো?

বললেন—আমাদের আগ্রা ফোর্টের দেয়াল-আঁকা একটা ফ্ল্যাট সিন আছে না? ওটাই লাগিয়ে দেবো।

বললাম—সেকী! ইজিপশিয়ান পরিবেশে মোগল আর্ট?

—তা হোক। কী আর করা যাবে? পরের সপ্তাহে এঁকে দেবো।

অগত্যা সেই ব্যবস্থাই হলো। তৃতীয় দৃশ্য ছিল—উৎসব মণ্ডপ। কোনো অসুবিধা নেই। দ্বিতীয় দৃশ্যের ফ্ল্যাট এসে কভার করছে, সেই আসরে রাজকুমারীর কক্ষ সরিয়ে এটি বসিয়ে রাখলেই হলো। এটার পরেই দ্বিতীয় অঙ্কের ড্রপ।

তৃতীয় অঙ্কে দেখা গেল, এটিতেও অসুবিধা হচ্ছে না। 'জালুর দুর্গের সম্মুখ ভাগ'—ঐ আগ্রা ফোর্টের ফ্ল্যাট সিনটি আবার ব্যবহার করায় ব্যবস্থা হলো। ভিতরে রইল রাজকুমারীর কক্ষ। তৃতীয় দৃশ্যে—দুর্গ কারাগার—'ইজিপ্টের রানী'র যে কারাগারের দৃশ্য ছিল, তার পিছনের ফ্ল্যাটটি সামনে এনে দেওয়া হলো পাথরের দেওয়াল-গাঁথা—ওপরে ঘুলঘুলি-

আঁকা দৃশ্য বটে, কিন্তু সুন্দর খাপ খেয়ে যায়।

মুশকিল হলো চতুর্থ অংক নিয়ে। চারটে সিন আছে, তার মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থটি হচ্ছে বিরাট। একটি হচ্ছে রাজসভা, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'ডাবল-সেট'—উ'চুতে এক দৃশ্য—নীচে আরেক দৃশ্য—ওপরে-নীচে ভাগ-করা। নীচে হচ্ছে—মাটির গর্তের কারাগারের সেটের মতো একটা কারাকক্ষ-বিশেষ, পুরোহিতের বিচারে এখানেই সেনাপতিকে বন্দী করে রেখে অনাহারে তিলে তিলে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হয়। এইখানে রয়েছে সেনাপতি, আর ওপরে—রাজকুমারীর কক্ষ—বাঁদীদের নৃত্য-গীত। দৃশ্য-পরিকল্পনাটি ছিল এই—নীচে বন্দী সেনাপতি অনাহারে মৃত্যুবরণ করছে, আর ওপরে রাজকুমারীর ঘটছে চিত্তচাঞ্চল্য, তিনি আর নিজেকে যেন ধরে রাখতে পারছেন না। বাঁদীদের নাচ-গানও তাঁকে আনন্দ দিচ্ছে না। ঐ দুটি ব্যাপারই এক দৃশ্যে পর পর দেখানো হতো। কিন্তু অন্য সেট্ সরিয়ে এই সেট্ লাগাতে সময় নিয়েছিল আধ ঘণ্টারও ওপর। এতে লোকে অধৈর্যও ত হয়ে পড়বেই!

অতএব রাজসভা সরিয়ে দিয়ে এটিকে ঠিকমতো তাড়াতাড়ি সেট্ করা সম্ভব নয়। প্রবোধবাবু আমার মুখের দিকে তাকালেন। এটি বড়ো সাধের সেট্ ছিল আমার। দোতলা সিন। শেষ মুহূর্তে বন্দিনী আসছে ছুটে সেনাপতির কাছে, দুজনে একসংগে মরছে।

প্রবোধবাবু একটু হাসলেন, বললেন—কী করা যাবে? ওটাকেই বাদ দাও।

বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। এটা বাদ যাবে কী?

কিন্তু উপায়ও নেই। কারাগারের পিছনকার ফ্ল্যাটটা সামনে দিয়ে—রাজকুমারীর কক্ষটা কভার করে—সেনাপতির সেল-এর দৃশ্য দেখানো যায় কিনা, সেকথাও চিন্তা করা হলো। আমি বললাম—অসম্ভব। ওতে ডেপথ্ কমে যাবে। অমন শেষ দৃশ্যটি, ওতে সমস্ত অ্যাকটিংটা বেশ ভালো করে দেখানো যাবে না।

সেনাপতি সাজছিলাম আমিই।

তাহলে কী হবে? ফ্ল্যাট সিনটা লাগিয়ে কভার করতে পারলে রাজসভা ভাঙতে তিন মিনিটের বেশি সময় লাগত না। তার বদলে—রাজকুমারীর কক্ষ করে রাখতে কতক্ষণ? কিন্তু 'সেল' সামনে আনলে সেনাপতিরও চলছে না। অমন গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য, ওটি অবহেলা করলে চলবে না।

সুতরাং রাজকুমারীর কক্ষের দৃশ্যগুলিই বাদ দেওয়া হোক। শুধু 'সেল'ই থাকুক, দোতলার দৃশ্য উড়িয়ে দেওয়া গেল, রাজকুমারীর অন্তর্বেদনা, বাঁদীদের নাচ ও গান বাদ গেল। (ক্রমশ)

বাদশা • বেগম • নফর

বাদশাহের বাদশাহী গেছে, বেগমের অশ্রু চাপা পড়েছে কবরের তলায়। নফর আজও ঐতিহ্য বহন করে বেঁচে রয়েছে বাংলার বুকে। ঘটনা-স্রোতে তমসাবৃত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এদের কাহিনী এতিদন ছিল অজ্ঞাত। সেই কাহিনীকে জীবন-দান করে পরিবেশন করছে বেদুইন; উদ্ঘাটিত হচ্ছে ইতিহাসের ভাঙাগড়ার অজানা রহস্য। দাম সাড়ে তিন টাকা

অন্যান্য কয়েকখানি বই

বেদুইন	॥	এই শহরে	২·৫০
বিমল মিত্র	॥	প্রথম পুরুষ	৩·০০
আশাপূর্ণা দেবী	॥	শশিবাবুর সংসার	৪·০০
নীহাররঞ্জন গুপ্ত	॥	বহ্নিশিখা	৬·৫০
"	॥	বিয়ের আগে ও পরে	৫·০০

ইস্ট লাইট বুক হাউস : ২০, স্ট্র্যান্ড রোড, কলিকাতা—১

সুবোধ ঘোষের উপন্যাস
মীন পিয়াসী
দাম চার টাকা

জনম জনম
সুবোধকুমার চক্রবর্তীর উপন্যাস
দাম তিন টাকা

বিজন চক্রবর্তীর ভ্রমণ-উপন্যাস
উত্তরস্যাং দিশি
দাম দু' টাকা

অন্যান্য বই

কাচঘর—বিমল কর ॥ ভোরের মালতী—সুবোধ ঘোষ ॥ মেঘরাগ—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ কুসুমেষু—সুবোধ ঘোষ ॥ মনোমুকুর—সমরেশ বসু ॥ কুসুমের মাস—সন্তোষ ঘোষ ॥ জোনাকির আলো—মিহির আচার্য ॥ শুন বরনারী—সুবোধ ঘোষ ॥ অগ্নি অবগুণ্ঠনে—সুবোধকুমার চক্রবর্তী ॥ বিদিশার নিশা—শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ আকাশ ও মৃত্তিকা—সরোজকুমার রায়চৌধুরী ॥ নিতসিন্দুর—সুবোধ ঘোষ ॥ নতুন নাম নতুন ঘর—শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ থিরবিজুরী—সুবোধ ঘোষ ॥ মৌন বসন্ত—স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ একটি নীড়ের আশা—স্বরাজ বন্দ্যোপধ্যায় ॥

ক্লাসিক প্রেস ॥ ৩।১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

৫৯

এখানেও নরনাথই এসেছে তদ্বিরে।

'আমার দাদা বর্নবিহারী মিত্তির পাঠালেন আমাকে।' ভূপেনের বৈঠকখানায় ঢুকে নমস্কার করে বললে নরনাথ।

বর্নবিহারী কোনো জুনিয়র উকিল-টুকিল হবে এমনি আঁচ করল ভূপেন। 'কে বর্নবিহারী?'

'আপনার দ্বিতীয় পুত্র যাকে বিয়ে করছে তার বাবা।'

'আরে কী আশ্চর্য, আসুন, বসুন।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ভূপেন। তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে ডেকে আনল হেমেনকে।

'শুভদিন তাড়াতাড়ি ঠিক করে ফেলতে হয় এবার।' বললে নরনাথ।

'হ্যাঁ, যত শিগগির হয়।' বললে হেমেন। 'মানে যত শিগগির পাত্র-পাত্রীরা ঠিক করে।'

'তা তো ঠিকই। আরেক কথা', নরনাথ ঘাড়ের উপর হাত বুলোল। 'দাদা বলছিলেন আপনাদের কোনো দাবিদাওয়া আছে কিনা।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল হেমেন। 'পাত্র-পাত্রীরা যেখানে স্বেচ্ছায় মিলিত হচ্ছে সেখানে আবার দাবিদাওয়া কী! ভজনও করবে অবার ভোজনও মারবে এ হয় না।'

'কিছু বলা যায় না মশাই।' গম্ভীর হল ভূপেন। 'সব আমার স্ত্রী জানেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করে জানাব আপনাদের।'

'জানাবেন। আরেকটা কথা।' নরনাথ নাকের ডগা চুলকোতে লাগল। 'আপনারা কি মেয়েকে আশীর্বাদ করতে যাবেন?'

ভূপেন আর হেমেনের মধ্যে দ্রুত একটা চোখ তাকাতাকি হল। প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠল দুজনে: 'কী দরকার!'

হেমেন আরো একটু বিশদ হল। 'ওদের নির্বাচনে আমরা যখন সম্মতি দিলাম তখনই তো হয়ে গেল আশীর্বাদ।'

'বেশ। এখন আরেকটা কথা, বলতে পারেন শেষ কথা।' নরনাথ এবার চিন্তিত ভঙ্গিতে দাড়িতে হাত বুলুতে লাগল। 'বিয়ের পর ওরা কি এ বাড়িতে থাকবে?'

'তাহলে কোথায় থাকবে?' হেমেনকে কেমন কাঠখোট্টা শোনাল।

'এ বাড়িটাতে যথেষ্ট জায়গা নেই বলে শুনেছি।'

'রাখুন।' হেমেন নিজের বুকের উপর হাত রাখল। 'যদি প্রাণ থাকে তাহলে স্থানও আছে। কেন, ওরা কিছু বলছিল নাকি?'

'না, তেমন কিছু শুনিনি পষ্টাপষ্টি।' নরনাথের হাত এবার উঠে এল কানের পিঠে। 'তবে আধুনিক ছেলেরা বিয়ের পর আলাদা হয়ে যেতে চায় তো।'

'আমরা দেব না যেতে। যত দিন পারি ততদিন পরিবারের একান্নবর্তিতা বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করব। আমাদের সব ঐতিহ্য সব বৈশিষ্ট্য চলে যেতে বসেছে কিন্তু পারিবারিক সংহতির যে আদর্শ এতদিন চলে আসছিল তা আমরা পারতপক্ষে ক্ষুণ্ণ হতে দেব না।'

'কী করে রাখবেন?' নরনাথ বললে, 'অর্থনৈতিক কারণেই তো ভেঙে যাচ্ছে।'

'অর্থনৈতিক কারণে তত নয় যত স্বার্থনৈতিক কারণে। অকর্মণ্য হয়ে একজন আরেকজনের ঘাড়ে বসে খাবে এ অন্যায় সন্দেহ নেই কিন্তু একজন অক্ষমকে আর সকলে সাহায্য করবে না পৃথক করে দেবে এ অন্যায়ের চেয়েও অন্যায়।'

'তাহলে বার্ধক্যে আমরা পুত্রবধূর সেবা পাব না?' ভূপেন বললে।

'পাব না নাতি-নাতনির মাধুর্য? গৃহ শুধু একটা গুহা হয়ে থাকবে? দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পাট উঠে যাওয়ার পর অতিথি এলে তাকে দুটো ফুটিয়ে দেবার ব্যবস্থা থাকবে না?'

'না, না,' কথা পালটে নিতে চাইল নরনাথ, 'যৌথ পরিবার বাঁচিয়ে রাখতে পারলে তো ভালই। সবাই যদি মিলে-মিশে থাকতে পারে তাহলে আর কথা কী!'

'যাকে আধুনিক রাজনীতির ভাষায় বলতে পারেন সহাবস্থান।' হেমেন বললে।

'পঞ্চশীল?'

'পঞ্চশীল তো নয়, পঞ্চশূল। আর সব চেয়ে দীর্ঘ শূলটার নামই ক্ষুদ্রতা। চিত্ত-দারিদ্র্য।' হেমেনের স্বর তপ্ত হয়ে উঠল। 'যে জ্যেষ্ঠ সেই কর্তা হবে নিঃসন্দেহ, যদি সে, অভিমানে নয়, সানন্দে না দাবি ছাড়ে। যে কর্তা সে অবিসম্বাদিত শ্রদ্ধা পাবে সকলের, কিন্তু শ্রদ্ধা, জানেন তো, আপনা-আপনি আসে না, আকর্ষণ করে নিতে হয়। আর সে আকর্ষণ সহজ হয় সেই ক্ষেত্রে যেখানে কর্তা উদার, ত্যাগস্বীকারে সম্মত। এখানে কর্তা-কথাটা কিন্তু জেনারেল ক্লজেজ য়্যাক্ট অনুসারে বুঝতে হবে। কর্তা ইন-ক্লুডস কর্ত্রী। নইলে কর্তা যদি ক্ষুদ্রাত্মা হয়, যদি একা তার পাতেই মাছের মুড়ো পড়ে, মানে যদি নিজের কোলের দিকেই অনবরত সে ঝোল টানে, নিজের ছেলেটিকে নন্দদুলাল ভেবে জায়ের ছেলেটিকে নাড়ুগোপাল ভাবে—তাহলেই সর্বনাশ। তা হলেই সংসারে আর লক্ষ্মী নেই, আছে শুধু তার বাহনের চিৎকার।'

'এই লক্ষ্মীর সংসার হবে কিসে?' উঠতে উঠতে নরনাথ শুধোল।

'শুধু বউয়ের গুণে।' বললে হেমেন।

'শুধু বউয়ের?' উঠে পড়ল নরনাথ।

'হ্যাঁ, ছেলে যতক্ষণ একা থাকে ততক্ষণ সমস্যা কোথায়? বউ নিয়ে এলেই তখন স্থান সংকুলানের কথা। যে এতকাল দ্বার মুক্ত দীর্ণ করেছে ভেদ করেছে, সে এখন স্থান

BE TALLER

and healthier by our new exercises and diet schedule. Details free.

283 (D.E.) Azad Market, Delhi-6

ঢোল কোম্পানীর
দাদ ও কাউরের
অব্যর্থ মলম
বরানগর • কলিকাতা

ধবল-শ্বেত কুষ্ঠ

বহুদিন পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম, দিনরাত চর্চা ও অনুসন্ধানের পর কবিরাজ শ্রীব্রহ্মস্বরূপ, বি এ উহা সমূলে বিনাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইংরাজীতে লিখিবেন।

আয়ুর্বেদিক কেমিক্যাল
রিসার্চ লেবরেটরিজ, ফতেপুরী, দিল্লী ৬

হয়ে রক্ষা করবে, রোধ করবে। কিছুতেই ছেড়ে দেবে না, হেরে যাবে না। এই হবে তার হাতের লোহা, মাথার সিঁদুর।'

'তেমন মেয়ে কোথায় আর আজকাল?' নরনাথ টেবিলের ধার থেকে সরে এল।

'না, না, আছে, আছে।' ভূপেন বলে উঠল। 'ধৈর্যের প্রতিমা। স্নিগ্ধ অথচ তেজস্বিনী। আছে, আছে।'

'থাকুক বা না থাকুক, সে আমাদের কোনো সমস্যা নয়।' হেমেনও উঠে পড়ল। 'মোট-কথা, আমরা কিছুতেই আমাদের দুর্গ, আমাদের যুক্ত পরিবার ভাঙতে দেব না। যদি ভাঙেও কোনোখানে, তা আবার জোড়া লাগাব। নাতির সঙ্গে সোনার থালায় ভাত খাব আমরা। নইলে আমাদের কিসের কেরামতি।'

'বেশ, ভালো কথা, সুখের কথা।' নমস্কার করে বেরিয়ে গেল নরনাথ।

হেমেনও বেরুচ্ছিল, তার আগেই ঢুকে পড়ল মৃণালিনী।

'মেয়ের বাড়ির অভিভাবকদের কেউ এসে-ছিল বুঝি?'

'হ্যাঁ, কাকা এসেছিল।' হেমেন কেটে পড়তে চাইল।

'আশীর্বাদের কথা কী বলছিল?' ভূপেনের দিকে সরাসরি নিক্ষিপ্ত হল মৃণালিনী।

'বলছিল আশীর্বাদ করতে যাব কিনা।'

'আর শুনলাম তুমি 'না' করে দিলে।'

'হ্যাঁ, কী দরকার আর ও সব হ্যাংগামার। ওরা যখন পরস্পরে সম্মত হয়েছে—'

'না,' ধমক দিয়ে উঠল মৃণালিনী। 'আশীর্বাদ করতে হবে বৈকি। তুমি দিন ঠিক করে ওদের খবর পাঠাও, হবে আশীর্বাদ। এই সব অনুষ্ঠান হয় না বলেই পরে সব নষ্ট হয়ে যেতে চায়। আশীর্বাদের বদলে দেখা দেয় অভিশাপ হয়ে।'

'তা বেশ খবর পাঠাব। আমি আর হেমেন গিয়ে পাকা দেখে আশীর্বাদ করে আসব।' ভূপেন বলল।

'সঙ্গে আমিও যাব।'

'তুমি যাবে কী! শাশুড়ি কখনো যায় পাকা দেখতে?'

'রাখো। ছাড়ো ওসব সেকেলেপনা। পারলে শাশুড়ি বরযাত্র যায়, আর এ তো শুধু পাকা দেখা। জানো সেদিন নীরেন-বাবুর ছেলের বউভাতে গিয়েছিলাম, শাশুড়ির ডিরেকশানে ছেলের বউ অন্ন-নৃত্য নাচল—'

'অন্ন-নৃত্য?' হেমেন হাঁ হয়ে রইল।

'তুমি তো কোনোখানে যাও না, গেলে দেখতে পেতে।' মৃণালিনী হাতমুখ ঘুরিয়ে বলতে লাগল। 'স্ত্রী-পুরুষ খেতে বসেছে, সামনে স্টেজ বাঁধা। যে বউ হয়ে এসেছে সে নামকরা নাচুনী, [illegible] নাম করতে পারবে। নিমন্ত্রিতদের সেই নাচ [illegible] দেখালেন [illegible] কি করে, কি করে শাশুড়ির মান বাড়ে। শাশুড়ি বললে, যদি দুর্ভিক্ষ নৃত্য হতে পারে, অন্ন-নৃত্য হবে না কেন?'

'ঠিকই তো।' সহজেই সায় দিল ভূপেন।

'সুতরাং ওসব সেকেলে নিয়ম চলবে না। আমিই যাব অগ্রণী হয়ে। সোনার সাত লহর হার দিয়ে আশীর্বাদ করব। কী যেন তুমি প্রশংসা করছিলে মেয়েটির!' ভূপেনের দিকে তাকাল মৃণালিনী। 'কিসের যেন প্রতিমা বলছিলে?'

'প্রতিমা? কিসের প্রতিমা?' সাহায্যের জন্যে হেমেনের দিকে তাকাল ভূপেন।

'ও, হ্যাঁ, লক্ষ্মীর প্রতিমা।' মৃণালিনী নিজেই মনে করতে পারল। 'নামটিও বিনতা। সুন্দর নাম।'

'বিনতা?' আঁৎকে উঠল হেমেন। 'সে তো বিহঙ্গমের মা।'

'মা?' ঘা খেয়ে যেন বসে পড়ল মৃণালিনী। 'সে কুমারী। কী জানি মেয়ে-ইস্কুলটার নাম, সেখানে সে চাকরি করে। একটা ভদ্র উচ্চশিক্ষিত মেয়ের নামে যা তা একটা কলঙ্ককথা বললেই হল?'

'আহা, ঠাট্টা বোঝ না কেন?' ভূপেন বললে, 'মহাবিহঙ্গম মানে বড় পাখি। সব চেয়ে বড় পাখি কে? গরুড়। আর ঐ গরুড়ের মায়ের নামই বিনতা।'

'এ যে গাট্টা মেরে ঠাট্টা। এরকম ঠাট্টা ভালো নয়। যে বাড়ির বউ হয়ে আসবে তার সম্বন্ধে এ স কী কথা! আর শোন', মৃণালিনীর মুখ থমথমে হয়ে উঠল। 'আরেকটা কথা বলে রাখছি।'

'বলো।' ভূপেন ঘাড় কাত করল।

'তেতলায় যে ঘর উঠেছে—'

'এখনো সম্পূর্ণ ওঠেনি, প্রায় হয়ে এসেছে বলতে পারো।' হেমেন সংশোধন করতে চাইল।

'ঐ হল। বিয়ে হতে হতে তৈরি হয়ে যাবে। ঐ ঘরে কিন্তু নতুন বউ থাকবে।'

'কোন্ আইনে?' প্রায় রুখে উঠল ভূপেন।

'আইন তুমি বোঝ গে যাও। আমার ইচ্ছে সমস্ত আইনের চেয়ে বড়। যতক্ষণ আমি আছি ততক্ষণ এ-বাড়িতে একমাত্র আমার কথাই চলবে। আর কারো কথা নয়।'

'না, না, আগে যেমন ছিল তেমনি সুকু আর তার বউ থাকবে।' ভূপেন দৃঢ় হবার চেষ্টা করল।

'তা হলে তেতলার ঘরে? সেখানে তুমি থাকবে?' দাঁতে দাঁত লাগাল মৃণালিনী।

'না।' কঠিন হল ভূপেন। 'যাদের এ-বাড়ি তারা থাকবে।'

== বঙ্গসাহিত্যের সাম্প্রতিকতম উপন্যাস ==

বর্তমান বর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

উপকণ্ঠে

॥ ন টাকা ॥

আকাদমী পুরস্কারপ্রাপ্ত "কলকাতার কাছেই" গ্রন্থের পরবর্তী কাহিনী—কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ উপন্যাস।

সিপাহীবিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত সুবিপুল উপন্যাস।
॥ সাড়ে আট টাকা ॥

বহ্নিবন্যা

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নবতম উপন্যাস

এই তীর্থ ৩॥

প্রফুল্ল রায়ের নূতন উপন্যাস

তটিনী তরঙ্গে ৫৲

হীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের
অবহেলিত মানবসমাজের জীবনবেদ
নবতম উপন্যাস

লীলাভূমি ৫৲

মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা—১২

উত্তমপুরুষ-এর
সাম্প্রতিক প্রকাশিত উপন্যাস
আঁখি বিহঙ্গ ৩·০০
সুধাপারাবার ২·০০
নীহাররঞ্জন গুপ্তের
রুক্মিণীবাঈ ৩·০০
প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত প্রায়
আশাপূর্ণা দেবীর
নবজন্ম ৩·০০
ধ্রুবেন সেনের
পুষ্পধন্বা ২·০০

॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে ॥
উত্তমপুরুষ-এর
বাসর ২·৫০
তপতী কন্যা ২·০০

॥ প্রকাশ প্রতীক্ষায় ॥
উত্তমপুরুষ-এর
সুবৃহৎ উপন্যাস
নকল রাজা নকল রাণী

॥ অনুবাদ সাহিত্য ॥
ট্রেজার আইল্যাণ্ড—স্টিভেন্‌সন্‌ ২·০০
অকুল-পাথার—জুল ভার্ণে - ২·০০
ওল্ড কিউরিওসিটি শপ্‌—ডিকেন্স ১·৫০

তুলি-কলম
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

'কাদের এ-বাড়ি? মানে, বাড়িওলারা?'

'বা, তা কী করে হয়? যারা এ গোটা বাড়িটা কিনেছে, মানে হেমেন আর বিজয়া, তারা থাকবে।'

'মানে ঠাকুরপো এই সম্পূর্ণ বাড়িটা কিনে নিয়েছে?' চোখে যেন অন্ধকার দেখল মৃণালিনী। 'শুধু তেতলায় ঘর তোলবার খরচ দেয়া নয়, সমস্ত বাড়িটাই সাকুল্যে কিনে নিয়েছে?' অসহায় চোখ ফেলল হেমেনের উপর।

'সমুদয় কিনে নিয়েছে। মোট দাম আশি হাজার!' ভূপেনের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'কত বড় কথা। হেমেন বাড়ির মালিক হয়ে গেল।'

'আর তুমি?' দু হাতের দুই বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মৃণালিনী মুখ খিঁচিয়ে উঠল। 'তুমি কী হলে?'

'আমার কোনো পরিবর্তন নেই। যা ছিলাম তাই রইলাম।' নিস্পৃহ গলায় ভূপেন বললে, 'যে ভাড়াটে সেই ভাড়াটে।'

'আমরা ঠাকুরপোর ভাড়াটে হয়ে গেলাম?' শোকের সুর বার করল মৃণালিনী।

'তাতে আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি কী হল?' ভূপেন আশ্বস্ত করতে চাইল। 'ওপর-ওপর স্বত্বের কী অদল-বদল হয় না হয় তাতে আমাদের কী এসে যায়? আমরা যেমন গুনছিলাম তেমনি ভাড়া গুনে যাব। আগে ভাড়া দিতাম এক জমিদারকে, এখন থেকে দেব হেমেনকে। আমাদের পক্ষে একই কথা। হর দরে হাঁটুজল।'

'তা হলে', আতঙ্কে চোখ কপালে তুলল মৃণালিনী। 'ঠাকুরপো যদি উচ্ছেদের নোটিশ দেয় আমাদের উঠে যেতে হবে?'

'উপায় কী তা ছাড়া? তাই যাতে ঝগড়া-টগড়া না করো, কর্তৃত্ব একটু কম ফলাও, ওদের একটু মন মজিয়ে চলো—'

'অসম্ভব। তুমি এখুনি অন্য বাড়ি দেখ। নোটিশ দেবার আগেই যাতে মানে মানে সরে পড়তে পারি।'

'আমরা বেঁচে থাকতে কি আর নোটিশ দেবে? ছোটর থেকে বড় করে তুলেছি, মানুষ করে তুলেছি, ও কি কৃতঘ্নতা করবে? কিরে, করবি?' হেমেনের দিকে তাকাল ভূপেন।

হেমেন মৃদু-মৃদু হাসতে লাগল।

'কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। আজকের শুভবুদ্ধি কালকে বিবুদ্ধি হয়ে যেতে পারে। সুতরাং এ বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলো।'

'আগে ওরা অন্যত্র যেতে চাইত, এখন উলটে তুমি চাইছ।' ভূপেনও হাসল। 'কিন্তু আমাদের সাধনা একত্র হয়ে থাকবার সাধনা। ব্যক্তির স্বার্থকে সমষ্টির মঙ্গলে পরিণত করার সাধনা। দায়ে পড়ে নয়, শুধু আনন্দে ভ্রাতৃত্বে নিজের ক্ষুদ্রতাকে বিসর্জন দেওয়া।'

'রাখো।' আবার ধমকে উঠল মৃণালিনী। 'সংসারে যার যেমন হাতের তাস। ভাগ্যের খামখেয়ালিতে কারু হাতে বা টেক্কা-তিরি। রঙের টেক্কা কেউ পাশায় না, পাশানো যায় না। না চাইলেও টেক্কার গুণেই পিঠ উঠে আসে। ভাইয়ের তুল্য যেমন মিত্র নেই তেমনি আবার ভাইয়ের তুল্য শত্রু নেই। সুতরাং ভাইয়ের উপর নির্ভর না করে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াও।'

'আমার একার সামর্থ্য কোথায়?' হাত-পা ছাড়া গলায় ভূপেন বললে।

'তা হলে সুকুকে ডাকো। ও যেখানে ওর বউকে নিয়ে থাকবে সেখানেই এক পাশে আমি ঠাঁই করে নেব। তুমি থাকো তোমার ভাইয়ের গোয়ালে।'

'তোমার ছেলে, তুমিই তাকে খবর দাও।' ভূপেন মুখ ফেরাল।

'তাই দেব।'

দুর্ধর্ষ ঘাই মেরে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল মৃণালিনী, হেমেন পথ আটকাল। হাসিমুখে বললে, 'শোনো, সব কথা বলা হয়নি। দাদা কিছু কম করে বলেছেন।'

মৃণালিনী থামল।

হেমেন বললে, 'বাড়িটা সত্যি কেনা হয়েছে নগদ আশি হাজারে। কিন্তু ক্রেতা শুধু একা আমি নই, ক্রেতা আমি আর দাদা দুজনে, সমানাংশে।'

'সত্যি?' মৃণালিনী দশ দিক আলো করে ঝলমল করে উঠল।

'তোমাকে দলিলটা দেখাই। দলিল না দেখলে তোমার হয়তো বিশ্বাস হবে না।'

পাশের ঘরে গিয়ে আলমারি খুলে দলিল বার করে আনলে হেমেন। মৃণালিনীর হাতে দিয়ে বললে, 'এই দেখ ক্রেতাদের নাম, অংশ আট আনা করে। পড়ে তর্জমা করে বুঝিয়ে দেব তোমাকে?'

'বুঝেছি, যখন বলছ। কিন্তু উনি চল্লিশ হাজার টাকা পেলেন কোথায়?'

'শোনো। মূলে সমস্ত টাকাটাই আমার। ধরো আমি ওঁকে এই চল্লিশ হাজার টাকা দান করেছি—ছোট হয়ে বড়কে কি দান করা যায় না? খুব যায়। দেবতাকে যদি দেওয়া যায় তাহলে দাদাকেও। কিংবা ধরো ঐ টাকাটা উনি আমার কাছ থেকে ধার করেছেন। যদি ছেলেরা পারে যেন শোধ দিয়ে দেয়। যদি না পারে তাতেও ক্ষতি নেই। যেহেতু ঐ ছেলেরা আমারও ওয়ারিশ। আমার যা থাকবে না-থাকবে শেষ পর্যন্ত ওরাই পাবে।'

'কিন্তু আসলে দলিলে লিখেছ কী?' বাস্তবের গলায় জিজ্ঞেস করল মৃণালিনী।

'লিখেছি, আমিই চল্লিশ হাজার টাকা ধারতাম দাদার কাছে। এই কবালায় সেই ঋণ থেকে মুক্ত হলাম আর সমান অংশে দুজনে, দাদা আর আমি, স্বত্ববান হলাম বাড়িতে। কি, এই ব্যবস্থাটা ভালো হল

না? সমান অধিকারের ব্যবস্থা। কেউ কারো অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী থাকবে না, সবাই এক নৌকোর সোয়ারী হয়ে পাল তুলে দেবে। উঠবে নতুন আরেক সমৃদ্ধির বন্দরে।'

'কিন্তু যদি বেনামীর কথা ওঠে?' অনেক তলাতে পারে মৃণালিনী।

'কে তুলবে সেই প্রশ্ন? আমার অবর্তমানে বিজয়া তুলবে? তুলে তার লাভ কী, যাবে কোথায়? তার নিজের বলতে তোমরা ছাড়া, প্রশান্ত-সুকান্ত ছাড়া আছে কে? তোমাদেরকে আঁকড়েই তাকে বাঁচতে হবে যদি অবশ্য পুণ্যবলে সধবা না যায়। তার জীবদ্দশায় তাকে নিশ্চিন্ত করার জন্যেই এই বাড়ি কেনা, সকলকেই নিশ্চিন্ত করার জন্যে। আর আমাদের কে হটায়, কে আমাদের ঘর ভাঙে?'

'আর বাড়িভাড়া?'

'কে দেবে? কাকে দেবে?' ভূপেন বললে, 'বাড়িভাড়ার দফা রফা।'

'তা হলে তো খুব ভালো।' উথলে উঠল মৃণালিনী। মমতাময় চোখে তাকাল হেমেনের দিকে। 'এতই যখন ছাড়লে তখন তেতলার ঘরটা সুকু আর তার বউকে ছেড়ে দিতে পারো না?'

'যে ঐ ঘর দাবি করছে সেই বিজয়াকে জিজ্ঞেস করো।'

বিজয়াকে ডাকল মৃণালিনী। দরজার বাইরে প্যাসেজের কাছটায় বিজয়া এসে দাঁড়াল। মৃণালিনী তার কাঁধে হাত রাখল। রাখতেই দুজনে আট আনা-আট আনা হয়ে গেল। মৃণালিনী বললে, 'আমাদের দুজনেরই যখন সমান স্বত্ব তখন ঐ তেতলার ঘরের দাবি আমরা একত্রে ছেড়ে দিলাম। ঐ ঘরে সুকু আর বিনতা থাকবে।'

'বা, সুকু আর তার বউয়ের জন্যেই তো ঐ ঘর উঠেছে।' সোহাগে গলে গিয়ে বললে বিজয়া।

হেমেন বললে, 'সুকুকে খবর পাঠাব?'

মৃণালিনীর মুখ স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছে। 'আর কী দরকার!' তারপর স্পষ্ট প্রসন্নতা ফুটে উঠল। 'সর্বসমস্যার সমাধানই তো হয়ে গেল।'

'হ্যাঁ, হয়ে গেল, তবু—' মাথা চুলকোল হেমেন। 'তার বিয়ে নিয়ে কিছু বলতে পারত তোমাকে।'

'তোমাকেই তো বলেছে। তোমরা এখন যা ঠিক করবে তাই হবে।'

'হ্যাঁ, আট আনা আট আনা।' হাসল ভূপেন।

'চল', বিজয়াকে ডাকল মৃণালিনী, 'চল্ তেতলার ঘরটা দেখে আসি।'

'আমি!' হাতে কী একটা কাজ আছে এমনি ভাব দেখাল বিজয়া।

মৃণালিনী একাই সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল। হেমেন বললে, 'প্রকাণ্ড একটা জট কিন্তু

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

ডক্টর নবগোপাল দাসের
চাঞ্চল্যকর সৃষ্টি

এক অধ্যায়

দুর্নীতি দমন পর্বতের অধিকর্তা হিসেবে ডক্টর দাসকে বাংলা দেশ সশ্রদ্ধায় স্মরণ করে। পারেন্তো তিনি করেছেন অনেক 'রাঘব-বোয়ালদের', উন্মোচন করেছেন বীভৎস ঘটনার নায়ক-নায়িকাদের নগ্ন স্বরূপ আই-সি-এস জীবনের স্মৃতি-কাহিনীর এক অধ্যায়। ৩·০০ ॥

দেবেশ দাশের নবতম রম্যগ্রন্থ

পশ্চিমের জানলা

সপ্ত সমুদ্রের পারে পশ্চিম জগতের জানলা দিয়ে দেখা জীবন-মিছিলের বিচিত্র রূপায়ণের অন্তরঙ্গ কাহিনী রঙে রসে রঞ্জনায় সার্থকসুন্দর। ৫·০০ ॥

রাজসী (৩য় মুঃ) ৩·০০ ॥
ইয়োরোপা (৭ম মুঃ) ৩·০০ ॥

জরাসন্ধের নবতম উপন্যাস

ন্যায়দণ্ড ৬·৫০ ॥

সৈয়দ মুজতবা আলীর নবতম গ্রন্থ

চতুরঙ্গ ৪·৫০ ॥

সমরেশ বসুর আশ্চর্য উপন্যাস

বাঘিনী ৭·০০ ॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মহাশ্বেতা (২য় মুঃ) ৫·৫০

ছায়াছবির রূপোলী পর্দায়
সমরেশ বসুর 'আনন্দ' পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস
গঙ্গা (৩য় মুঃ) ৫·৫০ ॥
সম্প্রতি চিত্রমুক্তি ঘটেছে।
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সপ্তপদী (১৩শ মুঃ) ২·৫০ ॥
ছায়াচিত্রে রূপায়িত হচ্ছে।
জরাসন্ধের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি
তামসী (৭ম মুঃ) ৫·৫০ ॥
বাংলায় 'বিষকন্যা' ও হিন্দীতে 'বন্দিনী' নামে ছায়াচিত্রে রূপায়িত হচ্ছে।

বরিস পাস্তেরনাকের উপন্যাস

ডাঃ জিভাগো ১২·৫০ ॥

কবিতার অনুবাদ ও সম্পাদনা :
বুদ্ধদেব বসু

বার্ট্রান্ড রাসেলের প্রখ্যাত গ্রন্থ

সুখের সন্ধানে ৫·০০
[The Conquest Of Happiness]
অনুবাদ : পরিমল গোস্বামী
[জর্জ অ্যালেন অ্যাণ্ড আনউইন-এর অনুমোদিত প্রকাশিত]

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নতুন বই

আয়ুবের সঙ্গে

পাকিস্তানের নবনায়ক ডিক্টেটর আয়ুব খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ-আলাপের কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী। পূর্ব-বাংলার অন্তরঙ্গ রেখাচিত্রে সমুজ্জ্বল এই অনুপম গ্রন্থে কবির দৃষ্টির সঙ্গে ঘটেছে সাংবাদিকের প্রখর দৃষ্টিপাত। ২·০০ ॥

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর
তুঙ্গভদ্রা ৪·০০ ॥
সতীনাথ ভাদুড়ীর
পত্রলেখার বাবা ৪·০০ ॥
আনন্দকিশোর মুন্সীর
রাঘব বোয়াল ৩·০০ ॥
ধনঞ্জয় বৈরাগীর নাটক
রূপোলী চাঁদ (৩য় মুঃ) ২·৫০ ॥
ভবানী মুখোপাধ্যায়ের
জর্জ বার্নার্ড শ ৮·৫০ ॥
মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের
চরণিক ৩·০০ ॥
সন্তোষকুমার দে'র
বৈঠকী গল্প ২·৫০ ॥
নিখিলরঞ্জন রায়ের
সীমান্তের সপ্তলোক ৩·০০ ॥
নীলকণ্ঠের কথামৃত
এলোমেলো ২·৫০ ॥
স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
রাত্রির (২য় মুঃ) ৪·০০ ॥
প্রমথনাথ বিশীর
চলন বিল (৩য় মুঃ) ৪·৫০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২

থেকে যাচ্ছে। খোদ পাত্রী নিয়েই গোলমাল।' ভূপেনের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল হেমেন। 'হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব নাকি?'

'সর্বনাশ।' সাপ-দেখার মতন লাফিয়ে উঠল ভূপেন। 'এখন কিছু ভাঙতে গেলে তুমুল করবে। সমস্ত তছনছ ওলোট-পালোট করে দেবে। হয়তো, শেষকালে যেমন যায় সব শাশুড়ি, কাশী কি পুরী পালাবে। ভরা ডুবি হবে।'

'হ্যাঁ, আমিও বলি, এখন চেপে যাওয়া ভালো।' বিজয়া বললে স্থির স্বরে, 'পাকা দেখার সভায় প্রথম দেখবে. আশীর্বাদ করতে বাধ্য হবে, তখন আর রাগ দেখিয়ে করবে কী। যদি বা রাগ দেখায়, তা হলেও আশীর্বাদ তো পণ্ড হবে না, যেহেতু আপনারা আছেন। আর আশীর্বাদ একবার হয়ে গেলে সর্বত্র অভয়।' সুন্দর করে হাসল বিজয়া। 'বরং দিনের দিন সুকুকে ও-বাড়িতে হাজির থাকতে বলুন। দিদি যদি কিছু গোলমাল করতে চায় সুকুই সামলাতে পারবে।'

'হ্যাঁ, তাই ভালো।' ভূপেন উদার উচ্ছ্বাসে সায় দিল। 'সুকুই সামলাবে তার মাকে। আমরা কেন মাথায় লাঠি খাই।' বলে নিজের টাকে হাত রাখল।

কদিন পর এক রবিবার পাকা দেখার দিন ঠিক হল আর ক্ষণ ঠিক হল বেলা দশটা।

সাজতে বসল মৃণালিনী।

জয়ন্তী জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছ, মা?'

ঘাড়ে গলায় বুকে পাউডার ঢালতে ঢালতে মৃণালিনী বললে, 'তোর ছোড়দার বউকে পাকা দেখতে।'

'কাকে? বিনতাদিকে?'

'হ্যাঁ। হস্টেল থেকে কোন্ এক কাকার বাসায় এসে উঠেছে, সেইখানে। কিন্তু তুই ভদ্রমহিলাকে বিনতাদি বলিস কোন্ সুবাদে?'

ঘরে সুবীর ছিল, প্রতিবাদ করে উঠল। 'তোদের ইস্কুলে পড়ায়?'

'নাই বা পড়াল!'

'নাই বা পড়াল? তা হলে দুনিয়ার সমস্ত শিক্ষিকাই তোর দিদি?'

'বা, সম্মান করে কথা কইতে হবে না?' জয়ন্তী ফোঁস করে উঠল।

'তার জন্যে তুই দিদি বলবি? আমরা মাস্টারদের দাদা বলি? যখন ঘরে আসবে তখন তো বৌদিই বলবি?'

'এখন?'

'এখন কিছুই বলবি না। ওসব নাম মুখে উচ্চারণও করবি না।' সুবীর ভারিক্কি চালে বললে। 'তুই আদার বেপারী, তোর জাহাজের খোঁজে কী দরকার?'

আঁচল এলিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে নিয়ে নেমে গেল মৃণালিনী। বিজয়াকে ডাকল।

ঝণ্টু গেল তার মাকে খবর দিতে। বললে, 'ঠাকুমা কাকার নতুন বউ আনতে গেল—'

কচি আঙুলে কড় গুনে গুনে ছোট-ছোট যোগ করছিল সেণ্টু। সে হঠাৎ তার লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে ঝণ্টুর উপরেই তেরিয়া হয়ে উঠল। 'ভালো হবে না বলছি। ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব।'

'কেন, ওর ঠ্যাং খোঁড়া করবি কেন?' বন্দনা নিবৃত্ত করল ছেলেকে। 'যে আসবে তার ঠ্যাং খোঁড়া করবি। ও কী করেছে?'

যুক্তিটা বোধ হয় মেনে নিল সেণ্টু। লাঠি সরিয়ে রেখে আবার সে পেন্সিল নিয়ে বসল। হাতে রেখে যোগ করতে শেখেনি এখনো। তাই রিক্ত বাঁ হাতখানি পেতে এক রত্তি আঙুলে দুইটি বিচ্ছিন্ন সংখ্যার যোগফল খুঁজে বেড়াচ্ছে।

'ছোড়দিদিও গেল সেই সঙ্গে।' ঝণ্টু আরেকটু জুড়ল।

'সে কি? বিজুও গেছে? আমাকে নিয়ে গেল না কেন?' খাতা পেন্সিল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লুটিয়ে পড়ল সেণ্টু। 'আমরা কান্নার খোঁজ নিয়ে আসতে পারতাম। এতদিনে নিশ্চয়ই তার পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছে।'

'হ্যাঁ, অগ্নিপরীক্ষার পর এবার তার পাতাল প্রবেশ।' প্রশান্ত ঘরে ছিল, ছেলেকে তুলে নিয়ে বসিয়ে দিল বই খাতার সামনে। 'আর সে আসবে না।'

'না, না, আসবে।' আবার সেণ্টু চেঁচিয়ে উঠল।

'হ্যাঁ, আসবে।' সেণ্টুকে স্তোক দেবার জন্যে বন্দনা বললে। 'আর এসে একবারে সকলের মাথার উপরে বসবে। বিচারটা একবার দেখ।' স্বামীকে এবার সে লক্ষ্য করল। 'সিনিয়রের প্রমোশন নেই। ওপেন মার্কেট থেকে কোন একটাকে ধরে এনে টঙে বসিয়ে দিলে।'

'আজকাল এই রেওয়াজ।' প্রশান্ত বললে, 'শুধু খাতিরের শ্রীক্ষেত্র।'

'বলে কিনা আমাদের গুণ নেই। আর যে মাস্টারনী আসছে সে একেবারে গুণের গম্বুজ। যে আবিষ্কার করেছে সে নিজেও একজন গুণস্তম্ভ। টিকলে হয় ঝড়ে জলে। হ্যাঁ, কাকাজি হত, মুখে যাই বলি, মনে মনে মানতে হত একশোবার।'

'কিসে গেল ওরা?' বন্দনাকে [illegible] জন্যে ঝণ্টুকে জিজ্ঞেস করল প্রশান্ত।

ঝণ্টু বললে, 'ট্যাক্সিতে।'

([illegible])

নাট্যকার **কিরণ মৈত্রের**

চোরা-বালি (পূর্ণাঙ্গ) ২·০০

যা হচ্ছে তাই ২·০০

(শ্লেষ ও হাসির ২টী নাটক)

এক অঙ্কে শেষ ২·২৫

(শ্রেষ্ঠ ৪টী একাঙ্ক)

বিমল রায়ের

অসমাপ্ত ১·০০

গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতায় ও বেতারে অভিনীত)

সিটি বুক এজেন্সী

৫৫, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলি-৯

সদ্য প্রকাশিত

স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য

সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

স্বদেশী যুগের বিস্মৃতপ্রায় বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক পরিচয় নির্ণয়ের প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়), ভারতী, প্রবাসী, ভাণ্ডার, নবভারত, সাহিত্য প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে লেখক দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান রচনা উদ্ধার করেছেন। সে-সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন সাহিত্য-গ্রন্থের আলোচনার মধ্যেও অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের পরিচয় আছে। ঐতিহাসিক ঘটনা ও লেখক-পরিচিতি-প্রসঙ্গে নতুন তথ্যের পরিবেশন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা, পরিশিষ্টে বত্রিশটি দুষ্প্রাপ্য ও বিস্মৃতপ্রায় স্বদেশী গানের সংকলন এবং দুষ্প্রাপ্য ছবির এগারোখানি ব্লক গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। মূল্য দশ টাকা।

অ ন্যা ন্য ব ই

যমুনা-কী-তীর	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	উপন্যাস	৩·০০
জীবন বিচিত্রা	চিত্রগুপ্ত	„	৩·০০
দরদী শরৎচন্দ্র	মণীন্দ্র চক্রবর্তী	জীবনী	৪·৫০
ল্যাম্পপোস্ট যা বলেছে	যতীন্দ্র বিশ্বাস	রম্যরচনা	৩·০০
মনমর্মর	যতীন্দ্র বিশ্বাস	উপন্যাস	৪·০০

বসুধারা প্রকাশনী ৪২নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট : কলিকাতা-৬

চিত্র প্রদর্শনী

গত ৭ই নভেম্বর থেকে ১০ দিনের জন্যে ক্যাথিড্রাল রোডে আকাডেমী অব ফাইন আর্টস ভবনে শান্তিনিকেতনের আলোকচিত্রের একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন ইণ্ডিয়ান টিউব-এর কর্তৃপক্ষ এবং টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানীর প্রচার বিভাগ।

কলকাতার প্রখ্যাত আলোকচিত্রশিল্পী শ্রীশম্ভু সাহার ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে শান্তিনিকেতনে তোলা ১৫০টি ছবি এ প্রদর্শনীতে সংগ্রহ করা হয়। আলোকচিত্রগুলির বিষয়বস্তু বিবিধ। এর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় ১০টি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বড় বড় প্রতিকৃতি; যে প্রতিকৃতিগুলি সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও অত্যন্ত উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। এছাড়া, আমরা দেখতে পেলাম রবীন্দ্রনাথের কর্মব্যস্ত জীবনের শেষ অধ্যায়ের কয়েকটি আলোকচিত্র এবং শান্তিনিকেতনের ল্যাণ্ডস্কেপ ও কয়েকটি অনুষ্ঠানের ফটোগ্রাফ। জামসেদপুরের এস পি গাওয়াণ্ডের তোলা বর্তমানের শান্তিনিকেতনের কয়েকটি ফটোগ্রাফও দেখা গেল এ প্রদর্শনীতে।

শ্রী শম্ভু সাহা প্রায় চল্লিশ বছর আগে প্রথম শুরু করেন আলোকচিত্রশিল্পী হিসাবে তাঁর জীবন। তখন তাঁর হাতিয়ার ছিল একটি ভাঙগা হাফ-সাইজ প্লেট ক্যামেরা। সে সময় যে ঘরে ইনি প্রসেসিং-এর কাজ করতেন সে ঘরটিও একটি দেখবার জিনিস বটে। হাওয়া বাতাস নেই, আলো নেই, চটে মোড়া একটি ছোট্টঘর। লাল রং-করা চিমনি লাগানো একটি হারিক্যান জেবলে কোনও রকমে কাজ করতেন শিল্পী।

১৯২৫ সালে শ্রী সাহা মেদিনীপুরের কোনও কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ করে কলকাতায় আসেন কাজের সন্ধানে। ন্যাশনাল কাউন্সিল, ইয়ং মেনস্ ক্রিশ্চিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে ইনি প্রথম চাকরি পান। ১৯৩২ সাল থেকে ফ্রিলান্স ফটোগ্রাফার হিসাবে কাজ শুরু করেন। এই সময় এঁর অন্য সরঞ্জামগুলির সঙ্গে একটি রোলিফ্লেক্স ক্যামেরাও যুক্ত হয়। ক্রমে ইনি ফটোগ্রাফার হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন এবং মিনিয়েচার ক্যামেরা ওয়ার্ল্ড-এর কয়েকটি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করেন। এর কিছুকাল পরে শ্রী সাহা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পান এবং শান্তিনিকেতনে যান। সেখানে সি এফ অ্যানড্রিউজ এবং আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে এঁর পরিচয় হয়। সেই সময়ের তোলা ফটোগ্রাফের মালা সাজিয়ে এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন ইণ্ডিয়ান টিউব কোম্পানী এবং টাটা স্টীল-এর প্রচার বিভাগ। রবীন্দ্রনাথের মত এত নিখুঁত ফটোগ্রাফের উপযোগী মডেল্ শ্রী সাহা সারাজীবনে আর পাননি—এটা অবিশ্যি শ্রী সাহার নিজের মত।

এস পি গাওয়াণ্ডেরও যথেষ্ট খ্যাতি আছে ফটোগ্রাফার হিসাবে। ইনি জামসেদ-

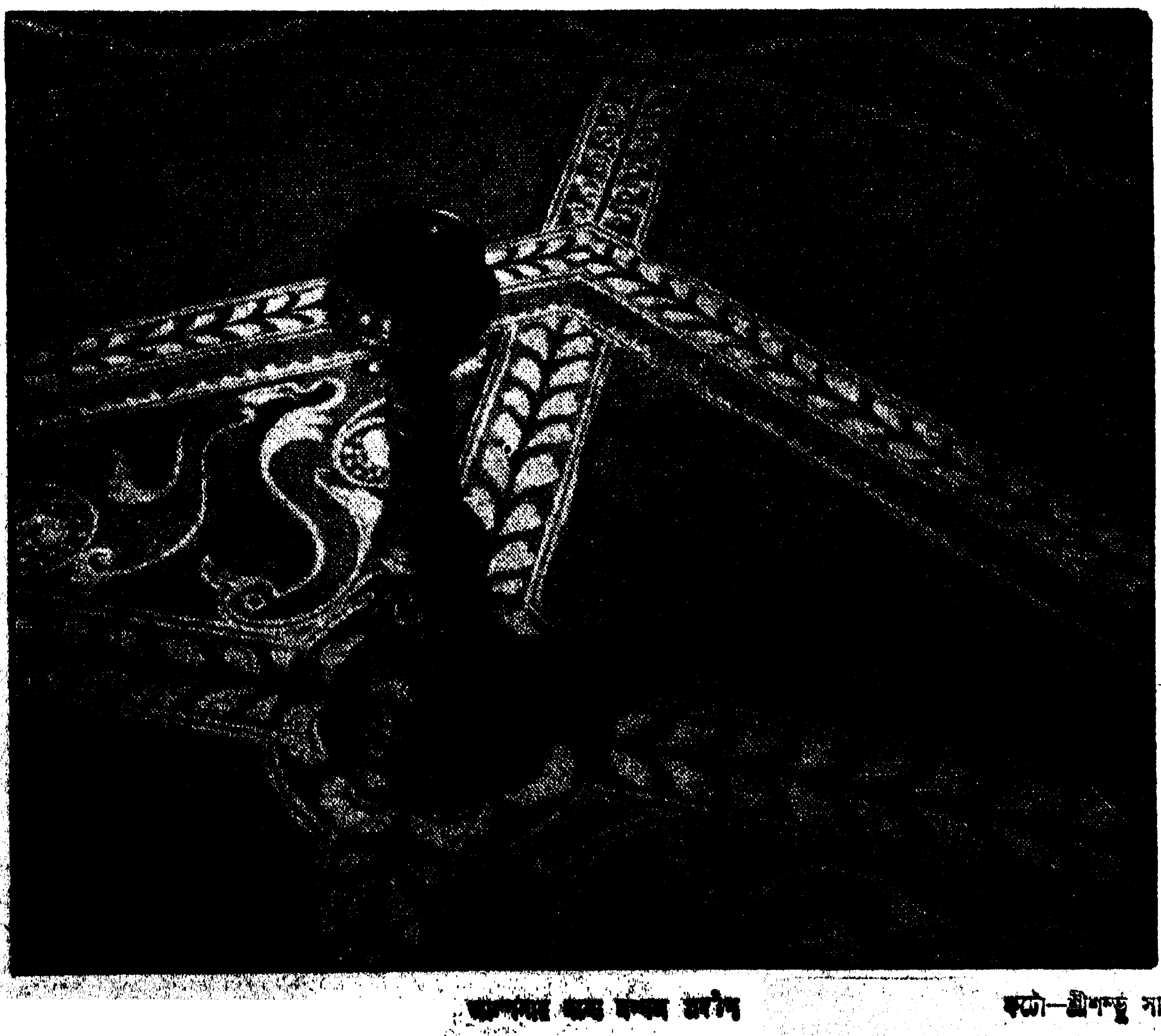

[illegible] ফটো—শ্রীশম্ভু সাহা

শ্যামলী ফটো—শ্রীশম্ভু সাহা

পুরের ফটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন অব ওয়েস্ট বেংগলের চেয়ারম্যান ছিলেন ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত। বরোদার কলাভবনে দু বছর চিত্রবিদ্যা চর্চা করার পর ইনি জে জে স্কুল অব আর্ট-এর ব্যবহারিক শিল্পের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ১৯৪৭ সালে সেখানকার 'ফেলো' নিযুক্ত হন, পরে লণ্ডনে যান উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে। সেখান থেকে ফিরে এসে কিছুকাল ইনি বোম্বাই শহরে প্রচার-শিল্পী হিসাবে কাজ করেন। বর্তমানে শ্রী গাওয়াণ্ডে টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানীর সংগে সংযুক্ত।

এ প্রদর্শনী দেখে রবীন্দ্রনাথ ও শান্তি-নিকেতন সম্বন্ধে বেশ একটা পরিষ্কার ধারণা করা সম্ভব হয় দর্শকদের পক্ষে। রবীন্দ্র-নাথের জীবনের একটি বিরাট অংশের এমন ব্যাপক প্রামাণ্য আলোকচিত্রের সংগ্রহ আর কখনও দেখা যায়নি। শ্রী সাহার তোলা ফটোগুলি থেকে জানতে পারা যায়, রবীন্দ্র-নাথ কিভাবে নানান অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন এবং কত গণ্যমান্য অতিথির শান্তি-নিকেতনে যাতায়াত ছিল। রবীন্দ্রনাথের সংগে মহাত্মা গান্ধী, সি এফ অ্যান্ড্রুজ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এবং আরও অনেকেরই ছবি এই প্রদর্শনীতে দেখতে পেলাম। বিশ বছর আগে শান্তি-নিকেতনের আশে পাশের জীবনযাত্রা, বাড়ি-ঘর এবং নৈসর্গিক দৃশ্যের শোভারও পরিচয় আমরা পেলাম এ প্রদর্শনীতে।

ফটোগ্রাফী 'আর্ট' পদবাচ্য কিনা—এ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হয়ে গেছে আগে, সুতরাং সে প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি এখানে করতে চাই না। তবে শম্ভুবাবুর প্রতিটি রচনাই নন্দনতত্ত্বের বিচারে যে রসোত্তীর্ণ সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই আমাদের। ইনি প্রমাণ করেছেন, ফটোগ্রাফী বিদ্যার অনুশীলনেও সৌন্দর্য চর্চার যথেষ্ট অবকাশ আছে। সুন্দর বস্তুর বা দৃশ্যের যথাযথ ফটোগ্রাফ গ্রহণ করলেই তা সুন্দর ফটোগ্রাফ হয় না। আমাদের চোখের দেখায় এবং ফটোগ্রাফীর দেখায় তফাত অনেক এবং এই তফাতগুলিকে কাজে লাগাতে পারলে ফটোগ্রাফীও আর্টের পর্যায়ে উঠতে পারে। তবে চিত্রকর যতটা স্বাধীনতা উপভোগ করেন আলোকচিত্রশিল্পী ততটা স্বাধীনতা উপভোগ করতে অবশ্যই পারেন না। কেননা, চিত্রকর বিষয়বস্তুর আনুষঙ্গিক অন্তরায়গুলি ত্যাগ করে কেবল সৌন্দর্য-টুকুরই বর্ণনা দিতে পারেন ব্যক্তিগত কেরা-মতির সাহায্যে। কিন্তু ফটোগ্রাফার-এর পক্ষে অবান্তর জিনিসগুলিকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়ে আলোকচিত্র রচনা করা খুব কঠিন কাজ। সেই কারণে বিষয় নির্বাচনে ফটোগ্রাফারকে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কিরকম আলোয়, কি অবস্থায়, এবং কতটা দূরত্ব থেকে ফটো তুললে মূল বিষয়টি পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত হবার সম্ভাবনা, কি উপায়ে অনাবশ্যক বিষয়ের আতিশয্যকে চাপা দেওয়া যায়, ফোকাসের বাইরে রেখে অথবা ছায়ায় ফেলে অবান্তর বিষয়গুলির প্রাধান্য কিভাবে সংযত করা যায়—এসব নানা বিষয়ে সম্যক বিচারশক্তি লাভ করা অনেক অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ। শ্রী সাহার যে সে অভ্যাস এবং অভিজ্ঞতা আছে তার প্রমাণ এ'র প্রত্যেকটি রচনাই। এ'র প্রত্যেকটি রচনাতেই উপাদানগুলি অত্যন্ত সুসংস্থিত। কোন রচনাতেই শৃংখলা ও সামঞ্জস্যের ছন্দপতন হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে করি, 'খোয়াই' (৩), 'সাঁওতালি মেয়ে' (৬), 'অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর' (২১), 'রামকিঙ্কর' (২২), 'চা চক্র' (৩১), 'ইন্দীরা' (৩২), 'রবীন্দ্রনাথ ও জওহরলাল' (৩৭), 'দ্বারিক' (৪৫), 'গরবা নৃত্য' (৪৮), 'শ্যামলী' (৬২), 'বনোমালি' (৬৩), 'বসন্ত উৎসব' (৮২) এবং (৮৩), 'বাউল' (১২০), 'কলাভবনে মহাত্মা' (১২৮) এবং রবীন্দ্রনাথের ১০টি বিখ্যাত প্রতিকৃতি।

ভারতের বিভিন্ন শহরে এই প্রদর্শনীটি দেখাবার ব্যবস্থা করছেন ইণ্ডিয়ান টিউব কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ। এই প্রচেষ্টার জন্যে প্রতিষ্ঠানটি অবশ্যই জনসাধারণের ধন্য-বাদার্হ হয়েছেন। ক্যাটালগ বিক্রি করে যে টাকা সংগ্রহ করা হচ্ছে তা বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসদন নির্মাণ উপলক্ষে দান করা হবে।

==== কিশোর সাহিত্য ====

—— প্রকাশিত হল ——

শেফালি নন্দীর লেখা

রাজকুমারী রূপরেখা ১·৫০

—— অন্যান্য বই ——

ভেরা চ্যাপলিনার
চিড়িয়াখানার খোকাখুকু ৪·০০
(জীবজন্তু সম্পর্কে মজার গল্প ও অনেকগুলি ফটোচিত্র বইখানিকে আকর্ষণীয় করিয়াছে)

স্যোমুস্কিনের
বরফের দেশে আইভ্যাম ১·৭৫
(মেরু দেশে একটি কিশোরের অভিযান)

ভেরা পানোভার
পিতা ও পুত্র ২·৭৫
(একটি শিশুমনের বিচিত্র ভাবনা কল্পনা সুখ দুঃখের কাহিনী)

মেটারের
সাথী ৩·০০
(রুশ দেশে কারিগরী বিদ্যা-লয়ের ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা-জীবন নিয়ে লেখা)

আলেক্সি তলস্তয়ের
নিকিতার ছেলেবেলা ৩·০০
(লেখকের ছেলেবেলার স্মৃতি-কথা)

শেফালি নন্দীর
পান্নাদ্বীপ ১·০০
(গল্পে আয়ার্ল্যাণ্ডের ইতিহাস)

পপুলার লাইব্রেরী ১৯৫।১বি, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

পুস্তক পরিচয়

প্রাচীন সাহিত্য

হিরণ্ময় পাত্র—জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী। প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—৪, টাকা।

বেদ-পুরাণ ভাগবত ভারতীয় সাহিত্যের রত্নভাণ্ডার। আজ এ-সংবাদ যতখানি সত্য বলে বিবেচিত হয়, তার চেয়ে কিংবদন্তীই বোধ হয় বেশী। তার জন্য আধুনিক কালের উচ্চশিক্ষিত পাঠকদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। খুব সম্ভব শিক্ষাপ্রণালীর গলদটাই এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। সংস্কৃত আজ একটি মৃত ভাষা, ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে তার প্রয়োজনীয়তাও বেশী কিছু নেই। ফলে সংস্কৃত সাহিত্য পাঠের উৎসাহ ক্রমে ক্রমে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। তবু অস্বীকার করে উপায় নেই, যে সংস্কৃত ভাষার ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে ভারত-বর্ষের সব কয়টি সাহিত্য তাকে জানবার প্রয়োজন কোনোদিনই ফুরোবে না। ভাষা বা সাহিত্য শিক্ষার জন্যই নয়, জীবনের বিচিত্রতাকে জানবার জন্যও বটে, কেননা, বেদ পুরাণ ভাগবত-রামায়ণ-মহাভারত কাহিনীর মধ্যস্থতায় মানুষকে জীবনের কথা শুনিয়েছে চিরকাল। অন্তত তার জন্যও এ-কাহিনীগুলোর সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার সামাজিক মানুষের। কখনও কখনও ছাত্রপাঠ্য হিসেবে কিছু কিছু কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে বাংলা ভাষায়, কিন্তু তা যথেষ্ট নয় এইজন্য যে, যে কথা পূর্ণবয়স্কদের পক্ষে অশোভন নয়, অথচ কিশোর পাঠকের পক্ষে অনধিগম্য, সে সব অনূদিত কাহিনীতে সে-কথা কাহিনী স্থান পায়নি কোথাও। তদুপরি তাদের পুনঃ প্রকাশ অন্তত সাহিত্যের মাধ্যমে ঘটেনি বিশেষ। সেদিক থেকে সুবোধ ঘোষের 'ভারত প্রেমকথা'ই পথিকৃৎ।

হিরণ্ময় পাত্র প্রাচীন সংস্কৃত কাহিনীর বাংলা ভাষার রূপান্তরমাত্র নয়, নতুন চেহারায় সার্থক সাহিত্যসৃষ্টিও। যে-কথা সাধারণ মানুষেরও, যে প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ অহরহ ব্যতিব্যস্ত—সে সব বিষয়েরই দার্শনিক প্রকাশ ঘটেছে এই গল্পগুলোর মধ্যে। বেদপুরাণের কোনো কাহিনীই নিরর্থক নয়—এবং সেখানে সুন্দরের পাশে কুৎসিত আলোর পাশে অন্ধকারকেও সমান মর্যাদায় স্থান দেওয়া হয়েছে—এবং তাদের শুভ পরিণতির ইঙ্গিতও আছে। সুতরাং হিরণ্ময় পাত্রের লেখক যদি এই গল্পগুলোর মধ্যে সেই কুৎসিত ও অন্ধকারকেই সুন্দর এবং আলোময় ক'রে তুলে ধরতে চেষ্টা করেন তা হলে অন্যায় কিছু করেননি। বরং এই প্রচেষ্টার জন্য পাঠকের কাছে ধন্যবাদের যোগ্য বলেই বিবেচিত হবেন। ধন্যবাদের যোগ্য এই কারণেও যে লেখক সত্যিকারের রসিক সাহিত্যিক, পণ্ডিত লেখক। বাংলা ভাষার যে কী প্রচণ্ড শক্তি তার পরিচয় হিসেবেও হিরণ্ময় পাত্র পাঠকের কাছে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ৩৯১।৬০

কিশোর সাহিত্য

ডাকাতের হাতে—অচিন্ত্যকুমার সেন-গুপ্ত। শ্রীপ্রকাশ ভবন, এ-৬৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২। আড়াই টাকা।

ডাকাতের হাতে—এই রোমাঞ্চকর উপন্যাসটি সাধু ভাষায় লেখা হলেও ছোটদের জন্যে লেখা। অন্তত ছোটদের নিয়ে লেখা, ছোটদের মন দিয়ে দেখে

ফোন : ৩৪-৫৭৬৭

সানাই

কার্তিক সংখ্যা বেরিয়েছে
দাম এক টাকা মাত্র
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সম্পূর্ণ উপন্যাস

দুইতীর, এক নদী

এক আদর্শবাদী তরুণের জীবনে দুটি জ্যোতির্ময়ী নারীর আত্মত্যাগের মহৎ কাহিনী। কথাশিল্পী শচীন্দ্র-নাথের এই নবতম শিল্পকৃতি সাহিত্যের দরবারে সম্মানিত আসন লাভ করবেই। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে এর দাম হবে অন্তত চার টাকা।

এ ছাড়া আছে সানাই-এর সমস্ত নিয়মিত বিভাগ ও অজস্র ছবি।

দি ম্যাগাজিন সিণ্ডিকেট
২০৩/৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,
কলকাতা-৬

(সি ৯৪০৫)

উল্লেখযোগ্য ৭টি বই

উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবীর
উত্তরলিপি
দাম—৪,

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের
তারার আঁধার
দাম—৩৷৷৹

বিমল করের
মল্লিকা
দাম—৩,

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বৈশালীর দিন
দাম—৩।৹

বারীন্দ্রনাথ দাশের
দুলারীবাঈ
দাম—৪,

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
কস্তুরীমৃগ
দাম—৪,

গল্প সংকলন

সন্তোষকুমার দে-র
রক্তগোলাপ
দাম—৩,

পরিবেশক : ত্রিবেণী প্রকাশন
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিঃ-১২
মফঃস্বলের অর্ডার : কথাকলি
১, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিঃ-৯

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় প্রণীত

রাহু ও রবি (যন্ত্রস্থ)

প্রজাপৎ ঋষি ৩·০০

ওপার-কন্যা ৩·০০

আকাশ-বনানী জাগে ৩·০০

ধরণীর ধূলিকণা ৩·৫০

পথের ধুলো ৪·০০

ধুলো রাঙা পথ ৩·৫০

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

মহাদান ৫·০০

শ্রীমন্ত সওদাগর প্রণীত

সন্ধিলগ্ন ২·৫০

বিশ্বনাথ পাবলিশিং হাউস

৮নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা।

লেখা। এবং সচরাচর রোমাঞ্চকর উপন্যাস, ছোটদের জন্যে লেখা বাংলা উত্তেজক উপন্যাস যে-রকমটি হয়ে থাকে, অর্থাৎ চরিত্র-সৃষ্টি কার্যকারণ সম্পর্কে উদাসীন থেকে অঘটন-ঘটন-পটিয়স কৃতিত্বের যে পরিচয় পাতায় পাতায় ছড়ানো হয়ে থাকে, 'ডাকাতের হাতে' তার ব্যতিক্রম। কর্ণফুলি নদীতে নৌ-ডাকাতির একটি সাধারণ কাহিনী। অমরেশবাবু নামক এক ভদ্রলোক সপরিবারে ডাকাতের হাতে পড়েন এবং তিনি ও তাঁর স্ত্রী কোনগতিকে অক্ষতদেহে রক্ষা পান। তাঁর ছেলে এবং মেয়ে, অনিল ও বুলুকে ডাকতেরা হরণ করে নিয়ে যায়। সনেটের দ্রুতগতি পূর্ব-নির্ধারিত শেষার্ধের মত গোয়েন্দা কাহিনীর এর পর থেকে উদ্ধার-পর্ব শুরু হয়ে থাকে। এখানে তা হয়নি। ডাকাতের বিরুদ্ধে কোন দুর্ধর্ষ চ্যালেঞ্জ নেই, একটি ছোট্ট মেয়ে অতি সহজে ডাকাতদের সমস্ত চ্যালেঞ্জকে বানচাল করে দিয়েছে। বিসর্জনের অপর্ণার মত বুলুর ভূমিকা। ডাকাত সর্দার গণেশের চরিত্রটি মানবিক গুণে আকর্ষণীয় হয়েছে। উপন্যাসটি আমাদের ভালো লেগেছে।

৪২৭।৬০

উপন্যাস

কেরল সিংহম্। কে এম পানিক্কর। অনুবাদঃ বোম্মানা বিশ্বনাথম্। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ছয় টাকা।

প্রাদেশিক সাহিত্যের অনুবাদের প্রয়োজন স্বীকার করে আলোচ্য গ্রন্থকে স্বাগত জানাই। লেখক সর্দার পানিক্কর জাতীয় জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে পরিচিত হলেও সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর খ্যাতি বাঙালী পাঠকের অজ্ঞাত। 'কেরল সিংহম্' লেখক ও পাঠকের মধ্যে পরিচয়ের সুযোগ বিস্তৃত করল।

মূল উপন্যাসটি মালয়ালম ভাষায় রচিত। কাহিনী ঐতিহাসিক। বিদেশী শাসকদের অধিকার স্থাপন চেষ্টায় বাংলা দেশ ছাড়াও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে নানারকম প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল। কেরল তন্মধ্যে অন্যতম। একটি প্রেম-মধুর গতিবান কাহিনীর মধ্য দিয়ে শ্রীযুত পানিক্কর কেরলের রাজা ও জনগণের স্বাধীনতা রক্ষার ইতিবৃত্ত উপস্থিত করেছেন।

অনুবাদক শ্রীবিশ্বনাথম্ বাঙালাভাষী নন; কিন্তু ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যের কিছু কিছু বাংলায় অনুবাদ করে পরিচিত হয়েছেন। 'কেরল সিংহম' তাঁর আপাতত শ্রেষ্ঠ ও সার্থক প্রয়াস বলা যায়। বলতে দ্বিধা নেই, বাংলা ভাষায় তিনি একটি ঈর্ষণীয় রচনাভঙ্গী আয়ত্ত করেছেন। তবে শব্দ ব্যবহারে ও বাক্য-গঠনে তিনি এখনো কোথাও কোথাও যথাযথ নন। এই ত্রুটির কথা বাদ দিলে 'কেরল সিংহম' অনুবাদের স্বচ্ছন্দ সাবলীলতায় দৃষ্টান্ত হবার দাবি রাখে। বিশ্বনাথনকে ধন্যবাদ; অনুবাদ সাহিত্যের প্রসারে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আমাদের গৌরবের বস্তু। গ্রন্থটি সুদৃশ্য, সুমুদ্রিত।

৩০১।৬০

অপরাহ্ন—বিমল কর। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম তিন টাকা।

শুধু আকৃতির দিক থেকেই নয়, প্রকৃতিগতভাবেও অপরাহ্ন যথার্থ উপন্যাস শ্রেণীর মধ্যে পড়ে না। নভেলেট বা উপন্যাসিকার মত এই স্বল্পায়তন কাহিনীটি প্রায় নাট্যোপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে। চারটি চরিত্রকে বেছে নিয়ে সেই চার চরিত্রের স্বগত বিবৃতিকে কেন্দ্র করেই একটি বিষাদ-করুণ পারিবারিক আখ্যান গড়ে উঠেছে। অপরাহ্নের পূর্বজন্মের আর-একটি স্মরণীয় উপন্যাস আছে, [illegible] দিক থেকে যার কথা স্বভাবতই মনে আসে। সেটি রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরে। সেখানে তিন চরিত্র, এখানে চার। সেখানেও স্বগতোক্তি, এখানেও। কিন্তু দুয়ের [illegible]

এ. পি'র বই

গুণময় মান্না প্রণীত সুবৃহৎ উপন্যাস নতুন বিস্ময়

'যন্ত্র-জীবনের একটি মহাকাব্য'

জুনাপুর স্টীল

স্নেহাস্পদেষু,

তোমার 'জুনাপুর স্টীল' উপন্যাসটির প্রথম খণ্ড পড়লাম। গ্রন্থটি আয়তনে বিরাট ও আধুনিক শ্রমশিল্পজীবনের একটি সর্বাংগীন মহাকাব্যোচিত কাহিনী। তুমি যেভাবে এই বিরাট পটভূমিকাকে তথ্য ও বিচিত্র জীবনলীলার বিবরণ দিয়ে পূর্ণ করেছ তাতে তোমার কল্পনাসমৃদ্ধি ও জীবনবোধের প্রসারের চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায়। তুমি শুধু যন্ত্রের কথাই বল নি, এই যন্ত্র ব্যবস্থায় মানবমনের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াটিও সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছ। কলকারখানার নিয়ম নিগড়ে বাঁধা শ্রমব্যবস্থার সংগে পারিবারিক জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশটিও নিপুণভাবে মিশেছে। বিরাট কারখানার ছায়াতলে এবং ওরই ছন্দের সংগে তাল রেখে এক নিজস্ব মানবিক জীবনও আপন নিগূঢ় রহস্যকে বিকশিত করতে চেয়েছে। অন্যান্য যন্ত্রজীবন-সংক্রান্ত উপন্যাসের সংগে তুলনায় মানবিক রসের সংমিশ্রণই তোমার উপন্যাসটিকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে।

আমি আশা করি যে এই বিরাট উপন্যাসটি যখন সম্পূর্ণ হবে তখন ইহা যন্ত্র-জীবনের মহাকাব্যরূপে স্বীকৃতি লাভ করবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

খালেদ চৌধুরী অংকিত প্রচ্ছদ ও মূল্যবান বাঁধাই

দাম ১০·০০

প্রকাশিত হ'ল ॥

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নতুন সাহিত্যকীর্তি ॥ লাজবতী ২·০০

শান্তিকুমার ঘোষের অনুপম গ্রন্থ ॥ অন্য এক সমুদ্র ২·০০

এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স, এ/৯, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ১২

প্রভেদ অনেক। প্রথমত সে-উপন্যাসটি লিরিকধর্মী, তার স্বগত- বাচন অনেকটা ডায়েরী পদ্ধতিতে, কাহিনীর গল্পাংশকে ধারাবাহিক অগ্রসৃতি দিয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের বীজ সেখানে থাকলেও বর্তমান উপন্যাসটি সম্পূর্ণতই মনস্তত্ত্ব নির্ভর। এখানে গাল্পিক কাঠামো নেই বললেই চলে। চারটি চরিত্রই প্রস্ফুটিত হয়েছে একটি সঙ্কট-সংঘাতময় মুহূর্তে, যাকে উচ্চচূড় নাটকীয় মুহূর্ত বলতে পারি।

তাছাড়া বিষয় নির্বাচনেও এটি বর্তমান-কালের একটি অনুচ্চারিত বক্তব্যকেই প্রতিধ্বনিত করেছে। নানা মানুষের জীবনে নানা মূর্তিতে প্রেম দেখা দিতে পারে, দেখা দেয়ও। একটি মহিলার চল্লিশ বছর বয়সে, যখন কর্তব্যে কর্তব্যে তিনি প্রায় রুদ্ধশ্বাস, যখন স্বামী সুদূরকালের বিগত স্মৃতি-মাত্র, কিংবা স্মৃতিও নয়, সেই সময় প্রেম এলো তার জীবনে। সদ্য আরোগ্য, মধ্য-বয়সী, ক্লান্ত, নিঃসঙ্গ অবিনাশবাবু এলেন। চারটি দৃষ্টিকোণ থেকে এ-প্রেমের চেহারা আলাদা। কোথাও স্বার্থপরতায়, নির্লজ্জতায় কুৎসিত, কোথাও মৃত্যুর মত অনিবার্য, সহজ, অমীমাংসিত। এটি প্রেমের উপন্যাস নয়, প্রেমের সমস্যার উপন্যাস। পারিবারিক শান্তি, বিশ্বাস, সহ-অবস্থানের মধ্যে হয়ত এ-প্রেম জায়গা করে নিতে পারে না, কিন্তু মনের মধ্যে একে অস্বীকার জানাবার উপায় কোথায়।

শ্রীযুত বিমল করের অন্তরবিশ্লেষণ, বর্ণন এবং গদ্যরীতিটি ঈর্ষণযোগ্য। নামকরণ সুন্দর। ২৯৪।৬০

ভ্রম সংশোধন

মহাশয়,

বর্তমান সপ্তাহের 'দেশ' পত্রিকার 'প্রসঙ্গত' বিভাগে আমাকে 'বেঙ্গল থিওসফিক্যাল সোসাইটি'র সভাপতি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আমি উক্ত সংস্থার সভাপতি নই, এমনকি উহার সহিত আমার কোন সংস্রবই নাই।

এই সংশোধনটুকু আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশ করিলে বাধিত হইব। ইতি—ভবদীয় শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী।

প্রাপ্তি সংবাদ

স্মৃতিচারণ (১ম ও ২য় পর্ব)—শ্রীদিলীপ-কুমার রায়।

হাস্নুহানা—শিবরাম চক্রবর্তী।

মাটির পথ—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

একটি জীবন—ডাঃ অতুলচন্দ্র লাহিড়ী।

আমার জীবন (৩য় খণ্ড)—শ্রীভারতী দেবী।

আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য—শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ।

উত্তরস্যাং দিশি—বিজন চক্রবর্তী।

নতুন করে পাওয়া—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

রোমান্টিক কবিতা—উৎপল মিত্র।

নজরুল চরিত-মানস—ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত।

অনেক সন্ধ্যা, একটি সন্ধ্যাতারা—বারীন্দ্রনাথ দাশ।

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

মনোজ বসুর ভ্রমণ-কথা

ভ্রমণ-কথার হাত ধরে চলেছে কাহিনী, কাহিনীকে পাশে রেখে চলেছে ভ্রমণ। অনাবিল প্রসন্নতার আলোয় প্রতিটি পৃষ্ঠা ঝলমল করছে।

সোবিয়েতের দেশে দেশে (২য় মুদ্রণ) ৬·০০

মনোজবাবুর সোবিয়েতের দেশে দেশে আমাদের মত গৃহকোণে আবদ্ধ জীবদের ভ্রমণের পিপাসা মেটায়, বৈঠকী গল্পের ক্ষুধা মেটায়, প্রচণ্ড বিতর্ক ও কৌতূহলের বস্তু সোবিয়েত দেশ সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য জানিয়ে দেয়। - - - (স্বাধীনতা)

চীন দেখে এলাম ১ম ও ২য় পর্ব ৩·০০/৩·৫০

নতুন ইয়োরোপ : নতুন মানুষ (২য় মুদ্রণ) ৫·০০

পথ চলি (সদ্যপ্রকাশিত ৩য় মুদ্রণ) ৩·০০

বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড : কলিকাতা বারো

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

মনের মানুষ

তিন টাকা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বহু যুগের ওপার হতে — দু টাকা

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

বিবেকানন্দ চরিত — পাঁচ টাকা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তিন শূন্য — তিন টাকা পঞ্চাশ

ছেলেদের বিবেকানন্দ — এক টাকা পঁচিশ

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী

রবীন্দ্র মানসের উৎস সন্ধানে — তিন টাকা পঞ্চাশ

সুবোধ ঘোষ

ভারত প্রেমকথা — ছয় টাকা

সরলাবালা সরকার

গল্পসংগ্রহ — পাঁচ টাকা

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন

চিন্ময় বঙ্গ — চার টাকা

লিপিকার বই

বিদুষক : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : দুই টাকা পঞ্চাশ

সাহিত্যের সত্য : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : দুই টাকা পঞ্চাশ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা — ৯

রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

অসামান্য ও অনবদ্য

চিত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজেন তরফদার প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিলেন "অন্তরীক্ষ" ছবিটি দিয়ে। সেদিনকার সেই সচেতন শিল্পীর মধ্যে যে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দেখা গিয়েছিল, তা-ই আজ এক বিস্ময়কর পরিপূর্ণতা লাভ করেছে তাঁর দ্বিতীয় শিল্প-সৃষ্টি "গঙ্গা"তে। সিনে আর্ট প্রোডাকশন্স-এর পতাকাতলে তৈরী রাজেন তরফদারের এই অসামান্য ছবি বাংলা চলচ্চিত্রপটকে আবার নতুন করে মহৎ শিল্পের মর্যাদায় অভিষিক্ত করল।

সুখ্যাত কথাসাহিত্যিক সমরেশ বসুর "গঙ্গা" উপন্যাস এই ছবির অবলম্বন। সারা বছরের মধ্যে মাত্র তিন মাস সময় যাদের কাটে ঘরে, আর বাকী দিনগুলিতে যারা ভেসে চলে গঙ্গার জোয়ার-ভাটায়—পশ্চিম বাংলার সেই

"গঙ্গা"র পরিচালক রাজেন তরফদার।
ফটোঃ অলক মিত্র।

জেলেদের বিচিত্র ও রোমাঞ্চপূর্ণ জীবনধারা, তাদের বিশ্বাস ও সংস্কার, আশা ও নিরাশা, সুখ ও দুঃখের এক নাট্য-প্রামাণিক কাহিনী ছবিটিতে রূপায়িত।

কাহিনীর নায়ক বিলেস, পাঁচু মালোর ভাইপো সে। বিলেস গাঁয়ের সেরা জোয়ান, ডানপিটে। কারোর তোয়াক্কা করে না সে, এমনকি নিজেদের সমাজে প্রচলিত সামাজিক সংস্কার ও ধর্মবোধ, রীতি-নীতি কিছুই সে মানতে চায় না। যে মহাজনের প্রতাপের কাছে তার বাপ-দাদা চিরকাল মাথা নুইয়ে এসেছে, তার মহাজনী কর্তৃত্ব বিলেসের কাছে অসহ্য। তাই বিলেসকে নিয়ে তার খুড়ো পাঁচু মালোর উদ্বেগ ও অশান্তির অন্ত নেই। তার ওপর পাঁচু যেদিন শুনল যে বিলেস সমুদ্রে যাবার জন্যে অস্থির, সেদিন পাঁচুর মন আতংকে ভরে উঠল। কারণ ঠাকুরমশায় বলে গেছেন, তাদের বংশের কেউ কোনদিন সাগরে মাছ ধরতে গেলে সর্বনাশ হবে।

পাঁচুর মনে পড়ে সাগরে মাছ ধরতে গিয়ে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারেনি তার দাদা নিবারণ। সারাদিন অনেক খুঁজে সাগর-পারের এক জংগলে সে আবিষ্কার করেছিল নিবারণের রক্তমাখা গামছা আর কাদার ওপর বাঘের পায়ের ছাপ। সেই সর্বনাশা দিনটির কথা ভেবেই আঁতকে ওঠে পাঁচুর মন। নিবারণেরই ছেলে বিলেস। যে-ভাবেই হোক বিলেসকে ঘরে বাঁধতে হবে। গামলী পাঁচীর মুখ ভেসে ওঠে পাঁচুর মনে। বিলেসকে ভালবাসে গামলী। কিন্তু গামলীর মনের খবর রাখবার অবসর'ও বুঝি নেই বিলেসের। তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে অকূল দরিয়া।

গঙ্গায় মাছ ধরার মরসুম সাঙ্গ করে ফিরে এসেই বিলেসের সঙ্গে গামলী পাঁচীর বিয়ে দেবে, পাঁচু মনে মনে স্থির করে। বিলেস খুড়োর সংগে রওনা হয় গঙ্গা-যাত্রায়। নোঙর তুলে নৌকো ভাসিয়ে দেয় সে। ঘাটে দাঁড়িয়ে চোখের জলে তাকে বিদায় জানায় গামলী পাঁচী।

বিলেসের নৌকো গঙ্গার বুক বেয়ে গিয়ে নোঙর ফেলে অন্য এক ঘাটে। সেখানে রয়েছে পাঁচুর বহুদিনকার মহাজন দামিনী। দামিনী মেয়ের পয়সাতেই ব্যবসা চালাত। তার মেয়ে মারা যাবার পর ব্যবসার ভার তুলে নিয়েছে তার নাতনী হিমি। সাজতে ভালবাসে হিমি, খোঁপায় সে ফুল গোঁজে, পায়ের মল ঝমঝমিয়ে সে নদীর ঘাটে নেমে আসে। নূপুরের নিক্কণ অনুরাগের প্রতিধ্বনি তোলে বিলেসের মনে। আর বিলেসের সুঠাম দেহ ও ঝাঁঝালো কথা নেশা জাগায় হিমির মনে। বিলেসের কথা শুনে হিমি মুখ টিপে হাসে, হেসে তাকে বলে "ঢপ"। বিলেসের দেহ-মন সুখের হিল্লোলে কেঁপে ওঠে। ঘাটে মাছ বেচা-কেনার সংগে সংগে চলে হিমি ও বিলেসের মন দেয়া-নেয়া।

খুড়ো পাঁচুর মন রাগে জ্বলে ওঠে বিলেসের এই প্রেমবিলাসে। হিমির কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায় [illegible] বিলেসকে। কিন্তু দুরন্ত যৌবন কোন বাধাই মানে না। বিলেসের কাছে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করে দেয় হিমি, বিলেস তাকে বুকে তুলে নেয়।

ওদিকে গঙ্গায় আসে "টোটা", [illegible] দুর্ভিক্ষ। অনাহার ও রোগভোগে [illegible]

গান্ধী স্মারক নিধির দু'খানি বিশিষ্ট বই

সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গান্ধী-দর্শন ও সর্বোদয় আদর্শের বিশ্লেষণমূলক একখানি চমৎকার গ্রন্থ। তদুপরি এই গ্রন্থে বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার বিবর্তন ও অগ্রগতির ইতিহাস সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে।

"বাংলা ভাষায় এ জাতীয় বই একেবারেই ছিল না। সেদিক থেকে বইটি বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।"—আনন্দবাজার পত্রিকা

মূল্য ২.৫০ ন. প

গান্ধীজীর ন্যাসবাদ

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু সংকলিত

মহাত্মাজীর ন্যাসবাদ বা অছিবাদ তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা।

মূল্য ৫০ ন. প.

প্রস্তুতির পথে

গান্ধীজীর—

১। গীতাবোধ ২। পল্লী-পুনর্গঠন ৩। সর্বোদয়

॥ ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ॥

পাঁচুর শরীর ভেঙে পড়ে। তারপর গঙ্গার বুকেই একদিন সে চোখ বোজে। মরবার আগে সে বিলেসকে সাগরে যাবার অনুমতি দিয়ে যায় এবং বলে যায়, হিমি মাছমারার ঘরে বউ হয়ে আসতে চাইলে সে যেন তাকে গ্রহণ করে। বিলেস তার সব চাওয়াই পায়, কিন্তু হারায় সব চাইতে আপনজন তার খুড়োকে।

খুড়োর শেষ কথা বিলেস জানায় তার জাতভাইদের। সাগরে যাবার জন্যে সকলকে সে অনুপ্রাণিত করে তোলে। হিমি এসে দাঁড়ায় তার পাশে। বিলেসের ঘরে ঘরণী হয়ে আসবে হিমি। কিন্তু হিমি'কে বিলেসের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করে তার দিদিমা। দামিনী বলে হিমিকে, সর্বনাশের রক্ত ওর গায়ে। নিজের জীবনের কাহিনী শোনায় দামিনী তার নাতনীকে। বিলেসের বাবা নিবারণের আগুনে নিজেকে পুড়িয়েছিল একদিন দামিনী। দামিনী বলে, তার পাপেই নাকি নিবারণ অকালে প্রাণ-হারায়। হিমি'কে সে বলে, ড্যাংগা ও জলে মেলামেশা থাকে, কিন্তু এক সংগে কোনদিন মিশে যেতে পারে না।

দামিনীর সাবধান-বাণী বুঝি এক অজানা আশংকায় হিমির মনকে নাড়া দিয়ে যায়। পাপের রক্ত তার শিরা-উপশিরায়। সে কী পারবে বিলেসকে অমংগলের হাত থেকে বাঁচাতে? ঘরে ফিরে যাবার জন্যে তৈরী হয় বিলেস। হিমি কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘাটেই থেকে যায়—ঘাটে দাঁড়িয়েই সে অপেক্ষা করে থাকবে তার প্রিয়তমের জন্যে। বিলেস বলে যায়, প্রতি জোয়ারের টানে সে ভেসে আসবে হিমির কাছে, এসে যেন তার দেখা পায়। গংগার বুকে প্রাণপদ্ম ভাসিয়ে দেয় হিমি, আর অপেক্ষা করে থাকে কবে আবার তা গংগার তরংগে দুলে দুলে ভাসতে ভাসতে ভিড়বে এসে তার ঘাটে।

"গংগা"র কাহিনী চিত্রনাট্যকার পরিচালক রাজেন তরফদারের অসাধারণ প্রয়োগ-নৈপুণ্যের গুণে এক অপরূপ রসমাধুর্যে নিয়ে রজতপটে উপস্থিত হয়েছে। মৎস্য-জীবীদের প্রাত্যহিক জীবনচর্যার আনন্দ ও উন্মাদনা, সংশয় ও সংস্কার, আশা ও বঞ্চনা'কে উপজীব্য করে শ্রীতরফদার ছবিতে একদিকে যেমনি এক দুর্বার নাট্যাবেগ সৃষ্টি করে তুলেছেন, অপরদিকে তেমনি একটি বিশেষ সমাজ-জীবনের মনোময় ও রূপময় প্রামাণিক পরিচয়টি অপূর্বভাবে তুলে ধরেছেন পর্দার বুকে। যে অতুলনীয় সম্পদে ছবিটি শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের শিল্পকীর্তিগুলির মধ্যেও অনন্য তা হল এর কাহিনী বিন্যাসে প্রামাণিকতা ও প্রাণাবেগের স্বতঃস্ফূর্ত রস-মিলন। মৎস্যজীবীদের প্রাত্যহিক জীবন-যাপনের অন্তরালে তাদের অপরাজিত জীবনীশক্তির যে প্রাণধারা সুখ-দুঃখের জোয়ার-ভাটার নিত্য আলোড়িত তার সংযত ও শাণিত রূপধারায় সমস্ত ছবিটি আভিনন্দ

আপনারা অনেকেই চেয়েছিলেন-

স্যুটিং

দেখতে। কিন্তু স্টুডিওতে আপনাদের নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাতে কাজের অসুবিধা হয়। তাই আমরা আমাদের ফটো-গ্রাফারদের পাঠিয়েছিলাম বিভিন্ন ছবির স্যুটিং-এর ছবি তুলে আনতে। এমন কি কোলকাতার বাইরেও। এর জন্য প্রচুর অর্থব্যয় এবং প্রভূত শ্রমস্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু আপনাদের মনস্তুষ্টির জন্যে তাতেও আমরা কুণ্ঠিত নই। আমাদের ফটোগ্রাফারেরা আপনাদের স্যুটিং দেখাবার জন্যে যে সমস্ত ছবি ও খবর এনেছেন সেগুলি হ'ল:

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'সমাপ্তি', দিলীপ নাগ পরিচালিত 'নেকলেশ', অসিত সেন পরিচালিত 'স্বরলিপি', অরূপ গুহঠাকুরতা পরিচালিত 'বেনারসী', ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত 'কোমল গান্ধার', মনোজ ভট্টাচার্য পরিচালিত 'ডাইনী', অগ্রদূত পরিচালিত 'অগ্নি সংস্কার', নির্মল মিত্র পরিচালিত 'কাঞ্চনমূল্য', সুশীল মজুমদার পরিচালিত 'কঠিন মায়া', শ্যাম চক্রবর্তী পরিচালিত 'খনা', বিকাশ রায় পরিচালিত 'কেরী সাহেবের মুন্সী', সরোজ কুমারী পরিচালিত 'চেনা অচেনা', হেমচন্দ্র চন্দ্র পরিচালিত 'নতুন ফসল', প্রমোদ লাহিড়ী পরিচালিত 'নফর সংকীর্তন', মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত 'পংকতিলক'

এছাড়া যে সমস্ত ছবির স্থিরচিত্র ছাপা হয়েছে সেগুলি হ'ল:

অজয় কর পরিচালিত 'শুন বরনারী', দিলীপ বসু পরিচালিত 'সরি ম্যাডাম', পিনাকী মুখার্জী পরিচালিত 'মধ্যরাতের তারা', শ্রীজয়দ্রথ পরিচালিত 'বিষকন্যা', পান্না সেন পরিচালিত 'ষষ্ঠীপদর সংসার'

এর সংগে থাকবে কালিন পাল প্রেরিত বোম্বাই স্টুডিওর অনেক ছবি।
সর্বমোট ছবি থাকছে ১১১খানি।

অগ্রহায়ণ সংখ্যা উল্টোরথ

দাম পাঁচ সিকা ॥ [illegible]ত হবে ২২শে নভেম্বর

লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের

অঙ্গার

মিনার্ভা থিয়েটারে

প্রতি বৃহস্পতি ও শনি ৬৷৷
রবি ও ছুটীর দিন ৩ ও ৬৷৷
(সি ৯৩৯৩)

হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে ছবিটি ভাস্বর হয়ে উঠেছে বাস্তবের সর্বতশ্চক্ষু রূপদর্শনে। সমষ্টিগত জীবনযাত্রার এমন নিখুঁত পরিবেশ ও পরিমণ্ডল এর আগে যেমনি বাংলা ছবিতে দেখা যায়নি, তেমনি বাস্তবের সঙ্গে ভাবের, প্রামাণিকতার সঙ্গে প্রাণস্পন্দনের, বস্তুতথ্যের সঙ্গে জীবননাট্যের এমন মরমী হরপার্বতীমিলন বাংলা চলচ্চিত্রপটে এর আগে আর রূপ নেয়নি। সেদিক দিয়ে রাজেন তরফদারের এই ছবি মহৎ চলচ্চিত্রের অন্যতম সংজ্ঞা হয়ে থাকবে।

ছবিটির শিল্পশোভনতা দর্শকদের নিমেষে স্তব্ধ ও বিস্মিত করে রাখে। নদীর বুকে ঝড়ে-জলে মাছমারাদের মাছ ধরার দৃশ্য ও গঙ্গার নয়নবিমোহন নিসর্গরূপ ছবিটিতে আশ্চর্য সুন্দরভাবে রূপায়িত। তা বাদে পরিচালক মাছমারাদের বৈচিত্র্যময় জীবনধারার রূপ—প্রতিবেশীর সঙ্গে তাদের দাঙ্গা, নৌকা-বাইচ, যুবক-যুবতীদের নিত্যকর্ম ও অবসরবিনোদন প্রভৃতি একান্তভাবে বাস্তবানুগ করে তুলেছেন। স্থলে ও জলের বিভিন্ন দৃশ্য গ্রহণে এবং বিভিন্ন নাট্যমুহূর্তে ও পরিবেশ উপস্থাপনে নানাপ্রকার দৃশ্যকোণ রচনায় পরিচালক ছবিটিকে যেভাবে রূপাঢ্য ও বর্ণাঢ্য করে তুলেছেন তার তুলনা বাংলা ছবিতে বিরল।

ছবিটির সর্বাঙ্গীন শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে এ
কাহিনী বিন্যাসের ছোট-খাটো দুর্বল
সহজেই ঢাকা পড়ে যায়। ছবির দ্বিতীয়া
নায়ক-নায়িকার প্রেমোপাখ্যানের বিন্যা
একই নাট্যপরিবেশ ও দৃশ্যের পুন
পৌনিকতা ছবির গতিকে কিছু
মন্থর করে দেয়। নায়ক-নায়িকার মা
প্রেমোন্মেষের ব্যঞ্জনা হিসাবে ছবিতে মৃদ
মলয়ে হিন্দোলিত যে রাশি রাশি ফুল
ফুলগাছ দেখানো হয়েছে অনুরূপ দৃশ্য এ
বিশিষ্ট পরিচালকের একটি সাম্প্রতি
হিন্দী ছবিতে ইতিপূর্বে দেখা গেছে। এ
ধরনের সাদৃশ্য "গঙ্গা"র মত ছবি
অপ্রত্যাশিত ও অবাঞ্ছিত। সাগরে যাও
নিয়ে নায়কের মুখে ছবির শেষে
উদ্দীপনাময় সংলাপ জুড়ে দেওয়া হয়ে
ছবিতে তা কিছুটা রসহানি ঘটিয়েছে।

অভিনয়ের দিক দিয়ে ছবিটি বিশি
সম্পদে ভূষিত। নায়ক বিলেসের চরিত্র
নিরঞ্জন রায়ের অভিনয়ে প্রাণবন্ত হ
উঠেছে। চরিত্রটির মূল প্রাণধর্ম, স্বভা
রুচি, বৈশিষ্ট্য ও দৃষ্টিভঙ্গি তি
অসাধারণ দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছে
কৃত্রিমতাবর্জিত সহজ সরল প্রণয়ের অ
ব্যক্তিও তাঁর অভিনয়ে সুপরিস্ফুট। প
মালোর ভূমিকায় জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ত
অনিন্দ্যসুন্দর অভিনয়ে দর্শকদের মন হ
করে নেন। চরিত্রটিকে তিনি হাবে-ভা
কথায় ও কাজে বাস্তবানুগ করে তুলেছে
ভাইপোর প্রতি স্নেহের অভিব্যক্তিতেও তি
সুন্দর পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। নায়িক
(হিমি) রূপসজ্জায় রুমা গাঙ্গুলির অভি
সংবেদনশীল। এক দ্বন্দ্বক্লিষ্ট ও বিড়ম্বি
প্রেমিকার মর্মজ্বালা তিনি তাঁর অভিন
চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। দিদি
দামিনীর উপদেশের প্রতিবাদে "না না" ব
তার কোলে কেঁদে লুটিয়ে পড়ার দৃশ্যটি
তিনি দর্শকের মনে গভীরভাবে রেখাপ
করেন। মৎস্যজীবীর ঘরের এক মেয়ে, গাম
পাঁচীর চরিত্রে সন্ধ্যা রায়ের চরিত্রসৃ
দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করবে
চরিত্রটির নির্মল প্রণয়ানুরাগ, মান-অভিম
ও স্বভাবসুন্দর চাপল্য শ্রীমতী রায় নিপ
দক্ষতায় রূপায়িত করে তুলেছেন।

ছবির অন্যান্য ভূমিকায় যাঁরা প্রশংসনী
অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তাঁ
মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য মনি শ্রীমানী। এ
সুদখোর মহাজনের চরিত্রে তাঁর অভি
খুবই মনোগ্রাহী। অন্যান্য বিশিষ্ট চরি
সার্থক ও মনোজ্ঞ অভিনয়ের জন্যে প্রশং
পাবেন মহম্মদ ইসরাইল, গোবিন্দ চক্রবর্ত
সীতা মুখোপাধ্যায়, সুরুচি সেনগুপ্তা
উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়েকটি প্রা
চরিত্রে প্রমথনাথ ঘোষ, সাধনা রায়চৌধু
সুমনা ভট্টাচার্য, শেফালী বন্দ্যোপাধ্যা
রথীন ঘোষ, নমিতা সিংহ, হরিমোহন ব
বাদল মণ্ডল, তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায় ও
মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় কৃতিত্বপূর্ণ।

রামায়ন
কৃত্তিবাস বিরচিত

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত সুন্দর চিত্রাবলী ও মনোরম পরিসাজে রুচিসম্মত অনিন্দ্য প্রকাশন। [৯৲]

৷৷ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য ৷৷
ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত। [১৫৲]

৷৷ রমেশ রচনাবলী ৷৷
রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত মোট ছয়খানি উপন্যাস একত্রে গ্রন্থিত। [৯৲]

৷৷ বঙ্কিম রচনাবলী ৷৷
প্রথম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস। [১০৲] ৷৷ দ্বিতীয় খণ্ডে উপন্যাস ব্যতীত যাবতীয় রচনা। [১৫৲]

৷৷ জীবনের ঝরাপাতা ৷৷
রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী সরলা দেবীচৌধুরানীর আত্মজীবনী ও নবজাগরণ যুগের আলেখ্য। [৪৲]

৷৷ মহানগরীর উপাখ্যান ৷৷
শ্রীকরুণাকণা গুপ্তা রচিত উপন্যাস। [২৷৷০]

সাহিত্য সংসদ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : কলি—৯
৷৷ আমাদের বই সর্বত্র পাইবেন ৷৷

সিনে আর্ট প্রোডাকশন্সের 'গঙ্গা'র একটি দৃশ্যে নিরঞ্জন রায়, রুমা গাঙ্গুলি ও সীতা মুখোপাধ্যায়।

নির্মলেন্দু চৌধুরী সুরারোপিত লোক-সংগীত ছবির অন্যতম আকর্ষণ। তাঁর গাওয়া "সজনি গো সজনি" ও "আমায় ডুবাইলিরে আমায় ভাসাইলিরে" গান দুটি দর্শকের মনকে আবিষ্ট করে রাখে। পঙ্কজ মিত্রর গাওয়া "ইচ্ছা করে ও পরাণডারে" গানটি উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দরভাবে চিত্রায়িত করেছেন। গানটি জনপ্রিয় হবে বলে আশা করা যায়। সলিল চৌধুরী পরিবেশানুগ আবহ সংগীত রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

ছবিটি শিল্পসৌন্দর্যে অনন্যসাধারণ হয়ে ওঠার মূলে যাঁর অবদান মুক্তকণ্ঠে প্রশংসার দাবি রাখে তিনি আলোকচিত্রশিল্পী দীনেন গুপ্ত। এই তরুণ কলাকুশলী তাঁর যাদু-স্পর্শে ছবিটিতে রূপমায়ার এমন বৈভব ছড়িয়ে দিয়েছেন যা শ্রেষ্ঠ কারুকৃতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে থাকবে। ক্যামেরার সাহায্যে প্রকৃতির আলো-আঁধারি রূপ-সম্ভারকে তিনি যেন উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন রজতপটে।

ছবির কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগের মধ্যে সুষ্ঠু ও শ্রীমণ্ডিত চিত্রসম্পাদনার জন্যে সাধুবাদ পাবেন হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়। শিল্পনির্দেশে রবি চট্টোপাধ্যায়, রূপসজ্জায় প্রাণানন্দ গোস্বামী, সংগীত গ্রহণে বি এন শর্মা (বোম্বে), শব্দগ্রহণে যথাক্রমে অবনী চট্টোপাধ্যায় (বহির্দৃশ্যে) ও দুর্গাদাস মিত্র (অন্তর্দৃশ্যে) এবং আবহ-সংগীত ও শব্দ-পুনর্লিখনে সত্যেন চট্টোপাধ্যায় প্রশংসা পাবার মতো দক্ষতা দেখিয়েছেন।

সুরের সমারোহ

ভারতের শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রতি যাঁরা অনুরক্ত তাঁদের কাছে গৌতম পিকচার্স-এর "সুরের পিয়াসী" ছবিটির বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। ভারতের যে-সব বিখ্যাত ও জনপ্রিয় সংগীত-শিল্পীদের গাওয়া গান ও যন্ত্র-সংগীত এতকাল চলচ্চিত্রপটে নেপথ্য থেকে ঝংকৃত হয়ে উঠত, তাঁদেরই কয়েক-জনকে সংগীত পরিবেশনে দেখা যাবে এই ছবিতে। সেদিক দিয়ে সংগীতানুরাগীদের কাছে ছবিটির আবেদন অনস্বীকার্য।

প্রযোজিত

রূপশ্রী লবণাক্ত

রচনা—পার্থপ্রতিম সরকার
সম্পাদনা ও পরিচালনা
কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়
আলোক—তাপস সেন

মিনার্ভা থিয়েটারে

২১শে নভেম্বর, সোমবার—সন্ধ্যা ৭টায়
(সি ১৪২২)

বিশ্বরূপা
(অভিজাত প্রগতিধর্মী নাট্যমঞ্চ)
[ফোন : ৫৫—১৪২৩, বুকিং ৫৫—৩২৬২]
বৃহস্পতি ও শনি সন্ধ্যা ৬॥টায় | রবি ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬॥টায়
প্রয়োগনৈপুণ্যে ও অভিনয়মাধুর্যে অতুলনীয়

সেতু
৩০০তম রজনীর পথে

মনকে দোলা দেয়, ভরিয়ে দেয়
নাটক—বিধায়ক আলোক—তাপস সেন
শ্রেঃ নরেশ মিত্র - অসীমকুমার
তরুণকুমার, মমতাজ, সন্তোষ, জহর, জয়শ্রী, সুব্রতা, ইরা, আরতি প্রভৃতি
ও
তৃপ্তি মিত্র (বহুরূপী)

বিশ্বরূপায় বহুরূপীর অভিনয়

রবীন্দ্রনাথের

রক্তকরবী

২২শে নভেম্বর, মঙ্গলবার — সন্ধ্যা ৬॥টায়
নির্দেশনা—শম্ভু মিত্র
আলোক—তাপস সেন
ভূমিকায়—তৃপ্তি মিত্র, শম্ভু মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, অমর গাঙ্গুলী, কুমার রায়, শোভেন মজুমদার, [illegible]

একটি মামুলী নাট্যকাহিনীকে উপলক্ষ করে ছবির সংগীত-আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই কাহিনীর নায়ক-নায়িকা অরুণাংশু ও জয়ন্তী। উভয়েই সুরের সাধনায় নিবেদিত-প্রাণ। জয়ন্তী তার সাধনায় সাময়িকভাবে লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পড়ে প্রলয় নামে সদ্য বিলেত ফেরত এক যুবকের প্রভাবে। প্রলয় জয়ন্তীর বাবার বন্ধুপুত্র। অনেকদিন আগে থেকেই প্রলয় ও জয়ন্তীর বিয়ে ঠিক করে রেখেছিলেন তাদের অভিভাবকরা। তাই বাগদত্তা জয়ন্তী চেয়েছিল উন্নাসিক এবং ভারতীয় সংগীতকলার প্রতি বীতশ্রদ্ধ প্রলয়ের সংগে নিবিড়ভাবে মিশে নিজেকে তার উপযুক্ত করে তুলতে, কিন্তু তার মোহভংগ ঘটতে বিলম্ব হল না। এবং মোহমুক্ত হয়ে সে কীভাবে আবার অরুণাংশুর পাশে এসে দাঁড়াল তা-নিয়েই গড়ে উঠেছে কাহিনীর নাট্য-পরিণতি।

সংগীত পরিবেশনই যে-ছবির মূল লক্ষ্য, কাহিনী স্বভাবতই সেখানে গৌণ ও দুর্বল থেকে যায়। আলোচ্য ছবির ক্ষেত্রে তার কোন ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। যে কাহিনী ছবিটিতে রূপায়িত তার ঘটনাবাজি পরিণাম-বিহীন, মূল চরিত্রগুলি অপরিণত এবং নাট্যোপকরণ কষ্টকল্পিত ও কৃত্রিম। ছবির এই বিবর্ণ ও বিরস আখ্যানভাগটিকে পরিচালক বিশু দাশগুপ্ত সামগ্রিকভাবে নাট্যরসে উপভোগ্য করে তুলতে পারেননি। ছবির সংগীত-সম্ভারও কাহিনীর নাটকীয় বিন্যাসের ভেতর দিয়ে পরিবেশন করতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। বিখ্যাত শিল্পীদের সংগীতানুষ্ঠান ছবিতে প্রক্ষিপ্তভাবেই জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে রজতপটের মাধ্যে একটি উচ্চাংগ সংগীত সম্মেলন উপভোগে আমোদই শুধু ছবিখানি উপহার দিয়েছে এর বেশী কিছু নয়।

ছবিতে সংগীত পরিবেশনে যে-সব প্রখ্যা শিল্পীর দেখা পাওয়া যায় তাঁরা হলে 'পান্নালাল ঘোষ (বাঁশী), ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ (সরোদ), ওস্তাদ বিলায়ে হোসেন (সেতার), ওস্তাদ ইমারৎ হোসে (সেতার), নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় (সেতার) হীরাবাঈ বরোদেকর (কণ্ঠ) এবং এঁদে সংগে তবলা-সংগতে শান্তাপ্রসাদ, নিখি ঘোষ, রাধাকান্ত নন্দী, মহাপুরুষ মিশ্র ও আশুতোষ ভট্টাচার্য। এই সব শিল্পী সংগীতানুষ্ঠান দর্শকদের মনকে আবিষ্ট করে রাখে। ছবিতে যে-সব শিল্পী নেপথে কণ্ঠদান করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছে লক্ষ্মীশংকর (বোম্বে), সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এ টি কানন, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সতী নাথ মুখোপাধ্যায়। "আজি সংগীত মুখরি লগনে" গানটি সুন্দর সুরারোপিত এব সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও প্রতিমা বন্দ্যো পাধ্যায়ের কণ্ঠদানে সমৃদ্ধ। এই গানখানি সংগে কয়েকজন শিল্পীর যন্ত্র-সংগীত ও ভারতী রায়ের নৃত্যাংশ খুবই উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। "বধূ এই মধুমাসে" (এ টি কান ও লক্ষ্মীশংকরের কণ্ঠে) এবং "আমি আ চলে যাই" (সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া গান দুটি সুগীত। ছবিতে সংগীত পরি চালক আলী আকবর খাঁ'র আবহ-সুররচ বৈশিষ্ট্যহীন।

ছবির নায়ক-নায়িকার চরিত্র দুটির রূ দিয়েছেন প্রবীরকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী এক সংগীত-সাধকের নিষ্ঠা ও ব্যক্তি প্রবীরকুমারের অভিনয়ে সুন্দরভা পরিস্ফুট। একনিষ্ঠ সংগীত-সাধিব হিসাবে সুপ্রিয়া চৌধুরীকেও দর্শকদে ভাল লাগবে। তাঁর শান্ত অভিব্যক্তি বিশে কয়েকটি দৃশ্যে খুবই মরমী হয়ে উঠে আবার কয়েকটি নাট্যমুহূর্তে শ্রীমত চৌধুরীর অভিনয় নিষ্প্রাণ। উন্নাসি বিলেত ফেরত প্রলয়ের চরিত্রে দীপক মুখে পাধ্যায়ের অভিনয় মনোগ্রাহী। প্রলয়ে প্রণয়িনী এক আধুনিকার রূপসজ্জায় নমি সিংহের অভিনয় স্বচ্ছন্দ। নায়ক-নায়িকা পিতার চরিত্রে যথাক্রমে ছবি বিশ্বাস ও কম মিত্র'র অভিনয় মনোজ্ঞ। সংগীত-বিদ্যালয়ে আচার্যের ভূমিকায় মিহির ভট্টাচার্যে অভিনয় মনে রেখাপাত করে না। বিশে দুটি পার্শ্বচরিত্রে অপর্ণা দেবী ও পদ দেবীর অভিনয় সাবলীল ও সংযত। অ অবকাশে ছবিতে যাঁরা দর্শকদের আনন্দ দে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন নৃপতি চট্টোপাধ্যায় অশোক সরকার। নবাগতা কান্তা রায় শুক্লা দাস ছোট ভূমিকায় চরিত্রোচি অভিনয় করেছেন।

চিত্রগ্রহণে সন্তোষ গুহরায় ও নির্মল

ষ্টারে (শীতাতপনিয়ন্ত্রিত)
ফোন : ৫৫-১১৩৯
প্রতি বৃহস্পতি ও শনি ৬।। টা
প্রতি রবিবার ৩ টা ও ৬।। টা
শ্রেয়সী
ছবি বিশ্বাস • কমল মিত্র
সাবিত্রী চট্টো • বসন্ত চৌধুরী
অজিত বন্দ্যো • অপর্ণা দেবী
অনুপ • লিলি • শ্যাম ও
ভানু বন্দ্যো

কবিগুরুর পাশ্চাত্ত্যদেশ ভ্রমণ সম্বন্ধে
মৈত্রেয়ী দেবীর দীর্ঘ গবেষণাপ্রসূত অসামান্য গ্রন্থ
বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ
কবি নিজে বলেছেন, তাঁর য়ুরোপ ভ্রমণের ইতিবৃত্ত যা কোথাও প্রকাশ পায়নি, তার মূল্য অনেক। লেখিকা বহু পরিশ্রমে সেই ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করে, পরম শ্রদ্ধা ও গভীর অভিনিবেশের সংগে যে রচনা গ্রথিত করেছেন তা শুধু বাংলার নয় সমগ্র দেশের গৌরব বৃদ্ধি করবে। নতুনভাবে সুমুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হল। দাম : ৭·৫০ ॥
মৈত্রেয়ী দেবীর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি
মংপুতে রবীন্দ্রনাথ
নতুন প্রচ্ছদে নতুন গ্রন্থরূপ । দাম ৭·৫০
অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকাশন :
নন্দাঘুণ্টি বিজয়াভিযানের সহ-নেতা বিশ্বদেব বিশ্বাসের কাঞ্চনজংঘার পথে ২·৫০ ॥ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুরাণ-কাহিনী অমৃতের উপাখ্যান ৩·৫০ ॥ চিত্তরঞ্জন দেবের ভ্রমণ তারাপীঠের একতারা ৩·৭৫ ॥ শ্রী পান্থের পুরনো কলকাতার কথা আজব নগরী ৩·০০ ॥
একমাত্র পরিবেশক :
পত্রিকা সিণ্ডিকেট ১২।১. লিণ্ডসে স্ট্রীট কলিকাতা—১৬

জ্যোতি ঘোষ, সম্পাদনায় অর্ধেন্দ্ চট্টোপাধ্যায় ও প্রতুল রায়চৌধুরী এবং শব্দগ্রহণে জে ডি ইরাণীর কাজ সন্তোষজনক। কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজ ও সর্বাঙ্গীণ আঙ্গিক গঠন পরিচ্ছন্ন।

চিত্রালোচনা

সিনে আর্ট প্রোডাকশন্সের "গঙ্গা" পৃথ্বী পিকচার্সের "কাতিল" এবং ফিল্ম মেকার্স-এর "তীর ঔর তলোয়ার"—এ সপ্তাহের মুক্তি-তালিকায় এই তিনটি নতুন ছবি। বলা বাহুল্য, প্রথমটি বাংলায় এবং বাকি দুটি হিন্দীতে তোলা।

রাজেন তরফদার পরিচালিত "গঙ্গা"র সমালোচনা এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত হল। ভারতীয় ফিল্ম শিল্পের ইতিহাসে এই ধরনের প্রচেষ্টা শুধু অভূতপূর্ব নয়, বাস্তবানুগ কাহিনীর এমনি ধারা শিল্পসম্মত চিত্র বিন্যাস পৃথিবীর যে কোন দেশেই বিরল। বাংলার মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রাকে কেন্দ্র করে লেখা সমরেশ বসুর "গঙ্গা" উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বেই সমাদৃত হয়েছে। সেই কাহিনীরই চিত্র-সংস্করণ এবার নিঃসন্দেহে আরো বিস্তৃততর ক্ষেত্রে আলোড়ন তুলবে। নিরঞ্জন রায়, রুমা গাঙ্গুলি, সন্ধ্যা রায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সীতা মুখোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানী প্রভৃতিকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। সলিল চৌধুরী এ ছবির সুরকার।

এ সপ্তাহে মুক্তিপ্রাপ্ত দুটি হিন্দী ছবিরই পরিচালক মহম্মদ হুসেন। "কাতিল"-এর ভূমিকালিপিতে আছেন প্রেমনাথ, চিত্রা, হীরালাল ও ললিতা পাওয়ার। নাশাদ সুরযোজনা করেছেন। "তীর ঔর তলোয়ার"-এর প্রধান শিল্পীদের নাম—শশীকলা, কামরান, শ্যামকুমার, কমল ও মেহরা। নিসার এতে সুর দিয়েছেন।

• • • •

বিশ্বভারতী চিত্রমন্দিরের "পঙ্কতিলক" সমাপ্তির পথে। রাসবিহারী লাল লিখিত একটি নতুন ধরনের কাহিনী এতে রূপায়িত হয়েছে। প্রযোজক এইচ পি গোয়েংকা ও পরিচালক মঙ্গল চক্রবর্তী ছবিটিকে সব দিক দিয়ে অনন্যসাধারণ করে তোলবার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করছেন না। লেখক প্রযোজক পরিচালক-এর এই জুটি ইতিপূর্বে একাধিক সফল চিত্র দর্শকদের উপহার দিয়েছেন। তাঁদের নবতম প্রচেষ্টা সম্বন্ধে চিত্রপ্রিয়দের আগ্রহ হওয়া তাই স্বাভাবিক। "পঙ্কতিলক"-এর ভূমিকালিপিতে বহু নামকরা শিল্পীর সমাবেশ লক্ষণীয়। তাঁদের মধ্যে আছেন কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, তরুণ রায়, (ছায়াচিত্রে এই প্রথম), উৎপল দত্ত, জহর রায়, তরুণ-

গতকাল মুক্তিলাভ করেছে—

অসাধারণ উপন্যাসের অনবদ্য চিত্ররূপ!

সিনে আর্ট প্রোডাকসন্ প্রাইভেট লিঃ নিবেদিত

সমরেশ বসুর

গঙ্গা

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : রাজেন তরফদার

সংগীত : সলিল চৌধুরী

সম্পাদনা :

হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়

একমাত্র পরিবেশক : অরোরা পিকচার্স এণ্ড থিয়েটার্স লিঃ

রঙমহল ফোনঃ ৫৫ ১৬১৯

বিমল মিত্রের

সাহেব বিবি গোলাম

নাট্যরূপ শচীন সেনগুপ্ত

শ্রেঃ নীতীশ, রবীন, হরিধন, সত্য, জহর, বিশ্বজিৎ, অজিত, মুকুন্দ, নির্মল, মিণ্টু, সমর, অঞ্জ, কার্তিক, চিত্রা, কবিতা, ... , অনিলা, শ্যামলী, দীপিকা, কেতকী দত্ত ও চিত্রা মিত্র

গিরিশ থিয়েটার

কলিকাতায় ৫ম স্থায়ী নাট্যশালা

প্রযোজনা ও উপস্থাপনা—বিশ্বরূপা থিয়েটার

স্থান : বিশ্বরূপা থিয়েটার (৫৫-৩২৬২)

বিবেকের তাড়নায় অস্থির যাত্রিপূর্ণ

জংশন স্টেশন

সোমবার, বুধবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা ৬॥টায়

এবং রবি ও ছুটির দিন সকাল ১০॥টায়

নাটক—সলিল : পরিচালনা—বিধায়ক

আঙ্গিক নির্দেশনা—তাপস সেন

শ্রেঃ—মহেন্দ্র গুপ্ত, জ্ঞানেশ মুখার্জি, বিধায়ক ভট্টাচার্য, সুনীল ব্যানার্জি, তরুণ, রাজেশ, প্রভাত, গীতা দে ও জয়শ্রী সেন

বিঃ দ্রঃ ইহার পর গিরিশ থিয়েটার যথাসময়ে নিজস্ব (স্বতন্ত্র) ভবনে আত্মপ্রকাশ করবে। অনিয়মিত দিবসে গিরিশ থিয়েটারের বিশ্বরূপা মঞ্চে অভিনয় অনুষ্ঠানে দর্শকের পৃষ্ঠপোষকতা না পাওয়ায় এবং নাট্য আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন নাট্যসংস্থাগুলিকে বিশ্বরূপার ডিসেম্বর '৬০ হইতে অনিয়মিত দিবসগুলিতে অভিনয়ের পুনরায় সুযোগ দানের জন্য উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল।

সুশীল মজুমদার প্রোডাকশন্সের "কঠিন মায়া"র একটি দৃশ্যে ছায়া দেবী, রাম চৌধুরী ও বিশ্বজিৎ।

কুমার, তরুণ মিত্র, ছায়া দেবী, সবিতা বসু, সন্ধ্যা রায় এবং একদল প্রতিভাবান শিশু-শিল্পী। সুধীন দাশগুপ্ত এই ছবিতে সুর-যোজনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

*   *   *

বি আর সি সিনে প্রোডাকশন্সের প্রথম ছবি "সরি ম্যাডাম"-এর নায়ক-নায়িকা বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়। এই ছবিতে তাঁদের নিজ কণ্ঠের গান দর্শকরা শুনতে পাবেন। এর সংগীত গ্রহণের জন্যে পরিচালক দিলীপ বসু ও গীতিকার তেজোময় গুহ সম্প্রতি বোম্বাইতে গেছেন। ওখানকার নামী সুরকার ভেদপাল এ ছবির সংগীত পরিচালনা করবেন।

নাট্যাভিনয়

গিরিশ থিয়েটার চারমাস "ডাউন ট্রেন" চালিয়ে ডিসেম্বর থেকে লাইন তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তবে কর্তৃপক্ষ নাট্যামোদীদের আশ্বাস দিয়েছেন যে নিজস্ব রঙ্গালয় নির্মাণ করে গিরিশ থিয়েটার আবার নতুন করে যাত্রা শুরু করবে। চার মাসের মধ্যে দু'বার ড্রাইভার বদল করেও যথেষ্ট পরিমাণে প্যাসেঞ্জার আকর্ষণ করতে না পারায় "ডাউন ট্রেন" বন্ধ রাখতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েছেন।

*   *   *

গিরিশ থিয়েটারের দরজা বন্ধ হলেও ডিসেম্বর থেকে আর একটি নতুন রঙ্গালয়ের পত্তন হচ্ছে দক্ষিণ কলকাতায়। থিয়েটার সেণ্টার আগামী ১লা ডিসেম্বর থেকে অন্যান্য সাধারণ রঙ্গালয়ের মত সপ্তাহে তিনদিন নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন। ধনঞ্জয় বৈরাগীর নতুন নাটক "আর হবে না দেরী" এই সম্প্রদায়ের প্রথম আকর্ষণ। তরুণ রায় নাটকটি পরিচালনা করবেন। শিল্পীবৃন্দে মধ্যে অনেক প্রখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রীর দেখা মিলবে। নিয়মিত অভিনয়ের জন্যে থিয়েটার সেণ্টারের প্রেক্ষাগৃহটি সুসংস্কৃত করা হয়েছে। স্টেজের পরিধিও বাড়ানো হয়েছে। আলোক নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য ব্যবস্থাও আধুনিকতম পদ্ধতি অনুযায়ী।

*   *   *

প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা "বৈশাখী"-র নবতম নাট্য-নিবেদন "লবণাক্ত" আগামী ২২শে নভেম্বর সন্ধ্যা সাতটায় মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হবে। আমাদের দেশে রকবাজ-ছেলে নামে যারা পরিচিত তারা চরম বিশৃঙ্খলতার মধ্যে তলিয়ে যাবে, না বেঁচে থেকে পৃথিবীকে বাঁচাবে—এই নাটকে তারই একটি বলিষ্ঠ ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। পৃথ্বীশ সরকার লিখিত "লবণাক্ত" পরিচালনা করবেন কমল চট্টোপাধ্যায়।

*   *   *

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের দেশবন্ধু নগর শাখা ১৯শে ও ২০শে নভেম্বর স্থানীয় রঙমহল মঞ্চে দুইদিনব্যাপী একটি একাঙ্ক নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছে। এই উৎসবে দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "অপচয়" ও "কেউ দায়ী নয়", অচিন্ত্য সেনগুপ্তের "উপসংহার" এবং অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের "আজকের উত্তর"—এই চারটি একাঙ্ক নাটক অভিনীত হবে। নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব বহন করবেন দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রকাশিত হবে ১৫ই নভেম্বর

বাঙলা সাহিত্যের নতুন সাড়া হচ্ছে 'লৌহকপাট'; নতুন কণ্ঠস্বর হচ্ছে তার দুঃসাহসী-ধর্মী স্রষ্টা জরাসন্ধ। 'পাড়ি' তাঁর সাম্প্রতিকতম এবং বলিষ্ঠতম উপন্যাস। দাম ঃ ৩·০০

*

'ফসিল' ও 'পরশুরামের কুঠার',—বাঙলা ভাষায় ছোট গল্পের পৃথিবীতে ক্লাসিকের পর্যায় পৌঁছে গেছে। তাদের লেখকেরই অনবদ্য গল্প এক-সঙ্গে এই— 'চিত্তচকোর'। দাম ঃ ৩·৫০

একই সঙ্গে নাট্যকার এবং ঔপন্যাসিক ধনঞ্জয় বৈরাগী সাহিত্যের সব্যসাচী। 'বিদেহী' তাঁর রহস্যরতীন সাহিত্য-রসসম্পৃক্ত উপন্যাস।

দাম ঃ ২·৫০

৩৩ কলেজ রো ঃ

কালকাতা ৯

জরাসন্ধের পাড়ি

সুবোধ ঘোষের চিত্তচকোর

ধনঞ্জয় বৈরাগীর বিদেহী

বাক সাহিত্য

শ্রীসনুকুমার রায়ের নেতৃত্বে বাঙালী ছেলে-দেরে 'নন্দাঘুণ্টি' জয় সম্পর্কে দেশের খেলার পাতায় কিছু লেখা হয়নি বলে এক সাংবাদিক বন্ধু অভিযোগ করছিলেন। তাঁর মতে পর্বতারোহণ ঠিক খেলাধুলা না হলেও আংশিকভাবে খেলাধুলার গণ্ডির মধ্যে পড়ে। প্রতিবাদ করে বলেছিলাম কি করে খেলাধুলায় গণ্ডির মধ্যে পড়বে? এ তো খেলা নয় একটা অভিযান। খেলার এর মধ্যে কি আছে? যুক্তি হিসাবে সাংবাদিক বন্ধু বলেছিলেন আগে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমও তো অভিযান ছিল। এখন তোমরা তাকে খেলার পাতায় টেনে এনেছ কেন? ম্যাথু

বেঙ্গল টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ন হ্যারী অ

ওয়েব যেদিন প্রথম দূরতিক্রমা ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেছিলেন সেদিনও সারা বিশ্বে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম ছিল অভিযান। আজ ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের ব্যাপার হয়েছে স্পোর্টস, খেলাধুলার অঙ্গীভূত।

এর উত্তরে বলেছিলাম—'যতদিন মাউণ্টেনিয়ারিং বা পর্বত আরোহণ সম্পর্কে প্রতিদ্বন্দ্বীতার সৃষ্টি না হবে, যতদিন অজানাকে জানার নেশায়, আর অজেয়কে জয়ের আশায় মানুষ মৃত্যু পণ করে ছুটবে অনিশ্চিতের পানে ততদিন পর্বতারোহণ 'অভিযান' বলেই বিবেচিত হবে। যদি কোনদিন পৃথিবীর মানুষ পর্বত আরোহণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়—কোনদিন পর্বত আরোহণে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয় সেদিন হবে পর্বতারোহণ স্পোর্টস। তার আগে পর্যন্ত দুর্গম গিরি, কান্তার মরু দুস্তর পারাবার পার হবার সমস্ত প্রচেষ্টাই অভিযান। তাছাড়া অভিযান ও খেলার মধ্যে পার্থক্য—অভিযানে পদে পদেই জীবনের ভয় থাকে। বড়ই দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল সে পথ। প্রতি মুহূর্তে [illegible]

খেলার মাঠে

একলব্য

কারো মৃত্যু ঘটলেও সেটা ব্যতিক্রম। খেলা দেহ-মনের আনন্দ লাভের উপকরণ। পাতানো আসরে সুখের কল্পনা বিলাস। আর অভিযান শুধু দেহের কৃচ্ছ্রসাধন। খেলার ক্ষেত্রে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মানসিক শক্তির প্রত্যয় মিশ্রিত বিচ্ছুরণ। আর অভিযানের ক্ষেত্রে জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য। অভিযান হচ্ছে একটা 'মহা কিছু' করার প্রত্যাশা—আশ্রিত মহাপণ। যাক সে কথা।

• • •

এ সপ্তাহের দেশের লেখা যখন পাঠকদের হাতে পড়বে তার আগেই পাকিস্তান ক্রিকেট দল ভারতে পৌঁছে যাবে। পুনায় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একাদশের সঙ্গে তাদের সফরের প্রথম খেলাও আরম্ভ হবার কথা। বোম্বাইতে ভারত ও পাকিস্তানের প্রথম টেস্ট খেলা আরম্ভ হতেও খুব বেশী সময় বাকী নেই। ডিসেম্বরের ২ তারিখ থেকে বোম্বাইতে প্রথম টেস্ট খেলা আরম্ভ হবে। অথচ ভারতীয় দলের খেলোয়াড় মনোনয়ন করা দূরের কথা, কে অধিনায়ক হবেন তাও স্থির হয়নি। তার উপর আবার ৪ জন খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে বরোদার মহারাজার রিপোর্ট এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

বরোদার মহারাজা ছিলেন ১৯৫৯ সালের ইংলণ্ড সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের ম্যানেজার। কোন খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে কিছু বলবার থাকলে ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ১৯৬০ সালের বার্ষিক সাধারণ সভার আগেই তাঁর বলা উচিত ছিল। গত বছর বার্ষিক সভার আগে বরোদার মহা-রাজার অভিযোগ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডে পৌঁছয় নি এবং অস্ট্রেলিয়ান দলের ভারত সফরের ডামাডোলের মধ্যে ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ অতিশয় ব্যস্ত ছিলেন এ কথা ধরে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায়—অস্ট্রেলিয়া দলের সফর তো শেষ হয়েছে বহুদিন। তারপর ৮।৯ মাস কেটে গেল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মহা-রাজার অভিযোগ সম্পর্কে একটা ফয়সালা করা কি উচিত ছিল না?

অভিযোগও যার-তার বিরুদ্ধে নয়। উমরীগার, মঞ্জরেকার, সুভাষ গুপ্তে ও কৃপাল সিংয়ের মত ৪ জন খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে। কৃপাল সিংয়ের কথা না-হয় ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু উমরীগর, মঞ্জরেকার ও সুভাষ গুপ্তে

এখনো ভারতীয় দলের পক্ষে অপরিহার্য বলে বিবেচিত। অথচ ঠিক পাকিস্তান দলের সফরের মুখে এদের বিরুদ্ধে বরোদার মহারাজার অভিযোগ। এতে শুধু সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়দের উপরই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে না। সমগ্র ভারতীয় দলের উপর এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী।

• • •

বাংলার ৩ নম্বর খেলোয়াড় জে এম ব্যানার্জিকে ফাইন্যালে স্ট্রেট গেমে হারিয়ে উঠতি খেলোয়াড় হ্যারী অ এবার বেঙ্গল টেবল টেনিসের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ

বেঙ্গল টেবল টেনিসের মহিলা চ্যাম্পিয়ন কুমারী উষা আয়েঙ্গার

করেছেন। মেয়েদের বিভাগের চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন কুমারী উষা আয়েঙ্গার ফাইন্যালে কুমারী শকুন্তলা দত্তকে পরাজিত করে। বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ কুমারী উষার পক্ষে অবশ্য নতুন সম্মান নয়। উপর্যুপরি চারবার এবং মোট পাঁচবার উষা এই সম্মানের অধিকারী হলেন। কিন্তু হ্যারী অ-র চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ তার পক্ষে নতুন সম্মান।

হ্যারী অ ও জে এম ব্যানার্জির ফাইন্যাল খেলায় হ্যারী বুদ্ধির জোরেই বিজয়ী হয়েছেন বলা যেতে পারে। প্রথম দুটি গেমে জে এম ব্যানার্জির আক্রমণাত্মক খেলার বিরুদ্ধে তাকে প্রধানত আত্মরক্ষার কৌশল অবলম্বন করতে দেখা যায়। ফলে মারমুখী ব্যানার্জির মারের ভুলচুকে হ্যারী বেশী পয়েন্ট সংগ্রহ করেন। তৃতীয় গেমে অবশ্য হ্যারীও মারতে দ্বিধা করেননি।

হ্যারী ছিলেন টেবল টেনিসের গুরুজী জিতেন বসুর প্রিয় ছাত্র। হ্যারী একদিন বড় খেলোয়াড় হবে বলে বসু যে ভবিষ্যৎ

রোম অলিম্পিকে ৭টি পদকের অধিকারী জিমন্যাস্ট বি স্যাকলিন

বাণী করেছিলেন তাই সত্যে পরিণত হতে যাচ্ছে।

মেয়েদের ফাইন্যালে কুমারী উষা আয়েঙ্গার তার আত্মরক্ষামূলক খেলার রীতি পরিবর্তন করে কুমারী শকুন্তলার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করেন এবং আক্রমণাত্মক খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বীকে কাহিল করে পঞ্চমবার লাভ করেন বাঙলার টেবল টেনিসে চ্যাম্পিয়নশিপ পুরস্কার।

অলিম্পিক ফলাফল

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

রোম অলিম্পিকের সাঁতার, অ্যাথলেটিক স্পোর্টস, সাইকেল চালনা ও মুষ্টিযুদ্ধের ফলাফল ইতিপূর্বে দেশ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে। এবার জিমন্যাস্টিকস ও মল্লযুদ্ধের ফলাফল প্রকাশ করা হলঃ—

পুরুষ ও মেয়েদের জিমন্যাস্টিকসের মোট ১৩টি স্বর্ণপদকের মধ্যে ৭টি স্বর্ণ-পদক পেয়েছে রাশিয়া, ৪টি পেয়েছে জাপান, আর ফিনল্যান্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়া পেয়েছে একটি করে স্বর্ণপদক।

জিমন্যাস্টিকসে রাশিয়া এবং জাপানের প্রতিনিধিদের বিশ্বজোড়া নাম ডাক। সুতরাং রোমে তারাই যে বিজয়ী পদক ভাগযোগ করে নিয়ে দেশে ফিরবেন এতে সন্দেহের কিছু ছিল না। সন্দেহের ছিল জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে কোন দেশ জিমন্যাস্টিকসে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেবে?

যদিও পুরুষদের ৮টি স্বর্ণপদকের মধ্যে জাপান ৪টি ও রাশিয়া ৩টি স্বর্ণপদক পেয়েছে তবুও সামগ্রিকভাবে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছে রাশিয়া। কারণ পুরুষ বিভাগে সর্বসমেত রাশিয়া পেয়েছে ১১টি পদক, জাপান ৯টি। আর মেয়েদের সম্বন্ধে তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। কারণ এক 'বীমের' স্বর্ণপদক ছাড়া মেয়েদের সমস্ত স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক গিয়েছে রাশিয়ার দখলে। এ এক অভাবনীয় সাফল্য। এর থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায়, জিমন্যাস্টিকসে সোভিয়েট রাশিয়ার মেয়েরা কতখানি পটু। চেকোশ্লোভাকিয়া এক বোসাকোভা ছাড়া রাশিয়ার মেয়েদের কাছ থেকে একটি পদকও কেউ ছিনিয়ে নিতে পারেনি। বোসাকোভা পেয়েছেন বীম ব্যালান্সের স্বর্ণপদক।

ব্যক্তিগত কৃতিত্বের দিক দিয়ে রাশিয়ার বি স্যাকলিনের সঙ্গে কারো তুলনাই চলে না। এবারকার অলিম্পিক পদক লাভের খতিয়ান তালিকায় তিনিই রয়েছেন শীর্ষ-স্থানে। অলিম্পিকের একটি পদক লাভই যেখানে বিশ্বসম্মানের প্রতীক সেখানে স্যাকলিন পেয়েছেন তিনটি স্বর্ণ, তিনটি রৌপ্য ও একটি ব্রোঞ্জ—মোট ৭টি পদক।

এর পরেই আসে জাপানের টি ওনোর নাম। ওনো, যিনি মেলবোর্ন অলিম্পিকে একটি স্বর্ণ, দুটি রৌপ্য ও একটি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছিলেন, তিনি রোমেও তিনটি স্বর্ণ, দুটি রৌপ্য ও দুটি ব্রোঞ্জ—মোট ৬টি পদক পেয়েছেন।

পদক লাভের খতিয়ানে মেয়েদের মধ্যে শীর্ষস্থানে আছেন রাশিয়ার মেয়ে জিমন্যাস্ট ল্যারিশা ল্যাটিনিনা। ইনি পেয়েছেন মোট পাঁচটি পদক—দুটি স্বর্ণ, দুটি রৌপ্য ও একটি ব্রোঞ্জ। রাশিয়ার আস্তাকোভাও সবরকমের একটি করে পদকের অধিকারিণী হয়েছেন। নীচের ফলাফল থেকে জিমন্যাস্টিকসের সমস্ত অবস্থা বোঝা যাবে।

১২ রকমের সম্মিলিত ব্যায়াম কসরত:— ১ম—বি স্যাকলিন (রাশিয়া) ১১৫·৯৫ পয়েন্ট· ২য়—টি ওনো (জাপান) ১১৫·৯০ পয়েন্ট, ৩য়—ওয়াই টিটোভ (রাশিয়া) ১১৫ ৬০ পয়েন্ট।

দলগত চ্যাম্পিয়ানশিপ:—১ম—জাপান ৫৭৫·২০ পয়েন্ট; ২য়—রাশিয়া ৫৭২·৭০ পয়েন্ট; ৩য়—ইতালী ৫৫৯·১৫ পয়েন্ট।

ফ্রি স্ট্যান্ডিং:—১ম—এন আইহারা (জাপান) ১৯·৪৫০ পয়েন্ট; ২য়—ওয়াই টিটোভ (রাশিয়া) ১৯·৩২৫ পয়েন্ট; ৩য়—এফ নেইচিলি (ইতালী) ১৯·২৭৫ পয়েন্ট।

প্যারালেল বার:—১ম—বি স্যাকলিন (রাশিয়া) ১৯·৪০০ পয়েন্ট; ২য়—জি কার্মিনুচি (ইতালী) ১৯·৩৭৫ পয়েন্ট; ৩য়—টি ওনো (জাপান) ১৯·৩৫০ পয়েন্ট।

হোরাইজেন্টাল বার:—১ম—টি ওনো (জাপান) ১৯·৬০০ পয়েন্ট; ২য়—এম টাকেমাটো (জাপান) ১৯·৫২৫ পয়েন্ট; ৩য়—স্যাকলিন (রাশিয়া) ১৯·৪৭৫ পয়েন্ট।

রিং:—১ম—এ আসারিয়ান (রাশিয়া) ১৯·৭২৫ পয়েন্ট; ২য়—বি স্যাকলিন (রাশিয়া) ১৯·৫০০ পয়েন্ট; ৩য়—টি ওনো (জাপান) ১৯·৪২৫ পয়েন্ট।

পোমেল্ড হর্স:—১ম—ই একম্যান (ফিনল্যান্ড) ১৯·৩৭৫ পয়েন্ট; ২য়—বি স্যাকলিন (রাশিয়া) ১৯·৩৭৫ পয়েন্ট।

৩য়—এস ট্সুরুমি (জাপান) ১৯·১৫০ পয়েণ্ট।

লং হর্স :—১ম—টি ওনো (জাপান) ১৯·৩৫০ পয়েণ্ট; ২য়—বি স্যাকলিন (রাশিয়া) ১৯·৩৫০ পয়েণ্ট; ৩য়—ভি পোটনই (রাশিয়া) ১৯·২২৫ পয়েণ্ট।

জিমন্যাস্টিকস মহিলা

৮ রকমের সম্মিলিত ব্যায়াম কসরৎ :—১ম—এল ল্যাটিনিনা (রাশিয়া) ৭৭·০৩১ পয়েণ্ট; ২য়—এস মুরাটোভা (রাশিয়া) ৭৬·৬৯৬ পয়েণ্ট; ৩য়—পি আস্তাকোভা (রাশিয়া) ৭৬·১৬৪ পয়েণ্ট।

ফ্রি স্ট্যাণ্ডিং :—১ম—এল ল্যাটিনিনা (রাশিয়া) ১৯·৫৮৩ পয়েণ্ট; ২য়—পি আস্তাকোভা (রাশিয়া) ১৯·৫৩২ পয়েণ্ট; ৩য়—টি জুকিনা (রাশিয়া) ১৯·৪৪৯ পয়েণ্ট।

ভল্টিং :—১ম—এম নিকোলেভা (রাশিয়া) ১৯·৩১৬ পয়েণ্ট; ২য়—এস মুরাটেভা (রাশিয়া) ১৯·০৪৯ পয়েণ্ট; ৩য়—এল ল্যাটানিনা (রাশিয়া) ১৯·০২৬ পয়েণ্ট।

প্যারালেল বার :—১ম—পি আস্তাকোভা (রাশিয়া) ১৯·৬১৬ পয়েণ্ট; ২য়—এল ল্যাটানিনা (রাশিয়া) ১৯·৪১৬ পয়েণ্ট; ৩য়—টি লিউকিনা (রাশিয়া) ১৯·৩৯৯ পয়েণ্ট।

বীম :—১ম—ই বোসাকোভা (চেকোশ্লোভাকিয়া) ১৯·২৮৩ পয়েণ্ট; ২য়—এল ল্যাটানিনা (রাশিয়া) ১৯·২৩৩ পয়েণ্ট; ৩য়—এস মুরাটোভা (রাশিয়া) ১৯·২০২ পয়েণ্ট।

মল্লযুদ্ধ

অলিম্পিকে দু'রকমের মল্লযুদ্ধের ব্যবস্থা আছে। ফ্রি স্টাইল ও গ্রীকো-রোমান স্টাইল। এক এক রকমের মল্লযুদ্ধে আবার ৮টি করে বিভাগ। ফ্লাই, ব্যাণ্টম, ফেদার, লাইট, ওয়েল্টার, মিডল, লাইট হেভি ও হেভি ওয়েট। দেহের ওজন অনুযায়ী মল্লযোদ্ধাদের বিভাগ নিরূপিত হয়।

সোভিয়েট রাশিয়ার মল্লবীরেরা মেলবোর্নে পেয়েছিলেন ১৩টি পদক। এর মধ্যে স্বর্ণপদক ছিল ৬টি। রাশিয়ার পরই স্থান ছিল তুরস্কের। কেবলমাত্র মল্লবীরদের কৃতিত্বে মেলবোর্নে পদক লাভের তালিকায় তুরস্ক অধিকার করেছিল চতুর্দশ স্থান। তারা পেয়েছিল মোট ৭টি পদক—তিনটি স্বর্ণ, দু'টি রৌপ্য ও দু'টি ব্রোঞ্জ। কিন্তু এবার কুস্তির ১৬টি স্বর্ণপদকের মধ্যে তুরস্কের মল্লবীরেরাই ঘরে তুলেছেন ৭টি পদক। রাশিয়া ও আমেরিকা পেয়েছে তিনটি করে, আর জার্মানী, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়া পেয়েছে একটি করে স্বর্ণপদক।

গতবারের বিজয়ীদের মধ্যে দু'জন এবারও বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছেন। দু'জনই তুরস্কের মল্লবীর। ফ্রি স্টাইলে গতবারের ব্যাণ্টম ওয়েট চ্যাম্পিয়ান এম ডাগিস্ট্যানলী এবার ফেদার ওয়েটের চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন। গ্রীকো-রোমান স্টাইলে গতবারের বিজয়ী এম বেরাক এবারও বিজয়ী হয়ে পর পর দু'টি অলিম্পিকের স্বর্ণপদক পেয়েছেন।

জিম ন্যাস্টিকসে পাঁচটি পদকের অধিকারিণী ল্যারিশা ল্যাটিনিনা

এবার রোমে ভারতীয় মল্লবীরদের মধ্যে কেউই কোন পদক লাভ করতে পারেন নি। ফ্রি স্টাইলের মিডল ওয়েটে মাধো সিং লাভ করেছেন ষষ্ঠ স্থান। ওয়েল্টার ওয়েটে পাকিস্তানের মহম্মদ বসিরের ব্রোঞ্জ পদক লাভ উল্লেখের দাবি রাখে। মল্লযুদ্ধের ফলাফলও এই সঙ্গে দেওয়া হল :—

মল্লযুদ্ধ—ফ্রি স্টাইল

ফ্লাই ওয়েট :—১ম—এ বিলেক (তুরস্ক, ২য়—এম মাৎসুবারা (জাপান), ৩য়—এস সকেপুর (জাপান)।

ব্যাণ্টম ওয়েট :—১ম—টি ম্যাকান (ইউ এস এ), ২য়—এন জালেভ (বুলগেরিয়া), ৩য়—টি ট্রোজানওয়াস্কি (পোল্যাণ্ড)।

ফেদার ওয়েট :—১ম—এম ড্যাসিস্ট্যানলি (তুরস্ক), ২য়—এস আইভানভ (বুলগেরিয়া), ৩য়—ভি রোবাশিভলি (রাশিয়া)।

লাইট ওয়েট :—১ম—এস উইলসন (ইউ এস এ), ২য়—ভি সিনায়াভস্কি (রাশিয়া), ৩য়—ই ডিমোভ (বুলগেরিয়া)।

ওয়েল্টার ওয়েট :—১ম—ডি ব্রুবাগ (ইউ এস এ), ২য়—আই ওগান (তুরস্ক), ৩য়—এম বসির (পাকিস্তান)।

মিডল ওয়েট :—১ম—এইচ গাঙ্গার (তুরস্ক), ২য়—জি স্খিরটলাটজে (রাশিয়া), ৩য়—এইচ' অ্যাণ্টনসন (সুইডেন)।

লাইট হেভি ওয়েট :—১ম—অাই আটলী (তুরস্ক), ২য়—আর তাখতি (ইরান), ৩য়—এ আলবুল (রাশিয়া)।

হেভি ওয়েট :—১ম—ডব্লিউ ডিয়েট্রিস (জার্মানী), ২য়—এইচ কেপিয়ান (তুরস্ক), ৩য়—এস জারাসেভ (রাশিয়া)।

মল্লযুদ্ধ—গ্রীকো-রোমান

ফ্লাই ওয়েট :—১ম—ডি পিরভুলেস্কু (রুমানিয়া), ২য়—ও সৈয়দ (সম্মিলিত আরব), ৩য়—এম পাজিরায়ে (ইরান)।

ব্যাণ্টম ওয়েট :—১ম—ও কারাভায়েভ (রাশিয়া), ২য়—আই সার্নিয়া (রুমানিয়া), ৩য়—ডি স্টয়িকোভ (বুলগেরিয়া)।

ফেদার ওয়েট :—১ম—এম সিল্ল (তুরস্ক), ২য়—আই পলিজাক (হাঙ্গেরী), ৩য়—কে ভিরুপায়েভ (রাশিয়া)।

লাইট ওয়েট :—১ম—এ কোবিভজ (রাশিয়া), ২য়—বি মার্টিনোভিক (যুগোশ্লাভিয়া), ৩য়—এল ফ্রেইজ (সুইডেন)।

ওয়েল্টার ওয়েট :—১ম—এম বেরাক (তুরস্ক), ২য়—জি মারিটস্নিগ (জার্মানী), ৩য়—আর স্কিয়েরমেয়ার (ফ্রান্স)।

মিডল ওয়েট :—১ম—ডি ডবরেভ (বুলগেরিয়া), ২য়—এল মেজ (জার্মানী), ৩য়—আই তারানু (রুমানিয়া)।

লাইট হেভি ওয়েট :—১ম—টি কিস (তুরস্ক), ২য়—কে বিমবালভ (বুলগেরিয়া), ৩য়—জি কার্টোজিয়া (রাশিয়া)।

হেভি ওয়েট :—১ম—আই বগদান (রাশিয়া), ২য়—ডব্লিউ ডিয়েট্রিস (রাশিয়া), ৩য়—কে কুবাট (চেকোশ্লোভাকিয়া)।

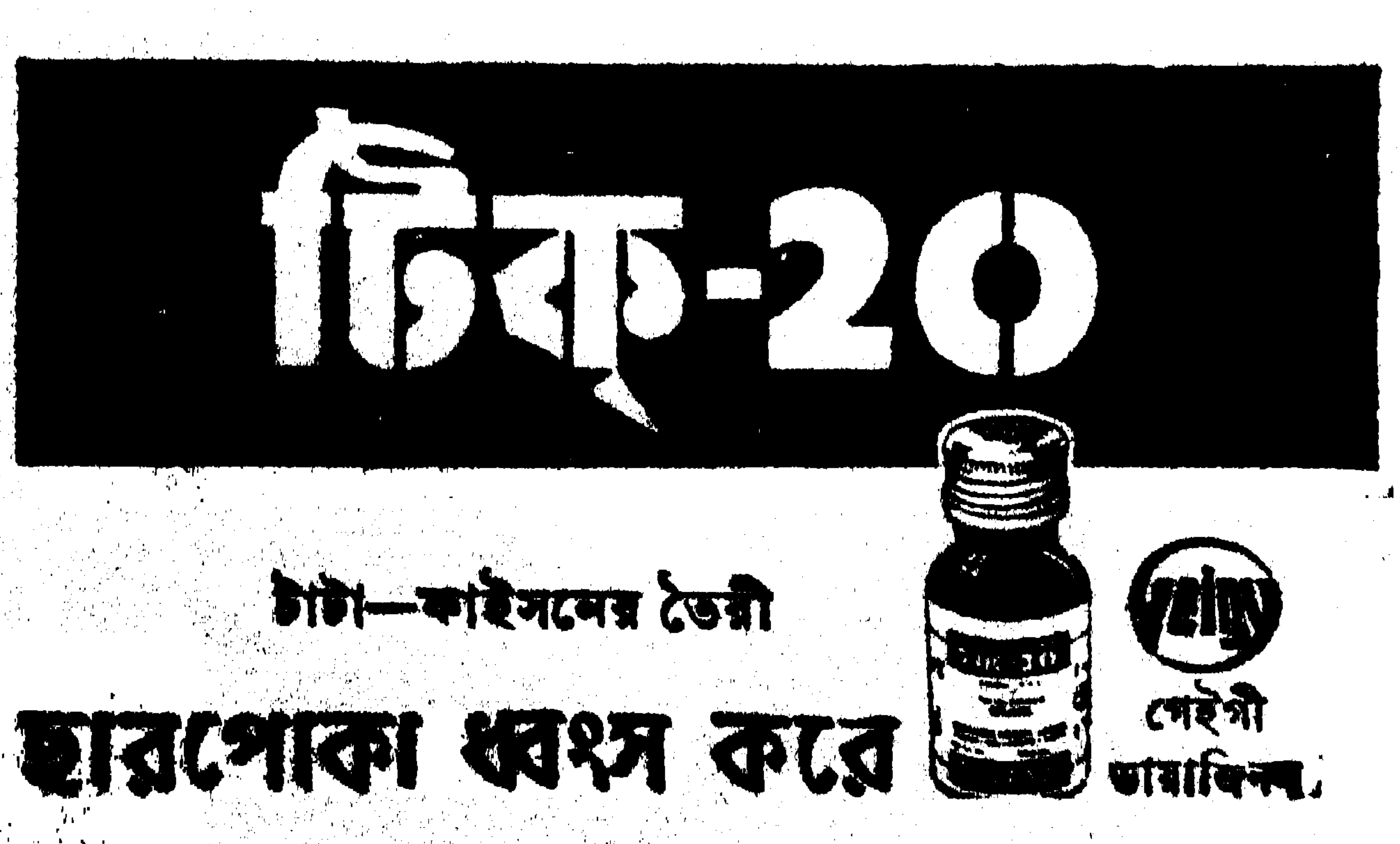

...NMENT LIBRARY ... Behar

সাম্প্রতিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

৭ই নবেম্বর—প্রকাশ, পাকিস্তানের নিকট বেরুবাড়ী ইউনিয়নের একটি অংশের হস্তান্তর সম্পর্কে কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গের সহিত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের যে আলোচনা হয়, তাহা এখন পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয় নাই।

আজিকার বাংলার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীর সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান দিনের পর দিন এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী ও চোরাকারবারীদের ব্যাপক দৌরাত্ম্যে নানাভাবে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এ সম্পর্কে বিভিন্ন ওয়াকিবহাল মহল হইতে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

৮ই নবেম্বর—বেরুবাড়ী হস্তান্তরের প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মহলে আবার বিক্ষোভের ঝড় তুলিতে চলিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধান সংশোধনের অস্ত্র দিয়া বেরুবাড়ী ইউনিয়নের অঙ্গচ্ছেদ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেও এই রাজ্যের জনমত উহাতে সহজে সায় দিবে না বলিয়া দায়িত্বশীল মহলের অনেকের দৃঢ়বিশ্বাস।

সম্প্রতি সমাজবিরোধীদের উপদ্রবে বরাহনগর অঞ্চলের অধিবাসীদের নিরাপত্তা বিপন্ন হইয়াছে বলিয়া বিভিন্ন নাগরিকদের পক্ষ হইতে অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। অনেকে এই অঞ্চলকে "সমাজবিরোধীদের শাসিত এলাকা" বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন।

৯ই নবেম্বর—টোকিও হইতে অদ্য প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা যায়, জাপানের কোন এক বিখ্যাত রেস্তোরাঁয় ভোজের সময় শ্বাসনালীতে একখণ্ড মাংস প্রবেশ করায় ভারতীয় বিমানবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ এয়ার-মার্শাল শ্রীসুব্রত মুখার্জি শ্বাসরুদ্ধ হইয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কন্যা শ্রীমতী অনীতা এই বছরের শেষদিকে ভারতে আসিতেছেন বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার তিন মাস কাল ভারতে অবস্থানের সম্ভাবনা বলিয়া জানা গিয়াছে।

১০ই নবেম্বর—গতকল্য সকালে কলিকাতায় বাগিচা সংক্রান্ত ত্রিপক্ষীয় শিল্প কমিটির বৈঠকে চা, কফি এবং রবার বাগিচা সম্পর্কে তিনটি পৃথক বেতন বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। কেন্দ্রীয় শ্রম দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীআবিদ আলী উক্ত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

ভারতীয় বিমানবাহিনীর অধ্যক্ষ এয়ার মার্শাল শ্রীসুব্রত মুখার্জির মৃতদেহ অদ্য সন্ধ্যায় বিমানযোগে কলিকাতা (দমদম) হইতে পালাম বিমান বন্দরে আনীত হইলে এক বিপুল জনতা ঐ স্থানে সমবেত হয়। পূর্ণ সামরিক মর্যাদার সহিত আজ (শুক্রবার) সকালে স্বর্গত এয়ার মার্শালের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইবে।

১১ই নবেম্বর—কলিকাতা কর্পোরেশনের বিভিন্ন দপ্তরের দুর্নীতি অনাচারাদির অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে অদ্য পৌরসভার যে বিশেষ অধিবেশন হয় তাহা বাগাড়ম্বরের মধ্যেই শেষ হইয়াছে; দুর্নীতি দূর করিবার কেলেঙ্কারি দূর করিয়া পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থা পূতিগন্ধহীন করিবার কার্যকরী কোন সিদ্ধান্তই সভা দীর্ঘ এক ঘণ্টার আলাপ-আলোচনায় গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

১২ই নবেম্বর—উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ সম্পূর্ণানন্দ জানাইয়াছেন যে, তিনি রাজ্য আইন সভায় কংগ্রেসী দলের নেতৃত্ব ত্যাগ করিবেন এবং ২৯শে নবেম্বর নূতন নেতা নির্বাচিত হইবে।

জাপানের যুবরাজ আকিহিতো ও তাঁহার পত্নী মিচিকো সোদা অদ্য রাত্রি ৯ ঘটিকায় টোকিয়ো হইতে একখানি বিশেষ বিমানে করিয়া দমদম বিমানঘাটিতে পৌঁছিলে তাঁহাদের সাদর সম্বর্ধনা জানানো হয়।

১৩ই নবেম্বর—নন্দাঘুণ্টি-বিজয়ী তরুণ দল অদ্য সকালের ট্রেনে হাওড়া স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলে অপেক্ষমাণ নরনারীর এক বিরাট জনতা তাঁহাদের বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানায়। বিজয়ী দলের জয়ধ্বনিতে সমগ্র স্টেশন এলাকা মুখরিত হইয়া ওঠে।

গতকল্য শেষরাত্রে স্বগৃহে পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যমন্ত্রী শ্রীহেমচন্দ্র নস্করের মৃত্যুর প্রায় দশ ঘণ্টা পরে অদ্য অপরাহ্নে নিমতলা শ্মশানঘাটে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

বিদেশী সংবাদ

৭ই নবেম্বর—অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব উপলক্ষে পিকিং-এর সোভিয়েট দূতাবাসে আজ রাত্রে যে সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয় তাহাতে চীন কম্যুনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান মাও-সে-তুং উপস্থিত ছিলেন। বলা বাহুল্য যে, মাও-সে-তুং সচরাচর বাহিরে আত্মপ্রকাশ করেন না।

ঢাকার খবরে প্রকাশ, ঘূর্ণিবাত্যা ও জলোচ্ছ্বাসে বিধ্বস্ত পূর্বপাকিস্তানের উপকূলবর্তী অঞ্চলে শত শত কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের ২০ লক্ষ টাকার অধিক সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

৮ই নবেম্বর—আগামী চার বৎসরের জন্য রিপাব্লিকান ভাইস-প্রেসিডেণ্ট রিচার্ড নিকসন অথবা ডেমোক্রাট সেনেটর জন কেনেডিকে মার্কিন প্রেসিডেণ্টের পদে নির্বাচনের জন্য সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ আজ ভোট দিবার জন্য নির্বাচন কেন্দ্রে যান।

গোয়া এবং স্পেন ও পর্তুগালের আরও ১৭টি বিদেশী উপনিবেশকে স্বায়ত্তশাসনবহির্ভূত অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করার জন্য ভারত এবং এশিয়া ও আফ্রিকার আরও ৮টি রাষ্ট্র সাধারণ পরিষদে একটি প্রস্তাব পেশ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

৯ই নবেম্বর—সেনেটর জন কেনেডি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নূতন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়াছেন। রিপাবলিকান প্রার্থী ভাইস-প্রেসিডেণ্ট শ্রীরিচার্ড নিকসনকে পরাজিত করিয়া শ্রীকেনেডি হোয়াইট হাউসের গদিতে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং আট বৎসর পর হোয়াইট হাউসে পুনরায় ডেমোক্রাট দলের আধিপত্য কায়েম হইল।

আজ রাষ্ট্রপুঞ্জের অছিগিরি কমিটিতে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা শ্রী ভি কে কৃষ্ণমেনন বলেন যে, পর্তুগালকে হয় রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী তাহার বৈদেশিক রাজ্যগুলি সম্পর্কে দায়িত্ব পালন করিতে হইবে, নয় উহাকে সনদ বর্জন করিয়া বিশ্ব সংস্থা ত্যাগ করিতে হইবে।

১০ই নবেম্বর—ওয়াশিংটনের খবরে প্রকাশ,—টেলিভিশন যন্ত্রের ন্যায় একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সামনে একখানা চিঠি রাখিয়া দিলে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ইলেকট্রন তরঙ্গে ভর করিয়া ছবি উঠিবে চিঠিখানার। মাত্র চার সেকেণ্ডে সে চিঠি আমেরিকার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে চলিয়া যাইবে।

ইতালীয় সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'কণ্টিনেণ্টাল' আজ এই মর্মে এক সংবাদ পরিবেশন করিয়াছে যে, গত ২১শে অক্টোবর এক নতুন ধরনের সোভিয়েট ক্ষেপণাস্ত্র বিস্ফোরণের ফলে দুইজন ঊর্ধ্বতন অফিসার সহ অন্ততপক্ষে একশত জন লোক নিহত হইয়াছে। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ এযাবৎ ঐ সংবাদ প্রকাশ করেন নাই।

১১ই নবেম্বর—গতকল্য চীৎকার ও ধিক্কারধ্বনির মধ্যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীহ্যারল্ড ম্যাকমিলানের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণের অভিযোগ আনা হয়। প্রধানমন্ত্রী শ্রী ম্যাকমিলান এই গোলমালের মধ্যে স্বপক্ষের যুক্তিগুলি খাড়া করিয়া বক্তৃতা দিবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিতে পারেন নাই।

গতকাল ভোর রাত্রির দিকে একদল প্যারা-সৈন্য দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রেসিডেণ্ট নোগো দিন দিয়েমের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটাইবার জন্য সাইগনে প্রেসিডেণ্টের প্রাসাদের উপর আক্রমণ চালাইতে আরম্ভ করে।

গতকল্য ক্রেমলিনে বারটি কম্যুনিস্ট শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে কম্যুনিস্ট শীর্ষ-বৈঠক আরম্ভ হইয়াছে। এই বৈঠক গত সপ্তাহের বৃহস্পতিবার আরম্ভ হইবার কথা ছিল কিন্তু অজ্ঞাত কারণে মুলতুবী থাকে।

১২ই নবেম্বর—অদ্য বেলা দুইটার সময় প্রেসিডেণ্ট নোগো দিন দিয়েম-এর বিরুদ্ধে ৩০ ঘণ্টাব্যাপী বিদ্রোহের অবসান ঘটে। এই সময়ে সাইগনে বিদ্রোহী প্যারা-সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করে।

কর্নেল মোবুতুর সৈন্যরা কঙ্গোস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীআখতার রহমনের পত্নীর প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়াছে। তাহারা ভারতীয়দের বিরুদ্ধে মন্তব্যও করে।

১৩ই নবেম্বর—সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান "তাস" জানাইতেছেন, কল্যাগারে মনুষ্যের বাচ্চার কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড তৈয়ার করা হইয়াছে এবং উহা আসল হৃৎপিণ্ডের ন্যায় কাজ করিতেছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক—শ্রী[illegible]
প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারাকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

GOVER... RARY

দেশ

DESH 40 Naya Paise
Saturday, 26th November, 1960

২৮ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১০ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

সংবিধান ও জনমত

রাষ্ট্রের স্বাধীন সত্তার একটি পরিচয় তার আঞ্চলিক সংহতি; যেমন স্বাধীন ভারতীয় প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের পরিচয় একটা বিস্তীর্ণ ভূভাগের উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিমে সুনির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত তার আঞ্চলিক অধিকার। এই চতুঃসীমার বাইরে যাই থাকুক, ভিতরের কোন অংশের উপর কোন বিদেশী রাষ্ট্রের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে দেওয়া মানে ভারত-রাষ্ট্রের আঞ্চলিক সংহতি নাশ। চীনের বিরুদ্ধে ভারতের অভিযোগ এই নিয়েই। সীমানা নির্ধারণ নিয়ে ভারত-পাকিস্তান বিরোধ হয়ত কিছুটা অন্যরকম; পাকিস্তানকে বেরুবাড়ী ইউনিয়নের অর্ধাংশ হস্তান্তরের প্রস্তাবটা সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির অপরিহার্য অঙ্গ মনে করা যায় না। যায় না আরও এই কারণে যে, ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার তের বৎসর পর ভারত-রাষ্ট্রভুক্ত একটি এলাকা পাকিস্তানকে হস্তান্তরিত করার উদ্যোগ চলছে। যুদ্ধে হারজিতের ফলে কোন দেশের আঞ্চলিক অধিকার সংকুচিত অথবা প্রসারিত হতে পারে, যেমন হয়েছে জার্মেনীর, জাপানের, পোল্যান্ডের। আরও বহু দিন পূর্বে, এক শতাব্দীরও আগে, এমনও ঘটেছে যে, এক রাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত অঞ্চল অন্য রাষ্ট্র কিনে নিয়েছে, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিনেছিল লুইসিয়ানা স্টেট ফ্রান্সের কাছ থেকে। বেরুবাড়ি হস্তান্তরের প্রস্তাবটা যুদ্ধে হারজিতের মাশুলও নয়, কিম্বা বেচাকেনাও নয়। স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের একটা অবিসংবাদিত অংশ বিদেশী রাষ্ট্রকে হস্তান্তরিত করা হবে কেন, তার কারণ সাধারণের পক্ষে বোধগম্য নয়। আন্তর্জাতিক রোয়েদাদের জের টেনে নেহরু-নূন চুক্তি; এই চুক্তির শর্ত পূরণের জন্য বেরুবাড়ি পাকিস্তানকে হস্তান্তর প্রস্তাব। এক কথায়, চুক্তির মর্যাদা রক্ষার জন্য স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের নূতন অঙ্গচ্ছেদ।

দেশনায়কেরা সম্ভবত মনে করেন, বিশাল ভারতবর্ষই যখন বিভক্ত করা হয়েছে, তখন দেশের সামান্য একখণ্ড বিদেশী রাষ্ট্রকে হস্তান্তর করায় কী আসে যায়। বেরুবাড়ির বারো হাজার নাগরিক এবং তাদের বাসভূমিকে খরচের খাতায় লিখতে রাষ্ট্র-কর্তারা দ্বিধা করবেন না জানি। কিন্তু প্রশ্নটা শুধু বেরুবাড়ি ও তার বারো হাজার নাগরিকের ভাগ্য বিপর্যয়ে সীমাবদ্ধ নয়। বেরুবাড়ি পাকিস্তানকে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন শ্রী নেহরুর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠেছে, কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত কি গণতান্ত্রিক রীতিসম্মত? রাষ্ট্র কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়; রাষ্ট্রের আঞ্চলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করে কোনও ভূখণ্ড বিদেশী রাষ্ট্রকে সমর্পণ করবার অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারেরও নাই। কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রীম কোর্টের অভিমত মেনে নিয়ে এখন সংবিধান সংশোধনের জন্য পার্লামেন্টে বিল পেশ করছেন। এ-দ্বারা আইনের মর্যাদা রক্ষিত হতে পারে, কিন্তু গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে জনগণের অধিকার রক্ষার নীতিগত প্রশ্নের সুবিচার ঘটছে না।

গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে জনসাধারণের সার্বভৌম অধিকার, জনসাধারণই সকল ক্ষমতার উৎস—সংবিধানের এই প্রথম প্রতিজ্ঞা নিতান্ত কথার কথা নয়। জনসাধারণের সম্মতি ছাড়া দেশের এক অংশ—সে অংশ যতই সামান্য হোক না কেন—বিদেশী রাষ্ট্রকে হস্তান্তর করার অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের নাই। পার্লামেন্টেরও সে-অধিকার বর্তমানে আছে কিনা সন্দেহ। কারণ পার্লামেন্টে নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিরা তাঁদের নির্বাচকমণ্ডলীর কাছ থেকে এ-বিষয়ে কোনও নির্দেশ নেননি। পার্লামেন্টের অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ এবং মোট সদস্য-সংখ্যার অধিকাংশের ভোটে সংবিধান সংশোধন করা যায় বটে; উপরন্তু কোনও অঙ্গরাজ্যের সীমানা পরিবর্তন, আয়তন বৃদ্ধি অথবা হ্রাস করার জন্যও পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করতে পারেন। কিন্তু অঙ্গরাজ্যের অঙ্গচ্ছেদ করে কর্তিত অংশ বিদেশী রাষ্ট্রকে হস্তান্তর করার জন্য সংবিধান সংশোধন আদৌ গণতান্ত্রিক নীতিসম্মত কিনা, এই প্রশ্নের সন্তোষজনক বিচার প্রয়োজন। জনসাধারণের সুস্পষ্ট অভিমত গ্রহণ না করে পার্লামেন্ট যদি বিদেশী রাষ্ট্রকে দেশের এক অংশ সমর্পণ করার ক্ষমতাসম্পন্ন হন, তাহলে দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে যে-কোনও গভর্নমেন্ট ইচ্ছামত ভারত-রাষ্ট্রের অঙ্গচ্ছেদ ও সংহতি হনন করতে পারবেন। সংবিধান এবং আইন যাই বলুক, স্বাধীন রাষ্ট্রের আঞ্চলিক সংহতি এভাবে নষ্ট বা ধ্বংস হতে দেওয়া জন-স্বার্থের বিরোধী এবং নিশ্চয়ই জনগণের অভিপ্রেত নয়।

ভারতীয় সংবিধানের আর-এক গুরুতর অসঙ্গতি বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি অথবা চুক্তি সম্পাদনে গভর্নমেন্ট অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারই সর্বেসর্বা। কেন্দ্রীয় সরকার যদি বেরুবাড়ির মত অন্য কোনও ভারতীয় এলাকা বিদেশী রাষ্ট্রকে (যথা চীনকে) হস্তান্তর করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন, তবে সেক্ষেত্রেও পার্লামেন্টের অর্থাৎ জন-প্রতিনিধি-মণ্ডলীর অনুমোদন আবশ্যিক নয়। অর্থাৎ বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি এবং সন্ধি ব্যাপারে ভারতীয় সংবিধানের ফাঁকটা এত বড় যে, নেহরু সরকার কিম্বা অন্য কোনও কেন্দ্রীয় সরকার রাজধানী দিল্লি বাদে গোটা দেশটা কোনও বিদেশী রাষ্ট্রকে হস্তান্তরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হলে পার্লামেন্ট কিম্বা জনসাধারণ আইনত সে-চুক্তি অগ্রাহ্য করতে অক্ষম।

ব্রিটেনের সংবিধান লিখিত না হলেও অলিখিত বিধি হল আর্থিক দায়যুক্ত কোন চুক্তি কিম্বা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কোনও এলাকা হস্তান্তরের জন্য চুক্তি বা সন্ধি পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়া কার্যকর হতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেনেটের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদন ছাড়া কোনো বৈদেশিক চুক্তি বা সন্ধি সিদ্ধবদ্ধ হতে পারে না। গণতান্ত্রিক বিধানে এদিক দিয়ে ভারতীয় সংবিধানই গভর্নমেন্টের

যথেচ্ছ বিধানের প্রশ্রয়দাতা। তবে কেন্দ্রীয় সরকার সম্পাদিত চুক্তি বা সন্ধি অনুমোদন করা না করার অধিকার পার্লামেণ্টকে দেওয়া হলেও অবস্থার যে বিশেষ পরিবর্তন হবে, তা নয়। ক্ষমতাসীন দলের যতদিন পার্লামেণ্টে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে, ততদিন কেন্দ্রীয় সরকার অনায়াসে যে-কোনও চুক্তি বা সন্ধি অনুমোদন করিয়ে নিতে পারবেন। তবু বলি, সংবিধানের বিধান এড়িয়ে দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিদেশী রাষ্ট্রের হাতে দেশের এক অংশ সমর্পণ করাটা নজীর হিসাবে যেমন বিপজ্জনক, তেমনি জনসাধারণের প্রতি ঘোর অমর্যাদাসূচক। রাষ্ট্রের আঞ্চলিক সংহতি রক্ষার প্রশ্নে জনসাধারণের স্পষ্ট সম্মতি ছাড়া পার্লামেণ্টের কোন সিদ্ধান্ত নেবার নৈতিক অধিকার নেই।

প্রসঙ্গত

মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাসগৃহ-রক্ষণ সম্বন্ধে সরকারী পরিকল্পনা সম্প্রতি জানা গেল। পরিকল্পনাটি জেনে বিস্মিতও হওয়া গেল যথেষ্ট। গত ১৫ নভেম্বর তারিখে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় প্রশ্নোত্তরকালে রাজ্যের পূর্ত ও গৃহনির্মাণ মন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, মধুসূদন দত্ত কলকাতায় যে সকল বাড়িতে বাস করেছেন তার মধ্যে একটি বাছাই করে মাইকেলের স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা নাকি শীঘ্রই করা হবে। তিনি আরও জানিয়েছেন—৬নং লোয়ার চিৎপুর রোডের বাড়ি সংরক্ষণের কোনো প্রস্তাব সরকারের নাকি আপাতত নাই।

এই ভাষণ পাঠ করে আমাদের চমক লাগল, মনে হল—

এ কি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে! এমন আশ্চর্য কথা শোনার জন্যে আমরা প্রস্তুত ছিলাম না বলেই সম্ভবত আমরা চমকিত হয়েছি।

মাইকেলের বাসগৃহগুলির মধ্যে থেকে একটি বাড়ি বাছাই করা হবে।—ভালো কথা। কিন্তু তার আগেই বাছাই করে আসল গৃহটি—৬নং লোয়ার চিৎপুর রোডের গৃহটি—বাদ দিয়ে রাখা হল কেন, এই রহস্য যদি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উদ্ঘাটন করেন, তাহলে দেশবাসী তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হবেন।

মাইকেলের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা যে কারণে করার কথা হচ্ছে, সেই কারণটি ঘটেছে ঐ গৃহে—ঐ ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোডের গৃহে। ঐ গৃহে বাসকালেই তিনি রচনা করেছেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহ। সুতরাং এই গৃহটির মর্যাদা অন্য সব গৃহের চেয়ে অধিক।

যদি মাইকেলের স্মৃতিরক্ষার ঐকান্তিক ইচ্ছা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের থেকে থাকে তাহলে এই গৃহই সংরক্ষণ করতে হবে। উপরোধে ঢেঁকি-গেলা, কিংবা 'রোগী যথা নিমথায় মুদিয়া নয়ন'—গোছের কোনো দায়সারা কাজ করার জন্য যদি যে কোনো একটি বাড়ি বাছাই করতে তাঁরা উদ্যোগী হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, দরকার নেই সে কাজে।

৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড বাংলা সাহিত্যের একটি তীর্থ। কয়েক বছর আগে (১৯৫৫) 'বঙ্গসাহিত্য সমাবেশ' নামক সাহিত্যিক সংস্থার উদ্যোগে এই গৃহে মধুসূদনের জন্মতিথি পালিত হয়। বাংলা দেশের বিশিষ্ট প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিক বৃন্দের সঙ্গে সেদিন বিচারপতি রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী স্বর্গত পান্নালাল বসু সেই সভায় এই গৃহটি রক্ষার যুক্তি প্রদর্শন করেন। শিক্ষামন্ত্রী লিখিতভাবেও গৃহটি রক্ষার বিষয় বলেন, এবং তার মূল্য নিরূপণ করে বঙ্গসাহিত্য সমাবেশের সম্পাদককে জানান যে, গৃহটির মূল্য আনুমানিক ২,০৬,৪১৫, টাকা।

ধনঞ্জয় বৈরাগীর

নতুন উপন্যাস

ছন্দ যতি মিল

আগামী সংখ্যা থেকে

ধারাবাহিকভাবে

প্রকাশিত হবে।

আমরা সেইসব নথিপত্রের প্রতি পূর্ত ও গৃহনির্মাণ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সরকারী দপ্তর থেকে তিনি এগুলি দেখে নিয়ে যেন কাজে অগ্রসর হন। তাহলে তিনিও অযথা দেশবাসীর কাছে অপদস্ত হবেন না, দেশবাসীও নিজেদের অপ্রস্তুত মনে করবেন না।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আমরা মধুসূদনের প্রামাণ্য জীবনী রচয়িতা নগেন্দ্রনাথ সোমের বক্তব্যের প্রতিও আকর্ষণ করি, "মধুস্মৃতি" গ্রন্থে লিখিত আছে—

তিনি [মধুসূদন] পুলিস কোর্টে দ্বিভাষিকের পদে উন্নীত হন। এই পদ লাভ করিয়া তিনি কিশোরীচাঁদের উদ্যানবাটিকা পরিত্যাগপূর্বক তদানীন্তন লালবাজার পুলিস কোর্টের পূর্ব পারে লোয়ার চিৎপুর রোডের উপর অবস্থিত ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড দ্বিতল ভবন ভাড়া করিয়া তাহাতেই বাস করিতে লাগিলেন।

এই বাটিতেই তিনি মেঘনাদবধকাব্য, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, শর্মিষ্ঠা নাটক, পদ্মাবতী নাটক, কৃষ্ণকুমারী নাটক, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। রত্নাবলী ও শর্মিষ্ঠা নাটকদ্বয়ের ইংরাজি অনুবাদও এই বাটীতে অবস্থান কালেই সমাধা করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষায় রচিত তাঁহার যাবতীয় গ্রন্থই পুলিস আদালতে দ্বিভাষিকের কার্যে নিযুক্ত থাকিবার সময় রচিত। ন্যূনাধিক তিন বৎসরের মধ্যে অদ্ভুত প্রতিভাশালী মধুসূদন এই পবিত্র কীর্তিমন্দিরে তাঁহার জীবনের অপূর্ব সাহিত্যব্রতের প্রতিষ্ঠা করেন।

যে গৃহটি "পবিত্র কীর্তিমন্দির"রূপে আখ্যাত, সেই গৃহটি বাদ দিয়ে অন্য যে-কোনো একটি গৃহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রহসনের নামান্তরই হবে। এই গৃহটি বাদ দেওয়ার হেতু দেশবাসীর জানার আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। আমরা অবগত আছি যে, এই গৃহের

মালিক—মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর

ইজারাদার—মৌলভী মহম্মদ নূরুল ইসলাম ২১৭ পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা

তাঁদের কাছ থেকে গৃহটি ক্রয় করে নিতে আশা করি কোনো অসুবিধা নেই।

পরিশেষে এই গৃহটি সম্বন্ধে মধুসূদনের অন্তরঙ্গ সুহৃৎ গৌরদাস বসাক কি বলেছেন উদ্ধৃত করি—

It was in this memorable house that he (Madhusudan) wrote his principal works—Sarmistha, Tilottama, and Meghnadbadh. Had Bengal been Englnd this house would have been purchased and maintained for being visited by the admirers of his genius.

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বঙ্গদেশ সত্যই ইংলণ্ড নয়, কিন্তু বঙ্গদেশ রত্নগর্ভা, "হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন" মধুসূদনের এ উক্তিই ধ্রুব সত্য। তার প্রমাণ, মধুসূদনের বাসগৃহ-সংরক্ষণ ব্যাপারের অদ্ভুত পরিকল্পনাটি।

বিদেশের কথা লিখতে গেলে রাষ্ট্র-শক্তিধরদের কথাই বেশি এসে যায়। এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের সম্পর্ক বা এক দেশের উপর অন্য দেশের প্রভাবের কথা-প্রসঙ্গে রাষ্ট্রশক্তির ভূমিকাই মুখ্য আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। তার কারণ আছে। ধর্ম, সাহিত্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান—কিছুরই লেনদেন আজকাল অবাধ নয়, সবই কম হোক বেশি হোক, রাষ্ট্রশক্তির অনুমোদন সাপেক্ষ। অতীতেও রাজার হাত এসব ব্যাপারে ছিল না তা নয়। রাজার আনুকূল্য বা বিরুদ্ধাচরণের ফল মানুষকে বরাবরই ভোগ করতে হয়েছে। অবশ্য এসব ব্যাপারে রাষ্ট্রশক্তির আচরণ সব দেশে বা সব যুগে এক রকম ছিল না। ধর্ম ও রাষ্ট্রশক্তি একে অপরের আনুকূল্যে স্বীয় প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছে। কখনো কখনো দুয়ের ক্ষেত্র মিলে গিয়ে উভয় শক্তি একাধারে দেখা দিয়েছে। আজকাল সাধারণত ধর্ম বলতে যে- অর্থ ধরা হয়, ধর্মের সংজ্ঞা পূর্বে তার চেয়ে অনেক ব্যাপক ছিল। অনেক কিছু, বিশেষত সমাজ-জীবনে, যা পূর্বে ধর্মের অন্তর্গত বলে ধরা হত, তা এখন অন্য নামে অভিহিত করা হয়। ধর্ম ও রাষ্ট্রশক্তির সম্পর্ক আলোচনার সময়ে এই কথাটা মনে রাখা দরকার। তা না হলে ধর্মীয় ব্যাপারে পূর্বের তুলনায় বর্তমানকালে রাষ্ট্রশক্তির হস্তক্ষেপের পরিমাণ বেশি কি কম, তার বিচার ঠিক হবে না। যেখানে রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে আলাদা করা হয়েছে বলে বলা হয়, সেখানে যদি দেখা যায় যে, পূর্বে ধর্মীয় বলে বিবেচিত হত কিন্তু এখন হয় না, এমন অনেক কিছু ব্যাপারে রাষ্ট্রের প্রভাব বা অধিকার কমেনি, এমনকি হয়ত বেড়েছে, তাহলে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে আজকাল যে-ধারণার সৃষ্টি করা হয়, তার অর্থ একটু ভালো করে যাচাই করে নেওয়া উচিত। কম্যুনিস্ট থিওরী ধর্ম বলে কিছু মানতেই রাজী নয়, কিন্তু বস্তুত ধর্মের এক্তিয়ার যা ছিল, সব কিছুর উপরই কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র অধিকার দাবি করে। কম্যুনিজম অবশ্য নিজেকে ধর্ম বলে না, কিন্তু কম্যুনিস্টের কাছে কম্যুনিজমই ধর্মস্থানীয় এবং সেই ধর্মের যাবতীয় ব্যাপারে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের অধিকার স্বীকৃত। [illegible]

[illegible]

লেনদেনের উপরেই রাষ্ট্রশক্তির কর্তৃত্ব বিস্তৃত এবং দৃঢ়তর হচ্ছে। ধর্ম (এমন কি, বর্তমানের সংকীর্ণ সংজ্ঞার ধর্ম), সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান—কোনো কিছুতেই আজকাল এক দেশের মানুষের অন্য দেশের মানুষের সঙ্গে স্বাধীনভাবে দেওয়া-নেওয়া করার সাধ্য নেই। সব কিছুতেই রাষ্ট্রের অনুমোদন চাই। অতীতেও রাষ্ট্রশক্তির এসব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ চলত, কিন্তু এখনকার মতো এমন বজ্র আঁটুনি পূর্বে কখনও ছিল না। এখনকার মতো এমন আঁটঘাট বাঁধার ব্যবস্থা পূর্বে সম্ভবও ছিল না। আজকাল রাষ্ট্রশক্তির অনুমোদন ছাড়া এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াত পর্যন্ত সম্ভব নয়, বাইরে যেতে হলে বা অন্য দেশের লোকের ভিতরে আসতে হলে পাসপোর্ট, ভিসা চাই, "বিদেশী" টাকা ক্রয় করাও রাষ্ট্রশক্তির ইচ্ছা এবং অনুমতির উপর নির্ভর করে। এমন কি, অনেক ব্যাপারে বিদেশ থেকে দান গ্রহণও রাষ্ট্র-

'নাভানা'র বই

আধুনিক কাব্যের অবিস্মরণীয় গ্রন্থ

জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা

পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো

সর্বসুলক্ষণসম্পন্ন স্বর্গত কবি জীবনানন্দ দাশের 'ঝরা পালক', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'বনলতা সেন', 'মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির' ও 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থগুলির বিশিষ্ট কবিতাসমূহ এবং অনেকগুলি উৎকৃষ্ট অপ্রকাশিত রচনা এই সংকলনে সংযোজিত হয়েছে। পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণে কবির সর্বশেষ রচনাটি সমেত সংক্ষিপ্ত জীবনীপঞ্জী এবং তাঁর নিজের ও একটি পাণ্ডুলিপির আলোকচিত্র সন্নিবিষ্ট হয়েছে ॥

দাম ঃ পাঁচ টাকা

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

বোদলেয়ার ঃ তাঁর কবিতা ॥ বুদ্ধদেব বসু
প্রথম কদম ফুল ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ
ঘরে-ফেরার দিন ॥ অমিয় চক্রবর্তী

নাভানা

[illegible] গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

শক্তির অনুমোদন ছাড়া চলে না। কারণ রাষ্ট্রের ভয় পাছে সে দানের মধ্য দিয়ে দাতা কোনো গূঢ় মতলব হাসিলের চেষ্টা করে। প্রত্যেক দেশের রাষ্ট্রশক্তির হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র যত বাড়ছে, এই অবিশ্বাস তত বাড়ছে। ধরুন, শিক্ষা কোনো দেশে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীন। শিক্ষার ধারা, উদ্দেশ্য, ব্যবস্থা সমস্তই রাষ্ট্রকর্তাদের তৎকালীন মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এমন দেশে যদি অন্য দেশ থেকে কোনো ছাত্র আসতে চায়, তবে শেষোক্ত দেশের রাষ্ট্রশক্তি স্বভাবতই মনে করতে পারে যে, এ ব্যাপারে তারও কিছু বক্তব্য থাকা দরকার, কারণ এখানে প্রকৃতপক্ষে কারবারটা হচ্ছে অন্য এক রাষ্ট্রের সংগে এবং কোনো রাষ্ট্রই বর্তমানকালে তার নিজের নাগরিককে অন্য কোনো রাষ্ট্রের সংগে সরাসরি কোনো কারবার করতে দিতে প্রস্তুত নয়। কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের করায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা নিতে গেলেও এবং সে-শিক্ষা মুফৎ পাওয়া গেলেও (বস্তুত মুফৎ পাওয়ার কথা হলে কড়াকড়ি আরো বেশি) নিজের দেশের গভর্নমেণ্টের অনুমোদন চাই।

এ বিষয়ে ভারত সরকারের ব্যবস্থা পূর্বে অনেকটা ঢিলেঢালা ছিল। স্বাধীনতা লাভের পরে কয়েক বছর পর্যন্ত কিছু সংখ্যক ভারতীয় ছাত্র সরাসরি বিদেশী সরকার বা বিদেশী সরকার কর্তৃক নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে শিক্ষা নিয়ে এসেছে। তখন এইসব শিক্ষার্থীদের মনোনয়ন ব্যাপারে ভারত সরকার কোন হস্তক্ষেপ করতেন না। বিদেশী কর্তৃপক্ষ যাদের মনোনয়ন করতেন তারাই যেতে পারত। পরে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এখন বিদেশী সরকার বা বিদেশী সরকারের দ্বারা নিযুক্ত প্রতিষ্ঠান যদি ভারতীয় ছাত্রদের জন্য কোনো স্কলারশিপ দিতে চান তবে স্কলারশিপ প্রার্থীর মনোনয়ন এখন ভারতীয় কর্তৃপক্ষ করেন, অবশ্য মনোনয়নের সময়ে তাঁদের সংগে বৃত্তিদানকারী সরকারের প্রতিনিধিও থাকেন। মস্কোতে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট "পিওপলস্ ফ্রেণ্ডশিপ ইউনিভার্সিটি" নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে সেখানে ছাত্র-ছাত্রী নেওয়া হচ্ছে যাদের যাবতীয় খরচা সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ বহন করেন। এই প্রতিষ্ঠানে সরাসরি ছাত্র ভর্তি করে নেওয়ার চেষ্টা প্রথম হয়েছিল। অন্যান্য দেশের ছাত্রদের সম্বন্ধে ঠিক কী হয়েছে জানি না। কিন্তু ভারত সরকার এতে আপত্তি করেন। মস্কোতে ফ্রেণ্ডশিপ ইউনিভার্সিটিতে ভারতের ছাত্র যারা যাবে তাদের মনোনয়ন ভারত সরকার করেন। ভারত সরকার আর একটি শর্ত করে দিয়েছেন যে, পলিটিক্স্ বা ঐ ধরনের বিষয় শিক্ষার জন্য কোনো ভারতীয় ছাত্রকে পাঠানো হবে না, প্রধানত বিজ্ঞান অথবা কারিগরী শিক্ষার জন্য পাঠানো হবে। সোভিয়েট ইউনিয়নে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই ভালো। কিন্তু তার জন্য এশিয়া এবং আফ্রিকার ছাত্রদের জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আবশ্যকতা কেন হলো? অন্যান্য সাধারণ প্রতিষ্ঠানে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা কি সম্ভব ছিল না? কারো কারো মনে এরূপ সন্দেহ জেগেছে যে ফ্রেণ্ডশিপ ইউনিভার্সিটির বৈজ্ঞানিক শিক্ষার মান অন্যান্য সোভিয়েট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তুলনায় নিচু হবে।

এই প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন করতে গিয়ে মিঃ ক্রুশেচফ বলেছেন যে, তিনি কম্যুনিস্ট এবং কম্যুনিজ্‌ম্‌ই তাঁর কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ মতবাদ, ফ্রেণ্ডশিপ ইউনিভারসিটিতে শিক্ষার ফলে কেউ যদি কম্যুনিস্ট হয় তবে তাঁরা অবশ্য (সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ) রাগ করবেন না, আবার কেউ যদি কম্যুনিস্ট না হয় তাহলেও তাঁরা রাগ করবেন না; সাম্রাজ্যবাদী ক্যাপিটালিজ্‌ম্‌ দ্বারা যে-সব দেশ নিগৃহীত হয়েছে তাদের উপকার করা ছাড়া ফ্রেণ্ডশিপ ইউনিভারসিটি স্থাপনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। যাই হোক এসব কথার অর্থ কেটেছেঁটে কতটুকু নিতে হয় তা সকলেই জানেন। আসল কথা হচ্ছে এই যে, যখন কোনো সরকারই অন্য সরকারকে বিশ্বাস করেন না এবং সব ব্যাপারেই সরকারী হস্তের বিস্তার চলছে তখন এক দেশের মানুষের সঙ্গে অন্য দেশের মানুষের সহজ আদান প্রদানের পথ ক্রমশ একেবারে বন্ধ হয়ে আসছে। মজা এই যে আন্তর্জাতিক লেনদেনে সরকারী শক্তির এক্তিয়ার যতই একচেটিয়া হওয়ার দিকে চলেছে মানুষের মনের উপর সহজ [illegible] প্রভাবের লেনদেন যেন ততই কঠিন হয়ে উঠছে।

টলস্টয়ের ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে আজ ভাবি [illegible] চেষ্টায় [illegible] মর্মের উপর কী প্রভাবই [illegible] পেরেছিলেন।

পূর্ব ভারতের শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক সর্বাধিক প্রচারিত প্রতি শিক্ষিত ব্যক্তির অবশ্যপাঠ্য মাসিক।

"বাংলার অনন্যসাধারণ মাসিক পত্রিকা।" —শ্রীঅতুল গুপ্ত

শিক্ষক

"A unique journal of great educational value." —Dr. S. N. Banerjee.

'শিক্ষক' শিক্ষাব্রতীদের অবশ্য পঠনীয় ও জাতীয় সম্পদ বলে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য। —শ্রী এ. কে. চন্দ

"গত তের বছর 'শিক্ষক'-এর কাছ থেকে আমরা যা পেয়েছি তার মূল্য অসামান্য।" প্রাক্তন শিক্ষা অধিকর্তা—ডাঃ পরিমল রায়

"শিক্ষা জগতে একটি স্থায়ী মর্যাদাপূর্ণ আসন লাভ করিয়াছে।" —ডাঃ শ্রীকুমার ব্যানার্জি

"শিক্ষক" দেশের একটি প্রকাণ্ড অভাব পূরণ করিয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট—ডাঃ শিশির মিত্র

"শিক্ষক মাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য।" —ত্রিপুরার শিক্ষা অধিকর্তা

বার্ষিক মূল্য—৬·২৫

খ্যাতনামা মনীষীদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাসহ শ্রাবণে ... ... সগৌরবে চতুর্দশ বর্ষে পড়িয়াছে।

সম্পাদক— অধ্যাপক শ্রীমহীতোষ রায়চৌধুরী, এম-এ, এম-এল-সি
৬১, বালীগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। ফোন: ৪৬-১৮৭৪

দূর দূরান্তরে পণ্যের বার্তা পাঠাইয়া নূতন ক্রেতা সৃষ্টি করিতে হইলে 'শিক্ষকে' বিজ্ঞাপন দিন।

(সি-১৫৫২)

আলোচনা

অতি আধুনিক ছোট গল্প

মহাশয়,

উপরোক্ত পর্যায়ের আলোচনা বেশ সময়োপযোগী হয়েছে। অনেকের মতন এই প্রশ্ন আমাদের মতো পাঠক-দেরকেও দস্তুর মতো চিন্তিত করে তুলেছে। নতুনকে আমরা অভিনন্দিত করব অবশ্যই। কিন্তু নতুন বস্তুটি স্বয়ম্ভূ নয়—তারও পুরাতনের সংগে একটা সম্পর্ক রয়েছে। নতুনতার খাতিরেই যদি নতুনতা আসন দখল করতে আসে তাহলে তার কৌলীন্য সম্পর্কে সংশয় জাগে।

কিছু সমালোচক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, অতি আধুনিক গল্প কালে কবিতার আদল নেবে। আমরাও বলি নিক। কিন্তু এ প্রশ্ন থেকেই যায়—গল্প শেষ পর্যন্ত তার নিজস্ব ধর্ম মেনে চলবে কিনা। আমাদের মনে হয় গল্পে ঘটনা চরিত্র ভাবমণ্ডল এবং সর্বোপরি জীবনদর্শন সাধারণ অর্থে থাকা উচিত। অথচ সত্যি কথা বলতে গেলে হালের গল্পে একমাত্র লেখকমানসের মেদুর ভাবালুতা ছাড়া অন্য ধর্ম দুষ্প্রাপ্য। তাঁরা লেখায় মনোহারি পরিবেশ সৃষ্টি করেন কিন্তু গল্পপাঠ শেষ করে পাঠকের কেবল মনে হয় এই পরিবেশ শুধু পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে। না-ঘটনা না-চরিত্র না-জীবনদর্শন কোনো কিছুকেই তা কাজে লাগাতে পারছেনা। যেন কবিতার মতোই একটা মুড সৃষ্টি করবার প্রয়াস। হালের লেখকদের লেখায় ডিটেলস্-এর কাজ আছে। কিন্তু সে-ডিটেলস্ চরিত্র-স্ফুটনে বিন্দুমাত্র সহায়ক হচ্ছে না বলেই আমাদের বিশ্বাস। চরিত্রের তৎকালিন মানসিকতার দর্পণেই কেবলমাত্র পরিবেশ ফুটে ওঠাই স্বাভাবিক। অর্থাৎ একজন বেকার ক্ষুধার্ত লোক যদি ধর্মতলা থেকে কলেজ স্ট্রীট হেঁটে আসেন তখন তাঁর বাস্তব পরিমণ্ডল ভিক্তোর হ্যুগোর নায়ক জাঁ ভালজাঁর মতো হবে। তিনি ট্রামের তারে ছেঁড়া ঘুড়ির টুকরো, কিংবা হাতে অষ্টাদশী যুবতী কিংবা বাথরুমের গায়ে কোনো বিজ্ঞাপন দেখবেন [illegible] সত্য নয়। সেই ক্ষুধার্ত মানুষটির কাছে তখন পূর্ণিমার চাঁদ ঝলসানো রুটি হয়ে গেছে। অন্তত [illegible] সত্য তাই বলে। একথা বলা [illegible] হবে [illegible] বাস্তবের সত্য [illegible] [illegible]

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

ডক্টর নবগোপাল দাসের
চাঞ্চল্যকর গ্রন্থ

এক অধ্যায়

সংবাদপত্রের শিরোনামার পিছনে যে কাহিনী অনুক্ত তারই চাঞ্চল্যকর ঘটনার বিস্তৃত পরিবেশে উদ্ঘাটিত হয়েছে 'রাঘব-বোয়াল-দের' বীভৎস নগ্ন স্বরূপ। ৩·০০ ॥

দেবেশ দাশের নবতম রম্যগ্রন্থ

পশ্চিমের জানলা

সপ্ত সমুদ্রের পারে পশ্চিম জগতের জানলা দিয়ে দেখা জীবন-মিছিলের বিচিত্র রূপায়ণের অন্তরঙ্গ কাহিনী রঙে রসে ব্যঞ্জনায় সার্থক-সুন্দর। ৫·০০ ॥

নট নাট্যকার ও কথাশিল্পী
বিজন ভট্টাচার্যের নবতম উপন্যাস

রাণী পালঙ্ক ২·৫০ ॥

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নবতম উপন্যাস

নিকষিত হেম ৩·০০ ॥

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর

আয়ুবের সঙ্গে

প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নবনায়ক সামরিক ডিক্টেটর আয়ুব খানের সংগে সাক্ষাৎ-আলাপের কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী। পূব বাংলার চেনা-অচেনা মানুষের জীবন্ত এ্যালবাম। ২·০০ ॥

জরাসন্ধের সাম্প্রতিক উপন্যাস

ন্যায়দণ্ড ৬·৫০ ॥

তামসী (৭ম মুঃ) ৫·৫০ ॥

বাংলায় 'বিষকন্যা' ও হিন্দীতে 'নাগিনী' নামে চিত্রায়িত হচ্ছে।

সৈয়দ মুজতবা আলীর নবতম গ্রন্থ

চতুরঙ্গ ৪·৫০ ॥

সমরেশ বসুর আশ্চর্য উপন্যাস

বাঘিনী ৭·০০ ॥

গঙ্গা (৫ম মুঃ) ৫·৫০ ॥

সম্প্রতি এই বইটির চিত্রমুক্তি ঘটেছে

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সপ্তপদী (১২শ মুদ্রণ) ২·৫০

ছায়াচিত্রে এই বইটির মুক্তি আসন্ন

বরিস পাস্তেরনাকের উপন্যাস

ডাঃ জিভাগো ১২·৫০ ॥

কবিতার অনুবাদ ও সম্পাদনা:
বুদ্ধদেব বসু

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের প্রখ্যাত গ্রন্থ

সুখের সন্ধানে ৫·০০

[The Conquest Of Happiness]
অনুবাদ: পরিমল গোস্বামী
[শেষ বই দুটি বুক্স অ্যাণ্ড কোং-র সহযোগিতায় প্রকাশিত]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
চলাচল (২য় মুঃ) ৬·৫০ ॥

সুবোধ ঘোষের
একটি নমস্কারে (২য় মুঃ) ৪·০০ ॥

প্রাণতোষ ঘটকের
মুক্তাভস্ম (২য় মুঃ) ৫·০০ ॥

প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর
ঝড়ের পাখী (২য় মুঃ) ৩·০০ ॥

হুমায়ুন কবিরের
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ৩·৫০ ॥

প্রমথ চৌধুরীর
পিয়াপসন্দ (৫ম মুঃ) ৩·০০ ॥

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর
মণিপদ্ম ৪·০০ ॥

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
অপারেশন (২য় মুঃ) ৬·০০ ॥

প্রফুল্ল রায়ের
সিন্ধুপারের পাখি (২য় মুঃ) ৯·০০ ॥

বারীন্দ্রনাথ দাশের
কর্ণফুলি (৩য় মুঃ) ৩·৫০ ॥

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
কন্যাকুমারী (২য় মুঃ) ৩·০০ ॥

নীলকণ্ঠের
অদ্য ও প্রত্যহ (২য় মুঃ) ৫·০০ ॥

আনন্দকিশোর মুন্সীর
রাঘব বোয়াল ৩·০০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২

১১শ
টি-বি সীল
বিক্রয় অভিযান
আরম্ভ হয়েছে ২।১০.৬০
সমাপ্ত হবে ২৬।১।৬১

প্রতিখানা ১০ নয়া পয়সা
একখানি সীল কেনার অর্থ আপনার দশ নয়া পয়সা ব্যয়; কিন্তু দুঃস্থের সেবায় এই সামান্য দানই অসামান্য হয়ে উঠবে—সার্বজনীনতার গুণে। অন্যকে কিনতে উদ্বুদ্ধ করুন।

বংগীয় যক্ষ্মা সমিতি
পি/২১, স্কীম ৪৯, সি-আই-টি রোড, কলিকাতা-১৪।

মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল
আরোগ্য করিতে ২৭ বৎসর ভারত ও ইউরোপ অভিজ্ঞ ডাক্তার ডিগোর সহিত প্রতিদিন প্রাতে ও প্রতি শনিবার, রবিবার বৈকাল ৩টা হইতে ৭টায় সাক্ষাৎ করুন। ৩বি, জনক রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা—২৯। (সি ৯৫০০)

করছেন। কিন্তু অভিনব মাত্রই প্রগতিশীল নয় একথা ভাববার সময় এসেছে, আশা করি। আমাদের তো মনে হয় এটা মস্ত বড় দুর্লক্ষণ। জীবনদর্শনের অভাবে সুষ্ঠু সমাজ বোধের অপরিচয়ে চরিত্রকে চেনবার অক্ষমতাকে ভাষার কারুকার্যে আবরিত করবার প্রয়াস। হালের লেখকেরা একই ভঙ্গি এমন ভাবে মকশো করে যাচ্ছেন যে তার ভেতর থেকে লেখক ব্যক্তিত্বকে খ'ুজে পাওয়া গবেষণার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাম চেপে দিয়ে সাম্প্রতিক লেখকদের যে কোনো গল্প যে কোনো নামে চালিয়ে দিলে ধরা যাবেনা। এটাকে যূথ প্রবৃত্তি আখ্যা দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু শিল্পকর্মের ব্যাপারে এ প্রবৃত্তি ব্যক্তিত্বের অপহৃতি ঘটায়।

অতি আধুনিক গল্পের যে লক্ষণগুলি আমাদের চিন্তিত করেছে সেই সম্পর্কে জানালাম। ইতি—

প্রদীপকুমার দে
চিন্সুরা

সবিনয় নিবেদন,

অতি আধুনিক ছোট গল্প সম্বন্ধে কোনো কোনো পাঠক যে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ তুলেছেন, মনে হয়, এ সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

যদিও একজন লিখেছেন, "সত্যি বলতে কি, কোন অভিযোগের কথা তুলতে চাইনি।" তবু, তাঁর সমগ্র পত্রে অভিযোগের সুর আছে এবং থাকাটাও স্বাভাবিক বটে।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যে যখন দেখি, অধিকাংশ রথী-মহারথীরা জনসাধারণের সহজবোধ্য, সহজপাঠ্য রচনা বিতরণের ছলে হাল্কা, চটুল সাহিত্য পরিবেশন করছেন, তখন তার পাশাপাশি অল্পসংখ্যক তরুণ শক্তিমানদের রচনার নতুনত্ব ও বলিষ্ঠতার আবির্ভাবে মনে মনে খুশী না হয়ে পারিনি। এবং এই স্বল্পসংখ্যক তরুণ লেখক 'দেশ' পত্রিকার মাধ্যমে এমন কিছু ছোট গল্পের পরিবেশন করেছেন, যে-গল্পগুলি আমাদের ভাবায়। আমাদের মনের জড়তাকে প্রচণ্ড ধাক্কা মারে। আমার মনে হয়, একঘেয়ে, জোলো গল্প পড়তে পড়তে পাঠকদের ক্লান্তি এসেছিল। ছোট গল্পের বিরুদ্ধে অভিযোগের সুর না তুলে যদি নতুন লেখকদের নতুন প্রচেষ্টাকে সহানুভূতি দিয়ে বিচার করতে এগিয়ে আসা যায়, তবে মনে হয়, অতি আধুনিক ছোট গল্প সম্বন্ধে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ নিয়ে বসে থাকতে পারব না।

আর "মানব জীবনে সহজ রসের উৎস" বেঁচে আছে কী না সে-সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। বিনীত—

সুভাষ সিংহ, গৌহাটী।

৩

'সম্পাদক', "দেশ",

শ্রদ্ধেয় মহাশয়। অতি আধুনিক ছোট গল্প সম্পর্কে আলোচনা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পড়লাম। এই সময়োচিত আলোচনার সূত্রপাতের জন্যে ধন্যবাদ। অতি আধুনিক ছোট গল্পের বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত বসু যে অভিযোগ করেছেন তা আমরা যাঁরা বাংলা ছোট গল্পকে ভলাবাসি, সমর্থন না করে পারিনে। অস্বীকার ক'রে লাভ নেই আজকালকার গল্প ক্রমেই দুর্বোধ্য থেকে দুর্বোধ্যতর হচ্ছে। কিন্তু একটা কথা কিছুতেই ভেবে পাইনে গল্পকে অযথা দুর্বোধ্য ও হেঁয়ালীর আধারে ভরে রেখে গল্পলেখকের কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। আপনি যদি একটি গল্প পড়ে আনন্দই না পেলেন, রস গ্রহণ করতে না পারলেন অথবা পারলেও প্রচুর স্নায়ুর ব্যায়াম করতে হ'লো তাহ'লে সে গল্প পড়ার কোন অর্থ হয় না, ছাপার তো নয়ই। অথচ আজকাল প্রায় প্রতিটি তথাকথিত অতি আধুনিক গল্পলেখকের গল্পের এই-ই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য। অবশ্য আপনি বলতে পারেন ঝরঝর করে একবার পড়ে ফেলেই যে গল্পের মানে বোঝা যায়, এতটুকুও ভাবতে হয় না, সেপ্রকার কাহিনীপ্রধান গল্পের এতটুকু গভীরতা নেই; অথচ রস পেতে হলে গভীরেই যেতে হয়। স্বীকার করি। কিন্তু গভীরে যেতে যেতে যদি অনবরত আপন স্নায়ুর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে পীড়িত হতে হয়, তাহ'লে কি সেই রস আর রস থাকে? অতি আধুনিক ছোট গল্পলেখকদের কাছে- আমাদের অনুরোধ তাঁরা এদিকটা একবার ভেবে দেখবেন। বিরুদ্ধবাদীরা হয়তো বলবেন, 'বাংলা ছোট গল্প নিয়ে আজ নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। আর এই প্রগতির যুগে এরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা অপরিহার্য'। অস্বীকার

১৯৬১ সালে আপনার ভাগ্যে কি আছে?

আপনি যদি ১৯৬১ সালে আপনার ভাগ্যে কি ঘটিবে তাহা পূর্বাহ্নে জানিতে চান, তবে একটি পোষ্টকার্ডে আপনার নাম ও ঠিকানা এবং কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া পাঠাইয়া দিন। আমরা জ্যোতির্বিদ্যার প্রভাবে আপনার বার মাসের ভবিষ্যৎ লাভ-লোকসান, কি উপায়ে রোজগার হইবে, কবে চাকুরী পাইবেন, উন্নতি, স্ত্রী পুত্রের সুখ-স্বাস্থ্য, রোগ, বিদেশে ভ্রমণ, মোকদ্দমা এবং পরীক্ষায় সাফল্য, জায়গা জমি, ধন-দৌলত, লটারী ও অজ্ঞাত কারণে ধনপ্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয়ের বর্ষফল তৈয়ারী করিয়া ১৷৹ টাকার জন্য ভি-পি যোগে পাঠাইয়া দিব। ডাক খরচ স্বতন্ত্র। দুষ্ট গ্রহের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উপায় বলিয়া দিব। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা জ্যোতির্বিদ্যায় কিরূপ অভিজ্ঞ। মিথ্যা প্রমাণিত হইলে আমরা মূল্য ফেরৎ দিবার গ্যারাণ্টি দিই। পণ্ডিত দেবদত্ত শাস্ত্রী, রাজ জ্যোতিষী। (DC-3) জলন্ধর সিটি।

Pt. Dev Dutt Shastri, Raj Jyotishi, (DC-3)
Jullundur City.

করিনে। আধুনিকতার পরিপন্থী নই আমরা। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে বাংলা গল্প অচিরেই নতুন পথের সন্ধান দেবে এ বিশ্বাস ও আশা আমাদের আছে। কিন্তু উগ্র আধুনিকতা যেমন পরিত্যাজ্য তেমনি যে পরীক্ষা শুধুই উদ্ভট ও এলোমেলো চিন্তার প্রতিফলন সেরূপ পরীক্ষায় সময় ও শ্রম নষ্ট করার অর্থ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। নমস্কারান্তে ইতি—

রাখাল চক্রবর্তী। কলি—৬

৪

সবিনয় নিবেদন,

গত বারোই কার্তিক শনিবার ৫১ সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত অতি আধুনিক ছোট গল্প সম্পর্কে একটি আলোচনা পড়ে আমি ঐ সম্পর্কে আমার কিছু মতামত জ্ঞাপন করছি।

শ্রীযুত বসু অতি আধুনিক ছোটগল্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে বলেছেন, "ছোট গল্পগুলি আধুনিক কবিতার সহধর্মী। যেন গদ্যকেই লিরিক-ছন্দে-কাব্যের মাধুর্যে রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।" এ সম্পর্কে আমার মতামত হ'লো যে লেখক আধুনিক কবিতার সহধর্মী বলতে কি বোঝাতে চাইছেন তা বুঝতে পারলাম না। তাছাড়া ছোটগল্পের মধ্যে ছোটগল্পের আনন্দ ও রস এবং সেই সংগে কাব্যরস যদি যুগপৎ পাওয়া যায় তাতে কোন ক্ষতি আছে কি? বরং পাঠক তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করবে। এই প্রসংগে এই সুরে সাধা রবীন্দ্রনাথের অনেক ছোটগল্পের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

পরে শ্রীযুত বসু জিজ্ঞাসা করেছেন—"সাধারণে আনন্দ বিতরণই কি সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়?"—সাধারণে আনন্দ বিতরণ সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য কি! সাহিত্য সৃষ্টিতে সাহিত্যিকের আরো কিছু মহৎ আরো এমন কিছু শিল্প-শৈলী প্রকাশ করতে হয় যা সব সময় সকলের মনের মধ্যে অনুপ্রবেশ লাভ করে না। তা আপনার বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ করে। তাকে যুগ-মানসের দাবি স্বীকার ক'রেও যুগোত্তীর্ণ হতে হয়।

লেখকের সন্দেহ মনস্তত্ত্বমূলক গল্প আশানুরূপ আনন্দ যোগাতে পারছে কিনা। গল্প রচনার বিভিন্ন দিক আছে—এরূপ গল্প রচনা করা তার একটি মাত্র এবং অনতিব্যাপ্ত দিক নয় কি? মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ কঠিন কঠোর; নির্জলা আনন্দ সৃষ্টি করতে হয়ত পারে না কিন্তু পুষ্ট-বলিষ্ঠ চিন্তাবাহী সাহিত্য সৃষ্টি হয় নিশ্চয়ই।

অতি আধুনিক ছোটগল্পের যে যাত্রা সে যাত্রা সুদূরপ্রসারী হবে কিংবা আদৌ সুদূরপ্রসারী হবে কিনা সে বিষয়ে লেখক সন্দিহান। যখন কোন নতুন খাতে সাহিত্য-ধারা বইতে থাকে তখন সন্দেহ-সংশয়-তীব্র প্রতিবাদ বা বাদানুবাদ তার স্থায়িত্ব নিয়ে হ'বেই—সমস্ত বিশ্ব-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এরূপ হয়েছে। কিন্তু অতি আধুনিক ছোটগল্প লেখক বা বর্তমান ছোটগল্পকে নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে তাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানানো ভালো নয় কি? অবশ্য ক্ষমাহীন ত্রুটি যেখানে সমালোচনা সেখানে থাকবেই।

লেখকের প্রশ্ন চলতি গল্প আনন্দ দিতে পারছে না কেন? সাহিত্য থেকে আনন্দ লাভ নিতান্ত ব্যক্তি-কেন্দ্রিত। সমস্ত ছোট-গল্প হয়ত আনন্দ দিতে পারে না এ

প্রকাশিত হল

নাগলতা

সুবোধ ঘোষ

এ বছরের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

এ বছরের শারদীয়া 'দেশে' প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। চিন্তার-চমৎকারিতায়, আনন্দে-বিস্ময়ে অপূর্ব। বর্ণাঢ্য প্রচ্ছদ। ৩·৫০

বরণীয় লেখকের

রমাপদ চৌধুরী

সাম্প্রতিক যুগে বাংলা কথাসাহিত্যে যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য রমাপদ চৌধুরী তাঁদের অন্যতম। বৈচিত্র্যে, বিশালতায় পরিধিতে এবং গভীরতায় তাঁর পৃথিবী বর্ণবহুল।

আপন প্রিয় (৫ম মুদ্রণ) ৩·০০

কথাকলি (২য় সং) ৩·০০

দুটি চোখ দুটি মন (২য় সং) ৩·০০

যন্ত্রস্থ

লেখালিখি

স্মরণীয় গ্রন্থসম্ভার

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নীলাঞ্জনছায়া	৩·০০
তীরভূমি	৪·৫০
জনপদবধূ (৩য় সং)	৪·৫০

গৌরকিশোর ঘোষ

মন মানে না	৩·৭০
জল পড়ে পাতা নড়ে	৮·০০

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

শুক্ল সন্ধ্যা (২য় সং)	৫·৫০
রমণীর মন	৩·৫০

সন্তোষকুমার ঘোষ

মুখের রেখা	৫·০০
পরমায়ু	৩·৫০

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ভোরের রাগিণী

চিত্তরঞ্জন মাইতি

কার্শিয়াং-এর পরিবেশে একটি আশ্চর্য মধুর রোমান্টিক উপন্যাস

কথাশিল্প

৩৬ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

পরিবেশনায়:
দি নিউ বুক এম্পোরিয়ম
২২।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। কলিকাতা-৬

অভিযোগ আংশিক সত্য হ'তে পারে, কিন্তু ছোট গল্পের বিভাগ নির্দেশ করে যদি ভালো-লাগা মন্দ-লাগার প্রশ্ন ওঠে তবে তা বিচারাধীন ও তর্ক-সাপেক্ষ।

শেষের দিকে শ্রীযুত বসু বলেছেন "জীবন যেখানে দিন দিন জটিলতার পাকে জড়িয়ে পড়ছে, সাহিত্যকে সেখানে সহজ হতে হবে।" এ রকম কোন বাঁধাধরা নিয়ম নির্দিষ্ট আছে বলে মনে হয় না। তাছাড়া এই সংগে এ কথাটাও ঠিক নয় কি যে যেহেতু জীবন আমাদের দিন দিন জটিলতার পাকে জড়িয়ে পড়ছে সেহেতু (জীবনের সংগে সাহিত্যের নিগূঢ় যোগাযোগ চিন্তা করে) সাহিত্যের মধ্যে তার অনুচিন্তা-ভাবনা ও জটিল-জটগুলো বিশ্লেষণের চেষ্টা হবে। তার ফলে ঐ সাহিত্যের মধ্যে পথ-নির্দেশ ও আনন্দ-অনুধ্যানের সাধনা ও সিদ্ধি মিলবে।

বিনীত—**কৃষ্ণানন্দ দে**, কাঁথি, মেদিনীপুর

পত্রাবলী

শ্রীরবীন্দ্রনাথঠাকুর

[নির্ম্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ১১ ॥

ওঁ

Norddentscher Lloyd Bremen
An Bord des D...

১১ই নবেম্বর, ১৯২৬

[ডিসেম্বর হবে, কবি ভুল করে নভেম্বর লিখেছিলেন]

কল্যাণীয়াসু,

সন্তোষের কথাটা ভুলতে পারিনে। নিজের জীবনের কথাটা ভাবি—কত সুদীর্ঘকাল বেঁচে আছি—কত সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা চেষ্টা ও সাধনা, কত বহু-গ্রন্থিজটিল ইতিহাস জাল বুনতে বুনতে এতদিন কেটে গেল। তার তুলনায় সন্তোষের জীবন কতই অল্পপরিসর। যৌবন সমাপ্ত হতে না হতে ওর জীবন সমাপ্ত হ'ল। তবুও ওর জীবনের ছবি সুব্যক্ত; বৈচিত্র্যবিহীন, কিন্তু অর্থবিহীন নয়। চারদিকে কত লোক ব্যবসা করচে, সংসার করচে; সমস্তটাই ঝাপ্‌সা। তাদের দিনগুলো দিনের স্তূপ, একটার উপর আর একটা জড়ো হয়ে উঠচে, সবগুলো মিলে কোনো রূপ ধরচে না। সন্তোষের জীবন তেমন রূপহীন জীবন নয়। মনে পড়চে, এই সেদিন এল আমেরিকার শিক্ষা শেষ করে। শান্তিনিকেতনের কাজের মধ্যে এসে জায়গা ক'রে নিলে। আরো অনেক অধ্যাপক এখানে কাজ করেচেন, যেমন অন্য জায়গায় করতে পারতেন তেমনি, কিম্বা তার চেয়ে কিছু বেশি। কিন্তু সন্তোষ তার তরুণ হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা নিয়ে এই কাজের ক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। অবশ্য এর সঙ্গে তার জীবিকার যোগ ছিল সন্দেহ নেই কিন্তু তার আমার যোগ আরো বেশি ছিল। ব্যক্তিগত প্রয়োজনের দাবীতে আমরা প্রতিদিন যে কাজ করে থাকি তার কোন উদ্বৃত্ত নেই, কোনো আলো নেই, নিজের মধ্যেই তা শোষিত হয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু এমন একটি সাধনার সঙ্গে সন্তোষের সমস্ত জীবন সম্পূর্ণ সম্মিলিত হয়েছিল যে-সাধনা তার ব্যক্তিগত প্রয়োজন মণ্ডলের অনেক অতীত। তার শক্তির সম্পূর্ণতা যথেষ্ট ছিল, এবং ব্যক্তিগত চরিত্রের দিকেও ক্ষুদ্রতার অভাব ছিল না। তবু সমস্ত ত্রুটি ও বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়েও একটি সৃষ্টিশক্তিশালিনী নিষ্ঠা প্রতিদিন তার জীবনকে একটি সুষমার মধ্যে পরিণতি দিচ্ছিল। তার শ্রদ্ধাপ্রদীপ্ত জীবনের সেই পরিণতির ছবিটি আমি খুব স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি। এই জন্যে আরো স্পষ্ট দেখচি, যেহেতু তার জীবন স্বচ্ছ ও সরল ছিল—তার মধ্যে উপাদানের বহুলতা ছিল না। তার সংসার এবং তার সাধনা, তার কর্ম্ম এবং তার আদর্শ একত্র মিলিত ছিল, তার অল্পকালের আয়ুটুকু নিয়ে সে যে তারি মধ্যে জীবন সম্পন্ন করে যেতে পেরেছে এ তার সৌভাগ্য। তার পক্ষে একটি সঙ্কটের সময় আসন্ন হয়ে আসচে বলে ইদানীং আমার মনে অনেক সময় আশঙ্কা জেগেছিল। যে সূত্রে সে বহুকাল থেকে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সে সূত্রটি খুব সঙ্কীর্ণ ও দুর্ব্বল। সেটা বেশিদিন স্থায়ী হতে পারত না—তারপরে কি হত বলতে পারিনে। তাই মনে হয় এই সময়ে মৃত্যুর দ্বারাই সে আপনার জীবনকে ঠিক সমাপ্তি দিতে পেরেছে। সে যে নিজেকে ক্রমে এমন করে শান্তিনিকেতনের প্রত্যন্ত ভাগে ঠেলে এনেছিল, সে নিতান্তই তার বুদ্ধির দোষে ও ক্ষমতার অভাবে—সে জন্যে কাউকেই দোষ দেওয়া যায় না—এমনকি এই বুদ্ধির দোষে সন্তোষ শান্তিনিকেতনের প্রতি বিরুদ্ধাচরণও করেচে। এ আমি জানি—কিন্তু এই সব বিরুদ্ধ প্রমাণ নিয়েই যদি তাকে বিচার করি তাহলে অবিচার করা হবে। মানুষের সম্বন্ধে অনেক সময়ে বিরুদ্ধপ্রমাণগুলিই প্রত্যক্ষতঃ প্রবল, এবং সংখ্যাতেও অনেক—কিন্তু তাও মানুষের সত্যতার দ্বারা পরাভূত হয় না। কে তা জানে? যার ধৈর্য্য আছে যার দরদ আছে। আমি যদি প্রমাণের দ্বারা সন্তোষকে জানতুম তাহলে ভুল জানতুম—আমি তাকে সম্পূর্ণদৃষ্টির দ্বারা জানি। ভালবাসার দ্বারা সব সময়েই যে দৃষ্টির বিকৃতিই ঘটে তা নয়, দৃষ্টির সম্পূর্ণতাও ঘটে। আমার বুদ্ধি প্রমাণকে অস্বীকার করে না, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি প্রত্যক্ষবোধকেও শ্রদ্ধা করে। দুইয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে একান্ত বিরোধও ঘটে, তখনি রহস্য বড় কঠিন ও বড় দুঃখকর হয়ে ওঠে। স্বয়ং মৃত্যুর মধ্যেই এই বিরোধ আছে—আমাদের হৃদয়ের চরমবোধ কিছুতেই তাকে চরম বলে মানতে চায় না—কিন্তু বিরুদ্ধপ্রমাণের আর অন্ত নেই—এই দুই প্রতিপক্ষের টানাটানিতেই তো এত দুঃসহ বেদনা। আমার "যেতে নাহি দিব" কবিতাটি এই বেদনারই কবিতা।

আজ জাহাজের মধ্যশ্রেণীর যাত্রীদের দরবার নিয়ে গোরা এসেছিল। এই অপরাহ্নে তারা আমার মুখ থেকে কিছু শুনতে চায়। যদি প্রথম শ্রেণীর যাত্রী হত তা হলে হঠাৎ রাজী হতা[ম] না—দ্বিতীয় শ্রেণীতে মনুষ্যত্বের আবরণ অনেকটা হাল্কা—সেখানে মানুষকে দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে যাবার সময় হয়ে এল। কী বলব কিছুই জানিনে—কিন্তু মনে হচ্ছে যে বেশ ভাল লাগবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১২ ॥

ওঁ

Norddentscher Lloyd Bremen
An Bord des D...

১২ই ডিসেম্বর

সমুদ্রে আজ নিয়ে আর চারদিন আছে। ১৬ই সকালে কলম্বো পৌঁছব। কিন্তু ঠিক দেশে পৌঁছবার শান্তি পাব না দীর্ঘ রেলযাত্রা নানাভাগে বিচ্ছিন্ন। তারপরে পুপে যাকে বলতে শিখেছে "মালপত্র," তার সংখ্যা বহু, তার আয়তন বিপুল এবং তার আধারগুলির অবস্থা শোকাবহ। কোনো বাক্স আছে যাত্রার সূচনাতেই চাবির সঙ্গে তার চিরবিচ্ছেদ ঘটেচে, দড়ি দড়ার বন্ধন ছাড়া যার আর গতি নেই; কোনো বাক্স আছে সর্ব্বাঙ্গ আঘাতে জর্জ্জর, কোনো বাক্স আছে যা ভুরিভোজ পীড়িত রোগীর মত উদ্গারের দ্বারা ভার প্রশমনের জন্য উৎসুক—অথচ যুদ্ধক্ষেত্রের হাসপাতালের রোগীর মত এদের কথায় কথায় নাড়াচাড়া করতে হবে। এখন দেখে এদের সম্বন্ধে রথীর উদ্বেগ সকরুণ। তা হোক্, তবুও দেশের মুখে চলেচি এবং দীর্ঘপথের সেই তরুচ্ছায়াচ্ছন্ন শেষ ভাগটা যেন দে[খা] যাচ্চে। এখনি আমাদের দেশের সে দাক্ষিণ্যপূর্ণ সূর্য্যালোক আকাশে ছড়িয়ে পড়েচে। শুক্লপক্ষের চাঁদ প্রতিদিন পূর্ণত[র]

হয়ে উঠ্‌চে; আমাদের মর্ম্মর মুখরিত শালবীথিকার পল্লব-পুঞ্জের মধ্যতার দোললীলা মনে মনে দেখতে পাচ্চি। প্রবাস-কালের সমস্ত বোঝা উত্তরায়নের বহির্দ্বারে নাবিয়ে দিয়ে আপনমনে সেচ্ছাবিহারের পালা অনতিবিলম্বে শুরু করব বলে কল্পনা করচি। কিন্তু হায়, এও নিশ্চয় জানি, যে দেবলোক আমাদের বাস নয়, যেখানেই থাকি না কেন, অনেকের অনেক ইচ্ছার ভিড় ঠেলে ঠেলে নিজের ইচ্ছার জন্য অতি সংকীর্ণ একটুখানি পথ পাওয়া যায়,—একটু সুবিধা এই যে, পথ সংকীর্ণ হলেও সেটা অনেক কালের অভ্যস্ত পথ—ভিড়ের মধ্যেও খানিকটা আপনমনে চলা সম্ভব।

জাহাজে রেডিও যোগে মাঝে মাঝে যে খবর পাওয়া যায় তার থেকে জানা গেল যে হাঙ্গেরি ও ভিয়েনা অঞ্চলে অতি-মাত্রায় বরফবৃষ্টি চলচে। তাতে আমার মনটাকে উদ্বিগ্ন করেছে। আশা করচি এতদিনে পথ কাটিয়ে বুডাপেস্ট আরোগ্য আশ্রমে গিয়ে পৌঁছতে পেরেছ এবং পথে কোন কষ্ট হয়নি। তোমার চিকিৎসা কেমন চল্‌চে, শরীর কেমন আছে, আগামী কালের জন্য ব্যবস্থা কি রকম হবে এসব খবর পেতে নিশ্চয় এখনো দেরি আছে। অতিরিক্ত ঠাণ্ডার সঙ্গে লড়াইয়ে তোমার শরীরকে ক্লিষ্ট করে নিজের? লাল-দাড়ির সঙ্গে কি রকম চল্‌চে? আর হুজকা? ইতিমধ্যে আরো নতুন বন্ধু হয়তো জুটচে।

আমাদের সহযাত্রীদের মধ্যে একজন জর্ম্মন নৃতত্ত্ববিদ্ সস্ত্রীক ভারতবর্ষে চলেচেন। তিনি আমাদের অধ্যাপকের নাম শুনেচেন। আমাকে বল্‌লেন "শুনেচি তিনি ফিজিক্‌সের অধ্যাপনা করেন। তা হলে বোঝা যাচ্চে তিনি নৃতত্ত্ববিদ্যার আঙ্কিক দিকটার চর্চ্চা করেন; আমরা এর মানবিক দিকটা নিয়ে আছি।" মানবিক বল্‌তে যে কতখানি বোঝায় তা এর অধ্যবসায় দেখে একটু আন্দাজ করা যেতে পারে। দক্ষিণ ও মধ্য ভারতের বন্যজাতিদের বিবরণ সংগ্রহ করতে চলেচেন। এ সব জাতদের বিষয় এখনো অজ্ঞাত ও দুর্জ্ঞেয়। আমি তো এদের নামও শুনিনি। এরা খুব দুর্গম জায়গায় প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। ইনি তাদের সেই প্রচ্ছন্নতার মধ্যে প্রবেশ করতে চলেচেন। তাঁবুতে থাকলে পাছে তারা ভয় পায় সন্দেহ করে এই জন্যে একটা থলি নিয়েচেন; রাত্রে তারি মধ্যে থাকবেন। সাপ আছে হিংস্র জন্তু আছে, অনিয়ম অপথ্য ও ব্যাধির আশঙ্কা আছে। অর্থাৎ প্রাণ হাতে করে নিয়ে চলেচেন। দুই বৎসর এই কাজে থাক্‌বেন। জর্ম্মন গবর্মেণ্ট খরচ দিয়ে পাঠাচ্চে। যুবতী স্ত্রী সঙ্গে চলেচেন। একটি শিশুসন্তানকে আত্মীয়ের হাতে রেখে এসেচেন। পাছে অরণ্যে স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়েন এই জন্য সঙ্গ নিয়েচেন। ইতিমধ্যে ম্যাপ্ নিয়ে বই নিয়ে নোট তৈরি করচেন, স্বামীর কাজ এগিয়ে দেবার জন্যে। এঁদের সঙ্গে নিজেদের তুলনা ক'রে নিজেদের লজ্জাবোধ হয়। যাদের সংবাদ সংগ্রহের জন্যে দুঃসহ কষ্ট ও বিপদ অগ্রাহ্য করে চলেচেন তারা আত্মীয় জাতি নয়, সভ্যজাতি নয়, মানবজাতীসম্বন্ধীয় তথ্য ছাড়া তাদের কাছ থেকে আর কোন দুর্মূল্য জিনিস আদায় করা যাবে না। আমরা ভারতহিতৈষী ভারতীয়, ঘরের থেকে দেড় হাত দূরে যারা আছে তাদের কথা জানবার জন্য আধহাত পরিমাণ নড়ে বসতে পারিনে। এরা পৃথিবীর সমস্ত ভাণ্ডারের দ্বার উদ্‌ঘাটন করতে বেরিয়েচে, আমরা পৃথিবীর মাটীজুড়ে ছেঁড়া মাদুর পেতে গড়াগড়ি দিচ্চি। জায়গা ছেড়ে দেওয়াই ভালো—বিধাতা সাফ করবার অনেক দূতও লাগিয়েচেন। আরো দুই একজন দুর্জ্জয় শক্তিসম্পন্ন জর্ম্মন কৃতী ও পণ্ডিতকে জাহাজে দেখ্‌লুম। যখন তারা আমাকে সম্মান দেখান তখন আমি সেটাকে মায়া বলেই মনে করি।

এতদিন সমুদ্র প্রায় নিশ্চল ছিল। আজ একটু দোল দিয়েচে। সৌমা তাতেই শয্যাশায়িনী। নন্দিনীর চাঞ্চল্যের বাঘের গল্প বানানো সম্বন্ধে আমাকে অসাধ্য সাধন করতে হচ্চে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি বুডাপেস্ট শহরে বুডাপেস্ট মিউনিসিপ্যালিটির অতিথি হয়ে গিয়েছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটি থেকেই ড্যানুবের ধারে তথাকার প্রাসাদতুল্য সেনট গেলার্ট হোটেলে কবিকে তারা দলবল সুদ্ধু রেখেছিল। কবিকে দেখাশুনা তত্ত্বাবধানের যাতে কোন ত্রুটি না হয় সেজন্যে মিউনিসিপ্যালটিরই একটি কর্মচারী, তার ইংরিজি ভাষায় দখল আছে এই অনুমানে কর্তৃপক্ষ তাকে সারাক্ষণ আমাদের হোটেলে হাজির রেখেছিলেন। ভদ্রলোকের প্রকাণ্ড লালচে দাড়ি এবং নাকটা খুব লম্বা কটমট। তাই আমরা তাকে সর্ব্বদা "লালদাড়ি" বলে নিজেদের মধ্যে উল্লেখ করতাম। বেচারা ইংরিজি ভালো করে বলতে পারত না, বুঝতে একেবারেই পারত না। তার আর একটা কারণ সে বেজায় কালা। কিন্তু অতি ভাল মানুষ এবং তার উপরে কবির ভার নিয়ে সে আছে এইজন্য সর্বদাই সসব্যস্ত। তাকে নিয়ে অনেকদিন অনেক কৌতুকের সৃষ্টি হত বলে বোধ হয় কবি তার কথা মনে রেখেছিলেন। এই চিঠিতে তারই উল্লেখ। "হুজ্‌কা"ও আর একটি কর্মচারী মিউনিসিপ্যালিটির।

॥ ১৩ ॥

ওঁ

Norddentscher Lloyd Bremen
An Bord D. Fulda
১৫ই ডিসেম্বর ১৯২৬
২৯ অগ্রহায়ণ, শুক্ল একাদশী

কল্যাণীয়াসু,

কাল সকালে কলম্বো পৌঁছব। যখন য়ুরোপে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম আজকের এইদিনের কথা অনেক দিন কল্পনা করেছি—জাহাজ ভারতবর্ষের কাছাকাছি এসে পৌঁচেছে—উজ্জ্বল আকাশ বুক বাড়িয়ে দিয়েচে; শকুন্তলার বালক ভরত যেমন সিংহের কেশর ধরে খেল্‌চে, শীতের নির্মল রৌদ্র তেমনি তরঙ্গিত নীল সমুদ্রকে নিয়ে ছেলেমানুষী করচে—আর সেই নারকেল গাছের ঘন বন, যেন দূর থেকে ডাঙার হাত-তোলা ডাক। সেই কল্পনার ছবি এখন সাম্‌নে এসেচে কাল লঙ্কা-দ্বীপের খুব কাছ ঘেঁসে জাহাজ এল—শ্যামল তটভূমির কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পেলুম। ঐ তরুবেষ্টিত দিগন্তের ধারে মানুষের প্রতিদিনের জীবন যাত্রা চল্‌চে এই কথাটা যেন নতুন ও নিবিড় বিস্ময়ের সঙ্গে আমার মনে লাগ্‌ল। আমি জানি যারা ঐখানে মাটী আঁকড়ে আছে তারা নিজে এর আনন্দ, এর সৌন্দর্য্য, এর মহান্যতা যে স্পষ্ট বুঝচে তা নয়। অভ্যাসে আমাদের চৈতন্যকে ম্লান করে দেয়, কিন্তু তবু যা সত্য তা সত্যই। দূরের থেকে শান্তিনিকেতন আমার কাছে যতখানি, কাছের থেকে ঠিক তত-খানি না হতেও পারে—কিন্তু তার থেকে কি প্রমাণ হয়? দূরের দৃষ্টিতে যে সমগ্রতা আমরা এক করে দেখতে পাই সেইটেই বড় দেখা, কাছের দৃষ্টিতে যে খুটিনাটিতে মন আবদ্ধ হয়ে সমষ্টিকে স্পষ্ট দেখতে দেয় না সেইটেই আমাদের শক্তির অসম্পূর্ণতা। এই কারণেই, আমাদের সমস্ত আয়ু নিয়ে আমরা যে জীবন যাপন করছি তাকে আমরা পুরোপুরি জানতেই পারিনে,—যা পাইনে তার জন্য খুঁতখুঁত করি, যা হারিয়েছে তার জন্যে বিলাপ করি, এমনি করে যা পেয়েছি তার সবটাকে নিয়ে তাকে যাচাই করবার অবকাশ পাইনে। আসল কথা শান্তি-নিকেতনের আকাশ ও অবকাশে পরিবেষ্টিত আমাদের যে জীবন তার মধ্যে সত্যই একটি সম্পূর্ণ রূপ আছে, যা কলকাতার সূত্রচ্ছিন্ন জীবনে নেই। সেই সম্পূর্ণরূপের

সেগুলো অপ্রাসঙ্গিক; পর্ব্বতের গায়ের গর্ত্তের মতো যা পর্ব্বতের উচ্চতাকে বৃথা প্রতিবাদ করে। শান্তিনিকেতনের ভিতর দিয়ে মোটের উপর আমি নিজেকে কি রকম করে প্রকাশ করছি সেইটের দ্বারাই প্রমাণ হয় শান্তিনিকেতন আমার পক্ষে কি—মাঝে মাঝে কি রকম নালিশ করেছি, ছট্‌ফট্ করেছি তার দ্বারা নয়। শুধু আমি নই শান্তিনিকেতনে অনেকেই আপন আপন সাধ্যমত একটি সুসংগতির মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করবার সুযোগ পেয়েছে। তেজেশ১ মানুষটি খুব বিশেষ কেউ নয় আশ্রমের ইতিহাসে খুব মোটা অক্ষরে তার নাম থাকবে না; কিন্তু এইখানে তার ছবিটি একটি সম্পূর্ণ ছবি; প্রতিদিনের অপ্রাসঙ্গিকতা তার বিশিষ্টতাকে চাপা দিতে পারেনি। অন্য জায়গায় সে ইস্কুলমাষ্টার হোত, এখানে সে তেজেশ হয়েছে, তাই সে সুখী! শাস্ত্রীমশায়,২ নন্দলাল,৩ ক্ষিতিবাবু,৪ সকলের পক্ষেই একথা সত্যি। এটা যে হয়েচে সে কেবল আমার জন্যেই হয়েচে একথা যদি বলি তা হলে অহঙ্কারের মত শুনতে হবে কিন্তু মিথ্যে বলা হবে না। আমি নিজের ইচ্ছার দ্বারা বা কর্ম্ম-প্রণালীর দ্বারা কাউকে অত্যন্ত আঁট করে বাঁধি নে—তাতে করে কোন অসুবিধা হয় না তা বলি নে—আমি নিজেই তার জন্যে অনেক দুঃখ পেয়েছি কিন্তু তবু আমি মোটের উপর এইটে নিয়ে গৌরব করি। অধিকাংশ কর্ম্মবীরই এর মধ্যে ডিসিপ্লিনের শিথিলতা দেখে—অর্থাৎ না-এর দিক থেকে দেখে, হাঁ-এর দিক থেকে দেখে না। স্বাধীনতা ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য সংঘটিত এই যে ব্যবস্থা এটি আমার একটি সৃষ্টি—আমার নিজের স্বভাব থেকে এর উদ্ভব। আমি যখন বিদায় নেব, যখন থাকবে সংসদ, পরিষদ ও নিয়মাবলী, তখন এ জিনিসটিও থাকবে না। অনেক প্রতিবাদ ও অভিযোগের সংগে লড়াই করে এতদিন একে বাঁচিয়ে রেখেছি—কিন্তু যারা বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ তারা একে বিশ্বাস করে না। এর পরে ইস্কুলমাষ্টারের ঝাঁক নিয়ে তারা অতিবিশুদ্ধ জ্যামিতিক নিয়মে চাক বাঁধবে—শান্তিনিকেতনের আকাশ ও প্রান্তর ও শালবীথিকা বিমর্ষ হয়ে তাই দেখবে ও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবে। তখন তাদের নালিশ কি কোনো কবির কাছে পৌঁছবে?

কোনো খবর দেওয়া ঘট্‌ল না। ইদানিংনের একটা বিশেষ খবর হচ্ছে এই যে জাহাজের জর্ম্মন ডাক্তার মিস্ প-কে প্রস্তাব (প্রেপোজ) করেছে—তার বয়স অল্প, দেখতে মন্দ না, কপাল ভালো কারণ মিস্ প— রাজি হয়নি। পৃথিবীতে কারোই হতাশ হবার কারণ নেই, এমনকি ৭ বৎসর সকলকেই অপেক্ষা করতে হয় না, এইটেই প্রমাণ হয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১ স্বর্গীয় তেজেশচন্দ্র সেন, ২ স্বর্গীয় বিধুশেখর শাস্ত্রী, ৩ শ্রীনন্দলাল বসু, ৪ স্বর্গীয় ক্ষিতিমোহন সেন।

॥ ১৪ ॥

ওঁ

Norddeutscher Lloyd Bremen
An Bord des D

কল্যাণীয়াসু,

রাত্রি এখন। কাল ভোরে কলম্বো। ইতিমধ্যে মিস্ প—সম্বন্ধে আমাদের মনে যে একটুখানি আন্দোলন উপস্থিত হয়েছে খোলসা করে বলে ফেলি। ঠিক বিচার করছি কিনা কেউ বলতে পারে না—কিন্তু রথী বৌমারও মন কিছু বিগড়েচে দেখে অবিচারের আশঙ্কার ঝাঁজ কতকটা মরেচে। প্রথম কিছুদিন মিস্ প—আমার অভিমুখে অত্যন্ত বেশি ঘেঁষেছিল—বিশেষত রাত্রে অন্ধকার ডেক্-এ। আত্মরক্ষার জন্য বৌমাকে কাছে রাখতে হোল—তাতে বৌমার প্রতি কিছু যেন বাঁকা ভাব দেখা গেল। শেষকালে আমি ওকে স্পষ্ট বলে দিলুম, আত্মীয় বন্ধু ছাড়া আর কাউকে আমি কাছে আনাগোনা করতে দিতে চাইনে। তখন থেকে ছুটি পেয়েছি। —প্রশান্ত রথীর টাইপরাইটার নিয়ে গেছে সুতরাং আমার কিছু লেখা রথীকে দিয়ে টাইপ করাবার জন্যে ওর টাইপ্-রাইটার ছাড়া গতি ছিল না। কিছুতে ওর দিতে ইচ্ছে ছিল না। রথীকে বল্‌লে তুমি হয়তো টাইপ করতে জানো না, হয়ত কল খারাপ করে দেবে—টাইপ করার বিদ্যেয় মিস্টার মহলানবিশের হাত দুরস্ত ছিল।—এই ধিক্কার সহ্য করেও নিতান্ত কাজের দায়ে মাথা হেঁট করে রথী ওর কল ব্যবহার করতে বাধ্য হল। রথীর সংগে ওর ব্যবহার ঠিক ব্যারন বংশীয়ের মেয়েদের মত নয়। কান্ড দেখে রথীরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল, আমাকে কিছুই বলেনি।—বহুবিধ বিদ্যায় ওর ষোলো আনা দখল আছে বলে প্রায়ই জানান দিয়ে থাকে। "পটারি"তেও দক্ষতা আছে বলে কপাল ক্রমে বৌমার কাছে আত্মঘোষণা করছিল। হয়তো খবর পায়নি বৌমার এ বিদ্যা জানা আছে। Glaze করতে হলে কিরকম মসলা মিশোল করা দরকার এই প্রশ্ন বৌমা যখন জিজ্ঞাসা করলেন তখন জানা গেল যে ওর একেবারে জানা নেই—অর্থাৎ পটারিতে ওর বিদ্যে আমার চেয়ে অত্যন্ত বেশি নয়। এতে স্বভাবত বৌমার মনে খট্‌কা লেগেচে। তিনি ওকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার আঁকা কোনো ছবি বা মূর্ত্তি বা খসড়া কিছু আছে? বল্‌লে আগাগোড়া সমস্তই লণ্ডনে বিক্রি হয়ে গেছে। সেই বিক্রি হওয়ার পর থেকে একটা স্কেচ্ বইয়েতে আঁচড় কাটেনি।—লণ্ডনে ছোট বড় সমস্ত কীর্ত্তি নিঃশেষে বিক্রি হয়ে যাওয়া সাধারণ ব্যাপার নয়। এপ্‌স্টাইনের মত লোকেরও ভাগ্য এত ভালো নয়। তাই বৌমার মন থেকে ধোঁকা যাচ্ছে না। ভারতবর্ষ ও ভারতীয় কলাবিদ্যা সম্বন্ধে বহুবিধ বই নিয়ে আমাদের নৃতত্ত্ববিদ্ চলেচেন। অন্য কোনো কোনো যাত্রী এ সম্বন্ধে তাঁর সংগে আলাপ করেছে মিস্ প—একদিনের জন্যে বইও চায়নি, আলাপও করেনি মুকুলের ছবি ছাড়া ভারতীয় কলা সম্বন্ধে ও-কিছু খবর রাখে না—সেই ঔৎসুক্যের টানে ও আমার সঙ্গ নিয়েচে তার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে ওর মানসপট একেবারে পরিষ্কার চাঁচামোছা। লণ্ডনে থাকতে কারো কাছ থেকে কোনো জানবার চেষ্টাও করেনি মুকুলের কাছ থেকেও না। শান্তিনিকেতন বা বিশ্বভারতীর আদর্শ ওকে ডাক দিয়েছে একথা বলা অত্যুক্তি হবে। এতদিন জাহাজে আমার সংগে চলেচে আমাকে এমন কোনো প্রশ্নমাত্র করেনি যার থেকে মনে হতে পারে যে সংসারতাপতপ্তচিত্তে সান্ত্বনার জন্যে ওর প্রয়োজন আছে এবং সে প্রয়োজন আমার কোনো উপদেশে তৃপ্ত হতে পারে। জাহাজে নৃত্যের আসরে ও বেশ জমিয়ে নিয়েছে, পূর্বেই আভাস দিয়েছি কোনো কোনো যুবকের সংগেও ওর মধুর সম্বন্ধ চল্‌চে। যদিও বলচে তাকে ও প্রত্যাখ্যান করেচে কিন্তু সে একেবারেই বাহ্যত নয়। ফোটোগ্রাফ প্রভৃতির প্রদর্শনীর সাহায্যে নিজের আভিজাত্য সম্বন্ধে সকলকেই সচকিত করেচে। যখনি ও কল্পনা করে আমার মনে সংশয় আছে সেইসব ফোটোগ্রাফ আমাকে দেখাতে থাকে— পর্শুদিন দেখেছি। কী ওর আর্ট কি ওর আভিজাত্য উভয় সম্বন্ধে ফোটোগ্রাফিক প্রমাণ ওর যথেষ্ট আছে। এ পর্যন্ত শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে একটি মাত্র চিন্তা ওর মনে জাগরূক দেখা যায়, সে হচ্ছে শান্তিনিকেতনে বেণী সংহারের নাপিত আছে কিনা।

আমি নিয়ত চেষ্টা করচি ওর প্রতি যাতে আমার সন্দেহ না জন্মে। আর সমস্ত প্রশ্ন একরকম করে ঠেকিয়ে রেখেছি—কেবল এ প্রশ্ন কিছুতে তাড়াতে পারচিনে যে, সর্ব-ত্যাগিনী হয়ে ও আমার সঙ্গ কেন ধরলে? পারমার্থিক কারণে যে নয় তা বোধ হয় কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। সাহিত্যিক কারণ থাকতে পারে। হঠাৎ পশুর্দিন উৎসাহের সঙ্গে আমার কাছে এসে বললে, চড়ুই পাখির সম্বন্ধে ফরাসী ভাষায় একখানা বই ওর হাতে এসেচে সেইটে ও আমাকে পড়াতে চায়। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বললে ইতি-পূর্বে কোন্ এক অসাবধান মুহূর্তে চড়ুই পাখির দৌরাত্ম্য সম্বন্ধে আমি বিরুদ্ধভাব প্রকাশ করেছিলুম। কিন্তু ফরাসী পণ্ডিতের মতে চড়ুই পাখির গুণও যথেষ্ট আছে, বস্তুত আমাদের অধিকাংশেরই মত ঐ ক্ষুদ্র জীব দোষেগুণে জড়িত। সাহিত্যিক কোনো রচনা সম্বন্ধে এই প্রথম ওর উত্তেজনা দেখা গেল। ওর উৎসাহের আর একটি বিষয় আছে সে হচ্চে প্রশান্ত। ও বলে প্রশান্তের মতো humorous মানুষ খুব অল্পই আছে। এটা নিশ্চয়ই আমার উপরে ঠেস্। ও-বলে প্রশান্ত খুব বুদ্ধিমানের মত ওকে উপদেশ দিত। বুঝতে পারচ, এটাও তুলনায় সমালোচনা। প্রশান্তর জর্ম্মান সম্বন্ধে কোনো মত আমার কাছে প্রকাশ করেনি কিন্তু বোধহয় প্রশান্তর কাছে করে থাক্‌বে। যা-হোক পঞ্চমাঙ্কের প্রান্তে আমার কপালে কি আছে কে জানে? ট্র্যাজেডি, না কমেডি?

এই চিঠিতে আমার দুর্বলতাই প্রকাশ পাবে। কিন্তু মনের মধ্যে দুর্বলতা থাকলে সেটা তোমাদের কাছে গোপন করা উচিত নয়। স্বভাব দোষে মন কিছু বিচলিত হয়েচে সে কথা স্বীকার করতেই হবে। এ পর্যন্ত নিজের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে লড়াই করেচি এখনো করব। কিন্তু কোমরের বাঁধন অনেকখানি আলগা হয়ে এসেচে। আমার সেই ইজেরের ফিতের মতো। ইতি ১৫ই ডিসেম্বর, শ্রীরবীন্দ্রনাথ।

॥ ১৫ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

রানী, কাল কলকাতায় এসে পৌঁছেছি। হাওড়া স্টেশনে ভয়ঙ্কর ভীড় এবং জয়ধ্বনি। ভিড়ের মধ্যে তোমার শ্বশুর মশায় ও বুলা ছিলেন। রামানন্দবাবু, শান্তা কালিদাস অরুন্ধতী বেবি ও জানা লোক প্রায় সকলেই দেখা গেল। অজানা লোকেরও অন্ত ছিল না। তারপরে কাল সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত বন্ধু অবন্ধু খবরের কাগজের রিপোর্টার প্রভৃতির সমাগমে মুহূর্তকাল ছুটি পাইনি।

রাত্রে তোমার শ্বশুর মশায় এসেছিলেন, তোমরা আমার সঙ্গে ফিরে আসোনি বলে তিনি অত্যন্তই ব্যাকুল হয়ে আছেন। তাঁর ছেলের কাণ্ডজ্ঞানের উপর তাঁর একটুও আস্থা নেই তা স্পষ্টই বোঝা গেল। তোমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত তাঁর মন কিছুতেই সুস্থির হবে না। আমি তাঁকে বললুম তোমরা আমাদের সঙ্গে ফেরোনি তার মধ্যে একটা সান্ত্বনার কথা এই যে তোমার চিকিৎসা সম্বন্ধে একটা চরম সুব্যবস্থা হবার সম্ভাবনা রয়ে গেল। এখানে এসেই তোমার একখানি বড়ো চিঠি পেয়ে খুব খুসি হলুম। এসেই পাব এমন আশা করিনি। মনে করেছিলুম তোমাকে পথের মধ্যে যে সব চিঠি লিখেছি সেগুলোতে আমারই জিৎ থেকে যাবে। এই চিঠিতে তুমি আগে ভাগে তার শোধ দিয়েছ। কিন্তু সংখ্যায় ও পরিমাণে নিক্তির পাল্লায় ওজন এখনো আমার পক্ষেই অনেকটা ঝুঁকে আছে। কিন্তু আমার এ জিৎ বেশি দিন থাকবে না। এবার থেকে হয়ত আমার হারবার পালা। দেশে এসেই নানা জবরজঙ্গ ব্যাপারের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হয়। কাজের জিনিস অত্যন্ত তুচ্ছ হলেও তার ধা অত্যন্ত প্রবল। এখনি যেন তার আভাস পাওয়া যাচ্চে।

বুঝতে পারচি শান্তিনিকেতনে সকলেই চঞ্চল হয়ে আছেন। এখন কিছুদিন ঝটোপুটি চলবে। আমি মনকে সম্পূর্ণ বিবিক্ত রাখবার চেষ্টা করব কিন্তু যখন কোনো আন্দোলনে অন্যায় মথিত হয়ে ওঠে তখনই আমার পক্ষে সহিষ্ণুতা বড় কঠিন হয়। তবু একান্তভাবে শান্ত থেকে নিষ্ঠানমুক্তির কাছ ঘেঁষে চলব মনে করে আছি দেখি কতদূর পেরে উঠি। আজ এখনই শান্তিনিকেতনে যাত্রা করতে হবে। কিন্তু বৌমা কাল এসেই হাঁপানিতে শয্যাগত। তিনি যেতে পারবেন না। ভালো লাগ্‌চে না। তিনি যাবেন না অথচ মিস্ প—আমার সঙ্গে এ পেরে উঠবো না তাই মিস্ প—কে এখানেই রেখে যাচ্ছি।

জীবন, অমল প্রভৃতিদের ক্ষনকালের জন্যে দেখেচি। কিন্তু এখনো কথাবার্ত্তা হবার অবসর হয়নি। তাই এখানকার ভাবগতিক বুঝতে পারচিনে। ক্রমশ জানা যাবে। হয়ত ইতিমধ্যে তোমরা আমার চেয়ে বেশি জেনেছ। কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছাও করে না। এসব ছোটো কথা যখন বড় হয়ে ওঠে তখন তার অত্যাচার অত্যন্ত পীড়াজনক হয়। সেটা মনের পক্ষে পরাভব। এইসব ক্ষুদ্র উৎপীড়ন গুলোকে সুদূরে ঠেকিয়ে রাখতে ইচ্ছে করচি, বড় শক্ত। এরা বড় পথে চলে না, নানা খিড়কির রাস্তা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। আমাকে গল্প লিখ্‌তে বল্‌চ। সে কথা পরে হবে কিন্তু তার আগেকার কথা হচ্চে তুমি গল্প লিখ্‌তে শুরু করেচ কিনা। তোমার চিঠিতে সে প্রসঙ্গের আভাসমাত্র দেখা গেল না। কিন্তু কথাটা পাকাপাকি ঠিক হয়ে গেছে সে আর অস্বীকার করবার জো নেই।

গত সাত মাস ধরে দেশে ফেরার কল্পনা সর্বদাই মনে জেগেচে সুতরাং কল্পনাটা দৈর্ঘ্যে খুবেই বড় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু দেশে ফেরবামাত্র তার বহর একেবারে কমে গেল। মনে হচ্চে চিরদিন এইখানেই ছিলুম—কোথাও যাইনি। তাছাড়া দেশে আসবামাত্র নিজেও সবসুদ্ধ ছোটো হয়ে যাই হঠাৎ পাঁকের মধ্যে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেলে যেমন খাটো হতে হয় সেইরকম। এখানকার সবকিছুরই পরিমাণ ছোটো, তাই নিজেকে কোনো উচ্চতার মধ্যে খাড়া রাখতে পারিনে। এখানে আমাদের সবচেয়ে বিপদ হচ্চে চারিদিকে খর্বতার রাজত্ব তার শাসন থেকে নিজেকে বাঁচানো বড় শক্ত।

হায় আমার শিলাইদহের সুদূর নির্জনতা! সেই নির্জনতাই আমাকে অনেককাল বাঁচিয়ে ছিল।

আজ এ চিঠি না দিলে এ মেলে যাবে না—চিঠি বন্ধ না করলে এ গাড়ি পাব না অতএব খানিকটা ফাঁক রয়ে গেল।

ইতি ৬ই পৌষ ১৩৩৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

য়ুরোপ থেকে ফিরে আসবার মুখে কবিকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিয়েছিলাম যে তিনি দেশে ফিরেই একটা বড় রকম গল্প লিখতে শুরু করবেন। হাসতে হাসতে বললেন "আচ্ছা লাগে। কিন্তু তাহলে আমারও একটা সর্ত্ত আছে। তোমাকেও একটা গল্প লিখতে হবে।" আমি অবাক হয়ে মুখের দিকে চাইতেই বললেন "ওকি! ওরকম ভয় পেয়ে গেলে কেন? তোমার আর ভাবনা কি? যেমন তেমন করে একটা কিছু খাড়া করে দিও, তারপর আমি তাকে মেজে ঘষে ঠিক তৈরী করে দেবো। এমন কি তখন কেউ টেরই পাবে না ওটা তোমার লেখা নয়।" আমি খুব হেসে উঠলাম। উনিও সে হাসিতে যোগ

দিয়ে বল্‌লেন "এরকম কাজ জীবনে বহুবার করেছি। তাই তো বল্‌ছি আমার মত এমন একটা কবি সম্রাট তোমার সহায় থাক্‌তে তুমি লিখ্‌তে ভয় পাচ্ছো কেন? তোমাকে এবারে লিখ্‌তেই হবে, তা হলে আমিও লিখ্‌বো।" অনেক ঝুটোপুটির পর শেষ পর্যন্ত আমাকে রাজী হতেই হোলো। কিন্তু বলাবাহুল্য আমি আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি। কিন্তু কবি তাঁর কথা রেখেছিলেন দেশে ফিরে কুমু আর মধুসূদনের কাহিনী রচনা করে। যখনই মনে করি আমার জেদে যেদিন জাহাজে কথা দিয়েছিলেন বলেই যোগাযোগের মতো ওরকম একখানা বই লেখা হোলো তখনই নিজের কাছে কৃতজ্ঞ না হয়ে পারি না আসলে আমাদের একা ফেলে আস্‌ছেন বিদেশে বলে ওঁর মনটা ব্যথিত হয়ে ছিল তাই সেদিন আমার আবদার এড়াতে না পেরে কথা দিয়েছিলেন। যতোদিন না খবর পেলাম গল্প লেখা আরম্ভ হয়েছে ততোদিন ক্রমাগত প্রত্যেক চিঠিতে ওঁর প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দিয়েছি

(ক্রমশ

GOVERNMENT LIBRARY Cooch Behar

রূপালী মাছ

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

তুমি যেন এক রূপালী মাছ
চারিদিকে জল সুশীতল,
জলধারা যেন স্বচ্ছ কাঁচ—
তাই তুমি সুখে রূপালি মাছ
জলকেলি কর অবিরল।

আমি ধরে রাখি বুকে তোমার
ছবিটি মনের আয়নায়;
কত যে খাম্‌কা খুশি তোমার
হিজিবিজি ছবি বুকে আমার
আঁকে, সাত-রঙা-পাখ্‌নায়।

যাবো, আমি যাবো, তোমার কাছে
কোনো আমিষাশী লোভে না;—
ব্যাধিত যুগের যে স্নায়ু-জ্বর
বিকল করেছে গ্রাম-নগর
তা' দিয়ে তোমাকে ছোঁব না।

কিছু শীতলতা ভিক্ষা চাই
গভীর জলের শান্তির;
এই নাগরিক ব্যস্ততার
ব্যাধি হতে চাই মুক্তি, আর
অবসর চাই ক্লান্তির।

তোমাকে ঘিরে হে রূপালী মাছ!
হতে চাই জল সুশীতল;
আমি জলধারা, স্বচ্ছ কাঁচ—
তুমি এই বুকে রূপালি মাছ
খেলা করে যাবে অবিরল।

[illegible]

বিষ্ণু দে

শহরে বিষাদ বর্ষার মতো, বাংলার মতো,
চাঁদনী আকাশে ভাসে আর ডোবে, হাসে।
হোক না যতই ছন্নছাড়া সে,
আশ্চর্য সে পরম আপন বড় প্রিয়জন কিম্ভুত এই শহর!
সন্ত্রাসে সংগ্রামে উল্লাসে ক্লান্তিতে তার প্রাণের নিত্য লহর।

থাক্‌ শত দোষ, হোক না হাজার ভুল।
কাকে দোষ দেবে? জীবনেরই ভুল, কমবেশি সেও দায়ী।
কত ফুল ঝরে কত চারা মরে মাটির স্তন্যপায়ী!—
তবু হে মালিনী, মালঞ্চ ভরো ফুলে,
মালাকর আর করবে না দেখো ভুল।

শ্রাবণের ঘন দিগন্তব্যাপী ধূসর মেঘের নীলে
ছোট ছোট মেঘ বর্ষাতি বেগে ছোটে
যেমনটি যায় তোমার উধাও মুখের ঠোঁটের খোঁজে
আমার হৃদয় মাঠে ঘাটে খালে বিলে।

সন্ধ্যা দেখেছ? বর্ষাদিনের নটমল্লারে সন্ধ্যা?
মেঘের সপ্তবর্ণ আকাশে দিকে দিকে প্রাণবহি।
শত অশ্রুতে অক্ষত আশা বর্ষার রাঙা সন্ধ্যা।—
তোমারও বন্ধ্যা ভাবনা, দেখবে, রাঙল!

রাত্রিগুলিকে জড়ো ক'রে রাখো বীর জগতের গুণ্ঠিত জীর্ণ
যেখানে পার্থসারথি স্বয়ং তন্দ্রাকে
প্রেরণা জোগান বীরের কাতর প্রেমিক হিয়ার তৃষায়।—
আমরা কি ভীরু, যেহেতু হৃদয় রাজপথে পথে ভাঙল?

দিনগুলি গেছে একচ্ছত্র কর্মে, কে হারে কে জেতে
ধর্মযুদ্ধে অন্নবস্ত্র চেয়ে, জীবনের জলসত্রে।—
রাত্রি ঘনায়, পাড়ার যুগলমন্দিরে
মধ্যরাতের আরতি এবারে ডাকে
আজ থেকে কালে চলো যাই ধীরে ঘুমের গঙ্গা বেয়ে॥

সংবাদে শুনিলাম বেরুবাড়ী হস্তান্তর নাকি নেহরু-নুন চুক্তিরই অংশ বিশেষ। বিশুখুড়ো সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন—"বড় বেশি নুন-টান"!

শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণ মন্তব্য করিয়াছেন যে ভাষা সমস্যার সম্মুখীন হইলে আমরা পশুর ন্যায় ব্যবহার করি। —"ঠিক বলেছেন। তখন পশুর মতোই ভাষা যায়

হারিয়ে, থাকে শুধু গুঁতোগুঁতি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

ভারত বনাম পাকিস্তানের ক্রিকেট টেস্টের প্রথম দুইটি খেলায় নরী কনট্রাক্টর অধিনায়ক নির্বাচিত হইয়াছেন। নির্বাচনের পূর্বের এক সংবাদে শুনিয়া ছিলাম যে পাঁচ পাঁচজন খেলোয়াড় নাকি অধিনায়কের পদপ্রার্থী ছিলেন। "কনট্রাক্টরের নির্বাচনের পর তাঁরা এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম রেজিষ্টার করবেন কিনা তা অবশ্য সংবাদে বলা হয়নি"—মন্তব্য করেন জনৈক ক্রিকেটরসিক সহযাত্রী।

হিন্দী বিশ্বকোষ প্রকাশিত হইয়াছে। "কণ্ঠলেংগটি প্রভৃতি শব্দের কোন পরিবর্তন পরিবর্জন করা হয়েছে কিনা তা এখন পর্যন্ত জানা যায়নি"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

শ্রী নেহরুর জন্মদিনে দক্ষিণ কলিকাতায় অনুষ্ঠিত শিশুদের একটি আনন্দ-উৎসব বয়স্কদের ছেলেমানুষির জন্য পণ্ড হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাঠ করিলাম। শুনিলাম কতিপয় বয়স্করা নাকি বেড়া ভাঙিয়া উৎসব অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া গোলমালের সৃষ্টি করেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"তাদের ঠিকুজী দেখলে বোঝা যেতো যে তারা বয়স্ক নয়, খোকা। তবে কিনা যাকে বলে রামখোকা!!

বিশ্ব "ফাও" সংস্থা (F. A. O) ক্ষুধা বিতাড়নের জন্য সংগ্রাম করিবেন। খুড়ো বলেন—"সংগ্রামের অনেক খরচ। অনেক ঝামেলা। তার চেয়ে অজীর্ণ হয় এমন সহজলভ্য খাদ্যের ব্যবস্থা করলে খিদে আপনা থেকে মাত হয়ে যাবে"!!

ট্রামে-বাসে

একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সংবাদে জানা গেল রাশ্যাতে নাকি কৃত্রিম "চিকেন হার্ট" প্রস্তুত করা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইহা যে কাহারও বুকে বসাইয়া দেওয়া যাইবে।—"চিকেন হার্টগুলি দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য রাখা হবে, না রপ্তানি করা হবে তা অবশ্য সংবাদে বলা হয়নি"—মন্তব্য করে শ্যামলাল।

একটি সংবদে জানা গেল যে ১৯৫৭ সালের এপ্রিল হইতে এযাবৎ পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি পার্টির সদস্যদের নিকট পার্টির চাঁদা বাবৎ প্রায়

৯১,০০০ হাজার টাকা বাকী পড়িয়া আছে। —"কর্তৃপক্ষ চাঁদা আদায়ে কুশলী পাড়ার ছেলেদের হাতে চাঁদা আদায়ের ভারটা দিয়ে দেখতে পারেন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলি সরকারের কর্তৃত্বাধীনে লইবার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কলম্বোতে মহিলারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছেন। সংবাদে বলা হইয়াছে এই ধরনের মহিলা বিক্ষোভ কলম্বোতে এই প্রথম। —"সরকার এবার বুঝবেন ধানী-লঙ্কা কাকে বলে"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

কলিকাতা কর্পোরেশনের সাইকেল পিয়ন ও বাইরের কাজে রত কর্মী-দের জন্য বর্ষায় যেসব ছাতা ও বর্ষাতি দেওয়ার কথা ছিল তা শীতকালে দেওয়া হইবে বলিয়া সংবাদ পাঠ করিলাম।—"কর্পোরেশনের আঠারো মাসে বছর সুতরাং কাজে কাজেই"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

মার্কিন মুল্লুকের সংবাদে প্রকাশ সেখানে কোন এক ফার্নিচারের দোকানে কাজ করিবার জন্য তিনটি শিম্পাঞ্জী নিয়োগ করা হইয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"খুব আশ্চর্য সংবাদ নয়। শিম্পাঞ্জীদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে অনেক ক্ষেত্রেই পেয়েছি। আর অফিসের কাজে বাঁদর নিয়োগের ব্যবস্থা তো প্রায় নিত্যি তিরিশ দিনই চোখে পড়ছে"!!

মস্কোতে কমউনিস্টদের "সামিট" মিটিং চলিতেছে। —"সামিটে তুষার-মানবের সংগে যোগাযোগ হয়ত তাঁরা

এখনো করতে পারেন নি"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

হাঙ্গেরির জনৈক তরুণ ভূপর্যটক মন্তব্য করিয়াছেন যে ভারত তাঁর স্বপ্নের দেশ। —"ভারতবাসী কিন্তু তার স্বদেশকে দেয়ালার দেশ বলেই জানে"—বলাবাহুল্য মন্তব্য বিশুখুড়োর।

ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস

জব চার্ণকের বিবি

কলকাতা স্রষ্টা জব চার্ণকের প্রেমময় জীবন আলেখ্য। ॥ পাঁচ টাকা ॥

অর্চনা পাবলিশার্স

৮বি, রমানাথ সাধু লেন, কলিকাতা-৭

(সি ১৫৬৯)

অভিনব কাগমা আবিষ্কার

রেজিঃ নং ৪৩২৭

অম্লপিত্ত, লিভার ব্যথা, অম্লশূল, পিত্তশূল ইত্যাদি যাবতীয় পেটের বেদনায় অব্যর্থ

বিফলে মূল্য ফেরত।

সকল ঔষধের দোকানে পাইবেন

দি কাগমা ঔষধালয়

৮৭, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা-৩৭

প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

৬০

ট্যাক্সিতেই হেমেন জিগগেস করলে মৃণালিনীকে, 'হারটা নিয়েছ?'

বিজয়া বললে, 'নিয়েছি।'

পথেই কিন্তু একটা আভাস দিয়ে রাখা ভালো, নইলে ব্যাপারটা কী রকম ঘোলাটে থেকে যাবে, হয়তো বা দেখাবে প্রতারণার মত। যেন কারে ফেলে মজা দেখা হচ্ছে এমনি একটা শত্রুতার ভাব। এটা ঠিক নয়।

'আচ্ছা বৌদি', হেমেন আবার লক্ষ্য করল মৃণালিনীকে, 'আমরা যদি গিয়ে দেখি এ মেয়ে তোমার বিনতা নয়—'

'বিনতা নয় মানে?' মৃণালিনী রুক্ষ মুখে বললে, 'তবে আবার কে?'

'ধরো আর কোনো প্রণতা?' হেমেনের দু চোখ কৌতুকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'না, না, আর কেউ হতে যাবে কেন? বিনতাই প্রণতা। তোমরা তো জানো না এর মধ্যে কতবার ও এসেছে আমার কাছে, কত বলেছে ঘর-সংসারের কথা—'

'কিন্তু সুকু তো কিছু বলে নি।' বললে হেমেন। 'ও তো আর আসেনি তোমার কাছে।'

'না আসুক, না বলুক।' বিজ্ঞের মত মুখ করল মৃণালিনী। 'একদিকের কথা শুনেই আরেক দিকের কথা বেশ বোঝা যায়। বিনতার ভাবসাব থেকেই বোঝা গেছে সুকুর মতি-গতি, সুকুর পছন্দ।' তারপর এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে হঠাৎ তীক্ষ্ণ বাণ ছুড়ল। 'তবে তোমরা মেয়ে কে, ঠিক না জেনেই চলেছ পাকা দেখতে?'

'আমাদের জানবার কী দরকার!' ও পাশ থেকে বললে ভূপেন।

'জানবার কী দরকার মানে?' ঝলসে উঠল মৃণালিনী। 'তাই বলে যা-তা একটাকে ধরে নিয়ে আসবে?'

'আসবে—আমরা তার কী করব?' ভূপেন উদাসীন ভঙ্গি করল। পরে একটু জেরার মত করে প্রশ্ন করল, 'প্রথমবার যে ধরে এনেছিল জানিয়েছিল আমাদের? মত নিয়েছিল? যা কপালে এনে নিক্ষেপ করেছে তাই [illegible]

তাই যা ছুঁড়ে মারবে তাই তুলে নেব। ওর যাতে পছন্দ তাতেই আমরা স্বচ্ছন্দ। শত হলেও ছেলে। সেই ছেলে আর ছেলের বউকে কে পারে ফেলে দিতে?'

'বিশেষ করে কৃতী রোজগারে ছেলে।' ফোড়ন দিল হেমেন।

'বা, সেই যে মেয়ের কাকা এল বাড়িতে, পাকা দেখার দিন ঠিক করতে, তার থেকেও ব্যাপারটা স্পষ্ট করে নিলে না—কে মেয়ে, কী পরিচয়?' মৃণালিনী যেন ফাঁপরে পড়ল। 'এটা কোন ধরনের কথা?'

'অত্যন্ত আধুনিক ধরনের।' বললে হেমেন। 'পাত্রীর মনোনয়নে বাবা-কাকার যখন কোনো কথা খাটবে না, ভূমিকা থেকে পরিশিষ্ট কোনোখানে না, তখন পাত্রী কে, এ সম্পর্কে বাপ-কাকার কৌতূহল অবান্তর। শুধু অবান্তর নয়, অসঙ্গত। শুধু এসে বললে, বিয়ে করছি, বললাম ঠিক আছে। আগন্তুক ভদ্রলোক এসে বললে, আমি পাত্রীর কাকা, নেমন্তন্ন করতে এসেছি আপনাদের, বললাম ঠিক আছে, ঠিকানাটা রেখে যান। এর বেশি আমাদের বক্তব্য নেই, থাকতে পারে না—'

'এর বেশি কিছু বলতে কইতে গেলেই একসারসাইজিং ও জুরিসডিকশন নট ভেস্টেড ইন কোর্ট হবে যাবে।' হাসিমুখে লেজুড় জুড়ল ভূপেন।

'তবে যেখানে পাত্রী জানা নেই সেখানে আশীর্বাদের ঘটা কিসের?'

'শুধু সুকুর অনুরোধে'। ড্রাইভারের পাশে বসার দরুন বারে বারে ঘাড় ফিরিয়ে মুখের দিকে তাকাতে হচ্ছে না। এই হেমেনের আরাম।

'এ সব ঘটা হয়নি বলেই প্রথম বারেরটা ভেস্তে গিয়েছিল।' ভূপেন বললে, 'তাই দ্বিতীয় বারের বেলায় সাবধান হয়েছে।'

'তা ছাড়া যে পাত্রীকেই সুকু মনোনীত করবে তারই উপর আমাদের আশীর্বাদ তা সে পাঁচিই হোক আর খেঁদিই হোক।' হেমেন উদার সুরে বললে।

'বললেই হল?' বিজয়ার হাসি ছাপিয়ে ধমকে উঠল মৃণালিনী।

'না বললেও হবে'। গম্ভীরস্বরে হেমেন বললে। 'পাঁচি হলেও আমাদের আদরের খেঁদি হলেও আমাদের আদরের। সুকু বউকে ফেলব কোথায়? এ তো তুর ফন্দুর বুঝছি? বাঙালী বিয়ে করছে, কিন্তু যদি ধরো বিদেশে গিয়ে অজ্ঞাত-কুলশীলা এক মেম বিয়ে করে আনত, 'শেম'-'শেম' করতে পারতাম না, ঠিক বরণ করে নিতাম—

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় সংস্করণ বার হল

এ কে গৈরিকের দীপ্ত শিখা! হাতে তেজোদৃপ্ত লাঠি। চলেছে উদাসীনের মত, আবৃত্তি করছে সংস্কৃত শ্লোক। সে শ্লোকের তাৎপর্য হচ্ছে অহঙ্কার আর অলঙ্কার, গৌরব আর প্রতিষ্ঠা—সমস্তই ভস্মমুষ্টি। কি হবে আমার স্বর্ণে-রৌপ্যে, কাষ্ঠে-লোষ্ট্রে, বসনে-ভূষণে, স্তূপীকৃত জড়ের জঞ্জালে? খেতড়ির রাজপ্রাসাদ আমাকে কী দেবে, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডই বা আমাকে কী দেবে? যে জিনিস ধুলো হয়ে যাবে তার ধুলো ঝেড়ে দিন কাটাতে আমি প্রস্তুত নই। আমি প্রতিষ্ঠা চাই না, সম্মান চাই না, সিংহাসন চাই না, সমস্ত ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে যিনি মূলশক্তি তাঁকে চাই।

—দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পথে—

এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা ১২

'আর সে মেম গাউন ছেড়ে ব্লাউজ না পরলেও, শাঁখা-সিঁদুর না পরলেও—' ভূপেন মাথা নাড়তে লাগল।

'বলো কী ভীষণ কথা!' মৃণালিনীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'আমাদের কোর্টের উকিল মহীতোষবাবুর বড় ছেলে করল কী! বিদেশ থেকে মেম বিয়ে করে আনল।' বলতে লাগল ভূপেন। 'মেমসাহেব যদিও শাড়ি-ব্লাউজ পরতে রাজি, শাঁখা-সিঁদুর পরতে, কিন্তু মহীতোষবাবুর ছেলে কিছুতেই তাতে রাজি নয়। বলে, তুমি যদি ও সব পরে বাঙালী মেয়ে সাজতে চাও, তাহলে তোমাকে বিয়ে করলাম কেন! স্ট্রেইট বাঙালী মেয়ে বিয়ে করলেই তো হত। তা ছাড়া, তুমি যদি ও সব পরো, তোমাকে সঙের মতন দেখাবে। ইংরেজও নয় বাঙালীও নয়, হয়ে দাঁড়াবে 'বাংরেজ'। তোমার সমস্ত 'গ্ল্যামা'র ধুয়ে যাবে, তোমাকে 'ডাউডি' দেখাবে—'

'সে আবার কী!' আতঙ্কে শিউরে উঠল মৃণালিনী।

'মানে তুমি বোদা, বিস্বাদ হয়ে যাবে, লেশমাত্র আকর্ষণ থাকবে না।' বিশদ হল ভূপেন। 'তোমার রূপ তোমার পোশাকে চুলে গয়না-টায়না-না-পরায়, হাঁটা-চলায় কথা বলায়, সর্বোপরি তোমার ভাষায়। তুমি আধো-আধো বাঙলা শিখে আমার সঙ্গে প্রেমালাপ করবে এ দুশ্চেষ্টা কেন!' যদি বাঙলাতেই আলাপ করব তবে ষোল আনা বাঙালী মেয়ের স্বারস্থ হতে দোষ কী ছিল!'

'তারপর হল কী?' অস্থির হয়ে উঠল মৃণালিনী।

'যাও না, মহীতোষবাবুর বাড়িটা দেখে এস না। দোতলাটা ছেলে-বউকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছেন। আর সামনের রাস্তা থেকেই দেখবে দোতলার বারান্দায় হাঁটু-ছোঁয়া ফ্রক পরে মেমসাহেব, মহীতোষবাবুর পুত্রবধূ, পাইচারি করছে আর সিগারেট ফুঁকছে।

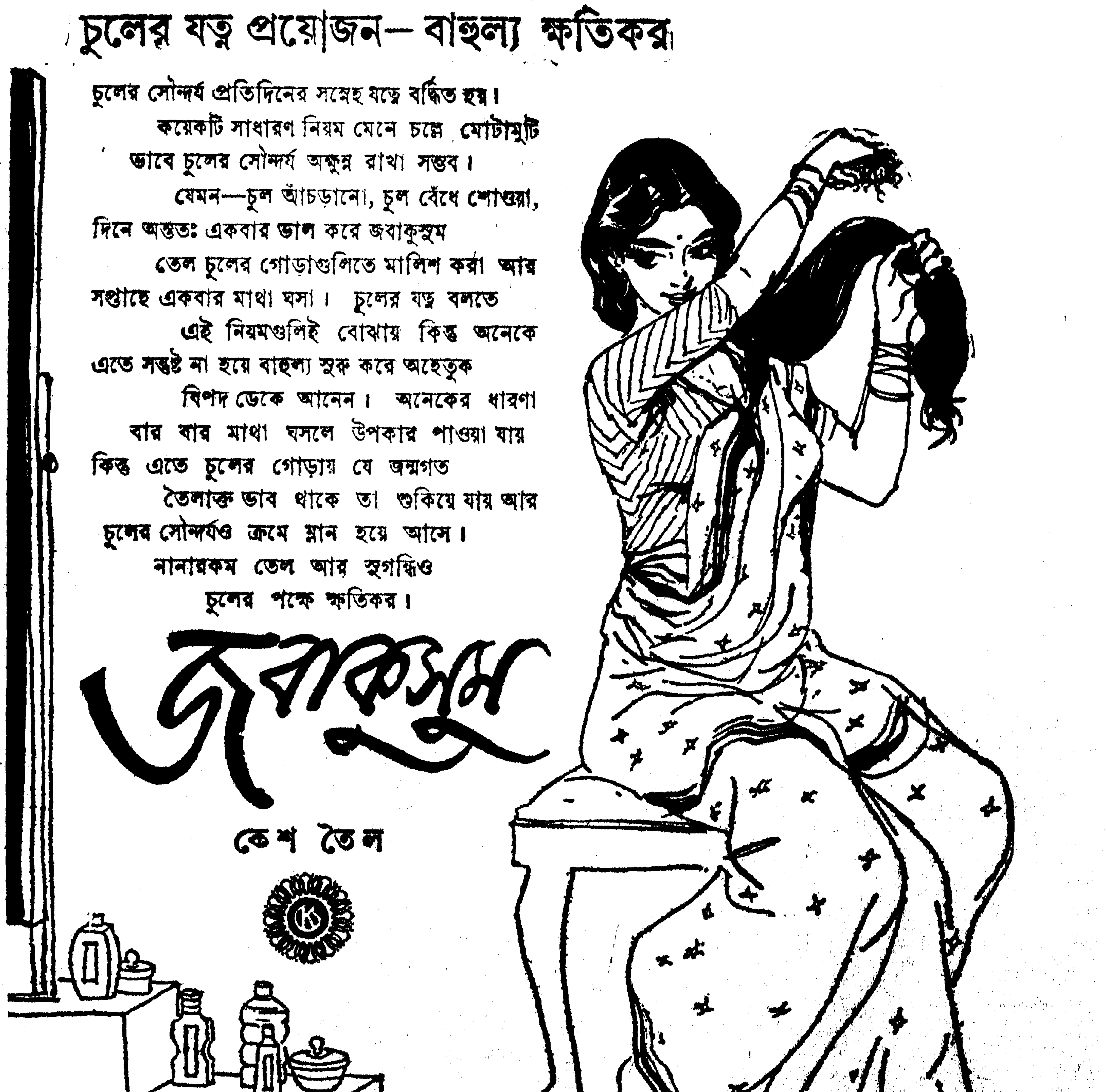

ছেলের ইচ্ছায়, গ্ল্যামারের খাতিরে, সব মেনে নিতে হয়েছে মহীতোষবাবুকে। ফেলবে কোথায়!'

'কী সাংঘাতিক!' মৃণালিনীর হৃৎপিণ্ড শুকিয়ে গেল।

'এ তো ধূমাবতী দেখলে', হেমেন বলল, 'এবার ছিন্নমস্তা দেখবে চলো।'

'সে আবার কী?' উদ্বিগ্ন হল বিজয়া।

'ছিন্নমস্তা মানে আমাদের অফিসের সুখময়বাবুর ছেলের বউ।'

'সে আবার কী করল!' ভূপেন কৌতূহলী হল।

'সুখময়বাবুর ছেলে বিধবা বিয়ে করেছে।' বলতে লাগল হেমেন। 'কিন্তু বিয়ে করার বউকে সাজতে-গুজতে দিচ্ছে না, পরতে দিচ্ছে না গয়না। শুধু তাই নয়, সিঁথিতে সিঁদুর আঁকতে দিচ্ছে না, পায়ে আলতা, ঠোঁট রাঙাতে দিচ্ছে না পান খেয়ে। বলে তুমি যদি উদগ্র সধবা সাজবে, তা হলে তোমার চার্ম কোথায়? যাকে আমি ভালোবেসেছি সে কোথায়? এ সজাগোজা মহিলা তো আরেক লোক সুতরাং, আগে যেমন ছিলে, তেমনি বিধবা সাজো। হ্যাঁ, স্বামী বেঁচে থাকলেও বিধবা। আর সেই যে করুণ-করুণ মুখ করে থাকতে, যে মুখ আমাকে মুগ্ধ করেছে, সেই করুণ-করুণ মুখ করে থাকো। নচেৎ যদি রঙ্গ-রসে হাসিতে আনন্দে প্রগল্ভ হও, তা হলে তোমার জাত মারা যাবে, তোমাকে অশ্লীল দেখাবে, অশুচি দেখাবে, তোমাকে আর ভালোবাসা যাবে না—'

'তারপর?' ভূপেনই জিজ্ঞেস করল।

'তারপর আর কী! আগের সেই বৈধব্য-বেশই ধরল বউ। ছেলে বলে কি না, শাদা থান না পরলে, কপাল-মাথা শাদা না রাখলে, ভালোবাসা যাবে না। ভাবতে পারো বৌদি, ছেলে বেঁচে, অথচ তার বউ পাড় ছাড়া শাদা শাড়ি পরে করুণ-করুণ মুখ করে সংসার করছে।'

'উঃ, কী দিনকালই পড়েছে!' অন্তরে-অন্তরে শিউরে উঠল মৃণালিনী। 'আমার সুকু না জানি কী কাণ্ড করে বসেছে!'

'যাই করুক, যে মেয়েকেই পছন্দ করুক, যুগের যেমন হাওয়া', ভূপেন বললে, 'তাকেই আমরা আশীর্বাদ করব।'

মনে-মনে গুরুদেবের শরণাপন্ন হল মৃণালিনী। কিন্তু জোর পেল না। তাই গেল কালীঘাটে মা-কালীর দুয়ারে। হে মা কালী, সুকু যেন বিদঘুটে কিছু করে না বসে। বিনতা হোক প্রণতা হোক, একটি বাঙালী মেয়েই যেন ওর বউ হয়। আর কিছু চাই না, যেন বয়সে বড় না হয়। বুড়ি না হয়। যেন কুমারী হয়। আর, ভগবান, যেন অন্তত ম্যাট্রিকটা পাশ থাকে। আমার আগের বউকে তো জানো। সে কত [illegible]! কত [illegible]! একেবারে [illegible]

হলে লোকে ধর্ম দেখবে। আমার থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেবে।

দুয়ারে ট্যাক্সি এসে দাঁড়াতেই বাড়ি-ভর্তি লোক কলধ্বনি করে উঠল। বহু মুখে বেজে উঠল শঙ্খ। আর এত বড় একটা সম্ভ্রান্ত জনতা দেখে মৃণালিনী কিছুটা আশ্বস্ত হল, হয়তো পাত্রী একেবারে পরিত্যাজ্য হবে না। সর্বত্রই দেখছি খোলা মাঠের হাওয়া, সারল্যের জল, কোথাও এতটুকু লুকোলুকি ঢাকাঢুকির কুয়াশা নেই।

তবু বিধাতাপুরুষ যে এক সাংঘাতিক রসিকব্যক্তি এ জ্ঞান ছিল বলেই মৃণালিনী স্তব্ধ হয়ে রইল, বিনীত হয়ে রইল।

কেউ কারু প্রত্যক্ষ পরিচিত নয়, গায়ত্রী আর ইন্দিরা মেয়েদেরকে অভ্যর্থনা করল, আর নরনাথ পুরুষদের। 'দাদা অসুস্থ, বিশেষ হাঁটতে পারেন না, নিজের ঘরে আছেন বন্দী হয়ে।' বনবিহারীর অনুপস্থিতির সাফাই দিল নরনাথ।

'হ্যাঁ, যাবার আগে দেখা করে যাব।' ভূপেন বললে।

কাকলির ঘরেই জিনিসপত্র সরিয়ে প্রকাণ্ড ফরাস পাতা হয়েছে। বরপক্ষীয়েরা বসল তার উপর। তাকিয়ে রইল মুখো-মুখি দরজার দিকে। কখন কী মূর্তিতে দেখা দেবে কন্যা, বিকটদর্শনা না কি অমিয়ময়ী অম্লানলক্ষ্মী!

পাশের ঘরে সাজছে কাকলি। সাজছে মানে সাধারণ ভাবে একটু ফিটফাট হচ্ছে। গায়ত্রীর ইচ্ছে একটু গয়না-টয়না পরে ভরা-ভর্তি সাজে, দামী রঙিন শাড়ি দোলায়, চুলে বিনোদ বেণী তৈরি করে। আর কবে দেখতে পাব সেই সাবেকী ঠাট—একটু বা আপসোস করে।

'মাথা খারাপ!' হাসিমুখে সমস্ত প্রস্তাব উড়িয়ে দেয় কাকলি। 'চেনাবামুনের পৈতের দরকার কী। যেমনটি আছি তেমনটি গিয়ে দাঁড়াব।'

এখন কথা উঠেছে খালি মাথায় দাঁড়াবে, না, মাথায় একটু তুলে দেবে আঁচলের প্রান্তটা। কিসে ফুটবে শালীনতার ভাব। এ নিয়ে আবার কথা কী! আমি তো এখন মিস মিত্র। নবজাত।

কিন্তু ঘরে ঢুকতেই দরজার কাছে প্রথমেই ভূপেনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল কাকলি। এতক্ষণ আড়ালে ছিল, ভূপেন এসেছে বুঝতে পারেনি। এখন চকিতে চোখাচোখি হতেই, মাথার কাপড় টেনে দিল কাকলি। আর, মাথায় কাপড় দেওয়া অবস্থায় দাঁড়াল সভাস্থলে।

কন্যার সঙ্গে যেমন একজন বাহিকা আসে, কাকলির সঙ্গে তেমনি আসছিল ইন্দিরা। ইন্দিরা তো প্রকারান্তরেই বিবাহিতা. কিন্তু সঙ্গে অপর একজন যে এগুচ্ছে

বাস্তবধর্মী ও মনস্তত্ত্বমূলক
দু-খানি সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস

নদীর মত

প্রফুল্ল রায়—দাম— ৩·০০

এই উপন্যাসের পটভূমিকা পূর্ববঙ্গ। ধলেশ্বরী এই দেশেরই এক নদী। এই ধলেশ্বরীর দুই তীরে ঢালী-মালী, কাহার-কুমার, মুধা-নিকারী ছত্রিশ জাতের বাস। এই সব দুঃখী, অন্ত্যজ মানুষগুলিকে দুই তীরে সুখাশ্রয় দিয়ে ধলেশ্বরী অবিরাম বয়ে চলে আর বুঝি বা তার ঢেউয়ের দুর্জ্ঞেয় ভাষায় নিশিদিন তাদেরই জীবন-কথা বলে যায়।...লেখকের ভাষার বৈচিত্রে ও অনন্যসাধারণ চরিত্র চিত্রণের মুন্সিয়ানায় এই উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্রই পূর্ণ সজীবতা লাভ করেছে।

রঞ্জনা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—দাম—৩·০০
"মরিতে চাহি না আমি এ সুন্দর ভুবনে,
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

এই উক্তির মাঝে যে সজীব প্রাণ আ[illegible] তাকে সার্থকতায় ভরে তুলবার ভার নিয়ে[illegible] এই উপন্যাসের নায়ক ও নায়িকা। জীব[illegible] যুদ্ধে বার বার পর্যুদস্ত হয়েও তা[illegible] তাদের সেই ক্লেদাক্ত ও বিষময় জীবন[illegible] আপ্রাণ চেষ্টায় বহু ঘাতপ্রতিঘাতের ম[illegible] দিয়ে আবার টেনে এনেছে এক অপ[illegible] মধুময় জীবনে। লেখক তাঁর নিজ[illegible] ভঙ্গিতে এমন এক সুমধুর পরিবেশ সৃ[illegible] করেছেন যা এক কথায় অনবদ্য এবং এক নারায়ণবাবুতেই সম্ভব।

॥ এখনই সংগ্রহ করুন ॥

বিহার সাহিত্য ভবন প্রাঃ লিঃ
৩৭এ, কলেজ রো, কলিঃ—৯

(সি ৯৬[illegible]

বঙ্গসাহিত্যের বাঙ্গ-রসভাণ্ডারে অভিন[illegible]
সংযোজন
দীপঙ্করের

মিঠে কড়া

মূল্য : ২·৫০
প্রকাশক :
মৈত্রায়ণ : ৪/২ মহেশ চৌধুরী
কলিকাতা ২৫
সম্ভারক :
দি নিউ বুক এম্পোরিয়াম
২২।১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা ৬

(সি ৯৩

স্বর্ণাক্ষরে খুব রক্তিম না হলেও তারই তো সমগোত্রীয় মনে হচ্ছে। বিবাহিতা না হলে আর মাথায় ঘোমটা কেন? কেন ভঙ্গিতে এত গাম্ভীর্য!

আঁতকে উঠল মৃণালিনী। পাশেবসা বিজয়ার একটা হাত ধরে ফেলে দিশেহারার মত বললে, 'এ আবার কার বউ বিয়ে করছে সুকু?'

'ভালো করে দেখুন না তাকিয়ে।' হাসি-লাগা মুখে বললে বিজয়া।

সকলের আগে নিচু হয়ে মৃণালিনীকেই প্রণাম করতে এগুলো কাকলি।

'য়্যাঁ'-! তুমি? আমাদের ছোট বউমা?'

'পরের বউকে কোন দুঃখে বিয়ে করতে যাবে?' বিজয়ার দুই চোখে খুশি উপচে উঠল। 'নিজের বউকেই বিয়ে করছে সুকু।'

'খুব ওরিজিন্যাল।' টিপ্পনী কাটল হেমেন।

'তুমি আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গিয়েছ।' কাকলির চিবুকে একটু হাত বুলালো মৃণালিনী। 'উঃ, আমি কত কী আবোলতাবোল ভাবছিলাম, আমার বুকটা এখনো ঢিপঢিপ করছে। বাবাঃ, পাথর নেমে গেছে বুক থেকে। চলো, ঘরের লক্ষ্মী ঘর আলো করবে চলো। কই সব সরঞ্জাম —? ধানদুব্বো কই?' বিজয়ার দিকে গ্রহ হাত বাড়াল। 'দে, হারটা দে।'

বাক্সটা এগিয়ে দিল বিজয়া।

সাতলহর হারটা শূন্যে একবার দুলিয়ে মৃণালিনী কাকলির গলায় পরিয়ে দিল।

মৃণালিনীকে আবার প্রণাম করল কাকলি। এবং ক্রমে-ক্রমে আর-সকলকে।

ভূপেনের দিকে তাকিয়ে মৃণালিনী বললে গদ্‌গদ হয়ে, 'সুকুর যে এমনতর কীর্তি বুঝতে পারিনি—'

'আমরাও কি পেরেছি?' সায় দিল ভূপেন।

'যদি একজনকে দেখতাম, বাড়িটা ঠিক ধরতে পারতাম।' কাকলিকে লক্ষ্য করল মৃণালিনী। 'তোমার সেই দাদা কোথায়? তাকেই তো একমাত্র চিনি।'

দেবনাথের খোঁজ শুরু হল। দেবনাথ বাড়ি নেই।

'আরেকজনকে দেখলেও হয়তো ধরতে পারতে।' হেমেন বললে, 'কই, সে আসেনি?

সবাই ব্যস্ত হয়ে তাকাতে লাগল চারদিকে। সে কে?

'সুকু।'

'ওমা, সে কেন আসবে?' বিজয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আরো সকলে হেসে উঠল। 'সেও দেখবে নাকি পাকা করে?

চারদিকে আনন্দের হুল্লোড় পড়ে গেল। শুরু হল খাওয়া দাওয়া। বনবিহারীর সঙ্গে দেখা করা। দিনখনের হিসেবে আসা।

'সেণ্টুকে নিয়ে এলেন না কেন?' বিজয়ার কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল কাকলি।

'যাও না, দেখে এস না সেণ্টুকে।' বিজয়া বললে হাসতে-হাসতে। 'সে একটা লাঠি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কাকার ঠ্যাং ভাঙবে বলে।'

'কাকার অপরাধ?'

'কাকা তার কাকীমাকে ফিরিয়ে না এনে আবার বিয়ে করছে বলে।'

কথা শুনে হাসতে লাগল কাকলি। কিন্তু হাসির স্রোতে জলের ফোঁটা চিকচিক করে উঠল।

একটু আড়ালে কাকলিকে ডেকে নিল মৃণালিনী। গলা নামিয়ে অন্তরঙ্গের মত বললে, 'তোমার চাকরিতে উন্নতি হয়েছে?"

'আপনাদের আশীর্বাদে কিছু হয়েছে।'

'মাইনে বেড়ে কত হয়েছে এখন?' গলার স্বর আরো ঝাপসা করল মৃণালিনী।

'তা নেহাত মন্দ নয়।' ভয়ে-ভয়ে শুকনো মুখে কাকলি বললে।

'তা মন্দই হোক আর ভালোই হোক, সব টাকাই তোমার। তোমার ইচ্ছেমত তুমি খরচ করবে, তোমার বুদ্ধিমত, বিবেকমত। আয়েও যেমন তোমার স্বাধীনতা, তেমনি ব্যয়েও। কারও কিছু বলবার-কইবার নেই, দাবি করবার নেই। যার উপর দাবি করবার আছে সে সুকু—তা, শুনছি তারো নাকি রোজগার বেড়েছে। তাই তুমি খোলসা মনে কাজ করে যাবে, যতদিন অবশ্যি তা সম্ভব রাখেন ভগবান, তা কেন, যতদিন তোমার খুশি।'

নিগাঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কাকলি।

এই অন্তরঙ্গ দৃশ্যটুকু হেমেনের চোখ এড়াল না। সে বলে উঠল 'আর কিছু নয়, দুনিয়ায় শুধু মিষ্ট মুখেই ইষ্ট লাভ।'

আনন্দের হাটে ভাঁটা পড়ল, বরপক্ষীয়েরা যখন চলে গেল ট্যাক্সি করে। কিন্তু, আশ্চর্য, তাদের একজন এখনও বাকি।

শিশুর দাঁত ওঠা
সহজ করে তোলার জন্য
পিরামীড গ্লিসারিন

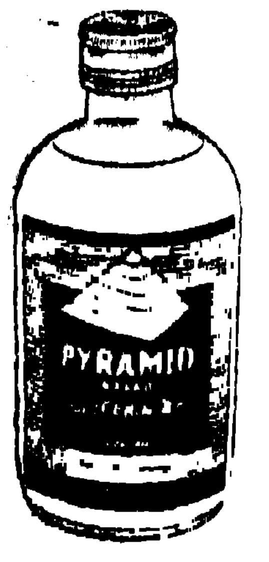

একটা নরম কাপড়ে আপনার আঙুল জড়িয়ে পিরামীড গ্লিসারীনে আঙুলটা একটু ডুবিয়ে নিন। তারপর আস্তে আস্তে শিশুর মাড়ীতে আঙুলটা ঘষতে থাকুন। তাড়াতাড়ি ব্যথা কমে যাবে। তা ছাড়া এর মিঠি স্বাদ শিশুদের খুবই ভাল লাগবে।

এটি বিশুদ্ধ এবং উপকারী। গৃহকর্মে, ওষুধ হিসেবে, প্রসাধনে ও নানা রকম ভাবে সারা বছরই কাজে লাগে —তাই পিরামীড গ্লিসারিনের একটা বোতল সর্বদাই হাতের কাছে রাখুন।

বিনামূল্যে পুস্তিকা! এই কুপনটি ভরে, "হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড পোঃ বক্স ৪০৯, বোম্বাই-১" এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

দয়াকরে আমাকে বিনামূল্যে ইংরেজী/হিন্দীতে * পিরামিড গ্লিসারিনের গৃহকর্মে ব্যবহার প্রণালী পুস্তিকা পাঠান।

আমার নাম ও ঠিকানা ______

* যে ভাষায় চান, সেটি রেখে অন্যটি কেটে দিন

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

'এ কী, তুমি কোত্থেকে?' চোখ প্রায় কপালে তুলল কাকলি।

'ও পাশের ছোট ঘরটায় ছিলাম এতক্ষণ বন্দী হয়ে।' কাঁচমাচু মুখে বললে সুকান্ত।

'সে কী? তুমিও আমাকে পাকা দেখলে নাকি?'

'না, আমার তোমাকে নিরন্তর কাঁচা দেখা। পাকা করে দেখতে গেলেই তো শেষ হয়ে যাবে। আমার কাঁচা দেখায় শেষ নেই, পুরোনো হওয়া নেই। সে সব সময়েই নতুন করে দেখা, আরেক রকম করে দেখা। তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং—'

'নবং নবং পরে হবে। কিন্তু পাকা দেখার সময় তুমি কী করে এখানে আস, কোন্ নিয়মে?. কোনো হাইকোর্টে এর নজির আছে?'

'আমরা বেনজির' উদার হাস্যে উদ্ভাসিত হল সুকান্ত। 'এ মামলা অফ ফার্স্ট ইম্প্রেশন। আসলে আমার উপস্থিতি তোমাকে রক্ষা করতে—'

'আমাকে?'

'হ্যাঁ, সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্স হতে। আর তা কাকার আদেশে। মানে পাত্রী নিয়ে যদি কোনো হই চই হয় তা শান্ত করতে।'

'মানে সন্দেহ ভঞ্জন করতে।'

'বলতে পারো সন্তোষবিধান করতে।'

'কই, লাগল না তোমাকে।'

'পরে লাগবে।'

'ছাই লাগবে! আমি একাই জিতে নিলাম।'

'একা কিছুই হবার নয়। আমার শানাইয়ের পোঁ আছে বলেই তো তোমার মনোহারী করতব।'

গায়ত্রী এসে বলে গেল এখানেই খেয়ে যাবে সুকান্ত।

'তা হলে আর কথা কী! চলো ঘুরে আসি।' আনন্দের ঢেউ তুলল কাকলি।

'চলো।'

বাইরে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিল দুজনে।

কাকলি বললে, 'চলো কিছু কেনাকাটা করা যাক।'

'না, না, কেনাকাটা নয়, অন্তত এখন নয়।' বললে সুকান্ত। 'এখন শুধু একটু ঘোরা, নিরুদ্দেশে বেড়ানো। আমরা যে নতুন, চিরন্তন নতুন, আলোতে-হাওয়াতে এ নতুন করে অনুভব করা। সৌন্দর্যে নতুন, যৌবনে নতুন।'

'তা হলে বলতে চাও এ মিলন শুধু সুকান্তর সঙ্গে কাকলির নয়, এ মিলন চিরন্তন সুন্দরের সঙ্গে চিরন্তন যৌবনের।' বললে কাকলি।

'আর এই মিলনের মন্ত্র ভালোবাসা। চিরন্তন নবীন থাকবার মন্ত্র।' বললে সুকান্ত। 'এমনিতে প্রতিদিনের অত্যন্ত পৃথিবী তো জীর্ণ পুরোনো কিন্তু যেই

দেখা হবে অমনি সমস্ত শ্রীহীন সুন্দর হয়ে ওঠে, উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—'

'আর', কথার জের টানল কাকলি, 'মরা কাঠে যৌবনের মঞ্জরী জাগে, মরা নদীতে যৌবনের জোয়ার।'

'তোমাকে যদি এখন দু-বাহুর মধ্যে জড়াতে পারতাম,' সুকান্ত ছেলেমানুষের মত মুখ করল, 'তা হলে বলতে পারতাম চির-সুন্দরের বাহুপাশে চিরযৌবন বাঁধা পড়ে আছে।'

'তা বলো না যত খুশি।' কাকলিও শৈশব-সরল মুখ করল। 'মুখে বলতে দোষ ক[…] কাজে না করলেই হল।'

'আমরা চলেছি কোথায়?' হতাশের ম[…] জিজ্ঞেস করল সুকান্ত।

'চলো আমাদের সেই সব পুরোনো [… …]গুলি আবার দেখি।'

সুকান্ত তেমনি নির্দেশ দিল ড্রাইভার[…] কতদূর যেতেই বললে, 'আর্যে! এই দে[…] স্বাতী-চিত্রগৃহ, যেখানে একদা এক বর্ষা[…] সন্ধ্যায় আপনি আমার জন্য প্রতীক্ষা করির[…] ভান করিয়াছিলেন—'

মৃগতৃষ্ণা

দেবপ্রিয় দে

"...একদিন অনুরাধা মুখার্জির জীবন ছিল। শান্তি না থাক সংসার ছিল। সুখ না থাক দুঃখও ছিল। কিন্তু আজ কিছুই অবশিষ্ট নেই। আছে শুধু ঝোড়ো বাতাসের মত এক রাশ অট্টহাসি। যার কোনই মানে হয় না। কেন হাসে তা সে নিজেই জানে না। তবু হাসে। কারণ সে এখন রাঁচীর মেন্টাল হসপিটালের একজন বাসিন্দা।"

এক আশ্চর্য উপন্যাস যা একবার পড়লে বার বার পড়তে ইচ্ছে করে।

সকল সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য : ২.৫০

আনন্দবাজার বলেন :

"...ভাষা স্বচ্ছন্দ হবার ফলে বইটি আগাগোড়া পড়তে একটুও অসুবিধা হয় না"—

কেনা গোলাম

কালিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এছাড়া আরো অনেকে অনেক কিছু বলবেন। কিন্তু এই বইটি নিয়ে 'নব বলাকার' কাছে যেভাবে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন অবিরত পাঠকদের কাছ থেকে আসছে তাতে মনে হয় নিঃসন্দেহে এর লেখক অদূর কালের শরৎচন্দ্র...। মূল্য : ৩.৫০

নব বলাকা প্রকাশনী, ৪ নফরচন্দ্র লাহা লেন, কলি — ৩৬

(সি ১৩৮৬)

প্রবন্ধসাহিত্যে নতুন সংযোজন—

বীরবল ও বাংলা সাহিত্য

ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

॥ দাম চার টাকা ॥

বীরবল ওরফে প্রমথ চৌধুরী বাংলাসাহিত্যে এক ধ্রুবদ্যুতি ব্যক্তিত্ব। বীরবলে[…] কৃতিত্ব বুদ্ধির মুক্তিতে ও যুক্তির আশ্রয়ে, রচনার রূপ ও রীতির গঠনে-প্রসাধনে, আ[…] ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ তির্যক জীবন দর্শনই তাঁর অতিরিক্ত গৌরব। বীরবলের এই বুদ্ধিপ্রব[…] মননশীলতার সযত্ন বিশ্লেষণ করেছেন গ্রন্থকার। তাঁর ভাষা প্রদীপ্ত, পাণ্ডিত্য বিস্তী[…] ও অন্তর্দৃষ্টি স্বভাব-গভীর। বীরবল সম্বন্ধীয় দশটি প্রবন্ধের সমষ্টি এই বই। প্রত্যেকটি প্রবন্ধ বক্তব্যের স্পষ্টতায় ও ব্যঞ্জনার পরিমিতিস্ফূর্তিতে সমৃ[…] বলা যায় বীরবলের রূপচেতনা ও ভাস্কর্যনৈপুণ্য স্বয়ং লেখকে এসে বর্তেছে। […] চিত্তবৃত্তির বাহুল্যবর্জিত আভিজাত্যে বীরবল বিশিষ্ট সেই আভিজাত্য এই গ্রন্থের ভূষণ। তথ্য যুক্তি ও সিদ্ধান্তের অন্বয়ে রচনায় যে স্বচ্ছতা ও গাঢ়তা এসেছে, […] অনায়াস-স্বাচ্ছন্দ্য প্রকাশিত হয়েছে, তা অভিনন্দনযোগ্য। বিশুদ্ধ বৈদগ্ধ্যের পরিচা[…] এ আলোচনা শুধু তৃপ্তিদায়ী নয়, আলোকধর্মী। এ বই শুধু ছাত্রের নয়, স[…] রসিকসমাজের।

—অল ইণ্ডিয়া রেডিও, কলিকাতা কেন্দ্রে শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের আলোচ[…]

ক্লাসিক প্রেস, ৩/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

কতক্ষণ পরে সংকান্ত আবার বললে, ‘…যে, অবলোকন করুন, এই সেই ইংলন্ডে-…রী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিসৌধ, যার দ্বার-…শ আমি আপনার জন্য তৃষ্ণার্ত নয়নে অপেক্ষা করিতাম আর নির্ধারিত সময় পার হইয়া যাইত, আপনি আসিতেন না—’

‘আর অদূরে ঐ যে মাঠ দেখিতেছি?’

‘উহাই প্রসিদ্ধ গড়ের মাঠ। কতদিন ঐখানে বসিয়া আমরা একত্র পাঠ্যপুস্তক নিয়া আলোচনা করিয়াছি আর পথচারীরা আমাদিগকে গৃহহীন উদ্বাস্তু মনে করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছে—’

তারপর ওরা একদিন বেড়াতে এল জুতে।

‘বরাননে, এই সেই বিচিত্র পশুশালা, যেখানে কেন কতককে খাঁচায় পোরা হইয়াছে ও কেন কতককে হয় নাই এই প্রশ্ন চির-বিস্ময়ের চিহ্ন হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—’

আবার একদিন লেকএ।

‘চারুনেত্রে! রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে মার্জনা করুন, এই সেই রবীন্দ্র-সরোবর, যার জলে আমরা একত্র নিমজ্জিত হইয়া মানব-

আহারের পর দিনে দু'বার..

সব ঋতুতে স্বাস্থ্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়

দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দ্দি, কাসি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান

সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য, ৩৬, গোয়ালপাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

দীক্ষা সংবরণ করিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম—'

'মিথ্যে কথা।' ছোট্ট চিমটি কাটল কাকলি।

তারপর আকাশে একদিন নবীন বর্ষার মেঘ করে এলে, সন্ধ্যাকালে, ওরা দুজনে ছাদে চলে এল।

কদম গাছের কাছে এসে কাকলি বললে, 'দেখ আনন্দে কেমন রাশি-রাশি ফুল ফুটেছে। প্রতি বছরেই ফোটে, প্রতি বছরেই মনে হয় এই বুঝি প্রথম। জগতের পাত্রে এক কণা অমৃতেরও ক্ষয় নেই।'

'তেমনি জীবনের পাত্রেও যেন এক কণা না কম পড়ে।'

'দেবতার কাব্য দেখ। মরেও না, জীর্ণও হয় না।'

'তেমনি করা যায় না জীবনের কাব্য? ন জীর্যতি ন মমার।'

'আজ কিন্তু চেয়ার নিয়ে উঠছে না চাকর।'

'আর কদমফুল চিনি না বলে কেউ বলছে না, কে ড্যাম ফুল!'

দুজনে হেসে উঠল একসঙ্গে।

দু তরফ থেকেই বিয়ের সরকারী নিমন্ত্রণ-পত্র ছেপে এসেছে। ঠিক হয়েছে ওদের যারা সমান বন্ধু তাদেরকে একসঙ্গে গিয়ে নিমন্ত্রণ করবে। আর যারা একক বন্ধু তাদেরকে বিচ্ছিন্ন ভাবে।

সমান-বন্ধু বলতে অফিসের ক'জন আর বাইরের বলতে দীপঙ্কর।

দীপঙ্করের বাড়ি একদিন চলল দুজনে।

সন্ধ্যাশেষে গলিটা অন্ধকার-মত। ওরা ঢুকছে, দেখল কে একটি মহিলা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে গলি থেকে।

'চিনতে পারলে?' জিজ্ঞেস করল কাকলি।

'লক্ষ্য করিনি।'

'যতদূর মনে হচ্ছে, বিনতা।'

'তা—এখানে?'

'বোধহয় দীপঙ্করের কাছে এসেছিল।'

'দীপঙ্করের কাছে আসবে কেন?'

'কে জানে হয়তো কোনো গোপন ষড়যন্ত্রে।' চিন্তিত মুখ করলে কাকলি। 'মুখের গ্রাস কেড়ে নিলাম, হয়তো বা সেই যন্ত্রণায়। আর যার উপকার করেছি সেই দীপঙ্কর যদি এখন শত্রুতা করে, আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'

'চলো যাই না, জিজ্ঞেস করি না দীপঙ্করকে।'

ঘরে ঢুকেই দীপঙ্করের চুরুকের ঢেউটা না কাটতেই কাকলি বলে উঠল: 'কে এসেছিল? একটি মহিলাকে দেখলাম।

'আরে, সে তো আপনারই বন্ধু, আপনারই নাম করে এসেছিল, বিনতা সেন—'

'বক্তব্য কী?'

'বক্তব্য আর কী! বক্তব্য মাস্টারি আর ভালো লাগে না, যদি অনত্র আর-কোনো একটা চাকরি ওকে যোগাড় করে দিতে পারি।' দীপঙ্কর হাসল। 'বললাম, আমিই নিধিরাম সর্দার, আমি কোত্থেকে কী যোগাড় করে দেব? তবে ভদ্রতা করে যা বলতে হয়, তাই বললাম। বললাম, দেখব চেষ্টা করে। দেখবেন ভুলবেন না, আবার আসব খোঁজ নিতে, বলে চলে গেল।'

'চলে কী আর যায়! ওঠেই না।' বিরক্ত মুখ করে দুর্গাবালা বললে, 'শেষকালে আমি তাড়া দিতে উঠল।'

'এমন তাড়া যে আমাদের দেখেও দেখল না।' কাকলির ক্ষুণ্ণ স্বর।

'তার মানে ধরা পড়তে চায় না।' দীপঙ্করের স্বরে সমবেদনার ছোঁয়া।

'মেয়েদের সব চেয়ে বড় চাকরি হচ্ছে বিয়ে।' বললে দুর্গাবালা। 'আসলে সেই চাকরির খোঁজ। মধুর অভাবেই গুড়ের ডাক। তা তোমাদের তো ফের বড় চাকরি জুটে গেল।' দুর্গাবালার গলায় একটু বা খোঁচামারা।

'হ্যাঁ, শুনেছেন তা হলে।' হাসল কাকলি।

'হ্যাঁ, এই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল শুনলাম, আবার এরই মধ্যে বোঝাবুঝি হয়ে গেল?'

'সোজাসুজির আবার বোঝাবুঝি কী!' হাসির পর্দা আরো উঁচুতে তুলল কাকলি। 'তাই মিলতে দেরি হল না।'

'যাই বলো তুমি অস্থিরচিত্ত।' প্রায় ভর্ৎসনা করল দুর্গাবালা। 'এই হন্তদন্ত হয়ে বিয়ে করলে, ক'দিন যেতে না যেতেই বিয়ে ভাঙলে, আবার ব্যস্তসমস্ত হয়ে সেই সোয়ামীতেই বিয়ে বসতে চলেছ? সেই মাটিতেই আবার মৃদঙ্গ তৈরি? মানুষে বলবে কী!'

'মানুষে কবে কী ভালো বলল! ভাঙলেও নিন্দে, গড়লেও নিন্দে।' কাকলির হাসি আর থামে না।

'এই অস্থিরতার ফল হবে আবার এই বিয়ে ভেঙে যাবে—' দুর্গাবালাকে রূঢ় শোনাল।

তাই বুঝেই হয়তো দীপঙ্কর বললে, 'বা, এই বয়সটাই তো অস্থির হবার যেমন ভাঙবার তেমনি ভালোবাসবার।'

'যদি ভেঙে যায়, অস্থির হওয়ার দরুন, পারব না বিচ্ছিন্ন থাকতে। আবার মিলব।' সমস্ত মেঘ উড়িয়ে দিল কাকলি। 'অস্থিরতার শেষ হচ্ছে শান্তি। আর কে না জানে, শেষের সুখই সুখ। শেষের ঘুমই ঘুম।'

কাকলির হাত ধরে আড়ালে টেনে নিল দুর্গাবালা। নিচু গলায় বললে, 'যখন একবার ছেড়ে ছিলে তখন আবার ঐ ঝগড়াটে বাড়িতে ঢুকছ কোন সাহসে? আর কোনো ঠান্ডা বাড়ি খুঁজে পেলে না?'

'ভবিতব্য।' কপাল দেখাল কাকলি।

'এত আমাদের উপকার করলে, আরেকটা

মুক্ত হস্তে দান করুন
সামরিক সেনা পতাকা দিবস
(৭ই ডিসেম্বর)
পূর্বতন সৈনিক ও তাঁদের
পরিবারের কল্যাণের জন্য

প্রকাশিত হয়েছে
অধ্যাপক ক্ষেত্রগুপ্ত ও অধ্যাপিকা জ্যোৎস্না গুপ্তের

তারাশঙ্করের ধাত্রীদেবতা

বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক তারাশঙ্করের সাহিত্য সম্পর্কে মৌলিক আলোচনা।
মূল্য : ২·২৫

*

শরৎচন্দ্রের দেনা পাওনা

শরৎসাহিত্য সম্পর্কে নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গীতে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের আলোচনা।
মূল্য : ২·০০

অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তের
দু'খানি অনন্যসাধারণ সমালোচনা গ্রন্থ

প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন

আলোচ্য বিষয় : চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মনসামঙ্গল, বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, দ্বিজমাধব, মুকুন্দরাম, আলাওল ও পদ্মাবতী, মৈমনসিংহ গীতিকা, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, বৈষ্ণব কাব্যসাহিত্যর ভূমিকা, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস।
মূল্য : ৮·০০

কুমুদরঞ্জনের কাব্য বিচার

(প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিতপ্রায়)
মূল্য : ২·৭৫

ডিসেম্বর মাসেই প্রকাশিত হবে
অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত ও অধ্যাপিকা জ্যোৎস্না গুপ্তের

বাংলা নাটকের আলোচনা

(১ম খণ্ড)
এই খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে মেবার পতন, নীলদর্পণ, প্রফুল্ল এবং নর-নারায়ণ।

গ্রন্থ নিলয়
১৭২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

উপকার করলে কী হত! দীপঙ্কর তো এমন অযোগ্য ছেলে ছিল না!'

কাকলি হাঁ হয়ে রইল।

'এখন তোমার অতগুলি টাকা কী করে তুলে দিই সংসার থেকে? কী করে শোধ করি?'

'শোধ করতে হবে না। এই নিন নিমন্ত্রণ চিঠি। যাবেন সকলকে নিয়ে।' সুকান্তকে প্রায় টেনে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে।

বেরিয়ে আসতে-আসতে সুকান্ত বললে, তুমি কী সুন্দর বললে বলো তো! শেষের অর্থেই সুখ।

এখন বরেনের কাছে কে যায়? সে কি উভয়ের বন্ধু, না, একলা একজনের? কোনো কথা হয়নি। কিন্তু তার নিমন্ত্রণ হবে না এ ভাবনার অতীত। কে না জানে সে ছিল বলেই এই মিলন সম্ভব হয়েছে। নিমন্ত্রণ সভার যদি কেউ অগ্রগণ্য থাকে তবে সে বরেন ছাড়া কেউ নয়।

এখন সে যদি একলা একজনের বন্ধু, তবে কার বন্ধু?

একলা কাকলিই গেল তাকে চিঠি দিতে। দিনের বেলা, তার বাড়িতে, দোতলায়। দিব্যি চাকরের হাতে কার্ড দিল। ঘরে যাবু একা। হলই বা না, ভয় কিসের! বলে দাও আমিও একা।

নিচু সোফায় বসে খবরের কাগজ পড়ছে বরেন। শান্ত বিস্ময়ভরা চোখে তাকাল বরেন। বললে, 'আপনাকে আবার এভাবেই দেখতে পাব কল্পনা করিনি।'

'আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।'

এবার বরেন একটু মনোযোগী দৃষ্টি ফেলল। কিন্তু সেই তার সর্বাঙ্গলেহী হাড়-মাসবিদ্ধ-করা তীক্ষ্ণ চাউনি কোথায়? চোখে একটু বা উদাসীন ছায়া নিয়ে বললে, 'নিমন্ত্রণ করতে এসেছেন কথাটা ঠিকমত বলেননি। চট করে শুনলে অন্যরকম মানে হয়। কি, হয় না?'

'আমার বিয়েতে আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।' আগের বাক্যটা দ্রুত সংশোধন করল কাকলি।

'বুঝেছি। ব্যাখ্যা করে বলতে হবে না।' নিচু চোখে আবার পড়ায় মন দিল বরেন।

চিঠিটা হাত বাড়িয়ে নিল না দেখে, সামনে যে মোড়ার উপর ছাইদান সে মোড়ার উপর রেখে কাকলি বললে, 'যাবেন।'

'চেষ্টা করব।'

'আচ্ছা আসি।' ধীরে চলে গেল কাকলি।

সিঁড়ি প্রায় ধরেছে, বরেন ডাক দিয়ে উঠল, 'শুনুন।'

যাই কি না যাই, আবার ফিরল কাকলি। নির্মল মুখে দাঁড়াল কাছে গিয়ে।

'শুনুন। একটা কাজ আমার করে আসা হয়নি। মনের মধ্যে তাই খুঁত খুঁতুনি রয়ে গেছে—'

'কী কাজ?'

'আপনার দাদা দেবনাথবাবুর জন্যে একটা চাকরি জোগাড় করে দেওয়া।' নতুন করে সিগারেট ধরাল বরেন। 'দেখুন, জোগাড় হয়েছে একটা। যদি আপত্তি না থাকে ওঁকে আমার অফিসে পাঠিয়ে দেবেন—' আবার কাগজে মন দিল বরেন।

'বলব দাদাকে।' সিঁড়িতে ধাপে ধাপে জুতোর শব্দ করতে-করতে নেবে গেল কাকলি।

সেখান থেকে বিনতার হস্টেল। বিনতা যে কাকলির একলার বন্ধু তাতে আর সন্দেহ কী।

না কখনই নয় !

কিন্তু তাহলেও এক মাথা ভর্ত্তি পাকা চুল মানুষকে লোকের কাছে 'অপ্রিয়' করে আর তার জীবনে ব্যর্থতা এনে দিয়ে তাকে অতিষ্ঠ করে তোলে।

কিন্তু আজকের পৃথিবীতে যেখানে বিজ্ঞান বহু বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন এনেছে সেখানে পাকা চুলের জন্যে কারুর উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়, কারণ 'লোমা' একটি আদর্শ কেশ তৈল ও কালো কেশ-রঞ্জক যা নিরাপদে ও খুব দ্রুত আপনার চুলের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনে। লোমার সুমিষ্ট গন্ধ লক্ষ লক্ষ লোকে ভালবাসে, সেইজন্যেই এটি অন্যান্য আরো কালো কেশ রঞ্জকের পাশাপাশিই চলছে।

লোমা

মেখে চুল আঁচড়ান

আপনার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্যে

একমাত্র এজেন্ট: এম.এম. খাম্বাটওয়ালা আমেদাবাদ-১, ইন্ডিয়া

এজেন্ট: সি. নরোত্তম এ্যাণ্ড কোং বোম্বাই-২

এসে দেখল বিনতার জ্বর। রুক্ষ চুলে রোগা মরাটে চেহারায় শুয়ে আছে।

'এ কী, আমার বিয়েতে যাবি না? সাজাবিনা আমাকে?'

ম্লান হেসে বিনতা বললে, 'দেখছিস তো! এখন আমাকে না কেউ সাজিয়ে দেয়!'

'হ্যাঁ, আমিই সাজিয়ে দেব। কিন্তু যা ভাবছিস, খাটে নয়, পাটেই দেব তোকে সাজিয়ে। হাঁ রে, তুই চাকরি খুঁজছিস? মাস্টারি ছেড়ে দিবি?'

'হেডমিসট্রেসের সঙ্গে বনছে না।'

'তা চাকরি খুঁজছিস তো দীপংকরের কাছে কেন?'

'আমার আবার মুরুব্বি কোথায়?' দীর্ঘশ্বাস চাপল বুঝি বিনতা। 'সত্যি কথা বলতে, আমার তো তোর নাম ধরে যাওয়া।'

'যাবি তো রাজার বাড়ি যাবি। বড় গাছে গিয়ে বাসা বাঁধবি।'

'বড় গাছ?'

'হ্যাঁ, বরেনের কাছে যাবি। আমার নাম করে যদি দীপংকরের কাছে যেতে পারিস, তবে বরেনের কাছে যেতে বাধা কী!'

'বা, তার সঙ্গে তো তোর ঝগড়া হয়ে গেছে।'

'আমার সঙ্গে ঝগড়া হলে কী হয়, আমার নামের সঙ্গে তো হয়নি।' কাকলি বিনতার হাতে একটু হাত বুলিয়ে দিল। 'আমার নাম বললে নিশ্চয়ই সে তোর একটা ব্যবস্থা করে দেবে। তুই ভালো হয়ে একবার গিয়ে দেখা করে দ্যাখ না—'

'যাব, যখন তুই বলছিস—'

সেই বরেনের কছে নিমন্ত্রণের চিঠি নিয়ে আবার সুকান্ত এসে হাজির।

'আরে, আয়, আয়—' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল বরেন।

'আমার বিয়েতে নেমন্তন্ন করতে এলাম।'

'কবার নেমন্তন্ন? সেই যে সেদিন—' বলতে-বলতে চেপে গেল বরেন। সুকল কাকলির নেমন্তন্ন করতে আসার খবরটা সুকান্ত জানে না। সুকান্তর কাছ থেকে যদি তা কাকলি গোপন করে রেখেছে বরেনও তাই রাখতে পারবে।

'তুই তো এই মিলনের সেতু।'

'কিংবা বলতে পারিস হেতু।'

'একই কথা। যাস কিন্তু।'

'চেষ্টা করব।'

সুকান্ত চলে যাচ্ছিল ডাকল বরেন। বললে, 'শোন, আবার যদি কোনোদিন দরকার হয়, আমাকে খবর দিস—'

সশব্দে হেসে উঠল দুজনে।

রাত্রে, ট্যাক্সিতে, সশব্দে হেসে উঠল কাকলি আর সুকান্ত। অকারণে। অকারণে।

এবার কান্না-কান্না ভাব আনল সুকান্ত। বললে, 'আর তিন দিন মোটে আছে। এখন একটু নিয়ন্ত্রণ করলে দোষ কী।'

'তিন দিন দেখতে—দেখতে কেটে যাবে।'

'কাল আমি বাড়ি চলে যাব। তারপর দুদিন আর দেখাই হবে না। উঃ, কী নিদারুণ।'

'দুরন্ত-দুঃসহ।'

'একটু কাছে এস না সরে। ড্রাইভারের আয়না?

'রাস্তায় পাহারাওয়ালা দাঁড়িয়ে। ভুলে যাচ্ছ কেন, ময়দানের কাছাকাছি ঘুরছ। কী সব মারাত্মক নাম! লাভার্স লেন। ফিলমস্টার্স গ্রেভ। নির্ঘাৎ থানায় ধরে নিয়ে যাবে।'

'আমরা ঠিক বর্তমান মুহূর্তে না হই, অতীতে একদিন স্বামী-স্ত্রী ছিলাম, এই ডিফেন্স চলবে না?'

'তন্তুমাত্র না।'

'নো ফান্ডামেন্টাল রাইট?'

'নান্।'

'তবে লম্বা মুখ করে বসে থাকা ছাড়া আর উপায় কী!'

কতক্ষণ চুপচাপ কাটাবার পর হঠাৎ তপ্ত গাঢ় গলায় বলে উঠল কাকলিঃ 'এ সব কি চেয়েচিন্তে হাত পেতে ভিক্ষে করে সেধে কেঁদে পাওয়া যায়? ঝাঁপিয়ে পড়ে জোর করে আদায় করে নিতে হয়।' বলেই কাকলি পরিপূর্ণ উচ্ছ্বাসে বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্যাকুল বাহুতে জড়িয়ে ধরে নিবিড় অধরে বিহ্বল চুমু খেল।

দুই হাতের মধ্যে গুচ্ছ-গুচ্ছ সদ্যফোটা নতুন কদমফুল, উচ্ছল স্বাস্থ্য আর সমর্পণ, সুকান্ত যতদূর সাধ্য দীর্ঘ ও তীক্ষ্ম করল সেই মদিরতা।

'তোমার দাম আমার এই আনন্দের মধ্যে।' বললে কাকলি।

'আর এই আনন্দ সমগ্রের সুখের মধ্যে, জীবনের বীণাতে, সংসারের বীণাতে—'

কাকলিকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে সুকান্ত হস্টেলে চলে গেল।

পর দিন বাড়ি, আর পড় তো পড়, একেবারে সেন্টুর সামনে।

'তুমি একলা যে, আমার কাম্মা কই?'

হাত বাড়িয়ে তাকে কোলে নিতে গেল সুকান্ত, কিন্তু জবাব পাবার আগে কিছুতেই সেন্টু ধরা দেবে না।

'তোর কাম্মার কথা তো বিজু জানে।'

'বিজু জানে? আমার কাম্মাকে ফেলে রেখে তোমার একটা নতুন কাকিমা আনবার মতলব। আমি বুঝি জানি না কিছু?'

'দেখিস না তোর কাম্মার থেকে এই নতুন কাকিমা কত সুন্দর। কত ফর্সা।'

'কত ফর্সা না হাতি!' চোখ ছলছল করে এল সেন্টুর।

টিক্-20

টাটা—ফাইসনের তৈরী

ছারপোকা ধ্বংস করে

গেইগী ডায়াজিনন

ওয়াটারপ্রুফ
ওয়াচ এবং অ্যালার্ম টাইমপিস্
মাত্র ৫৫ টাকায়
৫ বৎসরের গ্যারান্টি, সাইজ ১০½
নং ৬১ জুয়েল ওয়াটারপ্রুফ
ক্রোম ৪০ টাকা
রোল্ডগোল্ড ওয়াচ
অতিরিক্ত ৫
নং ৬২ টেবল ক্লক ৬'' ডায়াল
চমৎকার কেস ২২ টাকা
অ্যালার্ম টাইমপিস্ ৩০
ডাকখরচ অতিরিক্ত ২ টাকা
বিনামূল্যে ক্যাটালগের সহিত
প্লাস্টিক ক্যালেন্ডার

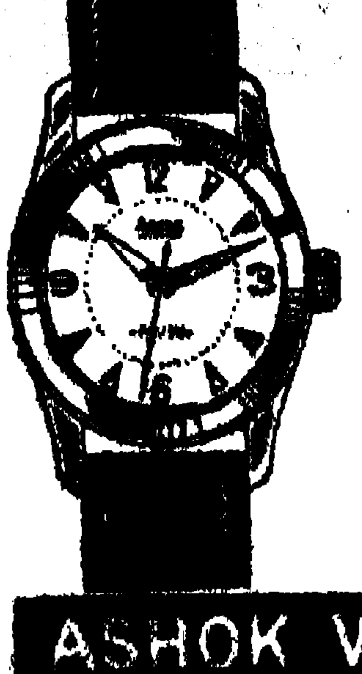

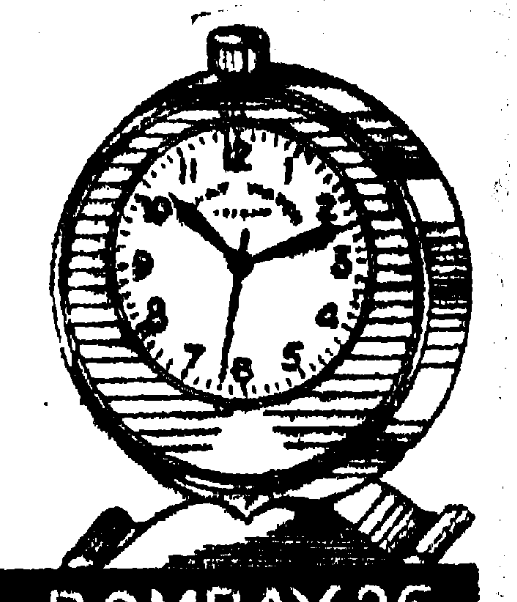

ASHOK WATCH HOUSE BOMBAY-26.

'দেখিস না কত তোকে বেশি ভালো-বাসবে নতুন কাকিমা। কত তোকে জিনিস দেবে।'

'তুমি জিনিস নাও গে। আমার জিনিস চাই নে।'

'চল আমার তেতলার ঘরটা দেখে আসি—' আবার হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল সুকান্ত।

'আমি তোমার সঙ্গে কথা কইব না, যাব না তোমার কাছে। দেখ না আমি কী করি।'

'কী করবি?'

'পুলিসে খবর দেব। পুলিস তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে। যতক্ষণ কাম্মাকে না এনে দেবে ততক্ষণ তোমাকে ছাড়বে না।'

'পুলিস পাবি কোথায়?'

'রাস্তা দিয়ে কত যায় একজনকে ডেকে এনে ভাব করে নেব।'

'শেষকালে তোকে পুলিসে না ধরে!'

'ধরুক। তবু তুমি যা না, তোমার চেয় পুলিস ভালো।'

হাসতে-হাসতে তেতলার নতুন সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল সুকান্ত।

নিজের ঘরে বসে দাড়ি কামাচ্ছে প্রশান্ত। আয়নার মুখচ্ছায়াকে সম্বোধন করে বলছে, 'তুমি যে তিমিরে সে তিমিরে।'

'না. না, তিমিরে হতে যাবে কেন?' বন্দনা এল হাসতে হাসতে। 'এই দেখ পদোন্নতি।' বলে হাতভরা একগোছা চাবি দেখাল। হাতের তালুতে নাচাতে লাগল।

'তার মানে?'

'আমিই এখন ভাঁড়ারের মন্ত্রী, পরিবেশ-নের থালা আমার হাতে।'

'বলো কী। মাছ দুধ সব তেতলায় উঠবে না তা হলে?'

'না। সংসারের ভার মা আমাকে ছেড়ে দিয়েছেন। মেয়ের বাড়ি থেকে রেডিও রেফ্রিজিরেটার দিচ্ছে, আরো কত কী, মা এখন ওসব নিয়ে থাকবেন, তাঁর পাঠ-পুজা নিয়ে, সভা-সমিতি নিয়ে—'

'আর কাকিমা?'

'তাঁর তো ম্যাগাজিন আর ফ্যাশান।'

'বলো কী তাহলে তুমিই একমাত্র কর্ত্রী কারয়িত্রী করণগুণময়ী কর্মহেতুস্বরূপা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাকে তোয়াজ না করলে এক টুকরোর বেশি দুটুকরো মাছ পাচ্ছ না, এক হাতার বাইরে দুধের কড়া ঠনঠন।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে গান ধরল প্রশান্ত। 'মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে, আমি আর বাইতে পারলাম না।'

সুকান্ত—কাকলির বিয়ে হয়ে গেল। গাছ ভরা ফুল, বাড়ি ভরা আলো, মুখ ভরা হাসি আর মন ভরা মধু।

আর দেহ ভরা পরমাশ্চর্যের রহস্য।

নতুন বউ বাড়ি এসেছে, চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙে গেছে, সমস্ত দিক দেশব্যাপ্ত করে উৎসবের বাজনা—এমন সময় অন্তর্বিব উঠল, সেন্টুকে পাওয়া যাচ্ছে না।

'ওরে সেন্টু, দ্যাখ এসে কে এসেছে।' সকলে ডাকতে লাগল উচ্চ রোলে।

কোনো প্রত্যুত্তর নেই।

সকলের মুখে উদ্বেগ, কোথায় গেল সেন্টু? সমস্ত জ্যোৎস্না ঢেকে যেন কালো মেঘের উদয় হল সহসা।

বিজয়াই বার করল খুঁজে। তেতলার ঘরে খাটের নিচে নতুন জিনিসপত্রের আড়ালে মাথায় ফেটি বাঁধা লাঠি হাতে যুদ্ধের সাজে চুপ করে বসে আছে সেন্টু। তার শত্রুরা এক সময়ে যে এই দুর্গে প্রবেশ করবে সে তা বুঝে নিয়েছে এবং খাটস্থ হলেই অতর্কিত আক্রমণ করবে তারই আশায় মুহূর্ত গুনছে।

'এই যে, এইখানে সেন্টু।' জিনিসপত্র সরিয়ে সেন্টুকে বার করে আনল বিজয়া।

আর তার ডাক শুনে প্রায় সমস্ত সংসার, আর সকলের আগে কাকলি, উঠে এল উপরে।

'ঐ দ্যাখ কে এসেছে।'

তাকাবার আগেই মাথার ঘোমটাটা টেনে অনেকখানি নামিয়ে দিয়েছে কাকলি। আর সেন্টুকে ধরবার জন্যে বাড়িয়েছে দুই হাত।

'আমি যাব না ওর কাছে। ও ডাইনি বুড়ি। ও পেত্নি। শাঁকচুন্নি।' প্রবলতর প্রতিবাদ তুলল সেন্টু।

তবুও কাকলি তাকে ধরে দুই হাতে বুকের উপর চেপে ধরল।

'আমাকে নামিয়ে দাও বলছি।' নেমে পড়বার জন্যে হাত পা ছুঁড়তে লাগল সেন্টু। 'আমি তোমার কোলে যাব না। কিছুতেই না। আমি পুলিসে খবর দেব।'

'আমাকে পাচ্ছ না চিনতে?' ঘোমটা ঢাকা অবস্থায়ই কাকলি বললে, 'আমি তোমার নতুন কাকিমা।'

আর সকলে, ছেলেমেয়েদের দল, হেসে উঠল খিলখিল করে।

'আমি নতুন-ফতুন চাই না। কাকিমা না ফাঁকিমা। আমি আমার কাম্মাকে চাই।' কান্না জুড়ল সেন্টু।

আর সেই মুহূর্তে কাকলির মুখের ঢাকা সরিয়ে দিল বিজয়া।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে মোহিত চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সেন্টু। 'এ কী, তুমি, কাম্মা?' সহসা অভাবনীয়কে বুক ভরে পাবার যে খুশি সেই খুশিতে কাকলির বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগল অঝোরে।

'এ কি, কাঁদছ কেন? আমিই তো এসেছি।'

ভালো করে আবার দেখবার জন্যে মুখ তুলল সেন্টু। এবার তার কান্নাভরা চোখে হাসিভরা রোদ্দুর।

সত্যিই। সত্যিই তার কাম্মাই এসেছে।

আবার মুখ লুকোল সেন্টু। আচ্ছন্ন স্বরে বললে, 'তুমি আর চলে যাবে না?'

'না, না, আর যাব না।' কাকলি তার পিঠে.মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। 'তোমাকে ফেলে আর কি যেতে পারি কোথাও?'

'তবে ওরা যে বলছিল নতুন কাকিমা আসছে।'

'আমিই পুরোনো, চেয়ে দেখ, আমিই সেই নতুন।' বললে কাকলি।

সেন্টু বুঝেছে। তার আর চাইবার দরকার নেই।

ঃ অধ্যাপক ও সি গাঙ্গুলী বিরচিত ঃ
তথ্যমূলক মূল্যবান সংগীত-সন্দর্ভ ঃ—

রাগ-রাগিণীর নাম রহস্য

পুস্তকপ্রেমীদের জন্য স্বল্পসংখ্যক শোভন সংস্করণ।
রঙীন চিত্র সম্বলিত সুদৃশ্য পুস্তক
মূল্য ঃ পনের টাকা অগ্রিম দেয়।
প্রকাশের পর মূল্য বৃদ্ধি হইবে।

প্রকাশক ঃ আর্য্যনাথ গাঙ্গুলী
২নং আশুতোষ মুখার্জি রোড
কলিকাতা-২০
ফোন নং ঃ ৪৭-১৭১০
(সি ৯৩৭৭)

অজিতকৃষ্ণ বসু (অ-কৃ-ব)
সম্পাদিত ব্যঙ্গ, হাস্যরস
ও কার্টুন সাপ্তাহিক

সচিত্র ভারত

প্রতি সংখ্যা ২৫ ন. প.
৮৬, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩
এজেন্সী ও বিজ্ঞাপনের জন্য লিখুন
(সি ৯৪৪৭)

রবীন্দ্র জন্মোৎসবে সভাপতিত্ব করা উপলক্ষ্যে বাংলা দেশের বাইরের একটি সাহিত্য সংস্থার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার একটু মনোমালিন্য হয়েছিল। ও'দের দু'জন প্রতিনিধি আমার সঙ্গে কথা পাকাপাকি করবার জন্য উৎসবের প্রায় দেড় মাস আগে কলকাতায় এসেছিলেন। আমি যেতে রাজী হওয়ায় ও'দের একজন পকেট থেকে কয়েকখানা দশ টাকার নোট বার করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে বলেছিলেন, "আপনার ফার্স্ট ক্লাশের ট্রেন ভাড়াটা রেখে যেতে চাই। আপনি যদি অনুগ্রহ করে এখান থেকে টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে বসেন, তবে ওখানে আমরা আপনাকে নামিয়ে নেবো।"

আমি রাজী হইনি। বলেছিলাম, "না-না, ওসব হয় না। টাকাটা নিয়ে রাখি, আর শেষে যদি আমার যাওয়া না হয়ে ওঠে?"

ও'রা বলেছিলেন, "তাতে কী হয়েছে? তেমন যদি হয়, টাকাটা ফেরত দিয়ে দেবেন।" কিন্তু আমি বেশ বিরক্তভাবে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, ও'দের কেউ যদি কলকাতায় এসে আমাকে নিয়ে যেতে পারেন, তবেই আমার যাওয়া হবে। ফার্স্ট ক্লাশের গাড়ি ভাড়া আমি এখন থেকে নিজের কাছে রাখতে পারবো না।

ও'রা আর প্রতিবাদ করেননি। এবং শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে ডবল খরচ করে কলকাতায় লোক পাঠিয়ে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। ও'দের সাহিত্য সংস্থার আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো নয়, এবং কলকাতায় একটা বাড়তি লোক পাঠাবার জন্য কয়েক মাসের নতুন বই কেনা বন্ধ রাখতে হয়েছিল। আমার এই ব্যবহারের জন্য ভিতরে ভিতরে বেশ সমালোচনা হয়েছিল। কেউ কেউ নাকি বলেছিলেন, "লেখক হলে, সবরকমের খামখেয়ালীই মানিয়ে যায়। লোকে একা-একা পৃথিবী ঘুরে আসছে: আর উনি এমনই বড়ো ভাবুক লেখক হয়ে পড়েছেন যে, আমাদের দেওয়া কয়েকটা টাকা কয়েকদিন নিজের কাছে রেখে, তাই দিয়ে একখানা ফার্স্ট ক্লাশের টিকিট কেটে গাড়িতে চেপে বসতে পারলেন না।" একজন টিপ্পনী কেটে-ছিলেন, "ইনিয়ে বিনিয়ে যারা গল্প লিখতে পারে, আজকাল তাদের সাত খুন মাপ।"

ও'দের অতিথি হয়ে থাকতে থাকতেই এই সব কথাগুলো আমার কানে এসেছিল। কিন্তু আমি মোটেই রাগ করিনি। বরং ভেবেছিলাম, ও'দের কাউকে ডেকে আমার অবস্থাটাও একটু বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ করবো। অপরের দেওয়া ফার্স্ট ক্লাশের ট্রেন ভাড়া নিজের কাছে রাখতে

কেন আমি ভয় পাই, তা বলবো। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরবাবুর কাহিনীটা তখন আমি ওঁদের সামনে মুখ ফুটে বলতে পারিনি। আজ কিন্তু দক্ষিণেশ্বরবাবুর কথাই লিখবো আমি। এই লেখা নিশ্চয় সাহিত্য সংস্থার দু-একজন কর্তৃপক্ষের নজরে পড়বে। এবং তাঁরা যদি পড়া শেষ করে, আমাকে ক্ষমা করেন, তবে তাঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

ইট-কাঠ-পাথরে গড়া সভ্য মানুষের এই পৃথিবীতে কত অদ্ভুত সৃষ্টিকেই তো দেখলাম। সুদীর্ঘ দুর্ভাগ্যের কণ্টকময় পথে কত বিচিত্র মানুষের অযাচিত ভালবাসা পেয়ে ধন্য হলাম। কর্মক্লান্ত দিনের শেষে সন্ধ্যার অলস অবসরে আজও তাঁদের কথা চিন্তা করতে আমার খুব ভালো লাগে। মনে হয়, ওঁরা যেন আমার সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আর আমি যেন পথ ভুলে গিয়ে ওঁদের সঙ্গ-সুখ অনুভব করছি। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরবাবুকে আমার মোটেই ভালো লাগে না। খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা, ময়লা ধুতি ও ছেঁড়া কেট্‌সের জুতো-পরা দক্ষিণেশ্বরবাবুর দেহটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলেই আমি ভয়ে আঁতকে উঠি। মনে হয়, দক্ষিণেশ্বরবাবুর ঐ রোগা ছোট্ট পঁয়তাল্লিশ বছরের দেহটা নড়তে নড়তে আমার খুব কাছে এগিয়ে আসছে। ওঁর নিরুপায় নিরীহ একজোড়া চোখের দৃষ্টি আমার মুখের উপর রেখে দক্ষিণেশ্বরবাবু বলছেন, "তুমি? তুমিও এই কথা বললে? অথচ ব্ল্যাকমার্কেটে একপোয়া চিনি কেনবার জন্য আট আনা পয়সা আমিই তোমাকে দিয়েছিলাম।"

দক্ষিণেশ্বরবাবু আমার জীবনের প্রথম সহকর্মী। তখন আমার বড়োই দুর্দিন। কাজের ধান্দায় সমস্ত কলকাতা শহর চষে ফেলেও কিছু সুবিধা করতে পারছিলাম না। একজন উপদেশ দিয়েছিল, একখানা পুরনো টাইপরাইটার নিয়ে হাওড়া কোর্টের সামনে গাছতলায় বসে পড়ো। যদিও কম্পিটিশনের বাজার, তবুও দিনে দেড়টা-দুটো টাকা রোজগার হয়ে যাবে। সেকেণ্ডহ্যাণ্ড টাইপরাইটার কিনতে গেলেও বেশ কিছু টাকা লাগে; এবং সে-টাকা আমার কাছে ছিল না। বছর খানেক যে-কোনো কাজ করে শ' দেড়েক টাকা জমাতে পারলে, যদি আমার পক্ষে কোর্টের টাইপিস্ট হওয়া সম্ভব হয়।

সেই সময়েই শালকিয়া রামচ্যাণ্ড রোডের এক পানওয়ালা আমাকে মিঃ রাজপালের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। ঐ পানওয়ালা সন্ধ্যাবেলায় লুকিয়ে বেআইনী মদ বিক্রি করতো, এবং সেই ব্যবসা সূত্রেই রাজপালজীর সঙ্গে ওর পরিচয়। সাদা হাফ শার্ট, সাদা হাফ প্যাণ্ট, সাদা মোজা ও জুতো-পরা ভদ্রলোককে দেখলে হঠাৎ মনে হবে বুঝি নেভির কোনো বড়ো অফিসার। কিন্তু শুনলাম, উনি কারুর চাকরি করেন না, নিজেরই ব্যবসা আছে।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর জনৈক মাড়োয়ারীর প্রাসাদোপম অট্টালিকা আছে। ঐখানেই রাজপালজী আছেন। শুনলাম, ঐ মাড়োয়ারীর কলকাতা শহরে ঐরকম আরও খান দশেক বাড়ি আছে। তাছাড়াও বিরাট ব্যবসা। রাজপালজীর সঙ্গে ঐ মাড়োয়ারী নাকি আরও নতুন ব্যবসা খুলবেন। ব্যবসা খুলুন চাই না খুলুন, আমার একটা চাকরি হলেই বেঁচে যাই। এবং রাজপাল বোধ হয় তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই বললেন, "এখন মাসে উনিশ টাকা করে দেবো। তারপর যদি কাজ দিয়ে খুশি করতে পারো, তা হলে ঐ উনিশ টাকাই যে বেড়ে বেড়ে কোথায় দাঁড়াবে, জানি না, হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই তুমি মাসে চব্বিশ-পঁচিশ টাকা রোজগার করতে আরম্ভ করবে।"

রাজপাল সায়েবের কোম্পানির আমি টাইপিস্ট। মাড়োয়ারীদের ঐ বিশাল বাড়িটাতে আমাকে আসতে হয়, এবং সেই-খানে প্রথম দিনেই ওঁর অ্যাকাউণ্টেণ্ট দক্ষিণেশ্বরবাবুর সঙ্গে পরিচয় হলো। আমাকে বসিয়ে রেখে রাজপাল ডাকলেন, "ডাকিনবাবু!" সঙ্গে সঙ্গে এক ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলেন।

আমাকে দেখিয়ে হাতের ছোট্ট লাঠিটা ঘোরাতে ঘোরাতে রাজপাল ভদ্রলোককে বললেন, "এই নয়া আদমী লিয়ে লিয়েছি। এইবার থেকে তোমার কাজ কমে গেল।"

দক্ষিণেশ্বরবাবুর মুখের দিকে সেই প্রথম তাকালাম। মুখে সজারুর মতো খোঁচা খোঁচা সাদা-কালো মেশানো সপ্তাহ-খানেকের পুরনো দাড়ি। লম্বায় পাঁচ ফুটের বেশি হবেন না। রাজপাল সায়েবের সামনে উনি যেভাবে দাঁড়িয়েছিলেন, তাতেই বোঝা যায়, ওঁকে বেশ ভয় পান। ওঁর সামনে, আমার সঙ্গে কথা বলতেও যেন ভয় পেলেন। ময়লা শার্টের হাতাটা কনুই

একদা মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত রচনা করিয়া ইহাকে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য একজন লেখকের খোঁজ করিতেছিলেন। কিন্তু কেহই এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হইলেন না। অবশেষে পার্বতী-তনয় গণেশ এই শর্তে রাজি হইলেন যে তাঁর লেখনী মুহূর্তের জন্যও থামিবে না।

আধুনিক যুগের লেখকরাও চান যে তাঁদের লেখায় গতি কোনক্রমেই ব্যাহত না হয়। আর এই অব্যাহত গতির জন্যই সুলেখা আজ এত জনপ্রিয়।

সুলেখা ওয়ার্কস্ লিঃ
কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

(GENERAL) BOL' 5-50

পর্যন্ত গোটানো। হাতের শিরাগুলো পর্যন্ত ফোলা ফোলা। ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে কেমন অসহায়ভাবে হাসলেন।

রাজপাল তাঁর বাজখাঁই গলায় হুংকার দিয়ে হিন্দীতে যা বললেন, তার মানে দাঁড়ায়, "আর ডাকিনবাবু, মেয়েদের মতো অমন মুখ বুজে দাঁড়িয়ে রয়েছো কেন? কথা বলো? আদমী যদি পছন্দ না হয়ে থাকে, তাও বলো; এ-ব্যাটার পিছনে তিনটে লাথি মেরে রাস্তায় বার করে দিয়ে, অন্য আদমী নিয়ে আসছি।"

বলে কি লোকটা! আমি তো চমকে উঠেছি। কিন্তু এর আগে কোনোদিন চাকরি করিনি, আমাদের বংশেও কেউ কখনো চাকরির ধার দিয়ে যায়নি। মনকে বোঝালাম, আপিসে বোধহয় সায়েবরা এইভাবেই কথা বলেন, এতে দুঃখ করবার কিছু নেই। কিন্তু সংগে সংগে ভয় হলো, ডাকিনবাবু যদি আমাকে পছন্দ না করেন? যদি সোজা বলে দেন, "না, ছোঁড়াটাকে আমার ভালো লাগছে না।" তা হলে? মাস মাস উনিশটা টাকা, তাও বোধ হয় গেল।

ডাকিনবাবু কিন্তু কিছুই বললেন না। যেমনভাবে লোকে বলির পাঁঠা যাচাই করে, সেইভাবে আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন।

রাজপাল এবার ছড়ি হাতে কাজে বেরিয়ে পড়লেন। বেরিয়ে যাবার আগে ও'র লাল এবং গোল গোল চোখ দুটো পাকিয়ে বললেন, "ডাকিনবাবু, পোস্টকার্ডগুলো আপনি তা হলে আজই লিখে ফেলুন। রেশন আনতে আপনাকে যেতে হবে না, নয়া বাবু যাবে।"

রেশন আনা? হ্যাঁ তাও করতে হবে। দু'খানা রেশন কার্ড দিয়ে ডাকিনবাবু বললেন, "খুব সাবধান কিন্তু। সায়েবের সন্দেহ হলেই, দাঁড়ি-পাল্লায় মাল ওজন করবেন।"

শুনে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। "আমি কি চোর যে ও'র রেশনের মাল চুরি করতে যাবো?" আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ডাকিনবাবুর বোধ হয় একটু মায়া হলো। বললেন, "আমার উপর তো রাগ ক'রে লাভ নেই। লোকটাকে তো চেনেন না।"

ভয় পেয়ে ফিস ফিস করে বললাম, "কেন?"

"দুদিন থাকুন। সব বুঝতে পারবেন।" ডাকিনবাবু ঢোক গিললেন। তারপর আরও আস্তে আস্তে বললেন 'ডেঞ্জারাস লোক গুণ্ডা..." শেষ কথাটা ও'র বলবার ইচ্ছা ছিল না, নিজের অজান্তেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতে ভয়ে থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলেন।

আমার হাতটা দুহাতে চেপে ধরে প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেন, "দোহাই আপনার, যেন বলে দেবেন না, তা হলে আমাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবে।"

রেশন নিয়ে এসে দেখি ডাকিনবাবু এক-মনে চিঠি লিখে যাচ্ছেন। বললাম, "ডাকিনবাবু, আমি এসেছি।"

উনি একবার আমার মুখের দিকে তাকালেন। চশমাটা নাকের ডগা থেকে নামিয়ে বললেন, "আপনিও আমাকে ডাকিন-বাবু বলবেন? ও-বেটা পাঞ্জাবী না হয় উচ্চারণ করতে পারে না, কিন্তু আমার আসল নাম দক্ষিণেশ্বর চাটুজ্যে।"

GOVERNMENT LIBRARY Cooch Behar

আমি বললাম, "আমার অপরাধ হয়ে গিয়েছে। এখন থেকে আপনাকে দক্ষিণেশ্বরবাব্ বলেই ডাকবো।"

দক্ষিণেশ্বরবাব্ যেন বেশ খ্শি হলেন। বললেন, "ভগবান তোমার মঙ্গল কর্ন। এখন গোটাকয়েক চিঠি লিখে ফেলো দেখি।"

চিঠি লিখতে বসলাম। কিন্তু সেই সব চিঠিগ্লোর কথা মনে পড়লে আজও আমার ভয় পায়। সেইসব চিঠির যে কোনো একটার জন্য আমাকে জেলে পচতে হতে পারতো। ভাগ্যিস আমার হাতের লেখা কেউ চিনতো না। কিন্তু আমার হাতে লেখা দ্'একটা উড়ো চিঠি আজও বড়তলা কিংবা কটন স্ট্রীটের মাড়োয়ারীদের কাছে সযত্নে রাখা আছে কিনা কে জানে। থাকলে আজও আমার বিপদে পড়বার সম্ভাবনা রয়েছে।

কয়েকদিনের মধ্যেই সভয়ে আবিষ্কার করলাম রাজপালজী যা-তা বস্তু নন। সাধারণ লোককে ঠকিয়ে একশ্রেণীর মাড়োয়ারী পয়সা করে; আবার তাদের ঠকিয়ে পয়সা হাতাবার জন্য রাজপালের

PSTP. 1-X52 BG
এ এ্যাণ্ড এফ. পিয়ার্স লিঃ লণ্ডনের পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত।

মতো ঘাঘু পাঞ্জাবী রয়েছেন! চোস্ত ইংরিজী বলিয়ে কইয়ে। কথাবার্তায় যে কোনো ঝানু ব্যবসাদারকেও গলিয়ে জল বার করে দিতে বেশীক্ষণ লাগে না। তাদেরই একজনকে পটিয়ে এই রাজপ্রাসাদে উঠেছেন তিনি। একটা পয়সাও ভাড়া লাগে না। উল্টে দারোয়ানরা ঢুকতে বেরোতে সেলাম ঠোকে।

কিন্তু বড়বাজারের গদিওয়ালারা ঠকবার জন্য বসে নেই। হাঁড়িকাঠের মধ্যে তাদের মাথা গলাতে বেশ উচ্চ মার্গের বুদ্ধির প্রয়োজন। সেইজন্যই স্বনামে বেনামে বহু চিঠি লিখতে হয়। হয়তো রাজপালজীর নজর পড়লো ক-এর উপর। তাহলে প্রথমেই উনি ক-এর কাছে যাবেন না; কাজ আরম্ভ করলেন ঙ-এর উপর। বেনামে তাকে লিখলেন—আপনি 'ঘ' সম্বন্ধে সাবধান। কায়দা করে ঘ-এর সংগে আলাপ করে রাজপাল হয়তো ক্রমশ গ-এর দিকে এগোবেন। তারপর কতরকমের সূক্ষ্ম জাল বুনে উনি যে ক-কে ফাঁদে ফেলবেন, সে-এক সুদীর্ঘ রহস্য কাহিনীর বিষয়বস্তু। সময় পেলে ভবিষ্যতে তা লেখা যাবে।

কিন্তু সে গল্পের সংগে দক্ষিণেশ্বরবাবু বা আমার বিশেষ কোনো সম্বন্ধ নেই। আমরা কেবল নিমিত্ত মাত্র। ওঁর কথা মতো হাতে কিংবা টাইপরাইটারে রোজ কয়েকখানা চিঠি লিখলেই আমার মাসের মাইনেটা জুটে গেল। বড়ো জোর দু' একটা বেনামা টেলিফোন। তাও করেছি।

কিন্তু দক্ষিণেশ্বরবাবু? ওঁর অনেক কাজ। সারাদিনই মুখ বুজে কাজ করেন, আর সায়েবের ডাক হলেই ভয়ে থর থর করে কাঁপতে আরম্ভ করেন।

উনি রাজপাল কোম্পানির অ্যাকাউণ্টেণ্ট। কিন্তু মাইনে কত জানেন? তিরিশ টাকা। প্রথমে শুনে আমিও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমার না হয় অভিজ্ঞতা নেই, তাই উনিশ টাকাতেই ঢুকে পড়েছি। তাও কিছু চিরকাল থাকবো না। টাইপে হাতটা একটু সরলেই অন্য জায়গায় পালাবো। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরবাবু? উনি তো কাজ জানেন। উনি কেন পড়ে আছেন?

দক্ষিণেশ্বরবাবুকে আমি মোটেই বুঝতে পারতাম না। কখনো হাসতে দেখিনি ওঁকে। সারাক্ষণই গুম হয়ে বসে আছেন। আর সারা পৃথিবীকেই যেন ভয়ের চোখে দেখছেন। শুধু সায়েবকে নয়; আমাকে, এমন কি বাড়ির দারোয়ানদের পর্যন্ত উনি ভয় করতেন। যেন ওরা এখনি ওঁকে ধরে মারবে। ওঁর ওপর অত্যাচার করবে।

আর রাজপাল সায়েবও যা ব্যবহার করতেন ওঁর সংগে। রেগে উঠে একদিন বললেন, "উল্লু কাঁহাকা, রামছাগলের মতো একমুখ দাড়ি হয়েছে কেন?" এইখানেই শেষ নয়, তার পরের কথাগুলো কলমের ডগা দিয়ে লেখাও যায় না। দক্ষিণেশ্বরবাবু কিন্তু কোনো প্রতিবাদই করলেন না। বরং ওঁর পায়ে ধরে কুকুরের মতো কেঁউ কেঁউ করতে লাগলেন। বললেন, "এবারের মতো ছেড়ে দিন হুজুর। আমি এখনই দাড়ি কামিয়ে আসছি।" রাজপাল সায়েবের রাগ তখনও কমেনি, দক্ষিণেশ্বরবাবুর মাথায় একটা চাঁটি মারলেন, আর সংগে সংগে উনি ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

এ কোন্ পৃথিবীতে এলাম? আমার শরীর তখন থর থর করে কাঁপছে। কিন্তু ওমা! যার জন্য এতো ভাবছিলাম, দেখলাম তাঁর কিছুই হয়নি। রাস্তায় ইঁটের উপর বসে দাড়ি কামিয়ে, একটু পরে ফিরে এসেই দক্ষিণেশ্বরবাবু নিজের গালে হাত ঘষতে লাগলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "দেখো তো, কেমন কামানো হয়েছে। ছ' পয়সা নিয়ে নিল।" রাজপাল সায়েব যে ওঁকে চাঁটি মেরেছেন, ওঁকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিয়েছেন, তা উনি যেন ভুলেই গিয়েছেন।

নিজের জামাটার দিকে তাকিয়ে বলেছেন, "যখন রেশন আনতে যাবে, তখন আমার জন্যে একটা দু' পয়সা দামের সাবান কিনে এনো তো ভাই।" নিজের জামাটা দেখিয়ে বললেন, "তিন হপ্তা কাচা হয়নি। কোনদিন আবার সায়েবের নজরে পড়ে যাবো, তখন গতবারের মতো কান ধরে ওঠ-বোস করাবেন।"

দক্ষিণেশ্বরবাবুকে সত্যি আমি বুঝতে পারি না। যখন কাজ করেন, তখন কেমন সুন্দর কাজ করেন, কিন্তু অন্য সময় মনে হয়, উনি হাবা বোবা। কোনো সর্বনাশা অসুখে যেন বুদ্ধিবৃত্তি, ব্যক্তিত্ব একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

দক্ষিণেশ্বরবাবুর বাড়ি ঘর নেই। সায়েবের ওইখানেই থাকেন। কাজকর্ম সেরে আমি যখন বাড়ি ফিরে যাই, উনি তখন চুপচাপ বসে থাকেন। এতো দুঃখ, এতো অভাব অনটনের মধ্যে তবুও আমার নিজের একটা সংসার আছে। সেখানে আমার বিধবা মা, আমার নাবালক ভাইবোনদের সংগে সন্ধ্যাবেলায় গল্প করেও আনন্দ পাই। আমরা সবাই মিলে স্বপ্ন দেখি, চিরদিন কিছু আমাদের দুঃখ থাকবে না। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরবাবু? ওঁর তো কিছুই নেই। একবেলায় ছাতু, আর একবেলায় দারোয়ানদের কাছে খরচা দিয়ে চাপাটি আর একটা তরকারি খান উনি। কোথাও বেরোন না উনি। জিজ্ঞাসা করেছি, "সন্ধ্যাবেলায় তো কোনো কাজ থাকে না, তখন কী করেন?"

"কী আর করবো, ভাই, তিনতলার ছাদে গিয়ে বসে থাকি। সেইখান দিয়ে হাওড়া স্টেশনের রেললাইন দেখতে পাওয়া যায়। ট্রেনগুলো দেখি।"

"আমাদের বাড়িতে যাবেন একদিন?"

রবীন্দ্রনাথ

গুণময় মান্না

। রবীন্দ্র রচনার পূর্ণাঙ্গ মার্কস্‌বাদী বিশ্লেষণ । ৪·৫০

"এই গ্রন্থখানি যাঁহারা পড়িবেন তাঁহারা লেখক স্থানে স্থানে বৃহত্তর সামাজিক পটভূমিকার উপস্থাপনে ও বিশ্লেষণে যে সূক্ষ্ম এবং পরিচ্ছন্ন চিন্তার পরিচয় দিয়াছেন, সাহিত্য ও সঙ্গীতের আকৃতি প্রকৃতির বর্ণনায় ও বিশ্লেষণে যে নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাকে সশ্রদ্ধভাবে গ্রহণ করিতেই প্রলুব্ধ হইবেন।" —ডাঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

বেঙ্গল পাবলিশার্স । কলিকাতা-১২

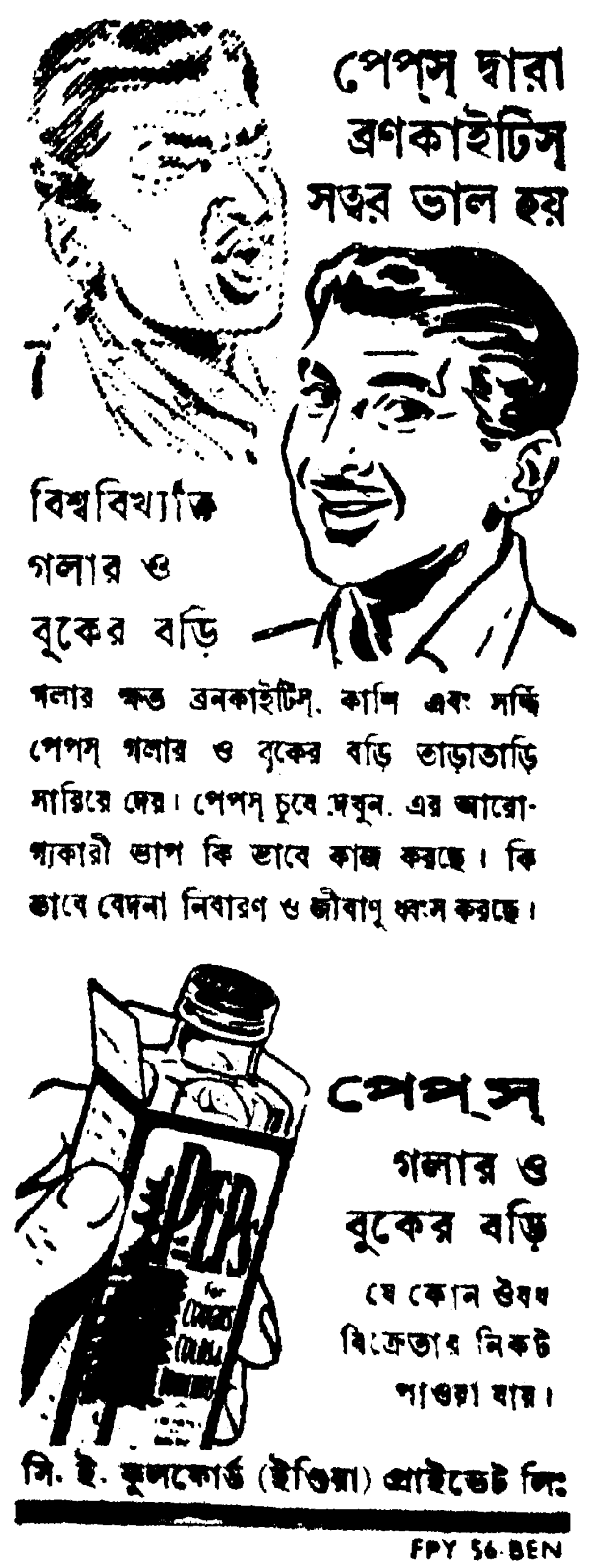

পরিবেশক—মেসার্স কেম্প এন্ড কোং লিঃ ১২সি চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১২

আমি বলেছি। উনি রাজী হননি। "না, কারুর বাড়িতে যাওয়া আমার অভ্যাস নয়।"

মাকে একদিন বলেছিলাম, "দক্ষিণেশ্বরবাবু যে কী খান। বড্ড কষ্ট হয়।" সেই শুনে মা সিগারেটের কৌটো করে খানিকটা তরকারি, আর গোটাকয়েক রুটি দিয়েছিলেন। সেদিন দুপুরে আমাদের সায়েবও বেরিয়ে গিয়েছিলেন। দুটোর সময় ওঁকে জোর করে ধরে, আমার সঙ্গে টিফিনে বসালাম। কী আনন্দ করেই যে সে তরকারি খেলেন। খেতে খেতে হঠাৎ কে'দে ফেললেন। হঠাৎ বললেন, "তুমি আমাকে ভালোবাসো, তাই না?"

আমার চোখেও জল এসে গিয়েছিল। ওই কে'চোর মতো লোকটার মধ্যেও তা হলে অনুভূতি আছে। বলেছিলাম, "হ্যাঁ, দক্ষিণেশ্বরবাবু, আমি অন্তত আপনাকে ভালোবাসি।"

সেই দিন ও'র দুর্বল মুহূর্তে দু-একটা কথা শুনেছিলাম। আবিষ্কার করেছিলাম, উনি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট। শুনে আমি তো চমকে উঠেছিলাম। উনি বোধ হয় আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেছিলেন। বলেছিলেন, "ও বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? তড়াং করে নিজের চেয়ার থেকে উঠে পড়ে ও'র ময়লা বিছানার মধ্য থেকে একটা তেল-চিটচিটে খাম বার করেছিলেন। সেই খামের ভিতর থেকে একটা বি-এ পাশের সার্টিফিকেট বার করে আমার মুখের উপর ছ'ুড়ে দিয়েছিলেন। "পালিয়ে আসবার সময় আর কিছু পারিনি, কিন্তু এ সার্টিফিকেটটা ঠিক নিয়ে এসেছিলাম" দক্ষিণেশ্বরবাবু বলেছিলেন।

"পালিয়ে?" আমার ঔৎসুক্য বেড়ে গিয়েছিল। "কোথা থেকে পালিয়ে এসেছিলেন?"

কিন্তু তার উত্তরে ঐ কে'চোর মতো মানুষটা যে সাপের মতো ফনা তুলে তেড়ে উঠবে তা ভাবত পারিনি। ঘুষি বাগিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, "তাতে তোমার দরকার কী? এইটুকু এ'চোড়েপাকা ছোকরা, তোমার তাতে দরকার কী?"

আমি এমন আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম, যে, কথা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা হয়তো আরও গড়াতো, যদি না রাজপাল সায়েব ঠিক সেই সময়েই বাইরে থেকে ফিরতেন। মেজাজটা সায়েবেরও খারাপ ছিল। আর ও'কে দেখেই দক্ষিণেশ্বরবাবু একমনে নিজের কাজ করতে লাগলেন। যেন কিছুই হয়নি।

সেদিনটা আমারও খুব খারাপ ছিল। শুক্রবার যে রেশন আনার দিন, তা বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছিলাম। রাজপাল সায়েব তা জানতে পেরে একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন, "শুয়োর-কা-বাচ্চা তুমি লাট সায়েব হয়ে গিয়েছো, মনে করে রেশনের টাকাটা চেয়ে নিতে পারোনি।" আর কোন কথা না বলে, ব্যাগ হাতে করে রেশন আনতে চলে গিয়েছি। কিন্তু, সেইদিনই যে এমন বিপদ হবে, তা জানবো কী করে? চাল আর গম দুটো থলেতে ঢুকিয়ে একপো চিনির ঠোঙাটা বাঁচাতে নিয়ে রাস্তা দিয়ে আসছিলাম। হঠাৎ এক সাইকেলওয়ালা কোথা থেকে এসে এমন ধাক্কা দিল যে, আমি উল্টে পড়লাম। চিনির ঠোঙাটা ঠিকরে গিয়ে খোলা নর্দমার মধ্যে গিয়ে পড়লো।

আপিসে শুকনো মুখে ফিরে আসছি। ভাগ্যিস রাজপাল সায়েব তখন আবার বেরিয়ে গিয়েছিলেন। দক্ষিণেশ্বরবাবু শুনে বললেন, "সর্বনাশ হয়েছে। সায়েব হয়তো তোমাকে মেরেই ফেলবেন।"

ব্ল্যাক মার্কেটে চিনি পাওয়া যায়। কিন্তু এক পোয়ার দাম আট আনা। মাসের শেষে এতগুলো পয়সা আমি কোথায় পাবো?

আমি তো ঠক ঠক করে কাঁপতে শুরু করেছি।

আমার সেই অবস্থা দেখে দক্ষিণেশ্বরবাবু ধমকে উঠলেন। "ভয় কী? চুরি-জোচ্চুরি তো করনি।" তারপর কী ভেবে নিজের বিছানার ভিতর থেকে একটা সিগারেটের টিন বার করলেন। সেখান থেকে একটা আধুলি নিয়ে আমাকে দিয়ে বললেন, "যাও, এখনি কিনে নিয়ে এসগে যাও।"

আমি কে'দে ফেলেছিলাম। কৃতজ্ঞতায় ও'র হাতটা জড়িয়ে ধরেছিলাম। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে, মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে উনি বলেছিলেন, "তুমি এখনও ছেলেমানুষ।"

ব্ল্যাকমার্কেট থেকে চিনি কিনে এনে আমি চুপ করে বসেছিলাম। মনে মনে ভাগ্যকে ধিক্কার দিচ্ছিলাম। ভাবছিলাম, আমার না-হয় উপায় নেই, লেখাপড়া শিখিনি, কাজ জানি না। কিন্তু এই বি-এ পাশ-করা লোকটা কেন এখানে তিরিশ টাকা মাইনেতে পড়ে রয়েছে? আর ঐ যে পালিয়ে আসার কথা বললে, সে কোথা থেকে?

দক্ষিণেশ্বরবাবু এসে আমার পাশে বসলেন। আস্তে আস্তে হাত দুটো আমার কাঁধে রেখে বললেন, "আহা বেচারার দিনটা আজ খারাপ গেল। আমি জানতাম। যখনই আমাকে খাওয়াতে গিয়েছ, তখনই বুঝতে পেরেছিলাম, আজ কিছু একটা হবেই।"

এইভাবেই জীবন চলছিল—বলবার মতো যে জীবনের কিছুই ছিল না। ইদানীং কিন্তু দক্ষিণেশ্বরবাবুর মধ্যে একটু পরিবর্তন দেখছিলাম, সারাক্ষণ গুম হয়ে থাকেন, সব

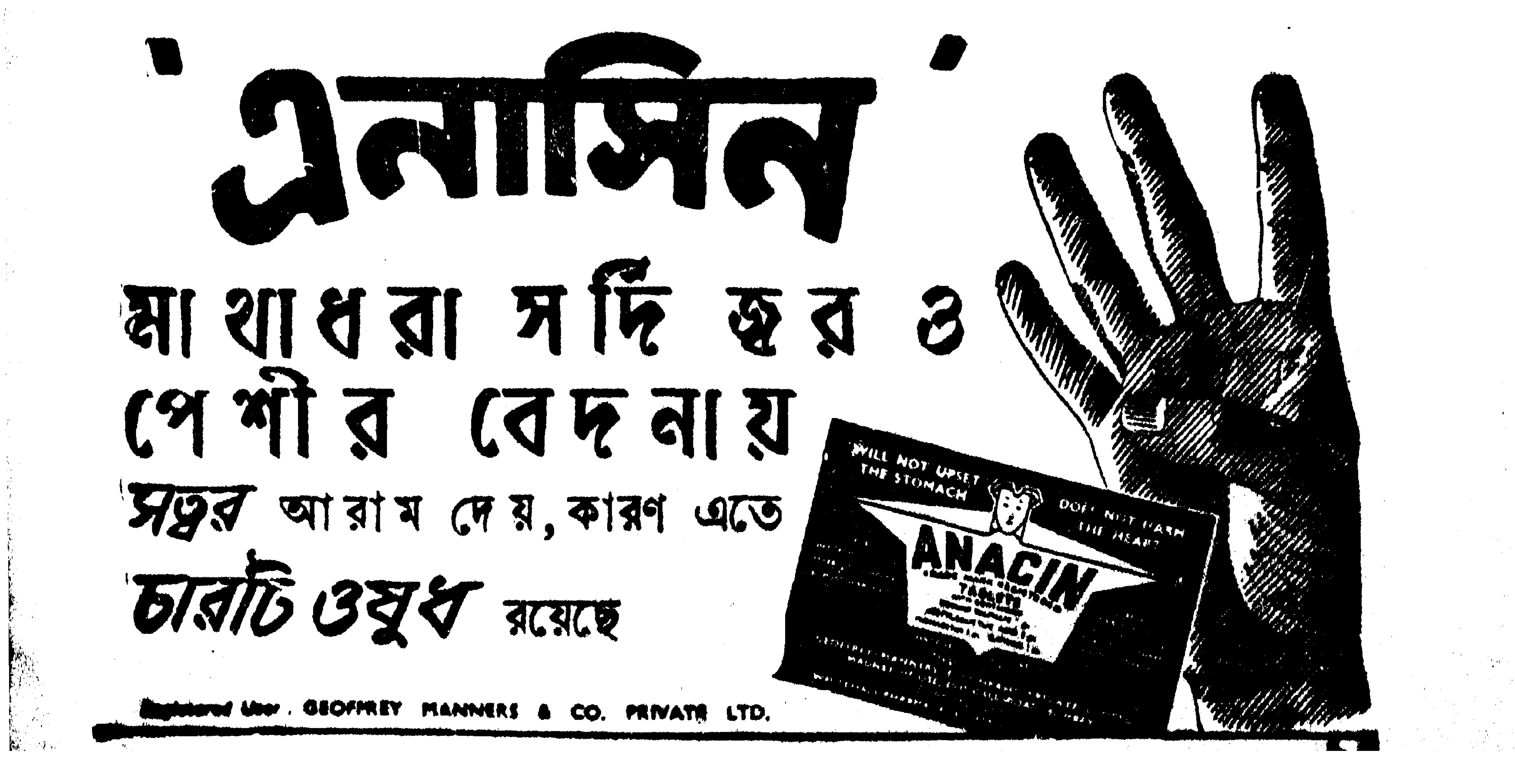

সময়ই যেন কিছু চিন্তা করছেন। সায়েব একদিন ও'কে গালাগালি করলেন, "উল্লু, শুয়ার কাঁহাকা।"

দক্ষিণেশ্বরবাবু হঠাৎ যেন রেগে উঠলেন। বললেন, "আমি তোমার চাকরি করবো না। আমি চলে যাবো।"

রাজপাল সায়েব যেন অট্টহাস্যে ভেঙে পড়লেন। ও'র হাঁড়ির মতো গোল মুখের গোল গোল বসন্তের দাগগুলো যেন চকচক করে উঠলো। "রুপেয়া? মেরা রুপেয়া লে আও।"

আর দক্ষিণেশ্বরবাবু সঙ্গে সঙ্গে আবার যেন কেঁচো হয়ে গেলেন। কোনো কথা না বলে উনি সুড় সুড় করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিজের কাজ করতে আরম্ভ করলেন।

সেদিন স্তম্ভিত হয়ে ও'দের দু'জনের নাটক দেখলেও কোনো প্রশ্ন করতে পারিনি। পরের দিন কাজ করতে এসে দেখি দক্ষিণেশ্বরবাবু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন।

আমি সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই উনি কান্না বন্ধ করে চোখ মুছতে লাগলেন। বললেন, "কি ভুলই যে করেছি ভাই।"

আমি ফ্যাল ফ্যাল করে ও'র মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। উনি নিজের মনেই বললেন, "বোধ হয় কোনোদিনই ও-টাকা আমি শোধ করতে পারবো না।"

"আপনি বুঝি টাকা ধার করেছিলেন, সায়েবের কাছে?"

সে-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দক্ষিণেশ্বরবাবু বললেন, "আমি যা করেছি ভাই, তুমি যেন কোনোদিন অমনভাবে নিজের সর্বনাশ করো না। কখনো পরের পয়সায় ফার্স্ট ক্লাশের ট্রেনে চড়ো না।"

আমি কিছু বুঝতে না পেরে দক্ষিণেশ্বরবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এবার ও'র কাছে যা শুনলাম, তাতে অবাক না হয়ে উপায় ছিল না।

নিজের খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে দক্ষিণেশ্বরবাবু বললেন, "আমাকে দেখে তোমার পাগলা পাগলা বোধ হয়। তাই না? কিন্তু চিরকাল ভাই আমি এমন ছিলাম না। আমারও সংসার ছিল, ছেলে-মেয়ে ছিল। আমিও কোট, প্যান্ট, টাই পরে আপিস করতাম। পাঞ্জাবে থাকতাম তখন। কিন্তু ওখানকার রায়টে সব গেল। আমারই চোখের সামনে আমার ছেলে, মেয়ে, বৌকে কেটে ফেলেছে। আমি কোনো রকমে পালিয়ে স্টেশনে এসেছিলাম। আমার কাছে তখন একটা আধলা ছিল না। পুরো একদিন কিছু খেতে পাইনি। ঐ স্টেশনেই তো রাজপালের সঙ্গে দেখা হলো। রাজপালও পালিয়ে আসছিল। আমার অবস্থা দেখে, ওর বোধ হয় দয়া হয়েছিল। বলেছিল, "তোমার কোনো ভয় নেই, আমি তোমাকে নিয়ে যাবো। ট্রেনে তখন বেজায় ভিড়। কোথা থেকে কী করে ও দুখানা ফার্স্ট ক্লাশের টিকিট যোগাড় করে নিয়ে এল। ফার্স্ট ক্লাশের টিকিট দেখে আমার ভয় হলো। বললাম, অতো দামের টিকিট কাটলে, কিন্তু আমার কাছে যে কিছু নেই।" রাজপাল হেসে বললে, "ওতে কী হয়েছে, পরে শোধ করে দিও।"

"তারপর?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

দক্ষিণেশ্বরবাবু বললেন, "তারপর আর কী ভাই, সেই থেকেই ও'র কাছে পড়ে রয়েছি। আর লোকটা পাটনা, কলকাতা, কটক আর গৌহাটীতে মাড়োয়ারীদের সঙ্গে জাল-জোচ্চুরি করে বেড়াচ্ছে। আমি বলেছি, 'আমি চলে যাবো।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ও ফার্স্ট ক্লাশের গাড়ি ভাড়া সুদ সমেত ফেরত চায়। বলে টাকা দিয়ে চলে যাও। যা পাই, তার থেকে যা খেয়ে টাকা জমাচ্ছি। কিন্তু অতো টাকা কোথায় পাবো? ফার্স্ট ক্লাশে না এসে থার্ড ক্লাশে এলে এতোদিনে আমি সব টাকা শোধ করে দিয়ে চলে যেতে পারতাম।" দক্ষিণেশ্বরবাবুর চোখ দুটো ছলছল করছে আমি বুঝতে পারলাম।

অত্যন্ত অন্যায় বলে মনে হয়েছে আমার। আমার টাকা থাকলে সেই টাকা রাজপালের মুখের উপর ফেলে দিয়ে দক্ষিণেশ্বরবাবুকে চলে যেতে বলতাম। কিন্তু আমার কাছে দুটো টাকাই নেই, তা অতোগুলো টাকা।

নূতন উপন্যাস

"একটি জীবন"

ডাঃ অতুলচন্দ্র লাহিড়ী — ৪·৭৫ নঃ পঃ

বিশ শতকের প্রথম অর্ধের 'জীবনায়ন', উপন্যাসের মতো ভাবনিষ্ঠ, ইতিহাসের মতো সত্য নিষ্ঠ। আবার এক অনুপম দাম্পত্য জীবন। সেই সব দিনের কথা এমন করে ইতিপূর্বে আর কেউ বলেন নাই।

লেখকের প্রথম বইঃ

কৈলাস-মানসের-পথে

২য় সংস্করণ ৩·৫০ নঃ পঃ

ভ্রমণ সাহিত্যে এ একটি মূল্যবান সংযোজন।

পরিবেশক—ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

(সি ১০৬২/১)

জগদীশবাবুর গীতা

মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা অন্তঃ-রহস্য ভূমিকাদি অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়মূলক যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ৬·০০

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম ভারত-আত্মার বাণী

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও গীতার সূক্তির আলোচনা ৬·০০ ভারতের সাধক-বাণী শিক্ষাদীক্ষার কথা ৬·০০

শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১·০০ কর্মবাণী ১·২৫

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী· ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন!

যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র

বহু গুল্ম গাছড়া দ্বারা বিশুদ্ধ মতে প্রস্তুত

বাকলা

ব্যবহারে লাখ লাখ রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন

ভারত গভঃ রেজিঃ নং ১৬৮৩৪৪

অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা,

মুখে টকভাব, ঢেকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দাগ্নি, বুকজ্বালা, আহারে অরুচি, স্বল্পনিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যাঁরা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও বাকলা সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিফলে মূল্য ফেরৎ।

৩২ তোলার প্রতি কৌটা ৩৲ টাকা, একত্রে ৩ কৌটা — ৮৲ আনা। ডাঃ মাঃ ও পাইকারী দর পৃথক।

দি বাকলা ঔষধালয়। হেড অফিস- বরিশাল (পূর্ব পাকিস্তান) ব্রাঞ্চ-১৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৭

দক্ষিণেশ্বরবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছি, সায়েব যে আপনার কাছে টাকা পায়, তা বুঝি লিখিয়ে নিয়েছে?"

দক্ষিণেশ্বরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "না। লেখা-লিখির ভিতরে কিছু নেই।"

আমার মুখটা সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললাম, "দক্ষিণেশ্বরদা, তা হলে কিছু ভয় নেই।"

দক্ষিণেশ্বরবাবু সাগ্রহে বললেন, "তোমার মাথায় কোনো বুদ্ধি এসে গিয়েছে বুঝি? আমার নিজের যে কী হয়ে গিয়েছে, ভাই। কিছুতেই মাথা খাটাতে পারি না।"

উৎসাহের সঙ্গে বললাম, "দক্ষিণেশ্বর-বাবু, আপনি বুক ফুলিয়ে পালিয়ে যান, পাঞ্জাবী আপনার কিছুই করতে পারবে না।"

ভেবেছিলাম আমার কথা শুনে দক্ষিণেশ্বরবাবু আনন্দে লাফিয়ে উঠবেন। কিন্তু ঠিক উল্টো হলো। ভয়ে উনি যেন আঁতকে উঠলেন। চোখ বন্ধ করে বলতে লাগলেন, "কালী, কালী। মা ব্রহ্মময়ী মা আমার, দেখিস আমাকে। আমার কোনো দোষ নেই। নেমকহারাম নই আমি। ছোটো ছেলে, বুঝতে পারেনি, বলে ফেলেছে।"

আমি ও'র হাবভাব দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। উনি চোখ খুলে গম্ভীরভাবে বললেন, "যা বলেছো, বলেছো, অমন কথা আর কখনো মুখে এনো না।"

সত্যি, এর পর আমি আর কিছু ও'কে বলিনি। নীরেব ও'কে রাজপালের অত্যাচার সহ্য করে যেতে দেখেছি। মানুষ ঠকিয়ে লোকটা অতো টাকা রোজগার করছে। সেই পয়সায় গাড়ি চড়ছে, মদ খাচ্ছে, সন্ধ্যা বেলায় বাড়িতে মেয়েমানুষ এনে ফুর্তি করছে, তবু দক্ষিণেশ্বরবাবুর কাছে পাওনা গোটা কয়েক টাকা ছেড়ে দেবে না।

তবু দক্ষিণেশ্বরবাবু ও'কে গালাগালি করতেন না। বলতেন, "ও'র দয়াতেই তো পালিয়ে আসতে পেরেছি। লোককে আমি ঠকাতে পারবো না।"

আমি বলেছি, "টাকাটা শোধ দিতে আপনার আর কতদিন লাগবে?"

উনি ম্লান হাসলেন, "এমনভাবে চললে, এ-জন্মে আর শোধ হবে বলে মনে হয় না ভাই।"

আমারও খুব রাগ হয়ে গিয়েছে। বলেছি, "আপনারও দোষ আছে। ফার্স্ট ক্লাশে আসা আপনার উচিত হয়নি। জানেনই তো ওসব আমাদের জন্যে নয়। ওসব বড়লোকদের জন্যে। যাদের অনেক টাকা আছে তারাই অমন গদিওয়াল গাড়িতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আসতে পারে।"

"ঠিকই বলেছ ভাই। কিন্তু মানুষের যখন দুর্মতি হয়, তখন এমনিভাবেই হয়। না-হলে তখনই তো আমার ভাবা উচিত ছিল যে, ফার্স্ট ক্লাশে যেতে অনেক টাকা লাগে।" দক্ষিণেশ্বরবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

বাড়িতে ফিরে এসেও দক্ষিণেশ্বরবাবুর কথা আমি ভুলতে পারতাম না। মা যখন যত্ন করে আমাকে জলখাবার, চা এনে দিতেন তখনই মনে পড়ে যেতো গ্রাণ্ডট্রাংক রোডের এক বিশাল প্রাসাদে একটা অন্ধকার খুপরীতে একজন চুপচাপ বসে আছেন। আসলে বন্দী হয়ে আছেন। একবার ফার্স্ট ক্লাশের ট্রেনে চড়ে, নিজেকে চিরদিনের মতো বন্ধক দিয়ে বসে আছেন। ফার্স্ট ক্লাশের গাড়িভাড়ার টাকা সুদে বাড়ছে। প্রতি মুহূর্তে বাড়তে বাড়তে সেই টাকার বাণ্ডিল দক্ষিণেশ্বরবাবুর সমস্ত অস্তিত্বকে গ্রাস করছে। সামান্য একটু কষ্ট করে যদি সেদিন থার্ড ক্লাশে আসতেন, দক্ষিণেশ্বরবাবু আজ তাহ'লে স্বাধীন হয়ে যেখানে ইচ্ছে ঘুরে বেড়াতে পারতেন।

দক্ষিণেশ্বরবাবুকে বলেছি, "কেন আপনি পড়ে রয়েছেন? কেউ আপনাকে আটকে রাখতে পারে না। এটা বে-আইনী। ক্রীতদাস প্রথা আমাদের দেশ থেকে অনেকদিন উঠে গিয়েছে।"

দক্ষিণেশ্বরবাবু মাথা চুলকোতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু তারপরই বলেছেন, "মাথার উপর তো আর একজন রয়েছেন। তিনি কি বলবেন? কোন্ মহাপাপের ফলে তো এ-জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল। আবার? আবার আমি একজনের পাওনা গণ্ডা ফাঁকি দেবো?"

রাত্রে শুয়ে শুয়ে আমি আবার চিন্তা করেছি। দক্ষিণেশ্বরবাবুর জন্য অজান্তেই আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এসেছে। তারপর হঠাৎ যেন মনে হলো মাথায় একটা নতুন চিন্তা আসছে।

পরের দিন আপিসে গিয়ে দেখি, সায়েব বেরিয়ে গিয়েছেন। সামান্য যা কাজ ছিল, তা শেষ করে দক্ষিণেশ্বরবাবুকে খোঁজ করতে গিয়ে দেখি উনি চেয়ারে নেই। ও'র ঘরে গিয়ে, দেখি ময়লা কাঁথার উপর বসে সিগারেটের পুরনো কৌটো থেকে টাকা বার করে গুনছেন। আমাকে দেখে বললেন, "এখনও অনেক টাকা লাগবে ভাই।" তারপর হঠাৎ কেঁদে ফেললেন। সেদিন সকালে বোধ হয় সায়েবের কাছে বকুনে খেয়েছিলেন। বললেন, "তোমার তো অনেক বুদ্ধি আছে ভাই। আমাকে কোনোরকমে মুক্তি দিতে পারো?"

উত্তেজনায় আমার বুকটাও দ্রুত ওঠানামা করছিল। বললাম, "কাল রাত থেকে একটা খুব সোজা কথা মনে হচ্ছে। এখানে থাকলে আপনি কোনোদিন ফার্স্ট ক্লাশ টিকিটের দাম শোধ করতে পারবেন না। আপনি বি-এ পাশ। একটা ইস্কুল মাস্টারী পেলেও এর থেকে অনেক বেশী টাকা রোজগার করতে পারবেন। তখন একটু চেষ্টা করলেই রাজপালজীর টাকাটা দিয়ে দিতে পারবেন।"

দক্ষিণেশ্বরবাবুর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এই সোজা কথাটাও ও'র মনে আসেনি। আমি বললাম, "আপনি তো আর টাকাটা মেরে দিতে চান' না। অথচ এখানে থাকলে আপনাকে দেনা নিয়েই মরতে হবে। পরের জন্মে দেনাটা আরও বেড়ে যাবে।"

দক্ষিণেশ্বরবাবু বেশীক্ষণ চিন্তা করতে পারেন না। একটু উত্তেজনায় ও'র মাথা ঘুরতে আরম্ভ করে। মাথাটা চেপে ধরে বললেন, "তুমি এখন যাও। আমার মাথার ভিতরটা কেমন করছে।" আমি চলে এলাম।

কিন্তু তারপরেই যে এমন হবে তা জানতাম না। পরের দিন সকালে আপিসে গিয়ে দেখি ভয়ানক অবস্থা। ছাতের রুলটা ঘোরাতে ঘোরাতে রাজপাল আহত বাঘের মতো ঘরের মধ্যে পায়চারি করছেন। আমাকে আসতে দেখেই পাঞ্জাবী রাজপাল যেন লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, "এ্যাঁ, শয়তানের বাচ্চা, তুমি এসে গিয়েছো। কিন্তু আর একজন কই?"

বহু শতাব্দী পূর্বে যে পদ্ধতি ভারতবর্ষই আবিষ্কার করেছিল

প্রায় ১৬০০ বৎসর পূর্বে নির্মিত মরিচাহীন লৌহস্তম্ভ তৈরীর বহু পূর্বে শিল্প ও বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রেই ভারতবর্ষ খ্যাতি লাভ করেছিল।

ভেষজ কেশতৈলও ভারতের একটি প্রাচীন আবিষ্কার—যার গোপন তথ্য বহু শতাব্দী ধরে অজ্ঞাত ছিল—যত দিন না আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণায় এর বিশুদ্ধ ভেষজ উপাদান আবার আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তার নাম দেওয়া হয়েছে—'কেয়ো-কার্পিন'।

কেয়ো-কার্পিন

মনোরম গন্ধযুক্ত 'কেয়ো-কার্পিন' চুলের গোড়ায় প্রাণশক্তি যোগায়।

দে'জ মেডিকেল ষ্টোর্স প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা • বোম্বাই • দিল্লী • মাদ্রাজ

"কে?" আমি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞাসা করলাম।

"ও, আবার ন্যাকা সাজা হচ্ছে! ডাকিন বাবু কোথায়? ব্যাটা কাল রাত থেকে ভেগেছে।"

এমন যে হবে আমি বুঝতে পারিনি। লোকটা যে এমন হিংস্র হয়ে উঠবে, তাই বা কেমন করে জানবো। এখনই হয়তো আমাকে ধরে মার লাগাতে আরম্ভ করবে। তখন বয়স কম, তার উপর সংসারের অভাব, স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমার স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব যেন মুহূর্তে লোপ পেয়ে গেল। হয়তো চাকরিটাও এখনি চলে যাবে। এ-মাসের মাইনেটাও দেবে না। তাহলে খাবো কী? মনিবের পা জড়িয়ে ধরলাম আমি। বললাম, "বিশ্বাস করো, কোথায় গিয়েছে, জানি না।"

পাঞ্জাবী রাজপাল আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন, "এখন সাড়ে নটা বাজে, বেরিয়ে পড়ো। বেলা একটার মধ্যে যদি ডাকিনবাবুকে ফিরিয়ে না আনতে পারো, তাহলে তোমার একদিন কি আমার একদিন।"

রাস্তায় বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হাওড়ার বাসস্ট্যান্ডের কাছে এসে দাঁড়ালাম। কত লোক নিশ্চিন্ত মনে নিজের নিজের কাজে যাচ্ছে। আর আমি? ওদের সৌভাগ্য দেখে আমার হিংসে হতে লাগল। পরমুহূর্তেই মনে হলো শরীরটা যেন ঠান্ডা হয়ে আসছে। একি খপ্পরে পড়লাম আমি? এর থেকে যে না খেতে পেয়ে মরা অনেক ভাল ছিল। আমার মা জানছেন, আমি আপিসে চাকরি করছি। এখন সামান্য মাইনে, পরে কাজ শিখলে বেড়ে যাবে। অথচ আমি কি করছি? ভাবলাম, ওখান থেকেই পালিয়ে যাই। কিন্তু রাজপাল? সে আমার বাড়ির ঠিকানা জানে। আমার রক্ষে রাখবে না।

কিন্তু এই বৃহৎ কলকাতা শহরের কোথায় আমি দক্ষিণেশ্বর বাবুকে খুঁজে বেড়াই? কোনো সন্ধান না জানা থাকলে, এই শহরের কাউকে বার করা যায় নাকি? হাওড়া পুলের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলতে লাগলাম।

বেশ কয়েক ঘণ্টা ঘুরে ঘুরে ব্যর্থ হয়ে যখন রাজপালের বাড়িতে ফিরে এলাম, তখন ঢুকতে ভয় করছিল। লোকটা আমাকে বিশ্বাস করবে না, হয়তো মারধোর করবে। কোনো রকমে সাহস সঞ্চয় করে ভিতরে ঢুকে বললাম, "খুঁজে পাইনি।"

অসন্তুষ্ট হয়ে রাজপাল আমাকে যা বললেন তার অর্থ হলো, আমি মানুষ নই, ভেড়া। মানুষের বুদ্ধি থাকলে এই কলকাতা শহরের সবকিছুই খুঁজে বার করা যায়। কিন্তু ভেড়া আর ছাগলরা দুলের গোঁতা না খেলে কিছুই করতে পারে না। তারপর মাথায় সোলার টুপিটা চড়িয়ে, নিজের জুতোটা বুরুশ দিয়ে ঝেড়ে, রাজপাল বললেন, "চলো আমার সংগে। ও ব্যাটাকে কেমন না খুঁজে পাওয়া যায় একবার দেখি।"

প্রথমে আমরা হাওড়া স্টেশনে গেলাম। রাজপাল প্রত্যেকটা প্ল্যাটফরম, ওয়েটিং রুম, ওয়েটিং হল তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলেন। তারপর গংগা স্নানের ঘাট। সেখানেও ছড়িটা ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। এবার পোল পেরিয়ে আমরা স্ট্র্যান্ড রোডে এসে পড়লাম। নদীর ধারের ঘাটগুলো দেখতে দেখতে আরও আধঘণ্টা পরে আমরা যেখানে এসে হাজির হলাম, সেখানে অখন্ড হরি-নামের পালা চলছে। গত কয়েক বছর ধরেই ধর্মভীরু মাড়ওয়ারীরা ওখানে বিরামহীন কীর্তনগানের ব্যবস্থা করেছেন। শিফট ডিউটিতে এক একদল লোক ওখানে ঘুরে ঘুরে খোলকরতাল বাজিয়ে নামগান করে চলেছেন। এধারে ম্যারাপ বেঁধে আপিসও বসেছে। এতোগুলো লোকের তদ্বির তদারক করাও তো কম কথা নয়। বিরাট হান্ডায় তখন খিচুড়ি রান্না হচ্ছে। আর একদল গাইয়ে তখন পাতা পেতে খেতে বসে গিয়েছে। উপরে এক ঝাঁক কাক আর চিল গোল হয়ে ঘুরছে। সেইখানেই যে দক্ষিণেশ্বর বাবুর দেখা পাওয়া যাবে কী করে জানবো? রাজপাল হঠাৎ যারা খাচ্ছিল তাদের দিকে ছড়িটা তুলে বললেন, "ওইতো।" সত্যি, আমি সভয়ে দেখলাম দক্ষিণেশ্বরবাবু উবু হয়ে বসে খিচুড়ি খাচ্ছেন।

ছুটে গিয়ে রাজপাল দক্ষিণেশ্বরবাবুর ঘাড়টা চেপে ধরলেন। সংগে সংগে অন্য লোকগুলো হৈ হৈ করে উঠলো। কী হয়েছে? কী হয়েছে? আওয়াজ শুনে ওখানকার ম্যানেজার বৃদ্ধ রাজস্থানী ভদ্রলোকও ছুটে এলেন। রাজপাল তখনও জামার কলার ধরে দক্ষিণেশ্বরবাবুকে টেনে তোলবার চেষ্টা করছেন। ম্যানেজার এসে ছাড়িয়ে দিলে। বললে, "ছিঃ বাবুজী, খাওয়ার মধ্যে মানুষকে জ্বালাতন করলে মহাপাপ হয়।"

অপ্রস্তুত হয়ে রাজপাল সায়েব বললেন, "ব্যাটা পালিয়ে এসেছে।" ম্যানেজার আস্তে আস্তে বললেন, "ঠিক আছে বাবুজী, ওর খাওয়া শেষ হোক, ততক্ষণ আপনি আমার ওখানে বসবেন চলুন।" দক্ষিণেশ্বরবাবুকে বললেন, "বেটা, তোমার খাওয়া হলে, আমার এখানে এসো।"

দক্ষিণেশ্বর বাবুর আর খাওয়া হলো না। তখনই হাত ধুয়ে, চলে এলেন। রেগে গিয়ে বললেন, "কেন এখানে এসেছেন, আমি আপনার চাকরি করবো না।"

ও'র কথায় কান না দিয়ে রাজপাল ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলেন, "লোকটা এখানে কবে এসেছে?" ভাঙা চশমাটা নাকে লাগাতে লাগাতে বৃদ্ধ রাজস্থানী ভদ্রলোক বললেন, "কাল রাত থেকে। গরীব আদমি। দেখে বড়ো দয়া হলো, তাই টেম্পোরারী

হরিনামের চাকরি দিয়েছি। এক টাকা রোজ, আর দ্ববেলা খাওয়া।"

রাজপাল বললেন, "লোকটা চোর। আমার বাড়ি থেকে কালকে চুরি করে পালিয়ে এসেছে।"

ম্যানেজার অবাক হয়ে গেলেন, "এ্যাঁ। অথচ লোকটাকে দেখে আমার ধার্মিক লোক বলে মনে হয়েছিল।"

দক্ষিণেশ্বর বাবু কাতরভাবে চিৎকার করে উঠলেন, "একেবারে বাজে কথা, আমি চোর নই। আমি ও'র কাছে চাকরি করবো না, তাই চলে এসেছি।"

ম্যানেজারবাবু যেন দক্ষিণেশ্বরবাবুকেই বিশ্বাস করলেন। বললেন, "আমি এ-সবের মধ্যে নেই। ও বলছে, আপনার চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছে।"

রাজপালের শয়তানীতে-ভরা চোখ দুটো যেন চকচক করে উঠলো। বললেন, "পণ্ডিতজী, আমাকে বিশ্বাস না হয়, একে জিজ্ঞাসা করুন" রাজপাল আমাকে হঠাৎ দেখিয়ে দিলেন। তারপর আড়চোখে সকলের অলক্ষ্যে আমার দিকে এমন ভাবে তাকালেন, যে চোখ নামিয়ে না নিলে, আমার পাঁজরের হাড়গুলো পর্যন্ত গলে যেতো।

"এ লোকটি কে?" ম্যানেজারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

"আমার আর একজন নোকর", রাজপাল উত্তর দিলেন।

কী করবো আমি? ম্যানেজার বাবু আমার মুখের দিকে তাকালেন, জিজ্ঞাসা করলেন, "খোকাবাবু এই লোকটা কী চুরি করে পালিয়ে এসেছে।" দক্ষিণেশ্বরবাবুও যেন ভরসা পেয়ে বললেন, "বলুক, ওই বলুক আমি চুরি করে পালিয়ে এসেছি কিনা।"

হে ঈশ্বর কি করবো আমি? রাজপাল সায়েবের সর্বনাশা চোখ দুটো আমি আর একবার দেখতে পেলাম। বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পেটানো শুরু হয়েছে। দক্ষিণেশ্বর-বাবুও আমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন। কিন্তু আমার নাবালক ভাইবোন, আমার বিধবা মাও আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। এ-মাসের মাইনে আজও পাইনি। কী করবো আমি? চেষ্টা করে-ছিলাম আমি। কিন্তু পারলাম না। সত্যি-কথা বলতে পারলাম না। ঠোঁট কেঁপে উঠছিল, কিন্তু কোনোরকমে বললাম, "হ্যাঁ।"

এক মুহূর্তে রাজপালের রূপ যেন পালটিয়ে গেল। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ম্যানেজারকে বললেন, "তাহলে পুলিসের ব্যাপারে আপনাদেরও জড়াতে হয়। টাকা-কড়িগুলো কোথায় লুকিয়ে রেখেছে সার্চ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তা আমি চাই না। আমার চাকরের দোষে আপনাদের কষ্ট দিতে চাই না। বরং ওকে নিয়ে গিয়ে যা হয় করি।"

নির্বিবাদী ভালো মানুষ ম্যানেজার সায়েব ভয় পেয়ে গেলেন। "কী ফ্যাসাদ। আপনি বরং ওকে নিয়েই যান।" দক্ষিণেশ্বর বাবু ততক্ষণে ভেঙে পড়েছেন। দু-একবার বিড় বিড় করে বলছেন, "আমি চোর? আমি চোর?" ও'র হাতটা চেপে ধরে রাজপাল চলতে আরম্ভ করলেন। লজ্জায়, ঘৃণায় আমি দক্ষিণেশ্বর বাবুর মুখের দিকে তাকাতে পারিনি।

বাড়িতে গিয়ে রাজপাল দক্ষিণেশ্বর-বাবুকে একটা ঘরের মধ্যে পুরে বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলেন। বললেন, "তোমার যা ওষুধ তা আমি ফিরে এসেই দেবো। আমার সমস্ত দিনটা নষ্ট করে দিয়েছো।" আমাকে বললেন, "আমি এখনি বেরোচ্ছি, ফিরতে দেরি হবে। তোমার কী আজ আছে?"

বললাম, "রেশন আনতে হবে।"

আমার উপর একটু খুশী হয়েই ছিলেন। বললেন, "বাঙালবাবুর পোলের তলা থেকে রেশন নিয়ে তোমাকে আর আপিসে ফিরতে হবে না। কালকে সকালে এখানে আসবার সময় মালগুলো নিয়ে এলেই চলবে।"

রাজপাল বেরিয়ে গেলেন। আমি ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে রইলাম। ভিতরের ছোট্ট বন্ধ ঘরটা দেখে, আমার মনের যা অবস্থা হচ্ছিল তা বর্ণনা করবার মতো সামর্থ আজও আমার নেই। কিছুক্ষণ পরেই শুনতে পেলাম, দক্ষিণেশ্বরবাবু আমার নাম ধরে ডাকছেন। "...বাবু আছেন নাকি? লক্ষ্মীটি ভাই একবার জানলার দিকে আসুন না।" আমার যেতে খুব ইচ্ছে করছিল, কিন্তু যেতে পারিনি। একটু পরেই দক্ষিণেশ্বরবাবুর কাতর স্বর আবার শুনতে পেয়েছি। "দয়া করে দরজাটা একবার খুলে দিন না। আমি পালিয়ে যাবো না। শুধু একবার বাথরুমে যাবো।" কিন্তু আমার কোনো উপায় ছিল না। আমার কাছে চাবি নেই। আর থাকলেও হয়তো সাহস করতাম না। আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। রেশন আনবার জন্য উঠে পড়লাম। দক্ষিণেশ্বরবাবুর গলার স্বর তখনও ভেসে আসছিল। কিন্তু সে ডাকে কে সাড়া দেবে? এই জনহীন বিশাল প্রাসাদের বাইরে দক্ষিণেশ্বরবাবুর স্বর গিয়ে পেঁছবে না।

পরের দিন সাড়ে নটার সময় এসে দেখি বাইরের দারোয়ান আমাকে ডাকছে। কাল-রাত্রে সেই "পাগলা" বাবু নাকি নিজের ধুতিটা গলায় জড়িয়ে আত্মহত্যা করেছে। পুলিস এসে গতরাত্রেই লাস নিয়ে গেছে।

রাজপাল সায়েবের কোনো ক্ষতিই হয়নি। পুলিসকে উনি বলেছিলেন, "দেখুন না লোকটার জন্য এতো করলাম, তবু রাখতে পারলাম না। রায়টের পর ওকে যখন উদ্ধার করে নিয়ে এলাম তখন থেকেই ওর মাথার ঠিক ছিল না।"

এতোদিন পরে আজও যখন সেই ভয়াবহ দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়, আমি তখন চারিদিকে তাকিয়ে দেখি দক্ষিণেশ্বরবাবু কোথাও দাঁড়িয়ে আছেন কিনা।

কারুর কাছে আগাম পয়সা নিয়ে ফার্স্ট ক্লাশের ট্রেনে চড়া আমার পক্ষে কোনো দিনই সম্ভব হবে না।

আর আমি রাজপাল সায়েবের খপ্পর থেকে কীভাবে উদ্ধার পেলাম? সে কাহিনী অন্য এক সময়ের জন্য তোলা থাক।

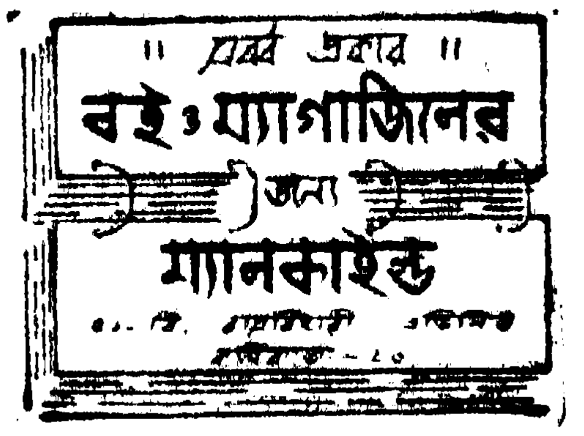

(সি-৮৫৩৯।২)

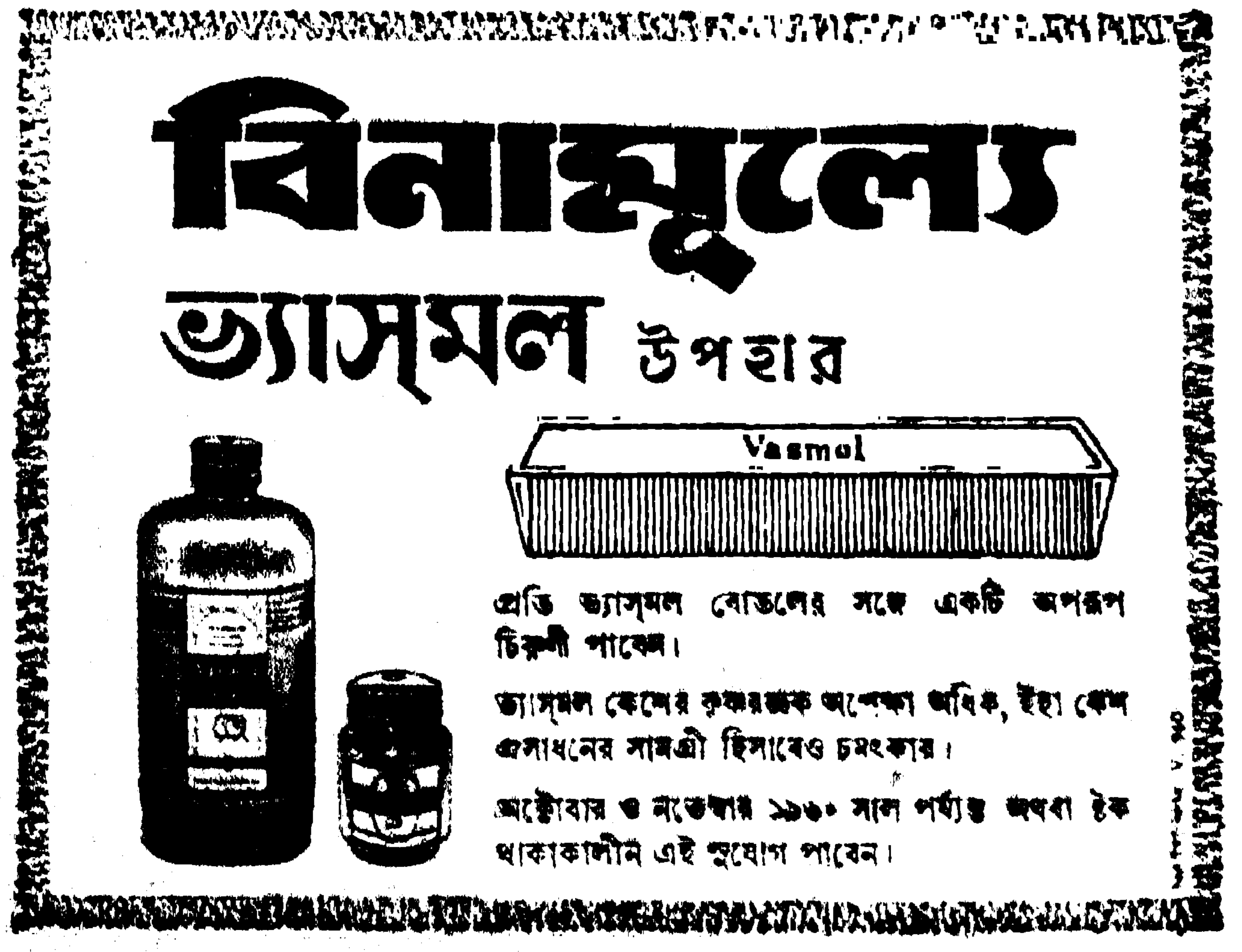

আপনার লাবণ্যোজ্জ্বল মুখশ্রীর জন্যে

পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম ও ফেস পাউডার

মুখশ্রী নিখুঁত রাখার জন্যে

পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীমের স্নিগ্ধ প্রসাধন দরকার — এতে ছোটখাটো কাটা ও দাগ ঢাকা পড়ে। এই ক্রীম চটচটে নয়, কিন্তু এর ওপর পাউডার লেগে থাকে — আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য অম্লান রাখে।

চোখজুড়ানো রঙের জন্যে

খুব হালকা রঙের রেশম কোমল পণ্ডস ফেস পাউডার ব্যবহারে আপনার বর্ণোজ্জ্বল মুখশ্রী মন কেড়ে নেবে ও সারাক্ষণ অপূর্ব সুন্দর দেখাবে।

পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম ও ফেস পাউডার প্রতিদিন একসঙ্গে কিংবা আলাদাভাবে ব্যবহার করে আপনার মুখের লাবণ্য নিখুঁত রাখুন ও দিনে দিনে উজ্জ্বল ক'রে তুলুন — এমন চমৎকার উপায় আর নেই।

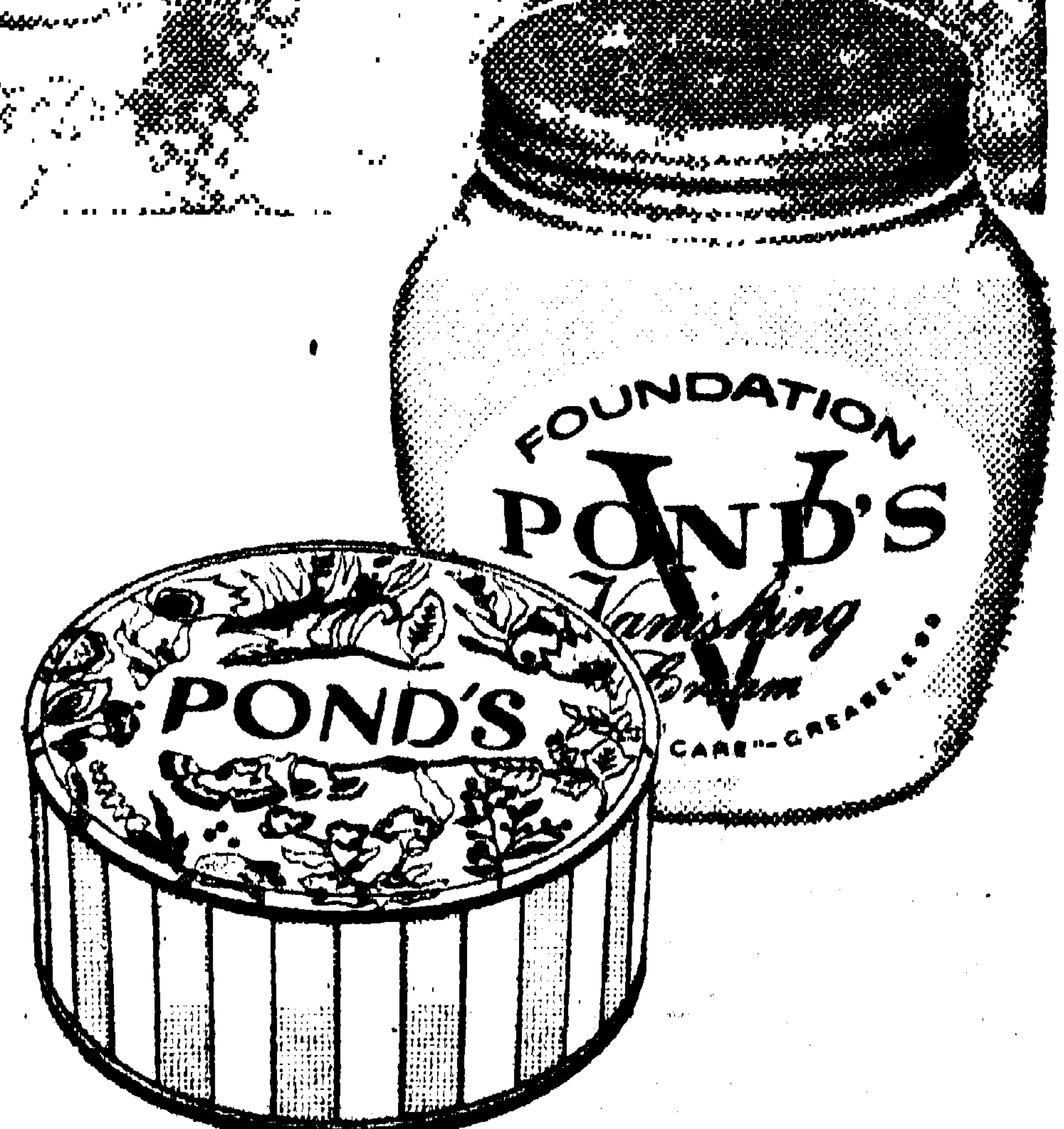

সারা পৃথিবীর সুন্দরী রমণীদের মনের মত প্রসাধন

চীজব্রো-পণ্ডস ইনক্ (সীমিত দায়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সমিতিবদ্ধ)

কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

(৪৬)

সেদিনও জানতো না দীপংকর সতী তাকে এ কোথায় নিয়ে চলেছে। মানুষের জীবনে যখন অভিশাপ আসে তখন সে প্রথমে এমনি আশীর্বাদের ছদ্মবেশেই আসে। তখন তার বাইরের চেহারা দেখে তার আসল রূপটা দেখা যায় না। তাকেই সত্য বলে মনে করি, আনন্দ বলে ভুল করি, বন্ধু বলে অভ্যর্থনা করি। অথচ বেশ তো ছিল দীপংকর। সকলকে ছেড়ে নিজেকে নিয়েই তো সে বেশ ছিল। নিজে আর তার মা। ছোটবেলা থেকে যা সে হতে চেয়েছিল তা সে হতে পারেনি, কিন্তু যা সে হয়েছিল তাই-ই বা কি কম! সেই কমটুকু নিয়েই জীবনে সান্ত্বনা পেতে চেয়েছিল দীপংকর। নিজের জীবনের অসাফল্যকে অনাবশ্যক অভাববোধ দিয়ে পীড়িত করতেও চায়নি দীপংকর। লক্ষ্মীদি ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেখান থেকেও প্রত্যাখ্যানের পর দীপংকর নিজেকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছিল—এমন সময় কেন সতী এল!

পরে একদিন শম্ভু বলেছিল—আপনি তো জানেন না নতুনবাবু, বৌদিমণির জন্যে আমার বড্ড কষ্ট হয়—

দীপংকর একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিল—কেন শম্ভু, তোমার বাবুদের এত টাকা, তবে কষ্ট কেন?

—ওই যে মামণি: মামণি কি সোজা মানুষ ভেবেছেন?

দীপংকর জিজ্ঞেস করেছিল—কিন্তু তোমার দাদাবাবু? দাদাবাবু তো লোক ভাল—

শম্ভু বলেছিল—আজ্ঞে দাদাবাবু তো দেবতুল্য লোক, তার তুলনা হয় না—

—তাহলে তোমার বৌদিমণির কষ্ট কিসের?

শম্ভু এ-কথার উত্তর দিয়েছিল, কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারেনি দীপংকর। সেদিন আফিস থেকে গাড়িতে যেতে যেতেও দীপংকর সেই কথাই আরম্ভ করেছিল। সতীর গাড়ি। এই গাড়িটা চড়েই সেদিন সতী তাকে নেমন্তন্ন করতে গিয়েছিল।

সতী বললে—তোমার অফিসের কাজের ক্ষতি করলাম নাকি?

দীপংকর বললে—না, ক্ষতি আর কি, আমিই আজকে সকলকে কাজ করে না বলে ধমকেছি, আর আমিই আজকে কাজ ফাঁকি দিয়ে তোমার সংগে চলেছি—

—তা একটু না হয় আমার জন্যে কাজে ফাঁকিই দিলে—

দীপংকর বললে—সে জন্যে নয়, কিন্তু কালই তো গিয়েছিলাম তোমাদের বাড়িতে! কাল না-হয় আমার জন্মদিন ছিল কিন্তু আজকে আবার কিসের উপলক্ষ্য?

সতী বললে—তুমি আবার জিজ্ঞেস করছো কেন? আমায় অপমানটা তো তুমি নিজের কানেই শুনলে?

দীপংকর সতীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। বললে—আমি তোমাদের বাড়িতে নতুন মানুষ, সবটা বুঝতে পারিনি, আর তা ছাড়া, আমার কৌতূহলও নেই ও-ব্যাপারে—

—কৌতূহল না থাক, উপকার তো করতে পারো আমার।

—উপকার?

দীপংকর চমকে উঠলো। বললে—আমাকে তুমি আর উপকার করতে বল না সতী! ছোটবেলায় একজনের উপকার করেছিলাম, রোজ ভোরবেলা মন্দিরে-মন্দিরে ফুল দিয়ে আসতাম, সেই সময়ে একজনের খুব উপকার করতাম, অন্তত মনে করতাম তার উপকার করছি বুঝি; কিন্তু সেই উপকারের ফলটা দেখে পর্যন্ত উপকারের ওপর অরুচি ধরে গেছে—

—কার? কার উপকার করেছিলে?

—সে তুমি না-ই বা শুনলে। আর তাছাড়া, তোমার কাছ থেকে উপকারের অনুরোধ শুনলেও হাসি পায় যে—!

সতীও হাসলো। বললে—এখন আর সে-কথা বলতে পারবে না। এখন তুমি অনেক বড়। এখন তুমি অন্য মানুষ, এখন তুমি আর সে-তুমি নেই—

দীপংকর গম্ভীর হয়ে গেল কথাটা শুনে। বললে—কেন?

—এখন তুমি কত বড় চাকরি করো। এখন তুমি কত মাইনে পাও!

দীপংকর আর থাকতে পারলে না।

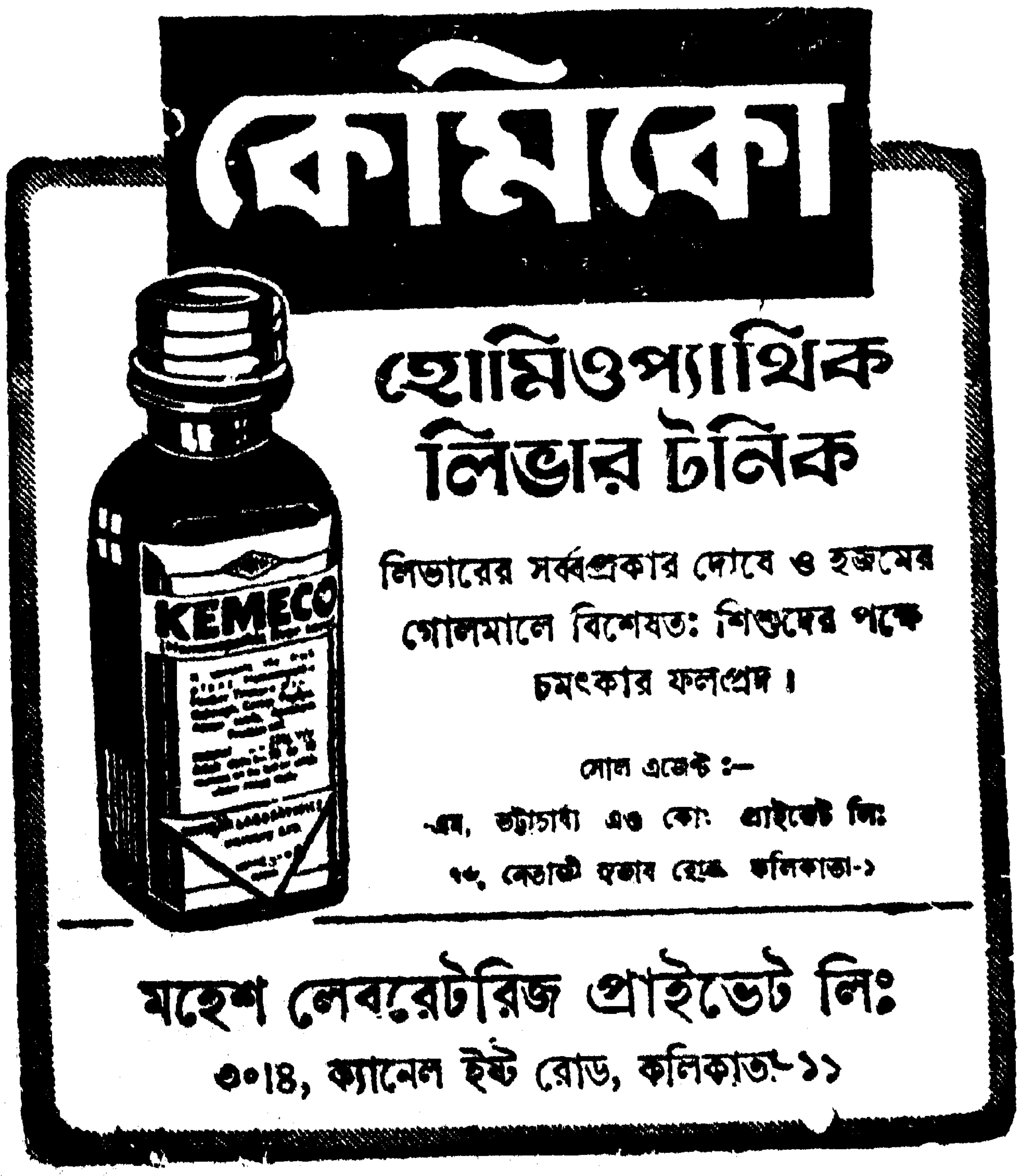

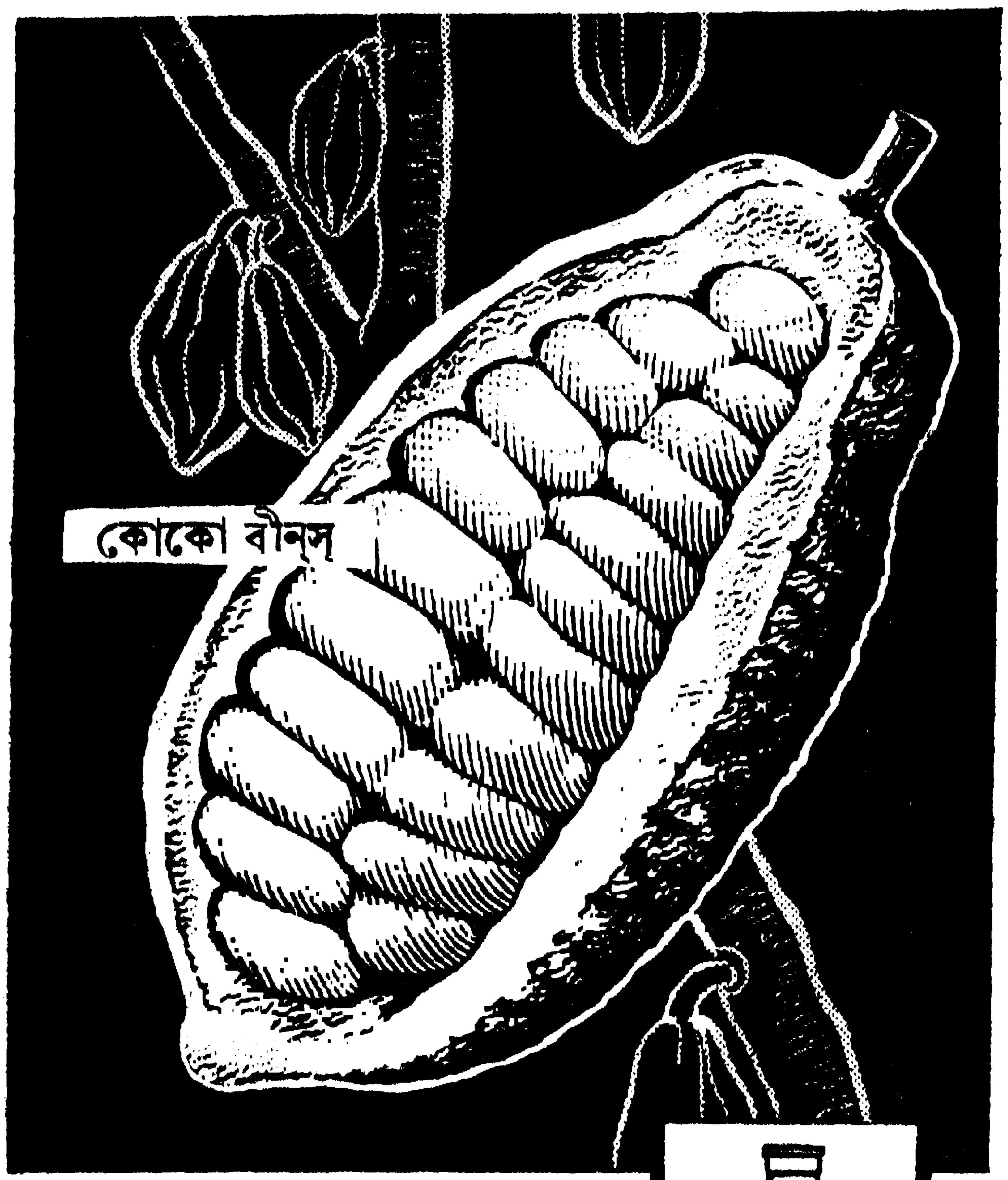

ক্যাডবেরীর চকোলেট আপনার জন্য উপকারী কেন ?

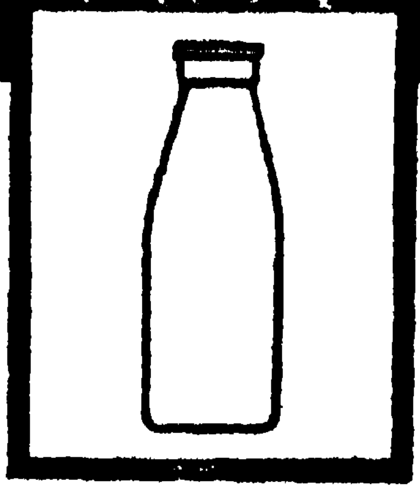
দুধ

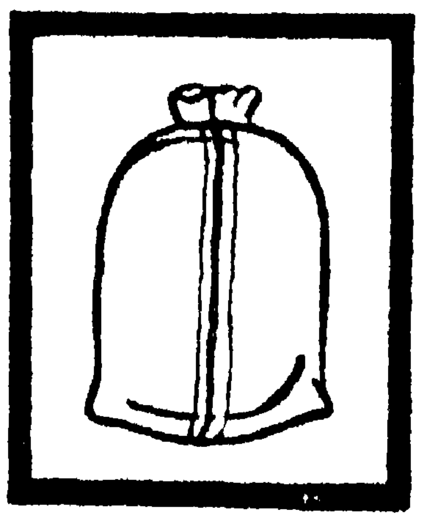
চিনি

কারণ এতে আছে টাটকা দুধ, পরিশুদ্ধ চিনি এবং পুষ্টিকর কোকো বীনের যাবতীয় স্বাভাবিক সদ্‌গুণ এবং দেহে উদ্যম সঞ্চারের ক্ষমতা।

ক্যাডবেরীর মিল্ক চকোলেট ছেলে-বুড়ো সকলেরই অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য, আর খেতেও অতি সুস্বাদু !

ক্যাডবেরী মানেই সেরা

বললে—শেষকালে তুমিও আমাকে অপমান করবে সতী! মাইনে দিয়েই তুমি আমাকে বিচার করবে? তোমার কাছে অন্তত এটা আশা করিনি! তাহলে আমার চেয়ে মিস্টার ঘোষাল বেশি মাইনে পায় বলে তুমি দেখছি কোন্‌দিন তাকেও আমার চেয়ে বেশি খাতির করবে!

সতী বললে—সত্যিই, তোমাদের মিস্টার ঘোষাল কি জঘন্য লোক—

দীপঙ্কর বললে—সব মানুষ তো সমান হয় না—আমার দুর্ভাগ্য যে ওই সব লোকের সঙ্গেই আমাকে কাজ করতে হয়! অথচ দেখ সতী, একদিন এই চাকরির জন্যে কত মাথা খুঁড়েছে আমার মা, কত ঠাকুর দেবতার কাছে মানত করেছে—এখন দেখছি এরা চাকরি দিয়ে টাকা দিয়ে আমার মনুষ্যত্বটুকুও কিনে নিয়েছে—

সতী ঠিক বুঝতে পারলে না কথাগুলো। বললে—কেন, ও-কথা বলছো কেন?

দীপঙ্কর বললে—সে ঠিক তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না। আজকেই অনেকগুলো লোককে খুব বকেছি, খুব ধমক দিয়েছি, কিন্তু বকতে বকতে কেমন মনে হচ্ছিল, আমি যেন নিজেকেই শাস্তি দিচ্ছি, আমার বকুনিগুলো যেন আমার মুখেই ফিরে আসছে! আমি যেন তখন থেকে নিজেই অপরাধী হয়ে আছি তাদের শাস্তি দিয়ে!

—কেন, এ-রকম কেন মনে হয় তোমার?

দীপঙ্কর বললে—জানো সতী, ছোট-বেলায় আমাদের ক্লাসে একটা ছেলে ছিল, তার নাম লক্ষ্মণ সরকার—আমাকে দেখলেই সে চাঁটি মারতো। আমি যে তার কী শত্রুতা করেছিলাম জানি না কিন্তু আমাকে দেখলে সে না-মেরে থাকতে পারতো না! কতদিন তার মার খেয়ে আমি কেঁদেছি, ভেবেছি কেন ও মারে। ছোটবেলায় কারণটা বুঝতে পারিনি আজ বড় হয়ে বড় চাকরি করে বুঝতে পেরেছি—

—কী বুঝেছ?

দীপঙ্কর বললে—বড় হয়ে আজ আমি নিজেও একজন লক্ষ্মণ সরকার হয়ে গেছি। আর শুধু আমিই নয়, আমরা যারা বেশি মাইনের চাকরি করি, যারা একটু অবস্থা ফিরিয়েছি, তারা সবাই লক্ষ্মণ সরকার হয়ে গেছি। আমরা তাই সুবিধে পেলেই দীপঙ্করদের চাঁটি মেরে মজা পাই—

তারপর একটু হেসে বললে—একলা তোমার শাশুড়িকে দোষ দিয়ে লাভ কী!

সতী বললে—তুমি সব জানো না তাই হাসতে পারছো—

দীপঙ্কর বললে—দেখবে, একদিন যখন তুমি নিজেও শাশুড়ি হবে, তখন তুমিও লক্ষ্মণ সরকার হয়ে উঠবে—

সতী বললে—শাশুড়ি আমি আর হবো না—

—কেন, যখন তোমার ছেলে মেয়ে হবে

তাদের বিয়ে হবে, তখন শাশুড়ি হবে বৈ কি!

সতী বললে—তুমি সব জানো না, তাই এইরকম কথা বলছো—

দীপংকর বললে—যেটুকু দেখলাম কাল, তাতেই সব বুঝে নিয়েছি—

—তা যদি বুঝতেই পারলে তো বললে না কেন কিছু?

দীপংকর বললে—আমি আর কী বলবো বলো, আমি আর কী করতে পারি? আমি খেলুম শুধু, পেটে ঢুকছিল না, তবু খেলুম —তোমার মান রাখবার জন্যেই খেলুম—

তারপর একটু থেমে বললে—তারপর তুমি তো গাড়ি করে বাড়ি পাঠিয়ে দিলে, কিন্তু বাড়িতে গিয়ে বিছানায় শুয়েই কি ঘুম আসে—? কিছুতেই ঘুমোতে পারি না—। শেষে ভাবলাম, দূর ছাই, সতীর কথা ভেবে ভেবে আমার ঘুম আসবে না এটা কী রকম!—সতী আমার কে? কেউ না—

সতী বললে—আমারও ঘুম আসেনি দীপু, পরশু রাত্তের পর এখন পর্যন্ত একটুও ঘুমোই নি—

দীপংকর বললে—আর একটু সহ্য করো, তোমার শাশুড়ি তো বুড়ো মানুষ ক'দিনই বা বাঁচবে বড়ী—তারপর তুমি আর সনাতনবাবু—

সতী বললে—আজ সেই জন্যেই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি—

—কিন্তু আমি গিয়ে তোমার কতটুকু সাহায্য করতে পারবো বুঝতে পারছি না—! আমি আজ না-ই বা গেলাম, তাছাড়া, বাড়িতে অনেক কাজ, কিন্তীদিকে সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।

সতী বললে—না না তুমি চলো ওঁকে বলে রেখেছি যে তুমি আসবে, ওঁর সঙ্গে যে তোমার আলাপ করিয়ে দেব। আজকে তোমার যাওয়া চাই-ই আর কিছু নয়, কালকের ব্যাপারের একটা নিষ্পত্তি করা চাই-ই তারপরে তোমাকে আর জীবনে কখনও যেতে বলবো না—জীবনে আর কখনও না গেলেও আমি কিছু মনে করবো না—

এখন মনে হয়, আশ্চর্য, সতী যদি জানতো মানুষের জীবনে কোনও সমস্যার নিষ্পত্তিই এত সহজে হয় না। যদি জানতো যে-সমস্যা নিয়ে সে এমন করে বিপর্যস্ত হয়েছিল তার সমাধান এত সহজে হবার নয়। যদি জানতো এমনি করে মানুষের জীবনে সমস্যাটা প্রথমে ছোট হয়েই উদয় হয় বটে কিন্তু তারপর তাকে বাড়তে দিলে তা আর ছোট থাকে না। সেই ছোটই আবার একদিন বৃহৎ হয়ে দীপংকরকেও উপহাস করতে পারে। যদি জানতো তাহলে আর সেদিন অত আগ্রহ করে গাড়ি নিয়ে একেবারে দীপংকরের অফিসে এসে হাজির হতো না।

গাড়িতে পাশে বসে রয়েছে সতী। আর দীপংকর অন্যমনস্ক হয়ে নানান্ কথা ভাবতে লাগলো। এমন করে নিজেকে সতীর হাতে ছেড়ে দেওয়া তার পক্ষে কি ভাল! সতী বড়লোকের বাড়ির বউ, তার অনেক আছে, অল্প নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই। অনেক আছে বলেই অল্পকে হারাতে তার ভয় নেই কিন্তু দীপংকর কেন যাচ্ছে! কীসের স্বার্থ তার। শুধু একটু সান্নিধ্য! শুধু একটু কথা বলার সুখ!

সতী হঠাৎ বললে—বাঁ দিক ধরে চলো—

গাড়িটা এবার বাঁদিকের রাস্তা ধরলো।

দীপংকর বললে—আমার যেন কী-রকম ভয় করছে সতী—

—কেন কী হয়েছে? কীসের ভয়?

দীপংকর বললে—না, ভয় নয়, তোমাদের সংসারের মধ্যে আমি গিয়ে কেন আবার গণ্ডগোল বাধাই বলো তো—

সতী বললে—না, কোনও গণ্ডগোল হবে না, আজকে ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব যে তোমাকে—কালকে আমারই ভুল হয়েছিল, কালকে ওঁকে ডেকে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেই ভালো হতো—

দীপংকর বললে—তুমি বলছো, যাচ্ছি কিন্তু তোমাদের শাশুড়ি স্বামী তোমাদের পরিবারের মধ্যে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে কী সুরাহা হবে বুঝতে পারছি না—

গাড়িটা আবার সোজা রাস্তায় পড়লো। আর বেশি দূর নয়। বেশ সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। রাস্তায়-রাস্তায় আলো জেলে দিয়েছে। বাড়িতে এতক্ষণ কী হচ্ছে কে জানে। কিন্তীদিকে পাওয়া গেছে কিনা তার ঠিক নেই। বাড়িতে মা'কেও বলে আসা হয়নি। মা-ও হয়ত ভাববে। এখন মা'র আর কোনও কাজ নেই আগের মত। আগে বাড়ি শুদ্ধু লোকের ভাত রাঁধতে হতো। আজ সকাল থেকে বলে বলেও মাকে খাওয়ানো যায়নি। মা কেবল কেঁদেছে। আশে-পাশের সব জায়গায় দেখা হয়েছে। কোথাও নেই! সেই পুরোন বাড়ি। যে-বাড়ির ভেতরে একদিন ঢুকতে কত রোমাঞ্চ হতো, এখন সেই বাড়িরই বাসিন্দা হয়ে গেছে দীপংকর। সতী লক্ষ্মীদি যে-ঘরে শুতো সেই ঘরটাতেই আজ শোবে

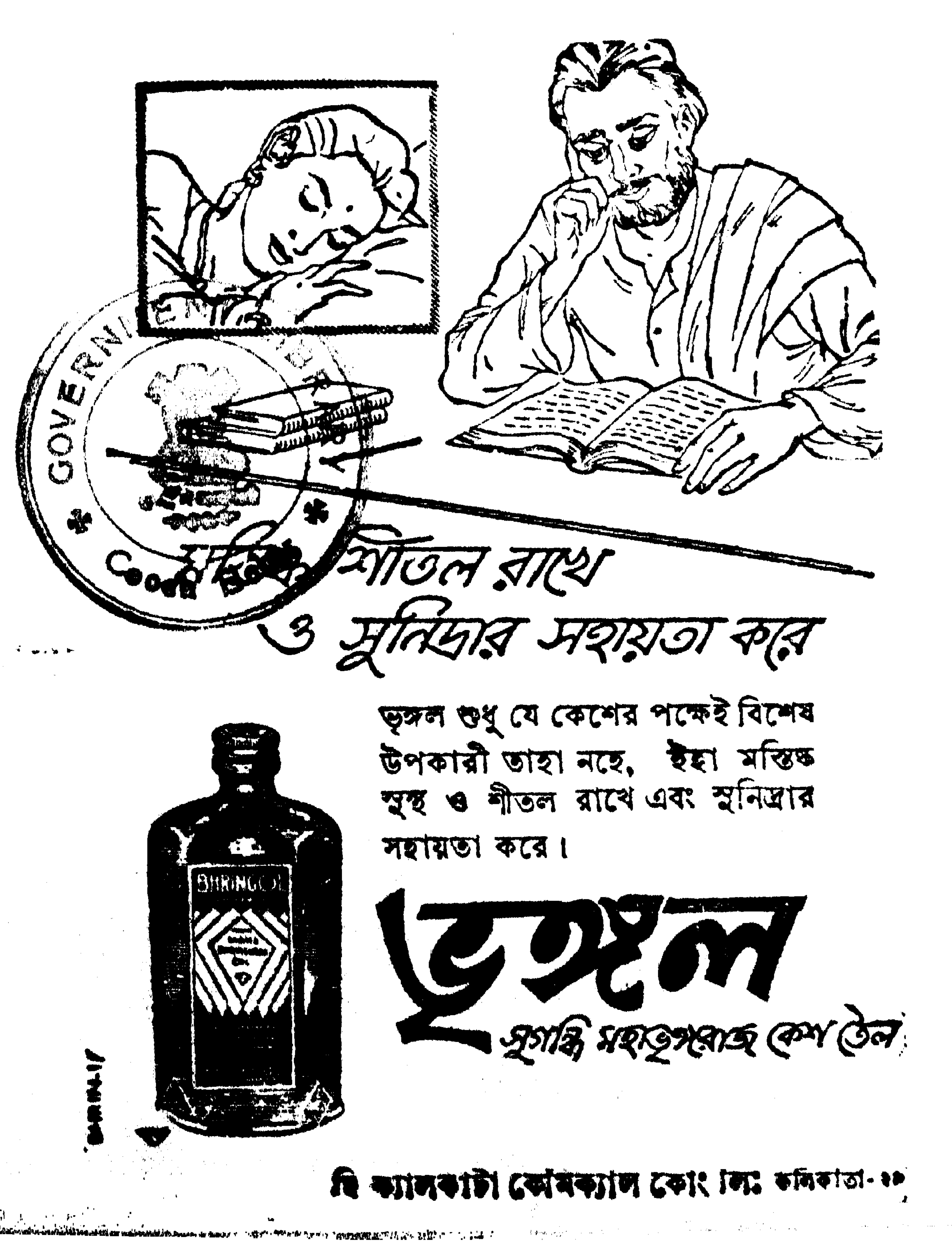

দীপঙ্কর। সেই ঘরেরই চারটে দেয়ালের মধ্যে দীপঙ্করের রাতটা কাটবে!

—নেমে এসো দীপু!

হঠাৎ যেন জ্ঞান ফিরে এল দীপঙ্করের। কালকে এই বাড়িতেই এসেছিল দীপঙ্কর। এই বাড়ির গেট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভেতরে ঢুকেছিল। আজ আবার সেই বাড়ির গেট দিয়ে সতীর গাড়িতে করেই ভেতরে ঢুকছে।

—এসো,—

অফিস থেকেই সোজা আসা। সেই সকাল বেলা বাড়ি থেকে অফিসে গিয়েছে। অফিসে গিয়ে পর্যন্ত এক মিনিটের বিশ্রাম পাওয়া যায়নি। রবিনসন সাহেবের ঘরেই কেটে গেছে দু' ঘণ্টা। সকলের সময় নষ্ট হয়েছে। তারপর স্টাফের সঙ্গে বকাবকি। কিছুই কাজ হয়নি সারাদিনে। টেবিলে ফাইলের পাহাড় জমে গেছে। কালকে সকালে গিয়েই সব পরিষ্কার করতে হবে। তারপর যেটুকু সময় কাজ করার ইচ্ছে ছিল তাও নষ্ট হয়ে গেল সতী আসার পর।

সতী আগে আগে চলছিল। এতক্ষণ

খেয়াল হয়নি। এক গাড়িতে পাশাপাশি বসে আসার সময়ও খেয়াল হয়নি। হঠাৎ মনে হলো সতী কী যেন একটা সেণ্ট্ মেখেছে! দীপংকরের মনের সমস্ত গ্লানিটা যেন এক মুহূর্তে কেটে গেল। কী সেণ্ট! এত চমৎকার গন্ধ! না কি, বাগানের ফুলের গন্ধ। ভারি চমৎকার সতীদের বাগানটা! নানারকম ফুল ফুটে রয়েছে! আজও সেই মার্বেল-ফ্লোর, আজও সেই ক্যাক্‌টাস্, আজও সেই মনোগ্রাম-আঁকা পাপোষ! আজও সেই ঝক্-ঝকে তক্-তকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ!

আজ কিন্তু আর দোতলায় ওঠবার সিঁড়িটার দিকে নয়। আজ একতলাতেই। সতী সামনে সামনে যাচ্ছিল। সিঁড়িটার কাছে যেতেই পেছন ফিরে বললে—এদিক দিয়ে এসো দীপু—

বলে সতী আবার চলতে লাগলো।

দীপংকর বললে—কোথায় নিয়ে যাচ্ছো আমায় এদিকে?

কত বড় বাড়ি সতীদের। বাইরের রাস্তা থেকে এতখানি বোঝাই যায় না। বোঝা যায় না—ভেতরে এত ঘর আর এত কম লোক! বোঝা যায় না—এত বিরাট বাড়ির মধ্যে এত বারান্দা আর এত করিডোর আর এত কিছু অতিক্রম করে তবে সনাতনবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হয়।

—আর কতদূর, সতী?

সতী বললে—তোমার ভয় নেই, এসো না—

সে কবেকার কথা। কত কাল আগে স্টিভেডোর শিরিষ ঘোষ সবে কলকাতার সাহেব কোম্পানীর আমলে বেশ পসার জমাতে শুরু করেছেন। সস্তা-গন্ডার সময় তখন। দু'তিন টাকা চালের মণ। চার আনা করে দুধের সের। কিন্তু সেই সস্তা-গন্ডার আমলেও মেদিনীপুরে দুর্ভিক্ষ হতো, ফরিদপুর বন্যায় ভেসে যেতো। সনাতনবাবুর কাছেই সে-সব কাহিনী শুনেছিল দীপঙ্কর। নিজেদের বাড়ির নিজেদের বংশের সব পুরোন কাহিনী। দেয়ালে দেয়ালে পূর্বপুরুষদের ছবি টাঙানো। পূর্বপুরুষ বলতে নাম-করা কেউই নেই। কবে বর্ধমান বা হুগলী কোন জেলা থেকে এসেছিলেন শিরিষ ঘোষ। খিদিরপুর ডক্ তখন তৈরি হয়েছে। মাল ওঠানো নামানো আর কুলি-মজুর খাটানো এক সমস্যার ব্যাপার। জাহাজ এসে পৌঁছোলে সবাই ভিড় করে দাঁড়াতো গিয়ে। রাতারাতি সাহেবদের ঠকিয়ে, সাহেবদের চোখ বুজিয়ে অনেক মাল পাচার হয়ে যেত বাইরে। সাহেব কোম্পানী টেরও পেত না সে-সব। কাপড় আসতো ম্যাঞ্চেস্টার থেকে,

সবই আসতো জাহাজে। তখন তারা [stamp] দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। সাহেব গুদামও তৈরি হয়নি। বৃষ্টিতে মাল [stamp] কোম্পানীর বড়কর্তা পামারস্টোন্ সাহেব ভিজতো, রোদে পুড়তো। সাহেবরা আমদানি-রপ্তানির কাজে হাজার-হাজার টাকা লগ্নী করেছে, ছোটখাটো ব্যাপারে নজর না-দেওয়ায় লোকসান হতো মাঝে-মাঝে। শিরিষ ঘোষ তখন ছোট ছেলেটি। ভাগ্য অন্বেষণে হাজির হয়েছিল খিদিরপুর ডকের ধারে। ঘুরে বেড়াত কাজের সন্ধানে। ভাবতো যদি জাহাজে চড়ে বিলেত যাওয়া যায় একবার তো ভাগ্য ফিরিয়ে নেবে চির-কালের মত। কিন্তু সে-আশা সফল হয়নি তাঁর। ভাগ্য ফিরলো অন্য রকম ভাবে।

একদিন জাহাজ থেকে নামাবার সময় একটা ক্রেন জেটির ওপর পড়ে গেল। বিরাট একটা ক্রেন। মাল জাহাজে ওঠানো-নামানোর জন্যে তখন সবে কলকাতায় ক্রেন আমদানি করছে সাহেব কোম্পানী। সেই বার্মিংহামে তৈরী ক্রেন জেটিতে নামাতে গিয়ে পড়ে গেছে। জখম হয়েছে অনেকে। কেউ আর কাজ করতে চায় না। শিরিষ এসে হাঁক-ডাক করছিলেন খুব। কিন্তু নেটিভ-নিগাররা কেউ কাজ করতে চায় না। তখন শিরিষ ঘোষ এগিয়ে গেলেন। ভাঙা ইংরিজীতে বললেন—আমি ক্রেনটা তুলে দিতে পারি হুজুর—আমার কুলি-মজুর আছে—

—কে তুমি? হু আর ইউ?

শিরিষ ঘোষ বললেন—আমি পুওর ম্যান স্যার—পুওর ম্যানস্ সন্—

তা আনো। আনো লোক, আনো কুলি-মজুর। তখুনি শিরিষ ঘোষ চলে গেলেন মুন্সীগঞ্জে। সেই ঝাঁ ঝাঁ করছে রদ্দুর। মুন্সীগঞ্জের একটা খোলার চালের খুপরিতে তখন থাকতেন তিনি। মা'র একজোড়া সোনার অনন্ত ছিল তাঁর তখন শেষ সম্বল। সেইটি নিয়েই তখুনি বেরিয়ে পড়লেন বাজারে। স্যাকরার দোকানে গিয়ে বেচে দিলেন সে-দুটো। খাঁটি গিনি সোনার অনন্ত। যখন আর কিছু জুটবে না

murphy radio
পূর্ব ভারতের একমাত্র পরিবেশক
দেবসনস্ প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা * পাটনা
অনুমোদিত ডিলার্স
ইস্টার্ণ ট্রেডিং কোং
২, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা—১। ফোন : ২২-৩১৩৮

কুমারেশ
লিভার ও পেটের পীড়ায়

তখনকার জন্যে রেখে দিয়েছিলেন লুকিয়ে। তখন আর বেশি ভাববারও সময় নেই। পাঁচ ভরির অনন্ত। বারো টাকা করে তখন সোনার। বাট টাকায় দিলেন সে-দুটো বেচে। টাকাগুলো পকেটে নিয়ে মুন্সীগঞ্জের কুলিপাড়ায় গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে তখন বহু কুলির আড্ডা। সকলকে আগাম চার আনা করে বিলোতে লাগলেন। তাদের সবাইকে নিয়ে হাজির হলেন জেটিতে। দেড়শো কুলি। এখন এই চার আনা করেই নাও সবাই, বাকিটা পরে পাবে। জেটিতে যেতেই সাহেব কুলি-মজুর দেখে খুব খুশী। মাথার ওপর কাঠ-ফাটা রোদ, তখনও লাঞ্চ খাওয়া হয়নি।

পামারস্টোন্ সাহেব দেখেই বললেন—কী পুওর ম্যান, কুলি এনেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, দরকার হলে আরো আনতে পারবো।

তা সেই ক্রেণ উঠলো শেষ পর্যন্ত। নির্বিঘ্নেই উঠলো। হৈ হৈ শব্দ করে ক্রেন উঠলো। পামারস্টোন্ সাহেব খুব খুশী। আর সেই থেকেই শিরিষ ঘোষের ভাগ্য ফিরলো। ক্রেন ওঠার সংগে সংগে শিরিষ ঘোষেরও ভাগ্য উঠলো।

আর তারপর থেকেই শুরু হয়েছে আর এক নতুন মহাজনের ইতিহাস। কলকাতার এই দক্ষিণে তখন সব সুরকির রাস্তা। কিছু কিছু মেঠোপথ। কিছু বাঁশঝাড় আর কিছু ধানজমি। হাজরা রোডের দক্ষিণ দিকে তখন সবটাই জংগল। সেই সময়েই এই মাঠের কোণে এসে বসতবাড়ি করলেন নতুন মহাজন শিরিষ ঘোষ। যখন টাকা ছিল না, তখন মুন্সীগঞ্জের খোলার বস্তিতে তাঁর দিব্য চলে যেত। কিন্তু টাকা হাতে আসার পর আর তা চললো না। টাকার কী অদ্ভুত ম্যাজিক। মানুষ যন্ত্র আবিষ্কার করে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে, আকাশে পাখা চালিয়ে দূরত্বকে জয় করেছে। রেলগাড়ি, স্টীম ইঞ্জিন, মোটরগাড়ি চড়ে রূপকথার দৈত্য-দানব রাজকুমাররা এক পদক্ষেপে সাত-সাত ক্রোশ পথ পাড়ি দিয়েছে। সবই সম্ভব হয়েছে। কিন্তু নতুন যন্ত্রযুগের সব আবিষ্কারকে ম্লান করে দিয়েছে টাকা। নতুন সমাজের বনেদ হলো বংশ-গৌরব নয়—টাকা। যা কিছু হচ্ছে পৃথিবীতে, যা কিছু ঘটছে, যত প্রেরণা যত গবেষণা, যত উদ্যম আকাঙ্ক্ষা উত্থান সবই এই মুদ্রার মোহে। শিরিষ ঘোষ যখন কোম্পানী খুললেন খিদিরপুরে, যখন বাড়ি করলেন ভবানীপুরে, তখন সবে মাত্র টাকার পাখা গজাচ্ছে! আগেকার দিনে শ্যামবাজারের বনেদী পাড়ার টাকা থাকতো আরাম করে লোহার সিন্দুকের মধ্যে ঘুমিয়ে। বাইজী-নাচের আসরে আর শুঁড়িখানায় তার খাতির ছিল অনেক। কিন্তু এবার আর বাইজী নয়, টাকা নিজেই ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগলো। কারবারের টাকা ব্যাঙ্কের সিন্দুকে এসে আর ঘুমিয়ে রইল না, বাইরের জগতে ঘুরপাক খেয়ে বেড়াতে লাগলো। সে হলো সচল সজীব গতিশীল টাকা! এ যুগে টাকা শুধু গতিশীল নয়, এ-যুগে টাকা হলো ক্রিয়েটিভ্। টাকা বংশবৃদ্ধি করতে লাগলো। টাকা যত বেশি চলতে লাগলো, তত বাড়তে লাগলো। এ-যুগের মহাজনদের আর বাইজীদের নাচের আসরে টাকা খরচ করতে হলো না—। টাকা নিজেই নেচে মর্যাদা বাড়াতে লাগলো। সবই এ-যুগে বেচা-কেনার পণ্য হয়ে উঠলো। টাকা নিজে রূপান্তরিত হয়ে সকলকেই রূপান্তরিত করে দিলে। স্নেহ দয়া মায়া ভালবাসা সবই হলো টাকার শিকার। মানুষ নিজেই একদিন টাকার পণ্য হয়ে উঠলো। তাই টাকা যাকেই ছুঁলো, যা কিছু স্পর্শ করলো সব সোনা হয়ে উঠলো। আগেকার যুগে মুনি-ঋষিদের হাড়েও এমন ভেলকি খেলতো না। আগে ছিল 'ডেথ্ দি লেভেলার', এখন হয়েছে 'টাকা দি লেভে-লার'। মৃত্যুর চেয়েও কঠিন, মৃত্যুর চেয়েও শক্তিশালী টাকা। টাকা সমস্ত শ্রেণীভেদ ভেঙে দিয়ে নিজের নতুন কৌলীন্য হাজির করলো। টাকা স্বর্গ তো বটেই—টাকাই হলো শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তাছাড়া, টাকাই বংশ, টাকাই গোত্র, টাকাই শ্রেণী! নতুন করে যে-শ্রেণীতে শিরিষ ঘোষ ঠাঁই পেলেন, সে সমাজও টাকায় তৈরি। সবার চেয়ে বড় কুলীন টাকা, সবার চেয়ে বড় ব্রাহ্মণ টাকা আসলে রক্তই হলো টাকা, রক্তের মতন টাকাই সমাজের শিরা-উপশিরার মধ্যে প্রবাহিত হতে লাগলো তখন থেকে।

এই এত যে টাকা ক্ষমতা, এ শিরি

চোখের ক্ষতি ক'রে নয়...

বাচ্চাদের যদি বেড়ালের চোখ থাকতো তা'হলে ভাবনা ছিলনা—ওরা অন্ধকারেও দেখতে পেতো! ওদের কম আলোতে পড়তে দেওয়া মানেই চোখের অপূরণীয় ক্ষতি করা। তাই ফিলিপ্স আর্জেন্টা

ওকে স্বচ্ছন্দে পড়তে দিন

বাল্ব লাগিয়ে নিন। উজ্জ্বল অথচ আরামদায়ক আলোতে স্বচ্ছন্দে পড়তে পারবে—চোখের ক্ষতি হবে না। ওরা নিজেরাই বলবে, ফিলিপ্স আর্জেন্টার আলোতে পড়া কত সহজ!

৪০, ৬০, ৭৫, ১০০ ও ১৫০ ওয়াট্স-এর পাওয়া যায়

PHILIPS

ফিলিপস আর্জেন্টা

উজ্জ্বল আলো, চোখে লাগে না

ফিলিপস ইণ্ডিয়া লিমিটেড

ঘোষ বুঝেছিলেন বৈ কি। বুঝেই টাকার পেছনে এত ছুটেছিলেন। কিন্তু আর একটা দিকও নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন বোধহয়। কারণ তখন দক্ষিণেশ্বরে এক পরমহংস প্রচার করছেন—মাটি টাকা, টাকা মাটি। কিন্তু তখন খুব দেরি হয়ে গিয়েছে। ততদিনে টাকার পাহাড় জমিয়ে ফেলেছেন তিনি। বাড়ি গাড়ি করে, বাগান, জমিদারী, আবাদ কিনে টাকার ক্ষমতাটাও বুঝেছেন, টাকার জ্বালাটাও বুঝে নিয়েছেন। তিনি দেখেছিলেন, যারা একদিন প্রথমে জীবনে তাঁকে আশ্রয় দেয়নি, টাকা হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আশ্রয়ে এসে তাঁকে তোষামোদ করেছে। টাকার সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সব জুটেছে। যত ভক্ত-সংখ্যা বেড়েছে, যত গলগ্রহদের সংখ্যা বেড়েছে, তত টাকার জ্বালা বুঝেছেন। শেষ জীবনে নিজের সহধর্মিণীর মৃত্যুতে সেটা আরো বেশি করেই বুঝেছিলেন। তারপর একদিন গিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। তখন সেখানে অনেক ভক্তের ভিড়। কিছু কথা বলবার সাহসও হয়নি, সুযোগও হয়নি। নিজের অগাধ টাকার অপরাধে তখন নিজেই তিনি অপরাধী, তাই আর মুখ খুলতে পারেন নি। তারপর শেষকালে একদিন তো মারাই গেলেন।

শিরিষ ঘোষ আর বেশিদিন বাঁচলে কী হতো বলা যায় না, হয়ত সব সম্পত্তি-টম্পত্তি বিলিয়ে যেতেন দু'হাতে। কিন্তু তখন ছেলের হাতে এসে পড়লো সেই অগাধ টাকা। ছেলে শুধু নয়, পুত্রবধূর হাতে। আজ তিন পুরুষ ধরে সেই টাকা বেড়ে বেড়ে এখন এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছিয়েছে যে, খরচ করে উড়িয়েও তা আর ফুরোন যাবে না।

গাড়িতে আসতে আসতেই সতী বলেছিল—এ-বাড়ির যদি এত টাকা না থাকতো তো বোধ হয় ভালো হতো দীপু—

—কেন, টাকার জন্যেই তো আমরা সব এত চাকরি-বাকরি করছি, টাকার জন্যেই তো এই দাসত্বের জ্বালায় জ্বলছি—টাকা থাকলে কি আর এত সইতে হতো!

—না, তুমি জানো না দীপু, সকলের সব জিনিস তো সয় না, এদেরও তেমনি টাকা সয় না।

—সে কি! টাকা কি এরা ওড়ায়?

সতী বলেছিল—সে তো তবু বরং ভালো ছিল, তাতেও বুঝতাম এরা বেঁচে আছে, কিন্তু সে-ক্ষমতাও যে এদের নেই, টাকা ওড়ানোতেও ক্ষমতার দরকার হয়, সাহসের দরকার হয়, মেজাজের দরকার হয়—

সেই যে কবে একদিন তিন পুরুষ আগে শিরিষ ঘোষ বলে গিয়েছিলেন—টাকা বড় নচ্ছার জিনিস। এরা বুঝি [illegible] কার্থ করেছে। [illegible]

শেয়ারে সেই যে টাকাগুলো আটকে রেখেছে, তার থেকে আর নড়চড় হবার যেন উপায় নেই। শুধু টাকাই আটকে রাখেনি, টাকার সঙ্গে শিরিষ ঘোষের অধস্তন পুরুষ তাদের আত্মাও আটকে রেখেছে, তাদের সম্ভ্রম, বনেদিআনা, পৌরুষ সব কিছু গচ্ছিত রেখে দিয়ে এসেছে ব্যাংকে। দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। সম্ভ্রমের এক তিল নষ্ট হলেই তাদের যেন লোকসান হয়ে যাবে, বনেদিয়ানার এক চুল নষ্ট হলেই যেন তাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। অর্থের সঙ্গে সঙ্গে বুঝি পরমার্থকেও তারা বন্দী করে রেখেছে ব্যাংকে। ব্যাংকের সেফ্ ডিপোজিট্ ভল্টে। পৃথিবী যদি একদিন রসাতলেও যায়, যদি প্রলয়-পয়োধি জলে সর্বকিছু একাকার হয়ে যায় একদিন, তবু তাতেও তাদের বনেদিয়ানা ধ্বংস হবে না! প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের গেট-এ দরোয়ান বসিয়ে, ব্যাংকের পাশ-বই সিন্দুকে আটকে রেখে তাই তাঁরা তাঁদের আভিজাত্যকে বন্দী করতে চেয়েছিলেন। যেন কিছুতেই না খোয়া যায়, যেন কিছুতেই না গায়ে আঁচড় লাগে সেখানে! কিন্তু কে জানতো বর্মায় মানুষ হওয়া একটা আশ্চর্য মেয়ে সে-বাড়ির বউ হয়ে ঢুকে তিন-পুরুষের সমস্ত ধ্যান্-ধারণা এমন করে তছনচ্ করে দেবে!

দীপংকরও বুঝতে পারেনি তার সেই জন্মদিনে নেমন্তন্ন খেতে যাওয়ার জের এমন করে এতদিন ধরে চলবে। এমন মর্মান্তিক তার পরিণতি হবে!

সতী সামনে সামনেই চলছিল। বললে—এসো, ভেতরে এসো, এইখানেই উনি আছেন—

দীপংকর বললে—এ কোথায় নিয়ে এলে?

সতী বললে—এইটেই ও'র লাইব্রেরী-ঘর, এখানেই ও'র বেশির ভাগ সময় কাটে—

(ক্রমশ)

সর্বঋতুর সঞ্জীবনী
দই মিষ্টি
গাঙ্গুরাম গ্র্যাণ্ড সন্স্
ভবানীপুর ও কালীঘাট — কলিকাতা —
ফোন: ৪৭-২৩৭৭

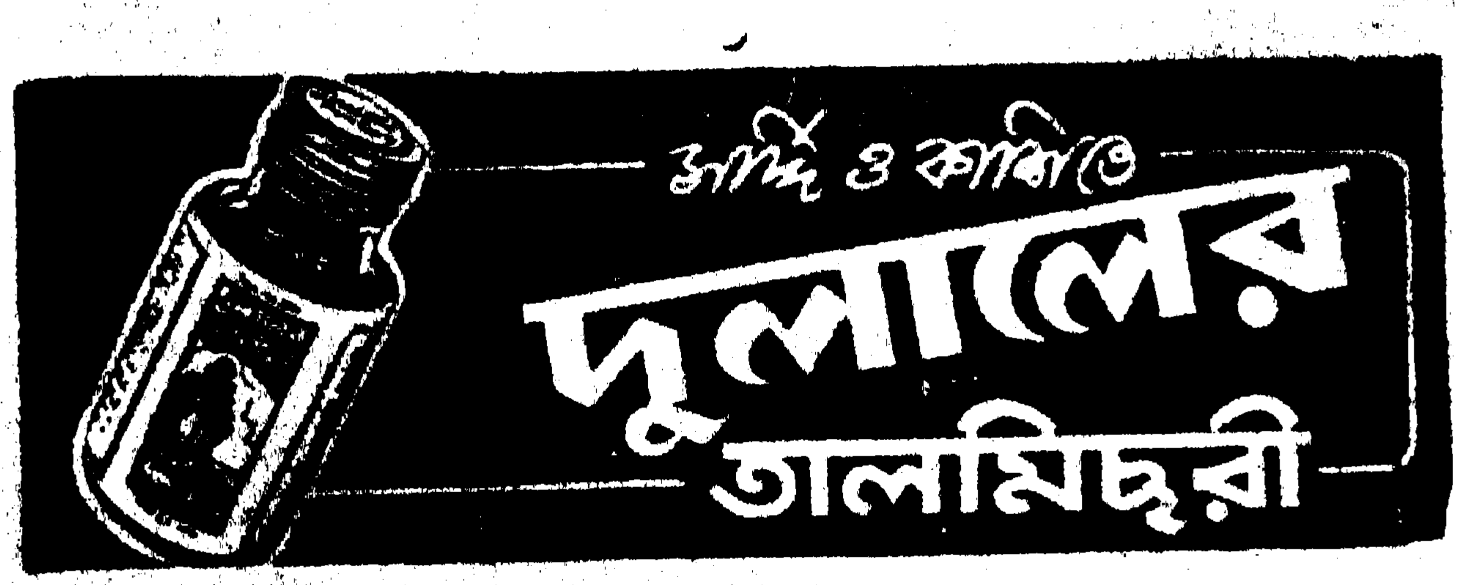

সতীশ কবিরাজের
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল
পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য বিজ্ঞানাচার্য স্বর্গীয় ডাঃ জ্ঞান-চন্দ্র ঘোষ ডি. এস. সি কর্তৃক পরীক্ষিত ও সুবাসিত।
আর্য ঔষধালয় · কলিকাতা

॥ ১২ ॥

আমাদের বাগানের গাছগুলির খুব যে একটা পরিচর্যার প্রয়োজন হত তা নয়। তারা ছিল বেশ খানিকটা স্বাবলম্বী। আমরাও সহজভাবে তাদের সঙ্গে মিলে মিশে তাদের মধ্যে বিচরণ করতে পারতুম। মালি ছিল মাত্র দুটি—তার মধ্যে একজন সর্দার মালি, যে মনে করত সর্দারি করাই তার কাজ এবং যে-হেতু তার অধীনস্থ বারো-চৌদ্দজন মালি কমতে কমতে এক-এ এসে দাঁড়িয়েছিল, সে তাই সর্দারীও করত না, মালির কাজও করত না। বাগানের গাছ-গুলির যেটুকু তদারক দরকার তার ভার নিয়েছিলেন মেজদাদামশায়। দোপাটি, কস্‌মস্, গাঁদার বীচি এনে যোগী মালি মেজদাদামশায় নির্দেশ নিত কোথায় লাগানো হবে। সরু রাস্তার ধারে ধারে জায়গাগুলি দেখিয়ে দিতেন মেজদাদা, যোগী মালি চারা লাগাতো। সন্ধ্যামণির আর কুন্দফুলের ঝোপ কোথায় বসবে, স্থলপদ্ম, সোঁদাল, বকফুল বাগানের কোন জায়গায় লাগালে বেমানান হবে না, রঙ্গনের ঝাড় কতটা ছাঁটা দরকার, এসব ভাবনা ছিল মেজদাদার। গোল-বাগানের কোকো-গাছ আর কুমায়ুন পাইনের গাছও শুনেছি মেজদাদা লাগিয়ে-ছিলেন। বড়দাদা আর দাদামশায় এ নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তাঁরা শুধু দেখে খুশী হয়ে জানিয়ে দিতেন তাঁদের 'অনুমোদন। বড়দাদা দুপুরের ঘুম সেরে বারান্দায় বেরিয়ে এসে চোখ দুটোকে সরু করে এনে বাগানের সবুজ ঘনিমার দিকে চেয়ে থাকতেন। কি দেখতেন তিনিই জানেন। তারপর মাথাটা একটু তুলে নারকেল গাছের চুড়োগুলো একবার দেখে নিয়ে এঁকে ফেলতেন শরতের আকাশ-পটে নারকেল-শ্রেণীর ছবি কালোয় সাদায় চীনে কালি দিয়ে। বর্ষার সময় দেখেছি মহানিম আর বকুল গাছ পাতার ভারে জলে ভিজে নুয়ে পড়েছে—আর বড়দাদা তারই সঙ্গে দুটি-চারটি চাতক-পাখি জুড়ে দিয়ে চমৎকার একটা ভিজে ভিজে ছবি আঁকছেন। বড়-দাদার অনেক ছবি থেকেই জোড়াসাঁকো বাগানের গন্ধ পাওয়া যেত।

দাদামশায় বাগানের শখ ছিল একটু অন্যরকম। বড় গাছ, ফলের গাছ বা ফুলের গাছ তিনি কোনোদিন লাগান নি। গোল-বাগানে ঢোকবার মুখে সরু সরু কাঁটাওয়ালা একটা মনসার ঝোপ ছিল, লাল লাল ফুটকীর মতো ফুলে ভরা থাকত ঝোপটা বার মাস। শুনেছিলুম, ঐটিই নাকি একমাত্র গাছ যা বাগানের মাটিতে দাদামশায় লাগানো। এ ছাড়া, ছিল দাদামশায় অনেকগুলি চীনে-মাটির টব। সেই টবে তিনি মাটি আর পাথর ভরে নানারকম গাছ লাগাতেন আর দেখতেন যাতে তারা কিছুতেই বড় হতে না পারে। গাছগুলি ছোট্টটি হয়ে থাকত চিরকাল। জাপানীরা যেমন বনসাই করে তেমনি। গোলবাগানের উত্তর দিকটা, যার বাঁদিকে ছিল বাঁশের মাচার উপর মাধবীলতার ঝাড় আর যার ঘন পাতার মধ্যে বাসা বাঁধত ঘুঘু আর টুনটুনি আর যার শুকনো পাতা কুড়িয়ে আমরা খেলাঘরের ঝাঁটা বাঁধতুম, তারই ঠিক মাঝখানে টালি-বাঁধানো রাস্তার ধারে সারি

বদহজম?

তা'হলে এই সাধারণ পরীক্ষাটি করুন—

পেটব্যথা, গা বমিবমি অথবা পেটফাঁপা—অম্লাধিক্যের এই অস্বস্তিকর লক্ষণগুলি দেখা দেবার সাথে সাথেই ম্যাক্লীন ব্র্যাণ্ড ইনডিজেশন পাউডারের একটি মাত্রা খেয়ে নেবেন। "ম্যাকলীন কার্বোনেটস্" এবং "এ্যালুমিনিয়াম্ হাইড্রক্সাইড" এর সমন্বয়ে প্রস্তুত এই অপূর্ব্ব ঔষধটি আপনাকে অবিলম্বে দীর্ঘস্থায়ী আরাম এনে দিয়ে প্রমাণ করে দেবে যে ম্যাক্লীন ব্র্যাণ্ড ইনডিজেশন পাউডার শুধু পাকস্থলী থেকে অতিরিক্ত অম্লরস দূর করে না, সাথে সাথে এর পুনর্গঠন প্রতিরোধ করে।

ম্যাকলীন ব্র্যাণ্ড
ইনডিজেশন পাউডার

সারি ইঁটের ধাপের উপর সাজানো থাকতো দাদামশায় বন্‌সাই। এরই থেকে একটি দুটি টব-সুদ্ধ গাছ—যেগুলির গড়ন বেশ মানান-সই হয়ে উঠেছে—মাঝে মাঝে দোতলার বারান্দায় এনে তুলতেন। বারান্দার পূব-রেলিংএর গায়ে কাঠের পাটা লাগানো ছিল। তারই উপর বসিয়ে দিতেন তাদের। নিজের চেয়ারে বসে দেখতেন ছোট্ট গাছগুলির পিছনে ভোরের সূর্যোদয় হচ্ছে, পূর্ণিমার চাঁদ উঠছে।

এই গাছগুলির মধ্যে সব সেরা ছিল একটি তেঁতুল গাছ। অনেকে দেখে গেছেন এ গাছ। যথেষ্ট গর্ব ছিল দাদামশায় এ গাছের। তেঁতুল গাছটির উপর দাদামশায় সবচেয়ে বেশী যত্ন ছিল। গুঁড়ি যখন নরম ছিল তখন দড়ি দিয়ে বেঁধে তাকে নুইয়ে নতশির করে দিয়েছিলেন। আমরা সেইভাবেই তাকে দেখেছি। ছোট ছোট কচি-পাতায় ভরে যেত ডালপালা। গাছতলার নুড়িগুলি শেওলায় ঢাকা পড়ে সবুজ হয়ে উঠত। ফড়িং উড়ে এসে বসত তার ডালে। গাছটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নিজেরা ছোট্ট হয়ে যেতুম, আর গাছটাকে মনে হত বিরাট এক যক্ষ—বড় বড় পাথরের গায়ে পাকিয়ে পাকিয়ে তার শিকড়গুলো মাটির গহ্বরে ঢুকে গেছে। গাছ-তলাটা যেন অন্ধকার রহস্যে ভরে থাকত।

শুনেছিলুম, কাসাহারা নামে এক জাপানী ছুতোর মিস্ত্রি জোড়াসাঁকো বাড়িতে কাজ করতে এসেছিল। কাঠের কাজে আশ্চর্য তার হাত। কিন্তু দাদামশায় হঠাৎ যেটা আবিষ্কার করে ফেললেন সেটা আরো আশ্চর্যজনক। কাসাহারা শুধু ছুতোরের কাজই জানে না, জাপানী উদ্যান-শিল্পে, যাকে বলে ল্যান্ডস্কেপ্ গার্ডেনিং, তাইতে তার পাকা হাত। দাদামশায়রা তাকে নিয়ে বাগানে নামলেন। বললেন—দেখ দেখি কাসাহারা এই বাগানটা। কিছু করতে পারো এটাকে নিয়ে?

কাসাহারা বললে—আপনাদের লাইব্রেরী ঘরের দরজা-জানলাগুলোয় হাত লাগিয়েছি—ওটা আগে শেষ করি। তারপর দেখা যাবে। তবে একখানা গাছে এখনই অস্ত্র চালানো যায়। আসুন আমার সঙ্গে।

এই বলে দাদামশায়দের নিয়ে ফিরে এল লাইব্রেরী ঘরে। লাইব্রেরী ঘরের পূবদিকের দেয়ালে কাসাহারা যে গোল জানলাটা ফোটাচ্ছিল তার পিছনে এনে দাঁড় করাল দাদামশায়দের। বললে—দেখুন সামনের ঐ গাছটা। সামনে ছিল একটা প্রকান্ড শিশু-গাছ শাখা-প্রশাখা নিয়ে। আঙুল দিয়ে দুটো মোটা মোটা ডাল দেখিয়ে বললে—ঐ দুটোকে উড়িয়ে দেব। পূবের আকাশটাকে ঢেকে রেখেছে। খুলে দিই একবার আকাশটা, তারপর দেখবেন পূর্ণিমার চাঁদ কেমন ওঠে।

এই বলে কাসাহারা হাতে এক কুঠার নিয়ে নিজেই গিয়ে উঠে পড়ল সেই শিশু গাছে। তারপর কোপ মেরে উড়িয়ে দিল মাঝখানের মোটা মোটা দুটো ডাল। গাছটার ঈষৎ বক্র দুই প্রকান্ড বাহুর মাঝে সমস্ত পূবের আকাশটা বেরিয়ে পড়ল। জানলা আর বাগান, বাগান আর গাছ, গাছের সঙ্গে আকাশ। কাসাহারার হাতে পড়ে লাইব্রেরী ঘরের জানলার পরিকল্পনা আর বাগানের শিশু গাছের কান্ডবিন্যাস যেন একই চিত্র-পটে আঁকা হয়ে পূর্ণ সঙ্গতি পেয়েছিল।

দাদামশায় বুঝলেন, কাসাহারা সামান্য মিস্ত্রি নয়, রীতিমত শিল্পরসিক। বললেন—কাসাহারা, তোমার যা ক্ষমতা, তোমার যা শিল্পজ্ঞান তার পূর্ণ বিকাশ হওয়া দরকার। জোড়াসাঁকোর বাগানে হবে না। তোমাকে মাইনে দিয়ে বহুদিন রাখতে পারলে একটা কথা ছিল। সে ক্ষমতা আমার নেই। এখানে ঐ একখানি গাছের উপরেই তোমার যে হাতের কায়দা দেখিয়ে গেলে তাতে করে এ জায়গায় তুমি অমর হয়ে রইলে। তোমার জন্যে আমি একটি ভালো বাগানের ব্যবস্থা করছি। কিন্তু তার আগে তুমি বাপু আমার এই জানলার ধারে বসাবার জন্যে তোমার দেশের কিছু বন্‌সাই আনিয়ে দাও।

দাদামশায় কাসাহারার জন্যে প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের কাশীপুরের বাগান-বাড়ি 'এমারেল্ড বাওয়ার'এ চাকরির বন্দোবস্ত করে দিলেন। সেখানে কাসাহারা বাগানের একটি অংশকে সাজালো মনের মত করে। গাছ লাগিয়ে, গাছকে বাড়িয়ে তারপর গাছের ডাল কেটে কেটে তার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার তার অপূর্ব হাত ছিল। আস্তে আস্তে সে প্রদ্যোৎকুমারের বাগানে যে জাপানী ল্যান্ডস্কেপ গার্ডেনটি করেছিল সেটি দেখে মুগ্ধ হননি এমন কোনো মানুষ, কোনো জ্ঞানী গুণীই ছিলেন না তখনকার দিনে।

ইতিমধ্যে জাপান থেকে তিন তিনটে টবে-লাগানো বামন-গাছ এসে গেল। অতি সুন্দর আদত জাপানী বন্‌সাই। কাসাহারার তৈরী পূব-মুখো গোল-জানলার ধারে চমৎকার মানালো। বন্‌সাই আর দু-বাহু মেলা শিশু গাছ—এরই পিছন দিয়ে সোনার থালার মতো চন্দ্রোদয়ও দেখলেন দাদামশায়রা। কিন্তু জাপানী বন্‌সাই এ-দেশের গরম হাওয়ায় হঠাৎ একদিন শুকিয়ে গেল। শূন্য পড়ে রইল টব।

তখন আবার ডাক পড়ল কাসাহারার। কাসাহারাকে ডেকে দাদামশায় বললেন—বিদেশী গাছ এখানের মাটিতে, এখানের

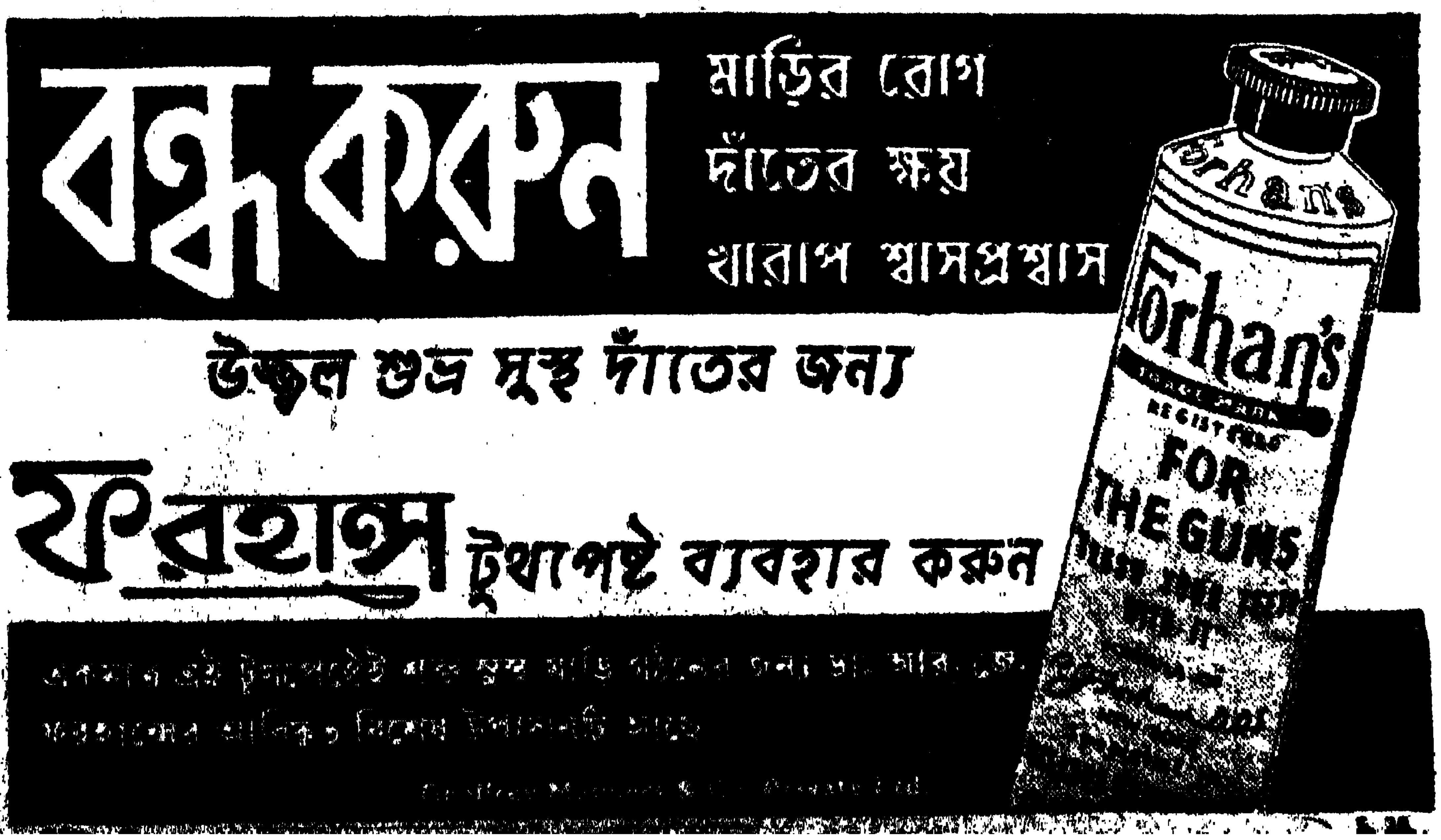

হাওয়ায় টিকবে না। তুমি শেখাও আমায় গাছকে কি করে বে'টে করতে হয়। আমি দেশী গাছের বন্‌সাই বানিয়ে নেব।

কাসাহারা বললে—আমি বড় গাছের ডাল কেটে কেটে গাছকে দুরুস্ত করতে শিখেছি। বাগান সাজাতে জানি। গাছ বে'টে করার আমি জানি কি? বন্‌সাই তো এক বিশেষ বিজ্ঞান। বড় বড় মাথা-ওয়ালা লোক এর চর্চায় মেতে আছেন।

দাদামশায় বললেন—তা হোক। যা জানো সাহেব তাতেই হবে। এসো লেগে যাই দুজনে—কিছু না কিছু বেরবেই মাথা থেকে দেখে নিও ঠিক। এই বলে দুজনে মিলে একটা তে'তুল গাছ লাগালেন টবে। তারপর তাকে নানান কায়দায় সত্যিই করে ফেললে বে'টে বামন। এই হচ্ছে দাদামশার বিখ্যা তে'তুল গাছ। দাদামশার প্রথম বন্‌সাই।

এই তে'তুল গাছ আর এরই মতো অ কয়েকটা গাছ নিজেরা যেমন ছোট হ গিয়েছিল, তাদের ডাল-পালা তো বটে পাতাও গিয়েছিল ছোট হয়ে। কিন্তু দাদ মশার আরো অনেকগুলি গাছ ছিল, তাদে সবকিছু ছোট হত কিন্তু পাতা কিছুতে ছোট হতে চাইত না। পাতার কুঁ বেরলেই নখ দিয়ে সেগুলিকে উপ ফেলতেন। কাঁচি বা ছুরি দিয়ে কাটতে না। বলতেন, নখের বিষ লাগুক, তা ছোট হবে। কাসাহারার কাছ থেকে শি ছিলেন কায়দাটা। কিন্তু এই যে ক'টা গা যারা বে'টে হয়ে গিয়েও নিজেদের পাতা ছোট করতে চাইতো না, তাদের নিয়ে দা মশার ভাবনার অন্ত ছিল না। বলতেন বেটাদের তেজ দেখেছিস্‌? টব থেকে ফে বেরতে চায়। যত ছি'ড়ছি তত বেরচ্ছে এইরকম একটি পাঁকুড় গাছ একবার ন দাকে দিয়ে ছিলেন। বললেন যাও তোমা কলা-ভবনের বাগানে লাগিয়ে দাও। বাড় সেখানে। এখানে থাকতে চাইচে না।

নন্দ-দা সেটিকে অতি শ্রদ্ধায় বয়ে নি গিয়ে শান্তিনিকেতনে কলাভবনের জমি লাগিয়ে দিয়েছিলেন। দাদামশায় বছর পরে গিয়েছিলেন একবার কলাভবনে। টা পাঁকুড় তখন এক বিরাট মহীরুহ।

দেখে বললেন—টবের মধ্যে আটকা প ছিল এতদিনের বাড়। ছাড়া পেয়ে কি ক করে ফেলেছে দেখেছো?

সেবারে কার্শিয়ং পাহাড়ে গে আমরাও সবাই গেছি। পুজোর পাহাড়ে-শীত, তবু ভোরে উঠতেন। পায়ে সেপাইদের মতো পট্টি জড়িয়ে জা বাঁধতেন। তারপর তিব্বতী জোব্বা হাতে একটা লোহার ফলা-বাঁধানো থোঁচ লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন পাংখা-ব রোডের দিকে। পথের ধারে বা বনের হয়তো চোখে পড়ল একটা পাথর, দিয়ে তুলতেন তাকে। কিন্তু পাথর ক কার্শিয়ং-এ বিশেষ কিছুই পা বলতেন, জমি সব শ্যাওলা আর বুনো ঢাকা, পাথর চোখে পড়বে কোত্থেকে?

হঠাৎ একদিন বেলা করে ফির মাথার টুপি খোলা, কপালে বিন্দু ঘাম, ডান হাতে লাঠি, বাঁ হাতে লাঠির ফলাটা। খুব উত্তেজিত। বললেন—এ শাবল টাবল কিছু নিয়ে শিগ্‌গীর আমরা ভাবলুম, হীরের খনিই আবি করে ফেলেছেন বুঝি বা। তারপর শুন তা নয়। রাস্তার ধারে চমৎকার নাকি বেঁটে গাছ পাওয়া গেছে। সেটাকে মাটি আলগা করে তুলে

—আপনিও দ্রুত, নিশ্চিতভাবে ও নিরাপদে ব্যথা কমাতে

সারিডন-এর ওপর নির্ভর করতে পারেন

আপনার খুকু তার কষ্ট কমিয়ে দেবার জন্য আপনারই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আর সত্যই আপনি তা পারেন। কেননা সারিডন চটপট ব্যথা-বেদনা কমিয়ে দেয়… অথচ খুবই নিরাপদ।

সারিডন-এ অনিষ্টকারক কোন কিছু নেই, এতে হার্টের কোন ক্ষতি বা হজমের কোন গোলমাল হয় না। তার ওপর বিশেষ উপাদানে তৈরী বলে সারিডন আশ্চর্যরকম তিনটি কাজ দেয়—এতে যন্ত্রণার উপশম হয়, মনের স্বাচ্ছন্দ্য আসে ও শরীর ঝরঝরে লাগে।

মাথাধরা, গা ব্যথা, দাঁতের যন্ত্রণা ও সাধারণ ব্যথা-বেদনায় তাড়াতাড়ি আরাম দেয় সারিডন… সারিডন নিরাপদ বেদনা-উপশমকারী।

একটিই যথেষ্ট

একটি ট্যাবলেট ১২ নঃ পঃ

★ সারিডন স্বাস্থ্যসম্মত মোড়কে থাকে, হাতে ধরা হয় না

★ একটি সারিডনই প্রায় ক্ষেত্রে পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে একমাত্রা

★ সিকি থেকে আধখানা শিশুদের মাত্রা

একমাত্র পরিবেশক: ভলটাস লিমিটেড

দিয়ে খুব করে খুঁচিয়েছেন, তাতেও হয়নি। শেষে ফলা দিয়ে জোর করে চাড় দিতে গিয়ে ফলাই গেছে ভেঙে। আমরা একটা ছোটখাট শাবল জোগাড় করে অমৃৎ বাহাদুরকে নিয়ে দাদামশায় সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম। নাওয়া খাওয়ার কথা সবাই ভুলে গেল। বেশ মাইলখানেক পথ। জায়গাটায় পেঁছে দেখি, রাস্তার ধারে কই, রাস্তার উপরেই একটা গাছ। বড় বড় ক-টা পাথর সরিয়ে দাদামশায় সরকারী সড়কে বেশ একটা গর্ত করে ফেলেছেন। মিউনিসিপ্যালিটির লোকে একবার দেখলেই হয় আর কি! কিন্তু তখন আর ও-সব ভাববার সময় নেই। কি সুন্দর গাছখানা! আঁকা বাঁকা শক্ত গড়ন। পাতাগুলি ছোট্ট ছোট্ট। একেবারে আসল বন্‌সাই।

দাদামশায় বল্লেন—দেখছিস্‌ একেবারে তৈরী গাছ। এ কখনও ছাড়া যায়? চালা শাবল চট্‌পট্‌—আবার কে কোথায় দেখে ফেলবে।

আশ্চর্য চোখ দাদামশায়! কত লোক হেঁটেছে—কই কারুর চোখে তো পড়েনি এমন সুন্দর একখানা বন্‌সাই, যা তুলে নিয়ে গিয়ে পাথর দিয়ে টবে সাজিয়ে দিলেই হল। যে দেখবে সে-ই মুগ্ধ হবে।

অমৃৎ বাহাদুর মাটি খুঁড়ে চল্লো। কিন্তু কী সর্বনাশ! যত খোঁড়ে ততই শিকড় বেড়ে চলে। গাছের উপরটি এতটুকু কিন্তু দেড় হাত মাটি খুঁড়ে ফেল্লো তখনও শিকড়ের শেষ নেই। আমরা দেখলুম লোহার মত শক্ত শিকড় পাকিয়ে পাকিয়ে পাথর ফাটিয়ে নেমে গেছে।

দাদামশায় বল্লেন—এ যে পাতালে প্রবেশ করেছে দেখছি। এত বড় শিকড় তো টবে ধরবে না। কি করা যায় তাহলে?

বলতে বলতেই অমৃৎ বাহাদুর হেঁচকা টানে শিকড় শুদ্ধ গাছ উপড়ে ফেলেছে।

বেলা হয়ে গিয়েছিল বলে ভাগ্যিস রাস্তায় কেউ ছিল না। আমরা তাড়াতাড়ি মাটি আর পাথর দিয়ে গর্তটা বুজিয়ে ফেললুম কোনরকমে। দাদামশায় বল্লেন—নিয়ে চল্‌ গাছটাকে, দেখা যাক এটাকে সাজানো যায় কিনা!

সেদিন-ই মাটি খুঁড়ে বাগানে লাগানো হল গাছটাকে। অত বড় শিকড় শুদ্ধ গাছ—কোনো টবেই লাগানো যেত না তাকে! জল ঢালা হল গাছের গোড়ায়। খুব যত্ন করলুম আমরা। কিন্তু সব যত্নেও সে গাছ বাঁচল না। অমন জোরাল শক্ত সমর্থ গাছ, দু-দিনে শুকিয়ে গেল তার পাতা—ঝরে গেল একটি একটি করে। পল্লবগুলি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

দাদামশায় বল্লেন—না আনলেই হতো দেখছি। পাথরের রস খেয়ে বেড়েছিল—মাটির রসে ওর কি হবে?

এবার জোড়াসাঁকোর এক গুজব বলি।

একবার বর্ষার শেষের দিকে জোড়াসাঁকোর বাগানে শরতের রোদ যখন থেকে থেকে উঁকি দিচ্ছে, হঠাৎ বর্ষা আবার ফিরে এল। আকাশ অন্ধকার করে নামল বাদলা। ভিজে হাওয়া আর অক্লান্ত বৃষ্টি। টিপ্‌ টিপ্‌ টিপ্‌ টিপ্‌ করে দিনে রাতে সমানভাবে চললো আট দিন। বাড়ির বাইরে বার হবার যো নেই। বই খাতা কাপড় চোপড় স্যাঁৎসেতে। বারান্দার মেঝে শুকোতেই চায় না। দাদামশারা বারান্দাতেই বসে থাকতেন আর বৃষ্টির ধারা বর্ষণ দেখতেন। তারপর হঠাৎ রাত্রে যেদিন বৃষ্টি থেমে গেল আর ভোরের রোদে ঝল্‌মল্‌ করে উঠল আমাদের বাগান, সেদিন আমরা কেউ ওঠবার আগেই অতি প্রত্যূষে উঠে দাদামশায় গিয়ে হাজির হয়েছেন বাগানে। রাত্রে বিশেষ ঘুম-টুম হত না—টের পেয়েছিলেন ঠিক কখন অন্ধকারের মধ্যে বৃষ্টি থেমে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

আমরা ঘুম থেকে উঠেই শুনলুম, ভয়ানক কাণ্ড, দাদামশায় তেঁতুল গাছ চুরি গিয়েছে। ভোরে উঠে দাদামশায় বাগানে গিয়েছিলেন। ফোয়ারার মাঝখানে যেখানে গাছটা থাকত, দেখেন সেখানে গাছ নেই—বেমালুম অদৃশ্য হয়েছে। কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না! দেখলুম মহা চিন্তিত হয়ে দোতলার বারান্দায় দাদামশায় বসে রয়েছেন। মুখে একখানা আধ-পোড়া চুরুট, তাতে আগুন নেই, সেইটাই টানছেন। আমাদের দেখে বল্লেন—কার কার কাছে বলেছি বল্‌তো 'ডোয়ার্ফ' ট্রীগুলো জাপানে হাজার টাকায় বিক্রী হয়?

আমরা বল্লুম—এ তুমি অনেকের কাছেই বলেছ। বলে অতি সৎ এবং ভদ্র দেশী বিদেশী কয়েকজন আগন্তুকের নাম করলুম যাঁরা মাঝে মাঝে জোড়াসাঁকো-বাড়িতে আসতেন।

দাদামশায় বল্লেন—কাউকে বিশ্বাস নেই। আমার তেঁতুল গাছের উপর সবার নজর। জাপানেই চলে গেছে কি না দেখ্‌। সেদিন কাকে বলছিলুম, ঐ তেঁতুল গাছে যখন তেঁতুল ফলবে তখন তার দাম হবে দশ হাজার টাকা!

দাদামশায় প্রিয় তেঁতুল গাছে ছোট্ট ছোট্ট গুটিপোকার মতো তেঁতুল ধরবে এ স্বপ্ন দাদামশায় অনেক দিনের। আমাদের কতবার বলেছেন।

কিন্তু ভদ্রই হোক অভদ্রই হোক, এ-কদিনের প্রচণ্ড বৃষ্টিতে কেউ যে জোড়াসাঁকো বাড়ির গেট পার হয়ে ঢুকেছে তারও কোনো প্রমাণ নেই। বেশীর ভাগ সময় আমাদের বাড়িতে ঢোকবার গলিই ছিল এক-হাঁটু জলের তলায়।

দাদামশায় কিন্তু খুঁতখুঁতুনি গেল না। —কে জানে, যখন এদিকে বৃষ্টি চলেছে, ঘরের মধ্যে আমরা বন্ধ, কে ঢুকে পড়েছে ফাঁক দিয়ে? দরোয়ানরাই কি আর নজর রাখতে পারবে? গেল এতদিনের তেঁতুল গাছটা!

আমরা সবাই খুঁজলুম। মালিরা খুঁজলো। কিন্তু সবই হল নিষ্ফল। কোথাও পাওয়া পাওয়া গেল না। দাদামশায় অত দিনের অত যত্নের তেঁতুল গাছটা চুরি হয়েছে বলেই সাব্যস্ত হয়ে গেল।

ডাঃ ইউ. এম. সামন্ত
বাইওকেমিক
গার্হস্থ্য-চিকিৎসা
দশম সং ঃ দাম—২,
গৃহ চিকিৎসার একটি সরল ও সুন্দর পুস্তক। প্রতি গৃহে রাখা কর্তব্য।
সামন্ত বাইওকেমিক ফার্মাসী
৫৮/৭ ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড
কলিকাতা—২
বাইওকেমিক ঔষধ ও পুস্তকের
— প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান —

হাইড্রোসিল (একশিরা)
কোষসংক্রান্ত যাবতীয় রোগের জন্য
ডাঃ কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, এম বি (ক্যাল)
দি ন্যাশনাল ফার্মেসী
(স্থাপিত ১৯১৬)
৯৬-৯৭, লোয়ার চিৎপুর রোড (দোতলায়)
কলিকাতা-৭
প্রবেশ পথ—হ্যারিসন রোডের উপর, জংশনের পশ্চিমে তৃতীয় ডাক্তারখানা। ফোন ঃ ৩৩-৬৫৮০। সাক্ষাৎ সকাল ৯টা হইতে রাত্রি ৮টা। রবিবারও খোলা থাকে।
(সি-৮৭৬৯)

তারপর বেরল সেটা গাছঘরের নিভৃত কোণ থেকে। যে রেখেছিল সে-ই পরম কর্তব্যের খাতিরে বার করে সেটা দাদামশার হাতে পেঁছে দিলে। ইতিহাসটা হচ্ছে এই। বাড়ির একটি চাকর বৃষ্টির মধ্যে বাগানে বিচরণ করবার সময় দেখতে পায় দাদামশার শখের গাছটির অবস্থা সঙ্গীন। বৃষ্টির তোড়ে ফোয়ারার মধ্যাংশ থেকে পিছলে পড়ে ফোয়ারার জলে অর্ধমগ্ন। সে সেটিকে বাঁচাবার জন্যে যত্ন করে তুলে নিয়ে যায় গাছঘরের আশ্রয়ে। সেখানেই ছিল গাছটি। বেশ ভালই ছিল। শুধু বৃক্ষোদ্ধারের খবরটি কারো কানে পেঁছে দেবার কথা উদ্ধারকর্তার মনে পড়েনি।

—গাধাটার বুদ্ধি দেখেছিস্! বলে দাদামশায় হারানো গাছ ফিরে পাওয়ার আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলেন।

এই তেঁতুল গাছ যখন একবার দক্ষিণের বারান্দায় পূব রেলিংএ লাগানো কাঠের পাটার উপর থাকতো সেই সময় দাদামশার একটি ছাত্র আমাদের বাড়িতে ছিলেন। দাদামশায় তাকে ডেকে একদিন বল্লেন—আঁকো দেখি আমার এই তেঁতুল গাছের একখানা ছবি।

ছবি তিনি আঁকতেন ভালো। অন্তত আমরা তাঁর ছবি খুব পছন্দ করতুম। সারাদিন খাটলেন। বন্সাই তেঁতুল গাছের সামনে রং তুলি হাতে একনিষ্ঠ সাধকের মতো বসে কাজ করে গেলেন। সন্ধ্যার সময় ছবিটি শেষ করে ভিজে ছবি শুকিয়ে দাদামশার কাছে নিয়ে এলেন। দাদামশায় তখন বসে বসে 'ডিকেন্স্'এর 'ব্লীক হাউস' পড়ছিলেন। বল্লেন—সন্ধে বেলায় কি ছবির রং দেখা যায়? দিনের বেলা দেখিও।

চলে যাচ্ছিলেন, দাদামশায় আবার কি ভেবে তাঁকে বল্লেন—আচ্ছা দেখি!

ব্লীক হাউস মুড়ে রেখে দিলেন এক পাশে। ছবিটা হাতে নিয়েই বল্লেন—আাই দেখ। তেঁতুল গাছ কোথায়? এ যে টব এঁকেছ!

টবে লাগানো তেঁতুল গাছ তিনি যেমন দেখেছিলেন তেমনই এঁকেছিলেন।

দাদামশায় বল্লেন—গাছ আঁকতে বল্লুম, তুমি টব এঁকে বসলে! আমার তেঁতুল গাছকে তাহলে তুমি দেখতেই পাওনি। আমার গাছ কি এইটুকু নাকি? ছবি আঁকছিলে যখন, তখন গাছের বয়েসের কথা মনেই হয়নি? কি দেখছিলে ঠিক করে বল তো? টব না গাছ?

—আজ্ঞে গাছও দেখছিলুম, টবও দেখছিলুম।

—কে তোমায় টব দেখতে বলল? অর্জুনের লক্ষ্যভেদের গল্প পড়েছ? পড়ে নিও। শুধু যদি গাছটাকে দেখতে চোখের সামনে, গাছটা বড় হয়ে যেত। তুমি হয়ে যেতে ছোট। গাছের গুঁড়ি গাছের ডাল যে কতকালের পুরোনো, কত তার বয়েস পষ্ট দেখতে পেতে। চলো ঠিক করে দিই তোমার ছবি।

বলে উঠলেন ছবিটা নিয়ে। দক্ষিণের বারান্দায় ছবি আঁকবার জায়গায় গিয়ে চেয়ারে পা গুটিয়ে বসলেন। দেরাজ থেকে বেরল একটা কাঁচি। কচাকচ্ কেটে দিলেন। টবের অর্ধেকটা কাটা পড়ল। বাকি অর্ধেকটাকে রং দিয়ে ঢেকে দিলেন জমির সঙ্গে মিলিয়ে। তারপর ছাত্রটিকে বল্লেন—যাও, দাঁড়াও গিয়ে সামনে ঐ রেলিংটার ধারে। তোমাকে এঁকে দিই ছোটটি করে।

বলে তেঁতুল-গাছতলায় আঁকলেন তার অনুগতভাবে দাঁড়ানো চেহারা। বিরাট গাছের তলায় আশ্রিত এক পথিক। আর আঁকলেন একটুখানি আকাশ।

তারপর বল্লেন—কতদিনের গাছ—ক[illegible] এর বয়েস! এর সঙ্গে চালাকি? দিলু[illegible] তোমাকে বুড়ো-আংলা করে। নাও।

ছবি ফিরিয়ে দিয়ে বল্লেন—আচ্ছা রোজ ভোরবেলা উঠে তো তুমি সূর্যোদয় দেখ[illegible] যাও, কাল থেকে ঐখানে বসে সূর্যোদ[illegible] দেখবে। তোমার চোখ তৈরী হওয়া দরকার। যেদিন আমায় এসে বলবে, আজ্ঞে আ[illegible] তেঁতুলতলায় বসে সূর্যি ওঠা দেখেছি সেইদিনই আবার ছবি আঁকতে পাবে, তা[illegible] আগে নয়।

এই বলে ডিকেন্স্এর ব্লীক হাউসটা তু[illegible] নিয়ে আবার পড়ায় মনোনিবেশ করলেন।

(ক্রমশ

সারা জীবন স্বচ্ছন্দে চালিয়ে আরাম পাবেন

একটি হিন্দ সাইকেল কিনুন—নিখুঁত কাজ দেবে। সবরকম হিন্দ সাইকেলেই উন্নত শ্রেণীর হাব ও সেলফ-অ্যালাইনিং ফর্ক ফিটিং-এর দরুন অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে চালানো ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। রি-ইনফোর্সড শক্ত ফ্রেমে তৈরী এই সাইকেল আজীবন টেঁকে, তাছাড়া দরকার হ'লে বাড়তি জিনিসপত্রও বয়ে নেওয়া যায়।

রয়্যাল ষ্টার
হিন্দ অ্যাম্বাসাডার
হিন্দ সুপার্ব
হিন্দ

হিন্দ সাইকেল
আজীবন সঙ্গী হয়ে থাকবে

হিন্দ সাইকেলস লিঃ, ২৫০ ওরলি, বোম্বাই-১৮

ASP/HC-148

[illegible] ক্রয়ের জন্য আমাদের লোকাল অর্গানাইজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন [illegible]
৮ [illegible]

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

৫৩

ফল কিন্তু খারাপ হলো না, নাটকটি বেশ গতিলাভ করল। শিফ্‌টিং-এর ব্যাপারে প্রবোধবাবু বিশেষ যত্নশীল ছিলেন, বাড়তি লোক পর্যন্ত দিয়েছিলেন কাজটা ত্বরান্বিত করবার জন্য।

আমাকে সেদিন ছাড়লেন বেলা পাঁচটার পর। বললেন—তুমি এবার যাও, সাজো গে। তোমার অভিনয় রয়েছে, না?

কিন্তু, কিছু-কিছু কাজ যে এখনও—

বললেন—সে-সব আমি সেরে দিচ্ছি। আমি যখন রয়েছি, তোমার ভয়টা কিসের?

সরে এলাম। একটু পরেই এলেন অপরেশবাবু, মুখখানা থমথম করছে, নাটকে ভূমিকা আছে বলেই এলেন, নইলে আসতেন না, এমন ভাব। এসে, কারুর সঙ্গে কথা নয় কিছু নয়, নিজের চেয়ারটাতে বসলেন, বেশকারী সাজাতে শুরু করল। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার রূপসজ্জা শেষ করে ও'র পাশে গিয়ে বসলাম। ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলাম, সেট্‌ নিয়ে আমাদের সবার সব খাটুনির কথা। উনি সব শুনলেন, তারপর সংক্ষেপে বললেন—দেখা যাক, কি হয়।

হলো অদ্ভুত কান্ড! নাটকের সময় কমে গেল প্রায় দেড়টি ঘণ্টা। একটি নাটকে দেড় ঘণ্টা সময় কমে যাওয়া সাধারণ ব্যাপার নয়! দর্শকদল খুশী হলেন, খুশী হলেন আমাদের ডিরেক্টররা, হরিদাসবাবু যখন ভিতরে এলেন, দেখি, ও'রও মুখে হাসি ফুটেছে। অপরেশবাবুর মনের মেঘ কেটে গেছে, উল্লাস প্রকাশ করে বললেন—এই ত হলো। এটা আগে হলে ত কোনো কথাই উঠত না।

বললাম—শিফটিং-এর ব্যাপারটা আজ ভালোভাবে সবার জানা হয়ে গেছে, কাল দেখবেন সময় আরও দশ মিনিট কমে যাবে।

—ভালো কথা।

ও'র সেই ইজিচেয়ারটিতে বসে বসেই উনি সাজছেন। সেখানে বসেই 'মেক-আপ' তুলতে তুলতে বলতে লাগলেন—সিনগুলি কিন্তু হয়েছিল ভালো, তবে ও যখন গেছে, তখন পাপ গেছে! বুঝলেন না? আমাদের দেখতে হয় নাটকটা। নাটকের স্রোত ব্যাহত হচ্ছে কিনা, সেটা লক্ষ্য রাখাই হচ্ছে বড় কথা।

উদাহরণস্বরূপ গিরিশচন্দ্রের কথা তুললেন। বললেন—ও'র পঞ্চাঙ্ক নাটকগুলির কথাই ধরুন না কেন, এমনভাবে লেখা যে, অঙ্কের শেষে শেষে ড্রপ ফেলা সত্ত্বেও মানুষের মন থেকে তা মুছে যায় না। আসল কথা কী জানেন? দর্শকের বিরক্তি জন্মালে সোনার নাটকও চলে না।

তারপরে, কথায় কথায় ছেলেভুলানোর সুরে বললেন—টমাস অট্‌ওয়ে-র "ভেনিস্‌ প্রিজারভড্‌" নাটকটি এবার 'অ্যাডাপ্ট' করব। তাতে নানারকম সব সিন আছে। দেখান, যত কেরামতি দেখাতে পারেন!

টমাস অট্‌ওয়ে ছিলেন সপ্তদশ শতকের এক ইংরেজ নাট্যকার। ১৬৮১ সালে লণ্ডনে অভিনীত হয়েছিল তাঁর "ভেনিস্‌ প্রিজারভড্‌"।

যাই হোক, তার পরদিন ছিল 'বন্দিনী'র ম্যাটিনী শো, সেটিও হয়ে গেল। সবাই খুব খুশীই আছেন। বন্দিনী আবার হলো ৩০শে ও ৩১শে ডিসেম্বর এবং ১লা জানুয়ারী। অর্থাৎ পর পর অভিনয় চলছেই। ২রা হলো—সাজাহান, ৩রা—আবার বন্দিনী, ৪ঠা—কর্ণার্জুন। এবং এই ৪ঠা তারিখের পর ছুটি পেলাম, বড়দিনের আসরও শেষ হলো।

'বন্দিনী' সম্পর্কে "বৈকালী" লিখেছিলো "—বন্দিনীর শিক্ষক এবং প্রযোজকদের সহকারী ছিলেন অহীন্দ্রবাবু। 'বন্দিনী'তে দেখা গেল যে, শুধু তিনি অভিনেতা নন, একজন সুদক্ষ প্রডিউসার। আমরা অপরেশচন্দ্র এবং অহীন্দ্রভূষণের সমবেত চেষ্টায় বাংলার রঙ্গমঞ্চের আমূল সংস্কার দেখতে পাব আশা করি।"

দশই জানুয়ারী 'নবযুগ' লিখলে—"বন্দিনী, দৃশ্য-সৌন্দর্যের খনি বললেই চলে, ইহার দৃশ্যপটাদি এত অধিক চিত্তাকর্ষক যে, একবার মাত্র ইহার অভিনয় দেখিলে ইহার সৌন্দর্যের সম্যক্‌ উপলব্ধি করা যায় না—বেশভূষার পরিকল্পনাও সম্পূর্ণ মৌলিক।......পুরুষ চরিত্রের মধ্যে ইস্‌কিবল, অ্যামোসিস, মিতানীর রাজা ও তাবেজের ভূমিকায়—অপরেশবাবু, অহীন্দ্রবাবু, দুর্গাপ্রসন্নবাবু ও আশ্চর্যময়ীর অভিনয় অত্যন্ত স্বাভাবিক ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। নাহেরণ—শ্রীমতী নীহারবালা, ইঁহার অভিনয়ে হাস্যরসের সাবলীল ছন্দের সহিত দেশভক্তির গভীর মন্ত্র সুন্দররূপে বাজিয়া উঠিয়াছিল। বন্দিনী ফিরোজবালা, চেষ্টা ও শিক্ষার ফলে একজন সাধারণ অভিনেত্রীও যে সুন্দর অভিনয়ে সক্ষম হন, ইঁহার অভিনয়ে আমরা সেটি সুন্দররূপে উপলব্ধি করিয়াছি।"

সমালোচনা প্রায় সব কাগজই ভালো

উপন্যাস

সোম-সবিতা— সরোজকুমার রায়-চৌধুরীর অনবদ্য উপন্যাস (২য় সংস্করণ—যন্ত্রস্থ) মূল্য ৪.০০ টাকা

আমারি আঙিনা দিয়া—গ্রাণ্ড হোটেলের প্রখ্যাত উপন্যাসিক ভিকি বামের রাগ-বিরাগের মর্মস্পর্শী আখ্যান—'MEN NEVER KNOW'—সরিৎশেখর মজুমদার অনূদিত

মূল্য ২.৫০ টাকা

গল্প

কুলতোরে— বিভূতিভূষণ গুপ্তের একটি সার্থক গল্পগুচ্ছ (২য় সংস্করণ)

...মূল্য ৩.০০ টাকা

নাটক

॥ অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের নবতম পূর্ণাঙ্গ প্রহসন ॥

মৌন-মুখর—নাচে গানে সুরে আশ্চর্য এক হাসির নাটক।

...মূল্য ২.০০ টাকা

ঐ লেখকের আরও দুটি অসামান্য পূর্ণাঙ্গ নাটক

১। **নচিকেতা**— 'ভগবান বুদ্ধের আদর্শে অনুপ্রাণিত স্বাধীন ভারতবর্ষ আশা করি এ নাটকের যথার্থ মহিমা উপলব্ধি করতে পারবে।'—দেশ

...মূল্য ২.০০ টাকা

২। **থানা থেকে আসছি**—

...মূল্য ২.০০ টাকা

॥ একাংক রচনায় যাদুকর মন্মথ রায়ের ॥

ফকিরের পাথর ও নাট্যগুচ্ছ—মন্মথ রায় (একাঙ্কের জলসা)

...মূল্য ২.৫০ টাকা

অটো-প্রিণ্ট এণ্ড পাবলিসিটি হাউস, ৪৯, বলদেওপাড়া রোড, (মানিকতলা), কলিকাতা-৬

ফোন ঃ ৩৫—২৯৫৯

করেছিলেন, হ্যাণ্ডবিল কাগজ কিছু-কিছু ত্রুটিও বার করেছিলেন, কিন্তু এবারে আমাদের রাখালদা আর বসে রইলেন না, ধরলেন তাঁর কলম। ঐ যে আমরা আগ্রা দুর্গের দৃশ্যটি মিশর যুগে চালিয়ে দিয়েছিলাম, ঐতিহাসিক সে ত্রুটি দেখাতে ছাড়বেন কেন? তবে, ওটি ত আমরা জানতামই। মিশরের কোন্ সময়ের ঘটনা ঐ 'বন্দিনী', এসব নিয়ে উনি এমন কূটতর্ক তুললেন যে বলার নয়! শুধু সমালোচনাই নয়, ইতিহাসের নানান্ কচ্‌কচানি! কোন্ বংশের কোন্ রাজত্বকালে, তা কেন নাটকে স্পষ্ট বলা নেই? যদি অমুক হয় ত, তার সময়ে পোশাক-টোশাক ছিল ভারি কম; আর যদি অমুক না হয়ে তমুকের রাজত্বকালে হয়ে থাকে ত, পোশাকের হবে আরও পরিবর্তন, ইত্যাদি।

ওদিকে শিশির পত্রিকার সঙ্গে আমাদের কর্তৃপক্ষের কী এক মনোমালিন্যের ফলে কর্তৃপক্ষের সম্পর্কে শিশির লিখতে শুরু করলেন সে প্রায় ব্যক্তিগত আক্রমণ আর কী! তবে, সরাসরি নিজেরা লেখেন নি, চক্ষু-লজ্জা বলেও ত একটা পদার্থ আছে, এক পত্রপ্রেরকের জবানীতে লিখেছিলেন শিশির। এসব ব্যাপার ঐ 'বন্দিনী'র কাল থেকেই শুরু হয়েছিল। সংবাদপত্রের রীতিই এই, কে যে কখন কার পক্ষে আছেন তা বোঝা ছিল সত্যিই মুশকিল।

যাই হোক, যা বলছিলাম। আমরা ত বড়দিনের আসরের শেষে দু' একদিনের জন্য ছুটি পেলাম। নাট্যমন্দিরে তখনো 'পাষাণ' চলছে, মিনার্ভায়—'জোরবরাত'। 'নবযুগ' লিখেছিলেন, ২১শে নভেম্বর তারিখে—"এই ক্ষুদ্র প্রহসনই হয়ত মিনার্ভার আগেকার বরাত আবার ফিরাইয়া আনিবে।"

মিনার্ভা ২৫শে ডিসেম্বর খুলেছিলেন—"কৃতান্তের বঙ্গদর্শন"—ঐ ভূপেনবাবুরই লেখা। 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন' বলে যে ধরনের বই আছে, এ বই সেই ধারারই অনুসৃতি বলা চলে। যমরাজ কৃতান্ত বাংলাদেশে এসেছেন দেশ দেখতে, বীর হনুমান বা মহাবীর হচ্ছেন ত্রিকালজ্ঞ, তিনি বেঁচেও আছেন তিনকাল, তিনি যমরাজকে দেখাচ্ছেন বাংলাদেশের অবস্থা, -বন্যা-দুর্ভিক্ষ-মহামারী ইত্যাদি। বইটি আমি দেখেছিলাম। লোকে বইটি নিয়েওছিল। কৃতান্ত সাজতেন কুঞ্জবাবু, মহাবীর সাজতেন হাঁদুবাবু, আর চিত্রগুপ্ত—যতদূর স্মরণ হয়—কার্তিকবাবু। এতে পটলবাবু একটি অদ্ভুত দৃশ্য করেছিলেন—বিপুল বন্যা—তাতে মানুষ-গাছপালা-ঘরের চাল-গরুবাছুর সব ভেসে যাচ্ছে! চমৎকার হয়েছিল দৃশ্যটি। একে ত ভাড়া করা স্টেজ, তাতে, রোলার-এর ওপর সিন ব্যবহার করে এটা যে তিনি করে তুলতে পেরেছিলেন, তাতে তাঁকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ না জানিয়ে কোনো উপায় নেই। ওঁদের স্টেজের নিজস্ব বাড়িও ততদিনে প্রায় তৈরী হয়ে এলো অবশ্য।

চব্বিশ সাল ত এভাবে চলে গেল। এর মধ্যে থিয়েটারের কথাই বলে গেলাম, সিনেমার কথা একটুও বলা হয়নি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সিনেমাও করেছি বই কী! সেই যে 'ইরাণের রাণী'র সিনারিও-র কথা বলেছিলাম, আমার সেই সিনারিও-কে ভিত্তি করেই ম্যাডানরা ছবি তুললেন 'মিশরের রাণী'। কর্নওয়ালিশ মঞ্চে (এখনকার 'শ্রী') আমাদের শুটিং হতো। সেই 'সোল অফ এ স্লেভ'-এর মতো সূর্যকিরণ সম্পাতে নয়, নিয়ন্ত্রিত বৈদ্যুতিক আলোকসম্পাত-এর সাহায্যে ছবি তোলা হচ্ছে। দারা আমিই করছি। 'রাণী'-র ভূমিকা করবার মতো কত সুন্দরী সুন্দরী সব মেমসাহেবরা আছে কিন্তু, কৃষ্ণভামিনীর অভিনয় ত ওঁরা দেখেছিলেন, তাই ধরে বসলেন, ঐ ভূমিকা কৃষ্ণভামিনীকে দিয়েই করাতে হবে। 'রাণী' তাই কৃষ্ণভামিনীই করছে। ওদিকে দুর্গা ত ম্যাডান-পত্নীদের বাঁক সে সমসাময়িক ওদের কাছে এসে বলতে পারছে না তারে, আমাকে এসে ধরলে, যে কোনো একটা পার্ট তাকে দেওয়া হোক, সে করবে। বাজার—পয়সা-কড়ি চাই না, একটি পার্ট ...

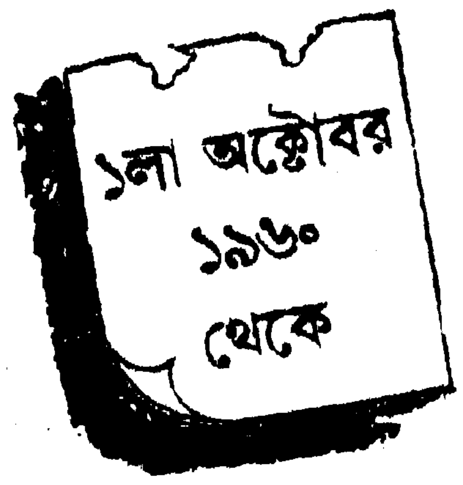

শালিমার পেইণ্টের তৈরী
যে সব রঙ ওজন দরে বিক্রী হয়
তা মেট্রিক ওজনে পাওয়া যাচ্ছে

শালিমার পেইণ্টের রঙ এখন মেট্রিক ওজনের স্ট্যাণ্ডার্ড প্যাকে কিংবা প্রচলিত স্ট্যাণ্ডার্ড প্যাকে (সমতুল্য মেট্রিক ওজনের উল্লেখসহ) পাওয়া যাচ্ছে।

নীচের তালিকাটি থেকে আপনার পক্ষে ওজনের হিসাব করতে সুবিধা হবে :

প্রচলিত স্ট্যাণ্ডার্ড প্যাক	সমতুল্য মেট্রিক ওজন	মেট্রিক স্ট্যাণ্ডার্ড প্যাক	প্রচলিত এবং মেট্রিক প্যাকের মধ্যে ওজনের মোটামুটি পার্থক্য
৫৬ পাঃ	২৫·৪ কিলোগ্রাম	২০ কিলোগ্রাম	− ৫·৪ কিলোগ্রাম (১১ পাঃ ১৫ আঃ)
২৮ পাঃ	১২·৭ কিলোগ্রাম	১০ কিলোগ্রাম	− ২·৭ কিলোগ্রাম (৫ পাঃ ১৫ আঃ)
১৪ পাঃ	৬·৩৫ কিলোগ্রাম	৫ কিলোগ্রাম	− ১·৩৫ কিলোগ্রাম (৩ পাঃ)
৭ পাঃ	৩·১৮ কিলোগ্রাম	——	——
৪ পাঃ	১·৮১ কিলোগ্রাম	২ কিলোগ্রাম	+ ১৯০ গ্রাম (৬·৭ আঃ)
৩ পাঃ ৮ আঃ	১·৫৯ কিলোগ্রাম	১·৫ কিলোগ্রাম	− ৯০ গ্রাম (৩·১ আঃ)
১ পাঃ	৪৫৪ গ্রাম	৫০০ গ্রাম	+ ৪৬ গ্রাম (১½ আঃ)

যে কোনো ওজনে বা যে কোনো আকারে নিন—আগেকার দরেই পাবেন—জিনিসও আগেকার মতই

১লা অক্টোবর, ১৯৬০ থেকে ১লা এপ্রিল, ১৯৬১-র মধ্যে 'দি স্ট্যাণ্ডার্ড অব ওয়েট্‌স অ্যাণ্ড মেজার্স অ্যাক্ট, ১৯৫৬' আইন অনুসারে শালিমার পেইণ্টের তৈরী সমস্ত রঙ ও অন্যান্য জিনিস (ওজনে বা আকার হিসেবে বিক্রীর) মেট্রিক ওজনে বিক্রী হবে। আমরা আপনাকে সর্বদা ওয়াকিবহাল রাখব।

be-BRIGHT-buy

SHALIMAR PAINT, COLOUR & VARNISH COMPANY
PRIVATE LIMITED
CALCUTTA • BOMBAY • MADRAS • NEW DELHI • KANPUR • (Agents overseas)

TSPW 587 BEN

কী পার্ট দেওয়া যায়? ইন্দু ইয়ুসুফ রত স্টেজে, কিন্তু, দিনের বেলায় তার ফিস রয়েছে, সে ত শুটিং করতে পারবে া, তাই ইয়ুসুফই দেওয়া হলো দুর্গা সকে। আমরা তিনজন ছাড়া আর সব ূমিকাই করলে পার্শী থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। দাউদ শা যিনি করেছিলেন, তাঁর নাম—নাসেরওয়ানজী। পার্শী থিয়েটারের ইনি ছিলেন প্রবীণ অভিনেতা, থিয়েটার এখন আর করেন না, করেন শিক্ষকতা। গিরিশবাবুর খুব ভক্ত ছিলেন। বলতেন—গিরিশবাবুর বাড়িতে কতবার তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছি!

শুধু উনি কেন, বাইরে থেকে বহু নাট্য সেবী ব্যক্তি এসে-এসে গিরিশবাবুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন, গিরিশবাবুর বাড়ির দোতলার বৈঠকখানার ঘরটি ছিল একটি পীঠস্থান।

ওদিকে 'মিশরের রাণী'র শুটিং চলে স্টেজের ওপরে। স্টেজের ভিতরে আলো দিয়ে সিনেমার ছবি তোলা হচ্ছে, তখনকার দিনের সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার! আরও বিস্ময়ের বস্তু হচ্ছে, তখনকার কর্নওয়ালিস স্টেজটাই করা হয়েছিল—রিভলভিং স্টেজ। ফ্রামজী ম্যাডান শুধু রিভলভিং স্টেজের মালমশলাই নিয়ে এসেছিলেন তা নয়, বহু নতুন-নতুন জিনিস নিয়ে এসেছিলেন কণ্টিনেণ্ট থেকে, তার কিছু ব্যবহৃত হয়েছে, আবার কোনো-কোনো জিনিসের প্যাকিংই খোলা হয়নি! পাশের 'ক্রাউন'-এ বসানো হবে বলে 'রিভলভিং স্টেজ'টা খুলে ফেলা হয়েছিল, তারপর যে সেটা কোথায় গেল, তার আর কেউ হদিশ করতে পারলে না! ওটিই বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের প্রথম রিভলভিং স্টেজ, তবে দুঃখের বিষয়, এতে কোনো নাটক মঞ্চস্থ হলো না, হলো সিনেমার দৃশ্য গ্রহণ। জিনিসটি খাঁটি ইয়োরোপের আমদানি বলে ছিল বেশ দৃঢ় এবং মজবুত, আর এর গতিও ছিল দ্রুত ও সাবলীল। দু'ধারে দর্শকের জন্য যে দু' সারি আসন থাকে, তার মাঝের পথে ক্যামেরা বসিয়ে ছবি তোলা হতো, প্রয়োজন মতো, মঞ্চ ঘুরে যাচ্ছে, আবার প্রয়োজন মতো ক্যামেরার মুখে সূক্ষ্মতর লেন্স্ বসিয়ে ক্লোজ-আ শটগুলিও তোলা হচ্ছে। ম্যাডানের সেইসব জিনিসপত্রই বা কোথায় গেল? ম্যাডানের ওখানে যে কতো পুকুর-চুরি হয়েছে, তার কি ইয়ত্তা আছে? ফ্রামজী ম্যাডান স্ক্রিন আনিয়েছিলেন ইয়োরোপ থেকে, যেটি বিদ্যুৎশক্তিতে চালিত হতো। অর্থাৎ সুইচ টিপলে ওটা নানান আকারে খুলে যেতো অথবা বন্ধ হয়ে যেতো নানান্ আকার ধারণ ক'রে। নানান্ আকার ধারণ ক'রে উঠে যেতো, নানান্ আকার ধারণ ক'রে পড়ে যেতো। আর ছিল সাউণ্ড-এর সরঞ্জাম। এটিকে প্রেক্ষাগৃহে বসিয়ে ছবির প্রয়োজন মতো পরিবেশ-সৃষ্টিকারী শব্দের উৎপাদন করা হতো। রেকর্ডিং করা কোন-কিছু নয়, রীতিমত মেকানিক্যাল সাউণ্ড। সেই সাউণ্ডে শোনা যেতো—মেঘগর্জন—বন্যার স্রোতের কলধ্বনি ইত্যাদি। পরে ম্যাডানের চিত্রগৃহে (এখন যেটা এলিট্ সিনেমা) 'বেন্‌হুর' ছবি দেখানোর সময় ব্যবহার করা হয়েছিল ঐ সাউণ্ডের যন্ত্রটি।

'মিশরের রাণী'র শুটিং অধিকাংশই হয়েছিল কর্নওয়ালিশ মঞ্চের ঘূর্ণায়মান স্টেজে, কিছু-কিছু হাওড়া অঞ্চলে—বহির্দৃশ্য-গ্রহণের জন্য। ফ্রামজী নিজেই ছবি তুলেছিলেন। বছরের মাঝামাঝি মুক্তি পেয়েছিল ছবিখানা, কিন্তু ল্যাবরেটরীর দোষেই হোক, অথবা যে কোনো কারণেই হোক, ছবির সেড্‌গুলি বড় বেশী কালো-কালো দেখাচ্ছিল, বইও ভালো হয়নি।

মনে পড়ত আমাদের অত যত্নের 'ফটো প্লে সিণ্ডিকেট'-এর কথা। হেম মুখুজ্যের কর্মপরিবর্তন ঘটেছে। ডুকাস সাহেব এখানে বিয়ে করেছেন দ্বিতীয় পক্ষে। তাঁর শিশুসন্তানটির গভর্নেসকে বিয়ে করে বসলেন তিনি। এর ফলে হয়ত এখানে তাঁর সামাজিক প্রতিষ্ঠার কিছু হানিই হয়ে থাকবে, তিনি কারবার গুটিয়ে সস্ত্রীক চলে গেলেন বিলেত। অতএব, হেমবাবু হয়ে পড়েছিলেন কর্মহীন। 'হগ্ মার্কেটে'র সামনে—অপেরা হাউসে—খোলা হয়েছে তখন 'গ্লোব সিনেমা।' এর মালিক হয়েছেন দুজন—দুজনেই পার্শী—কুকা আর সিজুয়া। মুখুজ্যেমশাইয়ের সঙ্গে আলাপ ছিল এ'দের। তারই সূত্র ধরে গ্লোবের ম্যানেজার হয়ে গেলেন হেমবাবু। আমরা সময় পেলে যখন বিলিতি সিনেমা দেখতে

বদহজমের যন্ত্রণায় যেন আপনার কাজ মাটি না হয়

হিউলেট্‌স মিকশ্চার বদহজমে এবং খাওয়ার পরে পাকস্থলীর যন্ত্রণায় দীর্ঘস্থায়ী আরাম এনে দেয়!

জ্বালাকর এসিডের দরুণ পাকস্থলীর দেয়ালে কোন ক্ষতি হ'তে দেয় না, ফলে খুব দ্রুত পাকস্থলীর ব্যথা কমিয়ে দেয়। প্রায় ৮০ বছরেরও ওপর থেকে পৃথিবীর সর্বত্র ডাক্তাররা এর ব্যবস্থা দিয়ে আসছেন।

শিশুদের জন্যে: হিউলেট্‌স মিকশ্চার শিশুদের পেটের গণ্ডগোলেও উপকারী।

পেট খারাপ হলে আফিমযুক্ত হিউলেট্‌স মিকশ্চার ব্যবহার করুন।

সি, জে, হিউলেট এণ্ড সন (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড
[illegible], নাইমিয়ারা মারক স্ট্রীট
[illegible]

যেতাম, ইনি বসিয়ে দিতেন প্লোবের আসনে। প্লোবে বসে বসে এ'র কল্যাণে কত সিনেমাই না তখন দেখেছি!

এইরকম অবস্থা। একদিন প্লোবে গেছি কী-এক সিনেমা দেখতে, হেমবাবু বললেন—শুনেছেন, ওদিকে প্রফুল্লকে—বলেই, কথাটা শেষ না ক'রে ঘাড়টা নেড়ে বোঝাতে চাইলেন—চলে গেছে।

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায়?

—ব্যাংগালোর।

—কীরকম?

উনি বললেন—ব্যাংগালোরে কুকা-সিজুয়ার একটা সিনেমা-হাউস আছে, তার ম্যানেজারের দরকার ছিল। প্রফুল্লকে বলতে সে বললে—আমি যাব, বসে বসে হিসেবের খাতা লেখার কাজ আর ভালো লাগছে না। তাই, চলে গেল নতুন চাকরি নিয়ে।

মুখে ও'কে কিছু বললুমনা বটে, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে একটা অভিমান হলো। ভাবলাম, আমি না হয় থিয়েটার নিয়ে মেতে আছি, তা বলে, প্রফুল্ল চলে গেল, যাবার আগে একবার দেখাটাও করে গেল না!

অবশ্য, আমিও তার খবর করিনি, সেজন্য তার মনেও অভিমান হতে পারে!

মনটা খারাপ হয়ে গেল। সিনেমা সেদিন আর দেখলাম না, হেমবাবুর সঙ্গে বসে বসে গল্প করতে লাগলাম। বললাম—তিনজনে মিলে সেই যে সাধের কোম্পানী করেছিলাম, তার কী হলো? মুমূর্ষু ত ছিলই, তবু আশা ছিল, প্রফুল্ল আবার একটা-কিছু আরম্ভ করে ওটাকে উজ্জীবিত করবে, কিন্তু, তা আর হলো না, কোম্পানী শেষ পর্যন্ত মরেই গেল! ছবিটা আছে ত?

—তা' আছে।

—ওটা রঙীন করবে হেন-তেন কত কি, সব আশাই নির্মূল হয়ে গেল।

চুপ করে রইলেন হেমবাবু। মনটা সত্যিই ভারাক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। এই দু'বছরে যদিও থিয়েটার নিয়ে মেতে আছি, কিন্তু অর্থও পাচ্ছি, নামও হয়েছে, কিন্তু তবু, ওখানে কাজ করে যে আনন্দ পেয়েছি, তার তুলনা হয় না। গোকুলবাবুতে আমাতে মিলে সেই সব দুরাশার ছবি-আঁকাব খেয়ালী দিনগুলিকে মনে পড়ে! পরিশ্রমকে পরিশ্রম বলে মনে হয়নি, এত মাদকতা ছিল কাজে! বন্ধু-বান্ধব মিলে হাতে কাজও করছি, মুখে খোসগল্প, কারণে-অকারণে হেসে উঠছি। যেন হাসির ফোয়ারা রঙীন হয়ে উঠে ফেটে ছড়িয়ে পড়ছে। এত স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের উৎসারণ ছিল সে সব দিনে—সে সব কাজে! সে আনন্দ জীবনে আর কখনো পাইনি বললেও চলে।

বাড়ি ফিরে এসে বাবাকে বললাম—ফটো প্লে সিণ্ডিকেট মরে গেছে।

বাবা একটু চমকে উঠেই প্রশ্ন করলেন—কে মরে গেছে?

একে-একে বললাম বাবাকে। বাবা একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপর বললেন—ওটা তোমার মূল্য। শিখতে গেলে দক্ষিণা দিতে হয়, তুমি কিছু দক্ষিণা দিলে আর কী!

তারপরে, বাস, ঐটুকুই। যেমন মেতে যাবার তেমনি মেতে গেছি থিয়েটারের কাজে। ৯ই জানুয়ারী—শুক্রবার—'সরলা' খোলা হলো। এই 'সরলা' ছিল ভূতপূর্ব স্টারের 'বিজয়-বৈজয়ন্তী'। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের যুগান্তকারী উপন্যাস—'স্বর্ণলতা'-র প্রথম অংশটুকু—অর্থাৎ সরলার মৃত্যু ক্ষণ পর্যন্ত অবলম্বন করে এটিকে নাট্যাকারে রূপান্তরিত করেছিলেন—অমৃতলাল বসু। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল'র অভিনীত হবার পর হয়েছিল 'সরলা'র অভিনয় [illegible] সালের কথা। [illegible] অসাধারণ সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে গিরিশচন্দ্র লেখেন 'প্রফুল্ল'। এমারেল্ড ছেড়ে যখন তিনি আবার স্টারে এলেন, সেই তখন ১৮৮৯ সালে। কিন্তু, 'প্রফুল্ল' নিয়ে হৈ-হৈ করলেও বাংলা নাটমঞ্চের প্রথম সামাজিক ট্রাজেডী হচ্ছে—'সরলা।' পথিকৃতের সম্মান 'সরলা'কে দিতেই হবে। তখন গদাধরচন্দ্র করেছিলেন অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), আর, আমাদের সময়ে করলেন দানীবাবু। এর আগেও যতবার 'সরলা' হয়েছে, 'গদাধরচন্দ্র' উনিই করেছেন. 'গদাধরচন্দ্র' হচ্ছে দানীবাবুর বিখ্যাত ভূমিকা এবং পুরাতন স্টারে বেলবাবু মারা যাবার পর যতবার 'সরলা' হয়েছে, গদাধরচন্দ্র করেছেন কাশীনাথবাবু, দানীবাবু করেছেন তখন অন্য থিয়েটারে। শশীভূষণ করলেন—তিনকড়িদা। নীলকমল—নরেশ মিত্র। বিধুভূষণ—নির্মলেন্দু। রমেশ দারোগা—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত। ঠানদি—কোহিনুরবালা। শ্যামাঝি—আশ্চর্যময়ী। প্রমদা—রাণী সুন্দরী। মুদিনী—ফিরোজাবালা (নেনী)। গদাধরের মাতা—সিন্ধুবালা। এবং নাম-ভূমিকায়—কৃষ্ণভামিনী। কৃষ্ণভামিনী তত-দিনে আরোগ্যলাভ করে ফিরে এসেছে। তাছাড়া, অন্যান্য ছোটখাট ভূমিকায় ছিল—সন্তোষ দাস (ভুলো), তুলসী চক্রবর্তী প্রভৃতি। এতে আমার কোন ভূমিকা ছিলনা। আমি বসে বসে অভিনয়টা দেখেছিলাম। দেখে, চমকে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, এমন সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় বহুদিন দেখিনি। দানীবাবুর আশ্চর্য অভিনয়ের কথা আর কী বলব, তিনকড়িদার অভিনয়ও যেমন স্বাভাবিক তেমনি সুন্দর, আর চমৎকার করলেন—নরেশবাবু। 'বিজলী' ২৩শে জানুয়ারী বিশদ সমালোচনা করে লিখলেন—"প্রধান ভূমিকা হতে আরম্ভ করে অতি তুচ্ছ ভূমিকা পর্যন্ত নিখুঁতভাবে অভিনীত দেখে আমরা পরমানন্দ লাভ করেছি।"

কৃষ্ণভামিনীর ভূয়সী প্রশংসা করে, নরেশবাবু সম্পর্কে বিশেষ করে লিখলেন—"সঙ্গত ও সঙ্গীত বাতিকগ্রস্ত নীলকমলের কথা কহিবার ধরণ, বলিবার কায়দা ও ভাবপ্রকাশের বিশিষ্ট ভঙ্গীতে প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা পেয়েছি।" "নির্মলেন্দুর 'বিধুভূষণ'-ও সাফল্য অর্জন করেছিল, কিন্তু আমার কাছে যেটা প্রভূত বিস্ময়ের বস্তু হয়ে দেখা দিয়েছিল, সে হচ্ছে—কৃষ্ণভামিনীর 'সরলা'। কৃষ্ণভামিনী এর আগে বড়ো-বড়ো পার্ট করেছে, ভালোভাবেই করেছে, কিন্তু, তাতে যেন একটা শেখানো ভাব থাকত, পূর্বসূরী কোনো অভিনেত্রীর ছাপও পাওয়া যেতো কিন্তু 'সরলা' দেখে মনে হয়েছিল, এ-ওর অন্তরের মূর্তি! 'সরলার' মধ্যদিয়ে ওর অভিনয়ের স্বকীয়তা [illegible] অভিনয় শুধু সার্থকতাই

মূল্য পাঁচ টাকা
শুকতারা
চতুর্দশ বর্ষে প'ড়বে

বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য গ্রন্থরাজি

হীরেন্দ্র নাথ দত্ত বেদান্তরত্ন
প্রণীত

উপনিষদ্—জড় ও জীবতত্ত্ব	৫৲
গীতায় ঈশ্বরবাদ (৬ষ্ঠ সং)	৩৷৷০
কর্মবাদ ও জন্মান্তর (৩য় সং)	২৷৷০
বেদান্ত পরিচয় (২য় সং)	২৷০
সাংখ্য-পরিচয়	২৷৷০
যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ	২৲
বুদ্ধদেবের নাস্তিকতা	১৷৷০
রাসলীলা	১৷৷০
অবতারতত্ত্ব	১৷৷০
দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র	২৷০
রঙ্গমতী (নাটক)	১৷৷০
মেঘদূত (মূল সহ)	১৲
Theosophical Gleanings	Rs. 4/8/-

শ্রীকনকেন্দ্রনাথ দত্ত
৯০/১, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৫, প্রকাশকের নিকট ও সমস্ত প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

হয়নি, বলা যায়—স্বতঃস্ফূর্ত—চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম। সরলা গ্রাম্যবধূ—অসীম ধৈর্য—অন্তরে তেজস্বিনী—অথচ নম্র—'বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ'র একেবারে যথাযথ প্রতিচ্ছবি! শেষদৃশ্যে, যেখানে সে মৃত্যুপথযাত্রিনী—বিধুভূষণ ফিরে এসেছে—তার সঙ্গে সেই তার শেষ সাক্ষাৎ—সেই দৃশ্যে ওর অভিনয় দেখে আমাদেরই চোখে জল এসে গিয়েছিল, দর্শকের ত কথাই নেই। এই 'সরলা'র ভূমিকা পুরানো স্টারে করেছিলেন কিরণবালা। অভিনয়-ক্ষমতায় এতদূর উঠেছিলেন যে, প্রখ্যাতা অভিনেত্রী বিনোদিনীর পরেই তাঁর নাম করা হতো তখন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত, তাঁর অভিনেত্রী-জীবন সম্যকরূপে বিকশিত হয়ে ওঠবার আগেই তিনি মারা যান—অল্পবয়সে। এই কিরণবালাই আবার প্রফুল্ল নাটকের প্রথম জ্ঞানদা।

প্রসঙ্গত আরও একটা কথা বলে রাখি। বিনোদিনী তখন প্রায়ই থিয়েটার দেখতে আসতেন। যথেষ্ট বৃদ্ধা হয়েছেন, কিন্তু থিয়েটার দেখবার আগ্রহটা যায়নি। নতুন বই হলে ত উনি আসতেনই, এক কর্ণার্জুন যে কতবার দেখেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। মুখে-হাতে তখন তাঁর শ্বেতী বেরিয়েছে, একটা চাদর গায়ে দিয়ে আসতেন। এসে, উইংগসের ধারে বসে পড়তেন। অমনি, আমাদের মেয়েরা, যে-যেখানে থাকত সবাই আসত ছুটে, একটা মোড়া এনে পেতে দিতো, আর 'দিদিমা' বলে ওঁকে একেবারে ঘিরে ধরত। কথা বলতেন খুব কম। থিয়েটারের সবাই খুব সম্ভ্রম করতেন ওঁকে। আমি দূরে থেকে ওঁকে দেখতে দেখতে ভাবতাম, এই কি তিনি, যাঁর কথা এত শুনেছি, সেই দীর্ঘাঙ্গিনী সুন্দরী, তেজস্বিনী নায়িকা বিনোদিনীই কি এই বৃদ্ধা মহিলা?

অভিনয়ান্তে কাছে এসে প্রশ্ন করেছি—কেমন দেখলেন মা?

অপূর্ব স্নেহমণ্ডিত মুখখানি, বলতেন—বেশ বাবা।

বাড়িতে ওঁর নাতি-নাতনী, শুনেছি, বাড়িতে পুজো-অর্চনা লেগেই আছে, তবু থিয়েটার দেখতে ওঁর ঠিক আসা চাই। কৃষ্ণভামিনী 'সরলা' করে এসে ওঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলেন। উনি ওঁকে আশীর্বাদ করলেন। ওঁর মুখের ভাব দেখেই বুঝেছিলেন, উনি ওর কল্যাণ ও শুভ-কামনাই করলেন। কিন্তু, কৃষ্ণভামিনীর অমন যে সম্ভাবনাপূর্ণ জীবন, সে ও একদিন অকালে গেল মিলিয়ে! কিরণবালার মতো কৃষ্ণভামিনীও বেশীদিন বাঁচে নি, অল্প বয়সেই মারা গিয়েছিল। কিন্তু, সে বৃত্তান্তও বলা যাবে যথাসময়ে।

এর পরে স্টারে খোলা হলো ক্ষীরোদ-প্রসাদের নতুন নাটক "গোলকুণ্ডা"—৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫, বুধবার—রাত সাড়ে সাতটায়। পরদিন—বৃহস্পতিবারও ঐ সময়ে হয়েছিল গোলকুণ্ডা। এতে প্রধান ভূমিকা ছিল 'হাসান'—সেটি করলে নির্মলেন্দু। অন্য বড়ো পার্ট মীরজুমলা, সেটি করলেন তিনকড়িদা। ঔরংজেব—আমি। কুতুব সা—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত। আমীন—সন্তোষ দাস (ভুলো)। সুবাসিনী ততদিনে আবার ফিরে এসেছে স্টারে, সে করলে—সেলিমা। মণিজা—রানীসুন্দরী। আরজমন্দ—কৃষ্ণ-ভামিনী। আহিরন—নিভাননী। 'বিজলী' লিখলে ২৭শে ফেব্রুয়ারী—"গোলকুণ্ডার অভিনয়ের কথা বলতে বসে, প্রথমেই মনে পড়ে এর নায়ক হাসানের কথা। এই হাসানের ভূমিকা নিয়েছিলেন নির্মলেন্দু-বাবু। সত্যাশ্রয়ী ও ঈশ্বর বিশ্বাসীর নির্ভীক উদাসীন ভাব, মাতৃস্নেহ বঞ্চিতের অভিমান ও স্নেহ-পিপাসা, উদার-প্রেমিকের সংযত প্রেম এবং অভিমানী স্বভাবের সাময়িক উত্তেজনা তাঁর সমগ্র অভিনয়ের মধ্যে ওতঃপ্রোতভাবে মিশে গিয়ে দর্শকদের একেবারে তন্ময় করে রেখেছিল। এর পরেই উল্লেখযোগ্য হয়েছিল অহীন্দ্রবাবুর অভিনয়। গোলকুণ্ডার ঔরংজেব নিতান্তই অপ্রধান চরিত্র। এই ভূমিকায় বিশেষ কিছু কৃতিত্ব দেখাবার অবসর নাট্যকার রাখেন নি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অহীন্দ্রবাবু তাঁর শান্ত সংযত অভিনয়ের দ্বারা ছদ্মবেশী ফকির কৌশলী ও কুশাগ্রবুদ্ধি ঔরংজেবের যে ছবি ফুটিয়ে তুলেছিলেন, তাহা একান্ত উপভোগ্য।... অতি অভিনয়ের—ওভার অ্যাক্টিং-এর ঝোঁক কমিয়ে অহীন্দ্রবাবু যে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন এতে তাঁর শক্তি ও গ্রহণ-সাপেক্ষ মনেরই পরিচয় দেয়। আমরা তাঁর এই সুন্দর নিখুঁত অভিনয় দেখে বিস্মিত হইনি আনন্দিত হয়েছি।"

'বেঙ্গলী' লিখলে ১লা মার্চ তারিখে—"The principal attractions of the play are the beautiful rendering of the part of Aurangjeb by Mr. Ahindra Chowdhury and that of Harsan by Mr. Nirmalendu Lahiri."

(ক্রমশ)

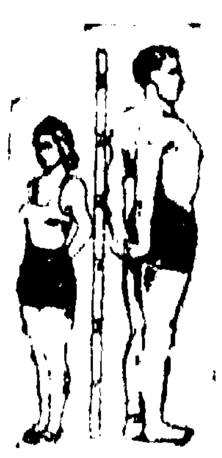

BE TALLER

and healthier by our new exercises and diet schedule. Details free.

283 (D.E.) Azad Market, Delhi-6

গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী গত হবার পর বহু সুধী ব্যক্তি তাঁর সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান কথা বলেছেন এবং লিখেছেন। এঁদের অনেকের সঙ্গেই তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎভাবে কথাবার্তা অল্পই হয়েছে কিন্তু যেটুকু হয়েছে সেই স্মৃতি যথেষ্ট মূল্যবান মনে করি এবং এই আলোচনায় তাঁর সংগীত চিন্তার যে পরিচয় পেয়েছি সেটি ব্যক্ত করে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের সুযোগ গ্রহণ করি।

সংগীত সম্বন্ধে ইন্দিরা দেবী উদার মতাবলম্বী ছিলেন। বাংলায় প্রচলিত সর্বপ্রকার সংগীত সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা এবং কৌতূহল ছিল। রবীন্দ্রসংগীতের বহু স্বরলিপি ছাড়াও দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ এবং রজনীকান্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট সুরকারগণের অনেক গান তিনি জানতেন এবং কিছু কিছু স্বরলিপিও করেছিলেন। এ ছাড়া সেকালকার বাংলার অনেক বিচিত্র সংগীতের স্বরলিপিও তিনি করেছেন। সব রকম গানের মাধ্যমে যাতে আমাদের সংগীতশিক্ষা অগ্রসর হয় সে সম্বন্ধে তিনি বহু বৈঠকে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন। প্রকৃতিতে তিনি অত্যন্ত সরল ছিলেন—মনের কথা খোলাখুলি বলা ছিল তাঁর অভ্যাস। তিনি যে যুগের মানুষ সে যুগে সামান্য তানবিস্তারের পক্ষপাতী সকলেই ছিলেন কেননা নানারকম গান কিছুটা খেলিয়ে গাওয়াই ছিল সেকালকার রীতি। এ বিষয়ে একদা তিনি একটি পত্রিকায় তাঁর স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেন। তার সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের প্রসঙ্গও ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকে তাঁকে ভুল বুঝে নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করেছিলেন। লিখিতভাবে প্রতিবাদ করাটা তাঁরা নানা কারণে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে অনেক কথা বলতে ছাড়েন নি। রবীন্দ্রনাথের গানে ওস্তাদি কসরতের পক্ষপাতী ইন্দিরা দেবী-চৌধুরাণী আদৌ ছিলেন না অথচ অনেকে তাঁর ওপর এইরকম উদ্দেশ্যও আরোপ করেছিলেন। ব্যাপারটি বর্ণনা করে তিনি নিজে আমাকে বলেছিলেন—"ঘরে বাইরে নানা কথা শুনে আমার তখন এমন অসহায় অবস্থা যে মনে হল সবাইকার কাছে বলি—Sorry, I spoke.

কাব্যসংগীতে বিশেষ করে বাংলা গানে লয়ের আদর্শ সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট চিন্তা করেছিলেন। বিভিন্ন শিল্পীর গান শুনে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে কোন একটা গান ঠিক কি লয়ে অর্থাৎ কি গতিতে গাইতে হবে সে সম্বন্ধে অনেকের স্পষ্ট ধারণা নেই। দ্রুত, মধ্য, বিলম্বিত—এই তিনটি শব্দেও গতির নির্দেশ স্পষ্ট হয় না। অনেকে দ্রুত অর্থে একটু বেশি দ্রুত বোঝেন আবার অনেকে দ্রুতকে প্রায় মধ্যলয়ের পর্যায়ে ফেলেন। এ সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্বরলিপি-গীতি-মালার প্রথম খণ্ডে কিছু আলোচনা করে এক প্রকার লয়াংক সংকেত নির্ধারণ করেন (পৃঃ ৪-৫)। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী এই লয়াংক সংকেত যাতে আরও বৈজ্ঞানিকভাবে নির্দিষ্ট করা যায় সে দিকে চিন্তা করবার উপদেশ দিয়েছিলেন। আজকালকার স্বরলিপি থেকে এই সংকেতটি উঠে যাওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করবার ইচ্ছা তাঁর ছিল কিন্তু বোধ হয় সেটি আর হয়ে ওঠে নি।

পাশ্চাত্য সংগীতের হার্মনির প্রতি অনুরাগ ছিল তাঁর অসাধারণ। সে যুগে যে স্বল্প কয়েকজন বাংলাগানে হার্মনি সম্পাদনের প্রয়াস করেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন প্রধান উদ্যোগী। চেষ্টা করলে বাংলা গানে উত্তম হার্মনি সম্পাদন করা যেতে পারে—এটা তিনি বিশ্বাস করতেন। তবে হার্মনির ক্ষেত্রে

দুটি তরুণ-তরুণীর দুঃখনিশার
অবসানের কাহিনী
নবীন সাহিত্যিক
হীরালাল পালধীর লেখা
'রাত্রি হলো শেষ'

সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আলোড়ন সৃষ্টিকারী উপন্যাস
পুতুল নিয়ে খেলা
হীরামোহন মুখোপাধ্যায়

নব বলাকা প্রকাশনী
৪নং নফর লাহা লেন। কলিঃ ৩৬

(সি-১৪১৪)

ভূতপূর্ব সৈনিক অমির হালদার রচিত
পল্টন জীবনের চিত্তাকর্ষক কাহিনী

পল্টন ছাউনি

"লঘু হাসা পরিহাসের মধ্য দিয়েও যে ভয়াবহ এবং ভয়ংকর জিনিসের কথা বলা যায় একথা লেখক তাঁর পল্টন ছাউনি পুস্তকে নতুন করে প্রমাণিত করলেন"...... —দেশ

সুপ্রসিদ্ধ গল্পভারতীতে প্রকাশিত
চার টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ
দাশগুপ্ত অ্যাণ্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ
৫৪।৩ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা
ডি এম লাইব্রেরী.
৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

(সি ৯৫৫৯)

BUY THE BEST
HIGHLY APPRECIATED
SAMSAD
ANGLO-BENGALI
DICTIONARY
1672 PAGES • Rs. 12-50 n.p.
SAHITYA SAMSAD
32 A, ACHARYA PRAFULLA CH. RD. • CAL-9

জাতীয় সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট সংযোজন

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বিরাট গ্রন্থ

ভারতে জাতীয় আন্দোলন

আন্দোলনের সূচনাকাল থেকে দেশ স্বাধীন হওয়া অবধি দীর্ঘ সময়ের সুসংবদ্ধ ও প্রামাণিক ইতিবৃত্ত। বহু তথ্য ও কাহিনী। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে লেখকের অকুণ্ঠ ও বলিষ্ঠ আলোচনা। আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে বাঙালী দেশকর্মীদের অবদানের বিবরণ। তৎসহ ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের সুচিন্তিত মুখবন্ধ এবং ডক্টর ওহদেদেরের বিশদ গ্রন্থপঞ্জী বইখানিকে বিশেষ মূল্যবান করেছে। সুচারু প্রচ্ছদ। সুদৃঢ় বাঁধাই। ১০·৭৫॥

অন্যান্য কয়েকখানি বিশেষ ধরণের রচনাঃ

ডেল কার্নেগির বিখ্যাত দুখানি বই **প্রতিপত্তি ও বন্ধুলাভ** (How to Win Friends & Influence People) ৪·৫০ ॥ **দুশ্চিন্তাহীন নতুন জীবন** (How to Stop Worrying & Start Living) ৫·৫০ ॥ পরিমল গোস্বামীর আত্মজীবনী **স্মৃতিচিত্রণ** ৭·০০ ॥ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুরাণ কাহিনী **অমৃতের উপাখ্যান** ৩·৫০ ॥ চিত্তরঞ্জন দেবের ভ্রমণ **তারাপীঠের একতারা** ৩·৭৫ ॥ নন্দাঘুণ্টি অভিযানের সহ-নেতা বিশ্বদেব বিশ্বাসের পর্বত-অভিযান **কাঞ্চনজংঘার পথে** ২·৫০ ॥

একমাত্র পরিবেশকঃ **পত্রিকা সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড**

৯২।১, লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ ॥ শাখা ঃ দিল্লী — বোম্বাই — মাদ্রাজ

রেডক্রস

হসপিটাল সুইপ

খেলা—৩১শে ডিসেম্বর ১৯৬০

প্রথম পুরস্কার পাবার সৌভাগ্য কার কে বলতে পারে?
রেডক্রস হসপিটাল সুইপের টিকিট কী আপনি কিনেছেন?

আপনার নাম, ঠিকানা, আর নন্-ডি-প্লুম মণিঅর্ডার কুপনে স্পষ্ট করে লিখে ১·১৫ নয়া পয়সা ডাকযোগে পাঠিয়ে দিন, আপনার খুচরা টিকিট সরাসরি আমরা পাঠিয়ে দেব। পোস্টাল অর্ডার যোগেও আপনি টাকা পাঠাতে পারেন। টিকিটের দাম হিসেবে ডাক টিকিট কিন্তু গ্রহণ করা হয় না।

টিকিটের দামঃ—১৲ টাকায় ১ খানা টিকিট,
১০৲ টাকায় ১২ খানা টিকিট আপনি পাবেন।

এ ছাড়াঃ—টিকিট বিক্রেতাদের জন্য আকর্ষণীয় পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। টিকিট বিক্রয়ের ফরম বিনামূল্যেই দেওয়া হয়—অন্যান্য নিয়মাবলী ও ফরমের জন্য লিখুন—

রেডক্রস পশ্চিমবঙ্গ

৫, ৬ গভর্ণমেণ্ট প্লেস (নর্থ), কলিকাতা ১

অনভিজ্ঞতা বা অশিক্ষিতপটুত্ব সম্বন্ধে তিনি বিশেষ শংকা প্রকাশ করেছিলেন। হালকা ইংরেজি রেকর্ডের অনুকরণ করে বাংলা গানে হার্মনি সৃষ্টির অপচেষ্টাকে তিনি আদৌ সমর্থন করেন নি।

আর একটি পাশ্চাত্যপদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন যেটি আমাদের সংগীতে প্রয়োগ করতে পারলে সত্যিই বেশ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হতে পারে। সাধারণত আমাদের গানের সংগে যে বাজনা থাকে তা একান্তভাবেই গানকে অনুসরণ করে। পাশ্চাত্য পদ্ধতি এ রকম নয়। গান যেভাবে চলে সংগের বাজনা ঠিক সেভাবে চলে না—তার রূপে একটা পার্থক্য আছে—অথচ বাজনা এবং গানের সহযোগিতা একটুও বেখাপ্পা ঠেকে না। বরঞ্চ এই মিলের বৈচিত্র্য মাধুর্য সম্পাদনে বিশেষ সহায়তাই করে। এইটি আমাদের সংগীতে কিভাবে প্রয়োগ করা যায় সে সম্বন্ধে চিন্তা করবার উপদেশ তিনি দিয়েছিলেন। আমাদের গানের সংগে পিয়ানো বাজানো হয় না—অর্গানেও আজ-প্রচলিত নেই। যাঁরা এই সব যন্ত্র ব্যবহার করেন তাঁরা এ বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখাতে পারেন। সাধারণত যে সব যন্ত্র কেবলমাত্র মেলোডির সংগে সহযোগিতা করবার জন্য ব্যবহার করা হয়, সে সব যন্ত্রে এ প্রচেষ্টা কতটা সফল হবে বলা শক্ত। আজকাল সিনেমা গ্রামোফোনে এই প্রচেষ্টার কিছুটা পরিচয় অবশ্য পাওয়া যাচ্ছে—তবে অনেক ক্ষেত্রেই তা সত্যিকারের আর্টের স্তরে পৌঁছোয় নি। ভবিষ্যতে হয়তো এ বিষয়ে আমরা অনেকটা সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হব।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর জীবিতকালে পাশ্চাত্যসংগীত সম্বন্ধে তাঁর অভিমতগুলি নিয়ে লিখব ভেবেছিলাম। কিন্তু এই সব ব্যাপারে তর্কের অবকাশ আছে, ভুল বোঝা-বুঝির সুযোগ তো আছেই। অতএব নানা কথা ভেবে এতকাল আলোচনা থেকে বিরত ছিলাম। বার্ধক্যে নানা বিতর্কজালে তাঁকে জড়িত করা আমাদের অভিপ্রেত ছিল না। তা ছাড়া বিদ্বেষপ্রসূত কোন মন্তব্য তাঁর মনোকষ্টের কারণ হলে সেটা আমাদেরও বিশেষ দুঃখের কারণ হত। আমাদের এ আশা ছিল যে, বিষয়গুলি নিয়ে তিনি নিজেই আলোচনা করবেন তখন তাঁর মতামতগুলি তাঁর ভাষাতেই উত্তমভাবে ব্যক্ত হবে। কিন্তু তিনিও শেষ পর্যন্ত এই সব বিষয়ে কিছু লেখেন নি। হয়ত নানা দিক ভেবে না লেখাই বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন। আজ তিনি তর্কের অতীত কিন্তু তাঁর সুচিন্তিত অভিমত, যা সাক্ষাৎভাবে তাঁর সংগে আলোচনায় জেনেছি—তা এই স্মৃতি-তর্পণ উপলক্ষ্যে জ্ঞাপন করা প্রয়োজন মনে করি।

বিশ্ববিচিত্রা

ইংলণ্ডে একবার এক মহিলা আদালত মারফত পাঁচশো কুড়ি টাকার জরিমানা আদায় করেছিলেন, কারণ তাঁর গ্রে-হাউণ্ডের লেজটি ঘড়ির স্প্রীংয়ের মতো গুটিয়ে ছিল বলে। মহিলা যার কাছ থেকে কুকুরটি কিনেছিলেন সে বলে কুকুরটি দাঁড়িয়ে থাকার সময় লেজ গুটিয়ে থাকে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, গ্রে-হাউণ্ডটি যতো দ্রুত ছোটে তার লেজটি ততোই গুটিয়ে যায়।

তুলনায় জরিমানা বেশীই করা হয়েছিল, কারণ গ্রে-হাউণ্ডের লেজ সোজা না থাকা আর হাল ছাড়া নৌকা একই কথা—দৌড়বার সময় মোড় ঘোরা তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে।

এ থেকে বোঝা যায় যে, দেখতে যতোটা মনে হয় প্রকৃতির মধ্যে তার চেয়ে বেশী চালন-যন্ত্র আছে। আর একটা জিনিস রয়েছে ঃ আমেরিকায় ইঁদুরের মতো এক প্রকার জন্তু আছে—পকেট গফার—যার সামনের আর পিছনের পা প্রায় সমান দৈর্ঘ্যের ফলে সামনে যেমন, তেমনি পিছন-দিকেও ওরা ছুটতে ওস্তাদ। মাটির নিচে অতি সরু গর্তের মধ্যে থাকে বলে এতে গফারদের চলাফেরা করা সুবিধে হয়। কচিৎ গর্তের বাইরে এলে পিছু হেঁটে এমনভাবে গর্তে ফিরে যায় যেন সুতো বেঁধে ওদের টেনে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু পিছন ছুটতে ওরা ধাক্কা সামলায় কি করে? এইখানেই ওদের "রাডারটি" অর্থাৎ লেজ কার্যকরী হয়। গফারদের লেজটি অতি স্পর্শাতুর হয় যা বেঁকে গিয়ে পথের বাধা জানিয়ে দেয়।

ফোলানো টায়ার তৈরী হবার বহু সহস্র বৎসর আগে থেকেই একটি জন্তু ফোলানো টায়ারের নীতি অবলম্বন করে আসছে। হাতির পা এমনভাবে তৈরী যে ওর দেহের ভারে পা'টা বড় হয়ে যায়। ভারটা তুলে নিলেই পা ছোট হয়ে যায়। এতে জলা-ভূমিতে চলার খুব সুবিধে হয়।

দেহের আকৃতির তুলনায় হাতিদের গতি বিস্ময়কর। পৃথিবীর বৃহত্তম স্তন্যপায়ী জীব—আফ্রিকার হাতি—কখনও কখনও ছ সাত টন ওজনের হয় এবং লম্বায় প্রায় ডবল ডেকার বাসের সমান হয়। অধিকন্তু, যদিও এক পা এগোতে সাত ফিটের বেশী অতিক্রম করতে পারে না তথাপি দীর্ঘপথ চলতে ওর গতি হয় ঘণ্টায় পাঁচ মাইল। কিন্তু তাড়া করলে মানুষের সমান সময়ে একশ গজ অতিক্রম করে অর্থাৎ ঘণ্টায় কুড়ি মাইল ছুটতে পারে।

হাতির একটা নির্ধারিত দূরত্ব অতিক্রম সম্পর্কে এক পরীক্ষা বিষয়ে একটি পুরোনো কাহিনী আছে। পরীক্ষাটি করেন এক শিকারী তাঁর বন্ধুর সহযোগিতায়। একটা ফাঁকা জায়গায় একটি হাতি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শিকারী ভদ্রলোক বন্দুক ছুঁড়ে তাকে ভয় দেখাতে ওঁর বন্ধু স্টপ-ওয়াচে গতি দেখতে থাকে। বন্দুকের শব্দে হাতিটি ফাঁকা জায়গা থেকে দৌড়ে ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করে অদৃশ্য হয়ে যায়। স্টপ ওয়াচে দেখা যায়, সময় লেগেছে দশ সেকেণ্ড এবং দূরত্ব মেপে দেখা যায় একশ কুড়ি গজ—হাতিটির গতি হয় ঘণ্টায় চব্বিশ মাইল।

আর মোটাচামড়ার জীব, যার গতি আরো বেশী, হচ্ছে আফ্রিকার গণ্ডার। শিকারের ছবি তোলায় সুখ্যাত কর্নেল মার্কসওয়েল ম্যাক্সোয়েল একবার আফ্রিকার এক সমতল-ভূমি দিয়ে গাড়ি করে যেতে এক ক্রুদ্ধ গণ্ডারের কয়েক হাত দূর দিয়ে সওয়া মাইল যেতে তাঁর গাড়ির স্পীডোমিটারে ঘণ্টায় আটাশ মাইল গতি ওঠে। আর একবার ম্যাক্সওয়েল এক মাদি গণ্ডারের সঙ্গে গাড়ি নিয়ে পাল্লা দিতে তার স্পীডোমিটারে ঘণ্টায় পঁয়ত্রিশ মাইল গতি দেখা যায়। রাস্তাটা অবশ্য কিছুটা ঢালু ছিল।

দ্রুতগতিসম্পন্ন জন্তুদের দৈহিক গঠন পরীক্ষা করলে বোঝা যায়, তাদের দেহযন্ত্র দৌড়ের কেমন উপযোগী। জনকয়েক মোটর কারিগর একবার রুশীয় নেকড়ের গতিযন্ত্র পরীক্ষা করে দেখে। তথ্যগুলি পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, ভূমি স্পর্শ করতে নেকড়ের পায়ে ন্যূনতম পীড়াবোধ হয়। গ্রে-হাউণ্ডের এবং ঐভাবে গঠিতদেহ কুকুরের নমনীয় শিরদাঁড়া ওদের গতিশীল হয়ে ওঠায় সহায়ক।

দৈহিক গঠন ও গতির সম্পর্ক বিষয়ে ডাঃ উইলিয়াম কে গ্রেগরি আর এক কথা বলেন। তিনি বলেন, ঘোড়া ও হরিণ জাতীয় গতিশীল জন্তুদের পায়ের নিম্নবর্তী হাড়গুলি উপরিভাগের হাড়ের চেয়ে দীর্ঘ হয়। হাড়ের এইপ্রকার বিন্যাস দ্রুত পা সঞ্চালনে সহায়তা করে, ফলে গতিলাভ করা সম্ভব হয়।

পৃথিবীর চারপেয়ে জন্তুদের মধ্যে গ্রে-হাউণ্ড ও রেসের ঘোড়ার গতি সবচেয়ে

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

মনের মানুষ

তিন টাকা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বহু যুগের ওপার হতে

— দু টাকা

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

বিবেকানন্দ চরিত

পাঁচ টাকা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তিন শূন্য

— তিন টাকা পঞ্চাশ

ছেলেদের বিবেকানন্দ

— এক টাকা পঁচিশ

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী

রবীন্দ্র মানসের উৎস সন্ধানে

— তিন টাকা পঞ্চাশ

সুবোধ ঘোষ

ভারত প্রেমকথা

— ছয় টাকা

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন

চিন্ময় বঙ্গ

— চার টাকা

সরলাবালা সরকার

গল্পসংগ্রহ

—পাঁচ টাকা

লিপিকার বই

বিদূষক ঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ দুই টাকা পঞ্চাশ

সাহিত্যের সত্য ঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ দুই টাকা পঞ্চাশ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা — ৯

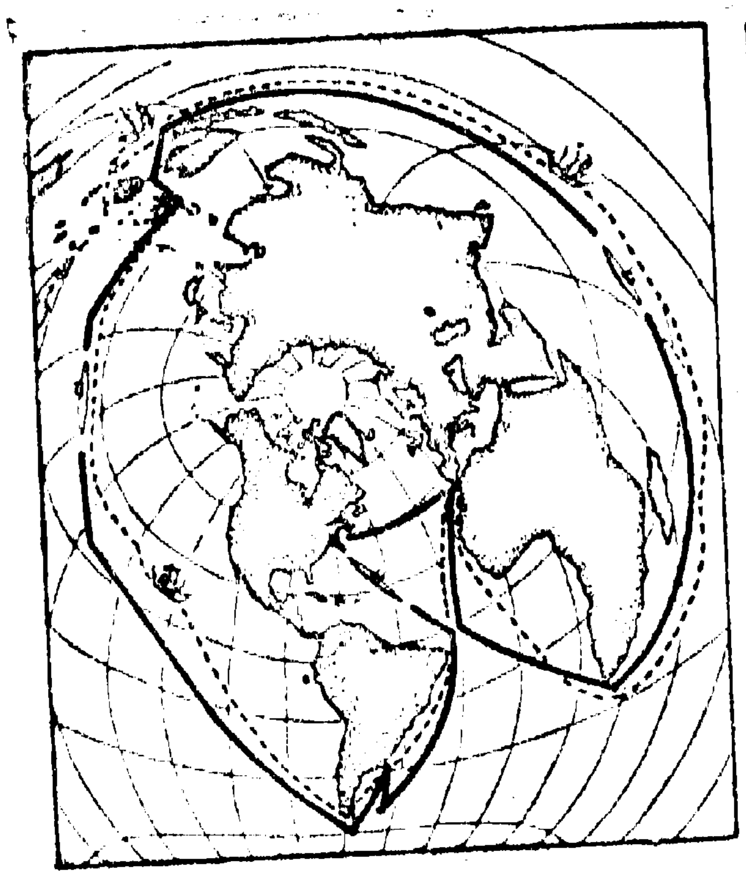

১

২

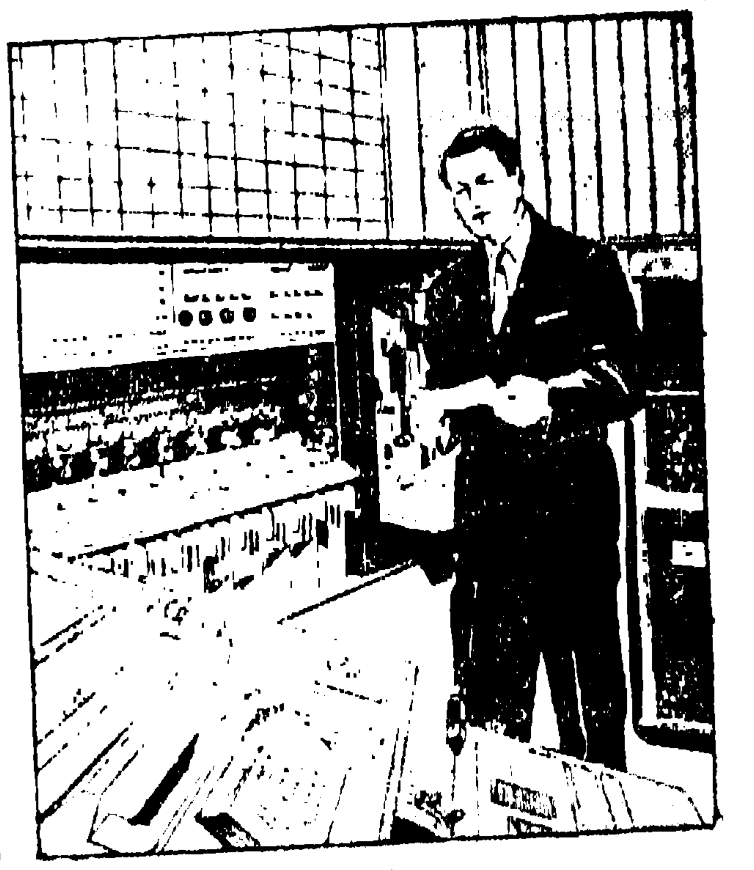

৩

১। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ আবিষ্কর্তা ফার্ডিনান্ড ম্যাগেলান যে পথ দিয়ে ভ্রমণ করেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের আণবিক শক্তি-চালিত ডুবোজাহাজ 'ট্রিটন' সেই একত্রিশ মাইল পথ সম্পূর্ণভাবে জলের নীচ দিয়ে ৬১ দিনে অতিক্রম করে। ম্যাগেলানের সময় লেগেছিল তিন বছর। আরো ১০,৫৯২ মাইল ভ্রমণ করে 'ট্রিটন' মোট ৮৪ দিনে তার যাত্রা সম্পূর্ণ করে। ২। বিশেষজ্ঞরা বলেন, ফড়িঙের উল্লম্ফন পেশী মানুষের পেশীর দ্রুততম গতির চেয়ে দশ গুণের সমান। প্রাণীজগতে শক্তিতে এর সমতুল্য হচ্ছে শামুকের খোলসের মুখ বন্ধ করার পেশী। ৩। আমেরিকার পদার্থবিজ্ঞানী ও ব্রীজ খেলায় চ্যাম্পিয়ান ডগলাস স্টীন সাড়ে উনত্রিশ হাজার টাকাকে ছ বছরে এগার লক্ষ সাড়ে বিয়াল্লিশ হাজার টাকায় পরিণত করেন। শেয়ার বাজারের গতি-প্রগতি নির্ধারণে তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং একটি ইলেকট্রনিক কম্পুটিং যন্ত্র ব্যবহার করেন। তাঁর ব্যবসা ছিল আলু ও পিঁয়াজের।

বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর দৌড়বাজ গ্রে-হাউণ্ড পাঁচ সেকেণ্ডে একশ গজ অর্থাৎ ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে ছুটতে পারে। হুইপেটরা গ্রে-হাউণ্ডের মতো বেগবান না হলেও বারো সেকেণ্ডে দুশ গজ তারা দৌড়তে পারে। কতকগুলি হুইপেট অবশ্য এর চেয়েও বেগবান হয়। প্রথম শ্রেণীর কোন শিক্ষিত হুইপেটের পক্ষে ঘণ্টায় ছত্রিশ মাইল বেগে দৌড়ানো অসম্ভব নয়।

বৃটিশ ডারবি দৌড় হয় ঘণ্টায় গড়পড়তা হিসেবে পঁয়ত্রিশ মাইল বেগে। কিন্তু কম দূরত্বের ক্ষেত্রে কোন চ্যাম্পিয়ান ঘোড়া এর চেয়েও দ্রুত দৌড়তে পারে। আমেরিকার বিখ্যাত ঘোড়া 'ম্যান অফ ওয়ার' সওয়া মাইল দৌড়তো ঘণ্টায় তেতাল্লিশ মাইল বেগে এবং সারা জীবনে সে একবার মাত্র পরাজিত হয়েছিল। মেক্সিকো সিটিতে ১৯৪৫ সালে 'বিগ র‍্যাকেট' নামক ঘোড়াটি সওয়া মাইল ২০·৮ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে সমান কৃতিত্ব দেখায়।

ঘণ্টায় তেতাল্লিশ মাইলের চেয়ে বেশী দৌড়তে পারে এমন জন্তু কমই আছে। যতদূর জানা যায় একমাত্র চিতা এবং কয়েক জাতের হরিণ এর চেয়ে বেশী বেগবান। জন্তুদের মধ্যে সবচেয়ে বেগবান হচ্ছে মঙ্গোলীয় কৃষ্ণসার মৃগ ও চিতা। ডাঃ রয় চ্যাপম্যান এণ্ড্রুজ একবার গোবি মরুভূমিতে একদল কৃষ্ণসার মৃগকে তাড়া করেছিলেন। "ওরা এত বেগে দৌড়তে থাকে যে বৈদ্যুতিক পাখা ঘোরার সময় ব্লেডগুলি যেমন দেখায় ওদের পাগুলি তার চেয়ে বেশী স্পষ্ট দেখা গেল না। আমরা দেখলাম ওরা প্রথম আধ মাইল ছুটলো ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে এবং পরে গতি কমে দাঁড়ায় ঘণ্টায় চুয়াল্লিশ বা পঞ্চাশ মাইল।"

মঙ্গোলীয় কৃষ্ণসার মৃগ প্রায় জন্মগ্রহণের পরই দৌড়তে শেখে। নিঃসন্দেহে এটা হয় ওদের শত্রু নেকড়েদের খপ্পর থেকে বাঁচবার সক্ষমতা অর্জনের উপায় হিসেবে। এণ্ড্রুজ বলেন একবার তিনি মাত্র দুঘণ্টা হল জন্মেছে এমন একটি কৃষ্ণসার মৃগশিশুর সামনে পড়েন। তাকে দেখামাত্রই মৃগশাবকটি গুলির মতো ঠিকরে পালিয়ে যায়। এণ্ড্রুজ চট করে তাঁর ঘোড়ার পিঠে চেপে শাবকটির অনুসরণ করেন। প্রথমটায় শাবকটির পাগুলি স্খলিত হলেও ক্রমে এমন বেগে দৌড়তে থাকে যে তাঁর ঘোড়া কিছুতেই আর তার নাগাল পায়নি।

প্রকৃতির সবচেয়ে বেগবান সৃষ্টি হচ্ছে চিতা। অল্প দূরত্বের ক্ষেত্রে কোন জন্তুই চিতার গতিবেগের সমকক্ষ হতে পারে না। গত মহাযুদ্ধের আগে লণ্ডনে প্রায়ই গ্রে-হাউণ্ডের সঙ্গে চিতার দৌড় অনুষ্ঠিত হতো। চিতার তুলনায় কুকুর এত মন্থরগতি দেখা যায় যে একবারে একটি চিতা এগিয়ে যেতে একটি কুকুরকে ডিঙিয়ে পার হয়। চিতাদের দৌড়ের পক্ষে উপযুক্ত ক্ষেত্র না হলেও ঘণ্টায় তারা পঞ্চান্ন মাইল অতিক্রম করতে সক্ষম হয়।

চিতার বেগবর্ধক ক্ষমতা যে কোন গাড়ির পরিকল্পনাকারীকে তার জায়গায় বসবার পক্ষে যথেষ্ট। ১৯৩৯ সালের ৩০শে জুন তারিখে লণ্ডনের 'দি টাইমস' পত্রিকার বিবরণ অনুযায়ী চিতা স্টার্ট নেওয়া থেকে দু সেকেণ্ডের মধ্যে ঘণ্টায় পঁয়তাল্লিশ মাইল গতিতে পৌঁছতে পারে। (গতিটা বড়ো অসাধারণ লাগে কি? তাহলে এই খবরটা শুনুন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার জেমস গ্রে একবার পুকুরে সন্তরণশীল ৯ ইঞ্চি লম্বা এক ট্রাউট মাছের চলচ্চিত্র তোলেন। ছবিখানিতে যদিও দেখা যায় মাছটির সর্বাধিক গতি ঘণ্টায় পাঁচ মাইল, কিন্তু আরম্ভ থেকে এই গতিবেগ পৌঁছতে তার সময় লেগেছিল ১/২০ সেকেণ্ড—যা দাঁড়ায় ঘণ্টায় একশ মাইলের সমান।)

চিতার সর্বাধিক গতিবেগ সম্পর্কে স্তন্যপায়ী জীব সম্পর্কে ফরাসী বিশেষজ্ঞ প্রফেসার বুরলিয়েব বলেন যে, একটা চিতার কুড়ি সেকেণ্ডে সাতশ গজ অর্থাৎ ঘণ্টায় একাত্তর মাইল দৌড়ানোর একটা রেকর্ড আছে।

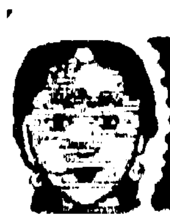
ধবল-শ্বেত কুষ্ঠ

বহুদিন পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম, দিন রাত চর্চা ও অনুসন্ধানের পর কবিরাজ শ্রীব্রহ্মস্বরূপ বি এ, উহা বিনাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইংরাজীতে লিখিবেন।

আয়ুর্বেবদীক কেমিক্যাল রিসার্চ লেবরেটরিজ ফতেপুরী, দিল্লী-৬

গ্রন্থ-পরিচয়

প্রবন্ধ

নায়কের মৃত্যু। শিবনারায়ণ রায়। শতাব্দী গ্রন্থভবন। ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৭। মূল্য ৪·৫০ নঃ পঃ।

ছাত্র পাঠ্য নয় অথচ সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে এমন বাংলা প্রবন্ধ গ্রন্থ এখনও বিরল। শিবনারায়ণ রায় প্রণীত 'নায়কের মৃত্যু' প্রধানত এই অকৃত্রিম উদ্দেশ্য সাধন করেছে বলে লেখক এবং প্রকাশক অভিনন্দনযোগ্য।

তেরোটি বিভিন্ন বিষয়াশ্রিত প্রবন্ধের সমষ্টি এই গ্রন্থ—'নায়কের মৃত্যু'। সমাজ-জীবন অথবা সমাজ-মানসিকতার সমস্যা জাতীয় আলোচনা দু'তিনটি প্রবন্ধে দেখা যাবে, যার মধ্যে 'জাতিবাদ, মনুষ্যত্ব ও সংস্কৃতি' এবং 'ভারতে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ' একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য বেশির ভাগ প্রবন্ধই প্রধানত সাহিত্য ও সাহিত্যের সমস্যা নিয়ে। 'নায়কের মৃত্যু' 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক মন' 'সমকালীন বাঙালী কবিদের প্রতি' 'বাংলা উপন্যাসের সংকট' প্রভৃতি—এ-জাতীয় রচনার মধ্যে পড়ে। অপর কয়েকটি রচনার বিষয় এবং আলোচনা অপেক্ষাকৃত হালকা মেজাজের। বিষয় অথবা মেজাজের প্রকারান্তর ঘটলেও লেখকের মার্জিত চিন্তাশীল এবং নিজস্ব দৃষ্টি-ভঙ্গীর একটি ঐক্য সকল প্রবন্ধের মধ্যে দেখা যায়। সম্ভবত এই ঐক্যের একটি এই যে লেখক 'হিউমান ডিগনিটি'র প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাবান বলে তাঁর সমস্ত রচনায় জীবন সমস্যা ও মানবিকতার সমস্যা নানা রূপে দেখা দিয়েছে।

'জাতিবাদ, মনুষ্যত্ব ও সংস্কৃতি' রুডলফ রকারের একটি গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিত। কিন্তু এই আলোচনা অধিকতর তাৎপর্যময় হয়েছে রবীন্দ্রনাথের জাতিবাদ সম্পর্কে অনাস্থাশীল মনোভাবের ব্যাখ্যায় এবং লেখকের নিজস্ব বিচারবুদ্ধির প্রখরতায়। প্রকৃতপক্ষে রচনাটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের মর্যাদা দাবী করতে পারে। জাতীয়তাবাদের সর্বনাশা রূপের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁদের পক্ষে লেখকের মতে সায় না দিয়ে উপায় নেই। হয়ত কোনো কোনো মন্তব্য নিতান্ত কটু এবং কিঞ্চিৎ জেদী বলে মনে হতে পারে। এক জায়গায় তিনি লিখছেন: "ব্যক্তিগত বিবেক এবং সর্ব-মানবীয় কল্যাণকে জাতিগত স্বার্থের চাইতে ওপরে স্থান দেবার মত মনস্বিতা এদেশে কোথায় বা আজ চোখে পড়ে!" পাঠক ভাবতে পারেন, এই মনস্বিতা যেন অন্য দেশে আজ খুব চোখে পড়ছে! সম্ভবত দ্বিধার সঙ্গে বলতে হবে, কই দেখি না তো। অবশ্য লেখকের অনুতাপ ঐ-দেশের জাতীয়তাবাদীদের জন্যে! এ দেশের মনস্বীদের সর্বমানবীয় কল্যাণের চিন্তা প্রসঙ্গে গান্ধীজীর উল্লেখ দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। হয়ত লেখকের এ-বিষয়ে অন্য অভিমত।

'ভারতে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ'—সুসংবদ্ধ এবং সহজবোধ্য রচনা। গণতন্ত্রের যেটি মূল কথা, অবস্থার উন্নতি করতে হলে তার

মানুষ গড়ার কারিগর

দ্বিতীয় মুদ্রণ
৫·৫০ নঃ পঃ

শিক্ষানায়কেরা বিশ্ববিশ্রুত দুইখানা ক্লাসিকের সঙ্গে তুলনা করলেন:—

আনন্দবাজার পত্রিকা—উপন্যাসখানিকে শিক্ষকদর্পণ বলা যেতে পারে—**নীলদর্পণ** যেমন নীলকর ও নীলের উৎপাদকদের দর্পণ ...কবিশেখর কালিদাস রায়

'শিক্ষক' মাসিক-পত্রিকার সম্পাদকীয়—একদা নিগ্রো ক্রীতদাসদের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা ও নির্যাতনের বিবরণ জনসমাজে প্রকাশ করিয়া Uncle Tom's Cabin-এর স্বনামধন্যা রচয়িত্রী নিগ্রো জাতির অশেষ উপকার সাধন করিয়াছিলেন। আমরা আশা করি, এই পুস্তকের রচয়িতা ভূতপূর্ব শিক্ষক মনোজ বসুও তাঁহার এক কালের সহকর্মীদের শোচনীয় অবস্থার প্রতি দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ইহার অবসান ত্বরান্বিত করিতে সমর্থ হইবেন। (অধ্যাপক মহীতোষ রায় চৌধুরী)

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ—কলিকাতা বারো

শ্রীজওহরলাল নেহরুর

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

বিশ্ব-বিশ্রুত "GLIMPSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। এ শুধু সন-তারিখ-সমন্বিত ইতিহাস নয়—ইতিহাস নিয়ে সরস সাহিত্য। গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পটভূমিকায় গৃহীত মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন যুগের চিত্রাবলী নিয়ে লিখিত একখানা শাশ্বত গ্রন্থ। জে. এফ. হোরাবিন-অঙ্কিত ৫০খানা মানচিত্র সহ। প্রায় হাজার পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ।

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৫·০০ টাকা

শ্রীজওহরলাল নেহরুর
আত্ম-চরিত ১০·০০ টাকা

শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারীর
ভারতকথা ৮·০০ টাকা

প্রফুল্লকুমার সরকারের
জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ২·৫০ টাকা

অনাগত (উপন্যাস) ২·০০ টাকা

ভ্রষ্টলগ্ন (উপন্যাস) ২·৫০ টাকা

আলান ক্যাম্বেল জনসনের
ভারতে মাউণ্টব্যাটেন ৭·৫০ টাকা

আর জে মিনির
চার্লস চ্যাপলিন ৫·০০ টাকা

শ্রীসরলাবালা সরকারের
অর্ঘ্য (কবিতা-সঞ্চয়ন) ৩·০০ টাকা

ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর
আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে ২·৫০ টাকা

ত্রৈলোক্য মহারাজের
গীতায় স্বরাজ ৩·০০ টাকা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ। ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

মীন পিয়াসী

সুবোধ ঘোষ

হিসেব করে, দোষগুণ বিচার করে কাউকে ভালবাসা যায় না—ভালবেসে তবে ভাবতে হয়। মনের মত করে কাউকে পাওয়া যায় না,—মনের মত হয়ে যায় বলেই তাকে পাওয়া যায়। কারও সংগে কারও মিলটিল থাকে না—অমিলগুলিও ভালবাসার দায়ে মিলে যায়। তাই তার নাম মিলন। এই উপলব্ধিই এতদিনে তপতী মল্লিকের জীবনে সত্য হয়ে উঠেছে। তাই আর সমাজ, সংস্কারের শাসনকে মানতে রাজী নয় তপতী। পৃথিবীর কোন ভ্রূকুটিকেই আজ আর সে ভয় করে না। লেখকের নবতম সুবৃহৎ উপন্যাস। দাম চার টাকা।

নতুন নাম নতুন ঘর

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নতুন নতুন পরিবেশ আর বৈচিত্র্যের স্বাদ নিয়ে বাংলা সাহিত্যের আসরে লেখকের আবির্ভাব খুব বেশী দিনের নয়। তবুও, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে তিনি ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। এই লেখকের এই গ্রন্থ একটি মধ্যবিত্ত নারীর জীবন আলেখ্য। দাম দু টাকা।

থির বিজুরী

সুবোধ ঘোষ

সাহিত্যিক হিসাবে সুবোধ ঘোষের পরিচয় নতুন করে কিছু দেবার নেই। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে তিনি বাংলা সাহিত্যের আসরে স্থিরদ্যুতি নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করছেন। 'থির বিজুরী' তাঁর প্রসিদ্ধ গল্পগ্রন্থগুলির অন্যতম। অনবদ্য নতুন সংস্করণ। দাম তিন টাকা।

জনম জনম

সুবোধকুমার চক্রবর্তী

মানব জীবনের চেতনপ্রবাহ নিরবচ্ছিন্ন: এই নিরবচ্ছিন্ন চেতনাপ্রবাহকে আমরা কালের চিহ্নে বিশেষভাবে চিহ্নিত করলেও আসলে তা অখণ্ড অবিভাজ্য। এবং এক একটি বিশেষ যুগের বিশেষ মানসভঙ্গীটি নিঃশেষিত হওয়ার পূর্বেই অন্যতরবোধ ও অনুভব অংকুরিত হয়ে উঠে। নালন্দার পটভূমিকায় লেখক এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিন টাকা।

অন্যান্য বই

শুন বরনারী—সুবোধ ঘোষ—৩·০০ ॥ নিতসিন্দুর—সুবোধ ঘোষ—৩·০০ ॥ কুসুমেষু—সুবোধ ঘোষ—২·৫০ ॥ ভোরের মালতী—সুবোধ ঘোষ—২·০০ ॥ মৌন বসন্ত—স্বরাজ বন্দো: (ছাপা হচ্ছে) ॥ কাচঘর—বিমল কর—২·০০ ॥ মেঘরাগ—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—২·৫০ ॥ একটি নীড়ের আশা—স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়—৩·০০ ॥ অগ্নি অবগুণ্ঠনে—সুবোধকুমার চক্রবর্তী—৩·০০ ॥ বিদিশার নিশা—শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—৩·০০ ॥ জোনাকির আলো—মিহির আচার্য—২·০০ ॥ আকাশ ও মৃত্তিকা—সরোজকুমার রায়চৌধুরী—৩·৫০ ॥ কুসুমের মাস—সন্তোষকুমার ঘোষ—২·৫০ ॥ মনোমুকুর সমরেশ বসু—২·৫০ ॥ আদ্যিকালের বাদ্যিবুড়ো—জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী—২·০০ ॥ বীরবল ও বাংলা সাহিত্য—ডাঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—৪·০০॥

ক্লা সি ক প্রে স, ৩।১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২।

দায়িত্ব আমাদের নিজেদের কাঁধে নিতে হবে—, এই কথাটি স্পষ্টভাষণে লেখক জানাতে পেরেছেন। এবং পেশাদার রাজনীতিকের মতন কোনো দ্বিতীয় ভগবানে দোষারোপ করে মূল সমস্যাটিকে এড়িয়ে যাননি। রচনাটি স্বচ্ছ এবং প্রত্যক্ষ।

'নায়কের মৃত্যু' এবং 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক মন' অপর দুটি প্রবন্ধ যার উল্লেখ অবশ্যকর্তব্য বলে মনে করি। 'নায়কের মৃত্যু'র মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, বর্তমান শতকে 'কি রেনেসাঁসী আর কি উনারতন্ত্রী' উভয়বিধ অর্থে নায়ক নায়িকা দুর্লভ হয়ে উঠেছে। কেন হয়েছে, শ্রীযুত রায় তার দীর্ঘ বিস্তৃত আলোচনা করে এই ধারণায় উপনীত হয়েছেন যে, উনিশ শতকের শেষার্ধে ফরাসী সাহিত্যে যে ব্যক্তির নির্বাণ সূচিত হয়েছিল বিশ শতকের শিল্পী-সাহিত্যিকদের হাতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের শূন্য-গর্ভতা অনুভূত হওয়ায় ব্যক্তি অস্তিত্বের বিলয় ঘটেছে। কারণ প্রসঙ্গে লেখক যে যুক্তিসিদ্ধ আলোচনা করেছেন তার পরিচয় দেওয়া এক্ষেত্রে সম্ভব নয়, স্বল্প কথায় এইমাত্র বলা যায়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যদি পাপ-বোধ এবং সর্ববিধ দুঃখ-যন্ত্রণার কারণ হয়, অথবা যদি গোষ্ঠী সত্তাই একমাত্র সত্য হিসাবে গৃহীত হয় তবে ব্যক্তি-অস্তিত্বের পায়ের তলায় মাটি কোথায়? বর্তমান সমালোচকের ধারণা 'নায়কের মৃত্যু' আলোচ্য গ্রন্থের সর্বোত্তম রচনা।

'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক মন' চমৎকার। প্রায় নিরলংকার সরল এবং অকপট বক্তব্যের জন্যে লেখাটি সর্বশ্রেণীর পাঠকেরই ভাল লাগবে।

অপরাপর প্রবন্ধগুলির আলোচনা এক্ষেত্রে অসম্ভব জেনে বলি, স্রষ্টা বনাম সৃষ্টি: বার্টোল্ট ব্রেখট; গুস্তাভ ফ্লোবেয়ার ও 'মূঢ়তার বিশ্বকোষ'; পাঠকদের নিঃসন্দেহ ভাল লাগবে। 'বাংলা উপন্যাসের সংকট' কি 'মহানগরের গ্রামীণ মন' লেখকের মন্তব্যের প্রতি আমাদের কৌতূহলী করে মাত্র।

ভ্রমণ-সাহিত্য

চরণিক — মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। বেংগল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা-১২। তিন টাকা।

বিচিত্র পৃথিবী। বিচিত্র তার অনিঃশেষ দৃশ্য। বিচিত্র তার দেশদেশান্তরের মানুষ। একমাত্র ভ্রমণসাহিত্য পাঠের মধ্যে দিয়ে —মরিতে চাহি না যে সুন্দর ভুবনে—তার চিত্র-চরিত্র প্রেমসান্নিধ্য হয়ত কিছুটা লাভ করা যায়। এ বইয়ের লেখক ভ্রমণের মধ্যে

দিয়ে পৃথিবীকে কাছে টেনেছেন। আমরা তার ভ্রমণের বইটি পড়ে এইমাত্র চেকো-শ্লোভাকিয়ার পাহাড়ে, গ্রামে গ্রামে, প্রকৃতির লীলায়িত রূপরাজ্যে বেড়িয়ে ফিরে এলাম।

এক একটি মানুষ আছেন ঘরে বসেই পৃথিবীর স্বরূপ দর্শন করেন। বিমানে উড়ে গিয়ে হাজার হাজার মাইল টপকে কেউ কেউ পৃথিবীকে আত্মীয় করেন। জাহাজ, রেলগাড়িও পৃথিবীর সঙ্গে তাড়াতাড়ি বন্ধুত্ব পাতাবার কাজে আজ কম সহায়ক নয়। কিন্তু একটা কথা মনে পড়ছে, যখন স্বয়ং বিজ্ঞান মানুষকে এসব দ্রুতগামী দূরযানী সুযোগ-বকশিশ দেয়নি—তখনও পথচলা পথিক গুড়ি গুড়ি পায়ে হেঁটে পৃথিবীর বুক মাড়িয়ে দূর-দূরান্তরে দেশ-দেশান্তরে পাড়ি দিত। এখন পুরোন দিনের পায়ে-হাঁটা পদ্ধতি আর কেউ অনুসরণ করে না—কিন্তু মনে হয় পায়ে হেঁটে পৃথিবীর মাঠ পাহাড় রাস্তা গ্রাম শহর পার হয়ে চলে যাওয়া বিচিত্র ধরিত্রীকে স্পর্শের সবচেয়ে আন্তরিক পন্থা।

চরণ থেকে চরণিক। চরণের পরে নির্ভর করে যারা দেশ ভ্রমণ করে তারাই চরণিক। এ বইয়ের লেখক নিজেকে একজন চরণিক বলেছেন। আমাদেরও তাঁকে যোগ্য চরণিক বলে মেনে নিতে একটুও আপত্তি নেই। গত যুদ্ধেরও আগে লেখক যখন ইংল্যাণ্ডে ছিলেন তখন সেখানকার ছুটিতে তিনি চেকোশ্লোভাকিয়ায় চরণিক বা ভাণ্ডার-ফোগেলদের সঙ্গে ভিড়ে পায়ে হেঁটে গোটা শ্লোভাকিয়ার গ্রাম পাহাড় উপত্যকা, এক কথায় প্রাকৃতিক অধিরাজ্যে ভ্রমণের সংকল্প করেন। এই চরণ ভ্রমণে তাঁর সংগী জুটে-ছিল ও-দেশেরই একটি উৎসাহী যুবক। নাম মিরেক। গোটা ইওরোপে চরণনির্ভর একদল ভ্রমণকারী আছেন। তাঁদের 'ভাণ্ডার-ফোগেল' নামে অভিহিত করা হয়। এইসব ভ্রমণকারীদের সমিতি আছে—ভ্রমণকারীদের পক্ষে এই সমিতিগুলির সহযোগিতা ও সাহায্য অপরিহার্য। লেখক তাঁর বন্ধু মিরেককে নিয়ে শ্লোভাকিয়ার প্রাকৃতিক দর্শনীয় স্থানগুলিতে ঘুরেছেন। তাতরা পর্বতশ্রেণী, আলপাইন ফুলের বন, কার্পেথিয়ান পর্বতমালা, হ্রদ, গিরিখাদ, দক্ষিণ মোরাভিয়ার লোকনৃত্য কিছুই বাদ পড়েনি লেখকের দৃষ্টি ও উপলব্ধির এলাকা থেকে। সমস্ত বইখানির মধ্যে সহজ স্বচ্ছন্দ একটা গতিবেগ নিহিত রয়েছে যা পাঠকের মনকে বহুদূর এক অজানা দেশে টেনে নিয়ে যায়। বাংলায় বিদেশের পটভূমিতে রচিত ভ্রমণসাহিত্যের লেখকরা ইওরোপের কোন দেশের অজ পাড়াগাঁর, অশিক্ষিত সুন্দর সরল মনের সংস্পর্শ তেমন দেখতে পান না; লেখক আমাদের ভ্রমণসাহিত্যের বিভাগটিকে সেদিক থেকে এক ধাপ এগিয়ে দিলেন।

৩৫৬।৬০

প্রাপ্তি স্বীকার

Military History of India.—Sir Jadunath Sarkar.

Lahiri's Indian Ephemeris of Planets' Positions for 1961 A.D.

লোকমান্য তিলক—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা।

সচিত্র বর্ণমালা।

সচিত্র শব্দমালা।

বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস—অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত।

ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান— (১ম ভাগ)—ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত।

খাল পোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী।

রাস্তায় রাস্তায়—প্রাণতোষ ঘটক।

বিজ্ঞান বিচিত্রা—উইলিয়াম এইচ ক্রাউন—অনুবাদক—ধ্রুবজ্যোতি সেন।

মহাচীনের ইতিকথা—শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

জলের কথা—সৌমেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

কম্যুনিস্ট পার্টি ও কেরল—অনুবাদ—গায়ত্রী দাশগুপ্তা।

Y.M.C.A. Publications

Classical Sanskrit Literature—Keith	Rs.	3.00
Gotama Buddha—Saunders	"	2.00
Islam in India & Pakistan—Titus	"	5.00
Camping for Boys—Norman Ford	"	1.50
Indian Painting—Brown	"	3.00
Hindi Literature—Keay	"	2.50

Y.M.C.A. Publishing House,
5, Russell, St., Calcutta-16.
Phone : 23-3480

ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার প্রথম সাহিত্যিক মিলন কেন্দ্র

রাজপথ জনপথ

চাণক্য সেন

দাম—৬.৫০ ন. প.

কয়েকটি মতামত ঃ

নিউ দিল্লীর কেরল ক্লাবে এক সাহিত্যিক বৈঠকে কেরলের প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীশ্যামলালয়ম্ সাহিত্যে নতুন আঙ্গিক, বিষয়বস্তু ও দৃষ্টি-ভঙ্গী সম্বন্ধে আলোচনাকালে 'রাজপথ জনপথ'এর উল্লেখ করেন। 'রাজপথ জনপথ' আঞ্চলিক সীমান্ত উত্তীর্ণ হয়ে জাগ্রত উদ্বেলিত আফ্রিকাকে বাংলাসাহিত্যে নিয়ে এসেছে। লেখকের এই অভিনব প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষার লেখকদের প্রেরণা দেবে। —দিল্লী হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ৩১শে আগস্ট, ১৯৬০

"বক্তব্য তোমার মহৎ, সুতরাং 'রাজপথ জনপথ' মহৎ সাহিত্যশ্রেণীতে পড়বে। এ সৃষ্টির জন্য তোমাকে অভিনন্দন জানাই।" —সত্যবন্দী

"তোমার দৃষ্টিতে দর্শন আছে। অন্তর্দৃষ্টি আছে। —অমল হোম

আমাদের অন্যান্য বই

করুণা কোরো না—স্টিফান জাইগ। ৬·০০ ॥ **প্রিয়াল লতা**—সঞ্জয় ভট্টাচার্য। ২·৫০ ॥ **বন্ধু অমিতা**—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ২·০০ ॥ **জলকন্যার মন**—শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩·০০ ॥ **মন্থন**—অমরেন্দ্র ঘোষ। ৩·০০ ॥ **কুসুমের স্মৃতি**—অমরেন্দ্র ঘোষ। ২·৫০ ॥ **দুই সখী**—বিনয় চৌধুরী। ২·০০ ॥ **তিমিরাভিসার**—শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫·০০ ॥ **বালির প্রাসাদ**—পুলকেশ দে সরকার। ৪·০০ ॥

সুবোধ ঘোষ-এর নতুন উপন্যাস
নবীন শাখী
শীঘ্রই বেরুবে

নবভারতী ঃ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ঃ কলিকাতা-১২

(স ১৪০৭)

রংজগৎ

চন্দ্রশেখর

নিন্দনীয় নিষ্ক্রিয়তা

আসন্ন রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে দেশময় উৎসবের সাড়া পড়ে গিয়েছে। দেশবাসী এই পবিত্র ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে শ্রদ্ধা ও সংকল্প, আনন্দ ও অনুশীলনের ভেতর দিয়ে জাতীয় জীবনের সত্তায় সার্থক করে তোলার ব্রতচারণে নিয়োজিত। কবি আবির্ভাবের শতবর্ষ পূর্তির এই উৎসব আজ সরকারী বেসরকারী এবং ছোট-বড় অসংখ্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে একটি পুণ্যব্রত-উদ্‌যাপনের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করে চলেছে। কিন্তু স্বাধীন ভারতের এই বিরাট ও মহান জাতীয় উৎসব নিয়ে বাংলা চলচ্চিত্র- জগতে এখনও কোন উদ্দীপনা ও প্রেরণার সাড়া জাগে নি। অসংখ্য ছোট ছোট শৌখিন নাট্যসংস্থা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যখন তাঁদের ক্ষুদ্র সামর্থ ও আয়োজনের মধ্য দিয়ে কবির জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবটিকে পূর্ণ করে তোলার মহৎ সংকল্প গ্রহণ করেছে, তখন অনেকেই আশা করেছিলেন যে বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্প-মহলের উৎসব-কর্মসূচীর কথা অচিরেই জানা যাবে। দুঃখের বিষয়, এ-বিষয়ে জনসাধারণ এখনও কিছুই অবহিত হতে পারেননি। হয়তো সংস্থাগতভাবে চিত্র-নির্মাতাদের এই উৎসব-পালনের পরিকল্পনা এখনও রূপ গ্রহণ করেনি। কিন্তু পরিকল্পনার আগে প্রেরণার যে পদশব্দটি শোনা যায় তা এখনও অশ্রুতই রয়ে গেছে।

নিউ থিয়েটার্স—সরকার প্রোডাকসন্স প্রযোজিত 'নতুন ফসল'-এর একটি দৃশ্যে বাণী হাজরা, সুপ্রিয়া চৌধুরী ও বিশ্বজিত

জাতীয় জীবনের একটি বৃহত্তম সাংস্কৃতিক অধিষ্ঠান চলচ্চিত্র শিল্পমহল। চলচ্চিত্র অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক মাধ্যম। এই শিল্পের ধারক ও বাহকরা রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর পুণ্যলগ্নে কী-ভাবে কবির প্রতি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করবেন তা-নিয়ে চলচ্চিত্রামোদী এবং জনসাধারণের মধ্যে বেশ আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। চলচ্চিত্র শিল্প-মহলের উৎসব-পালনের কর্মসূচী জানার আগ্রহ হয়তো এখনও তাঁদের রয়েছে। দেশব্যাপী রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষ পূর্তির শুরুতে আর বিলম্ব নেই, এবং চারিদিকে নানা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার উৎসব-আয়োজনের প্রস্তুতিও প্রায় সম্পূর্ণ। কিন্তু এখনও পর্যন্ত একটি মহৎ কর্তব্য সম্পাদনে চলচ্চিত্র শিল্পজগতের নীরবতা বিস্ময়কর। এই নীরবতা নিষ্ক্রিয়তারই নামান্তর।

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে চলচ্চিত্র স্থান পেয়েছে। সাহিত্যের দরবারে ও চলচ্চিত্রের হরপার্বতী সম্বন্ধ যে শুভ প্রয়াসের ফলে সম্ভব হল এবং সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের হরপার্বতী সম্বন্ধ যে একনিষ্ঠতার ফলে রূপ পেল, সেই শুভ-প্রয়াস ও একনিষ্ঠতা চলচ্চিত্র শিল্পমহলকে একটি ঐতিহাসিক ব্রত উদ্‌যাপনে আজও

WINTER REDUCTION SALE

শীতবস্ত্র ও পোষাক

শতকরা ২৫, ৩০, টাকা কম মূল্যে

নতুন ষ্টক SALE এ দেওয়া হল

কাশ্মিরী শাল, পাল্লাদার, দৌরদার, চারহাসিয়া।
অমৃতসর —মালদা, তুষ, শাল, আলোয়ান, র‍্যাগ, কম্বল।
লুধিয়ানা —পলওভার, স্লীপওভার, মাফলার, স্কার্ফ।

নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত মনোরম গরম পোষাক
বাজার অপেক্ষা ২৫,—৩০, কম মূল্যে বিক্রয় করিতেছি:

ছেলেমেয়েদের শীতের পোষাকের বিশেষ আয়োজন

হরলালকা এণ্ড কোং
কলেজ স্ট্রীট
রামরিকদাস
হরলালকা এণ্ড সন্স
ভবানীপুর

এস, হরলালকা এণ্ড কোং
ধর্মতলা
হরলালকা ষ্টোর্স
(আমাদের নূতন দোকান)
ব্রাবোর্ণ রোড

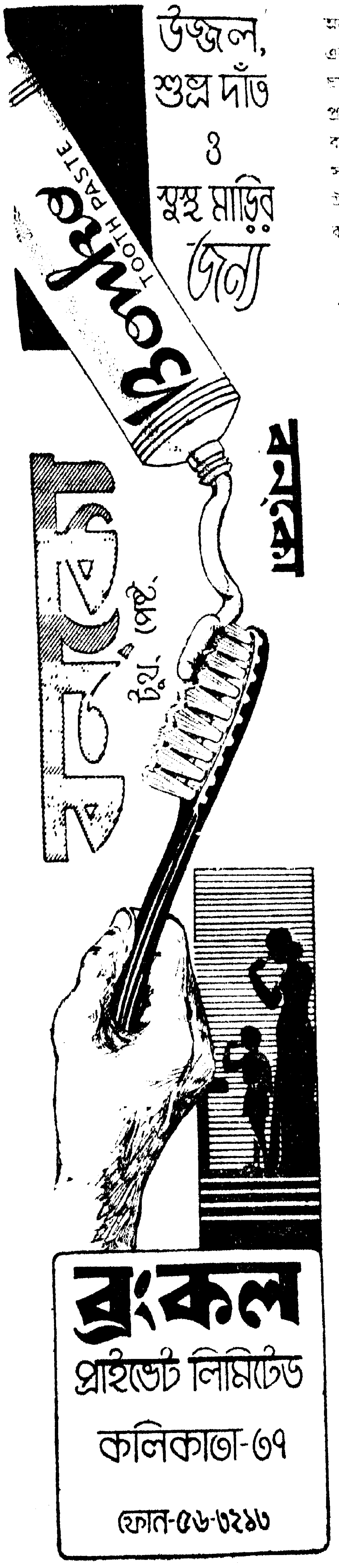

(সি ৯৫২৩)

পর্যন্ত সক্রিয় করে তুলতে পারেনি বলে অনেকেই বিস্মিত হবেন। আজকের যুগের একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক মাধ্যম হিসাবে ছায়াছবিকে সাহিত্যমেলায় স্বীকৃতিদানের প্রয়োজন যাঁরা উপলব্ধি করেছেন, তাঁরা বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পজগতের পক্ষ থেকে সংস্থাগতভাবে রবীন্দ্র জন্ম শত বার্ষিকী উৎসব পালনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুভব করবেন, এমন আশা করাটা অন্যায় নয়।

রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর প্রতিভার স্পর্শ পায়নি এমন কোন সাংস্কৃতিক আন্দোলন আমাদের দেশে নেই বললে অত্যুক্তি হবে না। বাংলা চলচ্চিত্র তার অনতিদীর্ঘ ইতিহাসে বাঙালী জীবনের একটি অপরিহার্য সাংস্কৃতিক বাহন হিসাবে যে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছে তার কারণ এই শিল্প-মাধ্যমটিও বঙ্গসংস্কৃতি ও শিক্ষার অন্যান্য মাধ্যমের মতো রবীন্দ্র-সাহিত্যের স্নেহ-চ্ছায়ায় লালিত ও পুষ্ট হয়েছে। বাংলা ছবির প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথের গল্প ও উপন্যাসের চিত্ররূপ তার মর্যাদা বাড়িয়েছে, রবীন্দ্রনাথের গান বাংলা ছবিতে প্রাণ-সঞ্চার করেছে এবং সাধারণভাবে ছায়াছবির কাহিনী রবীন্দ্র সাহিত্যের ভাবধারায় অনু-প্রাণিত হয়ে উঠেছে। বাংলা রজতপটের বর্তমান স্বর্ণযুগও রবীন্দ্রনাথের কাহিনী দ্বারা সমৃদ্ধ। এক কথায় বলতে গেলে, রবীন্দ্র-মানসের প্রভাবে বাঙালীর জীবন, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিল্প নতুন প্রাণের ছন্দে যে-ভাবে গড়ে উঠেছে, সেই ভাবেই আত্মিক বিকাশলাভ ঘটেছে বাংলা ছবির। তর্কাতীত এই সত্যটিকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার ভেতর দিয়ে উপলব্ধি করা এবং কর্মের মধ্য দিয়ে সার্থকতর করে তোলার ব্যগ্রতা আজও দেখা দেয়নি বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প-মহলে। এই উদাসীনতা ক্ষমার্হ নয়।

কী উপায়ে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পজগত কবি-আবির্ভাবের শতবর্ষ পূর্তি উৎসব পালন করতে পারেন তা-নিয়ে অনেক আলোচনা ও পরিকল্পনা প্রণয়নের অবকাশ আছে। বাংলা ছবির জন্মকাল থেকে আজ পর্যন্ত যে-সব ছবি রবীন্দ্রনাথের গল্প বা উপন্যাসের ভিত্তিতে তৈরী হয়েছে সেগুলির পুনর্মুদ্রণ ও প্রদর্শনীর আয়োজনই হয়তো সর্বাগ্রে অনেকের মনে জাগবে। বাংলা ছবিতে শ্রেষ্ঠ কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও গীতরচনার জন্য রবীন্দ্র-পুরস্কারের ব্যবস্থা এবং রবীন্দ্রনাথের নামে ভবন তৈরী করে চলচ্চিত্র শিল্পের অনুশীলনের জন্যে স্থায়ী আলোচনা-চক্রের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কবির প্রতি অর্ঘ্য নিবেদনের পরিকল্পনাও হয়তো অনেকের কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কর্মজীবনের যে-কোন একটি দিক নিয়ে কিংবা তাঁর তৈরী বিশ্বভারতীর

থিয়েটার সেণ্টার

ফোন : ৪৭-৩৫৫৫

রবি
সন্ধ্যা
৬॥০

উপদেষ্টা : প্রেমেন্দ্র মিত্র
পরিচালনা : তরুণ রায়
মঞ্চ : খালেদ চৌধুরী
আলো : অমর ঘোষ

শ্রেঃ কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বনানী চৌধুরী, তরুণ রায়, পিকলু, পরিমল, স্নিগ্ধ, তারাপদ, অমরেশ, গোবিন্দ, মমতা ও দীপান্বিতা রায়

• • •

শুভারম্ভ ১৫ই ডিসেম্বর

রুচিস্মিত সুবাসের
শুচিস্মিত স্নিগ্ধতা

POMPEÏA
Perfume
and
POMPEIA FACE POWDER
POMPEIA LOTION
POMPEIA BRILLIANTINE
ইণ্টারন্যাশনাল ফ্রাগ্রেন্স [illegible]
বোম্বাই

প্রসঙ্গত

শিশুসাহিত্যের যাদুকর স্বর্গত সুকুমার রায়ের স্ত্রী এবং বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের মাতা সুপ্রভা রায় গত ২৭শে নভেম্বর শেষ রাতে, ২-১৫ মিনিটে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৬৮। সাধারণভাবে তাঁর এই পরিচয় হলেও নিজস্ব গুণ ও কীর্তিতে তিনি মহীয়সী পর্যায়ের ছিলেন।

১৮৯২ সালের ৩রা ডিসেম্বর তিনি ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর জগৎচন্দ্র দাশ। ছোট বয়েস থেকেই সুপ্রভা দেবী শিল্প ও সংগীতের পরিবেশে বড় হন। তাঁর মাতামহ ছিলেন সুখ্যাত গায়ক ও ব্রহ্মসংগীত রচয়িতা কালিনারায়ণ গুপ্ত। অতুলপ্রসাদ সেনও সম্পর্কে তাঁর মাসতুতো ভাই ছিলেন। কিছুকাল তিনি তাঁর ছোট মাসী ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের স্ত্রী, সুগায়িকা সুবলা আচার্যের কাছেও ছিলেন। এঁদের সংস্পর্শে আসার ফলে উত্তরকালে সুপ্রভা দেবী গানে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

মাতা সুপ্রভা দেবী, পুত্র সত্যজিৎ রায়, পৌত্র সন্দীপ রায় ও পুত্রবধূ বিজয়া দেবী

বি-এ অধ্যয়নকালে ১৯১৩ সালের ১৩ই ডিসেম্বর কলকাতার শিবনারায়ণ দাস লেনের ব্রাহ্মমন্দির ভবনে তাঁর বিবাহ হয়। তখন তাঁর শ্বশুরালয় ছিল ২২, সুকিয়া স্ট্রীটে। এইখান থেকেই সুকুমার রায়ের সম্পাদনায় ছোটদের পত্রিকা 'সন্দেশ' প্রকাশিত হয়। এখান থেকে এঁরা উঠে যান ১০০ গড়পার রোডে। এই গৃহেই ১৯১৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর সুকুমার রায়ের পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী পরলোকগমন করেন। সত্যজিৎ রায় জন্মগ্রহণ করেন ১৯২১ সালের ২রা ডিসেম্বর। মাত্র আড়াই বৎসরের শিশু ও বিধবা পত্নী রেখে ছত্রিশ বৎসর বয়সে সুকুমার রায় ইহলোক ত্যাগ করেন ১৯২৩ সালে। সেই আরম্ভ হয় সুপ্রভা দেবীর জীবন সংগ্রাম। পুত্রকে মানুষ করে তোলার দায়িত্ব একা তাঁর উপরে এসে পড়ল।

রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে তিনি পুত্রকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে গিয়ে কিছুকাল থাকেন। সত্যজিতের বয়স তখন চার বৎসর। কয়েক বছর শান্তিনিকেতনে থেকে ১৯২৭ সালে আসেন বেলতলায় তাঁর ভ্রাতা প্রশান্তকুমার দাশের গৃহে। এখানে থাকতেই সত্যজিৎ রায় বালিগঞ্জ গভর্নমেণ্ট হাই স্কুলে ভর্তি হন। এ সময়ে সুপ্রভা দেবী লেডী অবলা বসু প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাসাগর বাণী ভবনটি পুনর্গঠনের ভারপ্রাপ্ত হন। রবীন্দ্রনাথের শিল্পকলার প্রেরণা তিনি বাণী ভবনের ছাত্রীদের মধ্যে সঞ্চারিত করে তোলেন গান, সূচীশিল্প, ভাস্কর্য বিষয়ে শিক্ষাদানের মাধ্যমে। ছাত্রীদের তিনি নিজের সন্তানের মতো স্নেহ করতেন এবং তারাও তাঁকে মায়ের শ্রদ্ধাভক্তি দিয়ে ঘিরে রেখেছিল। দশ বৎসর এখানে কাজ করার পর ১৯৪০ সালে তিনি যান ঝাড়গ্রামে বাণী ভবনের শাখা বিদ্যালয়টি সংগঠিত করে দিতে। ইতিমধ্যে সত্যজিৎ রায় প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অর্থশাস্ত্রে বি এ অনার্সে পাস করেন।

সত্যজিৎ রায় কৈশোরজীবনে শান্তিনিকেতনে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর সংস্পর্শে আসায় যেটুকু শিল্প প্রেরণা লাভ করেন—তাছাড়া নিয়মিতভাবে শিক্ষা তিনি কারুরই অধীনে করেননি। কিন্তু তাঁর শিল্প প্রতিভার উন্মেষের মূলে তাঁর মায়ের প্রেরণা ও উৎসাহই মুখ্যত কার্যকরী হয়েছে। সত্যজিৎ রায়ের প্রথম প্রচেষ্টা 'পথের পাঁচালী' সৃষ্টির মূলে ছিল তাঁর মায়ের প্রেরণা। চিত্রের নির্মাণে সত্যজিৎ রায়কে দীর্ঘকাল যে কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে, সেটা তিনি সহ্য করতে পেরেছিলেন তাঁর মায়ের উৎসাহ পেয়ে।

বিবিধ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সংগেও সুপ্রভা দেবী যুক্ত ছিলেন। সুকুমার রায় সুধীবন্ধুদের নিয়ে যে 'মনডে ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করেন সুপ্রভা দেবী তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন। সুপ্রভা দেবী ছিলেন অত্যন্ত সেবাপরায়ণা—কারুর অসুখের কথা শুনলেই বিচলিত হয়ে পড়তেন। কিন্তু নিজের দুঃখকে অন্তর্মুখী করে রাখতেন।

বড়ো অকস্মাৎ মৃত্যু তাঁকে কবলিত করে। শুক্রবার সকালেও তিনি বেশ সুস্থ আছেন দেখে সত্যজিৎ রায় শান্তিনিকেতনে যাত্রা করেন রবীন্দ্রনাথের জীবনীবিষয়ক ছবিখানি তোলার ব্যাপারে। কিন্তু সন্ধ্যায় তিনি ফিরে আসেন মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে। শেষ পর্যন্ত সুপ্রভা দেবী জানান, তাঁর কোন কষ্ট নেই। মৃত্যুর দিন সন্ধ্যায়ও তিনি সকলের সংগে স্বাভাবিকভাবে আলাপ করেন।

কি পরিমাণ যে স্বামীঅনুগতপ্রাণা ছিলেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার মুহূর্ত পর্যন্তও সেটা অনুভব করতে পেরেছিলেন যাঁরা তাঁর মৃত্যুর পর শেষ দেখা দেখতে গিয়েছিলেন। চিরনিদ্রায় মগ্ন — গলায় শুকনো বিবর্ণ একটি পুষ্পহার। কষ্ট করে চিনতে হয় বেলফুলের গড়ে মালা বলে— বিবাহের সময় মালা বদলের এই মালা। চন্দনের বাক্সে এটি সাতচল্লিশ বছর ধরে সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। জানিয়ে গিয়েছিলেন শেষযাত্রায় যেন তাঁকে এই মালা পরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

এই মহীয়সী বিদুষী মহিলার কাছে দুটি কারণে বাংলা দেশ চিরঋণী হয়ে রইল। লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে প্রথম জীবনে স্বামীর ছায়ানুবর্তিনী হয়ে সাহিত্য সৃষ্টির কাজে তাঁকে নিত্যনিয়ত নীরবে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। পরবর্তী জীবনে আড়াই বছরের পিতৃহীন শিশুপুত্রকে পক্ষীমাতার ন্যায় সংসারের সকল ঝড়-ঝাপটার মধ্যে আপন পক্ষপুটে রক্ষা করে তাকে বড় হবার এবং বড় কিছু করবার প্রেরণা দিয়ে এসেছেন। আজ এই রত্নগর্ভা মাতার লোকান্তরিত আত্মার প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পুত্রের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।

বৈদেশিকী

RNM... LIBRARY ... Bihar

কংগোতে ইউনাইটেড নেশনস্-এর হয়ে যাঁরা কাজ করছেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ভারতীয় সামরিক অফিসার ২২শে নভেম্বর লিওপোল্ডভিলে কংগোলিজ সৈন্য কর্তৃক গুরুতরভাবে প্রহৃত হন। উচ্ছৃংখল সৈন্যেরা শ্রীরাজেশ্বর দয়াল এবং ব্রিগেডিয়ার রিখোর বাড়ি আক্রমণ করার ভয়ও দেখিয়েছিল, যার জন্য বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং শ্রী দয়াল এবং ব্রিগেডিয়ার রিখোর পরিবার ইউনাইটেড নেশনস্-এর দপ্তরে এসে একরাত্রি কাটান। তাঁদের বাড়ির উপর আক্রমণ অবশ্য হয়নি, কিন্তু ২২শে তারিখের ঘটনার খবরেই ভারতে যথেষ্ট উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে।

পার্লামেণ্টে বিষয়টির উল্লেখ হলে প্রধান মন্ত্রী জানান যে, ভারত সরকারের দৃষ্টিতেও এই ঘটনা অত্যন্ত গুরুতর। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ চেয়ে পাঠানো হয়েছে এবং এই সপ্তাহের মধ্যেই (অর্থাৎ বর্তমান প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পূর্বেই) পার্লামেণ্টে কংগো সম্বন্ধে আবার আলোচনা হবে। গত বৃহস্পতিবারে যে-আলোচনা হয়, তার মধ্যেই জওহরলালজী বলেন যে, ২২শে নভেম্বরের ঘটনার দরুণ ইউনাইটেড নেশনস্-এর পক্ষে কর্মে নিযুক্ত ভারতীয়দের সরিয়ে আনার কথা চিন্তনীয় নয়। সেরূপ করা পলায়নের সামিল হবে, সেরূপ দৌর্বল্য-সূচক সিদ্ধান্ত তিনি করবেন না।

আসলে কিন্তু এক্ষেত্রে বীরত্ব অথবা দৌর্বল্যের কোনো নূতন প্রশ্নই ওঠে নি। ভারতীয় অফিসারদের প্রতি যে-ব্যবহার করা হয়েছে তার জন্য দুঃখ এবং ক্রোধ স্বাভাবিক, ভবিষ্যতে এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা দূর করার সর্ববিধ চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু যে-ঘটনা ঘটেছে সেটা অভাবনীয় কিছু বলে মনে করার কারণ নেই। কংগোর যা অবস্থা তাতে ওখানে যারাই আছে তাদেরই এইরকম দু একটা ঘটনার মধ্যে পড়ার সম্ভাবনা আছে ধরে নিতে হবে। রাশিয়ানদের যে-অভিজ্ঞতা হয়েছে সেটা অবশ্য অন্যশ্রেণীর ব্যাপার। তারা ইউনাইটেড নেশনস্-এর হয়ে আসে নি, তারা আলাদাভাবে এসেছিল এবং পরে চলে যেতে বাধ্য হয়। ঘানার প্রতিনিধিরা অবশ্য ইউনাইটেড নেশনস্-এর কাজের সংগে জড়িত। কিন্তু তাদের সংগে যে-গোলমাল হয়েছে সেটার মূলও অন্যধরনের, ভারতীয় অফিসাররা যে-ঘটনায় পড়েন সেটা তার সংগে তুলনীয় নয় যদিও তাতে সেই ধরনের পলিটিক্স-এর সামান্য ছোঁয়াচ লেগে থাকতেও পারে। তবে ব্যাপারটা মুখ্যত গুণ্ডামি যার ফলভোগ অন্যদেরও—যেমন মার্কিন, ক্যানেডিয়ান-দেরও অল্পবিস্তর করতে হয়েছে। যে-সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় ইউ-নাইটেড নেশনস্ কংগোতে গিয়েছে এটা সেই সমস্যারই অংশ। কংগোতে কেন্দ্রীয় সরকার বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই, রাষ্ট্রীয় জীবন অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বারা শতধা বিচ্ছিন্ন। সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে বেলজিয়ানরা অনেক ক্ষেত্রে আবার দলে দলে ফিরে এসেছে। বিরোধের যে কত স্তর তা হিসাব করে উঠা যায় না। কাসাবুভু, লুমুম্বা, মোবুটু কার পিছনে কার এবং কতটা সমর্থন আছে বুঝা কঠিন।

সবচেয়ে মুশকিল হয়েছে মোবুটুর সৈন্যদল নিয়ে। এদেরকে এখন সৈন্যদল বলাই উচিত নয়, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত গুণ্ডার দল বলা যেতে পারে, কারণ এদের এখন

মাটির পথ	উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৬·৫০
ভস্ম পুতুল	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৫·০০
পরমাপিপাসা	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	৩·৫০
পথ আমায় ডাকে	গদাধর নিয়োগী	৪·০০
গল্প	অন্নদাশংকর রায়	৫·০০
অভিযাত্রীক	ডঃ নবগোপাল দাস	৫·০০
এই পৃথিবী পান্থনিবাস	রমাপদ চৌধুরী	৫·০০
স্মরণ চিহ্ন	সুধীরঞ্জন মুখার্জি	৫·০০
উত্তর পুরুষ	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	২·৫০
রাজপুতানী	বিমল মিত্র	৩·৫০
উদয় অস্ত	বনফুল	৬·০০
রানী বৌ	প্রাণতোষ ঘটক	৪·০০
সেই উজ্জ্বল মুহূর্ত	সুবোধকুমার চক্রবর্তী	৪·০০
অপরাহ্ন	বিমল কর	৩·০০
সিন্ধুনদের প্রহরী	প্রমথনাথ বিশী	২·৫০
মাটি	তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়	২·৫০

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

হাড়ের পাশা ৩, অভিশপ্ত পৃথি (১, ২) ৭, এপার পদ্মা ওপার গঙ্গা ৩·৫০, বৌরাণীর বিল ৪·৫০, মেঘমল্লার ৩, কালোছায়া (১, ২, ৩, ৪) ১০·৫০

প্রলয় শিখা ২, নজরুল ইসলাম

রঙ্গব্যঙ্গ ৩·৭৫ রূপদর্শী

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের ডাঃ সাটিরা ও রবার্ট ব্লেক সিরিজ

ডাক্তারের পায়ে বেড়ী, ডাক্তারের জেলখানা, ডাক্তারের মুষ্টিযোগ, ডাক্তারের নবলীলা, ডাক্তারের হাতে দড়ি

প্রত্যেকখানি ২·৫০

ডি এম লাইব্রেরি, ৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রায় কোনো শৃংখলার বন্ধনই নেই, যা খুশী করে বেড়াচ্ছে অথবা যে-যখন পারছে এদের দিয়ে যা খুশী করাচ্ছে। নামে এদের কর্তা মোবুটু, কিন্তু মোবুটুরও যে ওরা আজ্ঞাধীন তা বলা যায় না। প্রথমে যখন এই সৈন্যদল বেলজিয়ান অফিসারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তখন সেটা কংগোর স্বার্থেই করেছিল কারণ বেলজিয়ান অফিসাররা তখন বেসরকারী ইউরোপীয়ান-দের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র বিলি করছিল। যদি কংগোর নেতারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিলোপ সাধন না করতেন তবে সৈন্যদল কংগোর শান্তিরক্ষার একটি উত্তম সামিল হতে পারত। কিন্তু নেতাদের মধ্যে বিরোধের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারও ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল, সৈন্যদলকেও শৃংখলাবদ্ধ করা গেল না। ফলে সৈন্যরাই শান্তির সবচেয়ে বড়ো শত্রু হয়ে উঠছে। তাদের আরো উচ্ছৃংখল হওয়ার কারণ হয়েছে অর্থনৈতিক দুরবস্থা। সৈন্যদের যে-সামান্য বেতন, তাও তারা নিয়মিত পায় না। সুতরাং লুটতরাজের দিকে তাদের লক্ষ্য গেছে।

ইউনাইটেড নেশন্‌স্-এর সেক্রেটারী জেনারেলের বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে শ্রীরাজেশ্বর দয়াল যে দ্বিতীয় রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে তিনি একটি ভয়াবহ অরাজকতার চিত্র এঁকেছেন। সেই রিপোর্ট যাঁরা পড়েছেন তাঁরা ২২ নভেম্বরের ঘটনায় অতিমাত্রায় বিস্মিত হবেন না। মহামারীর মধ্যে সেবা করতে গিয়ে ডাক্তারদের মধ্যে দু একজন রোগের দ্বারা আক্রান্ত হলে তাতে আশ্চর্য হবার কোনো কারণ নেই। আসল প্রশ্ন হল এই যে-রকম মহামারী তাতে সেবার কাজ যে-ভাবে চলছে তাতে সুফল পাবার আশা আছে কিনা। এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই যে, শ্রীরাজেশ্বর দয়ালের এই রিপোর্টে যে অবস্থার চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে সেটা আগের চেয়ে, অর্থাৎ ওঁর সেপ্টেম্বর মাসের রিপোর্টে যে ছবি দেখা গিয়েছিল তার চেয়ে অনেক খারাপ। এই সময়ের মধ্যে বেলজিয়ানদের প্রত্যাবর্তন এবং কংগোর অন্তর্দ্বন্দ্বে তাদের অধিকতর সক্রিয় পক্ষাবলম্বন বেড়েছে। সংগে সংগে হিংসাত্মক কাজ এবং অরাজকতাও বেড়েছে। তার অর্থ এই যে, ইউনাইটেড্ নেশন্‌স্ যে-উদ্দেশ্যে কংগোতে গিয়েছে সেই উদ্দেশ্য সাধনের পথে গত দু মাসে অনেক বাধা বৃদ্ধি হয়েছে।

কংগোর প্রতি পৃথিবীর দরদ যদি নিঃস্বার্থ হতো তাহলে অবশ্য এই অবস্থা হতো না। কিন্তু কংগোতে যে "কোলড্ ওয়ারের" হাওয়া লেগেছে। সেই হাওয়াতে অন্তর্দ্বন্দ্বের আগুনের জোর আরো বেড়েছে। ইউনাইটেড নেশন্‌স্ যখন প্রথম আসে তখন কংগোলীজ এবং বেলজিয়ানদের মধ্যে মারামারি থামানো এবং কংগোর নবলব্ধ স্বাধীনতাকে অকালমৃত্যু থেকে বাঁচানোই ছিল উদ্দেশ্য। বেলজিয়ান-দের না সরিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় ইউনাইটেড্ নেশন্‌স্‌ও দেখতে পায় নি। সেই সরানোর কাজ প্রথমে মোটামুটি এগিয়েছিল; তারপর নানা দিকের নানারকম চাপে অবস্থা উল্টোদিকে চলল। ফিরে-যাওয়া বেলজিয়ান অনেকে ফিরে এসেছে, তাতে কংগোর আর্থনীতিক বা অন্য কোনো-রকম ব্যাপারে উন্নতি হয় নি, রাষ্ট্রীয় জীবনের ঐক্য আরো ভেঙেছে, অরাজকতা আরো বেড়েছে। এখন কেবল ঐক্য নয়, সরকারী কর্তৃত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠাও ইউ-নাইটেড্ নেশন্‌স্-এর দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে দায়িত্ব স্পষ্টভাবে স্বীকার করা উচিত। প্রেসিডেণ্ট কাসাভুবুর অনুমোদিত ব্যক্তিদের কংগোর প্রতিনিধি হিসাবে ইউনাইটেড্ নেশন্‌স্-এ আসন দেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের আর যে গুণই থাক এর দ্বারা একটি অলীক বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে একথা মানতেই হবে। কারণ কোনো দেশের প্রতিনিধি থাকার মানে সেখানে গভর্নমেণ্ট আছে। কিন্তু কংগোতে তারই অভাব। অথচ কংগো স্বাধীন দেশ। সেই স্বাধীন দেশে গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব এসে পড়েছে ইউনাইটেড্ নেশন্‌স্-এর উপর। অথচ আইনে বলে যে, ইউনাইটেড্ নেশন্‌স্-এর পক্ষে কোনো দেশের ভিতরে গিয়ে কিছু করতে হলে সেই দেশের সরকারের সম্মতি ও আহ্বান আবশ্যক। যাই হোক, এখন ইউনাইটেড্ নেশন্‌স্ কংগোর ভিতরেই আছে এবং গভর্নমেণ্টের কাজ যেটুকু হচ্ছে সেটা ইউনাইটেড্ নেশন্‌স্-এর লোকদের দ্বারাই হচ্ছে। যেমন করেই হোক ইউনাইটেড্ নেশন্‌স্‌কেই কংগোতে গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করে দিতে হবে।

২৭।১১।৬০

জনপ্রিয় মিষ্টান্ন পরিবেশক

গাঙ্গুরাম এণ্ড সন্স

১৫৯সি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

নতুন নতুন বই........পাঠাগারে উপহারে অপরিহার্য বই

সদ্য প্রকাশিত :

নীহাররঞ্জন গুপ্তের একখানি রহস্যঘন অনবদ্য উপন্যাস

নীলকুঠি ৫-০০

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়-এর

পিয়াসী মন ৩·৫০

আগাগোড়া নতুন ধরণের নতুন উপন্যাস : নারী চরিত্রের আশ্চর্য বিশ্লেষণ।

অনুবাদ গ্রন্থ :

বঞ্চিতা ৩·৫০

'বিখ্যাত ঐতিহাসিক হিন্দী উপন্যাস 'অধর্ম কি লুট'এর বাংলা অনুবাদ 'বঞ্চিতা' 'ভোলগা থেকে গংগা'খ্যাত অনুবাদক শ্রীভগীরথ অনুদিত।

শ্রীঅবধূতের নতুন রহস্য উপন্যাস

নীলকণ্ঠের উপন্যাস

ট্যাক্সির মিটার উঠছে ৪·০০

শ্রীবাসবের উপন্যাস

দূর কিনারে ৫·০০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

নতুন করে পাওয়া ৪·০০

নতুন ধরণের নতুন উপন্যাস

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু সম্পাদিত

ভূতের গল্পের সংকলন ২·৫০

ডিটেকটিভ গল্পের সংকলন ২·৫০

হাসির গল্পের সংকলন ২·৫০

॥ পূর্ণ তালিকার জন্য আমাদের সহিত যোগাযোগ করুন ॥

দি নিউ বুক এম্পোরিয়ম : ২২/১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

আলোচনা

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

সবিনয় নিবেদন,

শ্রদ্ধেয় শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় আত্ম-স্মৃতির ৫০ সংখ্যক পরিচ্ছেদে সাজাহান নাটক পর্যালোচনার শেষে লিখিয়াছেন:

"আর, প্রেমিক? তার দৃষ্টান্তও বড় কম নেই। মুসলমান সম্রাট, চারটি বিয়ে করতেও তার পক্ষে আটকাবার কথা নয়। তা ত তিনি করেননি। এক মমতাজ ছাড়া দ্বিতীয় পত্নীও তার ছিল না......।"

শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয়ের এ ধারণা একেবারেই ভুল। বাদসাহ শাহজাহান চারটি বিয়ে করিয়াছিলেন এবং তাহারা কান্দাহারী বেগম, মমতাজ বেগম, ফতেপুরী বেগম ও সিরহিন্দী বেগম নামে পরিচিতা। আর, শেষোক্ত বেগমের কবর তাজমহলের বহিঃপ্রাঙ্গণেই রহিয়াছে। প্রথমা ও তৃতীয়ার কবরেরও হদিস পাওয়া যায়।

আর, "তাজমহল ত এক দাম্ভিক সম্রাটের মদগর্ব ঐশ্বর্যের প্রতীক নয়"— কথাটি দেখা যায় মোটেই সত্য নয় যদি আমরা শাহজাহানের জীবনকে সত্যিকারে বুঝিতে চেষ্টা করি, তবে সে আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়। ইতি—

শৈলেন দত্ত, আগ্রা।

লেখকের বক্তব্য

সবিনয় নিবেদন,

শ্রীশৈলেন দত্ত মশাই সাজাহানের যে চারটি বিবাহের কথা উল্লেখ করেছেন, সে কথা ঠিক হতে পারে। যদুনাথবাবুর ইতিহাস থেকে আমি এটা পরে জানতে পেরেছি যে সাজাহানের অন্য স্ত্রী ছিল। এর জন্য শৈলেনবাবুকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমার ৫০ সংখ্যক পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে যে উল্লেখ আছে, তার সপক্ষে একথাই বলতে পারি যে, অন্যান্য পত্নী থাকা সত্ত্বেও তাঁদের কোনো সক্রিয়তার আভাষ মেলে না, এমন কি তাদের তেমন প্রভাব সাজাহানের ওপর ছিল বলে মনে হয় না, যেমন ছিল মমতাজ বেগমের। এসব কারণের জন্যই আমাদের পক্ষে অনুরূপ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক ছিল।

চরিত্রাভিনেতা-রূপে আমার লক্ষ্য ছিল তাঁকে প্রেমিক রূপে দেখানো যায় কিনা। চরিত্রাভিনেতা-রূপে আমার দায়িত্ব এটুকুই বলে মনে করি। স্মৃতিকথায় কথা-প্রসঙ্গে এই ধারনার কথাই এসে পড়ে।

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

নট নাট্যকার ও কথাশিল্পী বিজন ভট্টাচার্যের নবতম উপন্যাস
রাণী পালঙ্ক ২·৫০ ॥

সুলেখক শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবতম উপন্যাস
নিকষিত হেম ৩·০০

ডক্টর নবগোপাল দাসের চাঞ্চল্যকর গ্রন্থ
এক অধ্যায় ॥ তিন টাকা ॥

দেবেশ দাশের নবতম রম্যগ্রন্থ
পশ্চিমের জানলা ॥ পাঁচ টাকা ॥

জরাসন্ধের সাম্প্রতিক উপন্যাস
ন্যায়দণ্ড ৬·৫০ ॥
আড়াই মাসে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অনন্য গ্রন্থ
আয়ুবের সঙ্গে ২·০০

সৈয়দ মুজতবা আলীর নবতম গ্রন্থ
চতুরঙ্গ ৪·৫০ ॥
আড়াই মাসে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
মহাশ্বেতা (২য় মুঃ) ৫·৫০
শ্রেষ্ঠগল্প (৬ষ্ঠ মুঃ) ৫·০০

সমরেশ বসুর আশ্চর্য উপন্যাস
বাঘিনী ৭·০০ ॥

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর মহোত্তম উপন্যাস
তুঙ্গভদ্রা ৪·০০ ॥

নিখিলরঞ্জন রায়ের ভ্রমণকাহিনী
সীমান্তের সপ্তলোক ৩·০০ ॥

প্রবোধকুমার সান্যালের
দেবতাত্মা হিমালয়
১ম খণ্ড : (১০ মুঃ) ৯·০০ ॥
২য় খণ্ড : (৫ম মুঃ) ১০·০০ ॥

সতীনাথ ভাদুড়ীর
পত্রলেখার বাবা ৪·০০ ॥
অপরিচিতা (২য় মুঃ) ৩·০০

ধনঞ্জয় বৈরাগীর নাটক
রূপোলী চাঁদ (৩য় মুঃ) ২·৫০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
কয়লাকুঠির দেশে ৩·৫০
রায় চৌধুরী ২·২৫

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের
প্রদক্ষিণ (২য় মুঃ) ৪·০০

বুদ্ধদেব বসুর
নীলাঞ্জনের খাতা ৪·০০
হঠাৎ আলোর ঝলকানি (২য় মুঃ) ২·৫০ ॥

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের
চরণিক ৩·০০
লাফা যাত্রা ২·৫০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
দুয়ার হতে অদূরে (৩য় মুঃ) ৩·৫০
বরযাত্রী (৬ষ্ঠ মুঃ) ৩·৫০

বিক্রমাদিত্যের
দেশে দেশে (২য় মুঃ) ৩·০০
ফতে নগরের লড়াই ২·৫০

শশিভূষণ দাশগুপ্তের
ব্যান ও বন্যা ৩·০০

সরলাবালা সরকারের
হারানো অতীত ৩·০০
স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রী-রামকৃষ্ণ সংঘ (সচিত্র) ৪·৫০ ॥

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-বারো ॥

সুনীল ভঞ্জ রচিত
কিন্তু কেন? পূর্ণাঙ্গ নাটক
২য় সংস্করণ বেরোল — ২.
প্রান্তিক পাব্লিশার্স
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট : কলি-১২
(সি ৯৬৬৩/১)

ডাকযোগে সম্মোহন বিদ্যা শিক্ষা

হিপ্নোটিজম, মেসমেরিজম, ইচ্ছাশক্তি, দিব্যদর্শন, চিন্তা পঠন ইত্যাদি বিদ্যাসমূহ প্রফেসর রুদ্রের পুস্তকাবলীর সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার সাহায্যে নানাবিধ রোগ আরোগ্য এবং বদ্ অভ্যাসসমূহ দূর করা যায় এবং আর্থিক ও মানসিক উন্নতি হয়।

নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন।

এস রুদ্র,
রাজেন্দ্র পথ, পাটনা ১।

শঙ্খ মার্কাই
শ্রেষ্ঠ গেঞ্জি
যশোর কুম্ভ ইণ্ডাষ্ট্রী কোং
কলিকাতা-৯

ধবল-শ্বেত কুষ্ঠ

বহুদিন পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম, দিন রাত চর্চা ও অনুসন্ধানের পর কবিরাজ শ্রীব্রহ্মস্বরূপ বি এ, উহা বিনাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইংরাজীতে লিখিবেন।

আয়ুর্বেবদীক কেমিক্যাল
রিসার্চ লেবরেটরিজ ফতেপুরী, দিল্লী-৬

দ্বিতীয়ত, একই চরিত্রে বহুদিন ধরে বহুবার রূপদান করবার সুযোগ এলে, অভিনেতার মনে নানান দিক দেখাবার স্পৃহা জাগাটা স্বাভাবিক। ইতিহাস—সত্য সেদিক দিয়ে তাকে সাহায্য করে অবশ্যই। কিন্তু, সে সত্যও মানুষ একদিনে আহরণ করে না, অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা তাকে ক্রমশ সচেতন করে তার সৃষ্টি সম্পর্কে। আমি 'সাজাহান' বেশ পরিণত বয়স পর্যন্তও করেছি, সে-সব দিনে অভিনয়ে যে আরও 'সৌকর্য' আনবার চেষ্টা না করেছি এমন নয়, সে সময়ের কথা হয়ত পরে আরও কিছু বলতে হবে। যদু নাথবাবুর ইতিহাসের (History of Aurangzib) প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় যে কথাটি আছে

"Shah Jahan was intensely devoted to his wife Mumtaz."

—এটিই ছিল আমার প্রধানতম লক্ষ্য বস্তু।

যাই হোক, শৈলেনবাবুকে পুনর্বার ধন্যবাদ জানাই। উপসংহারে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, তথ্যের দিক থেকে ভুল থাকলে আমাকে জানানো মাত্রই আমি তা সংশোধন করে নেবো আমার বইতে, কিন্তু মতামতের ব্যাপারটা আমার নিজস্ব।

নমস্কারান্তে, বিনীত ভবদীয়
অহীন্দ্র চৌধুরী।

আধুনিক ছোট গল্প

১

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়,

গত কয়েক সংখ্যা ধরে 'দেশ' পত্রিকায় বর্তমান ছোটগল্পের দুর্বোধ্যতা নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। এটা সুলক্ষণ।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যে দুটো দুঃসাহসিক বলিষ্ঠ ভাবধারার প্রকাশ দেখছি আধুনিক কবিতা ও আধুনিক গল্প। আধুনিক গল্প এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত নতুন আগন্তুক। সত্য বলতে কি এখন পর্যন্ত আধুনিক ছোটগল্প লেখকের সংখ্যা মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। তবু আমরা এদের স্বাগত জানাব। পাঠক-পাঠিকাদেরও অনুরোধ করব একটু সহানুভূতিশীল দৃষ্টি নিয়ে এগিয়ে আসতে।

বর্তমান ছোটগল্প 'দুর্বোধ্য' শুধুমাত্র এই আখ্যা দিয়ে সাহিত্যের দরবারের এক-পাশে সরিয়ে রাখব না। কেন দুর্বোধ্য? কি এর উদ্দেশ্য? কি এর বক্তব্য? সমস্ত কিছু আমাদের শুনতে হ'বে। জানতে হ'বে। একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যখন নতুন কিছু সংযোগ করতে চাইছে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তখন তাদের নিরুৎসাহ করা মোটেই যুক্তিপূর্ণ হবে না। হ'তে পারে সে আপাত দুর্বোধ্য, আপাত দৃষ্টিকটু। তা' বলে অপাংক্তেয় হ'তে যাবে কেন? আর দুর্বোধ্যতা ত একটু থাকবেই। যেখানে কাহিনীর স্থান গৌণ মনস্তত্ত্ব ও অন্তররাজ্যের খুঁটিনাটি বর্ণনায় লেখকরা অপেক্ষাকৃত গম্ভীর ও সতর্ক সেখানে প্রচলিত সরলতা আশা করা যায় না। উচিতও নয়।

যাঁরা বলেন, আমরা মনস্তত্ত্ব, ভাব বিশ্লেষণ চাই না, গল্প চাই সহজ সুন্দর স্বাভাবিক গল্প তাদের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নেই। বাংলা সাহিত্য তাদের প্রতি উদাসীন নয়। বরং অপেক্ষাকৃত মুক্তহস্ত। শুধু, বিনীত অনুরোধ করব তাঁরা যেন Dean of St Paul-এর মত আধুনিক গল্প লেখকদের 'modern atrocities' মনে না করেন।

এই নতুন রীতির বৈশিষ্ট্য কোথায়? এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার স্থান চিঠি-পত্রের বিভাগ নয়।

নতুন গল্প লেখকেরা, প্রথমেই বলেছি, কাহিনীকে মূল উপজীব্য বিষয় বলে মেনে নেননি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, তীক্ষ্ণ মনোবিশ্লেষণ ক্ষমতা, গভীর অন্তর্দৃষ্টির সমন্বয় নিয়ে একখণ্ড ক্ষুদ্র আরশিতে মানবিক সত্তার সমগ্র রূপটি ধরতে চান। এর মধ্যেই থাকে পাপ, পুণ্য, লালসা প্রভৃতির দ্বন্দ্ব। 'দ্বন্দ্ব' কথাটিকে আমি বিশেষ জোর দিয়ে বলতে চাই। কারণ বর্তমান পৃথিবীতে বিশেষ করে আমাদের মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজে এমন এক গভীর অসন্তোষ জমাট বেঁধে আছে, যার হাত থেকে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি মুক্ত হ'তে। কিন্তু কিছুতেই সুস্থ সমাধান করে উঠতে পারছি না। তাই আজ এত অস্থিরতা, এত তীব্র মনোবিক্ষোভ। সাহিত্যেও এরই প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং যারা বাংলা সাহিত্যে কোন Class চরিত্র সৃষ্টি হচ্ছে না বলে আক্ষেপ করেন তাদের জানা ভাল, নিরাশ হ'বার মত এখনও কিছু ঘটেনি, বাংলা সাহিত্যের তেমন কোনও দুর্দশা ঘটবে বলেও মনে হয় না।

নতুন রীতির গল্প লেখকরা সেই

আসামের পটভূমিকায় লেখা
মেখলা পরা মেয়ে
শ্রী যুধাজিৎ প্রণীত
MEKHALA PARA MEYE
a National Novel

প্রত্যেক বাঙ্গালীরই পড়া উচিত
লিপি-বন্ধন, ৯নং শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা—৬
(সি-৯৫৭৭)

অন্তর্বেদনা তাদের কলমে ধরতে চান। অবশ্য ধরবার পদ্ধতি অভিনব। নিজেরাই এই পদ্ধতি আবিষ্কার করে নিয়েছেন। কোন উচ্ছ্বাস, আকুলতা ভাববিলাসিতা নেই। অতি সতর্কতার সঙ্গে একটি একটি করে গ্রন্থি উন্মোচন করেন। বাইরের পরিবেশের প্রভাব থাকে না তার চেয়ে বেশী ভেতরের। ভেতরের ব্যাপারটা এমনই গোলমেলে যে, সাধারণ দৃষ্টিতে তাকে একটু দুর্বোধ্যই মনে হয়। এই জন্যে পাঠক শ্রেণীকে কিঞ্চিৎ প্রয়াস করতে হয়। যদি কোন একটা নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে তবে কেন আমরা সামান্য কষ্ট স্বীকার করতে রাজী হব না? তা না করে যদি অংকুরেই উচ্ছেদের খড়্গ তুলে ধরি তবে নতুনের জন্ম আসবে কোথেকে?

সমালোচনা খুবই বাঞ্ছনীয়। ভাল সমালোচনা নতুন রীতিকে ভুল ভ্রান্তি থেকে মুক্ত করবে বলেই বিশ্বাস। আর তাছাড়া নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ অনেক অবাঞ্ছিত কলমও ঢুকে পড়েছে নতুন রীতির যাত্রাপথে।

শেষে আমি শুধু এই কথাই বলতে চাই বর্তমানের নতুন রীতিতে বিশ্বাসী গল্প লেখকেরা পাঠক পাঠিকাদের কাছে আরও কিছু বেশী ধৈর্য, শ্রম এবং আগ্রহ আশা করেন। বিনীত। **শান্তিরঞ্জন চক্রবর্তী**, নৈহাটি, ২৪ পরগণা।

২

সবিনয় নিবেদন,

২৬শে কার্তিকের দেশ পত্রিকায় শ্রীমতী আয়েষা দেবীর চিঠিটি পড়লাম। তিনি যখন বলেন, লেখক যে সমাজ এবং জীবন থেকে তাঁর রচনার উপকরণ সংগ্রহ করছেন পাঠক তো সেই সমাজেরই মানুষ সে তো তাদের জীবন। কিন্তু মুশকিল এই পাঠক নিজেকে দেখছেন না। আর্শি তুলে ধরার পরও না। ইত্যাদি, তখন মনে হয় পত্রলেখিকার মনোভাব এই যে, আধুনিক ছোটো গল্প নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে তার কারণ গল্পের বিষয়বস্তুর (কনটেন্ট) বৈচিত্র্য। কিন্তু সত্যিকার ঘটনা কি তাই? বাংলা ছোটো গল্পের যে রূপ আজ ফুটে উঠেছে, লেখিকা যাকে বলেছেন আর্শির প্রতিবিম্ব। তা কি বিষয়বস্তুর নানা বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ?

আমার মনে হয় তার উল্টো। আজকের তরুণতম সাহিত্যিকেরা বর্তমানে বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেই সবচেয়ে উদাসীন। আধুনিক ছোটো গল্পে আঙ্গিক, ভাষা ও প্রকরণের ক্ষেত্রে তাঁরা যে বিদ্রোহ পরিস্ফুট করে তুলেছেন তা সংগ্রামচেষ্টা হলেও, শুধু এই দিয়েই তাঁরা সাহিত্যকে এগিয়ে দিতে পারবেন না। যদিও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বড় হয়ে দেবো না,—'এই দিয়ে লোক ঠকানোই তাঁদের ব্যবসা।' বিশেষত আজকের দিনে, যখন পুরোনো যুগের সাহিত্যিকেরা নিবে-যাওয়া ফুলঝুরির মতো শুধু অংগারই ছড়াচ্ছেন বাংলা-সাহিত্যে, তার পরের যুগ স্তিমিত, তখন তরুণতম গল্পকারদের কিছুটা গুরুত্ব নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তবু—গত দু'তিন বছরে ছোটো গল্পে ভাষা ও প্রকাশরীতির যে বিস্ময়কর উন্নতি ঘটেছে, তা স্বীকার করেও বলব, শুধু ভাষা বা আঙ্গিক দিয়েই তো সমস্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না, বক্তব্য বিষয়বস্তুরও দরকার। বিশেষত তাঁদের গল্প বুঝতে না-পারলে পাঠকেরা ভিড় করবেন চলচ্চিত্রে সিনেমা-সাহিত্যের স্টলে গিয়ে, যেখানে পিছু হটতে শুরু করেছে সাহিত্য। তাই আজকের দিনে ভাষা ও প্রকাশ বৈচিত্র্যের সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, মধ্যবিত্ত জীবনের কয়েকটি মুহূর্তের নিপুণ চিত্র, মামুলি প্রেমের গল্প, বিশেষত্বহীন ঘটনাকে নিখুঁত রূপ দেওয়া ইত্যাদি আমার কাছে নিরর্থক লাগে। দেখি, সমস্ত সাহিত্যটাই আজ মধ্যবিত্ত জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডিতে পাক খাচ্ছে। ইদানীং 'ভূগোল বাড়াও' আন্দোলনে যা হয়েছে তাতে প্রত্নতাত্ত্বিক কৌতূহল হয়তো কিছুটা মেটে, কিন্তু সাহিত্যবোধ তৃপ্ত হয় না। কাজেই ভাবতে হয়, এসব নতুন হতে পারে, কিন্তু প্রগতি নয়।

সাহিত্যিকদের গভীর জীবনবোধ আর সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি থাকা দরকার, তাই তাঁদের কাছে শুধু 'হাসি আর উল্লাস' নিশ্চয়ই চাইবো না। কিন্তু তাঁরা যদি কেবল জীবনের অন্ধকার দিকের ছবিগুলিই আঁকেন, তাহলে সে সাহিত্য ও অসম্পূর্ণই থাকে। তাকে পাঠকের আয়নায় রাখবার বানানো কথা বলা হাস্যকর। যা দৃষ্টিকে পীড়া দেয় তা রূপ-কথা নয়।

আধুনিক ছোটোগল্পে অস্পষ্টতা যে আছে, তা লেখিকা কোথাও তো বিন্দুমাত্র অস্বীকার করেননি। অথচ কে না-জানে আজকের চেতনা-প্রবাহ-ভিত্তিক গল্পের কিছু কিছু অংশ অস্পষ্টতা ও বিচ্ছিন্নতা ভারাক্রান্ত।

একটি রীতিতে লেখা অবশ্যই সব লেখকের লক্ষ্য নয়। কিন্তু যে রীতিতেই লেখা হোক না, অস্পষ্টতা সব লেখাতেই কিছুটা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ও অসংলগ্নভাবে রয়ে যাচ্ছে। তার কারণ কেবল এই নয় যে আমাদের সমাজ-জীবন অনেক বেশী জটিল হয়ে পড়েছে। অবশ্য জীবন জটিলতর হয়েছে মানছি, কিন্তু সেটাই সব নয়। মূল কারণ বোধহয় এই যে, আজকের সাহিত্যিকেরা যে পরিবারে মানুষ হয়েছেন যেখানে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেছেন, সেই সংকীর্ণ সীমাখণ্ডিত গণ্ডিটিকে তাঁরা কাটিয়ে উঠতে পারেননি, পারেননি সমাজ-

প্রকাশিত হল প্রতিবেশী সাহিত্য

নানার হাতি

বৈকম মুহম্মদ বশীর

অনুবাদিকা

নিলীনা আব্রাহাম

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন: এই মালয়ালমের প্রবীণ লেখকের গ্রন্থ 'নানার হাতি' উপাদেয় এবং মূল্যবান বললেই বলা হবে কটু আমার বিশ্বাস। সুদৃশ্য প্রচ্ছদ। দাম ঃ দু টাকা।

বরণীয় লেখকের স্মরণীয় গ্রন্থসম্ভার

সুবোধ ঘোষ

নাগলতা (সদ্য প্রকাশিত) ৩·৫০
রূপসাগর (৩য় সং) ৪·৫০
পলাশের নেশা (৪র্থ সং) ৩·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

যোগভ্রষ্ট (সদ্য প্রকাশিত) ৫·০০
রাধা (৪র্থ সং) ৭·০০

সৈয়দ মুজতবা আলী

শবনম (সদ্য প্রকাশিত) ৫·০০
ধূপছায়া (৭ম সং) ৪·০০

আগাথা ক্রিস্টি

দশপুতুল (সদ্য প্রকাশিত) ৩·৫০

বিমল মিত্র

বেনারসী (চিত্রায়িত হইতেছে) ৪·৫০

গৌরকিশোর ঘোষ

জল পড়ে পাতা নড়ে ৮·০০
মন মানে না ৩·৭৫

প্রেমেন্দ্র মিত্র

হরিণ চিতা চিল (কবিতা) ৩·০০
জল পায়রা (২য় সং) ৪·০০

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

সচেতন হয়ে গভীর জীবন বোধ আয়ত্ত করতে। শ্রেণীচ্যুত মানুষ হয়ে ওঠা দূরে থাক, তাঁরা সযত্নে পালন করছেন মধ্যবিত্ত জীবনের ক্লেদাক্ত গণ্ডিটাকে। কিন্তু স্বীয় প্রতিভার অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে তাঁরা নতুন কিছু সৃষ্টি করতে উৎসুক। পুরোনো পথের অনুসরণ করতে তাঁরা চাননা। কিন্তু কোন্ দিকে পা বাড়াবেন? গভীর জীবনবোধ ও অভিজ্ঞতার অভাবের ফলে, এ অবস্থায় কিছুটা দিশেহারা হয়ে পড়া স্বাভাবিক। স্বভাবতই তাঁরা নানা টেকনিক খুঁজছেন, হাতড়ে বেড়াচ্ছেন ভাষার নতুনত্ব। আত্ম-তৃপ্তি খুঁজছেন আঙ্গিক ও ভাষার নানা পরীক্ষা নিরীক্ষায়। বিষয়বস্তুর অভাব (বা স্বল্পতা) তাঁরা ঢেকে দিতে চেয়েছেন লেখার স্টাইলে। কিন্তু সত্যি কি তাতে মহৎ সৃষ্টি সম্ভব!

আসলে, আমার ধারণা, বিষয়বস্তুর তুচ্ছতা ও হীনতার জন্যেই ভাষা ও প্রকাশ-রীতির ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা সত্ত্বেও, আধুনিক ছোট গল্প তেমন সুফল লাভ করছে না। বিনীত—**সুশান্ত চক্রবর্তী**, লখনউ।

৩

মাননীয় মহাশয়,

'দেশ' পত্রিকায় 'অতি আধুনিক ছোট গল্প' পর্যায়ে আলোচনা পড়লাম। অনেকের সংগে সব বিষয়ে একমত হতে পারলাম না। কারণ আধুনিক কবিতা দুর্বোধ্য ও অস্পষ্ট হলেও আধুনিক ছোট গল্পে অস্পষ্টতা তেমন চোখে পড়েনি। যা ঘটে যাচ্ছে তারই সার ও সংক্ষিপ্ত রূপ ছোট গল্পে ধরা পড়ে, তাতে বাস্তবতা তো থাকবেই। এখানে কল্পনার আশ্রয় নিলে তা মনোরঞ্জক হবে না। যুগ বদলেছে কাজেই লেখার ধারা বদলাবে সন্দেহ নেই। নবাগত ছাড়াও খ্যাতনামাদের গল্পও তো মাঝে মাঝে 'দেশ'এ বার হয় তা হয়ত পাঠকেরা জানেন; আনন্দ দিতে পারা ও আনন্দ পাওয়ার মধ্যে একটু সম্পর্ক আছে সেটা অভিযোগ-কারীরা চিন্তা করে দেখুন। একজন সাধারণ সাহিত্যপ্রেমিক হিসাবে ও 'দেশ'এর নিয়মিত পাঠক হিসেবে একথা জানালাম, এটা আমার সমালোচনা নয়।

বিনীত। **স্বপ্না ও শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।** অন্নপূর্ণা হোটেল। (রাঁচী)

৪

সবিনয় নিবেদন,

অতি আধুনিক ছোটগল্পের দুর্বোধ্যতা সম্বন্ধে অভিযোগ জানিয়ে 'দেশ'-এর পাতায় কোনো কোনো পাঠক চিঠি লিখেছেন। একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য 'দেশ' এ এবং আরো কয়েকটি পত্রিকায় কিছুদিন ধরেই কয়েকটি নতুন ধরনের ছোটগল্প প্রকাশিত হচ্ছে। লেখকরা কয়েকজন ছাড়া প্রায় সকলেই নবাগত। এঁদের দৃষ্টিভঙ্গী আঙ্গিক পারিপাট্য ও রচনাশীলতা পূর্বসূরীদের চেয়ে এতই স্বতন্ত্র যে, আমাদের অনভ্যস্ত চোখে এবং মনে একটা অপ্রসন্নতার ভাব জাগিয়ে তুলছে। গোঁড়া যাঁরা তাঁদের কথা বলছিনে, এই চমক নব্যপন্থীদেরও অসুবিধের কারণ হয়ে পড়ছে। অভিযোগ এই, আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের অতি অস্পষ্টতার আড়ালে আনন্দের ধারা কেন হারিয়ে যাচ্ছে।

প্রসংগক্রমে বলে রাখি, আমিও একজন রসপিপাসু পাঠক। সাহিত্যের মধ্যে রসের উৎস সন্ধানে আমিও সর্বদা উৎসুক। তাই ছোটগল্পকে নিয়ে এই নতুন নিরীক্ষা আমার দৃষ্টিপথে সংগত কারণেই এসেছে। আর তাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করবার ত্রুটি আমার হয়নি।

ছোটগল্পের অস্পষ্টতার একটা কারণ বোধহয়, আজকের গল্প মোটেই কাহিনী-কেন্দ্রিক নয়। গল্পের জন্য গল্প এ নীতি আজকে আর মানা হচ্ছে না। ঘটনার ঘনঘটা নেই, মানুষের মন এর পটভূমিকা। বহির্রাজ্য ছেড়ে মনোরাজ্যে ক্রমশ প্রবেশ এ একটা চূড়ান্ত ব্যতিক্রম। একটি মানুষের ভাবনা দিয়ে ঘেরা বিশেষ একটি দিক লেখকের বাস্তবগ্রাহ্য লেখনীতে রূপ পাচ্ছে। একটি নিটোল-কাহিনীর লেশমাত্র তাতে নেই। আমরা সাধারণ পাঠকরা, চিরকালই আর একটা কিছু গভীরভাবে চিন্তা করতে শিখিনি এমন নয়। শিখেছি। সখন একেবারেই আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে, হাল ছেড়েছি।

কিন্তু এই প্রসংগে কেন জানিনে অভি-যোগকারীরা একটি বিষয়ে নীরব থেকেছেন। গল্পের সাহিত্য মূল্য বাড়ছে অথবা কমছে তার কথা কিছু বলেননি। এই প্রসংগের বিচারে এখনই হয়ত কিছু বলা অনুচিত হবে। এক্সপেরিমেন্টের রাস্তা পেরিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে এখনো দেরি আছে। তবে বলা ভালো, দুর্বোধ্যতাই যদি একমাত্র কারণ হয়, তার জন্য কোনো একটা কিছুকে একেবারেই অপাংক্তেয় করে রাখতে হবে তার কোনো মানে নেই। রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনা দুর্বোধ্যতা দোষে দোষী। হার্ডি অথবা কার্লাইলকে তাহলে ভুলেই যেতে হয়। রাশি রাশি রহস্যোপন্যাসের পাশে এমন লেখক এবং লেখাকে তাহলে নেহাৎই চুপ করে থাকতে হয়। আনন্দ আহরণই যদি একমাত্র কথা হয় তবে তা কি শুধু সহজ স্বচ্ছ জটিলতাহীন কথার মালায় (যা কিনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হালকা) মধ্যেই পাওয়া যাবে? আমরা জীবনের গভীরতাকে অস্বীকার করে পলকা জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হব এটা কি চিরকালের অন্যায় ধারণা নয়? অন্তর্মুখী মানসিকতাকে বাদ দিয়ে চিরকালীন আনন্দের স্বাদ আস্বাদন করা চলতে পারে না। বাংলা ছোটগল্প এই অনাবিল অনিকর্ষ গভীর আনন্দানুভূতির পথের পথিক।

আমার মনে হয়, চারিদিকের অশালীন অশান্ততা এবং হালকা রঙরসের মাঝখানে আমাদের তরুণ লেখকরা একটা নির্দিষ্ট গতিপথ নিজে থেকেই তৈরী করে নিচ্ছেন। স্বতন্ত্রী ভাব ও পরীক্ষামূলক আঙ্গিক ও ভাষা দুয়ে মিলে জীবনের গভীরতাকে তুলে ধরতে চেষ্টা করছেন। কোনো একটা সাধারণ চমক সৃষ্টির দাস তাঁরা নন।

বাংলা ছোট গল্পের দীর্ঘপথ পরিক্রমার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আধুনিক লেখকরা কলম ধরেছেন। বর্তমান জগৎ ও জীবনটা খুব একটা সহজ হয়ে তাঁদের চোখে প্রতিভাত হয়নি। আর তাই সহজ ভাবের প্রকাশ তাঁদের গল্পগুলির মধ্যে যদি নাই-বা দেখা যায় সেজন্য দোষ দিতে পারিনে। তাছাড়া, একথাই বা স্বীকার করবো কেন, আধুনিক ছোট গল্প সাধারণ পাঠকের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে? আসল কথা, হালকা জিনিসের প্রতি আমাদের আকর্ষণ এত বেশী হয়ে পড়ছে যে, ফলে 'সিরিয়াস' কিছুই আর মনের মধ্যে দাঁড়াতে পারছে না। এ ত্রুটি আমাদেরই। ভবদীয়—

ভবানী রায়। কলিকাতা—৫

পলাশী প্রকাশিত

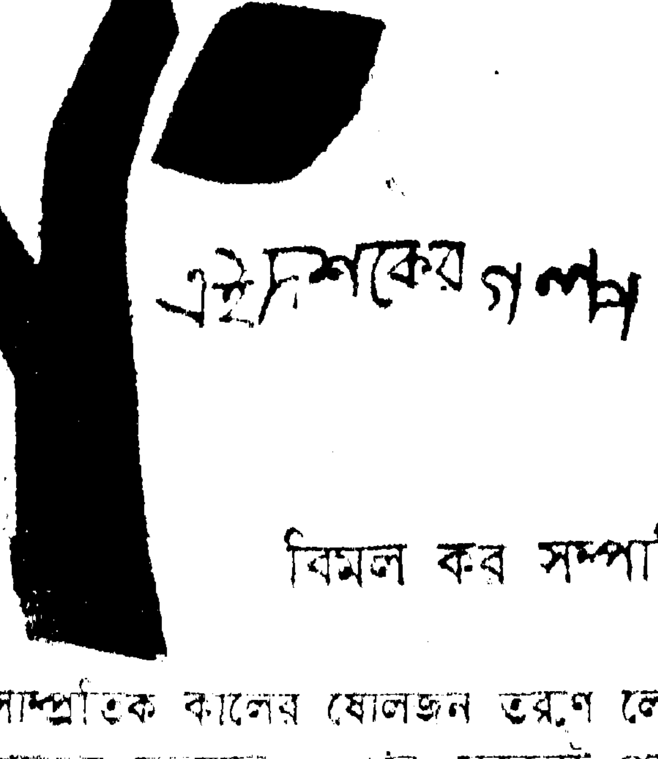

বিমল কর সম্পাদিত

সাম্প্রতিক কালের ষোলজন তরুণ লেখকের গল্পের সংকলন। এঁরা সকলেই প্রায় এই দশকের মধ্য-সময় থেকে লিখতে শুরু করেছেন। অতি-স্বল্প সময়ে এঁদের সাহিত্য প্রচলিত ধারাকে অতিক্রম ক'রে বহু বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। তাই আঙ্গিক রীতি বক্তব্য ও বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতর স্বাদের জন্য এই সংকলন অবশ্যই গল্প-পাঠকের কাছে প্রিয় হবে। মূল্য : ৪·০০

পরিবেশক : **নবগ্রন্থ কুটির।**
৫৪/৫এ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ১২

(সি-৯৭৯৬)

পত্রাবলী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ১৬ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

রাণী, তোমার চিঠি পেলে আমি কত খুসি হই তা নিশ্চয় জানো অতএব দীর্ঘপত্র পড়তে আমার ক্লান্তি হতে পারে এই আশঙ্কা প্রকাশ করে তোমার চিঠির যে অংশটা তুমি নষ্ট করো সেই অংশে যদি তুমি অন্য কথা লেখো তাহলে তোমার চিঠি একেবারে নিখুঁৎ হয়। এখানে এসে অবধি আমার মনটা অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে আছে। তার প্রধান কারণ এখানে আমাদের কর্মের মধ্যে রথী প্রভৃতির সম্বন্ধে ভারি একটা বিরুদ্ধতা জমে উঠেচে। সেটা বড় জঞ্জাল। রথীরা নিজেদের যে পরিমানে দিয়েছে ও করেছে তার সমস্ত হিসাব এরা এদের মনের কালী দিয়ে লুপ্ত করে দিল—ছোট ছোট খুঁৎ স্খলন নিয়ে কেবলি জল্প করবার জন্যে উৎসুক হয়ে রয়েছে। এতে আমাকে এই জন্যেই পীড়িত করচে যে, রাগ করলে বড় ছোট হতে হয় তাতেই আমি সব চেয়ে দুঃখ পাই। আমার অন্তরাত্মাকে সব রকম কালো মেঘ থেকে সম্পূর্ণ নির্মুক্ত করতে চাই! বিছানায় রাত্রের অন্ধকারে মনের সব দুর্বলতা ঘন হয়ে বুদ্ধিকে কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে হাঁপিয়ে মারতে চায়—তার পর সকালে বিছানা থেকে উঠে অরুণ আলোর মাঝখানে আপনাকে ফিরে পাবার চেষ্টা করি। ক্ষুদ্রতার কাছে হার মানতে চাইনে। মনের ভূসংস্থানে যে গিরিমালা আকাশের পানে লক্ষ্য করে উঠেচে তার নীচের দিকে ক্ষণে ক্ষণে বাষ্প জমে তো জমুক কিন্তু তার শিখরের উপরটা যেন মুক্ত থাকে, তার উপরে যেন আলো পড়বার কোনো বাধা না ঘটে। অন্যে যখন অবিচার করে তাতে ক্ষতি নেই কিন্তু তার দ্বারা নিজে যখন আত্মবিস্মৃত হই তাতেই গভীর গ্লানির কারণ ঘটায়। সেই দীনতা থেকে নিজেকে যদি রক্ষা করতে না পারি তাহলে আমি বড় অযোগ্য।

এইতো গেল লোকব্যবহারে যে সংকট ঘটেছে তার কথা। তার উপরে বোধহয় আর্থিক সংকটও কঠিন হয়েছে কিছু কিছু তার আভাস পাচ্ছি। তাতে রথীর দুঃখ অনুমান করে আমি দুঃখ পাই। স্বভাবত বিষয়বুদ্ধিহীন বলে আমি চিরকালই জেনেশুনেই আর্থিক বিপত্তি ঘটিয়েছি এবং তাতে বিশেষ বিচলিত হই নি। কিন্তু স্নেহের ক্ষেত্রে ঔদাসীন্য রক্ষা করা কঠিন। তা হোক তবু এসব জিনিসের ওজন আমরা উদ্বেগের বোঝা চাপিয়ে যত বাড়িয়ে তুলি এদের ততখানি বাস্তবতা বোধ নেই। কিছুনা, কিছুনা, কিছুনা এই কথা বারে বারে বলতে হবে।

এখন যাক নিজের কথা। তবু দুঃখের কাহিনী ফুরোতে চায় না। তোমরা নিশ্চয় খবর পেয়েছ শ্রদ্ধানন্দকে একজন মুসলমানে কি রকম নিদারুণ ও কাপুরুষভাবে হত্যা করেছে। দেশের চারিদিকে কেবল আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। হিন্দুদের মধ্যে যারা বুদ্ধিজীবী লোকনায়ক তারাও উষ্ণ বাক্যে এই অগ্নিকাণ্ডের সহায়তা করচে। আমি সেদিন শান্তি-নিকেতনে এ সম্বন্ধে কিছু বলেচি সেটা অনুলিখিত হয়েচে, সেটাকে শোধন করে কাগজে বের করব—যাঁরা মরীয়া হয়ে মারমূর্তি ধরেচেন, যাঁরা উত্তেজনার উপরে আরো উত্তেজনা প্রয়োগ করতে চান সেই কাটা-ঘায়ে-নুনের-ছিটে বিধানপন্থীরা আমার উপরে উগ্র হয়ে উঠবেন—এ সমস্তই হচ্ছে আমার ভাগ্যগগনের শনিগ্রহের লীলা। বারেবারেই এই রকম ঘটে আসছে। আমাদের জনসাধারণ আমার সম্বন্ধে বলতে পারে—

ক্রোধার্ত হইয়া যবে অগ্নিবান চাই,
তাড়াতাড়ি এনে দেয় বরফের চাঁই।

•

এদিকে শান্তিনিকেতনে এসেই মন্টুর চিঠিতে জানলুম যে, ঝুনুর ক্ষয়রোগের সূত্রপাত আশঙ্কা করা যাচ্ছে। কাল সে নিজে লিখেচে এখানে আমার কাছে এসে থাকতে চায়। আমাদের আশ্রমে ওরকম রোগীকে আশ্রয় দেবার দায়িত্ব কেমন করে গ্রহণ করব। আজ আর একখানা চিঠিতে লিখেচেন ডাক্তাররা এখনো নিঃসংশয় হন নি, এমন কি যদিবা কিছুবা হয়ে থাকে তার পরিমাণ সামান্য এবং প্রথম অবস্থায় তার সঞ্চারকতা নেই। অত্যন্ত আসবার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়েচে—তাকে নিষেধ করতে কষ্ট হচ্চে। কি কর্তব্য সম্পূর্ণ ঠিক করতে পারচিনে।

মন্টু ও অতুল আর দু চারদিনের মধ্যে এখানে আসতে পারে বলে আমাকে জানিয়েছে। সবুজপত্রে মন্টু সঙ্গীত সম্বন্ধে ওর সঙ্গে আমার একটা আলোচনার বিবরণী প্রকাশ করেচে সেটা মন্দ হয় নি। তার মধ্যে ওর নিজের ভাষায় স্বকীয় ভঙ্গী থাকা সত্ত্বেও আমার বক্তব্য বিষয়টা মন্দ স্পষ্ট হয়নি।

এতদিন পরে শান্তিনিকেতনে এসে মিস্ প-র আবরণটা খুলে গেছে। একটা কুহেলিকার আবরণের ভিতর দিয়ে ওকে আমি কেবলি ভুল বুঝছিলুম। সেটা কেটে গিয়ে ভারি আনন্দ পাচ্ছি। ওর যেটা যথার্থ স্বরূপ সেটা শ্রদ্ধেয়। তা ছাড়া যদিও এখনো কাজে প্রমাণ দেয় নি তবু ও যে আর্টিস্ট তাতে সন্দেহ করবার কোনো কারণ নেই। এখানে এসে ওরও খুব মন খুলে গেছে—খুব আনন্দ বোধ করচে।

Williams-এর সঙ্গে যোগ দিয়ে ও শিশুবিভাগের ভার নেবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেচে। সে পক্ষে ওর বিচিত্র শক্তি আছে। উইলিয়মসও ভারি উৎসাহিত। আমার সেবার কার্যে আমি ওকে, এবং আমাকে বাঁধতে গেলেই এই মুক্তি-পিপাসীর পক্ষে বিপদ ঘটত সুতরাং ওকেও দুঃখ পেতে হত। অতএব আমার হাতের থেকে সম্পূর্ণ পরিত্রাণ করে আমি ওকে বাঁচিয়েছি। এখন কেবল একটা ভাবনার কথা এই যে, ওর ব্যয়ভার বহনের উপযুক্ত অর্থ কোথায় পাই। আমরা নিজে যে দেউলে তার আভাস দিয়েছি—আমাদের আশ্রমও যে তার চেয়ে সচ্ছলতর অবস্থায় তা বলতে পারিনে। আমাদের সংসদ-ক্ষেত্রে ব্যয়সংক্ষেপের পরশুরামের অভ্যুদয় হয়েছে। তাঁর উদ্যত কুঠারের চোট থেকে বিদেশী অবলা রমনীকে বাঁচাই কি করে? এই সমস্ত দুরূহ ভাবনার দুর্গম জঞ্জালের মধ্যে পড়ে মনটা নিরতিশয় ক্লিষ্ট হয়েছে। এই রকম বিভ্রাটের সময়েই ব্যালাটিন ফুরেস্তে কার্বনিক এসিড বাথ্ নেবার উপযুক্ত সময়। জাহাজে চড়বার সময় প্রবাস-

মুখী তোমাদের প্রতি অত্যন্ত করুণা হয়েছিল। আজ এই স্বদেশপ্রত্যাগত হতভাগ্যের প্রতি করুণা কোরো। যদি বায়ুপথে বায়ুযানের সুযোগ থাকত তবে এখানকার কলুষিত বায়ু থেকে এই মুহূর্তে সেই দেশে চলে যেতুম "প্রবাস" বলে যে দেশকে আমি অনেকদিন অন্যায় অপবাদ দিয়ে এসেছি। আজ তোমরা যে সেই বিদেশীয় পরমাত্মীয়দের মধ্যে আছো এ তোমাদের সৌভাগ্য, তাতে সন্দেহমাত্র কোরো না। আমাদের সঙ্গে যদি আসতে তবে দুঃখ পেতে।

তোমার চিকিৎসা এবার নিঃশেষে সার্থক হোক্ এই আমি কামনা করি। মনের পীড়া থেকে আমারো অনতি-কাল পরে চিকিৎসার প্রয়োজন হবে—তখন আবার সেই দূরবাসী পরমবন্ধুদের শুশ্রূষাকামী হয়ে আবার যাব এখনি সেজন্যে চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠচে। তুমি আমার হয়ে আমার সেখানকার সকল বন্ধুকেই বারবার আমার সাদর ও সম্প্রীতি অভিবাদন জানিয়ো।

তোমার দিদির মৃত্যুসংবাদ এইমাত্র পেলুম। তুমি নিশ্চয় এ চিঠি পাবার অনেক পূর্বেই পেয়েছ এবং আপনার ভিতর থেকেই আপনার সান্ত্বনা সংগ্রহ করেচ। ইতি ২৮ ডিসেম্বর ১৯২৬

স্নেহাসক্ত শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেবার বুডাপেস্টে কবির শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ায় বুডাপেস্ট থেকে বোধহয় ১০০ মাইল দূরে বালাটন হ্রদের ধারে যে স্বাস্থ্য-নিবাস আছে সেখানকার কর্তৃপক্ষরা কবিকে অনুরোধ করেন তাঁদের স্বাস্থ্যনিবাসে গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম নিতে। সেই সময় আমরা দুজন এবং মিস্ পণ্ড কবির সঙ্গে গিয়ে বালাটন ফ্যুরেড স্যানিটোরিয়ামে কাটিয়ে আসি। কবি বোধহয় দিন ১০।১২ ছিলেন সেখানে, সেই বিশ্রামে ওঁর খুব উপকার হয়েছিল। চমৎকার নির্জন ছোট গ্রাম। চারিদিকে চাষীদের বাড়ি, চোখ ফেরালেই দেখা যায় সোনালী রং এবং পাকা গমে ক্ষেত ভরে রয়েছে। বাড়িটার সামনেই বালাটন হ্রদ, এবং স্বাস্থ্যনিবাসের বাগানটির অনেকগুলো বড় বড় ম্যাগ্‌নোলিয়া গাছ ফুলে ফুলে সাদা হয়ে আছে। এই স্বাস্থ্যনিবাস বিখ্যাত এর Natural hot Spring Mineral bath-এর জন্যে। কবি সেখানে কদিন খুবই খুসিতে কাটিয়েছিলেন।

॥ ১৭ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

রাণী, কাল তোমাকে যতটুকু লিখেচি তারি আবেগটা মনের মধ্যে কিছু কিছু ঢেউ তুলচে। তোমাকে যদি লেখবার রাস্তা না থাকত তাহলে অব-চৈতন্য লোকের গুপ্ত বেদনা ভাণ্ডারে দুঃখ জমা হয়ে অবশেষে কোন্ এক আকস্মিক স্বপ্নবৎ আকারে ভুতুড়ে কাণ্ড করে বেড়াত। আমি এই কথাই ভাবছিলুম, স্বল্প প্রমাণে বা কল্পিত কারণে লোকের প্রতি অবিচার করতে আমিও ত্রুটি করিনে। অতএব অন্য লোকের কাছ থেকে যখন অসঙ্গত অবিচার পেয়ে থাকি তখন সেটাকে আমার প্রাপ্য অংশের মধ্যেই গণ্য করে নিয়ে মাথা হেঁট করে থাকা উচিৎ। আমাদের বিজ্ঞান অধ্যাপককে বোলো তার কাছে আমি নীতি স্বীকার করচি—আর যে গ্রহ আমাকে মাঝে মাঝে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন তাঁর কাছেও। অধ্যাপক তার মোহমুক্ত শান্ত দৃষ্টিতে সহজেই মানুষের প্রতি সুবিচার করতে পারে একথা জোরের সঙ্গেই স্বীকার করতে হবে। অন্ধ ঝোঁকের বেগে অবিচার পরায়ণতা থেকে মুক্তি দেবার পক্ষে অধ্যাপকের দৃষ্টান্ত আমাকে কিছু পরিমানে রক্ষা করেচে। বস্তুত মুক্তির পক্ষে এইটে হল প্রথম সোপান, দ্বিতীয় সোপান ক্ষমা, সর্বশেষ হচ্ছে প্রেম। সে আছে অনেক দূরে—তার নীচের কোঠায় একবার চেষ্টা দেখা যাক্—যদি কিছু পরিমাণে সফল হতে পারি তবে আমার পুণ্যের ভাগ অধ্যাপকের অংশে জুটবে।

বৌমা এখনো কলকাতায়। পুরো প্রবাসবাসকালে যে শান্তিনিকেতনের নাম জপ করে এসেছে এখনো বেচারার সেখানে আসা ঘটল না। পথে আমার সঙ্গে প্রতিদিন পুপের যে প্রশ্নোত্তরমালা চলত সে হচ্ছে এই: প্রশ্ন: পোর্টসায়েদের পরে? উত্তর: এডেন, প্রশ্ন: এডেনের পরে? উত্তর: কলম্বো, প্রশ্ন: কলম্বোর পরে? উত্তর: মাদ্রাজ, প্রশ্ন: মাদ্রাজের পরে? উত্তর: কলকাতা। প্রশ্ন: কলকাতার পরে? উত্তর: তারপরে আর কিছু নেই। তখন অপর পক্ষে তুমুল আক্ষেপ, প্রতিদিন আমার পরে এই তাঁর অভিযোগ ছিল যে, আমি শান্তিনিকেতন কেবলি ভুলে যাই। মাস্টার যেমন করে পড়া মুখস্থ করায় পুপে তেমনি করে কলকাতার পরে শান্তিনিকেতনের পর্যায় বারবার মুখস্থ করাত। ঐ শিশুর পক্ষে জননী বসুন্ধরার একমাত্র কোল হচ্চে শান্তিনিকেতন।

"——" সঙ্গে মোকাবিলার চেষ্টা করেছি—সে তার নিজের পক্ষের দুরূহ সঙ্কটের কথা ব্যাখ্যা করে জানালে। নির্মম হয়ে বিচার করতে হলে সে সব কথাও একেবারে ঠেলে দিতে পারা যায় না। তবু দুঃখ সে তো দুঃখই—সুবিচারই হোক্, অবিচারই হোক্ মানবজীবনের দুর্দাম ট্র্যাজেডিকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। অতএব বিনা বাক্যে ব্যথাটাকে বুকে করে নিলুম। যখন দুঃখটা তীব্র হয়ে বুকের মধ্যে নাড়া দিতে থাকে তখন তাকে পঞ্চাশবৎসর দূরবর্তী ভাবীকালের দিগন্তে দাঁড় করিয়ে দেখি—দেখতে পাই লক্ষ লক্ষ লুপ্ত ব্যাপারের মধ্যে—ভাঙা রাজসিংহাসন, ছেঁড়া প্রেমের গ্রন্থি, ফিকে বিচ্ছেদ বেদনার মধ্যে, ঝাপ মারিয়ে রং মিলিয়ে নালিশ ভুলে গিয়ে একেবারে নেই হয়েই আছে। এইসব জগদ্দল পাথরগুলো জমে থাকলে জীবনের প্রবাহ বইতেই পারত না।

দিন দুয়েক আকাশে ঘন মেঘ জমে কাল সমস্ত দিন দিগঙ্গনাদের ছিঁচ কাঁদন চলেছিল। অবসাদে পৃথিবীর মুখ মুষড়ে গিয়েছিল—মনে হল সুদীর্ঘকালেও এর বুঝি অবসান নেই। আজ সকালে উঠেই দেখি কোনোখানে দেবতার অপ্রসন্নতার কোনো চিহ্নই দেখা যাচ্চে না। নির্মল আলোতে চারিদিক ঝলমল করচে। এখন মধ্যাহ্ন, আকাশ মেঘশূন্য —উত্তরায়নের বাড়ির উত্তর পশ্চিম কোণের নতুন তৈরি ঘরে বহু বস্তুর বহুবিস্তৃত উচ্ছৃঙ্খলতার ভাবাবর্তে এক প্রকাণ্ড চৌকির ধারে খোলা জানলার সামনে বসে বসে চিঠির কাগজের প্রশস্ত চারটি পৃষ্ঠা ভরানো গেল—এ পর্যন্ত চিঠি-দৌড়ে তোমার চেয়ে যে হেরেছি এমন বদনাম দিতে পারবে না। কিন্তু আমার বিশ্বাস, ঝগড়া করবার সময় সে কথাটা ভুলে যাবে—কারণ কৃতজ্ঞতার বোঝা মানুষ সুবিধা পেলেই হাল্কা করতে চায়। ২৯ ডিসেম্বর

স্নেহাসক্ত শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১৮ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

রাণী, তোমার এবারকার চিঠি থেকে বোঝা গেল যে কাইরো এবং পোর্ট সৈয়দ থেকে তোমাকে যে দুটো চিঠি

পাঠিয়েছিলুম তার একখানাও তখনো তুমি পাওনি। মনে হচ্ছে যেন পাওয়া উচিত ছিল অর্থাৎ মনে লাগচে যেন পেলে ভালো হত। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস আমাকে চিঠি লেখার দুই একদিনের মধ্যেই সে চিঠি পেয়েছ, খুব সম্ভব দুটোই এক সঙ্গে। সেই চিঠি সম্বন্ধীয় একটা কথা কেবলি থেকে থেকে আমাকে খোঁচা দেয়—সে হচ্চে মিস্ প-সম্বন্ধে আমার অত্যন্ত বিরূপ ধারণার বিবরণ। তবু মোটের উপর একথাও ঠিক যে মনের মধ্যে উপস্থিত মত যখন যতটুকু গরম হাওয়া হুহু করে উঠেচে আমার পত্রের মধ্যে তার কম্পন তোমার গোচরে যে পৌঁচেছে সেটা হয়ত আমার মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালোই। সেটা সম্পূর্ণ চাপা পড়ে ভিতরে ভিতরে গর্মে উঠলে হয়ত মিস্ প-এরই তাতে দুঃখের কারণ ঘটাত। তবু অবিচার করার অনুশোচনা মন থেকে ঘুচতে চাচ্চে না। দেখতে পাচ্ছি "ভদ্রমহিলাটি" সম্পূর্ণ নিরীহ, কেবল ওর প্রকাশের ভাষা উচ্চারণে ও ব্যাকারণে অত্যন্ত বাধাগ্রস্ত বলে ওকে ভুল বোঝা এত সহজ। তা ছাড়া ওর মুখচ্ছবির উপরেও বিধাতা যেন একটা অসমাপ্তির ঝাপ্‌সা আবরণ দিয়ে রেখেচেন, যে কোনো জীব সৃষ্টিকর্তার তুলির অনা-মনস্কতায় অস্পষ্ট হয়ে থাকে তার প্রতি আমরা এত সহজে নিষ্ঠুর হতে পারি। অনেক সময়েই, যাকে ভালো করে দেখতে পাইনে, তাকে দেখতে পারিনে। আমার খুব বিশ্বাস লাল দাড়ি সম্বন্ধেও আমাদের সেই রকম ঘটেছিল। আমাদের মত সাহিত্যিক মেজাজ যাদের তাদের মুস্কিল ঐ, তারা দেখতে চায় সবটা মিলিয়ে একটা ছবি। যারা বৈজ্ঞানিক, যারা জানতে চায় ছবি দেখাটায় তাদের তেমন শখ নেই, এমন কি, তারা ছবিটাকে ভেঙে দেখে। আমাদের কারবার ধারণা নিয়ে। কিন্তু প্রধানতঃ ধারণার সত্যতা আমার নিজের মধ্যে, কিন্তু অবধারণা যথাসম্ভব আমিটাকে সরিয়ে রেখে বিষয়টাকেই স্পষ্ট করে দেখে। এই জন্যে রাগদ্বেষ সে-ক্ষেত্রে তেমন প্রবলভাবে পাকিয়ে উঠতে পারে না। আমি যদি নিছক সাহিত্যিক হতুম তাহলে ধারণার বশ হয়ে থাকতে আপত্তি করতুম না। আমার শিল্পকাজে আমি রং লাগাতে চাই কিন্তু তাই বলে নিজের সর্বাঙ্গে রং মেখে বেড়াতে চাইনে। কাজ শেষ হলে চিত্তটাকে ধুয়ে নিরঞ্জন করতে চাই। মনটা যেন পৃথিবীর আকাশের মত থাকে এই আমার ইচ্ছা—অর্থাৎ সকল ঋতুর ও দিনরাত্রির সকল প্রহরের রঙের লীলা তার উপর দিয়ে চলবে, কেউ বাধা পাবে না—অথচ তার গায়ে রং জড়িয়ে থাকবে না। এই জন্যেই যখন কোনো একটা ধারণামাত্র আমার ব্যবহারকে বিকৃত করে দেয় তখন অবিলম্বে হোক বিলম্বে হোক আমার মন সে জন্যে বড় দুঃখ পায়। আমার অনু-ভূতিশক্তি একান্ত প্রবল বলেই অনুভূতিকে ভয় পাই। এমন কি, সে অনুভূতি যদি অন্ধ অনুভূতি না হয় তবুও। মিস্ প-আমার সেবার কাজ করে না, বোধ হয় সেই জন্যেই তাকে সহজভাবে বোঝা এখন আমার পক্ষে সোজা হয়েছে। আরিয়ম উইলিয়ম্‌সের কাজে যোগ দিতে তার খুব ইচ্ছে—আরিরমও মনে করেন যে মিস্ প-এর দ্বারা তিনি ভালো কাজ পেতে পারবেন। ও স্বভাবত ছেলে ভালোবাসে বলে ছেলেদের কাজে ওর উৎসাহ আর নৈপুণ্য আছে—জীবজন্তুর প্রতিও ওর যথেষ্ট স্নেহ আছে। শিশুবিভাগের কাজে ওর দ্বারা অনেক সহায়তা পাওয়া যেতে পারে। কেবল বাধচে আমাদের দৈন্যে এসে। বিদ্যালয়ের ব্যয়সংক্ষেপ ব্যাপারে কাঁচির কচকাচ মুখর হয়ে উঠেচে। নতুন লোক নিয়োগের প্রস্তাব আশ্রমের ভদ্রলোকদের আঁৎকিয়ে তুলবে। পরিনামে আছি আমরা—কিন্তু আমাদেরও হরিনাম করবার সময় এসেছে। রথীর মামা নগেন্দ্র কাল সমস্ত হিসেবপত্র নিয়ে হাজির। দেখা গেল, জমিদারীর আয় আমাদের ভাগ্যে বৎসরে ঠিক এক হাজারে এসে ঠেকেছে—বাকি সমস্তই সুদ ও অন্য দায় নিকাশে খরচ হয়। যদি জমিদারী থেকে একেবারে কিছুই না নিই তবে কুড়ি বৎসরে অর্থাৎ আমার জীবনান্তকাল অনেক পেরিয়ে তবে ঋণ শোধ হবে। স্থির করতে হল, কিছুই নেব না, বই বিক্রির টাকা থেকে খরচ চালাব। তার মানে, সংসার খরচ খুব কষে ছাঁটতে হবে—কলকাতার সমস্ত খরচে দাঁড়ি পড়বে—চেষ্টা করতে হবে বিচিত্রার বাড়ি ভাড়া দিয়ে কিছু আয় সম্ভব হয় কিনা। রথীর সঙ্গে বসে সমস্ত ব্যাপারটা সুস্পষ্ট করে বুঝে নিয়ে।

প্রথমটা কেমন লণ্ডনের নবেম্বরের কুয়াশার মত হাঁফধরা অন্ধকার বুক চেপে ধরলে। তার পরে ফিলজফির আশ্রয় নিলুম। আত্মারামকে বলাবার চেষ্টা করলুম, "ভালোই হয়েছে অকিঞ্চনতা একটা কঠোর সাধনা।" সে তো ঠিক কথা, সম্ভবত খুব উপকার হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে মিস্ প-এর কি করা যায়। খাওয়া দাওয়া আমাদের ঘরেই চলছে। বর্তমান দশায়, সেটুকুও গায়ে লাগে। যাহোক এই ভাবেই পরপারহীন চিন্তা পারাবারে পাড়ি দিচ্ছি।

খবর চাও? এ কয়দিন অতুল (১) আর মণ্টু (২) আমার কাছে এসে কাটিয়ে গেছে। আজ মধ্যাহ্নে আহার করে এই কিছুক্ষণ আগেই চলে গেল। অনেক কথা হল। বোঝা গেল আমাদের সুখ দুঃখ ছাড়াও জগতে আরো অনেক তীব্র সুখ দুঃখের পালা চলচে। ঝুনু (৩) শয্যাগত। প্রতিদিন তার নিয়মিত জ্বর আসচে। ডাক্তাররা সন্দেহ করচে ক্ষয়রোগ। মনের বেদনায় সেটাকে প্রবল করে তুলচে। কিছুদিন এখানে আমার কাছে এসে থাকতে চাচ্চে। কি কথি ভেবে পাচ্চিনে। মনে হচ্চে যেন গত চিঠিতে তোমাকে এ খবরটা দিয়েছি এটা পুনরুক্তি হল। কিন্তু চিঠিতে যেটা পুনরুক্তি সুতরাং পরিহার্য, জীবনে তাকে পরিহার করা যায় না। অদৃষ্টের এই হাজার-বার স্বীকার্য, অসংখ্য পুণরুক্তিতেই জীবনটাকে বন্ধুর পথের উপর দিয়ে ঠেলে নিয়ে চলেচে।

বুঝতে পারচ মনটা কেমন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। সংকল্প করেচি ভিক্ষারঝুলি নিয়ে আমেদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে একবার বেরোতে হবে। তাতে ঝুলির গৌরব বাড়বে কিনা সন্দেহ কিন্তু চারদিকে ঘুরে ফিরে মনটা হয়তো আপনাকে ভুলে থাকতে পারে। য়ুরোপে থাকতেই শুনেছিলেম অম্বালালের ইচ্ছে আমি তাঁদের ওখানে গেয়ে সেখানকার বার্ষিক বরাদ্দগুলিকে পাকা করে নিই। আমি না গেলে কাজ সিদ্ধ হবে না।

মনি গুপ্ত (৪) আর্টিস্টের সঙ্গে রেখার (৫) বিবাহ প্রস্তাব পাকা হয়ে গেছে। মাঘ মাসেই আশ্রমেই বিবাহ সম্পন্ন হবে। নন্দলালের কন্যা গৌরিরও পাত্র জুটেছে। পাত্রটি ভালোই, গৌরীর গুণে মুগ্ধ—একান্ত আগ্রহের সঙ্গে তাকে প্রার্থনা করচে, তার ইচ্ছা এই মাঘ মাসেই গৌরীদান হয়ে যায়। এদিকে রথীর প্রস্তাব এবার ১১ মাঘের দুই একদিন পরেই কলকাতায় নটীর পূজার অভিনয় করে কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করা হয়। যদি এই আসন্ন বিবাহের মুখে গৌরীর মা বাপ রঙ্গমঞ্চে কন্যার নাট্যলীলার অনুমোদন করেন তাহলে অনতিবিলম্বে রিহার্সাল বসবে। একটা খবর শুনে তুমি বোধ হয় চিন্তিত হবে—য়ুরোপে রচিত সেই নতুন গানগুলি আমি মেয়েদের শেখাতে বসেচি। তোমার স্মৃতিপটে সুরের

যে ছবি আছে আর এদের চিত্তপটে যে ছবি অঙ্কিত হচ্চে, রেখায় রেখায় তার মিল হবে এমন কথা শপথ করে বলা যায় না।—বস্তুত শপথ করে এর বিপরীত কথাটাই বলা যেতে পারে।

অধ্যাপককে জানিয়ো "মিস্ প"-কে যে চিঠি লিখেচে তার থেকে খবর পেলুম যে, তোমরা বেশ আদরে অভ্যর্থনায় বুড়াপেস্টে আসর জমিয়েছিলে। আমি আন্দাজ করচি অটোগ্রাফ ও ফটোগ্রাফের সংখ্যা অসম্ভব রকম বেড়ে চলচে। নতুন ছবির দুই একখানাও যদি এদিকে চালান দাও ত খুসি হব। বলা বাহুল্য তার প্রতিদান দিতে পারব না—কারণ এখানে এসে অবধি আমার প্রতি ক্যামেরার, ক্যামেরীর বা ক্যামেরিনীর দৃষ্টি একেবারে অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে তোমরা কোথায় আছো কে জানে বোধ হয় লণ্ডনে। এইবার একটা আরাম কেদারায় পা মেলে দিয়ে চীৎ হয়ে পড়া যাক্। শীত মধ্যাহ্নের আতপ্ত হাওয়ায় আকন্দ ফুলের গন্ধ আসচে—সামনে পুষ্পিত বাবলার শাখা ও তার ছায়া আন্দোলিত। ইতি ২০ পৌষ ১৩৩৩

স্নেহাসক্ত শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

র বী ন্দ্র না থ

শিবরাম চক্রবর্তী

বিশ্ব আপন-মন্থনে
ক্ষুব্ধ প্রাণের ক্রন্দনে
জন্ম দিল চন্দ্রকে......
চন্দ্রকে!
মুগ্ধ মনে মগ্ন রে
দেখছিল সে স্বপ্ন রে!
হায়রে নিয়ম-নৃত্য কি!
চন্দ্র সে যে জন্মিয়াই
উতল করি সব হিয়াই
লাগলো আলোর বন্ধনে
বিশ্বমনের মন্থনে
নিত্য কি!

বিশ্বমোহন চন্দ্র সে
নিত্যভুবন-বন্দ্য সে
জন্মালো ফের কোন ক্ষণে
চিত্ত করে আকুল কি!
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি?

যত পাখি গাইছিল
ভোরের আলোর খৎ পেয়ে......
যত পথিক ধাইছিল
পথ বেয়ে......
থমকে গেল চমকে যে!
চিরকালের স্বপ্ন রে
সকল পাখির তান লয়ে
উঠল বুঝি গান হয়ে......
অবাক সুরস্নিগ্ধরা
পাখিরা আর পথিকরা
এবং গৃহতৃপ্তরা
শুনল মনের ছন্দ সে
স্বপনকে।

সে সুর বুঝি, হায় মিছে নয়,
সে গান বুঝি আর কিছু নয়,
আদিকালের বিশ্বমায়ের
বুকফাটা
চাঁদের আলোর সুরকাটা......
সেই সবই!
নিখিল কবির চিত্তপায়ের
পথহাঁটা
সুরের ধ্বনি রাখলো ধরি
অমর করি
নিত্যকালের এই কবি।
আনলো সুরের সুরধনী,
বুনলো গানের সুরবুনানি
চাঁদের আলোর মাকুর কি?
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি?

কনিষ্ঠতম

কিরণকুমার রায়

ঠিক একশ বছর আগে এব্রাহাম লিংকন মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। আততায়ীর হাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। কুড়ি বছর পর নির্বাচিত হন জেমস গারফিল্ড। তাঁরও মৃত্যু আততায়ীর গুলীতে। তার কুড়ি বছর পর উইলিয়ম ম্যাকিনলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। আততায়ী তাঁর প্রাণনাশ করে। এর কুড়ি বছর পর ওয়ারেন হার্ডিং নির্বাচিত হন, কিন্তু রাষ্ট্রপতি থাকাকালেই তাঁর মৃত্যু হয়। কুড়ি বছর পর ফ্রাংকলিন রুজভেল্ট নির্বাচিত হয়েও ভাগ্যকে এড়াতে পারেননি। রাষ্ট্রপতি পদে কাজ করার সময়ই তাঁর জীবনের যবনিকাপাত ঘটে। দেখা গেছে, প্রতি কুড়ি বছর পর নির্বাচিত মার্কিন রাষ্ট্রপতির জীবন রোমাঞ্চকর। ১৯৪০ সালে রুজভেল্টের কুড়ি বছর পর এবার নির্বাচিত হলেন আনকোরা রাজনীতিক জন ফিৎজজেরাল্ড কেনেডি। দশ মাস আগেও তাঁর স্বদেশের খুব বেশি মানুষ তাঁকে চিনত না, বিদেশে তো একেবারে অজ্ঞাত। কিন্তু প্রচার-কায়দায়, ব্যক্তিত্বের জোরে, আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়তায় তিনি আজ বিশ্বনায়কের আসন পূর্ণ করেছেন।

আরেকটি দৃষ্টিকোণ থেকেও এই নির্বাচনকে দেখা যেতে পারে। বিংশ-শতাব্দীতে মাত্র তিনজন ডেমক্রেট রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন জ্যাক কেনেডির আগে। উড্রো উইলসন, ফ্রাংকলিন রুজভেল্ট ও হ্যারি ট্রুম্যান। তিনজন রাষ্ট্রপতিই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মহাযুদ্ধের মধ্যে নিয়ে গেছেন। এবছর নির্বাচিত হয়েছেন বিংশ শতকের চতুর্থ ডেমক্রেট রাষ্ট্রপতি। পৃথিবীর চারদিকে বারুদ জমা হয়ে আছে। শুধু কঙ্গো, বার্লিন, কিউবা, তিব্বত, আলজেরিয়া বা ফরমোজা নয়, যে কোন জায়গায় যে কোন দিন যে কোন মুহূর্তে দাবানলের মত বারুদ জ্বলে উঠতে পারে। ক্রুশ্চেভ-মাউ সে তুঙ তৈরি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এডেনাুর-ম্যাকমিলানও কম প্রস্তুত নয়। যত উচ্চাশা থাকুক, রাষ্ট্রসংঘ তো খেলাঘর আর নেহরু নাসের টিটো এনক্রুমা যুনু সুকর্ণ তো নির্বিরোধী। ঠাণ্ডা লড়াইঘরে স্তূপ স্তূপ এটম বোমা হাইড্রোজেন বোমা জমা হয়েছে, রকেটগুলি সংকেতের অপেক্ষায় স্তব্ধ। জ্যাক কেনেডি পৃথিবীকে কি উপহার দেবেন? মহাশ্মশানের শান্তি না পারস্পরিক সৌহার্দ্যের সম্প্রীতি?

গত আট মাস ধরে জ্যাক কেনেডি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শহরে শহরে নির্বাচনী সফর করেছেন। প্রথম দিকের প্রশ্ন ছিল ডেমক্রেটিক দলের মনোনয়ন লাভ। তারপর সরাসরি নিকসনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। রিচার্ড নিকসন ও তাঁর স্ত্রী প্যাট নিকসন আমেরিকার বিখ্যাত দম্পতি। খবরের কাগজে প্রত্যহ তাঁদের ছবি বেরোয়, বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে তাঁদের নিত্য যোগাযোগ। সে তুলনায় কেনেডি রাজনীতিতে নবাগত। নিকসন ঠাণ্ডা মানুষ, উত্তেজিত হন না, অসংযত ব্যবহার করেন না, পাকা

কনিষ্ঠতম বিশ্বনায়ক জন এফ কেনেডি ও পত্নী জ্যাকোলিন কেনেডি

ডিপ্লোম্যাট। কিন্তু কেনেডির মধ্যে যৌবনের চাঞ্চল্য টগবগ করে ফোটে। নির্বাচনী সভায় যখন নিকসন যান, তাঁর ঠোঁটের কোণে মিষ্টি হাসি মধুর হয়ে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ বক্তৃতা করেন, মজার মজার কথা বলেন। টেক্সাসের এক সভায় বললেন, এখানকার একটি ছোট্ট মেয়ে পলা রাইনহার্ট চিঠি লিখেছে, সে একটি এলবামের বই চায়। এখানে আসার আগে আমি বইটি নিয়ে এসেছি। কিন্তু বইটি দেব একটি মাত্র শর্তে। এই উপহার দেওয়ার জন্যই যদি তার বাবা মা আমাকে ভোট দেন তাহলে নারাজ। সভায় কি উপস্থিত আছ পলা, তাহলে একবার মুখ ফুটে বল, তোমার মা বাবার কি ইচ্ছা!

পলা উপস্থিত ছিল, সে হাসিমুখে এগিয়ে এল। তাকে আলিঙ্গন করলেন প্যাট। সভায় গুঞ্জন ওঠল, ব্যক্তিগত উষ্ণতার স্পর্শ লাগল সবার মনে, হাসি ও করতালি শোনা গেল।

কিন্তু কেনেডি একেবারে আলাদা। তাঁর মুখে হাসি আছে, সে হাসি ডিপ্লোম্যাটের নয়, কর্মীর। সভার ডায়াসে তিনি যতক্ষণ বসে থাকেন বারে বারে মাথায় হাত দিয়ে চুল ঠিক করেন, আঙুলের ডগায় নেকটাইটাকে জড়ান, ডান পায়ে মাঝে মাঝে তাল দেন। চঞ্চল যৌবনের প্রতীক। যখন বক্তৃতার জন্য তাঁর ডাক আসে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করেন তাঁর বক্তব্য। প্রত্যেকটি কথা শাণিত তীক্ষ্ন, প্রত্যেকটি বাক্য দ্রুতগতি তীরের মত মর্মভেদী।

কেনেডি বয়সে তরুণ, মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়স। নিকসনও বেশি বড় নয়, বয়স সাতচল্লিশ। তরুণ নিকসনের পেছনে সর্বপ্রিয় আইজেনহাওয়ারের আশ্রয়, পুরো রিপাবলিকান দলের সানন্দ সমর্থিত। তদুপরি রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা। কেনেডির সে সৌভাগ্য ছিল না। ট্রুম্যান-স্টিভেনসন-হ্যামক্রে প্রভৃতি ডেমক্রেট দলপতিরা কখনো তাঁর পাশে সক্রিয়ভাবে এসে দাঁড়াননি। তাঁকে একা দ্বন্দ্ব করতে হয়েছে, নিজের প্রবল ব্যক্তিত্বের মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করতে হয়েছে, তিনি শক্ত মানুষ। নবাগত হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি ও সম্মান অটুট রাখার যোগ্যতম ব্যক্তি। তাঁর বাধা ছিল অনেক, তিনি ধর্মে রোমান ক্যাথলিক, বয়সে ছোট, রাষ্ট্রচালনার অভিজ্ঞতায় একেবারে নিঃস্ব। তিনি ব্যক্তিত্বের জোরে সব বাধা অতিক্রম করেছেন, জনপ্রিয়তার অলকাতিলকায় বরণীয় হয়ে প্রমাণ করেছেন, আগামী অশান্ত বছরগুলিতে ক্রুশ্চেভের মুখোমুখি দাঁড়াবার মত শক্তি

● অনুবাদ সাহিত্য ●

এমিল জোলার "হিউম্যান বিস্ট"-এর বঙ্গানুবাদ

পাশবিক ৫.৫০

এ্যালবার্টো মোরাভিয়ার The Woman of Rome-এর বঙ্গানুবাদ

রোমের রূপসী (প্রথম খণ্ড) ৪.০০

রোমের রূপসী (দ্বিতীয় খণ্ড) ৫.০০

অনুবাদক : প্রবীর ঘোষ

চলন্তিকা প্রকাশক

২১২/১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

যা ইচ্ছে হয় খান !

হিউলেটস মিকশ্চার

খাওয়া দাওয়ার পরে পাকস্থলীর ব্যথায় দীর্ঘস্থায়ী আরাম এনে দেবে।

সি. জে. হিউলেট এণ্ড সন (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড
৮৬।এ, নাইনিয়াপ্পা নায়ক স্ট্রীট, মাদ্রাজ-৩

ICHM 1128

সাহস ও বুদ্ধি তাঁর প্রচুর পরিমাণে আছে।

অথচ, দাদার অকালে মৃত্যু না হলে হয়ত কোনদিনই জ্যাক কেনেডিকে রাজনীতির আসরে [illegible] না। সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের প্রতি [illegible] চিরকালের ঝোঁক। ছেলেবেলায় খাবার টেবিলে বসে বাবা বা ভাই বোনে মিলে রাজনীতির তর্ক জমত, দাদা জো ছিল অসামান্য। রাজনীতিইতিহাসের জ্ঞান, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সাহসে তাকে প্রতিভাবান বলে মনে হত। মা বাবা জানতেন, ভাই-বোনেরা জানত, দাদা জো একদা নিশ্চয়ই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হবে। দাদার দীপ্তিতেই তখন ঝলমল করত সারা পরিবার। জ্যাক ছিল মাঝারি ধরনের, যেমন লেখাপড়ায় তেমন খেলাধুলায়। নেতৃত্ব থেকে নিরালাই ছিল পছন্দ। কিন্তু মহাযুদ্ধ আর দাদার মৃত্যু জীবনটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে তাকে একেবারে নায়কের ভূমিকায় নামিয়ে দিয়েছে।

জ্যাক কেনেডির বাবা জোসেফ প্যাট্রিক কেনেডি কীর্তিমান পুরুষ। দেড়শ বছর আগে আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে দুটো পরিবার আসে বোস্টন শহরে। কেনেডি আর ফিৎজজেরাল্ড পরিবার। জন ফিৎজজেরাল্ড বোস্টন শহরে অনেকবার মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন, কংগ্রেসেরও তিনি সদস্য ছিলেন। তাঁর মেয়ে রোজকে বিয়ে করেন জোসেফ প্যাট্রিক কেনেডি। জোসেফ কেনেডি হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে একটি ব্যাঙ্কের সামান্য চাকরি করতেন। হঠাৎ শুনতে পেলেন কলম্বিয়া ট্রাস্ট কোং এক নামকরা ব্যাঙ্কের সঙ্গে সম্মিলিত হতে যাচ্ছে। কলম্বিয়া ট্রাস্টে তাঁর বাবার কিছু শেয়ার ছিল। তিনি আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে চড়া সুদে পয়তাল্লিশ হাজার ডলার ঋণ নিয়ে ট্রাস্টের অধিকাংশ শেয়ার কিনে নেন। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তিনি নামকরা ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্টের পদাধিকার করেন। সারা আমেরিকার ব্যাঙ্কিং জগতে এত অল্পবয়স্ক প্রেসিডেণ্ট আর হয়নি।

তখন থেকেই জোসেফ কেনেডির ভাগ্য ঘুরে যায়। ব্যাঙ্ক, মদের ব্যবসা, বাজার ও এস্টেট, সিনেমা, তেল ও খনি, নানা বাণিজ্যে তিনি অকাতরে টাকা ঢালেন। কোথায়ও লোকসান হয় না, লাভে মুনাফায় তিনি ফুলে ফেঁপে ওঠেন। কোটিপতি ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি এখন প্রখ্যাত।

জন ফিৎজজেরাল্ডের প্রথমা কন্যা ও বোস্টন শহরের মক্ষিরানী রোজকে বিয়ে করার এক বছর পর জোসেফ কেনেডির প্রথম ছেলে জো'র জন্ম। তখনই তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তাঁর প্রত্যেক ছেলে ও মেয়েকে একুশ বছরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে দশ লক্ষ ডলারের সম্পত্তি দান করবেন। যাতে তাঁর ছেলেমেয়েদের কোনদিনই অর্থার্জনের জন্য ভাবতে না হয় এবং নিজের স্বেচ্ছামত জীবন বিকশিত করার পুরো আর্থিক সাহায্য পায়। তাঁর চার ছেলে ও পাঁচ মেয়ের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই তিনি প্রতিজ্ঞা পূরণ করেও বিপুল বিত্ত ও ব্যবসাকে দিন দিন বাড়িয়ে চলেছেন। ব্যাঙ্কে মজুত তাঁর বর্তমান অর্থের পরিমাণ আশী কোটি টাকা।

জোসেফ কেনেডি ডেমক্রেটিক দলের আজীবন সদস্য। রুজভেল্ট তাঁকে সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। স্টক মার্কেটের যে সমস্ত প্রচলিত রীতিনীতি তাঁকে বড়-লোক করেছে, তিনি সে সময় নিজে আইন করে সেই রীতিনীতি বন্ধ করে দেন। সৎ ও সংবেদনশীল মানুষ হিসেবে রুজভেল্ট তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন।

ব্যবসার প্রয়োজনে দেশ বিদেশে নিত্য ঘুরে বেড়াতে হলেও ছেলেমেয়েদের মানুষ করার দিকে জোসেফ কেনেডির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। রোজ কেনেডি ধর্মশীলা মহিলা, প্রত্যেক মেয়েকেই তিনি ক্যাথলিক স্কুলে পড়িয়েছেন। কিন্তু ছেলেদের বেলায় জোসেফ কিছুতেই ধর্মান্ধতা পছন্দ করেননি। তিনি ছেলেদের কিছুটা ধর্ম সম্বন্ধে নিস্পৃহ করে রাখতে চাইতেন। ছেলেদের তিনি প্রাইভেট প্রিপেরেটরি স্কুল ও হার্ভার্ডে পাঠিয়েছেন। বড়ছেলে জো ও মেজছেলে জ্যাক কিছুকাল লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকসে পড়েছেন। সেখানে বিখ্যাত অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কী ছিলেন তাঁদের গুরু। ছোট দুই ছেলে ববি ও টেড ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের ডিগ্রী নিয়েছেন।

যেখানেই কেনেডি পরিবার ঘুরে বেড়াক, বোস্টন, ব্রনক্সভিল, ওয়াশিংটন, লণ্ডন, পাম বীচ বা রিভিয়েরা—সর্বত্র নতুন নতুন উত্তেজনা, ঘ্রাণ, অভিজ্ঞতা, শব্দ ও আলোচনা দিনগুলিকে উষ্ণ করে রেখেছে। কেপ কডে দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশ কাটাতে গিয়ে ভাইবোনে তীব্র প্রতিযোগিতা করেছে টেনিস খেলায়, সাঁতারে, গলফ বা নৌকোবাইচে। কে কাকে হারাতে পারে, এই নিয়ে উত্তেজিত প্রতি-যোগিতা। মা বাবা পাশে দাঁড়িয়ে হেসেছেন। বলেছেন, ছেলেমেয়েরা যুদ্ধ করুক। সব-চেয়ে বড় কথা, তারা যে এক সঙ্গে যুদ্ধ করছে। আমাদের জন্য ভাবি না, নিজেদের ভার আমরা নিজেরা বইতে পারব। মাঝে মাঝে ছেলেমেয়েদের পাশে একা জোসেফকে রেখে রোজ কেনেডি ঘরে গিয়ে নিরালায় বিশ্রাম করছেন। এই উত্তেজনায় তিনি ক্লান্ত নন, নবাগতের জন্মসম্ভাবনায় নিজের ও সন্তানের মঙ্গলকামনা তাঁকে ঘরে নিয়ে গেছে।

জোসেফ কেনেডি ছিলেন রুজভেল্টের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা। তিনি ওয়াশিংটনে মাসের পর মাস থাকতে শুরু করলেন। ছেলেমেয়েরা রুজভেল্ট ও নেতৃবৃন্দের কাছা-কাছি এল। সে সময় জোসেফ কেনেডি ইংল্যাণ্ডে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের পদ গ্রহণ

করেন। লণ্ডনের রাষ্ট্রদূতভবনে পুরো পরিবারকে নিয়ে এলেন জোসেফ। আন্তর্জাতিক রাজনীতির তুমুল আলোচনা পারিবারিক খাবার ঘরে ঝড় তুলল। গ্রীষ্মাবকাশে ছেলেরা য়ুরোপের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগল। জো গেলেন স্পেন সীমান্তে, জ্যাক মস্কো ও বার্লিন নগরীতে। কখনো কখনো সপ্তাহান্তিক ছুটি কাটাতে পুরো পরিবার যেতেন প্যারিসে। সে সময় হিটলারের সৈন্যবাহিনী দিনরাত কুচকাওয়াজ করছে, মুসোলিনী রোমের গদীতে। শীর্ণকায় দুর্বলচিত্ত নেভিল চেম্বারলেন গুটানো ছাতা ও রেনকোট হাতে নিয়ে বিব্রত, যুদ্ধের আশঙ্কায় আরো ব্যতিব্যস্ত। রুচিবান অধ্যাপকের মত চেহারার ব্লুম ফ্রান্সের মসনদে। মহাযুদ্ধের পদধ্বনি কান না পাতলেও শোনা যায়। বার্লিন রেডিওতে অনবরত গর্জন।

হিটলারের যুদ্ধপ্রস্তুতির ব্যাপকতা ও শক্তি জোসেফ প্যাট্রিক কেনেডিকে কিছুটা বিভ্রান্ত করেছিল। মহাযুদ্ধ যে বাধবেই তাতে কারো সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সর্বব্যাপী যুদ্ধে কে জয়লাভ করবে? হিটলার না চেম্বারলেন-ব্লুম? অথবা হিটলার মুসোলিনী না স্ট্যালিন? তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু রুজভেল্টের পররাষ্ট্রনীতি একেবারে বিপরীত, তাই তাঁকে ডেকে নেওয়া হল ওয়াশিংটনে। তিনি পদত্যাগ করলেন।

সাবালক হওয়া মাত্র প্রত্যেক সন্তানকে চাল্লিশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি দিয়েছেন জোসেফ কেনেডি। না, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য জীবনসংগ্রাম তিনি সন্তানদের জন্য চাননি। যার যেভাবে খুশি জীবনকে টেনে নিয়ে যাক। ইচ্ছে করলে অলস বাবুয়ানা ও বেপরোয়া ফুর্তিতে দিন কাটাতেও মানা ছিল না। তিনি সন্তানদের বলতেন, 'তোমাদের জন্য সমস্তরকম সুযোগ আমি করে দিচ্ছি। কিন্তু এই সুযোগের মস্ত দায়-দায়িত্বও আছে। তোমাদের জীবনকে সার্থক করার জন্য তোমরা আপ্রাণ চেষ্টা করবে।'

বড়ছেলে জো ডেমক্রেটিক দলের প্রতিশ্রুতিবান তরুণ নেতা। কংগ্রেসের একটি আসন পূর্ণ করবেন এবং যথাসময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, তা সুনিশ্চিত। কিন্তু মেজছেলে জ্যাক সম্পর্কে বাপ মা বা ভাই-বোনদের ধারণা, জ্যাক হয়ত লেখক বা অধ্যাপক হবে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর্থার ক্রুকের পরামর্শে জ্যাক তখন নতুন করে গবেষণা-প্রবন্ধ লিখছেন 'হোয়াই ইংল্যান্ড স্লেপ্ট'। প্রবন্ধটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়ে বেস্টসেলারের সম্মান লাভ করেছে।

কিন্তু মহাযুদ্ধের বারুদের গন্ধ যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষদের জীবন ছুঁয়েছে, কেনেডি পরিবারে তখন একে একে দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ নেমেছে। প্রথমে খবর এল, নৌ-লেফটেনাণ্ট জ্যাক কেনেডির কোন সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানী ডেস্ট্রয়ারের আক্রমণে বিধ্বস্ত পি টি বোটের নাবিকদের জীবন-রক্ষার জন্য তাঁর দুঃসাহসিক বীরত্ব ইতিমধ্যেই খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছে। তাঁর সাহস প্রেরণা যুগিয়েছে তরুণ যুদ্ধযাত্রীদের। তখনও হাসপাতালে জ্যাকের চিকিৎসা চলছে। এমন সময় সংবাদ এল, বড় ছেলে লেফটেনাণ্ট জো কেনেডি ইংল্যাণ্ডের সমুদ্রতীরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। সমুদ্রের অতলগর্ভে দুবার শত্রুদের সঙ্গে তুমুল সংঘর্ষে তিনি রোমহর্ষক বীরত্ব দেখিয়েছেন। ছুটিতে বাড়ি যাবার সময় আদেশ হল, বোমা বোঝাই একটি বিমানের চালক হয়ে কাজ করতে হবে। বিমানটি আকাশে উড়ে একটি নাজী-টু শত্রু-বিমানের পশ্চাদ্ধাবন করে। কিন্তু চরম বিপদের পূর্বক্ষণে প্যারাশুটযোগে অবতরণ করার সময় বিমানটি বিস্ফোরিত হয়ে ভেঙে যায়। জোর দেহ শতধাবিচ্ছিন্ন হয়ে ছত্রাকারে ছড়িয়ে পড়ে নিচের মাটিতে।

জোর মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার তিন সপ্তাহ পরে খবর আসে আরেকটি পারিবারিক দুঃসংবাদের। বোন ক্যাথলীনের স্বামী মারকুইস অব হার্টিংটন নর্মাণ্ডির রণক্ষেত্রে মারা গেছেন। মারকুইস ছিলেন ডিউক অব ডিভনসায়ারের জ্যেষ্ঠপুত্র। ইংল্যাণ্ডে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ভবনে ক্যাথলীনের সঙ্গে মারকুইসের প্রথম পরিচয়। পরে যুদ্ধের সময় ক্যাথলীন যখন রেডক্রস কর্মী হিসেবে লণ্ডনে আসেন তখন তাঁদের পরিণয়। বিয়ের এক মাস পর মারকুইস যান রণক্ষেত্রে, আর ফেরেন না। চার বছর পর ক্যাথলীনও বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। স্বামীর যেখানে মৃত্যু

॥ সম্প্রতি প্রকাশিত ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নূতন সংস্করণ

শেষ সপ্তক মূল্য ৪·৫০, ৫·৫০

পুনর্মুদ্রণ

বুদ্ধদেব	১·৭০, ২·৭০
ব্যঙ্গকৌতুক	২·২০
মানুষের ধর্ম	২·০০
শিক্ষা	৩·৭০
সংকলন	৩·৫০

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পথে বিপথে	৩·৫০
বাংলার ব্রত	১·০০
ভারতশিল্পে মূর্তি	১·০০
ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ	১·০০
মাসি	২·৫০

বিশ্বভারতী

উৎসবে

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট • কলিকাতা

হয়েছিল তার থেকে অল্প দূরে পড়েছিল নিহত ক্যাথলীনের মৃতদেহ।

জ্যেষ্ঠপুত্র জো'র স্মৃতিরক্ষার্থে জোসেফ কেনেডি একটি সেবায়তন গড়ে তুলেছেন, নাম দিয়েছেন 'জোসেফ পি কেনেডি জুনিয়র ফাউণ্ডেশন'। আট কোটি টাকা খরচ করে নানা শহরে এই প্রতিষ্ঠানের হাসপাতাল ও নার্সিং হোম নির্মিত হয়েছে। কেনেডি পরিবারের ছেলেমেয়ে ও জামাইরা এই প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব করেন।

দাদা মারা যাওয়ার পর আস্তে আস্তে জ্যাক রাজনীতিতে ঢোকেন। তিনি বলেন, 'দাদা মারা না গেলে আমি কখনো রাজনীতিতে আসতাম না। আমি যদি মারা যাই তাহলে ছোটভাই বব আসবে। ববের যদি কিছু ঘটে, তাহলে টেড আসবে। আমার পরিবার থেকে কেউ না কেউ সব সময়ই রাজনীতিতে অংশ নেবে।'

যুদ্ধ থেকে ছাড়া পাওয়ার আগে দীর্ঘকাল তাঁকে হাসপাতালে শুয়ে থাকতে হয়েছিল। যুদ্ধ থামার পর তিনি সাংবাদিকতাকে

ইনি দুদিন বাদেই মা হবেন

এঁর স্বাস্থ্য ভালো রাখা দরকার

যাঁরা মা হতে চলেছেন আর যাঁরা মা হয়েছেন তাদের সবাইকেই ডাক্তাররা সব সময় রবিনসন্স 'পেটেণ্ট' বার্লি খেতে বলেন, কেননা—

* এতে শরীরের দূষিত পদার্থ বেরিয়ে যায়, শরীরটি সুস্থ থাকে
* ক্যালসিয়াম ও লৌহ মিশিয়ে একে বিশেষ শক্তিশালী করা হয়েছে
* ছেলে হওয়ার পর মায়ের দুধ বাড়াতে এ বিশেষভাবে সহায়তা করে
* উৎকৃষ্ট বার্লিশস্য থেকে তৈরী হয়—এবং এর পেছনে রয়েছে ১৫০ বছরের ওপর বার্লি তৈরীর অভিজ্ঞতা

RPT-1

এই বার্লিতে অনধিক ০·০২৮% লৌহ বি. পি. এবং ১·৫% ক্রিটা প্রি. বি. পি. আছে।

দুঃসহ গরমের দিনে সুস্বাদু, শীতল ও তৃপ্তিদায়ক পানীয় হিসেবে রবিনসন্স 'পেটেণ্ট' বার্লি চমৎকার।

রবিনসন্স 'পেটেণ্ট' বার্লি

ক্যালসিয়াম ও লৌহ সংযোগে বিশেষ শক্তিশালী

অ্যাটলান্টিস (ঈস্ট) লিঃ (ইংলণ্ডে সংগঠিত)

WTRPT

পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। স্যানফ্রান্সিস্কো আন্তর্জাতিক সম্মেলন, ইংল্যাণ্ডের নির্বাচন (১৯৪৫), পটসডাম মিটিং প্রভৃতি নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার তিনি রিপোর্ট করেন। 'প্রোফাইলস ইন কারেজ' নামে লিখিত তাঁর জীবনীগ্রন্থ যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-পুরস্কার পুলিটজার প্রাইজ লাভ করেছে।

কেনেডি পরিবারটি বিচিত্র। বাবা জোসেফ ও মা রোজ বৃদ্ধ হলেও উদ্দীপনা হারাননি। ভাই ও ভাইয়ের স্ত্রীরা এবং বোন ও বোনের স্বামীরা যখন পারিবারিক ড্রইং রুমে সমবেত হন, তখন এক অদ্ভুত কাউন্সিলের মত মনে হয়। বাবা স্পীকার, জ্যাক প্রেসিডেন্ট এবং ববি সেক্রেটারী অব স্টেট। ছোটভাই টেড মোটা মানুষ, কিন্তু কাজের বেলায় পাখীর মত সূক্ষ্ম। তিনি এবং বোন ইউনিসের স্বামী রবার্ট সার্জেন্ট শ্রিভার, জীনের স্বামী স্টিফেন এডোয়ার্ড স্মিথ ও প্যাট্রিসিয়ার স্বামী চলচ্চিত্রনায়ক পিটার লফোর্ড প্রত্যেকেই রাজনীতির উৎসাহী কর্মী। প্রত্যেক বোন, বিশেষ করে ববির স্ত্রী ইথেল একেবারে নেত্রী। সাতটি সন্তানের জননী ও সাত মাসের গর্ভবতী হয়েও ইথেল সারা-দেশের নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়েছেন।

যদি একটু ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকেন, তাহলে জ্যাকি। জ্যাক কেনেডির স্ত্রী জেকোলিন কেনেডি। ত্রিশ বছরের এই তন্বী তরুণীটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সম্মানীয়া মহিলার গৌরব লাভ করেছেন। এক মাথা সোজা-সোজা চুলের তলায় ছোট কপাল। ধনুকের মত আঁকা ভুরুর নিচে দুটি উজ্জ্বল কালো-তারার চোখ। নাক তীক্ষ্ণ নয়, কিন্তু পাতলা ঠোঁটের রেখায় সর্বদা স্বচ্ছ ছেলেমানুষি হাসি ঝলমল করে। পাঁচটি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন। কিন্তু রাজনীতির তর্কবিতর্কে কখনো নিজেকে জড়ান না। ছবি আঁকতে তাঁর ভাল লাগে, অবসর পেলেই ক্যানভাসের সামনে গিয়ে দাঁড়ান। আড়াই বছরের ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে কেরোলিন কার্পেটের ওপর ছোটাছুটি করে অথবা পুতুল ঘোড়ার পিঠে চেপে অনবরত 'হেট, হেট' করতে থাকে। ছবি আঁকতে আঁকতে মা হাসিমুখে মেয়ের দিকে তাকান।

জ্যাকি শান্ত স্নিগ্ধ। জ্যাক চঞ্চল উষ্ণ। জ্যাক কেনেডি রিচার্ড নিকসনের মত হিসেবি নয়, ডিপ্লোম্যাট নয়। জ্যাক কেনেডি টগবগ করে ফোটেন যখন আঘাত করার প্রয়োজন আসে; আঘাতকে তীক্ষ্ণ তীব্র করেন যখন শত্রুর নিপাত আকাঙ্খিত হয়। অথচ সরল নিষ্পাপ পবিত্রতা আছে প্রাণে, মন সংবেদনশীল। আমেরিকার ধনাঢ্য-দের পার্টি রিপাবলিকান, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র-দের দল ডেমক্রেটিক। নিজেরা ধনী হয়েও কেনেডি পরিবার তিন পুরুষ ধরে ডেমক্রেটিকদের দলে।

কেনেডি মনে করেন, ক্রুশ্চেভের মুখো-মুখি হয়ে বিশ্বসংকটের একাংশের নেতা আমেরিকা। আমেরিকা যদি ঠিকপথে চালিত না হয়, পৃথিবীর বিপদ রোধ করা যাবে না। অথচ, রিপাবলিকান সরকার ডালেসের নীতিকে আঁকড়ে ধরে থেকে নিরপেক্ষ দেশগুলিকে অযথা অপবাদ দিয়েছে উচ্চাকাশচারী ইউ-টু ধ্বংসের পর মার্জনা প্রার্থনা না করে অন্যায় করেছে এবং এক-রোখা পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করে সংকটকে ভয়াবহ করে তুলেছে। তিনি মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম ও কৃষিজগতে আরো উদার নীতি প্রবর্তিত হওয়া উচিত এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে আরো মজবুত করা প্রয়োজন। প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত চেস্টার বাউয়েলস তাঁর পররাষ্ট্র বিষয়ক পরামর্শদাতা এবং উদার-পন্থী রুজভেল্ট পরিবার সুহৃদ।

তাঁর মা রোজ কেনেডি কিছুকাল আগে এক পার্টিতে বলেছেন, 'যুদ্ধের বিভীষিকা জ্যাক জানে। যুদ্ধে যখন মা জ্যেষ্ঠপুত্রকে হারায় এবং নবপরিণীতাবধূ চিরদিনের মত স্বামীবিরহ অনুভব করে, জ্যাক নিজের জীবন দিয়েই যুদ্ধের শোক, বেদনা, মনস্তাপ ও অশ্রুকে জানে। তাই আমি বিশ্বাস করি, জ্যাক আমাদিগকে আর যুদ্ধে নিয়ে যেতে পারে না।'

কেনেডিরা ধর্মীয় মতে রোমান ক্যাথলিক। যুক্তরাষ্ট্রে ক্যাথলিকদের সংখ্যা শতকরা আটত্রিশ। ক্যাথলিকদের বিশ্বাস করে না প্রোটেস্টাণ্টরা, মতেও ব্যবধান প্রচুর। ১৯২৮ সালের নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন তৎকালীন যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ ডেমক্রেট নেতা অল স্মিথ। ধর্মীয় মতের জন্য তাঁর শোচনীয় পরাজয় হয়েছিল। এবারও ধর্মের প্রশ্নটা নির্বাচনের আগাগোড়া একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আরেকটা প্রশ্ন হয়েছিল, রাষ্ট্রচালনার অভিজ্ঞতা।

কেনেডি বলেছেন, 'দুটি মানুষ বা দুটি দলের মধ্য থেকে আপনারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে যাচ্ছেন না, আপনাদের বেছে নিতে হবে জনস্বার্থ ও ব্যক্তিগত আরাম, জাতীয় সম্মান ও জাতীয় ক্ষয়িষ্ণুতা এবং প্রগতির মুক্তবায়ু ও গতানুগতিক গণ্ডলিকা প্রবাহের মধ্যে কাকে আপনারা গুরুত্ব দেন। আত্মত্যাগ আর মাঝারিজীবনের মধ্যে আপনারা কি পছন্দ করেন। সমগ্র মানবজাতি আপনাদের সিদ্ধান্ত জানার জন্য অপেক্ষা করে আছে।'

ক্রুশ্চেভ অভিনন্দন জানিয়েছেন কেনে-ডিকে। রুজভেল্টের আমলে যে রুশ-মার্কিন সম্প্রীতির সূত্রপাত হয়েছিল তা সমৃদ্ধতর হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন। নয়াদিল্লি প্রকাশ্যে মুখ না খুললেও হাসিটা লুকোতে পারেনি। বন্ধু আইজেনহাওয়ারকে হেরে যেতে দেখেও ম্যাকমিলান, দাগল ও এডেনার বিষণ্ণ নয়। মার্কিন যুবক-যুবতীরা তো গান বেঁধে ফেলেছে: 'নেভার ফিয়ার, জ্যাক ইজ হিয়ার!' শুধু পিকিং রেডিও গোমরা-মুখে ঘোষণা করেছে কালো কয়লার এপিঠ ওপিঠ নেই, সব সমান। অ[illegible] আলকাতিলকায় চর্চিত কনিষ্ঠতম বিশ্বনায়ক জন ফিৎজজেরাল্ড কেনেডি অপেক্ষা করে আছেন নবজাতকের জন্য। স্ত্রী জ্যাকিকে বলেছেন, 'জান, এবার একটি ছেলে আশা করছি।' ছেলে হোক আর মেয়েই হোক, পৃথিবীর সমস্ত নবজাতক ইতিহাসের পাতায় পড়বে, জ্যাক কেনেডির রূপকথা। যুদ্ধ কি অনিবার্য না সমৃদ্ধি অপরিহার্য?

[পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ, জ্যাকি কেনেডি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছেন]

যষ্টি-মধু

ভঙ্গ বঙ্গের রঙ্গ-ব্যঙ্গের একমাত্র মাসিক পত্রিকা। কার্টুনে কণ্টকিত, রচনায় রসালো। আজই গ্রাহক বা এজেন্ট হোন।
প্রতি সংখ্যা ·৪০, বার্ষিক ৪·৫০

সম্পাদক : কুমারেশ ঘোষ
৭৫এ, গড়পার রোড, কলিকাতা—৯

ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস

জব চার্ণকের বিবি

কলকাতা স্রষ্টা জব চার্ণকের প্রেমময় জীবন আলেখ্য। ॥ পাঁচ টাকা ॥

অর্চনা পাবলিশার্স
৮বি, রমানাথ সাধু লেন, কলিকাতা-৭

(সি-৯৭৫৭)

সুকৃতি রায়চৌধুরীর

তপোময় তুষারতীর্থ

কেদারবদরী ভ্রমণের সর্বাধুনিক কাহিনীতে পঞ্চপাণ্ডবের পিকনিকের আসরে তানসেনের গানের রসজ্ঞ বর্ণনা ॥ ১২টি ছবি
৮·৫০ নঃ পঃ

দি বুক হাউস, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলি-১২
(সি-৯৬০২/১)

ঢাকা হতে প্রকাশিত
উভয় বাংলার সেরা সাহিত্যিকদের লেখাপুষ্ট
হাস্যরসাত্মক পাক্ষিক

সচিত্র সন্ধানী

ও

সিনেমা মাসিক

রূপকথা

স্থানীয় কার্যালয়—
৮নং নবীন সরকার লেন, কলিকাতা-৩

(সি-৯৬২৮)

কেমন সুন্দর ঘন চুল
—এঁরা নিশ্চয়ই
ব্যবহার করেন...
টাটার
কেশ তৈল
টাটার সুবাসিত নারিকেল কেশ তৈল—
ফুলের গন্ধে ভরা
পরিশোধিত খাঁটি তেল
টাটার ক্যাস্টর হেয়ার অয়েল—চমৎকার
মিষ্টি গন্ধে ভরপুর
কেশরাশি ঘন ও সুন্দর ক'রে তুলতে হ'লে
টাটার কেশ তৈল ব্যবহার করুন !
HAIR OIL
THE TATA OIL MILLS
টাটা-র তৈরী

ছন্দ যতি মিল

ধনঞ্জয় বৈরাগী

(১)

সারা সপ্তাহ ধরে একঘেঁয়ে অবিরাম বৃষ্টিতে ভিজে আর কাগজের নিরাশ করা আবহাওয়া সংবাদ পড়ে, স্যাঁতস্যাঁতে মন নিয়ে, সপ্তাহ শেষের দু'দিন ছুটিতে বাইরে যাবার উৎসাহ কেউই বিশেষ পায়নি বলেই তাদের ঠাট্টা করার জন্যে যেন হঠাৎ শনিবারের সকাল বেলাতেই আকাশ পরিষ্কার স্বচ্ছ নীল হয়ে গেল, রোদে ঝলমল করে উঠল ঘন সবুজ গাছ আর কাঁচ কলাপাতা রঙএর ঘাস, যা বোধ হয় বছরের মধ্যে ন'মাস শীতে কেঁপে কেঁপে ম্যালেরিয়া রোগে ভোগা তরুণের মত অল্প বয়েসে বুড়ো হয়ে বসে থাকে।

এমন একটি আশ্চর্য পরিষ্কার সকাল পাওয়া এদেশে যে কতখানি ভাগ্যের কথা, তা হাড়ে হাড়ে বোঝে যারা বারমাস বাস করে লন্ডনে। যদিও এখানে চারটে ঋতুর নাম শোনা যায় কিন্তু বছর জুড়ে দরবার করে শীত জুজু। অন্যরা লুকিয়ে চুরিয়ে ঘোমটা সরিয়ে মাঝে মাঝে উঁকি মারলেও বেশীক্ষণ টিঁকতে পারে না; জুজুর ভয়েই অস্থির। ক্যালেন্ডারের তারিখ হিসেবে একদিন সরকারী গ্রীষ্মকাল ঘোষণা করা হয় বটে তবে তার সঙ্গে প্রকৃতির বিশেষ সম্বন্ধ থাকে না। দুঃখ হয় মেয়েদের জন্যে, হাল ফ্যাশানের প্যারিসের বুকপিঠ হাতকাটা জামা পরে পুরুষদের চোখে পুলক কিম্বা স্বামীদের মনে ঈর্ষা জাগাবার সুযোগ পায় না তারা, আলমারি খুলে গ্রীষ্ম সজ্জাগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বিরহিণী প্রিয়ার মত।

তবু এরই মধ্যে একদিন হঠাৎ না বলে কয়ে রোদভরা দিন এসে হাজির হয়; পরমায়ু তার বেশীক্ষণের না হলেও, হাসি এনে দেয় সকলের মুখে। (এমন কি ইংরেজরাও হাসে, যদিও তাদের নামে বদনাম শোনা যায় তারা হাসতে জানে না।) স্কুলের ছুটি থাকলে গরীব ছেলেমেয়েরা রাস্তায় খেলা করে। নকল বন্দুক দেখিয়ে অন্যকে ভয় দেখায়, যুদ্ধ করার ভান করে। বাড়ির বউ বাজার করতে বেরিয়ে ঠেলা গাড়িতে বাচ্চা সমেত গল্প করতে লেগে যায় অন্য বউয়ের সঙ্গে, হয়ত আর এক বাড়ির কেচ্ছা নিয়ে। চিরকেলে মেয়েলী গল্প। মিসেস অমুকের তৃতীয় বার ডিভোর্স করা যে উচিত হয়নি তারই রায় দিচ্ছে দু'জন গৃহস্থ বধূ, কে বলতে পারে এও সেই আঙুর ফল টকের মত কোন গল্প কিনা। মধুচন্দ্রিমায় আনন্দে বিভোর হয়ে দিন কাটাচ্ছে যে দম্পতি, তারা এমন একটি দিনে মাতাল হয়ে ওঠে। আর যাদের এখনও বিয়ে হয়নি, পূর্বরাগ চলছে রাত্রে তারা যে কোন অছিলায় অফিস কামাই করে যুগলে বেরিয়ে পড়েছে, সামর্থ্য অনুযায়ী পিকনিকের বাস্ক নিয়ে হয়ত হ্যাম্পস্টেড হিথেই দিন কাটাবে। বড়রাও আজ বাদ যায় না, টিউব স্টেশন থেকে বেরিয়ে অফিস যাবার পথে ফুল কিনে বুকে গোঁজে, হয়ত একটা কারনেশিয়ান। দুপুরে খাবার সময় চট করে কিছু গিলে ফেলে বড় রাস্তায় রোদের মধ্যে বেরিয়ে বড় বড় দোকানগুলোর সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে window shopping করে। আবার বাড়ি ফেরার সময়, তখনও দিন ভাল থাকলে একটা কফি বারে ঢুকে, দুধ চিনি না দিয়ে এক কাপ কফি খায় চায়ের বদলে, নিজের অজান্তে ভাল দিনের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। বুড়ো বুড়ীর দল আজ সকাল থেকে পার্কে গিয়ে বসে এক তাড়া খবরের কাগজ নিয়ে। সুদূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক অবস্থা থেকে নাকের ডগার রাশিয়ার হুমকি পর্যন্ত সব কিছু পড়া চাই, সেই সঙ্গে প'য়ষট্টি বছর বয়েসে কোন লর্ড তার লেডীকে সরিয়ে নাম করা নাইট ক্লাবের টুকরো কাপড় পরা বাইশ বছরের মেয়েকে বিয়ে করেছে, সে খবরের চাটনিও। ঘরে বসেও এগুলো যে পড়া যায় না তা নয়, কিন্তু এত ভাল লাগে না। বিশেষ করে সামনের বেঞ্চের যে ভদ্রমহিলা কুকুর নিয়ে বেড়াতে এসেছেন তিনি যেন কয়েকবারই ফিরে তাকালেন। সত্যি এমন দিনে নিজেকে খুব বেশী বুড়ো মনে হয় না। প্রকৃতির যাদুকর, ঝকমকে রোদ ভরা দিন, সোনার কাঠি বুলিয়ে দশটা বছর বয়েস কমিয়ে দিয়েছে।

আজব শহর লন্ডন। যেমনি লম্বা চওড়া তেমনি পুরোন, কবে এর পত্তন হয়ে ছিল ঐতিহাসিকরা তার খবর জানেন। দেশ-বিদেশের লোক এসে শহরে বাস গেড়েছে, কালো সাদা হলদে কত রকম তাদের রঙ তার চেয়ে আরও রঙীন বেশ ভূষা। সকলের রুচি অনুযায়ী রেস্তরাঁ, চীন ভারত ফরাসী তুর্ক কেউ বাদ যায় না। শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিদেশীদের বাস। বাথারহিলে ডেনরা, স্পিটালফিল্ডে ফরাসী, কারকেনওয়েলে ইটালীয়ান লাইম হাউসে চীনেরা বসতি গেড়েছে কত বছর থেকে। তার ওপর হিটলারের তাড়ায় পালিয়ে এসে জার্মান ইহুদীরা তো হ্যাম্পস্টেডটা দখল

লৌহকপাটের পর,—জীবনের আরেকটি কপাট যাঁর জাদু-করাঘাতে এইমাত্র উন্মুক্ত, জরাসন্ধের সেই সাম্প্রতিকতম রচনার নামই 'পাড়ি' ।। দাম ঃ তিন টাকা
'সবাই কবি নয়, কেউ কেউ কবি'—এই উক্তির পুনরুক্তি করে বলা যায় : সবাই গল্পকার নয়, কেউ কেউ ছোটগল্পের শিল্পী। এবং সুবোধ ঘোষ ছাড়া আর কেউ নন বাঙলা ভাষায় শেষ স্মরণীয় ছোটগল্প ফসিল এবং পরশুরামের কুঠারের গল্পকার। 'চিত্ত চকোর' সেই শিল্পীর প্রতিভার আরেক পরিচয়ে প্রদীপ্ত ।। দাম ঃ তিন টাকা
ধনঞ্জয় বৈরাগী বাঙলা সাহিত্যের তরুণতম এবং জনপ্রিয়তম নাম। 'বিদেশী' তাঁর যে কোনও নাটকের চেয়েও নাটকীয় উপন্যাস; চিন্তা ও চিত্তাকর্ষক ।। ২.৫০
৩৩ কলেজ রো,
কলিকাতা—৯

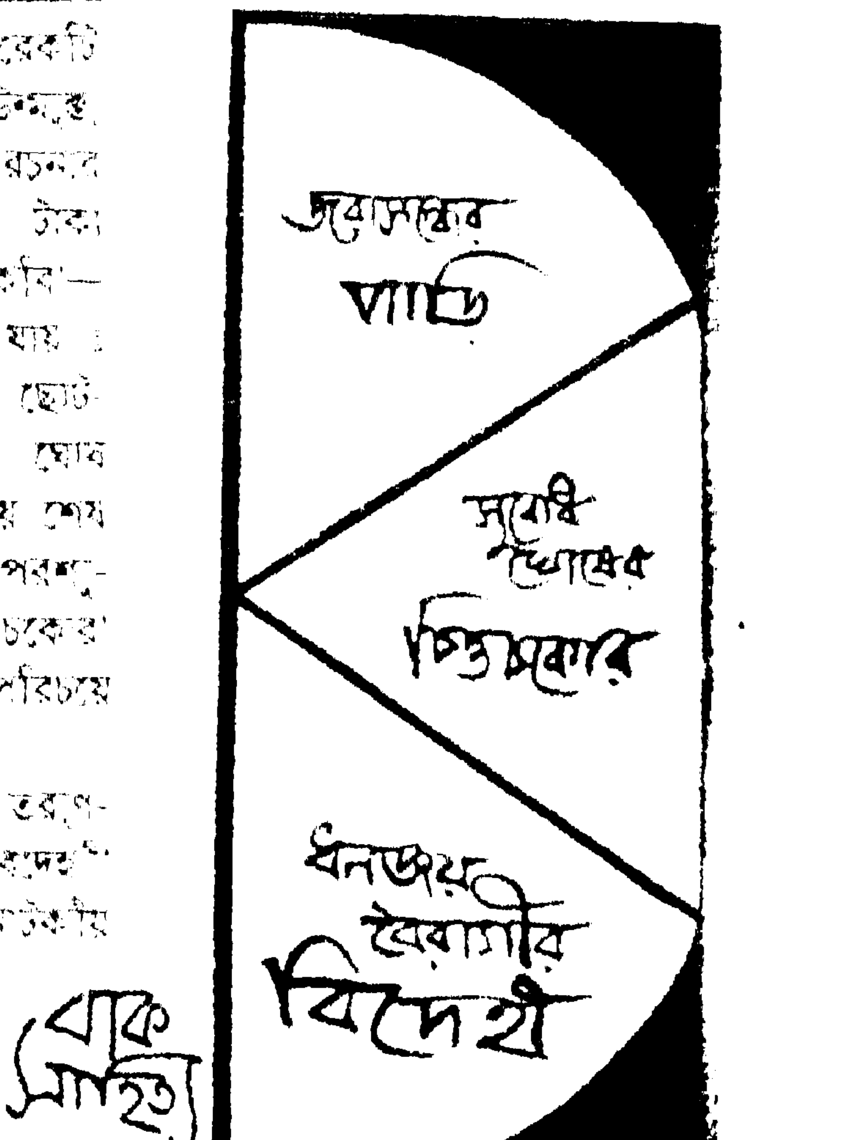

ঘরে বসে গেছে বললেই হয়। ভারতীয়ের সংখ্যাও কম নয়, ইস্ট এন্ডের অশিক্ষিত গরীব খালাসীদের কথা বলছি না, পড়ুয়া ছেলের সংখ্যাও যে অনেক, ছড়িয়ে রয়েছে সমস্ত শহরে। ভারতীয় রেস্তরাঁর সংখ্যা একের পর এক বাড়ছে দেখে সন্দেহ হয় ভারতীয়ের সংখ্যাও সেই অনুপাতে বাড়ছে, না দেশী রান্নার রস পেয়েছে ইংরাজদের স্বাদবিহীন জিভ বা শুধু সেদ্ধ খেতেই অভ্যস্ত।

এমন একটি চমৎকার খটখটে দিন ভারতীয় ছেলেদের মনেও উল্লাস এনে দেয়। তাদের মনে পড়ে দেশের কথা, আত্মীয় স্বজনের কথা, কচুর ঘন্ট আর শাকের চচ্চড়ির কথা, সেই সঙ্গে রকে বসে ইয়ারদের সঙ্গে আড্ডা মারার কথা। আহা কবে আবার তারা দেশে ফিরবে, কবে সকলের সঙ্গে মাটিতে বসে, হাত দিয়ে চটকে ভাত আর মাছের ঝোল খাবে।

প্রত্যেক শনিবারের মত আজকেও দেরি করে উঠে সৌরেন যখন গ্যাসের রিঙে চায়ের জল বসালো তখন প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। অন্য শনিবার দেরি করে উঠলে কোন ক্ষতিই হয় না, কিন্তু আজ পর্দা সরাতেই যেই এক ঝলক গরম রোদ এসে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল, সৌরেনের মন খারাপ না হয়ে পারলো না। এতক্ষণ না ঘুমিয়ে আগে উঠে পড়লে রোদটা সে উপভোগ করতে পারত। এমন দিনে বাড়ি বসে থাকলে পাপ হবে। সৌরেন চা না ভিজিয়েই কয়েকটা পেনী সংগ্রহ করে, ড্রেসিং গাউন গায়ে জড়িয়ে, নীচে নেমে গেল টেলিফোন করতে। নামতে নামতেই দু'একজন বুড়ীর সঙ্গে দেখা, অভ্যাস মত সৌরেন গুড মর্নিং বলে গাল কুঁচকে হাসে।

সৌরেন যাকে চাইছিল সে-ই টেলিফোন ধরল, লীলা চৌধুরী।

—আমি সৌরেন কথা বলছি—কেমন আছ লীলা?

—খবর নেবার জন্যে অনেক ধন্যবাদ। ভালই আছি।

—আজ দিনটা বড় চমৎকার, না?

—খুব সুন্দর রোদ উঠেছে। তুমি কি এই উঠলে নাকি?

—হাঁ, কাল বাড়ি ফিরতে তিনটে বেজে গেল।

—তাই নাকি, কোথায় গিয়েছিলে?

—মীনাক্ষীর ফ্ল্যাটে। খুব জমেছিল। পার্টীয়ের, আমি—

—সরোজদার বাড়ি আজ রিহার্সাল মনে আছে তো?

—সেতো বিকেলের দিকে, নিশ্চয় যাবো। সৌরেন একটু থেমে বলে, 'আমি বলছিলাম আজ সকালটা কি করছ?'

—কেন বলতো?

—কোথাও খেতে গেলে হতো।

—আমি যে আরেক জায়গায় যাবো কথা দিয়েছি।

—তাই নাকি? তাহলে আর কি হবে, সৌরেন হতাশ হয়।

—দেখা তো হবেই রিহার্সালে।

—তা হবে। আচ্ছা লীলা, enjoy your self বাই, বাই।

—বাই, বাই।

লীলা চৌধুরীর গোলগাল মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল সৌরেনের; শ্যামলা রঙের ওপর টকটকে লাল লিপস্টিক মাখা ঠোঁট, ইংরিজী কায়দায় চুল কেটে ডোনাট দিয়ে খোঁপা বাঁধা। এরা সেই জাতের মেয়ে যারা দেশে ছিল পাকা মেম সাহেব, বাড়িতেও ইংরিজীতে কথা বলত আর ক্লাবে যেত বলরুম নাচের আকর্ষণে অথচ বিলেতে এসে এরা দেশী হবার চেষ্টা করে পুরো মাত্রায়। লীলা আর প্রমীলা দুই বোন। প্রমীলা ছোট, তবে দুজনের মধ্যে বয়েসের ব্যবধানটা খুব বেশী নজরে পড়ে না। এদের বাবা মারা গেছেন কিছুদিন হল, ব্যাঙ্কে অনেক টাকা রেখে। দু'জনেই সাবালিকা তাই মা বাধা দেননি লণ্ডনে আসায়। দু'জনেই কাজ করে, বাড়ি থেকে পয়সা পাঠাতে হয় না, তাছাড়া বুঝি কিছু পড়েও, অন্তত বলে তো তাই।

সৌরেনের সঙ্গে লীলার যে কোন বিশেষ সম্পর্ক আছে তা নয় তবে এমন একটি সুন্দর দিনে রেস্তরাঁয় বসে বসে গল্প করতে মন্দ লাগত না। দেশে অবশ্য মেয়েদের সঙ্গে মেশার কোন সুযোগই ছিল না। একমাত্র বৌদির ছোট বোন অহনা মাঝে মাঝে আসত বটে তবে দু' দণ্ড তাকে একলা পাবার সুযোগ ছিল কোথায়? এদেশে এসে সে বুঝেছে সময় কাটাতে হলে মেয়েদের মত সঙ্গী আর কেউ নেই। কোথা দিয়ে যে সময় গলে যায় বুঝতে দেয় না, তার মধ্যে কত রকমের গল্প আর মান অভিমান।

তাছাড়া একথাও সত্যি, লীলাদের জাতের মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করার সুযোগই বা কোথায় দেশে। সাধারণ গেরস্থ ঘরের অতি সাধারণ ছেলে সৌরেন, যার না আছে টাকার জোর না লেখাপড়ার। কোন রকমে একাপিঠের জাহাজ ভাড়া যোগাড় করে দুর্গা বলে পাড়ি দিয়েছিল, লণ্ডনে এসে যদি চাকরি না পেত তাহলে হয়েছিল আর কি।

ভারতের 'পতাকা মার্কা'
তৈল
দেখুন
ফোন ৩৫-২৭৭৪
ভারত অয়েল মিল

শীতের দিনে-ও
ল্যানোলিন-যুক্ত বোরোলীন
আপনার ত্বক-কে সজীব রাখবে

শীতের কনকনে হাওয়ার হাত থেকে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য রক্ষা করতে বোরোলীন-ই হচ্ছে আদর্শ ফেস ক্রীম। ওষধিগুণ-যুক্ত সুরভিত বোরোলীনে ল্যানোলিন আছে বলে শীতের দিনে-ও গাল, হাত ও ঠোঁটফাটার হাত থেকে রক্ষা করে আর রুক্ষতম ত্বকেও লাবণ্য বৃদ্ধি করে। বোরোলীনের যত্নে নিজেকে রূপোজ্জ্বল করুন।

বোরোলীন
পরম প্রসাধন

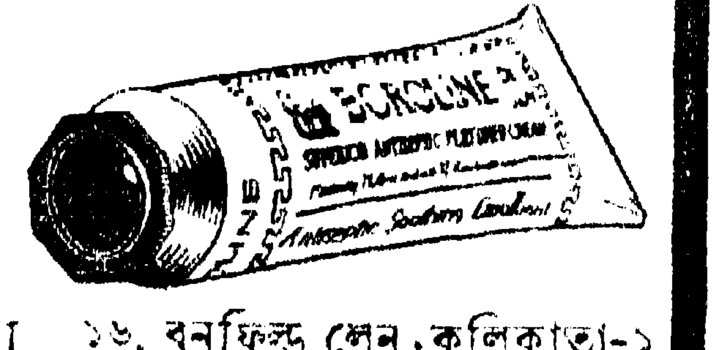

পরিবেশক : জি, দত্ত এণ্ড কো ১৬, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা-১

edarts/59

ইচ্ছে ছিল কিছু একটা পড়ার, transport schoolএ নামও লিখেছিল, তবে এ ক' বছরের মধ্যে একটাও পরীক্ষা দেওয়া হয়নি, আর হবেও বলে মনে হয় না। লেখাপড়ার অভ্যেসটা একবার চলে গেলে আবার তা ফিরিয়ে আনা সহজ ব্যাপার নয়।

লণ্ডনে আসার আগে যার সঙ্গে সৌরেন-এর আলাপ ছিল সে মীনাক্ষী। তারাও বড়লোক, লীলাদের মত না হলেও মীনাক্ষীর মামা নামজাদা উকিল, বালীগঞ্জে প্রকান্ড বাড়ি। তবে এক পুরুষে পয়সা বলে এখনও ব্যবহারে টাকার ঝাঁঝ পাওয়া যায় না। মীনাক্ষীর দাদা সৌরেনের সঙ্গে এক কলেজে পড়াশুনো করেছিল, সেই সুবাদেই যাতায়াত। সৌরেন আজ অনায়াসেই মীনাক্ষীকে নিমন্ত্রণ করতে পারত কিন্তু কাল ওর ফ্ল্যাট থেকে এত রাত্রে সবাই উঠেছে যে এখনও পর্যন্ত মীনাক্ষী হয়ত ঘুম থেকে ওঠেনি।

তাই লীলাকে না পেয়ে সৌরেন ফোন করল রঞ্জত বোসকে।

রঞ্জত বললে, যেতে পারি তবে একটা শর্তে।

—কি শুনি?

—His, his, who's who's. মানে যার যার নিজের খরচায়।

সৌরেন সানন্দে রাজী হল, তাহলে কোথায় আসবি?

—একটার সময় পিকাডেলী, আন্ত-র্জাতীয় ঘড়ির সামনে।

ফোন সেরে সৌরেন যখন ওপরে উঠে এল চায়ের জল ঠান্ডা হয়ে গেছে। আবার গ্যাস জ্বালাতে হবে। নজরে পড়ল টেবিলের ওপর দেশ থেকে আসা কালকের এয়ার লেটারটা পড়ে রয়েছে, টেনে নিয়ে আরেকবার পড়ল। মা লিখেছেন এবার ফিরে যাবার জন্যে।

সৌরেন চিঠি পড়েই নিজের মনে হাসে, দেশে ফিরে যেতে কি তারও ইচ্ছে নেই, কিন্তু ফিরে গিয়ে চাকরি পাবে কোথায়? পেলেও আবার হয়ত সেই প্রথম ধাপ থেকে শুরু করতে হবে, এ ক'বছরের অভিজ্ঞতার কোন দামই সে পাবে না।

যদিও লণ্ডনের বিভিন্ন অঞ্চলের নাম পাওয়া যায় সাহিত্যের পাতায়, তবে যে জায়গাটা নিয়ে সবচেয়ে বেশী মাতামাতি করেছে রোম্যান্টিক লেখকরা সে হলো সোহো। এ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে বিপন্না সুন্দরী যুবতী আর সন্দেহ জাগানো বিদেশীদের যেসব রহস্যজনক কাল্পনিক গল্প লেখা হয়েছে, পড়ে মনে হয় সোহোতে বোধহয় কেউ বাস করে না, শুধু রেস্তরাঁ আর নাইট ক্লাবেরই আস্তানা।

আসলে কিন্তু সোহো লণ্ডনের হৃৎপিণ্ড পিকাডেলী সার্কাসের সঙ্গে লাগোয়া; রিজেন্ট স্ট্রীট, অক্সফোর্ড স্ট্রীট, আর চেরিং ক্রশ রোডের মাঝখানের ছোট্ট জায়গা। লণ্ডনের চারদিকে বিদেশীদের বসতি থাকলেও সোহোতে এসে সকলে যেন স্বচ্ছন্দে ঘুরে ফিরে বেড়ায়, সে ফরাসী, ইটালীয়ান, ভারতীয় যেই হোক না কেন। এখানে সব দেশের রেস্তরাঁ আছে, সেখানে নানা স্বাদের খাবার। কত রকমারি বিদেশী দোকান কত অচেনা ভাষার খবরের কাগজ। এখানে মুদির দোকানে পাওয়া যায় রকমারি রান্নার মশলা, যা বিলিতি কায়দায় প্যাকেটে ভরা নয়, চটের থলির ভেতর থেকে বার করে কাগজে মুড়ে দেয়। এখানে কফির আদর বেশী, হঠাৎ কেউ চা চাইলে অন্যেরা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকায়।

বেশীর ভাগ লণ্ডনবাসীই জানে সরু গলি আর বিচিত্র গন্ধ ভরপুর এই সোহোতে কম পয়সায় পেটভরে ভাল খাবার পাওয়া যায়, যদি অবশ্য ঠিকমত দোকান জানা থাকে। তা না হলে গলা কাটা যাবারও সম্ভাবনা আছে, বাইরে থেকে ভাঙ্গা ছোট্ট

একটি নায়িকার উপাখ্যান

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে আন্তরিকতায় অন্যতম বিশিষ্ট হচ্ছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। তিনি এমনভাবে পাঠক-পাঠিকার মনে প্রবেশ করেন যে, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রে পাঠক-পাঠিকা নিজেদেরই যেন দেখতে পান। তার কারণ, আজকের এই উদ্‌ভ্রান্ত ও ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের যতটুকু তিনি দেখেছেন, বুঝেছেন, তারই উদ্‌ঘাটনে রতী হয়েছেন তিনি তাঁর অপরিসীম ক্ষমতা নিয়ে। এবং সেই দেখার মধ্যে রয়েছে আমাদের অতি পরিচিত পরিবেশ আর চরিত্র। 'একটি নায়িকার উপাখ্যান' তাঁর সেই ক্ষমতার শ্রেষ্ঠ প্রতিফলন। মধ্যবিত্ত পরিবারের কলেজ-ছাত্রী ঝর্ণার কল্পলোক সিনেমায় অবতীর্ণের অতি বিচিত্র কাহিনী। বর্ণাঢ্য প্রচ্ছদ। দাম দু'টাকা মাত্র।

সীমন্ত সরণি

সুবোধ ঘোষ

ভালবাসার যেন একটা স্বতন্ত্র সর্বজয়ী ইচ্ছা আছে, যার উপর ব্যক্তির শাসন চলে না। ভালবাসার জীবনকে অস্বীকার করতে চায়নি এণাক্ষী; কিন্তু যেন নিজেকেই অস্বীকার করতে চেয়েছিল। জীবন আর ঘটনার কোন সত্যের দিকে তাকিয়ে নয়, শুধু নিজেরই ইচ্ছার দিকে তাকিয়ে সে তার প্রেম ও অপ্রেম খুশিমত গড়ে তুলেছিল। কিন্তু দেহ ও মনের যত বিচিত্র ভয় আর সংস্কার নিয়ে শাসন-করা সেই অদ্ভুত ভালবাসার পরীক্ষা এণাক্ষীকে একদিন তার জীবনেরই ভুল ধরিয়ে দিল। যে অনুরাগ নারীর সীমন্ত সরণি সুরঞ্জিত করে, সেই অনুরাগের কাছে আত্মসমর্পণ করে তবেই মুক্তি পেয়েছিল এণাক্ষীর নারীত্বের স্বপন। বিচিত্র ঘটনাবিন্যাস, নিখুঁত চরিত্র সমাবেশ ও অভূতপূর্ব আঙ্গিক, এই নতুন উপন্যাসখানিকে সুন্দরতর করে তুলেছে। দাম ৩·০০

আমাদের অন্যান্য গল্প-উপন্যাস প্রভৃতির জন্য ক্যাটালগ চেয়ে লিখুন:

ক্যালকাটা পাবলিশার্স

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

নতুন বই :
শ্রী বাসব-এর
ছায়া দোলে - ৫·০০
নাজমা বেগম - ৫·০০
নীলকণ্ঠের অদ্বিতীয় উপন্যাস
দ্বিতীয় প্রেম - ৫·০০
নীহার গুপ্তের রহস্য উপন্যাস
ছায়া পথ - ৪·৫০
করুণা প্রকাশনী,
১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিঃ-১২

টীল ব্যাধি ও স্ত্রী রোগ
ঃ বৎসরের অভিজ্ঞ যৌনব্যাধি বিশেষজ্ঞ ঃ এস পি মুখার্জি (রেজিঃ) সমাগত রোগীগকে গোপন ও জটিল রোগাদির রবিবার কাল বাদে প্রাতে ৯—১১টা ও বৈকাল —৮টা ব্যবস্থা দেন ও চিকিৎসা করেন।
শ্যামসুন্দর হোমিও ক্লিনিক (রেজিঃ)
১৪৮, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

★ আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।
★ আকর্ষণীয় হারে ক্যাস সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।
★ স্পেশাল সেভিংস ডিপোজিট একাউণ্টে বার্ষিক ২১% হারে সুদ দেওয়া হয়।
হেড অফিস
৪ ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১

দোকান কিম্বা তার নড়বড়ে চেয়ার টেবিল দেখে বোঝবার যো নেই কি পয়সা নেবে একটা মাংসের ডিশ সার্ভ করতে।

রজত বোসের কাছে কিন্তু সোহো খুবই পরিচিত জায়গা। পিকাডেলী থেকে সোরেনকে সংগ্রহ করে, দু'তিনটে মোড় বেঁকেই সে হাজির হল ছোট্ট একটা কফি বারের সামনে। বেশী লোক ছিল না, কোণের দিকে দু'জন বিদেশী বসে কফি নিয়ে গল্প করছিল। তাদের পাশ দিয়ে রজতরা নেমে গেল নীচে, বেস মেনেট। এ ধরনের জায়গায় সোরেন বড় একটা আসেনি, তাই ভাল করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। পুরোন ইঁটবার করা ঘর তারই সঙ্গে মানানসই জর্জীয়ান আমলের লোহার ফিটিংস, যা থেকে আলো ঝোলান হয়েছে। চেয়ার নেই, তার বদলে পিঠ উঁচু কাঠের বেঞ্চ। দু'জন পাশাপাশি বসবার। টেবিলের পায়াগুলো প্রয়োজনের অতিরিক্ত মোটা হঠাৎ দেখলে মনে হয় সরু তালগাছের গুঁড়ি কেটে বসিয়ে দিয়েছে।

রজত হেসে জিজ্ঞেস করে, কেমন, জায়গাটা ভাল লাগছে না?

সোরেন কি বলবে ভেবে পায় না, অন্যরকম মানে অদ্ভুত মনে হচ্ছে।

—আমার কিন্তু এ জায়গাটা খুব প্রিয়, প্রায় রোজই একবার না একবার ঢুঁ মেরে যাই। আমার কি মনে হয় জানিস সোরেন, এ জায়গাটার একটা আভিজাত্য আছে, যা নেই ওয়েস্ট এণ্ডের আধুনিক ফ্যাশানের রেস্তরাঁগুলোয়। এখানে আমরা অনেক সহজ হতে পারি, ইচ্ছেমত চেঁচিয়ে গল্প করতে পারি, বিলিতী এটিকেটের ধার ধারতে হয় না কাউকে।

একথা রজতের বলা সাজে, কারণ তার পোশাক পরিচ্ছদের মধ্যেও এমন একটা মৌলিকতা আছে যা হয়ত বিলিতী ফ্যাশানের গজকাঠি দিয়ে মাপা যায় না। কিন্তু সোহোর এই রেস্তরাঁয় বোহেমিয়ান আবহাওয়ার সঙ্গে চমৎকার মিলে যায়। রজত সাধারণ মাঝারি আকৃতির বাঙালী, ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি আর মানানসই গোঁফে কিন্তু চেহারাটার অনেকখানি বদলে গেছে। বাদামী রঙের কর্ডের প্যাণ্টের ওপর ঘন নীল হাত লম্বা উঁচু গলার পুলওভার, চুলগুলো উস্কো খুস্কো, তেল পড়েনি অনেকদিন। কালো চুল লাল হয়ে গেছে।

নিখুঁত ভাঁজ করা কলকাতায় বানানো নীল সার্জের স্যুট পরে সোরেনকে রজতের কাছে যেন বড় বেশী কেতা দুরস্ত আর আড়ষ্ট বলে মনে হয়। দর্জি যদিও বই-এর ছবি দেখেই স্যুট বানিয়েছে তবে বইটা বোধহয় বছর দশের আগেকার, যুদ্ধের পরেই ইংলণ্ডে যে ধরনের স্যুটের ফ্যাসান উঠেছিল। এতদিন বাদে তা কলকাতায় আমদানী হয়েছে। চকচকে কালো জুতো, সাদা শক্ত কলার আর নীলের ওপর ঘন নীল স্ট্রাইপ কাটা টাই পরে সাহেব সাজার প্রাণপণ চেষ্টা করলেও সোরেনকে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মতই দেখায়।

রজত আর সোরেন কলকাতার একই কলেজের ছাত্র। রজত হিস্ট্রীতে অনার্স পেয়ে লণ্ডনে চলে এসেছিল পি এইচ ডি করতে। তখন থেকে নাগাড়ে দশ বছর সে এদেশেই আছে যদিও পি এইচ ডির থিসিস্ এখনও দেওয়া হয়নি। সোরেন লণ্ডনে এসে রজতের হদিশ পায়নি বহুদিন; মাত্র মাসখানেক আগে হঠাৎ এক টিউব স্টেশনে ওদের দেখা, তারপর দিন দুই ওরা মিলিত হয়েছে।

রজত পেছনের পকেট থেকে পাইপ বার করে ধরাবার চেষ্টা করে। বলে, সোরেন তুমি স্বচ্ছন্দে সিগারেট খেতে পার, আমার ওটা চলে না।

সোরেন সিগারেট ধরাল, বড় বেশী দাম।

রজত হেসে ওঠে, সেই জন্যেই তো পাইপ ধরেছি, অনেক সস্তায় হয়ে যায়, বিশেষ করে কাউকে অফার করতেও হয় না।

—আশ্চর্য! তুই ঠিক আগের মতই আছিস।

—বদলাবার কোনো কারণ ঘটেনি তো।

—তা নয়, দশ বছর এদেশে রয়েছিস। ভেবেছিলাম হয়ত সাহেব হয়ে গেছিস।

—সাহেব হবার জন্যে তো এদেশে আসিনি, এসেছিলাম পড়াশুনো করতে, করেছি।

—পি এইচ ডির থিসিসটা দিলি না কেন?

—দিয়ে কি হতো?

—আহা দেশে ফিরে কাজে লাগত, অন্তত ত ভাল কলেজে একটা হিস্ট্রীর প্রফেসার হতে পারতিস।

রজত পাইপটা দাঁতে কামড়ে বলে, সেই জন্যেই তো দিইনি।

—মানে?

—গরু চরাবার সাধ নেই।

—তবে মিথ্যে এদেশে এলি কেন?

—মিথ্যে কেন হবে? পড়েছি খুব। শুধু তকমাটা লাগাই নি। সে একরকম ভালই।

কথা চাপা পড়ে গেল। ওয়েট্রেস্ এসেছিল অর্ডার নিতে, রজত তাকে বললে, একটু পরে এস এলিস্, আমরা মারিয়ার জন্যে অপেক্ষা করছি।

মেয়েটা চলে গেল। সোরেন জিজ্ঞেস করে, মারিয়া কে রে, তোর বান্ধবী?

—একরকম তাই।

সোরেন আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসে, কেমন লাগছে এদেশে থাকতে?

—খুব ভাল।

—কোন দিক দিয়ে?

—ইতিহাসে যা পড়েছি তারই পুনরাবৃত্তি দেখছি, ভারী মজা লাগছে।

—কি বলছিস বুঝতে পারলাম না।

রঞ্জত সোজা হয়ে বসে, চোখ দুটো ছোট ছোট করে ঠোঁট ফাক না করেই হাসে, বলে, গ্রীক্ সাম্রাজ্য উঠল, পড়ল। তারপর এল রোমান সাম্রাজ্য, তাদেরও উত্থান পতন দেখলাম। এখন বৃটিশ সাম্রাজ্য, উঠেছিল এখন কালের নিয়মে ক্রমশ ক্ষয়ে যায়, দেখতে ভারী মজা লাগে।

সৌরেন কোন কথা বলে না, রঞ্জতের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—এ কেমন জানিস, জো লুই-এর মত বক্সিং চ্যাম্পিয়ান, বছর কয়েক শ্রেষ্ঠ মল্ল বীর থেকে, যখন হারতে শুরু করে, দর্শক হিসেবে তখন দেখতে যেরকম লাগে আর কি। নতুন এক নাম না জানা বক্সারের ঘুষিতে দাঁড়াতে পারছে না জো লুই, পড়ে পড়ে যাচ্ছে, তবু মনের জোর করে, সম্মানকে আঁকড়ে ধরে থাকার লোভে উঠে দাঁড়াচ্ছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুষি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। হয়ত মুখ ফেটে রক্ত পড়ছে ওঠো, ওঠো, বলে অনেকে উৎসাহ দিচ্ছে করুণা করে কিন্তু সে পারছে না, তার দম ফুরিয়ে গেছে আর যেন শক্তি নেই।

রঞ্জতের প্রত্যেকটা কথা ওজন করা, একটা বিরাট সত্য যা সে বোঝবার চেষ্টা করেছে তাই যেন ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা করছে। এই ধরনের মারাত্মক কথা সে বলে কলেজ জীবনের শুরু থেকে, তবে এতটা জোর দিয়ে নয়। এ জোর সে পেয়েছে এ দেশে এসে, মন দিয়ে পড়াশুনো করে।

পাইপের ছাইটা জুতোর গোড়ালীতে ঠুকতে ঠুকতে রঞ্জত আবার বলে। এখন আর এক রাউণ্ড বাকী আছে। ওয়ার্লড্ চ্যাম্পিয়ান কে হবে তাইতেই বোঝা যাবে। কথার জোর নয়, ঘুষির জোর কার বেশী। আমেরিকার না রাশিয়ার?

সৌরেন এতক্ষণে কথা বলে, তুই কি বলছিস তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগবে?

—লাগলেই হলো, তখনি বোঝা যাবে পৃথিবীটা নীল হবে না লাল?

—তুই বুঝি নীল রক্ত লাল করার দলে?

রঞ্জত হাসে, আমি কোন দলেই নই, ইতিহাসের ছাত্র। ঐতিহাসিক কোন দলে নাম লেখাতে পারে না।

সৌরেন একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, দেশে ফিরবি না?

—ইচ্ছে নেই।

—শেষ পর্যন্ত বিদেশেই মরবি নাকি?

—যদি মরিই ক্ষতি কি?

—তোর কোন ন্যাশনাল ফিলিংস নেই?

—ওটা মনের সংকীর্ণতা।

—তাহলে তোর পরিচয় কি হবে?

—আমি মানুষ।

—ধর্মে বিশ্বাস করিস?

—ধর্ম হল এক ধরনের ব্যবসা। যা করে অনেক পুরুত, অনেক দোকানদার, অনেক প্রকাশক দিব্যি দু'পয়সা রোজগার করছে।

সৌরেন অস্বস্তি বোধ করে, তার মানে ভগবান ও মানিস না?

—মানবার মত কোন যুক্তি পাইনি।

—গীতা পড়েছিস?

—গীতা কেউ পড়ে না।

—কি বলছিস আবোল তাবোল?

রঞ্জত আবার সেই রকম ঠোঁট ফাঁক না করেই হাসে, হিন্দুদের গীতা আর ক্রীশ্চানদের বাইবেল এই দুটো বই বোধহয় ছাপা হয় সবচেয়ে বেশী। কিন্তু মজা কি জানো, পড়ে সব চেয়ে কম লোক। গীতার প্রয়োজন চিতায় পোড়বার জন্যে আর বাইবেলের দরকার কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে 'সত্য ছাড়া মিথ্যা বলব না' হলফ নেবার সময়।

সৌরেনের কেমন সন্দেহ হয় রঞ্জত বোধ হয় শুধু কথা বলার খাতিরেই উল্টো পাল্টা বকছে। মনের থেকে এ সব বিশ্বাস করে না। জিজ্ঞেস করে, তোর রাজনৈতিক মতামতটা এবার শুনি, প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাস করিস ত?

—করি আবার করি না-ও।

—তার মানে।

—প্রজাতন্ত্র নির্ভর করছে প্রজাদের অবস্থার উপর। যে দেশে শতকরা নব্বুই জন নিরক্ষর সেখানে প্রজাতন্ত্র একরকমের রাজনৈতিক প্রহসন।

—তার মানে তুমি চাও ডিক্টেটরসিপ?

রঞ্জত এবার হো হো করে হাসে ডিক্টেটরশিপ্ কে না চায় সৌরেন, ছোটর মধ্যে ভাবো না, তুমি, আমি সবাই তো এক একজন ক্ষুদে ডিক্টেটর, আমাদের দরকার শুধু একপাল নিরীহ শিপ্ (ভেড়া), ব্যাস তাহলেই ডিক্টেটরশিপ চলবে পুরো মাত্রায়।

এবার সৌরেনও হাসে, তোমার কোন কথাটা যে ঠাট্টা আর কোনটা সিরিয়াস তা বোঝা মুশকিল।

মৈত্রেয়ী দেবী রচিত কবিগুরুর পাশ্চাত্ত্যদেশভ্রমণের
অ-পূর্বপ্রকাশিত-তথ্যসমূহে সমৃদ্ধ

বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ

শুধু প্রামাণিক নয়, বাংলা সাহিত্যে গর্ব করবার মতো রচনা। ৭·৫০॥

লেখিকার অবিস্মরণীয় সৃষ্টি
নতুন প্রচ্ছদে নতুন শোভন সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল।

মংপুতে রবীন্দ্রনাথ

সুচারু-সজ্জিত উপহারোপযোগী এই সংস্করণের দাম ৭·৫০॥

॥ একমাত্র পরিবেশক : পত্রিকা সিণ্ডিকেট, ১২/১, লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলি ১৬ ॥

Amico's
GREEN LINIMENT

আপনি নিশ্চয় দৈহিক ব্যথার যন্ত্রণা পাচ্ছেন, কোথায়?
কোমরে, হাঁটুতে কিম্বা কোন সন্ধিস্থানে?
শুনে খুশী হবেন-
শারীরিক, বুক বা পিঠের পাঁজরার
বাতের ইত্যাদি যাবতীয় ব্যথায়
এ্যামিকো গ্রীন লিনীমেণ্ট
(সবুজ মালিশ)
বাস্তবিকই নির্ভরযোগ্য।
মূল্য বড় শিশি ২'৭৫ নঃ পঃ
ছোট শিশি ১'৭৫ নঃ পঃ
"মাশুল" স্বতন্ত্র
ব্যবস্থাপত্রের জন্য লিখুন—
আমিন এণ্ড ইসমাইল প্রাইভেট লিঃ
৮০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

কথা হয়ত চলত—এমন সময় সিঁড়ি দিয়ে একরকম লাফাতে লাফাতে মারিয়া নেমে আসে। রজত পরিচয় করিয়ে দিতেই সে হাত জোড় করে ভারতীয় কায়দায় ক্ষমা চায়, আজ আমাকে মাপ করতে হবে মিঃ লাহিড়ি। আমি আপনাদের সঙ্গে টেবিলে যোগ দিতে পারব না।

সৌরেনের আগে রজতই কথা বলে, কেন, হঠাৎ আবার কি হলো।

—মিঃ গ্র্যানথাম-এর সঙ্গে খেতে যেতে হবে।

—বা, বা, আমরা যে তোমার জন্যে এতক্ষণ না খেয়ে বসে আছি।

—আমি অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু কি করব রজত বুঝতেই তো পারছ, মিঃ গ্র্যানথাম আমাদের মালিক উনি নিজে খেতে বললেন—

রজত গজরাতে থাকে, বুড়োর কিন্তু এ ভারী অন্যায়, আগে থেকে তার বলা উচিত ছিল।

মারিয়া নরম চোখে রজতের দিকে তাকায়, প্লীজ্ রজত তুমি বোঝাবার চেষ্টা কর, এত আমার পক্ষে একটা চান্স, উনি ইচ্ছে করলেই আমাকে পারমানেন্ট করে নিতে পারেন।

রজত কিন্তু তখনও বুঝতে চায় না, সৌরেনের কাছ থেকে দু'মিনিট সময় চেয়ে নিয়ে মারিয়ার সঙ্গে সমানে বকর বকর করে।

সৌরেন মারিয়াকে ভাল করে লক্ষ্য করে, ওরও সাজ পোশাকটা রজতের মতই অদ্ভুত। ব্লু জিনের প্যান্ট পরেছে, পায়ের তলার দিকটা সরু, অনেকটা মোগল আমলের সেপাই সাজতে যে ধরনের পাজামা পাঠায় পেশাদার ড্রেসাররা। গায়ে একটা ঢিলে কোট, বুকের কাছে দড়ি দিয়ে বাঁধা, কাঁধের সঙ্গে লাগানো হুড ঝুলছে, দরকার হলে বৃষ্টির সময় মাথায় দিতে পারে। চুলটা বেশ ভাল, ঘাড় পর্যন্ত ঢেউ খেলানো। আজকালকার ফ্যাশান অনুযায়ী, পুরুষদের মত ছোট ছোট করে ছাঁটা নয়। অনেকটা চৌকো ধরনের মুখ, তবে ভাষা ভাষা নীল চোখ দুটো সুন্দর।

হাসলে পরে গালের সঙ্গে চোখ দুটোও তার হাসে।

নিজেদের মধ্যে কথা শেষ করে, সৌরেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মারিয়া ওপরে উঠে যাচ্ছিল, রজত জিজ্ঞেস করলে, কখন ফিরবে ?

মারিয়া উঠতে উঠতেই বলে, আশা করছি সন্ধ্যার আগে।

—অন্তত রাত্রে ফিরবে তো ?

মারিয়ার চোখে মুখে দুষ্টুমী খেলা করে, বুড়ো ছাড়ে তবে তো।

রজত ঘুঁষি পাকিয়ে দেখায়।

মারিয়া চলে গেলে রজত খাবার অর্ডার দিয়ে এসে বসে। বলে, দুপুরটা যখন ফাঁকা পাওয়া গেছে, চল কোন ছবিতে যাওয়া যাক।

সৌরেনের মনে পড়ে যায় চিত্রাঙ্গদার কথা। বলে, আমাকে যে সরোজদার বাড়ি যেতে হবে, রিহার্সাল আছে।

—তুই কি করবি ?

—গান।

রজত আবার এক চোট হাসে, তুইও তাহলে ঐ দলে ঢুকেছিস।

—কোন দলে ?

—আমি সরোজ অ্যাণ্ড কম্পানীর নাম দিয়েছি পারস্পরিক পিঠ চুলকানো সমিতি। অর্থাৎ

—তার মানে ?

—খুব সোজা, সরোজ গান করলেই অন্যরা বাহবা দেয়, জয় নাবলে সরোজরা পিঠ চাপড়ায়, একজন আরেকজনের পিঠ চুলকোচ্ছে আর কি। লীলা, প্রমীলা, অপূর্ব, হিতেন সব ঐ দলে।

—তুই তাহলে সবাইকেই চিনিস ?

রজতের চোখ দুটো হাসে, চিনি বইকি, সব মক্কেলকে চিনি। ওদের দলে যত কটা ছুঁড়ী আছে সব লণ্ডনে এসেছে বিয়ে করার জন্যে, সুযোগ পেলেই ছিপ ফেলে বসে থাকে, যদি কোন দেশী ছেলেকে গাঁথতে পারে। কিন্তু ছোঁড়াগুলোর উল্টো মতি, দেশী মেয়েতে মন ওঠে না, তারা ঘুরছে মেমসাহেবদের পেছনে। এ ভারী মজার ব্যাপার, আমি বসে বসে সার্কাসের ঘোড়-দৌড় দেখি। কথার স্রোত এতদূরে এসে অন্য দিকে মোড় ফিরলেই বোধহয় সৌরেন খুশী হত কিন্তু খেতে খেতে রজত যখনই জিজ্ঞেস করলে, তোর মীনাক্ষী তো এখানেই, খবর কি ?

সৌরেন মনে মনে প্রমাদ গণল, দেখা হয় মাঝে মাঝে।

—সে কি রে, দেশে থাকতে তো তুই অনেক দূরে এগিয়েছিলি।

সৌরেন সহজ হবার চেষ্টা করে, ওসব ছেলেমানুষির কথা ছেড়ে দে। মীনাক্ষী আজকাল মন দিয়ে ছবি আঁকছে।

—দূর দূর ছবি এঁকে কি হবে। এবার জীবনটাকে দেখতে বল।

—তুই যা ভাবছিস তা নয় রে, বলব একদিন যদি অবশ্য শোনার ইচ্ছে থাকে।

রজত উৎসাহ প্রকাশ করে, নিশ্চয় শুনব, তোদের কথা শুনতে আমার ভারী ভাল লাগে। আধফোটা প্রেম, আধ আধ কথা, চোখের জল, মান অভিমান। দেহ পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই বিয়ে, না হয় আত্মহত্যা। এ ভারী রোমান্টিক ব্যাপার।

রজত হাসতে থাকে, সেই ঠোঁট-না-ফাঁক করা ছোট ছোট চোখের বিদ্রূপ মাখা হাসি।

(ক্রমশ)

শান্তিনিকেতনের বাঘ শিকার

আরণ্যক

শান্তিনিকেতন এখন বিশ্ববিখ্যাত বিদ্যাপীঠ, রবীন্দ্রনাথের হাতে গড়া পুরোন ছোট আশ্রম-বিদ্যালয়ের রাজসংস্করণ। এর আশেপাশে বাঘ শিকারের রোমাঞ্চকর কাহিনী বর্তমান যুগের শান্তিনিকেতনীদের কাছে হয়ত বেখাপ্পা মনে হবে। কিন্তু বছর বিয়াল্লিশ আগে বিজলীবাতিহীন শান্তিনিকেতন আশ্রমের খড়ো ঘরের বাসিন্দা একদল স্কুলের ছাত্র ঠেঙিয়ে এক প্রকাণ্ড চিতাবাঘ মেরেছিল সত্যিই। সে সময় এই ঘটনা নিয়ে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল আমার মনে আছে। এবং এখন শুনতে একটু কৌতূহলজনক লাগবে যে এই কৃতিত্বের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে কিছু বাদানুবাদও হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন বাংলা দেশে বহুকাল ধরে জনপ্রিয় হতে পারেনি। বিপক্ষদলের অনেকের চোখে ধারাবাহিকতার ছন্দ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের নতুন শিক্ষাপদ্ধতির অমিত্রাক্ষর ছন্দ মোটেই ভাল ঠেকেনি। এর মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যা শান্তিনিকেতনকে ন্যাকামির কেন্দ্রও মনে করতেন। আগামী শতবার্ষিকীর দোহাই পেড়ে ঈষৎ শ্রুতিকটু কিছু বললে আশা করি পাঠকরা প্রসাদগুণে লেখককে ক্ষমা করবেন—ওই আশ্রমিক চালচলন রবীন্দ্রনাথের কোন কোন আত্মীয়দেরও বিদ্রূপের বিষয় ছিল। ধান ভানতে শিবের গীত হতে চলল। যাক, বিপক্ষদলের মতে বাঘমারার ব্যাপারটা অতিরঞ্জিত একটা হুজুগ মাত্র। যারা বড় বড় উস্কোখুস্কো চুল রাখে, ঘাটে মাঠে খালি পায়ে গান গেয়ে বেড়ায়, তারা ঠেঙিয়ে বাঘ মেরেছে! ঠিক কোন দলেরই না হয়ে আমার মতও এই ধরনের রূপ নিয়েছিল সেই সময়। তার কারণ বেজায় হিংসা বোধ করেছিলাম। আমার সমবয়সীরা একটা বাঘ মেরে ফেলল হাতেনাতে, আর আমি কলকাতায় বসে বসে চিড়িয়াখানার খাঁচা আর বন্দুকের ক্যাটালগ সম্বল করে দিন কাটাব এ কখন হতে পারে? ও বাঘ বাঘই নয়।

কিন্তু বাঘটা সত্যিই বাঘ ছিল, তবে ঈশ্বরের কৃপায় ডোরাদার বড় বাঘ নয়, প্রমাণ মাপের চিতা বাঘ। এই বিচিত্র শিকার-পর্বের বিস্তারিত কাহিনী শুনেছি অনেক বছর পরে, আমার জনৈক বন্ধু ও শিকারী শ্রীবিজয় বাসুর কাছে। বাসু সেই বিয়াল্লিশ বছর আগের শিকারে একজন পাণ্ডা ছিলেন। তিনি এর বিস্তারিত বিবরণ যা দিয়েছেন তা রীতিমত মনোরম ও উত্তেজনাপূর্ণ। সমতুল্য কোন ঘটনা, অর্থাৎ স্কুলের বালকছাত্রদের হাতে লাঠিপেটা খেয়ে বাঘের মরণ, আর কোথাও ঘটেছে বলে আমি শুনিনি। বাসুর জবানীতেই কাহিনীটা বলা যাক।

—"১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল অবধি আমি শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলাম। আমার স্কুলের পড়া শেষ হওয়ার ঠিক আগে, ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে, একদিন সকালে শান্তিনিকেতনের ছোট্ট হাসপাতালে একটি রোগী এল, তাকে বাঘে ঘায়েল করেছে খুব। লোকটাকে আনা হয়েছিল শান্তিনিকেতনের কাছেই তালতলী বলে একটা গ্রাম আছে সেখান থেকে। বেচারী ভোর বেলা অন্যদের সঙ্গে মাঠে গরু চরাতে নিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় একটা চিতাবাঘ পাশের ঝোপ থেকে লাফ দিয়ে তার পালের একটা গরুকে ধরে। এ তখন দৌড়ে এসে বাঘটাকে তাড়াবার চেষ্টা করে। অমনি সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা গরু ছেড়ে তাকে আক্রমণ করে। লোকটার হাতে ছিল মাত্র একটা লাঠি, তাই আশ্রয় করে সে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও বাঘটা আঁচড়ে কামড়ে তাকে খুব জখম করে। তার চিৎকারে আর সকলে হৈ হৈ করে এসে পড়ায় বাঘটা তাকে ছেড়ে পালিয়ে যায়।

বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন জখমী লোক হাসপাতালে এসে হাজির হল। ওদের কাছ থেকে জানা গেল যে ওরা এবং পাশের কয়েকটি গ্রামের লোকরা দল বেঁধে তীর ধনুক, বর্শা, লাঠিসোঁটা যে যেরকম হাতিয়ার পেয়েছে তাই নিয়ে বাঘটাকে মারবার চেষ্টা করেছিল। বাঘের গায়ে গোটা কয়েক তীর লাগে, তাতে সে ভীষণ ক্ষেপে ওঠে। ওরা নাকি কাছ থেকে বর্শা দিয়ে আক্রমণ করার কোন সুযোগ পায়নি। খুব সম্ভব অত কাছে ঘেঁষেইনি। ওরা বলল, তালতলীর জমিদার বাবুর একটা বন্দুক আছে বটে, কিন্তু গুলী নাই। আমাদের খুব অনুরোধ করতে লাগল

বিনামূল্যে
উপহার ১৯৬১ সালের সুন্দর ক্যালেণ্ডার প্রতি

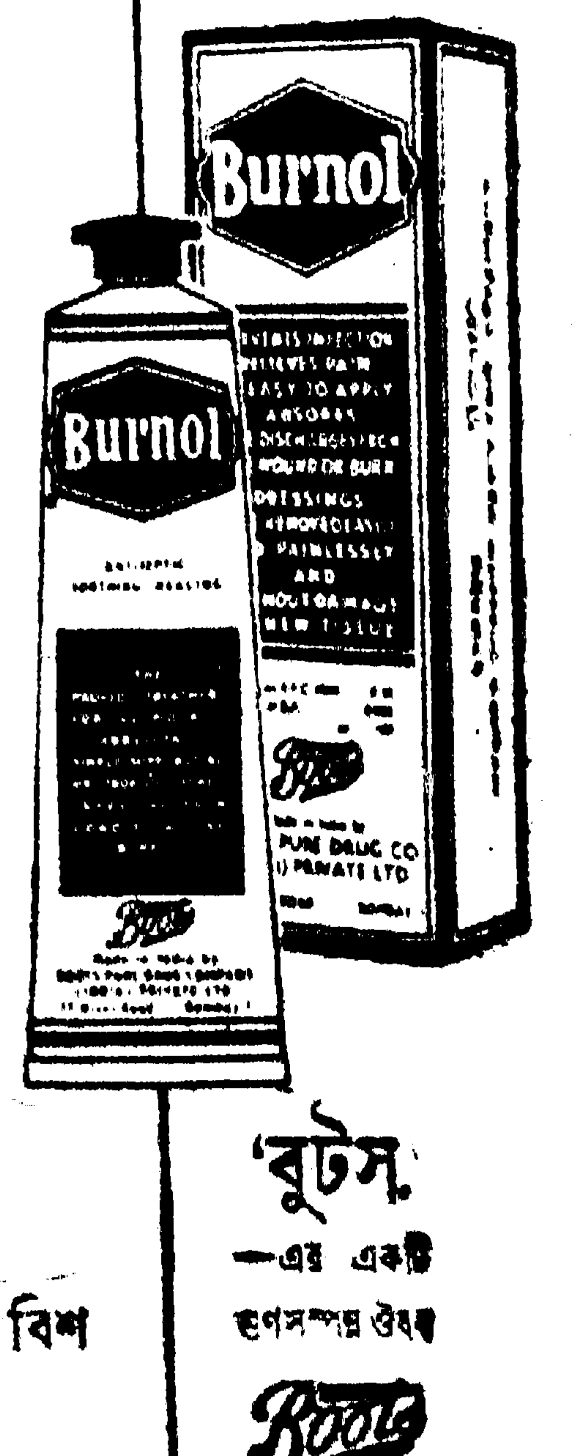

বার্নল
টিউবের সহিত
বার্নল কিনুন—কাটা, পোড়া, কীটদংশন, ক্ষত ইত্যাদি জন্য
আদর্শ এ্যান্টিসেপটিক মলমরূপে বিখ্যাত বিশ বছরের উপর।
'বুটস্'—এর একটি গুণসম্পন্ন ঔষধ
Boots
NATIONAL BB.17

...ন, আপনারা বাঘটা মেরে দেবেন।' ...রকম অনুরোধ করা ওদের পক্ষে যথেষ্ট ...াভাবিক, কারণ আগে বরাবর বন্যা, মহা- ...রী, আগুন লাগা ইত্যাদি সবরকম বিপদ ...পদে ওদের সাহায্য করতে আমরা এগিয়ে ...য়েছি। অবশ্য বর্তমান ঘটনার মত উদ্ভট ...ন্ড আমরা আর কখনও শুনিনি।

এদিকে এই দুঃসংবাদ আমাদের অধ্যক্ষ মহাশয়ের কানে পৌঁছানমাত্র তিনি আদেশ জারী করলেন কোন ছাত্র যেন শান্তি-নিকেতনের চৌহদ্দির বাইরে না যায়। এরকম হুকুমের সঙ্গত একটু কারণও ছিল। আমরা কয়েকটি ছাত্র মিলে একটা ডানপিটে দল তৈরী করেছিলাম। এর প্রধান ছিলাম আমি। আর নানা দুরন্তপনার জন্য আমাদের রীতিমত বদনাম ছিল। অধ্যক্ষ মহাশয় আমাদের ডেকে বিলক্ষণ শাসিয়ে দিলেন যাতে আমরা তাঁর হুকুম অমান্য না করি। কিন্তু আমরা ডানপিটেরা পরামর্শ করে ঠিক করলাম হুকুম যাই থাক, তালতলা গিয়ে বাঘটা মারার চেষ্টা করতেই হবে। দলের সকলেরই সেটা শান্তিনিকেতন স্কুলে শেষ বছর। মানে ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী সকলেই। আমি দলের মধ্যে সবচেয়ে ছোট, আমার বয়স তখন চোদ্দ। সবচেয়ে যে বড় তার বয়স সতেরো। চিড়িয়াখানার বাইরে কেউই বাঘ তো দূরের কথা, চিতাবাঘও দেখিনি। আমাদের মধ্যে দুজন বন্দুক ছুঁড়তে জানত —নরভূপ আর শনি। নরভূপ নেপালে তার বাবার সঙ্গে পাখি, হরিণ ইত্যাদি ছোটখাট শিকারে যেত; আর শনির দাদা পরলোকগত সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, আমাদের একজন মাস্টার মহাশয়, তাঁর একটা বন্দুক ছিল। শনি সেই বন্দুক দিয়ে দুই একবার রাস্তার কুকুর ও শেয়াল মেরেছে। আমরা শনিকে বললাম বন্দুকটা চুরি করে আনতে। কিন্তু দেখা গেল সেটা আলমারিতে বন্ধ হয়েছে এবং চাবিটা তার দাদার পকেটে উঠেছে। শেষে অনেক চেষ্টায় শনি এক বাক্স গুলীভরা টোটা বাড়ি থেকে 'না বলিয়া' নিয়ে এল।

আমরা মতলব করেছিলাম তালতলীতে পৌঁছে ওখানকার জমিদারের বন্দুকটা চেয়ে নেব। নরভূপের একটা ভোজালি ছিল, সেটা ও কতগুলো খুব শক্ত বাঁশের লাঠি নেওয়া হল। সবশুদ্ধ আমরা ছিলাম সাতজন। একত্রে এই মার্কামারা সাত মূর্তি বার হতে গেলেই যে ধরা পড়ব সে বিষয়ে একটুও সন্দেহ ছিল না। অতএব ব্যবস্থা হল এক-জন একজন করে আশ্রম থেকে বেরিয়ে মাইল খানেক দূরে রাস্তার এক জায়গায় সকলে একত্র হব। দুপুরে বেলা খাওয়ার পর এই-ভাবে খানিক বাদে বাদে সব সরে পড়লাম। তালতলীর জমিদারবাড়ি যখন পৌঁছলাম তখন বেলা তিনটে। দেখলাম গ্রামের সব লোক সেখানে জটলা করছে। তারা উৎসুক হয়ে আমাদের আসার প্রতীক্ষা করছিল। বলল চিতাবাঘটা অল্পদূরে একটা পুকুরের ধারে আমবাগানে ঢুকেছে। সেখানে কয়েক-জন লোক তাকে নজরবন্দী করে রেখেছে। জমিদারবাবু তাঁর বন্দুকটা বার করে দিলেন। দেখলাম ১২ বোর্-এর ঘোড়াওয়ালা বন্দুক; বেশ পুরোন এবং নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে, সর্বাঙ্গে মরচে ধরা। আমরা কিন্তু খুব আশ্বস্ত হলাম যখন পরীক্ষা করে দেখা গেল যে আমাদের টোটাগুলো ওই বন্দুকের মাপ-সই হয়েছে। দুজন লোক তারপরে বাঘের আস্তানা দেখাতে আমাদের নিয়ে চলল। সেখানে যারা পাহারা দিচ্ছিল তারা পুকুরের অপর পারে একটা গাছপালাভর্তি জংলা গোছের জায়গা দেখিয়ে বলল ঘণ্টাখানেক

আগে বাঘটা ওইখানে ঢুকেছে, বরং যতদূর বোঝা যায় ওইখানেই আছে। আমরা যুক্তি করলাম নরভূপ বন্দুকটা চালাবে, আমি টোটার বাক্স নিয়ে তার বাঁ দিকে থাকব, সঙ্গীরা আমাদের দু'পাশে থাকবে। নরভূপ বন্দুকে গুলী ভরল। তারপর আমরা পাশাপাশি সার বেঁধে পুকুরের অপর দিকে এগোলাম। ব্যাপারটা যে কি বিষম বিপজ্জনক তার একটুও ধারণা আমাদের তখন ছিল না। রাখালরা গরু হারালে যেমন করে গরু খুঁজে বেড়ায়, আমরা প্রায় সেইভাবেই বাঘ খুঁজতে চললাম।

একটু খোঁজাখুঁজির পরই দেখি বাঘটা একটা ছোট গাছের নীচে ছায়ায় শুয়ে রয়েছে। দু'টো তীরের ভাঙা ফলা তার পিছন দিকে বিঁধে আছে তাও দেখলাম। আমাদের দেখে বাঘটা বিকট মুখভঙ্গী করে গর্জে উঠল, কিন্তু আক্রমণ করল না। আমরা তার পনের ফুটের মধ্যে আন্দাজ এগিয়ে অর্ধবৃত্তাকারে তাকে ঘেরাও করলাম। আগে থেকে যেমন ঠিক ছিল সেই অনুসারে নরভূপ মাঝখানে, তার বাঁ দিকে আমি, অন্যরা দুই পাশে। নরভূপ বাঘটার মাথা লক্ষ্য করে বন্দুকের ঘোড়া টিপল, কিন্তু গুলী ফুটবার শব্দ না হয়ে শুধু কট্ করে ঘোড়াটা পড়ার আওয়াজ হল। অন্য ঘোড়াটা টিপল, ফের শুধু ওই কট্। তখন তাড়াতাড়ি আর দুটো টোটা আমি নরভূপকে এগিয়ে দিলাম, এবারেও ওই কট্কট্ আওয়াজ। আবার টোটা পুরে নরভূপ গুলী করল, একটা নল থেকে দুম্ করে গুলীর আওয়াজ শুনলাম। অমনি প্রচন্ড এক হাঁক দিয়ে বাঘটা আমাদের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। লাইনের একদিকে ছিল দ্বিজেন, সে লাঠি দিয়ে কষে এক ঘা মারল, কিন্তু না থেমেই তার পায়ে একটা থাবা মেরে বাঘটা নরভূপের উপর তেড়ে এল। তখন নরভূপর বন্দুকের নল প্রায় তার বুকে ঠেকিয়ে অন্য ঘোড়া টিপল: আবার সেই উৎকট কট্। বাঘটা পিছনের দুই পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে নরভূপের ডান কাঁধের উপর ঝুঁকে পড়তেই আর সকলে লাঠি দিয়ে তাকে প্রাণপণে পিটতে লাগল। বাঘটা নরভূপকে ছেড়ে দৌড়ে আমাদের পিছন দিকে একটা ঝোপে গিয়ে ঢুকল। তখন ওই ঝোপটাকে ঘিরে আগের মত আমরা এগিয়ে গেলাম। এবারেও আমি নরভূপের বাঁ পাশে। নরভূপ ফের গুলী চালাবার চেষ্টা করছে। বার দুই বিফল চেষ্টার পর একটা টোটা ফুটল। বাঘটা তখনই আবার নরভূপকে আক্রমণ করল। বাঘটা লাফিয়ে আসার সময় তার গায়ের ধাক্কা খেয়ে পুকুরের ঢালু পাড়ে আমার পা পিছলে গিয়েছিল। আমরা এবং গ্রামের যত লোক এই সৃষ্টিছাড়া শিকার দেখতে জড়ো হয়েছিল, সব একসঙ্গে গলা মিলিয়ে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে "মারো, মারো"। বাঘটা এবারেও সেই রকম দাঁড়িয়ে উঠে নরভূপকে কাঁধে আর বুকে জখম করল। নরভূপ বন্দুকের দ্বিতীয় নলটা ব্যবহার করবার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু পেরে উঠল না। সে বন্দুক দিয়ে বাঘটাকে ঠেঙাতে শুরু করল। নড়বড়ে প্রাচীন বন্দুকটা ভেঙে গেল শেষে। আর সবাই সজোরে লাঠির বাড়ি মারছে, নয়তো লাঠি দিয়ে বাঘটাকে ঠেলে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে। এই ধস্তাধস্তির মধ্যে নরভূপ পড়ে গেল, সৌভাগ্যক্রমে বাঘটাও পুকুরের ঢালু পাড়ে নীচের দিকে গড়িয়ে পড়ল। শবির হাতে ছিল নরভূপের ভোজালিটা, সে লাফ দিয়ে পড়ে বাঘের গলায় কোপ মারতে লাগল। ওদিকে আর সকলেও বাঘটাকে সঙ্গে সঙ্গে খুব ঠেঙাচ্ছে। শবির ভোজালির কোপানিতে বাঘের মাথা ধড় থেকে প্রায় আলাদা হয়ে গেছে। এই সময় পুকুরের অপর পারে স্থানীয় যারা এতক্ষণ দর্শকমাত্র ছিল, তারা দৌড়ে এসে যে যা পেল তাই দিয়ে পাগলের মত মরা বাঘটাকে পিটতে লাগল আর চিৎকার করে গালিগালাজ দিতে লাগল তার আত্মার উদ্দেশে। তাদের জোর করে বাধা দিয়ে থামাতে হল, না হলে বাঘের আর কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যেত না।

নরভূপ যেখানে পড়েছিল সেইখানে উঠে বসে আছে; একেবারে চুপচাপ, কেমন যেন

হোমিওপ্যাথিক

পারিবারিক চিকিৎসা

একমাত্র বঙ্গভাষায় মুদ্রণ সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার

উপক্রমণিকা অংশে "হোমিওপ্যাথির মূলতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক মতবাদ" এবং "হোমিওপ্যাথিক মতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি" প্রভৃতি বহু গবেষণাপূর্ণ তথ্য আলোচিত হইয়াছে। চিকিৎসা প্রকরণে যাবতীয় রোগের ইতিহাস, কারণতত্ত্ব, রোগনিরূপণ, ঔষধ নির্বাচন এবং চিকিৎসাপদ্ধতি সহজ ও সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। পরিশিষ্ট অংশে ভেষজ সম্বন্ধ তথ্য, ভেষজ-লক্ষণ-সংগ্রহ রেপার্টরী, খাদ্যের উপাদান ও খাদ্যপ্রাণ, জীবাণুতত্ত্ব ও জীবাণুর রহস্য এবং মল-মূত্র-থুথু পরীক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বিংশ সংস্করণ। মূল্য—৮.৫০ নঃ পঃ মাত্র।

এম, ভট্টাচার্য এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

ইকর্নমিক ফার্মেসী, ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১

সিকিম র‍্যাফল

গ্যারান্টিযুক্ত নগদ পুরস্কার
বৃহত্তম প্রথম পুরস্কার ১,০০,০০০, টাকা — অবশ্যই লাভ করতে হবে,
সেই সঙ্গে আরও পুরস্কার।

গত খেলা হয়েছে ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬০ তারিখে

প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন—শ্রীমতী পদ্মাবতী দেবী,
গ্রাম, এন, পাটনা, পো: অ: রাজপাড়া,
ভায়া কেন্দ্রাপাড়া, জেলা কটক (উড়িষ্যা)

দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন—এস. সেবা সিং,
পিপারিয়া, ভুরাভিরা (খেরী), ইউ. পি.

তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন—শ্রীরঘু ছুটে,
কর্ণাক বন্দর, বার্ষীদ বাজার,
স্টীমার ৬৫৫৪, বোম্বাই।

পুরস্কারের টাকা ইতঃপূর্বেই স্টেট ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হয়েছে এবং ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ জামীন। সিকিম সরকার পুরস্কারের টাকার জন্য দায়ী।

কে জানে আপনি আগামী পুরস্কার পাবেন না।

"টিকিটের মূল্য প্রতিটি ১, টাকা"

১৩টি টিকিটের একটি বই ১২, টাকা মাত্র

সকলের উপযোগী সর্বাধিক সস্তা।।

টিকিট বিক্রয় বন্ধ — ৭-১২-১৯৬০ খেলার তারিখ — ৩১-১২-১৯৬০

টিকিট ও ফরমের জন্য আবেদন করুন : দি অনরারী সেক্রেটারী

এইচ. আর চ্যারিটিজ ফন্ড, গ্যাংটক (সিকিম)

[ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৪-এ ধারা অনুসারে ২-৪-১৯৫৯ তারিখে সিকিম সরকার কর্তৃক অনুমোদিত (৯১—জি এস/৯/৫৯)]

ধরা ভাব। প্রচুর রক্ত পড়ায় ও জখমের ...ায় ও ওইরকম হয়ে গিয়েছিল। তা'ছাড়া হাতাহাতি বাঘের সঙ্গে লড়াই করবার ...াবহ অভিজ্ঞতা তার মনের উপরও অবশ্যই ...কটা চোট দিয়েছিল। তাকে ধরাধরি করে আমরা জমিদারবাড়ি নিয়ে গেলাম। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হল। বাঘের দাঁতের কোন দাগ ছিল না, বুকে আর কাঁধে শুধু নখের গভীর ক্ষত হয়েছে দেখা গেল। দ্বিজেন অল্পের উপর দিয়ে ছাড়া পেয়েছে, তার বাঁ পায়ে মাত্র একটা নখের ক্ষত দেখলাম। তারও যেটুকু শুশ্রূষা দরকার তা করা হল। জমিদারবাবু আমাদের জন্য খুব পুরু করে পোয়াল বিছানো একটা গরুর গাড়ি দিলেন। তাতে নরভূপকে ও মরা বাঘটাকে উঠিয়ে আমরা শান্তিনিকেতন রওনা হলাম। পথে যত বসতি ছিল, সেখান থেকে দলে দলে লোক আমাদের সাথী হয়ে শোভাযাত্রার শ্রীবৃদ্ধি করতে লাগল। শান্তিনিকেতন হাসপাতালে যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন আমাদের লোকবল অত্যন্ত স্পষ্ট। শান্তি-

সিল্কের রূপকথা

কিম্বদন্তী যে ৫০০০ বছরেরও পূর্বে সি লিঙ-সি নামে চীন দেশের এক মহারানী এই মনোহর সূতো আবিষ্কার করেছিলেন আর তাঁর নাম থেকেই সিল্ক কথার উৎপত্তি। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই সিল্ক তৈরীর ব্যাপারটি রহস্য হয়ে চীন দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু দূর দেশ দেশান্তরে এর ছিল রপ্তানী। আর এর মনোহর সৌন্দর্য্যতার জন্য রাজা মহারাজাদের অত্যন্ত প্রিয় বস্ত্র হয়ে উঠেছিল।

শিল্পবিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির সাথে সাথে এই সিল্ক এবং এর নবতম সংস্করণ, রেয়ন—এখন সকলেরই সামর্থের মধ্যে। আমাদের মিলে কয়েক শতাধিক তাঁত দিবারাত্র গজের পর গজ এই সিল্কের কাপড় বুনে চলেছে··· দেশের ও দশের সেবায় রোহিতের আর একটি দৃষ্টান্ত :

বিপিন সিল্ক মিলস্ কোং প্রাইভেট লিমিটেড

বোম্বে

একটি রোহিত গ্রুপের উদ্যোগ

নিকেতনে ইতিমধ্যে তালতলীর সব খবর পৌঁছে গেছে। আশ্রমের সকলে হাসপাতালে এসে আমাদের অপেক্ষায় মোতায়েন হয়েছেন। তাঁদের পুরোভাগে স্বয়ং গুরুদেব ও আমাদের অধ্যক্ষ মহাশয় আছেন দেখলাম। নরভূপ ও দ্বিজেনের তখনই উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হল। তারপরে অধ্যক্ষ মহাশয় আমাদের ধরে প্রচণ্ড ধমকানি আরম্ভ করলেন। বুঝিয়ে দিলেন আমাদের কপালে পরে আরও কড়া শাস্তি আছে। কিন্তু কপাল ভালই ছিল, রবীন্দ্রনাথ ও আরও কেউ কেউ আমাদের স্বপক্ষে ওকালতি করতে লাগলেন। ও'রা বললেন যে, নিতান্ত মারাত্মক কোন দুর্ঘটনা যখন ঘটেনি, এবং ছেলেরা যখন গ্রামের লোকদের একটা উপদ্রবের হাত থেকে উদ্ধার করেছে, তখন আর শাস্তি নাই বা দেওয়া হল। ও'দের বলা কওয়ার ফলে কেবল বকুনি খেয়েই আমরা পার পেলাম। চিতাবাঘটা সাত ফুটেরও উপর লম্বা ছিল, তবে একেবারে ঠিক মাপটা এতদিন পরে মনে করতে পারছি না। তার দাঁতগুলো ক্ষয়ে গিয়েছিল, গায়ের চামড়াও ফ্যাকাসেমত হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়, বেচারীর বেশ বয়স হয়েছিল। এই কারণে হরিণ বা জঙ্গলের অন্য পশু ধরতে অক্ষম হয়ে, সে অনেক দূর থেকে পোষা জন্তুর সন্ধানে ক্রমে তালতলীতে এসে পড়ে। তার পরই ক্ষিদে মেটাবার তাগিদে গরু ধরতে গিয়ে তার বিড়ম্বনা শুরু হয়। সারাটা দিন মানুষের হুড়োতাড়া, তীরের খোঁচা, ইঁট পাটকেল খেতে খেতে হয়রান হয়ে ওই ছায়া-ঘেরা গাছটার নীচে সে আশ্রয় নিয়েছিল। তখন দাঁত খিঁচানো ছাড়া আর কিছু করার উদ্যম তার ছিল না। তা না হলে আমরা যেরকম আনাড়ির মত এগিয়ে গিয়েছিলাম তখনই সে আমাদের দফা রফা করতে পারত অনায়াসে। যারা বেহুদ্দা আনাড়ি, অনেক সময় তারা বে'চে যায় নিছক বরাত জোরে; সেই বরাত জোরে আমরাও বে'চে গিয়েছিলাম। আমাদের অতিরিক্ত বাহাদুরীর অতি শোচনীয় পরিণতি হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। বাঘটার চামড়া ছাড়াবার সময় দেখা গেল তার চোয়াল গুঁড়ো হয়ে গেছে। এটা নরভূপের প্রথম গুলীতে হয়েছিল; যখন সে মাথা লক্ষ্য করে মারে। এবং এই জন্যই বাঘটা নরভূপকে দাঁতের কামড় দিতে পারেনি। দ্বিতীয় গুলীটা তার দুই ফুসফুস ফুঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। শবির ভোজালির কোপ না খেলেও বাঘটা অল্পক্ষণের মধ্যেই মরে যেত। তীর দুটো তার গায়ে বি'ধলেও উল্লেখযোগ্য কোন জখম করেনি। আমরা তার মরণ না ঘটালে বেচারী হয়ত আরও কিছুকাল তার স্বাভাবিক জীবন ভোগ করত।

আমাদের আশ্রমের একজন তরুণ মাস্টার মহাশয়, শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী, বাঘের খানিকটা মাংস কেটে নিয়ে গিয়ে রান্না করেছিলেন। তিনি কয়েকজনকে তাঁর লেপার্ড কারি চাখবার জন্য নিমন্ত্রণও করেছিলেন। আমাদের যদিও তিনি ডাকেননি। আমাদের বাদ দেওয়া অনেকের মতে অন্যায় বোধ হয়েছিল। পরে শুনে আমরা খুশী হয়েছিলাম যে অনেকক্ষণ সেদ্ধ করেও না কি ওই মাংস নরম করা যায়নি!

তবে কয়দিনের মধ্যেই আমাদের সৌভাগ্যের সূচনা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে ও তালতলীর জমিদারবাবুর কাছ থেকে আমরা ভোজের নিমন্ত্রণ পেলাম। এবং দুটোই দস্তুরমত চর্বচোষ্যলেহ্যপেয় মহাভোজ। অধ্যক্ষ মহাশয়ের কল্পনাশক্তির অভাব ছিল না, তালতলীতে নিমন্ত্রণে যাবার দিন অনুমতি দিলেন যদি অতিভোজনের ফলে হাঁটতে কষ্ট হয় তবে রাত্রে জমিদারবাড়িতে ঘুমোতে পারি।

নরভূপ কয়দিন পরে সেরে উঠেছিল। দ্বিজেন তার আগেই ভাল হয়ে গিয়েছিল। গ্রামের জখমী লোকদের মধ্যে একজন সেপটিক হয়ে মারা যায়, আর একজনের একটা হাত কেটে ফেলতে হয়। আমরা শান্তিনিকেতন থেকে চাঁদা তুলে চিকিৎসার জন্য এদের কলকাতায় পাঠিয়েছিলাম।

বাঘের চামড়াটা আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথকে আমরা উপহার দিই। তিনিও শাস্তি থেকে আমাদের রেহাই দেবার [...] অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে সুপারিশ ক[...] ছিলেন। সে সময় দ্বিজেন্দ্রনাথের বয়স [...] আশী বছর হবে। শান্তিনিকেতনের প্রত্যে[...] তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করত ও ভালবাসত।

এই ঘটনার কয়মাস পরে শান্তিনিকেত[...] পড়া সাঙ্গ হলে আমরা সাত ডানপিটে [...] ভঙ্গ হয়ে পড়লাম। ক্রমে ক্রমে আমা[...] সংযোগও আর রইল না। শবি মাত্র কয়দি[...] অসুখে ১৯২০ সালে মারা যায়। নরভূ[...] শেষ খবর আমি পাই ১৯৪৫ সালে। ত[...] সে ফৌজী ইঞ্জিনীয়ার দলে 'লেফটেন্যান্ট[...]

এতদিন পরেও ডিসেম্বর মাসের [...] উগ্র উত্তেজনাময় দিনটার কথা আমার স্ম[...] জ্বলজ্বলে হয়ে আছে।"

(শান্তিনিকেতনে শ্রীবিজয় বাসুর ১৪ [...] বয়সে যে বিষয়ে হাতে খড়ি হয়, বড় [...] তার চর্চা তিনি ছাড়েননি। কাজের [...] ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর শিকারের নেশা [...] আছে। কয় বছর আগে মধ্যপ্রদেশে [...] অভিযানে গুলী খাওয়া বড় বাঘের— [...] টাইগার—কবলে পড়ে ইনি নিতান্ত [...] জোরে প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন; কিন্তু একটা [...] কেটে বাদ দিতে হয়েছে, অন্য হাতও [...] ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই দুর্ঘটনার [...] ভবিষ্যতে আপনারা শুনতে পাবেন। —অ[...]

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.-প্রণীত

ব্যায়ামে বাঙালী	২.০০	বাংলার ঋষি	৩.০০
বীরত্বে বাঙালী	১.৫০	বাংলার মনীষী	১.২৫
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪.০০	বাংলার বিদুষী	২.০০
আচার্য জগদীশ	২.০০	রাজর্ষি রামমোহন	১.৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১.৫০	যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১.৫০
জীবন গড়া	.৭৫	রবীন্দ্রনাথ	১.২৫

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী · ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

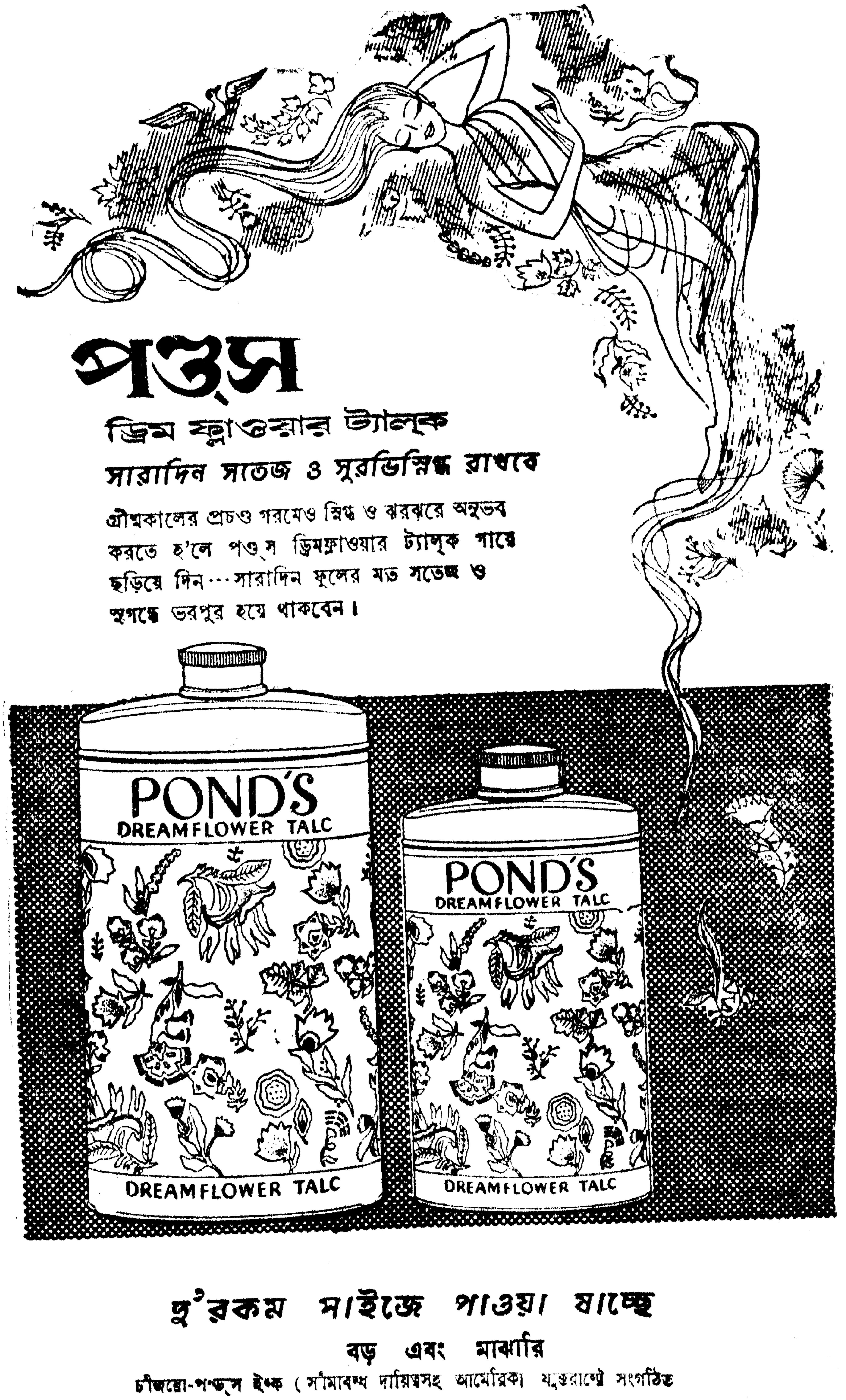
পণ্ড্স
ড্রিম ফ্লাওয়ার ট্যাল্‌ক
সারাদিন সতেজ ও সুরভিস্নিগ্ধ রাখবে
গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড গরমেও স্নিগ্ধ ও ঝরঝরে অনুভব করতে হ'লে পণ্ড্‌স ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যাল্‌ক গায়ে ছড়িয়ে দিন···সারাদিন ফুলের মত সতেজ ও সুগন্ধে ভরপুর হয়ে থাকবেন।
POND'S
DREAMFLOWER TALC
DREAMFLOWER TALC
POND'S
DREAMFLOWER TALC
DREAMFLOWER TALC
দু'রকম সাইজে পাওয়া যাচ্ছে
বড় এবং মাঝারি
চীজব্রো-পণ্ড্‌স ইন্‌ক (সীমাবদ্ধ দায়িত্বসহ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত

কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

(৪৭)

পর্দা সরিয়ে ঢুকতেই দীপঙ্কর দেখলে —বিরাট একটা ঘর। চারদিকে খালি বই। বই-এর মধ্যে টেবিলে বসে আছেন কালকের সেই ভদ্রলোক, সেই সনাতনবাবু। তখন পেছন ফিরে বসেছিলেন।

সতী ভেতরে গিয়ে ডাকলে। বললে—শুনেছো, এই দীপুকে এনেছি—

ভদ্রলোকের গায়ে একটা হাত-কাটা পাঞ্জাবী। উস্কো-খুস্কো চুল। সতীর কথাটা কানে যেতেই পেছন ফিরলেন। দীপঙ্করের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু চিনতে পারলেন না। সতীর দিকে ফিরে বললেন —কাকে এনেছো বললে?

সতী বললে—সেই যে যার কথা বলেছিলুম—?

—ও, তাই বলো—

বসে উঠে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে পড়লেন— বললেন—কী আশ্চর্য, আগে বলতে হয়! আপনি বসুন বসুন—

দীপঙ্কর একটা চেয়ারে বসলো। বললে—আপনি ব্যস্ত হবেন না—

সনাতনবাবু যেন সত্যিই বিব্রত হয়ে পড়লেন তবু। বললেন—দেখুন, কালকে আমি পুরী থেকে ফিরে এলাম তখন, মানে পুরী থেকে ঠিক নয়, আসলে কটক থেকে ফিরে এলুম। বর্ষা-কালে রথের সময় পুরী যাওয়াটাই ভুল—আমি ভেবে দেখছিলাম পুরী যেতে হলে হয় সেপ্টেম্বর নয় মার্চ মাসে যাওয়াই ভালো—

তারপর ঝুঁকে পড়ে বললেন—আমি আজ তিনখানা বই কিনেছি এই সম্বন্ধে, কাল রাত্রে আপনি বললে বিশ্বাস করবেন না, আমার ভালো ঘুমই হয়নি—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কেন?

—ঘুম কী করে হবে বলুন, আমি ভাবতে লাগলাম, উড়িষ্যাতেই বা এত বন্যা হয় কেন? আমাদের পূর্ববঙ্গেও বন্যা হয় অবশ্য, গত একশ বছরে নব্বইবার বন্যা হয়েছে। কিন্তু উড়িষ্যা সম্বন্ধে আমার সঠিক স্ট্যাটিস্‌টিক্স জানা নেই, তাই পড়ছিলুম—ভাবলাম উড়িষ্যার বন্যা সম্বন্ধে একটু জেনে রাখা ভালো—এই দেখুন এই তিনখানা বই আজ কিনে এনেছি—

দীপঙ্কর দেখলে তিনখানা মোটা-মোটা নতুন বই টেবিলে রয়েছে। উড়িষ্যার বন্যা, উড়িষ্যার ভূতত্ত্ব, নদীতত্ত্ব আর যেন সব কী বিষয় নিয়ে লেখা।

দীপঙ্কর বললে—আপনি পড়ছিলেন, আপনার পড়ার ক্ষতি করলাম মাঝখান থেকে—

—না না, ক্ষতি করবেন কেন? এ কি একদিনে শেষ হবে ভেবেছেন? এ তিন-খানা বইতে তো হবে না, আরো অনেক-গুলো বই কিনতে হবে, আজ বুক-সেলার্সদের চিঠি লিখে দিয়াছি, উড়িষ্যা সম্বন্ধে যত বই আছে, সব পাঠাতে—আমি তো ঠিক করেছি অন্ততঃ ছ'মাস লাগবে, এ ব্যাপারটা জানতে—

দীপঙ্কর সনাতনবাবুর কথা, সনাতন-বাবুর ব্যবহার লক্ষ্য করতে করতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। বললে—কোন্ ব্যাপারটা?

সনাতনবাবু বললেন—এই বন্যার ব্যাপারটা—ব্যাপারটা তো ঠিক সহজ নয়, প্রায়ই হয় যে এটা, উনিশ শো সাত্রিশ সালে যে ভীষণ বন্যা হয়েছিল আমার মনে আছে—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু বন্যা যদি হয়ই, তার আপনি কী করবেন জেনে? আপনি তো প্রতিকার করতে পারবেন না?

সনাতনবাবু চাইলেন সতীর দিকে, চেয়ে হাসলেন। বললেন—দেখছ তো, তুমি যা বলো, ইনিও তাই বলছেন— প্রতিকার যদি না-ই করতে পারলুম, জানতেও তো ইচ্ছে করে, জানতেও তো আনন্দ—

আশ্চর্য এই মানুষটা। সতীও বলেছিল দীপঙ্করকে। শুধু বন্যাই নয়, সব জিনিস সম্বন্ধেই সনাতনবাবুর কৌতূহল। বহুদিন আগে একদিন ইলিশ মাছ ভাজা খেয়ে খুব ভালো লেগেছিল সনাতনবাবুর। ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলেন— এটা কী মাছ ঠাকুর?

ঠাকুর বললে—আজ্ঞে ইলিশ মাছ—

ইলিশ মাছ! ইলিশ মাছ ভাজা ে আগেও খেয়েছেন। কিন্তু এত ভাে তো লাগেনি কখনও।

জিজ্ঞেস করলেন—কোন্ বাজার থেে মাছ আনা হয়েছে জানো তুমি ঠাকুর?

—আজ্ঞে, জানি, কৈলাশ তো য বাজারে, রোজ যে-বাজার থেকে আে সেই বাজার থেকেই এনেছে।

সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের

ইস্পাত ৫ম সংস্করণ

ওরা ভাঙবেই ৪৲

এলো আহ্বান ৬ষ্ঠ সংস্করণ ৪৲

সাধারণতন্ত্রী প্রকাশালয়, ৪৪, কালী কুমার মুখার্জি লেন, শিবপুর, হাওড় ও কলকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালে

(সি ১৩৭

সাধারণের বই

বরেন বসু

প্রান্তন ৪।৷০

গোলাম কুদ্দুস

মরিয়ম ৪৲

ভবেশ গঙ্গোপাধ্যায়

শেষ প্রান্তর ৪।৷০

মাহমুদ আহমদ

চার প্রহর ২৲

বরেন বসু

উপান্ত ৩৲

বাবুরামের বিবি —বরেন বসু — ২৲
আগন্তুক — ননী ভৌমিক — ২৲
নতুন ফৌজ (নাটক)—বরেন বসু — ১৷৷
ছাউনি (নাটক)—অবনী বন্দ্যোঃ — ১৷৷

সাধারণ পাবলিশার্স
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট ঃঃ কলি-১২

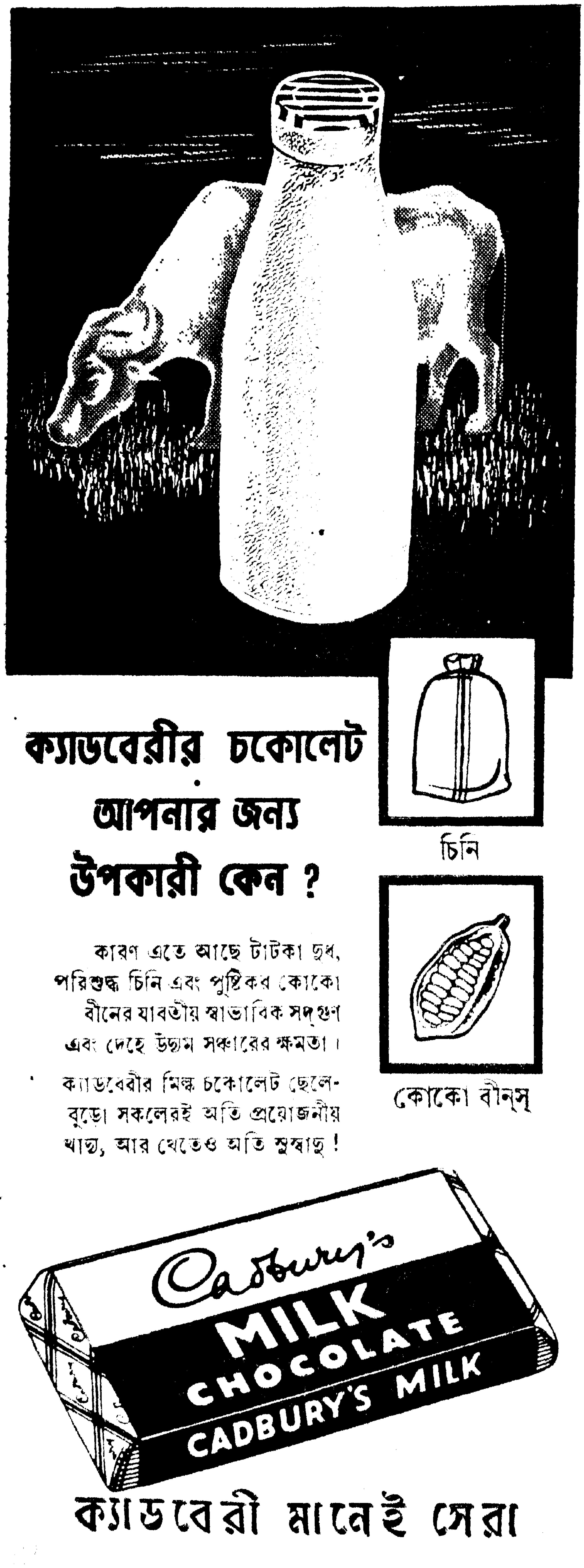

সনাতনবাবু বললেন—কৈলাশকে ডাকো তো ঠাকুর!

কৈলাশ আসতেই সনাতনবাবু বললেন—ঠাকুর কৈলাশকে জিজ্ঞেস কর তো কোন্ বাজার থেকে মাছ এনেছে—

কৈলাশের কথায় তেমন সন্তুষ্ট হলেন না সনাতনবাবু। শেষে ডাক পড়লো সরকার-বাবুর। সরকারবাবু এলেন ভেতরে। সনাতনবাবু জিজ্ঞেস করলেন—আজকে ইলিশ মাছটা কোথা থেকে কিনে আনা হয়েছে সরকারবাবু?

সরকারবাবু একটু ভয় পেয়ে গেল। বললে—আজ্ঞে হুজুর, আমি তো টাটকা মাছ দেখেই নিয়েছিলাম—রোজ তার কাছ থেকেই মাছ কিনি—

সনাতনবাবু তখন খাওয়া থামিয়ে দিয়েছেন। বললেন—সেই জন্যেই তো আমি জিজ্ঞেস করছি, কোন্ বাজারের মাছ?

—আজ্ঞে, জগুবাবুর বাজার!

সনাতনবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন—কোন্ নদীর মাছ বলতে পারেন?

—আজ্ঞে তা তো বলতে পারি না! আমি মেছুনীকে জিজ্ঞেস করবো কাল—

সনাতনবাবু হাসলেন। বললেন—তবেই হয়েছে, সে কি আর নদী চেনে, সে কেবল মাছই চেনে—তাকে জিজ্ঞেস করলে কিছু ফল হবে না, সে তো আর লেখাপড়া জানে না সরকারবাবু—

সরকারবাবু বললে—তা হলে কী করবো বলুন আজ্ঞে?

সনাতনবাবু আবার খেতে লাগলেন—বললেন—না, আপনাকে কিছু করতে হবে না, যা করবার আমিই করবো'খন—

খেয়ে উঠেই সনাতনবাবু লাইব্রেরী-ঘরে গিয়ে ডায়েরী খুললেন। খুলে লিখে রাখলেন—'বেলা বারোটার সময়ে ইলিশ মাছ ভাজা খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু লাগলো। সকাল বেলা জগুবাবুর বাজারের মেছুনীর কাছ থেকে কেনা। কোন নদীর মাছ জানা যায় নাই।' ডায়েরীতে লেখা শেষ করে বইগুলো খুঁজতে লাগলেন। মাছ সম্বন্ধে কোনও বই নেই তাঁর কাছে। একবার টেলিফোন করলেন কলেজ স্ট্রীটে। জিজ্ঞেস করলেন—ইলিশমাছ সম্বন্ধে আপনাদের কাছে কোনও বই আছে?

কয়েকটা দোকানেই টেলিফোন করলেন। কোথাও নেই। তারা বললে—আমাদের এখানে পাবেন না, আপনি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির জুলজি ডিপার্টমেণ্টে একবার টেলিফোন করতে পারেন—

শেষকালে তাই হলো। টেলিফোন করলেন সেখানে। নো রিপ্লাই। একজন অনেকক্ষণ পরে উত্তর দিলে—হঠাৎ ইউনিভার্সিটি ছুটি হয়ে গেছে লাইব্রেরী-

য়ানের মৃত্যুতে। কালকে টেলিফোন করবেন আপনি, বেলা বারোটার পর।

কিন্তু ব্যাপারটা অত সোজা নয়। জরুরী ব্যাপার। ফেলে রাখলে চলে না। হঠাৎ খেয়াল হলো। চিড়িয়াখানায় টেলিফোন করলেন। সে ক'দিন যে কী উত্তেজনায় কাটলো সনাতনবাবুর! একবার এখানে টেলিফোন করেন, একবার সেখানে। সনাতনবাবুর মা বললেন—কী হলো বাবা, কিছু বলতে পারলো ওরা?

সনাতনবাবু বললেন—না মা, কী করা যায় বলো তো এখন?

মা বললেন—কী আর করবে বাবা, ও ছেড়ে দাও—তুমি খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো—

কিন্তু সে-ক'দিন কিছুতেই আর ঘুম আসে না। সকাল বেলা জগুবাবুর বাজারের মেছুনির কাছ থেকে ইলিশ মাছ এনে বেলা বারোটার সময় ভাজা খেতে কেন এত সুস্বাদু লাগলো, তা জানা উচিত।

রাত্রিবেলা সতী বললে—তোমার হয়ত খিদে পেয়েছিল খুব, তাই ভাল লেগেছে—ও নিয়ে অত ভাবছ কেন?

সনাতনবাবু বললেন—কিন্তু জানতে তো ইচ্ছে করে, জানলে তো আনন্দ হয়—

সতী বললে—তা পৃথিবীতে তো জানার অনেক জিনিস আছে, সব কি তুমি জানতে পারবে, না জানা সম্ভব?

সনাতনবাবু বললেন—তা বলেছ তুমি ঠিক, সত্যিই তো, ইলিশ মাছ ছাড়াও তো অনেক জিনিস আছে, সব কি আমি জানতে পারবো? সব কি জানা যায়?

—তার চেয়ে এখন এসো, শুয়ে পড়ো—

জোর করে সতী সনাতনবাবুকে শুইয়ে দিলে। গায়ে চাদরটা ঢাকা দিয়ে দিলে। বললে—শুয়ে পড়ো এবার,—তোমার ঘুম পায় না?

সনাতনবাবু বললেন—কী রকম আশ্চর্য ব্যাপার দেখো, তোমরা সবাই তো মাছ খেলে, আমিও খেলুম, কিন্তু আমারই ভালো লাগলো, আর আমারই যত মাথা-ব্যথা—

কথা বলতে বলতেই খানিক পরে ঘুমিয়ে পড়লেন সনাতনবাবু। সতী টের পেলে সনাতনবাবুর তালে তালে নিঃশ্বাস পড়তে লাগলো। তারপরেও অনেকক্ষণ জেগে রইল সতী। অনেকক্ষণ। আবার সেই ঘড়ির ধুক-ধুকুনি সতীর বুকে বাজলো। আবার তন্দ্রা এল সতীর। আবার ভোর বেলা ঘরের বাইরে শাশুড়ি ডাকলেন—বৌমা—

কিন্তু পরের দিনই তিনশো টাকার বই কিনে আনলেন সনাতনবাবু, চৌরঙ্গীর বিলিতি দোকান থেকে। একেবারে মাছের যাবতীয় ইতিহাস, মাছের চাষ, কত রকমের মাছ আছে পৃথিবীতে—সমস্ত লেখা আছে। সমুদ্রের মাছ, নদীর মাছ, পুকুরের মাছ। বিদেশের মাছ, স্বদেশের মাছ। সেই বই পড়তে লাগলেন আবার দাগ দিয়ে দিয়ে। সকাল থেকে অনেক গভীর রাত পর্যন্ত। আর কোনও চিন্তা নেই তাঁর। ছ'মাস পরে মাছ সম্বন্ধে সব কিছু যখন জানা হয়ে গেল, তখন বাঁচলেন। সনাতনবাবুও বাঁচলেন, সনাতনবাবুর মা'ও বাঁচলেন।

কিন্তু জানবার বিষয় তো আর একটা নেই সংসারে। সব জিনিসেই সনাতনবাবুর অদম্য কৌতূহল। একদিন সকাল বেলা খবরের কাগজ খুলেই দেখলেন 'স্টেটস্‌ম্যানের' এডিটারের ওপর কে যেন পিস্তলের গুলী ছুঁড়েছে, বড় বড় অক্ষরে খবরটা ছাপা হয়েছে। সে উনিশ শো বত্রিশ সালের কথা। কলকাতার বহু লোক সে-খবরে চমকে উঠেছিল। কিন্তু সনাতনবাবু চমকালেন না।

বিকেল ছ'টার সময় এডিটার ওয়াটসন্‌ সাহেব অক্টারলোনী মনুমেণ্ট, ইডেন গার্ডেন স্ট্র্যাণ্ড রোড হয়ে নেপিয়ার রোডের দিকে মোটরে চড়ে আসছেন। গাড়িটা একটু ধীরে ধীরে চলেছে, এমন সময় একটা লোক গাড়ির জানালা দিয়ে সাহেবের দিকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়েছে। ওয়াটসনের স্টেনোগ্রাফার মিস্‌ গ্রস্‌ পাশে বসে ছিল—। তিনটে

স্বাদে ও গুণে......আদর্শ স্থানীয়

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন!
যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র

বহু গুল্ম গাছড়া দ্বারা বিশুদ্ধ মতে প্রস্তুত

বাক্‌লা

ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন

ভারত গভ: রেজিঃ নং ১৬৮৩৪৪

অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা,
মুখে টকভাব, ঢেকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দাগ্নি, বুকজ্বালা, আহারে অরুচি, স্বল্পনিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ন নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যাঁরা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও বাক্‌লা সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিফলে মূল্য ফেরৎ।
৩২ তোলার প্রতি কৌটা ৩৲ টাকা, একত্রে ৩ কৌটা — ৮৷৷৹ আনা। ডাঃ, মাঃ ও পাইকারী দর পৃথক।

দি বাক্‌লা ঔষধালয়। হেড অফিস-বরিশাল (পূর্ব্ব পাকিস্তান)
ব্রাঞ্চ-১৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৭

গলীর মধ্যে একটা তার গায়েও এসে লাগলো। তারপর অনেক কাণ্ড। ওয়াটসন সাহেবকে পি-জি হসপিট্যালে নিয়ে যাওয়া হলো। আর সন্ধ্যে সাতটার সময় মাঝেরহাটে বুড়োশিবতলায় দুজনকে পাওয়া গেল। দুজনেই তখন মরে গেছে। একজনের নাম ননী লাহিড়ী। আর একজন হালদার পাড়া রোডের গোপাল চৌধুরী।

তখন এ-সব নিয়ে ক'দিন খুব হৈ চৈ হলো শহরে। পুলিস, খানাতল্লাসী, চললো. দীপঙ্করেরও সে-সব দিনকার কথা মনে আছে। কিরণের সঙ্গে মেশাই তখন বন্ধ। পেছনে পেছনে সি-আই-ডি ঘুরছে। আই-বি অফিসে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল দীপঙ্করকে। সতীরও তখন নতুন বিয়ে হয়েছে।

সনাতনবাবু মাকে ডাকলেন। বললেন—কী ভীষণ কাণ্ড হয়েছে জানো মা?

মা বললেন—কী!

সনাতনবাবু বললেন—একেবারে সাহেবদের মেরে খুন করে ফেলছে সবাই—

মা বললেন—ও-সব স্বদেশীদের কাণ্ড, ও তো রোজই হচ্ছে সোনা—ও আর নতুন কী?

বাড়তি পোশাকের সাধ এখন মিটছে

কেননা আমার একটি

উষা

সেলাই কল আছে

নিজের পরণের জামা-কাপড় নিজের হাতে তৈরী করার চেয়ে ভালো কিছুই হতে পারে না---আর এতে আনন্দও পাওয়া যায় প্রচুর। টাকায় কুলোয়নি ব'লে পরবার সাধ থাকতেও যে-জামা আগে কিনতে পারিনি, এখন **উষার** দৌলতে তা' ঘরেই তৈরী হয়ে যাচ্ছে। **বিশ্বাস করুন, উষা** কিনে আমি সত্যিই **জিতেছি।** নতুন যাঁরা সেলাই করতে **শিখছেন, তাঁরাও এতে খুব তাড়াতাড়ি আর সহজেই সেলাই করতে পারবেন।**

যদি আগে কখনও কলে সেলাই না ক'রে থাকেন, তা'হলে আপনি খুব শিগ্‌গির এবং সস্তায় তা শিখতে পারেন, যে-কোনও **উষা** সেলাই এবং এমব্রয়ডারী স্কুলে ভর্তি হয়ে। বিশদ বিবরণ জানবার জন্যে আপনার বাড়ীর কাছাকাছি কোনো **উষা** বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করুন বা পোস্ট বক্স ২১৫৮, কলিকাতাতে চিঠি লিখুন।

জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড, কলিকাতা-৩১

সনাতনবাবু বললেন—তা তো আমিও জানি, কিন্তু এত পিস্তল কোত্থেকে আসছে জানতে হবে তো!

মা বললেন—ও জেনে তোমার কী হবে?

সনাতনবাবু বললেন—না, জানা তো দরকার। এত পুলিস, পাহারা, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রয়েছে, তবু এত পিস্তল কোত্থেকে আসছে!

—যেখান থেকে খুশী আসুক, আমাদের কী?

—বারে! জানতে হবে না। পিস্তল অমনি এলেই হলো? তাহলে পুলিস মিলিটারি রাখার দরকার কী? আমাদেরই তো দেশের সব মানুষ, আমরা তো এই দেশেই বাস করছি। শুধু খাওয়া-দাওয়া আর ঘুমোন তো পশুরাও করে। আমাদের সঙ্গে তাহলে আর তাদের তফাৎটা কী?

রাত্রে একমনে বই পড়া দেখে সতী জিজ্ঞেস করলে—সত্যি এ-সব জেনে কী হবে?

সনাতনবাবু বললেন—তোমার জানতে ইচ্ছে করে না?

সতী বললে—না!

সনাতনবাবু বললেন—আশ্চর্য তো! সত্যিই তোমার জানতে ইচ্ছে করে না, কে প্রথম পিস্তল আবিষ্কার করলো, প্রথম কাকে পিস্তল মারা হলো। প্রথম পিস্তল দেখতে কী রকম ছিল, তারপর সেই পিস্তল থেকে আজকের মডার্ণ পিস্তলের কী তফাৎ—সে-সব কিছুই জানতে ইচ্ছে করে না!

সতী বললে—সে আমার জেনে কী লাভ?

সনাতনবাবু হাসলেন। বললেন—তাহলে খেয়ে ঘুমিয়ে বেঁচে থেকেই বা কী লাভ?

সেই গুলীমারার ঘটনার পর থেকেই গাদা গাদা বই আনাতে লাগলেন সনাতনবাবু। সেই বই সব আবার দিন রাত পড়তে লাগলেন। ছ'মাস পরে সব জানা হয়ে গেল। তখন বাঁচলেন। সনাতনবাবুও বাঁচলেন, সনাতনবাবুর মা'ও বাঁচলেন।

কথাগুলো শুনতে শুনতে দীপঙ্করের খুব ভালো লাগছিল। এও একরকম মানুষ। কত জানবার জিনিস পৃথিবীতে। একটা জীবনে সব জিনিষ জেনে শেষ করা যায় না। পৃথিবীতে এত বই, এক জীবনে সব পড়ে শেষ করা যায় না। তবু চার-দিকে থাক্-থাক্ সাজানো বইগুলো দেখে কেমন শ্রদ্ধা হতে লাগলো সনাতনবাবুর ওপর। দরকার কি এত জানার। অন্য দশজন বড়লোকরা যা করে, তাই করলেই তো পারেন সনাতনবাবু! কেন মিছিমিছি এত পরিশ্রম। এত পয়সা খরচ। বিচিত্র মানুষ বটে সনাতনবাবু।

এই সব নিয়েই মেতে আছেন তো বেশ! এই সব নিয়েই তো উন্মত্ত হয়ে আছেন!

দীপঙ্কর বললে—এ গুলো সব কী বই?

সনাতনবাবু বললেন—এইগুলোই তো এতদিন পড়ছিলুম, ওয়ার নিয়ে কিছু ঘাঁটাঘাঁটি করছিলুম অনেকদিন ধরে হঠাৎ এই মাছের ব্যাপারটা মাথায় ঢুকতেই আবার মাছ সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছে হলো—

—ওয়ার? যুদ্ধ সম্বন্ধে হঠাৎ পড়ছেন কেন?

—ওয়ার যে বাধবে শুনছি।

—যুদ্ধ বাধবে?

বহুদিন আগে একটা যুদ্ধ গিয়েছে, সে-যুদ্ধ দেখেনি দীপঙ্কর। সে-যুদ্ধের গল্পই শুধু শুনেছে। মধুসূদনের রোয়াকে দুনিকাকারা বসে সব গল্প করতো যুদ্ধের। মেসোপোটেমিয়া আর প্যারিসের লড়াই-এর গল্প হতো রোয়াকের ওপর বসে বসে। আবার সেই যুদ্ধ বাধবে? বলছেন কী সনাতনবাবু!

সনাতনবাবু বললেন—সে কি, আপনি শোনেন নি? আপনাদের অফিসের সাহেবেরা কিছু বলছে না?

দীপঙ্কর বললে—না, কই, কিছু তো শুনিনি!

—শুনুন আর না-শুনুন, আমার নিজেরই যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছে যুদ্ধ বাধবে আবার মশাই। জার্মানীতে নাজি-পার্টি ওঠার পর থেকেই কেমন সন্দেহ হচ্ছে। ওই যে হিটলার লোকটা দেখছেন, ও লোকটা তত খারাপ নয়, লোকটা দেশকে ভালবাসে, দেশের ভালোই চায়, কিন্তু ওর পেছনে অনেক মারোয়াড়ী রয়েছে, তারাই আসলে ওকে নাচাচ্ছে—

—সে কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তারা অনেক বন্দুক-রাইফেল গোলা-গুলি তৈরি করে ফেলেছে, সেগুলো বিক্রী হচ্ছে না, একেবারে কার-খানায় জমে পাহাড় হয়ে উপচে পড়ছে, সেগুলো চালানো চাই তো—

সনাতনবাবু অনেক সব কথা বলতে লাগলেন। যুদ্ধের একেবারে গোড়াকার কথা সব। তখন কেউই যানতো না যুদ্ধ হবে। দীপঙ্করও জানতো না। খবরের কাগজেও সে-সব কথা বেরোতো না। কিন্তু সনাতনবাবুই, মনে আছে, সেদিন প্রথম দীপঙ্করকে যুদ্ধের কথাটা বলেছিলেন। কে জানে, হয়ত সনাতনবাবু নিজেই জানতেন না তাঁর কথা শেষকালে এমন করে অক্ষরে ফলে যাবে। আর সে-যুদ্ধে সমস্ত পৃথিবী জড়িয়ে পড়বে। জড়িয়ে পড়বে ইংরেজ, জড়িয়ে পড়বে ফরাসী, রাশিয়া সবাই। জড়িয়ে পড়বে পৃথিবীর প্রত্যেকটা লোক, প্রত্যেকটা অধিবাসী! আর সে যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত সতীও জড়িয়ে পড়বে!

নিউ এজ এর বই বলতে বোঝায় : সেরা লেখক, সার্থক রচনা, সুলভ মূল্য

প্রকাশিত হলো

॥ খেলার রাজা ক্রিকেট ॥

বিনয় মুখোপাধ্যায়

নতুন ৫ম সংস্করণ। ৩৷৷০

এ-বইতে যাঁরা খেলেন, তাঁরা পাবেন ভাল করে খেলা শিখবার সংকেত। যাঁরা খেলা দেখেন, তাঁরা পাবেন ভাল করে খেলা বুঝবার তথ্য। যাঁরা খেলেন না, খেলা দেখেনও না, তাঁরা পাবেন সাহিত্যে নতুন বিষয়বস্তুর স্বাদ ও সন্ধান।

॥ কেউ ভোলে না কেউ ভোলে ॥

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত অভিনব গ্রন্থ বার হলো। এই ভুলে যাওয়া, আর এই ভুলে না-যাওয়া, এই মনে রাখা আর এই মনে না-রাখার কথা নিয়েই অতীত দিনের স্মৃতি-মন্থন করেছেন শৈলজাবাবু। দাম সাড়ে চার টাকা

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে :

প্রকাশের আগেই ইতিহাস সৃষ্টি করেছে :

॥ অভিশপ্ত চম্বল ॥

তরুণকুমার ভাদুড়ী

স্মরণীয় কালের বাংলা সাহিত্যে এমন দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা আর কখনও হয়নি।

আমাদের প্রকাশিত দৃষ্টিপাত, দেশে বিদেশে, সাহেব বিবি গোলাম, কত অজানারে আপনাদের প্রশংসায় ধন্য হয়েছে। এবার এই "অভিশপ্ত চম্বল" আপনাদের তৃপ্তি দিলে আমরা আর একবার ধন্য হবো।

●

তরুণকুমার ভাদুড়ীর আর একটি অভিনব রচনা

মরুপ্রান্তর (২য় সং) ৪্

আমাদের প্রকাশিত কয়েকটি স্মরণীয় গ্রন্থ : দৃষ্টিপাত, জনান্তিক, ঝিলম নদীর তীর, দেশে বিদেশে, সাহেব বিবি গোলাম, কত অজানারে, তিথিডোর, তুমি সন্ধ্যার মেঘ, কিংবদন্তীর দেশে, উপনায়ন, বাঙালীর ইতিহাস, হলুদ নদী সবুজ বন, পদ্মপাতায় জল, নটী, খাঁড়ার লিখন, যাদের দেখেছি, বরনারী, আবহমান।

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ

২২ ক্যানিং স্ট্রীট; ১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিঃ; গোল মার্কেট, নতুন দিল্লী

—আপনি তো জানেন, কী করে হিট্‌লার ক্ষমতা পেলে? ভোটের আগে কমিউনিস্ট পার্টিকে বদনাম দেবার জন্যে নিজেরাই নিজেদের পার্লামেণ্ট হাউসটা আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিলে মশাই! কী শয়তান দেখুন! বদনাম হলো অন্য সব পার্টির। আর তারপরেই ভোট। ভোটে একেবারে গো-হারান্‌ হারিয়ে দিলে সকলকে। আমি তখন থেকেই ওয়াচ্‌ করছি কি না, বই পড়ছি আর দেখছি—কী হয়!

কথা বলতে আরম্ভ করলে আর শেষ হয় না। কথা বলতে আরম্ভ করলে সনাতনবাবুর আর জ্ঞান থাকে না কোনও দিকে। সাধারণত কথা বলবার হয়ত লোকই পান না মনের মত। আজকে দীপংকরকে পেয়ে সনাতনবাবু যেন মন খুলে কথা বলতে পেরে বেঁচেছেন! একাই কথা বলে যাচ্ছিলেন সনাতনবাবু, আর দীপংকর আর সতী, দুজনেই শুনেছিল।

বললেন—আমি কি এ-সব জানতুম,

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

স্টেট্সম্যানের এডিটরকে যেদিন স্বদেশীরা গুলী করলে, সেই দিনই প্রথম খেয়াল হলো যে পিস্তল কোথা থেকে প্রথম এল। মানে বন্দুক কবে প্রথম আবিষ্কার হলো। সেই সব বই আনালুম, এনে পড়তে পড়তে দেখি আরে জার্মানী তো কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে—এ তো যুদ্ধ লাগলো বলে! তখন আরো বই আনাই, দেখি যা ভেবেছি তাই—আসলে দেখলাম হিটলারের পেছনে রয়েছে থাইসেন—

—থাইসেন?

—থাইসেনের নাম শোনেন নি? আসলে লোকটা ব্যবসাদার। লোহা-লক্কড়, কয়লা, নানাকমের ব্যবসা তার, সে দেখলে হিটলার লোকটা তো বক্তৃতা করতে পারে ভালো! তো দাও একে চ্যান্সেলার করে।

—তাহলে একটা মজার গল্প বলি শুনুন—

বেশ মশগুল হয়ে গল্প ফাঁদছিলেন সনাতনবাবু। সতী বললে— আর গল্প থাক, দীপু এসেছে অফিস থেকে, তা জানো তো! আমি অফিস থেকে ওকে টেনে এনেছি। এখনও ওর খাওয়া-দাওয়া হয়নি—

সনাতনবাবু বললেন—ছি ছি ছি, এ কথা তো আগে বলোনি আমায়! আপনার খাওয়া হয়নি তা তো আমায় বলতে হয়! না, না আপনাকে আর আটকাবো না, আপনি বাড়ি চলে যান, আপনাকে, আর কষ্ট দেব না—

—ওমা, সে কি? চলে যাবে কেন? তুমি চলে যেতে বলছো কেন ওকে?

সতীও হাসতে লাগলো। দীপংকরও একটু লজ্জায় পড়লো।

সতী বললে—দেখলে তো ওঁর কাণ্ড, জানো, ওকে আমি নেমন্তন্ন করেছি আজ, তোমাকে কাল অত করে বললাম।

—তাই নাকি?

আকাশ থেকে পড়লেন সনাতনবাবু। বললেন—না না, আমার মনে পড়েছে—তাহলে তো ভালোই হলো, আরো অনেকক্ষণ গল্প করা যাবে—

বলে উঠলেন। বললেন—দাঁড়ান, তাহলে আর একটা বই এনে দেখাচ্ছি আপনাকে, এই পাশের ঘর থেকে নিয়ে আসছি—

বলে পাশের ঘরের দিকে চলে গেলেন। দীপঙ্কর সতীর দিকে চাইলে, বললে—সনাতনবাবু তো বেশ মানুষ সতী!

সতী সে-কথার উত্তর দিলে না। বললে—তুমি কিন্তু আজ খেয়ে যাবে দীপু, চলে যেও না যেন—

দীপংকর বললে—আজ সনাতনবাবুর সংগে আলাপ করে সত্যিই খুব খুশী হলাম, এত খবর রাখেন—

ততক্ষণে এসে পড়েছেন সনাতনবাবু। হাতে একখানা বই। বললেন—এখানা নতুন আনিয়েছি, এই দেখুন, একটা জায়গায় আপনাকে পড়িয়ে শোনাই—

সতী বললে—তাহলে, আমি রান্নার কদ্দূর কী হলো দেখি গে—তুমি বস দীপু—

বলে সতী চলে গেল।

অদ্ভুত মানুষ এই সনাতনবাবু! কোথায় কত দূরে সব দেশ, সে-সব দেশের সমস্যা, সে-সব দেশের মানুষের নাড়ি-নক্ষত্র সব জেনে মুখস্থ করে বসে আছেন একেবারে। উনিশ শো একত্রিশ সালে ব্রেজিলে কত লক্ষ ব্যাগ কফি সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, তাও মুখস্থ। একদিকে সাধারণ মানুষ তর ধর্ম, তার জীবিকা, আর একদিকে বড়দের রাজনীতি। জার্মানীতে ইহুদীদের ওপর যেমন অত্যাচার তেমনি রাশিয়াতে মহাজনদের ওপর অত্যাচার। দু'টোই এক। কোথাও বিশ্বাস নেই, আস্থা নেই, সহযোগিতা নেই। যুদ্ধ বাধলে কেউ জিতবে না, দেখবেন। আজ দু'দিক থেকেই দু'দল দু'রকম মত চালাবার চেষ্টা করছে। একদল বলছে সহযোগিতা শান্তি আর যুক্তির পথেই সভ্যতা এগিয়ে চলবে—আর একদল চাইছে ধ্বংস। মৃত্যুর মধ্যে, অপঘাতের মধ্যে, আত্মহত্যার মধ্যেই আত্মবিনাশ! কাকে আপনি চান বলুন? দু'জনেরই সমান ভোট, দু দলই দলে ভারী—দু দলের হাতেই সব রকম হাতিয়ার আছে—বোমা, বারুদ, রাইফেল, বন্দুক, গ্যাস সব কিছু! কারা জিতবে এখন বলুন?

—সোনা!

হঠাৎ সনাতনবাবুর কথার মধ্যে বাধা পড়লো। সনাতনবাবু কথা থামিয়ে দরজার দিকে চেয়ে বললেন— এই যে মা—

দীপংকর চেয়ে দেখলে। সনাতনবাবুর মা ঘরের ভেতরে ঢুকছেন। সতীর শাশুড়ি। কালকে এই চেহারাটাই দেখেছিল দীপংকর। এঁকে দেখেই সতী ভয়ে নীল হয়ে গিয়েছিল।

—এ কে সোনা?

সনাতনবাবু উত্তর দেবার আগে দীপংকর সোজা তাঁর কাছে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

দীপংকর দাঁড়িয়ে উঠে বললে—সতী আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছে—সনাতনবাবুর সঙ্গে আলাপ করে দিতে—

—বৌমা ডেকে এনেছে? তুমিই কালকে এসেছিলে, না?

দীপংকর বললে—হ্যাঁ—

—তা বৌমা না-হয় পাগল, তুমি কী বলে পাগলের কথায় এলে এখানে?

পাগল! সতী পাগল! দীপংকর কেমন যেন বিব্রত হয়ে পড়লো! সনাতনবাবুর মা এ কী বলছেন! সতী পাগল! একবার

শ্রীজওহরলাল নেহরুর

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

বিশ্ব-বিশ্রুত "GLIMPSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। এ শুধু সন-তারিখ-সমন্বিত ইতিহাস নয়—ইতিহাস নিয়ে সরস সাহিত্য। গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পটভূমিকায় গৃহীত মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন যুগের চিত্রাবলী নিয়ে লিখিত একখানা শাশ্বত গ্রন্থ। জে. এফ. হোরাবিন-অংকিত ৫০খানা মানচিত্র সহ। প্রায় হাজার পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ।

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৫·০০ টাকা

শ্রীজওহরলাল নেহরুর
আত্ম-চরিত ১০·০০ টাকা

শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারীর
ভারতকথা ৮·০০ টাকা

প্রফুল্লকুমার সরকারের
জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ২·৫০ টাকা
অনাগত (উপন্যাস) ২·০০ টাকা
ভ্রষ্টলগ্ন (উপন্যাস) ২·৫০ টাকা

অ্যালান ক্যাম্বেল জনসনের
ভারতে মাউণ্টব্যাটেন ৭·৫০ টাকা

আর জে মিনির
চার্লস চ্যাপলিন ৫·০০ টাকা

শ্রীসরলাবালা সরকারের
অর্ঘ্য (কবিতা-সঞ্চয়ন) ৩·০০ টাকা

ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর
আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে ২·৫০ টাকা

ত্রৈলোক্য মহারাজের
গীতায় স্বরাজ ৩·০০ টাকা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ ।৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

সনাতনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে দীপঙ্কর। সনাতনবাবু তখন সেই বইটা নিয়ে আবার চোখ বোলাতে শুরু করেছেন।

—তুমি কী রকম ভাই, বৌমার ?

দীপঙ্কর বললে—ওরা কালীঘাটে আমাদেরই বাড়ির পাশে থাকতো—ছোটবেলা থেকেই পরিচয়। একসঙ্গে অনেকদিন কাটিয়েছি কিনা, আমার মাকে সতী মাসীমা বলে ডাকতো—আর কিছু নয়—

—তা এতদিন দেখছো, ও পাগল কিনা জানো না ?

—আজ্ঞে, আপনি কী বলছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—

—তা যদি না বুঝতে পেরে থাকো তো আর বুঝেও কাজ নেই! আমি এই বউকে নিয়ে এতদিন ঘর করছি, আমি বুঝতে পেরেছি, ও পাগল ছাড়া আর কিছু নয়—! আমরা না-হয় ভালো করে খোঁজ-খবর না-নিয়ে বিয়ে দিয়েছি, কিন্তু তোমরা কেন ওর কথায় ভোল? তোমরা কেন ওর কথায় এ-বাড়িতে আসো ?

অপমানটা দীপঙ্করের বুকে গিয়ে শেলের মতন বিঁধলো। কিন্তু কী বলবে বুঝতে পারলে না।

সতীর শাশুড়ি আবার বলতে লাগলেন—কালকে তোমাকে আমি দেখেছি, কিন্তু মুখের ওপর কিছু বলিনি, কিন্তু আজও কী বলে তুমি এলে ?

দীপঙ্করের মনে হলো আর যেন এক-মুহূর্ত এখানে দাঁড়ানো তার উচিত নয়। বললে—আচ্ছা, আমি চলে যাচ্ছি এখুনি—

—হ্যাঁ, যাও; ও ডাকলেও কখনও এসো না, ও একটা পাগল, একটা বদ্ধ পাগলকে আমার বউ করে এনেছি—

ততক্ষণে ঘরের বাইরে পা বাড়িয়েছিল দীপঙ্কর। সনাতনবাবুর যেন এতক্ষণে খেয়াল হলো, বললেন—কোথায় যাচ্ছেন দীপঙ্করবাবু—? এই চ্যাপ্টারটা শুনুন, এই চ্যাপ্টারটা পড়িয়ে শোনাই আপনাকে—

সনাতনবাবুর মা বললেন—তুমি আর ওকে ডেকো না সোনা, ওকে যেতে দাও—

বলে পেছন-পেছন বেরিয়ে এলেন। ঘরের বাইরে এসে দীপঙ্কর কোন্ দিকে যাবে বুঝতে পারলে না। লম্বা বারান্দা। তার একপাশে ঘর, আর একপাশে চৌকো-চৌকো থাম। দুটো থামের ফাঁকে ফাঁকে বাগানের কিছু-কিছু নজরে পড়ে অন্ধকারের মধ্যে!

সতীর শাশুড়ি বোধহয় দীপঙ্করের অসুবিধাটা বুঝতে পারলেন। বললেন—তুমি যেন কিছু মনে কোরো না আবার—

দীপঙ্কর পেছন ফিরে যেন কথাটার মানে বুঝতে চাইলে।

সতীর শাশুড়ি বললেন—তোমাকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বললাম বলে কিছু যেন আবার ভুল বুঝো না বাবা—আমাদের এই ঘোষ-বাড়ির বংশের এ নিয়ম নেই—

দীপঙ্কর একটু দ্বিধা করতে লাগল। তারপর বললে—কিন্তু আপনি ওকে পাগল কেন বলছেন বুঝতে পারছি না—

সতীর শাশুড়ি এবার গলা ছাড়লেন। বললেন—তা পাগল নয়? পাগল না হলে নিজের পেটের ছেলেকে মা হয়ে কেউ খুন করতে পারে ?

দীপঙ্কর চমকে উঠলো। কথাটা শুনে এক-পা পেছিয়ে এসেছে। বললে—কী বলছেন ?

সতীর শাশুড়ি বললেন—যা বলছি ঠিকই বলছি বাবা, নিজের পেটের ছেলেটাকে জলজ্যান্ত মেরে ফেললে ?

তারপর দীপঙ্করের বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই আবার বললেন—অনেক দুঃখেই আমার মুখ দিয়ে এ-সব কথা বেরোচ্ছে আজ নইলে তোমরা পাড়ার লোক, পাড়ার লোকের কাছে ঘরের কথা সাত-কাহন করে বলার মানুষ আমি নই, আমার সে-স্বভাবও নয়—তোমাকে বৌমা নিজে ডেকে এনেছে বলেই এত কথা বলতে হলো, আমরা নিজের জ্বালায় জ্বলছি ওকে নিয়ে, এর মধ্যে তোমরা এসে আর আমার জ্বালা বাড়িও না বাবা, তুমি যাও এখন—

দীপঙ্করের আরো অনেক কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু ভদ্রমহিলার মুখ-চোখের দিকে চেয়ে আর কথা বলতে সাহস হলো না। এ কোন্ সংসার

শিশুর দাঁত ওঠা সহজ করে তোলার জন্য
পিরামীড গ্লিসারিন

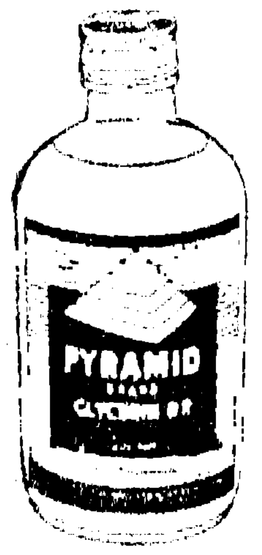

একটা নরম কাপড়ে আপনার আঙুল জড়িয়ে পিরামীড গ্লিসারীনে আঙুলটা একটু ডুবিয়ে নিন। তারপর আস্তে আস্তে শিশুর মাড়ীতে আঙুলটা ঘষতে থাকুন। তাড়াতাড়ি ব্যথা কমে যাবে। তা ছাড়া এর মিঠি স্বাদ শিশুদের খুবই ভাল লাগবে।

এটি বিশুদ্ধ এবং উপকারী। গৃহকর্মে, ওষুধ হিসেবে, প্রসাধনে ও নানা রকম ভাবে সারা বছরই কাজে লাগে—তাই পিরামীড গ্লিসারিনের একটা বোতল সর্বদাই হাতের কাছে রাখুন।

বিনামূল্যে পুস্তিকা! এই কুপনটি ভরে, "হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড পোষ্ট বক্স ৪০৯, বোম্বাই-১" এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

দয়া করে আমাকে বিনামূল্যে ইংরেজী/হিন্দীতে * পিরামিড গ্লিসারিনের গৃহকর্মে ব্যবহার প্রণালী পুস্তিকা পাঠান।

আমার নাম ও ঠিকানা ______

* যে ভাষায় চান, সেটি রেখে অন্যটি কেটে দিন

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

PYG. 16-X48 BG

এ কোন্ রহস্যের মধ্যে এসে পড়লো দীপঙ্কর! সতীকে দেখে বাইরে থেকে পাগলের কোনও লক্ষণই বোঝা যায়নি। সতীকে তো সহজ স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছিল। কেন সে খুন করলে নিজের ছেলেকে। আর তার যে কোনদিন ছেলে হয়েছিল, তা-ও তো বলেনি সতী!

দীপঙ্করের মনে হলো, সত্যিই তো সতীর শাশুড়ির কোনও অন্যায় নেই। যাকে সংসার করতে হয়, সে-ই সংসারের জ্বালা বোঝে। সতীর কী! সতী তো এ-সংসারের সামান্য বউ মাত্র। কিন্তু এই শাশুড়িকেই তো বিধবা হবার প্রথম দিন থেকে এই সংসারের হাল ধরে চালাতে হচ্ছে। থাকুক না অজস্র টাকা, কিন্তু টাকাটাই তো সব নয়। একদিন সামান্য জাহাজটাকে একলাই চালিয়ে নিয়ে এসেছেন এতদিন। এখন এই সংসার কা'র হাতে তুলে দিয়ে তিনি যাবেন! কার ওপর তিনি ভরসা করবেন! ছেলে তো লেখাপড়া, বই-বিদ্যে নিয়ে মেতে আছে। হয়ত ভেবেছিলেন, ছেলের বিয়ের পর ছেলের বউকেই সব ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। কিন্তু হয়ত সতীকে তাঁর পছন্দ হয়নি। হয়ত সতী তাঁর মনোমত নয়। এ কী অদ্ভুত জগৎ, এ কী অদ্ভুত সংসার। এদের এ-সংসারে স্বামী হয়ত স্ত্রীর মনোমত নয়, স্ত্রীও হয়ত স্বামীর মনোমত নয়। আবার ছেলেও হয়ত মায়ের মনোমত নয়, মা-ও হয়ত ছেলের মনোমত নয়। আর পুত্রবধূ! সতী যেমন শাশুড়ির মনোমত নয়। শাশুড়িও তাই হয়ত সতীর মনোমত নয়। অথচ দিনের পর দিন এক সংসারে এক ছাদের তলায় একই সঙ্গে এদের বসবাস করতে হবে। ভালো না লাগলেও বাস করতে হবে। এ কী যন্ত্রণা! গেটটা পেরিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় দীপঙ্করের মনে হলো, একদিন সাহেব পাড়ায় মিস্ মাইকেলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবার সময়েও ঠিক এই কথাই তার মনে হয়েছিল। লক্ষ্মীদির বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবার সময়েও এই একই কথা মনে হয়েছিল তার। বাইরে থেকে তো লক্ষ্মীদিকে দেখেও কেউ বুঝতে পারে না, মিস্ মাইকেলকে দেখেও কারো বুঝতে পারার কথা নয়। প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের সতীদের বাড়িটা দেখেও তো বোঝবার কোনও উপায় নেই। তবে কি সবাই এক! গরীব বড়লোক, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ভদ্র-অভদ্র সবাই! প্রিয়নাথ মল্লিক রোড, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, গড়িয়াহাটা, ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন-এর মধ্যে কোনও তফাৎ নেই? কোনও তফাৎ নেই কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান, জার্মানী, রাশিয়ার মধ্যে। মানুষের পৃথিবীতে এমনি করেই কি সর্বত্র অন্তরে হাহাকার আর বাইরে ছদ্মবেশের প্রলেপ!

দীপঙ্করের নিজের মতই যেন সবাই। ভেতরে ফুটো আর বাইরে জামা-কাপড়ের ফরসা চাকচিক্য! একদিকে ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের ভাঙা বাড়িটার মধ্যে জীবনযাত্রার নির্লজ্জ পরিহাস আর অন্যদিকে আপিসে গদি-আঁটা চেয়ার-টেবিলের বিলাস-বৈভব! এইটেই কি সত্যি, এইটেই কি নিয়ম। আশ্চর্য! তেত্রিশ টাকার ঘুষের কনকাটের ওপরেই কি পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জীবনের বুনিয়াদ!

—দীপু—দীপু—উ-উ-উ-উ—

হঠাৎ কানটা খাড়া করে একবার দাঁড়াল দীপঙ্কর। মনে হলো সতীর গলা ভেসে আসছে। যেন বাড়ির ভেতরের বারান্দা থেকে সতীর গলাটা ক্রমে আরো কাছে আসছে। সতী যেন দূর থেকে তাকে ডাকছে। সে ডাক ক্রমে কাছে আসছে। আরো কাছে। আরো, আরো কাছে। অন্দর মহল থেকে বার-বাড়ি, বার-বাড়ি থেকে, বার-বাড়ির বারান্দা, বারান্দা থেকে বাগান, বাগান থেকে সদর গেট—এইবার হয়ত একেবারে দৌড়তে দৌড়তে রাস্তায় এসে তাকে ধরবে।

—দীপু—উ-উ-উ-উ—

দীপঙ্কর হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে পা বাড়িয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি চলতে লাগলো। আরো তাড়াতাড়ি। হাজরা রোডের মোড়ের ট্রাম রাস্তার লোকজনের ভিড়ের মধ্যে একবার মিশে যেতে পারলে আর তাকে খুঁজে পাবে না সতী। আর খুঁজে পাবে না দীপঙ্করকে। সতীর জীবন থেকে এবার চিরকালের মত হারিয়ে যাবে দীপঙ্কর। দীপঙ্করের মনে হলো, এসংসারের যেন কোনও অর্থ নেই, যেন কোনও উদ্দেশ্য নেই। সত্যি, সকাল বেলার জীবনটা যেন আপিসে যাবার জন্যেই তৈরি হয়েছে। আপিসটা তৈরি হয়েছে যেন পা দুটোকে খানিক বিশ্রাম দেবার জন্যে! আর সন্ধ্যেবেলাটা! সন্ধ্যেবেলাটার সৃষ্টি যেন আপিস থেকে বাড়ি ফেরবার একটু অবসর যাপনের জন্যে। আর কিছু নয়। আর তারপর ঘুম। ঘুম না হলে পরের দিন আপিস যাবে কী করে। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত সেই একই চক্র। পৃথিবীর বুড়ো সূর্যটার মতই যেন অকারণে কেবল চক্রাকারে ঘোরা।

সতীর গলাটা তখন আর কানে আসছে না। রাস্তার ভিড় তখন একটু পাতলা হয়ে এসেছে। হাজরা পার্কের দক্ষিণের এই ফুটপাথের ওপর বহুকাল আগে একবার প্রফেসর অমল রায়চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সেদিন দীপঙ্কর যে-প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল তাঁকে, সে-প্রশ্নটাই আবার কাউকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো।

প্রকাশিত হয়েছে

অধ্যাপক ক্ষেত্রগুপ্ত ও অধ্যাপিকা
জ্যোৎস্না গুপ্তের

তারাশঙ্করের ধাত্রীদেবতা

বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক তারাশঙ্করের সাহিত্য সম্পর্কে মৌলিক আলোচনা।

মূল্য : ২·৩০

*

শরৎচন্দ্রের দেনাপাওনা

শরৎসাহিত্য সম্পর্কে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের আলোচনা।

মূল্য : ২·০০

অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তের
দুখানি অনন্যসাধারণ সমালোচনা গ্রন্থ

প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন

আলোচ্য বিষয় : চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মনসামঙ্গল, বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, দ্বিজমাধব, মুকুন্দরাম, আলাওল ও পদ্মাবতী, মৈমনসিংহ গীতিকা, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, বৈষ্ণব কাব্যসাহিত্যের ভূমিকা, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস।

মূল্য : ৮·০০

কুমুদরঞ্জনের কাব্যবিচার

(প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিতপ্রায়)

মূল্য : ২·৭৫

ডিসেম্বর মাসেই প্রকাশিত হবে

অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত ও অধ্যাপিকা
জ্যোৎস্না গুপ্তের

বাংলা নাটকের আলোচনা

(১ম খণ্ড)

এই খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে মেবার পতন, নীলদর্পণ, প্রফুল্ল এবং নরনারায়ণ।

গ্রন্থ নিলয়

১৭২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

তেল কোম্পানীর
দাদ ও কাউরের
অব্যর্থ মলম
বরাহনগর • কলিকাতা

সক্রেটিসের সেই কথাটা! কেন সংসারে ভালো লোকেরা কষ্ট পায়! কেন ভালো লোকেরা সাফার করে! কে তার কথার উত্তর দেবে। এই অগণিত জনতা, এই ট্রাম বাস, দোকান-পাট এই রাস্তা-ঘাট-পার্ক, ওই আকাশ-নক্ষত্র-চাঁদ, কার কাছে সে উত্তর পাবে! সক্রেটিস যদি বেঁচে থাকতেন আজ!

সার আপনি এখানে?

হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পেলে দীপঙ্কর। সামনে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে সম্ভ্রমে। সার্ট-পরা, মালকোঁচা-মারা ধুতি, হাতে একটা গোল অ্যালুমিনিয়ামের খাবারের কৌটো। বোঝা গেল আপিসের ক্লার্ক কেউ হবে।

দীপঙ্কর বললে—আপনি এদিকে কোথায়?

ছেলেটি বললে—বায়োস্কোপ দেখতে এসেছিলাম সার এক্সপ্রেস থিয়েটারে—

কথাটা বলে চলে যাওয়াই উচিত ছিল ছেলেটার। কিন্তু তবু দাঁড়িয়ে রইল। বললে—সার, যদি কিছু মনে না করেন, আমি দু মাস ধরে লিভ-ভেকেন্সিতে কাজ করছি, এখনও পার্মানেন্ট ভেকেন্সিতে আমাকে দেওয়া হলো না—

আরো বোধহয় অনেক কথা গড়গড় করে বলে গেল। নিজের দুঃখের কথা, নিজের বি-এ পাশ করার কথা, নিজের সংসারের কথা। নিজের চাকরির কথা। নিজের সামান্য আয়ের কথা।

দীপঙ্কর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—তুমি ঘুষ দিয়ে চাকরিতে ঢুকেছ? তেত্রিশ টাকা ঘুষ?

কিন্তু বলতে গিয়েও দীপঙ্করের মুখে কথাটা বেধে গেল। মুখের চেহারাটা ভালো করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখলে। কোন্ সেকশন, কোথায় বাড়ি, কিছুই জিজ্ঞেস করলে না দীপঙ্কর। কিছুই জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো না। দীপঙ্করের মনে হলো, এরা দীপঙ্করের চেয়েও যেন সুখী, দীপঙ্করের চেয়েও ভাগ্যবান। নইলে এত অভাবের মধ্যেও তো সিনেমা দেখতে এসেছে। এরা তো কই তার মত সংসারে কোন কিছু নিয়েই মাথা ঘামায় না। এরা কি সক্রেটিসের নাম শুনেছে, বাবাফ্-এর নাম শুনেছে, ফাইশেন-এর নাম শুনেছে। এরা কি তার মত এই ট্রাম-বাস-পার্ক, এই দোকান-পাট-মানুষ এই আকাশ-চাঁদ-নক্ষত্র নিয়ে মাথা ঘামায়। এরা কি প্রশ্ন করে কেন ভালো মানুষেরা কষ্ট পায় সংসারে! এরা কি জীবনের অর্থ খুঁজতে একলা-একলা, ঘুরে বেড়ায় তার মত গড়িয়াহাটা, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে! খুঁজে বেড়ায় ইতিহাসের কেতাবে!

দীপঙ্কর ছেলেটিকে সরিয়ে দিলে। বললে—এ-সব কথা রাস্তায় হয় না—আপিসে দেখা করো—

আশ্চর্য, এখানেও আপিস! এখানেও আপিসের হাত থেকে মুক্তি নেই। তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে চলতে লাগলো দীপঙ্কর। হয়ত ওদের মতন হতে পারলেই ভালো হত। সংসারের বুকের ওপর বসে দেনা-পাওনার কড়ি নিয়ে মাথা ঘামাতো না। সব জিনিস কড়ি দিয়ে কিনতো তার দাম পেলেই বেচতো। কিন্তু যে-মানুষ সামাজিক, যে-মানুষ দার্শনিক যে-মানুষ মানবিক—যে-মানুষ একাধারে সব, তার শান্তি কেমন করে হবে! তাকে শান্তি দেবে কে?

বাড়ির কাছে আসতেই দীপঙ্কর যেন চমকে উঠলো। বাড়ির সামনে যেন অনেক লোকের ভিড়। অন্ধকারে কাউকে বিশেষ করে চেনা যায় না। কিন্তু যেন কিছু একটা ঘটেছে। একটা কিছু বিপর্যয়।

কাছে আসতেই পুলিসের ভিড় দেখে আরো অবাক হয়ে গেল।

তবে কি ছিটে-ফোঁটার কাণ্ড! ছিটে-ফোঁটার ব্যাপারে পুলিস আসাটা কিছু বিচিত্র নয়। অনেক কাণ্ডর মধ্যে তারা জড়িয়ে থাকে। পুলিস-দারোগার সঙ্গে জীবনে তাদের অনেকবার মোলাকাত করতে হয়েছে। পুলিস-দারোগাকে ভয় করে চলবার মানুষ নয় ছিটে-ফোঁটারা।

তাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাবারই ইচ্ছে ছিল দীপঙ্করের। কিন্তু হঠাৎ ফোঁটা ডাকলে দূর থেকে।

বললে—এই যে দীপু এসে গেছে রে—এই দীপু—

দীপঙ্কর ভিড় ঠেলে কাছে গেল।

—কী হয়েছে এখানে!

ফোঁটা বিড়ি টানছিল। বললে—বিন্তীটার কাণ্ড শুনিছিস?

বিন্তীদি! বিন্তীদির আবার কী কাণ্ড হলো? বিন্তীদিকে পাওয়া গেছে তাহলে?

ফোঁটা বললে—আয়, ভেতরে দেখবি আয়—

বলে ফোঁটা দীপঙ্করের হাত ধরে বাড়ির উঠোনে নিয়ে গেল। (ক্রমশ)

১৯৬১ সালে আপনার ভাগ্যে কি আছে?

আপনি যদি ১৯৬১ সালে আপনার ভাগ্যে কি ঘটিবে তাহা পূর্বাহ্নে জানিতে চান, তবে একটি পোষ্টকার্ডে আপনার নাম ও ঠিকানা এবং কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া পাঠাইয়া দিন। আমরা জ্যোতিষবিদ্যার প্রভাবে আপনার বার মাসের ভবিষ্যৎ লাভ-লোকসান, কি উপায়ে রোজগার হইবে, কবে চাকুরী পাইবেন, উন্নতি, স্ত্রী পুত্রের সুখ-স্বাস্থ্য, রোগ, বিদেশে ভ্রমণ মোকদ্দমা এবং পরীক্ষায় সাফল্য, জায়গা জমি, ধন-দৌলত লটারী ও অজ্ঞাত কারণে ধনপ্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয়ের বর্ষফল তৈয়ারী করিয়া ১৷০ টাকার জন্য ভি-পি যোগে পাঠাইয়া দিব। ডাক খরচ স্বতন্ত্র। দুষ্ট গ্রহের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উপায় বলিয়া দিব। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা জ্যোতিষবিদ্যায় কিরূপ অভিজ্ঞ। মিথ্যা প্রমাণিত হইলে আমরা মূল্য ফেরৎ দিবার গ্যারাণ্টি দিই। **পণ্ডিত দেবদত্ত শাস্ত্রী, রাজ জ্যোতিষী।** (DC-3) জলন্ধর সিটি।

Pt. Dev Dutt 'Shastri, Raj Jyotishi, (DC-3)
Jullundur City.

ওয়াটারপ্রুফ
ওয়াচ এবং অ্যালার্ম টাইমপিস্
মাত্র ৫৫, টাকায়
৫ বৎসরের গ্যারাণ্টি, সাইজ ১০½
নং ৬১ জুয়েল ওয়াটারপ্রুফ
ক্রোম ৪০, টাকা
রোল্ডগোল্ড ওয়াচ
অতিরিক্ত ৫,
নং ৬২ টেবল ক্লক ৬″ ডায়াল
চমৎকার কেস ২২, টাকা
অ্যালার্ম টাইমপিস্ ৩০,
ডাকখরচ অতিরিক্ত ২, টাকা
বিনামূল্যে ক্যাটালগের সহিত
প্লাস্টিক ক্যালেণ্ডার

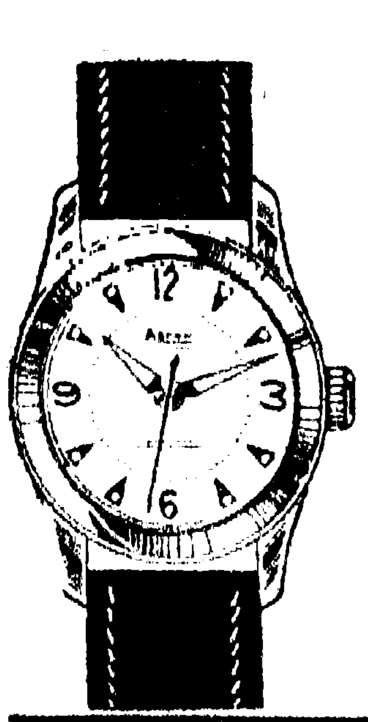

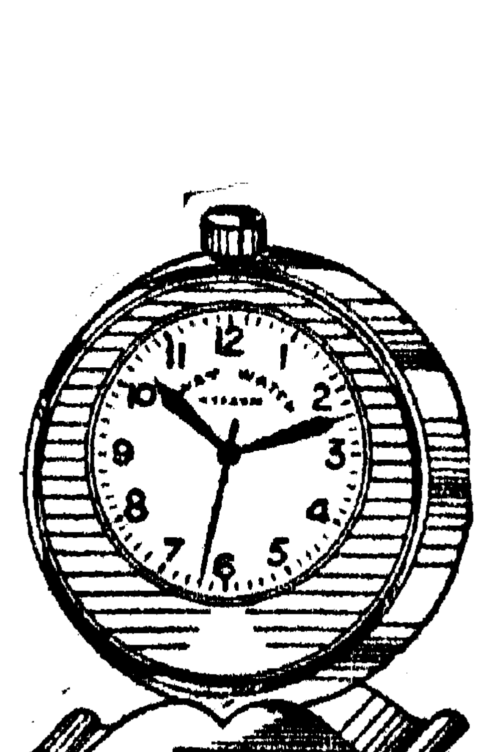

ASHOK WATCH HOUSE BOMBAY-26.

॥ ১৩ ॥

দাদামশার এক গুণ ছিল, তিনি কখনও খবরের কাগজ পড়তেন না। আমরা দেখতুম সবাই কাগজ পড়েন, কেউ বেশী, কেউ কম, অন্ততঃ একবার চোখ বুলিয়ে নেন সকলেই কিন্তু দাদামশায় খবরের কাগজ ছুঁতেনই না। দাদামশায় বলতেন—খবর কি পড়তে হয়? খবর পড়ে আরাম নেই, খবর শুনে আরাম। দাদামশায় খবর শুনতেন লোকের মুখে। খবর শুনে ওয়াকিবহাল হতেন দুনিয়া সম্বন্ধে।

খুব সকালে সাহাদের বাড়ি থেকে পদ্মবাবু আসতেন দোতলার দক্ষিণের বারান্দায়। থেলো হুঁকোয় এক কলকে তামাক পদ্মবাবুর বরাদ্দ ছিল রোজ। পদ্মবাবু ঢুকলেই বিশ্বম্ভর বেহারা কলকের গুলে আগুন দিয়ে হুঁকোয় বসিয়ে দিয়ে যেত আর পদ্মবাবু এক হাতে হুঁকো এক হাতে খবরের কাগজ নিয়ে বাগানের দিকে পিঠ করে বসে যেতেন। পদ্মবাবুই ছিলেন আমাদের বাড়ির খবরের কাগজের প্রথম পড়ুয়া। পদ্মবাবু এক সময় ছিলেন বঙ্গবাসী কলেজের উদ্ভিদ বিজ্ঞান পাঠের ডেমনস্ট্রেটার। গাছ-পালা সম্বন্ধে তাঁর প্রচুর উৎসাহ ছিল, জ্ঞানও ছিল। আমরা যখন তাঁকে দেখেছি তখন তিনি কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন। তখন তিনি জোড়াসাঁকো বাড়ির নিত্য-আগন্তুক। আফিম ধরেছেন। আমরা দেখতুম হুঁকো হাতে নিয়ে পদ্মবাবু ঝিমচ্ছেন, হাতের খবরের কাগজ খোলা। পড়া হচ্ছে না। ও দিকে মেজদাদা অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করে আছেন কখন পদ্মবাবুর পড়া শেষ হয় তারপর তিনি পড়বেন। কখনো দেখতুম চটকদার কোনো খবর পদ্মবাবু সকলকে পড়ে শোনাচ্ছেন। খবরের চটকে তাঁর আফিমের মৌতাত ছুটে যেত।

এখনো দেখেছি খবরের কাগজ পড়ার ফাঁকে ফাঁকে পদ্মবাবু আর মেজদাদামশায় উদ্ভিদ বিষয়ে উদ্যান পরিচর্যা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করছেন। মেজদাদামশার কাগজ পড়া হয়ে গেলে আর সকলে পড়তেন। মোটামুটি খবরগুলো দক্ষিণের বারান্দাতেই প্রতিদিন সকালবেলা মুখে মুখে আলোচিত হয়ে যেত। দাদামশায় ছবি আঁকা থেকে চোখ না তুলেই কাগজে ছাপা খবরগুলো সব জেনে ফেলতেন।

কলকাতার আকাশে যখন প্রথম এরোপ্লেন আসে পদ্মবাবুই খবরের কাগজ থেকে সে খবর দিয়েছিলেন দাদামশায়দের। সে কি উত্তেজনা। উড়োজাহাজ, যা কেউ কোনদিন চোখে দেখেনি, ছবিতেই দেখেছে তারই একখানা একেবারে জলজ্যান্ত উড়ে আসবে শহরের মাথার উপর দিয়ে। খবরটা দু-বার তিন-বার পড়া হল। কখন এরোপ্লেনটা আসবে, কোথায় গিয়ে নামবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হল। তারপর যেদিন এলো উড়োজাহাজটা, সকাল থেকে বাড়িসুদ্ধ সবাই ছাদে। আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে সবার চোখ ব্যথা হয়ে গেল। শেষে ছোট্ট বিন্দুর মতো উত্তর আকাশে ক্ষুদে এক ফড়িং-এর উদয়। ক্রমে বড় হতে-হতে মাথার উপর দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দে উড়ে পালালো দৈত্যটা। ছোট একটা 'টু সীটার' প্লেন। তখনকার দিনে ঐটেকেই মনে হয়েছিল এক উড়ন্ত দৈত্য! তারপর দশ বারো দিন ধরে রোজ খবরের কাগজ পড়ে পদ্মবাবুকে শোনাতে হত এরোপ্লেন বিষয়ক নানা খবর।

ভূমিকম্প বন্যা দুর্ভিক্ষের খবর, লাট-বেলাটের খবর, পদ্মার উপর রেলের পুল খোলার খবর, চিড়িয়াখানায় সাদা হাতী আসা, কলকাতা শহরে মনুমেন্টের মাথা ছাড়িয়ে বাড়ি ওঠা আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল খোলার খবর এই সব খবর পদ্মবাবু দাদামশায়কে শুনিয়ে দিতেন। দাদামশায়কে খবর জোগানো আর মেজদাদা-মশায়কে ভালো ভালো গাছ জোগানো

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়ের

আলোচনা-গ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথের বলাকা

অধ্যাপক অমিয়রতন বলেনঃ 'চলার স্নানে' পুণ্য হ'য়ে যুগে যুগে নবোদ্যমে চলে 'নবীন যৌবন'। বলাকাকাব্য এই যৌবনপ্রেমের জয়গান। সাম্প্রতিক সমস্যার কথা নয়, চিরন্তন অমৃতসত্যের আনন্দ-ই এ-কাব্যের ব্যঞ্জনার্থ।

চিরকালের আধুনিক কাব্য

রবীন্দ্রনাথের বলাকা

॥ ৪·৫০ ॥

শান্তি লাইব্রেরী

বিক্রয় কেন্দ্রঃ—৮।২এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

চলেছে, পন্নবাবুকে এই রূপে আমরা অনেক দিন দেখেছি। তারপর হঠাৎ পন্নবাবু মারা গেলেন।

ইতিমধ্যে ক্ষিতীশ আমাদের জোড়াসাঁকো পরিবারে এসে গিয়েছে। ক্ষিতীশের কোনো বাঁধা কাজ ছিল না। কিছু ফাইফরমাস খাটতো আর জোড়াসাঁকো বাড়িতে কোনো অভিনয় হলে রাস্তায় যখন গাড়ির ভিড় হতো তখন গাড়ির গতি এবং অভিমুখ নিয়ন্ত্রণ করে খুব আনন্দ পেত ক্ষিতীশ। আর সন্ধ্যা বেলায় কোথা থেকে একটা খবরের কাগজ জোগাড় করে এনে দাদামশায়কে খবর শোনাতো। পন্নবাবুর স্থান ক্ষিতীশ পূর্ণ করেছিল। তবে তফাত ছিল একটুখানি। ক্ষিতীশের খবর শোনাবার সময় ছিল সন্ধ্যাবেলা। আর ইংরিজী খবরের বদলে ক্ষিতীশ শোনাতো বাংলা খবর। এ দুটোই দাদামশার পক্ষে অধিকতর উপভোগ্য হয়েছিল বলে আমাদের বিশ্বাস।

ক্ষিতীশ একদিন বললে—আমার জাত-ব্যবসা কবিরাজী। আমি মাথায় মাখবার

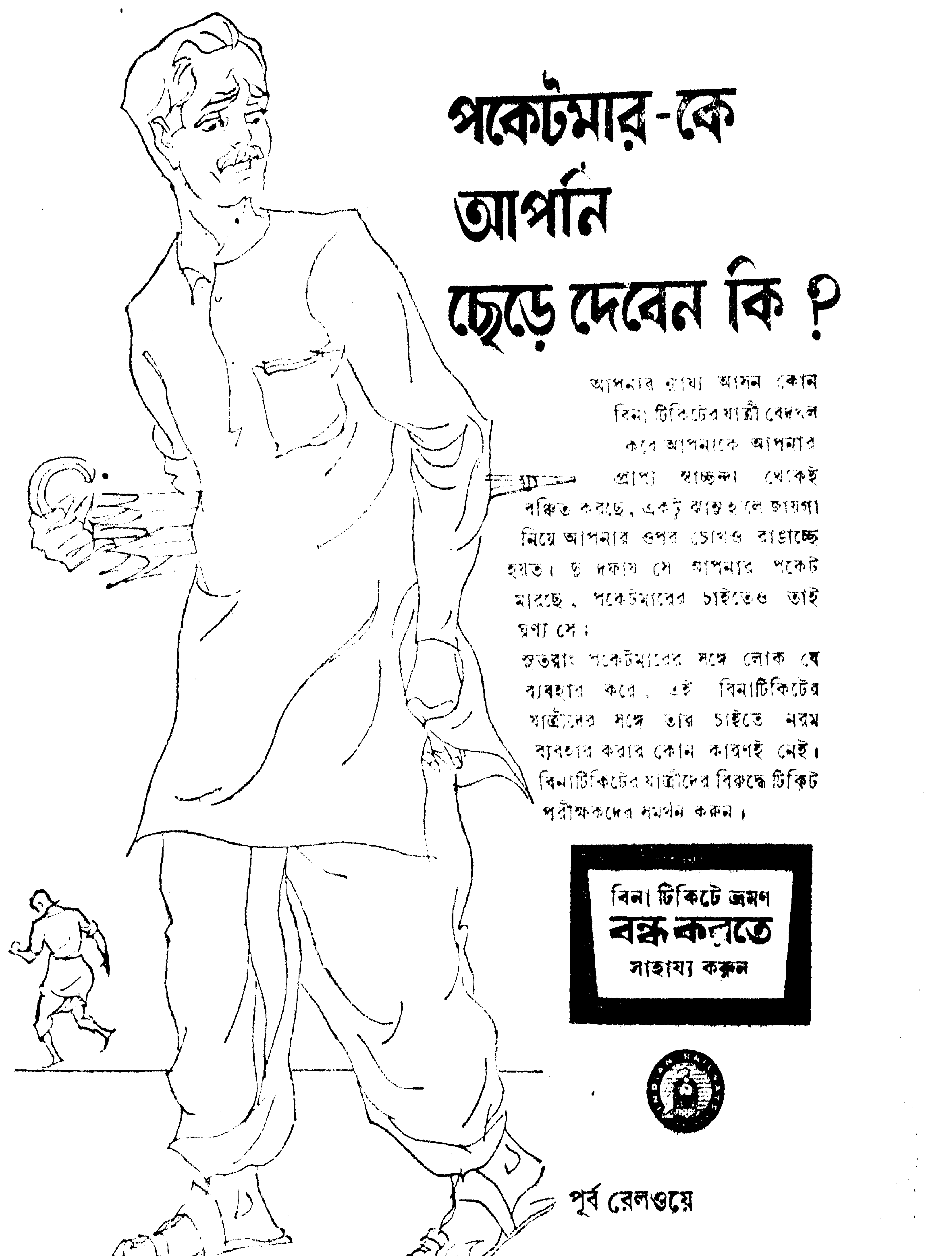

তৈল, তৈরী করব। বাবামশায় একটা নাম দিয়ে দিন।

দাদামশায় বললেন—তৈল্ তৈরী করবে? কবিরাজী তৈল্? বেশ নাম দাও অলকানন্দ।

ক-দিনের মধ্যে দেখি ক্ষিতীশ হাঁড়ি, কড়া, তেল, মশলা, গন্ধ, রং সব কিনে নিজের ঘরের এক কোণে রীতিমত এক কারখানা সাজিয়ে ফেলেছে। আর তৈরী করিয়ে এনেছে একটা রবার স্ট্যাম্প্—ছাপ মারলে তার থেকে এই লেখা বেরচ্ছে—

অলকানন্দ কেশ তৈল
ডাক্তার শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি আই ই
কর্তৃক প্রদত্ত নাম
মাখিলে মাথা ঠান্ডা হয় ও কেশ বৃদ্ধি পায়
মূল্য প্রতি শিশি ৮০

একদিন সকালে ক্ষিতীশ রাশি রাশি কাগজে এই ছাপ মেরে হাজির। দাদামশায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে দেখাতে দাদামশায়ের তো চক্ষু স্থির। বললেন করেছ কি ক্ষিতীশ? ডাক্তার, সি আই ই! তারপর তোমার ঐ পাগলের তেল মেখে লোকের যদি মাথা খারাপ হয় তখন তো আমাকেই ধরবে! নাম দিয়ে আচ্ছা ফাঁসাদে পড়লুম দেখছি!

ক্ষিতীশ দমবার পাত্র নয়। হেসে গলে পড়ে বললে—আজ্ঞে তেলের শিশির প্যাকেটের মধ্যে একটা হ্যান্ডবিল দেব। আপনার একটা সার্টিফিকেট তাইতে থাকলে.....

—তোমার তৈলই মাখলুম না, চোখেও দেখলাম না তার আবার সার্টিফিকেট! ওরে ও মোহনলাল, মোহনলাল! এ দিকে আয়। দেখ কান্ড! বলে চেঁচিয়ে আমায় ডাকতে লাগলেন।

আমি ছুটে এলুম। ক্ষিতীশ বললে—আজ্ঞে তেল আমি নিজে হাতে আপনার মাথায় মাখিয়ে দেব। আপনি সার্টিফিকেটটা লিখে দিন, নৈলে আমার তৈল্ বিক্রি হবে না।

—মোহনলাল, কাগজ নিয়ে আয়।

আমি একখানা কাগজ বাড়িয়ে দিতেই দাদামশায় অলকানন্দ কেশ তৈলের বেশ ভাল করে একখানা প্রশংসাপত্র লিখে দিলেন। তারপর আমায় বললেন—কালিদাসের ঋতু-সংহারটা নিয়ে আয় তো। ঋতুসংহার আনতে দাদামশায় গ্রীষ্মবর্ণনা থেকে আরম্ভ করে বসন্ত বর্ণনা পর্যন্ত দু-চার লাইন করে তুলে নিতে বললেন। প্রচণ্ড-সূর্যঃ স্পৃহনীয়চন্দ্রমাঃ থেকে শুরু করে প্রফুল্ল-চূতাঙ্কুরতীক্ষ্ণসায়কো পর্যন্ত ঢোকা হল।

—দে ঐগুলোকে ক্ষিতীশের হ্যান্ডবিলে ঢুকিয়ে। ছ-ঋতুতেই অলকানন্দ কেশ তৈল মধু চলে—থাকুক কালিদাসের এই সার্টিফিকেট। আমার সার্টিফিকেটটা তাহলে আর লোকের অত চোখে পড়বে না।

এইভাবে ক্ষিতীশের কেশতৈলের প্রচার শুরু হয়েছিল।

একদিন সন্ধ্যায় ক্ষিতীশ এক চার-পেজী খবরের কাগজ হাতে মহা উত্তেজিত অবস্থায় দাদামশায়ের সান্ধ্য বৈঠকে এসে হাজির।

—দেখুন বাবামশায়, আমার তৈলের কথা লিখেছে।

দাদামশায় বললেন—কি লিখলো আবার দেখি। আমাকে ধরবে টরবে না তো?

ক্ষিতীশ দেখালো লিখেছে ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহুল প্রশংসিত এক শিশি অলকানন্দ কেশ তৈল পাইয়া আমরা সবিশেষ প্রীত হইয়াছি। ইত্যাদি।

দাদামশায়ের মুখে হাসি ফুটে উঠল। তারপর বললেন—কত টাকা লাগল ক্ষিতীশ তোমার এই খবরটা কাগজে ওঠাতে?

ক্ষিতীশ মাথা চুলকে বললে—আজ্ঞে টাকা তো লাগেনি। আপনার নাম করতেই হয়ে গেল।

—আমার নাম করতে? আমার নামে বিল্ আসবে না কি?

—আজ্ঞে না, ওদের কাগজে আপনার লেখা ছাপা হবে এই বলে এসেছি।

—ও মোহনলাল, মোহনলাল। এদিকে আয়। ক্ষিতীশ কি কান্ড করে এসেছে দেখ।

যদি আপনি
পেপস্
গলার ও বুকের
বড়ি গ্রহণ করেন
পেপস্ মুখে রেখে দিন—এর আরোগ্যকারী ভাপ কি ভাবে গলার ক্ষত, ব্রঙ্কাইটিস্, কাশি ও সর্দিতে আরামপ্রদানে সাহায্য করে তা অনুভব করুন। পেপস এসবে সঙ্গে সঙ্গে আরামদান ও নিরাময় করে।
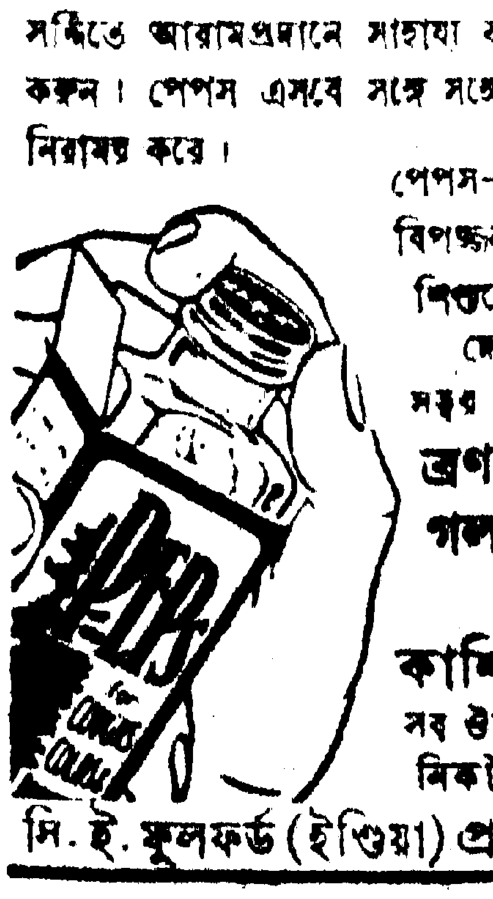
পেপস—কোন প্রকার
বিপজ্জনক ড্রাগ নেই
শিশুদেরও নির্ভয়ে
দেওয়া চলে
সত্বর নিরাময় করে
ব্রঙ্কাইটিস্, গলার ক্ষত, সর্দি, কাশি ইত্যাদি
সব ঔষধ বিক্রেতার
নিকট পাওয়া যায়
সি. ই. ফুলফর্ড (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ
FPY-54-BEN
পরিবেশক—মেসার্স কেম্প এণ্ড কোং লিঃ
১২সি চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১২

বাহির হইয়াছে **শৃণ্বন্তু** কার্তিক সংখ্যা

কার্তিক সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ
শ্রীঅরবিন্দের **অতিমানসের প্রকৃতি**, শ্রীঅনিলবরণ রায়ের **এটমের জন্ম**, নীরদবরণের **শ্রীঅরবিন্দের সাথে সান্ধ্য বৈঠক ও ভ্রাম্যমান**, ভূমানন্দের **শ্রীঅরবিন্দের বাসবদত্তা**, কেমনে পেলাম মায়ের কৃপা সিরিজে **ওর আত্মা আমার কাছে আছে**, মৃগাঙ্ক সরকারের **কাব্যের ফল্গুধারা**, অশোক সেনগুপ্তের **স্লেচ্ছ ক্রিকেট**, এছাড়া **সাহিত্যে নবজাগরণ** ইত্যাদি।

সমস্ত স্টলে পাবেন
মূল্য ৫০ নঃ পঃ; বার্ষিক চাঁদা পাঁচ টাকা।
শৃণ্বন্তু কার্যালয়
৬৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

(সি ১৬২৫)

* তমসো মা জ্যোতির্গময় *

সারদা-রামকৃষ্ণ

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গাপুরী দেবী রচিত
বসুমতী লিখেছেন:—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীসারদাদেবীর... যুক্তভাবে রচিত জীবনকথা এই প্রথম, বহু নূতন ঘটনা আলোচ্য পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।... ভাষা যেমন মধুর তেমনি হৃদয়স্পর্শী।
বহুচিত্রশোভিত পঞ্চম মুদ্রণ—৫,

গৌরীমা

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী বলেছেন:—যে বড় হয় সে একটিই হয়, তার সঙ্গে অপরের তুলনা হয় না। যেমন গৌরদাসী। গৌরদাসী কি মেয়ে? ওর মত কটা পুরুষ আছে?

বহুচিত্রশোভিত তৃতীয় সংস্করণ—৩,

অর্ঘ্য—১.৫০

শ্রদ্ধাঞ্জলি—০.৭৫

বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রবন্ধ ও কবিতায় গৌরীমাতার জীবনব্যাপী সাধন, পরহিতৈষণা, বাগ্মিতা, তেজস্বিতা প্রভৃতি বিভিন্ন দিকে আলোক সংকেত করিয়াছেন।

সাধু-চতুষ্টয়

স্বামিজী-সহোদর মনীষী শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের মনোজ্ঞ রচনা।
পরিবর্ধিত সংস্করণ—১.২৫

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম
২৬, মহারাণী হেমন্তকুমারী স্ট্রীট, কলিকাতা

(সি ১৬২৬)

শুনেছেন সব। বললুম—খবরের কাগজের সম্পাদক যদি এখন তোমার কাছ থেকে লেখা চেয়ে বসেন, তাহলে দিতেই হবে। এড়াবার কোনো উপায় নেই।

এই সময় একদিকে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন, অন্য দিকে সন্ত্রাস আন্দোলনের খবর খবরের কাগজে যা বেরত ক্ষিতীশ বেছে বেছে সেইগুলিই দাদামশায়কে শোনাতো। রাজনৈতিক খবর ছাড়া কোনো আজগুবি অবিশ্বাস্য খবর থাকলে তো কথাই নেই, ক্ষিতীশ আগে সেটা শোনাবে। ছাপার অক্ষরে বেরিয়েছে, সুতরাং খবর তো বটে! আর শোনাতো ফুটবলের খবর। তবে ফুটবলের খবর শোনাবার সময় ক্ষিতীশের বেশ একটা ভেদনিরূপনের ক্ষমতা দেখা যেত। ক্ষিতীশ ছিল ঢাকার বাঙাল। ঈস্ট বেঙ্গল ক্লাব জিতলে সেই খবরের পাতাটা খুলে দাদামশার পায়ের কাছে বসে পড়ত শোনাতে। কিন্তু মোহনবাগান জিতলে খবরটা একেবারেই চেপে যেত। আমরা কেউ খবরটা চুপি চুপি দাদামশার কানে পোঁছে দিলে দাদামশায় বলতেন—ও ক্ষিতীশ, আজকের ফুটবলের খবর তো কই বললে না?

ক্ষিতীশ যেন শুনতে পায়নি এমনি ভাব দেখিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠত—এই দেখুন কুয়োর ভিতর পড়ে এক বুড়ী মৃত হয়েছে! খবরটা পড়ছি। বলে বিশদভাবে বুড়ীর মৃত হওয়ার খবরটা পড়তে শুরু করত। ফুটবলের প্রসঙ্গ আর উঠত না।

তারপর দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন এমন জায়গায় এসে পৌঁছল যে গভর্নমেন্ট সব দিশী খবরের কাগজগুলোকে বন্ধ করে দিলেন।

দাদামশায় বললেন—কি মুশকিল দেখ তো। এই সময়েই খবরের সব চেয়ে বেশী দরকার আর এই সময় খবর নেই! ও ক্ষিতীশ, কি করা যায়? সময় কাটে কি করে? দেখো তো ক্ষিতীশ পায়ের এখানটা কি হল? ফুলে উঠে বড় ব্যথা করছে।

ক্ষিতীশ টিপে টিপে দেখে বললে—আজ্ঞে দেখে তো বিস্ফোটক বলে মনে হয়। ওষুধ লাগানো দরকার।

—তোমার কোনো কবিরাজী ওষুধ জানা আছে না কি?

—আজ্ঞে আছে বই কি। এখনই ব্যবস্থা করছি।

—থাক থাক তোমার ব্যবস্থা করতে হবে না। ডাক্তারকে খবর দাও, কাল এসে দেখে যাক।

ক্ষিতীশের আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা মঞ্জুর হল না দেখে ক্ষিতীশ নিরাশ হল বটে, কিন্তু ডাক্তার এসে যখন বললেন, ফোঁড়াটা বাঁকা রকম এবং ওষুধ দিয়ে ওটাকে ফাটিয়ে বেশ সাবধানে ড্রেসিং করে আস্তে আস্তে সারাতে হবে, তখন মহা উৎসাহিত হয়ে ক্ষিতীশ সমস্ত সেবার ভার নিজেই গ্রহণ করলো।

তারপর বেশ কিছুদিন এই ফোঁড়ার চিকিৎসা নিয়ে কাটলো। যন্ত্রণা বেড়ে উঠলো। পাকলো ফোঁড়া। তারপর ফাটলো। ধোয়া মোছা। বাঁধন খুলে গরম জলে ওষুধে ফোঁড়ার মুখ পরিষ্কার করা। তুলো আর ওষুধ দিয়ে পরতে পরতে জড়িয়ে জড়িয়ে আবার নতুন করে বাঁধা। ক্ষিতীশের সাহায্যে দাদামশায় রোজ দু-বেলা ঘন্টাখানেক ধরে এই করতেন। বাঁধন নিয়ে নানারকম এক্সপেরিমেন্ট-ও চলত। কি ভাবে বাঁধলে সহজে চলা ফেরা করা যায় অথচ বাঁধন ফস্কে ফস্কে পড়ে না, কিভাবে বাঁধলে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয় না, এই সব নানারকম ভৈষজ্য তথ্য আলোচিত ও পরীক্ষিত হত।

শেষে ফোঁড়া যেদিন সেরে গেল, দেখা গেল আর ড্রেসিং দরকার হবে না, দাদামশায় ভারি ভগ্নোৎসাহ হয়ে বললেন—বেশ সময় কাটছিল ক-দিন। কি যে করি এখন? ও ক্ষিতীশ, কি করা যায়?

একে খবরের কাগজ নেই, তার উপর ফোঁড়ার কাজও শেষ। ক্ষিতীশও দেখা গেল বড় দমে পড়েছে।

দিদিমা ভয়ানক চটে গেলেন। বললেন—তোমার যেমন কথা! ফোঁড়া সারলে আমার হরির লুট মানত করা আছে। আবার ফোঁড়া বাধাতে চাও নাকি?

ক্ষিতীশ সেদিন সন্ধ্যেবেলা খুব রহস্যজনক ভাবে দাদামশার ঘরে প্রবেশ করে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে ধপ্ করে দাদামশার পায়ের কাছে বসে পড়ল। তারপর পাঞ্জাবি উল্টে ফতুয়ার পকেট থেকে কতকগুলো ভাঁজ করা ময়লা কাগজ বার করে নীচু গলায় বললে—দাদামশায়, আপনার জন্যে নিষিদ্ধ খবরের কাগজ নিয়ে এলুম।

দাদামশায় চমকে উঠলেন—নিষিদ্ধ? নিষিদ্ধ কি হে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, খবরের কাগজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কংগ্রেসীরা এগুলো বার করছে। বোমার দলের কাগজও এনেছি। সেগুলো আরো ভালো।

—কি সর্বনাশ! তুমি কি আমার হাতে দড়ি দেওয়াবে না কি? কোত্থেকে পেলে তুমি এ সব? তুমিও ঐ দলে নাকি? বিদেয় কর বিদেয় কর।

—দেখুন খুব ভালো খবর আছে। বলে ক্ষিতীশ দাদামশার প্রতিবাদে দৃকপাত না করে লোম-হর্ষক সব খবর পড়ে যেতে লাগল। সেই সব খবরের মধ্যে কতক ছিল ব্রিটিশের অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী আর কতক ছিল বিপ্লবী দলের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাবার পরিকল্পনা। খবরগুলি যেমনই হোক, দাদামশায় শুনে খুব মজা পেলেন।

তারপর থেকে যতদিন খবরের কাগজ, প্রকাশের নিষেধ-আজ্ঞা প্রত্যাহার হয়নি রোজ ক্ষিতীশ নানা রাজনৈতিক দলের গোপন এবং নিষিদ্ধ হাতে-ছাপা বুলেটিন কোথা থেকে যোগাড় করে এনে দাদামশায়কে শোনাতো আর দাদামশায় খুব হাসতেন।

দাদামশায় বলতেন—ক্ষিতীশ এ এক আচ্ছা মৌতাত ধরিয়ে দিয়েছে। ভয়ে কাঁপছি সব্বোখ্খন, অথচ ছাড়তেও পারছি না।

(ক্রমশ)

ধবল বা শ্বেত

শরীরের যে কোন স্থানের সাদা দাগ, একজিমা, সোরাইসিস ও অন্যান্য কঠিন চর্মরোগ, গাত্রে উচ্চবর্ণের অসাড়যুক্ত দাগ, ফুলা, আঙগুলের বক্রতা ও দূষিত ক্ষত সেবনীয় ও বাহ্য দ্বারা দ্রুত নিরাময় করা হয়। আর পুনঃ প্রকাশ হয় না। সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ফোন ঃ ৬৭-২০৫৯। শাখা ঃ ৩৬, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯। (পূরবী সিনেমার পাশে)।

১১শ

টি-বি সীল বিক্রয় অভিযান

আরম্ভ হয়েছে ২।১০-৬০
সমাপ্ত হবে ২৬।১।৬১

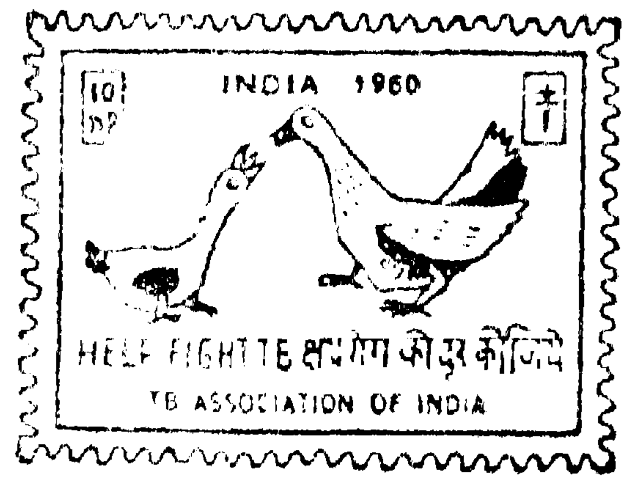

প্রতিখানা ১০ নয়া পয়সা

একখানি সীল কেনার অর্থ আপনার দশ নয়া পয়সা ব্যয়, কিন্তু দুঃস্থের সেবায় এই সামান্য দানই অসামান্য হয়ে উঠবে—সার্বজনীন তার প্রয়োগ। অপরকে কিনতে উদ্বুদ্ধ করুন।

বংগীয় যক্ষ্মা সমিতি

[illegible], সি-আই-টি রোড, কলিকাতা-১৪।

প্রিয়জনোচিত

সত্যেন্দ্র আচার্য

স্টেথসস্কোপটা বুকে লাগিয়ে হয়ত কিছু বলতে যাচ্ছিলেন অনুপম ডাক্তার কিন্তু কম্পাউন্ডার হিরন্ময় মহাপাত্রের উষ্ণ নিশ্বাস অনুভব করলেন। যার জ্বালা যেন মুহূর্তেই পংগু করে দিল অনুপম ডাক্তারের বক্তব্যটুকু। দু' কান থেকে পেতলের চিক্‌চিকে হাতল দুটো দু'-হাতে নামিয়ে গলায় ফাঁস লাগালেন। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে যেন ঠিক গালের ভেতর মার্বেল ঢুকিয়ে উচ্চারণ করলেন, না, সম্পূর্ণ সুস্থ আপনি।

অনুপম ডাক্তারের চোখদুটো কেমন ছোট হল। ভুরু দুটোকে ঠেলে ঠেলে অনেকখানি ওপরে তুললেন। কপালের ওপর ভাঁজ ফেলে ওপরের ঠোঁট দিয়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরলেন। যেন একটু জোরেই কামড়ালেন। ফ্যাঁসফেঁসে গলায় দ্বিতীয় কোন অকারণ উত্তরের আগেই কম্পাউন্ডার হিরন্ময় মহাপাত্র ওদিক থেকে উত্তর দিয়ে উঠেছে অমনি। আজ্ঞে হাঁ।

অনুপম ডাক্তার অনেকক্ষণ অনড় বসে থাকলেন চেয়ারে। গলার ফাঁস খুলে সজোরে অথচ সন্তর্পণে স্টেথস্কোপটাকে কুন্ডলী পাকিয়ে টেবিলের ওপর রাখলেন। তারপর উঁকি মেরে বাইরেটা একবার দেখে নিয়ে কাঙারুর মত লাফিয়ে লাফিয়ে সামনে বাঁধা ঘোড়াটার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

এই নিয়ম. জেলা শহরের এই নিয়মটুকু সেই যুগ যুগ ধরে বয়ে চলেছে এই শহরটার ওপর দিয়ে। ঘোড়াটা যখন প্রথম এ শহরে পদার্পণ করে তখন ছিল অনাদি ডাক্তার। নাম ছিল খুব। দাপট ছিল বিস্তর। ঘোড়াটাও তখন মরদ ছিল। তারপর সময়ের টানাপোড়েনে কত বদলে গেছে এ শহরটা। জুম্মা মসজিদের রং চটে গেছে। দক্ষিণ খোলা মিউনিসিপ্যাল অফিসঘরের মোগলাই কার্নিশের কারুকাজ খসে গেছে। শ্মশানঘাটের সাদা দেওয়ালগুলো কয়লা দিয়ে মৃত ব্যক্তির নাম লিখে লিখে কয়লা-কালো হয়ে গেছে। তবে নিয়মের এতটুকু রদবদল ঘটেনি এই জেলা শহরে।

তাই সকালে উঠে সেই অনাদি ডাক্তারের মত এই অনুপম ডাক্তারকেও চলতি নিয়ম ধারায় পা মিলিয়ে জেলা শহর দাতব্য চিকিৎসালয়ে বসতে হয় ঘণ্টাখানেক। তারপর উত্তর দিকের অমসৃণ কুমীর পিঠ সড়কে কিছুদূর এগিয়ে সোজা মাঠ ভেঙে শ্মশানঘাটের দিকে ঘোড়া ছোটানো। রাত্তিরের শবযাত্রীরা জড়ো হয়ে চুপচাপ সারা রাত্তির বসে থাকে মহাশ্মশানে। ঘোড়া থেকে নেমে সেই অনাদি ডাক্তারের মত আদি রং হারিয়ে ফেলা বিবর্ণ হ্যাটটাকে মাথা থেকে নামিয়ে বগলে চাপেন অনুপম ডাক্তার। তারপর স্ক্যাভেঞ্জারের হাত থেকে 'লিস্টি' নিয়ে ফ্যাঁসফেঁসে গলায় তাচ্ছিল্যে অস্পষ্ট উচ্চারণ করেন—এক নম্বর—

হাজির বাবু। মহাশ্মশানের বুকে পুণ্যলোভাতুর মহাযাত্রীর দল হাতজোড় করে অনুপম ডাক্তারের সামনে ছুটে এসে দাঁড়ায়। হ্যাটে চাপ দিয়ে দাঁতখিঁচোন অনুপম ডাক্তার। হাজির বাবু ? মোলো কিসে ?

স্তব্ধ, নিশ্চুপ শ্মশান প্রান্তর। বড় করুণ কিছু দীর্ঘশ্বাস, দগ্ধ, বড় নিদারুণ হাহাকার প্রতি প্রভাতের এই নির্মল হাওয়ায় যেন ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ওরা চুপি চুপি। সমস্ত শ্মশানটা যেন হাঁ করে হকচকিয়ে মহানেত্রে তাদের চোখে চেয়ে আছে। আর সেই চোখের সঙ্গে এই যাত্রীগুলোর চোখাচোখি হতেই কেউ চোখ বুজিয়ে ফেলে, কেউ খুলে শুধু জল মোছে।

পাষাণ অনুপম ডাক্তারের নির্মম কণ্ঠটা আবার গর্জালো। কিসে মোরলো ?

কিছুক্ষণের জন্যে কোন সাড়া শব্দ নেই। কম্প্রহাতে শবের মালিক অনুপম ডাক্তারের উপরি পাওনাটুকু অনুপম ডাক্তারের হাতে গুঁজে দেয়। নিউমোনিয়া।

অনুপম ডাক্তারের ঘোলাটে চোখদুটো অন্তত তখনকার জন্যে চকচক করে ওঠে। পাপ চুকলো।

নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে শবযাত্রীরা। স্তব্ধ, বড় স্তব্ধ এই শ্মশানটা যেন হাঁ করে চেয়ে আছে এদের চোখাচোখি। কোন প্রতিবাদ নেই। তিনটে তো মোটে চুল্লী। সকলে জানে এ নিয়ে অনুপম ডাক্তারের সংগে তর্ক করলে অনুপম ডাক্তার হ্যাটে চাপ দিয়ে শুনিয়ে শোনাবে—একটায় অনুপম ডাক্তারের মুখ পুড়বে, একটায় তার সুনাম পুড়বে, আরেকটায় যে তার পক্ষীরাজ গো। ভুরুঁদুটো চ্যাটালো কপালের নীচে জন্তুর মত তীব্র আর তীক্ষ্ণ চোখ দুটো জ্বলবে তখন অনুপম ডাক্তারের দপদপ করে।

অথচ—

ঘোড়াটার বাঁধন খুলে একটা চাপড় মেরে ঘোড়াটাকে একটু আদর করলেন অনুপম ডাক্তার। অথচ—

ঘোড়াটার বাঁধন খুলে সামনে দাঁড়ালেই সেই ভাবনার সুতোয় হঠাৎ টান পড়ে। আর তক্ষুনি এক লাফে ঘোড়াটার চেপে বসেন অনুপম ডাক্তার। ভাবতে ভাবতে কুমীর পিঠ অমসৃণ সড়কটুকু শেষ করে ধুধু-মাঠে সজোরে ঘোড়া ছোটান অনুপম ডাক্তার। অনুপম ডাক্তারের চোখের ওপর সুন্দর ছিল নাকি আগের দিনগুলো ?

অনুপম ডাক্তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই শবযাত্রীরা মড়ার গায়ের ঢাকা খুলে দিত। অনুপম ডাক্তার দেখতো কি দেখতো না।

শুধু একবার নিজের হাতখানা পকেটটাকে স্পর্শ করে ফিরে আসত। বিবর্ণ হ্যাটটা বগলে চেপে গম্ভীর গলায় আদেশ দিতেন, জ্বালিয়ে দাও।

অথচ—

ভাবতে ভাবতে ধূধূ-মাঠে ঘোড়া ছোটালেন অনুপম ডাক্তার। অথচ অই হিরণ্ময়। অই হিরণ্ময় মহাপাত্র। ভাবতে ভাবতে খানিকটা ঘাম কপাল থেকে চেঁচে নিয়ে মাঠে ঝরিয়ে দিলেন। সেদিনও তো এই অনুপম ডাক্তার অবসন্ন দেহটা দুলিয়ে দুলিয়ে চুল্লীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ঘোড়া থেকে নেমে সেদিনো এই অনুপম ডাক্তারের নির্দয় হৃদয়টা মোটা টাকার লোভে আদেশ দিয়ে উঠেছিল নাকি, জ্বালিয়ে দাও?

ঘোড়া ছুটছে টগবগিয়ে। ধূধূ প্রান্তরের ওপর ক্ষুরের খটাখট শব্দ যেন বরফের মত গলে যাচ্ছে। সজোরে চাবুক লাগালেন ঘোড়ার পিঠে শ্মশান ডাক্তার অনুপম। যেন আরো জোরে, আরো ঊর্ধশ্বাসে আরো আরো কোথাও, অন্য কোন দূর বেনামী বন্দরে উধাও হয়ে যেতে চাইছেন অনুপম শ্মশান ডাক্তার।

লাশটাকে শ্মশান ডাক্তার সেদিন ভাল করে দেখেছিল কি? ঘোড়ার পিঠে আরেকটা চাবুক লাগিয়ে আবার আজ নতুন করে ভাবতে চেষ্টা করলেন অনুপম ডাক্তার।

ঘোড়া ছুটছে টগবগিয়ে। একরাশ খটাখট তীক্ষ্ন শব্দ যেন তাড়া করেছে পেছন পেছন। ধুলোর গন্ধে মৌমাছি ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটেছে পেছন পেছন। লাশটাকে সেদিন ভাল করে দেখেছিল কি শ্মশান ডাক্তার?

অনুপম ডাক্তারের লোভী হাতদুটো চোখদুটোকে অন্ধ করে দিয়েছিল সেদিন। সেই অন্ধ চোখে পলকমাত্র দেখেছিল শ্মশান ডাক্তার, লাশটা একটা যুবতী মেয়ের। পাছে গ্রামের মধ্যে ঢিঢি পড়ে যায় সেই লজ্জায় নিজে থেকেই বিষ খেয়েছিল মেয়েটি।

কী মেয়ে গো! অনুপম ডাক্তারের বিস্ফারিত চোখদুটো মেয়েটার শেষ যন্ত্রণা-কাতর চোখদুটোয় অপলক তাকিয়ে উচ্চারণ করে উঠেছিল। তারপর লোভী চোখদুটোয় মৃত্যুশীতল মেয়েটার যৌবনে অনেকক্ষণ অপলক তাকিয়ে নিজের হাতেই গায়ের সমস্ত ঢাকা খুলে দিয়েছেন শ্মশান ডাক্তার।

দেখে থ হয়ে গেছেন অনুপম ডাক্তার। নখ থেকে চুল পর্যন্ত [illegible] নগ্ন দেহটার ওপর ওঠানামা করেছে অকারণে অন্তহীন লোভী দৃষ্টিটা। নিজে হাতে লাশটা নেড়েছেন। পরীক্ষার ছলে বহুবার বৃথাই ছুঁয়েছেন। মনে মনে উচ্চারণ করেছেন শ্মশান ডাক্তার, 'ইস, যে কাঁচা বয়সের ছুঁড়ী!'

ধরা গলায় জিজ্ঞেস করেছিল শ্মশান ডাক্তার—একাজ করলো কে? আর সঙ্গে সঙ্গে টাকার হাঁচি শুনতে পেয়েছে শ্মশান ডাক্তার।

কোথায় যেন ওত পেতে বসেছিল এই হিরণ্ময় মহাপাত্র। ঠিক তক্ষুণি ছুটে এসে খপ করে হাত দুটোকে জড়িয়ে ধরে সজোরে মুচড়ে দিয়েছে হিরণ্ময় মহাপাত্র। বেইমান, তোকেই জ্বালিয়ে দেব এক্ষুনি।

মাঠ ভাঙতে ভাঙতে ঘোড়াটা যেন হাঁফাচ্ছে। সেই সঙ্গে অনুপম ডাক্তারও যেন একটু হাঁফালো।

প্রথম চুল্লীটা সবে তখন ধরে উঠেছিল। সে আগুনের ঝাঁঝ এই রোদ্দুর-জ্বলা মাঠে আজ যেন স্পষ্ট অনুভব করছেন শ্মশান ডাক্তার। —তারপর একে একে সব জড়ো হল। অপমানের শেষ রইল না অনুপম ডাক্তারের।

বেশ মনে আছে আজো অনুপম ডাক্তারের, এই ঘোড়ায় চেপে অনুপম ডাক্তার ফেরেনি সেদিন। হাতকড়া লাগিয়ে ঘুষ খাওয়ার

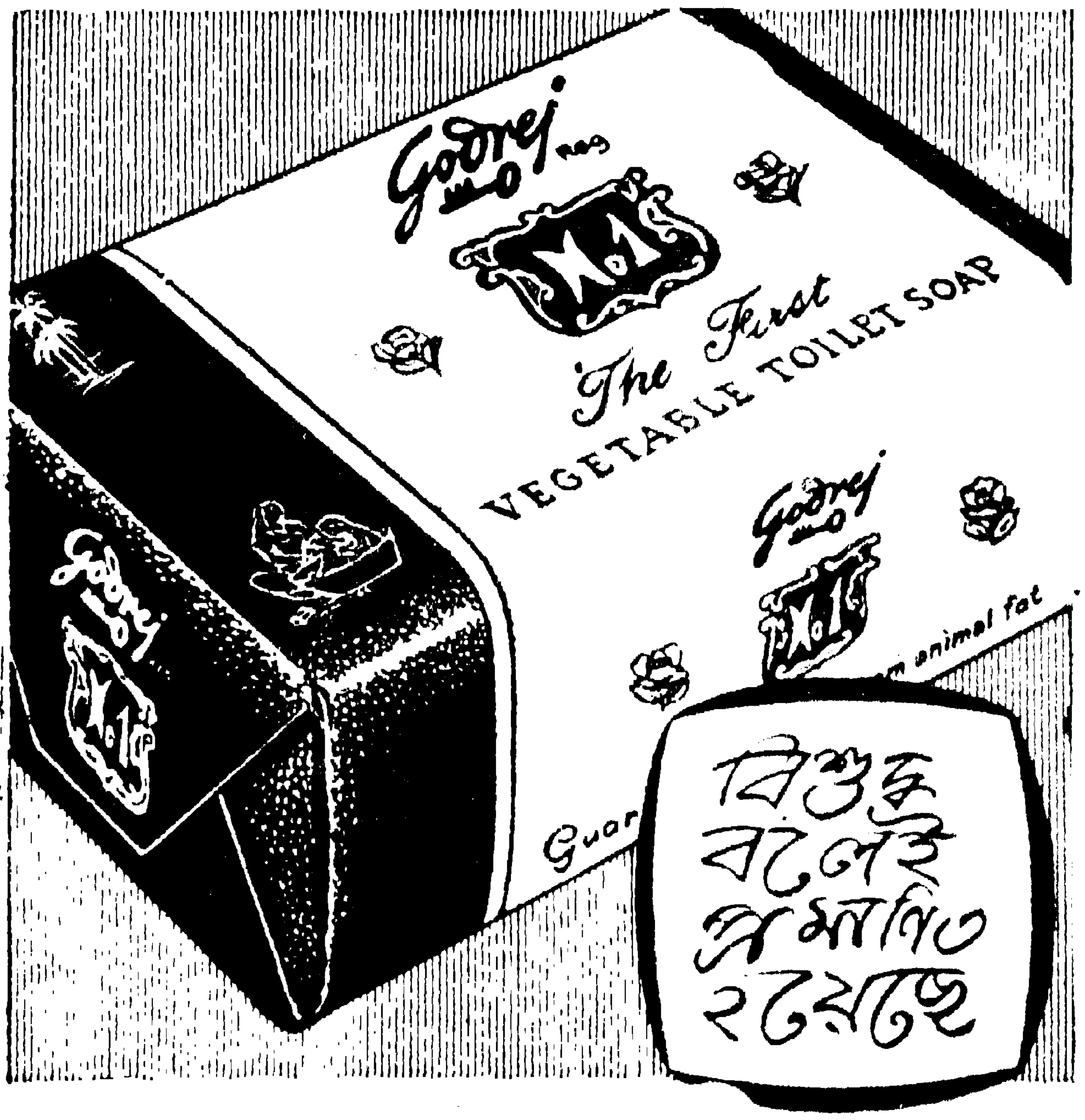

শীতকালে আপনার ফেটে যাওয়া ত্বককে শান্ত করতে সাবানের সেরা (রাজা) বড় সাইজের (রাজা সাইজের) গোদরেজ নং ১ সাবান দিয়ে স্নান করুন। ইহা মেশিনে মোড়া হয়। আর গোলাপ গন্ধযুক্ত তাই এর সৌরভ আপনাকে আনন্দ দেয়।

এ সাবানটিই প্রথম ভেষজ টয়লেট সাবান। সমঝদার ব্যবহারকারী এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা উপকারী এবং বিশুদ্ধ বলেই প্রমানিত হয়েছে।

ভুলবশতঃ কতক সাবান স্বচ্ছ থাকায় বিশুদ্ধ বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু মনে রাখবেন স্বচ্ছ হলেই বিশুদ্ধ এবং ভাল* হবে এমন কোন নজীর নেই।

গোদরেজ নং১
টয়লেট সাবান

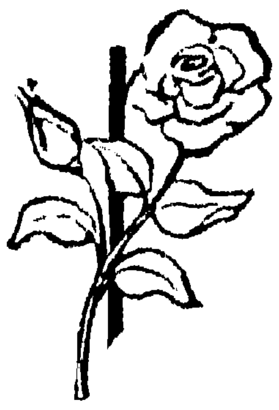

*ইউ. এস. ব্যুরো অব স্টাণ্ডার্ডস এর পরিপত্র "সাবান পরখ করার প্রণালী—"

Godrej গোদরেজ সাবানের সেরা নাম

অপরাধে পুলিসে ধরে নিয়ে গিয়েছিল অনুপমকে। জীবনভোর সঞ্চয়ের শেষটুকু পর্যন্ত ঠেকো দিয়ে যখন ছাড়া পেয়েছিল তখন সন্ধ্যে হয় হয়। শহরের হাডুডু খেলা উৎসাহী যুবকরা অপেক্ষা করছিল থানার সামনে। হিরণ্ময়ের গলায় সুতোয়বাঁধা লাল গোলাপের মালা। লাল। টকটকে লাল। আলোর মালা গলায় দিয়ে এই ঘোড়ার পিঠে হিরণ্ময় যেন ঠিক দেবতার মত বসে। আর—

একটু হাঁফালেন অনুপম ডাক্তার। জুতোর মালা গলায় দিয়ে খবরের কাগজ পরালো শহরের হাডুডুখেলা উৎসাহী যুবকরা। গাধার পিঠে চাপিয়ে ডুগডুগি বাজিয়ে অনুপম ডাক্তারকে ঘুরিয়েছিল সারা শহরটা।

অনুপম ডাক্তার কাঠ। চোখ দুটো হিম। ছ'ইঞ্চি চ্যাটালো কপালের নীচে গর্তে ঢোকা ঘোলাটে চোটদুটো সাহস করে যখন সার দুই খুলেছে তখন শত হাত দূরত্বের অই ঘোড়ার ল্যাজটাই খালি চোখে পড়েছে।

অনুপম ডাক্তার কাঠ। চোখ দুটো হিম। কষে ডুগডুগি বাজাচ্ছে শহরের হাডুডু খেলা উৎসাহী যুবকরা। ছ'ইঞ্চি কপালের ওপর একরাশ কড়ির মত শাদা দুঃখ যেন চকচক করছে। যেন ঘোলাটে চোটদুটোয় দাউ দাউ করে রক্তিম চিতা জ্বলছে।

এত অপমানিত হয়েও তবু ঘৃণা করেনি অনুপম ডাক্তার। শহরে সম্ভ্রমে এবং শ্রদ্ধা করেছে শ্মশান ডাক্তার। দূর থেকে শত ধিক্কারে তনু নীরব অঞ্জলি ছুঁড়ে দিয়েছে। —আহা, হিরণ্ময় মহাপাত্র শুধু মহান নয়, সুমহান, সুমহান।

আর সেই থেকেই কেমন যেন ভয় ভয় করে অনুপম ডাক্তারের। তাই কেমন যেন বদলে গেছেন আজ অনুপম ডাক্তার। সুস্থ ব্যক্তিকে মিথ্যে অসুস্থ সাজিয়ে বহু ভুয়ো টাকা কামিয়ে নিয়েছেন অনুপম ডাক্তার। সেই ঘটনার পর থেকে তাই এই শ্মশান ডাক্তার রোগীকে স্পর্শ করলে হাতের সমস্ত কাজের সঙ্গে আড়ি করে দিয়ে হিরণ্ময় মহাপাত্র চুপচাপ অপেক্ষা করে। শ্মশান ডাক্তার সত্য-মিথ্যে নিয়ে লোফালুফি করেন অনেকক্ষণ।

তারপর মিথ্যেটাকে পেটের দিকে চালান করে সত্যটাকেই ঠোঁটের দিকে ঠেলে দেন শেষ পর্যন্ত।

মাঠ শেষ করে অনুপম ডাক্তারের ঘোড়া শ্মশানঘাটের সামনে এসে দাঁড়ালো। শ্মশান ডাক্তার একবার তাকালো। দেওয়ালগুলোয় অজস্র নাম। কালো কয়লার অজস্র আঁচড়। অনুপম ডাক্তার অন্যমনস্কভাবে আরেকবার তাকালেন। সে মেয়েটার কেউ কি নাম লিখেছিল সেদিন? কেউ? অন্ধচোখে যে মেয়েটাকে অযথা চটকেছিলেন এই মহাশ্মশানে?

ঘোড়াটাকে সামনের একটা দেবদারুর ডালে বাঁধলেন। তারপর শ্মশান চুল্লীর দিকে হাঁটতে হাঁটতে আরো একবার তাকালেন দেয়ালে দেয়ালে।

ইতিমধ্যে তিনটি শব জড়ো হয়েছে। তড়ানো ছিটোনো শবযাত্রীরা একে একে নীরবে অনুপম ডাক্তারের সামনে এসে দাঁড়ালো। শ্মশান ডাক্তার স্পষ্টই উচ্চারণ করলেন, এক নম্বর—

শ্মশান ডাক্তারের ইশারায় শবের গায়ের ঢাকা খুলে দিল। বসন্ত। সেই থেকে নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করেন শ্মশান ডাক্তার। সারা শরীর ভরে অসংখ্য গুটি। অনুপম ডাক্তার চোখ বুজিয়ে বললেন, এক নম্বর চুল্লী।

দ্বিতীয়জন সামনে এসে দাঁড়ালো। সারা রাত্তিরের ক্লান্তি, কি একটা দুর্বোধ্য যন্ত্রণা তারেক আশ্চর্য মানুষে রূপান্তরিত করেছে লোকটাকে। চোখের জল মুছে নীরবে ঢাকাটা খুলে দিল লোকটা।

আহা রে, মারা গেল?

বছর তিনেকের একটা ফুটফুটে বাচ্চা। অনুপম ডাক্তার চোখ বুজিয়ে ফেললেন। আহা রে!

তৃতীয়জন সামনে এসে ককিয়ে কেঁদে উঠলো। অনুপম ডাক্তার নিজের চোখদুটো একটু বুজিয়ে বললেন, কাঁদিসনে, চুপ কর। ভাল করে মড়াটা পরীক্ষা করলেন অনুপম ডাক্তার। সর্পাঘাত। সারা শরীর নীল হয়ে গেছে। মুখের দু'পাশ থেকে নীলচে ফেনা গড়িয়ে গলার খাঁজে খানিকটা আটকে আছে।

পারে না পারে না পারে না। আর পারে না অনুপম ডাক্তার। আর পারে না। আর সইতে পারে না। রোমশ বাহু দিয়ে আস্তে আস্তে লোকটাকে টেনে তুলতে চাইলেন। কাঁদিসনে, চুপ কর। —ডাকরে ডাক, অই সর্বশক্তিমান হিরণ্ময়কে ডাক। ছলছলিয়ে উঠলো চোখ দুটো। গাঢ় নিশ্বাসে সূর্যের দিকে তাকালো অনুপম ডাক্তার—

হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম
তৎত্বং পূষন্নপাবৃনু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।

ডাক, ডাক প্রাণভরে ডাক। সত্যকে ডাক। সব সত্য, সব আনন্দকে আড়াল করে দেখছিস না চোখের ওপর কী আশ্চর্য জ্বলছে? প্রাণ-ভরে ডাক। শান্তি পাবি রে, শান্তি পাবি।

চলন্তিকার

কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস

॥ শক্তিপদ রাজগুরু ॥

মন মানে না ৩·০০

অবাক পৃথিবী ৩·৫০

পথ বয়ে যায় ৩·৭৫

॥ চিত্রগুপ্ত ॥

আমি চঞ্চল হে ৩·০০

॥ নন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

পরপূর্বা ২·৫০

॥ শান্তি দাশগুপ্তা ॥

অগ্নিসম্ভবা ৩·৭৫

॥ মনোজিৎ বসু ॥

বেলা ভূমি ২·৫০

॥ শিবদাস চক্রবর্তী ॥

মেঘমেদুর ২·৫০

॥ মনোজ সান্যাল ॥

শ্বেত-চন্দন ৩·৭৫

চলন্তিকা প্রকাশক

২১২/১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

BUY THE BEST

HIGHLY APPRECIATED

SAMSAD ANGLO-BENGALI DICTIONARY

1672 PAGES • Rs 12·50 n.p.

SAHITYA SAMSAD

32A ACHARYA PRAFULLA CH RD. • CAL-9

ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠ

যাঁহাদের বিশ্বাস এ রোগ আরোগ্য হয় না, তাঁহারা আমার নিকট আসিলে ১টি ছোট দাগ বিনামূল্যে আরোগ্য করিয়া দিব।

বাতরক্ত, অসাড়তা, একজিমা, শ্বেতকুষ্ঠ বিবিধ চর্মরোগ, ছুলি মেচেতা ব্রণাদির দাগ প্রভৃতি চর্মরোগের বিশ্বস্ত চিকিৎসাকেন্দ্র।

হতাশ রোগী পরীক্ষা করুন।

২০ বৎসরের অভিজ্ঞ চর্মরোগ চিকিৎসক

পণ্ডিত এস শর্মা (সময় ৩—৮)

২৬/৮ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯

পত্র দিবার ঠিকানা পোঃ ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা

দি রিলিফ

২২৬, আপার সার্কুলার রোড

এক্সরে, কফ প্রভৃতি পরীক্ষা হয়

দরিদ্র রোগীদের জন্য—মাত্র ৮, টাকা

সময়ঃ—সকাল ৯টা থেকে ১২·৩০ ও বৈকাল ৪টা থেকে ৭টা

আস্তে আস্তে টেনে তুললেন বউটার বুকের ওপর থেকে অনুপম ডাক্তার। থুতনী আর কপালের নীল ফেনা নিজে হাতে মুছিয়ে দিলেন। পরীক্ষা শেষ করে চোখ-বুজিয়ে কোন উপায়ে উচ্চারণ করলেন, তিন নম্বর চুল্লী।

কাজ শেষ। বগল থেকে হ্যাটটা নিয়ে মাথায় চাপালেন অনুপম ডাক্তার। দেয়ালটায় আরেকবার অন্যমনস্ক তাকিয়ে ঘোড়ার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বেলা বেড়েছে। কতকগুলো শকুন কি শঙ্খচিল, ঠিক বোঝা যায় না, ঘুরপাক খাচ্ছে মাথার ওপর। নাড়াচাড়া করতে সকালে ভুল দেখেনি তো? লাফ মেরে ঘোড়াটায় চেপে বসলেন অনুপম ডাক্তার।

শ্মশানের কোলের কাছেই শহর মুখো রাস্তা। মাঠের ওপর দিয়ে বুক ঘষে ঘষে শহরে গিয়ে শেষ। বেলা বেড়েছে। সারা মাঠভরে যেন আগুনের টুকরো ছড়িয়ে পড়েছে। একটা ক্লান্তি, কি একটা উত্তেজনায় ঘোড়ার পেটে একটা জুতোর ঠোক্কর লাগালেন।

জুতোর ঠোক্করে ঘোড়াটা আগে এমনি মাঠের পথে ছুটলে ঘোড়ার ক্ষুরের সঙ্গে সঙ্গে শ্মশান ডাক্তারের খাকি প্যাণ্টের পকেটটা রানারের হাতের বল্লমের ঘুঙুরের মত তালে তালে বাজতো। অথচ—অথচ আজ? কম্পাউণ্ডার হিরণ্ময় মহাপাত্রের পবিত্র দৃষ্টিটা সূর্যের মত সর্বত্র জ্বলছে।

আজ যেন অসহ্য লাগে অনুপম ডাক্তারের এই নিয়ম মাফিক বৃত্তিটা। নির্লোভ, সম্পূর্ণ সনাতন মনটা নিয়ে সকালের সঙ্গে সঙ্গে মিউনিসিপ্যাল দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রাত্যহিক হাজরে দেওয়া আর মরা মানুষ-গুলোকে হাতে ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা। প্রাত্যহিক নিয়মধারার এই নিয়ন্ত্রক গ্লানি কেমন যেন বিষিয়ে তুলেছে অনুপম ডাক্তারের মস্তিষ্ক।

মাঠ শেষ করে শহরের রাস্তার ওপর উঠেছে ঘোড়া। ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে একটা মানুষ যেন চিৎকার করে উঠলো।

চমকালেন অনুপম ডাক্তার। দু'হাতে লাগাম টেনে ঘোড়ার গতিটা সংযত করলেন। আরে, অন্ধমুনি, কী খবর?

অন্ধমুনি। সত্যিই লোকটা অন্ধ। শহরের মুখোমুখি এই পরিত্যক্ত পোড়ো বাড়িটায় ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে আত্মীয়তা পাতিয়ে বাস করে লোকটা। সকলে বলে অন্ধমুনি। আন্দাজে ঘোড়াটার একটা পা জড়িয়ে ধরে বললো, একবার নামবেন বাবু?

ঘোড়া থেকে বসেই অনুপম ডাক্তার সূর্যের দিকে তাকিয়ে বেলাটা পরীক্ষা করলেন। লোকটা একটা পা জড়িয়ে ধরে বললো, অন্ধ হয়েছি, অইতো আমারে সকলে বাবু। একটু আগে আপনার ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ নিয়ে এল। একটু আগেও তো কাঁদছিল। একটু নামবেন বাবু? কার হাত ধরে আর গাঁয়ে ভিক্ষেয় বেরোবো বাবু?

অনুপম ডাক্তার ঘোড়া থেকে নামলেন। চলো। পোড়ো বাড়িটায় ঢুকলো দুজনে। অনুপম ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন অর্ধ উলঙ্গ দেহটাকে। টকটকে তাজা লাল রক্ত পড়েছে চুইয়ে চুইয়ে কাপড়ময়। নিতান্ত বিমূঢ়ের মত স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকলেন অনুপম ডাক্তার। নিস্পন্দ। নির্বাক। প্রস্তর মূর্তি যেন। মাথার মধ্যে একরাশ প্রশ্ন। এলো-মেলো। বিক্ষিপ্ত। অভিজ্ঞ ডাক্তার অনুপম। ছ'ইঞ্চি চ্যাটালো কপালের ওপর দগদগে মোটা শিরা দুটো দপদপ করছে। যন্ত্রণায় কালো হয়ে গেছে নিতান্ত কিশোরী মেয়েটার চোখ দুটো। তাকালেন অনুপম ডাক্তার। বারবার তাকালেন। স্ফীত তলপেটটায় বারবার কটাক্ষ করলেন অনুপম ডাক্তার।

প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে ঘোড়ায় চাপলেন শ্মশান ডাক্তার। শ্মশান ডাক্তারের যে ঘোলাটে চোট দুটো সূর্যের দিকে তাকিয়ে এখনো বেলা ঠিক করতে পারে, সে দুটো চোখ, অই সুমহান হিরণ্ময় মহাপাত্রকে তিন নম্বর আলমারির বিষ ওষুধগুলো নিয়ে

ইচ্ছামত সন্তানের জন্ম বন্ধ রাখতে হলে পড়ুন
শ্রীবিজয় বসাক প্রণীত
বিনা খরচায় জন্মনিয়ন্ত্রণ
[৩য় সংস্করণ] দাম—২,
প্রাপ্তিস্থান : প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী,
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২
(সি ৯৫৭১)

হেমাটো সার্সাপ্যারিলা
রক্তশোধক, বলবর্ধক, বাত ও চর্মরোগ নাশক পুষ্টিকর সালসা
সকল বয়সে সমান উপযোগী
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ • কলিকাতা-৬

সোএলের পরিচয় ব্যবহারে
ডট্ কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রীজ
১৮, পার্শী চার্চ স্ট্রীট, কলিকাতা-১

কুমারেশ
লিভার ও পেটের পীড়ায়

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

৫৪

আর্ট থিয়েটারে—যখনই যে-পার্ট আমাকে দেওয়া হয়েছে, আমি কখনো না করিনি। 'গোলকুণ্ডা'র ঔরংগজেব-চরিত্রটি ছোট পার্ট, কিন্তু তাহলেও আমি 'না' করলাম না। এবং মনে খুঁতখুঁতিও ছিল না। কারণ, পড়ে দেখলাম, পার্টটি ছোট হলেও পার্টটি ভালো, পার্টের মধ্যে একটা বিশেষত্ব বিদ্যমান। ঔরংগজেবকে এখানে যেরকম দেখানো হয়েছে, তাতে অদ্ভুত লাগল ভূমিকাটি। গোলকুণ্ডা তিনি জয় করতে চান, কিন্তু পিতার নিষেধ, সেজন্য যুদ্ধাদি করা চলছে না, তাই নিয়েছেন কৌশলের আশ্রয়। ফকিরের ছদ্মবেশ ধারণ করে রাজ্যের চারদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই ঘটনার প্রক্ষেপনটি ভালো লাগল। প্রথম দৃশ্যেই তাঁর পুত্র মহম্মদকে তিনি যেখানে বুঝিয়ে দিচ্ছেন গোলকুণ্ডা তাঁর চাই কেন, সেখানকার সংলাপাংশও বেশ ভালো লাগছে। কথায়-কথায় পুত্রকে তিনি বলছেন—"মহম্মদ, ধর্মের জন্য রাজ্য, না, রাজ্যের ধর্ম?...মূর্খ, এখনো হাঁ করে মুখের পানে চেয়ে? খাওয়ার জন্য বাঁচা না, বাঁচার জন্য খাওয়া?

মহম্মদ বললে—বাঁচার জন্য খাওয়া।

ঔরংগজেব বললেন—ব্যাস, তাহলে ধর্মের জন্য রাজ্য।

ঔরংগজেব-চরিত্রের এই দিকটাই আমার মনে সাড়া জাগালো বেশী। ধর্মের ভণ্ডামী নয়, ধর্মের প্রতি যথার্থ অনুরাগ ও বিশ্বাস। যদুনাথ সরকার-মশায়ের ইতিহাস পড়েও একথা মনে হয়েছে, ধর্মের ব্যাপারে ঔরংগজেবের কোনো ভণ্ডামী ছিলনা। তাঁর বিশ্বাস ছিল, ধর্মবিস্তারের জন্য রাজ্য-বিস্তারের প্রয়োজন। তাঁর কাছে ধর্ম হচ্ছে শক্তি, আর এই শক্তির স্ফুরণ হচ্ছে রাজ্য-বিস্তারের। ঔরংগজেবের চরিত্রটিকে আমি অন্তত এইভাবে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিলাম।

গোলকুণ্ডা'য় ঔরংগজেবের যতগুলি দৃশ্য আছে, সবগুলিই বিচিত্ররকমের। অভিনেতা-হিসাবে তাতে আমি 'রস' পেয়েছিলাম। যেমন ধরা যাক পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের ঘটনাটা। ফকির-রূপে ঔরংগজেব ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাঁকে এসময় চিনতে পেরেছেন কুতুব সা'র লোক। পারসিক রেজাক খাঁ ছিলেন কুতুব সার বিশ্বস্ত অনুচর, তিনি ওঁকে চিনতে পেরে বলছেন—

—সুলতান, আপনি বন্দী।

ঔরংগজেব বললেন—জীবন থাকতে ঔরংগজেব বন্দী হবে না।

—তবে অস্ত্র ধরুন।

ঔরংগজেব বললেন—করুণাপরবশ হয়ে একসময় আমিই যাকে পঞ্চসহস্র সৈন্য ভিক্ষা দিতে চেয়েছিলুম, তার সংগে যুদ্ধে অস্ত্রও ধরব না।

তারপরে, আরও কিছু কথাবার্তার পর—রেজাক খাঁ বললেন—তবে প্রস্তুত হোন।

ঔরংগজেব বললেন—একটু ঈশ্বরের আরাধনা করবার সময় দিতে আপত্তি আছে?

—না সুলতান, আমিও মুসলমান।

তারপরে, বইতে লেখা আছে—"(আওরংগজেব উপাসনায় বসিলেন)"

এটা আওরংগজেবের ভণ্ডামী নয়, মনে-প্রাণে এটা উনি বিশ্বাস করতেন বলে আমার ধারণা, যে, ঈশ্বরের আরাধনাকালীন তাঁর কোনো ক্ষতি হবে না, এবং ঈশ্বরের আরাধনার ফলস্বরূপ আকস্মিক বিপদ থেকে তিনি উদ্ধারও পাবেন। স্যর যদুনাথ ঠিক এধরনের একটি ঘটনার উল্লেখ করে গেছেন তাঁর বইতে। আফগানিস্তানের উত্তরে ছিল 'বালখ' বা বাহিলক দেশ, সেখানে যুদ্ধ হচ্ছে, সম্রাট সাজাহান তাকে পাঠিয়েছেন সেনাপতি করে। বাহিলকের অধিবাসীরা প্রবল যোদ্ধা ছিল—শক্তিমান ছিল—তার ওপরে পার্বত্য দেশ—কঠিন ও বন্ধুর পথ আজকের দিনে যাকে গরিলা যুদ্ধনীতি বলে, সেইভাবে যুদ্ধ চালাতো তারা, এদিক থেকে ওদিক থেকে আচমকা শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত তারা। সুতরাং সহজ নয় এদের সংগে যুদ্ধ চালানোর ব্যাপারটা। অনেক সেনাপতি পাঠানোর পর অবশেষে ঔরংগজেবকে সেখানে পাঠালেন সাজাহান। বলা বাহুল্য, এ-যুদ্ধ তিনি জয়ও করেছিলেন। ভাষান্তরে, দমনও করেছিলেন বাহিলকবাসী বিদ্রোহীদের। তা, এই যুদ্ধবর্ণনার মধ্যেই এক-যায়গায় আছে, যে, যুদ্ধ করতে করতে

অমর কথাশিল্পী
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অশনি সংকেত
৪·৫০

ছায়াছবি
৩·০০

নীলগঞ্জের
ফালমন সাহেব
৩·৫০

অনুসন্ধান
৩·০০

ঊর্মি মুখর
২·৭৫

বিভূতি প্রকাশন
২২এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা—১২

হঠাৎ ঔরংগজেব দেখলেন—সূর্য অস্ত যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে। যেই দেখা অমনি তিনি করলেন কী, হস্তীপৃষ্ঠ থেকে নেমে এসে—কার্পেট পেতে—ঐ যুদ্ধক্ষেত্রেরই মাঝখানে নামাজ পড়তে শুরু করে দিলেন। দৃশ্যটি এমন অভিনব, যে, শত্রুমিত্র নির্বিশেষে, সবাই যুদ্ধ থামিয়ে অবাক হয়ে—তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে! ঔরংগজেবের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এই, 'ভগবানের নাম যখন করছি তখন বর্ম হয়ে ঘিরে থাকবে আমাকে তাঁর আশীর্বাদ, কেউ আমাকে তখন বধ করতে পারবে না।'

এখন, এই যাঁর একান্ত বিশ্বাস, তাঁকে ধার্মিক না বলে ভণ্ড বলি কী করে?

এটা পড়া ছিল, তাই 'গোলকুণ্ডা'র ঐ দৃশ্যটিতে আন্তরিকভাবেই তিনি নামাজ পড়তে শুরু করলেন। প্রার্থনা করলেন, পরে উঠে দাঁড়ালেন। ইতিমধ্যে হলো কী, অতর্কিতে অন্যত্র আরেক বিপদ দেখা দিল যার জন্য রেজাকের স্ত্রী সেলিনা ফিরে এসে স্বামীকে ডেকে নিয়ে চলে গেলেন। রেজাক বললেন ঔরংগজেবকে—'আমি চললুম আরেকজন ফকিরকে রক্ষা করতে।' চলে গেলেন রেজাক খাঁ।

বর্ণনায় বিস্তারিত কিছু এনে লাভ নেই। মোট কথা, বড়ো শান্তি পেলাম অভিনয়টি করে। হাসান-মীরজুমলা-এসব হচ্ছে বড়ো পার্ট, তাদের তুলনায় 'ঔরংগজেব' কিছুই নয়। তবু তাঁর চালচলন—তাঁর মুখের ভাষা শুধু তাঁর মুখেরই যা কম, সর্বত্রই সংলাপাংশ অত্যন্ত মধুর—প্রভূত প্রশংসা লাভ করেছিল। অভিনয়টা করে মনে একটা কামনা জাগল—ঔরংগজেবের বড়ো পার্ট কি আমি কোথাও করতে পাই না? এমন একখানা বই, যাতে ঔরংগজেবের পার্টটি বড়ো আছে, তাতে যদি অভিনয় করি, তো কেমন হয়?

এ অভিলাষের ফলস্বরূপ কী হয়েছিল, সেকথা যথাসময়ে বলব, আপাতত 'গোলকুণ্ডা'র ব্যাপারটা শেষ করে নেই।

উমাচল-গ্রন্থাবলী

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী প্রণীত

যোগবলে রোগ আরোগ্য

(সহজ যৌগিক উপায়ে সর্বরোগের চিকিৎসা)—৫।০; Yogic Therapy (ঐ, ইংরাজী)—৫; **যৌগিক ব্যায়াম** (আসন-মুদ্রা ও প্রাণায়াম ইত্যাদি)—৪; **ব্রহ্মচর্য**—২॥০; **ঈশোপনিষৎ**—২; **খাদ্যনীতি**—১।০ [সব বই একত্রে—২০]

শ্রীনারায়ণী—লিজেল রেমোঁ **নিবেদিতা**—৭॥০

যুগাচার্য বিবেকানন্দ স্বামীর মানসকন্যা নিবেদিতার অপরূপ জীবনী—মূল ফরাসী হইতে সম্মোদিত বাংলায় স্বচ্ছন্দ অনুবাদ।।

উমাচল প্রকাশনী

৫৮।১।৭বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলি—৬

(সি-৮৬১৫)

অভিনয় তো ভালোই হয়েছিল, কিন্তু 'গোলকুণ্ডা' নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে বেধে গেল তুমুল বাদ-বিসম্বাদ। ইনি যদি সমালোচনা লেখেন, তো উনি দেবেন সে সমালোচনার উত্তর। এইভাবে আবার উত্তর-প্রত্যুত্তরও চলতে থাকে। "অবতার" ১৯শে ফেব্রুয়ারী (১৯২৫)-এ লিখলে—"গোলকুণ্ডা কী? উহা কি নাটক? সন্দেহ হইল। নাটকের উপাদান কবিত্বের সুষমায় মণ্ডিত হইয়াছে, নাটকত্ব ফুটে নাই কিন্তু ছত্রে-ছত্রে এমন কবিত্ব ফুটিয়াছে, যাহা দুর্লভ। সবাই ক্ষীরোদপ্রসাদের ভাষা এমনই শক্তিময়ী।"

'বৈকালী' লিখলে—ওটা নাটকই নয়, নাটক হয়নি ইত্যাদি ইত্যাদি।

তার উত্তরে "শিশির" আবার লিখলে—নাটকটি খুবই ভালো। ইত্যাদি।

'শিশির'কে তৎক্ষণাৎ আবার আক্রমণ করলে 'বৈকালী'। তখন 'বৈকালী' যেভাবে লিখতেন, তাতে 'বৈকালী'কে অনেকে স্টারেরই কাগজ বলে মনে করত। এমন যে 'বৈকালী' সে-ও হঠাৎ ক্ষেপে গেল। পরস্পরের মধ্যে এইসব চলতে চলতে হঠাৎ দেখি, 'শিশির'ও বেঁকে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা শেষপর্যন্ত নাটক ছেড়ে স্টারের কর্তৃপক্ষের সমালোচনা শুরু করে দিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল—এ বই [illegible] পড়লে ফুল ফুটে যেত। কিন্তু এইবার আছে কী? অপরেশচন্দ্রের নাটক তো নয়ই—স্টারে নতুন সব লোকজন এসেছে, কাজেই আশা হলো আমাদের, এখন দেখছি সেই পেশাদারী হাতে পড়েই সব পড়েছে। ওঁরা সেসব দেখেও দেখছেন না। এর উত্তরে অন্য কাগজে লিখলে—এসব কেন? নাটক দেখে নাটকের সমালোচনা করো, এসব আলোচনা কেন? আমরা তো দেখছি স্টার সপ্তাহে পাঁচ দিনই অভিনয় করাচ্ছেন, স্টার বারবেলা পর্যন্ত মানছেন না।

এইসব আলোচনা এতদূর শেষপর্যন্ত গড়ালো যে, স্টারের কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে 'শিশির'কে বলে বসলেন—ঘরের কথা তাঁরা যদি এভাবে বলা শুরু করেন তো, তাঁরা বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেবেন।

'শিশির' তাতে গরম হয়ে লিখলে—'বিজ্ঞাপনের জন্য লিখি নাকি? ওঁরা কী মনে করেছেন?' ইত্যাদি।

শেষ পর্যন্ত 'নবযুগ' করলে কী, ২৮।২।২৫ তারিখে দুটো কার্টুনই ছেড়ে দিলে। রঙ্গালয়ের দরজার সামনে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন, আর তাকে দেখে একটি সারমেয় 'অসন্তোষের চীৎকার' করছে। ওপরে ক্যাপশন—বিজ্ঞাপন পাইবার পূর্বাবস্থা। পাশের ছবিটিতে লেখা—'বিজ্ঞাপন পাইয়া'—তাতে দেখানো হয়েছে সারমেয়টি মাংসের টুকরো খাচ্ছে। নীচে, ক্যাপশন—'অনুমোদন জ্ঞাপন।'

ব্যাপারটা তখন ঐ পর্যন্ত গিয়ে গড়ালেও, পরে, 'জনা' অভিনয়ের সময়ে আবার এধরনের বাদ-বিসম্বাদ উঠেছিল উত্তাল হয়ে। সমালোচকে-সমালোচকে সে যুদ্ধ দাঁড়িয়েছিল একেবারে খেউড় পর্যন্ত।

স্টার ইতিমধ্যে নতুন আর কী বই ধরা যায় সেই সব ভাবছেন, ইতিমধ্যে 'ক্যালকাটা' কাগজে আবার এক সুদীর্ঘ সমালোচনা বেরুলো 'গোলকুণ্ডা'র। সমালোচনার নীচে কারুর নাম নেই, কিন্তু ইতিহাসের খুঁটিনাটি নিয়ে এমন মাথা ঘামানো মনে হলো এ আমাদের [illegible] না হলেই যায় না। নইলে ইতিহাসের কচকচি নিয়ে এমন [illegible] আর করবে কে? [illegible] ও [illegible] ঐতিহাসিক [illegible] হয়েছেন। কিন্তু, নাটক-নোভেল [illegible] শুদ্ধ ঐতিহাসিক—[illegible] ছাড়া অন্য কে হতে পারে? [illegible] আমার [illegible] ঠিক [illegible] সমালোচনায় ছিল। লিখেছেন—

"The author choose the right place for the setting of his story, but he forgot to study the locality. Names of places and persons are delightfully mixed up."

আরও লিখেছেন—'Aurangzeb himself appears in the garb of a Fakir, a sort of garb which no respectable Musalman Fakir will ever wear. . . . . The Fakir usually wears a garment of patchwork called the 'Jallab'. No Musalman Fakir ties the turban on his head in the fashion in which Mr. Ahindra-Chowdhury does it. His turban reminds one of the first attempts of Behari syces after obtaining their first employment in Calcutta.

এই সময় আরও এক রীতি কাগজে কাগজে দেখা যেতে লাগল খুব, সে হচ্ছে পত্র প্রেরকদের পত্র ছাপানো। আগেও ছিল, তবে এতটা ছিল না। নালিশ থাকলে পত্র লেখক লিখতেন বই কী! কিন্তু, এখন আর সেসব নয়, এখন, সমালোচনা, এমন কি নিছক পাণ্ডিত্য জাহির করবার জন্যও কেউ কেউ লিখতেন। এঁদের বলা যায়—"ফ্রী লান্সার" সমালোচক। কে কতোটা ইয়োরোপীয় থিয়েটার বুঝেছেন, সে-সব জ্ঞানের প্রকাশই থাকত বেশী। এধরনের পত্র প্রকাশ আগেও ছিল, তবে এবার হলো বেশী। "গোলকুণ্ডা" নাটকের "হাসান" (নির্মলেন্দু) সম্পর্কে প্রত্যেকটি কাগজ একবাক্যে প্রশংসা করেছেন। কিন্তু তবু পত্র আসতে লাগল কাগজে-কাগজে, কেউ লিখছেন—'হাসান' চরিত্রটি বুঝতে পারেন

লোকে। এবং এই বুঝতে না-পারার প্রসঙ্গ কেউ কেউ আবার পত্র-যোগে চরিত্র বিশ্লেষণ করে বোঝাতে বসলেন। সে এক কাণ্ড!

ঐ সময়, তারিখটিও উল্লেখ করতে পারি, ২৫ সালেরই ১০ মার্চ—ফরোয়ার্ডে বিরাট এক প্রবন্ধ বেরুলো—"আর্টিস্টস্ অফ দি নিউ এরা" শিরোনামা দিয়ে। শিশিরবাবু, আমি ও তিনকড়িদা—এই তিনজনের অভিনয়ের তুলনামূলক সমালোচনাই ছিল তার বিষয়বস্তু। এধরনের প্রবন্ধ পরে আরও কতো বেরিয়েছে, কিন্তু, আমাদের নিয়ে সেই-ই বেরিয়েছিল প্রথম। লোকের তখন যে ওসব লক্ষ্য পড়েছে, এটাই হচ্ছে—খবর। পরে কিছু কিছু অবকাশ মতো, তুলে দেওয়া যাবে।

যাই হোক, প্রসঙ্গ ছাড়িয়ে আবার চলে এসেছি। ১১ই ফেব্রুয়ারী—অসুখ থেকে উঠে—দুর্গাদাস এসে আবার কাজে যোগদান করলে 'ইরাণের রাণী'তে তার পূর্বেকার 'কাত্তী'র ভূমিকায়। ঐদিনে কৃষ্ণভামিনীও কাজে যোগ দিয়েছে; সুবাসিনীও ফিরে এসেছে। সবাই পুরনো, একমাত্র 'দাউদশা' গেছে বদলে, 'দাউদশা' এবার করলেন নরেশ মিত্র।

তার পরের দিন—বৃহস্পতিবার—খোলা হলো—বঙ্কিমের 'মৃণালিনী'। পুরাতনের মধ্যে নির্মলেন্দু-প্রফুল্ল সেনগুপ্ত-নীহার যে-যার ভূমিকা করলে, দানীবাবু 'পশুপতি' এসে হঠাৎ-ই পড়ল আমার ঘাড়ে। 'দিগ্বিজয়' সাজলেন কাশীবাবু। গিরিজায়া সাজলেন আশ্চর্যময়ী (যদিও সুবাসিনী ফিরে এসেছে)। মনোরমা—সুশীলাসুন্দরী। এঁর মনোরমা মিনার্ভায় আমি আগেও দেখেছি। আর্ট থিয়েটারে যোগ দিয়ে উনি প্রথম ভূমিকাই করলেন—এই মনোরমা। সুন্দর কণ্ঠস্বর নিখুঁত উচ্চারণ, দেখতেও—ছিলেন দীর্ঘাঙ্গিণী—যাকে বলে 'স্টেজ-ফিটিং চেহারা।' এর এই সব গুণাবলীর জন্যই যখন প্রথম এলেন স্টেজে, তখন একেবারে 'নায়িকা'র ভূমিকা নিয়েই দেখা দিয়েছিলেন। সেযুগে—সেই শিশিরকুমারীর যুগে—প্রথমে—এসেই করলেন একেবারে—'নাহারিণ', এবং অধ্যাপক মন্মথনাথ বসুর শিক্ষকতায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তখন সুশীলাসুন্দরী এই গুণগুলি থাকার দরুণ। আর্ট থিয়েটারেও পরে ইনি অনেক ভালো ভালো পার্ট করেছিলেন।

পশুপতি——আমার আগে দানীবাবুই করেছেন—মাঝে মাঝে তিনকড়িদাও করেছেন। আমার দানীবাবুর রকমটি পছন্দ হওয়াতে প্রায় সেই-ধরনেরই করলাম। বিশেষ করে, সেই দৃশ্যে, যেখানে, অষ্টভুজা মাতৃমূর্তিকে তুলে নিয়ে বিসর্জন দিতে চলেছেন পশুপতি। দানীবাবু সে সময় যেরকম ভাবে বাঁ-হাঁটু পেতে, ডান হাঁটু উঁচুতে রেখে বাঁ-হাতে দেবীর চরণ বেষ্টন করে—ডান হাতে তাঁর কোমর ধরে—আর কাঁধটা প্রতিমার কটিদেশে চেপে রেখে—মুখটা বেঁকিয়ে দর্শকের দিকে তাকিয়ে সংলাপ বলতেন, আমিও সেটা হুবহু করেছিলাম। অবশ্য এযায়গায় যেধরনের সংলাপ আছে, তা ঠিক ভাবে বলতে গেলে, আর কোনো ভঙ্গিতে হয় বলে মনে হয় না, তাই গিরিশচন্দ্রের ঐ ভঙ্গিমায় যে ছবি দেখেছিলাম—সেটা অনুসরণ করতেন দানীবাবু—তিনকড়িদাও তাই করে গেছেন, —সেই ছবি একেবারে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল মনে, তার থেকে অন্যরকম করবই বা কেমন করে?

আমার সৌভাগ্য, দানীবাবুর বদলে আমি নামাতে, দর্শকরা কোনো আপত্তি করেননি এবং কাগজও অখ্যাতি করেননি।

এই নাটকের পর প্রস্তুতি চলতে লাগল বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ' অভিনয়ের। এতে আমার ভূমিকা কিছু ছিল না। ৪ঠা মার্চ বুধবার 'বিষবৃক্ষ' খুলে গেল। নগেন্দ্রনাথ—দানীবাবু, শ্রীশচন্দ্র—নির্মলেন্দু, হরদেব—ননীগোপাল মল্লিক, ডাক্তার—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত, সূর্যমুখী—কৃষ্ণভামিনী, কমলমণি—রাণীসুন্দরী, দেবেন্দ্র—আশ্চর্য-কুন্দনন্দিনী—নীহারবালা, হীরা—সুবাসিনী, ময়ী।

সত্যি কথা বলতে কী, এই বইতে অভিনেত্রীদের অভিনয়ই সব চাইতে সেরা হয়েছিল। বিশেষ করে, সূর্যমুখীর ভূমিকা কৃষ্ণভামিনী যা করলে, তা এককথায় —অপূর্ব। একদিকে তেজস্বিনী—মহিমময়ী, স্বামী-সোহাগিনী, অন্যদিকে—ঘটনা পরম্পরায়—স্বামীর অনাদৃতা হয়ে যে মলিন মূর্তিতে পরিণত হলেন,—এদুটি অবস্থাই অতি সুন্দর রূপে ফুটিয়েছিল কৃষ্ণভামিনী। বিশেষ করে যেখানে কমলমণিকে আসতে লিখেছেন সূর্যমুখী, কমলমণি এসেছে, চারিদিকে খুঁজছে—গোধূলিবেলা—সন্ধ্যা হয়ে আসছে—সে ডাকতে ডাকতে ঢুকছে —আর একটা ঘরে মলিন বেশে ম্লানমুখে তন্ময় হয়ে নিজের অবস্থার কথা, নিজের স্বামীর কথা ভাবছেন সূর্যমুখী, কমলমণির ডাক তার কানে ঢুকছেও না!

কমলমণি ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেছে, বললে—এ কী বউ, তুমি এভাবে—এখানে?

যে ঘরে সূর্যমুখী বসেছিল, সে ঘর তার বাস নয়। ভাবটাও সূর্যমুখীর অনুরূপ নয়, কমলমণির তাই বিস্ময়।

সূর্যমুখীর তখন চমক ভাঙল, সে তাড়াতাড়ি—"ও-ঠাকুরঝি", বলে উঠে, জড়িয়ে ধরলে তাকে দুহাতে; ধরে, তার বুকে মুখ রেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে।

এত ভালো করলে যে, হাততালি পড়ে গেল দর্শকদের মধ্যে। কৃষ্ণভামিনীর ঐ "ও-ঠাকুরঝি" বলা—আর তারপর সবটাই ত নির্বাক অভিনয়, কিন্তু এমন অভিভূত হয়ে পড়লেন দর্শক, যে, হাততালি দিয়ে উঠলেন।

আমি বসেছিলাম ভিতরে, ইন্দু, উইংসের পাশ থেকে দেখছিল, এসে বললে—দেখলে না? কাল দেখো।

আমি যা ভেবেছিলাম কৃষ্ণভামিনী উত্তরোত্তর উন্নতি করবে, তাই হলো। ওর সত্যিই প্রতিভা ছিল, তার বিকাশ হচ্ছে পূর্ণ বিভায়।

এইভাবে 'বিষবৃক্ষ'-এর দ্বিতীয় সপ্তাহ হয়ে গেল, তৃতীয় অভিনয় হবে ১৮ই মার্চ। দানীবাবু তখন বিদেশে গিয়েছিলেন। রাঁচিতে ওঁর স্ত্রী ছিলেন—কী যেন অসুখ—আজ মনে নেই—সেখানেই চিকিৎসা চলছিল—রেডিয়াম ট্রিটমেণ্ট না কী—দানীবাবু সপ্তাহে সপ্তাহে যেতেন, সোমবার ফিরতেন। কিন্তু এবার, মঙ্গলবার রাত্রে হঠাৎ টেলিগ্রাম এলো, দানীবাবু আটকে পড়েছেন, আসতে পারছেন না। কী হবে? কে করবে নগেন্দ্র?—না, ঐ ত অহীন রয়েছে।

এবারেও সেই 'হঠাৎ'। নগেন্দ্র করতে হবে। মঙ্গলবার রাত্রে টেলিফোন করে যে-যে কাগজে পাওয়া গেছে, বিজ্ঞাপনে দানীবাবুর নাম পাল্টে আমার নাম দেওয়া হলো। কোনো-কোনো কাগজে দানীবাবুর নামই বেরিয়ে গেল। অর্থাৎ সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় আমাকে করতে হলো—"নগেন্দ্র।"

(ক্রমশ

কালীঘাট ও কালীমন্দিরের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত
রম্য উপন্যাস
অজিত মুখোপাধ্যায় অমৃত মন্থন বেংগল পাবলিশার্স
তারাশঙ্কর, অচিন্ত্যকুমার, সজনীকান্ত দাস, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দ কর্তৃক উচ্চ-প্রশংসিত। মূল্য : চার টাকা
কলিকাতা—১২
(সি-১৬৬৬)

ট্রামে-বাসে

আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী চালিহা নাকি বলিয়াছেন যে, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের পক্ষে আমাদের ঘরোয়া ব্যাপারে নাক গলান উচিত নয়। "শ্রী রায় ডাক্তার বলেই নাক গলান। ভারতেরই একটি অংগরাজ্যের মানুষ বিনা চিকিৎসায় উন্মাদ রোগে ভুগবে, একথা ডাঃ রায় ভাবতে পারেন না"—বলেন বিশু খুড়ো।

সম্প্রতি ভারতের প্রধান মন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সংগে শ্রী চালিহার আসাম পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটি উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তাঁরা কী বলিয়াছেন, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রী চালিহা হাসিতে হাসিতে বলিয়াছেন—"ভদ্র ব্যবহার করুন"। "হাসার অর্থ হলো—কী ছেলেমানুষী উপদেশই তাঁরা দিলেন। "বাল্য শিক্ষায়" এর চেয়ে আরো কত ভালো ভালো উপদেশের কথা পড়েছি"—সংবাদটা বিশ্লেষণ করে আমাদের শ্যামলাল।

অনেক রেলওয়ে কর্মী আসাম হইতে ট্রান্সফারের জন্য আবেদন করিয়াছে বলিয়া শ্রীজগজীবন রাম লোকসভায় ঘোষণা করেন। তিনি সমস্ত আবেদনপত্রই

অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আর কর্মীদের নিরাপত্তার প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, সে দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। —"তার চেয়ে বলা উচিত ছিল, সে দায়িত্ব কর্মীদের নিজের অর্থাৎ তাদের কর্মফলই তাদের কর্মের জন্য দায়ী।" মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

আর ৬৬ বছর পরে পৃথিবী ধ্বংস হইবে বলিয়া একটি গণনার ফল শুনিয়াছিলাম। সম্প্রতি অন্য এক গণনায় শুনিলাম তাহা হইবে না। "বাপস্ বাঁচা গেল। এ কদিন রাতে ভালো করে ঘুম হচ্ছিল না"—বললেন অন্য এক সহযাত্রী

পৃথিবী ধ্বংসের খবরটার জের টেনে বিশু খুড়ো বলিলেন—"আর দু'শ বছর পর পৃথিবী থাক বা না থাক তাতে আমাদের কিছু আসবে যাবে না। পৃথিবীর মৌরসী পাট্টা করবেন বলে যাঁরা ভাবছেন, আসবে যাবে তাঁদের।"

এক সংবাদে শুনিলাম, পাকিস্তানে একটি সলাগুলে শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"তবে কি পাকিস্তানে ভারতের রামরাজ্যের আদর্শেই অনুপ্রাণিত হয়েছে!!"

রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল শ্রী দাগ হ্যামারশেল্ড সভ্যদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছেন যে, আর ছয় মাসের মধ্যে ৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা না হইলে রাষ্ট্রপুঞ্জের কোষাগার শূন্য হইয়া যাইবে। —"একি লাটে ওঠার পূর্বলক্ষণ"—প্রশ্ন করেন জনৈক সহযাত্রী।

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের কলিকাতা শাখার সাধারণ বার্ষিকী সভায় বলা হইয়াছে যে, তৃতীয় যোজনায় জনস্বাস্থ্য খাতে যে-অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। —"স্বাস্থ্যের ব্যাপারে জনসাধারণ সিদ্ধি মলমের ওপর অধিক নির্ভর করেন বলে এবং প্রথাটি সস্তা বলে সরকার আর এদিকে বেশি টাকা খরচ করা সমীচীন মনে করেন নি"—মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

ইংলণ্ডের রানী বেনারসে গিয়া কোথায় উঠিবেন, কী করিবেন, কী দেখিবেন, ইত্যাদির একটা কর্মসূচী প্রস্তুত করা হইয়াছে। নূতনত্ব কিছু নাই। তাঁহার স্বর্গত পিতামহ যাহা করিয়াছেন, রানীও তাহাই করিবেন। "আমরা বলি, এই নূতন পরিবেশে কিছু কিছু নূতন করা ভালো। তাতে কমনওয়েলথ টাই-টার বাঁধন শক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপে ধরুন, বেনারসের বার্তাক ভক্ষণ। ঠাণ্ডি পোলাওর সংগে বাইগন কা কোপ্তা—অপূর্ব, অপূর্ব!!"

কয়েকদিন আগের খবরে শুনিয়াছিলাম ভারতে এলার্ম ক্লক প্রস্তুত হইবে। শ্যামলাল বলিল—"নিদ্রার ব্যাঘাত

যাতে না হয়, তার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন এ অঞ্চলে এলার্ম ক্লক আমদানীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করুন।!"

প্রসংগত রহ্মের প্রধান মন্ত্রীর কথা মনে পড়িল। সংবাদে শুনিলাম, তিনি নাকি দেশে ফিরিয়া যাইবার সময় কিছু বেনারসী পান সংগে করিয়া নিয়াছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী পান-প্রসংগে একটি পূর্ববঙ্গের কবিয়ালের গান

শুনাইলেন—"পান দিলে সুপারী লাগে, আরো লাগে চুন; ঘুষকাইয়া ঘুষকাইয়া জ্বলে পিরীতের আগুন গো—পান দিলে সুপারী লাগে।"

GOVERNMENT LIBRARY Bihar

চিত্র প্রদর্শনী

এ সপ্তাহে পার্ক স্ট্রীট-এর আর্টিস্ট্রী হাউস-এ কয়েকজন তরুণ সমকালীন শিল্পীর কিছু চিত্রকলা এবং ভাস্কর্য প্রদর্শিত হচ্ছে। এঁরা সম্প্রতি গঠিত সোসাইটি অব কনটেম্পোরারী আর্টিস্টস-এর সভ্যসভ্যা। এঁদের মধ্যে কয়েকজন শিল্পরসিক মহলে বেশ পরিচিত এবং কয়েকজন নবাগত।

ছবিগুলির সমালোচনা করার আগে সমকালীন শিল্পধারা বা কণ্টেম্পোরারী আর্ট বলে বর্তমানে যেসব নবাতন্ত্র প্রচলিত সে সম্বন্ধে এখানে কয়েকটি কথা বলার প্রয়োজন বোধ করি। সমকালীন শিল্প সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত এবং এই মতানৈক্যের জন্যেই সমকালীন শিল্প আজ এতটা প্রচার লাভ করেছে এমন মতামতও শোনা যায়। নতুন 'স্কুলের' সৃষ্টি হচ্ছে, সেই সঙ্গে নিন্দা করার লোকের সংখ্যাও যেমন বাড়ছে, প্রশংসাবাদীদের সংখ্যাও বাড়ছে। বিখ্যাত ফরাসী শিল্প রসিক জাঁ কাস্‌ তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত PANORAMA DES ARTS PLASTIQUES CONTEMPORAINS গ্রন্থে লিখেছেন—

Modern art in its detail and by very sensational manifestations, interests and stimulates: but the biggest thing is to feel and consider it as a phenomenon, to understand the basis of this phenomenon and finally to place it among other realities of the contemporary world and in its relationship to the world.

সমকালীন শিল্পকে একটি ফিনোমিনন অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ব্যাপার বলে না হয় ধরেই নেওয়া গেল। কিন্তু প্রশ্ন হল, একালে যাকে ফিনোমিনন বলে বাহবা দেওয়া হচ্ছে ৫০০ বছর পরেও কি তা তেমনিই বাহবা পাবে? কিন্তু ভারত শিল্প বা ইউরোপের রেনেসাঁস শিল্প বা অন্য কোনও ক্লাসিক শিল্প ৫০০ বছর আগে যা প্রশংসা পেয়েছে আজও তা রসিকদের কাছ থেকে পেয়ে থাকে এবং ৫০০ বছর পরেও তা পাবে। বিদগ্ধ সমকালীন শিল্পীরা তাই মন দিয়েছেন এমন কিছু সৃষ্টি করতে যা সেকালের শিল্পের মতই চিরকাল বেঁচে থাকবে। কিন্তু কমিউনিকেটিভ না হলে অর্থাৎ শিল্পীর মনের ভাব যদি অন্যের মনের মধ্যে প্রবেশের পথ না পায় তা হলে সে ছবি অনাকালের রসিকদের বিচারে আর্ট পদবাচ্য বলে স্বীকৃত হবে কিনা সে বিষয় কোনও নিশ্চয়তা নেই। ছবিকে কমিউনিকেটিভ করে তোলবার জন্যে যে আবার চাক্ষুষ পরিচয় মাত্রকে শিল্প ব্যক্ত করেই শিল্পীকে ক্ষান্ত থাকতে হবে এমন কথাও বলিনা। তবে চিত্রকর বা ভাস্কর, তিনি যতই আধুনিকপন্থী হন না কেন, তাঁকে বিশেষ ভাষা অনুসরণ করতেই হবে এবং সে ভাষার ব্যাকরণ সম্বন্ধেও তাঁর সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। এলোমেলো কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করলেই যেমন কোনও বক্তব্য প্রকাশ পায় না তেমনি এলোমেলো কিছু রঙের আঁকিবুকি কাটলে বা প্লাসটার অথবা পাথরের কয়েকটি তালগোল সৃষ্টি করলেই কোনও ভাব প্রকাশ পাবেনা। আপন ব্যক্তিমানস প্রকাশের দোহাই দিয়ে অতি উৎসাহী সমকালীন শিল্পীরা অনেক সময় ব্যাকরণকে জলাঞ্জলি দিয়ে বাড়াবাড়ি রকম বিকৃতি, অতিরঞ্জন এবং অনুরঞ্জনের আশ্রয় নেন। তখনই ব্যাপারটি একটু চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, উদ্ভট সব ছবির(?) সৃষ্টি হতে থাকে এবং এই সুযোগে আনাড়ি ছবি আঁকিয়েদের দলও নিজেদের সমকালীন শিল্পী হিসাবে স্বীকৃতির দাবি করে বসেন। আরেকটি কথা, শিল্পকে উপলব্ধি করতে হলে দর্শকেরও কিছুটা বিচার বুদ্ধি এবং জানাশোনা থাকা একান্তই আবশ্যক। এক তর্কযুদ্ধে একজন প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, ছবি আর্ট পদবাচ্য হবে তখনই যখন সে ছবি দেখে যে কোনও দর্শকই মর্ম বুঝতে পারবে। এ যুক্তির সমর্থন আমি অবশ্যই করিনা। গরু কেবল জাবর কাটারই সারমর্ম বোঝে তার সামনে বীণা বাজালে কোন অর্থই হয় না। সমকালীন শিল্প কেন, যে কোন শিল্পকেই উপলব্ধি করতে হলে কিছুটা বোধ শক্তির দরকার হয়

কৃষক শিল্পী—সুহাস রায়

যাই হোক, এখন আসল প্রসঙ্গে আসা যাক।

সোসাইটি অব কণ্টেম্পোরারী আর্টিস্ট-দের দলে আছেন ২০ জন শিল্পী। এঁরা হলেন কমলা রায়চৌধুরী, রেবা হোর, সোমনাথ হোর, সুকান্ত বসু, অরুণ বসু, সনৎ কর, শৈলেন মিত্র, শ্যামল দত্তরায়, সর্বানী রায়, সুনীল দাশ, প্রকাশ কর্মকার, বিজন চৌধুরী, সত্যসেবক মুখোপাধ্যায়, উমা সিদ্ধান্ত, রঘুনাথ সিংহ, অরুণাভ দত্ত, সুভাষ রায়, দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়, নমিতা দত্ত এবং অনিলবরণ সাহা। এক নমিতা দত্ত ছাড়া এ দলের আর সকলেই পাশ্চাত্ত্যের সমকালীন শিল্পের ধারা অনুসরণ করেছেন। মনে হয় শ্রীমতী কমলা রায়চৌধুরী, এ দলের অন্যান্য শিল্পীদের তুলনায় অনেক পরিণত তাই এঁর ছবিগুলি স্বতন্ত্র ভাবে চোখে পড়ে। বাকি সকলেরই ছবির মেজাজ যেন কতকটা একই রকম। রেখাগত বা আকারগত মিল বলছিনা, চিন্তাধারাটা যেন সকলেরই এক। এটা হবার কারণ, এঁরা সকলেই অনুপ্রেরণা লাভ করছেন কিছু বিদেশী প্রিণ্ট দেখে। না, এঁরা যে বিদেশী ছবির পুনরাবৃত্তি করছেন সেকথা বলছিনা। এঁরা বিদেশী ছবির প্রিণ্ট থেকে আধুনিক আঙ্গিকে ছবি আঁকা শিক্ষা করছেন। এবং বিদেশী সমকালীন শিল্প সম্বন্ধে যে-সব বই বা যা প্রিণ্ট আমাদের দেশে আসে তা সংখ্যায় খুবই কম। তাই বিভিন্ন ধরনের ছবির সঙ্গে এঁদের পরিচয় না হওয়ার ফলেই সম্ভবত এই মিল। এই কারণেই স্বদেশের মাটির সঙ্গে এঁদের ছবির আত্মা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অনেক সময় মনে হয়েছে এঁরা আকারকে বিকৃত করেছেন শুধু বিকৃত করার জন্যেই, কোনও বিশেষ ভাবকে প্রকাশ করার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। এমন হয়েছে, আমার মনে হয়, তার কারণ এঁরা ঠিক উপলব্ধি করতে পারেননি—কেন বড় বড় পাশ্চাত্ত্য শিল্পীরা ঐ ধরনের বিকৃতির আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের রচনায়। এঁদের নব্য শিল্প উদ্ভাবনার প্রচেষ্টা আমি সর্বান্তঃকরণেই সমর্থন করি কিন্তু যতক্ষণ না এঁরা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারছেন, বস্তুনিরপেক্ষ আকার, বিকৃতি-করণ, আতিরঞ্জন, অনুরঞ্জন প্রভৃতির সার্থকতা কি, ততক্ষণ পর্যন্ত এঁদের ছবিতে স্বতঃস্ফূর্ত ভাব প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়। এঁরা সকলেই অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী এবং অনেকেই যথেষ্ট ধীশক্তির অধিকারী, সুতরাং আমার আবেদন এঁদের কাছে—নতুন কিছু করার আনন্দে নয়, প্রকৃত রসোত্তীর্ণ শিল্প উদ্ভাবনার উদ্দেশ্য নিয়ে এঁরা যেন পরীক্ষণ নিরীক্ষণের আত্ম-নিয়োগ করেন। আজ সেজান-ই বা বিরাট কেন, শাগাল-ই বা বিরাট কেন, বর্দা-ই বা বিরাট কেন আর পিকাশো-ই বা বিরাট কেন এটা উপলব্ধি করতে না পারলে মহৎ কিছু সৃষ্টি করা কি সম্ভব? আরেকটা কথা, এঁরা আজ নতুন বলে যেটা প্রচার করতে চাইছেন সেটা পাশ্চাত্ত্যে আর নতুন বলে ধরা হয় না। বেশ পুরোনো।

শিল্পী সর্বানী রায়ের একটি কাজ

যাই হোক, এঁদের মধ্যে কয়েকজনের ওপর আস্থা রাখা যেতে পারে। যদি এঁরা সমকালীন শিল্পের 'নাড়ী স্পন্দন' যথার্থই অনুভব করতে পারেন তা হলে ভবিষ্যতে নিশ্চয় কিছু মহৎ এঁদের কাছ থেকে আশা করা যায়। সোমনাথ হোরের গ্রাফিক রচনাগুলি নজরে পড়া উচিত ছিল, কিন্তু প্রদর্শনের দোষে এগুলির উৎকর্ষ কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। নমিতা দত্ত এ প্রদর্শনীতে তাঁর মিনিয়েচারগুলি প্রদর্শন না করলেই পারতেন। যাই হোক, শৈলেন মিত্র, বিজন চৌধুরী, সনৎ কর, অরুণ বসু, প্রকাশ কর্মকার, সুকান্ত বসু, সুনীল দাশ, অরুণাভ দত্ত, এবং রঘুনাথ সিংহ-এর কাজ দেখে আমরা আশা করতে পারি—ভবিষ্যতে এঁরা যথার্থ রসোত্তীর্ণ কিছু সৃষ্টি করতে পারবেন।

নবগঠিত সোসাইটি অব কনটেম্পোরারী আর্টিস্টস-এর উদ্দেশ—যেসব তরুণ শিল্পী অবহেলায় তাঁদের শিল্পীসত্তা বিসর্জন দিতে বসেছেন, তাঁদের উৎসাহ এবং সুযোগ-সুবিধা দান করা এবং বিভিন্ন শিল্পীর মধ্যে চিন্তাধারা আদানপ্রদানের ব্যবস্থা করা। খুব মহৎ উদ্দেশ্য সন্দেহ নেই। ঈর্ষা, দলাদলি, অবজ্ঞা, নিজের সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা, অর্থের প্রতি দুর্বলতা এবং ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য তদ্বির করা, এসব সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দিয়ে এর আগে অনেকেই এ ধরনের সংস্থার বিনাশের কারণ হয়েছেন। সুতরাং এঁদের প্রত্যেকের কাছে আমার নিবেদন, যেন ঐ ধরনের কোনও দোষের দাস না হয়ে পড়েন। সোসাইটি অব কনটেম্পোরারী আর্টিস্টস ক্রমশ বেড়ে উঠুক, এই আমাদের একান্ত কামনা। ৭।এ, মাইশোর রোড, কলকাতা—২৬—এই ঠিকানায় আপাতত এঁদের দপ্তর খোলা হয়েছে। এখান থেকে ছবি বিক্রীও করা হয়।

বিখ্যাত রাশিয়ান মডেল
৬ ও ৫০ গুলীর

No Licence Needed

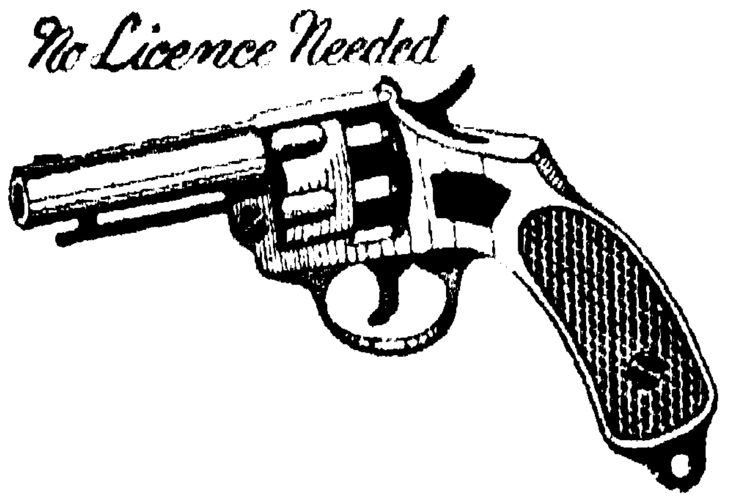

রিভলবার

দেখিতে আসলের মত, স্বয়ংক্রিয়
প্রচণ্ড শব্দ ও আগুনের স্ফুলিঙ্গ
বিনামূল্যে ২৫টি গুলি

ডাকাত, হাঙ্গামাকারী ও বনাজন্তুকে ভয় দেখানো যায়।
মঞ্চাভিনয়ে, আত্মরক্ষার্থে ও সামাজিক মর্যাদায় ব্যবহার্য

ক্যাটাঃ নং ১০১ — টাঃ ৭/-
ক্যাটাঃ নং ১০২ — টাঃ ৯/-
ক্যাটাঃ নং ১০৩ — (৫০টি স্বয়ংক্রিয় গুলিতে) টাঃ ১৪/-

অতিরিক্ত গুলি—প্রতি ১০০টি ৫, টাকা। উৎকৃষ্ট চামড়ার খাপ—৬, টাকা
প্যাকিং ও পোস্টেজ ২, টাকা অতিরিক্ত।

নোবল ট্রেডিং কর্পরেশন, ২৬-এ, ভারতনগর, বোম্বাই-৭।

GOVERN... LIBRARY
বিশ্বলিপি

বাসিন্দাদের কাছে ডেভিলস আইল্যান্ড ছিল এক জীবন্ত নরক, একটা বিরামহীন দুঃস্বপ্ন। দুনিয়ার লোক বলতো এটা অত্যন্ত লজ্জাকর। শেষে জনমতের চাপে পড়ে ফ্রান্স ১৯৫৩ সালে এই কুখ্যাত কয়েদী-উপনিবেশটি বন্ধ করে দেয়। ক্যারিবিয়ান সাগরের আঁচলায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এই সম্পত্তিটি এখন প্রয়োজনাতিরিক্ত বলে ঘোষিত হয়েছে। চেষ্টা করা হচ্ছে বাড়িগুলির মধ্যে কোনটির কোন মূল্য থাকলে সেগুলি নিলাম করার। কয়েদী সংশোধনের উচ্চ আশা নিয়ে গঠিত এই দ্বীপে এখন লুপ্তপ্রায় ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছু নেই। ওখানে পাঠানো হয়েছিল ৫৭,০০০ কয়েদী কিন্তু ফিরে আসতে পেরেছে মাত্র ২,০০০ জন। বাকিরা মারা গিয়েছে রোগে, পালাবার নিষ্ফল চেষ্টায় এবং বেপরোয়া প্রকৃতির লোকেদের সঙ্গে সংগ্রাম করে।

মূল ডেভিলস আইল্যান্ড পার্বত্যময় ছোট একটি দ্বীপ যেখানে সেরা কয়েদীদের রাখা হতো। কিন্তু নামটা এমন সংক্রামক ছিল যে ফরাসী গায়েনার তিনটি দ্বীপ এবং মূল ভূমির জঙ্গল কেটে জীর্ণ বাড়ি নিয়ে গঠিত সমগ্র কয়েদী উপনিবেশটিই স্থায়ীভাবে ঐ নামে অভিহিত হতে থাকে।

লোকেদের মনে ডেভিলস আইল্যান্ডের কথা প্রথম গাঁথা হয়ে যায় ক্যাপ্টেন এলফ্রেড ড্রেফাসকে ওখানে নির্বাসিত করাতে। ১৮৯৪ সালে দেশদ্রোহীতার অপরাধে শাস্তি পাবার পর চার বছর তিনি এই দ্বীপের রৌদ্রদগ্ধ অনুর্বর ভূমির ওপর পায়চারি করে কাটান। তারপর তাঁকে ফ্রান্সে ফিরিয়ে আনা হয় এবং তিনি নিরপরাধ ঘোষিত হন। তাঁর বিবরণে এই ভয়াবহ কয়েদখানা সম্পর্কে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই উপনিবেশটির আসল কারাপাল ছিল সমুদ্র, হাঙর, জঙ্গল আর প্রচণ্ড গরম। তাসত্ত্বেও এই গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে কম বেতনে কাজ করার ফলে রুক্ষ-মেজাজের চারশত প্রহরী শৃংখলা রক্ষার জন্য নিযুক্ত থাকতো।

গড়পড়তায় ওখানকার তাপমাত্রা ৮৫ ডিগ্রী। বছরে সাত মাস অবিরাম বৃষ্টি আর বাকি পাঁচ মাস গায়ে ফোস্কা পড়ার মতো রৌদ্র তাপ। ম্যালেরিয়া আর পীতজ্বর ছিল বারোমাস। ১৮৪৮ সালে ফরাসী সাম্রাজ্যে ক্রীতদাস প্রথা লোপ করায় শ্রমিক সমস্যা মেটাতে এই উপনিবেশটি গড়ে ওঠে। রাতারাতি ফ্রান্সের প্রাচীনতম উপনিবেশ গায়েনার ক্ষেত ও আবাদসমূহ লোকবল রহিত হয়ে যায়। ১৮৫২ সাল থেকে কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসদের স্থান গ্রহণ করে শ্বেতকায় কয়েদীরা।

ফরাসী গবর্ণমেন্টের ধারণা ছিল যে গ্রীষ্মপ্রধান এই স্থানে কঠিন দণ্ডভোগ অপরাধ নিবৃত্তিতে সহায়ক হবে। আরো উদ্দেশ্য ছিল যে কয়েদীরা বিভিন্ন প্রকার কাজ শিখে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে অঞ্চলটির উন্নতি সাধনে যত্নবান হবে। প্রথম দিকে অনেকে গায়েনাতে যাওয়াকে স্বাগত জানায়। তারা আশা করেছিল অধিকতর স্বাধীনতা পাবে—এবং পালাবার সুযোগও। বহু কয়েদীর দল উল্লাসে গান গাইতে গাইতে কয়েদী জাহাজ লা মার্টিনিয়ারে গিয়ে ওঠে। কিন্তু মোহ ভাঙতে বেশী দেরী হয়নি। জাহাজ চলতে এদের লোহার খাঁচায় গাদাগাদি করে রেখে দেওয়া হয়। প্রতিবাদ কেউ করলে তাকে নিকষ অন্ধকার খোলে বন্ধ করে রাখা হয়।

কয়েদী উপনিবেশটি ছিল ক্যারিবিয়ান উপকূলে এবং মারোনি নদীর এক পাশের তীর ধরে দশ মাইল প্রসারিত স্থান। এর চারদিকে জল, জঙ্গল আর শত্রুভাবাপন্ন ওলন্দাজ গায়েনার সীমান্ত। অধিকাংশ কয়েদীকেই রাখা হতো মূলভূমিতে। দেশদ্রোহী ও গুপ্তচরদের পাঠানো হতো ক্ষুদ্র ডেভিলস আইল্যান্ডে এবং সাধারণতঃ পাঁচ ছজনের বেশী কয়েদীকে ওখানে আটক রাখা হতো না। বিপজ্জনক, অবাধ্য ও উন্মাদ কয়েদীদের রাখা হতো সেন্ট যোসেফ দ্বীপে, অনেককে নির্জন কক্ষে তাদের

১

২

৩

১। ভূতত্ত্ববিদ্‌রা অনেকদিন থেকেই জানেন পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ ফাটল-ধরা। সম্প্রতি প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ৪৫,০০০ মাইল দীর্ঘ একটি ফাটলই পৃথিবী বেষ্টন করে রয়েছে। এই চিড় খাওয়ার অর্থ রহস্যাবৃতই হয়ে রয়েছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা বলেন, এই ফাটলটি পৃথিবীব্যাপী ভূকম্প অঞ্চলটি অনুসরণ করে গিয়েছে। ২। জার্মানীর কাক্সহ্যাভেনের মৎস্যজীবীরা, যেখানে এলব নদী পড়ছে উত্তর সাগরে ওরা সেখানকার তীরে ঝুড়িতে করে মাছ শিকার করে। মাছ ঢেউয়ে ভেসে আসে এবং জল কমে গেলে তীরে পড়ে থাকে। দিনে দুবার মৎস্যজীবীরা কাঠের তৈরী স্লেজে কুকুর জুতে মাছভর্তি ঝুড়িগুলি তুলে নিয়ে যায়। ৩। মোটামুটি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্রসমূহে গড় পড়তায় শতকরা পঞ্চাশ-ষাট ভাগ স্থান দখল করে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বিজ্ঞাপনে। বড় শহরের সংবাদপত্রে সপ্তাহে একদিন এই ধরনের বিজ্ঞাপন কুড়ি থেকে ষাট পৃষ্ঠা দখল করে

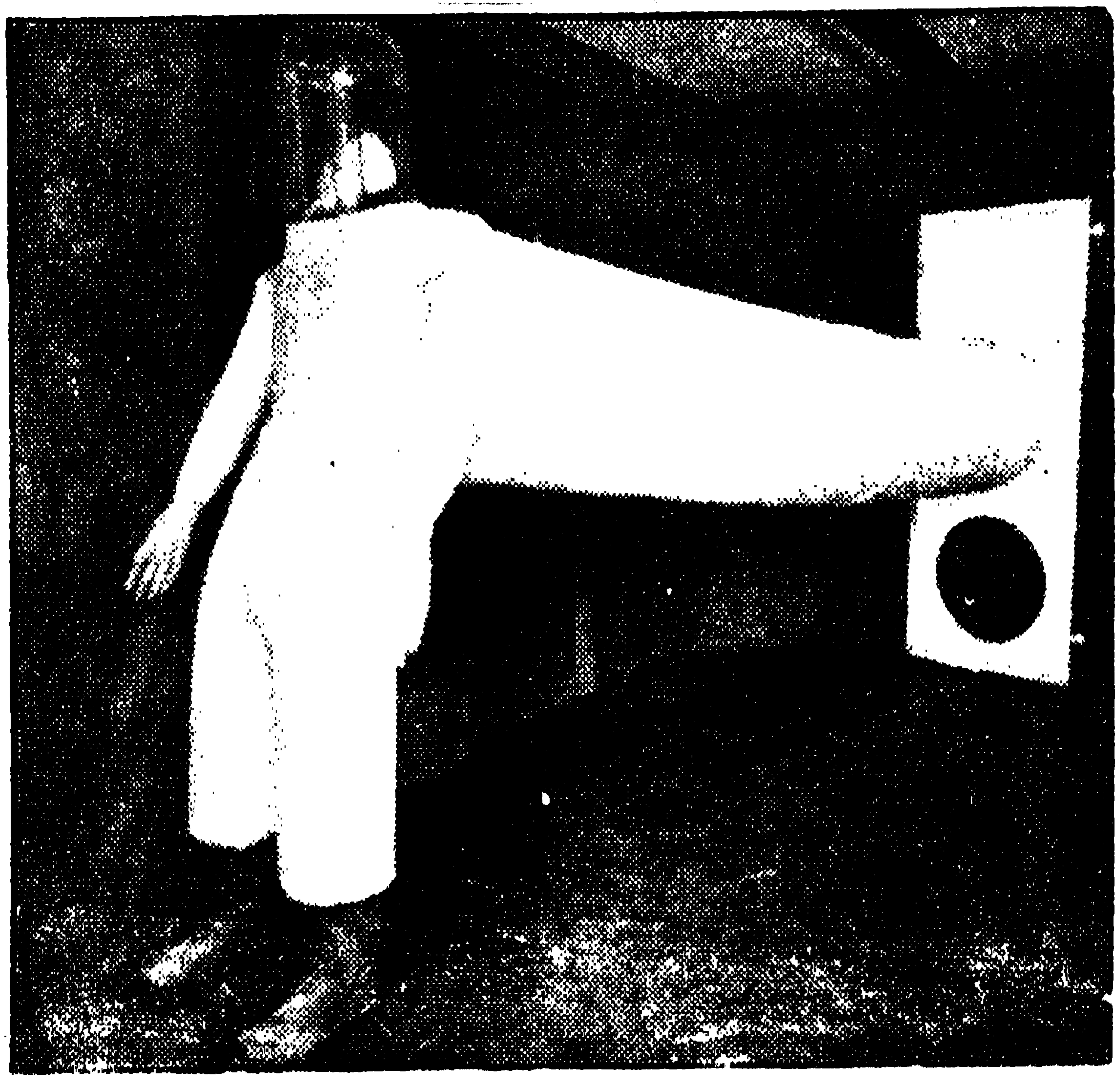

ইংলণ্ডে হারওয়েলে অবস্থিত আণবিক শক্তিকেন্দ্রে তেজস্ক্রিয় ঘরে বিপজ্জনক রশ্মিবিচ্ছুরণ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক ব্যবহৃত পোশাক। বৈজ্ঞানিককে সংযুক্ত টিউবের মধ্যে দিয়ে গুঁড়ি মেরে পোশাকে ঢুকতে হয়

বাকের সঙ্গে শিকল দিয়ে বেঁধে। অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর আবহাওয়াযুক্ত রয়েল আইল্যাণ্ডে রাখা হতো রুগ্ন কয়েদীদের, আর থাকতো প্রহরীরা এবং শাসন পরিচালন কাজে নিযুক্ত লোকেরা।

আট বছরের কম কারুর সাজা হলে সমপরিমাণ বৎসর তাকে মুক্ত কয়েদিরূপে থাকতে হতো। আট বছরের বেশী যতো বছরের সাজাই হোক সেটা যাবজ্জীবন দণ্ড বলে পরিগণিত হতো। দণ্ডকাল পার হলে কয়েদীরা বাড়ি ফিরতে পারতো—অবশ্য কোন উপায়ে জাহাজ ভাড়া যোগাড় করতে পারলে। খুব কম কয়েদীই তা পারতো।

এই ব্যাপারে দুজন কয়েদী সম্পর্কে একটি গল্প আছে। ওরা দুজনে মিলে একজনের ক্লাসে বাবার মতো তের শত টাকা সঞ্চয় করে। ওরা সে টাকা নিরাপদে রাখার জন্য স্যালভেশন আর্মির কাছে গচ্ছিত রাখে। রাত্রে ওরা স্যালভেশন আর্মির দপ্তরের তালা ভেঙে ঢুকে সেই টাকা চুরি করে। পরদিন ওরা আরো তেরশ টাকা জমা দেয়। এইভাবে ওরা দেশে ফিরে যেতে সক্ষম হয়।

পালাবার অকোশটা এমন স্বাভাবিক বলে পরিগণিত হতো যে প্রথমবার কেউ ধরা পড়লে তাকে সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হতো। দ্বিতীয়বার ধরা পড়লে তাকে সেণ্ট যোশেফ দ্বীপে চালান করে দেওয়া হতো পাঁচ বছরের জন্য। সেখানে কুড়ি দিন অন্ধকার কক্ষে আর দশদিন আবছা আলোকিত কক্ষে-এইভাবে তাকে বন্ধ করে রাখা হতো, আর খেতে দেওয়া হতো দুদিন শুকনো রুটির পর তিনদিন উপবাস। মূলভূমিতে রাস্তা তৈরীর কাজে নিযুক্ত কয়েদীদের পক্ষে পালানো সহজ ছিল। কিন্তু কেউ ওলন্দাজ গায়েনার বা ব্রাজিলের দুর্গম জঙ্গলের মধ্যে পালাতে চেষ্টা করলে ধরা পড়ে ফরাসী কর্তৃপক্ষের হাতে অর্পিত হতো।

সবচেয়ে সুবিধে ছিল কোন উপায়ে একটি নৌকা এবং খাদ্যসামগ্রী জোগাড করে সাড়ে সাতশত মাইল সাগর পার হয়ে ত্রিনিদাদে পৌঁছানো। কচিৎ এই ধরনের কয়েদীচালিত নৌকা পাড়ি দিতে সক্ষম হলে তার মধ্যে অবশ্যই দেখা যেতো ক্ষুধা ও পিপাসায় অর্ধমৃত কয়েদীদের। ত্রিনিদাদের বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাদের সুস্থ হবার পক্ষে যথেষ্ট কদিন মাত্র থাকতে দিয়ে কিছু খাদ্যসামগ্রী দান করে আবার সমুদ্রে ছেড়ে দিত। তারপর তাদের চেষ্টা হতো ভেনিজুয়েলা বা স্বাগত হওয়া বিষয়ে অনিশ্চিত কোথাও গিয়ে পৌঁছানো। এমনিধারা পলায়নকারী কয়েদী দলের অধিকাংশেরই আর কোন খবর পাওয়া যেত না।

কতক কয়েদী পালিয়ে যেতে সফল অবশ্য হয়েছে। একজন কয়েদী পালিয়ে বুয়েনস এয়ার্সে পৌঁছয় এবং সেখানে আট বছর কাটায়। তারপর প্যারীসে ফিরতে ওকে সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার করা হয়। উপনিবেশটির সবচেয়ে বিখ্যাত পলায়নকারি ছিল রেণি বেল্লবেনোয়া। ১৮২২ সালে সে গায়েনাতে আসে এবং চারবার ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর ১৯৩৫ সালে পালাতে সক্ষম হয়। প্রথমে সে পৌঁছয় ত্রিনিদাদে এবং সেখান থেকে কলোম্বিয়ায়। পরে যুক্তরাষ্ট্রের এক মালবাহী জাহাজে আত্মগোপন করে পাড়ি জমায়।

এক কাউন্টেসের পরিচারক পদে কাজ করার সময় বেল্লবেনোয়া চুরির অপরাধে ৮ বৎসরের দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হয়। তের বছর কয়েদ থাকাকালে সে কয়েদীদের দৈনন্দিন জীবনের ভয়াবহ অবস্থা—প্রহরীদের যোগসাজসে কয়েদীদের ওপর শোষণ; নির্জন কারাকক্ষে থাকাকালীন দুঃসহ ক্ষুধার যন্ত্রণাভোগ ইত্যাদি ঘটনার দিনলিপি রেখে যায়। এই সব তথ্য অবলম্বনে রচিত তার "ড্রাই গুলোটিন" নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে একসঙ্গে দশটি বিভিন্ন ভাষায়। কয়েদী-উপনিবেশটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণে এই বইখানি বিশেষভাবে কার্যকরি হয়।

পালাবার বাইশ মাস পর বেল্লবেনোয়া যুক্তরাষ্ট্রে যখন পৌঁছয় তখন তার চুয়াল্লিশ পাউন্ড ওজন কমে গিয়েছে আর দাঁতগুলি সবই পড়ে গিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে বেআইনীভাবে প্রবেশের অপরাধে তার পনের মাস জেল হয়। পরে ১৯৫৬ সালে সে আমেরিকার নাগরিক হয়। গত বছর বেল্লবেনোয়ার মৃত্যু হয়েছে।

সামান্য অপরাধের জন্য ডেভিলস আইল্যাণ্ডে প্রেরিত বহু কয়েদীকে শেষ পর্যন্ত যাবজ্জীবন অথবা মৃত্যুদণ্ড পেতে হয়েছে। ঈসিডোর হেস্পেল নামক এক কয়েদী এক কর্ণেলকে প্রহার করে কিন্তু কথার প্যাঁচে সে জল্লাদের কাজ জুটিয়ে নেয়। এরপর সে ঝগড়ার ফলে এক কয়েদীকে হত্যা করে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে নিজের হাতেই গুলোটিনে প্রাণ দেয়। গুলোটিনটি এমনভাবে খাটিয়ে দেয় যাতে নিজের প্রাণসংহারে ত্রুটি না ঘটে।

BE TALLER

and healthier by our new exercises and diet schedule. Details free.

283 (D.E.) Azad Market, Delhi-6

পুস্তক পরিচয়

কবিজীবনী

কবি তরু দত্ত—রাজকুমার মুখোপাধ্যায়। এশিয়া পাবলিশিং কোং, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলিঃ—৭। ২·৫০ নঃ পঃ।

মাত্র উনিশ বছর বয়সে ফরাসী এবং ইংরাজী ভাষায় সাহিত্য রচনা করে কবি তরু দত্ত বিশ্বসাহিত্যে পরিচিতা হন। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, তরু দত্ত একমাত্র লেখিকা, যাঁর পূর্বে কোনো বিদেশী ফরাসী ভাষায় উপন্যাস লেখেননি। মাত্র উনিশ বছর বয়সে এই বাঙালী মহিলার কলম থেকে ফরাসী উপন্যাস রচিত হলো, এবং সে গ্রন্থ পাঠ করে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী সমালোচক অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস কোনো বাঙালী হৃদয় তাঁকে উৎসাহিত করবার জন্য এগিয়ে এলেন না। বাঙালী প্রতিভার ভাগ্যই বুঝিবা এরকম।

কবি তরু দত্ত এক অসাধারণ প্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন; কিন্তু সাহিত্যের একান্ত দুর্ভাগ্য যে মাত্র একুশ বছর বয়সে তিনি লোকান্তরিতা হন। আরো দুঃখের বিষয়, তাঁর মৃত্যুর প্রায় এক শতাব্দী অতিবাহিত হতে চলেছে তথাপি ইতিপূর্বে কবি তরু দত্তের জীবনেতিহাস লিখবার জন্য কেউ বিশেষ সচেষ্ট হয়েছেন বলে এর আগে জানা যায়নি। অনেকের নিকট কবি তরু দত্ত এখনও অজ্ঞাত, হয়তো কেবলমাত্র উনিশ শতকের একজন বাঙালী মহিলা কবি হিসাবেই পরিচিতা।

এদিক থেকে রাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টাকে সাধুবাদ জানাতে হয়। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আলোচনাধারা প্রবাহিত হয়েছে। এটি কবি তরু দত্তের পূর্ণাঙ্গ চরিত্র চিত্রণ না হলেও মোটামুটিভাবে কবি প্রতিভার পরিচায়ক হিসাবে বিশেষ অভিনন্দনযোগ্য। লেখক বক্ষ্যমান গ্রন্থে তরু দত্তকে আরভানের উপন্যাসের লেখিকা হিসাবে সমালোচনা করবার চেষ্টা করেছেন এবং উপন্যাসখানি যে ফরাসী ভাষায় লিখিত বাংলা উপন্যাস, সেই বিশিষ্টতাকেই তিনি পাঠকের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। বিস্মৃত তরু দত্ত বাঙালী সাহিত্যরসিকের গৌরব। কাব্যোৎসাহী পাঠক কবি তরু দত্ত সম্পর্কে এই আলোচনা গ্রন্থটি পাঠ করে উৎসাহিত হবেন। প্রসঙ্গত একটি কথা : রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর এই বিশেষ মুহূর্তে কবি তরু দত্তের সমগ্র কাব্য ও সাহিত্যের একটি সংকলন প্রকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয়—এতে বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্য পাঠকের একটি স্থায়ী উপকার সাধিত হতে পারবে।

৫৭০।৫৯

কিশোর সাহিত্য

হ্যামেলিনের বাঁশিওলা—বুদ্ধদেব বসু। শ্রীপ্রকাশ ভবন, ১-৬৬, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা—১২। দু' টাকা।

বুদ্ধদেব বসুর ছোটদের জন্য লেখা গল্পের মধ্যে একটা বিশেষ পরিচ্ছন্নতা আছে, যা কিশোর পাঠকের মন সহজেই আকর্ষণ করতে পারে। একটি সুন্দর ঘরোয়া পরিবেশ রচনা এবং কিশোর পাঠককে সামনে রেখে গল্প বলার একটি বিশেষ নৈপুণ্য তাঁর রচনার মধ্যে পাওয়া যায়। 'হ্যামেলিনের বাঁশিওলা'র গল্পগুলি পাঠ করে ছোটরা নিঃসন্দেহে আনন্দ পাবে, এর ভাষা এবং গল্প বলার বিশেষ ভঙ্গীপ্রকরণ উল্লেখযোগ্য। 'হ্যামেলিনের বাঁশিওলা—আমাদের আশ্চর্য দাদু, বাবা, প্রোফেসর, দুই বন্ধু'—মোট পাঁচটি গল্প আছে বর্তমান গ্রন্থে। বহুখ্যাত ইংরেজী কবিতা 'পাইড পাইপারে'র কাহিনীকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে প্রথম গল্পটি—এটি এবং এছাড়া আমাদের আশ্চর্য দাদু, বাবা বা দুই বন্ধু প্রভৃতি গল্পগুলি শুধু কিশোর পাঠক নয়, বড়দেরও উপভোগ্য বলে মনে হবে।

৭৩৪।৬০

বড় গল্প

মধুচক্র—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী, মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। দাম—দু' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

একশ এক পৃষ্ঠার ছোট বইটি একটি নিম্নবিত্ত মেস-জীবনের কাহিনী। আট নজন মেম্বার আর উড়ে ঠাকুর ও বিচ্ছু-চাকর কেষ্টাকে নিয়ে একঘরে সর্বস্ব এই মেস-পরিবার। সকালে ঘুম ভাঙা থেকে রাত্রিতে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত নানা বিচিত্র মানুষের সমাবেশ এই পরিবারের একদিনের কাহিনী লিখেছেন সরোজকুমার রায়-চৌধুরী। একটি বড় গল্প হিসাবে এটি স্বীকৃতি পাবে, কিন্তু রচনাশৈলী, চরিত্র-চিত্রণ বা ঘটনা পরিকল্পনায় কোন নতুনত্ব বা বৈশিষ্ট্য নেই। যার মুখ দিয়ে গল্পটি বলা হচ্ছে, তাকেও কুহেলিকা মনে হয়। তাছাড়াও, বইটির সর্বত্র ছড়িয়ে আছে

স্মরণীয় ৩রা ডিসেম্বর !

আজ অপরাজেয় কথাসাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের** ৪র্থ মৃত্যুবার্ষিকী দিবসে আমরা স্বর্গত লেখকের অমর আত্মার শান্তি কামনা করি। তাঁর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে তাঁর অনুরাগী পাঠকদের আগামী **১৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাদেরই প্রকাশিত** এই লেখকের সর্বশেষ উপন্যাস **শান্তিলতা** ২।।০, এবং লেখকের আরও চারটি বিখ্যাত উপন্যাস **মাশুল** ৩।।০, **পাশাপাশি** ৩।।০, **নাগপাশ** ৩, ও **হরফ** ৬, এই বইগুলির যে কোন দুইটি বা অধিক ক্রয়েচ্ছু পাঠকদের সংগ্রহের সুবিধার্থে প্রতি টাকায় দুই আনা কমিশন দেব।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই ● উপহার দেওয়া আপনার রুচির পরিচয়।

..............॥ আমাদের প্রকাশিত আরও কয়েকটি বিখ্যাত উপন্যাস ॥..............

প্রেমেন্দ্র মিত্রের : **আবার নদী বয়** ৩।।০, শক্তিপদ রাজগুরুর : **মেঘে ঢাকা তারা** (চলচ্চিত্রে যুগান্তকারী উপন্যাস) ৪।।০, **দেবাংশী** ৩, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের : **অবরোধ** ৩, **বনকপোতী** ৩।।০, নীহার গুপ্তের : **রঙের টেক্কা** ৪।।০, পৃথ্বীশ ভট্টাচার্যের : **সোনার পুতুল** ৩।।০, মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের : **আধুনিকা** ৩।।০

সাহিত্য জগৎ : ২০৩।৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

মাসিক কল্যাণী দাম ৫০ নঃ পঃ
আশ্বিন সংখ্যার আকর্ষণ
ডঃ অংশু দত্তের ঃ পটমন্ডপে ভলতেয়ার
সর্বত্র পাওয়া যায়। বার্ষিক চাঁদা ৬,
৩ বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রিট, কলিকাতা-১

সদ্য প্রকাশিত
নীহার রঞ্জন গুপ্তের
উপন্যাস
মদন ভস্ম ৩৲
পোড়ামাটি
ভাঙ্গাঘর ৮৲
আর, এন, চ্যাটার্জী এন্ড কোং
২৩, নির্মলচন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর প্রমাদ ও যত্নবিহীন প্রকাশনার স্বাক্ষর। প্রকাশকের পক্ষে এই ত্রুটি অমার্জনীয়। ৬৫।৬০

মানুষের মতন মানুষ—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। কথামালা প্রকাশনী, ১৮এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২। দাম—তিন টাকা।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের সেই সংখ্যাসাঁথষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের অন্যতম যাঁদের রচনায় এক মরমী, অকপট জীবনচেতনার আভাস মেলে। তাঁর "মানুষের মতন মানুষ" উপন্যাসে কলকাতার একটি গলির পরিধিতে অনেক ধরনের মানুষের ভিড় জমে উঠেছে। তাদের প্রাত্যহিক জীবনচর্যা কানাগলির বদ্ধ পরিবেশের মধ্যেই মেলে ধরেছে জীবনের ব্যাপ্ত ও বিচিত্র রূপটিকে। এই রূপে রূপায়িত হয়ে উঠেছে মানুষের মতন মানুষ আর অমানুষ। তাদের ঘিরেই এক মানবিক আবেগধর্মী কাহিনী শৈলজানন্দের আলোচ্য গ্রন্থ। ২৩১।৬০

প্রতিবিম্ব—প্রভাত দেব সরকার। পরিবেশক: ডি হাজরা অ্যান্ড কোং, ১৩, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম দু' টাকা।

প্রভাত দেব সরকারের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাঁর ঘটনা-বিন্যাসের স্বচ্ছ ভঙ্গি এবং ঘটনা-সংস্থানের নৈপুণ্য। এবং সেইজন্যই ছোটো গল্প তাঁর প্রতিভার মূল বাহন। তাঁর অধিকাংশ গল্পই একটি নাটকীয়তার মধ্যে বিরাম লাভ করে, আশ্রয় পায়।

আলোচ্য বই কিন্তু ছোটো গল্প নয়, বড়ো গল্প। এবং এখানে প্রভাত দেব-সরকার ঘটনা বর্ণনার চেয়ে উৎসুক ঘটনা-বিশ্লেষণে এবং রূপায়নে। বইটির প্রথম পংক্তি থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত একটি চলস্রোত বয়ে গেছে, লেখক সেই চলস্রোতটিকে নিবিড়ভাবে অনুসরণ করেছেন এবং সেই অনুসৃতির মধ্যে একটি বক্তব্য আছে।

অর্থাৎ কবিচিত্তের একটি প্রবণতা এসে এইবার তাঁর রচনায় যুক্ত হলো। এই যুক্তটা নিঃসন্দেহে শুভ। আলোচ্য কাহিনীতে এক তীর্থযাত্রিণীর শান্তি-সন্ধানের আলেখ্য যে উজ্জ্বলভাবে আঁকা হয়েছে, তা অভিনব। এই কাহিনী তার প্রতিবিম্ব। বিশ্বেশ্বরের প্রথর রূপের একটি বাসনার মধ্যে অথবা জগতের শিল্পের মধ্যে সেই প্রতিবিম্বের সন্ধানে এই চিত্রায়নে লেখক যে গভীরতার পরিচয় রেখেছেন তা পাঠকের কাছে তাঁকে নূতন মূল্যে প্রতিষ্ঠিত করবে। (৩১৭।৬০)

ছোটগল্প

শুভক্ষণ — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক—সুরুচি প্রকাশনী, ১ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম—৩.

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রথমাবধি ছোট গল্প রচনায় সিদ্ধহস্ত এবং আজও পর্যন্ত তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প লেখক। রচনাশৈলীর যে গুণটির জন্য অনুরাগী পাঠক মহলের কাছে আজো সমানভাবে আদৃত, তাঁর সদ্যপ্রকাশিত ছোট-গল্প সংগ্রহ 'শুভক্ষণে'ও সে গুণের পূর্ণ পরিচয় মেলে। মানুষ হিসেবে মানুষের প্রতি ভালোবাসা, প্রকৃতিকে তার স্বমহিমায় উপলব্ধি প্রবল নৈরাশ্যের মধ্যেও আশার আলো তাঁর প্রত্যেকটি ছোটগল্পকে ভিন্ন ভিন্নভাবে উজ্জ্বল করে রেখেছে। হয়তো অধিকাংশ গল্পেই গভীর জীবন দর্শনকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, তবু প্রতিটি গল্প পড়ার পর পাঠকের মনে একটু দোলা লাগবেই। 'রেকর্ড' বা 'শুভক্ষণ' গল্প শুধু মনের মধ্যে দোলা দেয় না, মানুষ জাতির মর্মকেও যেন সুন্দর বেদনার সঙ্গে মনে পড়িয়ে দেয়। তাছাড়া একই লেখকের মধ্যে যে কত বিচিত্র অনুভূতি ক্ষণে ক্ষণে উঁকি দিয়ে যায়, তারও কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাবে এ-গল্প গ্রন্থে। কিন্তু 'তিতির' গল্পটিকে বড় বেশী উদ্দেশ্যমূলক বলে মনে হলো, তাছাড়া মধ্যে রূপকের বাবহার ঘটনাটিকে স্বাভাবিকও হতে দেয়নি। ৪৪৭।৬০

SARKAR'S DIARY 1961
The most up-to-date modern diaries with India-wide reputation. All diaries contain latest useful information with English, Bengali, Samvat, Sakabda and Hijri dates. The Diaries are issued in various sizes and different styles. They are the cheapest available diaries in the market. They eminently satisfy the taste of every one.

ROYAL DIARY — Big-sized Diary Bound in decent style (10"×6½")	Rs 4.50
DEMY DIARY — Bound in decent style (8¾"×6½")	Rs 3.50
CROWN DIARY — Limp-bound (7"×5½")	Rs 2.75
LAWYER'S DIARY — This is unquestionably the best Law Diary ever published with many useful legal information (4½"×3¼")	Rs 1.75
EVERYMAN'S DIARY — Best upto-date Diary for everyman. Decent get-up and binding (4½"×3¼")	Rs 1.75
EVERYMAN'S DIARY — Plastic cover	Rs 2.25
LITTLE DIARY — Best pocket Diary on superior paper with Hindi dates in Hindi (4"×2½")	Rs 1.25
LITTLE DIARY — Plastic cover (4"×2½")	Rs 1.75
LITTLE DIARY — Plastic cover (Three days to a page)	Rs 1.25
BENGALI DIARY — One day to a page (4"×2½")	Rs 1.25

M. C. SARKAR & SONS PRIVATE LTD.
14, BANKIM CHATTERJEE ST., CALCUTTA-12.

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। ছ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ সূর্যের মতই তাঁর চারপাশে একটি গ্রহমণ্ডলী সৃষ্টি করেছিলেন। এই গ্রহমণ্ডলীর কেউ কেউ স্বালোকিত, কেউ কেউ রবীন্দ্র প্রভায় ভাস্বর। এমনি কবি সমাজের তেরজন কবিকে নিয়ে গ্রন্থকার আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই উত্তর সাধকের দলের সকলেই রবীন্দ্রানুসারী ছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কোন কোন কবি সম্বন্ধে লেখকের মূল্যায়ণ নির্লিপ্ত হয়নি। ভাষা সংযত নয়। তবে ছাত্রার্থে রচিত গ্রন্থের এবম্বিধ বিচারের সার্থকতা নেই বলে অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। ৮৬।৬০

Slavery in India—by Amal Kumar Chattopadhyaya. Nagarjun Press, Calcutta. Price Rs. 10.

ভারতে দাস প্রথা লইয়া ইতিপূর্বে বিশদ কোন আলোচনা হয় নাই সম্ভবত, তবে বিভিন্ন ইতিহাসবিদের প্রদত্ত তথ্যে প্রাসঙ্গিক আলোচনা অবশ্য আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলি তথ্যসমৃদ্ধ বটে কিন্তু তাত্ত্বিক আলোচনা, অর্থাৎ সমাজ ও যুগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথার রূপ-বিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করা হয় নাই। এই দিক দিয়া আলোচ্য পুস্তকটি অত্যন্ত মূল্যবান। লেখক বিভিন্ন পুস্তক ও কাগজপত্র ঘাঁটিয়া তথ্যের সঙ্গে তত্ত্বের সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার ভাষাও চমৎকার, স্বচ্ছন্দ ও সুখপাঠ্য।

• পুস্তকের লেখক ইতিহাসের ছাত্র, অভিজ্ঞ ইতিহাস-বিজ্ঞানী নহেন। ইহাতে তাঁহার অগৌরবের কিছু নাই। ইতিহাস-বিজ্ঞানী নহেন বলিয়াই পুস্তকটিতে স্বভাবতই কিছু ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। যেমন—প্রাচীন ভারত ও এশিয়ার দাস-প্রথার সঙ্গে ইউরোপের দাস-প্রথার তুলনামূলক আলোচনা নাই; ইউরোপ ও আমেরিকায় রাজনৈতিকভাবে দাস-প্রথার অবসান সত্ত্বেও অর্থনৈতিকভাবে ইহা যে নূতন রূপে এখনও বিরাজমান, তাহার উল্লেখ নাই; আর উল্লেখ নাই ভারতের দাস-প্রথার বিশেষ রূপ ও চরিত্রের।

বইটি সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ হইত, যদি থাকিত সমগ্র পৃথিবীতে দাস-প্রথা সম্পর্কে একটি সাধারণ মন্তব্য এবং সভ্যতার ক্রমাগ্রগতির সঙ্গে এই প্রথার রূপ পরিবর্তনের পরিচয়।

অন্যথায় পুস্তকটি তথ্যবহুল, এবং ইহা রচনা করিতে গিয়া লেখক যে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার নিদর্শন প্রতি পৃষ্ঠায়ই পাওয়া যায়।

সর্বশেষ একটি কথা: পুস্তকটির দাম অত্যধিক হইয়াছে। (২৪৮।৬০)

ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা—১২ থেকে প্রকাশিত। মূল্য ছয় টাকা।

প্রবন্ধকার হিসেবে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর পরিচয় নতুন ক'রে দেবার প্রয়োজন নেই। আলোচ্য প্রবন্ধ-সংকলনে তাঁর আঠাশটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে।

বিষয়-দিগন্তের দিক থেকে সংকলনটির মূল্য অসীম। ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর ভূমিকা কতোটুকু, অভিধানের সীমা কতোখানি, সংস্কৃত সাহিত্যে ঐন্দ্রজালিক প্রেরণার পরিমাণ কিরকম, রেল-ভ্রমণের প্রাচীন চিত্র কি ধরনের—কতো যে বিচিত্র বিষয় লেখক অবতারণা করেছেন, তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়।

কিন্তু সেটাই তাঁর কৃতিত্বের মানদণ্ড নয়। রচনারীতিতেও তিনি বিশিষ্ট। প্রাবন্ধিকের বিষয়বোধ এবং ব্যক্তিগত রচনাকারের রসাশ্রয়ী রচনাভঙ্গি তাঁর মধ্যে মিলিত হয়েছে। তাঁর রচনার প্রসাদগুণ পণ্ডিতজনকে অবহিত ক'রে রসতৃষ্ণ পাঠক-চিত্তে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। তাঁর বিষয় বিন্যাসের, পরিবেষণ-ভঙ্গিমা 'সুহৃদ্-সম্মিত' অর্থাৎ বন্ধুজনোচিত। তিনি বন্ধু

ফার্স্ট প্রাইজ
সুনীল ভঞ্জ রচিত
কৌতুক নাটিকা
সদ্য প্রকাশিত হইল
এক দৃশ্যে অভিনয়োপযোগী—১।০
প্রান্তিক পাবলিশার্স
৬ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট : কলি-১২
(সি ৯৬৬৩/২)

সংগীত ত্রৈমাসিক
রম্যবীণা
ধ্রুপদী-সংগীত বিষয়ক প্রবন্ধ-সমৃদ্ধ
পঞ্চম-সংখ্যার বিষয়সূচী :
কলাবিদের স্বাধীনতা
শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়
সংগীত পরিবেশনবিধি
শ্রীরবিশংকর
ধ্রুপদ প্রবন্ধগীতি
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
অধ্যাত্মসাধনা ও সংগীত
শ্রীযামিনীকান্ত চক্রবর্তী
মার্গ সংগীতের সংজ্ঞা বিচার
শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
হিন্দু সংগীতের মাধুর্য (পুনর্মুদ্রণ)
শ্রীমণিলাল সেন
সঙ্গীতে রাগরাগিণী শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য
এ ছাড়াও নিয়মিত বিভাগ
॥ সম্পাদক ॥
ভাস্কর মিত্র
মূল্য ॥ প্রতি সংখ্যা ৭৫ নঃ পঃ
কার্যালয় : ২৬/৪ রড স্ট্রীট, কলিকাতা-১৯
(সি-৯৭৯৫)

॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ॥
পতঙ্গ
সাতটি গল্পের প্রত্যেকটি কাহিনীর বিষয় বস্তুর মধ্যে সূক্ষ্মভাবে অথবা ক্ষেত্রবিশেষে স্থূলভাবে যৌনক্ষুধাই ব্যক্ত হয়েছে। 'পতঙ্গ' গল্পের যৌনরুচির পরিণাম বিশেষভাবে মনের উপর রেখাপাত করে।
—দৈনিক বসুমতী।
রাক্ষসী, প্রতিনিধি এবং পতঙ্গের বিষয় নির্বাচনে তার লেখকের ঋজু-বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। ... পতঙ্গ একটি বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা। —দেশ। মূল্য— ২.৫০
'পতঙ্গ' চেনাজানা মানুষের মনের কথা নিয়ে লেখা সাতটি গল্প সংকলন।
কল্লোল প্রকাশনী :
এ১৩৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিঃ।

• সবে বেরুলো—
ডক্টর সাধনকুমার ভট্টাচার্যের
শিল্পতত্ত্বের কথা ৬-০০
শিল্পতত্ত্ব সম্বন্ধে একজন অসাধারন বিশেষজ্ঞের লেখা তাঁদের জন্যে যাঁরা এ-বিষয়ে কিছু জানেন এবং তাঁদেরও জন্যে যাঁরা এ-বিষয়ে কিছু জানেন না।
• এই পর্যায়ের অন্য বই :
অধ্যাপক বিমলকৃষ্ণ সরকার
কবিতার কথা ... ৫.০০
ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
সমালোচনার কথা ... ৬.৫০
ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ
নাটকের কথা ... ৪.০০
ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায়
ছোট গল্পের কথা ... ৫.০০
ডক্টর গুরুদাস ভট্টাচার্য
সাহিত্যের কথা ... ৭.০০
অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য
উপন্যাসের কথা (জানুআরি ৬১)
• এরই সঙ্গে অনুপম গবেষণা-গ্রন্থ
ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায়ের
দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার ... ১২.০০
সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড
৯ রামবাগান স্ট্রীট : কলিকাতা ৬
(সি-৯৯০৪)

হয়ে আমাদের মধ্যে অবরোহণ করেন, কিন্তু যখন প্রসঙ্গ সমাপ্ত ক'রে চুপ করেন, তখন আমরা বিস্ময়ে আনত হয়ে পড়ি।

আরেকটি কথা। বৈজ্ঞানিকসুলভ তথ্য-বিবেক তাঁর মধ্যে আশ্চর্য। তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্ত তথ্য-নিঃসৃত। বইখানির ব্যাপক সমাদর আমরা সর্বান্তঃকরণে কামনা করি।

(৪১৮।৬০)

আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। ছয় টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক একজন প্রতিষ্ঠাবান অধ্যাপক। সুতরাং, যে-বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছেন, সেটি তাঁর বস্তুনিষ্ঠ গবেষণায় পরিণত হতে পেরেছে।

অথচ বিষয়টি যে জটিল, তাতে সন্দেহ নেই। প্রাগাধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যে যেখানে বাধা-নিষেধতা ও বিধি-নিষেধ, আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব সেখানে জগতে আনন্দ-যজ্ঞে উপস্থিত হওয়ার নিমন্ত্রণপত্র। কি ক'রে দীর্ঘ সময় ধ'রে এই বিবর্তন ঘটেছে, শ্রীযুক্ত আচার্য তীক্ষ্ণ তথ্য-চেতনা নিয়ে সেকথা আলোচনা করেছেন।

সবচেয়ে বড়ো কথা, শিক্ষার্থীর মনের সামগ্রিক প্রত্যাশা ও গঠনের উপর তিনি বিশেষ জোর দিয়েছেন। শিক্ষার্থীর মনকে তিনি প্রধানত ব্যক্তিসাপেক্ষ (individualistic) দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দেখেছেন—কোনো যান্ত্রিক বা প্রতিষ্ঠানগত আচার-অনুষ্ঠানের ক্রীড়নক হিসেবে দেখেন নি। ফলত, তাঁর দৃষ্টিকোণের ঔদার্য বিষয়টির উপরে ঈপ্সিত সমাধানের আলো ফেলেছে, একথা অনস্বীকার্য।

কনফুশিয়াস থেকে শুরু ক'রে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে-সমস্ত মনস্বী পুরুষ শিক্ষাতত্ত্বকে মানুষের মুক্ত চিন্তাশক্তির সঙ্গে যুক্ত দেখেছেন, বীরেন্দ্রমোহন তাঁদের ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। তার ফলে, বইখানি শুধু তথ্যবহুল পাঠ্যবই হয়েই থাকেনি, একটি সরস সংকলনও হয়ে উঠেছে। বইটির বহুল সমাদর আমাদের কাম্য।

(৩৫৫।৬০)

বিবিধ

কাকচণ্ডীশ্বর কল্পতন্ত্রম্—অনুবাদক: শ্রীনিরঞ্জন মিশ্র, এম এ, কাব্যতীর্থ। প্রকাশক: রাজকুমার শ্রীভবানীপ্রসাদ গর্গ বাহাদুর, মহিষাদল, মেদিনীপুর। মূল্য চার টাকা।

প্রাচীন ভারতের চিকিৎসাশাস্ত্রের একটি বৃহদংশ যুক্ত ছিল ধর্মের সঙ্গে, জীবনবোধের সঙ্গে। চিকিৎসা যে নিছক পথ্য-বিধান নয়, বাঁচবার উপায়-নির্দেশ, এই ভাবনা প্রাচীন ভারতের অনেক চিকিৎসককে উদ্বুদ্ধ করেছে। আলোচ্য গ্রন্থটিও এক অর্থে ভারতধর্মাশ্রয়ী। এর মূলে একটি মাঙ্গলিক বোধ কাজ করেছে। এবং ভূমিকা-লেখক শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় এর যে তথ্য-বহুল পটভূমিকা প্রদর্শন করেছেন, তা থেকে একথা স্পষ্ট যে, কাকচণ্ডীশ্বর একজন সাধক পুরুষও বটে। প্রকাশক এই গ্রন্থ প্রকাশ ক'রে আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন। কেননা, এ-বইখানি আমাদের স্মৃতি থেকে হারিয়ে যেতে বসেছিল।

আমাদের চতুষ্পার্শ্বে যে-সব ফল ও ফুল, লতা ও উদ্ভিদ আছে—তাদের মধ্যে আয়ুর্বেদ জীবনরস সন্ধান করেছে। আলোচ্য গ্রন্থেও সেই রস-সন্ধানের সুষ্ঠু ও সুগভীর আয়োজন। এর ফল-বিচার করতে আমরা প্রস্তুত নই। কিন্তু একথা স্বীকার করবো, অদীক্ষিত রস-পিপাসু পাঠকের কাছে এ-বইখানির অনেক মূল্য আছে। বইটির সমাদর কামনা করি।

(২৫৬।৬০)

উপনিষদে সাধন রহস্য—শ্রীরাজমোহন নাথ, বি ই, তত্ত্বভূষণ। প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা—১২। মূল্য ৩.৫০।

বেদ ও উপনিষদ হইতে সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন রসের কয়েকটি কাহিনীকে গ্রন্থকার ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ব্যাখ্যাগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন মতান্তর থাকিতে পারে কিন্তু লেখকের গ্রন্থনের ভঙ্গিমায় প্রসঙ্গগুলি সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য। ধর্মপ্রাণ পাঠকের নিকট বইটি সমাদৃত হইবে, সন্দেহ নাই।

২৩২।৬০

এই ভারতের পুণ্যতীর্থে—শ্রীদেবলাল। প্রকাশক: এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ ২, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ছয় টাকা মাত্র।

ভূমিকাতে লেখকের স্বীকৃতি আছে, এই ভারতের পুণ্যতীর্থে বর্ণিত যে সব ঘটনা ও চরিত্র, তারা লেখকের 'মনোরাজ্যের বিজৃম্ভণ মাত্র নয়', 'বস্তুভিত্তি' বর্তমান বাস্তব জগৎ। লেখকের অনুসন্ধিৎসু মন বিভিন্ন তীর্থ ক্ষেত্র ভ্রমণ করে তীর্থকামী অগণিত চরিত্র, চরিত্রের নাটকীয়তার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছে। জীবন নাটকের উৎস উদভ্রান্ত ও অতৃপ্ত মন। যে মন সুখ, দুঃখ, স্বপ্ন, সাধ, আহ্লাদের কষ্টি পাথরে যাচাই হয়ে ওঠে। লেখক তৃতীয় ব্যক্তি হয়ে সেইসব দৃশ্যপট দেখবার চেষ্টা করেছেন, দেখেছেনও।

গ্রন্থটি আগাগোড়াই ভ্রমণ বৃত্তান্তের ভঙ্গিমায় লিখিত। অনেকাংশে অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের অবতারণা করায় পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবার যথেষ্ট কারণ বর্তমান, আবার মাঝে মধ্যে জীবন্ত ও জটিল তত্ত্বকে সহজবোধ্য করে তুলবার কৃতিত্বে লেখক প্রশংসা দাবি করতে পারেন। উচ্ছ্বাস ও অবান্তর প্রসঙ্গ বাদ দিলে পুস্তকটি স্থায়ী মূল্য রাখতে সক্ষম হতো।

১৭৮।৬০

দেশবিদেশের বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তিদের গবেষণামূলক রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে
Folk-Lore-এর Folk-Culture
Special প্রকাশিত হয়েছে।
দাম: ২.৫০ নঃ পঃ
৩, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রিট, কলিকাতা-১

মুক্ত হস্তে দান করুন
সায়ুধ সেনা পতাকা দিবস
(৭ই ডিসেম্বর)
পূর্বতন সৈনিক ও তাঁদের
পরিবারের কল্যাণের জন্য

সন্তোষকুমার ঘোষের উপন্যাস
কোপাই নদীর মেয়ে
'কোপাই নদীর মেয়ে' আপনাকে আশান্বিত করিবে, হাসাইবে, কাঁদাইবে ও ভারতীয় দর্শনচিন্তা আপনার গ্রহণযোগ্যরূপে উপস্থাপিত করিবে। মূল্য ৫,
দেবব্রত ভৌমিকের নূতন উপন্যাস
দুরন্ত নদী
যৌবন চঞ্চল বাঙালীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতার নিখুঁত চিত্র। মূল্য—৩,
শ্রীগুরু লাইব্রেরী: ২০৪, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ—শৈলেশ-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—গান্ধী স্মারক নিধি, বাংলা শাখা, ২১, গড়িয়াহাটা রোড, কলিকাতা—১৯। দাম—২·৫০ নয়া পয়সা।

সর্বোদয় দর্শনকে যতদূর সম্ভব সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন লেখক। তাকে একটি বিশেষ দর্শনরূপে গ্রহণ করতে হলে তার প্রতিষ্ঠার জন্য বহুকালপ্রবাহিত অন্যান্য দর্শনের পাশে তাকে অবশ্যই এনে দাঁড় করাতে হবে। লেখক সে-কথা ভোলেন নি, এবং প্রসঙ্গতই তিনি পৃথিবীর বহু প্রাচীন ও নবীন দর্শন সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন। সংক্ষেপ হলেও আগ্রহশীল পাঠকের কাছে তাই এ-গ্রন্থ ভালো লাগবে। ২৫৫।৬০

The Temples Of The South—The Publication Division, Ministry of Information & Broadcasting, Govt. of Delhi. Rs. 4.00.

আসমুদ্র হিমালয় জুড়ে ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন মন্দির। মন্দিরময় ভারতের আকর্ষণ শুধু স্বদেশবাসীর নিকটেই নয়, আশ্চর্য স্থাপত্য, শিল্পকলা, ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি নানা কারণের জন্যই বিদেশী পর্যটক ও গবেষকগণের দ্রষ্টব্য বিষয়। ভারত সরকারের বেতার ও তথ্যদপ্তর সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতের মন্দির সম্পর্কে একটি তথ্য সমৃদ্ধ সচিত্র পুস্তক প্রকাশ করেছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মন্দিরগুলির মধ্যে দক্ষিণ ভারতের মন্দির বিশেষ আকর্ষণীয় এবং নানা কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলির একটি সুন্দর পরিচয়—এর স্থাপত্যরীতি এবং শিল্পনৈপুণ্যের বিভিন্ন ধারার বিষয় আলোচ্য গ্রন্থে সুন্দর ভাবে আলোচিত হয়েছে। দ্রাবিড় ও চালুক্যরীতির মন্দির প্রসঙ্গে এবং কেরালা ও দক্ষিণ কানাড়ার মন্দির সম্পর্কে আলোচনা থেকে উৎসাহী পাঠক ও পর্যটকগণ বিশেষ উপকৃত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। গ্রন্থটিতে সুন্দর কয়েকটি আর্টপ্লেট রয়েছে। গ্রন্থটির প্রচার কামনা করি। ৪৫০।৬০

পত্রিকা

ভাঙ্গাগড়া—৮।৪ নটবর দত্ত লেন, কলিকাতা—১২। মূল্য ১০ নঃ পঃ।

ভাঙ্গাগড়া নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকাখানি ভাঙ্গড় থানা এবং উহার সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মুখপত্র। এই পত্রিকাখানির আবির্ভাবে তথাকার জনজীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে। আনন্দবাজার পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা শ্রীবনবিহারী চক্রবর্তী ইহার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রাপ্তি স্বীকার

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস—অজিত দত্ত।
বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ—মৈত্রেয়ী দেবী।
আমার জীবন-কাহিনী—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী — অনুবাদক—শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
পরশুরামের কবিতা—পরশুরাম।
নিভে আসা দীপ—শীতলকুমার দাশ।
মন ও মৃত্তিকা—মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা।
মহাশূন্যের রহস্য—উইলি লে—অনুবাদক—গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য।
A Doctor in the Army—Satyen Basu.
Thus spake the Christ—Swami Suddhasatwananda.
একলব্য (ছোটদের নাটক)—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়।
ইডেনে শীতের দুপুরে—শঙ্করীপ্রসাদ বসু।
সবুজ চিঠি—মনোজ বসু।
পথ চলি—মনোজ বসু।
অফুরন্ত—সুনীল চক্রবর্তী।
রূপান্তর—শচী মুখোপাধ্যায়।
না হয় বাঁকা, না বাজে বাঁশী—মহাতাবউদ্দিন।
শরৎ সাহিত্য-সমীক্ষা—ক্ষীরোদ দত্ত।
রাজকুমারী রূপরেখা—শেফালি নন্দী।
রৌদ্রধারা—কনক মুখোপাধ্যায়।
অগ্নিকন্যা—চিত্তরঞ্জন মাইতি।
গাওনা—লীলা মজুমদার।
দুই পথিক—বনফুল।
নিশিপালন—বিমল মিত্র।
বিশ্বপথিক বাঙালী—নির্মলচন্দ্র সিংহ।
মেঘ-পাহাড়—আশাপূর্ণা দেবী।
রান্নাবান্না—বেলা দে।
সোহো স্কোয়ার—সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

তিন দিন তিন রাত্রি

নারী হৃদয় জটিল, যুবতী হৃদয় জটিলতর। সুলেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র এই জটিল চরিত্র চিত্রণে সুপটু। তিন দিন তিন রাত্রিতে আছে এমনি এক অসাধারণ মনস্তাত্ত্বিক কাহিনী। ছায়াচিত্রে রূপায়িত হচ্ছে।

দাম : পাঁচ টাকা

লিপিকার বই

দুস্তর মরু—দরবেশ

লেখক যেন গল্প বলছেন। তাঁর বলার ছন্দে কত রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথ্য লুকিয়ে আছে। দূর প্রাচ্যের আলোড়নের ভূমিকায় রচিত এ উপাখ্যান সরস ও মধুর হয়ে উঠেছে আয়েষা তৌফিকের রোমহর্ষক কাহিনীতে। দাম : তিন টাকা

আরও কয়েকখানি বই

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় :
বিদূষক ২·৫০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় :
সাহিত্যের সত্য ২·৫০

প্রেমের গল্প

প্রেম কি? প্রণয়ই বা কি? মানব মানবীর হৃদয়ের পরিতৃপ্তিই কি প্রেম? না আরও কিছু? প্রেমের পরিণতি কিসে—নায়ক-নায়িকার মিলনে না বিরহে? এই দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটেছে বাংলা কথা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীদের সার্থক সুন্দর রূপায়ণে। লিখেছেন—

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

প্রত্যেকটির দাম: চার টাকা।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা—৯

রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

জার্মান চলচ্চিত্র উৎসবের পরিপ্রেক্ষিতে

গত বৃহস্পতিবার কলকাতায় সপ্তাহ-ব্যাপী জার্মান চলচ্চিত্র উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটল। এই উৎসব উপলক্ষে জার্মান চলচ্চিত্রের প্রতিনিধিরা তাঁদের দেশের কয়েকটি সাম্প্রতিক শ্রেষ্ঠ ছবি এদেশের চিত্রামোদীদের দেখাতে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু যে-কয়টি সুনির্বাচিত ছবি জার্মান চলচ্চিত্র প্রতিনিধিরা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন, তার মধ্যে একটি এদেশে প্রদর্শিত হল না। ছবিটির নাম—"দি কনফেশনস্ অব ফেলিক্স ক্রুল।" বিশ্ব-বন্দিত জার্মান ঔপন্যাসিক টমাস মান-এর একটি বহুপঠিত উপন্যাসের এই চিত্ররূপ পৃথিবীর সর্বত্র চিত্ররসিকদের অভিনন্দন পেয়েছে।

জার্মান চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে পাকিস্তানেও ছবিটি প্রদর্শিত হয়েছে। কিন্তু এদেশের দর্শকেরা ছবিটি দেখার সুযোগ পেলেন না। কারণ ছবিটি আমাদের সেন্সর বোর্ড-এর কাছ থেকে "অশালীনতার" দায়ে প্রদর্শনের ছাড়পত্র পায়নি। যে-ছবি পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সুখ্যাতির সঙ্গে প্রদর্শিত হয়েছে, এমনকি যে-ছবি ইসলাম-রাষ্ট্র পাকিস্তানের সেন্সর-কর্তাদের রুচিকেও আঘাত করল না, সে-ছবি এখানকার সেন্সর বোর্ড এর সভ্যদের অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হল, সেটা ভাবতেও অবাক লাগে।

সাহিত্য ও শিল্পে শালীনতা ও অশালীনতা, শ্লীলতা ও অশ্লীলতার মাঝের সীমারেখাটি যে কোথায়, এ নিয়ে আজও বিতর্কের অবসান ঘটেনি। হয়তো কোনদিন ঘটবেও না। কিন্তু জীবনায়নের ব্যাপ্তি বা জীবনবোধের অনুভূতি যেখানে মানুষের প্রবৃত্তির অতল গভীরে প্রসারিত অথবা কামনা-বাসনার অন্তহীন রহস্যে উদ্ঘাটিত, সাহিত্য ও শিল্পের শর্ত সেখানে অবমানিত নয়। জীবন সেখানে স্বধর্মে শালীন। এই শালীনতাকে বাদ দিয়ে জীবনের বিশ্বরূপ আঁকা সম্ভব নয়। টমাস মান জীবন বিশ্বরূপের এক অসাধারণ শিল্পী। তাঁর কাহিনীর চিত্ররূপ "অশালীনতা"র দায়ে মুক্তি পেল না, দর্শকেরা ছবিটি দেখতে পেলেন না—এতে এদেশের সুধীমহলে ক্ষোভ ও বিস্ময়ের সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক।

টমাস মান-এর একটি রসোত্তীর্ণ কাহিনীর চিত্ররূপে আমাদের সেন্সর বোর্ড-এর বিচারে যে প্রদর্শনের অযোগ্য বিবেচিত হল দেশ বিদেশের শিল্প-রসিকদের কাছে এ ঘটনাটি হাস্যকর মনে হতে পারে। জার্মান চলচ্চিত্র প্রতিনিধি দলের জনৈক সভ্য পরিহাসচ্ছলে বলেছেন "পাকিস্তানে গিয়ে যে রস-বোধের 'সেন্স অব হিউমার' পরিচয় পেয়েছি, এখানে দেখছি তা নেই।" এই মন্তব্য যে আমাদের সম্মান বাড়ায়নি সেটা সেন্সর কর্তাদের বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাঁদের বোঝা উচিত ছিল যে এ ধরনের 'ফেস্টিভাল' বা চলচ্চিত্র উৎসবের একটি বিশেষ লক্ষ্য হচ্ছে, দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক ভাবের বিনিময়, বিদেশের শিল্প-ভাব ও রীতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। যে-উদ্দেশ্যে সেন্সর বোর্ড কোন ছবির প্রদর্শন অযোগ্য বলে মনে করেন, বিদেশী ছবির 'ফেস্টিভাল'-এর ক্ষেত্রে তা অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে অনুসরণ না করলেও বিশেষ ক্ষতির কারণ ছিল না। জার্মান ছবির সাম্প্রতিক বিকাশ, ভাবরূপ ও শিল্পকৃতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনের জন্যে যে উৎসবের আয়োজন, সেই উৎসবের অঙ্গহানি ঘটিয়ে সেন্সর বোর্ড ক্ষতিগ্রস্ত করলেন এখানকার অগণিত দর্শক এবং চলচ্চিত্র শিল্পের বহু কলা-কুশলী, শিল্পী ও তরুণ বিদ্যার্থীদের। 'ফেস্টিভাল'এ প্রদর্শিত ছবি শহরে নিয়মিতভাবে দেখানো বিদেশী ছবিগুলির পর্যায়ে পড়ে না। শহরের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে নিয়মিতভাবে প্রদর্শিত বিদেশী ছবিগুলি নাগরিক জীবনের সাংস্কৃতিক সত্তার সঙ্গে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভাব-বিনিময়ের পথটি প্রশস্ত করে দেয়। কিন্তু সাত দিনের জন্যে আয়োজিত ফেস্টিভ্যালে মাত্র একদিনের জন্য প্রদর্শিত কোন ছবি নাগরিক জীবনের ভাবধারায় কোন চাঞ্চল্য

সগৌরবে চলিতেছে

মুক্তি ইণ্টারন্যাশনালের নিবেদন

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বিরচিত

বিয়ের খাতা

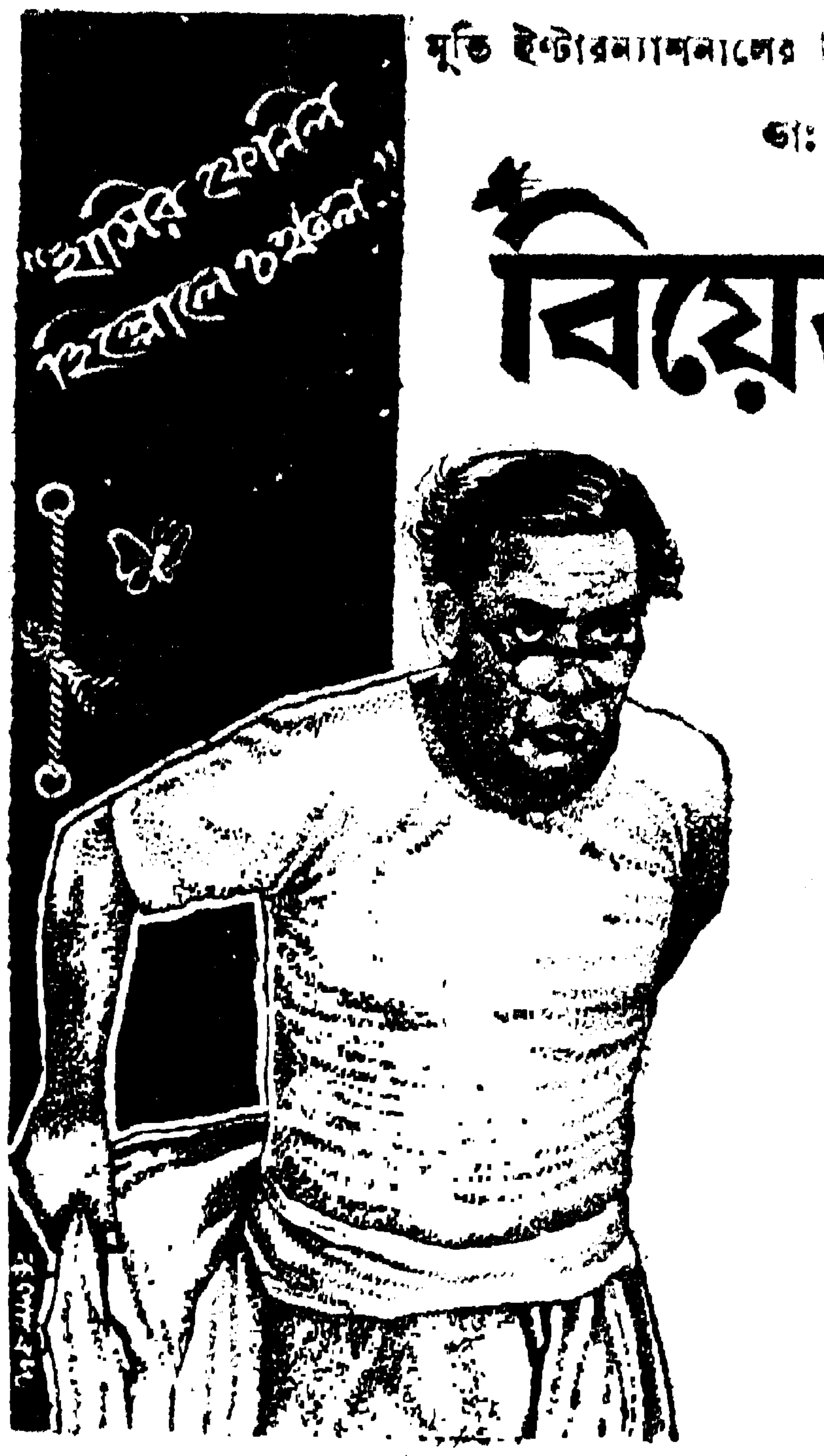

পরিচালনা : নির্মল দে

সঙ্গীত : নচিকেতা ঘোষ

রূপায়ণে :

সুনন্দা · পদ্মা · মঞ্জুলা

তপতী · গীতা · হাসি

জহর গাঙ্গুলী · জহর রায়

আশীষ সেন · অমর মল্লিক

তরুণ · অনুপ · মিহির

হরিমোহন · দিলীপ রায়

ও আরও অনেকে

উত্তরা ০ পূরবী ০ উজ্জলা

এবং সহরতলীর বিশিষ্ট চিত্রগৃহে

— পি, কে, পিকচার্স পরিবেশিত —

জার্মান চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে গত সপ্তাহে যে জার্মান প্রতিনিধিদল কলকাতায় এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে (বাঁ দিক থেকে) সাবিনে সেসেলম্যান, হর্স্ট বুখোলজ ও মারিয়ানে কখ এই তিনজন প্রখ্যাত চিত্রতারকা ছিলেন।

আনতে পারে, এমন ধারণা অলস কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। বিদেশী ছবির 'ফেস্টিভ্যাল'-এর কোন ডিরেক্টার দর্শকরা সেই দেশের বিশেষ ঐতিহ্য, শিল্পরুচি ও সংস্কৃতির আলোকেই বিচার করে থাকেন, বিশেষ দেশের দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে দিয়েই বিদেশী ছবি দেখে থাকেন। বিশেষত বিদেশী ছবির 'ফেস্টিভ্যাল'-এর উদ্দেশ্য যেখানে সংস্কৃতি—এক দেশের শিল্পসাধনার সঙ্গে অন্য দেশের জনসাধারণের প্রত্যক্ষ পরিচয় সাধন—, সেক্ষেত্রে আমাদের সেন্সর বোর্ড তাঁদের 'বিশেষ' ক্ষমতাটি প্রয়োগ না করলে আমাদের শিক্ষিত জনসাধারণ একটি উল্লেখযোগ্য জার্মান চিত্রসৃষ্টি দেখার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতেন না।

সেন্সর বোর্ড সাধারণ প্রেক্ষাগৃহে ছবিটির প্রদর্শন অনুমোদন না করলেও বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পমহলের নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক ও শহরের বিশিষ্ট নাগরিকদের জন্য আয়োজিত কোন বিশেষ প্রদর্শনীতে ছবিটি দেখবার অনুমতি দিলে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে ধন্যবাদার্হ হতে পারতেন। দুঃখের বিষয়, তাঁরা এই সদ্বুদ্ধি ও সহযোগিতার পরিচয় দিতে পারেননি। ফলে সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত জার্মান চিত্রপ্রদর্শনীর এই সমারোহ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। এর জন্য দায়ী আমাদের নীতিবাগীশ সেন্সর বোর্ড—যাঁদের শালীনতা-বোধের ফলে বিদেশী অতিথিরা এদেশ থেকে অ-সহযোগিতার এক তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে স্বদেশে ফিরে গেলেন!

সেন্সর বোর্ডের বিধানে ছবিটির প্রদর্শন বন্ধ থাকার ফলে রুচিশীল দর্শকসমাজে যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে, তার প্রতি সেন্সর-কর্তারা উদাসীন থাকতে পারেন না। ছবিটি কী কারণে নিষিদ্ধ হল, সে-সম্বন্ধে রসিকজনের মনে কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। অতএব আশা করব, অচিরেই সাংবাদিক ও চিত্রশিল্পীদের দেখবার জন্য সেন্সর বোর্ড ছবিটির একটি বিশেষ প্রদর্শনের অনুমতি দেবেন। ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি অথবা অন্য কোন সংস্থার উদ্যোগে এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হতে পারে।

জার্মান চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে আরও একটি কলঙ্কজনক ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইলাম আমরা। ঘটনাটি ঘটেছে গত শনিবার টেকনিশিয়ানস্ স্টুডিওতে। ঐদিন সেখানে বাংলা চলচ্চিত্রের কলা-কুশলীদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি সভায় জার্মান চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। কলাকুশলীদের প্রতিনিধিস্থানীয় যে প্রতিষ্ঠানটির কথা

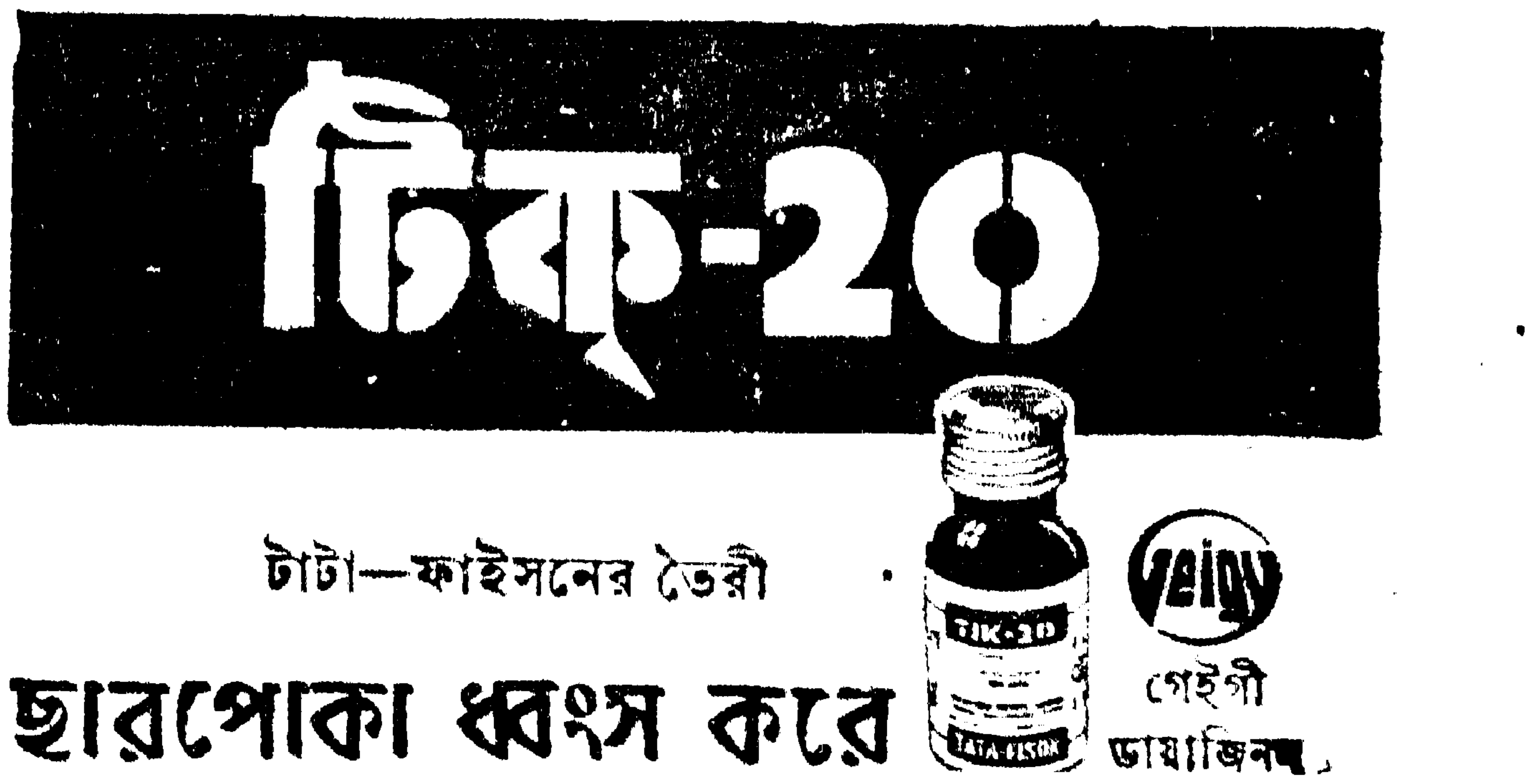

নিউ থিয়েটার্স একজিবিটার্স নিবেদিত "নতুন ফসল" চিত্রে এক কৃষক দম্পতীর ভূমিকায় কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া চৌধুরী।

সকলেই জানেন, তা সি টি এ বি নামে পরিচিত। কিন্তু সম্বর্ধনা-সভার নিমন্ত্রণ-পত্রে যে প্রতিষ্ঠানটির নাম দেখা গেল, তা হল সিনে ওয়ার্কারস অ্যাণ্ড টেকনিশিয়ানস্ কমিটি। •এই সংস্থার জন্মলগ্ন সম্বন্ধে আমরা অবহিত নই, এর কর্মধারা সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ। অথচ এই নিমন্ত্রণ-পত্রে সভাপতি হিসাবে সুশীল মজুমদারের নাম দেখা গেল—যাঁকে আমরা সি টি এ বি-এর সভাপতিরূপেই জানি।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সি টি এ বি-র (?) সভাপতিরূপে সুশীল মজুমদার জার্মান প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। তাঁর ভাষণে জার্মান চলচ্চিত্রের ইতিহাস প্রসঙ্গে দু-একটি তথ্যের উল্লেখ ছিল। এর উপস্থিত অতিথিদের সঙ্গে জা চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎ-পরি করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে জনৈক মঞ্চে উঠে এসে প্রাথমিক কর্তব্য সমা পর শ্রী মজুমদারের ভাষণে উল্লি জার্মান চলচ্চিত্র সম্পর্কে যাবতীয় ত ভুল সংশোধনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে হিটলারের আমলে জার্মেনীতে ছায়াছ উন্নতি যে বিশেষভাবে প্রতিহত হয়, ত তিনি তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ কর ভোলেননি। সম্বর্ধনা সভা যে স্বু কলেজে অনুষ্ঠিত বিতর্ক-সভা নয়, হয়তো বক্তা সাময়িকভাবে ভুলে গি ছিলেন। পূর্ববর্তী বক্তার ভুল সংশো তিনি যে উৎসাহ দেখালেন, তা যে-কোন সভাতে মানানসই হোক না বিদেশীর সম্মানে আহূত সম্বর্ধনা-সভ কিছুতেই নয়। বিদেশী অতিথিরা ক এই আচরণে কী ভেবে গেলেন জানি তবে উপস্থিত সুধীবৃন্দ এতে খ লজ্জিত ও পীড়া অনুভব করেছে বিদেশী অতিথিদের সামনে পাড়িয়ে এই প্রতিযোগিতা সম্বর্ধনা-অনুষ্ঠানে সৌন্দর্য ক্ষুণ্ন করেছে। কেউ যদি কোন ভুলই পরিবেশন করে থাকেন, তবে প্রতি অনুষ্ঠানসমূহের একটি অল সময়-কাল আছে। বক্তা সেটি বিস্মৃত বিদেশীদের উপস্থিতে বাঙালীর মনে ক্ষোভের কারণ ঘটিয়েছেন।

এখানেই ইতি নয়। সভাশেষে জটি স্টুডিও কলাকুশলী শিল্পীদের ডাকে মাইকের সামনে এসে, শিল্পীদের স না পেয়ে তিনি ঘোষণা করলেন—"এখানেই শেষ।" পরে খবর নিয়ে জ গেল যে স্টুডিও কর্মীদের শিল্পী নিমন্ত্রণ-পত্রই পাঠাতে হবে, এমন নিয় আগে দেওয়াই হয়নি। যাঁরা সভার প্রার উপস্থিত ছিলেন, গেয়েছিলেন। সম অনুষ্ঠানটি এমনি বিশৃঙ্খলা অস্বস্তিকর পরিবেশের ভেতর দি সম্পন্ন হয়। শুধুমাত্র অনুষ্ঠানে সভাপতি শ্রীদেবকীকুমার বসুর মনো ভাষণ সকলকে মুগ্ধ করে। শ্রী বসু ব বক্তৃতায় ভারত ও জার্মেনীর ঐতিহাসি সাংস্কৃতিক সম্বন্ধের কথা উল্লেখ ক সকল দেশের সকল শিল্পসেবীর সামনে যে চিরন্তন মানবিক আদর্শ রয়ে তার প্রতি সকলের মনোযোগ আক করেন। সভার পুরোহিত হিসাবে তি 'প্রমথেশ বড়ুয়ার একটি প্রতিকৃতি বিদে অতিথিদের হাতে উপহাররূপে তুলে দে মঞ্চে 'প্রমথেশ বড়ুয়ার এই প্রতিকৃ অনুষ্ঠান আরম্ভের আগে থেকেই ছি মঞ্চ ফুল ও মালা দিয়ে সাজানো হ বিদেশীদের গলায় মালা পরানো হ

কার্তিক সংখ্যা 'সিনেমা জগৎ' যাঁরা সংগ্রহ করতে গিয়ে হতাশ হয়েছেন তাঁদের জানাচ্ছি:

অগ্রহায়ণ সংখ্যা

সিনেমা জগৎ

সবেমাত্র প্রকাশিত হয়েছে। অবিলম্বে সংগ্রহ করুন নচেৎ গতবারের মত হতাশ হবার সম্ভাবনা আছে।

এ সংখ্যাতেও যথারীতি

১০১

খানি ছবি ও কার্টুন দেওয়া হয়েছে।

দাম — এক টাকা

সভাপতিকে মাল্যদান করা হল। তারপর ইয়ুথ কয়ারের শিল্পীরা যখন গাইতে এলেন, 'প্রমথেশ বড়ুয়ার ছবিটি একপাশে সরিয়ে রাখা হল—শিল্পীদের পায়ের কাছে। এই প্রতিকৃতির জন্য একটি মালাও জুটলো না। মঞ্চের উপরে প্রতিকৃতিটি রাখবার কোন আসনও জুটলো না। নতুন যুগের যেসব কলাকুশলীরা এই সম্বর্ধনা-সভার অনুষ্ঠান করেছিলেন, তাঁরা পুরোনো আদর্শ ও ঐতিহ্যকে হয়তো মাড়িয়েই চলতে চান। কিন্তু একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিল্প-স্রষ্টার—যাঁকে বাংলা ছবির অন্যতম পুরোধা বললেও অত্যুক্তি হয় না—প্রতিকৃতির প্রতি এই ঔদাসীন্য ও অবহেলাই যদি দেখানো হবে, তবে মঞ্চের' উপর এর স্থানই বা কেন করা হল। সভাপতি শ্রীবসুর ভাষণে 'প্রমথেশ বড়ুয়ার প্রতি যে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে, তা সভার উদ্যোক্তাদের অপরাধ অনেকখানি ক্ষালন করেছে। সভাতে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পমহলের অনেক শিল্পসেবীদেরই দেখা যায়নি। তাঁরা অনাহূতই ছিলেন কিনা জানি না। তাঁদের উপস্থিতিতে সভাটি বাংলা চলচ্চিত্র জগতের প্রতিনিধিত্বমূলক অনুষ্ঠানরূপে সম্পাদিত হলে আরও বেশী শোভন হত। বোম্বাই অথবা মাদ্রাজে জার্মান চলচ্চিত্র প্রতিনিধিরা ছায়াছবির শিল্পী, পরিচালক, প্রযোজক ও কলাকুশলীদের দ্বারা যেরকম বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হয়েছেন, কলকাতায় তাঁরা সে বিরাট সম্বর্ধনা পেয়ে যাননি। এটা এখানকার চলচ্চিত্রসেবীদের পক্ষেই লজ্জার বিষয়।

জার্মান চলচ্চিত্র উৎসব সম্পর্কে বিশেষ খবর: গত ২৪শে নভেম্বর নিউ এম্পায়ারে "রয়েল গেম" ছবিটি দিয়ে চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন হয়। উৎসবের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু।

জার্মান চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদের মধ্যে যারা উল্লেখযোগ্য, তাঁরা হলেন অভিনেত্রী সাবিনে সেসেলম্যান ও মারিয়ানে কশ, অভিনেতা হর্স্ট বুখোলজ, ডাঃ ডি স্বার্জ, আর্থার ব্রাউনার, ডাঃ হানস রুডলফ ও এইচ এম ষেল।

গত ২৪শে নভেম্বর দিল্লী থেকে তাঁরা কলকাতায় পৌঁছন এবং ঐদিন সন্ধ্যায় একটি সাংবাদিক বৈঠকে প্রতিনিধি দল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলিত হন।

সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে জার্মান চলচ্চিত্র সম্বন্ধে প্রতিনিধিরা যেসব তথ্য পরিবেশন করেন, তাতে জানা যায় যে, জার্মেনীতে সাধারণত ছয় সপ্তাহের ভেতর একটি ছবির চিত্রগ্রহণ শেষ হয়। ওদেশের চিত্রতারকারা এক সঙ্গে একাধিক ছবিতে কাজ করেন না। বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁরা অনন্যোপায় হয়ে একসঙ্গে মাত্র দুটি ছবিতে অংশ গ্রহণ করে থাকেন, তার বেশী নয়। সেখানকার কোন চলচ্চিত্র শিল্পী কোন ছবির জন্য ১,০১,০০০ টাকার বেশী পারিশ্রমিক পান না। সেখানকার চিত্র-প্রযোজকরা ঐতিহাসিক অথবা কাল্পনিক কাহিনীর চাইতে বাস্তবধর্মী কাহিনীই বেশী পছন্দ করেন। জার্মেনীতে বাঁধাধরা 'সেন্সরশিপ' বলতে কিছু নেই। সরকার, ধর্ম-প্রতিষ্ঠান ও চলচ্চিত্র মহলের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি সমিতির তত্ত্বাবধানে সর্বজনগ্রাহ্য কয়েকটি নৈতিক বিধানের দ্বারা সেখানকার ছায়াছবির স্বরূপ ও উদ্দেশ্য বিচার করে দেখা হয়। প্রায় ৪৮টি দেশে জার্মান ছবি ব্যবসায়িক প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হয়। এই রপ্তানির বার্ষিক আয় প্রায় ২৭ থেকে ৩০ মিলিয়ন মার্কের কাছাকাছি। রবীন্দ্রনাথের গল্প ও উপন্যাসের ইংরেজী ও জার্মান অনুবাদ সে-দেশের লোকদের কাছে খুবই আদরণীয়। অভিনেতা হর্স্ট বুখোলজ রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর'-এর নাট্যরূপের মূল ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বলে জানা যায়। জার্মান শিল্পীরা ভাল চিত্রনাট্য ●

বিশ্বরূপা

(অভিজাত প্রগতিধর্মী নাট্যমঞ্চ)

[ফোন: ৫৫-১৪২৩, বুকিং ৫৫-৩২৬২]

বৃহস্পতি ও শনি সন্ধ্যা ৬॥টায় | রবি ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬॥টায়

৩০০তম রজনীর সিংহদ্বারে

সেতু

রঙ্গমঞ্চের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি

নাটক—বিধায়ক আলোক—তাপস সেন

শ্রেঃ নরেশ মিত্র - অসীমকুমার

তরুণকুমার, মমতাজ, সন্তোষ, তমাল, জয়শ্রী, সুব্রতা, হিরা, আরতি প্রভৃতি

ও

তৃপ্তি মিত্র (বহুরূপী)

বিশ্বরূপায় বহুরূপীর অভিনয়

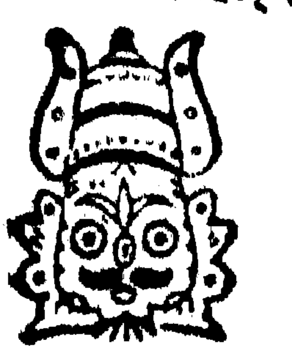

রবীন্দ্রনাথের

রক্তকরবী

৬ই ডিসেম্বর, মঙ্গলবার — সন্ধ্যা ৬॥টায়

নির্দেশনা—শম্ভু মিত্র

আলোক—তাপস সেন

ভূমিকায়—তৃপ্তি মিত্র, শম্ভু মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, অমর গাঙ্গুলী, কুমার রায়, শোভেন মজুমদার, আরতি মৈত্র ও অমিত মৈত্র

● কলালক্ষ্মীর মন্দিরের
● বর্ণ-আলিম্পনে......
● নব-সৃষ্টির স্বর্ণ-স্বাক্ষর!

মিষ্টি সুরের সুরভি-স্নিগ্ধ পরিবেশে - - -
অন্তরঙ্গ প্রেমের অকুণ্ঠিত মহিমায় উজ্জ্বল—

নিউ থিয়েটার্স
(একজিবিটার্স) প্রা: লিমিটেড

নতুন ফসল

পরিচালনায় হেমচন্দ্র | সংগীত রাই বড়াল

লোক-সংগীত নির্মল চৌধুরী | আবহ-সংগীত ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ

কাহিনী: সরোজকুমার রায়চৌধুরী

॥ চিত্র-নাট্য: বিনয় চ্যাটার্জি ॥

শ্রেষ্ঠাংশে:

॥ সুপ্রিয়া চৌধুরী ॥ কালী ব্যানার্জি ॥ বাণী হাজরা ॥ নির্মল চৌধুরী ॥ বিশ্বজিৎ ॥ অনুপকুমার ॥ রেণুকা রায় ॥ অমর মল্লিক ও বহু শিল্পী ॥

শুক্রবার ২রা ডিসেম্বর শুভারম্ভ!

রূপবাণী - অরুণা - ভারতী

ও শহরতলীর সর্বত্র

—গোল্ডউইন রিলিজ—

এ-রকম ক্ষমতাসম্পন্ন করা সম্ভব নয়। সে-দিক থেকে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তার কার্যকর তাৎপর্য খুবই সীমাবদ্ধ।

ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থার গণ্ডীর মধ্যেই তিনি রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা এবং দায়িত্ব কিছুটা প্রশস্ত করার পক্ষপাতী। ধরা যাক, মেনে নেওয়া গেল ভারতীয় সংবিধানের যথার্থ ব্যাখ্যানুযায়ী রাষ্ট্রপতি তাঁর মন্ত্রিসভার পরামর্শ অগ্রাহ্য করবার অধিকারসম্পন্ন। কিন্তু এর দ্বারা পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির ভূমিকা কি স্বচ্ছন্দ হবে? পার্লামেণ্টে ভোট-নির্ভর মন্ত্রিসভার কোনও সিদ্ধান্ত যদি রাষ্ট্রপতি তাঁর নিজস্ব বিবেচনা মত অগ্রাহ্য করেন, তাহলে মন্ত্রিসভা পার্লামেণ্টের আস্থা হারাতে পারেন এবং রাষ্ট্রপতি ও তাঁর মন্ত্রিসভার মধ্যে মত-বিরোধের ফলে ক্রমাগত শাসন-সংকট ঘটাও অসম্ভব নয়। এর প্রতিকার ভারতীয় সংবিধানে বর্তমানে নেই। বিলাতী পার্লামেণ্টারী ছাঁচে ঢালাই ভারতীয় রাষ্ট্রবিধান আমাদের দেশের উপযোগী কি না সেই মূল নীতিগত প্রশ্নের বিচার ও নিষ্পত্তি ছাড়া ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তার সন্তোষজনক সমাধানের সম্ভাবনা দেখা যায় না।

প্রসঙ্গত

দুর্নীতি দমন সংক্রান্ত এক বে-সরকারী প্রস্তাব বিষয়ে গত সপ্তাহে বিধানসভায় তুমুল বিতর্ক হয়ে গিয়েছে। সরকার পক্ষের ও বিরোধীপক্ষের সদস্যদের মধ্যে দুর্নীতির অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগে যাত্রার আসর নাকি ভালই জমেছিল। গ্যালারীর দর্শকেরা ঘন ঘন করতালি বাজিয়ে দুই দলকেই প্রচুর উৎসাহ দিয়েছেন।

দুর্নীতি ক্যানসার-এর মতই মারাত্মক ব্যাধি, দেশের ও সমাজের অন্যতম প্রধান শত্রু। সরকারী শাসনব্যবস্থার উঁচু স্তর থেকে এই সংক্রামক রোগ যখন ক্রমশই নীচু তলা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে তখন ক্যানসার-গ্রস্ত রোগীর মতই শাসনব্যবস্থার একাংশকে চিরকালের মত পঙ্গু করে দেয়। স্বাধীন ভারতের শাসনযন্ত্রের আজ সেই অবস্থা, পক্ষাঘাতগ্রস্তের রুগীর মত তাকে খুঁড়িয়ে চলতে হচ্ছে। দুর্নীতি দমনে সরকারপক্ষ কি পরিমাণ সক্রিয় তার প্রমাণ হিসাবে জনৈক কংগ্রেস সদস্য বিতর্ককালে বিধানসভায় পরিসংখ্যানের নজির হাজির করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, ১৯৫৯-৬০ সালে দুর্নীতির অভিযোগ এসেছে ৭৬,৮৬৯টি। এই সময়ের মধ্যেই এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ ৯৭,১৩৬ ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করেছিলেন। তার মধ্যে ৭২,৬৬৪ জনকে আদালতের কাঠগড়ায় হাজির করানো হয় এবং ৬৮,১০৩ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় দণ্ড দেওয়া হয়। সে-দণ্ড কঠোর না মৃদু সে সম্বন্ধে প্রবক্তা নীরব ছিলেন, আমাদেরও তা জানার আগ্রহ নেই, কারণ, এ-সব অভিযোগে অভিযুক্ত আসামীর বিরুদ্ধে দণ্ডের অনুপাতের জ্ঞান আমাদের আগেই হয়েছে। সংখ্যাতত্ত্বের আশ্রয় নিয়ে সরকারপক্ষের উক্ত সদস্য বোধহয় এই কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, দুর্নীতি দমনে গভর্নমেণ্ট কী পরিমাণ কঠোরতাই না অবলম্বন করে আসছেন। কিন্তু এই সংখ্যাতত্ত্ব উল্টালেই বেরিয়ে পড়বে সরকারী প্রচেষ্টার এক নগ্নরূপ। বেশ কিছু বছর হল এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ খোলা এবং এই বিভাগের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রচুর টাকা খরচ করে সরকার দুর্নীতি দমনের ব্যবস্থা করে আসছেন। তা সত্ত্বেও এই ছোট্ট শহরেই প্রায় এক লক্ষ দুর্নীতির অভিযোগ আসে কি করে? এ থেকে কি প্রমাণিত হয় যে, গভর্নমেণ্ট মনে প্রাণে দুর্নীতি দমনে সচেষ্ট এবং সক্রিয়?

গভর্নমেণ্টের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ নেই, চেষ্টাটা কতখানি সক্রিয় সন্দেহ সেইখানেই। তাছাড়া, সরকারী ও তার ছোঁওয়া লেগে বে-সরকারী শাসনযন্ত্রের আপাদমস্তক দুর্নীতির সংক্রামক বীজাণুতে ভর্তি। সর্বাঙ্গেই যার ঘা মলম লাগাবে কোথায়?

বিরোধী দলের সদস্যদেরও বলিহারী যাই। বিধানসভায় গলাবাজি করে কী লাভ, দুর্নীতি যে আজ আমাদের জাতি-চরিত্রে পরিণত হয়েছে। ইংরেজ আমলের আমলা-তান্ত্রিক শাসনযন্ত্রের সবচেয়ে বড় 'অবদান' এই দুর্নীতি যা স্বাধীন ভারতের শাসকপক্ষ বৃটিশ শাসনতন্ত্রের মহান ঐতিহ্যরূপে সযত্নে রক্ষা করে চলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ দেশের স্বাধীনতালাভ দেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ এই ঋষি স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতবর্ষের বর্তমান-কাল বোধহয় আগেই দেখতে পেয়েছিলেন। 'সভ্যতার সংকট'-এ এক জায়গায় তিনি বলেছেন—'ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে?'

এখানে 'দীনতা'-র জায়গায় 'দুর্নীতি' কথাটি বসিয়ে নিতে পাঠকদের অনুরোধ জানাচ্ছি, আমাদের বক্তব্য তাহলে আরও স্পষ্ট হয়।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর আমরাই বা কি করেছি। নৈবেদ্যের উপর চিনির মণ্ডর মত ইংরেজ ব্যুরোক্রেটিক শাসনযন্ত্রের মাথায় কোট-প্যাণ্টের পরিবর্তে শুধু খদ্দরের গান্ধী-টুপি বসিয়েছি, শাসনযন্ত্রের বাদবাকি খোলসটা যেমন ছিল তেমনিই আছে। সেই কোট-প্যাণ্টের বহর, সেই দীর্ঘসূত্রী লাল-ফিতা, সেই আই সি এস সেজড়ধারী চীফ সেক্রেটারীর রাজত্ব, যেখানে মন্ত্রীদেরও টুঁ-শব্দ করবার উপায় নেই। তা না হলে দেবব্রত নিয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে যে ছড়ির বাড়িটা খেলেন সেই ছড়িটি কে বা কাহারা জুগিয়ে দিয়েছে সে-কথা গত সোমবার লোকসভায় বিবৃতিদান প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেই ফেলেছেন। বৃটিশ আমলাতন্ত্রের উত্তরাধিকারী এইসব অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসাররা স্বাধীন ভারতেরও দণ্ডমুণ্ডের কর্তাকর্তা-রূপেই বিরাজমান, সেই সঙ্গে উপরি পাওনা হিসাবে পাঁচসালা পরিকল্পনার দৌলতে পেয়েছেন কোটি কোটি টাকা খরচের অধিকার। বৃটিশ আমলে পাঁচসালা পরিকল্পনার বালাই ছিল না সুতরাং দুর্নীতিটা লোকচক্ষুর অন্তরালে ভিতরে ভিতরে ক্রিয়া করছিল। আজ তা সর্বাঙ্গে গলক্ষত হয়ে লোকচক্ষুর সামনে ফুটে উঠেছে। বৃটিশ আমলের দুর্নীতির ঐতিহ্য বহনকারী আমলাদের হাত দিয়ে যে টাকা খরচ হচ্ছে তার কিছু যাচ্ছে কাজে, বেশীর ভাগই অকাজে। লাভের গুড়ে ভাগ বসাবার জন্য মাছির ভনভনানির অভাব নেই, সেই মাছির উৎপাতে জনসাধারণ অতিষ্ঠ। সরকার স্থির করলেন এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ খুলে দুর্নীতি দমন করবেন। তার নমুনা ত আমরা দেখলাম। 'আবোল তাবোল'-এর বিখ্যাত কবিতার সেই ছবিটির কথা পাঠকদের মনে করিয়ে দিই। টিফিনের আগে ঘুম দেবার সময় কারা সব পাত থেকে খাবার তুলে খেয়ে যায়। গৃহকর্তা ঢাল-তরোয়াল নিয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা করলেন, রামু হও দামু হও, ও পাড়ার ঘোষ বোস, সবাইকে তরোয়াল দিয়ে ঘ্যাঁচাঘ্যাঁচ কাটবেন। বাহির দুয়ারে এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ নামক ঢাল-তরোয়াল নিয়ে সরকার চোর ধরবার জন্য উদ্যত, পাছ দুয়ার দিয়ে যারা নিত্য খেয়ে যায় তারা খেয়েই যাচ্ছে।

বৈদেশিকী

বৃটিশ রাণী এলিজাবেথ ভারত ভ্রমণে আসবেন। অবশ্য সঙ্গে তাঁর স্বামী প্রিন্স ফিলিপ ডিউক অব এডিনবরাও থাকবেন। ডিউক অব এডিনবরা এর আগেও ভারতে এসেছেন। গত বারের আগের বারে ভারতীয় সায়েন্স কংগ্রেসে তিনি উপস্থিত ছিলেন। স্বাধীন ভারতে অন্য দেশের রাষ্ট্রপতি আরো এসেছেন কিন্তু তাঁদের আসা এবং রাণী এলিজাবেথের আসার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে এবং পার্থক্য করাও হবে। রাণী এলিজাবেথের পিতা পর্যন্ত প্রায় দুশো বছর ধরে ("কোম্পানীর আমল"ও এই হিসাবের মধ্যে ধরা হচ্ছে) বৃটিশ রাজারা ভারতবর্ষের প্রভু ছিলেন। বহু, বোধহয় বেশির ভাগ ইংরেজরই ধারণা যে, ইংরেজ শাসনের দ্বারা সুশিক্ষিত হয়েই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে। অর্থাৎ ইংরেজ শাসনই ভারতীয়দের স্বরাজের যোগ্য করে তুলেছে এবং ভারতীয়দের সেই যোগ্যতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজরা ভারতকে স্বাধীনতা দান করেছে। রাণী এলিজাবেথেরও এই ধারণা থাকা সম্ভব এবং তিনি এখানে এসে যা দেখবেন শুনবেন তাতে তাঁর সেই ধারণা শিথিল হবার কোনো সম্ভাবনা দেখছি না। যে-পরিবেশ ও আবহাওয়ায় তাঁকে রাখা হবে এবং তাঁর ভারত দর্শন সম্পন্ন হবে তাতে নিজের পূর্বপুরুষদের কীর্তির মধ্যেই বিচরণ করছেন বলে তাঁর অনুভব হবে। কোন বাড়ীবাগিচাগুলি নয়, যে মানুষগুলিকে তাঁর সান্নিধ্যে পাবেন তাঁদেরকেও ইংরেজের হাতে গড়া মানুষ বলে বোধ হবে। তাঁর কাছে এঁদের ভাব-খানা মনে হবে যেন—"দেখুন, আপনার বাপদাদারা যা করে গেছেন সেই ধারা বজায় রেখে আমরা কীরকম উন্নতি করে চলেছি।"

রাণী এলিজাবেথ যদি খোঁজ নেন তাহলে জানতে পারবেন যে ভারতে বৃটিশ রাজা যুবরাজদের অভ্যর্থনার জন্য যে অর্থব্যয়ের বহর অতীতে প্রচলিত ছিল তাঁর বেলাতেও মোটামুটি সেটাই অব্যাহত থাকবে। বিদেশী গণ্যমান্য অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য অর্থব্যয় করতে ভারত সরকার অভ্যস্ত কিন্তু রাণী এলিজাবেথের বেলায় যে-অর্থব্যয়ের ঘটা হবে, সেরূপ আর কারো বেলায় হয় নি। সবরকম মিলে সরকারী ও বেসরকারীভাবে সারা দেশে এই উপলক্ষে বিশ পঁচিশ কোটি টাকা খরচ হবে বলে মনে হয়। এই টাকা খরচ থেকে পরোক্ষ লাভ যদি কিছু হয় তাও প্রায় সবটাই দিল্লী এবং কয়েকটা বড়ো শহর এবং কোনো কোনো শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের ভাগ্যে ঘটবে। এই দরিদ্র দেশের পক্ষে দুদিনের একজন অতিথিকে খাতির করার জন্য এরূপ কাণ্ড যে অশোভন এবং অন্যায়, একথা কিন্তু মুখে আনলেই সেটা অমার্জনীয় অভদ্রতা বলে গণ্য হবে। তবে রাণী এলিজাবেথের স্বদেশে যদি বৃটিশ গভর্নমেন্ট অনুরূপ কাণ্ড করার আয়োজন করতেন তাহলে বৃটিশ জনসাধারণের মধ্যে তার কী প্রতিক্রিয়া হত সেটা কল্পনা করা যায়। ইংরেজরা আমাদের অনেক কিছু শিখিয়ে গেছে। কেবল সেই জিনিসটি শেখায় নি বা শেখাতে পারে নি সেটা শিখলে আজ দেশের অবস্থা এবং "আতিথেয়তার" মধ্যে এরকম উৎকট অসামঞ্জস্য লোকে বরদাস্ত করত না, এরূপ অসামঞ্জস্যের উদ্ভবই হত না।

রাণী এলিজাবেথের আসা এবং অন্য

'নাভানা'র বই

ক বি তা

জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা	৫·০০
কঙ্কাবতী ॥ বুদ্ধদেব বসু	৩·০০
শীতের প্রার্থনা ঃ বসন্তের উত্তর ॥ বুদ্ধদেব বসু	৩·০০

প্র ব ন্ধ

আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয় ॥ দীপ্তি ত্রিপাঠী	৭·৫০
রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেম ॥ মলয়া গঙ্গোপাধ্যায়	৩·০০
সব-পেয়েছির দেশে ॥ বুদ্ধদেব বসু	২·৫০
পলাশির যুদ্ধ ॥ তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়	৪·০০
রক্তের অক্ষরে ॥ কমলা দাশগুপ্ত	৩·৫০
সময়টা কেমন যাবে ॥ জ্যোতি বাচস্পতি	৩·০০

গ ল্প ও উ প ন্যা স

এক অঙ্গে এত রূপ ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৩·০০
প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প	৫·০০
সমুদ্র-হৃদয় (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু	৪·০০
ফরিয়াদ (উপন্যাস) ॥ দীপক চৌধুরী	৪·০০
মেঘের পরে মেঘ (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু	৩·৭৫
গড় শ্রীখণ্ড (উপন্যাস) ॥ অমিয়ভূষণ মজুমদার	৮·০০
বসন্তপঞ্চম ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র	২·৫০
তিন তরঙ্গ (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু	৪·০০
মীরার দুপুর (উপন্যাস) ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	৩·০০
মাধবীর জন্য ॥ প্রতিভা বসু	২·৫০
চার দেয়াল (উপন্যাস) ॥ সন্তোষপ্রিয় ঘোষ	৩·০০
বিবাহিতা স্ত্রী (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু	৩·৫০
বন্ধুপত্নী ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	২·৫০
মনের ময়ূর (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু	৩·০০

কি শো র সা হি ত্য

মিঠুয়া ॥ সমর চট্টোপাধ্যায়	১·০০
অবন পটুয়া ॥ সমর চট্টোপাধ্যায়	২·৫০

নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

রাজরাজড়াদের আসার মধ্যে যে-পার্থক্য আছে তার উপর আমাদের কর্তারা একটু টীকাটিপ্পনীর আবরণ দিয়ে ঢাকবার চেষ্টায় আছেন। রাণী এলিজাবেথ ২৬-এ জানুয়ারী রিপাবলিক দিবসে দিল্লীতে উপস্থিত থাকবেন। রিপাবলিক দিবসের প্যারেডে তিনি রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের সঙ্গে এক গাড়ীতে আসবেন এবং দুজনে এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্যারেডে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দলের অভিবাদন গ্রহণ করবেন। রিপাবলিক দিবসে এরূপ পূর্বে কখনো হয় নি। বলা হচ্ছে যে, রাষ্ট্রীয় দিবসে অন্য দেশের রাষ্ট্রপতি উপস্থিত থাকলে নাকি এইরূপ করাই রীতি। যদি তাই ধরে নেওয়া হয় তবে আমরা একটা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি—২৬এ জানুয়ারী দিল্লীতে উপস্থিত থাকার জন্য আর কোনো দেশের রাষ্ট্রপতি আমন্ত্রিত হবেন না। রাণী এলিজাবেথ কমনওয়েলথ-এর "হেড"। এই বিশেষ সৌজন্য প্রদর্শনের দ্বারা তাঁর সেই পদের মর্যাদা রক্ষা করা হচ্ছে, এরূপ মনে করা অসংগত হবে না। অথচ স্পষ্ট করে কিছু বলা হচ্ছে না।

রাণী এলিজাবেথ বৃটেনের রাণী, তাঁর পূর্বপুরুষেরা সম্প্রতিকাল পর্যন্ত ভারতের রাজা ছিলেন, এখনও রাণী এলিজাবেথ কমনওয়েলথ-এর "হেড", যে-কমনওয়েলথ-এর ভিতরে ভারতও আছে—এই তিন ভাবের যোগাযোগের প্রভাব আমাদের কর্তাদের উপর রয়েছে। তাছাড়া, বিদেশে শিক্ষাদীক্ষা এবং মাউন্টব্যাটেন পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠতার সূত্রে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর কাছাকাছি স্ত্রীপুরুষেরা যেন বৃটিশ সমাজের কতকগুলি মনোভাব পেয়েছেন বলে মনে হয়, যার ফলে তাঁরা রাণী এলিজাবেথের আগমনকে একটা "গ্রেট সোশ্যাল অকেশন" করে তুলতে চান। ইংরেজ আমলে এরূপ সুযোগ কেবল সাদাচামড়াওয়ালাদেরই ছিল আর কথঞ্চিৎ দেশীয় নৃপতিবৃন্দের এবং তাঁদের মোসাহেবদের।

রাণী এলিজাবেথের আগমন সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে এসে যায়। সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ একটি গুরুত্বের প্রশ্ন তুলেছেন। ইণ্ডিয়ান ল ইনস্টিটিউটের বাড়ীর ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করার সময়ে প্রেসিডেণ্ট রাজেন্দ্রপ্রসাদ যে বক্তৃতা দেন তাতে তিনি ল ইনস্টিটিউটকে একটি বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখতে বলেন। সে বিষয়টি হচ্ছে—ভারতীয় সংবিধানে প্রেসিডেণ্টকে ঠিক কী ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, ভারতীয় প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা বৃটিশ রাজা (বা রাণীর) মতোই অর্থাৎ আসলে কোনোই ক্ষমতা নেই। সরকারী ব্যাপারে ক্ষমতা সমস্তই মন্ত্রী-দেরই, প্রেসিডেণ্টের যে-সব ক্ষমতা লেখা আছে সেগুলির প্রয়োগ সবই তাঁর নামে মন্ত্রীদের নির্দেশ অনুসারেই হবে। (মন্ত্রীরা বলতে শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকেই বুঝায় কারণ অন্য সব মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীরই আজ্ঞা-বাহী।) এই ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। যিনি সংবিধানের প্রধান রক্ষক, সংবিধানের মর্যাদা রক্ষার জন্য যিনি শপথ গ্রহণ করেছেন তিনিই সংবিধান অনুযায়ী তাঁর ক্ষমতা কতখানি সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ নন, এটা বড়ো গুরুত্বের কথা। ভবিষ্যতে আলোচনার জন্য বিষয়টি রইল। ৪।১২।৬০

॥ ক্রিকেটের অদ্বিতীয় গ্রন্থ ॥

শঙ্করীপ্রসাদ বসুর

ইডেনে শীতের দুপুর

কলকাতায় ক্রিকেট এবং শীত সুরু হয়ে গিয়েছে। শীতের মাধুর্য এবং ক্রিকেটের সৌন্দর্য যদি উপভোগ করতে চান 'ইডেনে শীতের দুপুর' আপনাকে পড়তেই হবে। ৩·৭৫

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

গ্রাম—বাণীবিহার ফোন—৩৪-৪০৫৮

কথাকলি-র উপন্যাস

১লা জুন প্রকাশিত হয়েছে
মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের **তারার আঁধার** ... ৩·৫০

১লা জুলাই প্রকাশিত হয়েছে
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের **কস্তুরীমৃগ** ... ৪·০০

১লা আগস্ট প্রকাশিত হয়েছে
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **বৈশালীর দিন** ... ৩·২৫

১লা সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়েছে
বারীন্দ্রনাথ দাশের **দুলারীবাঈ** ... ৪·০০

১লা অক্টোবর প্রকাশিত হয়েছে
বিমল করের **মল্লিকা** ... ৩·০০

১লা নভেম্বর প্রকাশিত হয়েছে
আশাপূর্ণা দেবীর **উত্তরলিপি** ... ৪·০০

১লা ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়েছে
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের **শ্রীমতী** ... ৪·০০

১লা জানুয়ারী প্রকাশিত হবে
নীহাররঞ্জন গুপ্তের **জতুগৃহ**

পরিবেশক
ত্রিবেণী প্রকাশন
২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মফঃস্বলের অর্ডার
কথাকলি
১ পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলিকাতা ৯

আলোচনা

সহশিক্ষা ও জাতীয় উন্নতি

সবিনয় নিবেদন,

গত ২২শে অক্টোবরের দেশ পত্রিকায় শ্রীঅমল মুখোপাধ্যায়ের 'সহশিক্ষা ও জাতীয় উন্নতি' প্রবন্ধটি পড়লাম। আমাদের অতিরক্ষণশীল সমাজের সামনে দাঁড়িয়ে কতকগুলি সত্যি কথা পরিষ্কার গলায় বলতে পেরেছেন বলে শ্রী মুখোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানাই।

আমরা, নিম্নলিখিত পত্রলেখিকারা, দীর্ঘকাল বাংলাদেশের সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ শিক্ষাজীবনের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত। এবং গত কয়েক বৎসর য়ুরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনধারার সংস্পর্শে এসেছি। এদের সাবলীল বলিষ্ঠ ছাত্রজীবনের পাশে আমাদের দেশের তরুণ যৌবনের ছবিটি যখন চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তখন স্পষ্ট বুঝতে পারি, আমাদের যুবক-যুবতীদের আচরণের মূল্যমানের পরিবর্তনের সময় এসেছে এবং যত তাড়াতাড়ি আমরা সেকেলে নীতিবোধকে ছেড়ে ফেলে সুস্থ মনে নতুন করে ভাবতে শিখব ততই আমাদের ছাত্র-সমাজের তথা দেশের মঙ্গল। নতুবা, আমাদের আর অন্যান্য দেশের ছাত্রদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আপনারা যদি একটু ভাল করে ভেবে দেখেন, তাহলে নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, আমাদের দেশের যুবক-যুবতীরা শোচনীয়ভাবে বিড়ম্বিত জীবন যাপন করেন। আমাদের ছাত্রদের সামনে কি আদর্শ তুলে ধরা হয়? ছেলেবেলা থেকেই নানা বই-পত্রের মধ্য দিয়ে কিংবা বড়দের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপদেশের দ্বারা আমাদের ছেলেদের মাথায় কয়েকটি জিনিস ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।—'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ'—অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করে পুঁথিপত্রের পাঠ কণ্ঠগত কর, যতদিন না ছাত্রজীবন শেষ হয়। আজ যদি মুখ ঘুরিয়ে চোখ মেলে আমাদের দেশের মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রদের দিকে একটু আগ্রহ সহকারে দেখেন তাহলে সেখানে এক মহা আতঙ্কের ছবি লক্ষ্য করবেন।

কিন্তু এই যে বৈকল্য, এটা কি স্বাভাবিক? তাহলে জীবন, প্রকৃতি চলছে কি করে? কর্মের মধ্যে যথাযথ বিশ্রাম, অবকাশ, আনন্দ ও উৎসাহ এই ক্লান্তিকে মুছে দেয়, এই সত্যটা পশ্চিমী লোকেরা

— সদ্য প্রকাশিত হয়েছে —

নট নাট্যকার ও কথাশিল্পী
বিজন ভট্টাচার্যের নবতম উপন্যাস
রাণী পালঙ্ক ২·৫০

সুলেখক শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নবতম উপন্যাস
নিকষিত হেম ৩·০০

ডক্টর নবগোপাল দাসের
চাঞ্চল্যকর গ্রন্থ
এক অধ্যায় ৩·০০
ওপরতলার বীভৎস ঘটনার বাস্তব কাহিনী

দেবেশ দাশের নবতম রম্যগ্রন্থ
পশ্চিমের জানলা
॥ পাঁচ টাকা ॥

সমরেশ বসুর আশ্চর্য উপন্যাস
বাঘিনী ৭·০০

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অনন্য গ্রন্থ
আয়ুবের সঙ্গে ২·০০

জরাসন্ধের সাম্প্রতিক উপন্যাস
ন্যায়দণ্ড ৬·৫০ (২য় মুঃ)
আড়াই মাসে প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষিত

সৈয়দ মুজতবা আলীর নবতম গ্রন্থ
চতুরঙ্গ ৪·৫০ (২য় মুঃ)
আড়াই মাসে প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষিত

॥ উল্লেখযোগ্য বই ॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
মহাশ্বেতা (২য় মুঃ) ৫·৫০
রসকলি ৩·৫০

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর
তুঙ্গভদ্রা ৪·০০
মণিপদ্ম ৪·০০

নিখিলরঞ্জন রায়ের ভ্রমণকাহিনী
সীমান্তের সপ্তলোক ৩·০০

প্রবোধকুমার সান্যালের
নওরঙ্গী ৩·০০
গল্প সংগ্রহ ৪·০০

সতীনাথ ভাদুড়ীর
সত্যি ভ্রমণ কাহিনী ...

বরিস পাস্তেরনাকের উপন্যাস
ডাঃ জিভাগো ১২·৫০

কবিতার অনুবাদ ও সম্পাদনা:
বুদ্ধদেব বসু

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের প্রখ্যাত গ্রন্থ
সুখের সন্ধানে ৫·০০
[The Conquest Of Happiness]
অনুবাদ : পরিমল গোস্বামী
* বই দুটি রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানীর সহায়তায় প্রকাশিত

বনফুলের
শ্রেষ্ঠ গল্প (২য় মুঃ) ৫·০০
মানদণ্ড (২য় মুঃ) ৪·৫০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
তিমির-তীর্থ (২য় মুঃ) ২·৫০
বাংলা গল্প-বিচিত্রা ৪·০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
অনুরাগিণী (২য় মুঃ) ২·০০
কন্যাকুমারী (২য় মুঃ) ৩·০০

প্রফুল্ল রায়ের
সিন্ধুপারের পাখি (২য় মুঃ) ৯·০০
পূর্ব-পার্বতী (২য় মুঃ) ৮·৫০

নীলকণ্ঠের
এলেবেলে ২·৫০
অদ্য ও প্রত্যহ (২য় মুঃ) ৫·০০

বারীন্দ্রনাথ দাশের
রাজা ও মালিনী ৩·০০
বেগম বাহার লেন (২য় মুঃ) ৪·০০

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
রাত ভোর (২য় মুঃ) ২·০০
মৃগতৃষ্ণা ৩·০০

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর
নীলাঞ্জন (২য় মুঃ) ৪·০০
মহাকাল (২য় মুঃ) ৩·৫০

নারায়ণ সান্যালের
বল্মীক ৪·০০
বকুলতলা পি এল ক্যাম্প (২য় মুঃ) ৩·০০

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-বারো ॥

খুব ভাল করে বুঝেছে। তাই তাদের যৌবন আমাদের মত তাড়াতাড়ি দেউলে হয়ে যায় না। কর্মমধ্যবর্তী অবকাশ নতুন কর্মশক্তিকে দ্বিগুণিত করে। এইখানে আসুন এই পাশ্চমীদের সঙ্গে এবং অমলবাবুর সঙ্গে আমরা একমত এই যে, "যৌন প্রবৃত্তি মানুষের প্রবলতম প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির অন্তরালে নিহিত আছে মানুষের দুর্বার শক্তি।" সত্যি কথা বলতে—এই প্রবৃত্তির যথাযথ ব্যবহারে মানুষ অজস্র আনন্দের উপকরণ খুঁজে নিতে পারে। আর এটা স্বীকার করতেই হবে, এই প্রবৃত্তির সূক্ষ্মতম মানসিক বিকাশ, যার নাম ভালবাসা, আর যার আশেপাশে জড়িয়ে আছে সমবেদনা, মমত্ব ইত্যাদি, তা মানুষের সবচেয়ে সুকুমার মনোবৃত্তি। আর মানুষকে সঞ্জীবিত করে তুলতে এর চেয়ে বেশী ক্ষমতা কারও নেই। দুঃখের কথা—মানব-মনের এই প্রেরণার দরজার মুখে মুষল হাতে দাঁড়িয়ে আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবকেরা, সমাজের কর্ণধারেরা।

এবারে দ্বিতীয় ফলটির কথা বলিঃ—শ্রী মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "বরং প্রকৃত অর্থে 'সহশিক্ষা' প্রথার অভাবই বর্তমানকালের নারী পুরুষের নানান সামাজিক সম্পর্কের অধঃপতনের মূলে।" এ কথা কটি কত সত্যি তার একটা প্রমাণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভাষায় বলি। আমাদের দেশের অসংখ্য নিম্ন মধ্য উচ্চ সবস্তরের ছাত্রদের সাথে মিশেছি। আবার এদেশের সহজ-সম্পর্ক অনেক ছাত্রছাত্রীর সঙ্গেও গভীরভাবে আলাপ করে দেখেছি। একটা কথা শুনলে স্তম্ভিত হবেন। আমাদের দেশের উচ্চ নিম্ন ভেদে সমস্ত ছাত্রেরা দিবারাত্র যে-সব আলোচনা করেন তা শুনলে এদেশের সম-পর্যায়ী ছাত্রদের কান লাল হবে—বিরক্তি উদ্রেক করবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা সেরা ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বসে যে ভাষায় কথা বলেন তা শুনলে আমাদের দেশের অতি নীচু সমাজের অশিক্ষিত লোকেরাও স্তম্ভিত হবে। এদেশের ছাত্রদের সঙ্গে বহুদিন মিশেছি। তেমন ভাষা কারুর মুখ থেকে কোনোদিন শুনিনি। এর কারণ কি? একটা কথা এঁরা বিশ্বাস করবেন কি—মনের মরালিটির দাম দেহের মরালিটির চাইতে হাজার গুণ বেশী?

ইতিমধ্যেই অনেক বিলম্ব হয়েছে। পাশ্চমী অর্থনীতি এবং শিক্ষার প্লাবন যে গতিতে আমাদের ঘরের আনাচে কানাচে অন্দরে বাহিরে প্রবেশ করেছে আমাদের সমাজ তার সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে পাল্টাতে পারে নি। এর ফলে আমরা আমাদের পুরনো চণ্ডীমণ্ডপ ছেড়েছি, দোল দুর্গোৎ-সবের সামাজিক মিলনও প্রায় বিলীন কিন্তু তার বদলি কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা আমাদের হয়নি। যে যুগের মধ্যে আমরা আজ বাস করছি তাকে সোজা কথায় বলা যায় পিরিয়ড অব সোস্যাল ভ্যাকাম। কলকাতার রাস্তায় অগণিত কিশোর-কিশোরী যুবক-যুবতী আজ দিশেহারা হয়ে দিবায় সন্ধ্যায় ঘুরে বেড়ায়—কি করি? দিনটা কাটাই কি করে?—এই পরম একাকীত্বের বেদনা-সমুদ্র মন্থন করে কি-ই বা উঠতে পারে একমাত্র বিকৃতি ছাড়া? শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় ঠিকই বলেছেন, বাস্তব দিক দিয়ে বিচার করে দেখতে গেলে সুস্থভাবে ছেলেমেয়েদের সামাজিক মিলন ঘটাবার এক এবং একমাত্র রাস্তা হচ্ছে—'সহশিক্ষা'র নামে যে প্রহসন আমাদের শিক্ষায়তনগুলোতে চলেছে তা সম্মার্জনী সহকারে বিসর্জিত করে অবিলম্বে সত্যিকারের সহশিক্ষা প্রচলিত করা হোক। ছেলেমেয়েদেরকে শুধু ছেলেমেয়েদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া নয়, অভিভাবক এবং অধ্যাপকদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে হবে তাদের সামাজিক মেশা-শোনা এবং মিলন ঘটাবার জন্য। ছোটবেলা থেকেই তীব্র কুসংস্কারের শিক্ষা দিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েদের ইতিমধ্যেই আমরা বিগড়ে রেখেছি। কলেজে ঢুকে সেরূপ সুযোগ কিছু তারা পায় বটে, কিন্তু সাচ্ছন্দ্য-ভাবে তার ব্যবহার করার কথা কল্পনা করতেও পারে না।

সামাজিক নীতিবোধের পুরোনো কাঠামো পবিত্র গঙ্গার বক্ষে বিসর্জন দিয়ে নতুন নীতি রচনার সময় কি আজও হয়নি? অন্যেরা কি বলেন? ইতি,

বিনীত—অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়। দেবী খান। বিনায়ক ঘোষ। ভৈরব রায়। শর্বেন্দু দত্ত। সঞ্জীব ঘোষ ও সুনীল তুলাপাত্র।
ওহিও স্টেট ইউনিভার্সিটি। ইউ এস এ

॥ অতি আধুনিক ছোট গল্প ॥

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

সাম্প্রতিক কালের আঙুলগুনতি কয়েক-জন তরুণ গল্পকার ছোটগল্পের ক্ষেত্রে নতুন পথে পদচারণার প্রচেষ্টায় উন্মুখ হয়েছেন এবং কিছু কিছু গল্পও বিভিন্ন পত্রিকাকে আশ্রয় করে ('দেশ'-ও অন্যতম) পাঠক-সমাজের পাতে পরিবেশিত হয়েছে। বলা বাহুল্য সব নতুনের মতই এক্ষেত্রেও পাঠকের রসবোধ কুণ্ঠাজড়তার পরিচয় দিয়েছে। 'দেশ'-এর আলোচনায় মোটামুটি তা মুদ্রিত। অনেকে অবশ্য প্রতিবাদী সেজে যুক্তিগ্রাহ্য কথাও বলেছেন। উভয়পক্ষের কথাই সংস্কারোর্ধ্ব দৃষ্টি নিয়ে ভেবে দেখবার লোকেরও অভাব নেই বাংলাদেশে।

ছোটগল্পের ক্ষেত্রে ধরতে গেলে এই জাতীয় একটা সুর ও রূপবদলের দরকার ছিল। এতদিন ভাল ছোটগল্প লেখা হচ্ছিল নিঃসন্দেহে। তবে শিল্পাত্মক স্বৈরাচারে সস্তায় বাজিমাতের ফিকির এবং শুধুমাত্র ভারে প্রচুর ভোঁতা গল্পে বাজার ছেয়ে যাচ্ছিল। পাঠকদের পক্ষে একটা চূড়ান্ত অতৃপ্তি ও ক্ষোভ দানা বাঁধছিল। বস্তুত

পলাশী প্রকাশিত

এই দশকের গল্প

বিমল কর সম্পাদিত

সাম্প্রতিকার সাহিত্যে এই গ্রন্থের লেখকরা নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের ক্ষয়িষ্ণু চেহারা যত আবেগহীনতার সঙ্গে এঁকেছেন কেউ-বা প্রচণ্ড আবেগে সেই সমাজের দু'একটি আকাঙ্ক্ষাকর বেদনাকে রূপ দিয়েছেন। আধুনিক মানুষের মানসিক বিচ্ছিন্নতা এবং সেই মানুষেরই আত্মিক দ্বন্দ্ব সমভাবে এঁদের রচনায় উপস্থিত। নিছক চিন্তাশ্রিত গল্পও এঁদের লক্ষ্যের বহির্ভূত নয়। **দাম ঃ ৪·০০**

যাঁরা লিখেছেন

অজয় দাশগুপ্ত অমলেন্দু চক্রবর্তী দিব্যেন্দু পালিত দীপেন বন্দ্যো-পাধ্যায় দেবেশ রায় প্রবোধবন্ধু অধিকারী বরেন গঙ্গোপাধ্যায় মতি নন্দী যশোদাজীবন ভট্টাচার্য রতন ভট্টাচার্য শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় সোমনাথ ভট্টাচার্য স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবেশক ঃ নবগ্রন্থ কুটির ৫৪।৫এ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ১২

(সি ৯৯৮৬)

নিত্য একই হাতের একই রান্না ব্যঞ্জন খেয়ে রসনারুচি বিদ্রোহী হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। কিছু দিন থেকে নতুন মশলায় নতুন হাতে পাক-করা ব্যঞ্জনের প্রয়োজন পাঠকসাধারণের রসনারুচিকে ফিরিয়ে আনতে তাই একান্ত করে অনুভূত হয়ে আসছিল। এ পটভূমিকায় নতুন ধরনের ছোটগল্পকে স্বাগত জানান সৎপাঠক মাত্রেরই কর্তব্য এবং এরপর এসব ছোটগল্পের ত্রুটিবিচ্যুতি খতিয়ে দেখার প্রশ্ন।

অতি আধুনিক ছোটগল্প বর্তমান জটিল মনস্তাত্ত্বিকতা-চিহ্নিত নামাবলীতে আবৃত। ফলে মনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের গহনে ডুব দিয়ে গভীর সূক্ষ্মতম মানসকূটের ওপর আলোকসম্পাত এবং যথাযোগ্য আঙ্গিককলা গ্রহণে অতি আধুনিক ছোটগল্প দুর্বোধ্যতার ধাপে গিয়ে ঠেকেছে। ফলতঃ শিল্পাধার মাধুর্যের সামগ্রিক রক্ষণ-প্রচেষ্টা সার্থক না হলেও অনেক ক্ষেত্রে অতিচারের জোয়ারজলে ডুবে গেছে। জটিল ভাবনাকে জটিল আকারে রূপ দিয়ে দিয়ে এবং অবশেষে সেই কাহিনীকে ফেনিয়ে এই শ্রেণীর অনেক লেখক উপমা প্রতীক চিত্রকল্পের উদ্ভট নকশার উপমানুপ্রাচুর্যের প্রাবল্যে কেটে কেটে পাঠককে বিভ্রান্ত করেছেন। অবশ্য এঁরা নিজেদের উচ্চস্তরের ইন্টেলেকচুয়াল ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন এবং যাঁরা সর্বগুণসম্পন্ন এবং রসরুচিসম্পন্ন যথার্থ উত্তম পাঠক তাঁরা এদের শিল্পের নামে যথেচ্ছ অতিচারকে স্বীকৃতি না দিয়ে এবং দুর্বোধ্য সাবাস্ত করে শল্যচিকিৎসার ব্যবস্থা দিলে বহুলপঠিত জনসাধারণ রুচির অনধিকারী বলে ধিক্কৃত হন। বলা বাহুল্য এটি সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। তবে যেসব গল্প দুর্বোধ্য হয়েও রসোত্তীর্ণ হয়েছে সেগুলি জীবনপ্রত্যয়ের নবতম ভাষ্য, উপমাপ্রতীক চিত্রকল্প ও আঙ্গিক চাতুর্যে অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। ছোটগল্পের এই ধারার সার্থক শিল্পীরা পূর্বোল্লিখিত অতিচার সম্বন্ধে সচেতন এবং তাঁরা এও জানেন যে, অতি আধুনিক হয়ে উঠবার আবেগে স্বেচ্ছাকৃত দুর্বোধ্যতায় গল্পকে জমাটকুয়াশার নিরেট চিল বানিয়ে অনেকে পাঠককে ছুঁড়ে মেরে ব্যথিত করে তুলছেন। 'দেশ'-এর পৃষ্ঠায় অতি আধুনিক ছোটগল্পের বিরূপ আলোচনা এই বাঞ্ছিত স্থানের বক্তব্যকরণও হতে পারে।

গল্পমধ্যে যাঁরা নিছক ঘটনা কাহিনী-বহুল অদ্ভুত গূঢ় ক্রিয়াকাণ্ডের রস পেতে চান, তাঁরা বলা বাহুল্য এই নতুন ধরনের গল্প পড়ে তৃপ্তি পাবেন না। তাঁদের পাবার কথাও নয়। আর না পেলেও বাংলা-সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হবে না বলেই মনে করি। আলোচ্য গল্পকারদের উদ্দিষ্টও তাঁরা নন।

নতুন ধারাবাহীদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে 'to teach about life as he has observed it' কথাটি পত্রিকান্তরে তাঁদের কোন এক সুবন্ধু-সমর্থকের প্রবন্ধে উদ্ধৃত দেখেছিলাম। বলা বাহুল্য এখানে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে, আর তাই নির্দ্বিধায় একথা মেনে নেবার রুচি কাম্য নয়। তবে যাঁরা নিজেদের মনন ও অনুভূতির দীনতা সত্ত্বেও নতুনরীতির গল্পকার বলে চিহ্নিত করতে কোমরে গামছা বেঁধেছেন নানারকম চেষ্টাকৃত ছলাকলার ভিড়ে খড়পোড়া ধোঁয়ার আড়ালে তাঁদের পক্ষে এ ইংরেজী উক্তি স্মরণ রাখলে সুফল ফলতে পারে। বলা বাহুল্য এ নৈতিক প্রত্যাশাপূরণে আমাদের মনের ভাব যথেষ্ট নৈরাশ্যজনক।

সর্বশেষে 'দেশ' পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যার আলোচনা বিভাগে প্রকাশিত পত্রে এক ভদ্রলোকের একটি শিথিল উক্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে চাই। তিনি বলেছেন 'মনস্তাত্ত্বিক দিকথেকে যৌনতত্ত্ব-ভিত্তি এবং ক্রমিক আধিপত্যের দৃষ্টিতে প্রাধান্য পায়।'..... কিন্তু এই অনালোচিত বিষয়ের বর্ণনায় ভঙ্গিটিও স্বাভাবিক হতে পারছে না। ভদ্রলোক যাকে অবান্তর বলে নির্দেশিত করেছেন তা কি যথার্থই অবান্তর। জানি না সাহিত্যের সম্পর্কে তাঁর ধারণা কেমন, তবে মার্গ প্রতিষ্ঠিত। নমস্কারান্তে। ইতি—

শতদলশোভন চক্রবর্তী, চুঁচুড়া, হুগলী

নবীন সংখ্যা উপলক্ষে

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

নব গল্প সংকলন

বরণীয় লেখকের স্মরণীয় গ্রন্থসম্ভার

নানার হাতি ॥ বৈকম মুহম্মদ বশীর ২·০০

শ্রেষ্ঠ মালয়ালম সাহিত্যের সম্পদ উপন্যাস

নাগলতা ॥ সুবোধ ঘোষ ৩·৫০

এ বছরের শারদীয় প্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

আকাশ লিপি (২য় সং)	॥ গজেন্দ্রকুমার মিত্র	৭·০০
আমার ফাঁসি হল (২য় সং)	॥ মনোজ বসু	৩·৫০
একান্ত আপন	॥ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪·০০
তৃষ্ণা (২য় সং)	॥ সমরেশ বসু	৩·০০
চীনে লণ্ঠন (২য় সং)	॥ গজেন্দ্র মজুমদার	৩·২৫
ইষ্টকুটুম	॥ ,,	৩·৫০
বধূবরণ (৩য় সং)	॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	৩·০০
অপরূপা	॥ ,,	৪·০০
মিতে মিতিন	॥ ,,	৩·০০
স্বাদু স্বাদু পদে পদে	॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	২·৭৫
গ্রীষ্মবাসর	॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	২·৭৫
অন্দর মহল	॥ সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৩·০০
সুচরিতাসু	॥ প্রভাত দেবসরকার	৩·০০
প্রিয়তমেষু	॥ স্টেফান জাইগ	২·০০
প্রথম প্রণয়	॥ বিক্রমাদিত্য	৩·০০
দশ পুতুল	॥ আগাথা ক্রিস্টি	৩·৫০

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড ২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা—১২

হাইনে ও রবীন্দ্রনাথ

অরুণকুমার সরকার

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর জর্মন কবি হেইনরিখ হাইনের জন্মদিন। এই উপলক্ষে স্মরণ করা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম হাইনের সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'সাধনা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতে হাইনের ন'টি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল; অনুবাদ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'সাধনা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল আজ থেকে ৬৮ বছর আগে ১২৯৯ সালে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথই যে সর্বপ্রথম বাংলাভাষায় হাইনের অনুবাদ করেছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু শুধু পথিকৃৎ হিসেবেই নয়, এ-ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের নাম সঙ্গত কারণেই উল্লেখযোগ্য। বাংলাভাষায় এ-পর্যন্ত হাইনের যত কবিতা প্রকাশিত হয়েছে সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের কীর্তিই তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে আশা করা যায় সকলেই এ-বিষয়ে একমত হবেন।

তুমি একটি ফুলের মতো মণি
এমনই মিষ্টি, এমনই সুন্দর!
মুখের পানে তাকাই যখনি
ব্যথায় কেন কাঁদায় অন্তর!

শিরে তোমার হস্ত দুটি রাখি,
পড়ি এই আশিস মন্তর,
বিধি তোরে রাখুন চিরকাল
এমনই মিষ্টি, এমনই সুন্দর

মূলে কবিতাটি হাইনের একটি অতি জনপ্রিয় কবিতা। কবিতাটির সারল্য এবং আবেগ রবীন্দ্রনাথ এমন যথাযথভাবে উপস্থিত করতে পেরেছেন যে, মনে হয় একটি মৌলিক বাংলা কবিতা পড়ছি। এমনতর একটি সার্থক অনুবাদ 'রাণী, তোর ঠোঁট দুটি মিঠি'।

রাণী, তোর ঠোঁট দুটি মিঠি,
রাণী, তোর মধুমাখা দিঠি,
রাণী, তুই মণি, তুই ধন,
তোর কথা ভাবি সারাক্ষণ!

দীর্ঘ সন্ধ্যা, কাটে কি করিয়া
সাধ জাগে তোর কাছে গিয়া
চুপিচাপি বসি একভিতে,
ছোটখাট সেই ঘরটিতে।

ছোট হাতখানি হাতে ক'রে
অধরেতে রেখে দিই ধ'রে।
ভিজাই ফেলিয়া আঁখিজল,
ছোট সে কোমল করতল।

মাতৃভক্ত হাইনে নিঃসন্তান হয়েও অপত্য-স্নেহকে নিবিড়ভাবে অনুভব করতেন। উদ্ধৃত কবিতাদুটি তারই নিদর্শন। ইচ্ছে করেই গোটা কবিতাদুটিকে উদ্ধৃত করলাম। কেননা, রবীন্দ্রনাথ কৃত অনুবাদগুলি কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায়, আধুনিক কালের খুব অল্প সংখ্যক পাঠকই তাদের সন্ধান রাখেন।

সহজেই অনুমান করা চলে যে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং যতীন্দ্রমোহন বাগচী হাইনের অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন। এঁরা উভয়েই শুধু যে ইংরেজির সহায়তায় অনুবাদ করেছেন তাই নয়, অনুবাদকালে যথেষ্ট স্বাধীনতাও নিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ-যে মূল জর্মন ভাষা থেকেই হাইনের কবিতার ভাষান্তর ঘটিয়েছিলেন, 'সাধনা' পত্রিকায় তার উল্লেখ রয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী এবং মোহিতলাল মজুমদারের কাছে ঋণ-স্বীকার করেও বলব তরুণ বাঙালী কবি এবং কাব্যপাঠকদের মনে হাইনে সম্বন্ধে নতুন ক'রে অনুরাগ সঞ্চার করতে পেরেছেন অন্য একজন আধুনিক কবি। তিনি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর অনুবাদগুলি "প্রতিধ্বনি" নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদগুলি কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হলে হাইনের প্রতি আমাদের টানটা গাঢ়তর হবে।

গত ষাট বছর ধরে বিশিষ্ট বাঙালী কবিরা যে কল্পদর্শী হাইনের অনুরক্ত হয়ে রয়েছেন তার কারণ বোধকরি দ্বিবিধ। প্রথমত, হাইনে গীতিধর্মী রোমান্টিক কবির শিরোমণি ব'লে; দ্বিতীয়ত তাঁর কবিতায় ভারতীয় কাহিনীর উল্লেখ থাকার জন্য। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অনূদিত নিচের কবিতাটি পাঠ করবার সময় বুঝতে পারি ভারতীয় পুরাকাহিনীর সঙ্গে হাইনের কত পরিচয় ছিল:

বিশ্বামিত্র, বিচিত্র এই লীলা!
দিবারাত্রি আহার নিদ্রা ছেড়ে,
তপস্যা আর লড়াই ক'রে শেষে
বশিষ্ঠের গাইটা নিলে কেড়ে!

বিশ্বামিত্র তোমার মতো গরু
দুটি এমন দেখিনি বিশ্বে!
নইলে একটি গাভী পাবার তরে
এত যুদ্ধ, এত তপিস্যে!

এ তো গেল ঠাট্টা। হাইনের অনেক কবিতায় এদেশের এমন অনেক গন্ধস্নিগ্ধ বর্ণনা রয়েছে যে তা পড়ে নৈকট্যের নিবিড়তা অনুভব না করে পারি না। দৃষ্টান্ত হিসেবে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ 'গঙ্গার তীরে সৌম্যপুরুষ সমাধিমগ্ন পদ্মাসনে' মনে পড়ে।

যাই হোক, দুজনেই মূলত গীতিকবি বলে হাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মেজাজের বিশেষ একটা মিল ছিল। রবীন্দ্র-অনূদিত হাইনের নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি পড়বার সময় মনে হয় না কি যে কবিগুরুর রচনাই পড়ছি?

প্রথমে আশাহত হয়েছিনু,
ভেবেছিনু সবে না বেদনা;
তবু তো কোন মতে সয়েছিনু,
কী ক'রে যে সে কথা শুধাও না।

মৃগতৃষা

দেবীপ্রিয় দে

আনন্দবাজার বলেনঃ লেখক বাংলা-সাহিত্যে নবাগত। বর্তমান সমাজ-জীবনের এক নগ্ন সত্যকে পরিস্ফুট করার জন্যই মৃগতৃষার কাহিনী রচিত। নবাগত হলেও লেখক কাহিনী বর্ণনায় যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এরই জন্যে উপন্যাসটি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

দৈনিক বসুমতী বলেনঃ বর্তমান সমাজের বাস্তব পটভূমিকায় রচিত এই কাহিনীর মাধ্যমে গ্রন্থকার যে সত্যটি প্রকাশ করতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট ভাবেই ধরা দেবে পাঠক পাঠিকার সমক্ষে .....

কবি ও সুলেখক শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু বলেনঃ সোজা সরল ভাষায় কাহিনীটি শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত একটি পাহাড়ী নদীর মত ঝিরঝির করিয়া বহিয়া গেছে। ..... সাহিত্যের কাজই হইতেছে মানুষকে শিক্ষিত করা, উন্নত করা। তার পরিবর্তে আজকাল সাহিত্যক্ষেত্রে একমাত্র আদিরসকে নানারূপে নানাভাবে বিচিত্রিত করিয়া যথেচ্ছ সামাজিকভাবে উত্তেজিত করিয়া যে ধ্বংসকর খেলা চলিতেছে, তরুণ লেখকের এই বইখানি নিশ্চয়ই তার ব্যতিক্রম। মূল্য ২.৫০

নব বলাকা প্রকাশনী, ৪ নফরচন্দ্র লাহা লেন, কলিকাতা-৩৬

(সি-৯৭০০)

। পত্রাবলী

GOVERNMENT LIBRARY Cooch Behar

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ১৯ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

রাণী, প্রত্যেক মেল্‌এ তোমার চিঠি পাব এমন আশা করিনি। পোর্টসৈয়েদ থেকে কলম্বো পর্যন্ত আমার সপ্তাহগুলো পত্রহীন ছিল সুতরাং তারা যে নিষ্ফল হবে সেটা আমার হিসাবের মধ্যে আছে। তাই এবারকার ফাঁকটা কৈফিয়ংহীন হয়নি। মনের মধ্যে তবুও একটু সংবাদের অপেক্ষা ছিল কারণ আরবারে তোমার চিকিৎসার প্রথম খবর মাত্র ছিল, তার সমাপ্তির খবরটা এইবারে পেলে মনটা শমে এসে পৌঁছত। আমার হয়েচে কি, তোমার কাছে সকল কথা অনর্গল বকে যাওয়ার অভ্যাস পাকা হয়ে গেছে। আমার মনটা স্বভাবতই নদীর ধারার মতো, চলে আর বলে একসঙ্গেই—বোবার মত অবাক হয়ে বইতে পারে না। এটা যে ভালো অভ্যাস তা নয়। কারণ মুছে ফেলবার কথাকে লিখে ফেললে তাকে খানিকটা স্থায়িত্ব দেওয়া হয়—যার বাঁচবার দাবী নেই সেও বাঁচবার জন্যে লড়তে থাকে। ডাক্তারি শাস্ত্রের উন্নতির কল্যাণে অনেক মানুষ খামাকা বেঁচে থাকে প্রকৃতি যাকে বাঁচাবার পরোয়ানা দিয়ে পাঠান নি—তারা জীবলোকের অন্নধ্বংস করে। আমাদের মনে যখন যা উপস্থিত হয় তার পাসপোর্ট বিচার না করেই তাকে যদি লেখন রাজ্যে ঢুকতে দেওয়া হয় তাহলে সে গোলমাল ঘটাতে পারে। মনে করো মিস্ প—সম্বন্ধে যেমনি মনে একটা ধারণা উপস্থিত হয়েচে অমনি সেইটাকে একটা ছবির আকারে সম্পূর্ণ করে প্রকাশ করবামাত্র সে আপন যাথার্থ্যের অধিকার সহজে আর ছাড়তে চাইলে না। যদি প্রশান্তের মতো বলতে পারতুম যে এখনো ছবি খাড়া করবার সময় হয়নি অতএব চুপ করে থাকাই ভালো তাহলে মুছে ফেলবার সময় এত বেশি মাজাঘষা করবার দুঃখ পেতে হত না। যে কথাটা ক্ষণজীবী তাকেও অনেকখানি আয়ু দেবার শক্তি সাহিত্যিকের কলমে আছে,—সেটাতে বেশি ক্ষতি হয়না সাহিত্যে। কিন্তু লোকব্যবহারে হয় বই কি। চিন্তাকে আমি তাড়াতাড়ি রূপ দিয়ে ফেলি। সব সময়েই যে সেটা অযথা হয় তা নয়—কিন্তু জীবনযাত্রায় পদে পদে এই রকম রূপকারের কাজের চেয়ে চুপকারের কাজ অনেক ভালো। আমি প্রগল্‌ভ, কিন্তু যারা চুপ করতে জানে তাদের শ্রদ্ধা করি। যে-মনটা কথায় কথায় চেঁচিয়ে কথা কয় তাকে আমি এখানকার নির্মল আকাশের নীচে গাছতলায় বসে চুপ করাতে চেষ্টা করচি। এই চুপের মধ্যে শান্তি পাওয়া যায় সত্যও পাওয়া যায়। আমাদের সাংসারিক জীবনে সম্প্রতি যে একটা বিপর্যয় ঘটেছে চিরাভ্যাসক্রমে সেটা নিয়ে মন মুখর হয়ে উঠতে চায়—কিন্তু যদি তাকে বিনা বাধায় কথা বলে যেতে দিই তাহলে ঘটনার সঙ্গে বর্ণনার যোগ হয়ে যে একটা ঘূর্ণি হাওয়ার হুহুংকার উৎপন্ন হবে তার আলোড়নটাতে না আছে সুখ না আছে প্রয়োজন। প্রত্যেক নূতন অবস্থার সঙ্গে জীবনকে খাপ খাওয়াতে গিয়ে নানা জায়গায় ঘা লাগে—তখনকার মতো সেগুলো প্রচণ্ড—নতুন চলতে গিয়ে শিশুদের পড়ে যাওয়ার মত—তা নিয়ে আহাউহু করতে গেলেই ছেলেদের কাঁদিয়ে তোলা হয়—বুদ্ধি যার আছে সে এমন জায়গায় চুপ করে যায়—কেননা সব কিছুকেই মনে রাখাই মনের শ্রেষ্ঠ শক্তি নয়, ভোলবার জিনিসকে ভুলতে দেওয়াতেও তার শক্তির পরিচয়।

ইতিমধ্যে কলকাতায় গিয়েছিলুম। 'স' একদল নরনারী নিয়ে গানের তালিম দিচ্ছিল। তার ইচ্ছে ছিল আমাকে সামনে রেখে নাচ ও গানের উপলক্ষ্য করে একটা কলহ সৃষ্টি করে ও তার ধাক্কাটা আমার উপর দিয়েই যায়। দুঃখ বহন করতে রাজি হয়েই গিয়েছিলুম। গতকাল সোমবার এই দুর্যোগের লগ্ন ছিল। কিন্তু তৎপূর্বেই অসহ্য ভিড়ের উপদ্রবে রবিবার সকালে আমার শরীরের এমন অবস্থা হল যে তখনি দশটার গাড়িতে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে আসতে বাধ্য হলুম। বুঝতে পারচি শরীরটা দেউলে অবস্থার ধার ঘেঁষে কাজ চালাচ্চে—ঋণগ্রস্ত ধনীর মতো বাইরে থেকে বোঝবার জো নেই—তাই উমেদারের দল এখনো ছোটোবড়ো নানা দাবী নিয়ে দৌড়ে এসে ভিড় করে—মেসেজ চাই, বক্তৃতা চাই, লেখা চাই, সার্টিফিকেট চাই। যদি বলি শক্তি নেই তো ঠাউরে বসে কৃপণতা করচি। মনে স্থির করেচি সেই অখ্যাতিটাই রটুক।

নটীর পূজার অভিনয়ের প্রস্তাব উঠেচে। গৌরীর বিবাহের পূর্বেই কাজটা সারা চাই। অর্থাৎ আগামী ১৫ই মাঘের মধ্যেই চুকিয়ে দিতে হবে। দুই একজন প্রধান পাত্রের অভাব— যথা লাবী ১ ও অমিতা ২। এই ফাঁক ভরাবার জন্যে কন্যা খুঁজে বেড়াচ্চি। অর্থাৎ আমার অবস্থা ঠিক কন্যাদায়ের উল্টো— আমার হোলো নাটকের পাত্রদায় —কন্যাই দুর্লভ। ভরসা আছে একরকম করে চলে যাবে। আশা করচি এত ভালো হবে যে তোমরা দেখতে পেলে না বলে তোমাদের চিরকাল পরিতাপ থাকবে। ইতি ২৭ পৌষ ১৩৩৩।

স্নেহাশক্ত শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খুব পিঠে খাচ্চি, আর খেজুর রস, আর নলেনগুড়।

---

১ মমতা দাসগুপ্ত, ক্ষিতিমোহ সেন-এর দ্বিতীয়া কন্যা। ২ অমিতা সেন (খুকু)।

বিদেশে অনেক সময় বসে দেশের লোভনীয় খাদ্য যা যা আছে তাই নিয়ে কবির সঙ্গে আলোচনা করতাম। আমার বিদেশী কেক্ পেস্ট্রীতে কোনোদিনই লোভ নেই, তার চেয় পিঠে খেজুর রস, নলেন গুড়, খইর মোয়া প্রভৃতি অনেক বেশী পছন্দ বলে কবি আমাকে সর্বদাই "গ্রাম্য মেয়ে" "বাঙ্গাল" এই সব বলে ঠাট্টা করতেন। যদিও ঠাট্টা করতেন তবু আমি জানতাম তাঁর নিজেরও এইসব খাদ্যের প্রতি যথেষ্ট পক্ষপাতিত্ব ছিল. এই চিঠিখানা শেষ করে তার পরে যে আবার পিঠে, খেজুর রস, নলেন গুড়ের কথা লিখেছেন তা সেই আমাদের নানা দিনের হাস্য কলহের মধ্যে এই সব খাবারের আলোচনা স্মরণ করে। তাছাড়া এগুলো খেতে গিয়ে আমার কথা মনে করে হয়তো একটু করুণাও হোতো।

সেইবার মাঘমাসে কলকাতায় "নটীর পূজা"র অভিনয় জোড়াসাঁকোতে হয়েছিল। কলকাতায় সেই প্রথম "নটীর পূজা"। শান্তিনিকেতনের অভিনয় ক'জনইবা কলকাতার লোক দেখতে পেয়েছিল? লোকমুখে শুনেছি "নটীর পূজা" দেখবার জন্যে শহরশুদ্ধ লোক ভেঙে পড়েছিল। বহুলোক টিকিট না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যায়।

॥ ২০ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আজ এইমাত্র এবারকার মেলে-এ তোমার চিঠি পেলুম। বলা বাহুল্য তাতে খুসি হয়েছি। কিন্তু মনের মধ্যে খেদও অনুভব করচি। খেদের কারণ এই যে, আমার যে কোনো চিঠি পেয়েছ এ চিঠিতে তার আভাস পাওয়া গেল না। অথচ আমি তোমাকে এবার যত চিঠি লিখেচি পরিমাণে ও সংখ্যায় এত চিঠি আজ বিশ বছরের মধ্যে কাউকে লিখিনি। সম্ভবত সেগুলো প্যারিসে এমেরিকান এক্সপ্রেসের ঝুলির মধ্যে সুপ্তি-মগ্ন হয়ে আছে—কোনো একসময়ে একেবারে অনেকগুলো হস্তগত হবে। কিন্তু তুমি যে আমার বিনা চিঠির পরিবর্তে চিঠি লিখে আমাকে ঋণী করচ বলে মনের মধ্যে একটা মহৎ গৌরব অনুভব করচ এটা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারচি না। আমার পণ ছিল চিঠিতে বর্ণনা বিস্তার করে তোমাকেও আমি লজ্জা দেব—ডাকঘরের বিড়ম্বনায় আমার সেই অসামান্য কীর্ত্তি যদি অগোচর থেকেই যায় তাহলে আর একবার আমার শনিগ্রহের প্রভাব সপ্রমান হবে। এতদিনে তোমরা নিশ্চয় লণ্ডনে গিয়ে কোনো একটা অপরিচিত ঠিকানায় আশ্রয় নিয়েচ নিশ্চয় জানি হোটেল রোজিনায় তোমার আবির্ভাব হবে না—সুতরাং তোমার বর্তমান পরিবেশের মাঝখানে তোমার ছবি যে কল্পনা করব—সে সুযোগ নেই। লণ্ডনকে ভালো লাগে না বলে লণ্ডনের চেহারাটা আমার মনে অস্পষ্ট হয়ে থাকে। তা ছাড়া কণ্টিনেণ্টে তুমি যাদের সমাদরের মধ্যে সঞ্চরণ করছিলে তারা সকলেই আমার সুহৃদ—তাদের আদর আমিও পেয়েছি—সুতরাং যখন তাদের মধ্যে তোমার একটা ঠিকানা পাই তখন অনুভব করি তুমি বেশি দূরে নেই। তোমার এবারকার চিঠিতে সেই আমার বন্ধুদের কিছু কিছু আভাস পেয়ে খুব খুসি হলুম। ঠিক এই মেলেই "New York Times"-এ "ছপী-হুরী" আমার একটা ছবি পেলুম। বুকারেস্টের সেই জনতার মধ্যে আমি সেই মোটর রথারূঢ়—তুমি আমার পাশে বসে। ছবিটা বেশ ভালোই উঠেচে। ঐ ছবিটি য়ুরোপে আমার রথযাত্রার একটি আদর্শের মতো। সেই বহুলোকের হৃদয়ের উন্মুক্ত রাজপথের মধ্য দিয়ে চলা, দেশ থেকে দেশান্তরে, উচ্ছ্বসিত সমাদরের কলকোলাহলের মধ্য দিয়ে—সঙ্গে তোমরা রয়েচ। জীবনের এই পরিচ্ছেদটি আপনার মধ্যে আপনি সম্পূর্ণ—তার সমস্ত তানমানের বৈচিত্র্য সেই একটি সংগীতের মধ্যেই নিঃশেষে পর্যাপ্ত। আজ এখানে এই যে জীবনযাত্রার মধ্যে এসে পড়েচি এর এবং তার মাঝখানে কোনো যোজক নেই—ও যেন একটি দ্বীপ। এখানকার কারো সঙ্গে মুখোমুখি বসে ওর স্মৃতি আলোচনা চলতেই পারবে না—এখানকার রেখা ও রং সেখানকার ছবিতে চালানো যাবে না। অতএব তুমি যখন ফিরে আসবে তখন দুজনে মিলে মাঝে মাঝে কোনো নিভৃত অবকাশে সেদিনকার ছবি মনের মধ্যে ফুটিয়ে তুলব। এখানকার জীবনটা ভারবহুল: যা তুচ্ছ, যা অনাবশ্যক, যা জীর্ণ তার সমস্তই মুহূর্তে মুহূর্তে জমা হয়ে উঠচে। সেখানকার সেই ক'টি দিন এর তুলনায় অনেক সহজ—আর্টিস্টের হাতে আঁকা ছবিরই মতো। অর্থাৎ একটি মাত্র বিশেষ ভাব, বিশেষ রস তার মধ্যে সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠেচে। তার সেই সমগ্রের অখণ্ডতা মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়ে গেল। মনে আছে, য়ুরোপের কোনো কোনো শহরের প্রান্তবর্তী পাহাড়ের চূড়ার উপরে দাঁড়িয়ে দূর থেকে উপত্যকার করতলগত পুরীটিকে সমগ্র দৃষ্টিক্ষেত্রের আয়ত্ত করে যখন দেখতে পেতুম কেমন সুন্দর লাগত। এবারকার য়ুরোপীয় মহাদেশের ঐ ক'টি মাসকে পিছন ফিরে দূরত্বের চূড়ার উপর থেকে তেমনি একটি নিবিড় সংহত বিশিষ্টতার মধ্যে দেখতে পাচ্চি—সুন্দর লাগচে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি যখন এদেশে ফিরে আসবে এমনি করেই মাঝে মাঝে কোনো না কোনো বিশেষ অবকাশে ফিরে তাকিয়ে এই ছবির একটি সুন্দর সম্পূর্ণতা দেখতে পাবে। আমাদের দেশের আরো অনেক মেয়ে য়ুরোপে ভ্রমণ করে গেছে—কিন্তু তাদের ভ্রমণ তোমার ভ্রমণের মতো এমন দানা বেঁধে ওঠে নি। তাদের স্মৃতি ঝরে পড়া একমুঠো শুকনো পাপড়ির মতো—বৃন্তআশ্রিত অপরিচ্ছন্ন ফুলের মতো নয়। আমার গর্ব ও আনন্দ হচ্চে এই মনে করে যে, এই দুর্লভ জিনিসটি তুমি আমার হাত থেকেই পেয়েছ—এমন করে আর কেউ কখনো পাবে না!

তোমাকে লিখেচি নটীর পূজার রিহার্সাল চলচে। ভালোই হচ্চে। কিন্তু মনে ভয় আছে, পাছে আমার চিরপরিচিত ভারতীয় অদৃষ্ট আমার সঙ্গে কঠিন কৌতুক করতে প্রবৃত্ত হন। এখনি তাঁর কালো মুখোশটা পরে তিনি আমাকে ভয় দেখাতে প্রবৃত্ত হয়েচেন। এই মাঘের শুরুতেই বৃষ্টিবাদলের অকাল উপদ্রব দেখা দিয়েচে। আজো সকালে সকালে কালো মেঘে আকাশটা যেন পাগলের মতো আলুথালু হয়ে রয়েচে। আমাদের অভিনয়ের দিন যদি দুর্যোগের অবসান না হয় তা হলে—থাক, আগে থাকতে কল্পনায় বিভীষিকা রচনা করে লাভ নেই।

দেশে ফিরে অবধি বুকের ভিতর নানাবিধ দুশ্চিন্তার চাপ পড়েচে বলে কিছুই লেখা হয় নি। শিশু বিভাগ তাদের হাতে লেখা পত্রিকার জন্যে একটা লেখার আবদার করাতে এই কবিতাটি লিখেচি—

আপন মনে গোপন কোণে
লেখা-জোখার কারখানাতে
দুয়ার রুধে, বচন কুঁদে
খেলনা আমার হয় বানাতে॥
এই জগতে সকাল সাঁজে
ছুটি আমার অন্য কাজে,
মিলে মিলে মিলিয়ে কথা
রঙে রঙে হয় মানাতে॥
কে গো আছে ভুবন মাঝে
নিত্য শিশু আনন্দেতে,
ডাকে আমার বিশ্ব খেলায়
খেলাঘরের জোগান দিতে।
বনের হাওয়ায় সকাল বেলা
ভাসায় সে তার গানের ভেলা,
সেইতো কাঁপায় সুরের কাঁপন
মৌমাছিদের নীল ডানাতে॥

আমি যদি তুমি হতুম তা হলে এতক্ষণে লিখতুম, মস্ত চিঠি হল, তোমার পড়তে বিরক্তি হবে। সেই আলোচনাতেই বাকি ফাঁকটা ভরিয়ে দিতে পারতুম। কিন্তু যেটা নিশ্চয় জানি বাজে কথা সেটা লিখে মানুষকে অসাড়চিত্ত বলে গাল দেওয়া আমি সৌজন্য মনে করিনে।

আশা করি চিঠিটা পাবে। কিন্তু আশা না করাই ভালো কারণ বৈরাগ্যমেবাভয়ং। তবু মানব ধর্ম ছাড়তে পারিনে—চিঠিলেখা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিষ্কাম হবার শক্তি নেই—যাকে লেখা যায় সে যে পেয়ে খুসি হবে এ ইচ্ছাটা নির্বাণমুক্তির অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত মনের মধ্যে থেকে যায়। ইতি ১৭ জানুয়ারী ১৯২৭ (৩রা মাঘ)

স্নেহাসক্ত শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ২১ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

রাণী, খুব রাগ হচ্চে। আগামী জন্মে আমাকে পাতা পাতা লম্বা চিঠি লিখে লিখে অসংখ্য ফাউণ্টেন পেন তোমাকে ভোঁতা করে দিতে হবে। এই যে ব্রহ্মশাপ দিচ্চি তার কারণ এ নয় যে তোমার চিঠি পাই নি। পেয়েছি। তাকে লিপি বলা চলে না, তাকে লিপিকা বললেও অত্যুক্তি হয়। সকলের চেয়ে স্পর্ধা হচ্চে এই যে, তোমার এ চিঠিও নিরুত্তরের চিঠি। যে হতভাগা ভাড়া দিতে পারে নি, তাকে হোটেলওয়ালা যদি ভাঁড়ার ঘরের এক কোণে স্থান দেয় সে যেমন এও তেমনি। একেবারে বিশুদ্ধ চ্যারিটি। অথচ আমার মাসুলে আমি ষোলোআনার জায়গায় পাঁচ শিকে চুকিয়ে দিয়ে বসে আছি। তার একখানা রসিদও পেলুম না, যাতে চিত্রগুপ্তকে দেখাতে পারি যে, অন্তত চিঠি সম্বন্ধে আমি নির্মলকুমারী ওরফে রাণী মহলানবিশের কাছে একছত্রের জন্যেও ঋণী নই। আশা করি আমার মোটা মোটা চিঠিগুলো ইহলোকেই কোনো একটা জায়গায় জমচে এবং তোমার হাতে এসে পড়ে তোমাকে লজ্জা দেবে—তার আগে যত পারো অহঙ্কার করে নাও এবং মনে মনে আমাকে গঞ্জনা দিতে থাকো।

নটীর পূজা অভিনয় আর দিন ৫।৬-এর মধ্যেই হবে। আজই খানিকবাদে দুপুরের গাড়িতে মেয়েদের দল নিয়ে রওনা হব। আগামীকাল ১১ মাঘ। এখানকার মেয়েরাই গান করবে। যেহেতু এবার সেসময়ে আমাকে উপস্থিত থাকতেই হবে সেইজন্যে বেদীতে বসতেই হল। আমি কেবল উদ্বোধনের বক্তৃতা করব ক্ষিতিবাবু১ দেবেন উপদেশ। কলকাতার কাউকে জানাইনি। জানালে ভিড়ই হবে আর কিছুই হবে না। কালিদাস২ এসেছিলেন তিনি ব্রাহ্মসমাজকে মেলাবার কাজে যোগ দেবার জন্যে আমাকে ধরতে। আমি রাজি হইনি। বলেছি ব্রাহ্ম বলে কবুল করতে প্রস্তুত নই। কারণ ব্রাহ্ম বলতে বিশেষ কোনো ধর্মকে যদি স্বীকার করতে হয় তবে সেই দলের ধর্মকে আমি মানিনে—আমার ধর্ম আমার একান্ত নিজেরই—সে ধর্মের ঘাটে এসে এখনো আমার জীবন-তরনী পৌঁছয়নি—আশা করি মরবার আগে কোনো একদিন পৌঁছবে। আর ব্রাহ্ম বলতে কতকগুলি লোককে যদি বিশেষ ভাবে আপনার বলতে হয় তাতেও আমি রাজি নই—কেননা খাতায় নাম সইয়ের দ্বারা সেই আত্মীয়তা ঘটে না। তার পরে কথাটা এই যে ঐক্য পদার্থকে তার নিজেরই মাহাত্ম্যের দ্বারা যাঁরা শ্রদ্ধা ও সাধনা করেন আমি তাঁদের নমস্কার করি এবং তাঁদের সঙ্গে আমার মনের মিল আছে। এ ক্ষেত্রে সে জিনিসটাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্চিনে। সাম্প্রদায়িক ঐক্যে যে বল মানুষ কামনা করে সেটা প্রায় বৈষয়িক লোভেরই মত—মাথা গুণ্‌তির আনন্দ তাতে। মাথা গুণ্‌তির উপর যে সিদ্ধি বিরাজ করে আমি তাকে বিশ্বাস করিনে, এমন কি ভয় করি। ঐক্যের পরে এই সব সম্প্রদায়ের পাণ্ডাদের কতবড়ো শ্রদ্ধা তার একটা প্রমাণ দিই। তোমরা সকলেই জানো বিশ্ব-ভারতী নাম দিয়ে আমি একটা কাজের পত্তন করেচি। তাতে তোমাদের অনেককে সহায়রূপে টানবার কঠিন চেষ্টা করা গেল। আশ্বাসও পেয়েছি অনেক। এমন সময় হঠাৎ দেখি বিশ্ব-ভারতীর পাশ দিয়ে আর এক বনস্পতি গজিয়ে উঠচে তার নাম হচ্চে বৃহত্তর ভারত। তাতে নতুন কথা কিছু নেই, ঐ বিশ্বভারতীরই সাধনাকে নামান্তরের লেবেল্‌ দিয়ে এঁরা বাজার গরম করচেন। কাঁরা সব? যাঁদের আমি অজস্র স্নেহ করেচি, যাঁদের আমি যথেষ্ট সাহায্য করেচি, এমন কি বৃহত্তর ভারতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় সাধনের কালে যাঁরা সকৃতজ্ঞ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বিশ্বভারতীতে তাঁদের জীবন উৎসর্গ করবার সঙ্কল্প জানিয়েছেন। আমিও তা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছিলুম। একথা সত্য, যে এঁদের যদি আমার কাছে আমি পেতুম আমার সিদ্ধিলাভের সুযোগ হত। ধর্মে নয়, কিন্তু এই রকম কর্মেই ঐক্যের যথার্থ সার্থকতা। যাঁরা অনায়াসে সেই ঐক্যবন্ধন ছিন্ন করে এক চেষ্টাকে দ্বিধাবিভক্ত করতে কুণ্ঠিত হন না তাঁরাই যখন ধর্মসাম্প্রদায়িক ঐক্যের দূত হয়ে আমাকে তাঁদের দলে টানতে চেষ্টা করেন তখন নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিই এবং আমার শনি গ্রহের উপরেই তার দায় চাপিয়ে কতকটা সান্ত্বনা পাই। কেন না যাদের স্নেহ করেচি তাদের শ্রদ্ধা-হীনতাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করিনে। এখনো বিশ্বাস করিনে, মানুষের দুর্বলতাকে সম্পূর্ণ মেনে নিয়েও মোটের উপরে তাকে ভালোবাসা যায়। কিন্তু যায় বলেই তাতে আঘাত বেশি লাগে। যাকগে।

আসচে মেলের পূর্বে আজ কেবল একটি দিন আমার হাতে আছে। একটি দিনও নয়, দুটি ঘণ্টা। তাই তাড়াতাড়ি লিখে দিচ্চি। একে চিঠি লেখবার যোগ্য খবর আমার মাথায় আসে না, তার উপর তাড়ার চোটে তাড়া পাড়া ছেড়ে পালায়।

ঝুনু আমাদের উত্তরায়ণের সেই কুটীরে এসে আশ্রয় নিয়েচে। এ সংবাদ তোমাকে পূর্বে দিয়েচি কিনা জানি নে। আমাদের পক্ষে আজকাল এই আতিথ্য খুব কঠিন ও দায়িত্ব-পূর্ণ। আমাদের এখন সকল প্রকার অভাবেরই অন্ত নেই। কিন্তু ও বেচারার কোথাও কোনো গতি নেই। কাজেই ওর দায় নিতেই হল। একটু ভালোও আছে।

আমাকে ভিক্ষার ঝুলি হাতে পশ্চিমের রাজাদের দ্বারে যেতে হবে। কাজটা শরীর ও মন উভয়েরই পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকূল। কিন্তু আবার আমার শনিগ্রহকে দায়িক করে এই কাজে বেরোতে হবে—ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে। তার পরে মার্চ এপ্রিলে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে সিঙ্গাপুর রবার হাটে ঘুরে আসবার সংকল্প মনে আছে। কপালে কি আছে দেখি। তোমরা ফিরে আসার আগেই যদি বেরোতে হয় তাহলে ভালো লাগবে না। আজ আর সময় নেই। ইতি ১০ মাঘ ১৩৩৩

স্নেহাসক্ত শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ২২ ॥

ওঁ

৬ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন
কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু,

এবারে নটীর পূজা উপলক্ষে কিছুদিন থেকে কলকাতায় কাটল। আজ আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই শান্তিনিকেতনে রওনা হতে হবে। এর মধ্যে তোমাকে ভদ্র রকমের চিঠি লিখতে পারব এমন আশা নেই। একে সময় অতি অল্প, তার পরে চারিদিকে গোলমাল, কত লোক কার্ড পাঠাচ্চে, কত রকমের খুচরো দাবী—মাথার ঠিক থাকে না। ওদিকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভিখারী গান গাচ্চে, শুনে আশ্চর্য হবে হার্মোনিয়ম বাজিয়ে। এমন অবস্থায় নিজের নামেরই বানান ভুল হয়ে যায়। অতএব আজ তোমাকে চিঠি না লিখলে বিশেষ কিছু ক্ষতি হত না—কিন্তু তুমি ফিরে এলে তোমার কাছে গর্ব করতে পারব যে, কোনো মেল্‌-এ আমার চিঠি ফাঁক পড়েনি। মানুষ যে মনোবৃত্তি নিয়ে ডাক টিকিট জমা করে এও তাই। সে টিকিটের কোনো অর্থই নেই—কেবল এই গৌরব যে কোনো দেশের টিকিট বাদ যায় নি। মানুষ এই ভাব নিয়েই এক তীর্থের পরে আর এক তীর্থে গিয়ে পুণ্য জমাতে থাকে।

১ ক্ষিতিমোহন সেন। ২ ডঃ কালিদাস নাগ।

কোনোটা পাছে ফস্‌কে যায় এই আশঙ্কা। বুলোর[১] কাছে শুনলুম তুমি জ্বরে পড়ে কাউকেই চিঠি লেখো নি। এত দূরবর্তী খবরের একটা সান্ত্বনা এই যে, যখন শোনা যায় তখন সেটা অতীত হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই সুস্থ হয়ে এখন তোমরা ইংলণ্ডে চলে গেছ। তবুও মনের মধ্যে যে অবোধ বাস করে সে প্রথমটা একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে।

নটীর পূজা যে কলকাতার লোককে কি রকম উতলা করে তুলেচে তা নিশ্চয়ই বুলো প্রভৃতির চিঠিতে শুনেছ। টিকিট কেনবার ভিড়ে দরজা ভাঙাভাঙির ব্যাপার বেধে ছিল। ইচ্ছে করলে আরো ২০।২৫ দিন এই রকম পূর্ণ বেগে ব্যবসা চালাতে পারা যেত। কিন্তু হায়রে, আসচে রবিবারে গৌরীর বিয়ে। বাস্‌ হয়ে গেল। এমন সুন্দর দৃশ্য আর কেউ কখনো দেখতে পাবে না। গৌরীর মত মেয়ের কি বিয়ে দেওয়া উচিৎ? খবর পেলুম গাড়ির সময় হল।

স্নেহাসক্ত শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(ক্রমশ)

১ প্রফুল্লকুমার মহলানবীশ

যা রে মন, ডুবে যা

মণীন্দ্র রায়

যা রে মন, ডুবে যা আঁধারে।
যে তোকে চায় না তারই বন্ধ দরোজায়
কেন সাড়া নিস বারেবারে!

ও ঘরে দুয়ের খেলা,
স্তব্ধ হ'য়ে আছে বিশ্বলোক।
সে বৃত্তের শতসূর্যে চেয়ো না এখন,
পুড়ে যাবে চোখ।

যা রে মন, ডুবে যা পাতালে।
যন্ত্রণায় ঢাকা থাক হীরেটুকু তোর
শ্বাসরুদ্ধ খনির আড়ালে॥

অন্যতর জন্মমৃত্যু

শিবশম্ভু পাল

অন্যত্র কপট স্বর্গে আত্মহারা মাতাল মৌমাছি;
কুসুমে কুসুমে রাখি চরণের চিহ্নগুলি স্পর্শলোভাতুর।
যা কিছু মোহন তার কবিত্বের নম্র ছায়াতলে
বসে থাকি। পুষ্পদল, তোমাদের কাছে আমি ঋণী।

দ্বিখণ্ডিত জন্মমৃত্যু। দেহের আধার তাই আরও
নিভৃত সঞ্চয় রাখে সযতনে, বনজ স্বভাব
রক্তের পল্লবে গুপ্ত শেষহীন গন্ধবহ ফুলের মতন
এবং এখানে আমি মন্ত্রমুগ্ধ সাপ হয়ে আছি।

কেবল তুমিই জানো শহর, শহরতলী, অন্তরবাহির।
কপট স্বর্গের আলো বিদ্ধ করে নির্যাতির মতো
ফুল হলে, মূর্তি হলে বুকের তলায় অনায়াসে।
অথচ এখানে নেই বিনাশ্চ অটবী, নীলাকাশ!

পৃথিবীর মতো সব সহ্য করো। আত্মার শিকড়ে
প্লাবন, ঝড়ের বেগ কতবার আঘাত হানে।
তুমিও কি বৃষ্টি নও, বিপর্যয়, প্রমত্ত সাগর?
এসব স্মরণাতীত কালের স্বগত কথা বাতাসে সন্তরে॥

সুতোর কাজ

সুনীল বসু

বেদানার রঙ গোধূলি আলোয় জলের শরীরে
এখনো ধরে নি রুবির মালাটি আকাশের গ্রীবা।
অন্ধকারের অঙ্গুরী নয় জোনাকির হীরে
রাত্রির কালো মসলিনে শুধু মুছে ফেলা দিবা।

ময়ূরীরা সব পেখম মেলেছে শাড়িতে সায়ায়
হাতির দাঁতের দেহগুলি যেন আপেল-পিছল,
ঘুরেছে ফিরছে মায়ামৃগগুলি সোনালী ছায়ায়
আকাশ এখনো ফেলে নি ত তার রেশমী ত্রিপল।

পুরনো দিঘির জলের মতন জোছনার দ্যুতি
ফুটলো দীর্ঘ প্রাসাদের বুকে, সামনে বাগানে।
ঘাসের কাঁথায় সুতোর নক্সা শিশিরের পুঁতি
গাছের আঁচলে জরি ও চুমকি সেলাইয়ের টানে।

বিকেলের বুকে মুছে গেলে রোদ আলোর নিকেল
সন্ধ্যায় ঝরে সাদা রাত্রির অ্যালুমিনিআম
ঝালর দোলায় ঝাউ-দেওদার-তাল-নারকেল
আস্তে বাজাও বাতির সামনে হারমোনিয়াম।

পঞ্চতন্ত্র

সৈয়দ মুজতবা আলী

তলস্তয়*

"কবিগুরু, তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।" রবীন্দ্রজীবনের সপ্ততি বৎসর পূর্ণ হলে শরৎচন্দ্র এ কথাটি বলেছিলেন। সমস্ত বাঙলা দেশ তখন জয়ধ্বনি করে এই বিস্ময়ে আপন বিস্ময় প্রকাশ করেছিল।

কবিগুরু তলস্তয়ের মৃত্যু সংবাদ যখন রুশ সাহিত্যের তখনকার দিনের শরৎচন্দ্র গর্কির কাছে পৌঁছল, তখন তিনি তাঁর শোকবিলাপ শেষ করার সময় লিখেছিলেন, তাঁর দিকে তাকিয়ে যে-আমি ঈশ্বর বিশ্বাস করিনে মনে মনে বলেছিলুম "এই লোকটি ঈশ্বরের মত (গড-লাইক)।"

প্রতি ধর্মেই একটি প্রশ্ন বার বার উঠেছে। ভগবান যখন মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনা করতে চান, তখন তা করেন কোন পদ্ধতিতে। ভারতীয় আর্যরা উত্তরে বলেছেন, স্বয়ং ভগবান তখন মানুষের মূর্তি ধরে অবতাররূপে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধ এবং মহাবীর হয়তো নিজেরা এই মতবাদে স্বীকৃতি দিতেন না, কিন্তু বহু বৌদ্ধ এবং জৈন ও'দের পূজো করেন অবতাররূপে এবং হিন্দুরাও বুদ্ধকে অবতারের আসনে বসাতে কুণ্ঠিত হননি।

সেমিতি জগতে বিশ্বাস, ভগবান তখন মানুষের মধ্যে একজনকে বেছে নিয়ে তাঁকে তাঁর 'প্রফেট', 'পয়গম্বর', 'রসুল', 'প্রেরিত পুরুষ' নাম দিয়ে নবধর্ম প্রচার করতে আদেশ দেন। ইহুদী এবং মুসলমানদের বিশ্বাস, এ'রা কখনো কখনো অলৌকিক দৈবশক্তির আধার হন, কখনো হন না।

খৃষ্টের আসন মাঝখানে। তিনি কখনো বা ঈশ্বরের পুত্ররূপে, কখনো ঈশ্বররূপে, কখনো বা শুধুমাত্র 'প্রেরিত পুরুষ'রূপে অর্ঘ্য পেয়ে থাকেন। ইসলাম তাঁকে অলৌকিক শক্তিধারী ('মুআজিজা' বা 'মিরাকল' করার অধিকারী) পয়গম্বররূপে স্বীকার করে। খৃষ্ট যে অবতাররূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন, তার পিছনে হয়তো প্রাচীন ভারতীয় আর্য ধর্মের প্রভাব আছে। এ তথ্য প্রমাণ করা সহজ নয়, কিন্তু হিট্টাইটদের আমল থেকেই যে পূর্ব ভূমধ্যসাগর তটাঞ্চলে আর্যপ্রভাব বিস্তৃত ছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ভারতবর্ষে যে দুজন অবতার সর্বজনমান্য, তাঁরা শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ।

তলস্তয়

রামচন্দ্র রাবণকে শাসন করে দুষ্কৃতির বিনাশ করেন ও পুণ্যাত্মা জনের মনে সাহস বাড়িয়ে দেন। এবং এই সত্য ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে অস্ত্র ধারণ করতে বিমুখ হননি। পরবর্তী যুগে বোধ করি প্রশ্ন উঠেছিল যে, সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রাণনাশ কি নিতান্তই অপরিহার্য? এযুগে তাই দেখতে পাই মাইকেল যখন সীতাকে দিয়ে রামের বর্ণনা করাচ্ছেন তখন বলছেন, 'মৃগয়া করিতেন কভু প্রভু; কিন্তু জীবনাশে সতত বিরত।'

কৃষ্ণ অবতীর্ণ হবার পূর্বে হয়তো প্রশ্নটা আরো সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ লক্ষ্য বা আদর্শ (এন্ড) মহান হলেই কি যা খুশী সে পন্থা (মীনস) অবলম্বন করা যায়? মহাভারতে তাই কি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অস্ত্র ধারণ করছেন না, কিন্তু অবশ অর্জুনকে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন?

এরপর বুদ্ধদেব। তিনি সর্ব অবস্থাতেই জীবনাশ করতে মানা করেছেন। কিন্তু রামকে যেরকম এক রাষ্ট্রের অধিপতিরূপে অন্য রাষ্ট্রের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কৃষ্ণকে যে রকম অধর্মচারী রাষ্ট্ররাজ দুর্যোধনের মোকাবেলা করতে হয়েছিল, বুদ্ধদেবকে সে রকম কোনো রাষ্ট্রের বৈরীভাবের বিরুদ্ধে সম্মুখীন হতে হয়নি। সমাজের ভিতর ব্যক্তিগত জীবনে প্রাণনাশ না করেও প্রাণধারণ করা অসম্ভব নয়, কিন্তু যদি বর্বর প্রতিবেশী রাষ্ট্র এসে লুণ্ঠন, নরহত্যা, ধর্ষণ ও অন্যান্য পাপাচারে লিপ্ত হয়, তবে কি আক্রান্ত নৃপতি ক্ষমা ও মৈত্রী নীতি অবলম্বন করে নিষ্ক্রিয় তুষ্ণীম্ভাব দ্বারা রাজধর্ম প্রতিপালন করবেন?

বুদ্ধদেবের পর খৃষ্ট যখন সে যুগের অধর্মাশ্রিত রাষ্ট্র গঠন প্রেম ও মৈত্রী দ্বারা পরিবর্তিত করতে চাইলেন, তখন স্বন্দ্ব

* লেয়ো নিকোলায়েভিচ তলস্তয়। জন্ম—ইয়াস্নায়া পলিয়ানা (তুলা) ৯-৯-২৮; মৃত্যু আস্তাপভো (তামবভ) ২০-১১-১০। এ মাসে তাঁর মৃত্যুর অর্ধশতাব্দী পূর্ণ হল।

কুমারেশ ঘোষের
বিনোদিনী বোর্ডিং হাউস
অভিনব সচিত্র সরস উপন্যাস ২.৫০
('শেষপর্যন্ত' নামে ছায়াচিত্রে রূপায়িত)
যম
কুমারেশ ঘোষের নতুন রঙ্গ নাটক ১.৫০
ডি. এম ॥ ৪২ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলি-৬
গ্রন্থগৃহ ॥ ৬ বংকিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২

প্রথিতযশা
শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কাশ্যমীর
"তত্ত্বানুসন্ধানী মন নিয়ে লেখক কাশ্মীরকে দেখেছেন তার ঐতিহাসিক পটভূমিকায়। ফলতঃ কাশ্মীরের বিভিন্ন বর্ণনার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে সে দেশের একটি সামগ্রিক চিত্র। সাধারণ ভ্রমণ বিলাসীর সঙ্গে এখানেই পার্থক্য শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের।"
—আনন্দবাজার পত্রিকা
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট।
কলিকাতা-৬

বাধলো সে রাষ্ট্রের স্তম্ভদ্বয় ধনপতি ও ধর্মাধিকারীদের সঙ্গে। তিনি অস্ত্র ধারণ করতে অসম্মত হন। ক্রুশের উপর তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। (পাঠক কিন্তু ভাববেন না, তাই বলে খৃষ্টধর্ম প্রচারে বাধা পড়ে গেল—বস্তুত খৃষ্টান মাত্রেরই বিশ্বাস প্রভু যীশু ক্রুশে জীবন দেওয়াতেই তাঁর বাণী জনগণের সম্মুখে জাজ্জ্বল্যমান হল, তাঁর জীবনদানের ফলেই আমরা জীবন লাভ করলুম, কিন্তু এ প্রস্তাবনা আমাদের বর্তমান আলোচনায় অবান্তর।)

এর পর ঐ সেমিতি জগতেই হজরৎ মুহম্মদ। মক্কাতে যতদিন ছিলেন, ততদিন তিনি অস্ত্র ধারণ করেননি। মক্কার রাষ্ট্রপতিরা যখন তাঁকে মেরে ফেলা সাব্যস্ত করলেন, তখন তিনি মদিনার নাগরিকদের আমন্ত্রণে সেখানে গিয়ে তাদের দলপতি হলেন—তারা অস্ত্রধারণে পরাঙ্মুখ ছিল না।*

আপন ধর্মকে উচ্চতর আসনে বসানোর জন্য কোনো কোনো অমুসলমান ধর্মযাজক হজরৎ মুহম্মদকে রক্তলোলুপ উৎপীড়ক-রূপে অঙ্কিত করেছেন (যেন অন্যের পিতার নিন্দাবাদ না করে আপন জনকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা যায় না!) কিন্তু তার চেয়েও বেশী ক্ষতি করেছে লুণ্ঠনকারী বর্বর নামে-মুসলমান তুর্ক অভিযানকারীরা (এস্থলে ফিরোজ, আকবরের কথা হচ্ছে না।) বার্নাড শ মুহম্মদ চরিত মন দিয়ে পড়েছিলেন বলে তাঁর এক কাল্পনিক কথোপকথনে এসম্বন্ধে একটি মন্তব্য করেছেন। মুহম্মদকে দিয়ে বলাচ্ছেন,

"I have suffered & sinned all my life through an infirmity of spirit which renders me incapable of slaying."

বস্তুত নানা দিক দিয়ে দেখতে গেলে হজরৎ মুহম্মদ শ্রীরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের মাঝখানে আসন নেন (এঁরা গীতা ও কুরান দিয়ে গিয়েছেন) এবং মোদ্দা কথা এই দাঁড়ায় যে, রাষ্ট্র যখন তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করল, তখন তিনি যুদ্ধ করতে পরাঙ্মুখ না হয়ে 'শর সংহরণে' প্রস্তুত রইলেন। মহাপুরুষ মুহম্মদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পূর্ণতম বিকাশ দেখতে পাই বিরুদ্ধাচারণকারীর সম্মুখে সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করার সময়।

এর পর তের শত বৎসর ধরে কেউ আর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তাব উত্থাপন করেনি। পান্ডা পুরোহিতদের টীকাটিপ্পনির ভিতর খৃষ্টের বাণী নানা বিকৃতরূপ ধারণ করল—পাদ্রী সায়েবরা প্রতি যুদ্ধে পরমোৎসাহে বন্দুক কামান মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা পূত পবিত্র করে যুদ্ধে পাঠালেন।

এযুগে তলস্তয়ই পুনরায় খৃষ্টকে আবিষ্কার করলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে সমাজে তথা সাহিত্যে * সম্পূর্ণতম খ্যাতি অর্জন করার পর তিনি করলেন ঊনবিংশতি শতাব্দীর তথাকথিত ইয়োরোপীয় সভ্যতা বৈদগ্ধ্যের মূলে কুঠারঘাত। তার অর্থনীতি, সাহিত্য, সমাজ এবং বিশেষ করে ধর্ম—এগুলোর পিছনে যে কত বড় ভণ্ডামি লুকনো রয়েছে, সেটা দেখাতে গিয়ে তিনি যে দার্ঢ্য, মেধা ও কঠোর সত্যনিষ্ঠা দেখালেন, তার সামান্যতম বর্ণনা দেওয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব। 'ওয়র এন্ড পীস' তিনি লিখেছিলেন হীরার কলম নিয়ে সোনার কালি দিয়ে—আর তাঁর জীবনের এই চরম উপলব্ধি তিনি লিখলেন দধীচির অস্থি নির্মিত দমশ্কী তলওয়ার দিয়ে আপন বুকের রক্ত মাখিয়ে।

'রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ মহাপাপ' তাঁর এ-বাণী 'দুখবর' সম্প্রদায় মেনে নিয়েছিল এবং বহু দুঃখ বরণ করার পর তলস্তয়েরই সাহায্যে নির্বাসন স্বীকার করে মাতৃভূমি ত্যাগ করে। শেষ পরীক্ষা সেখানে হয়নি।

রুশ রাষ্ট্র তলস্তয়কে কখনো সম্মুখযুদ্ধে আহ্বান করেনি বলে বলা অসম্ভব, তাঁকে শেষ পর্যন্ত ক্রুশ বরণ করতে হত কিনা। তবে একথাও ঠিক আপন আদর্শের চরম মূল্য দেবার জন্য তিনি আত্মজন পরিত্যাগ করে পথপ্রান্তের অবহেলায় প্রাণত্যাগ করেন।

তলস্তয় কাহিনী এখানেই হয়তো শেষ, কিন্তু সেই চিরন্তন কাহিনী আরো এগিয়ে গিয়েছে এবং কখনো শেষ হবে কি না জানিনে।

গাঁধীকে বহু অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন তলস্তয়। তিনিই এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম, যিনি বিদেশী পাপী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র সংগ্রাম করে জয়লাভ করেন।

আবার এটম বোমা তৈরি হচ্ছে।

---

* বার্নাড শ খৃষ্ট ও মুহম্মদের এক কাল্পনিক কথোপকথনের বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর অতুলনীয় ভঙ্গীতে

"Who is to be the judge of our fitness to live?" said Christ. "The highest authorities, the imperial governors, and the high priests, find that I am unfit to live. Perhaps they are right."

"Precisely the same conclusion was reached concerning myself" said Muhammad. "I had to run away and hide until I had convinced a sufficient number of athletic young men that their elders were mistaken about me: that, in fact, the boot was on the other leg."

Bernard Shaw, The Black Girl in Search of God, p. 57.

* যাঁরা নোবেল প্রাইজের নাম শুনলেই চৈতন্য হারান তাঁদের বলে দেওয়া ভালো যে, ঐ প্রাইজ যদিও ১৯০১ খৃঃ থেকে দেওয়া আরম্ভ হয়, ও তলস্তয় ১৯১০-এ গত হন, তিনি এটি পাননি।

নতুন নতুন বই.........পাঠাগারে উপহারে অপরিহার্য বই

সদ্য প্রকাশিত : তিনখানা উপন্যাস......

নীহাররঞ্জন গুপ্তের একখানি রহস্যঘন অনবদ্য উপন্যাস
নীলকুঠি ৫·০০
কত নিশি পোহাল ৩·৫০

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়-এর
পিয়াসী মন ৩·৫০
আগাগোড়া নতুন ধরণের নতুন উপন্যাস : নারী চরিত্রের আশ্চর্য বিশ্লেষণ।

অনুবাদ গ্রন্থ :
বঞ্চিতা ৩·৫০
বিখ্যাত ঐতিহাসিক হিন্দী উপন্যাস 'অধর্ম কি লুঠ'এর বাংলা অনুবাদ 'বঞ্চিতা' 'ভোলগা থেকে গঙ্গা'খ্যাত অনুবাদক শ্রীভগীরথ অনূদিত।

নীলকণ্ঠের উপন্যাস
ট্যাক্সির মিটার উঠছে
৪·০০

শ্রীবাসবের উপন্যাস
দূর কিনারে ৫·০০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
নতুন করে পাওয়া ৪·০০
নতুন ধরণের নতুন উপন্যাস

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু সম্পাদিত
ভূতের গল্পের সংকলন ২·৫০
ডিটেকটিভ গল্পের সংকলন ২·৫০
হাসির গল্পের সংকলন ২·৫০

॥ পূর্ণ তালিকার জন্য আমাদের সহিত যোগাযোগ করুন ॥
দি নিউ বুক এম্পোরিয়ম : ২২/১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬.

Cooch Behar

বেরুবাড়ী সংক্রান্ত ব্যাপারে "আনন্দবাজার পত্রিকা" তিনটি প্রশ্ন করিয়াছেন:—(১) বেরুবাড়ীবাসীর কি অপরাধ? (২) কাহার স্বার্থে এই উপঢৌকন? (৩) দেশের চেয়ে কি ব্যক্তিগত মর্যাদা বড়?

বিশুখুড়ো উল্লিখিত তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন:—(১) যেহেতু তারা বেরুবাড়ীবাসী; (২) যারা স্বার্থ ছাড়া কথা কয় না তাদের স্বার্থে; (৩) নিশ্চয়। একশবার, হাজারবার।

বেরুবাড়ী ব্যাপারে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ উপদেশ দিয়াছেন—বৃহত্তর স্বার্থে উহার পাকিস্তানে যাওয়াই উচিত. বড় ভাই হিসাবে ভারতের কিছু বেশী ত্যাগ

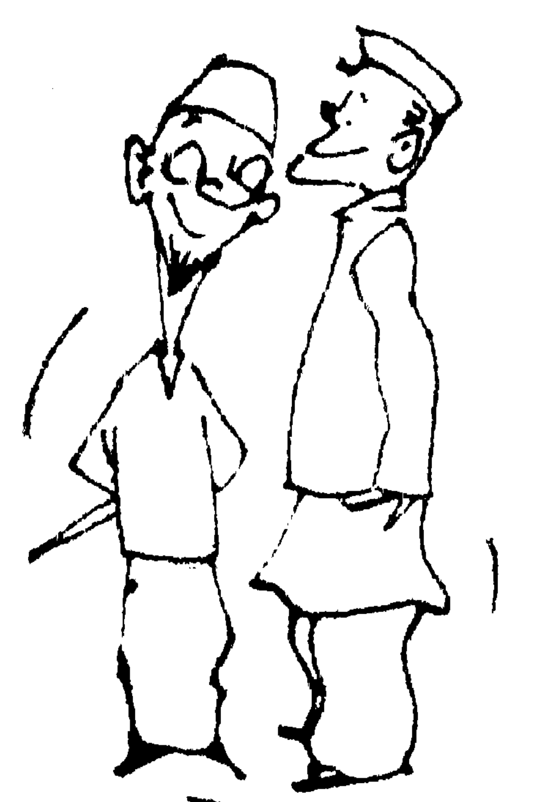

করা বাঞ্ছনীয়।—"আহা, ও মধু, ও মধু। কিন্তু জয়প্রকাশজী কি জানেন না যে, ভারত কখনো বড় ভাই বলে স্বীকৃতি পায়নি। তার পরিচয় বড়দিদির, সম্বন্ধী ইত্যর্থ"—বলে শ্যামলাল।

বিধানসভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী শ্রীঈশ্বরদাস জালান নাকি জানাইয়াছেন যে, "সত্বর" অর্থে বোঝায় অনির্দিষ্টকাল।—"রাজশেখরবাবু বেঁচে থাকলে চলন্তিকায় শব্দটির অন্য অর্থ প্রদানের জন্য যৎপরোনাস্তি মনস্তাপ ভোগ করতেন"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

টিকমগড় হইতে একটি অদ্ভুত রোগের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আক্রান্ত ব্যক্তি নাকি মধ্যরাত্রি হইতে উন্মাদের ন্যায় আচরণ করেন কিন্তু সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হন।—"জাঁহাবাজ গিন্নীদের এতে হাত না থাকলে রোগটাকে অদ্ভুত বলে স্বীকার করতেই হবে"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

ট্রামে-বাসে

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী লোকসভায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় খাদ্যশস্যের ব্যবসার প্রয়োজনীয়তা নাই।—"কিন্তু শাস্ত্রে বলে—বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, এমন মওকা ছাড়া কি উচিত হবে—" বলেন বিশুখুড়ো।

একটি সংবাদে বলা হইয়াছে—পাক-ভারত অর্থমন্ত্রীদের তিনদিনব্যাপী আলোচনা সমাপ্ত হইয়াছে। বৈষয়িক প্রশ্ন অমীমাংসিত রহিয়াছে।—"তা হোক, আধ্যাত্মিক প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেলেই হলো"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় কোন সদস্য নাকি সখেদে বলিয়াছেন যে, আমরা আর এখন পৌরপিতা নই, পৌর অনাথ। অথচ রিপোর্টাররা সব লেখেন, এই কথাটাই লেখেন না। খুড়োও সখেদেই বললেন—"বেচারা, বেচারা! কিন্তু অনাথ-আশ্রম যা আছে তাতে তো স্থান সংকুলান

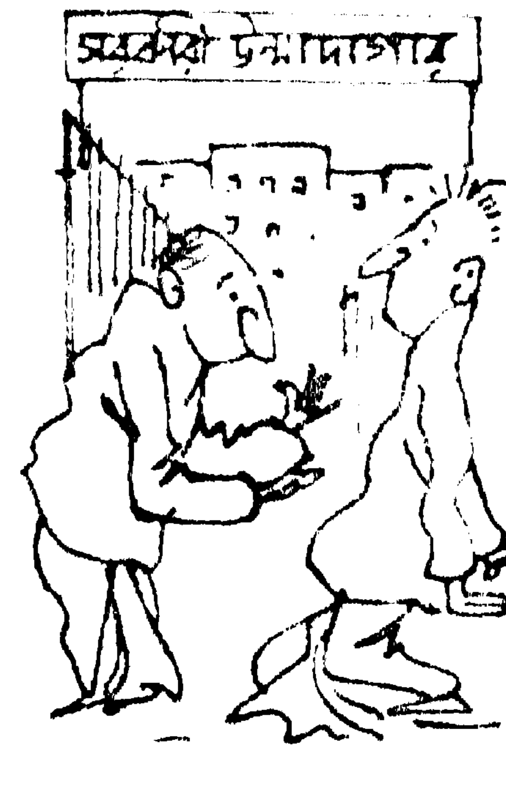

হবে না। তবে শুনেছি, একটি নূতন উন্মাদাগার তৈরি হচ্ছে কলকাতায়। রাজ্য সরকার যদি সেখানে পৌর অনাথদের একটা ব্যবস্থা করে দেন!!"

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীগোপাল রেড্ডী একটি প্রশ্নের উত্তরে জানাইয়াছেন—সামন্ত যুগীয় অভিজাতদের মধ্যে ভারতে এখনো ১৬ জন কোটিপতি আছেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদের নাম প্রকাশে অসম্মত হন।—"ঐ তো ও'দের দোষ। ঘোড়দৌড়ের মরসুমটায় দু'চার টাকার জন্য যে গিয়ে হাত পেতে দাঁড়াবে সেটাও সহ্য হলো না"—বলেন জনৈক ঘোড়দৌড় রসিক।

চাণক্য তার "নগর দর্শনে" পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাকে রেডিওর "গল্পদাদুর" আসরের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। বলিয়াছেন, সেখানে "মহিলা মহলও" আছে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"কথাটা যখন উঠলই তখন বলব, আরো আছে। গোঁইয়া বগড়া শুনলে "পল্লী-মঙ্গল"-ও একে পড়ে। মঙ্গলের বিকৃত রূপও এই বিধানসভাতে পাওয়া যায়!!"

যৌতুক নিষিদ্ধকরণ বিল লইয়া পার্লামেন্টের দুই সভার মধ্যে মতভেদের সংবাদ পাঠ করিলাম।—"লোকসভা আর রাজ্যসভার মধ্যে হবে বেয়াই বেয়ান নিশ্চয়ই আছে। সুতরাং এক কথায় যৌতুক নিষেধ বললেই তো আর হয় না"—বলে শ্যামলাল।

এক সংবাদে জানা গেল, রাশিয়ার ফুটবল দলের ভারত আগমন বাতিল হইয়া গিয়াছে।—"ভালোই হয়েছে। পাকিস্তানের ক্রিকেট খেলা দেখার টিকিট সংগ্রহেই তো হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি, এর ওপর রাশিয়ার ফুটবল মানে তো সাঁড়াশী আক্রমণ"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

ভারত বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্টে তরুণ খেলোয়াড় জয়সীমাকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। খুড়ো বলিলেন—"এর নূতন নামকরণ হওয়া উচিত,—নির্বাসিত করণ।"

মঞ্জুষা
সংস্কৃত মাসিক পত্র
সম্পাদক: ডঃ ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
পৌষ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গল্প। অপলা শাস্ত্রীর পদ্য। সন্তানের স্বরের ক্রম। কালিদাসের প্রভাব। উপনিষদের নূতন ভাষ্য। ইংলণ্ড কোনোদিন অনুবাদ, প্রশ্নোত্তর। সেরসরী। ঐক্য। দেবের অর্থ। বিচার ইত্যাদি আছে। বার্ষিক ছয় টাকা।
৯, ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৪
ফোন: ৫৫-৫০৭৯
(সি ৯৯১৯)

মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল
আরোগ্য করিতে ২৭ বৎসর ভারত ও ইউরোপ অভিজ্ঞ ডাক্তার বিশ্বাসের সহিত প্রতিদিন প্রাতে ও প্রতি শনিবার, রবিবার বৈকাল ৩টা হইতে ৭টায় সাক্ষাৎ করুন। ৩বি, চক্র রোড, বালিগঞ্জ কলিকাতা ২৯। (সি ৯৯৭৫)

চিত্র প্রদর্শনী

কলকাতার ডিজাইন সেন্টারের নাম এখন বেশ পরিচিত। উপরো-উপরি কয়েক বছর ধরেই এঁদের নানান রকম কারুশিল্পের প্রদর্শনী আমরা দেখতে পাচ্ছি। প্রতি বছরেই কিছু কিছু করে নতুন জিনিস এঁরা পেশ করছেন দর্শকদের সামনে। এর আগের প্রদর্শনীতে আমরা দেখেছিলাম বিভিন্ন আকারের তৈজসপত্রাদি এবং পুতুল। সে প্রদর্শনীটি দেখে আমাদের খুব ভাল লেগেছিল। পোড়া মাটির তৈজসপত্র আমরা সচরাচর যা দেখতে পাই তা বিভিন্ন রঙের হলেও চকচকে হয় না। কিন্তু ডিজাইন সেন্টারের তৈরী এসব তৈজসপত্রাদি মাটির হলেও চিনামাটির মতই চকচকে। বর্তমানে সাধারণ কুমোররা এই চকচকে করে রঙ লাগাবার ক্রিয়া কৌশল জানে না। যদিও প্রাচীন কালে আমাদের দেশে এরকম তৈজসপত্র তৈরী হত তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। এই ক্রিয়াকৌশল শেখাবার জন্যে জার্মানী থেকে উইলহেম মোশ নামে এক সাহেবকে নিয়ে আসা হয়েছে। এঁরই শিক্ষাধীনে থেকে ডিজাইন সেন্টারের কারিগরেরা এসব তৈজসপত্রাদি তৈরী করছেন। নক্সা এবং আকারের পরিকল্পনা করছেন ডিজাইন সেন্টারের কয়েকজন শিল্পী এবং রঙ লাগানো হচ্ছে মোশ সাহেবের বিভাগে। এই দুয়ের সমন্বয়ে অত্যন্ত লোভনীয় সব জিনিসপত্রের সৃষ্টি হচ্ছে।

গতবারের তুলনায় এবারের প্রদর্শনীটি আরও চিত্তাকর্ষক বলে মনে হল। প্রদর্শনীটি ৩রা ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে পার্ক স্ট্রীটের আর্টিস্ট্রী হাউস-এ। দু-সপ্তাহের মত চলবে। এবার এঁরা কেবল বিভিন্ন আকারের এবং বিচিত্র নকশার তৈজসপত্র সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত থাকেননি, রঙবেরঙের এবং কারুকার্যখচিত টালি, জাফ্রি, মজাইক, বড় বড় মূর্তি এবং আরও অনেক রকম জিনিস তৈরী করেছেন। নকশায় এবার লক্ষ্য করলাম কিছুটা সুকুমার শিল্পের ছোঁয়া লেগেছে। ঘর সাজাবার জন্য তো বটেই, আর্ট সংগ্রহের জন্যেও এগুলি অত্যন্ত মূল্যবান সামগ্রী বলেই আমি মনে করি। আশা করা যায় আগামী বছরের গোড়ার দিকে এসব জিনিস পুরো বাজারে চালু হবে। অন্যান্য সরকারী

ডিজাইন সেন্টারের কয়েকটি মৃৎশিল্প

প্রতিষ্ঠানের তুলনায় কলকাতার ডিজাইন সেন্টার যে যথেষ্ট সক্রিয় তার সাক্ষ্য এই প্রদর্শনীগুলি। এখানে গ্রামের শিল্পীদেরও নিয়মিত শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্তমান লোকশিল্পের উন্নতির মূলে ডিজাইন সেন্টারের দান যথেষ্ট তারিফ করার মত। এর জন্যে এখানকার পরিচালকের এবং প্রত্যেক কর্মীরই প্রশংসা ও অভিনন্দন অবশ্যই প্রাপ্য।

• • •

ক্যাথিড্রাল রোডে আ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস-এর ভবনে গুরুচরণ সিংহের কিছু চীনামাটির কাজের নমুনা প্রদর্শিত হচ্ছে। বর্তমানে গুরুচরণ সিংহের নাম বেশ ছড়িয়েছে। বোম্বাই শহরের এবং দিল্লি শহরের বড় বড় আর্ট জার্নালে এবং সংবাদপত্রে এঁর ভূয়সী প্রশংসা প্রকাশিত হয়। একেকটি প্রদর্শনীতে এঁর শিল্প কর্ম বিক্রীও হয় অবিশ্বাস্য রকম। বর্তমানে দিল্লিতে 'ব্লু আর্ট পটারী' নামে একটি কার্যালয় চালু করেছেন ইনি। সেখানে ছাত্রের সংখ্যা নেহাত কম নয়। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ সফর করার সৌভাগ্য এঁর হয়েছে।

যাইহোক যে সব নমুনা আমরা এখানে দেখতে পেলাম সেগুলির আকৃতি যেন সাবেকী আমলের আকৃতিরই সামান্য রকমফের। কোনটির একটু কানা উঁচু একদিকের, কোনটির কানা একটু মুড়ে দেওয়া হয়েছে, কোনটির গলা বেশীরকম সরু এবং পেট মোটা আবার কোনটির পাশ থেকে খোঁচা করে কোণ বার করা হয়েছে। এঁর রঙ প্রলেপনের কায়দা—তরল রঙ শুধু ঢেলে দেওয়া। এই তরল রঙ আপনা থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে বিভিন্ন [illegible] পাত্রের গায়ে। কোনটির আধখানা গায়ে রঙ পড়েছে, কোনটির সারা গায়েই রঙ লেগেছে আবার কোনটির গায়ে ছিটে ফোঁটা রঙ লেগেছে। বেশীরভাগ সবারই খুব হালকা রঙ। [illegible] আমার এঁর শিল্প কর্মগুলি খুব একটা কিছু আহামরী বলে মনে হল না। [illegible] শিল্পকর্মগুলি [illegible] দেওয়া হয়েছে। [illegible] শিল্পকর্ম [illegible] হয়েছে। ব্যাপারটা [illegible] ধরনের [illegible] রঙচঙে মহিলাকে দর্শকদের আশেপাশে বসিয়ে রাখা হয়েছে। তাঁদের হাতে শিল্প পাত্র এবং পেন্সিল। দর্শকের মধ্যে কেউ যদি কিছু কিনতে চান, চটপট তাঁরা তাঁর নাম এবং শিল্পকর্মটির নম্বর টুকে নিচ্ছেন। মনে হল ঐ [illegible] ঢাকা, রঙীন কাপড় প্রভৃতির মতই এসব মহিলাদেরও ব্যবহার করা হচ্ছে পটারীগুলির বিজ্ঞাপনের জন্যই। এই ধরনের ব্যবহার করা প্রদর্শনী দেখতে বাংলা দেশের দর্শকেরা অভ্যস্থ নয়, তাই ব্যাপারটা যেন কেমন কেমন মনে হয়।

আকাডেমী অব ফাইন আর্টস ভবনে, আরেকটি প্রদর্শনী চলছে এসপ্তাহে। সেটি, [illegible] শিল্পী যোফিন এবং রাফাই-এর চিত্রকলা প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীর সমালোচনা আগামী সপ্তাহে প্রকাশ করার ইচ্ছে রইল।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় সোসাইটি অব কন্টেম্পোরারী আর্টিস্টস-এর চিত্রকলা এবং ভাস্কর্য প্রদর্শনীর সমালোচনায় ছাপার ভুলে 'শর্বরী রায়ের' পরিবর্তে 'সর্বানী রায়' এবং সোমনাথ হোরের 'গ্রাফিক আর্টটি'র পরিবর্তে 'গ্রাফিক আর্টগুলি' প্রকাশিত হয়।

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

সে সময়ে, দানীবাবুর ভূমিকায় অপরকে নামাতে গেলে মারামারি ব্যাপার হয়ে যেত। মিনার্ভায় উনি 'শংকরাচার্য'তে নাম-ভূমিকায় নামতেন, একবার ও'র বদলে অন্যকে নামানোতে হৈ-হৈ ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল।' সেসব ঘটনা জানা ছিল বলেই আমার ভয়ের অন্ত ছিল না। আমাদের আর্ট থিয়েটারেও অনুরূপ ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল। সরলা-র 'গদাধর' পুরোনো স্টার থিয়েটারে করেছিলেন কাশীবাবু, এ ভূমিকায় ও'র রীতিমত নাম ছিল, কিন্তু আমাদের স্টারে দানীবাবুর বদলে ও'কে একবার নামানো হ'লো, কিন্তু দর্শক উঠল হৈ-হৈ ক'রে, কিছুতেই নিলে না। এই নিয়ে সপক্ষে-বিপক্ষে কাগজে খুব লেখালেখিও হলো। কেউ কেউ লিখলেন—ও'র মতো নামজাদা অভিনেতাকে নামিয়ে এভাবে অপদস্থ করা কেন, ইত্যাদি।

নগেন দত্ত সেজে হঠাৎ-ই নামতে যাচ্ছি, রূপসজ্জা সেদিন যতই শেষ হয়ে আসছে, যতই এগিয়ে আসছে 'বিষবৃক্ষ' শুরু হবার কাল, ততই মনে পড়ছে ঐসব কাহিনী, আর ভিতরটা অস্থির হয়ে উঠছে। প্রবোধবাবুকে যেমন নতুন ভূমিকা করবার সময় প্রণাম করতে যেতাম, আজও গেছি।

বললাম—নামালেন ত, কী যে হবে, জানি না।

বললেন—কিছু হবে না, নেমে যাও দেখি। সকালে—কাগজে নাম বেরিয়েছে তোমার! তবে আর ভয়টা কিসের?

বললাম—কোনো-কোনো কাগজে বেরিয়েছে, কোনো কোনো কাগজে বেরোয়নি। যারা তা দেখেনি, তারা যদি গোলমাল করে?

বললেন—করে ত দেখা যাবে'খন।

অবশেষে স্টেজে ত নামলাম। নগেন দত্ত করে গেলাম বটে, কিন্তু বেশ ভয়ে ভয়ে। অথচ, আমার পরম সৌভাগ্য, গোলমাল ত হ'লোই না, অভিনয়ের সময় মাঝে মাঝে যে ব্যঙ্গোক্তি বা বক্রোক্তি ভেসে আসলেও আসতে পারে বলে আশা করেছিলাম, তা-ও এলো না। দর্শক নীরবেই শুনে গেলেন আমার 'নগেন দত্ত'।

প্রবোধবাবু বললেন—দেখলে ত? জায়গায় জায়গায় 'এপ্লজ' পর্যন্ত পেয়ে গেছ! গোলমাল ত দূরের কথা।

একটু অবাক হয়েই বললাম—তাইত দেখছি।

প্রবোধবাবু বললেন—তোমার একটা কাজ করা উচিত। প্রেসে নোট দিয়ে ধন্যবাদ জানানো উচিত দর্শকদের।

ও'র পরামর্শে তা-ই দিলাম। অনেকগুলি ইংরেজি ও বাংলা কাগজে বেরিয়ে গেল আমার ধন্যবাদ-জ্ঞাপন পত্র। 'নায়ক থেকে তুলে দিচ্ছি। ২১শে মার্চ 'নায়ক'-এ 'বেরিয়েছিল 'নগেন্দ্র দত্তের ভূমিকায় অহীন্দ্রবাবু'—এই শিরোনামা দিয়ে। 'মহাশয়, আপনার সুবিখ্যাত পত্রের মারফৎ আমি আমার পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতৃগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাদের উৎসাহ ও সহানুভূতি না পাইলে গত বুধবার রাত্রে আমি কিছুতেই বিষবৃক্ষের নগেন্দ্র দত্তের ভূমিকায় অভিনয়ে সাফল্যলাভ করিতে পারিতাম না। নাট্যাচার্য সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) মহাশয়ের অসুস্থতার জন্য আমাকে হঠাৎ একরকম অপ্রস্তুত অবস্থাতেই নগেন্দ্র দত্তের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। তবু যে সুধী দর্শকমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহার মূলে তাঁহাদেরই উৎসাহ ও সহানুভূতি। বশম্বদ—অহীন্দ্র চৌধুরী।'

কিন্তু এরও আবার বিরূপ সমালোচনা হয়েছিল কোথাও-কোথাও। কেউ কেউ বললেন—'এ আবার কি রকম প্রচার-পন্থা!' হয়ত এটা প্রচারই, কিন্তু থিয়েটারের ব্যাপারে প্রচারই যে সব! পোস্টারে পোস্টারে

একটি বিশিষ্ট একাঙ্ক নাটক সংকলন
—আনন্দবাজার

This volume has two illuminating articles; the introductory note by Dr. Bhattacharya is a scholarly work and reveals the historical background and modern trend of one-act plays. Dr. Ghosh's article, however, is confined to the judgement of the pieces selected for this volume.—Amrita Bazar.

একাঙ্ক সঞ্চয়ন

সংকলনে আছে—রবীন্দ্রনাথ, শচীন সেনগুপ্ত, তুলসী লাহিড়ী, তারাশংকর, মন্মথ রায়, বনফুল, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, পরিমল গোস্বামী, বিধায়ক ভট্টাচার্য, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অখিল নিয়োগী, সুনীল দত্ত, গিরিশংকর, সোমেন নন্দী, শীতাংশু মৈত্র, কিরণ মৈত্র, রমেন লাহিড়ী প্রমুখ নাট্যকারের নাটক। সম্পাদনায়—ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য ও ডঃ অজিতকুমার ঘোষ। দাম ৮·০০

গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতায়
পুরস্কারপ্রাপ্ত বিদ্যুৎ বসুর
লার্নিং ফ্রম দি
বার্নিং ঘাট ১·৫০

বীরু মুখোপাধ্যায়ের নতুন নাটক
সাহিত্যিক—২·০০

উমানাথ ভট্টাচার্যের মঞ্চ-সফল প্রহসন
শেষ সংবাদ—২·৫০

ছোটদের বাইশজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের
বাছাই-করা নাট্য-সংকলন

ছোটদের রঙমহল ৩·৫০

বিজন ভট্টাচার্যের **গোত্রান্তর** ২·৫০। বিধায়ক ভট্টাচার্যের **কান্নাহাসির পালা** ২·৫০। জোছন দস্তিদারের **দুই মহল** (২য় সং) ২·৫০। বীরু মুখোপাধ্যায়ের **সংক্রান্তি** (২য় সং) ২·৫০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রীভূমিকাবর্জিত কৌতুক নাটক **বারো ভূতে** ১·৫০। সুনীল দত্তের স্ত্রীচরিত্রবর্জিত **হাসির হুল্লোড় হবুরাজার দেশে** ১·৫০। **অংকুর** (২য় সং) ১·৫০। **লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার**—তুলসী লাহিড়ী ২·০০। **নাটক নয়**—কিরণ মৈত্র ১·২৫। **একাঙ্ক সপ্তক**—দিগিন বন্দ্যোঃ ৩·০০। **অপরাজিত**—রমেন লাহিড়ী ১·৭৫। **অপরাধী**—দীপংকর সরকার ০·৬২। **জিজ্ঞাসা**—শান্তি মুখোঃ ২·২৫। **জয়ের পথে**—সঞ্জীব সরকার ১·৫০। **উষার আলো**—অন্নদা বাগচী ১·৫০। সুনীল দত্তের **হরিপদ মাস্টার** (২য় সং) ২·০০, **জতুগৃহ** ১·৫০, **ত্রিনয়ন** ১·০০, **লাঠৈতরাজ** ০·৫০

নতুন মর্মস্পর্শী পূর্ণাঙ্গ নাটক

অভিশপ্ত ক্ষুধা—১·৭৫

জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
১৯, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা—৯

সুব্রহ্মণ্য-র **মায়ামৃগ**

কৌতুক নাটক ॥ ১টি স্ত্রী ভূমিকা ॥ ১·২৫ নঃ পঃ
নাটকটি উপাদেয় সংলাপে অগ্রসর......হিমাদ্রি।
চরিত্রগুলি সুন্দরভাবে চিত্রিত........রূপলেখা।
অল্প খরচায় চিত্তবিনোদনের খোরাক...থিয়েটার।
এম রায়চৌধুরী, ২৮, চক্রবেড়ে লেন, কলি-২০
(সি ৯৬০২/২)

BE TALLER

and healthier by our new exercises and diet schedule. Details, free.

283 (D.E.) Azad Market, Delhi-6

রূপচর্চায়
কে,হোড়ের
প্রসাধনী

ধবল-শ্বেত কুষ্ঠ

বহুদিন পর্যন্ত ব্যয়ার পরিশ্রম, দিন রাত চেষ্টা ও অনুসন্ধানের পর কবিরাজ শ্রীব্রহ্মস্বরূপ বি এ, উহা বিনাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইংরাজীতে লিখিবেন।

আয়ুর্বেদীক কেমিক্যাল
রিসার্চ লেবরেটরিজ ফতেপুরী, দিল্লী-৬

—হ্যান্ড বিলে—হ্যান্ড বিলে 'অভাবনীয় অভূতপূর্ব' বলে যে-সব লেখা হয়, সে-ও প্রচার, ঘটা করে যেসব নাম দেওয়া হয়, সে-ও ত প্রচার! সেই জন্যই বলছি, যদি এই সুযোগে কর্তৃপক্ষ আমার কিছু প্রচার করে থাকেন ত, সেটা নাটকের জন্যই করেছেন। ব্যবসার জন্য তাঁদের প্রচার করতেই হবে। শুধু গুণ থাকলেই চলবে না, তার প্রচারও চাই। আমি দীর্ঘকাল এই যে অভিনেতা-জীবনযাপন করেছি, তাতে হিসেব করে দেখেছি, বিভিন্ন স্বত্বাধিকারী মিলে আমার প্রচারের জন্য লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করেছেন। এটা কেন? স্বার্থ উভয়বিধ। তবে হ্যাঁ, এটুকু বলা যেতে পারে, তখনকার দিনে ওরকম ধন্যবাদ দিয়ে প্রচার আর দেখা যায়নি। এটা অবশ্য অভিনব।

কিন্তু সে যাই হোক, 'বিষবৃক্ষ'-এর জন্য এ' প্রচারের কোনো প্রয়োজন ছিল না। ভাষান্তরে বলা যেতে পারে, এর পিছনে প্রচারের উদ্দেশ্যও ছিল না। 'বিষবৃক্ষ'-এর জন্য বিশেষ প্রচার ছিল অন্য দিক দিয়ে। আর্ট থিয়েটার বিজ্ঞপ্তি দিতেন—'বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের দুজন শ্রেষ্ঠ গায়িকার সঙ্গীত-যুদ্ধ।' এই হিসাবে। ১৩ই মার্চ 'নাচঘর' যে সমালোচনা করেছিলেন, তার থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিলেই বিষয়টা পাঠকদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠবে আশা করি।

"আর্ট থিয়েটার তাঁদের বিজ্ঞাপনপত্রে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের দুজন শ্রেষ্ঠ গায়িকার যে সঙ্গীত যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, তাতে মনে হলো যেন জয়মাল্যটা দর্শকেরা সকলেই এই হীরার কণ্ঠেই দুলিয়ে দিতে ব্যগ্র হয়েছেন। আমরা সেদিনের দর্শকদের সুবিচার সম্পূর্ণ অনুমোদন করতে পারি। সত্য সত্যই সেদিন শ্রীমতী সুবাসিনী সঙ্গীত ও অভিনয় এই দুইয়েরই নৈপুণ্য দেখিয়ে উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করতে পেরেছিলেন।" 'বিষবৃক্ষ'এ দেবেন্দ্র দত্তর ভূমিকাতেই গান ছিল বেশী, ঐ পার্টটিই গায়কের পার্ট ছিল। আগে আগে হীরার ভূমিকার জন্য গায়িকার দরকার হতো না। অবশ্য তখনকার দিনের অধিকাংশ অভিনেত্রীই মোটামুটি গান জানতেন, একটি কি দুটি গান ভূমিকায় থাকলে প্রায় সকলেই চালিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু সঙ্গীতপিপাসু দর্শকের সংখ্যা তখন ছিল বেশী, গায়ক বা গায়িকার সুকণ্ঠ থাকলে তাঁরা তা বেশ বিচার করেই দেখে নিতে পারতেন। নাটকে গানেরও তখন বিশেষ এক স্থান ছিল। সেই জন্য সম্প্রদায়ে ভালো গায়ক বা গায়িকা রাখতেই হতো, নইলে দল চালানো কঠিন হতো। আমাদের স্টারে তখন ছিল রঙ্গমঞ্চের দুজন শ্রেষ্ঠ গায়িকা—আশ্চর্যময়ী ও সুবাসিনী। আশ্চর্যময়ী সাজলেন দেবেন দত্ত আর সুবাসিনী—হীরা। আগের তুলনায় আমাদের 'হীরা'র মুখে গান ছিল বেশী এবং সেই গানেই সুকণ্ঠী সুবাসিনী জয়মাল্য পরেছে।

দেবেন্দ্র দত্ত-র মুখে যেসব গান ছিল, তার প্রায় সব কটিই ছিল বঙ্কিমের নিজের রচনা যেমন,—

শ্রীমুখ পংকজ দেখব বলে হে, তাই
এসেছিলাম এ গোকুলে'।

'আয়রে চাঁদের কণা, খেতে দিব ফুলের
মধু, পরতে দিব সোনা।

'কাঁটা বনে তুলতে গেলাম কলঙ্কের ফুল।'

'আমার নাম হীরে মালিনী।'

'বয়স তার বছর ষোলো দেখতে-শুনতে
কাল-কোলো।

পিলে অগ্রমাসে মলো, আমি তখন
খানায় পড়ে।'

'মনের মতন রতন পেলে যতন করি তায়—
সাগর ছেঁচে তুলবো নাগর পতন করে কায়।'

শেষোক্ত গানটি ছিল হীরা ও তার সখী মালতীর ডুয়েট গান। এই দু' লাইনই মাত্র বঙ্কিমের রচনা, বাকিটা নাট্যরূপকার অমৃতলাল বসু রচনা করে দিয়েছিলেন—

'সেই অলংকারের অলংকার
পরবো করে গলার হার
কখনো না সোহাগ ক'রে
জড়াবো খোঁপায়—ইত্যাদি।

বইতে হীরার গান হিসাবে দেওয়া আছে—'স্থান দিও চারু চরণে।' তার বদলে হীরা গাইত—'সুখে কি অসুখে আছি।'

আরও একটা গান হীরা গাইত—'বড়ো ঝোড়ো হাওয়া—যায় না সহা—কি জানি কেমন মন করে।' আমাদের 'হীরা'র আরও গান বেড়েছিল। বাড়তি প্রায় সব গানই অমৃতলালের রচনা, তার মধ্যে একটি গান ছিল নিধুবাবুর বলে প্রচলিত—

'ভালোবাসিবে বলে ভালবাসিনে।
আমারও স্বভাব প্রিয়ে তোমা বই
আর জানিনে॥'

এই গানটি নাটকে খুব জমে যেতো। দেবেন্দ্র এক লাইন গাইছে, হীরা অমনি তারপরেই যেন গাইছে, যেন দেবেন্দ্র হীরাকে শেখাচ্ছে। এমনি করে করে গানখানি গাওয়া হতো। আর ওদের দুজনের এই গান শুনে দর্শক যেন একেবারে মেতে উঠত। দুজনের দুরকম গলায় গান, গানের ভঙ্গিতে এবং তান লয়ে কে কাকে হারালে, তা' এই গান থেকেই দর্শকদল বিচার ক'রে দেখে নিতো। গানখানি রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুর রচনা বলে চলে গেলেও কোনো কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি এটিকে শ্রীধর কথকের রচনা বলে মনে করেন। গানটি খুব বিখ্যাত ছিল তখন।

দেবেন্দ্রর মুখে আরেকটি গান ছিল, সেটি আমার বিশ্বাস, অমৃতলালেরই রচনা। এ গানটি লোকে খুব নিতো। গানটির আরম্ভ—

'তামাকু হে
তব তুলনা নাহি বঙ্গে।
কত মাধুরী মেশা মরি অই কাল অঙ্গে।'

বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ'-এর দশম পরিচ্ছেদে—'বাবু' শিরোনামায় তামাক সম্বন্ধে যে মন্তব্য করে গেছেন—'হে হুক্কে—হে আল্‌বোলে' ইত্যাদি, এ গানখানি সেই ভাবধারারই অনুসৃতি বলা চলে।

'বিষবৃক্ষ' যখন প্রথম হয়েছিল ন্যাশনাল থিয়েটারে, তখন 'নগেন' করেছিলেন গিরিশচন্দ্র, আর 'দেবেন দত্ত' করেছিলেন সঙ্গীতাচার্য রামতারণ সান্ন্যাল। পরে এমারেল্ডে যখন 'বিষবৃক্ষ' হলো, তখন মহেন্দ্র বসু (ট্রাজেডিয়ান অব বেঙ্গল যাঁকে বলা হতো) করতেন 'নগেন' আর সঙ্গীতাচার্য পূর্ণচন্দ্র ঘোষ করতেন 'দেবেন দত্ত।' পুরাতন স্টারে দেবেন দত্ত করেছেন কাশীবাবু। তবে দেবেন দত্ত হিসাবে এ'দের মধ্যে পূর্ণবাবুরই নাম বেশী শুনেছি,' তাঁকে নাকি মানাতোও খুব সুন্দর। ঐ সময়ে ও'দের গাইয়ে 'হীরা'র দরকার হতো না, আমাদের আমলেই 'হীরা' হতো রীতিমত গায়িকা। আমাদের এখানে আশ্চর্যময়ী 'দেবেন্দ্র' করায় কোনো-কোনো কাগজে মন্তব্য করা হয়েছিল, তিনকড়িবাবু থাকতে আশ্চর্যময়ীকে 'দেবেন্দ্র' দেওয়া হলো কেন? কিন্তু আশ্চর্যময়ীর অভিনয় ও গান শুনে সেকথা আর বলা চলল না। পরে, আশ্চর্যময়ীর অনুপস্থিতিতে তিনকড়িদাকে 'দেবেন দত্ত' সাজানো হয়েছে, কিন্তু হরিদাসী বৈষ্ণবী সেজে যখন তিনি বেরুলেন, তখন লোকে হেসে উঠল। লম্বা-চওড়া দশাসই চেহারা তিনকড়িদার বৈষ্ণবী মানাবে কেন? পূর্ণবাবুর দৈহিক সৌন্দর্য ছিল, স্ত্রীলোক সাজালে তাঁকে মানিয়ে যেতো নাকি অপূর্ব সুন্দর।

তখনকার দিনের রেওয়াজের কথা বলেছি, অভিনেত্রী মাত্রেই গান জানত, তবে এদের মধ্যে যারা সুকণ্ঠী, তারা দর্শকমণ্ডলীতে প্রভাব বিস্তার করতেন অতি সহজে। দর্শকও ছিলেন তখন রীতিমত গান-পাগল, ভালো গায়ক বা গায়িকা চিনে নিতে তাঁদের দেরি হতো না। সেই বেঙ্গল থিয়েটারে যেদিন থেকে অভিনেত্রী নিয়ে অভিনয় করার ব্যবস্থা হ'লো, সেদিন থেকেই গাইয়ে অভিনেত্রীদের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে বেশী, সমাদরও ছিল তাঁদের খুব। যাদুমণি, ক্ষেত্রমণি, বনবিহারিণী (ভুনী), বিনোদিনী, মঙ্গামণি (গঙ্গাবাঈ), সুকুমারী দত্ত—এ'রা সবাই ছিলেন নামজাদা অভিনেত্রী ও গায়িকা। মধ্য যুগে ছিলেন নরীসুন্দরী, সুশীলবালা। আমাদের সময়ে স্টারে বিশেষ অভিনয়ের দিনে যখন জলসা হতো, নরীসুন্দরী এসে মাঝে মাঝে গাইতেন। যথেষ্ট বয়স হয়েছে তাঁর তখন, কিন্তু কণ্ঠস্বর তখনো রয়েছে রীতিমত মিষ্টি। সুশীলাবালার গান দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে অনেকবার শুনেছি, তিনি অকালে পরলোকগমন করলেন ১৯১৫ সালে।

বড়ো গায়িকা বলতে তখন এ'দেরই বোঝাতো, সঙ্গীতাচার্য যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কথা পরে যথাস্থানে বলব।

'বিষবৃক্ষ'-এর পর ধরা হলো অতুলকৃষ্ণ মিত্রের অপেরা—'শিরী-ফরহাদ।' ২৭শে মার্চ, শুক্রবার খোলা হলো এই বই। শিরী—নীহার, ফরহাদ—আমি। হামজাদ—রাধাচরণ, গুলাম—কৃষ্ণভামিনী।

ফরহাদ সর্বপ্রথম করেছিলেন হাঁদুবাবু। তিনি গাইতে পারতেন। আর আমি? পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে, আমার সেই যাত্রার আমলের কথা, যখন আমি রীতিমত দোহারকী করেছি। সে অভিজ্ঞতা অবশ্যই ছিল, কিন্তু তাহলেও ভাবনার কথা বই কী! একানে গান ছিল আমার একখানা। আর

সারিডন খেলেই তো খুব তাড়াতাড়ি ও নিরাপদে যন্ত্রণা দূর হয়

বাথাবেদনায় আর কষ্ট পেতে যাবেন কেন—সারিডন খেয়ে তাড়াতাড়ি ও নিরাপদে ব্যথার উপশম করুন।

সারিডন-এ অনিষ্টকর কোন কিছু নেই, এতে হার্টের কোন ক্ষতি বা হজমের কোন গোলমাল হয় না। তার ওপর বিশেষ উপাদানে তৈরি ব'লে সারিডন আশ্চর্যরকম তিনটি কাজ দেয়—এতে যন্ত্রণার উপশম হয়, মনের স্বাচ্ছন্দ্য আসে ও শরীর ঝরঝরে লাগে।

মাথা-ধরা, গা-ব্যথা, দাঁতের যন্ত্রণা এবং সাধারণ ব্যথা-বেদনায়, তাড়াতাড়ি আরাম পেতে হ'লে সারিডন খান...সারিডন নিরাপদ বেদনা-উপশমকারী।

★ সারিডন স্বাস্থ্যসম্মত মোড়কে থাকে, হাতে ধরা হয় না।

★ সারিডন একটি ট্যাবলেটের দাম মাত্র বারো নয়া পয়সা।

★ একটি সারিডন-ই প্রায় ক্ষেত্রে পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে পুরো এক মাত্রা।

একটিই যথেষ্ট

একটি ট্যাবলেট ১২ নঃ পঃ

একমাত্র পরিবেশক : ভলটাস লিমিটেড

IWTVT 87

রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে
প্রকাশিত
রৌদ্রধারা
কবিতার বই
কনক মুখোপাধ্যায়
দাম—দুই টাকা : প্রকাশক—প্রতিশ্রুতি
প্রাপ্তিস্থান :
ন্যাশনাল বুক এজেন্সী : কলিকাতা-১২
ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত বই-এর দোকান
(সি, ৯৮৮৬)

বাংলা নাট্য-সাহিত্যে এক অসামান্য সংযোজন
দীনেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাটক
রায়বাঘিনী
উচ্চ প্রশংসিত। অভিনয়ে তৃপ্তি।
পরিবেশক—ডি. এম. লাইব্রেরী।
১.২৫ নয়া পয়সা
(সি ৯৯৭৪)

ছিল—ডুয়েট। কবরের ভিতর থেকে শিরী গাইবে, আর তার সঙ্গে গাইবে ফরহাদ।

এ' তবু ডুয়েট, কিন্তু একানে গানখানা নিয়ে করব কী?

রাধাচরণকে বললাম—ওটা বাদ দাও, ও' গান পারব না।

রাধাচরণ বললে—আমি আপনাকে ঠিক শিখিয়ে দেবো, আপনি ভাববেন না। কতো আজেবাজে মেয়েকে শিখিয়ে তৈরি করলাম, আর আপনাকে পারব না?

চলল- সঙ্গীত শিক্ষা। তারপরে, অভিনয়ের দিন, সিনটা যখন এলো, গানটা ধরলাম মন্দ নয়, কিন্তু একানে গান ত,কেমন যেন স্তিমিত হয়ে এলো, দমে পাচ্ছি না। রাধাচরণ পাশ থেকে চাপা গলায় নির্দেশ দিলে—তুলে গান।

গায়ক ত নই, যা হোক করে কোনগতিকে সে রাতে কাজ চালানো গেল। রাধাচরণ উৎসাহ দিয়ে বললে—বেশ হয়েছে।

বললাম—নাহে, শেষ গানটি, আর গাইব না। শিরী একাই গাক।

—তা কী করে হয়?

তখন রাধাচরণ করলে কী, আমার হয়ে নিজেই গেয়ে দিলে। আমি কবরের মধ্যে নামতে যাচ্ছি, সেই সময় ঠোঁট নেড়ে গেলাম, আড়াল থেকে রাধাচরণ গেয়ে গেল। যাকে বলে—প্লে ব্যাক।

ফিল্মে ত এরকম প্লে-ব্যাক পরে কতোই না হয়েছে, কিন্তু স্টেজে? তা নীহারকেও বহুবার অনেকের প্লে-ব্যাক করে যেতে হয়েছে।

এই ত গেল 'শিরী-ফরহাদ।' এর পরে মার্চ মাসে প্রাচীরপত্র পড়লে—'জনা'—গিরিশচন্দ্রের-'জনা'। দিন কয়েকের মধ্যেই আবার শুনলাম—শিশিরবাবুও 'নাট্য মন্দিরে' 'জনা' খুলছেন তারাসুন্দরীকে এনে। আমাদের 'জনা' খোলা হবে—৩রা এপ্রিল। আর, ও'দেরও 'জনা' খোলবার তোড়জোড় চলেছে, ও'রা কবে খোলেন, দেখা যাক।

সুশীলাসুন্দরী ফেব্রুয়ারী মাসে স্টারে এসে যোগদান করেছিলেন। এসেই তিনি করলেন 'মৃণালিনী'তে মনোরমা, আর তারপরে কোনো পার্ট করেননি। মনোরমা অবশ্য তাঁর করা পার্ট, মিনার্ভায় করেছেন। এখানে মনোরমা করবার পর আর কিছু করলেন না বটে, কিন্তু রোজ আসতেন, এসে অপরেশচন্দ্রের কাছে 'জনা'র নামভূমিকায় মহলা দিতেন, এ' আমরা লক্ষ্য করেছি।

অতএব বোঝা গেল, 'জনা'য় জনা করবেন সুশীলাসুন্দরী। আর শিশিরবাবুর ওখানে 'জনা' করছেন কে? না, তারাসুন্দরী। শুনলাম, তিনি ওখানে যোগদানও করেছেন। খবরটায় চমক দিল, কারণ তিনি আর মঞ্চাবতরণ করবেন না, এই-ই ত শুনেছিলাম। সুতরাং হঠাৎ যে তিনি মত পরিবর্তন করলেন, এর কারণ কী?

তারাসুন্দরীর ছোট ছেলের নাম—নির্মল। 'খোকা' বলে সবাই ডাকত। ভুবনেশ্বরে ত থাকতেন তারাসুন্দরী। তাঁর ভাল্লুকপাড়ার বাড়ীতে ছেলে, দুই মেয়ে, বড়ো মেয়ের ছেলেমেয়ে এ'দের নিয়েই তিনি থাকতেন। খোকাও থাকত, পড়াশুনা করত, ইদানীং অবশ্য করত না, ছেড়ে দিয়েছিল। সেই ছেলে অর্থাৎ খোকা চব্বিশ সালের শেষের দিকে হঠাৎ মারা গেল—বছর ষোলো হয়েছিল বয়স। এই খোকাকে আমরা খুবই চিনতাম, প্রায়ই আসত আমাদের থিয়েটারে, ওকে আমরা সবাই-ই খুব ভালবাসতাম। খুব মনোযোগ দিয়ে থিয়েটার দেখত, আর যখন সমালোচনা করত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, আমরা তখন এটুকু ছেলের সমালোচনার নৈপুণ্যে দেখে অবাক হয়ে যেতাম। একেবারে পাকা সমালোচকদের মতো! এটা ওর পূর্বজন্মের সংস্কার, না, কী? ও এলেই আমরা ওকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করতাম—খোকা, কেমন দেখলি বলত?

অমনি ও শুরু করত। আর যা ও' বলত, তাতে যুক্তি থাকত, ছেলেমানুষ বলে ওর

॥ অজিত দত্ত ॥
বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস
শুধু হাস্যরসের সন্ধানই নয়; গোটা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসই তুলে ধরেছেন গ্রন্থকার। মূল্য : বার টাকা।
॥ দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ ॥
আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য
রামমোহনের কাল থেকে বিহারীলাল পর্যন্ত বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যের নিপুণ বিশ্লেষণ। মূল্য : আট টাকা।
॥ গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী ॥
ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ
বহু নতুন তথ্যসমৃদ্ধ লোকমাতা নিবেদিতার অপূর্ব জীবনালেখ্য। মূল্য : পাঁচ টাকা।
॥ মণি বাগচি ॥
শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার
নটগুরুর প্রতিভাদীপ্ত জীবনের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এবং সেই সঙ্গে বাংলা থিয়েটারের আদ্যন্ত পরিচয়। মূল্য : দশ টাকা।
রামমোহন ৪.০০ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ৪.৫০
মাইকেল ৪.০০ কেশবচন্দ্র ৪.৫০
১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ কলিকাতা—২৯ ॥ জিজ্ঞাসা ॥ ৩৩, কলেজ রো কলিকাতা—৯

হেমাটো সার্সাপ্যারিলা
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ • কলিকাতা-৯
রক্তশোধক, বলবর্ধক, বাত ও চর্মরোগ নাশক পুষ্টিকর সালসা
•
সকল বয়সে সমান উপযোগী

কথা আমরা উড়িয়ে দিতে পারতাম না।

এ-হেন খোকা ছিল মায়ের বড়ো আদুরে ছেলে। সুতরাং সেই ছেলে যখন চলে গেল, তখন মায়ের মনের অবস্থা যে কীরকম হতে পারে, সে ত সহজেই অনুমেয়। ছেলের অসুখে থিয়েটার-মহলের চেনা ডাক্তারবাবুরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তবু রাখা গেল না।

তারাসুন্দরী ছিলেন ঠাকুরের খুব ভক্ত। ভুবনেশ্বরে ঠাকুরের নামে মঠ করে দিয়েছিলেন—রামকৃষ্ণ মিশনের কাছেই ছিল সেই মঠ। কিন্তু সেখানেও মন নিবিষ্ট হতে চায় না, তাই তিনি ভাবলেন, আবার কাজকর্ম শুরু করবেন, কাজে ডুবে থাকলে যদি সব ভুলে থাকা যায়! ও'র মনের এই অবস্থাতেই নাট্য মন্দিরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির সঙ্গে ও'র সাক্ষাৎকার ঘটে থাকবে, এবং তারই ফলে আকস্মিকভাবে ও'র ঐ নাট্য মন্দিরে যোগদান!

ওদের মহলা চলছে, আর আমাদের 'জনা' খুলে গেল—৩রা এপ্রিল, ১৯২৫ সাল, শুক্রবার রাত সাড়ে সাতটায়। ভূমিকালিপি ছিল এই—বিদূষক—দানীবাবু। প্রবীর—আমি। অর্জুন—নির্মলেন্দু লাহিড়ী। নীলধ্বজ—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত। বৃষকেতু—দুর্গাদাস। অগ্নি—দুর্গাপ্রসন্ন বসু। শ্রীকৃষ্ণ—ইন্দু। নায়িকা—সুবাসিনী। মদনমঞ্জরী—নীহার। জনা—সুশীলাসুন্দরী।

'জনা'য় রূপসজ্জার ব্যাপারে আমরা খুব যত্ন নিয়েছিলাম মনে আছে। বিশেষ করে আমি আর দুর্গা নেমেছিলাম খালি গায়ে—হাতে পায়ের মতো বুকে-পিঠে পর্যন্ত রঙ করে। বেনারসী ধুতি পরতুম, আর নিতাম উত্তরীয়। সঙ্গে অলঙ্কারাদি ত ছিলই। যুদ্ধের সময় বর্ম আর তীরধনুক প্রভৃতি। এতে করে সুন্দর দেখাতো। অর্থাৎ প্রায় 'কর্ণার্জুন'এর রূপসজ্জার মতই, তবে ওতে যেমন হাতকাটা বেনিয়ানের মতো জামা পরতাম, এতে আর সেটাও পরতাম না, তার বদলে গায়ে করতাম রঙ! প্রথম দিনের অভিনয়ে গাসুদ্ধ রঙ করতে হবে, তাই একটু দেরি হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি সিনে বেরিয়ে গিয়ে দেখি, উত্তরীয়টি তুলে নিয়ে আসিনি। আর যাবে কোথায়? কাগজে অমনি সমালোচনা বেরুলো। কেউ লিখলেন বোধ হয় নিতে ভুলে গেছে। কেউ লিখলেন উত্তরীয় না থাকাটা ভালো হয়নি, বিশেষতঃ ঐ দৃশ্যে।

পরবর্তী দৃশ্যে উত্তরীয় নিয়ে বেরিয়েছিলাম ঠিকই। তাতেও সমালোচনা। কেউ কেউ লিখলেন, ও দৃশ্যে উত্তরীয় না থাকলেও চলে। পুজোর সিনেই যখন উত্তরীয় ছিল না, তখন এ দৃশ্যে আবার কেন? ইত্যাদি।

এসব ছাড়া অভিনয়ের সমালোচনাও কিছু কিছু করেছেন কেউ কেউ। কেউ কেউ দোষ ধরেছিলেন। কেউ কেউ বললেন—আমার

প্রকাশিত হইয়াছে:

অমলা দেবীর

মরু-মায়া

অনন্যসাধারণ উপন্যাস মূল্য—৩·২৫

দুর্ভাগ্যের স্রোতে ভাসতে ভাসতে, ঘাটে অঘাটে ভিড়তে ভিড়তে যে অভাগিনীর জীবন-তরী কূলে এসেও ডুবে গেল তারই মর্মস্পর্শী কাহিনী।

বহুদিন পর খ্যাতনামা সাহিত্যিকের উপন্যাস প্রকাশিত হইল।

কল্লোল প্রকাশনী, এ১৩৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

আপনার কপিটি বুক করেছেন কি?

আসামের পটভূমিকায় লেখা

মেখলা পরা মেয়ে

শ্রীযুধাজিৎ প্রণীত

MEKHALA PARA MEYE

a National Novel

প্রত্যেক বাঙ্গালীরই পড়া উচিত

লিপি-বন্ধন : ৯ শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬

(সি ৯৮৮৯)

প্রকাশিত হল

মুক্তিপ্রিয়া

সুবোধ ঘোষ

মূল্য আড়াই টাকা

যে লেখক প্রথম আত্মপ্রকাশেই সকলকে চমৎকৃত করেছিলেন, তাঁরই লেখা আধুনিকতম উপন্যাস সেই চমকই দেবে পাঠককে।

বারীন্দ্রনাথ দাশ

অনেক সন্ধ্যা, একটি সন্ধ্যাতারা

মূল্য চার টাকা

শহর-জীবনের একটি মনোরম কাহিনী

প্রকাশক ও বিক্রেতা: গ্রন্থশ্রী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬ এবি, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা—১৯

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ — পরিবেষক

(সি ১৮৩৫)

'প্রবীর' নাকি একটু 'আবদেরে' ছেলে হয়ে গেছে। উচ্চ প্রশংসিত হলো দানীবাবুর 'বিদূষক'। আগাগোড়া এত গম্ভীরভাবে হাস্যোদ্দীপক কথাবার্তা বলে গেলেন, যা এক কথায় অপূর্ব! দানীবাবুর 'বিদূষক' হাস্যরস ও ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে যেভাবে তাঁর প্রভুভক্তি ও দেবভক্তি প্রকাশ করে গেছেন, সে এক রীতিমত শেখবার জিনিস!

এই সময়, আরেকটি অভূতপূর্ব ব্যাপার ঘটল। সেটি বলবার আগে আরেকটি সংবাদ দিয়ে নেই। দেশবন্ধু ও বাসন্তী দেবী আমাদের 'বন্দিনী' দেখে গিয়েছিলেন। এ সংবাদ বেরিয়েছিল 'বেঙ্গলী' ও 'অমৃত-বাজারে' ২৬শে মার্চ।

এবার 'অভূতপূর্ব ব্যাপারটি' কী ঘটে-ছিল বলি। আর্ট থিয়েটারে অর্থাৎ আমাদের একটি দল আহূত হয়ে চললেন রেঙ্গুণে অভিনয় করতে। ৫ই এপ্রিল জাহাজ ছেড়ে-ছিল আউট্রাম ঘাট থেকে। এ নিয়েও কাগজে টিকা-টিপ্পনী বেরিয়েছিল। ২রা এপ্রিল 'নায়ক' লিখলেন—'এরা ব্রহ্মদেশে প্রায় চাল্লিশ জন যাচ্ছেন, যশোমুকুট প'রে ফিরে আসুন এই কামনা।' এর আগে অবশ্য আর কোনো দল কলকাতা থেকে রেঙ্গুণে প্লে করতে যায়নি।

অন্যান্য কাগজে কিছু সমালোচনাও বেরুল-এর। দল যাত্রা করবার আগেই তাঁরা লিখতে শুরু করলেন—শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা সেখানে গেল না কেন?

ও'রা জানেন না, শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সবারই যাবার দরকার করে না এই জন্য যে, তাঁরা সেখানে অপেরাজাতীয় প্লেই চেয়েছিলেন, গুরুগম্ভীর নাটক নয়।

তাঁরা আরও লিখলেন—'সেই জন্য আশংকা হয় আশানুরূপ সাফল্য তাঁরা নাও লাভ করতে পারেন। অবশ্য মগের মুল্লুকে গিয়ে তাঁরা যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন, কিন্তু বাংলার বাইরে বাঙালীর অভিনয় গৌরবের নিন্দা ও খ্যাতি তাঁদের এই অভি-নয়ের ওপর অনেকখানি নির্ভর করছে বলেই একথা বলতে আমরা বাধ্য হচ্ছি।'

যাই হোক, চাল্লিশ জন নিয়ে গঠিত দলটি ত চলে গেলেন। আমার যাওয়ার খুবই ইচ্ছা ছিল, নতুন একটি দেশ দেখব, ইচ্ছা হবে না? কিন্তু ও'রা আমাকে নিলেন না দলে, সেজন্য আমার খুব অভিমানও হয়েছিল। অবশ্য এদিকে থিয়েটারে ত নিয়মিত অভিনয় চলেছে। দানীবাবু ফিরে এসেছেন, তবু আমি 'নগেন' করছি, এছাড়া চলেছে গোল-কুণ্ডা, জনা, ইরাণের রাণী, বন্দিনী, কর্ণার্জুন। সপ্তাহে পাঁচ দিনই অভিনয়। এসব ছেড়ে আমি যা-ই বা কী করে? তবু, মন মানেনি। ও'রা যেদিন গেলেন প্রবোধ-বাবুর নেতৃত্বে, সেদিন আমি ও'দের বিদায় সম্ভাষণ জানাতে আউটরাম ঘাটে পর্যন্ত যাইনি।

অথচ তারপরে যা ঘটল, সে অতি মজার ব্যাপার। রেঙ্গুণে ও'রা পৌঁছেছেন, সেখানে প্লে শুরু হবে কি হয়েছে, এমন সময় রেঙ্গুণ থেকে এলো টেলিগ্রাম—'অহীন্দ্রকে পাঠাও'! সে কী একটা? ঘন ঘন টেলিগ্রাম। অহীন্দ্রকে চাই।

এবার আমিই বসলাম বেঁকে। তখন নিয়ে গেল না, এখন ডাকছে। বলে বসলাম—যাব না।

ব্রহ্মদেশে স্টারের এই যে অভিযান, এর পিছনে একটা আবার ইতিহাস আছে। এবং সেই ইতিহাস গ'ড়ে উঠেছিল আমাকে কেন্দ্র করেই। এই যে ও'দের রেঙ্গুণ যাবার যোগা-যোগটা ঘটে গেল, তার হেতু পর্যন্ত আমি। সেটা এবার বলব। বললে, পাঠক আমার অভিমানের কারণটা বুঝতে পারবেন।

(ক্রমশঃ)

বড়দিন সংখ্যা উল্টোরথে
শ্রীবিরূপাক্ষের
রস-রচনা 'পেশাদার থিয়েটার'

প্রেমের গল্প

প্রেম কি? প্রণয়ই বা কি? মানব মানবীর হৃদয়ের পরিতৃপ্তিই কি প্রেম? না আরও কিছু? প্রেমের পরিণতিই বা কিসে—নায়ক নায়িকার মিলনে না বিরহে? এই দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটেছে বাংলা কথা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীদের সার্থক সুন্দর রূপায়নে। লিখেছেন **তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।**

প্রত্যেকখানির দাম চার টাকা

তিন দিন তিন রাত্রি

নারী হৃদয় জটিল, যুবতী হৃদয় জটিলতর। সুলেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র এই জটিল চরিত্র চিত্রণে সুপটু। তিন দিন তিন রাত্রিতে আছে এমনি এক অসাধারণ মনস্তাত্ত্বিক কাহিনী। ছায়াচিত্রে রূপায়িত হচ্ছে।

দাম ঃ পাঁচ টাকা

লিপিকার বই

দুস্তর মরু— দরবেশ

লেখক যেন গল্প বলছেন। তাঁর বলার ছন্দে কত রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথ্য লুকিয়ে আছে। দূরে প্রাচ্যের আলোড়নের ভূমিকায় রচিত এ উপাখ্যান সরস ও মধুর হয়ে উঠেছে আয়েষা তৌফিকের রোমহর্ষক কাহিনীতে। দাম ঃ তিন টাকা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ

বিদূষক ২·৫০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ

সাহিত্যের সত্য ২·৫০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন,
কলিকাতা—৯

বিশ্ববিচিত্রা

প্রতি বছর ১১ই নভেম্বর যুদ্ধে মৃতদের উদ্দেশে স্মৃতি দিবস প্রতিপালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে দেশের জন্য যুদ্ধে যারা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে তাদের প্রশস্তি গানের সঙ্গে দেশের অবস্থাটা বিবৃত করা হয়।

সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতি তর্পণের কৃতিত্ব দেওয়া হয়, এথেন্স যখন গৌরবের উচ্চতম শিখরে, সে সময়কার প্রখ্যাত নেতা পেরিক্লিসকে। সে বক্তৃতাতেও পেরিক্লিস মৃতদের সম্মান জানিয়ে দেশের অবস্থা বিশ্লেষণ করেন।

বক্তৃতাটি দেওয়া হয় ২৪০০ বৎসর পূর্বে এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে যুদ্ধের প্রথম যুদ্ধাভিযানের পরিশিষ্টে। প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী সে বক্তৃতায় যুদ্ধে প্রথম নিহত এথেনীয় সৈন্যের স্মৃতি তর্পণ করা হয়। কিন্তু বক্তৃতাটি কেবলমাত্র মৃতদের সম্পর্কেই নয়, এথেন্স ও তার গৌরব, তার মহত্ত্ব ও তার ভাবধারা সম্পর্কে যা বলা হয় তা এখনকার গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের সঙ্গে মিলে যায়। পেরিক্লিসের অভিভাষণটি এই ছিল :

'আমার পূর্ববর্তীদের অধিকাংশই এই অভিভাষণ প্রবর্তনের প্রশংসা করেছেন। তাঁরা যে অনুভব করেছেন নিহত সৈন্যদের সম্পর্কে শ্রদ্ধা প্রকাশ করা উচিত, সেটা ভাল কথা। কিন্তু আমি এই অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম নই। সহনাগরিকের বিয়োগ সম্পর্কে আমাদের বোধশক্তি একজন লোকের বক্তৃতার স্তুতির ওপর নির্ভর করে থাকা উচিত নয়। কিন্তু যেহেতু আমাদের পূর্ব পুরুষদের বিচক্ষণতা এই আইন প্রবর্তিত করেছে, আমিও তা মেনে নিয়ে এখানে সমবেত সকলের ইচ্ছা ও অনুভূতির সঙ্গে যাতে খাপ খায়, যতোটা ভালভাবে সম্ভব, আমি সেই চেষ্টাই করবো।

"আমার প্রথম বক্তব্য হবে আমাদের পূর্ব পুরুষদের সম্পর্কে; কারণ এটা সংগত হয় এবং শোভনও হয় যে এই প্রকার এক উপলক্ষ্যে তাঁদের উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা উচিত। কারণ, এই দেশেই সর্বদা বসবাস করে তাঁদের প্রচেষ্টায় তাকে গড়ে তুলে তাঁরা মুক্তহস্তে আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছেন। সুতরাং তাঁরা আমাদের প্রশংসা লাভের যোগ্য; তার চেয়ে বেশী প্রাপ্য আমাদের পিতাদের, যেহেতু আমরা নিজেরাই যুদ্ধে বা শান্তিতে আমাদের শক্তিকে সুসংবদ্ধ করেছি এবং নগরীর স্বাধীনতা অর্জন করেছি। যে সব যুদ্ধ আমরা বা আমাদের পিতারা করেছেন সে সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই না। আপনাদের সকলেরই তা ভালভাবেই জানা আছে। তার চেয়ে আমার অভিপ্রায় হচ্ছে যে শাসনতন্ত্র ও পদ্ধতিতে আমরা বড় হতে পেরেছি, তার মাহাত্ম্য অভিব্যক্ত করা। কারণ আমার মনে হয় যে আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে এই কথাই ভেবে দেখা দরকার।

"আমাদের গভর্নমেণ্ট আমাদের প্রতিবেশীর অনুকরণে গঠিত নয়। ওরা আমাদের কাছে নয়, আমরাই ওদের কাছে একটা আদর্শ। আমাদের সংবিধানকে বলা হয় গণতন্ত্র কারণ এ কয়েকজনের হাতের নয়, অনেকের। কিন্তু আমাদের আইন ব্যক্তিগত বিরোধে সকলের ক্ষেত্রেই সমান ন্যায়বিচার করে এবং আমাদের জনমত কৃতিত্বের সকল ক্ষেত্রে প্রতিভাকে স্বাগত জানায় ও সম্মানিত করে।

"আমাদের গণজীবনে যেমন স্বাধীন অভিব্যক্তির সুযোগ দান করি, তেমনি দৈনন্দিন জীবনে পরস্পরের সম্পর্কে একই

শিক্ষক ছাত্র এবং স্কুল কলেজ পাঠাগার ও অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের প্রতি নিবেদন—

গ্রন্থকারের বিশেষ ইচ্ছা অনুসারে, আপনারা সকলে যাতে সুবিধায় বইখানি সংগ্রহ করতে পারেন সেজন্য নির্দিষ্টসংখ্যক কপি মাত্র ৮.৫০ মূল্যে দেওয়া হবে।

॥ অবিলম্বে আপনার অর্ডার পাঠান ॥

বিশ্বভারতীর প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক 'রবীন্দ্র-জীবনী' প্রণেতা

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত বিরাট প্রামাণিক গ্রন্থ

ভারতে জাতীয় আন্দোলন

আন্দোলনের আদ্যোপান্ত ইতিকথা। সহজ সুললিত ভাষায় বহু তথ্য ও কাহিনীর সমাবেশ। মুক্তি-সংগ্রামে বাংলার অপ্রতিম শৌর্যবীর্য ও কর্মকুশলতার অনুপ্রেরণাময় ব্যঞ্জনা। অনুসন্ধিৎসু ও জ্ঞানলিপ্সু প্রত্যেক বাঙালীর অবশ্যপাঠ্য বই।

দাম : ১০.৭৫

॥ একমাত্র পরিবেশক : পত্রিকা সিণ্ডিকেট : ১২।১, লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলি:-১৬ ॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত

নবতম গল্পগ্রন্থ

আগে কহ আর

যাঁর 'এক অঙ্গে এত রূপ' যিনি 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে' তাঁরই আবার নতুন ঘোষণা—'আগে কহ আর'। অচিন্ত্যকুমারই একমাত্র, যাঁর রাজ্য ভূমি থেকে ভূমা পর্যন্ত বিস্তৃত, যাঁর শিখর থেকে শিখরে, শিহর থেকে শিহরে ক্রমাগত পদক্ষেপ। আর কে না জানে, প্রেমই জীবনের শিখর শিহর, আদিম আহুতি হয়েও পরমতমের আরতি। রহস্যময় তমসার পারে কণকরুচির সূর্যচ্ছটা! আঁধারে—আলোকে সেই প্রেমেরই বহু বিচিত্র বিকাশ বিস্তার এই গল্পগুলিতে। আর রচনাশৈলীর সৌষ্ঠবে ও সৌষম্যে অচিন্ত্যকুমারের জুড়ি কে? দাম তিন টাকা

টি এস বি প্রকাশন,

৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

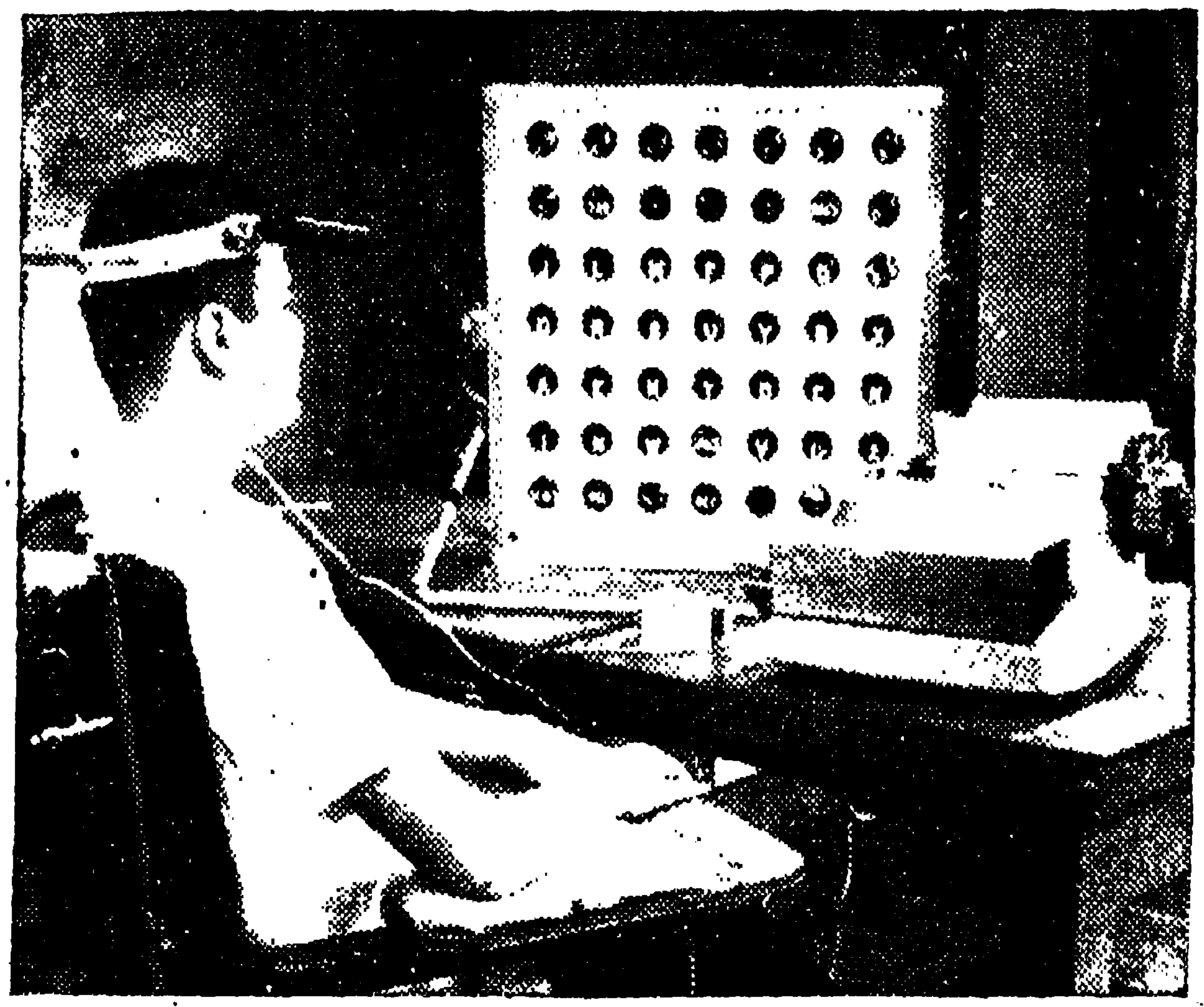

নিউ ইয়র্ক শহরের যোশেফ পোজিক যারা হাতের সাহায্য নিতে অক্ষম তাদের জন্য এই দূর-ব্যবধান টাইপরাইটার উদ্ভাবন করেছেন। কপালে লাগানো একটি টর্চ থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মি বিশেষভাবে তৈরী দাঁড় করানো কি-বোর্ডের ফটো-ইলেকট্রিক সেলকে সক্রিয় করে তোলে।

নীতি মেনে চলি। আমাদের প্রতিবেশী যদি তার নিজের মতো চলে খুশী থাকে তাহলে তার ওপর কুদৃষ্টি বা রুষ্ট কথা বলতে চাই না। ব্যক্তিগত মেলামেশায় আমরা খোলাখুলি এবং বন্ধুভাবাপন্ন, সম্প্রদায়গত আচরণে আমরা দৃঢ়ভাবে আইনের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকি। আমরা শ্রদ্ধা নিবেদনে সংযম স্বীকার করি; কর্তৃত্বপদে যে কেউ অধিষ্ঠিত হোক আমরা তার বাধ্য থাকি, এবং তেমনি নিপীড়িতদের রক্ষার্থে যে আইন রয়েছে তৎপ্রতিও। তত্রাপি আমাদের এটা শুধু কাজ নিয়ে থাকার নগরী নয়। আর কোন নগরী আত্মাকে উৎফুল্ল করে তোলার এতো ব্যবস্থা করেনি এবং দিনের পর দিন ধরে আমাদের পাবলিক বিল্ডিংগুলির সৌন্দর্যে হৃদয় ও দৃষ্টিকে মুগ্ধ করে তোলার এমন সমারোহও পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই।

অধিকন্তু এই নগরী এত বিরাট ও শক্তিশালী যে সারা পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ এখানে প্রবাহিত হয়ে আসে যাতে আমাদের নিজেদের উৎপাদিত সামগ্রী অন্যান্য জাতির শ্রমের ফলের তুলনায় অতি সাধারণ মনে না হয়।

"আমাদের সামরিক শিক্ষাও আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীর তুলনায় ভিন্ন প্রকৃতির। আমাদের নগরীর দুয়ার পৃথিবীর সবায়ের জন্য উন্মুক্ত। আমরা পর্যায়ক্রমে নির্বাসন দেওয়ার নীতিও অনুসরণ করি না, কিংবা বিদেশ থেকে আগত ব্যক্তিদের শত্রুরা নিজেদের কাজে লাগাতে পারে ভেবে তাদের কোন কিছু দেখায় বা আবিষ্কারে বাধা দিই না। কারণ আমাদের আস্থা বস্তুগত সরঞ্জাম পরিকল্পনায় নিহিত নয়, নিহিত রয়েছে আমাদের যুদ্ধশক্তির ওপর। তেমনি শিক্ষা ব্যাপারও। ওরা অতি ছেলে বয়েস থেকেই সাহস অর্জনের চেষ্টায় কঠোরভাবে পরিশ্রম করে; আর আমরা ইচ্ছা মতো চলে খুশী মনে জীবন যাপন করে সেই একই বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করি না।

"আমরা বিনা অপচয়েই সৌন্দর্যের ভক্ত এবং অমানুষিকতা ব্যতিরেকেই বিচক্ষণতার ভক্ত। সম্পদ আমাদের কাছে আত্মশ্লাঘার উপাদান নয়, কৃতিত্ব প্রকাশের সুযোগ বলেই পরিগণিত; এবং দারিদ্র্য স্বীকার করে নেওয়াকে অসম্মানজনক বলে মনে না করলেও তার অপনোদনের কোন চেষ্টা না করাটা প্রকৃত অধঃপতন বলে মনে করি। আমাদের নাগরিকরা ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় কাজ নিয়ে থাকে কিন্তু নিজেদের নানা ব্যাপারে এমন তারা আত্মসমাহিত হয়ে থাকে না যাতে এই নগরীর খবর রাখা বিঘ্নিত হতে পারে। জনজীবন থেকে নিজেকে যে সরিয়ে রাখে তাকে অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো 'শান্তি প্রকৃতি'র মনে না করে আমরা তাকে অপদার্থ বিবেচনা করি। আলোচনা না করে কোন আইন প্রণীত হলে সেটা ব্যর্থ হতে বাধ্য এইটে ধরে নিয়ে আমরা নীতিবিষয়ক যাবতীয় বিষয় ব্যক্তিগতভাবে তর্ক ও আলোচনার দ্বারা মীমাংসা করি। কারণ আমরা কাজে সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দুঃসাহসিক এবং আগে থেকেই চিন্তাশীল বলে প্রখ্যাত।

"ভাল কাজেও আমরা পৃথিবীর অন্যান্য লোকের ঠিক বিপরীত। আমরা বন্ধু অর্জন করি তাদের আনুকূল্য গ্রহণ করে নয়, তাদের আনুকূল্য প্রদান করে। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে আমরা সবাই স্বার্থের দিকটা হিসেব করার চেয়ে স্বাধীনতার প্রতি নির্ভীক বিশ্বাস রেখে মানুষের উপকার করি।

"এই হচ্ছে সেই নগরী যার রক্ষায়, আমরা যাদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি তারা বীরের মতো প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। তারা এমনিই ছিল যারা এখানে সমাধিস্থ হয়েছে, আর এই সেই নগরী যে তাদের অনুপ্রাণিত করেছে। আমরা জীবিতরা প্রার্থনা করতে পারি যেন তাদের বেদনাদায়ক মুহূর্ত থেকে পরিত্রাণ পাই কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম বিজয়দর্পের মনোবৃত্তি নিয়ে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়ানোর ভাব যেন আমরা পরিহার করতে পারি। দিনের পর দিন তোমাদের সামনে এথেন্সের যে মহত্ত্ব প্রতিভাত হয়ে রয়েছে, তাকে ভালবাসো, তৎপ্রতি তোমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখো, এবং তাকে বিরাট অনুভব করলে মনে রেখো যে তার এই বিরাটত্ব অর্জিত হয়েছে সাহসী এবং কর্তব্যে সচেতন ব্যক্তিদের দ্বারা।

"তারা তাদের জীবন দিয়েছে সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য এবং প্রত্যেকে তার নিজের স্মরণীয় কাজের জন্য লাভ করেছে প্রশংসা যা কোনদিন বিস্মৃত হবার নয়, আর সেই সঙ্গে সর্বোত্তম সমাধি, এ নয় যার মধ্যে শুধু তাদের নশ্বর অস্থিই রক্ষা করা হয়েছে, কিন্তু সেটা হচ্ছে মানুষের মনে একটা আবাস যেখানে তাদের বিজয়গৌরব এমন সতেজ থাকবে যাতে যেমন অবস্থাই দেখা দিক না কেন, কথা ও কাজকে যেন উদ্দীপিত করে তুলতে পারে। সমগ্র পৃথিবীই হচ্ছে খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সমাধিক্ষেত্র; এবং তারা শুধু তাদের দেশের মাটির উপর প্রস্তরগাত্রে খোদিত হয়েই থাকে না, দৃশ্যমান প্রতীক ছাড়াই, অপর মানুষের জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দূরে দূরান্তরে জীবিত থেকে যায়।"

হাইড্রোসিল (একশিরা)

কোষসংক্রান্ত যাবতীয় রোগের জন্য

ডাঃ কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, এম বি (ক্যাল)

দি ন্যাশনাল ফার্মেসী

(স্থাপিত ১৯১৬)

৯৬-৯৭, লোয়ার চিৎপুর রোড (দোতলায়)
কলিকাতা-৭

প্রবেশ পথ—হ্যারিসন রোডের উপর, জংশনের পশ্চিমে তৃতীয় ডাক্তারখানা। ফোন : ৩৩-৬৩৮০। সাক্ষাৎ সকাল ৯টা হইতে রাত্রি ৮টা। রবিবারও খোলা থাকে।

(সি ৯৮৬২)

কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

(৪৮)

ভেতরে উঠোনে গিয়ে দাঁড়াতেই একটা বুকফাটা কান্না যেন হঠাৎ সেই অন্ধকার রাত্রির হৃদ্‌পিণ্ড ভেদ করে দীপঙ্করকে গ্রাস করতে এল। পাশেই মা বসে ছিল বিন্তীদির মাথাটা ধরে। মাথার চুলগুলো একদিনেই জট ধরে গেছে। ধুলোয় লুটোচ্ছে। গলা পর্যন্ত সমস্ত শরীরটার ওপর একটা চাদর বিছোন। স্থির নিশ্চল নিথর শরীর। বিন্তীদি যেন চিত হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

দীপঙ্করকে দেখেই মা যেন নতুন করে আবার ডুক্‌রে কেঁদে উঠলো।

ফোঁটা বললে—বোকার বেহদ্দ—

এতক্ষণে যেন জ্ঞান ফিরে এল দীপঙ্করের। পাশ ফিরে বললে—কে?

—আরে, বলা নেই কওয়া নেই, চুপি চুপি একলা গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছে! কেউ টের পাইনি আমরা—

বড় অস্বাভাবিক লেগেছিল ছিটের কাছে, ফোঁটার কাছে। তাদের কাছে বড় বিচিত্র লেগেছিল বিন্তীদির এই আত্মবিলোপ! যেন তারা আশা করেনি এমন করে। কিন্তু আশ্চর্য, সেই অন্ধকার উঠোনের মধ্যে বিন্তীদির নশ্বর দেহটার সামনে দাঁড়িয়ে বিন্তীদির অপমৃত্যুটাকে দীপঙ্করের বড় সহজ বড় স্বাভাবিক মনে হয়েছিল সেদিন। ছোটবেলা থেকে দেখা বিন্তীদিকেই যেন আবার নতুন করে দেখছিল সে। যেন আবার নতুন করে বুঝতে চেষ্টা করছিল তাকে। সারা জীবন ধরে যে কথা বলেনি, সেই মেয়ে যেন হঠাৎ আজ বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। যে-মেয়ে সব সময়ে সকলকে ভয় করে এসেছে, আজ যেন সে হঠাৎ নির্লজ্জ হয়ে উঠেছে। হঠাৎ নির্ভীক হয়ে উঠেছে। এইটেই যেন বিন্তীদির পক্ষে স্বাভাবিক। একলা চুপি চুপি বাড়ি থেকে রাতের অন্ধকারে তাই বেরিয়ে পড়েছিল সেদিন। অন্ধকার পাথর-পটির গলির মধ্যে গিয়ে তাই হয়ত তার পথ চিনতে কষ্ট হয়নি। তাই হয়ত বর্ষার গঙ্গার দিকে চেয়ে একবার দ্বিধাও করেনি। অমাবস্যার অন্ধকারে অনন্ত জ্যোতিষ্কলোককে যেমন প্রকাশ করে দেয়, তেমনি নিবিড়তম দুঃখের মধ্যেও হয়ত তার আত্মা আনন্দলোকের ধ্রুবদীপ্তি দেখতে পেয়েছিল। হয়ত তাই দেখেই বিন্তীদির মন বলে উঠেছিল—বুঝেছি, সব দুঃখের রহস্য আমি বুঝে ফেলেছি, আর কোনও সংশয় নেই, আর কোনও দ্বিধা নেই। সব সুখ-দুঃখের শেষপ্রান্ত যেখানে গিয়ে মিলেছে, সেখানে গিয়েই আমার হৃদয় অনন্ত দেবতার সন্ধান পাবে। অমৃত যাঁর ছায়া, মৃত্যুও যাঁর ছায়া, তাঁকে ছাড়া আর কার কথা ভাববো, তাঁকে ছাড়া আর কার কাছে আশ্রয় চাইবো—

তারপরেই হয়ত একটা শব্দ হয়েছিল গঙ্গার বুকে।

আর ভাসতে ভাসতে ডুবতে ডুবতে বিন্তীদি হয়ত তার অনন্ত দেবতার কাছেই পৌঁছিয়ে গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত।

কয়েকজন পুলিস-কনস্টেবল এসে ঢুকলো থানা থেকে। তারা এবার বিন্তীদিকে নিয়ে যাবে। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে তাকে নিয়ে।

মা কেঁদে উঠলো—ওগো, তোমরা ওকে কাটা-ছেঁড়া কোর না—

ছিটে বলল—না দিদি, কাটা-ছেঁড়া করবে না, শুধু এগজামিন করে নিয়েই আবার আমাদের মড়া আমাদেরই দিয়ে দেবে—

সত্যিই তো, মাকে কে বোঝাবে, যে পুলিসেরও একটা দায়িত্ব আছে, একটা কর্তব্য আছে। কেউ বিষ খাইয়ে মেরে গঙ্গায় ফেলে দিতেও তো পারে! দীপঙ্কর আস্তে গিয়ে মাকে ধরে তুললো। বললে—ঘরে চলো মা, ও আর ভেবে কী হবে! যা হবার হয়ে গেছে—

মা হয়ত বুঝলো। মা তো দীপঙ্করের চেয়েও আরো বেশি দেখেছে। কত মৃত্যু অতিক্রম করে কত দুঃখের সমুদ্র পার হতে হয়, তবেই তো জীবন পূর্ণ হয়ে ওঠে। বহুকাল আগে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে সেই যে এক মহোৎসব শুরু হয়েছে, সেইখানেই তো আমরা এসে নিমন্ত্রিতের মতন দাঁড়িয়েছি। সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা সমস্তই যে সেই মহোৎসবকে কেন্দ্র করে।

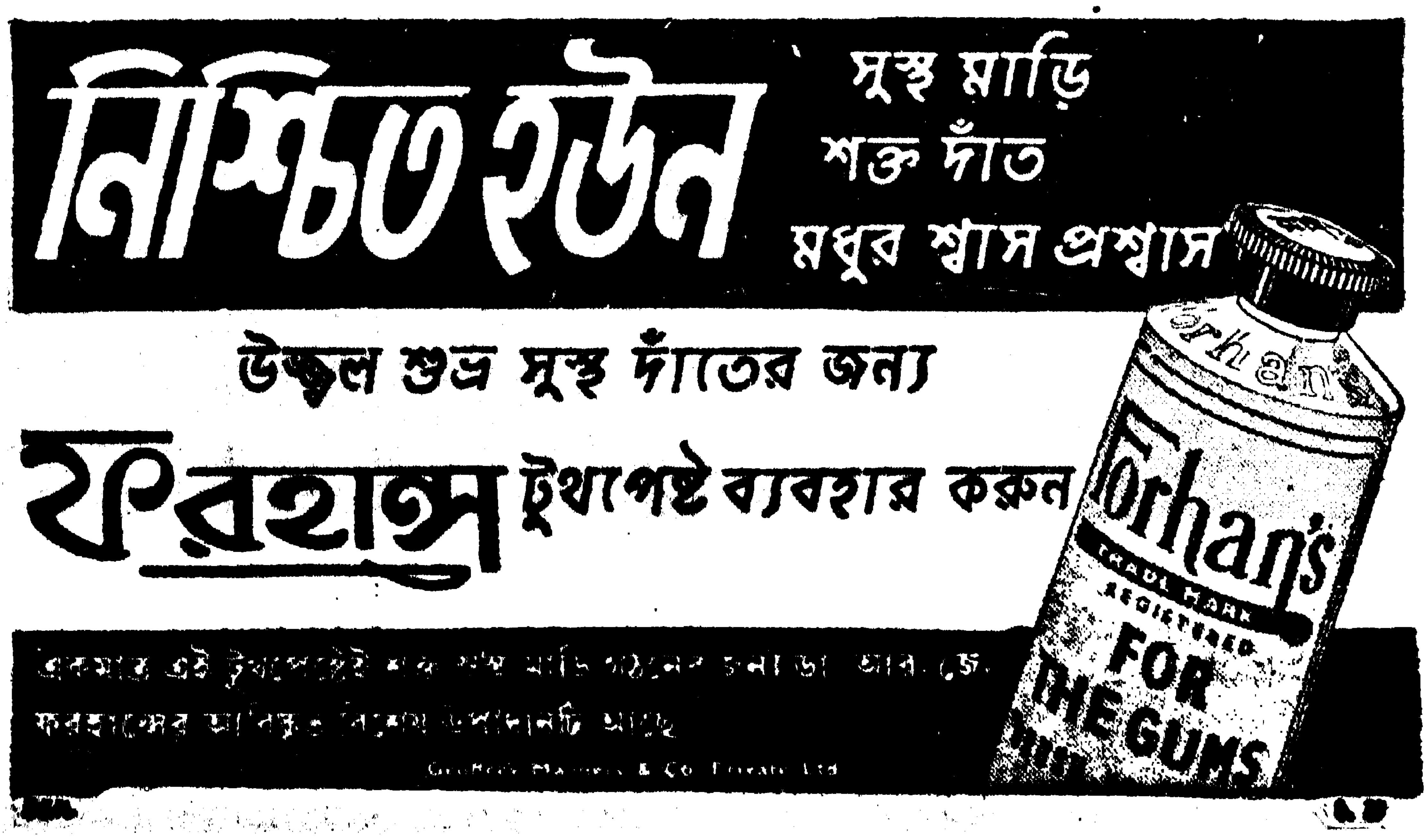

জীবনের মহোৎসবের নিমন্ত্রণে এসে আমরা কত বিচিত্র স্বাদে কত বিচিত্র রূপে কত অভাবনীয় কত অনির্বচনীয় চেতনার বিস্ময়ে কতবার আত্মহারা হয়ে উঠবো, তার কি শেষ আছে!

সেদিন সমস্ত রাত মা ঘুমোতে পারেনি। সকাল থেকে খায়নি কিছু। তারপর বিকেল থেকেই এই বিপর্যয়। সমস্ত বাড়িটাও এক-সময়ে নিঃঝুম হয়ে উঠলো।

মা-র ঘর থেকে নিজের ঘরে এসে দীপঙ্কর নিজেও ঘুমোতে পারলো না। মনে হলো শুধু বিন্তীদির অপমৃত্যুই নয়, শুধু লক্ষ্মীদির অধঃপতনই নয়, সতীর অপমানও নয়, কিছু নয়, এরা যেন সবই উপলক্ষ্য! দীপঙ্করের জীবন-যাত্রার পথের দু'ধারের সব জঞ্জাল পথের ধারেই যেন এদের রেখে যেতে হয়—পথের ধারেই এদের সমাধি, পথের ধুলোতেই এদের পরিসমাপ্তি!

কিন্তু পরদিন আর কোনও কথা শুনলো না দীপঙ্কর।

একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এল নিজেই। মাকেও নিয়ে এসে তুললো গাড়িতে। বললে—এখানে থাকলে আর তুমি বাঁচবে না মা, এখানে থাকলে তোমাকে আর আমি বাঁচাতে পারবো না—

মা-ও যেন আপত্তি করতে পারলে না আর।

ছিটে এল ফোঁটা এল। তারাও যেন বিন্তীদির ঘটনার পর কেমন নিস্তেজ হয়ে গেছে।

বললে—যাবি? সত্যি সত্যিই যাবি?

দীপঙ্কর বললে—এবার আর বাধা দিও না তোমরা, এর পর এখানে থাকলে মা বাঁচবে না আর—

এই বাড়ি থেকে যাওয়া কি এতই সোজা! কথাগুলো বলতে বলতে দীপঙ্করের গলাটাও কেমন বুজে এল। আজ আর তাকে বাধা দেবার কেউ নেই। যারা বাধা দিয়েছিল, সেই ছিটে-ফোঁটাও যেন আজ অন্যরকম হয়ে গেছে। তাদেরও আর জোর খাটছে না যেন। কিন্তু দীপঙ্করের মনে হলো ছিটে ফোঁটা বাধা দিলেই যেন ভালো হতো। যেন একটু বাধা দিলেই দীপঙ্কর থেকে যায় এখানে। এই ছোটবেলা থেকে এত বড় হওয়ার স্মৃতি জড়ানো বাড়িটাতে।

দীপঙ্কর বলতে লাগলো—এখানে থাকবো বলেই তো ঠিক করেছিলাম, কিন্তু এর পর থাকি কী করে তোমরাই বলো?

কই, কিছু তো বলছে না ছিটে-ফোঁটা। কই, আগের বারের মতন তো টেনে নামিয়ে নিচ্ছে না গাড়ি থেকে! কেন ওরা প্রতিবাদ করছে না। কেন বলছে না—কী হবে গিয়ে? থাক্ না এখানে। থাকতে থাকতে সব সয়ে যাবে। আবার নতুন পাড়ায় গিয়ে, নতুন জায়গায় ভালো লাগানো শক্ত! গঙ্গা দূরে হয়ে যাবে। লাভ কী গিয়ে!

দীপঙ্কর বললে—পুলিস থেকে যা বলে, আমি খবর নেব'খন আর অঘোরদাদুর শ্রাদ্ধতেও আমি আসবো, তোমরা কিছু ভেবো না—

মা এতক্ষণে কথা বললে। বললে—চন্নুনীর সঙ্গে আর দেখা করলুম না বাছা, তোমরা বলে দিও আমি চলে গেছি—

তখনও কেউ কিছু বলছে না। ছিটে ফোঁটা যে অত দুর্দান্ত লোক, তারাও যেন মনে মনে চাইছে দীপঙ্কর চলেই যাক্। দীপঙ্কর এখান থেকে দূর হয়ে যাক। আশ্চর্য! এই রকমই বোধহয় হয় সংসারে। এইটেই বোধহয় স্বাভাবিক! দীপঙ্করের মনে হলো তারা যেন তাকে তাড়িয়েই দিচ্ছে বাড়ি থেকে। ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিচ্ছে। এক-

বার বলুক না ওরা, শুধু আর একটি বার থাকতে বলুক না। তাহলে তো আর দীপঙ্কর যায় না। এতদিনের পাতা সংসার ছেড়ে আবার নতুন করে তাহলে সংসার পাততে হয় না। বলুক না সেই কথাটা। বলুক না যে চলে গেলে তারা কষ্ট পাবে!

—কী বললে?

মনে হলো যেন কী বললে তারা!

ছিটে বললে—না কিছু বলিনি—

দীপঙ্কর বললে—তাহলে আসি?

তারপর পাঞ্জাবি ট্যাক্সি-ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিলে। পাড়ার দু'একজন ভদ্রলোক অত ভোরে উঠে এসে দেখছিল। তারাও কিছু বলতে পারলে না। তাদের সকলের চোখের সামনে স্নেহ-প্রীতির সমস্ত বাঁধন ছিঁড়ে দীপঙ্কর চলতে লাগলো।

মনে আছে পরে গাঙ্গুলীবাবু শুনে বলেছিলেন—কেন? আপনার কষ্ট হলো কেন?

দীপঙ্কর বলেছিল—কী জানি, আমার মনে হলো ওরা যেন আমায় তাড়িয়ে দিলে মশাই! আমাকে আর একবার বললেই আমি গাড়ি থেকে নেমে ওই বাড়িতেই থাকতুম, আর যেতুম না কখনও—

আশ্চর্য! এই রকম মানুষই দীপঙ্কর! যেখানে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সেখানে সম্পর্কটা চিরস্থায়ী করতে না পারলে যেন বুকের মধ্যে কষ্ট হয়, বেদনা হয়। অথচ মুখে বললে সে-কষ্টটার কথা কেউ বুঝতে পারে না। সবাই ভাবে এও এক ছলনা বুঝি দীপঙ্করের। এও এক-রকম মিথ্যাচার।

দীপঙ্কর বললে—অথচ দেখুন, এতদিন কেটে গেল, আর একদিনের জন্যেও যাইনি ও-বাড়িতে। সেই বিন্তীদির শেষ পর্যন্ত কী হলো, অঘোরদাদুর শ্রাদ্ধই বা কী রকম হলো, তা-ও দেখতে যাইনি!

ছিটে নিজে এসে নতুন ঠিকানায় নেমন্তন্ন করতে এসেছিল। বলেছিল—যাস্ কিন্তু ঠিক্, খুব ঘটা করছি—সাত শো লোক খাবে—দিদিকে নিয়ে যাস্—

ছিটে ফোঁটা দু'জনেই একটা প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করে বাড়ি বাড়ি নেমন্তন্ন করে বেড়াচ্ছে।

বললে—মোল্লার চকের দই অর্ডার দিয়েছি। আর দত্তপুকুর থেকে ছানা আসছে—আর সোমবার দিন জ্ঞাত্-ভোজন, বারাসত থেকে তিন-মণ পোনা মাছ আসছে, পোনা মাছের কালিয়া আর খাসীর মাংস করবো—কেমন হবে বল্ তো?

দীপঙ্কর ফিরিস্তি শুনে যাচ্ছিল। বললে—ভালোই তো—

ছিটে বললে—শ্রাদ্ধের দিন ছানার ডালনে আর ধোঁকার তরকারি করছি, আর দই সন্দেশ, রাবড়ি আর শেষকালে একটা করে ল্যাংড়া আম—কেমন হবে?

দীপঙ্কর এ-কথার কোনও উত্তর দিলে না।

ছিটে বললে—কী রে, কথা বলছিস্ না কেন, বল্ কেমন আইটেম্ করছি—

দীপঙ্কর বললে—আমি আর কী বলবো, ভালোই তো!

ছিটে বললে—সবাই বলছে এত খরচ করবার দরকার কী!

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ, আমিও তো তাই বলছি তোমাদের—

ছিটে বললে—না রে, তুই জানিস না, শালারা বলবার সময় ওই কথা বলবে, কিন্তু খারাপ খেতে দিলে আবার আড়ালে ঠুকবে। বলবে—নাতি দুটো ঠাকুর্দার শ্রাদ্ধে একটা পয়সা খরচ করলে না। এ শালার ভদ্দর-লোকদের আমি খুব চিনে নিয়েছি, জানিস্, এর চেয়ে ছোটলোক শালারা ভালো, তারা নুন খায় গুণও গাইবে!

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—আর বিন্তী-দির শেষ পর্যন্ত কী হলো?

—কী আর হবে, তুই তো গেলিনে, আমাকেই সব করতে হলো? টাকা ছাড়লুম, সব ঠিক হয়ে গেল!

—কীসের টাকা? টাকা কেন?

ছিটে বললে—টাকা লাগবে না? তুই বলছিস কী? টাকা না দিলে লাস্ দেবে কেন আমাদের?

দীপঙ্কর কেমন অবাক হয়ে গেল। এতেও টাকা? বেঁচে থাকতেও টাকা, মৃত্যুতেও টাকা! লাস্ তো পাওয়া গিয়েছিল লক্-গেট-এর ভেতর। বিন্তীদি ভাসতে ভাসতে একেবারে চেতলার মাটি-কাটা খালের লক্-গেটে গিয়ে আটকে ছিল। সেইখান থেকে পুলিস প্রথম আবিষ্কার করে বিন্তীদিকে। শাড়িটা ভেসে উঠেছিল জলের ওপরে। যারা ভোরবেলা বেড়াতে বেরোয়, তাদের নজরেই প্রথমে জিনিসটা পড়ে। কী যেন একটা ভাসছে। মেয়েমানুষের শাড়ি এখানে ভাসছে কেন? তারপর ভিড় জমে যায় ব্যাপারটা দেখতে। তারাই খবরটা দেয় আলিপুর

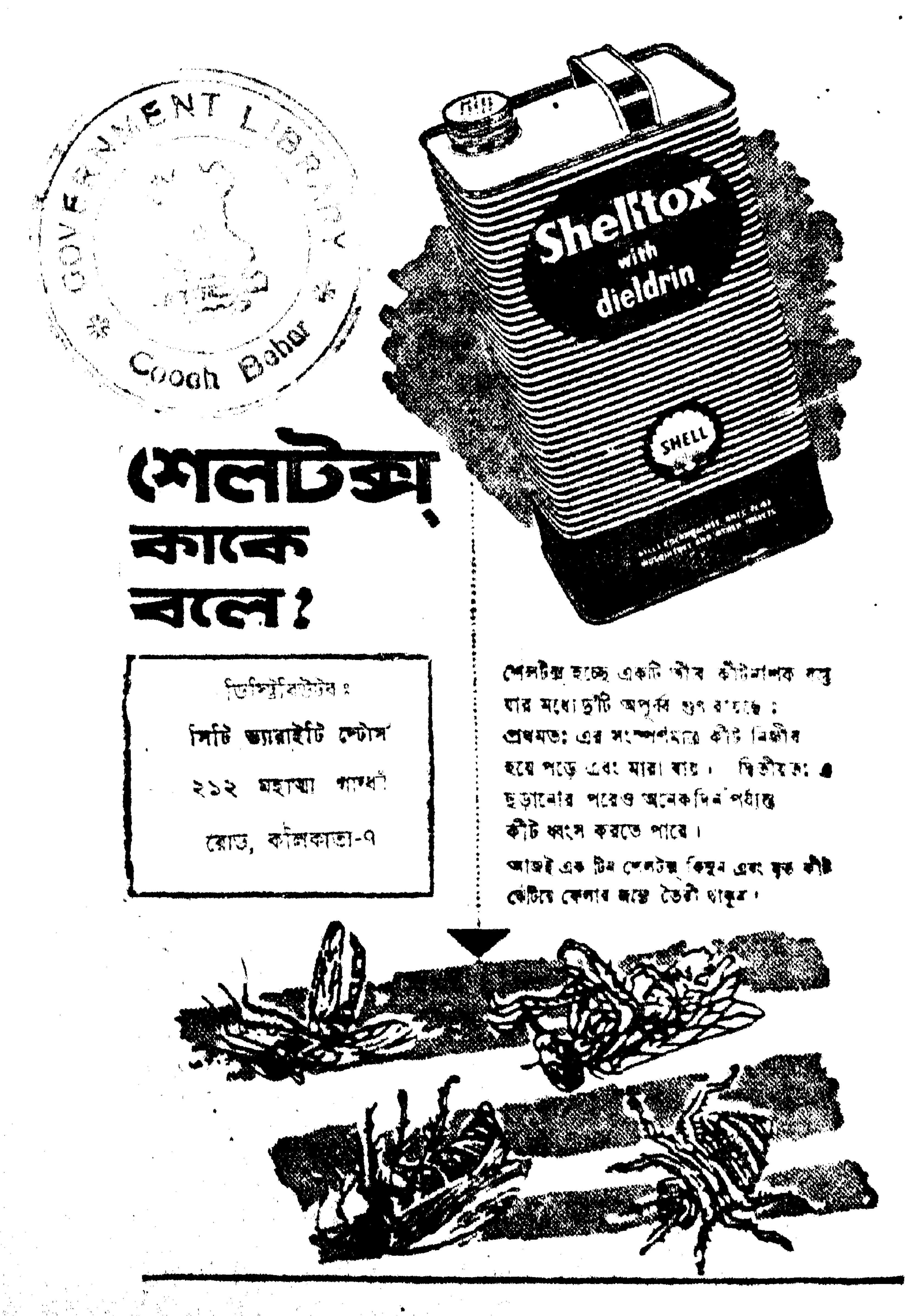

GOVERNMENT LIBRARY Cooch Behar

পশমের পোশাক বোনা প্রতিযোগিতা ফলাফল

প্রথম হয়েছেন—

জগদীশ সাইগল, (নিউদিল্লী), এক সপ্তাহ ধরে দুটি উপভোগ করতে পারবেন কলকাতা বিনা ব্যয়ে।

দ্বিতীয় হয়েছেন—

শ্রীমতী শরণ আহুজা, (নিউ দিল্লী), এক হাজার টাকা পুরস্কার পাবেন।

তৃতীয় হয়েছেন—

শ্রীমতী সুশীলা মালি, (নিউ দিল্লী), পাঁচশত টাকা পুরস্কার পাবেন।

যাঁরা বাছিলয়ালের পুরস্কার পেয়েছেন—

শ্রীমতী সি. ভি. ভেঙ্কটেশন, (রাঁচী)। কুমারী রত্নাবলী পুরী, (পুনা)। শ্রীমতী সি. ভি. ভেঙ্কটেশন, (রাঁচী)। শ্রীমতী শকুন্তলা মাধবন রাও, (বাঙ্গালোর)। শ্রীমতী সিন্ধু দুলানী (বাঙ্গালোর)। শ্রীমতী শরণ আহুজা (দিল্লী)।

ক্লুব পুরস্কার যাঁরা পেয়েছেন—

কুমারী ঈরা হানি, (বম্বে)। কুমারী মীরা ডি কারেকার, (বরদা) কুমারী রাণী আহমেদ, (কলিকাতা)। কুমারী কমলা সাইগল, (হায়দ্রাবাদ) শ্রীমতী ডি. কে. বাবলী, (বম্বে)। শ্রীমতী প্যাট্রিকা ডানহাম, (সেকেন্দ্রাবাদ)।

লালইমলি পুরস্কার পেয়েছেন যাঁরা—

শ্রীমতী প্রকাশ বাজওয়া, (চণ্ডীগড়)। শ্রীমতী শরণ আহুজা, (দিল্লী)। শ্রীমতী পদ্মা আবিদ, (শ্রীনগর)। শ্রীমতী ওয়াই, বাম্পটন, (নিউদিল্লী)। শ্রীমতী এনি ক্যাচাটুর, (কলিকাতা)। শ্রীমতী অনুপ মলহোত্রা, (পাতিয়ালা)। শ্রীমতী পদ্মা আবিদ (শ্রীনগর)। শ্রীমতী এইচ. আর. খান্না, (ভিলাই)। কুমারী ঊষা খান্না, (পাতিয়ালা)। কুমারী রামা আগা, (কানপুর)।

মডেলা পুরস্কার পেয়েছেন যাঁরা—

কুমারী সাবিত্রী সিনাল, (নিউদিল্লী)। শ্রীমতী ই, এম, মারকুইস, (নিউদিল্লী)। শ্রীমতী পুষ্পা রায়, (নিউদিল্লী)। কুমারী সুলতানা ইকবাল, (বাঙ্গালোর)। শ্রীমতী বসির এম. এ. খান, (বেগমপেট)। শ্রীমতী রতন কাপূর, (মুজঃফরপুর)।

রেমণ্ড পুরস্কার পেয়েছেন যাঁরা—

শ্রীমতী জেবিন ডি' সুজা, (নাগপুর)। কুমারী এম. মাথুর, (দিল্লী)। শ্রীমতী এইচ, খোসলা, (কলিকাতা)। শ্রীমতী এনি ক্যাচাটুর, (কলিকাতা)। শ্রীমতী এইচ, খোসলা, (কলিকাতা)। শ্রীমতী ই. জে. মার্কস্, (কলিকাতা)। কালিকা এ. সোরাবওয়ালা, (বম্বে)। কুমারী রমা আগা, (কানপুর)। শ্রীমতী শকুন্তলা সরদেশাই, (বম্বে)। শ্রীমতী আই. শ্রীবাস্তব, (নিউদিল্লী)।

প্রচারিত ইনটার ন্যাশনাল উল সেক্রেটারিয়েট ও সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলন কর্তৃক।

থানায়। তারা ডোম নিয়ে এসে লাস্ তোলে। তারপর খোঁজখবর করতে করতে ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের ঠিকানাটা বেরিয়ে পড়ে। সেখান থেকেও একটা মেয়ের নিরুদ্দেশ হবার খবর ভবানীপুর থানায় ডায়েরী করে গিয়েছিল। সোজা কেস্, ঘোরপ্যাঁচ নেই এর মধ্যে! তবু টাকা লাগচে কেন?

ছিটে বললে—তা বললে শুনবে কেন? শেষকালে দিলুম নাকের ওপর পাঁচটা টাকা ফেলে—তারপর একেবারে জল্! সেই লাস্ নিয়ে ক্যাওড়াতলায় গিয়ে পুড়িয়ে এলুম—

কী সহজ সরলভাবে কথাগুলো বলে গেল ছিটে! বললে—ও নিয়ে আর ভাবি না বুঝলি, কপালে গচ্চা লেখা ছিল, গাঁট-গচ্চা—কে খণ্ডাবে বল্?

তারপর একটু থেমে বললে—আর গচ্চা কি আজ প্রথম দিলুম রে, সারা জীবনটা তো গচ্চা দিতে দিতে গেল কেবল—সেই-জন্যেই তো কংগ্রেসের মেম্বর হয়ে গেচি—

—সে কি? কংগ্রেসের মেম্বর হয়েছ তুমি?

ছিটে হাসলো দাঁত বার করে। বললে—শুধু আমি নই, ফোঁটাও হয়েছে—তোদের মাস্টার প্রাণমথবাবুর কাছে গিয়ে চার আনা চাঁদা দিয়ে জয়-মা-কালী বলে মেম্বার হয়ে গেছি—

দীপঙ্কর বললে—তাহলে তো জেল খাটতে হবে?

—তা খাটবো, জেলই খাটবো, জেল খাটতে তো পেছ্‌পাও নয় ছিটে-ফোঁটা, জেল তো এমনিতেই খাটছি, না-হয় ওমনিতেও খাটবো!

—কিন্তু, কংগ্রেসের মেম্বর হয়ে সুবিধেটা কী হবে তোমার?

ছিটে বললে—আরে দ্যাখ্ না, নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করে ঘরে বসে মাল খাবো, তাতেও ঘুষ দিতে হবে—এ কী রাজত্বে বাস করছি বল্ দিকিনি আমরা! এ শালার স্বরাজ হলে ঘুষ থেকে তো অন্ততঃ বাঁচবো! আমরা তো সুভাষ বোসের সঙ্গে এক-হাজতে কাটিয়েছি। ও জে এম সেনগুপ্তর দলের লোকেরা যা-ই বলুক, লোকটা মাইরি সাচ্চা, বিড়ি টিড়ি খায় না, ও গান্ধীটাও সাচ্চা লোক, স্বরাজ হলে আর যাই হোক, ঘুষ তো আর দিতে হবে না—

কথা বলতে বলতে অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ যেন খেয়াল হলো। বললে—যাই, অনেক জায়গায় আবার ঘুরতে হবে—তা তুই যাস্ কিন্তু, দিদিকে নিয়ে যাস্—

বলে উঠলো ছিটে। বাড়িটার বাইরে এসে দাঁড়িয়ে দেখলে এদিক-ওদিক। বললে—কত ভাড়া দিস্ বাড়ির? কুড়ি টাকা?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ—

ছিটে বললে—কুড়িটাকা? ভাড়াটা একটু বেশি, তা যাই হোক, স্বরাজ হলে এই বাড়ির ভাড়া দশটাকা করে দেব আমরা—শালা ইংরেজরা না গেলে আর ভদ্দরলোক-দের বেঁচে থেকে সুখ নেই—যাই—

বলে গাড়িতে উঠে চলে গেল ছিটেফোঁটা!

শেষ পর্যন্ত হয়ত শ্রাদ্ধবাড়িতে যেত দীপঙ্কর। একবার ইচ্ছেও হয়েছিল। অনেক দিনের সম্পর্ক। অনেক কিছু দিয়েছিল অঘোরদাদু! বলতে গেলে অঘোরদাদু না থাকলে হয়ত বড় হওয়াই হতো না শেষ পর্যন্ত। হয়ত সেই দু'মাস বয়সেই জীবন-লীলা ফুরিয়ে যেত দীপঙ্করের। মানুষটার মনের কোণে যতটুকু স্নেহ-প্রীতিই থাক্, সবটুকু পেয়েছিল শুধু দীপঙ্কর একলা। আর কেউ নয়। সেই তার আত্মার সদ্‌গতির জন্যে অন্ততঃ দীপঙ্করের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সকাল বেলাই একটা কাণ্ড হলো।

প্রতিদিন সকালে উঠে বাজার করে নিয়ে এসে দীপঙ্কর অফিসে চলে যেত ভাত খেয়ে। ছোটখাটো সংসার। বলতে গেলে দু-জনের সংসার। মা যে সেই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন থেকে চলে এসেছে, তারপর থেকে যেন অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছিল। যেন কথা কমে গিয়েছিল মুখে। এত সাধ ছিল মা'র, এত কল্পনা। কতদিন থেকে আকাঙ্ক্ষা ছিল ছেলে নিজে একটা বাড়ি ভাড়া করবে—আর মা হবে সেই সংসারের গৃহিণী। পরের বাড়ির রান্নার হাত থেকে মা বাঁচবে। মা ভেবেছিল তাতেই বুঝি স্বর্গ-সুখ। তাতেই বুঝি সমস্ত কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাবে মা। কিন্তু দীপঙ্করও লক্ষ্য করে অবাক হয়ে গেল—মা যেন চুপ করে কী ভাবে একলা-একলা। মা যেন নিজের জীবনের ভারে দিন দিন নুইয়ে পড়ছিল।

সেই ছোটবেলাকার মতন দীপঙ্কর মা'র কাছে অফিস থেকে এসে বলতো—মা, কী হয়েছে তোমার?

মা বলতো—কই কিছু হয়নি তো!

—তবে? এ-পাড়াটা কি খারাপ লাগছে তোমার?

—না খারাপ লাগবে কেন?

পুব দিকের রেল-লাইনের ওপারে কচুরি-পানা ভর্তি সার-সার পুকুর। আর আশে-পাশে কয়েকটা চালাঘর। পাশেই রেলওয়ের গুডস্ শেড্। ওয়াগন থেকে মাল নামে ইয়ার্ডে। সেখান থেকে শেড্-এর ভেতরে ওঠে। পুবদিকের বারান্দায় দাঁড়ালে স্পষ্ট রেলের কাজকর্ম দেখা যায়। এতদিন রেলের চাকরি করছে দীপঙ্কর, অথচ নিজের চোখে রেলগাড়ি দেখবার সুযোগ কবারই বা হয়েছে? মা'র কত সাধ ছিল ছেলে রেলের চাকরি করলে ছেলের পাশে তীর্থ দর্শন করবে। কাশী গয়া বৃন্দাবন যাবে। কিন্তু এতদিন অঘোরদাদুর জন্যে কোথাও যাওয়া হয়নি। কার ওপর অঘোরদাদুর ভার দিয়ে যাবে! বিন্তীদিই বা কার কাছে থাকবে! কিন্তু এখন? এখন তো আর কোনও বন্ধন নেই, এখন তো আর বাধা দেবার কেউ নেই।

—একবার কোথাও যাবে মা? তুমি যে কত বলতে তীর্থ করবার কথা!

মা বলতো—না বাবা, কোনও তীর্থের দরকার নেই আমার, তুই-ই আমার তীর্থ, তুইই আমার কাশী গয়া—

আশ্চর্য! অঘোরদাদুর বাড়িতে রান্না করতে করতে কতদিন অনুযোগ করেছে অভিযোগ করেছে মা। চিরকাল রান্না করতে পারবে না বলে কত বক্ বক্ করেছে মা চন্নুনীর কাছে। অথচ আজও নিজের হাতে রান্না করতে মার এতটুকু ক্লান্তি নেই।

দীপঙ্কর বলেছিল—একজন লোক বরং রাখি, সে-ই রাঁধবে, তুমি বরং জপ্ তপ্ আহ্নিক নিয়ে থাকো—

মা বলেছে—না বাবা, রাঁধতে আমার কষ্ট নেই—

—কিন্তু এমন করে সারাজীবনই কি তুমি ভাত রেঁধে যাবে কেবল—

মা বলেছে—আমি মরলে তুই বরং ঠাকুর রাখিস্ একটা—

অঘোরদাদু আর বিন্তীদির মৃত্যুর পর থেকেই কেমন যেন হয়ে গেছে মা। অর্থাৎ এ-বাড়িতে আসবার পর থেকেই যেন মা অন্যরকম হয়ে গেছে। সকাল বেলাই কলে জল আসে। সেই অত ভোরেই মা চান করে নেয়। তারপর উনুনে আগুন দিয়ে ঠিক আগেকার মত ভাত চড়িয়ে দেয়। দীপঙ্কর তখন চাকরটাকে নিয়ে বাজারে চলে গেছে। নতুন চাকর। ছোট্ট ছেলে। মেদিনীপুর না কাঁথি—কোথায় যেন বাড়ি।

দীপঙ্কর ডাকে—কাশী—

কাশী এসে দাঁড়ায় বাজারের ঝাড়ন নিয়ে।

দীপঙ্কর বলে—তোর আসল নামটা কী রে? কাশীনাথ না কাশীশ্বর না কাশী-পতি?

কাশী হাসে। বলে—শুধু কাশী—

—শুধু কাশী কি রে। শুধু কাশী কারো নাম হয়!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, শুধু কাশী!

ছেলেটার বাপও নেই, মাও নেই। দীপঙ্করের চেয়েও দুস্থ। দীপঙ্করের চেয়েও অনাথ। কাশীকে দেখে দীপঙ্করের নিজের কথাই মনে পড়ে। কাশীর মতই দীপঙ্কর একদিন নিঃস্ব ছিল, সহায়সম্বল-হীন ছিল, অনাথ ছিল। তফাৎ শুধু দীপঙ্করের মা ছিল, কাশীর মা নেই।

সংসারের কাজে ঝঞ্ঝাট ঝামেলা থাকেই। ঝঞ্ঝাট ছাড়া সংসার হয় না। মাঝে মাঝে মা-ও কাশীকে বকে। মা-ও মেজাজ খারাপ করে। বলে—বসে তো আছিস্, বলি ততক্ষণে ঘর-গুলো ঝাঁট দিতে পারিস না—

তারপর আবার হয়ত মা রান্নাঘর থেকে ডাকে—কাশী, ও কাশী—

কাশীর কোথাও সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না। হঠাৎ কখন কোথায় যে থাকে, তারও ঠিক থাকে না। ছোট ছেলে, হয়ত বাইরে দোকান থেকে কিছু আনতে গেছে। তারপর রাস্তায় কিছু মজা দেখে সেখানেই জমে গেছে। যখন বাড়িতে এল, তখন মা'র উনুনে কামাই যাচ্ছে। কাশী আসতেই মা ঝাঁজিয়ে উঠলো—কোথায় গিছলি রে তুই, গেছলি কোথায় বল?

সর্বঋতুর সঞ্জীবনী
দই মিষ্টি
গাঙ্গুরাম গ্র্যাণ্ড সন্স
ভবানীপুর ও কালীঘাট — কলিকাতা —
ফোন: ৪৭-২৩৭৭

রেনবো
ফাউন্টেন পেন কালি
●ঝরঝরে লেখা হয়
●তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়
●সাবলীল গতিতে
কালি নামে

রেনবো ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিঃ
২১এ, আর্মেনিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

কাশী বলে—আমি তো দোকান থেকে সরষের তেল আনতে গিয়েছিলাম—

সরষের তেল আনবার কথা মা ভুলে গিয়েছিল। তবু দমলো না মা। বললে—সরষের তেল আনতে গিয়েছিলি—তা এতক্ষণ? এই এক ঘণ্টা? মাইনে দেওয়া হচ্ছে না তোমাকে? ছ' টাকা যে মাইনে দেওয়া হচ্ছে তোমায়, সে কি মুখ দেখে?

এক-এক সময় মা'র বকুনি দেখে দীপংকরও অবাক হয়ে যায়। এমন তো ছিল না মা। এমন মেজাজ তো মা'র ছিল না আগে! একদিন মা-ই ছিল অঘোরদাদুর বাড়িতে আশ্রিতা, আজ মা-ই হয়েছে মালিক। একদিন মা'র দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিল অঘোরদাদু, আজ মা-ই হয়েছে আবার কাশীর দণ্ডমুণ্ডের মালিক। মালিক হলেই কি এমনি হতে হয়! ঘরের ভেতরে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে দীপংকর অন্যমনস্ক হয়ে যায়। লুকিয়ে লুকিয়ে কাশীর মুখখানার দিকে চেয়ে দেখে। মুখটা কেমন ম্লান হয়ে গেছে। শুকিয়ে গেছে চেহারাটা বকুনি খেয়ে। আহা! কেউ ওকে লেখাপড়া শেখায়নি। ওকে লেখাপড়া শেখাবার কেউ নেই। অঘোরদাদু

দীপঙ্করকে লেখাপড়ার খরচ দিয়েছিল, তাই দীপঙ্করের লেখাপড়া হয়েছে। চাকরি হয়েছে। কাশীকে দেখে দীপঙ্করের নিজের কথাই বার বার মনে পড়ে যায়। অঘোর-দাদু না থাকলে তাকেও তো এই রকম কাশীর মতন পরের বাড়িতে চাকরের কাজ করে পেট চালাতে হতো। তাতে আর কাশীতে তফাত কী! দীপঙ্কর না-হয় মোটা মাইনে পায়, কিন্তু তাতে কী!

মা ধমক দিয়ে বলে—কেন্, কম্মে আছো তুমি শুনি? বাবুর জুতোটায় একটু রং দিতে পারো না? কেবল খাবার কুমীর?

তাড়াতাড়ি রং আর বুরুষটা নিয়ে কাশী পায়ের সামনে বসে জুতো রং করতে লেগে যায়।

মাঝে মাঝে দীপঙ্করের মনে হয় মাকে একটু বুঝিয়ে বলে। বুঝিয়ে বলে যে—মা, ও-ও তো মানুষ, ওরও তো একটু বিশ্রাম দরকার, ওরও তো একটু খেলা করতে ভালো লাগে, ও-ও তো আমার মত অনাথ—

কিন্তু বলতে গিয়েও থেমে যায়। দরকার নেই। এতদিন পরে মা একটু কর্তৃত্ব করতে পেরেছে, এতদিন পরে অন্তত একজনের ওপরেও নিজের মালিকানা আরোপ করতে পেরেছে। বললে হয়ত মা সব কথা বুঝবে না। সারা জীবন মা পরের কর্তৃত্ব মেনেই চলেছে, পরের খেয়াল-খুশির তাঁবেদারি করে চলেছে, এই এতদিন পরে মুক্তি হয়েছে মা'র, মা যদি কাশীকে একটু বকেই, তাতেই বা কী! দীপঙ্কর চোখ-কান বুজে থাকলেই পারে। কিন্তু পৃথিবীর সব দিকে চোখ-কান খোলা রাখা যার স্বভাব, সে কেমন করে সব দেখেও চুপ করে থাকতে পারবে!

আড়ালে কাশীকে ডেকে বলে—হ্যাঁরে, কাশী, তোর কষ্ট হচ্ছে?

—না বাবু, কিসের কষ্ট!

কাশী বুঝতে পারে না। দীপঙ্করের মত নরম মন নয় বলেই হয়ত কষ্টবোধটা তার এত তীব্র নয়। কিন্তু কষ্ট যা, তা কষ্টই। বোধ থাকুক আর না-থাকুক। শীতে কাশী হি-হি করে কাঁপলে দীপঙ্করেরই যেন শীত করে, বর্ষায় বেশী ভিজলে দীপঙ্করেরই যেন গা শপ্-শপ্ করে। কাশীর কষ্ট দেখলে দীপঙ্করের নিজেরই কষ্ট হয় যেন। দীপঙ্করের কেমন মায়া হয় কাশীটার জন্যে। লুকিয়ে লুকিয়ে গেঞ্জি কিনে এনে দেয় কাশীকে। বলে—নে পর এটা—

তারপর চুপি চুপি বলে—মাকে যেন বলিস নি আমি দিয়েছি এটা—

তারপর ঘরে নিয়ে গিয়ে বলে—দ্যাখ, একটা কথা শোন্—

কাশী বুঝতে পারে না দাদাবাবু কী বলবে। কাছে এসে দাঁড়ায়। একটু ভয়ও হয় বুঝি তার।

দীপঙ্কর বলে—দ্যাখ, মা যদি তোকে বকে, তুই যেন কিছু মনে করিস নি, মা'র তো বয়েস হয়েছে, বুড়ো মানুষ তো, একটু বকলে তোর ক্ষতি কী, বুঝলি?

কাশী মাথা নাড়ে।

—আর দ্যাখ, মা যদি তোকে পেট ভরে খেতে না দেয় তো আমাকে বলবি, বুঝলি। আমি তোকে পয়সা দেব, দোকান থেকে খেয়ে আসিস—বুঝলি? বুঝলি তো?

কাশী আশ্বাস পেয়ে চলে যায়। কিন্তু দীপঙ্করের মনে হয় এ-ও যেন স্বার্থপরতা! এ-ও আর-এক রকমের স্বার্থপরতা! কাশীর ভাল করাটা যেন উপলক্ষ্য। আসলে দীপঙ্কর নিজের স্বার্থেই কাশীকে সন্তুষ্ট করতে চায়? কাশী চলে গেলে তো তারই ক্ষতি! তার মায়েরই ক্ষতি! কাশী চলে গেলে তো দীপঙ্করকে নিজেকেই দোকানে ছুটতে হবে, বাজারে ছুটতে হবে। কিন্তু আসলে সে কাশীর ভালো চায় না, নিজের ভাল চায়? নিজের আরাম চায় বলেই তো কাশীকে এত ভালবাসে দীপঙ্কর। ভালবাসার ভান করে। আসলে দীপঙ্কর তো ভাল নয়—স্বার্থপর, ভণ্ড, শয়তান। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কাশীর কাছেও ভালোমানুষ সাজে সে। ভাবতে ভাবতে আবার কেমন ঝিমিয়ে পড়ে দীপঙ্কর। আবার আপিস গিয়ে খানিকক্ষণ নিস্তেজ হয়ে বসে থাকে! সে ক'দিন কিছুই ভালো লাগে না। সমস্তক্ষণ কেবল মনে হয়, সে ফরসা জামা-কাপড় পরে ভদ্রলোক সেজে বেড়াচ্ছে—আসলে সে নীচ, সে হীন, সে পশু!

সেদিন সকাল বেলাই কাণ্ডটা ঘটলো। একটা থার্ড ক্লাস ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে।

কাশী সদর দরজা খুলে দিলে। বললে—হ্যাঁ, এই বাড়িতেই থাকেন—

আর কথাবার্তা নেই। দীপঙ্কর তখন জামা-কাপড় পরে আপিস যাবার জন্যে তৈরি। নতুন এজেন্ট এসেছে আপিসে। আজকাল ঘন-ঘন ডাক আসে ক্রফোর্ড সাহেবের কাছে। মিস্টার ঘোষালের মত লোকও ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করে। দিল্লী থেকে এক-একটা জরুরি চিঠি আসে আর আপিসসুদ্ধ তোলপাড় পড়ে যায়। নতুন ডাবলিং হবে কোথায়, কোথায় নাইনটি পাউণ্ড রেল-লাইন তুলে একশো কুড়ি পাউণ্ড করা হবে, তারই জোর তলব। একটু দেরি হলে চলবে না। মিস মাইকেলেরও কাজ বেড়ে গেছে। ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার, চীফ ইঞ্জিনীয়ার, ট্রাফিক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, সবাই মিলে মিটিং হয়। তারপর দু-তিন দিন একসঙ্গে কনফারেন্স করে চিঠি ড্রাফট্ করতে হয়। কিন্তু একটা ঝঞ্ঝাট মিটতে-না-মিটতে আর-একটা ঝঞ্ঝাট এসে হাজির হয়। তখন আবার মিটিং আবার কনফারেন্স!

মিটিং-এ কিছু কথা উঠলেই রবিনসন

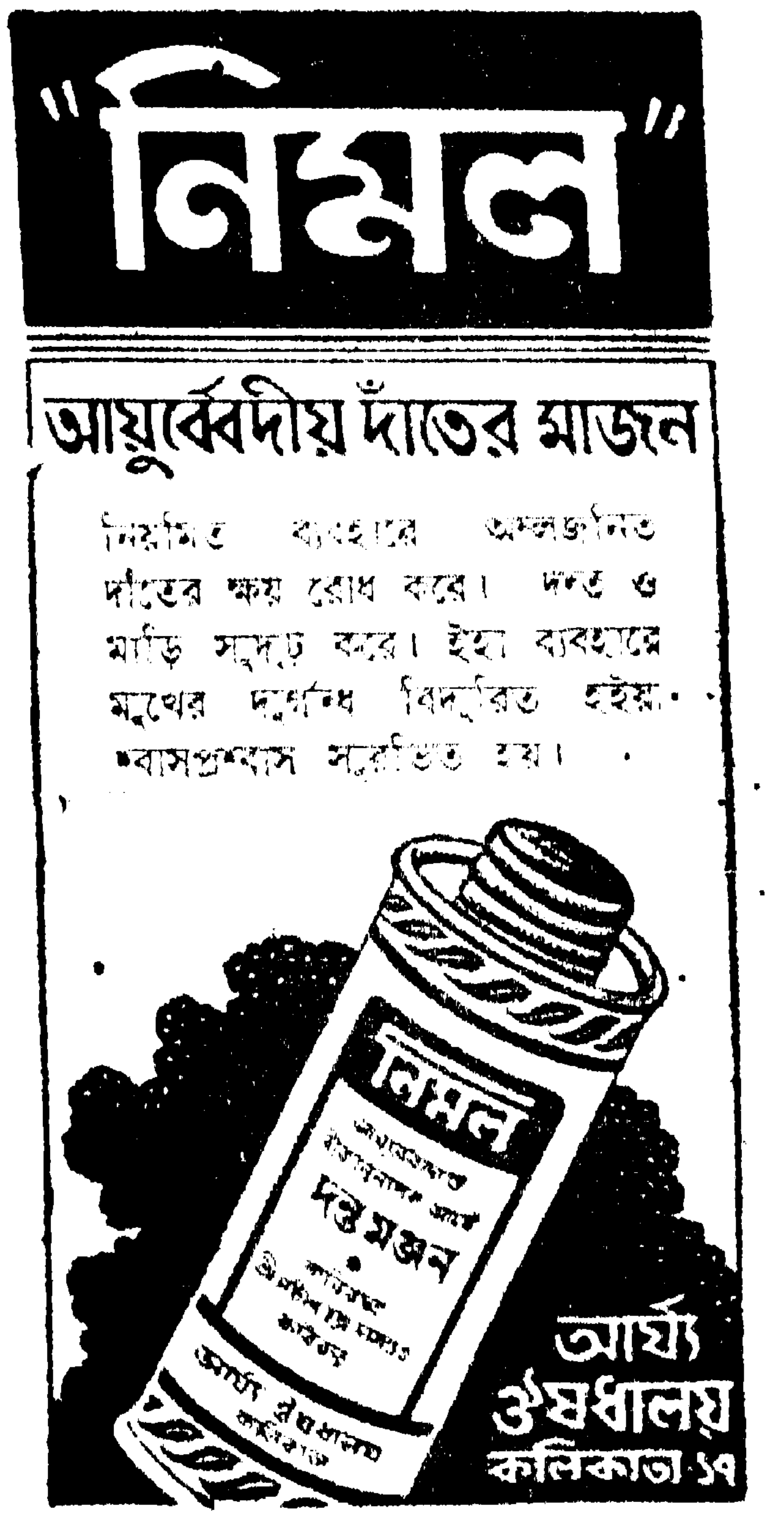

খাবার দেখে ভয় হচ্ছে?

হিউলেট্‌স মিক্শ্চার

খাওয়া দাওয়ার পরে পাকস্থলীর ব্যথায় দীর্ঘস্থায়ী আরাম এনে দেবে।

সি, জে, হিউলেট এণ্ড সন (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড
৮৬।এ, নাইনিয়াপ্পা নায়ক স্ট্রীট
মাদ্রাজ-৩

TCH 1127

সাহেব বলে—অল্ রাইট, সেন ক্যান ডু ইট্—সেন সব পারে—!

তারপর সেনের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় কাজ। কত ওয়াগন ডক্-এ হ্যাণ্ড-ওভার করা হয় রোজ, তার স্টেটমেণ্ট তৈরি করতে হবে। সেন তৈরি করবে। লাস্ট ইয়ারে কত ওয়াগন ডেলিভারি হয়েছে, আর এ-বছের এই ছ' মাসে কত হয়েছে, তার নিখুঁত হিসেব চাই। এক দিনের মধ্যে।

চীফ ইঞ্জিনীয়ার বলে—ট্রিট্ দিস্ য়্যাজ মোস্ট আর্জেণ্ট—

দীপঙ্কর রামলিঙ্গমবাবুকে ডেকে পাঠায়। রামলিঙ্গমবাবু বলে—এ-কাজ আজকের মধ্যে কী করে হবে স্যার? এখন তো তিনটে বেজেছে—

দীপঙ্কর বলে—কী করবো বলুন, বোর্ডের রিপ্লাই কাল পাঠাতেই হবে—

রামলিঙ্গমবাবু কিছু না-বলে নিজের সেকশানে গিয়ে বলে—আজ কেউ পাঁচটার সময় বাড়ি যেতে পারবে না—বীরেশবাবু, পঞ্চাননবাবু, কালীপদবাবু, সব এখানে আসুন—

—কেন?

—সেন-সাহেবের অর্ডার। এই স্টেটমেণ্ট তৈরি করে তবে যাবে সবাই।

সবাই ফোঁস করে উঠলো। তার মানে? পাঁচটা তেইশের পাঁশকুড়া লোক্যাল ছাড়লে কোন্ ট্রেনে বাড়ি যাবো শুনি? ছ'টা ছাপ্পান্ন? ছ'টা ছাপ্পান্নয় গেলে বাড়ি পৌঁছাতে তো সেই যার নাম রাত ন'টা। তারপর খরচপাতি নেই—বাড়ির লোক ভাববে না? তাছাড়া আপিসে চাকরি করতে এসেছি বলে কি মাথা কিনে নিয়েছে নাকি সাহেবরা? এই বেলা তিনটের সময় দেড় বছরের পুরোন স্টেটমেণ্ট তৈরি করতে হবে! সাহেবদের কী! তাদের তো সংসার দেখতে হয় না, তাদের তো বাজার করতে হয় না। তারা বুঝবে কী করে আমাদের জ্বালাটা!

—তাহলে আপনারা সেন-সাহেবকে বলুন গিয়ে, আমি কী করবো!

—হ্যাঁ, যাবো তো, এখখুনি যাবো, এখখুনি গিয়ে বলবো।

কিন্তু আশ্চর্য, কেউ সেন-সাহেবের কাছে যায় না। কারোরই সাহেবের সামনে গিয়ে বলবার সাহস নেই। মাথা গুঁজে স্টেটমেণ্ট তৈরি করে। বকেয়া কাজ ফেলে রেখে সেকশানসুদ্ধ লোক স্টেটমেণ্ট নিয়ে বসে। পুরোন এক-বছর দেড়-বছর আগেকার সব ফাইল। ধুলো ময়লা জমেছে। ধুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে বাবুদের জামা-কাপড়, ধুতি-সার্ট ধুলোয়-ধুলো হয়ে যায়।

ওদিক থেকে ক্রফোর্ড সাহেব তাগাদা দেয়—ইজ্ ইট রেডি সেন? এত দেরি হচ্ছে কেন?

সাহেবদের ঘরে টি আসে, কফি আসে, স্ন্যাক্স আসে আর মিটিং বসে। তারপর এক-সময়ে আর ধৈর্য থাকে না কারো। সাহেবরা চলে যায়। পরের দিন আর্লি আওয়ার্সে এসে যেন সব রেডি থাকে। তখন পেলেই চলবে। কিন্তু সেকশানে পুরোদমে তখন কাজ চলছে। সন্ধ্যে ছ'টা বাজলো, সাতটা বাজলো। রাত আটটা বাজলো।

হঠাৎ রামলিঙ্গমবাবু ঘরে ঢুকলেন আবার। হাতে একটা দশ টাকার নোট।

বললেন—সেন সাহেব মিষ্টি খেতে দিয়েছে আপনাদের, এই নিন—

এত যে রাগ, এত যে গজ্-গজানি, সব জল হয়ে গেল সব দশ টাকার ঘুষ পেয়ে। বাবুদের মুখে হাসি ফুটলো। চাপরাশি দশ টাকার সিঙাড়া, কচুরি, নিমকি, রসগোল্লা, চা নিয়ে এল সেই রাত আটটার সময়। বাবুরা গপ গপ করে গিলতে লাগলো সেই ঘুষ। দশ টাকার ঘুষ দিয়ে দীপঙ্কর সেকশানের বাবুদের কিনে নিলে। রাতারাতি ভালো হয়ে গেল মানুষটা! রাতারাতি দেবতা হয়ে গেল দীপঙ্কর সেন। রাত ন'টার সময় সেই স্টেটমেণ্ট তৈরি করে বাবুরা লাফাতে লাফাতে বাড়ি চলে গেল! কিন্তু যে-স্টেটমেণ্টের জন্যে এত চা, কফি, সিঙাড়া,

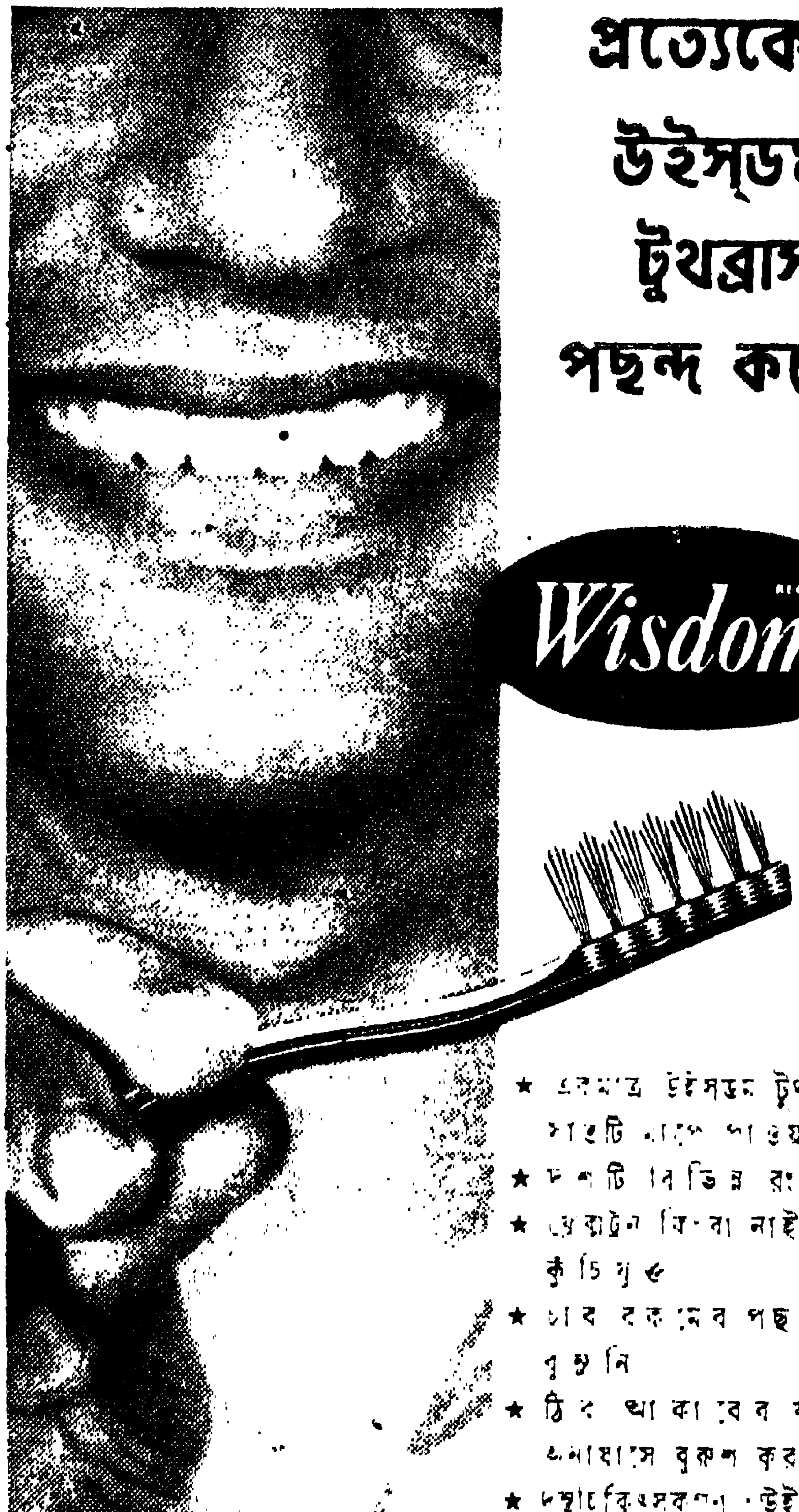

প্রত্যেকেই উইস্‌ডম টুথব্রাস পছন্দ করেন

★ একমাত্র উইসডম টুথব্রাসই সাতটি মাপে পাওয়া যায়
★ দশটি বিভিন্ন রং
★ প্রেব্রাট্রন কিংবা নাইলনের কুঁচিযুক্ত
★ চার রকমের পছন্দসই বুরুশ
★ ঠিক আকারের যা'তে অনায়াসে বুরুশ করা যায়
★ দন্তচিকিৎসকগণ উইসডমই অনুমোদন করেন।

জে. এল. মরিসন, সন এণ্ড জোন্স (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড

বোম্বাই • কলিকাতা • মাদ্রাজ • দিল্লী

কচুরি খরচ হলো, সেই স্টেটমেণ্টই আর দরকার হলো না। পরদিনই বোর্ড থেকে টেলিগ্রাম এল প্রোজেক্ট ক্যানসেলড্। সেটার ফলোজ!

এমনি করেই রোজ একটা-না-একটা হুলস্থূলে কাণ্ড বাধে। তখন মনে হয় দিন বুঝি আর কাটবে না—চাকরির বুঝি আর টিকবে না। তারপর আবার সব ঠিক হয়ে যায়। আবার ঢিমেতালে চলে আপিস। আবার হৃদয় চাপরাশি পাঁঠার চপ্ আর ঘুগনি নিয়ে ঘরে-ঘরে ফিরি করে বেড়ায়। আবার রবিনসন সাহেবের কুকুরের অসুখ করে। আবার রেকর্ড সেকশান থেকে একটা চিঠি ট্রান্সফার্ট সেকশানে আসতে চোদ্দ দিন লাগে। আবার সকালের তলব পড়ে সাহেবের ঘরে। আবার বোর্ড থেকে জরুরী চিঠি আসে। আবার মিটিং, আবার কনফারেন্স। আবার চা সিঙাড়া, কচুরি, রসগোল্লা ঘুষ দিতে হয়। আবার বাবুরা খুশী হয়।

এমনি করেই চলছিল। এমনি করেই হয়ত বরাবর চলবে আপিসের কাজ। তবু, নতুন এজেন্ট আসার পর আবার আপিসে সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে। আবার হাব-ভাব শুরু হয়েছে।

সেদিন তাড়াতাড়িই আপিসে যাচ্ছিল দীপংকর। হঠাৎ কাশী বললে—ঘোড়ার গাড়িতে একজন বাবু এসেছে—

বাবু! কে বাবু?

কাশী বললে—সঙ্গে একজন মেয়েমানুষও আছে—

ততক্ষণে ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া চুকিয়ে দিয়েছে ভদ্রলোক। তিন টাকা ভাড়া হয়েছিল হাওড়া স্টেশন থেকে কালীঘাট। কালীঘাট ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন পর্যন্ত। কিন্তু সেখান থেকে ঠিকানা নিয়ে আবার এই জায়গা পর্যন্ত আসতে হয়েছে।

ভদ্রলোকের সঙ্গে ঝগড়া বেঁধে গেল গাড়োয়ানের। বললে—সাড়ে তিন টাকা দিচ্ছি তবু হবে না? আমাকে কি পাড়াগেঁয়ে লোক পেয়েছ? নেবার হয় নাও, নয়তো চলে যাও, আমি আর একটি পয়সা দেব না—

গাড়োয়ান বললে—পুরোপুরি চার টাকা না দিলে আমি যাবো না বাবু, চার টাকাই দিতে হবে, অনেক ঘুরেছি—

—এ তো দেখছি মহা জ্বালা হলো!

তারপর পাশের দিকে চেয়ে বললে—ওরে ক্ষিরি, তুই যা। তুই বাড়ির ভেতর যা দিকি—তোর জ্যাঠাইমাকে গিয়ে বল তো, গাড়োয়ান ঝামেলা করছে বড়—

দীপংকরের মা এসে অবাক। এ কে? এরা কারা?

ভদ্রলোক কিন্তু এক নিমেষেই চিনতে পেরেছে। বললে—আমায় চিনতে পারছো না বৌদি, আমি সন্তোষ—সন্তোষ! তবু চিনতে পারলে না মা। ঘোমটাটা আরো একটু টেনে দিলে মুখের ওপর। ভদ্রলোকের গায়ে ছিটের সার্ট। পায়ে ভারি জুতো। উঁচু কাপড়। হাঁটু পর্যন্ত ধুলো। আর পাশে একটি কটকটে মেয়ে। মাথায় বেড়া বিনুনী খোঁপা। একটা কাঁচপোকার টিপ্ কপালে। একটা ডুরে শাড়ি পরেছে। পায়ে আলতা।

সন্তোষ বললে—ওরে ক্ষিরি, তোর জ্যাঠাইমাকে প্রণাম কর্, প্রণাম করতেও শিখিয়ে দিতে হবে?

—থাক্, থাক্, বাছা—

চিবুকে হাত দিয়ে মা একবার ঠোঁটে ঠেকিয়ে আশীর্বাদ করলে।

সন্তোষ বললে—যাই বলো বৌদি, তোমাদের কলকাতার গাড়োয়ানরা কিন্তু বড় শয়তান, তিন টাকায় রফা হলো, আমি আট গণ্ডা পয়সা বখশিস দিচ্ছি, তাতেও খুশী নয়—

বলে ট্যাঁক থেকে বার করে পুরোপুরি চারটে টাকাই দিয়ে দিলে। তারপর বললে—তোমার চাকরটিকে বলো না বৌদি, মাল-গুলো নামিয়ে নিক—

মাল মানে টিনের তোরঙ্গ একটা আর একটা পাকা কুমড়ো আর কয়েকটা ঝুনো নারকোল। কাশী কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে নামিয়ে নিলে ট্রাঙ্কটা আর পুঁটলিটা।

সন্তোষ বাড়ির মধ্যে ঢুকে বললে—আমাকে তুমি চিনতে পারোনি বৌদি ঠিক—

সত্যিই মা তখনও চিনতে পারেনি।

সন্তোষ বললে—কে বল তো?

মা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

সন্তোষ বললে—সে কি আজকের কথা বৌদি, সম্পর্ক তো রাখলে না আর দেশের সঙ্গে। ভাবলাম বৌদি যদি সম্পর্ক না-ই রাখে তো আমরা রাখবো না কেন? তাই ক্ষিরিকে নিয়ে চলে এলাম রেলে চড়ে—

মা বললে—রসুলপুরের সন্তোষ তুমি!

—দেখ দিকিনি! এতক্ষণ লাগলো চিনতে! তবু যা হোক চিনতে পারলে এই-ই যথেষ্ট—

মা বললে—তা এই তোমার মেয়ে নাকি?

সন্তোষ বললে—মেয়ে নয় বৌদি, গলার কাঁটা—

—তা আমার জা কোথায়? জাকে নিয়ে এলে না যে?

সন্তোষ বললে—জা কি আর আছে বৌদি! এই গলার কাঁটাকে রেখে পালিয়েছে আমাকে, জ্বালাতে—

—সে কি! এই এতটুকু দেখেছি তোমাকে সন্তোষ, কবেই বা বিয়ে করলে, আর কবেই বা মেয়ে হলো, কিছুই জানি না।

সন্তোষ বললে—দিন যে হু-হু করে যাচ্ছে বৌদি, দিন কি কারো জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে। তা বেশ বাড়ি তোমার বৌদি, ভাবলাম কলকাতায় গিয়ে তবু একটা ওঠবার জায়গা হলো, কী দিনকাল যে পড়েছে! তা পা ধোবার জল কোথায় বল দিকিনি—কাল রাত্তির বেলা কাদা মাড়িয়ে রেলে উঠেছি, আর পা ধোবার জল পাইনি—

কাশী জল দিলে। পা ধুতে লাগলো

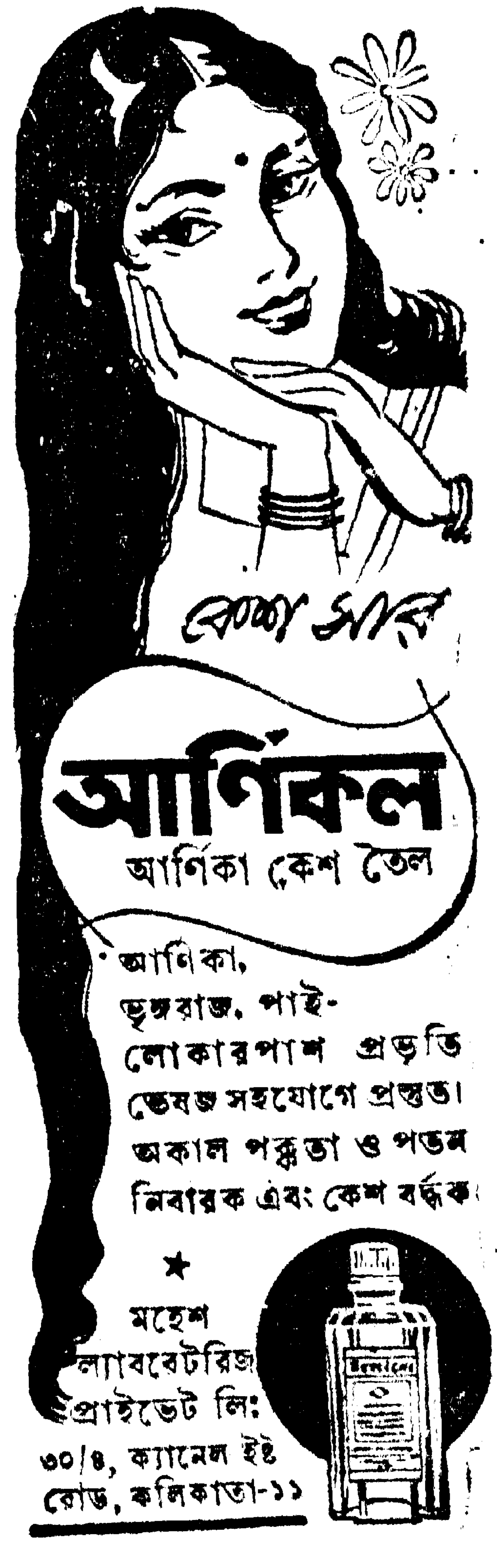

সোল এজেণ্ট:
এম, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ,
৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

সন্তোষ। জুতো জোড়াও ধুতে লাগলো। বললে—ও ক্ষিরি পা ধুবি তো ধুয়ে নে মা—

দীপঙ্কর আপিসের জামা-কাপড় পরছিল। মা কাছে আসতেই দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—ওরা কারা মা?

মা বললে—তুই ওদের চিনবি না. রসুলপুরের লোক—সম্পর্কে ঠাকুরপো—

নিচে থেকে সন্তোষ তখন ডাকছিল—ও বৌদি, কোথায় গেলে?

মা বললে—এই দীপু আপিস যাচ্ছে ঠাকুরপো, তুমি একটু বোস, আমি যাচ্ছি—

দীপঙ্কর বললে—মা তুমি যাও, আমার কিছু দরকার নেই, ওদের আবার খাবার জোগাড় করতে হবে বোধহয়—

মা নিচেয় আসতেই সন্তোষ বললে—এই কুমড়োটা আমার ভিটের কুমড়ো, ভাবলাম দেশের কুমড়ো খেতে বৌদির হয়ত ভালো লাগবে—খেয়ে দেখো মিষ্টি একেবারে গুড়—ও ক্ষিরি, কুমড়োটা বার কর তো মা পোঁটলা খুলে— (ক্রমশ)

Cooch Behar

মেঘ থম থম আকাশের মুখে বিদ্যুতের ভেংচি। পাঁচকালো লেইংয়ের জল। এস. এস. এডাভানা শম্বুকগতিতে ব্রুকিং স্ট্রীট জেটি ছোঁবার চেষ্টা করছে।

মালের জাহাজ। লোক নামবার হুড়োহুড়ি নেই। পোর্ট কমিশনের কয়েকজন সাহেব ঘোরাঘুরি করছে জেটিতে। ক্লিয়ারিং এজেন্টের প্রতিনিধিরা জটলা পাকাচ্ছে এখানে ওখানে। মাল্লারা মোটা ম্যানিলা দড়ি ছুঁড়ে দিচ্ছে তটের দিকে।

এসব দিকে রহমানের নজর নেই। রেলিং ধরে চুপচাপ চেয়ে আছে সদ্য আলো-জ্বলে-ওঠা শহরের দিকে। মনে মনে বিড়বিড় করে হিসাব করছে। আঙুলের কড় গুনে গুনে।

কত বছর হবে। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ। ঠিক পাঁচ বছর। এই পাঁচ বছরে এস এস এডাভানা পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্র তোলপাড় করেছে। বহু বাণিজ্য বন্দরে নোঙর ফেলেছে। রহমানের দেহটাই শুধু ঘুরেছে, স্বাদ পেয়েছে নোনা নীলচে জলের, মনটা পড়ে ছিল রেঙ্গুন শহরে। গোটা শহরে নয়, চুয়াল্লিশ নম্বর গলির অপরিসর দুটি কামরায়। ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দেওয়া আর এক সদ্য জেগে ওঠা কিশোরী মনের কাছে।

নিকষ কালো এক রাত। নীল আকাশে দু একটা তারার চুমকি আর পথের মিটমিটে দীপদণ্ড। অনেকটা আজকের রাতের মতনই।

একেবারে আচমকা বৃষ্টি এল। কাল মেঘের ওড়নায় তারার মুখ অদৃশ্য। প্রথমে ফোঁটায়, ফোঁটায়, তারপর মুষলধারায়। সরাবের দোকান থেকে বেরিয়ে রহমান একটা রিক্‌শার অপেক্ষা করছিল। রিক্‌শা কোথাও নেই। দুর্যোগ দেখে সবাই সরে পড়েছে। পা দুটো টলছিল, মাথার চাকিতে আগুনের উত্তাপ। নেশার মাত্রাটা একটু বেশীই হয়ে গিয়েছিল।

বেশ কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি গায়ে পড়তে চেতনা হল। কোন রকমে ছুটে রাস্তা পার হয়ে এক ঝুঁকেপড়া টিনের চালার নীচে ঢুকে পড়ল। রহমান বিপদে পড়ল। আবছা অন্ধকারে মনে হল আরও কে একজন যেন রয়েছে সেখানে। থাক যার ইচ্ছা, নিজের মাথা বাঁচলেই হল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রহমান আবহাওয়ার দেবতার বাপান্ত করল। ফূর্তি একেবারে মাটি। এতক্ষণে মা পোয়া দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। এই বাদলায় কি আর বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে তার জন্য। কিংবা আর কোন নাগর জুটে গেছে। বুদ্ধিমান কোন লোক। সরাবের দোকানে সময় নষ্ট না করে, বৃষ্টি ঝেঁপে আসবার আগেই সে সোজাসুজি আস্তানায় গিয়ে জুটেছে। মা পোয়ার আস্তানায়।

বিড় বিড় করে গালাগাল পাড়তে লাগল রহমান। মাত্র তিন দিন। তিনটে দিন জাহাজ বন্দরে থাকবে। তারপর আবার নাচন শুরু হবে নীল দরিয়ার বুকে। কিন্তু বর্মী বৃষ্টির ব্যাপার রহমানের খুব জানা আছে। একবার আরম্ভ হলে এক সপ্তাহের আগে থামবে, এমন আশা কম। একবার চলতে শুরু করলে মালের জাহাজেরও আর ঠিকানা নেই। কতদিনের ধাক্কা কে জানে। এক মাস, দেড় মাস দু মাস। এ কদিন ফূর্তি বন্ধ। কেবল কাজ আর কাজ। মদ আর মেয়েমানুষের স্বপ্ন দেখাও বারণ।

একটা রিক্‌শার শব্দ পাওয়া গেল। ঠুন্ ঠুন ঠুন। রহমান একটু অন্যমনস্ক ছিল, হঠাৎ নারীকণ্ঠের আওয়াজে থমকে ফিরে দাঁড়াল।

রিক্‌শা, এই রিক্‌শা।

রিক্‌শা থামল। একটু এগোতেই দেখা গেল রাস্তার আলোর টুকরো এসে পড়েছে।

প্রথমে রহমানের মনে হ'ল আসমানের পরী। হাতির দাঁতের মতন গায়ের রং, তাতে গোলাপীর মিশোল। কালো চুলের রাশ মাথার ওপর চুড়ো করে বাঁধা। টানা চোখ, লালচে অধর। পরনে গেঞ্জি আর লুঙ্গি। বয়স, কত বয়স হবে? বছর ষোল-সতেরোর বেশী নয়। কয়েক পা এগিয়ে মেয়েটি ফিরে দাঁড়াল, আপনি কোন্ দিকে যাবেন? রাত বাড়ছে, এখন রিক্‌শা পাওয়া মুশকিল।

কথাগুলো যে মেয়েটি তাকে বলছে, একথা বুঝতে রহমানের বেশ সময় নিল। যখন বুঝল, তখনও কানের মধ্যে মেয়েটির কণ্ঠের সুরেলা ভ্রমর-গুঞ্জন। জাহাজের গায়ে হালকা ঢেউয়ের কিঙ্কিনির রেশ।

আমি যাব জেটিতে। রুকিং স্ট্রীট জেটি।

আসুন, আমাকে নামিয়ে দিয়ে আপনাকে নিয়ে যাবে।

মেয়েটি আগে উঠল, তারপর সংকোচে, সন্তর্পণে রহমান। রিক্‌শা চলতেই রহমান মুশকিলে পড়ল। স্বল্প পরিসরে বার বার মেয়েটির দেহের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যেতে লাগল। ভেজা জামার জন্যই বুঝি স্পর্শ এত নিবিড় মনে হ'ল। বহু কষ্টে এদিকের হাতল ধরে রহমান নিজেকে সামলাল। ফিকে হয়ে-যাওয়া নেশাটা আবার যেন গাঢ় হয়ে এল। মা পোয়ার কথা মনে হ'ল কিন্তু মা পোয়ার দেহ কি এত নরম, এত তপ্ত।

আপনি জাহাজে কাজ করেন বুঝি?

হ্যাঁ।

কি মজা, কেমন কত দেশ ঘুরে বেড়ান। মেয়েটি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

রহমানের কানে কর্ক-স্ক্রু খোলার শব্দ। অজস্র ফেনা বোতলের শীর্ণ মুখে। তার নীচে রক্তিম পানীয়। সুরা নয় সুধা।

আপনি, আপনি কি করেন? থেমে থেমে নিজেকে সংযত করে রহমান জিজ্ঞাসা করল।

মেয়েটি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। বাইরের বৃষ্টিধারার দিকে চাইল, আড়চোখে দেখল রহমানের দিকে, তারপর বলল, আমি কিছু করি না। কাজ খুঁজতে গিয়েছিলাম যে কোন রকমের কাজ।

কাজ? রহমান দুটো চোখ কোঁচকাল। কাজ-ভোলান এমন রূপ নিয়ে কাজ খোঁজার কোন মানে হয়।

কাজ? রহমান বিড় বিড় করে বলল, বাড়িতে কেউ নেই আপনার?

মেয়েটি ঘাড় নাড়ল, মা আছে, আর কেউ নেই। বাবা যখন মারা যান, তখন আমার বয়স ছয়।

মুখটা ছুঁচোলো করে রহমান চুক-চুক শব্দ করল, তারপরই থেমে গেল মেয়েটির কথায়।

আপনি সরাব খান? উঃ, কি বিশ্রী গন্ধ!

অনেক কসরত করে পকেট থেকে রুমালটা বের করে রহমান মুখে ঢাকা দিল। পথে আর একটি কথাও হ'ল না। মেয়েটির নির্দেশে রিক্‌শা সরু এক গলির মধ্যে ঢুকল। একসময় থামল রিক্‌শা একটা বাড়ির সামনে।

স্বপ্নের ঘোরের মতন সব কিছু আবছা ঠেকল রহমানের কাছে। না, নেশা আর নেই। মেয়েটির একটি কথাতেই নেশা ছুটে গেছে। তবু সব যেন অবাস্তব ঠেকছে। মেয়েটির গায়ে গা ঠেকিয়ে এতটা পথ আসা। অচেনা এক বাড়ির সামনে আচমকা রিক্‌শা থামা।

রহমান ভেবেছিল মেয়েটি আর কথাই বলবে না তার সঙ্গে। নাক সিঁটকেই বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়বে।

কিন্তু মেয়েটি তা করল না। নেমে দাঁড়িয়ে বলল, দয়া করে আমাদের বাড়িতে একটু বসে যাবেন না?

আমি? রহমান ঢোক গিলল।

হ্যাঁ, এক কাপ চা ছাড়া আর কিছু দেবার সামর্থ্য আমাদের নেই। তবু মেহমান আপনি, দয়া করে একটু বসে যান।

যন্ত্রচালিতের মতন রহমান নেমে এল। বিদ্যুতের আলোয় ঘন কালো চোখের ইশারা। যৌবনোচ্ছল দেহ। আধো আলো, আধো অন্ধকারে যেন দিশা হারাল রহমান। হাতঘড়িটার দিকে নজর দিল। সবে সাড়ে আটটা, এখনও অনেক সময়। দশটার মধ্যে জাহাজে ফিরতে পারলেই যথেষ্ট। তার পরে ফিরলেও অসুবিধা নেই। মন্ত্রগুপ্তি রহমানের জানা আছে।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে মেয়েটি তর তর করে উঠে গেল। রহমান পিছন পিছন।

আম্মে, দরজা খোল। দরজায় মেয়েটির অসহিষ্ণু করাঘাত।

দরজা খুলে গেল। জীর্ণদেহ এক প্রৌঢ়া দেখেই মনে হয় যৌবনরবি অস্তমিত, কিন্তু গোধূলির রেশ সারা দেহে। কাজল চোখে, সুগঠিত দেহে সৌন্দর্যের ভস্মরশ্মি।

প্রৌঢ়ার নির্দেশে রহমান ভিতরে গিয়ে বসল কাঠের ছোট টুলের ওপর। চোখ ফিরিয়ে এদিক ওদিক দেখল। শ্রীহীন, অসংস্কৃত কামরা, আসবাব-বর্জিত। বোঝা যায় কি কষ্টে মা আর মেয়ে দিনাতিপাত করে। খোদা জানেন, হয়তো সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষিত, তাই এই মেয়েকে নিষ্ঠুর পথের ওপর গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে কাজের সন্ধানে।

প্রৌঢ়া পা মুড়ে রহমানের কাছে বসল। তার চাকরির খুঁটিনাটি খোঁজ নিল, বেতনের

বদহজম?

তা'হলে এই সাধারণ পরীক্ষাটি করুন—

পেটব্যথা, গা বমিবমি অথবা পেটফাঁপা—অম্লাধিক্যের এই অস্বস্তিকর লক্ষণগুলি দেখা দেবার সাথে সাথেই ম্যাক্লীন ব্র্যাণ্ড ইনডিজেশন পাউডারের একটি মাত্রা খেয়ে নেবেন। "ম্যাকলীন কার্ব্বোনেটস্" এবং "এ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড" এর সমন্বয়ে প্রস্তুত এই অপূর্ব্ব ঔষধটি আপনাকে অবিলম্বে দীর্ঘস্থায়ী আরাম এনে দিয়ে প্রমাণ করে দেবে যে ম্যাক্লীন ব্র্যাণ্ড ইনডিজেশন পাউডার শুধু পাকস্থলী থেকে অতিরিক্ত অম্লরস দূরই করে না, সাথে সাথে এর পুনর্গঠন প্রতিরোধ করে।

HIY-3-BEN.

ম্যাকলীন ব্র্যাণ্ড
ইনডিজেশন পাউডার

আসল জিনিষের জন্য এই — Alex. C. Maclean

অংক, কোন কোন দেশে ঘুরেছে, তার হিসাব।

মেয়েটি মার পিছনে নিজেকে ঢেকে উৎকর্ণ হয়ে শুনল রহমানের কথা।

কথা বলতে বলতেই মাঝপথে রহমান থেমে গেল। রুমাল দিয়ে চেপে ধরল নিজের মুখ। কিছু বলা যায় না বাতাসে একটু গন্ধ পেলেই মেয়েটি হয় তো চীৎকার করে উঠবে।

উঠতে দিল না চাইলেও একসময়ে রহমানকে উঠতে হল। বৃষ্টি কমেছে। তা ছাড়া রিক্‌শাও অপেক্ষা করছে রাস্তায়। কোন অসুবিধা হবে না।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই রহমান টের পেল, কে একজন পিছন পিছন আসছে। মা কিংবা মেয়েই হবে। এ ছাড়া আর আছেই বা কে বাড়িতে।

রাস্তায় নেমে রহমান ফিরে দাঁড়াল।

হামিদা পেঁৗছে দিতে এসেছে। রাস্তা পর্যন্ত।

নামটা রহমান একটু আগেই জেনেছে। প্রৌঢ়ার কাছ থেকে। বাপ মুসলমান। এ তল্লাটে সবাই বলত আবদুল সায়েব। ছোটখাট কাপড়ের ব্যবসা ছিল। খুব ছোট, কোন দোকানই ছিল না। কাপড় সংগে নিয়ে মফঃস্বলে মফঃস্বলে ঘুরে বেড়াত। ট্রেনে, স্টিমারে, মোটর বাসে। তারপর হঠাৎই একদিন খবর এল আবদুল সায়েব মারা গেছে। প্রোমের রেলওয়ে ওয়েটিং রুমে হার্টফেল।

তারপরই দুরবস্থা শুরু হল। যেটুকু সঞ্চয় ছিল, খতম। দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় দু-একজন সাহায্য করতে এসেছিল, কিন্তু তাদের চোখের চেহারা হামিদার মার ভাল লাগে নি। তখন হামিদার মায়ের বয়স ছিল, আর সে বয়সে কেমন দেখতে ছিল আজকের চেহারা দেখে রহমান বেশ আঁচ করতে পারে।

এখন সংগ্রামের প্রায় শেষ পর্যায়। যে ভয়ে আত্মীয় স্বজনের সাহায্য নিতে চায় নি, সে ভয়ের চেয়েও অনাহারের ভয়টা আরও মারাত্মকরূপ ধরে এসে দাঁড়িয়েছে মুখের সামনে।

কাজ আছে। ঘরে বসে করা যায়, এমন কাজ। তামাকের পাতা দিয়ে চুরুট তৈরী করা কিংবা সিল্কের লুঙিগতে পুঁতি বসানো। দুটো পেট চলার পক্ষে যথেষ্ট আয় করা যায়। কিন্তু প্রথমে যেটুকু টাকা ঢালতে হয়, সেটুকু সম্বলও যে এদের নেই।

বাড়িওয়ালা আবদুল সায়েবের পুরোনো বন্ধু, তাই মুখ বুজে আছে। কিন্তু মুখ বুজে থাকারও সীমা আছে একটা। মাসের পর মাস বিনাভাড়ায় ভাড়াটে রাখা যায় না। আর হামিদারা থাকতেও পারবে না সেভাবে।

নিন রেখে দিন। হামিদা হাত প্রসারিত করল।

কি?

আমার রিক্‌শাভাড়া। বাড়ি পর্যন্ত আসার

রহমান হাসল, সে রিক্‌শাতে তো আমিও ছিলাম। আমাকেই বা বিনা ভাড়ায় রিক্‌শাওয়ালা বইবে কেন। রেখে দিন। ভাড়া আমি দিয়ে দেব।

রিক্‌শায় উঠতে যাবার মুখেই বাধা। হামিদা কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। চুলের একটা মিষ্টি গন্ধ। নারীদেহেরও। নারীদেহের যে সুবাসে রহমান অভ্যস্ত, এ যেন সে ধরনের গন্ধ নয়। অকূল সমুদ্র থেকে জাহাজ নদীতে ঢোকার মুখে দু-পাশের গাছপালার যেমন সোঁদা সোঁদা গন্ধ পাওয়া যায়, ঠিক যেন তেমনি। মাটির গন্ধ, আশ্রয়ের গন্ধ, আশ্বাসের গন্ধ।

কালও তো বেরোবেন, তাই না?

হ্যাঁ, তিনদিনের একদিন কেটে গেল। আর দু-দিন আছি এ বন্দরে। রোজই বেরোব।

কালও যাবেন সরাবে দোকানে?

আড়চোখে রহমান হামিদার দিকে দেখল। মাত্রা ছাড়াচ্ছে যেন মেয়েটি। পথের আলাপ, তার বেশী নয়, অথচ কথা বলছে যেন রহমানের নিকে করা বিবি। কৈফিয়ৎ তলব করছে।

রহমান ঠোঁটটা কামড়ে বলল, তা, যদি দিল চায়, যাব বইকি।

তার চেয়ে সোজা আমাদের বাড়ি চলে আসুন। আপনার জাহাজের গল্প বলবেন। এইসব গল্প শুনতে আমার খুব ভাল লাগে।

রহমান তাড়াতাড়ি রিক্‌শার মধ্যে গিয়ে ঢুকল। আবার বিদ্যুতের ঝলকানি।

হামিদা সেই আলোয় বড় স্পর্ধা, বড় দুর্বার।

প্রকাশিত হয়েছে

প্রভাত দেবসরকারের সর্বাধুনিক উপন্যাস

স্বাবলম্বিনী

নরেন্দ্রনাথ মিত্র-এর **দেবযানী**

অমৃত সাহিত্য মন্দির ১৬/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

(সি ৯৮৫১)

শ্রীজওহরলাল নেহরুর

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

বিশ্ব-বিশ্রুত "GLIMPSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। এ শুধু সন-তারিখ-সমন্বিত ইতিহাস নয়—ইতিহাস নিয়ে সরস সাহিত্য। গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পটভূমিকায় গৃহীত মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন যুগের চিত্রাবলী নিয়ে লিখিত একখানি শাশ্বত গ্রন্থ। জে এফ. হোরাবিন-অঙ্কিত ৫০খানা মানচিত্র সহ। প্রায় হাজার পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ।

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৫·০০ টাকা

শ্রীজওহরলাল নেহরুর
আত্ম-চরিত ১০·০০ টাকা

শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারীর
ভারতকথা ৪·০০ টাকা

প্রফুল্লকুমার সরকারের
জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ২·৫০ টাকা

অনাগত (উপন্যাস) ২·০০ টাকা

ভ্রষ্টলগ্ন (উপন্যাস) ২·৫০ টাকা

অ্যালান ক্যাম্বেল জনসনের
ভারতে মাউণ্টব্যাটেন ৭·৫০ টাকা

আর জে মিনির
চার্লস চ্যাপলিন ৫·০০ টাকা

শ্রীসরলাবালা সরকারের
অর্ঘ্য (কবিতা-সঞ্চয়ন) ৩·০০ টাকা

ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর
আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে ২·৫০ টাকা

ত্রৈলোক্য মহারাজের
গীতায় স্বরাজ ৩·০০ টাকা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ। ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

বিছানায় শুয়েই রহমান নিজের কপাল চাপড়াল। কোথায় মা পোয়ার ঘরে ফূর্তি, হৈ হুল্লোড় হত, তা নয়, কোথাকার কে তার ঠিক নেই। ইনিয়ে বিনিয়ে দুঃখের কাহিনী শোনা বসে বসে। শুধু তাই হলেও কথা ছিল কিন্তু মেয়েটা আবার মক্তবের মাস্টারের মতন উপদেশ দিতে আসে।

তবে, হ্যাঁ, খুবসুরত মেয়ে বটে। অর্ধেক দুনিয়া ঘুরেছে রহমান, এমনটি চোখে পড়ে নি। এমন কালো ভোমরার মতন চোখ, এমন টুসটুসে রঙীন ঠোঁট।

বিছানায় রহমান এ-পাশ ও-পাশ করল। ওই ভালো লাগার নেশার পরমায়ু তো মোটে আর দু-দিন। নোঙর তোলার সঙ্গে সঙ্গে পিছনের উপকূলের মতন সব কিছু মুছে যাবে। যে স্মৃতিটুকু মনের কোণায় থাকবে নোনা জলের ঝাপটায় ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যেতেও তার দেরী হবে না।

পরের দিন বিকেল হতেই রহমান সাজ-গোজ শুরু করল। চকচকে লুংগী, ফিতে দেওয়া পাতলা পাঞ্জাবি, গোঁফের দুটো পাশ

কসমেটিক দিয়ে চোখা, পালিশ চকচকে পাম্পশ্যু।

দু-একজন সঙ্গী টিটকারি দেয়, কি মিয়া পোশাকের যা ঝলমলানি, নিকে বসবে নাকি? দাওয়াতটা ফাঁকি দিও না যেন।

রহমান হাসল, তারপর কি মনে হতে ট্রাঙ্কের তলা থেকে গোঁজে খুলে কিছু টাকা হাতে তুলে নিল। বেশ কিছু।

জেটিতে নেমেই রিকশায় চড়ে বসল। আজ আকাশে মেঘের ভ্রুকুটি নেই, তবু এমন পোশাকে রহমানের হাঁটতে ইচ্ছা হল না।

একটু অন্যমনস্ক ছিল রহমান। মা পোয়ার কথা ভাবছিল, হঠাৎ খেয়াল হতেই চমকে উঠল।

একি, এখানে রাখলে কেন?

কথাটা বলে রিকশাওয়ালার মুখের দিকে চেয়েই ভ্রূ কোঁচকাল। কালকের লোকটা বলেই যেন মনে হচ্ছে। গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঠিক গিয়ে হাজির হয়েছে জেটিতে।

ততক্ষণে গামছা বের করে রিকশাওয়ালা হাওয়া খেতে শুরু করেছে, এখানে আসবারই তো কথা ছিল হুজুর। কাল তো উনি তাই বলেছিলেন আপনাকে।

রাগে রহমানের সর্বশরীর জ্বলে উঠল। সারাটা দুনিয়া যেন ষড়যন্ত্র শুরু করেছে ওর বিরুদ্ধে।

রিকশাওয়ালাকে ধমক দিতে গিয়েই রহমান থেমে গেল। ওপর থেকে প্রৌঢ়ার গলার স্বর শোনা গেল, এস বাবা, এস।

অগত্যা রহমান নেমে পড়ল। রিকশাওয়ালার সামনে একটা আট আনি ছুঁড়ে দিয়ে তর তর করে ওপরে উঠে গেল।

প্রৌঢ়া দরজা খুলে অপেক্ষা করছিল। রহমানকে দেখে সহাস্যে বলল, কাল অনেক রাত অবধি আমি আর হামিদা তোমার কথা বলেছি বাবা।

রহমান ঘরের এ-কোণে ও-কোণে চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। কই, যে মানুষটা আসতে নিমন্ত্রণ করেছিল, সে কোথায়।

সন্ধানী দৃষ্টির অর্থ বুঝতে প্রৌঢ়ার অসুবিধা হল না। মুচকি হেসে বলল, হামিদা বাড়ি নেই। এক জায়গায় গেছে কাজের সন্ধানে।

আবার রহমান টুলের ওপর বসল। বরাত। হামিদাই যখন নেই, তখন এখানে বসেই বা কি করবে! আর কতক্ষণই বা বসবে মিছামিছি। কালকের সন্ধ্যাটা বরবাদ হয়েছে, আজকের বিকেলটাও কাটাতে হবে এই বিগতযৌবনার সঙ্গে। সে বসে বসে দুঃখের একতারা বাজাবে, তাই শুনতে হবে রহমানকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে।

প্রৌঢ়া বসল না। বলল, আমি এক কাপ চায়ের জোগাড় দেখি বাবা।

না, না, রহমান হাত নাড়ল, আমি উঠব এবার। আর এক জায়গায় যেতে হবে আমাকে।

যেতে যেতে প্রৌঢ়া ফিরে দাঁড়াল, হামিদা এখনি এসে পড়বে। আমাদের এক জানাশোনা লোক একটা কাজের খোঁজ দিয়েছে, তাই গেছে সেখানে। ওর যেমন কপাল, কতবার তো কত জায়গায় গেল, কিছুই হল না।

একেবারে আচমকা, কথাগুলো বলবে ভাবেও নি রহমান। তবু কি করে ওর মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল, কম বয়সী মেয়েছেলেকে বাইরে কাজ করতে পাঠালে ইজ্জত থাকে না। মানুষ তো সবাই সমান নয়। একবার পিছলে পড়লে আর ফেরার উপায় থাকবে না।

প্রৌঢ়া রহমানের কাছে ফিরে এল। গম্ভীর গলায় বলল, জানি বাবা, সব জানি। অসময়ে সব হারিয়ে, দুঃখের আগুনে পুড়ে দুনিয়াকে খুব চিনেছি। মানুষের চেয়ে এখানে কুমির হাঙর যে বেশী, তাও জানি। কিন্তু পোড়া পেট মানে না। সব বুঝেও চোখ বন্ধ করে থাকতে হয়।

আর এক তাজ্জব কাণ্ড করল রহমান, অথচ বেসামাল করার মত একটি ফোঁটাও তার পেটে যায় নি। জাহাজ থেকে সোজা চলে এসেছে এখানে।

কোমরের বেল্টে বাঁধা ব্যাগ খুলে রহমান করকরে নোটের তাড়া প্রৌঢ়ার হাতে তুলে দিল, নিন, রাখুন এগুলো।

একবার গুণেই প্রৌঢ়া অবাক-কণ্ঠে বলল, এ যে অনেক বাবা।

অনেকই দিলাম। দুটো মানুষকে খেয়ে পরে বাঁচতে হবে তো। চুরুট বানাবার কাজ করুন ঘরে বসে বসে, নয়তো পুঁতির কাজ লুঙ্গি কিংবা চটির ওপরে।

আরো অনেক কিছু হয়তো বলত, আবোল তাবোল কথা, কিন্তু দরজার পাশে হামিদা এসে দাঁড়িয়েছে। যোরাঘুরিতে দুটি গাল আরক্ত। কপালের পাশে ঘামের ফোঁটা। দুটি চোখে ক্লান্তির ছাপ।

কি হলো রে? প্রৌঢ়া প্রশ্ন করল।

এখনও কিছু ঠিক হয়নি। আজো বলল আরো যেতে হবে। রোজ একবার করে খবর নিতে হবে।

রহমান অযথাই দাঁতে দাঁত চাপল। আকো না ইবলিশের বাচ্ছা। কাজটাজ সব বাজে ওজর। জোয়ান সমর্থ মেয়ে এই ফাঁকে রোজ তার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে তাই চায়। চাকরি দেবার হাতটাই একদিন মানুষ ধরবার থাবা হয়ে দাঁড়াবে। ছলে, বলে, কৌশলে নিজের কুক্ষিগত করবে অনাঘ্রাত যৌবনকে।

আর তোমার কোথাও গিয়ে দরকার নেই। প্রৌঢ়ার কণ্ঠে সংকল্পের স্পর্শ। দৃঢ়তারও।

হামিদা অবাক হল। এর মধ্যে কি এমন সাত রাজার সম্পত্তি পেল মা যে হামিদাকে আর কাজ খুঁজতে বেরতে হবে না। পায়ের ওপর পা দিয়ে ঘরেই বসে থাকতে পারবে। কেলেমাদের মতন মাথায় ঘোমটা দিয়ে, এক গা গহনা পরে, শুধু সংসারের কাজ করবে।

উত্তরের আশায় মার দিকে নয়, রহমানের দিকে হামিদা চোখ ফেরাল। এই লোকটাই

রবীন্দ্রনাথ

অধ্যাপক গুণময় মান্না

রবীন্দ্ররচনার পূর্ণাঙ্গ মার্কস-বাদী বিশ্লেষণ। ৪·৫০

"His work on Rabindranath shows a marked originality of approach and interpretation and conveys the idea of great intellectual powers to those who may not agree with his point of view."
Dr. Srikumar Banerjee

বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২

চলন্তিকার

কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস

॥ শক্তিপদ রাজগুরু ॥

মন মানে না ৩·০০

অবাক পৃথিবী ৩·৫০

পথ বয়ে যায় ৩·৭৫

॥ চিত্রগুপ্ত ॥

আমি চঞ্চল হে ৩·০০

॥ মদন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

পরপুরী ২·৫০

॥ শান্তি দাশগুপ্তা ॥

অগ্নিসম্ভবা ৩·৭৫

॥ মনোজিৎ বসু ॥

বেলা ভূমি ২·৫০

॥ শিবদাস চক্রবর্তী ॥

মেঘমেদুর ২·৫০

॥ মনোজ সান্যাল ॥

শ্বেত-চন্দন ৩·৭৫

চলন্তিকা প্রকাশক

২১২/১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

বুঝি নতুন আশ্বাস বয়ে এনেছে, নতুন জীবনের বার্তা! নিজেরই হালচালের ঠিক নেই, বেসামাল অবস্থায় ঘোরাফেরা করে, সে আবার আর একটা সংসারের ভার নেবার কথা বলে।

এই দেখ, নোটের তাড়াটা প্রৌঢ়া মেয়েকে দেখান।

কোথা থেকে এল মা?

ছাদ ফুঁড়ে। খোদা হাফিজ, এতদিন পরে তাঁর আমাদের কথা মনে পড়েছে।

প্রৌঢ়ার কথাগুলো হামিদা কানে তুলল না। একটু এগিয়ে রহমানের সামনে এসে বলল, আপনি দিয়েছেন এসব টাকা? এত টাকা?

সর্বত্রই সপ্রতিভ ব্যক্তি মাত্রেই 'লোমা' খোঁজেন, এবং এর বহুল বিক্রয় তার শ্রেষ্ঠ গুণের পরিচায়ক। 'লোমা' এখন একটি আন্তর্জাতিক পন্য এবং প্রায় পৃথিবীর সর্বত্রই রপ্তানী করা হয়। মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা ছাড়াও রপ্তানীর দ্বারা আন্তর্জাতিক বাজারে এর গুণাবলীর জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সর্বত্র অসংখ্য বোতল লোমার ব্যবহারই লোমার প্রতি মানুষের বিশ্বাসের একটি স্বাক্ষর।

লোমা—একটি আদর্শ কেশ তৈল ও চুলের কলপ।

একমাত্র বিক্রেতা
এম এম. খাম্বাটবালা,
আমেদাবাদ-১
এজেন্টঃ
সি, নরোত্তম এণ্ড কোং
বোম্বাই-২

লোমা

পৃথিবীব্যাপী প্রশংসিত কেশ তৈল ও চুলের কলপ

BEN.

এজেন্টঃ মেসার্স শা বাভাশ এণ্ড কোং, ১২৯, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

আগের রাতের মতনই হামিদার চোখে বিদ্যুতের ঝলকানি। গলার স্বরও কাকলি-মধুর নয়। মনে হচ্ছে যেন চটেছে।

মেয়ের ব্যাপার দেখে মা প্রমাদ গণল। যেতে যেতে বলল, তুই বস একটু রহমানের কাছে। আমি চায়ের যোগাড় দেখি।

কি কথা বলছেন না যে? এবার হামিদা ভাল হয়ে বসল। রহমানের মুখোমুখি।

আজ আর রহমানের ভয়ের কিছু নেই। বাতাসকে নয়, মানুষকেও না। স্বচ্ছন্দে মুখ তুলে কথা বলতে পারবে। দরকার হলে আর একটা মুখের কাছাকাছিও নিয়ে যেতে পারবে নিজের মুখ।

দিয়েছি তা হয়েছে কি। কথাটা বলেই রহমান এ-পকেট ও-পকেট হাতড়াল রুমালের খোঁজে। রুমাল নেই। মা পোয়ার কাছে আসার ব্যস্ততার মধ্যে রুমালটা আনতেই ভুলে গেছে। তার জন্য এই মেয়েটাই দায়ী। মা পোয়ার কাছে আসবে বটে, কিন্তু সারাক্ষণ এই মেয়েটার কথাই মনে মনে ভেবেছে। হামিদা যদি মা পোয়া হয়ে যায় কিংবা তার চেয়েও ভাল কথা, হামিদা হামিদাই থাক। শুধু দুটি দৃষ্টি নিয়ে সে যদি অপেক্ষা করত রহমানের জন্য।

মা পোয়ার বাড়ির মত হৈ হুল্লোড় হত না বটে, গান, নাচ বেলেল্লাপনা, কিন্তু শান্তি পেত রহমান। দু দণ্ড কাছে বসে কথা বলার শান্তি, হামিদার চোখে চোখ রেখে বসে থাকার শান্তি।

কিন্তু কেন দেবেন, সেটাই হচ্ছে কথা। আমরা আপনার কে?

খুব কঠিন প্রশ্ন করেছে হামিদা। এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া রহমানের সাধ্য নয়।

তবু রহমান একটা উত্তর দিল, কেউও নয়, মনে করুন ধার দিয়েছি। আপনাদের কারবার লাভ হলে ফেরত দিয়ে দেবেন টাকাটা।

হামিদা মুচকি হাসল। বলল, সেই বেশ। আবার কবে এদিকে আসবেন বলুন।

এদিকে? বছর খানেকের মধ্যেই আসব বোধ হয়। গত বছরেও এসেছিলাম এখানে।

ঠিক আছে, আপনার টাকাটা সেই সময়েই শোধ দিয়ে দেব। মা আর আমি উদয়াস্ত খেটে শোধ করব আপনার ঋণ।

রহমান কিছু বলল না। চুপচাপ বসে রইল পা গুটিয়ে। হামিদা যেন মা পোয়ার মতন কথা বলছে। ঠিক সেই ধরনের। দেওয়া আর নেওয়া। লেনদেন হলেই সম্পর্ক শেষ। অনেকটা আবার রহমানের জাহাজের মতন। মাল তোলা কিংবা মাল নামানো বন্ধ হলেই বন্দরের সঙ্গে সম্পর্ক খতম। নোঙর তুলে সরে আসতে হবে জেটি থেকে।

কি চুপচাপ কেন, বলুন আপনার সফরের কথা।

আধো অন্ধকার ঘর। বাতি-জ্বালার কথা বুঝি মা-মেয়ে কারুরই মনে পড়েনি। না জ্বলুক বাতি। হামিদার দুটো চোখ সার্চলাইটের মতন জ্বলছে। মনের কোণে জমা সামান্য অন্ধকারটুকুও যেন নেই।

সালংকারে জাহাজী-জীবনের বর্ণনা শুরু করল রহমান। চীন উপসাগরে টাইফুনের মুখে মোচার খোলার মতন হাজার হাজার টনের জাহাজের অসহায় দোলানি। চুম্বক পাহাড়ের টানে জাহাজের নক্ষত্র-গতি. দিনের পর দিন নীল দরিয়ার ওপর ভেসে-যাওয়া শান্ত জীবন।

শুনতে শুনতে হামিদা বার বার শিউরে উঠল। প্রচণ্ড ঢেউয়ে জাহাজ কাত হয়ে পড়েছে, মাল্লারা মালপত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে সমুদ্রের বুকে, তবু যদি জাহাজ ভাসে কিছুক্ষণ। ওরা বলে, 'জেটিশন' করা। অনেক সময় এভাবে জাহাজ বাঁচাবার চেষ্টা করা হয়। কাপ্তেন থেকে বয় পর্যন্ত ঈশ্বরের নাম করে। খালাসীরা কাজের ফাঁকে ফাঁকে নমাজে বসে যায়। খোদা-তাল্লার কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে।

এক সময়ে হামিদা এগিয়ে এসে রহমানের একটা হাত চেপে ধরল. চুপ কর, চুপ কর। আর শুনতে পারছি না। এভাবে মৃত্যুকে নিয়ে ছিনিমিনি খেল তোমরা, তাই জীবনের ওপর দরদ নেই. পয়সার কোন মোহ নেই। সরাব খাও, চেনা নেই, শোনা নেই, এমন লোককে পয়সা বিলিয়ে দাও।

রহমান নিঃশব্দ। তখনও হামিদার হাত তার হাতের ওপর। অনেক আগে একবার ডেকের বাতি জ্বালাতে গিয়ে 'শক' লেগেছিল তার হাতে। সমস্ত শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠেছিল। একটা দাহ শিরায় শিরায় ছড়িয়ে গিয়েছিল। আজকের অনুভূতি তার চেয়েও তীব্র।

কথার সুরে হামিদা অন্তরঙ্গতা এনেছে। নিজেকে এনেছে রহমানের স্পর্শের পরিধির মধ্যে।

খুব আস্তে. প্রায় অস্পষ্ট গলায় রহমান বলল, তোমার ভয় করছে হামিদা?

হ্যাঁ. তোমার কথা ভেবে। তোমার যদি কিছু হয়?

আশ্চর্য, যে-লোকটা অনন্ত লোনাজলের বুক ভেঙে সফর করে বেড়ায়, দু ফোঁটা লোনা জল দেখেই সে বিচলিত হয়ে পড়ল।

আমার কিছু হবে না হামিদ। তুমি আমার জন্য ভাববে, তাই আমার কিছু হবে না।

কতক্ষণ এমনিভাবে দুজনে হাতে হাত রেখে বসেছিল, খেয়াল নেই, আচমকা বাতি জ্বলে উঠতেই দুজনের সম্বিত ফিরে এল।

হামিদার মা এসে দাঁড়িয়েছে। পিছনে এক ছোকরা চাকর।

ছোট একটা টেবিলের ওপর খাবার জিনিসগুলো রাখতেই রহমান বলে উঠল, সর্বনাশ. একি করেছেন আপনি? এত খাবার?

এত আর কি বাবা? রাতের খাওয়াটা এখানেই খেয়ে যাবে।

ভাগ্য সুপ্রসন্নই বলতে হবে রহমানের। জাহাজ আরো পাঁচ দিন জেটিতে রয়ে গেল।

ইঞ্জিনের কি-একটা যন্ত্র সময় বুঝে বেগড়াল, বড় বড় সায়েব-মিস্ত্রী সেটা সারাতে নাজেহাল।

এ কদিন রোজ রহমান হামিদার বাড়ি গিয়ে উঠল। শুধু গল্প-গুজবই নয়, তাকে নিয়ে দিনদুয়েক পথে-পথে ঘুরল। এক-ফাঁকে জেটির কাছ থেকে জাহাজটাও দেখিয়ে নিয়ে গেল। সঙ্গে করে দোকানে নিয়ে গিয়ে সিল্কের লুঙ্গি আর কানের দুটো লাল পাথরও কিনে দিল।

যাবার সময়. হামিদার হাতে হাত রেখে শপথ করল। জীবনে সরাব ছোঁবে না. কখনও অন্য মেয়েমানুষের দরজা মাড়াবে না। মোট কথা, হামিদাকে ভুলিয়ে দেবে, কখনও এমন কাজ করবে না।

রহমান রেলিংয়ের ধারে আরও একটু সরে এল। এই ঘটনার পর পাঁচ-পাঁচটা বছর কেটে গেছে। এডাভানা রেঙ্গুনে বন্দর ছুঁতে পারেনি। একটা বোকামি করেছে রহমান। হামিদার বাড়ির নম্বরটার খোঁজ রাখেনি। গলিটা জানে, কিন্তু নম্বরটা লেখার কথা মনেই হয়নি। তাহলে অন্তত চিঠিপত্র লিখতে পারত মাঝে মাঝে। হামিদার উত্তর হয়তো পেত না, তবু তার চিঠি তো পৌঁছত হামিদার কাছে।

একেবারে আচমকা লড়াই শুরু হয়ে গেল। মেঘ নেই, ঝড় নেই, একেবারে বর্ষণ? জুঁইফুলী বৃষ্টি নয়, আগুনে-বোমার স্ফুলিঙ্গ। হংকং থেকে সিঙ্গাপুরের দিকেই আসছিল জাহাজ, বেতারে খবর এল জাহাজ ঘোরাও। গণ্ডগোল আরম্ভ হয়েছে। প্রাচ্যের কোন বন্দর নিরাপদ নয়।

জাহাজ মোড় ফিরল অস্ট্রেলিয়ার দিকে। তাও জাঁদরেল কোন বন্দর নয়, ছোট্ট এক

বিখ্যাত রাশিয়ান মডেল
৬ ও ৫০ গুলীর
No Licence Needed

রিভলবার
দেখিতে আসলের মত, স্বয়ংক্রিয়
প্রচণ্ড শব্দ ও আগুনের স্ফুলিঙ্গ
বিনামূল্যে ২৫টি গুলি
ডাকাত, হাঙ্গামাকারী ও বন্যজন্তুকে ভয় দেখানো যায়।
মঞ্চাভিনয়ে, আত্মরক্ষার্থ ও সামাজিক মর্যাদায় ব্যবহার্য

	১০১	১০২
ক্যাটাঃ নং	টাঃ ৭/-	টাঃ ৯/-

	১০৩	
ক্যাটাঃ নং	টাঃ ১৪/-	(৫০টি স্বয়ংক্রিয় গুলিতে)

অতিরিক্ত গুলি—প্রতি ১০০টি ১, টাকা। উৎকৃষ্ট চামড়ার খাপ—৬, টাকা. প্যাকিং ও পোস্টেজ ২, টাকা অতিরিক্ত।
নোবল ট্রেডিং কর্পরেশন, ২৬-এ. ভারতনগর, বোম্বাই-৭।

জগদীশবাবুর গীতা

মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা অন্তঃ-রহস্য ভূমিকাসহ অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়মূলক যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ৬.০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম ভারত-আত্মার বাণী
শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার শাস্ত্রীয় আলোচনা ৩.০০ ভারতের শাশ্বতবাণী বিশ্বমৈত্রীর কথা ৩.০০
শিক্ষার্থীর ধর্ম শিক্ষা ১.০০ কর্মবাণী ১.২৫
প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী· ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

শহুরের জেটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে রইল। ঝড়ের সময় পাখি যেমন ডানা গুটিয়ে বসে থাকে, ঠিক তেমনই করে।

কোন কাজ নেই। জাহাজ ঘষা-মাজা করা আর ছোট্ট শহরে পায়চারি। দিনের পর দিন। লড়াইও থামে না, নোঙরও ওঠে না। রহমানের শরীরে যেন শ্যাওলা জমে গেল। সঙ্গের খালাসীরা তবু ওরই মধ্যে সুখের খোঁজে এদিক-ওদিক দৌড়াল। ভাল ভাল সরাবের দোকান আছে, তার ওপর ছোট শহর হলে হবে কি, বিশেষ এলাকাও রয়েছে। ধবধবে মেয়েমানুষের পাল।

রহমান অবশ্য নির্বিকার। চুপচাপ ডেকে শুয়ে থাকে শতরঞ্চি বিছিয়ে। কিংবা ক্যাপ্টেনের কাছে বসে বসে লড়াইয়ের খবর শোনে। জার্মানীর সঙ্গে শুরুতে দোস্তি ছিল রুশের, তারপর দুজনে দুজনের দুশমন হয়ে গেল। একজন হাতিয়ার নিয়ে তেড়ে গেল আর একজনের দিকে। আকাশ ছেয়ে গেল জংগী বিমানে। বোমায় বোমায় বড় বড় শহর গুঁড়িয়ে ছাতু হয়ে গেল।

সংগীরা বারকয়েক ডেকেওছে রহমানকে, কি পীরসায়েব যাবে তো চল। খুব ভাল জিনিস আছে অকল্যান্ড এভিনিউতে। একেবারে কাঁচা বয়স।

রহমান প্রথম প্রথম ঘাড় নাড়ত। হাত-জোড় করে মাপ চাইত, আজকাল কিছু বলে না। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপচাপ বসে থাকে।

তাই রহমানের নতুন নামকরণ হয়েছে পীরসায়েব। রেঙ্গুন বন্দর ছাড়বার পরই ভোল একেবারে পাল্টে ফেলেছে রহমান। বন্দরে তো নামেই না, নামলেও দোকান-বাজারে ঘোরাঘুরি করে। নিষিদ্ধ গলির দিকে এক-পা এগোয় না, সরাবের দোকানে তো নয়ই।

পার্সারের মুখে একদিন শুনতে পেল রহমান। পার্সার বলছিল ক্যাপ্টেনকে। সেকেন্ড মেটও বসেছিল সেখানে।

বোমায় প্রচুর মানুষ মারা গেছে। নিরীহ নরনারীর দল। যারা লড়াইয়ে অংশ নেওয়া দূরে থাক, লড়াই কি জিনিস চোখেই দেখেনি। তারাও বলি হ'ল এই যুদ্ধে। গরু-ছাগলের মতন মরল।

'ইয়া আল্লা' বলে রহমান চেঁচিয়ে উঠতেই ক্যাপ্টেন ঘাড় ফেরাল, কে, কে ওখানে।

আমি হুজুর। রহমান দাঁড়িয়ে উঠল।

ক্যাপ্টেন সামনে এসে দাঁড়াল, কি বল, হঠাৎ অমন করে চেঁচিয়ে উঠলে কেন?

বর্মা দেশেও কি বোমা পড়েছে হুজুর? রেঙ্গুন শহরে?

হ্যাঁ, পড়েছে বৈকি। গোটা বর্মা তো দখল করে নিয়েছিল জাপানীরা, এখন অবশ্য চাকা ঘুরেছে।

আর শুনতে পারল না রহমান। দুহাতে কান চেপে একেবারে রেলিংয়ের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। কোথাও কোন আলো নেই। গাঢ় অন্ধকার। জাহাজের কোন আলো জ্বালার হুকুম নেই। এমন কি, খোলা ডেকে দেশলাই পর্যন্ত জ্বালাতে পারবে না। ওপর থেকে জংগী বিমানের নজরে পড়ে যাবে।

রহমানের বুকের ভিতরটাও ঠিক এমনই অন্ধকার। ছোঁয়া যায়, হাত বোলানো যায় এই পুঞ্জীভূত অন্ধকারের স্তরে, কিন্তু আলোর ইশারা ফোটানো যায় না।

একদিন লড়াই থামল। সারা শহর হুমড়ি খেয়ে পড়ল খবরের কাগজের ওপর। হিরোশিমা আর নাগাসাকির ভস্ম দেখে রণদেবতা স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। ক্যাপ্টেন সকলের সামনেই চিৎকার করে গান গাইতে লাগল। শত্রুপক্ষ পরাজিত হয়েছে। এবারেও বৃটিশ জয়ী।

আবার উৎফুল্ল হ'ল বয়লার। ঢেউ কেটে কেটে এডভানা এগিয়ে চলল অন্য বন্দরের সন্ধানে।

একেবারে কোণে ওপরের ডেকে রহমান নমাজে বসল।

সিংগাপুর এড়িয়ে পেনাংয়ে নোঙর ফেলল জাহাজ। একপাল ছোকরার দল ভিড় করে এল জেটিতে। জাহাজ জেটিতে ঠেকবার আগেই লাফিয়ে পড়ল ডেকের ওপর। লড়াই ভয় নেই, অন্ততঃ মৃত্যু পার হয়ে [illegible] হয়েছে। দেখা গেল, লোক-লজ্জারও বালাই নেই, শরমের ধার ধারে না। সকলের সামনেই পণ্য-নারীদের দেহের বিবরণ দিতে শুরু করল, রাত কাটাবার দক্ষিণার মূল্য। বন্দর নিয়ে মারপিটও শুরু করল নিজেদের মধ্যে।

পার্সারের পাশেই রহমান দাঁড়িয়েছিল। রহমানের দিকে ফিরে পার্সার গম্ভীর গলায় বলল, লড়াই মানুষকে জানোয়ারের কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে তাদের। জীবনের মূল্যবোধ বদলে দিয়েছে।

এর কথা বুঝল না রহমান। আকাশের দিকে চেয়ে ভাবল, যেখান থেকে খোদার দোয়া নেমে আসবার কথা, সেখান থেকে মারণাস্ত্র নেমে আসে। তাঁর এত সাধের গড়া দুনিয়াকে তছনছ করে দেয়, হজরতের আদরের মানুষকে মনুষ্যত্ব ভোলায়।

রাতের অন্ধকারে আরো বীভৎস দৃশ্য রহমানের চোখে পড়ল। বারনারীরা সেজে-গুজে জেটির ফটকের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। হাসি-ঠাট্টায় দোজখ গুলজার। গালে হাত দিয়ে বসে পড়ল রহমান। ছোট্ট এই বন্দর, সেখানেই হারেম-ছুট মেয়েদের সংখ্যা এত বেশী? এ-ও কি লড়াইয়ের অবদান। শুধু প্রাণই নেয়নি, তার চেয়ে আরো মারাত্মক, আওরতদের ইজ্জতও ছিনিয়ে নিয়েছে। বে-সরম করে তুলেছে অন্তঃপুরচারিণীদের।

জাহাজ পেনাং ছাড়তে রহমান স্বস্তির

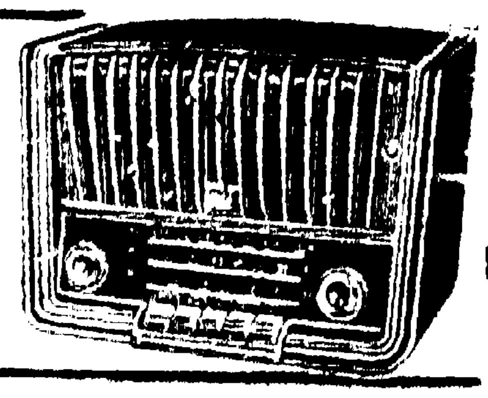

১৯৬১ সালে আপনার ভাগ্যে কি আছে?

আপনি যদি ১৯৬১ সালে আপনার ভাগ্যে কি ঘটিবে তাহা পূর্বাহ্নে জানিতে চান, তবে একটি পোষ্টকার্ডে আপনার নাম ও ঠিকানা এবং কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া পাঠাইয়া দিন। আমরা জ্যোতির্বিদ্যার প্রভাবে আপনার বার মাসের ভবিষ্যৎ লাভ-লোকসান, কি উপায়ে রোজগার হইবে, কবে চাকুরী পাইবেন, উন্নতি, স্ত্রী পুত্রের সুখ-স্বাস্থ্য, রোগ, বিদেশে ভ্রমণ, মোকদ্দমা এবং পরীক্ষায় সাফল্য, জায়গা জমি, ধন-দৌলত, লটারী ও অজ্ঞাত কারণে ধনপ্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয়ের বর্ষফল তৈয়ারী করিয়া ১৷০ টাকার জন্য ভি-পি যোগে পাঠাইয়া দিব। ডাক খরচ স্বতন্ত্র। দুষ্ট গ্রহের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উপায় বলিয়া দিব। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা জ্যোতির্বিদ্যায় কিরূপ অভিজ্ঞ। মিথ্যা প্রমাণিত হইলে আমরা মূল্য ফেরৎ দিবার গ্যারান্টি দিই। পণ্ডিত দেবদত্ত শাস্ত্রী, রাজ জ্যোতিষী। (DC-3) জলন্ধর সিটি।

Pt. Dev Dutt Shastri, Raj Jyotishi, (DC-3), Jullundur City.

নিঃশ্বাস ফেলল। এর পরেই রেঙ্গুন শহর। মাঝপথে আর কোথাও থামবার কথা নয়। এতদিন পরে ভাল নারিকেল-ছাওয়া দ্বীপের ছবি ভেসে উঠল রহমানের চোখের সামনে। নীল আর সবুজে মেশানো শান্ত রঙের প্রতীক।

শুধু একটা চিন্তা। বেঁচে আছে তো হামিদা? এত বড় একটা লড়াই গিয়েছে গোটা দেশের ওপর দিয়ে। বার বার শাসক বদল হয়েছে। শহরের ওপরই বোমারু বিমানের আক্রোশ বেশী। শহরেই থাকে হামিদা।

জাহাজ রেঙ্গুন শহর ছুঁতেই রহমান উঠে দাঁড়াল। সোয়ে ড্রাগোন প্যাগোডার স্বর্ণাভ অবয়ব ঝলসে উঠছে মিটমিটে নক্ষত্রের আলোয়। দু-একটা উঁচু উঁচু বাড়িও দেখা গেল। তেমনই আছে বুকিং স্ট্রীট জেটি।

সেজে গুজে জেটিতে গিয়ে দাঁড়াতেই সঙ্গীরা ঠাট্টা করল।

আরে, কি ব্যাপার পরিসাহেব। এতদিন উপোস করে আর থাকতে পারলে না বুঝি? এই তো চাই। আরে ভাই, আমাদের কি আর মৌলভীর দিনযাপন চলে। আমরা আজ আছি, কাল নেই, কাজেই মাঝখানের সময়টুকু প্রাণভরে ফুর্তি করে নেওয়া দরকার বইকি।

রহমান কোন কথা বলল না, কিন্তু বাজারের মোড়ে তার হাত ধরে সবাই টানাটানি আরম্ভ করতেই শান্ত গলায় বলল, আমায় মাপ কর ভাই। আমাকে আর এক জায়গায় যেতে হবে। বিশেষ প্রয়োজন।

শহরের মাঝখানে এসেই রহমান চমকে উঠল। আগে যেখানে বড় বড় বাড়ি ছিল, এখন সেখানে ধ্বংসস্তূপ। কোথাও পুরনো ভিতের ওপর নতুন বাড়ি শুরু হয়েছে। কোথাও আধ-ভাঙা বাড়ির মধ্যেই অনেকে বাস করছে।

পায়ে পায়ে রহমান এগিয়ে গেল। মনে মনে হিসাব করল চুয়াল্লিশ নম্বর গলির। আর দুটো গলি। তারপরই হলদে রঙের দুতলা বাড়ি। যদি অবশ্য এখনও হামিদারা সেই বাড়িতেই থাকে। আর যদি অন্য কোথাও উঠে গিয়ে থাকে, তাহলেই নাগাল পাওয়া মুশকিল হবে।

কিন্তু খেই ছাড়বে না রহমান। চাকরি ছেড়ে এই শহরে চেপে বসবে। দরকার হলে 'তুরিয়া' কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে। খোঁজ করবে হামিদার। যদি সে জীবিত থাকে, যেমন করে হোক তাকে বের করবে।

একটু এগোতেই দেখা হয়ে গেল। একেবারে চোখাচোখি।

হামিদা জানলায় দাঁড়িয়ে আছে। আরো সুন্দর হয়েছে, আরো পুরন্ত। চোখের ভাষা আরো ব্যঞ্জনাবহ।

রহমানকে দেখে হামিদা মুচকি হাসল।

আল্লা মেহেরবান। আল্লা মেহেরবান। বিড় বিড় করে রহমান বার বার উচ্চারণ করল। লড়াই তার হামিদাকে কাড়তে পারেনি।

দ্রুত পায়ে রহমান কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। দরজা বন্ধ। দু-একবার করাঘাত করতেই খুলে গেল। হামিদাই খুলে দিল।

খুব কাছে দাঁড়িয়ে হামিদা, তবু ছুটে রহমান যেতে পারল না তার কাছে। দু চোখে রাত্রি জাগরণের কালিমা, সারা মুখে অসংয় অত্যাচারের হিজিবিজি আঁচড়।

কি পয়সা আছে তো? না হলে এখানে সুবিধা হবে না। অন্য কোথাও যাও।

পয়সা? হামিদা আমি? রহমানের কণ্ঠস্বর আর্তনাদের মতন ঠেকল।

কে রে হামিদা? পাশের ঘর থেকে আর একটা নারীকণ্ঠ ভেসে এল।

এক বিনা-পয়সার নাগর এসেছে তাই ফুর্তি করতে।

অনেক আগে বাতাস শুঁকে হামিদা যেমন চমকে উঠেছিল, আজ রহমানও তেমনি চমকে উঠল। সেই এক গন্ধ। খোসরোটা শুধু মুখ বদল করেছে।

টলছে হামিদা। এমন মানুষকে, এমন অবস্থায় পাঁচ বছর আগের ছোট্ট এক অনুভূতির কথা বোঝাতে যাওয়াই বোকামি। সে চেষ্টা করে লাভ নেই।

রহমান ঘুরে দাঁড়াতেই হাসিতে ফেটে পড়ল হামিদা। অপ্রকৃতিস্থ হাসি।

দাঁড়িয়ে পড়ল রহমান। সিঁড়িতে ভর দিয়ে চুপ করে দাঁড়াল। আটকাতে পারেনি হামিদা। লড়াই শুধু এদেশেই নয়, ওর জীবনেও এসেছিল। আগেকার সুকুমার বৃত্তিগুলোকে দলে পিষে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। হাত বাড়িয়ে তুলে নেবার মতন রহমানের জন্য কিছু অবশিষ্ট রাখেনি।

টিক্-20

টাটা—ফাইসনের তৈরী

ছারপোকা ধ্বংস করে

গেইগী ডায়াজিনন

কালীঘাট ও কালীমন্দিরের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত
রম্য উপন্যাস
অজিত মুখোপাধ্যায় অমৃত মন্থন
বেংগল পাবলিশার্স
তারাশংকর, অচিন্ত্যকুমার, সজনীকান্ত দাস, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দ কর্তৃক উচ্চ-প্রশংসিত। মূল্য : চার টাকা
কলিকাতা—১২

(সি-৯৬৬৫)

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন!
যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র

বহু গাছড়া দ্বারা বিশুদ্ধ মতে প্রস্তুত

বাকলা

ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন

ভারত গভঃ রেজিঃ নং ১৬৮৩৪৪

অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা,
মুখে টকভাব, ঢেকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দাগ্নি, বুকজ্বালা, আহারে অরুচি, স্বল্পনিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যাঁরা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও বাকলা সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিফলে মূল্য ফেরৎ।
৩২ তোলার প্রতি কৌটা ৩৲ টাকা, একত্রে ৩ কৌটা — ৮৷৷ আনা। ডাঃ মাঃ ও পাইকারী দর পৃথক।

দি বাকলা ঔষধালয়। হেড অফিস- বরিশাল (পূর্ব্ব পাকিস্তান)
ব্রাঞ্চ-১৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৭

প্রচুর ফেনায় চুলের ময়লা কাটিয়ে দেয়

টাটা-র
শ্যাম্পু

আপনার চুল চক্‌চকে, পরিষ্কার
ও কোমল রাখে...
অবাধ্য চুল বশে আনে।

টাটার উৎপাদন

॥ ১৪ ॥

অলকানন্দ তেল বেচে ক্ষিতীশ ভেবেছিল বড়লোক হয়ে যাবে। কিন্তু তা আর হল না। প্রথম দিকে উৎসাহের অন্ত ছিল না ক্ষিতীশের। কালিদাসের শ্লোক আর দাদামশায়ের সার্টিফিকেট এরই জোরে ব্যবসাটা অনেকদূর এগিয়ে যাবার কথা। তেল তো খারাপ নয়, যেমন বর্ণ, তেমনি গন্ধ, গুণও ভালো—মাখলে সত্যিই মাথা ঠাণ্ডা হত। তার উপর দামেও সস্তা। প্রথম আশি নব্বই শিশি তেল দোকানে দোকানে বেশ চটপট নিয়ে নিলে। শোনা গেল, বিক্রিও হচ্ছে ভালো। ক্ষিতীশ এসে দাদামশায়কে খবর দিলে—আজ্ঞে আপনার আশীর্বাদে আমার ব্যবসা, বলতে নেই হে' হে' হে'—বলে একগাল হেসে ফেলল। আমরা ভাবলুম, জবাকুসুম, লক্ষ্মীবিলাস, কেশরঞ্জনের মতো ক্ষিতীশের অলকানন্দের নাম হাটে-বাজারে শোনা যাবে। সকলের মুখে ধ্বনিত হবে এইবার অলকানন্দ, অলকানন্দ! কিন্তু দ্বিতীয় দফা তেল নিয়ে ক্ষিতীশ যখন দোকানে বাজারে বেরল, তখন দেখা গেল, তেল নেবার ইচ্ছে থাকলেও তেল-বেচা পয়সা তাড়াতাড়ি উসুল করবার ইচ্ছে খুব বেশি লোকের নেই। কেউ বললে,—মাস কাবার হোক। কেউ বললে—পরে আসবেন। তেলের ব্যবসার এদিকটা ক্ষিতীশের জানা ছিল না। টাকা আদায়ের কত ঝঞ্ঝাট, তাতে কত নাজেহাল হতে হয়, সেদিক দিয়ে যথেষ্ট তিক্ত অভিজ্ঞতা হতে লাগল ক্ষিতীশের। শেষে একদিন দাদামশায়ের সামনে এসে খুলে বললে সব কথা। বললে—ব্যবসা তো আর চলে না দাদামশায়। পাওনাদারেরা খেয়ে ফেলল। এদিকে আদায় উসুল কিছু নেই।

দাদামশায় শুনে বললেন—হয়েছে। কথায় বলে, কেন কড়ি মাখ তেল! তোমাদের দেশে বুঝি এ-প্রবাদবাক্যের চল নেই? তেলের ব্যবসায় নেমেছ আর এটা জান না?

ক্ষিতীশ স্বীকার করলে—এ-সদুপদেশ সে কখনও শোনেনি।

দাদামশায় তখন ক্ষিতীশের দেনার হিসেব নিলেন। হিসেব টিসেব নিয়ে দেখা গেল, কাঁচা তেল, কাঁচা মশলা প্রভৃতি বাবদ ষাট-সত্তর টাকা দেনা।

দাদামশায় বললেন—তেলের নাম দিয়ে অচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল তো! এ-ঋণভার থেকে উদ্ধার পাই কি করে? ভেবেছিলুম ছোকরা তেল বেচে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এখন দেখছি এর ঋণভার তো বটেই, এর ভারও আমার উপর এসে পড়ল।

এই বলে ক্ষিতীশের দেনা দাদামশায় মিটিয়ে দিলেন। বললেন—ব্যবসা তো চুকলো। আর তো কোনো কাজ নেই—পা টেপো এখন বসে বসে।

ক্ষিতীশ দাদামশায়ের পা টিপতে বসে গেল। এইভাবে একদিন সন্ধেবেলায় পা টিপতে টিপতে ক্ষিতীশ বললে—দাদামশায়, বড় ভূতের ভয় হচ্ছে।

দাদামশায় অবাক হয়ে বললেন—সেকি ক্ষিতীশ? ভূত আবার কোথায় পেলে?

—আজ্ঞা, আমার ঘরের পাশেই আপনাদের পিতৃপুরুষের ক্যাশঘর। ঐখানেই।

—পিতৃপুরুষের ক্যাশঘরে কি? ঐখানে ভূত ঢুকেছে?

—আজ্ঞা।

একতলায় দোলনার বাগানের পশ্চিম দিকে কাছারি ঘর—লম্বা হলের মত। তার এক কোণে সারি সারি কাঠের র‍্যাক-এর উপর সাজানো বহু যুগের নথী-পত্র, দলিল-দস্তাবেজ ধুলোয় ঢাকা। বড় বড় ইঁদুর তার ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে বেড়ায়। বর্ষার শেষের দিকে আরশোলায় ভরে যায় অন্ধকার ঘরের কোণগুলো। জমিদারী সেরেস্তার এই সব পুরোনো দলিল নিয়ে কেউ কোনদিন ঘাঁটাঘাঁটি করে না। বাগানের উত্তর-পশ্চিম কোণে এই কাছারি-ঘর শেষ হয়েছে। তার গায়েই উত্তর দিকের প্রথম ঘর হচ্ছে ক্ষিতীশের। এই ঘরে খুব ছেলেবেলায় আমরা দেখেছিলুম দাদামশায়ের লিথোর ছাপাখানা ছিল। বিরাট বিরাট পাথর সাজানো থাকত এক কোণে আর ঘরের মাঝখানে ছিল লিথো প্রেসটা। সেই সব পাথর ঘষে ঘষে মসৃণ করে তার উপর ছবি ট্রান্সফার করে এক-একটা পাথরে এক-এক রকম রং দিয়ে যখন তিনরঙা, চার-রঙা ছবিগুলো ছাপা হয়ে বেরুত, আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতুম, আর দু-একখানা আধ-ছেঁড়া ছবি যদি এসে পড়ত আমাদের হাতে, তাহলে দৌড়

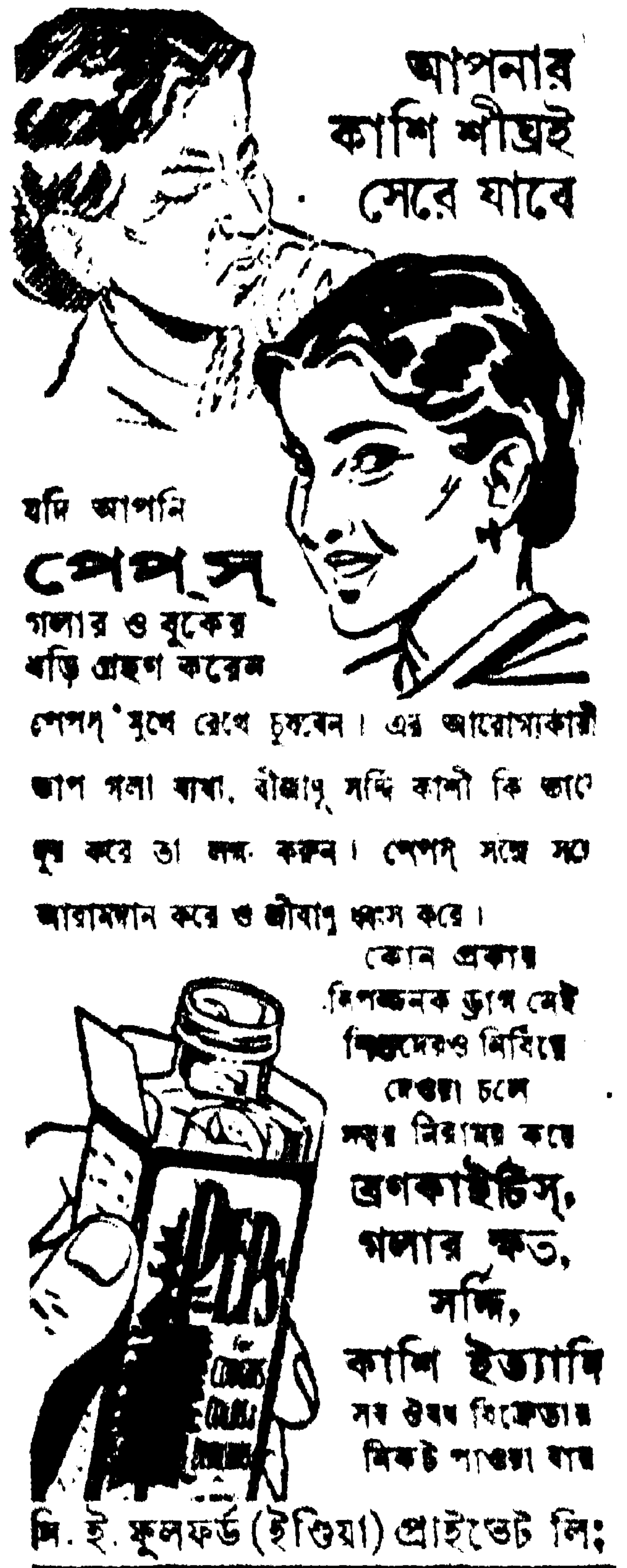

[illegible]—মেসার্স কেম্প এণ্ড কোং লিঃ
১২সি চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১২

দিতুম তাই নিয়ে আমাদের ঘরে। দাদামশায় নিজহাতে লিথোর পাথরে ছবি আঁকায় সাহায্য করতেন। এই লিথোযন্ত্রে ছাপা হয়েছিল বড়দাদার ব্যঙ্গচিত্রের বই 'অদ্ভুতলোক' আর 'বিরূপবজ্র'। এই ছাপাখানা উঠে যাবার বহুদিন পরে ক্ষিতীশের অধিকারে আসে এই ঘর। সেই ঘরের পাশেই হচ্ছে ক্যাশঘর। সত্যিই এক সময় জমিদারির খাজনা এই ঘরে এসে জমা হত। মোটা মোটা লোহার গরাদ-ঘেরা ঘর। লোহার ফ্রেমে গরাদ বসানো দরজা, তাতে মস্ত তালা ঝোলানো। ঘরে খাজনা জমা থাকলে গাদা-বন্দুক হাতে পাহারা থাকতো শান্ত্রী। কিন্তু বহুকাল হল সেসব রীতি আর নেই। বাক্স ভরে, নৌকো বোঝাই হয়ে, রেলে করে টাকা আসার বদলে আজকাল টাকা আসে ইনশিয়োর হয়ে। আমরা তো দেখিইনি, আমরা জন্মাবার কতকাল আগে থেকে ঐ ঘরের আসল ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেছে জানি না। তবুও ঘরটাকে বলা হয় ক্যাশঘর। ঘরটাকে আজকাল ব্যবহার করা হয় গুদম ঘরের মতো। তার মধ্যে আছে দ্বারকানাথের আমলের 'ডাইনিং-রুম'-এর কিছু আসবাবপত্র, ঝাড়, লণ্ঠন, কাঁচের আর চীনামাটির বাসন ইত্যাদি। তালা-বন্ধ পড়ে থাকে জিনিসগুলো—কেউ কোনোদিন খোলেও না।

এই ঘরে ক্ষিতীশ বলছে ভূত ঢুকেছে?

দাদামশায় বললেন—কি করে টের পেলে হে?

—আজ্ঞা, গভীর রাতে আওয়াজ শুনতে পাই!

—কিসের আওয়াজ?

—কে যেন লোহার দরজা ভাঙছে।

—দরজা ভাঙছে কি রকম?

—ঝন্ ঝন্ শব্দ হয়। এতদিন বলিনি আপনাদের। কিন্তু ভয় ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। তাই আর না বলে থাকতে পারলাম না।

দাদামশায় আমাদের ডেকে পাঠালেন। তারপর বললেন—ঐ শোন্! নীচের ক্যাশঘরে কি কান্ড চলেছে! বলে 'ভূত' ক্ষিতীশ তো ভয়েই গেল। তারপর বললেন—ওরে চোর নয় তো? মাটির নীচে দ্বারকানাথের কিছু পোঁতা ছিল কিনা, কে জানে? চোরেরা হয়তো খবর পেয়েছে! ভূতও হতে পারে, বলা যায় না। সে-আমলের ডাকাত ভূত!

শুনে আমাদের ব্যাপারটাকে বেশ লোমহর্ষক বলে মনে হল। কল্পনায় রং চড়িয়ে মনের মধ্যে অনেক রকম ছবি আঁকা চলতে থাকল। দাদামশায় নিজেই অনেক রকম ব্যাখ্যা করতে থাকলেন। একবার বললেন—চোরেরা ক্যাশঘরের খবর পেয়েছে নিশ্চয়। বাড়ির নীচে দিয়ে ঢুকে সিঁদ কেটে ক্যাশঘরে ঢোকবার চেষ্টা করছে। গাঁইতির শব্দ শুনে ক্ষিতীশ বলছে ভূত।

আমাদের বাড়ির একতলার মেঝের নীচে পুরনো বাড়ির রীতি অনুযায়ী এ-পার থেকে ও-পার অবধি খিলেন-করা টানা ফাঁক ছিল অনেকগুলো। তার মধ্যে বেজী থাকত, খট্টাস থাকত, গোসাপও থাকত দু-একটা। এর মধ্যে দিয়ে সিঁদেল চোর প্রবেশ করে মাটি ফুঁড়ে ক্যাশঘরে গিয়ে ঢুকবে, এটা বিশ্বাস করা যতটা শক্ত হোক, কিন্তু জোড়াসাঁকো বাড়ির সন্ধ্যার আমেজে বেশ রসিয়ে রসিয়ে কল্পনা করে নেওয়া একটুও কষ্টসাধ্য ছিল না। কিন্তু প্রশ্ন ছিল ক্যাশঘরে অত কষ্ট করে চোর যে ঢুকবে কিসের লোভে ঢুকবে? এর কোনো সদুত্তর ছিল না। এক যদি ধরে নেওয়া যায় গুপ্তধনের লোভে, যার খবর এক দ্বারকানাথ জানতেন, আর কেউ জানে না, তাহলেও খানিকটা মানে পাওয়া যায়। কিন্তু সেদিক দিয়ে দেখতে গেলেও মেনে নিতে হয় যে গুপ্তধন বার করতে গেলে উপর থেকে মাটি খুঁড়তে হবে—তার জন্য মাটির নীচে ঢুকে সুড়ঙ্গ কেটে চলবার দরকার কি? এইসব গোলমেলে যুক্তি-তর্কের ফলে শেষ অবধি সিদ্ধান্ত হল, ক্ষিতীশ যদি সত্যিই কোনো ঝন্ ঝন্ শব্দ শুনে থাকে তা হলে তা ভূতের থেকেই নিঃসৃত। আর চোর যদি নেহাত হয়ই, তাহলেও সে চোরের ভূত।

দাদামশায় ক্ষিতীশকে বললেন—এবার যদি গভীর রাতে তুমি কোনো শব্দ শোনো তাহলে আমাদের ডেকে তুলবে। আমরা গিয়ে দেখব।

ক্ষিতীশ বললে—আজ্ঞে আমি থাকব নীচে, আপনারা উপরে। বেশী ডাকাডাকি করতে গেলে ভূতই হোক, চোরই হোক, পালিয়ে যাবে।

অনেক ভেবে চিন্তে একটা উপায় ঠিক হল। দাদামশায় ঘরের দক্ষিণ দিকের জানলার ঠিক নীচে একটা কলতলা। জায়গাটা তিনদিকে ঘেরা বলে বেশ নিরিবিলি। ক্ষিতীশ ভূতের শব্দ শুনলেই চুপি চুপি কলতলায় চলে আসবে। সেখানে দাদামশায় ঘরের জানলা থেকে ঝুলবে একটা দড়ি। সেই দড়ির আগায় বাঁধা থাকবে একটা ঘণ্টা। ক্ষিতীশ দড়ি টেনে ঘণ্টা বাজিয়ে বেশী শব্দ না করে আমাদের ডেকে তুলবে।

আমাদের বাড়িতে যে স্কুল বসত, সেই স্কুলের একটা পিতলের ঘণ্টা ছিল। মাস্টারমশায়ের টেবিলে থাকত সেটা। তিনি পড়ার শুরুতে আর ক্লাশের শেষে সেটা বাজাতেন। সেই ঘণ্টাটা কাজে লাগল। সেটাকে নিয়ে এলুম দাদামশায় শোবার ঘরে। তারপর কলতলার দিকের জানলায় গায়ে টাঙিয়ে একখানা দড়ি বেঁধে দড়িখানা নীচে কলতলা অবধি ঝুলিয়ে দিলুম। প্রতি রাতেই যে ভূত আসে একথা ক্ষিতীশ হলপ করে বলতে পারল না। কিন্তু ঠিক রইল সেদিন রাতে যদি ক্যাশঘরে ঝন্‌ঝন্ শব্দ ওঠে তাহলে ক্ষিতীশ উঠে এসে ঘণ্টার দড়ি ধরে টানবে।

দুরু দুরু বুকে সে-রাতে সকলে আমরা শুতে গেলুম। দাদামশায় বললেন—দ্বারকানাথ ঠাকুরের ক্যাশঘর বাবা! ওখানে কি আছে কিছুই বলা যায় না। দেখ্ কি বেরয়!

উত্তেজনায় আমাদের চোখে ঘুমই আসতে চায় না। তারপর নানান ভাবনা ভাবতে ভাবতে কখন আমরা ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। কত রাত হয়েছে, ঘুমের মধ্যে শুনি দাদামশায় গলা—ওরে ওঠ্, ক্ষিতীশ ঘণ্টা টেনেছে।

ধড়মড় করে উঠে বসলুম। তারপর চুপি চুপি পা টিপে-টিপে সকলে মিলে হাজির হলুম দাদামশায় শোবার ঘরে। দিদিমা দেখলুম জেগেছেন। বলছেন—তুমি একলা যেও না। চরিত্রাকে সঙ্গে নাও। দাদামশায় ঘরের পুব জানলা দিয়ে নীচে ক্ষিতীশের ঘর আর ক্যাশঘর দুই-ই দেখা

১১শ

টি-বি সীল

বিক্রয় অভিযান

আরম্ভ হয়েছে ২।১০.৬০

সমাপ্ত হবে ২৬।১।৬১

প্রতিখানা ১০ নয়া পয়সা

একখানি সীল কেনার অর্থ আপনার দশ নয়া পয়সা ব্যয়; কিন্তু দুঃস্থের সেবায় এই সামান্য দানই অসামান্য হয়ে উঠবে—সার্বজনীনতার গুণে। অন্যকে কিনতে উদ্বুদ্ধ করুন।

বংগীয় যক্ষ্মা সমিতি

পি২১, স্কীম ৭১, সি-আই-টি রোড, কলিকাতা-১৪।

যায়। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলুম নীচের বারান্দা আর তার গোল গোল থামগুলো ফিকে চাঁদের আলোয় আর অন্ধকারে থম থম করছে। ঠিক সেই সময় ক্যাশঘরের দিক থেকে হঠাৎ একটা ঝন্-ঝন্ শব্দ উঠে আমাদের হাড় কাঁপিয়ে দিয়ে গেল।

ক্ষিতীশ তখনও কলতলায় দাঁড় হাতে দাঁড়িয়ে। আর একবার সে ঘণ্টার দাঁড়তে টান দিলে। আমরা কলতলার জানলার কাছে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করে ক্ষিতীশকে বললুম—শুনেছি। তৈরী থাকো, আমরা যাচ্ছি।

চরিত্র একটা বেঁটে মোটা লাঠি হাতে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো। আমরাও যে যা পারি নিলুম। তারপর সকলে খালি পা করে অন্ধকারের মধ্যে সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে চললুম নীচে নেমে। দাদামশা-ও চললেন তাঁর বাঁকা লাঠি হাতে আমাদের সঙ্গে। ক্রমে যখন প্রায় কলতলার কাছে নেমে এসেছি, আবার সেই ঝন্‌ঝন্ শব্দ।

দাদামশায় চরিত্রকে বললেন—চরিত্র এগিয়ে গিয়ে দেখ্ তো।

চরিত্র সাহসী ছিল। চট করে কলতলা ছাড়িয়ে কাছারিখানার কাছ থেকে উঁকি মেরে ফিরে এল। ক্যাশঘরের দরজার কাছে ছায়ামূর্তি বা ঐ ধরনের কিছুই সে দেখতে পেলে না।

তারপর সাহসে ভর করে আমরা দল বেঁধে এগলুম। কিন্তু নিঃশব্দে পা ফেলে ফেলে। শেষে ক্যাশঘরের সামনে এসে আমরা দাঁড়ালুম। সেই সময় আবার ঝন্-ঝন্ শব্দ। এবার রীতিমত জোরে—আমাদের একেবারে চমকে দিয়ে। ভয়ে আমরা পরস্পরের কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালুম। শব্দটা ক্যাশঘরের মধ্যে থেকে আসছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কি সর্বনাশ! ভিতরে লোক আছে নাকি? গাঁইতি দিয়ে কিছু ভাঙছে? ঢুকলেই বা কি করে? দিব্যি তো তালা ঝুলছে লোহার দরজায়? তবে কি সত্যিই সুড়ঙ্গ কেটে ঢুকেছে? না সমস্তটাই ভৌতিক ব্যাপার? এইসব প্রশ্ন এলো সবার মনে।

ক্যাশঘরের তালা খোলা সাব্যস্ত হল। কে যেন আলো জ্বালাতে চাইলো। দাদা-মশায় বারণ করলেন। বললেন, ভূত পালিয়ে যাবে।

যতদূর সম্ভব শব্দ না করে এবং আলো না জেলেই সেই মর্চে-পড়া তালা আস্তে আস্তে আমরা খুলে ফেললুম। ঠিক সেই সময় ঝন্‌ঝন্ ঝ্ ঝম শব্দে সমস্ত ক্যাশ-ঘর যেন কেঁপে উঠল। ভয়ে পিছিয়ে গেলুম সকলে। কিন্তু দাদামশায় দেখি ফস্ করে একটা দেশলাই জেলে ফেলেছেন। ক্যাশঘরের খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে দেখা গেল দ্বারকানাথের কাচের বাসনের আলমারির পাল্লা ফাঁক করে এত্তা বড় এক ইঁদুর তার লম্বা ল্যাজ মাটিতে লুটিয়ে ছুটে পালাচ্ছে। ক্ষিতীশ চরিত্র আর একজন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। দেশলাই জেলে দেখা গেল, বাসনের আলমারির মধ্যে আরো দুটো ধেড়ে ইঁদুর। সে দুটোকে তাড়িয়ে আলমারি খুলতেই অল্প আলোয় দ্বারকানাথের ডিনার সেট্ চক্‌চক্ করে উঠল। ড্রেসডেন আর মাইসেন্ থেকে আনানো কোন্ যুগের জিনিস এখনও নতুনের মতো। ভারি ভারি প্লেটগুলোকে ইঁদুরে দাঁতে করে টেনে তুলছিল আর ফেলছিল। আলমারির মধ্যে থেকে সেই আওয়াজ বার হচ্ছিল যেন লোহার দরজা ভাঙার শব্দের মতো। এই ব্যাপার তাহলে?

খুব খানিকটা হাসাহাসি হল, তারপর দাদামশায় বললেন—এ কি যে-সে জিনিস? দ্বারকানাথের প্লেট—আওয়াজ কি! বাড়ি সুদ্ধ মানুষকে ঘুম থেকে টেনে তুলেছে।

এইসব সূক্ষ্ম কারুকার্যে ভরা কাঁচের বাসন আর ড্রেসডেনার-মাইসনার চায়নার কথা বাড়ির কর্তারা ভুলেই বসেছিলেন। কারুর মনেই ছিল না এমন সম্পদ ঐ এঁদো-পড়া ঘরের মধ্যে ধুলো চাপা পড়ে আছে। তারপরদিন বাসনগুলোকে বার করে ধুয়ে মুছে দোতলার বারান্দায় নিয়ে গিয়ে তিন দাদামশার সামনে সাজানো হল। অনেকদিন পরে পূর্বপুরুষদের সম্পত্তির উপর চোখ বুলিয়ে তিনজনেই খুব আনন্দ পেলেন। তারপর ঠিক করলেন, ওগুলোকে ক্যাশ-ঘরে আর না রেখে নিজেরাই ঘরে সাজিয়ে রাখবেন, মাঝে মাঝে ব্যবহার করবেন। তিন ভাগে ভাগ হয়ে তিন দাদামশার ঘরে চলে গেল জিনিসগুলো।

ক্যাশ-ঘরে ভূতের উপদ্রব বন্ধ হল। ইঁদুরগুলো কেন যে ঐ প্লেটগুলোকে নিয়ে মাঝরাতে অমন পাগলামি করত জানি না। দ্বারকানাথের জীবদ্দশায় তিনি কত যে এলাহি ডিনার-পার্টি দিয়েছিলেন তার লেখা জোকা নেই। তারই গন্ধ লেগে আছে নাকি ঐ প্লেটগুলোর গায়ে? এতদিনেও ধুয়ে মুছে যায়নি? কে জানে?

(ক্রমশ)

অনুবাদ সাহিত্য
এমিল জোলার "হিউম্যান বিস্ট"-এর বঙ্গানুবাদ
পাশবিক ৫·৫০
এ্যালবার্টো মোরাভিয়ার
The Woman of Rome-এর বঙ্গানুবাদ
রোমের রূপসী (প্রথম খণ্ড) ৪·০০
রোমের রূপসী (দ্বিতীয় খণ্ড) ৫·০০
অনুবাদক : প্রবীর ঘোষ
চলন্তিকা প্রকাশক
২২২/১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

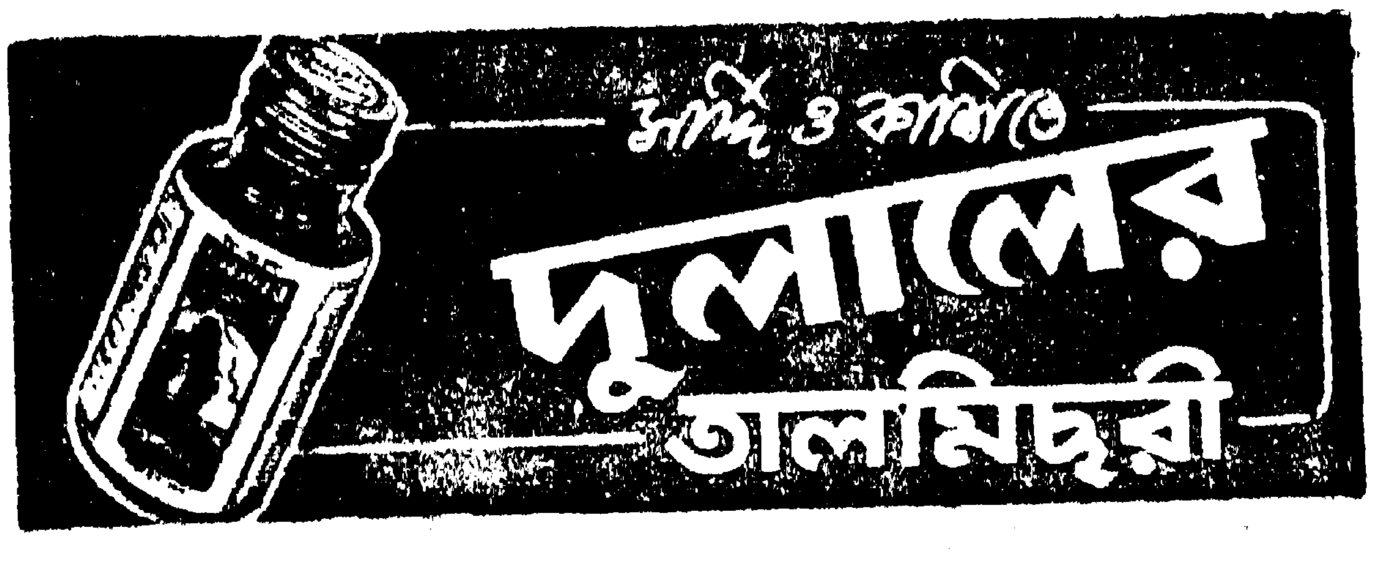

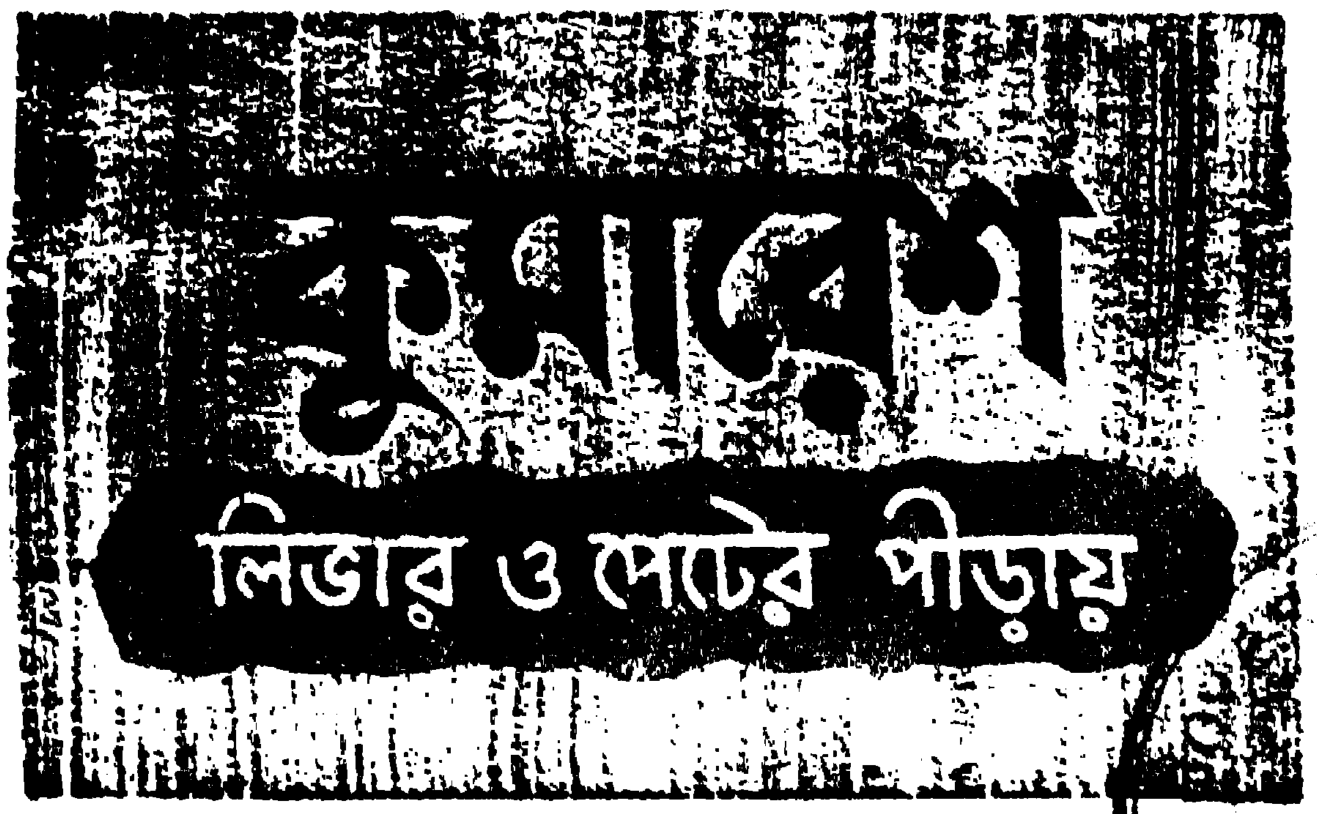

আহারের পর
দিনে দু'বার..
সব ঋতুতে
স্বাস্থ্য লাভের
শ্রেষ্ঠ উপায়
দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহাদ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দ্দি, কাসি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।
সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান
Mritusanjibani
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
মৃতসঞ্জীবনী
সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা
কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদ-আচার্য্য, ৩৬, গোয়ালপাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭
অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

ছন্দ যতি মিল

ধনঞ্জয় বৈরাগী

২

সুইস কটেজ টিউব স্টেশনে নেমে মোড়ের দোকান থেকে এক থোকা বিলিতি ফুল কিনে, লীলা চৌধুরী যখন সরোজ রায়ের ফ্ল্যাটের ঘণ্টি টিপল তখন ঘড়িতে বারটা বেজে গেছে। আজ লীলার সাজের বৈচিত্র্য ছিল যথেষ্ট। ইচ্ছে করে ডোনাট দিয়ে খোঁপা না বেঁধে ফরাসী কায়দায় চুলগুলো টান করে ওপরে বেঁধে ঘোড়ার ল্যাজের মত ফুলিয়ে ঘাড়ের ওপর ঝুলিয়ে দিয়েছে।

সরোজ দরজা খুলে সাদরে অভ্যর্থনা করল. মাদাম এসে গেছেন দেখছি, দেরি দেখে ভাবলাম আর কোথাও বুঝি আটকে গেলে।

লীলা ওপরে উঠতে উঠতে বলে, প্রায় আটকে গিয়েছিলাম,' সৌরেন ফোন করে ছিল খেতে যাবার জন্যে।

সরোজ কপাল কুঁচকে জিজ্ঞেস করে, সৌরেন? হঠাৎ কি ব্যাপার? স্বর্ণ ঘটিত মকরধ্বজ এর মত প্রেম ঘটিত কিছু নয় ত?

লীলা হাসে. হলেও একতরফা।

—যাই বল লীলা আজ কিন্তু প্রেম করবার দিন, কি রোদরে বাবা, রীতিমত গরম হচ্ছে, আজ রাত্রে চান করতে হবে।

—আপনি ভারী বেরসিক সরোজদা রীতিমত অফুল।

—কেন?

—কি কথার ছিরি. প্রেম, গরম, চান কি রকম এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন।

হো হো করে হেসে ওঠে সরোজ, সত্যি, কিছুতেই রোম্যাণ্টিক হতে পারলাম না। কখন যে মুখ ফসকে কি বলে ফেলি।

লীলা বসবার ঘরে ঢুকে ফুলগুলো টেবিলের ওপর রাখে, কোট খুলতে খুলতে বলে, মুখ ফসকে মোটেই নয় ইচ্ছে করে বলেন।

সরোজ তখনও হাসে, তাতে আমার লাভ?

—এক একটা বিচ্ছিরি মানুষ থাকে খালি চেষ্টা কি করে মেয়েদের অ্যাটেনশান ড্র করবে।

—মেয়েরা কান না দিলেই তো পারে।

লীলা কোণঠাসা হতে চায় না, বলে, কোন মেয়েই কান দেয় না, আপনি নিজেই হাসবড়ো হয়ে বসে আছেন।

সরোজ কথাটা ঘুরিয়ে দেয়, যদি মনে কর সুপ রান্না করা দরকার, এক প্যাকেট চিকেন সুপ কেনা আছে, তৈরি করে ফেলতে পারো। আমি মাংস আর ভাত রেঁধে রেখেছি।

—সে আমি দেখছি কি করতে হবে না হবে। জয় খাবে তো?

—না, ও বেরিয়ে গেছে। মাথা চুলকে বলে গেল, 'সরোজদা একটু বেরুচ্ছি, একেবারে রিহার্সালের সময় ফিরব।' নিশ্চয় ডোরিনা লণ্ডনে ফিরেছে।

লীলা মুখ বেঁকিয়ে হাসে, আচ্ছা সরোজদা, দেশে কি আর মেয়ে পাওয়া যেত না, কি বলে ও ডোরিনাকে বিয়ে করল? যেমনি পাকাটির মত চেহারা তেমনি মুখশ্রী। জয়টার কি টেস্ট বলে কিছু নেই?

সরোজ ফুলগুলো সাজিয়ে রাখছিলো. না তাকিয়েই বলে, কারুর ব্যক্তিগত ব্যাপারে কথা না বলাই ভাল।

লীলা কিন্তু তখনও থামে না, কি নোংরা মাগো, সারাক্ষণ নাকটা সর্দিতে ভড় ভড় করছে, আমি বলে দিচ্ছি ও সাতজন্মে চান করে না।

সরোজ কথাটা হঠাৎ থামিয়ে দেয়, আমার কিন্তু বেশ খিদে পেয়েছে।

লীলা বিরক্ত, হয়েও হেসে ফেলে, আপনি যে জাতে বামুন তা বেশ বোঝা যায়। বেশ চললুম আমি রান্নাঘরে। একেবারে খাবার দিয়ে ডাকব, মিথ্যে আর বিরক্ত করবেন না।

সরোজ রায় কলকাতার নামকরা ভাল ছেলে। পরীক্ষায় বরাবর ফার্স্ট হয়ে স্কলারশিপ নিয়ে ইওরোপে এসেছিল। এখানেও তার নাম অক্ষুন্ন ছিল, বিদেশী ছেলেরাও কেউ হটাতে পারেনি। পাশ করে বেরিয়ে সরোজ চাকরি নিল এখানকার এক নামজাদা ফারমে, হাতেনাতে 'কাজ শেখার সুযোগ পাবে বলে; সেই সঙ্গে অবশ্য মাইনেও তার কম ছিল না। তাই সুইস কটেজের কাছে তিন কামরার ফ্ল্যাট নিয়ে থাকত সরোজ। ওর সঙ্গে অনেক সময় অনেকেই থেকেছে, যেমন আজকাল জয় থাকে কিংবা আগে সৌরেন ছিল। তবে এ ফ্ল্যাটের বেশীর ভাগ খরচাই সে চালায় নিজে। শুধু এইটুকুই বললে বোধ হয় এ ফ্ল্যাটের পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। যখনই

শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

হালআমলের একখানি উল্লেখযোগ্য স্মরণীয় কাব্য।

আপনার 'আসন্ন'.....পড়িয়া প্রচুর আনন্দ পাইলাম। 'নবীন'কে যদি জয়মালা দিতে হয়, 'আসন্নের' তাহা প্রাপ্য। এ বছর 'রবীন্দ্র পুরস্কার' 'আসন্নের' কবিকে দেওয়া উচিত।........দীর্ঘজীবী হোন। অনাগত গুরুগৌরবের অধিকারী হোন।......

—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

শান্তি লাইব্রেরী

বিক্রয় কেন্দ্র : ৮/২-এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

লণ্ডনে এমন কোন বাঙালী ছেলে এসে পড়ে যে হয়ত কোথাও থাকবার ব্যবস্থা না করেই জাহাজ থেকে নেমে পড়েছে, বন্ধুরা তাকে পাঠিয়ে দেয় সরোজ রায়ের কাছে। জানে সপ্তাহখানেক এখানে সে অনায়াসে থাকতে পারবে গৃহস্বামীর আতিথ্যে।

এ ছাড়া সরোজের আর একটি বিশেষ গুণ আছে যা তাকে সাহায্য করেছে ভারতীয় ছাত্রদের কাছে আরও আপন আরও ঘনিষ্ঠ হতে, তা হোল রবীন্দ্র সংগীত। সরোজ সত্যি ভাল গান করে। বিদেশে এসে অনেক কলঘাড় গায়কও গাইয়ে বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু সরোজ মোটেই সে জাতের নয়, দেশে থাকতেই গানে তার যথেষ্ট নাম ছিল। খাঁটি শান্তিনিকেতনের ঢঙ, তার গলায়, দরদ দিয়ে ভাষার মাধুর্য পৌঁছে দিতে পারে শ্রোতার অন্তরে। এখানে যারা রবীন্দ্র সংগীতের ভক্ত তারা সকলেই তাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, সরোজদা বলে ডাকে। তাই লণ্ডনের ভারতীয় ছাত্রদের যা কিছু সাংস্কৃতিক

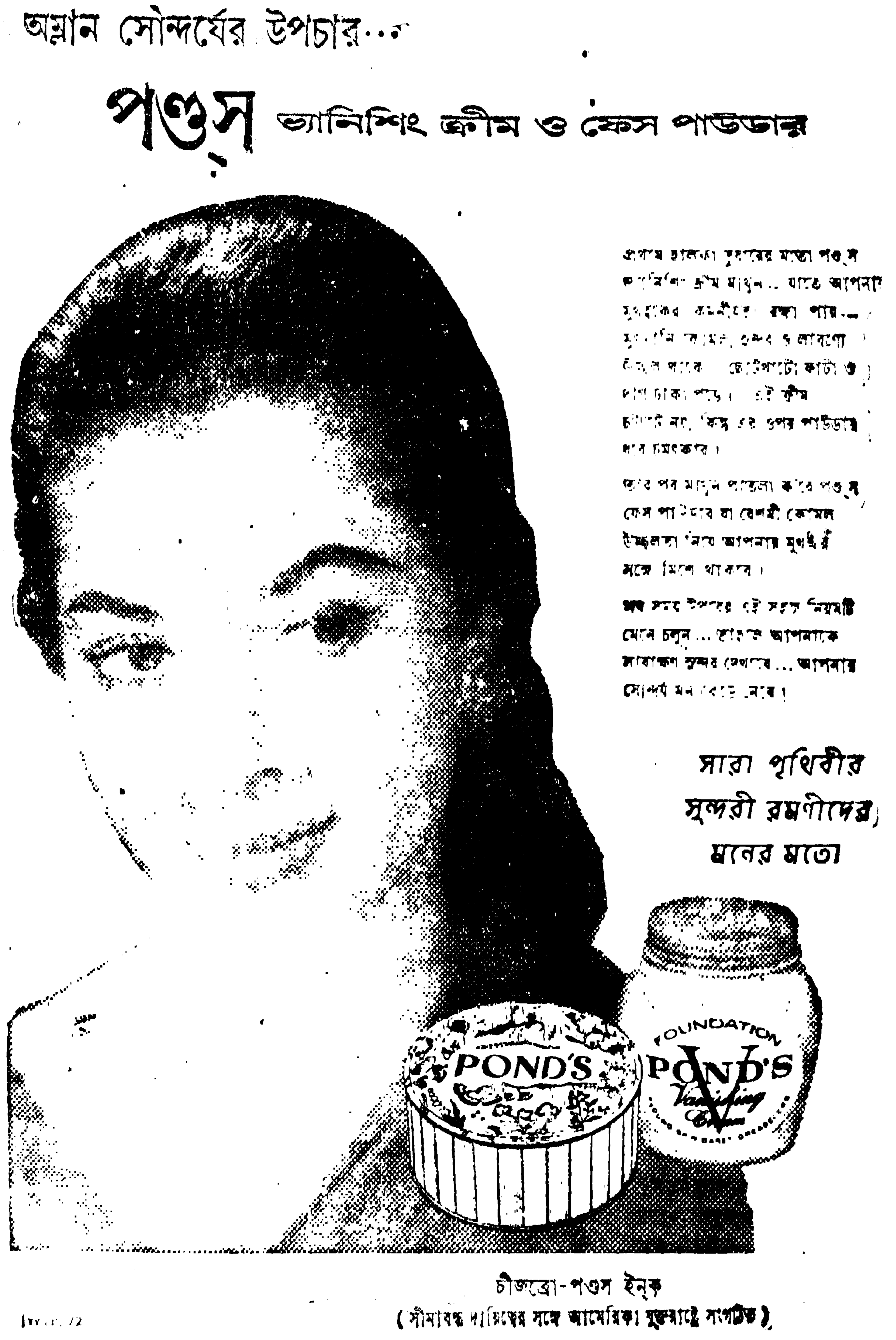

অনুষ্ঠান হয় তার মহলা চলে সরোজের ফ্ল্যাটে, এখানে সকলের অবারিত দ্বার।

ফুলদানিতে ফুল সাজাতে সাজাতে সরোজ গুন গুন করে গান করছিল, 'ঘরেতে ভ্রমর এল গুন গুনিয়ে'। অন্যমনস্কভাবে অনেক কথাই সে ভাবছিল, বিশেষ করে আজকের রিহার্সালের কথা, ছেলে মেয়েগুলো ঠিক সময় মত এলে হয়? লন্ডনে থাকলে কি হবে সময় জ্ঞানটা দেশের মতই রয়ে গেছে। যারা বা গাইতে পারে তাদের তাল জ্ঞান মারাত্মক, নাচিয়েদের অবস্থাও তথৈবচ। লীলা কিন্তু আজ কাল মন্দ নাচে না, যদিও কলকাতায় সে কখনও নাচেনি, যা নেচেছে সবই ইংরিজী বলরুম নাচ। কিন্তু আশ্চর্য গানের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে পা ফেলে ঠিকই। এদেশে এসে আর কিছু না হোক, সত্যিকারের মেম সাহেব দেখে, এ মেয়েগুলোর বিলিতীপনা অনেক কমেছে।

ওদিকে রান্নাঘরে ঢুকে লীলা সুপ চড়াতে গিয়ে দেখে অপরিষ্কার বাসনের পাহাড় জমা হয়েছে বেসিনের ওপর। পুরুষ মানুষদের সংসার করা দেখলে সত্যি হাসি পায়। বাইরের ঘরদোর পরিষ্কার ফিটফাট্ হলে কি হবে, যত নোংরা রান্না ঘরে। লীলা এপ্রনের অভাবে একটা তোয়ালে কোমরে জড়িয়ে নিয়ে বাসন ধুতে শুরু করে। আশ্চর্য, এই দেড় বছরে তার কত পরিবর্তন হয়েছে। দেশে থাকতে বাসন মাজা, কাপড় কাচা, রান্না করা কিছুই সে জানত না, এগুলো বরাবর বেয়ারা বাবুর্চিরাই করে এসেছে। অথচ এখানে এসে হাতে নাতে সবই তো করছে। শুধু করছে বললে কম বলা হয়, করে আনন্দ পাচ্ছে। অবশ্য কাজ করার সুবিধেও এদেশে অনেক।

পাশের ঘর থেকে সরোজদার গুন গুন শোনা যাচ্ছে। এ মানুষটাকে ভারী অদ্ভুত লাগে লীলার। কলকাতায় নিখুঁত ভাঁজের দেশী ছাঁটের স্যুট পরা গলায় টাই লাগানো যে সব ছেলেরা তাদের বাড়িতে আসত কিংবা ক্লাবে নাচতে যেত তাদের সঙ্গে এর যেন কোন মিলই নেই। সরোজ যে খুব সুন্দর দেখতে তা নয়। সে বেঁটে। ইংরেজদের পাশে যেন আরও বেশী বেঁটে দেখায়। কপালটা মেয়েদের মত ছোট, গায়ের রঙ দেশে নিশ্চয় ময়লা ছিল, এখানে অনেক দিন থাকার জন্যে খানিকটা ফিকে হয়েছে। পাঁচজনের মধ্যে একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে প্রথম দেখাতে সরোজকে বেছে নেওয়া শক্ত, কিন্তু আলাপ হবার পর বোঝা যায় তার একটা নিজস্ব ধরণ আছে, যার জন্যে পঞ্চাশটা লোকের মধ্যে থেকেও সে তাদের মধ্যে হারিয়ে যায় না। যে কোন পোশাকে সরোজকে সুন্দর দেখাবে বলে মনে হয় না, কিন্তু ও যা পরে তাতে ভালই মানায়। সরোজের বয়েস হবে তিরিশ কি বড় জোর বত্রিশ, কিন্তু এমন একটা ভাব করে থাকে যেন অনেক বড়, সেই অতি গম্ভীর মুখখানা ভাবলেই লীলার হাসি পায়। তবে যে জিনিসটা তার ভাল লাগে তা হল সরোজের কালো কুচকুচে চোখ দুটো। কি চালাক অথচ কি গভীর।

দরজার কাছে এসে দাঁড়াল সরোজ, হেসে জিজ্ঞেস করল, ও কি করছ, ঐ পাহাড় এখন বুঝি কেউ সাফ করতে বসে?

লীলা কাজ করতে করতে উত্তর দেয়, দোষ কি!

—এক ঘণ্টা লেগে যাবে।

—মোটেই না, ধোয়া প্রায় শেষ হয়ে গেছে, আপনি যদি শুকুতে সাহায্য করেন, তাহলে দশ মিনিটে হয়ে যাবে।

সরোজ একটা ঝাড়ন টেনে নিয়ে ধোয়া বাসনগুলো মুছতে শুরু করে, এ কাজটা আমি করে ফেলতে পারতাম, তবে আজ জয়ের পালা ছিল তাই করিনি।

লীলা হাসে, জয় আবার ডিস্ ধোবে।

—মিলে মিশে থাকতে হলে সবাইকেই সমান কাজ করতে হবে।

—এত যে উপদেশ দেন কেউ শোনে, বিশেষ করে জয়?

—শুনলে ওদেরই লাভ হবে, আমার আর কি? সরোজ একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, মাকে চিঠি লিখেছ?

লীলা গম্ভীর স্বরে উত্তর দেয়, হ্যাঁ।

—কি লিখলে?

—যা বলেছিলেন। পুজোর সময় ফিরে যাব, প্যাসেজ্ বুক্ করতে।

—আর প্রমীলা?

—ও থাকবে, ইকনমিক্স নিয়ে পড়াশুনো করবে।

—হয়ত তোমরা আমার ওপর চটবে, কিন্তু বিশ্বাস কর এতে তোমাদের অনেক উপকার হবে। মিথ্যে এদেশে পড়ে থেকে সময় নষ্ট করে লাভ কি? তুমি দেশে ফিরে যাও, বিয়ে থা' কর, মার বয়েস হচ্ছে তো। আর প্রমীলা চাকরি ছেড়ে যাহোক কিছু পড়ুক; এখানে এসে কেরানীর চাকরি ধরায় কোন লাভ আছে কি?

লীলার মাথায় দুষ্টুমি বুদ্ধি পাক খাচ্ছিল, নোংরা হাতে সরোজের মুখটা খপ করে চেপে ধরে, দোহাই আপনার আর লেকচার দেবেন না, আমি সব বুঝে ফেলেছি, আপনার মত বিজ্ঞ লোক আর দ্বিতীয় নেই।

সরোজ নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ইংরিজী কায়দায় বলে, দাঁড়াও দুষ্টু মেয়ে, তোমায় আমি মুরগীর ঝোল দিয়ে চান করাব।

হাসি ঠাট্টা হৈ হৈ এর মধ্যে তারা যখন খেতে বসল, ঘড়িতে তখন দুটো বেজে গেছে।

শনি রবি দু'দিন ছুটি থাকে বলে

BUY THE BEST
HIGHLY APPRECIATED
SAMSAD ANGLO-BENGALI DICTIONARY
1672 PAGES • Rs. 12·50 n.p.
SAHITYA SAMSAD
32 A, ACHARYA PRAFULLA CH. RD. • CAL-9

একটি গৌরবের বস্তু যা শত-শতাব্দী ধ'রে গুপ্ত ছিল

সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদ, দুর্গ ও সমাধি-মন্দিরগুলি আজও দাঁড়িয়ে আছে বহু শতাব্দী পূর্বে ভারতের জীবন-যাত্রার উচ্চমানের পরিচায়ক হিসাবে।

রাজপুরনারীদের গৌরবের বস্তু ছিল ভেষজ কেশতৈল—যার গোপন তথ্য এখন আবার আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তার নাম দেওয়া হয়েছে 'কেয়ো-কার্পিন'।

কেয়ো-কার্পিন

মনোরম গন্ধযুক্ত 'কেয়ো-কার্পিন' চুলের গোড়ায় প্রাণশক্তি যোগায়।

দে'জ মেডিকেল ষ্টোর্স প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা • বোম্বাই • দিল্লী • মাদ্রাজ
পাটনা • গৌহাটি • কটক

শুক্রবারের দুপুর থেকেই কেমন যেন ছুটি ছুটি ভাব দেখা যায় লণ্ডনের আফিস পাড়ায়। লাঞ্চ থেকে ফিরে কাজে আর কারো মন বসে না, কোন রকমে ফাইলপত্তর গুছিয়ে রেখে বাড়ি পালাতে পারলেই বাঁচে। বিশেষ করে গ্রীষ্মের সময় যখন লণ্ডনের সীমানা ছাড়ালেই ইংলণ্ডের গ্রামগুলো মনোরম হয়ে থাকে; সবুজ ঘাস আর কত রঙের ফুল, নীল আকাশ আর সূর্যের আলো। গ্রামে যাদের বাড়ি আছে, তারা শুক্রবার রাতেই গাড়ি করে বেরিয়ে যায়, দুদিন গ্রাম্য জীবন উপভোগ করতে। যাদের বাড়ি নেই কিন্তু পয়সা আছে, তারা শনিবার সকালে, সমুদ্রের ধারে কিংবা কোন নির্জন হোটেলে একটা রাত কাটিয়ে আসতে। আর যাদের পয়সা নেই, তারা অনেক রাত পর্যন্ত মদ খেয়ে মাতাল হয়ে শনিবার ভোর বেলা বাড়ি ফেরে। ভারতীয় ছাত্ররা অবশ্য এদের কোনটার মধ্যেই পড়ে না। তারা কয়েকজন মিলে কারুর বাড়িতে জড়ো হয়ে আড্ডা মারে। স্রেফ আড্ডা। বকর বকর করতে করতে কখন যে রাত্রি বেড়ে যায় বুঝতে পারে না। তারপর হঠাৎ একজনের হাই উঠলেই সবাই একে একে হাই তোলে, পরস্পরকে বিলিতী কায়দায় সুপ্রভাত জানিয়ে, আস্তে আস্তে যে যার বাড়ি ফিরে যায়।

মীনাক্ষীকেও যেতে হয় অনেক শুক্রবার অনেকের অনুরোধে। কিন্তু কোনদিনই কোথাও বেশী রাত পর্যন্ত থাকে না, এমন কি সরোজদার 'পিঠ চুলকানো সমিতি' থেকেও বারটার আগেই সে উঠে পড়ে। কারণ প্রতি শনিবার সকালবেলা তাকে অতুল মামার সঙ্গে প্রাতরাশে যোগ দিতে হয়, তাঁদের বাড়ি গিয়ে। এ নিয়ম আজকের নয়, যবে থেকে মীনাক্ষী এ দেশে আছে এই ব্যবস্থা, এক শনিবার না গেলে বা দেরি হলে সর্বনাশ, হাজারটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, এমন কি দেশে দাদুর কাছে নালিশ করে চিঠিও চলে যায়। কিন্তু এ শুক্রবার বিপদে পড়ল মীনাক্ষী, এতজন এসে পড়ল ওর ঘরে যে কাউকেই উঠতে বলতে পারল না, গল্প আর তর্ক চলল অনেকক্ষণ। যখন তারা উঠে গেল রাত প্রায় তিনটে। এরপর ঘুমুলে সকাল বেলা ওঠা অসম্ভব মীনাক্ষীর পক্ষে, তাই বিছানায় না শুয়ে কোচের ওপরেই চোখ বুজে পড়ে রইল। কিন্তু তবু ঘুমকে এড়াতে পারল না, আপনা হতেই এক সময় চোখ বুজে এল।

সকাল বেলা তাড়াহুড়ো করেও অতুল মামার বাড়ি পৌঁছতে মীনাক্ষীর প্রায় আধ ঘণ্টা দেরী হয়ে গেল। অতুলমামা ড্রয়িং রুমে বসে চা সহযোগে আগাথা ক্রিস্টির ডিটেক্টিভ বই পড়ছিলেন, মীনাক্ষীকে দেখে ঘড়ির দিকে আঙ্গুল দেখালেন।

মীনাক্ষী লজ্জিত স্বরে বলে, আমি খুবই দুঃখিত অতুল মামা, বড্ড দেরী হয়ে গেছে। কাল এত রাত করে শুয়েছি—

অতুল মামা বই থেকে চোখ না তুলেই প্রশ্ন করেন, কার বাড়ি গিয়েছিলে?

—কোথাও যাই নি বাড়িতেই ছিলাম।

—তবে।

মীনাক্ষী মিথ্যে কথা বলল, কাজ করছিলাম, একটা পোর্ট্রেট ধরেছি।

অতুল মামা ছবির বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করলেন না, যাও মামির সঙ্গে দেখা কর।

আমরা দেরী দেখে খেয়ে নিয়েছি।

অতুল মামার বয়েস এখন বছর পঞ্চাশ। যুদ্ধের আগে ব্যারিস্টারী পড়তে এসে এখানেই বিয়ে করে চাকরি নিয়ে বসে গেছেন। কিন্তু এখন আর ভাল লাগে না। শুধু যে গরম লাগে তাই নয়, এত ঢিমে তেতালায় ওখানকার জীবন চলে যে তার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেননি কিছুতে। অবশ্য দেশেও তাঁর বিশেষ কোন টান ছিল না। আপনার জনের মধ্যে ছিলেন বুড়ো বাবা। তাঁকেও অতুল মামা বিলেতে এনেছিলেন; এখানেই তিনি মারা গেছেন বছর কয়েক আগে। মীনাক্ষীদের সঙ্গে রক্তের কোন সম্পর্ক ওঁর নেই, তবে অনেক দিনের যাতায়াত ও বাড়িতে। কলেজ জীবনে মীনাক্ষীর মামাই ছিলেন ওঁর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু; সেই সূত্রে মীনাক্ষীরাও অতুল মামা ডাকে।

কলকাতায় থাকতে অতুল মামা সম্বন্ধে মীনাক্ষীর বড় চমৎকার ধারণা ছিল, বয়েসের তুলনায় কত ছেলেমানুষ। কি সুন্দর ব্যবহার। কিন্তু বিলেতে এসে ওঁরই অভিভাবকত্বে থেকে সে ধারণা ওর পাল্টেছে। এখন মনে হয় মানুষটা যেন বড্ডই শুকনো, এতটুকু রস নেই শরীরে।

যদিও-বা অতুল মামাকে সহ্য করতে পারে মীনাক্ষী কিন্তু মেজ মামি তার কাছে

পৌষ বিশেষ সংখ্যা
নব কল্লোল
মূল্য ১২৫নে:প:
— মূল্য বৃদ্ধি হইবে না —
তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় — উপন্যাস
বনফুল — গল্প
উত্তম কুমার — স্মৃতিকথা
ডা: নীহার রঞ্জন গুপ্ত — সম্পূর্ণ উপন্যাস
ডা: নগেন্দ্র নাথ দে — মনস্তত্ত্ব
অনিল কুমার চট্টোপাধ্যায় — সম্পূর্ণ উপন্যাস
ডা: বিশ্বনাথ রায় — শারীরিক প্রশ্ন
শ্রীমতী বানী রায় — নূতন গল্প
সতীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য — হাতের ভাষা
বিমল ঘোষ — কবিতা
মায়া বসু — কবিতা
তাছাড়া আরো গল্প, কবিতা, ফিচার রংগমঞ্চ, সিনেমা, সিনেমা চিত্র, অন্যান্য চিত্র কার্টুন, আরো অনেক কিছু।
✳ বইয়ের আকার বড় হবে ✳

অসহ্য। শুকনো চিমড়ে চেহারা, সাদা ফ্যাকাশে রঙের সঙ্গে ম্যাড় ম্যাড়ে সোনালী চুল। সারাক্ষণই যেন নাক তুলে বসে আছেন, ভদ্রমহিলা কেন যে নিজেকে এত বড় মনে করেন, তা আজও মীনাক্ষী বুঝতে পারে না। সব সময়ই তার মনে হয়েছে মেজ মামি একের নম্বর স্বার্থপর, পান থেকে চুনটি খসলেই ওঁর নিজ মূর্তি বেরিয়ে পড়ে।

মিসেস আইলিন চৌধুরী সেজে গুজে কুকুর নিয়ে বেড়াতে বেরোচ্ছিলেন, মীনাক্ষীকে দেখে আড়ষ্ট হাসি হাসলেন, মীনা ডার্লিং, তুমি এসে পড়েছ, আমি ভেবেছিলাম আজ আর বোধ হয় আসবে না।

মীনাক্ষী আগের মতই দুঃখ প্রকাশ করল।

—তুমি নিশ্চয় কিছু মনে করবে না মীনা, আমাকে এখুনি বেরতে হবে। বেচারী শীলু এই সময়টির অপেক্ষায় সকাল থেকে বসে থাকে, আমি রোজ ওকে বেড়াতে নিয়ে যাই কি না।

মেজ মামি কুকুরের দিকে সস্নেহে তাকালেন। শীলু, বড় বড় বাদামী রঙের লোমওয়ালা সুন্দর দেখতে শিকারী কুকুর। এতক্ষণ মীনাক্ষীর হাত চাটতে ব্যস্ত ছিল, হঠাৎ নিজের নাম শুনে কান দুটো তুলে মিসেস চৌধুরীর দিকে তাকাল। মীনাক্ষী তাড়াতাড়ি বলে, না, না, আপনি নিশ্চয় বেড়াতে যান, আমার জন্যে কেন সময় নষ্ট করবেন।

তাহলেও না খেয়ে যেও না। রান্নাঘরের কোথায় কি আছে সবই তো জান, তোমার মামাকে জিজ্ঞেস কর, গরম চা হচ্ছে শুনলে উনিও হয়ত এক কাপ খেতে পারেন।

হাতে চেন নিয়ে কুকুরের সঙ্গে মেজ মামি বেরিয়ে গেলেন। মীনাক্ষী ঢুকল রান্নাঘরে। খাবার ইচ্ছে তার মোটেই ছিল না, গ্যাস জেলে চায়ের জলটা বসিয়ে দিল। আইলিন চৌধুরীর বয়েস যতই হোক চল্লিশের বেশী নয় নিশ্চয়। হাল ফ্যাসানের পোশাকের ও'র অভাব নেই। পনের দিন অন্তর দোকানে গিয়ে চুল সেট্ করিয়ে আসেন, বুকটা কৃত্রিম উপায়ে ফুলিয়ে রাখেন সব সময়। তবু ওকে দেখলে পঞ্চাশ বছরের বেশী বলে মনে হয়। অতুল মামার সঙ্গে ও'র সম্পর্কটা কতখানি হৃদ্যতার তা মীনাক্ষী আজও বুঝতে পারেনি। অনেক সময়ই তার মনে হয়েছে অতুল মামা যেন স্ত্রীর মন যুগিয়ে চলার চেষ্টা করেন। আইলিন মামি যদি সত্যি কাউকে ভালবাসে তো সে ঐ শীলু। এও মীনাক্ষীর কাছে মনে হয় বড় বেশী আদিখ্যেতা। ঐ কুকুরটা যেন এ বাড়ির একমাত্র ছেলে। রাত্রে সে অতুলমামাদের বিছানাতেই শোয় তাছাড়া ওর ঘুম আসে না। সারাদিন বসে থাকে কোচের ওপর, ড্রইং-রুমের কোণের দিকে যে ছাই রঙের কোচটা রয়েছে তার নামই হোল শীলুর

এই দশকের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম

দিল্লি হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ৩১শে অগস্ট, ১৯৬০ হইতে অনূদিত :

নিউ দিল্লির কেরল ক্লাবে এক সাহিত্যিক বৈঠকে কেরলের প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীশ্যামনারায়ণ কৃষ্ণনায়ার সাহিত্যে নতুন আঙ্গিক বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলা উপন্যাস "রাজপথ জনপথে"র উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, শ্রীচাণক্য সেন রচিত এই উপন্যাসখানি ভারতীয় সাহিত্যে অভিনব, কারণ এই উপন্যাসে সর্বপ্রথম ভারতে আগত একজন স্বাধীনতাকামী আফ্রিকানের অভিজ্ঞতা মানসিক ও বাস্তব

রাজপথ জনপথ

চাণক্য সেন কৃত উপন্যাস

এবং নানাবিধ ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া তার পরমাশ্চর্য পরিণতি দেখান হয়েছে। প্রধানত এক বুদ্ধিপ্রধান সমস্যাকে ঔপন্যাসিক নিপুণতা ও সাহিত্যিক রসের সঙ্গে সার্থকভাবে উপস্থিত করেছেন। কেরল সাহিত্য এখনও আঞ্চলিকতায় বন্দী; আঞ্চলিক সমস্যার বাইরে সে যায়নি। কিন্তু এই গ্রন্থ আঞ্চলিক সীমান্ত উত্তীর্ণ হয়ে জাগ্রত, উদ্বেলিত আফ্রিকাকে বাংলা সাহিত্যে নিয়ে এসেছে।

"তোমার দৃষ্টিতে দর্শন আছে, অন্তর্দৃষ্টি আছে।" —অমল হোম

ঔপন্যাসিক হিসেবে আপনাকে 'স্বাগত' স্বাগত জানাই। ধন্য আপনার লেখনী ও মননের গভীরতা, উপলব্ধির বিস্তার.....সুখরক্ষা করেছেন আপনি.....সমস্ত দেশের, বাংলার, ভারতের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের। পিটার কাবাব, অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে বাংলা সাহিত্যের অভিজ্ঞতায়। —কবি নিখিল নন্দী

'রাজপথ জনপথ' এত ভাল লেগেছে যে, খুব ভেবে চিন্তেই.....লেখার লোভ হয়েছিল.....রাজপথ থেকে জনপথের কাহিনী অসাধারণ, অপূর্ব। —তাপস সেন

আসলে তিনি রসিকের চোখ দিয়ে আর বিজ্ঞানী মন নিয়ে দেখেছেন দিল্লি মহানগরীকে। সেখানে মিলিত হয়েছে নানা দেশের নানা ভাবভাবনা, নানা মতে ও পথে বিশ্বাসী বহু নরনারী। পাত্রপাত্রী অনেক। সকলেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে ফুটে উঠেছে। তাই কাকে ফেলে কার পরিচয় দেব এ এক সমস্যা.....সবাই ফুটে উঠেছে একটি মনোরম কাহিনীকে কেন্দ্র করে.....তারা সবাই দেখছেন এই ভারতকে আর তাদের দেখাকে দেখছেন চাণক্য সেন। এ দেখাকে তারিফ করতে হয়.....বাংলা উপন্যাসে.....এখন এল আফ্রিকার মুক্তি-সংগ্রামের যোদ্ধারা। তাদের আমরা স্বাগত জানাই। —আকাশ বাণী, কলিকাতা।

স্থানাভাবে অসংখ্য পাঠক ও সমালোচকের বক্তব্য প্রকাশ করা সম্ভব হোল না।

॥ ভিঃ-পিঃ'তে পাঠানো সম্ভব নয়। ডাকমাশুল সহ সাত টাকা পাঠালে বই পাঠানো হয় ॥

নবভারতী

৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

(সি ৯৮২৬)

কোচ। শীলুর খাবার মেনু প্রত্যেকদিন বদলাতে হয়, রোজ রোজ এক ঘেয়ে খেতে ওর অরুচি লাগে। শীলু চান করে বাথটবে, বড় পরিষ্কার তোয়ালেতে গা মুছিয়ে মেজ মামি হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে লোমের জল শুকিয়ে দেন: এ ধরনের আরও কত কি। ইংরেজরা কুকুর ভালবাসে মীনাক্ষী তা জানত, কিন্তু আইলীন চৌধুরীর এ ধরনের কুকুর পরিচর্যাকে ও পাগলামি ছাড়া আর কিছু আখ্যা দিতে পারে না।

দু' কাপ চা হাতে নিয়ে মীনাক্ষী যখন অতুল মামার ঘরে এল তখনও উনি মন দিয়ে ডিটেকটিভ বই পড়ছেন, চা খেয়ে খুশী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ডিম রুটি সব খেয়েছ ত? মীনাক্ষী মিথ্যে বলল, খেয়েছি।

অতুল মামা কি যেন ভাবছিলেন, শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন, বাড়ির চিঠিপত্র পেয়েছ সম্প্রতি?

—গত সপ্তাহে পেয়েছিলাম, মামিমা লিখেছিলেন।

—হুম্। তারপর আর কেউ লেখেনি?

—না।

অতুল মামা চুপ করে গেলেন। মীনাক্ষীর কেমন যেন সন্দেহ হয় উনি কোন কথা গোপন করার চেষ্টা করছেন, কেন কি হয়েছে?

—না, এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম।

মীনাক্ষী তবু প্রশ্ন করে, দাদু কি আপনাকে কিছু লিখেছেন?

মীনাক্ষীর চোখের দিকে তাকিয়ে অতুল মামা আর কথা লুকোতে পারেন না, স্বীকার করেন, হ্যাঁ।

—কি লিখেছেন?

—চিঠিটা উনি নিজে লেখেননি, মনে হল অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়েছেন।

মীনাক্ষী উৎকণ্ঠিত হয়, কেন?

অতুল মামা সহজ হবার চেষ্টা করে এলেন, পাছে তুমি উতলা হও, তাই বলতে চাইছিলাম না, মানে তোমার দাদুর শরীরটা ভাল নেই।

—কি হয়েছে?

—তা লেখেননি, তবে বয়েস হয়েছে তো, কত রকমই হতে পারে। চিঠিটা একটু সেণ্টিমেণ্টাল হয়েছে, অসুখ হলে যা হয় আর কি। লিখেছেন ওনার ভাল মন্দ যদি কিছু হয়, আমি যেন তোমার দেখাশুনো করি। এ আবার লেখবার কি আছে। তোমার দেখাশুনো করাতো আমার কর্তব্য। তাছাড়া মনে কর—

অতুলমামা হয়ত আরও অনেক কথাই বলতেন, কিন্তু মীনাক্ষীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন, তার মুখ সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, এতটুকু রক্ত যেন তাতে নেই। টানা টানা চোখ দুটো জলে ভরে এসেছে। অতুল মামা তাড়াতাড়ি উঠে এসে মীনাক্ষীর মাথায় হাত রাখলেন, কি ছেলেমানুষ তুমি, এত সহজে ভেঙে পড়লে চলবে কেন? অসুখ করেছে, আবার সেরে যাবে; মানুষের কি অসুখ করতে নেই? ছি, ছি, তোমাকে দেখছি বলাই উচিত ছিল না।

মীনাক্ষী আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়, কান্না ভেজা গলায় বলে, আজ আমি আসি অতুল মামা।

অতুল মামা বোঝেন বাধা দিয়ে লাভ হবে না, শুধু বললেন, বিকেলের দিকে একটা ফোন করো।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে একরকম ছুটতে ছুটতে মীনাক্ষী অতুল মামার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। তারপর কেমন করে টিউব ধরে সে বাড়িতে এসে পৌঁছয় কিছুই তার মনে থাকে না। সারাক্ষণ সে তার দাদুর কথাই ভেবেছে।

একটা উঁচু পাহাড়ের তলায় দাঁড়িয়ে অনেক চেষ্টা করেও যেমন পুরো পাহাড়টা দেখা যায় না, অথচ দূরে থেকে দেখলে তার সবটুকু পরিষ্কার হয়ে চোখের সামনে ফুটে ওঠে, তেমনি কলকাতায় থাকতে তার দাদুকে মীনাক্ষী যত না বুঝতে পেরেছিল, লণ্ডনে একলা থেকে তাঁর মহত্ব অনেক বেশী উপলব্ধি করতে পেরেছে। ছোট বেলায় বাপ মা হারিয়ে মীনাক্ষী আর তার ইস্কুলে পড়া দাদা অমিতাভ যখন এসে উঠল মামার বাড়িতে তখন যিনি তাদের সব অভাব পূরণ করে ছিলেন, শুধু স্নেহ ভালবাসা দিয়ে নয়, কর্তব্য বোধের অনুপ্রেরণা জাগিয়ে, তিনি এই দাদু। সংসারে অনেক মানুষ আসে যাদের অকৃপণ ভালবাসা অনেক সময় স্নেহাস্পদকে পঙ্গু করে দেয়, আবার এমন হিতাকাঙ্ক্ষীও আছেন, যাদের সুদৃঢ় কর্তব্য বোধ নিষেধের দড়ি দিয়ে এমনভাবে পাক দিয়ে ফেলে যা থেকে মুক্তি পাওয়াই কঠিন হয়ে পড়ে। এ দুই-এর মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে পারে খুব কম লোকেই, মীনাক্ষীর মতে তার দাদু তা পেরেছিলেন। সেইজন্যেই কলকাতায় থাকতে মীনাক্ষী দাদুকে ভালবাসত, অসংকোচে তার কাছে আবদার জানাত আবার ভয়ও করত সকলের চেয়ে বেশী।

মীনাক্ষীর দাদামশায় বারীন্দ্রনাথ যে যুগের বাংলায় মানুষ সে যুগে একদিকে যেমন ইংরেজীপনার আদেখলামির স্রোত বইছে অন্য দিকে আবার তেমনি মাটি চাপা-পড়া দেশী সংস্কৃতিকে খুঁড়ে বার করার প্রয়াস চলছে পুরো দমে। বারীন্দ্রনাথ দুই বিভিন্ন ধারার সঙ্গম। সাহেবদের নকল করে তখনকার ফ্যাশান অনুযায়ী তিন পীস স্যুট গ্যালিস দিয়ে পরে থাকতেন সারাক্ষণ, ধুতি পরলে নাকি অস্বস্তি বোধ করতেন। শুধু বেশ নয় ইংরাজী ভাষাটাকে আয়ত্ত করেছিলেন মাতৃভাষার মতন। প্রফেসার থেকে যখন সরকারী কলেজের প্রিন্সিপাল হলেন, তখন কত সময় ছোকরা ইংরেজ প্রফেসারদের ভাষার ভুল শুধরে দিতেন। তারা লজ্জিত হয়ে স্বীকার করে নিত। আবার সন্ধ্যে হলেই ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে মদের বোতল নিয়ে বসতেন। এমন সান্ধ্য মজলিস তখন বসত অনেকের বাড়িতেই। বারীন্দ্রনাথও যেতেন কত নাম করা সাহিত্যিকের নিমন্ত্রণে। এরা মদ খেতেন বটে, তবে মাতলামি করতেন না। চারটে পেগ খাবার পরও তর্ক করার সময় সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর আলোচনার খেই হারাতেন না কখনও।

বারীন্দ্রনাথ আবার বইও লিখলেন, ধনবিজ্ঞান আর বাণিজ্য। ইকনমিকস্ আর কমার্সের ওপর প্রথম বাংলা ভাষার বই।

ডাকযোগে সম্মোহন বিদ্যা শিক্ষা

হিপ্নোটিজম, মেসমেরিজম, ইচ্ছাশক্তি, দিব্যদর্শন, চিন্তা পঠন ইত্যাদি বিদ্যাসমূহ প্রফেসর রুদ্রের পুস্তকাবলীর সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার সাহায্যে নানাবিধ রোগ আরোগ্য এবং বদ অভ্যাসসমূহ দূর করা যায় এবং আর্থিক ও মানসিক উন্নতি হয়।

নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন।

এস রুদ্র,

রাজেন্দ্র পথ, পাটনা ১।

ধবল বা শ্বেত

শরীরের যে কোন স্থানের সাদা দাগ একজিমা, সোরাইসিস ও অন্যান্য কঠিন চর্মরোগ, গাত্রে উচ্চবর্ণের অসাড়যুক্ত দাগ ফুলো, আঙ্গুলের বক্রতা ও দূষিত ক্ষত বেদনায় ও বাহ, দ্বারা দ্রুত নিরাময় করা হয়। আর পুনঃ প্রকাশ হয় না। সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা। ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট হাওড়া। ফোন: ৬৭ ২৩৫৯। শাখা: ৩৬ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯। (পূরবী সিনেমার পাশে)।

মহাভারত আর রামায়ণের তথ্য ঘেঁটে তার মধ্যে যে সমাজতন্ত্রের বীজ আছে, তা পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিতেন ছাত্রদের সামনে। বিদেশী সরকারের তলায় চাকরি করেও ছাত্রদের মনে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন স্বদেশপ্রীতির আনন্দ। তাই আজও অনেক ছাত্র যারা উত্তর জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, এসে বারীন্দ্রনাথকে প্রণাম করে তাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে যায়।

মীনাক্ষী বারীন্দ্রনাথকে দেখেছে রিটায়ার করার পর। ঠিক যেন ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে ওঁদের সময় বাঁধা থাকত। সকালে উঠে খবরের কাগজের সঙ্গে চা পান শেষ করে নটার মধ্যে তৈরি হয়ে গাড়ি করে বেড়াতে বেরিয়ে যেতেন। হয় লেক, না হয় ভিক্টোরিয়া। বাড়ি ফিরে তেল মেখে চান, বারটার মধ্যে খাওয়া। মাছ, মাংস, ডিম সবই খেতেন তবে অল্প পরিমাণে। দুপুরে বেলা তিনখানা খবরের কাগজ তন্ন তন্ন করে পড়ে ইংরেজ সরকারের নিত্যনূতন ফন্দি ধরার চেষ্টা করতেন।

এ প্রোগ্রামের একদিনও নড়চড় দেখেনি মীনাক্ষী। এমন কি মীনাক্ষীর মা যেদিন মারা গেলেন, সেদিনও উনি সময় মত সব কাজই করেছেন। আশ্চর্য চাপা মানুষ। মীনাক্ষীর কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, বাপ মা কেউই চিরকাল বেঁচে থাকে না, যদি তোমার মায়ের আত্মাকে সুখী করতে চাও, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িও, সৎপথে থেকো আর নিজে সুখী হয়ো।

এ আশীর্বাদ নয়, উপদেশও নয়, এ একজন শুভানুধ্যায়ীর ঐকান্তিক শুভ কামনা। সেদিনের কিশোরী মীনাক্ষী দাদুর এ কথাগুলো মনের মধ্যে গেঁথে রেখেছিল, তাই ত বড়লোক মামার বাড়িতে ঐশ্বর্যের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবার সব রকম সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছে।

দাদু তাকে সব সময় পথ দেখিয়েছেন, যখনই বুঝেছেন মীনাক্ষী নিজেই পথ হাতড়াচ্ছে কিংবা অন্যদের বোকা প্রশংসায় ভুল পথে যাচ্ছে। মীনাক্ষীর স্পষ্ট মনে পড়ে, ও তখন বি এ ক্লাশের ছাত্রী, একদিন লেকের ধারে বসে একটা ল্যান্ডস্কেপ এঁকেছিল তেল রঙ দিয়ে। কলেজের বান্ধবীরা প্রশংসা করল পঞ্চমুখে সেই সঙ্গে দু-একজন পরিচিত প্রফেসারও। বাড়িতে ছবি দেখে মামিমা ঠিক করলেন বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রাখবেন বসবার ঘরে। আর সকলেই এক-বাক্যে স্বীকার করল মীনাক্ষীর আঁকবার হাত চমৎকার। এত প্রশংসার পর ছবি নিয়ে মীনাক্ষী দাদুর কাছে যেতে যেতে ভেবেছিল উনিও খুসী হবেন নিশ্চয়। কিন্তু আশ্চর্য। চোখে চশমা লাগিয়ে অনেকক্ষণ ছবিটা দেখে ধীর স্বরে বললেন, সত্যিই যদি ছবি আঁকতে চাও, তাহলে ভাল করে তাকিয়ে দেখো যাকে আঁকছ। কতগুলো ধারণার বশে রঙ ফলাতে যেও না।

কথাটা পরিষ্কার বুঝতে না পেরে মীনাক্ষী মুখ তুলে তাকায়।

দাদু হাসলেন, শান্ত মোলায়েম হাসি, যে দিকে তাকাবে সে দিকেই দেখবে রঙের খেলা। আমি তো আকাশের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে দেখি কত রঙের বিচিত্র প্রকাশ সেখানে। ছবি আঁকছ বলে আকাশ মানেই নীল ভেবো না, পাতা মানেই সবুজ নয়, সূর্য আঁকতেই লাল রঙ দিও না। প্রত্যেকটি মিনিটে কত তার পরিবর্তন তা দেখতে হবে, বুঝতে হবে, অন্তরে উপলব্ধি করতে হবে, তারপর তুমি সৃষ্টি করতে পারবে। সে তুমি শিল্পীই হও, কবিই হও।

মীনাক্ষীর চোখে জল এসেছিল। গোপন করার জন্যে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করে। শুনতে পায় পেছন থেকে দাদু বলছেন, জানি তুমি মনে কষ্ট পেলে, কিন্তু অবসর সময়ে কথাগুলো ভেবে দেখো, সমাজের কাছে শিল্পীর দায়িত্ব যে অনেকখানি।

ঐ শেষের কথাটি মীনাক্ষী কিছুতেই ভুলতে পারে না। সেই দিন থেকে বলতে গেলে সে ছবি আঁকায় সত্যিকারের মন দিয়েছে। শুধু রেখা রঙ আর আলোছায়ার খেলাই নয়, প্রকৃতির রূপকে অন্তরে উপলব্ধি করে ছবির ভেতর দিয়ে প্রকাশ করেছে।

বারীন্দ্রনাথের সকলের চেয়ে বড় গুণ তিনি যুগের সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলে এগিয়ে গেছেন, তাই কোনদিনই তার মতামতগুলো সেকেলে বলে মনে হয়নি। মীনাক্ষীর মামাতো ভাই যখন বামুনের মেয়ে বিয়ে করবে বলে বায়না ধরল তখন সকলের আগে মত দিলেন, বারীন্দ্রনাথ, শুধু তাই নয় নিজে অগ্রণী হয়ে মেয়েকে বরণ করে বাড়ি নিয়ে এলেন। মীনাক্ষীর বিয়ের জন্যে বাড়ির সকলে উতলা হলেও বারীন্দ্রনাথ হননি। উনি বলেছিলেন, মীনাক্ষীর যদি ইচ্ছে করে, বিয়ে না করে চাকরিবাকরি করতে পারে, তাতে উনি আপত্তি করবেন না।

তাই ত এই পঁচিশ বছর বয়েস পর্যন্ত অবিবাহিতা থেকে মীনাক্ষী নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী ছবি আঁকা নিয়ে থাকতে পেরেছে। এই ইওরোপে আসাও তো বারীন্দ্রনাথ না হলে হোত না, কি রকম করে উনি নাতনীর মনের কথা ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন।

চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল, পীয়ের টেলিফোন করছে।

—সুপ্রভাত মীনাক্ষী।

—সুপ্রভাত পীয়ের।

—কখন ঘুম থেকে উঠলে।

—উঠেছি অনেকক্ষণ, অতুল মামার বাড়ি গিয়েছিলাম।

পীয়ের অন্য দিকে হাসে, হ্যাঁ, আজ তো তোমার হাজিরা দেবার দিন। এখন কি করছ?

—জানি না।

—তার মানে বাড়িতে থাকছ তো?

—হয়তো থাকবো।

পীয়ের আশ্চর্য না হয়ে পারে না। এরকম করে কেন কথা বলছ মীনা, তোমাকে আজ বড় অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে।

মীনাক্ষী অস্বীকার করতে পারে না, হ্যাঁ পীয়ের, আমার দাদুর শরীরটা ভাল নেই অতুল মামার কাছে চিঠি এসেছে।

—তাই নাকি!

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।

পীয়ের নিজে থেকেই বলে, আমি আসছি এখুনি মীনা, তুমি কোথাও বেরিয়ে যেও না।

পীয়ের টেলিফোন কেটে দিয়েছে। মীনাক্ষীও আস্তে আস্তে রিসিভার নামিয়ে রাখে। সে জানত দাদুর শরীর খারাপ হয়েছে শুনলে পীয়েরও তারই মত উদ্বিগ্ন হবে। মীনাক্ষীর কাছে অনবরত দাদুর কথা শুনে শুনে ও আজকাল প্রায়ই বলে, এখন আমার কি মনে হয় জানো মীনা, তোমার দাদু যেন আমার খুব চেনা লোক। অনেক দিনের পরিচয় আমাদের। (ক্রমশ)

ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস

জব চার্ণকের বিবি

কলকাতা স্রষ্টা জব চার্ণকের প্রেমময় জীবন আলেখ্য। ॥ পাঁচ টাকা ॥

অর্চনা পাবলিশার্স

৮বি, রমানাথ সাধু লেন, কলিকাতা-৭

(সি ৯৯৩৮)

অভিনব নূতন উপন্যাস

"একটি জীবন"

বিংশ শতকের বলিষ্ঠ কিশোরের জীবনায়ন। বহু বিচিত্র সত্যঘটনা সম্বলিত চরিত্র অঙ্কনে এবং কথা বলার বিশেষ ভঙ্গীতে লেখক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

লেখকের প্রথম বই—

কৈলাস-মানসের পথে

২য় সংস্করণ ৩.৫০ নঃ পঃ

ভ্রমণ সাহিত্যে মূল্যায়নে বাংলা খ্যাতি অর্জন করেছে।

পরিবেশক : ডি. এম. লাইব্রেরী

৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট। কলিকাতা-৬

(সি ৯৩৩৮/২)

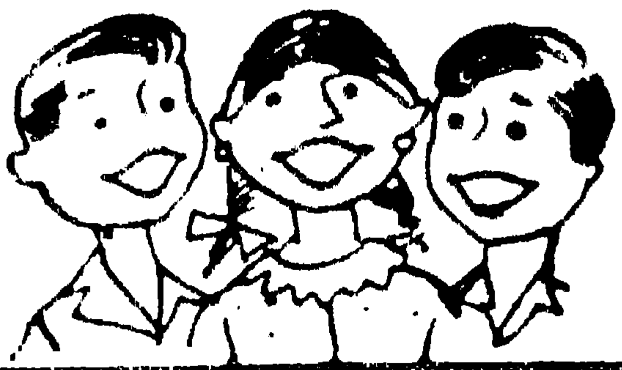

ব্রাউন এণ্ড পলসনের ব্লামাঞ্জ সকল শিশুরই প্রিয়

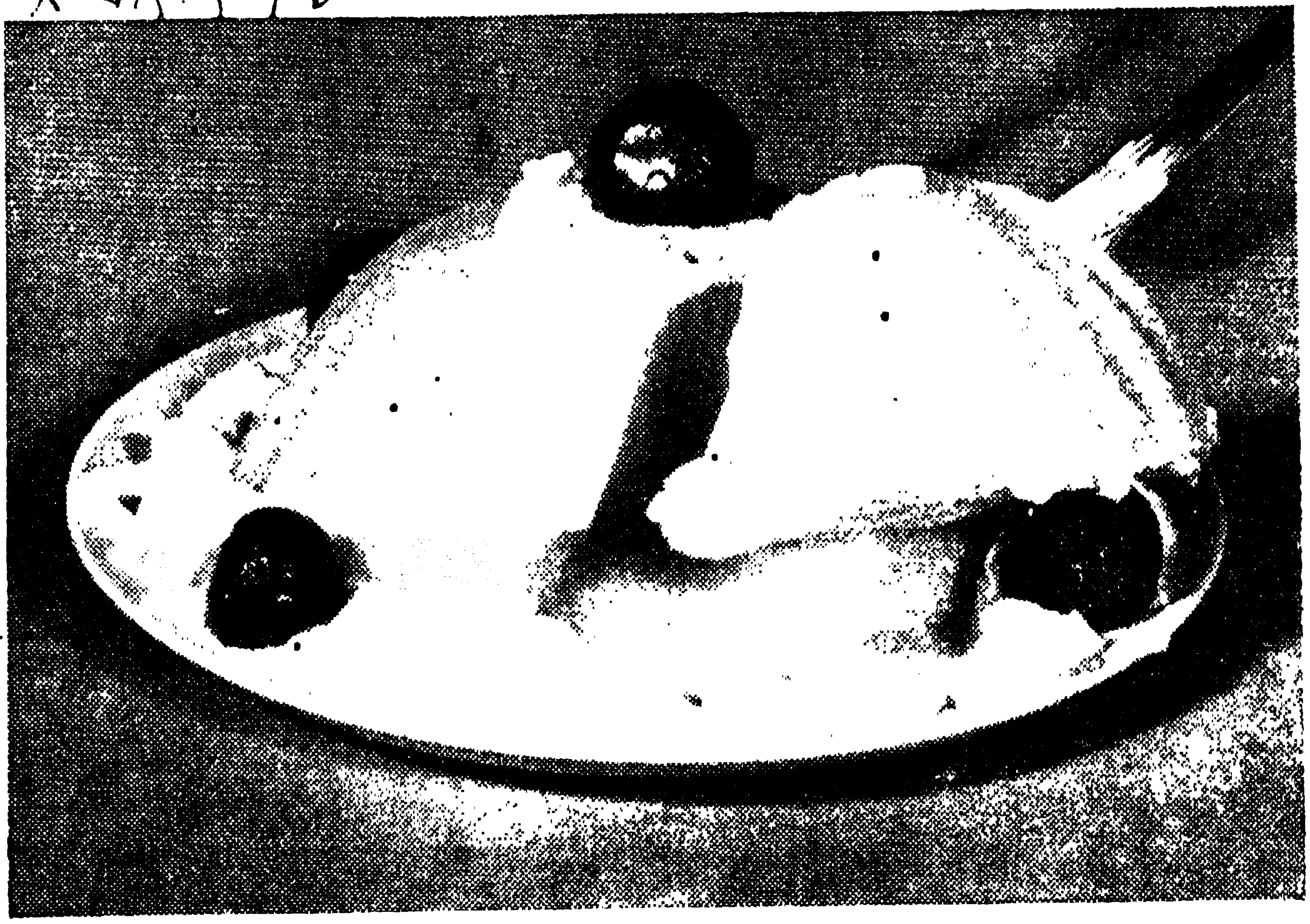

ব্রাউন এণ্ড পলসন ফ্লেভারড কর্ণফ্লাওয়ার

ব্লামাঞ্জ-নামী মিষ্টি মুখের মধ্যে সুন্দরভাবে মিলিয়ে যায়। আপনি যদি ব্রাউন এণ্ড পলসনের সুগন্ধি কর্ণফ্লাওয়ার দিয়ে মিষ্টি তৈরী করেন সব সময়েই সাফল্য লাভ করবেন। কারণ ব্রাউন এণ্ড পলসনের কর্ণফ্লাওয়ার সুন্দরভাবে মিলে যায়, এমন কি ঘন অবস্থাতেও মুখে ডেলা হয়ে থাকে না। পাঁচটি বিভিন্ন সুন্দর গন্ধে পাওয়া যায়। ভ্যানিলা, রাস্পবেরি, কারমেল ষ্ট্রবেরি এবং পাইনঅ্যাপেল। ব্রাউন এণ্ড পলসনের তৈরি অন্যান্য জিনিষ - পেটেন্ট কর্ণফ্লাওয়ার রেক্সজেলি, ভ্যারাইটি কাস্টার্ড এবং কাস্টার্ড পাউডার।

ব্রাউন এণ্ড পলসন্‌ ফ্লেভারড কর্ণফ্লাওয়ার

কর্ণপ্রোডাক্টস কোং (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ

বিনামূল্যে: এই কুপন পূর্তি করে পাঠালে বিনামূল্যে অপূর্ব সুন্দর নূতন রন্ধনপ্রণালীর বই ইংরাজী, হিন্দী, তামিল, তেলেগু, গুজরাটি, মালায়ালম, বাংলা, মারাঠি এবং উর্দু ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় পাবেন। (যে ভাষায় চাই সেটি রেখে অন্যান্য ভাষার নাম কেটে দিন)

ডাকের জন্য ২৫ নয়া পয়সার একটি স্ট্যাম্প জুড়ে দিচ্ছি

মিঃ/মিসেস/মিস ....

....

ঠিকানা ....

....

ডিপার্টমেন্ট নং DSH-1
কর্ণ প্রোডাক্টস কোং (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড,
পোঃ অঃ বক্স নং ৯৯৪, বোম্বাই-১
এ প্রস্তাব শুধু ভারতের জন্য

ভারতের প্রতিনিধি : প্যারী এণ্ড কোং লিমিটেড

পুস্তক পরিচয়

সাহিত্য আলোচনা

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস। অজিত দত্ত। জিজ্ঞাসা। ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯। মূল্য বারো টাকা।

বাংলা সাহিত্যের কোনো বিশেষ রসোৎকর্ষ মাত্র বিচার্য করে বৃহৎ গ্রন্থ, যতদূর জানি, বিশেষ নেই। সাহিত্যের বিভিন্ন ব্যক্তি বা বিভিন্ন শ্রেণী নিয়ে গবেষণা এবং আলোচনা হয়েছে, কিন্তু সাহিত্যের কোনো একটা গুণ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চোখে সাধারণত পড়ে না। সেদিক থেকে এই বইটি সাহিত্য-পাঠকের কাছে এক নতুন ঔৎসুক্যের সঞ্চার করবে। বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে এমনি ধরনের বিস্তৃতির অনুসন্ধান বাঞ্ছনীয়।

আমাদের দেশে তথ্য-সংকলন বা প্রশ্নবোধক অনুসন্ধান এবং গবেষণা সমার্থক। সংকলনের স্তর অতিক্রম করে সুসম্বন্ধ সামগ্রিক ধারণায় পৌঁছতে সাহায্য করাই গবেষকের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। প্রথম পর্যায়ে যেমন তথ্য-সংকলনের শ্রম স্বীকার থাকবে, পরবর্তী পর্যায়ে তেমনি থাকবে এক অন্তর্দৃষ্টি। •আমরা অনেক সময় অন্তর্দৃষ্টিকে চমকপ্রদ কথা বলবার প্রবৃত্তি বলে ভুল করি। সিদ্ধান্ত নতুন হতে পারে, কিন্তু তা যে উদ্ভট হবে এমন কথা নিশ্চয়ই স্বীকার্য নয়। অতিশয় নতুন কথাও সহজ যুক্তিপারম্পর্যে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। 'বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসে' নতুন কথা যথেষ্টই আছে। চমৎকার রসবোধের সঙ্গে প্রকৃতিস্থতার সমন্বয় পাঠককে মুগ্ধ করবে। বইখানি তথ্যে ঠাসা, তবে তথ্যের উদ্ধৃতিতে বিশেষত্ব আছে। অজিতবাবুর দৃষ্টি মূলত রস-সমালোচনার দিকে নিবদ্ধ থাকায় তথ্য বাছাইয়ে তিনি প্রয়োজনানুযায়ী সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। অজ্ঞাত অখ্যাত সাহিত্যমূল্যহীন অকিঞ্চিৎকরতায় পাঠককে তিনি বিভ্রান্ত করেননি। অথচ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন সাহিত্য বিভাগগুলির ধারাবাহিক আলোচনায় গ্রন্থখানি সমৃদ্ধ করেছেন।

উল্লেখযোগ্য এই যে, সমগ্র মধ্যযুগের আলোচনা তিনি মাত্র একটি অধ্যায়ে আটাশ পৃষ্ঠায় সেরে নিয়েছেন। মুকুন্দরাম, **ভারতচন্দ্র এবং নবযুগের সূচনায়** ঈশ্বর গুপ্ত ছাড়া আধুনিক-পূর্ব যুগের সাহিত্য পদবাচ্য হাস্যরস দুর্লভ। এই পথ-নির্বাচনেই পাঠক লেখকের দ্বিধাহীন সাহিত্যিক মানের আভাস পাবেন। এর পর 'নবযুগের কবিতা, নবীন নাটকের আবির্ভাব, গদ্যের প্রথম যুগ, রবীন্দ্রনাথ' এবং 'রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য'—এই কয়টি ভাগে হাস্যরসের নানা রীতিভঙ্গির প্রকাশ দেখানো হয়েছে। প্রথমেই 'অবতরণিকা' অধ্যায়ে লেখক হাস্যরসের সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য সংস্কৃত সাহিত্যে এর স্থান, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিতে হাস্যরসের তুলনা ইত্যাদি তত্ত্বগত আলোচনা করে নিয়েছেন। বাংলার হাস্যরসিক সাহিত্যিকদের আলোচনায় অজিতবাবুর যে বৈশিষ্ট্য সহজেই দৃষ্টিগোচর হবে তা এই যে, হাস্য-রস বস্তুটা তাঁর মতে কোনো শিল্পীর একটা আকস্মিক বিচ্ছিন্ন সৃষ্টি নয়—সমগ্র ব্যক্তির এবং জীবন-দৃষ্টিরই সেটা প্রকাশ। সেইজন্যে লেখক হাস্যরসিকদের জীবনী প্রসংগত আলোচনা করেছেন, তেমনি তাঁদের অন্যবিধ রচনার উল্লেখ এবং সম্পর্ক বিচার করেছেন। ফলে নিছক হাস্যরসের বিচার ছাড়াও বাংলা সাহিত্যের এক ব্যাপক ধারাবাহিক রস-বিচার এতে পাওয়া যাবে। একজন প্রখ্যাত শ্রদ্ধেয় কবির হাতের এত বড়ো সাহিত্য-সমালোচনা পাঠকদের মধ্যে যে গভীর আগ্রহের সৃষ্টি করবে, তাতে সন্দেহ নেই।

লেখকের সিদ্ধান্তগুলিও ইংরেজিতে যাকে বলে 'রিফ্রেশিং'। সিদ্ধান্ত গ্রহণে লেখকের দুঃসাহস আছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ

অধ্যাপক শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
• আলোচনা-গ্রন্থ •
কবিগুরুর রক্তকরবী ॥ ৩·২৫ ॥
। সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ।
বঙ্কিম-জিজ্ঞাসা ॥ ৩·২৫ ॥
সিগনেট • বিদ্যোদয় • শান্তি লাইব্রেরী
॥ সূর্যভারতী : ৪৮-সি, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা-১৪ ॥

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরীর
অবিস্মরণীয় উপন্যাস
সোম সবিতা
আত্মত্যাগের অম্লান জ্যোতিতে উদ্ভাসিত এক বিচিত্র নারী চরিত্র। একই আকাশে চন্দ্রসূর্যের আকর্ষণ-বিকর্ষণেও লক্ষস্থির ধ্রুবতারা—আপন দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল।
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। মূল্য ৪,
অটোপ্রিন্ট অ্যান্ড পাবলিসিটি হাউস
৪৯ বলদেওপাড়া রোড, কলিকাতা—৬

নাটক
ভাবছি মনে হাসছি কেন?
থাকব হাসি ত্যাগ করে
ভাবতে গিয়ে ফিকফিকিয়ে
ফেলছি হেসে ফ্যাক করে
অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের
নবতম পূর্ণাঙ্গ প্রহসন
মৌণ মুখর মূল্য ২,
নাচে গানে সুরে আশ্চর্য এক হাসির নাটক
নচিকেতা মূল্য ১·৫০
"ভগবান বুদ্ধের আদর্শে অনুপ্রাণিত স্বাধীন ভারতবর্ষ আশা করি এ নাটকের যথার্থ মহিমা উপলব্ধি করতে পারবে"
—দেশ
থানা থেকে আসছি মূল্য ২,
একাংক রচনার যাদুকর মন্মথ রায়ের
ফকিরের পাথর ও নাট্যগুচ্ছ ২,

একাধিক সমালোচকের সঙ্গে তাঁর মত-পার্থক্য আছে, এমনকি, 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো সাহিত্য-সম্রাটের বিধানকেও তিনি মেনে নিতে পারেন নি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে লেখক বঙ্কিম সম্পর্কে যে ইঙ্গিত করেছেন, সেটা অসংগত বলেই মনে করি। 'কৃষ্ণচরিত্রে' আলোচনায় বঙ্কিম কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অনুবাদের সশ্রদ্ধ ঋণ স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু সেজন্য তাঁর সাহিত্যিক বিচারবোধে হুতোম প্যাঁচার নকশাকে গ্রহণের অযোগ্য মনে হলেও অপ্রশংসা করা অনুচিত—এই রীতি ঠিক কি? ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অমৃতলাল বসু সম্পর্কে প্রচলিত মতেরও প্রতিকূলতা অজিতবাবু নির্ভীকভাবেই করেছেন আবার ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অপেক্ষাকৃত স্বল্প আলোচিত লেখকদের তিনি নতুন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রবীন্দ্রোত্তর আলোচনাতেও পাঠক নতুন চিন্তার খোরাক পাবেন। অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু এবং সুকুমার রায়ের আলোচনা পড়লাম। এঁদের বিশেষত শেষের দুজন সম্পর্কে বিশুদ্ধ সাহিত্যিক রসবিচার সেরকম কোথাও দেখিনি। সুকুমার রায়-সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যুগের কিছু কিছু নতুন তথ্য লেখক দিয়েছেন, যেগুলির মূল্যবত্তা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশই নেই। প্রসংগত বলা দরকার, ৪৬৬ পৃষ্ঠায় শ্রীকাপিঞ্জল সম্পর্কে অজিতবাবু বলেছেন, 'ইনি কে, এখনও জীবিত কিনা তা এই লেখকের জানা নেই।' সৌভাগ্যক্রমে শ্রীকাপিঞ্জল জীবিত। ইনি হচ্ছেন কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

এই বইখানির একটি গুণ অবশ্যই উল্লেখযোগ্য—এর ভাষা। সমস্ত রকম উৎকেন্দ্রিকতাবর্জিত স্পষ্ট ঋজু ভাষা—কোথাও বিন্দুমাত্র ধোঁয়াটে ভাব নেই। ভাষার মারপ্যাঁচ বা মতামতে শ্যাম ও কুল রাখবার মতো চিন্তাদৈন্যও কোথাও নেই। সমালোচনার এই নিরাবেগ অথচ বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বে সমুজ্জ্বল এই ভাষা পাঠকের অন্তরে গভীর প্রভাব রেখে যায়। লেখক যেমন পরিচ্ছন্ন শুচি হাস্যরসের পক্ষপাতী, তাঁর ভাষাতেও তিনি সেই পরিচ্ছন্নতা, শুচিতা এবং ভারবর্জিত চলিত রীতির আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। প্রমথ চৌধুরীর আলোচনাটি পড়লেই লেখকের ভাষার আদর্শ কি, বুঝতে পারা যায়।

'বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস' নিঃসন্দেহে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের একটি স্মরণীয় গ্রন্থ। শুধুই যে ছাত্রদের প্রয়োজন মেটাবে তা নয়, অন্য পাঠকরাও পড়ে খুশি হবেন। প্রকাশক ছাপা বাঁধাইয়ে কোথাও ত্রুটি রাখেন নি। ৫৩৪।৬০

চরিত কথা

বিদ্যাসাগর পরিচয়—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—২ টাকা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বিদ্যাসাগর বক্তৃতামালার' প্রবন্ধ আকারে বিদ্যাসাগর পরিচয় নামে প্রকাশিত।

বিদ্যাসাগর পরিচয় গ্রন্থে (১) প্রতিবেশ ও সমসাময়িক কাল, (২) শিক্ষা সংস্কারে বিদ্যাসাগর, (৩) শিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগর, (৪) সাহিত্য সাধনায় বিদ্যাসাগর এবং (৫) সমাজহিতে বিদ্যাসাগর শীর্ষক বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। আবার প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য কৃতী পুরুষদের ভাবনা-চিন্তা ও কর্মপ্রণালী নতুন তথ্যসহকারে পরিবেশিত হয়েছে। রামমোহন এদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কী ধারণা পোষণ করতেন; দেশের রাজনৈতিক মতামতের ক্ষেত্রে তিনি কোন আদর্শের দ্বারা চালিত হতেন প্রভৃতি বিষয় নিপুণ গবেষক শ্রীযুক্ত বাগল এই গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। অবশ্য এই সব আলোচনা বিদ্যাসাগরকে কেন্দ্রীভূত করেই হয়েছে।

বিদ্যাসাগর পরিচয়ে লেখক প্রমাণ করেছেন যে, গত শতাব্দীর নব জাগরণের মূলে যে কয়টি বিষয় গভীরভাবে কাজ করেছে তার মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষাকে সহজ ও সাধারণগম্য করে তোলা প্রধান। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই এই প্রধান বিষয়টিতে অভূতপূর্ব কৃতিত্ব দেখিয়ে গেছেন। প্রতীচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারাকে বাঙ্গালী-মনে সঞ্চারিত করার

মাসিক পত্রিকা যাঁরা পড়েন ও যাঁরা বেচেন তাঁদের ঠিক মনের মত

মানসী

শীঘ্রই প্রকাশিত হতে চলেছে

● মানসীর আকর্ষণ ●

— প্রতি সংখ্যায় —

- বাংলা কথাসাহিত্যের দিকপালদের অনেকগুলি গল্প উপন্যাস
- ভারতীয় কথাসাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ গল্পের অনুবাদ
- রম্যরচনা, মনোরম প্রবন্ধ
- রূপালী পর্দা ও মঞ্চের রঙীন পৃথিবী
- রস রচনা, ব্যঙ্গকৌতুক, কার্টুন রকমারী ফিচার
- মানসীর প্রত্যেকটি লেখা সচিত্র। পাতায় পাতায় রঙ ও রেখার সৌন্দর্য। প্রতি সংখ্যায় কভার হবে বহু রঙের মনের মত একটি ছবি আর্ট পেপারে ছাপা।

মানসীর বৃহত্তম আকর্ষণ—তার দাম কম অথচ সবচেয়ে সুন্দর

মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড

পি ৫৯, সি-আই-টি রোড
কলিকাতা—১৪

(সি ৯৯৯১)

জন্যে যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যই সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম—তা বিদ্যাসাগর যেমন মনেপ্রাণে অনুভব করতেন, তেমনি যথাশক্তি তা কার্যকর তিনিই করে তুলেছিলেন—একথা প্রমাণ করে লেখক বলেছেন যে, "এই সকল কারণে গত শতাব্দীর নব জাগৃতির কথা প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামই সর্বাগ্রে আমাদের মনে উদিত হয়।"

বিভিন্ন ঘটনার উদ্ধৃতির সাহায্যে লেখক দেখিয়েছেন যে, দেশের উন্নতির ক্ষেত্রে তিনি যেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তেমনি বারবার তাঁর নিজের জীবনও বিপন্ন হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনেও তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য। সাহিত্যানুরাগ থাকলেও দেশহিতের জন্যে তাঁর যে সাহিত্য চর্চা—তাও অসামান্য প্রতিভাধর পুরুষের পক্ষেই সম্ভব।

যাই হোক, বিদ্যাসাগর সম্পর্কে আজকাল বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সে সকল গ্রন্থের কথা মনে রেখে ও একথা বলা যায় যে, লেখক আলোচ্য গ্রন্থে যুগ-রেখার পটভূমিতে বিদ্যাসাগরের পরিচয় প্রকাশ করে তাঁকে যুগবৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যাঁরা ঊনিশ শতকের এই বিশেষ অধ্যায়টি নিয়ে গবেষণা করতে চান, তাঁদের পক্ষে আলোচ্য গ্রন্থটি বিশেষ সহায়ক হবে। ১১০।৬০

গল্প সংকলন

সজনীকান্ত দাসের স্বনির্বাচিত গল্প : গ্রন্থম্, কলিকাতা—৬। দাম পাঁচ টাকা।

সম্পাদক সজনীকান্ত দাস কবিতা, গল্প, উপন্যাস, ব্যঙ্গরচনা, কাহিনীকাব্য, প্রবন্ধ ইত্যাদি নানা শাখায় লেখনী চালনা করেছেন। ১৯২৫ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তাঁর লিখিত গল্পের সংখ্যা প্রায় একশ। তার মধ্যে চব্বিশটি নির্বাচিত গল্প নিয়ে এই সংকলন। গ্রন্থের নামেই প্রকাশ, গল্পগুলি তিনি নিজে বেছে দিয়েছেন।

বিংশ শতকের উপর্বে লিখিত এই ত্রিশটি বছর বাংলাসাহিত্যের গল্পশাখার ক্ষেত্রে স্মরণীয় সময়। বিষয়বস্তু, রচনাশৈলী ও দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনব বৈচিত্র্য ও সৌকর্যে এই সময়ে লিখিত ছোট গল্পের বিস্ময়কর বিকাশ ঘটেছে। একালের এমন অনেক লেখক সাহিত্যসৃষ্টিতে ভাস্বর হয়েছেন, বাংলাসাহিত্যকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করেছেন, যাঁরা একদা প্রত্যক্ষভাবেই সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও তাঁর আক্রমণের পাত্র হয়েছিলেন। এই আঘাত আদর্শগত ছিল এই বিশ্বাস নিয়ে এই অনুজ সমালোচক আলোচ্য বইয়ের প্রত্যেকটি গল্প অত্যন্ত উৎসুক আগ্রহে পাঠ করেছে।

গল্পসাহিত্যের অত্যন্ত সমৃদ্ধকালে এই সমালোচক আজন্ম নিশ্বাস নিয়েছে বলেই হয়ত আলোচ্য গল্পগুলিকে যুগোপযোগী মনে হয়নি। গল্পগুলির মধ্যে ১৯৫৩ সালে লিখিত 'বিদ্যুল্লতা' সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে। স্বয়ং লেখকও এই গল্পটিকে প্রথম স্থান দিয়েছেন। এই সমালোচকের ধারণা, ব্যঙ্গকবিতা ও কাব্যকাহিনী রচনাতেই সজনীকান্ত দাসের প্রতিভা সর্বাধিক বিকশিত হয়েছে।

পরিশেষে একটি বিষয় জানাই। 'এক আনার ডাকটিকিট', গল্পে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, 'গল্প লিখবার উদ্দেশ্য অর্বাচীনকে শিক্ষা দেওয়া।' সেই জ্ঞানের

মানুষ গড়ার কারিগর

মনোজ বসু
নব মুদ্রণ : ৫.০০

শিক্ষানায়কদের আর একটি অভিমত:

"শিক্ষাজগতের সকল গ্লানি একদিন দূরীভূত হবে, সেদিনের পাঠককুলও সমাদরে এই বই উপন্যাস পাঠ করবেন। [illegible] যেমন [illegible] এই [illegible]।"

[Bulletin of the W. B. Head Master's Association April-May 1960]

বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রা) লিমিটেড : কলিকাতা—১২

নব-বৃন্দাবনের পর

আসামী কারা ?

নীলকণ্ঠের নতুন বই সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশ করছে এই সপ্তাহের শেষে

নব প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ দুটি গ্রন্থ

সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস

সুন্দরী কথা-সাগর ৫-৫০

কবে কোন অতীতে মহারাজা চন্দ্র দেবী ভবসুন্দরীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। জন্ম-জন্মান্তরের অন্ধকার সেতু পার হয়ে একালে চন্দ্রের জীবনে আবার সেই দেবীর ছায়া পড়েছিল। সেই অপরূপ ছায়া চন্দ্রের জীবনের অর্থ বদল করে দিয়েছিল, তার জীবনে নূতন রঙ ধরিয়েছিল, নোতুন গান এনেছিল।

যে বই শেষ করে
ওঠার আগে ছাড়া যায় না—
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
বিচিত্র অবদান

জানালার ধারে ৪-০০

শ্রীগুরু লাইব্রেরী—২০৪ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলি ৬। ফোন: ৩৪-২৯৮৪

ভারততীর্থ
বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
পাঞ্জাব ও দক্ষিণ ভারতের মনোহারী চিত্র। টাকা ২·০০

মহাসোভিয়েট
মৈত্রেয়ী দেবী রচিত রুশ ভ্রমণ কাহিনি।
বর্তমান রাশিয়ার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন আলেখ্য। টাকা ৩·৫০

আবরণ
সমারসেট মম-এর সার্থক উপন্যাস দি পেণ্টেড ভেইল-এর পূর্ণাঙ্গ ও সাবলীল অনুবাদ। টাকা ৩·০০

বিচিত্রা
৬ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলিকাতা

ভার যখন লইয়াছি"...ইত্যাদি। প্রায় প্রত্যেকটি গল্পেই এই মনোবৃত্তি স্পষ্ট। কিন্তু পাঠকমাত্রই কি অর্বাচীন অথবা অর্বাচীনকে শিক্ষা দেবার জন্যই কি দেশ-বিদেশের লেখকরা গল্প লেখেন?

১৬৭।৬০

স্মৃতিকথা

আমার শিল্পী জীবনের কথা। আব্বাসউদ্দীন আহ্‌মদ। স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ভিক্টোরিয়া পার্ক, ঢাকা ১। চার টাকা।

দেশসঙ্গীত, বিশেষত পল্লীগীতির গুণগ্রাহীদের কাছে শিল্পী আব্বাসউদ্দীন আহমদের নাম অশ্রুত নয়। এমন সুর-সমৃদ্ধ দরদী কণ্ঠ, যা শুধু সংগীতেই শেষ নয়, রূপ থেকে অরূপের দিকে নিয়ে যেতে পারে; সচরাচর শুনতে পাই না। আমাদের দুঃখ, এই গুণী শিল্পী বর্তমানে জীবিত নেই। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থ সেই মহান, নিষ্ঠ শিল্পীর আত্মকথা। তাঁর অতীত জীবন স্বচ্ছন্দ ও সুসংগত নয়, নানা সংগ্রামে বিচিত্র; এবং শিল্পী হিসেবে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত হবার পরও ঘটনাবহুল। এই গ্রন্থে তাঁর আমৃত্যু স্মৃতির সঞ্চয় অক্ষয় রূপ পেয়েছে। প্রথম গানের প্রেরণা, কলেজ-জীবন, শিল্পীর আসনে, নব-জাগরণে বাংলার মুসলমান, উত্তরকাল, বিদেশ ভ্রমণ ও জীবন সায়াহ্নের স্মৃতি—এই সাতটি অধ্যায়ে এই গ্রন্থ বিভক্ত। পরিশেষে তাঁর রেকর্ডসমূহের একটি [illegible] তালিকা। শিল্পীর একটি ছবি এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে।

প্রসংগত একটি কথা বলা প্রয়োজন। আব্বাসউদ্দীনের শিল্পসাধনা ছিল গান। কিন্তু তাঁর ভাষা এত সাবলীল ও মধুর যে, পড়তে পড়তে বিস্মিত হতে হয়। অক্ষরে না হোক, আন্তরিক চর্চার ফলেই বোধহয় এমন সম্ভব। একটি অপূর্ব স্মৃতিচারণ হিসেবে বর্তমান গ্রন্থকে সুসাহিত্যের মর্যাদা দেয়া চলে। শিল্পীর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থটির সম্পাদনা করেছেন শিল্পীর পুত্র জনাব মোস্তফা কামাল। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। পূর্ব-বাংলায় যে এমন সুমুদ্রিত, রুচিসম্মত গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব, তা জানা ছিল না। আমরা এই অমূল্য গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

২০৩।৬০

উপন্যাস

পট ও পুতুল—বসন্ত সেন। প্রকাশক—টি এস বি প্রকাশন, ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—২·৫০ টাকা।

প্রেমের ত্রিকোণ কাহিনী উপন্যাসের চিরন্তন বিষয়বস্তু। এ-উপন্যাসে সেই ত্রিকোণ আছে কিন্তু তা চিরন্তন প্রেমকে আশ্রয় করেনি। রমলা বা মন্দাকিনী কাউকেই সুকান্ত প্রাণ ঢেলে ভালোবাসেনি। অন্যদিকে সুকান্তকে ভালোবেসে প্রবঞ্চনাকে চিনতে ভুল করেনি রমলা। আর মন্দাকিনী যে শেষ পর্যন্ত সুকান্তকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিলো তা নিতান্তই প্রেমের তাড়নায় নয়, জীবনের একটি অবলম্বন পাওয়ার আশায়। অর্থাৎ সমস্ত কাহিনীর মধ্যে প্রেম বস্তুত কোথাও নেই, যদি কিছু থাকেও তবে তা প্রেমের অভিনয়মাত্র।

কাহিনীর নায়ক এক কথায় একটি উচ্চ শিক্ষিত লম্পট। সে ভালোবাসে না, অথচ মোহের মাদকতায় নিজের স্ত্রীকে হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করে না। এমন মানুষ সমাজে নেই তা নয়, কিন্তু এমন একটি

বাংলা ভাষার সবশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা
গল্প-ভারতী

গল্প-ভারতী অতি অল্পদিনের মধ্যে সমসাময়িক সাহিত্য জগতে যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছে তাহা অভূতপূর্ব।
গল্প-ভারতী নবজাগ্রত জাতির মর্মবাণী মর্মকাহিনী সকল শ্রেণীর নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যিকদের মিলনতীর্থ।
গল্প-ভারতী সরস সাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতির অন্তরের ব্যথা ও বেদনার কথা আপনার নিকট পৌঁছাইয়া দিতেছে।
গল্প-ভারতী নূতন যুগের চিন্তার দ্বারকে উন্মোচন করিয়া দিয়াছে।
গল্প-ভারতী অনুবাদ সাহিত্যে নূতন ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছে।
গল্প-ভারতী বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের মান উন্নীত করিয়াছে।
গল্প-ভারতীর প্রত্যেক পাতা স্থায়ী সাহিত্যের দাবী করে।

গল্পভারতীর বিশেষ
উল্লেখযোগ্য নূতন নূতন আকর্ষণ
• একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস • সচিত্র রবীন্দ্রপাঠচক্র ও রবীন্দ্রযুগ • সচিত্র সংযোজন
• বহু নূতন নূতন ফিচার।

গল্প-ভারতীর গ্রাহক হওয়া মানে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিকে সাহায্য করা। [illegible] বৎসর আরম্ভ। যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। বার্ষিক [illegible] মাত্র ১৫্।
ভারতের সর্বত্র যেখানে আমাদের এজেন্ট নাই এজেন্ট আবশ্যক।
প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য মাত্র ১্
২৩/২বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬
ফোন: ৩৫-৩২৯৪

চরিত্রকে কেন্দ্র করে উপন্যাস রচনা করতে বসলে যে সব বাধা সামনে পড়তে পারে, লেখক সে সব বাধাকে উত্তীর্ণ হতে পারেননি। ফলে রচনায় প্রচুর কল্পনা ছড়িয়েও সমস্ত কাহিনী পাঠকের মনকে দোলা দেয় না। ৪৬১।৬০

বিবিধ

মহিষাসুরমর্দিনী রচনাঃ বাণীকুমার। সুর ও স্বরালাপঃ পঙ্কজকুমার মল্লিক, স্বরানুলিখনঃ প্রভাতকুমার মিত্র। প্রাপ্তিস্থানঃ—দাশগুপ্ত অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ, ৫৪।৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ৬.৫০ নয়া পঃ।

উপরোক্ত গ্রন্থ বিবিধ রাগ, ভাবগর্ভ বিষয় এবং বেদ পুরাণাদি থেকে শ্লোকাবলী সংগৃহীত হয়েছে। তাছাড়া এর মধ্যে আছে সঙ্গীতের সম্বন্ধে বৈদিক ও তান্ত্রিক [illegible] চণ্ডীর প্রাচীন সম্বন্ধে [illegible] এই মহিষাসুরমর্দিনী সুসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। [illegible] এই গ্রন্থে [illegible] অপরিহার্য। ৩৮২।৬০

Our struggle. Moni Ghosh. Das Gupta & Co. (Private) Ltd, 54/3 College Street. Calcutta—12. Price Rs. 3.00.

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির মধ্য দিয়ে দ্রুত উন্নয়নের দিকে দেশ যখন এগিয়ে চলেছে, তখন তারই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য গ্রন্থটি মূল্যবান। ধর্মঘট ও শ্রমিক আন্দোলনের পটভূমিকায় গ্রন্থটি রচিত, এবং শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যারা জড়িত তারা উক্ত গ্রন্থটি থেকে সঠিক পথের নির্দেশ পেতে পারেন। কেননা উন্নয়নের যুগে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে না গেলে কোনো পরিকল্পনাই সাফল্য লাভ করতে পারে না। লেখক নিষ্ঠার সঙ্গে জামসেদপুরে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস ও শিক্ষাকে বিশ্লেষণ করেছেন। ৪১১।৫৯

স্মৃতি-তীর্থ। শিক্ষাব্রতী বেণীমাধব দাসের রচনা ও জীবন কথার সংকলন। প্রকাশিকা বীণা ভৌমিক, ১৭এ, একডালিয়া প্লেস, কলিকাতা ১৯। মূল্য ২৲।

এই গ্রন্থে শিক্ষাব্রতী বেণীমাধব দাসের বিবিধ রচনা সংকলিত হয়েছে; রচনাসমূহে শিক্ষাব্রতীর জীবনের আদর্শ ও জীবনদর্শন সুপরিস্ফুট। এর মধ্যে চট্টগ্রামের নববর্ষবরণ, নবযুগের সাধনার ধারা, এবং ইংরেজীতে লিখিত রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দুইটি রচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থশেষে বেণীমাধব সম্বন্ধে অনেকগুলি রচনা আছে। তার মধ্যে দুটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়, একটি যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির, অপরটি সুভাষচন্দ্র বসুর। ১৯০৩ সালে বেণীমাধব কটকে কটক কলেজে শিক্ষকতা করতে যান, সেই সময়ের কথা লিখেছেন বিদ্যানিধি মহাশয়। সুভাষচন্দ্র তাঁর ছাত্র, লিখেছেন, "শিক্ষকদের মধ্যে একজনই মাত্র আমার মনে স্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন। তিনি হলেন আমাদের প্রধান-শিক্ষক বেণীমাধব দাস।"

বইটি সকলের পড়ে দেখা উচিত। ৪৮৩।৬০

প্রাপ্তি-স্বীকার

একটুকু ছোঁওয়া লাগে—প্রণব রায়।
মৌন মুখর—অজিত গঙ্গোপাধ্যায়।
চিত্ত চকোর—সুবোধ ঘোষ।
পাড়ি—জরাসন্ধ।
বিদেহী—ধনঞ্জয় বৈরাগী।
শান্তি—রামরূপ বিদ্যাবাগীশ।
পথের বাঁকে—নির্মলনলিনী ঘোষ।
চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি—শংকরী প্রসাদ বসু।
চন্দন বহ্নি—শ্রীকালিদাস রায়।
নিশিগন্ধা—কল্যাণী চৌধুরী।
রায়-বাঘিনী—বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।
রূপমঞ্জরী—নরেন্দ্রনাথ মিত্র।
দর্পণে অনেক মুখ—পবিত্র মুখোপাধ্যায়।

ভ্রম-সংশোধন

গত সংখ্যা দেশে প্রকাশিত [illegible] আচার্যের প্রিয়ব্রতসেবিত [illegible] এইরূপ [illegible] দিয়ে [illegible] মুদ্রণ-প্রমাদবশত শেষ পঙ্‌ক্তিটি বাদ গেছে।

নতুনদিন সংখ্যা উল্লেখযোগ্য
সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সম্পূর্ণ উপন্যাস একফালি

রংজগৎ

চন্দ্রশেখর

রসচ্যুত পল্লী কাহিনী

নিউ থিয়েটার্স (একজিবিটারস) প্রাইভেট লিঃ নিবেদিত "নতুন ফসল" ছবিটির সঙ্গে ঐতিহ্যদীপ্ত নিউ থিয়েটার্স-এর স্মৃতি অনেকখানি জড়িয়ে রয়েছে। শুধুই স্মৃতি, গৌরবময় ঐতিহ্য নয়।

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর লেখা "ময়ূরাক্ষী", "গৃহকপোতী" ও "সোমলতা" নামে তিনটি গল্পের ভিত্তিতে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিনয় চট্টোপাধ্যায়।

ছবিতে গ্রাম্য মোড়ল-চাষী হারাণ ও তার স্ত্রী বিনোদিনীর দাম্পত্যজীবনকে ঘিরে একটি নাট্যকাহিনীর রূপদান করা হয়েছে। বিনোদিনী সুন্দরী। তাই হারাণের মনে একটি আশংকাই অকারণে থেকে থেকে দানা বেঁধে ওঠে। তার ভয়, বিনোদিনীর রূপ যদি নিমন্ত্রণ করে আনে কোন পরপুরুষকে।

দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে ছোট্ট তাদের সংসার। ছোট ছোট আশা ও কল্পনা, সুখ ও দুঃখের ভেতর দিয়েই কেটে যাচ্ছিল তাদের নানা রঙের দিনগুলি। একদিন কালবৈশাখীর মতোই এক সর্বনাশা ঝড় এসে ভেঙে দিয়ে গেল হারাণ-বিনোদিনীর সুখের সংসার। কুচক্রী গ্রামবাসীর চক্রান্তে একদিন বিষিয়ে তুললো হারাণের মন। তার মন বিশ্বাস করতে চায়নি, কিন্তু প্রতিবেশীরা তার স্ত্রীর কলঙ্কের যে প্রমাণ দিয়েছে তাকে তাও সে পারেনি অবিশ্বাস করতে। হারাণের দূর-সম্পর্কের ভাই তারাপদকে নিয়ে বিনোদিনীর সতীত্বে কলঙ্ক দিয়েছে প্রতিবেশীরা। উত্তেজনা ও সন্দেহের বশে নিদারুণভাবে বিনোদিনীকে অপমান করল হারাণ। অভিমানিনী একদিন কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে গৃহত্যাগ করে। অনুতপ্ত হারাণ খুঁজতে বেরোয় বিনোদিনীকে। নদীর তীরে বিনোদিনীর গায়ের চাদর দেখতে পেয়ে হারাণ ভেবে নেয় যে, স্ত্রী তার আত্মহত্যা করেছে। ছোট ছেলেমেয়ে দুটিকে হারাণ পাঠিয়ে দেয় তাদের মামার বাড়িতে।

এদিকে বিনোদিনী এসে আশ্রয় নেয় তার বাল্যসখী ললিতা ও তার বাউল স্বামী রসময়ের ঘরে, অন্য এক গাঁয়ে। ললিতার ভাই গৌরহরি ছিল বিনোদিনীর বাল্যসাথী, কৈশোরের দোসর, প্রথম যৌবনের প্রেমাস্পদ। হারাণের সঙ্গে বিয়ের আগে থেকে গৌরহরিকেই সে পতিরূপে বরণ করে নিয়েছিল তার অন্তরে। বিয়ের পর বিনোদিনী অসতী হয়নি, পতিকে ছাড়েনি, বরং নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে স্বামীর কাছে। কিন্তু গৌরহরির স্মৃতিকে মন থেকে মুছেও ফেলতে পারেনি সে। বিনোদিনী-বিরহে গৌরহরি সংসারে মন বসাতে পারেনি। বৈষ্ণবের জীবন নিয়ে সে প্রেমের গান গেয়ে বেড়ায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

বিনোদিনী যখন ললিতার গৃহে আশ্রিতা, তখন সেখানে একদিন উপস্থিত হল গৌরহরি। সে ভুল বুঝেছিল তার প্রেমাস্পদা বিনোদিনীকে। তাকে যেদিন সে জীবন-সঙ্গিনীরূপে চাইল, সেদিনই বিনোদিনী সখীর আশ্রয় ছেড়ে চলে এল নিজের ভাইয়ের কাছে। নতুন আশ্রয়ে বিনোদিনীর কপালে জুটলো শুধু অবজ্ঞা ও লাঞ্ছনা। এই দুর্ভোগের অংশীদার হল তার ছেলে-মেয়েরাও যাদের হারাণ রেখে গিয়েছিল তাদের মাতুলালয়ে। ভাইয়ের আশ্রয় যখন বিষ হয়ে উঠল বিনোদিনীর কাছে, তখন স্বামীর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর অন্য কোন পথ রইল না তার সামনে। কিন্তু অভাগিনী স্বামীর কাছে গিয়েও নিজেকে ধরা দিতে পারল না—যখন জানল স্বামী দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের জন্যে ব্যস্ত। বিনোদিনী ফিরে গেল আবার গৌরহরির কাছে। নিজেকে অবশেষে তার কাছে সমর্পণ করতে, তার আশ্রয়ের ভিক্ষায়। গৌরহরির মন তখন বন্ধনহীন প্রেমের আলোকে উদ্ভাসিত। শেষ পর্যন্ত গৌরহরি ও রসময়ের চেষ্টায় হারাণ ও বিনোদিনী আবার কী করে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হল তা নিয়েই চিত্রনাট্যের পরিণতি।

দর্শকেরা ছবিটি দেখার সঙ্গে সঙ্গেই এতে একাধিক সাহিত্যস্রষ্টার কয়েকটি

উত্তর কলিকাতা সঙ্গীত সম্মেলন

৩য় বার্ষিক অধিবেশন

১৪ই ডিসেম্বর হইতে ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৬০

মহাজাতি সদন

কণ্ঠসঙ্গীতে

ওস্তাদ আমীর খাঁ (বোম্বাই)
পণ্ডিত মল্লিকার্জুন মনসুর (ধারওয়ার)
পণ্ডিত বাসবরাজ রাজগুরু (ধারওয়ার)
শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী (কলিকাতা)
শ্রীমতী পদ্মাবতী গোখেল (নাগপুর)
শ্রীমতী মানিক বর্মা (বোম্বাই)
শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়ক (কটক)
ভারত সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ

কথক নৃত্যে

শ্রীমতী রোশনকুমারী
(বোম্বাই)

যন্ত্রসঙ্গীতে

ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ (কলিকাতা)
পণ্ডিত রবিশঙ্কর (দিল্লী)
শ্রীরাধিকামোহন মৈত্র (কলিকাতা)
শ্রীনিখিল ব্যানার্জী (কলিকাতা)
শ্রীশিশিরকণা ধরচৌধুরী (কলিকাতা)
পণ্ডিত কিষেণ মহারাজ (বেনারস)
পণ্ডিত রামস্বরূপ (দিল্লী)
শ্রীকানাই দত্ত (কলিকাতা)
শ্রীশ্যামল বসু (কলিকাতা)
[illegible]
ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ (কলিকাতা) ঐ
ওস্তাদ মহম্মদ সগীরুদ্দিন (কলিকাতা) ঐ
শ্রীবিশ্বনাথ বসু (কলিকাতা)
ডঃ সাজ্জাদ হোসেন ও সহশিল্পীবৃন্দ

॥ বিশেষ আকর্ষণ ॥

কলিকাতায় সর্বপ্রথম

মাদ্রাজ ভগ্নীত্রয়ীর আবির্ভাব

(শশী — কলা — মালা কর্তৃক)

ভারত নাট্যম ও ডান্সেস অফ ইণ্ডিয়া

প্রবেশ মূল্য: সিজন—২৫, ২০, ১৫। সাহায্যদাতা—৩৫, ৫০, ১০০, ও তদূর্দ্ধে
প্রাপ্তিস্থান: ৮, হরলাল মিত্র স্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা-৩, সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ১০টা (৫৫-২১৫৩)
অমৃতবাজার পত্রিকা, ক্লব বিভাগ, কলিকাতা-৩, সকাল ১০টা হইতে বেলা ৫টা (৫৫-৭২৩১ এক্সট ২১)
আনন্দবাজার পত্রিকা, পারসোনেল বিভাগ, কলিকাতা-১, সকাল ১০টা হইতে রাত্রি ৮টা (২৩-৩৩৫১)
শ্রীদুলাল কুণ্ডু, ৭৯, পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা-২০ (৪৭-২৮১০)

জনপ্রিয় কাহিনীর প্রভাব সহজেই আবিষ্কার করতে পারবেন। এই প্রভাব অথবা সচেতন অনুসরণ ছড়িয়ে রয়েছে ছবির ঘটনাপ্রবাহে, চরিত্রচিত্রণে ও সংলাপে। ছবির বাউল দম্পতির জীবনে সহজিয়া রস ও ভাবের যে আভাস ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা অপরিণত ও ভ্রান্ত কষ্টকল্পনার পরিচায়ক। পরস্পরের প্রতি তাদের আচরণ, কথাবার্তা ও তাদের জীবনধারণের রূপটিও রুচিবিগর্হিত। রুচি ও শালীনতা বোধকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে ছবির অনেক দৃশ্যে—বিশেষত পুকুরে বিনোদিনী ও ললিতার স্নান ও জলকেলির দৃশ্যে। এ-সব দৃশ্য কাহিনীর বিন্যাস ও বিস্তারে অপরিহার্য পরিণতির পথ ধরে আসেনি। চিত্রনাট্যকার ও সংলাপকর্তা ছবিটিতে যেমনি বৈষ্ণব মাধুর্য-রস ও পরকীয়াতত্ত্বের বিকৃত কল্পনার প্রত্যক্ষ প্রশ্রয় দিয়েছেন, চিত্রপরিচালক তেমনি দুটি নারীচরিত্রের উপস্থাপনে অসংযত যৌন-আবেদনকে সযত্নে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

অসংবদ্ধ চিত্রনাট্য ছবিটির সর্বাঙ্গীণ দীন নাট্যদশার জন্য সর্বাধিক দায়ী। তবুও ছবিতে বিশেষ নাট্যমুহূর্ত রচনার যে অবকাশ ছিল পরিচালক হেমচন্দ্র চন্দ তার সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি। ছবিতে দীর্ঘ অনাবৃষ্টির পর বারিবর্ষণ ও কৃষকদের আমোদ-আহ্লাদের দৃশ্যটি সুপরিকল্পিত। মামুলী ধারায় কাহিনীর বিন্যাস ও অতি-নাটকীয়তার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা এক বিশেষ শ্রেণীর দর্শকদের কাছে ছবিটিকে আদরণীয় করে তুলতে পারে।

ছবিটির প্রয়োগ-কর্মে বহু অসঙ্গতি ও বিসদৃশতা স্বল্পবুদ্ধি দর্শকদেরও নজর এড়ায় না। "পাম্প-শু" ও "ক্যালেণ্ডার" সম্পর্কে হারাণের অজ্ঞতা (যার আজন্ম নিবাস শহরের অনতিদূরে) হাস্যকর। বিনোদিনীর বেশভূষা, চলাফেরা ও কথাবার্তা মোটেই নিরক্ষর কৃষক-পত্নীর মতো নয়, এবং বিনোদিনীর পিতৃকুলকে যেরূপ সভ্য ও শিক্ষিত দেখানো হয়েছে, সেক্ষেত্রে তার পক্ষে হারাণের মতো চাষীর ঘরণী হয়ে আসাটাই অস্বাভাবিক। হারাণের সঙ্গে তার নিকট জ্ঞাতিভাই তারাপদর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সত্তার প্রভেদটিও অবাস্তব মনে হয়। এ-ক্ষেত্রে তারাপদ নয়, হারাণের চরিত্রটিই অবাস্তব। যার ভাই কলকাতায় থেকে লেখাপড়া শিখেছে, তার পক্ষে কলকাতায় চাষ-বাস হয় কিনা জিজ্ঞাসা করাটা অতি বড় বোকামিও হাসাবে। ছবিতে বাউল দম্পতিকে যেভাবে নেচে গান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেটা অস্থির-চিত্ত-প্রসূত লম্ফ-ঝম্প ব্যতীত আর কিছুই নয়। বাউল-নাচের সৌন্দর্য তাদের নৃত্যে যেন উপহসিত।

অভিনয়ের দিক দিয়েও ছবিটি আশানুযায়ী সমৃদ্ধ নয়। হারাণের চরিত্রটি কালী

এপেক্স ফিল্মসের "শূন নরনারী"-র মূল উপজীব্য একটি ট্রেনের কামরা। তারই অভ্যন্তরে এক কৌতুকজনক পরিস্থিতির মুখে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরীকে।

বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ে চিত্রনাট্যের দাবি অনুযায়ী নিপুণভাবে রূপায়িত। তাঁর অভিনয় সামগ্রিকভাবে মুদ্রা-দোষ বর্জিত না হলেও বিশেষ কয়েকটি মুহূর্তে তা মনে রেখাপাত করে। বিনোদিনীর রূপসজ্জায় সুপ্রিয়া চৌধুরীর অভিনয় মনোজ্ঞ। কিন্তু নাট্যমুহূর্তে তাঁর অভিনয় নিষ্প্রাণ। বিনোদিনীর প্রতি প্রণয়াসক্ত গৌরহরির চরিত্রে বিশ্বজিতের অভিনয় বিরহের অভিব্যক্তিতে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। বিনোদিনী ও গৌরহরির ভূমিকায় সুপ্রিয়া চৌধুরী ও বিশ্বজিতের অভিনয়ে যথাক্রমে বাংলা ছবির দুই জনপ্রিয় অভিনেত্রী ও অভিনেতার সচেষ্ট অনুকরণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। বাউল দম্পতি রসময় ও ললিতা চরিত্র দুটির রূপদান করেছেন যথাক্রমে নির্মল চৌধুরী ও বাণী হাজরা। শ্রী চৌধুরীর অভিনয় সাবলীল ও চরিত্রানুগ। শ্রীমতী হাজরার অভিনয় অতি-চাঞ্চল্যের দোষে দুষ্ট। দুটি শিশুচরিত্রে মালা রায় ও শ্রীমান লোকনাথের অভিনয় মনোজ্ঞ। পার্শ্বচরিত্রে অভিনয়ের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন অনুপকুমার, রেণুকা রায় ও রেবারাণী। অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রে রাজলক্ষ্মী দেবী, নীতীশ মুখোপাধ্যায় ও অমর মল্লিকের নাম উল্লেখযোগ্য।

ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ ও তাঁর যন্ত্রী-সংঘ রচিত ছবির আবহ-সংগীত পরিবেশানুগ হয়ে উঠতে পারেনি। পারিপার্শ্বিক প্রাণরূপের স্পন্দন তাঁদের সুররচনায় অনুপস্থিত। রাইচাঁদ বড়াল সুরারোপিত কয়েকটি গান শ্রুতিমধুর। তবে "আমার হৈমবতী" (হারাণের মুখে) গানটির সুরারোপ এ-ছবিতে বেমানান। নির্মল

চৌধুরী সুরারোপিত ছবির লোকসংগীত ছবির এক বিশেষ আকর্ষণ। শ্রী চৌধুরীর গাওয়া গানটি বেমানান ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া ... বেশী ... গান ... রাখে।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজে

থিয়েটার সেণ্টার

... আর হবে না দেরী

... মিত্র ... রায় ... নৃপেন চৌধুরী ... অমর ঘোষ ... বন্দ্যোপাধ্যায়, বনানী চৌধুরী, ... রায়, ... পরিমল, ... মমতা, তারাপদ, ... ও দীপান্বিতা রায়

শুভারম্ভ ১৫ই ডিসেম্বর

কয়লা খনিতে মাটির বারোশ' ফুট
নীচে খাদের রহস্যময় পরিবেশে
শ্বাস-রোধকারী আশ্চর্য অভিনয় ও
প্রয়োগ-পরিকল্পনার জন্য

অঙ্গার

সুর—রবিশঙ্কর
পরিচালনা—উৎপল দত্ত
লোকসংগীত—নির্মল চৌধুরী
উপদেষ্টা—তাপস সেন

মিনার্ভা থিয়েটারে

প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ৬॥
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন ৩ ও ৬॥

(সি ৯৮৯২)

অমূল্য মুখোপাধ্যায় (আলোকচিত্র) এবং অতুল চট্টোপাধ্যায় ও সুজিত সরকার (শব্দানুলেখন) প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সুনীতি মিত্রের শিল্পনির্দেশ যথাযথ। সর্বাঙ্গীন আঙ্গিক-গঠনে ছবিটিতে উন্নতির অবকাশ রয়েছে।

কনে যাচাই

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত রচিত প্রণয় ও কৌতুকাশ্রয়ী একটি কাহিনীর ভিত্তিতে তৈরী মন্ডী ইণ্টারন্যাশনাল-এর "বিয়ের খাতা" ছবিটি।

কাহিনীর নায়ক অরিন্দম। অরিন্দম ওকালতি পাশ করার পর তার বিয়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তার বাবা সাব-জজ ধনগোপালবাবু। ছেলের জন্যে মেয়ে দেখার বিরাম নেই ধনগোপালবাবুর। যত পাত্রী তিনি দেখেছেন তাদের ছবি, ঠিকুজির প্রতিলিপি, চুলের দৈর্ঘ্য, দেহের মাপ, গায়ের রঙ, হাঁটার ভঙ্গি এবং তাদের সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য তিনি টুকে রেখেছেন একটি খাতায়। খাতাটির নাম দিয়েছেন "বিয়ের খাতা"। নতুন কোন পাত্রী দেখার পরই তার পূর্ণ বিবরণ ও পরিচয় তিনি টুকে রাখেন এই খাতায়, এবং প্রত্যেকের গুণাগুণ বিচার করে প্রতি বিষয়ে তিনি নম্বর পর্যন্ত দিয়ে রাখেন তাঁর খাতায়। দুঃখের বিষয়, ৩৫০ নম্বরের বেশী কোন পাত্রীই পায়নি এ পর্যন্ত, অথচ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার মোট নম্বর তিনি ধার্য করেছেন ৫০০।

বিয়ের ব্যাপারে অরিন্দম পিতার পছন্দ-অপছন্দের ওপরই এতকাল নির্ভর করে এসেছে। কিন্তু বন্ধু সুকেশের বোন অলকা তার মন জয় করে নেবার পর সে পড়ল ভাবনায়। বাবাকে মুখ ফুটে কিছু বলবার সাহস তার নেই। আবার এদিকে মেয়েদের সামনে মুখ তুলে কথা বলবার সাহসও নেই লাজুক অরিন্দমের। তাই অলকাকেও মনের বাসনা সে খুলে বলতে পারেনি। তারপর একদিন যখন ধনগোপাল-বাবু পাত্রী হিসাবে অলকাকে অপছন্দ করলেন, অরিন্দমের জীবনে তখন সত্যিই এক নতুন সমস্যা দেখা দিল। অলকার সঙ্গে মিলনের সব আশাই সে তখন প্রায় বিসর্জন দিয়েছে। এমনি সময়ে নতুন চাকরি পেয়ে তাকে চলে যেতে হল কালিম্পঙয়ে।

ধনগোপালবাবুর পাত্রী সন্ধান ও পাত্রী পরীক্ষার কাজ এদিকে অবাধ গতিতে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু মনোমত পাত্রী পাওয়া তো দূরের কথা, তার পাত্রী পরীক্ষার ধরনের জন্যে স্থানবিশেষে লাঞ্ছনাই জুটেছে তাঁর কপালে। যে পুত্রের জন্যে তাঁর এত দুর্ভাবনা ও দুর্গতি সে তখন কালিম্পঙয়ে তার এক বন্ধু-দম্পতির সাহায্যে অলকার সুখ-সান্নিধ্যে এসে ভিড়েছে। অলকার বাবা তখন বদলি হয়ে এসেছেন কালিম্পঙয়ে।

এদিকে ধনগোপালবাবু ছেলের বিয়ের শেষ চেষ্টায় মরিয়া হয়ে উঠে তাঁর বিয়ের খাতার অন্তর্ভুক্ত বাছা বাছা পাত্রীগুলিকে আবার দেখতে চেয়ে তাদের অভিভাবকদের কাছে চিঠি পাঠিয়ে দেন। ধনগোপালবাবুর চিঠি পেয়ে শতাধিক কন্যাদায়গ্রস্ত অভিভাবক যখন তাঁর বাড়িতে এসে হট্টগোল শুরু করে দেয়, ঠিক সেই সময়ে কালিম্পং থেকে টেলিগ্রামে এসে পৌঁছয় ছোট্ট একটি বার্তা। অরিন্দম-অলকার শুভ-পরিণয়ের সংবাদ। ধনগোপালবাবু সপরিবারে ছুটে চলেন কালিম্পঙয়ে। গিয়ে দেখেন অরিন্দম-অলকার মালাবদল হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত তিনি ছেলের বিয়ে কীভাবে হাসিমুখে মেনে নেন তা নিয়েই ঘটে কাহিনীর সুখ-পরিণতি।

ছবির কাহিনী এ-কালের নয়। এবং রূপ-রস ও বিশেষত নায়ক-চরিত্রটির ক্ষেত্রে এ-কাহিনীর সঙ্গে কাহিনীকারের "অভয়ের বিয়ে"র যে বিশেষ কোন অমিল নেই সেটা দর্শকের মনে সহজেই ধরা পড়বে। তাই ছবির মৌল আবেদন অনাস্বাদিতপূর্ব নয়।

নায়কের পিতার "বিয়ের খাতা" ও পাত্রী-পরীক্ষার কয়েকটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে

শীতবস্ত্র ও পোষাক
এবং হোসিয়ারী দ্রব্যাদি
শতকরা ২৫৲—৩০৲ কম মূল্যে
WINTER REDUCTION SALE
নূতন ষ্টক SALEএ দেওয়া হইল
হরলালকা
কলেজ ষ্ট্রীট, ধর্ম্মতলা, ভবানীপুর
ব্রাবোর্ণ রোড